৪ অক্টোবর ১৯৮৬

যাও গিরিরাজ

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী □

মুখোপাধ্যায় □

আনন্দ বাগচী □

একটি

ফিলিপ্‌স – গত পঞ্চাশ বৎসরাধিক কাল ভারতের ঘরে-ঘরে বিশ্বস্ত নাম

নিশ্বাসে দুর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়!

আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র!

নিয়মিত কোলগেট ব্যবহার সারা পরিবারকে দেয় সুস্থসবল দাঁত
আর তাজা নির্মল নিশ্বাস। এর থেকেই তো আসে আত্মবিশ্বাস!
আর কোলগেটের তাজা মিণ্টি স্বাদ কার না পছন্দ!

প্রতিবার দাঁত মাজার সময়ে কোলগেটের বিশিষ্ট ফর্মূলা কীভাবে কাজ করে দেখুন।

দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকেই নিশ্বাসের গন্ধ আর দাঁত ক্ষয়ের শুরু।

কোলগেটের অজস্র সক্রিয় ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে এই ক্ষয়ক্ষতিকারী খাবারের কণাগুলো বার করে আনে, রোগজীবাণু হ'তে দেয় না।

ফলে দাঁত থাকে সুস্থসবল, নিশ্বাস হয় ঝরঝরে তাজা।

প্রতিদিন নিয়মিত কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজতে ভুলবেন না। সম্ভব হ'লে প্রতিবার খাবার পর।
নিশ্বাসে দূর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়!
আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র।

কি তাজা মিণ্টি স্বাদ

এখনও জয়
এত চটপটে আছে
কি ভাবে ?

সারাদিনের ধকলের পরেও জয়কে তাজা রাখে ভিভা।

কেননা ভিভাতে অতি প্রয়োজনীয় ৮টা ভিটামিন আছে, যা শরীরের জন্য সবারই ভীষণ প্রয়োজন।

ক্রীমযুক্ত তাজা দুধ ও পাকা বার্লির মল্ট দিয়ে তৈরী, ভিভা নিমেষে গুলে যায়, তাই হজম করাও সোজা।

এসবের জন্য ভিভাই হচ্ছে একমাত্র স্বাস্থ্যকর পানীয় যা যোগায় স্ট্যামিনা।।

ওদের হারানো সহজ নয়, এতে আছে ভিটামিন
চারিদিকে হৈ চৈ-ভিভা দিন, ভিভা দিন।

ASP JIL 86

JiL
জগৎজিত ইন্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড

সূচীপত্র

দেশ

১৭ আশ্বিন ১৩৯৩ □ ৪ অক্টোবর ১৯৮৬ □ ৫৩ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা
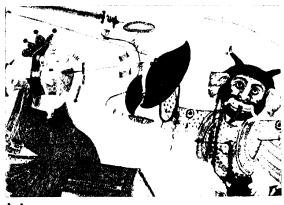
২১

পূজার প্রাক্কালে এই বোধন। প্রচ্ছদ নিবন্ধের চালচিত্রে দুর্গতিনাশিনীর ষড়দর্শন। লঘুগুরু দৃষ্টিকোণ থেকে তত্ত্বে তথ্যে আকীর্ণ আবেগ-আবিষ্ট ছটি রচনা।
হিমালয়ের বহুরূপী পার্বতী সমতলের সাধনচেতনায় কীভাবে বিবর্তিত হয়েছেন, মূর্তিত, অন্বিত এবং অর্চিত হয়েছেন তারই শাস্ত্রানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী।
আর পার্বতীর মর্ত্যাগমনের গীতালেখ্য তুলে ধরেছেন রাজ্যেশ্বর মিত্র। বাঙালীর অবারিত আন্তর-আকৃতিকে অনর্গল এবং অন্তরঙ্গ করে তুলেছে আগমনী গান।
বিগতবঙ্গে গ্রামের হৃৎপিণ্ড স্বরূপ চণ্ডীমণ্ডপের বিচিত্র ও ব্যাপক ভূমিকা ছিল। পূজা-পাঠ-সঙ্কীর্তনের নিশ্ছিদ্র মহিমার মধ্যে দেবী দুর্গা আর দেশমাতৃকা একাকার হয়েও কীভাবে সঙ্কীর্ণতায় আক্রান্ত তারই ভ্রাম্যমাণ নিরীক্ষা কিশলয় ঠাকুরের রচনায়।
বেদে বেদীতে সূক্তচিত্রে যেমন, তেমনি রাজকীয় বন্দনায় মুদ্রারূপিণী হয়েও মহাদেবীর দর্শন ঘটেছে। মুদ্রাচিত্রের এই ইতিহাস সমীক্ষা করেছেন ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
সর্বজনীন উৎসব অবকাশের রম্য আলেখ্য আনন্দ বাগচীর মৃগয়া-ঘটিত রচনায় উপভোগ্য।
সেই সঙ্গে একালের চোখে সেকালের চোখ। পূজা পার্বণের ভিনদেশী শিল্পীর পর্যবেক্ষণ শুধু তথ্য চিত্র নয়, চিত্রতথ্যও। সংযোজক অভী দাস।

৭৫

বক্তব্যে ও ব্যক্তিত্বে গান্ধীজী এক দুর্বোধ্য রূপক। তুলনাহীন। যার অনুশীলন বৈষ্ণবের শাক্তপূজার মত হয়ে দাঁড়ায় আমাদের কাছে। অশীন দাশগুপ্তের স্বচ্ছ সপ্রতিভ বিশ্লেষণে বহু আলোচিত গান্ধীর এই নবনিরীক্ষা।

প্রচ্ছদ
বিকাশ ভট্টাচার্য

সম্পাদক সাগরময় ঘোষ

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক
৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ২০ পয়সা পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা

প্রকাশিত হল

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের

জীবনবোধদীপ্ত উপন্যাস

বসবাস

দাম ২৫.০০

বসবাসই একদিন গড়ে তুলেছিল মানুষের সমাজ, তার সভ্যতা, তার নিবিড় আত্মিক বন্ধন। গড়ে তুলেছিল তার রুচি, শিক্ষাসহবত, জীবনদর্শন, যথা-অর্থে বেঁচে থাকার সার্বিক মূল্যবোধ।
কিন্তু এই অদ্ভুত সময়ে—যখন সব-কিছুই দ্রুত বদলে যাচ্ছে, পালটে যাচ্ছে পুরনো ধ্যানধারণা ও বেঁচে থাকার ধরনধারণ—বসবাসের বন্ধন খুলতে বদ্ধপরিকর নতুন প্রজন্মের কিছু মানুষ; তৎপর রক্তসূত্রের সম্পর্ক ছিন্ন করতেও। এই অশুভ প্রবণতার পরিণতি সম্পর্কেই যেন নতুনভাবে সচেতন করে দিতে আগ্রহী এ-যুগের বিশিষ্ট কথাকার সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। দেখিয়ে দিতে উদগ্রীব যে, রক্তের বন্ধনই সব নয়, নিঃসম্পর্ক অনাত্মীয়ও হয়ে উঠতে পারে পরম নিকটজন।
একই পাড়ার ভিন্ন দুই বাড়িতে বসবাসকারী দুই সহোদর বৃদ্ধ, তাদের দু-ধরনের সমস্যাজর্জর জীবন এবং দুজনেরই পরিচিত এক বন্ধুর আকস্মিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বোনা তুমুল কৌতূহলকর এই উপন্যাসে দীপ্ত এই জীবনবোধকেই নিপুণভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। প্রচ্ছদ: দেবাশিস দেব।

প্রকাশিত হয়েছে

মীরা বালসুব্রমনিয়ন -এর

বুদ্ধিদীপ্ত রহস্যভেদের গল্প সংগ্রহ

প্রবলেম সলভার পুল্লা রেড্ডী

দাম ১০.০০

কুচকুচে কালো রঙ, ততোধিক কালো মাথার চুল। হ্যান্ডেল বার গোঁফ। সাদা মুক্তোর মতো দাঁত। সবসময় মুখে হাসি। মাথা ঠাণ্ডা, বুদ্ধি পরিষ্কার, চিন্তা স্বচ্ছ। দীর্ঘকাল কলকাতায়। অনর্গল বাংলা বলতে পারেন। কাজ করেন সরকারী অফিসে।
গোয়েন্দাগিরিটা শখের ব্যাপার। তবু নিজেকে গোয়েন্দা বলতে চান না পুল্লা রেড্ডী। বলেন, প্রবলেম সলভার। অর্থাৎ সমস্যার সমাধানকারী।
কথাটা বিনয়ের, কিন্তু কাজটা কঠিন। যেভাবে সমস্যার সমাধান করেন পুল্লা রেড্ডী, তা মোটেই ছোট করে দেখবার নয়। কোথায় কার গুপ্তধন খুঁজে দিতে হবে, কোথায় কে উইল চুরি করেছে, কে হারিয়েছে দুর্মূল্য কাগজপত্র, কে হাতড়েছে হীরের নেকলেশ, কার হাতে পৌঁছে দিতে হবে দামী জিনিসপত্র—প্রবলেম সলভার পুল্লা রেড্ডী হাজির। তাঁর গোয়েন্দাগিরির গল্পে কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে না, সবই সহজ, সাধারণ, কিন্তু অসাধারণ হয়ে ওঠে বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণের গুণে। এইসব গল্প সবই প্রায় বেরিয়েছিল পাক্ষিক 'আনন্দমেলা'য়। এবার বেরুলো তুমুল আকর্ষণীয় এক বই হয়ে। প্রচ্ছদ: প্রবীর সেন।

নানা স্বাদ, নানা বিষয়

কে এম ম্যাথিউর
কেরালার আধুনিক রান্না
দাম ২৫.০০

লীলা মজুমদার ও কমলা চট্টোপাধ্যায়ের
রান্নার বই
দাম ১৫.০০

বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের
মিষ্টান্নপাক
দাম ১৫.০০

ডাঃ অরুণকুমার মিত্রের
কন্যা জায়া ও জননী
দাম ৩০.০০

চিত্রা দেবের
বিবাহবাসরের কাব্যকথা
দাম ১৬.০০
পুঁথিপত্রের আঙিনায় সমাজের আলপনা
দাম ১২.০০

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি
দাম ১৫.০০

সাগরময় ঘোষের
একটি পেরেকের কাহিনী
দাম ১০.০০

ভগীরথ বন্ধুর
চৈতন্যসঙ্গীতা
দাম ১২.০০

তপনকুমার দাস ও ডাঃ কানাইলাল ভৌমিকের
কৃষিবিজ্ঞান: প্রযুক্তি ও তথ্য
দাম ৪০.০০

পাঠকপ্রিয় পঞ্চম মুদ্রণ

অরূপরতন ভট্টাচার্যের

ভুল-ভাঙানো, বিজ্ঞানসম্মত পরামর্শ

কী খাব না খাব

দাম ৮.০০

ভাতের সঙ্গে জল খাওয়া কি অনুচিত? স্বাস্থ্য ফেরাবার জন্য টনিক খাব, না অন্য কিছু? পোলট্রির ডিম খাব, না দিশি? হাঁসের ডিম, না মুরগির? কুচো মাছ ভালো, না বড় মাছ?—আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে এমনতর যত প্রশ্ন, তারই জবাব দিয়েছেন বিজ্ঞানে রবীন্দ্র পুরস্কার-প্রাপ্ত লেখক। এইসব উত্তরে ভেঙে যাবে বহু বদ্ধমূল ভুল, অযৌক্তিক ধারণা, বহু সংশয়, সংস্কার।

চটপটে চতুর্থ মুদ্রণ

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কর্তৃক সংকলিত

অনবদ্য গল্প-সংগ্রহ

মাধুরীলতার গল্প

দাম ৮.০০

কবিকন্যা মাধুরীলতা আর যার তাঁর গল্প নিয়ে অনবদ্য এক সংগ্রহ এই গ্রন্থ। এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলতে গিয়ে এ যুগের অন্যতম প্রধান সাহিত্যিক বিমল কর লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ যে বলতেন, 'ওর ক্ষমতা ছিল'—তা পিতৃস্নেহবশত নয়। যথার্থই ক্ষমতা ছিল মাধুরীলতার।"
আরেকটি বই:
মাধুরীলতার চিঠি ৭.০০

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের

সংবেদনশীল উপন্যাস

অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ

দাম ৮.০০

সন্ধেবেলা যেমন সাপ বলতে সংস্কারে বাধে অনেকের, বলে লতা, তেমনি এই রোগের নামও নাকি নিতে নেই। বলতে হয়, 'হ্যানসেনের অসুখ'। এই সেই রোগ, যে-রোগে সেরে-ওঠার থেকে বড় অসুখ আর নেই। সারা পৃথিবী ফিরিয়ে নেবে মুখ। এমন-কি বাড়িতেও ফেরা কঠিন। কোনরকমে হাসপাতালে গছিয়ে দেওয়া মানেই সম্পর্ক ঘুচিয়ে দেওয়া।
এমনই দুরারোগ্য ব্যাধি-কবলিত এক মানুষের আত্মকাহিনী শোনাতে গিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় শুনিয়েছেন এই রোগে আক্রান্ত একটি সমাজেরই কথা, যে সমাজ নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছিল এই বিকলাঙ্গ, বাতিল মানুষেরা। সে এক আশ্চর্য আকর্ষণীয় কাহিনী। কবি বলেই নিশ্চিত সুভাষ মুখোপাধ্যায় পেরেছেন মমতাময় প্রগাঢ় দুটি চক্ষু দিয়ে এদের বেদনা যন্ত্রণার পৃথিবীকে এমন অসামান্যভাবে দেখাতে, এমন জীবন্তভাবে দেখাতে।
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ: ছেলে গেছে বনে ৬.০০ একটু পা চালিয়ে, ভাই ৬.০০ জল সইতে ৬.০০ হাফিজের কবিতা ২৫.০০

প্রকাশিত হয়েছে

রত্নেশ্বর হাজরার

নতুন কাব্যগ্রন্থ

আছি নির্বাসিত

দাম ১০.০০

[illegible] থেকেই ইতস্তত পত্র-পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে [illegible] রত্নেশ্বর হাজরার কবিতা। তাঁর [illegible] দিয়েছে মাটি [illegible] হিসেবে যাঁরা [illegible] রত্নেশ্বর হাজরাকে চিহ্নিত [illegible] কবি হিসেবে।
[illegible] এই যে, [illegible] দিক থেকে [illegible] তাঁর কবিতায় [illegible] রত্নেশ্বর হাজরাকে [illegible] আবদ্ধ [illegible] এ-প্রশ্ন [illegible] কবি, [illegible] তিনি [illegible] দিয়েই নিজ [illegible] চান তিনি, [illegible]। 'আছি নির্বাসিত' [illegible] নতুন কাব্যগ্রন্থেও সৎ, [illegible] ও সন্ধানী [illegible] চিহ্ন স্পষ্ট ধরা পড়েছে। প্রচ্ছদ: প্রবীর সেন।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

সুকুমার রায় স্মরণ সংখ্যা

পূর্বোক্ত সংখ্যায় শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'সন্দেশ-সম্পাদক সুকুমার রায়' প্রবন্ধটিতে প্রথমেই এই দ্বিধা ব্যক্ত হয়েছে যে, উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পরে 'সন্দেশ'-এ কি সম্পাদক রূপে সুকুমারের নাম কখনো মুদ্রিত হয়েছিল ? প্রণববাবু সে-কালের 'সন্দেশ'-এর প্রচ্ছদ দেখার সুযোগ পাননি বলেই সঙ্গত কারণে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন। ১৩২২ থেকে ১৩৩০ অবধি মলাট ও বিজ্ঞাপন অংশ সমেত 'সন্দেশ'-এর কিছু এলোমেলো সংখ্যা সম্প্রতি সংগ্রহ করতে পেরেছি, সেই সুবাদেই কয়েকটি তথ্য পেশ করছি।

উপেন্দ্রকিশোর সম্পাদিত 'সন্দেশ'-এর দ্বিতীয় বর্ষেই প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদে আর্ট ওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত ছিল এই ক'টি কথা : 'ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা' 'সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, বি. এ.।' আর প্রচ্ছদচিত্রের নিচে টাইপ কম্পোজ ক'রে : 'বার্ষিক মূল্য ১।৷ প্রতি সংখ্যা ৵ আনা।'

১৩২৫-এর 'সন্দেশ'-এর কয়েকটি সংখ্যা থেকে দেখতে পাচ্ছি, প্রচ্ছদের (সুকুমার কৃত) ছবির তলায় টাইপ সাজিয়ে ছাপা রয়েছে : 'সম্পাদক শ্রীসুকুমার রায়, বি. এসসি।' পত্রিকার দাম তখন দু' আনা থেকে বেড়ে হয়েছে দু' আনা দু' পয়সা।

১৩২৮ ও ১৩৩০ সালেরও কিছু সংখ্যায় দেখছি অনুরূপভাবে প্রচ্ছদের নিচে ছাপা হয়েছিল সম্পাদক সুকুমারের নাম। ১৩৩০-এর মাঘ সংখ্যাতে সম্পাদক হিসাবে শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরীর নাম পেয়েছি। ১৩২৮ থেকে ১৩৩০ এই পর্বে 'সন্দেশ'-এর প্রতি সংখ্যার দাম ছিল তিন আনা, বার্ষিক মূল্য দু' টাকা চার আনা।

১৩২৮-৩০ পর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় 'সন্দেশ' কার্যালয় চিরকালই ছিল সুকিয়া স্ট্রিটে। এমন কি রায় পরিবার ১০০ গড়পার রোডে চলে আসার পরেও। সুকিয়া স্ট্রিটের কার্যালয়ের নম্বর অবশ্য তিনবার বদলেছে এর মধ্যে। প্রথমে ছিল ২২ নম্বর, তারপরে ২১/২ এবং শেষে ৭২ নম্বর।

কিছুটা প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে উপেন্দ্রকিশোর সম্পাদিত 'সন্দেশ'-এর দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনের কথা বলি। প্রথম বর্ষের উদ্বৃত্ত 'সন্দেশ'গুলি বাঁধিয়ে বিক্রি করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঘোষণাটি ছিল এই রকম:

> ১৩২০ সালের বাঁধান সন্দেশ
> প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার বই। ১৪
> খানি রঙ্গিন ছবি, প্রায় ১০০
> খানি হাফটোন ছবি,
> সুন্দর বাঁধাই।
> শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
> ,, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
> শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী,
> শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী,
> শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার,
> ,, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত,
> ,, যোগীন্দ্রনাথ সরকার
> প্রভৃতির লেখা ১৩২০
> সালের সন্দেশে বাহির
> হইয়াছে।
> উপহারের উৎকৃষ্ট পুস্তক।
> মূল্য ১।৷ টাকা মাত্র।
> "সন্দেশ" কার্যালয়,
> ২২ নং সুকিয়া স্ট্রিট,
> কলিকাতা।

উপেন্দ্রকিশোরের অজস্র অস্বাক্ষরিত রচনা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও এই বিজ্ঞাপনেও তিনি নিজেকে অন্তরালেই রেখেছিলেন। এই প্রথা সুকুমারও অনুসরণ করেছিলেন। উপেন্দ্রকিশোরের সম্পাদনা কালে রায় পরিবারভুক্ত কোনো লেখকের নাম ছাপা হয়নি, এ-কথাটিও ঠিক নয়। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় 'ফুলের ভাষা' কবিতাটির রচয়িতা শ্রীসুখলতা রাও-এর নাম ছাপা হয়েছিল।

> **সবিনয় নিবেদন**
> **'দেশ' কার্যালয় পূজার ছুটি উপলক্ষ্যে বন্ধ থাকার জন্যে ১১ অক্টোবরের 'দেশ' পত্রিকা প্রকাশিত হবে না। পরবর্তী সংখ্যাগুলি যথারীতি প্রকাশিত হবে।**
> **সম্পাদক □ দেশ**

আলোচ্য স্মরণ সংখ্যায় একাধিক লেখক ফোটোগ্রাফিতে সুকুমারের ব্যুৎপত্তির কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সুকুমার রায় রয়েল ফোটোগ্রাফিক সোসাইটির প্রথম ভারতীয় ফেলো নন, দ্বিতীয়। সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই ভুলটি হয়েছে। শনাক্ত করা যায়, সুকুমার গৃহীত ফোটোগ্রাফ বর্তমানে নিতান্তই বিরল, তবু তার মধ্যে যেটি সবচেয়ে মূল্যবান আবিষ্কার —১৯০৬ নাগাদ তোলা রবীন্দ্রনাথের পোর্ট্রেট— সেটি এই স্মরণ সংখ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের তরুণ বন্ধু' নিবন্ধটির মধ্যে ছাপা হয়েছে। কিন্তু ফোটোগ্রাফটি যে সুকুমার তুলেছিলেন সে-কথার উল্লেখ থাকলে উক্ত নিবন্ধটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ফোটোগ্রাফটির একটি অতি বাঞ্ছনীয় সূত্রও স্থাপিত হত। রবীন্দ্রনাথের এই পোর্ট্রেট সমেত সুকুমারের তোলা অন্যান্য ফোটোগ্রাফ সম্বন্ধে বিবরণের জন্য আগ্রহী পাঠক ১৩৯২-এর শারদীয়া 'এক্ষণ'-এ প্রকাশিত 'ছবি তোলা' প্রবন্ধটি দেখতে পারেন।

পত্রলেখক রচিত 'বিজ্ঞান-কর্মী সুকুমার'-এ এক জায়গায় আছে '"সন্দেশ" ছিল এক অর্থে ইউ. রায় অ্যাণ্ড সন্স-এর হাউস জার্নাল'। এই উক্তির যাথার্থ্য নিয়ে পরিচিত কয়েকজন পাঠকের মুখে প্রশ্ন শুনে সকলের অবগতির জন্য ১৩২১-এর বৈশাখ সংখ্যা 'সন্দেশ'-এর অন্তিম প্রচ্ছদ জুড়ে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করছি :

> The Sandesh is Printed
> and illustrated by
> U. RAY & SONS
> Process Engraver,
> Illustrators, Art
> Printers and Publishers
> 100, Gurpar Road,
> Calcutta

বিজ্ঞাপনটি আশা করি আমার বক্তব্যকেই সমর্থন করছে।

সিদ্ধার্থ ঘোষ
কলকাতা-৩২

জাতীয় কংগ্রেস ও অতুল্য ঘোষ

'দেশ' পত্রিকায় শ্রীসত্যব্রত ঘোষ-এর ধারাবাহিক রচনা 'জাতীয় কংগ্রেস ও অতুল্য ঘোষ' আমার মত অনেকেই আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেছেন। ওই রচনার চতুর্থ কিস্তিতে (১৯ জুলাই, ৫৩ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা) ৭১ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন : ১৯৩০ লাহোর কংগ্রেসে সভাপতি পদে মহাত্মা গান্ধী সব চেয়ে বেশি ভোট পান : ইত্যাদি। বস্তুত লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল ১৯২৯ সালে। সেটিকে ঐতিহাসিক অধিবেশন বলা হয়েছিল এই জন্য যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই অধিবেশনেই প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে পূর্ণ স্বরাজের দাবি সম্পর্কিত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল এবং সেই অধিবেশনের শেষে মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং 'স্বাধীনতা দিবসের' সংকল্প বাক্যের খসড়া রচনা করেছিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে অনুমোদনের পর ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারি তারিখ সারা ভারতে জনসভা করে এই সংকল্প বাক্য পাঠ করা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রতি বছর দেশের সর্বত্র ওই দিনটি 'স্বাধীনতা দিবস' রূপে উদযাপিত হতো ত্রিবর্ণরঞ্জিত কংগ্রেস পতাকা উত্তোলন ও অভিবাদন (ওই পতাকাই ছিল পরাধীন ভারতের 'জাতীয় পতাকা'—ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক) এবং স্বাধীনতার সংকল্প বাক্য পাঠের মাধ্যমে। দেশের নয়া শাসনতন্ত্র রচিত হওয়ার পর এই ২৬শে জানুয়ারী দিনটি পালিত হচ্ছে 'রিপাবলিক ডে' বা প্রজাতন্ত্র দিবসরূপে। ১৯২৯ সালের বছরের শেষ দিন —৩১ শে ডিসেম্বর মধ্য রাত্রে সুদীর্ঘ বিতর্কের পর পূর্ণ স্বরাজের (complete Independence) দাবিসূচক প্রস্তাবটি গৃহীত হয় প্রচণ্ড হর্ষোচ্ছ্বাসের দ্বারা 'বন্দেমাতরম' ও 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্যে।

জাতীয় পতাকা উড্ডীন হলো। রাবী নদীর তীরে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পর হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত নেহরু আনন্দাতিশয্যে বালকের ন্যায় মঞ্চের ওপর নৃত্য করেছিলেন—নব্বুই বছরের গান্ধীবাদী নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন এই সেদিনও এই দৃশ্যটির কথা উল্লেখ করেছেন। পণ্ডিতজী এই সম্বন্ধে তাঁর আত্মচরিত গ্রন্থে বলেন : 'পূর্ণ স্বাধীনতার মূল প্রস্তাব এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের কার্যপ্রণালী প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো, কয়েক সহস্রের মধ্যে এক শতেরও কম ব্যক্তি বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন।

...লাহোর কংগ্রেসের স্মৃতি আমার চিত্তপটে উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত রয়েছে। ...এখানে আমিই নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলাম এবং সাময়িকভাবে রঙ্গমঞ্চের

কেন্দ্রস্থল আমিই অধিকার করেছিলাম'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহাত্মাজী রচিত 'স্বাধীনতা দিবসের' সংকল্প বাক্যের শুরু এইভাবে : 'আমরা বিশ্বাস করি, জাতীয় জাগরণের সমুন্নতির পূর্ণ পথে অন্যান্য দেশবাসীর ন্যায় ভারতবাসীরও তার স্বাধীনতা লাভ করার এবং শ্রমলব্ধ বিত্তভোগ ও জীবন ধারণের উপযোগী উপকরণ পাওয়ার অবিচ্ছেদ্য অধিকার রয়েছে'। ইত্যাদি। বালক বয়সে পূর্ব বঙ্গের মহকুমা শহর চাঁদপুরের নীরদ পার্কে ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে প্রবীণ গান্ধীবাদী জননায়ক হরদয়াল নাগের নেতৃত্বে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও স্বাধীনতার সংকল্প বাক্য গ্রহণের অনুষ্ঠানটি আমার স্মৃতিতে এখনো অক্ষয় হয়ে আছে।

শ্রীতপাদার তাঁর রচনার আর এক জায়গায় নাম বিভ্রম সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জিজ্ঞাসার উত্তরে অতুলাবাবু বলেন : "আমার ছেলে নয়, বীরভূমের অতুল ঘোষের ছেলে বিলেতে আছে। অন্য কিছু নয়।" অতুল ঘোষ মানভূমের প্রখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা ছিলেন, বীরভূমের নয়। জন্ম তাঁর বর্ধমানের খণ্ডঘোষ। অতুলাবাবু নিজেই প্রবন্ধকারের নিকট অতুলচন্দ্র এবং তাঁর সহধর্মিণী লাবণ্যপ্রভা দেবী সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে অতুল ঘোষ ও অতুল্য ঘোষ—এই নাম বিভ্রাট নিয়ে আর একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনার কথা মনে পড়ে। অতুলাবাবু তখন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক, সভাপতি ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি। প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যালয় তখন ধর্মতলা স্ট্রিটে—মৌলালির মোড়ে। বাঙলাভাষী অধ্যুষিত মানভূম সে সময় বিহারের অন্তর্গত। বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি বিহারের বিমাতৃসুলভ আচরণের প্রতিবাদে সমগ্র মানভূমে কংগ্রেস নায়ক অতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়। 'টুসু' সত্যাগ্রহ নামে আখ্যাত ওই আন্দোলনে মানভূম জেলা উত্তাল হয়ে ওঠে। টনক নড়লো দিল্লির কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের। তাঁরা মানভূমের বঙ্গভাষীদের সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণের জন্য একটি তদন্ত কমিশন গঠন করলেন এবং এই সম্পর্কিত ঘোষণা ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র অতুল ঘোষের নামে উদ্দিষ্ট হলেও চলে আসে অতুল্য ঘোষের কাছে—কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের ঠিকানায়। দিল্লির কংগ্রেস অফিসে অতুল্য ঘোষ নামটি সমধিক পরিচিত বলেই সম্ভবত এই বিভ্রান্তি। অতুল্যদাই আমাকে এই চিঠির খবর দেন এবং আমিও 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' খবরটি প্রকাশ করে কৃতিত্ব লাভ করি। সেই সময় এই খবরটি খুবই প্রাসঙ্গিক এবং মূল্যবান ছিল। এই ভাবে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' পড়ায় 'স্কুপ' করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

মধুসূদন চক্রবর্তী
কলকাতা ১৪

চালধোয়া জল

৫ জুলাই-এর 'দেশ' পত্রিকায় বিজ্ঞানের টুকরো খবরের "চালধোয়া জল" শিরোনামের প্রতিবেদনের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। বলা হয়েছে প্রচণ্ড উদরাময়ে মৃতপ্রায় শিশুদের চালধোয়া জল খাইয়ে তিনদিনে নিরাময় করা হয়েছে। যাদের চালধোয়া জলের সঙ্গে সোডিয়াম ও পটাসিয়াম খাওয়ান হয়েছিল তাদের উপকার হয়েছে কম এবং আরও কম উপকার হয়েছে যাদের কেবল গ্লুকোজ ও সোডিয়াম-পটাসিয়াম খাওয়ানো হয়েছিল জলের সঙ্গে।

এইরকম বিজ্ঞানের খবর বিভ্রান্তিকর এবং বিপজ্জনক। গবেষণা বহুবিধ হতে পারে এবং বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিতও হতে পারে। কিন্তু তা বিজ্ঞান গ্রাহ্য হওয়ার আগে সাধারণ পত্রিকায় ছাপালে তা জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। আমার বিশ্বাস উদরাময়ে মরণাপন্ন শিশুকে চালধোয়া জল খাওয়ালে মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। আলোচনা করা যাক চালধোয়া জল কতটা বিজ্ঞানসম্মত বা কার্যকারী। প্রকাশিত প্রতিবেদনে যথার্থই বলা হয়েছে, "উদরাময়ের দরুন শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে জল বেরিয়ে যায়। সেই সঙ্গে বেরিয়ে যায় সোডিয়াম এবং পটাসিয়াম। এসব রোগীকে প্রচুর পরিমাণ জলের সঙ্গে লবণ এবং গ্লুকোজ খাওয়াতে হয়।" সে

কারণেই উদরাময়ে চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার আগেই রোগীদের সোডিয়াম পটাসিয়াম ও গ্লুকোজ গোলা জল খাওয়ানোর প্রচারে নেমেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। চালধোয়া জলে কি কি আছে? জল, চালের গুড়ো, চালের আবরণের গুড়ো (থিয়ামিন সমৃদ্ধ), চালের খোসার গুঁড়ো (তুঁষ) এবং ধানের সঙ্গে মাটি জীবাণু ইত্যাদি। ছোলা গম আটার মত চালেও প্রচুর জীবাণু থাকে। উদরাময়ে আক্রান্ত মরণাপন্ন শিশুকে এই চালধোয়া জল খাওয়ানোর ফল হিতে বিপরীতই হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

"ডাঃ মেহতা বলেছেন, চাল ধোয়া জলে যথেষ্ট কার্বোহাইড্রেট থাকে। তাই ভাল ফল পাওয়া যায়।" কার্বোহাইড্রেটেই যদি উদরাময় ভাল হয় তবে অশুদ্ধ চাল ধোয়া জল কেন? চাল গুড়ো করে জীবাণু মুক্ত করে ডোজ নির্ধারণ করে জলে গুলে খাওয়ালেই হয়। আরও বিজ্ঞানসম্মত হবে আরও সহজ পাচ্য শুদ্ধ কার্বোহাইড্রেট 'গ্লুকোজ' দিয়ে চিকিৎসা করলে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার ডাঃ মেহতার গবেষণায় নাকি দেখা গেছে চালধোয়া জলের সঙ্গে সোডিয়াম ও পটাসিয়াম (ইলেকট্রোলাইটস) দিয়ে অপেক্ষাকৃত খারাপ এবং ইলেকট্রোলাইটসের (সোডিয়াম পটাশিয়াম) সঙ্গে গ্লুকোজ দিয়ে আরও খারাপ ফল দেখা গেছে। এবার দেখা যাক গ্লুকোজ এবং ইলেকট্রোলাইটস এর ভূমিকা। উদরাময়ে বাহ্যবমিতে শরীরের জলের সঙ্গে সোডিয়াম এবং কিছু পটাসিয়াম এবং অন্যান্য গৌণ পদার্থ বেরিয়ে যায়। ধমনীতে নুনজল (জল ও সোডিয়াম ক্লোরাইড) দিলেই জীবন রক্ষা পায়। কিন্তু পটাসিয়াম দিলে আরও ভাল। শরীরে তাপের যোগান দেওয়া যায় ধমনীতে গ্লুকোজ নামক সর্বোত্তম কার্বোহাইড্রেট দিয়ে। খাওয়ালে তা শরীরে কাজ করে একটু দেরীতে। বার্লি বা চালের গুড়ো খাওয়ালে তা শরীরে প্রবেশ করে গ্লুকোজে পরিবর্তিত হয়ে তবে কাজে লাগে আরও দেরীতে।

অতএব চালধোয়া জলের কার্বোহাইড্রেট শিশুর উদরাময় নিরাময় করবে কোন পদ্ধতিতে? তর্কের খাতিরে ধরা যাক চালের জীবাণু উদরাময়ের জীবাণুকে নাশ করে উদরাময় ভাল করে। তাহলে কি জীবাণু আছে, তা কেমন করে কাজ করে তা নির্ধারিত হওয়া দরকার এবং ঐ জীবাণুর চরিত্র, ক্ষতিকর দিক সব খতিয়ে দেখার পরে তার মাত্রা নির্ধারণ করা উচিত; তারপর প্রয়োগ বিধি প্রণয়ন করে তবে তা মানুষে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

কোনও জিনিসে রোগ আরোগ্য হয় মনে হলেই কেউ মানবশিশুকে গিনিপিগের মত গবেষণায় লাগাতে পারেন না। তাই সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে গবেষণা সম্পর্কে, গবেষণা লব্ধ ফল সম্পর্কে। এই অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদন করেছেন কথাটি মনে হয় সর্বোত্তম ধোকা।

ডাঃ এস আর জানা
মেদিনীপুর, মেদিনীপুর

সম্পাদকীয়

গত ২৬ জুলাই 'দেশ' সম্পাদকীয়তে ভাষা সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য পড়লুম। 'ফলশ্রুতি, উৎকর্ষতা, ঐক্যতান'—ব্যাকরণের উদারতায় যদি ক্ষমা করা যায় তাহলে তাকে কি "ভাষা এগিয়ে চলেছে" বলতে হবে? সেটা "লজ্জাস্কর হাস্যস্কর" রূপে অভিধানে স্থান পেলেও তা প্রচলিত অশুদ্ধ শব্দ বলেই ধরে নেওয়া হবে; তাই না? নতুন ব্যাকরণ/অভিধান রচনার জন্য পণ্ডিত সমিতির প্রয়োজন বোধ করছেন,—যে সমিতি অজস্র ভুলকেও আভিধানিক বা ব্যাকরণসম্মত বলে গ্রাহ্য করবে।

ভাষা পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনের দোহাই দিয়ে বা অগ্রগতির নাম নিয়ে হাওলার্স দিয়ে ব্যাকরণ তৈরী হবে? এখন শিক্ষিত বাঙালী "তোমাদেরকে"—"আমাদেরকে" "প্রশ্ন রাখছেন"—"পদক্ষেপ গ্রহণ" করছেন। 'সিংহভাগ' শব্দটি ভাষার 'সিংহভাগ' খেয়ে ফেলেছে। সেদিন টিভিতে একজন মন্ত্রী বললেন যে তিনি কোন একটি সমস্যার 'সিংহভাগ' সমাধান করেছেন। শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্য করার মতো। চলচ্চিত্রের পরিচয়লিপিতে, টিভি'র পর্দায়, পোস্টারে, বিজ্ঞাপনে অসংখ্য ভুল বানান। এসবের আড়ালে যাঁরা কাজ করেন সম্ভবত প্রত্যেকেরই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী আছে। পণ্ডিত, ব্যাকরণ, অভিধান কতোটা সাহায্য করেছে এইসব ডিগ্রী আহরণ করতে? ভাষায় রক্ষণশীল আমরা থাকতে পারি না। কারণ ভাষা প্রবাহ। 'সৌজন্যতা', 'দারিদ্রতা', "মৌনতা" গ্রাহ্য না করলে নিতান্ত "অসভাতামি" হয়ে যাবার

সম্ভাবনা। তবে কেন ইংলিশ নামক বিদেশী ভাষার সম্বন্ধে আমরা রক্ষণশীল ? একটা ভুল ইংলিশ মুখ থেকে ফসকে যদি কারুর বেরিয়ে যায় তাহলে বাঙালী সমাজে তার স্থান নির্ণয় করা শক্ত। তাকে ক্ষমা করা যায় না।

ভুল বাংলা বা বিকৃত বাংলা উচ্চারণে কারুর লজ্জায় মাথা হেঁট হয় না—স্বাধীনতার উনচল্লিশ বছর পরেও। শিক্ষিত সমাজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই কষ্টের ও যন্ত্রণার বাংলা উচ্চারিত হচ্ছে ; তাদের অভিভাবকরা খুশী।

কারণ সমাজ ইংলিশ বলার দিকে ঝুঁকেছে, শেখার দিকে নয়। বাংলা এদিকে ধুঁকছে। তাই আমাদের শিশু/কিশোর সাহিত্যে আলোড়ন জাগছে না। কারা পড়বে ? লেখকরা কাদের জন্যে লিখবেন ? তাই 'তুমি ডবে নীড়বে হৃদায়ে মামো' শুনতে হয়—তাই 'দুর্গা' বানান সদর্পে সর্বত্র বিচরণ করছে। 'দুর্গা' ক্রমশ এক্সটিংক্ট হয়ে যাচ্ছে।

এসিয়াটিক সোসাইটি কিংবা বাংলা একাডেমি কি করবে ? যদি না শিক্ষিত বাঙালী ব্যক্তিগতভাবে সচেতন হয় ? যদি না রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র ইত্যাদি জন-মাধ্যম সতর্ক হয় ?

বিদ্যাসাগর এসেও হাওলার্সের গুঁতোয় দিশাহারা হয়ে যাবেন। বাঙালী তাঁর মূর্তিতে কালি মাখিয়েছে ; জ্যান্ত পেলে নিঘাৎ "লাশ ফেলে দেবে" !

নীলিমা সেন-গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা-১৯

শুষ্ক তাপের দৈত্যপুরে

১৯ জুলাই দেশ পত্রিকায় শ্রীদেবাশিস দাশগুপ্ত 'শুষ্ক তাপের দৈত্যপুরে' শীর্ষক প্রচ্ছদ নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত শহর কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বর্ণনা ও যথার্থ আলোচনার মাধ্যমে বর্তমান রবীন্দ্রচর্চার বাস্তব চিত্রমালা সুন্দর সাজিয়ে দিয়েছেন।

রবীন্দ্র-সৃষ্টির প্রতিটি ধারায় প্রতিবেদকের অবাধ বিচরণ ও অনায়াস দক্ষতা, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের চিন্তাভাবনা, অনুভূতি ও চর্চার একটি সুন্দর ছবি চিত্রিত করতে সাহায্য করেছে এই দীর্ঘ প্রতিবেদনে। প্রতিটি অনুষ্ঠান যেভাবে আলোচিত হয়েছে, বিশেষত 'দেশ'-এর মত সমৃদ্ধ অভিজাত সাময়িকীর পাতায় আগামীদিনের সম্ভাবনাময় শিল্পীরা যে প্রশংসাসূচক প্রচার পেয়েছেন, তার জন্য প্রতিবেদকের ধন্যবাদ অবশ্যই প্রাপ্য। এত বিস্তৃত আলোচনা সত্ত্বেও প্রথম সারির কয়েকজন একেবারেই অনুল্লেখিত— যেমন মায়া সেন, গোরা সর্বাধিকারী, অরবিন্দ বিশ্বাস, বন্দনা সিংহ, চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। এঁরা কি রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম বার্ষিকীর কোন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানেই অংশগ্রহণ করেননি ?
আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীদাশগুপ্ত এক জায়গায় লিখেছেন, 'সাহসের বিপরীতার্থক শব্দ স্পর্ধা'। (পৃঃ ২৪, প্রথম স্তম্ভ, ২০ লাইন) 'সাহস' ও 'স্পর্ধা' দুটোই প্রায় সমার্থক শব্দ। 'স্পর্ধা' কিছুটা 'দুঃসাহস' মিশ্রিত। তবে 'দুঃসাহস' শব্দটি গুণবাচক ও নিন্দাবাচক উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'দুঃসাহসিক অভিযান' ও 'দুঃসাহসিক ডাকাতি'। সাধারণ প্রয়োগে 'স্পর্ধা'কে নিন্দাবাচক 'সাহস' যুক্তই মনে হয় কারণ এককথায় 'স্পর্ধা'র অর্থ 'দর্প'। তাই 'স্পর্ধা' কখনই 'সাহসে'র বিপরীতার্থক শব্দ নয়। 'সাহসে'র বিপরীতার্থক শব্দ 'ভয়'। পরিশেষে তড়িৎ চৌধুরীর গান ও রবীন্দ্রসঙ্গীত জগতে তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতিজনিত প্রতিবেদকের আক্ষেপ প্রসঙ্গে এই পত্রলেখকও আলোচ্য প্রতিবেদক সম্পর্কে একটি আক্ষেপ প্রকাশ না করে পারছেন না। প্রায় কুড়ি বছর আগে এক কিশোরের আকস্মিক অকালমৃত্যু উপলক্ষে আয়োজিত যাদবপুর অঞ্চলের এক বিদ্যালয় গৃহের স্মৃতিসভায় আলোচ্য প্রতিবেদক শ্রীদেবাশিস দাশগুপ্তের পরিবেশিত কয়েকখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত যা সুর, তাল, লয়, উচ্চারণ ও গায়কীর গুণে এক কথায় অনবদ্য এবং বিশ বছর পরেও এই পত্রলেখকের স্মৃতিতে অম্লান। সেই শিল্পী যিনি 'মৃত্যুর পরেও গীতবিতান বুকের উপর থাকবে' ভেবে শান্তি পান, তিনি সেই সঙ্গীত পরিবেশন থেকে নিজেকে আড়াল করে আমাদের মত শ্রোতাদের দুঃখী করে রাখলেন কেন ? তাঁর ক্ষেত্রেও কি 'প্রচার মাধ্যম নদীর বাঁকের মত কাজ' করেছিল ?

মৃদুল চট্টোপাধ্যায়
কলি-৭০০ ০৩২

জেট ল্যাগ

২ অগস্ট 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীসমরজিৎ কর জেটল্যাগ

সমস্যার সমাধানে মেলাটনিনের কার্যকারিতার সংবাদ পরিবেশন করেছেন। এ জন্য ধন্যবাদ জানাই। এ প্রসঙ্গে, অনুল্লিখিত প্রাসঙ্গিক দু'একটি তথ্য নিবেদন করি। মেলাটনিন নিঃসৃত হয় মস্তিষ্কে অবস্থিত পিনিয়াল (Pineal) নামক একটি গ্রন্থি থেকে। এই গ্রন্থিটি সুদীর্ঘকাল থেকে বিজ্ঞানীদের অনেক কল্পনার খোরাক জুগিয়েছে। সেই সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী বিজ্ঞানী দার্শনিক Descartes ভেবেছিলেন পিনিয়াল হচ্ছে 'আত্মার আধার'। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীদের এক বড় অংশ অবশ্য ধারণা করতে ভালবাসতেন এই ক্ষুদে গ্রন্থিটির যাবতীয় কাজই হচ্ছে যৌন এবং প্রজনন সম্পর্কিত। কিন্তু পরে দেখা গেছে এবং শ্রীকরের সংবাদেও সমর্থিত হচ্ছে যে পিনিয়ালের কাজ-কারবার শুধু যৌন ও প্রজননেই সীমাবদ্ধ নয়।

এই মেলাটনিনের নিঃসরণ চক্রাকারে কমে-বাড়ে আলো-অন্ধকারে বা শারীরিক সক্রিয়তা-নিষ্ক্রিয়তায়। শুধু মেলাটনিন নিঃসরণই নয়, শারীরবৃত্তীয় বহু ক্রিয়াকলাপই দেখা গেছে, দিনে-রাতে চব্বিশ ঘণ্টায় প্রায় ঘড়ি-ঘণ্টা মিলিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন আড্রেনোকর্টিকোট্রপিক হর্মোনের নিঃসরণ সর্বাধিক হয় ঠিক সকালে ঘুম ভাঙার আগে। দিনের আলো যত বাড়ে (সেই সঙ্গে শারীরিক সক্রিয়তা) এর নিঃসরণ তত কমতে থাকে। স্বাভাবিক শারীরিক তাপমাত্রাও এ রকম ছন্দোবদ্ধভাবে কমে বাড়ে। বিজ্ঞানী ফ্রানজ হলবার্গ দৈনিক এ ধরনের ছন্দোবদ্ধ শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপের নাম দিয়েছেন Circadian Rhythm. বাংলায় একে বলা চলে 'প্রাত্যহিক ছন্দ'। মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে (বা লিম্বিক সিসটেমে) 'অবস্থিত' একটি সুনিয়ন্ত্রিত 'জৈব ঘড়ি'র (Biological Clock) কথা কল্পনা করা হয় যা এই প্রাত্যহিক ছন্দকে নিয়ন্ত্রিত করে। এখান থেকে যাবার পরপরই মেক্সিকোতে বিকেল চারটেতে খেলা দেখতে বসলে ঘুমের ঢুলুনি আসবেই, কেননা এখানে তখন গভীর রাত। এখানকার সময়ের সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত 'জৈব ঘড়ি' তখন সে কথা জানিয়ে দেবে। জেটল্যাগে যে উপসর্গ দেখা যায় তা এই 'জৈব ঘড়ি' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রাত্যহিক ছন্দপতনের ফলেই। জেটল্যাগের আলোচনায় এ প্রসঙ্গটির উল্লেখ দরকার ছিল।

প্রণবেশ নাথ
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

জাতীয় সংহতি

১৬ আগস্ট '৮৬-র 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীদীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় 'জাতি প্রথা ও জাতীয় সংহতি' নিবন্ধটির এক জায়গায় (ঐ, পৃঃ ৩১) বলেছেন—'যদুদের দেবতা কৃষ্ণ এসে ইন্দ্রকে হঠিয়ে দিয়েছেন।' তথ্যটি সঠিক নয়।

প্রথমত, উক্ত কৃষ্ণ এক অসুর ছিল; যদুবংশের কৃষ্ণ নয়। দ্বিতীয়, ঐ কৃষ্ণাসুর দশ সহস্র অনুচরসহ অংশুমতী নদীর তীরে ইন্দ্রের হাতে বিধ্বস্ত ও নিহত হয়েছিল।

—ঋগ্বেদঃ ১/১৩০/৮; ৮/৯৬/১৩-১৫। অধিকন্তু, ঋগ্বেদের রচনাকাল এবং যদুবংশীয় অধস্তন ৫৫তম পুরুষ কৃষ্ণের সময়কালের ব্যবধান প্রায় ৩,০০০ বৎসর।

পরিশেষে একটি কথা না বলে পারছি না। ১৬ আগস্টের 'দেশ'-এ জাতীয় সংহতি নিয়ে চারটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তার তিনটিতে সমস্যাটি সরাসরি এবং সহজভাবে আলোচিত হয়েছে; কিন্তু শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের নিবন্ধটি নানাবিধ তথ্যের ভারে কেমন যেন জট পাকিয়ে গিয়েছে।

বিমলেন্দু ঘোষ
কলকাতা-৬০

লুসাই হিলস

'দেশ' ২৩ আগস্ট, সুপ্রকাশ চক্রবর্তীর প্রবন্ধ অশান্ত মিজোরামে শান্তিচুক্তি প্রসঙ্গে এই পত্র। লেখক এক জায়গায় লিখেছেন "১৮৯৮ সালে দুটি জিলাকে একত্র করে লুসাই পার্বত্য জেলাকে পুরোপুরি আসামের অন্তর্গত করা হয়"। আবার অন্য জায়গায় লিখেছেন, "স্বাধীনতার পর তা আসামের একটা জিলা হিসাবে গণ্য করা হল"। বক্তব্যদুটি পরস্পরবিরোধী। স্বাধীনতার বহু আগে থেকেই লুসাই হিলসকে আসামের একটা জিলা হিসাবে গণ্য করা হতো। অন্তত ১৯৩৩ সালের খবর আমি জানি। তখনই লুসাই হিলস আসামের একটা জিলা ছিল এবং শাসনকর্তা ছিলেন ডেপুটি কমিশনার। আসাম রাইফেলস-এর ব্যাটালিয়নও ওখানে ছিল। লেখক ঠিকই লিখেছেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের ট্রাইবালদের ভয় নিজেদের আইডেনটিটি বাঁচিয়ে রাখার ভয়।

যোগব্রত মিশ্র
কাটিহার, বিহার

সংশোধন

আমাদের ৬ সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় সুকুমার সেন লিখিত 'হেঁয়ালি ও সুকুমার রায়' রচনায় ১৯ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে পিতা-র পরিবর্তে পিতামহ এবং ২১ পৃষ্ঠার ১ম কলমে প্রশান্তকুমার মহলানবীশ-এর পরিবর্তে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ পড়তে হবে।● দেশ

নতুন
"আমার চুলে এখন আর খুস্‌কি নেই। আর এই সুপার সফ্‌ট ব্যবহারের জন্য আরও ভালো হয়েছে যে চুলকে কি সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে।"
খুস্‌কি-প্রতিরোধক কণ্ডিশনার শ্যাম্পু
নতুন সুপার সফ্‌ট-এ রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রমাণিত ও নির্ভরযোগ্য খুস্‌কি প্রতিরোধক উপাদান যা আপনার চুল থেকে খুস্‌কি ও চুলকুনি দূরে করে ও চুলের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনে।
আবার এতে আছে কণ্ডিশনার ও।
তাই সুপার সফ্‌ট-এর এই বিশিষ্ট ফর্মূলা আপনার চুলে এনে দেবে ঝলমলে চিকণ, দোল দোলানোর অপরূপ পরশ।
সুপার সফ্‌ট নিয়মিত ব্যবহার করুন। আপনার আর অন্য কোন শ্যাম্পুর দরকার লাগবে না।
Super Soft
Conditioner
Anti-Dandruff Shampoo
All In One
একটি সর্বগুণ সম্পন্ন

সম্পাদকীয়

বোধন

আগমনীর দুই হাতে কালের মন্দিরা সুখে দুঃখে কূলে কাঁটায় মীড় দিচ্ছে থেকে থেকে। মনের মধ্যে তারই মোচড়। বাঙালীর ভাঙাচোরা জীবনের মধ্যে, জোড়তালি-মারা শতচ্ছিদ্র সংসারে, দিন আনি দিন খাই ভাবনার ওপর ঢাকের বাজনা বেজে উঠল। পুজোর জোয়ার এসে গেল। তার জলোচ্ছ্বাস টের পাওয়া গিয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে থেকেই। সংসারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, অগোচর বুকের ভেতর। এক অপার্থিব আনন্দ থেকে থেকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল সকাল বিকেল দুপুর, ছুঁয়ে যাচ্ছিল বাল্যকৈশোর বার্ধক্য, জীবনের স্তর পরম্পরা।

নীলকণ্ঠ আকাশের গায়ে শুভ্র মেঘের বিভূতি, জলেস্থলে রোদ্দুর বেজে উঠেছে যেন সরোদের তার। খালে বিলে কুমুদ কহ্লার। কাশ দুলছে হাওয়ায়। খোলা জানালায় শিউলির গন্ধ। অঙ্গন হয়ে উঠেছে প্রাঙ্গণ। কুমোর পাড়ায় তুলির শেষ টান। লেখকের কলম পেয়েছে পুজোর ছুটি। রঙীন মলাটে সেজেগুজে বেরিয়ে গেছে শারদ সাহিত্য। কেনাকাটা প্রায় শেষ। ছোট ছোট ঘরকন্নার মধ্যেও লেগেছে একান্নবর্তী নাড়ির টান। সামাজিক আনাগোনা চলেছে এপাড়ায় ওপাড়ায়। এখানে শাড়ি ওখানে ধুতি। প্রণামীর পিঠে আশীর্বাদ। মাতৃস্মৃতি জাগিয়ে তুলছে বাল্য স্মৃতি। মা আসছেন, এসে গেছেন। ঘরে বাইরে, তাঁর ছড়ানো সংসারে। চণ্ডীমণ্ডপ পুজোমণ্ডপ আনন্দময়ীর আগমনে আলোয় আলো। বিশ্বরূপা এসেছেন বঙ্গজননী হয়ে। আজ তাঁর অকাল বোধন। অকালের বোধন।

বাঙালীর ব্যষ্টি জীবন, সমষ্টি জীবন ধুঁকছে। তার শিল্প সংস্কৃতি সাহিত্য শিক্ষা, তার সমূহ অস্তিত্বই আজ বিপন্ন। নিজভূমে পরবাসীর মত সে ক্রমশ পিছু হটছে। জীবিকায় কোণঠাসা হয়ে তার সমাজবন্ধন শিথিল, মূল্যবোধ বিনষ্ট। স্বাধীনতার সাড়ে তিন দশক পরেও সর্বদা অপাঙ্‌ক্তেয় বাঙালীর গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব অসূয়া ও আর বিভ্রান্তি সব শুভ উদ্যোগে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, সব দক্ষযজ্ঞই শেষ পর্যন্ত পণ্ড হচ্ছে। বিগত মহিমা হৃতগৌরব জাতির ঘরে ঘরে মনুষ্যত্বের দুর্ভিক্ষ। ভাঙা বাংলায় আবার চিড় ধরেছে, তিন টুকরো হবার উপক্রম হয়েছে তার পায়ের তলার মাটি।

এই দিনগুলোই প্রতি বছর আমাদের স্মৃতিভারাতুর করে তোলে। ফেলে আসা জীবনের কথা নতুন করে মনে পড়িয়ে দেয়। ঠোঁটের হাসি চোখের জলে ধুয়ে যায়। কী পেয়েছি আর কী পাইনি, কী পাবো আর কী পাবো না ভেবে ভেবে মনের ভেতরটা আনচান করে ওঠে। দক দকা বিসর্জনের বাজনাও বাজতে থাকে ভেতরে ভেতরে। তবু নতুন জামাকাপড়, কলি ফেরানো ঘর, কলরবে মুখর হয়ে ওঠে স্বজন পরিজন। বেনারসী গরদ যেমন বেরোয় আলমারির তলা থেকে তেমনি ফ্রেন্ডঅলও বেরোয় বাঙালির ঘর থেকে। তবু জানি এদিন যাবে, এদিনও যাবে। আবার রাজনীতি, আবার অর্থনীতি পাকে পাকে বেঁধে ফেলবে আমাদের। আবার মধ্যবিত্ত ঝুলি ঝেড়ে বেরোবে প্রতিদিনের পুরনো-আনকোরা সমস্যা। বাজারের থলে আরও শীর্ণ হবে। আবার খোয়া-খোবলানো পথে বেরুবো। ত্রিশঙ্কুর হাতের সামনে আবার ঝুলবে ট্রামের বাসের আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হ্যান্ডেল। পায়ের তলায় মাটির বদলে জেগে থাকবে এক চিলতে অবিশ্বাস্য ফুটবোর্ড। ছেলেবেলায় যেমন করে জীবনকে সইতে পেরেছিলাম আজও হয়তো তেমন করেই পেরে যাব শেষ পর্যন্ত। আর কটা দিন আর কটা মাস আর কটা বছর বই তো নয়। নতুন জুতোর কামড় সয়ে যেমন করে লেংচে বেড়িয়েছি একদিন, গোড়ালিতে অনভ্যস্ত চলনের স্টিকিং প্লাস্টার। এই বঙ্গজীবন তেমনি করেই দেবীদর্শনের স্মৃতি ধরে রাখবে প্রতি পদে। সন্তর্পণে জ্বালিয়ে রাখা প্রদীপগুলো হেমন্তের কুয়াশায় ঢেকে যাবে, ঘরে ঘরে শিউলির মত নিষ্পাপ মুখগুলো মলিন হবে যথারীতি। তবু আশা, তবু আকাশ প্রদীপ, হাতড়ে মরা অন্ধকারের মধ্যে বিন্দুপ্রমাণ আলো ইশারা।

এই তো আমাদের জীবন। এখানে বোধন আছে বিসর্জন আছে কিন্তু পুজো নেই। মায়ের প্রতিমা সাজাই ঘটা করে ঘট বসাই কিন্তু পুজো করি না। নানা ছলে নানা রূপে মা আসেন বারবার কিন্তু তাঁকে চিনে নিয়ে এই জীবনের মধ্যে বরণ করে নেওয়া হয়নি। তাঁর সঞ্জীবনী স্পর্শ এসে পৌঁছায় না প্রাণের মধ্যে। ফুলের মালা আর ধূপের ধোঁয়ার আড়ালে থেকে যায় তাঁর অবিনশ্বর মূর্তি। প্রতিমা আবার ফিরে যায় তার কাদামাটি কাঠ খড়ের স্তূপের মধ্যে। নিরন্ন জননী তার ক্ষুধিত শিশুটিকে কোলে নিয়ে বসে থাকে শূন্যচোখে। গাড়ি বারান্দার তলায়, ঝুপড়ির দরজায়।

চিঠির দর্পণে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

তিরিশের শেষার্ধ থেকে পুরো চল্লিশের দশক। এই সময়টা ছিল যাদের ভরা যৌবনের বছর তারা কে কোথায় ছিটকে গেছে ভেবে অবাক লাগে। অনেকেই হয়ে গেছে দুনিয়ার বার। কেউ কেউ রণছোড় হয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। কেউ কেউ অভিমানে নিজেকে গুটিয়ে নিলেও ঘাট মানেনি। শেষ পর্যন্ত দুধের বাছাদের নামের মধ্যে তারা বিপ্লবের শেষ সাঁজাটুকু ঢেলে দিয়ে নিজেদের অতৃপ্ত আশার দই পেতেছিল।

১৩

প্রজাপতির নির্বন্ধ

গীতা এসেছিল কাজ নিয়ে। ভারতে শিশুরক্ষা সম্মেলন করবে। দেশের মাটিতে পা দিতেই ওর ফেরার পথে কাঁটা পড়ে গেল। জব্দ হল ওর পাসপোর্ট। আর আমি? নিজেকে গলার কাঁটা বলে কেউ?

আমার ছিল সবেধন নীলমণি পঁচাত্তর টাকার এক চাকরি। এলেবেলে এক পাবলিশার। তার পার্টটাইম এডিটর। বিয়ের পিঁড়িতে বসতে না বসতেই সে চাকরি নট হয়ে গেল।

গেল তো গেল।

ভগবান, ভূত আর ভবিষ্যৎ—জীবনে এই তিনটেরই পরোয়া না করায় ভালো হয়েছে না মন্দ হয়েছে, আজ এই অবেলায় সেসব খতিয়ে বিচার করার কোনো মানে হয়?

ঠিক এই ব্যাপারে আমার আর গীতার মিলটাই বোধ হয় ছিল প্রজাপতির নির্বন্ধ। নইলে সংসারের টানাটানিতে গাঁটছড়া কবে ছিঁড়ে যেত।

দেশের জন্যে মন কেমন করায় পড়িমড়ি করে ওর ফেরার পেছনে 'আমার বাংলা'রও কিছুটা হাত ছিল। যাতে আছে আমার লেখা আর চিত্তপ্রসাদের ছবি।

তিরিশের শেষার্ধ থেকে পুরো চল্লিশের দশক। এই সময়টা ছিল যাদের ভরা যৌবনের বছর তারা কে কোথায় ছিটকে গেছে ভেবে অবাক লাগে। অনেকেই হয়ে গেছে দুনিয়ার বার। কেউ কেউ রণছোড় হয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। কেউ কেউ অভিমানে নিজেকে গুটিয়ে নিলেও ঘাট মানেনি। শেষ পর্যন্ত দুধের বাছাদের নামের মধ্যে তারা বিপ্লবের শেষ সাঁজাটুকু ঢেলে দিয়ে নিজেদের অতৃপ্ত আশার দই পেতেছিল।

খালি হাতে

গীতা যাতে ফিরে এসে জলে না পড়ে, তার জন্যে মারী-ক্লোদ জোর করে ওর হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়েছিলেন। হাজারখানেক টাকা। বস্তির মেয়েদের নিয়ে হাতের কাজের সমবায় গড়তে গিয়ে তার বেশির ভাগটাই খরচ হয়ে গেল। কিছুটা গেল পরোপকারে। শেষ যেটুকু ছিল, সেটা এক মক্কেল ধার নিয়ে পরে শাঁসালো হয়েও আর শোধ দেয়নি।

শিশুরক্ষা সম্মেলন হল পুরনো বন্ধুদের দোর ধরে, চেয়েচিন্তে, চাঁদা তুলে।

এ কাজে চিত্ত ছিল গীতার এক বড় খুঁটি।

পার্টির সদরদপ্তর তখনও বোম্বাইতে। যোশীর আমল শেষ হওয়ার পর থেকেই চিত্ত পার্টির কমিউন ছেড়ে দিয়ে আন্ধেরিতে গিয়ে রুবি-টেরাসে নিজের আলাদা আস্তানা গেড়েছিল।

থাকত সন্ন্যাসীর মত। লম্বা মানুষ। হাড়গুলো চ্যাটালো। ঘর ছেড়ে বড় একটা বেরোত না। ওর যে এত মেজাজ, যার জন্যে বন্ধুরা সব সময় তটস্থ হয়ে থাকত, যারা ওর জন্যে অনেক কিছু করেছে, তারাও। তাতে বাইরে থেকে মনে হত ওর মধ্যে বড় বেশি অহংকার অহংভাব। বোম্বাইকে যে না চেনে, তার পক্ষে ঠিক বোঝা যাবে না কেন চিত্ত শজারুর মত গায়ের কাঁটাগুলো থেকে থেকেই খাড়া করে তুলত। ঠকবাজ আর ফেরেব্বাজদের পাল্লায় পড়ে ঘাড় গুঁজে কাজ করেও বোম্বাইতে সে কম চোট খায়নি। ভালো মানুষির যে কী ফল তা বটুকদা, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন। বোম্বাই থেকে বটুকদাকে পালাতে হয়েছিল কি সাধে!

পুরনো চিঠি ঘাঁটার এই এক মুশকিল। এক কথার টানে আরেক কথা এসে যায়। এক মুখের পাশে আরেক মুখ ভেসে ওঠে।

হটাবাহার

চিত্তপ্রসাদ লিখছে গীতাকে (তখনও 'গীতাদি' আর 'আপনি'-র দূরত্বে হয়ত দীর্ঘ অদর্শনে), ৯-২-৫২—'...আপনি আর সুভাষ যে আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে আমায় ডেকেছেন, তার উত্তরে আমি যেতে পারব না লিখতে মন সরছে না আদৌ। আমি এ ক'দিন আপনার চিঠি পাওয়ার পর থেকে অনেক ভেবে দেখলাম, কিন্তু মনে হচ্ছে না যে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে।

'ব্যক্তিগত বাধার কথা, মানে যেসব কমিটমেন্টস্-এ এখানে এখন জড়িয়ে আছি, তার কথা ছেড়ে দিলেও, আমি ওখানে গিয়ে সত্যি কি এবং কতটুকু কাজ করতে পারব? সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন, বিনয় করবার ছেলে আমি নই।...আমাকে এখন বঙ্গের বাইরের আদমি হিসেবে দেখা উচিত, কলকাতাবাসীরা সেই হিসেবে দেখবে, আমিও নিজে সেই অবস্থাতেই গিয়ে পড়ব। তার মানে কলকাতায় যা ঘটিয়ে তোলা সম্ভব সম্মেলনের পক্ষে, তা আমার দ্বারা পুরো করা সম্ভব হবে না।...জানি, ও-শহরে অল্পবয়সী এবং বিশেষ করে পার্টির ছেলেমেয়ে মহলে আমার ভক্ত আছেন কয়েকজন, কিন্তু সম্মেলনের কাজ তো আরো ব্যাপক এবং সিরিয়াস্লি হওয়া দরকার। সেই জন্যেই তো আমি আগের চিঠিতে আপনাকে লিখেছিলাম যামিনীবাবুকে জড়াতে। তাঁকে সামনে রেখে তাঁর

প্রভাবে রমেনবাবু কি রামকিঙ্কর — এই ধরনের মানুষদের দিয়ে কাজ করাতে পারলে সত্যিকারের কাজ হবে। নইলে শুধু আমাকে দিয়ে ব্যাপারটা সমাধা করলে এটা দলগত ব্যাপারের রূপ নেবে — এই আমার ধারণা। পার্টির বাইরের মানুষদের নিয়ে কাজটা শুরু হলে আমি তার মধ্যে সাধারণ কর্মী হিসেবে একজন হয়ে খাটতে রাজি আছি। কিন্তু তার জন্যে যত খরচ বহন করতে হবে তা উচিত হবে কিনা সম্মেলনের এই প্রাথমিক অবস্থায় ভেবে দেখুন।...

'তারা বেচারী দোরে দোরে মাথা কুটে ঘুরছে সম্মেলনের কাজে লোক জড়ো করবার জন্যে। কিন্তু ওকে দিয়ে বেশি কিছু সম্ভব তো নয়। ওর না আছে নাম, না আছে প্রভাব। দিদির, মিসেস চারী-র, শরীর খুবই অসুস্থ, ওঁরা ওঁর ইস্কুল মাস্টারি আছে। পোরিন বা আর যাঁরা কিছু করতে পারেন, তাঁরাই তো করছেন না।...

'আসল কথা, আমার যা মনে হচ্ছে, যতক্ষণ না পার্টি এ বিষয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে, ততক্ষণ খাটিয়ে বা মাথা ঘামাবার তাগাদা বা কর্মী পাওয়া যাবে না। আর তা পাওয়া না গেলে দুচারটি প্রাণীর প্রাণপাতেও কিছু গড়ে উঠবে না।

'...এখন ভেবে দেখুন এ অবস্থায় আমার দ্বারা কদ্দুর হতে পারে। আপনার আর সুভাষের আমন্ত্রণ পেয়ে আমার যে কী লোভ হচ্ছে কলকাতায় যাবার তা কথায় বলার নয়।...

'দেবীপ্রসাদের সঙ্গে নিশ্চয় আপনার দেখা হয়। তাঁর কাছেও আমি গুরুতরভাবে অপরাধী হয়ে আছি তাঁর পত্রের উত্তর না দিয়ে। আমি যে এখন কী ঝামেলায় আছি তা বর্ণনা করার শক্তি আমার নেই। একটা নমুনা শুনুন — এখানকার আর্ট সোসাইটির অ্যানুয়াল এগজিবিশনের জন্যে খেটেখুটে প্রচুর অর্থ সময় এবং আশা খরচ করে তিনখানা অয়েল করেছিলাম। তিনটিই রিজেক্ট করেছেন কর্তারা — ব্যাপারটা আমার পক্ষে এতই শোচনীয় যে কদিন মায় শরীর অবধি খারাপ যাচ্ছে।...'

চিঠির বাক্সে

চিঠির বাক্স জিনিসটাই এমন যে তার কোনো বাছবিচার নেই। গীতা যখন শিশুরক্ষা নিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছে, তখনই এল সুধার চিঠি। শোভাকে চিনতাম স্কটিশে পড়ার সময়। মোটা রণেন ওকে যখন হাত ধরে ট্রামে তুলে দিত, সে এক দৃশ্য হত। ওরা দুজনেই ঠাকুরবাড়ির। ওদের চলন বলনে এমন একটা আভিজাত্য ছিল, যা আমাদের মত নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের কাছে একই সঙ্গে ছিল ঈর্ষণীয় আর হাস্যকর। শোভার গায়ের রং, মাথার চুল — দুটোই ছিল মেমসাহেবদের মত।

চিত্তপ্রসাদের ছবি

সুধার তা নয়। কুচকুচে কালো চুল। সুন্দর মিষ্টি মুখ।

সুধা বিয়ে করেছিল লোকশিল্প সংগ্রাহক অজিত মুখার্জীকে। সুধাংশু রায় তাঁর বন্ধু। দুজনে এক বৃত্তের লোক। সুধাংশুবাবুর বোন পেনু। সুধাংশুবাবুর সঙ্গে অনেক পরে মেদিনীপুরে একবার আলাপ হয়েছিল। মৃত্যুর পর তাঁর মহামূল্য লোকশিল্প সংগ্রহশালার কী দশা হয়েছে জানি না। একটা সময়ে সুধা প্রায়ই আসত। পরে ধর্মের মধ্যে নিজেকে পুরোপুরি গুটিয়ে নেয়।

গীতাকে ইংরিজিতে লেখা সুধা-র চিঠি (১৫-২-৫২) — 'এতদিন তোমার কাছে যেতে পারিনি, তোমাকে চিঠি লেখাও হয় নি — তার জন্যে তুমি মনে কিছু করো না। আমার ভাগ্যটাই খারাপ।... আমার মা রাঁচিতে মেন্টাল নার্সিং হোমে থাকেন। হঠাৎ ওঁর শারীরিক আর মানসিক স্বাস্থ্য এমন ভেঙে পড়ে যে খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমি আর আমার বোন ছুটে যাই। মাকে আমরা নিয়ে এসেছি। কিন্তু অবস্থা যে-কে সেই। আমরা এখনও ওঁকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছি। আমার মনের অবস্থা বুঝতেই পারছ।... শোভা যখন তোমার সঙ্গে কলেজে পড়ত, মা যেতেন — তোমার মনে পড়ে? ...পেনুও মাসাধিক কাল অসুখে শয্যাগত। দেখা হলে ও তোমাকে বলবে ওর কী হয়েছিল। ও ভেবেছিল ও আর বাঁচবে না।

'এইসব মুশকিলে পড়ে তোমার নাটকে আর আমাদের অভিনয় করা হল না।...'

দমদম জেল থেকে

দিলীপ দত্ত তখনও বিনাবিচারে বন্দী। কেন কে ছাড়া পায় আর কেন কে পায় না — আজও আমার কাছে তা রহস্য। এর পিছনে থানা পুলিসেরও বোধ হয় একটা প্রতিহিংসার হাত থাকে। নইলে দিলীপ কী এমন এক ভয়ঙ্কর ব্যক্তি ছিল? রোগা নিরীহ প্রকৃতির মুখচোরা মানুষ। জেলে বসে শুধুই কবিতা লিখত।

যারা ছাড়া পেয়ে বাইরে আসে, তাদের ওপর জেলে-থাকা লোকদের স্বভাবতই একটা অভিমান থাকে। বাইরে গিয়ে ভেতরের লোকদের কথা তারা ভুলে যায়। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়।

কিন্তু জেলের ভেতর আর বাইরেটা তো এক নয়। জেলের ভেতরে নিশ্চল নিথর জীবন। সেখানে রুদ্ধ সেলের একাকিত্ব। বাইরে এসেই যেন এক ঘূর্ণীঝড়ের মধ্যে পড়া। জীবনের হাজার সমস্যা সেখানে সহস্র হাতে ছেঁকে ধরে। কপালে চড়চড় করে দীর্ঘদিনের অনভ্যাসের ফোঁটা। ,

দিলীপ লিখছে (৪-৩-৫২)—'চিঠি পেয়েছি। আমার লেখা 'শান্তি' কবিতা ভালো লেখার পর্যায়ভুক্ত কেন হয়নি, তা অত সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ মন্তব্যের ভেতর থেকে বুঝতে পারলাম না। এ-কথা সত্যি যে নানান কাজের চাপ আপনাকে বিস্তারিত সমালোচনা লেখা থেকে বিরত করছে। কিন্তু এ-কথাও খুবই সত্যি যে, আমার লেখার দুর্বলতা কোথায় তা যদি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দেওয়া হয়, তাহলে সংশোধন করব আমি কি করে।...

'...এখানকার পরিবেশ বড় বেশি ভোঁতা। কোনো কিছু নিয়ে গভীরভাবে পড়া বা তার ওপর বিস্তারিত আলোচনা করার অবস্থা একরকম নেই বললেই চলে। সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে এ-কথাটা বড় বেশি সত্য। তাই ভয়ানক খারাপ লাগে। কোনোরকম লেখবার মত মেজাজ সৃষ্টি করতে পারছি না।...'

পি-সি যোশীর একটা কথা এই প্রসঙ্গে না বলে পারছি না।

'জনযুদ্ধ' ছেপে বার করার প্রধান ঝক্কিটাই সে সময়ে ছিল নিরঞ্জনদা আর আমার ঘাড়ে। নিরঞ্জন সেন। মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় ছিলেন দীর্ঘমেয়াদী বন্দী। পরে যুক্তফ্রন্টের সময় নিরঞ্জনদা মন্ত্রী হয়েছিলেন।

একদিন দেখি নিরঞ্জনদা যোশীর ওপর খুব চটে গেছেন। যোশী নাকি তাঁকে জিগ্যেস করেছিলেন, 'আচ্ছা দাদা, কত বছর তুমি জেলে ছিলে?' নিরঞ্জনদার কাছ থেকে হিসেবটা জানার পর নাকি যোশী জোড়েন কেটে বলেছিলেন, 'তার মানে, অতগুলো বছর গচ্চা গেছে।'

কথাটা শুনে আমারও সেদিন খারাপ লেগেছিল। কিন্তু এখন মনে হয়, তার মধ্যে একটা বড় সত্যি ছিল। বাইরের জীবনসংগ্রাম আর সাধারণ মানুষের সঙ্গে একজন বন্দীর দীর্ঘদিনের এই বিচ্ছিন্নতা বাস্তবকে ক্রমশ আড়াল করে দেয়। কল্পনার একটা আলাদা জগৎ গড়ে তুলে তার মধ্যে নিজেকে সে গুটিয়ে নেয়।

নইলে বিপ্লবীদের খাইয়ে পরিয়ে জেলে পুরে রাখার ব্যবস্থাই বা হবে কেন?

তোড়জোড়

গীতার একটা দোষ (বা গুণ), ও যখন যা নিয়ে মেতে ওঠে—তাতে সবাইকেই জড়িয়ে ফেলে।

পুরনো বন্ধুবান্ধব যে যেখানে ছিল, সবাইকে তুর্কিনাচন নাচাচ্ছে। কেউ টাকা তুলছে, কেউ গাড়ি দিয়েছে, কেউ তার আপিস থেকে ছুটেছে উৎসাহে।

আমাদের বাড়িরও সেই হাল। সংসার কিভাবে চলবে তার ঠিক নেই, বাড়ির শিশুদের ঘাড়েও চেপে বসেছে ওর শিশুরক্ষার দায়। উপরন্তু তো আছেই আমার ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর পরিচয়।

এই বেহিসেবী জীবনেরও যে একটা মাধুর্য আছে, সেটা না বুঝলে এতদিন বেঁচেই বা থাকি কী করে!

বার্লিন থেকে গীতার কাছে আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক নারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদিকা মারী-ক্লোদ ভাইয়াঁ কুতুরিয়ে-র চিঠি (৫-৩-৫২) এসেছে—'তোমার সুন্দর চিঠির জন্যে সাবাস। যে খবর পাঠিয়েছ এবং কঠিন অবস্থা আর বিস্তর বাধাবিপত্তির মধ্যে যে চমৎকার কাজ করেছ, তাতে আমরা কী খুশি হয়েছি বলার নয়। এসব কাজে কত যে আত্মত্যাগ করতে হয়, কত যে কাঠখড় পোড়াতে হয়—আদরের গীতা, আমরা তা জানি। আমরা সবাই, বিশেষ করে যারা এ বাড়িতে থাকি—আমরা কী যে আনন্দ পেয়েছি বলার নয়। আমরা বিশেষভাবে চাই, তোমার স্বাস্থ্য ভালো থাক আর আশাবাদ অটুট হোক।...'

মন্টু

মারী-মন্টু তখনও বুদাপেশতে। মন্টু তখনও ঘাড় থেকে আন্তর্জাতিক ছাত্র সংগঠনের জোয়াল নামাতে পারেনি। গীতাকে লিখেছে (২০-৩-৫২): 'আচমকা একটা সরকারী চিঠিতে আপনার পাত্তা পাওয়া গেল। একেবারেই জানা ছিল না কী করছেন না করছেন। মাঝে বিলেত ঘুরে এলাম, তারাও জানত না।...

'আপনাদের চিঠিটা একটু দেরি করে এখানে পৌঁচেছে। বস্তুত কনফারেন্স শেষ হওয়ার পর।...

'আমার গাঁড়াকলটা জানেন কিনা জানি না। যাঁতাকলে পড়েছি। রণজিৎ চলে গেল আমাকে রেখে—এই শর্তে যে, জাহাজ পেলেই ওম্পার হব। কেউ না এলে যাওয়া হবে না, এখানকার সিদ্ধান্ত। মহা গাঁড়াকলে পড়েছি। জাহাজ ছিল জানুয়ারিতে। শেষাশেষি তা বানচাল করাতে হল। কিছু করতে পারেন এ সম্পর্কে?

'...এদেশে তো ছিলেন। অবস্থা তো জানেনই, খবরের অভাবে কেমন হাঁফছাড়া ভাব হয়!

'কলকাতা আজকাল নিশ্চয়ই খুব গরম। নির্বাচনের সাফল্যের পর উৎসাহ নিশ্চয়ই চড়া?...

'আপনার সই এখনও ব্যানার্জী বলে ব্যানার্জী নামেই খাম পাঠালাম।'

স্বর্ণদা

যেদিন বুদাপেশত থেকে গীতাকে মন্টু চিঠি দিয়েছে, সেই একই দিনে দিল্লী থেকে আমাকে চিঠি লিখেছেন স্বর্ণদা। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য। 'তথাপি' উপন্যাসের লেখক। 'ছিন্নমূল' ফিল্মের গল্পও তাঁর।

এখনকার পাঠকেরা অনেকে হয়ত স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের নামই শোনেনি। স্বর্ণদা কোন জাতের লেখক ছিলেন, সেকালের পত্রপত্রিকা ওল্টালে তা জানা যাবে। আজকের বাজারে তাঁর কোনো বই-ই হয়ত মিলবে না। যাঁরা তাঁর সমঝদার ছিলেন, তার মধ্যে অতিশয়োক্তিতে সবচেয়ে বেশি মুখর ছিলেন সরোজ দত্ত। যে সম্ভাবনা ছিল তা পরিণতি পায়নি বলেই অতিশয়োক্তির কথাটা উঠছে।

স্বর্ণদা যা হতে পারতেন, তা যে হতে পারেন নি—তার কারণ, অভাবগ্রস্ত যৌথ পরিবারের যূপকাষ্ঠে নিজেকে তিনি বলি দিয়েছিলেন। তার জন্যে তাঁকে কখনও খেদ করতে দেখিনি। যখন তিনি কিছুটা স্বস্তি পেয়ে দিল্লীতে নিজের সংসার গড়লেন, তখন আর কোমর বেঁধে লেখার বয়স নেই। তাছাড়া সে স্বস্তিটুকুও তো মিলেছিল নিজেকে অনুবাদের জাঁতাকলে বেঁধে।

ভাবলে মন খারাপ হয়। কিন্তু ভালো লাগে যখন ভাবি লেখকদের মধ্যে স্বর্ণদার মত বড় মনের মানুষ খুব কম দেখেছি।

স্বর্ণদার চিঠির পুরোটাই তুলে দিতে পারতাম। আর কিছু না হোক, অনবদ্য ভাষার গুণে। কিন্তু তার অনেক জায়গায় আমার সম্বন্ধে তাঁর অপার স্নেহ এমনভাবে উথলে উঠেছে যে, তা নিজে পড়ে খুশি হওয়া যায়—কিন্তু ছাপিয়ে পাঁচ কান করা যায় না।

ভুলি নি

স্বর্ণদা লিখছেন, 'প্রিয় সুভাষ হঠাৎ তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি অপরিসীম। শুধু এইটুকু বলে আমার মনের ভাব ঠিকমত প্রকাশ পেল না। তোমার চিঠিটা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া। অতি-ভাষণ হল নিঃসন্দেহে। কিন্তু খুশি-ভরা মনের এ অকপট ভাষা।

'ভুলি নি—কাউকেই ভুলি নি।…তোমাকে যে প্রীতির চোখে দেখি তাতে মাখানো শ্রদ্ধার অঞ্জন।

'তুমি জেল থেকে ছাড়া পাবার পর একবার চিঠি দেবার লোভ হয়েছিল। 'স্বাধীনতা'য় তোমার বিয়ের খবর পড়ে অভিনন্দন জানিয়ে একখানা পোস্টকার্ড লিখেছিলাম। শেষ পর্যন্ত তা ডাকে দিইনি। যে কারণে দু দুবার অদম্য ইচ্ছার রাশ টেনে রেখেছি, সে কারণ এখনো রয়েছে। তবু এবার না লিখে থাকতে পারলাম না। তোমার স্বহস্তে-লেখা ছোট চিঠিখানার প্রভাব এমনি অপ্রতিরোধ্য। 'সমধর্মী' বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র সত্যেন রায়, বিমল ঘোষ আর কৃষ্ণ গোঁসাই-এর সঙ্গেই চিঠিপত্রের যোগাযোগ আছে। কবিতার মত চিঠি লেখার ব্যাপারেও বিমল ঘোষের অক্লান্ত কলম। মাঝে মাঝে জবাব দিই।…বছর দুই আগে কলকাতায় থাকতে—তোমরা তখন জেলে—একবার রাষ্ট্র হয়ে গেল: আমি বিগড়ে গেছি—এতদূর বিগড়ে গেছি যে, রেডিওতে মজদুর-মণ্ডলীর আসরে মাঝে মাঝে বক্তৃতা করছি। অন্যে পরে কা কথা, আমাদের নিজেদের মধ্যে কত জনের সম্পর্কে কতবার এরকম কত মিথ্যা বা অর্ধ-সত্য বা বিকৃত সত্য ছড়াতে দেখলাম আমাদের নিজেদের লোকদেরই!

'পরিচয়'

'…তুমি সম্পাদক হওয়ার পর 'পরিচয়ে'র উন্নতি হয়েছে। আমাদের প্রত্যাশার কাছাকাছি এখনো পৌঁছয়নি সে আলাদা কথা এবং সে বিষয়ে তুমিও পুরোপুরি সচেতন। 'পরিচয়' তার পূর্বগৌরব হয়ত এখনো ফিরে পায়নি। কিন্তু মাঝখানের শোকাবহ নিমজ্জমান দশা থেকে তুমি অর্থাৎ তোমার আমল যে, তাকে প্রকৃতিস্থতার ডাঙায় টেনে তুলেছে একথা কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী নিয়মিত পাঠক অস্বীকার করতে পারবে না।…যেখানে এখনো আমাদের মধ্যে 'সাহিত্যের আবহাওয়া—কানাকানি আর রেষারেষিতে ভারাক্রান্ত' এবং এর পেছনে রাজনৈতিক আকাশে এত বড় ভুলভ্রান্তির ঝড়ঝাপটার পরে স্বচ্ছতা ও সুস্পষ্ট পথনির্দেশের অভাব এখনো রয়েছে, সে-ক্ষেত্রে 'পরিচয়ে'র সাংস্কৃতিক প্রতিফলন এ সবের কত বেশি ঊর্ধ্বে উঠবে শুনি?…

'দিল্লী ভালো লাগে না। রাত দিন কলকাতা যেন সহস্র চৌম্বক বাহু দিয়ে টানছে। আপাতত ফিরে যাবার উপায় নেই। গিয়ে খাব কী? আজীবন অভাব-অনটনের সঙ্গে লড়াই করেছি। আজ দেড় বছর হল আর্থিক দিক থেকে নিশ্চিন্ত জীবনের স্বাদ পাচ্ছি। তবু মাঝে মাঝে মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আর্থিক নিশ্চিন্ততার কথাই কি বড় হয়ে উঠবে? যখন ভাবি সুভাষ, বিমল ঘোষ, সমরেশ বসু ও আমাদের আরো অনেকে আর্থিক দুশ্চিন্তার আবর্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, তখন এক্সেপশন হয়ে থাকার আমারই বা কোন নৈতিক অধিকার আছে? সবাই যখন টিকে আছে বা টিকে থাকার জন্যে আপ্রাণ করছে, তখন আমিই বা তা পারব না কেন? পরক্ষণেই আবার ষোলআনা সেয়ানা হয়ে যাই। সাংসারিক বুদ্ধির কাছে হার মানে ছলকে-ওঠা মনের আবেগ। সর্বনাশ! দূরে বসে কলকাতার বাজারের যে হালচাল টের পাচ্ছি তাতে ফিরে-যাব ভাবতে গিয়ে বুক কাঁপে। সেলফসেন্টার্ড না হয়ে উপায় কী!

'…এখানে আড্ডা নেই। তাই বড় নিঃসঙ্গ বোধ করি। গোপালদার এক প্রবন্ধের লাইন মনে পড়ে: আড্ডা বাঙালী কালচারের এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ। দিল্লী, বিশেষ করে নয়াদিল্লী এক অদ্ভুত শহর। তার সব দিক দিয়ে সব রকম ঐশ্বর্য থেকেও যেন আসল বস্তুটিই নেই—নেই প্রাণের রস। ভারতের রাজধানী বড় অনুদার ও অসামাজিক।

দিল্লীতে ভালো নেই

'…তোমার চিঠি পেয়ে কিছুটা উৎসাহিত হয়েছি। কী লিখব তাও ঠিক করে ফেলেছি। তা না-গল্প, না-প্রবন্ধ, না-নিবন্ধ, না-পার্সোনাল এসে।' ঐসব মিলে একটা কিছু। 'পরিচয়ের' সম্পাদক লেখা ভালো হয়েছে মনে হলে তবেই ছাপবেন। নইলে নয়। তাতে ক্ষুণ্ণ হব না। আমার কেমন ধারণা হয়েছে, লেখক হিসেবে আমি স্পেন্ট-আপ—গল্পলেখক হিসেবে তো বহুকাল আগেই। মাঝে মাঝে তবু সাধ যায় লিখে প্রমাণ দিতে যে, এখনো লিখতে পারি। সেই সদিচ্ছার জোর কম, তাই হয়ে উঠছে না। আমার সময়ও কম। আপিসের ষোলআনা কাজই কলমের কাজ। তাই ঘরে ফিরে এসে কাউকে বড় আকারের একখানা চিঠি দেবার পর্যন্ত এনার্জি থাকে না। চিঠি পেতে ভালো লাগে, লিখতে নয়। এই কলমবিমুখতা সুস্থ মনের লক্ষণ নয়। এর জন্যে আমার আবাল্য ভগ্ন স্বাস্থ্য অনেকখানি দায়ী।

'তোমারও সময় কম। একদিকে সংসারের বোঝা, আর একদিকে বাইরের বৃহত্তর কর্তব্যের দায়। তোমার অবসর সময় নিশ্চয় ভারমুক্ত নয়। সুতরাং এ চিঠির জবাব না দিলে বা দেরিতে দিলে অসন্তুষ্ট হব না। সময় আর সুযোগ মত কখনও যদি চিঠি দাও তা হলে আমার বাসার ঠিকানায় দিও।

'তোমাদের দুজনকে আমাদের দুজনের প্রীতি জানিয়ে চিঠি এখানে শেষ করছি।'

কাবলিওয়ালা

সম্পাদকের আসনে বসলে লেখক হয়ে যায় কাবলিওয়ালারও অধম। আমার সে অভিজ্ঞতা কম নয়। লেখকের সঙ্গে হয় তখন শুধু পাওনাদারের সম্পর্ক।

সাধে কি আর নরেন্দ্রনাথ মিত্র লিখছেন (২৩-৩-৫২)— '…শরীর সুস্থ ছিল না। দিই দিই করে জবাব দিতে একটু দেরি হয়ে পড়ল। কিছু মনে করবেন না।

'…লিখতে পারছিনে, তবু লিখতে হচ্ছে।

'আপনার খবর কি? নতুন কি লিখছেন টিকছেন। এবারকার 'পরিচয়ে' ঢাকার ভাষা-আন্দোলন সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্যটুকু ভালো লাগল। এ যে কবির কলমের লেখা তা বেশ বোঝা যায়।…

'পরিচয়ের জন্যে গল্প চেয়েছেন। উপন্যাসের কিস্তি লিখতে লিখতে ছোট গল্প মোটেই আসছে না। তবু লিখতে চেষ্টা করব। হৃদয়গ্রাহী হবে কিনা বলতে পারছি নে। তবে আপনার মত সহৃদয় বন্ধুর অনুরোধ রাখতেই হবে।…'

লিনোকাট

চিত্তপ্রসাদ গীতাকে লিখেছে (২৮-৩-৫২)— '…এবার শুনুন, শান্তা মুখুয্যে (ভালেরাও) তারাকে দিয়ে কথা দিয়েছিলেন যে, তিনি পুণায় হপ্তাখানেক কাটিয়ে এসে আমায় ডাক দেবেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন টাইমস-এ দেখলাম তিনি অস্ট্রেলিয়ান ডেলিগেটদের সঙ্গে রওনা হয়ে গেছেন—সে ডেলিগেশনও যে কবে এলো তাও কেউ একটু দয়া করে খবর দেয়নি এই গরীবকে। তারা আজ দিন পনেরোর ওপর একেবারে শয্যা নিয়েছে, তার সঙ্গেও কেউ যোগাযোগ রাখেনি এবং যতদূর জানি, মিসেস ওয়াদিয়া আর শারা লতিফি দুজনেই ওর প্রতি সদয় নন। মোদ্দা কথা, বম্বের যে কী হাল তা বম্বেতে না থাকলে বুঝতে পারবেন না। কাজেই লিনোকাট পাঠাবার আশা আমাকে ছেড়ে দিতেই হয়েছিল।

'সে যাই হোক, আমি আজ দিন কতক হল লিনোকাটের খাতা পাঠিয়ে দিতে পেরেছি। এক সোভিয়েটের বন্ধু আকাশপথে ইউরোপ ঘুরে মস্কো ফিরছিলেন, খুব সম্ভবত তিনি ভিয়েনা হয়ে যাবেন, অন্যথা ওয়ারশ থেকে ডাকে পাঠাবেন বলেছেন। বোধ হয় খাতা ইতিমধ্যে ভিয়েনা পৌঁছে গেছে। যদিও ঐ টিসু-কাগজেই প্রিন্ট করে পাঠাতে বাধ্য হয়েছি (কারণ নেপালী কাগজ সোমনাথ হোড় আর রেবার কাছ থেকে পেয়েও ভদ্ররকমের প্রিন্ট বার করতে পারিনি শত চেষ্টাতে সে-কাগজে, এবং টিসুতে যথাসম্ভব ভালো করে প্রিন্ট করেছি), তবু খাতাটি মোটামুটি দেখতে ভালোই দাঁড়িয়েছিল দু-একজন বন্ধু বলেছেন এখানে। কভারের ওপর রঙীন ছবি এঁকে দিয়েছি এদেশের মা ও শিশুর, আর দুটি বর্ডারিগোছের

শান্তির পায়রা আর দেশী ও বিদেশী নানা ভাষার হরফে শান্তি কথাটি দিয়ে, আর খাতাটিকে নীল ফিতে দিয়ে বেঁধে দিয়েছি। এর সঙ্গে সুভাষের ছড়া গেঁথে দিতে পারলে কী অপূর্ব ব্যাপার হত তা বলার নয়, কিন্তু—থাক কিন্তু—কিন্তুর অন্ত নেই এ জীবনে··· ।

'তবু আরো ভালো খবর আছে, গীতাদি । প্রথম, লণ্ডন থেকে বারবারা নিভেন নিজের থেকেই লিখেছেন যে, তিনি প্যাট মাইলস-এর কাছে ঐ লিনোকাটগুলি দেখেছেন এবং তাঁর কাছে এত ভালো লেগেছে যে, তিনি তা সব ওখানকার আর্টিস্টদের দেখাবেন এবং পাম-দত্তকেও দেখাবেন, আর পত্রিকায় ছাপাবার চেষ্টা করবেন । আমার পক্ষে সবচেয়ে আনন্দের লেগেছে তাঁর 'আই অ্যাম ট্রিমেণ্ডাসলি ইমপ্রেসড বাই দি ইণ্ডিয়ান কোয়ালিটি অব ইওর ওয়ার্ক'—কথাগুলি··· ।

বম্বের হাল

'তারপর, কলকাতার শিশুরক্ষা সম্মেলনের খবর—সত্যিকারের খবর—পেয়েছি সবে পরশু—এবং পেয়েছিও দৈবাৎ । আমার এক বন্ধুর বাড়িতে 'স্বাধীনতা' পাই দৈবাৎ—এবং ছেঁড়াখোঁড়া অবস্থায় । কপাল আমার ভালো যে, সব ক'খানি সংখ্যাই পেয়েছি—মানে, কনফারেন্সের আগের দিন থেকে শেষ দিন অবধি । তারাও সেই প্রথম আমার কাছ থেকে সম্মেলনের বর্ণনা পেয়েছে । বম্বের হালচাল দেখে হতাশ ছিলাম, কিন্তু স্বাধীনতার রিপোর্ট পড়ে আফসোস হচ্ছে যাইনি বলে, আপনার এত অনুরোধ সত্ত্বেও । আপনার চিঠি থেকে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি যে, আপনি এতদূর ঘটিয়ে তুলেছিলেন···

'একটা কথা সুভাষকে বলবেন কি আমার হয়ে ? পরিচয়ের কভারে যে লিনোকাটটি ছেপেছিল তা মোটেই হ্যাপি হয়নি । প্রথমত ঐ বিশেষ ছবিটি কভারের উপযুক্ত হয়নি—বড় বেশি grim পরিচয়ের মত পরিচ্ছন্ন পত্রিকার পক্ষে । ও ছবিটি পত্রিকার ভেতরে কোথাও চলতে পারত অবশ্যি । দ্বিতীয়ত, লাল কালিতে মানায়নি মোটেই । তৃতীয়ত, ব্লকের সাইজ আরো অনেক রিডিউস করলে পত্রিকার সাইজের সঙ্গে ব্যালান্স করত । এখন যেন জোর করে ধরে রাখা হয়েছে পাতার ওপর ।···'

তারা যাজ্ঞিক

তারা বলতে তারা যাজ্ঞিক । পার্টির পুরনো লোক । আমরাও কি আজকের ?

চিত্তর শুনেছি একজন সম্বন্ধেই হৃদয়দৌর্বল্য ছিল ।

তেতাল্লিশে পার্টির প্রথম সম্মেলন হয়েছিল বোম্বাইতে । শান্তা (বিয়ে হয়ে 'গান্ধী') তার ছোট বোন (কী যেন তার নাম ? মনে পড়েছে, দীনা । যার প্রথম বিয়ে হয়েছিল রমেশ সঙ্ঘবির সঙ্গে), তারা—এরা আমাদের সেই তখন থেকে বন্ধু । পরে কে কোথায় ছিটকে গেছে । কখনও বোম্বাইতে, কখনও দিল্লিতে কালেভদ্রে দেখা ।

তারার খোঁজ মিলল গীতা ফিরে আসার পর ।

তারা লিখেছে (৩১-৩-৫২)— '···'স্বাধীনতা' থেকে জানলাম জব্বর হয়েছে ওখানে তোমাদের সম্মেলন । বোম্বাইতে যা হল কহতব্য নয় । ···অস্ট্রেলিয়ার যে প্রতিনিধিরা ভিয়েনা যাচ্ছিল, মিসেস ওয়াদিয়া তাদের একটা রিসেপশনের ব্যবস্থা করেন । সভায় তেমন লোক হয়নি । অবশ্য টাইমস অব ইণ্ডিয়ায় বেশ ফলাও করে তার রিপোর্ট ছাপে । ···সৌরাষ্ট্রেও বিশেষ কিছু হয়নি ।···পার্টির ভেতর এত সব বিপর্যয়ের পর কিছু করা যে কত শক্ত, সেটা এখানকার কিছু লোক বোঝে না । বোম্বাইয়ের চেয়ে বাংলা সেদিক থেকে শতগুণে ভালো । ···তোমার চিঠি আমি চিত্তকে দেখিয়েছি । ও পত্রপাঠ তোমাকে লিখবে বলেছিল । লিখেছে কি ?

'কলকাতায় যেতে পারলে খুব ভালো লাগত । কিন্তু আমি এখন একেবারে শয্যাগত । একেবারেই কোথাও যাওয়ার ক্ষমতা নেই ।···' চিত্ত দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে । তারা কোথায় আছে কে জানে ?

সাধ আর সাধ্য

স্বর্ণদা হপ্তা দেড়েক পর আবার লিখলেন— '···হঠাৎ অতিরিক্ত কাজের ভার এসে পড়েছে—লেখার কাজ । শুধু বাড়িতে বসে অনুবাদ করাই নয়, প্রেসের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে হচ্ছে এমন কাজ । সুতরাং শেষ পর্যন্ত লেখা পাঠাতে না পারলে মার্জনা করো ।

'মেলা, প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র উৎসব, সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ ও সোভিয়েৎ দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক যতই নিবিড় হচ্ছে, এখানে আমাদের কাজও অল্পবিস্তর বেড়ে চলেছে সেই অনুপাতে । সময় নেই । সময় নেই মানে, এত বেশি কলমের কাজের পরে আবার কলম নিয়ে বসবার মত আবশ্যক উৎসাহের অভাব আছে । একখানি উপন্যাস লেখায় হাত দেবো দেবো করছি অনেকদিন । পেরে উঠছি না ।

'তোমরা এখন সাংস্কৃতিক সম্মেলন নিয়ে ব্যস্ত । দূর থেকে দোলা লাগে মনে । ছুটে যেতে ইচ্ছা হয় । দিল্লীর জীবনে এরকম বৃহৎ প্রবাহ নেই । তিখোনফের দলকে তোমরা দেখেছ, তাঁদের কথা শুনেছ, নিজেদের কথা তাঁদের শুনিয়েছ । আমরা তাঁদের চর্মচক্ষে পর্যন্ত দেখিনি । নয়াদিল্লীর পাবলিক রিসেপশন হয়েছিল জিমখানা ক্লাবে । সে স্থান আমাদের কাছে অনধিগম্য । বৃটিশ আমলে জিমখানা ক্লাব ছিল রাজধানীর দেব-দেবীদের আড্ডাখানা । আজও তাই আছে । এখানকার প্রগতিশীল মহলের মুরদ বুঝতেই পারছ । একটা জনসম্বর্ধনার ব্যবস্থা করতে পারল না বা করল না ।

সোভিয়েৎ প্রতিনিধি দলগুলিকে বম্বে-মাদ্রাজ-কলকাতায় তোমরা যেমন করে পাও আমরা এখানে তা কল্পনাও করতে পারি । সাধে আর দিল্লী ছেড়ে চলে যেতে চাই । এখানে না আছি ভারতবর্ষে না আছি বিদেশে ।

'পরিচয়কে লেখা পাঠাবই । কিছুদিন সময় দাও ।···'

ডাঃ ক্ষীরোদ চৌধুরী

ভিয়েনা থেকে গীতাকে লেখা ইংরিজিতে ডাঃ ক্ষীরোদ চৌধুরীর চিঠি (১৯-৪-৫২)—'আজও তোমার কোনো চিঠি পেলাম না । মন খারাপ লাগছে । কলকাতা ছেড়েছি আজ ঠিক পনেরো দিন । এ সপ্তাহে আমাদের সম্মেলন শেষ হল । ৬৪টি দেশ থেকে এসেছিল ছ'শোর মত প্রতিনিধি । কত জাতিবর্ণের মানুষ, কত রকমের ভাষা আর কত বিচিত্র সব পোশাক । শ্রীনিয়োগী এসে পৌঁছুলেন শেষ দিনে—আক্ষরিকভাবেই একেবারে শেষ মুহূর্তে ।

'কিছু কিছু আলোচনা বেশ··· (শব্দটা অস্পষ্ট, হাজার হোক ডাক্তারের লেখা তো)··· হলেও, প্রস্তাবগুলো খুব যুক্তিপূর্ণ আর সুচিন্তিত । এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, প্রস্তাব পাশ করেই আমরা ক্ষান্ত হব না । দেশের মানুষ আর সরকারকে দিয়ে শিশুদের কল্যাণকর কিছু কাজ আমরা করাতে পারব । সিদ্ধান্ত হয়েছে, (১) আমরা যে যার দেশে ফিরে গিয়ে গৃহীত প্রস্তাবগুলো কাজে পরিণত করার চেষ্টা করব ; (২) শিশুরক্ষার জন্যে আমাদের জাতীয় সংগঠন গড়ে তুলতে হবে··· ।

'আমি খুবই হতাশ হয়েছি শা-র দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণে । ভদ্রলোক পর পর দুদিন তো সভাতেই এলেন না । ভবিষ্যতে আমাদের আরও ঝাড়াই-বাছাই করে লোক পাঠাতে হবে ।··· হোটেলে আমাদের খুব যত্নআত্তি করে রেখেছে ; এক ভদ্রমহিলা সারাক্ষণ আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে বেড়িয়েছেন । প্রবাসে যেভাবে আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে । তাতে আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ ।

'তুমি জানো, ২১ মাস পর এই প্রথম আমি একটু ছুটি পেয়েছি । আমি খুব ক্লান্ত । আরও সপ্তাহ তিনেক ইউরোপে, সম্ভবত জার্মানি আর ইতালিতে কাটিয়ে তারপর দেশে ফিরব । ···আশা করি, ভালো আছো । ···চিত্তপ্রসাদের ছবির সবাই খুব তারিফ করেছে ।'

(চলবে)

its horses. Now I know that it's the home of something equally thoroughbred.'

'The finest horses in the country come from the Gwalior Stud. You can take my word on that, because I've known them for more years than I care to remember.

Once, a funny thing happened on the way to the stables. I met another type of thoroughbred. I saw some of the best Suiting and Shirting material in the world. From Gwalior.

about what you wear, ask to see Gwalior's Golden Glade Worsted Suiting and Dornfab. They're winners all the way. Say you heard about it straight from the horse's mouth!'

M. A. K. PATAUDI

IN A CLASS OF ITS OWN

MAPP-GR-86-113
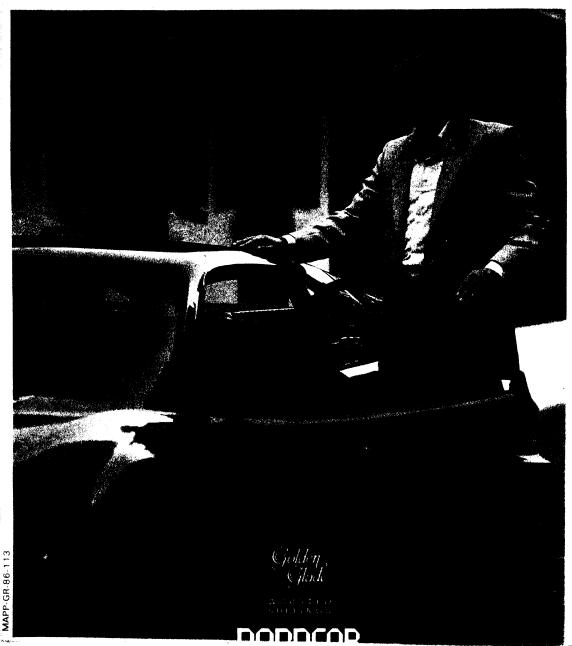
হিমালয়ের পার্বতী

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

নিশাশেষে জেগে উঠেছে একটি বালিকা। পাশে মা। শয্যায় ছড়িয়ে পড়েছে চাঁদের আলো। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে পশ্চিম গগনের চাঁদ। শিশু বায়না ধরেছে, আকাশের ওই চাঁদ তাকে ধরে দিতে হবে। মা কত বোঝাচ্ছেন, চাঁদ কি ধরা যায়? বালিকা সে কথায় কান দিচ্ছে না। তার জেদী কান্নায় মা অস্থির। বাবাও পাশে ছিলেন। তিনি উঠে একটি আয়না নিয়ে মেয়ের মুখের সামনে ধরে বললেন, এই দেখ চাঁদ। বালিকার কান্না থামল। দর্পণে নিজের চাঁদমুখ দেখে নিজেই ভুলে গেল চাঁদমুখী বালা।

মানবীর মত লীলাচঞ্চলা এই বালিকাই হিমালয়ের পার্বতী। গিরিরাজ হিমালয় তাঁর পিতা। মা পিতৃগণের মানসীকন্যা মেরুদুহিতা মেনকা। পর্বতের কন্যা বলে নাম পার্বতী।

ঘরের মেয়ে হলেও পার্বতী পরাপরকৃতি, মহামায়া, মহাশক্তি। তিনি নিখিল বিশ্বের 'সদসৎ' সকল শক্তির মূল।

শক্তির মূর্ত লীলা বলতেই সাধারণত মনে একটা ভয়ঙ্কর ভাবের সৃষ্টি হয়। হানাহানি, মারামারি, যুদ্ধবিগ্রহ— ক্রোধের গর্জন, অহংকারের 'হং হো' হুঙ্কার, হতাহতের রুধির স্রোত—সব মিলিয়ে এক বিভীষিকার রাজ্য। আসুরী শক্তি ও দৈবী শক্তি, যে শক্তিই হক রণরঙ্গে তার প্রকাশ মহাভয়ঙ্কর। দেবী শক্তিও সেখানে সংহৃতিরূপা, যেন দারুণা কালরাত্রি-মহারাত্রির প্রতীক। তিনি কখনও মধুপান করছেন, কখনও খড়্গিনী শূলিনী গদিনী হয়ে শত্রু সংহার করছেন। দানবদলে উঠছে হাহাকার। নিহত হচ্ছে দুর্গ-অসুর, কত ঘোরাসুর, গজাসুর, মহিষাসুর। 'অরিসংক্ষয়', 'দুর্বৃত্তবৃত্তশমন' ও দানব দল নেই যেন শক্তির সার্থকতা। দেবীও অবশ্য দেবতাদের এই আশ্বাসই দিয়েছিলেন—

> ইত্থং যদা যদা বাধা দান বোত্থা ভবিষ্যতি।
> তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম ॥

কিন্তু শক্তির আর একটি রূপ রয়েছে, যেখানে তিনি কোমলা, শান্তিকরী, 'সদা দয়ার্তচিত্তা'—যেখানে তিনি মঙ্গলা, 'অব্যাজ করুণামূর্তি'—যেখানে তাঁর 'সৌম্যোভাস্বতিসুন্দরী'

ছবি : দীপেন বসু
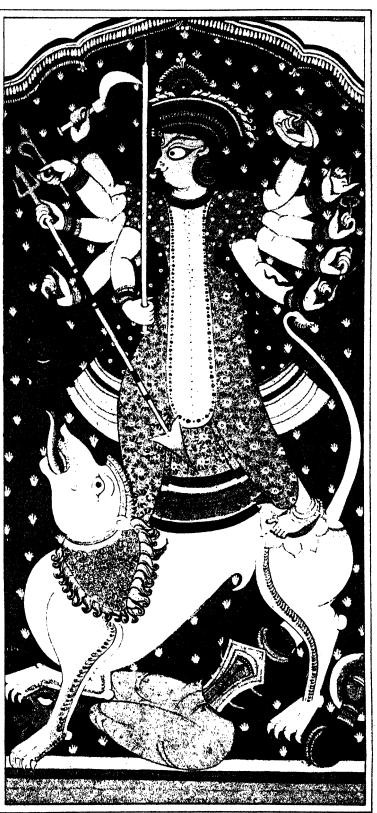
রূপ। রণক্ষেত্রে নয়, গৃহীর গৃহাঙ্গণে তাঁর লাবণ্যময়ী, লাস্যময়ী লীলার প্রকাশ। সেখানে তিনি নন্দিনী কন্যা, আনন্দদায়িনী জায়া, অনন্ত স্নেহময়ী জননী।

হিমালয়ের পার্বতী হলেন সেই আনন্দরূপিণী চিতিশক্তি, গৃহের বন্ধনে মূর্তিময়ী প্রীণন প্রতিমা। অবশ্য হৈমবতী পার্বতীর মধ্যেও যে কখনও কখনও রুদ্রীরূপের প্রকাশ না ঘটেছে, তা নয়। তবু সেগুলি ছাপিয়ে প্রধান হয়ে উঠেছে তাঁর গার্হস্থ্য লীলা। অন্য কোন শক্তিমূর্তির মধ্যে এই লীলা তেমন প্রকাশ পায়নি।

দাক্ষায়নী সতীও গৃহের কন্যা ও জায়া। কিন্তু পুরাণে তাঁর সে গৃহ-লীলা অস্ফুট। অধিকাংশ পুরাণে সতীর জীবনের যবনিকা উত্তোলিত হয়েছে তাঁর জীবনের শেষ অঙ্কে, যেখানে পতিনিন্দা শুনে তিনি যোগবলে তনু ত্যাগ করেছেন। সমগ্র পুরাণ মুখর হয়ে উঠেছে গিরিনন্দিনী পার্বতীর গৃহলীলার বর্ণনায়। শুধু পুরাণ নয়, রসসাহিত্যের প্রকীর্ণ কবিতায় এবং কাব্যে স্নেহপ্রেমের লীলাবিলাসিনী রূপে চিত্রিত হয়েছেন হৈমবতী পার্বতী। হালের গাথা সপ্তশতীতে, ভর্তৃহরির শৃঙ্গার শতকে, আচার্য গোবর্ধনের আর্যাসপ্তশতীতে, সদুক্তি কর্ণামৃতের সঙ্কলনে পার্বতী প্রোদ্দাম প্রেমনায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যেও হরপ্রিয়া ও কুমারজননী রূপে প্রধান স্থান গ্রহণ করেছেন মেনানন্দকরী হিমরাজ দুহিতা পার্বতী। গৃহের পরিবেষ্টনে, স্বজনের মমত্ববন্ধনে, পতিংবরা কুমারীর কঠিন তপশ্চর্যায় মহাশক্তি মহামায়ার সে এক বিচিত্র লীলা।

চণ্ডী সপ্তশতী পাঠের পূর্বে দেবী কবচ পাঠ করা হয়। এই কবচের সূচনায় দেবীর নয়টি নামের উল্লেখ করা হয়েছে— শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্র ঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী ও সিদ্ধিদাত্রী। এগুলি নব দুর্গার নাম। আসলে একমাত্র 'কাত্যায়নী' নামটি বাদে প্রথমাদিক্রমে বিন্যস্ত এই নামগুলি শৈলপুত্রী পার্বতীরই গৃহজীবনের পরিচয়বহ। কাত্যায়নী হলেন রণরঙ্গিণী মহিষমর্দিনী দুর্গা। তাঁর সঙ্গে হিমালয়ের পার্বতীর যোগ থাকলেও সম্পর্ক একটু দূরান্বয়ী। তাঁর লীলাক্ষেত্র হিমাচল নয়, বিন্ধ্যাচল। বিন্ধ্যাচলের দুর্গা দানবদলনী, ভয়ঙ্করী—হিমাচলের পার্বতী মাধুর্যময়ী গৃহশ্রী। নবদুর্গার বাকী আটটি নাম ধারাবাহিকভাবে হিমালয়ের পার্বতীর পূর্ণাঙ্গ জীবনের সূচক। কন্যকা, পূর্বরাগময়ী কুমারী, কামকলাবিলাসিনী কামিনী, বাৎসল্যময়ী জননী ও হরের অর্ধাঙ্গিনীরূপে হৈমবতীর সমগ্র গৃহজীবনের ইতিহাস এই নামমালায় বিধৃত।

শৈলপুত্রী পার্বতীর জীবনের স্পষ্ট দুটি স্তর। একটি জন্ম থেকে বিবাহ পর্যন্ত, অপরটি হরজায়া, স্কন্দজননী ও অর্ধনারীরূপে শিবের দেহার্ধে স্থান লাভ। নবদুর্গার প্রথম চারটি নামের (শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘণ্টা ও কুষ্মাণ্ডা) লীলাভূমি হিমগিরি, শেষের চারটি নামের (স্কন্দমাতা, কালরাত্রি, মহাগৌরী ও সিদ্ধিদাত্রী) লীলাকেন্দ্র কৈলাস।

দক্ষযজ্ঞে দক্ষজতনু ত্যাগ করে শিবপ্রিয়া সতী হিমরাজ গৃহে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পবিত্র গার্হপত্য ব্রতের সূচনা করেই এ জন্ম। এদেশে সন্তানজন্ম শুধু সম্ভোগ-কামনার বিলাসমাত্র নয়। সন্তান শুদ্ধ সংজ্ঞাপত্যের তপশ্চর্যার ফল। পরমা প্রকৃতিকে কন্যারূপে লাভ করার জন্য হিমরাজ ও মা মেনকা সেই সাধনাই করেছিলেন। দীর্ঘ সাতাশ বছরের তপস্যা—কখনও অর্ধাহার, কখনও অনাহার। নিয়ত প্রার্থনা—"প্রসীদ প্রসীদ মাতঃ"। এরই শুভ পরিণাম মেনাগর্ভে জগন্মাতার জন্ম।

জন্মমাত্র প্রসন্ন হল দিঙমণ্ডল, সুগন্ধে পূর্ণ হল সমীরণ, বনস্পতি হল মধুময়। দেখতে দেখতে হিমালয়ভূমি সর্বমঙ্গল ও সৌভাগ্যের আকর হয়ে উঠল। নীলোৎপলের মত শ্যামবর্ণা কন্যা, যেন নববর্ষার নয়ন জুড়ানো মেঘ। সর্বাঙ্গে চন্দ্রিকার স্নিগ্ধ দ্যুতি। বিম্বপ্রভ ওষ্ঠ, আরক্ত পাণিতল, পদ্মপ্রতিম যুগ্মপদ—সর্বলক্ষণে লক্ষণান্বিতা মেয়ে। মেনা মুদিতা হলেন, হৃষ্ট হলেন হিমরাজ।

আগুন, তেমনই পার্বতী থেকে উৎপন্ন হবে তারকঘ্ন পুত্র। তাই হিমগৃহে নারদের আগমন, উদ্দেশ্য শিবের পরিচর্যায় পার্বতীকে নিয়োগ করা।

দেবর্ষিকে দেখে স্বাগত জানালেন শৈলরাজ। রাণী মেনকাও এলেন, সঙ্গে কন্যা কালী—কৈশোর লাবণ্যের নিখুঁত প্রতিমা। মা নিজে প্রণাম করে মেয়েকে বললেন, ঋষিকে প্রণাম কর। শুনে সলজ্জে পিতার বুকে মুখ লুকালেন আদরিনী কন্যা। মায়ের ইচ্ছা, ঋষির মুখ থেকে শোনেন কন্যার ভাগ্যের কথা। পার্বতীকে দেখে নারদ বাগব্যাজে বললেন, কন্যা অলক্ষণা, উত্তালহস্তা, ব্যভিচারীপদা—এ কন্যার বর জন্মগ্রহণ করেননি। শুনে ক্ষুণ্ণ হলেন জননী, বিমর্ষ হলেন পিতা। উত্তাল হস্ত যাচকের লক্ষণ, ব্যভিচারী পদ চঞ্চলার। নারদ তখন সহাস্যে বললেন, ইনিই মহাশক্তি মহামায়া। পরমা শক্তিকে কোন লক্ষণ দিয়ে বোঝানো যায় না,

তুষারধবল কৈলাসশৃঙ্গ : মহাদেবের আবাসস্থল তথা অগণন পৌরাণিক কাহিনীর পটভূমি

শৈলপত্নীরা 'আমি আগে, আমি আগে' ('অহং পূর্ধিকয়া'—পদ্ম· সৃষ্টি) বলতে বলতে নবজাতাকে দেখতে ছুটে এলেন। পর্বতের কন্যা বলে নাম হল পার্বতী। কৃষ্ণা বলে তিনি 'কালী' নামেও অভিহিতা হলেন। মায়ার বন্ধন স্বীকার করলেন মহামায়া।

আর দশজন গৃহকন্যার মত বালিকা পার্বতীর খেলার দিকে ঝোঁক—কখনও পুতুল নিয়ে খেলা, কখনও কন্দুকক্রীড়া। বাংলার কবিরা পার্বতীর 'লুকলুকানি' খেলা ও কড়ি নিয়ে 'দশপঁচিশ' খেলারও বিবরণ দিয়েছেন।

পার্বতীর বাল্য-পৌগণ্ডের সন্ধিক্ষণে স্বর্গের প্রয়োজনে হিমগৃহে এলেন দেবর্ষি নারদ। স্বর্গ তখন তারক অসুরের পরাক্রমে পর্যুদস্ত। দেবতারা জেনেছেন, শিবতেজে যে কুমারের জন্ম হবে, তিনিই হবেন তারক-হন্তা। কিন্তু সতীহারা শিব তখন যোগ আশ্রয় করে 'ঊর্ধ্বরেতা' হয়েছেন। তিনি হিমপ্রস্থেই কঠিন তপশ্চর্যায় রত। এই শিবকে 'প্রচ্যুত রেতা' করতে পারেন একমাত্র পার্বতী। অরণি থেকে যেমন জ্বলে ওঠে

পার্বতীও সকল লক্ষণের অতীত, তাই তাঁকে বলা হয়েছে 'অলক্ষণা'। ইনি সর্বদা বরদা, বরদানের জন্য হাত তুলে আছেন, তাই উত্তালহস্তা—'উত্তালো বরদঃ পাণিরেষ দেব্যাঃ সদৈব তু' (পদ্ম· সৃষ্টি)। এঁর চরণদ্বয়ের বর্ণ কালো, কিন্তু প্রণত দেবতাদের কিরীটমণির প্রভায় সে বর্ণ বিচিত্র বর্ণ ধারণ করবে—সুচ্ছায়ায় আবৃত হবে চরণের স্বচ্ছায়া, তাই ইনি ব্যভিচারী পদা। সর্বোপরি এঁর পতি হবে দেবাদিদেব মহাদেব। তিনি অজর, অমর, নিত্য ও অজ। তাই বলা হয়েছে এঁর বর জন্মগ্রহণ করেননি।

নারদ বললেন, শিব এখন হিমপ্রস্থেই যোগরত রয়েছেন। হে শৈলরাজ, আপনি কন্যাকে তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত করুন। শিবকে আরাধনা করে পার্বতী শিবকেই পতিরূপে লাভ করবেন।

কবি কালিদাস অপূর্ব কাব্যময় ভাষায় হিমালয় দুহিতার এই শিব পরিচর্যার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কিশোরীর পূর্বরাগেরও সঞ্চার এই সূত্রে। পুরাণকারেরা বলেন, পার্বতীর শিবরাগ জন্মান্তরীণ সংস্কারের মত তাঁর ভিতর প্রকাশ

পেয়েছিল। কখনও তিনি শিবের জন্য সমিধ-বারি-পুষ্প আহরণ করতেন, কোনদিন এনে দিতেন পদ্মবীজের মালা, কখনও বা শিবকে প্রসন্ন করার জন্য সহচরীদের নিয়ে গান করতেন, নৃত্য করতেন। কখনও বা মানবীজনোচিত অভিলাষবশে শিবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন—"বীক্ষন্তী চিন্তয়া মাস সকামা চন্দ্রশেখরম" (কালিকা· পু)। এমন কি স্বপ্নেও তিনি শিবকে দেখতেন। তাঁর একমাত্র কামনা—কবে শিব আমার পাণিগ্রহণ করবেন।

পার্বতীর এই ইচ্ছার পরিপূর্ণতার পথে অন্তরায় ছিল। প্রথমত হর তখন যোগব্রতে রত। যোগের পথে কাম বিঘ্নস্বরূপ। তা ছাড়া শিবের ইচ্ছা, কালী গর্ভবাসে মলিন হয়েছেন, তাঁর দেহশুদ্ধি প্রয়োজন। দেহ শুদ্ধ হলে তিনি পার্বতীর পাণিগ্রহণ করবেন। এই জন্য তিনি কালীকে স্বদয়িতা জেনেও সামনে দেখেও ঠিক দেখতেন না—'পশ্যন্নপি ন পশ্যতি'। অথচ পার্বতী তাঁকে বিধিমত পেতে অভিলাষ করতেন। প্রাকৃত রমণীর মত নানা ছলে তিনি শিবকে আকৃষ্ট করতে যত্ন করতেন, প্রকাশ করতেন রাগময়ী নারীর হাব-ভাব বিলাসবিভ্রম। কিন্তু ঘটনার গতিকে সম্পূর্ণ অন্য পথে মোড় ঘুরিয়ে দিল শিবকর্তৃক মদনভস্ম ঘটনা।

মদনদাহ ঘটনাটি বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কালিকাপুরাণে ও শিবপুরাণে পার্বতীর উপস্থিতিতেই মদনভস্ম হয়েছে। কালিদাসও শিবপুরাণ অনুসরণ করে মদনভস্মের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। দেবতাদের নিয়োগে দর্পিত মদন রতিসহ বসন্তকে নিয়ে হিমপ্রস্থে উপস্থিত হয়েছিল। পার্বতীও তখন শিবসেবার জন্য শিব-সন্নিধানে এসেছিলেন। এমন সময় তপোভূমিতে আকালিক বসন্তের উদয় হল। প্রফুল্ল পুষ্পগন্ধে অরণ্য আমোদিত হল, দ্বন্দ্বভাব প্রকাশ পেল জীবজগতে ('দ্বন্দ্বভাব-বিতেনিরে')। পরিবেশ বিকার প্রাপ্ত হলেও অবিকৃত রইলেন যোগীশ্বর শিব। শম্ভুকে বিচলিত করার কোন সুযোগই মদন খুঁজে পেল না। এমন সময় মুহূর্তের জন্য মহাদেব ধ্যানবিরত হলেন। মদনও সুযোগ বুঝে শিবের প্রতি কামশর বর্ষণের উদ্যোগ করল। তখন পার্বতী মহাদেবকে প্রণাম করছিলেন। মহাদেবের মন সহসা চঞ্চল হল। তিনি অনুরাগ বশে কালীর মুখ দেখতে লাগলেন ('বদনং কাল্যাঃ সাকূতং সংব্যালোকয়ৎ'—কালিকা)। শিব পুরাণে বলা হয়েছে,—এই সময়ে শিব পার্বতীকে প্রেম-সম্ভাষণও করেছিলেন।

কিন্তু যোগী মহাদেবের এ বিভ্রান্তি মুহূর্তমাত্র। অবিলম্বে তিনি সংযত হলেন। স্থির হয়ে এই চাঞ্চল্যের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি সম্মুখেই দেখলেন উদ্যতকার্মুক মদনকে। রুদ্রের তৃতীয় নয়নে ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হল। সমগ্র বনভূমিতে 'সংহর সংহর' রব উঠতে না উঠতেই সেই অনলে মদন দগ্ধ হয়ে গেল। তপস্যার প্রতিকূল মনে করে শিব তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করলেন। কামদাহে পার্বতীর কামনাও ছিন্নমূল হল।

কালিকাপুরাণ মতে, ভীতা চকিতা শৈলপুত্রী শিব বিরহে আকুলা হলেন। এমন সময় সেখানে এলেন পিতা হিমরাজ। পুত্রীকে তদবস্থ দেখে তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'মা ভৈষীঃ কালি মা রোদীঃ'—কালি, ভয় পেয়ো না, কেঁদো না। এই বলে কন্যাকে নিয়ে তিনি নিজ ভবনে চলে এলেন।

মৎস্য ও পদ্ম পুরাণের মতে (এই প্রসঙ্গের বর্ণনা ও ভাষা উভয় পুরাণেই এক) মদনদাহ কালে পার্বতী অনুপস্থিত ছিলেন। 'কৃত কৌতুকমঙ্গলা' কালী তখন 'শুভ্র চীনাংশুক' পরিধান করে সর্বাভরণে ভূষিতা হয়ে পিতার সঙ্গে শিবের কাছেই আসছিলেন। সহসা পথিমধ্যে রোরুদ্যমানা রতিকে দেখে জানতে পারলেন, শিব কামকে দগ্ধ করেছেন। শিব অকাম হয়েছেন জেনে গিরিরাজ ও পার্বতী উভয়েই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কামভোগ বিবাহের অঙ্গ। কামস্তুতি পাঠ করেই পিতা 'কামায়ত্বা' বলে কন্যাকে বরের হস্তে সম্প্রদান করেন। বর যেখানে অকাম, সেখানে কিসের বিবাহ? শুনে 'সম্ভ্রমভীষণঃ' আকার ধারণ করলেন হিমরাজ। সখেদে নিজের দুশ্চিহ্নযুক্ত দেহকে নিন্দা করতে লাগলেন পার্বতী।

বামন পুরাণের মতে শিবের পার্বতী-প্রত্যাখ্যানের ঘটনাটি অন্যপ্রকার। সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেব অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে পড়েন। সেই অবস্থায় মদন তাঁকে নানাভাবে কামশরে বিদ্ধ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মহাদেব তাকে দগ্ধ করে তপস্যার জন্য হিমপ্রস্থে গমন করেন। পর্বতপতি হিমাচল তাঁকে স্বাগত জানিয়ে সেই স্থানেই তপস্যা করতে বলেন। গিরিরাজ কন্যা কালীও সখীদের নিয়ে সেখানে এসে কৃতাঞ্জলি হয়ে হরের চরণ বন্দনা করলেন—'ববন্দে চরণৌ'। শিব বললেন, তোমার এ অনুষ্ঠান যুক্তিযুক্ত নয় 'ন যুক্তং চৈবম'—এই বলে তিনি প্রমথগণের সঙ্গে অন্তর্ধান করলেন।

কারণ যাই হক, শিবের এই প্রত্যাখ্যান পার্বতীর জীবনে এনে দিল রূপান্তর, তাঁকে প্রতিষ্ঠিতা করল দেবীকবচোক্ত দ্বিতীয় নাম 'ব্রহ্মচারিণী' রূপে। চাঞ্চল্যের স্থলে এল গাম্ভীর্য, ভোগাকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে এল ত্যাগ-সংযম, অপ্রাপ্তির নিরাশা দূরীভূত হল প্রাপ্তির স্থির লক্ষ্যে। পিতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি সখীমুখে ঘোষণা করলেন, 'নাসাধ্যম্ভু তপস্যতঃ'—তপস্যার অসাধ্য কিছু নেই। তপস্যা দিয়েই তিনি দুর্ভগত্ব মোচন করবেন, তপস্যার বলেই তিনি অকাম প্রেমিককে সকাম করে পতিরূপে লাভ করবেন।

হিমালয়ের পার্বতীর এই ব্রহ্মচারিণীর ভূমিকা ভারতবর্ষের প্রেমার্থিনী কুমারীর মহিমময় আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত ভাষায় এই তপশ্চর্যার প্রশস্তি গেয়েছেন। প্রেম কল্যাণশ্রীতে ভূষিত হয় সংযমে ও নিয়মে। দুঃখের ব্রতেই সমাজমঙ্গল, প্রেমের প্রতিষ্ঠা। পার্বতীর তপস্যা তার একক দৃষ্টান্ত, প্রেমের একমুখিনতার চূড়ান্ত। পার্বতীর 'উমা', 'অপর্ণা', 'পঞ্চতপা' নামগুলিও রূঢ় হয়ে উঠেছে এই দুশ্চর তপোব্রত প্রসঙ্গে।

পার্বতী কালীর 'উমা' নামটির উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে। বাংলা শিবায়ন কাব্যের কবি রামকৃষ্ণ বলেন,

উমা উমা ধ্বনি হল ভূমিষ্ঠের কালে।
কেহ কেহ তেকারণে উমা উমা বলে ॥

ভারতচন্দ্র বলেন, পার্বতীর জন্মকালেই মা মেনকা তাঁকে পরমশিবের শক্তিরূপা জেনে এই নামকরণ করেছিলেন—

উ শব্দে বুঝহ শিব মা শব্দে শ্রী তার।
বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈল সার ॥

আবার কেউ কেউ বলেন, 'উমা' হল গৃহীর প্রণব। অ, উ, ম এই তিনটি বর্ণ নিয়ে প্রণব গঠিত। ব্রহ্মবিদের প্রণব অ+উ+ম=ওঁ বা ওম্; যোগীদের প্রণব ব+অ+ম=বম এবং গৃহীদের প্রণব উ+ম+অ=উমা।

পুরাণ মতে পার্বতীর 'উমা' নামটি প্রচলিত হয়েছে তপশ্চর্যার কঠিন সঙ্কল্প থেকেই। শিবের কামদাহের কথায় পার্বতীর তপস্যার সঙ্কল্প শুনে গিরিরাজই বলেছিলেন, তোমার কোমলদেহ কঠিন তপঃক্ষম নয়, অতএব 'উমেতি চাপনং পুত্রি'—উ=ওগো, মা=না। এই থেকেই পার্বতীর উমা নাম প্রচলিত হয়। কালিকা পুরাণ বলেন, মা মেনকা পুত্রীকে বনে গিয়ে তপস্যা করতে নিষেধ করেছিলেন বলেই পার্বতীর নাম হয়েছে উমা—

যতো নিরস্তা তপসে বনং গন্তুঞ্চ মেনয়া।
উমেতি তেন সোমেতি নাম প্রাপ তদা সতী ॥

কালিদাসও উমা নামের এই ব্যুৎপত্তিই গ্রহণ করেছেন। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত উমা নামের 'ব্যাখ্যার এত বৈচিত্র্য' লক্ষ্য করে এই সংশয় প্রকাশ করেছেন, "হয়ত উমা শব্দটি মূলতঃ কোনও সংস্কৃত শব্দ নয়।"

উমা শব্দের উৎপত্তি যে ভাবেই হক, শব্দটি খুব প্রাচীন। কেন উপনিষদে "উমা হৈমবতী" নাম রয়েছে। আচার্য সায়ন 'সোম' শব্দটির ব্যাখ্যায় 'উময়া সহ বর্তমানঃ' বাক্যটি প্রয়োগ করেছেন। বৈদিক সোম-তত্ত্বই তন্ত্রের 'শিবোমা' তত্ত্ব বা শক্তিবিশিষ্ট শিবতত্ত্ব।

উমা-তত্ত্ব যাই হক, সঙ্কল্পে অটল পার্বতীকে কেউ নিরস্ত করতে পারেনি। প্রিয়তমকে লাভ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাঁকে রাগময়ী নায়িকার মর্যাদা দান করেছে। শিবকে লাভ করার জন্য তিনি হিমপ্রস্থে শিবের তপোভূমিতেই তপোরতা হলেন। মহার্ঘ বস্ত্র-আভরণ ত্যাগ করে রাজনন্দিনী ধারণ করলেন বল্কল ও মৌঞ্জীমেখলা, চমরীসম কেশকলাপ হল রুক্ষ জটা। আহার গ্রহণেও তিনি কঠোর হলেন। প্রথমে ফলাহার, দ্বিতীয়ে শুধু জল পান ('তোয় ভোজনং'), তারপর স্বয়ং পতিত বৃক্ষপত্র (পর্ণ)। অবশেষে তিনি এই পর্ণভোজনও ত্যাগ করে নিরাহারী হলেন। এই থেকে পৃথিবীতলে তাঁর নাম হল 'অপর্ণা'—কালিকাপুরাণ বলেন,

আহারে ত্যক্তপর্ণাভূদ্ যস্মাদ্ধিমবতঃ সুতা।
তেন দৈবেরপর্ণেতি কথিতা পৃথিবীতলে ॥

দুশ্চর তপশ্চরণ প্রসঙ্গে পার্বতীর 'পঞ্চতপা' নামটিও প্রসিদ্ধ হয়েছে। পাঁচ প্রকারের কঠিন তপস্যাই পঞ্চতপ। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে সামনে আগুন

জ্বেলে তিনি একপায়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতেন ; অশ্রান্ত বর্ষায় আচ্ছাদনশূন্য স্থানে দাঁড়িয়ে তিনি শিব নাম জপ করতেন ; দারুণ শীতে হিমশীতল জলে আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে শিবের ধ্যান করতেন ; প্রবল বাত্যায় তিনি উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে হরের কথা ভাবতেন ; হিংস্র জন্তুর আক্রমণকেও তিনি উপেক্ষা করতেন। বাত-আতপ-শীত-বৃষ্টি, জন্তুর ভয় তাঁকে সাধনভ্রষ্ট করতে পারেনি। পঞ্চভূতের তাড়নাকে জয় করেই পার্বতী হয়েছিলেন 'পঞ্চতপা'।

প্রেমের জন্য ব্রহ্মচারিণী পার্বতীর এই কৃচ্ছ্রসাধনা পৃথিবীতে শাশ্বত হয়ে আছে। কষ্ট কষ্ট নয়, অন্তরে এক কামনা,

যদি সত্যই তপস্যা করে থাকি ; সত্যই যদি হরের প্রতি অনুরক্তা হয়ে থাকি, আমার তপস্যা যদি সত্য হয়, তাহলে হর প্রসন্ন হন—'হরস্তেন প্রসীদতু'।

এই অবস্থায় স্বয়ং শিব জটিল ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে পার্বতীকে পরীক্ষা করার জন্য এসে শিবনিন্দা করেছিলেন। শিবনিন্দা শ্রবণে শিব-প্রেমিকা পার্বতীর মনোলোভন প্রত্যুত্তর পুরাণে ও কাব্যে অমর হয়ে আছে। বামন পুরাণের পার্বতী ভিক্ষুকে বলেছিলেন 'যাদৃশস্তাদৃশো বাপি স মে নাথো ভবিষ্যতি'। কালিদাস রক্তান্তনেত্রা পার্বতীর মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন, হে শিবনিন্দক ব্রাহ্মণ, তুমি হরকে জান না। বিবাদে প্রয়োজন নেই, হর যেরূপই হন, 'মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতম্'—আমার মন তাতেই স্থিত। এ হল ভাবের কথা, প্রেমের স্থির নিষ্ঠার কথা। প্রেম যুক্তি-তর্ক মানে না, ধন-ঐশ্বর্য কামনা করে না। প্রেমের সার্থকতা প্রিয়তমকে ভালবেসে, লক্ষ্যের একাভিপ্রায়ে। এই প্রেমেই প্রতিষ্ঠিতা হয়েছিলেন ব্রহ্মচারিণী, পঞ্চতপা অপর্ণা।

জটাধারী বটুর মুখে শিবনিন্দা শুনে পার্বতী সখীকে বললেন, যতদূরে গেলে তাঁর কানে শিবনিন্দার ধ্বনি না পৌঁছোয় ততদূরে গিয়েই তিনি তপস্যা করবেন। বলে তিনি চলার উদ্যোগ করলেন। সেই মুহূর্তে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে পথ আগলে দাঁড়ালেন স্বয়ং শিব। পার্বতীর তখন 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা। প্রিয় অভীষ্টকে দেখে ভীত-চকিতা-কালী অধোমুখী হলেন ; লজ্জায় ও প্রীতিতে যেন জড়ের মত হয়ে গেলেন—'প্রীতিলজ্জাভিঃ সা জড়েব তদাভবৎ'। সেই অবস্থায় শিব বললেন, তোমার তপস্যায় আমি প্রীত হয়েছি। আমি তোমার দাস।

পার্বতীর আশা পূর্ণ হল। নিমেষে দূরীভূত হল দীর্ঘদিনের তপঃক্লেশ, হৃদয় পূর্ণ হল সিদ্ধিরূপ আনন্দের সুধাধারায়। কিন্তু তিনি সংযম হারালেন না। শিব তখনই 'পুষ্পবিবাহ' করে তাঁকে গ্রহণ করতে চাইলেন। কিন্তু পার্বতী সখীদের মুখ দিয়েই জানালেন,

লোক মর্যাদা লঙ্ঘন করা অনুচিত। কন্যা স্বদত্তা হয় না, পিতৃদত্তাই হয়ে থাকে। পিতার কাছে প্রার্থনা করে আপনি আমার পাণিগ্রহণ করুন।

অনূঢ়া প্রেমিকার এ সংযম গৃহধর্ম ও সমাজধর্মের দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শিবও যোগ্য ও ন্যায়সঙ্গত ভেবে পার্বতীর বাক্য অনুমোদন করেছিলেন এবং যথা বিধানে সপ্তর্ষিদের পাঠিয়ে কন্যাদানে হিমরাজের সম্মতি আদায় করেছিলেন।

বিবাহপূর্বা পার্বতী আরও দুটি নামের অধিকারী হয়েছিলেন। দেবী কবচে তাদের বলা হয়েছে 'চন্দ্রঘণ্টা' (মতান্তরে 'চণ্ডঘণ্টা') ও 'কুষ্মাণ্ডা'।

চন্দ্রঘণ্টা মানে রাকাচন্দ্রের মত অপরূপ লাবণ্যময়ী। অঙ্গবর্ণের দিক থেকে পার্বতী ছিলেন শ্যামা। তাই তাঁকে বলা হত কালী। কিন্তু এই কালোরূপের মধ্যেই ছিল অপূর্ব এক মাধুরী, কালিদাস যা লক্ষ্য করে বলেছিলেন 'পুপোষ লাবণ্যময়ান বিশেষাণ্'। কালীর স্বাভাবিক লাবণ্য তপস্যায় আরও উজ্জ্বল হয়েছিল। একদিকে তপোদীপ্তি, অন্যদিকে প্রণয়ে সিদ্ধকামা কুমারীর তৃপ্ত মাধুর্য। একদিকে সলাজ অরুণিমা, অপরদিকে আনন্দের স্মিত হাসি। সব মিলিয়ে কালী হয়ে উঠলেন বিশ্বের মনোমোহিনী। রবীন্দ্রনাথ তপস্বিনীর এই রূপের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, "লাবণ্যপরাক্রান্ত যৌবনকে পরাভূত করিয়া পার্বতীর নিরাভরণা মনোময়ী কান্তি অমলা জ্যোতির্লেখার মত উদিত হইল।" এর উপরে মা মেনকা মেয়ের অঙ্গে তুলে দিলেন রাজকন্যার অঙ্গসজ্জা—ক্ষৌম বসন, সুগন্ধি অনুলেপন, দিব্য অলঙ্কার। পার্বতী হলেন অপরূপ রূপ লাবণ্যবতী, যেন নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের চন্দ্রিকা। পার্বতীর এই রূপটিই 'চন্দ্রঘণ্টা' নামে প্রসিদ্ধ। এ যেন দগ্ধ কামকে পুনরুজ্জীবিত করার রূপ, অকাম শিবকে সকাম করে তোলার জয়ঘণ্টা।

'কুষ্মাণ্ডা' নামটি হৈমবতী পার্বতীর সংযমশুদ্ধ চরিত্রের আর একটি দিকের পরিচয়। আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে গুপ্তবতী টীকায় কুষ্মাণ্ডা নামের ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, ত্রিতাপময়ত্রিত সংসার (কুষ্ম) যাঁর উদরে (অণ্ডে), তিনি কুষ্মাণ্ডা। বাংলা শিবায়ন কাব্যের কবি রামকৃষ্ণ বলেন, স্ত্রীত্ব বর্জিত 'ষণ্ড কলেবর' যাঁর, তিনি কুষ্মাণ্ডা, অর্থাৎ নপুংসক। এই প্রসঙ্গে কুমারী পার্বতীর একটি কাহিনীও বিবৃত হয়েছে।

সাধনায় সিদ্ধকাম হলেও বিবাহের পূর্বে পার্বতী নিত্য শিবপূজা করতেন। প্রথমে গঙ্গাস্নান করে সখীদের নিয়ে পুষ্পচয়ন করতেন। একদিন

গিরিরাজ, স্ত্রী মেনা, এবং কন্যা পার্বতী : ইলোরা-ভাস্কর্য

ফুল তুলতে গিয়ে তিনি বহুদূরে চলে যান এবং সখীসঙ্গচ্যুতা হয়ে মহাদেবের মালঞ্চে প্রবেশ করেন। তিনি জানতেন না কার এই উদ্যান। পুষ্পপ্রিয়া পার্বতী মনের সুখে ডালপালা ভেঙে পুষ্প চয়ন করলেন। দেখে ছুটে এলেন উদ্যানপ্রহরী নন্দী, শিবের মালঞ্চে কে ফুল তোলে। নিষেধ করা সত্ত্বেও পার্বতী নিরস্ত হলেন না। নন্দী গিয়ে শিবকে সংবাদ দিলেন। শিব ধ্যানে জানতে পারলেন, মালঞ্চে এসেছে তাঁরই বাগ্‌দত্তা প্রিয়া পার্বতী। সাভিলাষ চিত্তে তিনি চললেন প্রিয়া-মিলনের উদ্দেশ্যে। পার্বতীও বুঝলেন, এখনই আসবেন স্বয়ং শিব। পাছে তাঁর 'চন্দ্রঘণ্টা' রূপে মুগ্ধ হয়ে অপরিণীতা কুমারীর সঙ্গে মিলিত হন, এই ভয়ে পার্বতী মাধবীলতায় তাঁর গুপ্ত অঙ্গ স্থাপন করে 'ষণ্ডকলেবর' অর্থাৎ কুষ্মাণ্ডা হয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। এলেন শিব। শিবের উদ্দাম লালসা অনুমান করে অশোকতরু তাঁকে বললেন, প্রভু, গৃহস্থের ধর্ম রক্ষা করে কালীর সঙ্গে মিলিত হওয়া উচিত, তাঁর পিতৃকুলের মর্যাদা রক্ষা করা উচিত। শুনে শিবও তাঁর পুংস্ত্ব চাঁপা ফুলে রক্ষা করলেন। লোকাচারের অনুরোধে কেউ কাউকে স্পর্শ করলেন না, অথচ পার্বতী ক্রীড়াকৌতুকে একটি নিশি কুষ্মাণ্ডারূপেই যাপন করলেন শিবের মালঞ্চে। এর জন্য বিবাহের পূর্বে সমাজের কাছে উমাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল।

কুষ্মাণ্ডা রূপের তাৎপর্য হল বিবাহপূর্বা সুন্দরী কুমারীর সংযম। যে-কোন অবস্থাতেই হক, বিধিসম্মত পরিণয়ের পূর্বে পার্বতী কখনও শিবকে দেহদান করেননি।

এদেশে বিবাহের অষ্ট প্রকার ভেদ থাকলেও প্রাজাপত্য বিবাহই শুদ্ধ গার্হস্থ্য বিবাহের আদর্শ। এতেই পবিত্র সংজাম্পত্যের প্রতিষ্ঠা। পার্বতীর বিবাহ গৃহধর্মের মঙ্গলবন্ধনে নিয়মিত। দেবতা ও যজ্ঞাগ্নিকে সাক্ষ্য রেখে গৃহের কল্যাণ কামনা করে পিতা কন্যাকে বরের হস্তে সমর্পণ করেন। হিন্দু জীবনের যাবতীয় লোকাচার ও ধর্মাচার এবং মানবধর্ম সংহিতার সকলে নিয়ম মেনেই গিরিরাজ কৃতমঙ্গলা কন্যাকে শিবের করে সম্প্রদান করেছেন। বিবাহ-পূর্ব রাগ সামাজিক নিয়মে পবিত্র দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। হর পার্বতীর এই বিবাহচিত্র এদেশের চিত্র-ভাস্কর্য ও কাব্যকল্পনায় বিধৃত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথও উচ্ছ্বসিত ভাষায় এই শুদ্ধ বিবাহের জয়গান করেছেন।

বিবাহিতা নারীর দুটি রূপ। এক রূপে নারী মোহিনী ও কামিনী, আর এক রূপে নারী জননী ও গৃহিণী। নারীর কামিনী রূপটি জননীত্বে উত্তীর্ণ হওয়ার ভূমিকা। শিবপ্রিয়া পার্বতীর ভিতর এই দুই রূপেরই বলিষ্ঠ প্রকাশ।

বিবাহের পর শৈলজার মোহিনী নায়িকা মূর্তির বর্ণনা পুরাণেও করা হয়েছে, লৌকিক কাব্য কবিতাতেও করা হয়েছে। পুরাণের বর্ণনায় হরপার্বতীর রতি বিলাসে এক অলৌকিক স্বপ্নময় পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। লৌকিক কাব্য-কবিতায় লৌকিক মান-অভিমান, অভিলাষ ও মিলন শৃঙ্গার বর্ণনায় কবিরা কামশাস্ত্রের নির্যাস

শত বছর আগে আমাদের প্রপিতামহর বিয়ের আসরে তোলা সংবর্ধনার ছবি এখনও নিখুঁত!

হায়দ্রাবাদের লালা দীনদয়ালের সংগ্রহশালা থেকে : ফটো তোলার সাল, ১৮৮৫।
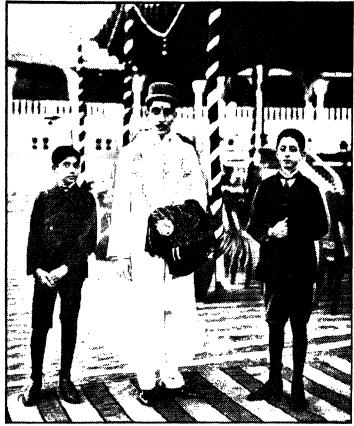
সেই সুখ-স্মৃতি আজও যেন জীবন্ত সত্য...
এটাই তো ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট ফটোগ্রাফির কৃতিত্ব!

পরিবার জনের ফটোর অ্যালবাম খুলে ধরে,
মন যেন আনন্দে যায় ভরে।
পুরানোকালের চমৎকার সব ছবি...নানা রঙের দিনগুলি ভাসে মানসপটে...
...শুধু ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটে।
ষাট, সত্তর, আশি, বা আরও আগে তোলা,
আজও স্পষ্ট, জীবন্ত রূপের ছবি, যায় নাকো ভোলা।
সেকালের বা একালে এটা চিরপছন্দের, চিরকালের।
সুতরাং, ছবি তুলে অ্যালবামে রাখতে ভরে,
শুধু ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট ফিল্মে রাখুন ধরে।
দেখবেন, আনন্দে মন উঠবে ভরে...যুগ যুগ ধরে।

স্মৃতি যদি কভু হয় ম্লান... ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটে ছবি থাকে অম্লান।

ইন্দু
ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট রোল ফিল্ম আর ব্রোমাইড।

ঢেলে দিয়েছেন। অলঙ্কার শাস্ত্রে উত্তম দেবতার সম্ভোগ-শৃঙ্গার বর্ণনা রসাপকর্ষক দোষ বলে গণ্য। দিব্য নায়ক-নায়িকায় অদিব্য চেষ্টার আরোপে প্রকৃতি বিপর্যয়াদি অনৌচিত্য দোষ ঘটে। সাহিত্যদর্পণাকার তাই আদেশ দিয়েছেন, 'ইদং পিতোঃ সম্ভোগবর্ণনমিবাত্যন্তমনুচিতম্'। কিন্তু হর-পার্বতী বা রাধাকৃষ্ণর বিহার বর্ণনায় প্রায় সকল কবিই এই বন্ধন লঙ্ঘন করেছেন। কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের অষ্টম সর্গ হর-পার্বতীর মহাবিহার বর্ণনায় বর্ণাঢ্য। তাতে নবদম্পতীর উদ্দাম বিলাসের কোন অঙ্গই বাদ পড়েনি। কিন্তু কবি এমনভাবেই প্রকৃতির রূপণায় বিষয়টিকে পরিবেশন করেছেন, যার ফলে আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত তাঁর প্রশংসা না করে পারেননি। কালিদাস বলেন, বরবধূর এহেন সংযোগের ফলেই পরস্পর আশ্রিত দুটি হৃদয়ের প্রেমবন্ধন গাঢ়বদ্ধ হয়—'প্রেম গূঢ়মিতরেতরাশ্রয়ম্'। হর-পার্বতীর হৃদয় দুটিও এইভাবে একাত্ম হয়ে উঠেছিল।

নারীত্বের চরিতার্থতা মাতৃত্বে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "জননীপদ আমাদের দেশের নারীর প্রধান পদ"। এদেশে বন্ধ্যা নারী কোন মাঙ্গলিক কর্মে স্থান পায় না। পোয়াতির গৌরবেই নারী ধন্যা। প্রত্যেক স্ত্রীর অন্তরে সন্তান কামনা জন্মার্জিত সংস্কারের মত প্রচ্ছন্ন থাকে। পার্বতীর মনেও সে কামনা ছিল। কখনও তিনি বৃক্ষাঙ্কুর রোপণ করে তাকে কৃতাচারমঙ্গলে পুত্রের মত লালন করতেন, বলতেন 'দশপুত্রসমোদ্রুমঃ'—একটি গাছ দশপুত্রের সমান। কখনও বা সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে দেখতেন শিবের ভূতাদি প্রমথগণকে। এঁদের ভিতর একজন ছিলেন বীরক। শুদ্ধাঙ্গ, সুন্দর বালক—অদ্ভুত তেজ। তিনি তাকেই পুত্ররূপে গ্রহণ করতে অভিলাষী হলেন। শিবও সানন্দে সম্মতি দিলেন। নগরাজ নন্দিনীর মাতৃস্নেহ বীরককে ঘিরেও প্রকাশ পেল। পরবর্তীকালে এই বীরকই হয়েছিলেন হর-পার্বতীর রতিগৃহের সতর্ক প্রহরী।

পার্বতীর পুত্রকামনা এতেও তৃপ্ত হয়নি। তিনি নিজের গর্ভে পুত্র কামনা করতেন। অবসর বিনোদনের ভিতরেও প্রকাশ পেত এই অভিলাষ। গণেশ জননীরূপে পার্বতীর খ্যাতি এই সূত্রে।

গণেশের জন্ম সম্পর্কে বিভিন্ন পুরাণ বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করেছেন। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ-মতে পার্বতী শিবের নিকট পুত্র কামনা করলে, একদিন শিব একটি রক্তবর্ণ বস্ত্র তাঁকে দিয়ে বললেন, এই নাও পুত্র। পার্বতী সেই বস্ত্রটিকে কোলে নিয়ে বসলে তাতে জীবন সঞ্চার হল। পুত্রটি 'মা মা' বলে কাঁদতে লাগল। বাৎসল্যবশে পার্বতীর স্তনে দুগ্ধ ক্ষরিত হল। তিনি তাকে সন্তান বলেই গ্রহণ করলেন। কিন্তু অচিরেই সে শিশুর মস্তক ছিন্নহয়ে ভূমিতে পড়ে গেল। শিবের নির্দেশে তার দেহে গজমুণ্ড লাগিয়ে দেওয়া হল। পুত্র হলেন গজানন।

বামন পুরাণের মতে, স্নানকালে পার্বতী নিজেই নিজের অঙ্গমলা দিয়ে একটি চতুর্ভুজ গজমুখ মূর্তি নির্মাণ করে ভূতলে নিক্ষেপ করেছিলেন। পুত্র বলে শিব একেই উমার কোলে দেন। নায়ক বিনা উৎপন্ন হয়েছে বলে, পুত্রের আর এক নাম হয় বিনায়ক। পার্বতী পুত্রভাবে গ্রহণ করে স্নেহে অভিভূতা হয়ে তার মস্তক আঘ্রাণ করেন।

কোন পুরাণ মতে, পার্বতী ব্রত করে পতিসংশ্রয় ছাড়াই পুত্র লাভ করেন। স্বর্গের দেবগণ নবজাত পুত্রকে দেখতে এলে শনির দৃষ্টিতে পুত্রের শির খসে পড়ে। তখন গজমুণ্ড এনে নতুন মস্তক জুড়ে দেওয়া হয়। দেখে পার্বতী অত্যন্ত ক্ষুব্ধা হন। শিব তখন তাকে বলেন এই গজমুখ পুত্রই গণেশ নামে বিখ্যাত হবে। ইনি হবেন প্রধান গণেশ্বর, ঋদ্ধি সিদ্ধিদাতা এবং বিঘ্ননাশের দেবতা। সকল দেবতার পূর্বে ইনি পূজা লাভ করবেন।

পার্বতীর একান্ত ইচ্ছা, শিবের ঔরসে নিজগর্ভে পুত্র জন্ম। শিব জানতেন, কালী তাঁর তেজ ধারণ করতে পারবেন না। তবু তিনি মহামৈথুনে প্রবৃত্ত হন। সে রতিক্রীড়ায় ত্রিভুবন আকুল হয়ে ওঠে। দেবগণ নিজেদের প্রয়োজনেই সেই মহামৈথুন ভঙ্গ করেন। অকাল মৈথুনভঙ্গে যে তেজ স্খলিত হয়, সেই তেজ থেকেই জন্মগ্রহণ করেন তারকঘ্ন কুমার স্কন্দ। শিব তেজকে প্রথম গ্রহণ করেন অগ্নিদেব। তিনি সে তেজ ধারণে অসমর্থ হয়ে গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। গঙ্গা সে তেজ শরবনে ত্যাগ করেন। এই শরবনেই শিবপুত্রের জন্ম হয়। কাত্তিকাদি ছয় নক্ষত্রদেবী স্তন্য দিয়ে কুমারকে পোষণ করে পার্বতীর ক্রোড়ে অর্পণ করেন। নবজাত শিশুর মাতা যেই হন, পার্বতীর সংশ্রয়ে শিবতেজ থেকে উৎপন্ন বলে পার্বতীকেই বলা হয় 'স্কন্দমাতা'। দেবীকবচে এইটিই দেবীর পঞ্চম নাম।

দেবীর পাঁচটি নামই পার্বতীর মানবী লীলার পরিচয় বহন করে। গৃহচারিণী কুমারী জায়া ও জননীরূপে মহাশক্তির মধুর আকৃতি এই নামভূমিকাগুলির মধ্যে মর্তলোকের গার্হস্থ্য জীবনকে পূর্ণ করে তুলেছে। দুর্গার 'কালরাত্রি', 'মহাগৌরী' নাম দুটিও গার্হপত্য জীবনের দিকেই অঙ্গুলি সঙ্কেত করে। তবে উমা হৈমবতীই যে পরমা শক্তি, তার কিছুটা প্রকাশ 'কালরাত্রি' নামটির মধ্যে রয়েছে। দুর্গার ষষ্ঠ নাম 'কাত্যায়নী'তে মহাশক্তির প্রকট প্রকাশ। পার্বতীর গার্হস্থ্য লীলার ভিতরে যা কিছু বিভূতির প্রকাশ দেখা যায়, সেগুলি সবই ঘটেছে কৈলাসে। কৈলাসবাসিনী শিবানীই প্রয়োজন বিশেষে দানবদলনী। কৈলাসের হৈমবতী উমা—'শিবোমা পরমাশক্তি'। শিবশক্তি হলেও তাঁর শিবজায়া রূপটি আচ্ছন্ন হয়নি।

এদেশে জননীত্বই নারীর চরম প্রাপ্তি নয়। নারীত্বের প্রধান অলঙ্কার পাতিব্রত্য। স্বামীই সাধ্বী স্ত্রীর একাশ্রয়। মনু বলেন, স্ত্রীলোকের পৃথক যজ্ঞ নেই, ব্রতও নেই। পতিনিষ্ঠাই স্ত্রীজনের ধর্ম, সাধ্য ও স্বর্গ। জীবিতকালে পতির সান্নিধ্য এবং পরলোকে পতিলোকপ্রাপ্তিই রমণীর চরম প্রাপ্তি। পুরাণকার বলেন, 'ধবসৈএকস্যা যা নারী লোকে পূজ্যতমা স্মৃতা'—পতিনিষ্ঠ নারীই পৃথিবীতে পূজ্যতমা।

পার্বতী হলেন এই পাতিব্রত্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। শিবের মনোরঞ্জনই শিবানীর ধ্যান, জ্ঞান। 'কালরাত্রি' ও মহাগৌরী' নাম দুটি তারই ইঙ্গিতবাহী।

'কালরাত্রি' মহাশক্তির একটি আদিরূপ। কল্পান্তে সমগ্র সৃষ্টি লয়প্রাপ্ত হয়। তখন সৃষ্টি অপ্রজ্ঞাত, অলক্ষণ ও তমোভূত। এই অবস্থার যে শক্তি, তিনিই কালরাত্রি। মহাকালকেও তিনি কলন করেন। তাঁকে যোগনিদ্রাও বলা হয়। স্বরূপে তিনি কালী, মহাকালী। তিনিই মহালয়া (মহা+লয়া); সমগ্র সৃষ্টি তাতেই লয়প্রাপ্ত হয়। আবার সমগ্র সৃষ্টির সম্ভাবনাও তিনি। এদিক থেকেও তিনি মহালয়া (মহা+আলয়া)। মহালয়া কালরাত্রিই ধ্বংস, তিনিই সৃষ্টি। মহালয়াতেই পিতৃপক্ষের শেষ ও দেবী পক্ষের সূচনা। মহা তামিস্রই কালরাত্রির বর্ণপ্রতীক।

কৈলাসনাথে হর-পার্বতীর কল্যাণসুন্দর মূর্তি

সতী দক্ষজতনু ত্যাগ করে যখন মেনাগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তখন দেব প্রয়োজনেই ব্রহ্মা 'কালরাত্রি'কে স্তব করে বলেছিলেন, হে দেবি, তুমি তোমার কালো বর্ণ দিয়ে মেনা গর্ভকে আবৃত কর, যাতে পার্বতী কৃষ্ণবর্ণা হন। কালরাত্রি তাই করেছিলেন। ফলে হৈমবতীর বর্ণ হয়েছিল নীলোৎপলদলশ্যাম। তাঁর নামকরণ করা হয়েছিল কালী। কালরাত্রি ও পার্বতী অভিন্না। হৈমবতী উমা একা ও অনংশা, কালরাত্রিও 'একানংশা'।

হিমরাজ পার্বতীকে 'কালী' বলে ডাকতেন। শিবও উমাকে কালী বলেই সম্বোধন করতেন। তাতে সাধ্বী পার্বতী মনে কিছু করতেন না। প্রেমের দৃষ্টিতে বিরূপ সম্বোধনও মধুর।

কিন্তু বিপর্যয় সৃষ্টি হল একদিন। সেদিন বিশেষভাবে বিস্তৃত হল কালরাত্রির প্রভাব। যামিনীই কামিনী সঙ্গের বিশিষ্ট কাল, রাত্রিই 'প্রিয়কণ্ঠগ্রহানন্দদায়িনী'। শঙ্কর সেই কালেই গিরিজাকে নিয়ে রমণীয় মন্দিরে প্রবেশ করলেন। মন্দির অন্ধকার। পার্বতীও কৃষ্ণবর্ণা। চন্দ্রমৌলি মহাদেবের চন্দ্রকলার স্বল্প আভায় গৃহ কিছুটা আলোকিত। সেই স্বল্প আলোকে রক্তাম্বর

পরিহিতা কালী নিশা-সংস্পৃক্তা হয়ে 'অতি তমোময়ী' হয়ে উঠলেন। মহাদেব কেলিকৌতুকে বললেন, 'কালি, আমার সামনে তোমাকে যেন চন্দনতরু সংশ্লিষ্ট কালসর্পীর মত দেখাচ্ছে।' —'ভুজঙ্গী বাসিতা শুদ্ধা সংশ্লিষ্টা চন্দনে তরৌ।' (মৎস্য) শুনে মুহূর্তে জ্বলে উঠলেন মানকুপিতা কালী। তাঁর মূর্তি আরও ভীষণ হয়ে উঠল। তিনিও কঠিন স্বরে বললেন, 'সবিষ নীলকণ্ঠ তুমি, তোমার কণ্ঠে তোমারই যোগ্য কথা উচ্চারিত হয়েছে। স্বরূপে মহাকাল হয়ে আমাকে কালী বলা উপযুক্তই হয়েছে। তাহলে আমার এ কালীদেহের প্রয়োজন কি? শৈলশিখরে গিয়ে আমি এখনই এ দেহ ত্যাগ করব।'

কালী গমনোদ্যতা হলে প্রেমিক মহাকালের শিরোভূষণ চঞ্চল হল। শিব পুরাণে বলা হয়েছে, এই সময় মহাদেব কুপিতা কালীকে তুষ্ট করার জন্য তাঁর পদতলে পতিত হয়েছিলেন। মহাকালীর চরণতলে মহাকাল। তবু প্রসন্না হলেন না চণ্ডী মানিনী। পতিকে উপেক্ষা করে তিনি সবেগে চলে গেলেন। যাবার সময় দত্তক পুত্র বীরককে রেখে গেলেন রতিগৃহের দ্বাররক্ষক রূপে, যেন সে গৃহে অন্য কোন নারী প্রবেশ করতে না পারে।

কালরাত্রি কালী 'মহাগৌরী' হলেন এই সূত্রে। মানকুপিতা নারীর মান যত প্রচণ্ডই হক, সে তো প্রিয়তমকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়। বরং প্রিয়কে আরও নিবিড় করে কাছে পাওয়ার লক্ষ্যেই মানিনীর মান। বিশেষ করে শিবানী। তিনি শিবসর্বস্ব। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য পতি-প্রসাদন। কৃষ্ণ দেহবর্ণ যাতে গৌর হয়, তার জন্য তিনি শুরু করলেন দুশ্চর ব্রত।

এমন সময় তিনি একটি ভুল সংবাদ পেলেন। কালীকে রতিমন্দির ত্যাগ করতে দেখে অন্ধক দৈত্যের পুত্র "আড়ি" পিতৃহন্তা শিবকে অভিভব করার জন্য বীরকের অলক্ষ্যে সর্পবেশে রতিগৃহে প্রবেশ করে উমার বেশ ধারণ করল। শিব প্রথমে বিস্মিত হলেন। পার্বতীর মানভঙ্গ তো এত সহজে হয় না। পরক্ষণেই তিনি বুঝলেন, এ হল আসুরী মায়া। এক পদাঘাতে তিনি উমাবেশধারী দৈত্যকে নিহত করলেন।

পার্বতী তখন পতির প্রীতিকামনায় তপোরত। বায়ুমুখে তিনি সংবাদ পেলেন, এক সুবেশা নারী শিবের মন্দিরে প্রবেশ করেছে। শুনে ক্রোধে জ্ঞানহারা হলেন চণ্ডী নায়িকা। শিব কি কামলম্পট। তাহলে কি প্রয়োজন জীবনে! তাঁর কোপ থেকে উৎপন্ন হল এক সিংহ। কালী সিংহের মুখে প্রবেশ করে আত্মবিসর্জন দিতে উদ্যতা হলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে এলেন পিতামহ ব্রহ্মা। তিনি কালীকে নিবৃত্ত করলেন। কালী তাঁকে তাঁর সঙ্কল্পের কথা জানালেন, পতি তাঁকে কালী বলে উপেক্ষা করেছেন, তিনি কালোবর্ণ ত্যাগ করে গৌরী হয়ে স্বামীর প্রীতি উৎপাদন করে তাঁর দেহার্ধভাগিনী হবেন। ব্রহ্মা বললেন, 'এবমস্তু'। দেখতে দেখতে পার্বতীর অঙ্গকোষ থেকে নির্গতা হলেন কালরাত্রি নিশাদেবী—

—দৃষ্টা সা অভবদ্দীপ্তা ঘণ্টাহস্তা ত্রিলোচনা। নানাভরণ পূর্ণাঙ্গী পীত কৌষেয়বসনা॥ মৎস্য

রাত্রিদেবীর কৃষ্ণবর্ণ থেকে বিযুক্তা হওয়ায় কালী হলেন গৌরী, মহাগৌরী। আর হৈমবতীর কোষমুক্তা দেবী কৌশিকী নামে প্রসিদ্ধা হলেন। ইনিই শুম্ভ নিশুম্ভ বধের নায়িকা। পার্বতী তাঁকে নিজক্রোধসম্ভূত সিংহটিকে দান করেন। সিংহবাহিনী কৌশিনকী বিন্ধ্যাচলে চলে যান।

মার্কণ্ডেয় পুরাণেও 'কৌশিকী' পার্বতীর শরীরকোষ থেকে নিঃসৃতা। তিনি পার্বতীর তপস্যার ফলে নির্গতা হননি, দেবগণের স্তব শুনে তিনি পার্বতীর দেহ থেকে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। তাঁর অঙ্গপ্রভায় দশদিক আলোকিত। তিনি নির্গত হওয়ায় পার্বতী কৃষ্ণা হয়ে যান 'কৃষ্ণাভূৎপার্বতী' এবং কালিকা নামে হিমালয়ে অবস্থান করতে থাকেন।

কালিকা পুরাণে কালীর গৌরীত্বলাভের বর্ণনাটি অন্যরকম। হর পার্বতী যখন মন্দর পর্বতে বিহারে রত, তখন উর্বশী প্রভৃতি স্বরুপ্সরাগণ সেখানে আসেন। তাঁদের সামনেই শিব তাঁকে 'কালী' বলে সম্বোধন করায় পার্বতী ক্ষুব্ধা হয়ে গৌরীত্ব লাভের জন্য হিমালয় সানুর মহাকৌষী প্রপাতে তপস্যায় নিযুক্তা হন। গৌরবর্ণা হওয়ার জন্য পতিপ্রাণা পার্বতী শিবেরই জ্যোতির্ময় শান্ত রূপের ধ্যান করতে থাকেন— 'জ্যোতির্ময়ং পরং শান্তং শিবং শিবকরং বরম্'। এ ধ্যান পতিপ্রীতি ও গতিপ্রাণতারই ধ্যান। তুষ্ট হয়ে যোগীশ্বর শিব পার্বতীকে ধ্যানে দেখা দেন। আত্মতত্ত্ব বোঝাবার জন্য শিব প্রথমে কালীকে তাঁর কালিকাত্মিকা রূপ দেখিয়ে পরে পরাপ্রকৃতির নিষ্কল রূপ দেখালেন। অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি দিয়ে কালী তখন নিজের স্বরূপ বুঝতে পারলেন। বুঝলেন, শঙ্কর হলেন জগন্ময় এবং তিনি নিজে হলেন জগন্ময়ী। বর্ণভেদ ভ্রান্তিমাত্র। স্বরূপে কালীই গৌরী, গৌরীই কালী। যিনি বিষ্ণু মায়া বৈষ্ণবী, তিনিই ব্রহ্মাণী সরস্বতী, তিনিই শিবানী কালী। ধ্যানে বিরত হয়ে বহির্দৃষ্টিতে তিনি সামনে পতিকেই দেখলেন। পতির কাছে তিনি গৌরবর্ণ প্রার্থনা করলেন, আরও প্রার্থনা করলেন—তিনিই যেন একমাত্র হরপ্রিয়া হতে পাবেন। শঙ্কর 'তথাস্তু' বলে কালীকে আকাশগঙ্গায় স্নান করালেন। নিমেষে কালী হলেন সুবর্ণবর্ণা গৌরাঙ্গী। পদ্মরাগ প্রতিম অঙ্গবর্ণ দেখে মহাদেবও আনন্দিত হয়ে বললেন, আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কোন নারীকে মনে মনেও গ্রহণ করব না— 'মনসাপি গ্রহীষ্যামি নান্যাং সত্যং ব্রবীমি তে' শুধু তাই নয়, তিনি গৌরীকে নিজ দেহার্ধে স্থান দিলেন। হরগৌরীর এই মিলিত মূর্তিই 'অর্ধনারীশ্বর' মূর্তি। এই মূর্তিতে পতিব্রতাগ্রগণ্যা উমা হলেন পতির দেহার্ধভাগিনী।

কথায় বলা হয়, স্ত্রী স্বামীর সহধর্মিণী, স্ত্রী স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী। তপোবনে এবং পতিপ্রাণতা বলে সত্য সত্য স্বামীর দেহার্ধ ভাগ লাভ করার সৌভাগ্য একমাত্র উমাই অর্জন করেছেন। পতিনিষ্ঠ হয়ে ভারতীয় নারী কত বেশী স্বাধীন ভর্তৃকার অধিকার লাভ করতে পারে, হিমালয়ের পার্বতী তার একক দৃষ্টান্ত। মহাদেব ঠিকই বলেছিলেন, তপশ্চরণে, চরিত্র মর্যাদায় ও গুণে তোমার সমান কেউ নেই— 'তপসা ত্বৎসমো নাস্তি শীলেন চ গুণেন চ।'

অর্ধ নারীশ্বর মূর্তি তন্ত্রতত্ত্বের দিক থেকেও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এ যেন শক্তিবিশিষ্ট শিবতত্ত্বের অদ্বৈত রূপ, যেখানে শিব শক্তি একীভূত হয়ে 'সামরস্যাত্মা'। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে উমা ও মহেশ্বর দ্বৈতরূপেই অবস্থিত। সেখানে শিবের বাম ঊরুতে উপবিষ্টা ও পতির বামবাহু দ্বারা আলিঙ্গিতা হয়েই পার্বতীর অবস্থান। হরপার্বতীর এই কল্যাণসুন্দর মূর্তিই শিল্পী-ভাস্করের প্রেরণা হয়ে উঠেছে।

নিখিল তন্ত্রশাস্ত্রও প্রবর্তিত হয়েছে উমা মহেশ্বরের এই অবস্থান থেকে। আগম শব্দের ব্যুৎপত্তি হল— 'আগতং শিব বক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজাশ্রুতৌ। শুধু তন্ত্র কেন, যাবতীয় মন্ত্র, ব্রত, সদাচারের পূর্বপক্ষ পার্বতী। পতিপ্রাণা পার্বতীর জিজ্ঞাসার উত্তরেই প্রিয়তমার কাছে সকল বিদ্যার রহস্য প্রকাশ করেছেন মহাদেব। সেবা দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে স্বামীকে একান্তভাবে বশ করে এদেশের নারী সর্বজ্ঞ স্বামীর সাহচর্যে কেমন করে সর্ববিদ্যায় পারদর্শিনী হয়ে ওঠেন, তারও সুন্দর দৃষ্টান্ত হৈমবতী পার্বতী।

এই রূপেই পার্বতী হয়ে উঠেছিলেন সর্ববিদ্যা, সর্বসিদ্ধির আকর। 'সিদ্ধিদাত্রী' নবদুর্গার নবম ও শেষ নাম। পাতিব্রত্য বলেই পার্বতী সিদ্ধিদাত্রী হয়েছিলেন— 'মোক্ষদাশ্চ মুমুক্ষূণাং কামদাশ্চ

শিব ও পার্বতী, জনক ও জননীর আদিতম

ফলার্থিনঃ' (দেবী· ভাগ)। শ্রীমদ্‌ভাগবতে বলা হয়েছে, দাম্পত্য প্রেমভিলাষী সতী উমার অর্চনা করবে— 'দাম্পত্যার্থং উমাংসতীম'। বাণরাজার কন্যা পার্বতীর কাছে প্রার্থনা করেই অনিরুদ্ধকে মনোমত পতিরূপে লাভ করেছিলেন (হরিবংশ)। শুধু পার্থিব কামনা নয়, পার্বতী ব্রহ্মবিদ্যাও প্রদান করেন। কেনোপনিষদের বহু শোভমানা উমা হৈমবতী ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী।

হিমালয়ের পার্বতীর লীলায় গার্হস্থ্য রূপটিই মুখ্য। শেষাংশ হিন্দু পাতিব্রত্যের একক আদর্শ। নারীর জীবনে পাতিব্রত্যের পূর্ণতাই সর্বার্থসাধক। পাতিব্রত্যই সংজাম্পত্য, পাতিব্রত্যই শুদ্ধ প্রেমচর্যার ভূমি, পাতিব্রত্যেই জননীত্বের প্রতিষ্ঠা। পার্বতীর জীবনে এগুলি তো পরিস্ফুট হয়েছেই, উপরন্তু তিনিই দেখিয়েছেন, পাতিব্রত্যই দেবত্ব—পতিব্রতাই মহাশক্তি।

পুরোন বাংলা সাহিত্যেও পার্বতীর ঘরোয়া রূপটি প্রধান স্থান অধিকার করেছে। তবে পুরাণ থেকে বাংলার পরিবেশনা স্বতন্ত্র। পুরাণে পার্বতীর গৃহস্থালীর বর্ণনায় কোথাও অভাব-দারিদ্র্যের কথা বলা হয়নি। বঙ্গের কবিরা হর-পার্বতীর এই অভাবের চিত্রের উপরই গুরুত্ব দিয়েছেন। অভাবের সংসারে হর-গৃহিণী পার্বতী অভাবের তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এমন কি স্বামী পুত্রদের অন্ন দিতে গিয়ে তাঁকে এমন কথাও বলতে হয়েছে— 'প্রথমে যে পাতে দিব তাই ঘরে নাই' (কবিকঙ্কন)। স্বামী তাঁর এতই গরীব যে গৌরীর হাতে একজোড়া 'বাইশঙ্খ'ও দিতে পারেন না। বঙ্গের সামাজিক পরিবেশে স্থাপন করার ফলে হরগৌরী অতি সাধারণ নরনারীর পর্যায়ে নেমে এসেছেন। বঙ্গের মেনকা, হিমরাজ শিব, পার্বতী হাড়ে হাড়ে বাঙালী। শিব বেকার, নেশাখোর। উপরন্তু কামলম্পট। এই স্বামীকে সামলাতে পার্বতীকে অস্থির হয়ে উঠতে হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে পার্বতীর প্রেমিকারূপ একেবারেই আচ্ছন্ন। তবে বাংলার শাক্তগীতিতে কন্যারূপিণী উমা সকলের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। বাংলার আগমনী ও বিজয়া গান মা মেনকা ও কন্যা উমার স্নিগ্ধ মধুর সম্পর্ক দিয়েই গড়া। বাংলার কবিরা, উমাই যে সর্বশক্তি মহেশ্বরী, একথা ভোলেননি—

প্রসাদ ভণে, মুনিগণে যোগধ্যানে যাঁরে না পায়।
তুমি গিরি ধন্য! হেন কন্যা পেয়েছ কি পুণ্য উদয়॥

এই প্রসঙ্গে দেবী দুর্গার 'কাত্যায়নী' নামটি বিচার্য। কাত্যায়নী প্রকৃতপক্ষে মহিষমর্দিনী দুর্গা। মহিষাসুরের বিক্রমে দেবলোক পর্যুদস্ত হলে, সকল দেবতার ক্রোধে ও তেজে জ্বলন্ত পর্বতের ন্যায় দিগন্তব্যাপী এক সংহত তেজের সৃষ্টি হয়। বামন পুরাণের মতে, হিমালয়বাসী কাত্যায়ন ঋষি এই তেজকে 'উপাকৃত' করে একটি নারীমূর্তির আকার দেন। কারণ, মহিষাসুরকে ব্রহ্মা বর দিয়েছিলেন, সে দেবাসুর-দানবের অবধ্য হলেই 'স্ত্রীবধ্য' হবে। কাত্যায়ন ঋষির নামে দেবীর নাম হয় 'কাত্যায়নী'। তিনি বিন্ধ্যপর্বতে গিয়ে মহিষাসুরকে সসৈন্যে নিহত করেন।

বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও ঐতিহাসিক বিচারের পা ধরে গবেষক পণ্ডিতগণ বলেন, হিমালয়ের উমা ও কাত্যায়নী দুর্গা স্বতন্ত্র। একটির নন্দিনী মূর্তি, অপরটির ভয়ঙ্কর দৈত্যদলনী 'যুদ্ধং দেহি' মূর্তি। জাতি ও প্রকৃতির দিক থেকে উমা ও কাত্যায়নী ভিন্ন উৎস-সম্ভব। পরবর্তীকালে জোর করে এ দুটিকে মিলানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

যুক্তির দিক থেকে এ মতকে অগ্রাহ্য করা যায় না তবে উমা হৈমবতীর কাহিনী খুব প্রাচীন। পরমা শক্তি ব্রহ্মবিদ্যা রূপে তাঁর প্রতিষ্ঠাও স্মরণাতীত কালের। পরাশক্তি স্বরূপে নিত্যা, অক্ষরা, অব্যাকৃতা হলেও তিনিই আবার যুগে যুগে বিভিন্ন মনুর অধিকার এবং কল্পে কল্পে দেবগণের কার্যসিদ্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবির্ভূতা হন। চণ্ডী সপ্তশতীতেও এ কথা বলা হয়েছে। হয়ত এইভাবেই কাত্যায়নী দুর্গা হিমালয়ের পার্বতীর সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছেন।

হৈমবতী পার্বতীর সঙ্গে কাত্যায়নী দুর্গার যোগ দূরান্বয়ী হলেও একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। সকল দেবতার যে তেজ সংহত হয়ে নারী মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল, তাতে শম্ভুর 'ভ্রুকুটি কুটিল' ক্রোধের অংশ মুখ্য। 'শাম্ভব' তেজ দিয়েই দেবীর মুখখানি গড়া হয়েছিল। ত্রিশূলধারী মহাদেব তাঁর শূল থেকে দেবীকে শূলাস্ত্র প্রদান করেছিলেন। সেই ত্রিশূলেই মহিষাসুর নিহত হয়েছিল। হিমরাজ তাঁকে বাহন সিংহ দিয়েছিলেন। এই সিংহে আরূঢ়া হয়েই তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। বামন পুরাণের মতে, মহিষাসুরকে বধ করে দেবতাদের বর দিয়ে দেবী হরপাদমূলেই প্রবেশ করেছিলেন— 'হরপাদমূলে প্রবিবেশ'।

পার্বতীর ভিতর যে রুদ্রী শক্তি নিহিত ছিল, তাঁর দেহ থেকে কৌশিকীর নির্গম তার প্রমাণ বহন করে। কৌশিকী কালরাত্রি। শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধে তাঁরই ললাট ফলক থেকে দংষ্ট্রাকরালবদনা কালী নির্গতা হয়েছিলেন। তিনি চামুণ্ডা নামেও বিখ্যাত।

বস্তুত শক্তি একদিকে রুদ্রী, অপর দিকে সৌম্যা। যিনি দানবদলনী অক্ষমা, তিনিই আবার শান্তিরূপিনী ক্ষমা। একই প্রকৃতি কখনও ঝটিকা প্লাবনে ভূমিকম্পে ভয়ঙ্করী, কখনও বসন্তের স্নিগ্ধ মাধুর্যে ও শারদশ্রীর শোভায় হৃদয়-আহ্লাদকারিনী। পুরাণে ও তন্ত্রে এ দুটি রূপকে কখনই পৃথক মনে করা হয়নি। চণ্ডীতেও দেখা যায়, দেবীর দেহ থেকেই ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী প্রভৃতি শক্তি পৃথক ভাবে প্রকাশ পেয়েছিলেন, আবার দেবীর ইচ্ছাতে দেবী-দেহেই বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে দেবীই বলেছিলেন,

'একৈ বাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমপরং' দেবী ভাগবতও বলেন, একই অভিনেতা যেমন রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন, তেমনই একই শক্তি নানারূপে লীলা করেন— 'নানারূপা ত্বেকরূপা জায়তে কার্য গৌরবাৎ।'

বঙ্গদেশের সাধক কবিরা শক্তির এই ঐক্য-তত্ত্বকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। শুধু সাধক কবি কেন, এদেশের জনসাধারণের দৃষ্টিতেও দুর্গা ও উমা এক। বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব। এই উৎসবের পূজ্য মূর্তি সপরিবার মহিষমর্দিনী দুর্গা বা কাত্যায়নী। কিন্তু সকলেই ভাবেন, ইনি মেনানন্দকরী উমার মতই আমাদের ঘরের মেয়ে। পতিগৃহ থেকে মেয়ে ঘরে এলে যেমন আনন্দ উৎসবের সাড়া পড়ে যায়, দুর্গাপূজায় বাংলার ঘরে ঘরে সেই সাড়াই জাগে। কবিরা উমার আগমনী গানে মুখর হয়ে ওঠেন— 'যাও যাও গিরি আন সে উমায়।' মায়েরা দুর্গাপূজা উপলক্ষে যে বরণডালা সাজান, সেটি পতিগৃহ থেকে পিতৃগৃহে আগত কন্যাকে বরণ করে নেওয়ার মঙ্গলডালা। বিজয়া হল কন্যা বিদায়ের অশ্রু দিয়ে গড়া বাঙালী মায়ের অশ্রুমালা —'রতন ভবন মোর আজি হৈল অন্ধকার' (কমলাকান্ত)। সাত সকালে পান্ত ভাত খাইয়ে, মেয়ের কপালে সিন্দুর পরিয়ে, মুখে মিষ্টি ও পান দিয়ে, আবার এস ('পুনরাগমনায়চ') বলে চিবুক চুম্বক করে মায়েরা দুর্গাকে বিদায় দেন। তাঁদের দৃষ্টিতে পার্বতী ও মহিষমর্দিনী দুর্গা এক হয়ে যান।

হিমালয়ের পার্বতীর ভিতর নন্দিনী গৃহচারিণীর রূপটি প্রধান হলেও, যেহেতু তিনিই মহাশক্তি, সেজন্য শক্তির অন্যান্য রূপগুলিও তাঁর সঙ্গে অবিনাভাবে যুক্ত। ইতিহাসের বিচারমূলক দৃষ্টিতে রূপগুলি ভিন্ন ভিন্ন মনে হলেও, পারমার্থিক তত্ত্ব ও ভক্তি ভালবাসার দৃষ্টিতে মহাশক্তি একা ও অভিন্না।

[illegible] এলিফ্যান্টা ভাস্কর্য

মুদ্রায় বিচিত্রিতা মহাদেবী

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মুদ্রা বা টাকার প্রচলন হয়েছিল বাণিজ্যে বা জিনিসপত্র আদান-প্রদানের ব্যাপারে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারের জন্য। মুদ্রাগুলিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের (অর্থাৎ রাজার বা সরকারের বা ধনী ব্যবসায়ীর বা ব্যবসায়ী শ্রেণীর বা স্থানীয় প্রশাসনের) পরিচয় বহনকারী প্রতীক, চিহ্ন বা লেখ উৎকীর্ণ হত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের আরাধ্য বা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে পরিচিত দেবদেবীর প্রতিমূর্তিও মুদ্রার শোভা বাড়াত। অনেক সময় যে ছাঁচ (die বা mould) মুদ্রা তৈরীর জন্য ব্যবহার করা হবে, তাতে ক্ষুদ্রাকারে ও উল্টাভাবে উৎকীর্ণ করা হত কোনও পরিচিত মূর্তির রূপকে। ফলে ঐ ছাঁচে প্রস্তুত মুদ্রায় সোজাভাবে প্রস্ফুটিত চিত্রটিতে লক্ষ করা যায় আসল মূর্তিটির ভাস্কর্যগত কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য। এই ধরণের উদাহরণ প্রাচীন মুদ্রা ও ভাস্কর্য শৈলীর মধ্যে একটা সম্পর্কের ইঙ্গিত করে। [১] সুতরাং প্রাচীনকালের মুদ্রাগুলি অনেক সময় আমাদের কেবলমাত্র বিভিন্ন প্রশাসকের ও তাঁদের অধীনস্থ দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কথাই জানায় না, বিভিন্ন প্রদেশের ধর্মবিশ্বাস, মূর্তিতত্ত্ব এবং নান্দনিক শৈলী সম্পর্কেও নানারূপ তথ্য পরিবেশন করে। [২]

প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রায় যে সকল দেবীর প্রতিরূপ লক্ষ করা যায়, তাঁদের মধ্যে শ্রী বা লক্ষ্মীর প্রাধান্য সর্বাধিক। তবে মুদ্রায় শিবের শক্তি মহাদেবীর উপস্থিতিও উপেক্ষণীয় নয়।

এই সম্পর্কে প্রাচীন পঞ্চাল বা উত্তর পঞ্চালের (যার রাজধানী ছিল অহিচ্ছত্রা বা বর্তমান উত্তর-প্রদেশের বেরিলী জেলার রামনগরে) এক শাসকের মুদ্রার উল্লেখ করা যেতে পারে। ভদ্রঘোষ নামে পরিচিত এই ব্যক্তি খ্রীষ্টপূর্ব বা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করেছিলেন বলে মনে করা যায়। [৩] ভদ্রঘোষের এক শ্রেণীর মুদ্রায় জনৈকা দেবীকে দেখা যায় পদ্মের উপরে দাঁড়িয়ে থাকতে। তাঁর বাঁহাত কোমরে, ডান হাতে ধরা পদ্মের মৃণাল। [৪] পঞ্চালের নৃপতিদের নামের সঙ্গে তাঁদের মুদ্রায় উপস্থিত দেবদেবীদের নামের বা তাঁদের ইঙ্গিত বহনকারী চিহ্নের মিলের কথা স্মরণ করে (অর্থাৎ অগ্নিমিত্রের মুদ্রায় অগ্নিদেব, রুদ্রগুপ্তের মুদ্রায় রুদ্রের ত্রিশূল, সূর্যমিত্রের মুদ্রায় সূর্য, প্রভৃতির কথা ভেবে) [৫] ভদ্রঘোষের মুদ্রায় উৎকীর্ণ নারীমূর্তিকে ভদ্রা বা সুভদ্রা বলে শনাক্ত করা যেতে পারে। [৬] ভদ্রা দুর্গার এক নাম। অন্য আর এক নাম সুভদ্রা। [৭] এক বিশ্বাস অনুযায়ী দুর্গা কৃষ্ণের এক সম্পর্কে বোন। [৮] কৃষ্ণ ও

মুদ্রা বা টাকার সঙ্গে শুধু বাণিজ্যের সম্পর্ক নয়। প্রাচীন মুদ্রায় খুঁজে পাওয়া যায় দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে। মুদ্রায় শুধু রাজার মুখ, কি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পরিচয়বহনকারী প্রতীক চিহ্ন বা লেখই উৎকীর্ণ হত না, আঁকা হত শাসকের আরাধ্য বা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের পরিচিত দেবদেবীর প্রতিমূর্তি। মুদ্রার বিচার তুলে ধরে ইতিহাসের আর এক অধ্যায়।

চিত্র নং ১। শক-পহ্লব যুগের একটি স্বর্ণমুদ্রা, বা পদক বা অভিজ্ঞানের উপরে উৎকীর্ণ বৃষ ও পুষ্কলাবতীর দেবী অম্বার প্রতিরূপ

বলদেবের বোন সুভদ্রা বা একানংশার দুই বাহু বিশিষ্ট রূপের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে বৃহৎসংহিতায় ও বিষ্ণুধর্মোত্তরে তা থেকে জানা যায় যে এই দুই দেবের মধ্যস্থিত একানংশা দেবী, ভদ্রঘোষের মুদ্রায় উপস্থিত দেবীর মত বাঁহাত রেখেছেন কোমরে এবং ডান হাতে ধরে আছেন পদ্ম (অর্থাৎ পদ্মের মৃণাল)। [৯] সুতরাং ভদ্রঘোষের মুদ্রায় আমরা সুভদ্রা বা দুর্গা একানংশার এক প্রতিরূপ দেখতে পাচ্ছি বলে মনে করতে পারি। [১০]

অবশ্য এ কথা মানতে হবে যে "ভদ্রা" নামটি শ্রী বা লক্ষ্মীর প্রতিও প্রযোজ্য হতে পারে। ভদ্রঘোষের আরাধ্যা দেবী লক্ষ্মীর ন্যায় পদ্মালয়া। এই দিক থেকে দেখতে গেলে তাঁকে "শ্রী" রূপে চিহ্নিত করাও অন্যায় নয়। [১১]

॥ ২ ॥

এই ধরনের সন্দেহ নেই খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর একটি স্বর্ণমুদ্রা বা পদক বা অভিজ্ঞানের উপরে উৎকীর্ণ এক দেবী মূর্তির পরিচয়ের ক্ষেত্রে। এই দেবীরও বাঁহাত কোমরে ও ডান হাতে ধরা আছে পদ্মের মৃণাল। উপরন্তু মাথায় মুকুট। দুই পাশে খরোষ্ঠী (বা খরোষ্টী) লিপিতে উৎকীর্ণ লেখ "পখলবদি দেবত অম্প এ" [১২]। চিত্র ১ এই লেখটি অম্প বা অম্ব বা অম্বাকে গন্ধারের অন্তর্গত পুষ্কলাবতী নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে চিহ্নিত করছে। [১৩] মুদ্রা, পদক বা অভিজ্ঞানটির অন্যদিকে দাঁড়িয়ে আছে একটি বৃষ। উপরে গ্রীক অক্ষরে লেখা লেখ Tauros এবং নীচে খরোষ্ঠী (বা খরোষ্টী) লিপিতে উৎকীর্ণ লেখ "উষভে" দুটি কথারই অর্থ "বৃষ"। বৃষ কেবল শিবেরই বাহন নয়, পশুরূপী শিবও বটে। [১৪] সুতরাং শিবের শক্তি অম্পা বা অম্বা [১৫] খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে পুষ্কলাবতীর দেবী নামে পরিচিতা ছিলেন এবং তাঁর প্রতিমূর্তির এক হাতে থাকত পদ্ম।

কোমরে বাঁহাত ও ডান হাতে পদ্ম নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দেবীকে দেখা যায় খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদের রাজা প্রথম অজ (Azes)-এর এক শ্রেণীর মুদ্রার মুখ্যদিকে। গৌণদিকে বৃষের অর্থাৎ শিবের বাহন বা পশুরূপী শিবের আবির্ভাব [১৬] চিত্র ২ দেবীকে শিবের শক্তি অম্বারূপে চিহ্নিত করে। প্রায় একই ধরনের চিত্র (অর্থাৎ একদিকে একই ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে দেবী ও অন্যদিকে বৃষ) দেখা যায় প্রথম অজের আর এক শ্রেণীর মুদ্রায়। তবে এখানে দেবীর পাশে একটি সিংহের সম্মুখভাগ দৃশ্যমান। [১৭] চিত্র ৩

এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতে মনে হয় যে

চিত্র নং ৫ । কুষাণরাজ হুবিষ্কর মুদ্রায় ওএষো ও ওম্মো (= অম্বা)

পুষ্কলাবতীর দেবী ও শিবের শক্তি অম্বা বা দুর্গার সঙ্গে সিংহের যোগাযোগ ঘটেছিল খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী নাগাদ। এই সময় ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে বিশেষভাবে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপন করেছিল পশ্চিম এশিয়া—যেখানে অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন মাতৃদেবীর সঙ্গে পশুরাজের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে ছিলেন সুমেরীয় নিনলিল (নিনহুরসাগ), ফ্রিজীয় ও লিডীয় (সুতরাং পশ্চিম এশীয়) কুবিলি (কুবেলি ?) বা সিবিলি, আসুরীয় ইষতার, গ্রীসীয় রিয়া ও অ্যাথিনা, ব্যাবিলোনীয় ননা এবং পারসীক অনাহিত। [১৮] এই দেবীরা নিজ নিজ ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা মাতৃদেবীরূপে পূজিত হতেন। ভক্তরা এদের অধিকাংশের রণনিপুণতার খ্যাতির কথাও জানতেন। বিভিন্ন জাতিভুক্ত ঐসব ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের ফলে এই সব দেবীরা পরস্পরের নিকটবর্তী এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে একে অন্য থেকে অভিন্নরূপে পরিচিত হন। এই একীকরণ সম্ভবপর হয়েছিল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বহু পূর্বেই। কুবেলি, ইষতার ও ননার সঙ্গী সিংহ, রিয়া ও পরে অ্যাথিনার সহচরে পরিণত হয়। [১৯]

সিংহ ছিল এই দেবীদের বাহন বা সহচর।

চিত্র নং ১৫ । গুপ্তবংশীয় প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর নামাঙ্কিত মুদ্রায় সিংহবাহিনী মহাদেবী

চিত্র নং ১৬ । দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রায় সিংহবাহিনী মহাদেবী

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পার্গামনে (বর্তমান তুর্কীর অন্তর্গত) নির্মিত বেদীর গায়ে উৎকীর্ণ দেবাসুরের যুদ্ধ কাহিনীতে সিংহকে দেখান হয়েছে দেবীর সঙ্গী হিসাবে। [২০] কখন কখন এই দেবীরা সিংহবাহিত রথেও ভ্রমণ করতেন বলে মনে করা হত। আফগানিস্তানের আই-খানুমে প্রাপ্ত খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর একটি রৌপ্য ফলকে কুবেলিকে দেখান হয়েছে দুটি সিংহবাহিত রথে দাঁড়ান অবস্থায়। [২১] চিত্র ৪

এই সব অভারতীয় মাতৃদেবীদের ধ্যান-ধারণার পক্ষে অম্বা বা দুর্গা সম্পর্কিত ভাবনাকে প্রভাবিত করা মোটেই আশ্চর্যজনক ছিল না। এইরকমই যে ঘটেছিল তার প্রমাণ

চিত্র নং ২ । শক-পহ্লব নৃপতি প্রথম অজের (Azes-এর) মুদ্রায় মহাদেবী

চিত্র নং ৩ । অজের আর একটি মুদ্রায় মহাদেবী, তাঁর ডান দিকে সিংহ

মেলে আনুমানিক দ্বিতীয় শতকের প্রথম ভাগের কুষাণ নৃপতি হুবিষ্কের দুই শ্রেণীর মুদ্রার তুলনামূলক আলোচনায়। প্রথম শ্রেণীর মুদ্রার গৌণদিকে একটি পদ্ম ও শিঙা আকারের একটি প্রাচুর্যের দ্যোতক পাত্র হাতে এক দেবী এবং তাঁর পাশে এক পুরুষ দেবতা। উৎকীর্ণ দুটি লেখর একটির মতে দেবী হচ্ছেন ওম্মো (ommo) (অম্মা <অম্বা বা উমা ?) [২২] এবং দেবতাটি হচ্ছেন ওএষো (oesho) (বেষ<বিষ (বিস)<বৃষ=শিব)। [২৩] চিত্র ৫ দ্বিতীয় শ্রেণীর মুদ্রাগুলির গৌণদিকে চিত্র ও লেখ প্রথম শ্রেণীরই প্রায় অনুরূপ। কেবল দেবীর পাশে উৎকীর্ণ লেখটি হচ্ছে "ননা" ("ওম্মো" নয়)। [২৪] চিত্র ৬

এখানে ওম্মো বা অম্বা (দুর্গা) থেকে ননা অভিন্না। ননা ও অম্বার হাতে প্রাচুর্যের দ্যোতক শিঙারূপী পাত্র এদের ঐশ্বর্যের দেবী বলেও ইঙ্গিত করছে। হেলেনীয় সভ্যতা আশ্রিত সংস্কৃতি ও শিল্পের প্রভাবাধীন গন্ধারে নগরলক্ষ্মী রূপে কল্পিত অম্বার হাতে এসেছিল গ্রীক লক্ষ্মী টুখে (tuche>tyche)-এর আয়ুধ Keras Amal theias। [২৫] অনেক হেলেনীয়রা বিশ্বাস করত যে

চিত্র নং ৪ । আফগানিস্তানের আই-খানুমে প্রাপ্ত রৌপ্য ফলকে কুবেলির চিত্র—দেবী সিংহবাহিত রথে দাঁড়িয়ে আছেন

আমালথিয়া নামের এক ছাগের শিঙা থেকে তার মালিক যা চাইবে, তাই পাবে। কাজেই Keras Amal theias প্রাচুর্যের দ্যোতক এক পাত্র।

যেমন টুখের সম্পর্কিত ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া অম্বা বা দুর্গার পক্ষে সম্ভবপর, তেমনি তাঁর সঙ্গে ননার একীকরণের আশ্চর্যের কিছু নেই। ভারতীয় উপমহাদেশের নিকটবর্তী মধ্য এশিয়ায় ননার জনপ্রিয়তা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল দেবীর সঙ্গে সিংহের সম্পর্ক স্থাপনের সময়। এর এক ইঙ্গিত পাওয়া যায় oxus বা বক্ষুর নিকটবর্তী খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের এক রাজ্যের শক বা ইউয়েচ-চি শাসক সাপাদবিজেস-এর রৌপ্য মুদ্রায়। এই শ্রেণীর মুদ্রায় উৎকীর্ণ সিংহের দুই পাশে গ্রীক লেখ Nanaia[২৬] চিত্র ৭ কুষাণযুগে ননার জনপ্রিয়তার প্রমাণ বিভিন্ন মুদ্রায় ও নাম মুদ্রায় (seal-এ) তাঁর "ননাশাও" কথাটি উৎকীর্ণ থাকলেও তাঁকে আমরা ননা-অম্বার প্রতিমূর্তি বলে মনে করতে পারি।

॥ ৩ ॥

এই সিংহবাহিনী দেবীকে দেখা যায় গুপ্তবংশের রাজা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁর মহিষী কুমারদেবীর নামাঙ্কিত স্বর্ণ মুদ্রার গৌণদিকে। তাঁর পা পদ্মের উপর। এক হাতে ঐশ্বর্য বা সৌভাগ্যের চিহ্ন (মণি-মুক্তা খচিত) ফিতা, যদিও অন্য হাতে ননার দণ্ডের পরিবর্তে প্রাচুর্যের দ্যোতক পাত্র।[৩১] চিত্র ১৪ অবশ্য ফিতা ছাড়াও এই পাত্রের উপস্থিতি ননা=অম্বার সঙ্গে আরডখষর বা ঐশ্বর্যের দেবীর যোগ নিবিড় করে তুলেছে। আলোচ্য গুপ্ত মুদ্রাগুলিতে দেবীর পাশে উৎকীর্ণ

চিত্র নং ১২। তৃতীয় কনিষ্কর মুদ্রায় আরডখষ

চিত্র নং ১৫। এক ভারতবাসী গ্রীক (Indo-Greek) রাজার মুদ্রায় প্রাচুর্যের দ্যোতক পাত্র হাতে টুখে

চিত্র নং ১৪। এক কুষাণ মুদ্রায় প্রাচুর্যের দ্যোতক পাত্র হাতে আরডখষ

চিত্র নং ৯। কুষাণ যুগের এক নামমুদ্রায় ননা

চিত্র নং ৬। হুবিষ্কর আর একটি মুদ্রায় ওএশো ও ননা

চিত্র নং ৮। কুষাণ মুদ্রায় ননা

চিত্র নং ১০। কুষাণ রাজ তৃতীয় কনিষ্কর মুদ্রায় ননা

চিত্র নং ৭। শক বা ইউয়েচ-চি শাসক সপাদবিজেসের মুদ্রায় ননার সঙ্গী সিংহ

চিত্র নং ১১। এক আসাকীয় রাজার মুদ্রায় তাঁকে দেখা যাচ্ছে টুখের কাছ থেকে সৌভাগ্যসূচক ফিতা গ্রহণ করতে

প্রতিমূর্তির আবির্ভাব।[২৭] চিত্র ৬,৯
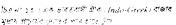
ননার এই সব প্রতিমূর্তির অনেকগুলি সিংহের উপরে আসীন।[২৮] এদের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হল তৃতীয় কনিষ্কের মুদ্রার গৌণ দিকে ননার প্রতিমূর্তি। এখানে সিংহের উপরে আসীন ননার এক হাতে একটি দণ্ড অন্য হাতে (মণি-মুক্তা খচিত) ফিতা।[২৯] চিত্র ১০ যা ঐশ্বর্যের দুই দেবী গ্রীক টুখে ও ইরানীয় আরডখষ (আরডখষো)-এর অনেক প্রতিমূর্তির হাতে দেখা যায়।[৩০] চিত্র ১১,১২ টুখে ও আরডখষর প্রতিমূর্তির হাতে অনেক সময়ে থাকে প্রাচুর্যের দ্যোতক পাত্র।[৩০] চিত্র ১৫—১৪ এটির সঙ্গে ননা এবং অম্বার সম্পর্কের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

শক-পহ্লব ও কুষাণ আমলের মুদ্রারাজি থেকে মনে হয় যে মাতৃদেবী অম্বা বা দুর্গা সিংহবাহিনী ও ঐশ্বর্যের দেবীরূপে সুপরিচিত হয়েছিলেন। কুষাণ যুগের মহিষমর্দিনী মূর্তিগুলি দেবীর অশুভশক্তি নাশের ক্ষমতার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়।[৩২] এই সময়ে তাঁর সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণার বিবর্তনের সঙ্গে ননার যোগ অনস্বীকার্য। তাই তৃতীয় কনিষ্কের মুদ্রায় পদ্মের (?) উপরে পা রেখে সিংহের উপরে সৌভাগ্যসূচক ফিতা হাতে আসীন দেবীকে যখন দেখি, তখন তাঁর পাশে
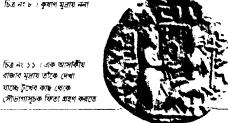
লেখ "লিচ্ছবয়ঃ"। এই লেখর সঙ্গে দেবীর প্রতিমূর্তির যদি যোগ থেকে থাকে (যা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না) তাহলে তাঁকে আমরা লিচ্ছবিদের রক্ষাকর্ত্রীরূপে কল্পনা করতে পারি।

মাতৃদেবী এবং শক্তি ও ঐশ্বর্যের দেবী সিংহবাহিনী অম্বা বা দুর্গার বিভিন্ন আয়ুধের ভারতীয়করণ হয় গুপ্তযুগে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের গজলক্ষ্মী সম্পর্কিত দুটি ধারণার অপূর্ব সমন্বয় হয়েছে এখানে।[৩৮]

কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন যে প্রথম কুমারগুপ্তের "সিংহনিধনকারী" শ্রেণীর কিছু মুদ্রায় উৎকীর্ণ সিংহবাহিনী দেবীর এক হাতে পদ্ম থাকলেও, অন্য হাতে মুণ্ডমালা।[৩৯] এই অনুমান সত্য হলে মহাদেবীর ঘোরভাবের বা অসুরঘাতিনীরূপের এক ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যায়।[৪০]

গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের মত গুপ্তযুগের মুদ্রায় মহাদেবীর প্রতিরূপগুলির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাসের সমাবেশ ও সমন্বয় দেখা যায়। গুপ্তমুদ্রায় উৎকীর্ণ বিভিন্ন মূর্তির মত মহাদেবীর প্রতিমূর্তিগুলির মধ্যেও লক্ষ করা যায় ঐ কালের ভাস্কর্যশৈলীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য, যেমন দেহের বিচিত্র ভঙ্গিমা ও গতিময়তার ইঙ্গিত, অঙ্গসৌষ্ঠব, সাবলীল রেখাচিত্রণ, প্রভৃতি।[৪১] এখানে মুদ্রার পটভূমিকায় দেখতে পাই মহাদেবী ভাবনার ও গুপ্ত শিল্পের বিকাশ।

॥ ৪ ॥

মুদ্রায় দেবদেবীর সংখ্যা ও রূপভেদ গুপ্ত ও গুপ্তপূর্ব যুগের তুলনায় গুপ্তোত্তর কালে (আনুমানিক ৫৫০ অথবা ৫৭০-৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ) ও মধ্যযুগের আদিভাগে (আনুমানিক ৭৫০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দ) অনেক কমে গিয়েছিল, যদিও ভাস্কর্যে

চিত্র নং ১৯। কাশ্মীরের এক মুদ্রার একদিকে রাজা এবং অন্যদিকে সিংহবাহিনী দেবী

চিত্র নং ২৬। গাহড়বাল নৃপতি গোবিন্দচন্দ্রের মুদ্রায় শিবলিঙ্গসমেত মহাদেবী

চিত্র নং ১৭। প্রথম কুমারগুপ্তের মুদ্রায় সিংহবাহিনী মহাদেবী

"সিংহনিধনকারী" শ্রেণীর মুদ্রার এবং প্রথম কুমারগুপ্তের "সিংহনিধনকারী" ও "রাজা ও রানী" শ্রেণীর মুদ্রার গৌণদিকে দেবীকে দেখা যায় সিংহের উপরে নানারূপ মনোরম ভঙ্গিমায় আসীন। প্রাচুর্যের দ্যোতক পাত্রের বদলে মৃণালসহ পদ্ম এবং সৌভাগ্যের ফিতার স্থলে বোধ হয় পাশের ব্যবহার দেখা যায়। দেবী এ দুটিই বা এদের একটিকে হাতে ধরে আছেন। (চিত্র ১৬, ১৭) দুটি আয়ুধই আবার বিভিন্ন শ্রেণীর গুপ্তমুদ্রার উপরে উৎকীর্ণ শ্রী বা লক্ষ্মীর প্রতিমূর্তির হাতে দৃশ্যমান। (চিত্র ১১) ঐশ্বর্যের দেবী শ্রীর সঙ্গে মহাদেবীর নিবিড় যোগ শিল্পের ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করেছে উত্তর-প্রদেশের এটা জেলায় বিলসড়ে আবিষ্কৃত এক স্তম্ভগাত্রে। (চিত্র ১৮) দেবীর ক্ষোদিত প্রতিরূপ সিংহের উপরে আসীন। এক হাতে পদ্মের মৃণাল। দেবীকে দুই পাশ থেকে অভিষিক্ত করছে দুটি হাতী। সিংহবাহিনী ও

এই বিষয়ে বৈচিত্র্য ছিল অন্তহীন। [৪২] অল্পসংখ্যক দেবদেবীর মধ্যেও রয়েছেন শিবের শক্তি।

হর্ষদেবের নামাঙ্কিত এক স্বর্ণমুদ্রার গৌণদিকে এক বৃষের (নন্দীর) উপরে বা পিছনে কোনও আসনের উপরে বসে রয়েছেন শিব ও তাঁর বাঁ পাশে পার্বতী [৪৩], যেমন দেখা যায় অনেক ভাস্কর্যের নমুনায়। হর্ষদেবকে ৭ম শতাব্দীর প্রথমভাগের পুষ্পভূতি বংশীয় রাজা হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য থেকে অভিন্ন বলে মনে করা হয়। [৪৪]

প্রবরসেন (খুব সম্ভবত দ্বিতীয় প্রবরসেন) নামাঙ্কিত কাশ্মীরের এক শ্রেণীর স্বর্ণমুদ্রায় সিংহবাহিনী দেবীর বাঁ হাতে পদ্ম এবং তাঁর পিছনে সপুষ্প ঘট। [৪৫] চিত্র ১৯ এখানে মাঙ্গলিক (পূর্ণ)ঘট দেবীকে উর্বরতাদাত্রী ঐশ্বর্যময়ী ও মঙ্গলময়ীরূপে ইঙ্গিত করছে। দেবীর পূজা ভক্তদের ঐশ্বর্য ও মঙ্গলের সূচক হবে বলে মনে করা হত। [৪৬]

চার, ছয় বা আট হাত বিশিষ্ট এক দেবী দাঁড়িয়ে আছেন প্রাচীন সমতটে (অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লা ও নোয়াখালি অঞ্চলে) ৭ম-৮ম শতাব্দীতে প্রচলিত এক শ্রেণীর স্বর্ণমুদ্রায়। [৪৭] অবশ্য এই দেবী শিবের শক্তি মহাদেবী কিনা সে সম্পর্কে কোনও স্থির সিদ্ধান্ত নেবার মত প্রমাণ আমাদের নেই।

অম্বা বা দুর্গার সঙ্গে যোগের অনেক বেশী সম্ভাবনা ডাহলের (বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের এক অংশের) কলচুরি নৃপতি গাঙ্গেয়দেব (আনুমানিক ১০১৯-১০৪২ খ্রীষ্টাব্দ) কর্তৃক প্রচলিত এক মুদ্রাচিত্রের বা মুদ্রাছাপের (coin-type-এর) সঙ্গে। [৪৮] চিত্র ২০ এই রাজার নামাঙ্কিত উৎকৃষ্টমানের স্বর্ণমুদ্রাগুলিতে এক দেবীর রূপ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এটা সম্ভবপর হয়েছিল সম্ভবত এই সব মুদ্রাগুলির ছাঁচ (die) তৈরীর ও তার উপরে মুদ্রা-চিত্রটির উল্টারূপ (negative impression) উৎকীর্ণ করার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পারদর্শিতা, ভাল মানের ধাতুর ব্যবহার এবং মুদ্রা তৈরীর প্রকৌশলের সুষ্ঠু প্রয়োগের ফলে। [৪৯]

চিত্র নং ২২ । গুপ্তযুগের এক ভাস্কর্যে গঙ্গাদেবী

আলোচ্য মুদ্রাগুলির উপরে এক চার-হাত বিশিষ্ট দেবী হাঁটু মুড়ে বসে আছেন সামনের দিকে তাকিয়ে। তাঁর বাঁ পা ডান পায়ের সামনে (বা তার উপরে) রাখা আছে। উপরের দুই হাতে পদ্মের মৃণাল, নীচের দুই হাত জানুর উপরে ন্যস্ত। দেবীর গায়ে নানা অলঙ্কার ও প্রায় স্বচ্ছ পরিধান। মাথার পিছনে প্রভামণ্ডলের চিহ্ন।

সুষম অঙ্গবিন্যাস, দেহরেখা চিত্রণে সাবলীলতা ও আপাতদৃষ্টিতে দেহের কমনীয়তা এই প্রতিমূর্তির মধ্যে এনেছে গুপ্তশৈলীর কিছু বৈশিষ্ট্য। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই ; কারণ মধ্যপ্রদেশে গাঙ্গেয়দেবের রাজ্যের সম্ভাব্য সীমানার মধ্যেই গুপ্তশৈলীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মধ্যযুগের আদিভাগের কিছু ভাস্কর্য পাওয়া গেছে। এই পর্যায়ের এক ভাস্কর্যে গঙ্গাদেবীর দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিমা ও তাঁর অঙ্গসৌষ্ঠব [৫০] চিত্র ২১ মধ্যপ্রদেশের বেশনগরে আবিষ্কৃত গুপ্তযুগের গঙ্গামূর্তির সঙ্গে তুলনীয়। মনে হয় কলচুরি বা হৈহয় রাজ্যের একাংশে গুপ্তশিল্পের রেশ মধ্যযুগের আদিভাগ অবধি রয়ে গিয়েছিল। [৫১] চিত্র ২২

গাঙ্গেয়দেবের মুদ্রায় উৎকীর্ণ নারীমূর্তির দু'হাতেই পদ্মের মৃণাল। সুতরাং এটিকে শ্রী বা লক্ষ্মীর প্রতিরূপ বলে ধরে নিতে আমরা আগ্রহী হতে পারি। বসার ভঙ্গীর ব্যাপারেও এই প্রতিরূপ বিভিন্ন গুপ্ত মুদ্রায় উৎকীর্ণ দুই হাতের শ্রীমূর্তির সঙ্গে তুলনীয়।

অবশ্য এই বিষয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্ত নেবার আগে গাঙ্গেয়দেবের পুত্র ও উত্তরাধিকারী কর্ণের নাম-মুদ্রার (seal-এর) উপরে উৎকীর্ণ এক দেবীমূর্তি সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন।

চিত্র নং ২৩ : কলচুরি নৃপতি কর্ণদেবের নামমুদ্রায় মহাদেবী

চিত্র নং ২১ । মধ্যযুগের আদিভাগের এক ভাস্কর্যে গঙ্গাদেবী

চিত্র নং ২৪ : কছারের এক শ্রেণীর মুদ্রায় হর-গৌরী

চিত্র নং ২০। কলচুরি নৃপতি গাঙ্গেয়দেবের মুদ্রায় মহাদেবী এবং গুপ্ত মুদ্রায় লক্ষ্মী

এখানেও চার-হাতের এক দেবী হাঁটু মুড়ে বসে আছেন সামনের দিকে তাকিয়ে। দুই পাশ থেকে দুটি হাতী তাঁর অভিষেক করছে। দেবীর সামনে উপবিষ্ট শিবের বাহন বৃষ (নন্দী)।[৫১] চিত্র ২৩ এর উপস্থিতি দেবীকে শিবের শক্তি অম্বা বা দুর্গা বলে শনাক্ত করতে পারে। তবে তার ধারণার সঙ্গে মিশে রয়েছে শ্রী সম্পর্কিত বিশ্বাস।

বেশ কয়েকজন কলচুরি রাজার নামমুদ্রায় এই দেবীর উপস্থিতি [৫২] তাঁকে সংশ্লিষ্ট রাজ পরিবারমণ্ডলীর আরাধ্যা বলে চিহ্নিত করে। সুতরাং কলচুরি নৃপতি গাঙ্গেয়দেবের মুদ্রায় উপস্থিত দেবীর সঙ্গে তাঁর যোগ অস্বীকার করা যায় না।

গাঙ্গেয়দেব নামাঙ্কিত সকল মুদ্রাতেই এই দেবীর প্রতিমূর্তির শিল্পগত মান প্রশংসনীয় নয়। এই সকল মুদ্রায় ব্যবহৃত ধাতুতে স্বর্ণের পরিমাণ গাঙ্গেয়দেবের উপরোক্ত মুদ্রাগুলির তুলনায় বেশ কম। বেশ কিছু সংখ্যক মুদ্রা আবার রৌপ্য বা তাম্রের। অপকৃষ্ট মানের এই মুদ্রারাজি গাঙ্গেয়দেবের পরবর্তীকালে সরকারী এবং বেসরকারী টাঁকশালে তৈরী হয়ে থাকতে পারে। [৫৩] আলোচ্য মুদ্রা-চিত্রটি পরমার, গাহড়বাল, চন্দেল্ল, চাহমান, প্রভৃতি বিভিন্ন রাজবংশের মুদ্রায় ব্যবহৃত হয়েছে।[৫৪] চিত্র ২৪

এই বহুল ব্যবহার যেমন মুদ্রা চিত্রটির এবং বোধ হয় এতে উপস্থিত দেবীর জনপ্রিয়তার ইঙ্গিত করে, তেমনই তাঁর আসল পরিচয় আরও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়। এই জাতীয় অনেক মুদ্রায় দেবীর মাথায় ঘোমটা।[৫৫] চিত্র ২৫ কিছু মুদ্রায় দেবীর দেহের বাঁ দিকে যোনিপট্টসমেত লিঙ্গ অঙ্কিত।[৫৬] চিত্র ২৬ এখন এই দেবীকে শিবের শক্তি অম্বা বা দুর্গা বলে স্বীকার না করে উপায় নেই।

আলোচ্য মুদ্রা-চিত্র ও নামমুদ্রার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যে দেবীকে আমরা চিনতে পারি তিনি শিবের শক্তি ও মাতৃদেবী অম্বা এবং শ্রী সম্পর্কিত ধারণার সমন্বয়ের ফলস্বরূপা চতুর্ভূজা। লক্ষ্মীরূপী এবং শিবলিঙ্গভূষিতা এই দেবীকে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের এক শিল্পশাস্ত্রে মহালক্ষ্মী নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[৫৭] এই নাম দুর্গা ও লক্ষ্মী দুই দেবীর প্রতিই প্রযোজ্য।[৫৮]

সিংহবাহিনী দুর্গার আবির্ভাবও মধ্যযুগের আদিভাগের কিছু মুদ্রায় দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের হোয়সল বংশের দুই রাজা বিষ্ণুবর্ধন (আনুমানিক ১১০৮-১১৫২ খ্রীষ্টাব্দ) এবং প্রথম নরসিংহের (আনুমানিক ১১৫২-১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) কিছু মুদ্রায় দেবীকে দেখা যায় শঙ্খ ও চক্র হাতে নিয়ে সিংহের উপরে বসে আছেন।[৫৯] বেলুড়ের কপ্পেচেন্নিগরয় মন্দিরস্থিত একটি অপরূপ মহাদেবীমূর্তি হোয়সল রাজ্যে তাঁর সম্পর্কিত ধর্মবিশ্বাসের জনপ্রিয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[৬০]

॥ ৫ ॥

প্রধানত বিভিন্ন মুসলমান রাজবংশের দ্বারা শাসিত মধ্যযুগে বা মধ্যযুগের মধ্য ও শেষ ভাগে (আনুমানিক ১২০০-১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) নানা কারণে মুদ্রার প্রচলন বাড়লেও মুদ্রা-চিত্র হিসাবে দেবদেবীর প্রতিমূর্তির ব্যবহার ভীষণভাবে কমে গিয়েছিল। তবু ঐ যুগের বিভিন্ন হিন্দু রাজা ও কিছু মুসলমান নৃপতির মুদ্রায় দেবদেবীদের সন্ধান পাওয়া যায়। এদের মধ্যে দুর্গাও আছেন।

দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর রাজ্যের নৃপতি দ্বিতীয় হরিহর, প্রথম ও দ্বিতীয় দেবরায়, কৃষ্ণদেবরায়, সদাশিবরায়ের বিভিন্ন মুদ্রার শোভা বাড়িয়েছেন মহেশ্বর (=শিব) ও তাঁর বাঁপাশে বাঁ জানুর উপরে বসা উমা (=পার্বতী=দুর্গা)।[৬১] মহীশূর রাজ্যে ওড়েয়ার বংশের স্বাধীন রাজা চিক্কদেবরাজের (১৬৭৩-১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ) এক শ্রেণীর মুদ্রায় দেখা যায় চামুণ্ডার এক প্রতিরূপ।[৬২]

পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রত্নমাণিক্যের কিছু সংখ্যক মুদ্রায় সিংহের সঙ্গে উৎকীর্ণ লেখতে দুর্গার উল্লেখ আছে।[৬৩] এখানে দুর্গার বাহন তাঁর প্রতিনিধি বা প্রতীক।[৬৪] বিজয়মাণিক্যের এক মুদ্রা-চিত্রের বিষয় খুব সম্ভবত শিবের অর্ধনারীশ্বর রূপ[৬৫] (শিব ও দুর্গার দেহের সমন্বয়ে গঠিত বলে কল্পিত)।[৬৬] এই মুদ্রাচিত্রে অর্ধনারীশ্বরের ডান দিকে দুই হাত (অর্থাৎ চতুর্ভুজ শিবের ডানদিকের দুই হাত)। দেহের ডান দিকের জানু ও পা বৃষের উপরে ন্যস্ত। দুর্গারূপী বাম অংশে পাঁচ হাত (অর্থাৎ দশভূজা দেবীর বাঁ দিকের পাঁচ হাত)। দেহের বাম অংশের জানু ও পা সিংহের উপরে

চিত্র নং ২১। ত্রিপুরার এক রাজার মুদ্রায় অর্ধনারীশ্বর

স্থাপিত।[৬৭] চিত্র ২৭ হর ও গৌরীর দুটি আবক্ষ মূর্তি রেখাচিত্রের আকারে উৎকীর্ণ হয়েছে কচ্ছার রাজা ইন্দ্রবল্লভের এক স্বর্ণমুদ্রায়। চিত্র ২৮ রেখাচিত্র হলেও মুখের ডৌল সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। মূর্তি দুটি পরস্পর সংলগ্ন হলেও, অর্ধনারীশ্বর রূপ নেয়নি। এখানে হরের গলায় সাপ ; হর ও গৌরীর মাথার মাঝখানের খালি জায়গাতে আঁকা আছে ত্রিশূল।[৬৮]

ভারতে ইংরেজ শাসন কায়েম হবার প্রথম পর্বে কোনও কোনও স্বাধীন রাজ্যের মুদ্রায় এবং ইংরেজ শাসনকালের কিছু করদ রাজ্যের মুদ্রাতেও দেবীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রথম পর্যায়ভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মুদ্রার মধ্যে মহীশূর রাজ্যের মুদ্রারাজি উল্লেখযোগ্য। হায়দার আলীর এক শ্রেণীর স্বর্ণমুদ্রায় মহেশ্বর ও উমার উপস্থিতি স্থানীয় হিন্দুদের ধর্মমত সম্পর্কে তাঁর সহিষ্ণুতার প্রমাণ বহন করে।[৬৯]

ইংরেজদের অধীনস্থ মহীশূর রাজ্যের ওডেয়ার রাজাদের কিছু সংখ্যক মুদ্রাতে মহেশ্বর ও উমাকে দেখা যায়।[৭০] অনেক মুদ্রাতে উপস্থিত দুর্গার বাহন সিংহের পাশে উৎকীর্ণ লেখতে চামুণ্ডীর (=চামুণ্ডার) উল্লেখ আছে।[৭১] চামুণ্ডেশ্বরীর মন্দির মহীশূরের এক বিখ্যাত দেবালয়।[৭২] অন্যান্য করদ রাজ্যের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের পুদুকোট্টাই অঞ্চলের মুদ্রায় উৎকীর্ণ ব্রহদম্বার (পার্বতীর) উপবিষ্টা প্রতিমূর্তি স্মরণীয়।[৭৩]

॥ ৬ ॥

আর বেশী উদাহরণ না দিয়েও বলা যেতে পারে যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের মুদ্রাচিত্রের বিষয়বস্তু হিসাবে মহাদেবীর নানারূপ প্রতিমূর্তির ব্যবহার অনস্বীকার্য। এই সব প্রতিরূপ মহাদেবীর সম্পর্কে নানা ধারণার উৎপত্তি, বিবর্তন ও সমন্বয় এবং

চিত্র নং ২৪। গাঙ্গেয়দেবের নামাঙ্কিত দুটি মুদ্রায় মহাদেবী

চিত্র নং ২৫। চন্দেল্লবংশের বিভিন্ন মুদ্রায় ঘোমটা মাথায় মহাদেবী

বিভিন্ন অঞ্চলে এই দেবী সংক্রান্ত ধর্মবিশ্বাসের জনপ্রিয়তার ইঙ্গিত করে। দুর্গা ভাবনার গতি ও প্রকৃতির সাক্ষী হিসাবে সংশ্লিষ্ট আকর গ্রন্থাবলী (শিল্পশাস্ত্র সমেত) ভাস্কর্য ও চিত্ররাজির মতই বিভিন্ন শ্রেণীর মুদ্রার গুরুত্ব অসাধারণ। শিবের শক্তি মহাদেবীর বিচিত্র রূপের বৈচিত্র্যে ভারতীয় মুদ্রা সুচিত্রিত।[৭৪]

টীকা

১। বি এন মুখার্জী, ***এ প্রি ফর স্টাডি অফ আর্ট ইন কয়নেজ***, বারাণসী, ১৯৮৩, পৃঃ ২ ইত্যাদি ; ৩৮ ইত্যাদি।

২। জে এন ব্যানার্জী, ***ডেভেলপমেন্ট অফ হিন্দু আইকনোগ্রাফি***, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৫৬, (নীচে **ডি এইচ আই** রূপে চিহ্নিত), পৃঃ ১০৮ ইত্যাদি ; বি এন মুখার্জী, ***আর্ট ইন গুপ্ত এণ্ড পোস্ট-গুপ্ত কয়নেজেস অফ নর্দার্ন ইণ্ডিয়া***, লখনউ, ১৯৮৫, (নীচে **এ জি পি সি এন আই** রূপে চিহ্নিত), পৃঃ ২২ ; ইত্যাদি।

৩। ভদ্রঘোষের শাসনকালের সঠিক তারিখ জানা যায় না। তবে প্রথম শতাব্দীর শেষে বা দ্বিতীয় শতাব্দীর গোড়ায় অহিচ্ছত্রা অঞ্চলে কুষাণ শাসন প্রতিষ্ঠার কিছু আগে তিনি রাজত্ব করেছিলেন বলে মনে করা যেতে পারে। এই সম্পর্কে বি এন মুখার্জী, ***দি ডিসিন্টিগ্রেশন অফ দি কুষাণ এম্পায়ার***, বারাণসী, ১৯৭১, পৃঃ ১১ ; কে এম শ্রীমালী, ***হিস্ট্রী অফ পঞ্চাল***, খণ্ড নং ১, নিউ দিল্লী, ১৯৮৩, পৃঃ ১১৬ ; ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

৪। কে এম শ্রীমালী, ***উপরোক্ত গ্রন্থ***, খণ্ড নং ২, নিউ দিল্লী, ১৯৮৫, পৃঃ ৬১।

৫। জে অ্যালান, ***এ ক্যাটালগ অফ দি ইণ্ডিয়ান কয়েনস ইন দি ব্রিটিশ ম্যুজিয়াম, ক্যাটালগ অফ দি কয়েনস অফ এনসেণ্ট ইণ্ডিয়া***, লণ্ডন, ১৯৩৬, পৃঃ ১১৭ ও ১৯২ ইত্যাদি ; **ডি এইচ আই**, পৃঃ ১১৫।

৬। ও পি সিং, ***রিলিজিয়ান এণ্ড আইকনোগ্রাফি অন আর্লি ইণ্ডিয়ান কয়েনস***, বারাণসী, ১৯৭৮, পৃঃ ২৩।

৭। এম মনিয়র-উইলিয়মস, ***এ সংস্কৃত-ইংলিশ ডিক্সনারী***, পুনর্মুদ্রণ, অক্সফোর্ড, ১৯৫৩, পৃঃ ৭৪৬ ও ১২২৯।

৮। ***মহাভারতের দুর্গাস্তোত্র ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ*** (৯১, ৩৭), ইত্যাদি দ্রষ্টব্য ; **ডি এইচ আই**, পৃঃ ৫০২—৫০৩।

৯। ***বৃহৎ সংহিতা***, ৫৭, ৩৭-৩৯ ; ***বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ***, তৃতীয় ভাগ, ৮৫, ৭০-৭২।

১০। **ডি এইচ আই**, পৃঃ ১৩৩।

১১। **ঐ**, ও পি সিং, ***উপরোক্ত গ্রন্থ***, পৃঃ ২৩। অবশ্য মহাভারতের এক অংশে ভদ্রা, বৈশ্রবণের স্ত্রী এবং লক্ষ্মী থেকে পৃথক বলে বর্ণিত হয়েছেন (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত ***মহাভারত***, আদিপর্ব, ১৯২, ৬১। তবে এখানে ধনপতি বৈশ্রবণ বা কুবেরের স্ত্রী ভদ্রা ধনের দেবী এবং সেই হিসাবে ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে তুলনীয়া।

১২। বি এন মুখার্জী, ***নানা অন লায়ন—এ স্টাডি ইন কুষাণ ন্যুমিসম্যাটিক আর্ট***, কলিকাতা, ১৯৬৯, (নীচে **এন এল** রূপে চিহ্নিত) পৃঃ ৭২—৭৩, চিত্রপত্র, ৫, নং ১৭।

১৩। **ঐ** পৃঃ ৭৩।

১৪। **ঐ** ; **ডি এইচ আই**, পৃঃ ১১২-১১৩ ; এম মনিয়র - উইলিয়মস, ***উপরোক্ত গ্রন্থ***, পৃঃ ১০১২।

১৫। এম মনিয়র-উইলিয়মস, ***উপরোক্ত গ্রন্থ***, পৃঃ ৮৩ ; ***তৈত্তিরীয় আরণ্যক*** (১০, ১৮) অনুযায়ী পশুপতি (অর্থাৎ শিব) অম্বিকার পতি। "অম্বিকা" ও "অম্বা" এই দুটি কথারই অর্থ হল "মাতা"।

১৬। **এন এল**, চিত্রপত্র, ৫, নং ১৫।

১৭। **ঐ**, চিত্রপত্র, ৫, নং ১৬, পৃঃ ১৪, **ডি এইচ আই**, পৃঃ ১৩৫।

১৮। এই সকল দেবীর ইতিহাসের আকরসমূহ ও তাঁদের উপর আলোচনা প্রসঙ্গে জে হেস্টিংস, (সম্পাদক), ***এনসাইক্লোপেডিয়া অফ রিলিজিয়ন এণ্ড এথিকস*** (এডিনবার্গ ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৫২-৫৫, নীচে **ই আর ই** চিহ্নিত) গ্রন্থমালার খণ্ড নং ১ (পৃঃ ৭২, ১৪৭, ৪১৫ ও ৭৯৭), খণ্ড নং ৪ (পৃঃ ৩৭৭), খণ্ড নং ৬ (পৃঃ ৩৮১), খণ্ড নং ৭ (পৃঃ ১১৬ ও ৪২৮—৪৩৪), খণ্ড নং ৮ (পৃঃ ৮৪৭—৮৪৯), খণ্ড নং ১২ (পৃঃ ৬৯৫) এবং খণ্ড নং ১৪ (পৃঃ ১৭৭-১৭৮) এবং **এন এল** গ্রন্থের পৃঃ ১২—১৮ দ্রষ্টব্য।

১৯। উপরের টীকা নং ১৮ ; বি এন মুখার্জী, "ফরেন এলিমেণ্টস ইন আইকনোগ্রাফি অফ মহিষাসুরমর্দিনী—দি ওয়ার গডেস অফ ইণ্ডিয়া", **জেড ডি এম জি**, ক্রোড়পত্র নং ৬, স্টুটগার্ট, ১৯৮৫, পৃঃ ৪০৪, ইত্যাদি ; ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, "মহিষাসুরমর্দিনীর সন্ধানে", **দেশ**, পূজাসংখ্যা, ১৯৮৩, পৃঃ ১৪।

২০। **দেশ**, পূজাসংখ্যা, ১৯৮৩, পৃঃ ১৮, চিত্র নং ১৬ ; পৃঃ ১৪ ও ২৩, টীকা নং ৩৫-৩৯।

২১। এইচ পি ফ্র্যাংক ফোর্ট, ***ফুইএ দাইখানুম***, খণ্ড নং ৩, পারিস ১৯৮৪, পৃঃ ৩, ইত্যাদি ; চিত্রপত্র, ৪১।

২২। **এন এল**, চিত্রপত্র, ৫, নং ১৮।

২৩। ***পাইঅ সদ্দ মহাণ্ণবো*** (প্রাকৃত গ্রন্থ পরিষদ প্রকাশিত), বারাণসী, ১৯৬৩, পৃঃ ৮০৩। ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে ধরনের প্রাকৃত প্রচলিত ছিল, তাতে দন্ত্য স, মূর্ধন্য ষ ও তালব্য শ-এর ব্যবহার ছিল।

২৪। **এন এল**, চিত্রপত্র, ৫, নং ২০ ; **ডি এইচ আই**, পৃঃ ১৩৬।

২৫। **এন এল**, পৃঃ ১৫, পৃঃ ২৫, টীকা নং ৭৯—৮৩ ; এইচ জি লিডল এবং আর স্কট, ***এ গ্রীক-ইংলিশ লেক্সিকন***, পুনর্মুদ্রণ, অক্সফোর্ড, ১৯৬১, পৃঃ ৭৬। পৌসানিয়সের মতে টুখের হাতে শোভা পেত keras Amaltheias (***পেরিগেসিস টেস হেল্লাডস***, ৪, ৩০)। গ্রীক শস্য দেবী ডিমিটারকে এক ধরনের লক্ষ্মী বলে ধরে নেওয়া যায়। ডিমিটারের প্রতিমূর্তির হাতেও প্রাচুর্যের দ্যোতক শিঙারূপী পাত্র থাকতে পারে (এস কারি ও অন্যান্যরা, ***দি অক্সফোর্ড ক্লাসিক্যাল ডিক্সনারী***, পুনর্মুদ্রণ, অক্সফোর্ড, ১৯৫৩, পৃঃ ২৬৩ ; **এন এল**, পৃঃ ১১৪, চিত্রপত্র, ৬, নং ২১)।

২৬। **এন এল**, পৃঃ ১১০ ; চিত্রপত্র, ৪, নং ৮।

২৭। **ঐ**, পৃঃ ১১০-১১১ ; চিত্রপত্র, ৪, নং ৯—১১।

২৮। **ঐ**, পৃঃ ১০ ; চিত্রপত্র, ১, নং ১।

২৯। **ঐ**, পৃঃ ১৭ ; বি এন মুখার্জী, ***কুষাণ কয়েনস অফ দি ল্যাণ্ড অফ ফাইভ রিভারস***, চিত্রপত্র, ২৬। অনেক প্রাচীন মুদ্রায় গ্রীক দেবী টুখেকে দেখা যায় রাজাকে এই ধরনের মাথায় বাঁধবার মূল্যবান ফিতা উপহার দিচ্ছেন। তাঁর অন্য হাতে প্রাচুর্যের দ্যোতক পাত্র (ডব্লু, রথ, ***ক্যাটালগ অফ দি কয়েনস অফ পার্থিয়া***, লণ্ডন, ১৯০৩, চিত্রপত্র, ৪, নং ১ ; চিত্রপত্র, ২৬, নং ১২ ; ইত্যাদি)। সৌভাগ্যের এই দুটি চিহ্ন গ্রীক দেবী টুখের (বা ডিমিটারের) কাছ থেকে পেয়েছিলেন ইরানীয় আরডখষ।

চিত্র নং ১৮। উত্তরপ্রদেশের বিলসড়ে প্রাপ্ত এক স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ মহাদেবীর প্রতিরূপ

৩০ । উপরের টীকা নং ২৯ দ্রষ্টব্য ।

৩১ । **দেশ**, পূজাসংখ্যা, ১৯৮৩, পৃঃ ১২, ইত্যাদি ।

৩২ । এ এস আলটেকার, **কয়নেজ অফ দি গুপ্ত এম্পায়ার**, বারানসী, ১৯৫৭, চিত্রপত্র, ১, নং ১১, ইত্যাদি ।

৩৩ । **ঐ**, চিত্রপত্র, ৬, নং ১, ইত্যাদি ।

৩৪ । **ঐ**, চিত্রপত্র, ১২, নং ১, ইত্যাদি ; চিত্রপত্র, ১৪, নং ৪ ।

৩৫ । গুপ্তোত্তর যুগে পাশ মহাদেবীর, চণ্ডী, কাত্যায়নী, প্রভৃতি রূপের এক বিশিষ্ট আয়ুধ হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল (**অগ্নিপুরাণ**, ৫০, ১—৬ ; **মৎস্যপুরাণ**, ২৬০, ৫৫—৭০ ; ইত্যাদি) ।

৩৬ । এ এস আলটেকার, **উপরোক্ত গ্রন্থ**, চিত্রপত্র, ৩, নং ৫ ; চিত্রপত্র ৯, নং ১০, ইত্যাদি ।

৩৭ । **এন এল**, পৃঃ ১৮-১৯ ও ১১৪ ; চিত্রপত্র, ৭, নং ২৪ ।

৩৮ । গুপ্তোত্তর যুগেও সিংহবাহিনী গজলক্ষ্মীর মূর্তি প্রস্তুতের প্রমাণ আছে । খাজুরাহোতে মধ্যযুগের আদিভাগে ক্ষোদিত এইরূপ দুটি মূর্তির কথা আমরা জানি (ও পি সিং **উপরোক্ত গ্রন্থ**, পৃঃ ২৬)।

৩৯ । এ এস আলটেকার, **উপরোক্ত গ্রন্থ**, পৃঃ ১৯০ ; চিত্রপত্র ৬২, নং ৯ ও ১০ ।

৪০ । **মার্কণ্ডেয় পুরাণে** বলা হয়েছে যে মহাদেবী থেকে উদ্ভূত কালী চণ্ড ও মুণ্ড নামে দুটি অসুরকে ধরে তাদের মাথা কেটে ফেলেছিলেন এবং তাদের মাথা দুটি মহাদেবীর কাছে নিয়ে এসেছিলেন । এই কারণে কালী চামুণ্ডা নামে খ্যাত (**মার্কণ্ডেয় পুরাণ**, ৮৭, ২২—২৫) । চামুণ্ডা দুর্গার একরূপ । মাতৃকারূপে চামুণ্ডার গলায় মুণ্ডমালা এবং এক হাতে ছিন্নমস্তক (**ডি এইচ আই**, পৃঃ ৫৩৭) ।

৪১ । **এ জি পি সি এন আই**, পৃঃ ২০, ইত্যাদি ।

৪২ । **ঐ**, পৃঃ ৬৪-৬৭ ।

৪৩ । **ঐ**, পৃঃ ৩৮ ; চিত্রপত্র, ১১, নং ৮ ।

৪৪ । **ঐ**, কে ডি বাজপেয়ী, **ইণ্ডিয়ান ন্যুমিসম্যাটিক স্টাডিজ**, নিউ দিল্লী, ১৯৭১, পৃঃ ১৫৫ ।

৪৫ । সি কানিংহাম, **কয়েনস অফ মিডিভ্যাল ইণ্ডিয়া**, লণ্ডন, ১৮৯৪, চিত্রপত্র ৩, নং ৩ ; এল গোপাল, **আর্লি মিডিভ্যাল কয়েন-টাইপস অফ নর্দান ইণ্ডিয়া**, বারাণসী, ১৯৬১, পৃঃ ৫৭ ।

৪৬ । এই সম্পর্কে **মার্কণ্ডেয় পুরাণ**, ৯২, ১২-১৩ দ্রষ্টব্য ।

৪৭ । **দেশ**, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৮২, পৃঃ ১৭ ।

৪৮ । **এ জি পি জি সি এন আই**, পৃঃ ৪৪ ; চিত্রপত্র ৪৪, নং ১—৪ ।

৪৯ । **ঐ**, পৃঃ ৪৫-৪৬ ।

৫০ । **ঐ** ; এস কে সরস্বতী, **এ সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ান স্কাল্পচার**, দ্বিতীয় সংস্করণ, নিউ দিল্লী, ১৯৭৫, পৃঃ ১৯৫ ।

৫১ । **এ জি পি সি এন আই**, পৃঃ ৪৪-৪৫ ; চিত্রপত্র ১৯, নং ৫ । দেবী ও বৃষের মাঝখানে "শ্রীমদ-কর্ণদেবঃ" এই লেখ উৎকীর্ণ আছে ।

৫২ । ভি ভি মিরাশী, **কর্পাস ইনসক্রিপসিও নুম ইণ্ডিকারুম**, খণ্ড নং ৪, **ইনসক্রিপসনস্ অফ দি কলচুরি-চেদি এরা**, উটাকামণ্ড, ১৯৫৫, প্রথমভাগ, চিত্রপত্র ৫২ ; দ্বিতীয়ভাগ, চিত্রপত্র ৭৪, ৭৭ ; ইত্যাদি ।

৫৩ । **এ জি পি জি সি এন আই**, পৃঃ ৪৭—৪৯ ।

৫৪ । এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য **এ জি পি জি সি এন আই**, পৃঃ ৪৯—৫৪ ।

৫৫ । **ঐ**, পৃঃ ৪৬ ; চিত্রপত্র ২৭, নং ১৪ ; চিত্রপত্র ২৯, নং ৪ । শিল্প শৈলীর দিক থেকে বিচার করলে মনে হতে পারে যে দেবীর প্রভামণ্ডলকেই রেখার টানে হেরফের করে অবগুণ্ঠন বা ঘোমটায় পরিণত করা হয়েছিল । গাঙ্গেয়দেবের কিছু ভাল মানের স্বর্ণমুদ্রাতেও ঘোমটার আবির্ভাব বোধহয় লক্ষ করা যায় (ঐ, চিত্রপত্র ২৩, নং ১৫)।

৫৬ । **ঐ**, পৃঃ ৫১ ; চিত্রপত্র ৩১, নং ১৩ ; চিত্রপত্র ৪৭, নং ১ ।

৫৭ । **বিশ্বকর্মশাস্ত্র** ; টি এ গোপীনাথ রাও, **এলিমেন্টস অফ হিন্দু আইকনোগ্রাফি**, খণ্ড নং ১, ভাগ ২, মাদ্রাজ, ১৯১৪, পৃঃ ১৩৬ ।

৫৮ । এম মনিয়র উইলিয়মস, **উপরোক্ত গ্রন্থ**, পৃঃ ৮০০ ।

৫৯ । বি চট্টোপাধ্যায়, **কয়েনস অ্যাণ্ড কারেন্সী সিসটেমস ইন সাউথ ইণ্ডিয়া, এ ডি ২২৫—১৩০০**, নিউ দিল্লী, ১৯৭৭, পৃঃ ২৮০-২৮১ ; চিত্রপত্র ৭, নং ৩৩৭-৩৩৮ ; বি এন মুখার্জী, **এ প্লী ফর দি স্টাডি অফ আর্ট ইন কয়নেজ**, পৃঃ ৩৩ ।

৬০ । **আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ মাইশোর, অ্যানুয়াল রিপোর্ট**, ১৯২৯, পৃঃ ২৪ ।

৬১ । এ ভি নরসিংহমূর্তি, **দি কয়েনস অফ কর্ণাটক**, মহীশূর, ১৯৭৫, পৃঃ ১৪৯, ১৫২, ১৫৯, ১৬৪ ও ১৬৭ ।

৬২ । **ঐ**, পৃঃ ২৩৭ ।

৬৩ । রমণীমোহন শর্মা, **কয়নেজ অফ ত্রিপুরা**, বারানসী, ১৯৮০, পৃঃ ১৩ ইত্যাদি ।

৬৪ । প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের অনেক অঞ্চলের ও শ্রেণীর মুদ্রা-চিত্রের বিষয় "সিংহ" । কিন্তু পশুরাজের উপস্থিতি সর্বক্ষেত্রেই দুর্গাকে ইঙ্গিত করবে একথা ভাবার কারণ নেই ।

৬৫ । **দি জার্নাল অফ দি ন্যুমিসম্যাটিক সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া**, ১৯৬৭, খণ্ড নং ২৯, পৃঃ ৭৬ ; চিত্রপত্র ৬, নং ১ ।

৬৬ । **ডি এইচ আই**, পৃঃ ৫৫২—৫৫৪ ।

৬৭ । টীকা নং ৬৫ দ্রষ্টব্য । ত্রিপুরা, অহোম, কোচবিহার, কছার, প্রভৃতি রাজ্যের মুদ্রায় উৎকীর্ণ লেখতে মহাদেবীর (তাঁর দুর্গা, গৌরী, চণ্ডী, রণচণ্ডী প্রভৃতি রূপের) প্রতি সংশ্লিষ্ট নৃপতির ভক্তির উল্লেখ আছে ।

৬৮ । **জার্নাল অফ এনসেণ্ট ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রী**, ১৯৭১-৭২, খণ্ড নং ৫, পৃঃ ২০৯, চিত্রপত্র ৭, নং ৬ ।

৬৯ । এ ভি নরসিংহমূর্তি, **উপরোক্ত গ্রন্থ**, পৃঃ ২১৮ । হায়দর আলীর পুত্র টিপুর মুদ্রারাজিও বৈচিত্র্যে ভরা ।

৭০ । **ঐ**, পৃঃ ২৩৮, ইত্যাদি ।

৭১ । **ঐ**, পৃঃ ২৪২, ইত্যাদি ।

৭২ । কে আর বাসবরাজ, **হিস্ট্রী অ্যাণ্ড কালচার অফ কর্ণাটক**, ধারোয়াড়, ১৯৮৪, পৃঃ ২১৯ ।

৭৩ । জে অ্যালান, **ক্যাটালগ অফ দি কয়েনস ইন দি ইণ্ডিয়ান মুজিয়াম**, খণ্ড নং ৪, ক্যালকাটা, অক্সফোর্ড, ১৯২৮, পৃঃ ১৪৮ ।

৭৪ । প্রাচীন মুদ্রায় দেবদেবীর প্রতিরূপ সম্পর্কে আলোচনার জন্য **ডি এইচ আই**, পৃঃ ১০৮, ইত্যাদি দ্রষ্টব্য । **শেষ**

মাজ়া নাম

রাজা চলো মৃগয়ায়

আনন্দ বাগচী

আপনার কেয়ো-কার্পিন চুল এই সুন্দর নতুন স্টাইলে বাঁধুন। চমৎকার দেখাবে!

কেয়ো-কার্পিনের এই স্টাইলে কী ভাবে চুল বাঁধবেন দেখুন।

একটি বড় সোনালী রঙের ফিতে নিন। একটি বড় সূঁচে পরান। মাথার সামনে থেকে চুল আঁচড়ে একগুছি চুল মাথার ঠিক উপরে শক্ত করে ধরুন। ফিতে দিয়ে গেরো বাঁধুন। দু'ধারে যেন সমান ফিতে ছাড়া থাকে।

গেরো থেকে এক ইঞ্চি দূরে আবার আধ ইঞ্চি মতন মোটা গুছি চুল নিন। সূঁচটি গুছির চারধারে গোল করে ঘুরিয়ে এনে ফিতের মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে টানুন।

উপরোক্তভাবে মাথার দু'ধারে চুলের গুছি "সেলাই" হয়ে গেলে শেষ গুছির কাছে ফিতেটিতে ভালো করে দুটি গেরো বাঁধুন। এবার বাড়তি ফিতে কেটে ফেলুন।

ফিতের ডগা দুটি চুলের ভিতর গুঁজে ভালো করে পিন দিয়ে আটকে দিন।

চুলের সর্বাঙ্গীন যত্নের জন্যে প্রতিদিন ব্যবহার করুন মৃদু সুরভিত কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল।

চুলের পুষ্টি যোগাবে। চুল থাকবে সুন্দর, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল এবং পরিপাটি। অথচ তেলমাখা চটচটে ভাব একেবারেই থাকবে না। এবার আপনি ইচ্ছেমতো যে কোন স্টাইলে চুল বাঁধুন।

১০০ মি.লি. ও ৩০০ মি.লি. শিশিতে পাওয়া যায়।

কেয়ো-কার্পিন

সুগন্ধী হেয়ার অয়েল।
চুল চটচটে করে না।

সুস্থ চুল। সুন্দর চুল।
কেয়ো-কার্পিন চুল।

যাদের যত্নই আপনার আস্থা

CLARION C-DMHO-11

পঞ্চাশোর্ধ্বে বানপ্রস্থের প্রেসক্রিপশনটি যিনি উচ্ছেদ নোটিশ ধরিয়ে দেবার কায়দায় আমাদের হাতে গুঁজে দিয়েছিলেন সেদিন, সুখের বিষয় যৌবনের বনাভিসারে কোথাও তিনি বাগড়া দিয়ে যাননি।

বন সকলের, বন সব সময়ের, বনবিহারের জন্যে কোনো 'এজ বার' ছিল না সেদিন, আজও নেই। জাতিধর্ম নির্বিশেষে অরণ্যের অধিকার ছিল সকলের হাতের মুঠোয়। পদাধিকারী মাত্রেরই; সেখানে চতুষ্পদে আর দ্বিপদে কোন ফারাক হয়নি। এক অর্থে যদি নো ম্যানস ল্যান্ড অন্য অর্থে এভরি ম্যানস ল্যান্ড ছিল আদিভূমি বনভূমি। শুধু বন্যেরাই বনে সুন্দর, তা কেন, অন্যেরাও সেখানে সুন্দর মানিয়ে গিয়েছিল। কাঠুরে মধুকর ব্যাধ থেকে শুরু করে মুনি-ঋষি-সন্ন্যাসী সবাই। তবে লোকভেদে রুচিভেদ হবেই, নেশা পেশা তপস্যায় সে তারতম্য টের পাওয়া যায়। তাই বধ্যভূমি হয়ে উঠেছে তপোবন, অরণ্য হয়ে উঠেছে শরণাগতের আশ্রম।

রামায়ণ মহাভারতের পাতা ওল্টালে চোখ উল্টে যাবে অনেক বিচিত্র রকমের আরণ্যক উপাখ্যানে যারা আবার উপন্যাসকেও হার মানাবে। অরণ্যের পর্বে পর্বে ছড়িয়ে রয়েছে অলৌকিক জীবনকথা। কত তপ জপ সিদ্ধি স্খলন। এই নগ্ন নির্জনতা সব সময় নারীবর্জিত থেকেছে তাও নয়। আশ্রম বালিকাদের পেছনে ফেলে অপ্সর কিন্নর গন্ধর্ব কন্যারা ঘোরাফেরা করেছে। অজীন বল্কলের পাশাপাশি গেরুয়া ফেলানো মেড ইন-লোকালয় বস্ত্রখণ্ডও ছিল। ছিল বিলাস পাশে বিবেকহীন অস্তিত্ব। কৌপিন কাঁচুলির সহবাস, এ যুগে হলে খবরের কাগজের পাতার হেডলাইন হয়ে যেত।

বনগমনের আর একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম ছিল মৃগয়া। বলতে কী এই রাজকীয় উৎসবে অংশ নেননি, অরণ্য-অধ্যুষিত ভারতবর্ষে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। রাজা দশরথ, রাজা সুরথ, রাজা দুষ্মন্ত থেকে শুরু করে আরও অসংখ্য রাজারাজড়ার কাহিনী উপকাহিনী শাখাকাহিনীতে ভারতের বনপর্ব পল্লবিত হয়ে আছে। বহু পৌরাণিক ইতিহাস আর কিংবদন্তীর সূচনা হয়েছে মৃগয়া থেকে। বিস্ময়ে বিষাদে আনন্দে অভিশাপে মাখামাখি হয়ে আছে সেই সব উপাখ্যান। দশরথের হাতে সিন্ধুহত্যা না ঘটলে রামায়ণ অন্যরকম হত। শুধু এই একটি মাত্র নজির নয়, আরও অনেক অনেক সামান্য ঘটনাই বাঁক নিয়েছে অসামান্য উপসংহারে।

আসলে বন হচ্ছে আদিপ্রাণ বৃক্ষের চারণভূমি। প্রকৃতির প্রত্যক্ষ উপনিবেশ। যুগ যুগ ধরে উদ্ভিদের এই অমৃত-যাত্রায় তারই অনিবার্য অদৃশ্য প্ররোচনা নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। আদিম সভ্যতা অরণ্যের প্রাণ কেন্দ্রে সজাগ আছে এমন দুর্মর এক জীবনীশক্তি যাকে মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গেই শুধু তুলনা করা যায়। হাজার হাজার বছর ধরে নগরজীবন তাই ছুটে এসেছে এই বনজীবনের কাছে বিশল্যকরণীর সন্ধানে। প্রকৃতির নিবিড় অবগাহনে ধুয়ে মুছে গেছে দেহমনের গ্লানি। সব ক্ষত, সব ক্ষতি। লোকে লোকে ভিন্ন রুচি, জনে জনে ভিন্ন লক্ষ্য কিন্তু গন্তব্য এক। যন্ত্রসভ্যতার আখমাড়াই কলে নীরস ছিবড়ে হয়ে যাবার আগে সব মানুষের মনই হাহাকার করে বলে ওঠে: দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর। কিন্তু কে নেবে আর কে দেবে? অরণ্যে রোদন করে লাভ নেই অরণ্যের জন্যে। এখন পৃথিবী জুড়েই চলেছে অরণ্যের উচ্ছেদ, বন কেটে বসত। বন চলে আসছে শহরে জ্বালানি হয়ে, ফার্নিচার হয়ে, হোয়াইট প্রিন্ট নিউজ প্রিন্ট হয়ে। শহরের জীবনে বনের আত্মা আসছে চোলাই হয়ে। মানুষের রাজনীতি আর শিক্ষা সহবতে মিশেছে জংলী কানুন আর জঙ্গলের অন্ধকার। কিন্তু এখন বিলম্বে বুঝে গেছি সব। বুঝেছি, শুধু অরণ্য নয়, অরণ্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষও হয়ে গেছে ছিন্নমূল, উচ্ছন্ন। নগর পুড়িলে দেবালয় কী এড়ায়—একথা যেমন সত্যি তেমনি একথাও মিথ্যে নয় যে, অরণ্যে যখন কুঠার পড়ে তখন নিজের পায়েও কুড়ুল পড়তে দেরি হয় না মানুষের। আজ আমাদের সেই দশা, নাকের বদলে হাতে এসেছে যান্ত্রিক অবদান নরুণ। জীবন থেকে বন শব্দটা বাদ চলে গেছে কবে, কিন্তু বনভোজন রয়ে গেছে জীবনযাপনের যৌথকর্মে। বনের রাক্ষস যদি-বা আক্ষরিক অর্থে নির্বংশ হয়েছে কিন্তু বনলক্ষ্মী রয়ে গেছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের হাজিরা খাতায়।

সে রাম নেই সে অযোধ্যাও নেই। তার জন্যে হয়তো এখন দুঃখও নেই। সত্য ত্রেতা দ্বাপর হয়ে কলি যুগও এখন যাই যাই করছে। তবু রাজা আছে, মানে এই সেদিন ইস্তক ছিল, রিয়্যাল রাজা। রায় বাহাদুর মার্কা রাজা নয়। তার হাতিশাল ঘোড়াশাল টাকশাল রানীশাল ছিল। রাজমুকুট, সিংহাসন মায় রাজছত্র পর্যন্ত ছিল। আর ছিল রাজার মনে রেকারিং অশান্তি।

রুদ্র গ্রীষ্মের পর এসেছিল ক্রুদ্ধ বর্ষা। চরাচর নিশ্চল। জনজীবন অবরুদ্ধ। রাজপ্রাসাদের অলিন্দ বাতায়ন ধাঁধিয়ে দিয়েছে মুহুর্মুহু বিদ্যুতের ঝলক। আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু। কেকাধ্বনির সঙ্গে বেজে উঠেছে পাখোয়াজ। আকাশে মেঘের দোয়াত উপুড় করে দিয়ে বহু যুগের ওপার থেকে আসা বর্ষাও ফিরে গেছে কবে। আবার রোদ উঠেছে, রোদের রং এখন কাঁচা সোনা। সাদা মেঘে শিউলির গন্ধ। নৌকোয় পাল তুলে প্রবাসীরা একে একে ফিরে আসছে ঘরে। বাতাসে কাঁপছে আগমনীর সুর। মাটি পড়েছে প্রতিমার কাঠামোয়। নাম-না-জানা সিরসিরানি এসে দরজা ধাক্কাচ্ছে। সব কেমন বাহির অবস্থা।

কিন্তু ছন্দ কেটে গেছে এক জায়গায়। রাজার মনে শান্তি নেই।

ঘরকা মুরগী দাল বরাবর, তব রোজের রাজভোগও হয়ে গেছে পানসে পাঁপা। ঘুমিয়ে

আর হাই তুলে আর আঙুল মটকে অষ্টপ্রহরকে হরিমটর করা তো মুখের কথা নয়। ভোঁতা মুখে গোঁফ চুমড়েও রাজা কেমন ভোম মেরে গেছেন।

বহুকাল এদেশে কোন যুদ্ধ নেই, বিদ্রোহ নেই, অন্তর্ঘাত নেই। কলহ নেই, সমস্যা নেই, আর্জি নালিশ চুরিচামারি নিশ্চিহ্ন। কে যেন রুপোর কাঠি ছুঁইয়ে দিয়ে গেছে প্রজার ঘরে ঘরে। কেমন দমবন্ধ রামরাজত্বের অবস্থা। আমলা-শামলা মন্ত্রী-তন্ত্রী প্রায় বেকার, কোতোয়ালের নিজেরই কোতল হবার দশা, সেনাপতির তরোয়ালে মরচে, রাজা অচল। শুধু বন্দনাগান আর স্তুতিস্তাবকতায় তাঁর কান পচে গেছে। থেকে থেকে মনের মধ্যে আত্ম-জিজ্ঞাসার ধিক্কার উঠছে: এই গাদাগাদা গালভরা গুণবাচক বিশেষণের মালিকটা কে বটে হে? আমিই তো? এই আমি! যে আমির দিনরাত্তিরের সিংহভাগই কাটছে পালংকে আর পানীয়ে, বাকিটুকু দরবারী সিংহাসনে। খাজনার চেয়ে বাজনা নয়, বাজনার চেয়েই খাজনা বেশী হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। সংসার সংখ্যায় বেড়েছে। পাটরানী থেকে পার্টটাইম রানী, খাটরানী থেকে খাটো ডাঁটো নন গেজেটেড উপ-ছুপো রানীতে ছয়লাপ। অন্দর থেকে উদ্যান, **রংমহল** থেকে ঢংমহল পা ফেলার গা ফেলার জায়গা নেই। অনেক পুরুষের ঘরানা, বহুত দিনের কালেকশন, কালকেতুর মতই দিনে দিনে বেড়েছে। করার কিছু নেই।

কিন্তু রাজা এখন রোগে না রাগে না বৈরাগ্যে ভুগছেন কে জানে! এ সবে তাঁর মন নেই। কেতাবে রুচি নেই, নৃত্যগীতে অনীহা, বাঁদরমুখো বিদূষকের একঘেয়ে ভাঁড়ামি অসহ্য। বসে বসে দেহের তাবৎ সরসন্ধি-বাঞ্জনসন্ধিতে প্রায় **স্পন্ডেলাইটিসের** জং ধরবো ধরবো করছে। **রাজবৈদ্য** প্রত্যহ ভোর বেলায় এসে মকরধ্বজী শ্লোক আউড়ে নাড়ি টিপছে আর ধোঁয়াটে টিপ্পনী কাটছে, অসহ্য। রোগ না রগড়। হঠাৎ তাস পাশা শতরঞ্জ উলটে দিয়ে রাজা হেঁড়ে গলায় হুঙ্কার ছাড়লেন, 'মৃগয়া!'

তিন অক্ষরের এই মৃগয়া শব্দটির মধ্যে বোধ হয় তিন হাজার ভোল্টের যাদু ছিল। শোনামাত্র তুর্কি লাফ লাফিয়ে উঠল ইয়ারবক্সী বয়স্যারা। দোহারকি দিল, 'রাজা চলো মৃগয়ায়।' অনুচর পরিচরের দল এক পায়ে খাড়া। সাজ সাজ রব পড়ে গেল রাজপুরীতে। হাতী লাগাও, ঘোড়া লাগাও, তাঁবু তোল রব উঠল। লোক লস্করের বাহিনী তৈরি, রস রসদ সাজ সরঞ্জাম প্রস্তুত।

রাজা ফের হুঁশিয়ারি দিলেন, 'চাই শিকার।'

সমস্বরে স্লোগান উঠল, 'তাই স্বীকার।'

কিন্তু শুভারম্ভ বলে একটা কথা আছে। তাই পাঁজিপুঁথি বেরলো, গণক এলো, সুলুক সন্ধানী আরণ্যক এল। মানচিত্তির খুলে বন বাছাই হল। পশুবিশেষজ্ঞ সায় দিলেন মাথা নেড়ে।

ঢাকঢোল পিটিয়ে রামশিঙা ফুঁকে বিশাল বাহিনী এসে বনের কিনারে ছাউনি ফেলেছে। পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে স্রোতস্বিনী, তরতর করে বয়ে যাচ্ছে দিনগুলো। গভীর বনের গোলোক ধাঁধার মধ্যে সারাদিন শিকার টুঁড়ে বেড়ানোর মধ্যে রোমাঞ্চকর উম্মাদনা যেমন আছে, তেমনি রাশি রাশি পশুবধের মধ্যে আনন্দের উত্তেজনাও কম নেই। এমন হরিণছুট ছোটা অনেকদিন ছোটেন নি রাজা মশাই। অনুমান করা শক্ত নয়, স্বর্ণমারীচের পিছনে রামচন্দ্র কী দৌড়ানটাই না দৌড়েছিলেন। তিনি তো তাও অশ্বপদ, পরশ্বৈপদী কিন্তু রামচন্দ্র ছিলেন নিতান্তই খালিপদ। তাঁকে স্রেফ নিজের পায়েই দৌড়তে হয়েছিল।

মৃগ থেকেই যদিও মৃগয়া কিন্তু মৃগয়া করা মানে কেবল মৃগ শিকার নয়। খরগোশ সজারু কি হরিণ মারতে কোনো রাজাই বনে আসেন না। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে কোনো প্রমাণ সাইজের শিকারীই চাইবেন না। যদিও বাতাসের মত দ্রুতগতি আর আলেয়ার আলোর মত পলকে অদৃশ্য হওয়া হরিণকে পিছু ধাওয়া করে লক্ষ্যভেদ করা চাট্টিখানি কথা নয় সেকথা অবশ্য স্বীকার্য। তবু মারি তো গণ্ডার বলে একটা কথা। গভীর অরণ্যে বিগ গেমস-এর অ্যাডভেঞ্চার না থাকলে এত তোড়জোড় আয়োজন উদ্যোগই মাটি। আসলে এটাও এক ধরনের মিনিয়েচার যুদ্ধই। বীরত্ব এখানেও বড় কথা। বুনো হাতি, বাঘ, বাইসন আর দাঁতাল শুয়োরকে সামনাসামনি মোকাবিলা করার মধ্যে একটা শক্তি পরীক্ষার সুযোগ আছে। ভারতের যখন তিন ভাগ বন আর এক ভাগ বসতি ছিল তখন এই সব হিংস্র পশুই হয়ে দাঁড়িয়েছিল অরণ্যের দুরাচারি রাক্ষস। জনজীবন বিপন্ন হয়ে উঠতো এদের আক্রমণে। শস্য বিনষ্ট, মানুষের চলাচল বিঘ্নিত, বনভিত্তিক জীবিকা বন্ধ হয়ে যেত। তাই নিয়মিত মৃগয়ায় এসে প্রজাপালক রাজা এই আতঙ্ক দূর করার চেষ্টা করতেন। হিংস্র পশুর অস্বাভাবিক সংখ্যা বৃদ্ধিকে দমনে রাখতেন। বহু পশু নিহত হত, ততোধিক পশু দূরান্তরে সরে যেত।

শৃঙ্গ চর্ম পশুমুণ্ড আর মূল্যবান গজদন্তের বিপুল ট্রফি নিয়ে রাজা সদর্পে ফিরে আসতেন রাজধানীতে। আবালবৃদ্ধ নরনারী ভেঙে পড়ত এই ক্ষাত্রকর্ম স্বচক্ষে দেখার জন্যে রাজপুরীর সামনে।

আমাদের বিবাগী রাজাও চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন কদিনেই। দিনান্তে শিবিরে ফেরার পর খোলা আকাশের নিচে জমে উঠছে বিচিত্র মজলিশ। ক্যাম্প ফায়ারের চারপাশে অনুচর অনুগামীদের খণ্ড খণ্ড জটলা। ঝলসানো মাংসে বহুকাল পরে যেন সুখের তার ফিরেছে সকলের। গল্পে এসেছে নতুন স্বাদ। সারা দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে চলেছেন সহচরের দল। সেই সঙ্গে লোমহর্ষক স্মৃতিকথা আর মায়াবিনীর উপাখ্যানের মধ্যে এসে ঢুকছে গা-ছমকানো জ্যোৎস্না আর নিশাচর শব্দমালা। গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে জীয়ন্ত গাছের ছায়া। জরিদার নদীর জলে বুঝি বিবস্ত্রা পরীর দল অসতর্ক অবগাহনে নামবে আর একটু পরেই। কিন্তু রাজার চোখে ঘুম নেমে এসেছে তার আগেই। রাত গভীর।

কিন্তু শেষ রাজাও চলে গেছেন কতকাল আগে। এখন শুধু খেতাবি রাজা। সরকারের মাসোহারা জমা পড়ে তাঁর ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে। বলতে গেলে তাসের রাজা, পেপার কিং। কাগুজে বাঘের চেয়েও নিরীহ। নিরামিষ পেনসন ভোজী। বন্দুকের নলের বদলে গল্‌ফ ক্লাব আর বিলিয়ার্ড স্টিক। বারুদের বদলে বীয়ার। মৃগ মাংসের স্বাদ মোগলাই মোরগায়।

রাজা না থাকুক উচ্চবিত্ত বাঙালীর মধ্যে শখের শিকারী সমাজ তৈরি হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। কিন্তু তাঁদের হাত পেকে আসতে না আসতেই বনভূমি প্রায় তছরূপ হয়ে গেল। রিজার্ভ ফরেস্ট আর রেসট্রিকটেড ফরেস্টের তকমা পেয়ে গেল রুগ্ন অরণ্য। টাকে চুল গজাবার চেষ্টা চলেছে অ্যাফরেস্টেশন নাম দিয়ে। গড়ে উঠেছে অভয়ারণ্য। শিকার শিকেয়। শ্বাপদ সুমারির পরিসংখ্যান দেখে চোখ কপালে ওঠে আমাদের। গণ্ডার আঙুলে গোনা যায়। বাঘ নগণ্য। নিতান্তই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। কুমীরের ছানাকে পেলে পুষে মানুষ করার দায়িত্ব পড়েছে এখন মনুষ্য পণ্ডিতদের হাতে।

সুতরাং চোরা শিকারীর ফ্যান্সি মার্কেট যেমনই জমুক স্বীকৃত শিকারীদের শিকারকর্ম এখন একাদশীর জল-পান। সিজিনে টিকিট কেটে বাঁধা মাচায় বসে বাবু মেছোর মাছ ধরার মত। দিনান্তে বৈঠকখানার বাজার ফেরত বাড়ি, নইলে মান থাকে না।

আসল কথা মানচিত্তির শুকিয়ে আসছে। পশুপাখিরা দ্রুত পাততাড়ি গুটোতে শুরু করেছে। বনটন এখন থেকে ক্যালেণ্ডারেই শোভা পাবে। নিকট দিনের দুনিয়ায় কে জানে হয়তো মনুষ্য ছাড়া দ্বিতীয় কোন পশুরই অস্তিত্ব থাকবে না। ম্যান ইটার না থাক ম্যানকিলার তো থাকলই সুতরাং দুঃখ কী! মনুষ্য শিকারই সবচেয়ে প্রশস্ত এবং অবিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে খবরের কাগজ দের দর্শনে [illegible] বাঙালীকে চিনেছে

খুললে সেকথাই তো মালুম হয় প্রতিদিন। মৃগয়া এখন মানবমৃগয়া। যুদ্ধবাজ রাজা রাজড়ারা অন্তত অঙ্গীকার করবে না।

দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে পথও বদলায়। হাত-হাতিয়ার বদল হয়, বাই-বাতিক বাঁক নেয়। মৃগয়ারও ঈস্টার্ন বাইপাস খুলে গেছে। রাইফেল শটগানের জায়গায় ক্যামেরার মাইফেল শুরু হয়ে গেছে। গল্পের গরু এতদিন গাছে উঠতো এখন গল্পের ক্যামেরা। সিনেমার বারদুয়ারি দৌড় এখন জঙ্গলের দিকেই তাক করে থাকে। হিরোহিরোইনের আবদার আউটিং চাই, নইলে রোমান্স জমবে না। প্রডিউসারও বোঝেন সিনেমার মোদ্দা কথাই এনটারটেনমেন্ট। এবং সেটা উভয়পক্ষেই দরকার। লাখ লাখ টাকার শ্রাদ্ধ যেখানে, দানসাগর বাহুল্য না। গল্প বাছাইয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আউটিংয়ের স্পট বাছাইয়ে লেগে পড়েন সপারিষদ পরিচালক। যেন বনভোজনের জায়গা খুঁজছেন। কিংবা পুজোর ছুটির আগের পারিবারিক পাঁয়তারা। কাশ্মীর না কাঠমাণ্ডু? হিমালয় না সাউথ ইন্ডিয়া? আচ্ছা জব্বলপুর মার্বেল রক কাজে লাগানো যায় না? জঙ্গল চাই, জলপ্রপাত থাকলে ভাল হয়। দর্শকদের কথাও ভাবতে হবে। ধেড়ে খোকাদের জলছবির ওপরে ছেলেবেলার টান। লাভ সীনকে একটু জলজ্যান্ত করা যাবে, বেদিং কস্টিউম ছাড়াই। মসৃণ চাটালো পাথরের চাঁই, মৈনাকের মত মাথা তুলেছে। বুকে স্বেদবিন্দুর মত জলকণা। ইউসেলফ কি রকম সেক্সি বলুন! স্রাইট বস্ত্রহরণের ইমেজ আর একটু স্টান্ট-টেনশন পাঞ্চ করতে পারলে বক্স অফিস হিট।

কিন্তু কতার সঙ্গে গিন্নীর মত মেলে না। ব্যাপার তো আসলে সাইট সিয়িং, কদিন ফুর্তিসে ফার্তাসে কাটিয়ে আসা। সেই সঙ্গে দেশ দর্শন, সেই সঙ্গে একটু খুনসুটি অ্যাফেয়ার, যতই ঝাপসা হোক, প্রেস স্কুপ হিসেবে লুফে নেবে। হিরো কাশ্মীর তো হিরোইন বেঁকে বসল। প্রাইস এ ভালগার। জাম্বু নিয়ে গিয়েছিলেন উঠতি বয়সে, তারপর ফার্স্ট হাজব্যান্ডের সঙ্গে আর একবার। তার চেয়ে বরং—

স্পট সিলেক্ট হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। উঠল বাই তো কটক যাই। সেইভাবেই। লটবহর তো কম না, লোকজনও একটা প্রমাণ সাইজের বরযাত্রী বাহিনীকে হার মানায়। রাইটার স্ক্রিপ্ট রাইটার বোঝার ওপরে শাকের আঁটি। আছেন শস্ত্রপাণিরা, কলাকুশলীরা বিগ শ্যুটার ক্যামেরা ম্যান। পেন্টার ড্রেসার। বাবুর্চি খানসামার পল্টন, আছেন কমেডিয়ান, চলমান বিদূষক। একেবারে রাজসমারোহে মৃগয়া যাত্রা।

চিত্রমালার কথা থাক। বাংলা ছবি, হিন্দী ছবির জংলী ফ্যাশন থেকে সরে আসা যাক দর্শকের দুনিয়ায়। ভাদুরে রোদ্দুরে গরদ বেনারসীর ট্রাঙ্ক যাঁহা মুখ খুলেছে, পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে টিকটিকির ডিমের মত ছোট হয়ে আসা ন্যাপথলিন, অমনি মন উড়ু উড়ু চোখ ঢুলু ঢুলু অবস্থা। নিপাট ব্যাচেলার, সদ্য চাকরিতে থিতু, আনন্দবাজারের পাত্রপাত্রী কলমে এই সেসনে কেস উঠেছে এমন, এ-বাড়ির সে-বাড়ির বড় মেজ সেজ ছেলের দল হাতের কলম শুইয়ে রেখে টেবিলে তবলার বোল তুলছে থেকে থেকে রব না ঘরে/ বাহির করেছে পাগল মোরে।

ভ্রমণ একটা বড় ব্যামো। ছেলেবেলা থেকেই

ছবি : সুবীর চ্যাটার্জি
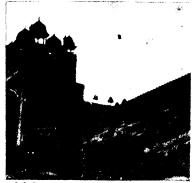
মাসিপিসি চড়ে বাঙালী ছেলেরা বেড়ু করতে শিখেছে, এই আইবুড়ো বয়সে কিংবা এক পল্টনের পিতা হয়েও সে রোগ সারে নি। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বেরিয়ে পড়ছে। হিলটপ থেকে সীলেভেল, সিঞ্চল থেকে সজনেখালি, লেক ফলস ফরেস্ট—যে কোন জায়গায় গিয়ে নামবে দলে দলে মরসুমী পাখির মত। তীর্থাতীর্থ নেই, খ্যাতি অখ্যাতিতে অপরোয়া। এই সাইট হান্টারের দল আসলে বিউটি সংসার। শেষ কপর্দকটি খরচ করে, রেলপথের ফিরতি স্টেজটা শুধু শুকনো পাঁউরুটি আর ভাঁড়ের চায়ে ভর করে তেরাত্তির জাগা গুরুদশাগ্রস্ত চেহারা নিয়ে বাড়ি ফিরবে তাও স্বীকার। হোটেল, হলিডে হোম, ধর্মশালা চুঁড়ে, শেষ ইস্তক হয়তো এক চিলতে শেয়ারের মাথা গোঁজার আশ্রয়, শস্তার ডালরুটি আর কদলী ভক্ষণ, এখানে দণ্ড ওখানে মাশুল, ধস্তাধস্তি হাঙ্গামা-হুজ্জুৎ, এটা খোয়ানো সেটা হারানো, ঠক জোচ্চোরের পাল্লায় উঠে নেমে, কটু কষায় অনেক অভিজ্ঞতা বগলদাবা করে যারা ফিরে এল, মনে হয়েছিল এরপর তারা নাকে কানে খৎ দিয়ে একদম সুবোধ বালকের মত ঘরে বসে যাবে। আর বাইরে বেরোনোর নামটি করবে না।

কিন্তু যাঁরা জানেন, তাঁরা ঠিকই জানেন, সামনের বছর আবার ওদের ডানা গজাবে। হোল্ড অল বাঁধবে, সুটকেস গুছোবে, রিজার্ভেশনের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরবে। টুরিস্ট আর মাইগ্রেটরি বার্ডসের সঙ্গে তফাত একটাই। একজন বিনাটিকিটের যাত্রী অন্যজন টিকিটের। একজনের স্থান কাল নির্দিষ্ট অন্য জনের নয়। ভূভারতের যে কোন জায়গায়, যে কোনো ছুটিছাটায়, বছরের যে কোনো সময়ে। আসলে ভেতরের মনটা তো দিবারাত্র নেচেই চলেছে যাবো যাবো করে। পায়ের তলা সুড়সুড় করছে, ইচ্ছেটা করছে পালাই পালাই

এও শিকার, দৃশ্য শিকার। কত পাহাড়, কত বন, কত নদী, কত সূর্যোদয় সূর্যাস্ত, সফেন ব্রেকার, বালিয়াড়ি কুয়াশায় বৃষ্টিতে মাখামাখি কত অবিস্মরণীয় মুহূর্ত, সুখ দুঃখের সিলুয়েট, কত মুখ আর মুখের কথা ধরা পড়ল অ্যামেচার ক্যামেরায়, মনের কম্পিউটার যন্ত্রে, চোখের মণিতে। ভরে রইল বুকের তলা, কারো কাছে হয়নি বলা— এমন সব গল্পের ছেঁড়া পাতা, উপন্যাসের টুকরো, ছবির নেগেটিভ।

কিন্তু এই ভাবাবেগ, বুকের ভেতরের এই

আনচান, ড্রাগ অ্যাডিক্টের মত এই পথের চোরা টান বুঝতে হলে আগে বাঙালীকে বুঝতে হয়। কারণ টুরিস্ট আর এই ভ্রমণেচ্ছু নেশাড়ুরা একজাতের মানুষ না। বাঙালী ছাড়া আর কেউ বোধহয় এভাবে নস্টালজিয়ার শিকার হয়নি।

দশ অবতার তাস নিয়ে বাঙালী যে একদিন খেলায় মেতেছিল তার নেপথ্যের একটা কারণ বোধহয় এই যে, সে নিজেও বহুরূপী; দশ অবতারের সব কটি স্বভাবই তার মধ্যে বিলক্ষণ বর্তমান। ভূভারতে আর কোথাও এমন একটা দশচক্রী জাত, এমন দশাচক্রের জাত খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার মধ্যে যেমন ঘরকুনো কূর্ম, পিঠে কুলোবাঁধা মন্থরগতি মেরুদণ্ডহীন কচ্ছপ আছে, তেমনি অযুক্তিবাদী একগুঁয়ে দাঁতাল বরাহও বর্তমান। বরাহনন্দন সম্বোধনে সে কেন যে অতি মাত্রায় সেন্সিটিভ হয়ে পড়ে এ থেকেই তা বোঝা যায়। বাঙালীর চরিত্রে যেমন হাতে পায়ে মাথায় খাটো বামন আছে তেমনি বিজ্ঞ বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী বুদ্ধও আছে। তার জীবনের প্রতিপদে কেবল গ্রন্থি নেই, গ্রন্থও আছে; বলতে গেলে তার তামাম জীবনটাই বইবাহিক! সে বায়কুণ্ঠ হলেও বইকুণ্ঠ নয়। অনন্ত শয়নপটু শয্যাসঙ্গী বিযুত সে। বসতে পেলে সব সময়ই শুতে চাওয়া যেমন অভ্যেস, তেমনি মীন স্বভাবও তার মধ্যে চলমান। মিনমিনে কিন্তু জলজ্যান্ত অস্থির, স্রোতের উজানে উজিয়ে চলা আর ভবঘুরে ভেসে বেড়ানোয় জুড়ি নেই। ডুবে ডুবে জল খাওয়ার মধ্যে তো ঘুষ খাওয়ার মতই পরকীয়া উল্লাস আছে।

বাঙালীর দশচরিত নিয়ে এই দরবার করার কারণ তাকে একবাক্যে ঘরকুনো বলে গাল দিলে সত্যেরই অপলাপ হবে। একথা আজ প্রমাণ হয়ে গেছে যে, ভ্রমে এবং ভ্রমণেও তার তুলনা হয় না। সময় বিশেষে সে সর্পের মধ্যে ঢুকে বসে থাকে বটে কিন্তু তার পায়ের তলায়ও রীতিমত সর্ষে রয়েছে। বেড়ানো তার পয়লা চক্করের নেশা।

বাঙালী জাতটা অম্বাণীও নয় অপ্রবাসীও নয়। শিল্প সংস্কৃতি সঙ্গীত আর ভিন্ন ভাষার শব্দাবলী সে কেবল নির্বিচারে হরণ চয়ন অনুকরণ করেনি তাকে পরিপাকও করে নিয়েছে নিজস্ব ঘরানায়। পরকীয়াবৃত্তি তার রক্তের সংস্কার। তেমনি আছে তার মধ্যে প্রবাসকে নিজের আবাস করে তোলার আত্মিক প্রবণতা। প্রতিবেশী প্রদেশগুলিতে এক সময় গড়ে উঠেছিল বাঙালীর সম্ভ্রান্ত উপনিবেশ। বিশেষ করে বিহার উড়িষ্যা আসামে ছিল বৃহত্তর বঙ্গভূমিকা। চিকিৎসক, আইনজীবী ও সরকারী উচ্চজীবিকার মানুষ কয়েক পুরুষের শিকড় গেড়ে পাকাপোক্ত বসে গিয়েছিলেন দেশান্তরে। পরবাসেও তাঁরা খ্যাতিমান বিত্তবান হয়েছিলেন। কেবল রেঙ্গুনে কি সিঙ্গাপুরেই নয়, ইউরোপ-আমেরিকায় থিতু হওয়া বাঙালীর সংখ্যা আজ কম নয়। এই সব নজির থেকেই বোঝা যায় বাঙালী আজ কোণঠাসা হতে পারে কিন্তু কস্মিনকালেও সে ঘরকুনো ছিল না। বারমুখো বাউণ্ডুলেও ছিল।

শুধু তীর্থচর হয়ে পুণ্য সঞ্চয়ের লোভে সে দূরে দুর্গমে পাড়ি দেয়নি, সৌন্দর্যের হাতছানি আর অজানার আকর্ষণই তাকে পথে নামিয়েছে। দেব-দর্শনের চেয়ে দেবদুর্লভ দৃশ্যই তাকে টেনেছে বারংবার, মুহুর্মুহু। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে এই তার চরিত্র। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়াই তার নেশা। জীবনে পাঁজির পাতা যত উল্টেছে, টাইম টেবলের পাতা উল্টেছে তার চেয়ে অনেক বেশী। ভ্রমণের মধ্যেই সে পেয়ে গেছে পড়ে পাওয়ার চোদ্দ আনা আনন্দ। তাই বেড়ানোর গল্প তার কাছে বুঝি পরচর্চার চেয়েও মুখরোচক। মুগ্ধ হবার বিস্মিত হবার সহজাত সংস্কার নিয়ে বাঙালী হেঁটে চলেছে হাজার বছর ধরে। তার সঙ্গে মিশেছে যস্মিন দেশে যদাচারের প্রতি ভোজন বিলাসী বাঙালীর রসনার কৌতূহল। ড্যাম চীপের দিকে তার একটা মেয়েলি আকর্ষণ প্রকট বলেই বাঙালী টুরিস্টের নামের আগে একদা 'ড্যাঞ্চিবাবু' কথাটা যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। তবু 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া, নিজের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া' কথাটা বোধ হয় ভ্রমণই মানুষকে শেখাতে পারে। বঙ্গে কেবল প্রতিবেশী মাত্রেই দুরাত্মা এই অপবাদও ঘোচাতে পারে সে। আর বস্তুত ঘটেছেও তাই। ঘরের বাইরে বাঙালীর অন্য চেহারা, দেশান্তরে অন্য মূর্তি।

আমার এক অগ্রজ কবিকে জানি, এয়ারপোর্ট তাঁর বাড়ির পরিচিত বাস-স্টপের মত।

'এখন চলি ভাই, একটু ওপাড়ায় যাচ্ছি, তাড়া আছে'—বলে তিনি যেন বাসের হ্যান্ডেল ধরে ঝুলতে ঝুলতে বিদেশে চলে গেলেন। রাশিয়ায়। গেছো দাদার মত, তাঁকে আমরা প্রায়শই পকেট থেকে রুমাল বের করে দোলাবার সুযোগ পাই না। কখন যে হুট করে বেরিয়ে যান, এয়ারোপ্লেনে চেপে বসেন, বোধহয় গণৎকারের পক্ষেও বলা শক্ত।

আমার আর এক প্রিয় বন্ধু বছরে ছ' মাসই বোধহয় বাইরে, বিদেশে রাত কাটান। পরিচিতরা প্রায়ই দেখা করতে এসে হতাশ হয়ে ফিরে যান। একদিন এক রসিক ভদ্রলোক এসেছিলেন এই রকম। অফিসে এসে চেয়ার খালি দেখে মুচকি বললেন, 'কী, এবার ছোট না বড়ো?'

আমি হাঁ হয়ে গেলাম। শুধোলাম, 'আজ্ঞে?'

উনি মুচকি হেসে বললেন, 'বলছিলাম, আপনার ফ্রেন্ড গেলেন কোথায়?'

আমি পাল্টা হেসে জানালাম, 'এই তো একটু আগেই চলে গেল। শুনলাম আসামে যাবে।'

'ওঃ, ছোট বাইরে! তাই বলুন'—ইস্কুল জীবনের পরিভাষায় রসিকতা করে ভদ্রলোক চলে গেলেন। আসলে আমার বন্ধুর বেলায় এই সব শর্ট ট্রিপ বোধ হয় ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

কিন্তু আমার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এমন মানুষ আছেন যাঁরা ইনল্যান্ডার হিসেবেই নাম কিনেছেন। অন্দর মহলেও এই সব নিরন্তর ভ্রমণবিলাসীরা আবহাওয়া বিলকুল বদলে দিয়েছেন খবর পাচ্ছি। এক বোহেমিয়ান কবি বন্ধু বনবাদাড় চষে বেড়াচ্ছেন প্রায় আড়াই দশক ধরে। বোতলের মত প্রকৃতিও নাকি তাকে কিক দেয় যখন তখন। শুধু বনবাংলা নয়, যে-কোনো প্রদেশের নামী দামী অখ্যাত-কুখ্যাত তাবৎ বনবাংলোই তাকে চুলের মুঠো ধরে টানে। ফলে হামেশাই দু পাঁচ দিনের জন্য বেপাত্তা হয়ে যায়। কেউ জানে না, অনেকের ধারণা, সে নিজেও জানে না সে কোথায় গেছে। ইদানীং গৃহিণী নাকি চায়ের জল চাপানোর আগেও একবার সরেজমিনে দেখে যান তার কাঁধের ঝোলা আর জুতোজোড়া যথাস্থানে আছে কিনা। আছে তো সেও আছে, নেই তো নেই।

কিন্তু সকলেই তো আর ঘরদোর পুত্রকলত্রকে এভাবে নিলামে চড়িয়ে চলে যেতে পারে না। মধ্যবিত্ত ছাপোষা বাঙালীর সে সাধ্য কোথায়। কিন্তু বছরে একবার, অন্তত পুজোর ছুটিতে একবার তার কেরানী কলম আর কলতলার কলকাতাকে ফেলে দূরে কাছের শৈলশঙ্গ কিংবা সমুদ্র-টমুদ্র দেখতে বেরিয়ে পড়ে সপরিবারে। তার বোনাস, ওভার টাইম, টিউশানী আর লক্ষ্মীর ভাঁড় ওতেই নিবেদন হয়ে যায়। পায়ের সুড়সুড়ি এমন জিনিস যে কুয়োর ব্যাঙও সাগরে ঝাঁপায়। ফুটপাথ-ফ্ল্যাটেই পর্যন্ত দৌড় যে পায়ের সেও পাহাড় ডিঙোয়।

বাসের ভিড়ে টানা এক ঘণ্টা স্যান্ডউইচ মেরে বসে, মুখের ওপর ঢুস খাওয়ার ভঙ্গিতে হামলে দাঁড়ানো তিন বাঁড়ুজ্যের কয়েক গ্যালন গরম নিঃশ্বাস গিলে গলদঘর্ম মধুসূদনবাবু সবে হাজরে ফেরত নিজের চেয়ারে দাবনা দাবিয়েছেন, অমনি ভানু দত্ত তাঁর দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। তাঁদের ডিপার্টমেন্টে ছোকরা সদ্য ঢুকেছে, বলতে গেলে এখনো অন্নপ্রাশন হয়নি, প্রবেশনার। এঁচোড়ে পাকা। [illegible] ওপর ফালি সুপুরির মত এক চিলতে কাটা গোঁফ, চোখে [illegible] চশমা। টলারেট করা যায় না, [illegible] এড়িয়েই চলেন।

পাখার রেগুলেটার দু ঘর বাড়িয়ে দিতে বলে রুমালের খোঁজে যাস্ট পকেটে হাত ঢুকিয়েছেন অমনি [illegible] বললেন, 'মুস্তাফিদা, [illegible]'

আচমকা [illegible] একটু নার্ভাস লাগেই। [illegible] এসেছে, আর [illegible] তাও সার্টিফিকেট এক-এর কল্যাণে, নইলে হরস্কোপে পুরো দু বছরই ঘ্যাচাং হয়ে যাবার কথা। মেয়েগুলো ফাস্ট-কামার, ছেলেটাই ইন করেছে বড্ড লেট করে। নইলে আজ কে পরোয়া করত এই চাকরির।

রুমাল বের করে চশমা খুলে ঘাম মোছা হল না, চতুর্দিকে চোখের মণি ঘোরাতে ঘোরাতে পাকি এক গেলাস জল টানেন প্রতিদিন সেটাও স্থগিত রইল। মিনিট তিনেক শিবনেত্র হয়ে বসে ফ্যানের হাওয়া উপভোগ মাথায় উঠল। ভোঁতাটে গলায় ভানুকে সুধোলেন, 'কী শুনছো?'

'আপনার চেয়ারে নাকি নতুন লোক বসছে শিগগিরই?'

'বসছে মানে! আমি কি রিটায়ার করছি?'

'বালাই ষাট!' ভানু জিভ কামড়ায়।

'ষাট নয় আটান্ন!' অভ্যেসবশে সংশোধন করে দেন।

'ওই যাঁহা বাহান্ন তাঁহা আটান্ন' ভানু দত্ত কঠিন

মুখে হাসল, 'আপনি তো দার্জিলিং যাচ্ছেন বডি রাখতে ?'

হ্যাঁ, এবারের পুজোয় ওটাই তাঁর টার্গেট। বাড়ি করার পর লাগাতার তিন বছর থম মেরে ছিলেন। দুবার গঙ্গা পেরিয়েছিলেন অবিশ্যি কিন্তু ছাইগাদা ইস্টিশান ছাড়িয়ে বেশী দূর এগোনো হয়নি, লিলুয়ায় শ্বশুরবাড়িতে চোখের মাথা খেয়েও আউটিং সেরেছেন।

'যাচ্ছিই তো। কিন্তু বডিফডি কি সব বলছ ?'

'দাদা বুঝি কাগজ পড়েন না ?'

'না ! এত ভেজাল মাল থাকে যে হজম হয় না। তাছাড়া কদিন বাদে ওপারে গিয়ে তো ইংরেজী বাংলা কোন কাগজই পাব না। তাই কাগজের নেশাটা সময় থাকতে ছেড়ে দিয়েছি।'

কথাটা সত্যি নয়। বাড়ি করার পর থেকেই আসলে ছেড়েছেন। ভানু তখন যে লোমহর্ষক সংবাদ শোনালো তাতে মধুবাবুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভানু স্পষ্টই বলল, দাদা রিটার্ন টিকিটটা আর মিছিমিছি কাটবেন না ! আপনার কন্ডোলেন্স আমরাই সামলে নেব। যাক এই দুর্দিনের বাজারে একটা লোকের অন্তত চাকরি হবে।

টিকিট রিজার্ভেশন হোটেল বুকিং সব হয়ে গেছে, হাই সব্বোনাশ ! মধুবাবু বিড়বিড় করে বললেন, এই অন্তিম সময় এখন কি কতা শোনালে হে ? এখন যাই কোতা ? তবে কী শালার ওখেনে চণ্ডীগড়েই—ক বছর ধরেই বলছিল—'

'চণ্ডীগড়ে !' ভানু ইলেকট্রিক শখ খেল যেন, 'সত্যি দাদা ! আপনি আর এই পিচে খেলার যুগ্যি নন। সেন্ট পার্সেন্ট মাথা খারাপ হবার আগে গো ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন। মাতৃগর্ভেই ফিরে যান, ওই আপনার সেফ কাস্টডি ! কেন ধারে কাছের আর কোন নাম মনে পড়লো না ?'

'তুমি কী সাজেস্ট করো ?' অসহায় মুখে মধুবাবু জিজ্ঞেস করেন।

'কেন পুরী। এক রাত্তিরের মামলা। ঠায় উবু হয়ে বসেই চলে যেতে পারবেন, নো রিজার্ভেশন নট কিচ্ছু !'

'হ্যাঃ খুব বলেচ ! পুরী তো ডালপুরী হয়ে গেচে রে ভাই। কম করে বার সাতেক গেচি !'

'তবে বকখালি কী ঝাড়গ্রাম, বাঁচিটা নেই গেলেন, ওখান থেকেও আপনার ফিরে আসা—'

বুঝলেন 'ব্যাকরাইপ' ছোকরা ফক্কুড়ি করছে। বললেন, 'সে আমি যেখানে যাই যাবো, তুমি এখন নিজের চেয়ারে যাও। ফাইল টাইলের একটু ধুলো ঝাড়ো—'

বেশ দর্শনীয় শ্রাগ করে ভানু চলে গেল। মধুসূদনবাবুর মনে হলো, ছোকরা তাঁর বাইরে যাওয়ায় বাগড়া দিতে এসেছিল। বাঙালীর যা স্বভাব। প্রতিবেশীদেরও তো দেখছেন। যদি সাউথে যাবে তো বলে নর্থে যাচ্ছি। যদি পাড়ার পুজো প্যান্ডেলে শালগ্রাম হয়ে বসবে তো উটি আলমোড়ার গপ্পো শোনায়। এই সব পাঁচ কথায় কান পাততে গিন্নিকে না করে আসছেন বরাবর। কিন্তু কে শোনে কার কথা !

অবিশ্যি এর উল্টো দিকও আছে। গত বছর যখন ইভাকুয়েশনের কলকাতার মত ষষ্ঠীর সকালে পাড়া ঝেঁটিয়ে ফাঁকা হয়ে গেল তখন গিন্নির মুখের দিকে আর তাকাতে পারেন নি। আসন্ন বিজয়া না থাকলে হয়তো বাক্যালাপ হপ্তা কয়েক বন্ধই থাকতো।

আমাদের ছেলেবেলায় অবশ্য দিনকাল অন্যরকম ছিল। তখনও দুই খণ্ডে বাংলা দেশ তৈরি হয়নি কিন্তু মুখে মুখে পদ্মা বরাবর একটা অদৃশ্য গণ্ডি টেনে নিয়েছিল মানুষ। একটা উন্নাসিক ভ্রুকুটির। দুই কিসিমের জার্সি পরে যেন একই মাঠে খেলতে নেমেছে দুই দল। হাফ টাইম অন্তর কোট বদলাচ্ছে, গোলপোস্ট বদলাচ্ছে, জীবিকার বলের পেছনে দৌড় বদলাচ্ছে।

শঙ্খধ্বনির মত। রেল ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ হুইসেল অ্যানেসথেশিয়ার মত মগজে বিঁধে থাকত দিন ভর। নির্ভর নির্ভাবনায় আমরা কটি বালক বালিকা দিগন্ত চিরে যাওয়া রেললাইন থেকে চোখ ফিরিয়ে মাটির বদল দেখতাম। এক মেটের পরে দোমেটে, তারপর চিকণ বালির রং ধরতো প্রতিমায়। বিশাল গৈরিক পদ্মার প্রমত্তা প্রতিমা, আর পারাপার স্টীমার চালচিত্রের তলায় ঝলসে উঠত জলের খড়্গ। তারপর ওপারে পৌঁছে শেষ নাস্তা হত পদ্মপাতায় লুচি আর পাবনার কাঁচা গোল্লায়। বিশ্বাস কোম্পানির মটোর আসতো ধুলো উড়িয়ে প্যাসেঞ্জার নিতে। আসতো ছই তোলা খড় বিছানো মোষের গাড়ি। দুখানা কাঠের

সৌন্দর্যের হাতছানি আর [illegible] ছবি : সুবীর চ্যাটার্জি

ভূগোল মাফিক আমরা ছিলাম বাঙাল। ওপারে বাস্তু, এপারে বাসা। তাই যাওয়া আসা লেগেই থাকত। গ্রীষ্মের বন্ধে, পুজোর ছুটিতে অন্তত দুবার পদ্মা ডিঙোতে হত। সেকালে আমাদের কাছে ওই দেশের বাড়িই ছিল ভূস্বর্গ, সেই ছিল গয়াকাশী। হাওয়া বদল করতে নৈনিতাল দার্জিলিং ছুটিনি, দেওঘর মধুপুর সাঁওতাল পরগনার ক্রেজও ছিল না। আজ এ বয়সে মনে হয় কবিতার লাইনটা আমাদেরই মনের কথা ! তবু ভরিল না চিত্ত। সারা জীবনের ভ্রমণটা বুঝি ভ্রমেই কেটে গেল। পিতৃ পিতৃব্যনির্ভর সেই ছেলে-বয়সের বুকের মধ্যে স্টিমারের ভোঁ জড়িয়ে যেত অলৌকিক

চাকায় আলাপ চালাতে চালাতে মেঠো রাস্তায় দণ্ডী কেটে এগোতো। দুপাশে ভাঁট ধুতরো বনতুলসীর জঙ্গল, বকুল আর পলতে মাদার, শ্যাওড়া গাছ, বাঁশ ঝাড়। আম কাঁঠালের ঘন ছায়ার মধ্যে কখন ঘুঙুর পরানো ঘুঘুর ডাক দিয়ে শান্তি পর্ব শুরু হত।

আজ অনেক জীবন পেরিয়ে এসেও দেওয়ালে পিঠ রেখে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে এই ছবি। বলতে গেলে ছবির ক্যালেন্ডার। একটার পিছনে আর একটা মুখ লুকিয়ে আমার জন্যেই যেন অপেক্ষা করছে। আর এখন কটির টুকরো ঠোকরাতে এসে কলকাতার জীবন কলে-পড়া ইঁদুরের মত মরণকামড়ে ঝুলছে। রুটি আছে ছুটি নেই। ■

চণ্ডীমণ্ডপ প্রদক্ষিণ

কিশলয় ঠাকুর

এই চণ্ডীমণ্ডপেই রবীন্দ্রনাথের অক্ষর পরিচয়। 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ'-এ তিনি বলছেন, 'তখনকার ধনীমাত্রেই আপন চণ্ডীমণ্ডপে সামাজিক কর্তব্যের অঙ্গরূপে পাঠশালা রাখতেন, গুরুমশায় বৃত্তি ও বাসা পেতেন তাঁরই কাছ থেকে। আমার প্রথম অক্ষর পরিচয় আমাদেরই বাড়ির দালানে, প্রতিবেশী পোড়োদের সঙ্গে।'

এখানে দালান, চণ্ডীমণ্ডপ—সমর্থক। তবু দালান, ঠাকুরদালান, দুর্গাদালান ইত্যাদি শব্দ আধুনিক, অর্বাচীন। চণ্ডীমণ্ডপ—প্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী। দালান—নাগরিক, চণ্ডীমণ্ডপ—গ্রামীণ। নগরীর ধনীগৃহের দালানে শরতে-বসন্তে দেবীপূজা ছাড়া সংবৎসর পাঠশালা, মজলিস, যাত্রা-থিয়েটার যা কিছু হোক, নগরজীবনে তার গুরুত্ব ততোটা নয়, যতোটা গুরুত্ব গ্রামজীবনে এই চণ্ডীমণ্ডপের। পাঠশালা এখানেও হোত। নিমাই পণ্ডিত অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যর চতুষ্পাঠীও ছিল নবদ্বীপের এক চণ্ডীমণ্ডপে। মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপ। কিন্তু গ্রামজীবনের সমগ্র সত্তা জুড়ে সে ব্যাপ্ত, বিক্রান্ত। চণ্ডীমণ্ডপ তার প্রাণবেদিকা।

'এই চণ্ডীমণ্ডপটি একদিন ছিল গ্রামের হৃৎপিণ্ড, সমস্ত জীবনীশক্তির কেন্দ্রস্থল। পূজাপার্বণ, আনন্দ-উৎসব, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ সব অনুষ্ঠিত হইত এইখানে। অন্যায়-অত্যাচার-উৎপীড়ন, বিশৃঙ্খলা-ব্যভিচার-পাপ, গ্রামের মধ্যে দেখা দিলে এই চণ্ডীমণ্ডপেই বসিত পঞ্চায়েত। এই আসরে বসিয়া বিচার চলিত, শাসন করিয়া সে-সমস্ত দূর করা হইত। গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত এই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে হাঁক দিলে গ্রামের সমস্ত ঘর হইতে সে ডাক শোনা যায়—সে ডাক উপেক্ষা করিবার কাহারও সামর্থ্য ছিল না। ...চণ্ডীমণ্ডপের পাশ দিয়া যে যতোবার যাইত, প্রণাম করিয়া যাইত।'—উদ্ধৃতিটি তারাশঙ্করের 'চণ্ডীমণ্ডপ' (গণদেবতা) থেকে।

চণ্ডীমণ্ডপের অধিষ্ঠাত্রী চিন্ময়ী চণ্ডীই দুর্গা। ঋগ্বেদের 'বিশ্বদুর্গা'। আত্ম পরিচয়ে যিনি বলেন—'অহং রাষ্ট্রী'। সেই মূর্তিমতী রাষ্ট্রশক্তির আসনখানি এ-মণ্ডপে পাতা। একে কেন্দ্র করেই হাজার বছর ধরে আমাদের গ্রামজীবন আবর্তিত। হাঁ, হাজার বছর।

বঙ্গের বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত ভবদেব ভট্ট একাদশ শতাব্দীর লোক। তিনি চণ্ডী বা দুর্গার পূজা-প্রকরণ রচনাকালে তাঁর পূর্ববর্তী জীকন

চণ্ডীমণ্ডপ সর্বধর্ম স্থান। সমাজগৃহও চণ্ডীমণ্ডপ। যাত্রা, তরজা, কথকতা, কবির আসর বসবে চণ্ডীমণ্ডপের আটচালায়। কবিরাজ রোগী দেখবেন এখানে বসে। তাস-দাবা-পরচর্চা-পাঠশালা সব কিছুরই এই পীঠভূমি। এ যেন মূর্তিমান পল্লীবার্তা পত্রিকা। ধ্বংসোন্মুখ তবু বিধ্বস্ত নয়। আজও তাকে ঘিরে শারদপ্রকৃতির আরতি।

প্রমুখের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন। অনুসন্ধানে আরো অতীত উন্মোচিত হতে পারে। না হলেও নেহাত হাজার বছরের সাক্ষ্য হাতের কাছে হাজির। কলকাতায় নয়। ওই বিপুল ঐতিহ্য নিয়ে আজও ধূসর পল্লীগুলিতে দাঁড়িয়ে আছে চণ্ডীমণ্ডপ।

বারো মাসে তের পার্বণের বঙ্গভূমে ব্রত-পূজা অবিরল অনুষ্ঠিত। তার ক'টিরই বা সম্পর্ক আছে চণ্ডী বা দুর্গার সঙ্গে! কিন্তু চণ্ডীমণ্ডপ আছে সব কিছুতেই। পৌষসংক্রান্তির আগের রাত্রির শেষ প্রহর। গাঁয়ের মেয়ে-বউরা উঠে এসে জড়ো হয়েছেন চণ্ডীমণ্ডপে। 'পৌষ আগলানো ব্রত' করতে। যেয়ো না পৌষ। আগের মাসে গিয়েছে ইতুলক্ষ্মীর পরব। কোনো সম্পর্ক নেই এর সঙ্গে চণ্ডীর। তবু গৃহবধূরা সকালে স্নান করে টানা আসবেন চণ্ডীমণ্ডপে। এখানে প্রণাম না সেরে কেউ লক্ষ্মী পাতবেন না ঘরে। শিব, কালী, শীতলা, হরি, ধর্মঠাকুর সবারই ধর্মস্থান এই মণ্ডপকে ঘিরে। চণ্ডীমণ্ডপ সর্বধর্ম স্থান। সমাজ গৃহও চণ্ডীমণ্ডপ। এই চণ্ডীমণ্ডপের খুঁটিতে-দেয়ালেই সাধারণের জ্ঞাতার্থে নোটিশ লটকাতো রাজার পেয়াদা। তবেই 'গেজেট' হয়ে গেল। যাত্রা- তরজা- কথকতা- কবির আসর বসবে চণ্ডীমণ্ডপের আটচালায়। কবিরাজ রোগী দেখবেন এখানে বসে। তাস-দাবা-পরচর্চা-পাঠশালা সবকিছুরই এই পীঠভূমি। এ যেন মূর্তিমান পল্লীবার্তা পত্রিকা। এখানে পৌঁছলেই দশ গাঁয়ের সত্যি-মিথ্যে পড়া হয়ে গেল। এবং উঠতে-বসতে, যেতে-আসতে আনত হতেই হবে এখানে। এটিই পল্লীর শেষ কথা, শিখরতীর্থ। ধ্বংসোন্মুখ তবু বিধ্বস্ত নয়। আজও তাকে ঘিরে শারদপ্রকৃতির আরতি। সুপ্রাচীন, বিস্ময়কর, বিচিত্র চণ্ডীবন্দনা, দুর্গাপূজা। চলুন দেখে আসি। সে ঐতিহ্য, সে বৈচিত্র্য কলকাতায় অকল্পনীয়।

কলকাতার পূজার 'চণ্ডীপাঠ' থেকে 'ব্র্যান্ডিপান' পর্যন্ত অনেক নকশা সর্বজ্ঞাত। চণ্ডী বা দুর্গারও এখানে অন্যরূপ। যা দেখে গ্রান্ট সাহেব বলেছেন—দুর্গা হচ্ছে হিন্দুর একমাত্র হিরোইন। এই হিরোইনকে ঘিরে পূজা পরিবর্তিত-উৎসব। দুর্গোৎসবে তিনদিনের পূজায় নয় দিনের উৎসব। হাচিসন সাহেব রূপচাঁদ মল্লিকের বাড়ির দুর্গাপূজা দেখে লেখেন—ভারতে দেশীয় আমোদ প্রমোদের যতরকম ব্যবস্থা আছে বাবু তার সব আয়োজন করেন।

প্রাণকৃষ্ণ হালদার তাঁর বাড়ির 'পূজা'-য় প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দিয়ে সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে

বলেন, তাঁর মণ্ডপে দয়া করে পদধূলি দিলে 'উইথ টিফিন, ডিনার অ্যান্ড ওয়াইনস'—ইত্যাদি পান ভোজনের ত্রুটি হবে না। ঢালাও ব্যবস্থা আছে।

আঠার শ' উনিশের ক্যালকাটা জারনাল রাজা রামচন্দ্র রায়ের বাড়ির দুর্গোৎসবের বর্ণনায় সেখানকার অষ্টমীর রজনীকে আরব্য রজনীর স্বপ্নপুরীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। উদাহরণের অনটন নেই।

জোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁ, কুমারটুলির অভয়াচরণ মিত্র কিংবা দরজিপাড়ার মিত্র বাড়ি, জানবাজারের রানী রাসমণি, খিদিরপুরের ভূকৈলাস রাজবাড়ি, কৈলাস বসুর বাড়ি প্রভৃতি জায়গার দুর্গাপূজার খ্যাতি শোনা যেতো খুব। তার মধ্যেই তিন বাড়ির পূজা প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়। সেকালের কলকাতায় একটি কথা চালু ছিল—মা এসে গয়না পরেন জোড়াসাঁকোয় শিবকৃষ্ণ দাঁ-র বাড়ি, ভোজন করেন অভয়চরণ মিত্রের বাড়ি আর রাতে নাচগান দেখেন শোভাবাজার রাজবাড়িতে।

শিবকৃষ্ণ দাঁ-র বাড়ি মায়ের গয়না পরা নিয়ে এক কাহিনী আছে। দাঁ মশায় নাকি প্যারিস থেকে হীরে-চুনি-র গয়না গড়িয়ে আনেন দুর্গাকে পরাতে। বিসর্জনের সময় গয়নাগুলি খুলে রাখেন। এই দৃশ্য দেখে প্রিন্স দ্বারকানাথ প্রতিমার সর্বাঙ্গে সোনার গয়না পরিয়ে গয়নাসুদ্ধই গঙ্গায় বিসর্জন দেন।

মা ভোজন করতেন যে অভয় মিত্রের বাড়ি সেখানে মণ্ডপে রুপোর গাড়ু ঘটি, গামলা সাজানো থাকতো মা খেয়ে মুখ ধোবেন বলে। তারপর বিশ্রামের জন্য মণ্ডপের মধ্যেই সোনার কাজকরা পালঙ্কে থাকতো রেশমি বিছানা। তবে ভোজন কি দিয়ে? অমৃতলাল বসু এ-বাড়ির ভোগরাগের এক বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর স্মৃতি, 'আত্মস্মৃতি'তে। তিনি বলছেন, এখানকার ভোগের এক-একখানা জিলিপি যেন এক-একখানা গরুর গাড়ির চাকা। কামানের গোলার মতো মতিচুর। মায়ের দু'পাশে যে মিঠাই সাজানো থাকতো তা মেঝে থেকে উপরের কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকত। এক-একটি মণ্ডার ওজন ছিল দশ-বারো সের।

মা রাত জেগে নাচগান দেখেন যে শোভাবাজার রাজবাড়িতে তা নিয়েও আছে একটি উল্লেখ্য ঘটনা। কালীপ্রসন্ন সিংহ একবার সেখানে নিমন্ত্রণে গিয়ে সর্বসমক্ষেই বলে ফেলেন—'রাজার বাড়ি দুর্গোপুজো, নেমন্তন্নে আসা গেছে। সেপাই খাও, সান্ত্রী খাও, গোরা কনসটেবল খাও, ফরাস, তাকিয়া, চেয়ার, কৌচ খাও, ঝাড়, সেজ, দেলগিরি বেল-লণ্ঠন খাও; কিন্তু লুচি সন্দেশের যদি প্রত্যাশা কর, তবে সরে পড়।'

পরের বছর সিংহ মশায় নিজের বাড়ির পূজায় রাস্তার দুধারে রোশনাই বেঁধে মজলিস করে হাজার হাজার লোককে নিমন্ত্রণ করে ভূরিভোজন করান।

এসবের অধিকাংশই এখন অতীতের স্মৃতি। সেসব জৌলুশের উৎসব আর নেই, কোথাও পূজা উঠে গিয়েছে, কোথাও-বা, নিয়মরক্ষা বা উইলের দায়ে অনুষ্ঠিত হয়। আর সব হুজুগে বারোয়ারি। ঘুঁটে-প্যাকাটির অভিনব প্রতিমা দর্শন করুন!

তার চেয়ে চলুন কলকাতা ছাড়িয়ে গ্রামবাংলায়, এখনো ঐতিহ্যবাহী চণ্ডীমণ্ডপগুলির আটচালায়, আটচালায়।

কলকাতা ছাড়িয়ে, কিন্তু উপকণ্ঠে নয়। কলকাতার ক্রমবিস্তারী পক্ষপুট ঢেকে ফেলেছে, উপকণ্ঠের চণ্ডীমণ্ডপগুলিকে। চারদিক ঘিরে বসত-বস্তি। মাঝখানে চণ্ডীমণ্ডপ যেন অবাঞ্ছিত পোড়ো বাড়ি। দেবতা বিদায়, দুর্বৃত্তের আস্তানা। কোথাও-বা এজমালি সম্পত্তি। কারো দায় নেই সারানোর। বরং যতো দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়, ততোই মঙ্গল। বসতবাটিখানা সম্প্রসারিত করা যায়। হতে পারে জঞ্জালমুক্ত গারডেনিং। এই দৃশ্যই দেখতে পাবেন গ্রামবাংলার দিকে এগোতে এগোতে। সব প্রাচীন শিল্পকলার স্বাক্ষর মিশে যাচ্ছে মৃত্তিকায়। পানিহাটীতে মুখার্জিদের শিল্পালংকৃত চণ্ডীমণ্ডপটির পতনোন্মুখ দশাটি দেখলেই বুঝতে কষ্ট হয় না এই অবস্থাটা। আড়িয়াদহে দেখতে পাবেন দেওয়ান দাতারামের বিখ্যাত চণ্ডীমণ্ডপে এখন মাছের বাজার বসেছে। পথের পাশে পাশে এমনি ভিখারির পান্থশালা, শয়তানের আস্তানা, বটবৃক্ষের ভিত সব পরিত্যক্ত দুর্গাদালান। এখানে নয়।

আমরা যাবো গ্রামবাংলার প্রান্তে প্রান্তে, কাঁচামাটির পথ বেয়ে, বহু শত বৎসরের ঐতিহ্যোজ্জ্বল সব চণ্ডীমণ্ডপের সামনে, সব কিংবদন্তীর পূজা দেখতে। দেখব বঙ্গের দুর্গা-বিচিত্রা। দেবী সেখানে কেবল দশভুজা নন, কোথাও দ্বিভুজা, কোথাও ত্রিভুজা, কোথাও চতুর্ভুজা এমনি করে অষ্টভুজা থেকে অষ্টাদশভুজা পর্যন্ত। কতো বিচিত্র তাদের গাত্রবর্ণ। কোথাও কৃষ্ণদুর্গা, কোথাও শ্বেতদুর্গা, কোথাও নীলদুর্গা, আবার কোথাও-বা রক্তদুর্গা। কখনো দেবী সিংহবাহিনী, বৃষবাহিনী, কখনো ব্যাঘ্রবাহিনী, কখনো-বা সিংহ-ব্যাঘ্র-উভয়বাহিনী। এবং কোথাও শংকরের অঙ্কশায়িনী।

পূজায় বাজি পোড়ানো দেখার পর মল্লরাজের চণ্ডীমণ্ডপে এসে দেখুন আজও পূজায় কামান গর্জায়। কৃষ্ণনগরে তোপধ্বনি হয়। শুনুন বৈকুণ্ঠপুরে নরবলির পর কলজেভাজা খাওয়ার কাহিনী। অষ্টমীর রাতে কামতাপুররাজের দেবীপূজায় দেখুন মোষ, ছাগ, শূকর, কাছিম আর টুনটুনি পাখী বলি। দেখুন চিলকিগড়ের জঙ্গল-পাহাড়ের মধ্যে মণ্ডপের বলির রক্তধারা কেমন করে নালা দিয়ে ডুলুং নদীতে নেমে জলকে লাল করে দেয় আজও। প্রত্যক্ষ করুন আদিবাসী যুবক-যুবতীরা কেমন করে মণ্ডপের সামনে নগ্ন দেহে লতাপাতা জড়িয়ে নৃত্যোৎসবে মাতে। ভীমা, ভয়ঙ্করী মূর্তির পাশে স্নেহময়ী মাতৃমূর্তি, আবার পরম বৈষ্ণবী রূপ দেবীর।

দামিনায় দেখবেন চণ্ডীমঙ্গল প্রণেতা কবিকঙ্কণ-এর প্রতিষ্ঠিত দুর্গা পূজা আজও চলছে কেমন করে। দেখতে পাবেন, পরমবৈষ্ণব বৃন্দাবন দাসের পাটে কেমন করে শাক্ত পূজা হচ্ছে। এমনকি দেখে আশ্চর্য লাগবে কেমন করে সমুদ্রগড়ের মুসলমান বাড়িতে পূজা হচ্ছে মহিষমর্দিনীর।

মুসলমান বাড়িতে দুর্গাপূজা! কথাটা হঠাৎ অবিশ্বাস্য ঠেকতে পারে। তাই আগেই বলে নিই। কলকাতা থেকে কাটোয়ার পথে সমুদ্রগড় স্টেশন। প্লাটফরমের এক পাশে বর্ধমান, আর পাশে নদীয়া। সমুদ্রগড় বর্ধমানে। সমুদ্রগড়ের রাজা ছিলেন রণজিত ভট্টঠাকুর। নবাব তখন মুরশিদকুলি খাঁ। দোর্দণ্ডপ্রতাপ তাঁর। সমুদ্রগড়ের হিন্দু রাজা রণজিত ভট্টঠাকুর একবার নির্দিষ্ট সময়ে দিতে পারলেন না নবাবের খাজনা মিটিয়ে। তাঁর প্রতি নবাবের শাস্তি বিধান

প্রত্যক্ষ করুন আদিবাসী যুবক-যুবতীরা কেমন করে মণ্ডপের সামনে নগ্নদেহে লতাপাতা জড়িয়ে নৃত্যোৎসবে মাতে। ভীমা, ভয়ঙ্করী মূর্তির পাশে স্নেহময়ী মাতৃমূর্তি, আবার পরম বৈষ্ণবী রূপ দেবীর।

দুর্গোৎসবের প্রসঙ্গে নদীয়া, বিশেষ করে কৃষ্ণনগরকে স্মরণ করতেই হবে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উৎসাহেই দুর্গাপূজা সারা বঙ্গে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ রাজা ভবানন্দ ষোল শ' ছয় খ্রীস্টাব্দে মাটিয়ারিতে যে দুর্গাপূজা প্রবর্তন করেন সে পূজা মহারাজা রুদ্র শুরু করেন ষোল শ' বিরাশিতে, কৃষ্ণনগরে রাজধানী পত্তন করে। সেই পূজাই চলছে আজও। চলছে সেই চণ্ডীমণ্ডপেই। এখানেই ক্ষৌমবস্ত্র পরে, নগ্ন পদে দাঁড়িয়ে দেবীর পূজারতি দেখতেন নদীয়াধিপতি। এই নাটমন্দিরেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে রামপ্রসাদ গেয়ে গিয়েছেন তাঁর মাতৃবন্দনার গান। আপনি এখানে এসে দাঁড়াতে পারেন আজ। আজো পূজা হয় এখানে।

দ্বিভূজা দুর্গা দেখতে পারেন নদীয়ার পাবখালিতে। হুগলির পাটুলির দুর্গাও দ্বিভূজা। আবার লর্ড ক্লাইভের দেওয়ান রায় রায়ান রামচন্দ্র সেনের অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত কাঠের চণ্ডীমণ্ডপে পূজা হচ্ছে স্বপ্নাদিষ্ট ত্রিভূজা প্রতিমার। আঁটপুরেও ষোল শ' চুরাশিতে নির্মিত কাঠের চণ্ডীমণ্ডপে পূজা হয় বর্ধমান রাজের দেওয়ান কন্দর্প মিত্র বাড়ির। চুঁচুড়ায় সপ্তগ্রামের সাগর দত্তের বাড়ির অভয়াদুর্গাও দ্বিভূজা। দেবী সিংহবাহিনী নন এখানে। তিনি পদ্মাসীনা। সাগর দত্ত চৈতন্যপার্ষদ উদ্ধারণ দত্তর বংশধর। পূজাও তাই বৈষ্ণবমতে। এখানে মহিষাসুর নেই। আবার এখানকার রাঢ়ী সুবর্ণবণিকদের পূজা—শিবদুর্গার। এখানে শিবের কোলে পার্বতী। পূজা হয় পূর্ণ তান্ত্রিক পদ্ধতিতে।

ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজবাড়িতে পূজা হয় আজও জলঘড়ি দেখে সময় স্থির করে। ভূরিশ্রেষ্ঠ বা ভুরশুটরাজ রুদ্র নারায়ণ নির্মিত মণ্ডপে এই পূজা সনাতন প্রথায় অনুষ্ঠিত হয়।

মেদিনীপুরের পাশকুঁড়া এলাকায় আছে অষ্টভূজা মৃন্ময়ী বরোজ চণ্ডী। কালকেতু ফুল্লরার স্মৃতিবিজড়িত গোলাহাটে এলে দেখতে পাবেন চণ্ডীমূর্তির পূজা।

ত্রিবেণীর বিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন জন্মান সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। সেখানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আড়াই শ' বছরেরও বেশি প্রাচীন দুর্গাপূজা আজও অনুষ্ঠিত হচ্ছে সুপ্রাচীন মণ্ডপে। এখানেই ত্রিবেণীর বাঁধানো ঘাটে স্নান সেরে খড়্গ হস্তে নিজেই ছাগবলি দিতেন তর্কপঞ্চানন। ত্রিবেণীর তীরে স্মৃতির এই পীঠভূমিতে দাঁড়িয়ে এই পূজা দেখতে পাবেন আপনি।

বীরভূম তো পরম শক্তি পীঠ। রাজা সুরথ-এর সুপুর এখানেই অবস্থিত। দুর্গাপূজা আর বলির শেষ নেই এ জেলায়। বলির জন্য খ্যাত বলিপুরই বর্তমান বোলপুর। বক্রেশ্বরে আছে অষ্টাদশভূজা মহিষমর্দিনীর পূজা।

কান্দীর নবগ্রামে পূজা হয় পদ্মাসীনা দশভূজা দুর্গার। প্রাচীন পদ্ধতিতে দুর্গাপূজা, আজও দেখতে পাবেন মহিষাদলের গর্গরাজাদের চণ্ডীমণ্ডপে। মালদার প্রাচীন জনপদ একবর্ণায় মৈথিলি ব্রাহ্মণেরা শারদ দুর্গার পূজাশেষে হরির লুট দেন। দশমীতে কালিন্দী নদীতে হয় নৌকা বাইচ। হাওড়ার রসপুরে নিমকাঠের দুর্গা প্রতিমার পূজা হয়। আবার বাঁকুড়ার পাত্রসায়েরে ভয়াল রঙ্কিনী দেবী দশভূজা। শরৎকালে রঙ্কিনীদুর্গা পূজা হয় মণ্ডপে নয়—এক পাকুড় গাছের তলায়।

কলকাতার পূজার 'চণ্ডীপাঠ' থেকে 'ব্র্যাণ্ডিপান' পর্যন্ত অনেক নকশা সর্বজ্ঞাত। চণ্ডী বা দুর্গারও এখানে অন্যরূপ। যা দেখে গ্রান্টসাহেব বলেছেন—দুর্গা হচ্ছে হিন্দুর একমাত্র হিরোইন।

গাছের তলায় বা বন [illegible] দুর্গাপূজার রেওয়াজ অনেক জায়গাতেই আছে। কোথাও কোথাও এর নাম বনদুর্গা। চব্বিশ পরগনার বহু স্থানে, বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকায় গিয়ে দেখবেন সর্বত্র বনবিবির পূজা। এই বনবিবি আসলে বনদুর্গা। বনবিবির ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তাঁরা বনবিবির পূজা করেন দুর্গামন্ত্রে।

এইভাবেই সারা বঙ্গের সর্বত্র ছড়ানো দুর্গার বিচিত্র পূজায়োজন। সর্বত্র তাঁর আসনখানি পাতা। এ ব্যাপারে অবশ্য রাজা-জমিদারদের রাজকীয় জাঁক জৌলুশ অতুলনীয়। এবং এর প্রসারের জন্যই তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা অনস্বীকার্য। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রয়াস সর্বাধিক। রাজ্য মধ্যে দুর্গাপূজা প্রসারের জন্য তাঁর নির্দেশ জারি করা ছিল। এ-পূজা বায়বহুল বলে কার্যনির্বাহে অনেককে তিনি অর্থ সাহায্যও করতেন বলে জানা যায়। নাটোর এবং বর্ধমানরাজেরও এ কার্যে উৎসাহ দানের খবর পাই। 'সমাচারচন্দ্রিকা'র একটি উদ্ধৃতি—'যবনাধিকার কালে এ প্রদেশের বহুতর হিন্দু জমিদার আর রাজাই কহ ইহারা থাকাতে উক্ত কর্ম লোপ হয় নাই। বিশেষ নদীয়া, নাটোর, বর্ধমান এই তিন চারিজন রাজার অধিকারের মধ্যে যে ব্যক্তির কিঞ্চিৎ সংস্থান হইত তিনি পূজা না করিলে রাজারা তাহারদিগকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিতেন পূজা অবশ্যই করিবা।'

এর ফলে দুর্গা পূজা প্রসারিত হয় গোটা বঙ্গদেশে। প্রতিষ্ঠিত হয় অজস্র কারুকার্যময় পূজামণ্ডপ, চণ্ডীমণ্ডপ, ঠাকুরদালান, দুর্গাদালান ইত্যাদি। নরবলির ধূসর যুগ পেরিয়েও ঢাকের বাদ্যির সঙ্গে মোষবলি, পাঁঠাবলি, সন্ধ্যারতি, সন্ধিপূজার ধুন্ধুমারে গমগম বঙ্গের বাতাস। ওপার বঙ্গেও তাই। মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর 'ন হন্যতে' গ্রন্থে পূর্ববঙ্গে তাঁর গ্রামের বাড়ির দুর্গাপূজায় মোষবলির প্রসঙ্গ তুলে বলেছেন, গৃহকর্তা জ্যেষ্ঠতাতকে অনেক বলিবিরোধী যুক্তিজাল সহ সুদীর্ঘ ভাষণ দিয়েও ব্যর্থ হন তিনি। কবিরাজ জ্যেষ্ঠতাত সর্বক্ষণ তামাক টেনে গেলেন এবং ওঁর সমগ্র ভাষণকেই যেন তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে উড়িয়ে দিলেন। পরে শুধু মন্তব্য করেছিলেন—'নরেনের মাইয়াডা বড় কুতার্কিক'।

আমি বোধ হয় পাত্রপাত্রী ও ঘটনাস্থলকে জানি। গৈলা গ্রামের ওই বাড়িটির নাম কবীন্দ্রবাড়ি। আমাদের বাড়ি তার পাশেই। জ্যেষ্ঠতাত, বিখ্যাত কবিরাজ ললিতমোহন কবিসাগর। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর কন্যা মৈত্রেয়ী একবার তাঁর বাড়িতে একটি মোষ বলি দেখেই বিচলিত। কিন্তু প্রতি বছর পূজায় বাড়ি গেলে দেখতেন, কোন কোন বছর মানতের জোড়া মোষও বলি হয়েছে তাঁদের বাড়ির পূজায়। চল্লিশের দশক পর্যন্ত আমি তার

প্রত্যক্ষদর্শী। এবং ওই গ্রামে কেবল ওই একটি বাড়িতে নয়, আট-দশ বাড়িতেই মোষবলি হোত। শতাধিক মণ্ডপে সমৃদ্ধ বৃহৎ গ্রামটিতে পাঁঠাবলি যে কতো হোত তার ইয়ত্তা নেই। ওপার বঙ্গের অন্যত্রও একই চিত্র ছিল। ছিল বলছি এ জন্য, এখন তা থাকতে পারে না। আর কতটা আছে তা দেখবার জন্য আমারও অধিকার নেই কাউকে আমন্ত্রণ জানাতে। তবে সে পূজা নেই—তা অনুমেয়। সে পূজা নেই এখানেও। কারণ রাজা-জমিদার বিদায় নিয়েছেন। এখন বারোয়ারির মেরাপ বাঁধা মাইকোৎসব। বারোয়ারির মধ্য দিয়ে বিদায় নিল চণ্ডীমণ্ডপ। বিদায় নিল পূজা। দুর্গাপূজা হোল দুর্গোৎসব। এবং উৎসব ছেড়ে উন্মত্ততা।

গ্রাম বাংলার প্রথম বারোয়ারি গুপ্তিপাড়ার। তারপরই শান্তিপুর, উলা প্রভৃতি জায়গায়। এই পূজা সম্পর্কেই সমাচার দর্পণের খবর—শান্তিপুরে পাঁচ লাখ টাকা ব্যয়ে এক দুর্গাপূজা হোল। তার হিড়িক চলল পরবর্তী ছ'বছর ধরে। প্রতিমার উচ্চতা হয়েছিল ষাট হাত। অত বড় প্রতিমা গঙ্গায় বয়ে নিয়ে বিসর্জন দেওয়া যখন সমস্যা হল, তখন উদ্যোক্তারা প্রতিমা খণ্ড খণ্ড করে নিয়ে বিসর্জন দেয়। টেক্কা দিল ওরা গুপ্তিপাড়ার ওপরে।

বদলা নিল গুপ্তিপাড়া। তারা এক গণেশপূজা জুড়ে দিল মাঠাকাপড় আর কাচা পরিয়ে। লোকে প্রশ্ন তুলল, কাচা কেন গণেশের? গুপ্তিপাড়ার জবাব—শান্তিপুরে মায়ের অপঘাত মৃত্যু ঘটেছে বলেই মাঠা-কাচা পরেছেন গণেশ!

কলকাতা বা শহরের হালের হিড়িক-মত্ততা-বর্ণন বাহুল্য মাত্র।

তবু শহর ছাড়িয়ে সুদূর বঙ্গে এখনো কিছু কিছু দুর্গাপূজা রয়েছে অতীতের সাক্ষী রূপে চণ্ডীমণ্ডপে বিধৃত। যেখানকার আটচালায়, নাটমন্দিরে পূজার সময় শত শত বছর পিছনের গন্ধ-পবন ফিরে ফিরে আসে, ঘিরে রাখে সম্মোহনে সকলকে।

তবে এরূপ অধিক দিন থাকবে না। যেমন কালের হাওয়ায় লাল দুর্গা হলুদ হয়ে গিয়েছে বৈকুণ্ঠপুরের রাজবাড়িতে। যেমন অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত বালিদেওয়ানগঞ্জের মন্দির পরিত্যক্ত হয়ে পূজা হচ্ছে প্যাণ্ডেলে। আজ আছে শুধু বর্তমান জোড়বাংলা গঠনের মন্দির প্যানেলে উৎকীর্ণ উপেক্ষিত মহিষাসুরমর্দিনী। এমনি বহু বর্জিত মন্দির হয়েছে দুর্বৃত্ত-জন্তুজানোয়ারের আস্তানা। বহু মণ্ডপ জীর্ণ, বহু-বা ধ্বংসস্তূপে পরিণত। পূজা না হলেও যে চণ্ডীমণ্ডপগুলি অতীতের ঐতিহ্য নিয়ে আজও আগন্তুককে হাতছানি দেয় তার বৈভবের কাছে আপনা থেকে আনত হয় শির। আর মনে বিস্ময় জাগে এই দেখে—কতো রূপে, কী ব্যাপক প্রতিষ্ঠায় জগজ্জননী দুর্গা বিরাজিত বঙ্গে। অজান্তেই উচ্চারিত হবে—ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরণ্য। কেবল শক্তি বা শৈব স্থলে নয়, বিষ্ণুমন্দিরও অলঙ্কৃত দুর্গা প্রতিমায়। বৈষ্ণবদেরও কোন দ্বিধা হয়নি বিষ্ণু-মন্দির শীর্ষে দেবী ভগবতীকে স্থান দিতে। তিনি তো 'অনন্তবীর্যা বৈষ্ণবীশক্তি'। বঙ্গে যতো মন্দির তার মধ্যে দুর্গামন্দির সর্বাধিক। যেসব

একদা নাকি এক নবমী পূজার দিন মন্দিরের সামনে থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায় এক কিশোরী। সারা গ্রামে বিষাদের ছায়া। মাকে খুব ডাকতে থাকেন পুরোহিত। রাতে তিনি শুনতে পান স্বপ্নের ঘোরে, মা যেন বলছেন, বিধিমতে তাঁর ভোগ হয়নি এদিন। তাই তিনি কিশোরীকে জ্যান্ত গিলেছেন। সে এখনও জ্যান্তই আছে তাঁর পেটে। ঠিক মতো পূজো ভোগ হলেই ওরা পেয়ে যাবে কিশোরীকে। তাই হল। ভোগের পরেই পেট চিরে বেরিয়ে এল কিশোরী। সেই থেকে পেট কেটে রাখা হয় প্রতিমার। নাম পেটকাটি।

মন্দিরে শিব, কালী, রাধা-গোবিন্দ পূজিত, সেখানেও মন্দিরগাত্রে, তোরণশীর্ষে দশভুজা খোদিত। এর কিছু যে আদিতে দুর্গা মন্দির এবং পরে পরিবর্তিত তা বুঝতে কষ্ট হয় না। কোথাও বা মূল মন্দির শিব-কালী বা রাধা-মাধবের। তবু দুর্গা তাঁদেরও শিরোধার্য। বঙ্গের কারুশিল্পশোভার স্বাক্ষর এই মন্দিরগুলি অবলোকন করতে করতে এই পরম সত্য উপলব্ধ হবে।

জয়দেবের কেন্দুলিতে আছে রাধা-মাধবের নবরত্ন মন্দির। সে মন্দিরেও দেখতে পাবেন অলঙ্কৃত দুর্গামূর্তি। চণ্ডীদাসের নানুরে আটচালার বাশুলি মন্দিরেও দুর্গা মূর্তি খোদাই করা। তারাপীঠেও আটচালা মন্দির। তারও প্রবেশপথে দুর্গা। আসুন বিষ্ণুপুরে। পোড়ামাটির শিল্পকর্মশোভিত অপূর্ব কৃষ্ণ রায়ের মন্দির, তারও প্যানেলে দুর্গা। দুর্গা—সোনামুখীতে শ্রীধরের পঁচিশ রত্ন মন্দিরের দেয়ালে। মেদিনীপুর শহরে বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দির। দুর্গাচিত্র সেখানেও। দাসপুরের রঘুনাথ মন্দিরের তোরণশীর্ষে অপূর্ব অকালবোধন চিত্র। দশভুজার কাছে পূজারত রামচন্দ্র। এখানকার লক্ষ্মী-জনার্দনের পঞ্চরত্ন মন্দিরেও দুর্গার প্যানেল। অকালবোধন দৃশ্য কেশপুর থানার ঘোষপুরের মন্দিরেও।

হুগলিতে বংশবাটির রাজাদের বিখ্যাত বাসুদেব মন্দির। দেওয়ালে তার দুর্গা খোদাই। মহিষমর্দিনী আছেন হরিপালের রাধা-গোবিন্দ মন্দিরে। গোকর্ণ গ্রামে আছে ষোল শতকে নির্মিত অতি প্রাচীন এক সুন্দর ঐতিহাসিক নৃসিংহ মন্দির। মন্দিরের পোড়ামাটির কাজ বিস্ময় জাগায় আজও শিল্পীদের। এই মন্দির গাত্রে দেখতে পাওয়া যাবে পোড়ামাটির অপূর্ব চতুর্ভুজা দুর্গা। কালনায় বর্ধমান রাজের প্রতিষ্ঠিত এক বিখ্যাত শিবমন্দির আছে। মন্দিরের ত্রিখিলান তোরণে দেখতে পাবেন রাম-রাবণে যুদ্ধ হচ্ছে, মাঝখানে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে দুর্গা, রাবণবধে উদ্যত। বর্ধমান শহরের সর্বমঙ্গলা মন্দিরের গায়ে রয়েছে চালিসমেত দুর্গামূর্তি। দেবী এখানে সিংহবাহিনী হলেও—ঘোড়ার মুখের মতো পৌরাণিক সিংহ।

বীরভূমের মামুদবাজারের গণপুর গ্রাম প্রচুর পুরাকীর্তি-সমৃদ্ধ মন্দিরের ঐশ্বর্যে ভরা। এখানকার একাধিক মন্দিরে দুর্গামূর্তি রয়েছে। বিশেষ করে একটি চারচালা শিবমন্দিরের সামনে দেখা যাবে রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃশ্য এবং তার মাঝখানে খড়্গধারিণী দশভুজা। এখানকার একটি আটচালা বিষ্ণুমন্দিরেও দেবী দুর্গা শোভমানা। ইলামবাজারের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরের তোরণখিলানে অপূর্ব দুর্গা দৃশ্যমান।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের গ্রাম হাওড়ার পেঁড়ো। সেখানে পঞ্চরত্ন শিখরদেউলগাত্রে খোদিত দুর্গামূর্তি। চব্বিশ পরগনার ইছাপুরে গোবিন্দজিউর মন্দিরে, হিঙ্গলগঞ্জের রাধা-গোবিন্দ মন্দিরে এবং ভাটপাড়ার শিবমন্দিরেও পাবেন দেবী দশভুজাকে।

তাছাড়া দুর্গামূর্তি উৎকীর্ণ মেদিনীপুরের মালঞ্চে তিন শ' বছরের প্রাচীন দক্ষিণাকালী

মন্দিরে, কর্ণগড়ে শিবমন্দির, ইটাণ্ডায় আর পারামবুয়ার কালীমন্দিরে। সুখারিয়া গ্রামে মুস্তাফিদের বিখ্যাত পঞ্চবিংশতিচূড় কালীমন্দিরের তোরণশীর্ষেও দেখবেন পোড়ামাটির অপূর্ব ভগবতী। এবং শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর আটচালা মন্দিরের খিলানেও অধিষ্ঠিতা সপরিবার দেবী দশভুজা।

পরম কথা, এই দেবীকে নিয়ে বাঙালির জীবন আবর্তিত হয়ে এসেছে। তিনিই আমাদের ধ্যানের বিন্দু। কখনো তিনি আমাদের কন্যা, কখনো মাতা, কখনো দেশমাতৃকা, কখনো বা জগজ্জননী, জগৎপালিনী, শত্রু-সংহারিণী, আমাদের সর্বস্বরূপিণী।

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা নিজের হাতে দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দেন না। কারণ তাঁরা মনে করেন দেবী তাঁদের আদরের কন্যা। পিতা হয়ে কেমন করে পাদ্যঅর্ঘ দেবেন! দেবীচরণে অঞ্জলি দেন পুরোহিত। রাজা করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তখন তদগত হয়ে।

আবার স্বাধীনতার শহীদের বন্দেমাতরম ধ্বনির মধ্যে দুর্গা এবং দেশমাতৃকা অভিন্ন হয়ে যায়। গৃহস্থের কাছে তিনি শাকম্ভরী, সর্বৈশ্বর্যময়ী। সাধকের আকৃতি—ত্বমেবপ্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতু।

আদিতে এই জগজ্জননীর পূজা ছিল সর্বজনীন। রাজা-জমিদারদের মণ্ডপের পূজাতেও শাস্ত্রবিধিমতে সমাজের সব শ্রেণীর মানুষকে যুক্ত হতে হোত। এমনকি পতিতাও উপেক্ষিতা নয়। আজও কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির পূজায় প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী এক গণিকা হাজির থাকে মণ্ডপে। নববস্ত্র দেওয়া হবে তাকেও।

তবু পরে ধনাঢ্যদের সংকীর্ণতায় ধীরে ধীরে অপসৃত হচ্ছিল মাতৃপূজার এই সর্বজনিনতা। প্রথম যুগের বারোয়ারিতেও দেখি ব্রাহ্মণ্যপ্রাধান্য। জাতি-বর্ণ-শ্রেণী বিভেদ ভেঙে এই পূজাকে সর্বজনীন রূপ দেন স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে। সেটা উনিশ শ' এক সাল। আজ থেকে পঁচাশি বছর আগেকার ঘটনা।

আদর্শটি অনুপ্রাণিত করেছিল স্বামীজীর উত্তরসাধক নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে। তিনি উদ্বোধন করেন কলকাতার প্রথম সর্বজনীন দুর্গোৎসব বাগবাজার আর সিমলায়। এর পর থেকেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে সর্বজনীন দুর্গোৎসব। কিন্তু আর একটি ক্রিয়া ঘটতে শুরু করে এর মধ্য দিয়ে। পূজা হল গৌণ, উৎসব মুখ্য। এবং পরে উৎসবও গৌণ হয়ে উন্মত্ততাই পাচ্ছে প্রাধান্য। কোথাও কোথাও তা উৎপীড়নের নামান্তর। সর্বজনীনের বিরুদ্ধে বলছি না। বলা যাবেও না। দৃষ্টান্ত টানার সম্ভাবনা আছে নেতাজী থেকে। কিন্তু তাঁর ভক্তি, তাঁর নিষ্ঠা, তাঁর আকুলতা? সে কোথায়, কার মধ্যে সন্ধান পাবো তার? নেতাজীর কোদালিয়ার বাড়িতে আজও দুর্গাপূজা হয় মণ্ডপে। কিছুকাল আগেও সেই মণ্ডপে বসে নেতাজীর বয়সী, তাঁর আমলের বৃদ্ধ প্রতিমাশিল্পীর মুখে শুনেছি বালক সুভাষের ভক্তি-বিশ্বাসের কাহিনী। সকাল করে স্নান সেরে উঠে সেই যে মন্দিরে নববস্ত্র পরে পুরোহিতের চণ্ডীপাঠ শুনতে বসতেন, শেষ না হলে উঠতেন না, জলস্পর্শ করতেন না। প্রতিমার দিকে তাকিয়ে চোখে আবেগের অশ্রু ভাসতো তাঁর। প্রতিমা শিল্পীর এই বিবরণের সত্যমর্ম বুঝতে কষ্ট হয় না যখন তাঁর মায়ের কাছে লেখা বাল্য-কৈশোরের চিঠিগুলি পাঠ করি। তাঁর প্রায় সব চিঠির শিরেই লেখা—'শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়'। একটি চিঠির কটি ছত্র এখানে চয়ন করছি। শৈশবে তিনি কটকে থাকতেন। পূজায় সেখানকার স্কুল থেকে ছুটি পেলেন না কিশোর সুভাষ। সেবার দুর্গাপূজায় কোদালিয়ার বাড়িতে উপস্থিত থাকতে পারছেন না বলে তাঁর মনের বেদনা প্রকাশ করে মাকে চিঠিতে লিখছেন—

'মা, এবার একটি দুঃখ রহিয়া গেল। বড় বেশি দুঃখ—সাধারণ দুঃখ নহে। এবার দেশে যাইয়া সেই ত্রৈলোক্যপূজ্যা, সর্বদুঃখহারিণী, মহিষাসুরমর্দিনী, জগন্মাতা দুর্গাদেবীর সর্বাভরণভূষিতা, নানা সাজসজ্জিতা, দেদীপ্যমানা, জ্যোতির্ময় মূর্তি দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিতে পারিলাম না, এবার পুরোহিত মহাশয়ের সেই মধুর, পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ বা তাঁহার শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি কর্ণগোচর করিয়া শ্রবণশক্তি চরিতার্থ করিতে পারিলাম না।...সর্বোপরি এবার পুরোহিত প্রদত্ত শান্তিজলের অভাবে শান্তিলাভ করিতে পারিলাম না, সবই নিষ্ফল হইল!' জননী, জগজ্জননীর জন্য কার, কোথায় আজ এ হৃদয়-আকুতি! *রেখাচিত্র : সুধীর মৈত্র*

প্রচ্ছদ নিবন্ধ
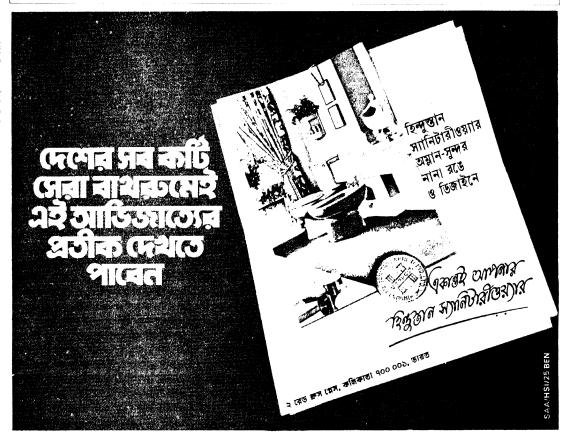
এক বিদেশী শিল্পীর চোখে সেকালের পূজা-পার্বণ

অভী দাস

সলভিন ভারত তথা হিন্দুদের সম্পর্কে প্রায় কিছু না জেনে এদেশে উপস্থিত হন। তাঁর আঁকা ছবি বস্তুনিষ্ঠ, উচ্ছ্বাস বা অবজ্ঞা বর্জিত। তাঁর চিত্র ও বিবরণ দুই শতাব্দী পূর্বের, বিশেষত বাংলার সমাজ জীবনের মূল্যবান প্রামাণ্য দলিল।

হিন্দুর জীবন জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত মন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এর প্রগাঢ় প্রভাব পড়েছে তাদের সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি ও চিন্তাধারায়। তাই হিন্দুদের জানতে হলে, মানসিকতাকে সম্যক উপলব্ধি করতে হলে তাদের ধর্মবিশ্বাস, পূজা-পার্বণ ও আচার-অনুষ্ঠানের একান্ত পরিচয় লাভ করা অবশ্য প্রয়োজন। ইউরোপীয়দের ভারত আগমনের কাল থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত যে সব পাশ্চাত্য শিল্পী এ দেশে এসেছিলেন তাদের মধ্যে সলভিনই একমাত্র লোক যাঁর শিল্পকর্ম মূলত এই উপলব্ধিতে অনুপ্রাণিত। তিনি ভারতে দীর্ঘ কাল ছিলেন, বহু রাজ্য গ্রাম নগর পরিদর্শন করেছেন, উচ্চ মহল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সকলের সঙ্গে মিশেছেন, উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, তাদের শাস্ত্র ও ধর্ম-বিশ্বাস জানবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল হিন্দুদের দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দুদের নিজস্ব পরিচয় লাভ করা। বস্তুত সেকালের তিনিই একমাত্র শিল্পী যিনি হিন্দুদের বর্ণাশ্রম, বৃত্তি, শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহণ, নৃত্য, সঙ্গীত, পূজা-পার্বণ—এক কথায় সমাজ জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে সমানভাবে বিচরণ করেছেন। তাই তাঁর শিল্পকর্ম সেকালের সমাজ জীবনের এক নির্ভরযোগ্য চিত্ররূপ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিভিন্ন রিপোর্ট ও পত্রাবলী, খৃষ্টীয় মিশনারী ও বিদেশী পরিব্রাজকদের বিবরণ ও

দুই শতাব্দী আগে সলভিনের আঁকা দুর্গা প্রতিমা

দিনলিপি ইত্যাদি থেকে সে সমাজের পরিচয় অবশ্যই পাওয়া যায়। তবে সে সব অক্ষরবিন্যস্ত প্রতিভাস মাত্র। সলভিনের চিত্রগুলি তুলি-কলমে বিধৃত বাস্তব রূপ ; এবং সেগুলি রঙিন হওয়ায় দুই শতাব্দী পূর্বের রঙে-রসে মণ্ডিত মোহময় প্রেক্ষাপটে ফিরে যাবার এক অপূর্ব সুযোগ এনে দেয়।

সলভিনের পুরো নাম ফ্রাঁসোয়া বালতাজার সলভিন (Francois Baltazard Solvyns)। তিনি বেলজিয়ামের মানুষ। জন্ম ১৭৬০ সালে আন্তোয়ার্পে। ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকার দিকে তাঁর দারুণ ঝোঁক। মাত্র বার বছর বয়সে রৌদ্র-বৃষ্টি-ঝড়ে বিচিত্ররূপী উত্তর সাগরের ছবি এঁকে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। এক সময়ে তাঁর ছবি আর্ক ডাচেস মারিয়া ক্রিস্টিনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ক্রিস্টিনা ছিলেন বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় জোসেফের (রাজত্ব কাল ১৭৮০—৯০) ভগ্নী এবং নেদারল্যান্ডের অন্যতম গবর্ণর। ক্রিস্টিনা তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন এবং যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন ততদিন সলভিন তাঁর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হননি।

সেকালের রামায়ণ গান। ঠাকুর হাতে চামর দুলিয়ে রামলীলা গাইছেন

সলভিন স্যার হিউম পোফামের সঙ্গে প্রাচ্য দেশ অভিমুখে সমুদ্র যাত্রা করেন ; তবে ঠিক কত সালে তাঁদের যাত্রা শুরু হয়েছিল তা জানা যায় না। তিনি লোহিত সাগরের উপকূলভাগ জরিপ করেছিলেন। তারপর ভারতে এসে পৌঁছোন। তিনি ব্যাপকভাবে এ দেশ পরিভ্রমণ করেন। তখন টিপু সুলতানের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ চলছে। শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধের সময় (ফেব্রুয়ারী, ১৭৯২) সলভিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ভারতে অবস্থান কালে সলভিন হিন্দু শাস্ত্র, আচার-অনুষ্ঠান ও জীবন-ধারা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করেন। স্যার উইলিয়ম জোন্স এ বিষয়ে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তিনি কলকাতা থেকে তাঁর প্রথম চিত্রাবলী প্রকাশ করেন ১৭৯৯ সালে। সলভিনের বিশাল চিত্র-গ্রন্থ Les Hiudus পারী থেকে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এটি L' Institut de France-কে উৎসর্গীকৃত। এ জন্য তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেছেন।

সলভিনের শেষ জীবন কাটে আন্তোয়ার্পে। দেশে ফিরে তিনি আন্তোয়ার্প বন্দরের ক্যাপ্টেন হন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১০ অক্টোবর ১৮২৪।

তাঁর মোট তিনটি চিত্রগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমটি প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে ১৭৯৯ সালে এর নাম : A collection of two hundred and fifty coloured etchings descriptive of the manners, customs and dresses of the Hindoos। এর দুটি খণ্ড। বইয়ের মূল্য উল্লেখ নেই। প্রকাশক বা ছাপাখানার নামও নেই। রঙিন প্লেটগুলির আকার ৩৭·২×২৫·৩ সেঃ মিঃ। ছবি এবং সেগুলির পরিচিতি গ্রন্থের পৃষ্ঠার উপরে আঠা দিয়ে আঁটা। তাই মনে হয় ছবিগুলি বাইরের কোথাও থেকে ছাপিয়ে আনা হয়েছিল।

তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয় লন্ডন থেকে ১৮০৭ সালে। প্রকাশক : Edward Orme, Printseller to his Majesty and the Royal Family। এটির নাম : The costume of Hindostan elucided by 60 coloured engravings with descriptions english and French taken in the years 1798 and 1799। গ্রন্থকর্তার নাম Balt. Solvyns of calcutta বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সব ছবি রঙিন এবং সবগুলিই cut-out হিসেবে ছাপা। মুখবন্ধে সলভিন বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে মূল ড্রয়িংগুলি সবই বাংলাদেশে আঁকা হয়েছিল।

তাঁর তৃতীয় ও শেষ গ্রন্থটি হল Les Hindous। প্রকাশক : Chez L' auter, Paris। এর চারটি খণ্ডে মোট ২৮৮টি রঙিন ছবি আছে। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৮০৮ সালে, দ্বিতীয়টি ১৮১০ সালে, তৃতীয়টি ১৮১১ সালে এবং শেষ খণ্ডটি ১৮১২ সালে। এগুলিতে দুই আকারের ছবি আছে। বেশীরভাগ ছবির আকার ২৪·৭×৩৫ সেঃ মিঃ। কিছু ছবি, বিশেষত উৎসব-অনুষ্ঠানের ছবি দুই পৃষ্ঠাব্যাপী, বইয়ের মাঝে ভাঁজ করে বসান। এগুলির আকার ৫০×৩৫·২ সে মি। গ্রন্থের মূল্য উল্লেখ নেই। তবে একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে, প্রকাশ কালে এর মূল্য একশত গিনি নির্ধারিত হয়েছিল।

গ্রন্থের প্রথমেই একটি বিরাট মুখবন্ধ আছে। প্রত্যেকটি চিত্রের বিপরীত পৃষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট চিত্রের বিষয়, তার বিবরণ বা তাৎপর্য সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে ইউরোপীয় পাঠকদের কথা মনে রেখে। বৃটিশ মিউজিয়মের ক্যাটালগ অনুযায়ী মুখবন্ধটি সলভিনের নামে ছাপা হলেও এটি লিখে দিয়েছিলেন জি বি ডেপিং এবং ইংরাজীতে চিত্র-পরিচয় লিখেছিলেন মাদাম সলভিন। একটি চিত্র-পরিচিতিতে উল্লেখ আছে যে মূল স্কেচটি এঁকেছিলেন মাদাম সলভিন।

মুখবন্ধ যেই রচনা করে থাকুক না কেন এতে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে সলভিনের নিজস্ব মতামতই যে প্রকাশিত হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এ দেশ ও দেশবাসী সম্বন্ধে তাঁর অন্ধ মোহ যেমন ছিল না, তেমনি ছিল না ঘৃণা বা বিদ্বেষ। তিনি ভারতবাসীকে বাস্তব প্রেক্ষাপটে নিরপেক্ষ অথচ সহানুভূতিশীল মন দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন। মুখবন্ধই তার সাক্ষ্য বহন করছে।

তিনি লিখেছেন, 'হেরোডোটাস (খৃষ্ট পূর্ব ৪৮৪—৪২৫) থেকে শুরু করে মার্কো পোলো (খৃষ্টাব্দ ১২৫৪—১৩২৪) পর্যন্ত অনেকেই হিন্দুস্তান সম্বন্ধে অনেক গাল-গল্প প্রচার করেছেন। হেরোডোটাস বলেছিলেন, হিন্দুস্তানে কুকুরের মত বড় বড় এক জাতের পিপড়ে আছে, এরা স্থানীয় অধিবাসীদের গুপ্তধনের সন্ধান দিয়ে থাকে। অপরদিকে মার্কোপোলো প্রভৃতি ভারতকে স্বর্গরাজ্য বলে বর্ণনা করেছেন। এখানে নাকি সোনা রূপা ছড়িয়ে আছে, আর কতো যে অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস রয়েছে তার হিসেব নেই। বস্তুত ভারতবর্ষ উর্বর মস্তিষ্কের পক্ষে স্বপ্নজাল রচনার প্রশস্ত ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল।

ইতর জনেরা এই সব হাস্যকর গাল-গল্প শুনে হতবাক হলেও কিছু লোক স্বপ্নজাল ভেদ করে ভারতবাসীর আচার-আচরণ ও চরিত্র গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছে এবং জানতে পেরেছে যে, মনুষ্য জাতির মধ্যে হিন্দুরা এমন এক মানব গোষ্ঠী যাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, গর্ববোধ নেই, ঔৎসুক্য নেই, প্রকৃতি যা দিয়েছে তা নিয়েই তারা তুষ্ট এবং তাদের অন্তরে রয়েছে সেই প্রশান্তি যা পাশ্চাত্য দেশবাসী দর্শন ও বিজ্ঞানের জটাজালের মধ্য দিয়ে অর্জন করবার জন্য এতকাল ব্যর্থ চেষ্টা করেছে।

এপোলোনিয়াস তিয়ানাস (খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) বিশ্বের প্রধান প্রধান দেশগুলি পরিভ্রমণ করে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বলেছেন, 'আমি এমন এক মানব গোষ্ঠী দেখেছি যারা এই পৃথিবীতে থাকলেও এর সঙ্গে যুক্ত নয়, জনপদে বাস করলেও তার সঙ্গে বাঁধা পড়ে নেই, সব কিছু তাদের অধিকারে অথচ তারা কোন কিছুরই অধিকারে নেই।

তাই আমরা যখন দেখি হিন্দুদের সব কিছু, এমন কি আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জামও স্মরণাতীত কাল থেকে বংশ পরম্পরায় তারা লাভ করেছে এবং তাদের গার্হস্থ জীবন সুপ্রাচীন সাধনার ধারা বহন করে চলেছে, তখন সহজেই এটা উপলব্ধি করা যেতে পারে যে এই মানব গোষ্ঠীকে সঠিকভাবে জানতে গেলে এবং তাদের সম্বন্ধে একটা নির্ভুল ধারণা অর্জন করতে গেলে সেই মানব সমাজের মধ্যে দীর্ঘ কাল বাস করতে হবে। শুধু তাই নয়, দৃষ্টিশক্তি সজাগ রেখে তাদের প্রতিটি কাজকর্ম লক্ষ্য করতে হবে।

ভারতে দীর্ঘ ১৫ বৎসর কাল থেকে এই প্রখ্যাত জাতিকে তাদের নিজ দেশেই গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের যে সুযোগ লাভ করেছিলাম তারই সুফল আজ পরম আস্থার সঙ্গে সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করছি। যে ড্রয়িংগুলির উপর ভিত্তি করে গ্রন্থের প্লেটগুলি তৈরি সেগুলি আমি প্রকৃত ঘটনাস্থলে বসেই এঁকেছি। অন্যের উপরে এ কাজের ভার কখনও অর্পণ করিনি অথবা পূর্বসূরীদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিনি। এই কাজের জন্য আমি সময়ের দিকে তাকাই নি, দুঃখ-কষ্টের পরোয়া করিনি বা খরচের প্রতি নজর রাখিনি। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, প্রতিটি জিনিস আমি স্বচক্ষে দেখব, খুঁটিয়ে পরীক্ষা করব যাতে অঙ্কিত বস্তুর অতি সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যও ছবিতে নির্ভুলভাবে বিধৃত থাকে। যাঁরা আমার এই দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য কর্মের ফলশ্রুতি মনোযোগ দিয়ে দেখবেন তাঁরা এটা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন।'

সলভিনের এই দাবি যথার্থ। চিত্রগুলি তো বটেই, চিত্র-পরিচিতি থেকেও সেকালের পূজাপার্বণ, পোশাক পরিচ্ছদ বৃত্তি তথা সমাজ-জীবনের একটা নির্ভরযোগ্য পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সঠিক করে ভারতে এসে পৌঁছেছিলেন তা অবশ্য জানা যায় না; এবং ভারত ত্যাগ করে কবে স্বদেশে ফিরে যান তা তিনি কোথাও উল্লেখ করেননি। গ্রন্থের মুখবন্ধে শুধু জানিয়েছেন যে তিনি এ দেশে ১৫ বৎসর ছিলেন। তাঁর প্রথম চিত্র-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৯৯ সালে কলকাতা থেকে। মনে হয় সম্ভবত তিনি ১৭৮৫ সালে ভারতে এসে পৌঁছেছিলেন। তাই তাঁর শিল্প-কর্মে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের সমাজ-চিত্রই পরিস্ফুট।

হিন্দুদের, বিশেষত বাঙ্গালীর প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা থেকে শুরু করে মহাভারত পাঠ, রামায়ণ গান ও হরিসঙ্কীর্তন পর্যন্ত বাংলার মুখ্য সব পূজা-পার্বণের ছবি তিনি এঁকেছেন এবং সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন।

দুর্গা পূজার কথাই ধরা যাক। সলভিন প্রতিমার যে ছবি এঁকেছেন একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে দেবদেবীর সাজসজ্জা থেকে শুরু করে পূজার ঘট, থালায় পূজার উপকরণ ইত্যাদি খুঁটিনাটি কোন কিছুই বাদ পড়েনি। বাঁ-পাশে বসে একজন ব্রাহ্মণকে চণ্ডীপাঠ করতেও দেখা যায়। চিত্র-পরিচিতিতে প্রথমে তিনি প্রতিমার বর্ণনা দিয়েছেন। নিষ্প্রয়োজনবোধে এখানে তা উল্লেখ করা হল না। উৎসবের বিবরণ দিয়ে তিনি লিখেছেন, 'সকালে মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে পূজা শুরু হয়। পূজা শেষ হলে ভক্তেরা চাল, ফলমূল মিষ্টান্ন ইত্যাদি অর্ঘ দেন। এগুলি প্রধানত পূজারী ব্রাহ্মণের উপরি পাওনা। এই পূজায় হিন্দুরা পশু বলি দেয়—যেমন মহিষ। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঁঠা বলি দেওয়া হয়ে থাকে। বলির শেষে পশুর মুণ্ডটি শুধু কাঁসার থালায় করে দেবীকে নিবেদন করা হয়।

'হিন্দুরা যতরকম দেবদেবীর পূজা করে তার মধ্যে দুর্গাপূজাই সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ। সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই এই উৎসবে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করে থাকে। যাদের প্রচুর টাকাকড়ি আছে তারা পূজার সময়ে আট দিন ধরে 'নচ'-ওয়ালীদের নাচের আসর বসায়। গন্ধদ্রব্য, মিষ্টান্ন ইত্যাদির ঢালাও বিতরণ চলে। উৎসবে ইউরোপীয়রা যোগ দিয়ে থাকে। ইউরোপীয়দের পেলে হিন্দুরা খুব খুশি হয়। পূজার বিপুল আয়োজনে এক এক জন ধনী হিন্দুর লাখ টাকা খরচ হয়ে যায়।

জামা-কাপড় এমন সূক্ষ্ম যে সেগুলিকে অঙ্গাবরণী না বলাই ভাল। শাড়ির উপরের অংশ অনেক সময়েই কোমরের নীচে ঝুলে পড়ে। নাচের সময় সদর দরজা বন্ধ করে রাখা হয়। তখন বাইরের লোক ও ইউরোপীয়দের ভিতরে থাকতে দেওয়া হয় না। ছয় সাতটি মেয়ে ঘণ্টা চারেক ধরে নাচে, সঙ্গে থাকে বাজনা। ধনী দর্শকেরা গানের কোন সুর শুনে খুশি হলে চার, আট বা ষোল টাকা নর্তকীদের দিকে ছুঁড়ে দেয়। এই ইনাম ছাড়াও তারা প্রচুর জামা-কাপড় ও নগদ টাকা পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে।

'তৃতীয় দিনে দেবীর পূজা মাত্র একবার হলেও ভোগ ও বলি চলে অনেকক্ষণ ধরে। এই দিনেই মহিষ বলি পড়ে। একজন গণ্যমান্য নেটিভ আমাকে বলেছেন যে তিনি নিজে এক ধনী ব্যক্তির গৃহে নবমীর দিনে ১০৮টি মহিষ বলি দিতে দেখেছেন। নদীয়ার বর্তমান রাজার পিতাঠাকুর দুর্গাপূজায় বহু সংখ্যক পাঁঠা ও ভেড়া বলি দিয়েছিলেন। তিনি প্রথম দিনে একটি পশু বলি

অতীতের ছবি সঙ্কীর্তন। খোল করতাল বাজিয়ে কীর্তন চলেছে ধনী গৃহের আঙ্গিনায়

সকালে পূজা-অর্চনা হয় আর সন্ধ্যাকালে চলে নাচ-গান। কয়েক দিন পরে পূজা শেষ হলে হিন্দুরা শোভাযাত্রা করে প্রতিমা নিয়ে গিয়ে জলে বিসর্জন দেয়। তারা নদীতে পাশাপাশি দুটো নৌকা রেখে মাঝখানে আড়াআড়িভাবে প্রতিমা বসিয়ে দেয়। তারপর ধীরে ধীরে নৌকা দুটি সরিয়ে নিলে প্রতিমা জলে পড়ে ডুবে যায়'।

সলভিনের দুর্গা পূজার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ কতখানি নির্ভরযোগ্য তা বিচার করে দেখা যেতে পারে। তাঁর সমকালীন শ্রীরামপুরের প্রখ্যাত মিশনারী রেভাঃ উইলিয়ম ওয়ার্ড ১৮০৬ সালে দুর্গা পূজার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন তা থেকেই এর সমর্থন মেলে।

ওয়ার্ড লিখেছেন, 'প্রথম দিন পূজার পর ধনী লোকেরা প্রতিমার সম্মুখে নাচবার জন্য চমৎকার পোশাক ও গহনা দিয়ে প্রায় সারা দেহ ঢাকা কয়েক জন গণিকা নিয়ে আসে। তাদের গান অতি অশ্লীল, নাচও অত্যন্ত অশোভন। নর্তকীদের পোশাকও তেমনি। তাদের

দেন। তারপর থেকে প্রতিদিন পূর্ব দিনের দ্বিগুণ সংখ্যক পশু বলি পড়তে থাকে। ষোল দিন ধরে পূজা চলে। শেষের দিনে ৩৩,১৬৮টি বলি পড়ে। সেবারে এইভাবে তিনি ৬৫,৫৩৫টি পশু বলি দিয়েছিলেন। কোন কোন অঞ্চলে একেবারে নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা দুর্গা পূজায় শূকর বলি দেয় ও দেবীকে সুরা নিবেদন করে। পূজার পর সেই মাংস ও মদ খেয়ে মেয়ে পুরুষে এক সঙ্গে অশোভন নৃত্য করে।

'কলকাতায় বলি শেষ হলে উপস্থিত ধনী-দরিদ্র সকলেই পশুর রক্ত-ভেজা মাটি সারা শরীরে মেখে পিশাচের মত নৃত্য শুরু করে দেয়। একটু পরে সেই অবস্থাতেই তারা নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে অন্য বাড়ির প্রতিমা দর্শনে বেরিয়ে পড়ে'।

প্রতিমা বিসর্জনের বর্ণনা করে ওয়ার্ড ১৮০৩ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বরের দিন-লিপিতে লিখেছেন, 'বিকেল পাঁচটার সময় আমরা

বলাগড়ের কাছে এসে পৌছলাম। প্রায় বিশটি গ্রামের দুই শত লোক বিসর্জন দেখতে ভিড় করেছে। এদের মধ্যে নারী শিশুও অনেক। লক্ষ্য করলাম একটি নৌকার উপরে প্রতিমার সম্মুখে একজন অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করে নাচছে। লোকটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। নৌকাটি ধীরে ধীরে সকলের সম্মুখ দিয়ে বয়ে গেল। সবাই তাকিয়ে দেখল। কেউ কিছু বলল না; বরং হাসতে লাগল। আরও কয়েকটি প্রতিমার সম্মুখে কয়েক জন পুরুষ মেয়েদের পোশাক পরে আর কয়েক জন পুরুষের সঙ্গে নাচছে, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করছে। শ্রীরামপুরে আমাদের বাড়ির সম্মুখেও এরকম বিশ্রী ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।'

দেখা যাচ্ছে দু'জনের বিবরণের মূল বিষয়ে কোন পার্থক্য নেই। তবে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ভিন্ন। সলভিনের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত, বস্তুনিষ্ঠ এবং অতিরঞ্জনের প্রবণতা মুক্ত। অপর জনের বিবরণও যথাযথ সন্দেহ নেই, তবে লেখনীতে ঘৃণার মনোভাব খুব প্রচ্ছন্ন নয়।

সেকালে হিন্দু সমাজে রামায়ণ গান, মহাভারত পাঠ, সঙ্কীর্তন অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। শহরে তো বটেই গ্রামেগঞ্জেও তার নিয়মিত অনুষ্ঠান হত। সলভিন এ সবেরও ছবি এঁকেছেন নিখুঁতভাবে।

রামায়ণ গানের বর্ণনায় তিনি লিখেছেন, 'গায়ক ব্রাহ্মণ ভগবান রাম অবতারের বিভিন্ন কীর্তিকথা গান করে বলে যান। হাতে থাকে কালো রঙের চামর। এর দণ্ডটি রুপোর। গানের সঙ্গে সঙ্গে সেটি সারাক্ষণ দোলাতে থাকেন। তাঁর পরিধানে থাকে দামী পোশাক ও শাল। গলায় লাল ফুলের মালা। তাঁর পেছনে বসে সহকারীরা। ব্রাহ্মণ গান করে যান। আর সঙ্গীরা তাঁর শেষ কলি পুনরাবৃত্তি করে চলে। শ্রোতারা ভক্তিনম্র চিত্তে গান শোনেন। কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে কখনও শোকে মোহ্যমান হন, আবার কখনও আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান।

'সাধারণত কোনও ভক্তিমান হিন্দুর বাড়ির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে রামায়ণ গানের আসর বসে। গানের খরচা তাঁকেই বহন করতে হয়। বাড়ির কর্তা একটা উচ্চস্থানে বসেন। বাড়ির ও পাড়ার সম্ভ্রান্ত মহিলারা চিকের আড়ালে বসেন। চিক বাঁশ দিয়ে তৈরি। এর ভিতর থেকে তাঁরা দেখেন এবং এর ভিতর দিয়েই তাঁদের আবছা দেখা যায়। নিম্ন শ্রেণীর মেয়েরা বাইরের বারান্দায় বসেন। এঁদের বাইরে চলাফেরায় বিশেষ বাধা নেই।

'এ ছাড়া রামায়ণ গান হাটে বাজারে গ্রামেগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সন্ধ্যার সময় গান শুরু হয় এবং বহু লোক ভিড় করে শুনতে আসে। গানের সঙ্গে থাকে খোল, করতাল।'

মাত্র পঞ্চাশ বছর পূর্বে বাংলার পল্লী অঞ্চলে যে রামায়ণ গানের অনুষ্ঠান দেখেছি তার সঙ্গে সলভিনের এই বিবরণের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। দেখেছি আসরের সম্মুখে পট্টবস্ত্রে ঢাকা একটি জলচৌকির উপরে থাকত নামাবলীতে জড়ান একখণ্ড রামায়ণ পবিত্র গ্রন্থটিকে ফুল-চন্দনে পূজা করে ঠাকুর গান শুরু করতেন। তাঁর পরনে সাদা ধুতি-চাদর, গলায় ফুলের মালা। আর হাতে থাকত ঠিক সলভিনের বর্ণনা মত রুপোর হাতলওয়ালা একটি চামর। গানের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার রূপদানে এটিই ছিল তাঁর একমাত্র হাতিয়ার। এই চামরই ছিল কখনও রামচন্দ্রের হাতের ইন্দ্রধনু, কখনও রাবণের হাতের বজ্রসার শূল, কখনও হনুমানের হাতে বিশাল পর্বত, আবার কখনও প্রেয়সীর মুখে হাওয়া করার তালপাখা। তখনও খোল করতালই ছিল প্রধান বাদ্য। ঠাকুর দু'তিন কলি গেয়ে ছেড়ে দিতেন, আর সঙ্গীরা শেষের কলি পুনরাবৃত্তি করত প্রচণ্ড শব্দে খোল করতাল বাজিয়ে। ঠাকুর আবার গান ধরলে বাজনা চলত অতি ধীরে। তখন গানের মজুরী ছিল মাত্র পাঁচ টাকা। অবশ্য আসরের এক পাশে থাকত একটা পেতলের পরাত। ভক্ত শ্রোতারা তাতে পয়সাটা, আনিটা দিয়ে যেত ঠাকুরের প্রণামী।

এবারে দেখা যাক সলভিনের বর্ণনায় মহাভারতের সভা: 'ব্রাহ্মণ ঠাকুর লাল ফুলের মালা গলায় পরে উঁচু বেদীর উপরে বসেন। তাঁর হাতে হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ মহাভারতের পুঁথি—অর্থাৎ পাতার উপরে লেখা মহাভারত। সম্মুখে টুলের উপরে আরও কয়েকটি পুঁথি, শালগ্রাম শিলা ও শঙ্খ ঘণ্টা।

'সকালে ঠাকুর উচ্চকণ্ঠে সংস্কৃতে মহাভারতের শ্লোক আবৃত্তি করেন। সংস্কৃত খুব কম লোকে বোঝে বলে তখন সভায় লোকজন বেশী থাকে না। বিকেলে বা সন্ধ্যাকালে ঠাকুর মহাভারতের কথা সরল বাংলায় ব্যাখ্যা করে বলেন। তখন বহু লোক এসে জড় হয়।

'সভা বসে কোনও বাড়ির সম্মুখস্থ মাঠে বা বড় বাড়ির প্রথম আঙ্গিনায় (তখনকার বড় বড় জমিদার বাড়িতে তিন চারটি আঙ্গিনা থাকত)। সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের মহিলাদের স্থান ছিল চিকের আড়ালে। সাধারণ মেয়েদের বাইরে। ছবিটির মূল স্কেচ মহাভারতের সভায় বসে এঁকেছিলেন মাদাম সলভিন।'

হরি সঙ্কীর্তন হিন্দুদের অতি প্রাচীন ও সাধারণ ধর্মানুষ্ঠান। সর্বত্র ও সর্বস্তরে প্রচলিত। বৎসরের কোন বিশেষ ঋতু বা তিথি-নক্ষত্রের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। বৎসরের যে কোনও সময়ে, ইচ্ছা হলে প্রতিদিনও সঙ্কীর্তন করা চলে। এমনি একটি সর্ব প্রচলিত অনুষ্ঠানের রূপ দুই শত বৎসর পূর্বে কেমন ছিল সে সম্বন্ধে সলভিন বলেছেন,

'হরি বিষ্ণুর এক নাম—যিনি সৃষ্টির রক্ষাকর্তা। বিষ্ণুর গুণকীর্তনই হল হরি সঙ্কীর্তন। গায়ক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ। তিনি বিষ্ণুর বা তাঁর কোন অবতারের বিষয় অবলম্বন করে গান করেন। তাঁর প্রেমও (লীলা) গানের বিষয় হতে পারে। গানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র খোল করতাল। ব্রাহ্মণ কিছুটা গেয়ে ছেড়ে দেন। তখন অন্যান্য বৈষ্ণবেরা খোল করতাল বাজিয়ে তাঁর গানের শেষ অংশ ধরে গাইতে থাকে।

'ব্রাহ্মণ গান গেয়ে অথবা ঘটনা অনুযায়ী ভাব প্রকাশ করে কাহিনী ব্যাখ্যা করেন। শ্রোতারা তাই শুনে কখনও ভক্তি-রসে বিভোর হয়ে যায়, কখনও অশ্রু বিসর্জন করে, আবার কখনও হেসে গড়িয়ে পড়ে।

'সন্ধ্যাকালে বা একটু রাত্রে সঙ্কীর্তনের আসর বসে। এই গান শোনার জন্য সবচেয়ে বেশী লোকের ভিড় হয়। কীর্তন সাধারণত পনের দিন ধরে চলে। যিনি সঙ্কীর্তনের আয়োজন করেন তাঁর বেশ কিছু অর্থ ব্যয় হয়। কারণ যে কয় দিন গান চলে সেই কয়দিনই কীর্তনীয়াদের খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য সব ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তাঁরই। গৃহকর্তার কর্মচারীরাও প্রত্যেকে এসে ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে কিছু টাকা রেখে তাঁকে আলিঙ্গন করে।

'গায়ক বৈষ্ণবের পোশাক খুবই দামী। গলায় রত্নহার, পরনে মূল্যবান বস্ত্র ও গায়ে শাল। সবগুলির মূল্য কয়েক হাজার টাকা হবে। মাথার পাগড়ী ও গলায় ঝোলান কয়েকটি মালা তারের তৈরি। গায়কের পক্ষে এইরকম সাজসজ্জা অপরিহার্য।

হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী ভগবানের নাম, লীলা ও গুণাদির উচ্চৈস্বরে উচ্চারণই কীর্তন। তাই কীর্তন সম্বন্ধে সলভিনের ধারণা ভ্রান্ত নয়। তিনি মাত্র কয়েকটি বাক্যে তৎকালে প্রচলিত কীর্তনের যে রূপ বর্ণনা করেছেন এখনও তার খুব বেশী পরিবর্তন ঘটেনি। তবে তিনি যে পনের দিন ব্যাপী সঙ্কীর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন তা সর্বক্ষেত্রে গ্রাহ্য নয়। সঙ্কীর্তন যেমন এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা ব্যাপী হতে পারে তেমনই অষ্ট প্রহর, এক মাস বা এক বৎসর ব্যাপীও চলতে পারে। মনে হয় তিনি পক্ষকাল ব্যাপী সঙ্কীর্তন দেখেছিলেন এবং সে কথাই উল্লেখ করেছেন।

এই কয়টি ধর্মানুষ্ঠান ছাড়াও অন্যান্য যে সব পূজা-পার্বণ তিনি চিত্রায়িত করেছেন সেগুলি হল—রাসযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রথযাত্রা, দোলযাত্রা, স্নানযাত্রা, চড়ক পূজা, নীল পূজা, মনসা পূজা। সেকালে মনসা পূজা উপলক্ষে যে বিচিত্র শোভাযাত্রা বের হত এখন আর তা দেখা যায় না। সলভিন বলেছেন, 'মনসা পূজার সময় সাপুড়েদের একটি ছেলেকে রঙিন পোশাক পরিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে নেয়। বাঁশের টোপর তৈরি করে তার উপরে ছেলেটিকে বসিয়ে দেয়, তারপর সেই টোপর কাঁধে নিয়ে মিছিল, শোভাযাত্রা করে ঢাকঢোল বাজিয়ে গ্রাম পরিক্রমা করে। ছেলেটির গলায় জড়ান থাকে সাপ, বাহুতে সাপ, হাতে সাপ। যারা শোভাযাত্রার সঙ্গে চলে তাদের অনেকের হাতেও থাকে জ্যান্ত সাপ।'

সলভিন ভারত তথা হিন্দুদের সম্বন্ধে প্রায় কিছু না জেনেই এ দেশে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। অশেষ ধৈর্য ও পরিশ্রম স্বীকার করে তাদের ধর্ম ও জীবন যাত্রা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং চিত্রে তাদের সম্যক পরিচয় বিবৃত করে রেখেছেন। তৎকালীন পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিদেশীদের সঙ্গে স্থানীয় লোকদের সংযোগের পরিবেশ বিচার করলে তাঁর চিত্রকর্মের পরিব্যাপ্তি অসাধারণ মনে হয়। অধিকন্তু তাঁর রচনা বস্তুনিষ্ঠ, উচ্ছ্বাস বা অবজ্ঞা বর্জিত। তাই তাঁর চিত্র ও বিবরণ দুই শতাব্দী পূর্বের এ দেশের, বিশেষত বাংলার সমাজ জীবনের এক মূল্যবান প্রামাণ্য দলিল। ■

Marvel

হাইকু
শাড়ি

আগমনী গান

রাজ্যেশ্বর মিত্র

ছবি : সুধীর চ্যাটার্জি

বছর তেরো চোদ্দ আগেকার কথা। দুর্গাপূজার ষষ্ঠীর দিন সকালবেলা চলেছি তারকেশ্বরের গাড়িতে। সিঙ্গুর ইসটিশনে একটি লোক দুটি ছেলেকে নিয়ে উঠল; উদ্দেশ্য গান গেয়ে পয়সা সংগ্রহ। ছেলে দুটি মন্দিরা বাজিয়ে একটি গান ধরল যা শুনে আশ্চর্য হয়ে যেতে হল। গানটি খাঁটি আগমনী সঙ্গীত এবং বোধ করি সুরটি বাংলায় প্রচলিত আলাইয়া। এই ধরনের গান এ যুগে শুনতে পাওয়া দুর্লভ। গানটি স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে দিলুম।

ঐ দেখো মেনকারানী
তোমার উমা ঐ আসিছে,
সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী
আর কার্তিক গণপতি
আনন্দে মা ভগবতী
মধুর মৃদু হাসিছে।
হেমঘটে পূর্ণবারি
শোভে কদলীর সারি
কি জানি উমা তোমারি
অভিমান করে পাছে।

বাঁশিওয়ালের বাঁধা গানটি ওরা ঠিক তাল রেখে গেয়ে গেল। গানটির মধ্যে বেশ খানিকটা লোকসঙ্গীতের ধরন ছিল, কিন্তু আলাইয়ার সঙ্গে মিলেমিশে একটা রাগসঙ্গীতের আবহ এসে পাওয়া গেল। এমন আরও সৃষ্টি আছে বাংলা গানে। বিশেষ করে প্রাচীন পালায় এর একটি পরিচিতি ছিল—মনোহরসাই। কিন্তু এটি পদাবলী কীর্তনের মনোহরসাই নয়, কারণ তার একটা বহুধরন রূপ ছিল; তবুও এই ধরনের গানেও কীর্তনের একটা রীতি বেশ ভালোভাবেই প্রকাশ পেত। পুরোনো বাংলা গানে কেবল যে উচ্চাঙ্গ বা ... রচিত হয়েছে এমন নয়, বেশ কিছু লোকগীতও রাগসঙ্গীতের সহযোগে এক একটা নতুন কম্পোজিশন সৃষ্টি করেছে, বহু গানেই এমনতর সাক্ষ্য পাওয়া যাবে।

প্রচলিত প্রথা বা ট্র্যাডিশনের দিক থেকে আগমনী বাংলার সঙ্গীতে একটি বিশিষ্ট শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। প্রধানত গান হলেও মঙ্গলকাব্যের পরবর্তী কালে এবং কবি পাঁচালীর যুগে আগমনী, কাব্য তথা লিরিকের দিক থেকেও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল, এমন কি সাহিত্যেও তার একটা স্থান নির্ধারিত হয়ে গেছে। অনেকে এই শ্রেণীর গানকে শাক্ত পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু, শাক্ত পদাবলী না বলে শাক্ত গীতাবলী বলাই ভালো, কারণ পদাবলী বলতে যে বিস্তৃত পর্যায় বোঝায় তার পরিচয় এইসব গানে খুব কমই আছে। সকলেই জানেন আগমনী গানের বিষয়বস্তু হল উমার পিত্রালয়ে আগমন এবং মাত্র তিন দিন যাপন করেই আবার প্রস্থান। এই বিদায়কে কেন্দ্র করে বিজয়ার গানও কম রচিত হয়নি এবং সেগুলির কারুণ্যও মনকে অভিভূত করে।

আগমনীর বৈচিত্র্য হচ্ছে তার রূপে এবং রসে। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে বাৎসল্য রস; আবার দুর্গার সিংহবাহিনী মহিমময়ী প্রতিকৃতিও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক রীতিতে বর্ণিত হয়েছে।

ভারতচন্দ্রের রচনা থেকেই আরম্ভ করি।

বড় আনন্দ উদয়
বহুদিনে ভগবতী আইল আলয়।
শঙ্খঘণ্টারব মহামহোৎসব
ত্রিভুবনে জয় জয়,
নাচিছে নটিক গাইছে গায়ক
রাগ তাল মানে লয়।
যত চরাচর হরিষ অন্তর
পরম আনন্দময়
রায় গুণাকর কহে পুটকর
মোরে যেন দয়া হয়।

এই গানে সেকালের চণ্ডীমণ্ডপের বা দুর্গামণ্ডপের ইঙ্গিত আছে। সাধারণত ধনীগৃহের চণ্ডীমণ্ডপে কিংবা গ্রামের প্রতিষ্ঠিত বারোয়ারিতলার একধারে দুর্গার প্রতিমা অধিষ্ঠিত থাকত। সারা দিন উৎসবের ফাঁকে ফাঁকে নানারকম গানবাজনা চলতে থাকত। রাত্রিতে সঙ্গীতের আসরও বসত এবং তা শুনতে আসতেন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ। এ ছাড়া যাত্রাগান, কবি, পাঁচালীর অনুষ্ঠান তো ছিলই। আমরা যেসব গান সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে সেগুলিরই সন্ধান রাখি, কিন্তু আরও বিপুল সংখ্যক গান হারিয়ে গেছে, যা সেকালকার নানা অনুষ্ঠানে প্রচলিত ছিল। এমনি একটি প্রাচীন গান উদ্ধৃত করি। শুনেছি গানটি নাকি চণ্ডী যাত্রার দ্বিতীয় অঙ্কে "মহিষমর্দিনী" নামক একটি পালায় গাওয়া হত। গানটির প্রসঙ্গ হচ্ছে এই যে, অসুররাজ শুম্ভ দূত পাঠিয়েছেন অম্বিকার কাছে তাঁর আত্মসমর্পণের জন্যে। দূত অসাধারণ রূপলাবণ্যসম্পন্না দেবীকে একাকিনী দেখে তাঁকে সম্বোধন করে এই কথাগুলি বলেছেন। এর সুর খাম্বাজ এবং কিছু উচ্চাঙ্গ কাজও এতে বর্তমান।

[illegible]

একাকিনী কেন ধনী
দাঁড়ায়ে আছ বাহিরে
জান না ললনা কত
আশঙ্কা আছে তোমারে।
দুলিত লম্বিত বেণী
ব্যাপিয়াছে পৃষ্ঠপরে
দিয়াছ সিন্দুরবিন্দু
অরুণ সদৃশ শিরে,
ফণী অনুমানি ধনী
পাছে দংশে তবাধরে।
কবাকুম্ভ জিনি উচ্চে
বেষ্টিয়াছ নীলাম্বরে,
বদন শারদশশী
আলো করে চরাচরে,
রাহু প্রসারিয়া বাহু
পাছে আসি গ্রাস করে॥

[illegible]

গানের এই পটভূমিকাটি আমার একজন প্রবীণ সঙ্গীতশিক্ষকের কাছ থেকে শোনা, যিনি হাওড়ার অধিবাসী ছিলেন; এর সত্যতা সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ দিতে এই লেখক অপারগ। এই রকম আগমনী উপলক্ষে রচিত কত প্রাচীন যাত্রার গান হারিয়ে গেছে।

সাহিত্যের সাক্ষ্য যাঁদের পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে রামপ্রসাদ কিছু আগমনী রচনা

করেছিলেন ; তবে তাঁর গানে বাৎসল্য রসের প্রাবল্য ; যেমন—

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার
এই যে নন্দিনী আইল বরণ করিয়া আন ঘরে,
মুখশশী দেখে আসি দূরে যাবে দুঃখরাশি
ও চাঁদমুখের হাসি সুধারাশি ক্ষরে।
ইত্যাদি

এই গানটি কিন্তু প্রসাদী রীতিতে গাওয়া হত না ; এর চাল অনেকটাই রাগসঙ্গীতের। সাধক কমলাকান্তও দু-চারটি আগমনী গান রচনা করেছিলেন, রীতি প্রায় একই।

এলো গিরিনন্দিনী
লয়ে সুমঙ্গলধ্বনি ঐ শুন গো রাণী,
চল বরণ করিয়ে উমা আনি যেয়ে
কি কর পাষাণ রমণী ?
অমনি উঠিয়ে পুলকিত হইয়ে
ধাইল যেন পাগলিনী।
চলিতে চঞ্চল খসিল কুন্তল
অঞ্চল লোটায় ধরণী,
আঙ্গিনার বাহিরে হেরিয়ে গৌরীরে
দ্রুত কোলে নিল রাণী।
ইত্যাদি

রামনিধি গুপ্তের রচনার মধ্যে একটিই আগমনী গান পাওয়া যায়। গানটি ইমন কল্যাণে শুনেছি প্রাচীন গায়কের কণ্ঠে। এই রাগে অবশ্য আগমনী কদাচিৎ শোনা যায়। গানটি কিন্তু "নিধুবাবুর টপ্পা" বলতে যা বোঝায় সেই স্টাইলে গাওয়া হত না। তেতালায় বেশ ঢিমে চালে খেয়াল অঙ্গেই গানটি গাইতে শোনা যেত।

গিরি কি অচল হলে
আনিতে উমারে,
না হেরে তনয়ামুখ
পরাণ বিদরে।
তরান্বিত হও গিরি
তোমার করেতে ধরি
আমার উমা ও মা বলে
ডাকিছে আমারে।

এঁরই সমসাময়িক কালী মীর্জা দু-একটি আগমনী রচনা করেছিলেন। বিখ্যাত গীতকার হিসাবে হয়তো তাঁর রচনা তৎকালে প্রচলিত ছিল, পরে সেগুলি খুব কমই শোনা যেত। তাঁর একটি গান—

কাফি সিন্ধু—মধ্যমান।

কি কর শিখরবর আন গিয়ে আনন্দময়ীরে
হয়ে রাণী এলোথেলো গিরির নিকটে এলো
ওমা, উমা নাহি এলো ঘরে।
এ দুঃখ কি সহে মা-তে তুমি তার তাত তাতে
তাতে বুঝাতে হয় উমাকে তোমায়,
মনেতে হয় দুহিতে অস্থির হয়ে দুয়েতে
কালী কালী বলে আঁখি ঝরে।

এঁদেরই কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালের স্বনামধন্য গীতকার শ্রীধর কথক একাধিক আগমনী রচনা করে গেছেন। সেগুলির মধ্যে যে গানটি উদ্ধৃত করছি সেটি ছিল টপ্পা অঙ্গের। এটি ঝিঝিটে গাওয়া হত। এই ঝিঝিটও কিন্তু হিন্দী চালের ঝিঝিট নয়। এর একটি বিশেষ রীতি প্রচলিত ছিল বাংলায়, সেটি বর্তমানে অপরিচিত বললে অত্যুক্তি হয় না।

গিরিরাজকে ডেকে দে গো
আমার গৃহে গৌরী এলো
নাশিতে আঁধার রাশি
উমাশশী প্রকাশিল।
এই নগরে লোক ছিল ঘরে ঘরে
না ডাকিতে আমার ঘরে
কেবা কবে এসেছিল।
কেবল উমার আগমনে
সকলে সানন্দ মনে
গিরিপুরবাসীগণে
গিরিপুর আজ ভরে গেল।

কবিওয়ালাদের মধ্যে রাম বসুর একটি গান সুবিখ্যাত। গানটি হয়তো কবিগানের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিংবা তা নাও হতে পারে, কিন্তু রচনাটি সুদীর্ঘ, প্রথম দিকের কিছুটা মাত্র কালাংড়ায় গাইতে শুনেছি অল্প বয়সে। গানটির ভাষান্তর আছে ; লেখকের শোনা রূপটি এই রকম—

গতনিশিযোগে আমি দেখেছি যে সুস্বপন
এল আমার তারাধন।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে মা কৈ মা কৈ বলে
দাও দেখা দুখিনীরে,
অমনি দু বাহু পসারি উমা কোলে করি
আনন্দেতে আমি আমি নই।
ইত্যাদি

বাঁধনদার গদাধর চক্রবর্তীর রচিত একটি আগমনী গান একদা খুব খ্যাতিলাভ করেছিল।
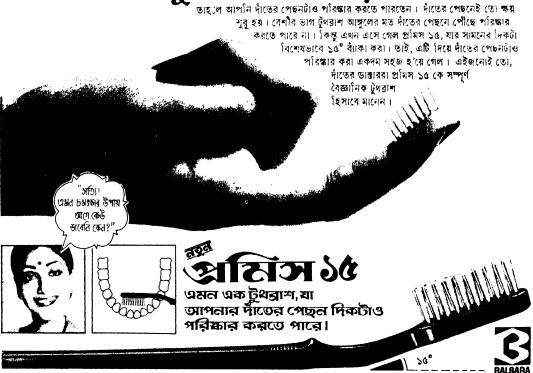
গায়কেরা অনেকেই জানতেন না তাঁর নাম, কিন্তু তাঁরা বিশেষ আবেগের সঙ্গে এই গানটি গাইতেন—

পুরবাসী বলে উমার মা,
তোর হারা তারা এল ঐ
শুনে পাগলিনী প্রায়
অমনি রাণী ধায়
বলে উমা কৈ উমা কৈ।
কেঁদে রাণী বলে আমার উমা এলে
একবার আয় মা আয় মা করি কোলে,
অমনি দু বাহু পসারি মায়ের গলা ধরি
অভিমানে কেঁদে রাণীরে বলে
কই মেয়ে বলে আনতে গিয়েছিলে?
তোমার পাষাণ প্রাণ
আমার পিতাও পাষাণ
জেনে এলাম আপনা হতে।
গেলে নাকো নিতে, রব না,—
যাব দু দিন গেলে।

বর্ধমানরাজের দেওয়ান রঘুনাথ রায় প্রাচীন গীত কবি। আজ তিনি বিস্মৃত, কিন্তু এক সময় তাঁর রচিত ভক্তিগীতির খ্যাতি ছিল। তিনি কালীভক্ত ছিলেন, আগমনীও কয়েকটি রচনা করেছিলেন।

কি শোভা মহিষমর্দিনী।
হেরি ত্রিভুবনজন আনন্দিত মন
পুলকে করে জয়ধ্বনি।
দশভুজে নানাবিধ আয়ুধ সাজে
কটিতে বাজিছে কিঙ্কিণী,
পরিধানে বিচিত্রবসন অতি সুশোভন
অঞ্চলে দোলে গজমুক্তাশ্রেণী
শিশু শশী ভালে চাঁচর কুন্তলে
মণিতে গ্রথিত সুবেণী
অরুণোপর আনন্দে রজনীকর
চরণযুগল গো এমনি।
অকিঞ্চন মন প্রকাশ কারণ
ভবাব্ধি তরণে তরণী।

শোনা যায় তিনি ভণিতাস্বরূপ "অকিঞ্চন" শব্দটি ব্যবহার করতেন।

বর্ধমানের মহারাজ মহতাবচাঁদও আগমনী গানে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর কিছু গান প্রাচীন গায়কদের কাছে সুপরিচিত ছিল।

কে ও প্রসন্নবদনা বিরাজমানা
কোটিচন্দ্রপ্রভা ত্রিনয়না হারভূষণা।
দক্ষিণপদ সিংহোপরি বামাঙ্গুষ্ঠ মহিষে ধরি,
বিচিত্র পট্টাম্বরী মঞ্জীরচরণা।
ইত্যাদি

উদ্ধৃত দুটি গানেই দুর্গার সিংহবাহিনী রূপের প্রকাশ ঘটেছে। বাৎসল্য রস ব্যতীত ওজঃশক্তি প্রকাশক এই রসটিও আগমনী গানের একটি বিশেষ দিক। পাঁচালীকার দাশরথি রায়ের এই রকম একটি বিখ্যাত গান আছে। সঙ্কলন গ্রন্থাদিতে এটির সুর দেখা যায় ললিত: আবার ঝিঁঝিটেরও উল্লেখ আছে। লেখক কিন্তু এই গানটি শুনেছেন সুরট-মল্লারে। এই সুরটিও একান্তভাবেই বাংলার একটি নিজস্ব রীতিতে চলে, হিন্দী গানে সুরট-মল্লারের পরিচয় অন্য রকম।

দিগন্তজোড়া শুভ্রতায় ওঁর আসন পাতা। আগমনী গান ছড়িয়ে পড়ে, দূর থেকে দূরে, শরতের নীলে   ছবি অশোক চক্রবর্তী

কৈ হে গিরি কৈ সে আমার
প্রাণের উমা নন্দিনী
দ্বিভুজা বালিকা আমার
উমা ইন্দুবদনী।
কক্ষে লয়ে গজানন, গমন গজগমন
মা বলে মা ডাকে মুখে আধ আধ বাণী।
এ যে করী অরিতে করি ভর
করে করিছে রিপু সংহার
পদভরে টলে মহী মহিষনাশিনী।

মেনকারাণী গিরিরাজের প্রতি আক্ষেপ করে বলছেন,—তিনি যে গণেশজননী সদামাতৃরূপিণী তাঁর কন্যা উমাকে দেখতে চেয়েছিলেন, তার দেখা তিনি পাননি, তার স্থানে যিনি আবির্ভূতা হয়েছেন তিনি দশভুজা মহিষমর্দিনী সংহারিণীমূর্তিতে অসুরদলনে প্রবৃত্তা। মায়ের কাছে এ মূর্তি ভয়ের উদ্রেক করেছে। তবে, এটি একটি চমৎকার চিত্র হলেও আগমনীর ভাবগত

রীতি এটা নয়, মায়ের এবং মেয়ের মিলনই আগমনীকে সার্থকতায় উত্তীর্ণ করে রেখেছে। দাশরথি নিজেই এই ধরনের একটি অতি বিখ্যাত গান লিখে গেছেন,—

গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল
ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী,
লয়ে যুগল শিশু কোলে মা কৈ মা কৈ বলে
ডাকছে শশধর বদনী।
মা গো ত্রিভুবন মানো ত্রিভুবন ধন্যো
তোর মেয়ে সামান্য নয়গো রাণী
আমরা ভাবতেম ভবের প্রিয়ে
মা নাকি তোর মেয়ে
তিনি নাকি ভবের ভয়হারিণী।

ইত্যাদি

এককালে বোধ করি এমন গায়ক ছিলেন না যিনি এ গানটি না গাইতেন। অবশ্য, তখনকার প্রথা অনুসারে সুরের ভিন্নতা এবং স্টাইলেরও পরিবর্তন ঘটত, কিন্তু এটিকে আগমনীর একটি representative গান বললে অত্যুক্তি হয় না। এর মাঝখানের দুটি পদ অনেকে সঞ্চারীতে গাইতেন, অনেকে এটিকেও অন্তরা রূপেই রক্ষা করতেন। সাধারণত উদ্ধৃতাংশটুকুই গাইতে শুনেছি।

উনবিংশ শতাব্দীতে নবযুগের সূচনায় ঈশ্বর গুপ্ত কয়েকটি আগমনী রচনা করেছিলেন, কিন্তু সেগুলি নিতান্তই গতানুগতিক এবং গায়কদের মুখে প্রচলিতও হয়নি। বরঞ্চ আগমনী গানে এযুগে সর্বাধিক সাফল্যের দাবি করতে পারেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি প্রচলিত রীতিতেই গান রচনা করেছিলেন এবং সেগুলি এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। একটি দৃষ্টান্ত—

কুস্বপন দেখেছি গিরি উমা আমার শ্মশানবাসী
অসিতবরণা উমা মুখে অট্ট অট্ট হাসি।
এলোকেশী বিবসনা উমা আমার শবাসনা
ঘোরাননা ত্রিনয়না ভালে শোভে বালশশী।
যোগিনী দলসঙ্গিনী ভ্রমিছে সিংহবাহিনী
হেরিয়া রণরঙ্গিনী মনে বড় ভয় বাসি।
উঠ হে উঠ অচল পরাণ হল বিকল
ত্বরায় কৈলাসে চল আন উমা সুধারাশি।

এই গানটির সুর বলা হয়েছে আলাইয়া এবং

চিন্ময়ী রূপে মৃণ্ময়ীর আবাহন ছবি : [illegible] চট্টোপাধ্যায়

তাল আড়াঠেকা। বাংলায় আলাইয়ার যে চলন দেখা যায় এ গানের মধ্যে সেটি পুরোপুরি বর্তমান। গিরিশচন্দ্রের আরও একটি বিখ্যাত গান,—

ওমা কেমন করে পরের ঘরে
ছিলি উমা বল মা তাই
কত লোকে কত বলে
শুনে ভেবে মরে যাই।
মার প্রাণে কি ধৈর্য ধরে
জামাই নাকি ভিক্ষা করে
এবার নিতে এলে বলব হরে
উমা আমার ঘরে নাই।

বিজয়ার গান আগমনীর তুলনায় কমই রচিত হয়েছে; তথাপি কয়েকটি গান বিশেষ প্রচলিত ছিল। রূপচাঁদ পক্ষীর নাম সুবিদিত। তাঁর একটি গান এক সময় প্রায়ই শোনা যেত।

নবমী নিশি পোহালো কি করি কি করি বল
ছেড়ে যাবে প্রাণের উমা দেখো না বিজয়া এলো।
বৎসরাবধি পরে তারা আনন্দ করিলেন ধরা
যায় কিসে দুঃখপসরা আমারে বল।
নবমী নিশি প্রভাত এ কি দেখি বিপরীত
উমা হয়ে চমকিত নত শিরে রহিল॥

ইত্যাদি।

দাশরথি রায়ের একটি গান নবমীর সন্ধ্যায় অনেকেই গাইতেন। এটিও মনোহরসাই ঢঙে ঝাঁপতালে গাওয়া হত।

নন্দি গিরিনন্দিনী ত্রিনয়নের নয়নতারা
তারাহারা হয়ে আমি হয়ে আছি রে তারা হারা।
যেদিন তিনদিন বলে, গেছে রে সেই দিন-তারা,
সেইদিনে তখনি আমি দেখেছি রে দিনে তারা,
তারাশোকে বহিছে তারায় তারাকারা ধারা।
বসে যোগাসনে সেই তারারূপে
যারা আছে রে তারা সঁপে,
ওরে নন্দি, তারা কি ধন জেনেছে তারা।
তোরা কি এতকাল মিথ্যা ঘরে কাল হরিলি
জ্ঞান হয় যে জ্ঞান চক্ষে মোর তারা না হেরিলি
জলাভাবে আকুল সিন্ধুকূলে থেকে তোরা।

সাহিত্যস্বীকৃত গীতকারদের রচিত আগমনী ও বিজয়া গানের কিছু উদাহরণ দেওয়া হল; কিন্তু এই পর্যায়ের গান কেবলমাত্র বিশিষ্ট গীতকারদের অবলম্বন করেই গড়ে ওঠেনি। বহু পল্লীকবি অষ্টাদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে বহু বিখ্যাত আগমনী ও বিজয়ার গীত রচনা করেছেন, যেগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে গাওয়া হত। এদের অনেকাংশ বাংলার বিভিন্ন জনপদে স্থানীয়ভাবে রক্ষিত হয়েছে। 'গণেশ আমার শুভকারী' এমনি একটি গান যা এক সময় পূর্ব-পশ্চিম উভয় বঙ্গেই পূজার উদ্বোধনে গাওয়া হত বিভিন্ন পাঠভেদে। দুঃখের বিষয় এইসব গান সামগ্রিকভাবে সঙ্কলনের উৎসাহ পরবর্তী কালে দেখা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে যথার্থ আগমনী গান বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই শেষ গাওয়া হয়েছে। তার পরে কেবল ট্র্যাডিশনের সূত্রেই অনেকে আরও দু-এক দশক এই শ্রেণীর গান গেয়েছিলেন। তার পরে আগমনীর নামে এক ধরনের গান রচিত হতে আরম্ভ করেছে তাকে আধুনিক পূজার গান বলাই সঙ্গত, কারণ একে কোনো পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। বলতে গেলে কে মল্লিকের পরে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী তাঁর মেঘমন্দ্রিত সুশিক্ষিত রাগসঙ্গীতে পরিশীলিত কণ্ঠে শেষ আগমনী গান গেয়েছেন। কেবলমাত্র অনুরোধ রক্ষার জন্যেই হয়তো কাজী নজরুল ইসলাম বা আরও কোনো কোনো গীতকার কিছু শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন যাকে আগমনীরূপে ব্যবহার করা হয়েছিল। এগুলি চাহিদাপূরণের জন্যেই রচিত হয়েছিল। আজ যুগ পালটেছে; এখনকার সার্বজনিক দুর্গাপূজার যে পরিবেশ তাতে সেই আগমনীকে Invoke না করাই ভালো, কারণ যা চলে গেছে তা আর ফিরে আসবে না। তবু, কদাচিৎ এক একটা প্রাচীন রীতির আগমনী শোনা যায় দুর্গাপূজার প্রাক্‌কালে, যেমন উল্লেখ করেছি নিবন্ধের প্রথমাংশে। ■

রসরচনা

টপ্পা

নিধুবাবু

মোল্লা নসরুদ্দীন তুরস্কের মানুষ। একদা তিনি তুরস্ক থেকে ইরানে চলে এলেন।

নসরুদ্দীন তখন স্বনামধন্য মানুষ। তিনি ইরানে এসেছেন; খবরটা ইরানের বাদশাহের কানে যেতে দেরি হল না।

খবর পেয়েই ইরানের বাদশাহ উজীরকে পাঠালেন সসম্মানে নসরুদ্দীনকে দরবারে নিয়ে আসার জন্য।

উজীর নিয়ে এলেন নসরুদ্দীনকে দরবারে। নসরুদ্দীন কুর্নিশ করলেন বাদশাহকে। বাদশাহ আনন্দে আত্মহারা হয়ে নসরুদ্দীনকে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন—মোল্লা, ইরানে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল, ইরান ধন্য, আমি কৃতার্থ।

নসরুদ্দীন আবার কুর্নিশ করলেন বাদশাহকে।

বাদশাহ বললেন—আপনি দয়া করে ইরানেই থাকুন। আপনার কী-কী চাই বলুন। সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

নসরুদ্দীন বললেন—কিছুই চাই না। আপনার অনুগ্রহই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

বাদশাহ বললেন—তা কি হয়। কিছু না নিলে আপনার খাওয়া-পরা চলবে কী করে? ইরানে আপনি দীনদুঃখীর মতো থাকবেন তা তো হতে পারে না। বলুন আপনার কী-কী চাই।

নসরুদ্দীন আবার কুর্নিশ করে বললেন—জাঁহাপনা, কিছুই আমার চাই না। যদি নিতান্তই আমাকে কিছু দিতে চান তাহলে...

বাদশাহ বললেন—তাহলে কী?

নসরুদ্দীন বললেন—তাহলে আপনি হুকুম দিন যেন আপনার রাজ্যে যারা নিজের বিবিকে ভয় করে তারা প্রত্যেকে রোজ সকালে আমাকে একটি মুরগির ডিম দেবে।

বাদশাহ অবাক হয়ে বললেন—সামান্য মুরগির ডিম নিয়ে আপনার কী হবে?

নসরুদ্দীন বললেন—সব হবে, সব হবে। ওর চেয়ে বেশি আর কিছু আমি নিতে পারব না।

অগত্যা বাদশাহ সেই হুকুমই দিলেন।

পরদিন সকালে নসরুদ্দীনের বাড়িতে মুরগির ডিমের পাহাড় হয়ে গেল। এবং দিনের পর দিন। শুধু মুরগির ডিম বেচেই অল্পদিনের মধ্যে নসরুদ্দীনের বিস্তর ধনদৌলত হয়ে গেল। অত মুরগির ডিমের কাজকর্ম চালানোর জন্য বিস্তর কর্মচারী বহাল করতে হল নসরুদ্দীনকে।

শুধু মুরগির ডিমের দৌলতে ইরানে নসরুদ্দীন মস্ত বাড়ি বানিয়ে ফেললেন। দামী-দামী জিনিসপত্রে বাড়ি ভর্তি হয়ে গেল। পোলাও-কালিয়া ছাড়া নসরুদ্দীন আর কিছু খান না।

তারপর নিজের বিবিকে নিয়ে আসার জন্য নসরুদ্দীন গেলেন তুরস্কে। নিজের বিবিকে নিয়ে যথাসময়ে ফিরে এলেন ইরানে।

পরদিনই নসরুদ্দীন গেলেন দরবারে। তুরস্ক থেকে আবার ইরানে ফিরে এসেছেন নসরুদ্দীন—বাদশাহ সেদিনের মতো দরবার ভেঙে দিলেন, নসরুদ্দীনকে নিয়ে চলে গেলেন অন্দরমহলে।

নসরুদ্দীনকে জড়িয়ে ধরে বাদশাহ বললেন—মোল্লা, কদিন আপনি ইরানে ছিলেন না, আমার মন খারাপ ছিল। আপনি ফিরে এসেছেন, আজ আমার মনে বড় আহ্লাদ। আপনাকে আমি প্রাণ ভরে ভালোবাসি।

নসরুদ্দীন বললেন—জাঁহাপনা, আমিও আপনাকে প্রাণ ভরে ভালোবাসি।

বাদশাহ বললেন—যদি সত্যি-সত্যি আমাকে আপনি প্রাণ ভরে ভালোবাসেন তাহলে নিশ্চয় আপনি তুরস্ক থেকে আমার জন্য কোনও উপহার নিয়ে এসেছেন?

নসরুদ্দীন বললেন—নিশ্চয় এনেছি। বাড়িতে রেখে এসেছি। আপনার হুকুম পেলে এখনই বাড়ি থেকে এখানে নিয়ে আসতে পারি।

বাদশাহ ব্যাকুল হয়ে বললেন—কী? কী উপহার নিয়ে এসেছেন আমার জন্যে?

নসরুদ্দীন গলা চড়িয়ে বললেন—একটি পরমা সুন্দরী তুর্কী তরুণী।

বাদশাহ অবাক হয়ে বললেন—অ্যাঁ!

নসরুদ্দীন গলা আরও চড়িয়ে বললেন—হ্যাঁ। তার কান সমুদ্রের পাতলা রঙিন ঝিনুকের মতো, কান পর্যন্ত টানা-টানা চোখ, হাত দুখানা পদ্মফুলের মতো, সর্বাঙ্গে মৃগনাভির গন্ধ...

বাদশাহ ফিস ফিস করে বললেন—আস্তে বলুন।

নসরুদ্দীন গলা আরও-আরও চড়িয়ে বললেন—তার ধনুকের মতো ভুরু, মুক্তোর মতো সাদা দাঁত, ডালিমের কোয়ার মতো আঙুলের নখ, গোলাপের কুঁড়ির মতো ঠোঁট, ঘন কালো আঙুরের থোকার মতো চুল, কোথায় লাগে তার কাছে বেহেস্তের হুরি?

বাদশাহ আরও ফিস ফিস করে বললেন—আঃ, মোল্লা, এত চিৎকার করে কথা বলছেন কেন? পাশের ঘরে বেগমসাহেবা আছেন, তিনি সব শুনতে পাবেন যে!

গলা একেবারে খাদে নামিয়ে নসরুদ্দীন বললেন—জাঁহাপনা, এখন থেকে রোজ সকালে আপনি আমাকে একটি মুরগির ডিম দেবেন—আমার ন্যায্য পাওনা।

* * * *

"বিলাতের এক পরম পণ্ডিত অধ্যাপক কলেজে যাইতে ছিলেন। পথিমধ্যে নস্য লইবার প্রয়োজন হইল। তিনি যেদিকে গমন করিতেছিলেন, সেইদিক দিয়া বায়ু বহিতেছিল; নস্য হস্তে লইলেই তাহা উড়িয়া যায়; এইজন্য তিনি পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। নস্য গ্রহণ করা হইলে, যেদিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন সেই দিকেই চলিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখেন যে, কলেজে না পহুঁছিয়া নিজ গৃহসম্মুখে উপনীত হইয়াছেন। এতদ্দেশের নস্যগ্রাহী অধ্যাপকদিগের মধ্যে এরূপ পণ্ডিত কত আছেন?" ('রহস্য-সন্দর্ভ', ৬ পর্ব, ৬১ খণ্ড, পৃঃ ১৩)

* * * *

"কোন ভদ্র ব্যক্তি একজন কবিরাজকে বলিলেন, 'মহাশয় অদ্য প্রাতে আমার পুত্র অকস্মাৎ অচৈতন্য হইয়া প্রায় দুই ঘণ্টাকাল তদবস্থায় ছিল।' এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া কবিরাজ কহিলেন, 'মহাশয় তাহার জন্য ভাবিবেন না, অনেকে যাবজ্জীবন ঐরূপ থাকেন।'" ('রহস্য-সন্দর্ভ', সন ১২৭৯, ৭ পর্ব, ৬৮ খণ্ড, পৃঃ ৩২)

* * * *

"ছেলের বাপ—মোটে হাজার টাকা! আমার ছেলের একখানা ঠ্যাঙের দামই যে হাজার টাকা হবে।

মেয়ের বাপ—হাজার টাকা দিচ্ছি, একখানা ঠ্যাঙই তবে কেটে দেও। গোটা ছেলেটা নিতে পারি এমন টাকা ত আমার নাই।" ('পঞ্চলহরী', ভাদ্র, ১১৯, পৃঃ ১৪০)

ছবি: প্রবীর সেন

চা নিয়ে

মণিয়ম্পত্তু মুকুন্দন

বাবার বেশ বয়স হয়েছে। চুল সব পাকা। নিয়মিত কামান না, ফলে মুখভর্তি সাদা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। দুঃখী-দুঃখী চেহারা, যখন কোন কথা বলেন, মনে হয় যেন কষ্ট পাচ্ছেন।

দুপুরে কয়েকঘণ্টা দিবানিদ্রা দেবার অভ্যাস হয়ে গেছে ওঁর। ঘরে একটা নকশি কাজ করা খানদানি তক্তাপোশ। সেটিও নাকি বাবার সমবয়সি।

পাশ ফিরে আধবোজা চোখে ঘুমোচ্ছিলেন। বাচ্চারা স্কুল থেকে ফিরে হট্টগোল শুরু করেছে। তবু জাগলেন না। শেষ-মেষ মা এসে ঝাঁকুনি দেবার ঝুঁকিটা নিলেন—"পাঁচটা বেজে গেছে।" বাবা জাগলেন বটে, কিন্তু আবার চোখ বন্ধ করলেন। শুয়ে রইলেন। কিছু পরে একটা চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বললেন—"এঃ! আজ শোওয়াটা বেশি হয়ে গেল। শরীরটা ভীষণ কাহিল লাগছে।" মা জিজ্ঞেস করলেন—"চা আনি?"

—"হুম।"

মা নলিনীকে ডেকে বললেন—"বাবার জন্য চা নিয়ে আয়।"

নলিনীর টানা-টানা চোখ। সর্বদা উনুনের পাশে বসে ফুঁ দিতে-দিতে দুটি গাল এখন গোলাপি কিশোরীর। চা নিয়ে এলো। ময়লা কাপড়, এলো-মেলো চুল।

"বেশ গরম আছে" বলে পেয়ালাটা টেবিলের উপর রাখলো। একটু পর মা সেটা নিয়ে তক্তাপোশের কাছে গেলেন। বাবা চোখ বুজে চুরুটে টান দিতে দিতে বললেন, "ওখানেই রেখে দাও। খেয়ে নেবো।"

মা দরজায় হেলান দিয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। বোজা চোখে চুরুটের টানে তোবড়ানো মুখখানিতে বিষাদের রেখাগুলি স্পষ্ট। মাঝে মাঝে কাতরে উঠছিলেন। চুরুট শেষ হল, তবু বিছানা থেকে ওঠার নাম নেই। মা মনে করিয়ে দিলেন—"চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বোধ হয়।"

বাবা তক্তাপোশ থেকে উঠে লুঙ্গিটা কষলেন। মা এগিয়ে দিলেন পেয়ালাটা। এক ঢোক গিলেই বাবা সেটা টেবিলে রেখে দিলেন।

"কি ব্যাপার? কী হল?"

"কিছুই নয়।"

"চিনি ঠিক আছে?"

"হ্যাঁ।"

"তবে খাচ্ছো না কেন?" পেয়ালার দিকে তাকিয়ে মা জিজ্ঞেস করলেন—
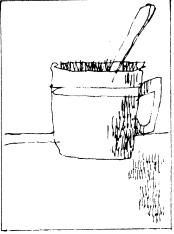
"কড়া হয়ে গেছে নাকি?"

বাবা কিছু বললেন না। জানালার পর্দাটা সরিয়ে বাইরে দেখতে লাগলেন। ঝির ঝিরে বৃষ্টি স্যাঁৎসেঁতে জনহীন দীর্ঘ রাস্তা।

চামচে করে চা-টা চেখে মা চেঁচিয়ে কোঁচকালেন—"নলিনী!"

সায়ায় ভিজে হাত মুছতে-মুছতে মেয়ে নলিনী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

—"চিনি দিস নি কেন?"

ভুলটা বুঝতে পেরেই মুখ লজ্জায় অবনত। উৎকণ্ঠায় ঘেমে নেয়ে উঠলো বেচারী।

—"আচ্ছা ভুলো মন তো তোর?"

মা নিজেই রান্নাঘর থেকে চিনি নিয়ে এলেন।

—"চা-টা তো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। গরম করে দি?"

—"না।" বাইরে দেখতে-দেখতে বাবা বললেন।

—"নাও। খেয়ে নাও।"

—"বলেছি তো, খেয়ে নেবো এখন।" চুরুটের ছাই ঝাড়লেন।

ঠাণ্ডা চায়ের পেয়ালাটা টেবিলেই পড়ে রইল। বাবা আবার চুরুট ধরিয়ে বাইরে দেখতে লাগলেন। হাজার অনুরোধ-উপরোধেও খেতে রাজি হলেন না।

—"কেন আমাকে জ্বালাতন করছো? যখন ইচ্ছা খেয়ে নেবো।"

—"বেচারা মেয়েটা চিনি দিতে ভুলে গেছে, তাই নিয়ে এতো জেদাজিদি?"

বাবা নিরুত্তর। পেয়ালাটা উঠিয়ে মা জিজ্ঞেস করলেন—

"খাবে না?"

বাবা চায়ের দিকে তাকালেনও না।

—"বাঃ! চমৎকার! ভুলে গেছে! তোমরা সবকিছু ভুলে যাও কিভাবে? এই তোমাদের আমার প্রতি শ্রদ্ধা?" গলগল্ করে বেরোতে লাগলো ধোঁয়া। মা কিছু বললেন না দেখে বাবা বলতে লাগলেন— "এই তো কিছুদিন আগে চুরুট শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমাকে একশোবার বলতে হয়েছিলো। আজ সকালে যখন ডাক্তারবাবু এলেন তুমি আমায় জোর করে ময়লা কাপড় পরিয়ে দিলে। এটাকেও কি 'ভুল' বলতে চাও? দ্যাখো, আমি সব বুঝি।"

"আমি তো ভাবতেই পারিনি যে ডাক্তারবাবু হঠাৎ চলে আসবেন। ধোওয়া কাপড় বার করে দিতেই তো যাচ্ছিলাম, কিন্তু সময় পেলাম না। জেনে-শুনে কেউ এ রকমটা করে নাকি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সব কিছু জেনে-শুনে করা হয়। আমি নোংরা কাপড় পরে ঘুরে বেড়ালে কার কি আসে যায়। আমি চা খাচ্ছি না, চুরুটে টান দিচ্ছি না, তো তোমাদের কি! তোমাদের তো লাভের পর লাভই হচ্ছে, তাই না?"

"এ কথা বোলো না।" মার চোখ ভিজে গেল। কপালের ওপর গড়িয়ে আসা কাঁচা-পাকা চুলে হাত বোলাতে-বোলাতে মা জানলা দিয়ে উঁকি দিলেন। ভিজে রাস্তা দিয়ে ছেলেকে আসতে দেখা গেল। হাতে অফিসের কাগজপত্র। বাবার মতই সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটার ধরন। মা বললেন—"রবি আসছে।"

ছেলে ভিতরে ঢুকে ফাইলপত্র টেবিলে রাখলো। ঘাম মুছতে-মুছতে ফরমাস—"মা, চা।" বাবার তক্তাপোশের কাছে গিয়ে এগিয়ে দিলো প্যাকেটটা— "আপনার চুরুট।"

রোজ অফিস-ফেরৎ বাবার জন্য চুরুট নিয়ে আসে সে। সাদা মোড়ক দেওয়া বাক্স। প্যাকেট খুলে লেবেলটা দেখে বাবা নাটকীয় ঢংয়ে বলতে শুরু করলেন—

"কদ্দিন ধরে তোমাকে বলছি যে এরকম সস্তা-মার্কা চুরুট এনো না। খেতে-খেতে গলা শুকিয়ে গেল। শহরে কি অন্য কোন ধরনের চুরুট বিক্রি হয়না?"

ছেলের মুখ থেকে খুশির আলোটা নিবে গেল—

"আপনি তো অন্য ধরনের চুরুট আনতে বলেননি।"

"আলবাৎ; আমি বলিনি," বাবা অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন,—

"চার পয়সা সস্তা যদি হয়, তাহলে এটাই

রোজ এনো। কেশে-কেশে আমি মরে যাবো। আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আরাম করো, আয়েশ করো।"

"আপনি যদি বলেন তাহলে অন্য লেবেলের চুরুট এনে দিচ্ছি ?"

না শোনার ভান করে বাবা বললেন—"আমার কথা শোনার সময় এ বাড়িতে কার আছে। আমার সুখ-দুঃখের কথায় তোমাদের কী যায়-আসে? আমি ভালভাবেই জানি আমার সম্বন্ধে তোমরা কতটুকু চিন্তা কর।" গলার স্বর বুজে এলো। কোটরগত চোখ মাটিতে নিবদ্ধ করে বাবা বলতে থাকলেন—"আমি একটু আরাম করে ঘুমোতে চাই, তা তোমাদের গায়ে লাগে। ঘুমিয়ে সুখ-দুঃখ ভুলে থাকতে পারি, কিন্তু ইনি সে সময়টাও দেন না, ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে দেন।"

"রবি! পাঁচটা বাজার পরেই ওঁকে তুলেছি! চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিলো না? যা কিছু আমি করি তাতেই খুঁত ধরা হয়।" বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন মা।

"বাঃ! সাবাস! তুমি বেকসুর খালাস। ময়লা কাপড় ধোওয়া হয়নি, সেটা আমারই দোষ। চায়ে চিনি পড়েনি, সেটাও আমারই দোষ!"

"যা ইচ্ছা বলো। আমাকে তো সহ্য করতেই হবে। আমারই কপাল। এ তো আর আজকের কথা নয়। পঁচিশ-তিরিশ বছর হল বিয়ে হবার পর এখানে এসেছি, একদিনের জন্যেও শান্তি পাইনি।" মার চোখ জলে ভরে গেল।

আধপোড়া চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে বাবা বললেন—

"লেকচারটা বেশ ভালই হল।"

মা কিছু বললেন না। অপ্রতিভভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন, যেন এমন কিছু বলে ফেলেছেন, যা বলাটা উচিত হয়নি। মার অবস্থা দেখে বাবা বললেন—

"আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কথা শোনাচ্ছে। দাম কমে গেছে যে! সারা জীবন মেহনত করে করে যখন আমি ক্লান্ত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছি, তখন লেকচার দেবার কথা মাথায় আসছে। কিন্তু জেনে রাখো, তোমাদের এখনও অতটা ক্ষমতা হয়নি।"

"বাবা, রাগ করবেন না। চা আবার করে দেবে। আমি এক্ষুনি গিয়ে আপনার পছন্দমত চুরুট নিয়ে আসছি।"

ছেলেকে বেরিয়ে যেতে দেখে বাবা বাধা দিলেন—"তুমি আবার যাচ্ছো কোথায়? আমি না চাই চুরুট না চা। এরকম যেন না হয়, যে তোমাদের সামনে হাত পেতে আমাকে কিছু চাইতে হচ্ছে। আমি যে বুড়ো হয়ে গেছি, পরিশ্রম করতে পারি না; এ জ্ঞানটা তোমাদের আছে? আমার মনের কথাটা কী, সেটা বুঝে আমার পছন্দসই চুরুট আনা উচিত। আমাকে দেখা-শোনা করা উচিত। এটা মনে রেখো যে আমি কোন ভিখারী নই। ভগবান করুন সে দিন যেন কখনো না আসে। এরকম অবস্থা না হয় যে তোমরা বাবাকে আর দেখতেই পারছো না।" কাঁপা-কাঁপা গলা।

"বাবা, আপনি এসব কথা বলছেন কেন? আপনার কোন বিরুদ্ধাচরণ তো আমরা করিনি। না জেনে-শুনে যদি কিছু ঘটে গিয়ে থাকে তার জন্য মাফ করে দেবেন।"

"মাফ করবো? তোমাদের খাওয়ালাম-পরালাম। দু'বেলা দু'মুঠো জুটছে, মাথার ওপর ছাদ আছে। এসব কী করে হল? আমার রক্ত জল করে। আর শেষ পর্যন্ত এই বুড়ো বয়েসে আমাকে না খাইয়ে মারার তাল করছো! ব্যাপারটা যে বুঝতে পেরেছি তা যখন আমি সাফ-সাফ জানিয়ে দিচ্ছি তখন তুমি বুক ফুলিয়ে বলছো—

মাফ করে দেবেন! বাঃ! চমৎকার!"

ছেলে নিজেকে সংযত করে বাবার কাছে গিয়ে নরম সুরে বললো—"বাবা, বুঝতেই পারছি যে আপনার মধ্যে কিছু পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা আপনার বিরুদ্ধে স্বপ্নেও কখনো কিছু বলবো না, ভাববো না, করবো না। আপনার প্রতি ভালবাসা-শ্রদ্ধা আমাদের বরাবরই আছে। আপনি মন খুলে নিজের কথাটা বলুন।"

মুহূর্তে ছেলের চেহারাটা দেখে নিয়ে বাবা শান্ত হয়ে বললেন—"তাহলে কি তোমরা এই বুড়োটাকে একেবারে ভুলে যাওনি?" এক চিলতে হাসি—"দাঁও-পাঁচ, ধোঁকাবাজি আমার সঙ্গে চলবে না। বোধ হয় ঠাউরেছো যে তোমরা যা-কিছু করছো তা আমি চুপচাপ দেখবো আর বরদাস্ত করবো। কখনো নয়। যতক্ষণ শরীরে

নিউট্রিলায় বানানোর মজা সত্যিই সোজা !

আমি প্রথমে কেবল জলেতে নিউট্রিলা চাংক্স মিনিট দশেক ভিজিয়ে নিই। তারপর নিংড়ে সব জল বার করে, ছানার টুকরো, বড়া বা বড়ির মতই সরাসরি তরকারির কাই, ঝোলে মিশিয়ে দিই। ফলে তৈরী হয় যে খাবার, সবার মতেই চমৎকার। আর জানেন তো, যাঁরা ছিমছাম গড়ন রাখতে চান, নিউট্রিলা তাঁদের জন্যে সত্যিই চমৎকার। আর মাগ্গি-গণ্ডার পুষ্টিকর খাবারের বদলে, নিউট্রিলায় বেশী পুষ্টিগুণ আর কম খরচ পড়ে।

নিউট্রিলায় বানানো রকমারি খাবার, আহা চমৎকার !

নিউট্রিলা আসার ফলে, কতো চমৎকার খাবার আর কাটলেট, সিঙ্গাড়া বড়ার জলখাবার, বা পোলাওতো আমি খেতে পাই আর কেবলই চাই।

নিউট্রিলা মেলানো খাবার বেশী প্রোটিনের আর পুষ্টিকর !

শরীরকে সুস্থ-সবল গড়ে তুলতে আর সবসময়ে চাঙ্গা রাখতে প্রোটিনের অশেষ গুণ। আর নিউট্রিলায় এর পুরো গুণটাই রয়েছে। প্রকৃতির এই মহান দানের সেরাজাতের প্রোটিনে ভরপুর সোনালী সয়াবীন দিয়েই নিউট্রিলা বানানো। তাছাড়া, নিউট্রিলা খেলে কোনও মেদ জমে না এবং এতে কোলেস্টেরল জমার আশংকা খুবই কম আর হজমও হয় খুবই সহজে।

১০০% নিরামিষ

নিউট্রিলা

প্রোটিন-সমৃদ্ধ সয়া আহার

মোলায়েম, রসালো চাংক্স আর গ্র্যানিউলস
পুষ্টিগুণে ঠাসা, খাবার বানায় খাসা !

১০০ গ্রাম ও ২৫০ গ্রামের কার্টনে এবং ২৫০ গ্রাম ও ১০০০ গ্রামের পলিপ্যাকে পাওয়া যায়।

রুচি সয়া ইন্ডাস্ট্রীজ লিমিটেডের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

এতটুকুও সামর্থ্য আছে, আমি প্রতিবাদ করবোই। তোমরা যা-ইচ্ছে তাই করবে, তা চলতে দেবো না। সাবধান!"

"কিসের ধোঁকাবাজি বাবা? আপনি খোলাখুলি বলে ফেলুন। এসব আপনার মনগড়া ধারণা।"

"মনগড়া! বাঃ! বেশ! আমি বিনা কারণেই বকবক করি তাহলে? এর পর তো এ কথাও বলবে যে আমার জ্ঞান-গম্যি নেই, আমি পাগল। এটা ধোঁকাবাজি নয় তো কি?"

ছেলে চুপচাপ। মার তোবড়ানো গাল চোখের জলে ভিজে যেতে লাগলো।

পাকা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বাবা বললেন—"তোমরা আমাকে পাগল বানাতে চাও তাই না? বুড়ো কুকুরের মত তাড়িয়ে দিতে চাও। লোকজন কথা তুললে বলে দেবে— 'কি আর করা যায়। বেচারা পাগল হয়ে গেছে।' দাঁও-প্যাঁচ! ধোঁকাবাজি!"

মুখে হাত চাপা দিয়ে মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

বাবা মুখ ফিরিয়ে বললেন—"কাঁদছো কেন? তোমার চোখের জলের স্রোত দেখে বা তোমার ছেলের কথা শুনে গলে যাবার পাত্র আমি নই। তোমাদের হুকুমমত লেজ নাড়তে থাকবো নাকি? এটা আমার বাড়ি, বহু বছরের মেহনতের ফল। এর চার দেওয়ালের মধ্যে আমারই হুকুম চলবে। সবার উচিত আমি যা বলবো তা মাথা নিচু করে মেনে নেওয়া। আমার সামনে দাঁড়িয়ে লেকচার দেওয়ার আস্পদ্ধা যেন কারোর না হয়।"

মা চুপ করে দাঁড়িয়ে। চোখের দৃষ্টি মাটিতে গাঁথা। ছেলেও কিছু বললো না। বিষণ্ণ, চিন্তিত। বাবা ছেলের দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করলেন—"কি? চুপ মেরে গেলে কেন? বোধ হয় ফন্দি আঁটছো যে কিভাবে বুড়োটাকে বাড়ি থেকে দূর করে দেওয়া যায়? ও আশা ত্যাগ করো বাছা। যতক্ষণ শ্বাস আছে, এই বাড়িতেই আমি থাকবো, বুঝলে?"

"বুঝলাম," ছেলের গলা উত্তেজিত, "আচ্ছা বাবা, মার চোখের জলটাই আপনার কাম্য তাই না? আমরা একদিনও শান্তিতে থাকতে না পারি, সেটাই আপনি চান। বলুন কী হলে আপনি খুশি হন? বউ-ছেলেমেয়েদের বাড়ি থেকে বার করে দিয়ে একা থাকতে যদি চান, সেটা বলে দিন।" হাত ঘষতে ঘষতে ছেলে দ্রুতবেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সিঁড়ি বেয়ে নেমে রাস্তার দিকে। বাবার মতো একপাশে ঝোঁক দিয়ে ওর চলার বিশেষ ঢংটা লক্ষ করার মত।

বাবা আধপোড়া চুরুট জানলার কাঠে রেখে গালে হাত বোলাতে বোলাতে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। অনেকক্ষণ থামে ভর দিয়ে চিন্তা করলেন, তারপর আরামকেদারা পেতে শুয়ে পড়লেন। অন্য একখানা চুরুট ধরিয়ে দেখতে লাগলেন থামের নিচের দিকটা। জল-ভরা উঠোনে অসংখ্য বুদবুদের ভাঙা-গড়া খেলা।

বৃষ্টিটা ধরার পর ছেলেকে ফিরে আসতে দেখা গেল। জামা-কাপড় ভিজে-জবজবে। চুল বয়ে জল গড়াচ্ছে। মাথা নামিয়ে সোজা ভিতরে চলে গেল এমনভাবে যেন আরামকেদারায় শায়িত বাবা এবং নতমস্তক বসে থাকা মা, দুজনের কেউই ওর নজরে পড়েনি।

কাছে গিয়ে মা জিজ্ঞেস করলেন, "ভাত চাপাই?"

বাবা "হ্যাঁ" বলে ধোঁয়া ছাড়ায় অভিনিবিষ্ট হলেন।

ভিজে কাপড়-জামা ছেড়ে ছেলে যখন এলো ততক্ষণে মা টেবিলে রাখা থালাগুলোয় ভাত বাড়ছিলেন। মাঝে-মাঝে আঁচলে চোখ মুছতে দেখে ছেলে জিজ্ঞেস করলো—"মা কাঁদছো কেন?"

মা কিছু না বলে গামছায় মুখ মুছতে লাগলেন। ফ্যাকাশে, পাণ্ডুর চেহারা, দেখলেই মনে হয় যেন অসুস্থ।

আবার গেলেন আরামকেদারার কাছে—, "বিছানা পেতে দিয়েছি। বাইরে ঠাণ্ডায় শুয়ে আছো কেন? চারটি ভাত খেয়ে নিয়ে ঘরে এসে শুয়ে পড়ো। আমাদের মাফ করে দাও, কথাটা রাখো।"

"আমার খিদে নেই।"

"দুপুরবেলায় তো ওই অতটুকু ভাত খেয়েছিলে। চা-ও খাওনি, তবু খিদে পাচ্ছে না?"

"আমি খাবো না। রবি খেয়ে নিয়েছে? ওকে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে বল।"

রবি অফিসের কাগজপত্র নাড়াচাড়া করছিলো। মা বললেন—"ও তোমার সঙ্গে খেতে বসবে বলে অপেক্ষা করছে।"

বাবার ডাক শুনে রবি এসে দাঁড়ালো। তিনি বললেন—"তুমি খেয়ে নাও। আমার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। আমার ভাগ্যটাই এরকম, কী আর করা যায়?"

ছেলে কিছু বলছে না দেখে বাবা আবার বললেন—"দাঁড়িয়ে আছো কেন? ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। যাও, খেয়ে নাও গে।"

"আপনি কিছুই খাবেন না?"

"বললাম তো না। আমার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। আমার যখন খুশি খেয়ে নেবো। তোমরা সবাই খেয়ে নাও।"

মা ও ছেলে দু'জনেই দাঁড়িয়ে। আবার আরম্ভ হল বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা হাওয়ার দাপট। বারান্দায় ছাঁট আসতে লাগলো। আকাশের কোণায় বিদ্যুতের ঝিলিক।

বাবা বললেন—"দমকা বাতাস আর বৃষ্টির তেজ বাড়ছে। কিছু খেয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ো।"

"খালি পেটে থেকে এই ঝড়-জলে বাইরে শুয়ে থাকলে অসুস্থ হয়ে পড়বে। অন্যদের এইভাবে জ্বালাতন করছো কেন?"

"বহু ঝড়-জল কাটিয়ে এসেছি। আমি অসুখে পড়বো না। আর ধরে নাও যদি পড়িও, তাতেই বা কী ক্ষতি? আমি কাউকে জ্বালাতন করি না।"

"খিদে না থাকলে খেও না, কিন্তু ভিতরে গিয়ে শুতে কি আপত্তি?"

"আমি যা-কিছু বলি, তার বিরোধিতা করাটা তোমাদের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি না খেয়ে থাকতে রাজি, বৃষ্টি হাওয়া সব সহ্য করবো যদি তোমরা আমার কথা শোন।"

মা বললেন—"আমরা তো কখনো তোমার কথা অমান্য করিনি।"

"তাহলে তোমরা ভিতরে যাও, আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ো। আমার সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তা করে মাথা খারাপ করো না। সবই আমার মন্দ ভাগ্য। অবশ্য আমার জন্য বেশিদিন তোমাদের কষ্ট পেতে হবে না। বড় জোর ছ'সাত মাস। তখনও যদি না মরি তাহলে এমন পথ বেছে নেবো যাতে কাউকে বিরক্ত না হতে হয়।" বাবা তোতলাতে থাকলেন উত্তেজনার কাঁপুনিতে।

"মা, ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।" চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মেয়ে বললো। শুনে বাবা চেয়ার থেকে উঠে বললেন—

"জেদ ছাড়ো, ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ো। তা না হলে..."

বাবা লুঙ্গিটা ভাল করে বাঁধলেন— "যা বলছি শোন। তাতেই মঙ্গল! না হলে এই বৃষ্টির মধ্যে আমি বেরিয়ে চলে যাবো। না-ই বা খেলাম, এই ঠাণ্ডায় আমাকে বারান্দায় শুয়ে থাকতে দাও। এটুকুও দেবে না? তুমি কি চাও যে রাস্তায় কুকুরের মত মরি?"

সশব্দে দরজা বন্ধ হল। আলো নিবে গেল। অন্ধকারে বৃষ্টির ছাঁট আর দমকা হাওয়ার মাঝে আরামকেদারায় শুয়ে-শুয়ে বাবা পকেট হাতড়াতে লাগলেন। চুরুট শেষ। নিচে চারদিকে ছড়িয়ে থাকা টুকরোগুলোর মধ্য থেকে একটা তুলে নিয়ে ধরিয়ে টান দিতে লাগলেন।

অনুবাদ : সোমনাথ সান্যাল

এম· মুকুন্দন
জন্ম ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৪২। জন্মস্থান মাহী। সম্পূর্ণ নাম মণিয়াম্মাড় মুকুন্দন। মলয়ালম গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত পুস্তক সংখ্যা আনুমানিক ... 'মাহী নদী কে তটে' যেঁ উপন্যাসের জন্য ১৯৭২ সালের কেরল সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন। শেষ

সিক্‌ল্-সেল অ্যানিমিয়া

সমরজিৎ কর

১৯১০। সারা শিকাগো শহরে বিচক্ষণ চিকিৎসক হিসেবে ডঃ জেম্‌স বি হেরিক-এর তখন খুবই নামডাক। গোলমেলে রোগ হলেই ডঃ হেরিক। ওই বছর জনৈক কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রকে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হল চিকিৎসার জন্যে।

ছেলেটির অভিভাবক জানালেন, এর আগে অনেক ডাক্তারকে দেখিয়েছেন তিনি। চিকিৎসাও চলছে দীর্ঘকাল। ফল হয়নি।

ডঃ হেরিক ছাত্রটিকে এক নজরে দেখে নিলেন। রোগা। সারা মুখে ক্লান্তির ছাপ। তারপর জিজ্ঞেস করলেন তাঁকে, বল কি কি অসুবিধে হচ্ছে তোমার ?

ছেলেটি বলল, অনেক দিন ধরে জ্বরে ভুগছি। মাঝে মাঝে সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। সব সময় খুকখুক্ কাশি। মাথা ঝিমঝিম করে। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার চিন্তাশক্তি কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

পরীক্ষা করতে গিয়ে ডঃ হেরিক আবিষ্কার করলেন, ছেলেটি রোগের একটি কারখানা। এর আগে সে জনডিসে ভুগেছে। তার পায়ে আল্‌সার। দেহের গাঁটে রোগ। বেতো রোগীর মত। সেই সঙ্গে অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা।

ছেলেটির রক্ত পরীক্ষা করা হল। স্বাভাবিক রক্তে যে লোহিত কোষ থাকে তারা হয় গোলাকার। কিন্তু ডঃ হেরিক লক্ষ করলেন, ছেলেটির বেশ কিছু সংখ্যক লোহিত কোষ দেখতে কতকটা কাস্তের মত। ইংরেজিতে কাস্তেকে বলা হয় 'সিকল্' (Sickle)। তাই এই কোষের তিনি নাম রাখলেন 'সিক্‌ল-সেল'। রক্তে এ ধরনের লোহিত-কোষ থাকলে শরীর দুর্বল হয়। মাঝে মাঝে অনুভূত হয় প্রচণ্ড যন্ত্রণা। 'সিক্‌ল-সেল'জনিত এই রোগটির তিনি নাম দেন 'সিক্‌ল-সেল ক্রাইসিস'। যার প্রধানতম লক্ষণ অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা।

পরে রোগটি নিয়ে অনুসন্ধান চালান একাধিক চিকিৎসাবিজ্ঞানী। দেখা গেল, এই রোগে যারা আক্রান্ত হয়, তাদের বেশির ভাগই মারা যায় কম বয়েসে। স্বল্পসংখ্যকের আয়ু পঞ্চাশ বছর বা তার চেয়ে যৎসামান্য বেশি।

রোগটির কারণ সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করলেন ইনডিয়ানা ইউনিভার্সিটি স্কুল অভ মেডিসিনের দুজন বিজ্ঞানী—ই· ভি· হান এবং ই· বি· গিলেসপাই, ১৯২৭ সালে। তাঁরা লক্ষ করলেন, যে সব রোগী সিক্‌ল-সেল অ্যানিমিয়ায় ভোগে, অকসিজেনের পরিমাণ বেশি হলে তাদের রক্তের বেশির ভাগ লোহিত কণার কাস্তের মত

স্বাভাবিক গোলাকার লোহিতকণার বদলে কাস্তের মত বাঁকা কোষ রক্তে অক্সিজেন পরিবহনের প্রতিবন্ধী হয়ে সৃষ্টি করে রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়ার লক্ষণ। হিমোগ্লোবিন অণুর একটি মাত্র উপাদানের পরিবর্তন লোহিতকণার এই বিকৃতির জন্য দায়ী।

গঠনবিশিষ্ট কোষের পরিবর্তন ঘটে। অকসিজেন বেশি থাকলে, বেশির ভাগ লোহিত কোষের গঠন গোলাকার থাকে। অকসিজেনের মাত্রা কমে গেলে লোহিত কোষগুলি ধারণ করে নানা রকম আকৃতি। কোনোটি কাস্তের মত, কোনোটি অর্ধগোলক, অথবা আঁকাবাঁকা। তাঁরা এটাও লক্ষ করেন, রক্তে যদি অকসিজেনের মাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়, বিকৃত ওই লোহিত কোষগুলির বেশির ভাগই আবার ফিরে পায় তাদের স্বাভাবিক আকৃতি। হয়ে ওঠে গোলাকার। ব্যাপারটা দাঁড়ায় কতকটা চন্দ্রকলার মত। সূর্য এবং চাঁদের পারস্পরিক অবস্থানের দরুন চাঁদকে যেমন কখনো দেখায় কাস্তের মত, কখনো অর্ধ গোলাকার, কখনো গোলাকার—এ ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঘটে কতকটা সেই রকম। অকসিজেনের মাত্রা কমে গেলে গোলাকার লোহিত-কোষের চেহারা দাঁড়ায় কাস্তের মত। অকসিজেনের মাত্রা বাড়লে কাস্তে গোলকে পরিণত হয়। অবশ্য এটাও দেখা গেল, কিছু কিছু সিক্‌ল্-সেল অকসিজেনের মাত্রা বাড়লেও তাদের আকৃতি পালটায় না। এ ধরনের কোষগুলির নাম দেওয়া হল 'ইরিভার্সিবল্ সিক্‌ল্-সেলস' বা অপরিবর্তী কাস্তে-কোষ।

ব্যাপারটা লক্ষ করে হান এবং গিলেসপাই মন্তব্য করেন, কৈশিক নালীর মধ্যে প্রবাহিত হওয়ার সময় রক্তের লোহিত-কোষগুলি তাদের সঞ্চিত অকসিজেন আশপাশের কোষকলাগুলিতে ছড়িয়ে দেয়। এর ফলে তাদের অকসিজেনের মাত্রা কমে আসে। তারা কাস্তে-কোষে পরিণত হয়। এবং আকৃতির পরিবর্তনই যে শুধু ঘটে, তাও নয়। তারা জমাট বাঁধতে থাকে। সিকল্-সেলে থাকে এক ধরনের অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন অণু। এই অণুগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে সৃষ্টি করে জেলাসের মত সামগ্রী। এই অবস্থায় কাস্তে-কোষ কৈশিক নালিকার মধ্যে জমতে থাকে, কতকটা [illegible] মত। এর ফলে

অকসিজেন পরিত্যাগ করার পর রোগীর লোহিত-কোষের অবস্থা।

অকসিজেনবাহী লোহিত-কোষের প্রবাহ বাধা পায়। ব্যাহত হয় কোষকলায় অকসিজেনের সরবরাহ। এক কথায় যার নাম সিকল্-সেল অ্যানিমিয়া। এই অবস্থায় শরীরে দেখা দেয় নানা রকম উপসর্গ; দুরারোগ্য ব্যাধি।

"সিকল্-সেল অ্যানিমিয়া একটি বংশগত রোগ।" বলেছেন রকেফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিজ্ঞানী অ্যানথোনি সেরামি এবং চার্লস এম· পিটারসন। "কোষের মধ্যে থাকে নানা রকমের জিন। তাদের এক এক শ্রেণীর ভূমিকা এক এক রকম। এক ধরনের জিনের কাজ লোহিত-কোষে হিমোগ্লোবিন তৈরি করা। কোন কারণে বিকৃত হলে এই জিন অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন তৈরি করে। ধরুন, কোন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বহন করছে অস্বাভাবিক জিন। এ ক্ষেত্রে ঘটনাটি ঘটতে পারে এই রকম: তাদের সন্তান হল। সন্তান বাবার কাছ থেকে পেল একটি অস্বাভাবিক জিন এবং মার কাছ থেকে পেল একটি অস্বাভাবিক জিন। এমনটি ঘটলে সন্তানের লোহিত-কোষে তৈরি হবে অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন। দেখা দেবে সিকল্ সেল অ্যানিমিয়া।"

কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায়, শিশু জন্মাল; বংশগত সূত্রে সে তার বাবা-মার কোন একজনের থেকে লাভ করল সিকল-সেলজনিত হিমোগ্লোবিন তৈরির একটি 'জিন', আর একজনের কাছ থেকে পেল স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন তৈরির 'জিন'। এ ক্ষেত্রে ওই শিশুর শরীরে সিকল-সেল অ্যানিমিয়া দেখা দেয় না। পরিবর্তে সে বহন করে বংশগতিসুলভ ধারাবাহিকতা। তার মাধ্যমে সেই জিন তার সন্তানসন্ততির দেহে পরিবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মজার ব্যাপার এই, অনেকে মনে করেন, যারা এ ধরনের বাহক তারা, যারা বাহক নয়, তাদের চেয়ে ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধ করার
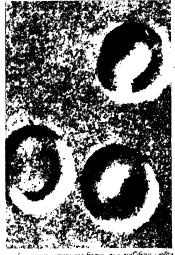
অকসিজেন গ্রহণ করার পর সিকল-সেল অ্যানিমিয়া রোগীর রক্তের লোহিত কোষ

দেখা গেছে, যাদের শরীরে এই রোগের জিন রয়েছে, কিন্তু রোগ অপ্রকট, স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় তাদের ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বেশি। তাই ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত এলাকায় বাস করলেও মৃত্যুর হাত থেকে তারা আত্মরক্ষা করতে পারে। এ এক রহস্য।

ক্ষমতা রাখে বেশি। তাই ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত এলাকায় বাস করলেও মৃত্যুর হাত থেকে তারা আত্মরক্ষা করতে পারে। বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন, আফ্রিকার যে সব অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশি, সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে গড়ে চল্লিশ শতাংশ সিকল্-সেল জিনের বাহক।

বর্তমানে সিকল্-সেল জিনের বাহক এবং সিকল্-সেল অ্যানিমিয়ার রোগী কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই এ ধরনের জিন বহন করছে কম করেও ৮ থেকে ১০ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ। প্রতি ১০০০টি শিশুর মধ্যে গড়ে তিনটি শিশু সিকল-সেল অ্যানিমিয়ার শিকার। এ ছাড়াও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, মধ্য আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন অঞ্চলেও ছড়িয়ে রয়েছে কিছু কিছু বাহক। কিছু সংখ্যক তুরস্ক, গ্রীস, মধ্যপ্রাচ্য এবং ভারতেও রয়েছে। আফ্রিকার দাস এবং বিদেশী আগন্তুকদের মাধ্যমেই সম্ভবত এ সব দেশে ওই জিন ছড়িয়ে থাকবে।

ব্যাপারটি রাসায়নিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার কাজে লেগে গেলেন বিজ্ঞানীরা। এক এক ধরনের জিন শরীরে এক এক ধরনের জীবরাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ঘটায়। এই প্রতিক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রে শরীরের পক্ষে যেমন উপকারী, আবার অনেক ক্ষেত্রে অপকারীও বটে। বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় শরীরে দেখা দেয় নানা রকম অনাকাঙ্ক্ষিত উপসর্গ, রোগ। এ ব্যাপারে অস্বাভাবিক জিনের ভূমিকা কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

১৯৪৯ সালে নোবেলবিজ্ঞানী লাইনাস পাউলিং পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করলেন, সিকল্-সেল-এর দরুন যে রোগ দেখা যায় তার মূলে কাজ করে অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন অণু। যার নাম দেওয়া হয়েছে হিমোগ্লোবিন-এস (hemoglobin S)। এই হিমোগ্লোবিনই লোহিত-কোষে বিকৃতি ঘটিয়ে তার আকৃতিটি করে তোলে কাস্তের (Sickle) মত। ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অভ টেকনোলজিতে এ নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন পাউলিং। সহযোগী হার্ভে এ· আইভানো, স্যামুয়েল জে· সিংগার এবং আইবার্ট সি· ওয়েলস। সিকল্-সেল অ্যানিমিয়া রোগীর হিমোগ্লোবিনের দ্রবণের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ চালিয়ে অদ্ভুত একটি ব্যাপার লক্ষ করলেন তাঁরা। দেখা গেল, তড়িৎপ্রবাহ চলার সময় স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন অণুগুলি হিমোগ্লোবিন-এস-এর তুলনায় অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে পজিটিভ তড়িৎদ্বারের (anode) দিকে অগ্রসর হয়।

এই ঘটনার কয়েক বছরের মধ্যেই হিমোগ্লোবিন-এস অণুর গাঠনিক ত্রুটিও আবিষ্কৃত হল। চারটি শৃঙ্খল দিয়ে তৈরি একটি হিমোগ্লোবিন অণু: দুটি সমাকৃতি আলফা শৃঙ্খল; দুটি সমাকৃতি বিটা শৃঙ্খল। প্রতিটি আলফা শৃংখলে থাকে ১৪১টি অ্যামিনো অ্যাসিড; প্রতিটি বিটা শৃঙ্খলে ১৪৬টি অ্যামিনো অ্যাসিড। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবরসায়নবিদ ভারনন ইনগ্রাম লক্ষ করেন,

স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন এবং হিমোগ্লোবিন-এস-এর বিটা শৃঙ্খলের গঠনে কিছুটা তারতম্য থাকে। স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের বিটা শৃঙ্খলের ষষ্ঠ স্থানে থাকে গ্লুটামিক অ্যাসিড, হিমোগ্লোবিন-এস-এর বিটা শৃঙ্খলের ষষ্ঠ স্থানে থাকে ভ্যালিন। এর জন্যেই তড়িৎক্ষেত্রের মধ্যে চলার সময় স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন এবং হিমোগ্লোবিন-এস-এর গতিতে তারতম্য দেখা যায়। কারণ ষষ্ঠ স্থান অধিকারী গ্লুটামিক অ্যাসিডবিশিষ্ট স্বাভাবিক বিটা শৃংখলে থাকে নেগেটিভ তড়িৎ আধান, ভ্যালিনবিশিষ্ট হিমোগ্লোবিন-এস-এ তড়িৎ আধান থাকে না।

এই আবিষ্কার সিকল্-সেল অ্যানিমিয়া চিকিৎসার ব্যাপারে যোগাল নতুন তথ্য। যে সব জৈবিক অণুতে বৈদ্যুতিক আধান থাকে তারা জলকে আকর্ষণ করে। এ ধরনের অণুদের বলা হয় হাইড্রোফিলিক (hydrophilic)। যে সব জৈবিক অণুতে বৈদ্যুতিক আধান থাকে না, তারা জলকে বিকর্ষণ করে। শেষোক্ত এই অণুদের বলা হয় হাইড্রোফোবিক (hydrophobic)। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের বিটা শৃংখলে ষষ্ঠস্থানে থাকে গ্লুটামিক অ্যাসিড (এক ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড)। এই অ্যামিনো অ্যাসিডে থাকে ধনাত্মক বিদ্যুৎ-আধান, যা জলকে আকর্ষণ করে। কিন্তু হিমোগ্লোবিন-এস-এর ষষ্ঠ স্থানে থাকে বিদ্যুৎ-আধানবিহীন ভ্যালিন, যা বিকর্ষণ করে জলের অণু। এই তথ্যটি জানার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব্ হেল্‌থ-এর রক্ত বিশেষজ্ঞ মাকিও মুরাইমা একটি তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে বললেন, বিটা শৃঙ্খলে জল-প্রতিহতকারী ভ্যালিন থাকে বলেই হিমোগ্লোবিন-এস অণুগুলি জমাট বেঁধে কাস্তের আকারে পরিণত হয়।

তথ্যটি জানার পর রোগটির নিরাময়ের কথাও ভাবা হল। কোন কোন রাসায়নিক যৌগ জলপ্রতিহতকারী অণুর গাঠনিক পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে জল-আকর্ষক অণুতে পরিণত করে। এ ক্ষেত্রে সেই রাসায়নিক যৌগ হিসেবে কাজে লাগানোর জন্যে ইউরিয়ার কথা প্রস্তাব করলেন মিশিগানের গ্র্যাণ্ড র‍্যাপিডস-এ অবস্থিত ব্লডগেট মেমোরিয়াল হাসপাতালের গবেষক রবার্ট এম· নালব্যানডিয়ান। সিক্‌ল্-সেল রোগীর শরীরে অতিরিক্ত মাত্রায় ইউরিয়া ইনজেকশন করে ভাল ফলও পাওয়া গেল।

স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের বিটা শৃঙ্খলের ষষ্ঠস্থানে থাকে গ্লুটামিক অ্যাসিড। হিমোগ্লোবিন এস এর বিটা শৃঙ্খলের ষষ্ঠস্থানে ভ্যালিন থাকায় হিমোগ্লোবিন অণু এবং সেই সঙ্গে লোহিত কণায় বিকৃতি ঘটে। পরিবর্তিত অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রতিক্রিয়া কমানোর জন্য রক্তে প্রয়োগ করা হয় বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ। সোডিয়াম সায়ানেট প্রয়োগ করার পর অক্সিজেন-পরিত্যক্ত অবস্থায় সিকল-সেলের অবস্থা কেমন স্বাভাবিক হয়েছে লক্ষ করুন

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, এ ধরনের চিকিৎসায় একটি বড় রকমের সমস্যা দেখা দিয়েছে। হিমোগ্লোবিন-এস অণুর মধ্যে অবস্থিত জলপ্রতিহতকারী রাসায়নিক বন্ধনীটি ভাঙতে গেলে দরকার অতিরিক্ত ইউরিয়া। রক্তে ইউরিয়ার মাত্রা যাতে বেশি পরিমাণে বজায় থাকে, সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। শেষ পর্যন্ত এটাই হয়ে দাঁড়াল সমস্যা। বিপাকীয় পদ্ধতিতে শরীরে এমনিতেই ইউরিয়া উৎপন্ন হয়। কিডনি রক্ত থেকে সেই ইউরিয়া বিমুক্ত করে। দেখা গেল, ইনজেকশনের সাহায্যে রোগীকে যে ইউরিয়া দেওয়া হচ্ছে তাও ওই একই পদ্ধতিতে বিমুক্ত হচ্ছে। ফলে রক্তে ইউরিয়ার মাত্রা প্রয়োজন মত বজায় থাকছে না। এই ত্রুটির দরুন ইউরিয়ার সাহায্যে সিকল-সেল রোগীর চিকিৎসা শেষ পর্যন্ত আর সফল করা গেল না।

পরে সমস্যাটি দূর করার জন্যে অন্যান্য উপাদানও কাজে লাগান হয়েছে। পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল, এ ব্যাপারে সায়ানেট অনেকটা কার্যকর। বিশেষ করে, সোডিয়াম সায়ানেট।

'আমরা একাধিক রোগীর উপর সোডিয়াম সায়ানেট প্রয়োগ করেছি।" সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন সেরামি এবং পিটারসন। "কোন অসুবিধে নেই। সিকল-সেল রোগীদের আমরা ক্যাপস্যুলে ভরে সোডিয়াম সায়ানেট খেতে দিই। রোগীর দৈহিক ওজনের প্রতি কিলোগ্রামে মাত্রা ১০ থেকে ২৫ মিলিগ্রাম। দেখা গেছে, এতে কোন ক্ষতি হয় না। রোগীদের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সায়ানেট হিমোগ্লোবিন-এস-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে। রক্তে লোহিত-কোষের পরিমাণ দীর্ঘকাল বজায় থাকে।"

সায়ানেটের মাত্রা বাড়িয়েও পরীক্ষা করা হয়েছে। দেখা গেছে, দৈহিক ওজনের কিলোগ্রাম প্রতি সোডিয়াম সায়ানেটের মাত্রা ৩৫ মিলিগ্রাম হলে দেখা দেয় কিছু কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত উপসর্গ। খাওয়ার ব্যাপারে অনিচ্ছা, ওজন হ্রাস প্রভৃতি। কোন কোন রোগীর ক্ষেত্রে দেখা দেয়, গা গুলনো ভাব, পেট ব্যথা এবং ঝিমুনি। কখনো মনে হয়, শরীরে হুল ফুটছে। হাত-পায়ে অসহ্য জ্বালা। সায়ানেট সেবন বন্ধ করলে এই সব উপসর্গ আর থাকে না।

বলা বাহুল্য, গবেষণা এখনো চলছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ভবিষ্যতে রাসায়নিক পদ্ধতি ছাড়াও বংশগত এই রোগটির নিরাময়ের ব্যাপারে জিন-প্রযুক্তিও কাজে লাগান যেতে পারে। **দেশ**

একটি সোনার পাথর বাটি

অশীন দাশগুপ্ত

কোন একজন ব্যক্তি—ঠিক মনে পড়ছে না, কে—কেষ্টঠাকুরের উপর বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন : 'অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল/ তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল।' বক্তব্য কুরুচিপূর্ণ কিন্তু প্রশংসনীয়। কেষ্টঠাকুরের মতিগতি সুবিধার ছিল না। তাঁকে বুঝবার চেষ্টায় প্রচুর বুদ্ধিমান মানুষের যথেষ্ট হেনস্থা হয়েছে। এই ধরনের সমস্যায় তুলনীয় ব্যক্তিদের কথা ভাবলে সুবিধা হতে পারে। কেষ্টঠাকুর সে উপায় একেবারেই রাখেননি। কিন্তু তাঁরই একটু নীচের ধাপে মনুষ্য সমাজ ও ইতিহাসে কিছু জটিল চরিত্র আছেন। তাঁদের বুঝবার চেষ্টা তুলনার পথে কিছুটা এগোতে পারে। গান্ধী এইরকম একটি মানুষ।

সহজ সরল ভাষায়, মধুর ব্যবহারে উল্টোপাল্টা বক্তব্য ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করাই গান্ধীর বৈশিষ্ট্য। মানুষটিকে কোন সহজ হিসাবে ধরা মুশকিল। গান্ধী রচনাবলী নব্বই খণ্ডে শেষ হয়েছে; গান্ধী কিন্তু বিশেষ কিছু লেখেননি। বই বলতে 'হিন্দ স্বরাজ', 'দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ', আর একটি 'আত্মজীবনী' যেটি আত্মজীবনী নয়। গান্ধী বলতেন আত্মজীবনী তিনি লেখেননি, লিখেছেন নিজের জীবনে সত্য নিয়ে পরীক্ষা চালানোর কিছুটা ইতিহাস। এই বক্তব্য সত্য। বইটি লেখেন ১৯২৬ সালে। মনে মনে তখন তিনি তাঁর সত্যে পৌঁছে গেছেন। গান্ধীর তপস্যা তখন পূর্ণাঙ্গ। অন্য মানুষ যে অর্থে আত্মজীবনী লেখেন গান্ধীর পক্ষে সেই লেখা তখন আর সম্ভব নয়, তেমন লেখা লিখবার কোন ইচ্ছাও আর মনে নেই। গান্ধী 'কিছু একটা' পেয়েছিলেন, 'কিছু একটা' খুঁজেছিলেন; সেই পাওয়াটা, সেই খোঁজাটা অসংখ্য চিঠিতে, প্রাত্যহিক বক্তব্যে, সাপ্তাহিক সম্পাদকীয়তে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কথাতে তিনি বিশ্বাস করতেন না। সেজন্য এই কথাগুলি আর বই হয়ে ওঠেনি। চিঠি, লেখা, বক্তব্য একত্র করে নব্বই খণ্ড হল; গান্ধীর লেখা বই কিন্তু বিশেষ নেই। মানুষটিকে বুঝবার ইচ্ছায় গান্ধী-বক্তব্যের সার সংগ্রহ করার চেষ্টা এর আগে হয়েছে। দীনবন্ধু

বিংশ শতাব্দীর সামনে প্রকৃত বিকল্প সাধনা যদি কেউ রেখে থাকেন তিনি গান্ধী। সেই বিকল্প আপনার গ্রহণযোগ্য মনে হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। কিন্তু নিজেকে যদি খাঁটি রাখতে চান তাহলে কোন এক সময় এই মানুষটির মোকাবিলা আপনাকে করতে হবে।

অ্যানড্রুজের কথা মনে পড়ে। কৃষ্ণ কৃপালনী, লুই ফিশার এগুলিও সুবিদিত নাম। টেণ্ডুলকারের বিশাল জীবনী-গ্রন্থও গান্ধীর কথাতেই গান্ধীকে উপস্থাপনা। কিন্তু গান্ধীর বক্তব্যের মূল কথা খুঁজে বার করার চেষ্টা করলে সেটা সংগ্রহ থাকে না, ভাষ্য হয়ে ওঠে। রাঘবন আইয়ার ইদানীং যে তিন-খণ্ডের প্রকল্পটি হাতে নিয়েছেন (দি মরাল অ্যাণ্ড পলিটিকাল রাইটিংস অফ মহাত্মা গান্ধী; প্রথম খণ্ড, অক্সফোর্ড, ১৯৮৬) সেই সংগ্রহ আবার একটি গান্ধী-ভাষ্য তৈরী করবে। অবশ্য ভাষ্যকার হিসাবে রাঘবন আইয়ার সুপ্রতিষ্ঠিত; তাঁর বই 'দি মরাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল থট অফ মহাত্মা গান্ধী' সুবিদিত। গান্ধী সম্পর্কে এতটা বুদ্ধিদীপ্ত লেখা কমই হয়েছে। কিন্তু রাঘবন আইয়ার চিন্তাশীল, দার্শনিক মানুষ; তিনি যখন 'আসল গান্ধী'কে খোঁজেন, গান্ধীও একটু যেন চিন্তাশীল, কোথায় যেন একটু 'অলৌকিক' হয়ে ওঠেন। রাঘবন আইয়ার জানেন মানুষের চৈতন্য ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। তাঁর গান্ধীর মাধ্যমে সেই চেতনার বিবর্তন ব্যাপারে আমরা সজাগ হয়ে উঠি।

অন্য একটি অসাধারণ বই লিখেছেন পান্নালাল দাশগুপ্তমশায়: 'গান্ধী গবেষণা।' বইটি আদপেই গবেষণা-গ্রন্থ নয়। বহু বছর আগে জেলে বসে লেখা। এখন ছাপা হল কারণ এই বক্তব্য কোন নতুন গবেষণায় পালটায় না। একজন নিখাদ বিপ্লবী মানুষ গভীর শ্রদ্ধায় গান্ধীকে বোঝার চেষ্টা করছেন; তার ফলে এই যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মানুষটির ছবি তৈরী হয়েছে, সতর্ক আলোচনায়। সত্যকার বড় মাপের মানুষকে নিয়ে আলোচনা করলে এমন হবেই। আলোচনার ঝোঁকে আলোচ্য একটু-না-একটু নতুন হয়ে ওঠে। গান্ধী-আলোচনা যাঁরা করেন তাঁরা নিশ্চয় একথা বুঝেই করেন যে এই মানুষটিকে এড়ানোর উপায় নেই। বিংশ শতাব্দীর সামনে প্রকৃত বিকল্প সাধনা যদি কেউ রেখে থাকেন তিনি গান্ধী। সেই বিকল্প আপনার গ্রহণযোগ্য মনে হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। কিন্তু নিজেকে যদি খাঁটি রাখতে চান তাহলে কোন এক সময় এই মানুষটির মোকাবিলা আপনাকে করতে হবে।

এই 'নিজেকে খাঁটি রাখা'র ব্যাপারটাই আসল গান্ধী। শুনতে ভারী কটু শোনাবে কিন্তু গান্ধীর মতো অবিশ্বাস্য আত্মকেন্দ্রিক আত্ম-উন্মাদ মানুষ ইতিহাসে হয়নি। এই কথা মনে রেখে যদি তুলনার মধ্যে যেতে চান তাহলে কার্ল মার্কস কি মাদার টেরেসার মধ্যে তুলনা পাবেন না, সমগোত্রীয় পাবেন সেন্ট অগস্টিনের লেখায় কিংবা রুশোতে।

গান্ধী যখন গান্ধী হয়ে ওঠেননি, অর্থাৎ মনে করুন সেই রাজকোটের শৈশব ও কৈশোর, তখনও তাঁর জীবন তৈরী হচ্ছে সজাগ এক আত্মসম্মান জ্ঞানকে ঘিরে। মোহনদাস মেধাবী ছাত্র হতে না পারে কিন্তু কেউ বলতে পারবে না যে মোহনদাস পড়া তৈরী করে না। বিলেত যাওয়ার ব্যাপারে সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট অপমান করলো—কথাটা গান্ধী-মানসে অক্ষয় হয়ে রইলো, সত্যপরীক্ষা ইতিহাসে ফিরে এলো। এই আত্মসম্মান জ্ঞানটাই পরে মোক্ষের তৃষ্ণা হয়ে ফুটলো। গান্ধী মোক্ষ লাভ করবেন। গান্ধী ঈশ্বরের সন্ধান করবেন। গান্ধী ঈশ্বরে বিলীন হবেন। এই সাধনার জন্য গান্ধী সব কিছু করতে রাজী আছেন, শুধু সত্যকে বিসর্জন দিতে পারবেন না। তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ সত্যই ঈশ্বর। ঈশ্বরকে বিসর্জন দিয়ে ঈশ্বরকে খোঁজা চলে না।

বলা বাহুল্য এই অমানুষিক আত্মকেন্দ্রিকতা মার্কসের মধ্যে নেই। একটা ভুল করবেন না: আলোচনা সমস্ত মানুষের স্বাভাবিক অহংবোধ কিংবা নিন্দনীয় অহংকার নিয়ে নয়। সেই দুটি ব্যাপারে বোধ করি মার্কস গান্ধীর চাইতে এগিয়ে ছিলেন। মার্কসের চরিত্রে কোন বৈষ্ণবী বিনয় কেউ যদি লক্ষও করে থাকেন, উল্লেখ করেননি। আলোচ্য সেই ব্যবহারের অহং নয়, সাধনার সূত্রপাতের অহং। আপনার সাধনা আপনি নিজেকে নিয়ে শুরু করবেন। আপনার সাধনা সর্বপ্রথম এবং সর্বোপরি আপনাকেই শুদ্ধ করবে। মনে রাখবেন, গান্ধী পাপাত্মা এবং পাপসম্ভব! তিনি পুণ্যে উত্তরণের পথ খুঁজছেন। নিজের প্রতিটি কাজ এবং প্রতিটি চিন্তার বিশ্লেষণ করে এই খোঁজা চলেছে। সম্ভবত গান্ধী আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে এই আত্মঅন্বেষণে পৌঁছান এবং অন্বেষণ আত্মকেন্দ্রিকতাটুকু জোরালো করে। আবার বলছি, খেয়াল করবেন এ বস্তু সেই গ্রীক তরুণ নারসিসাসের আত্ম-রতি আদপেই নয়। নিজেকে ভালোবেসে গান্ধী নিজের মধ্যে মগ্ন হননি। নিজের প্রতি সন্দেহ এবং অবিশ্বাসই গান্ধীকে সাধনার মধ্যে টেনেছে।

মার্কসের বক্তব্যে এই সাধনার কোন স্থান নেই। গান্ধী চিন্তা করেন মানুষের মনকে ধরে, ভালোমন্দ এবং পাপ-পুণ্য নিয়ে। তিনি জানেন মানুষ পালটালে তবেই সমাজ পালটাবে। মার্কসের চিন্তা শুরু হয় বাইরের জগতে, সমাজকে ঘিরে। মার্কস জানেন সমাজ পালটালে মানুষও পালটায়। মার্কসকে যদি জিজ্ঞাসা করতেন তাঁর নির্দিষ্ট পথে চললে সমাজ পালটাবে কিন্তু মানুষ কি পালটাবেন? উত্তর বোধ করি ছাপানো যেতো না।

কিন্তু লক্ষ করবেন একটি বিশেষ বক্তব্যে মার্কস এবং গান্ধী সম্পূর্ণ একমত। উভয়েরই একান্ত বিশ্বাস: তত্ত্ব এবং কাজ পৃথক করা চলে না। তত্ত্ব থেকেই কাজ, আবার কাজ থেকে তত্ত্ব। কিন্তু মার্কস তত্ত্ব খুঁজেছেন বাস্তব জগতের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে। তিনিও মানুষেরই মুক্তি খুঁজছেন। সেটা কিন্তু কোন অতীন্দ্রিয় মোক্ষ নয়, শোষণমুক্ত সমাজে [illegible] অধিকার। তিনি বলবেন মানুষের চরিত্র উন্নত হবে একমাত্র শোষণমুক্ত সমাজে। শুধু তাই নয়, সেই সমাজ যতদিন না আসছে ততদিন চারিত্রিক উন্নতির বিশেষ প্রয়াস ভ্রান্ত। এই চেষ্টা সমাজ পরিবর্তনের সঠিক আন্দোলনকে ভুল পথে টানবে।

অন্য দিকে, গান্ধীর এ ব্যাপারে মূল বিশ্বাস, কাজই মানুষকে তৈরী করে, কাজই মানুষকে পালটায়। আন্দোলন সত্যাগ্রহীকে তৈরী করবে। সত্যাগ্রহ থেকেই নতুন মানুষ আসবে। সেই মানুষ নতুন সমাজ তৈরী করবে। গান্ধী যদি নিজেকে শোধন করতে না পারেন, তিনি অন্যকে পথ দেখাবেন কেমন করে? জীবনের মধ্যে এই এবং কাজ গান্ধী যেমনভাবে মিশিয়েছেন তেমনটি আর জানি না। ধার্মিক মানুষ অবশ্য এভাবে কাজ করে। কিন্তু গান্ধীর ধর্ম শুধুমাত্র বিশেষ মানুষেই তো থেমে থাকতো না, নতুন একটা জীবনধারা তৈরী করতে চাইতো।

সেজন্য মার্কসের সঙ্গে তুলনাটা আসে। কিন্তু আগেই বলেছি এই তুলনা অস্বাভাবিক। [illegible]

তুলনা সেন্ট অগাস্টিন। চতুর্থ শতাব্দীর এই সাধক মানুষটি তেতাল্লিশ বছর বয়সে আত্মজীবনী লিখেছিলেন। লেখা ঠিক 'আত্মজীবনী' হয়নি। 'সেন্ট অগাস্টিনের স্বীকারোক্তি' বলেই বইটি খ্যাত। অগাস্টিন চেষ্টা করেছিলেন জীবন-কথা না বলে, অন্তর-জীবন কেমন করে পালটে যায় সেই কাহিনী লিপিবদ্ধ করে যেতে। কার্থেজ এবং মিলান শহরের এই খেলোয়াড়-অধ্যাপক জীবন উপভোগ করতে জানতেন। কেমন করে বলতে পারবো না, উপভোগ্য জীবনের মধ্যে পাপ-বোধ ঢুকলো। প্রথম যৌবনের অগাস্টিন বেশ কিছুদিন চেষ্টা করলেন মানি-পন্থার আড়ালে লুকিয়ে পাপের গ্লানি সামলাতে। মানি-পন্থা খ্রীষ্ট-জগতের অপ-ধর্ম, প্রাচীন বিক্ষিপ্ত মত। মানি বলে গিয়েছিলেন ভালো এবং মন্দ সম্পূর্ণ পৃথক দু'টি সত্তা। একই ভগবান দু'টিকে সৃষ্টি করেননি, করতে পারেন না। মানুষের মধ্যে ভালো আছে, মন্দও আছে। সাধনায় ভালো মানুষটি মন্দ মানুষটি থেকে পৃথক হয়ে যায়। অগাস্টিন যৌনতার আনন্দ, বিলাসিতা সবই উপভোগ করতেন। মনকে বোঝাতেন : 'এই পাপের মধ্যে সত্যকার আমি তো নেই। সাপের খোলসের মতো একদিন এসব খসে পড়বে।' বলা বাহুল্য, এই ছলনা বেশীদিন চলেনি। অগাস্টিন প্লেটোর চিন্তায়, সিসেরোর অনুপ্রেরণায় সত্যের সন্ধানে মত্ত হয়েছিলেন। পাপ-বোধ থেকেই খ্রীষ্ট ধর্মের গভীরে গিয়েছিলেন। শেষে উত্তর আফ্রিকার মফস্বল শহরের জীবনে ক্যাথলিক চার্চের বিশপ রূপেই দিন কাটান। বিভিন্ন রচনায় তাঁর জীবনভর সত্যের সন্ধান বর্ণনা করেছেন। 'স্বীকারোক্তি' আমরা সকলেই পড়ি। এছাড়াও তাঁর শেষ বিশাল রচনা 'ঈশ্বরের শহর' সুবিদিত। অগাস্টিন নিঃসন্দেহে সাধক। সৌভাগ্য, অগাস্টিন সুলেখক।

গান্ধী লেখক ছিলেন না কিন্তু অগাস্টিনের মতনই পাপ-বোধে ভুগতেন। শারীরিক সুখ এবং আনন্দ ঈশ্বরের অনভিপ্রেত, এই বিশ্বাস দু'জনেরই জীবন জটিল করে তুলেছিল। অগাস্টিন সত্যের সন্ধানী তার্কিক ছিলেন। বিভিন্ন মত ও পথের আলোচনা অতিক্রম করে তিনি ক্যাথলিক পন্থায় আশ্রয় পেয়েছিলেন। ঠিকই, তাঁর এই 'আশ্রয় নেওয়া'র ঘটনাটা মাথা খাটিয়ে হয়নি। বিশাল একটা মানসিক ভাঙচুরের মধ্যেই ঘটেছিল। কিন্তু বিশপ অগাস্টিন ক্যাথলিক ধর্মের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হয়ে ওঠেন এবং ক্যাথলিক বক্তব্য উপস্থাপনাতেই বাকী জীবন কাটান। গান্ধীর ধর্ম আদপেই এই চেহারা নেয়নি।

গান্ধী সত্যের সন্ধান করতেন ; প্রতি মুহূর্তেই করতেন। কিন্তু সেজন্য কখনই যে বিশেষ মাথা খাটিয়েছেন এমন মনে হয় না। গান্ধীর ঈশ্বর আসলে 'তর্কে বহুদূর।' মোহনদাস হিন্দু ছিলেন। ঈশ্বর তাঁর দৈনন্দিন জীবনে রামচন্দ্রের রূপ নিতেন। কিন্তু গান্ধী জাতি-ভেদ মানতেন না এবং হিন্দুমতের চাইতে গভীর অন্য কোন একটি সত্য-মত নিজের জন্য তৈরী করেছিলেন। হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সত্যধর্মের সংঘাত ঘটলে গান্ধী

মা টেরেসা

সত্যকে অনুসরণ করতেন। তিনি কোনদিনই অবশ্য এই বিরোধ স্বীকার করেননি। সহজভাবেই বলতেন : 'কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে অস্পৃশ্যতা হিন্দু ধর্মের অঙ্গ, তাহলে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করবো।' বলা বাহুল্য কেউ 'প্রমাণ' দিতে পারেনি। গান্ধীও শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত রামচন্দ্রকে স্মরণ করেছেন। কিন্তু কট্টর হিন্দুরা ঠিকই বুঝতেন, গান্ধীকে হিন্দু বলার অসুবিধা আছে। তাঁকে দলে নিলে আচার রক্ষা হয় না ; মুসলমান, অন্ত্যজ সকলেই বন্ধু হয়ে ওঠে। হিন্দু ধর্মের ঐতিহাসিক চেহারাটা এমন নয়। হিন্দু ধর্ম নিয়ে যে লোকগুলি রাজনীতি করেন তাঁরা সেজন্য গান্ধীকে দলে টানার কখনও চেষ্টা করেননি। অগাস্টিন ক্যাথলিক ছিলেন। তৎকালীন ক্যাথলিক সমাজ তাঁকে ঘিরে ছিল। তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। তারা অনুসরণ করেছে। গান্ধী হিন্দু হয়েও হিন্দু ছিলেন না। অগাস্টিন তর্ক করতেন অন্য মতের বিরুদ্ধে ; গান্ধী চাইতেন চণ্ডাল বন্ধুদের নিয়ে মন্দিরে ঢোকার পথ।

বলা বাহুল্য রাঘবন আইয়ার তাঁর সংকলন-গ্রন্থে ধর্ম সম্পর্কে গান্ধীর এই মূল বক্তব্যটি লক্ষ করেছেন। 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকার ১২মে ১৯২০ তারিখের একটি লেখা থেকে যে উদ্ধৃতিটি দিয়েছেন সেটি অবশ্যপাঠ্য। গান্ধী লিখেছেন : 'আমি ভারী স্বার্থপর। চারিদিকে তুমুল ঝড়, তারই মধ্যে আমি শান্তিতে থাকতে চাই। পরীক্ষা চালাই নিজের উপর, বন্ধুদের নিয়ে, রাজনীতির মধ্যে ধর্মকে নিয়ে এসে। ধর্ম কাকে বলে একটু বুঝিয়ে বলি। [যদিচ] হিন্দু ধর্মকেই অন্য সব ধর্মের উপরে আমি স্থান দিই, ধর্ম এখানে হিন্দু ধর্ম নয়। এই ধর্ম হিন্দু ধর্মকেও ছাপিয়ে ওঠে। এই ধর্ম মানুষের মূল প্রকৃতিকে পাল্টে দেয়। মানুষের ভিতরে আর বাইরে যে সত্য বিরাজ করছে সেই সত্যের সঙ্গে মানুষকে অচ্ছেদ্য ভাবে বেঁধে দেয়। এই ধর্ম মানুষকে নিত্য শোধন করে। মানব-প্রকৃতির মধ্যে এই ধর্মটুকুই চিরন্তন। নিজেকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করার জন্য কোন ক্ষতিই সে গ্রাহ্য করে না। মানুষের আত্মা যতদিন না নিজেকে উপলব্ধি করে ততদিন সে আত্মাকে অশান্ত রাখে। আত্মা তার স্রষ্টাকে খুঁজে পেলে, তাঁর সঙ্গে নিজের সাযুজ্য বুঝলে [তবেই তার ছুটি]।'

গান্ধী কোন পথে, কেমনভাবে এই ধর্মে পৌঁছালেন এবং হিন্দু ধর্মের সঙ্গে এই সত্য ধর্মের সম্পর্ক নিরূপণ করলেন, জানা নেই। আগেই বলেছি, গান্ধী অনেক লিখেছেন কিন্তু গান্ধী বিশেষ কিছুই লেখেননি। একবার শুধু জোর দিয়ে নিজের ধর্ম-প্রত্যয় পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন। বক্তব্য সুবিদিত এবং বহু-আলোচিত। বলেছিলেন, 'এতদিন জানতাম ঈশ্বরই সত্য ; এখন বুঝলাম সত্যই ঈশ্বর।' মনীষীরা এই বক্তব্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। পান্নালাল দাশগুপ্ত মশায়ের ভাষ্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখছেন : 'ভগবানের নামে, ধর্মের নামে পৃথিবীতে কত অধর্ম হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তারই জন্য ভগবানের সংজ্ঞা শুদ্ধ করার দরকার হয়েছিল গান্ধীজীর কাছে। তারই জন্য তিনি দেখেছেন সত্যই সেই শুদ্ধিকরণের মূল অস্ত্র। সত্যের আঘাতে সকল কিছুকে পরীক্ষা করে নিতে হবে—এমন কি ভগবানকে সত্যের যাচাই ছাড়া গ্রহণ করা যেতে পারে না। প্রেমময় ভগবান সাধারণ কামনা বাসনাতে পর্যবসিত হতে পারে, সুন্দরময় ভগবান ধনীর বিলাসিতায় পরিণত হতে পারে, শিবময় ভগবান নিবীর্যতা ও অকর্মণ্যতা ও পলায়নপরতাতে পরিণত হতে পারে, শক্তির ভগবান অত্যাচারী ও অহংকারীর হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু সত্যের ভগবানকে সত্যই থাকতে হবে—তা যত নিষ্ঠুরই হোক, যত কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ভক্তকে ফেলুক। সত্যের আলোকেই ভগবান ও ভক্ত সত্যিকার রূপে পরস্পরের নিকট প্রতিভাত হতে বাধ্য এই হলো গান্ধীজীর "সত্যই ভগবান" উক্তির ব্যাখ্যা।'

গান্ধীজীর কর্মযোগী মূর্তি পান্নালাল দাশগুপ্তের আলোচনায় যেমন ফুটেছে তেমনটি আর দেখিনি। সন্দেহ করি না, গান্ধীর ধর্ম গান্ধীর কর্ম থেকেই উঠে আসতো। অধর্মের রোধ করতে গান্ধীর নিশ্চয় প্রয়োজন ছিল ধর্ম এবং ঈশ্বরের শুদ্ধ সংজ্ঞা তৈরী করা। কিন্তু ভালো-মন্দের হিসাবে সকলেই একমত যে ঈশ্বরের নামে মন্দ কাজ করা চলে না। যদি বলি 'ঈশ্বরই সত্য' তাহলেও তাঁর নামে অনাচার অসঙ্গত। সেজন্য ধর্ম-জীবনের গভীরতম প্রত্যয় পরিবর্তন বা পরিশোধন প্রয়োজন নাও হতে পারে। অধ্যাপক আইয়ারের বোধ করি মনে ধরবে যদি ব্যাখ্যাটি একটু কূট পথে ঠেলা যায়। 'ঈশ্বর সত্য' বললে বোঝায় ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই সত্য বললে বোঝায় জগৎ মিথ্যা। ঈশ্বর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র চিরন্তন বাস্তব। বিশ্বাস করলে মানুষ এভাবেই বিশ্বাস করে। আপনারা জানেন, 'মহেশের মহাযাত্রা' উপাখ্যানে প্রেতযোনিতে অবিশ্বাসী মহেশ মৃত্যুর অব্যবহিত পরে শব-যাত্রার খাটিয়া থেকে বন্ধু হরিনাথকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন : 'আছে, আছে, সব আছে।' এই রক্ত-জল-করা আশ্বাস এবং 'ঈশ্বরই সত্য' এই

প্রত্যয়ের আশ্বাস একই গোত্রীয়। ভগবানে বিশ্বাস করলে ভূতে বিশ্বাস ঠেকানো মুশকিল।

গান্ধী এই অর্থে-ভগবানে বিশ্বাস করতেন কিন্তু এই বিশ্বাসকে এমন একটা রূপ দিতে পেরেছিলেন যে সহজে মহেশের কথা তোলা চলে না। 'ঈশ্বর-ই সত্য' পালটিয়ে গান্ধী যখন 'সত্যই ঈশ্বর' এই ধারণার মধ্যে গেলেন তখন বোধ করি তিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিধান সম্পর্কে ভাবছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে মনের জগৎ এবং বাইরের জগৎ কোন একটা আইন অনুযায়ী চলে। বস্তু-জগতের আইন বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেন। আত্মার আইন আবিষ্কার করবেন ধর্ম-জগতের বৈজ্ঞানিকেরা। আইন কিন্তু দুটি নয়, একটিই; মানুষের পাপে ভূমিকম্প হতে পারে। এই বিশ্ব-বিধান আমাদের জীবনে প্রতি মুহূর্তে কাজ করে। এই বিধানই আবার ব্রহ্মাণ্ডের অন্তিম সত্য। এই সত্যতে নিজেকে স্থাপনা, এই সত্যের প্রতি আগ্রহ, এটাই মানুষের সাধনা। এই সত্যই ঈশ্বর।

এর আগে গান্ধীর উদ্ধৃতিতে লক্ষ করেছেন যে এই সত্যই প্রতিটি মানুষের অন্তর-জীবনে বিরাজমান। সত্যাগ্রহী তাঁর সাধনায় এই সত্যকেই আবিষ্কার করতে করতে চলেন। মনে করা যেতে পারে যাত্রাশেষে মানুষ এই সত্যের পূর্ণ উপলব্ধিতে এই সত্যেই বিলীন হয়। এরকম করে যদি ধর্ম-বিশ্বাসকে দাঁড় করানো যায় তাহলে, সেই বিশ্বাস আর ভৌতিক থাকে না। আবার এই বিশ্বাস ভক্তের ভগবানকেও নাকচ করে না। রবীন্দ্রনাথ বোধ করি শেষ বয়সে অন্য সব কটি ভগবানকে হারিয়ে এই রকম একটি বিশ্ব-সত্যের অনুভূতি পেয়েছিলেন। গান্ধী তাঁর প্রতিদিনের রামচন্দ্রকে খারিজ না করেও এই বিশ্ব-সত্যকে ঈশ্বর বলে মেনেছিলেন।

যতদূর জানি অগস্টিন বিভিন্ন বিশ্বাসের পথ অতিক্রম করে ক্যাথলিক মতে স্থিতি পেয়েছিলেন। সেই মার্গের মধ্যে কোন নিজস্ব, বিশিষ্ট বক্তব্য তাঁর ছিল না। আবার গান্ধী যেভাবে তাঁর মোক্ষের সন্ধান সেবা-ধর্মের মধ্যে নিয়ে এলেন, অগস্টিন কোনও দিনও তা করেননি। সেবা বস্তুটায় অবশ্য গান্ধীর সহজ অনুরাগ। তাঁর সত্যকে তিনি বঞ্চিত এবং আর্ত মানুষের সেবার মধ্যেই খুঁজেছিলেন। এ ব্যাপারে তুলনা যদি থেকে থাকে মাদার টেরেসার কথা ভাবতে হয়।

আর্তের সেবাই মাদার টেরেসার জীবন। তিনি যেভাবে সেবার জীবন তৈরী করেছেন, গান্ধী সেবার গুরুত্ব কিন্তু সেভাবে নিতে পারেননি। টেরেসার সেবাব্রতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলি লক্ষ করলে গান্ধীর সঙ্গে কোথায় মিল এবং কতটা পার্থক্য বোঝার সুবিধা হবে।

টেরেসা জীবনে দু'বার ঈশ্বরের ডাক শুনেছেন। একবার নিজের বাড়িতে, ইউগোস্লাভিয়ার স্কোপিয় শহরে। সেই ডাক শুনে আঠারো বছরের টেরেসা এন্টালী লোরেটোয় চলে আসেন; ; গান্ধী তখন ডাণ্ডির পথে। লোরেটোর চার-দেওয়ালের আড়ালে পড়ানো, পড়াশুনা এবং প্রার্থনার জীবনে বেশ কয়েক বছর কাটে। ১৯৪৬ সালে দার্জিলিঙ যাওয়ার পথে টেরেসা দ্বিতীয়বার ঈশ্বরের ডাক শুনতে পান। লোরেটোর সাজানো জীবন শেষ হয়। টেরেসার কাজ শুরু হয় রাস্তার ভিখারী আর বস্তির গরীব মানুষগুলির মধ্যে। এরকম দুই দুইবার বিরজা হোমের প্রেরণা কোথায়? টেরেসা ধার্মিক। টেরেসা খ্রীষ্টান। খ্রীষ্ট ধর্মকে তিনি শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করেন, গান্ধীর যেমন ধারণা ধর্মের মধ্যে হিন্দু ধর্মই শ্রেষ্ঠ। টেরেসা কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ভারতবর্ষে আসেননি এবং প্রচারের কাজে কোনদিন এগোননি। গান্ধী একদা খ্রীষ্টান মিশনারিদের সম্পর্কে বলেছিলেন, এঁরা যদি মুখের কথায় প্রচার না করে, নিজের জীবনে খ্রীষ্টের আদর্শ তুলে ধরতেন, তাহলেই সত্যকার খ্রীষ্টের কাজ হত (ইয়ং ইন্ডিয়া, ২০ অক্টোবর ১৯২৭)। টেরেসা খ্রীষ্টের কথা আর্ত মানুষের কাছে বলেন না। তাঁর সঙ্গে যাঁরা কাজ করেন তাঁদেরও কথা-বলে প্রচার পরিষ্কার বারণ করা আছে। মাদার টেরেসা সর্বহারা মানুষের মধ্যে তাঁর যীশুকে দেখতে পান। যীশুর প্রতি ভালোবাসা সেবার চেহারা নেয়। টেরেসা কোনদিন গান্ধীকে দেখেননি। কিন্তু অজান্তেই গান্ধীর পথে চলেন।

একটু শুধু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। খ্রীষ্ট ধর্মের বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে টেরেসা জোর দিয়েছেন ভালোবাসার উপর, অগস্টিন যেমন এক সময় জোর দিয়েছিলেন বিধিলিপির উপর। টেরেসা বলেন আর্তের সেবা অবশ্য প্রয়োজন কিন্তু তার চাইতে বেশী প্রয়োজন আর্তকে কোলে নেওয়া। যে মানুষটি রাস্তায় পরিত্যক্ত অনাহারে মৃতপ্রায়, তার আশ্রয় দরকার, খাদ্য দরকার কিন্তু সব চাইতে বেশী দরকার ভালোবাসা। কোন মানুষ যে তার দিকে তাকায় না, সকলেই যে তাকে ত্যাগ করেছে, এই অবহেলার নিঃসঙ্গতা মর্মান্তিক। টেরেসা জোর দিয়ে বলেন, সমাজ সেবা তিনি করছেন না। সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলি পালটে ফেলার কাজ তাঁর আদপেই নয়। তিনি ভালোবেসেছেন এবং তাঁর এই ভালোবাসার মানুষগুলির জন্য তিনি একটা নতুন পরিবেশ তৈরী করবেন। এজন্য মাথা গোনার দরকার নেই। একটি মানুষের মুখের হাসি একটি নতুন জগৎ তৈরী করে। মস্ত একটা সমাজকে না ধরে একলা একটি মানুষকে ধরার এই চেষ্টা গান্ধীরও বৈশিষ্ট্য। আপনারা জানেন একলা চলবার একটা ঝোঁক গান্ধীর আগাগোড়াই ছিল। গান্ধী বারবার বলেছেন, সত্য মাথা গোনে না। সত্য ভগবান দশচক্রেও ভূত হন না। কিন্তু লক্ষ করবেন টেরেসা একলা মানুষের দিকে তাকালেও নিজের জীবন বিশ্লেষণ করার কোন চেষ্টা করেননি। বেশ কিছু উৎসাহী গবেষক হতাশ স্বীকৃতি জানিয়েছেন, টেরেসার জীবনী লেখা অসম্ভব। নিজেকে ভুলে তবেই তিনি যীশুকে পেয়েছেন। কৈশোরে তাঁর প্রথমবারের সংসারত্যাগ সম্পর্কে ম্যালকম মাগারিজ লিখেছেন: 'টেরেসার জীবনী শেষ হল; টেরেসার জীবন শুরু হল।' ম্যাগারিজ লিখেছেন বলেই কথাটা ফেলে দেবেন না। বরঞ্চ লক্ষ করুন গান্ধী-র আত্ম-বিশ্লেষণের সঙ্গে টেরেসার আত্ম-নিবেদনের পার্থক্য। গান্ধী প্রতি মুহূর্তে গান্ধীকে নেড়ে চেড়ে দেখেন; টেরেসা বিশ্বাস করেন টেরেসা কারুর নাম নয়, যীশুর কাজের একটা অছিলা।

বৈষ্ণব গান্ধী টেরেসার সমগোত্রীয়। কিন্তু সদা-জাগ্রত পাপ-বোধ অগস্টিন কি গান্ধীকে টেরেসা থেকে পৃথক করে। গান্ধীর ক্ষেত্রে অবশ্য আসল পার্থক্যটা অন্যত্র। সকলেই জানি গান্ধীর মধ্যে বৈষ্ণব মেজাজের বাড়াবাড়ি ছিল। কিন্তু গান্ধী প্রকৃত প্রস্তাবে শাক্ত। শব-সাধনা না করেও অভয়-মন্ত্রে সাধনা করা চলে। গান্ধী এই অসম্ভব পথের পথিক। ভয়কে জয় করার সাধনাই গান্ধীর জীবনের তপস্যা। সত্যকার অহিংসা সেই যে মৃত্যুভয়কে জয় করেছে। সত্য অহিংসা থেকেই প্রকৃত ভালোবাসা, যে জীবন দিতে পারে সেই তো ভালবাসে। টেরেসা ভালোবাসা দিয়ে বঞ্চিত মানুষের পুনর্বাসন খুঁজেছেন। গান্ধী দিয়েছেন অভয়। টেরেসা চেয়েছেন যীশুর প্রেমে মানুষের সম্পর্ক নতুন করে ঢেলে সাজাতে। গান্ধী চেয়েছেন আতঙ্কের অবসান ঘটিয়ে মানবিক পরিবেশ দূষণমুক্ত করতে। শেষ পর্যন্ত একই পথ, সাধনা কিন্তু পৃথক।

পান্নালাল দাশগুপ্তমশায় একটি স্পষ্টবাদী পরিচ্ছেদে এই নির্ভীক গান্ধীর ছবিটি ধরেছেন। তিনি লিখছেন: 'অহিংসা হিংসাকে এড়িয়ে চলে না। অহিংসার সাথে অহিংসার লড়াই হতে পারে না। ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে এবং হিংসার সঙ্গেই অহিংসার লড়াই।...যারা মনে করে মৃত্যুকে এড়াবার জনাই বুঝি অহিংসার প্রয়োজন যারা মনে করে দেশের স্বাধীনতা আনতে চাই কিন্তু মরতে চাই না—তাদের সুবিধাবাদ ও ভয়কে আশ্রয় দেবার জন্য গান্ধীজী অহিংসা আবিষ্কার করেছেন—তারা অতি মূর্খ। আর যাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী, তাঁরা যদি মনে করেন গান্ধী মৃত্যুর ভয় করতেন বা দেশে রক্তারক্তি এড়াবার জনাই একটা নরম পথ আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁরাও অতিশয় ভ্রান্ত।'

ভালোবাসার সন্ধানে মৃত্যুকে উত্তরণ, এই এক অসাধারণ সাধনা। সেজন্য গান্ধীর তুলনা দুষ্কর। মার্কস যেমন তত্ত্ব ও আন্দোলন এক করেছেন; গান্ধীও তত্ত্ব এবং জীবন মিলিয়েছেন। মার্কস এক সম্পূর্ণ বিকল্প সমাজের কথা ভেবেছিলেন। গান্ধী চেয়েছিলেন এক বিকল্প সভ্যতা। কিন্তু মার্কস লক্ষ করতেন বাইরের পৃথিবী। মার্কসের বিশ্লেষণে আসতো সামাজিক মানুষ। গান্ধী তাকাতেন ভিতরে। নিজেকে নিয়েই বিশ্লেষণ। নিজের উপর জোর খাটিয়ে গান্ধী অন্যের উপর চাপ আনতেন। নিজের প্রতি একটা তীব্র ধিক্কারও ছিল। কিন্তু সহযাত্রী অগস্টিনের মতো কোন একটা বিশিষ্ট মতে নিশ্চিত স্থিতি পেলেন না। নিজের মোক্ষলাভের চেষ্টা করলেন অন্য লোকের সেবায়। কিন্তু টেরেসা যেমন যীশুর প্রেমের পুতুল হতে পারলেন, নিত্য-চঞ্চল গান্ধী সেই ভালোবাসা পেলেন না। নিজস্ব সাধনায় এমন একটি ঈশ্বরকে খুঁজে পেলেন যাঁর পথে চলতে গেলে বৈষ্ণব মানুষকে শাক্ত সাধনা করতে হয়। এই ধরনের একটি সোনার পাথর বাটি তুলনাতেও বোঝা দুষ্কর। দেশ

MITSUBISHI
COLOR PAPER
KER TYPE 6000 SUPER

Photo by : Mr R. Krishnan

MITSUBISHI COLOR PAPER – a product of high technology and research conforming to the highest quality standards, has become the favoured one among professional and discerning photo enthusiasts – no wonder!

MITSUBISHI COLOR PAPER Ker Type 6000 Super has all the features to make your customers happy and maximise productivity.

Manufactured by :

MITSUBISHI PAPER MILLS LTD.

Exporters :

MITSUBISHI CORPORATION JAPAN

Processed, Packed & Marketed by :

INDIA CINE AGENCIES

Head Office : 730, Mount Road,
Madras – 600 006
Phone : 88843/88844

Branches:
Bombay (Ph: 351961/354202),
Delhi (Ph: 232156),
Calcutta (Ph: 290987/290286/297587),
Bangalore (Ph: 75762),
Hyderabad (Ph: 237865), &
Cochin (Ph: 354365)

SAM 315

ব্যক্তিত্ব
ফোটানো' কাপড়
স্যুটিং আর শার্টিং
—যে নামে আপনার পুরো আস্থা!
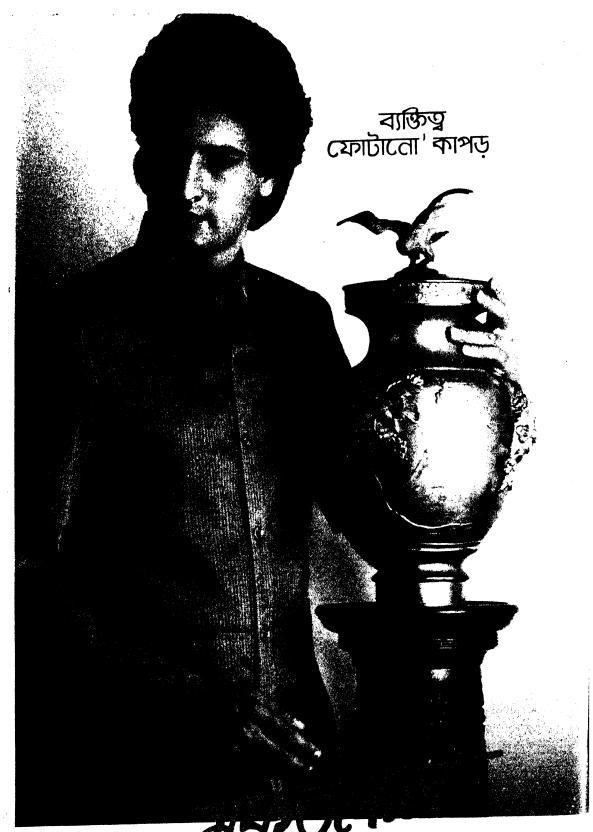
মহিলা পরিচালিত ফ্লোরেন্স ডে সেন্টার

শ্রীমতী

সেদিনটা ছিল রোদ ঝলমলে। গিয়েছিলাম কয়েকজন মহিলার যৌথ উদ্যোগের এক বাস্তব রূপ দেখতে —'ফ্লোরেন্স ডে সেন্টার'। শ্যামবাজার পাঁচ মাথার কাছে কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য তৈরি হয়েছে এই "ডে সেন্টার।" আরও আনন্দের কথা, কেবলমাত্র মহিলারাই পরিচালনা করবেন এই 'ডে সেন্টার'। ডাক্তার, সুপারিনটেনডেন্ট, অ্যানাসথেসিস্ট থেকে শুরু করে ও.টি নার্স, আয়া, মায় দরজার প্রহরীও থাকবেন মহিলা। মহিলাদের এত বড় উদ্যোগ নিঃসন্দেহে কলকাতায় এই প্রথম। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত 'ক্যালকাটা ফ্যামিলি অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সেন্টার'-এর সদস্যারা এই 'ডে সেন্টারের' উদ্যোক্তা। সংস্থার অন্যতম সদস্যা ছায়া ঘোষের সঙ্গে কথা বলছিলাম। উনিই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন যৌথ প্রচেষ্টার এই প্রাণকেন্দ্রটিকে। সুন্দর করে নিপুণ হাতে সাজানো হয়েছে অপারেশন থিয়েটার। চারদিকে বিদেশী যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম। একে তো বিদেশী জিনিস, তায় মেয়েলী হাতের বিন্যাস। বলা বাহুল্য অতিরিক্ত সৌন্দর্য কিছু বৃদ্ধি পাবেই। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নিজের হাতে সাজানো রিসেপসন রুমে বসালেন। গভীর অনুভূতি মাখানো চোখ তুলে বললেন, 'সম্প্রতি মাসখানেকের জন্য লন্ডনে গেছিলাম। ওখানে 'এসিয়ান ফাউন্ডেশন ফর হেল্প' নামে একটি সংস্থা নানা ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি, অ্যাম্বুলেন্স দেবার আশ্বাস দিয়েছেন। ইতিমধ্যে বেশ কিছু যন্ত্রপাতি এসেও গেছে। আর সেই সুবাদেই আমরা কাজ শুরু করেছি।' এখানে প্রধানত মহিলাদের লাইগেসান করানো হবে। ডে সেন্টারের কাজকর্ম শুরু হবে দিনের আলোতে, আবার শেষও হবে সূর্যাস্তের আগেই। অর্থাৎ সময়টা হল সকাল আট'টা থেকে বিকেল চারটে। বর্তমানে দৈনিক দশ থেকে পনেরো জন মহিলা নিরাপদেই লাইগেশন করাতে পারবেন। লাইগেশন করাতে কোন খরচ তো লাগবেই না, উপরন্তু সরকার প্রদত্ত কিছু অনুদান দেওয়া হবে ঐ সব মহিলাদের। বর্তমান যুগের একটি জটিল সমস্যার পরিকল্পনা— বাস্তব রূপ দেবার জন্যই ক্যালকাটা ফ্যামিলি অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সংস্থার উদ্যোক্তা মহিলারা দীর্ঘদিনের চিন্তাভাবনাকে সার্থক করে তুললেন। কথা প্রসঙ্গে ওখানকার দু'জন মহিলা ডাক্তার—বন্যা ভৌমিক আর বাবলি পাল—বললেন, 'ইতিমধ্যেই ফ্লোরেন্স ডে সেন্টার জমে উঠেছে। এমনি করেই হয়তো বা একদিন অশিক্ষার অন্ধকার চলে যাবে। আমাদের দেশের নিম্ন মধ্যবিত্ত, অল্পশিক্ষিত মহিলারা একটু সুখের ছোঁয়া পাবেন।'

কেবলমাত্র মহিলা পরিচালিত এই ডে সেন্টার গর্ভপাত সম্বন্ধেও যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করেছেন। মাত্র দু'শো টাকায় সম্পূর্ণ আধুনিক সরঞ্জামে এখানে গর্ভপাত করানো হবে। নিম্ন মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে ৫০% কনশেসন। অবশ্য সে ক্ষেত্রে রেজিস্টারড ডাক্তারের পত্র চাই। এখানে সুলভে এক্স-রেও করা হচ্ছে। এই সংস্থার

ফ্লোরেন্স ডে সেন্টারে অপারেশন ছবি : শিপ্রা দাস

মহিলাদের কর্মতৎপরতা দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম। পরিচিত হলাম একজন সদস্যা, বনানী দত্তের সঙ্গে। দৌড়োদৌড়ি করে সব ব্যবস্থা করছেন। রেজিস্টার সংরক্ষণ, রোগীদের নিয়ে আসা, রিলিফ করা, এক কথায় সব কাজ একাধারে করে চলেছেন। যেহেতু এখানে পুরুষের প্রবেশ প্রায় নিষেধ বললেই চলে, মহিলারা যেন বেশ একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন। বিদায়বার্তা জানাতেই ছায়া ঘোষ খুশীর রেস টেনে বললেন, 'জানেন, আমাদের ইচ্ছে আছে ভবিষ্যতে অনেক কিছু করবার। সুলভে ওষুধপত্র দেওয়া হবে দরিদ্র রোগীদের, ব্লাড ব্যাঙ্ক—আরো অনেক কিছু।

জানি না কতখানি সফলতা পাবো। তবে সবরকম চেষ্টার কোনই ত্রুটি রাখবো না।'

পূর্ব-পশ্চিম
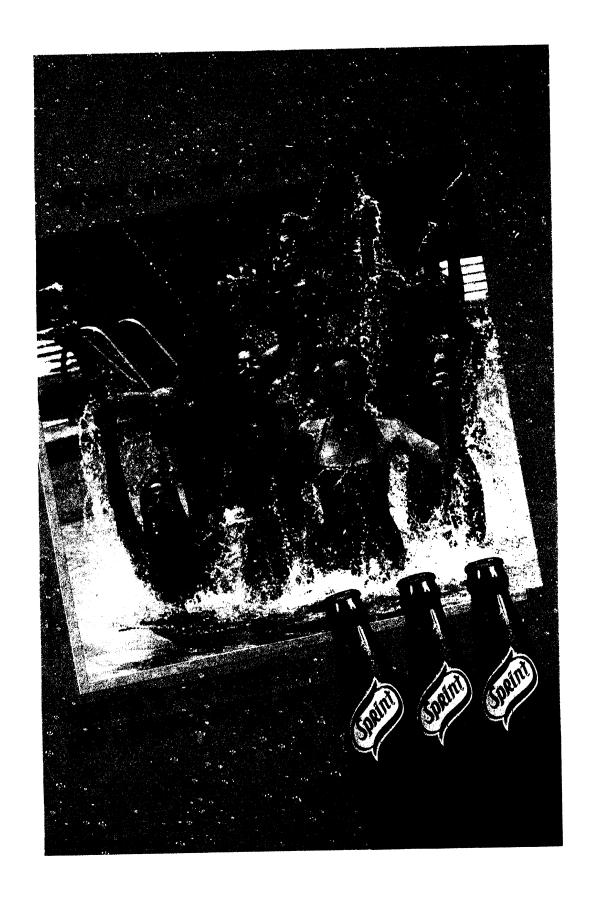
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যৌবন-২৫

পত্রিকার নাম নিয়ে আলাপ-আলোচনা চললো বেশ কয়েকদিন। নাম ঠিক করা সহজ নয়, নানারকম মত বিভেদ। আলতাফের ইচ্ছে নবারুণ বা নবার্ক, এই জাতীয় নাম দেওয়া, শাখাওয়াত হোসেনের আবার ঐ ধরনের সংস্কৃত-ঘেঁষা শব্দ অপছন্দ। তিনি প্রস্তাব দিলেন, নাম রাখা হোক 'জেহাদ'।

এই নামটি অবশ্য তরুণদের পছন্দ হয় না, কিন্তু শাখাওয়াত হোসেন পত্রিকার মালিক, তাঁর ইচ্ছেটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না এককথায়। পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি, তর্ক যতই চলুক, হোসেন সাহেব নিজের পছন্দটি আঁকড়ে ধরে রইলেন। নামটি ছোট, তিন অক্ষরের, শুনতে ভালো, বেশ একটা তেজের ভাবও আছে।

ঐ নামটি যেদিন প্রায় ঠিক হবার উপক্রম, তার পরদিন পল্টন তার কাঁধের ঝোলায় একটি বাংলা অভিধান নিয়ে এলো। কথা শুরু হবার পর সে হোসেন সাহেবকে জিজ্ঞেস করলো, চাচা, জেহাদ কথাটার মানে আপনি কী ভেবেছেন?

হোসেন সাহেব বললেন, কেন? এ সহজ কথার মানে সবাই জানে। জেহাদ মানে লড়াই!

পল্টন বললো, ডিকশনারিটা একবার কনসাল্ট করা যাক। বর্গের জ, জে জে জে, এই জেহাদ। লিখেছে, জিহাদ দেখো। আসল কথাটা হলো জিহাদ, আমরা মুখে বলি জেহাদ। নাম রাখতে গেলে জিহাদই রাখতে হয়। জিহাদ মানে লিখেছে, "মুসলমানগণের ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে এক যোগে ধর্মযুদ্ধ"।

বসির, আলতাফরা এক সঙ্গে বলে উঠলো, না, না, এ নাম রাখা চলবে না।

হোসেন সাহেব একটুখানি দমে গেলেন। কুর্তার পকেট থেকে রুমাল বার করে কপাল মুছতেই তাঁর আর একটা নাম মনে পড়ে গেল। তিনি উজ্জ্বল মুখে বললেন, তা হলে নাম দাও 'আজান'। এ নাম অতি সুন্দর!

পল্টন অভিধানের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললো, এর মানেটা দেখে নি!

আলতাফরা হেসে উঠলো। আজানের মানে সবাই জানে।

পল্টন বললো, আজমীর···আজল··· আজা···আজাড়···এই যে আজান! মানে হলো, "আহ্বান, মুসলমানদিগকে নমাজ পড়িবার নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান। বৈদেশিক।"

হোসেন সাহেব বললেন, এতে আপত্তির কোনো কারণ আছে? আমরা তো সকল মানুষরে ডাক দিতেই চাই।

অন্যরা কেউ চট করে কিছু মন্তব্য করলো না। যদিও এই নামটিও সকলের ঠিক পছন্দ হয়নি। বসির আর বাবুল চোখাচোখি করলো, এরা তলে তলে মার্ক্সবাদে দীক্ষা নিয়েছে, পত্রিকার নামে ধর্মীয় গন্ধ রাখা এদের মনঃপূত নয়।

আলতাফ বললো, আমি একটা কথা কই, চাচা! মামুন ভাইরে আমরা নিচ্ছি, এডিটর হিসাবে আপনার নাম থাকলেও ভারচুয়ালি তিনিই সব দেখাশুনা করবেন। মামুনভাই কবি মানুষ, পত্রপত্রিকার সাথে অনেকদিন ধইরা কানেকটেড, নামের ব্যাপারে তাঁর একটা মতামত নেওয়া দরকার।

হোসেন সাহেব ঈষৎ অসন্তোষের সঙ্গে বললেন, ঠিক আছে, লও হ্যার মতামত, কিন্তু আমার মন-পসন্দ না হইলে আমি ভেটো দিমু!

বাবুল তার বড় ভাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ছোট করে কাশলো। পত্রিকার নামের ব্যাপারে মামুনভাই-এর সঙ্গে তার আলোচনা হয়েছে আগেই। মামুনভাই তার বাসায় প্রায়ই আসেন মঞ্জু আর তার সন্তানের খোঁজ খবর নিতে। মামুনভাই বলেছেন যে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি একটি নামই বলবেন এবং সেটাই গ্রহণ করতে হবে। তিনি ঠিক করে রেখেছেন, 'ভবিষ্যৎ'। আমরা তো সবাই ভবিষ্যতের দিকেই তাকিয়ে আছি। বাবুল বলেছিল, কিন্তু য-ফলা দিয়ে নাম কি প্র্যাকটিকাল হবে? মামুন উত্তর দিয়েছিলেন, কেন? তয় ত দিয়ে 'ইত্তেফাক' যদি ভালোভাবে চলতে পারে, তা হলে য-ফলা দিয়ে 'ভবিষ্যৎ' কেন চলবে না।

আলতাফ মুখ ফেরাতেই বাবুল বললো, মামুনভাই তাঁর পছন্দের কথা আমাকে জানিয়েছেন। উনি নাম রাখতে চান ভবিষ্যৎ।

হোসেন সাহেব সঙ্গে সঙ্গে ভেটো প্রয়োগ করে বললেন, ও চলবে'না,
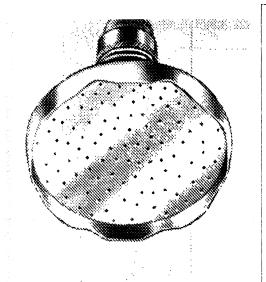
আর কিছু সাজেস্ট করতে বলো!

শেষ পর্যন্ত কাগজের নাম হলো 'দিন-কাল'। আগে ঠিক ছিল আগামী ঈদের দিন থেকে পত্রিকার যাত্রা শুরু হবে, কিন্তু এর মধ্যেই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান নির্বাচনের কথা ঘোষণা করলেন। অমনি সাজ সাজ রব পড়ে গেল। নির্বাচনের মুখেই তো কাগজ চালাবার প্রকৃষ্ট সময়।

আইয়ুব যে নির্বাচন চাইলেন, তাতে দেশের সব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নেই। ভোট দেবে পাকিস্তানের দুই ডানা থেকে মাত্র আশী হাজার মানুষ, এদের নাম হলো বেসিক ডেমোক্রাটস, যাদের নির্বাচন আগেই হয়ে গেছে। এই বেসিক ডেমোক্রাটসরা সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষ, নব্য ধনী সম্প্রদায়, ব্যবসায়ী, কন্ট্রাক্টর ইত্যাদি, আইয়ুবের আমলে এদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই হচ্ছে। এই বেসিক ডেমোক্রাটসরা নির্বাচিত করবে শুধু মাত্র প্রেসিডেন্টকে। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব আবার সেই পদের প্রার্থী।

এটা কি নির্বাচন, না নির্বাচনের প্রহসন? বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি প্রথমেই এই নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানালো। এই নির্বাচন বয়কট করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

রমনা পার্কের কাছে বাড়ি ভাড়া নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'দিন-কাল' কার্যালয়। সম্পাদক হিসেবে শাখাওয়াত হোসেন-এর নাম ছাপা হবে, নামের জন্যই তিনি কাগজ করছেন। তাঁর আলাদা ঘর, সেখানে তিনি যখন ইচ্ছে আসবেন। মামুন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, তাঁর নাম ছাপাবার আকাঙ্ক্ষা নেই, তিনি চান গণতন্ত্রের উদ্ধার, প্রথম দিন থেকেই তিনি খাটতে লাগলেন দারুণ ভাবে।

তিনি আলতাফ বাসির পল্টনদের নিজের ঘরে ডেকে বললেন, আমরা কিন্তু এই নির্বাচন সমর্থন করবো। আমরা গণতন্ত্র চাই, নির্বাচন চাই, যে-কোনো নির্বাচন থেকেই দূরে সরে থাকা কোনো কাজের কথা নয়। ধরো, এই ইলেকশানে যদি আমরা আইয়ুবকে ফেলে দিতে পারি, তা হলে পরবর্তী প্রেসিডেন্টের ওপর জেনারাল ইলেকশান কল্ করার জন্য চাপ দেওয়া যাবে।

পল্টন জিজ্ঞেস করলো, আইয়ুবের সঙ্গে কনটেস্ট করবে কে? সে রকম ন্যাশনাল ফিগার কে আছে?

সেটা ভেবে দেখতে হবে। তোমরা অপোজিশান পার্টির লিডারদের ইন্টারভিউ করো!

আলতাফ বললো, মামুনভাই, একটা কথা বলবো। কাগজের পলিসি আপনিই ঠিক করবেন। কিন্তু সেটা আমার হোসেন চাচারে দিয়ে একটু অ্যাপ্রুভ করায়ে নিতে হবে। একটু কায়দা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আসল ব্যাপার কী জানেন, আপনার মুখের কথাটাই ওনার মুখ দিয়ে বলায়ে নিতে হবে আর কি!

মামুন বললেন, সেটা কী ভাবে সম্ভব? আলতাফ, তুমি জানো, আমি পয়সার জন্য এই চাকরি করতে আসি নাই। এসেছি তোমাদের কথাতে। তোমার চাচা যদি কোনো প্রতিক্রিয়াশীল মতামত চাপায়ে দিতে চান, আমি তৎক্ষণাৎ রিজাইন করবো। আবার তোমার বন্ধুরা যদি প্রো চাইনিজ লাইন নিতে চায়, আমি তার মইধ্যেও নাই। আমি পাকিস্তানের সব মানুষের সমান অধিকারে বিশ্বাসী। আমি বিচ্ছিন্নতাবাদ ঘৃণা করি। পাকিস্তানরে যারা ভাঙতে চায় আমি তাদের দুশমন মনে করি। আমি ন্যাশানালিস্ট। এই আমার সোজা কথা!

পল্টন বললো, আমরা এক একটা ইস্যু ধরে আপনার সাথে আলোচনা করবো। আমার ধারণা, আপনার সাথে আমাদের মত বিরোধ হবে না।

আলতাফ বললো, আগে আমার কথাটা কইতে দাও। সব কাগজেই মালিকের স্বার্থ দ্যাখতে হয়। আমার চাচা...

মামুন বললেন, কাগজ লসে রান করলে বেশিদিন চলবে না সে আমি জানি। সার্কুলেশান যাতে বাড়ে সে দায়িত্ব আমার।

আলতাফ বললো, আমার চাচা শুধু প্রফিট চান না, তিনি সমাজে নাম কেনতে চান। মাঝে মাঝে তেনার দুই একটা ছবি ছাপাইতে হবে, এই আমার অনুরোধ। আর এমন একটা ভাব দেখাতে হবে, যেন ওনার মতামতেই সব কিছু চলতেছে। কায়দাটা আমি বলে দিই। 'বিচক্ষণ' কথাটার ওপর আমার চাচার খুব দুর্বলতা আছে। মাঝে মাঝে ঐ শব্দটা ব্যবহার করবেন। যেমন ধরেন, আপনি যদি বলেন, হোসেন সাহেব, আপনার মতন বিচক্ষণ মানুষ নিশ্চয়ই বুঝবেন যে এখন এই ইলেকশন

আমাদের সাপোর্ট করা দরকার। দ্যাখবেন যে আমার চাচা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলবেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!

পল্টন হেসে বললো, ঠিক, এটা আমিও লক্ষ্য করেছি বটে!

মামুন ভুরু কুঁচকে বললেন, ছবি ছাপাতে হবে!

আলতাফ বললো, এমনি এমনি কী আর ছবি ছাপাবেন? ধরেন, উনি মোনেম খাঁর সাথে আলাপ করতে গেলেন, তখন দুইজনের ছবি ছাপাবেন। সেটা একটা নিউজও হইলো!

কাগজ চলতে লাগলো মন্দ না। মামুন প্রেসে পাঠাবার আগে প্রত্যেকটা কপি নিজে দেখে দিতে লাগলেন, ভাষার শুদ্ধতার প্রতি নজর রাখলেন, সরকারের প্রতি প্রত্যক্ষ আক্রমণের বদলে সম্পাদকীয় কলমে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ প্রয়োগ করতে লাগলেন প্রচুর। বিভিন্ন জায়গায় রিপোর্টার পাঠিয়ে প্রকাশ করতে লাগলেন নানান দুর্নীতির কাহিনী। পাঠকরা এই সব পছন্দ করে।

বিরোধী দলগুলিও শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল। আইয়ুব-বিরোধী সব দলগুলি একত্র হয়ে নাম নিল কম্বাইনড অপোজিশন পার্টি বা কপ্। এখন প্রশ্ন হলো, আইয়ুবের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হবে কাকে? এমন কোন্ নেতা আছেন, যিনি পূর্ব ও পশ্চিম দুই পাকিস্তানেই সমানভাবে স্বীকৃত? সোহরাওয়ার্দি বেঁচে থাকলেও না হয় কথা ছিল⋯।

শেষ পর্যন্ত একটা নামই সবার মনে এলো। জিন্নার নামে পাকিস্তানের মানুষ এখনও মাথা অবনত করে। তিনি পাকিস্তানের স্রষ্টা, নতুন রাষ্ট্রটি সৃষ্টি হবার পর তিনি বেশিদিন বাঁচেননি, তাই তাঁকে কোনো বদনাম কুড়োতে হয়নি। সেই জিন্নার নামের ম্যাজিকটা কাজে লাগানো দরকার। জিন্না সাহেবের বোন ফতিমা জিন্না এখনো বেঁচে আছেন। তিনি আগে কখনো রাজনীতি করেননি, তাতে কী আসে যায়, তাঁর হয়ে প্রচার চালাবেন অন্যরা।

ফতিমা জিন্না এই নির্বাচনী দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে রাজি হয়ে গেলেন।

কিন্তু মামুন বিপদে পড়লেন শাখাওয়াত হোসেনকে নিয়ে। একজন স্ত্রীলোক পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হবে, এই চিন্তাটাই তাঁর কাছে অসহ্য। স্ত্রীলোক দেবে মাঠে-ময়দানে বক্তৃতা? 'দিন-কাল' অফিসে ঢুকতে ঢুকতে তিনি চিৎকার করতে লাগলেন, ইমপসিবল! আমাগো কাগজ ফতিমারে সাপোর্ট করবে না! ইমপসিবল! পাকিস্তানে আর কোনো পুরুষ নাই? মাইয়া মানুষের এই মদ্দাপনা ইসলাম বিরোধী।

মামুন নিজের ঘরে গুম হয়ে বসে রইলেন। হোসেন সাহেব তাঁকে ডেকে পাঠালেও তিনি দেখা করতে গেলেন না। বিকেলবেলা আলতাফ এলে তিনি গাম্ভীরভাবে এক টুকরো কাগজ তুলে বললেন, এই নাও আমার রেজিগনেশান লেটার। দিয়া আসো তোমার চাচারে। তিনিই এডিটারি করুন।

আলতাফ হালকাভাবে বললো, আরে মামুনভাই, আপনে মাথা গরম করেন ক্যান! কী হইছে শুনি।

মিতভাষী, নম্র-স্বভাব মামুন হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ে বললেন, তুমি বলতে চাও আমি ফতিমা জিন্নাকে ছেড়ে আইয়ুবকে সমর্থন করবো? যদি এক বাপের সন্তান হয়ে থাকি⋯

আলতাফ বললো, হায় আল্লা! আপনে দেখি বড় চটা চটছেন! দ্যাখেন না, সব ম্যানেজ কইরা দিতেছি! আচ্ছা মামুনভাই, আগে একটা কথা জেনেনি, হিস্ট্রিতে যেন পড়ছিলাম, দিল্লির মশনদে একবার এক সুলতানা বসে ছিল না? কী যেন নামটা?

—রাজিয়া!

—তিনি তো ভালোই রাজ্য চালিয়েছিলেন, তাই না? ব্যাস, তবে তো কেল্লা ফতে!

এর পর আলতাফ কিছুক্ষণ মামুনের সঙ্গে শলা পরামর্শ করলো। তারপর দুজনে একসঙ্গে গেল হোসেন সাহেবের ঘরে।

হোসেন সাহেব প্রথমেই বললেন, আমি নোট দিয়া দিছি, আমার কাগজ ফতিমার এগেইনস্টে।

আলতাফ বললো, চাচা, আগে দু' একটা কথা শুইনা লন। খুব প্রাইভেট। দরজা বন্ধ করি? চা-পানি কিছু লাগবে?

হোসেন সাহেব অস্থিরভাবে বললেন, না। আগে কাজের কথা কও! মাইয়ালোকে রাষ্ট্রপতি হইতে চায়, তোবা, তোবা, এমন কথা শোনাও হারাম।

আলতাফ বললো, চাচা, মামুনভাই আপনের মতামতগুলিরে খুব মূল্য দ্যান। আজ সকালেই কইতেছিলেন, আলতাফ তোমার চাচার মতন বিচক্ষণ মানুষকে যদি প্রশ্ন করা যায়, আইয়ুব না জিন্না, আইয়ুব না জিন্না। এই দুইটা নামের মধ্যে আপনি কোনটা বেছে নেবেন, তা হলে নির্ঘাৎ তিনি বলবেন, জিন্না, জিন্না!

হোসেনসাহেব বললেন, আলবাৎ! একশো বার। জিন্নার সাথে

আইয়ুবের কোনো তুলনা চলে ? কায়েদ এ আজম হলেন জাতির পিতা।

জিন্নারে ইন্ডিয়ার লোক পছন্দ করে না, একথা আপনি স্বীকার করবেন নিশ্চয়ই।

অরা জিন্না সাহেবের মর্যাদা কী বোঝে। অগো গান্ধীর থিকা, জওহরলালের থিকা আমাগো জিন্না অনেক বড়, তিনি অনেক বেশি বুদ্ধি ধরতেন !

ঠিক, আপনি ঠিক বলেছেন চাচা। পাকিস্তানরে স্ট্রং করার জন্য এখন আর একজন জিন্নার দরকার কি না ?

হক কথা ! যদি জিন্না সাহেবের একজন ভাই থাকতো কিংবা পোলা থাকতো, আমি তারেই সালাম জানাতাম। তার বদলে তোমরা একজন মাইয়া মানুষেরে···

শোনেন চাচা, শোনেন। মামুনভাই বলছিলেন, শাখাওয়াত হোসেনের মতন বিচক্ষণ মানুষ নিশ্চয়ই বুঝবেন যে ফতিমা জিন্না আসলে আর একজন রাজিয়া সুলতানা।

হেডায় আবার কেডা ?

আলতাফ মামুনের দিকে ফিরে বসলো, মামুনভাই, এবারে আপনিই বলেন।

মামুন একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, আপনি একটা নতুন পত্রিকার সম্পাদক, আপনার পত্রিকা থেকেই পাঠকরা জানবে যে একদা দিল্লির মশনদে বসেছিল এক মুসলমান কুমারী। তিনি দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করেছেন, নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে সৈন্য পরিচালনা করেছেন। ঐতিহাসিক সিনহাজ-ই-সিরাজ লিখে গেছেন যে নারী হয়েও রাজকার্যে তিনি ছিলেন বড় বড় বাদশাদের সমকক্ষ, ন্যায়পরায়ণ, বিদ্যোৎসাহিনী, যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ।

হোসেন সাহেবের ভুরু উঁচুতে উঠতে লাগলো আস্তে আস্তে। গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই এরকম কেউ দিল্লির সিংহাসনে বসেছিল ? স্ত্রীলোক ? মুসলমান ?

মামুন বললেন, সুলতান ইলতুৎমিসের কন্যা রাজিয়া মশনদে বসেছিলেন বারো শো ছত্রিশ খ্রিষ্টাব্দে। অযোগ্য রুকনউদ্দীনকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাজিয়া মশনদে বসে প্রজাদের···

আলতাফ এর মধ্যে মাথা গলিয়ে বললো, ঐ রুকনউদ্দীন হইলো আমাদের আইয়ুব। বোঝলেন চাচা। রাজিয়াও কুমারী ছিলেন ফতিমা জিন্নাও কুমারী। এই সব মিলের কথা কোনো কাগজে এখনও ছাপা হয় নাই। আমাগো দিন কালে যদি প্রথম বাইরায়···সেইজন্যই তো মামুনভাই বলছিলেন, আপনার মতন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে এটা বেশি বুঝাতেই হবে না।

হোসেন সাহেব টেবিলে কিল মেরে বললেন, আরে, আমি তো তোমাগো টেস্ট করতেছিলাম ! আমি রাজিয়ার কথা জানি না ? তিনিই যে নব রূপে এসেছেন····কাইলকের কাগজে ব্যানার হেড লাইন দাও, 'ফতিমা জিন্না নব রূপে রাজিয়া সুলতানা···· !'

নির্বাচনী প্রচার তুঙ্গে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কাগজের বিক্রিও বাড়তে লাগলো। মামুন কাজের নেশায় মেতে উঠলেন। তিনি রিপোর্টার পাঠাতে লাগলেন গ্রামে গ্রামে।

বাবুল চৌধুরী দিন-কাল পত্রিকায় কাজ নেয়নি, তার কলেজের চাকরিটা সে রেখে দিয়েছে, তবে এখানে সে প্রতি সন্ধেবেলাতেই আসে, আড্ডার এক কোণে চুপ করে বসে থাকে। বন্ধুদের চাপে পড়ে সে দু'একটা প্রবন্ধও লিখেছে, তাও ছদ্মনামে। সে একটু আড়ালে আড়ালে থাকতে চায়।

বেশি আড্ডা জমে নিউজ রুমে। রিপোর্টাররা একটু রাতের দিকে নানা রকম খবর ও বহু অসমর্থিত গুজব নিয়ে আসে ঝুড়ি ভরে, সেই সব নিয়ে হাসি মস্করা হয়। বাবুল পারতপক্ষে মামুন বা শাখাওয়াত হোসেনের ঘরে যায় না, ঐ দুই কক্ষে পত্রিকার নীতি নির্ধারক আলোচনায় সে অংশ নিতে চায় না। আলতাফ অনেক চেষ্টা করেও তার ছোটভাইকে এই কাগজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াতে পারেনি।

মামুনের সঙ্গে বাবুলের দেখা হয় তার নিজের বাড়িতে। বাবুলের ছেলে সুখু এখন হামাগুড়ি দেওয়া ছেড়ে টলটলে ভাবে হাঁটতে শিখেছে, দু' একটা কথাও বলে। মামুন সুখুকে না দেখে থাকতে পারেন না, সপ্তাহে অন্তত দু' তিনটি সন্ধেবেলা আসবেনই। পত্রিকা শুরু হবার আগে প্রতিদিন সন্ধেবেলা আসতেন। ঠিক সাতটা বাজার দু' এক মিনিট পরেও সিঁড়িতে ডাক শোনা যেত, মঞ্জু, মঞ্জু ! মামুনমামাকে দেখলে মঞ্জুরও চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মামুন মামা আসতে পারেন বলে সে কোনো সন্ধেবেলাই পারতপক্ষে বাড়ির বাইরে যেতে চায় না। মামুন এসেই সুখুকে কোলে তুলে নিয়ে এমন আদর করতে থাকেন যে মনে হয় তিনি নিজেও শিশু হয়ে গেছেন। সুখু কখনো কখনো তার মায়ের কোলে যেতে চাইলেও মামুন একটু পরেই আবার মঞ্জুর কোল থেকে সুখুকে তুলে আনেন নিজের বুকে। মামুনের নিজের কোনো পুত্র সন্তান নেই বলেই হয়তো তিনি মঞ্জুর ছেলের ওপর তাঁর সমস্ত স্নেহ-ভালবাসা-আদর উজাড় করে দিতে চান।

একদিন একটু বেশি রাত করে বাড়ি ফিরে বাবুল মঞ্জুকে বললো, শোনো, আমি কয়েকটা দিন একটু মফঃস্বলে থেকে ঘুরে আসবো ভাবছি।

সুখুকে সদ্য ঘুম পাড়িয়ে মঞ্জু তখন দেয়াল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। পাশের ঘরের টেবিলে ঢাকা আছে রাতের খাবার। বাবুলের ফিরতে যতই দেরি হোক, সে কোনোদিনই আগে খেয়ে নেয় না। বাবুলের ফিরতে দেরি হলে সে বকাবকিও করে না। পাশের বাড়িতেই থাকে মঞ্জুর ফুফাতো বোন জুনিপার, তার স্বামী শোভান একটি অতি বদ মাতাল, প্রতি রাতে সে বাড়ি ফেরে চিৎকার করতে করতে এবং স্ত্রীকে সে অকথ্য ভাষায় যে-সব গালিগালাজ দেয় তা পাড়া প্রতিবেশী সবাই শুনতে পায়। সেই তুলনায় বাবুল তো প্রায় ফেরেস্তা। সে মদ স্পর্শ করে না, সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে, স্ত্রীর প্রতি এ পর্যন্ত একবারও দুর্ব্যবহার করেনি। যে-সব দিন বাবুল পুরোপুরি বাড়ি থাকে, সেইসব দিনেই যেন মঞ্জুর একটু একটু ভয় করে। কোনো মানুষ বই নিয়ে এমন পাগল হতে পারে ? সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পরই বাবুল চোখের সামনে বই খুলে বসে, তারপর সারা দুপুর বিকেল সন্ধে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সে বই থেকে চোখ সরায় না। মামুন এলে সে অন্য ঘরে বসে থাকে। শুধু মামুন কেন, মঞ্জুর বাপের বাড়ির কোনো লোকের সঙ্গেই সে ভালো করে কথা বলে না। এইটা মঞ্জুর একটা গোপন দুঃখ।

মঞ্জু জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোথায় যাবে ?

একটা লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরে নিয়ে বাবুল বললো, কয়েকটা জায়গায় একটু ঘুরবো ভাবছি। ইলেকশানের মিটিংগুলো নিজের চোখে দেখে আসতে চাই। শুনছি তো মিস জিন্নার মিটিং-এ ভিড় হচ্ছে খুব। মঞ্জু, তুমি কাকে সাপোর্ট করো ?

মঞ্জু বললো, আমার সাপোর্ট করা না করায় কী আসে যায় ? আমার কি ভোট আছে ?

তবু মনে মনে তো তোমার একজনের প্রতি সমর্থন থাকবে।

আমি চাই ফতেমা জিন্না জিতুন। মামুনমামা বলেছেন, ফতেমা জিন্না জিতলে আমাদের বাঙালীদের অনেক সুবিধা হবে !

বাবুল জানলার কাছে গিয়ে চুপ করে রইলো। মঞ্জু তার পাশে গিয়ে কাঠের ওপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কার সাথে যাবে ?

বাবুল তার কোনো উত্তর না দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে মঞ্জুর গালে ছোট একটা টোকা মেরে বললো, মোনেম খাঁর লোকজনরা কী বলে জানো ? বেগম ফতেমা জিন্না পূর্ব পাকিস্তানের সমর্থনে কখনো কোনো কথা বলেছেন কী ? এই যে আমাদের এদিকে পরপর দু'বার এত বড় ঝড় আর সাইক্লোন হয়ে গেল, তাতে তিনি টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করা তো দূরের কথা, একটু ঠোঁটের দরদও দেখাননি !

মঞ্জু ত্রস্তভাবে বললো, এ কী, তুমি কি আইয়ুব খানকে সাপোর্ট করো নাকি ?

বাবুল বললো, চলো। খানা লাগাও। ক্ষুদা পেয়েছে খুব।

কী যেন একটা অজানা আশঙ্কায় কাঁপছে মঞ্জুর বুক। সে তার স্বামীর চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি ইলেকশন মিটিং-এ কেন যেতে চাও বলো তো ? তুমি যে বলেছিলে আর কোনোদিন তুমি পলিটিকসের সাথে নিজেকে জড়াবে না ?

বাবুল সহাস্যে স্ত্রীকে বুকে টেনে নিয়ে বললো, এত ভয় কিসের, বিলকিসবানু ? আমি নিজেকে পলিটিকসে জড়াচ্ছি না, শুধু একটু দেখতে যাচ্ছি। আমি যে-কদিন থাকবো না, মামুনভাইকে বলে যাবো, যাতে তিনি প্রত্যেকদিন এসে তোমার খোঁজ খবর নিয়ে যান। (ক্রমশ)

ছবি : অনুপ রায়

গর্ভধারিণী

সমরেশ মজুমদার

গত রাত হাওয়ার রাত ছিল। পালদেম বলেছিল বরফ পড়ার আগে হিমালয় হাওয়াদের পাঠায়। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল সব উড়িয়ে নিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে বীভৎস আওয়াজ। রাগী জন্তুর গোঙানি। অথচ বৃষ্টি নেই। আকাশ ঘোলাটে। সেখানে চাপ মেঘও নেই। কিন্তু একটি নখ লক্ষ হয়েছে। শীত বাড়ছে হু হু করে। ওদের কাঠের ঘরে নিরাপদ বিছানায় শুয়েও মনে হচ্ছিল উত্তাপ চাই।

আনন্দ চুপচাপ পড়েছিল। দ্বিতীয়বার ব্যাপারীরা ঘুরে গেল এই গ্রাম থেকে। ওরা অবশ্য তাদের হদিশ পায়নি। কিন্তু তাপল্যাঙের মানুষ কি করে এত টাকা হাতে পেল তা নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়েছে। পালদেম শেখানো উত্তর বলেছে, চারজনের এক অভিযাত্রীদল এই গ্রামের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের যে টাকা দিয়ে গিয়েছিল তাই দিয়েই কেনাকাটা করছে ওরা। উত্তরটা ওরা কতটা বিশ্বাস করেছে সেটা বোঝা যায়নি। কিন্তু প্রচুর জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছে। সেগুলো রাখা হয়েছে গ্রামের আর একটি খালি ঘরে। সেইসঙ্গে আছে গৃহপালিত সেইসব জন্তু যা গ্রামবাসীরা ব্যাপারীদের কাছে বিক্রি করেছিল। আজ বিকেলে বন্ধুদের কাছে আনন্দ তার পরিকল্পনা খুলে বলেছে। জয়িতা উৎসাহিত হয়েছে। একটা অবহেলিত, বলা যায় সভ্যতার ছোঁয়াচবর্জিত গ্রামের মানুষদের একত্রিত করে বাঁচার পথ খুঁজে দেওয়া মানে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার মানে নতুনভাবে খুঁজে পাওয়া। সারা বছর এরা হয় আধপেটা, নয় অভুক্ত থাকে। সবচেয়ে আগে এদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং সেটা সম্মিলিতভাবে। কেউ কম বা বেশী নয়। রান্না হবে একত্রে। এর ফলে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটা নিকট সম্পর্ক তৈরী হবে। এ বছরের ব্যবস্থা না হয় সুদীপের আনা টাকায় হয়ে যেতে পারে কোনরকমে, কিন্তু আগামী বছর থেকে নিজেদের জন্যে প্রতিটি মানুষকে কাজ করতে হবে। চাষের ব্যবস্থায় আধুনিক সাহায্য নিতে হবে, ডেয়ারি এবং পোলট্রি ফার্ম পুরো গ্রামের জন্যে তৈরী করতে হবে। আর সেই সব জিনিস দার্জিলিং না হোক গৈরাবাস অথবা মানেভঞ্জনের বাজারে পৌঁছে দিয়ে তার বিনিময়ে দরকারী জিনিস আনতে হবে। এদের নিজস্ব লেখ্যভাষা আছে কি না জানতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে হিন্দী অথবা ইংরেজি শিখতে হবে। অর্থাৎ সুস্থভাবে বাঁচতে হলে একা কিছু করা যাবে না, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খাটতে হবে। এই বোধ ওদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে। অবশ্য এর জন্যে বিশ্বাস অর্জন করা দরকার। বিদেশী বিভাষী মানুষকে চট করে কেউ বিশ্বাস করে না। তবু এখন যেন ওরা তাদের সঙ্গে অনেক সহজ ভঙ্গীতে কথা বলছে। ওই যে মেয়েটি যে মৃত্যুর দরজায় পৌঁছে গিয়েও কোন অজ্ঞাত কারণে এখনও মরে যায়নি তার জন্যে কেউ দায়ী করছে না এখনও। মরে গেলে কি হবে তা কে বলতে পারে! যাই হোক, এই গ্রাম ছাড়ার আপাতত কোন ইচ্ছে তার নেই। প্রথম কথা, পুলিসের রাইফেল এত দূরে পৌঁছাবে এমন সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয়ত, আকৈশোর যে বাসনা ছিল তা সম্ভব হবে এমন সম্ভাবনা নেই। বাবাও যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন তা একাত্তরেই মুখ থুবড়ে পড়েছে। সে ভেবেছিল দেশের যারা শত্রু তাদের আঘাত করার শিক্ষা জনসাধারণকে দিলে তারা উদ্দীপ্ত হবে এগিয়ে আসতে। মনে হয়েছিল, ভারতবর্ষের মানুষ ভেতরে ভেতরে সমস্ত সিস্টেমটার বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্তে বঞ্চিত হওয়ায় কষ্ট হয়ে উঠেছে শুধু তার প্রকাশের দরজা খুলে দিতে পারলেই লাভাস্রোত বইবে। কিন্তু কলকাতায় থাকাকালীন তার কোন প্রতিক্রিয়া সে দেখতে পায়নি। অবশ্য ওরা চলে আসার পর কিছু হয়েছে কি না তা জানা নেই। হলে অন্তত বিবিসি-র খবরে তার কথা শোনা যেত। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে সে সবই ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। কিন্তু বিখ্যাত গ্রন্থগুলো পড়ে তার তো মনে হয়েছিল পৃথিবীতে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে গেলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিদের হঠাতে বিপ্লব দরকার। বিপ্লবের পরে মানুষকে তার অধিকারের জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে। অর্থাৎ বিপ্লব উদ্দেশ্যনয়, ওই নয়া সমাজ ব্যবস্থাই আসল লক্ষ্য। সেই কাজ তো এখানেও শুরু করা যেতে পারে। এখানে তাদের চোখে কোন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির অস্তিত্ব চোখে পড়ছে না। কাহুনকে কোনভাবেই, এমন কি সামান্য জোতদার বলেও ভাবা যাচ্ছে না। এদের শত্রু অজ্ঞতা এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে, অশিক্ষার

ফসল দারিদ্র্য। কিন্তু এদের পক্ষে সবচেয়ে যে মূল্যবান সম্পদ তা হল রাজনীতির ধোঁয়াটে বিষ এখনও চেপে বসেনি। সামান্য পিছিয়ে নিয়ে গেলে পৃথিবীর আদিম যুগের মানুষের জীবনযাত্রায় এদের পৌঁছে দেওয়া যায়। অতএব এই মাটির ডেলাগুলো নিয়ে স্বপ্নের মূর্তি তৈরী করা যায়। বাধা যা আসবে তা ওদের অজ্ঞতা থেকে। এর মধ্যে আনন্দ কয়েকটি শব্দ শিখে ফেলেছে। এ ব্যাপারে জয়িতা তার থেকে এগিয়ে আছে। ও এখন ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাক্য বলতে পারে। ভুল করে কিন্তু সেই ভুলটা ওদের মজা দেয়। নিরাপদ বিছানায় শুয়ে আনন্দ এক ধরনের উত্তেজনা বোধ করে। কল্যাণটা ফিরে এলেই এরা ওদের অনেক কাছে এসে যাবে।

নিরাপদ বিছানায় শুয়ে জয়িতারও ঘুম আসছিল না। হাওয়া বইছে কিংবা বেড়ে যাওয়া ঠাণ্ডার জন্যে নয় ওর শরীর এবং মনে অস্বস্তি কাজ করছিল। সময় এসে গিয়েছে। কলকাতায় থাকতে এই ব্যাপারটা কোন গুরুত্বই পেত না। সে স্থির করে নিল যে প্রয়োজনে বন্ধুদের বলবে। এই কদিনে তাপল্যাঙের মানুষদের সঙ্গে মিশে সে অনেক কিছু জেনেছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত। এই পাহাড়ি মানুষরা সুদীপ আনন্দর সঙ্গে দূরত্ব রেখেছে, তার সঙ্গে রাখেনি। বোধহয় মেয়েরা খুব চট করেই বিশ্বাস কিংবা আস্থাযোগ্য হতে পারে। জয়িতা কৌতূহলী হয়েছিল এখানকার মেয়েরা তাদের ওই সমস্যার সমাধান কিভাবে করে তা জানতে। জানার পর শিউরে উঠেছিল। অল্পবয়েসীরা সেই কয়দিন প্রায় ঘরের বাইরে যায় না। স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে সবার আড়ালে থেকে যায়। কার লেখা মনে নেই, জয়িতা পড়েছিল বাংলাদেশের মেয়েরাও এক সময় ওই একই জীবনযাপন করত। ওই কদিন বিছানায় শুতো না, মাথায় তেল দিত না। তারও আগে ঘর ছেড়ে বের হতো না। নিজেদের অশুচি মনে করত। এখনও পুজোপার্বণে বাংলাদেশের মেয়েরা যোগ দিতে চায় না। এ হীনমন্যতা বোধ কি কারণে তা কেউ ভাবেনি। যেন প্রকাশ্যে বললে সেটা অশ্লীলতার পর্যায়ে চলে যাবে। দিন পাল্টেছে কলকাতায়। এখানকার বয়স্কা মেয়েরা যেভাবে নিজেদের সামলায় তা আদৌ অস্বাস্থ্যকর নয়। বোধহয় সেই কারণেই এদের অসুখবিসুখ অনিবার্য ঘটনা। সে নিজে না হয় কিছুদিন সামলে নিতে পারবে। কল্যাণ যখন গেল তখন তাকেও বিজ্ঞাপিত সাহায্য আনতে বলতে পারত কিন্তু তাই বা কদিন সাহায্যে আসতো? একটা উপায় বের করতেই হবে।

ওদিকে সুদীপের নাক ডাকছে। আনন্দ চুপচাপ। সুদীপটাকে জয়িতা আজকাল ঠিক বুঝতে পারছে না। সারাক্ষণ এত কি ভাবে? গ্রামের পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার প্রবণতা ওর মধ্যে। কিন্তু এখনও এখানকার ভাষা শেখার ইচ্ছে ওর নেই। গ্রামটা ছোট। মানুষগুলো সরল। আর যে ব্যাপারটা সবচেয়ে ভাল লেগেছে জয়িতার সেটা হল পুরুষরা মেয়েদের পদানসীন করে রাখে না। বরং বলা যায় মেয়ে পুরুষ সমান তালে কাজ করে, মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে সমান অধিকার আছে। শুধু বিবাহের বেলায় তাদের পরিবারের নির্দেশ মানতেই হয়। অথচ বিবাহের আগে যে যৌনভ্যাস নেই এমন নয়। সেটা সবাই জানেও কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামায় না যতক্ষণ না সন্তানসম্ভবা হচ্ছে কেউ। কিন্তু এখানকার মেয়েদের মধ্যে নানা ব্যাপারে যে সংস্কার তা মূলত অজ্ঞতা থেকেই। এদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করতে হলে ওই অজ্ঞতা আগে দূর করতে হবে। দ্বিতীয়ত শারীরিক কারণে এদের অনেকেই সন্তানসম্ভবা হতে পারছে না। নারীপুরুষ নির্বিশেষে গলগণ্ড রোগের ব্যাপক শিকার হচ্ছে। এইটে বাদ দিয়েও তাপল্যাঙকে মিনি ভারতবর্ষ ভাবা যায় না। কিন্তু তাপল্যাঙের মানুষগুলো যারা এখনও আধাআদিম যুগে বাস করছে তাদের জীবন বিপ্লব পরবর্তী স্বপ্নের সমাজ ব্যবস্থায় নিয়ে যাওয়ার অবাধ সুযোগ রয়েছে। ভারতবর্ষের মানুষের জীবনযাত্রা পাল্টে যাওয়ার যে স্বপ্ন নকশালরা দেখেছিল, সি পি এম মুখে বললেও কাজে যার উল্টো করেছে, চে গুয়েভারা অথবা মাও কিংবা হো চি মিন যে স্বপ্ন দেখতেন সেই কাজ এখানে করা সম্ভব। কয়েক কোটি না হোক কয়েক শ' মানুষকে জীবনের স্বাদ এবং স্বাধীনতা পাইয়ে দিয়ে স্বনির্ভর করলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা অর্থপূর্ণ হবে। এই ব্যাপারে সে একমত আনন্দের সঙ্গে। জয়িতা চোখ বন্ধ করতেই কল্যাণের মুখটা দেখতে পেল। কল্যাণের ফেরার সময় হয়ে গিয়েছে। ঝুঁকিটা অবশ্য কাউকে না কাউকে নিতেই হত। কিন্তু কল্যাণ যদি ধরা
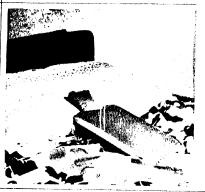
পড়ে যায় ? পুলিস যদি কল্যাণের পরিচয় জানতে পারে তা হলে মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য। জয়িতা জানে কল্যাণ বাঁচতে বড় ভালবাসে। এবং আর একটা জিনিস ইদানীং সে কল্যাণের মধ্যে লক্ষ করছিল। তার সঙ্গে ব্যবহারে যেন পরিবর্তন এসেছিল। কিরকম চোখে মাঝে মাঝে তাকাত কল্যাণ। এবং তখনই তার মনে হত সে যে মেয়ে এটা কল্যাণের দৃষ্টিতে এসেছে। ভাল লাগত না, অস্বস্তি বাড়ত। কিন্তু ওইটুকু ছাড়া আর কোন প্রিটেনশন বা বুজরুকি কল্যাণের ছিল না। বরং বুদ্ধি দিয়ে সব কিছু সামলে নেবার ক্ষমতার অভাব বড্ড চোখে পড়ত। সেই কল্যাণ দার্জিলিং-এ নিশ্চয়ই পৌঁছেছে। কিন্তু পৌঁছবার পর কতটা বোকামি করল তার ওপর নির্ভর করছে ওর ফিরে আসা। সুদীপটা তো প্রসঙ্গ উঠলেই বলে, 'ও শালা ফিরবে না। ঠিক হাওয়া হয়ে যাবে।' সুদীপ কল্যাণকে, ঠিক কল্যাণ নয়, ওই ক্লাশটাকেই অবিশ্বাস করে।

হঠাৎ আনন্দ কথা বলল, 'জয়ী, জেগে আছিস ?'

জয়িতা নড়ল না। বলল, 'হুঁ'।

আনন্দ বলল, 'আজ রাত্রে মেয়েটা মরে যাবে। তারপর কি হবে কে জানে ?'

জয়িতা বলল, 'আমি কল্যাণের কথা ভাবছি।'

আনন্দ বলল, 'কল্যাণ পালাবে না। ও আসবেই। কাল নয় পরশু। কিন্তু জানিস, আমাদের মধ্যে কেউ যদি ডাক্তার হত তা হলে এখানে আরও ভাল কাজ করতে পারতাম।'

জয়িতা প্রশ্ন করল, 'কল্যাণ ফিরবেই এই বিশ্বাস হল কেন তোর ?'

আনন্দর হাসি শোনা গেল অন্ধকারে, 'মধ্যবিত্ত বলে। মধ্যবিত্তরা সব সময় পালায়। কিন্তু বীরত্ব দেখাবার সুযোগ পেলে সেটা মরে না যাওয়া অবধি হাতছাড়া করে না।'

ঠিক সেই সময় চিৎকারটা উঠল। যেন কেউ প্রচণ্ড আহত হয়ে কাঁদছে। কান্নাটা গোঙানি বললে কম বলা হয়, কারণ কোন মানুষ অত জোরে গোঙাতে পারে না। এখানে আসার পর আজ দ্বিতীয় রাত ওই গোঙানিটা হচ্ছে। আনন্দ উঠে বসল। বাতাসের দাপট ছাপিয়ে কান্নার শব্দ হচ্ছে। আনন্দ বলল, 'মানুষের নয়, অসম্ভব। এটাই পালদেমের দানো।'

জয়িতা বলল, 'বাইরে বেরিয়ে দেখবি ? হেভি• ঠাণ্ডা কিন্তু।'

'দেখব। ইম্পসিবল। পালদেম যাই বলুক এ দানব নয়। দানব বলে কিছু নেই। হিলারী সাহেব পঁচিশ হাজার ফুট উঁচুতে উঠেও কোন জন্তুর হদিশ পাননি। এরা যাই বলুক তার পেছনে কোন সত্যি নেই।' আনন্দ উঠে শীতবস্ত্র জড়িয়ে নিচ্ছিল। জয়িতা ওকে অনুসরণ করল। কান্নাটা এখনও একটানা চলছে। ঘরে মোমবাতি জ্বালালো আনন্দ। শিখাটা কাঁপছে। এই সময় সুদীপ মুখ তুলল, 'কি ব্যাপার ? চললি কোথায় ?'

আনন্দ বলল, 'একবার দেখব বস্তুটি কি। এত জোরালো গলা কার ?'

সুদীপ আবার শুয়ে পড়ল, 'নেই কাজ তো খই বাছ।'

ওরা আর কথা বাড়াল না। দরজা থরথর করছিল। কোনমতে সেটা খুলে বাইরে দাঁড়াতে একসঙ্গে ঠাণ্ডা এবং হাওয়ার চাপ পড়ল শরীরে। বাইরে ঘন অন্ধকার নয়, একটা পাতলা আলো আঁধারে মিশে অদ্ভুত পরিবেশ তৈরী করেছে। আকাশে মেঘ আছে কিন্তু তার আড়ালে চাঁদও রয়েছে এটা বোঝা যায়। ওরা দুজনই কাঁপছিল। কান্নাটা ভেসে আসছে উত্তরের পাহাড় থেকে। কিছুক্ষণ একটানার পর কিছুক্ষণ যেন জিরিয়ে নিচ্ছিল। সমস্ত তাপল্যাঙও এখন চুপচাপ। কোন প্রাণের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে না। ওরা ঢালু জমি বেয়ে নেমে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ হাঁটার পর ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে হচ্ছে সমস্ত শরীর জমে যাচ্ছে। আনন্দ বলল, 'দৌড়ো। দৌড়লে ঠাণ্ডা কম লাগবে।' ওরা উত্তরের পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যেতেই পায়ের তলায় বরফ পেল। এর মধ্যে এখানে বরফ পড়তে শুরু করেছে। আর দৌড়োনো যাচ্ছে না। এর পরেই খাড়া পাহাড়। পাহাড়ের ওপরে বরফ ছিলই, এখন তা নেমে এসেছে অনেক নিচে। আর এখানে আসার পরই চিৎকার অথবা কান্না থেমে গেল। ওরা যত এগিয়ে এসেছিল তত স্পষ্ট হচ্ছিল কোন মানুষ নয়, এ আওয়াজ কোন জন্তুর গলা থেকে বের হচ্ছে। সম্ভবত জন্তুটি ওদের দেখতে পেয়েছিল এবং সে কারণেই চুপ করেছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আনন্দ বলল, 'নাঃ, ফিরে যাই চল।'

জয়িতা বিরক্ত হল, 'এলি কেন ? যেন তোর জন্যে চিড়িয়াখানার খাঁচায় বসে থাকবে ইয়েতি।'

ওরা চুপচাপ এগিয়ে আসছিল। শরীরের যেসব অংশ বাইরে বেরিয়ে আছে সেখানে কোন সাড় নেই। এখন আর কোন আওয়াজ আসছে না উত্তরের পাহাড় থেকে। সমস্ত চরাচর নিস্তব্ধ। ওরা যখন মাঝামাঝি তখন আনন্দ হাত বাড়িয়ে জয়িতাকে থামতে বলল। গোটা আটেক লোক ওপাশের পাহাড় থেকে নেমে আসছে নিঃশব্দে। ওদের লক্ষ্য অবশ্যই গ্রাম এবং প্রত্যেকেই সশস্ত্র। ওঁদের চলাফেরা দেখে বোঝা যাচ্ছে কোন গোপন মতলব হাসিল করতে ওরা এসেছে। আনন্দরা দাঁড়িয়েছিল একটা বড় পাথরের আড়ালে। পাথরটা হাওয়ার দাপট সামলাচ্ছে। একেই পাতলা অন্ধকার তার ওপর ওরা এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে যেখানে চট করে আগন্তুকদের দৃষ্টি পড়ার কথা নয়। আনন্দ ফিসফিসিয়ে বলল, 'লোকগুলো কারা বুঝতে পারছি না।' জয়িতা বলল, 'আর একটু লক্ষ করা যাক।'

আটজনের দলটা গ্রামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ওপাশ থেকে একটা কুকুর ডেকে উঠতেই ওরা থমকে দাঁড়াল। কুকুরটাকে শান্ত হবার সময় দিল। তারপর দলটা দুটো ভাগে দু পাশ দিয়ে এগোতে লাগল। একটা ভাগ চলল কাহুনের মন্দিরের দিকে আর একটা গ্রামের ভেতরে। ওরা যখন আর দৃষ্টির সীমায় রইল না তখন আনন্দ বলল, 'মনে হচ্ছে পাশের গ্রামের মানুষ। পালদেম এদের কথাই বলছিল। এরা তাপল্যাঙের কোন ক্ষতি করতে এসেছে। গ্রামের লোকদের সতর্ক করে দিতে হবে। চল।'

জয়িতা বলল, 'দাঁড়া। তাড়াহুড়ো করিস না। আগে দেখা যাক ওরা কি করে।'

আনন্দ প্রতিবাদ করল, 'না। তারপর সামলানো যাবে না।'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'যাবে। আমার কাছে রিভলভার আছে।'

আনন্দ এই পরিবেশেও হতভম্ব হয়ে গেল। 'এতদিন বলিসনি কেন ?'

জয়িতা বলল, 'বলার কোন কারণ ঘটেনি তাই। এবার এগিয়ে চল।'

হাঁটা শুরু করতে আনন্দ ওর দিকে বারংবার তাকাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করেই ফেলল, 'তোরটা পালদেম নিয়ে যেতে পারেনি ?'

জয়িতা বলল, 'পারলে আমার কাছে থাকত কি করে !'

ঠিক এই সময় একই সঙ্গে দু জায়গায় চিৎকার শুরু হল। মন্দিরের চিৎকার থেমে গেল আচমকা। আর গ্রামের ভেতর থেকে দুটো মানুষ একটা শরীরকে কাঁধে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে। মন্দির থেকেও চারটে লোক নেমে এল। সেই চিৎকার চেঁচামেচি এবার সমস্ত তাপল্যাঙে ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে লোক বেরিয়ে আসছে ঘর ছেড়ে।

কিন্তু মাঝরাতে ঘুম আচমকা ভেঙ্গে যাওয়ায়, হাওয়ার দাপট এবং শীতের প্রাবল্যে মানুষগুলো সচল হবার অনেক আগেই আটটা লোক কাজ সেরে দূরত্ব বাড়িয়েছিল। কি ঘটনা ঘটেছে তাই নিয়ে যখন বোঝাবুঝির পালা চলেছে তখন কয়েকজন তেড়ে আসছিল লোকগুলোকে ধরতে। কিন্তু তারা নিরস্ত্র, সশস্ত্র হানাদারদের সামনে এসে আর এগোতে সাহস পাচ্ছিল না। ঠিক তখন পাহাড়ের ওপাশে যে পথ দিয়ে হানাদাররা ঢুকেছিল সেখানে ঢাক জাতীয় বাজনা বেজে উঠল। বোঝা গেল হানাদাররা একা নয়, তাদের মদত দেবার জন্যে আরও অনেকে অপেক্ষা করছে। নিজেদের লোক কাজ হাসিল করে ফিরে আসছে দেখে তারা যে উল্লসিত সেটা চিৎকারে বোঝা গেল। আনন্দ বলল, 'আমরা পালদেমদের সাহায্য করব জয়ী। ওদের কোন দামী জিনিস চুরি যাচ্ছে। তুই আমাকে রিভলভারটা দে। গুলি আছে তো ওতে ?'

জয়িতা মাথা নাড়ল। তারপর ছুটে গেল খোলা জায়গায় যে পথ দিয়ে আটটা লোক এখন এক হয়ে ছুটে আসছে। প্রথম যে লোকটা ওদের লক্ষ করল সে চিৎকার করে উঠতেই দলের বাকীরা এইদিকে তাকাল। ওরা কাউকে কাঁধে ঝুলিয়ে আনছিল। একজনের দুটো হাত বুকের ওপর। বাকি পাঁচজন অস্ত্র ঘুরিয়ে এদের পাহারা দিতে দিতে এগিয়ে আসছিল। এই সময় দূর থেকে সুদীপের চিৎকার ভেসে এল, 'জয়ী, সরে যা।'

জয়িতা একবার মুখ ঘুরিয়েই ফিরিয়ে নিল। সুদীপ তাদের আস্তানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আনন্দ চিৎকার করল সেই সময়ে। তার গলার স্বরে হানাদারেরা এবার থমকালো। ওদের হাতের অস্ত্র বলতে যা দেখা গেল তা প্রাগৈতিহাসিক যুগেই ব্যবহার করা হত। দুটি নিরীহ মানুষ সামনে দাঁড়িয়ে মনে করায় ওরা দ্বিগুণ উৎসাহে তেড়ে এল সেই অস্ত্র উঁচিয়ে। জয়িতা তখন শূন্যে গুলি ছুঁড়ল।

হঠাৎ যেন সমস্ত পৃথিবী কেঁপে উঠল। পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে শব্দটা বহুগুণ বেড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো থমকে গেল। পেছনে পাহাড়ের উল্লাসও থেমে গেল। ততক্ষণে সুদীপ ছুটে এসেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে জয়িতার পাশে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে গেল কিন্তু জয়িতা তাকে হাত নেড়ে নিষেধ করল। হানাদাররা সাময়িক স্থবিরতা কাটিয়ে উল্টো পথ ধরার চেষ্টা করছিল কিন্তু জয়িতা দ্বিতীয়বার গুলি করতে তারা থেমে গেল। গুলিটা লেগেছে সামনে দাঁড়ানো হানাদারটির পায়ের কাছে মাটিতে। কিছুটা মাটি তার ফলে ছিটকে উঠেছে। ওরা ব্যাপারটা বোঝার পর যেন পাথর হয়ে গেল।

জয়িতা যে উত্তেজিত এবং অত্যন্ত নার্ভাস তা তার গলার স্বরে বোঝা গেল, 'পালদেমকে ডাক।' তার হাত সামনে প্রসারিত, কালো রিভলভারটা সামান্য কাঁপছে সেই হাতে। দু দুবার শব্দ হওয়ার পর হানাদাররা এখন পাথরের মত চুপচাপ। সম্ভবত এ জীবনে তারা এমন শব্দ শোনেনি। দুই থেকে তিনে দাঁড়ানো অন্য চেহারার মানুষরা যে শব্দ করছে তার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকায় ওরা কি করবে বুঝতে পারছিল না। শুধু হানাদার নয়, দূরে দাঁড়ানো তাপল্যাঙের মানুষরাও শব্দ শোনার পর বোবা হয়ে গিয়েছিল। এই কদিন যাদের তারা সাধারণ চোখে দেখেছে, প্রতিদিন লক্ষ্য রেখেছে যাতে না পালিয়ে যায় তাদের শক্তিসামর্থ্য সম্পর্কে যে অন্ধ ছিল তা স্পষ্ট হওয়ায় তারাও চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। এই সময় সুদীপ চিৎকার করল 'পা-ল-দে-ম'। তার সঙ্গে গলা মেলাল আনন্দ। আর এই চিৎকারটা হওয়ামাত্র যার দুটো হাত বুকের ওপর সে আচমকা দৌড়তে শুরু করল। জয়িতা এক মুহূর্ত ইতস্তত করল। তারপর লোকটার পা লক্ষ্য করে গুলি করল। কিন্তু তার হাত কাঁপছে। গুলি সম্ভবত সাত হাত দূর দিয়ে বেরিয়ে গেল। মরীয়া হয়ে সে দ্বিতীয়বার গুলি করা মাত্র লোকটা আছাড় খেয়ে পড়ল। কোথাও আর কোন শব্দ নেই। শুধু গুলির শব্দটা মিলিয়ে যাওয়ার পরেও কানে সেঁটে আছে। এবার জয়িতা নিজেই চিৎকার করল, 'পা-ল-দে-ম'!

তারপরে সেই মূর্তিটাকে পেছনের ভিড় ছেড়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। খুব ভীরু পায়ে আসছে পালদেম। যেন তার আসার মোটেই ইচ্ছে নেই। হানাদারদের দলটাকে অনেকটা এড়িয়ে খানিকটা দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। জয়িতা তাকে বলল, 'লোকগুলোকে মাটিতে বসে পড়তে বল।' পালদেম সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গলা তুলে হুকুমটা জানিয়ে দিতেই পাঁচজন পুতুলের মত মাটিতে বসে পড়ল। তাদের ভূতগ্রস্তর মত দেখাচ্ছিল। কাঁধে মানুষ নিয়ে যে লোক দুটো দাঁড়িয়েছিল তারা সময় নিল। যাকে ওরা কাঁধে তুলেছিল তার মুখ বাঁধা। কিন্তু হাত পা খোলা। তা সত্ত্বেও এই সময় পর্যন্ত কোন প্রতিবাদ করেনি। মাটিতে নামিয়ে দেওয়ার পর মেয়েটি সোজা হয়ে বসল খানিকটা তফাতে। সাতজন লোক তখন বসে দূরে পড়ে থাকা লোকটিকে দেখছে। সম্ভবত শব্দের ক্ষমতা চাক্ষুষ করে আরও কাহিল হয়ে পড়েছে তারা। জয়িতা পালদেমের সামনে এগিয়ে গেল, 'আমরা তোমাদের বন্ধু। এরা এই গ্রামে কি করতে এসেছিল?'

পালদেম বলল, 'ওরা আমাদের দেবতার মূর্তি চুরি করেছে। ওই যে লোকটা মাটিতে পড়ে আছে ওর কাছে আছে মূর্তি। আর এরা ওই মেয়েটাকে নিয়ে যেতে এসেছিল।'

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'এরা কারা?'

'পাশের পাহাড়ে ওদের গ্রাম। আমাদের শত্রু। বহু বছর ধরে ওদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া। আমাদের দেবতার ওপর ওদের খুব লোভ। আমাদের মেয়েদের ওপরেও। আমরা ফসল তুললে ওরা হানা দেয়। সাধারণত ওরা এ সব করে বরফ পড়লে। এবার ওরা আগেই সাহস দেখাল।' কথা বলতে বলতে এতক্ষণে পালদেমকে উত্তেজিত দেখাল।

জয়িতা বলল, 'তুমি কি চাও আমরা তোমাদের ওদের হাত থেকে বাঁচাই?'

'হ্যাঁ। আমি গ্রামের লোকদের বলছি ওদের বেঁধে ফেলতে।'

'না। তুমি আমাদের বন্ধু বলে ভাবতে পারোনি। অথচ তোমাদের আবার বলছি, আমরা বন্ধু বলেই মনে করি। তুমি চোরের মত আমাদের সমস্ত অস্ত্র চুরি করেছিলে কিন্তু এটা পারোনি। আর পারোনি বলেই আজ তোমাদের দেবতা এবং গ্রামের মেয়েকে বাঁচাতে পারলাম। আমি চাই এখনই তুমি আমাদের অস্ত্রগুলো ফেরত দেবে। যাও, চটপট কাজ করো।'

পালদেম হাঁ হয়ে তাকিয়েছিল।

জয়িতা চিৎকার করল, 'তোমার একার বোকামির জন্যে গ্রামের সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হোক তা আমি চাই না। এই ছোট্ট অস্ত্র দিয়ে আমরা বেশীক্ষণ লড়তে পারব না। আমি যা বলছি তা প্রত্যেকের ভালোর জন্যই বলছি। সুদীপ ওর সঙ্গে যা'।

সুদীপ এগিয়ে যেতেই পালদেমকে নড়তেই হল। ওরা যাচ্ছে ঝরনার দিকে।

দৃশ্যটা এখন এই রকম। লোকগুলো এবং মেয়েটি বসে আছে নির্বাক হয়ে। গ্রামের মানুষগুলো দূরে দাঁড়িয়ে। পেছনে উল্লাস নেই। হাওয়া বইছে। কিন্তু শীত যে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও তীব্র হয়ে উঠেছে তা কারো খেয়ালে নেই। আনন্দ এগিয়ে গেল দূরে পড়ে থাকা লোকটার কাছে। পাশে দাঁড়িয়েই সে বুঝতে পারল লোকটা মরেনি। ওর শরীর কাঁপছে। এমন কি রক্তের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। সে লোকটাকে টেনে তুলতেই কোন রকমে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ভয়ে থরথর করে কাঁপছে সে। গুলি তার গায়ে লাগেনি কিন্তু ভয়ে লোকটা কুঁকড়ে উঠেছে। ওর দুটো হাতে দেবতার সেই মূর্তিটা। সন্তর্পণে সেটি তুলে নিয়ে আনন্দ চিৎকার করল, 'কাহুন কাহুন'।

জনতার মাঝখান থেকে কাহুন তার শিষ্যসমেত বেরিয়ে এলেন। তাঁকেও খুব নার্ভাস মনে হচ্ছিল। আনন্দ তাঁর হাতে মূর্তি দিতে তিনি আশীর্বাদ করলেন। গ্রামের মানুষরা তখন খুশীতে চিৎকার করে উঠল। আনন্দ কাহুনকে বোঝাতে পারল এই লোকগুলোকে বেঁধে ফেলতে হবে, এখনই। কাহুন, সেই নির্দেশটা দেওয়ামাত্র কাজ শেষ হয়ে গেল।

আনন্দ এগিয়ে এল জয়িতার কাছে, 'দু দুটো গুলি ছুঁড়েছিস কিন্তু একটাও গায়ে লাগেনি। প্লিজ একথা বলিস না যে তুই ইচ্ছে করে গুলি গায়ে লাগাসনি।'

জয়িতা ঠোঁট কামড়ালো, 'গুলি ছোঁড়ায় আমি অভ্যস্ত নই। কিন্তু এই লোকগুলোকে তুই বাঁধতে বললি কেন? এদের শাস্তি দিলে দুই গ্রামের শত্রুতা কোনদিন মিটবে না।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'ঠিক বলেছিস, তাহলে কি করা যায়?

সেইসময় সুদীপ আর পালদেম ফিরে এল। সুদীপের হাতে একটা বড় টুকরি। কাছে এসে বলল, 'মালগুলো ঠিক আছে কিনা কে জানে। পাথরের খাঁজে লুকিয়ে রেখেছিল। মেয়েটা কে? ওকে বেঁধেছে কেন? ওতো এই গ্রামের মেয়ে।'

পালদেম মুখ নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। আনন্দ তার পাশে গিয়ে বলল, 'ভুল বুঝো না, আমরা কোন শত্রুতা করব না। কিন্তু এগুলো তোমাদের উপকারেই লাগবে।'

পালদেম মাথা মাথা নাড়ল কিন্তু সহজ হল না। জয়িতা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওই মেয়েটিকে বেঁধেছ কেন? ওকে তো এরা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল।'

'এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। ওকে ওই গ্রাম চায়। কিন্তু আমরা ওখানে মেয়ে দেব না। ওকে ওরা মুখ বেঁধেছিল কিন্তু হাত পা বাঁধেনি। তবু ওরা যখন নিয়ে আসছিল তখন ও কোন প্রতিবাদ করেনি। দোষ আছে ওর। ওর শাস্তি ভয়ানক।'

'ভয়ানক কেন?'

'ও বেইমানি করেছে। ওর স্বামী নেই, আত্মীয়স্বজন নেই। স্বভাব মন্দ। ও অন্য গ্রামে গেলে ওর জমি নিয়ে যাবে। এ হতে পারে না।'

'কেন? গ্রামের কোন ছেলে ওকে বিয়ে করবে না?'

'না। কেউ যেচে নিজের সর্বনাশ করতে চায় না।'

জয়িতা বলল, 'ঠিক আছে, এখন কোন শাস্তি দিও না। এই দলের মধ্যে কে নেতা তা ওদের জিজ্ঞাসা করো তো!'

পালদেম বলল, 'ওই যে ডানদিকের সবচেয়ে বড় চেহারার লোকটা ওই নেতা।'

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'ও কি তোমাদের ভাষায় কথা বলে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু লোকটা অত্যন্ত গোঁয়ার।'

জয়িতা এগিয়ে গেল লোকটার সামনে। লোকটা মাথা নামিয়ে বসেছিল। জয়িতা সামনে এসে দাঁড়াতে চোখ তুলে তাকাল। লোকটার বয়স তিরিশের নিচে। স্বাস্থ্য যে কোনো পাহাড়িদের চেয়ে ভাল। নাক বেশ

উঁচু। চোয়াল শক্ত হল লোকটার। চোখাচোখি হতেই চোখের দৃষ্টি পাল্টালো। লোকটা সত্যিই গোঁয়ার।

জয়িতা তার অল্প জানা শব্দ ব্যবহার করল, 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। পালদেম এর বাঁধন খুলে দাও। তুমি আমার সঙ্গে এদিকে এস।'

বন্ধুদের উপেক্ষা করে সে সোজা আস্তানার দিকে হাঁটতে লাগল। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর সে পেছন ফিরে তাকাতেই দেখল পালদেম বাঁধন খুলে দেবার পরও লোকটা নড়ছে না। সে আস্তানার সিঁড়িতে বসে তাকাল। মেঘ সরছে। ঢলে পড়া চাঁদের শরীর থেকে একটু একটু করে জ্যোৎস্না বের হচ্ছে। দূরের লোকগুলোকে ঝাপসা দেখাচ্ছে এখান থেকে। এবং সেই ঝাপসা অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটি সুগঠিত মানুষ ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

লোকটি সামনে এসে দুটো পা ঈষৎ ফাঁক করে দাঁড়াল। তার ভঙ্গীতে এখনও স্বাভাবিকতা আসেনি কিন্তু ধীরে ধীরে যে সে স্বভাব ফিরে পাচ্ছে তা বোঝা যায়। লোকটা অবশ্যই জেদী। ওর তাকানো, শরীর দেখলে এমনি সময় কথা বলতে সাহস পেত না জয়িতা। কিন্তু এখন ক্ষমতার চাবি তার হাতে। জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কি?'

লোকটার ঠোঁট একবার কুঁচকে উঠল। তারপর চোখ না সরিয়ে জবাব দিল, 'রোলেন।'

জয়িতা একটু অবাক হল। নামটার মধ্যে বিদেশী বিদেশী গন্ধ। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা এখানে চুরিডাকাতি করতে এসেছ কেন?'

রোলেন কোন জবাব দিল না। বুনো শুয়োরের মত মাটিতে পা ঘষল।

জয়িতা সেটা লক্ষ করে বলল, 'তাপল্যাঙের দেবতাকে তোমরা নিয়ে যাচ্ছ কেন?'

'এরা গতবার আমাদের ফসল লুঠ করে নিয়ে এসেছিল। ওই দেবতাই এদের সৌভাগ্যের প্রতীক।'

'তোমরা দুই গ্রামের মানুষ একই ভাষায় কথা বল, পাশাপাশি থাকো, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে লাভ কি? তোমরা কেউই আরামে থাকো না।' জয়িতার নিজের কাছেই কথাগুলো জ্ঞান জ্ঞান শোনালো।

রোলেন হাসল। ছোট চোখ গোল মুখ সত্বেও হাসিটা বেশ মোলায়েম। বলল, 'ওরা এখন বড়লোক। টাকা দিয়ে খচ্চরওয়ালার কাছ থেকে জিনিস কেনে। তোমরা ওদের বড়লোক করে দিয়েছ। বরফ পড়লে আমাদের না খেয়ে থাকতে হয়।'

জয়িতা বুঝলো এরা সব খবর রাখে। অথচ দুই গ্রামের মধ্যে মুখ দেখাদেখি সম্পর্ক নেই। সে বলল, 'আমাদের কাছে তাপল্যাঙের মানুষও যা তোমরাও তাই। আমরা চাই পাহাড়ের মানুষ সুখে থাকুক। তোমাকে একটা অনুরোধ করব, রাখবে?'

'কি অনুরোধ?'

'এখন কিছুদিন তোমরা এই গ্রামে হামলা করো না। তোমাদের মোড়ল কে?'

'কাহুনের কথা আমরা শুনি।'

'বেশ, তোমাদের কাহুনকে আমাদের কথা বল। আমরা তোমাদের গ্রামেও যেতে পারি। এই গ্রামের মানুষ যে সব সুবিধে পাবে তোমরাও তাই পাবে। শুধু তার বদলে আমাদের কথা শুনতে হবে। রাজী?'

রোলেন কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'আমরা ভেবে দেখব।'

'ওই মেয়েটাকে তোমরা নিয়ে যাচ্ছ কেন?'

'ওর শরীরে ভাল বাচ্চা হবে। ওর স্বামীর বাচ্চা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আমাদের গ্রামে স্বাস্থ্যবান মানুষ আছে। তা ছাড়া গ্রামে বাচ্চারও অভাব।'

'তোমাদের সঙ্গে যেতে ওর ইচ্ছে আছে?'

'তাই তো মনে হয়।'

'কিন্তু ওকে নিয়ে গেলে ওর জমিও তো তোমরা দাবী করবে!'

'তা তো করবই।'

'আপাতত ওকে এখানে রেখে যাও। তোমরা সবাই যেতে পারো এখন। কিন্তু মনে রেখো এখানে আর হামলা নয়। আমরা তোমাদের সঙ্গে ঝামেলা করতে চাই না। তোমরা তোমাদের গ্রামে ফিরে যাও।'

জয়িতার কথাগুলো লোকটা যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা আমাদের শাস্তি দেবে না?'

'না। ওরা ফসল চুরি করেছিল বলেই তোমরা এসেছিলে। শোধবোধ হয়ে গেছে।'

লোকটা একবার আকাশে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল সঙ্গীদের দিকে। সঙ্গীরা কথা শুনে চেঁচিয়ে উঠল। জয়িতার নির্দেশে পালদেম ওদের বন্ধন মুক্ত করে দিলে ওরা পাহাড়ের আড়ালে মিলিয়ে গেল। মেয়েটি বসেছিল চুপচাপ। জয়িতা তাকে বলল, 'তুমি ঘরে ফিরে যাও।'

মেয়েটি মাথা নাড়ল, 'না, আমি ঘরে যাব না।'

'কোথায় যেতে চাও?'

'জানি না। গ্রামের কোন পুরুষ আমাকে নেবে না। ওরা নিয়ে যাচ্ছিল, তোমরা বাধা দিলে কেন? আমি এখন কি করব!' কেঁদে ফেলল মেয়েটা।

জয়িতা ওর কাঁধে হাত রাখল। 'তুমি একজন মানুষ। মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে হবে।'

ছিটকে সরে গেল মেয়েটি। তারপর চিৎকার করে বলল, 'আমি একটা মেয়ে। জীবনে যদি একটা সত্যিকারের পুরুষমানুষ না পেলাম তা হলে বেঁচে থেকে লাভ কি!' (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ময়দানের দুই মনুমেন্ট

অশোক রায়

বলরাম না চুনী ? আমেদ না সাত্তার ? জার্নেল না অরুণ ঘোষ ? এই ধরনের তুলনামূলক প্রশ্ন অতীতে বহুবার উঠেছে। হালআমলেও একটা প্রশ্ন প্রায়ই পাক খায় ফুটবল অনুরাগীদের মনে, কে বড়— সুব্রত না মনোরঞ্জন ?

সুব্রত এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য নিঃসন্দেহে ফুটবল জীবনের সেরা সময় পার হয়ে এসেছেন। তবু এখনও প্রশ্ন ওঠে বর্তমান প্রজন্মকে আলো করে রাখা দুই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল নায়কের মধ্যে কে সেরা ? একথা ঠিক শৈলেন মান্না, চুনী গোস্বামী কিংবা রামবাহাদুর, সুধীর কর্মকারের পর ওরাই এখন নিজের নিজের ক্লাব সমর্থকদের চোখের মণি। ওরা এখনও জনপ্রিয়তার এভারেস্টে। মাঠে ইট পড়ছে ? সমর্থকদের অবিশ্রান্ত কটূক্তি ক্রমাগত হুল বেঁধাচ্ছে কোচ এবং ফুটবলারদের ? জীবিত অবস্থায় খেলোয়াড়দের শ্রাদ্ধের মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে গ্যালারিতে ? ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগান যে কোন মাঠেই এইরকম ঘটনা ঘটে, ঘটতেই পারে। বেগতিক অবস্থায় সবাই যখন নিরাপত্তা খোঁজে, তখন দু' মাঠেই এইরকম ফুটন্ত পরিস্থিতিতে সাহসের সঙ্গে ক্ষিপ্ত সমর্থকদের মুখোমুখি হয়েছেন সুব্রত এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। ওঁরা সামনে দাঁড়াতেই ক্রমে মিইয়ে গেছে সমর্থকদের ঝাঁঝ, ক্রোধ।ক্লাবের প্রতি 'বাবলু' এবং 'মনা'র বিরাট অবদান এবং আনুগত্যের সামনে লজ্জায় কুঁকড়ে গেছে উগ্র দর্শকের উষ্মা। এভাবেই সুব্রত এবং মনোরঞ্জন দুটি নাম উঠে এসেছে দুই ক্লাবে জনপ্রিয়তার চূড়োয়। এবং এভাবেই ওঁরা পেয়েছেন সমর্থকদের বুকের নরম জায়গাটির অধিকার। শীত-গ্রীষ্মের অনেক সকাল ময়দানের ঘাস পরিশ্রমের ঘামে ভিজিয়ে ওঁরা একটু একটু করে উঠে এসেছেন ওপরে। আত্মনিবেদনের অনেকটা পথ মাড়িয়ে।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
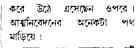
সুব্রত এবং মনোরঞ্জন দুই প্রধানের দুই রক্ষণ স্তম্ভ। তবু কল্পনাতেও দুটি সুব্রত বা দুটি মনোরঞ্জন কখনই বাংলা বা ভারতীয় ফুটবলের সেরা স্টপার জুটি হতে পারে না এইজন্যই যে, পরিপূরক হওয়ার মত গুণ আছে কেবলমাত্র একজন সুব্রত এবং একজন মনোরঞ্জনের মধ্যেই। দু'জন পাশাপাশি খেললে নির্ভরতা এবং বিশ্বাস অনেক বেশি খুঁজে পেত বাংলা কিংবা ভারতবর্ষ। কিন্তু দুর্ভাগ্য, দু'জনকে পাশাপাশি খেলতে দেখার অধিকার আমাদের বেশি দেওয়া হয়নি কেন জানি না।

এটা একরকম নিশ্চিত বাংলার হয়ে আর কখনও সুব্রত এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য পাশাপাশি খেলবেন না। শেষবার ওঁরা খেলেছেন গতবার জব্বলপুরে, সন্তোষ ট্রফিতে। আমার সৌভাগ্য, সন্তোষ ট্রফির আসরে ওই দুই বিরাট মাপের ফুটবলারকে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। প্রতিদিন রাত আড়াইটে পর্যন্ত আমার ঘরে (বাংলা দলের সঙ্গে একই হোটেলে ছিলাম) আড্ডা দিয়েছেন সুব্রত। এমন কি পরের দিন ম্যাচ থাকলেও। মিথ্যে বলব না, মাঝে মাঝে এ সন্দেহও দেখা দিয়েছে ওঁর অনিদ্রা রোগ নেই তো ? আর মনোরঞ্জন ? ডাইনিং হলে দিনে এবং রাতে দু'বার খাওয়া ছাড়া নিজের রুম ছেড়ে বেরুতেন না। ঘণ্টা ছ'য়েক কি তারও বেশি নিজের ঘরে অন্য ফুটবলারদের সঙ্গে তাস খেলে সময় কাটাতেন। মনে হত ফুটবলের পর তাসই কি মনোরঞ্জনের সবচেয়ে প্রিয় খেলা ? তবে মাঠে কিংবা প্র্যাকটিসে দু' জনকেই দেখেছি খুব সিরিয়াস।

মাঠে এবং মাঠের বাইরে দু' জনের মধ্যে অনেক মিল। বহু অমিলও। সুতরাং বিতর্ক নয়, মিল-অমিলের পটভূমিতে দুই ফুটবল চরিত্রকে ফিরে দেখা যাক।

মনের দিক দিয়ে দু' জনেই দৃঢ়, অকপট। এবং সন্দেহাতীতভাবে প্রতিবাদী চরিত্র। সুব্রত অপেক্ষাকৃত সোচ্চার, মনোরঞ্জন তুলনায় মৌন। নিজের ভাল বা মন্দ বিচার না করেই ক্লাবের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন সুব্রত। ক্লাবের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মনোরঞ্জন উদাসীন। আধ ঘণ্টার আলাপেই জীবনের গোপনতম ঘটনাটি বলে ফেলতে পারেন সুব্রত। সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুটির কাছেও মনোরঞ্জন উন্মুক্ত নন। সুব্রত অত্যন্ত সেন্টিমেন্টাল, সমালোচনায় কাতর হয়ে পড়েন সহজেই। আগে তেমনভাবে হতেন না, কিন্তু এখন মনোরঞ্জনও সমালোচনায় পীড়িত হয়ে পড়েন। ক্লাবপ্রীতি নিয়ে গর্ব এবং বাহ্যিক প্রকাশ আছে সুব্রতর। এক ঘর লোকের মধ্যেও সেকথা উচ্চকণ্ঠে জানাতে সুব্রতর দ্বিধা নেই। মনোরঞ্জনের ক্লাব প্রীতির ব্যাপারটা নীরবতার মধ্যেই নিহিত, ভালোলাগা উচ্ছ্বাসহীন। প্র্যাকটিসে সহ-খেলোয়াড়দের প্রায়ই ভীষণ বকাঝকা করেন সুব্রত। এ অভিযোগ অনেকেরই। আবার বুটের অভাবে খেলতে পারছে না— অক্লেশ নিজের বুট অন্যকে দিয়ে দিয়েছেন সুব্রত এমন কথাও বলেন অনেকে। প্র্যাকটিসে মনোরঞ্জন নিজেকে নিয়ে মগ্ন থাকেন, অন্যকে বকাবকি করেন খুব কম।

দু'জনের খেলার ধরনও আলাদা। সুব্রতর বল কন্ট্রোল, স্পিড, অ্যান্টিসিপেশন, কভারিং এবং ডিস্ট্রিবিউশন ভাল। ট্যাকলিং, হেডিং, টাফনেস এবং স্ট্যামিনার দিক দিয়ে মনোরঞ্জন এগিয়ে। তবে দু' জনেই সাহসী, জান লড়িয়ে দিতে পারেন। খেলতে খেলতে ক্রমেই যেন আত্মবিশ্বাসের পাহাড়ে

চড়তে শুরু করেন সুব্রত। খেলতে খেলতেই মনোনিবেশের গভীরে নেমে যান মনোরঞ্জন। সুব্রত গোটা দলকে নেতৃত্ব দিতে পারেন। মনোরঞ্জনের খেলা আত্মকেন্দ্রিক, নিজস্ব দায়িত্ব পালনের দিকেই ঝোঁকটা বেশি। আত্মদৃষ্টান্তে সুব্রত যদি নেতা হন তাহলে মনোরঞ্জন নিষ্ঠাবান সৈনিক। দলের স্বার্থে সুব্রত ঝুঁকি নেন। মাঝে মাঝে ঝুঁকি নিতে গিয়ে দলকে খেসারত দিতে হয়েছে। মনোরঞ্জন ঝুঁকি নেন কদাচিৎ। নিরাপদ খেলে দলকে বিপন্মুক্ত করার ব্যাপারে অধিক মনোযোগী। অনেকের ধারণা, অধিকাংশ সময় পাশে ভাল ডিফেন্ডার থাকায় সুব্রত উঠে যাবার ঝুঁকি নিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

সুব্রত ভট্টাচার্য

মনোরঞ্জনের সেই অভ্যেস গড়ে ওঠেনি, বেশিরভাগ সময় পাশে নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার না থাকায়। তবে এটা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, ওয়ান-ইজ-টু-ওয়ানপরিস্থিতি সামলাতে মনোরঞ্জন বল এবং সুব্রত বুদ্ধির ওপর বেশি জোর দেন।

সুব্রতকে মাঝে মাঝেই দেখা যায় মাঠ থেকে কোচ বা সহ খেলোয়াড়দের নির্দেশ দিতে। খেলতে খেলতে ম্যাচের ব্রেকিং পয়েন্ট এবং প্লাস পয়েন্টগুলো সুব্রত তাঁর অসাধারণ ফুটবল সেন্স থেকেই বুঝে নেন। সেই জনাই মাঠ থেকে সহ-খেলোয়াড় এবং কোচকে উপদেশ দিতে বা পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিতে পারেন। সুব্রতর ম্যাচ রিডিং ক্ষমতাও বেশি। উপদেশ দেবার ব্যাপারে মনোরঞ্জনের তেমন কোন আগ্রহ নেই।

দীর্ঘ পর্যবেক্ষণে একটা ব্যাপার স্পষ্ট— পিণ্টু, শ্যাম, সুধীর, হাবিবের মত সুব্রতও 'স্কিল্ড' ক্লাশ। ফর্ম হারিয়ে গেলেও বেশ কয়েক বছর খেলা চালিয়ে যেতে পারবেন। মনোরঞ্জন 'ওয়ার্কিং' ক্লাশ। ফর্ম একবার পড়ে গেলে সেভাবে আবার উঠে আসা কঠিন। তবে একটা কথা এই প্রসঙ্গে স্বীকার করে নেওয়া যাক, সুব্রতর সাফল্য ক্লাব এবং জাতীয় ফুটবলে। মনোরঞ্জনের আন্তর্জাতিক সাফল্য তুলনায় বেশি। সুব্রতর জীবনে অবশ্য সুযোগও কম এসেছে। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সুব্রত বড় জোর ৬ বার ভারতের জার্সি গায়ে চাপিয়েছেন। সেক্ষেত্রে মনোরঞ্জন আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলেছেন সুব্রতর দ্বিগুণেরও বেশি।

মনোরঞ্জনের চেয়ে সুব্রত বছর চারেকের বড়। সুব্রত কলকাতা মাঠে প্রথম খেলেন '৬৯ সালে বালী প্রতিভায়। মোহনবাগানের জার্সি পরার সুযোগ পান '৭৪ সালে। সুব্রত যেবার মোহনবাগানে আসেন সেই বারই মনোরঞ্জন ময়দানে পা রাখেন পুলিসের হয়ে। '৭৭ সালে ইস্টবেঙ্গল টেনে নেয় তাঁকে।

দু'জনের ফুটবল জীবনের সবচেয়ে বড় মিল— বড় টিমের জার্সি গায়ে চাপানোর পর আর কখনও কোন প্রলোভনেই জার্সি-বদল করেননি।

ক্লাব ছাড়েন না কেন? এই প্রশ্নে সুব্রত জানালেন, "আমার মোহনবাগানি হয়ে ওঠার পিছনে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব অনেকখানি। ছোটবেলা থেকে দেখেছি শ্যামনগরের (সুব্রতর বাড়ি ওখানেই) 'হিরো' কেষ্ট পাল। কেষ্টদা মোহনবাগানে খেলতেন। আমাদের বাড়িতে যাতায়াতও ছিল। রেডিওতে কেষ্টদার নাম শুনে আর খবরের কাগজে কেষ্টদার ছবি দেখে ভাবতাম মোহনবাগানে খেলতে পারলে তবেই এইরকম সুখ্যাতি পাওয়া যায়। তিয়াত্তর সালে রেলের হয়ে সন্তোষ ট্রফিতে ভাল খেলেছিলাম বলে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল দু'দলই আমাকে খেলার জন্য ডেকেছিল। ইস্টবেঙ্গলকে তো 'হাঁ' বলেও দিয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ আমাদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন মান্নাদা আর চুনীদা। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি আমাকে মোহনবাগানে খেলানোর জন্য ওদের মত বিখ্যাত ফুটবলার আমাদের বাড়িতে পা রাখবেন। ওই সামান্য কটা মুহূর্ত গোটা জীবনটাকেই যেন পালটে দিল। মনটা এমন হয়ে গেল যে, ইস্টবেঙ্গলকে কথা দেওয়া সত্ত্বেও মোহনবাগানে যোগ দিলাম। তারপর সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, ক্লাবের বহু উত্থান-পতনের সঙ্গে একটু একটু করে জড়িয়ে গেলাম। একটা কথা বলি, অন্তত বিরাশি সাল পর্যন্ত প্রতিবারই ইস্টবেঙ্গল আমাকে দলবদলের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কখনো সেন্টিমেন্ট, কখনো বিশেষ কারো প্রভাবে ফিরিয়ে দিয়েছি ওদের। বহুবার, হাঁ বহুবার, আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে, কম সুযোগ-সুবিধা নিয়েও ক্লাবে থেকে গিয়েছি। '৭৮ সালে ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল সম্পাদক পরেশ সাহা ক্লাব বদল করার জন্য আমাকে প্রায় ডবল টাকার অফার দেন। এইরকম অবস্থাতেও ক্লাব ছেড়ে যেতে পারিনি। জানি না, এই আনুগত্যের কোন মূল্য মোহনবাগান ক্লাব দেবে কিনা। এখন তো আমার গায়ে স্ট্যাম্প মেরে দেওয়া হয়েছে— 'মোহনবাগানের ঘরের ছেলে'। তবে মিথ্যে বলব না, তিরাশিতে মহমেডানে চলে যাব বলে ঠিকই করে ফেলেছিলাম ক্লাবের কিছু লোকের ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে। মান্নাদার জন্য যাওয়া হয়নি।"

মনোরঞ্জন ক্লাব না ছাড়ার কারণ হিসাবে বললেন "উনআশি সালে মোহনবাগান আমাকে সই করানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। কথাবার্তা প্রায় পাকাও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জার্সিবদল আর হয়নি। আশিতে ইস্টবেঙ্গল টিম ভেঙে তছনছ হয়ে গিয়েছিল। আগের বছরের ফুল টিমের প্রায় সবাই দল ছাড়ে। মহমেডান আমাকে বিরাট অফার দিয়েছিল সেবার। মনে আছে, খুব দ্বিধাগ্রস্তভাবে বাবার কাছে সমস্যার কথা বলেছিলাম। বাবা সব শুনে শুধু বলেছিলেন— একটা বড় প্রতিষ্ঠানে ঝগড়া মনোমালিন্য থাকতেই পারে। কিন্তু সেইজন্য প্রতিষ্ঠানকে বিপদে ফেলে পালানোটা ঠিক নয়। যেখানে শুরু করেছো সেখানেই শেষ করার চেষ্টা কোরো। তুমি যদি মোহনবাগান বা মহামেডান থেকে শুরু করতে তাহলেও একই কথা বলতাম। বাবা মারা গেছেন কিন্তু তাঁর সেই কথাগুলো এমনভাবে মনে গেঁথে গেছে যে, ইস্টবেঙ্গল ছাড়ার কথা ভাবতেই পারি না। বোধহয় সেই কারণেই এখন কোন ক্লাব আমার কাছে তেমন জোরাল প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসে না।" এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি, ক্লাবকে অসাধারণ সার্ভিস দেবার কথা মনে রেখেই ইস্টবেঙ্গল প্রতি বছর ক্লাবের হায়েস্ট-পেড ফুটবলারের চেয়েও কিছু বেশি টাকা মনোরঞ্জনকে দেয়। মনোরঞ্জনের সম্মান। মোহনবাগান সুব্রতর সার্ভিস সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু আর্থিক নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে।

দীর্ঘ তের বছর মোহনবাগানের জন্য অনেক ঘাম ঝরিয়েছেন সুব্রত। দশ বছর একা ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণ দুর্গ আগলেছেন মনোরঞ্জন। ঝড়-ঝাপটা এসেছে জীবনে, এসেছে ক্ষোভ। তবু যখনই নেমেছেন মাঠে, দু'জনেই ক্লাবের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসায় উৎসর্গ করেছেন শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু, ক্লান্তিহীন, বলিষ্ঠ সংগ্রামে। বোধহয় তাই এখনও জল-ঝড়-রোদ মাথায় নেওয়া সমর্থক দর্শকের কাছে সুব্রত আর মনোরঞ্জন বিশ্বাস এবং নির্ভরতার দুটি নাম। ময়দানের দুই মনুমেন্ট।

পাঙ্ক ক্রিকেটার

পাঙ্ক মানেই নোংরা-ছেঁড়াখোড়া পোশাক, রঙচঙে মুখ বিচিত্র চুলের কায়দা, উত্তেজক-আদিম জীবন। গ্রেগ ম্যাথুজ মুখে রঙ মাখেন না, শতছিন্ন পোশাক পরেন না, পাঙ্কদের মতো উত্তেজক জীবন কাটান এমন কোনও প্রমাণও নেই। তবে ম্যাথুজ জামাকাপড় পরেন একটু অন্য ধরনের। কানে থাকে দুল, চোখে গাঢ় সানগ্লাস, চুলের স্টাইলটা একটু অদ্ভুত, কথাবার্তাতেও প্রকাশ পায় যাবতীয় কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা। সাতাশ বছর বয়সী এই অফ স্পিনার এ মুহূর্তে বিশ্বে সেরা কিনা তা তর্কযোগ্য। তবে কোনও সন্দেহ নেই পাঙ্ক ক্রিকেটার হিসাবে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

গ্রেগ ম্যাথুজ যেন সব ব্যাপারেই অন্যদের থেকে আলাদা। তিনদিন ধরে ফোন করে ওঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যাচ্ছিল না। এত ব্যস্ত। তারপর যেদিন ধরা গেল ম্যাথুজ নিজেই হোটেলে আমাদের ঘরে এসে উপস্থিত। শর্টস আর একটা গেঞ্জি গায়ে, পায়ে চপ্পল। মাঠে দেখলে মনে হয় লোকটা বেশ একটা রুক্ষ, বদমেজাজি চরিত্রের। সামনাসামনি একদমই তা মনে হল না। ভূরিভোজনের পর পানটান খেয়ে লোকে যেরকম মুড়ে থাকে সেরকম সাবলীল ভঙ্গিতে দিব্যি টেবিলের ওপর পা-টা ছড়িয়ে বসে পড়লেন। বললেন, "কি জিজ্ঞেস করার আছে তাড়াতাড়ি, আমায় আবার টিম মিটিং-য়ে যেতে হবে।"

'স্পোর্টওয়ার্ল্ডে'র মুদার পাথেরিয়া প্রথমেই পাঙ্ক ইমেজের কথাটা তুলল এবং ম্যাথুজ বললেন, "আমার মনে হয় এটা সম্পূর্ণভাবেই প্রেসের ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো। আমি তো

পাঙ্কদের মতো অদ্ভুত সব জামাকাপড় পরা, মুখে বা চুলে রং মাখা এসব কিছুই করি না। চুলটা ছোট রেখে আমি একটু পেছনে টেনে আঁচড়াই এই পর্যন্ত। আসলে মা বলতেন, চুল যদি ছোট রাখি তাহলে কম বয়েসে পেকে যাওয়া বা পড়ার সম্ভাবনা কম।"

অস্ট্রেলিয়ান টিমের আর কেউ কিন্তু আপনার মতো গাঢ় সানগ্লাস, ফুলস্লিভ শার্ট, কানে দুল পরে না। "হ্যাঁ, আমি একটু অন্যরকম ড্রেস করতে ভালবাসি। তার মানে এই নয় যে, পাঙ্কদের মতো সাজগোজ করি। কানে দুল পরি কারণ আমার মনে হয় এটা চোখের পক্ষে তৃপ্তিদায়ক। ভিজুয়্যাল একটা অ্যাপিল এর আছে। সানগ্লাসের কথা বলছেন— ওটা হচ্ছে রেব্যান সানগ্লাস। দুর্দান্ত জিনিসটা— আমার মনে হয় ওদের (রেব্যানের) ধারে কাছে কেউ নেই। চোখের পক্ষে এই সানগ্লাস খুব উপকারী। শুধু রোদ থেকেই বাঁচায় না, চোখের আশেপাশের চামড়াও ভাল রাখে। একই কারণে শার্টের সবকটা বোতাম বন্ধ রাখি। কারণ মাঠে রোদে হয় কি, গলার কাছে চামড়াটা একদম ঝলসে যায়। বর্ডার ছাড়া টিমের আর কেউ আমার মতো পুরোহাতা শার্ট পরে না। আমি পরি কারণ ফিল্ডিং-এর সময় দুমদাম এদিক-ওদিক ডাইভ দিতে হয়। অতীতে হাতা গুটিয়ে রাখায় বহুবার এমন হয়েছে কনুইতে সরাসরি লেগে কালসিটে পড়ে গেছে বা কেটে গেছে।"

ম্যাথুজ অস্ট্রেলিয়ান টিমে এসেছেন মাত্র আড়াই বছর। এরই মধ্যে কিন্তু রীতিমতো জাঁকিয়ে বসেছেন। তের টেস্ট (ভারতের সঙ্গে সিরিজ শুরু হবার আগের হিসেব) তিনটে সেঞ্চুরি, তিরিশের ওপর উইকেট হয়ে গেছে। ভারতকে হারিয়ে গত বছর ওয়ার্ল্ড সিরিজ ক্রিকেট জেতার পিছনে তাঁর ভূমিকাই সব থেকে বড় ছিল। ম্যাথুজ নিজেও স্বীকার করলেন, "সাফল্য যেন খুব তাড়াতাড়িই এসে গেল।" ববি সিম্পসনের কাছে ম্যাথুজ চিরকৃতজ্ঞ। ক্রিকেট জীবনের শুরু থেকে সিম্পসন ম্যাথুজের পাশে। দুঃসময়ের একমাত্র সুহৃদ।

ম্যাথুজ জানালেন, বড় ম্যাচের আগে নিজেকে মোটিভেট করতে বিশেষ প্রস্তুতি নেন। প্রস্তুতি বিভিন্নরকমের হয় এবং তা নির্ভর করে কি ম্যাচ এবং কে প্রতিপক্ষ তার ওপর। কখনও হয়তো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা মারেন ঝিমিয়ে পড়া স্নায়ুকে চাঙ্গা করে তুলতে; আবার কখনও 'মিডনাইট অয়েল' নামে একটি অস্ট্রেলিয়ান গ্রুপের গান শোনেন। এত সব এবং আরও অনেক-অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ম্যাথুজ দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেছেন, হঠাৎই আমাদের খেয়াল হল মোক্ষম একটা প্রশ্ন বাদ চলে গেছে। মুদার তীরবেগে ছুটল— আচ্ছা, আপনাকে কি কেউ কখনও বলেছে লরেল-হার্ডি ছবির লরেলের সঙ্গে আপনার অদ্ভুত সাদৃশ্য? লরেল? অভিনেতা? আমার সঙ্গে, সত্যি?" করিডোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ম্যাথুজ থমকে দাঁড়ালেন। দুষ্টুমিতে ভরা মুখ দেখে অবশ্য বোঝা গেল অভিনয় করছেন।

পুরোনো ক্লাবে

এবার দল বদলের আগে গৌতম সরকার ও প্রসূন ব্যানার্জি বারবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন মোহনবাগানে সই করবেন। ফেরত আসবেন পুরোনো ক্লাবে। মোহনবাগান কিন্তু একদমই আগ্রহ দেখায়নি। তাদের কার্যকরী কমিটি এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়, এখনকার গৌতম-প্রসূনকে টাকা দিয়ে টিমে ফেরানো অর্থহীন। ক্লাবের এই সিদ্ধান্তের কথা

জেনেও নিরস্ত হননি সত্তর দশকের ময়দান কাঁপানো দুই লিঙ্কম্যান। বলেছিলেন, "টাকা চাই না। অন্তত মোহনবাগানে থেকে রিটায়ার করার সম্মানটুকু ক্লাব আমাদের দিক।" এতেও রাজি হননি এখনকার মোহনবাগান কর্তারা। এক কর্তা এমন কথা বলেছিলেন, "এটা লেখার জন্য নয়। মোহনবাগান ক্লাবটা কি রিটায়ার করার জায়গা?" অভিমানী গৌতম এ বছর মোহনবাগানের একটি খেলাতেও (ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ বাদে) মাঠে আসেননি। প্রসূন কিন্তু এসেছেন। প্রায় সবকটি ম্যাচই দেখেছেন। খেলার পর আড্ডা দিতে টেন্টেও গেছেন প্রিয়বন্ধু সুব্রতর সঙ্গে। দিনের পর দিন মোহনবাগান মিডফিল্ডারদের ছন্নছাড়া ফুটবল দেখে বিরক্ত সমর্থকদের একাংশ প্রসূনকে ঘিরে দাবী জানিয়েছে, আগামী বছর ফিরতেই হবে। লিগে মোহনবাগানের শেষ খেলার পর একটি অভিনব দৃশ্য চোখে পড়ল।

এক ভদ্রলোক তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে এসেছিলেন সুব্রত ভট্টাচার্যর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য। এরা সুব্রতর অসম্ভব ফ্যান। কিন্তু কখনও কাছ থেকে দেখার সুযোগ পায়নি। বাচ্চা বাচ্চা দুটি ছেলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছে, পাশে দাঁড়ানো প্রসূনকে দেখিয়ে সুব্রত বললেন, "একে চেন, কে? আমাকে না। ওকে নমস্কার কর। ওই রকম ফুটবলার হতে হবে। বুঝেছ প্রসূন ব্যানার্জির মতো।"

রাশের ক্লাব বদল

আয়ান রাশ আপাতত দারুণভাবে খবরের মধ্যে। লিভারপুলের এই দুর্ধর্ষ স্ট্রাইকার জুভেন্টাসে যোগ দিচ্ছেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ক্লাব জুভেন্টাস কত লাখ টাকা দিয়ে তাঁকে কিনেছে তা এখনও পরিষ্কার নয়, তবে এটুকু পরিষ্কার এতদ্দ্বারা মারাত্মক হতে যাচ্ছে জুভেন্টাসের ফরোয়ার্ড লাইন। পাওলো রোসি, মাইকেল লড্রাপ, বিগনিউ বনিয়েকের পাশে আসছেন রাশ। এছাড়া ভয়ঙ্কর এইসব ফরোয়ার্ডদের বল যোগান দেওয়া মাঝেমধ্যে নিজেও দু-চারটে গোল করার জন্য মিশেল প্লাতিনি তো থাকছেন-ই।

গৌতম ভট্টাচার্য

এশিয়াটিক সোসাইটির বর্তমান

তেল ফুরিয়ে এলে একা পলতে আর কতক্ষণ ? নিজের জীবন দিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারে না, বরং প্রদীপের বুকই পোড়ায়। যা ছিল দৃষ্টিনন্দন আলোর শিখা তাই হয়েওঠে দাহ, অন্ধকারের চেয়েও অকাম্য। কারণ সে তখন আগুন, নিছকই আগুন। সে সর্বভুক, ভালো মন্দে নির্বিচার, তার মূল্যায়ন শেষ পর্যন্ত ভস্মসার মাত্র।
এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কিংবা এই জাতীয় অতীতের অতন্দ্র বাতিস্তম্ভের দিকে তাকালে আজ এই উপমাটিই মনে পড়ে।

বিপ্লব নয়, সর্বজনীন ও সচেতন আত্মত্যাগ তিতিক্ষার মধ্য দিয়েও নয়, বাধ্যতামূলক বঞ্চনার মধ্য দিয়েই এসেছিল আমাদের কুড়িয়ে পাওয়া স্বাধীনতা। এবং সেই সঙ্গে স্বাধীনতার অনুসঙ্গী সার্বিক রাজনীতি, ভোটবাহন গণতন্ত্র। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, দেশগঠনের রাজসূয় যজ্ঞে তার ফলকথা অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় এবং আজব লোককথায় পর্যবসিত হয়েছে। আদর্শের ইতো ভ্রষ্ট স্ততো নষ্টঃ হয়ে উঠেছে বাস্তবিক ঘটনা। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, স্বাধীনতার পর আমাদের আত্মবিস্মৃতি যত দ্রুত এসেছে তেমন আগে কখনো আসেনি। আমাদের নীরব সাধনক্ষেত্রগুলি, চৈতন্যোৎকর্ষের জ্ঞানপীঠগুলি অবহেলায় উপেক্ষিত এবং অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত হয়েছে। ক্ষমতা খ্যাতি আর কাঁচা পয়সার চটকে জলুষে নতুন দিন পবিত্র মূল্যবোধকে নষ্ট করে দিতে থাকল। ঠিক এই অবস্থায় এশিয়াটিক সোসাইটি এসে ঠেকেছিল ভাটার চড়ায়। সরকার বিমুখ, দাক্ষিণ্যের বহতা স্রোত ধীরে ধীরে মজে এল। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে লগি ঠেলার মত কান্ডারী বিরল। ভান্ডার অর্থহীন। গবেষণা ও প্রকাশনা প্রায় বন্ধ। ছাদ আর মাথা বাঁচানোর আশ্রয় নয়, জীর্ণ ভবনের সংস্কার হয় না, স্থানাভাবে দুর্লভ সংগ্রহগুলি দুর্ভার বোঝা। পুঁথি-পাণ্ডুলিপির পথে বিবর্জিত অবস্থা। সন্নিবেশ বিন্যাস বিপর্যস্ত, সংরক্ষণে শৈথিল্য। অনিয়মিত অকুলান বেতনে কর্মীদের মধ্যেও অসন্তোষ আর বিশৃঙ্খলা। বহুকালান্তকারী প্রতিষ্ঠানের ভেতরে বাইরে জমতে শুরু করেছে অবাচীন সময়ের ধুলো।

এশিয়াটিক সোসাইটির বর্তমান এখন ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে ঝুলে রয়েছে

নবনির্মিত ভবনটি যতই সপ্রতিভ ভঙ্গিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকুক না কেন ১৮০৮ সালে স্থাপিত পার্শ্ববর্তী আদি ভবনটির দশা কর্ণের রথের মত। একতলাটা মাটির নিচে কয়েক ইঞ্চি বসে গেছে, রুদ্ধশ্বাস ঘরগুলো অস্বাস্থ্য ও অস্বস্তিকর। বিমে মরচে, ছাদ ধসের মুখোমুখি, পলস্তারাছুট দেওয়াল বিবর্ণ। ১৯৭৮ ও ১৯৮১-র বন্যার জল ঢুকেছিল নিচের ঘরে, বেনো জলে বেশ কিছু মূল্যবান বই খেয়ে দিয়েছে। সোসাইটির আর্ট গ্যালারি নেই, ফলে প্রায় আটষট্টি জন বিশ্বশ্রুত শিল্পীর অয়েল পেন্টিং গুদামজাত হয়ে পড়ে আছে। এ ছাড়া লাখ খানেক বই-পত্র এবং তার কাছাকাছি সংখ্যক মনোগ্রাফ একতলায় কফিন-বন্দী। অন্যান্য দুর্লভ পুঁথি ইত্যাদিও যথাযথভাবে রাখা যায়নি। অথচ বাড়িটি খালি করতে না পারলে মেরামতিও সম্ভব নয়। এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার বর্গ ফুট জায়গা প্রয়োজন যে প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু সুসমঞ্জসভাবে চলার জন্যে তার বদলে নতুন পুরনো বাড়ি মিলিয়ে সাকুল্যে চুয়াল্লিশ হাজার বর্গ ফুট জায়গা এখন। ফলে নতুন বাড়িতেও পার্টিশন তুলে খুপরি খুপরি ঘরে কাজ চালানো হচ্ছে। তবে আশার কথা ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসে পনের একরের মত জায়গা রাজ্য সরকার এশিয়াটিক সোসাইটিকে দিতে চেয়েছেন। মূল গবেষণা কেন্দ্রটি এখানেই স্থাপিত হবার কথা ভাবা হচ্ছে। সেই সঙ্গে তৈরি হবে গবেষকদের জন্যে হস্টেল। অফিসের কাজকর্ম চলবে পুরনো বাড়িতে।

পার্লামেন্টের স্বীকৃতি অনুযায়ী এশিয়াটিক সোসাইটি বর্তমানে একটি স্বাধীন স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এর সর্বোচ্চ অধিকারিক কাউন্সিল এবং তার দুই সহযোগী সংস্থা ফিনান্স কমিটি ও প্ল্যানিংবোর্ড সম্মিলিতভাবে এর যাবতীয় কার্যভার বহন ও নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক আনুকূল্যের জন্যে ছাড়া তার সরকার মুখাপেক্ষী হবার কোন কারণ নেই। তবু এই দশকের গোড়ায় প্রায় অচলায়তন এই প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে তুলে দেবার চেষ্টা হয়েছিল একবার। এ রাজ্যের বিদ্যাজীবী বুদ্ধিজীবীরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এই হস্তান্তরকরণের। অবশ্য কেন্দ্র এটিকে অধিগ্রহণ করেননি। বরং তাঁরা এমন একটি ঐতিহ্যবাহী ঐতিহাসিক সংস্থার জাতীয় গুরুত্ব নতুন করে উপলব্ধি করেছেন। দ্বিশতবার্ষিক জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির শুভদৃষ্টি পড়ায় এবং স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী একে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় এশিয়াটিক সোসাইটির সৌভাগ্য ফিরতে যাচ্ছে এমন মনে হয়েছিল। কারণ সপ্তম যোজনা প্রকল্পে কেন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানের জন্য ৩·৭ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন এ কথাও কারো অজ্ঞাত নয়।
বলা বাহুল্য ১৯৮৪ সাল থেকেই নতুন উদ্যমে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। অ্যাকাডেমিক দিকটি তড়িঘড়ি সক্রিয় করে তুলতে নতুন কিছু পরিকল্পনা কার্যকর করা হচ্ছিল মে মাস থেকে। বিদায়ী কাউন্সিলের প্রস্তাবিত প্যানেল নির্বাচনে জয়ী হবার পর ডঃ সুকুমার সেন সোসাইটির বর্তমান সভাপতি এবং জগন্নাথ চক্রবর্তী সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। এই গবেষণা-কেন্দ্রে এই প্রথম

পঠনপাঠনের ধারা চালু করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁদে এর রূপায়ণ শুরু করার পিছনে সরকারী প্রতিশ্রুতির আভাস ছিল সন্দেহ নেই। কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস ছিল অবিলম্বেই তুল্যমূল্যের স্বীকৃতি ও ডিগ্রি ডিপ্লোমা দেবার অধিকার তাঁরা পেয়ে যাবেন। এই ব্যাপারে তাঁরা যথাস্থানে আলাপ আলোচনাও চালাচ্ছিলেন. যেমন,কাজেও থেমে ছিলেন না। ম্যানুসক্রিপ্টোলজি ও ইস্টার্ন স্টাডিজ দুটি দ্বিবার্ষিক এমফিল কোর্স খোলা হয়েছে '৮৫ সালের জুলাই থেকে। পনের জন ছাত্র এই কোর্স পড়ছে, তার মধ্যে কিউবা, থাইল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার ছেলেমেয়েও আছে। সেই সঙ্গে নতুন আটটি শিক্ষাকেন্দ্র এবং চারটি শিক্ষণ প্রকল্পও সচল। এর জন্য বেশ কিছু কৃতবিদ্য ও খ্যাতকীর্তি ব্যক্তিকে অধ্যাপক পদে নিয়োগপত্রও দেওয়া হয়ে গেছে।

বিপর্যয় এল এরকম এক নাটকীয় মুহূর্তে। কেন্দ্রীয় সরকারের জরুরি নির্দেশ এসে পৌঁছলো অপ্রত্যাশিত এবং অপ্রস্তুত অবস্থায়। এই গবেষণা-কেন্দ্রটিকে পঠন-পাঠনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা চলবে না। কোর্সগুলো অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। সম্ভবত এখানকার বিভিন্ন সূত্র থেকে নানাবিধ অরাজকতার অভিযোগ কেন্দ্রের কানে পৌঁছেছে। কারণ রাজনীতি, স্বজনপোষণ, স্বেচ্ছাচার ইত্যাকার নানা দুর্নীতির প্রশ্ন উঠেছে এই প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনের বিরুদ্ধে। চুরি তছরূপের অভিযোগ আছে, আছে বেআইনিভাবে বাড়ি ভাড়া ও লীজ দেওয়ার ব্যাপারেও। তার ওপরে স্বর্ণমুদ্রা খোয়া যাবার রহস্যময় ব্যাপারটিও পরিস্থিতিকে ঘোরালো করে তুলেছে।

সব মিলিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটির ভবিষ্যৎ এখন ভাবনার বাইরে যখন বর্তমানই ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে ঝুলে রয়েছে।

সাহিত্য পুরস্কার

সুদূর সুইডেনে কিছু বঙ্গ সাহিত্য প্রেমী পাঁচ বছর ধরে একটি সাইক্লোস্টাইল বাংলা পত্রিকা নিয়মিত বের করে চলেছেন। এই সূত্রে তাঁরা পূর্ব পশ্চিম দুই বাংলার সঙ্গেই সাহিত্যিক যোগসূত্রটি নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করে আসছেন। এই উপলক্ষে প্রতি বছর তাঁরা প্রকাশিত রচনার ভিত্তিতে পুরস্কার দিয়ে থাকেন। তাঁদের প্রতিনিধি কলকাতায় এসে

উদয়ন ঘোষ

পুরস্কার বিতরণী উৎসব করে যান এক বছর দু বছর অন্তর।

এবারও এই পুরস্কার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল গত ৩১ আগস্ট মহাবোধি সোসাইটি হলে। সভার সভানেত্রী এবং প্রধান অতিথি হয়েছিলেন যথাক্রমে কবিতা সিংহ ও কৃষ্ণ ধর। উত্তরপ্রবাসীর বাৎসরিক পুরস্কার পেলেন গল্প ও প্রবন্ধকার উদয়ন ঘোষ। আর পঞ্চবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশেষ পুরস্কারটি দেওয়া হল বাংলাদেশের গল্প লেখক আবুল হাসানতকে। এছাড়া কবি দেবী রায় ও সোফিওর রহমানকে কবি স্বীকৃতি ও মানপত্রে সম্মানিত করা হল। পত্রিকা সম্পাদক গজেন্দ্রকুমার ঘোষ স্ক্যান্ডিনেভিয়ার বাঙালীদের সাংস্কৃতিক জীবন ও বঙ্গ সংস্কৃতির চর্চা বিষয়ে আলোচনা করেন। শিল্পী ঋষিণ মিত্র সম্মানিত দুই কবির আধুনিক কবিতার গীতিরূপ গেয়ে শোনান। লিটল ম্যাগাজিন সমূহের লেখক সম্পাদক ও সংস্কৃতিপ্রেমীর সমাবেশে এই ঘরোয়া অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়েছিল।

স্মৃত বিস্মৃত

ইতিহাস কখনো কখনো আবার ইতিহাসের তলায়ই চাপা পড়ে যায়। কোন কোন ইতিহাস গ্রন্থও ইতিহাস তার নিজেরই প্রতিধ্বনি করে থাকে, একথাও মিথ্যে নয়। একটি ইতিবৃত্ত গ্রন্থের ক্ষেত্রে সেই সত্যই আবার প্রমাণ হয়ে গেল। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত নদীয়া-কাহিনীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল দুবছরের মধ্যেই কিন্তু তারপর প্রায় পঁচাত্তর বছরের নীরবতা। ইতিমধ্যে অনেক জল গড়িয়ে গেছে মানুষের জীবনের ওপর দিয়ে। ঘটে গেছে এই গ্রন্থের রচয়িতার জীবনাবসান। বিশ বছর বয়সে তিনি বহু শ্রমসাধ্য ক্লেশসাধ্য অন্বেষণ ও পর্যটনের মাধ্যমে, অনেক অর্থ ও সময় ব্যয় করে অবিভক্ত নদীয়া জেলার যে দুর্লভ তথ্য ও সমাজচিত্র সংগ্রহ করেছিলেন তা বিস্ময়কর এক একক প্রচেষ্টা। দেশবাসীর সমূহ সহযোগিতা তিনি পাননি, হয়তো কেউ কেউ নিছক পাগলামিই মনে করেছিলেন। গুণগ্রাহীরা সেদিন এগিয়ে আসেননি। শুধু গ্রন্থ রচনা নয়, গ্রন্থ প্রকাশের দায়ও বহন করতে হয়েছিল সেদিন লেখককেই। আত্ম জিজ্ঞাসা ও স্বদেশপ্রীতি সম্বল করে এই ভগ্নস্বাস্থ্য অদম্য মানুষটি বলতে গেলে অসাধ্য সাধনই করেছিলেন। উনিশ শতকের শেষ পর্বে আঞ্চলিক, বিশেষ করে জেলা ভিত্তিক ইতিহাস রচনার একটা উদ্দীপনা এসেছিল এই বাংলা দেশে। যার ফলে বিভিন্ন ইতিহাস অন্বেষীর একাগ্র উদ্যোগে রচিত হয়েছিল বিক্রমপুর, মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, হুগলী প্রভৃতি জেলার ইতিবৃত্ত।

কুমুদনাথের সুরচিত ইতিহাসের প্রাথমিক এই খসড়ার মধ্যে কিছু অপূর্ণতা এবং অসংগতি থেকে গিয়েছিল অবশ্যই। কালের পালা বদলের সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুক্তি আরও বেড়েছে কারণ ইতিহাস থেমে থাকেনি, ঘটনায় অনুঘটনায় আরও বেড়েছে। পলিমাটির মত এই

কুমুদনাথ রায়

ভূখণ্ডের ওপর আরও কালপ্রবাহের স্তর জমেছে। কিন্তু কাঠামোটি মজবুত, সংস্কার ও সংযোজনযোগ্যই থেকে গেছে। ১৩১৭ সালে ২০+৪০০ পৃষ্ঠার সচিত্র বইটি (দাম ২ টাকা ১২ আনা) প্রকাশের পরেই কিন্তু জ্ঞানীগুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পত্রপত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল।

ত্রয়োদশ শতকের সূচনায় যে নবদ্বীপে হিন্দু রাজত্বের শেষ শয্যা রচিত হয়েছিল, আবার পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে সেই শ্মশান ভূমিতেই নব জাগরণের ভগীরথ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটেছিল। এই শাস্ত্রচর্চার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভারতচন্দ্রের দরবারী কাব্যচর্চার মহিমা। পরবর্তী কালে প্রমথ চৌধুরীর কলম। নীল বিদ্রোহ যে এই নদীয়াকে নীল-নদীয়ারূপে চিহ্নিত করে গিয়েছিল একদিন, ইতিহাস সেকথাও ভোলেনি।

পঁচাত্তর বছর পরে এই নদীয়া-কাহিনী আবার মোহিত রায়ের সম্পাদনায় পরিমার্জিত-বর্জিত-সংযোজিত হয়ে নবকলেবরে প্রকাশ পেল। রানাঘাট রবীন্দ্রভবনে গত ৭ সেপ্টেম্বর এই গ্রন্থের উন্মোচন করেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। এই উৎসাহী অন্তরঙ্গ জনসভায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুধীর চক্রবর্তী. স্বপন বসু, বরুণ চক্রবর্তী প্রমুখ।

স্মরণ সভা : কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৬৭তম জন্মদিবস পালিত হল কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট প্রেক্ষাগৃহে (২ সেপ্টেম্বর '৮৬)। বিভিন্ন বক্তা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, যে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন আশাবাদী কবি। স্লোগান হয়েছিল তাঁর কবিতা। যদিও তাঁর কবিতায় রাজনীতি ছিল কিন্তু তাতে ছিল না স্লোগানের যান্ত্রিক সোচ্চার। তাঁর নির্ঘোষ আজকের বিষাক্ত আবহাওয়ায় আরও বেশী প্রয়োজন। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষ, সুব্রত রুদ্র প্রমুখ কবিরা স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

এই উপলক্ষে তিনটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। 'কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মরণে', 'বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রন্থিত একশো কবিতা' এবং 'ছড়ায় ছড়ায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'।

এ বছরের জন্য 'বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুরস্কার' পেলেন কবি মণিভূষণ ভট্টাচার্য তাঁর 'নির্বাচিত কবিতা' গ্রন্থের জন্য। কবি অরুণ মিত্র এই পুরস্কার (এক হাজার টাকা) এবং মানপত্র প্রদান করেন।

দেশ

মানুষের পাশাপাশি

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

অশ্বশক্তি, মানুষের ঘোর অশ্বশক্তি প্রবণতা
লোভ, অধীরতা লক্ষ্য করে
সুঠাম ঘোড়ার দল ইয়োরোপ ছেড়ে চলে গেল,
রূপবান ছবির ক্যানভাসে
কেশর, খুরের চিহ্ন পড়ে আছে দেখ।

শুনি চীনদেশে পাখি নেই।
ওরা যে ডাকাত ছিল, বলে কাকাতুয়া,
ওদের বিলোপ ছিল বিষম জরুরি, জেনে রাখো।
প্রয়োজন বুঝেছেন অন্তর বোঝেননি সাম্যবাদী, তাই
গাছেরা নিঃসঙ্গ চীনে, মেঘেরা অনাথ।
নাকি এতদিনে
আলাস্কার সাইবেরিয়ার
নীলাভ ধূসর টীল
মানুষের পাশাপাশি বাসযোগ্যতার কথা ভেবে, ক্ষমা করে
ফিরেছে আবার?
ভয়ে-ভয়ে দেখে গেছে চীনাজল?
আমি যে পাখির চোখে সন্ত্রাস দেখেছি বহুবার।

কেবল আমরা এই পৃথিবী ভোগের অধিকারী—
এই তত্ত্ব প্রচার করেছে কিছু দুর্জ্ঞেয় মানুষ
সাম্য ও বৈষম্যবাদী, উভয়ত।
মানুষের দেহে ক্রমে জমেছে হলুদ মেদ, কত
শ্রমসংক্ষেপের ছালি। সংহার-সংবৃত নশ্বরতা।
যোদ্ধার সন্ততি শুধু প্রতিযোগী, দেখ
লেবরেটরির কাচে অনুর্বর চোখ পেতে আছে। অপেক্ষায়।

এই পৃথিবীর শস্য
মাছ তেল অ্যালকোহল লোভী ও অধীর
পুরুষ-রমণী মিলে একদিন নিঃশেষে সাবাড় করে দেবে, মনে হয়,
রেখে যাবে তাদের জেরক্স-কপি, যাদুঘর।
তারপর
পুরুষের দিকে ফিরে তাকাবে পুরুষ
রমণীর দিকে ফিরে তাকাবে রমণী
সে যে সমবেদনায় নয়, মমতায় নয়, আজ বোঝাতে পারি না।

আতরের দিন

শান্তি সিংহ

ছুঁয়ে থাকে অনুতাপ
কোমল বিষাদ
পরিচ্ছন্ন স্মৃতি
নাড়ে রঙিন রুমাল

এই বুঝি আতরের দিন!

জীবন মন্থিত ক'রে

শান্তিকুমার ঘোষ

জীবন মন্থিত ক'রে দুলছে সমুদ্র
কিনার ধ'রে হেঁটে চলেছে নায়ক
যতদূর প্রাণ চায়
মলিন হবার আগে শেষবার জ্ব'লে উঠলো
পশ্চিম প্রান্ত
যেন সব দাহ জুড়নো যায় জলে

আবার শুরু হ'তে পারে রঙের খেলা
অতিবেগুনীর রশ্মিতে চিনে-নেওয়া নিজেকে
হে নীলোর্মিবাহিত নৌকা আরোহীবিহীন,
সতত স্বপ্নহারা ঘুম ভেঙে পড়ছে ফেনা-ফুলে
আছে কত কামনার সমাধি, শত রঙ্গের সাক্ষী—
অপেক্ষমান দীর্ঘ বেলাভূমি;
তুলে নাও পান্থজনকে উদাস সহিষ্ণু তব
অনন্ত সলিলে

নুন

জয় গোস্বামী

আমরা তো অল্পে খুশি; কী হবে দুঃখ ক'রে?
আমাদের দিন চলে যায় সাধারণ ভাতকাপড়ে

চলে যায় দিন আমাদের অসুখে, ধারদেনাতে
রাত্তিরে দুভাই মিলে টান দিই গঞ্জিকাতে

সবদিন হয় না বাজার; হলে, হয় মাত্রাছাড়া
বাড়িতে ফেরার পথে কিনে আনি গোলাপচারা

কিন্তু, পুঁতবো কোথায়? ফুল কি হবেই তাতে?
সে অনেক পরের কথা। টান দিই গঞ্জিকাতে

আমরা তো এতেই খুশি, বলো আর অধিক কে চায়?
হেসে খেলে, কষ্ট করে, আমাদের দিন চলে যায়

মাঝে মাঝে চলেও না দিন, বাড়ি ফিরি দুপুররাতে
খেতে বসে রাগ চ'ড়ে যায়, নুন নেই ঠাণ্ডা ভাতে

রাগ চড়ে মাথায় আমার, আমি তার মাথায় চড়ি
বাপব্যাটা দুভাই মিলে সারা পাড়া মাথায় করি

করি তো কার তাতে কী? আমরা তো সামান্য লোক
আমাদের শুকনো ভাতে লবণের ব্যবস্থা হোক॥

আপনজনের জন্যে
অমূল্য উপহার!
MOTI
LUXURY BATH SOAP
MOTI
মোতি গিফ্‌ট প্যাক
তিনটি বিভিন্ন সুরভিতে, বড়, গোল বিলাসময় সাবান!
গোলাপের সমৃদ্ধ রাজকীয় সুগন্ধ, খশের বিশুদ্ধ
প্রাকৃতিক সুবাস, আর স্যাণ্ডেলের মৃদু মনোরম
চন্দন-সুরভি! এই তিন রংয়ের সমন্বয় —
অপূর্ব সুন্দর মোতি গিফ্‌ট প্যাক!
দিয়ে যেমন আনন্দ, নিয়েও তেমনি!
MOTI
মোতি
বড়, গোল, বিলাসময় সাবান
CLARION BT 20244 BEN

াটার তৈরী

কাঠের উপরে সেই রস মাখিয়ে দিই ।

বাস, কাঠ কাটা তখন আর শক্ত নয় ।

আগামী সপ্তাহে : নতুন গল্প
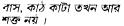
দুনিয়ার ৩০টিরও বেশি দেশ একবাক্যে স্বীকার করবে যে একমাত্র ডুলাক্স অ্যাক্রাইলিক ইমালশনেই পাবেন এতসব গুণের সমাবেশ···
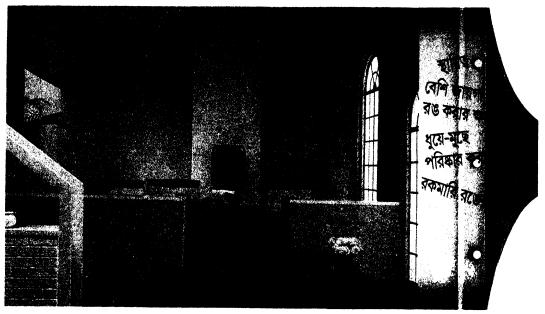
উপরন্তু পাবেন···

ডুলাক্স ফিনিশের অপরূপ জেল্লা

একমাত্র ডুলাক্সের বিশ্বজোড়া 'যুগান্তকারী' পেন্ট টেকনোলজির দৌলতেই আপনি পাচ্ছেন ডুলাক্স অ্যাক্রাইলিক ইমালশনের মতো একটি চমৎকার ওয়াল ফিনিশ। এতে আপনার পয়সা খরচ সত্যিই সার্থক। কারণ প্রতি লিটারে অনেক বেশি জায়গা জুড়ে রঙ করতে পারবেন, রকমারি রঙ থেকে পছন্দসই রঙটি বেছে নিতেও পারবেন। উপরন্তু, ময়লা ধরলে জল দিয়ে ধুয়ে নিলেই আবার নতুনের মতোই জেল্লা দেবে।

দেখতে কেমন হবে? একবার লাগিয়ে দেখুন, চোখ জুড়িয়ে যাবে। কোনো অ্যাক্রাইলিক ইমালশনে ঘরের চেহারা যে এমন খোলতাই হতে পারে—এ আপনি চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে চাইবেন না! কিন্তু এই-ই হল ডুলাক্স অ্যাক্রাইলিক ইমালশনের যাদু। অন্য কিছু এর ধারে-কাছেও আসতে পারে না।

IEL Limited

চলচ্চিত্র

ভালো ছবি, মন্দ ছবি এবং ছবির বাজার

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

১৯৮২ সালের শেষ দিকটায় ছবির সূত্রে আমন্ত্রিত হয়ে পশ্চিম জার্মানীর বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল কিছুটা সময়। মিউনিখে এসে আলাপ হলো ফোলকার স্লোয়েনদর্ফের সঙ্গে। স্লোয়েনদর্ফ জার্মান সিনেমার প্রতিভাবান নবীন পরিচালকদের মধ্যে অন্যতম একজন। গুন্টার গ্রাস-এর বিখ্যাত উপন্যাস 'টিন ড্রাম' অবলম্বনে তাঁর ঐ নামেরই ছবিটি সেই সময় স্লোয়েনদর্ফকে রাতারাতি অসম্ভব খ্যাতি এনে দিয়েছিল। কারণটা ছিল কান চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটির 'গোল্ডেন পাম' বা শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার প্রাপ্তি। একটি রেস্তোরাঁয় বসে আলাপ হলো। সঙ্গে আরো কয়েকজন তরুণ জার্মান চিত্র পরিচালক ছিলেন, মনে পড়ছে তাঁদের মধ্যে একজন রাইনহার্ড হাউফ। হাউফের সঙ্গে পরিচয় ছিল আগেই। ওর অনেক ছবিই কলকাতার ফিল্ম ক্লাবগুলো দেখিয়েছে এবং ওর শেষ ছবি 'স্ট্যামহাইম' এ বছর বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে 'গোল্ডেন বিয়ার' পেয়েছে। স্লোয়েনদর্ফ অত্যন্ত হাসিখুশি আমুদে মানুষ আর আমরা একই বয়সের মানুষ বলে আলাপ দ্রুত বন্ধুত্বের স্তরে নেমে এলো। ঠিক হয়ে গেল পরদিন সন্ধ্যায় আমরা স্লোয়েনদর্ফের বাড়িতে রাত্রির খাওয়াদাওয়া সারব। তার আগে সন্ধ্যায় দেখবো ওর নতুন ছবি 'ডি ফোলসুঙ্গ'। পরদিন সকালেই হোটেলে টিকিট পৌঁছে দিল ও। কুর্কমান স্ট্রাসের ওপর সেই থিয়েটারটিতে ছিল তিনটি প্রেক্ষাগৃহ। নির্দিষ্ট হলটিতে ঢুকে মনে হল ভুল করেছি। প্রথমত হলটি ছোট, তার ওপর দর্শক সংখ্যা কুড়ি থেকে পঁচিশজনের বেশী হবে না। অনেকটা দূরে আর একজন দর্শক বসেছিলেন। জিজ্ঞাসা করে নিশ্চিত হলাম যে ভুল হয় নি। স্লোয়েনদর্ফের ছবির জন্য নির্দিষ্ট হল এটাই। প্রথমে অবাক হয়েছিলাম। জার্মান সিনেমার অন্যতম পীঠস্থান মিউনিখ। অধিকাংশ চিত্রপরিচালকেরাই এ শহরে থাকতে ভালবাসেন। অথচ ভালো ছবির জন্য দর্শক এতো কম! ছবিটি সেই সময় আরো কোন হলেও চলছিল না। রাত্রিবেলা স্লোয়েনদর্ফকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম এই হাল প্রায় সব নতুন জার্মান চিত্রপরিচালকদের। দর্শকরা যদি এ ধরনের ছবির মোট বিনিয়োগের দশ/বারো শতাংশও এনে দেয় তাহলেই এরা খুশী। আর আঠারো ভাগ হলে তো ধুন্দুমার কাণ্ড, বুঝে নিতে হবে ছবি

সুপার হিট হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম যদি খোদ মিউনিখেই এই হয় তবে মফস্বল শহরগুলোর কি অবস্থা। স্লোয়েনদর্ফ চটপট উত্তর দিলো আরো খারাপ। গোটা পশ্চিম জার্মানি জুড়ে যে ছবিগুলো চলে বাণিজ্যিকভাবে রমরমিয়ে সেগুলোর প্রায় সিংহভাগ হলো হাল আমলের হলিউড-এ মেড-ইন-আমেরিকার তৈরী নিম্ন মানের আমেরিকান ছবি। পশ্চিম জার্মানীতে এসে এইসব আমেরিকান ছবিগুলো জার্মান নাম নিয়ে নেয় আর ছবির পাত্রপাত্রীরা গড়গড় করে জার্মান বলতে শুরু করে দেয় মাত্র। আর হলিউডের সেই সব ছবির অনুপ্রেরণায় আছেন জার্মান মার্ক-এ তৈরী হয় শুধুই চাকচিক্যময়, শুধুই বাণিজ্যিক স্বার্থে তৈরী আরো কিছু খারাপ জার্মান সিনেমা। এসবেরই মধ্যে স্লোয়েনদর্ফ, ওর বৌ-সমান নামী চিত্রপরিচালিকা মার্গারেট ফন ট্রটা, ভিম ভেন্ডার্স, ভেরনার হারজগ, রাইনহার্ড হাউফ প্রভৃতিরা ছবি তৈরীর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে মূলত জার্মানীর বিভিন্ন স্টেটের অনুদান, টেলিভিসন আর বিদেশের বাজারের ভরসায়। সব ব্যাপারটা যে খুব সহজ আর অনায়াসে হচ্ছে তা নয়। দুর্ভাবনার ছায়া তাৎক্ষণিক ভাবে হলেও মাঝে মধ্যেই কপালের চামড়াকে দিচ্ছে আরো একটু কুঁচকে, চোখের দৃষ্টিকে করে তুলছে প্রশ্নময়। কম-বেশী ইউরোপের প্রায় সব দেশেই অবস্থাটা এক রকম। আর আমেরিকান ইন্ডিপেনডেন্ট ফিল্ম মেকারদের অবস্থা তো আরো একটু বেশী সঙ্গীন। স্লোয়েনদর্ফকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অনেক দর্শকের কাছে পৌঁছতে চাও না? উত্তর না দিয়ে ও হেসে আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল, তোমরা চাও না? কিন্তু কতজন দর্শক দেখে তোমাদের ছবি?

সেদিন উত্তর না দিয়ে অন্য কথায় চলে গিয়েছিলাম। কেন না জানতাম, উত্তরটা এদেশে আমি বা আমার মত অনেকেরই জানা যাঁরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেকে কম বেশী সফল বা ব্যর্থতার মুখ দেখে অন্য ভাবে ছবি করার কাজটা চালিয়ে যেতে চাইছেন। কিন্তু উত্তরটা জানলেই সব সময় অঙ্কটা কষে ফেলা যায় না বা উত্তরটা জেনে অনেকসময়ই সেই সিঁড়ি-ভাঙার অঙ্কটা কষতে মন চায় না। অনেকেরই আমি বা আমার মত অনেকেই চান তাঁদের ছবির একেবারে প্রান্ত শহর-মফস্বল-গ্রামের (যে সব গ্রামে সিনেমা হল আছে) হলগুলোতে দিনের-পর-দিন মাসের-পর-মাস প্রতিটি শো-এর হাউস-ফুল বোর্ড টাঙিয়ে চলতেই থাকুক আর হা-পিত্যেশ করা দর্শক বার বার ফিরে গিয়ে ফিরে ফিরে আসুক। কিন্তু চাইলেই কি আর সব হয়! মাঝে মধ্যেই ছবি দেখে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন—ইচ্ছে হয় না সবার ভালো লাগার মত ছবি তৈরী করতে? অথবা, কোন দর্শকের কথা ভেবে এসব ছবি তৈরী? বা, কেন আপনাদের ছবি মানি-মেকিং মেশিন হতে পারে না যেমন অনেক ছবিই পারে? একজন কবি, সাহিত্যিক, ছবি আঁকিয়ে, ভাস্কর বা গায়ক এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে এড়িয়ে যেতে পারেন প্রশ্নকর্তাকে, কিংবা বিরক্ত হয়ে সরাসরি বলে দিতে পারেন যে আমি যে ভাবে চাই সেভাবেই লিখি, আঁকি, গাই। ভালো লাগলে ভালো, না ভালো লাগলে উল্টো পথে হেঁটে জনমনরঞ্জন করার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু একজন চিত্রপরিচালকের বড় দায়। তিনি এ ভাবে বলতে পারেন না কোন যুক্তিতেই। কেন না নির্মিত ছবিটির আর্থিক দায়ভার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁকে বহন করতেই হয়। যে ভাবেই হোক অন্তত ছবিতে বিনিয়োগের টাকাটাও সুদে-আসলে ফেরত না আনতে পারলে পরের ছবির জন্য আকাশের দিকে মুখ তুলে বসে থাকতে হতে

'আক্কিগলি' ছবির একটি দৃশ্য গ্রহণে নায়িকা দীপ্তি নাভাল

পারে বছরের পর বছর। একটা মজার গল্প এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে—গল্পটা আমি শুনেছিলুম বেশ কিছু বছর আগে এবং তারপর গল্পটা আমি বলেছি অনেককেই। তখনো 'পথের পাঁচালি' তৈরী করার কাজ হাতে-কলমে শুরু করেননি সত্যজিৎ রায়। টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়ায় প্রায় মাঝে মাঝেই আসেন—ছবির শুটিং দেখেন বিভিন্ন ফ্লোরে। একদিন একটি ফ্লোরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে পরিচিত একজনকে দেখে জিজ্ঞাসা করেন, এখানে কি ছবি হচ্ছে? উত্তর আসে, হাসির ছবি। অনেকটা নিজের মনেই সত্যজিৎ বলে ওঠেন, এখানে তো সবই হাসির ছবি! অনেক দুঃখেই কথাটা সেদিন তাঁর মুখ ফস্কে বেরিয়ে এসেছিল সন্দেহ নেই। কিছুকাল পরে যখন তিনি 'পথের পাঁচালি' তৈরী করেছিলেন তখন নিশ্চয়ই তিনি জানতেন সে সময়ে কোন ধরনের ছবির বাজার আছে, কি কি ছবি বা কি জাতের ছবি দর্শক সে পর্যন্ত নিয়েছে বা জানতেন টাকা রোজগারের ধান্দার ছবি তিনি তৈরী করছেন না। তাঁর পরবর্তী বেশ কিছু ছবি 'পথের পাঁচালি'কে ছাপিয়ে গেছে, কিন্তু তখনো তিনি জানতেন তাঁর ছবির মূল দর্শক কারা, প্রযোজককে মুনাফার বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না, তাঁর ছবি! অথচ কি অসম্ভব প্রয়োজন ছিল সে সময় 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র মত ছবির। সে সময়ে খুব একটা চলেনি ছবিটি। অথচ কুড়ি বছর পরে সেই ছবিটিকে তাঁর অন্যতম সেরা ছবি হিসেবে চিহ্নিত করতে দেশে-বিদেশে দর্শকের অভাব হয় নি অথবা শুধুই আর্কাইভের অন্ধকারে ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি সেই ছবি। প্রায় একই কথা বলা যায় ঋত্বিক ঘটক এবং ভারতবর্ষের আরো কয়েকজন পরিচালকদের ছবি সম্পর্কে। সব ছবিই 'পথের পাঁচালি'র মত ইতিহাস তৈরী করে না, করার ক্ষমতাও থাকে না। আর আপাত ভালো ছবির তৈরীর চেষ্টার মোড়ক খুলে ফেললে কখনো সখনো কোন কোন তথাকথিত নতুন রীতির পরিচালকদের কাছে ভান-সর্বস্বতা, অর্ধপাচা বা অজীর্ণ শিক্ষা, ছবি নির্মাণের প্রাথমিক জ্ঞান গরিমার অভাব—এসব যে ঝোলা থেকে বেড়ালের মত বেরিয়ে আসে না তা নয়। তবে এসব হঠাৎ স্রোতে ভেসে আসা নষ্ট শশা, পচা চালকুমড়োর মতই দৃশ্যত অসার ও পরিত্যাজ্য।

সাধারণত সিনেমা তৈরীর ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগের ব্যাপারটাকে দু'ভাগে ভাগ করা চলে। এক, অনেক অনেক টাকা লগ্নী করে সব ভাষার ও সব ধরনের মানুষকে ভালো লাগানোর উদ্দেশ্যে তৈরী বিগ বাজেট কমার্শিয়াল ছবি। দুই, অল্প মূলধনের সাহায্যে তৈরী কিছু ছবি অনেক সময়ই যার একটা অংশ নির্মিত হয় সিনেমাকে শুধুমাত্র বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার না করে তাকে মূলত শিল্পসৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। এই দুই উদ্দেশ্যে তৈরী করা সিনেমার মধ্যে যে কোন প্রতিযোগিতাই অসম হতে বাধ্য। শুধুমাত্র বাণিজ্যিক স্বার্থে নির্মিত সিনেমা তার লক্ষ্য চরিতার্থ করার জন্য যে কোন কৌশল গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না। ফলে, সিনেমার মূল বাজারকে তারাই নিয়ন্ত্রণ করে এবং অধিকাংশ সময়ই অল্প মূলধনের আওতায় থাকা ছবিগুলি এই বাজারকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। তাই অল্প বাজেটের ছবি করিয়েদের বিগ বাজেটের ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার রাস্তাটি প্রথম থেকেই বন্ধ থাকে। এবং এই দুই ধরনের ছবির দুটি রাস্তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। যদি ধরে নেওয়া যায় (
চলচ্চিত্রের সামান্য হলেও ক্ষমতা আছে মানুষে
বেঁচে-বর্তে থাকাকে প্রভাবিত করার আর তা
চলচ্চিত্রের উচিৎ মানবিক ও সামাজি
মূল্যবোধের (অবশ্যই প্রথাগত নয়) বিরুদ্ধাচর
না করা—তাহলে প্রথমেই মনে রাখা ভালো (
বাণিজ্যিক ছবির মানবিক ও সামাজি
দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করার কোন প্রশ্নই ওঠে না
সে সব ছবিতে এমন কিছু ঘটতেই পারে
সম্পূর্ণভাবে অবাস্তব, যা কড়ির ধার ধারে না,
দর্শককে তার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতি
এবং সর্বোপরি মানবিক পরিমণ্ডলের বাইরে নি
গিয়ে এক ধরনের লোম ও রিপু খাড়া ... ক
তাৎক্ষণিক আনন্দ দেয়। সব দেশেই এ ধরনে
ছবির দর্শক আছে। এ কথা আমি মানি না (
কোন সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাহায্য
মানুষকে এ ধরনের ছবি দেখা থেকে সম্পূর্ণ বির
করা যায়। চলচ্চিত্রের প্রবাদ পুরুষদের অনেকে
যেমন, আইজেনস্টাইন পুডভকিন ডভজেনকো
প্রভৃতিরা জন্মেছেন এবং কাজ করেছেন রাশিয়া
সোভিয়েত রাশিয়ায়। কিন্তু তাদের সেই দে
তারকোভস্কি (সম্প্রতি ইনি কর্মস্থল হিসেবে বে
নিয়েছেন ইটালিকে) বা অন্য দু'একজন ব
ভালো ছবি তৈরী করার মত পরিচালকেরা
নেই বললেই চলে। শস্তা বিষয় নিয়ে সরকা
দর্শক ভোলানোর ছবির সংখ্যাই বেশী। কিছু
আগে মস্কোতে দুটি সপ্রতিভ কাজ চালানোর
কথা ইংরেজি জানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শুধু
একজন ভারতীয় চিত্রপরিচালক জেনে আ
সঙ্গে আলাপ করতে আসেন। আমি কথা
খাতিরেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সত্যজিৎ

ঋত্বিক ঘটক—নাম শুনেছেন ? বিব্রত মুখে মাথা নাড়ে তাঁরা। অর্থাৎ কোনদিন এসব নাম শোনেননি তাঁরা। আননিয়নি, বুনুয়েল, বার্গম্যান, ওয়াইদা ?— নাঃ। সখেদে আবার নড়ে ওঠে তাঁদের মাথা। আমি আবার বলি, রাজকাপুর ? তাঁরা হাসেন। বলেন, অমিতাভ (বচ্চন)- মিঠুন (চক্রবর্তী)। আমাদের সত্যজিৎ- ঋত্বিক বা আন্তনিয়নি- বুনুয়েল ইত্যাদি প্রীতি এ ঘটনায় আহত হলেও কিছু করার নেই। সোভিয়েত রাশিয়ার সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনা ভারতবর্ষ বা তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর চেয়ে এগিয়ে আছে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। জনপ্রিয়তা কখনোই রুচি, যুক্তি, বা কোন ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টিশীল ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে না। জনপ্রিয়তা মূলত নির্ভর করে প্রচার ও সাধারণ মানুষকে তাৎক্ষণিকভাবে চমৎকৃত করার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীর ওপর। সমাজতান্ত্রিক চীন সম্পর্কেও ঘটনাটি প্রায় একই। সম্প্রতি হনলুলুতে হাওয়াই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে চিং কেই নামে একজন পরিচালকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তাঁর ছবি 'ইওলো আর্থ' দেশে-বিদেশে এ পর্যন্ত নির্মিত শ্রেষ্ঠ চীনা ছবি হিসেবে অভিনন্দিত হয়েছে। কিন্তু ছবিটি তাঁর নিজেদের দেশের দর্শক একেবারেই দেখতে চান নি। বাণিজ্যিকভাবে একেবারেই অসফল ছবিটি মূলত টাকা তুলেছে দেশের টেলিভিশন স্ক্রীনিং ও বিদেশের বিভিন্ন ফিল্ম-আর্কাইভে ছবির প্রিন্ট বিক্রিবাটা করে। বেজিং ফিল্ম একাডেমি থেকে পাশ করা ৩৩ বছর বয়স্ক এই পরিচালক জানালেন চীনের সিনেমা দর্শকের কাছে সব চেয়ে প্রিয় শস্তা আমেরিকান ছবি—যখন যেখানে হয় উপচে পড়ে দর্শকের ভিড়। ইউরোপের ছবির চাহিদা তুলনামূলকভাবে অনেক কম আর ভারতের মত দেশগুলির সিনেমা সম্পর্কে এদের প্রায় কোন রকম আগ্রহ নেই বললেই ভাল হয়। আসলে মেনে নিতে কষ্ট হলেও এটাই সত্যি যে—কি ধনতান্ত্রিক কি সমাজতান্ত্রিক— ভালো ছবির দর্শক সব জায়গাতেই প্রায় একই রকম ভাবে কম।

অল্প টাকায় শুধুমাত্র বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য মাথায় না রেখে শিল্প সম্মত ছবি যাঁরা করেন, তাঁরা কখনোই রাশি রাশি দর্শকের কথা ভাবতে পারেন না। দাঁতে দাঁত চেপে টিকে থাকার লড়াইটা কমবেশীভাবে সব দেশেই তাঁদের চালিয়ে যেতে হয়। একটা বিশ্বাস হয়তো সংগোপনে তাঁরা লালন করেন—একদিন দর্শক সংখ্যা আরো বাড়বে, আজকের সীমিত দর্শকের গণ্ডি ছাড়িয়ে তাঁদের ছবিও হয়তো আরো অনেক দর্শকের অভিনিবেশ টেনে নেবে—হয়তো একদিন এদের ওপর নির্ভর করে তৈরী করা সম্ভব হবে অন্য স্বাদ ও ভিন্ন জাতের ছবি। কিন্তু ততদিন কিভাবে চলবে—সরকারী বদান্যতায় ? ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল বা বিদেশের বাজারের পথ চেয়ে ? আর কবে টেলিভিসন ছবিটি দেখিয়ে ছবি তৈরীর অর্ধেক টাকাই দর্শনমূল্য হিসেবে তুলে দেবে তার কাল গুণে ? না কি তাঁরা আপাতত স্বধর্ম ত্যাগ করে মধ্যপন্থা বেছে নিয়ে এমন ছবি তৈরী করবেন যাতে সাপও মরবে আবার লাঠিও ভাঙবে না। তারপর যখন একদিন দর্শক বাড়বে তাঁরা মাথা ও গাল ভর্তি সাদা চুল এবং ফোকলা মুখ নিয়ে ভালো ছবি করার জন্য কাঁপতে কাঁপতে ক্যামেরার পেছনে গিয়ে দাঁড়াবেন। বস্তুত কে কি করবেন তা সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করবে কে কি ভাবে ভাবছেন, পারিপার্শ্বিককে দেখছেন এবং কোন ধরনের মানসিকতার পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠছেন তার ওপর। কিন্তু তাঁরা যদি একথা ভাবেন যে একদিন কোন মন্ত্রবলে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ছবি তৈরী করা বন্ধ হয়ে যাবে এবং সেদিন আপামর সমস্ত দর্শককে ভাল ছবি দেখানোর জন্য জড়ো করাতে পারবেন—তাহলে মূর্খের স্বর্গে যাঁরা সত্যিই বসে থাকেন তাঁরাও হেসে ফেলবেন—তাঁদের চেয়েও বড় মূর্খের দল আবিষ্কারের আনন্দে। আসলে আজকে একজন চিত্রপরিচালককে ছবি করার জন্য সবরকম গুণাবলী আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে টিকে থাকার কৌশলটা খুব ভালভাবে শিখে নেওয়াটাও সত্যিই অত্যন্ত জরুরী।

টিকে থাকার জন্য কৌশল বদলানোটা বাণিজ্যিক ভিত্তিক ছবি-করিয়েদের কাছেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি ফিল্ম সেন্সার বোর্ডের মেম্বারদের সঙ্গে বোম্বের বাঘা বাঘা চিত্র প্রযোজক-পরিবেশক ও পরিচালকদের একটি আলোচনায় প্রযোজক-পরিবেশক-পরিচালকরা করুণভাবে আবেদন জানান যে তাঁদের আরো, আরো বেশী উত্তেজক যৌনদৃশ্য ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হোক, না হলে টিকে থাকা দায় হয়ে উঠছে। সম্প্রতি প্রচুর অর্থব্যয়ে নির্মিত অনেকগুলো ছবির একটা বড় অংশের দর্শক বাজারে অদ্ভুতভাবে টাল খেয়ে পড়ে যাওয়ায় যে এই ধরনের আবেদনের পেছনে কাজ করছে তা সবাই বুঝতে পারেন। তবু একটা কথা শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়—অল্প বাজেটের ছবিগুলোর প্রয়োজনমত বাণিজ্যিক হয়ে ওঠারও কোন দায় নেই এমন অদ্ভুত ভাবনার কোন মানে নেই। অনেক শিল্পসম্মত ভাল ছবিই অনেক দর্শকের পক্ষপাতিত্ব অর্জন করতে পেরেছে। স্বধর্মত্যাগ না করেও আপাতত তাঁর সীমিত দর্শকের কাছে সৎ থাকার প্রসঙ্গ ও চেষ্টাকৃতভাবে অবাণিজ্যিক না হয়ে ওঠার ভাবনাটা নিশ্চয়ই একসঙ্গে ভাবা যেতে পারে। ■

'...বৃক্ষ' ছবির একটি দৃশ্য গ্রহণের সময় আহত সাংবাদিকের ভূমিকায় গৌতম ঘোষ

চি ত্র ক লা

সুজলা সুফলা

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ললিতকলা বিভাগের ছাত্রীছাত্রদের বার্ষিক প্রদর্শনী এ বছর অনেক ছিমছাম। যদিও সরকারী চারু কারু মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিকীর সঙ্গে তুলনা করলে কাজের বৈচিত্র্য এবং ব্যাপ্তি কম একথা স্বীকার করাই ভাল। মহাবিদ্যালয়ের যে বড় ঐতিহ্য সেটা ধরা তো সহজ নয়। তবে শিক্ষক ছাত্র মিলে একটা চেষ্টা চালাচ্ছেন। প্রদর্শনী দেখলে মনে হয়, তিনটে সুস্পষ্ট ধারা রয়েছে, সরকারী চারু কারু, কলাভবন শান্তিনিকেতন এবং ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের। এই ত্রিবেণী সঙ্গমে রচিত রবীন্দ্র ভারতীর ললিতকলা বিভাগের শৈলী এখনও একটা ঘরানার রূপ পায়নি। তবুও প্রদর্শনী আগের চেয়ে যে অনেক ভাল এটা বলতে হবে। (আকাদেমী অফ ফাইন আর্টস, ২০-৩০ অগাস্ট)।

জলরঙে নরেন সরকারের নিসর্গের ভেতর "মাটির বাড়ি", সৌরভ চন্দ্রের "গ্রামের মোড়লের" প্রতিকৃতি, সুরজিৎ ঘোষের একটি নীলচে ধূসর স্থিরবস্তু চিত্রের সাজানো এবং উপস্থাপনা, জয়দেব ঘোষের বনপথে একটি মানুষের চলে যাওয়া, পুলক সেনের পাহাড়ের সামনে গ্রামের ভোর, শেখর পালের দিগন্তবিস্তৃত জলে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি মানুষ এবং পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অঞ্জন দুবের নাম করতে হয়। এই বিভাগে দু একটি কাজ সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ভাল কাজগুলির সমান নাহলে কাছাকাছি। সৌরভ চন্দ্রের প্রতিকৃতিকে পুরস্কার না দিয়ে বিচারকরা বোধ হয় ঠিক করেননি।

তেলরঙে দিগম্বর ছবি বা স্থির বস্তু চিত্র কলকাতার অন্য দুটি মহাবিদ্যালয়ের সমকক্ষ কাজ দেখিনি, কারণ ছিলই না। ভুলে যাবার আগে কাশীনাথ কোলের টেম্পেরায় করা গাছ, পুকুরপাড়ে দুটি খালি চেয়ারের কাজটি উল্লেখ করতে হয়। স্যুরা সিনিয়াক ধারার বিন্দুবাদী ছবি। কিন্তু চোখের মণিতে তাঁরা বর্ণমিশ্রণ ঘটাতেন, পাশাপাশি রঙ ব্যবহার করে। দৃষ্টিবিভ্রম এখানে তৈরি হচ্ছে না। ফরাসী বিন্দুবাদী ধারায় রঙ ফাগের মতো গুঁড়ো গুঁড়ো ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির মতো। এখানে বুনোট সেলাইয়ের ফোঁড়ের মতো। কোলের হাতটি মিষ্টি। কিন্তু মৌলিক কাজ না দেখে অনুকরণ করলে ভুল করবেন। শেখর করের ঘোড়াটি তেলরঙ চাপিয়ে করা। মিনতি নাথের দুজন মহিলার কাজটিতে কিঞ্চিৎ মুনশীয়ানা লক্ষ্য করা গেল। তাঁর তুলাদণ্ড হাতে নিয়ে বোরখা পরা মহিলা ওয়াসিম কাপুরের কাজের দূরের ক্ষীণ প্রতিধ্বনির মতো। মাঝামাঝি রেখে রচনা করেছেন বলে কোনও ঝুঁকিও নেই সৌকর্যে। শুভঙ্কর বসুর নগর দৃশ্যের ছবিটার অভিব্যক্তিবাদী ধারায় রঙ চাপানো। বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত রচনা দুভাগে ভাগ করে একপাশে অন্ধকারে কিছু বর্ণের দোহার দিয়ে একটি পুরুষ এঁকেছেন, অন্যপাশে সাদার মধ্যে একটি নারী, ওপরে মাছের রূপবন্ধ কাজটিতে বেশ একটা মেজাজ আছে।

কিশোর চক্রবর্তীর ফাইবার গ্লাসের একটি কাজ

অরুণেশ চৌধুরীর কয়লায় তিনজন বসে থাকা মহিলা এবং অ্যাক্রালিকে করা ঘোড়া এবং শুয়ে বসে থাকা মানুষজনের কাজ দুটি বিরাট হলেও তাঁর বাবা বিজন চৌধুরীর প্রভাব খুবই প্রকট। তাছাড়া সেই মুনশীয়ানা অরুণেশের আয়ত্তে নেই। অসিত কর্মকারের বসে থাকা মহিলাদের চা-পানের কায়দা নীরদ মজুমদারের ঘরনার। এছাড়া অন্যদের কাজও বেশ যত্ন নিয়ে করা। যদিও কাঁচা কাঁচা কিছু ছবিও আছে।

ছাপাই ছবি বিভাগে কাঠখোদাই এবং লিনোকাটার প্রাধান্য। প্রত্যেকে দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। দুতিন জন ধাতুতক্ষণ করেছেন—বৈশাখী ঘোষ এবং কৌশিক মুখোপাধ্যায়ের কাজ উল্লেখযোগ্য। কাজগুলি কলাভবন শান্তিনিকেতনের ধারায় করা। নরেন্দু রায়ের বড় কাঠখোদাইতে পাদপীঠের মতো গোল পাথরে দাঁড়ানো দুজন দুঃখী মানুষ আছে, এদের একজনের হাতে ভিক্ষাপাত্র। পিছনে রয়েছে সাদার ওপর ছোট ছোট আঁচড়ে তোলা রেখার ছায়া। কালো সাদার ভাগবাটোয়ারা মন্দ নয়। যদিও একজনের পাঁজরার হাড়গুলিতে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পোড়ামাটির কাজগুলি ভাস্কর্যের চেয়ে পুতুলের মতো খানিকটা যেন। যেমন রতন সাহার "চৈতন্য" কাজটি ধরা যেতে পারে। কিংকর সাহার প্রমাণ মাপের ছাগলটি বাস্তবরীতিতে করা। যদিও বাঁকা টিকলির মতো ল্যাজের ধরনটা যেন যায় না।

লোহালক্কড় সাজিয়ে শ্যামল মুখোপাধ্যায়ের "মন্বন্তর" দলবদ্ধ মানুষের রূপ ধরেছে ঠিকই। কিশোর চক্রবর্তীর রেলস্টেশনে দ্বিমুখী বোঁচকা লোকজনের বসে থাকার দৃশ্যটিতে আয়তন এবং বস্তুপুঞ্জের সমন্বয় ঘটেছে মোটামুটি। শিশির টিকাদারের দুটি দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তি, কিশোর চক্রবর্তীর দণ্ডায়মান নারীমূর্তি দারুভাস্কর্যে উল্লেখের দাবী রাখে।

ফাইবার গ্লাসে আশিস পালের কাজটিতে একটি মেয়ের মুখ দীর্ঘায়িত করে রূপায়ণ করা হয়েছে একটু বেশিমাত্রায়।

ফলিত ললিতকলায় শো-কার্ড, পোস্টার, রেকর্ডের মলাট, কাগজের বাজারের থলের গায়ে আঁকা ছবি এবং এবং হরফের কাজগুলো দেখতে মন্দ লাগে না, যদিও সরকারী চারু কারু মহাবিদ্যালয়ের অঙ্কণ, রচনা, বর্ণপ্রয়োগের যে ঝিলিক এখনও সে জায়গাটার কাছাকাছি ছাত্রছাত্রীরা পৌঁছতে পারেননি। একটা অপেশাদারী ব্যাপার আছে। লক্ষণটা কিন্তু শুভ।

সন্দীপ সরকার

সং গী ত

রূপানুরাগ— পদাবলী কীর্তন

প্রবীণ কীর্তনকোবিদ নন্দকিশোর দাস প্রয়াত আনন্দবাজার সম্পাদক অশোককুমার সরকারের বিশেষ প্রীতিধন্য সঙ্গীতশিল্পী। জীবিতকালে প্রতি বৎসরই তিনি একাধিকবার তাঁর মদনমোহনতলার বাসগৃহে নির্বাচিত শ্রোতা ও ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে উচ্চাঙ্গ পদাবলী কীর্তনের রস উপভোগ করতেন। তাঁর প্রয়াণের পরেও এই ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ আছে। প্রকৃতপক্ষে মনোহরসাঁই ধারার পদাবলী কীর্তন আজ অবলুপ্তির পথে কারণ খুব কম শিল্পীই আছেন যাঁরা এই কঠিন তাল সমন্বিত সঙ্গীত পদ্ধতিকে আয়ত্ত করতে সক্ষম এবং আরও কম শিল্পী

আছেন যাঁরা বহু মহাজনপদের সঙ্গে পরিচিত বা কথকতায় ও ব্যাখ্যায় এই সব পদকে সহজবোধ্য করে তুলতে পারেন। নন্দকিশোর বহু বৎসরের শিক্ষানবিশী করে তাঁর শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করেছেন এবং আজ তাঁকে এই ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক বললে অত্যুক্তি হয় না।

৬ সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে নন্দকিশোরের কাছে জানতে চেয়েছিলুম তিনি কোন পালা গাইবেন। তিনি বললেন— 'রূপ, কেবলমাত্র রূপ গাইব।' যদিচ তিনি যথেষ্ট বিদগ্ধ শ্রোতার সামনে গাইতে ইচ্ছুক তথাপি শুধু রূপকে বিষয় করে আসর জমানো সহজ কথা নয়। এর কারণ রূপ-এর এস্থেটিক আবেদন আছে, কিন্তু আকর্ষণীয় আর কোনো ঘটনা নেই। একমাত্র সঙ্গীতের রস, পদাবলীর সৌন্দর্য এবং গায়কের কৃতিত্বই রূপবর্ণনাকে শ্রোতার কাছে সার্থকতায় উত্তীর্ণ করতে পারে। রূপ-এর প্রসঙ্গে অবশ্যই বলতে হয় এ আমাদের চোখে দেখা রূপ নয়, এ হচ্ছে শ্রীমতীর (যাঁকে কীর্তনীয়ারা রাধারানী বলে থাকেন) চোখ দিয়ে দেখা এক শ্যামল কিশোরের রূপ যার উপলব্ধি তাঁকে তীব্র অনুরাগের দিকে আকর্ষণ করে আনছে। বিভিন্ন পদকর্তা বিভিন্নভাবে এই রূপের বিবরণ দিয়েছেন, যাদের মধ্যে একটা সমন্বয়ের আবশ্যকতা রয়েছে। অর্থাৎ যিনি গায়ক শিল্পী তাঁকে পদে পদে এই কাব্যগত বৈষম্যের মধ্যে থেকে এমন একটা তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে যা রূপের বর্ণনাকে একটা দর্শনের আলোকে উদ্ভাসিত করে তোলে। এই যে একটা সামগ্রিকভাবে রূপের তত্ত্ব- বিশ্লেষণ এটি অত্যন্ত দুরূহ কাজ এবং বিশেষ প্রতিভাবান শিল্পী ব্যতীত এই পারদর্শিতা সম্ভব নয়।

নন্দকিশোরের মধ্যে এর কোনটিরই অভাব নেই। জটিল তালের শাসন মেনেও তিনি মূল আবেদনটিকে উজ্জীবিত রাখতে পারেন। কীর্তনের যে এত তালের পরিকল্পনা তাও তো এই গায়কীর দিক ভেবেই উদ্ভাবিত হয়েছে নইলে কীর্তনকেও খেয়ালের রীতিনীতি অবলম্বন করতে হত এবং গায়ক-তবলীয়ার দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হতে হত। পদাবলী কীর্তন সে পথে যায়নি, তালকে সে তার ভারসাম্য রক্ষায় সাথী করে নিয়েছে এবং তাই খোল কীর্তন, করতাল এত বিচিত্র গতিতে একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। আমার মনে হয় গত শতাব্দীর টপ্পা রচয়িতারাও এইটা উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁদের গায়কীতে তান, বিস্তারে একটা অসামান্য ইঙ্গিত ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তফাৎ এই, তাঁরা চৌপদীর বাইরে যাননি আর কীর্তনীয়ারা ত্রিপদী বাহুল্যকে সম্মান দিয়ে এসেছেন। বোধ করি বাংলা টপ্পাও এই রকম পালায় বিভক্ত করে ব্যাখ্যা টীকা টিপ্পনী সহ গাওয়া যায় এবং শ্রীধর কথকের মতন উৎকৃষ্ট কথাশিল্পীরা বোধ হয় সেইভাবেই পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন।

নন্দকিশোর সমতালে গৌরচন্দ্রিকার দীর্ঘ অনুষ্ঠান করলেন বাসু ঘোষের 'গোরা অনুরাগে মোর পরাণ কাতরে' গানটি দিয়ে। তারপর একে একে এলেন গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, গোপাল দাস, রঘুনাথ দাস, এমন কি কৃষ্ণ দাস কবিরাজ পর্যন্ত। বহু বিচিত্র তালের সমারোহ দেখা গেল। তবু, কীর্তনীয়া নন্দকিশোর যখন পদগুলির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ করে মূল উদ্দেশ্যগুলিকে ব্যাখ্যা সহযোগে প্রস্ফুটিত করে তুলছিলেন তখনই তিনি জ্ঞাপকতার দিক দিয়ে শ্রোতাদের মর্মস্থলে প্রবেশ করতে সমর্থ হচ্ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি রূপের বর্ণনায় সন্তুষ্ট রইলেন না, অনুরাগতত্ত্বে চলে এলেন, এমন কি যে পর্যায়ে শেষ করলেন তাতে বর্ষা-অভিসারের একটা নিদর্শনও রয়ে গেল। বলা বাহুল্য অনুষ্ঠানটি খুব জমেছিল। একটা জিনিস লক্ষ করলুম, তাঁর গানে মাঝে মাঝে আড়-খেমটার রীতির প্রবেশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর কতিপয় গীতধারার সুস্পষ্ট প্রভাব। এতে প্রমাণিত হয় পদাবলী কীর্তনের চলমান ধারা থেমে থাকেনি, আবশ্যকতাবোধে তাকেও বর্তমান থেকে কিছু কিঞ্চিৎ গ্রহণ করতে হয়েছে। এতে অবশ্য কীর্তনকলার বৈশিষ্ট্যের কোনো হানি হয়নি।

অবশেষে একটি অনুরোধ। আমার মনে হয় এই ধরনের সীমিত সময়ের অনুষ্ঠানে গৌরচন্দ্রিকাকে অধিকতর প্রলম্বিত না করাই ভালো এবং প্রতিটি পদ যেন সময়ের দিক থেকে সুবিচার পায়, এটাও দেখা আবশ্যক, যাতে পালাটি সামগ্রিকতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেও সুসম্পূর্ণ হতে পারে। আরও একটি কথা, অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে পালা বা বিষয়বস্তুর কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়ে তার উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্ট করে তুললে বোধ হয় সেটা পালাটিকে উপলব্ধি করার পক্ষে সহায়ক হতে পারে।

অনুষ্ঠানটি যাঁদের সহায়তায় সার্থক হয়েছে তাঁদের মধ্যে দোহার ছিলেন দেবশরণ মণ্ডল, সত্যনারায়ণ দাস, চন্দ্রকান্ত দাস এবং মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু। খোলে অপূর্ব সঙ্গত করেছেন সুবোধচন্দ্র সাহা এবং নন্দ মণ্ডল। সুবোধবাবুর সমগ্র দেহই যেন একটা নৃত্যের আঙ্গিককেও রক্ষা করে গেছে। এটিও পদাবলী কীর্তনের একটি বৈশিষ্ট্য যা প্রায় লোপ পেতে বসেছে। সব শেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি শ্রেষ্ঠ কীর্তন কলাবিদ নন্দকিশোর দাসের কাছে যিনি কিছুকাল হল সত্তর বৎসর অতিক্রম করেছেন, কিন্তু কণ্ঠ ও অপর কলাপ্রদর্শনের দিক থেকে কিছুমাত্র ন্যূনতাপ্রাপ্ত হননি।

রাজেশ্বর মিত্র

শিশির মঞ্চে 'সুরবাহার'

যেন পরদার পিছন থেকেই অনিয়মিত ও অনুচ্চ তবলা-লহরার অনুষ্ঠান। শিশির মঞ্চে ২২ আগস্ট 'সুরবাহার' এর অনুষ্ঠানে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে যাঁরা আসন গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের অন্তত শুরুর দশ-পনের মিনিট এ-রকম মনে হতেও পারে। শুরুতেও বৃন্দগানে যে-ভাবে ভূমিকা করা হয় বলা হল, 'আধুনিক কাল থেকে পিছনের দিকে যাব', আর এরপর ক্রমান্বয়ে শোনানো হল—নিমাই বিশ্বাসের কথায়, কৃষ্ণা সমাদ্দারের সুরে 'কোথা যাই', সলিল চৌধুরী-সৃষ্ট 'ধন্য আমি' ও হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'লঙ্গর ছাড়িয়া', তাতেও যদি মনে হয়, ব্যাপারটা ঠিক উল্টো হয়ে ধরা পড়ল, অর্থাৎ পিছনের দিক থেকে সামনের দিকেই এগিয়ে আসার ছবি ফুটল, দোষ দেওয়া যায় না। 'সুরবাহার'-এর শুরুর অনুষ্ঠান, আসলে, বেশ কিছুক্ষণ এলোমেলো। কৃতী দুই ছাত্রীকে যে মানপত্র দেওয়া হল তা শুনে যদি কারও প্রবন্ধ মনে হয়, যার উপজীব্য সাফল্যের ইতিহাস ও সন্দেহসম্ভব অভিযোগের নিরসন্তি, তাহলে ভুল হয় না এবং ধৈর্য রাখাও দুষ্কর। ছাত্রী দুজন অবশ্য যথাযথ তালিম পেলে ভালো গাইবেন। এদিনও তাঁরা খারাপ গাননি, কিন্তু ভিতর থেকে বাজানো অদৃশ্য হাতের মন্দিরা ও এফেকটস, মঞ্চের উপরের বেসুরো বাঁশি, মোটা সুরের তারযন্ত্র জয়ন্তী ভট্টাচার্যের ও রত্না দে-র গানের প্রতি সুবিচার করেনি। পূর্ত ও আবাসন মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে অবশ্য 'সুরবাহার'-এর সামগ্রিক কাজকর্মের প্রশংসা করলেন। বললেন, দু-দশক ধরে কাজ করে চলেছে এই সংস্থা। কাজটি কঠিন। চারদিকে যখন অবক্ষয় ও অপসংস্কৃতি, কায়েমী স্বার্থের সংগঠিত অপপ্রয়োগে যুবমানস অপসংস্কৃতিতে আচ্ছন্ন, সেই সময় সুস্থ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই অপসংস্কৃতিকে রুখবার কঠিন ব্রত পালন করে চলেছে

'সুরবাহার'। এঁদের শুভেচ্ছা কামনা করি।

জানি না, মন্ত্রীর এই শুভেচ্ছার কৃপাতেই কিনা, 'সুরবাহার'-এর পরবর্তী অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠল সপ্রতিভ, কৌতূহলকর ও দৃষ্টিনন্দন এক প্রযোজনা। উনিশটি রবীন্দ্রসঙ্গীত সংযোজিত করে 'সুরবাহার' মঞ্চস্থ করলেন 'রথের রশি'র নৃত্যনাট্য-রূপ। মঞ্চের নৃত্যাভিনয় যেমন চোখকে আশ্বস্ত করেছে, নেপথ্য-সংলাপের উচ্চারণে তেমনি অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতার ছাপ কানকে করেছে পরিতৃপ্ত। শুধু, ভিতর থেকে টেপে-চালানো সংলাপের সঙ্গে মঞ্চের কায়িক অভিব্যক্তি দু-এক ক্ষেত্রে মাত্রা ছাড়ানো। কথা ফুরোয়, হাত-পা নাড়া বন্ধ হয় না। তবে এটা খুব বড় একটি কিছু নয়, কয়েকটি অভিনয় রজনী পার হলে, মহলার হাল একটু কঠিন হাতে ধরলে, 'রথের রশি'র নৃত্যনাট্যরূপটি অচিরে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে, আশা করা যায়।

'আমার নিশীথ রাতের বাদলধারা'। মন, পরিপূর্ণ উপহার। মেজাজী, মাদকতা মেশানো। শেষ পর্বে ছিল সংলাপ-পাঠ। 'রাজা' থেকে শোনালেন তৃপ্তি মিত্র ও শাঁওলী মিত্র। পূর্বালোচিত এই অনুষ্ঠানটি এদিনও পরিবেশিত পূর্ণ মহিমায়।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

'শ্রাবণী'র অনুষ্ঠান

রবীন্দ্র সদনে 'শ্রাবণী' সংস্থার চতুর্থ বর্ষের অনুষ্ঠানে সংস্থার নিজস্ব প্রযোজনাটি ছিল এক নৃত্যগীতালেখ্য—'মেঘ, মন মেঘ'। সুমিত্রা সেন ছিলেন সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে, রেখা মৈত্র নৃত্যের। গ্রন্থনায় কণ্ঠদান করেছিলেন অশোক পালিত ও তুলসী রায়। অনুমান করি, এঁরা অতিথি-শিল্পী। তবে বাইরে থেকে অভিজ্ঞ কণ্ঠের এই সহযোগিতা গ্রন্থনাংশকে বিশেষভাবে সুখশ্রাব্য যে করে তুলেছিল, সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান ও কবিতা সমন্বয়ে রচিত এই আলেখ্যে অবশ্য পাঠের অংশ একটু কমালে সমগ্র অনুষ্ঠানটি আরও সপ্রতিভ হয়ে পেত, সে-কথাও এ-প্রসঙ্গে বলা দরকার। সংস্থার বেশ কয়েকজন নামী ছাত্র-ছাত্রীই, বোঝা গেল, প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন। পুরুষশিল্পীদের মধ্যে সুপরিণত সোমনাথ ভট্টাচার্য 'চিনিলে না আমারে'তে নিজেকে সহজেই চেনাতে পেরেছেন। দেবনাথ চৌধুরী ও দিলীপ সরকারও মন্দ গাননি। মহিলাশিল্পীদের মধ্যে নন্দিতা সাহার 'পুব হাওয়াতে' বস্তুতই দোলা দিয়ে যায়। ঠিক এই মানের না হলেও, উত্তীর্ণ আলপনা চৌধুরী ও ...গা সাহা। নামীদের মধ্যে সুশীল মল্লিক দুটি গানের মধ্যে বেশি উজ্জ্বল 'তিমির অবগুণ্ঠনে'র উন্মোচনে। একক দুটি ছাড়াও যখনই তিনি ...ত পরিবেশনে কণ্ঠ মিলিয়েছেন সুমিত্রা সেনের সঙ্গে, দুই পরিণত শিল্পীর যুগল-সম্মিলন তখনই পূর্ণ প্রকাশিত। সুমিত্রা সেনের দুটি এককের মধ্যে তাঁকে সগৌরবে পাওয়া গিয়েছে রেখা মৈত্রের ...নোগ্রাহী নৃত্য-সমন্বিত 'এ ভরা বাদর'তে। রেখা মৈত্রের কোরিওগ্রাফিতে নবীনতার স্বাদ ছিল ...কের 'হৃদয়ে মন্দ্রিল'তে। মলয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে দ্বৈত-নিবেদন 'আঁধার অম্বরে'ও দৃষ্টিশোভন। তবে রেখা মৈত্রর নিজেকে-ছাপানো পরিবেশন 'কোথা যে উধাও'র মতো দুরূহ গানের দুর্লভ দাপটে ভরা নৃত্য-রূপ। সম্মেলক নাচের-গানের স্ফূর্তিময় মিলনে স্মরণীয় 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে'। 'এসো শ্যামল সুন্দর' যদি শুরুর প্রার্থনা হত, ভাল লাগত।

মধ্যবর্তী গানের পর

এ-গানের হঠাৎ আবির্ভাব বিস্ময়কর। এই আলেখ্যের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধ্যায়েও ছিল দু-ধরনের আকর্ষণ। প্রথম পর্বে সুমিত্রা সেনের পরিচালনায় 'শ্রাবণী'র পরিবেশনে বেদগান ও 'আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা' আরম্ভেই এনে দিয়েছিল জমজমাট এক আলোবাতাস। প্রবীণ শিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়-এর কণ্ঠে ছ'খানি রবীন্দ্রসঙ্গীত এই পর্বকে পুরোপুরি স্বাদু করে তুলেছিল। বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়, তাঁর কণ্ঠের মধুর লাবণ্য সম্পৃক্ত 'গগনে গগনে' ও

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

স্মরণীয় একক অনুষ্ঠান

লা মার্টিনিয়ের শিক্ষায়তনের দেড়শ বছরের জয়যাত্রার স্মরণে একটি মনোজ্ঞ সঙ্গীতসন্ধ্যা আয়োজিত হয়েছিল কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে গত ৩০শে আগস্ট। একক সেতারবাদনের এই অনুষ্ঠানে বিশ্ববন্দিত শিল্পী পণ্ডিত রবিশঙ্কর প্রথমে বাজিয়েছেন শ্রী রাগের আলাপ, জোড়, ঝালা ও ধামার তালে নিবদ্ধ গৎ।

রাগরূপে পরিকল্পনার প্রথাগত সুরসঞ্চালনের মধ্যেও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল শিল্পীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধ্রুপদী আবেদন ও আলঙ্কারিক সৌন্দর্য। 'ঋ প ঋ গ ঋ' অথবা 'ঋ দ ন স ঋ' প্রভৃতি ট্র্যাডিশনাল স্বরসংগতির দৃঢ় ও বলিষ্ঠ প্রয়োগে রাগের স্বাভাবিক বিষণ্ণ আবেদনের সঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে যথার্থ উচ্চাঙ্গের এক দৃপ্ত মেজাজ।

জোড় অংশে কোমল ঋষভকে ঘিরে বিচিত্র স্বরসজ্জা এবং আকর্ষণীয় ন্যাসের সাহায্যে স্বরটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সার্থক অবতারণা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই পর্বে প্রাধান্য পেয়েছে সুকঠিন ছন্দবিন্যাস এবং ঘনসংবদ্ধ কূট বোল বিভাজন।

ঝালা অংশটিতেও শিল্পীর চিন্তাধারার অসাধারণ বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়েছে। দৃঢ়বদ্ধ ধামারের গৎকারিটি ছিল শিল্পীর একান্ত নিজস্ব academic মুডের সার্থক প্রতিফলন। গতের শুরুতেই অপূর্ব কয়েকটি ছোট ও সূক্ষ্ম তেহাই-এর সমাবেশ এবং পরে মিশ্র ছন্দের সুন্দর প্রয়োগে শিল্পীর নান্দনিক মননশীলতার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

সব মিলিয়ে অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে পণ্ডিত রবিশঙ্করকে পাওয়া গিয়েছিল তাঁর সুপরিচিত স্বয়ংভাস্বর মেজাজে।

শিল্পীর পরবর্তী অনুষ্ঠান কিরওয়ানি রাগের আবেদন শুধুমাত্র রসিক শ্রোতার উপলব্ধির ক্ষেত্রেই সীমিত ছিল না,— অপেক্ষাকৃত সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত সুরের আমেজে আপামর জনসাধারণ পরিতৃপ্ত ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এক্ষেত্রে ভাবাবেগের

পণ্ডিত রবিশঙ্কর

লালিত্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে জটিল ছন্দোবদ্ধ বিস্তার, সাবলীল তেহাই-এর বৈচিত্র্য এবং আটগুণ লয়ের বলিষ্ঠ ও সুগ্রথিত তানকারি। এই পর্যায়ে কার্তিককুমারের মাধুর্যপূর্ণ সেতার সহযোগিতা যথেষ্ট উপভোগ্য হয়েছিল।

সবশেষে পরিবেশিত হয় ট্র্যাডিশনাল আবেদনসমৃদ্ধ মাঝ-খামাজ। এই পর্বে শিল্পী প্রথমে দাদরা ও পরে ত্রিতাল গৎ বাজিয়ে শোনান। শুদ্ধ থেকে কোমল স্বরসঞ্চারের তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা ও তার নাটকীয় প্রয়োগে এবং রাগমালাতে পরিবেশিত বিচিত্র স্বররূপের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় শ্রোতারা রীতিমত অভিভূত।

ত্রিতাল অংশে কুমার বসুর একটি দীর্ঘ একক বাদনচক্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঁয়ার সুগভীর ও নিটোল ধ্বনি এবং ছোট ছোট আবর্তনের মধ্যে কূটছন্দের কাজ যথেষ্ট উপভোগ্য হয়েছিল। এই শিল্পীর সংযত ও সংবেদনশীল তবলা সহযোগিতা সমগ্র পরিবেশনাটিতে নিঃসন্দেহে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে।

বিনতা মৈত্র

রে ক র্ড

ক্যাসেটে শিশু সঙ্গীত

গ্রামোফোন রেকর্ড বা ক্যাসেটে প্রতি বছর নিয়মিত ভাবে কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত থেকে শুরু করে হাস্যকৌতুক পর্যন্ত প্রচারিত হয় যার মধ্যে শিশুদের চাহিদা মেটে এমন উদ্যোগ বড়ই বিরল। তবে একেবারেই কিছু প্রচারিত হয় না বললে অবিচার করা হবে। তুলনামূলকভাবে তা নিতান্তই অনুল্লেখ্য। তাই এ ধরনের যে-কোনো উদ্যোগকে স্বাগত জানাতেই হয়।

সম্প্রতি সাউন উইং রেকর্ড কোম্পানি 'ছুঁচো কত্তার গান' নামে একটি ক্যাসেট (SWC 137) বাজারে এনেছেন যা সত্যই ছোটোদের চাহিদা মেটাবে। এই ক্যাসেটে প্রযোজনা করেছেন প্রয়াত স্বনামধন্য যাদুসম্রাট পি. সি. সরকারের পুত্র মানিক সরকার। মার্কিন মুলুকে তিনি বিদ্যুৎ বিজ্ঞানী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। প্রধানত তাঁর দুই শিশুকন্যাকে মাতৃভাষায় আকৃষ্ট করানোর উদ্যোগের জন্যে এই পরিকল্পনা। ভাবতে ভাল লাগে এই উদ্যোগের স্বীকৃতি স্বরূপ দুই শিশু কন্যা পিয়া ও পায়েল আমেরিকার 'স্টার্স অব টুমরো' প্রতিযোগিতায় বাংলা গান গেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবং C. B. S-এর মতো কোম্পানি তাঁদের গান রেকর্ড করায় উদ্যোগী হয়েছেন। সেই শুরু যার দৌলতে আমাদের হাতে এসে পৌঁছল এমন একটি আনন্দের পসরা।

ক্যাসেটের এক দিকে পিয়া গেয়েছেন ছুঁচো কত্তার গান, স্যান্টা ক্রুজ ও ঝিঁঝি পোকার গান। অন্যদিকে অজগর, যাচ্ছি আমি মেক্সিকো, অ্যাস্ট্রোনট গেয়েছেন পিয়া, পায়েল ও মানিক সরকার। দুদিকে দুটি গানের সুর বেজেছে যন্ত্রসঙ্গীতে। গীতিকার শিখা ও মানিক সরকার। সুরকার স্বয়ং মানিক সরকার। দুই শিশু শিল্পীই গেয়েছেন আনন্দের সঙ্গে। অত্যন্ত সপ্রতিভ। আড়ষ্টতার লেশমাত্র নেই। পিয়ার কণ্ঠের চারটি গানই ভিন্ন স্বাদের। উচ্চারণ স্পষ্ট হলেও মার্কিন মুলুকের স্থায়ী বাসিন্দা হবার ফলে বাংলা ভাষা একটু বিচিত্র শোনায়—যা এই ক্যাসেটে বেশ মানিয়ে গিয়েছে। গায়ন ভঙ্গি স্বতঃস্ফূর্ত। স্যান্টাক্রুসকে 'ইন্ডিয়া'তে আমন্ত্রণের গানটি ভারি মজার। ঝিঁঝি পোকার ডাকের পটভূমিতে তাদের সঙ্গে মিতালির আহ্বান এবং মেক্সিকো যাবার বর্ণনা চমৎকার শোনায়।

পায়েল 'অজগর ওই আসছে তেড়ে/ আমটি আমি খাব পেড়ে' দিয়ে শুরু করে মহাকাশচারী হবার বাসনায় 'অজগর' গানটি প্রাণবন্ত করে তুলেছেন।

গানের সুরবিন্যাস সরল অনাড়ম্বর কিন্তু হৃদয়গ্রাহী। সামগ্রিকভাবে সুরের বিশিষ্টতায় ও ছন্দের হিল্লোলে প্রতিটি গানই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠার পিছনে সার্থক যন্ত্রসঙ্গীত সহযোগিতার অবদান অনেকখানি। গীতরচনা কিছু দুর্বল হলেও প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে তা অনায়াসে উপেক্ষা করা যায়। মানিক সরকার আমাদের প্রত্যাশা জাগিয়েছেন। তাঁর কাছে আরো পরিণত প্রযোজনার আশায় রইলাম। এই ক্যাসেটটি শিশুদের কাছে নিশ্চয়ই আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

সুভাষ চৌধুরী

ন ৃ ত্য

পৌষালীর ওড়িশি নৃত্য

কলকাতায় যুব তরুণ ওড়িশি নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে প্রথমেই যাঁদের মনে আসে পৌষালী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে একজন। আগে অনেক অনুষ্ঠানে তাঁর নাচ দেখে যে সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল তার সফল পরিণতির প্রথম পর্যায়ে তাঁকে দেখা গেল গত ২৩ আগস্ট পদাতিকের মঞ্চে তাঁর নৃত্যানুষ্ঠানে।

পৌষালীর নাচে প্রকরণ কুশলতার অতিরিক্ত এক নান্দনিক আবেদন ছিল যার উৎস তাঁর সনিষ্ঠ অনুশীলনে অর্জিত শিল্পের সঙ্গে বোধের অন্বয়। কঠিন নৃত্যভঙ্গীর দৃশ্যবাহিত রূপের সঙ্গে কেবল অভিনেয় আবেগ নয়, শিল্পীর নিজস্ব শিল্পানুভবও যুক্ত হয়েছিল।

সূচনার মঙ্গলাচরণ, গণেশবন্দনায় কিন্তু তিনি বেশীমাত্রায় সতর্ক ও

পৌষালী বন্দ্যোপাধ্যায়

আত্মসচেতন ছিলেন। পদের শেষাংশে সেই ত্রুটি কাটিয়ে উঠলেও সামগ্রিকভাবে সূচনাপদে তাঁর নৃত্যপ্রতিভার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়নি।

এই পরিচয় পাওয়া গেল পরবর্তী কিরওয়ানী পল্লবীতে। দুরূহ নৃত্যভঙ্গিমা ও দেহচারণার জটিল নৃত্যবিন্যাসে সমৃদ্ধ এই পদে যে নয়নাভিরাম লাবণ্য ছিল তা পৌষালী বিকশিত করেছিলেন পরিশীলিত প্রকরণে, প্রগাঢ় আবেগ ও স্বচ্ছন্দ প্রবহমান দেহচারণায়। পরের দুটি অভিনয় পদের বিষয় ছিল কৃষ্ণলীলা এবং বহুপ্রয়োগে জীর্ণ জয়দেবের অষ্টপদীর বদলে দুটি লৌকিক ওড়িয়া গান—লীলানিধি হে এবং নাচন্তি রঙ্গে শ্রীহরি—অবলম্বনে বিন্যস্ত। দুটি পদেই নৃত্যের চেয়ে নৃত্তাংশের আবেদন ছিল বেশী। অভিনয় সীমিত ছিল সলজ্জ, সস্মিত চোখমুখের বিনম্র অভিব্যক্তিতে এবং কৃষ্ণের প্রতি অনুনয়-বিনয়ের সরল দেহভাষার প্রয়োগে। কিন্তু পদচারিতার নৈপুণ্য, ছন্দ ও দ্রুতলয়ের দেহচারণায় বটুনৃত্যের মত বীণা, মৃদঙ্গ ও বাঁশী বাদনের নানা নৃত্যভঙ্গীর পরিচ্ছন্নতায় ও দেহরেখার ক্রমান্বয় ছন্দিত বিস্তারে—এই দুটি পদ দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল।

সমাপ্তিপদ মোক্ষ কোন নান্দনিক বা আধ্যাত্মিক মূর্ছনা দৃষ্টি করতে পারেনি।

সঙ্গীতে উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা করেছিলেন স্বয়ং গুরু কেলুচরণ, জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়, অজিত রাথ ও বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী।

মনসিজ মজুমদার

নৈবেদ্য ও চণ্ডালিকা

দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্যকল্পে 'যাত্রী' নিবেদিত মমতাশংকর ব্যালে সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে বসার জায়গার তুলনায় অতিরিক্ত দর্শক সমাগম হয়েছিল সে যে কারণেই হোক না কেন। সুতরাং প্রথমাবধি চলছিল বসার জায়গা নিয়ে গণ্ডগোল আর সেই কারণেই মমতাশংকর সম্প্রদায়ের প্রথম অনুষ্ঠান 'নৈবেদ্য' মাঝপথে বন্ধ করে দিতে হয়। কিছু পরে অবশ্য আবার শুরু হয় অনুষ্ঠান। গেটে টিকিট চেকিং-এর ব্যবস্থা ছিল অথচ বাড়তি লোকও প্রবেশাধিকার পেল—এই বিশৃঙ্খলার দায়টা শুধু আয়োজক

মমতা শংকর

সংস্থা 'যাত্রী'-রই নয়, দায়টা রবীন্দ্রসদনেরও।

নানা বিষয়ে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি নৃত্য-নিবেদন নিয়েই প্রথমার্ধের অনুষ্ঠান 'নৈবেদ্য'। 'জেলে-জেলেনী' কিংবা প্রাদেশিক হোলি নৃত্য আকর্ষণীয়। আনন্দশংকরের সুরমণ্ডিত মমতাশংকরের নৃত্য-পরিকল্পনায় 'চিরন্তন' ভালো লাগল। ভালো লাগল 'সূর্যপ্রণাম'। মমতাশংকরের একক রূপায়ণে 'কার্তিকেয়' অবশ্যই দৃষ্টিনন্দন তবে আরও যেন বলিষ্ঠতা অভিপ্রেত ছিল। এই নিবেদন সম্পর্কেই গ্রন্থনায় বলা হল যে 'কার্তিকেয়'-র নৃত্য-পরিকল্পনা উদয়শংকরের। উদয়শংকরের পরিবেশনায় 'কার্তিকেয়'র একটি সুপরিচিত নৃত্য-নিবেদন, কিন্তু যত দূর জানা আছে এর নৃত্য-পরিকল্পক গুরু শংকরণ নামবুদ্রি। কিছুদিন আগে এক নৃত্যানুষ্ঠানে এক খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী 'কার্তিকেয়'-এর নৃত্য-রচয়িতা হিসেবে শংকরণ নামবুদ্রির কথা বলেই তা পরিবেশন করেছিলেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধে নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা। প্রকৃতির ভূমিকায়

মমতাশংকরকে একটু সফিস্টিকেটেড লাগল তবে তাঁর নৃত্যাভিনয় ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে-অনুভবে স্বতন্ত্র ও ব্যঞ্জনাময়। পাশে ঝর্না দত্ত (মা) ভারসাম্য রক্ষা করেছেন বলা চলে। চন্দ্রোদয় ঘোষের 'আনন্দ' যথাযথ।

সাধারণভাবে মমতাশংকর কৃত নৃত্য পরিকল্পনা দৃষ্টিসুখকর কিন্তু কোন কোন সময় অতিরিক্ত মনে হয়েছে। যেমন—'মাটি তোদের ডাক দিয়েছে' গানের আগে মেয়ে-পুরুষের সমবেত নৃত্যটি হতে পারত আর একটু সংক্ষিপ্ত। শিষ্যাদলকে নিয়ে মায়ের মায়ানৃত্যের সময় অকারণে নৃত্যকে দীর্ঘ করা হয় প্রায় প্রতিটি প্রয়োজনায়, বর্তমান প্রযোজনায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সঠিক নাটকীয়তায় প্রকৃতির গানগুলি আশ্রয় পায় রমা মণ্ডলের সুরেলা কণ্ঠে। ডলি ঘোষের (মা) গানেও নাট্যরস ছিল। তড়িৎ ভট্টাচার্য (আনন্দ) সুকণ্ঠ তবে উচ্চারণে আরও স্পষ্টতা চাই। সম্মেলক কণ্ঠে 'নব বসন্তের দানের ডালি' উজ্জ্বল। 'সাত দেশেতে খুঁজে খুঁজে গো' গানে উচ্চারিত হল—'পেলাম রক্ষা তাই', স্বরলিপি অনুযায়ী সঠিক গীতিরূপটি হল—'পেলেম রক্ষা তাই'। নৃত্যনাট্যটি পরিচালনা করলেন চন্দ্রোদয় ঘোষ ও মমতাশংকর।

স্বপন সোম

না ট ক

পরিশুদ্ধ অসংগতি, হে গোলাপ

অভিজ্ঞতার বাইরে মানে অনভিজ্ঞতা নয়, অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত কিছু। ম্যাক্সমুলার ভবনে সংবর্ত প্রযোজিত "অশুদ্ধ গোলাপ" সম্পর্কে ঘোষণা "বিমূর্তের প্রতীকী বিন্যাস, হলেই বা নির্বাচিত বা পরিশীলিত দর্শক শ্রোতার জন্য, তাঁর থেকে মুখ ফেরাবার কোন সোচ্চার অঙ্গীকারে আমরা আশ্রয় খুঁজিনি কখনোই"। রাইনার মারিয়া রিলকের জীবন নিয়ে এই নাট্যভাবনা অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের। তাঁর মতে এটা নাটক নয়, নাট্যময় আলেখ্য কিংবা নাট্যকোলাজ, নাটক দেখবার পর নাট্যময় জীবনই আভাসিত, তবে নাটক নয় কেন? ভ্রাম্যমাণ কবি রিলকের জীবন কোথাও বাধা পড়ে না, প্রথাগত ভাবে সংঘাত নেই—কিন্তু অন্তর্লীন বিপ্লব নিয়েও তো নাটক করা যায়—অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সেই অর্থে নাটক গড়তে চাননি—যাকে অনেক সময় আমরা ব্যঙ্গ করে বলি 'নাটক জমে উঠলো' বা 'নাটক করো না তো!' কিন্তু রিলকের জীবন নিয়ে শুধু ডকুমেন্টারিও নিশ্চয়ই নয় এই নাট্যময় আলেখ্য তবে সবাঙ্গীণ শিল্পশোভন হয়েও সেতু গড়তে দেয় না অভিনয়—হয়তো তাই এই স্বীকারোক্তির আড়াল। সুনীল দাসের নির্দেশনায় অনেক নিপুণভাবনা আছে যেমন মঞ্চ পরিকল্পনা। একপাশে পূর্ণেন্দু পত্রীর সামান্য অলঙ্করণে দৃশ্যের আভাস দেওয়া—বিশেষত লু সালেমে আন্দ্রেয়াস এবং ক্লারার সঙ্গে রিলকের সম্পর্কে চিড় খায় তখন দুটি ছেলে মেয়ের মুখ দুদিকে। রিলকের আত্ম বিশ্লেষণের সময় একজন পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকে, দ্বিতীয় সত্তা মাঝে মাঝে এগিয়ে আসে। মঞ্চের একদিকে ব্যালান্স করে আবরণ, পিছনে সাইক্লোরামা আছে স্লাইড দেখানোর জন্য—দুদিকে আচ্ছাদনের ফলে সাইক্লোরামার সাদা রংকখনও একঘেয়ে হয় না। প্রায় সব সময়েই স্লাইড দেখানো হয়েছে, সেটা কি ইচ্ছাকৃতভাবে দর্শকের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার জন্য? রিলকের কবিতা আবৃত্তি হয়, সেইটি আবার স্লাইডে দেখানো হয়, কেউ পড়তে পারে না, রঁদ্যার বর্ণনার সময় ভাস্কর্য দেখানোটা জরুরী কিন্তু বুদ্ধদেবকে দেখানো দেখাবার অধিকন্তু। সময় বিশেষে স্লাইড বৈচিত্র্য আনতে পারতো, সবসময় দেখানোর জন্য স্বাদ হারিয়ে যায়। একই ভাবে প্রায় সবক্ষণ আবহ চলে, কিন্তু সৌমেন ঘোষের নির্বাচন চমৎকার ফলে মোৎসার্ট, বিটোভেন, প্রতিটি দৃশ্যে রং বদলাতে সাহায্য করে। বিশেষত প্রথম প্রথম ও শেষ দৃশ্যে ব্যবহৃত স্টীল পাইপটি অতুলনীয়। মাঝে মাঝে কবিতার ভাবনার শরীরী রূপ দেওয়া হয়। শুভাশিস ভট্টাচার্যের নৃত্য পরিকল্পনায় নাটককে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। শুধু সাপুড়ে বাঁশির কবিতা অনেকটা আক্ষরিক অঙ্গ সঞ্চালন। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বা অরফিউস কবিতা গুচ্ছের সময় বোঝা যায় নৃত্য নাটক গড়তে কতখানি সাহায্য করতে পারে। গ্যোয়টে, হাইনে, বৃশনার, হোল্ডারলীন, ক্লাইস্ট নাট্যচর্চায় শেষতম সংযুক্তি রিলকে। কিন্তু এই কোলাজ প্রচেষ্টা স্মরণীয় হতে পারত অভিনয় সমৃদ্ধ হলে। আবৃত্তি অংশ যেখানে নিয়ে যায়, গদ্য সংলাপ ততটাই স্থাণু করে দেয়। শিল্পীদের অনেকেই সংলাপের ছন্দ বিভাগ করতে পারে না। রিলকে টলস্টয়কে বলেন "ঈশ্বর আমার প্রতিবেশী; মাঝখানে একটা সুপ্ত দেওয়াল যে কেউ ডাক দিলেই দেওয়াল ভেঙে যাবে" এই কথা ঈশ্বরের প্রতি কবিতা গুচ্ছে যত সহজে বোঝা যায়, সহজ গদ্যে সেই প্রেরণা আনা যায় না। রঁদ্যা ভাবেন পাথরের মধ্যেই ঈশ্বর, কাজের মধ্যেই তাঁর ঈশ্বর। অল্প কথায় বলা যেমন তিন স্তবকে খাঁচার মধ্যে চিতা নিয়ে কবিতা, বা বুদ্ধদেব নিয়ে কবিতা আবৃত্তিতে বোঝা গেল কিন্তু অভিনয়ে কখনই দ্বন্দ্ব বোঝানো যায় না। একজনকে কথকের মত সূত্র ধরিয়ে ঘটনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। আন্দ্রেয়াস বলে "আমি হতে পারতাম মা কিংবা প্রেমিকা" আবার যার সঙ্গে বিয়ে হয় সেই ক্লারা "কাজের জগতের লোক"—শেষ আশ্রয় ন্যানির কাছে—এই খানেই নাট্যমহিমা, রিলকের ভ্রাম্যমান জীবন। রিলকের ভূমিকায় শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায় শেষদিকে মানিয়ে নিলেও প্রথম দিকে স্বচ্ছন্দ নন—হাত নিয়ে তিনি অসুবিধায় পড়েন। আন্দ্রেয়াস নাম দিলেন রাইনার মারিয়া রিলকে—রিলকের খুশি শুধু প্রদীপ করের আলোয় উদ্ভাসিত অভিনয়ে নয়। সুদেষ্ণা রায় কয়েক জায়গায় অপ্রস্তুত হলেও একটি ব্যক্তিত্ব আরোপ করেন। তাঁর ছোট ছোট দৃশ্য, সংলাপগুলি হয়ত চরিত্র গঠনের অন্তরায়। কিন্তু ক্লারা চরিত্রে বন্যা রায় কোন দায়িত্বই পালন করতে পারেননি। সংবর্ত নিশ্চিতভাবেই নতুন নাট্যভাবনার শরিক করে নিতে পারেন অনেককে কিন্তু তার জন্য প্রাথমিক শর্ত মানতে হবে, সেই দায়িত্ব অভিনয়ের। সংবর্ত রিলকের মৃত্যু তারিখের ভ্রম সংশোধন করে নিলেন।

জরুরী ভ্রম সংশোধন

প্রয়োজন ছিল চরিত্রের মেক আপে

দেবাশিস দাশগুপ্ত

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

বি বি ধ

জলসাঘরের আমি 'নই'

প্রতিবছরের মত এবারেও শিল্পী সংসদ সভাপতি উত্তম চট্টোপাধ্যায়কে দর্শকদের মনে করিয়ে দিতে হল ? সেলুলয়েড মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মদিন, শোকযাত্রীর বেশ আনন্দকে চাপা দিতে না পারে, এই বছর উত্তমকুমারের জন্মদিন উপলক্ষে অনেক অনুষ্ঠান হল পথে ময়দানে এবং পথে প্রেক্ষাগৃহে। শুধু জনপ্রিয় চিত্রাবলী দেখবার ভিড় নয়। শিল্পী উত্তমকুমার শিল্পীদের জন্য ভেবেছিলেন, তারই ফলশ্রুতি শিল্পী সংসদ। শিল্পী সংসদ উত্তমকুমারের জন্মদিন পালন করলেন আইস স্কেটিং হলে। দেবনারায়ণ গুপ্ত যে জনপ্রিয়তার কথা বলেন, সবাব্রত গুপ্ত যে নিষ্ঠার কথা বলেন, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় যে উদারতার কথা বলেন, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় যে সাহসিকতার কথা বলেন—সেগুলি ভোলা যায় না বলেই তিনি উত্তমকুমার। আসরে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন—শুধু শোভাবর্ধনের জন্য নয়, সক্রিয় অংশীদার হয়ে, সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করে শ্রদ্ধা জানালেন অনেক প্রখ্যাত শিল্পী। উত্তমকুমারের নামে একটি মঞ্চ স্থাপিত হল, প্রতিমূর্তির শিলান্যাস হল। একটি রাস্তার নামকরণ হল। উত্তমকুমারের স্বপ্ন—শিল্পীদের কল্যাণের জন্য অনেক কাজও করা হচ্ছে। বিভিন্ন পর্যায়ে দানের সংখ্যা কম নয়। জনপ্রিয়তার একটি অন্যদিকও আছে। যে কোন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের লোকান্তরের পর শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রতিযোগিতা চলে। আজ ছয় বৎসর বাদে অনিল চট্টোপাধ্যায় জানালেন, শিল্পী সংসদের নাম করে অনেক অবাঞ্ছিত লোক উত্তমকুমারের নামে ব্যবসা করে যাচ্ছে। শোকের প্রথম ধাক্কায় অনেক অসংগতি থাকলেও, এখন সেই দিকে নজর দেওয়া দরকার যাতে তাঁর মহান স্মৃতি কলঙ্কিত না হয়।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

নিদর্শন। দেবী এখানে দশভূজা। মূর্তিটির অনেকাংশ পুনর্নির্মিত। মায়ের মুখে যে একটি অনবদ্য কৌতুকহাস্য আছে, উড়িষ্যার অন্য কোন মন্দিরের মহিষমর্দিনী মূর্তিতে আমি তা লক্ষ করিনি। শ্রীদাস মূর্তিতত্ত্বের দিক থেকে মহিষমর্দিনীর যে আলোচনা করেছেন, তা ভাস্কর্য-মূর্তি শিল্পের ইতিহাসের দিক থেকে বিশেষ মূল্যবান দলিল হয়ে থাকবে।

বেশ কতগুলি প্রবন্ধ আছে যা বিশেষভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফসল। দুটি রচনা আছে শৈবতন্ত্র সম্বন্ধীয়। দেবলা মিত্রের "বালিয়ার ভুবনেশ্বর মহাদেব মন্দির" মন্দির স্থাপত্যের উপর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এই স্থাপত্যশিল্পের আর একটি বিশদ পরিচয় আছে ডি মুখার্জী এবং মহেশ্বর পি যোশীর রচনা দুটিতে। চারুশিল্প সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ক'টির মধ্যে কার্ল জে খাণ্ডালওয়ালার শিল্পী ফারুক বেগের উপর রচনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মোগল শিল্পকলার ইতিহাসে ফারুক বেগ একটি প্রয়োজনীয় নাম যার উল্লেখ আছে আকবর নামাতে। সেই শিল্পীর ইতিহাস দিয়েছেন খাণ্ডালওয়ালা। মিলড্রেড আর্চারের প্রবন্ধটির নাম "জর্জ ল্যাণ্ডসীয়ার : ভারতীয় স্থানচিত্রকলায় একটি বিস্মৃত নাম।" ইংরেজ রাজত্ব এদেশে কিছুটা স্থায়িত্ব পাবার পর থেকেই কিছু কিছু শিল্পীও ভারতবর্ষে এসেছেন, তাঁদের শিল্পকর্ম এখন ক্রমশ শিল্পরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। জর্জ ল্যাণ্ডসীয়ার এমন একজন শিল্পী সিপাইযুদ্ধের পর যিনি ভারতে এসে সতেরো বছর কাটিয়েছেন, এঁকেছেন স্থানিক ছবি, রাজারাজড়ার প্রতিকৃতি। প্রবন্ধটি শিল্পরসিক এবং ঐতিহাসিকদের দিক থেকে কৌতূহলোদ্দীপক।

অশোককুমার ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধে নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলাতে প্রধানত অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত শিল্পধারার উদ্ভবের এবং ক্রমবিকাশের কথা বলতে চেয়েছেন। নব্যবঙ্গীয় শিল্পকলার সূত্রপাত হয় প্রধানত উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে। ঈ বী হ্যাভেলের সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই অবনীন্দ্রনাথের হাতে নতুন শিল্পধারার পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। ১৮৯৫ সালে অবনীন্দ্রনাথ রাধাকৃষ্ণ চিত্রমালা আঁকেন। ১৯০২ সালে আঁকা হয় 'সাজাহানের মৃত্যু'। হ্যাভেলের অনুরোধে গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে যোগ দেন ১৯০৫ সালে। এই ইতিহাস বিশদভাবে ব্যক্ত করেছেন শ্রীভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধে। সেই উত্তেজনাময় যুগের একটা সামাজিক পটভূমি তিনি তুলে ধরেছেন, কিন্তু আশ্চর্যভাবে নীরব থেকেছেন স্বদেশী আন্দোলনের অপরোক্ষ প্রভাব উল্লেখ করা থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ ভাগ থেকে যে স্বদেশী চেতনা বাঙালীর মনকে উদ্বেলিত করতে থাকে, এই নব্যশিল্পকলার প্রকাশের মধ্যে নিঃসংশয়ে তা প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করেছে। শিল্পসৃজনে ভারতীয় রীতির প্রয়োগ, যেমন রেখার প্রাধান্য, আলোছায়া বর্জন, ছবিকে দ্বিমাত্রিক হিসেবে দেখা এ সবই ভারতীয় অহমিকার ফলশ্রুতি বলা চলে। এই অহমিকার দার্শনিক সমর্থন এসেছিল নিবেদিতা, ওকাকুরা, ডক্টর কুমারস্বামী প্রভৃতির কাছ থেকে। এই ভারতীয়ত্বের অহমিকার মধ্যে যে এই শিল্প-আন্দোলনের মৃত্যুবাণ লুকনো ছিল, তা অনেকের কাছেই ধরা পড়েনি। এই স্কুলের অনেক শিল্পীর মধ্যে অসামান্যতা সত্ত্বেও, প্রিরাফেলাইট চিত্র আন্দোলনের মত এই আন্দোলন তার অকালমৃত্যু রোধ করতে পারেনি। একমাত্র বোধ হয় নন্দলালই ব্যতিক্রম যিনি শেষ পর্যন্ত সধর্ম বজায় রেখে ক্রমশ উদ্ভাসিত হয়েছেন।

সঙ্গীত ও নৃত্যের উপর দুটি প্রবন্ধ আছে, লিখেছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এবং মৃণালিনী সরাভাই। কারুশিল্প, যেমন বাংলাদেশের সোলার কাজ, ভারতীয় অলঙ্কারশিল্প, সপ্তদশ শতাব্দীর মোগল কার্পেট প্রভৃতি বিষয় নিয়ে রচনাগুলি তথ্যসমৃদ্ধ। বহির্ভারতের শিল্পকলার উপর দুটি রচনা উল্লেখযোগ্য।

কয়েকটি সামান্য অনুযোগ উল্লেখ করি : পুস্তকটির ক ভারের শেষ পৃষ্ঠায় মূল্য উল্লেখ আছে ৭০০ টাকা। মুদ্রণপ্রমাদ কি না বোঝা গেল না। বইটির ভূমিকায় সম্পাদকদ্বয় জানাচ্ছেন ভারত গভর্নমেন্টের উদার দানের দ্বারা এই বই প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই আকাশ-ছোঁয়া দাম অর্ধেন্দ্রকুমারের স্মরণ উৎসবের ফসল সংগ্রহে উৎসুক বহু ব্যক্তির পক্ষে বাধা হয়ে থাকবে। চিত্রকলার প্রতিলিপিগুলি, বিশেষ করে অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পীদের কাজ মূল বর্ণে প্রকাশিত হলে বইটির মর্যাদা বাড়তো। অর্ধেন্দ্রকুমারের রচিত পুস্তক এবং স্বদেশ ও বিদেশে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধাবলী, যা এ পর্যন্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি, তার একটি তালিকা এই সংগ্রহে স্থান পেলে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার দৃষ্টান্ত সুস্পষ্ট হত।

ধ্রুপদী তিন কাব্য

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

ওমর খৈয়াম মেঘদূত গীতগোবিন্দ/ (সং) প্রণব বাহুবলীন্দ্র/ (অনু) শ্যামলকান্তি দাশ, সুধীর গুপ্ত, কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়/ ময়না প্রকাশনী/ কল-৯/ ৬০·০০

সাহিত্যের সর্বকালের সেরা তিন মহাকবির তিন ধ্রুপদী কাব্যকে একসঙ্গে পরিবেশন করার পরিকল্পনাটি অভিনব। একাদশ শতাব্দীর পারস্যের কবি ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত, কালিদাসের মেঘদূত এবং জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্য বাংলায় এর আগে বহুবার অনূদিত হয়েছে। কিন্তু একত্রে এই তিন মহাকাব্য নিয়ে কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। এদিক থেকে বর্তমান সংস্করণটি বাঙালি পাঠককে মহাকাব্যের তুলনামূলক বিচারের একটা সহজ সুযোগ করে দেবে।

ওমর খৈয়াম ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার মানুষ। তাঁর স্বদেশ তাঁকে বিজ্ঞানী হিসেবে শ্রদ্ধা করত। কিন্তু সমকালীন পারস্যে কবিখ্যাতি তাঁর ভাগ্যে বিশেষ জোটেনি। ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। বহু কবি ও সাহিত্যিক সমকালীন পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েও পরবর্তীকালে একেবারে হারিয়ে যান। তাঁদের সাহিত্যকর্মের গুরুত্ব এভাবে ক্রমেই অবলুপ্ত হয়ে যায়। অন্যদিকে ওমর খৈয়ামের মতো কবিদের, যাঁরা সাহিত্যের হাতে নগদ বিদায়ে বিশ্বাসী নন, যথাযথ স্বীকৃতির জন্য এমন কি কয়েক শতাব্দীও অপেক্ষা করতে হয়। একাদশ শতকের কবি ওমর খৈয়ামকে উনিশ শতকে আবিষ্কার করেছিলেন ইংরেজ কবি এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড। ফিটজেরাল্ড ১৮৫৭ সালে রুবাইয়াত অনুবাদ করেন। কিন্তু সে-অনুবাদেরও তাৎক্ষণিক স্বীকৃতি মেলেনি। দু বছর ধরে চেষ্টা করার পরও যখন ফিটজেরাল্ড রুবাইয়াতের প্রকাশক পেলেন না, তখন তিনি নিজেই বইটি বের করেন। ফিটজেরাল্ড নিজের অর্থব্যয়ে প্রকাশ করেছিলেন মাত্র ২৫০ কপি বই। সে বইয়েরও পাঠক ছিল না। বছর দুয়েক এভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর, হঠাৎই ফিটজেরাল্ডের অনুবাদের দিকে নজর পড়ল

রসেটি, সুইনবার্ন, রাস্কিনের মতো কবিদের। এর পরই ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত নিয়ে শোরগোল উঠল। সুতরাং সাহিত্যে তাৎক্ষণিক স্বীকৃতি না পেলেও হতাশ হওয়ার কারণ নেই। এদিক থেকে ওমর খৈয়াম নিষ্ফলের হতাশের দলে নতুন আশার সঞ্চার করবেন। অন্যদিকে কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের বিরহী যক্ষ এখনও প্রেমিকের সন্তপ্ত হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে পারেন সান্ত্বনার বাণী। কবি জয়দেব তাঁর শ্রীগীতগোবিন্দকে প্রবন্ধ সঙ্গীত নামে আখ্যা দিয়েছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি হয়েও তাঁর শ্রীগীত গোবিন্দে লক্ষ্মণসেনের স্তুতিবাচক কোনও পদ নেই। বরং আছে বুদ্ধস্তব। একদিক থেকে ওমর খৈয়াম, কালিদাস ও জয়দেবের মানসিকতার মিলও আছে। তাঁরা তিনজনেই ছিলেন রূপ ও সৌন্দর্যের উপাসক। কিন্তু তাঁদের নিছক ভোগবাদী কোনওভাবেই বলা যাবে না। তাঁদের কাব্যের আছে নিগূঢ় সামাজিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য। স্বয়ং চৈতন্যদেব ছিলেন জয়দেবের কাব্যের অনুরক্ত পাঠক। নতুন কালের পাঠকরা যেন ধ্রুপদী কাব্যগুলির সামাজিক তাৎপর্য সম্পর্কেও অবহিত থাকেন। বর্তমান সংস্করণটি সেদিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। তিন কবির দেশকাল এক নয়। কিন্তু তাঁদের কাব্যকে একসঙ্গে গ্রথিত করার অন্যতম উদ্দেশ্য হয়তো এটাই। রুবাইয়াত, মেঘদূত ও শ্রীগীতগোবিন্দের গ্রন্থনা ও গদ্য ভাষান্তরের দায়িত্ব নিয়েছেন অধ্যাপক প্রণব বাহুবলীন্দ্র। তিন কবির প্রেক্ষাপট ও সংশ্লিষ্ট ইতিহাস নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। আলোচনা করেছেন অনুবাদের নান্দনিক সমস্যাদি নিয়েও। বাংলায় কারা এই তিন কবির কাব্য অনুবাদ করেছেন, কেমন হয়েছে সে-সব অনুবাদ এ সম্পর্কেও তিনি সবিস্তারে তাঁর অভিমত জানিয়েছেন। তাঁর আলোচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ হলেও, ভাষা সহজ সরল। ফলে সাধারণ পাঠকও বিষয়ের গভীরে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারবেন। কিন্তু জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দের আলোচনায় জরুরী বহু সূত্র বাদ গিয়েছে। শ্রীগীতগোবিন্দের গবেষণামূলক যে দীর্ঘ ভূমিকাটি পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, তা এক্ষেত্রে তাঁকে কিছু পথের নির্দেশ দিতে পারত। মুখবন্ধে অলোক রায় অনুবাদ ও ছন্দ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ওমর খৈয়ামের অনুবাদ করেছেন তরুণ কবি শ্যামলকান্তি দাশ। তাঁর ছন্দের জ্ঞান নিখুঁত। অনুবাদও হয়েছে পাঠযোগ্য। সুধীর গুপ্ত অনূদিত মেঘদূত এবং কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায় অনূদিত শ্রীগীতগোবিন্দ কোথাও কোথাও আড়ষ্ট। বিশেষ করে মূল কাব্যের শব্দের ঝঙ্কার তাঁদের অনুবাদে অনেক সময় হারিয়ে গিয়েছে। গদ্য অনুবাদগুলির ক্ষেত্রে অবশ্য বিশেষ কিছু বলার নেই। সত্য চক্রবর্তী ও ভূপেন সেনের আঁকা ছবি ধ্রুপদী মেজাজটি অক্ষুণ্ণ রেখেছে। শ্রীগীতগোবিন্দের সূক্ষ্মালেখ্যগুলি সুন্দর।

ভয়ঙ্কর সুন্দর

বুদ্ধদেব গুহ

বেদে বাউলে
শিবশঙ্কর মিত্র
তরুণ পাবলিশার্স
কল ৭৩/২০.০০

শিবশঙ্কর মিত্র মশায়ের সুন্দরবন বিষয়ক নবতম বই "বেদে-বাউলে"র মুখবন্ধে ব্যবহৃত "আসিক্ত", "একাত্ম" একাত্মতাবোধ শব্দগুলি পাঠককে একটু ধাক্কা দেয়। এই উপন্যাস যতখানি না সুন্দরবন-বিষয়ক তার চেয়ে অনেকই বেশি সুন্দরবনের মানুষ-বিষয়ক। শিবশঙ্করবাবু সেই ধরনের লেখক নন যাঁরা জঙ্গলকে উপরে-উপরে একটু দেখেই বিশারদ সেজে বসে কলম ধরেন। ওঁর "সুন্দরবনের আজান সর্দার" বইখানি শুধু সুন্দরবনেরই নয় সুন্দরবনের মানুষদের জীবনেরও এমনই এক দলিল যা পৃথিবীর মহৎ-সাহিত্যের মধ্যে একটি বলে গণ্য হবার যোগ্যতা রাখে। 'আজান সর্দারের' অংশ বিশেষ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'র উপন্যাসের উচ্চতাতেই পৌঁছেছে। ঐ একটি বই লিখেই মিত্র মশায় ওঁর নিজের জন্যে এক অতি উচ্চস্থান বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে নির্ধারিত করেছেন। সুন্দরবনের গভীরে যাঁরাই একাধিকবার গেছেন তাঁরাই জানেন যে, এই আশ্চর্য

সুন্দর, নিথর নির্জন স্তব্ধতাময় ভয়াবহ 'ম্যানগ্রোভ ফরেস্টে'র সঙ্গে তুলনীয় বন পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে। এর সৌন্দর্যও যেমন অপূর্ব এর ভয়াবহতাও তেমনই অতীন্দ্রিয়। 'বেদে-বাউলেরই' মতো সুন্দরবনে যাঁরাই বাঘ শিকার করেছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম অসীম। শুধুই শিকারের গল্প অনেকেই লিখতে পারেন। এবং লেখেনও। শিকারের পটভূমিতে বনভূমির, বাদার মানুষদের করুণ এবং প্রায় মনুষ্যেতর এক জীবনযাত্রার হৃদয়গ্রাহী ছবি ফুটিয়ে তুলতে শিবশঙ্করের মতো লেখকই পারেন। সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্পর যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। তবে অসংখ্য নিরুপায়, গরীব, হতভাগ্য দেশবাসীকে বাঘের হাতে মরতে বাধ্য করে নরখাদক বাঘের সংখ্যা বাড়ানোর পিছনে কতখানি যুক্তি আছে তা এখনও বিচার করে দেখার অবকাশ আছে। শিবশঙ্করবাবুর এইই মত। এবং ওঁর মত অযৌক্তিকও নয় হয়তো। অনিল নাথ নামক বাদাবনের এক নবীন যুবক, যৌবন যার মধ্যে রায়মঙ্গল নদীরই মতো উচ্ছ্বাসে বহমান, গলায় যার 'কালুর' ডাকের মতো উদাত্ত তীক্ষ্ণ স্বরের গান, যার ডাক নাম 'বেদে' সেই বেদে-বাউলেই এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র। তার বেচারী বিধবা মা, তার প্রেমিকা মাধুরী, মাধুরীর ভাই সবুর, দিদিমণি, ডাক্তারবাবু, বিধবাপল্লীর দুঃস্থ মানুষদের সরল কিন্তু বিপজ্জনক জীবনযাত্রা, মহাজনদের অত্যাচার, সমাজ-সচেতন রাজনীতি-মনস্ক গ্রামীণ মানুষেরা, বহিরাগত কয়েকটি নকশাল ছেলে এদের সকলকে নিয়েই 'বেদে-বাউলের' উপাখ্যান। আরো অনেকেই অবশ্য আছেন। তবে প্রকৃত মূল চরিত্র সুন্দরবন এবং সুন্দরবনের জীবনই। এই বই পড়তে পড়তে নাকে সুন্দরবনের টাঁক আর খালের নোনা-গন্ধ আসে। গেন-বেগোন, দেয়ানি খাল, বানী-হ্যাতাল-কেওড়ার বন, পাশী বে-পাশী বন্দুক, রায়মঙ্গল, গোসাবা, ভাগাদোয়ানি নদী, নরখাদক বাঘে-ভরা বড়-চামটা, ছোট-চামটা, মিঠে পানির জন্যে মানুষের আকুলি-বিকুলি। এপার বাংলা ওপার বাংলার সুন্দরবনের এমন সজীব প্রাণবন্ত ছবি বোধহয় একমাত্র শিবশঙ্করবাবুই আঁকতে পারেন। বেদে-বাউলের বে-পাশী বন্দুকটি থাকে বনের গভীরে এক খলসে গাছের খোঁদলে। এক বিষবতী কালনাগিনীর জিম্মায়। যাঁরা সুন্দরবনের গভীরে নিজেরা কখনই যাননি,

তাঁরাও এই বই পড়লে সুন্দরবনকে অনুভব করতে পারবেন নিজেদের ধমনীতে।

চমৎকার বই। তবে "সুন্দরবনের আর্জান সর্দার" কিন্তু বেদে-বাউলের চেয়েও অনেক বেশি মর্মস্পর্শী উপন্যাস।

'বেদে-বাউলে'তে, উনি জীবনের বিভিন্ন দিক ঠাসবুনোনে একইসঙ্গে এনে ফেলেছেন। সামাজিক, অর্থনৈতিক,রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত বিষয়ের মিশেল করার পর, মনে হয়, উপন্যাসের মূল বক্তব্য ও পরিণতি সম্বন্ধে নিজেই যেন একটু অস্পষ্টতার শিকার হয়েছেন। শুধুই সামাজিক, ব্যক্তিগত, প্রাকৃতিক বা শুধুমাত্র রাজনৈতিক বক্তব্যেই উপন্যাসের বিষয়টি সীমিত থাকলে, ঐ পরিসরের মধ্যেই শিবশঙ্কর মিত্র তাঁর সুন্দরবন সম্পর্কিত মুন্সীয়ানার ছাপ, সুন্দরবনের পলিমাটিতে অমোঘ নরখাদক বাঘের পায়ের ছাপেরই মতো পাঠকের মনের মাটিতে রেখে যেতে সহজেই সমর্থ হতেন।

এই বিক্ষিপ্ততা সত্ত্বেও 'বেদে-বাউলে' চমৎকার, সত্য-নির্ভর, নির্ভেজাল জীবন-বেদে স্বচ্ছ একটি উপন্যাস। অভিজ্ঞতার যেহেতু কোনোই বিকল্প নেই সেই হেতুই এই বই অভিজ্ঞতার গুণেই পাঠকের সমাদর লাভ করবে।

শিবশঙ্কর মিত্র মশায়ের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেকই। ভবিষ্যতে তিনি আমাদের সুন্দরবন সম্পর্কিত আরও অনেক তথ্যসমৃদ্ধ ও দরদ-সম্পৃক্ত দলিল উপহার দেবেন এই আশা করব। সময় নিয়ে, সুন্দরবনের মানুষের জীবনযাত্রার সামগ্রিক ছবি একটি দীর্ঘ উপন্যাসে যদি তিনি তুলে ধরেন তাহলে সকলেই লাভবান হবেন।

'বেদে-বাউলে'র স্বল্প পরিসরই হয়তো প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিভিন্নতার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক রঙ নিয়ে ছবি আঁকতে বসলে এবং তাতে ব্যাপ্তি ফুটিয়ে তুলতে চাইলে ক্যানভাসের পরিসর বড় হলেই সুবিধে হয়।

শ্রীঅপরূপ উকিলের আঁকা প্রচ্ছদটি সুন্দর। শিল্পীরা অনেকেই উপন্যাসটি না পড়েই প্রচ্ছদ আঁকেন। তিনি সেই গোত্রীয় নন যে তা বোঝা যায় প্রচ্ছদের নিচের চোখজোড়ার জোড়া-ভুরু দেখে।

কথায় কথায় ভাষার কথা

তানাজী সেনগুপ্ত

কথার কথা/
সুভাষ মুখোপাধ্যায়/
দে'জ পাবলিশিং/
কল-৭৩: ১০.০০

এখনকার ছোটদের আমরা ঈর্ষা করি। তাদের দেখার জন্য আছে গুপী-বাঘা-র মতো মজার মজার ছবি, পড়ার জন্য ফেলুদা, কাকাবাবু সমেত রহস্য-রোমাঞ্চ আরও কত কি। আমাদের ছোটবেলায় কিন্তু এত বিচিত্র মানসিক আনন্দের ভোজ বসতো না। তবে প্রথম বাক্যটা কিন্তু

সত্যি সত্যি মন থেকে লিখিনি। ছোটদের কেউ হিংসে করে ? ছোটদের আনন্দিত দেখলে কোন বড়র না মন আনন্দে ভরে ওঠে ! এত সব মনে এল ছোটদের জন্য একটা ভালো বই হাতে পেয়ে। কঠিন এবং গম্ভীর বিষয় হিসেবেই যাকে আমরা জেনে এসেছি সেই ভাষাতত্ত্বকে একেবারে গল্পচ্ছলে ছোটদের জন্য শুনিয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কথার কথা' বইটিতে। বইটি হাতে পেয়েই মনে হয়েছে ইস ! এরকম একটা বই আমরা যদি ছোটবেলায় পেতাম ! ভাষার গড়ে ওঠা, ভাব প্রকাশে ভাষার ভূমিকা, বিভিন্ন দেশি-বিদেশি শব্দের ব্যবহার ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে গল্প করতে করতে ছোটদের অন্দর মহলে কখন যে লেখক ঢুকে পড়েন তা টেরই পাওয়া যায় না। এ তো জোর করে শেখানো, বোঝানো নয়, পড়তে পড়তে শেখা এবং বোঝা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটা বড় সুবিধা এই যে তিনি বড় কবি। তাই তাঁর কবিতার মতোই তিনি এখানে শব্দের ছবি আঁকতে আঁকতে এগোন। আর কে না জানে, ছোটরা বাক্য, ভারি ভারি কথার চেয়ে সহজ সরল আঁকিবুকিই বেশি পছন্দ করে। আর তাই এই বই তারা যে একটু বেশিই পছন্দ করবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি !

'কথার কথা' খুব একটা ভারি নয় আয়তনে, সাকুল্যে নব্বই পৃষ্ঠার। এর মধ্যেই আছে আটটি অধ্যায় এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে আছে একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপবিভাগ। লেখক খুব আস্তে আস্তে ছোটদের খাবার, চিবোবার এবং হজম করার সুযোগ দিয়ে এক থেকে অন্য অধ্যায়ে গিয়েছেন। প্রথম অধ্যায়টা বেশ বড়—নাম 'একের চেয়ে বেশি'। এক একটা নাম কেমন ভাবে বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতীক হয়ে ওঠে তারই আলোচনা আছে এই অধ্যায়ে। কথা আর ভাব কাকে বলে ? লেখক সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, 'সরব ভাষার নাম কথা, আর নীরব ভাষার নাম ভাব। আমরা তাই মুখ খুলে বলি, মুখ বুজে ভাবি।' 'টিকী ডুলতে গিয়ে' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে 'নানা মুনির নানা মত'-এর কথা। তৃতীয় অধ্যায়ে সামাজিক প্রয়োজনীয়তা থেকেই যে কথার জন্ম তা সহজভাবে বোঝানো হয়েছে। পরের অধ্যায়ে স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের তফাত, একই শব্দের নানা অর্থে প্রকাশ, প্রতিশব্দ এবং বাংলার বিপুল শব্দ ভাণ্ডার নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা। কতকগুলো চমৎকার খবরও এই অধ্যায়ে জানা হয়ে যায়। যেমন, শেকসপীয়র মোট ষোল হাজার আলাদা আলাদা শব্দ কাজে লাগিয়ে তাঁর নাটক লিখেছিলেন। 'সম্পর্ক পাতানো' অধ্যায়ে ভাব ও ভাষার যোগ রক্ষায় ব্যাকরণগত সম্পর্কের ভূমিকা আলোচিত—কর্তা, কর্ম, লিঙ্গ, কারক, বাচ্য এবং অব্যয় ইত্যাদি বহু পঠিত বিষয়গুলো মনে হয় যেন নতুন করে পড়ছি। 'বলতে বলতে বদল' অধ্যায়ে শব্দের অনবরত বদলের কথা বলা হয়েছে। 'মানচিত্র ও মানে' শীর্ষক অধ্যায়ে শব্দের অর্থের সঙ্গে সমাজজীবনের গভীরতর যোগাযোগের কথা আলোচিত। শেষ অধ্যায়ে 'দুনিয়ার ভাষা' যেমন ইংরেজি, চীনা, রুশ, জার্মান, আরবি ইত্যাদি নিয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন লেখক। যদিও তথ্যগুলো পুরনো।

এই ভাবেই পড়তে পড়তে দিব্যি অনেক বিষয়ে জানা হয়ে যায়। ছোটরা সঙ্গে বাড়তি কিছু ছবিও পাবে। ছবিগুলো কে এঁকেছেন ?—আঁকিয়ের নাম কিছু নেই। প্রকাশক যত্ন নিয়ে এই ধরনের বই যে ছেপেছেন তার জন্য অবশ্যই প্রশংসা করতে হয়। ভূমিকায় লেখক বইয়ের দোষত্রুটি ধরিয়ে দিতে বলেছেন। ছোটদের হয়ে আমি এখনই একটি দোষ ধরিয়ে দিতে পারি, তা হলো বইটা এত সংক্ষিপ্ত হওয়া ঠিক হয়নি। ভাষা বিষয়ে এত সহজ ও সুন্দরভাবে আরও কিছু জানতে পারলে ছোটদের আরও ভালো লাগতো। আশা করি সুভাষবাবু বুঝবেন—এটা ছোটদের মনের কথা, 'কথার কথা' নয়। ■

চ

ওরঞ্জন ঘোষ

বদেশের চোখে পথের পাঁচালি ৩৬, ৪৩, ২৩ আ ১৯৬৯ : ৩৭১-৩৭৫, স

দিও পাগল নই ২৯, ৪৭, ২২ সে ১৯৬২ : ৬৯৭-৭০০, রস

াম্প্রতিক থিয়েটার : শিকড় ও ডানা ৪৫, ১, ৫ন ১৯৭৭ : ৫১-৫৫, স

াবীব তনবীর : সাক্ষাৎকার, শশুরাল, কালারিন ৫০, ৪১, ১৩ আ ১৯৮৩ : ২৭-৩১, স

ত্রঞ্জন ঘোষ, *অনুলিখিত*

বীন্দ্রনাথের নাট্যচিন্তা সা ১৯৭৮ : ১০৭-১২৪, স

ত্রঞ্জন দাশ

দেশী আন্দোলনের কথা ৩৮, ২, ১৪ ন ১৯৭০ : ১২৭-১৩১, স

ত্রঞ্জন দাশ ৩৭, ৫২

ত্রঞ্জন দেব

অজানা এক বহ্নিকুসুম ও তার বৃন্ত শা ১৯৮১ : ১৯-২২, স

অপ্রচারিত রবীন্দ্রবাণীর উৎস সন্ধানে ৪৬, ৪৮, ৬ অ ১৯৭৯ : ৯-১২, স

ানন্দযজ্ঞের একটি ফুল কেমন করে ফুটলো ৫০, ৩৭, ১৬ জু ১৯৮৩ :১২-১৫, স

শ্বভারতীর কর্মধারা প্রবর্তনে রবীন্দ্রনাথের স্বলিখিত নির্দেশ ৪৫, ৪১, ১২ আ ১৯৭৮ : ৫১-৫২, স

বীন্দ্রজীবনে অপরিহার্য মন্ত্র ৫০, ৪০, ৬ আ ১৯৮৩ : ১৩-১৬, স

বীন্দ্র-জীবনের ইতিবৃত্ত ও কালক্রম প্রসঙ্গে ৪৮, ৮, ০ ডি ১৯৮০ : ৩৩-৩৫, স

বীন্দ্রনাথের একটি কবিতা : সূচনা ও সম্পূর্ণতা ৪৯, ৭, ৮ মে ১৯৮২ : ১৩-১৫, স

বীন্দ্রনাথের ডাক্তারী ৩৭, ৪৪, ২৯ আ ১৯৭০ : ৪৭-৪৫২

বীন্দ্রনাথের প্রথম পাবলিক ভাষণ ৪৭, ১৩, ২৬ জা ৯৮০ : ১১-১৬, স

বীন্দ্রনাথের শেষ দু'টি গানের জন্ম সা ১৯৭৯ : ১১

বীন্দ্রনাথের হাতে লেখা সর্বশেষ কবিতা ৪৮, ২৯, আ ১৯৮১ : ৯-১১, স

বীন্দ্র রচনায় বঙ্কিম প্রশস্তি ৪৬, ৩৪, ২৩ জুন ৯৭৯ : ১১-১২, স

তবর্ষ পূর্বের সন্ধ্যাসঙ্গীত ৪৯, ৩৫, ৩ জু ১৯৮২ : ১২, স

ন্তিনিকেতনের জন্মবর্ষ এবং জন্মদিন প্রসঙ্গে ৪৯, ২৬ ডি ১৯৮১ : ৯-১০, স

াস্বতীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় ৪৯, ৪৫, ১ সে ১৯৮২ : ১৩-১৭, স

জপাঠের সুবর্ণজয়ন্তী ৪৭, ৩৯, ২৬ জু ১৯৮০ : ৭-৩৯, স

ঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ইজাক সিঙ্গার ৪৬, ১, ৪ ন ১৯৭৮ : ৪৭-৫৫, স

মাদের পাঠ্যপুস্তক ২২, ১৬, ১৯ ফে ১৯৫৫ : ১১-১৭৪

র্নেস্ট হেমিংওয়ে ২২, ১, ৬ ন ১৯৫৪ : ৫৯-৬২,

লবেয়ার কামু ২৫, ১, ২ ন ১৯৫৭ : ১৭-২০, স ; , ১১, ১৬ জা ১৯৬০ : ৮১৩-৮১৬, স

ইন্ডিয়া আপিস লাইব্রেরী শা ১৯৫৫ : ১৫১-১৫৭, স

ইভো আন্দ্রিচ ২৯, ২, ১১ ন ১৯৬১ : ১১৭-১২০, স

কবি আলেকজান্দারে ৪৫, ২, ১২ ন ১৯৭৭ : ১৩-১৫, স

কোষগ্রন্থের কথা ২৬, ৩৮, ১৮ জু ১৯৫৯ : ৯২১-৯২৫, স

গার্সিয়া মার্কেজ ৫০, ৮, ২৫ ডি ১৯৮২ : ১৯-২০, স

গ্রন্থাগারিক বিপিনচন্দ্র ২৬, ১৬, ১৪ ফে ১৯৫৯ : ১৬১-১৬৩, স

জাতীয় গ্রন্থতালিকার ভূমিকা ২২, ২৭ (সা), ৭ মে ১৯৫৫ : ৫৩-৫৯

জাতীয় সাহিত্য উন্নয়নের পরিকল্পনা ২৫, ২৮ (সা), ১০ মে ১৯৫৮ : ১৭৩-১৮০

জার্মান সাহিত্যে ভারত শা ১৯৫৮ : ৯১-৯৬, স

টমাস মান ও বেতাল পঞ্চবিংশতি ২৪, ৩৮, ২০ জু ১৯৫৭ : ৯২৯-৯৩৪, স

দূরের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ ২১, ২৭ (সা), ৮ মে ১৯৫৪ : ৬২-৭০

ফুলমণি ও করুণা শা ১৯৫৬ : ১৩০-১৩৬, স

বরিস পাস্তেরনাক ২৬, ২, ৮ ন ১৯৫৮ : ৮৯-৯৭, স

বাংলা উপন্যাসে ভারতচিন্তা ৩৪, ২৭ (সা), ৬ মে ১৯৬৭ : ৮১-৮৭, স

বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা ৩১, ২৭ (সা), ৯ মে ১৯৬৪ : ১৩৩-১৪০, স

বাংলা সাহিত্যে অশ্লীলতা ২৮, ১০, ৭ জা ১৯৮১ : ৭৮৩-৭৮৫

ভারতীয় প্রকাশন শিল্প ২৪, ২৮ (সা), ১১ মে ১৯৫৭ : ২১৪-২২০

শিবনাথ শাস্ত্রী ৩৩, ২৭ (সা), ৭ মে ১৯৬৬ : ৬৫-৭৫, স

সমকালীন সমালোচনার ধারা ২৫, ৪৪, ৩০ আ ১৯৫৮ : ২৯৯-৩০৪

সল বেলো ৪৪, ৫, ২৭ ন ১৯৭৬ : ৩২১-৩২৯, স

সাংখ্য বিপ্লবের ঐতিহ্য ২৫, ১৩, ২৫ জা ১৯৫৮ : ৯০২-৯০৮

সাহিত্য : আঠারো শতকের বাংলা চিঠি ৪৯, ২০, ২০ মা ১৯৮২ : ৭১, স

সাহিত্য : এলিয়াস কানেত্তি ৪৯, ৩, ২১ ন ১৯৮১ : ৪৯-৫১, স

সুইডিস সাহিত্য : আধুনিক যুগ ২৭, ২৭ (সা), ৭ মে ১৯৬০ : ১১৩-১১৮, স

হালডর কিলজান ল্যাক্সনেস ২৩, ২, ১২ ন ১৯৫৫ : ৯৫-১০৪, স

চিত্তশুদ্ধির দিকে। বিজয়া মুখোপাধ্যায় ৪০, ৩৬

চিত্র সেন

জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারী—বোম্বাই ২১, ২০, ২০ মা ১৯৫৪ : ৪২১-৪২৫

জাপানী পুতুল ২২, ৫, ৪ ডি ১৯৫৪ : ৩৫৪-৩৫৫, স

চিত্রকর ও চিত্রসমালোচনা। সুধীর খাস্তগির ৩২, ৩৪

চিত্রকরের চোখে হাভানার যুব উৎসব। সন্দীপ সরকার ৪৫, ৪৯

চিত্রকলা ২১ ৩৬ ; ২১, ৪৮ ; ২২, ১৪ ; ২৩, ৩০ ; ২৬, ১৭ ; ২৮, ৩০ ; ২৮, ৪০ ; ২৯, ৮ ; ২৯, ৩৬ ; ৩০, ২৮ (সা) ; ৩৩, ১০ ; ৩৩, ১২ ; ৩৩, ২৫ ; ৩৩, ২৮ ; ৩৩, ৩১-৩৩, ৫০ ; ৩৪, ৭ ; ৩৪, ২২ ; ৩৬, ৪০ , ৩৮, ৪০ ; ৪৪, ১৯ ; ৪৪, ৪১-৪৪, ৪৯ ; ৪৫, ২১ ; ৪৫, ২৮ ; ৪৫, ৩৭ ; ৪৫, ৪৯ ; ৪৬, ৩১ ; ৪৯, ৯ ; ৪৯, ১৮ ; ৪৯, ২৮ ; ৪৯, ৩১ ; ৫০, ২৫-৫০, ৪১ ; ৫০, ৩৫ ; শা ১৯৬৫ ; বি ১৯৭৩ ; বি ১৯৭৯ ; বি ১৯৮২

চিত্রকলা—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ২৭, ৩৬

চিত্রকলা *আরও দেখুন* লোকচিত্র

চিত্রকলা—চীন ২৪, ৫১

চিত্রকলা—জাপান ৩৪, ৮

চিত্রকলা—জার্মানী ৫০, ৪৫

চিত্রকলা—ফ্রান্স ২২, ৩৭ ; ২৯, ৩৪ ; ৩৩, ১৫-৩৩, ১৭ ; ৪৫, ১৭ ; ৪৬, ৫-৪৭, ১৮

চিত্রকলা—বাংলাদেশ ৩৮, ৩৭

চিত্রকলা-ব্যঙ্গচিত্র ৩৮, ৯ ; ৩৯, ১১ ; ৩৯, ৩৬ ; ৩৯, ৪১ ; ৪০, ২৯

চিত্রকলা—লিথোগ্রাফ ৩১, ৪৩

চিত্রকলার মুক্তি। জ্যোতির্ময় দত্ত ৩৬, ৯ (বি)

চিত্রকূট—বিবরণ ও ভ্রমণ ৪৭, ১০

চিত্রগত কাহিনী। নীরোদ রায় ৩৩, ১৭-৩৪, ৫ ; ৪২, ১৩-৪২, ১৯

চিত্র-চোর ৩০, ৩১

চিত্র-নিভা। শোভন সোম ২৪, ১১

চিত্রনিভা চৌধুরী

নন্দনের কুঞ্জতলে ৩৩, ২৮, ১৪ মে ১৯৬৬ : ২৮১-২৮৬, স

চিত্রপরিচালনা। বাসু ভট্টাচার্য ৩৬, ৯ (বি)

চিত্রপ্রদর্শনী ২১, ১৩ ; ২২, ১১ ; ৩৮, ১৭ ; ৪৯, ৩৬

চিত্রপ্রদর্শনী গৃহ ২১, ২০

চিত্রমালা। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৪৯, ১

চিত্ররথ দত্ত

গর্ব-সুখ ৪১, ১৬, ১৬ ফে ১৯৭৪ : ১৯৩-১৯৯, গ

ঘোষদা ৪০, ৩২, ৯ জুন ১৯৭৩ : ৬৫৩-৬৫৫, গ

তুমি কি বেসেছ ভালো ৪২, ৩, ১৬ ন ১৯৭৪ : ১৭৯-১৮৩, গ

পরমা ৩৯, ৪৭, ২৩ সে ১৯৭২ : ৭৬৫-৭৭৪, গ

ফরটি ফোর ডাউন ৪৩, ২২, ২৭ মা ১৯৭৬ : ৬১১-৬২৫, গ

চিত্ররেখা গুপ্ত

সীলমোহর ৪০, ২৮, ১২ মে ১৯৭৩ : ১৭৯-১৮৩, স

চিত্রল হরিণী। কিরণশঙ্কর মৈত্র ৪৭, ১৮

চিত্রশালা। নরেন্দ্রনাথ মিত্র ২৮, ১৪

চিত্রশিল্পী উইলিয়ম ব্লেক। বিশ্বনারায়ণ রায় ২৬, ১০

চিত্রশিল্পী গগনেন্দ্রনাথ। কানাই সামন্ত ২৫, ১৭

চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ। শিবনারায়ণ রায় ২২, ২৭ (সা)

চিত্রশিল্পী শশিকুমার হেস। কমল সরকার ৩৯, ২৩

চিত্রশিল্পী সোনিয়া দা লাওনে। বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮, ৫

চিত্রশিল্পী হেমেন মজুমদার। বারিদবরণ ঘোষ বি ১৯৮১

চিত্রশিল্পে—নারী শা ১৯৫৫

চিত্র সমালোচনা ৩২, ৩৪

চিত্র সমালোচনার মূল্যায়ন। অটো প্রেমিঞ্জার শা ১৯৬৫

চিত্র সাংবাদিক ২৩, ২৪

চিত্রা দেব

শিল্পক্ষেত্রে নন্দলাল বসুর ছাত্রীদের ভূমিকা বি ১৯৮২ : ১৪৯-১৫৬, স

সাহিত্য : শরৎকুমারী চৌধুরানী : শুভবিবাহ ৪৭, ৩৯, ২৬ জু, ১৯৮০ : ৪১-৪২, স

সাহিত্য : শৈলবালা ঘোষজায়া : শেখ আন্দু ৪৮, ১৮, ১৬ মে ১৯৮১ : ৪৭-৫১, স

সাহিত্য : হরিপ্রভা তাকেদা : বঙ্গ মহিলার

"মা, তোমার রান্না না, এক্কেবারে ফার্স্ট ক্লাস

"নিউ ইণ্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স? নিশ্চয়ই!"

"সত্যি, এমন আশীর্বাদ আর হয় না। আমাদের যা কিছু আছে সর্বস্ব হারালেও নিউ ইণ্ডিয়া টাকা দিয়ে সে ক্ষতি পূরণ করবে। ব্যাপারটা ভেবে দেখুন একবার!"

এছাড়াও, আরো অনেক, অনেক কিছুর জন্যে নিউ ইণ্ডিয়া সুরক্ষা দেয়। যেমন, টি ভি সেট বিকল হলে, সাইকেলের অস্বাভাবিক ধরনের অ্যাক্সিডেণ্ট হলে, গুরুতর অসুখের জন্যে হাসপাতালে থাকতে হলে, অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, চুরি বা দাঙ্গা হলে... এ হল নিউ ইণ্ডিয়ার নবপ্রবর্তিত বহু রকমারি সেবা-ব্যবস্থার কয়েকটি মাত্র।

জেনারেল ইন্সিওরেন্সের অগ্রণী হিসেবে নিউ ইণ্ডিয়া বীমার যেকোনো এবং প্রতিটি প্রয়োজন মেটাতে সবচেয়ে বেশী রকমের সুরক্ষা-সম্ভার নিবেদন করে থাকে ... তা সে শহুরে বা গ্রাম্য, ব্যবসা সংক্রান্ত বা ব্যক্তিগত যাই হোক — মোট ৭৮ রকমেরও বেশী বিভিন্ন পলিসি আছে।

ভারতে এবং বিদেশে অবস্থিত ৬০০ টি দপ্তর আশ্বাস দেয়, যে নিউ ইণ্ডিয়া আপনার বীমা সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার জবাব দিয়ে আপনাকে সাহায্য করতে সদাপ্রস্তুত [illegible] আপনাকে আপনার প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দে[illegible] উন্নত করে তুলবে।

NEW INDIA ASSURANCE

কত কম দিয়ে...কত বেশী সুরক্ষা!

নিউ ইণ্ডিয়ার রকমারি বীমা পলিসি:

ক্যান্সার বীমা, ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা, হাসপাতালের চিকিৎসা এবং স্থায়ীভাবে হাসপাতালের চিকিৎসা পলিসি, ডোমেস্টিক প্যাকেজ পলিসি, যাবতীয় ঝুঁকির জন্যে বীমা, চুরিডাকাতি ও সিঁদ কাটা সম্বন্ধীয় বীমা, আগুন সম্বন্ধীয় বীমা, আগুন ও চুরি সম্বন্ধীয় মিলিত বীমা, বিমানযাত্রীর বীমা, জনগণের দায়দায়িত্ব বীমা, বাহকের দায়দায়িত্ব বীমা, ঘোড়ার বীমা, ইঞ্জিনীয়ারিং সরঞ্জামের বীমা, পেশাদারী খেসারত বীমা, কর্মচারীর ক্ষতিপূরণ বীমা, বিবিধ বিপর্যায় বীমা, বিশ্বস্ততার গ্যারাণ্টী বীমা, প্লেটগ্লাস বীমা, ব্যবসায়ে বাধাবিঘ্নের বীমা, পরিবহনকালে নগদ টাকার বীমা, সামুদ্রিক বীমা, নতুন রূপের বীমা, বলদের গাড়ী, পাম্প সেট, পেডুল সাইকেল ও আরো অনেক।

Contour Ads NIA 836 C/85 Ben.

সূচীপত্র

দেশ

১ কার্তিক ১৩৯৩ ☐ ১৮ অক্টোবর ১৯৮৬ ☐ ৫৩ বর্ষ ৫০ সংখ্যা

১৯

মেছো বাঘ আর মেছো বাঙালী কথা দুটো খুব পাশাপাশি। বাঙালীর ব্যাঘ্রমূর্তি আর ব্যগ্রমূর্তি ওই একবারই দেখা গিয়েছিল ওই মাছের ব্যাপারে। সেই প্রসঙ্গেই প্রাচীন সাহিত্য ঘেঁটে মৎস্যমঙ্গল রচনা করেছেন রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। মীনরাশির সংরক্ষণ ও সংহারপর্বের প্রযুক্তিচিত্র কিশলয় ঠাকুরের কলমে। এরই পাশে মেছো বাজারের সমীক্ষা করেছেন শ্যামল সান্যাল।

১৪

এডাম স্মিথ আর ডেভিড রিকার্ডো থেকে মিল-মার্কস ইস্তক উন্নয়ন তত্ত্বচিন্তার যে বৈপ্লবিক বিন্যাস ঘটেছিল তার পরেও প্রায় শতাব্দীকাল অতীত। এখন সেই পুরনো যুক্তিভাষ্যের টীকা-ব্যাখ্যার বদলে যে নতুন চিন্তা, নতুন ভাবনার প্রয়োজন সেকথাই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন অম্লান দত্ত।

৮৯

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে হারারেতে অষ্টম নির্জোট সম্মেলনের অনুপুঙ্খ ধারাভাষ্য ও বিশ্লেষণ বিশ্বপ্রেক্ষাপটকে উন্মোচিত করেছে প্রবীণ সাংবাদিক শিবদাস ব্যানার্জীর সপ্রতিভ কলমে। সজাগ ও সপ্রতিভ এই রচনাটি চিন্তাশীল মানুষের মনে নতুন প্রশ্ন যোগাবে।

সম্পাদক সাগরময় ঘোষ

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ২০ পয়সা পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা

সহবাস-সম্মতি বিল (১৮৯১) ও বিদ্যাসাগরের চিঠি

'দেশ' পত্রিকার ৩১-৫-৮৬ সংখ্যায় প্রকাশিত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ নিবন্ধ 'সহবাস-সম্মতি বিল (১৮৯১) সেদিনের সামাজিক আন্দোলন' এবং এই পত্রিকারই ২ আগস্ট ১৯৮৬তে 'চিঠিপত্র' কলমে প্রকাশিত প্রদীপ সাহার পত্রটি পাঠ করে মনে হল 'সহবাস-সম্মতি বিল (১৮৯১)'-এ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে অহেতুক এক ধন্দ উপস্থিত হয়েছে। এর কারণ দুটি : (১) প্রদীপবাবু তাঁর পত্রে নিজেকে 'রেফারেন্স'র পাঠক হিসাবে প্রচ্ছন্ন অহমিকা প্রকাশ করে যে ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিকে 'নির্ভরযোগ্য স্বীকৃত, প্রতিষ্ঠিত' বলে দাবি করে বিশ্বনাথবাবুর নিবন্ধের জবাব দিয়েছেন, রাধারমণ মিত্রের সেই 'কলিকাতায় বিদ্যাসাগর' পুস্তিকাটি কিন্তু যথার্থ অর্থেই রেফারেন্স নয়, তথ্যহীন, সূত্রহীন, অসংলগ্ন ডাইরির প্রাথমিক খসড়া বিশেষ। (২) বিশ্বনাথবাবু তাঁর অভিমতের স্বার্থেই যেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিঠির খণ্ডাংশ ব্যবহার করেছেন। ফলে এই বিভ্রান্তি।

বিশ্বনাথবাবু তাঁর এই নিবন্ধের জন্য 'নব্যভারত' পত্রিকা, বিনয় ঘোষের 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' (৩য় খণ্ড, ভাদ্র ১৩৬৬ সংস্করণ) এবং চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' (১৮৯৫ সংস্করণ) গ্রন্থদুটি প্রধানত অনুসরণ করেছেন। অথচ বিহারীলাল সরকারের প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য তথ্যবহুল 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থটি সম্ভবত অনুসরণ করেননি। বিহারীলালের গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারছি যে, বিদ্যাসাগরমহাশয় যখন ফরাসডাঙ্গায় বাস করছিলেন, তখন সরকার 'সহবাস-সম্মতি বিল' সম্বন্ধে তাঁর মত জানতে চেয়েছিলেন। এজন্য ৫-৬ দিনের সময় হাতে নিয়ে তিনি কলকাতা আসেন এবং বহু পরিশ্রম করে নানা শাস্ত্রের আলোচনা সাপেক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। সরকারকে লেখা তাঁর এই চিঠির পূর্ণ বয়ানের বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ :

"এই বিলের সর্বতোভাবে অনুমোদন করিতে আমি সমর্থ নহি। যে স্থলে স্ত্রী দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্বে ঋতুবতী হয়, সেস্থলে উক্ত বিল আইনে পরিণত হইলে, সর্ববিধায়ে গর্ভাধান সংস্কারানুষ্ঠানের প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইবে। গর্ভাধান-সংস্কার শাস্ত্রবিহিত সকলের পক্ষে অনুষ্ঠেয় ও সাধারণত বঙ্গদেশে প্রচলিত। স্ত্রীর প্রথম রজোদর্শন হইলে স্বামীকে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হয়। এই অনুষ্ঠানের অনুকূলে অনেক শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। এস্থলে কলিযুগের সর্বপ্রধান প্রামাণ্য পরাশর-বচন উদ্ধৃত করিলে যথেষ্ট হইবে —

'প্রথম রজোদর্শনকালীন ঋতুস্নাতা ভার্যাসমীপে যে স্বামী গমন না করেন, তিনি ভ্রূণহত্যারূপ মহাপাতক সঞ্চয় করেন ॥ ৪/১১'

যেহেতু কতকগুলি বালিকা দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিবার পূর্বেই প্রথম রজোদর্শন করে, বিল আইনে পরিণত হইলে, তাহাদিগের সম্বন্ধে উক্ত বিধির অনুষ্ঠান আদৌ হইতে পারিবে না। সুতরাং রাজবিধি দ্বারা বৈধ ধর্মানুষ্ঠানের প্রতিরোধ করিলে, জনসমাজে ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বালিকা স্ত্রীগণের রক্ষার জন্য উক্ত বিল যে আশ্রয় প্রদানে উদ্যত হইয়াছে, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। বহু সংখ্যক ঘটনায় দৃষ্ট হয় যে, সচরাচর দ্বাদশবর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ বয়সের মধ্যে প্রথম রজোদর্শন ঘটিয়া থাকে। দ্বাদশ বর্ষে সম্মতিবিধি নির্ধারিত হইলে ইহার ফল এই হইবে যে, উক্ত বর্ষ অতিক্রমকারিণী বালিকাগণ নিতান্তই আশ্রয়শূন্য হইবে। অধিকন্তু স্ত্রী দ্বাদশ বর্ষে পদক্ষেপ করিলেই স্বামী স্ত্রী-সহবাসে উত্তেজনা ও প্রশ্রয়প্রাপ্ত হইবে। যে বিধি, স্ত্রী দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেই, তাহার প্রতি নৃশংস আচরণের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে উদ্যত, সে বিধির সমর্থন আমি কোন প্রকারেই করিতে প্রস্তুত নহি।

যদিও এই সকল কারণে আমি বিলের সমর্থন করিতে অপারগ, তথাপি প্রচলিত কোন ধর্মসংস্কারের প্রতিকূলাচরণ না করিয়া, এমন কোনও আইন হউক, যাহাতে বালিকা স্ত্রীগণ সমুচিত আশ্রয়প্রাপ্ত হয়। তাহাতে আমি সম্পূর্ণ অভিলাষী। আমার প্রস্তাব এই যে, স্ত্রী রজঃস্বলা হইবার পূর্বে তৎসহবাস দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া নির্দিষ্ট হউক। অধিকাংশ বালিকা ত্রয়োদশ, চতুর্দশ অথবা পঞ্চদশ বর্ষের পূর্বে প্রায় রজঃস্বলা হয় না। সুতরাং আমার প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইলে তাহাদিগকে প্রস্তাবিত আইন, অপেক্ষাকৃত বাস্তবিক ও অধিকতর প্রশস্ত আশ্রয়প্রদানে সমর্থ হইবে। তৎসঙ্গে ধর্মানুষ্ঠানের বিরোধী বলিয়া উক্ত বিধির বিরুদ্ধে কোনও প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হওয়া সম্ভবপর নহে। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে রজঃস্বলার পূর্বে স্ত্রী-সহবাস স্বামীর পক্ষে নিতান্তই ধর্মবহির্ভূত কার্য। এ সম্বন্ধে তিনটি শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিলেই হইবে। প্রথম বচনটি বাচস্পতি মিশ্রকৃত 'স্মৃতিসার সংগ্রহ' হইতে উদ্ধার করা যাইতেছে—

'প্রথম রজোদর্শন হইলে, স্ত্রীর জননেন্দ্রিয়ে প্রথম বীর্যনিষেকের নাম গর্ভাধান সংস্কার।'

উক্ত বচনে 'প্রথম' এই শব্দের নির্দেশে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, রজোদর্শনের পূর্বে স্বামীর স্ত্রীর নিকটে অভিগমন শাস্ত্রের অনভিপ্রেত। দ্বিতীয় বচন মনুসংহিতার টীকাকার মেধাতীথি - প্রণীত টীকা হইতে উদ্ধৃত হইল—

'ঋতুকালে (চতুর্থ দিবসে) স্ত্রী সহবাস কর্তব্য ॥ ৩/৪৫ ॥'

'বিবাহের বিষয় উক্ত হইল। বিবাহানুষ্ঠানের পরে বালিকার পত্নীত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইচ্ছা থাকিলে সেই দিনেই স্ত্রী সহবাস সম্ভব। বিবাহের অব্যবহিত পরে স্ত্রীগমন নিষিদ্ধ। তবে কি করা কর্তব্য? ঋতুকাল পর্যন্ত তাহার (অর্থাৎ স্বামীর) অপেক্ষা করা উচিত।' কমলাকর ভট্ট প্রণীত 'নির্ণয়সিন্ধু' হইতে তৃতীয় বচনটি গৃহীত হইল—

'প্রথম রজোদর্শনের পূর্বে স্ত্রীগমন সর্বথা অনুচিত। অশ্বলায়ন (ঋগবেদের অন্যতম শাখার প্রবর্তক এবং একজন প্রসিদ্ধ কল্পসূত্রকার) বলেন যে, ঋতুদর্শনের পূর্বে কাহারও স্ত্রীগমন উচিত নহে। এ রূপ কার্যে মহাপ্রত্যবায় (মহাপাপ) সঞ্চার হয়। অকারণ বীর্যত্যাগে মনুষ্য ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হয়।'

এইরূপ সবিশেষ পর্যালোচনা করিলে, ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় যে, রজঃস্বলার পূর্বে স্ত্রী-সহবাস দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণনীয় হইবে। ঈদৃশ আইন বিধিবদ্ধ হইলে যে কেবল জনসমাজের উপকার ও বালিকা পত্নীগণের সমুচিত রক্ষা হইবে, তাহা নহে, বরং শাস্ত্রানুমোদিত ধর্মানুষ্ঠানের বিরোধী না হইয়া শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধির সমর্থন বাড়িবে। উক্ত নিয়মের বিরুদ্ধাচারণ করিলে শাস্ত্রে যে দণ্ডবিধির উল্লেখ আছে, তাহা আধ্যাত্মিক; সুতরাং অধিকাংশের অগ্রাহ্য। আইনানুসারে ইহা দণ্ডের দ্বারা নিষিদ্ধ হইলে, শাস্ত্রীয় বিধি অধিকতর কার্যকরী হইবে।

গভর্নমেন্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া এ বিষয়ে বিচারার্থ অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১।"

(বিদ্যাসাগর—বিহারীলাল সরকার, ১৩০২ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, পৃঃ ৬৩৩-৩৮)

সুতরাং এর পরেও কি বলা যায় যে, জীবন সায়াহ্নের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চাননি? কিংবা সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও তিনি বার্ধক্যের দুর্বলতা ও মানসিক দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে পড়ে 'বাল্য বিবাহপ্রথা' আইনের দ্বারা নির্মূল করতে চাননি? বিলটি আইনে পরিণত করার প্রাক্কালে তবু কেন তাঁর মত সরকার গ্রহণ করলেন না, এর চমকপ্রদ জবাব পাওয়া যায় বিহারীলালের গ্রন্থ থেকেই—বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত আইনের প্রার্থনা করেছিলেন ইংরেজ-রাজের কাছে। সে প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছিল। কারণ বিধবা-বিবাহ ইংরেজ রাজের প্রকৃতি ও নীতির অনুমোদিত। সহবাস-সম্মতি বিল সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের অভিমত ইংরেজ রাজের প্রকৃতি ও নীতি বিরুদ্ধ। ইংরেজ রাজনীতির এটাই সূক্ষ্ম তত্ত্ব।

তথাপি এই চিঠির দ্বারা এটাই আরেক বার প্রমাণিত হল যে, বিদ্যাসাগরমহাশয় যে আজন্ম পুরুষসিংহ ছিলেন, জীবনের শেষ দিনেও সেই তেজস্বিতার এক কণাও বিচ্যুতি ঘটেনি।

মাধবানন্দ ভট্টাচার্য
কলকাতা-২

বাঁধ ঝুলনা

৩০ আগস্ট ১৯৮৬ সংখ্যার দেশ পত্রিকায় প্রচ্ছদ নিবন্ধ 'বাঁধ ঝুলনা' তে কৃষ্ণা

বন্দ্যোপাধ্যায় দোলনা আর দোলা শব্দটি দুটি নিয়ে একটু গোলমাল করে ফেলেছেন। উত্তর ভারতের তীজ উৎসবে মেয়েরা যে ঝুলায় চড়ে দোল খায় তা দোলনা। ঝুলন-উৎসব বা হিন্দোল-লীলায় ও বসন্তোৎসবে যে ঝুলা ব্যবহৃত হয় তাও দোলনা। কিন্তু 'উমার আসা-যাওয়াতে দোলনা' লাগে না। 'দেবীর দোলনায় আগমন বা গমন' কথাটিও ঠিক নয়। আমরা জানি দেবীর দোলায় আগমন বা গমন হয়। এক অর্থে দোলা দোলনা হলেও দেবী দুর্গা যে দোলায় আসেন বা যান তার অর্থ দোলনা নয়। এ দোলা শিবিকা বিশেষ বা চতুর্দোলা। দোলনা হল সাধারণত যা কোন কিছুতে টাঙিয়ে দোল খাওয়া হয়। দেবীর দোলায় আসা-যাওয়া অশুভসূচক। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'শ্রাবণ মাসে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচুর ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয় রাধাকৃষ্ণের ঝুলন-উৎসব বা হিন্দোল-লীলা।' শুধু উত্তর-পশ্চিম ভারত কেন পশ্চিমবঙ্গেও 'ঝুলনযাত্রা' উৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়। ঝুলন দোলের অনুরূপ উৎসব। এর সংস্কৃত নাম হিন্দোল। শ্রাবণ মাসের শুক্লা একাদশী হতে পূর্ণিমা পর্যন্ত এর অনুষ্ঠানকাল। রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ দোলায় স্থাপন করে দোল দেওয়া এই উৎসবের প্রধান কার্য। পশ্চিমবঙ্গে এ উৎসব বৈষ্ণব ধর্মীয় উৎসব। উত্তর ভারতে এটি মুখ্যত মেয়েদের উৎসব। মেয়েরা বর্ষাকালের গ্রাম্য সঙ্গীত কজরী ইত্যাদি গেয়ে গাছে ঝুলা বেঁধে দোল খায়।

অজিতেন্দ্র সিংহ
সেবানগর,
নতুন দিল্লী-১১০০৩

রবীন্দ্রনাথের গানের গায়কী

১৯ জুলাই, ১৯৮৬ সংখ্যার 'দেশ'-এ শ্রীপার্থ বসু যখন 'রবীন্দ্রনাথের গানের গায়কী' সম্বন্ধে লিখলেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই অনুমান করেছিলেন, অভিমন্যু বধের একটা সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁর লেখায় সাহসের অভাব ছিল না। এখন নিশ্চয়ই তিনি ঘাবড়ে যাবেন না। তাঁর রচনার দায়িত্ব তাঁর নিজের। আমরা কেবল আর একটু খুঁটিয়ে দেখতে পারি, তিনি কি বলতে চেয়েছেন এবং সেই বলার কোন গুরুত্ব আছে কিনা।
প্রথমেই দেখেছি, শ্রীমান পার্থ পরিষ্কার বলছেন, 'গানের (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের গানের) এই গায়কী বা ঘরানা এখন একটিমাত্র নেই। বিচিত্র তার প্রকাশ। তার রূপেরও বদল ঘটেছে বহুবার। এতদিন পরে এখন হয়ত সময় হয়েছে জেনে নেবার রবীন্দ্রনাথের গানের সেই বিবিধ গায়কীর মধ্যে কোনটি তাঁর নির্বাচিত, কাঙ্ক্ষিত, কিংবা তাঁর গানের নিকটতর আত্মীয়। কোন্ ঢঙের চলনে চকিতে বুঝে যেতে পারি, এই তো রবীন্দ্রনাথের গান। নদীর কোন শাখায় চোখ রেখেই যেমন জানতে পারি এই হল আদিম গঙ্গা।'
পড়ে মনে হয়, রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই মূল ধারাটি খোঁজাই তাঁর উদ্দেশ্য। বেশ কিছু তথ্য সহযোগে সেই কাজটাই তিনি করেছেন প্রবন্ধের বেশ খানিকটা অংশ জুড়ে। রবীন্দ্রনাথের নিজের গলার যে-কটি রেকর্ড পাওয়া যায়, তাদের সাক্ষ্যও তো লেখকেরই অনুকূলে। অর্থাৎ গলা খুলে গাওয়া, স্পষ্ট উচ্চারণ, তালের মাত্রাভাগ দেখানো, ইত্যাদিকেই বলা যায় সেই গায়কীর প্রধান লক্ষণ। শব্দোচ্চারণের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে গভীর মমতার কথা পার্থ বলেছেন, রবীন্দ্রসঙ্গীতের কাব্যের উপাদান তো তার মধ্যেই যথার্থ স্ফূর্তি খুঁজে পায়। রবীন্দ্রনাথের গানে শুধু সুর নয়, এই শব্দোচ্চারণও গানকে কমিউনিকেশনের সর্বোচ্চ সম্ভাব্য স্তরে নিয়ে যায়। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে অবশ্য বাণীকে সেই মর্যাদা দেওয়া হয় না। কিন্তু ঠিক সেইখানেই তো রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশেষত্ব। কথা সেখানে সুরের অলঙ্কারমাত্র নয়, নির্লিপ্ত কাঠামোও নয়। রবীন্দ্রনাথের নিজের গানের গলা মধ্যবয়সেই ভেঙে গিয়েছিল। তবু সেই ভাঙা গলার গানেও প্রায় প্রতিটি শব্দেই যে অর্থবহতা এবং নাটকীয়তা পাওয়া যায়, তা কি অবহেলার যোগ্য? এই গায়কীর কথা বলতে গিয়ে পার্থ বেশ কজন গায়ক গায়িকার নাম করেছেন। খুঁজলে আরো নাম পাওয়া যাবে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যসঙ্গীতের একটা ঐতিহ্য এইভাবে তৈরি হয়েছিল। আর যে-সব কথা পার্থ বলেছেন তাঁর প্রবন্ধে, তাতে ব্যক্তি আর ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ স্বভাবতই এসে গেছে। সে-আলোচনাও যথাসম্ভব বিষয়মুখ (objective) মনোভাব নিয়ে হলেই ভাল হয়। কিন্তু আসল কথাটা বোধহয় এই যে রবীন্দ্রনাথ শুধু গান রচনা করেননি, গেয়েছেন, শিখিয়েছেনও। আর তাঁর নির্বাচিত গায়কী একটা ছিল। ভবিষ্যতের শিল্পী এবং শিক্ষকেরা এই কথাটা মনে রাখলে নিশ্চয়ই উপকার হবে।

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন

॥ ২ ॥

'দেশ' পত্রিকায় পার্থ বসুর লেখা 'রবীন্দ্রনাথের গানের গায়কী' বিশেষ নিবন্ধটি পড়ে চমকিত হলাম, কিছু লেখার আগ্রহে কলম ধরলাম।
শ্রীপার্থ বসু প্রবন্ধের প্রথমে লিখেছেন, "গানের এই গায়কী বা ঘরানা এখন একটি মাত্র নেই।" এই কথায় আমার কিছু আপত্তি আছে। "গায়কী বা ঘরানা" কথাটা ঠিক নয়। কারণ গায়কী ও ঘরানা এক কথা নয়। গায়কী একটা style। প্রত্যেক শিল্পীর মধ্যেই কিছু স্বাতন্ত্র্য থাকে। ঘরানা কথাটা অনেক ব্যাপক। যেমন classical musicএর একাধিক ঘরানা আছে, কিন্তু এক একটি ঘরানার শিল্পী বা ওস্তাদ অনেক। ভীমসেন যোশীর গান আমার খুব ভাল লাগে। উনি "কীরানা" ঘরানার গায়ক। কিন্তু তাই বলে "ভীমসেনী" ঘরানা বা "হিরাবতী" ঘরানা! ভীমসেন যোশী ও হিরাবতী বরোদেকর-এর গান কখনই হুবহু এক হবে না, অথচ ওঁরা একই ঘরানার লোক। প্রত্যেক শিল্পীরই কিছু স্বাতন্ত্র্য থাকে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিল্পীর style বা ঢং আলাদা হতে পারে, কিন্তু আমরা যদি ঘরানা বলে চিহ্নিত করি, তবে সেটা সাংঘাতিক ব্যাপার হবে না কি? প্রত্যেক রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্পী যে গান করেন তাতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য থাকবেই।
পার্থ বসু রবীন্দ্রনাথের গান ও দিনেন্দ্রনাথের গায়ন ভঙ্গীকে একই বলেছেন। যদি কেউ রবীন্দ্রনাথের ও দিনেন্দ্রনাথের গানের প্রাচীন রেকর্ড শোনেন, লক্ষ করবেন দুজনের অনেক তফাত।
পার্থ বসুর মতে চিৎকার করে গান করাটাই সার্থক রবীন্দ্রসঙ্গীত। তিনি বোধ হয় জানেন না রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের, মধ্য যুগের গানের সঙ্গে শেষ যুগের গানের গায়কীর অনেক তফাত। "আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে" গানটি প্রতিশুদ্ধ গান, চেঁচিয়ে গাইবার গান নয়। তবে কি আমরা বলব, রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজের প্রথম যুগের ঘরানার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন শেষ যুগে?
পার্থ বসুর মতে, "হিন্দি ভাঙ্গা গানকে রবীন্দ্রনাথের গান বলতে অনেক রসিকেরই দ্বিধা থেকে যায়"। তিনি যে "বোলো রে পাপাইয়া" ভেঙ্গে "কোথা যে উধাও হল" গানটি লেখেন সেটাকে কি রবীন্দ্রনাথের মৌলিক সৃষ্টি বলা যায় না? তবে গুণিজন কেন 'রবিমল্লার' বলেছেন?
পার্থ বসুর মতে শৈলজারঞ্জন শিষ্যরা কথার ওপর জোর দেন না। আমার মনে হয় উনি যখন গান শেখান, তার ধারে কাছে যাওয়ার সুযোগ পার্থ বসুর হয়নি। তাই উনি এরূপ মন্তব্য করতে পেরেছেন।
রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে এরকম একটি লেখা 'দেশ' পত্রিকার মত একটি পত্রিকায় প্রকাশ করাটা আমার কাছে মনে হচ্ছে শুধু ভ্রমাত্মক নয়, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

সবাণী মজুমদার
গীতাঙ্গন (নৈহাটি)।

॥ ৩ ॥

'দেশ' পত্রিকার ১৯ জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রী পার্থ বসুর 'রবীন্দ্রনাথের গানের গায়কী' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে কয়েকটি সিদ্ধান্তে সহজেই পৌঁছনো যায়।
(১) শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার রবীন্দ্রসংগীতের গায়নভঙ্গিমার ব্যাপারে নিজেকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের চাইতেও সমর্থ মনে করতেন এবং সেহেতু তিনি 'রবীন্দ্রসংগীত'-এ একটি 'নিজস্ব' গায়নরীতির প্রচার এবং শিক্ষাদান করেছেন।

(২) শ্রীশৈলজারঞ্জনের শিক্ষাদান কালে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জীবিত ছিলেন, এবং তিনি অত্যন্ত আগ্রহসহকারে শৈলজারঞ্জনকে বিশ্বভারতীর সংগীতভবনের অধ্যক্ষপদে নিয়োজিত করেছিলেন এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন যে শৈলজারঞ্জনের অবসরগ্রহণের পূর্বে আর কেউ অধ্যক্ষপদে নিয়োজিত হবেন না—এই জেনেই যে তাঁর নিজস্ব সংগীতধারা লুপ্ত হবে এবং অন্য এক গায়নরীতি জন্ম নেবে। অথবা, গুরুদেব শ্রীশৈলজারঞ্জনের হাতে সংগীতভবনের ভার ন্যস্ত করার পরে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম সৃষ্টি সংগীতমালার শিক্ষা এবং প্রচার সম্পর্কে নিতান্তই উদাসীন ছিলেন। তাঁর সংগীত সঠিকভাবে রক্ষিত হলো, না লুপ্ত হলো এ সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা প্রায় ছিল না বললেই চলে। (৩) উপরোক্ত দুটি সিদ্ধান্ত মেনে নিলে যে পরবর্তী সিদ্ধান্তে আমরা অনায়াসে পৌঁছই, তা হলো, রবীন্দ্রনাথের নিজেরই নিজস্ব সংগীতধারা ও গায়নরীতি সম্পর্কে কোনো সঠিক ধারণা ছিল না। অতএব রবীন্দ্রসংগীতে 'গায়কী' বলে কিছু নেই। বর্তমানে, শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রই একমাত্র রবীন্দ্রসংগীতে সঠিক গায়কীর নির্দেশ ও প্রচার করছেন।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি যাঁরা সঠিক এবং অভ্রান্ত বলে মেনে নেবেন বা নিচ্ছেন তাঁদের কথা অবশ্য আলাদা। তবে, ঘটনা হলো এই যে, শ্রীপার্থ বসুর এই ভিত্তিহীন রচনা যথেষ্ট সমালোচনার শিকার হয়েছে। এই পত্রিকার পাতাতেই নানা অভিযোগপত্র পাঠকদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তাই এ নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। তবে, রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি অশেষ প্রীতি এবং অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাবশত, সাধারণ একজন মানুষ হিসেবে একথা মনে করে দুঃখ পেতে হয়, যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ এবং প্রথিতযশা শিল্পীদের বেশীর ভাগই শ্রদ্ধেয় শৈলজাদার ছাত্র-ছাত্রী ছিলেন কোনো না কোনো সময়ে, এবং তাঁর কঠোর পরিশ্রম ও সাহায্যে উপলব্ধি করেছেন রবীন্দ্রসংগীত কী অপূর্ব বিভায় কথা ও সুর একে অপরকে ধারণ করে আছে, তাঁদের কোনো প্রতিবাদ পৌঁছয় না এসে। অথচ এ সময়ে সে সবের মূল্যই হয়তো হতো সব চাইতে বেশী! আরও মজার কথা এই যে 'British Raj'-এর সেই 'Divine and Rule' policy শেষমেষ রবীন্দ্রসংগীতেও এসে পৌঁছে গেল। যখনই আমরা "শৈলজারঞ্জন / শান্তিদেব", "সুচিত্রা / কণিকা"—এ সমস্ত তুলনামূলক আলোচনায় ঢুকে পড়ি, ভুলে যাই, তখনই আমরা মূল ধারাটি থেকে সরে আসার চেষ্টা করছি; মূলধারাকে টুকরো করছি। উৎসে ফেরার কোনো ইচ্ছেই আমাদের আর নেই। এই দেশের কোণে কোণে যে বিচ্ছিন্ন হতে চাওয়ার মানসিকতা এসে দানা বেঁধেছে, তা কি আমরা "বৃহত্তম থেকে ক্ষুদ্রতম" সর্বক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হতে দেখছি না? আমরা ভাঙতেই ভালোবাসি। সম্পূর্ণতা আমাদের সয় না।

দেবযানী সেনগুপ্ত
কলকাতা-৪০

বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ

'দেশ' পত্রিকায় (২৬·৭·১৯৮৬) প্রকাশিত জীবেন্দু রায়-এর পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমার কিছু বক্তব্য রাখার প্রয়োজন মনে করছি। শঙ্করীপ্রসাদের লেখা 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ'কে লক্ষ্য করেই জীবেন্দু রায় মশায়ের এই পত্রাঘাত। তাঁর মতে প্রায় একশত বছর আগের ধর্মান্দোলনের নেতাদের নামে বা সংস্কারক দলের নামে অযথা কালি ছিটিয়ে তাঁদের অশ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে যেটা বইটার সবচাইতে ক্ষতিকারক দিক। জীবেন্দু রায়মশায় জানেন নিশ্চয়,ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে ঐ ৬/৭ খণ্ডের বইটি ইতিহাসই,অন্য কোন সাধারণ তথ্যবহুল আলোচনা বা নিবন্ধ নয়। শঙ্করীপ্রসাদ দুরূহ পরিশ্রম স্বীকার করে যে তথ্য আজ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন তার জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদেরই পাত্র। ইতিহাসের আসল তথ্য পর্যালোচনাকালে যদি তৎকালীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কিছু নেতা, লেখক বা সংস্কারকের ওপর ছিটেফোঁটা কালি পড়ে গিয়ে থাকে, তাকে গোপন করার চেষ্টা করলে সত্যের অপলাপই হয়। তা হলে তো ইতিহাসের তথ্য উদঘাটন করতে যাওয়া আর সত্যকে বেমালুম চেপে যাওয়া একই কথা। আমাদের ছাত্রজীবনে নীচের ক্লাসে স্বামীজির জীবনীর ওপর রচনা লিখতে দিলে আমরা একটা জিনিসের ওপর বেশী জোর দিতাম—তা হলো নরেন্দ্রনাথ বাল্যকালে ভগবানে বিশ্বাস করতেন না, তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা নিয়ে সংসার ত্যাগ করেন, তারপর ১৮৯৩ খ্রীঃ আমেরিকার চিকাগো ধর্মমহাসভায় বেদান্তের ওপর বক্তৃতা দিয়ে জগদ্বিখ্যাত হয়ে যান। কিন্তু শঙ্করীপ্রসাদের লেখা বিস্তারিত ইতিহাস পড়ে জানতে পারছি—না, স্বামীজী অত সহজে বিশ্ববিখ্যাত হননি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বপক্ষে থাকা সত্ত্বেও অর্জুনকে যেমন প্রাণপণ করে লড়াই করতে হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, স্বামী বিবেকানন্দকেও তেমনি লড়াই করতে হয়েছে। স্বদেশী, বিদেশী, স্বধর্মী, বিধর্মী শত্রুর দল তাঁকে হেনস্তা করতে গিয়ে যে জঘন্য নীচ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছিল সে সময়, তাতে তারা ক্ষমারও অযোগ্য। স্বদেশের এবং বিদেশের অতগুলো শত্রুর সামগ্রিক চেষ্টার বিরুদ্ধে স্বামীজীকে যেভাবে লড়াই করতে হয়েছে—তাঁর একক চেষ্টাই আজ দেশবাসীর কাছে আদর্শ হয়ে থাকা উচিত। কেউ হঠাৎ কোন বিষয়ে বিখ্যাত হয়ে পড়লে তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা আমাদের জাতীয় স্বভাব—বিশেষ করে বাঙালীদের। তাঁকে বিদেশে পাঠানোর জন্য আমরা এক পয়সাও সাহায্য করলাম না, কিন্তু তাঁর নামে কুৎসা রটনার সময় আমরাই অগ্রণী। শুধু স্বামীজীই নন, এর পরেও আমরা এই জিনিসের পুনরাবৃত্তি হতে জেনেও অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিল, তখনই আমরা বাঙালীরা বিচার করতে বসলাম নরেন্দ্রনাথকে সত্য সত্যই সন্ন্যাসী বলা যায় কি না। আশ্চর্য যে এই বাগবিতণ্ডা ৮৪ বছর পরেও শেষ হয়নি। এই সব তথ্য গোপন করে যদি ইতিহাস লেখা হয়, জানি না সেটা ইতিহাসের মর্যাদা পায় কি না!

শঙ্করীপ্রসাদ কারো বিরুদ্ধে কোন বিষোদ্গার করেননি মোটেই, আসল তথ্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে তুলে ধরে দেশবাসীর সামনে হাজির করেছেন মাত্র।

অবিনাশচন্দ্র সরকার
নিউ দিল্লী-২২

দেখেছি আরো কয়েকজনের ক্ষেত্রে। জীবেন্দু রায়মশায় লিখেছেন, 'সমকালীন অন্যান্য ব্যক্তিদের কাছে তাঁরা যে সময় বিশেষে সমালোচিত বা নিন্দিত হয়েছেন তা এই মানবত্বের প্রেক্ষিতেই।' কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর জীবদ্দশাতেই অবতারপুরুষ বলে চিহ্নিত হয়ে গেছেন! আর স্বামীজীর বাণী শুনে যখন পৃথিবীর লোক বিমোহিত তখনই কালো মেঘের দল প্রস্তুতি শুরু করল তাঁকে মসীলিপ্ত করতে। দাক্ষিণাত্যই প্রথম আবিষ্কার করল স্বামীজীকে দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য হিসাবে; তাই যখন তারা স্বামীজীকে আমিষাহারী এবং অব্রাহ্মণ

স্বাগত নতুন শিক্ষানীতি

১৬ জুলাই, '৮৬—সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধটির জন্য ধন্যবাদ। সম্পাদক ঠিকই বলেছেন, ১৯৬৮-র জাতীয় শিক্ষানীতিতেও তো অনেক ভালো ভালো কথা ছিল। তার কতটা কার্যকরী হতে পেরেছে? যে সর্ষে দিয়ে ভূত ছাড়ানা হবে তাতেই যে গলদ। যাঁরা কাজ করবেন তাঁদের চারিত্রিক সততা ও কর্তব্যবোধ না থাকলে সবই যে ব্যর্থ হয় এতো জানা কথা।
এবারে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক নতুন যেসব কথা বলছেন

বলে কাগজের খবর থেকে জানা যাচ্ছে সেগুলি হল, (১) প্রতি জেলায় একটি করে মডেল স্কুল থাকবে, (২) বর্তমানে পরীক্ষায় যে পাস-ফেল প্রথা চালু রয়েছে তা তুলে দিতে হবে, (৩) চাকরির যোগ্যতা বিচারে স্কুল-কলেজী সার্টিফিকেট ডিগ্রি ডিপ্লোমার প্রয়োজন থাকবে না, (৪) সারা ভারতে একই পাঠক্রম প্রবর্তন করতে হবে। মনে হচ্ছে, উদ্দেশ্য সাধু হলেও প্রথম তিনটি রীতিতে আমাদের সমাজ-পরিবেশে ভালোর তুলনায় মন্দটাই আগে আসবে। প্রথম ব্যবস্থায় প্রতি জেলায় বিশেষ সুবিধভোগী পৃথক গোষ্ঠী গড়ে উঠবে। তারপর, স্কুলগুলির শিক্ষার মাধ্যম যদি মাতৃভাষা না হয়, হিন্দী বা ইংরেজি হয়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। দ্বিতীয় ব্যবস্থায় শিক্ষকরা ছাত্রদের পরীক্ষার জন্য তৈরি করবার পরিশ্রমটুকু আর করবেন না ; ছাত্ররাও জানবে পরীক্ষায় যখন পাস-ফেল নেই— পড়া না পড়া তো সমান কথা। তৃতীয় ব্যবস্থায়, চাকরির নিয়োগকারীরা, বিশেষ করে সরকারপুষ্ট সংস্থাগুলিতে, স্বজন পোষণের এবং ঘুষ খাওয়ার ঢালাও সুযোগ পাবেন। বর্তমান নিম্নমুখী কাজের মান আরও নেমে যাবে।

উদ্যোক্তারা বলবেন, সমালোচনা করা যত সহজ, সঠিক পথ বাতলানো ততটাই কঠিন। ঠিক কথা। তবু তাঁদের ভেবে দেখতে বলি, মডেল স্কুলের পিছনে যে টাকা যাবে সেই টাকায় ছাত্রদের স্কুলে টিফিন দেবার ব্যবস্থা হোক। সেই সঙ্গে শিক্ষকদের 'ওরিয়েন্টেশনে'র ব্যবস্থা হোক। পাস-ফেল তুলে না দিয়ে, বাৎসরিক পরীক্ষার পাশাপাশি সারা বছর পড়াশুনোর মূল্যায়ণ করা হোক। তার ফলাফলটাও বাৎসরিক পরীক্ষা-ফলের সঙ্গে যোগ করা হোক। শিক্ষকরা সারা বছর পড়ানোর এবং মূল্যায়নের কাজটা ঠিকমতো করছেন কিনা তার তত্ত্বাবধান করা হোক। ডিগ্রির সঙ্গে চাকরির সম্পর্ক পুরোপুরি তুলে না দেওয়াই ভাল মনে করি। ডিগ্রিটাকে নিম্নতম যোগ্যতা ধরে নিয়ে তারপর প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষা করে নিলেই সমস্যা অনেকটা মিটতে পারে। বস্তুত অধিকাংশ ক্ষেত্রে এনিয়মটাই বোধ হয় চলে আসছে। সর্বভারতীয় পাঠক্রমমান বেঁধে দেওয়াই ভাল মনে হয়। তবে সেখানেও দেশ-সমাজ-সংস্কৃতি অনুযায়ী কিছু রদ-বদলের স্বাধীনতা প্রয়োজন।

তবে মূল কথাটায় ফিরে আসি। সর্বাগ্রে প্রয়োজন, শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের চারিত্রিক সততা। শিক্ষা মন্ত্রককে সর্বপ্রথম সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সেইসঙ্গে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সর্বপ্রকার দলীয় রাজনীতিমুক্ত করতে হবে। শিক্ষক, উপাচার্য, শিক্ষাকর্মী নিয়োগে রাজনৈতিক প্রভাব থাকলে চলবে না। প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ এবং উপাচার্যদের দলীয় প্রভাবমুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে বিদ্যায়তনের কল্যাণের কথা মনে রেখে কাজ করতে হবে। এই পরিবেশ তৈরির দায়িত্ব সকলের, বিশেষ করে সমাজকর্মী ও রাজনীতিকদের।

চিঠিটা শেষ করার মুখে ৩০ আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মডেল স্কুল, প্লেটো ও আমরা' প্রবন্ধটি চোখে পড়ল। তিনি কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পিত 'নবোদয় বিদ্যালয়'এর স্বপক্ষে কিছু বক্তব্য রেখেছেন। রাজীবের স্বপ্নের সঙ্গে প্লেটোর স্বপ্নের তুলনা করেছেন। কিন্তু স্কুলগুলিতে তিন ভাষা শেখানো হলেও শিক্ষার মাধ্যম কি থাকবে— জানি না। ছাত্রদের এক ভাষা-ভাষী রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে নিয়ে এনে জাতীয় সংহতি ঘটবে এ-আশাও অবাস্তব মনে হয়।

নীলরতন সেন
দীপালি সেন
কল্যাণী, নদীয়া

শিবের মাথায় জল

২ আগস্ট '৮৬ তারিখের দেশ পত্রিকায় শম্ভু সেনের 'ভারত এবং একবিংশ শতাব্দী' নামীয় বিশেষ নিবন্ধে তারকেশ্বরের বাবা তারকনাথের মন্দিরে শিবের মাথায় জল দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে আমার আরো কিছু অবতারণা।

তারকেশ্বরে শিবের মাথায় জল দেওয়া বর্তমানে এক রকম হিড়িকে দাঁড়িয়েছে। বৎসরের বারো মাসই বাবার মাথায় জল দেওয়ার পবিত্র কর্মযজ্ঞ চলে। তবে এই ভক্তবৃন্দের জল দেওয়ার কাজে অতিভক্তি প্রকট হয়ে উঠেছে। বাঁকে জল নিয়ে আসা স্বল্প বেশবাস পরিহিত কিশোর কিশোরীরা অনাস্বাদিত অনুভূতির টানে সামাজিক রীতিনীতির কঠিন বাধা বন্ধন ভেঙ্গে ফেলে। শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর রাস্তার দু'পাশে বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মিত অস্থায়ী শিবিরে চলে বেলেল্লাপনা, কদাচার ও নোংরা ইংগিত।

আমি অনেক জল আনা যাত্রীকে জলের বাঁক নামিয়ে মদ খেতে দেখেছি। তার ওপর মুখে অশ্লীল খিস্তিখাস্তা তো আছেই। বাবার মাথায় জল ঢালা নিয়ে বাবার 'আন-রেজিস্টার্ড' ব্রাহ্মণদের অসৎভাবে পয়সা উপায় এখন রমরমা ব্যবসায় দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া এই সাধু (!) ব্রাহ্মণেরা পুজো দেওয়া ও থাকার ঘর ভাড়া থেকে ভালো পয়সা রোজগার করেন। পুণ্যভূমি তারকেশ্বরে আসা জল যাত্রীরা বাড়ি ফেরতাপথে ট্রেনে অস্বাভাবিক ভিড়ের সৃষ্টি করেন। তার ফলে রেলপথে সাধারণ ও অফিস যাত্রীরা তাঁদের গন্তব্যপথে যেতে বহু ভোগান্তি ভোগ করেন। বাবার মাথায় জল দিতে আসা অনেক যাত্রী বিনা টিকিটে ট্রেনে ভ্রমণ করে, এবং ধরা পড়ে। সব মিলিয়ে শৈবতীর্থ তারকেশ্বর বর্তমানে অতিভক্তির ফল্গুধারায় ডগমগ, ধর্মীয় অনাচারে ভরা তীর্থস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মধুমিতা সামন্ত
তারকেশ্বর
হুগলী

ভারত এবং একবিংশ শতাব্দী

২ আগস্ট '৮৬ আপনাদের 'দেশ' পত্রিকায় শম্ভু সেনের "ভারত এবং একবিংশ শতাব্দী" নিবন্ধটি পড়ে ভাল লাগল। ধর্মীয় কুসংস্কারের এই রূপ এখন সারা ভারতবর্ষেই ছড়িয়ে আছে। নগর মহানগর পেরিয়ে যা পৌঁছে গেছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। তাই কুসংস্কারের এই নগ্ন ছবি সহজে মুছে দেওয়া কি সম্ভব ? আমাদের দেশের সব সৃষ্টির মূলেই তো এখন নগ্নতা। সাহিত্য, শিল্প, চলচ্চিত্র এমনকি বিজ্ঞাপনেও তাই বিশেষভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এই সব কুসংস্কার পাল্টাতে গেলে যে সব মাধ্যম দরকার তার প্রায় প্রতিটিই তো নগ্নতায় ছেয়ে আছে। এই যখন অবস্থা তখন চন্দ্রগুপ্তির ঘটনা বিচ্ছিন্ন কোন কিছু নয়। ধর্মের দোহাই দিয়ে এর মধ্যে আছে রহস্য, এর পেছনে আছে বড় বড় মাথার সমর্থন। একমাত্র এইরকম বিকৃত রুচি এবং বিকৃত আনন্দের দ্বারাই মানুষের প্রতিবাদ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভব। আসলে তাই-ই ঘটছে। নইলে যাঁদের পক্ষে পরিবর্তনের নেতৃত্ব দেওয়া সহজ সেই মন্ত্রী, নেতা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং গুণীজনরাই তো এখন উপস্থিত থাকেন বিভিন্ন পূজার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। যেখানে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটুকুর পরেই শুরু হয় কুৎসিৎ অঙ্গভঙ্গি করে উন্মাদ আচরণ। বহু প্রগতিশীল (তারা তাই বলে) সংগঠনের যুবকরাও এখন এই উন্মত্ততায় মেতে উঠেছে। কিন্তু অদ্ভুত লাগে তখন যখন দেখি সেই সব সংগঠনের কিছু শিক্ষিত কর্ণধার হাতে হাতে শিকল তৈরী করে গর্বের সঙ্গে সেই উন্মত্ত নৃত্য রাস্তা দিয়ে পরিচালনা করে নিয়ে যান। ভাবটা এমন যেন তাঁরা কত শৃঙ্খলাপরায়ণ, রুচিশীল সংস্কৃতিপ্রেমী !

এমতাবস্থাতে দাঁড়িয়েও শম্ভুবাবুর মত আমরা অনেক মানুষই এ সবের বিরুদ্ধে, এ সবের পরিবর্তন চাই। কিন্তু এ ব্যাপারে যদি আমরা একত্র না হতে পারি, তবে এরকম নিবন্ধ পাল্টা নিবন্ধের দ্বারা কোন কিছুর পরিবর্তন আনা অসম্ভব শুধু নয়, অলীক কল্পনামাত্র।

সুধীন সেন
চাঁদপাড়া, উঃ ২৪ পরগণা

গ্রুপ থিয়েটারের গ্রুপ

৯ আগস্ট 'দেশ' পত্রিকায় বিভাস চক্রবর্তীর লেখা 'গ্রুপ থিয়েটারের গ্রুপ' লেখাটি পড়লাম।

বিভাস চক্রবর্তী নাটক পরিচালনা ও অভিনয় ক্ষেত্রে একটি 'গ্রুপ'(!)-র নিকট বিশেষ নাম সন্দেহ নেই। নাট্য আন্দোলন ক্ষেত্রে তিনি যে সব তথ্য ও তত্ত্বকথা লিখেছেন সেগুলি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সত্য। প্রশ্ন হচ্ছে, যেসব ত্রুটির কথা তিনি লিখলেন, সেসব ত্রুটির সঙ্গে তিনিও জড়িত বা অভিযুক্ত। মনে পড়ে, কয়েক বছর পূর্বে শিশির মঞ্চে থিয়েটার ওয়ার্কশপের উদ্যোগে একটি

আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। বিষয়—নাট্য আন্দোলন। এ রকম অনেক আলোচনা, বিতর্ক টিভি, রেডিও, পত্রপত্রিকা, মঞ্চ প্রভৃতি স্থানে হয়েছে এবং হবেও। হোক, এটা সুস্থতার লক্ষণ। বিভাসবাবু এই রকম এক বিতর্ককে আহ্বান জানিয়ে কি নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখতে চেয়েছেন? অবশ্য অস্তিত্ব কাজের ওপর নির্ভরশীল। যেমন উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী—প্রত্যেকেই নিজের 'গ্রুপ' থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েও আবার দল গড়ে (শম্ভুবাবু ছাড়া) প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন নিজ নিজ কর্মদক্ষতার গুণে। শম্ভুবাবু দল না গড়লেও এখনও প্রতিষ্ঠিত। উৎপল দত্তের এল টি জি মৃত হলেও শম্ভুবাবুর 'বহুরূপী', অজিতেশবাবুর 'নান্দিকার', বিভাসবাবুর 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' তাঁদের কর্মদক্ষতা ব্যতিরেকেই ভালই চলছে বলতে হবে। হালের থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'বেলা অবেলা' বিভাসবাবুর ক্ষেত্রে প্রমাণ। অর্থাৎ শম্ভুবাবুর পর কুমার রায়, অজিতেশবাবুর পর রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বিভাসবাবুর পর অশোক মুখোপাধ্যায় একই ঢঙে দল চালাচ্ছেন, চালাবেন। এঁরা গত হলে অনাবাবুরাও কালের রথ চালিয়ে যাবেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য, থিয়েটার ওয়ার্কশপের শিশিরমঞ্চের আলোচনা সভায় 'চেতনা'র অরুণ মুখোপাধ্যায় বীরের মত সত্য কথা বলেছিলেন যে, 'চেতনা' দল তিনিই গড়েছেন, সুতরাং দলের সবাইকে তাঁর কথামত চলতে হবে। যদি কেউ এ ব্যাপারে অন্য মত পোষণ করে, সে দল থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ উৎপল দত্তর রিকশাওয়ালাদের দিয়ে থিয়েটার করার মত ঘোষণা। আসলে আমরা প্রথমে 'নিজে'কে, পরে 'অন্য'কে গুরুত্ব দিই। এই মানসিকতা ঠিক মধ্যবিত্ত মানসিকতা নয়। যারা মহামানব তাঁদের ক্ষেত্রে এই মানসিকতা কখনও কখনও প্রভাব বিস্তার করে না বটে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বাঁকা চোখে না দেখলেও চলবে। একটা আধুনিক ফ্ল্যাটে অভাবহীন জীবনযাত্রাও তো মধ্যবিত্তজীবন। আর এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই সমাজের স্বর্ণখনি। 'সানন্দা'র প্রথম সংখ্যায় অপর্ণা সেনের নেওয়া সাক্ষাৎকারেও সত্যজিৎ রায় অভিমত ব্যক্ত করেছেন, মধ্যবিত্তদের নিয়েই কাজ করতে তিনি তৃপ্ত বেশী। তার মানে সত্যজিৎ রায়ের যা কিছু কর্মযজ্ঞ সে মধ্যবিত্তনির্ভর। সুতরাং বিভাসবাবু যতই গাম্ভীর্য রক্ষা করে শিল্পকর্মের সুন্দর স্বাক্ষর রাখুন না কেন, সবটাই মধ্যবিত্ত কালচার। তাকে 'ভাবালুতা', 'ধোঁয়াটে' শব্দ দিয়ে কটাক্ষ করা যেতে পারে, থিয়েটারের 'বেচারী' ভাবা যেতে পারে, তবু সেই 'গ্রুপ' তাকে 'অন্য থিয়েটার' নাম দিয়ে গড়তে হয়েছে এবং 'বেচারী' থিয়েটারকে ত্যাগ করতে পারবেন না। কারণ, তাহলে বিভাস চক্রবর্তীর অস্তিত্ব বিপন্ন হবে!

পরিশেষে নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে একটি কথা লিখি। আন্দোলন যখন নাটককে কেন্দ্র করে তখন সেই নাটক প্রয়োজনাকে কখনও আন্দোলনের হাতিয়ার ভাবার কোনই অবকাশ গ্রুপগুলি রাখছেন না। কারণ সবকটি নাট্যদল শিক্ষিত শহুরে বাবুশ্রেণীর বাহবা পাবার জন্য শিল্পকর্মের কলাকৌশলের প্রতিযোগিতায় নিজেদের দণ্ডীবদ্ধ রেখেছেন।

সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের কাছে সেজন্য আন্দোলনের বার্তা পৌঁছায়নি। ফলে নাটক মঞ্চস্থ করা গেছে, কিন্তু আন্দোলন কিছুই হয়নি। হাবিব তনবির কি কিছু করছেন?

গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা-৪

॥ ২ ॥

দেশ পত্রিকায় 'মুক্তচিন্তা' বিভাগটির জন্য প্রথমেই সম্পাদক মশাইকে সাধুবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। এটি না থাকলে শিল্প সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে এত খোলামেলা নিবন্ধ থেকে 'দেশ'-এর অগণিত পাঠক বঞ্চিত হতেন।
৯ আগস্ট 'ছিয়াশী তারিখের গ্রুপ থিয়েটার প্রসঙ্গে বিভাসবাবুর নিবন্ধটি মুক্তচিন্তা বিভাগে অন্যতম সার্থক ফসল। এই পর্যায়ে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে আমাদের নতুন করে ভাববার সযোগ দিয়েছেন। একদা গ্রুপ থিয়েটারের একজন সাধারণ কর্মী বিভাসবাবু পরবর্তী পর্যায়ে অনেক অসংগতি ও অনৈক্যের চড়াই উৎরাই ডিঙিয়ে নিজের যোগ্যতায় নির্দেশক এবং এখনও নির্দেশক। তাঁর কলমে যে যন্ত্রণাদগ্ধ 'সত্য' প্রকাশিত হল—গ্রুপ থিয়েটারের একেবারে 'হাঁড়ির খবর' যে সাহস নিয়ে তিনি পাঠক সমীপে নিবেদন করলেন—তা এক কথায় তাঁর পক্ষেই সম্ভব। গ্রুপ থিয়েটার তার ইতিহাস—গণনাট্য সংঘ —তার থেকে বেরিয়ে এসে 'ব্যক্তি'কে ঘিরে নাট্যসংগঠন তার উত্থান- অভ্যুদয় ইত্যাদি অধিকাংশ নাট্যকর্মীরই অজানা নয়। সবকিছু জেনে বুঝেও যা আমরা বলতাম না, বলতে পারতাম না, বলা সম্ভব হত না বা বলতে দেওয়া হত না—সেই মর্মান্তিক সত্যটি বিভাসবাবু সুতীব্র শ্লেষের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। এই স্বীকারোক্তি 'হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা'র শামিল। বিভাসবাবুকে আমরা যতটুকু জানি তিনি শুধু অভিনয় করেননি—দলে থেকেছেন। দলের মধ্যে দল করেছেন। দল ভেঙ্গেছেন। নেতৃত্ব দিয়ে নতুন দল গড়েছেন। এরই মধ্যে দলের 'এক নম্বর দাদা'ও হয়েছেন। আবারও দল ভেঙ্গেছেন। আবারও 'বড়দাদা' হয়ে নতুন দলের—নতুন নাটকের 'হাল' ধরেছেন। এইসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা দলের ওপর আরোপ করেছেন। দাদা হিসেবে এবং দলের কর্তা হিসেবে প্রয়োজনে প্রচণ্ড ডিপ্লোম্যাট হয়েছেন। মাঝে ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে দূরদর্শন শিক্ষাক্রম শেষ করেছেন। চাকরী ছেড়ে নিজের মনোমত বড় চাকরী পেয়েছেন। কিছুদিন বাণিজ্যিক যাত্রার নির্দেশনার দায়িত্বও পালন করেছেন। সুতরাং অভিনয় শিল্পের বিস্তৃত পরিমণ্ডলে অবাধ পরিভ্রমণ করেছেন এবং এখনও সেই গ্রুপ থিয়েটার থুড়ি 'অন্য' থিয়েটার করছেন।

বিভাসবাবু ঠিকই বলেছেন। আসলে গ্রুপ থিয়েটার হল কিছু ব্যক্তি মানুষের কেরিয়ার গড়ার সিঁড়ি। যার মাধ্যমে তাঁরা তরতর করে ওপরে উঠে যান। আর একবার 'ওপরে' উঠতে পারলে সব দরজা—সবার দরজা তাঁদের জন্য অবাধ উন্মুক্ত। বাকিরা? মধ্যবিত্ত ভাবালুতায় আচ্ছন্ন থেকে 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়'। কিন্তু ...। এর পরেও কিন্তু? হাঁ, বিভাসবাবুর জন্যে এর পরেও কিন্তু! ভাগিস্ গ্রুপ থিয়েটার ছিল এবং এখনও আছে। তাই তো আমরা বিভাসবাবুকে পেয়েছি। পেয়েছি বর্ষীয়ান শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, কালী সরকার, তুলসী লাহিড়ী, উৎপল দত্ত, শোভা সেন, সবিতাব্রত দত্ত, কুমার রায়, অমর গাঙ্গুলী, অজিতেশ, রুদ্রপ্রসাদ, কেয়া, মায়া, মমতা, নীলকণ্ঠ, অশোক, অরুণ আরো আরো বহুতর নাট্য-নিবেদিত প্রাণ। বিভাসবাবুকে স্মরণ করাই, গ্রুপ থিয়েটারের ধুলো তাঁর পায়ে সারা গায়ে। তিনি আমাদের সেই চেনা উঠোনের লোক। একান্ত আপনজন। তিনি দীর্ঘজীবী হোন। তিনি নাটক করুন। আরো বেশি করে করুন। কিন্তু একার দ্বারা তো নাট্যকর্ম হয় না। পাঁচজনকে নিতেই হয়। তাই গ্রুপ থিয়েটার 'না-পসন্দ' হলে 'অন্য' থিয়েটারই করুন। চরম প্রয়োজন না হলে শুধু শুধু 'শব ব্যবচ্ছেদ করে' লাভ কি?

দিব্যেন্দু বসু
হাওড়া

কেন রে এই দুয়ারটুকু

দেশ পত্রিকার ৯ আগস্ট সংখ্যায় শ্রীঅরিন্দম চক্রবর্তী মহাশয়ের লেখা "কেন রে এই দুয়ারটুকু" প্রবন্ধটি পাঠ করে অত্যন্ত সুখী হয়েছি। অভিভূত হয়েছি বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। আনন্দপ্রকাশ করার জন্যই এই চিঠি লিখলাম, অন্য কোন ধান্দা নেই। চক্রবর্তী মহাশয় যদি আমার চেয়ে বয়সে ছোটও হন (আমার বয়স ৬১, কলেজে পড়াই) তবু তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাচ্ছি। ভবিষ্যতে এমনই পাঠযোগ্য লেখা আপনারা আরো ছাপাবেন--- আশা করি।

প্রশান্তকুমার বাগচী
শান্তিপুর, নদীয়া

ভারত বিভাগ অথবা সংযুক্তি

১৬ আগস্ট '৮৬ দেশ পত্রিকায় "ভারত বিভাগ অথবা সংযুক্তি" প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় অতুলা ঘোষের • অভিমত, "১৯৪৭-এর পর থেকে একদল লোক ক্রমাগত, 'ভারত বিভাগ' বলে আন্দোলন করে এসেছে। কিন্তু আসলে ভারত বিভাগ হয়নি। এর জন্য দায়ী যতটা রাজনীতিবিদরা তার চেয়ে বেশী দায়ী ঐতিহাসিকরা।" আবার তিনিই লিখছেন, "ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রাক্কালে যাদের বাধ্য হয়ে

ভারতের বাইরে চলে যেতে হয়েছে [অবশ্যই পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়] তাদের প্রতি আমাদের সমবেদনা ও সহানুভূতি স্বাভাবিকভাবেই নিবিড় ।" ভারত বিভাগে আপনজন আমাদের ছেড়ে গেলেন এটা যখন বাস্তব সত্য তখন "আসলে ভারত বিভাগ হয়নি", এ রটনার জন্য "দায়ী যতটা রাজনীতিবিদরা তার চেয়ে বেশী দায়ী ঐতিহাসিকরা"—কি সর্বাংশে সত্য ? লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত বর্তমান রচনায় আছে "ভারতবর্ষের মোট ৪,৪২,৫৯৬ বর্গমাইল চলে গেল [তবু ভারত বিভাগ হয়নি ?] কিন্তু যুক্ত হল ৫,৩৮,৩৯৬ বর্গমাইল" । ঠিক এই হিসাবই আছে তাঁর কংগ্রেস শতবর্ষ সংখ্যা 'দেশ'-এর "ভারত বিভাগ (কার্য ও কারণ)" প্রবন্ধে । সেখানে পাই "দেশ বিভাগে ভারতের অনেক ক্ষতি হয়েছে । ভারতের অনেক জমি হারিয়েছে এটা যেমন সত্য তেমনি লক্ষাধিক বর্গমাইলেরও বেশী পাওয়া গেছে । (পৃঃ ১৩০) যিনি বলছেন "দেশ বিভাগে অনেক ক্ষতি হয়েছে" তাঁরই মন্তব্য "আসলে ভারত বিভাগ হয়নি" তা কিছু মানুষের রটনামাত্র, ঘটনা নয় !

দুটি প্রবন্ধের সাধারণ প্রতিপাদ্য পাকিস্তানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে ভৌগোলিক আয়তনের দিক থেকে ভারত লক্ষাধিক বর্গমাইল অতিরিক্ত ভূমির অধিকারী হয়েছে । অন্য কোনো দেশের ভূমি, বল বা প্রতারণা-সহায়ে ভারতবর্ষ অবশ্যই লাভ করেনি । শাসনতান্ত্রিক সুবিধা ও কূটনৈতিক প্রয়োজনে বিদেশী শাসক ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ-শাসনাধীন এবং করদ ও দেশীয় রাজ্য এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত রেখেছিল । স্বাধীনতার পরে ভারতের রাষ্ট্রসীমানায় যে সব করদ ও দেশীয় রাজ্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদের সামগ্রিক আয়তন থেকে পাকিস্তানের আয়তন বাদ দিয়ে বাড়তি ভূমি লাভের গাণিতিক হিসাব উভয় প্রবন্ধে দেওয়া হয়েছে । হিজ ম্যাজেস্টিস গভর্নমেন্টের প্রজা না হওয়ায় কি দেশীয় রাজ্যের প্রজারা ভারতীয় নন এবং তাঁদের আবাস ভারত ভূখন্ডের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে না ? গ্রীক বীর আলেকজান্ডার যখন পুরুর রাজ্য আক্রমণ করেন তখন পুরু সমগ্র ভারতের অধীশ্বর নিশ্চয়ই ছিলেন না । তবু তাঁর রাজ্য আক্রমণ ভারত আক্রমণ বলে তার ইতিহাসে চিহ্নিত । ভারতবর্ষের দক্ষিণতম প্রান্তের শংকরাচার্য যখন ভারতের চার প্রান্তে মঠ স্থাপন করেন তখন সেই চার প্রান্ত এক রাজশাসনাধীনে ছিল না । তবু সকল অংশই ছিল একটি বিরাট দেশের অঙ্গ । মোগল সাম্রাজ্য, মারাঠা বা রাজপুত রাজ্য এক শাসনাধীন না হলেও ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অখন্ডতা মিথ্যা হয়ে যায়নি রাজনৈতিক সীমানা বিন্যাসে । একইভাবে বিভিন্ন সময়ে রাজা ও রাজ্যসীমা পরিবর্তিত কিন্তু ভারতবর্ষ ভারতবর্ষই থেকে গেছে । ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে তার অন্যথা ঘটেছে এমন বিশ্বাসের কারণ নেই । মুক্তিসাধকরা অখন্ড ভারতের স্বাধীনতায় আত্মাহুতি দিয়েছিলেন । তাঁদের তপস্যা সার্থক হলেও সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা অকল্পনীয় ছিল না । সুতরাং চুক্তির মাধ্যমে স্বাধীনতার শর্তে ভারত বিভাগকে ভারত সংযুক্তি মনে করার আত্মপ্রসাদ ইতিহাস নয়, স্পষ্টতই তার বিকৃতি ।

শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র
বজ বজ, ২৪ পরগণা (দক্ষিণ)

মহাকাশ থেকে

১৬ আগষ্ট, ১৯৮৬র 'দেশ' পত্রিকায় অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা প্রবন্ধ "মহাকাশ থেকে হ্যালি পর্যবেক্ষণ" সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে । এই প্রবন্ধটির প্রকাশনা খুবই সময়োপযোগী হয়েছে । এখন পর্যন্ত বাংলা ভাষায় যে সব পত্র-পত্রিকা কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে, 'দেশ' ছাড়া আর কোনও পত্রিকাতে মহাকাশযান পাঠিয়ে হ্যালির ধুমকেতু সম্পর্কে নতুন কি কি তথ্য জানা গেছে, তার বিবরণ প্রকাশিত হয়নি—সেদিক থেকে বিবেচনা করলে এ লেখাটির মূল্য যথেষ্ট । হ্যালিকে এবারের আগমনে সোভিয়েত, ইউরোপ ও জাপান মহাকাশ গবেষণা সংস্থা সবশুদ্ধ পাঁচটি মহাকাশযান পাঠিয়েছিল, আর এরা খুব নিকটে গিয়ে হ্যালির কেন্দ্রীয় অংশ ও কোমা পর্যবেক্ষণ করেছে এবং তাদের নানারকম আলোকচিত্র তুলেছে—শুধু তাই-ই নয়, এরা এই সব পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য ও আলোকচিত্র পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছে । এই সব আলোকচিত্র ও তথ্য থেকে বিজ্ঞানীরা এই প্রথম ধুমকেতু রহস্যের খানিকটা কিনারা করতে পারবেন বলে আশা করছেন । এই সব গবেষণা সংস্থা যে সব গবেষণালব্ধ তথ্য হ্যালি সম্পর্কে প্রকাশ করেছেন, সেই বিপুল পরিমাণ তথ্য বিশেষভাবে খুঁটিয়ে পড়াশুনো করে লেখক একেবারে সাধারণ পাঠকের জন্যে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন, সে প্রচেষ্টা খুব সার্থক ও সফল হয়েছে ।

সাধারণ মানুষ এ লেখা পড়ে বুঝতে পারে যে কি কি নতুন তথ্য জানা গেছে—এইখানে এই লেখার নিঃসন্দেহে সার্থকতা ।

কিন্তু এই প্রবন্ধ প্রকাশনার ব্যাপারে আমার কিছু বলার আছে । প্রবন্ধটি যে পৃষ্ঠায় আরম্ভ, সেখানে দুখানি ছবি আছে (পৃষ্ঠা ৫৭), কিন্তু তার শিরোনাম এমনভাবে ছাপা হয়েছে যে তা পড়ে বোঝা অত্যন্ত দুরূহ । তার পরের দুটি পৃষ্ঠায় যেখানে প্রবন্ধের মূল অংশটি আরম্ভ হয়েছে, তার ছাপা অত্যন্ত অস্পষ্ট হয়েছে, এমন একটা রঙের ওপরে সাদা হরফের লেখা যে খুব কষ্ট করে তাকে পড়ে বুঝে নিতে হয় । এমনটি হবে কেন ? দেশ পত্রিকার সম্পাদকের কাছ থেকে আরও অনেক উন্নতমানের ছাপা আমরা আশা করব । এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে আরও দৃষ্টি দেওয়ার জন্যে সম্পাদককে অনুরোধ জানাচ্ছি । আর একটা কথা । এ প্রবন্ধে আছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য—সেগুলোতে মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটা একটা সাংঘাতিক ত্রুটি । কিছু কিছু স্থানে মুদ্রণ-প্রমাদ এমন যে পাঠকের মনে সন্দেহ দেখা দেয় । যেমন ৬৩ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে "ধূলিকণার ভর হল ১০-১৪ গ্রাম", ওটি হবে $১০^{১৪}$ গ্রাম—আকাশ পাতাল পার্থক্য হয়ে গেছে । ৬৪ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে "সবচেয়ে বড় ধূলিকণার ভর ৪০ মিলিগ্রাম আর সবচেয়ে ক্ষুদ্র ধূলিকণার ভর মাত্র ১০ গ্রাম" । এখানে ১০ গ্রামের পরিবর্তে $১০^{১৫}$ গ্রাম হওয়ার কথা । এই সব মুদ্রণ-ভ্রমে, অর্থ স্থানে স্থানে এত বিকৃত হয়েছে যে তা আর বলার নয় ।

আমার আরও একটু বক্তব্য আছে । ১৫ই আগষ্ট আমাদের স্বাধীনতা দিবস, সেইজন্যে এই সংখ্যা 'দেশ'-এর প্রচ্ছদে ভারতের পার্লামেন্টের চিত্র শোভিত হয়েছে । কিন্তু হ্যালিকে খুব কাছ থেকে দেখার যে চমকপ্রদ ও অবিস্মরণীয় ঘটনা এবারে হ্যালির আবির্ভাব উপলক্ষে ঘটে গেল, মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটা প্রচণ্ডরকমের প্রগতির প্রতীক, সে ব্যাপারে মানুষের অসাধারণ সাফল্য এই প্রথম—সেইদিক বিবেচনা করে দেখলে এই সংখ্যার 'দেশ'-এর প্রচ্ছদে রাখা উচিত ছিল হ্যালির কেন্দ্রীয় অংশের আলোকচিত্র, আর এই প্রবন্ধই হওয়া উচিত ছিল প্রচ্ছদ নিবন্ধ ।

সুবোধকুমার বসু
নতুন দিল্লী-১১০০১৯

টপ্পা

নিধুবাবুর 'টপ্পা' ক্রমশ আমাদের হতাশ করছে । ব্যাপারটা নিয়ে একটু বেশী আশাই ছিল আমাদের । কিছুদিন আগে তারাপদ রায় আমাদের কাণ্ডজ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধির উপর এমন রসাল প্রলেপ দিয়েছেন যে, এই ধরনের লেখা সম্পর্কে আমাদের প্রত্যাশাটা দিনদিন 'দেশ' পত্রিকার দামের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই চড়ছিল । এই রকম একটা সময়ে নিধুবাবু এলেন । আমরা আকাশছোঁয়া আগ্রহ নিয়ে তাঁর দু-তিনটে টপ্পা পড়লাম এবং বলা বাহুল্য, অতিদ্রুত মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল আমাদের প্রত্যাশা । অচিরেই আমরা 'জঘন্য', 'যাচ্ছেতাই' বিশেষণগুলো বসানোর উপযুক্ত একটা জায়গা পেয়ে গেলাম । 'টপ্পা' রসাল সন্দেহ নেই, কিন্তু আম যেমন খুব বেশী পেকে গেলে খাওয়া যায় না, টপ্পাও তেমনি অতিরিক্ত পক্কতাহেতু মাঝে মাঝে এমন মজে থাকে যে চিরাচরিত 'দেশ'-ই কায়দায় তাকে নেওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে । নিধুবাবু 'টপ্পা'-কে প্রায়ই ভীষণরকম খোলামেলা করে দিয়ে রসরচনা ব্যাপারটাকে ভীষণ রকম খেলো করে দেন ।

আমরা সকলেই নানা রকম ঝামেলায় জড়িয়ে থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে হাসতে চাই, হেসে রমণীয় করে নিতে চাই বেঁচে থাকাটাকে । কিন্তু সে হাসি যদি জোরজবরদস্তি কাতুকুতু মার্কা হয়, আমরা বিরক্ত হই । বিশেষত সে হাসি যদি এমন কোন পত্রিকার মাধ্যমে ছড়ায় যার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা গভীর তাহলে আমরা দুঃখ পাই । অথচ এই দুঃখজনক, বিরক্তিকর কাজটিই নিধুবাবু সপ্তাহের পর সপ্তাহ করে যাচ্ছেন । 'টপ্পা' পড়ে বুঝতে পারছি রসরচনা ব্যাপারটা সত্যিই কত কঠিন ।

অরিন্দম নাথ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
সুমন্ত্র দত্ত
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ।

সম্পাদকীয়

শুভ বিজয়া

মা এলেন। এবার আর চারদিন নয়, পাঁজির কেরামতিতে তিনদিন থেকে আবার ফিরে গেলেন। বৃষ্টি হল না, বৃষ্টি হল না বলে পশ্চিমবঙ্গবাসীর অভিযোগ মা বোধহয় শুনতে পেয়েছিলেন। তাই আসার আগেই নিম্নচাপ তৈরি করে ঘ্যানঘ্যানে বর্ষা আর প্যাচপ্যাচে কাদায় ভক্তদের প্যারেড করিয়ে ছাড়লেন। একালের মানুষ, দেশের রস যত কমছে ততই রসিক হয়ে উঠছেন। কলকাতার পথব্যবসায়ীদের এই সব দুর্যোগের দিনে বলতে শোনা গেছে—মা এবার নৌকোয় আসছেন আর যাচ্ছেন সাবমেরিনে। পুজোর বাজার যখন সবচেয়ে জমে ওঠার কথা সেই সময় বৃষ্টি হলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় তরফেরই মাথায় হাত। আবহাওয়ার ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ নেই ; কিন্তু যার ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত, যেমন বিদ্যুৎ তারই বা কি হাল হল পুজোর আগে। একই সঙ্গে পাঁচপাঁচটা পাওয়ার প্ল্যান্ট ভেঙে পড়া মুখের কথা নয়। দেবীরই কৃপা। পুজোর আগে লোডশেডিং যেন ভোজনের আগে সুক্তো। হতেই হবে, তা না হলে একটা ত্রুটি থেকে যায়।

মা এলেন। কি দেখে গেলেন ! আনন্দিত বা উল্লসিত হবার মতো কিছু চোখে পড়েছে বলে মনে হয় না। কোনও কিছুতেই কি আর প্রাণ আছে তেমন ! বেঁচে থাকার সমস্যা এত বেড়ে গেছে ! জীবন এত বিব্রত ! আনন্দের ডোজ কত বেশি হলে সব দুঃখ ভেসে যেতে পারে তার কোনও হিসেব করা অসম্ভব। সব আয়োজনই আমাদের যেন গ্রাস করতে আসছে। বাড়ি নেই, ঘর নেই, চাকরি নেই, নিরাপত্তা নেই, কিন্তু দেশ বলে তো একটা কিছু থাকবে। পরিবেশ, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, স্কুল কলেজ, জল আলো, যেসব জিনিস একটা দেশে থাকা উচিত তা যদি না থাকে তা হলে জীবনে আর কি অবশিষ্ট থাকে ! খাই না খাই একটা ভালো দেশে থাকি এ গর্বটুকুও করার পথ বন্ধ।

বছরের পর বছর সেই এক হাল। এক বোতল কেরসিনের জন্যে এক মাইল লাইন। সন্ধে হলে কোন ঘরে আলো জ্বলবে, কোন ঘরে জ্বলবে না তা বিদ্যুৎ দপ্তরও জানেন কি-না সন্দেহ। আজকাল লোড শেডিং-এর ফেউ জুটেছে ফেজ-শেডিং। দেবী দুর্গা সন্ধ্যার জনপদ দেখে আর গুনগুন করে গাইতে পারবেন না, 'ঘরে ঘরে আলো দেখে লাগে ভাল।' মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে হয়তো অনেকেই প্রার্থনা করেছেন, 'মা, কবে আমরা একটু সভ্য মানুষের মতো বেঁচে থাকার সুযোগ পাবো ! গ্রামে গ্রাম নেই, শহরে শহর নেই। কলকাতার যানবাহনে নিত্য শুম্ভ নিশুম্ভর লড়াই। স্লোগানটিকে চালু রাখার জন্যেই এই সু-ব্যবস্থা কি না কে জানে—লড়াই, লড়াই, লড়াই, লড়াই, লড়াই করে বাঁচতে হবে, বাঁচতে গেলে লড়তে হবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল সবই প্রায় লাটে উঠে গেছে। এখন অসুস্থ হলে মারসি-কিলিংই মনে হয় ভালো।' যে চালচিত্রে মায়ের আবির্ভাব, সে চিত্রে রাজসিকতা অথবা সাত্ত্বিকতা নেই, আছে ঘোর তামসিকতা। জীবন সম্পর্কে হতাশ না হওয়াই উচিত, তবু হতে হয়, কারণ কেই বা চায় দিনগত পাপক্ষয়। হবে হবে করে যা ছিল, তাও তো যেতে বসেছে। মনোযোগের অভাব, অব্যবস্থা, দুর্নীতি, দলাদলি সব মিলিয়ে বেঁচে হয়তো আমরা আছি ; কিন্তু বাঁচার মোহটা চলে গেছে। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশ নিজেদের অবস্থা চারপাশ থেকে কেমন গুছিয়ে আনছে আর আমরা যা ছিল তাও হারাতে বসেছি। আমাদের অসম্ভব সহিষ্ণুতার এই অপব্যবহার আর কতকাল চলবে !

পশ্চিমবাংলার সর্বগ্রাসী দারিদ্র্য দেখে গেলেন পার্বতী। কর্মহীন যুব সম্প্রদায় নন্দী, ভৃঙ্গী। ড্রাগের নেশায় সদা ঢুলু ঢুলু আঁখি। হতাশ প্রৌঢ় যেন ভোলানাথ, নীলকণ্ঠ। শ্মশানে ভূতের নৃত্য। সেখানেও পুলিস বসাতে হবে। গাঁজার আখড়া বুলডোজার দিয়ে ভাঙতে হচ্ছে। দেখে গেলেন, পশ্চিমবাঙলা ভেতর থেকে ভাঙছে। উত্তরপ্রান্তে পাহাড়ী ভাঙ্গন। আদিবাসীদের সশস্ত্র আন্দোলন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র নিধন। গড়াতে গড়াতে প্রবীণ কর্মচারিরাও শামিল। পরীক্ষার ফল বেরোতে বেরোতে বয়েস বেড়ে যায়। যে ফল বেরলো তাতেও সন্দেহ থেকে যায়। ডাকতে হয় রিভিউ কমিটি।

তবু শরৎ এসেছিল বর্ষণস্নাত। তবু কাশের গুচ্ছে লেগেছিল শিশির ছোঁয়া বাতাস। শিউলি ছুঁয়েছিল মাটি ভোরের প্রার্থনায়। দূরাগত ঢাকের শব্দ। শিশুর সানন্দ পথ চলা। কোজাগরী চাঁদ উঠেছিল আকাশে। কবিতার পূর্ণ আয়োজন। পুজো এলে আর যাই হোক জীবনের খাতা খুলে হিসেব মেলাতে হয়, ক বছর গেল আর রইল ক বছর।

বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছায় বাঁধা রইল আর একটি বছর সাহিত্যের সীমানায়।

এডাম স্মিথ

কার্ল মার্ক্স

উন্নয়নের তত্ত্ব ও ভবিষ্যৎ

অম্লান দত্ত

(৮ ও ৯ অক্টোবর ১৯৮৬ বিধান শিশু উদ্যানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত অশোককুমার সরকার স্মৃতি বক্তৃতামালা । বিধান শিশু উদ্যানের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রাপ্ত ।)

আর্থিক উন্নয়ন বিষয়ে আঠারো শতকের শেষভাগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষক ও ব্যাখ্যাতা ছিলেন এডাম স্মিথ । বৃটেনে শিল্পবিপ্লবের সেটা জন্মলগ্ন । স্মিথের তত্ত্বের একই সঙ্গে ধারক ও সমালোচক ডেভিড রিকার্ডো । তাঁর পর উনিশ শতকের মধ্য ও শেষভাগে যাঁরা এ বিষয়ে চিন্তার ক্ষেত্রে আলোড়ন তুলেছিলেন তাঁদের ভিতর কার্ল মার্ক্স ও জন স্টুয়ার্ট মিল বিশেষভাবে স্মরণীয় । সেই সময়ে আরো কিছু দেশে, যেমন জার্মানিতে, দ্রুত শিল্পোন্নয়ন শুরু হয়েছে । আর বৃটেনে ততদিনে শিল্পবিপ্লব শৈশব অতিক্রম করে গেছে । স্মিথের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের টীকাভাষ্য তখন আর যথেষ্ট রইল না । উনিশ শতকের অভিজ্ঞতার আলোতে উন্নয়নতত্ত্বকে নতুনভাবে সাজানো সম্ভব ও প্রয়োজন হল । মিল ও মার্ক্সের পর আরো এক শতাব্দীর অধিক কাল কেটে গেছে ! অনিবার্যভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে আরো নতুন তথ্য ও অভিজ্ঞতা, উনিশ শতকের পরিধির ভিতর যাদের খোঁজ পাওয়া কঠিন হবে । পূর্বসূরীদের চিন্তা এখনও মূল্যবান । তবু সময় এসেছে নতুন চিন্তার । পুরনো চিন্তার ব্যাখ্যাই যথেষ্ট নয় ।

(ক)

১৭৭৬ সালে এডাম স্মিথের সেই বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হল যার নাম, *An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, অর্থাৎ *জাতিসমূহের ধনদৌলতের প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধান* । স্মিথ একদিকে ছিলেন তাত্ত্বিক ও দার্শনিক, অন্যদিকে আর্থনীতিক ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর ভালো রকম পরিচয় ছিল ।

আর্থিক উন্নয়নের মূল কারণগুলি কী ? স্মিথের অনুসন্ধান এই নিয়ে । এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্যের খানিকটা পরিচয় দেওয়া যাবে । তার আগে পরিভাষা সংক্রান্ত একটা ছোটো প্রশ্ন আছে । বাংলায় 'অর্থ' শব্দটার একাধিক মানে হয় । ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'money' বাংলায় তাকে অনেক সময় 'অর্থ' বলি । যেমন ধরুন এই বাক্যটি,'জিনিস বিনিময়ের অসুবিধা দূর করতে গিয়ে অর্থের আবিষ্কার হল' (ধনবিজ্ঞান) । এখানে ঐ শব্দটির মানে হল money অর্থাৎ মুদ্রা । আবার ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'economic development' তাকে বাংলায় তর্জমা করে আমরা বলি আর্থিক উন্নয়ন । এখানে অর্থ শব্দটির অন্য এক মানে পাচ্ছি ।

অনেকে হয়তো ভাববেন, এই দুই অর্থের ভিতর পার্থক্য তেমন বড় নয় । আর্থিক অবস্থার উন্নতি মানেই হল টাকাপয়সার বৃদ্ধি । অথবা কথাটা উলটে বলা যায় টাকাপয়সা বাড়লেই আর্থিক উন্নতি হয় । ব্যক্তির ক্ষেত্রে এইরকম মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় । কিন্তু জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রেও কি এ কথা বলা যায় ? এইখানেই এডাম স্মিথের সঙ্গে তাঁর পূর্ববর্তী কিছু অর্থশাস্ত্রীর মতের মৌল পার্থক্য দেখা যায় । স্মিথের আগের যুগে অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রতিপত্তি ছিল, 'মার্কেন্ট্যালিস্ট' মতবাদের । এই মতবাদের লেখকেরা বিশ্বাস করতেন, দেশের ভাণ্ডারে সোনারুপো যত জমবে ততই আর্থিক উন্নয়ন এগিয়ে যাবে । অবশ্য তাঁদের কথাটা এখানে অতিরিক্ত সরল আকারে বলা হল । যাই হোক, এডাম স্মিথ মার্কেন্ট্যালিস্ট মতবাদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন । তিনি এই কথাটা জোরের সঙ্গে বলতে চেয়েছিলেন যে, সোনারুপো অথবা মুদ্রার পরিমাণ বাড়ানোটা আর্থিক উন্নয়নের মূল কথা নয় । উন্নয়নের একটা বাস্তব ভিত্তি চাই । যেমন শ্রমে দক্ষতা অথবা কার্যক্ষমতা আর্থিক উন্নয়নের বাস্তব নির্ধারক । আমাদের

জানতে হবে, কার্যক্ষমতা কীভাবে বাড়ে ? ইতিহাস ও তত্ত্ব মিলিয়ে এই প্রশ্নটার উত্তর আমাদের বুঝে নিতে হবে।

এডাম স্মিথ বললেন, বাজারের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে শ্রম বিভাগ বেড়ে চলেছে, আর তার সঙ্গে বাড়ছে শ্রমে দক্ষতা। একই মানুষকে যদি সব কাজই করতে হয় তবে কোনো কাজেই তার বিশেষ দক্ষতা আশা করা যায় না। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সবই যদি একই ব্যক্তিকে করতে হয় তবে জুতো সেলাইয়ের কাজে তাঁর বিশেষ পারদর্শী হবার সম্ভাবনা কম, শাস্ত্রেও বিশেষ পণ্ডিত হওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন। এডাম স্মিথ অবশ্য অন্য এক ধরনের কর্মবিভাগের কথা বিশেষ করে ভাবছিলেন। শিল্পের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সবটা আর কোনো একজনের হাতে থাকে না, প্রক্রিয়াটা ছোটো ছোটো অংশে বিভক্ত হয়ে যায়, আর প্রতিটি অংশে নিযুক্ত হয় এক বা একাধিক কর্মী। একই সঙ্গে যন্ত্রের ব্যবহারও বেড়ে যায়, বহুবিভক্ত প্রক্রিয়াগুলি যখন যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। এসবই ঘটতে পারে তখনই বেশি পরিমাণে শিল্পোৎপাদন যখন প্রয়োজন, আর বাজারের বিস্তার ঘটলে তবেই এটা সম্ভব। কৃষককন্যা যদি ঘরে বসে নিজের কাপড় নিজে বোনে তবে সেখানে শ্রমবিভাগের সুযোগ কম। কিন্তু বাজারের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে কাপড়ের কল ; কাজের প্রক্রিয়াটা সেখানে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় ; সেই সঙ্গে বাড়ে যন্ত্রের ব্যবহারও।

শ্রম বিভাগের ফলে কেউই আর নিজের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ জিনিস নিজে উৎপাদন করে না, নির্ভর করতে হয় বাজারের ওপর। মিলের মালিক উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রী করবার আগেই শ্রমিককে তার মজুরি মিটিয়ে দিতে হয়, যাতে দিনের শেষে তার গ্রাসাচ্ছাদন জোটে। কিন্তু মজুরি অগ্রিম দিতে গেলেই প্রয়োজন মূলধন। কাজেই শ্রমবিভাগ ও বাজারভিত্তিক উৎপাদনের জন্য মূলধন অত্যাবশ্যক। মূলধন আসে সঞ্চয় থেকে। এডাম স্মিথ তাই সঞ্চয়ের ওপর জোর দিয়েছিলেন।

এমনিভাবে স্মিথের চিন্তায় শ্রমবিভাগ, বাজারের বিস্তার, সঞ্চয় আর মূলধন পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। এই সবের ভিত্তিতে বৃদ্ধি পায় কার্যদক্ষতা। আর্থিক উন্নয়নের এটাই বাস্তব ভিত্তি। এই বাস্তব ভিত্তি যদি অনুপস্থিত থাকে তবে দেশে শুধু মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়ে জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব নয়। এই যে 'বাস্তব' বিশ্লেষণের ওপর জোর দেওয়া, এটা পাশ্চাত্য ধ্রুপদী অর্থবিজ্ঞানের একটা বৈশিষ্ট্য। টাকার মুখোশ পরে আর্থিক ক্রিয়াকাণ্ড আমাদের সামনে দেখা দেয়। সেই মুখোশের পশ্চাতে আছে 'বাস্তব' অর্থনীতি। শ্রম। ভূমি। মূলধন, অর্থাৎ যন্ত্রপাতি আর শ্রমিকের জীবনধারণের অন্ন। এইসব উপাদানের সংযুক্ত সুদক্ষ প্রয়োগে উৎপাদন হয় পণ্যদ্রব্য। পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ের জন্য বাজার। টাকা এই বিনিময়ের সহায়ক। তেল যেমন চাকা ঘোরাতে সাহায্য করে, কিন্তু তেলটা চাকা নয়। অর্থনীতির চাকাটা দৃষ্টির ভিতর আনতে হবে। 'বাস্তব' বিশ্লেষণের প্রতি মনোযোগ, ধ্রুপদী অর্থবিজ্ঞানের জোর এইখানে। পরবর্তী কোনো কোনো অর্থনীতিবিদের মতে তার দুর্বলতার একটা কারণও নিহিত এইখানে।

আগেই দেখেছি, উন্নয়নতত্ত্বে সঞ্চয়কে একটা বিশেষ স্থান দিয়েছিলেন এডাম স্মিথ। এটাকে ধ্রুপদী অর্থনীতির আরেক বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। জমিদার আর শিল্পপতি এই দুই শ্রেণীর লোকের প্রতি এডাম স্মিথের মনোভাবের পার্থক্য লক্ষ করবার মতো। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের প্রতি তাঁর মনের এক কোণে একটা গভীর সন্দিগ্ধতা ছিল। এই শ্রেণীর মানুষ সুযোগ পেলেই জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে জনসাধারণকে বিপাকে ফেলে, এই ধরনের উক্তি আছে তাঁর লেখায়। কিন্তু আর্থিক উন্নয়নের কাজে, দেশের ধনদৌলত বাড়াবার ব্যাপারে, তবু জমিদার বা অভিজাত শ্রেণীর ওপরে তিনি স্থান দিয়েছেন ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি শ্রেণীকে। অভিজাত শ্রেণীর মানুষ সঞ্চয়ী নয়, শিল্পপতি সঞ্চয়ী। সঞ্চয় আর সঞ্চয়ের বিনিয়োগ, উন্নয়নের জন্য এটাই জরুরী। কৃষির উন্নতির জন্যও এটা প্রয়োজন। ব্যাবসায়িক দৃষ্টি নিয়ে কৃষিতে মনোযোগ দিলে তারও উন্নতি ঘটে।

আর্থিক ক্রিয়াকাণ্ডে রাষ্ট্রের স্থান কী হবে ? অনেকে বলেন, বাজারের হাতেই এডাম স্মিথ সব ছেড়ে দিয়েছিলেন, রাষ্ট্রের জন্য আর্থিক ক্রিয়াকর্মে বিশেষ কোনো ভূমিকা তিনি অবশিষ্ট রাখেননি। স্মিথ সম্বন্ধে এটা ভুল ধারণা। অবশ্য আর্থিক ক্রিয়াকাণ্ডে বাজারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাঁর চিন্তায় স্বীকৃত। কিন্তু এ কথাও তিনি বুঝেছিলেন যে, ব্যবসায়ীদের হাতে সব ছেড়ে দিলে ঝোঁক চলে যায় একচেটিয়া ব্যবসায়ের দিকে। কাজেই রাষ্ট্রের একটা সদাসতর্ক ভূমিকা ছাড়া ব্যবসায় নির্বাধ থাকে না। তা ছাড়া এমন অনেক ক্রিয়াকর্ম আছে যাতে জাতীয় জীবন সামগ্রিকভাবে উন্নত কিংবা উপকৃত হয়, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কোনো ব্যবসায়ীর পক্ষে সেই সব কাজ তেমন লাভজনক নয়। স্মিথের প্রিয় উদাহরণ, জনসাধারণের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা। এইসব ক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা চেয়েছিলেন।

এডাম স্মিথের পর ধ্রুপদী অর্থবিজ্ঞানের প্রধান নায়ক ডেভিড রিকার্ডো। জমিদার আর শিল্পপতির ভিতর স্বার্থের দ্বন্দ্বের একটা পরিষ্কার বিশ্লেষণ পাওয়া যায় রিকার্ডোর লেখায়। স্মিথ জোর দিয়েছিলেন এই কথাটার ওপর যে, জমিদারশ্রেণী সঞ্চয় ও বিনিয়োগের কাজে বড় আগ্রহী হয় না, আগ্রহী হয় বিলাসব্যসনে, কাজেই আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর ভূমিকা দুর্বল। রিকার্ডো দেখালেন যে, আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে এই দুই শ্রেণীর স্বার্থ এবং দৃষ্টিভঙ্গী বিপরীত। তৎকালীন একটা রাজনীতির বিতর্কের ভিতর দিয়ে প্রশ্নটা জরুরী হয়ে উঠেছিল। নেপোলিয়নের আমলে ফ্রান্সের সঙ্গে বৃটেনের বৈরসম্পর্কের কারণে ফরাসী দেশের গম এক সময়ে ইংলন্ডে আসতে পারেনি। নেপোলিয়ন বিগত হবার পর বেশ কিছুকাল ফরাসী গমের আমদানির ওপর একটা শুল্ক থেকে গেল ইংরেজ কৃষকের স্বার্থে। ঐ শুল্কটা থাকবে, না তুলে দেওয়া হবে, এই নিয়ে তর্ক শুরু হল। তুলে দিলে অপেক্ষাকৃত শস্তা গম ইংলন্ডের জনসাধারণের হাতে আসবে। গমের দাম কমে গেলে কিন্তু জমিদারের প্রাপ্য খাজনা কমে যাবে। গমের দাম বেশি হলে জমিদারের লাভ। কিন্তু খাদ্যমূল্য বাড়লে মজুরীও বাড়ে, তাতে শিল্পপতির ক্ষতি। রিকার্ডো ছিলেন আমদানী শুল্ক তুলে দেবার পক্ষে। জমিদার ও শিল্পপতির স্বার্থের দ্বন্দ্বটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল সেই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে। রিকার্ডো সেটাকে তত্ত্ব হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। স্মিথের মতো তিনিও অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে ছিলেন।

যেমন জমিদার ও শিল্পপতির ভিতর স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে, বিশেষত হ্রস্বমেয়াদী দৃষ্টিতে, তেমনি দ্বন্দ্ব আছে শ্রমিক ও শিল্পপতির ভিতরও। এডাম স্মিথ ও রিকার্ডো সেটা লক্ষ করেননি এমন নয়। শ্রমিকেরা সংগঠিত নয় বলে শিল্পপতিদের সঙ্গে দর কষাকষিতে তারা সুবিধা করতে পারে না, স্মিথের লেখায় এই ধরনের মন্তব্য আছে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বটার ওপর স্মিথ অথবা রিকার্ডো ততটা জোর দেননি। তাঁদের দৃষ্টিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ জাতির স্বার্থে। এইখানে এসে পড়ে দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টির একটা বিচার। আর্থিক উন্নয়নের ফলে দীর্ঘমেয়াদে কি শ্রমিকেরও অবস্থার উন্নতি ঘটে ? ধ্রুপদী অর্থবিজ্ঞানীদের মতে সেটা নির্ভর করছে অন্য কিছু অবস্থার ওপর, যার ভিতর প্রধান জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। দেশে পুঁজি সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন শিল্পের বৃদ্ধি ঘটে তেমনি শ্রমের জন্য চাহিদাও বাড়ে। জনসংখ্যা যদি একই হারে বেড়ে চলে তবে মজুরি বাড়বে না। অনিয়ন্ত্রিত সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলে শ্রমিকের দারিদ্র্য দূর করা যাবে না। মালথাস এ কথাটা বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেছিলেন। তবে সংখ্যানিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনার বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। স্মিথ থেকে জন স্টুয়ার্ট মিল পর্যন্ত সবাই সেটা মানতেন। একদিকে প্রয়োজন পুঁজিসঞ্চয় অব্যাহত রাখা আর অন্যদিকে জন্মনিয়ন্ত্রণ। তবেই শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার উন্নতি হবে, ধ্রুপদী অর্থবিজ্ঞানীদের এই ছিল অভিমত।

একটা প্রশ্ন এখানে তোলা যেতে পারে। পুঁজিসঞ্চয় করা হলেই কি যথেষ্ট ? তার বিনিয়োগের সুযোগ থাকছে কি না সেটাও তো দেখা দরকার। যদি সঞ্চিত পুঁজির বিনিয়োগের সুযোগ কমে যায়, তবে তা থেকেই কি আর্থিক সঙ্কট দেখা দিতে পারে না ? এ বিষয়ে ধ্রুপদী অর্থবিজ্ঞানীদের ভিতর মতামতের কিছু পার্থক্য ছিল। তবে অধিকাংশের মতটা সংক্ষেপে এই রকম। ধরা যাক উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগের ক্ষেত্র আছে শুধু দুটি, খাদ্যশস্যের চাষ আর কাপড়ের কল। যারা কৃষিতে নিযুক্ত তাদেরও কাপড়ের প্রয়োজন আছে, আবার যারা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত তাদেরও খাদ্যের চাহিদা আছে। দুটো ক্ষেত্রেই যদি অনুপাত রক্ষা করে মূলধন বিনিয়োগ করা যায় তা হলে চাহিদার অভাবে উৎপাদন আটকে যাবে না। এমন অবশ্য হতে পারে যে, কাপড়ের কলে অত্যধিক টাকা ঢালা হল আর কৃষিকাজ অবহেলিত থেকে গেল। তা হলে বাড়তি কাপড় কিনবার মতো যথেষ্ট চাহিদা হয়তো বাজারে থাকবে না, কারণ চাষীদের আয় যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ

বিভিন্ন ক্ষেত্রের ভিতর পুঁজির বিনিয়োগে অনুপাত রক্ষা না করলে বাজারে সঙ্কট দেখা দিতে পারে। ভুলটা শোধরাতে সময় লাগে, কিন্তু বাজারের সংকেত বুঝে নিয়ে ঠিক পথে ফিরে আসা সম্ভব। এইরকম ভুল সংশোধন করতে করতেই অর্থনীতি এগিয়ে চলে। যোগান বাড়াতে গিয়ে বাড়তি পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয়, আর তা থেকেই বাড়তি আয় এবং চাহিদাও সৃষ্টি হয়। খাদ্যশস্য ও বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে আমাদের তাত্ত্বিক ছকের মধ্যে যদি আমরা যন্ত্রশিল্প যোগ করে দিই তা হলেও মূল যুক্তিটা ভেঙে পড়বে না। বাজারে সংকট যদিও মাঝে মাঝে দেখা দেয় তবু পুঁজির বিনিয়োগ ও আর্থিক উন্নয়ন সাময়িক হেরফের অতিক্রম করে এগিয়ে চলে। ইতিহাসের পথ মসৃণ নয়, এ কথা স্বীকার করে নিয়েও সাময়িক উত্থানপতন অথবা সুবিধা-অসুবিধার চেয়ে আর্থিক উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী নির্ধারকগুলির প্রতি অধিক মনোযোগী হতে শিখিয়েছে ধ্রুপদী অর্থবিজ্ঞান। 'বাস্তব' বিশ্লেষণের মতোই এটাও তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দীর্ঘ দৃষ্টিতে উন্নয়নের পথে একটি মূল বাধাই ধ্রুপদী আর্থিক তত্ত্বে স্বীকৃত। ভূমির উৎপাদিকা শক্তির একটা সীমা আছে। ফলে উন্নয়নের গতি একসময়ে ক্রমবর্ধমান বাধার সম্মুখীন হতেই পারে। কিন্তু সেটা বাজারের সঙ্কট নয়। উন্নয়নের দীর্ঘকালীন সীমা নির্ধারিত হচ্ছে চাহিদার অভাব থেকে নয়, জমির উৎপাদিকা শক্তির সীমাবদ্ধতা থেকে। জমি বলতে এখানে বোঝাচ্ছে না শুধু কৃষিযোগ্য ভূমি। আরো ব্যাপক অর্থে তেল কয়লা সহ সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক সম্পদের কথাই ধরতে হবে।

ধ্রুপদী অর্থবিজ্ঞানীরা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন এইরকম বলা হয়ে থাকে। কথাটা একেবারে ভুল নয়। তবে সম্পূর্ণ ঠিকও নয়। ধ্রুপদী অর্থবিজ্ঞানের মূল সিদ্ধান্তগুলি মেনে নিলেই যে কাউকে ধনতন্ত্রের সমর্থক হতেই হবে এমন নয়। যেমন ধরা যাক জন স্টুয়ার্ট মিলের কথা। তিনি অর্থবিজ্ঞানের ঐ সিদ্ধান্তসমূহ মোটামুটি মানতেন। কিন্তু সমাজতন্ত্র ও সমবায়ের প্রতি ছিল তাঁর গভীর সহানুভূতি। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সমাজবাদের ভিতর সমন্বয়ে তিনি আস্থা স্থাপন করেছিলেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ অগ্রসর হবে সমবায়ের পথে, এই তাঁর আশা ছিল। জন স্টুয়ার্ট মিলের সমন্বয়ী চিন্তা যুক্তিগ্রাহ্য কি না সেই আলোচনা আপাতত মুলতবী থাক।

উনিশ শতকের গোড়ায় ধ্রুপদী অর্থবিজ্ঞানের প্রভাব প্রবল হলেও সমালোচকের অভাব ছিল না। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে লিস্ট অথবা সিসমঁদির নাম। তবে অন্যান্য সবাইকে প্রসিদ্ধিতে ছাড়িয়ে গেছেন মহাপণ্ডিত কার্ল মার্ক্স। তাঁর চিন্তার সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া এখানে অসম্ভব। তবু সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা দরকার।

মার্ক্সের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর শোষণতত্ত্ব বহু লোকের মুখে-মুখে শোনা যায়। মানুষ তার শ্রমের দ্বারা পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে। শ্রমের পরিমাণ দিয়েই দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হয়। আবার ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রম নিজেই একটি পণ্যদ্রব্য কারণ বাজারে তার ক্রয়-বিক্রয় চলে। শ্রমিক যে-পরিমাণ মূল্য সৃষ্টি করে আর শ্রমের পরিবর্তে যে-মূল্য লাভ করে, এই দুয়ের ভিতর পার্থক্য আছে। যে-মূল্য শ্রমিক সৃষ্টি করেছে অথচ লাভ করেনি তাকে বলা হয়েছে উদ্‌বৃত্ত মূল্য। শ্রম ক্রয় করে পুঁজিপতি, উদ্‌বৃত্ত মূল্য তারই হস্তগত হয়। এরই নাম শোষণ। উদ্‌বৃত্ত মূল্য দিয়েই শোষণের পরিমাপ হয়। উদ্‌বৃত্ত মূল্যের দ্বারা পুষ্ট হয় শোষকশ্রেণী।

শ্রমের মূল্য, অর্থাৎ শ্রমিকের মজুরি, নির্ধারিত হয় কী ভাবে? ধনিকেরই স্বার্থে শ্রমিক লাভ করে সেই নিম্নতম মজুরি যাতে সে কষ্টে-সৃষ্টে বেঁচে-বর্তে থাকে আর প্রতিদিন ফিরে আসে আবারও উৎপাদনের কাজে উৎসর্গিত হবার জন্য। উদ্‌বৃত্ত মূল্য থেকে পুঁজি সঞ্চয় হয়, তাই দিয়েই নতুন করে শ্রমিক নিযুক্ত হয়, আর ক্রয় করা হয় সেই যন্ত্রপাতি যার সৃষ্টির মূলেও আছে শ্রম। পুঁজি সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে-সঙ্গে শ্রমিকের জন্য পুঁজিপতির চাহিদাও স্বাভাবিকভাবে বাড়বার কথা আর তারই ঊর্ধ্বমুখী চাপে বাজারের সাধারণ নিয়মে মজুরি বৃদ্ধি পাবার কথা। কিন্তু ধনিকশ্রেণী মজুরি-বৃদ্ধি রোধ করতে বদ্ধপরিকর। একে তো শ্রমের ক্রেতা হিসেবে পুঁজিপতিদের ভিতর একটা সমঝোতা বা অলিখিত চুক্তির মতো আছে। তা ছাড়া মজুরি-বৃদ্ধির উপক্রম দেখা দিলে শ্রমিকের নিয়োগ কমিয়ে দিয়ে যন্ত্রের নিয়োগ বাড়াবার পথে অগ্রসর হয় শিল্পের মালিক। যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে শ্রমিকদের ভিতর বেকারের সংখ্যা বেড়ে যায়। এই বেকারবাহিনীর চাপে মজুরি সর্বনিম্ন স্তরেই থেকে যায়।

এইসঙ্গে ধনতন্ত্রের আরো একটা ঝোঁকের কথা মার্ক্সীয় অর্থতত্ত্বে বলা হয়েছে। শিল্পে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ শিল্পের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ছোটো ছোটো শিল্প হয় বড় শিল্পের লেজুড় হয়ে যায়, নয়তো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে বিদায় নেয়। পুঁজি ক্রমশ অল্পসংখ্যক পুঁজিপতির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। এইভাবে সমাজে দুই বিপরীত মেরু সৃষ্টি হয়। এক মেরুতে অবস্থিত অল্পসংখ্যক ধনিক যাদের হাতে পুঁজি পুঞ্জীভূত। আর অন্য মেরুতে আছে বঞ্চিত জনসাধারণ যাদের শ্রমশক্তি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এইভাবে ধনিক ও শ্রমিকের দুই শিবিরে সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে, মধ্যবিত্তের স্থান ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

ধনতন্ত্রের ভিতর স্ববিরোধ এবার স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে ওঠে। একদিকে মূলধন ও যন্ত্রের অগ্রগতির ফলে সমাজের উৎপাদিকা শক্তি অসামান্যভাবে বেড়ে যায়। অন্য দিকে অধিকাংশ মানুষের দারিদ্র্যের ফলে ক্রয়ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থেকে যায়। দেশের ভিতর পণ্যদ্রব্য বিক্রি করার পথে কঠিন বাধা সৃষ্টি হয়। পুঁজিপতিরা তখন বিদেশের বাজার খুঁজতে বাধ্য হয়। বিদেশের বাজার নিয়ে আরম্ভ হয় বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশের ভিতর বিরোধ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। দেশের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট এইভাবে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। মার্ক্সবাদের শিক্ষা এই যে, ধনতন্ত্র স্থির হয়ে থাকে না, তার অন্তর্নিহিত স্ববিরোধ ক্রমেই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। বিপ্লবের ক্ষেত্র এইভাবে প্রস্তুত হয়। এই বিপ্লবে নেতৃত্বের ভূমিকা নেয় শ্রমিকশ্রেণী। আধুনিক শ্রমিকশ্রেণী একদিকে ধনতন্ত্রেরই সৃষ্টি। অন্য দিকে এই শ্রমিকশ্রেণীই ধনতন্ত্রের সংহারক।

মার্ক্সীয় তত্ত্ব অনুযায়ী বিপ্লবের পর প্রতিষ্ঠিত হবে শোষণমুক্ত সমাজ। যে-রাষ্ট্রযন্ত্র একদিন ছিল ধনিকের হাতে শোষণের ও অত্যাচারের যন্ত্র, সেটা এবার হবে শ্রমিকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন। বিপ্লবোত্তর সমাজেরও বিবর্তনে একাধিক ধাপ আছে, যার প্রথম ধাপকে বলা হয়েছে সমাজতান্ত্রিক আর উচ্চতর ধাপকে সাম্যবাদী। রাষ্ট্র যেহেতু মূলত শ্রেণী-আধিপত্য রক্ষার নিপীড়ক যন্ত্রবিশেষ, অতএব শোষণমুক্ত সমাজে তার প্রয়োজন ক্রমে ফুরিয়ে যাবারই কথা। সেটাই মার্ক্স আশা করেছিলেন। সেইখানে পৌঁছবার পথে শ্রমিকশ্রেণীর ডিক্টেটরশিপ একটা ঐতিহাসিক পর্যায়। মানুষের সার্বিক মুক্তিই শেষ লক্ষ্য।

একথা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, মার্ক্সীয় আর্থিক তত্ত্বের মূল ছিল ধ্রুপদী বিশেষত রিকার্ডোর চিন্তাভাবনায়। তবু এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর কিছু গুরুতর বৈসাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। আর্থিক জীবনে মাঝে মাঝে অস্থিরতা দেখা দেয় একথা রিকার্ডো, মিল সহ সবাই জানতেন। কিন্তু মার্ক্স বিশ্বাস করতেন, ধ্রুপদী অর্থবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন না, যে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ভিতর সংকট অনিবার্যভাবে ক্রমেই বেড়ে চলবে। ধনতন্ত্রের আশ্রয়ে শিল্পের উৎপাদিকা শক্তির অভূতপূর্ব বৃদ্ধি ঘটে, একথা স্মিথ এবং মার্ক্স উভয়েই মানতেন। শ্রেণীবিরোধের কথাও এঁদের কারোই অজানা ছিল না। তবে মার্ক্স তাত্ত্বিকভাবে স্বীকার করতেন না, ধ্রুপদী চিন্তানায়কেরা করতেন, যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতরও শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার উন্নতি সম্ভব। বলা বাহুল্য, আর্থিক ধ্যানধারণার এই পার্থক্যের সঙ্গে যোগ ছিল রাজনীতির, আরো ব্যাপক অর্থে সমাজনীতির। অবশ্য বিশ শতকের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও আমাদের ঐ দুই বিরোধী তত্ত্বের ভিতরই একটিকে বেছে নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। বরং সম্ভব আরো নতুন দৃষ্টিভঙ্গী।

(খ)

থিওরী অথবা তত্ত্বের সঙ্গে তথ্য সব সময়ে মেলে না। অথচ তত্ত্বের উদ্দেশ্য তথ্যকে বুঝতে সাহায্য করা। তত্ত্বের ভিত্তিতে যে-সব প্রত্যাশা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়, তথ্যের সঙ্গে তাদের মিলিয়ে দেখবেন সমাজবিজ্ঞানী। প্রয়োজন হলে সংশোধন করবেন পূর্বকল্পনা। বৈজ্ঞানিকের কাছে কোনো গৃহীত তত্ত্বই শেষ কথা নয়।

মোটা ধরনের কিছু তথ্যের প্রতি এবার দৃষ্টিপাত করা যাক।

পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ধন-বণ্টনে অসাম্য এখনও আছে বড় আকারেই। তবে শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে এ-কথা বলা যাবে না যে, সেই অসাম্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। বেকার সমস্যার সমাধান পৃথিবীর উন্নত ও অনুন্নত অধিকাংশ দেশে এখনও নাগালের বাইরে। দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিতে দেখতে

গেলে এ-কথাই বলতে হয় যে, ব্যবসায়িক অস্থিরতা এবং উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় মোটের ওপর বেড়েই চলেছে। সেই সঙ্গে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হয়েছে, যদিও তাদের অভাববোধ বোধকরি কিছুমাত্র কমেনি। জাপানে, পশ্চিম ইউরোপে অথবা আমেরিকায় আজকের শ্রমিক এক অথবা কয়েক প্রজন্ম আগের শ্রমিকের তুলনায় উন্নততর জীবনযাত্রার অধিকারী। এটা সম্ভব হয়েছে শিক্ষার প্রসার, শ্রমিক সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধি এবং প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে। ধনতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের মজুরি বাড়েনি এ-কথাটা সাধারণভাবে সত্য নয়। অবশ্য এইসব কথারই সমালোচনা সম্ভব। মার্ক্সবাদী মহলে যে-সমালোচনাটি প্রায়ই শোনা যায় তা হল এই যে, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতি সম্ভব হয়েছে অনুন্নত দেশের শ্রমিকদের শোষণ করে। পশ্চিমের ধনপতি স্বদেশে শ্রমিকদের কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিতে পেরেছে বিদেশে দারিদ্র্য চালান দিয়ে। অর্থাৎ, উন্নত ধনতন্ত্রের শ্রমিকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের প্রসাদপুষ্ট, এর বেশি কিছু নয়। পিছিয়ে-পড়া দেশগুলিতে অনেকেরই এইরকম বিশ্বাস। এ-বিষয়ে আরো কিছু আলোচনা পরে করা যাবে।

এই শতকের আরেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা, নতুন মধ্যবিত্তের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি। এই মধ্যবিত্ত শুধু ছোটো ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের নিয়েই নয়। আরো অন্য ধরনের মানুষ এর ভিতরে আছে। শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক গবেষক যন্ত্রবিদ ও নানা রকমের বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এরা নতুন মধ্যবিত্তের পঙ্‌ক্তিভুক্ত। পুঁজিপতি নয় এরা, কিন্তু অনেকেই উচ্চপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়েছে এদের শিক্ষায়, যার ফলে এদের আয়ের ক্ষমতা বেড়ে গেছে। এদের আয়ের উৎস নয় অশিক্ষিত শ্রম। বরং শিক্ষা, ব্যয়বহুল শিক্ষাই, এদের প্রধান পুঁজি। এদের অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে এক করে দেখা চলবে না। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এই নতুন মধ্যবিত্ত আধুনিক শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, বরং তার আশ্রয়ে বেড়ে চলে।

নতুন মধ্যবিত্তের আর এক অবলম্বন আমলাতন্ত্র। আধুনিক রাষ্ট্রে, কি ধনতন্ত্রে কি সমাজতন্ত্রে, আমলাদের শক্তি ও সংখ্যা বেড়ে চলেছে। আমাদের মতো দেশেও এরা বর্তমান ও বর্ধমান। উচ্চপর্যায়ের আমলাদের কোনো প্রকারেই শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাকার করে দেখা যায় না। এরা নতুন মধ্যবিত্তেরই অংশবিশেষ। যন্ত্রবিদ বিশেষজ্ঞ ও আমলাবাহিনী নিয়ে গঠিত এই যে বিশেষ শ্রেণী, এরা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তেমনি স্বচ্ছন্দে বিরাজ করে যেমন করে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। এই নব মধ্যমশ্রেণীর অবস্থান ও ভূমিকা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ছাড়া আজকের দিনে কোনো সঠিক সমাজতত্ত্ব হয় না।

অন্তত শিল্পোন্নত দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর একটা অতুচ্ছ অংশ মধ্যবিত্তের অংশ হয়ে যাচ্ছে। আজকের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এ-বিষয়ে সচেতন যে, সমাজ চলমান। প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিষ্ঠুর পরিবেশে মধ্যবিত্তের ব্যক্তিগত জীবনে ক্ষোভ ও নৈরাশ্যের কারণও কম নেই। এটা আশ্চর্য নয় যে, নব মধ্যবিত্তের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তাত্ত্বিকভাবে বিপ্লবী। এটাও আশ্চর্য নয় যে, এরা কার্যত স্থিতিশীলতা অথবা সুশৃঙ্খল পরিবর্তনের পক্ষপাতী। ঘোষিত তত্ত্ব আর আচরিত জীবনচর্যার ভিতর এই অসামঞ্জস্য মধ্যবিত্তের জীবন নাটকের মৌল বৈশিষ্ট্য। নতুন প্রজন্ম এই কাপট্যে মর্মাহত, যদিও অতি দ্রুত তাদেরও জীবনের এটা অঙ্গ হয়ে ওঠে।

রুশ বিপ্লবের পর পশ্চিমের সমাজতন্ত্রবিরোধী মহলে অনেকের ধারণা হয়েছিল যে, নতুন সোবিয়েত ব্যবস্থা বেশি দিন টিকবে না। সে-ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। সোবিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভালো-মন্দ দু দিকই আছে। সেখানে ধনের বণ্টনে অসাম্য অপেক্ষাকৃত কম। তবে সাংগঠনিক ও সামরিক ব্যবস্থায় স্তরভেদ, ক্ষমতার অসাম্য ও বিশেষ সুবিধাভোগীদের উপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না। বেকার সমস্যার নগ্ন রূপ সেখানে নেই। অপর পক্ষে ভোগ্যবস্তুর গুণগত মান রক্ষা করা যাচ্ছে না। অতিকেন্দ্রিকতার ফলে, তলাকার প্রতিষ্ঠানের হাতে ক্ষমতার অভাবে, আর্থিক ব্যবস্থাপনায় নানা অসুবিধা দেখা দিয়েছে। কিন্তু প্রধান কথা, এই নতুন ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ও সংশোধনের পথে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে, ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়ছে না। সোবিয়েত সমাজ আত্মরক্ষায় ও দ্রুত শিল্পায়নে সফল হয়েছে। বিদেশী সমালোচকদের নৈরাশ্যবাদী
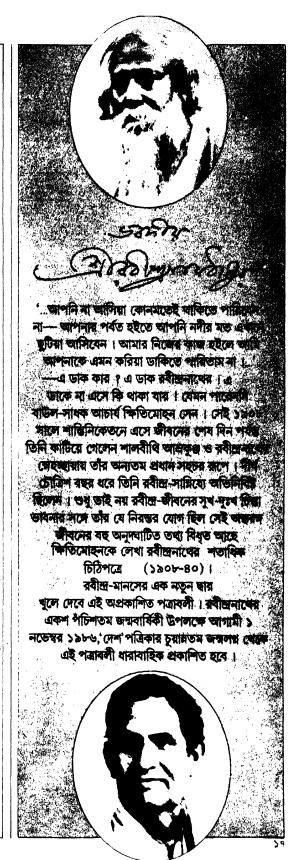
ভবিষ্যদ্‌বাণী ব্যর্থ হয়েছে। সোবিয়েত সমাজে যে নতুন মধ্যবিত্ত গড়ে উঠেছে তারা এই ব্যবস্থাকে ভাঙবার পক্ষপাতী নয়, সংশোধনের পথে একে চালু রাখতেই আগ্রহী। দেশের ভিতরই কিছু যুবক অবশ্য আছে, কিছু লেখক শিল্পী চিন্তাবিদ, যারা ঐ-দেশের বর্তমান ব্যবস্থার ঘোরতর সমালোচক, যাদের লেখা সরকারের চোখের আড়ালে প্রচারিত হচ্ছে। তবু এটাই ধরে নেওয়া ভালো যে, ও-দেশের বর্তমান আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ব্যবস্থার কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন সহসা ঘটবে না।

অন্তত শিল্পোন্নত দেশে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্বন্ধেও একই কথা বলতে হয়। মার্ক্স ভেবেছিলেন, ধনতন্ত্রের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে তার আত্মবিরোধ। যে-কোনো ধনতান্ত্রিক দেশে পুঁজির পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাবে ততই পুঁজিপতি আর শ্রমিকশ্রেণী দুই বিপরীত মেরুতে আরো বেশি করে সংবদ্ধ হবে, দুই বিরোধী শিবিরের সংঘর্ষ আরো তীব্র হয়ে উঠবে, বৈপ্লবিক পরিস্থিতি পক্ক হবে আর শ্রমিকশ্রেণী তখনই খুঁড়বে ধনতন্ত্রের কবর। অর্থাৎ, মার্ক্সের তত্ত্ব মেনে নিলে, প্রাগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশেই সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব সবচেয়ে ভীষণ, সেখানেই সঙ্কট সবচেয়ে গভীর। কিন্তু ১৯১৭ সালে বিপ্লব ঘটল অনুন্নত রুশ দেশে, ধনতন্ত্র যেখানে বেশি দূর বিকশিত হতে পারেনি। লেনিন প্রমুখ নেতারা অবশ্য এর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ধনতন্ত্র ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়, তৈরি হয়েছে বহু দেশ নিয়ে একটি দীর্ঘ শৃঙ্খল, এই শিকলের যেটা দুর্বলতম গ্রন্থি টান পড়লে সেটাই ভাঙবে আগে। তবু স্বীকার করা ভালো যে, রুশ দেশে বৈপ্লবিক ঘটনার পরও আশা করা হয়েছিল যে, মার্ক্সীয় তত্ত্ব অনুযায়ী বিপ্লব ছড়িয়ে পড়বে এক অথবা একাধিক উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে। কিন্তু ঘটনা অন্য প্রকার। রুশ বিপ্লবের পর প্রায় সত্তর বছর পূর্ণ হতে চলেছে। কোনো প্রাগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশেই বৈপ্লবিক প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি।

ব্যাপারটা বিশেষ করে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গত দশ পনের বছরে, ১৯৭৩ সালের পরবর্তী বছরগুলিতে। এ-সময়ে ধনতান্ত্রিক জগতে আবারও বড় আকারে আর্থিক দুর্যোগ দেখা দেয়। আশা করা অসঙ্গত হত না যে, এই সময়ে ঐ দেশগুলিতে জনমত প্রবলভাবে বামপন্থী হয়ে উঠবে, ধনতান্ত্রিক জগতে একটা বৈপ্লবিক পরিবেশ অপ্রতিরোধ্য হবে। কিন্তু তা হয়নি। ইংলন্ড ও আমেরিকার মতো প্রাগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই সময়ে ভোট পড়ল রক্ষণশীল দলগুলির পক্ষে। আরো উল্লেখযোগ্য, ফরাসী দেশে কম্যুনিস্ট দলের জনসমর্থন এই সময়ে কমে গেল প্রশ্নাতীতভাবে। সন্দেহ নেই যে, পশ্চিমী দুনিয়ায় সংগঠিত শ্রমিক তার বৈপ্লবিক উৎসাহ অনেক পরিমাণে হারিয়ে ফেলেছে। এইসব দেশে নব মধ্যবিত্তের চেতনায় আকস্মিক বিপর্যয়ের চেয়ে সামাজিক স্থায়িত্বের আকাঙ্ক্ষাই প্রবল। সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে এইসবের কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। একেই অবলম্বন করে প্রাগ্রসর ধনতান্ত্রিক জগৎ বিপ্লব ঠেকিয়ে রেখেছে। এই ব্যাখ্যা কতটা ভার গ্রহণ করতে পারে ভেবে দেখা দরকার। রুশ বিপ্লবের পর বিপ্লবী জগতে চিন্তা চলছিল, পশ্চিমী দেশগুলিতে কবে বিপ্লব আসবে? বলা হয়েছিল, পিকিং (বা বেজিং) আর কলকাতার পথে বিপ্লব এসে পৌঁছবে ইউরোপে আমেরিকায়। অর্থাৎ, চীন আর ভারতে সাম্রাজ্যবাদের বড় খুঁটি, ঐ দুটো দেশ হাতছাড়া হলেই শিল্পোন্নত পশ্চিমী ভূখণ্ডে ধনতন্ত্রের পতন ঘটবে। ভারত স্বাধীন হয়েছে, চীন কম্যুনিস্ট হয়েছে। কিন্তু এর ফলে পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপান জার্মানি ফরাসী দেশ হল্যান্ড বেলজিয়াম প্রমুখ আরো বহু দেশ উপনিবেশ হারিয়েছে। অথচ এর পরও ঐ-সব দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রয়োজনীয় কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করে আপাতদৃষ্টিতে আরো উন্নত জীবনযাত্রার দিকেই এগিয়ে চলেছে। স্পেনের উদাহরণও উল্লেখযোগ্য। ফ্রাংকোর একনায়কতন্ত্র পিছনে ফেলে, উপনিবেশের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে, স্পেন এগিয়ে চলেছে গতানুগতিক পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের পথ ধরে। ধনতন্ত্র সেখানেও সংশোধিত হয়েছে, ভেঙে পড়েনি।

কেউ হয় তো বলবেন, ঐ-সব দেশকেই ধারণ করে আছে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন দেশ। এতে মার্কিন দেশের ধারণশক্তিকে অত্যন্ত বড় করে দেখানো হয়। ভিয়েতনামে যখন নির্দয় যুদ্ধ চলছিল তখন অনেকে ভেবেছিলেন যে, ভিয়েতনামের উপর দখল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ভিয়েতনাম হাতছাড়া হয়েছে, যুদ্ধে মার্কিন দেশ হেরে গেছে, মার্কিন অর্থনীতি ভেঙে পড়েনি। কেবল ঔপনিবেশিক কারণে নয়, সমসাময়িক কালে আরো নানা অসামঞ্জস্যের ফলে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলি বড় ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। এ-কথা স্বীকার্য। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি, বিশেষত প্রাগ্রসর দেশগুলিতে, বহুবিস্তৃত বাজারের উপর নির্ভরশীল। মাঝে-মাঝেই অবস্থার আকস্মিক পরিবর্তনে এই অর্থনীতি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, যার পর নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সমন্বয়ে ফিরে আসা সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। ধ্রুপদী যুগের অর্থবিজ্ঞানীরাও এই রকম বিপর্যয়ের সঙ্গে অপরিচিত ছিলেন না। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে নতুন সাংগঠনিক পরিবর্তন ও তজ্জনিত জটিলতা, যেমন বৃহৎ শ্রমিক সংগঠন কিংবা অতিকায় শিল্প প্রতিষ্ঠানে একাধিকারের দিকে ঝোঁক, যার ফলে মূল্যস্ফীতি প্রতিরোধ করা কঠিন হয়ে ওঠে। এইসব সমস্যার ভিতর দিয়ে অনিবার্য হয়ে উঠেছে ধনতন্ত্রের পরিবর্তন, কিন্তু আকস্মিক ধ্বংস নয়।

অর্থাৎ, পাশ্চাত্য ধনতন্ত্র অথবা সোবিয়েত সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত মনোভাব যাই হোক না কেন, এই দুই ব্যবস্থাকে সঙ্গে নিয়েই পৃথিবী আরো অনেকদিন চলবে এটা মেনে নেওয়াই বাস্তব বুদ্ধিসম্মত। তৃতীয় বিশ্বের কোনো কোনো দেশে পরিস্থিতির ওলটপালট ঘটা অসম্ভব নয়। কিছু বড় পরিবর্তন তো অবশ্যম্ভাবী।

যেসব প্রাগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশ তৃতীয় বিশ্বে পুঁজি বিনিয়োগ করেছে তাদের ভিতর নানা কারণে মার্কিন দেশ আজ সর্বাগ্রগণ্য। তৃতীয় বিশ্বের উঠতি মধ্যবিত্তের একাংশ বিদেশী পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সক্রিয়। স্বভাবতই এই সংগ্রাম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের লক্ষণে চিহ্নিত। দেশের ভিতর পুরনো প্রতিষ্ঠিত সামন্ততন্ত্রী ও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ তার স্রোতও এই আন্দোলনে এসে মিশেছে। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছে নানা রকমের সমাজতান্ত্রিক চিন্তার। এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার বহু দেশে আন্দোলনের নেতাদের হাতে ক্ষমতা এসেছে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে। ফলস্বরূপ যে-সব শাসনতন্ত্র গড়ে উঠেছে তাদের বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। অস্থিরতাও উল্লেখযোগ্য। নতুন শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে বিদেশী বৃহৎ শক্তির নতুন করে চুক্তি হয়েছে। বাংলাদেশে দেখি এরই নাটকীয় দৃষ্টান্ত। তবে বাংলাদেশই একমাত্র উদাহরণ নয়। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই বিদেশী সহায়তা নতুনভাবে প্রবেশলাভ করেছে। কোনো দেশে মার্কিন সহায়তা প্রধান, কোনো দেশে সোবিয়েত সহায়তা। ইরান, ইরাক, ইজিপ্ট, ইথিওপিয়া, কাছাকাছি এই দেশগুলির ভিতরও কত প্রকার ভেদ। মোটের ওপর মার্কিন পুঁজির প্রশ্নাতীত প্রাধান্য। তবে এটাও এতোদিনে স্পষ্ট যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি কোনো সরলরেখায় কিংবা স্থায়ীভাবে মার্কিন অথবা সোবিয়েত পথে যাচ্ছে না। তাদের স্বাভাবিক গতি অন্য পথে। এমন কি আমেরিকা অথবা সোবিয়েত দেশের সামনেও কোনো পরীক্ষিত সরল পথ আজ নেই।

আমরা যখন এক-বিশ্বের কথা বলি, বিশ্ব-শান্তির কথা বলি, তখন এ-কথাটা মনে রাখা ভালো। সারা বিশ্ব কোনো এক ধর্মের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হবে অতীতের এই চিন্তা যেমন অবাস্তব তেমনি কোনো এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব কিংবা মতবাদ পৃথিবীকে ঐক্যবদ্ধ করবে এই চিন্তাও বাস্তববুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। এতে শুধু বিদ্বেষ বাড়ে। কিছু আদর্শ, কিছু মূল্যবোধ প্রয়োজন। প্রয়োজন সহাবস্থানের স্বীকৃতি, মনুষ্যত্বের ঐক্যের অভিলাষ। কিন্তু মানুষকে অগ্রসর হতে হবে নানা বিচিত্র পথে।

সহাবস্থানের স্বীকৃতি মানে অবশ্য এই নয় যে, আজকের দিনের বিভেদ ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী হবে। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র বলে যে দুটি ব্যবস্থাকে আমরা চিহ্নিত করেছি উভয়েই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, এ-কথা আমরা আগেই লক্ষ করেছি। এখন প্রশ্ন, এদের গতি কোন দিকে? এদের ভিতর ব্যবধান কি ক্রমে বাড়ছে না কমছে? পরিবর্তনের গতিতে এই দুই ব্যবস্থা ভবিষ্যতে এক অভিন্ন পরিণতিতে এসে স্থিতি লাভ করবে এমন মনে করবার যথেষ্ট কারণ নেই। তবে কোনো কোনো দিক থেকে এদের পার্থক্য কমে আসছে। রাজনীতির উচ্চকণ্ঠে কলহ ও কোলাহলের দাপটে এটা আমরা অনেক সময় লক্ষ করি না। অথচ এটা লক্ষ করবার যোগ্য বস্তু। যে-সব তত্ত্বের মধ্যে আমরা এতোদিন চূড়ান্ত বিরোধ ধরে নিয়েছিলাম, ক্রমে দেখা যাচ্ছে সেই দ্বন্দ্বের অনেকটাই দুই আংশিক সত্যের বিরোধ। সাম্প্রতিক ইতিহাসে তার ইঙ্গিত আছে। সেদিকে দৃষ্টি ফেরাবার আগে আজকের দিনের, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের, কিছু সমস্যার কথা বলে নেওয়া দরকার।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

মাছ আর বাঙালি

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

বাঙালীর রসনায় কেবল নয়, খাল-বিল-নদী সমৃদ্ধ এই বাংলার লোকরুচিতে, সংস্কৃতির গভীরে সামাজিক-লৌকিক আচার-আচরণে সময়ের উজান বেয়ে এসে পাকাপাকি ঠাঁই খুঁজে নিয়েছে এক উজ্জ্বল রুপালি ঐতিহ্য। গরমভাত দিয়ে মৌরলা মাছ খাবার রমণীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে গিয়েছেন কোনো এক পুণ্যবান, প্রাক্-বাংলা অপভ্রংশ ভাষায়। কিন্তু মৌরলাই কেবল নয়, রকমারি মাছ আর তার রকমারি রন্ধন প্রণালীর বর্ণনা ছড়িয়ে রয়েছে বাংলারই ইতস্তত প্রাচীন-অর্বাচীন রচনায়, কারো কারো স্মৃতিজীবী রসনায়। এই নিবন্ধে রুপোলি জাল থেকে, বাঙালীর মঙ্গলকর্ম থেকে, সাহেব-সুবোদের প্রথম মৎস্য-আস্বাদনের অভিজ্ঞতা থেকে, মায় কালিঘাট-পটের রসকলি কাটা গলদা চিংড়ি মুখে বেড়ালটির থেকেও উঠে এসেছে সহস্রাব্দের প্রাচীন মাছ, নস্টালজিয়ার সূক্ষ্ম কাঁটা সমেত।

শিল্পী : যামিনী রায়

বেড়াল তপস্বী : কালিঘাট পটচিত্র

মাছ, মেছুনী এবং বাবু : কালিঘাট পটচিত্র
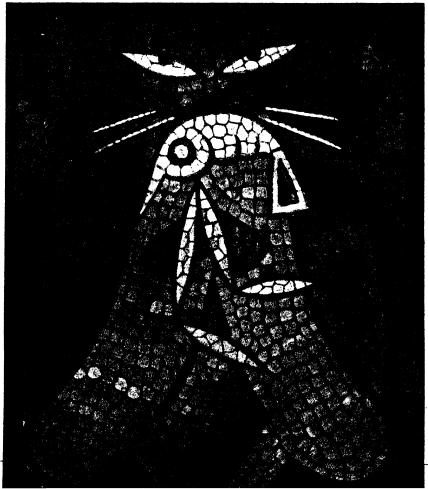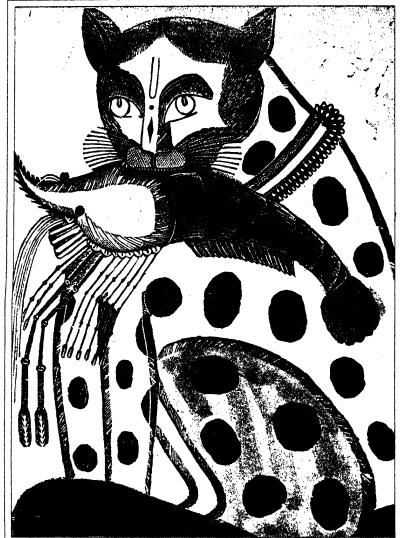
দুনিয়াদারীর খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা জানেন যে একজন ইংরেজ বা জাপানি দিনে গড়পড়তা যত মাছ খায় বাঙালিরা তার সামান্য অংশও খায় না বা খেতে পায় না। এই হিসেব শুনে আমরা যদি বলি যে ভারতের অর্ধেক স্ত্রী পুরুষ তো নানান কারণে আমিষ খায় না তাহলেও অঙ্কটার খুব হেরফের হবে না। কারণটা খুব সোজা—আমাদের দারিদ্র্য। যে কোন ধনী জাতের তুলনায় আমাদের মাথাপিছু বার্ষিক আয়, বিদ্যুৎ খরচ বা ইস্পাতের ব্যবহার ইত্যাদি যদি ধরা যায় তা হলে সঙ্গতির দিক থেকে আমরা যে কোন অতলে তলিয়ে রয়েছি তা বেশ বোঝা যাবে।

এ ছাড়াও বাঙালিদের সংখ্যার তুলনায় মাছের সরবরাহের পরিমাণেরও ব্যাপার আছে। এই সেদিন একটা ফিল্মে দেখছিলাম জাপানি জেলেরা অত্যাধুনিক সার সার ট্রলার নিয়ে

বাঙালীর স্বাদু স্বপ্নের চিত্ররূপ : কালিঘাট পটচিত্র

কিভাবে জাল টেনে জলপ্রপাতের তোড়ের মতন ট্রলারের গলুইয়ে মাছ ভরছে। দেখে ভয় হচ্ছিল এ ভাবে মাছ ধরলে হয়ত সমুদ্দুর শিগ্গিরি ফুরিয়ে যাবে।

এটা ঠিক যে এককালে বাংলায় মাছের এরকম দুর্দশা ছিল না। সে যাই হোক পরিমাণ দিয়ে ত আর দুনিয়ার সব জিনিসের মাপ বা ওজন ঠিক ভাবে ঠাওর করা যায় না। যেমন পরমাণুর ভেতরকার শক্তি বা বাঙালির মাছপ্রীতি। সত্যিকারের কৃষ্ণভক্তর যেমন 'ক' শুনলেই শরীরে রোমাঞ্চ হয় তেমনি মাছের নাম শুনলেই বাঙালির 'ঠাকুরমার ঝুলি'র সেই রাক্কুসীর মতন জিভ লকলক্ আর নোলা সক্‌সক্ করে। আর জ্যান্ত বাঙালি বা কেন বাঙালি-ভূতদের পক্ষেও কথাটা খাঁটি।

মাছ নিয়ে নানা জাতের নানান প্রবাদ আছে।

মকরবাহিনী দেবী : কালিঘাট পটচিত্র

কিন্তু বাঙালিরাই বলতে পারে যে 'মাছের নামে গাছেও হাঁ করে।' আষাঢ়ের প্রথম দিবসে বিরহী যক্ষ যখন পূর্ব মেঘকে উদ্দেশ করে তাকে রামগিরি থেকে অলকায় তার প্রিয়ার কাছে কুশলবার্তা নিয়ে যেতে বলে তখন কালিদাস যা বলেছিলেন বাংলায় তার মর্মার্থ হল : 'কামান্ধ এমনি অন্ধ অচেতনে সচেতন মানে।' তাই উপরোক্ত বাংলা প্রবাদটি শুনলে কালিদাসের মতন বলতে ইচ্ছে করে যে বাঙালি 'মৎস্যান্ধ এমনি অন্ধ অচেতনে সচেতন মানে।' আর একটা কথা। আমি অন্তত অবাক হতাম না যদি ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনী (কে তিনি ছিলেন নারী না পুরুষ?) অন্নদার কাছে বর চাইতেন যে 'দুধেভাতে' নয় 'আমার সন্তান যেন থাকে মাছেভাতে'। এই কথা শুনে অনেকে হয়ত হাঁ হাঁ করে উঠে বলবেন : 'আরে এ আবার কি কথা। ঈশ্বরী পাটনী 'দুধেভাতে' বলেছিলেন কারণ তা প্রাচুর্য, শ্রী আর শান্তির প্রতীক।' এর জবাবে আমি বলবো মাছ ভাত এ সব ছাড়াও বাঙালি জীবনেরও প্রতীক। আরও একটা কথা। সন্তান বলতে কন্যাও বোঝায়। তাই মাছে'ভাতে বললে মেয়ের বৈধব্য যাতে না হয় তারও কামনা থেকে যায়।

বাঙালি টাকার কুমীর বা জামাইষষ্ঠীর দিনে দু-চারজন ভাগ্যবান নতুন জামাই, আর শোনা যায় যাত্রার দলের হিরোরা ছাড়া রুই মাছের মুড়ো বা রুই মাছ খাওয়া এখন সাধারণ বাঙালির কাছে স্বপ্ন হয়ে গেছে। তবুও এই আগুন দামের দিনে থলে হাতে মাছের বাজারে লোকের ভিড় দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এর কারণ গেরস্ত এমনকি গরীব বাঙালিদের সরু এক ফালি মাছ টাক্‌না না দিলে বা চুনোপুঁটির গন্ধ না পেলে মুখে ভাত রোচে না। আবার একটা প্রবাদের কথা মনে পড়ছে :

জোলা মরে তাঁতে।
বাঙালি কাঙালি মরে মাছে আর ভাতে॥

মাছ ছাড়া বাঙালির জীবন ভাবা যায় না যেমন কালো ছাড়া কাক, সাদা ছাড়া বরফ ভাবা যায়
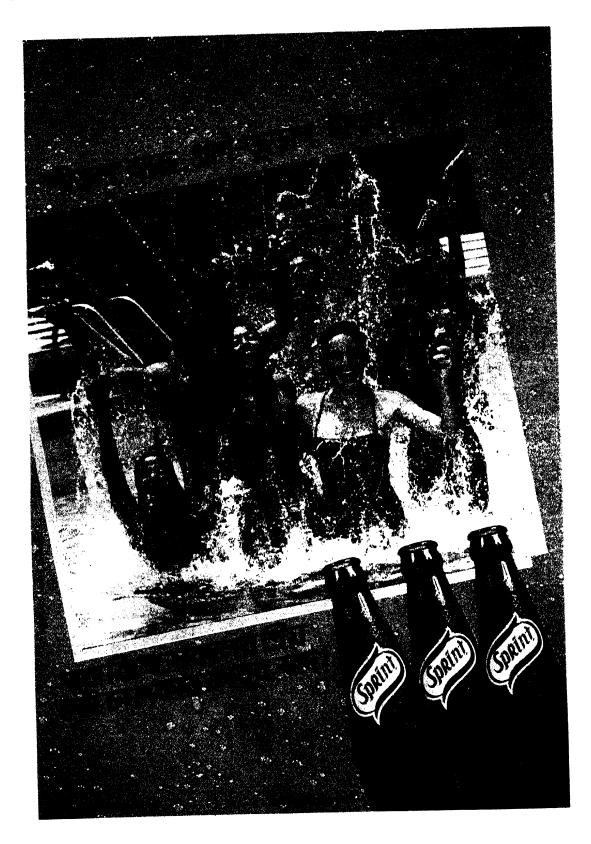
না। পঞ্চাশ ষাট বছর আগের সেই অগণতান্ত্রিক যুগে বাঙালিরা অবাঙালিদের বিশেষ করে হিন্দি আর ওড়িয়া ভাষীদের নিয়ে নানানরকম ঠাট্টাতামাশা করত। বলার দরকার নেই প্রতিপক্ষরাও ছেড়ে কথা কইত না। ছেলেবয়সে আমরা যখন কটকে ইস্কুলে পড়তাম তখন কখনও কখনও রাস্তাঘাটে ঝগড়াঝাঁটি হলে ওড়িয়া ছেলেরা আমাদের ঠাট্টা করে চেঁচাত: 'বাঙালি ট্যাংট্যাংলি খায় মড়া মাছ।' অবশ্য ওড়িয়ারাও অতীব মৎস্যপ্রিয়। তাই তাদের এই ঠাট্টার আসল মানে ছিল বাঙালিরা মহানন্দে মড়া অর্থাৎ পচা মাছ খায় যা ওড়িয়ারা ছুঁতেও ঘেন্না করে। আর হিন্দিভাষীরা মড়ার বাড়া গাল নেই-য়ের মতন একটি অপবাদ দিয়েই বাঙালিদের ঘাল করত—'মছলি-খোর।' এর সঙ্গে অবশ্য প্রায়ই শ্যালকরূপী মিষ্টি সম্বোধনটিও জুড়ে দিত।

বার্নার্ড শ তাঁর 'পিগম্যালিওন' নাটকের মুখবন্ধে ইংরিজি কথার উচ্চারণের অরাজকতা নিয়ে এক জায়গায় বলেছিলেন যে 'ইট ইজ ইমপসিবল ফর এনী ইংলিশম্যান টু ওপেন হিজ মাউথ উইদাউট ইনকারিং দি রাথ (ডিসপ্লেজার?) অফ অ্যানাদার।' যেকোন বাঙালির মাছের কথা লিখতে বসলে ঐ একই দশা। তাই আমার এই লেখাটা কি করে শুরু করবো, আমার বক্তব্য কিভাবে ফাঁদবো আর বক্তব্যের বৈওতি জাল পণ্ডিতির 'কোটাল' বাদে কিভাবে টেনে তুলব জানি না যাতে অন্তত দু-একটাও রুই-কাতলা পড়তে পারে।

বাঙালিদের মাছ খাওয়ার লিখিত নজিরের আগে পৃথিবীর খাদ্যের ইতিহাসে মাছের কথা একটু ছুঁয়ে যেতে চাই। শ্রীমতী রেনী ট্যানহিল তাঁর বিখ্যাত 'ফুড ইন হিস্ট্রি' বইয়ে মাছ খাওয়ার সবচেয়ে পুরনো যে উদাহরণ দিয়েছেন তা হল মেসোপোটেমিয়ার। সেখানকার প্রাচীন পুথিপত্তরে খ্রীষ্টপূর্ব ১৩০০ বছরেরও আগে পঞ্চাশ রকম মাছের নাম পাওয়া যায়। এই সময়েরই কাছাকাছি কালডিয়ার সুবিখ্যাত 'উর' শহরের বাঁকা-চোরা অলি-গলিতে রান্না মাংস আর অন্যান্য খাবারদাবারের সঙ্গে মাছভাজাও বিক্রি হত যা লোকেরা কিনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেত। বা কিনে বাড়ি নিয়ে যেত। গ্রীসে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী বা তারও আগের থেকে মাছ আর অন্যান্য খাবারের অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। সবচেয়ে পুরনো আর একজন সবচেয়ে খাবারের বিষয়ের নামজাদা গ্রীক লেখক আর্কেস্ট্রাটুস খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে সবরকম বিপদআপদ তুচ্ছ করে 'ডিলিজেন্টলি ট্র্যাভারসড অল ল্যাণ্ডস অ্যাণ্ড সী-জ ইন হিজ ডিজায়ার—অফ টেস্টিং কেয়ারফুলি দি ডিলাইটস অফ দি বেলী।' তাঁর একশ বছর পরে লিনসিউস বলে একজন গ্রীক 'দি সেনটর' বইয়ে নানানরকম সস দিয়ে মাছ রান্নার কথা বলেছেন। রোমানদের বিলাসিতার কথা জগদ্বিখ্যাত। পুরনো রোমান বইয়ে যতরকম অকল্পনীয় বিলাস-বহুল ভোজের কথা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধটির কাহিনী পেঙ্গুইন বই মারফৎ অনেকেই জানেন। সেটা হল খ্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতে পেট্রোনিয়াসের লেখা অসম্পূর্ণ

মাছমুখে বিড়াল: কালীঘাটের পট

'দি স্যাটিরিকন' যার পনের নম্বর ভাগে ট্রিমালকিউর দেওয়া ভোজের কথা আছে। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রথম পাক-প্রণালীর বই এপিসিউসের 'দি রোমান কুকারী'তে (খ্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দী) আছে নানারকম সস, গোলমরিচ গুঁড়ো আর মশলার বর্ণনা দেখে আঠার শতকের জুড়িহীন ফরাসী খাদ্যরসিক ব্রিলা-সাভারাঁ তাঁর অমর 'দি ফিজিওলজি অফ টেস্ট'-এ লিখেছিলেন যে রোমানরা মাছ রাঁধতে জেয়াদা লায়েক ছিলেন না বলে এত সসের ধুম। মাছের রোমান পর্ব শেষ করি একটা বীভৎস উদাহরণ দিয়ে। নিরো বা ক্যালিগুলার মতন পৈশাচিক সম্রাটরা তাদের ভোজে রোমানদের প্রিয় ল্যামপ্রে মাছ পরিবেশন করতেন। সেগুলোকে তখন কখনও কখনও তাঁদের বিশাল চৌবাচ্চায় রাখা ল্যামপ্রেগুলোকে মোটা-সোটা এবং আরও সু-তার করাতেন তাদের চোখে অপরাধী হতভাগ্য ক্রীতদাসের টুকরো টুকরো করা মাংস খাইয়ে।

এরপর পুরনো চীনে রান্নার কথা বলে বিদেশী প্রসঙ্গ শেষ করি। খাবারের কথা নিয়ে আরও নানা বইয়ের দুটি বিখ্যাত বই হল 'বুক অফ সংগস' (খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ সন) আর 'দি সামনস অফ দি সোল' যার কথা শ্রীমতী ট্যানহিল বিশেষ করে বলেছেন। এই দুটি বইয়ে দুটি খাবারের বর্ণনা পড়লে অবাক হয়ে যেতে হয় যে চীনেরা যে কতরকম সূক্ষ্ম উপাদান, সুগন্ধি হারব আর সস ব্যবহার করে মাছ মাংস আর অন্য খাবারগুলোকে দেবভোগ্য করার কায়দা জানতেন। সত্যিই তাঁরা

বোয়াল মাছ : কালীঘাটের পট

রান্নার শিল্পকে প্রায় কবিতার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এইবারে আমি বাঙালি আর মাছের লিখিত নজিরের কথায় আসি। পঞ্চাশ বছর বা তারও আগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাঙালির খাদ্য বিষয়ক বইয়ে লিখেছিলেন যে বাঙালিরা চিরকালই মাছ-মাংস ভোজী। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালির ইতিহাস'-এ লিখেছেন যে 'নদনদী-খালবিলবহুল প্রশান্ত-সভ্যতা প্রভাবিত এবং আদি অস্ট্রেলীয় মূল বাংলায় মৎস্য অন্যতম প্রধান খাদ্যবস্তু হিসাবে পরিগণিত হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়। বাংলাদেশের এই মৎস্যপ্রীতি আর্য সভ্যতা কোনোদিনই প্রীতির চক্ষে দেখিত না। মাংসের প্রতিও এই বিরাগ বাঙালির কোনদিনই ছিল না।... বাংলার অন্যতম প্রথম ও প্রধান স্মৃতিকার ভট্ট বাসুদেব সুদীর্ঘ যুক্তিতর্ক উপস্থিত করিয়া বাঙালির এই অভ্যাস সমর্থন করিয়াছিলেন। বস্তুত মাংস বা মৎস্য আহার বাংলাদেশে এত সুপ্রচলিত ও গভীরাভ্যস্ত যে, এই সমর্থন ছাড়া ভবদেবের কোন উপায় ছিল না।' এর পর ডঃ রায় বলেছেন যে বিখ্যাত স্মৃতিকার শ্রীনাথাচার্যও বিষ্ণুপুরাণ থেকে দুটি শ্লোক তুলে দেখিয়েছেন যে কয়েকটি পর্বদিন ছাড়া মাছ-মাংস খাওয়া বারণ নয়। বৃহদ্ধর্মপুরাণের মতে রুই, পুটি, শোল, সাদা আর আঁশওয়ালা অন্যান্য মাছ ব্রাহ্মণরা খেতে পারেন এই প্রসঙ্গে আমি একটি উদ্ভট শ্লোক অর্বাচীন হলেও তুলে দিতে চাই :

ইলিশ খলিশশ্চৈব ভেটকি মদ্গুর এব চ।
রোহিতো মৎস্যরাজেন্দ্র পঞ্চমৎস্যা নিরামিষাঃ ॥

দুনিয়ার এই পাঁচটি সবচেয়ে ভাল মাছকে নিরামিষ বললেও ভবানী পাঠক 'বিধবা' প্রফুল্লকে একাদশীর দিনে মাছ খেতে বললেও বাঙালি জাতের সবচেয়ে বড় কলঙ্ক বিধবাদের এই সুখাদ্য থেকে চিরকাল বঞ্চিত করে রেখে দেওয়া। সুখের কথা এই রীতিতে ভাঙন ধরেছে যদিও এখন গোঁড়াদের অভাব নেই যারা বিধবারা মাছ খেলে পারলে তাঁদের পুড়িয়ে মারে। বিধবাদের বেলায় এ বিধান খাটিল না।

নীহাররঞ্জন তাঁর বইয়ে আরও লিখেছেন যে, 'বাঙালির মৎস্যপ্রীতির পরিচয় পাহাড়পুর এবং ময়নামতীর পোড়ামাটির ফলকগুলিতে কিছু কিছু পাওয়া যায় ; মাছ কোটা এবং ঝুড়িতে ভরিয়া মাছ হাটে লইয়া যাওয়ার দুটি অতি বাস্তব চিত্র কয়েকটি ফলকেই উৎকীর্ণ।

পুরনো বাংলা সাহিত্যে মাছের কথা বলার আগে আমাদের ভারতীয় ধর্ম আর নানান মঙ্গলাচরণের মাছের কথা ছোট্ট করে বলতে চাই। মাছ আমাদের বিষ্ণুর প্রথম অবতার। প্রলয়পয়োধিজলে বেদ যখন ডুবুডুবু তখন কেশব মীন শরীর ধারণ করে বেদকে ধারণ করেন। মাৎস্যন্যায়ের তাণ্ডবের কথা বড় করে বলার দরকার করে না। কাশীরাম দাসের দৌলতে মহাভারতের অর্জুনের লক্ষ্যভেদ করে পাঞ্চাল রাজনন্দিনী দ্রৌপদীকে জয় করার কাহিনী আজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাঙালির সত্তার সঙ্গে মিশে রয়েছে। এই বিবাহের সূত্র ধরে বলতে চাই বাঙালির বিয়েতে মাছ অপরিহার্য। পশ্চিমবঙ্গে নতুন কনে যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ি যেত আর তাকে বরণ করা হত তখন সে বাঁ হাতে একটা জ্যান্ত ল্যাটা মাছ ধরে থাকত যেটিকে পরে বাড়ির পুকুরে ছেড়ে দেওয়া হত। এ রীতি কলকাতায় না হলেও কোথাও কোথাও গাঁয়েগঞ্জে এখনও চলিত আছে। বিয়ের তত্ত্বে সিঁদুর মাখানো ধান-দুব্বো দেওয়া জোড়া রুই একটি সবপ্রধান জিনিস। মেয়েরা পোয়াতি হবার পর রুই মাছের ল্যাজা আর পরমান্ন দিয়ে সাধ খাওয়ার বড় সুন্দর প্রথাটির কথা সবাই জানেন। পালাপার্বণের বাঙালি মেয়েদের অনিন্দ্যসুন্দর আলপনায় মাছের ছবি, পেতল ইত্যাদিতে মাছের মূর্তি কল্যাণ, লক্ষ্মীশ্রী আর সুখের প্রতীক। মাছ আরও দেখি সন্দেশ আর নারকোলপুলির ছাঁচে, চৈত সংক্রান্তিতে চিনির তৈরি মঠে।

বাঙালির ঘরে ঘরে প্রচলিত মাছ নিয়েও ছড়া অজস্র। এখানে তার মধ্যে দু-একটা তুলে দিচ্ছি। যেমন 'যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে' ছড়ার শেষের দিকে আছে :

ত্রিপূর্ণির ঘাটে দুটো মাছ ভেসেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলেন কে ॥
তার বোনকে বিয়ে করি ওড়ফুল দিয়ে ॥

কিংবা

খোকা যাবে ম্যাছ ধরতে ক্ষীরনদীর কূলে
ছিপ নিয়ে গেল কোলাব্যাঙে মাছ
নিয়ে গেল চিলে ॥

ছড়ার পর আসে প্রবাদের কথা। বাংলাভাষায় খনা আর ডাকের বচন আর ১১শ শতাব্দীর গোরক্ষবিজয় আর গোপীচন্দ্রের গানের সময় থেকে মাছ নিয়ে কত যে প্রবাদ আছে তার ইয়ত্তা নেই। ডঃ সুশীলকুমার দে'র 'বাংলা প্রবাদ' বইয়ের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে সংখ্যার দিক থেকে প্রবাদে মাছ বাঙালি মেয়েদেরও হারিয়ে দিয়েছে। খুব সংক্ষেপে বলতে এই প্রবাদ-প্রবচনগুলো হল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাঙালির গ্রাম্যজীবনের সুখদুঃখ, দৈনন্দিন সাংসারিক খুঁটিনাটি ঘরকন্না, সমাজ জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সারাৎসার। মানব চরিত্রকে ব্যঙ্গরস দিয়ে এমন অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বিশ্লেষণ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া ভার। আমি এখানে এই প্রবাদগুলোর থেকে কেবল ভণ্ডামি, খলত্ব ইত্যাদি নিয়ে দু চারটের কথা বলবো। যেমন বেড়ালতপস্বী বা তপস্বিনী। এই প্রবাদের সবচেয়ে চেনা রূপ হলো একটি বেড়াল যার কপালে তিলক গলায় তুলসীরমালা, মুখে গম্ভীর ভাব এঁকে দেখতে পাওয়া যায় কালীঘাটের পটে, বটতলার কাঠখোদাইয়ে যামিনী রায় আর নন্দলালের ছবিতে। কালীঘাটের এই পট দেখে জন ডে বলে একজন ইংরেজ পঞ্চাশ বছর আগে বলেছিলেন এই হল 'কুইন্টেসেন্স অফ ক্যাটারি'। খল শোক প্রকাশ করতে বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষর এক চরম মুহূর্তে লিখেছিলেন : 'সূর্যমুখীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া কুন্দ কাঁদিল। একথা শুনিয়া এ গ্রন্থের অনেক সুন্দরী পাঠকারিণী মনে মনে হাসিবেন, আর বলিবেন, "মাছ মরেছে বেড়াল কাঁদে।" গভীর জলের মাছ, মাছের তেলে মাছ ভাজা, মাছকে সাঁতার শেখানো, ধরি মাছ না ছুঁই পানি, মাছ খায় না মাছের ঝোল খায় ইত্যাদি ইত্যাদি মানুষের স্বভাব নিয়ে প্রবাদগুলোর কথা কত আর বলব। এরপর বাংলা সাহিত্যে মাছের কথা। প্রথমে প্রাক-বাংলা অপভ্রংশ ভাষায় লেখা 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে'র একটি পদের কথা ধরা যাক :

ওগগর ভত্তা রম্ভঅ পত্তা, গাইক ঘিত্তা
দুদ্ধ সযুত্তা
মোইলি মচ্ছা নালিচ গচ্ছা দিজ্জই কন্তা
খা পুনবন্তা ॥

ল্যাঠা মাছ : কালীঘাটের পট

এর মানে হল রোজ কলাপাতায় গরম ভাত, গাওয়া ঘি, মৌরলা মাছের ঝোল, আর পাট শাক পরিবেশন করে, তার স্বামীই পুণ্যবান। এ কিন্তু সাধারণ খাওয়া। নীহাররঞ্জন এক জায়গায় বলেছেন যে 'উচ্চকোটী'র বাঙালির বিবাহভোজে শাকপাতা চলত না এবং এত রকমের আমিষ আর নিরামিষ তরকারি-ব্যঞ্জন পরিবেশন করা হত তা লোকে 'গণনাও করিয়া উঠিতে পারিত না।'

এই 'গণনাও করিয়া উঠিতে পারিত না'র জের টেনে আমি আর দুটি বিয়ের ভোজের কথা বলি। প্রথমটি হল 'নৈষধকাব্যে' নল-দময়ন্তীর বিয়ের ভোজের কথা। গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' বইয়ের খাদ্যশিল্প বলে ছোট্ট লেখাটিতে বলেছেন মহাকবি শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জীয় আর গৌড়ীয় এই দুই ধরনের বিয়ের রীতির কথা জানতেন। এই ভোজে প্রথম কথা অনেক খাবার এমন কৌশলে তৈরি করা হয়েছিল যে বরযাত্রীরা সেগুলোকে অকালের বা অন্য কোন জিনিস ভেবে খেয়ে একেবারে ভ্যাবাচাকা বনে যান। এ খানিকটা আমাদের নতুন জামাইকে বোকা বানাবার নির্দোষ মজার মতন। বিয়ের 'ভোজ্যবস্তুর' সম্বন্ধে শ্রীহর্ষ একটি শ্লোকে লিখেছেন যে 'নানাপ্রকার মৎস্য, হরিণ, ছাগ ও পক্ষীর মাংসের দ্বারা সূক্ষ্ম সুস্বাদ এবং সুগন্ধি এত রকমের ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা হইয়াছিল যে, লোকে তাহা খাইয়া শেষ করা ত দূরের কথা, কেহ তাহার সংখ্যা করিতেও সমর্থ হয় নাই।'

আমার দ্বিতীয় উদাহরণটা হল কলকাতায় পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে অবধি গড়ের বাদ্যি আর বাঁধা রোশনাইয়ের সঙ্গে বিয়ের খাওয়া-দাওয়ার কথা। পুরনো দিনে বেশ কিছু বড়লোকেরা তাঁদের ছেলেমেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রিতদের রুমালি কাগজে ছাপা বিয়ের খাবারের নির্ঘণ্ট বিয়ের পদ্যর মতন দিতেন। তাতে প্রায়ই অন্তত শ খানেক বিভিন্ন খাবারের নাম থাকত আর নানান রকমারী মাংস ছাড়া বিশ ত্রিশ রকম মাছের তরকারি থাকত। অর্থাৎ অতিথিরা খাবার গুণে উঠতে পারলেও খেয়ে শেষ করতে অবশ্যই পারতেন না। আরও একটা কথা প্রাতঃস্মরণীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯২৩ সনে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে জেমোরগ্রামে যান। সেখানকার আতিথেয়তা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে "আহারের সময় ৬০/৬৫টা বাটি পাতে পড়িত...।" কেউ কেউ নিশ্চয় জানেন উত্তর কলকাতার কিছু কিছু বনেদি বাড়িতে অতিথির জন্যে এই ৫০/৬০টা বাটির ফাঁসির খাওয়ার আপ্যায়নের আতিশয্য এখনও আছে।

এইবার আসছে কিছু মঙ্গলকাব্যে মাছের কথা। ১৫৫০ সন নাগাদ লেখা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল সবচেয়ে পুরনো না হলেও একটি সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলকাব্য। অন্য সব কথা বাদ দিলেও 'চণ্ডীমঙ্গল' তখনকার বাঙালিদের দৈনন্দিন জীবন আর বিশেষ করে খাওয়াদাওয়ার খবরের ভাঁড়ার। এতে আমিষ আর নিরামিষ খাবারের বর্ণনা দেখলে মনে হয় পাল যুগের তুলনায় বাঙালিরা বোধ হয় খাবারের রকমারিত্ব, প্রাচুর্য আর রান্নার সৌকর্যে আরও এগিয়ে গিয়েছিল।

আমি এই লেখায় মাছের কথা বললেও 'চণ্ডীমঙ্গলে'র থেকে খানিকটা নিরামিষ খাবারের কথা তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না। এতে শিববন্দনায় এক শীতের সকালে দেবাদিদেব মহাদেব পুজো-আচ্চা সেরে গণেশের মাকে যা রাঁধতে বলেছিলেন তা হল এই : নিমশিমের তেঁতো শুক্তো, বেশি করে 'বাগান' দিয়ে কুমড়ো, কাঁটালবিচি আর নটেশাক, কড়া করে ভাজা সরষের শাক, সরষের তেলে কড়া করে ভাজা বেথুয়া শাক, 'টাবা' জল দিয়ে মুসুর ডাল, 'খণ্ড' দিয়ে ভাজা করমচা আর তাতে ঘিয়ে ভাজা ফুলবড়ি, খণ্ড দিয়ে ছোলার ডাল, বেসন দিয়ে কুমড়ো আর বড়ি ভাজা, কাঁটালবিচি ভাজা, ঘি আর জিরে দিয়ে সাঁতলানো পালংশাক, টক গোঁড়া নেবু দিয়ে কাসুন্দী আর ক্ষীর। রান্নার এই চিক্কনতা আমরা এখুনি মাছ রান্নায় দেখতে পাবো। তার আগে বলা দরকার যে হরিণ, বুনো শুয়োর, গোসাপ, সজারু ইত্যাদির মাংসের পোড়া বা শিককাবাবের কথাই পাওয়া যায়। কিশোর আকবর 'পাদিশাহ' হবার ছ বছর আগে বাঙালির রান্নার কালিয়া-কোর্মার পোলাওর বিশেষ খোঁজ পাওয়া যায় না।

দেবীর আদেশে লহনা যখন নির্বাসিতা খুল্লনাকে বাড়িতে ফিরিয়ে এনে তাঁকে স্নান করিয়ে, সুবেশিত আর সুরঞ্জিত করিয়ে 'পঞ্চাশ ব্যঞ্জন' রেঁধে আপ্যায়ন করেন তখন কি কি মাছ রান্না হয়েছিল তার বর্ণনা শুনুন :

কটু তৈলে রান্ধে রামা চিতলের কোল।
রুহিতে কুমুড়া বড়ি আলু দিয়া ঝোল ॥
কটু তৈলে কই মৎস ভাজে গণ্ডা দশ।
মুঠো নিঙাড়িয়া তথি (তাহাতে) দিল আদা রস ॥
বদরি শকুল মীন রসাল মূশরি।
পন চারি ভাজে রামা সরল-সফরী ॥
কতোগুলি তোলে রামা চিংড়ির বড়া।
ছোটো ছোটো গোটা চারি ভাজিল কুমুড়া ॥
কিরা দিয়া রুই মুড়া দিল খুল্লনারে।

কিন্তু বেচারি খুল্লনা! তার ভাগ্যে আদর করে দিব্যি দেওয়া রুই মাছের মুড়ো ছিল না। কারণ বাড়ির ল্যাজ-কাটা মূর্তিমান লুঠেরা ভাঁড়ুদত্তর মতন বজ্জাত বোঁচা বেড়াল মাছের মুড়ো পাতে দিতেই টাং থেকে এক লাফে তা নিয়ে ভেগে পড়ে। পরিচারিকা দুবলার ঠেঙা নিয়ে তার পেছন পেছন দৌড়নোই সার হল। কবি তাই 'থাকু লইয়া মাছমুণ্ডা যার যেবা ভোগ' বলে মাছের তরকারির রান্নার কথা শেষ করলেন।

আর এক জায়গায় আছে বণিককুলকে খাওয়ানোর জন্যে নানান নিরামিষ খাবারের সঙ্গে খুল্লনা উপরোক্ত ধরনের মাছ পরিবেশন করেন। আরও এক জায়গায় খুল্লনার মাছ রান্নায় কিছু হেরফের দেখা যায়। যেমন কাঁঠালবিচি দিয়ে চিংড়ি, মরিচ গুঁড়ো আদার রস দিয়ে কৈ, কাতলা মাছের ঝোল, খরশোলা মাছ ভাজা, আর শোল মাছের কাঁটা বার করে কাঁচা আমের সঙ্গে রান্না। এত গেল বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামের মুকুন্দরামের খাঁটি ঘটি মাছ রান্নার বর্ণনা। এবার শুনুন বরিশালের ফুল্লশ্রী গ্রামের পনেরো শতাব্দীর শেষের বিজয় গুপ্তর মনসামঙ্গল থেকে কিছু বাঙাল মাছরান্নার কথা :

মৎস্য কাটিয়া থুইল ভাগ ভাগ।
রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে কলতার আগ ॥
মাগুর মৎস্য দিয়া রান্ধে গিমা গাছ গাছ।
ঝাঁঝ কটু তৈলে রান্ধে খরসুন মাছ ॥
ভিতরে মরিচ গুঁড়া বাহিরে জড়ায়ে সুতা।
তৈলে পাক করিয়া রান্ধে চিংড়ির মাথা ॥
ভাজিল রোহিত আর চিতলের কোল।
কৈ মৎস্য দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল ॥

আশ্চর্য লাগে ঘটি-বাঙাল এই দুই রান্নায় ইলিশের নাম নেই। এর অনেক আগে বাংলার ইতিহাসের আদি যুগে জীমূতবাহন ইলিশ আর ইলিশের তেলের নানান গুণের কথা বলে গিয়েছিলেন। সে যাই হক ঘটি আর বাঙাল মাছরান্নার চিরকেলে আর অমীমাংসিত লড়াইয়ের মধ্যে না গিয়ে দুই বাংলার মাছ রান্নার বৈচিত্র্য আর সম্ভারের উপরোক্ত কথা পড়লে তাক লেগে যায়। সব কথা বাদ দিয়ে বলা যায় যে রান্নার আসল উদ্দেশ্য হল 'রাঁধা' জিনিসের স্বাভাবিক স্বাদ-গন্ধ-রস এমনকি চেহারা সুদৃশ্যভাবে বজায় রেখে অন্যান্য নানান জিনিস আর পরিমাণ মত মশলাপাতি দিয়ে স্বাভাবিক স্বাদ-গন্ধ-রসকে আরও বাড়িয়ে সুখাদ্যে পরিণত করা।

শোল মাছ : কালীঘাটের পট

এই দিক দিয়ে দেখলে পাঁচশ বছর আগের এই সব রান্নার কায়দার জবাব নেই। আর এটাও ঠিক যে এই 'রান্না-শিল্প' দুম করে একদিনে তৈরি হয়নি। এর পেছনে বাঙালিদের শ শ বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ভাবনা-চিন্তা রয়েছে। বিজয় গুপ্তের কলতার আগা আর রুই মাছের রাজযোটক বা কটু তেলে খরশোলা মাছ ভাজা কিংবা মুকুন্দরামের 'রুহিতে কুমুড়া বড়ি আলু দিয়া ঝোল বা মরিচ গুঁড়ো আর আদার রস দিয়ে কই রান্নার

পেছনে যুগ যুগের সাধনা রয়েছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেছিলেন যে বাংলায় বৈষ্ণবধর্মের প্লাবনের পর কিছু কিছু বিশেষ করে উঁচু জাতের বাঙালির বাড়ির হেঁশেলের মশলা পেষা শিল-নোড়ায় চন্দন ঘষা শুরু হয়। হাজার হাজার বছর আগে ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন প্রভাব যেমন বাঙালিকে তার আমিষ প্রীতির থেকে নড়াতে পারেনি বৈষ্ণব প্রভাবের পক্ষেও সেই কথা খাটে। তাছাড়া তথাকথিত বঙ্গ বৈষ্ণবই তেল মাছের ঝোল আর যুবতীর কোলের লোভ সামলাতে পারেনি।

এক বৈষ্ণবোত্তর আঠার শতাব্দীর 'অন্নদামঙ্গলে' মাছ রান্নার বর্ণনা আছে। তবে আমি এখানে সে ব্যাপারে না ঢুকে কাব্যটির থেকে বাংলাদেশের মাছের রকমারিত্বের একটি বর্ণনা দিয়ে মঙ্গলকাব্য আর মাছ প্রসঙ্গ শেষ করি। এই কাব্যের 'অন্নপূর্ণার পুরী নির্মাণ পরিচ্ছেদে এই অবাক-করা ফিরিস্তি রয়েছে:

'চিতল ভেকুট রুই কাতল মৃগল।
বানি লাঠা গড়ই উল্কা শউল শাল ॥
পাঁকাল খয়রা চেলা তেচক্ষা এলেঙ্গা।
গুঁতিয়া ভাঙন রাগি ভোলা ভোলচেঙ্গা ॥
মাগুড় গাগড় আরি বাটা বাচা কই।
কালবসু বাঁশপাতা শঙ্কর ফলুই ॥
শিঙ্গি ময়া পাবদা বোয়ালি ডানিকোণা।
চিংড়ি ট্যাংরা পুঁটি চান্দা গুড়া লোনা ॥
গাঙ্গদারা ভেঙ্গা চেঙ্গ কুড়িশা খলিশা
খরশুলা তপসীয়া পাঙ্গাশ ইলিশা ॥

এরপর গত শতাব্দীতে আমি যাঁর কথায় আসছি তাঁর মতন খাদ্যরসিক কবি বিজয় গুপ্ত, মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্রের পর বাঙালিদের মধ্যে আর কেউ জন্মাননি। আমি বাংলাভাষার পোয়েট অফ গ্যাসট্রোনমি ঈশ্বর গুপ্তর কথা বলছি। ছোট মুখে বড় কথার মতন শোনালেও বলি যে গুপ্ত কবির পদ্যর খাদ্যরসের দিকটা নিয়ে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র আহ্লাদে আটখানা হলেও সুনীতিবাবুর কথায় 'বাংলার ডাক্তাররা' এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখাননি। তাঁর 'পাঁটা', 'তপসী মাছ' হেমন্তে বিবিধ খাদ্য কবিতাগুলিতে খাবারদাবার নিয়ে তিনি যেরকম স্ফূর্তি এবং আনন্দ আর মজা করে আর বগল বাজিয়ে লিখে গেছেন তার ধারে-কাছে পরে কোন বাঙালি রন্ধন বিশেষজ্ঞ পৌঁছতে পারেনি। তবে এখানে বলা দরকার যে মাছ না হলেও দই মণ্ডা, সন্দেশ ক্ষীর পানতুয়া ইত্যাদি নানা রকমের বাঙালির প্রিয় মিষ্টি নিয়ে একালে ডি এল রায়, রজনীকান্ত সেন, নজরুল ইত্যাদি অনেকেই হাসির গান লিখেছেন।

ঈশ্বর গুপ্তর 'পদ্য' পড়ার আজকাল খুব ফ্যাসান নেই। তা ছাড়া তাঁর লেখাও বেশ কিছুকাল ধরে দুষ্প্রাপ্য। তাই আমি এখানে বাঙালির মাছ-প্রীতির এক চরম প্রতীক হিসেবে তাঁর মাছের রচনাগুলি থেকে একটু বেশি করেই উদ্ধৃতি দেবো। আশা করি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাইর কথায় তাতে আজকালকার বাঙালি পাঠক-পাঠিকা যাঁককণরা একটু মুখ বদলে নিতে পারেন।

প্রথমে তপসী মাছ। যে মাছ খেয়ে বঙ্গ বিশ্বনিন্দুক সাহেবরাও ম্যাঙ্গো ফিস বলতে অজ্ঞান ছিলেন। একজন সাহেব লিখেছিলেন যে এদেশে এসে তিনি টাকা করতে পারেননি, রোদে পুড়ে জলে ভিজে শরীর শেষ হয়ে গিয়েছে, তার মনও ছিন্ন-ভিন্ন তবুও তিনি শান্তি পান যখন তিনি ভাবেন যে এখানে এসে তিনি 'ম্যাঙ্গো ফিস' খেয়েছেন।

গুপ্তকবির ভাষায় সাহেবরা:
বাঙালির মত তারা রন্ধন না জানে।
আধসিদ্ধ করে শুধু টেবিলেতে আনে ॥
মশলার গন্ধ গায় কিছুমাত্র নাই।
অঙ্গে করে আলিঙ্গন কমলিনী রাই ॥

ঈশ্বর গুপ্ত তপসে মাছকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন:
কষিত কনককান্তি কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপ দাড়ী তপস্বীর প্রায় ॥

তারপর যা বলেছেন তার থেকে কিছু কিছু লাইন বাদ দিয়ে তুলে দিচ্ছি:
একবার রসনায় যে পেয়েছে তার।
আর কিছু মুখে নাহি ভাল লাগে তার ॥

*

না করে তোমারে যেই উদরে গ্রহণ।
বৃথাই জীবন তার বৃথাই জীবন ॥

*

জলধি করেছে তার কত উপকার।
লুণ খেয়ে, গুণ গেয়ে কাছে থাক তার ॥

*

ক্ষীরোদমথন কালে অপূর্ব্ব ঘটন।
দেবাসুরে ঘোর দ্বন্দ্ব সুধার কারণ ॥

*

সে সময়ে তুমি মীন অতি কুতূহলে।
খেয়েছিলে সেই জল তপস্যার ফলে ॥
অমৃত ভক্ষণে তাই এরূপ প্রকার।
সুমধুর আস্বাদন হয়েছে তোমার ॥
এ মত অমৃত ফল ফলিয়াছে জলে।
সাহেবেরা সুখে তাই ম্যাংগো ফিস বলে ॥

এরপরে আর দুচার ছত্র। সোম বচ্ছরে গাভীন হয়ে যখন তপসে মাছ সমুদ্দুর থেকে গঙ্গায় ডিম পাড়তে আসে তার উল্লেখ করে গুপ্ত কবি বলছেন:
গোঁৎ করে সোঁৎ ঠেলে ভাটী গাঙ ছেড়ে।
উজানের পথে চল দাড়ী গোঁপ নেড়ে ॥
শাঁখ ঘণ্টা বাজাইবে যত মেয়ে ছেলে।
ভিটে বেচে পূজো দিবে মিঠে জলে এলে ॥

শেষ লাইনটা পড়লে বলতে ইচ্ছে করে: "ভাবা যায়!" সব শেষ উদ্ধৃতি:
গাভীন হইলে তুমি রস তায় কত।
রাঁড়া হলে রাজ সুখ নাহি হয় তত ॥

ঈশ্বরগুপ্ত এই কবিতার আর এক জায়গায় লিখেছেন যে 'কুড়ি দরে কিনে লই, দেখে তাজা তাজা।/ টপাটপ খেয়ে ফেলি ছাঁকা তেলে ভাজা ॥ কবি কোথা থেকে কুড়ি দরে তপসে কিনতেন জানি না। তবে আজ একশ বছরের ওপর ধরে বাড়ির মেয়েরা যখন সন্ধ্যেবেলায় উনুনে আঁচ দিবেন তখন তপসের মরসুমের সময় হাঁক শোনা যেত "চাই তপসে মাছ।" জানি না উত্তর কলকাতায় আজও এই বড় মিষ্টি, বড় বাবু ডাক শোনা যায় কি না।

এইবার ঈশ্বর গুপ্তর বিশাল কবিতা হেমন্তে বিবিধ খাদ্য থেকে শীতকালের সবরকম খাদ্যের জিভে-জল-আনা রসে টৈটম্বুর কথা বাদ দিয়ে কিছু মৎস-বন্দনায় আসছি। যদিও এখানে বলা দরকার যে অনেক আনাজের সঙ্গে ঠিক মাছগুলির মণিকাঞ্চন সংযোগের কথাও এর ফলে বাদ যাবে।

প্রথম গলদা চিংড়ির কিছু কিছু:
জলের ভিতরে মাছ কত রস ভরা।
দাঁড়ী গোপ জটাধারী জামা যোড়া পরা ॥

* * *

বিশেষত শীতকালে অমৃতের খনি।
আমিষের সভাপতি মীন শিরোমণি ॥
গলদা চিংড়ী মাছ নাম যার মোচা।
পড়েছে চরণতলে এলাইয়া কোঁচা ॥
কালিয়ে পোলাও রাঁধো রাঁধো লাউ দিয়া।
ভাতে খাও ভেজে খাও হবে মুখপ্রিয়া ॥

এই ক' লাইনে সংক্ষেপে চিংড়িমাছের বেশ কিছু রান্নার বর্ণনা আছে মালাইকারি ছাড়া।

যদিও ১৮৮৬ সালে প্রথম ছাপা বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের পাক প্রণালীতে এর উল্লেখ রয়েছে। এর কারণ বোধহয় এই রান্নাটা তখন ওঠেনি। এখানে গলদা চিংড়ি আর পোনামাছের যে বটতলার কাঠখোদাইটি ছাপা হল তাতে দেখা যাচ্ছে যে ছবিতে এ গুলির হস্তাধিকারী ভাগ্যবান ব্যাক্তিটি গলদা চিংড়ি তরিবত করে খাবার জন্যে একটি দিব্যি নাদুস-নুদুস কচি লাউ কিনতে ভোলেননি।

গুপ্ত কবি এরপর দীনহীন কুচো চিংড়ি আর চুনো মাছের বর্ণনা করে বলেছেন:
দীনের তারণকারী চিংড়ীর ঘুষো।
সুমধুর বাতহর পয়সায় দুশো ॥
মূলক বেগুণ শাক যাতে তাতে লহ।
সমভাবে সদালাপ সকলের সহ ॥
অধম পুঁয়ের ডাঁটা তারে নিয়ে তারে।
ব্যঞ্জন মজাতে আর এমন কে পারে ॥

ইলিশ, তপসের মতন দু-চার জাতের মাছ না হয় আগের তুলনায় সরবরাহে ঘাটতি হয়েছে। কিন্তু অন্য সব মাছ কেন সোনার দামে বিক্রি হবে? সরকারি গাফিলতি আর মাছ যোগানদারদের বজ্জাতির জন্যে আজকের দিনে আমাদের মাছের এই হাল

শুকায়েছে খালবিল খানা সরোবর।
বাজারে বিক্রয় হয় চুনা বহুতর ॥
টেংরা, মৌরলা পুঁটি বেলে আর চাঁদা।
পাঁকাল প্রভৃতি কত রাঙা কালো সাদা ॥

*

কে জানে অম্বল ঝোল কেবা জানে ভাজা।
যাতে খাও তাতে সুখ যদি হয় তাজা ॥

এইবার মীনরাজ রোহিত-স্তুতির (যার সমভবে সমাদর সকল সময়) কয়েকটি ছত্র :

কাতলা মৃগেল আদি বড় মাছ যত।
রুইয়ের শ্রীপদতলে সবাই প্রণত ॥
কতদূর সুখোদয় ভোজনের বেলা।
তেল কাঁটা আদি করি নাহি যায় ফেলা ॥
কামুকের কত সুখ কুলটার কোলে ॥
রসনা যে সুখ পায় এ মাছের ঝোলে ॥
পলায়ের রাজা মাছ না হয় এমন।
সুধার আধার এই রুয়ের ব্যঞ্জন ॥
বল দেয় বুদ্ধি দেয় বাত নাশ করে।
নয়নের জ্যোতি বাড়ে মুড়া খেলে পরে ॥

এখানে একটা ছোট টিপ্পনী দিতে চাই। আমায় সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীঅজিতনাথ রায় মশাই একবার বলেছিলেন যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলতেন যে যদি কেউ ভাতের সঙ্গে রোজ একবাটি মাছের ঝোল খায় তার অন্যকিছু খাবার দরকার হয় না। তারপর শ্রীরায় আফসোস করছিলেন যে আগেকার দিনের মা-মাসী বা বামুনদাদার মতন মাছের ঝোল এখন আর কেউ বা রাঁধতে পারেন। কথাটা শুনে আমার স্বামী বিবেকানন্দর ছোট ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্তের একশ বছরের আগের বাড়ির মা মাসীদের করা ছক্কা-ছেঁচকিরূপী 'অমৃত'র বর্ণনার কথা মনে পড়ে গেল।

রুই মাছের পর গুপ্তকবি কৈ-মাছের কথা যা লিখেছেন তার থেকে মাগুর সম্বন্ধে দু-চার ছত্র শুনুন।

এমন মধুর মাছ নাহি হয় আর।
রোগী ভোগী উভয়েরই সম উপকার ॥
যুবকের কত সুখ যুবতীর কোলে।
কত বা অমৃত আছে বালকের বোলে ?
কত বা আমোদ হয় পূর্ণিমার দোলে।
সকল আমোদ এই মাগুরের ঝোলে ॥

এইবার আমি তিনি অন্য যেসব মাছ, মাছরান্নার কায়দা, খাওয়ার আনন্দ আর গুণাগুণ সম্বন্ধে লিখেছেন তার একটা ফিরিস্তি দিই। যথা, শিঙ্গি, ভেটকী, ভাঙন, বাটা, পরিশার (পার্শে), আমলেট ইত্যাদি কিন্তু এই সব 'দুনোদরের' মাছ তখনকার দিনেও গেরস্তদের ভাগ্যে জুটতো না। কবি তাই বড় আক্ষেপে লিখেছিলেন যে "শীতকালে সুখী সেই কড়ি আছে যার/ ধনের যোগেতে হয় ভোগের আহার।" এরপর তিনি খানিকটা সুখ পেয়েছেন সেই সব মাছের কথা বলে যেগুলি কলকাতার ধনী বাবুরা খেতে পেতেন না আর যা কলকাতার উত্তরে গঙ্গার ধারের গরীব গুরবো মহানন্দে খেতো চড়চড়ি করে একফোঁটা জলে হলুদ গুলে, বেগুনে মজিয়ে। সে সব মাছ হল নেটা বেলে, গুড়গুড়ি যেগুলো গুপ্তকবি এক আনা পনে এক ঝুড়ি মাছ বেছে বেছে মেছুনিদের কাছ থেকে কিনে আনতেন।

মাছেদের রাণী : উডকাট। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী' থেকে গৃহীত

এই মেছুনি কথাটা শুনলে গোয়ালিনি আর নাপতেনি শব্দটার মতন কত কি যে মনে পড়ে যায়। হুতোম লিখেছিলেন যে শোভাবাজারের রাজাদের ভাঙা বাজারের মেছুনিরা প্রদীপ হাতে করে ক্রেতাদের, "ও গামচা-কাঁদে, ভাল মাচ নিবি ? ও খ্যাংরা-গুঁপো মিনসে চার আনা দিবি বলে আদর কচ্চে—মধ্যে মধ্যে দু-একজন রসিকতা জানাবার জন্যে মেছুনি ঘেঁটিয়ে বাপান্ত খাচ্ছেন।' কমলাকান্তর দপ্তরে বঙ্কিমচন্দ্রও মেছুনির ও খ্যাংরাগুপো মিনসে জাতীয় মধুর ডাকের কথা বলেছেন। আর বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠক আর সুন্দরী পাঠকারিণীদের এই ব্যাপারে 'লোকরহস্যে'র 'Bransonism' প্রবন্ধটির কথা মনে পড়বে। ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত এই লেখায় বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণনা করেছেন কি করে বাগদির ছেলে কালাসাহেব জন ডিকসন বণ্ডিলা মেছুনির শুঁটকি মাছ চুরি করে কালা হাকিমের রায়ে সাতদিন কয়েদ হয়। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে আমরা মামার হাত ধরে শ্রীমানী বাজারের আঁশ বঁটি আর আঁশ চুপড়িওয়ালি মেছুনিদের দাপট দেখেছি। বড় দুঃখের কথা কয়েক বছর হল দেখছি বালীগঞ্জের বাজার থেকে আগেকার সেই সোমত্ত মেছুনিরা আর বিশেষ নেই যাদের কাছে মাছ কিনতে গিয়ে ঠকলেও তত গায়ে লাগত না। দিকে দিকে নারী প্রগতির দিনে কি আগের আরও অনেক অনেক ভাল জিনিসের মতন মেছুনি উঠে যেতে দেখে বড় দুঃখু হয়। এরা সব কোথায় গেল গো ? তবে মেছুনি, গয়লানি আর নাপ্তিনিরা আজও বেঁচে রয়েছে পুরনো নাটক-নভেলে, পুরনো গানে, কালীঘাটের পটে যার একটা এখানে ছাপা হল। পটের মেছুনিটিকে দেখলে পুরনো সেই রসের গানের একটা কলির কথা মনে পড়ে যায় : 'দোরসা মাছ বেচতে এসে মেছুনি তোর গুমর কেনে ?'

ছবিটি লক্ষ্য করলে পাঠক-পাঠিকারা অবশ্যই তক্ষুনি বুঝবেন যে মেছুনির গুমরের কারণটা কি ?

হায়, হায় ! এই মেছুনির কথা নিয়ে 'চক্রমণ' করতে গিয়ে প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম যে গুপ্তকবির বন্দিত আর একটি মাছের কথা বাকি রয়েছে।

আপনার মতই বাছাই-পছন্দ করে, আমাদের প্রতিটি প্লেট উঠেছে গড়ে!

সেলাম ষ্টীল। যেখানে কর্মনিষ্ঠ আমরা প্রতিটি প্লেট গড়তেই পুরো যত্ন নিই। যা কিছু ব্যবহার করি, তার অনেক বাছাই-পছন্দ করি...তৈরীর টেকনিক, কাঁচা মাল...সবকিছুতেই। জগতের সেরাটাই আমরা পছন্দ করে নিই। নির্মাণের প্রতিটি স্তরে, আমরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখি প্রতিটি ব্যাপারে। চলে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাতে আপনার হাতে যেটি পৌঁছয়, তা যেন সবার সেরা হয় — বরাবরই!

আজ্ঞে হাঁ।, আমাদের কাছে প্লেট মামুলি কিছু নয়, বড় কিছু এ হ'ল কোম্পানীর দার্শনিক নীতির এক প্রমাণ, যা বোঝায় আপনাদের বিষয়ে আমরা কত যত্নবান... ঠিক আপনার বাছাই-পছন্দের সমান।

সেলাম ষ্টীল প্লাণ্ট

সেলাম ৬৩৬ ০১৩, তামিলনাড়ু।

ষ্টীল অথরিটি অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)

সেলাম ষ্টেনলেস

আজই নিন! কারণ, ষ্টেনলেস ষ্টীল তৈরীর ব্যাপারে, আমাদের মত যত্ন কেইবা করে।

Sista's - SSP.558.86 BEN

সেটা হল খয়রা যার পেটকে তিনি 'ময়রার ঘর' বলে বর্ণনা করেছেন। আমার ময়রা শুনলেই টেকচাঁদ ঠাকুরের সেই ময়রার পায়রা চাঁদা দিয়ে ভাত খাওয়ার কথা মনে পড়ে যায়। সে যাই হোক, গুপ্তকবি তারপর বিভু পদে প্রণাম জানিয়ে বলেছেন :

ভাত মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙালী সকল।
ধানভরা ভূমি তাই মাছ ভরা জল ॥

গুপ্তকবির মতন আমরাও বিভুপদে প্রণাম জানাই কারণ তিনি শ' শ' বছর ধরে বাঙালিকে ভাতের সঙ্গে 'আহার ঔষধ আর পথ্যরূপী' মীন খাইয়ে পুষ্ট আর হৃষ্ট রেখেছিলেন। কিন্তু এখন কি ঘোর দুর্দিন! বেশ কিছু বছর আগে শ্রীপান্থ তাঁর 'মৎস্যপুরাণ' বলে ছোট্ট একটি অতি সরস লেখায় বিজয়গুপ্তর মাছ রান্নার পূর্বোক্তি উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে 'অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যখন এক নজরে এতগুলো মাছের মৌখিক ত পরের কথা চাক্ষুষ দর্শন লাভের সৌভাগ্যও মিলবে না।'

শ্রীপান্থের মাছের সঙ্গে মৌখিক দর্শনের কথায় আমার ঢেঁড়া সই রইল। তবে চাক্ষুষ দর্শনের ব্যাপারে তাঁর 'অদূরভবিষ্যতের' ভীতি এখনও সত্যি হয়নি। বরঞ্চ কলকাতার জাঁকালো জাঁকালো মাছের বাজারে গেলে বিজয় গুপ্ত-মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্র-ঈশ্বরগুপ্ত বর্ণিত মাছগুলো ছাড়া আরও এসেছে নতুন নতুন মাছ, যেমন তেলাপিয়া, অ্যামেরিকান কই, বক, শামন, সিলভার কার্প, পমফ্রেট। এ সব বাদে কালে-ভদ্রে দেখা যায় বিশাল বিশাল কই, চিতল, ভেটকির পাশে বাজার আলো করে শুয়ে রয়েছেন উত্তর ভারত থেকে চালানি দেবাকৃতি মহাশির মাছ যার অপরূপ স্বাদ অনেক পুণ্যি আর অনেক টাকা না করলে পাওয়া যায় না। এরপর বলা দরকার যে কলকাতার সব বাজারেই তেরিটি বাজারের কেরালার মোপলা পাইকেরদের মারফৎ নানান ধরনের শুঁটকি মাছ বিক্রি হয় যা এখন কিছু কিছু ঘটি বাবুরাও আগের মতন সেবনে নাক সিঁটকান না। কিন্তু বেশির ভাগ মাছের দর্শনই সার। ইলিশ, তপসের মতন দু চার জাতের মাছের না হয় আগের তুলনায় সরবরাহে ঘাটতি হয়েছে। কিন্তু অন্য সব মাছ কেন সোনার দামে বিক্রি হবে? সরকারি গাফিলতি আর মাছ যোগানদারদের বজ্জাতির জন্যে আজকের দিনে আমাদের মাছের এই হাল।

এইবার ইলিশের কথা বলা যাক। এটা একটা অবাক কাণ্ড বলে মনে হয় যে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত আলাদা করে ইলিশ নিয়ে কবিতা লেখেননি। কাব্যে-কাহিনীতে উপেক্ষিত হলেও ইলিশ বাঙালির বোধহয় সবচেয়ে প্রিয় আর সবচেয়ে গর্বের মাছ। তবে ইলিশের একটি বড় মনোহর বর্ণনা পড়েছিলাম ১৮৯৭ সনে লেখা রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মজার 'কষ্টিপাথর' বলে একটা নাটকে। তাতে নবীন বলে একজন 'উন্নতিশীল বাবু' এক টাকায় এক জোড়া ইলিশ কিনে এনে লোকদের বলছেন: 'রাজপুত্তুর মশাই রাজপুত্তুর! কি যে গড়ন যেন ননীর চাপ থেকে কেটে তুলেছে। দিব্বি দোহারা, একটু পাশ থেকে গোলাপীর আভা মাচ্চে।' এর পাশে বুদ্ধদেব বসুর চমৎকার ইলিশের বর্ণনা, 'জলের উজ্জ্বল শস্য' যেন একটু বেশি কাব্যিক একটু বেশি স্মার্ট বলে মনে হয়।

কয়েকদিন আগে আনন্দবাজারের 'কলকাতার কড়চায়' ইলিশ নিয়ে একটি ছোট্ট টুকরো লেখা বেরিয়েছিল, ভারি সুন্দর, ভারি মেজাজী। বেনামা লেখক এতে লিখেছিলেন যে এককালে এ শহরে এ সময়ে অলিতে গলিতে জলো হাওয়ায় ভেসে বেড়াত ইলিশের গন্ধ। ফিরিওয়ালা হাঁক দিয়ে যেত 'ইলিশ চাই —গঙ্গার ইলিশ'। বাজার-ফেরত গৃহস্থ রান্নাঘরের দিকে থলে বাড়িয়ে দিয়ে বলতেন—'আজও ইলিশ।' আমি ভাবছি আজ কার কত বুকের পাটা যে বাজার থেকে ফিরে বলতে পারে যে 'আজও ইলিশ'। এরপর কড়চা লেখক বলছেন যে 'কবে এ শহরে টাকায় তিনটে প্রমাণ সাইজ ইলিশ মিলত, সে খবর হয়ত একমাত্র জানা আছে জীবনতারা হালদার কিংবা রাধারমণ মিত্তির মশাইয়ের। তবে বর্ষায় কলকাতার বাজারে এক টাকায় একখানা কিলো ওজনের ইলিশ কিনেছেন—হ্যাঁ গঙ্গার ইলিশ—এমন মানুষ এখনও শহরে নিশ্চয় মেলাই আছেন।... সত্যি বলতে কী কয় দশক আগেও বাদল দিনে কলকাতা (ছিল) মৎস্যগন্ধা নারী। "এই 'মৎস্যগন্ধা' কথা শুনে আমার মনে পড়ছে কবে কোথায় যেন একজন বলেছিলেন যে বাড়িতে গঙ্গার ঘাট থেকে ইলিশ কিনে এনে ভাজলে চার গ্যাস দূরে তার গন্ধ শোনা" যেত।

গঙ্গার ইলিশের ঘাট বলতে অবশ্য একটা বোঝায় না। তক্তা ঘাট, বাবু ঘাট, বাগবাজারের ঘাট, বিচিলির ঘাট ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে কোন ঘাটের ইলিশ সবচেয়ে 'সুতার' তা নিয়েও তর্কাতর্কির শেষ নেই, ঘটি-বাঙালে পদ্মার ইলিশ-গঙ্গার ইলিশের লড়াইয়ের কা কথা। কে জানে কলকাতায় এককালে এমন শৌখীন ভোজনবিলাসী বাবুরা ছিলেন যাঁরা ইলিশ খেয়ে বলতে পারতেন যে সেটা কোন ঘাটের ইলিশ এবং মাঝ গঙ্গার ইলিশ কি না। যেমন ব্রিলা-সাভারাঁ বলেছেন যে পুরনো রোমে কিছু খাদ্য রসিক ছিলেন যাঁরা মাছ খেয়ে বলতে পারতেন যে সেটা কোন গাঙের মাছ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ একবার ভগবানের মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্য ইলিশের কথা পাড়েন। তিনি যা বলেছিলেন তার মর্মার্থ হল যে ভগবানের কি আশ্চর্য মহিমা! ডাব মাটির তিরিশ হাত ওপরে সর্বক্ষণ রোদ খাচ্ছেন কিন্তু খেলেই শরীর ঠাণ্ডা। কিন্তু ইলিশ গঙ্গার দশহাত গভীরে অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়, অথচ খেয়েছ কি পেটগরম। সে যাই হক, তিনি নিজে নিশ্চয়ই জিলিপির মতন ইলিশেরও ভক্ত ছিলেন। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে 'যমদত্ত' যতীন্দ্রমোহন দত্ত আরও নানারকম পুরনো জিনিসের মতন ইলিশ নিয়েও একটা সুন্দর লেখা লিখেছিলেন। কিন্তু তা আর আজকাল পাওয়া অসম্ভব। আরও শুনেছি যে কলকাতা বেতারের শ্রবণীতে একবার পরিমল গোস্বামী বোধহয় ইলিশ নিয়ে একটি মজার

'চিনির পানা খেয়ে খুশি ডিগবাজি খায় কাৎলা, চাঁদা মাছের সক জনের রইল না আর পাতলা।' শিল্পী: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাতে নাকি তিনি বলেছিলেন যে একজন বিদেশি মেমসাহেব একবার স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়িতে ইলিশ মাছের মুড়োর রান্না খেয়ে মোহিত হয়ে যান। ব্যাপারটা খুবই অবাক-করা, কারণ ইংরেজ আর ইউরোপিয়ানরা প্রায় সব মাছের মুড়ো বাদ দিয়ে খান আর আমরা ঘি-ভরা গলদা চিংড়ির মাছের মুড়ো চরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাই শুনলে অবাক হয়ে যান। এই কথাটা মনে রাখলে লেডি অবলা বসুর ইলিশ মাছ রান্নার হাতযশের খানিকটা আঁচ পাওয়া যাবে।

বাঙালি জীবনের সঙ্গে মাছ এমন আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে থাকলেও ঈশ্বর গুপ্তর পর বাংলা সাহিত্যে মাছ নিয়ে, জেলেদের জীবন নিয়ে, দাবার নেশার মতন ছিপ দিয়ে মাছ ধরার আনন্দ নিয়ে লেখার দৈন্য দেখলে দুঃখ্য হয়।

সাপের মুখে মাছ : কালীঘাটের পট

প্রথমে মাছ আর মানুষ নিয়ে নিছক কাল্পনিক কৌতুককাহিনী দিয়ে শুরু করা যাক। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী'। সবাই জানেন যে ভীষণ জ্বরের বিকারে কঙ্কাবতী স্বপ্ন দেখে যে সে নদীর জলে ডুবে গেলে জলের তলায় মাছরা তাকে নিয়ে গিয়ে কি করে সভা করে, প্রস্তাব করে আর ভোট দিয়ে তাকে রাণী করে। আর তারপর তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে ঝিনুকের মতিমহলে রাখলে সেখান থেকে কঙ্কাবতী রাণীগিরি করতে লাগলেন। গভীর জলের মাছেদের অবশ্য কঙ্কাবতীকে রাণী করার একটা মতলব ছিল। কারণ কঙ্কাবতী রাণী হলে তাদের কোন ভয় থাকবে না "বঁড়শী দিয়া আমাদের কেহ গাঁথিলে হাত দিয়া কঙ্কাবতী সুতাটি ছিঁড়িয়া দিবেন। জেলেরা জাল ফেলিলে, ছুরি দিয়া কঙ্কাবতী তাহা কাটিয়া দিবেন।"

কল্পনা ছেড়ে এখন রবীন্দ্রনাথের কথা ধরা যাক। সবাই জানেন যে ছন্দ শিখোনোর জন্যে তিনি লিখেছিলেন : পাতলা করে কেটো প্রিয় কাতলা মাছটিরে।

যোগমায়া কলেজের বাংলার অধ্যাপক বন্ধুবর ডঃ শঙ্কর চক্রবর্তী মশাই আরও মাছ নিয়ে নানান খবরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই ছড়াটি শোনান যেটি কবি বোধহয় কোনো নাত্নী-স্থানীয়াকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন :

যদি কোনোদিন তব ভর্তা না ভৎসে,
বেশী তেল হয়ে যায় পাকা রুই মৎসে,
লোভী এ কবির নাম মনে রেখ বৎসে।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর বাংলা খাবার নিয়ে লেখায় বলেছেন যে 'যোগাযোগে' মধুসূদন টাকা করে রুপোর বাসনে খেলেও মোটা চলের ভাত, মাছ আর সাধারণ তরকারি না হলে তাঁর মুখে রুচত না।

রবীন্দ্রনাথের কথা শেষ করার আগে তাঁর 'জীবনস্মৃতি'র সেই ঘটনার কথা বলি। কবি তাঁর শিক্ষক সাতকড়ি দত্ত মশাইয়ের সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে "... তিনি আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য মাঝে মাঝে দুই এক পদ কবিতা দিয়া, তাহা পূরণ করিয়া আনিতে বলিতেন। তাহার মধ্যে একটা মনে আছে :

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।

কবি এই ভাবে তার পাদপূরণ করেন :

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

ভাবতে ভাল লাগে যে শিশু রবি তাঁর কবিতা লেখার একটি সর্বপ্রথম প্রচেষ্টায় প্রথম যে কথাটি ব্যবহার করেন তা হল মীন। এই সুন্দর শ্রীমণ্ডিত কথাটির চেয়ে তাঁর কাব্য রচনার কি ভাল সূচনা ভাবা যেতে পারে।

এছাড়া রবীন্দ্রনাথ একজন মুষ্টিমেয় বাঙালি শিল্পী যিনি কাগজে আর এমনকি চামড়ার ওপর মাছের অনবদ্য ছবি এঁকেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর ইলশে গুঁড়ি কবিতা ছাড়া তিনি তাঁর 'দূরের পাল্লা' কবিতায় একটি জেলেদের নিয়ে এই অপূর্ব লাইনটি লিখেছিলেন যা কিছু পুরনো চীনে বা জাপানী ছবির কথা মনে করিয়ে দেয় :

ঝাপসা আলোয় চরের ভিতে
ফিরছে কারা মাছের আশে।

বাঙালি পাঠকদের কাছে মাছ আর জেলে জীবন নিয়ে লেখা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' বা সমরেশ বসুর 'গঙ্গা'র নাম করার দরকার নেই। এখানে আমি 'পদ্মানদীর মাঝি' থেকে ছোট একটি উদ্ধৃতি দিতে চাই

শেষ রাত্রে ভাঙা-ভাঙা মেঘে-ঢাকা
আকাশে ক্ষীণ চাঁদটি ওঠে।
জেলে নৌকার আলোগুলি
তখনো নেভে না। নৌকার
খোল ভরিয়া জমিতে থাকে
মৃত সাদা ইলিশ মাছ।
লণ্ঠনের আলোয় মাছের
আঁশ চকচক করে,
নিস্পলক চোখগুলিকে
স্বচ্ছ নীলাভ মণির মতন
দেখায়।

মীনাক্ষির এই অপূর্ব বর্ণনা সত্যিই বড় সুন্দর।

আবদুল জব্বর মশাই গ্রামবাংলার জীবনের নানান দিক ছাড়া দখনের জেলেদের জীবন, সমুদ্দুর আর গঙ্গায় মাছধরা, জাল আর মাছের রকমারিত্ব নিয়ে তার নিজস্ব ভাষায় বেশ কয়েকটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছেন।

শরৎচন্দ্রর কথা আমি সবচেয়ে শেষে বলছি। 'শ্রীকান্তর নৈশ অভিযান' বা 'দত্তা'য় নরেন্দ্রর ছিপে মাছ ধরা ছাড়া বিশেষ করে তাঁর 'রামের সুমতি'র সেই কার্তিক-গণেশের কথা বলতে চাই। দিগম্বরীর শয়তানি আর নারায়ণীর অসাবধানতায় ভগা জেলে যখন গণেশকে খেপলা জালে ধরে ফেলে তখন সেটা রামের প্রাণস্বরূপ এই মাছটির জন্যে সেই দামলা বালকের শোকে 'মহেশ' গল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়।

এ সবই ত না হয় হল। সত্যি কথা বলতে কি পুরো আধুনিক বাংলা সাহিত্যর কথা ধরলে তাতে মাছের কথা ছিটে-ফোঁটারই শামিল। এই ব্যাপারে আমরা কোথায় আছি তা ইংরিজি সাহিত্য থেকে দু-চারটে নজির দিলেই বুঝতে পারা যাবে। বেশিদূর না পেছিয়ে উনিশ আর এ শতাব্দী থেকে মাছ নিয়ে দুটো বইয়ের নাম করা যেতে পারে যা আধুনিক বিশ্ব সাহিত্যের উপন্যাসের মধ্যে একেবারে সেরা ক্লাসে পড়ে। এ দুটি হল : হারমান মেলভিলের 'মবি ডিক' আর আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সি'. 'মোবি ডিক' নামে দানবরূপী শাদা তিমি আর ক্যাপটেন আহাব আর তাঁর অন্যান্য নাবিকদের এই লড়াইয়ের কাহিনীর শিল্পোৎকর্ষ, দার্শনিক তাৎপর্য ইত্যাদি নিয়ে যে কত লেখালেখি হয়েছে আর হচ্ছে তার কোন অদিগদি নেই। আর হেমিংওয়ের বুড়ো আর সেই সামুদ্রিক মাছের যুদ্ধের কাহিনী তো মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যুদ্ধ আর ট্রাজেডির প্রতীক হয়ে গেছে।

এই ভারি ভারি বিষয়ের কথা বাদ দিলেও ছিপ দিয়ে মাছ ধরার সত্যি আর বানানো গল্প, আনন্দ আর ধরার কায়দা-কানুন নিয়ে ইংরিজিতে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছে আমি জানি না যে দুনিয়ার অন্য কোন সাহিত্যে তার তুলনীয় কিছু আছে কিনা। একথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না যে ইংরিজিতে কেবল মাছ ধরার মজা আর আনন্দ নিয়ে যত বই আছে তা ভ্রমণের বইয়ের চেয়ে কম নয়, আর সাহেব জাতের 'ধর্ম' ক্রিকেট খেলার ওপর বইয়ের চেয়ে বেশি। ইংরিজি মাছ-ধরার সাহিত্যে সর্বপ্রথম আর নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সেরা ক্লাসিক হল আইজাক ওয়ালটনের ১৬৫৩-য় ছাপা 'The Complete Angler'। ইংরিজি সাহিত্যে ওয়ালটন আর তাঁর বইয়ের জায়গা কোথায় তা একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। ওয়ালটনের বহু জীবনীকারদের মধ্যে আছেন তিন দিকপাল ইংরেজ কবি, জন ডান, স্যার হেনরি ওটোন আর জর্জ হারবার্ট। বাংলায় ছিপ সুতো

বঁড়শি, চার আর টোপ নিয়ে দু-চারটে 'শিক্ষামূলক' বই আছে। কিন্তু ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, চারিদিকে নিস্তব্ধ মেঘলা দুপুরে টোকা বা ছাতি মাথায় দিয়ে একজন ছিপ নিয়ে ফাতনার দিকে চোখ রেখে বসে আছেন মাঝে মাঝে দু-একটা ড্রাগন ফ্লাই বা গয়াল পোকা ছিপের আশপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। ঠিক যেন চীনের তাং বা সুং যুগের ছবি। তারপর সেই চরম মুহূর্তে, হঠাৎ ফাতনা নড়ে ডুবে গেল, হুইল ছিপের সুতোয় টান পড়ল, একটা চারসেরি রুই টোপ গিলেছে। তারপর ২০/৩০ মিনিট সে কি খেলা! কখনও ঘুড়ি কাটাকাটির মতন লাট ছেড়ে, কখনও ঘাপ্পা মেরে শেষে মাছ উঠল। এই যে অপেক্ষা, এই যে লড়াই এর আনন্দ নিয়ে কোন বাঙালি যদি বই কেন কোন প্রবন্ধ লিখে থাকেন তা আমার জানা নেই।

যাই হক, মাছ ধরার সুখের কথা না থাকলেও মাছ খাওয়ার সুখের জন্যে আজও নিরামিষের মতন বাংলার মাছ রান্নার কায়দার রকমারিত্বের শেষ নেই। সুখের বিষয় ঠাকুমা-দিদিমা-মা-মাসীদের কাছ থেকে শেখা এইসব পাক-প্রণালী এখনও বর্ষীয়ান মহিলাদের দৌলতে টিকে আছে। তবে কতদিন এসব রান্না বজায় থাকবে তা ভগবানই জানেন। এর মধ্যেই বহু ঝকঝকে তকতকে রান্নাঘর থেকে সেই চিরকেলে শিল-নোড়া, আঁশবটি আর আঁশ চুপড়ি বিদেয় নিয়েছে।

আমি এখানে মাছ রান্নার প্রণালী নিয়ে কিছু বলবো না। তাতে অবশ্য কোনো বিশেষ ক্ষতি নেই কারণ এই লেখাটা পাক প্রণালী নিয়ে নয়। তাই এখানে কেবল এইটুকু বলতে চাই যে বাঙালিরা মাছ রাঁধেন, পুড়িয়ে, সেঁকে ভেজে, ভাপে সেদ্ধ করে, ঝাল, ঝোল, টক, আর অজস্র রকম সাধারণ আর পোশাকি তরকারি করে যার ফিরিস্তি দিতে গেলে পাতার পর পাতা ভরে যাবে।

বাঙালি আমিষ বা নিরামিষ যে রান্নাই হক না কেন অন্যান্য দেশের ভাল রান্নার মতন একই রান্নার ভৌগোলিক বিভিন্নতার কথা বাদ দিলেও একই জায়গার পরিবার থেকে পরিবারে স্বাদের সূক্ষ্ম তফাৎ দেখা যায়। মূলত, রান্নার জিনিস আর মশলাপাতি এক হলেও এই তফাতের কতকগুলো কারণ আছে। যেমন রাঁধিয়ের হাতযশ, অভিজ্ঞতা থেকে হাতের-আটকল বা আন্দাজ আর সময়জ্ঞান, মশলাপাতির ব্যবহারে একটু-আধটু কমবেশি, একটু-আধটু ওজনের ঠেশের হেরফের, একটু-আধটু অনুপানের তফাৎ। ফলে ধরা যাক ইলিশের সরষে আর কাঁচা তেলের ঝোল বা বাগদা চিংড়ির মালাইকারির মতন সার্বজনীন রান্নায় স্বাদের সূক্ষ্ম তফাতগুলো পরিবার থেকে পরিবারে রান্নায় বেশ স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়। এ যেন একই ঘরানার দুজন ভিন্ন ভিন্ন গায়কের একই রাগের গানের ফারাকের মত।

আমি ঘটি-বাঙালের রান্নার কেরামতির লড়াইয়ের মধ্যে যাবো না। তবে শুধু একটা কথাই বলবো যে, ঘটিদের মতে বাঙালরা ছাই রান্নাকে লঙ্কা ঠেসে মুখরোচক করার চেষ্টা করে আর বাঙালদের মতে ঘটিরা সব রান্নাতেই মিষ্টি দিয়ে অখাদ্য করে দেয়—দুটোই বেবাক ভুল।

তবে বাঙালি আর মাছ নিয়ে লেখায় ঘটি আর বাঙালদের কাজিয়া নিয়ে একটু না বললেও 'অলক্ষণ' হয়। তাই আমি আমিষ আর নিরামিষ শুক্তুনি নিয়ে এই দুই দলের মতভেদ সম্বন্ধে দু-চার কথা বলবো। সবাই জানেন যে, কলকেত্তিদের মাছের সুক্তুনি দু চক্ষের বিষ আর পদ্মাপারের লোকেদের মুখে তারই জয়গানের কথা। এই ব্যাপারে আমি ভূমধ্যসাগরের ধারের দক্ষিণ ফ্রানসের কোত-দ্য-জ্যুর আর নীস, এই দুই অঞ্চলের ব্যুইয়াবেস (Bouillabaise) বলে জগদ্বিখ্যাত নানারকম সামুদ্রিক মাছ কিছু ধরনের সেলফিস ইত্যাদি দিয়ে তৈরি যুগের কথা বলবো। ওয়েভারলি রুট বলে একজন মার্কিন লেখক তাঁর 'ক্লাসিক' 'দি ফুড ইন ফ্রানস' বলে বইয়ে লিখেছেন যে, ব্যুইয়াবেসেতে চিংড়ি মাছ দেওয়া উচিত কি উচিত নয় তা নিয়ে দুই বিভিন্ন মতের ধ্বজাধারীদের মধ্যে চিরকাল ধরে কুরুক্ষেত্র হয়ে আসছে। এদের একদল বলে যে যারা ব্যুইয়াবেসেতে চিংড়ি মাছ দেওয়ার মতন ভয়ঙ্কর কাণ্ড করতে পারে তারা কুয়োর জলে বিষ ঢালতেও পারে। অন্যপক্ষ বলে যারা এই স্যুপে চিংড়ি মাছ দেয় না তারা না পারে হেন কম্মো নেই। তারা নিজেদের ছেলেদেরও না খাইয়ে মারতে পারে। আমি অনেকবার ঘটি-বাঙালে আমিষ আর নিরামিষ সুক্তুনি নিয়ে তর্কাতর্কি লাঠালাঠি দেখেছি। সুখের বিষয় কোনবারই কাউকে হাসপাতালে যেতে হয়নি।

এইবারে এই সুক্তুনির জের টেনে একটা বিখ্যাত মাছ-খাওয়ার গল্প বলে আমি আমার লেখার জাল গুটোবার ব্যবস্থা করি।

কাল ১৮৯৭ (?)। স্বামী বিবেকানন্দ ক'দিন ধরে বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে একা আছেন, দেখবার লোকের মধ্যে খালি শ্রীরামকৃষ্ণ-গত-প্রাণা যোগীন মা। সেদিন সর্বগ্রাসী সূর্যগ্রহণ। ধার্মিকেরা দূর দূর থেকে গ্রহণ দেখে চান করে পুণ্যার্জন করার জন্যে সাতসকাল থেকে কাতারে কাতারে ভিড় করেছেন। স্বামীজীর সেদিকে কোন উৎসাহ নেই। তিনি তার আগের দিন তাঁর বাঙাল দেশের শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে তাঁকে রেঁধে খাওয়াতে বলেছেন। গ্রহণের দিন ভোর আটটায় শরৎচন্দ্র মাছ, তরকারি আর রাঁধবার অন্যান্য জিনিস নিয়ে হাজির। স্বামীজী তাঁর বাঙাল শিষ্যকে বললেন, 'তোদের দেশের মতন রান্না করতে হবে আর গ্রহণের পূর্বেই খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়া চাই।'

পশ্চিমবঙ্গে নতুন কনে যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ি যেত আর তাকে বরণ করা হত তখন সে বাঁ হাতে একটা জ্যান্ত ল্যাটা মাছ ধরে থাকত। বিয়ের তত্ত্বে সিঁদুর মাখানো ধান-দুব্বো দেওয়া জোড়া রুই একটি প্রধান জিনিস।

রান্না শুরু হল। স্বামীজী মাঝে মাঝে এসে ঠাট্টা করছিলেন: "দেখিস মাছের 'জুল' বাঙালদিশি ধরনে হয়।" ভাত, মুগের ডাল, কই মাছের ঝোল, মাছের টক, মাছের সুক্তুনি রান্না প্রায় শেষ। স্বামীজী চান করে নিজেই পাত পেতে বসে পড়লেন। এখনও রান্নার কিছু বাকি আছে বলাতে আবদেরে ছোট ছেলের মতন বললেন, 'যা হয়েছে নিয়ে আয়, আমি আর বসতে পাচ্ছিনে, ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।' অতএব তাঁকে তাড়াতাড়ি ভাত আর মাছের সুক্তুনি দেওয়া হল। তারপর যে মাছের সুক্তুনি নিয়ে কলকাতার লোকেরা খুব ঠাট্টা-তামাশা করত তা খেয়ে বললেন: 'এমন কখনও খাই নাই।' তারপর

বাঙালীর প্রিয় চিংড়ি মাছ : কালীঘাটের পটচিত্র

বললেন, 'কিন্তু মাছের 'জুলটা' এমন ঝাল হয়েছে, এমন আর কোনটাই হয় নাই।' তারপর মাছের টক খেয়ে বললেন: 'এটা ঠিক বর্ধমানী ধরনের হয়েছে।' এরপর দই সন্দেশ খেয়ে, হাতমুখ ধুয়ে, খাটে বসে, তামাক টানতে টানতে সেই বিখ্যাত উক্তি করলেন: 'যে ভাল রাঁধতে পারে না, সে ভাল সাধু হতে পারে না—মন শুদ্ধ না হলে ভাল সুস্বাদু রান্না হয় না।' এই বলার পর ঘন্টা বেজে ওঠাতে 'ওরে গেরণ লেগেছে—আমি ঘুমুই' বলে স্বামীজী শুয়ে পড়লেন।

'পেটুক' স্বামী বিবেকানন্দর কথাটি কত খাঁটি তা এই প্রবাদটি প্রমাণ করে:

কে রাঁধে গো?
কয়লা, কড়াই, খুন্তি?
না রাঁধে তোমার মনটি!

শেষ

মীন-কথাসরিৎসাগর

কিশলয় ঠাকুর

বারমুডা ট্রায়াংগলে প্রতি বসন্তে সাগর তোলপাড় করা এক দারুণ মদনোৎসব হয় মাছেদের। আমেরিকা আর ইয়োরোপ থেকে হাজার হাজার ইল মাছ দীর্ঘ পথ সাঁতরে আসে বারমুডা ট্রায়াংগলে। এখানে অতলান্তিক মহাসমুদ্রের উদ্দাম জলতরঙ্গের মধ্যেই হয় মীন-সমাজের মিলনবাসর। মৃত্যুবাসরও। পথশ্রান্ত উৎসবক্লান্ত মেয়ে-পুরুষ সবাই প্রায় মারা যায় ওখানেই।

মেয়েরা মারা যায় ডিম ছেড়ে। ডিম থেকে বেরিয়ে বাচ্চারা প্রথমেই দেখতে পায় চারদিকে ভাসছে তাদের মা-বাবাদের হাজার হাজার মৃতদেহ। তাই দিয়েই ক্ষিধে মেটায় কিছু দিন। একটু বড় হতে, যাকে বলে চোখ ফুটতেই চিনতে কষ্ট হয় না নিজেদের জাত, গোত্র এমনকি পিতৃভূমি পর্যন্ত! যে-যার পিতৃ-উপকূলের দিকে সার বেঁধে যাত্রা করে। মারকিন মাছ যায় আমেরিকায়, ইয়োরোপে যায় ইয়োরোপীয়রা।

জলের মতোই গহীন, রহস্যময় জলের জীবন। মেরিন বায়োলজিস্টদের জাহাজ কেবল এগিয়ে চলেছে বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের ঢেউয়ে।

ব্রহ্মার অকস্মাৎ রেতঃপাতে যে ভীষণ অগ্নি প্রজ্বলিত হয় তা নেবাতে বিষ্ণু তাঁর উদ্গারের সঙ্গে নিঃশ্বাসবায়ু ত্যাগ করেন। তাতে সৃষ্টি হল জল। আগুন গেল নিবে। জগতে জল সৃষ্টির এই কাহিনীটি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের।

বিজ্ঞান বলছে জলের সৃষ্টি হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেন মিশে। পুরাণ-বিজ্ঞানের সাযুজ্য লক্ষণীয়।

ঈশ্বরীয় বিবর্তনের ধারায় দশাবতারের প্রথমে পাই মীনকে, জলবাসী – মাছকে। বিজ্ঞানের বিবর্তনতত্ত্বেও পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম প্রকাশ জলাশ্রয়ী অ্যামিবায়। যার পরিণত রূপ মাছ তথা অন্যান্য জলচর এবং পরবর্তী উভচর, ভূচর—মানবসমাজ। গোটা বসুন্ধরারই আদি জননী জল। সে অহরহ কাছে টানে, তবু আমরা বিচ্ছিন্ন। তার কোলে এখনো যে আছে, সে তার প্রথম সন্তান মাছ।

আছে, কিন্তু আর কত কাল? বিশ্বজোড়া, সপ্তসাগর মন্থন করা যে মীন সংহার অভিযানে আমরা নেমেছি তাতে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো মীনহীন হয়ে যাবে সব। কেবল হাহাকার ছাড়া কিছুই থাকবে না নিঃস্ব, নিঃসন্তান সমুদ্রের।

এখনই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উপকূল অঞ্চলে আর মাছ মিলছে না। মাছের খোঁজে জাহাজ ছুটছে মাঝসাগরে। এবং সেখানে মাছ ধরার যে ব্যাপক জাল ছড়ানো হচ্ছে, যে সাংঘাতিক পদ্ধতিতে পাকড়াও করা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মাছকে, তা ভাবা যায় না। মৎস্য নিধন অভিযানে সর্বাধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

সে-প্রযুক্তিটা কী রকম? আগে চলছিল ট্রলার নিয়ে মাঝ-দরিয়ায় জাল ফেলা। এখন হচ্ছে বুলনেটিং। কয়েক নটিক্যাল মাইল বিস্তীর্ণ জাল ছড়িয়ে দু পাশে দুই জেলে জাহাজ তাকে টেনে চলে। প্রতিবারে টন টন মাছ তুলছে ফাঁসে ফেলে। তবু কিছু কি ফসকে যায় না! ঝাড়ে

তুতিকোরিনের সমুদ্রোপকূলে মাছ-ধরা ট্রলারের পরীক্ষামূলক অভিযান। জেলে ডিঙি আর খেপলা জাল ছাড়িয়ে আমরা খুব বেশিদূর এগোতে পেরেছি কি?
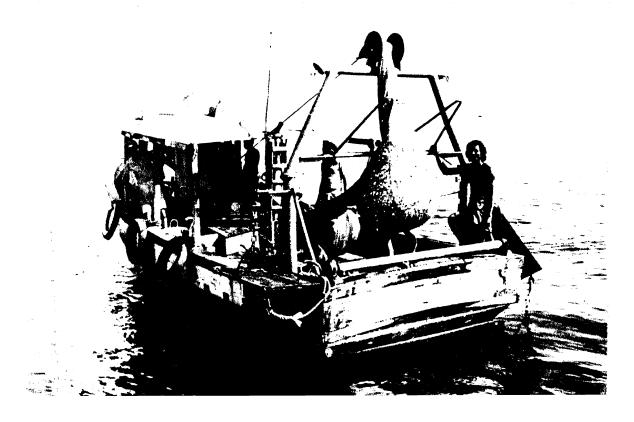
বংশে তোলার উপায় বার করা হল। এবং সেই নিবারণ পাড়ুইয়ের মতো সারাদিন জোয়ারি পেতে বাঁওড়ের ধারে বসে চুনো পুঁটি নিয়ে ঘরে ফেরাও এদের পোষাবে না। লাগানো হল 'ইকো সাউনডার'। গভীর জলের তলায় কোথায় মাছের ঝাঁক ঘাপটি মেরে আছে সে খবর বলে দেবে 'ইকো সাউনডার।' তক্ষুনি সেখানে ফেলো জাল, ছেঁকে তোল। কিন্তু জালে সবাই উঠে এলে তো বোঝা বাড়ে অনেক সময় আজেবাজে মাছে। এবার বসানো হল স্ক্যানার। সে শুধু মাছের খবর দেবে না, মাছের জাত গোত্র পরিমাণ সব দেবে জানিয়ে। তাই বুঝে জাল ফেলা, মাছ তোলা। এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তি জাহাজে টি- ভি স্ক্রিন। মাছ না ভাসলেও সাগর তলায় কোথায় কারা চলাফেরা করছে সব ছবি ভেসে উঠছে জেলে জাহাজের এই টি- ভি স্ক্রিনে। অতএব আর কথা নেই। জলদস্যুর মতো জেলেজাহাজগুলি ধাওয়া করে ফিরছে সাত-সমুদ্দুর তেরো নদী! হার্মাদদের মতো হানা দিচ্ছে মাছের রাজ্যে। নাড়ু বর্শেলের মতো 'মাছ না পেয়ে ছিপে কামড়' দিতে হয় না এদের। এরা 'মাছ' বললেই মাকাল ঠাকুর ধরা দেন। তাই আজ স্থলের সবাই নেমে পড়েছে জলে। জাপান, নরওয়ে, সুইডেন, হল্যান্ড, ডেনমারক সমুদ্রের মাছ তুলে সোনা বানাচ্ছে। মাছের টাকায় ধনাঢ্য ওইসব দেশ। এত বড় শিল্পোন্নত যে জাপান, তাদেরও মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ আজ এর ওপরে নির্ভরশীল। এবং মৎস্য শিকারে কারা নেমেছে জাপানে? মিৎসুবিসি, সুমিটামো, হিতাচির মতো বিশ্বজোড়া ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ঝাঁপিয়ে পড়েছে সাগরে। একা মিৎসুবিসিই গত বছর চুরাশি-পঁচাশি সালে পঁয়তাল্লিশ হাজার কোটি টাকার মাছের ব্যবসা করেছে। ছোট ছোট অজস্র সংস্থার কথা ধরছি না। মিৎসুবিসি হিতাচির মতো ছত্রিশটি আন্তর্জাতিক সংস্থা এখনই জাল ফেলে বসে আছে সমুদ্রে।

দূর-দরিয়ার কথা থাক। এই মুহূর্তে ভারতে কী হচ্ছে? অবশ্য একথা ঠিক এখনো দেশি জেলেডিঙি ক্ষেপজাল নিয়ে মাছ ধরতে যায় সাগরে। ভাগ্য তাদের সমর্পিত বরুণদেব বা বদর-এর হাতে। মাছ না মারতে পারলেও নিজেরা মরে। এই তো ওদের ডিঙি ভাসানোর মরসুম। সেপ্টেম্বর থেকে শুরু। মহাজনের কাছ থেকে ছ'মাসের জন্য চার-পাঁচ শ' টাকা আগাম নিয়ে সংসারে দেয়। ফেব্রুয়ারীতে ফেরা। মাঝে মাঝে শুধু তীরে এসে অপেক্ষমাণ মহাজনের হাতে মাছ তুলে দিয়ে যায়। সব দিন মাছ ধরা পড়ে না। ওরাও ফেরে না। এ দৃশ্য ডায়মণ্ডহারবারে গেলেই দেখতে পাবো।

কিন্তু গভীর জলে তখন অন্য রূপ। যান্ত্রিক নৌকা, ট্রলার, জেলে জাহাজে ছয়লাপ। সেখানে নামখানা-ঠাকুরান নদীর গেরস্থ জেলে যায়নি। সেখানে গেলে বিস্মিত হতে হবে দেখে ইউনিয়ন কারবাইড, ব্রিটানিয়া, ইনডিয়া টোবাকো, শ'ওয়েলস-এর মতো সব বিখ্যাত বৃহৎ ব্যাটারি বিস্কুট সিগারেট কোম্পানিগুলি মাছের জন্য চষে বেড়াচ্ছে সমুদ্রে। এদের প্রধান লোভ অবশ্য চিঙড়ির প্রতি। বিদেশের বাজার থেকে কোটি কোটি ডলার আনে এরা এই মাছ থেকে। তবে অন্য মাছও বাদ দেয় না। বিশেষ করে আন্দামানের কাছে নতুন এক রকম মাছ মিলছে নাম তুনা। দারুণ স্বাদ। বিদেশে এর নাম হয়েছে সামুদ্রিক চিকেন। এই তুনা ধরতে বাইরের জেলে জাহাজ পর্যন্ত বেআইনীভাবে ঢুকে পড়ছে আমাদের এলাকায়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বহু জেলেজাহাজ এখন নিজেদের উপকূল ছেড়ে হানা দিচ্ছে আমাদের উপকূলে। এখানে উল্লেখ্য আমাদের সাগর ওদের চাইতে সমৃদ্ধ। আমাদের স্যাণ্ড হেডকে মাছের খনি বলা চলে এখনও।

চিত্রটি অন্যান্য দেশের তুলনায় কিঞ্চিৎ আশাপ্রদ মনে হতে পারে এখনো। আসলে তা নয় মোটেই। ভারতের পশ্চিম উপকূল নির্মীন হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। তাই গুজরাট বম্বের ব্যবসায়ী জেলে জাহাজ নিয়ে আসছে এদিকে। এদেরও প্রধান লক্ষ্য চিংড়ি। এরা ডিম-পোনাসমেত চিংড়ি সাবাড় করে দিচ্ছে দেখে উদ্বিগ্ন ভারত সরকার সম্প্রতি বাধ্য হয়ে এখানে ট্রলার দিয়ে চিংড়ি ধরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। নির্দেশ অবশ্যই মানা হচ্ছে না। 'ফিন ফিস' ধরার নাম করে 'প্রন' ধরা হচ্ছে। তবে নির্দেশ অমান্য করলেই তো মাছের ফলন বাড়ছে না। এবং সমুদ্রবিজ্ঞানীরা সম্প্রতি যে তথ্য জানতে পেরেছেন তাতে এই পূর্ব উপকূল থেকেও মাছ বিদায় নেবে।

তথ্যটা হল, ভারতের উপকূল বিচলিত হচ্ছে। এর পশ্চিম উপকূল বছরে এক ইঞ্চি করে বসে যাচ্ছে; আর পূর্ব উপকূল উঁচু হয়ে উঠছে সমপরিমাণে। উপকূল উঁচু হলে মাছ থাকবে না। থাকতে পারে না। যে মাছ ডিম ছাড়তে উপকূলেই আসে তারা যখন পশ্চিমের অপেক্ষাকৃত অনুকূল পরিবেশেই বিরল হয়ে যাচ্ছে, তারা এখানে সুলভ হবে তেমন সম্ভাবনা নেই। আর গভীর সমুদ্রে তো সর্বদা মৎস্য শিকারী হার্মাদদের নৌবহর টহল দিয়ে চলেছে। এবং তারা আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে গভীরতম তলদেশ পর্যন্ত তল্লাশি চালিয়ে ছেঁকে তুলবে সব মাছ। অভয়ারণ্যের মতো ওদের জন্য অভয় সাগর নেই কোথাও। তা যদি না থাকে তাহলে আদি জননীর কোল থেকে একদা নিশ্চিহ্ন হবে তার প্রথম সন্তান। পৃথিবীর প্রথম প্রাণের প্রতীক।

ইলিশ এখনো রোমাঞ্চ আনে। গগনচুম্বী দাম, দুষ্প্রাপ্যতা সব কিছুর ঊর্ধ্বে এক গাঙ্গেয় আকর্ষণ। অপ্রতিরোধ্য

মীনকুল।

না, এত কথা বলা হচ্ছে তা মাছের শোকে বিড়ালের কান্না নয়। কারণ বিলক্ষণ জানা আছে, শোকার্ত বিড়ালকে সান্ত্বনা দিতে বক ছাড়া কেউ আসবে না। আমি সমুদ্র-সংহারের প্রসঙ্গ এজন্য তুলছি যে, ইদানীং খুব সন্তর্পণে সরকারী মহল থেকে নিজেদের ব্যর্থতা চাপা দেওয়ার জন্য একটি কথা উচ্চারিত হতে শোনা যাচ্ছে, মাছ-খেকোদের অভ্যাস বদলাতে হবে। 'সি-ফিস' হজম করা শিখতে হবে। রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী কিরণ্ময় নন্দর সঙ্গে কথা বলেছি। মাছের চাষ বাড়াতে সারা রাজ্য দৌড়ে বেড়াচ্ছেন তিনি। যে সব পুকুরে এজমালি মালিকানার ঝামেলায় মাছ চাষ হচ্ছে না সেগুলি অধিগ্রহণ করে যাতে মাছ ফলানো যায় তার জন্য আইন করেছেন। রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরও মিলেছে সে আইনে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের বহু টাকা এনে ঢেলেছেন ঝিলে, বিলে, বাঁওড়ে। তবু কেন মাছের ঘাটতি? তবু কেন আগুন দাম মাছের? তাঁরও সব হিসাব—অগ্রগতির ফিরিস্তি শেষে পরিষ্কার স্বীকারোক্তি, মাছের দাম কমানো সম্ভব নয়, রাজ্যে যতো জলাশয় জলকর রয়েছে তাতে যতো টাকাই

ছবি : তারাপদ ব্যানার্জি

জল আছে, জালও আছে, নেই মাছ

ঢালা যাক, মাছের ঘাটতি পূরণ অসম্ভব। জমির মতো জলদি জাতের উচ্চফলনশীল তেমন কোনো চাষ চালু করা যাবে না জলে। ক্রম সংকুচিত জলকর আর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার হিসাব দিয়ে মৎস্যমন্ত্রী বললেন, নদীতে তো আর মাছ ছাড়তে পারবো না! নদীর মাছও ধরে ধরে শেষ প্রায়। এখন একমাত্র ভবিষ্যৎ সমুদ্র।

বাধ্য হয়ে তাই এতক্ষণ মাছের স্বাদের বদলে সমুদ্র মন্থনে বিস্বাদ তুলতে হল। তাই বলে রত্নাকর সমুদ্র অচিরেই অমন রিক্ত হবে তা নয়। বৃহৎ শক্তিধরদের সমুদ্রগর্ভে পারমাণবিক পরীক্ষা বেশি ঘটলে অবশ্য অন্য কথা। সব শেষ হতে সময় লাগবে না।

সমুদ্র প্রসঙ্গ থাক। আমাদের ইনল্যাণ্ড ফিসারি বা অন্তর্দেশীয় মৎস্য চাষ চিত্রটি কি সত্যই কোন আশার আলো দেখাতে পারে না আমাদের? একটু বিচার করে দেখা যাক।

উনিশ শ' একাশির জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা পাঁচ কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ। এই জনসংখ্যার ভিত্তিতে কৃষি বিষয়ক জাতীয় কমিশনের যে সমীক্ষা হয় তাতে দেখানো আছে, পশ্চিমবঙ্গে মাছের বার্ষিক চাহিদা পাঁচ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার মেট্রিক টন। উনিশ শ' পঁচাশি-ছিয়াশি সালে এ-রাজ্যের জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছয় কোটি কুড়ি লক্ষ। চাহিদাও বেড়েছে নিশ্চয়। এবং সরকারী সর্বাধুনিক হিসাবটাও অন্যরকম দেখছি। মৎস্যমন্ত্রী বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে এখন মাছের চাহিদা বছরে সাড়ে আট লক্ষ মেট্রিক টন। আর মাছের যোগান হচ্ছে চার লক্ষ সত্তর হাজার মেট্রিক টন। অর্থাৎ বছরে তিন লক্ষ আশি হাজার মেট্রিক টনই ঘাটতি। পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমিতি অবশ্য মনে করেন চাহিদা সরকারী হিসাবেরও অনেক বেশি, পনেরো লক্ষ মেট্রিক টনের কম হবে না। ওদের হিসাবটা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা ভিত্তিক নাও হতে পারে। তবু গড়ে চাহিদার অর্ধেকটাই ঘাটতি ধরা চলে। এই চাহিদাটা ধরা হয়েছিল কোন হিসাবে? বছরে মাথা (মুখ) প্রতি সাত কেজি হিসাবে মাত্র! মিলছে বছরে সাড়ে তিন কেজি। অথচ ষষ্ঠ যোজনায় ত্রিশ কোটি টাকা ব্যয় করে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া কাজে লাগিয়েও এই অবস্থা!

এই হিসাবটা পড়তে গিয়ে কেউ যেন আবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, 'সেই গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ'-এর কথা না তোলেন। ওরকম কল্পনার মাছ কোনো কালেই ছিল না। ঘাটতি ছিল সব জায়গা থেকে চালান আসা ধনীর শহর কলকাতার মাছের বাজারেও। প্রখ্যাত মৎস্য বিশেষজ্ঞ ডঃ কে সি সাহার উনিশ শ' তের সালের এক রিপোর্টেও দেখি, সেই প্রথম মহাযুদ্ধের আগেও কলকাতার জনসংখ্যা যখন মাত্র নয় লক্ষ তখনও বার্ষিক মাছের যোগান ০·০৭ লক্ষ টন মাত্র। অর্থাৎ শতকরা বাহান্ন ভাগ ঘাটতি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও এই শোচনীয় অবস্থা থেকে মৎস্য চাষকে সমৃদ্ধ করতে নজর দেওয়া হয়নি দীর্ঘকাল। একদা মাত্র নব্বুই লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এই দফতরের। কর্মচারীদের মাইনে মিটিয়ে

কিছুই থাকত না। আজ অবশ্য ষষ্ঠ যোজনায় কেবল মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যই দেখছি ত্রিশকোটি টাকা খরচা। টাকাই জলে যাচ্ছে, অবশ্যই মাছের জন্য, কিন্তু মাছ মিলছে কই? অথচ সরকারী হিসাব মতে পশ্চিমবঙ্গে মোট জলাশয় বা জলকর আছে আট লক্ষ একর। নিবিড় মিশ্র চাষে এক একর জলকরে বছরে প্রায় কুড়ি কুইনটল মাছের উৎপাদন সম্ভব। তাহলে বর্তমানে যে জনসংখ্যা, তার প্রত্যেকে কম করেও বছরে পনের কেজির বেশি মাছ পেতে পারে। এটা মাথাপিছু চাহিদা সাড়ে সাত কেজির দ্বিগুণ। অর্থাৎ চাহিদা মিটিয়েও সমপরিমাণ মাছ এখন আমরা বাইরে চালান দিতে পারি। পারি মাছের আগুন দামেও জল ঢেলে দিতে, বাঙালির রসনা পরিতৃপ্ত করতে, তার বাঁচার প্রোটিন যোগাতে। কিন্তু পারিনি, পারছি না। কারণ কী?

উনিশ 'শ একষট্টি সালে সরকার নিযুক্ত শৈবাল গুপ্ত কমিটি যে রিপোর্ট দেয় তাতে বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে পুকুর দীঘি, ঝিল শ্রেণীর যে জলকর রয়েছে তার আয়তন পঁচাত্তর হাজার একর। এর মধ্যে মাছ চাষ হয় মাত্র কুড়ি শতাংশতে। বাকি আশি ভাগই পতিত জলা। ডঃ সত্যেশ চক্রবর্তীর নমুনা সমীক্ষায় ছিল, রাজ্যের এগারো লক্ষ পুকুরের মধ্যে বিরাশি শতাংশই পতিত জলাশয়। তাই এই হাল।

অবশ্য একষট্টি সালের অবস্থার থেকে এখন অনেক উন্নতি ঘটেছে মাছ চাষের। মোট পঁয়তাল্লিশ হাজার হেক্টর জলকরকে মাছ চাষের আওতায় আনা হয়েছে বলে দাবি করা হয়। তবে কাগজেপত্রে চাষ হলেও জলে যে তেমন চাষ হচ্ছে না তা সামগ্রিক উৎপাদন চিত্রেই পরিষ্কার। এখানে আরো একটা কথা—সব জলাশয়ের মালিকানা সরকারের নয়। এ রাজ্যের মোট যা জলকর আছে তার শতকরা মাত্র দশভাগ সরকারের কর্তৃত্বাধীন। আবার সরকারী মানেই মৎস্য দফতরের হাতে নয়। পূর্ত, সেচ প্রভৃতি দফতরগুলিই বেশির ভাগ জলকরের মালিক। নগণ্য এলাকা মৎস্য দফতরের। তবে পুকুর আর ঝিলের শতকরা দশ ভাগ সরকারের হলেও বাঁওড় শ্রেণীর জলাশয়ের শতকরা একশ ভাগই সরকারের। এখানেও অবশ্য মৎস্য বিভাগ গৌণ কর্তা। সরকারী বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব এমনকি ঝগড়া এবং পরস্পর বিরোধিতায় জলকরের সব জলই ঘোলা হচ্ছে। মার খাচ্ছে মাছ চাষ। জলকর বাড়ে না, কমে। আর জনসংখ্যা কমে না, বাড়ে। ফলে দূরত্বটাও বেশি হচ্ছে ক্রমাগত যোগান আর চাহিদায়।

রাজ্যে মাছ উৎপাদনের অপর যে এলাকা, এবং প্রধান এলাকা তা হল ভেড়ি। বিশেষ করে একদিকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, অপরদিকে আভ্যন্তর যোগানের ক্ষেত্রে এখনও এর তুলনা নেই। সব ঠিক মতো চললে, এখনো দীর্ঘকাল এই ভেড়িই আমাদের দিতে পারে ভরসা। কিন্তু সেখানে আজ ঘনায়মান সংকট। তাকানো যাক একবার সেই ভেড়ির দিকে।

এ এক আশ্চর্য অঞ্চল। ছড়ানো ছিটানো কিছু ভেড়ি এখানে ওখানে থাকলেও প্রধান ভেড়ি

সরকারী বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব এমনকি ঝগড়া এবং পরস্পর বিরোধিতায় জলকরের সব জলই ঘোলা হচ্ছে। মার খাচ্ছে মাছ চাষ। জলকর বাড়ে না, কমে। আর জনসংখ্যা কমে না, বাড়ে। ফলে দূরত্বটাও বেশি হচ্ছে ক্রমাগত যোগান আর চাহিদায়।

অঞ্চল কলকাতারই লাগোয়া চব্বিশ পরগনার সল্ট লেক থেকে শুরু করে করে ভাঙর, তিলজলা, কসবা, যাদবপুর এবং সোনারপুর—এই ছয়টি থানার প্রায় পঞ্চাশ হাজার একরের বিস্তীর্ণ জলাভূমি। সুন্দরবনের কোলে, এই জলাভূমিই ভেড়ি নামে পরিচিত মাছ চাষের সোনার খনি আজও।

এ এলাকাটির এক অতীত ইতিহাস রয়েছে। এই এলাকা দিয়ে একদা প্রবাহিত ছিল ভয়ংকরী বিদ্যাধরী নদী। একদিকে এর সঙ্গে ছিল গঙ্গার যোগ আর দক্ষিণে গিয়ে মিশেছে বঙ্গোপসাগরে। এই বিদ্যাধরীই গঙ্গার সমস্ত পলি নিয়ে বঙ্গোপসাগরে ফেলত। বিদ্যাধরীতে সব সময়ই পাল তুলে চলত বড় বড় মাল্লাই নৌবহর। একদা, সম্ভবত আঠারশ' সালে বিহারের রাজমহল অঞ্চলে হঠাৎ এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তিত হয় গঙ্গার গতিপথও। গঙ্গার খাত মিশে গেল পদ্মাখাতের সঙ্গে, জলধারা বইল সেদিকে। গঙ্গা থেকে আর বিদ্যাধরীতে আগের মত জল আসে না। ফলে সাগরের পলি জোয়ারে বিদ্যাধরীতে আসে কিন্তু ঢাল প্রবাহের অভাবে আর ফিরে যায় না সাগরে। চাষীরাও এ সময় কৃত্রিম বাঁধ দিয়ে দিতে থাকে জোয়ারের জল আটকাতে। সেই থেকে মৃত্যু শুরু হল নদীটির। সাগর সংযোগে এখানকার বাঁধের জল লবণাক্ত বলে নাম হল লবণ হ্রদ।

আঠারশ' পঁয়ষট্টিতে লর্ড বেন্টিংক লবণ হ্রদ এলাকার উন্নয়নের পরিকল্পনা করেছিলেন। কাজে হাত অবশ্য দেননি। আঠারশ' আশিতেও ফের সংস্কারের প্রশ্নটি ওঠে। তখনও কিছু হয়নি। উদ্যোগ একটা হয়েছিল আঠারশ' বিরাশিতেও। ইতিমধ্যে অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই কলকাতার ময়লা জল বিদ্যাধরীতে ফেলা শুরু হয়। আঠারশ' পঁচাত্তরেও শহর থেকে দৈনিক দেড় কোটি গ্যালন ময়লা জল ফেলা হয় বিদ্যাধরীতে। এদিকে সাগর থেকে যে জোয়ারের জল আসত, তার সঙ্গে থাকতো নানা রকম মাছের ডিম পোনা। বাঁধ দিয়ে সেই ডিম পোনার চাষ শুরু করে কিছু লোক। এগুলির মধ্যে পাবসে, ভেটকি, ভাঙর, এবং বাগদা চিংড়িই প্রধান। এক একটি বাঁধ বা জলাশয় দুশ থেকে হাজার একর পর্যন্ত ছিল। কিন্তু শহরের ময়লা জলের পরিমাণ বাড়তে থাকায় নোনাজলের মাছ চাষে অসুবিধা হল। তখন কিছু লোক ময়লা জলের মাছ চাষে নামে। সেটা এই শতকের তৃতীয় দশক থেকে। ধীরে ধীরে তিন রকম চরিত্রের ভেড়ি সৃষ্টি হয় এখানে। নোনা জলের, মিঠে জলের আর ময়লা জলের। এখন সেখানে লবণ হ্রদ নগরী। বিদ্যাধরীবক্ষের এই অংশটির তখন নাম ছিল দত্তের আবাদ। এখানেই ছিল সাড়ে চার হাজার বিঘের এক ময়লা জলের বিখ্যাত ভেড়ি। এটির পরিচালক বিদ্যাধরী স্পিল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি। এখানে মাছ চাষ, মাছের প্রদর্শনী, মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল। এখন তার চিহ্ন মাত্র নেই। তবু লবণ হ্রদ নগরীকে ঘিরেই এখনো আছে মজা বিদ্যাধরীর বিস্তীর্ণ ভেড়ি অঞ্চল। দু'পা হাঁটলেই অবাক হয়ে দেখা যাবে মাইলের পর মাইল শুধু জল আর জল। মাঝে মাঝে বাঁধের আলপথ। এখান থেকেই এখনো বছরে চার হাজার টন মাছ আসে শহরের বাজারে। মোট কথা, এরাই শহরবাসীর মাছের প্রধান যোগানদার। বছরে পঞ্চাশ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী বাগদা চিংড়িও এখানকার নোনা ভেড়ির ফসল। খেতে না পেলেও দেখতে বেশ লাগবে। তবে দেখতে এলে দিনের বেলায়, সন্ধ্যার আগেই ভেড়ি ছাড়তে হবে। কেন?

মশা, চোর, ডাকাত, সাপ এবং ভূত-পেত্নী সব কিছুর সমবেত উৎপাত শুরু হয় ভেড়ি-রাজ্যে। ভূত-পেত্নীর কথায় ধোঁয়া হতে পারে কারো কারো। কিন্তু এখানকার ময়লা জলের মিশেলে যে মিথেন গ্যাস ওঠে তা থেকে রাতের অন্ধকারে ধু-ধু জল প্রান্তে যখন আলেয়ার মতো আলোর ছোটাছুটি শুরু হয় তখন বেশির ভাগ মানুষেরই গা ছমছম করে। আর এর সঙ্গে অনুপান হিসাবে ভেড়ির লোকেরা বলবে কাঁচা মাছ খাওয়া পেত্নীর কথা, রাতে ওদের ভেড়িতে মাছ খেতে নামে। মুণ্ডু মটকে কোনো কোনো কর্মীকে ভেড়ির পাঁকে ঢুকিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। উনিশ শ' সাতান্ন সালে সেটলমেন্টের সময় ভেড়ির মালিকানা বাগাতে করতে দাঙ্গা, খুন-জখম যে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। মাঝে মাঝে লাল হয়ে গেছে ভেড়ির জল। খুন, দাঙ্গা তার পরেও হয়েছে। গুম হয়েছে বহু লোক। ভেড়ির মালিক একাধিক জন জেলে পচেন। ভেড়ির ফাঁকে ফাঁকে ছোটি ছোটি পল্লী—যেমন আইট, গঙ্গাপুর, কাটাতলা, বগাডোবা, কুলিপাড়ায় তাদের বসবাস—তিওর বাগদি, পোদ সব আছে। আছে। এদের মধ্যে অনেকেই সমাজবিরোধী। রাতে ডাকাতি করে। দিনে ঘুমোয়। এক একজনের আট-দশটা বউ। বউরা ভেড়িতে খাটে। এদের জীবনধারায় সামাজিক শৃঙ্খলা আনতে অনেক দিন লাগবে। পুলিশ এদের ঘাঁটায় না। ভেড়ি মালিকরা প্রয়োজনে এদের সাহায্য নেয়। একদা বিদ্যাধরীর নৌকোয় ডাকাতি করে অনেকে পয়সা করে, জমিদার হয়। এবং ভেড়িতে রাজত্ব করে। ভেড়ির তলায় মাঝে মাঝে নরকঙ্কাল মেলে আজো। কিছুদিন আগে একটি ভেড়ির তলায়, শিকলবাঁধা কয়েকটি নৌকোর বহর পাওয়া গিয়েছে। ওসব ডুবেছে হয় ঝড়ে, নয় ডাকাতের

মারে। এই পরিবেশেই ভেড়ি। ভেড়ি এলাকার দেবতা মাকাল ঠাকুর। মহাকাল থেকে শব্দটি এসেছে। সব ভেড়িতেই প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় মাকালপুজো হবে 'ছেপোল'তলায়। ছেপোল—শ্রীফল, মানে বেলগাছ। এখানে পুজো না দিলে ভূত-পেত্নী দৈত্যদানোর উৎপাতে ভেড়ি নাকি শুকিয়ে যাবে। মাঝে মাঝে হঠাৎ এখনো কারো ভেড়িতে জলোচ্ছ্বাস হয়। কেন ওরা জানে না। দশ-পনের বিশ হাত উঁচুতে জল ওঠে আবার পড়ে যায়। ওদের এসবে ভরসা মাকাল ঠাকুর। ভেড়িতে এসব মেনেই মাছের চাষ। এবং এই করেই এখান থেকে একদা বছরে প্রায় আট হাজার টন মাছের যোগান আসছিল। তবে সে সুদিন সরে যাচ্ছে। এখন ঠেকেছে চার হাজার টনে। ঠিক ঠেকেছে না। নেমেছে, নামছে এবং নামতে নামতে নিঃস্ব হবে কিনা কে জানে।

চব্বিশপরগনার এই ভেড়ি অঞ্চল গত কুড়ি বছরে অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। এক সল্টলেক সিটির জন্যই গিয়েছে তিন হাজার একর। পাটুলি বৈষ্ণবঘাটার উপনগরী গড়তে এক হাজার একর গ্রাস করা হয়েছে। বৈঁচি **পঞ্চান্নগ্রাম** বেসিন এলাকায় হারিয়েছে এক হাজার একর। তারপর জয়প্রকাশ নারায়ণ সরণী বা বাইপাস, বড় কয়েকটি হাউসিং কো-অপারেটিভ-এর মধ্যে মারা গেল আরও অনেক ভেড়ি এলাকা। এরকম ভেড়ি ভরাটের পর চলছে বেপরোয়া ভেড়ি দখল। উনিশ শ' উনসত্তরে দখল হয়ে গেছে এক হাজার একর ভেড়ি। এবং ভেড়ি অঞ্চলে আইন শৃঙ্খলার অবনতি, বাম আন্দোলনের সন্ত্রাস, যখন তখন দখলি নোটিশ— এসবের কারণে সত্তরসাল থেকে দু হাজার একর ভেড়ি পতিত হয়ে আছে। এইতো ক'মাস আগে দখল করার নামে বাঁধ কেটে ভাসিয়ে দেওয়া হল গোবেরিয়ার সাড়ে সাত হাজার বিঘা ভেড়ির মাছ। আতঙ্কে আশপাশেও কেউ আর টাকা ঢালছেন না ভেড়িতে মাছ চাষের জন্য। একদিকে আইন শৃঙ্খলার অবনতিতে যেমন দখল হয়ে যাচ্ছে ভেড়ির পর ভেড়ি, অপর দিকে, যতটুকু জল আছে তারও বেশির ভাগে চাষ হচ্ছে না মাছের। উনিশ শ' সাতাশ থেকে বত্রিশ সাল পর্যন্ত যে **সেটলমেন্ট** জরিপ হয় তাতে ভেড়ি এলাকার তেইশটি মৌজায় জলকর রেকর্ড হয়েছিল তেইশ হাজার একশ' একর। আর উনিশ শ' তিপ্পান-ছাপ্পানতে জরিপের সময় দেখা গেল ওই জলকর কমে দাঁড়িয়েছে চোদ্দ হাজার এক শ' বিরানব্বই একরে। অর্থাৎ ওই ক'বছরে জলকর হ্রাস পেয়েছে ৩৮·৬ শতাংশ। পক্ষান্তরে ওই সময়ে জমির বৃদ্ধি ঘটেছে পাঁচ হাজার চার শ' বত্রিশ একর থেকে তেরো হাজার ছয় শ' উননব্বই একর। জমি বৃদ্ধি ১৫১ শতাংশ। এখানেই থেমে থাকেনি। নিয়মিত দখল হামলায় কমেই যাচ্ছে জলকর। আর একাজে হঠাৎ করে একটা উত্তেজনা, উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে রাজ্য সরকারের নয়াভূমি সংস্কার আইন। যে কোন জলকরই দখল করা নাকি যাবে এখন চাষবাসের জন্য। বাঁধ কেটে দিলেই জল নামবে, অতএব

মৎস্য-অন্ত প্রাণ বাঙালীর মাছ আসে ভিন্ রাজ্য থেকে। পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট মাছ কোথায়। ছবি : কুশল গঙ্গোপাধ্যায়

চাষের জমি গণ্য হল। জল গেল জমি হল। এ এক বিচিত্র নীতি। ম্যাকিদোনিয়ার বীর আলেকজান্দার ভারতে এসে এক তাপস দার্শনিকের কাছ থেকে আনুগত্য আদায় করতে না পেরে কতোটা ভূভাগ তাঁর পদানত সে সব বোঝালেন। কাজ হল না দেখে ওঁর জাগতিক জ্ঞান সম্পর্কেই সন্দেহ হল গ্রিক বীরের। তিনি তখন প্রশ্ন করলেন—পৃথিবীতে জল বেশি না স্থল বেশি, জানা আছে?

হাঁ, স্থল।

আলেকজান্দারের হাসি পেল। পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। হিসাবটা তখনো নিখুত না হলেও জল যে বেশি তা স্বীকৃত। আর এ কী বলছে! তাপস বুঝতে পারলেন আগন্তুকের হাসির অর্থ—ব্যঙ্গ। তিনি গ্রিকবীরকে বললেন, ওই যে সরোবর রয়েছে, সেখানে গিয়ে নামুন।

সরকারী মদতের অভাবে পশ্চিমবঙ্গে ভেড়িগুলোর মরণাপন্ন অবস্থা মাছের আকালকে আরো প্রকট করেছে ছবি : শ্যামল সান্যাল

নিচে কী পাবেন?

মাটি।

সব জলের তলাতেই তাই।

হাসিটাই মাটি হল বীরের। মাটি সর্বত্র।

শ্রুতিটি এজন্যে এখানে টানা হল যে, এই ভুলটা আমরাও করছি। সুযোগ পেলেই কৃষিমন্ত্রক জলাজমিকে উদ্ধার করছে ফসলের জন্য, ভেড়ি নিচ্ছে সরকার ধানের জন্য। জল সরালেই তো জমি। তাহলে মাছের চাষটা হবে কোথায়! সব জলের তলাতেই তো ভূমি অতএব ভূমি আইনে সব দখল হবে। সেটাই হচ্ছে এখন। তাহলে জলের জীব থাকবে কোথায়? মৎস্য কৃষি মন্ত্রকের মধ্যে রাজ্যে কোন বোঝাপড়া নেই, বিবাদ-বিসংবাদ আছে। কেন্দ্রে কিন্তু দুটিই এক মন্ত্রকের অধীন। ভেবেচিন্তে ভারসাম্য বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব। কিন্তু রাজ্যে তার জো নেই। এখানে খাদ্য বলতে ধান-ডাল-সবজি বোঝায়। মাছ তা হলে কী? বিশেষ করে বঙ্গে? যেখানে চলতি প্রবাদ—মাছের কথায় গাছও হাঁ করে!

তবু মাছ উপেক্ষিত, মাছ উঠে যাচ্ছে। সরকারকেও দেখছি এতে মদত যোগাতে। রাজ্যের মাছ সংকট হচ্ছে এতে। সেদিকে না হয় নজর না-ই দেওয়া হল, কিন্তু যাদের জন্য ভেড়ি দখল করে ধানচাষে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে—তাদেরও কি এতে লাভ হচ্ছে কোনো? হিসাব বলছে, লোকসান হচ্ছে তাদেরও। নিবিড় মিশ্রচাষে এক একর জলকরে এক বছরে পনের থেকে কুড়ি কুইন্টল মাছ ফলানো যায়। এই পরিমাণ মাছের জন্য আনুমানিক খরচ পড়বে ছ' হাজার টাকা। আমি বর্তমান চড়া বাজার দর ধরছি না। সরকার নির্দিষ্ট দাম কুড়ি টাকা কুইন্টল ধরলেও মোট আসবে চব্বিশ হাজার টাকা এ থেকে। অর্থাৎ এক বছরে এক একর জলকর থেকে চাষী আয় করতে পারে সতের থেকে আঠার হাজার টাকা। এটা কাগজে হিসাব নয়। পশ্চিমবঙ্গের শত শত মৎস্যচাষী এই ফলই পাচ্ছে। মনে রাখতে হবে সুন্দরবনের এই এলাকার দুই-তৃতীয়াংশ বনভূমি। বাকি অংশ জঙ্গলকাটা আবাদ। এই আবাদের ছিয়ানব্বুই শতাংশ জমিই এক-ফসলি—হয় আমনের চাষ। আমনধানের উৎপাদন এখানে একরে কুড়ি মণ। বিশেষজ্ঞরা হিসাব করে দেখেছেন, সব খরচ বাদ দিয়ে এখানকার এক একর থেকে বার্ষিক সওয়া চারশ' টাকার বেশি আয় হতে পারে না। অথচ এখানকার এক একর ভেড়ি থেকে আসছে বছরে দু হাজার টাকা(খরচ বাদ দিয়ে)। তাছাড়া এখানকার কৃষি শ্রমিক বছরে পাচ্ছে আটশ সত্তর টাকা, আর ভেড়ি শ্রমিকের সেই আয় চার হাজার একশ টাকা, এবং ধানচাষের চাইতে মাছচাষে শ্রমসংস্থানও চারগুণ বেশি। তাহলে কী করবেন সরকার স্থির করুন। বরং সুন্দরবনে এক-ফসলি যে চার লক্ষ ত্রিশ হাজার একর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে নিচু জমি রয়েছে সেখানে মিশ্র মাছ চাষ করতে পারেন। কিছুকালের জন্য অন্তত আমাদের মাছের আকাল, মাছে আগুন থাকবে না। তাছাড়া এখন তো বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় জলদি-জাতের মাছও মিলছে। এখানে বাঙালি বিজ্ঞানী ডঃ হীরালাল চৌধুরীর নাম স্মরণীয়। উনিশ শ' ছাপ্পান্ন সালে তিনিই মাছের প্রণোদিত প্রজননের উদ্ভাবক। সারা দেশে তাই চালু হয় পরে। ফলন বেড়ে যায় মাছের। তারপর বিদেশ থেকে এসেছে আরও অনেক উন্নত পদ্ধতি, এসেছে অনেক নতুন প্রজাতিও। যেমন তেলাপিয়া, গ্রাসকারপ, সিলভার কারপ, সাইপ্রিনাস কারপ ইত্যাদি। চীনের এই সাইপ্রিনাসকে আমরা বলি আমেরিকান রুই। গ্রাস কারপ মানে ঘেসো-রুই—পুকুর থেকে নিজের দেহের সমপরিমাণ ঝাঁঝি খেয়ে বাঁচে এরা। এসেছে একধরনের উভলিঙ্গ পাঁকাল মাছ, যা প্রচুর বাচ্চা দেয়। দেয়, কিন্তু দিচ্ছে না। ঠিক মতো জল চায় সব মাছ। এক-এক প্রজাতি এক-এক জলস্তরে বিচরণ করে। যেমন একই জলাশয়ে রুই চলবে গভীরজলে, মৃগেল মাঝখানে, আর উপরে ভাসবে কাতলা। বিচিত্র মীন চরিত। এই যে সবার প্রিয় ইলিশ, সাগরের ঢেউ ভেঙে ভেঙে হাজার-হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এখানকার মিঠে জলে আসে ডিম পাড়তে। আমরা অবশ্য ডিমসহই খেয়ে ফেলি। ওদের বংশ বাড়বে কী করে! অথচ ইলিশ পাইনে বলে হা-হুতাশ সব বাঙালির। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। যেমন রবীন্দ্রনাথ নাকি ইলিশের চাইতে বেশি পছন্দ করতেন তপসে। হেতু? তাঁর মন্তব্য ইলিশটা বড্ড মেছো। তপস্বী শুদ্ধ।

তিনি অসাধারণ, আমাদের কথা সাধারণকে নিয়ে। তবে কবির একটি শব্দ বোধ হয় সকলেই গ্রহণ করতে পারি। 'ফিসারি' শব্দটিকে মৎস্য চাষ না বলে তিনি বলেছেন—মীনপোষ। কর্ষণ সম্পর্কিত চাষ কথাটা লাগসই নয় জলে। তাছাড়া প্রকল্পটি কেবল মৎস্য ভক্ষণ নয়, রক্ষণও হতে হবে। কেবল শোষণ নয়, পোষণও চাই; চাই মীনপোষ। তার জন্য চাই মাছের আবাস জলাভূমি; কিন্তু জলে নিরাপত্তা নেই এ-রাজ্যে। পাঁচ-ছ' কেজির একটি কাতলা হতে পাঁচ-ছ বছর পালন চাই। সে ভরসা কেউ করে না। তাই ডিম থেকে বাচ্চা বেরোতেই বাজারসই করা হয়। এবং সরকারী মৎস্য দফতরও মাছ নয় ডিম-পোনা উৎপাদনেই আত্মনিয়োগ করেছে। বড় মাছ আনি আমরা বাইরে থেকে টাকা ঢেলে। আর সারা ভারতের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ ডিমপোনা যুগিয়ে রেকর্ড করছি আমরা। এ নীতির আমূল পরিবর্তন হলে এখনো মাছে, সমৃদ্ধ ঘটানো সম্ভব, সম্ভব জলের নিরাপত্তায় দামের আগুন নেবানো। তাই চাই যথার্থ মীনপোষমন্ত্রক। এবং সর্বোপরি মীন বংশ নির্বংশ হওয়ার আগে এদের জন্যও অভয়ারণ্যের মতো চাই অভয় সায়র। ■

আপনজনের জন্যে
অমূল্য উপহার!
MOTI
LUXURY BATH SOAP
MOTI
মোতি গিফ্‌ট প্যাক
তিনটি বিভিন্ন সুরভিতে, বড়, গোল বিলাসময় সাবান!
গোলাপের সমৃদ্ধ রাজকীয় সুগন্ধ, খশের বিশুদ্ধ
প্রাকৃতিক সুবাস, আর স্যাণ্ডলের মৃদু মনোরম
চন্দন-সুরভি! এই তিন রঙ্গের সমন্বয়—
অপূর্ব সুন্দর মোতি গিফ্‌ট প্যাক!
দিয়ে যেমন আনন্দ, নিয়েও তেমনি!
MOTI
মোতি
বড়, গোল, বিলাসময় সাবান
টাটার তৈরী
CLARION/B/T/20/244 BEN

জীবনের রঙে মিলে-মিশে যায় যে স্বাদ একবার ..তা চিরদিন থাকে আপনার!

সুরুচিপূর্ণ জীবনযাত্রার কত নানান রঙ — সহজতা-ভরা সুরম্য বা চির-বসন্তেভরা জীবন — জীবনের যে কোনো রঙেই মিলে-মিশে এক হয়ে যায় লিপ্টন গ্রীন লেবেল চা। যাতে থাকে দার্জিলিঙের বিশুদ্ধ স্বাদগন্ধের বিরল সৌরভ। হিমালয়ের কোলঘেঁষা চা-বাগান থেকে আনা বর্ষার ধারা মেশানো, শীতল হাওয়ার ছোঁয়া লাগানো, ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ মেশানো, ঢেউ খেলানো চা-বাগানের বিশুদ্ধতা জড়ানো চা… যা দার্জিলিঙের বিশুদ্ধ স্বাদগন্ধে ভরা!

LIPTON
GREEN
LABEL
100% PURE DARJEELING
TEA

লিপ্টন গ্রীন লেবেল চা
দার্জিলিঙের বিরল স্বাদ… স্নিগ্ধ, সূক্ষ্ম, অনুপম।

LINTAS(C)/GL/4/2619 BG

মাছেরা গেল কোথায়?

শ্যামল সান্যাল

তারকাদের প্রিয় প্রসাধনী
এখন আরো আকর্ষণীয় হল

ইমামী ট্যাল্ক ও ইমামী ভ্যানিশিং ক্রীম। রেশম কোমল প্রাণ জোড়ানো ইমামী ট্যাল্ক পাউডার। মসৃণ, মনোরম ইমামী ভ্যানিশিং ক্রীম। ময়শ্চারাইজার যুক্ত এই ভ্যানিশিং ক্রীম ত্বকের লাবণ্য ফুটিয়ে তোলে। দুই-ই ফ্রেঞ্চ সুগন্ধে ভরা। এখন ছিমছাম নতুন প্যাকে আরো যেন ভালো লাগে। তারকাদের অতি প্রিয় ইমামী প্রসাধনী।

ইমামী

ট্যাল্ক পাউডার ও ভ্যানিশিং ক্রীম

এখন আগের চেয়ে আরো আকর্ষণীয় প্যাকে

বাজার আছে, পুকুর খাল বিল নদী জেলে আছে, ইচ্ছে আছে, কিন্তু সে নেই। থাকলেও তার নাগাল পাওয়া সাধারণের কর্ম নয়।

কথা হচ্ছে জলের ফসল মাছ নিয়ে। কোথায় গেল তারা? বাজারে যাবার সময়ে মাছের ছোট থলি সঙ্গে থাকে আবার ফিরেও আসে যেমন গিয়েছিল তেমনই খালি। বাজারে মাছ নেই; আর ষাট সত্তর টাকা কিলোর মাছ কিনতে গেলে কোমরের যে পরিমাণ শক্তি থাকা প্রয়োজন, বঙ্গসন্তানদের তা আদৌ নেই; অবশ্যই ব্যতিক্রম আছে। তাঁরা ডি এ, হাউস রেন্ট, বাস ভাড়ার হিসেব কষেন না। মাসের পনের দিন পার না হতেই চোখে সরষে, ধনে ধুঁতরো ফুল দেখতে হয় না সেই মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রমদের।

কিন্তু সেদিনকার অত মাছের ছড়াছড়ি কি গল্প কথা হয়ে গেল? বাজারে গিয়ে তো তোপসে, না চিতল কি নেওয়া যায় ভাবার সময় সুযোগ পাওয়া যেত। পারশে আর গুড়জাওলি পাশাপাশি সহাবস্থান করছে দেখে ভাবতে হত কাকে রেখে কাকে নিই? পাবদা, বোয়াল, বাচা যদি একই বাজারে একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তাহলে তো মহা বিপদের কথা। পাবদা কি বাচা সরষে দিয়ে যে খাওয়ার গন্ধ এখনও হাতে লেগে?

ওপাশ থেকে নিতাই ডাকছে, বাবু আসুন, বোয়াল, নিয়ে যাবে চিলে। বাবু মানে সবাইকেই লক্ষ্য করে ছোঁড়া এই ডাক। কোন বাবু কাবু হয়ে এগিয়ে আসবেন তা নিতাই জানে না। কিন্তু একথাটা সে নিশ্চিত ভাবেই জেনে গেছে বোয়াল মাছের কথাই যথেষ্ট। অফিসে যাবার টাইম একটু পিছিয়ে দিতেও বাবু থাবড়াবেন না।

কাজলি মাছের নামই শোনেননি? কোনওদিন দেখেননি, খাননি? শিয়ালদায় এক মাছ বিক্রেতা খদ্দেরটির মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ফেলল, বাবু কিছু মনে না করেন তো বলি এর কথা আপনার বাবা দাদুকে জিগাইবেন। কাজলি না খেলে আপনের মাছের কিছুই জানা নাই। এত ভালো টেস্ট কি কইব আপনেরে। তরুণ ক্রেতাটি ধরেই নিয়েছিল চল্লিশ টাকা কে জি র কাজলি মাছ আসলে তাকে গছাবার চেষ্টা। বাজে মাছ। তার থেকে চারা পোনা ভালো।

দোষ তরুণের নয়। কাজলির দেখাই পাওয়া যায় না। সে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। মুর্শিদাবাদের লালগোলা থেকে কলকাতায় আসার ধকলও পোয়ায় না। কাজেই এখনকার জেনারেশনের সঙ্গে তার আলাপই হয়নি তেমন। আর কাজলির বংশও বাড়ছে না, বরং ক্রমশ মুছে যাচ্ছে।

অথচ পূর্ববঙ্গের মানুষকে জিগ্যেস করলেই তাঁরা কাজলির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যেমন সুন্দর স্বাদ তেমনই উপকারি। প্রায়ই তো আগে জ্বর হত আমাদের। জ্বরের পরে বিস্বাদ মুখ। মা-ঠাকুমা কাজলির শুক্তো করে দিতেন। মুখ ছেড়ে যেত। তাঁরা এই সব বলার শেষে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অবধারিতভাবেই মন্তব্য করবেন, কোথায় গেল সে সব দিন।

বাজারে বাজারে মাথা কুটেও বাগদা চিংড়ির দেখা পাওয়া যাবে? গলদার কথা তো বাদই দেওয়া গেল। সাধারণ ছোট চিংড়িই কি ইদানীং দেখা যাচ্ছে তেমন? অথচ আপনার তো নারকেল দিয়ে চিংড়ি খাবার শখ হতেই পারে। চিংড়ির মেয়নেজ? চিংড়ি দিয়ে গরগরে মাখো মাখো ঝাল আর গরম ভাত? কি নেহাৎই চিংড়ি ভাজা? বাজারে তো মাছই নেই। আর যদি গলদা বিদেশে গিয়ে সাহেবদের পাতে উঠতে থাকে তাহলে কলকাতায় দেড়শো টাকা কিলো দাম তো হবেই। আপনার ক্ষমতা থাকে কিনবেন। চাঁই, আড়, শিলং বাচা, এমন কি শিঙ্গি কই মাগুর শোল, ফালুই এসব মাছও ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। বাজারে খোঁজ করলেই শোনা যাবে মাছ কই? যা আছে তার দাম তো বেশি হবেই।

মাছেরা সব গেল কোথায়? খাল-বিল, বর্ষায় জমা জল, মায় সরকারী দফতরগুলোকে তোলপাড় করেও তার খোঁজ পাওয়া দুষ্কর

অথচ আপনার ভেটকি খেতে ইচ্ছে হতেই পারে, ট্যাংরা মাছের ঝাল খেতে হঠাৎ বাসনা জাগলেই বা ঠেকায় কে? আইন, পুলিস, গিন্নি কেউই আপনার পথের কাঁটা নয়। যাদের চাইছেন তারাই হারিয়ে যাবার পথে। তাই বাজারে এদের অনুপস্থিতি প্রায় নিত্য। যদি বা এক আধদিন দেখা যায় তার দর শুনে আপনি সব বাসনা-কামনা বিসর্জন দিয়ে ব্যাক টু প্যাভেলিয়ান।

এতক্ষণ আমরা ইচ্ছে করেই বড় শোকাবহ সেই বিষয়টির প্রসঙ্গে আসি নি।

শোক দুঃখের কথা বলেই আস্তে আস্তে পর্দা ওঠানো আর কি। ইলিশ ভাজার সঙ্গে গরম ভাত। ভাতের চূড়ায় জয়ের নিশানা ওড়াবার আগে গোড়াতেই ইলিশ তেল। ইলিশের ঝাল? কাঁচা লঙ্কা চিরে চিরে দেওয়া, সরষের পাশ দিয়ে মাছের গা বেয়ে উঁকি মারছে? কাঁচা ইলিশের ঝাল? ইলিশ পাঁচশো গ্রাম, পাঁচফোড়ন, আদাবাটা এক চা চামচ; কাঁচালঙ্কা চারটে; হলুদ দু চামচ, ধনেপাতা যদি ইচ্ছে হয়, সরষের তেল তিন বড় চামচ; আটা এক মাঝারি চামচ, যদি ইচ্ছা হয়। দুপেয়ালা জল। নুন। উঃ ভাবা যায় না। দই ইলিশ, ভাপা ইলিশ, ইলিশের অম্বল, ইলিশের ডিমেরও কত রকমের পদ এখুনি খুঁজে পাওয়া যাবে।

সবই আছে। নেই শুধু ইলিশ। গঙ্গা তোলপাড়। জাল ফাঁকা। বাজারে ইলিশের গল্প আছে। মাছ কই? তবে যদি পদ্মার মাছ খেতে চান তাহলে সামান্য পাওয়া যাবে। মিলবে ওড়িশার কিছু ইলিশ। অবশ্যই চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা কিলো দরে। কিন্তু গঙ্গার ইলিশ, কোলাঘাটের সেই রাজপুত্র? ষাট সত্তর আশি যে কোনও দরেই উপে যাবে। যাচ্ছে, প্রত্যেকটি বাজারে।

ইলিশ না খেয়ে খেয়ে আমাদের অনেকেরই দুঃখ বোধটাই ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। প্রায় অভিমান আর রাগের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আমরা

ইলিশ না খাবার বহু যুক্তিও দাঁড় করিয়ে ফেলেছি। যেমন, ইলিশ খেলে পেট খারাপ হয়। এ মাছের কোনও ফুড ভ্যালু নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে বাঙালি ইলিশের শোকে পাথর হয়ে এসব কথা বলছে। পনের টাকা কেজি অঢেল গঙ্গার ইলিশ একবার বাজারে আসুক তো? পাড়ায় পাড়ায় শুরু হয়ে যাবে ইলিশ-উৎসব।

আমরা পনের টাকা কেজিতে ইলিশের কথা প্রচণ্ড সুখস্বপ্ন হিসেবেও হয়ত দেখি না আজ। কিন্তু যখন জীবনতারা হালদার লেখেন: "আস্তে আস্তে কলকাতা শহর পাল্টাচ্ছিল... দুপুরে বাসনঅলা, সন্ধ্যে বেলফুলের মালা, আণ্ডাঅলা তপসে মাছ টাকায় ষোলটা, গঙ্গার ইলিশ টাকায় তিনটে" তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারি, বড়জোর গেয়ে ফেলতে পারি, যে দিন ভেসে গেছে...। আর শ্রী হালদারের কথা টেনে নিয়ে বলতে পারা যায়, কলকাতা শহরই শুধু নয় তামাম পশ্চিমবঙ্গই বদলে গেছে, অতি দ্রুত। মাছে ভাতে বাঙালি এমন পরিচয় আগামীদিনে আর দেওয়া যাবে না। রান্নার বিষয়ে লিখতে গিয়ে প্রখ্যাত শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মাত্র কবছর আগে অবশ্য বলেছিলেন, "সকল বাঙালির মত আমিও মাছ-ভাত খেয়ে মানুষ... এশিয়ার সর্বত্র মাছ খাবার রীতি আছে কিন্তু মাছের জন্য এত দরদ আর কোথাও আছে কিনা আমি জানি না"।

ইলিশ গলদা বাগদা না হয় তেমন না পাওয়া গেল, কিন্তু পুঁটি, মৌরলা, ফলুই, চাবিলা, খলসে, চিতল, পাবদা, পারশে, গুরজাওলি, তোপসে পায়রা চাঁদা, পাঙ্গাশ, ট্যাংরা, কই—এরাই বা সব দল বেঁধে কোন নিরুদ্দেশের পথের পথিক হল? রুই ভেটকি কাতলা, মৃগেল, বাটা, সিলভারকার্প, তেলাপিয়া, আমেরিকান রুই এই রকম কিছু মাছ আজ বাজারে সাধারণভাবে দেখা যাচ্ছে। তাও পরিমাণে কম, দাম যথেষ্ট। অবশ্য তেলাপিয়া, সিলভারকার্প, আমেরিকান রুই ইত্যাদির দাম কাতলা, মৃগেল, রুই, বাটার তুলনায় কম। কারণ বাঙালি জনগণ এখনও সাবেকিপন্থী, নতুনদের চট করে চান্স দিতে চায় না।

ঘুরে ফিরে মোদ্দা কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে (ক) বাজারে মাছ নেই (খ) মাছের দাম চড়া (গ) বেশ কিছু জাতের মাছ প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে।

অর্থনীতির প্রাথমিক নিয়মেই যোগান কম থাকলে চাহিদা বাড়ে এবং চাহিদা বাড়ার ফলে দাম বাড়তে থাকে। প্রশ্ন উঠবে এ রাজ্যে মাছের চাহিদা আর সরবরাহের হিসেবটা কি? আমরা রাজ্যের মৎস্য বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী কিরণ্ময় নন্দ ছাড়াও মাছের ব্যবসায়ী, মৎস্যজীবী সমিতির সঙ্গে কথা বলে দেখেছি। কত চাহিদা, আর সরবরাহ কী পরিমাণ তার কোনও বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা হয়েছে বলে মনে হয় না। এ কথাটাও পরিষ্কার যে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ অনেক কম। কিরণ্ময়বাবুর হিসেব মত পশ্চিমবঙ্গে মাছের চাহিদা বছরে সাড়ে আট লক্ষ মেট্রিক টন। আর পাওয়া যায় চার লক্ষ সত্তর হাজার মেট্রিক টন। অর্থাৎ ঘাটতি হল বছরে তিনলক্ষ আশি হাজার মেট্রিক টন। সোজাসুজি দেখলে বলা যায় চাহিদার মাত্র

বিতর্কের মধ্যে খুব বেশি দূর না গিয়েও বলা চলে যে কৃষক শ্রমিক, মজদুরদের জন্য সরকারি আগ্রহ যতটা দেখা যায়, মৎস্যজীবীদের জন্য তার ছিটেফোঁটা রাখলে পরিস্থিতি অন্য রকম হতো।

অর্ধেক মাছ বাজারে আসছে। পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমিতির পক্ষ থেকে অবশ্য দাবি করা হয়েছে চাহিদার পরিমাণ বছরে পনের লাখ মেট্রিক টনের কাছাকাছি। যোগানের পরিমাণটা চারলক্ষ মেট্রিক টনের মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গ ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের বক্তব্য হল, ঘাটতির পরিমাণ দুই তৃতীয়াংশ মত।

স্বাভাবিকভাবেই ঘাটতির প্রতিক্রিয়া হল মূল্যবৃদ্ধি। দাম কতটা বেড়েছে? তিন থেকে চারশ শতাংশ মত। আমরা ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে প্রকাশিত তুলনামূলক মাছের দরের হিসেবটাতেই চোখ বোলাতে পারি।

প্রতি কিলো	২০-২-১৯৬১	২০-২-১৯৮৬
ভেটকি (মিষ্টিজল, কাটা)	৪·০০	৪৫·০০
ভেটকি (ঝিল)	৩·৫০	৩০·০০
ঐ (কাটা)	৬·৫০	৩২·০০
ভেটকি (নোনা জল)	৪·০০	৩৫·০০
কাৎলা	২·৮০	৩৫·০০
ঐ (কাটা)	৬·০০	৪৫·০০
রুই	২·৪০	৩৫·০০
ঐ (কাটা)	৩·০০	৪৫·০০
ইলিশ	২·৭৫	৪৫·০০
পমফ্রেট	৩·০০	২০·০০
কুচো চিংড়ি	১·০০	২০·০০

কলকাতা পুরসভার তৈরি করা এই হিসেবটাতে অনেক মাছের কথা নেই। তবু দর বাড়ার একটা ছবি একনজরে দেখলে আঁতকে উঠতে হয় না?

এই অবস্থাটা বাঙালি মেনেই নিয়েছে নিশ্চয়। না হলে বিধানসভায় গত এপ্রিলের একুশ তারিখে মৎস্যমন্ত্রী যখন বাজেট পেশ করেন বিরোধীপক্ষ কতটা বিপ্লব করলেন? অথচ এই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নথিপত্রেই দেখা যাবে উনিশ শ কুড়ি সালের পাঁচ মার্চ এ কে ফজলুল হক গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলছেন, বাজারে জিনিসপত্রের দাম ভীষণ বাড়ছে। সরকার জানান কিসের দর কতটা বেড়েছে? সরকারবাহাদুরের দেওয়া তুলনামূলক হিসেবে দেখা যাচ্ছে রুই মাছ প্রতি সেরের দাম উনিশ শ উনিশ সালে দাঁড়িয়েছে এগার আনায়। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে উনিশ শ দশ সালে ছিল আট আনা সের। একই সঙ্গে চাল ডাল তেল দুধের দাম বাড়ায় তৎকালীন সরকার উনিশ শ উনিশ সালের তেসরা জুলাই ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর প্রশ্নের জবাবে জানাচ্ছেন, প্রজাদের সুযোগ সুবিধার জন্য কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

উনিশ শ ছিয়াশি সালে চাল ডাল, তেলের হিসেব বাদ দিয়ে আমাদের আলোচ্য মাছের দিকেই লক্ষ্য স্থির রাখা যাক। যে কোনও বাজারেই প্রায় দেখা যাচ্ছে পুঁটি মৌরলাও কুড়ি বাইশ টাকা কিলো। চারা পোনা, ছোট বাটা পঁচিশ ত্রিশের কম আছে নাকি? বড় জাতের পোনা ত্রিশের ওপরেই সব সময়। মাছের এই হাউই দর সকলেরই প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা। তা সত্ত্বেও সরকারিভাবে এমন কিছু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি যাতে আমরা আহ্লাদিত হতে পারি। রাজ্য সরকারের নথির বক্তব্যে যদি আমোদিত হওয়া যায় তাই তুলে ধরা যাক সে কথা: "মাছ পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রিয় খাদ্য। এ রাজ্যে মাছের বার্ষিক চাহিদা ৫·৭ লক্ষ টন। সেক্ষেত্রে বার্ষিক উৎপাদন মাত্র ৩·৭ লক্ষ টন। ঘাটতি মেটানোর জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয় অন্য রাজ্য থেকে আমদানির ওপর। মাছের বিরাট চাহিদার তুলনায় উৎপাদন ও যোগান অপ্রতুল। সে জন্য উৎপাদনের উপায় সম্প্রসারণের দিকে আরও বেশি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

মৎস্যমন্ত্রী চলতি বছরে তাঁর বিভাগের জন্য এগার কোটি তিরানব্বই লাখ একষট্টি হাজার টাকার বাজেট পেশ করতে গিয়ে নানান পরিকল্পনার কথা বিধানসভায় উল্লেখ করে একেবারে শেষে বলেছেন, "আমি উনিশ শ পঁচাশি-ছিয়াশি সালের বাজেট ভাষণে জানিয়েছিলাম যে আমাদের আর্থিক এবং সাংগঠনিক শক্তি খুবই সীমিত। তবু মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়নে আমরা সচেষ্ট। মৎস্যচাষ সংক্রান্ত প্রকল্পগুলি রূপায়ণের মাধ্যমে শুধু মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে সাহায্য করাও আমাদের লক্ষ্য। সরকারি নথিতে মাছের ঘাটতি মেটানোর জন্য অন্য রাজ্যগুলি থেকে আমদানীর কথা জানিয়ে মৎস্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে সমর্থন করা হয়েছে কিনা সেটা বিচারের ভার আর আমাদের হাতে রাখছি না।

বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে সাহায্য করার কথাতেও সংশয় দেখা দিতে চায় যখন মৎস্যজীবীরা ক্ষোভের সঙ্গে জানান যে, এ রাজ্যের প্রায় সত্তর লক্ষ মৎস্যজীবী নিত্য অনাহার, চরম দারিদ্র্য ও পেশাগত বেকারত্বের

অভিশাপে মৃত্যুপথ যাত্রী। এই বিবর্ণ ছবি দেখে যদি অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' মনে পড়ে? ভেসে ওঠে সেই বর্ণনা "এক কাঁধে কাঁধ-ভোলা অন্য কাঁধে ঠেলা-জাল লইয়া তারা দলে দলে হন্যে হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কোথায় ডোবা কোথায় পুষ্করিণী তারই সন্ধানে। গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া কোথাও ডোবা দেখিতে পাইলে শ্যেনদৃষ্টিতে তাকায়। দেহ হাড্ডিসার, চোখ বসিয়া গিয়াছে। সেই গর্তে ডোবা চোখ দুইটি হইতে জিঘাংসার দৃষ্টি ঠিকরাইয়া বাহির হয়। জালের সামনাটা জলে ডুবাইয়া ঠেলা মারিয়া সামনের দিকে এক দৌড়। দুই চারিটা মৌরলা উঠে আর উঠে একপাল ব্যাঙ। ব্যাঙগুলি লাফাইয়া পড়িয়া যায়। মাছগুলি থাকে। সেগুলি বেচিয়া কয়েক আনা পাইলে তাতে ঘরে চাউল আসে, না পাইলে আসে না"।

রাজ্যসরকার অবশ্য সত্তর লাখ মৎস্যজীবীর কথা মানতে নারাজ। কারণ তাঁদের হিসেব মত এই সংখ্যা পনের লক্ষের মত। আর বিশ্বব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় সরকারি ও রাজ্যসরকারের আর্থিক সাহায্যপুষ্ট নানান পরিকল্পনায় মৎস্যজীবীদের উন্নতির বিশাল কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি তাঁরা শুনিয়েছেন। বিতর্কের ভিতরে খুব বেশি দূর না গিয়েও বলা চলে যে কৃষক শ্রমিক, মজুরদের জন্য সরকারি আগ্রহ যতটা দেখা যায়, মৎস্যজীবীদের জন্য তার ছিটেফোঁটা সরিয়ে রাখলেও আজ পরিস্থিতি অন্যরকম হতে পারত।

ইলিশ না খেয়ে খেয়ে আমাদের অনেকেরই দুঃখবোধটাই ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। প্রায় অভিমান আর রাগের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আমরা ইলিশ না খাবার বহু যুক্তিও দাঁড় করিয়ে ফেলেছি।

ইদানীং সে কাজ শুরু হয়েছে মাত্র। মৎস্যজীবীদের দুর্ঘটনা জনিত বীমা চালু হল তো অনেক টালবাহানার পর, হালে।

মৎস্যজীবীদের কথা রেখে এবারে মাছের যোগান ও উৎপাদন কমের প্রশ্নে যাওয়া যাক। যোগান কমে যাবার অন্যতম কারণ হল ভারতভাগ। পশ্চিমবঙ্গে মাছের প্রধান যোগানদার ছিল পূর্ববঙ্গ। অজস্র খাল বিল নদনদীতে ভর্তি পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশের মাছের উৎপাদনের একটা বড় অংশ পশ্চিমবঙ্গে আসত। সেই সরবরাহ বন্ধ। পশ্চিমবঙ্গেও পুকুর খাল বিলে নদীতে যথেষ্ট মাছ হত। কিন্তু জনসংখ্যার চাপ বাড়তে থাকায় জলাজমি সব অপরিকল্পিতভাবে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। নদী, ভেড়িতে বেড়েছে দূষণ। ভেড়িতে মাছ চাষ প্রায় বন্ধ। কৃষিজমির মত চাষযোগ্য জলা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিমালিকানায়। ভেড়ির মালিকরা রাজ্যসরকারের সঙ্গে মামলা করে বহু জায়গায় সেগুলি নিজেদের হাতে রেখে দিয়েছেন, কিন্তু মাছের উৎপাদনও বাড়াতে পারেননি। বৈজ্ঞানিক আর আধুনিক উপায়ে মাছ চাষের দিকে তাঁরা তেমন আগ্রহ দেখাননি। একটা হিসেবের কথা ধরলে এ রাজ্যে মোট চাষযোগ্য জলার পরিমাণ প্রায় দু লাখ হেক্টর। সরকারি হিসেব অনুসারে এখন মাত্র পঞ্চান্ন হাজার হেক্টরে তাঁরা মাছ চাষের

পনের টাকা কেজিতে ইলিশের কথা আজ কারো উদার সুখস্বপ্নেও আসে না। ইলিশের দিকে বাড়ানো হাতের উপর দামের চাবুক পড়লে তা আপনিই গুটিয়ে আসে ছবি : তারাপদ ব্যানার্জি

ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। এবং এই কাজ হয়েছে বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সাহায্যে! পূর্ব কলকাতার ভেড়িগুলি শহরের জন্য প্রয়োজনীয় মাছের একটা বড় অংশ দিত। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এবং মস্তানদের দাপটে সেগুলি থেকে উৎপাদন কমে প্রায় শূন্যে দাঁড়িয়েছে।

জলাজমি ভরাট করে বাড়িঘর কলকারখানা তৈরি ক্রমশই বাড়ছে। তাছাড়া অজস্র খাল বিল পুকুর সংস্কারের অভাবে হেজে মজে যাচ্ছে। কে সংস্কার করবে খাল বিল? কেন, সেচবিভাগ? মৎস্য বিভাগ আর সেচ বিভাগের কাজে কোনও সমন্বয় নেই। তেমনই ভূমি ও ভূমি সদ্ব্যবহার বিভাগের সঙ্গে বোঝাপড়ার অভাবে জমেছে প্রচুর জটিল সমস্যা। আবার মৎস্যজীবীদের সমবায়ের বিষয়টার সঙ্গে যুক্ত সমবায় বিভাগ। সেখানেও

চিংড়ি : মাছের বাজারের আরেকটি টক আঙুরফল

জটিলতা কিছু কম নয়। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি যা দাঁড়ায় তার ফল মাছের উৎপাদন মার খাওয়া।

পুকুর জলা ভেড়ি ছাড়াও এ রাজ্যে সমুদ্র, নদী থেকেও মাছ ওঠে। মেদিনীপুর আর চব্বিশ পরগণার প্রায় একশো কুড়ি কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্র উপকূলে মাছ ধরার পরিমাণ কমছে। অন্যদিকে যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায় সেই অল্প পরিমাণের মাছও বাজারে ঠিকমত আসে না।

একই অবস্থা চব্বিশ পরগণাতেও। সরকারি সূত্রে যদিও জানানো হয়েছে মৎস্যবন্দর, যন্ত্রচালিত নৌকা, উন্নত ধরনের জাল, বরফকল, হিমঘর গুদাম ইত্যাদির ব্যবস্থা করে এই সমস্যার হাত থেকে মুক্তির রাস্তা বার করা হচ্ছে। অবশ্য সরকারি ভাষ্যে পুলকিত হবার কোনও কারণ নেই। কতদূর কি কাজ হবে আর তার ফলে বাজারে প্রার্থিত বস্তুটির যোগান ক'মণ বাড়বে, তা না দেখা ইস্তক চুপচাপ থাকাই বোধহয় ভালো।

নদীর কথায় গঙ্গা প্রসঙ্গ এসেই যায়। আর গঙ্গার সঙ্গে ওঠে ইলিশের প্রশ্ন। গঙ্গার জলে নানারকম দূষণ ছাড়াও মোহানায় চড়া পড়ে যাবার ফলে ইলিশ নোনা জল থেকে মিষ্ট জলে ডিম ছাড়তে আসছে না। আর তারা যদি নাই আসে তাহলে ধরা পড়বে কি করে? গঙ্গায় অজস্র রকমের রাসায়নিক পদার্থ ফেলা কবে বন্ধ হবে, গঙ্গার সংস্কার আদৌ সম্ভব কি না, এইসব কূটবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত যতদিন না হচ্ছে ততদিনে ইলিশের আশা না করাই ভালো। কিন্তু বাংলাদেশের ইলিশ চোরাই পথে না এসে যদি সরকারি ব্যবস্থায় আনা যায় তাহলে কিছু উপকার হতে পারে? আবার ঝাড়গ্রাম ওড়িশা সীমান্তে সুবর্ণরেখা নদীতে যদি আধুনিক ব্যবস্থায় মাছ ধরা যায়, গঙ্গায় যদি লোহার খাঁচা দিয়ে ইলিশ পাকড়াও করা হয়—ইত্যাদি পরিকল্পনা নিয়ে রাজ্যের ফিশারিজ ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মাথা ঘামাচ্ছেন। বেশ কিছু বড় বড় সংস্থাও চিংড়ি ছাড়াও অন্যান্য মাছের রপ্তানী ব্যবসায়ে নেমেছে। বিস্ময়কর হলেও এটা ঘটনা যে রাজ্য সরকারি একটি কর্পোরেশনও চিংড়ি মাছ রপ্তানির জন্য বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বাজারে নামছে। গুঁড়ো মাছ রপ্তানির পরিকল্পনাও তাঁদের আছে।

ভারতের সব থেকে বড় পাইকারি মাছের বাজারটি হাওড়ায়। প্রায় সবকটি রাজ্য থেকে ট্রেন আর লরিতে মাছ এখানে আসে। পাইকাররা বিক্রি করেন। শিয়ালদার মাছের বাজার হাওড়ার পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম। দুই বাজারের প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে দেখা গেছে, হাওড়ায় একশ দেড়শ, শিয়ালদায় পনের কুড়ি মেট্রিক টন মাছের বিক্রিবাটা হয় রোজ। হাওড়ার বাজারে বেশিরভাগটাই আসে অন্য রাজ্য থেকে। শিয়ালদায় বাইরের চালানি মাছের সঙ্গে আসে চব্বিশ পরগণা সমেত নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, মালদহের সরবরাহ। হাওড়ায় প্রধানত বড় বড় মাছের দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু শিয়ালদায় ছোট এবং বিভিন্ন জাতগোত্রের আমদানি বেশি। দুটি বাজারে বছরে মোটামুটি দেড়শ কোটি টাকার কাছাকাছি কেনাবেচা হয়। এই টাকার বেশি অংশই যায় অন্ধ্র, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, ওড়িশায়। কিছুদিন আগেও হাওড়া থেকেই আসাম, শিলিগুড়ি, শিলং আসানসোল, বর্ধমান, রাণীগঞ্জ, ধানবাদে মাছ যেত। কিন্তু এখন প্রায় সব জায়গাতেই বড় বড় পাইকারি বাজার হয়ে গেছে। তাছাড়া ট্রেন লরি যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা অনেক বেড়ে যাবার ফলেও মাছ অন্য রাজ্য থেকে সরাসরি ঐ সমস্ত বাজারে চলে যাচ্ছে। বড় বড় এই পাইকারদের স্থির বিশ্বাস, চাহিদা আর যোগানের বিস্তর এই ফারাক ঘোচার নয়।

এই প্রসঙ্গে একটা তথ্য হল বাইরের রাজ্যগুলি যে মাছ আমাদের সরবরাহ করে তার প্রায় সব চারাই যায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে। এই রাজ্যই দেশের পঁচাত্তর শতাংশ চারা পোনা উৎপাদন করে। তারপরে চারা পোনা চলে যায় প্রচুর সস্তায় অন্যান্য রাজ্যে। সেই চারা বড় মাছ করে তারা আমাদেরই বেচে দশ-বিশগুণ বেশি দামে। মাছ চাষের যথেষ্ট ব্যবস্থা না থাকায় পশ্চিমবঙ্গের এই হাল।

শেষে সব থেকে বড় প্রশ্নটির মুখোমুখি হওয়া যাক—মাছের সমস্যা কি মিটবে?

পাইকারি বড় ব্যবসায়ী— কোনও সম্ভাবনাই দেখছি না।

পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমিতি—উৎপাদন, বিপণন ব্যবস্থা এবং সামন্ততান্ত্রিক আমলানির্ভর নীতি না বদলালে সমস্যা মিটতে পারে না।

বিমান মিত্র, চেয়ারম্যান, ফিসারিজ ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন—আগামী পাঁচ সাত বছরের ভেতরে মাছের ঘাটতি মেটার সম্ভাবনা দেখছি না।

মৎস্যমন্ত্রী, কিরণ্ময় নন্দ—আমি তো আলাদিনের মত ম্যাজিক জানি না যে হিং টিং ছট বললেই মাছ চলে আসবে।…

যে সব সূত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

১। আমার ছেলেবেলা—জীবনতারা হালদার, আনন্দবাজার পত্রিকা রবিবাসরীয় (১·৯·৮৫)

২। দি ক্যালক্যাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট ২২·২· ১৯৮৬ সংখ্যা

৩। মৎস্যমন্ত্রীর বাজেট ভাষণের মুদ্রিত কপি, ২১·৪·৮৬

৪। বামফ্রন্ট সরকারের সপ্তমবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত পুস্তিকা—পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার।

৫। বেঙ্গল লেজিসলেচার (১৮৬২-১৯২০) সত্যব্রত দত্ত

৬। রন্ধনশিল্প—বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়, এক্ষণ পত্রিকা ১৩৮৭ শারদীয় সংখ্যা

পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ প্রসঙ্গে

সমরজিৎ কর

মানুষ বড় কঠিন প্রাণী। হেন কাজ নেই, যা সে করতে পারে না। যদি তাকে বাগে রাখতে চাও, যদি চাও সব সময় সে তোমার আজ্ঞাবহ হয়ে থাকুক, সে ক্ষেত্রে একটিই পথ: তাকে সংশয় এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে ডুবিয়ে রাখ। তা হলেই দেখবে, তার শিরদাঁড়াটি দুমড়ে গেছে। তখন যা কিছু সে করবে, সবই তোমার স্বার্থে। বাধ্য হয়েই করবে, প্রতিবাদের ঝক্কি না নিয়ে। এক সময় ঔপনিবেশিকদের কাছে শাসন কর্তৃত্ব বজায় রাখার এটাই ছিল মূল নীতি।

সময়ের সঙ্গে অনেক কিছুই পাল্টায়। বেশির ভাগ উপনিবেশ এখন বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত, মুক্ত, তবে রাজনৈতিক দিক থেকে। যে মুক্তি মানুষকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার পথ সুগম করে—দারিদ্র থেকে মুক্তি, রোগ থেকে মুক্তি, অন্ধসংস্কার থেকে মুক্তি—এখন তা আরো জটিল আরো দুর্গম। আর এতে ইন্ধন যোগাচ্ছে আধুনিক সামরিক উপকরণ। অসচ্ছল দেশগুলির এমন সামর্থ্য নেই যে, সে ধরনের অস্ত্র তারা তৈরি করবে। ফলে আসরে নেমেছে বৃহৎশক্তিবর্গ। বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক রেষারেষি জিইয়ে রেখে যুদ্ধের পথ করছে প্রশস্ত। সেই সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে চালাও অস্ত্রশস্ত্র এবং সমর উপকরণের ব্যবসা। লক্ষ্য একটিই: দরিদ্র দেশগুলির উন্নয়ন ব্যাহত হোক, সব সময় তাদের উপর নির্ভর করুক। এই ফাঁকে এদের প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী হয়ে বৃহৎশক্তিধর দেশগুলি নিজেদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমৃদ্ধি বাড়িয়ে তুলুক। বলা বাহুল্য, পরমাণু বোমার ব্যাপারে বৃহৎশক্তিগুলির সংরক্ষণশীল মনোভাবের এটাই কারণ। এর জন্যেই তাদের টানাপোড়েনের যেন শেষ নেই।

পরমাণু বোমার ব্যাপক এবং বহুমুখী ধ্বংসলীলার কথা চিন্তা করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে রচিত হয়েছে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি। ১৯৭০ সালে এই চুক্তিটি বলবৎ হয়। চুক্তিতে যে সব দেশ স্বাক্ষর করে, তারা ঠিক করেছিল চুক্তি অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর অন্তর তাদের প্রতিনিধিরা সমবেত হয়ে পারমাণবিক অস্ত্র বিষয়ক সমস্যাবলী পর্যালোচনা করবেন। সেই মত ১৯৭৫ সালে বসেছিল প্রথম বৈঠক, জেনিভায়। দ্বিতীয় বৈঠক ১৯৮০ সালে। সেটিও জেনিভায়। ১৯৮৫ সালে জেনিভায় তৃতীয় বৈঠক হয়ে গেল। কিন্তু পারমাণবিক শক্তিহীন দেশগুলির গরিষ্ঠ অংশ যা ভেবেছিল, তিনটি সম্মেলনে তাই ঘটেছে। পারমাণবিক শক্তির ব্যাপারে যে দুটি দেশ বৃহত্তম—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন—তারা এখনো পর্যন্ত এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেয়নি, যাতে মনে হতে পারে পারমাণবিক যুদ্ধ বন্ধ করার ব্যাপারে সত্যিই তারা আগ্রহী। সোভিয়েত দেশকে ধন্যবাদ। সম্প্রতি তারা অবশ্য বলেছে, এক বছরের জন্যে তারা পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা বন্ধ রাখবে, যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তাই করে। কিন্তু দেখেশুনে [illegible] এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ কম। যার অর্থ, পারমাণবিক যুদ্ধ ঠেকিয়ে রাখার ব্যাপারটা এখনো দূর অস্ত।

বস্তুত, পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল দুটি। এক। যে সব দেশে কোনরকম পারমাণবিক শক্তি বিষয়ক উদ্যোগের চল হয়নি, সে সব দেশে যাতে পরমাণু বোমা তৈরি না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখা। দুই। যে সব দেশ পারমাণবিক দিক থেকে শক্তিধর, অর্থাৎ যারা ইতিমধ্যেই পরমাণু বোমা তৈরির ব্যাপারে কাজ করছে, এই চুক্তিতে ঠিক হয়, ভবিষ্যতে তারা পরমাণু বোমা তৈরি থেকে বিরত হবে। এবং এ ব্যাপারে নতুন কোন উদ্ভাবনার কথাও ভাবা চলবে না। এক্ষেত্রে আরো বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন বোমা তৈরির কথাই বলা হয়। পরে এই চুক্তির সঙ্গে যুক্ত হয় ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি (IAEA) বা আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা, ১৯৬৩ সালের আংশিক-পরিমাণ পরীক্ষারোধ বিষয়ক চুক্তি, পারমাণবিক জ্বালানি এবং সাজসরঞ্জাম সরবরাহকারী সংস্থাগুলি এবং ১৯৬৭ সালে রচিত তলাতেলোলকো চুক্তি। শেষোক্ত এই চুক্তিতে ঠিক হয়, পুরো লাতিন আমেরিকা পারমাণবিক অস্ত্র থেকে বিমুক্ত থাকবে।

১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যাতে মানব কল্যাণে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে সমর্থ হয়, সেই উদ্দেশ্যটি সামনে রেখেই রচিত হয় এই সংস্থাটির কার্যক্রম। পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলি তাদের কার্যক্রমে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসে একটি শর্তে—প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ, পারমাণবিক জ্বালানি এবং সাজসরঞ্জাম দিয়ে তারা সাহায্য করবে ঠিকই, তবে এই সঙ্গে সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলিকে প্রতিশ্রুতিও দিতে হবে যে এই সাহায্য তারা কখনোই পরমাণু বোমা তৈরিতে কাজে লাগাতে পারবে না। ওই সময় মাত্র তিনটি দেশই কেবলমাত্র পারমাণবিক প্রযুক্তির ব্যাপারে সমর্থ ছিল—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত দেশ এবং ইউনাইটেড কিংডম। পরে ১৯৬০ সালে প্রথম পরীক্ষামূলক পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় ফ্রান্স। ১৯৬৪ সালে চীন। ১৯৭৪ এ ভারত। ভারত অবশ্য 'বোমা' শব্দটি ব্যবহার করেনি। যে বস্তুটির বিস্ফোরণ ঘটান হয়, ভারতীয় বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন মানবকল্যাণমূলক পারমাণবিক উপকরণ বা "peaceful nuclear device"। নাম যাই হোক না কেন, এতে যে পারমাণবিক বোমার প্রযুক্তিই কাজে লাগান হয় তাতে কোন দ্বিমত নেই। বলা বাহুল্য, এই ছয়টি দেশই কিন্তু আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার সদস্য। অবশিষ্ট ১০৬টি সদস্যের কেউ এ পর্যন্ত পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়নি।

আংশিক পারমাণবিক পরীক্ষা রোধ বিষয়ক চুক্তির মূল কথা ছিল, আবহাওয়ামণ্ডল, সমুদ্রগর্ভ এবং মহাকাশে সবরকম পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা নিষিদ্ধ থাকবে। এই চুক্তিতে ভূগর্ভে পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা অবশ্য সমর্থিত হয়। তবে এ কাজ করতে গিয়ে পরিবেশে যাতে তেজস্ক্রিয় জঞ্জাল না ছড়ায় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। চুক্তিতে এ কথাও বলা হয়েছিল, যারা তখন এ ধরনের পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিল, তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করবে যাতে এই পরীক্ষার কাজটি ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা যায় এবং অবশেষে বন্ধ করা যায় পারমাণবিক যুদ্ধের সমস্ত রকম উদ্যোগ। গোড়ায় চুক্তিটিতে প্রথম তিনটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইউনাইটেড কিংডাম স্বাক্ষরও করেছিল। বর্তমানে এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১২। দুটি দেশ স্বাক্ষর করা থেকে বিরত থেকে গেছে—ফ্রান্স এবং চীন। মজার ব্যাপার হল, চুক্তিটি গোড়ায় স্বাক্ষর করল যে তিনটি দেশ, তাদের মধ্যে বৃহত্তম যারা, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নই চাতুর্যের আশ্রয় নিল গোড়া থেকেই। এর আগে তারা আবহাওয়ামণ্ডলে পরীক্ষা চালাত, সে কাজ বন্ধ করল। পরিবর্তে ব্যাপকভাবে শুরু করল ভূগর্ভে বিস্ফোরণজনিত পরীক্ষার কাজ। তাতে ক্রমেই ব্যবহৃত হতে লাগল [illegible] আরো বড় বোমা। আগে যেখানে বিস্ফোরণ ঘটান হত কিলোটন ক্ষমতার বোমার, এবার পরীক্ষামূলক বোমাগুলির বিস্ফোরণ ক্ষমতা দাঁড়াল মেগাটনে। এক নয়, একাধিক মেগাটন। এর ফলে আতঙ্কিত হয়ে উঠল পৃথিবীর মানুষ। যুদ্ধ নেই, অথচ পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটান হচ্ছে একের পর এক। বিস্ফোরণ ভূগর্ভে ঘটালেও তার ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া যে আটকে রাখা যায় না, সেটা বুঝে উঠতে কারোরই অসুবিধে হল না। বিস্ফোরণের সময় উৎপন্ন হয় নানারকম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ—তামা ৬৪, রুথেনিয়াম ১০৩, টেকনেসিয়াম ৯৯, টেলুরিয়াম ১২৭, রুবিডিয়াম ১০৬, টাংস্টেন ১৮৫, ল্যান্থানিয়াম ১৪০, ফসফরাস ৩২, বেরিয়াম ১৪০, আইওডিন ১৩১, কোবল্ট ৫৮, সেরিয়াম ১৪১, ম্যাঙ্গানিজ ৫৪, জারকোনিয়াম ৯৫, কার্বন ১৪, স্ট্রনসিয়াম ৯০ প্রভৃতি। এ ছাড়াও উৎপন্ন হয় তেজস্ক্রিয় গ্যাসীয় আইসোটোপ—ক্রিপটন, র‍্যাডন প্রভৃতি। এদের মধ্যে কোন কোনও আইসোটোপের অর্ধজীবন অনেক বেশি। কোন কোন আইসোটোপ জলে দ্রবীভূত হয়ে ভূগর্ভস্থ জলের ধারার সঙ্গে মিশে দূরাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বিষাক্ত সেই জল ভূস্তরের উপরে উঠে এসে প্রাণী এবং উদ্ভিদের ক্ষতিসাধন করতে পারে। ভূস্তরের ছিদ্রপথ দিয়ে বেরিয়ে এসে বিপজ্জনক গ্যাসীয় আইসোটোপ ছড়ায় বিস্তৃত আবহাওয়ামণ্ডলেও। অর্থাৎ অবস্থাটা দাঁড়াল এই: যুদ্ধ নেই, তবু তার প্রস্তুতির জন্যেই তেজস্ক্রিয়তায় কলুষিত হতে লাগল পৃথিবীর পরিবেশ। দেখা দিল ব্যাপক স্বাস্থ্য সমস্যা। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। বোমা ফেললে মানুষ মরে, সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়। কিন্তু যুদ্ধ নেই, তবুও ক্ষয়ক্ষতি। বিপর্যস্ত মানুষ, বিপর্যস্ত জলচর এবং স্থলচর প্রাণী, বিপর্যস্ত উদ্ভিদ জগৎ। এমন নজির মানব ইতিহাসে আর কখনো

দেখা যায় নি।

আগেই বলেছি, তলাতেলোলকো চুক্তিতে ঠিক হয়েছে, লাতিন আমেরিকার কোন দেশ ওই অঞ্চলে পরমাণু বোমা তৈরি, পরমাণু বোমা নিয়ে পরীক্ষা এবং তার ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে। কিউবা এবং গায়ানা ছাড়া লাতিন আমেরিকার মোট ২৩টি দেশ এতে স্বাক্ষর করেছে। একমাত্র আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এবং চিলিতে অবশ্য এই চুক্তি এখনো পর্যন্ত বলবৎ হয়নি। সুখের কথা, ওই অঞ্চলের যে পাঁচটি দেশ পারমাণবিক দিক থেকে শক্তিধর তারা সবাই এতে স্বাক্ষরও করেছে এবং চুক্তিটিকে মর্যাদা দেবে বলে অঙ্গীকারও করেছে।

কিন্তু গোল বেঁধেছে, পারমাণবিক সরবরাহকারী গোষ্ঠীদের নিয়ে। এই গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে মোট পনেরটি দেশ। চুক্তি অনুযায়ী এদের দায়িত্ব কোন দেশ তাদের সরবরাহ পারমাণবিক জ্বালানি, সাজসরঞ্জাম এবং প্রযুক্তি যাতে অস্ত্র তৈরির ব্যাপারে কাজে লাগাতে না পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখা। ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫ সালে এর জন্যে তারা একটি আঁটসাঁট বিধিও রচনা করেছে। ১৯৭৭ সালে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার সহায়তায় ৬৬টি সরবরাহ এবং আমদানিকারীর একটি দল বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করে। সরবরাহের ব্যবস্থাবলী কি ভাবে চালালে আমদানিকারী দেশ শুধুমাত্র মানবকল্যাণেই পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারে সমর্থ হয়, বোমা তৈরিতে নয়, সেটা খতিয়ে দেখে তারা। তাদের রিপোর্ট ১৯৮০ সালে যখন প্রকাশিত হল, দেখা গেল এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে কোন কিছু করার ক্ষমতাই তারা রাখে না। বোমা তৈরি এবং শুধু মাত্র মানবকল্যাণেই পারমাণবিক প্রযুক্তির ব্যবস্থাদির মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। যারা শক্তি উৎপাদন করছে, ইচ্ছে করলে তারা পরমাণু বোমাও তৈরি করতে পারে। করবে কি করবে না, সেটা পুরোপুরি নির্ভর করছে পারমাণবিক দিক থেকে সক্ষম দেশের নিজস্ব ইচ্ছের উপর। সরবরাহকারী গোষ্ঠীগুলির এ ব্যাপারে কোন কিছুই করার নেই।

প্রশ্ন দাঁড়াল পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে। চুক্তিতে স্বাক্ষর করার সময়, যারা পারমাণবিক শক্তিধর এবং যারা তা নয়, সবাই চেয়েছিল পারমাণবিক অস্ত্রের সম্প্রসারণ বন্ধ হোক। এ ক্ষেত্রে যে সব দেশের এখনো পর্যন্ত পারমাণবিক প্রকল্প চালু করার মত অবস্থা হয়নি তাদের দাবী ছিল খুবই স্পষ্ট: পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলি অস্ত্র তৈরির সম্প্রসারণ বন্ধ করুক, শক্তিশালী বোমা তৈরী থেকে বিরত থাকুক, আমরাও বোমা তৈরি থেকে বিরত থাকব। অতএব চাপ পড়ল পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলির উপর। সঙ্গে একটা সমঝোতায় তাদের বলা হল, চুক্তির ৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী আপনারা মিলেমিশে অন্যান্য দেশের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসুন। বন্ধ করুন পারমাণবিক অস্ত্রের সম্প্রসারণ।

খাতায় কলমে সবই হল। ১৯৭০ সালে বলবৎ হল পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি। বর্তমানে এই চুক্তির মধ্যে রয়েছে মোট ১২৮টি দেশ। চীন এবং ফ্রান্স এখনো পর্যন্ত এতে স্বাক্ষর করেনি। স্বাক্ষর করেনি আরো ৪০টি দেশ। যাদের মধ্যে কোন কোন দেশ ইচ্ছে করলে এখনই পরমাণু বোমা বানাতে তৈরি করতে পারে, অথবা অদূর ভবিষ্যতে তৈরি করার মত ক্ষমতা রাখে। এই দেশগুলির মধ্যে রয়েছে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ভারত, ইজ্রায়েল, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং স্পেন। কোন কোন দেশ চুক্তিটি এড়িয়ে চলছে, জাতীয় নিরাপত্তার খাতিরে। কোন কোন দেশের বক্তব্য, যারা পারমাণবিক শক্তিধর এবং যারা সে ক্ষমতা এখনো অর্জন করেনি, এই চুক্তিটি এই উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে রচনা করেছে বিরাট বৈষম্য। শেষোক্ত এই গোষ্ঠীর অন্যতম ভারত। এর ফলে যে সমস্ত দেশ এখনো পর্যন্ত এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি অথচ করার মনোভাব প্রকাশ করেছিল তাদের অনেকেই পিছিয়ে যাচ্ছে। চুক্তিতে বড় রকমের একটি ফাঁকও থেকে গেছে। বলা হয়েছে, পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি বন্ধ করুন। অথবা সীমিত করুন। তার অর্থ, বোমা তৈরির মালমশলা কেউ মজুত করতে পারবে না, এমন কোন কথা নেই। ফলে, কোন কোন দেশ এখনো পর্যন্ত বোমা হয়ত তৈরি করেনি, তবে তারা ইতিমধ্যে মানবকল্যাণে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে উদ্যোগী হয়েছে অথবা উৎপাদন শুরুও করেছে। অনেকেই জানেন, পারমাণবিক চুল্লি উপজাত সামগ্রী হিসেবে তৈরি হয় প্লুটোনিয়াম এবং বোমা তৈরির মানের মত ইউরেনিয়াম। এ সব বস্তুর সাহায্যে এখনো পর্যন্ত অবশ্য তারা পরমাণু বোমা তৈরি করে পরীক্ষার কাজে হাত দেয়নি। কিন্তু প্রতিদিন যে পরিমাণ পারমাণবিক বারুদ তারা মজুত করে চলেছে, প্রয়োজনে তা দিয়ে তারা যে বোমা তৈরি করবে না, তার গ্যারান্টি কোথায়? বৃহৎশক্তিবর্গ যতক্ষণ না সংযত হচ্ছে, তেমন কোন গ্যারান্টির কথা ভাবাও কি যায়? তাদের নেতিবাচক ভূমিকা গোটা পৃথিবীকেই ঠেলে দিচ্ছে পারমাণবিক যুদ্ধের দিকে।

১৯৭৭ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত দেশ এবং ইউনাইটেড কিংডাম পরমাণু বোমার পরীক্ষা সীমিত অথবা নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারে বহুবার আলোচনা করেছে। ফল হয়নি। ১৯৮০ সালের নির্বাচনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক পরীক্ষার ব্যাপারে শিথিল হয়ে উঠল। বলা হল, "নীতিগতভাবে অস্ত্র সম্প্রসারণ সীমিত করায় আমাদের সমর্থন থাকলেও, পরমাণু বোমা নিয়ে পরীক্ষার কাজ আমরা চালিয়ে যাবো। পারমাণবিক অস্ত্রজনিত ভীতি এবং ভারসাম্য বজায় রাখতে গেলে এটা করা দরকার।" ১৯৮৩ সালে মার্কিন অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ এবং নিরস্ত্রীকরণ সংস্থা (U. S. Arms Control and Disarmament Agency) ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলল, "নতুন নতুন অস্ত্রের উদ্ভাবনা, আধুনিকীকরণ, অস্ত্রসম্ভারকে নির্ভরযোগ্যতার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ এবং পারমাণবিক অস্ত্রের ফলাফল সম্পর্কিত গবেষণার জন্যে পরমাণু বোমার পরীক্ষা অবশ্যই প্রয়োজন।" ব্যাপারটা দাঁড়াল শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মত। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত দেশ এবং ইউনাইটেড কিংডাম জোটবদ্ধভাবে নিজেদের স্বার্থে কাজ করে চলছে, যেমন, ঠিক তেমনি নিরপেক্ষ এবং নির্জোট দেশগুলির পারমাণবিক চাহিদা নিয়ন্ত্রণে পদে পদে বাধাও সৃষ্টি করছে তারা।

১৯৭৫ সালে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির প্রথম সম্মেলনে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল তৃতীয় বিশ্বের ৭৭টি দেশ। যাদের নাম দেওয়া হয় ৭৭-এর গোষ্ঠী বা গ্রুপ অফ 77 (এই গোষ্ঠীর বর্তমান সদস্য সংখ্যা অবশ্য ১০০-রও বেশি, তবে নামটা একই থেকে গেছে)। তারা বলল, "চুক্তির সমস্ত বিধিই আমরা মেনে চলেছি, অথচ পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলির এ ব্যাপারে তেমন কোন মাথাব্যথাই নেই।" তারা নানারকম দাবী তুলল—ভূগর্ভে পরমাণু বোমার পরীক্ষা বন্ধ করতে হবে, অস্ত্রাগারগুলি পরমাণু বোমা থেকে ভারমুক্ত করতে হবে, পরমাণু বোমার ব্যবহার এবং সে ব্যাপারে কোন ভীতি প্রদর্শন করা চলবে না। এ ছাড়া, যে সব দেশ পারমাণবিক উদ্যোগ গড়ে তুলতে পারেনি, তারা যাতে মানব কল্যাণে সে ধরনের উদ্যোগে সমর্থ হয় সে ব্যাপারে শক্তিধর দেশগুলিকে তাদের সাহায্য করতে হবে। যে সব দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত দেশের সঙ্গে জোটবদ্ধ, তারা কিছুটা সহানুভূতি পেল। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক লাভের দরুন কোন কোন দেশ তাদের কাছ থেকে দাক্ষিণ্যের মত কিছুটা সাহায্যও পেতে লাগল। কিন্তু, পাল্লা ঝুঁকে রইল শক্তিধর দেশগুলিরই দিকে।

১৯৮০ সালে বসল দ্বিতীয় সম্মেলন। ফলম্ নাস্তি। ১৯৮৫ সালে তৃতীয় সম্মেলন। এবারেও একই ফল। বরং সম্ভাব্য পারমাণবিক যুদ্ধ ছাড়িয়ে গুরুত্ব পেয়েছে প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের আর এক পটভূমি—নক্ষত্র যুদ্ধ বা স্টার ওয়ার। একই সঙ্গে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা চলছে মার্কিন এবং সোভিয়েতদের মধ্যে। শুধু একটি ব্যাপারে তাদের মিল। যারা পারমাণবিক শক্তিধর নয়, উভয় পক্ষই তাদের এ ব্যাপারে সাহায্যের হাত গুটিয়ে রেখেছে।

ফল হয়েছে এই, বৃহৎ শক্তিবর্গের অস্ত্র প্রতিযোগিতার দরুন দরিদ্র দেশগুলিতে এখন বিরাজ করছে অন্তহীন নৈরাশ্য। আতঙ্ক। এই বুঝি যুদ্ধ হল, এ কথা ভেবে সঙ্গতি অনুযায়ী সবাই ভরিয়ে তুলছে তাদের অস্ত্রাগার। আর তা করতে গিয়ে মাথা বিকোতে হচ্ছে ধনী দেশগুলির কাছে। দরিদ্র দরিদ্রই থেকে যাচ্ছে, তাদের উন্নতিতে ঘটছে বাধা। পারমাণবিক আতঙ্কে ভুগছে পৃথিবীর তাবৎ মানুষ। ব্যর্থ পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি। যুদ্ধের নামে বিস্ফোরণ না ঘটালেও নিছক গবেষণার নামে বৃহৎ দুটি শক্তি যেভাবে নিয়মিত পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে, তাতে করে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর পরিবেশ প্রাণঘাতী তেজস্ক্রিয়তায় যাবে ছেয়ে। তার মর্মান্তিক পরিণতির কথা ভাবলে ভয়ে শিউরে উঠতে হয়।

চিঠির দর্পণে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

এখনকার লোকে ভুলেই গেছে একটা সময় দক্ষিণ কিংবা বালিগঞ্জ বা লেক রোড বলতে লোকে কী বুঝত। উত্তর থেকে ছেলেছোকরার দল আসত হাঁ করে ডানা-কাটা পরী দেখতে। রাস্তায় এত মেয়ে কলকাতায় আর কোথাও হাঁটত না। আর কী গেছো মেয়ে রে বাবা! সাইকেল চালায়। থলি নিয়ে বাজারে যায়। বড়দিনে ইস্কুলের ফেট্-এ জ্যোতিষী সেজে গম্ভীর মুখে ছেলেদের হাত দেখে। লেকে ব'সে সিগারেটে টান দিতেও তাদের বাধে না। সেকেলে লেখকরা তখন রগরগে গল্প লিখত লেক রোড নিয়ে।

১৪

ঠিকানা বদল

একই বাড়িতে আমরা থেকে গিয়েছি। তাই বলে একই ঠিকানায় নয়।

আগে এ বাড়িতে যেসব চিঠি আসত, তাতে ঠিকানার জায়গায় লেখা থাকত—পি ১০৪ লেক রোড।

এখন প্লট নম্বর উঠে গিয়ে হয়ে গেছে ৫-বি ডাঃ শরৎ ব্যানার্জী রোড। পুবের রাস্তায় ছিল ব্যানার্জীদের বরফ-কল।

এ জায়গাটায় অবশ্য আমার পায়ের ধুলো পড়তে শুরু করেছে অবশ্য তারও আগে থেকে। গোটা এ-তল্লাটটাই ছিল লেকের লাগোয়া। ছিল ঝোপঝাড় আর তালগাছ।

ডোবাপুকুর আর ধোপার পাট ছিল পরাশর রোড আর জনক রোডের শেষ প্রান্তে।

লেকে যাওয়ার একটাই রাস্তা ছিল; মুদিয়ালি হয়ে। লোকে মর্নিং ওয়াক করতে যেত রেল লাইনে।

সাদার্ন এভিনিউ তখনও হয়নি।

আমি সেইকালের লোক।

বন কেটে বসত

এখন যেখানে থাকি, আগে সেটা ছিল বন-হাসিল-করা আমাদের খেলার মাঠ। কালবোশেখিতে ধুপ-ধাপ তাল পড়ত।

কাঁথি কিংবা দিল্লী থেকে লেখা সমর সেনের চিঠিগুলো খুঁজে পেলে হয়ত আমাদের সেই সাবেক ঠিকানাটা পাওয়া যেত। কবে সেসব পোকামাকড় আর ইঁদুরের পেটে চলে গেছে।

এখনকার লোকে ভুলেই গেছে একটা সময়ে দক্ষিণ কলকাতা কিংবা বালিগঞ্জ বা লেক রোড বলতে লোকে কী বুঝত।

উত্তর থেকে ছেলেমেয়ে ছেলেছোকরার দল আসত হাঁ করে ডানা-কাটা পরী দেখতে। রাস্তায় এত মেয়ে কলকাতার আর কোথাও হাঁটত না। আর কী গেছো মেয়ে রে বাবা। সাইকেল চালায়। থলি নিয়ে বাজারে যায়। বড়দিনে ইস্কুলের ফেট্-এ জ্যোতিষী সেজে গম্ভীরমুখে ছেলেদের হাত দেখে। লেকে ব'সে সিগারেটে টান দিতেও তাদের বাধে না।

সেকেলে লেখকেরা তখন রগরগে গল্প লিখত লেক রোড নিয়ে। সেক্স লেখা নাকি শুধু প্রাপ্তবয়স্কেরাই পড়ত।

বাড়ির পর বাড়িতে তখন টু-লেট ঝুলত। এখন সেসব স্বপ্নকথা।

তখন আমরা থাকি একতলা-দোতলার সাতটা ঘরে। প্রকাণ্ড ছাদ। পঁচাত্তর টাকা ভাড়া; তাও কি, ট্রাম-রাস্তার ওপর।

ভাবুন একবার, লেকের ধারের জমির দাম তখন তিনশো টাকা কাঠা।

কসবার বাজারে পাঁঠার মাংসের সের ছ-আনা। তখন কচ্ছপ কেউ খেত না।

মনোহর পুকুর রোড হয়ে এসে লেক-ভিউ রোড ধরে তখন ছড়ি হাতে মর্নিং ওয়াকে যান শরৎচন্দ্র। রাস্তার লোকে ভ্রুক্ষেপও করত না। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমরা দেখতাম।

মহানির্বাণ মঠে সন্ধ্যেবেলায় হরিসংকীর্তনের ঠেলায় লেখাপড়া আমাদের মাথায় উঠত।

বড় থেকে ছোট

আমাদের বড় যৌথ পরিবার যখন বড় রাস্তা ছেড়ে আজকের এই সরু নতুন ঠিকানায় গলিতে উঠে আসে— তখন ঠাসা ঘরে আমাদের এক কাতে শুতে হত।

বাবার বুকে শেল বিঁধিয়ে কাকারা যখন আলাদা আলাদা বাসায় যার যার নিজের নিজের সংসার পেতে বসল, ছোট বাড়িটাই হঠাৎ যেন ফুলেফেঁপে উঠল। বাড়ি বলতে তখন যেন একটা ভাঙা হাট। অত ফাঁকার মধ্যে কেমন যেন হাঁফ ধরত।

ছেলেবেলা থেকেই ভিড়ের মধ্যে থেকে থেকে হই-হট্টগোলটাই হয়ে গিয়েছিল আমার ধাত। চারিদিকে বাচ্চারা চ্যাঁ ভ্যাঁ করবে, পাশের ঘরে এর-ওর সঙ্গে চুলোচুলি ঝগড়া হবে, মেঝের ওপর ঝনঝন করে থালাবাসন পড়বে, আশপাশে কাঁসর-ঘন্টা বাজবে, ঘরের মধ্যে বাবার বন্ধুরা তারস্বরে গল্প করবে—আর তারই মধ্যে এককোণে ব'সে আমি পড়ব।

নেহাৎ সামনে পরীক্ষা থাকলে বই আর মাদুর বগলে ক'রে সটান লেকে চলে গিয়ে রাস্তার আলোর নিচে গিয়ে ঘাসের ওপর বসব।

সত্যভামা

গীতারা সিঙ্গাপুর থেকে কলকাতায় চলে এসে লেক বাজারেরই কাছে পিঠে থাকত। কখনও কাকার বাড়িতে। কখনও ভাই-বোনে মিলে আলাদা সংসারে।

ওর দুই দাদা, গৌরাঙ্গ আর উদয়, আমাদের ইস্কুলেই এসে ভর্তি হয়েছিল। গোরা পড়ত আমার সঙ্গে। সাহেবী আমাদের এক ক্লাস ওপরে (ক'টা চুল, সাহেবদের মত গায়ের রং—তাই উদয়ের ডাকনাম সাহেবী)। আমাদের ইস্কুল বলতে তখন সত্যভামা।

ছোট হলেও সত্যভামা ইস্কুলের খুব নামডাক । এস দেবরায় পড়তেন দাদার সঙ্গে । আর ছিলেন বাঘা যতীনের ছেলে বীরেনদা, সিনেমা থিয়েটারে নাম-করাদের মধ্যে হরিসাধন দাশগুপ্ত, প্রমোদ লাহিড়ী, কালী ব্যানার্জী । আমি সত্যভামা ছেড়ে ভবানীপুর মিত্র ইস্কুলে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম শিক্ষকদের সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে । কিন্তু তাতেও সত্যভামা সম্বন্ধে পরে গর্বে বুক দশ হাত হতে বাধেনি । তার একটা বড় কারণ ভারতবিখ্যাত বংশীবাদক পান্নালাল ঘোষ তিরিশ টাকা মাস মাইনেতে আমাদের বক্সিং আর জিমন্যাস্টিকস শেখাতেন । বক্সিং রিং-এ যাঁর ঘুষির চোটে আমরা চোখে অন্ধকার দেখতাম, তিনি যে পরে বম্বে গিয়ে বাঁশীর সুরে সারা দেশ মাতিয়ে তুলবেন—সেদিন সেকথা স্বপ্নেও ভাবিনি ।

গরিব-বড়লোক সব বাড়ির ছেলেই তখন পড়ত পাড়ার ইস্কুলে । সেকালের বাবারা ছেলেদের পড়ানোর ব্যাপারে আজকের মতন এতটা উচাটনও হতেন না । টোল-মাদ্রাসা ছাড়া সব হাই ইস্কুলেই তখন ইংরিজিতে পড়ানো হত । তার ফলে বাইরের ইংরিজিময় কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের ছাড়পত্র পেতে খুব একটা অসুবিধে হত না—এই ভরসার জোরেই কি তাঁরা নিজেদের ছেলেদের ইস্কুলে দেওয়ার ব্যাপারে কম খুঁতখুঁতে ছিলেন ?

ঘুষি থেকে বাঁশি

ছোট হলেও, সত্যভামা ইস্কুলটা ফ্যালনা ছিল না ।
ছোট হলেও, সত্যভামা ইস্কুলটা ফ্যালনা ছিল না । ফুটবলে তখন সত্যভামার খুব নামডাক । এস দেবরায় পড়তেন আমার দাদার সঙ্গে । আর ছিলেন বাঘা যতীনের ছেলে বীরেনদা । ভালো অ্যাথলেট । সিনেমা থিয়েটারে নাম-করাদের মধ্যে হরিসাধন দাশগুপ্ত, প্রমোদ লাহিড়ী, কালী ব্যানার্জী । কৃতী ছাত্র, পরে ব্যারিস্টার এবং তারও পরে কলকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি তরুণ বোস সত্যভামা স্কুল থেকেই পাস করেছিল । আমি সত্যভামা ছেড়ে ভবানীপুর মিত্র ইস্কুলে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম শিক্ষকদের সংগ্রামে জড়িয়ে প'ড়ে । কিন্তু তাতেও সত্যভামা সম্বন্ধে পরে গর্বে বুক দশ হাত হতে বাধেনি । তার একটা বড় কারণ ছিল এই যে, ভারতবিখ্যাত বংশীবাদক পান্নালাল ঘোষ তিরিশ টাকা মাস মাইনেতে এই সত্যভামা ইস্কুলেই আমাদের বক্সিং আর জিমন্যাস্টিক্‌স্ শেখাতেন । বক্সিং-এর রিং-এ যাঁর ঘুষির চোটে আমরা চোখে অন্ধকার দেখতাম, তিনি যে তার অল্প কিছুকাল পরেই বোম্বাই গিয়ে বাঁশির সুরে সারা দেশ মাতিয়ে তুলবেন—সেদিন সেকথা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি ।

সাহেবীর চিঠি

এতটা পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটিবার দরকারই হত না—যদি সাহেবীর একটা চিঠি নিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে মনে মনে তোলাউপুড় না করতাম ।

ওর চিঠি যদি হাট ক'রে দিই, তাতে কি ওর আঁতে লাগবে ? আমাদের দুজনেরই মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে । আমাদের বিয়ের বয়েসও কম হলো না ।

নাচতে না চাইলেও, কিছুটা আগে পরে দুজনকেই ঘাড়ে ক'রে নাচাতে নাচাতে নিয়ে যাওয়ার লোকের অভাব হবে না । এ বয়েসে আমাদের কারো ঘোমটা দেওয়া সাজে না ।

মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে । কাজেই আইবুড়ো মেয়ের বাপ নয় যে, ভয়ে সিঁটিয়ে থাকবে ।

ছেলের বাপ হিসেবে ও এখন নিশ্চিন্তে মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছে । বউ পুষ্প শাশুড়ি হয়ে নাতিনাতনির কথা ভেবে চোখে চালশের চশমা এঁটে আজকাল নিশ্চয় কাঁথা সেলাই করছে ।

আর চিঠির জন্যে ওরা যদি চটে, তাতেই বা আমার কী আসে যায় । সম্পর্কে তো ও আমার শালা ।

ওকে ঠোকার এ সুযোগ আমিই বা কেন ছাড়ি ?

ওর চিঠিটা এসেছে বোম্বাই থেকে । সাহেবী তখন কাজ করছে রমেশ থাপার-সম্পাদিত পার্টির বেনামী সাপ্তাহিক 'ক্রসরোড্‌স্'-এ । পার্টির সদর-দপ্তর এর পরই দিল্লীতে উঠে আসে ।

সাহেবী লিখছে আমাকে, গীতাকে আর সীতাদিকে যৌথভাবে (২৪-৪-৫২)—চিঠির মাথায় বন্ধনীর মধ্যে ছোট্ট একটা মন্তব্য 'ব্র্যাকেটে সুভাষকে যা লিখেছি সেটা এলেবেলে)', তারপর—'মাঝে কয়েকদিন শরীরটা খারাপ হচ্ছিল ব'লে সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম । বিয়ের ব্যাপারে তোমাদের চিঠি পেয়ে উত্তেজনার ওপর প্রায় দিনে দু প্যাকেট খেতে আরম্ভ করেছি । তবে চিঠিটা লিখছি মাথা ঠাণ্ডা করে । এবং (আমি আর দাদা) দুজনের হয়ে । সুভাষ চিঠিতে ইঙ্গিত করেছে যে, আমরা শেষ পর্যন্ত ঘাবড়ে গিয়ে পিছিয়ে যেতে পারি । সুতরাং আরম্ভেই সেই অপবাদের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদ ক'রে জানাতে চাই : 'বিয়ের ভয় দেখাও কাহারে ?'

'প্রথমে নিজের কথাই বলা যাক—লজ্জার মাথা খেয়ে । আমার জন্মসাল হল ১৯২০ খৃঃ । সুতরাং বয়স ৩২ । আঠারো বছর

বয়েসের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের ঠিক করেছ শুনে ভালো লাগছে। (অবশ্য কার না লাগে। কী বলো, সুভাষ?) কিন্তু ব্যাপারটা অনুচিত হবে মনে হচ্ছে।

বৃদ্ধস্য তরুণী

'গিলু যা লিখেছে, খুব সত্যি। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা! মাথার চুলও বেশ কয়েকটা পেকেছে। অবশ্য সবই নির্ভর করবে মেয়ের ওপর, তার মানসিক বয়েস ইত্যাদি। সুতরাং এ বিষয়ে একটু ভেবেচিন্তে জানিও তোমাদের মতামত। (এটা লেখার মানে বুঝলে সুভাষ, সবই তো তোমাদের ওপর নির্ভর করছে—আপত্তি করা উচিত বলে করছি!) আর একটা আপত্তি হল, মোটে ম্যাট্রিক পাশ (না, পড়ে?)। পয়সা রোজগার করবে কী করে? প্রথমেই জানিয়েছিলাম যে, মেয়েকে রোজগার করতে হবে—এটা দাদারও মত। সুতরাং এদিক থেকে মেয়েদের মনোভাব ও ক্ষমতা জানবার বিশেষ প্রয়োজন।

'আর গিলু লিখেছে, চালাকচতুর মেয়ে। কি রকম চালাকচতুর? সেইরকম চালাকচতুর নাকি, যারা অনেক পার্টির থেকে এই সঙ্কট সময়ে ছিট্‌কে বেরিয়ে গিয়েছে—যারা সব সমস্যার সমাধান করতে পারে মুখের বুলিতে—উৎসাহ অগাধ, কিন্তু জীবনে দু-একটা ধাক্কা খেলেই যেরকম হাসিমুখে কাজ করত, সেইরকম হাসিমুখ নিয়েই অন্য লোকের কাছে চলে যায় (সুভাষ, হাসছো কেন)? যাইহোক, বেশি লিখব না—আবার যদি বিয়ে কেঁচে যায়?

'দাদার সঙ্গে তার বিয়ের ব্যাপারে আলোচনা করেছি। তার এখনও ৪০০০৲ টাকা দেনা। বেশির ভাগ কলকাতার পাবলিশিং হাউসে। তবে কিছু কিছু দেনা শোধ করেছে এখানকার। এখানে যেকালে বাড়ি রয়েছে, একটা মেয়ে এসে থাকলে খরচ এমন কিছুই বাড়বে না। ও চালিয়ে নিতে পারবে মনে করে। তাছাড়া এখন বিয়ে না করলে আর কখনই হবে না, সে ভয়ও আছে। মোটের ওপর মত আছে। বিয়ে করতে যাবার জন্যে দোকান দিন দশেকের জন্যে বন্ধ রাখতে পারবে।

তাত্ত্বিক দিক থেকে যে বুদ্ধিজীবীরা শেষের দিকে সাহস ক'রে বলেছিলেন, পার্টি বা গণ-সংগঠনে তাঁদের তেমন পা রাখার জায়গা ছিল না। অপদস্থ নেতাদের শূন্য আসনে বসবার তাঁদের যতটা সাধ ছিল, সাধ্য ছিল সে তুলনায় অনেক কম। জোর করে সম্পাদকের আসনে আমাকে বসিয়ে দিলেও, মনে মনে আমি সটকে পড়ার তাল খুঁজছিলাম।

'বার্নপুরে বিয়ে করতে যাওয়াটা উচিত হবে না মনে হয়। কেননা কাকুন নিজের চাল বজায় রাখতে খরচ করবেন হয়ত, আর মনে মনে গালাগালি দেবেন। তাছাড়া কলকাতা থেকে যাওয়া-আসার খরচ ইত্যাদি অনেক। কাকুনের মতামত জানিও। আর টোপর পরে যখন বিয়ে হবে না তখন অত গণ্ডগোলের মধ্যে যাওয়ার কী দরকার?

উপহারের বদলে

'গিলু যে জানিয়েছে মেয়েদের বাড়িতে যে, আমরা গরিব ও টোপর পরে বিয়ে করব না, সেটার সঙ্গে আমাদের দুজনেরই মত আছে। বিয়ের যা খরচ এবং, বউদের ও নিজেদের ট্রেনভাড়া ইত্যাদি. সে টাকাটা তুলবার পদ্ধতি এইরকম করা ভালো। যাঁরা খুব নিকট আত্মীয় (সুভাষ, আঁৎকে উঠছে কেন?), তাঁরা নিশ্চয় পাঁচ দশ টাকার উপহার দেবেন। উপহারের বদলে যদি নগদ টাকা দেন, তাহলে সব গণ্ডগোল মিটে যায়। এই ক'টা নাম জানাচ্ছি, শুভাকাঙ্ক্ষী আর কাউকে যদি জানা থাকে জানিও এবং যাদের নাম দিচ্ছি তাদের মতামত জানিও:

'কাকুন—১০০৲ ; ভুলদা ও আত্তমাসী—৫০৲ ; সেজ মাসী—১০৲ ; দাদুন—২০৲ ; দেবী-আবু—২৫৲ ; কামাক্ষী-রিখু—২৫৲ ; শীতল পিসে-আলদু পিসি—২০৲ ; দিদি—২৫৲ ; গিলু—৫৲ ; সুভাষ—২৷৷৹ (এটা বাড়াতে পারলে ভালো হয়)। মোট: ২৮২৷৷৹। বন্ধুবান্ধব যে কয়েকজন আছে শুধু এক গেলাস ক'রে সরবত খাইয়ে দিলেই হল।

'...বজবজে কবে যাচ্ছ জানিও।...

'পুঃ-মেয়েদের বাড়ির মত থাকলে ছবি পাঠিয়ে দিও। তবে ছবি সুভাষ যেন না তোলে—কেন না তাহলে গেঁজে যেতে পারে। আর একটা কথা লিখেছ যে মেয়ের বাপ সম্প্রতি মারা গিয়েছে। তার মানে কি কাকা কোনরকমে মেয়েকে বিদায় করতে পারলে বাঁচে? কাকা কি রকম লোক? পার্টি-মেম্বার মানে আজকালকার বাজারে বিশেষ কিছু নয়, যদি না লোক ভালো হয়। একথাটা জিজ্ঞেস করছি, কেন না আমার কোনো বিপদ হলে—ধরো, কারাগার—বউয়ের কোনো আশ্রয় মিলতে পারে কিনা।'

স্বর্ণদার লেখা

স্বর্ণদা লিখছেন (১৬-৪-৫২)—'তোমার দ্বিতীয় চিঠি পাবার পর লেখায় হাত দিয়েছি গত রবিবার ছুটির দিনে। অর্ধেকের বেশি ঐ একদিনেই লিখেছিলাম। বাকিটা এই তিন দিনেও শেষ হল না। আজ রাত্রে শেষ করব; নয়ত কাল রাত্তিরে পজিটিভলি। পরশু দিন ১৮ই এপ্রিলের মধ্যে ডাকবাক্সে ফেলছি নিশ্চিত। তুমি সময় দিয়েছিলে ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত। তিন দিন দেরি হল। চলবে তো?

'যে বিষয় নিয়ে লিখব ভেবেছিলাম, সময় অভাবে তা আর হল না। এ লেখার শিরোনামা হচ্ছে 'রাজধানীর সংস্কৃতি সংবাদ।' অরণি-তে ছদ্মনামে যে ভঙ্গীতে লিখতাম তেমনি ধরনের লেখা। তাড়াহুড়ো করে লিখছি। উৎরোবে কিনা সংশয় আছে। লেখাটা পড়ে যদি ভালো না লাগে শেষ পর্যন্ত, তা হলে ছেপো না। তাতে আমি আদৌ ক্ষুণ্ণ হব না। আর যদি চলবে বলে মনে করো, তাহলে মাঝে মাঝে ভাষার স্খলন চোখে পড়লে তা শুধ্‌রে নিও।

'তোমার চিঠি পেয়ে খুব উৎসাহিত হয়েছি, এখন এই উৎসাহটা টিকিয়ে রাখতে পারলে হয়।

'যেসব কথা লিখেছ, তার সঙ্গে দ্বিমত হবার কিছু নেই। তোমার চিঠি পড়তে পড়তে মনে পড়ল 'শেষের কবিতা'র একটা লাইন: 'রবি ঠাকুরের দল শাসিয়ে গেল, লিখে জবাব দেবে।' লিখে জবাব না দেওয়া পর্যন্ত ক্ষোভ আর অসন্তোষের কোনো দাম নেই।...'

ভেতরে বাইরে

এই দেড় বছরে এটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গিয়েছি জেলের

বাইরেটা আর ঠিক আগের মত নেই ।
আমরা যারা রণদিভের আমলটা মোটের ওপর জেলে জেলে কাটিয়েছি, আমাদের মধ্যে ছিল একটা শহীদ-শহীদ ভাব ।
বাইরে নেতৃত্বের যে অংশ গা-ঢাকা দিয়ে ছিল, তাদের অনেকেই ধরা পড়ে আমাদের ছেড়ে-আসা জেলখানায় তখন বন্দী । তাদের ভুলের মাশুল গুণতে হয়েছে পার্টির সাধারণ কর্মীদের । ফলে, তারা গুম হয়ে আছে । মুখ খুললেই শুধু অভিযোগ আর নালিশ ।

আমরা সাতে পাঁচে ছিলাম না বটে, কিন্তু তাই বলে আমাদের শহীদ-শহীদ ভাবটাও তাদের ঠিক বরদাস্ত হয়নি । তাছাড়া জেলে থাকলেও, আমরা তো বাইরের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে টুঁ-শব্দও করিনি । এমনকি উনিশ শতকের ঐতিহ্যের প্রশ্নে, রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নের ব্যাপারেও আমরা তো ওদেরই সুরে সুর মিলিয়েছি । এই ক্ষোভগুলো ছিল খুবই ন্যায্য ।
এর আবার একটা অন্যদিকও ছিল ।
তাত্ত্বিক দিক থেকে যে বুদ্ধিজীবীরা শেষের দিকে সাহস ক'রে লড়েছিলেন, পার্টি বা গণ-সংগঠনে তাঁদের তেমন কোনো পা রাখার জায়গা ছিল না । অপদস্থ নেতাদের শূন্য আসনে বসবার তাঁদের যতটা সাধ ছিল, সাধ্য ছিল সে তুলনায় অনেক কম ।
জোর করে সম্পাদকের আসনে আমাকে বসিয়ে দিলেও, মনে মনে আমি সটকে পড়ার তাল খুঁজছিলাম ।

দেড় বছরে এটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গিয়েছি জেলের বাইরেটা ঠিক আগের মত নেই । আমরা যারা রণদিভের আমলটা জেলে জেলে কাটিয়েছি, আমাদের মধ্যে ছিল একটা শহীদ-শহীদ ভাব । বাইরে নেতৃত্বের যে অংশ গা-ঢাকা দিয়ে ছিল, তাদের অনেকেই ধরা পড়ে আমাদের ছেড়ে-আসা জেলখানায় তখন বন্দী । তাদের ভুলের মাশুল গুণতে হয়েছে পার্টির সাধারণ কর্মীদের । মুখ খুললেই শুধু অভিযোগ আর নালিশ ।

বিদায়

মাঝে অনেকবার শৈলেশ্বর কাকাবাবুর কথা মনে হয়েছে । মন বলছিল উনি ভালো নেই । বর্ধমান থেকে লেখা (১৬-৪-৫২) শৈলেশ্বর কাকাবাবুর শেষ চিঠিতে সেই অনুমানেরই প্রমাণ মিলল !
'প্রিয় গোবিন্দ !
গত ৯ই ফেব্রুয়ারি সকালে আমি যখন তোমাদের বাসা থেকে রওয়ানা হই, তখন বাসার সকলে ঘুমিয়ে । সুতরাং কারও কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি । এখানে প্রবল জ্বরে পড়ি । প্রথমটায় জ্বর দিনকয়েক ১০৫° পর্যন্ত উঠেছিল । এখানকার ডাক্তার বললেন যে, অনেকদিন আমাশায় ভুগে লিভার একেবারে খারাপ হয়ে গেছে এবং জ্বরটা সেইজন্যেই হয়েছে । জ্বরটা বন্ধ হয়েছে, রক্তাল্পতাও কিছু কমেছে । কিন্তু…পেটের যন্ত্রণা…এখনও চলছে । শরীর এখনও খুব দুর্বল । শোয়া বা বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালে মাথাটা প্রায়ই ঘুরে যায় । ভালো হাঁটতে এখনও পারি না । হৃৎপিণ্ড দুর্বল বলে বেশি হাঁটাও বারণ ।
'…ক্ষিতীশ এখন কোথায় ? শান্তিপুরে না কলকাতায় ?…'
এরপর তাঁর মৃত্যুসংবাদ আসতে বেশি দেরি হয়নি । শৈলেশ্বর কাকাবাবু নিজে বোধহয় জানতেন না—তাঁর লিভারে বাসা বেঁধেছিল ক্যান্সার ।

কালীঘাটের গলি

কালিদাস পতিতুণ্ড লেনের সেই গলিটা ভোলার নয় । তার শেষপ্রান্তে ছিল সত্যেন মজুমদারের বাসা ।
একটা সময়ে রোজ সকালে সেখানে একতলার ঘরে বসত আমাদের আড্ডা । নিয়মিত ছিলাম আমরা তিনজন । হেমন্ত মুখার্জী, রমাকৃষ্ণ মৈত্র আর আমি । নীল চোখে রেলিং ধ'রে ধ'রে হাঁটি-হাঁটি পায়ে নীচে নেমে আসত গোগোল । সত্যেনবাবুর চোখের মণি । টুসু তখনও হয়নি ।
শান্তিদি ছিলেন সত্যেনবাবুর ভাগ্নী । আর অরুণ মিত্র ছিলেন তাঁর পুত্রপ্রতিম । অরুণবাবু কবিতা লিখতেন । কিন্তু শান্তিদি লিখতেন গল্প ; লিখতেন রীতিমত ভালো ।
স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই হাতে তুলিকলম থাকাটা বাঙালী গেরস্থ ঘরে পোষায় না । একজনকে তো হেঁসেল ঠেলতেই হবে ।
সুতরাং শান্তিদিকেই লেখা ছেড়ে দিতে হল ।
অরুণ মিত্র অরণি উঠিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন ফ্রান্সে । ফিরে আসেন আমি জেল থেকে ফেরার পর ।
অরুণ মিত্র যখন ফরাসী ভাষায় অধ্যাপকের চাকরি নিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেলেন, তখন খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল । কাগজ ছেড়ে অধ্যাপনা, কলকাতা ছেড়ে এলাহাবাদ—ভাবা যায় ?

নির্বাসিত

অরুণ মিত্র লিখছেন (১৮-৪-৫২)—'তোমার চিঠি পেয়ে খুব আনন্দ হল । তুমি যে একজন নির্বাসিত লোককে ভোলোনি, এটা তুচ্ছ কথা নয়, বিশেষত যে বিস্মৃতিতেই অভ্যস্ত তার পক্ষে ।
'…একটা কবিতা পাঠাব । লেখা রয়েছে, কিন্তু বুঝতে পারছি না তোমাদের মনঃপূত হবে কিনা । যদি দু-একদিনের মধ্যে অন্য কিছু না লিখি, তাহলে এটাই পাঠিয়ে দেব ।…
'এখানে কয়েকটা বাংলা সাহিত্য সমিতির সঙ্গে সংযোগ হয়েছে । কিন্তু এরা বড় পেছিয়ে আছে । বাংলা দেশের কোনো আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, অনেক বছর আগে যখন বাংলা থেকে ছিটকে এখানে এসে পড়েছিল, মনে মনে সেই সময়টাতেই থেকে গেছে ।…
'তোমার 'অগ্নিকোণ' এবং 'আমার বাংলা' ঠিকমতো আমার পড়া হয়নি । কলকাতায় ফিরলে আমাকে দিতে পারবে পড়তে ?
'শান্তি তোমার চিঠি পেয়ে খুশি । আজ তোমায় লেখার সময় পেল না, পরে লিখবে । ওরও শরীর ভালো যাচ্ছে না । গীতা কেমন ? তোমরা দুজনেই বোধহয় অতিরিক্ত পরিশ্রম করছ, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটু সাবধান থেকো ।…
'অমৃতর সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি । রামকুমার ছেলেটিকে আমারও ভালো লাগে । কিন্তু ওর ছবি কি প্রদর্শনীতে দেবার মত হয়েছে ?…'

অমৃত রায়

অমৃত সস্ত্রীক এসেছিল । আমাদেরই সঙ্গে ছিল । এলাহাবাদে ফিরে গিয়ে লিখছে (২১-৪-৫২)—(ছেঁড়া, পোকায়-খাওয়া) 'সেদিন কি অসম্ভব ভিড় ছিল, কিন্তু আমরা তবু বেশ সুবিধায় এসেছি । আমি গয়া অবধি ঘুমিয়েছি । আমাদের কোনোও কষ্ট হয়নি, এবং তার শ্রেয় দিতে হবে তোমাদের ।

'আমি এই শান্তিসংস্কৃতি সংখ্যাটি ('হংস') বের করে বিপদে পড়ে গিয়েছি, কাজেই বিক্রি খুব ভালো হচ্ছে না ।...পার্টির কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাচ্ছি না ।...এসব হল কাজের বার্তা এবং আমি আশা করি যে তুমি মন দিয়ে আমার কাজগুলো করবে ।
'আমাদের কত সুখ হল তোমার ওখানে সত্যিই বলতে পারব না । তুমি তো আমার সব দিনের জানাশোনা পাগলা ছিলে, কিন্তু তোমার বউ ও বউদিকে আমি এই প্রথম দেখলাম । (মাঝে মাঝেই পোকায়-খাওয়া)...আর দুজনকেই আমার কত ভালো লেগেছে...পারব না, দরকারও মনে করি না এবং...কথাটি বেশ সেন্টিমেন্টাল মনে হবে ।..., অতএব আমি সত্য বলব । ইউ হ্যাভ আ জেম অব আ গুড ওয়াইফ, সো সিম্প্‌ল্ অ্যান্ড সো গুড অ্যান্ড সো ইন্টেলিজেন্ট...
'আমি তোমাকে বারণ করলাম যে এই চিঠিটি যেন গীতার হাতে না পড়ে ।...'

গজেন ঘোষ

নেত্রকোণা থেকে গজেন ঘোষ (যে এখন সুইডেনে থাকে ?) লিখছে (২২-৪-৫২)— '...এবার এখানে এসে এমন একটা জিনিস প্রত্যক্ষ করলাম যা আপনাকে না জানিয়ে পারছি না ।...এসে এবার এখানে দেখলাম (পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলনের) যে সাংঘাতিক রূপটা আমরা কলকাতায় কাগজে পড়ে আন্দাজ করেছি, সংগ্রামটা হয়েছিল তার চেয়ে বিরাট । এত বড় আন্দোলন বঙ্গভঙ্গের আগেও কোনদিন পূর্ববাংলায় ঘটেছে কিনা সন্দেহ । আমি ময়মনসিংহ শহরের কথা আপনাকে জানাচ্ছি : পুরোদমে স্কুল কলেজ, এমন কি সরকারী অফিসগুলিও বন্ধ সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে । প্রাচীরপত্র আর ইস্তাহারে শহরটা ছেয়ে গিয়েছে । সবচেয়ে অবাক ঠেকবে পোস্টারের ভাষায় । রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, এমনকি সুকান্তের কবিতায় প্রাণ পেয়েছে পোস্টারগুলি । যেদিন গুলিতে ৪র্থ ছাত্রটি শহীদ হল, সেদিনের পোস্টারে লাল অক্ষরে লিখিত হল : 'আঠারো বছরের ডাক ...এ বয়স জেনো ভীরু কাপুরুষ নয় ।'...
'সত্যি কথা বলতে কি, ভাষার জন্যে এমনিতর সংগ্রামে সাধারণ, অতি সাধারণ মানুষেও এমনভাবে সাড়া দিতে পারে, এ ছিল অন্তত পূর্ববাংলার মত দেশে কল্পনার বাইরে ।...এখানকার সংগ্রামী বন্ধুদের সঙ্গে এ বিষয়ে অনেক আলাপ হল– তারা বলল, 'আমাদের আশা ছিল পশ্চিম বাংলা আরো বিপুলভাবে আমাদের সহযোগিতা করবে ।' আমি বলেছি পশ্চিমবঙ্গ তখন বন্দীমুক্তি আন্দোলন নিয়ে মেতে...
'...আমার এতদিন ধারণা ছিল, ছন্দোবদ্ধ মিল দেওয়া কবিতা বুঝি আধুনিক সমাজে বেশি আদৃত নয় : গদ্য কবিতা বা অমিলবহুল কবিতাই বুঝি আধুনিকতার বাহন । কিন্তু আপনার সঙ্গে আলোচনা করে সে ধারণার খানিকটা পরিবর্তন হল ।...'

লিখে টাকা

স্বর্ণদা লিখছেন (২২-৪-৫২)— '...তোমার চিঠি পেয়ে বেশ উৎসাহিত হলাম । লেখাটা ভালো হয়েছে জেনে এবার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করি ।...'পরিচয়ে'র কাছ থেকে টাকা নেওয়ার কথা তুলেছ কেন ?...আমি তো আজকাল আর্থিক দিক থেকে অনেক সুখে আছি যে— আমাদের অনেকেরই তুলনায়, দিল্লীতে এসে হাজার টাকার মতো দেনা শোধ দিয়ে জমাতে কিছু পারিনি বটে, তবে আছি এখানে । এত ভালো খাওয়াপরা আগে জীবনে কখনো জোটেনি । দুধ মাছ-মাংস-ফল খুব খাচ্ছি । শুনে অনেকের ন্যায্যতই হিংসে হবে । তবে এত সব ভালো ভালো খাবার কোথায় যে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে : দেখতে যেমন ছিলাম তেমনি আছি— ভদ্রলোকের এক কথার মতো । আসল কথা, এ সুযোগ সময়ে আসেনি ।...
'অর্থকরী লেখা কি তোমার সেই পরিকল্পিত উপন্যাস, না আর কিছু ? যে ক্ষেত্রে তোমার যশ, সেই কবিতায় এ পোড়া দেশে টাকা আসে না...শেষ পর্যন্ত চাকুরি না করে যদি লিখেই খেতে পারো, তাহলে একদিন তোমার জীবনীকার ঐ অসম্ভব জেদ নিয়ে মস্ত এক অধ্যায় লিখবে, জেনো । খুব শক্ত, তবু জয়ী হও ।

শিল্পী রামকুমার

করোলবাগ থেকে রামকুমার ইংরিজিতে লিখছে (২৩-৪-৫২)— 'এবার কলকাতায় তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে আমি যারপর নাই খুশি হয়েছি । আশা করি, এই পরিচয় দিনে দিনে বৃদ্ধি পাবে । দুঃখের বিষয়, তোমাদের সাহিত্য আমি তেমন পড়তে পারি না । তবে এখন আমি বাংলা শেখার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছি । আশা করছি, কিছুদিনের মধ্যেই বাংলা পড়তে পারব ।
'হুগো'-র উপর লেখা এরেনবুর্গের প্রবন্ধটি তোমাকে পাঠাচ্ছি । খুব সম্প্রতি 'লে লেত্রে'-তে বেরিয়েছে ।...তর্জমা হয়ে গেলে লেখাটা তুমি ডেভিড কোহেনকে দিও, ও যাতে ওর কাগজে ছাপাতে পারে ।...
'...সবে আমি সিমলার কুলিদের নিয়ে একটা বড় গল্প লেখা শেষ করেছি । ওদের পূর্বপুরুষেরা এসেছিল কাশ্মীর থেকে । 'হংসে' ছাপা হওয়ার পর পড়ে তোমার কেমন লাগল জানিও ।...শেষ করছি । গীতাকে ভালবাসা ।

আমার বাংলা

ঢাকা থেকে সংখ্যাবিজ্ঞানের ছাত্র ইমরুল কায়েস লিখছে (২৮-৪-৫২)— 'আপনার আমার বাংলা বইখানা পড়লাম । গল্পও নয়, উপন্যাসও নয়— কতকগুলো খণ্ডচিত্র । সাংবাদিকের লেখনীতে দরদ মিশিয়ে লেখা । এইসব খণ্ডচিত্রের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ মন নিয়ে পড়তে বসা যায় বলেই বোধহয় এত ভালো লাগে ।...এই ছোট ছোট চিত্রতে যে দরদ মেশানো রয়েছে তা মনকে স্পর্শ করে, চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে আসে : এবং পরমুহূর্তেই চোখের জল শুকিয়ে যায়, জ্বালা ধরে । মানুষের মধ্যে যে জাগরণের ইঙ্গিত আপনি দেখতে পেয়েছেন, সে কথা উপলব্ধি করে আশায় বুক বাঁধতে ইচ্ছে হয় ।
'...পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়— নোয়াখালি চাটগাঁ, পূর্ববাংলার অন্যান্য শহর, সিলেট শিলচর...আপনি কি তখন এসব দিকে আসেননি ? তবু নোয়াখালি থেকে একটা চিত্রের প্রয়োজন ছিল বলেই মনে হয় ।...ভাষা আন্দোলনের ওপর লিখিত পরিচয়ের সম্পাদকীয় পড়ে আমরা তৃপ্তি পেলাম । পূর্ববাংলার জাগ্রত জনতাকে আপনারা শক্তি যোগাবেন এই আশা করি ।...

অচ্যুত গোস্বামী

অচ্যুত গোস্বামী কি তখন কলেজের অধ্যাপক ? না, নিরুপায় হয়ে মাছের ব্যবসা করছেন ? ঠিক মনে নেই । তবে পার্টির সঙ্গে তাঁর ব্যবধান দিন দিন বাড়ছিল বলে কেউ কেউ কর্তাদের কান ভারী করত । অচ্যুতবাবু এই সময় একটা পোস্টকার্ডে লিখেছেন (৬-৫-৫২)— 'বৈশাখের পরিচয়ে আমার যে লেখাটা বেরিয়েছে, পড়ে দেখলাম সেটা ভালো হয়নি । ত্রুটিটা সংশোধন করে নেওয়ার জন্যে আমার একটু সুযোগ পাওয়া দরকার । কাজেই আমি যদি 'কল্লোলে'র সমকালের আরও দু-একজন লেখক— যেমন বুদ্ধদেব, অন্নদাশংকর এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র— এঁদের সম্বন্ধে লিখি তবে হয়ত এযুগ সম্বন্ধে আমার আরব্ধ আলোচনা মোটামুটি সম্পূর্ণ হতে পারে ।...
'আমার এ চিঠিখানা কি সুভাষবাবুর হাতে পড়ছে, না আর কারো ? আপনি যদি আর কেউ হন, দয়া করে সুভাষবাবুর সাম্প্রতিক খবরাখবর একটু জানাবেন কি ? বিশেষ ক'রে তাঁর ঠিকানাটা ?' সুভাষবাবুর ঠিকানা বদলের ঠিক তখনই তোলপাড় চলছিল ।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

টপ্পা

নিধুবাবু

হঠাৎ মৃগাঙ্ক মরে গেল।

মৃগাঙ্কের বউ নীলা, বলা বাহুল্য, খুবই কাতর হয়ে পড়ল। মোটামুটি সামলে উঠতেও মাসতিনেক।

নীলা একদিন মনে-মনে ভাবল—আমি আর মৃগাঙ্ক তো কতদিন একসঙ্গে প্ল্যানচেট করেছি। এখন একবার গোপনে এক-একা চেষ্টা করে দেখি না মৃগাঙ্কের আত্মাকে প্লানচেটে নিয়ে আসা যায় কি না। যদি নিয়ে আসা যায় তাহলে জানা যাবে মৃগাঙ্ক এখন কেমন আছে, কোথায় আছে।

দরজা বন্ধ করে নীলা একদিন বসল। যারা জানে তারা খুব চট করে প্ল্যানচেটে আত্মা নিয়ে আসতে পারে। তাছাড়া, আরেকটা কথা, মৃগাঙ্ক খুব বেশীদিন আগে মরেনি।

মৃগাঙ্কের আত্মা চট করে প্ল্যানচেটে এসে গেল।

নীলা জিজ্ঞেস করল— মৃগাঙ্ক, তুমি কি এসেছ? উত্তর পেল—এসেছি।

নীলা জিজ্ঞেস করল—মৃগাঙ্ক তুমি কেমন আছ?

উত্তর পেল—খুব ভালো আছি।

নীলা জিজ্ঞেস করল—কোনও কষ্ট নেই?

উত্তর পেল—নাঃ, কোনও কষ্ট নেই। তোফা আছি।

নীলা জিজ্ঞেস করল—ওখানে রান্নাবান্না কেমন?

উত্তর পেল—চমৎকার। এত ভাল রান্নাবান্না তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

নীলা জিজ্ঞেস করল—এখানে পৃথিবীতে তোমাকে খাইয়ে-দাইয়ে আমি যত সুখে রেখেছিলাম ওখানেও কি তত সুখ?

উত্তর পেল—তার চেয়েও ঢের বেশি সুখ। এত বেশী যে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

নীলা জিজ্ঞেস করল—উঃ, স্বর্গ এত ভালো জায়গা?

উত্তর পেল—নীলা, তুমি ভুল করেছ, আমি স্বর্গে আসিনি, নরকে এসেছি।

* * * *

"রামেশ্বর খুড়োর নাতনীর বিবাহের কথা হইতেছিল। পাত্রপক্ষীয় লোকেরা কন্যা দেখিতে আসিবেন। রামেশ্বর খুড়োর ছেলে কিনু বলিল, —'বাবা! আজ আর মদ খাইও না। বাড়িতে আজ দুইজন ভদ্রলোক আসিবে, একটা দিন নাই খাইলে?'

রামেশ্বর খুড়ো বলিলেন, 'রাম রাম! আজ কি মদ খাইতে পারি? যাই সকাল সকাল স্নান করিয়া আসি। তুমি জলখাবার আর রান্নাবান্নার যোগাড় করিয়া দাও'। এই বলিয়া রামেশ্বর খুড়ো স্নান করিতে গেলেন। স্নানটান কিছুই নয়, আস্তে আস্তে গিয়া শুঁড়ির বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে দুই প্রহর পর্য্যন্ত বসিয়া মদ খাইতে লাগিলেন। এদিকে নাতিনীকে দেখিতে ঘরে সেই ভদ্রলোকেরা আসিয়াছেন। 'কর্তা কোথায়, কর্তা কোথায়?' বলিয়া কিনুকে তাঁহারা বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। 'স্নান করিতে গিয়াছেন, এখনি আসিবেন', এইরূপ বলিয়া তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। দুই প্রহর হইয়া গেল, রান্না প্রস্তুত, তবুও কর্তার দেখা নাই। যা হইয়াছে, কিনু তাহা বুঝিলেন। বাড়ি আসিয়া পাছে ভদ্রলোকদিগের সমক্ষে ঢলাঢলি করেন, সেজন্য পিতাকে সাবধান করিবার নিমিত্ত কিনু শুঁড়ির বাড়ির দিকে চলিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ পিতার সহিত পথেই সাক্ষাৎ হইল। বগলে এক বোতল মদ লইয়া টলিতে টলিতে আসিতেছেন। কিনু বলিলেন, 'বাবা! তোমার কি মান অপমানের ভয় একেবারেই গিয়াছে? তোমাতে আর কি কোনও পদার্থই নাই? এই বৃদ্ধ বয়সে তোমার কি জ্ঞানগোচর একেবারেই গিয়াছে?' রামেশ্বর খুড়ো বলিলেন, 'কেন বাবা! হইয়াছে কি? এত রাগ কেন?' কিনু উত্তর করিলেন—'হইয়াছে কি? বগলে ও কি!' রামেশ্বর খুড়ো বলিলেন—'বগলে এ কি? বটে! আর কপালে এ কি? এটা দেখিলে আর ওটি বুঝি দেখিলে না?' রামেশ্বর খুড়ো শুঁড়ির বাড়ি হইতে বাহির হইয়া, পানাপুকুর হইতে একটু কাদা লইয়া কপালে একটা ফোঁটা কাটিয়াছিলেন। ছেলেকে সেই ফোঁটাটা দেখাইলেন।" (ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়: ভূত ও মানুষ, কলকাতা ১৯০৬, পৃঃ ১৬-১৭)

"বাগবাজার অঞ্চলের একজন ভদ্রলোক তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষে গুটিকতক ফ্রেন্ডকে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করেন।...ভোজের দিন নেমন্তন্নেরা এসে একে একে জুটলেন; খাবার দাবার সকলি প্রস্তুত হয়ে ছিল, কিন্তু সেদিন সকালে বাদলা হাওয়ায় মাছ পাওয়া যায়নি। বাঙ্গালিদের মাছটা প্রধান খাদ্য, সুতরাং কর্মকর্তা মাছের জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হতে লাগলেন; নানা স্থানে মাছের সন্ধানে লোক পাঠিয়ে দিলেন—কিন্তু কোন রকমেই মাছ পাওয়া গেল না—শেষে একজন জেলে এক সের-দশ-বারো ওজনের রুইমাছ নিয়ে উপস্থিত হলো। মাছ দেখে কর্মকর্তার খুসির আর সীমা রইল না। জেলে যে দাম বলবে, তাই দিয়ে মাছটি নেওয়া যাবে মনে করে জেলেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "বাপু, এটির দাম কি নেবে? ঠিক বল তাই দেওয়া যাবে।" জেলে বল্লে, "মশাই! এর দাম বিশ ঘা জুতো।"

"কর্ম্মকর্ত্তা বিশ ঘা জুতো!" শুনে অবাক হয়ে রইলেন, মনে বল্লেন, জেলে বাদলা পেয়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে, না হয় ও পাগল, কিন্তু জেলে কোন ক্রমেই বিশ ঘা জুতো ভিন্ন মাছটি দেবে না, এই তার পণ হলো। নিমন্ত্রণে বাড়ির কর্ত্তা ও চাকরবাকরেরা জেলের এ আশ্চর্য্য দাম শুনে তারে কেউ পাগল কেউ মাতাল বলে ঠাট্টা মসকরা কত্তে লাগলো, কিন্তু কোন রকমেই জেলের গোঁ ঘুচলো না। শেষে কর্মকর্ত্তা কি করেন, মাছটি নিতেই হবে, আস্তে আস্তে জেলেকে বিশ ঘা জুতো মাত্তে রাজি হলেন, জেলেও অম্লানবদনে পিঠ পেতে দিলে। দশ ঘা জুতো জেলের পিঠে পড়বামাত্র, জেলে "মশাই! একটু থামুন, আমার একজন অংশীদার আছে, বাকি দশ ঘা সেই খাবে, সে আপনার দরওয়ান দরজায় বসে আছে, তারে ডেকে পাঠান, আমি যখন বাড়ির ভিতর মাছ নিয়ে আসছিলাম, তখন মাছের আদ্দেক দাম না দিলে আমাকে ঢুকতে দেবে না বলেছিল, সুতরাং আমিও অদ্দেক বকরা দিতে রাজি হয়েছিলাম।" কর্ম্মকর্ত্তা তখন বুঝতে পাল্লেন, জেলে কি জন্য মাছের দাম বিশ ঘা জুতো চেয়েছিল। দরওয়ানজীকে দরজায় বসে আর অধিকক্ষণ জেলের দামের বকরার জন্য প্রতীক্ষে করে থাকতে হলো না, কর্ম্মকর্ত্তা তৎক্ষণি দরওয়ানজীকে জেলের বিশ ঘার অংশ দিলেন।" (কালীপ্রসন্ন সিংহ: হুতোম প্যাঁচার নকশা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, ১৯৫৭, পৃ ১৭-১৮)

ওড়িয়া কবিকুলের বাংলায় সাহিত্যচর্চা

'ওড্রদেশী হৈয়া কৈল বঙ্গলা বর্ণন/না লৈবে বচনদোষ সব সাধুজন ॥/ যইসনে তুলসী গাছিয়া নিজপটে ।/ না লয়ে তা দোষ দেবে ভূষণ মুকুটে ॥/ তৈছে ব্রজলীলা গাছি ওড়িয়া বঙ্গালে ।/ একত্র করিয়া এহু ভুবনমঙ্গলে ॥'—কবি রঘুনাথ দাস তাঁর 'ভুবনমঙ্গল' কাব্যে এভাবে জানাচ্ছেন যে তিনি উড়িষ্যাবাসী হয়েও বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করছেন ।

রঘুনাথ দাস কোন ব্যতিক্রম নন, সে-সময়কার অনেক ওড়িয়া কবিই বাংলাভাষায় কাব্যচর্চা করেছেন । তবে বঙ্গ লিপিতে নয়, ওড়িয়া লিপিতে । ভুবনেশ্বরের 'উড়িষ্যা রাজ্য প্রদর্শশালা'র পুথি বিভাগে এরূপ প্রায় পাঁচ শ' বাংলা পাণ্ডুলিপি আছে । অধিকাংশই তালপাতার পুথি । কাগজে লেখা পুথি বা বাংলা হরফে লেখা পুথিও আছে তবে তা মুষ্টিমেয় ।

এই পুথিগুলি দু রকমের—বাংলা রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতির ওড়িয়া হরফে অনুলিপি এবং ওড়িয়া কবিদের রচিত ওড়িয়া হরফে লেখা মৌলিক বাংলা কাব্য-কবিতা । ওড়িয়া কবিদের পরিচয় সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা গেছে যে তাঁদের কালসীমা ষোড়শ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত । এঁদের মধ্যে একমাত্র কবি পিণ্ডিক শ্রীচন্দন ব্যতীত অন্যান্য কবিরা মাতৃভাষা ওড়িয়া এবং/বা সংস্কৃতেও কাব্যচর্চা করেছেন । এইসব ওড়িয়া কবিদের সংখ্যা অর্ধশতাধিক ।

প্রশ্ন জাগে কেন এবং কি কারণে এঁরা বাংলাভাষায় কাব্যচর্চা করলেন । শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত উড়িষ্যার মানুষ গ্রহণ করেননি, কিন্তু চৈতন্যদেব ওড়িয়াদের নিকট অবতারপ্রতীমরূপে স্বীকৃত ছিলেন । উড়িষ্যাবাসীরা তাঁকে 'সচল জগন্নাথ' বলে অভিহিত করেছেন । জগন্নাথ মহাপ্রভুর সঙ্গে চৈতন্যদেবও ওড়িয়া-বাঙালীর মধ্যে মিলন সেতু গড়ে তুলতে এক বিরাট অবদান রেখে গেছেন । চৈতন্যদেবের সময় থেকে উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে নামকীর্তন ছড়িয়ে পড়ে এবং তার ভাষা ছিল বাংলা । বর্তমানেও সেই বৈশিষ্ট্য
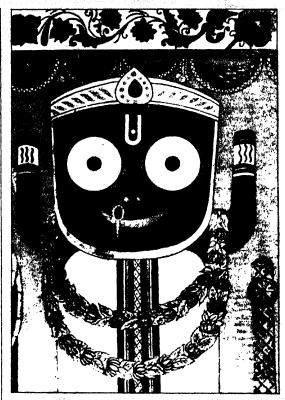
বর্তমান । শ্রীচৈতন্যের প্রেরণায় উড়িষ্যার কবিকুল বাংলাভাষায় কাব্যরচনায় ব্রতী হন ।

এ-সম্বন্ধে ডঃ বিষ্ণুপদ পাণ্ডার সঙ্গে তাঁর ভুবনেশ্বরের বাড়িতে আলোচনা হচ্ছিল । ডঃ পাণ্ডা কর্মসূত্রে ভুবনেশ্বরে যান । তিনি রিজনাল কলেজ অব এডুকেশন-এ বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করতেন । বর্তমানে অবসর গ্রহণ করেছেন ।

কৌতূহলবশত, উড়িষ্যা রাজ্য প্রদর্শশালার পুথি বিভাগে বাংলা পুথি সংগ্রহের কথা জানতে পেরে সেখানে যান । এ-সব তথ্য তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া । ডঃ পাণ্ডা জানালেন, 'বঙ্গদেশের সঙ্গে উড়িষ্যার ভাবসংহতির সহায়ক শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব । এর পর চৈতন্যদেবের নীলাচলে অবস্থিতি সেই সংহতিতে নতুন মাত্রা সংযোজন ঘটায় । এর ফলে বাংলায় সাহিত্যরচনার প্রেরণা সৃজিত হয় । কালক্রমে এটি একটি ঐতিহ্যধারার রূপ নেয় । এমনকি যে কবির বাংলাভাষাজ্ঞান বিশেষ পরিণত নয়, তাঁরাও বাংলায় কাব্যরচনা করেছেন । রঘুনাথ দাসের ভণিতায় এর স্বীকৃতি আছে ।' রঘুনাথ দাসকৃত 'ভুবনমঙ্গল' কাব্যের ভণিতা প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে ।

ওড়িয়া ভাষাভাষী এই সব কবির বাংলাভাষা শিক্ষা বাংলা ভাষাভাষীদের সাহচর্যে ঘটেছিল । ফলে বাংলা লিপিরূপ এঁদের আয়ত্তে ছিল না । ডঃ পাণ্ডা জানালেন, 'উড়িষ্যার জনসাধারণ যে বাংলাভাষায় রচিত কাব্যের রস উপভোগ করতে পারতেন তা বাংলায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্যচরিতামৃত ও মঙ্গলকাব্যের অনুলিপিগুলিই প্রমাণিত করে ।' ডঃ পাণ্ডা এক দশকেরও বেশী সময় এই সব পুথি সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত আছেন । প্রসঙ্গত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা তাঁর সম্পাদিত দ্বারিকা দাসের 'মনসামঙ্গল' ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে এবং রঘুনাথ দাসের 'ভুবনমঙ্গল' অচিরেই প্রকাশলাভ করবে । অনুরূপ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁর সম্পাদিত 'ত্রয়ী' (তিনখানি ছোট ছোট কাহিনীকাব্যের সংকলন) প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে ।

ডঃ পাণ্ডা তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডি লিট' উপাধি পেয়েছেন । ডঃ পাণ্ডা বলছিলেন, 'আমার কাজে প্রথম আর্থিক সাহায্য আসে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে । তারপর এন সি ই আর টি সাহায্য করেন আর অবসর নেবার পর তিন বছর আর্থিক সাহায্য দেন ইউ জি সি ।'

এ পর্যন্ত প্রায় তিরিশটি পুথির সম্পাদনার কাজ সমাপ্ত হয়েছে ।

বর্তমানে ডঃ পাণ্ডার অধীনে একজন গবেষক ছাত্র সনাতন বিদ্যাবাগীশের 'ভাবাবদ্ধ ভাগবত' ও একজন ছাত্রী 'বৈষ্ণবপদ' সম্পাদনায় নিযুক্ত আছেন ।

ডঃ পাণ্ডা বিশ্বাস করেন যে, উড়িষ্যার কবিদের এইসব রচনা বাংলা সাহিত্যেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । তাই তিনি অনুরোধ জানালেন যে এই পুথিগুলি সম্পাদনার পর প্রকাশের দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় ও সারস্বত প্রতিষ্ঠানের নেওয়া উচিত ।

কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানালেন যে উড়িষ্যা রাজ্য প্রদর্শশালার বাংলা পুথির সংখ্যা ক্রমবর্ধমান । নতুন পুথি যেমন সংগৃহীত হচ্ছে, তেমন বহু বাংলা পুথি ওড়িয়া পুথি বিভাগে অজস্র পুথির সঙ্গে মিশে আছে যা তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে । এইসব পুথির সুষ্ঠু সম্পাদনার জন্য বেশ কিছু গবেষকের প্রয়োজন যাঁদের ওড়িয়া সাহিত্যের জ্ঞান থাকাও আবশ্যিক ।

ঐতিহাসিক কারণে বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে যে সার্বিক ভাবসংহতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছিল । বর্তমানের এই বিচ্ছিন্নতাবাদের যুগে তাকে সযত্নে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য ।

পাশাপাশি

প্রায় প্রতি প্রজন্মেই একবার করে এমন একটা সময় আসে যখন কাব্যনাট্যের পুনরুত্থান ঘটে যায়। যুগ-মানসের ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে এক নাটকীয় উত্তুরে হাওয়ায় কবিতার পাতা খসতে থাকে, বেরিয়ে আসে তার অন্তর্বর্তী কাঠামো, তার ডালপালা। কবিরা তখন ঝুঁকে পড়েন এই নতুন রীতির নাটকের দিকে। দৃশ্যনাটকের মঞ্চে জায়গা করে নেয় পাঠ্যনাটক, অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় আর এক মাত্রা, আবৃত্তি। আবেগ সঞ্চারী সংলাপ ছন্দ স্পন্দে ভর করে প্রত্যক্ষ জগতে ব্যাবহারিক জীবনের ছকের মধ্যে গল্পক্ষম হয়ে ওঠে।

প্রাগাধুনিক বাংলা নাটক ও যাত্রা ছিল অধিকাংশই পদ্যাশ্রয়ী। কিন্তু কবিতার যথার্থ আখর তখনো তাতে পরানো হয়নি, ভাষার ছিলে বাঁধা হয়নি টানটান করে। তার সপ্রাণ সার্থকতা মণ্ডিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথে এসে। অনেক পরে, পঞ্চাশ-ষাটের দশকের মধ্যপর্বে বাংলা কাব্যনাটকের নবনির্মিতি ঘটতে থাকে ব্যাপকভাবে। সমসাময়িক বহু কবিই তখন সম্মিলিতভাবে এই নতুন মাধ্যমের শিল্পকর্মে মেতেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মণীন্দ্র রায়, অরুণ ভট্টাচার্য, আলোক সরকার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ অব্যবহিত দুই পর্বের কবিরা এ ব্যাপারে ব্রতী হয়েছিলেন। আশীর দশকে এসে আবার নতুন করে সেই হাওয়ার আগাম আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এই দীর্ঘ কবিতার মনস্কতা যে তারই পূর্বলক্ষণ তাতে বোধ হয় ভুল নেই। অনুমান হয় বাঙালী কবিরা অচিরেই হয়তো আবার কাব্যনাটক ও নাট্যকবিতার দিকে ঘুরে দাঁড়াবেন।

এ শুধু বাংলা সাহিত্যের সমাচার চিত্র নয়, পাশাপাশি ইংরেজী সাহিত্যেও একই রকম ঘটনা ঘটে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। নাট্যকবিতার শেষ উল্লেখ যোগ্য আলোড়নের সঙ্গে টি-এস এলিয়ট ও খ্রিস্টোফার ফ্রাই-এর নামও জড়িত হয়ে ছিল, যতদূর মনে পড়ে। কিন্তু ওই পর্বের নাটকগুলির তেমনভাবে পুনরুজ্জীবন ঘটেনি। এমন কি এলিয়টের মত এক কবিপ্রধানের কবিকর্মের মধ্যেও তার এক রকম গৌণ ভূমিকাই লক্ষ করা যায়। এক ভিন্ন গোত্রের পরকীয় চর্চার মতই তারা যেন স্বতন্ত্র হয়ে আছে। যেন এডওয়ার্ড যুগের নাট্য-অভ্যাসেরই প্রক্ষিপ্ত ও বিলম্বিত উদ্ভাসন, যে যুগে কাব্যনাটক ছিল এক প্রধান শিল্প, জিলবার্ট মারে-র পদ্যানুবাদে যখন ওয়েস্ট এন্ড এর থিয়েটারগুলো ভরে গিয়েছিল।

অথচ এলিয়ট জিলবার্ট মারের অনুবাদশৈলীকে নস্যাৎ করে মঞ্চাভিমুখী হয়েছিলেন। কাব্যভাবনা ও ভাষাকে সঙ্কুচিত করে, কেটে ছেঁটে পরিবেশ সৃষ্টির কাজেই তাকে সাংকেতিকভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন এলিয়ট। আর সেই কথা ও কাহিনীর ভিত্তি ছিল ধ্রুপদী গ্রীক সাহিত্যের মডেল। ১৯২০ সালের কাছাকাছি সময়ের কথা সেটা। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বেকেট, অসবোর্ন ও পিন্টারের মত ভিন্নধর্মী অন্য নাট্যকারদের আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা গদ্যে নাটকীয় কবিতাশৈলীকে অনেক বেশী স্বাধীনভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। কিন্তু পথভ্রষ্ট কবিতার গদ্যের কাছে আত্মসমর্পণের চেয়ে কবির হাতে তার নাটক্যরূপায়ণ বেশী বাঞ্ছনীয় হবে। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, টনি হ্যারিসনের 'ড্রামাটিক ভার্স ১৯৭৩-১৯৮৫' গ্রন্থটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। হ্যারিসন ওদেশে সাম্প্রতিক এক অগ্রগামী মঞ্চকবি। থিয়েটারের কবি। এলিয়ট-পন্থী হলেও এবং তাঁর রচনা মূলত অনুবাদ হলেও পদাবন্ধকে তিনি সার্থকভাবে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি অবশ্য অনুবাদ কথাটা নিজের রচনা প্রসঙ্গে অনুমোদন করেন না, তাঁর ভাষায় স্বীকরণী রূপান্তর, আক্ষরিক পারম্পর্য ভেঙে অনেকখানি মানানসই করে নেওয়া। তাই সম্ভব, কারণ থিয়েটারের জন্যে যাঁরা লেখেন আর থিয়েটারের ভেতর থেকেই যাঁরা উঠে এসেছেন তাঁদের প্রায়োগিক শিল্পবোধে এবং দৃষ্টিকোণে ফারাক হবেই। শুধু তাই নয় হ্যারিসন মূলত কবি, সৃজনশীল কবি। তাঁর নাট্যজীবনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে কবিজীবন বিস্তৃত, যদিও ১৯৮৪ সালে পেঙ্গুইন থেকে তাঁর 'সিলেকটেড পোয়েমস' বেরোবার আগে পর্যন্ত নাট্যকার হিসেবেই তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ছিল। হ্যারিসনের কবিতা নির্জন একক পাঠকের চেয়ে প্রকাশ্যে শ্রোতা সমষ্টিকেই বেশী সম্মোহিত করে এসেছে চিরদিন। কারণ মগ্নভাবনার চেয়ে আবেগোচ্চারিত চিন্তা ও বক্তব্যের সরাসরি আবেদন ছিল তার মধ্যে বেশী। তাই কবিতাকে পারফর্মিং আর্ট হিসেবে তিনি সঠিকভাবেই ব্যবহার করতে পেরেছেন। সঙ্গীতই ছিল তাঁর রূপকল্পনার কেন্দ্রীয় ভাবনা। পরিবেশকে মূলানুগ সঞ্চারিত করে দিতে তিনি পারেন নাটকের রূপান্তরিত পটভূমিতে। শব্দ প্রক্ষেপণের সেই যাদু তাঁর জানা ছিল যাতে সঠিক শব্দটি সরাসরি শ্রোতার মনে লাগসই আঘাত করতে পারে। ১৯৮১ সালে প্রথম প্রদর্শিত The *Oresteia* দেখে সমালোচক অসউইন মারে যথার্থই লিখেছিলেন :

"Surely the best acting translation of Aeschylus ever written. It gives the impression of catching every image and every nuance of meaning that is dramatically significant while recreating Aeschylus' traditional grandeur and sonority."

সংক্রান্ত সংবাদ

কবিতা ও কলকাতা : কবিতাই শেষ পর্যন্ত শিল্পসাহিত্য ও জীবনের শ্রবণীয় ও মননীয় নির্যাস। একমাত্র কবিতার সামনেই কোন সাহিত্যিক সীমারেখা টানা নেই। সবর্ণে অসবর্ণে তার মিলতে বাধা নেই কোনো। স্বক্ষেত্রের বাইরেও সে এসে হাত মেলায় গদ্যগোষ্ঠীর সঙ্গে। কবিতা হয়ে উঠতে পারে কখনো স্লোগান কখনো সংহিতা কখনো গান। গল্পে উপন্যাসে নাটকে তার স্বচ্ছন্দ প্রবেশ আমরা বারে বারেই লক্ষ করছি। মন্দাক্রান্ত গদ্য-পর্বে কবিতা এসে দাঁড়ায় উজ্জ্বল উদ্ধারের মত। আপন দুর্গমতম অন্তরাল থেকে মানুষকে চিরদিনই বাইরে টেনে বের করে এনেছে কবিতা। তেমনি কবিতার পাশাপাশি কলকাতাও। কারণ কলকাতাকে কোনদিনই কবিতা থেকে আলাদা করে ভাবা যায়নি। ভারত-পথিক, বিশ্বখ্যাত ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব গুন্টার গ্রাসকেও সম্প্রতি টেনে এনেছিল কলকাতার এক কবিতা পাঠের আসর। সীগাল বুকশপে ২৩ সেপ্টেম্বরের সান্ধ্য আসরে গুন্টার গ্রাস তাঁর বিভিন্ন মেজাজের দশটি কবিতা পড়ে শোনালেন। মূল জার্মান থেকে কবিতাগুলির ইংরেজী তর্জমা পাঠ করলেন রাজু রমণ। যুদ্ধোত্তর ইউরোপের আত্ম-জিজ্ঞাসার আর্তি ও ক্রোধের তীব্র নিখাদ শোনা গেল কবিতাগুলির মধ্যে। নানা মুখী প্রশ্নোত্তরে কবিতাপাঠোত্তর অন্তরঙ্গ সান্ধ্য আসর যেন আরও ঘন হয়েছিল সেদিন।

গুন্টার গ্রাস

পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে এই আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহেই গুন্টার গ্রাস কলকাতায় এসেছেন। এসেছেনভ্রমণসূত্রে কলকাতাকে দিন কয়েকের জন্যে ছুঁয়ে যেতে নয়, অন্তত এক বছরের মত কলকাতার সাধারণ জনজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি মিশে যেতে। এই ক্ষুধিতপাষাণ কলকাতা বিদেশী লেখক-কবিদের সম্প্রতি খুব টানছে, এর গ্লানি এর গৌরব, এর দারিদ্র্য এর অকপট সৌহার্দ্য এমন এক চরম স্পর্শবিন্দু যা ক্রমশ চুম্বক ক্ষেত্র হয়ে উঠছে। এখানে এত লেখার উপাদান যে ছড়িয়ে আছে কে জানতো ? অন্তত আমরা না। আমাদের চোখ তো দেখেনি। কারণ হয়তো আমরা 'মিরর ব্লাইণ্ড'। দর্পণও মানুষকে অন্ধত্ব দেয় এক এক সময়।

গুন্টার এসেছেন অজ্ঞাতবাসে, ছাপাখানার গোয়েন্দাদের চোখ এড়িয়ে, ভক্ত-মঞ্চ-সংবর্ধনা থেকে শতহস্ত তফাতে চলমান সংসার পাততে, সস্ত্রীক। সঙ্গে এনেছেন সততা। যে কলকাতা সম্পর্কে একদা তিনি তির্যক কটূক্তি করেছিলেন তাকেই আবার অক্ষরে অক্ষরে বুঝতে এসেছেন হাতে কলমে।

প্রাসঙ্গিক সংবাদ, 'ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট' কিংবা 'দি সিটি অব জয়' খ্যাত ফরাসী লেখক দোমিনিক লাপিয়েরও এখন কলকাতায়। কলকাতার মাধ্যাকর্ষণ তাঁকেও বারবার টেনে আনছে এখানে। তাঁর সিটি অব জয় গ্রন্থকে চলচ্চিত্রিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন 'গান্ধী' নির্মাতা গোলডক্রেস্ট সংস্থা। লাপিয়ের উদার হাতে আর্থিক শুশ্রূষা দিয়ে চলেছেন এই বাংলার আর্ত মানুষকে। শোনা যাচ্ছে ব্যারাকপুরের এক কুষ্ঠাশ্রমে তিনি গত পাঁচ বছরে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দান করেছেন। এবছরেও হাওড়া অঞ্চলের জনকল্যাণে তিনি চল্লিশ লাখ টাকার প্রতিশ্রুতি রেখেছেন। তাঁর আগামী বইটিতেও নাকি কলকাতার এক-তৃতীয়াংশ ভূমিকা থাকছে।

ECTV

গর্ভধারিণী

সমরেশ মজুমদার

জয়িতা হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তার মনে হল সে বোধ হয় সব কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারছে না। কোন মেয়ে প্রকাশ্যে এই রকম আকাঙ্ক্ষা নির্লজ্জ ভঙ্গীতে জানাতে পারে? আনন্দ এবং সুদীপ এগিয়ে এসেছিল। গ্রামের লোকেরাও ভিড় করে দাঁড়িয়েছে এখন। বন্দীদের ছেড়ে দেওয়াতে ওদের মুখে স্পষ্টতই অসন্তোষ। কিন্তু এখন এই যুবতীকে নিয়ে কি করা যায় সেটাও প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'ও কি বলছে রে? ওরা কি ওকে অসম্মান করেছে?'

জয়িতা কোন উত্তর দিল না। ওর শরীর ঘিন ঘিন করছিল। মেয়েটাকে তার হঠাৎ খুব কুৎসিত বলে মনে হল। যেন একটা আকাঙ্ক্ষা ওর সমস্ত সৌন্দর্যের ওপর কাদা ছড়িয়ে দিয়েছে। সে কোনরকমে জিজ্ঞাসা করতে পারল, 'তোমার এমন কথা বলতে লজ্জা করছে না?'

'লজ্জা করবে কেন? আমি কি বুড়ি হয়ে গেছি? আমি কি তোমার মত মেয়ে হয়েও ছেলে সেজে থাকি?' প্রশ্নটা স্বাভাবিক গলায় নয়। ওর তীব্র কণ্ঠ যেন সমস্ত চরাচরে ছড়িয়ে পড়ল। আর সেটা কানে যাওয়া মাত্র জয়িতার শরীরে যেন হিমালয়ের বাতাস ঢুকে পড়ল। তার কাঁপুনি এল। কোনরকমে পালদেমের দিকে তাকিয়ে সে বলতে পারল, 'একে তোমরা বোঝাও।'

তারপর যেন শীতলতা অতিক্রম করতেই সে জোরে জোরে পা চালাল। সুদীপ এবং আনন্দ তো বটেই, গ্রামের তাবৎ মানুষ অবাক হয়ে ওর যাওয়াটা দেখল। এই যাওয়াটা যে স্বাভাবিক নয় তা প্রত্যেকের কাছেই স্পষ্ট কিন্তু কারণটা নিয়ে কেউ একমত হতে পারত না। আনন্দ দেখল জয়িতা তাদের আস্তানার ভেতরে ঢুকে গেল। সে পালদেমকে বলল, 'অনেক রাত হয়ে গেছে, এবার তোমরা শুয়ে পড়।'

পালদেম এগিয়ে গেল গ্রামবাসীদের কাছে। ওরা নিচু গলায় কথা বলল কিছুটা সময়। তারপর পালদেম ফিরে এসে বলল, 'ওদের ছেড়ে দিয়ে ভাল কাজ করা হয়নি। আমাদের ভয় হচ্ছে ওরা আবার আক্রমণ করতে পারে চোরের মত। এখন আর সামনা-সামনি আসবে না তোমাদের জন্যে। তাছাড়া ওরা গ্রামাদের দেবতাকে নোংরা হাতে স্পর্শ করেছে। এই অন্যায়ের জন্যেও ওদের শাস্তি হওয়া উচিত ছিল।'

আনন্দ বলল, 'শাস্তি দিলে অপরাধ আরও বেড়ে যেত। তোমরা নিশ্চয়ই চাও শান্তিতে বসবাস করতে। ওরা যদি আবার আক্রমণ করে তাহলে আমরা কোন দয়া দেখাবো না। আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখো তোমরা।'

পালদেম তার গ্রামবাসীদের এই কথা জানালে তারা ধীরে ধীরে ঘরে ফিরতে লাগল। এখন আকাশে চমৎকার জ্যোৎস্না; ও-পাশে পাহাড়ের গায়ে যেন রুপোর ঢল নেমেছে। আনন্দরা দাঁড়িয়েছিল। দেখা গেল সমস্ত মানুষ চলে যাওয়ার পরেও মেয়েটি মাটি থেকে ওঠেনি। দুটো হাঁটুর ওর মুখ রেখে সে চুপচাপ বসে আছে। সুদীপ তাকে ডাকল, 'এই যে, তুমি এখানে বসে আছ কেন?'

মেয়েটি কোন জবাব দিল না। তার বসার ভঙ্গীতে এক ধরনের অসহায়তা থেকে উদ্ভূত জেদ প্রকট হচ্ছিল। সুদীপ চিৎকার করে পালদেমকে ডাকল। পালদেম ফিরে যাচ্ছিল। বন্দী মুক্তির কারণে সে যে সন্তুষ্ট নয় তা বোঝা যাচ্ছিল। ডাক শুনে সে পেছন ফিরে তাকাল। সুদীপ চিৎকার করেই বলল, 'এই মেয়েটা যে এখানে একা পড়ে রইল।' পালদেম নিরাসক্ত গলায় বলল, 'তাতে আমার কি?'

হঠাৎ মেয়েটি খিলখিলিয়ে হেসে উঠল, 'আমার কি, আমার কি!'

সুদীপ চাপা গলায় আনন্দকে জিজ্ঞাসা করল, 'পাগল হয়ে গেল না কি?' তারপর পালদেমকে ইশারায় ডাকল। নিতান্ত বাধ্য হয়েই পালদেম ফিরে এল। সুদীপ বলল, 'একে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছ না কেন?'

পালদেম বলল, 'কে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে? ওর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। গ্রামের লোকের ধারণা ওর প্রশ্রয় না পেলে ওরা এখানে আসতো না।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'ধারণা! প্রমাণ তো নেই'।

'প্রমাণ আছে। ওকে যখন ওরা নিয়ে যাচ্ছিল তখন একটুও চিৎকার করেনি সাহায্যের জন্যে। তারপরেও ওর হুঁশ হয়নি জোকে অপমান

করেছে।' পালদেম জানাল।

'জো।' সুদীপ অবাক হল, 'জো কে?'

'যে আমাদের সম্মান বাঁচাল। তোমাদের বন্ধু।'

সুদীপ এবার হো হো করে হেসে উঠল, 'বাঃ সুন্দর নাম দিয়েছ তো। জয়িতা থেকে জো।'

আনন্দ বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু পালদেম, এভাবে পড়ে থাকলে তো ও মরে যাবে ঠাণ্ডায়। তোমরা ওকে অন্য গ্রামে যেতেও দেবে না, আবার গ্রামেও জায়গা দিতে চাইছ না, এটা কি রকম ব্যাপার?'

হঠাৎ পালদেম বলল, 'এটাই এই গ্রামের নিয়ম। ও থাকবে নিজের মত। যতদিন গ্রামের কোন ছেলে ওকে বিয়ে না করছে ততদিন ও কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবে না। অবশ্য যেহেতু ও একবার সংসার করেছে তাই বিয়ে না করেও কেউ যদি স্বীকৃতি দেয় তাহলেও একই কথা হবে। এসব ও জানে। তাই নিজে থেকে ফিরে যাচ্ছে না ঘরে। আমি চলি।'

ওকে চলে যেতে দেখে আনন্দ মন্তব্য করল, 'ভাগ্যিস বলেনি এটা আমাদের গ্রামের ব্যাপার, তোমরা নাক গলিও না।'

সুদীপ বলল, 'এখন আর বলবে না। মালপত্তর হাতছাড়া হয়ে গেছে তো। কিন্তু একে নিয়ে কি করা যায়?'

আনন্দ কয়েক পা এগিয়ে মেয়েটার সামনে দাঁড়াল, 'তুমি ঘরে ফিরে যাচ্ছ না কেন?'

মেয়েটা মাথা নাড়ল। কিন্তু কিছু বলল না। আনন্দ আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ওই গ্রামে যেতে চাও?'

মেয়েটা এবার মুখ তুলে তাকাল। এখন তার চোখে জল। ঠোঁট কাঁপছে। কোনরকমে বলল, 'ওরাও আর আমাকে নেবে না। আমি মরে যেতে চাই। আমার কেউ নেই, কেউ নেই।'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কিভাবে মরবে?'

মেয়েটা হাত তুলে দূরের পাহাড় দেখাল, 'ওই ওখান থেকে লাফিয়ে পড়ব।'

সুদীপ বলল, 'ওটা কালকে করলে হয় না? আজকের রাতটা একটু ভাল করে ঘুমিয়ে নাও।'

মেয়েটা এবার উঠে দাঁড়াল, 'আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছ, না? ঠিক আছে, আমি মরে দেখাচ্ছি।' কথা শেষ করেই মেয়েটা পাহাড়ের দিকে ছুটতে লাগল। আনন্দ উত্তেজিত হল, 'সর্বনাশ, ও সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে সুদীপ, ইনস্যানিটি গ্রো করেছে। ওকে থামা। কেন যে ইয়ার্কি করিস।'

সুদীপ হকচকিয়ে গিয়েছিল। এবার সে-ও ছুটল। খানিকটা উঁচু পথ ভাঙতেই তার হাঁফ ধরে গেল। কিন্তু এই নির্জন হিম-জ্যোৎস্না রাত্রে একটি মেয়ে পৃথিবীতে আর থাকতে চাইছে না শুধু তার রসিকতার কারণে এই বোধ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। মেয়েটা কোনদিকে তাকাচ্ছে না। সুদীপ ক্রমশ দূরত্বটা কমিয়ে আনছিল। এই পথের শেষেই খাদ। সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়লে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সে মেয়েটির হাত ধরল। স্পর্শ পাওয়া মাত্র তীব্র চিৎকার করে মেয়েটি ঝটকা মারল নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে। সুদীপ প্রথমে টালমাটাল হল। মেয়েটির শরীরে ভাল শক্তি আছে। ওর নখের আঘাতে তার মুখ জ্বলছে। মুহূর্তের জন্যে আলগা হয়েছিল মেয়েটি। এবং সেই সুযোগে আবার ছুটতে চাইল। আক্রমণ, বিশেষত নখের জ্বালায় মাথায় আগুন জ্বলে গেল সুদীপের। সে প্রচণ্ড জোরে মেয়েটিকে আঘাত করল। মেয়েটি টলে গেল, তারপর হুমড়ি খেয়ে আছড়ে পড়ল পাথরের ওপরে যেখান থেকে খাদের দূরত্ব খুব বেশী নয়। চাঁদের ঠিক নিচে দাঁড়িয়ে সুদীপ নিজের মুখে হাত বোলাচ্ছিল। তার গালের চামড়া ছড়ে গিয়ে রক্ত ঝরা এখনও বন্ধ হয়নি। শালা, মেয়েটার উপকার করতে গিয়ে এই হল। নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল তার। সেই সময় আনন্দর গলা কানে এল, 'মেরে ফেললি নাকি? অত জোরে মারতে আছে?'

'জ্ঞান দিস না। দ্যাখ, আমার মুখের কি অবস্থা করেছে! নেকড়ে মাইরি, পাহাড়ি নেকড়ে।' সুদীপ ঝাঁঝিয়ে উঠল। আনন্দ ওর মুখের দিকে তাকাতে জ্যোৎস্নায় রক্ত দেখল। সে একটু উদ্বেগের সঙ্গে বলল, 'চটপট ঘরে গিয়ে ডেটল লাগা। মানুষের নখের বিষ, তার ওপর।' সে এগিয়ে গেল মেয়েটির কাছে। ঝুঁকে দেখল ওর নিঃশ্বাস পড়ছে। কিন্তু চেতনা নেই। আঘাত বোধ হয় বেকায়দায় হয়ে গেছে। এখন যদি মেয়েটার কিছু হয় তাহলে গ্রামবাসীরা উল্টে তাদের দায়ী করবে। সুদীপটা এখানে আসার পর থেকে ইচ্ছে বা অনিচ্ছায় একটার পর একটা ঝামেলা বাঁধাচ্ছে। উঠে দাঁড়িয়ে আনন্দ উষ্ণ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুই এটা কি করলি? এত জোরে কাউকে মারতে আছে! এ মেয়েটা মরে গেলে কি হবে?'

'ওতো মরতেই যাচ্ছিল।' সুদীপ এগিয়ে এল কাছে, 'ঠিক আছে, তুই যা, আমি দেখছি।'

আনন্দ কাঁধ ঝাঁকাল। সে আর দাঁড়াল না। আর একটা নতুন ঝামেলা আসছে কিন্তু তার কিছু করার নেই। যাওয়ার আগে সে বলে গেল, 'মেয়েটার জ্ঞান ফিরলে বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে চলে আসিস। রাত শেষ হতে চলল।'

সুদীপ কোন জবাব না দিয়ে মেয়েটার মাথার পাশে একটা পাথরে বসল। এখন তার আরও বেশী ঠাণ্ডা লাগছে। সে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে আনন্দর চলে যাওয়া দেখল। একটু ঝুঁকে সে মেয়েটার গালে চড় মারতে লাগল আলতো করে, 'অ্যাই অ্যাই মেয়েটা, উঠে পড়।' বেশ খানিকটা চেঁচামেচির পর চোখ মেলল মেয়েটা। দৃষ্টি স্বচ্ছ হতেই সে আতঙ্কিত হতে গিয়ে অবাক হল। দুর্বোধ্য একটা শব্দ করে আঙুল তুলে সে সুদীপের মুখটাকে দেখাতে চাইল। সুদীপ ঠোঁট ওল্টালো, 'এ তোমারই দান খুকী। এবার ঘরে যাও।'

বাংলায় বলার জন্যেই সম্ভবত মেয়েটা কিছু বুঝতে পারল না। সুদীপ এবার তাকে হাত ধরে দাঁড় করাল। উঠে দাঁড়িয়েই মেয়েটা আবার কান্না শুরু করল। একটু নার্ভাস গলায় সুদীপ তাকে বলল, 'শোন, আত্মহত্যা করা খুব কাজের ব্যাপার নয়। কার জন্যে নিজেকে মারছ? পৃথিবীটা কি ভাল, একে ছেড়ে যেতে হয়। ওই দ্যাখ, মাথার ওপর কি সুন্দর চাঁদ! তুমি একে আর দেখতে পাবে মরে গেলে? অবশ্য এখানে আর কিছুক্ষণ দাঁড়ালে আর খাদে ঝাঁপ দিতে হবে না, এমনিতেই পৃথিবী ছাড়তে হবে। তার চেয়ে আজ রাত্রে তোমার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। চল।' এসব কথাই সুদীপ বলছিল হিন্দীতেও নয়, কিন্তু মেয়েটা যেন তার অর্থ বুঝতে খুব চেষ্টা করছিল। এবং তার হাতের ইঙ্গিত বুঝে চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। সুদীপ ওর কাঁধ ধরে টানতে মেয়েটা সম্মোহিতের মত হাঁটতে লাগল। পুরোটা পথ কেউ কোন কথা বলল না। গ্রামের ভেতর ঢুকে সুদীপ ভাঙা শব্দ ব্যবহার করে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার ঘরটা কোথায়?' মেয়েটা এবার চারপাশে তাকাল। তারপর একটা খোলা দরজা আঙুল তুলে দেখাল। সেই দরজার কাছে ওকে পৌঁছে দিয়ে সুদীপ ফিরল। যেন হঠাৎ বিরাট একটা বোঝা তার মাথা থেকে নেমে গেল। অত্যন্ত হালকা পায়ে সে চাঁদ মাথায় নিয়ে হাঁটতে চোখ তুলল ওপরে। তারপর স্মৃতি থেকে শব্দ তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল, 'এইখানে/পৃথিবীর এই ক্লান্ত এ অশান্ত কিনারার দেশে/এখানে আশ্চর্য সব মানুষ রয়েছে।/তাদের সম্রাট নেই, সেনাপতি নেই/তাদের হৃদয়ে কোন সভাপতি নেই;/শরীর বিবশ হলে অবশেষে ট্রেড-ইউনিয়নের/কংগ্রেসের মত কোনো আশা হতাশার কোলাহল নেই।'

আস্তানায় ফিরে এসে ও দাঁড়িয়ে পড়ল। আনন্দ প্রায় চিৎকার করে বলছে, 'তোদের জন্যে আমি পাগল হয়ে যাব জয়িতা। একজন দার্জিলিং-এ গেল তো গেলই। আর একজন এমনভাবে মেয়েটাকে মেরেছে যে মরে গেলে আর দেখতে হবে না। তারপরে তুই-ও-!'

'আমি কি?' জয়িতার গলা তীক্ষ্ণ, 'আমি তোর কি অসুবিধে ঘটালাম?'

'এই ঠাণ্ডায় তুই আমাকে বাইরে যেতে বললি। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করতে নিজেই যাচ্ছিস! ব্যাপারটা কি তা জানাবার প্রয়োজন বোধ করছিস না। হঠাৎ যে কি খামখেয়ালিপনা শুরু হল সবার!'

'তুই অযথা উল্টোপাল্টা ভাবছিস।'

'অযথা? ও। তোর যদি প্রাকৃতিক প্রয়োজন থাকে সেটা বলতে পারতিস। প্রশ্ন করলে যা হোক জবাব দিলে কি হয়? উই ওয়ান্টটুডু সামথিং হেয়ার। নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হোক চাই না।'

'ঠিক আছে। আমি নিজে কিভাবে বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তুই ভুলে গেছিস আমি একটা মেয়ে। আই অ্যাম হ্যাভিং মাই পিরিওড্। এই ঘরে সবার সামনে—!' জয়িতার গলাটা থেমে গেল।

'যাচ্চলে! এটা নিয়ে এত ভাবনা করার কি আছে! এতক্ষণ বলতে কি হচ্ছিল! তোরা না এখনও এইট্টিন সেঞ্চুরিতে থেকে গেলি। এটা অন্তত

'তোর কাছে আশা করিনি।'

'তুই এমন গলায় বলছিস যেন আমার হাত কেটে গেছে!'

'তার বেশী কি! শোন, ওই ব্যাগটা এখানে আনার পর খোলা হয়নি। ওটা তোর প্রয়োজনে লাগবে। আমি বাইরে যাচ্ছি।'

'কি আছে ওতে?'

'তোর প্রয়োজনীয় জিনিস।'

'মাই গড! তুই এসব এনেছিস? কখন আনলি?'

আনন্দর গলা শোনা গেল না। কিন্তু দরজা খোলার শব্দ হল। জয়িতার চিৎকার কানে এল, 'আনন্দ, তুই খুব ভাল, খুব। আই অ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ।'

আনন্দকে দেখা গেল! 'থাক আর ন্যাকামো করতে হবে না। ছেলে বলেই ভেবে এসেছিস এতদিন, বন্ধু বলে নিতে পারিসনি!' তারপরেই আনন্দ সুদীপকে দেখতে পেল। সুদীপ চুপচাপ সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে ছিল। চোখাচোখি হতে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'মেয়েটাকে পৌঁছে দিয়েছিস?'

সুদীপ নীরবে ঘাড় নাড়ল। আনন্দ এগিয়ে এল, 'এই নে, আচ্ছা দাঁড়া, মুখ তোল, আমি লাগিয়ে দিচ্ছি।' সুদীপ দেখল আনন্দর হাতে ডেটল আর তুলো। সে ঠোঁট কামড়ালো। হঠাৎ তার শরীর সমস্ত জলকণা বুকের মধ্যে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। প্রাণপণে নিজেকে শাসন করার চেষ্টা করছিল সে। আনন্দ ডেটলে ভেজানো তুলো মুখে চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'কাঁদছিস! এত জ্বলছে?'

সুদীপ কোন কথা বলল না। অনেক কষ্টে সে নিজেকে অতিক্রম করতে পারল। তারপর ছাউনির তলায় পা ভাঁজ করে বসল। আনন্দ বসতে বসতে বলল, 'যা ঠাণ্ডা, আমার স্কিন ডিজিজ না হয়ে যায়! নাক-টাক সবার ফেটে গেছে।'

সুদীপ কিছু বলল না। ওর কথা বলতে খুব ভয় হচ্ছিল। জ্যোৎস্না ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে আসছে। চাঁদের যেন আর সে তেজ নেই। সুদীপ লক্ষ্য করল আনন্দ জয়িতার ব্যাপারটা বলল না। একই বয়সী, অথচ এই মুহূর্তে সুদীপের মনে হল আনন্দ অনেক এগিয়ে আছে। সে এইভাবে কথা বলতে পারত না জয়িতার সঙ্গে।

আনন্দ বলল, 'আর ক'দিনের মধ্যে বরফ পড়বে। আমরা তো কেউ কখনও বরফের মধ্যে থাকিনি। বই-পড়া বিদ্যেগুলো কাজে লাগানো যাবে। কিন্তু এ বছর খুব দেরি হয়ে গেলেও, এর মধ্যে বুঝলি, যতটা পারি গুছিয়ে নিতে হবে যাতে লোকগুলো বরফের সময় কিছুটা আরাম পায়।' সে যেন কিছু ভাবছিল, 'সুদীপ, কাল তুই একটা কাজ করিস। এই গ্রামে ঠিক কটা পরিবার আর পরিবার পিছু মানুষের সংখ্যা কাউন্ট করে নিস। সেই বুঝে আমাদের একটা হিসাব করতে হবে। এই গ্রামটার চেহারা একদিন পাল্টে দিতে হবে সুদীপ। প্রত্যেকটা মানুষ যেন বুঝতে পারে সে জন্মেছে শুধু মরে যাওয়ার জন্যে নয়।'

আনন্দর স্বরে উত্তেজনা ছিল। সুদীপ ওর দিকে তাকাল। আনন্দর বাবা নকশাল রাজনীতি করতেন। আনন্দ একদিন বলেছিল ওর প্রপিতামহ গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলনের শরিক ছিলেন, জেলও খেটেছেন। ওর রক্তে অনেক বিশ্বাস অবিশ্বাস মেলামেশি করে নিজস্ব চেহারা তৈরী করে নিয়েছে। গোটা ভারতবর্ষের চেহারা ফেরানোর কথা অনেকেই ভাবে। কিন্তু সেটা ভাবনার পর্যায়ে থেকে যায়। বুর্জোয়াদের সঙ্গে বাঁচার তাগিদে যারা আঁতাত করে তাদের ওরা গালাগাল দিয়ে থাকে। তত্ত্বের বাঁধা পথ থেকে সামান্য বিচ্যুতি ঘটলেই সংশোধনবাদের গালাগালি কপালে জোটে। কিন্তু কেউ এগিয়ে এসে বিপ্লবটাকে দেখিয়ে দেয় না। নিজের নিজের নিরাপদ বৃত্তে বাস করে কম্যুনিজমের তত্ত্বটাকে কপচে যাওয়ার মধ্যে একটা বিপ্লবী চরিত্র প্রকাশ করাই এদের একমাত্র মুক্তি। এই সব চিন্তা শুধু রোবট তৈরী করায় বিশ্বাসী, মানুষ সৃষ্টিতে নয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমে আনন্দ তারপর তারা অবশ্যই ব্যতিক্রম। এই দেশে ব্যক্তি হত্যা বা অস্ত্র ব্যবহার করে কখনও বিপ্লব আসবে না। বিপ্লব আসতে পারে ভালবাসা যদি প্লাবনের মত ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। একটা গ্রাম, একেকটা গ্রাম, সেই গ্রামগুলোর সমষ্টি একটা জেলা, সেই জেলাগুলোর সমষ্টি একটা প্রদেশ এবং প্রদেশগুলো একত্রিত হয়ে গেলে পুরো একটা দেশ যখন একসঙ্গে হাত মেলাবে তখনই বিপ্লব। এই গ্রামে কোন মধ্যবিত্ত নেই। উচ্চবিত্ত থাকার প্রশ্নই ওঠে না। অনেক মানুষ আছে এইখানে। 'স্বাভাবিক মধ্যশ্রেণী, নিম্ন শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিধি থেকে ঝরে/এরা তবু মৃত নয়।' জীবনানন্দের লাইনগুলো গুন-গুন করল সে আনমনে। সেটা কানে যাওয়া মাত্র আনন্দ মুখ ফেরাল, 'বাঃ! একটা পদ্য বল তো।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'না। কবিতার কথা মনে হলেই উল্টো-পাল্টা লাইন মাথায় আসছে। তুই বল।'

আনন্দ মাথা নাড়ল। তারপর দরাজ হল, 'তোমাকে দেখার মত চোখ নেই তবু/গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই তুমি/আজো এই পৃথিবীতে রয়ে গেছ।/ কোথাও সান্ত্বনা নেই পৃথিবীতে আজ/বহুদিন থেকে শান্তি নেই—' কে আসছে?'

শেষ শব্দ দুটো যেন কবিতারই মনে হয়েছিল সুদীপের। চোখ তুলতে দেখল মাঠ ভেঙ্গে উঠে আসছে কেউ। এত রাত্রে, বলা যায় রাত শেষের রাত্রে, ওই রকম ক্লান্ত পায়ে কে আসে? সুদীপ বলল, 'বুঝতে পারছি না।' পেছন থেকে জয়িতার গলা ভেসে এল, 'থামলি কেন আনন্দ?'

ওরা মুখ ফিরিয়ে দেখল, জয়িতা দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। মৃত জ্যোৎস্নায় তাকে যেন অশরীরী বলে মনে হচ্ছে। আনন্দ বলল, 'কেউ আসছে! কল্যাণ নয় তো?'

সুদীপ বলল, 'দূর! ওই হাঁটা ছেলেদের হতেই পারে না।'

জয়িতা টিপ্পনি কাটল, 'আমাদের সঙ্গে একজন মহিলা-বিশেষজ্ঞ আছে।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'বাংলাও বলতে পারিস না? ওই শব্দটার মানেও জানিস না।'

এই সময় মেয়েটিকে ওরা দেখতে পেল। সুদীপ বলে উঠল, 'একি রে! এ যে আবার ফিরে এল।'

আনন্দ জয়িতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই ওটা দ্যাখ তো!'

জয়িতা এগিয়ে এল বারান্দার কোণায়। মেয়েটি তক্ষণে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের দিকে একবার তাকিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'আমি ও ঘরে একা থাকতে পারব না।'

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'কেন? তোর সঙ্গে কে থাকত এতদিন?'

মেয়েটা উত্তর দিল না কথাটার। গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জয়িতা বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোর সঙ্গে এতদিন কে ছিল বললি না, কিন্তু কেন থাকতে পারবি না সেটা বল।'

'আমার ভয় করছে।'

'ভয়! কেন ভয় করছে? তুই তো বেশ ওদের সঙ্গে চলে যাচ্ছিলি না!'

'সেই জন্যেই তো ভয় করছে। গেলামও না, আবার গ্রামের কোন পুরুষও আমার কাছে এখন ঘেঁষবে না। এই সুযোগে দানোটা পাহাড় থেকে নেমে আসবে। দানো যে মেয়ের ওপর—।'

'দানোটা কে?'

'পাহাড়ে রাত হলে কেঁদে কেঁদে ডাকে, শোননি তোমরা?'

'তাহলে তুই কি চাস?'

'আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব এখানে।'

হঠাৎ জয়িতার গলা শীতল হল, 'না। তোমার এখানে থাকা চলবে না। ঠিক আছে, তোমার যদি ওখানে একা শুতে ভয় করে তাহলে আমি থাকব তোমার সঙ্গে। আমার কাছে যে অস্ত্র আছে তার ভয়ে তোমার দানোর বাবাও কাছে আসবে না।' তারপর আনন্দের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি যদি ওর ঘরে থাকি তোদের আপত্তি আছে?'

'উইদ প্লেজার।' সুদীপ বলল, 'এতে তোর প্রাইভেসিও থাকবে। কিন্তু মেয়েটা মনে হচ্ছে আমার প্রেমে পড়েছে। কেমন ঘুরে ঘুরে আমার দিকে তাকাচ্ছে দ্যাখ।'

জয়িতা কথা না বাড়িয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। সুদীপ মেয়েটাকে বলল, 'তুমি আমায় কি করছ দ্যাখো! গ্রামের অন্য কেউ হলে তোমাকে মেরেই ফেলত।'

মেয়েটা ঝকমকিয়ে হাসল, 'গ্রামের কেউ হলে আমাকে বাঁচাতেই যেত

না।'

এই সময় জয়িতা তার বিছানা গুটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল, 'আনন্দ, সুদীপটাকে বারণ কর। ও বেড়ালকে মাছ দেখাচ্ছে। মানুষকে প্রভোক করা একই অপরাধ।'

ঠিক তখনই চিৎকার উঠল। কান্নাটা আকাশে আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। ওরা পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে সেই নারীকণ্ঠের বিলাপ শুনছিল। ক্রমশ সেই চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে আশেপাশের ঘরে কণ্ঠ পরিষ্কার হল। এই সময় সামনে দাঁড়ানো মেয়েটি বলে উঠল, 'যাঃ, মরে গেল!'

কথাটা কানে যাওয়া মাত্র বিছানা ফেলে রেখে জয়িতা দৌড়তে লাগল। আনন্দ একবার ঘরের দিকে তকাল। সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কে মরেছে রে?'

আনন্দ বলল, 'মনে হচ্ছে সেই বাচ্চা মেয়েটা। তুই এখানে থাক। ঘরে মালপত্রগুলো আছে। তাছাড়া ওরা এখন তোকে দেখুক তা আমি চাই না।' বলেই সে ছুটল। সুদীপ খুব নার্ভাস হয়ে গেল।

এখন অবশ্য তাদের কাছে অস্ত্র আছে। কিন্তু ওই মেয়েটা যদি মরে যায় তাহলে গ্রামের মানুষরা ছেড়ে দেবে না বলে শাসিয়ে রেখেছে। তার মনে হল অস্ত্রগুলো হাতের কাছে রেখে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তারপরেই সে মন পাল্টালো। সে বাচ্চা মেয়েটার কোন ক্ষতি করেনি। উপকার করতে গিয়ে যদি লোকে ভুল বোঝে তো তার কিছু করার নেই। দেখাই যাক, কি হয়। সে দেখল মেয়েটা তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি গেলে না?'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'না।' মেয়েটি হাসল, 'না গিয়ে ভালই করেছ। ওরা তোমাকে দেখলেই খেপে যেত। কর্তার তো আর বাচ্চা হবে না। পনের বছরের স্ত্রী এতদিন ছেলের মতো ছিল।'

'তুমি যাও না।' সুদীপ মেয়েটিকে এড়াতে চাইল এবার।

'না বাবা, আমি মৃত্যু দেখতে পারি না। ভীষণ ভয় লাগে।' মেয়েটি উদাস গলায় বলল।

'ভয়! অথচ নিজে তো মরতে যাচ্ছিলে।' সুদীপ খিচিয়ে উঠল। মেয়েটি কিছু মনে করল না। সুদীপের দিকে তাকিয়ে আবার হাসল।

জয়িতা দেখল বেশ ভিড় জমে গেছে এর মধ্যে। মেয়েটির মা পাগলের মত মাথা ঠুকছে। বোঝা গেল একটু আগেই ওর প্রাণ বেরিয়ে গেছে। জয়িতাদের দেখে ভিড় আলগা হল। ওরা সেই পথে ঘরে ঢুকে দাঁড়াল। মেয়েটির কিশোর স্বামী মাথা নেড়ে জানাল মরে গেছে। এবার মহিলার নজর পড়ল ওদের দিকে। জয়িতা ভেবেছিল সে নির্ঘাৎ একটা কাণ্ড করবে। কিন্তু কিছুই না করে আশ্চর্যজনকভাবে কান্নাটা থামিয়ে দিল। জয়িতা এগিয়ে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখল। এখন কিছুই করার নেই। আনন্দ বাইরে বেরিয়ে এল। তার মনে হল উপস্থিত জনতা তাকে লক্ষ করছে। পালদেম ধারে কাছে নেই। সম্ভবত ও কোন অপ্রিয় ব্যাপারের মুখোমুখি হতে চায় না। কাউকে ডেকে নিজেদের অপরাধহীনতার কথা বোঝানোর চেষ্টা করাও বৃথা। সে ঠিক করল পরিস্থিতি যেমন হবে তেমন করা যাবে। ভেতর থেকে আর কান্না ভেসে আসছে না। হঠাৎ যেন থমথমে হয়ে গেল চারপাশ। আজ তাপল্যাঙের মানুষ ঘুমাতে পারছে না। আগুন জ্বলে উঠেছে চার পাঁচ জায়গায়। সেগুলো ঘিরে বসে আছে সবাই। অন্ধকারে কোন মানুষ পৃথিবী থেকে চলে গেলে ভোরের জন্যে জেগে বসে থাকতে হয়। কারণ চোখ বন্ধ করলেই মৃতরা ডাক দিতে পারে সঙ্গী হওয়ার জন্যে।

এই সময় কাহুনকে আবার নেমে আসতে দেখল আনন্দ। গম্ভীরমুখে দু'জন অনুচরকে নিয়ে কাহুন এগিয়ে যাচ্ছেন ঘরের দিকে যেখানে মৃত মেয়েটি শুয়ে রয়েছে। আনন্দর সামনে দিয়ে তিনি যখন যাচ্ছিলেন তখন সে নীরবে মাথা নাড়ল। কিন্তু তার কোন প্রতিক্রিয়া হল না কাহুনের মধ্যে। এবার পালদেমকে দেখা গেল। কোন একটা অগ্নিকুণ্ডের পাশে সে নিশ্চয়ই বসেছিল, কাহুনকে দেখে এগিয়ে এল। দু'জনে চাপা গলায় কিছু বলল। তারপর দু'জনেই ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। মুহূর্তের জন্যে আনন্দর মনে হল এই অশিক্ষিত এবং কুসংস্কারগ্রস্ত মানুষদের বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। এই মুহূর্তে ওরা লাফিয়ে পড়তে পারে তাদের ওপরে। এবং কাহুন যদি নির্দেশ

'দেন, ধর্মের নামে তাহলে তো কথাই নেই। বন্দুকের সঙ্গেও হয়তো খালি হাতে লড়ে যেতে চাইবে। অতএব এখান থেকে আপাতত আস্তানায় সরে যাওয়াই উচিত। রাতের অন্ধকারে মানুষের মুখ যতই অচেনা হয়ে যাক দিনের আলোয় তার মোকাবিলা করা সহজ। সে চিৎকার করে জয়িতাকে ডাকল। এবং তার এই চেঁচিয়ে কথা বলায় গ্রামবাসীরা তো চমকে তাকালই, তার নিজের কানেও অত্যন্ত কর্কশ ঠেকল।

জয়িতা বেরিয়ে এল বিস্মিত মুখে। চারপাশে তাকিয়ে আনন্দকে লক্ষ করল। তারপর দ্রুত দূরত্বটা কমিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ওরকম অসভ্যের মত চিৎকার করছিস কেন?'

আনন্দ বলল, 'আই অ্যাম সরি। কিন্তু মনে হচ্ছে আমাদের এখানে থাকাটা উচিত হবে না।'

'কেন? তোকে কেউ কিছু বলেছে?' জয়িতা যেন তখনও বিরক্ত।

'না। কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে কথা বলছে না। পালদেম তো সামনেই আসেনি। ওরা বলেছিল মেয়েটা মরে গেলে আমাদের ছাড়বে না। আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার।' আনন্দ চারপাশে তাকাল।

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'ওরা আমাদের ভয় করছে। আমাদের হাতের অস্ত্রের শক্তি ওরা বুঝেছে। উপায় ছিল না, কিন্তু এভাবে ভয় বাড়তে আরম্ভ করলে আমাদের কখনই ওরা বিশ্বাস করতে পারবে না। এই গ্রামে আমরা চিরকালই বিদেশী হয়ে থাকব। ওরা ভয়ে তোর সঙ্গে কথা বলছে না।'

'তোর সঙ্গে বলছে? তোরই হাতে রিভলভার ছিল।' আনন্দ জিজ্ঞাসা করল।

'প্রথমে করেনি। কিন্তু মেয়েটার মা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতেই যেই আমার চোখে জল এসে গেল তখন আবার কাঁদতে শুরু করেছে।'

'মহিলা তোকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল?' জয়িতার কথা অবিশ্বাস্য ঠেকল আনন্দর কাছে।

'শোক বড় বিচিত্র অনুভূতি। ধরাবাঁধা ব্যাখ্যায় তাকে ধরা যায় না। মেয়েটির শেষকৃত্য হবে সূর্য ওঠার মুহূর্তে। সেই অনুষ্ঠানে আমরা অংশ নেব। তুই সুদীপকে ডাক।' কথাটা শেষ করে জয়িতা আবার ভেতরে ঢুকে গেল। আনন্দ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ তার নিজেকে একজন টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত বলে মনে হল। অতিক্রম করতে চায় সে কিন্তু এক একটা শেকড় এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যে—। কাকে দোষ দেবে সে এ জন্যে? এখানে আসার পর জয়িতা যতটা সহজ এবং খোলা মনে এগোচ্ছে ততটা সে কেন পারছে না? আনন্দ হাঁটতে শুরু করল। শিক্ষাই মানুষকে শিক্ষিত করে। একটু একটু করে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টাই তো আসল কথা।

আস্তানায় ফিরে সুদীপকে সে বাইরে দেখতে পেল না। আনন্দ একটু বিস্মিত হল। তারপর ঘরের দরজা খুলে অন্ধকারে মুখ বাড়াল, 'সুদীপ?'

সুদীপের গলা ভেসে এল, 'বল।'

'ও। তুই শুয়ে পড়েছিস। ওঠ।'

'আবার উঠতে হবে কেন? সারাটা রাত এভাবে জেগে থাকা যায়?'

'মেয়েটাকে সূর্যোদয়ের সময় সৎকার করা হবে। আমাদের তিনজনের সেখানে থাকা উচিত।'

'আমাকে দেখলে ওরা খেপে যাবে না?'

'যেতে পারে, আবার নাও পারে।'

'তাহলে?'

'রিস্ক নিতে হবে।'

'আমি সঙ্গে মাল নিয়ে যাব।'

'না। সেটা আরও শত্রুতা বাড়াবে। মেয়েটা কোথায়?'

'ও-পাশে শুয়ে আছে।'

'অ্যাঁ, এই ঘরে?'

'তাছাড়া ঠাণ্ডায় যাবে কোথায়? ও একটু বেশী বকে, কিন্তু মনটা ভাল।'

'এর মধ্যে মনের খবর নিয়ে ফেলেছিস!'

'বাজে বকিস না। প্রেমট্রেম আমার দ্বারা হবে না।' সুদীপ উঠে একটা মোমবাতি জ্বালালো, 'মোমবাতির স্টক শেষ হয়ে আসছে।'

'অনেক কিছুই শেষ হয়ে আসছে।'

'আনন্দ! আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার যদি দলের স্বার্থের ক্ষতি না করে তাহলে তোদের কিছু বলার নেই। শুধু উটকো মন্তব্য করিস না।' সুদীপ আবার পোশাক চড়িয়ে নিচ্ছিল। আনন্দ দেখল মেয়েটা খানিকটা দূরে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। এই ঠাণ্ডায় কোন মানুষ ওইভাবে শুয়ে থাকতে পারে বিছানা ছাড়া? সে মেয়েটির কাছে গিয়ে বলল, 'ওঠো।'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'ওকে তুলছিস কেন?'

'এই ঘরে ওকে একা রেখে যেতে পারি না।'

মেয়েটি থতমত হয়ে উঠে বসল। সুদীপ তাকে ইশারায় ডাকল বেরিয়ে আসতে। কোন প্রতিবাদ না করে মেয়েটি ওদের সঙ্গে বেরিয়ে এল। আনন্দ লক্ষ করল মেয়েটি সুদীপের পেছন পেছন হাঁটছে। ব্যাপারটা তার ভাল লাগল না কিন্তু কোন মন্তব্য করল না সে।

ভোর হতে আর দেরী নেই। আকাশে স্বর্গীয় রঙের খেলা শুরু হয়েছে। পাহাড়ের চূড়োয় বরফ আরও নিচে নেমে এসেছে। এই সময় ওরা চিৎকারটা শুনতে পেল। ওপাশের পাহাড় থেকে চিৎকার করতে করতে মানুষটা নেমে আসছে। আনন্দরা তখন গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। সবাই উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে। দৌড়ে দৌড়তে মানুষটা কাছে আসতে প্রথমে চিনতে পারেনি আনন্দ। ছেলেটা একটি অগ্নিকুণ্ডের সামনে পৌঁছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ভিড়ের মধ্যে থেকে পালদেম ছুটে এল তার কাছে। ছেলেটা হাঁপাচ্ছে। প্রায় সাদা হয়ে গেছে ওর মুখ। আগুনের কাছে ওকে নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষা চলল কিছুক্ষণ। কেউ যেন একটা পাত্রে খানিকটা তরলপদার্থ এনে ওর মুখে ঢেলে দিল। একটু ধাতস্থ হয়ে ছেলেটা কথা বলতে শুরু করল জড়িয়ে জড়িয়ে। খানিকটা শোনার পর পালদেম চমকে আনন্দের দিকে এগিয়ে গেল। ছেলেটির এক হাতে তখনও বিরাট ঝোলাটা ধরা। পালদেম সেটাকে ছাড়িয়ে নিল আস্তে আস্তে। পালদেমের দৃষ্টি অনুসরণ করে আনন্দ কাছে যাওয়া মাত্র ছেলেটি আচমকা কাঁদল।

পালদেম মুখ নিচু করল। তারপর বলল, 'তোমাদের বন্ধুকে পুলিস মেরে ফেলেছে।'

বুকের মধ্যে ধক করে লাগল আনন্দর। তার সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে গেল। কল্যাণ নেই? কল্যাণ! সে কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।

পেছন থেকে সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে? পালদেম কি বলল?'

পালদেম বলল, 'তোমাদের বন্ধু আমাদের বন্ধু। না হলে সে আমাদের জন্যে ওষুধ আনতে যেত না। ওষুধ এনে এই ছেলেটির হাতে পৌঁছে দিতে পারত না।'

হঠাৎ ছুটে এল সুদীপ ছেলেটির সামনে। দু'হাতে তাকে খামচে ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে? কল্যাণের কি হয়েছে?'

ছেলেটি কোন কথা বলতে পারল না। কোনরকমে ঝোলাটাকে আঙুল দিয়ে দেখাল। সুদীপ সেখানে চাপ চাপ রক্ত দেখতে পেল। রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে। সে পাগলের মত ঝোলা খুলতেই প্রচুর ওষুধ এবং সিগারেটের প্যাকেট দেখতে পেল। সব কিছুই রক্তের ছোঁয়ামাখা। হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সুদীপ। গ্রামের মানুষগুলো পাথরের মত মাথা নিচু করে চারপাশে দাঁড়িয়ে। আনন্দ কোন কথা বলতে পারছে না। তার চিন্তাশক্তি অসাড় হয়ে গিয়েছিল। সে কল্যাণের মুখটাকেই কল্পনা করতে পারছিল না। এই সময় জয়িতার গলা পাওয়া গেল, 'পালদেম, কাহুন বলছেন আর দেরী করা যাবে না।'

পালদেম তার দিকে তাকাল। সুদীপ চিৎকার করে কেঁদে উঠল, 'জয়ী, কল্যাণ মরে গেছে। আমি-আমি-ওকে-!'

জয়িতার মুখ অগ্নিকুণ্ডের আলোয় ঈশ্বরীর মত মনে হচ্ছিল। সে আনন্দর দিকে তাকাল। তারপর গ্রামের মানুষদের বলল, 'আমাদের এক বন্ধুর কথা তোমরা শুনলে। এসো, এই সূর্যোদয়ের মুহূর্তে বাচ্চা মেয়েটির শরীর সৎকারের জন্যে নিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের বন্ধুর আত্মাকেও নিয়ে যাই। ও তোমাদের জন্যে একটা কাজ করতে গিয়েছিল। তোমাদের আপত্তি আছে?' সবাই মাথা নাড়ল, না। না। না। শব্দটা ছড়িয়ে পড়ল হিমালয় পর্যন্ত।

হঠাৎ সুদীপ বিড় বিড় করল, 'জয়ী, তুই মানুষ?'

'হ্যাঁ মানুষ।' জয়িতা কান্নাটা সামলালো, 'কল্যাণ এখানে আমাদের পায়ের তলায় মাটি দিয়ে গেল। শহীদের জন্যে কাঁদব কেন? আমি গর্বিত।'

(ক্রমশ)

ছবি: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

এ হৃদয় তোমার হৃদয়ে

বিষ্ণু দে

শান্ত করো এ হৃদয় তোমার হৃদয়ে শীতল মাটিতে
যেখানে ঘনায় ছায়া বনে বনে কোমল মর্মরে
তোমার মনের নীলে অশান্ত হৃদয়
বাসা পাক আকাশের ভিতে
তোমার মুখের মেঘ সেঁচা বিদ্যুতের
স্নিগ্ধধারা মুখে দাও খর ধারা আষাঢ়ের বানে
বাহুতে আশ্রয় দাও পাহাড়ে ঘেরাও দীঘির কল্লোলে
বুকে বুক একতালে দোলে বাহুতে বাহুতে
শান্ত করো এ হৃদয় তোমার হৃদয়ে
তোমার দেহের দীর্ঘ সমুদ্র হিল্লোলে
বালুচরে কটীতে উদরে। ঊরু জানু নীবি
তোমার দেহের আহা ছায়াঘন নীলিমাগহ্বরে
অতলান্ত সরোবরে শান্ত করো প্রখর সন্ত্রাস
তাপের উত্তীর্ণ প্রেম তোমার বাহুর ঢেউয়ে তোমার হৃদয়ে
দেহমনে আষাঢ় মিলনে আকাশ পৃথিবী
মেলাও তোমার ক্লান্তি আমার আবেগে
মেলাও গম্ভীর মেঘে পৃথিবী আকাশ ॥

তা-না-না-না করতে করতে

ব্রত চক্রবর্তী

ছাতা খুললেই দেখি
বৃষ্টির ভাঁড়ার ফুরিয়ে যায়।
অথচ ঝাড়া-হাত-পা বেরোলেই
আকাশের নীল চাঁছোযায় এমন ফুটো বেরোয়,
গেঞ্জির নীচের হৃদয়-টিদয় পর্যন্ত
ভিজে যায়।

খুব সতর্ক আর খুব চতুর হয়ে
কিছুদিন থেকে দেখেছি যে,
দিব্যি থাকা যায়।
কিন্তু যাকে জড়িয়ে ধরে দুটো-একটা
চুমু-টুমু না খেলে
বুকে হাঁফ ধরে, বুকের বাতাস কমে যায়,
সেই তাকে, জীবনকে, হাতের নাগালে পাচ্ছি না।

সেই থেকে আমি
কাদায়, কাঁটায়, রোদ্দুরে, মেঘে,
হুটহাট যাই, আসি।
পুড়ি, ভিজি, হুমড়ি খাই, আবার দাঁড়াই,
আবার হুমড়ি খেতে খেতে দেখি:
যাবো কি যাবো না তা-না-না-না করতে করতে
কখন, হঠাৎ, দিন ফুরিয়ে গেছে!

আমাদের সময় নেই

শান্তনু দাস

এখন আমরা, যারা টেবিলে অঙ্ক কষে ছন্দ মেলাচ্ছি
বস্তুত নিশ্চিন্ত জানি না, অনায়াসে মুরগীর
নলীটা কেটে দুটো আঙুলে চাপা—
স্থির হয়ে যাওয়া মৃত্যুর যন্ত্রণা,
কিংবা আস্ত একটা কচ্ছপকে খোল থেকে
বের করার প্রাচীন উল্লাস।
আমাদের কাছে আকাশ ঠিক আকাশেরই মতো
মেয়েমানুষ বলতে—একটা জ্যান্ত শরীর।

আমাদের এখন সময় নেই
সূর্যকে রক্তজবা কুসুম হয়ে দেখা।
এখন আমরা অতি দীর্ঘ পয়ার থেকে
ভীষণভাবে মাত্রাবৃত্ত হয়ে যাচ্ছি।

কিছু নেই যার সে-ও

রঞ্জন ভাদুড়ী

আমার কিছুই নেই, তবু আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম;
সমৃদ্ধিশূন্যতা মনে কোনওদিন আনেনি তো মোহ,
কারণ বিদেহরাজ জনকের ভাবশিষ্য আমি,
এবং আমারও আছে দগ্ধীভূত মানস-মিথিলা।

এ-ছাড়া কিছুই নেই, তবুও আশ্চর্য কী যে—আসে হানাদার,
সে কি শুধু কেড়ে নিতে দিনের আয়াস আর রাতের আরাম?
তবে কি রাজর্ষি-বাক্য মিথ্যে হয়ে গেল—
কিছু নেই যার সে-ও লক্ষ্য হবে দস্যু, ঘাতকের?
কিছু নেই যার সে-ও কাটাবে না দিন
আত্মমগ্ন উদ্বেগবিহীন?

বৃষ্টিধারায়

সুরজিৎ ঘোষ

বৃষ্টিধারার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দ্রুত
তুমি আমায় বললে, "এস একবার অন্তত
বৃষ্টিপাতের গহনে যাই ফিরে।
দেখবে কত অনায়াসে মেঘের আঁচল ছিঁড়ে
দামাল কচি জলের কণা যত
মাঠের উপর ঝরছে ইতস্তত।"

আমি কিছুই দেখিনি তার, কেবল তোমার মুখ
দু'হাত ভরে নিয়েছিলাম, বলেছিলাম 'সুখ
এমনি থাকো সারাজীবন অবাধ যাওয়া আসায়
বৃষ্টিধারার ভিতর থেকে গহন গাঙে ভাসায়।'

টুকটুকির ছেলে সারথি

শ্যামলকান্তি দাশ

ছেলে যদি দেখতে হয় নারায়ণের মতো
টুকটুকি তার নাম রাখবে সারথি।
এবং সেই সারথি যদি তেলেজলে একদিন চুকচুকে হয়ে ওঠে
টুকটুকি তাকে একটা রথ কিনে দেবে।
আর সেই রথ যদি চলতে চলতে ধূলিতে-ধুলোয়
আটকে না ফেলে তার ঘর্ঘর
আর যদি তেমনভাবে সহ্য করতে পারে সে শ্যাওলা-শৈবালের ভার
টুকটুকি কয়েকটা দিন সমুদ্র থেকে চক্কর মেরে আসবে।
চক্কর দেবার পর হাতে যদি সময় থাকে অফুরন্ত,
এবং পায়ে যদি খিল না ধরে যায়,
তা হলে প্রথমেই শোবার ঘর থেকে প্যানপেনে কবিত্বকে
ঘাড় ধরে বিদায় করবে।
বিদায় করবার পর জল যদি থাকে কাকচক্ষু,
যদি টগরে গুলঞ্চে ডুবে যায় চণ্ডালের জীবন,
যদি আনারসের ঝাড়ে আর শোনা না যায় চিতি-দাঁড়াশের
রতি-তড়পানির শব্দ,
তা হলে শরীরে একটু অন্যরকম হাওয়া লাগিয়ে আসবে টুকটুকি।

হাওয়া লাগছে না বলেই তো চারদিকে এত কিচিমিচি,
দাঁত বিকশিত করে হেসে উঠছে না সকালবেলার বিদ্যুৎ,
ঝরনা ফাটিয়ে ডেকে উঠছে না দুপুরবেলার মেঘ,
জঙ্গল মাতাল করে সরু রাস্তায় দৌড়ে যাচ্ছে না সন্ধেবেলার বাঘ।
হাওয়া লাগছে না বলেই তো টুকটুকির ভ্যাবলাকান্ত বর
তার নতুন কবিতার ষষ্ঠ পঙক্তির কাছে এখন মাথার চুল ছিঁড়ছে,
শরবতি লেবু আঁকতে গিয়ে সে এখন এঁকে ফেলছে ভূমণ্ডল
কুন্তীর মুখ আঁকতে গিয়ে আঁকছে মন্থরার কুঁজ
অযোধ্যা আঁকতে গিয়ে অবলীলায় এঁকে ফেলছে হস্তিনাপুর
হাওয়া লাগছে না বলেই তো এত কাণ্ড, এত বিভ্রাট!

আর হাওয়া লাগছে না বলেই
সংসারে আসতে বড্ড দেরি করছেন সারথি।
সেই কবে থেকে পাঁকে-পঙ্কে কাদায়-কর্দমে লীলা করছেন বাবু
অথচ বেরোবার নামটি নেই!
এদিকে অপেক্ষা করতে করতে
সোনার থালায় পরমান্ন জুড়িয়ে জল হয়ে গেল!

ড্রইংরুমে, প্লেটো

বটকৃষ্ণ দে

ড্রইংরুমে ব'সে প্লেটো, প্রেম, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়োত্তরতা,
তত্ত্ব নিয়ে তথ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করলেন পণ্ডিতপ্রবর—
প্রদর্শনী ঘুরে এসে রঙ, রেখা, নন্দনতত্ত্বে দৃষ্টিকোণতা
বিষয়ে কি বিষম গবেষণা মশায়ে'র—জ্ঞান কী প্রখর!
কবিতার গন্ধ নিয়ে, শব্দ, ছন্দ, ভাব, ভাষা মিল ও অমিলে
উঃ, কী দখল!

কিন্তু, ফল?
সূর্যাস্তের সোনাগুলি গলিয়ে-গলিয়ে পাগল
আকাশ নিজেকে উন্মাদ ক'রে, রঙ ছড়িয়ে, দেউলে হয়ে গেল,—
কালো সমুদ্র-বৈশাখী, পাহাড়ী মৌনতা আপনাকে মুখর বানালো
যুবতীর স্তনভার অপার উল্লাসে এক সংগীতের অমরত্ব দিল
একটি চিত্রের হাসি জন্মজন্মান্তর ভ'রে
আঁধারের বাঁকে বাঁকে উজ্জ্বলতা আঁকে—
তারি ফাঁকে ফাঁকে, অন্ধ এক পণ্ডিতমশায়
সারাক্ষণ কী হয়নি'র হিসাব মেলায়!

এসো আমরা ঝর্ণাতলে প্লেটো-পণ্ডিতদের ভুলে
যুবতীর প্রেমে পড়ি আসক্ত সম্ভোগে,
ছবি আঁকি, গান গাই
মধ্যরাত্রে অম্লান শাশ্বত একটি কবিতার কোরক ফোটাই!

একদিন খুন হবি তুই

কৃষ্ণা বসু

একদিন খুন হবি তুই!
একদিন তোর সঙ্গে রক্তারক্তি হবে।
আমার ঘরের আনাচে কানাচে তুই অপেক্ষা করিস,
ঘনিষ্ঠ মেঘের দিনে যখন আকাশ খুব নীচু হয়ে
নেমেছে পুরনো বাড়ির উঠোনে,
কোণে কোণে জমে আছে ঠাণ্ডা ভিজে অন্ধকার,
সেই অন্ধকার থেকে তুই আমার উপর লাফিয়ে পড়িস,
আমার সমস্ত খাদ্য তুমি বিস্বাদ করেছ,
আমার সকল রমণ-মুহূর্তে তুমি ঢুকে পড়ো,
আমার সকল ভোগের ভিতর অতৃপ্তির মত
তুমি জেগে থাকো লাল-চোখ, অনিদ্রাকাতর!

একদিন খুন হবি তুই।
বিষাদ রে, তোর সঙ্গে শেষ দেখা হবে রক্তাক্ত বিকেলে,
বাড়ী ফেরবার পথে, একদিন খুন করে তোকে
আমি কিনে নিয়ে যাবো রঙিন বেলুন,
চীনা লণ্ঠনের কারুকাজ, কিনে নেবো জাহাজের ছবি
আর সার্কাসের তাঁবু, নিয়ে যাবো সহর্ষ ইলিশ,
আর সেই সঙ্গে ডেকে নেবো দুএকটি ঘনিষ্ঠ বান্ধব।

পূর্ব-পশ্চিম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যৌবন-২৬

নোয়াখালিতে বসিরের বাড়ি। বসিরের সঙ্গে আগে থেকে কথা হয়েছিল। তাই বাবুল প্রথমে নোয়াখালিতে গেল।

ভাদ্র মাস। নদী-খাল-বিল জলে একেবারে টই-টম্বুর। যে দিকে তাকাও, শুধু সজল দৃশ্য। খানিকটা বাসে আর খানিকটা নৌকোয় আসতে হলো বাবুলদের। যাত্রা পথে বাবুল অনুভব করলো, শহরের চেয়ে গ্রাম্য প্রকৃতি তাকে অনেক বেশি উদ্বেল করে। নাম না জানা ফুলের গন্ধ, জলজ শ্যাওলার গন্ধ, এমনকি পাট-পচা গন্ধের মধ্যেও একটা মাদকতা আছে। একটা বিলের ওপর দিয়ে আসার সময় এক গুচ্ছ কচুরিপানার ফুলের সঙ্গে একটা হলদে রঙের ঢোঁড়া সাপের জড়িয়ে থাকার দৃশ্য দেখে তার মনে হয়, এই মুহূর্তে, এই বিল দিয়ে না গেলে এই বিশেষ দৃশ্যটি তো জীবনে দেখা হতো না। ছবিটি অকিঞ্চিৎকর, তবু যেন চোখে লেগে থাকে।

বসিররা এক পুরুষের বুদ্ধিজীবী। বসিরের বাপ-ঠাকুর্দা চাষবাস নিয়েই থাকতেন। বসিরই লেখাপড়া শিখে সাংবাদিক হয়েছে, বসিরের এক বড় ভাই পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে বড় অফিসার ছিলেন কিন্তু তিনি কোনো অজ্ঞাত কারণে আত্মহত্যা করেছেন গত বছর। আর এক ভাই আবার একেবারে গণ্ডমূর্খ, চাষবাসও করে না, সংসারের কিছু দেখেও না, গ্রামে মাতব্বরি করে।

বসিরদের বাড়িটি একটি খালের ধারে, বেশ ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন, উঠোনের একপ্রান্ত থেকেই শুরু হয়েছে আম-কাঁঠালের বাগান। দুটি বড় বড় ধানের গোলা ও হাঁস-মুর্গির খোঁয়াড়, অবস্থা বেশ সচ্ছল বোঝা যায়, বসিরের এক চাচা এখনো দেড়শো বিঘে জমি চাষ করান।

খালের উল্টো দিকে হিন্দু পাড়া, এরা ঠিক বর্ণহিন্দু নয়, নমঃশূদ্র, এদের জীবিকা মাছ ধরা, জাল বোনা ও নৌকোয় আলকাতরা লাগানো। এদের মধ্যে আবার কিছু কিছু খৃষ্টানও রয়েছে। এই অঞ্চলে দাঙ্গা হয়নি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনো সহজ মেলামেশা আছে, পাশের গ্রামে দুর্গাপূজাও হয়।

খালের ধারে ধারে ফুটে আছে কাশফুল, শিউলি গাছেও ফুল এসেছে। কিন্তু আকাশের চেহারা এখনো ঠিক শরৎকালের নয়, মেঘ সাদা হয়নি, নীল শূন্যতা তেমন চোখে পড়ে না, যখন তখন ঝেঁকে ঝেঁকে বৃষ্টি আসে। পায়জামা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে, খালি পায়ে, দু'খানা ছাতা নিয়ে বাবুল আর বসির গ্রাম ঘুরতে বেরুলো।

খানিকটা যেতেই সদ্য গোঁফদাড়ি গজানো এক ছোকরা দৌড়োতে দৌড়োতে এসে জুটে গেল ওদের সঙ্গে। এর নাম সিরাজুল, বসিরের এক পিসির ছেলে, বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা, সে বসিরের হাত ধরে অভিমানের সুরে বললো, আপনে কাইল রাতে আসলেন, আমারে একটা খবরও দিলেন না?

বসির বললো, আবার তুই এসে জুটলি? তোরে আমি ভয় পাই!

তারপর বাবুলের দিকে ফিরে বললো, এই ছ্যামড়াডা মেট্রিক পাস করে বসে আছে, খুব ইচ্ছে কলেজে পড়ার। ওর বাপ-দাদারা ওরে পড়াবে না, তার আমি কী করি বলো তো?

সিরাজুল বললো, আমি কতবার আপনেরে কইলাম আমারে একবার ঢাকা নিয়া চলেন, তারপর আমি নিজেই সব মেনেজ করবো।

—মেনেজ তো করবি। কিন্তু ঢাকায় গিয়ে তুই থাকবি কোথায়?

—কেন, আপনের বাসায়?

বসির আবার বাবুলের দিকে তাকিয়ে বললো, আচ্ছা কও তো, আমার বাসায় ও ক্যামনে থাকবে? দুইখান মাত্র ঘর!

সিরাজুল চোখের ইশারায় জানতে চাইলো, ইনি কে?

বসির বললো, ইনি বাবুল চৌধুরী, ইকোনমিকসের লেকচারার। ঢাকায় গিয়ে যদি ল্যাখাপড়া করতে চাস তো এনারে ধর!

সিরাজুল অমনি বাবুলের দিকে তাকিয়ে কাতরভাবে বললো, সার, আমার একটা ব্যবস্থা কইরা দ্যান, সার!

বাবুল হাসলো, মফঃস্বলের ছেলেদের কাছে ঢাকার ছাত্রজীবন খুব রোমাঞ্চকর মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু দিন দিন যেরকম খরচ বাড়ছে, তাতে সাধারণ গরিব ঘরের ছেলেদের আর ঢাকায় গিয়ে পড়াশুনো চালানো সম্ভব নয়।

বসির বললো, ও মনে পড়ছে, শোনলাম, তুই নাকি এর মধ্যে শাদী

করেছিস ? ঢাকায় কে যেন খবর দিল আমারে।

সিরাজুল লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করলো।

বসির একটু ধমক দিয়ে বললো, সত্যি কথা ? এর মইধ্যেই শাদী করে ফেললে তুই আর পড়াশুনা করবি কী করে ?

সিরাজুল বললো, কী করবো। আমার আব্বায় যে জোর কইরা আমার বিয়া দিল।

—জোর কইরা বুঝি বিয়া দেওয়া যায় ? যাক যা করছোস তো করছোস, তোর বউ দেখাবি না ? চল, তোর বউ দেইখ্যা আসি।

সিরাজুল এবার মাথা তুলে উজ্জ্বল মুখে বললো, যাবেন আমাগো বাসায়, যাবেন ?

দু'পাশে পাট খেতের মাঝখান দিয়ে কাঁচা রাস্তা। কাদায় পা গেঁথে যায়। পাট গাছের ওপর প্রচুর ফড়িং ওড়াউড়ি করছে। এক জায়গায় একটা বাঁশের সাঁকো। একখানা মাত্র বাঁশ পায়ের নীচে, আর একখানা বাঁশ ধরে ধরে যাওয়া, বাবুলদের ভয় ভয় করে। সে টাঙ্গাইল ও ঢাকা শহরেই বাল্য-কৈশোর কাটিয়েছে, তেমন গ্রামের অভিজ্ঞতা তার নেই। সন্তর্পণে সেই সাঁকো পার হতে হতে সে তলার জলের দিকে তাকিয়ে দেখলো ঈষৎ লালচে রঙের এক ঝাঁক মাছের পোনা, তার পাশেই রয়েছে একটা বড়, কালো রঙের শোল মাছ, যেন বাচ্চাগুলোর পাহারাদার। বাবুল এমন দৃশ্য আগে কখনো দেখেনি, সে মোহিত হয়ে থমকে যায়।

বসিরের সাংবাদিক প্রবৃত্তি জেগে উঠেছে এর মধ্যে। সে সিরাজুলের কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এদিকে ভোটের গরম ক্যামন রে ? কে জিতবে ?

সিরাজুল বললো, ফতেমা জিন্না ! আমরা কী শ্লোগান দেই জানেন না ? 'স্বৈরাচারী আইয়ুব খান, ভোট দিয়ো না এক খান !' আমি এখনই কইতে পারি, এদিকে আইয়ুব খান একটাও ভোট পাচ্ছে না !

—কপ্-এর নেতারা কেউ এদিকে আসে ?

—জী, আসে। আইজ বিকালেই তো রথতলার মাঠে মিটিং আছে, যাবেন ?

—যাবো তো বটেই।

বাবুলের দিকে ফিরে সে বললো, পূর্ব পাকিস্তানের চল্লিশ হাজার ভোটের মধ্যে আইয়ুব কয়টা পাবে আমারও সন্দেহ আছে। পশ্চিম পাকিস্তানে মিস জিন্নার সাপোর্টারি কম হবে না। যদি ফেয়ার ইলেকশন হয়, তাহলে আইয়ুবের জেতার কোনো চান্স নাই।

বাবুল বললো, জোর করে যে লোক প্রেসিডেন্টের আসন দখল করেছে, এখনও সিভিল-মিলিটারি সব ক্ষমতা যার হাতে, সে আবার প্রেসিডেনশিয়াল ইলেকশন ডেকেছে। কোনো কারণেই সে জায়গা ছাড়বে বলতে চাও ? এটা শুধু নিজের পজিশানটাকে আইনসম্মত করা।

সিরাজুলদের বাড়ি বেশি দূর নয়। এরা বসিরদের তুলনায় অনেক দরিদ্র। খড়ের চালের ঘর, উঠোনে এক হাঁটু জল জমে আছে, সেই জলে ভাসছে কতকগুলো মুর্গির পালক।

জল ঠেলে দাওয়ায় উঠে বসির বললো, ও পিসি, বাড়িতে মেহমান আইছে। কী খাইতে দিবা কও !

বসির এ বাড়িতে মান্যগণ্য অতিথি। একদল বাচ্চা এসে ওদের ঘিরে ধরে। তারা বাবুলের দিকেও অবাক ভাবে চেয়ে থাকে। বাবুলের চেহারা এমনিতেই সুদর্শন, তার ওপরে শহুরে পালিশ আছে, গ্রাম্য শিশুদের চোখে সে যেন একজন অপরূপ মানুষ।

নারকোল কোরা ও মুড়ি খেতে দেওয়া হয় ওদের। মুড়ি খেলেই বাবুলের চা তেষ্টা পায় কিন্তু এ বাড়িতে বোধ হয় চায়ের পাটই নেই। সিরাজুলের মা এমন ইনিয়ে বিনিয়ে দুঃখের গল্প শুরু করে যে একটু পরেই বাবুলের অধৈর্য লাগে।

সিরাজুলের বালিকা বধূ কিছুতেই লজ্জায় ওদের সামনে আসতে চায় না। সিরাজুল তাকে ধরে প্রায় টানাটানি করতে লাগল। সে আরও বেশি লজ্জা পাচ্ছে বাবুলের জন্য, কারণ বাবুল বাইরের লোক। একই ব্যাপার অনেকক্ষণ চলতে থাকার পর বসির বললো, থাক সিরাজুল, তোর বিবির মুখ আমরা দ্যাখতে চাই না। তুই একলাই দেখিস।

বাবুল বললো, আমি না হয় বাইরে গিয়ে দাঁড়াই।

এই সময় দু'তিনজন সাঙ্গপাঙ্গ সমেত একজন মুরুব্বি গোছের লোক বাইরে থেকে হাঁক দিল, এই সিরাজুল, সিরাজুল !

দীর্ঘকায় লোকটির পরনে সিল্কের লুঙ্গি, খালি গা, গলায় একটা সোনা[illegible] চেন। বাঁ হাতে একটা সিগারেটকে গাঁজার কল্কের মতন ধরে হুস হুস ক[illegible] টানছে। তাকে দেখে বাচ্চারা ভয় পেয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। সিরাজুলের মা আঁচলে মুখ ঢেকে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন, সিরাজুলে[illegible] যেন মুখ শুকিয়ে গেল। সে এক পা এক পা করে এগিয়ে গিয়ে গা মোচড়াতে মোচড়াতে দীন কণ্ঠে বললো, চাচা আপনি নিজে আইছেন আমিই তো আপনের বাড়িতে যাইতাম, কাইলই যাইতাম

লোকটি রাগে দাঁত কিড়মিড় করে, নিচু হয়ে পায়ের জুতো খুলে মার[illegible] ভঙ্গি করলো, কিন্তু জুতো খুললো না। চড় তুলে বললো, হারামখো[illegible] আবাগীর পুত, বেহায়া ! তোরে কিছু কই না, তাই তুই মাথায় উইঠ[illegible] বসছোস ? সেই বকরিদের সময় টাহা হাওলাৎ নিছিল, এহন আউস ধা[illegible] উঠানের সময় হইয়া গেল, আমার নিজেরই এহনে টানাটানি, তার উপর তু[illegible] আমার ছুট ভাইরে মারতে গেছিলি। সাপের পাঁচ পা দেখছোস বুঝি, না[illegible]

বসির চোখ গোল গোল করে বললো, ওরে বাবা, সেই লোকের এখ[illegible] এই অবস্থা ?

বাবুল জিজ্ঞেস করলো, এই অভদ্র লোকটা কে ?

বসির বললো, এর নাম ইরফান আলি, আগে কী সব ছোট খাটো কাম কাজ করতো, এখন সার, পেস্টিসাইডের ব্যবসা করে শুনেছি। আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে, গলার আওয়াজেও অনেক জোর হয়েছে, ইউনিয়ান কাউনসিলের মেম্বার !

—সিরাজুল টাকা ধার করেছে বলে তারে মারতে এসেছে ?

—ভাবভঙ্গি তো সেইরকমই দেখি ! দাঁড়াও, আমি দাবড়ানি দিচ্ছি। ব্যাটা কী যেন একটা ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিল একবার। ওঃ হো, মনে পড়েছে, ইরফান আলি তো একজন বেসিক ডিমোক্রাট !

—বেসিক ডিমোক্রাট-এর একখান নমুনা ?

—পূর্ব পাকিস্তানের চল্লিশ হাজার এলিটের একজন। কম কথা নয় !

বসির দাওয়া থেকে নেমে গিয়ে ভারিক্কি গলায় বললো, আরে, ইরফান ভাই যে ! কী ব্যাপার, এত হল্লা কিসের ?

ইরফান আলি যেন ভূত দেখলো কিংবা জোঁকের মাথায় নুন পড়লো। এখানে বসিরকে দেখতে পাবে, এটা যেন কল্পনাতীত ব্যাপার।

পূর্ব মূর্তি মুছে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বরে কোমলতা ঝরিয়ে বিগলিত মুখে সে বললো, আরে বসির ? তুমি কবে আইলা ? আমারে একটা সংবাদ দাও নাই ?

বসির বললো, তুমি তো এখন বিগ ম্যান। আমি তোমারে সংবাদ দেবো কোন্ সাহসে ?

ইরফান আলি এগিয়ে এসে বসিরের হাত চেপে ধরে বললো, কী যে কও তুমি ! আমরা হইলাম বিগ ম্যান, হেঃ ! কেউ মানে না। বসির, তুমি এখন কুন্ পেপারে আছো ?

বাবুল তাকিয়ে দেখলো, একটু দূরে সিরাজুলের পত্নী এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাইরে দিকে। এখন আর সে কাঠ-পুত্তলী নয়, এখন সে মানুষ, তার চোখেমুখ শঙ্কা। যতদূর মনে হয়, ধারেই এখন সিরাজুলদের সংসার চলছে, আজকের মতন এই রকম ঘটনা আগেও ঘটেছে এ বাড়িতে।

হঠাৎ বাবুলের বুকটা কেঁপে উঠলো, কতই বা বয়েস মেয়েটির, বড় জোর পনেরো-ষোলো। আব্বা-আম্মাকে ছেড়ে একটি নতুন সংসারে এসেছে। সবার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সময় লাগবে। তার আগেই এরকম অশান্ত। বাড়ি বয়ে এসে লোকেরা তার স্বামীকে মারতে আসে। স্ত্রীর চোখের সামনে যারা স্বামীকে অপমান করে, তারা কতখানি অমানুষ।

বাবুল আর একটা কথাও ভাবলো। সিরাজুলের স্বাস্থ্য ভালো, দেখলে মনে হয় গায়ে বেশ জোর আছে। সে যদি একটা দলবল তৈরি করে নি[illegible] পারতো তা হলে কেউ তার মুখের ওপর চোটপাট করতে সাহস পেত না। কিন্তু চেহারা বলশালীদের মতন হলেও সিরাজুলের প্রকৃতি নিশ্চয়ই নরম। গা-জুয়ারি করার বদলে সে আরও লেখাপড়া করতে চায়।

সিরাজুলের বউ এখন আর লজ্জাশীলা নয়। বাবুলের সঙ্গে একবার চোখাচোখি হলো। সেই দু'চোখে মিনতি। বাবুল নিজেই চোখ ফি[illegible] নিল, তবু তার সারা অঙ্গে একটা ঝাঁকুনি লাগলো। মেয়েটি যেন চেনাচেনা। না, বাবুল এই মেয়েটিকে আগে কখনো দেখেনি, কিন্তু

বাংলার সরল অসহায় নির্যাতিতা তরুণী মেয়েদের মুখ আঁকার সময় সমস্ত শিল্পীরা যেন অবিকল এই মুখটিই আঁকেন। মাটির রঙের শরীর, মাটির মতন সর্বংসহা কিন্তু মাটির মতন বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না।

বাবুল অধিকাংশ জায়গাতেই দর্শকের ভূমিকা পালন করে। সে মনে মনে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার করে, কিন্তু নিজে কোনো সক্রিয় অংশ নেয় না। এই মুহূর্তে হঠাৎ যেন সে একটা খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলো। সে উঠে দাঁড়িয়ে সিরাজুলের নবোঢ়ার দিকে তাকিয়ে চোখের ইঙ্গিতে জানালো, ভয় নেই। তারপর সে নেমে গেল দাওয়া থেকে।

বাবুল এমনিতে লাজুক ও মৃদুভাষী হলেও কখনো কখনো বেশ কঠোর হতে পারে। বসিরের মধ্যস্থতায় সিরাজুল ও ইরফান আলির মধ্যে একটা রফা হলো, বাবুল সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। বসিরের কথা থামিয়ে সে সিরাজুলকে ডেকে অন্যদের শুনিয়ে বেশ জোরে জোরে বললো, শোনো সিরাজুল, তুমি ঢাকায় যেয়ে যদি লেখাপড়া করতে চাও, আমার বাসায় থাকতে পারো। সেখানে থাকা খাওয়ার কোনো অসুবিধা নাই। এখানে তোমার কত টাকা হাওলাৎ আছে? দুপুরে বসিরের বাড়িতে যেয়ে তুমি টাকাটা নিয়ে এসো আমার কাছ থেকে। তুমি পরে আমারে শোধ দেবে।

বসির হকচকিয়ে বাবুলের দিকে ঘুরে তাকাতেই বাবুল আবার বললো, চলো, ইস্কুল বাড়িটা দেখে আসি। এখানে আর কতক্ষণ থাকবে?

ইরফান আলি বিস্ফারিত লোচনে বসিরকে জিজ্ঞেস করলো, এনারে তো চেনলাম না?

বসির সঙ্গে সঙ্গে বললো, চেনো না? মোনেম খাঁর ভাইর ব্যাটা, বাবুল চৌধুরী।

বাবুলের চেহারা দেখে প্রথমেই ইরফান আলির মনে সমীহভাব জেগেছিল, তার ওপর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খাঁর নাম শুনে ভয় পায় না, এমন ব্যক্তির সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

বিকেলবেলা ওরা গেল রথতলার মাঠে মিটিং শুনতে। একটি বড় পাকা বাড়ির সামনে প্রশস্ত মাঠ, এককালে এখানে ধুমধামের সঙ্গে রথটানা হতো, এখন বোধ হয় আর তেমন ধুমধাম হয় না কিন্তু একটি চালা ঘরের মধ্যে দোতলা সমান রথটি এখনো রয়ে গেছে।

মিটিং ডেকেছে কপ, তবে আওয়ামী লীগের কর্মীসংখ্যাই বেশি। প্রায় হাজার দেড়েক মানুষ এসেছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, দুপুরের পর থেকে আর বৃষ্টি পড়েনি। মাঠটিও বেশ উঁচু, কাদা জমে না। জনতার মধ্যে চাষাভূষো জেলে মুসলমান-হিন্দু সবরকমই আছে।

ফতিমা জিন্না নিজেই এখন সারা দেশে ঘুরে ঘুরে মিটিং করছেন। বক্তৃতাও ভালো দেন। তা বলে তিনি এত ছোট জায়গায় আসবেন তা আশা করা যায় না। তিনি আসেননি, তাঁর লিখিত ভাষণই পাঠ করা হলো, প্রথমে উর্দুতে, তারপর বাংলায়। তাঁর ভাষণে বেশ ভালো ভালো কথা আছে। তিনি ক্ষমতা হাতে পেলে সামরিক শাসনের অবসান ঘটাবেন। দেশে গণতন্ত্র আনবেন। প্রতিটি মানুষের সমান ভোটাধিকার থাকবে। অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দেবেন। পাকিস্তান নিজের পায়ে দাঁড়াবে। তাঁর ভাষণের মাঝে মাঝেই জনতার হর্ষধ্বনি হচ্ছে। যারা নিজের নামটিও স্বাক্ষর করতে জানে না, তারাও গণতন্ত্রের নামে উত্তেজনা বোধ করে। গণতন্ত্র যেন এক ম্যাজিক, যা এলে সব সমস্যার সুরাহা হয়ে যাবে।

ছোট একটি প্যাডে নোট নিতে নিতে বসির বললো, তুমি সাধারণ মানুষের এনথুথিয়াজম লক্ষ্য করছো, বাবুল? এবারে দেশে একটা চেইঞ্জ না এসেই পারে না।

বাবুল কোনো মন্তব্য করলো না।

খানিকবাদে একজন বাঙালী নেতা বক্তৃতা শুরু করলো। সেই বক্তৃতার ভাষা সাদামাটা, কিন্তু কণ্ঠস্বরে বেশ নাটক আছে, তার বক্তব্য মন স্পর্শ করে।

বাবুল জিজ্ঞেস করলো, এই লোকটা কে?

বসির বললো, একে চেনো না? এই-ই তো আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবর রহমান। ঐ পার্টির বড় বড় নেতাদের সরিয়ে দিয়ে সে এখন প্রধান হয়ে উঠেছে।

বাবুল প্রায় পাঁচ ছ' বছর পর শেখ মুজিবর রহমানকে দেখলো। চেহারায় কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে, তাই সে চিনতে পারেনি। রাজনৈতিক দলে ক্ষমতার ওঠা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেতাদের চেহারা বদলায়।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দি আর ক্ষমতাচ্যুত সোহরাওয়ার্দির চেহারায় ও ব্যক্তিত্বে অনেক তফাৎ সে দেখেছে। এই শেখ মুজিবর রহমানও এক সময় যখন মওলানা ভাসানি আর সোহরাওয়ার্দির যুগল ছত্রছায়ায় ছিলেন তখন তাঁর চেহারা ছিল বেশি প্রশ্রয় পাওয়া ধনী ব্যক্তির নাতির মতন। এখন তাঁর কণ্ঠস্বরে পৃথক ব্যক্তিত্ব।

সভা অতি সার্থক ভাবে শেষ হবার পর বসির আর বাবুল একটা শিরীষ গাছের নিচে বসে রইলো কিছুক্ষণ। হেঁটেই তো ফিরতে হবে, সুতরাং কোনো তাড়া নেই।

শর্টহ্যাণ্ডে লেখা নোটগুলি পড়তে পড়তে বসির বললো, আরও দু'তিনটা মিটিং দেখে একটা সার্ভে রিপোর্ট লিখবো। ভালো কপি হবে। মামুনভাই খুশী হবে।

বাবুল কোনো মন্তব্য করলো না।

বসির আবার বললো, সাধারণ মানুষের এতখানি সাপোর্ট, ফতিমা জিন্না পাওয়ারে আসবেনই। আইয়ুব ইলেকশান ডেকে নিজের কবর খুঁড়েছেন।

বাবুল এবারে বললো, তোমাকে একটা কথা বলবো, বসির? মিটিং শুনতে শুনতে আমার বউয়ের কথা মনে পড়ছিল খুব। তুমি হাসবে শুনে, তবু আমি আমার বউয়ের একটা কথা বলি। মঞ্জু বলেছিল, 'আমার সাপোর্ট করা না করায় কী আসে যায়? আমার কী ভোট আছে?' এই কথাটাই আমার কানে বাজছিল এতক্ষণ। এই যে আজ হাজার দেড় হাজার মানুষ এসেছিল বক্তৃতা শুনতে, এত উৎসাহের সঙ্গে চাঁচামেচি করলো, এদের কিন্তু কারুরই ভোট নাই। এমন কি শেখ মুজিবর রহমানেরও ভোট দেবার অধিকার নাই। এ এক অদ্ভুত ফার্স, একটা ইলেকশান হচ্ছে, যারা বক্তৃতা দিচ্ছে কিংবা বক্তৃতা শুনতে আসছে, তাদের প্রায় কারুরই ভোট দেবার অধিকার নাই, ভোট দেবে মাত্র আশি হাজার মানুষ।

বসির বললো, দেশের এত মানুষের যে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন, তা কি অস্বীকার করা যায়? বেসিক ডেমোক্রাটরা এর উল্টো দিকে যেতে পারবে?

—মাদাম জিন্না যা ঘোষণা করেছেন, তার সার কথাটা কী? তিনি সকলের জন্য গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার এনে দেবেন। অর্থাৎ? বেসিক ডেমোক্রাটদের উচ্ছেদ। এরা কিন্তু সুবিধাভোগী শ্রেণীর। এরা নিজেদের সব সুযোগ সুবিধা বিসর্জন দেবে, ফতিমা জিন্নার জন্য? আশ্চর্য!

—তুমি এতটা নৈরাশ্যবাদী হয়ো না, বাবুল। রিগিং যাতে না হয় তার জন্য আমরা সর্বক্ষণ ভিজিলেন্স রাখবো।

—রিগিং হোক বা না হোক, বেসিক ডিমোক্রেসি তুলে দিতে চাইবে, ঐ ইরফান আলির মতন ডিমোক্রাটরা? এ আমি বিশ্বাস করি না। ফতিমা জিন্নার কোনো ভবিষ্যৎ নাই।

—তুমি বাজি রাখবে? এক বোতল স্কচ!

—আমি মদ খাই না, বসির।

শেষ পর্যন্ত বাবুলের কথাই ঠিক হলো। নির্বাচনী ফলাফলে শোচনীয় ভাবে হেরে গেলেন বেগম ফতেমা জিন্না। আইয়ুব খাঁ শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে নয়, পূর্ব পাকিস্তানেও সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোট পেলেন, বিশ্বের চোখে তিনি হলেন পাকিস্তানের আইনসঙ্গত রাষ্ট্রপতি। (ক্রমশ)

ছবি : অনুপ রায়

দেশ

অনিয়মের একদিন

তুলসী সেনগুপ্ত

খুব যে কাজের মানুষ প্রসূন তা বলা চলে না। তা বলে বাড়িতেও বেশিক্ষণ বসে থাকার মানুষ নয় ও। একটা নামী স্কুলের বাংলার মাস্টার। সুতরাং বাইরে ওর চাহিদা নেই-ই বলতে গেলে। অবশ্য ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে সব বাবা-মা চিন্তিত তাঁদের কাছ থেকে দু-চারটে যে ডাক পায় না প্রসূন, তা নয়। দুমদাম দু একটা নিয়েও ফেলে। আর সঙ্গে সঙ্গে দেড়শো ইনটু-চার-এর গুণ দিয়ে একটু অবিশ্বাসী ভঙ্গিতে গুম মেরে বসে। অঙ্কটা যখন ছ'শ, তখন আগেভাগেই এটা সেটা কিনে ফেলে। অধিকাংশই বই আর পেন।

ওর বউ মল্লিকা রহস্য করে বলে, 'এ নিয়ে শ' দেড়েক কলম হ'ল তোমার। চাকরিটা চলে গেলে, দোকান খুলে বসবে নাকি?'

প্রসূনের মুখে শিশুর সারল্য। বলে, 'ধেৎ, কী যে বলো?"

'বইগুলো যে কেনো কখানা পড় বলতে পার?"

'ও সব ভবিষ্যতের সঞ্চয়, তুমি বুঝবে না,' প্রসূন সিগারেট ধরিয়ে গম্ভীর মুখে উত্তর দেয়।"

'আমাদের আবার ভবিষ্যৎ।' সামান্য অবহেলার ভঙ্গি ফুটিয়ে মল্লিকা বলে, 'এই নোনাধরা দেওয়াল, পায়রার খোপের মত ঘর, সব ঋতুতেই স্যাঁতসেঁতে ভাব, এ সব নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিতে হবে।'

প্রসূন স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলে, 'তোমাদের এই মধ্যবিত্ত মানসিকতা কবে যে কাটবে, বুঝি না। আমি বেরুচ্ছি, দুটো জরুরী চিঠি আসতে পারে, দেখে শুনে জঞ্জালের স্তূপে ফেলো, নইলে সেবারের মত কাণ্ড করে বসবে।'

মল্লিকা বলল, 'সে তো জেনেশুনেই করেছিলাম, প্রতি বছর পরীক্ষার খাতা নেবে, আর এক মাস ধরে, বাড়িতে একটা গণগনে উনোন বসিয়ে রাখবে। উঃ, কী জ্বালান যে জ্বালাও একটা মাস!'

প্রসূন একথায় জল হয়ে যায়। বলে, 'পুজোর সময় যখন চেক পাই তখন কিন্তু পেছনের একটা মাসের কথা বেমালুম ভুলেই যাই। অথচ কত সামান্য টাকা। কিন্তু রেসপনসিবিলিটি, তার কী শেষ আছে।'

মল্লিকা শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে হাসি চাপার চেষ্টা করে, তা দেখে, প্রসূন বলে, 'এমন করে হাসছ যেন ভানু জহরের কাণ্ড দেখছ?'

মল্লিকা বলল, 'হাসছি কী সাধে?'

'কিসের জন্য শুনি?'

'একজামিনারস মিটিং-এর পর খাতা নিয়ে বাড়ি এসে যখন ভ্যাবলা মুখ করে বসো, সেটা মনে পড়তেই হাসি পেল।'

প্রসূনও হাসল সে কথায়, বলল, 'ঝাঁ ঝাঁ রদ্দুর মাথায় করে হেড একজামিনারের বাড়ি যাওয়া, দু-চারটে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা, তারপর দুটো সিকি সাইজের সন্দেশ, দুখানা থিনঅ্যারারুট বিস্কুট আর পানশে চা। বিশ্বাস করো, আমি একদিনও খাইনি।'

'কেন খাওনি! সকলেই তো খায়।' মল্লিকা জিগ্যেস করল।

'সকলের সঙ্গে আমার তুলনা! আমি লিখি, ক্রিয়েটিভ রাইটার!

মল্লিকা ঠোঁট উল্টে খুব হালকা চালে উত্তর দেয়, 'ছ' মাস, এক বছরে একটা লেখা বেরোয়, তার আবার গর্ব!'

প্রসূন পাঞ্জাবি খুলে গ্যাঁট হয়ে বসল মল্লিকার মুখোমুখি। বলল, 'তা যাই হোক, রাইটার এ কথাটা অস্বীকার করবে কি করে? কাজের দফা-রফা হল। একটু চা খাওয়াও তো।'

মল্লিকা বলল, 'কেতলিতে চা আছে গরম করে দেবো, না, ফ্রেশ চা করবো?'

'তাই-দাও। চা খেতে খেতে আজ তোমার সঙ্গে দু'চারটে ব্যাপার নিয়ে বোঝাপড়া করবো।'

মল্লিকা ফের শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে রান্নাঘর মুখো হল। প্রসূন সিগারেট ধরাতে গিয়েও ধরাল না, সিগারেটটা মুখ থেকে নামিয়ে রাখে। দশ মিনিটের মধ্যেই মল্লিকা চা নিয়ে এল।

চায়ের রং দেখে নাক সিঁটকোয় প্রসূন। মুখে দেবার আগেই বলল, 'এটা চা, না কবরেজী পাচন?'

'আগে খেয়েই দ্যাখ না।' উত্তর দিয়েই মল্লিকা উৎসুক চোখে চেয়ে থাকে প্রসূনের দিকে।

প্রসূন চায়ে মুখ দিয়েই বলে, 'নাহ, যা ভেবেছিলাম তা নয়। আসলে চায়ের কোয়ালিটিটাই ভাল।'

মল্লিকা জিগ্যেস করে, 'কিসের বোঝাপড়া করবে বলছিলে না?'

প্রসূন হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'সোমনাথের কথা মনে আছে? অরুণের ভাইয়ের বিয়ে তে আলাপ হয়েছিল।'

মল্লিকা ভুরু কুঁচকে সোমনাথকে মনে করার চেষ্টা করল। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে নিরাশ গলা করে বলল, 'কাউকেই মনে করতে পারছি না।'

'অরুণের ভাইয়ের বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছিলাম, মনে নেই? ওর ভাইটা গরমকালেও মোজা পরেছিল। ওভাবে বর সেজে এখন কী কেউ বিয়ে করতে যায়? তুমি আর বিজু খুব হাসাহাসি করছিলে। তোমাদের পরামর্শে...

'হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়ছে।' মুখ উপচে হাসি ছড়িয়ে দিয়ে মল্লিকা জিগ্যেস করল, 'তা হঠাৎ সোমনাথের কথা কেন?'

সিগারেট ধরাল প্রসূন। বলল, 'গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি ওর কাছে থেকে।'

'কী সব হেঁয়ালী করছ, পস্টাপস্টি বল না, কী ব্যাপার?'

মল্লিকাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে প্রসূন বলল, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী কথা হয়। একটু পাশে বসোই না।'

মল্লিকা কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলে, 'ওসব ঢং এ বয়সে সাজে না। সামনের একত্রিশে জানুয়ারী, আমাদের কুড়ি বছর কমপ্লিট হবে।'

প্রসূন হো হো করে হেসে বলে, 'তাতে কী হয়েছে। জান, আমার বাবা-মা ছাপ্পান্ন বছর ধরে রোমান্টিক লাইফ লিড করেছিলেন!'

'ওঁদের মনে সুখ ছিল, তাই সম্ভব হয়েছে আমাদের সঙ্গে ওদের তুলনা হয় কী করে?'

'ছিঃ, তুলনা করবো কেন?' বলেই গুনগুন করে গাইল, আরো কিছুক্ষণ না হয় রহিলে কাছে...

'ধ্যাত', মল্লিকা বিরক্তি প্রকাশ করে চলে

যাচ্ছিল। প্রসূন ওর হাত ধরে একেবারে বুকের কাছে টেনে আনল। টের পেল মল্লিকার বুকটা কেমন ধুকপুক করছে ভয় পাওয়া পায়রার মত। বড় বেশি অবাক হল প্রসূন। এত বছর পরও মল্লিকার ভয় কাটল না কেন বুঝে উঠতে পারল না। কথাটা জিগ্যেস করতে গিয়েই দেখে, মল্লিকার চোখে মুক্তোর মত জল টলটল করছে। বিব্রত বোধ করল প্রসূন। মল্লিকার মুখের দিকে অপলকে চেয়ে রইল।

মল্লিকা কান্নায় ভেঙে পড়ল। ওর পিঠে হাত রাখতেই উথাল-পাথাল ঢেউ টের পেল প্রসূন। নিজেকে শক্ত মাটিতে দাঁড় করিয়ে জিগ্যেস করল, 'কী হলো?'

'আজ আটাশে মার্চ।' বলেই ফের ডুকরে কেঁদে উঠল মল্লিকা।

প্রসূনের সব কিছু মুহূর্তেই মনে পড়ে গেল। এদিনই ওদের একমাত্র সন্তান চিরকালের জন্য ছেড়ে গেছে। বেঁচে থাকলে আঠারোয় পা দিত। কিন্তু এবার আর গম্ভীর হয়ে থাকা চলে না ভেবেই মল্লিকাকে জোরে নাড়া দিয়ে বলে, 'কী হচ্ছে এসব। জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে এতে তো কারোর হাত নেই। মিছিমিছি মন খারাপ করছো তুমি। তার চেয়ে আজ একটু আমরা অনিয়ম করি, কী বলো?'

ম্লান মুখ করে মল্লিকা বলল, 'তুমি কিছু মনে করো না।'

প্রসূন মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করে বলল, 'আমার বয়েই গেছে। পৃথিবীতে কত মানুষের কত রকমের দুঃখ। খুব ভালো একটা ছবি চলছে মেট্রোতে। প্রায় বারো সপ্তাহ পার হল। ভাবছি, এখন গেলে ম্যাটিনির টিকিট পেয়ে যাব। রান্না-বান্না আজ থাক। গতকাল ছ'টা এরিয়ার ডি এ পেয়েছি। টাকার চিন্তা করো না।' মল্লিকা হেসে ফেলল এবার। বলল, 'যতক্ষণ তুমি না ফেরো ততক্ষণ আমাকে ঠুটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকতে হবে। বলি কী আমিও তোমার সঙ্গে যাই, কেমন?'

'তাহলে তো খুবই ভাল হয়। তোমার তো স্নান সারা; আমি বরং চটপট স্নান সেরে নিই।' প্রসূন বলল।

বাইরে বেরিয়েই অন্য মানুষ হয়ে গেল মল্লিকা। লিণ্ডসে স্ট্রীট থেকে কেনা হালকা প্রিন্টেড শাড়ি পরেছে, শ্যাম্পু করা খোলা চুল বাতাসে এলোমেলো হয়ে দোল খাচ্ছিল মল্লিকার। প্রসূন রহস্য করে বলল, 'তোমাকে না মাইরী বিজ্ঞাপনের মেয়ের মত দেখাচ্ছে। আমাকে তোমার পাশে একদম বেমানান লাগছে। সকলে তোমাকেই দেখছে, আর আমাকে দেখে ভাবছে আমি তোমাকে ভাগিয়ে এনেছি।'

সুন্দর ভঙ্গিতে হেসে মল্লিকা বলে, 'লোকে ঠিকই ভাবছে।'

প্রসূনও হাসল সে কথায়। ঘড়িতে সময় দেখে বলল, 'এই রে দশটা বেজে গেল।'

মল্লিকা খুশি খুশি গলায় উত্তর দেয়, 'তা আজ তো আমরা অনিয়ম করবো বলেই বেরিয়েছি।'

কতগুলো যে বাস চলে গেল বোঝাই মানুষ নিয়ে তার সীমা সংখ্যা নেই।

মল্লিকা অস্ফুটে শুধু বলল, 'বাব্বা ! লাইফ রিস্ক করে কী ভাবেই না অফিস করতে হয় সকলকে।'

প্রসূন ভারিক্কী গলা করে বলল, 'তাহলেই বোঝ। আর তোমরা এটা হল না, ওটা হল না, এটা নেই, ওটা নেই, কত রকমের বায়নাক্কাই না করো।'

'তাতে তোমার কী ! খাও দুলকি চালে, ফেরো দুলকি চালে। পড়ালে পড়ালে, না পড়ালেও কেউ দেখার নেই। ফাঁকির কায়দা তোমরা কত রকমই না জান।' মল্লিকা কথাগুলো বলে ঠোঁট টিপে হাসি চাপছিল। প্রসূন বলল, 'তা তো বলবেই। পরপর তিনটে ক্লাস করার পর জিব বেরিয়ে যায়। তার ওপর একটা এক্সট্রা ক্লাস। কেউ না এলেই গেরো। হেড মাস্টার অ্যাবসেনটিস রুটিন করেই খালাস।'

'তার মানে ওই এক্সট্রা ক্লাসটাই ফালতু। ক্লাসে গিয়ে খালি ছেলেদের পাহারাদারি করা।'

'সে কথা ঠিক। আমি বাংলা পড়াই, সায়েন্সের 'স'ও বুঝি না। সেই আমাকেই যদি...'

'থাক। যুক্তি তোমরা অনেক দাঁড় করাতে পারো। কথা শেষ করেই ডান দিকে হেলে মল্লিকা বলল, 'এই মিনিবাসটা একটু ফাঁকা মনে হচ্ছে, যদি দাঁড়াবার জায়গা পাই তো উঠে পড়বো কী বলো ?'

নিরাসক্ত ভঙ্গিতে প্রসূন উত্তর দেয় 'দেখ।'

যা ভেবেছিল তাই, বাসটা মোটামুটি ফাঁকাই। কথা মত ওরা দুজনই সেটাতে উঠে পড়ল। মিনিট পনেরোও লাগল না এসপ্লানেডে পৌঁছুতে। বাস থেকে নেমে রাস্তা পার হয়ে ওরা মেট্রোর সামনে এসে পৌঁছুল। বড় বড় হরফে হাউসফুল লেখা বোর্ডটা ওদের ভীষণ ভাবে অসহায় করে দিল মুহূর্তে।

প্রসূন বলল, 'রাবিশ। অ্যাডমিনসট্রেশান বলে কোন কিছুই নেই। সিক্সটি পার্সেন্ট টিকিট ব্ল্যাকারদের হাতে চলে গেছে। শো শুরু হওয়ার ঘন্টাখানেক আগেই ব্ল্যাকারদের দাপাদাপি শুরু হয়ে যাবে।'

মল্লিকা বলল, 'তা-বলে ব্ল্যাকারদের কাছ থেকে টিকিট আমি তোমাকে কিনতে দেব না।'

'ক্ষেপেছ। আমি ওদের ছায়াও মাড়াই না কোনদিন। তার চেয়ে চলো, এখন তো প্রায় এগারোটা বাজল, এবার নিশ্চিন্ত হয়ে গুপ্তধনের খোঁজটা করে আসি। জানি, কোন কাজই হবে না, তবু চেষ্টা করতে দোষ কী।' প্রসূন একটানা বলে গেল কথাগুলো।

মল্লিকা কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করল, 'গুপ্তধনের ব্যাপারটা কী বললে না তো!'

প্রসূন একটু চাপা স্বভাবের। এটা এতদিনেও টের পেল না দেখে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেও এ মুহূর্তে তা প্রকাশ করল না। মেট্রোর পাশের সরু গলির ভেতর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল মল্লিকাকে নিয়ে। দুপাশে অসংখ্য দোকান। বিদেশী জিনিসপত্রের ছড়াছড়ি। গতকাল এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় আজ রোদের তাত তেমন নেই। বরং রোদ বেশ মিঠেই লাগছিল। সারা বছর যদি এমনি আবহাওয়া থাকত তো, পৃথিবীর সেরা জায়গা হত এই কলকাতা। কিন্তু তা তো হবার জো নেই। আগামী কালই এমন চড়া রোদ উঠবে যে, গায়ের ছাল-চামড়ায় ফোস্কা পড়ার দশা হবে। এসব ভাবতে ভাবতে ওরা যখন যাচ্ছিল, ঠিক সে সময় একটা ছোট্ট দোকানে চোখ গেল প্রসূনের। দামী সেন্ট, ইলেকট্রনিক্স ঘড়ি, ছাতা, এমন কি সুন্দর সুন্দর চপ্পলও নজরে পড়ল। মল্লিকার সুঠাম হাতটা ধরে প্রসূন বলল, 'এসো।'

ভদু, ইনটিমেট, চার্লি, আরও কত রকমের সেন্টের শিশির দিকে চোখ বোলাল প্রসূন। একটা শিশি তুলে ধরে বলল, 'এটা আসল, না, খিদিরপুরের ?'

দোকানদারের চোখেমুখে বেশ সপ্রতিভ ভঙ্গি। বলল, 'তা তো আমরাও জানি না স্যার। তবে যাদের কাছ থেকে এসব কিনি তারা এ লাইনের পাকা লোক। বেশি দাম হলেও ঠকবেন না।'

'কত দাম এটার ?'

'সাতান্ন টাকা। দু বছরের বেশি চলবে।'

'পঞ্চাশে হয় না।'

মল্লিকা ভুরু কুঁচকে বলল, 'মিছিমিছি এতগুলো টাকা খরচ করবে ?'

প্রসূন হেসে বলল, 'আজ অমিয়মের দিন না।'

মল্লিকা কথা বাড়াল না। দোকানদার রাজী হয়ে গেল ওই টাকাতেই। বলল, 'বিশ্বাস করুন স্যার, দু টাকা লাভ রেখে মালটা বেচলাম আপনাকে।'

প্রসূন শিশিটা খুলে এক প্রস্ত মল্লিকার গায়ে, নিজের গায়ে, এমন কী দোকানদারের গায়েও স্প্রে করে দিল। সেন্টের মিষ্টি গন্ধে ডুবে গেল ওরা।

দোকানদার হি হি করে হাসছিল, বলল, 'আসলি মাল হলে, জামা কাপড় ধোয়ার পরও গন্ধ থাকবে।'

'তাই বুঝি।' মল্লিকার গলায় খুশির ঢেউ উপছে পড়ছিল।

দাম মিটিয়ে ওরা সামনের দিকে এগিয়ে গেল। একটা দোকানে গরম সিঙাড়া ভাজছে। মল্লিকা সিঙাড়ার খুব ভক্ত। প্রসূন বলল, 'চলবে নাকি ?'

দোকানের ভেতরে জায়গা নেই। বাইরে দাঁড়িয়েই ওরা সিঙাড়া আর মাটির ভাঁড়ে চা খেল। শুধু ওরাই নয়, আরো অনেকেই খাচ্ছিল। কেউ কারুর দিকে নজরও করছে না। এটা ভাল লাগল প্রসূনের। আরও একটু এগোতেই দুপাশে সুন্দর সুন্দর আয়নার দোকান দেখতে পেল।

প্রসূন বলল, 'একটা আয়না কিনলে কেমন হয় ? বাড়ির আয়নাটা আর চলে না। আয়নার সামনে দাঁড়ালে মনে হয়, আমি নই, অন্য কেউ বুঝি আমাকে ঠাট্টা করছে। তোমার এরকম মনে হয় না ?'

মল্লিকা উত্তর দিল, 'বললে বলে মনে পড়ল, নইলে ওটাই গা সওয়া হয়ে গেছে। চুন বালি খসা দেয়ালে তুমি আয়না রাখবে কোথায় ?'

প্রসূন বলল, 'বাড়িওলাটা একের নাম্বারের তৈয়েটে। মুখ মিষ্টি। পয়লা নম্বরের হারামজাদা। বলে কী জান, আরও তিরিশ টাকা ভাড়া বাড়াতে হবে।'

মল্লিকা বলে, 'ঘরের তো ওই অবস্থা। সে কথা কী বলেছ ভদ্রলোককে ?'

'ক্ষেপেছ ? ও কথা বলে বিপদ ডেকে আনি আর কী। বললেই হয়তো বলবে, পছন্দ না হয়, ছেড়ে দিন। ছাড়লেই দ্বিগুণ ভাড়ায় ভাড়াটে পেয়ে যাবে।'

মল্লিকা প্রসূনের বক্তব্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই বুঝি চুপ করে গেল।

প্রসূন বলল, 'বাদ দাও। চলো, বরং গুপ্তধনের খোঁজটা আগে করে আসি।'

এবার গলায় বিরক্তির ঝাঁঝ তুলে বলল, 'সেই থেকে গুপ্তধন, গুপ্তধন করছো।'

হো হো করে হেসে ফেলল প্রসূন। একটা সিগারেট ধরিয়ে গল গল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'আগে চলই না ; গেলে স্বচক্ষেই সব দেখতে পাবে। সব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে।'

মল্লিকা কথা বাড়াল না। প্রসূন লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোচ্ছে। ওর সঙ্গে সমানে হাঁটতে পারছিল না মল্লিকা। বলল, 'আর একটু আস্তে চল না ?'

প্রসূন চলার গতি কমিয়ে দিল সামান্য। মল্লিকার গা ঘেঁষে চলতে চলতে বলল, 'দেখতে দেখতে বারোটা পার হয়ে গেল। গুপ্তধনের আখড়ার বাবুরা আর মাত্র ঘণ্টা দুয়েক থাকবে। তারপর কে যে কোথায় সটকে পড়বে তার ঠিক নেই।' কথা শেষ করেই বাঁদিকের গলি পেয়েই তাতে ঢুকে পড়ল প্রসূন। বলল, 'তাড়াতাড়ি এসো। ট্রামে করে বরং চলে যাই।'

মল্লিকা যে গোলকধাঁধায় সেই গোলকধাঁধাতেই রয়ে গেল। মুখে চোখে সামান্য বিরক্তির চিহ্নও ফুটে উঠল। একটু এগোতেই ট্রাম রাস্তায় এসে পড়ল ওরা।

ট্রাম থেকে নেমেই মল্লিকা বলল, 'সামান্য এটুকুনের জন্যে মিছিমিছি পয়সা খরচ করলে।'

প্রসূনকে আজ খুশির মেজাজে পেয়েছে। বলল, 'ভুলে যাচ্ছ কেন, আজকের দিনটা তো অনিয়মের দিন।' কথাটা শুনে শুধু মুখ টিপে হাসল মল্লিকা।

লোটাস সিনেমার সামনে তখন তাণ্ডব চলছে। হলের সামনে বেশ কয়েক শ লোক। ওদের অধিকাংশের বয়সই কুড়ির মধ্যে। সেখানে রঙীন প্রজাপতির মত নানান ধরনের পোশাক পরে বেশ কিছু মেয়েও রয়েছে। ভিড় কাটিয়ে উৎসুক ভঙ্গিতে ছবির নাম দেখে নিল প্রসূন। ছবির নাম 'বে-আবরু'।

প্রসূন মল্লিকাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'চমৎকার নাম। বে-আবরু। হিন্দিওলারা বেশ নাম দিচ্ছে তো আজকাল।'

মল্লিকা হাসতে হাসতে বলল, 'হাম কিসিসে কম নেহি, আ গলে লাগ যা, প্রেম পূজারী, ধনি কী ফুল, এসব কী খারাপ নাম ?'

হঠাৎ ওদের সামনে একজন চোয়াড়ে মার্কা

ছেলে দাঁড়িয়ে বলল, 'টিকিট নেবেন নাকি ?'

'না ভাই। সিনেমা দেখার সময় নেই।'

'দুটো বেড সীন আছে। ইংলিশ ছবিকেও হার মানায়। চার টাকার টিকিট আট টাকা দেবেন।'

প্রসূন বিরক্তির সঙ্গে ভুরু কোঁচকাল। বলল, 'অনেকেই তো ল্যা ল্যা করছে টিকিটের জন্য। ওদিকে যাও না।'

'দূর মশাই।' বলেই প্রচণ্ড তাচ্ছিল্যের ঢং-এ পাশ কাটিয়ে চলে গেল ছেলেটা।

'বেয়াদপ, বাস্টার্ড !' প্রচণ্ড রাগে আর ক্ষোভে ফেটে পড়ছিল প্রসূন।

মল্লিকা বলল, 'গালাগাল দিচ্ছ কেন ? অনিয়মের দিনে এমনটা তো হবেই।'

প্রসূন বলল, 'ওদের অ্যাটিচুড তুমি বুঝবে না। তোমাকে খারাপ লাইনের ভেবেছে। দেখবে এসো।' বলেই মল্লিকার হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে সার বাঁধা রিকশাওলাদের সামনে এসে দাঁড়াল। ওদের দেখতে পেয়েই রিকশাওলারা টং টং করে ঘণ্টা বাজাতে লাগল।

প্রসূন বলল, 'আমাদের দেখে ঘণ্টা বাজাচ্ছে কেন বলো তো ?'

মল্লিকা বলল, 'এটা ওদের জীবিকা তাই।'

'মোটেই না। ওরা সব ব্রথেলের টাউট। রিকশায় চাপলেই ওরা ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে যাবে। এ পাড়ায় দুপুরে রাত্তিরে বিস্তর ফাঁকা বাড়ি পাওয়া যায়। একবার ঢুকিয়ে দিতে পারলেই সওয়ারীর কাছ থেকে তো পয়সা নেবেই, তারপর বাড়িওলার কাছ থেকেও পয়সা ঝাড়বে।'

মল্লিকার গলা শুকিয়ে কাঠ। ফ্যাসফেসে গলায় বলল, 'এত সব তুমি জানলে কী করে ?'

'জানতে হয় বুঝলে! চোখ কান বুজে কলকাতায় বাস করা চলে না। সে সব পরে বলবো 'খন। এবার চলো তো।'

দুটো বাড়ি ছাড়িয়ে তৃতীয় বাড়িতে ঢুকে পড়ল ওরা। দোতলায় উঠেই বাঁ দিকে এগিয়ে গেল। মল্লিকা দেখল, বড় বড় করে আবাসন কথাটা লেখা। সরকারী প্রতিষ্ঠান । এবার মুচকি হাসল।

মল্লিকাকে পাশে রেখে স্থির চোখে অফিসের ভেতরটা দেখছিল প্রসূন।

'কাকে খুঁজছেন'। একজন পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে জিগ্যেস করল।

প্রসূন সরল সহজ ভঙ্গিতে উত্তর দিল, 'কাউকেই চিনি না, শুধু খোঁজ পেয়ে এসেছি।'

'ফ্ল্যাট ? হবে না। তবে ওই যে টাকমাথা ভদ্রলোককে দেখছেন, বিভাসবাবু ওঁর নাম, পারলে উনিই পারবেন।' কথা কটি বলেই ভদ্রলোক পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

প্রসূন সতর্ক চোখে সব কিছু দেখে নিয়ে মল্লিকাকে বলল, 'এবার কিন্তু তোমাকেই একটু অ্যাকটিভ হতে হবে গুপ্তধনের জন্য।'

'কী রকম ?'

প্রসূন ওর কানে কানে কী বলল।

কথাটা শুনে হাসি পেলেও নিজেকে সামলে নিল মল্লিকা। বলল, 'চেষ্টা করব। তবে কখনও তো এমন গোলকধাঁধায় পড়িনি।'

ওরা দুজন খুব ধীর পায়ে বিভাসবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে ওঁর টেবিলের সামনে দাঁড়াল। স্তূপীকৃত কাগজের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছেন বিভাসবাবু। কিন্তু হলে হবে কী বড় সতর্ক মানুষ বিভাসবাবু। কাজ করতে করতেই মুখ না তুলে গম্ভীর গলায় বললেন, 'কী চাই ?'

মল্লিকাই আগ বাড়িয়ে কথা বলল, 'নমস্কার বিভাসবাবু।'

নারী কণ্ঠে মাথা তুললেন বিভাসবাবু। বললেন, 'নমস্কার, কী ব্যাপার বলুন তো ?'

মল্লিকা বলল, 'পরশু মিনিবাসে আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি।'

'কী শুনেছেন ?'

'আপনার চেষ্টা আর সহানুভূতির জন্য এক ভদ্রমহিলা পূর্বাশায় ফ্ল্যাট পেয়েছেন।' মল্লিকার গলায় দৃঢ়প্রত্যয়ের সুর।

হো হো করে হাসলেন বিভাসবাবু। পরক্ষণেই মুখের রেখা পাল্টে ফেলে সতর্ক চোখে চেয়ে রইলেন এদের দিকে। বড় করে নস্যির টিপ নিয়ে রুমাল দিয়ে নাক মুছে বললেন, 'জীবনে আমি কারুর কোন উপকার করিনি। ভদ্রমহিলা কী আপনার পরিচিতা ?'

চট করে মল্লিকাও বলে ফেলল, 'না, না। দুজন ফ্ল্যাটের বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন। পেছনের সীটে আমি ছিলাম। সমস্যায় পড়েছি আমরাও। তাই ওদের কথা মন দিয়ে শুনছিলাম।'

'কী করেন আপনি ?'

মল্লিকা উত্তর দেয়, 'কিছুই জোগাড় করতে পারিনি, বি-এড পাস করে তিন বছর বসে আছি। ইনি আমার স্বামী, স্কুলমাস্টার। বোঝেনই তো একার রোজগার ....'

'বিলক্ষণ জানি। কটি ছেলেমেয়ে আপনার ?'

গাঢ় গলা করে উত্তর দিল মল্লিকা, 'নিঃসন্তান।'

'এখন কোথায় থাকেন।'

'শ্রীমানী বাজারের কাছে, একটা ছোট্ট ঘরে। দিনে আলো জ্বালতে হয়। আমার হাজার রকমের অসুখ। ওঁর ডিওডিনাল আলসার।'

এবার বিভাসবাবু প্রসূনের দিকে চেয়ে বললেন, 'কোন স্কুলে পড়ান ?'

প্রসূন স্কুলের নাম বলতেই চমকে গেলেন বিভাসবাবু। বললেন, 'অ্যাডমিশানের ব্যাপারে আপনারা খুব কড়া, তাই না ?'

প্রসূন বলল, 'সরকারী স্কুল, তা একটু তো হবেই, তবে মোটামুটি ভাল ছেলে হলে পেয়ে যায় অনেকেই।'

বিভাসবাবু বললেন, 'দেখুন মশাই, এখনকার যুগটাই হচ্ছে গিভ অ্যান্ড টেক পলিসির।'

প্রসূন বিগলিত ভঙ্গি করে বলল, 'তা তো বটেই'

'আমার নাতিকে ক্লাস ওয়ানে অ্যাডমিশান করিয়ে দিতে পারবেন ?'

'এটা তো এপ্রিল মাস, সামনের বছরে চেষ্টা করে দেখব আর পারি হঠাৎ যদি কোন ভেকান্সি হয় তা হলে।'

'চাকরির ভেকান্সি হয় শুনেছি, অ্যাডমিশানের ব্যাপারেও ভেকান্সি আছে নাকি ?' বলেই মুখ টিপে হাসলেন বিভাসবাবু।

প্রসূন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতেই বিভাসবাবু স্পষ্ট গলায় বললেন, 'তাহলে সামনের বছরেই আসবেন।'

মল্লিকা এবার করুণ গলা করে বলল, 'কিছু না দিতে পারলে, আমাদের মত মানুষরা কী করবে বলুন তো ? শুনেছি, পূর্বাশায় এখনও টু-রুম ফ্ল্যাট খালি আছে আর সিংঘিবাগানেও। ভদ্রমহিলার কথা শুনে কেমন যেন বিশ্বাস হয়েছিল, আপনি ওই ভদ্রমহিলাকে যেমন উপকার করেছেন, আমাদের জন্যও কিছুটা করবেন। আমাদের অবস্থা একটু সহানুভূতির সঙ্গে দেখলে চিরকালের জন্য আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।'

স্তূপীকৃত কাগজগুলো দেখিয়ে বিভাসবাবু বললেন, 'এর মধ্যে শতকরা নব্বুইটাতেই বাঘা বাঘা লোকের রেকমেন্ডেশান রয়েছে। তাছাড়া পার্টির সুপারিশ তো আছেই। ঘেন্না ধরে গেল মশাই।'

প্রসূন কথার খেই ধরে বলল, 'অ্যাডমিশানের ব্যাপারেও আমাদেরও অনেক ঝামেলায় পড়তে হয়। ষাটটা সীটের মধ্যে পঞ্চাশ জনেরই হয় সুপারিশে। আই ওয়াশ দেয়ার জন্য দশজন বাইরের সুযোগ পায়। এবার আমার ছোট ভাইয়ের ছেলের জন্য চেষ্টা করেছিলাম। হয়নি। বাড়ির কেউ বিশ্বাসই করে না যে, আমি চেষ্টা করেছি। বিশ্বাস করুন হেড মাস্টারের পায়ে ধরতেই শুধু বাকি রেখেছি। মাঝখান থেকে বাড়িতে আমরা অস্পৃশ্য হয়ে গেলাম। কী যে কষ্ট বোঝাতে পারব না।' একটুক্ষণ থেমে সুর পাল্টে প্রসূন বলল, 'জানেন বিভাসদা, বাড়িতে হইচই চলছে, আমাদের দেখেই সবাই স্পিক-টি-নট। মেজবউদিকে তো একদিন বলতেই শুনলাম, 'নিজের ছেলে হলে ঠাকুরপো কী না করে পারত ? কী করি বলুন তো, বিভাসদা ?'

বিভাসবাবুও কেমন যেন পাল্টে গেলেন। গাঢ় শ্বাস ফেলে বললেন, 'এ রকম অভিজ্ঞতা আমারও আছে। নিজে থাকি মদন দত্ত লেনের এঁদো গলিতে, নিজের জন্য যে কিছু করবো, তার উপায় নেই। ছেলেমেয়ে বউ সব আমাকে নিয়ে উপহাস করে। আমি নাকি ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। সহ্য করতে পারি না। আবার ওদের যে বুঝিয়ে বলব, তারও উপায় নেই। ছোট ছেলেটা তো একদম বকে গেছে। নেশা করে রাতদুপুরে বাড়ি ফেরে। ফ্ল্যাট পাইয়ে দেবে বলে আমার নাম করে একজনের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা বেমালুম লোপাট করে দিল। কী লজ্জা ! কী লজ্জা !'

ফাঁক পেয়ে মল্লিকা প্রসূনকে দেখিয়ে বলল, 'আর ও তো অপদার্থ সাবজেক্টের টীচার। বাংলা পড়ায় বলে, কোন টিউশানও পায় না। সকলেই ভাবে বাংলার লোক ইংরেজীর কী জানে। অথচ, শুনলে অবাক হবেন, ওরই দুখানা অনুবাদের বই বেশ রমরম করে চলে। এ যাবৎ ও দুটো বই থেকে সাড়ে সাতশ টাকা রোজগার করেছে।'

প্রসূনের দিকে আপাদমস্তক দেখলেন বিভাসবাবু। বেশ সমীহ করেই বললেন, 'আপনি রাইটার। একথা আগে বলতে হয়।'

প্রসূন মাথা নিচু করে বলে 'কাউকেই বলি না। বড় লজ্জা হয়, গ্লানি বাড়ে।'

বিভাসবাবু বললেন, 'ছেলেবেলায় আমারও সাহিত্য বাতিক ছিল। সব যে কোথায় মিলিয়ে গেল, কে জানে!' কথা শেষ করেই পেপার ওয়েট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

বিভাসবাবুর টেবিল ঘিরে অদ্ভুত এক নাটক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সকলেরই সংলাপ শেষ হয়ে গেছে। তাই অসম্ভব নৈঃশব্দ্য বিরাজ করছে। মাথার ওপরে বনবন করে পাখার শব্দই শুধু হচ্ছিল। সমস্ত নিস্তব্ধতাকে চুরমার করে বিভাসবাবু বললেন, 'এই ফর্মটা নিয়ে যান। ফর্ম ফিল আপ করে দিয়ে যাবেন; ডেটটা মেনশান করবেন না। ফর্ম জমা দিয়ে আর এমুখো হবেন না। পারলে মদন দত্ত লেনের বাড়িতে যাবেন। এই নিন আমার বাড়ির ঠিকানা।'

বিভাসবাবুর আচরণে অভিভূত হয়ে গেল দুজনই।

বাইরে বেরিয়েই দেখে, আকাশে থমথমে মেঘ। এক্ষুণি হয়তো ভেসে যাবে কলকাতা। ঘড়িতে সময় দেখল, একটা দশ। দ্রুত পায়ে ওরা ফিরতি ট্রামে এসপ্ল্যানেডে এল। আর যতটা সম্ভব দ্রুত পায়ে আর্মেনিয়ার দিকে এগিয়ে গেল।

দোকানে ঢুকতেই খাবারের গন্ধে ওরা টের পেল ক্ষিদে পেয়েছে। সামনে একটাও বসবার জায়গা না পেয়ে ওরা ভেতরে গেল। একটু এগোতেই খালি কেবিন পেয়ে গেল। মুখোমুখি বসে ওরা পরস্পরের দিকে বিস্ময় বিহ্বল চোখে দেখছিল।

উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে মল্লিকা বলল, 'ফ্ল্যাট আমরা পেয়ে গেছি; এটা জোর গলায় বলতে পারি।'

'আমারও তাই মনে হয়।' প্রসূন বলল। 'কথা শেষ করে স্থির চোখে মল্লিকাকে নজর করে বলল, 'তুমি যে এত পাকা অভিনেত্রী তা কিন্তু আগে জানতাম না।'

মুখে লালচে আভা নিয়ে মল্লিকা চুপ করে আছে দেখে হো হো করে হেসে উঠল প্রসূন। বেয়ারা এসে পড়ল হাসির মাঝখানেই। চিকেন কালিয়া আর বিরিয়ানির অর্ডার দিয়ে শরীরটাকে এলিয়ে বেশ কায়দা করে সিগারেট ধরাল প্রসূন।

'মিনিবাসের ব্যাপারটা তোমার মাথায় এল কি করে।' প্রশ্ন করল প্রসূন।

মল্লিকা অকপটে বলল, 'সে কী ছাই আমি জানি। কেন যেন মনে হল, লোকটা যদি জিগ্যেস করে বসে, কী করে জানলাম, তো ধাঁ করে মাথায় বুদ্ধিটা খেলে গেল।' একটানা কথা বলে রিন রিন শব্দে হাসল মল্লিকা। তারপর বলল, 'আর তুমি? তুমিই কী কম বড় অভিনেতা। বাপের একমাত্র ছেলে তুমি; আর সাত কাহন করে একান্নবর্তী সংসারের কথা গড়গড় করে বলে গেলে। আর শেষটা তো ক্লাইম্যাক্সে নিয়ে গেলে। দুম করে বিভাসবাবুকে বিভাসদা বানিয়ে দিলে। সত্যি তোমার তুলনা নেই।'

বেয়ারা খাবার দিয়ে গেল। ওরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করছিল না। ওরা হেসেই যাচ্ছিল। এত হাসি আর এত মজা যে ওদের জীবনে সঞ্চিত হয়েছিল, তা যেন এই প্রথম টের পেল।

খাওয়া সেরে বিল মিটিয়ে দিতে গিয়েই প্রসূন হিসেবী হয়ে গেল। পকেট থেকে খুচরো পঞ্চাশ পয়সা বের করে টিপস দিল বেয়ারাকে।

মল্লিকা বলল, 'এক টাকা দিলে পারতে। অনিয়মের দিন কীনা!'

প্রসূন সে কথায় সামান্য হেসে মল্লিকার হাত ধরে রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়েই ঘড়িতে চোখ রাখল। দুটো কুড়ি। এখনও চেষ্টা করলে কোন শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে মোটামুটি তিন ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারবে ভেবে, ও সামনের সিনেমা হলের থিকথিকে ভিড়ের মধ্যে মল্লিকাকে নিয়ে সেঁধিয়ে গেল। ওদের কাছে আজ যেন লুকোন আছে একটা আশ্চর্য প্রদীপ। প্রদীপের দৈত্যটা যেন ওদের মনের সব কিছু সামনে এনে হাজির করছে।

সিনেমা হলের সিঁড়ির ধাপে প্রসূন সুমধুর এক নারীকণ্ঠের ডাক শুনতে পেল।

মল্লিকা বলল, 'এই, তোমাকে বোধ হয় কেউ ডাকছে।'

প্রসূন বলল, 'এ নামে আরও কতজন থাকতে পারে।'

'ধুত! এ নামটা শুধু তোমারই, আর কারো থাকতে পারে না।'

'থাকলে কী করবে?'

'বলবো, নামটা পাল্টাতে। এ নামটা শুধু আমারই জন্য', মল্লিকা সহাস্যে উত্তর দেয়।

ঠিক সে সময় ভিড় ঠেলে একজন মহিলা এগিয়ে এসে প্রসূনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, 'বাব্বা! এত ডাকছি, শুনতেই পাও না যে?'

প্রসূন চিনতে পারল সঙ্গে সঙ্গে, শুক্লা সেন। সুগন্ধি ফুলের মতন স্মিত মুখে দাঁড়িয়ে। এতগুলো বছর কেটে গেছে তবু শুক্লার এতটুকু চেহারায় পরিবর্তন নেই দেখে, আশ্চর্যও হল কম না। অপলকে মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুমি একা, না সঙ্গে তোমার উনিও আছেন?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে শুক্লা মল্লিকার দিকে চেয়ে বলল 'তোমার বউ বুঝি?'

'কেন ভাগানো বলে মনে হচ্ছে বুঝি?'

'তা তুমি পার। পি. জি.-র এমারজেন্সীর গেটের সামনে যা কাণ্ড করেছিলে মনে আছে?'

'মনে নেই আবার' প্রসূন পূর্ব স্মৃতি স্মরণ করে হাসল।

মল্লিকা কৌতূহল চেপে রাখতে পারছিল না জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছিল বলুন তো?'

শুক্লা সুস্মিত ভঙ্গি করে বলল, 'বলতে পারি। তবে একটা শর্তে।'

'শর্তটা কী শুনি?'

'শুনলে প্রসূনকে ভুল বুঝতে পারেন, তাই সঙ্কোচ হচ্ছে।'

মল্লিকা টানটান ভঙ্গিতে বলল, 'কথা দিচ্ছি, ভুল বুঝবো না।'

প্রসূনকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা বলুন তো ভাই, কোন প্রেমিক কী তার প্রেমিকাকে হাসপাতালের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে বলতে পারে? প্রসূন কিন্তু পেরেছিল।'

প্রসূন মল্লিকার সামনে সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করল, 'ন্যাচারেলি! পকেটের তখন যা অবস্থা, সিনেমা হলের সামনে ডাকার সাহস ছিল না।'

মল্লিকা আর শুক্লা সে সময় পরস্পরের দিকে রহস্যঘন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। তারপর মল্লিকা হাল্কা গলায় শ্লেষ মিশিয়ে বলল, 'আপনার বন্ধুটি তার যোগ্য জায়গাই বেছে নিয়েছিল, কী বলেন?'

খোঁচাটা গায়ে মাখলো না শুক্লা। নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে অপূর্ব লাস্য ফুটিয়ে বলল, 'কিন্তু প্রসূনের মন্দ কপাল। তার আগেই আমি পরিমলের সঙ্গে এনগেজড হয়ে গেছি। খুব দুঃখ পেয়েছিলে, তাই না প্রসূন?'

পসূন ঋজু ভঙ্গিতে উত্তর দিল, 'কান্নাকাটি করেছিলাম কিনা মনে নেই। কিন্তু তুমি কি বলেছিলে মনে আছে?'

'নাহ। সে সব একদম ভুলে গেছি।'

মল্লিকা দুম করে বলে ফেলল, 'কিছুই ভোলেননি আপনারা। ভুললে এত কথা বলতে পারতেন না।'

শুক্রা কথা ঘোরালো। ঘড়িতে সময় দেখে খুব ব্যস্ততার সঙ্গে বলল, 'ওর আসার কথা ছিল। কিন্তু মনে হচ্ছে, কাজে আটকে গেছে। আর আসতে পারবে না। আমি আট টাকা করে ব্ল্যাকে টিকিট কিনেছি। নেবে তো নাও।'

প্রসূন বলল, 'তুমি পারও বটে। তিন টাকা নব্বয়ের টিকিট আট টাকায়। নীতিতে বাধছে। ঠিক আছে দাও। ব্ল্যাকার তো নও। দাও।' প্রসূন টিকিট দুটো হাতে নিয়ে ষোল টাকা এগিয়ে দিল শুক্লার দিকে।

শুক্লা টাকা ক'টা নিয়ে ব্লাউজের ভেতর গুঁজে দিয়ে মল্লিকার দিকে কটাক্ষে তাকিয়ে হনহন করে ভিড় কাটিয়ে চলে গেল।

সিনেমা হলে প্রথম বেল বাজল। মল্লিকার সঙ্গে প্রসূনের দৃষ্টি বিনিময় হতেই মল্লিকা শ্লেষের গলায় হাসল, 'আজকের অনিয়মটা চূড়ান্তই হল দেখছি।'

একজন অপরিচিত লোক ওদের পাশে এসে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলবো?'

প্রসূন বলল, 'নিশ্চয়ই বলুন?'

লোকটা বলল, 'আপনাদের কথাগুলো শুনেছি বলেই বলছি, আপনি কিন্তু ঠকেছেন।'

'তার মানে?'

লোকটা বলল, 'ওই ভদ্রমহিলা একদিন আমার কাছেও ঠিক ওই একই কথা বলে টিকিট বিক্রি করেছিল। সেদিনও কিন্তু আপনাদের মতই আমারও মনে হয়েছিল, উনি ব্ল্যাকার নন। কিছু মনে করবেন না, চলি।' লোকটা চলে গেল।

হলের শেষ বেল এবার বাজল। প্রসূন আর মল্লিকা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সিঁড়ির গোড়ায়। মল্লিকা হঠাৎ ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'মিথ্যেবাদী!!'

'কে?' প্রসূন দুর্বল গলায় বলে।

মল্লিকা উত্তর দিল না। প্রসূনের হাত থেকে টিকিট দুটো টেনে নিয়ে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিল সে।

ছবি : অনুপ রায়

শেষ

ঠোঁটদুটি মোর হাসিমাখা যেন পাকা টুকটুকে চেরীফল, অন্তর মম খুশি-উচ্ছল সদ্যফোটা শতদল!"
ল্যাক্মে লিপস্টিক।
সবচেয়ে বেশী রকমের রঙের সম্ভার!
মেটালিক্স, গ্লীমারস্ আর এক ধরনের বিশিষ্ট 'ন্যাচারাল'।
আরো মোলায়েম — মসৃণ, আর সবচেয়ে সমান গ্লস।
রূপ ঝলমল, অন্তর খুশি-উচ্ছল করতে Lakmé

When the vase is Satsuma, the walls are Luxol Silk.

Luxol Silk. It is the only emulsion paint you can tell with your eyes closed. Just run your fingers over the silken, super-smooth finish.

Luxol Silk. Its perfect silk finish makes it so easy to wash, so easy to keep bright and clean looking for years and years.

Luxol Silk. Choose from over forty shades of silk. And from a whole new range of whites that whisper.

Drape your walls with Luxol Silk
— the richest emulsion in the world.

BERGER
PAINTS
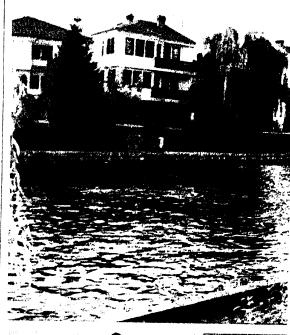
ম্যাসিডোনিয়ায় কবিতা-সন্ধ্যা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

স্ট্রুগা শহর—যেখানে বসেছিল আমাদের কবিতা পাঠের আসর

ওখরিড নামে যে একটি সুবৃহৎ হ্রদ আছে কোথাও তা আমার জানা ছিল না। আমার বাড়িতে যে অ্যাটলাস আছে, তাতে স্ট্রুগা নামে কোনো শহরের নাম তন্নতন্ন করেও খুঁজে পাওয়া গেল না। ম্যাসিডোনিয়ার কথা আমি পড়েছি ইতিহাসে, ভূগোলে নয়। ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপের ছেলে দুঃসাহসী আলেকজাণ্ডার দিকবিজয় করতে করতে ভারতের সিন্ধু নদীর পারে এসে থেমেছিলেন। সেই ম্যাসিডোনিয়া যে এখন আধুনিক যুগোশ্লাভিয়ার একটি রিপাবলিক, সরলভাবে সত্যি কথাটা স্বীকার করছি, তা আমি জানতুম না আগে।

সেই ম্যাসিডোনিয়ার ওখরিড হ্রদের তীরে স্ট্রুগা নামে অতি ছোট্ট একটি শহরের কবি-সম্মেলনে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পেলাম হঠাৎ। সেখানকার বাৎসরিক কবি সম্মেলনের পঁচিশ বছর পূর্তি হচ্ছে, সেই উপলক্ষে পৃথিবীর বহু দেশের কবিদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা দেবেন আতিথেয়তা, ভারত সরকারের সংস্কৃতি সম্বন্ধ পরিষদ (আই সি সি আর) স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রস্তাব পাঠালেন আমার বিমান ভাড়া দেবার।

এই সময় আমার খুব কাজের চাপ। কয়েকদিন আগেই বিদেশ থেকে ফিরেছি, কয়েক মাস পরেই আবার বিশ্ব বইমেলায় যোগদানের কথা আছে, এর মাঝখানে শারদীয় সংখ্যার লেখা-টেখা শেষ করতে হবে। কিন্তু ভ্রমণের কথা উঠলেই আমার পায়ের তলা সুড়সুড় করে, তা ছাড়া ম্যাসিডোনিয়া নামটির রোমাঞ্চ অনুভব করি শরীরে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়েও যে যুগোশ্লাভিয়া জোট নিরপেক্ষ হয়ে আছে, সেই দেশটি চাক্ষুষ দেখার আগ্রহও ছিল অনেকদিন ধরে। সুতরাং সাগরদা-নীরেনদা-রমাপদ চৌধুরী-সেবাব্রত গুপ্ত প্রমুখ বাঘা বাঘা সম্পাদকদের উষ্মা ও রক্তচক্ষুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও রাজি হয়ে গেলুম এককথায়।

সুতরাং অগাস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আবার আকাশযাত্রা। যেতে হবে বেশ কয়েকবার বিমান বদল করে। বারবার নামা-ওঠা, এক একটা বিমানবন্দরে কয়েক ঘণ্টা করে অপেক্ষা বেশ বিরক্তিকর, কিন্তু নতুন দেশ দেখার আনন্দে তা সহ্য করা যায়। কলকাতা থেকে বোম্বাই, তারপর বিরাট এক লাফে জ্যুরিখ, সেখান থেকে বেলগ্রেড। আপাতত বেলগ্রেডে রাত্রিযাপন। বিমান কম্পানিই সেখানে হোটেল ঠিক করে রেখেছে।

বেলগ্রেডের আসল নাম বেওগ্রাড। খুবই প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর। এই শহরটিকে বলা যায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মাঝখানের দরজা। কত যে যুদ্ধ, ধ্বংস ও রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটেছে এখানে তার ইয়ত্তা নেই। বিকেলবেলা পৌঁছে পরেরদিন সকালের মধ্যে, একা একা, এই শহর ভালোভাবে দেখার সুযোগ পাওয়া যাবে না, কিন্তু একটা জিনিস দেখবোই, তা আগে থেকেই ঠিক করে এসেছি। কোনো নতুন জায়গায় গেলে সেখানকার নদী না দেখলে আমার মন আনচান করে। বেলগ্রেডের পাশ দিয়ে গেছে একটা নয়, দু দুটো নদী। একটির নাম সাভা, আমাদের কাছে তেমন পরিচিত নয়। কিন্তু অন্যটি হল ইওরোপের প্রধান নদী দ্যানিয়ুব। এই শহরেরই এক প্রান্তে ঐ দুই নদীর সঙ্গমস্থল।

পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি, সমাজতান্ত্রিক দেশে রাত্তিরবেলাও একলা একলা নির্ভয়ে চলাফেরা করা যায়। রাস্তা হারিয়ে ফেলতে পারি, কিন্তু কেউ অন্ধকারে ছুরি দেখাবে না। পকেটে পয়সা-কড়ি কম, ট্যাক্সি চড়ার বিলাসিতা মনেও আসে না। তবে, এই শহরে ট্রাম চলে। ট্রামে চেপে, লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে করতে পৌঁছে গেলুম আমার অভীষ্ট স্থলে। দ্যানিয়ুবের তীরে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলুম ব্লু দ্যানিয়ুবের স্বর্গীয় মূর্চ্ছনা।

যুগোশ্লাভিয়ার ম্যাপে, এমনকি ম্যাসিডোনিয়ার ম্যাপেও স্ট্রুগা শহরের নাম নেই। যেমন ভারতবর্ষের, এমনকি পশ্চিমবাংলার মানচিত্রেও চম্পাহাটি বা কৈখালির নাম পাওয়া যাবে না। এত ছোট শহরে এরকম একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকা প্রথমে বিস্ময়কর মনে হলেও পরে বুঝতে পারলুম, এটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। আমাদের সব কিছুই রাজধানীতে হয়, তার ফলে ছোট ছোট শহরগুলির মানুষরা আঞ্চলিকতা ছাড়িয়ে বিপুল বিশ্বের স্বাদ পায় না কখনো। কিন্তু দেশের নাগরিক হিসেবে তাদেরও কি সমান অধিকার নেই? রাজধানীর মানুষদের তুলনায় তারা অনেক কিছু থেকে কেন বঞ্চিত থাকবে?

ইংরিজি বানানে OHRID, উচ্চারণে ওখরিড নামে বিশাল হ্রদটির গায়ে এই স্ট্রুগা শহর। জায়গাটি বড় সুন্দর। যেদিকেই তাকাও, বড় বড় পাহাড়ের গা। হ্রদের জল স্বচ্ছ নীল। বাড়িগুলির সামনে আপেল-ন্যাশপাতির বাগান। স্বাস্থ্যকর জায়গা হিসেবে খ্যাতি আছে বলে ইওরোপের অনেক ভ্রমণকারী আসে এখানে, তাই কয়েকটি বেশ বড় বড় হোটেল আছে। সুতরাং এতগুলি অতিথির স্থান সঙ্কুলানের অসুবিধে নেই।

হোটেলে ঘর পাবার পর অনুষ্ঠান সূচিতে চোখ বোলালুম। বাইরের চল্লিশটি দেশ থেকে আশীজন কবিকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে, এছাড়া রয়েছেন যুগোশ্লাভিয়ার কবিরা। ভারতীয় হিসেবে নাম রয়েছে তিনজনের, অন্য দু'জন হলেন সচ্চিদানন্দ বাৎসায়ন—অজ্ঞেয় এবং এল এল মেহোত্রা। অজ্ঞেয় হিন্দী ভাষার প্রবীণ কবি, তাঁর কথা জানি, কিন্তু মেহোত্রার নাম আমি আগে কখনো শুনিনি। পরে জানলুম, এই মেহোত্রা যুগোশ্লাভিয়ায় আমাদের রাষ্ট্রদূত। বিকেলবেলা দেখা হলো তাঁর সঙ্গে। অজ্ঞেয়জী তখনও এসে পৌঁছোননি, পরদিন আসবার কথা।

অন্যান্য দেশের কবিদের তালিকায় বেশ কয়েকটি নাম আমার পূর্ব পরিচিত, অন্যান্য সম্মেলনে দেখা হয়েছে, বিশেষত বেলজিয়ামের কাব্য-উৎসবে। বাংলাদেশ থেকে এসেছেন আলাউদ্দীন আল-আজাদ, এঁর সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল না, আসবার পথে বিমানেই আলাপ হয়েছে। আমেরিকা থেকে এসেছেন পাঁচ জন, রাশিয়া থেকে দু'জন। এই দু'দেশের তালিকায় রয়েছে দু'জন বিশ্ববিখ্যাত কবির নাম, অ্যালেন গীনসবার্গ এবং আন্দ্রেজ ভজনেসেনস্কি। এই দু'জনকে ঘিরেই বেশি লোকের কৌতূহল।

অ্যালেন গিনসবার্গ

গোটা ম্যাসিডোনিয়ার জনসংখ্যাই সাড়ে উনিশ লাখ, কলকাতার অর্ধেকও নয়। স্ট্রুগা শহরের জনসংখ্যা দশ-পনেরো হাজার হবে। তবু এই পুঁচকে শহরে আছে একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক কবিতা-ভবন ও সংগ্রহশালা। সেখানে রক্ষিত আছে পৃথিবীর বহু ভাষার কবিতার বই, কবিদের ছবি ও পাণ্ডুলিপি। এ ছাড়া রয়েছে আর একটি কবিতা-কেন্দ্র। যেটি স্থানীয় কবিদের জন্য। যুগোশ্লাভিয়ার প্রধান ভাষা সার্বোক্রোয়াশিয়ান। কিন্তু তার চাপে ম্যাসিডোনিয়ান ভাষা যাতে হারিয়ে না যায়, সেইজন্য ম্যাসিডোনিয়ান ভাষার উন্নতির খুব চেষ্টা হচ্ছে। গোটা কবি সম্মেলনের সমস্ত কাজকর্ম চললো ঐ ভাষায়। আমার ধারণা হলো, এখানে এই আন্তর্জাতিক কবি-সম্মেলনের উদ্যোগের অন্যতম কারণ, বিশ্বের লোকেরা

জানুক, ম্যাসিডোনিয়ার একটি নিজস্ব উন্নত ভাষা আছে।

কবিতা-ভবনের চূড়ায় একটি বিশাল আলো জ্বালিয়ে হলো সম্মেলনের উদ্বোধন। সামনেই একটি ছোট নদী। কবিতা শুনতে সারা শহরের লোকই চলে এসেছে, সম্ভবত এটাই এই শহরের প্রধান বার্ষিক উৎসব। প্রত্যেক বছর এই উৎসবে একজন কবিকে প্রধান কবির সম্মান-পুরস্কার দেওয়া হয়। সোভিয়েত দেশের জনপ্রিয় কবি আন্দ্রেজ ভজনেসেনস্কি এই পুরস্কার পেয়েছেন কয়েক বছর আগে, আমাদের অজ্ঞেয়জীও পেয়েছেন গত বছর, এ বছর পাচ্ছেন অ্যালেন গীনস্‌বার্গ।

প্রতিদিন কবিতা পাঠের আসর দু'বার। সন্ধ্যায় ও মধ্যরাত্রে। এ দেশের সন্ধ্যা আমাদের সন্ধ্যা এক নয়। এ দেশের সন্ধ্যা শুরু হয় আটটার পর, শ্রোতারা খাওয়াদাওয়া করে আসে। যেহেতু কবিদের সংখ্যা অনেক, তাই প্রতিদিন সন্ধ্যার

রীগা শহরের গির্জার দৃশ্য

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের কবিদের ভাগ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। সবাই একটি করে কবিতা পড়বেন। আর একটি অনুষ্ঠান মধ্যরাত্রি থেকে শুরু, তাতে যার যত খুশী কবিতা পড়তে পারেন, সারা রাত চললেও ক্ষতি নেই। দর্শক-শ্রোতারা অধৈর্য না হলেই হলো। শ্রোতাদেরও রাত দুটো তিনটেয় বাড়ি ফেরার জন্য গাড়িঘোড়া পাওয়ার চিন্তা নেই। যে-যার হেঁটেই বাড়ি ফিরতে পারে। এ ছাড়া অনেকেরই নিজস্ব গাড়ি আছে। এই গ্রাম-প্রতিম ছোট শহরেও ইচ্ছে করলে সারা রাত ট্যাক্সি পাওয়া যায়।

খুব সম্ভবত স্বাস্থ্যের কারণেই অজ্ঞেয়জী শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছোলেন না। স্থানীয় উদ্যোক্তারা অনেকেই তাঁর খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন। রাষ্ট্রদূত মেহোত্রা একদিন থেকেই ফিরে গেলেন। সুতরাং ভারতীয় বলতে একা আমি। এত বড় রাষ্ট্রের ভার কি একা আমার ঘাড়ে সামলাতে পারি? তার জন্য অনেক ঝক্কি ঝামেলা পোহাতে হয়েছে।

রীগা শহরের বিভিন্ন দৃশ্য

একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

তৃতীয়দিন সকালে আমি সবেমাত্র ঘুম চোখে নিজের ঘর থেকে নেমে এসে হোটেলের ডাইনিং রুমে চা খেতে এসেছি। অর্ডার দেওয়া হয়েছে, তখনও চা আসেনি। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আর যত গুণই থাক, হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাবার দাবার পেতে বড্ড দেরি হয়। যেহেতু সমস্ত হোটেলই সরকারি, তাই পরিচারকদের ব্যবহার অবিকল সরকারি কর্মচারিদের মতনই, তাঁরা আস্তে হাঁটেন, অনেক কথা কানে শুনতে পান না। এখানে আবার ইংরিজিও বোঝেন না।

চায়ের প্রত্যাশায় বসে আছি, এমন সময় উদ্যোক্তাদের একজন প্রতিনিধি ব্যস্তসমস্ত হয়ে এসে বললেন, সেদিন প্রভাতী অনুষ্ঠানে কয়েকটি দেশের নামে গাছ পোঁতা হবে। ভারতবর্ষের নামের গাছটির গোড়ায় মাটি ঢালতে হবে আমাকে।

আমি বললুম, ঠিক আছে, চা-টা খেয়ে নিই?

প্রতিনিধি বললেন, কিন্তু সবাই তৈরি হয়ে আছে। আপনার জন্য শুরু করা যাচ্ছে না, অনুগ্রহ করে এক্ষুনি চলুন।

ভদ্রলোকের চোখমুখ দেখে মনে হলো, ওঁর ওপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেটা ঠিকঠাক পালিত না হলে উনি ওপরওয়ালার কাছ থেকে বকুনি খাবেন।

আমি বললুম, তা বলে, এক কাপ চা খাওয়ারও সময় হবে না?

উনি বললেন, তা হলে বড্ড দেরি হয়ে যাবে।

অর্থাৎ উনিও জানেন যে আশু চা পাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা নেই। সুতরাং আমাকে উঠে পড়তেই হলো।

আমাদের হোটেল থেকে মাইল দেড়েক দূরে একটি উদ্যানের নাম দেওয়া হয়েছে 'কবিতার উদ্যান'। সেখানে প্রতি বছরই কিছু কিছু কবিকে নিয়ে গাছ পোঁতান হয়। অজ্ঞেয়জী এলে প্রবীণ ও খ্যাতিমান হিসেবে এ কাজটি নিশ্চয়ই তাঁকেই করতে হতো। সকালবেলা প্রথম কাপ চা পানের আগে আমার মেজাজ খোলে না। তাছাড়া আগেরদিন একটা ভারি সুটকেস তুলতে গিয়ে আমার ডান হাতে হঠাৎ ব্যথা লেগেছে।

চারা গাছ নয়, মাঝারি আকারের একটি পাইন গাছ অন্য জায়গা থেকে এনে লাগানো হচ্ছে, সুতরাং অনেকখানি মাটি দিতে হবে। আমি মনে মনে ভাবছি, গাছ পোঁতার জন্য এত আদিখ্যেতার কী দরকার। আমি এক চামচে মাটি ফেলার পর বাকি কাজটা তো বাগানের মালিরা করে দিলেই পারে। তা নয় পুরোটাই করতে হবে আমাকে, ভারি কোদালটা তুলতে হাত টনটন করছে আমার। কিন্তু মুখ বিকৃত করার উপায় নেই, হাসি হাসি মুখ করে থাকতে হবে। কারণ টিভি-র জন্য ছবি তোলা হচ্ছে। অজ্ঞেয়জী না এসে কী বিপদেই ফেললেন আমাকে!

এই অনুষ্ঠান শেষে অ্যালেন গীনসবার্গ আমাকে দেখতে পেয়ে কাছে এসে জড়িয়ে ধরে বললো, সুনীল, কী আশ্চর্য আবার এত তাড়াতাড়ি তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল!

আমি বললুম, তুমি পুরস্কার পেয়েছো, সে জন্য তোমাকে অভিনন্দন, অ্যালেন! আজকাল বড় বড় প্রতিষ্ঠান তোমাকে পুরস্কার দিচ্ছে!

অ্যালেন হেসে বললো, মায়া! সবই মায়া!

আমি বললুম, কাল সন্ধেবেলা থেকে তোমাকে দূর থেকে দেখছি। কত লোকের সঙ্গে তুমি অনবরত কথা বলে যাচ্ছো। খুব ব্যস্ত। সব লোকের সঙ্গে তুমি ঠাণ্ডা মাথায় সবরকম প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও কী করে, অ্যালেন?

অ্যালেন সেই রকমই হেসে বললো, বড় কঠিন কর্ম। কঠিন কর্ম!

অ্যালেন মায়াকে বলে মাইয়া, কর্মকে বলে কার্মা। তবে এর দু'একদিন বাদে সে "জয় জয় দেবী, চরাচর সারে, কুচযুগ শোভিত মুক্তা হারে..." এই শ্লোকটি নির্ভুল উচ্চারণে মুখস্ত বলেছিল, যদিও সে সংস্কৃত জানে না।

ম্যাসিডোনিয়ায় (এখানকার উচ্চারণে

ম্যাকেডোনিয়া) প্রত্যেক ছোট ছোট শহরেই আছে আলাদা বেতারকেন্দ্র। এছাড়া রাজধানী স্কোপিয়ায় টিভি সেন্টার, খবরের কাগজ বেরোয় বেশ কয়েকটি, এরা সবাই মিলে বহিরাগত কবিদের সাক্ষাৎকার নেবার জন্য ব্যস্ত। কান একেবারে ঝালাপালা হবার জোগাড়। অ্যালেনের মতন এই সব 'কঠিন কর্ম' আমি ঠিক পারি না। একই কথা বারবার বলতে একঘেয়ে লাগে। আমি ওদের কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই, তার চেয়ে প্রকৃতি দেখা অনেক আনন্দের।

স্ট্রুগা শহরের মাঝামাঝি বয়ে যাচ্ছে একটি ছোট নদী, বেশ স্রোত। দু' পাড় বাঁধানো, মাঝে মাঝে গাছের নিচে বেঞ্চ পাতা। কেউ কেউ ছিপ ফেলে মাছ ধরছে। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা দাপাদাপি করছে জলে। কিছুদূর অন্তর অন্তর একটা করে ব্রীজ। একটি ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে আমি উঁকি মেরে চমকে উঠলুম। সেই নদীতে অসংখ্য মাছ, ছোট ছোট, চেলা জাতীয়। ঐ মাছ ধরা ও বাচ্চাদের দাপাদাপি দেখে আমার পূর্ববঙ্গের বাল্যস্মৃতি মনে পড়ে যায়।

নদীটি গিয়ে পড়েছে লেক ওখরিডে, সেই মোহনায় দলে দলে নারী-পুরুষ এসেছে রোদ পোহাতে। পশ্চিমী দেশগুলির সমুদ্রতীরে এই রকম দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। এই হ্রদও প্রায় সমুদ্রের মতন। তবে পশ্চিমী দেশগুলিতে এই সব জায়গায় একটা জমজমাট ভাব থাকে, তার কারণ কাছাকাছি অনেক দোকানপাট ও গানবাজনা। সেই তুলনায় এই জায়গাটা বেশ শান্ত।

কবির দলকে ছেড়ে, একলা একলা হাঁটতে হাঁটতে আমি অনেক দূরে একটি গ্রাম্য বাজারে চলে যাই। পাশেই অভ্রভেদী পাহাড়। মানুষগুলি একবিন্দু ইংরেজি বোঝে না। কিন্তু মুখের ভাবে যে সারল্য তা বিশ্বজনীন। কিছু কিছু মানুষের চেহারা ও পোশাক এবং কোনো কোনো বাড়ির গড়ন দেখলে বেশ চেনা চেনা লাগে, মনে হয় আমাদের দেশের মতন। এর কারণ, তুর্কিরা এখানে বেশ কয়েক শতাব্দী রাজত্ব করে গেছে, সেই প্রভাব এখনও রয়েছে কিছু কিছু। এদেশে কিছু তুর্কি এবং মুসলমান আছে, মাঝে মাঝে মসজিদও চোখে পড়ে।

এ দেশের মুদ্রার নাম দিনার। আরব-পারস্য কাহিনীতে দিনারের উল্লেখ পেয়েছি অনেক। দশ দিনারে এক ক্রীতদাসী পাওয়া যেত, রাস্তায় কেউ এক এক দিনার কুড়িয়ে পেলে আনন্দে লাফাতো। সেই দিনারের এখন কী দুর্দশা! দু মাইল ট্যাক্সি চাপলে এক হাজার দিনার লাগে। আমাদের এক টাকায় ওদের প্রায় তিরিশ দিনার। তবে কম মূল্যের দিক থেকে দিনার এখনো ইটালির লীরাকে হারাতে পারেনি।

এখানকার খাদ্যদ্রব্যের খুব একটা গুণগান করা যায় না। পেট ভরাবার উপযোগী খাদ্য আছে ঠিকই, কিন্তু সুস্বাদু নয়। রান্না বৈচিত্র্যহীন। হোটেলে আমাদের খাদ্যদ্রব্য বিনামূল্যে, বাঁধাধরা মেনিউ, অতিরিক্ত কিছু নিতে গেলে দাম দিতে হয়। একদিন এক পরিচারক আমার পাশ দিয়ে এক প্লেট মাছ ভাজা নিয়ে যাচ্ছে দেখে বললুম, আমাকে ঐ মাছ ভাজা দাও তো এক প্লেট। মাংস খেয়ে খেয়ে মুখ পচে গেছে, তা ছাড়া বাঙালীর বাচ্চা মাছ দেখলে তো ইচ্ছে জাগবেই। একটি প্লেটে বড় সরপুঁটি জাতীয় মাছের দুটি টুকরো এনে দিয়ে সেই পরিচারক প্রায় আমার গালে থাপ্পড় মেরে তিন হাজার দিনার নিয়ে নিল! অত দামের জন্যই বোধ হয় সেই মাছের স্বাদ আমার কাছে গাছের বাকল ভাঙ্গার মতন মনে হলো! সম্মেলন কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রত্যেককে আট হাজার দিনার করে দিয়েছিলেন হাত খরচ হিসেবে। তার মধ্যে তিন হাজার চলে গেল এক প্লেট মাছ ভাজায়! লোভ থেকে যে পাপ, এটা সেই পাপের বেতন!

একদিন আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো পিকনিকে। মাইল পঞ্চাশেক দূরে পাহাড়ের ওপরে। সেন্ট লাউম নামে এক প্রাচীন মনাস্টারির চত্বরে। বড় মনোহর সেই স্থান। মনাস্টারিটি বেশ প্রাচীন, জানলাগুলিতে ছবি আঁকা রঙীন কাচ। এদিককার অধিকাংশ মানুষই গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের অন্তর্গত। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও ধর্মচর্চা লোপ পায়নি।

এই পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে ওখরিড হ্রদটি অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। কাছেই দেখি এক জায়গায় জলের ওপর সরল রেখার অনেকগুলো সাদা সাদা বল ভাসছে। একজন জানালো যে প্রাচীন ম্যাসিডোনিয়া রাজ্যের মতন এই হ্রদটিও অনেক ভাগ হয়ে গেছে। কিছু অংশ গেছে গ্রীসে, কিছু অংশ আলবেনিয়ায়। আমরা যে বলগুলি দেখছি, সেটা হলো আলবেনিয়ার সীমারেখা। এই সেই আলবেনিয়া, যেখানে পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের মানুষের প্রবেশ নিষেধ।

আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল আমার পূর্ব পরিচিত মার্ক নেসডর নামে এক মার্কিন তরুণ কবি। সে বললো, সুনীল, তুমি যদি মনের ভুলে ঐ সীমান্ত পেরিয়ে যাও, তা হলেই গুলি খেয়ে মরবে!

আমি বললুম, তোমার সে ভয় থাকতে পারে, আমার নেই। আমি দু'হাত তুলে বলবো, আমি মাদার টেরিজার কলকাতা থেকে এসেছি।

স্ট্রুগায় কবিতা উৎসব হলো চারদিন। এর মধ্যে দুটি সন্ধ্যা খুবই অভিনব। একটি সন্ধ্যা পুরোপুরি এবারের পুরস্কার বিজয়ী অ্যালেন গীনসবার্গকে কেন্দ্র করে। সেই আসর বসলো ওখরিড শহরের সেন্ট সোফিয়া গীর্জার অভ্যন্তরে, রাত দশটায়। এখানে অ্যালেনের কবিতা পড়া হলো বিভিন্ন ভাষায়, তারপর অ্যালেন ছোট্ট বক্তৃতা দিল। নিজের কবিতা পড়লো, অনেকগুলি এবং গান তো সে গাইবেই। সঙ্গে আছে খুদে হারমোনিয়ামটি। তার প্রথম গানটিই হলো, 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড।'

স্ট্রুগার শেষ সন্ধ্যাটি যেমন বেচিত্র্যপূর্ণ, তেমনই বর্ণাঢ্য। অনুষ্ঠানের নাম দা ব্রিজেস। অর্থাৎ পৃথিবীর নানা দেশের কবিদের মধ্যে সেতুবন্ধন। মঞ্চ সাজানো হলো নদীর ওপরে সত্যিকারের একটি সেতুর ওপরে। দর্শক শ্রোতারা বসেছে

ভারতের রাষ্ট্রদূত ও কবিতা সম্মেলনের সভাপতির সঙ্গে

স্ট্রুগা শহর

নদীর দু ধারে। প্রত্যেক দেশের একজন মাত্র কবি একটি করে কবিতা পড়বেন। এমনকি আমেরিকা বা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকেও একজন করে। সুসজ্জিত মঞ্চটি নদীর ধার থেকে এমন অপরূপ দেখাচ্ছিল যে আমার ইচ্ছে করছিল দর্শকদের মধ্যেই বসতে। অজ্ঞেয়জী এলে আমি নিস্তার পেয়ে যেতুম, কিন্তু অগত্যা আমাকেও উঠতে হলো মঞ্চে।

এ এক এমনই বিচিত্র কবি সম্মেলন, যেখানে মঞ্চোপরি উপবিষ্ট কবিরা কেউ কারুর কবিতা প্রায় এক অক্ষরও বুঝতে পারছেন না। প্রত্যেক কবি কবিতা পাঠ করছেন তাঁদের মাতৃভাষায়, তারপর স্থানীয় কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রী এসে আবৃত্তি করছে সেই কবিতার ম্যাসিডোনিয়ান ভাষায় অনুবাদ। ইংরেজির মধ্যস্থতা নেই। অর্থাৎ আমরা ফরাসী - জার্মান - ইজিপশিয়ান-গ্রীক - ইতালিয়ান - স্প্যানীশ - পোলিশ - নরওয়েইনিয়ান - টার্কিশ ইত্যাদি ভাষার মূল কবিতাও বুঝছি না, ম্যাসিডোনিয়ান অনুবাদও আমাদের কাছে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। কবিরা পড়ছেন নদীর দিকে তাকিয়ে। আমি মনে মনে বললুম, আর কেউ না বুঝুক, নদী বুঝবে।

অত্যাশ্চর্য ব্যাপারটি এই যে, এই আসরে গ্রীক-জার্মান-ইতালিয়ান ইত্যাদি ভাষা মাত্র একবার করে শোনা গেলেও বাংলা ভাষা শোনা গেছে দুবার। ভারত ও বাংলাদেশ থেকে।

মঞ্চে শাড়ী পরা মহিলাও ছিলেন একজন, তিনি এসেছেন শ্রীলঙ্কা থেকে, তিনি কবিতা পড়লেন ইংরিজিতে। সব শেষে পুরস্কারটি তুলে দেওয়া হলো অ্যালেন গীনসবার্গের হাতে। সেটি একটি গোল্ডেন রীথ্ বা স্বর্ণ-শিরোমাল্য। সত্যি সত্যি সোনার। সেটি গ্রহণ করে অ্যালেন মাইকে তিনবার শুধু বললো, ওম্ ওম্ ওম্। এই ধ্বনির মর্ম বোধ হয় অন্য কেউই বোঝেনি, অ্যালেন চোখ টিপলো আমার দিকে, দর্শকদের মধ্য থেকেও অনেকে ওম্ ওম্ বলে চেঁচিয়ে উঠলো।

এর পরদিন কবিতার আসর ছড়িয়ে গেল বিভিন্ন শহরে ; কবিরা ভাগ হয়ে গেল কয়েকটি দলে। উদ্দেশ্য এই যে ম্যাসিডোনিয়ার সব অঞ্চলের মানুষই যেন এই আন্তর্জাতিক সমাবেশের কিছুটা অংশ নিতে পারে।

আমি আগে থেকেই বলে রেখেছিলুম, আমি খুব ছোট শহরে যেতে চাই। ছোট জায়গা আমার অন্তরঙ্গ লাগে, রাস্তাঘাটও ভালো করে দেখা যায়। আলাউদ্দিন আল-আজাদ ও আমি একই দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এলুম স্টিপ নামে একটি ছোট্ট শৈলশহরে। পথে প্রিলেপ নামে এক জায়গার এক দোকানে প্রকৃত টার্কিশ খাবার খাওয়া হলো, বেশ ঝাল ঝাল খাদ্য, বেশ আমাদের রুচিমতন। এখানকার ওয়াইন বিখ্যাত। কিন্তু যুগোশ্লাভিয়ায় এসে দেখছি, এরা ওয়াইনের সঙ্গে সোডা কিংবা মিনারাল ওয়াটার মিশিয়ে দেয়। ইওরোপের অনেক দেশে ওয়াইনের সঙ্গে জল মেশালে বাঙাল বলবে!

স্টিপ শহরটি ক্ষুদ্র হলেও এখানেও একটি সংস্কৃতি ভবন আছে। কবিতা পাঠ হলো তার চত্বরে, আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করলেন কিছু কিছু স্থানীয় কবি। সেই সব কবিদের সঙ্গে আড্ডা জমলো রাত্রে ভোজসভায়। সেই আড্ডা চললো রাত পৌনে তিনটে পর্যন্ত। কবিতা পাঠের আসরের চেয়েও আমার এই সব আড্ডা বেশি ভালো লাগে। আমরা কেউ কারুর কবিতা বুঝতে পারিনি, কিন্তু আড্ডায় চলে এলুম অনেক কাছাকাছি। এর মধ্যেই এক সময় প্রস্তাব উঠলো, প্রত্যেককে নিজের দেশের দু একখানা করে গান শোনাতে হবে। প্রথমে শুরু করলো কিউবার মেয়ে মারলিন বোবেস, তারপর চেকোশ্লোভাকিয়ার লিডিয়া ভাদকের গ্যাভেরনিকোভা, তারপর হাঙ্গেরির পেটার কানট্রর··· একে একে প্রত্যেকে। আলাউদ্দীন আল-আজাদ শোনালেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। যুগোশ্লাভিয়ার কবিরা দলে ভারি, তাঁরা শোনালেন অনেকগুলি পল্লীগীতি থেকে আধুনিক। আমাকেও বেসুরো হেঁড়ে গলায় গাইতেই হলো দু-একখানা।

সারা ম্যাসিডোনিয়া ঘুরে সমস্ত কবির দল আবার জমায়েত হলো এখানকার রাজধানী স্কোপিয়া-য়। (বানান Skopje) এখানেও কবিতা পাঠ করতে হলো একটি কারখানায়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, তাদেরও কবিতা শোনাবার প্রথা আছে।

তবে, কারখানায় কবিতা শোনাবার কথা মানে

এই নয় যে, শ্রমিকরা ওভারঅল পরে যন্ত্রপাতি হাতে নিয়ে বড় বড় মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আর আমরা সেখানে কবিতা পড়ে যাচ্ছি। সে রকম ব্যাপারই নয়। মস্ত বড় কারখানা, প্রায় দশ হাজার লোক কাজ করে, তাদের রয়েছে নিজস্ব সুদৃশ্য রঙ্গমঞ্চ। সেখানে এসেছেন বিশেষ নিমন্ত্রিতরা। তবে এঁদের নিজস্ব বেতার ব্যবস্থা আছে। এখানকার কবিতা পাঠ সরাসরি শ্রমিকদের কাছে রিলে করা হবে, শ্রমিকরা ইচ্ছে করলে শুনতে পারেন, বন্ধ করে দিতে পারেন।

এই আসরে আমার পাশেই বসেছেন ভজনেসেনস্কি। এর আগে দু তিনবার দেখা হলেও আমি ওঁর সঙ্গে আলাপ করিনি। কারণ, প্রথমত, আমি নিজে থেকে কারুর সঙ্গে আলাপ করতে পারি না। দ্বিতীয়ত ভজনেসেনস্কির ভাবভঙ্গি দেখে তাঁকে আমার অহঙ্কারী মনে হচ্ছিল। অহংকারের কারণ আছে, তিনি সোভিয়েত দেশের জনপ্রিয় কবি। যুগোশ্লাভিয়ানরা অনেকেই রুশ ভাষা মোটামুটি বোঝে সুতরাং এঁর কবিতার সঙ্গে পরিচিত, তিনি এখান থেকে পুরস্কারও পেয়ে গেছেন।

আমার লাজুকতাও বোধ হয় এক ধরনের অহংকার, তাই আমি বিখ্যাত কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যেচে কথা বলতে পারি না। সুতরাং পাশাপাশি বসেও আমাদের দুজনের কোনো কথা হলো না।

ভজনেসেনস্কির কবিতা পাঠের ভঙ্গিটি নাটকীয়। মঞ্চে মাইক্রোফোনটি ছিল একটি ডেস্কের ওপর, তিনি সেটি সরিয়ে আনলেন ফাঁকা জায়গায়, যাতে তাঁর সম্পূর্ণ শরীরটি দেখা যায়। তাঁর পরনে সাদা প্যাণ্ট ও সাদা শার্ট, মধ্যবয়েসী সুগঠিত দেহ, মাথার চুল ঈষৎ পাতলা হয়ে এসেছে। একটা পা সামনে এগিয়ে, এক হাত তুলে তিনি কখনো চেঁচিয়ে কখনো নিচু গলায় পড়লেন দুটি কবিতা। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারলুম না, তবে স্ট্রুগা শব্দটি শোনা গেল কয়েকবার, এই সব উল্লেখ থাকলে স্থানীয় লোকেরা খুশী হয়।

এই সব আসরে অনেককেই খুব চেঁচিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে কবিতা পড়তে দেখি। ম্যাক্স মায়াটিস নামে একজন আমেরিকান কবি, অতি দীর্ঘকায়, কাউবয়ের মতন চেহারা, সে প্রায় নাচতে নাচতে লম্বা একটা কবিতা মুখস্থ বলে। মালয়েশিয়ার কবি আবদুল গফফার ইব্রাহিম এমন জোর দিয়ে, ডেস্ক চাপড়াতে চাপড়াতে কবিতা পড়লো যেন সে মেঠো রাজনৈতিক বক্তৃতা দিচ্ছে। আবার অনেক লাজুক, মৃদু গলার কবিও আছেন।

অ্যালেন গীনসবার্গ এই আসরে ছিল না, তাকে পাঠানো হয়েছিল অন্য কারখানায়। তার সঙ্গে দেখা হলো সন্ধেবেলা হোটেলের লবিতে। সে বললো, সুনীল, তোমার সঙ্গে তো এবার ভালো করে গল্পই করা গেল না। আমি বললুম, তুমি এখানে বড্ড ব্যস্ত। অনেকে তোমাকে সর্বক্ষণ ঘিরে থাকে।

অ্যালেন আমার কাঁধ ধরে এক পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বললো, সত্যি, ক্লান্ত হয়ে গেছি। শোনো, আর কারুকে বলো না, তুমি ঠিক পৌনে সাতটায় হোটেলের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকো।

নির্দিষ্ট সময়ে অনেটা নামে এক পথপ্রদর্শিকা (অনেকেই তাকে ডাকছিল অনীতা বলে) অ্যালেন, ভজনেসেনস্কি ও আমি হোটেল থেকে কেটে পড়লুম আড্ডা দিতে। অ্যালেনের সঙ্গে ভজনেসেনস্কির খুব বন্ধুত্ব, পৃথিবীর অনেক দেশের কবি সম্মেলনে দেখা হয়েছে। ভজনেসেনস্কি আমেরিকাতেও গেছেন কয়েকবার, অ্যালেনও সোভিয়েত দেশে গেছে, যুগোশ্লাভিয়াতেও এসেছে দু বার।

পরিচয় হবার পর দেখা গেল ভজনেসেনস্কি যথেষ্ট নম্র ও ভদ্র, তাঁর মঞ্চের নাটকীয়তার সঙ্গে বাইরের ব্যবহারে কোনো মিল নেই।

হাঁটিতে হাঁটিতে আমরা চলে এলুম টার্কিস বাজার নামে একটি বিচিত্র এলাকায়। বেশ পুরোনো জায়গা, খোয়া পাথরের পথ, আঁকাবাঁকা, দু পাশে অসংখ্য দোকান, বেশির ভাগই খাবারের,

স্ট্রুগা শহরের বিভিন্ন দৃশ্য

কোনো কোনো দোকান উপচে এসেছে রাস্তায়। সেখানেই চেয়ার টেবিল পাতা। এটা যেন একটা আলাদা নগরী, এখানে শুধু তরুণ-তরুণীর ভিড়। অনেকেই কোনো দোকানে বসার জায়গা পায়নি। তারা আড্ডা দিচ্ছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। এই তারুণ্যের জগৎ দেখে নিমেষে মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।

অনেটা-র চেনা, রাস্তার ওপর একটা খোলামেলা দোকানে একটা টেবিল নিয়ে বসলুম আমরা। সামান্য কিছু খাবার নেওয়া হলো, আর চা। আড্ডা জমতে লাগলো আস্তে আস্তে। অ্যালেন ভজনেসেনস্কিকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি ইণ্ডিয়ায় যাওনি কখনো?

ভজনেসেনস্কি মাথা নেড়ে ক্ষুণ্ণভাবে বললো, না। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে একবার নেমন্তন্ন পেয়েছিলাম। সং ঠিকঠাক, কিন্তু সেই সময়েই কিয়েভ শহরে দু জায়গায় আমার কবিতা পাঠের ব্যবস্থা হয়েছিল, লোকজন টিকিট কেটে ফেলেছিল। তাই ইণ্ডিয়ায় যাওয়া হলো না। আবার কোনো কারণে কিয়েভের অনুষ্ঠানও শেষ মুহূর্তে বাতিল হয়ে গেল!

আমি বললুম, এরপর আসুন একবার!

অ্যালেন বললো, হ্যাঁ, ইণ্ডিয়ায় গিয়ে অবশ্যই কলকাতায় যাব। গঙ্গার ধারে, নিমতলা শ্মশানে, দক্ষিণেশ্বরে। কী চমৎকার সময় কেটেছে আমার।

তারপর অ্যালেন মহা উৎসাহে শক্তি ও জ্যোতির্ময় দত্তের গল্প শোনাতে লাগলো ওকে।

সর্বক্ষণই যে আমরা কলকাতা নিয়ে পড়ে রইলুম তা নয়। আড্ডার নিয়ম অনুসারে কথা গড়িয়ে যেতে লাগলো প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে। রাত্রি গাঢ় হলো কিন্তু যুবক-যুবতীদের ভিড় বাড়ছে ক্রমশ। চতুর্দিকে হাসিখুশী হল্লা। অনেটা নামের মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী। ইংরেজি সাহিত্যের যথেষ্ট খবর রাখে, সে খুব সাবলীলভাবে মিশে গেল আড্ডায়। টেবিল যাতে ছাড়তে না হয় সে জন্য আমরা কাপের পর কাপ চা খেয়ে যাচ্ছি। এখানে মদটদও পাওয়া যায়। কিন্তু সেদিকে কারুর ঝোঁক নেই। অনেটা যথেষ্ট তরুণী, আমি ও ভজনেসেনস্কি প্রায় সমবয়েসী। অ্যালেনই বয়ঃজ্যেষ্ঠ। সে সদ্য ষাট পূর্ণ করেছে। সে খাবার দাবারের ব্যাপারে কিছুটা সাবধানী হয়েছে এখন, কিন্তু বার্ধক্যের ছোঁয়া লাগেনি শরীরে।

কথায় কথায় প্রসঙ্গ এলো পৃথিবীর ধ্বংস-সম্ভাবনায়। পরমাণু যুদ্ধে পৃথিবী থেকে কি একদিন মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? ভজনেসেনস্কি কোনো উত্তর না দিয়ে কাতর, উদাসীনভাবে তাকিয়ে রইলেন। অ্যালেন আমার দিকে চাইতেই আমি বললুম, আমার নৈরাশ্যবাদী হতে ইচ্ছে করে না। অনেটা জোর দিয়ে বললো, না, না, পৃথিবী বাঁচবে। মানুষ বাঁচবে, মানুষের সমাজ আরও সুন্দর হবে।

অ্যালেন হেসে বললো, এই যৌবনের তেজই হয়তো একমাত্র বাঁচাতে পারে পৃথিবীকে!

বৈ দে শি কী

হারারেতে অষ্টম নির্জোট সম্মেলন

শিবদাস ব্যানার্জি

দিনটি ছিল ৬ সেপ্টেম্বর। জিম্বাবোয়ের রাজধানী হারারেতে সদ্য অনুষ্ঠিত অষ্টম নির্জোট সম্মেলনের সমাপ্তির দিন। পৃথিবীর প্রায় সব প্রান্ত থেকেই এসে জড়ো হয়েছিলেন প্রায় শ' পাঁচেক সাংবাদিক। যাঁদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল জিম্বাবোয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলিতে। এমন সুন্দর, ছিমছাম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, খোলামেলা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর সচরাচর নজরে পড়ে না। ভারতবর্ষে ত' নয়ই। যে ক'জন ভারতীয় সাংবাদিকের সুযোগ হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে একই প্লেনে যাতায়াতের, তাঁরাও ছিলেন সেখানেই।

সেদিন ভোর পাঁচটাতেই (ভারতীয় সময় সকাল ৮-৩০ মিঃ) তাঁদের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল বাক্স প্যাঁটরা বাঁধা ছাঁদার ধুম। তালাবন্দী কিছুই করা যাবে না। কারণ, জিম্বাবোয়ে কর্তৃপক্ষ চেক করার পর, প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী, আবার, সে সবই তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে দেখবেন। তবেই, সে সব প্লেনে তোলা যাবে। উপায় নেই। যার যা রেওয়াজ! সবাইকেই তাই এই সব কাজ সেরে এক প্রস্থ কাপড় চোপড় পরে তৈরি হতে হল সকাল ৭টার মধ্যে। সেদিনই সকাল ৯-৩০ মিঃ ধার্য হয়েছিল রাজীব গান্ধীর সাংবাদিক সম্মেলন। যে উপলক্ষ্যে, তিনি, করাচীর বিমান ছিনতাই এবং শ্রীলঙ্কায় তামিল সমস্যা নিয়ে ওই দুই দেশের সরকারকেই বেশ এক হাত নিয়েছিলেন। এবং যতদূর মনে পড়ে, করাচি বিমান আড্ডার ঘটনা নিয়ে প্রথম প্রশ্নটি ছিল সংবাদ সংস্থা রয়টারের এক সাংবাদিকের।

শেষ দিন হলেও কাজের তাড়া সেদিন কম ছিল না। তার বিশেষ একটা কারণ ছিল, এইসব ভারতীয় সাংবাদিকদের ওপর নির্দেশ ছিল, বেলা তিনটের মধ্যে খবর পাঠানোর কাজকর্ম সেরে সবাইকে তৈরি থাকতে হবে এয়ারপোর্ট যাত্রার জন্য। প্রধানমন্ত্রীর প্লেন ছাড়বে ৫-৩০ মিনিটে। ধরে নেওয়া হয়েছিল, তারই মধ্যে নির্জোট সম্মেলনের শেষ অধ্যায় শেষ হয়ে যাবে। যা যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন, সে সব কাজ সেরে। তারই মধ্যে ছিল, অষ্টম নির্জোট সম্মেলনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বক্তব্য, নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে সম্মেলনের বিশেষ এক বিবৃতি, বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এক বিশেষ প্রস্তাব, নবম সম্মেলনের স্থান নির্দেশ এবং সম্মেলনের পক্ষে

ন্যামের সার্থকতা নিয়ে উঠেছে নানা বিতর্ক। এর অনেকটাই উঠেছে যেসব দেশ ন্যামকে নিয়ে অস্বস্তিতে পড়েছে তাদের প্ররোচনায়। হারারে সম্মেলনেও যার কিছু কিছু নজির মেলে। কিছু যেসব সরকার এই আন্দোলনের বিরোধী অনেকে প্রকাশ্যেই, ন্যামের কথাবার্তা বা চিন্তাধারার প্রতিফলন করতে শুরু করেছেন।

নতুন চেয়ারম্যান জিম্বাবোয়ের প্রধানমন্ত্রী মুগাবে

বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ে যে ব্যুরো দুই সম্মেলনের মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে নানাবিধ বক্তব্য প্রকাশ করে থাকেন তারও পরবর্তী বৈঠকের স্থান নির্দেশ।

সম্মেলনের এর আগের আটটি দিনও কম কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কাটেনি। মূল সম্মেলন বসার ব্যবস্থা হয়েছিল, নবনির্মিত শেরাটন হোটেলের লাগোয়া, এই সম্মেলনকে সামনে রেখেই তৈরি, বিরাট এক অডিটোরিয়ামে। যাতে অন্তত ৪,৫০০ জন একই সঙ্গে বসে সভার কাজ চালিয়ে যেতে পারেন। অর্থাৎ, আয়তনে, দিল্লির বিখ্যাত সম্মেলন গৃহ, বিজ্ঞান ভবনের প্রায় চার গুণ বড়। অডিটোরিয়ামটি যেমন বড়, তেমন চোখে লাগার মত সাজানো গোছানো। পুরোটা নীল ও সোনার রঙে কাজ করা গালিচা দিয়ে মোড়া। সামনে মঞ্চ। সম্মেলন গৃহের লাগোয়া রয়েছে, প্রায় একই আয়তনের লবি। সেখানে ডেলিগেটদের আদর আপ্যায়নের সব রকম বন্দোবস্ত। চা ও কফির ব্যবস্থা। একটির বেশি বার। বাইরে সামিয়ানা খাটিয়ে বন্দোবস্ত ছিল খাওয়া দাওয়ার। টি ভি বা সাধারণ ক্যামেরা ঝুলিয়ে না গেলে, অডিটোরিয়াম চত্বরে ছিল ঢোকা বারণ।

এই অডিটোরিয়ামের ওপর তলায় ছিল মিডিয়া সেন্টার। যেখানে বসেই সাংবাদিকদের সম্মেলনের কর্মসূচী, বক্তৃতা টিভিতে শুনে কাজ চালাতে হত। টেলেক্স অফিস ছিল নীচের তলায়। এক কোণে ছিল টাইপের ঘর। রাখা ছিল প্রায় ৫০টি নতুন টাইপ মেশিন, টেবিল চেয়ার। এই সাংবাদিকদের লবির অন্য এক কোণে ছিল, আর একটি বার। এই ইমারত থেকে বেরিয়ে, সামনের রাস্তা পার হলেই মিলতো একটি ক্যানটিন। সঙ্গে, আরও একটি বার। এই ক্যান্টিনে বসে, দুপুর বা সন্ধ্যার খাওয়া সারতে সারতেও, টিভিতে সম্মেলনের গতি বা কাজকর্মের ওপর নজর রাখা সম্ভব হত। বলে রাখা ভাল, সম্মেলন চলাকালীন বেশ কয়েকদিন, সন্ধ্যের দিকে এই ক্যান্টিনের বারে বিশেষ বিশেষ পানীয় হয়ে পড়তো উধাও। যেমনটি ঘটেছিল মিডিয়া সেন্টারের বারে, ৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার কিছু পরে। বাধ্য করেছিল কর্তৃপক্ষকে বাক্স ভর্তি ভর্তি বাড়তি পানীয় জোগাড় করে নিয়ে আসতে।

৩০ আগস্ট যেদিন রাজীব গান্ধী হারারে পৌঁছোন, সেদিন থেকেই বলা চলে নির্জোট সম্মেলনের (ন্যাম-এর) শুরু। সেদিন সন্ধ্যের

মধ্যে পৌঁছে যান ১০১ সদস্য দেশের মধ্যে অন্তত ৪০ জন রাষ্ট্র প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী। আর, তখন থেকেই শুরু হয় বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয় বা সমস্যা, এবং বিশেষ করে, ন্যাম সম্মেলনের কর্মসূচী ও তা কি ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তাই নিয়ে আলাপ আলোচনা। সবটা-ই হয়ে চলে পর্দার আড়ালে। রাষ্ট্র প্রধান বা প্রধানমন্ত্রীদের যেসব সুরক্ষিত ভিলায় রাখা হয়েছিল সেখানে, শেরাটন হোটেলের লবিতে বা ঘরে ঘরে। যেখানে থাকতে দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন সদস্য দেশের সংশ্লিষ্ট শীর্ষ আমলাদের। আর এই পর্দার আড়ালে আলাপ আলোচনা এবং কিছুটা হয়তো ঘুঁটি-চালাচালি চলে সম্মেলনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। এবং যেসব আলাপ আলোচনার আঁচ মিলতো বিভিন্ন দেশের আমলাদের মুখে বা তাঁদেরই ঘনিষ্ঠ কতিপয় সাংবাদিকের কাছ থেকে। এবং যেহেতু এইসব শলাপরামর্শ দু'একটি বিষয়ে শেষ করে উঠতে দেরি হচ্ছিল, তাই সম্মেলনের অন্তিম বৈঠক বসতে ৬ সেপ্টেম্বর বিকেল তিনটে থেকে বিলম্ব হল, প্রায় ৭ সেপ্টেম্বর ভোর ১-৩০ মিঃ। সেই কারণে রাজীব গান্ধীরও সম্মেলন শেষ করে গিয়ে প্লেনে চড়তে বাজলো ভোর তিনটে। ফলে বোম্বাই পৌঁছতে হল, সকাল ৭-৩০ মিঃ-এর বদলে বিকেল চারটেয়। আর, সাংবাদিকদের এই অধৈর্য প্রতীক্ষার জের সামলাতেই মিডিয়া সেন্টারের বারে ঘটেছিল পানীয়ের ঘাটতি।

ন্যামের পত্তন করেছিলেন ভারতবর্ষের জওহরলাল নেহেরু, মিশরের গামাল আবদেল নাসের, ইন্দোনেশিয়ার সোকার্নো এবং যুগোশ্লাভিয়ার মার্শাল টিটো। পঁচিশ বছর আগে। মোট ২৫ সদস্য নিয়ে। এঁদের কেউ-ই আর ইহজগতে নেই। কিন্তু আন্দোলন চলেছে। শক্তি সঞ্চয় করেছে। হারারে সম্মেলনের অন্যতম বিশেষ অঙ্গ হয়েছিল আন্দোলনের, যার মূল উদ্দেশ্যই হয়ে এসেছে বিশ্বশান্তি, নিরস্ত্রীকরণ, জোট নিরপেক্ষতা। এবং এইসব মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গী বিগত ২৫ বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দরবারে বারে বারে প্রতিফলিত হয়ে এসেছে। ন্যামের সার্থকতা নিয়ে উঠেছে নানা বিতর্ক। এর অনেকটাই উঠেছে যেসব দেশ ন্যামকে নিয়ে অস্বস্তিতে পড়েছে তাদের প্ররোচনায়। হারারে সম্মেলনেও যার কিছু কিছু নজির মেলে। কিন্তু রাজীব গান্ধীর উক্তি উল্লেখ করেই বলা চলে, যেসব সরকার এই আন্দোলনের বিরোধী এবং অনেকে প্রকাশ্যেই, সেই সব দেশের জনগণের একাংশও ন্যামের কথাবার্তা বা চিন্তাধারার প্রতিফলন করতে শুরু করেছেন। যেমন, সম্প্রতি দেখা গেছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বাধানিষেধ আরোপ করার প্রশ্নে। বিশেষ করে আমেরিকা ও ব্রিটেনে। এই দুই দেশেই সাধারণ জনমত সোচ্চার হয়ে উঠছে সরকারের এই বাধানিষেধ আরোপ বিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে।

হারারে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিদায়ী চেয়ারম্যান রাজীব গান্ধী। ১ সেপ্টেম্বর। সেই দিনই বিকেলে বিশেষ অনুষ্ঠান হয় ২৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে। এবং এই সম্মেলন শুরু হওয়ার পরই রাজীব গান্ধী ন্যাম সভাপতির পদ ছেড়ে দেন, জিম্বাবোয়ের প্রধানমন্ত্রী রবার্ট মুগাবের হাতে। মুগাবের বয়স ষাটের উর্ধে। উচ্চশিক্ষিত। ক্ষমতায় এসেছেন সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তাঁর প্রথম ন্যাম সম্মেলনে উপস্থিতি কিউবার রাজধানী হাভানায়। সেখানে তিনি যান গেরিলা যোদ্ধাগোষ্ঠীর নেতা হিসেবে। মাথার ওপর ঝুলছিল মোটা অঙ্কের পুরস্কার।

স্বাভাবিক কারণেই হারারে সম্মেলনের প্রধান ঝোঁক ছিল জিম্বাবোয়ের প্রতিবেশী দক্ষিণ আফ্রিকার উপরেই। তার বর্ণবিদ্বেষী নীতির উৎখাতের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা প্রণয়ন এবং কার্যকরী করার দাবীতে। এই দক্ষিণ আফ্রিকাই বিগত এপ্রিল-মে মাসে রাজীব গান্ধীর কিছু আফ্রিকার দেশ সফরের ঠিক শেষে, তথাকথিত ফ্রন্টলাইন রাজ্যগুলির ওপর আচমকা বিমান হানা চালায়। গেরিলা ঘাঁটি উৎখাত করার অজুহাতে। বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে যে ধরনের আন্তর্জাতিক মতামত গড়ে উঠছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে ন্যাম সম্মেলনকালে সেই একই ধরনের আশঙ্কা যথেষ্ট ছিল। তা রোখার প্রস্তুতিও ছিল প্রচুর। শেরাটনের আশেপাশে এবং ছবির মত সুন্দর, সাজানো, শহরের বিশেষ বিশেষ অংশে, বিমান বিধ্বংসী কামান দেখা যেত আকছার। অন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল। সেখানে প্রতি পদক্ষেপে পার হতে হত মেটাল ডিটেক্টর। এসব সত্ত্বেও শেরাটনের লবিতে ঢোকা ছিল বারণ। সম্মেলনের সঙ্গে সুদূর সম্পর্ক আছে এরকম প্রায় সবাইকেই, এমনকি একাংশ ট্যাক্সি চালককেও নিরাপত্তা বিভাগের কাছ থেকে পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন নিতে হয়েছিল। সৌভাগ্য যে সেরকম আক্রমণ কিছু ঘটেনি। এমনকি, লিবিয়াতেও নয়। সম্ভাব্য আক্রমণকারীদের এই পিছিয়ে আসা নিয়ে মিডিয়া সেন্টারে ছিল নানা জল্পনা কল্পনা। ভয়? না, আফ্রিকার এবং এশিয়ার জনমতকে উপেক্ষা করে ভবিষ্যতে তাদের বন্ধুত্বের সম্ভাবনাকে একেবারেই নস্যাৎ না করে তোলার চেষ্টা?

বর্ণবৈষম্যের উপর 'চূড়ান্ত আঘাত' হানা এবং সংগ্রামরত ফ্রন্টলাইন রাষ্ট্রগুলিকে সুনির্দিষ্ট সহযোগিতার আন্তরিক আহ্বান জানিয়ে সপ্তাহব্যাপী অষ্টম ন্যাম শুরু হয় ১ সেপ্টেম্বর। নতুন চেয়ারম্যান, মুগাবে, তাঁর মূল ভাষণে বললেন, বর্ণবৈষম্যের প্রকৃতি ও চরিত্র নিয়ে বিশ্লেষণের সময় পেরিয়ে গেছে। এখন চাই কাজ এই কুপ্রথা চিরতরে খতম করার কাজ, প্রতিবেশী স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে প্রিটোরিয়ার আগ্রাসন ঠেকানোর কাজ, এবং নামিবিয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার অবৈধ এবং ঔপনিবেশিক দখলদারি উচ্ছেদের কাজ।

হারারেতে আলোচনারত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট কেনেথ কাউন্ডা

প্রায় একই সুরে বিদায়ী চেয়ারম্যান, রাজীব গান্ধীর মূল বক্তব্য ছিল, যতদিন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষ এবং স্বৈরাচার বহাল থাকবে এবং নামিবিয়া অধিকৃত থাকবে, ততদিন আমাদের স্বাধীনতা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণের মুক্তি এবং সার্বভৌম হিসাবে নামিবিয়ার আত্মপ্রকাশ কতখানি ত্বরান্বিত করা যায়, তার ওপরই নির্ভর করবে হারারে সম্মেলনের সাফল্য।

অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রশ্ন সম্বন্ধে রাজীব গান্ধী বলেন, দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে ন্যাম দুই শক্তিজোটের প্রবল চাপের সম্মুখীন হয়ে এসেছে। তারা এই আন্দোলনে অন্তর্ঘাত চালানোর চেষ্টা করেছে। এর নিন্দা করেছে। নিজেটি সদস্যদের জোটে টানার চেষ্টা করেছে। তবু নিজোটি আন্দোলন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। শক্তি সঞ্চয় করেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আন্দোলনের ঐক্য ও সংহতি আরও জোরদার করার প্রয়োজন আছে।

মূল ভাষণের মুখবন্ধে মুগাবের অনুরোধে সম্মেলন উঠে দাঁড়িয়ে প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধায় এক মিনিট নীরবতা পালন করে। পরে তিনি রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়কেই পরীক্ষামূলক পরমাণু বিস্ফোরণ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। তবে, তাঁর বক্তব্যে অনেকের মনে হয়েছিল চীনের বক্তব্যের প্রতিফলন ছিল। উল্লেখযোগ্য, স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে চীনের সাহায্যই মুগাবের

দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে ন্যাম দুই শক্তিজোটের প্রবল চাপের সম্মুখীন হয়ে এসেছে। তারা এই আন্দোলনে অন্তর্ঘাত চালানোর চেষ্টা করেছে। এর নিন্দা করেছে। তবু নিজোটি আন্দোলন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। শক্তি সঞ্চয় করেছে।

মিলেছিল প্রথম এবং অনেকের মতে, পর্যাপ্ত। তিনি পরমাণু শক্তিধর সব রাষ্ট্রকে বাধ্যতামূলক একটি আন্তর্জাতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হতে বলেন। উল্লেখ না করলেও, মার্কিন সেনেটর জেসি জ্যাকসনের সুপারিশ সমর্থন করে মুগাবে বলেন শিল্পোন্নত পশ্চিমী দেশগুলির রাজধানীতে প্রিটোরিয়ার বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করার জন্য ন্যামের তরফে বিদেশ মন্ত্রীদের একটি দল পাঠানো যেতে পারে। এই ধরনের আর একটি দল এ-মাসের শেষে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে নামিবিয়া বিষয়ক বিতর্কে যোগ দিতেও পাঠানো যেতে পারে।

উল্লেখ করা যেতে পারে রাজীব গান্ধী এবং মুগাবের সব কটি প্রস্তাবই পরবর্তী কালে সম্মেলন গ্রহণ করে। আলাদা একটি বিবৃতি প্রকাশ করে সম্মেলন বলে, ২৫ বছর আগে এই ন্যাম রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ের কাছে আবেদন রেখেছিল, দু'পক্ষ এক জায়গায় বসে, পরমাণু অস্ত্র তৈরি এবং পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ করার এক চুক্তি করুন। মানবজাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচান। ২৫ বছর পর আবার হারারে থেকে ন্যাম এই দুই দেশকেই অনুরোধ জানাচ্ছে, এই বছরেই দু'তরফের যে আলোচনায় বসার প্রস্তাব রয়েছে, সেই উপলক্ষে আপনারা পরমাণু অস্ত্র নিয়ে এক চুক্তিতে সই করুন।

কিন্তু এই নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে ন্যামের এই সিদ্ধান্ত বিনা বাধায় নেওয়া সম্ভব হয়নি। এর সবকিছুই অবশ্যি ঘটে গেছে সম্মেলনের নেপথ্যে। সম্মেলনের সব বক্তব্য বা বিবৃতির খসড়া নিয়ে মূল আলোচনা এবং বিতর্ক আসলে ঘটে বিভিন্ন কমিশনে, যেখানে মোটামুটি সব দেশেরই আমলারা প্রতিনিধিত্ব করেন। এবং রাজনৈতিক বিষয়ক কমিশনে এই বিশেষ বিবৃতি নিয়ে আলোচনাকালে পাকিস্তান পাল্টা প্রস্তাব করে বসে, একই সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকাকেও পারমাণবিক অস্ত্র-মুক্ত রাখার দাবী রাখতে হবে। এইসব এলাকার মধ্যে পড়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, যার মধ্যে ভারতবর্ষও অন্তর্ভুক্ত। ভারতের পক্ষে পাকিস্তানের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়। এবং অন্যদের সমর্থনে, ভারতের মতামতই প্রাধান্য পায়। বিবৃতিটি যেভাবে খসড়া হয়ে এসেছিল, মোটামুটি সেই চেহারাতেই পাশ হয়ে যায়। মূল ন্যামের সমর্থনও পেতে দেরি হয় না। হয়ত কারও নতুন কোনও প্রশ্ন তুলে বাগড়া দেওয়ার বা পাশ করতে দেরি করে দেওয়ার, রাত জাগার ক্লান্তিতে কারও মনে আসেনি। ভোর দু'টোর সময় সবাই হয়ত অধৈর্য হয়ে চাইছিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্মেলনের ঝামেলা মিটিয়ে ফেলা যায়, ততই তাঁদের শরীরের পক্ষে মঙ্গল। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সহমত বা বহুমত গড়ে তুলতে এই ভাবে ডেলিগেটদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটানোর নজির মিলবে ভুরি ভুরি।

পারমাণবিক অস্ত্র সংবরণ নিয়ে ন্যামকে যে দু'ভাগে ভাগ করার চেষ্টা হয়েছিল, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না। বরং, সবাই আশঙ্কা করছিলেন যে কোনও ইস্যু নিয়েই এটা ঘটানোর চেষ্টা হতে পারে। বস্তুত, এটা বলা হয়ত অত্যুক্তি হবে না যে ন্যামের প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই যে দুই বৃহৎ শক্তি এবং তাঁদের কেন্দ্র করে দুটি জোট গড়ে উঠেছে, তারা ন্যামকে দ্বিখণ্ডিত করার চেষ্টা থেকে কোনওদিনই বিরত থাকেনি। এবং সাধারণভাবে ধরা হত সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া বা পাকিস্তানের মত ন্যামের সভ্য যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছাকাছি দেশ, সেইরকম রুশ ঘেঁষা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে কিউবা। কিন্তু তাই বলে এদের কেউই এমন কিছু কোনওদিন করে বসেনি যাতে ন্যাম ভেঙে যায়। কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ড মাঝে মাঝে ন্যামের ঐক্য এবং সংহতির ভাবমূর্তি ম্লান করে এসেছে। এই ত' কিছুদিন আগে কিউবা প্রস্তাব এনেছিল, রাশিয়াকে ন্যামের চিরকালের বন্ধু হিসেবে চিহ্নিত করা হোক। কিন্তু সে প্রস্তাব বেশিরভাগ সদস্য খারিজ করে দেয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আরও কয়েকটি ইস্যু নিয়ে ন্যাম কমিশনে বা নেপথ্যে যে কূটকচালি ঘটে গিয়েছিল, হারারে সম্মেলনের আশেপাশে কারও তা অজানা ছিল না। যেমন ধরা যাক, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বাধানিষেধ আরোপ করার পরবর্তী পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য একটি তহবিল সৃষ্টি করার প্রশ্নটি : শেষ পর্যন্ত এই তহবিল গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ভারতবর্ষ অর্থাৎ রাজীব গান্ধীকে চেয়ারম্যান করে। অন্য সদস্যদের সংখ্যা হবে ১৯। বাধানিষেধ আরোপ করা হলে দক্ষিণ আফ্রিকা চুপ করে থাকবে না। পাল্টা ব্যবস্থা নেবে : এবং সেই ব্যবস্থার যথোপযুক্ত মোকাবিলা করাই হবে এই তহবিল কর্মকর্তাদের মূল কাজ। এ ত' গেল, সম্মেলনেরই সিদ্ধান্ত। কিন্তু, এই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করতে গিয়ে যেসব অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে এবং তার প্রতিটি কি ভাবে সমাধান করা যায় তাই নিয়ে রাজীব গান্ধী মুগাবে এবং অন্য কয়েকজন আফ্রিকার রাষ্ট্র প্রধান বিস্তারিত আলোচনা সেরে, মোটামুটি একটা ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে রেখে এসেছেন। এখন, আসলে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার কাজটুকু শুধু বাকী। আশা, সেই কাজও অচিরেই শুরু হবে। এই কর্মসূচীরই অংশ বিশেষ হল ভারত একাই কতটুকু কি সাহায্য করতে পারে, তার বিশদ খতিয়ান। যে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ করে জিম্বাবোয়ের মতই অন্য কয়েকটি ফ্রন্টলাইন রাষ্ট্র, ভারতের সাহায্যপ্রার্থী তার মধ্যে রয়েছে কৃষি এবং যানবাহন, বিশেষ করে রেলপথ নির্মাণ এবং

উন্নয়ন। কিন্তু যেহেতু ভারত এইসব দেশের তুলনায় অনেক উন্নত, সেই কারণে তার পক্ষে সহযোগিতার হাত বাড়াতে গিয়েও তা করতে হয়েছে সন্তর্পণে। যাতে কেউ না মনে করে ভারত দাদাগিরি ফলাচ্ছে। যাই হোক, এই ধরনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং অনেকাংশেই প্রযুক্তিবিদ্যা বিনিময়ের প্রশ্নে ভারত আগের থেকে অনেক বেশি আগ্রহ দেখাবে। তবে তার পক্ষে অসুবিধা থাকবে একটাই ; ভারতের পক্ষে খুব বেশি অঙ্কের সাহায্য, কিছু প্রতিদান পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে, করা কালক্রমে কষ্টসাধ্য হতে পারে।

ন্যাম সদস্যদের, যাদের সবাইকেই অনগ্রসর দেশ বলে ধরা হয় তাদের সামনে রাজনৈতিক থেকেও বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থনৈতিক। এদের অধিকাংশই পশ্চিমী দেশের ঋণভোগী। এমনকি যুগোশ্লাভিয়াও। এই ঋণ শোধের প্রশ্ন ছাড়াও অন্য অনেক সমস্যার মধ্যে রয়েছে অগ্রসর দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য, যে ব্যাপারে প্রায় সবকটি অগ্রসর দেশই আস্তে আস্তে রপ্তানির রাস্তা বন্ধ করে চলেছে। এইসব প্রশ্নের সমস্যা নিয়ে বেশ কয়েকবার, যাকে বলে সাউথ-নর্থ বা অগ্রসর এবং অনগ্রসর দেশগুলির যৌথ আলোচনা হয়ে গেছে ; ফল কিছু ফলেনি। আদৌ ফলবে কিনা বা অগ্রসর দেশগুলি ফলতে দেবে কিনা তাই নিয়েই রয়েছে বিরাট সন্দেহ। তাই হারারেতে প্রস্তাব ছিল, অগ্রসর দেশগুলি গরজ না দেখালে অনগ্রসর দেশগুলিকেই এগিয়ে এসে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে, পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করা উচিত। অন্তত যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর দেশগুলির মোকাবিলা করার চেষ্টা নেওয়া যায়। এবং এই সহমত গড়ে তোলার জন্য গঠন করা হোক একটি মন্ত্রীস্তরে ন্যাম কমিটি। পাকিস্তান এক্ষেত্রেও আপত্তি জানায়। কারণ দেখায় শুধু কমিটির সংখ্যা বাড়িয়ে কাজ কিছু হবে না। এবারও তার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

অন্য দিকে নির্জোট আন্দোলনের পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বাধানিষেধ আরোপ করার প্রশ্ন নিয়ে বিদেশমন্ত্রীদের একটি দল পশ্চিমী রাজধানীগুলিতে গিয়ে তাদের বোঝাবার চেষ্টা করুক, এই বলে মুগাবের যে প্রস্তাব ছিল তা মোটামুটি বিনা বিতর্কেই গৃহীত হয়ে যায় ; এইসব ব্যাপারেই বিশেষ করে নেপথ্যে আলাপ আলোচনা চালিয়ে বিতর্কিত প্রশ্নগুলিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রচেষ্টায় মুখ্য ভূমিকা ছিল ভারতের। বিশেষ করে রাজীব গান্ধীর। এই বিদেশমন্ত্রীদের বাইরে পাঠানোর প্রশ্নে অবশ্যি সম্মেলন লবিতে প্রথমে গুজব রটেছিল ভারত হয়ত এতে খুব বেশী গা করবে না। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, ভারতও ওই মন্ত্রীগোষ্ঠীর অন্যতম সদস্যপদ গ্রহণ করলো। তাই নিয়ে, আবার রাজনৈতিক জল্পনা কল্পনা সৃষ্টি হল ; ভারত পশ্চিমী দেশগুলিকে চটাতে চাইছে না। তাই এই প্রস্তাব মেনে নিল। এ-ধরনের ভারত-বিরোধী মন্তব্য যাঁদের মুখে শোনা যেত, তাঁদের পক্ষে কারণ দেখানো হত যে রাজীব গান্ধী

পাকিস্তান এখনও ন্যাম-এর দিক থেকে, ভারত, কিউবা, যুগোশ্লাভিয়া বা এমনকি জিম্বাবোয়ের মত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারেনি। আদৌ পারবে কিনা বা হতে চায় কিনা তাও অনিশ্চিত।

তাঁর মূল সম্মেলনের বক্তৃতায় সরাসরি সাম্রাজ্যবাদ কথাটা উল্লেখ করে তার বিরুদ্ধে ত কোনও বক্তব্যই রাখেননি। তাছাড়া, লিবিয়ার রাষ্ট্রনেতা মুয়াম্মার গদ্দাফি স্বয়ং সম্মেলনে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও রাজীব গান্ধী তাঁর বক্তৃতায় লিবিয়ার ওপর মার্কিন হামলার ত কোনওই উল্লেখ করেননি। সাইপ্রাস সমস্যা সম্পর্কিত তাঁর মন্তব্য এসেছিল, মূল ছাপানো এবং বিতরিত বক্তৃতার সংশোধনী হিসেবে।

এইসব কূটকচালি যখন চলছে নেপথ্যে, মূল প্রকাশ্য সম্মেলন চলেছে খানিকটা ঢিমে তালে। অনেকটাই উত্তেজনাহীনভাবে। উত্তেজনার খোরাক জুগিয়েছিল, কয়েকজনের মধ্যে বিশেষ করে গদ্দাফি, ইরাক এবং ইরান। গদ্দাফিই হয়ে উঠেছিলেন হারারে সম্মেলনের যাকে বলে আগুন-খেকো বক্তা। পরনে ছিল (টি ভি-তে দেখা অবশ্যি) টকটকে লাল রং-এর শার্ট। গলা খোলা সাদা কোর্ট। এবং দু' কাঁধ বেয়ে ঝুলেছিল চাদরের মত দেখতে কিছু আবরণ। তাঁর বক্তৃতা শুরুর আগে কেউই ধারণা করতে পারেননি যে এত কড়া বক্তৃতার বক্তা এত চিঁচি ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলার হতে পারেন। সেই তুলনায় কিউবার ফিদেল কাস্ত্রোর গলা ছিল অনেক ভারি। গম্ভীর।

গদ্দাফির আগে আরও বেশ কয়েকটি দেশ ন্যাম-এর সমালোচনা করে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের নীচু সুরের সঙ্গে গদ্দাফির সুরের কোনই মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সবাইকে স্তম্ভিত করে গদ্দাফি বলে চলেন, নির্জোট আন্দোলন একটি হাসাকর আন্তর্জাতিক তামাশা এবং এখন থেকে আমার লক্ষ্য হবে এই আন্দোলনকে অতিক্রম করে এবং সম্পূর্ণ নির্মূল করে বিশ্বকে দুটি পৃথক শিবিরে বিভক্ত করা—সাম্রাজ্যবাদের শিবির এবং মুক্তিযুদ্ধের শিবির। ন্যামকে বিদায় জানিয়ে গদ্দাফি বলেন ভাবের ঘোরে চুরি করে কোনও লাভ নেই। সাম্রাজ্যবাদের পুতুল ও চরদের সঙ্গে (এদের কয়েকজনকে তিনি নাম করে চিহ্নিতও করেন, যেমন, ইজিপ্ট, ক্যামেরুন) আমরা কি একাসনে বসতে পারি ? বরং আমরা ওয়ারশ জোটের সঙ্গে যোগ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ব্যাপক ফ্রন্ট গড়ে তুলতে পারি। আমার মনে হয় নির্জোট সম্মেলন বাস্তবিক একটা ষড়যন্ত্র। নির্জোট আন্দোলনকে তাই নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

এই বিষ যখন তিনি এক বিশেষ অনুত্তেজিত ভঙ্গীতে বলে চলেছেন তখন মাঝে মাঝেই তিনি ডান হাতখানা থিয়েটারি ঢং-এ তুলে ফেলছিলেন। আর প্রতিবারই দেখা গেল, সম্মেলন হল থেকেই আরবি ভাষায় শ্লোগান দিচ্ছিল কারা ? চারজন সেনাবেশী দেহরক্ষী। অল্প বয়স। তিনজনই মেয়ে। সবাই ত অবাক। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত জানা গেল গদ্দাফি ন্যাম ছেড়ে যাচ্ছেন না এখনই। তাঁর বক্তৃতার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া যা মিলেছিল খোদ চেয়ারম্যান মুগাবের মুখে, সেটাও মনে থাকার মত। গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন, এই ন্যাম আন্দোলনই লিবিয়ার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে দুনিয়ার দরবারে পৌঁছে দিয়েছে।

সম্মেলনে আর মনে রাখার মত বক্তৃতা ছিল কাস্ত্রোর। অনগ্রসর বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লাগোয়া, দেশগুলির অর্থনৈতিক সমস্যার চেহারা এবং চরিত্রটা কি, তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ ছিল অনবদ্য। শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল ভারতের দুই কম্যুনিস্ট পার্টির নেতাদের কাস্ত্রোর কাছ থেকে অনেক কিছু জেনে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। তাঁর ভাষণে ছিল না কোনও উত্তেজনার ছাপ। ছিল নিশ্ছিদ্র এক বক্তব্য। চ[illegible] করে যার সম্বন্ধে জানি না বলা শক্ত।

আর উত্তেজনার খোরাক জুগিয়েছিল ইরাক এবং ইরাণ। তাঁদের পারস্পরিক যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে। প্রথমে ইরাণ ইরাককে অপরের দেশ আক্রমণ করার অপরাধে ন্যাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার আর্জি জানায়। উত্তরে ইরাকও রাখে একই দাবী। আর ইরাক যখন সম্মেলনের ভেতরে তাই করে চলেছে, মিডিয়া সেন্টারে ইরাণী সংবাদ সরবরাহ সংস্থার লোকজন বহু বর্ণে সুন্দর ছাপানো ও বাঁধাই বই ও পুস্তিকা অন্য সব সাংবাদিকের হাতে হাতে বিলি করে চলেছেন ইরাকী অত্যাচারের রেকর্ড হিসেবে। বলে রাখা ভাল এই দুই দেশের কাজিয়া রাজনৈতিক কমিশনে একসময় এক অচলাবস্থা সৃষ্টি করে তুলেছিল। যেমনটি হয়েছিল ন্যাম-এর দিল্লি সম্মেলনে। দু'পক্ষই দাবী রাখে অপরকে দোষারোপ করে বক্তব্য রাজনৈতিক দলিলে

ঢোকাতে হবে। এখানেও শেষ পর্যন্ত ভারতীয় আমলাদের হস্তক্ষেপেই দু'পক্ষ বাচনিক যুদ্ধের সমাপ্তি টানে। দলিলে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে সামান্য একটি বক্তব্য ঢুকিয়ে।

সম্মেলনের শেষ দিন অন্তিম বৈঠক বসতে দেরী হওয়ার কারণও ছিল এই ধরনের এক অচলাবস্থা। নবম ন্যাম সম্মেলন কোথায় হবে, সে প্রশ্নটি নিয়ে সম্মেলনের নেপথ্যের কথাবার্তা তখনও শেষ করা সম্ভব হয়নি। যদিও একদিন আগেই মিডিয়া সেন্টারের খবর ছিল, এই প্রশ্ন শিকেয় তুলে রাখা হবে। ছেড়ে দেওয়া হবে ন্যামের মন্ত্রী স্তরের "ব্যুরোর" হাতে। এই পর্যায়ে দাবীদার ছিল তিনজন। নিকারাগুয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং পেরু। একসময় মনে হয়েছিল নিকারাগুয়ার পেছনে সমর্থনই সবচাইতে ভারি হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে ছিল কিউবা। হয়ত ভারতও। বিরুদ্ধ মতটি ছিল যেহেতু নিকারাগুয়া প্রায় সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক বোঝাপড়ার রাস্তায় নেমেছে, সেই কারণে নিকারাগুয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে ন্যামকে সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। সেটা এখনই করা হয়ত উচিত হবে না।

এর থেকেও বেশী বেগ দিয়েছিল যাকে বলা যায় খুচরো একটি সমস্যা। সেটি ছিল মন্ত্রী স্তরে ন্যাম "ব্যুরো"র পরবর্তী বৈঠক কোথায় হবে। উত্তর কোরিয়া বলে বসলো, সেই বৈঠক হবে আমাদের রাজধানীতে। তাই নিয়ে টানাপোড়েন শেষ করতে বেজে গেল স্থানীয় সময় রাত প্রায় একটা (ভারতীয় সময় ভোর ৪-১৫ মিঃ)। ঠিক হয় ব্যুরোর বৈঠক হবে সাইপ্রাসে। তখনই সম্ভব হয় অষ্টম সম্মেলনের অন্তিম বৈঠক বসার।

হারারে সম্মেলনের সাফল্য বা বিফলতা নিয়ে অনেক আলোচনা আগামী তিন বছর অর্থাৎ পরবর্তী ন্যাম সম্মেলন বসা পর্যন্ত হয়ে চলবে। হারারের মূল সাফল্য কিন্তু ছিল, এই হয়ত প্রথম একটি সম্মেলন কার্যকরী কিছু কর্মসূচী নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারলো। তার কারণ মনে হবে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় এবং ওই দেশের বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক অর্থনৈতিক বাধানিষেধ আরোপ করার প্রশ্ন। বিশেষ করে আবার সেই প্রশ্ন নিয়ে সিদ্ধান্তের সুযোগ ঘটলো জিম্বাবোয়ের রাজধানী হারারেতে। অর্থাৎ, একটি ফ্রন্টলাইন রাষ্ট্রে।

দ্বিতীয়ত, রাজীব গান্ধী মেনে নিতে না চাইলেও বলা চলে, উপনিবেশবাদ এবং এই উপনিবেশবাদের মূল উৎস যে সাম্রাজ্যবাদ, তার বিরুদ্ধে ন্যাম-এর সোচ্চার দৃঢ় কণ্ঠস্বর ছিল হারারে সম্মেলনের বিশেষত্ব। যা আগে খুব কম সময়েই হতে দেখা গেছে। মূল সম্মেলনের প্রায় সবকটি বক্তৃতারই সুর ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠেছিল অন্য দেশে বাইরের সৈন্যের উপস্থিতি। যেমন আফগানিস্তানে বা কামপুচিয়ায়। পাকিস্তানের মত অনেক দেশই এই সমস্যার দিকে সবাইকার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে বক্তব্য রাখে। কিন্তু এসব করা সত্ত্বেও পাকিস্তান এখনও হয়ত ন্যাম-এর দিক থেকে, ভারত, কিউবা, যুগোস্লাভিয়া বা এমনকি জিম্বাবোয়ের মত যাকে বলা যায় প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারেনি। আদৌ পারবে কিনা বা হতে চায় কিনা তাও অনিশ্চিত।

হারারে সম্মেলনের সাংবাদিকদের থাকার জায়গা জিম্বাবোয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতই, হারারে শহরটির জুটি ভারতে মেলে না। কি সুন্দর সাজানো গোছানো বাড়ি ঘর, রাস্তা এবং দুধারে ফুলের গাছ। সময়টাও ছিল অপ্রত্যাশিত। ওখানকার বসন্তকাল এখন। সেখানে সারারাতই রাস্তার ট্রাফিক আলো জ্বলে। এবং প্রায় ন'দিনের মধ্যে এমন কোনও ঘটনা নজরে পড়লো না যেখানে কোনও গাড়িচালক ট্রাফিক আলো মানছে না বা প্রতিটি মোড়ে ডান দিক থেকে আগত গাড়ীকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে না। এসব অভ্যাসই হয়ত বিগত দিনের অভিজ্ঞতা প্রসূত। ভারতের মত সেই অভিজ্ঞতাটাও ছিল মূলত একটি উপনিবেশের জমানার।

সুতরাং একমাত্র ল্যাম্পপোস্টে ন্যাম নেতাদের ছবি এবং পতাকা টানিয়ে দেওয়ার বেশী সাজগোজের প্রয়োজন হয়নি। বৃহৎ সম্মেলনের অভিজ্ঞতা না থাকলেও সম্মেলনকে সর্ববিষয়ে সার্থক করে তোলার জিম্বাবোয়ের প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয়। খানিকটা অবাক করাও বটে। সম্মেলনের মোট খরচা, একটা বেসরকারি হিসেবমত প্রায় ৩০ মিলিয়ান মার্কিনী ডলারের সমতুল। সাংবাদিকদের প্রয়োজনীয় টেলেক্স এবং টেলিফোনের ব্যবস্থা ছিল যথেষ্ট। একটু আলাদা ভাবে কাজ করেছিলেন ভারত সরকারের কয়েকজন লোক। তাঁদের কাজ ছিল বিশেষ করে ভারতীয় সাংবাদিকদের লেখা সব সংবাদ টেলেক্সে তাদের দপ্তরে পৌঁছে দেওয়া। এঁরা সকলেরই ধন্যবাদ অর্জন করেছিলেন।

এই জিম্বাবোয়েরই এক সময় নাম ছিল রোডেশিয়া। আর তদানীন্তন সরকারের নেতৃত্বে ছিলেন আয়ান স্মিথ। তাঁকেও একসময় অন্য দেশের অর্থনৈতিক অবরোধের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। যা এখন দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে মুগাবেকে করতে হচ্ছে। কিন্তু সেই অবরোধের আমলেই এই রাষ্ট্রটি হয়ে ওঠার চেষ্টা করে স্বনির্ভর। বিভিন্ন বিষয়ে। তার ফলভোগ করছে এখনকার জিম্বাবোয়ে এবং জনসাধারণ। কিন্তু এখনও এই দেশের ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প এমনকি কৃষিরও একটা প্রধান অংশ চালাচ্ছেন শ্বেতাঙ্গরা এবং বেশ কয়েকটি বহুজাতিক সংস্থা। ব্যবহারের বেশ কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিস যেমন, পেট্রোলজাত দ্রব্যসামগ্রী আসে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বা দক্ষিণ আফ্রিকার পথে। সেই দেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বাধানিষেধ আরোপ করতে গিয়ে জিম্বাবোয়েকে ভাবতে হচ্ছে বহির্বাণিজ্যের বিকল্প কোনও পথ ব্যবহার করা যায় কিনা।

একটি বিকল্প পথ রয়েছে, কিন্তু তা আরও বাড়ানো দরকার। আর তাই করতে গিয়ে ভারতের মত দেশের সাহায্যপ্রার্থী জিম্বাবোয়ে। ■

সম্মেলনে 'আগুন-খেকো বক্তা' লিবিয়ার রাষ্ট্রনেতা মুয়াম্মার গদ্দাফি

অসাধারণ ছোট্ট দাবাড়ু

হিমানীশ গোস্বামী

প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে পৃথিবীর তুলনায় অনেক পিছিয়ে হলেও ভারতেরক্ষেত্রে বলা যায় অগ্রগতি হয়েছে অসামান্য। একজন নয়, দুজন নয়, অজস্র বালক-বালিকা যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে আসবে, তার জন্য ধৈর্য ধরবে, হয়ত কিছুটা ত্যাগ-স্বীকারও করতে হবে, তখনই তাদের মধ্যে কয়েকজন অনেক এগিয়ে যাবে।

নীরজ মিশ্র

যুগোস্লাভিয়ার মাঝির ছেলে মার্কো জেখৌভিক। কম বয়সেই পৃথিবী বিখ্যাত দাবা খেলোয়াড়—একেবারে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। আলেখিন, কাপাব্লাংকা, লাসকার, টাটাকোভার, বগলইউবভ প্রমুখের সঙ্গে স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। গ্রাম্য বালকের যে দাবা প্রতিভা আছে সেটা জানা গেল অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে—একজন পাদরি এবং একজন পুলিস সার্জেন্ট রোজ বিকেলে কাজকর্মের পর তিন গেম করে দাবা খেলতো, আর মার্কো বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ঐ খেলা দেখত। একদিন বিশেষ এক কারণে পাদরিকে খেলা শেষ করার আগেই চলে যেতে হল। সার্জেন্ট দেখল খেলাটি শেষ হবার সম্ভাবনা নেই, সে চলে যাবার উদ্যোগ নিতে নিতে দেখতে পেলো মার্কো বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দাবার বোর্ডের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। একটু ইয়ার্কির ভঙ্গিতে সার্জেন্ট জিজ্ঞেস করলো, কি হে, খেলাটি শেষ করার ইচ্ছে হচ্ছে নাকি? সার্জেন্টের ধারণা ছিল ছেলেটি খেলার বিন্দু-বিসর্গও জানে না! ছেলেটি ঘাড় নেড়ে জানালো, সে খেলতে চায়। খেলা চলল, এবং চোদ্দ চালের মাথায় সার্জেন্টকে হারিয়ে দিল! সার্জেন্ট মনে মনে ভাবল সে ঠিক সাবধান হয়নি তাই সে হেরেছে, কিন্তু পরবর্তী খেলাতেও সার্জেন্ট হেরে গেল! মার্কোকে নিয়ে হইচই পড়ে গেল! সে যেখানে যায় সেখানেই দেখাতে থাকে তার অসাধারণ দাবার ক্ষমতা! পনের বছরের ছেলে মার্কো কিছু দিনের মধ্যেই হয়ে পড়ল একটা অসাধারণ ব্যাপার। দাবার জগতে সে একেবারে লাফাতে লাফাতে চলল, এবং ২০ বছর বয়সেই সে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হল!

গল্পকথা? অবশ্যই। অনেকেই বলতে পারবেন কাহিনিটি বিখ্যাত জার্মান লেখক স্টেফান ৎসোয়াইগ-এর 'দি রয়্যাল গেম'-এ পাওয়া যাবে। গল্পটি যে কেবল দাবা খেলোয়াড়দেরই মুগ্ধ করবে তা নয়—এমন গল্প মন্ত্রমুগ্ধ এবং বিস্মিত করবে যে-কোনও গল্প পাঠকেরই। কিন্তু এটি গল্পকথা হলেও এটি যে বিশেষ অসম্ভব ঘটনা—একেবারেই আজগুবি তা কিন্তু মোটেই নয়। এত ছোট বয়সে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া কি সম্ভব? তা ছাড়া, সে গ্রামের ছেলে—লেখাপড়াও তো ভাল শেখেনি। গল্পেই আছে মার্কো অতি কষ্টে পড়তে পারত, এবং সংস্কৃতির যে কোনও আঙিনায় তার ছিল সমান অজ্ঞতা! তার পক্ষে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন হওয়া কি সম্ভব?

স্টেফান ৎসোয়াইগ যা লিখেছিলেন তার কোনটিই অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয়। উনি যে সময়ে লিখেছিলেন সে-সময় অবশ্যই বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন যাঁরা হয়েছিলেন তাঁদের কারুই বয়স কুড়ি নয়। স্টাইনিজ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলেন ১৮৬৬ সালে, ৩০ বছর বয়সে। তারপর লাসকার—ইনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ২৫ বছর বয়সে, কাপাব্লাংকা হয়েছিলেন ৩৩ বছর বয়সে, আলেখিন হয়েছিলেন ৩৫ বছর বয়সে। এর পর অবশ্য আরও কম বয়সে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন মিখায়েল তাল—২৪ বছর বয়সে, কারপভও ২৪ বছর বয়সে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হন তবে হিসেব মতো তালের চেয়ে কারপভের বয়স কম ছিল। আরও কম, মাত্র ২২ বছর বয়সে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলেন গ্যারি কাসপারভ এই তো সেদিন। এখন যে-ভাবে দাবা চর্চা চলছে পৃথিবীতে তাতে ২০ বছর বয়সের কেউ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নও হয়ে যেতে পারেন হয়ত। অতএব স্টেফান ৎসোয়াইগের রয়্যাল গেম গল্পকথা হলেও বাস্তবতাকে ছুঁয়েই আছে। আর ছোট বয়সে দাবার অসাধারণ

কৃতিত্ব দেখানোটাও খুব একটা আশ্চর্য ব্যাপার নয়, কেন না, এটা স্পষ্ট হয়ে আসছে যে দাবা খেলায় দাবা সংক্রান্ত জ্ঞানের উন্মেষ ছোট বয়স থেকে না হলে বা অসাধারণ কৃতিত্ব না দেখালে ভবিষ্যতে বিরাট কিছু করার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ।

আরও স্পষ্ট কথা এই যে দাবা খেলার পরিবেশে ছোটবেলায় গড়ে না উঠলে ছোট বয়সে দাবা শেখার ইচ্ছেই হবে না। সেজন্য দাবায় উৎসাহী দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নে স্কুলে স্কুলে দাবা শেখানো হয়, উৎসাহও দেওয়া হয়। কেবল স্কুলে নয়—সোভিয়েত ইউনিয়নের যে কোনও জায়গায়, অফিসে, কারখানায়, ক্লাবে, খামারে, বহু রেস্তরাঁয়, হোটেলে, দূরযাত্রার ট্রেনে, বিমানে দাবার সেট ঘুঁটি সহ পাওয়া যায়। খেলতেও দেখা যায় যত্রতত্র। সোভিয়েত ইউনিয়নে যে আনুমানিক ৬০ জন গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছেন সেটার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরি করা ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছে। প্রায় সর্বত্রই দেখা গেছে, দাবা খেলায় যাঁরা বিশ্বে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন তাঁদের প্রত্যেকেই ছোট বয়সে দাবা খেলার আইনকানুন শিখেছেন, উৎসাহের সঙ্গে খেলেছেন, এবং এগিয়ে যেতে পেরেছেন।

যাঁরা যাঁরা দাবায় বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁদের ছেলেবেলার ইতিহাসে প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় বাড়িতে দাবা খেলা হত, তা দেখতে দেখতেই শিশু দাবা খেলাটি আয়ত্ত করে ফেলত। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন কাপাব্লাংকার ইতিহাস তাই। ইনি মাত্র চার বছর বয়সেই দাবা খেলার আইন-কানুন শিখে নিয়েছিলেন। বাবার সঙ্গে বহু দাবা খেলেছেন, একটা জটিল চাল দেওয়ার সময় কাপাব্লাংকা এমন চাল দেখিয়ে দিলেন যা কিনা অভাবনীয়—বিশেষ করে একটি শিশুর পক্ষে তো বটেই! ঐ একই ব্যাপার ঘটেছে গত শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ মার্কিন খেলোয়াড় পল মরফির ক্ষেত্রেও। খুব ছোট বয়সেই ইনি দাবা খেলতে শুরু করেন এবং ক্রমাগত ভাল খেলে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। ১২ বছর বয়সেই উনি তৎকালীন বড় খেলোয়াড় লোয়েনথালকে হারিয়ে দেন। ২০ বছর বয়সে মরফি পলসেন-কে হারিয়ে দেন আটটি গেমের পাঁচটিতে, দুটিতে ড্র করেন,

রোহিণী খাদিলকার

এবং হারেন মাত্র একটিতে।

বড় দাবা খেলোয়াড়ের জীবনী পর্যালোচনা করতে গেলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই ছোটবেলায় বিস্ময়-বালক ছিলেন। একথা আমাদের দেশের সুলতান খান সম্পর্কে যেমন সত্য, তেমন সত্য প্রায় প্রবাদে পরিণত মার্কিন খেলোয়াড় ববি ফিশার-এর ক্ষেত্রেও। মার্কিন খেলোয়াড় সামুয়েল রেশেভস্কি সাত বছর বয়সেই ১৮০০ রেটিং অর্জন করেছিলেন, ২৪ বছর বয়সে তাঁর রেটিং হয়েছিল ২৬০০। মার্কিন অধ্যাপক এলো দাবা খেলায় কে কতখানি উন্নত মানের তার একটা মোটামুটি হিসেব বৈজ্ঞানিক উপায়ে করার কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ফিডে সেই রেটিং-এর কৌশল মেনে নিয়েছে। এর ফলে কে কতখানি এগিয়ে রয়েছে দাবায় তার একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এটি কাজ চালানোর জন্য একটা ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কিছু নয়—তবে পৃথিবীতে যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক দাবা খেলছে সেখানে এই রকম একটা হিসেব না হলে ঝামেলা অনেক বাড়ত। এবার আসা যাক একটি হিসেবে। ১৯৮৪ সালে ভারতে ভিলওয়াড়া গ্র্যান্ডমাস্টার্স টুর্নামেন্টে যে ১২ জন যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রাশিয়ান গ্র্যান্ডমাস্টার কুজমিন-এর রেটিং ছিল সবচেয়ে বেশি—২৫০৫। দিব্যেন্দুর রেটিং ঐ সময় ছিল ২৪৬০। ঐ সময় দিব্যেন্দুই ছিল ভারতের সবচেয়ে বেশি রেটিংওয়ালা দাবা খেলোয়াড়।

অনুপমা অভয়ংকর

ছবি দিলীপ ব্যানার্জি

তা হলে দেখা যাচ্ছে, 'বিস্ময় বালক' দিব্যেন্দু যতটুকু উঠতে পেরেছে তা আন্তর্জাতিক মানের কাছে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তবে, ওর ওঠার সময় এখনও যায়নি। দাবা যেহেতু আন্তর্জাতিক খেলা, এবং শ্রেষ্ঠত্ব বা অশ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে আন্তর্জাতিক খেলাতেই—সেখানে প্রতিযোগিতা এখনও অসমান এবং ভারতের পক্ষে বড় কিছু করার সম্ভাবনা এখন পর্যন্ত তেমন চোখে পড়ে না। তাই বিস্ময় বালককে বিস্ময়-যুবক হতেই হয়, না হলে এ খেলায় পিছিয়ে থাকতে হয়।

এবারে দেখা যাক কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত দাবা খেলোয়াড়, যাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন বিস্ময়-বালক, কি ভাবে দ্রুত তাঁদের রেটিং বাড়াতে পেরেছিলেন। গত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আনাতলি কারাপভের ৭ বছর বয়সেই ছিল ১৬০০ পয়েন্ট, ৮ বয়সে হয় ১৭০০, ১০ বছর বয়সে হয় ২০০০, ১১ বছর বয়সে ২১০০ এবং ১৮ বছর বয়সে ২৬০০ আর ২৩ বছর বয়সে ২৭০০। বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নও (কাসপারাভ) ছিলেন 'বিস্ময় বালক'। ইনি ৯ বছর বয়সেই অর্জন করেছিলেন ১৮০০ পয়েন্ট, ১০ বছরে ২০০০ (কারপভেরও তাই হয়েছিলো), ১৬ বছর বয়সে ২৬০০ এবং বর্তমানে, বলাবাহুল্য, তাঁর রেটিং পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা। কাপাব্লাংকা (বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন) ৯ বছর বয়সে অর্জন করেছিলেন ১৮০০ পয়েন্ট, ২৪ বছর বয়সে ২৭০০। আলেখিন (বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন) ১১ বছর বয়সে ১৮০০, আর ৩৮ বছর বয়সে ২৭০০।

বিশ্বের হিসেবে ভারতের অবস্থা অনেক নিচে। ভারতের বিস্ময় বালক বিশ্বের সেরা বিস্ময় বালকের কাছে নেহাতই শিশু! কেউ যদি

প্রশ্ন করে, ভারতে গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার সম্ভাবনা প্রথম কার? আমাদের ধরেই নিতে হবে আমাদের বিস্ময় বালকদের নানা অসুবিধের মধ্যেই খেলে যেতে হবে, যদিও দাবা খেলা আগেকার মতো অতটা অগ্রহণীয় নয়। তবু আমরা দেখতে পাই একটি ছেলেকে ডাক্তার হওয়ার জন্য বা ইঞ্জিনিয়ার করার জন্য অভিভাবকবর্গ যে উৎসাহ দেখান এবং অর্থ ব্যয় করেন একটি দাবা প্রতিভাকে উৎসাহ তেমন দেওয়া হয় না। অবশ্যই দিব্যেন্দু বা নীরজ মিশ্রর বাড়ির কথা আলাদা। আমরা এও জানি, এখন ভাল দাবা খেলোয়াড় সরকারি এবং বে-সরকারি চাকুরি পাবার সুযোগ যতখানি পাচ্ছে, আগে সে-সব সুযোগ মোটেই ছিল না,

দিব্যেন্দু বড়ুয়া *ছবি: তপন দাস*

কিন্তু এখনও অভিভাবকদের কিছুটা সন্দেহ, কিছুটা দ্বিধা রয়েছে। একটি ভাল দাবা খেলোয়াড় ছেলেকে উৎসাহের চাইতে নিরুৎসাহই এখনও করা হয়, কেন না, সহজ হিসেব এই যে ডাক্তারিতে বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ একবার পাস করলেই মোটামুটি আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি, কিন্তু দাবায় ভাল ফল করলেই যে তা হতে পারবে তার গ্যারান্টি নেই। অভিভাবকদের অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না, কেননা ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পাস করার সম্ভাবনা যেখানে শতকরা ৮০ ভাগ, সেখানে দাবায় আই এম সংগ্রহ করার কল্পনাও যে করা যায় না! এত বড় ভারতবর্ষে যদি দশ লক্ষ লোকও দাবা খেলোয়াড় থাকেন তাহলেও দেখা যাচ্ছে আই এম হতে পেরেছেন মাত্র ন'জন! এটা কোনও হিসেবে আসে না। তাই দাবা খেলতে খেলতে ব্যর্থ হলে (যার সম্ভাবনা বিরাট) ছেলের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে? তাই আগে কিছু ডিগ্রি দরকার। এই মানসিকতার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। তবু এরই মধ্যে কিছু কিছু (যার সংখ্যা অতি সামান্য অবশ্যই) দাবা চর্চা করছেন। কিছু কিছু শিশু প্রতিভারও দেখা পাওয়া যাচ্ছে। মেয়েদের মধ্যেও দাবা খেলার চল হচ্ছে, কিন্তু তাও তুলনায় অতি সামান্য! অতএব, বলা যায় আগামী বেশ কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের এই ভারতবর্ষের কেউ গ্র্যান্ডমাস্টার হতে পারবেন কিনা তাতে রয়েছে যথেষ্ট সন্দেহ! মনে রাখতে হবে, সমস্ত পৃথিবীতে গ্র্যাণ্ডমাস্টারের সংখ্যা আনুমানিক দুশো এবং আই এম বা ইন্টারন্যাশনাল মাস্টারের সংখ্যা হাজার খানেক (সঠিক হিসেবটা বলা যাচ্ছে না)।

সম্প্রতি আনন্দ-র বিস্ময়কর প্রতিভা নিয়ে নানা গবেষণার অন্ত নেই। কলকাতায় টাটা-স্টিল এবং আলেখিন দাবা ক্লাব আয়োজিত আন্তর্জাতিক গ্র্যান্ডমাস্টার টুর্নামেন্টে মাত্র আধ পয়েন্টের জন্য আনন্দর একটি গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম পাওয়া হল না। এর বয়স এখন প্রায় সতের বছর। তামিলনাড়ুর ছেলে, ইস্কুলে পড়ে। ওর মা ওর ন-বছর বয়সে শিখিয়েছিল দাবা কেমন করে খেলতে হয়। শিখেই সে একজন ওস্তাদ হয়ে ওঠে। এ দিক দিয়ে দাবার সঙ্গে সঙ্গীত প্রতিভাদের তুলনা করা হয়। বলা হয় ও দুইই ছোটবেলারই জিনিস এবং প্রধানত পরিবেশেই হয়ে থাকে প্রেরণা! এমন কম দেখা যায় যে কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ একজন স্থির করলো সে দাবা খেলা শিখবে! তারপর সে বই টই যোগাড় করে দাবা শিখল। দাবা শেখার ইচ্ছে হতে পারে তখনই যখন আশে পাশে দাবা খেলা হতে দেখা যায়। বিশেষত বাড়িতে দাবার সামান্য একটু চর্চা থাকলেও ছোটরা তা খেলতে বা আয়ত্ত করতে উৎসাহিত হয়। আরও একটি ব্যাপার আছে। যদি কেউ ভাল খেলতে থাকে তাহলে তাকে আরও ভাল খেলবার সুযোগ করে দেওয়ারও ব্যাপার থাকে। আমাদের দেশে এটির একটু অভাব আছে। আমার পরিচিত একাধিক বালক চমৎকার দাবা খেললেও অভিবাকদের তেমন ইচ্ছে নয় যে সে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে ঐ নিয়েই থাকুক! কিন্তু এটা তো ভবিষ্যত নিরাপত্তার প্রশ্ন। সেই কারণে অভিভাবকরা মন্দ করেন তা বলা যাবে না। এদিকে পশ্চিমী কোনও কোনও দেশে দাবা প্রতিভা দেখলেই কেউ না কেউ পেট্রন হয়ে যান। হয় কোনও দানশীল উৎসাহী ব্যক্তি, নয়তো রাষ্ট্র (যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে হয়)। তাহলে, আমাদের দেশে কে গ্র্যান্ডমাস্টার হতে পারবে? কার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি?

সবচেয়ে ছোট-র দিক দিয়ে দেখতে গেলে অবশ্যই আনন্দর কথাই আগে মনে পড়বে। ওর খেলা দেখে বিদেশী গ্র্যান্ডমাস্টাররা প্রভূত পরিমাণে প্রশংসা করেছেন, কেউ কেউ বলেছেন ভারতের প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার হবার সম্ভাবনা এরই। ১৯৮৫-র লন্ডনে লয়েডস ব্যাঙ্ক আয়োজিত দাবা প্রতিযোগিতায় আনন্দ ব্রিটিশ গ্র্যান্ডমাস্টার জোনাথান মেস্টেল-কে হারিয়ে দেয় কিন্তু সে পয়েন্টের হিসেব এগারোরও নিচে থাকে। ২১ বছরের নিচে দুদিন ধরে যে টুর্নামেন্ট হয় (১০টি খেলা হয় দিনে পাঁচটি করে—এক এক জনের সময় নির্ধারিত হয় মাত্র ৩০ মিনিট) তাতে আনন্দ প্রথম হয়। এখন পর্যন্ত দেখা গেছে চালের জন্য তাকে বিশেষ সময় নষ্ট করতে হয় না। এ ব্যাপারে কাপাব্লাংকা, আলেখিন বা ফিশারের সঙ্গে তার মিল আছে। কিন্তু গ্র্যান্ডমাস্টার আনন্দ হবেই সে কথা জোর করে বলা যায় না, কেন না, কোনও খেলাতেই কে কি হবে জোর করে বলা সম্ভব নয় বোধ হয়। ব্যতিক্রম ছিল ফিশারের। একমাত্র ফিশারের খেলা দেখেই বহু বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেছিলেন যে ফিশার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবেই! ফিশারের বয়স তখন মাত্র চোদ্দ! ফিশার এর পর দুর্বার গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে তার দাবার প্রচণ্ড প্রতিভা নিয়ে এবং ১৯৭২ সালে ২৯ বছর বয়সে সে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়। কিন্তু তারপর চোদ্দ বছর সময় চলে গেছে, ফিশারের বয়স এখন ৪৩ বছর। এই সময়ের মধ্যে সে একটি খেলাও খেলেনি কোনও মানুষের সঙ্গে। তবে কম্পিউটারের সঙ্গে খেলেছে কি না, এবং সে আবার ফিরে আসবে কিনা তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই।

আনন্দ গ্র্যান্ডমাস্টার হবে কি হবে না তা বলা সম্ভব নয়। বিদেশী বিশেষজ্ঞ হলেই যে তাঁর মতামত সর্বদা সত্যি হবে তার কোনও মানে হয় না। এটা অনেকটা নির্ভর করে কি প্রসঙ্গে বিদেশী বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেন। সাধারণত একটা খেলার ছোট কেউ ভাল খেলার পর তার সমর্থক, বা আত্মীয় কিংবা সাংবাদিক বিদেশী বিশেষজ্ঞকে প্রশ্ন করেন: আপনি কি মনে করেন অমুকের গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার সম্ভাবনা আছে? এর উত্তর কি হতে পারে, 'হ্যাঁ' ছাড়া? তা ছাড়া যেকোনও কম বয়সী ভাল দাবা খেলোয়াড়ের সামনে পড়ে রয়েছে বহু বছর সময় কেমন করে বলা যাবে, না—এর গ্র্যান্ডমাস্টার হবার সম্ভাবনা নেই? সুতরাং উত্তর একটাই, আর তা হচ্ছে 'হ্যাঁ'। আসল উত্তরটা মনে মনেই থাকে, তা হল—অমুক ভাল খেলছে বা না খেলছে তা আমি ভাল করে বিচার করিনি, খেলা বিশ্লেষণ করিনি—তবু বলা যায়, না—অসম্ভব নয়, তবে লাখ দশেক দাবা খেলোয়াড়ের মধ্যে মাত্র একজন গ্র্যান্ডমাস্টার হতে পারে, অতএব মোটামুটি খেলা না দেখেই বলা যায়, না—অমুকের গ্র্যান্ডমাস্টার হবার সম্ভাবনা নেই।

তবে কেমন করে ফিশারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবার ব্যাপারটা বহু বিশেষজ্ঞ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন? তার কারণ, ফিশারের কয়েকটি অসাধারণ খেলা বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। ফিশারের সঙ্গে বার্ন-এর একটি খেলা হয়েছিল—১৯৫৬ সালে, ফিশারের বয়স তখন মাত্র ১৩। অতি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে দাবা বিশারদ জেরাল্ড এব্রাহাম লিখেছিলেন, "খেলাটিতে জিতেছিল যে তার বয়স তখন মাত্র তেরো—যে হারল সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব চ্যাম্পিয়ন। খেলাটিকে বলা যায় দাবা-ধূমকেতু অথবা বোধহয় বিরাট এক তারকার আবির্ভাব বললেই ঠিক হয়। তরুণ দাবা খেলোয়াড় প্রতিপক্ষের ঢিলেমির সুযোগ নিয়ে ক্রমশ তাকে কাবু করে ফেলে।" এর পর খেলাটি বিশ্লেষণের সময় ফিশারের ১১তম চাল সম্পর্কে এব্রাহাম লিখলেন, "এ এক অভাবনীয় এবং আশ্চর্য চাল—যে

চাল দিচ্ছে তারই মত অভাবনীয় এবং আশ্চর্য ! চালটিকে বলা যায় বিনা মেঘে বাজ !" ফ্র্যাংক ব্রেডি লিখেছিলেন, "এই চালটি (১৭ নং চাল) শত শত বছর ধরে আলোচিত হবে ।" এ ছাড়াও (সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে অবশ্য বলা হয়েছিল, প্রতিভাবান এই খেলোয়াড়টি অতিরিক্ত প্রচার এবং প্রশংসায় খারাপ হয়ে যাবে) এই কিশোরটি সম্পর্কে প্রভূত পরিমাণে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন আরও অনেকে। কিন্তু ঠিক সে-রকমভাবে কোনও খেলোয়াড় নিয়ে আর কখনও এত উচ্ছ্বাস দেখানো হয়নি। ভারতেও নয়। অবশ্য ভারত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দাবায় এসেছে বলা যায় গত দশ বছর। এর মধ্যেই সাফল্য এর অনেক। এবং বলা যায় আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই গ্র্যান্ডমাস্টার কেউ না কেউ হবেনই। কিন্তু কে হবেন বলা শক্ত। আনন্দর প্রতি আমাদের চোখ রইল ঠিকই, যেমন রইল দিব্যেন্দু এবং থিপসের উপরও।

কিন্তু এরা ছাড়াও ছোট খেলোয়াড় অনেক। বয়সেই তারা ছোট—আসল খেলায় বড়দের সঙ্গে এরা খেলে অনেক সময়েই সমানে-সমানে ! একটু সময়ের জন্য আমাদের প্রতিবেশী দুটি দেশের দিকে তাকানো যাক—এই দুটি দেশ হল পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ। এখনও এই দুটি দেশের কেউ গ্র্যান্ডমাস্টার হতে পারেনি। সমস্ত এশিয়াতেই গ্র্যান্ডমাস্টারের সংখ্যা অতি সামান্য। বাংলাদেশের একমাত্র ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার হল মুর্শেদ। মুর্শেদ গ্র্যান্ডমাস্টার হবেই বলে অনেকে মনে করেন আবার অনেকে এও মনে করেন যথেষ্ট ক্ষমতাবান কুড়ি বছরের এই বালকটি এতই স্পর্শকাতর এবং অনুভূতিপ্রবণ যে তাকে উপরে উঠতে হলে এই সব চরিত্রগত দোষ বা গুণকে অতিক্রম করতে হবে। কয়েক মাস আগে সে কলকাতায় যখন খেলতে এসেছিল তখন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে সে গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম পাওয়ার জন্য একটি ড্র-গেমে জিতেছিল প্রতিপক্ষের 'সহযোগিতায়'। তখনই সে খুব ব্যথিত হয়েছিল, মুষড়ে পড়েছিল এবং টুর্নামেন্ট-পরবর্তী ভোজসভায় গরহাজির ছিল। এর পরও সে ভারতে এসেছিল, এসেছিল দিল্লিতে ভিলওয়ারা গ্র্যান্ডমাস্টার টুর্নামেন্টে। এবারে সে এসে দেখে খেলোয়াড়দের জন্য দু-রকম থাকবার ব্যবস্থা। আগেও যেমন করা হয়েছিল, এবারেও সোভিয়েত এবং বালগারিয়ান খেলোয়াড়দের এক জায়গায় এবং ভারতীয়দের অন্য এক জায়গায় থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভারতীয়রা নিজেরাই এই ব্যবস্থা চেয়েছিল। নিয়াজ মুরশেদকেও ভারতীয়দের সঙ্গেই থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু নিয়াজের মনে হয়েছিল তার উপযুক্ত সম্মান তাকে দেওয়া হয়নি, অতএব তাকে সোভিয়েত এবং বালগেরিয়ানদের সঙ্গে একই জায়গায় থাকতে দেওয়া হক। এই অনুরোধের পর সিদ্ধান্ত নিতে কিছু বিলম্ব হওয়ায় মুরশেদ ধরে নেয় তার অনুরোধ মেনে নেওয়া হবে না এবং সে অবিলম্বে খেলা ছেড়ে চলে যায়। এর ফলে সুধাকর বাবু এই টুর্নামেন্টে খেলতে না পেরে হতাশ হয়। পাকিস্তানে একজনও ইন্টারনাশনাল মাস্টার নেই। পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় খেলোয়াড় এম ওমর খান, এর রেটিং ২৩৯০, ভারতের আনন্দের ২৪২০ এবং তুলনায় কাসপারভের ২৭৪০ !

এটা বিস্তারিতভাবে বলার কারণ হল দাবা খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত চরিত্র দাবা খেলার সময়-বিভাগকেই দারুণভাবে প্রভাবিত করে। ফিশারের মত শ্রেষ্ঠ দাবা খেলোয়াড়কেও কেবল স্পর্শকাতরতার জন্য অনেক দণ্ড দিতে হয়েছে। স্নায়ুর জোর কেবল দাবা খেলার সময় নয়—সর্বত্রই থাকা দরকার। একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবা খেলার দিন প্রিয় আত্মীয় বা বন্ধুর দুর্ঘটনা বা মৃত্যু সংবাদে কম দাবা খেলোয়াড়ই স্থির থাকতে পারে। এ ছাড়া অন্য অনেক ব্যাপারেও দাবা খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ দাবা খেলোয়াড়ের মনকে নাড়া দিতে পারে।

যাই হক, বলার কথা একটাই, সেটা হল কোন ছোট দাবা খেলোয়াড়ই 'ছোট' নয়। আজকাল পৃথিবীময় দাবা-চর্চা যেভাবে হচ্ছে তাতে ছোটদের বড় হয়ে ওঠার সুযোগ যেমন বাড়ছে, পথের বাধাও তেমনই বাড়ছে। "এলাম, দেখলাম, জয় করলাম" এটা আর দাবা খেলোয়াড়দের পক্ষে প্রযুজ্য নয়। পল মরফি স্টাইনিজ কিংবা লাসকার যেভাবে দাবার মাঠে ছড়ি ঘোরাতেন, এখন আর তেমনটি করা সম্ভব নয়। এখন দাবা খেলোয়াড় বেশি, চর্চাও বেশি। এর জন্য নানারকম ক্লাস, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ছোট-খাট হরেক প্রতিযোগিতা, রেটিং, রাজ্য পর্যায়ে এবং দেশ পর্যায়ে প্রতিযোগিতা—দাবার ক্ষেত্র বিস্তার লাভ করছে। এখন সাব-জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, মেয়েদের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন খেলা চলছে অতি উৎসাহে। চলছে পোস্টাল দাবা প্রতিযোগিতা এবং এতেও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা হয় !

আমাদের দেশে ছেলেদের চাইতে মেয়েদের মধ্যে দাবার প্রচলন অন্যান্য দেশের মতই, অর্থাৎ, মেয়েরা বেশি খেলে না। এই খেলায় তাদের যোগ্যতা যথেষ্ট থাকলেও লড়বার শক্তি, কিংবা জিতবার জন্য অসম্ভব জেদ ছেলেদের চাইতে কম। অবশ্য আসল কারণ ঠিক বলা যায় না। মেয়েদের মধ্যে ভিরা মেনচিক ছিলেন এক অতি আশ্চর্য দাবা খেলোয়াড়, তিনি ত্রিশের দশকে ব্রিটেনে বহু বিখ্যাত গ্র্যান্ডমাস্টারকে দাবায় হারিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন। বর্তমানে ভারতে ৭ জন মেয়ে খেলোয়াড়ের ফিডে রেটিং রয়েছে, এঁরা হলেন রোহিণী খাদিলকার (২১১৫), ভাগ্যশ্রী শাঠে (২০৭৫), অনুপমা অভয়ঙ্কর (২০৬৫), পি ভি নির্মলা (২০৬০), ভি উন্নি (২০১০), জয়শ্রী খাদিলকার (২০০৫) এবং এস আর রাধা (১৯৪৫)। এদের মধ্যে চারজন ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার (মেয়েদের আলাদা হিসেবে রাখা হয়), এঁরা হলেন রোহিণী, অভয়ঙ্কর, উন্নি এবং রাধা। এরা প্রত্যেকেই ছোটবেলা থেকে দাবা খেলেছে এবং প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য প্রভূত পরিমাণে পরিশ্রম করেছে। অনুপমা অভয়ঙ্করের বয়স এখন ১৭ বছর। সে এই বছরের জুন মাসে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার এডেলেইড-এ এশিয়ান জুনিয়র গার্লস্ চেস্ চ্যাম্পিয়নশিপে যোগ দিয়ে দশ-এর মধ্যে সাড়ে আট পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছে। ১৯৮৪ সালে ভাগ্যশ্রী ব্রাইটনে মেয়েদের ব্রিটিশ চ্যাম্পিয়নশিপে যোগ দিয়ে দারুণ ভাল ফল করে। তারপর ঐ বছরই লন্ডনে লয়েডস্ ব্যাংক টুর্নামেন্টে যোগ দিয়ে সে অর্জন করে তার প্রথম ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার 'নর্ম'। আরও একজনের নাম এখানে করা যায়—এর নাম এখনও ফিডে রেডিং তালিকায় আসেনি, কিন্তু শিগগিরই আসবে। নাম নাগভূষণম শরিতা, বয়স মাত্র ১৪। এর ভাই এন সুধাকর বাবু। সুধাকর বাবু একবার জাতীয় জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। শরিতা গত বছর সাব-জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হয় মেয়েদের মধ্যে।

আরও অনেক নাম আছে। প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে পৃথিবীর তুলনায় অনেক পিছিয়ে হলেও ভারতের ক্ষেত্রে বলা যায় অগ্রগতি হয়েছে অসামান্য। এই কথাটা আসলে বলা দরকার, একজন নয়, দু-জন নয়, অজস্র

তরুণ প্রতিভা বিশ্বনাথন আনন্দ

বালক-বালিকা যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে আসবে, তার জন্য ধৈর্য ধরবে, হয়ত কিছুটা ত্যাগ-স্বীকারও করতে হবে, তখনই তাদেরই মধ্যেও কয়েকজন অনেক এগিয়ে যাবে। যেমন ব্রিটেনে হয়েছে। বছর দশেক আগে ব্রিটেনে একটি গ্র্যান্ডমাস্টারও ছিল না, কিন্তু আগ্রহ প্রবল হওয়ায় এবং বে-সরকারি এবং ব্যক্তিগত সাহায্য প্রভূত পরিমাণে আসায় এবং দাবাচর্চা ঠিক মতো পরিচালিত হওয়ায় ছোট দ্বীপ ব্রিটেনে বর্তমানে গ্র্যান্ডমাস্টারের সংখ্যা বোধ হয় আটজন (সঠিক সংখ্যা জানা নেই), কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা এঁদের মধ্যে চারজন শ্রেষ্ঠদের তালিকায় প্রথম ৫৫ জনের মধ্যে রয়েছে। এরা হল শার্ট (৯ম), নান (১৬তম), মাইলস (২৫তম) এবং চ্যান্ডলার (২৯তম)। ■

খ্যাতির বিড়ম্বনা

ড্যালে টমসনের কাছে একটা প্রতিযোগিতা জেতা কোনও ব্যাপারই না। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিঙ্গসেনের ডেকাথলনে বিশ্ব রেকর্ড থাকতে পারে কিন্তু দুজনের মধ্যে ড্যালেই যে সেরা তা এখন মোটামুটি সবাই মেনে নিয়েছে। ড্যালের বয়েস

আপাতত আঠাশ। যাবতীয় সুখ-আহ্লাদকে দূরে সরিয়ে রেখে গত বার বছর ধরে ও একমনে অনুশীলন করে যাচ্ছে। অদ্ভুত ওর একাগ্রতা! ওর নিষ্ঠা! এমন কি ক্রিশমাসের দিনও ড্যালে দু বেলা অনুশীলন করে থাকে। ওর নিজের কথায়, প্রতিযোগিতা জেতাই আমার বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই লোক যে এক নম্বর হবে এবং নিজের জায়গা ধরে রাখবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আশ্চর্য হতে হয়, ড্যালের মতো পরিহাসপ্রিয়, মজাদার মানুষকেও খ্যাতি নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে দেখে। ব্রিটেনের সর্বকালের সেরা অ্যাথলিট হিসাবে স্বীকৃতি পাবার দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ড্যালে। এবং যতই এগোচ্ছে ততই সমস্যায় পড়ছে ওর জনপ্রিয়তাকে সামাল দিতে। জনপ্রিয়তায় মাথা ঘুরে গেছে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। আসলে চর্তুদিকে ক্রমবর্ধমান প্রশংসা ও স্তাবকতার বাতাবরণ ওর মনের ওপর একটা চাপ সৃষ্টি করে রেখেছে। ড্যালে যে ইদানীং বহু ক্ষেত্রে অটোগ্রাফশিকারীদের মেজাজ দেখাচ্ছে, শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে, এই চাপ কাটিয়ে উঠতে না পারাই তার কারণ। ইংল্যান্ডের কাগজগুলিতে এর জন্য ও কড়াভাবে সমালোচিতও হচ্ছে। এক সাংবাদিক লিখেছেন, ড্যালে টমসন চায় স্বচ্ছ একটা বুদ্বুদের মধ্যে বাস করতে, যার মধ্যে দিয়ে ওকে দেখা যাবে, ওর প্রশংসা করা যাবে কিন্তু ওকে ছোঁয়া যাবে না।

লোকের সঙ্গে আপনি এত খারাপ ব্যবহার করেন কেন? বিশেষত যেখানে এদের অধিকাংশই আপনার ভক্ত? উত্তরে ড্যালে বলেছে, "আপনারা আমার অবস্থাটাও একটু বোঝার চেষ্টা করুন। ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন মানে তো এই নয় যে সাধারণের চেয়ে আমার ধৈর্য বেশি। আমি হয়তো কারুর সঙ্গে কথা বলছি, হঠাৎই সেখানে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য তিন চারজন এসে হাজির হল। একান্তে ডিনার সারছি, সেখানে কেউ বাড়িয়ে দিল অটোগ্রাফ খাতা। তখন কি মেজাজ ঠিক রাখা সম্ভব? যদি কারুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে থাকি আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু তাদেরও এটা বোঝা উচিত আমি জনগণের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নই।"

নতুন হাওয়া

মাইকেল পানফর্স খুব মজার ছেলে। বর্গ, ভিল্যাণ্ডার বা ইয়ারিডদের মতো ওর শরীরেও বইছে সুইডিশ রক্ত কিন্তু এদের মতো ও এত ঠাণ্ডা মেজাজের ভাবাবেগহীন নয়। টেনিস সার্কিটে রীতিমতো নাম করে ফেলেছে পানফর্স। মাত্র আট মাসেই। ফরাসি ওপেনের আগে ওকে কেউ চিনত না। বেকার এবং লেকোঁতে-কে এই প্রতিযোগিতায় ও পর পর হারায় তারপর ফাইনালে হারে লেণ্ডলের কাছে। তখন থেকেই সবাই চোখ রাখছে তেইশ বছরের এই প্রতিভাটির দিকে। পার্নফর্স যে খুব আমুদে চরিত্রের আগেই বলেছি। ফরাসি ওপেন চলাকালীন প্রত্যেকটি অপ্রত্যাশিত জয়ের জন্য ও নিজেকে সম্মান জানাতো অপেক্ষাকৃত ভাল জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করে। তৃতীয় রাউণ্ডের ম্যাচ জেতার পর ও হোটেলের সিঙ্গল রুম ছেড়ে ডাবল রুম নেয়। বেকারকে হারানোর পর প্লেয়ারদের জন্য নির্দিষ্ট হোটেল সোয়িটেল ছেড়ে উঠে যায় মেরিডিয়ানে। এরপর মেরিডিয়ানের অন্যতম দামি সুইটটি ভাড়া করল সেমিফাইনালে লেকোঁতেকে হারাবার পর।

অনেকের মনে হতে পারে নেহাতই বালকোচিত উচ্ছ্বাস। টেনিস-লিখিয়েরা কিন্তু খুব খুশি। তাঁরা বলছেন, রবকবহীন পেশাদারী টেনিসের একঘেয়েমি কাটাতে এমন একটা মজাদার চরিত্রের খুব প্রয়োজন ছিল। তাঁদের কাছে পানফর্স একটা নতুন, স্নিগ্ধ হাওয়ার মতো।

'কিং' ফুটবলার

ক্রিকেট খেলতে খেলতেই তার মাঝে সময় করে এই শীতের মরশুমে ফুটবল খেলবেন ভিভ রিচার্ডস। যে টিমের হয়ে খেলবেন তাদের নাম হাঙ্গারফোর্ড। এরা খেলে ইংল্যাণ্ডের ডক্সহল ওপাল লিগে।

দূর, রিচার্ডস আবার কি ফুটবল খেলবে? ক্রিকেট ভাল খেললেই কি...? এরকম যদি কারুর মনে হয় তিনি ভুল করবেন। রিচার্ডস বেশ ভাল ফুটবল খেলেন। অন্তত আমাদের দেশের স্ট্যাণ্ডার্ডে তো বটেই। ক্রিকেটে নাম করার আগে

অ্যান্টিগুয়ার পক্ষে বিশ্বকাপের প্রাথমিক পর্বের ম্যাচে খেলেছেন। একদমই ছেলেখেলার ব্যাপার নয়। অ্যান্টিগুয়া রীতিমতো ভাল দল। অন্তত এশিয় দেশগুলির মানে। জোরের সঙ্গে বলা যায়, কলকাতা মাঠে রিচার্ডস ফুটবল খেলতে চাইলে তাঁকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। কিং রিচার্ডস খেলেন মিডফিল্ডে। প্রিয় ফুটবলারের নাম কার্ল হাইনজ রুমেনিগে। ভিভ রিচার্ডস তাদের ক্লাবে ফুটবল খেলবেন এই প্রচার বা এই সম্মানের কথা ভেবেই যে শুধু হাঙ্গারফোর্ড তাঁকে নিয়েছে এমন নয়। বরং সমারসেট আর ওয়ারউইকশায়ারের প্রীতি ফুটবল ম্যাচে রিচার্ডসের খেলা হাঙ্গারফোর্ডের কর্তাব্যক্তিদের মনে এমন দাগ কেটেছে যে পরের দিনই তাঁরা কথা বলতে চলে আসেন।

সবার অলক্ষ্যে

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ২-০ সিরিজ জেতায় তাঁরও অবদান ছিল। কপিল-চেতন-বেঙ্গসরকার-দের মতো না হলেও কাছাকাছি। কিন্তু তিনি থেকে গেছেন সবার অলক্ষ্যে। পিটার মেলভিলের নাম কেউ শোনেনি। অথচ এই ইংরেজ ভারতীয় ক্রিকেটারদের চোট আঘাত সারিয়ে তোলার দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালন না করলে সাহেবদের দেশে কিছুতেই আমাদের ফল এত ভাল হত না। মেলভিল ফিজিওথেরাপিস্ট। কেমব্রিজ ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে জড়িয়ে। প্রথম তাঁর সাহায্য ভারতীয়রা নেয় বিরাশি-র ইংল্যাণ্ড সফরে। সন্দীপ পাটিলের গোড়ালি মচকে যাওয়ায় ওল্ড ট্র্যাফোর্ড টেস্ট খেলতে পারবেন কিনা সন্দেহ দেখা গিয়েছিল। মেলভিল পা ঠিক করে দেন এবং পাটিলও ধন্যবাদ জানান, ১২৯ রানের অসাধারণ ইনিংস খেলে। এবার ম্যানেজার আগেই মেলভিলকে ঠিক রেখেছিলেন টেস্ট ও একদিনের ম্যাচগুলির জন্য। পরে দেখা যায়, অত্যন্ত দূরদর্শী ছিল এই সিদ্ধান্ত।

পিঠের ব্যথা, পেশী সংকোচন এবং অন্যান্য নানাবিধ শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে গোটা সফরে ভারত দলের অন্তত সাত থেকে আটজন শয্যাশায়ী হয়েছে এবং তাদের সুস্থ করে তুলেছেন মেলভিল।

পেস বোলারদের সুস্থ রাখার জন্য বিদেশ সফরে টিমের সঙ্গে একজন ফিজিওথেরাপিস্ট রাখা অবশ্য। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে থাকেন ডেনিস ওয়েট।

এখন অস্ট্রেলিয়াও ফিজিওথেরাপিস্টের গুরুত্ব বুঝেছে আর বার্নার্ড টমাসের কাছে ইংরেজ ক্রিকেটারদের ঋণ তো প্রায় কিংবদন্তীর পর্যায়ে।

ভারতীয় বোর্ড এব্যাপারে আশ্চর্যরকম উদাসীন। ক্রিকেটাররা বহুবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছে, তবু ব্যবস্থা হয়নি দলের সঙ্গে নিয়মিত একজন ডাক্তার রাখার।

গৌতম ভট্টাচার্য

পুজো আসে পুজো যায়

শ্রীমতী

সারা বছরের প্রতীক্ষিত সেই দিনটি এল, আবার চলেও গেল। ভেবেছিল আমাদের এই গোলগোল পাকানো একঘেয়ে জীবনে খানিকটা আনন্দের আর খুশির দমকা বাতাস নিয়ে। আর চলে গেল সারা বছরের স্বল্প সঞ্চয় আর পুজোয় পাওয়া বোনাসের জমার অঙ্ককে শূন্য করে। তবুও কোথায় যেন একটা ছোট্ট খুশির চমকি জ্বলে এই চারটে দিন। নেই—নেই। গেল—গেল। এতো আমাদের জীবনের রোজকার অভিজ্ঞতা। তবু ঠোঁটের কোণে একফালি কৃত্রিম হাসি কখন যে অনাবিল আনন্দ হয়ে ঝরে পড়ে আমরা বোধ হয় বুঝতেই পারি না।

পুজো পুজো। চারদিকে একটা হই হুল্লোড়। আজ কিন্তু পুজোর রূপ গেছে পাল্টে। জমিদারবাড়িতে অথবা শহরের কয়েকটি অবস্থাপন্ন বাড়িতে পুজো আর সীমাবদ্ধ নেই, মা আসবেন কিসে তাই নিয়ে কত জল্পনা কল্পনা। নৌকোয় এলে প্লাবনে ভাসবে দেশ, ঘোটকে এলে খরায় জ্বলবে দেশ। এখন কে আর সে সব দেখে! শহরে এখন অলিতে গলিতে পুজো। পাড়ার মাতব্বর ছেলেরা রসিদ বই হাতে ঘুরছেন। বাড়ির কর্তা ভয়ে ভয়ে গলির মুখে ঢোকেন। কে জানে কত যাবে এ বছর। আজকের এই মাগ্যিগণ্ডার বাজারে বারোয়ারী পুজোয় এই কত বেরিয়ে যায়। আলোর রোশনাই। শোলা অথবা সলমা জরির কারুকার্যে ঝলমল করছেন দেবী। নতুন শাড়ির খসখস আওয়াজে, পারফিউমের চড়া গন্ধে শহরের রাস্তা সুবাসিত। বাসে, ট্রামে ঠেলাঠেলি আগের চেয়ে বেশি। গাড়ির জ্যাম দ্বিগুণ। তবু অন্তরের আনন্দ টিকে হয়ে যেন আমাদের সহ্য ক্ষমতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। গ্রামে অবশ্য এ ধরনের দৃশ্য খুব একটা দেখা যায় না। সেখানে এখনও পুজোর সংখ্যা তেমন নয়। পাড়ার বউ-মেয়েরা পুজোর জোগাড় করছেন। বাড়ির কর্তারা ক্রমে পুজোমণ্ডপের সৌষ্ঠব বজায় রাখার চেষ্টায় ব্যস্ত। বেশ খানিকটা ঘরোয়া ব্যাপার এখনও আছে।

চারটে দিন যেন কোথা দিয়ে চলে গেল। এল নবমী নিশি। এল মা-এর কৈলাসে যাবার ক্ষণ। টলটলে চোখে পাড়ার এয়োরা প্রলেপ রাঙা সিঁদুর আর মিষ্টির থালা হাতে। মা-এর মুখে মিষ্টি, পান দিয়ে খানিকটা রসিকতা হয় নিজেদের মধ্যে। মা চলে যান ব্যান্ড পার্টি, তাসা অথবা ঢাকের বাদ্যির তালে তালে। আর আমরা ফিরে আসি সেই পুরোনো চার দেওয়ালের চৌহদ্দিতে। শেষ হল আনন্দের রেশ। আবার বাজবে পুরনো টেপ। মনটা উদাস হয়ে যায়। বিজয়ার সেই প্রাণখোলা আনন্দের দিনও বুঝি শেষ হয়ে এল। পুজোর চারটে দিন যেন অদ্ভুতভাবে মন থেকে সব মুছে দেয়। কিন্তু বিজয়ার সেই ছুটোপাটি বাড়ি বাড়ি ঘোরা বেড়ানোর দিন আর নেই। এখন বাচ্চারাও মেপে মেপে খায়, নেহাত আপনজন ছাড়া পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে না। আমরা নিজের ঘরে নিজেরা পাকে পাকে বাঁধা পড়ে আছি। নিজের শাখা-প্রশাখাকে দেখারই সময় হয় না, অন্যের দিকে দৃষ্টি দেব কখন।

'আবার এস মা'

ছবি : শিপ্রা দাস

মা-এর মনে জাগে পুলক। এক বছর পর মেয়ে এল বাপের বাড়ি। মফঃস্বলের চাকরি করা ছেলে এসেছে মাত্র চারদিনের ছুটি নিয়ে। নাতি-নাতনিকে পেয়ে মা-এর কত না আনন্দ। সারা বছরের ক্লান্তির পর মন চায় একটু বিশ্রাম। তাই আমরা চাকরি-বাকরি করা মেয়েরা যেতে চাই বাড়ির বাইরে। শহরের জল, বায়ু আর শব্দ দূষণের কবল থেকে অন্তত মুক্তি পাওয়া সাতটা কি দশটা দিন। এত দৈন্য, গ্লানি, অভাব অনটন, তবুও মা আসেন আবার চলেও যান। বিজয়ার শুভ দিন রেখে যায় আমাদের মনে আনন্দ হতাশার অদ্ভুত বৈচিত্র্যময় এক সহাবস্থান। পুজো শেষ হয়ে গেল। ছুটি ফুরলো। মেয়ে চলে যাবে শ্বশুর বাড়ি। ছেলে যাবে কর্মস্থলে। মা-র চোখ ছলছল করে ওঠে। আবার আসছে প্রতীক্ষার দিন। এক দিন, দু-দিন করে তিনশ পঁয়ষট্টি দিন। শুভ বিজয়ার সেই অনেক চাওয়ার পরের পাওয়ার আনন্দ সারা বছর আমাদের দিক হালকা খুশির আমেজ, প্রশান্তি দিক। ■

ইলেকট্রনের পাকাপোক্ত বনিয়াদের ফলে প্রতিদিন জীবনের মারপ্যাঁচে নিখুঁত মেলে।
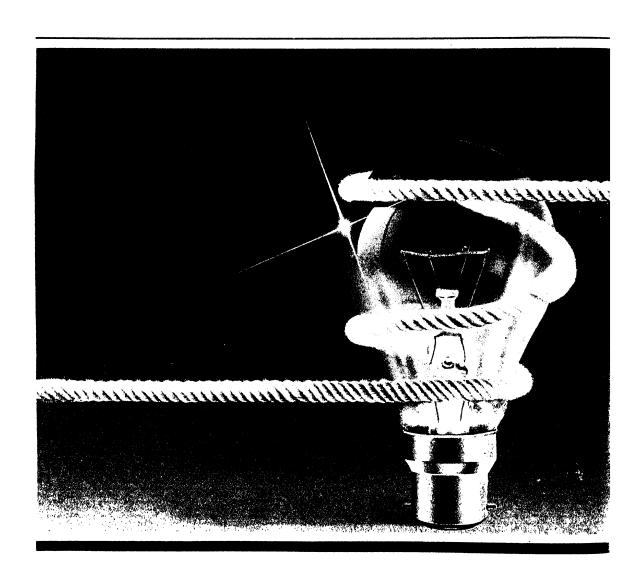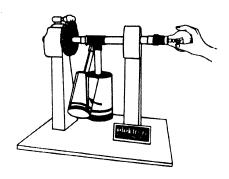
ইলেকট্রন-এর 'মারপ্যাঁচের পরীক্ষা বাল্‌ব বা টিউবের ক্যাপসিলিং এর বিষয়ে কঠোরতম শিক্ষা।

এখানে দেখুন, বাল্‌বের ক্যাপটি একটা হোল্ডার সকেটে 'ফিট' করা আছে, যাতে আবার ৩১/২ কিলো ওজনের ভার লাগানো রয়েছে। এবার বাল্‌ব বা টিউবের গ্লাশের প্রান্তটিকে মোচড় দিয়ে ওজনে ভারকে দিগন্তমুখী এক সমান্তরাল রেখায় আনা হয়।

যখন আপনি একটা ঘর থেকে বাল্‌ব নিয়ে আরেকটা ঘরে লাগাতে যান, তখন এই পরীক্ষাটা কত কাজে আসে জানলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন।

বাজারে ছাড়ার আগে, ইলেকট্রন বাল্‌ব ও টিউবের নানান জটিল পরীক্ষ-নিরীক্ষার এ হ'ল এক উদাহরণ মাত্র।

অন্যান্য জটিল পরীক্ষার ধাক্কার মধ্যে রয়েছে-ফিলামেন্টের ক্ষমতা দেখার জন্য ভোল্টেজ টেস্ট, আলোকচ্ছটার বিকীরণ দেখার জন্য লুমেন টেস্ট এবং দীর্ঘকাল চমৎকার চলার জন্য ১০০০ ঘন্টা জ্বালানোর পরীক্ষা।

আরো কি, ইলেকট্রন বাল্‌ব ও টিউব নির্মানের অধিকাংশ যন্ত্রোপকরণই ইলেকট্রন গ্রুপ দ্বারাই নির্মিত। আর যেসব উপকরণ নয়, যেমন ফ্লোরেসেন্ট পাউডার ও ফিলামেন্ট ওয়্যার, সেগুলি আবার আমেরিকার অগ্রণী নির্মাতা জেনারেল ইলেকট্রিক থেকে আমদানি করা।

এইসব গুণের বহরের জন্যেই, আশ্চর্যের কিছুই লাগে না। যখন দেখা যায় যে এত অল্প সময়ের ভেতরে, ঘরে-ঘরে ও অফিসে অফিসে ইলেকট্রন বাল্‌ব, টিউব ও ফিটিংস-এর কদর বেড়েছে বিপুল হারে।

ইলেকট্রন সোডিয়াম ভেপার, মারকারি ভেপার ও হ্যালোজেন ল্যাম্প, পথঘাট, ফ্যাক্টরি, প্রভৃতি সাজিয়ে তুলছে আলোকচ্ছটায়।

আজ্ঞে হ্যাঁ, এর ১০০০ ঘন্টা আয়ুর প্রতিটিক্ষণ, এ আলোকচ্ছটা করবে বিকীরণ।

কল্পনা ল্যাম্প্‌স অ্যান্ড কম্পোনেন্ট্‌স প্রাঃ লিঃ
২২ এলডাম্‌স রোড মাদ্রাজ ৬০০ ০১৮

elektron

ইলেকট্রন-আলোর জগতে জ্যোতিষ্ক

অরণ্যদেব বৃক্ষ-নিবাসে ফিরছেন । রাজা তাঁকে ওয়াকার-কাকা বলে । *

নাটক

"বসে আছে সিংহাসনে— কবি নয়"

দেবাশিস দাশগুপ্ত

নট ॥ —দেখলেন তো ? কথাটি নেই। এই বয়সের বাচ্চারা গোটা একটা অভিধান আউড়ে যায়, আর এর মুখে একটা বাক্যি নেই। হাসে না কাঁদে না, মুখে কোন রেখা পর্যন্ত নয়। চব্বিশ ঘণ্টাই মুখ ঝুলিয়ে আছে, নিশ্চয়ই কোন গোলমাল আছে— (ছেলেটির সামনে গিয়ে খানিক ভাঁড়ামো করে) দেখলেন ? কোন সাড়া নেই। কোন ভাবলেশ নেই। বড়ো হয়ে এ নাট্য সমালোচক না হয়ে যায় না ! (হয়বদন— গিরিশ কন্নড— অনুবাদ— শঙ্খ ঘোষ)।

শুধু গিরিশ কন্নড় নয়, শিল্পী মাত্রেই সুযোগ পেলে সমালোচককে এক হাত নিয়েছে। সমালোচক মাত্রেই নিন্দিত, প্রত্যেকেই সমালোচককে এড়িয়ে চলেন। এড়িয়ে চলার যথেষ্ট কারণও আছে। একজন নাট্য সমালোচকের বহুদিন পর্যন্ত বিয়ে হয়নি। কোন শ্বশুর তাঁর মেয়েকে সমালোচকের হাতে দিতে নারাজ। অথচ একজন সুপাত্র বলতে যা বোঝায়, সমালোচক তাই ছিলেন। সকলেই ভেবেছেন, খুঁত ধরা যার পেশা, সে সংসারে প্রতি পদে স্ত্রীর

একজন নাট্য প্রযোজক যেমন দর্শক তৈরি করতে পারেন—সমালোচক তাঁকে চিনিয়ে দিয়েও দর্শক তৈরি করতে পারেন—এই বোধটা অনেকদিন বিস্মৃত। নাট্য সমালোচক যেটা করেন, সেটা সবটাই প্রশংসা, এবং কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে একই বিশ্লেষণ, হয়ত সামান্য দু'একটি নিন্দাসূচক প্রস্তাব।

খুঁত ধরবে এটাই স্বাভাবিক। যাই হোক, নাট্য সমালোচক বন্ধুর অবশেষে বিয়ে হ'ল। ফুলশয্যার দিন, রাত্রে সমালোচক নবপরিণীতাকে একটা গান গাইতে বললেন আস্তে আস্তে। মেয়েটি জানালো সে গান জানে না, অগত্যা একটা আবৃত্তির অনুরোধ হ'ল। নতুন বউ অনেক দিন আগে লেখাপড়ার জন্য যা মুখস্থ করেছিল, আবৃত্তি করল। সমালোচক বললেন, "এই যে তুমি আবৃত্তি করলে এর ছন্দ হল এই রকম, এর নাম এই, তোমার অ্যাকসেন্টে ভুল আছে, উচ্চারণে এই ত্রুটিগুলি আছে ইত্যাদি আলোচনায় রাত ভোর হয়ে গেল। বাইরে জ্যোৎস্না ছিল, কোকিলও ডেকেছিল, কিন্তু নবপরিণীতা তা জানতেও পারল না। একজন অভিনেত্রী আমায় বলেছিলেন, যেদিন প্রেস শো থাকে, সেইদিন আমাদের রক্তচাপ বেড়ে যায়— তারপর শো-এর মাঝখানে হঠাৎ টর্চের আলো সামনের দিকে জ্বলে উঠলেই সংলাপ গুলিয়ে যায়। সমালোচনা মানেই কিছু অলোকপাত, কিন্তু আমরা জানি ওটা আলো নয় আলেয়া— সমালোচকের হাতের টর্চ, নিশ্চয়ই কোন "ভুল" টোকা হয়ে গেল।

ক্রমশ সমালোচনার অর্থ বদলে যাচ্ছে। নাট্য সমালোচনায় ভাল মন্দ দুই-ই লেখা হয়। কিন্তু লোকে দেখা হলে বলে "তোমার খুব প্রশংসা দেখলাম"। আবার যখন কেউ বলে, "তোমার খুব সমালোচনা দেখলাম" তার অর্থ হচ্ছে নিন্দা। আগে বোধ হয় সমালোচনার অর্থ অন্যরকম

নাটোরের রাজবাড়িতে 'গালিলেওর জীবন' নাটকের আলোচনা : ফ্রিৎস বেনেভিত্স্, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অশোক মুখোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায় এবং অরুণ মুখোপাধ্যায়

ছিল। অনেক পুরনো পত্রিকা ঘেঁটে দেখেছি— সবটাই আদ্যন্ত প্রশংসা, বহুক্ষেত্রে আবেগ বিহ্বল, সকলেই হয় "জ্বালাইয়া দিয়াছে" কিংবা "সুধা বর্ষণ করিল"— সম্রাট থেকে মৃত সৈনিক সকলেই "মনোমুগ্ধকর"। বেশিদিন আগের কথা নয়, একজন চিত্র পরিচালক ট্রামে বললেন, তাঁর সদ্য রিলিজ হওয়া বই সম্পর্কে "নর্থে খুব ভাল সেল, সাউথে খুব খারাপ। আর মশাই আপনাদের শিরোনাম দিলেন! এই সব পরিচালক সক্ষোভেই বলতে পারেন "তেহিনো দিবসা গতা"।

পৃথিবীতে খুব কম লোক আছেন যাঁরা নিজের কাজকে ছোট করে দেখেন। সবটাই যুগান্তকারী, দৃপ্ত ঘোষণা, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে দেখার বাসনা। সমালোচক যখন এই বেলুনে পিন ফোটাতে আসেন তখনই বিপর্যয়।

জায়গার অভাবে নান্দীকারের ফুটপাথে মহলা

ছবি : ডি এন মিত্র

কাগজে যা সমালোচনা হয়েছে, কোন মানে হয় না। আমার অমুক ছবি যখন বেরোল তখন বিখ্যাত একজন চলচ্চিত্র সমালোচক হেডিং দিলেন— 'চলচ্চিত্র আকাশে নতুন সূর্যোদয়'— আহা সেইসব দিন কোথায় গেল!" আমি হতবাক, পঁচিশ কিংবা পনেরো বছর আগে যে ছবির নাম তিনি করলেন সেটি একটি ট্র্যাশ— তার সম্পর্কে সমালোচক কিভাবে ওই অভাবনীয়

যে-কোন নাট্য কর্মীবন্ধু তাঁদের কথাবার্তায় বলে থাকেন তাঁর নাটকের ওই সমালোচনাটা খুব ভালো হয়েছে। খোঁজ নিয়ে দেখুন— সেই সমালোচনা নির্জলা প্রশংসা। যে লেখায় কিছু নিন্দে আছে, সেটা তাঁদের মেনে নিতে কষ্ট হয়; অথচ বহুক্ষেত্রে জানি সমালোচনার পরে অনেক সফল প্রযোজনারও বদল হয়েছে, কিনতু কখনই সেটা স্বীকার করা হয় না।

বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গ দর্শন"-এর আমল থেকে সাহিত্য-সমালোচনা যেভাবে পুষ্টিলাভ করেছে, নাট্য প্রযোজনার সমালোচনা সেইভাবে এগোতে পারলো না কেন? বঙ্গদর্শন, বিচিত্রা, সবুজ পত্র, শনিবারের চিঠি, পরিচয় প্রভৃতি পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনায় ডিটেলের অজস্র উদাহরণ। কিন্তু 'নাচঘর'-এর সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া নাট্য প্রযোজনার সেরকম ডিটেল আলোচনা নামী পত্রিকায় খুব কম। তবে কি নাট্য সমালোচকের বিদ্যা-বুদ্ধির অভাব, না পত্রিকায় নাটকের জন্য স্থানাভাব? হয়ত বিদ্যা-বুদ্ধি নিয়েও নাট্য সমালোচক নিরাপদ দূরত্বটাই পছন্দ করেন। "দেশ" পত্রিকাতেও অনেকদিন আগে শৌভিক-এর চলচ্চিত্র-নাট্য সমালোচনা অনেক দর্শক তৈরি করতে পেরেছে, সব সময় সেটা হয় না। একজন নাট্য প্রযোজক যেমন দর্শক তৈরি করতে পারেন—সমালোচক তাঁকে চিনিয়ে দিয়েও দর্শক তৈরি করতে পারেন— এই বোধটা অনেক দিন বিস্মৃত। নাট্য সমালোচক যেটা করেন, সেটা সবটাই প্রশংসা, এবং কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে একই বিশ্লেষণ, হয়ত সামান্য দু'একটি নিন্দাসূচক প্রস্তাব। অর্থাৎ নিহত-আহত নয়, পুলিসি ভাষায় 'মৃদু লাঠি চালনা'। একজন শীর্ষস্থানীয় নাট্যব্যক্তিত্ব অভিনয় দেখানোর জন্য প্রেসকে ডাকেন না। তার অনেকগুলি যুক্তি আছে। একটি যুক্তি হ'ল— "আমি খুব ভাল অভিনয় করলাম, কাগজে বেরোল, "অসাধারণ অভিনয়"— যেটা অফিস ক্লাবের অভিনয়েও ব্যবহার করা হয়। কোথায় আমার অসাধারণত্ব, কোথায়ই বা সাধারণ মাপের, সেটা বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল না। ফলে একটা ফরমুলা সমালোচকেরা নিতে পারেন— অসাধারণের সঙ্গে মাত্রা যোগ করে অর্থাৎ 'অসাধারণ' ১' 'অসাধারণ ২' 'অসাধারণ ৩' এইভাবে। এছাড়া নানারকম দায়বদ্ধতার প্রশ্ন আছেই। একটা পুরস্কার ঘোষণা অনায়াসেই করা যেতে পারে "গত পঁচিশ বছরের মধ্যে যাত্রার পাঁচটি খারাপ সমালোচনা দেখাইতে পারিলে নগদ এক হাজার টাকা পুরস্কার দিব।" গ্রামের সাধারণ লোক যাত্রা দেখার জন্য ভিড় করে, কলকাতায়ও যাত্রা প্রদর্শনীতে বহু লোক। কিন্তু নির্দ্বিধায় বলা যায়, তাঁরা যাত্রার সমালোচনা পড়ে ভিড় করেন না— বড় জোর খবরটা পেতে পারেন। নিশ্চিতভাবে সমালোচক যাত্রার দর্শকের মধ্যে প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন, কিন্তু কখনই তাঁদের নাট্যবিচার করতে সাহায্য করেননি। নিঃসন্দেহে তাঁরা যাত্রাকে অবলুপ্তির হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, কিন্তু যাত্রা যখন প্রতিষ্ঠিত তখনও একই পদ্ধতি। সকলেই জানেন শৈশবে লালন পালন, যৌবনে শাসন না করলে অনেকের মত শিল্পও বিপথগামী হয় কিম্বা এক জায়গায় থেমে থাকে।

নাট্য সমালোচনার এই ত্রুটির জন্য আমরাই বঞ্চিত। সেকালের প্রযোজনা সম্পর্কে আমরা যেটুকু জানতে পারি সেটা কিছুটা স্মৃতিচারণ, কিছুটা বৈঠকি আড্ডায়। কোন শিল্পী কেন বড় বোঝা যায় না, মঞ্চসজ্জায় কোথায় বা অভিনবত্ব পোশাকের রঙ, পোশাকের ব্যবহার— গা

আবহের সুচাতুত ব্যবহার কোথাও জানা যায় না। আলোকসম্পাতে কতখানি মুড আনা সম্ভব হয়েছিল সেটাও ধরাছোঁয়ার বাইরে। একমাত্র শিশিরকুমারের "সীতা" এবং অন্যান্য নাটক সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। "সীতা" নাটকের মধ্যে একটা অভ্যুদয় কাজ করেছিল বলেই হয়ত এটা সম্ভব হয়েছিল, যেটা পরবর্তী কালে নবান্ন, ছেঁড়া তার-এর ক্ষেত্রেও কিছুটা হয়েছে। বাকি সবই আপ্লুত ভাষণ। "সীতা" নাটক নিয়ে চারিদিক তোলপাড়— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত একটি দীর্ঘ কবিতাই লিখে ফেললেন। ঠিক সেই সময় শিবরাম চক্রবর্তী দুটি সমালোচনা লেখেন— একদম বিপরীত মেরুর। নেপথ্য কাহিনী যাই হোক, এই সমালোচনা যে অনেকাংশেই যুক্তিবহ সেটা প্রমাণিত হল শিশিরকুমারের আমেরিকা সফরের পর। শোনা যায় অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন সোজা মঞ্চে এসে শিশিরকুমারকে আমেরিকা যেতে নিষেধ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, শিশিরকুমারের সম্প্রদায়ে যথার্থ শিল্পী জনা তিনেক। বিদেশে তখন একক অভিনয়ের দিন চলে গেছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে টিমওয়ার্কের প্রয়োজনীয়তা। এদেশে তখনও নাটক দু তিনজনের অভিনয়ের উপর নির্ভরশীল। শিশিরকুমার আমেরিকা যাবার পর এই সত্যটি বুঝেছিলেন। শিল্পী দুর্গাদাস যেটা বুঝেছিলেন অনেক সমালোচক সেই ভুলটি ধরিয়ে দিতে পারেননি— শ্রদ্ধা অনেক সময় ক্ষতিও করে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত "ফাল্গুনী" নাটকের দীর্ঘ সমালোচনা লিখলেন। —মঞ্চসজ্জা সম্পর্কে কিছুটা জানা গেল, কিন্তু সবটাই "অহো কি দেখিলাম" জাতীয় রচনা, ফলে আজ পর্যন্ত ফাল্গুনীর মত আলাদা জাতের নাটক সেভাবে পরীক্ষিত হল না। প্রত্যেকটি দৃশ্যের শুরুতে একটি গীতিভূমিকা নাটকের একটি নতুন ফর্ম। প্রত্যেকেই প্রযোজনা করতে গিয়ে দ্বন্দ্বে পড়েন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত আনুপূর্বিক সবই লিখেছেন, শুধু বিশ্লেষণ করতে পারেননি। যদি ভাল লেগে থাকে তবে কেন ভাল? খারাপ বলাটা অনেক সোজা, ভাল বললেই বোঝায় নাটকের গোত্রান্তর। সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব থাকে যুক্তি দিয়ে, শুধু ভক্তি-বিনম্র প্রণিপাত দিয়ে নয়।

এই কেন ভাল আবিষ্কার সূত্রেই সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। ধরা যাক আপনি মাঠে খেলা দেখছেন, এখনকার চিমা কৃশাণু একটি গোল মিস করলেন— আপনি হতাশ হয়ে কপাল চাপড়ালেন। পাশে অনেক দর্শক আপনাকে ধিক্কার দিলেন—"ওই পজিশান থেকে গোল দেওয়া যায় না।" ক্রিকেটে মাঠে বেঙ্গসরকার একটি ক্যাচ মিস করলেন— মাঠজুড়ে আওয়াজ উঠলো— বাম বাম। পরে জানা গেল ওটা ক্যাচ ছিল, তখন আপনার কাতোরক্তিকে সকলে উপহাস করলো, "ওখান থেকে ক্যাচ ধরা যায়? ...ন না মশাই মাঠে নেমে দেখুন না"—আপনি ...টা ক্ষেত্রেই মুখ বন্ধ করলেন। অথচ আপনি ... পজিশন থেকে সালে বা চুণী গোস্বামীকে ...ল করতে দেখেছেন, শর্ট লেগে দাঁড়িয়ে

খাটাল সংলগ্ন ঘরে প্রয়াস প্রযোজনায় 'দানব' নাটকের রিহার্সাল — ছবি : অভিজিত শীল

ব্যাটসম্যানের সজোরে স্ট্রোকটি মুস্তাক আলিকে ক্যাচেপরিণত করতে দেখেছেন। আপনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে এঁদের অভিজ্ঞতা মিলবে না। এক্ষেত্রে অবশ্যই আমি সম্প্রতি টেলিভিশনে বিশ্বকাপে মারাদোনার খেলাকে তুলনায় আনব না— যেমন অনেক নাট্য সমালোচক কথায় কথায় তুলনামূলক আলোচনায় টেনে আনেন লরেন্স অলিভিয়ার বা ভিভিয়ান লে-কে। বলতে পারেন দুজনেই তো মানুষ। কিন্তু দুজনের সুযোগ সুবিধাও তুলনামূলকভাবে বিচার্য। আগে সমালোচকরা এদেশের অভিনেতাদের আখ্যা দিতেন এদেশের গ্যারিক বা এদেশের আনা পাভলোভা — এটা কখনই মেনে নেওয়া যায় না। আমার দেশের শিল্পী আমাদেরই মতন করে হবে, বিদেশীর তুনলায় তাঁকে সম্মানিত বা অপমানিত দুটোই অযৌক্তিক।

বহুদিন আগে একটি মঞ্চ সফল প্রযোজনা দেখতে গেছেন একালের একজন শীর্ষস্থানীয় নাট্য প্রযোজক, সঙ্গে দলের কয়েকজন অভিনেতা। তখনকার জনা সমাদৃত শিল্পী দাপটে অভিনয় করছেন, একজন সতীর্থ শিল্পী ফিসফিস করে প্রযোজককে জিজ্ঞাসা করলেন, এত ভরাট গলা কিন্তু কোন মড্যুলেশন নেই, সূক্ষ্ম কাজ করেন না কেন? একালের প্রযোজক আরও আস্তে উত্তর দিলেন "পারে না তাই করে না"। স্বাভাবিকভাবেই দুজনের নাম করলাম না, দুজনেই এখনও বেঁচে, প্রায় সমবয়সী। একালের প্রযোজক এখন কিংবদন্তী, সেকালের অভিনেতা এখন অবলুপ্ত, অবসর নিয়ে নয়, কালের বিচারে তাঁকে সরে যেতে হয়েছে। যে কথাটি এতদিন আগে একালের নাট্য প্রযোজক বলেছিলেন— সে কথাটি তখন কোন সমালোচক কিন্তু বলেননি। যদিও বা বলতেন, তখন প্রশ্ন উঠত "কী সাহস!" খেলার প্রসঙ্গ আবার টেনে বলা যায়, আপনি মাঠে না নেমেও খেলা দেখার অভিজ্ঞতা আপনাকে সমৃদ্ধ করতে পারে, আবার যিনি মাঠে নেমেছেন তিনি নাড়ীর স্পন্দন বোঝেন। এই

জন্যই খেলার পাতায় একজন আনকোরা সমালোচক, একজন অভিজ্ঞ সমালোচক এবং খেলোয়াড়ের রিপোর্ট (যদি না তিনি বন্ধুত্ব বা অন্য কোন স্বার্থে জড়িত থাকেন) আলাদা হতে বাধ্য। নাটকে একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রী হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলেন— দর্শকের সঙ্গে সমালোচকও অজান্তে হাততালি দিয়ে ফেলেন, যাঁরা থিয়েটারি অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তাঁরা জানেন ওটা খুবই সহজ থিয়েটারের প্যাঁচ। একজন শিল্পী ভাবতেই পারেন, কী স্পর্ধা — আমি দীর্ঘদিন ধরে শিল্প চর্চা করে আসছি, আর এক কলমের অধিকারে আমায় নস্যাৎ! সবিনয়ে জানাই, সমালোচক হয়ত অভিজ্ঞতায় ধনী, এবং তাঁকে নানারকম দেখতে হয়, ফলে তুলনামূলক তারতম্য নজরে আসতেই পারে। সমালোচককে সব সময় শত্রু শিবিরের লোক হিসাবে ধরা হয়। একটি নাটক হয়ত সব জায়গায় ভাল লেখা হল, একটি কাগজে খারাপ লেখা হল, ব্যস, তিনি শত্রু হয়ে গেলেন। বিশেষত অফিস ক্লাব বা ঐ ধরনের থিয়েটারে "আমার পিসেমশাই প্রেসিডেন্সীর প্রফেসর, তিনি বলে গেছেন ভাল, মাসিমা কত সোসাইটির সাথে যুক্ত, তিনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ, সব কাগজ ভাল লিখল— আর উনি বড় বিদ্বান হয়েছেন!"

এর বিপরীত দিকটাও ভাবা দরকার। অনেক সময় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সমালোচনা করা যায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিন্দুবিসর্গ না জেনেও। হাতের কাছে ভাতখণ্ডে বা অন্য শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বই থাকলেই হল, চাই কি আরোহণ অবরোহণের স্বরগুলি লিখে পাঠককে চমকে দেওয়া যায়। কিন্তু আলাদাভাবে মন্তব্য করলেই মুশকিল, থিয়েটারের ক্ষেত্রেই এই অভিজ্ঞতা বিপজ্জনক। সমালোচনা নিয়ে কেউ চিঠি লেখেন না, তবে আড়ালে সকলেই হাসেন। একজন সমালোচক মলিয়ের-এর একটি সাম্প্রতিক প্রযোজনা দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখলেন, "মলিয়ের কেন এদেশে বহু চর্চা হয় না?" ভদ্রলোক জানেন না, এই দেশে

বাংলা নাটকের জন্মলগ্ন থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ থেকে আজ পর্যন্ত অনেকেই মলিয়ের কাছে ঋণী। সমালোচক বিদেশি সাহিত্যের খবর রাখলেও দেশজ নাটকের খবর রাখেন না। কলকাতায় পেশাদারি মঞ্চে সংস্কার বশত বিদেশী অবলম্বনে নাটকের উৎসভূমি বিজ্ঞাপিত হয় না। সমালোচকেরা নাটকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কেউ ভাবলেন না এই দেশে যদি অত ভাল মৌলিক নাটক লেখা সম্ভব হত, তবে মৌলিক নাটকের অভাব নিয়ে এত সেমিনার অনুষ্ঠিত হত না। এক্ষেত্রে এটাই স্পষ্ট সমালোচক দিশি কিম্বা বিদেশী দুই ধরনের নাটক সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল নন। কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত সতু সেনকে নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। তার মধ্যে একটি মারাত্মক ভুল আছে। এক জায়গায় বলা আছে রংমহলে "রামের সুমতি" নাটকের প্রযোজক ছিলেন কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্র পরলোকগমন করেছেন ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, নাটকটি প্রযোজিত হয় তার বছর ছয়েক বাদে। আসলে রংমহল মঞ্চে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে একজন প্রযোজক অভিনেতা ছিলেন তাই এই নাম বিভ্রাট। অমিতাভ দাশগুপ্ত 'সাম্প্রত' থিয়েটারের বন্ধুস্থানীয়, সকলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ, তবু তাঁর থিয়েটার চর্চা সবাঙ্গীণ নয়, তার মতো সহমর্মীর যখন এরকম ভুল হতে পারে, তখন অন্যের ক্ষেত্রে কি ঘটবে, সেটা অনুমেয়। 'মহাকালীর বাচ্চা' নাটকে নির্দেশক বিভাস চক্রবর্তী অনেকগুলি নতুন চিন্তা এনেছিলেন। যেমন মঞ্চের প্যাটার্ন কখনই একরকম থাকছে না অর্থাৎ ফিল্মে যেমন একই দৃশ্য ক্যামেরার বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ধরা হয় সেই রকম ভাবনার সফল বিন্যাস— যেটা সব নাট্যকর্মীরই বিশেষভাবে প্রশংসা পায়। সমালোচক লিখলেন, "একবার ঠাকুর ঘর ডানদিকে আর একবার বাঁদিকে গেল কি করে?" সকলেই বুঝে গেল ইনি থিয়েটারের সঙ্গে ওতপ্রোত নন। এই "মহাকালীর বাচ্চা" নাটক দেখতে একজন দৈনিক কাগজের সমালোচক এলেন। বিরতির সময়ে নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন "কেমন লাগছে"? সমালোচক বললেন, "আলোটা অপর্যাপ্ত মনে হচ্ছে।" মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁকে স্টেজে নিয়ে গিয়ে দেখালেন অন্ধকার সৃষ্টির জন্য কত রকম ব্যবস্থা করতে হয়েছে, সাড়ে ছটায় শো হলে বেলা দুটো থেকে কত মেহনত করতে হয়। নাটকের বিষয়বস্তুই হচ্ছে অন্ধকারের গর্ভ থেকে জন্ম নিচ্ছে মহাকালীর বাচ্চা। মোহিতবাবু বললেন, "কাগজের দোষ হচ্ছে, তোমরা সম্পাদকের টেবিলে গিয়ে তিন চারটে নাটক দেখার গল্প বললে, সম্পাদক বললেন, বাঃ তুমি তো খুব নাটক দেখো— যাও এই নাটকটা সমালোচনা করে এসো, তোমার অভিজ্ঞতা হয়তো তিন মাসে বারোটি নাটক দেখার। যিনি আলো করছেন তিনি জীবনের মূল্যবান ত্রিশ চল্লিশটি বছর কাটালেন স্টেজের সঙ্গে, তাঁর নাম তাপস সেন— তিনি কিছু না ভেবেই করেছেন, এটা ভাবো কি করে?" এই ঘটনা আকছার ঘটছে। থিয়েটার সমালোচনা

একজনকে বলা হল, 'নাটকটা একটু স্লো মনে হল।' প্রযোজক স্বর্গীয় হাসি হেসে বললেন, 'জীবন মন্থর তাই বোঝাতে চেয়েছিলাম।' অভিনেতা সংলাপ বললেন, তৃতীয় সারির আসন থেকে বোধগম্য হল না, অভিযোগের উত্তরে বললেন, 'আমাদের অভিনয় ন্যাচারিলিস্টিক'।

করতে হলে তাকে ভালবাসতে— তার সব কিছু জেনে— হয়ত স্টেজের সঙ্গে যুক্ত না থাকা যায়, কিন্তু ভাবের ঘরে ফাঁকি সহ্য করা যায় না। একটা সিরিয়াস দল অনেক চিন্তা করে নাটক নামালেন আর একজন ছাপার অক্ষরে অনভিজ্ঞতার জন্য তাকে নস্যাৎ করে দিলেন, এটা ক্রমশ ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নাটকে সঙ্গীত পরিচালক ভেবেচিন্তে কোন দেশাত্মবোধক বা হিন্দি ছবির প্যারডি করলেন— দর্শক বুঝলো, সমালোচক চুরির দায়ে অভিযুক্ত করলেন—তখন হতবাক হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। আবার গ্রামীণ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নানারকম শব্দ ব্যবহার করা হল, সমালোচক লিখলেন, "সঙ্গীত পরিচালকের গ্রাম সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার।" আসলে সমালোচকই ঢেঁকির শব্দ, তক্ষক সাপের ডাক শোনেননি। গ্রাম বলতে তিনি বোঝেন বাঁশিতে ভাটিয়ালি সুর বা বাউলের দোতারা। নাট্য পরিচালক অনেক চিন্তা করে সংলাপের একটা প্যাটার্ন আনলেন, সমালোচক বললেন, ছন্দবিচ্যুতি ঘটেছে। পরিচালক যে সেটাই চেয়েছেন, চরিত্র বিকাশের জন্য, সেটা সমালোচক বুঝলেন না।

বিপরীত প্রক্রিয়াটাও লক্ষণীয়। নাট্য প্রযোজকেরা অনেক সময় থিয়েটারির রোগে ভোগেন। প্রচুর পড়াশুনো করেছেন, কিন্তু স্টেজে দাঁড়াতে জানেন না। একজনকে বলা হল, "নাটকটা একটু স্লো মনে হল।" প্রযোজক স্বর্গীয় হাসি হেসে বললেন, "জীবন মন্থর তাই বোঝাতে চেয়েছিলাম।" এঁদের বোঝানো যাবে না নাটক দুই ঘণ্টায় শেষ হচ্ছে বলেই তার মানে তার গতি অব্যাহত নয়। কেউ বা এমন আলো করলেন দ্রষ্টব্য কিছুই থাকে না, অভিযোগ তুললে বললেন, আমরা অন্ধকারের নাটক করছি। অভিনেতা সংলাপ বলেন, তৃতীয় সারির আসন থেকে বোধগম্য হল না, অভিযোগের উত্তরে বললেন, "আমাদের অভিনয় ন্যাচারিলিস্টিক।" তাকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না "অশ্রাব্য" শব্দটির দুই রকম অর্থ হতে পারে। ব্রেখটের একটি নাটক সমালোচনার পর একজন পড়ুয়া প্রযোজক লোক মারফৎ খবর পাঠিয়েছিলেন, "বলে দেবেন উনি ব্রেখট সম্পর্কে কিছুই পড়েননি।" আমি সবিনয়ে আমার অক্ষমতার কথা জানালাম, "ঠিকই ধরেছেন, তবে উপকৃত হই যদি প্রযোজক দেখিয়ে দেন, ব্রেখট কোথায় বলেছেন নাটক দেখে দর্শক ঘুমোক এবং ভুল উচ্চারণ শুনুক।"

তবু সকলেই চান সমালোচনা প্রকাশিত হোক এবং যাত্রার আলোচনাকে গালাগালি দিয়ে তাঁরাও কিছু প্রশস্তি চাইবেন। অনেকে আগাম আদায় চান, প্রথম শোতেই সাংবাদিক ডাকেন, তারপর যখন খারাপ হয় তখন জনে জনে এসে বলেন "এটা প্রথম শো, কিছু লিখবেন না"। অন্যদিকে নান্দীমুখ প্রযোজিত "তেত্রিশতম জন্মদিবস" প্রথম শো দেখার পর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করলাম, "এটা প্রথম শো, এর উপরে কিছু লিখব কি?" অজিতেশ জোরের সঙ্গে বললেন, "নিশ্চয়ই। প্রথম শোতেও যা হবে পঞ্চাশতম শোতেও তাই হবে। যেটুকু বাড়তি খামতি হবে সেটা আমি ধরতে পারব— সমালোচনা পড়বো না।" এটা স্পর্ধা নয়, উপলব্ধি। এর আগে আমারই সামনে একটি ইংরাজি দৈনিকের সমালোচক "পাপপুণ্য" দেখার পর গ্রীনরুমে এসে প্রথম অভিনন্দন জানালেন প্রম্পট ছাড়া অভিনয়ের জন্য। অজিতেশ তীক্ষ্ণভাবে বললেন "সে কী! কলকাতায় কোন গ্রুপেই তো প্রম্পট হয় না— আপনি এটাও জানেন না— আপনি সমালোচনা করবেন?"

কেউ কেউ আছেন, যাঁরা চমক সৃষ্টির জন্য প্রতিষ্ঠিত শিল্পীকেও নস্যাৎ করে দেন, নানারকম উল্টোপাল্টা যুক্তি দিয়ে। কিন্তু অল্পেতে কিছুই হয় না। নাটক সমানভাবেই চলতে থাকে, সমালোচক উপহসিত হন। খেলার মাঠে প্রতিপক্ষকে হারাতে সমান শক্তি নিয়ে নামতে হয়, এক্ষেত্রে কোন ঝুঁকিই নেই— নিজে নিরাপদ দূরত্বে একটি দুর্গে আত্মগোপন করে অন্যের কাঁচের ঘরে ঢিলমারা খুব সোজা। পক্ষান্তরে সমালোচিত কেউ জীবনানন্দ উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে পারেন "বরং তুমিই লেখো না একটা কবিতা।" তাঁদের বোঝানো যাবে না, আমি খেতে ভালবাসি পরিষ্কার সাহসের সঙ্গে বলতে পারি, এটা ভাল এটা খারাপ। এর জন্য আমার পাকা রাঁধুনী হওয়ার প্রয়োজন নেই। ভোজন রসিক হওয়াটা আবশ্যিক শর্ত।

এইখানেই ভুল বোঝাবুঝি— কেউ কেউ সমালোচক ডাকেন না, কেউ বা সতর্ক থাকেন বুঝি বা প্রশস্তি ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশিত হয়। ফলে মুখে সকলে বলেন, সমালোচনাকে পরোয়া করেন না, কিন্তু কাজের সময় বেপরোয়াও হতে পারেন না। নানাভাবে চেষ্টা চলতে থাকে কোন বিশেষ বিশেষ সমালোচককে এড়িয়ে যাওয়ার। ক্রমশ নাট্য প্রযোজক ও সমালোচক দুটি শিবিরে বিভক্ত। প্রযোজক সব সময়েই বাবুরাম সাপুড়েকে খুঁজবেন, "সেই সাপ জ্যান্ত গোটা দু [illegible] আনত··· করে না কো ফোঁসফাঁস মারে না'ক [illegible] ঢাঁস।" এবং সমালোচক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাঁরা [illegible] গরুড়ের ছানা হবেনই এবং ফুটো স্কোপ নি[illegible] যাবেনই।

শেষ সংবাদ: একটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে একজন নাট্যকর্মী "অজাতশত্রু"র বিপরীতার্থক শব্দ উত্তর দিলেন— "নাট্য সমালোচক"। পরীক্ষকও একজন নাট্য প্রযোজক, তিনি এই শব্দ নির্বাচনে পুলকিত হয়ে ছাত্রকে পুরো নম্বর দিয়েছেন।

সংগীত

সুরঙ্গমার প্রতিষ্ঠা দিবস

সুরঙ্গমার ত্রিশতম প্রতিষ্ঠা দিবস ও আচার্য শৈলজারঞ্জন মজুমদারের সাতাশিতম জন্মজয়ন্তী উৎসব আয়োজিত হয়েছিল কলা মন্দির মঞ্চে গত আঠারো আগস্ট সন্ধ্যায়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক মিহিরকুমার সেন এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ নিমাইসাধন বসু। প্রথম পর্বে ছিল উদ্বোধন সংগীত, কর্মসচিবের প্রতিবেদন, প্রধান অতিথির ভাষণ, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সভাপতির ভাষণ ও শৈলজারঞ্জন মজুমদারকে অর্ঘ্যদান।

দীর্ঘ বিরতির পর অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে পরিবেশিত হল নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা। সুরঙ্গমার ত্রিশ বছরের ঐতিহ্যের কথা মনে রেখে এই অনুষ্ঠান পর্যালোচনা, আত্মসমালোচনা হিসাবে বিবেচিত হোক।

রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য প্রযোজনার প্রধান দুটি বিভাগ—নৃত্য ও সংগীত। এছাড়া প্রযোজনায় মঞ্চ, সাজসজ্জা, যন্ত্রানুষঙ্গ, আলোকসম্পাত ইত্যাদির ভূমিকাও কম নয়। তবু নৃত্যনাট্যে যে রূপসৃষ্টি প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান সেই নৃত্যাংশের প্রাধান্য অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৃত্যভাবনা কি গানের মতো নির্দিষ্ট স্বরলিপির ছকে বাঁধতে পেরেছিলেন না চেয়েছিলেন? যতদূর জানা যায় বারেবারেই এই ভাবনাকে প্রসারিত করায় তিনি অনেকখানি নির্ভরশীল ছিলেন অন্যের পরে অর্থাৎ আধারের যোগ্যতার উপর। রবীন্দ্রনৃত্য বলে কি কোনো নির্দিষ্ট শৈলী আমরা পেয়েছি? বরং বলা যেতে পারে, একটি ধারা প্রবর্তিত হয়েছে যা শৈলী আর প্রকরণ নয়—রুচিস্নিগ্ধ সৌন্দর্যের রূপপ্রকাশের স্বাতন্ত্র্য। এসব আলোচনা সাধারণভাবে আমরা এড়িয়ে যেতে চাই ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা পরিবেশিত হয় তা ছন্দোবদ্ধ কতকগুলি অসংলগ্ন অবান্তর ভঙ্গি, কখনো বা গানের আক্ষরিক নৃত্যানুবাদের অক্ষম প্রচেষ্টা অর্থাৎ কখনই তা শিল্প হয়ে ওঠে না। সুরঙ্গমার এই প্রযোজনার নৃত্যকল্পনা প্রায় সেই তথাকথিত ঐতিহ্যের পরম্পরাবাহী—যা আঙ্গিকগত অসম বিন্যাসে অসংবৃত, পুনরাবৃত্তিতে ক্লান্তিকর। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কোনো নৃত্যসংগঠনে নৈপুণ্য দেখা গেলেও সামগ্রিক প্রযোজনায় তা কোনো নতুন মাত্রা যোগ করে না।

'চিত্রাঙ্গদা' : শিল্পী নন্দলাল বসু

নাটকের কোনো গতি থাকে না। ঐতিহ্যের পথ বেয়েই নতুন সৃষ্টি হবে যা যুগের তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম—কেবল ক্লান্তিকর উপস্থাপনার সার্থকথা কোথায়! নৃত্যশিল্পীদের সম্পর্কে দু-একটি বক্তব্য: দর্শক আসনের দ্বিতীয় সারিতে বসে থাকার কারণেই সম্ভবত পূর্ণিমা ঘোষকে চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় বড্ডোই বেমানান লেগেছে। তিনি শিক্ষিত, সুদক্ষ শিল্পী কিন্তু শৈলী আর প্রকরণে ঢাকা পড়েছে চিত্রাঙ্গদার আনন্দ-বেদনা। অন্যান্য ভূমিকা অনুল্লেখ্য। মদন চরিত্র এমনভাবে মঞ্চে উপস্থাপিত হয় যা কেবল কৌতুক রস সৃষ্টি করে। সম্মেলক নৃত্যের শিল্পীরা এমন অভিব্যক্তিহীন কেন?

সংগীতাংশের আলোচনায় একটি বিশ্বাসের কথা অকপটে জানাতে চাই। যদিও পরিচালনায় শৈলজারঞ্জন মজুমদারের নাম আছে তবু আমার কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। তাঁর শিক্ষার ধারা ও পারফেকশান সম্পর্কে বর্তমান প্রতিবেদক ওয়াকিবহাল বলেই স্বাভাবিকভাবে মনে হয় এক্ষেত্রে তাঁর নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। এরকম বিশৃঙ্খল অনাটকীয় গান খুব কমই শোনা যায়। চিত্রাঙ্গদা, মদন এবং বিভিন্ন চরিত্রের সম্মেলক গানগুলির প্রতি এমন চরম অবহেলা ত্রিশ বছরের ঐতিহ্যবাহী যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছেই অপ্রত্যাশিত নয় কি? কেন এমন প্রযোজনার প্রতি আকৃষ্ট হবেন সাধারণ মানুষ! এই বিশৃঙ্খল উপস্থাপনা কোনো ঐতিহ্যের পরম্পরা বলে গ্রাহ্য হতে পারে না। আশিস ভট্টাচার্যের কণ্ঠে অর্জুনের গান ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম। প্রত্যাশিত নাটকীয়তার অভাব থাকলেও স্নিগ্ধ কণ্ঠের গান অনেকখানি তৃপ্তি দিয়েছে।

নৃত্যনাট্য প্রযোজনায় মঞ্চসজ্জা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে যথেষ্ট ভাবনার অবকাশ আছে। এই প্রযোজনায় তা অত্যন্ত অবহেলিত। সেও কি ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে উতরে যাবে? মঞ্চের মধ্যেই সহযোগী যন্ত্রশিল্পীদের নিয়ে গানের দল বসেছেন ঐতিহ্যের কথা মনে রেখে। একথা কি ভাবা অন্যায় হবে এককালে প্রয়োজনের তাগিদে এই ব্যবস্থা ছিল। আজ কেবল তা অপ্রয়োজনীয়ই নয়, অসুবিধাজনক। আলোকসম্পাতের নামে কখনো লাল কখনো সবুজ আলোর ব্যবহারে কি মাত্রা যুক্ত হয় জানা নেই। তবে গানের দলের হাত নাড়া, কথা বলা, লয় দেখানো, হাসিঠাট্টা, ভুল করে লজ্জিত হওয়া এবং আরো অনেক কিছুই যখন প্রকাশ্য ও প্রকট হয়ে ওঠে তখন মর্মাহত হতেই হয়। এ-সব নেপথ্যে থাকাই ভালো। সাজসজ্জারও একই ধারা। এখানেও সেই ঐতিহ্য নামধারীর সজাগ দৃষ্টি। পাঠ যাত্রার ধারা অনুসারী। শিক্ষার দৈন্যে নয়, অনাদর-অবহেলা ও চিন্তার দৈন্যে লালিত এই ধরনের প্রযোজনাগুলি আজ নবনৃত্যনির্মিতির নামে উগ্র স্বেচ্ছাচারিতাকে আরো উৎসাহিত করছে যা কেবল ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে শেখায়।

সুভাষ চৌধুরী

কেউ বোঝে না কেউ বোঝে

কখনও ছন্দোবদ্ধ কথাই কাব্য, কখনও ছন্দোবদ্ধ জীবনটাই কাব্য। নাগরিক ও গ্রামীণ জীবনের বনস্পতি একরকমের হলেও শিকড় আলাদা। শিশির মঞ্চে অভিব্যক্তি (ছান্দার, বাঁকুড়া) কথামুখ ও পদাবন্ধ (কলকাতা) সাহচর্যে অনুষ্ঠান 'একই বৃন্তে গ্রাম শহর' অনুষ্ঠানে এই সত্যই প্রমাণিত।

প্রথম পর্বে উৎপল চক্রবর্তীর পরিচালনায় 'অভিব্যক্তি' প্রযোজনা করেন বাঁকুড়ার লোকগানের

বারমাস্যা ও কাব্যসঙ্গীত। গ্রামের গান ও শহরের গানে একটা বর্ডার রেখা আছে। এই সীমান্ত রক্ষায় প্রহরী থাকতে হয় নিজেকে—নইলে সহজ প্রাণের গান হারিয়ে যায়। বিষ্ণুপুরে এখন অনেক ট্যুরিস্ট এমনি মাটির ঘোড়া থেকে পালিশ লাগানো ঘোড়া বা মনসার ঝাড় পছন্দ করছেন। শো-কেসে মানালেও মাটির রং-এর ঘরানা বদলে যায়। লোকসঙ্গীতেও এই সমস্যা প্রবল। এই অনুষ্ঠানে 'পেন্নাম করি সব্বোজনে, বস্যাছি না, 'এই আসনে', মুশকিল আসানের গান 'মুশকিল আসান কর দয়াল সত্যপীর', মনসামঙ্গলের গান 'দেবী আয় মা আমাদেরই আসরে'—গানগুলি সজীব প্রাণশক্তিতে, বিশেষত ছোট ছোট

ঝুমুর-এর একটি দৃশ্য

মেয়েরা যখন ভাদু টুসু গান করে নাচে—তখন তাঁদের আনকোরা ভাবটি মন কাড়ে, এমন কি একজনের জিব ভ্যাঙচানো পর্যন্ত। এই সাবলীল ভাবটি সব সময় সুরানুবাদে আসে না। ধরা থাক, লোকগানে 'ডাক্তারবাবু ডাক্তারবাবু আর খাব না দুধ সাবু, এবার খাব কমলালেবু', যেমন অনায়াসে পার্বণের গানে লৌকিক আর্তি মিশে যায়, নাগরিক কবিতায় সেটা সম্ভব হয় না। তবু তরুণ মুখোপাধ্যায় যখন মুশকিল আসান গানের পর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কি ঘর বানাইসে দেখ' বা শঙ্কর চন্দের ঝুমুর গান 'তুমি কি জাত কাহার পতি কুথায় তোমার ঠিকানায় হে ঠিকানা' স্বতঃস্ফূর্ত গান। প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ভাওয়াইয়া গানটি 'চিল মারির ঐ চিকন চিড়ারে, গোয়ালপাড়ার দই' মুহূর্তের মধ্যে বাঁকুড়া থেকে উত্তরবঙ্গে নিয়ে যায় কিন্তু পূর্ব বাংলায় তিনি নিয়ে যেতে পারেন না। এই আসরের সবচেয়ে অসহ্য এবং লোক-সংস্কৃতিতে নাগরিক গায়কীর পালিশ লাগানোর কুৎসিত উদাহরণ স্নেহময় চট্টোপাধ্যায়ের গান। তাঁর প্রতিটি গান, নৌকা ভুলিয়ে পাতাল রেলকে মনে করিয়ে দেয়। লোকসংস্কৃতির বিকৃতি ঘটলে সেকি কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার দাঁড়াতে পারে, তার জ্বলন্ত প্রমাণ তিনি হয়ে রইলেন। প্রথমে মানিক সরকারের বক্তব্যই প্রমাণিত, তিনি গ্রামের ভাষা বোঝেন না। তরুণ মুখোপাধ্যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় সুর দিয়ে গাইলেন—তাতে একটা ভাল বাগেশ্রী রাগায়িত গান হল, কাব্য একেবারেই অধরা থেকে গেল। একজন সুরকারের কাব্যকে বোঝারও একটা দায় থাকে—দায়ে পড়ে দারগ্রহ করতে কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি।

শ্রুতি নাটক প্রসঙ্গে প্রারম্ভে জগন্নাথ বসু বক্তব্য রাখলেন। শ্রুতি নাটকের জন্মকথা ছাড়াও একটি কথা মূল্যবান। অনেকে অনুশীলন না করেই সহজ পথ ভেবে নিয়ে শ্রুতি নাটক করে থাকেন। এই আসরে কথামুখ প্রযোজিত শ্রুতি নাটক শুনে সেই সত্য প্রমাণিত হল। শ্রুতি নাটকের প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে বিষয় নির্বাচন। সে কাব্য একা পাঠ করার, এবং বোঝার—সেটা কী সব সময় শুধু নাটক করে পৌঁছে দেওয়া যায়? যদিও বা পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্য প্রয়োজন ভাল অভিনয়, যা শুধু কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে। 'এখন অসুখ' অংশে সুদীপ্ত চক্রবর্তী যে জায়গায় নিয়ে যেতে পারেন, স্নিগ্ধা বিশ্বাস ততটাই পিছিয়ে আনেন, শঙ্কর রায়ের 'আমাদের কেউ নেই' সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য থেকে যায়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'বাইশ বছর পরে' কাব্য-নাটক অব্যর্থ হয়ে ওঠে সুদীপ্ত চক্রবর্তী ও মিলু ত্রিপাঠির অভিনয় গুণে। অপূর্ব গোস্বামীর অমিতাভ, কাব্যের জগতে মূর্তিমান গদ্য। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'নীপার বর' গল্পটি যে এত ক্লান্তি আনতে পারে কে জানত? ভাল লাগে স্বপ্না ঘোষ, বীণা দত্ত ও সুদীপ্ত চক্রবর্তীর অভিনয়। অন্য সকলে খবর পড়ার মত গল্প পাঠ করেন। শঙ্কর রায় প্রমাণ করলেন তিনি সত্যিই নীপার বর নয়, নীপার বক। সমস্ত পাঠ অভিনয় প্রথম থেকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভাতের গরম' কবিতা গল্প সব মিলে প্রহেলিকা হয়ে থাকে—কিছুটা শরীর পায় মিলু ত্রিপাঠি ও বীণা দত্তের অভিনয় গুণে। প্রথমে সুধী প্রধানের ও মানিক সরকারের বক্তব্য মেনে নিয়েই বলা যায়, গ্রামের কথা শহরের মানুষ যদিও বা বোঝে, কিন্তু

উপস্থাপনা এবং নির্বাচনের জন্য অনেক সময় শহরের মানুষও শহরের কথা বোঝে না।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

রমণীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতানুষ্ঠান

এক মনোজ্ঞ উচ্চাঙ্গ সংগীতানুষ্ঠান উপহার পাওয়া গেল বিশ্বরূপা মঞ্চে 'তাল-বেতাল' সংস্থার আয়োজনে। প্রভাতী এই অনুষ্ঠানের শুরুতে সমবেত নারীকণ্ঠে দুটি ভজন।

অতঃপর বঙ্কিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের হার্মোনিয়াম ও রমেশ মিশ্রর সারেঙ্গী সহযোগে অমর বসুর তবলা লহরার অনুষ্ঠান অবশ্যই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। পেশকার, বিভিন্ন কায়দা তাঁর হাতে বেশ পরিচ্ছন্ন-রূপে এল। কণ্ঠসংগীতের অনুষ্ঠানে শিপ্রা বসুর প্রারম্ভিক নিবেদন নটভৈরো রাগে বিলম্বিত খেয়াল। সকালের সুরের একটা স্বতন্ত্র গভীর আবেদন আছে যা শিল্পীর সহৃদয় পরিবেশনে মূর্ত হয়ে ওঠে।

তাঁর রেওয়াজি কণ্ঠ ত্রিসপ্তকে অনায়াস। রাগের স্বরবিস্তারে যে ভাবে তিনি রাগরূপ বিশ্লেষণ করেন তা তাঁর শিল্পবোধপূর্ণ নৈপুণ্যের কথাই প্রকাশ করে। অম্লান থাকে রাগরূপও। বিলম্বিত খেয়ালেই পাওয়া গেল উৎকৃষ্ট সরগম আর স্বচ্ছন্দ তানকর্তব। একই রাগে দ্রুত খেয়ালটি সমৃদ্ধ হল গতিময় সুগঠিত তানে। নটভৈরো রাগে এই বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল মিলিয়ে আর একটি কথাও বলতে হয়, তা হল শিল্পীর সাংগীতিক পরিমিতিবোধের কথা। খেয়ালের পর ঠুংরি—সেও এক মেজাজি সুরেলা পরিবেশন। রমেশ

গোবিন্দ বসু

শিপ্রা বসু

মিশ্রের সারেঙ্গী সহযোগিতা যথারীতি উচ্চমানের এবং তবলায় অমর বসুও যথাযথ। শেষে যন্ত্রসংগীতের অনুষ্ঠানে সুপরিচিত নবীন শিল্পীত্রয়—বিশ্বমোহন ভাট (গিটার), দয়াশংকর (সানাই) ও তরুণ ভট্টাচার্য (সন্তুর) তাঁদের শিল্পনৈপুণ্যের পূর্ণ পরিচয় রাখলেন। গুর্জরী টোড়ি রাগে আলাপ ও জোড় তাঁদের প্রথম নিবেদন। তিন শিল্পী নিজস্ব শৈলীতে বাজালেও রাগের এক অখণ্ড ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে আলাপ পর্বে।

এবং এখানেই উল্লেখ করা প্রয়োজন ত্রয়ীশিল্পীর পারস্পরিক বোঝাপড়ার কথা যা এদের সারা অনুষ্ঠানেই ব্যাপ্ত ছিল। তিনজনের সঙ্ঘবদ্ধ সুনিপুণ প্রয়াসে বিলম্বিত গৎ শ্রবণসুখকর, এখানেও পাওয়া যায় বুদ্ধিদীপ্ত স্বরসঙ্গতির প্রয়োগ। দ্রুত গতে তিন যন্ত্রেই তান-তেহাইয়ের কাজ উচ্চাঙ্গের হয় আর অবশ্যই উল্লেখ্য।

শেষে অনবদ্য ঝালা। তবলাসঙ্গতে গোবিন্দ বসু তাঁর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সুচারু সমন্বয় ঘটিয়েছেন। মনে রাখার মত তাঁর সহযোগিতা।

রমণীয় এই উচ্চাঙ্গ সংগীতানুষ্ঠানের জন্য আয়োজক 'তাল-বেতাল' ধন্যবাদার্হ।

স্বপন সোম

রে ক র্ড

ধ্বনিচিত্রে শারদ-অর্ঘ্য

[পু]জো বলতে যেমন ঢাকের বাদ্য, [বী]রেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে মহালয়ায় [চ]ণ্ডীপাঠ, তেমনি এইচ এম ভির [শা]রদ-অর্ঘ্যও। এ বছর আসন্ন [শা]রদ-অর্ঘ্যের একটি রেখাচিত্র তুলে [ধ]রার জন্য গ্র্যান্ড হোটেলের একটি [অ]ভিজাত কক্ষে গ্রামোফোন [কো]ম্পানি অব ইন্ডিয়া লিমিটেডের [ক]র্তৃপক্ষ একটি প্রাক্-পূজা সম্মিলনীর [আ]য়োজন করেছিলেন গত ১৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়। স্লাইডের [স]হায়তায় সুবীর ঘোষের [ভা]ষ্য-সহযোগে, দেয়ালে প্রক্ষেপিত [হ]ল এই শারদ-অর্ঘ্যের যে-টুকরো [ধ্ব]নিচিত্র, তাতেও ছিল সেই [অ]বিস্মরণীয় কণ্ঠের চণ্ডীপাঠ, ঢাকের [আ]ওয়াজ, কাশ ফুলের সমারোহ এবং [দে]বী দুর্গার ভুবনমোহিনী মুখচ্ছবি। [পু]জো যে আসছে, অনুভব করতে [দে]রি হয়নি।

[শু]রুতে গ্রামোফোন কোম্পানির [ত]রফে সংক্ষিপ্ত এক স্বাগত ভাষণে [ভা]ইস প্রেসিডেন্ট শ্রী পি কে ব্যানার্জি [ব]ললেন, গত পঞ্চাশ বছর ধরে [শা]রদ-অর্ঘ্যের এই ঐতিহ্য চলে [আ]সছে। একটি পুজো শেষ হলেই [আ]না পুজোর কাজ শুরু হয়। এ-বছর [আ]রও বর্ণময়, বৈচিত্র্যময় ও [স]মৃদ্ধিময় করে সাজিয়েছি আমরা [আ]মাদের এই অর্ঘ্য। সর্বস্তরের [মা]নুষের রুচির দিকে তাকিয়েই এই [আ]য়োজন। এবার যাটটিরও বেশী [রে]কর্ড/ক্যাসেট বেরুচ্ছে। [যা] আছে এবারের এই সম্ভারে, [সে]টাই দেখানো হল স্লাইডের মাধ্যমে। গানে এবার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপলা সেন ও বনশ্রী সেনগুপ্ত উপহার দিচ্ছেন পুরনো জনপ্রিয় গানের সংকলন। নতুন রেকর্ড করেছেন কিশোরকুমার, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, হৈমন্তী শুক্লা, অজয় চক্রবর্তী, উৎপলেন্দু চৌধুরী, অনুপ ঘোষাল, শিবাজী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

হাসির গানে মিন্টু দাশগুপ্তর অদ্বিতীয় প্যারোডি গান থাকছে। এছাড়াও প্রকাশিত হচ্ছে দীপা সাহা-সুভাষ সাহার যুগ্ম-ক্যাসেটে কৌতুক-নকশা, সুশীল চক্রবর্তীর ই পি। বালসারার যন্ত্রসঙ্গীতে বাংলা ছায়াছবির হিট গান। কাজী অরিন্দমের গীটারে ও সৈকত মুখার্জির মাউথ অর্গানে থাকছে হিন্দি গান। বেরুচ্ছে প্রবীণ রামকুমার, ভূপেন হাজারিকার গানের রেকর্ড, জনপ্রিয় শ্রাবন্তী মজুমদারের নতুন রেকর্ড। শম্ভু মিত্র শোনাচ্ছেন একটি রেকর্ডে অয়েদিপাউসের গল্প। আরেকটি অভিনব উপহার—প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার গল্পের নাট্যরূপ। তবে রেকর্ডের টুকরো অংশ যদি স্লাইডের সঙ্গেই শোনানো হত, বেশি আকর্ষণীয় হতে পারত।

রেকর্ডের অংশ বিশেষ শোনানোর ব্যবস্থা ছিল পরে। যখন অভ্যাগতরা মশগুল পান-ভোজনের ব্যাপক আড্ডায়। সে আড্ডায় দেখা গেল সেকাল-একালের বহু শিল্পীকেই।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

নৃ ত্য

মোহিনী অট্টমের অনুষ্ঠান

[ক]রণীয় মহিলা সমাজের উদ্যোগে [গ]ত ৭ সেপ্টেম্বর আইস স্কেটিং রিংক[-এ] [হ]লে পরিবেশিত হল গীতা [রা]ধাকৃষ্ণের মোহিনী অট্টম [নৃ]ত্যানুষ্ঠান। বিশুদ্ধ মোহিনী অট্টম [নৃত্যে]য় গীতা খুবই খ্যাতি অর্জন [ক]রেছেন— বিশেষ করে স্বকীয় [নৃত্য]বিন্যাসে ধ্রুপদী কাব্যপদ [পরি]বেশন করে। কলকাতায় অবশ্য [তাঁর] নৃত্যানুষ্ঠান এই প্রথম।

[কথ]াকলির স্ত্রীবেশমের ও [ভর]তনাট্যমের উপাদানের সংমিশ্রণে [গড়া] এই ধ্রুপদী নৃত্যকলার স্থায়ীভাব শৃঙ্গার, তাই এতে প্রাধান্য পেয়েছে লাস্য নৃত্যভঙ্গী। লাস্যময় দেহচারণায় বিকশিত হয় এই নৃত্যকলার মোহিনী রূপ। এই রূপটিকে ধরার জন্য গীতা সবিশেষ যত্ন নিয়েছেন তাঁর নৃত্যানুষ্ঠানে। তাঁর দেহচারণায় চোখ, মুখ ও পায়ের কাজের ছন্দোময় চারুতায় মোহিনী অট্টম নৃত্যভঙ্গীর বৈচিত্র্য, ও এই নৃত্যপ্রকরণের পরিণত ও স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেল।

গীতা রাধাকৃষ্ণ

প্রচলিত নৃত্যপদের পরিবর্তে গীতা একাহারী ধারায় ব্যালে নৃত্য পরিবেশন করলেন। নিজস্ব নৃত্যবিন্যাসে রচিত পদগুলির বিষয় ছিল ষোড়শ শতকের মলয়ালী কবি ভত্ততিরিপাড় রচিত বিষ্ণু বন্দনার কাব্য নারায়ণীয়মের কয়েকটি শ্লোক। তাঁর নৃত্যকলার মোহিনী রূপটি সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে প্রকাশিত হল দুটি নৃত্য পদে— রসক্রীড়া ও কেশাদিপদবর্ণমে। একটিতে ছিল বৃন্দাবনে গোপিনীদের কৃষ্ণের নাচ অন্যটিতে ছিল বিষ্ণুর আপাদমস্তক রূপবর্ণনা। অভিনয়ের ভাবব্যঞ্জনা ও বিশুদ্ধ নৃত্যের সুষমা উভয়ই ছিল তাঁর নয়নাভিরাম লাস্যপ্রধান দেহচারণায় বিন্যস্ত নিখুঁত নৃত্যভঙ্গীমায়।

অভিনয় পদগুলিতে অনেক সময় লাস্য উপাদানের ঘাটতি ছিল মাইমধর্মী দেহভঙ্গীর প্রাবল্যে। বালক্রীড়া, বিশ্বরূপদর্শনম ও গোপীবস্ত্র হরণমে গীতার মুখ্য প্রয়াস ছিল শ্লোকে বর্ণিত এই বহুলপ্রচলিত কৃষ্ণলীলার কাহিনীগুলিকে আক্ষরিকভাবে মূলানুগ করে নৃত্যে বিবৃত করা। নিরাভরণ, সরল কাহিনী রেখাকেই অনুসরণ করেছে কখনও কখনও নিছক অনুকৃতিধর্মী দেহভাষায় রচিত অতি সরল নৃত্যবিন্যাস। ভাব-আবেগের জটিল নাটকীয়তার সৃষ্টিধর্মী বিস্তারে নৃত্য ও নৃত্যাংশে অনেক সমৃদ্ধ হতে পারত। যা আংশিকভাবে সফল হয়েছে অভিশপ্ত ইন্দ্রদ্যুম্নের কাহিনী নিয়ে রচিত গজেন্দ্র মোক্ষমের গজনৃত্য অংশে। তবু এই সব পদে মোহিনী অট্টমের মনোহারী আবেদনের অভাব ছিল না। বিভিন্ন চরিত্রের রূপনির্মাণে গীতার পরিমিত রস-ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ অভিনয় ছিল খুবই সাবলীল। বিশেষ মনোজ্ঞ হয়েছিল কবির রোগযন্ত্রণা ও রোগমুক্তির নৃত্যাংশ।

মনসিজ মজুমদার

নৃ ত্য না ট্য

রবীন্দ্র সঙ্গীতে শকুন্তলা

নরেন্দ্র সেবা টাস্কটের উদ্যোগে গত ২৪শে অগষ্ট রবীন্দ্র সদনে পরিবেশিত হল প্রবাহিনীর নৃত্যনাট্য শকুন্তলা। এই প্রযোজনার অভিনবত্ব হল কাহিনীর বিন্যাসে, বিষয়ের বিস্তারে, নাটকীয় মুহূর্ত রচনায়, আবহ সৃষ্টিতে, এমন কি কখন কখনও সংলাপের প্রয়োজনেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রয়োগ। উদ্বেল যৌবন প্রবৃত্তির রূঢ় ঋজু নাটকীয় আখ্যানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিশীলিত রোমান্টিক অনুভবের লিরিক পরিমণ্ডল। ফলে, প্রবৃত্তির উচ্ছলতা থেকে পরিণত প্রেমে উত্তরণের যে দুরন্ত ভাববস্তু কালিদাসের কাহিনীতে পাই তার নাটকীয় প্রাখর্য রবীন্দ্রনাথের গানের লিরিক ঝরনাধারায় এক শান্ত বিনম্রতা অর্জন করে, চরিত্রগুলি এক নির্বিশেষ মাত্রা পায় এবং গানগুলির সুর ও রূপের অনন্য রূপকে অনুসরণ করে নাটক ও নৃত্যাংশ। তাই এই প্রযোজনাকে বলা চলে শকুন্তলার কাহিনী সূত্রে গাঁথা, নৃত্যযোগে পরিবেশিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের 'চিত্রমালা'। এবং সেই জন্যই প্রায় চৌত্রিশটি গানের সম্পূর্ণ বা আংশিক

শুভাশিস ও সুস্মিতা ভট্টাচার্য

প্রয়োগের সার্থকতা নিয়ে বিশদ আলোচনা অবান্তর হয়ে ওঠে। সূচনায় কণ্বমুনির আশ্রমের শান্ত ও সমাহিত পরিবেশ দুষ্মন্তের মৃগয়ায় বিঘ্নিত হওয়ার আগেই অনেকগুলি সমবেত গান ও নৃত্যের কলরোলে মুখর হয়ে ওঠে। প্রথম প্রেমোন্মেষের মুহূর্তে 'মম যৌবন নিকুঞ্জে' এবং 'ঝড়ে উড়ে যায়' কতকটা দ্বৈত

অঞ্চলে চিরায়ত শিল্প অনেকটাই পাওয়া যায়, সমতলে নানা রকম বাণিজ্যিক বিভ্রান্তি। হয়তো ওড়িশা মন্দিরের দেশ বলে সেখানেও শুদ্ধতা বজায় থাকে। আগামীকাল বিচার করবে দাক্ষিণাত্যে কোনটি চিরায়ত, ভরতনাট্যম অথবা শ্রীদেবীর 'এ' মার্কা ফিল্ম।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

বি বি ধ

বিচিত্রানুষ্ঠান

লবণ হ্রদ মঞ্চে বি ডি ব্লক ফোরাম-এর উদ্যোগে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল সম্প্রতি। অনিন্দিতা সান্যালের সুকণ্ঠে 'তোমার কথা হেথা' রবীন্দ্রসঙ্গীতে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা। অতঃপর উদ্যোক্তাদের পক্ষে দু-একজন বক্তব্য রাখলেন অনুষ্ঠান সম্পর্কে। সেদিনের অনুষ্ঠানসূচীতে ছিল: স্মৃতিচারণা, সঙ্গীত, শ্রুতিনাটক ও কবিতা পাঠ।

রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা হেমন্তবালা দেবীর কন্যা বাসন্তী বাগচীর স্মৃতিচারণ ও গান এ-অনুষ্ঠানের এক বড় প্রাপ্তি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের কথা, রবীন্দ্রনাথের কাছে দু-একটি গান শেখার কথা এল শ্রীমতী বাগচীর অন্তরঙ্গ স্বাদু স্মৃতিচারণে। 'কাঁদালে তুমি মোরে' শিখেছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে, সেটিই শোনালেন শেষে। বয়স ক্লান্তি এনেছে স্বাভাবিক নিয়মেই কিন্তু কণ্ঠে তাঁর সুর ঠিকই আছে।

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-চিন্তা নিয়ে একটি গীতি-আলেখ্য (সংকলন: মিহির বসু) পরিবেশিত হল গ্রন্থনা সহযোগে। একক সঙ্গীতে তন্দ্রা চক্রবর্তীর গানের চর্চাটি আছে বোঝা যায়, কণ্ঠটিও সুন্দর কিন্তু 'আজি প্রণমি তোমারে' গানে অন্তরাতে 'মরে' উচ্চারণ করলেন 'মোরে', বাণীর অর্থটিই গেল বদলে। প্রসূণ কাঞ্জিলালের 'শুভ্র আসনে বিরাজ' একটা মান রক্ষা করেছে। বাকী একক ও দ্বৈত গানগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি ঠিকই তবে অংশগ্রহণকারীরা

বাসন্তী বাগচী

আন্তরিক চেষ্টা করেছেন। এই আলেখ্যটিতে প্রায় সাত-আটজন গায়ক-গায়িকা অংশ নিলেন অথচ কোন সম্মেলক গান ছিল না, থাকলে সঙ্গীতাংশ অন্য মাত্রা পেত। রবীন্দ্রনাথের গল্প 'শেষের রাত্রি' অবলম্বনে শ্রুতিনাটকটি সার্বিকভাবে উপভোগ্য। রীতা বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ঠের ব্যবহারে সফল, দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যথাযথ। অপর্ণা দত্ত ও গৌতম দাসও অনুল্লেখ্য নয়। অতঃপর ভবানী ভট্টাচার্যের রবীন্দ্র-কবিতা পাঠ সাধারণ। বরং বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে শেষে গোপা কাঞ্জিলালের নজরুল গীতির অনুষ্ঠান। সুরেলা রেওয়াজী কণ্ঠ আর সূক্ষ্ম সাঙ্গীতিক অলংকরণের সুচারু প্রয়োগ তাঁর গানে স্বতন্ত্র মাত্রা আনে।

স্বপন সোম

কলকাতার জন্মদিন

২ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটস্থ ঠনঠনে রাজবাড়ির প্রকাণ্ড উঠোনে চব্বিশে আগস্ট সন্ধ্যায় কলকাতা শহরের দুশো ছিয়ানব্বুইতম জন্মদিন পালিত হল। গঙ্গাতীরের এক নির্জন অঞ্চলে পালের জাহাজযোগে জোব চার্নকের সদলবলে পদার্পণের দিনটিকেই কলকাতা শহরের জন্মদিন ধরা হয়েছে। নোবেল লরিয়েট কবি কিপলিং যতোই বলুন, 'এ শহর চান্স ইরেকটেড'।
যাই হোক, ঠনঠনে রাজবাড়ির উঠোনে তো নরম গালচে বিছোনো, তার ওপর ধপধপে সাদা চাদর। সাড়ে তিনশো' সুবেশ ও উৎসুক নরনারী। গা ছেড়ে বসে উপভোগ করেছেন আড়াই ঘণ্টার ছিমছাম ঘরোয়া অনুষ্ঠান। বাড়ি ফেরার সময়ে জুতো খোঁজাখুঁজির হাঙ্গামা নেই। সদর দরজার মুখে, জাপানী নাকি ইরানী কায়দায় (?) প্রতি অতিথির হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল একটি করে গোলাপ ফুল এবং 'পাদুকা পুরাণ' ছাপ দেওয়া পলিথিনের পাতলা ব্যাগ। উদ্যোক্তাদের ঘোষণা, "অনুগ্রহ করে, যে যার জুতো ব্যাগের মধ্যে করে এটি হাতে বা কোলে নিয়ে কিংবা নিজের পাশে রেখে ফরাসে বসুন।"
উপস্থিত সকলের জন্যে প্লেটভরা মুখরোচক জলখাবারের ব্যবস্থাও ছিল।
চতুর্দিকে ঝলমলে আলো, পুরনো কলকাতার নানাবিধ ছবি দেওয়া সুন্দর ডেকরেশন।
প্রায় শুরুতেই কিন্তু সুর কেটে গেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের কারমাইকেল অধ্যাপক ডাক্তার ব্রতীন মুখোপাধ্যায়ের ভাষণে।

তিনি বললেন, জোব চার্নককে কলকাতার জনক বলা মহা ভুল। কলকাতা শহর তাঁর হাতে গড়া নয়। এমন কি, এ শহর ইংরেজদের দ্বারাও গড়া নয়। বরং কলকাতা শহরের জন্ম ইংরেজ আগমনের আগেই হয়েছিল। ভারতীয় বণিক শেঠ-বসাকরা আগেই এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন, অন্যান্য জনবসতিও ছিল, আর্মেনিয়ানরাও ছিলেন এখানে। এমন কি ১৬৩০ খৃষ্টাব্দের তারিখ খোদাই করা জনৈকা নারী রোজা বিবির কবরের পাথর কলকাতায় পাওয়া গেছে।

অনুষ্ঠানের মূল সুর এবং মেজাজ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অবিলম্বে ফিরিয়ে আনলেন বিশেষ অতিথি হিসাবে তাঁর ভাষণে ও কলকাতা বিষয়ক স্বরচিত কবিতা পাঠে। নীরেন্দ্রনাথ বলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু (১৯৩৯ খ্রীঃ) পর্যন্ত কলকাতা ছিল বড় শান্ত, ঘরোয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তারপর থেকে ক্রমে তার চেহারার বদল হতে লাগল, "যেন সে তার লুকনো দাঁত নখ সব বার করল।"

কলকাতা শহরের অতীত ঐতিহ্য যথাসম্ভব বজায় রেখে, তার যথার্থ শ্রী ফিরিয়ে আনতে, তাকে আরো বাসযোগ্য করতে আমাদের সবাইকে আরো দায়ীত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানালেন নীরেন্দ্রনাথ, কারণ, "এখনো, নানান দিক বিচারে, কলকাতা অতুলনীয়।"

হাওড়ার প্রবীণ গায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায় ধ্রুপদ তথা রাগসঙ্গীত প্রভাবিত খাঁটি টপ্পা গেয়ে শ্রোতাদের মাতিয়ে দেন। বর্তমানে প্রচলিত টপ্পার গায়নরীতির সঙ্গে তাঁর রীতি মেলে না। প্রথমে শুনতে কিছু অস্বস্তি লাগলেও একটু পরে আমাদের কান অভ্যস্ত হয়ে গেলে বুঝতে পারি খাঁটি জিনিসের স্বাদই আলাদা:

তাঁর নিবেদন, দাশরথী রায়ের 'ননদিনী বোলো নাগরে', শ্রীধর কথকের 'কেন মিছে কর অভিমান', গোপাল উড়ের 'সখা, কি জন্যে যোগীসনে হব যোগিনী' এবং অজ্ঞাত কবির 'মাগো, আমায় পাগল করবি কবে।'

গানে গোপালবাবুকে প্রশংসনীয় সহযোগিতা করেন তাঁর সুকণ্ঠ পুত্র বাণীকুমার চট্টোপাধ্যায়। তবলায় ছিলেন প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়। শিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কয়েকটি উপভোগ্য পুরাতনী গান নিবেদন করলেন নিপুণভাবে।
কলকাতা বিষয়ক অনেকগুলি ছড়া শোনান নীলাদ্রীশেখর বসু। রবীন্দ্রনাথ থেকে নীরেন্দ্রনাথ, শঙ্খ, সুনীল, সুভাষ, শক্তি ও আরো অনেকে উপস্থিত সেই ছড়াগুলির মধ্যে।

হীরেন মল্লিক কয়েকটি বাংলা কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে কলকাতা বিষয়ে কিপলিংয়ের সেই অমর ইংরেজি কবিতা সুষ্ঠুভাবে শোনান। পরিশেষে এক ছোট্ট অথচ মূল্যবান ভাষণ দেন নিশীথরঞ্জন রায়।

সমগ্র অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা 'দি ক্যালকাটান্স' নামক সংস্থা। এটির বয়েস ওই চব্বিশে আগস্ট এক বছর পূর্ণ হল। কলকাতা শহরের ইতিহাস ও সংস্কৃতি রক্ষণে 'দি ক্যালকাটান্স' বিশেষভাবে আগ্রহী বলে জানান।

সংস্থার ইচ্ছে, কলকাতা এলাকায় দু বিঘে জমি সংগ্রহ করে একটি মিউজিয়াম, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী হল, লাইব্রেরি, কলকাতা সংক্রান্ত মূল্যবান ফটো, ছবি, স্মারক দ্রব্য, দলিলদস্তাবেজ ইত্যাদি রাখা হবে গবেষকদের জন্য।

সুজিতকুমার সেনগুপ্ত

উজ্জ্বল অবক্ষয় : দক্ষিণের মন্দির

অভী দাস

*দক্ষিণের দেবস্থান/
সুধীরকুমার মিত্র/
নাভানা/
কল-৭২/৩০.০০*

মন্দিরের দেশ দক্ষিণাভূমি। এক বা একাধিক মন্দিরে প্রায় প্রতিটি পল্লী চিহ্নিত। তদুপরি সগৌরবে বিরাজিত কয়েকটি অতি বিশাল মন্দির—যা পরিকল্পনা, গঠন ও শিল্পবৈশিষ্ট্যে ভারতে তো বটেই, বিশ্বেও অনন্য। খ্রীষ্ট জন্মের অন্তত কয়েক শতাব্দী পূর্বে বিন্ধ্য-পারে মন্দির শিল্পের ঐতিহ্য সৃষ্টি হলেও দাক্ষিণাত্যে বিশেষত দ্রাবিড়-ভূমিতে তা স্বকীয় সুষমায় ভাস্বর হয়ে ওঠে সপ্তম শতাব্দীতে মহান পল্লব বংশের আমলে। পূর্বে ছিল ইট-কাঠের মন্দির। রোদ বৃষ্টিতে অতি সহজে স্বল্প কালের মধ্যে তার বিনষ্টি ঘটত। এই যুগ থেকে শুরু হয় প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড খোদাই করে স্থায়ী দেবমন্দির গঠনের প্রয়াস। তারপর ক্রমান্বয়ে চোল, পাণ্ড্য ও বিজয়নগরের কালে সেই মন্দির শিল্প বিকশিত হয়ে সর্বশেষে মাদুরাইতে এসে পরিণতি লাভ করে।

দক্ষিণের মানুষ ধর্মপ্রাণ। শিল্পের প্রাণ-শক্তিও ছিল ধর্ম। প্রবল প্রতাপশালী নৃপতি, তাঁদের মহিষী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা যেমন মন্দিরের জন্য অর্থ সামর্থ্য নিয়োগ করেছেন সাধারণ মানুষও তেমনি যথাসাধ্য দিয়ে দেবতার করুণা ভিক্ষা করেছে। নামহারা শিল্পীরা প্রাণমন ঢেলে দিয়েছে দেব-মন্দিরে স্বর্গীয় সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত করার একান্ত সাধনায়। ভক্তিরসের প্রাবল্যে মন্দির-গাত্রে, স্তম্ভে, মণ্ডপে, প্রবেশদ্বারে যেখানে এতটুকু স্থান পেয়েছে সেখানেই দেবদেবীর মূর্তি, ফুলপাতা বা জটিল নকশা খোদাই করে শিল্পী-প্রাণের আর্তির রূপদান করেছে। মন্দিরের আয়তনও মূল গর্ভগৃহকে কেন্দ্র করে ক্রমে বিস্তার লাভ করেছে অন্তরাল, মণ্ডপম, অন্তঃপ্রাচীর, বহিঃপ্রাচীর ও গোপুরমের বিশালত্বে। বস্তুত রামেশ্বরম ও মাদুরাইয়ের মত মন্দির-সমষ্টির নগরোপম বিরাট আকার ও বিশাল আয়তন ভক্তের হৃদয়ে স্পর্শ করে, সাধারণ দর্শককেও হতবাক করে রাখে। মন্দির ও তার সংশ্লিষ্ট অঙ্গগুলির বৃহৎ আকার এবং মন্দির এলাকার সর্বক্ষেত্র জুড়ে ঘন বিন্যস্ত ও সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখলে অনুমান করা যায় কী পরিমাণ অর্থ, লোকবল, সময়, পরিশ্রম ও ধৈর্যের বিনিয়োগ ঘটেছিল এগুলির নির্মাণে। স্বতন্ত্রভাবে মন্দির, মণ্ডপম বা খোদিত মূর্তিগুলি যথার্থই সুন্দর, কিন্তু সামগ্রিকভাবে শিল্প-সুষমা বা স্থাপত্য শিল্পের ঐক্যবোধ সৃষ্টি করে না। যেমন মাদুরাইয়ে মীনাক্ষী মন্দিরের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ বিখ্যাত গোপুরম। [illegible]টি অতি বিশাল দশ তলা, ১৬০ ফুট উঁচু এবং রামায়ণ, মহাভারত ও যাবতীয় পুরাণের মোট ১৫১২টি খোদিত মূর্তিতে আবৃত। মনে হয় যেন মূর্তির গভীর অরণ্য। প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ পার্সি ব্রাউনের মতে দ্রাবিড় মন্দির-শিল্প অবশ্যই মনোরম রীতি। তবে তা অবক্ষয়ে পর্যবসিত এবং সে অবক্ষয় উজ্জ্বল।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণে গিয়ে প্রধান মন্দিরগুলি দর্শন করেন আর বিতরণ করেন কৃষ্ণনাম যার ফলে "এই মত বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণদেশ"। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক প্রবীণ সাহিত্যিক সুধীরকুমার মিত্র ১৯৭৪ সালে মহাপ্রভুর 'চরণস্পর্শে রঞ্জিত' সেই তীর্থস্থানগুলি দর্শন করেন। তার মধ্যে ২০টি দেবালয়ের বিবরণ সন্নিবদ্ধ করে চৈতন্যদেবের পঞ্চশত বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে 'দক্ষিণের দেবস্থান' প্রকাশ করেছেন। তবে সেই সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন পুরী ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলির বিস্তারিত আলোচনা। মহাপ্রভুর তীর্থযাত্রার সঙ্গে এর সামঞ্জস্য থাকলেও এতে গ্রন্থনামের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি। তা ছাড়া উড়িষ্যার মন্দিরের ইতিহাস ও শিল্পধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুধীরকুমার চাক্ষুষ দর্শনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বহু সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি মিলিয়ে সেই উজ্জ্বল অবক্ষয়ের সাক্ষ্য বহনকারী কয়েকটি মন্দিরের ইতিহাস, গঠনপদ্ধতি, শিল্প-নৈপুণ্য এবং অধিষ্ঠিত দেবদেবীর পূজা, উৎসব ইত্যাদি প্রায় সব কিছুরই বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। ইতিপূর্বে দক্ষিণের মন্দির সম্পর্কে যে বাংলায় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি এমন নয়। ঠিক এই মুহূর্তে মনে পড়ছে প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'দাক্ষিণাত্য'-র কথা গ্রন্থটির কথা এখনও মনে আছে এই কারণে যে এটি শোভিত ছিল উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি চমৎকার আলোক-চিত্রে—আলোচ্য গ্রন্থের যে অংশটি অতি বিকর্ষক। তবে 'দক্ষিণের দেবস্থান'-এর মত দাক্ষিণাত্যের প্রধান মন্দিরগুলির এত বিস্তারিত বিবরণ সংবলিত গ্রন্থ বাংলায় আর নেই। দক্ষিণ ভারত যাত্রার পূর্বে তীর্থযাত্রী তথা প্রমোদ ভ্রমণকারীর পক্ষে

মূর্তির অরণ্য : মাদুরাই গোপুরমের একাংশ

এটি অবশ্য পাঠ্য। কারণ, প্রধান মন্দিরগুলি আকারে ও আয়তনে এত বিশাল যে আগে থেকে কোথায় কী আছে জেনে না গেলে অনেক কিছুই অ-দৃষ্ট থেকে যেতে পারে এবং যায়ও। বড়ই পরিতাপের কথা, সম্ভবত অতি দ্রুত রচনা ও মুদ্রণের কারণে দ্বিরুক্তি, বিপরীত উক্তি ও প্রভৃত মুদ্রণ-প্রমাদে গ্রন্থটির বিষম অবমূল্যায়ন ঘটেছে। একেও কি উজ্জ্বল অবক্ষয়ের ঐতিহ্য রক্ষা বলব? স্থানাভাববশত সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। লেখক কন্যাকুমারী অধ্যায়ে 'নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে দেবী দর্শন করতে হয়' বাক্যটি পর পর দুটি অনুচ্ছেদে অনাবশ্যক দুবার ব্যবহার করেছেন। তেমনি তিরুপতি অধ্যায়ে তিরুপতি থেকে তিরুমালাই পর্যন্ত পিচঢালা রাস্তার কথা সন-তারিখ সহ দুবার উল্লিখিত হয়েছে। প্রয়োজন ছিল না। বিপরীত উক্তির একটি উদাহরণ কন্যাকুমারী মন্দিরের অবস্থান সম্পর্কে। তিনি প্রথমে লিখেছেন, 'ত্রয়ী সমুদ্রের সোনালী বালুকারাশির উপর প্রতিষ্ঠিত কন্যাকুমারী তীর্থ।' এক অনুচ্ছেদ পরেই লিখছেন, 'সমুদ্র সৈকতে বিচিত্র বর্ণের বালুকারাশির উপর সুবিস্তৃত...।' বস্তুত ত্রি-সমুদ্র সঙ্গমে বিভিন্ন বর্ণের বালুকারাশি পাওয়া যায়। এমন কী কন্যাকুমারীতে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা পলিথিনের প্যাকেটে ভরে বিভিন্ন বর্ণের বালুকা বিক্রি করে।

কয়েক স্থানে অনুবাদের ত্রুটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। জগন্নাথদেবের মূর্তি সম্বন্ধে ইংরেজিতে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া আছে—Jagannath is the emblem of God having no other form than the eyes and the hands। এর ভাবার্থে তিনি লিখেছেন—'জগন্নাথ চক্ষুহস্তবিহীন হলেও তিনি ভগবানেরই প্রতিরূপ।' তা ছাড়া গ্রন্থের বহু স্থানে খোদিত মূর্তিকে ছবি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উড়িষ্যার 'মন্দিরে মিথুন মূর্তি' শীর্ষক অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন—'উড়িষ্যার অধিকাংশ মন্দিরে... কেন এই ধরনের রুচি-বিগর্হিত ছবি আঁকা হয়েছিল...।' অথচ মাত্র একটি বাক্য পূর্বে তিনিই এগুলিকে 'অশ্লীল মূর্তিগুলি' বলে উল্লেখ করেছেন। মুদ্রণ প্রমাদের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হল না। কেন না তার তালিকা বিশাল। অনেক স্থানে দাক্ষিণাত্যের নৃপতিদের নাম ভুল ছাপা হয়েছে। এটি ক্ষতিকারক, কারণ সাধারণ বাঙালী পাঠক এই নামগুলির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নয়। তবে জানি না কার অজ্ঞতার দরুন মন্দিরের 'অঙ্গন' গ্রন্থের বিশাল পরিধিজুড়ে 'অঞ্জন' রূপে প্রকাশিত। অন্যত্র তিনি রবীন্দ্রনাথের একটি অতি পঠিত ও গীত কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন এইভাবে—'আমার মাথা নত করে হবে হে তোমার চরণধূলার তলে'। সবচেয়ে আহত হতে হয় গ্রন্থের একেবারে শেষ অধ্যায়ে—'নৃসিংহ দেবের মন্দির'-এ এসে। তিনি লিখেছেন, 'ভগবান নৃসিংহদেবের মূর্তির যে বিবরণ শ্রীমদভাগবতে (!)

আছে তাতে দেখা যায় যে তাঁর মুখ কেবল হরিণের মত এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হচ্ছে মানুষের মত।' এ শ্লোক তিনি কোথায় পেলেন? শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে আছে প্রহ্লাদের কথায় ক্রোধান্বিত হয়ে হিরণ্যকশিপু স্তম্ভে মুষ্ট্যাঘাত করা মাত্র এক বিকট রূপ আবির্ভূত হয়। হিরণ্যকশিপু হতবাক হয়ে স্বগতোক্তি করেন, নায়ং মৃগো নাপি নরো—অর্থাৎ এ মৃগও নহে, মানুষও নহে। এর ঠিক পরেই বলছেন—বিচিত্রমহো কিমেতন্নৃমৃগেন্দ্ররূপম—অর্থাৎ এই আশ্চর্য প্রাণী নৃ (নর) মৃগেন্দ্র (সিংহ) বা নরসিংহরূপী (শ্রীমদ্ভাগবত—৭/৮/১৮)। সুধীরকুমারও কিন্তু ঠিক পরবর্তী বাক্যেই নৃসিংহদেবের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন—'তাঁর চক্ষুদ্বয় উত্তপ্ত সুবর্ণের ন্যায় পিঙ্গল বর্ণ ও উগ্র জটা ও কেশর দীপ্তিশালী।' নৃসিংহের মুখ যদি হরিণের মতই হবে তবে কেশর এল কী করে? তাঁর মত জ্ঞানী ও প্রবীণ লেখক একটু সজাগ ও সতর্ক হলেই এই সব অবাঞ্ছিত ত্রুটি মুক্ত হয়ে এটি যথার্থ আকর গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করতে পারত।

গানের লীলার সেই কিনারে

সুভাষ চৌধুরী

গানের লীলার সেই কিনারে/ সুধীর চক্রবর্তী/ অরুণা প্রকাশনী/ কল-৬/৪০.০০

শিল্পরূপ সৃষ্টির একটা ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত অবশ্যই থাকে কিন্তু স্বতঃসঞ্জাত সৃজনমহিমা কেবলই রেখে যায় আত্মজাগরণের পরিচয় যার উন্মোচন আর বিশ্লেষণ কখনোই কেবলমাত্র ইতিহাসের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। রূপসৃষ্টির উন্মোচনের বিশ্লেষণে বিষয়টি আত্মস্থ হওয়া চাই। রবীন্দ্রসংগীতে আভরণবর্জনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে যে অন্তঃসংগতি আর সৌন্দর্যসুষমা তা কি কেবল তালিকা আর শ্রেণীবিন্যাসে ধরা দেবে? কিন্তু কালানুক্রমিক তালিকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাংগীতিক বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রসংগীতে অন্তরের আবেগ ও বাইরের সৌন্দর্যলোকের মিলনে যে রূপসৃষ্টির মাহাত্ম্য তার প্রতি সম্ভবত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথের সকল গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বর্তমান প্রসঙ্গে তাঁর একটি বক্তব্য হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না: 'শিল্পসৃষ্টি নিয়ে পৃথিবীতে যে তর্কজাল বোনা হয়েছে, তাতে আবদ্ধ হয়ে, বন্ধনদশাকাতর অনেক লোক অনেক আর্তনাদ করেছে, অনুভব করার জিনিসকে বোধগম্য করার চেষ্টা করেছে; indefinable-কে define করার চেষ্টা করেছে। বুদ্ধির দ্বারা আরো ব্যবচ্ছেদ করেছে; অনুভূতির দ্বারা সেই রসসৃষ্টির সুষমার অপূর্ব সৌষ্ঠব তারা উপলব্ধি করতে পারে নি।'

তবু অনুভব করার জিনিসকে বোধগম্য করে তোলার প্রয়োজনীয়তা একেবারে অস্বীকার করা যায় কি? রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে সেই প্রত্যাশা পূরণের সার্থক প্রচেষ্টা সুধীর চক্রবর্তীর 'গানের লীলার সেই কিনারে' গ্রন্থটি। রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গে যে অর্ধশতাধিক গ্রন্থ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে নির্দ্বিধায় স্বীকার করি তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসংগীতের নতুন কোনো দিগন্ত উদ্ভাসিত হয় নি, উন্মোচিত হয় নি চিন্তাশীল নতুন তথ্যের রত্নগুহ—কারণ সেগুলি অধিকাংশই বাণিজ্যিক কারণে পাঠ্যপুস্তকের ধাঁচে রচিত। শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রসংগীত' আকর গ্রন্থটি প্রধানত এই-সব গ্রন্থের আশ্রয়। অবশ্য প্রধানত বাণীর নির্মাণ আর সৃষ্টির নিরিখে উল্লেখযোগ্য শঙ্খ ঘোষের 'এ আমির আবরণ' গ্রন্থের কথা স্বতন্ত্র। 'গানের লীলার সেই কিনারে' গ্রন্থে আশ্চর্যভাবে ধরা রয়েছে দুই ধারার সামঞ্জস্য। লেখক সাহিত্যের অধ্যাপক এবং তাঁর সাংগীতিক শিক্ষার ভিতটিও সুদৃঢ়। এছাড়া সামগ্রিকভাবে বাংলাগানের প্রতি আছে তাঁর মমতা এবং নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, যার প্রতিফলন আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিটি প্রবন্ধে। ঠিক এমনি একটি গ্রন্থের প্রত্যাশায় ছিলাম দীর্ঘদিন ধরে।

গ্রন্থের দশটি প্রবন্ধই ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কিন্তু গ্রন্থ সংকলনকালে তার পরিমার্জিত রূপ নতুন আকার নিয়েছে। লেখকের নিজের ভাষায়, 'রচনাগুলির বক্তব্য ও ভাষা আমার সর্বাধুনিক চিন্তা ও সিদ্ধান্ত বহন করছে।' প্রথম প্রবন্ধ 'সমকালীন গীতিকার ও রবীন্দ্রনাথ: বৃক্ষ ও বনস্পতি'। গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ হিসাবে এর প্রয়োজনীয়তার কথা ছেড়ে দিলেও অসাধারণ দক্ষতায় লেখক গানের রূপ ও রূপায়ণ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালীন গীতিকার-সুরকারদের মধ্যে মিল কত কম তার পরিচয় রেখেছেন। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জানাতে ভোলেন নি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল জীবনের নির্যাস তাঁর গান। অন্যান্য গীতিকার-সুরকারদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক প্রতিষ্ঠিত করেছেন রবীন্দ্রসংগীতের নির্মাণ কৌশল যতখানি বাংলাগানের ঐতিহ্যবাহী ততখানি হিন্দুস্থানী গানের নয়। গানের নির্মিতি অর্থাৎ গঠন বিন্যাসে কাব্যের সংহত রূপকল্পনা কেমন করে এক একটি 'মুড'-কে ধরে রেখেছেন এবং সেজন্য এই গানে শিল্পীর ইমপ্রোভাইজেশন অকল্পনীয়। লেখক এমন নিরাসক্তভাবে সমস্ত বিষয়টি দেখেছেন যা সত্যই বিস্ময়কর। অতুলপ্রসাদের গান সম্পর্কে, 'অন্তর্মুখিনতার কারণে তাঁর গানের রূপায়ণ কঠিন' বিস্তারিত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। 'গানের দুই রাজা ॥ রবীন্দ্রনাথ ও রবার্ট বার্নস' প্রবন্ধটি কেবল তথ্যসমৃদ্ধির জন্যই নয়, মূল্যায়ন স্বাতন্ত্র্যের জন্যও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে লেখক এই দুই গীতিকারের প্রতিতুলনায় সামান্য বৈশিষ্ট্য লক্ষণ হিসাবে ভাঙা গানের বিপুল সমারোহের কথা উল্লেখ করে দেখিয়েছেন বার্নস-এর নির্মাণ প্রতিভা অনেক ক্ষেত্রে

রুচিপুষ্ট শব্দ পরিবর্তনেই ব্যয়িত হয়েছে আর রবীন্দ্রনাথ ভাঙতে ভাঙতে কেমন করে গড়েছেন নতুন নতুন গানের এক বিচিত্র ভাণ্ডার। এই প্রবন্ধে লেখক জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের গানের সৌন্দর্য গভীরতার মননের প্রক্রিয়ায় যে বৈশিষ্ট্যগুলি ফোটে তার অন্যতম হল নতুন তালের সৃজন। নতুন তাল কি সত্যই সৃষ্টি হয়েছে?

'রবীন্দ্রসংগীত : বাংলা গানের সর্বনাশ ও সর্বস্ব' অত্যন্ত সময়োপযোগী ও নির্ভীক প্রবন্ধ। বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায় লেখক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রসংগীত আমাদের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েও কী আশ্চর্য মননহীন অপচয়ের সামগ্রী। আলোচনার বেশ কিছু অংশ হাল্কাচালে লেখা। রবীন্দ্রসংগীত যে এখন অধিকাংশ শিল্পী বা প্রতিষ্ঠানের কাছে ব্যবসার সামগ্রী তা সে প্রগতিবাদী সংগীত শিল্পী, চলচ্চিত্রকার থেকে শুরু করে লেখক ও পুস্তক ব্যবসায়ী পর্যন্ত—অসংখ্য উদাহরণসহ দ্বিধাহীনভাবে তা প্রতিপন্ন করেছেন। প্রসঙ্গত লেখক বেশ মুক্তমনে বিভিন্ন শিল্পীর নাম উল্লেখ করেছেন, অবশ্যই তা মতান্তরের অপেক্ষা রাখে। 'কবিতা আর গানের আকাশ' প্রবন্ধে লেখক প্রয়াসী হয়েছেন কেমন করে এক শিল্পসৃষ্টি অন্যতর এক সৃষ্টিকে প্রাণিত করে। আবার কোথাও কোথাও তারা মিলে রাত্রি যেমন মেলে দিনের পারাবারে। 'গানে ছবির প্রেরণা ও রবীন্দ্রনাথ' বা 'কবিতা আর গানের আকাশ' প্রবন্ধ দুটি যেন একে অপরের পরিপূরক। কবিতা গান আর ছবির মধ্যে চলেছে অবিরাম এক রূপবর্তনের লীলা। লেখক শুধু ভাবুক নন রসিকও তাই এমন প্রাঞ্জল করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন বিষয়গুলিকে। 'দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে-দেওয়া' প্রবন্ধে লেখক রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন পর্যায়ের একগুচ্ছ গানের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন দেওয়া নেওয়ার অপরূপ ব্যঞ্জনা। সেখানে কখনো দাতা কখনো গ্রহীতা বড়ো হয়ে ওঠে—দেওয়া নেওয়ার মূল সত্যই রয়ে গিয়েছে এই অসমতায়। একটি নতুন ভাবনা যা রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে আরো মনস্কতা বাড়ায়। কিন্তু এই প্রবন্ধের একটি বক্তব্যে পরস্পর বিরোধের আভাস মেলে। 'রবীন্দ্রনাথের গানের কালক্রম ধরে তার থীমেটিক বা বিষয়গত দিকটি আমরা অনেক সময় দেখতে ভুল করি। এই ভ্রান্তি বা ভ্রষ্টতা রবীন্দ্রনাথেরই বানানো। কেন না তাঁর গানগুলিকে তিনি গীতবিতানে পূজা-প্রেম-প্রকৃতি-স্বদেশ--বিচিত্র—মাত্র পাঁচটি পর্যায়ের বিভাজনে সাজিয়ে দিয়েছেন এবং তার ফলে আমাদের বীক্ষণ আর কৌতূহল ঐ পাঁচটি বিভাগকেই শুধু মেনে নেয়।' সত্যি কি তাই? তবে তো 'দেওয়া-নেওয়ার' মতো প্রবন্ধের প্রয়োজনই ছিল না।

'বাংলা নাটকের গান, রবীন্দ্রনাটকের গান' প্রবন্ধে রবীন্দ্র পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক বাংলা নাটকের গান সম্পর্কে আরো একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রত্যাশিত ছিল। 'নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন করলেও তাঁর গান চরিত্র হারায় না'। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গান সম্পর্কে কি এমন কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে? 'পায়ে চলার শিল্পে বাক্যের শিল্প' প্রবন্ধ সম্পর্কে নানান তর্ক উঠতে পারে, কিন্তু ভাষার টানে পাঠককে একটানা পড়তেই হয় এই প্রবন্ধ। মনে হয় লেখক বিষয়টি সম্পর্কে সংশয়াতীত নন অর্থাৎ তাঁর মনন ক্রিয়ায় গড়ে ওঠে নি নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্ত। যেমন 'নটীর পূজা' সম্পর্কে বলছেন, 'কোন ভাবেই পুরোপুরি নৃত্যনাট্য বলা যায় না।' পুরোপুরি না হলে কি আংশিক? নৃত্যনাট্যের তালিকায় রাখছেন 'তাসের দেশ'। আবার বলছেন, 'কখনোই তাসের দেশ সার্থক নৃত্যনাট্য হয় না।' তথ্যগত অসংগতিও চোখে পড়ে যেমন গদ্যনাট্য চণ্ডালিকা প্রকাশের তারিখ বলছেন ১৯৩৪। পরিশোধ উল্লিখিত হচ্ছে কাব্যনাট্য বলে—এসবই হয়ে যায় অনবধানতায়। রবীন্দ্রসংগীতে কীর্তনের প্রভাব প্রবন্ধটি অত্যন্ত মূল্যবান। কীর্তনের প্রভাব তাঁর সামগ্রিক সংগীতরচনার অন্তস্তলে কেমন করে সঞ্চারিত হয়েছিল তার বিস্তৃত মনোজ্ঞ আলোচনায় সমৃদ্ধ এই প্রবন্ধ। গ্রন্থের বিন্যাস সম্পর্কে দু-একটি কথা : 'গানের দুই রাজা : রবীন্দ্রনাথ, রবার্ট বার্নস' এবং 'কোন ভাঙনের পথে এলে' দুটি পাশাপাশি বিন্যস্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ হতে পারত 'রবীন্দ্রসংগীত : বাংলাগানের সর্বনাশ ও সর্বস্ব।' সুমুদ্রিত এই গ্রন্থের রুচিস্নিগ্ধ প্রচ্ছদের জন্য প্রবীর সেনের নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখযোগ্য। পরিশেষে এমন কথা বলা হয়তো অসংগত হবে না যে এই গ্রন্থটি রবীন্দ্রসংগীতের সাংগীতিক ও সাহিত্যিক আলোচনার সীমা অতিক্রম করে এমন একটি তৃতীয় মাত্রা যুক্ত হয়েছে যা রবীন্দ্রসংগীতের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। লেখক অনুভূতি আর গভীরতায় আমাদের রবীন্দ্রসংগীতের লীলার কিনারে পৌঁছে দিতে পেরেছেন—অনুভব করার জিনিসকে বোধগম্য করে তুলতে পেরেছেন—এখানেই তাঁর সার্থকতা।

সরস জীবনের নকশা

বিপ্লব চক্রবর্তী

রসেবশে (১ম)/ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়/ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ/ কল-৯/২০.০০

আকাশ পাতাল/ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়/ পুষ্প/ কলকাতা/২২.০০

নকশা একটি অভিনব শিল্প মাধ্যম। লেখকের অভিজ্ঞতার রসে জারিত নকশা জীবন-নির্ভর হলেও পুরোপুরি গল্প-নির্ভর নয়। লেখকের রসদৃষ্টিই এর মৌল উপাদান। মূলত সমাজ জীবনের খণ্ডচিত্ররূপে নকশা কখনো আবার বিরস জীবনের সরস উপাখ্যান হয়ে ওঠে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যে নকশা রচনার জোয়ার এসেছিল। তুলনামূলকভাবে বিশ শতকে এই রচনা ধারাটি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। অতি সাম্প্রতিককালে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় নকশা রচনার ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। আমাদের সমাজজীবনের বহু প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা তাঁর শক্তিশালী কলমে নকশার রূপ পেয়েছে। জীবনের আবিলতা, অসংগতি এবং মাধুর্যের সঙ্গে মিশেছে ব্যঙ্গ এবং কৌতুক। সব মিলিয়েই তিনি রচনা করেছেন সরস জীবনের নকশা। আলোচ্য গ্রন্থ দু'টি সেই রসসৃষ্টির ভাণ্ডার।

'রসেবশে'র প্রথম পর্বটি মোট ৬৫টি খণ্ড রচনার সংগ্রহ। রসের বিচারে অবশ্য এগুলিকে অখণ্ড বলা চলে। বাঙালী জীবনের অতীত এবং বর্তমান তাঁর রস সন্ধানের সহজক্ষেত্র। প্রাত্যহিক জীবনের বিবর্ণতা, বিশুষ্কতার মধ্যে যে রস লুকিয়ে থাকে সঞ্জীববাবু তাকেই পরিবেশন করেছেন অননুকরণীয় ভঙ্গীতে। জীবনের বিপর্যস্ত রূপ প্রত্যক্ষ করে তিনি হতাশ নন, কিন্তু বহু হতাশায় পূর্ণ জীবনের রসচিত্র অঙ্কনের পশ্চাতে যেন এক অনুচ্চারিত প্রশ্নকে তিনি ছুঁড়ে দেন। তাই হাস্যরস উপভোগ করে এবং ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মর্ম উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাঠককে ভাবতে হয় কেন এমন হয়। গ্রন্থটির প্রথম দিকের বেশ কিছু রচনায় সেকালের বাঙালীর রাগ, মেজাজ প্রভৃতি বিষয়ে নানা রসচিত্র উপস্থিত। তারপর ক্রমেই তিনি সরে আসেন সমকালীন জীবনে। বাঙালী জীবনের নৈতিক

দুর্ভিক্ষ, সামাজিক অবক্ষয়, ধর্মীয় অসারতা প্রভৃতি নানা দিকগুলো তিনি নানাভাবে ফুটিয়ে তোলেন। একালের সমাজচিত্র অঙ্কনে তাঁর সবচেয়ে বড় প্রকরণ হল তাঁর পরিহাস-রসসিক্ত কথনভঙ্গী। এই জন্য প্রত্যেকটি রচনাতেই এমন একটা বৈঠকী মেজাজ আছে যা পাঠককে মুগ্ধ করে। শব্দ প্রয়োগের গুণে প্রত্যেকটি নকশাই জীবন্ত ছবির সমতুল। কখনও তিনি আক্ষেপ করেন যে খেলা আমাদের কোনও দিনই খেলোয়াড় করতে পারল না, আবার কখনও সহজ সুরে বলেছেন মানুষের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারলে পৃথিবীটা এমনকি দুঃখের।

রসেবশে বেঁচে থাকা বাঙালীর অনাকাঙ্ক্ষিত সমাজ পরিবেশের বাস্তব চিত্রগুলো শয়তানের সঙ্গে

সাক্ষাৎকারে, দর্শকের দরবারে, ডাক্তারের দপ্তরে, বুলেটিনের ব-কমলে অথবা সরাসরি উপস্থিত করা হয়েছে। সমগ্র উপস্থাপনার ভঙ্গী, মেজাজ ও প্রসাদগুণ নিঃসন্দেহে পাঠককে মুগ্ধ করবে। অবশ্য এই নকশায় কিছু কিছু অতিশয়োক্তি স্বভাবিকভাবেই উপস্থিত, কিন্তু ভাব ও ভাষার অসাধারণ প্রয়োগ নৈপুণ্যে তা সহজে নজরে আসে না। এটি গ্রন্থটির গুণ এবং দোষ উভয়ই।

আকাশ পাতাল গ্রন্থের একুশটি খণ্ড রচনা নকশা হলেও রম্যরচনার রূপ পেয়েছে। এগুলি আমাদের সমাজ জীবনের ছবি হলেও ভাবুকের জীবনভাবনার প্রকাশক। 'রসেবশে'র বাগবৈদগ্ধ্য এ গ্রন্থে সমানভাবে না থাকলেও দার্শনিক জীবনভাবনার সঙ্গে নকশার মেজাজ মিলেমিশে নতুনতর রসসৃষ্টি করেছে। মানুষের মধ্যে সমাজ, মানুষে মানুষে সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, ঘৃণা বিবাহপ্রথা এমনতর বিভিন্ন বিষয়ে সেই রসস্নিগ্ধ ভাবুকতার সঙ্গে মিশেছে লঘু কথনের আমেজ।

উভয় গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ এদের প্রচ্ছদ। 'রসেবশে'র ইমপ্রেশনিস্ট কায়দায় আঁকা অসাধারণ প্রচ্ছদটির শিল্পী স্বয়ং লেখক। আকাশ পাতালের প্রচ্ছদে শিল্পী মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিটিও গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থ দু'টির ছাপা ও বাঁধাই উন্নত মানের।

জ্যাম-জেলির কুটিরশিল্প

সাধনা মুখোপাধ্যায়

ঘরে করো শিল্প গড়ো/ তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়/ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ/ কল-১৩/১১.০০

আচার, জ্যাম, জেলি, চাটনি ইত্যাদির জনপ্রিয়তা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বাজারে কেনা এই সব খাদ্যবস্তু অনেক সময়েই উচিত মানের হয় না। বাড়িতে তৈরি করলে এগুলির শতাংশই খাঁটি। লেখক অনেক পরিশ্রম করে এই সব খাদ্যদ্রব্য বাড়িতে তৈরি করার সঠিক পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন।

আটত্রিশ অধ্যায়ে বিভক্ত এই বইয়ে শুধুমাত্র এই সব মুখরোচক খাদ্যদ্রব্যের প্রস্তুত প্রণালীই বর্ণনা করা হয়নি—বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে খাদ্যের সংরক্ষণ-তত্ত্ব। খাদ্য নষ্ট হওয়া বিষয়ক মৌলিক তথ্যগুলো না জানলে তো আচার জ্যাম জেলি ইত্যাদি বাড়িতে তৈরি করে সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়।

আগে অবশ্য মা দিদিমারা বলতেন আচার জিনিসটা খুব শুদ্ধ হয়ে ছুঁতে হয়। তাঁদের ধারণা যে একেবারে ভ্রান্ত ছিল তাও বলা যায় না—কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিচ্ছন্নতার অভাবেই এগুলো নষ্ট হয়ে যায়।

এই বইটি লেখার আরেকটি উদ্দেশ্য আছে। আচার জ্যাম জেলি ইত্যাদি ঘরে তৈরি করে নিজেরাই শুধু খেয়ে এর স্বাদ আস্বাদন না করে বাজারেও এসব বিক্রি করা যায়। কিছু সাজসরঞ্জাম কিনে নিয়ে বাড়িতেই কুটিরশিল্প গড়ে তোলা যায়। এতে পুঁজিও লাগবে কম এবং বেকার যুবকেরাও ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করে কিছু উপার্জন করতে পারবেন। এমনকি মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহিণীরা কিংবা চাকুরিজীবীরাও অবসর সময়ে এটিকে কেন্দ্র করে বাড়তি কিছু উপার্জন করতে পারবেন।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক বইয়ের সাহায্য নিয়ে লেখক বিজ্ঞান-ভিত্তিক খাদ্য-সংরক্ষণের এই বইটি লিখেছেন। বিভিন্ন ঋতুর উদ্বৃত্ত ফল যেমন কমলালেবুর সিজনে কমলালেবুর, পেয়ারার সিজনে পেয়ারার, টোম্যাটোর সিজনে টোম্যাটোর, কাঁচা আমের সিজনে কাঁচা আমের যথাক্রমে মার্মালেড, জেলি, সস, আচার ইত্যাদি তৈরি করে বোতল জাত করে ফেললে সারা বছর জুড়ে এই সব খাদ্যবস্তুর স্বাদ গ্রহণ করা যাবে।

লেখকের বিজ্ঞানভিত্তিক এই খাদ্য-সংরক্ষণের বইটি লেখার উদ্যম প্রশংসনীয়। বইটি পড়লেই বোঝা যায় এটি হল লেখকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল।

দারিদ্র্যের মূল্যবোধ ও রাজনীতি

গৌতম নিয়োগী

গরীবী, আকাঙ্ক্ষার বিস্ফোরণ ও বিদ্রোহ / সজল বসু / সৃজন পাবলিকেশনস / কল-২৯ / ১২.০০

গ্রন্থের ভূমিকাতেই লেখক জানিয়েছেন যে 'বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তু খুবই সমসাময়িক ও বিতর্ক উদ্দীপক, লেখকের সব ধ্যানধারণা অনেকের কাছে নির্ভুল নাও মনে হতে পারে।' কথাটি সর্বাংশে সত্যি। গ্রন্থের নাম দিয়েই কথাটি ব্যাখ্যা করা যাক। নামটি যতোটা ভারি, ততোটা সহজবোধ্য নয়। 'গরীবী' কি? কথাটি আদৌ বাংলা শব্দ নয়, হিন্দী-উর্দু; এবং প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক শ্লোগান দেশব্যাপী উচ্চারিত হওয়ার আগে কথাটি বাঙালি সমাজে শোনা গেছে কিনা সন্দেহ। উঁচু মানের সিরিয়াস বইতে এমন শব্দ প্রয়োগ বাংলা ভাষার গরীবী অর্থাৎ দারিদ্র্যই প্রকট করতে চায় যা বাস্তবে সত্যি নয়। 'আকাঙ্ক্ষার বিস্ফোরণ ও বিদ্রোহ' কথাটি ইংরাজী-গন্ধী এবং শব্দসমষ্টির মধ্যে এক বিপ্লবী ব্যঞ্জনা আছে, যা গোটা বইতে অনুপস্থিত। বরং সমগ্র বইটি পড়ে মনে হলো লেখক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের স্বীকৃত আদর্শের চেয়ে এক ধরনের কাল্পনিক ভারতীয় সমাজবাদের স্বপ্নময় জগতে বিচরণ করতে ভালোবাসেন।

বইতে ছ'টি আলোচনায় লেখক বিষয়বস্তুকে সাজিয়েছেন। এই ছটি হলো গরীবীর সংস্কৃতি ও উন্নয়নের মূল্যবোধ, মূল্যবোধ ও আকাঙ্ক্ষার বিস্ফোরণ, আকাঙ্ক্ষার বিস্ফোরণ ও বিপ্লবের মূল্যবোধ, বিপ্লব বিদ্রোহের বিন্যাস, মধ্যবিত্ত সন্ত্রাসবাদ, ভদ্রলোক সমাজ ও রাজনীতি। গরীবীর সংস্কৃতি ব্যাপারটি কি? লেখক কোথাও ব্যাখ্যা করেন নি অথচ প্রথম লাইন শুরু করেছেন 'গরীব হলেই গরীবী-সংস্কৃতি থাকবে এমন কথা নেই।' গরীব কারা সে-সম্পর্কে বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের মত উদ্ধার করার পর লেখক বলছেন 'গরীবী হঠাও' বললেই ত দারিদ্র্য দূর হয় না; তাছাড়া মার্কিন লেখক অসকার লুইসের মত উল্লেখ করে লেখক জানিয়েছেন গরীবী উচ্ছেদের চেয়ে গরীব সংস্কৃতি উচ্ছেদ অনেক শক্ত। যদি গরীবী সংস্কৃতি বলতে দরিদ্র মানুষের সামাজিক মূল্যবোধ তাহলে মূল সত্য এই যে এই শ্রেণীর মানুষদের সামাজিক মান উন্নয়ন অর্থাৎ ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং ক্রমবিকাশের সুযোগ দিলে তাদের মূল্যবোধের পরিবর্তন হতে বাধ্য। কারণ অর্থনৈতিক রূপান্তরে বহু সংস্কারই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। মূল্যবোধ ব্যাপারটিও শুধু দরিদ্র কেন মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রেও সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশ - কাঠামোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এ-বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তৃতীয় বিশ্বের নানা উন্নয়নশীল দেশে পুরনো মূল্যবোধ যে ক্রমে ধ্বংসের মুখে তার জন্য প্রধানত দায়ী বর্তমানের সামাজিক অবস্থা যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে গত শতাব্দী থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে সৃষ্ট। 'মূল্যবোধে ধস' লেখক লক্ষ করেছেন, 'সমাজের প্রাণশক্তি সমাজধর্ম থেকে নির্বাসিত হয়ে রাষ্ট্রশক্তির' শিকারে পরিণত হয়েছে লক্ষ করেছেন অথচ ঔপনিবেশিক শাসনের স্বাভাবিক উত্তরাধিকার ব্যাপারটি তাঁর নজরে আসেনি। আকাঙ্ক্ষার বিস্ফোরণ অথচ সুযোগের অভাব, এ-অবস্থা থেকে দুর্নীতি বাড়তে বাধ্য। আকাঙ্ক্ষা আছে, তা বিস্ফোরণ হলে বিদ্রোহ বা বিপ্লবী প্রচেষ্টা শুরু হবে, তা যে রূপেই হোক না কেন।

লেখক প্রকৃত বিপ্লবী মূল্যবোধ সৃজনের উপর জোর দিয়েছেন অথচ তা কি করে হবে তা বলেন নি। বরং আমাদের দেশের বিপ্লবী আদর্শ ও সংগঠনের মধ্যবিত্ত সর্বস্বতাকে সমালোচনা করেছেন। তাঁর সমালোচনা সবই যে অযৌক্তিক তা নয়, কিন্তু তার জন্য মূল তত্ত্বকে দোষ দেওয়া যায় না। আর বামপন্থী আন্দোলন মাত্রেই সন্ত্রাসবাদী এমন যুক্তি হাস্যকর এবং 'ব্যক্তিমানুষের পরিবর্তন' (সমাজের সার্বিক পরিবর্তন না করে) ইত্যাদি কথা বুজরুকি মাত্র। বাংলার তথাকথিত নবজাগরণের প্রতিভূ হিসেবে ভদ্রলোক সমাজের উদ্ভব এবং মধ্যবিত্ত শহুরে শিক্ষিত এই শ্রেণীর সামাজিক ভূমিকা নিয়ে অনেক ভালো লেখা আছে এবং এ বিষয়ে সজল বসুর আলোচনা নিতান্তই নগণ্য। যে 'ভদ্রলোকতন্ত্র'-কে লেখক শেষ অধ্যায়ে সমালোচনা করেছেন, তিনি নিজেই তার গণ্ডীতে আবদ্ধ। ফলে সমাজের পরগাছা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর শব্দের মায়াজাল সৃষ্টি করে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার কৌশল যেমন আজকাল সমাজ ভাবনায় অচল, সার্বিক সংকট সৃষ্টি হলে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা রুদ্ধ করা তেমনি মুশকিল।

জ

২৫ অক্টোবর ১৯৮৬ পাঁচ টাকা

সন্ত্রাসবাদ

পান্নালাল দাশগুপ্ত □ রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় □

অমলকুমার মুখোপাধ্যায় □

অমলেন্দু

২৫ অক্টোবর ১৯৮৬ পাঁচ টাকা

সন্ত্রাসবাদ

পান্নালাল দাশগুপ্ত □ রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় □ শঙ্খ

অমলকুমার মুখোপাধ্যায় □

ভয়েজার-ইউরে

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বাড়ন্ত
ছেলেমেয়েদের চাই কমপ্লান
একমাত্র কমপ্লান-এই
আছে এদের প্রতিদিনের
একান্ত প্রয়োজনীয়
২৩-টি খাদ্যগুণ
সাধারণতঃ ছেলেমেয়েরা
১৫ বা ১৬ বছর বয়সের মধ্যে
প্রায় সবদিক থেকেই পুরোপুরি
ভাবে বেড়ে ওঠে।
তাই এদের এই সময়ে
দরকার এমন পুষ্টি,
যা সরাসরি সুস্থ-সবল শরীর
গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।
এই কারণেই আপনার
ছেলেমেয়েদের আজ থেকেই
কমপ্লান খাওয়ানো
শুরু করুন। কমপ্লান-এ
আছে প্রোটিনের সেরা
মিল্ক প্রোটিন (২০%)।
এছাড়া আছে আরো
২২-টি খাদ্যগুণ। কমপ্লান
পাবেন চমৎকার সব স্বাদ-গন্ধে।
23
Glaxo
Complan
সুপরিকল্পিত মাত্রায়
২৩-টি প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ
ফলিক অ্যাসিড
ভিটামিন সি
ভিটামিন ডি
ভিটামিন ই
দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই।
কমপ্লান® -সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার
B84.GI.C.68 Ben

সূচীপত্র

দেশ

৮ কার্তিক ১৩৯৩ ☐ ২৫ অক্টোবর ১৯৮৬ ☐ ৫৩ বর্ষ ৫১ সংখ্যা

২১

সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞায়-ব্যাখ্যায় গোলমাল আছে। কাকে সন্ত্রাস বলব, কাকে প্রকৃত সন্ত্রাসবাদী সে বিষয়ে আমাদের অনেকেরই ধারণা স্পষ্ট নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনকে ঘিরে সন্ত্রাসবাদের তাত্ত্বিক দিকটি সমীক্ষা করেছেন পান্নালাল দাশগুপ্ত।
রাষ্ট্র নিজেই এক চরম সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। সন্ত্রাস দমন করতে সে অনায়াসেই প্রতি-সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পারে। ভারতের মত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদ এক বিপজ্জনক অসুস্থতা। সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূত্রে ভারতের অধুনা-চিত্র তুলে ধরেছেন অমলকুমার মুখোপাধ্যায়। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস, আন্দোলন-দলন ও গেরিলা অন্তর্ঘাতের তথ্যবাহী আলোচনা রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিমান ছিনতাই ছোঁয়াচে রোগের মত ছড়িয়ে পড়েছে দুনিয়াময়। বিমান দস্যুতার সালতামামি শম্ভু সেনের কলমে।

৯৬

এ এক নতুন ধরনের সাক্ষাৎকার। মহাশূন্যে মহাকাশে। যন্ত্র-সাংবাদিক ভয়েজার-২ গিয়েছিল নেপচুনের সন্নিধানে। তার ফলে বহু প্রত্যাশিত কিছু চমকপ্রদ তথ্য এসে পৌঁছেছে এই গ্রহে। অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তারই আলোচনা করেছেন এই নিবন্ধে।

১৪

জনপ্রিয় 'চিঠির দর্পণে' আরও কিছু মুখ আর মুহূর্ত ছিল প্রতিবিম্বিত হবার। কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া গেল না। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্বাদু কলমের জমাটি রচনার এটিই শেষ কিস্তি।

সম্পাদক **সাগরময় ঘোষ**

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক
৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ২০ পয়সা পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা

ছান্দসিক
প্রবোধচন্দ্র সেনের
প্রয়াণে
আমরা
শোকাহত

প্রবোধচন্দ্র সেনের

সারা জীবনের ছন্দ-জিজ্ঞাসার সারাৎসার

নূতন ছন্দ-পরিক্রমা

দাম ৪০·০০

দীর্ঘ সাত দশক ধরে ছন্দ চর্চায় মগ্ন প্রবোধচন্দ্র সেনের সারা জীবনের চিন্তা, চর্চা ও অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান বিধৃত এই কালজয়ী গ্রন্থে। বাংলা ছন্দের নানা দিক নিয়ে প্রচলিত বহু ভ্রান্তির নিরসন ঘটিয়েছেন প্রবোধচন্দ্র এই গ্রন্থে, বহু বিতর্কের দিয়েছেন জবাব। ছাত্র ও সাধারণ পাঠক, গবেষক ও কাব্যপ্রেমিক— প্রত্যেকের হাতে তুলে দিয়েছেন কাব্যরস উন্মোচনের অন্যতম চাবিকাঠি।
এ-গ্রন্থ তাঁর সারা জীবনের চর্চা অভিজ্ঞতার সারাৎসার শুধু নয়। এত দীর্ঘকাল ধরে এমন নিরবচ্ছিন্নরূপে ছন্দ নিয়ে ভাবনা, চর্চা, অধ্যাপনা ও প্রবন্ধ রচনার ফলে তাঁর জিজ্ঞাসা ও চিন্তাধারা নানা বাঁক ঘুরে কীভাবে এগিয়ে এসেছে পরিণতির মোহনায়, সেই বৈচিত্র্যময় পথের হদিশ ও পরিণতির স্বরূপও এ-গ্রন্থে ধরা পড়েছে।

১৭০০০ কপি নিঃশেষের পথে

সমরেশ মজুমদারের
সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারজয়ী উপন্যাস

কালবেলা

দাম ৪০·০০

উত্তরবঙ্গ থেকে আগত তরুণ অনিমেষ চেয়েছিল দেশের মানুষের পাশে দাঁড়াতে।
জীবনের নানা জটিল আবর্তে ভেসে গিয়ে এবং রাজনীতির আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেকে দগ্ধ করে সে আবিষ্কার করল যে, দাহ্যবস্তুর কোনো সৃষ্টিশীল ক্ষমতা নেই। পুলিশের নির্মম অত্যাচারে অনিমেষ যখন বিকলাঙ্গ, তখন বিপ্লবের শরিকেরা যে নিঃশেষে নয় গুছিয়ে নিয়েছে আখের। অনিমেষ অবাক হয়ে দেখল মাধবীলতাকে, যে কোনো রাজনীতি করেনি কখনো, শুধু তাকে ভালবেসে আলোকস্তম্ভের মতো একা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। খরতপ্ত মধ্যাহ্নে একগ্লাস শীতল জলের বেশি কিছু সে হতে চায়নি।
বিপ্লবের নিষ্ফল হতাশায় ডুবে যেতে যেতে অনিমেষ আবিষ্কার করেছিল, বিপ্লবের আরেক নাম মাধবীলতা।

সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত এই গ্রন্থের পরবর্তী পর্ব

কালপুরুষ

দাম ৫০·০০

ষষ্ঠ মুদ্রণ

পার্থসারথি চক্রবর্তীর
বিজ্ঞানভিত্তিক মজাদার বই

মজার এক্সপেরিমেন্ট

দাম ৬·০০

বিজ্ঞানের নানা রকম মজাদার পরীক্ষা আর ম্যাজিকের মতো তাক-লাগানো কিছু খেলা এই বইতে শিখিয়েছেন পার্থসারথি চক্রবর্তী। বাড়িতে বসেই সহজে করা যাবে এইসব খেলা ও পরীক্ষা। শুধু তাই নয়, কেন হচ্ছে, কী করে হচ্ছে, এসব কথাও অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি।

আরেকটি অবশ্যপাঠ্য

পার্থসারথি চক্রবর্তীর
বহু-প্রতীক্ষিত গ্রন্থমালা

ছোটদের বিজ্ঞানকোষ

দাম ৫৫·০০

বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার আবিষ্কার, উন্নতি ও অন্যান্য জরুরী তথ্য অতি আকর্ষণীয় ভাষায় এ-বইতে বর্ণিত হয়েছে। অসংখ্য ছবি, চার্ট, ইলাসট্রেশন। প্রথম খণ্ড বেরিয়েছে, এই অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থমালার।

গর্বের বই, গল্পের বই

বিমল কর-এর
সরস গল্প
দাম ২০·০০

রূপদর্শীর
ব্রজদার গুল্প-সমগ্র
দাম ১০·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
শাজাহান ও তাঁর নিজস্ববাহিনী
দাম ১০·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর
এক মেয়ে ব্যোমকেশের কাহিনী
দাম ১০·০০

দিব্যেন্দু পালিতের
মূকাভিনয়
দাম ১০·০০

আনন্দ বাগচীর
রাজযোটক
দাম ১০·০০

প্রকাশিত হচ্ছে

সমরেশ বসুর
নতুন উপন্যাস

দশদিন পরে

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

দ্বিতীয় মুদ্রণ

শৈলেন ঘোষের
দুরন্ত রূপকথা

স্বপ্নের জাদুকরী

দাম ৮·০০

কিশোর হীরালাল মায়ের মুখে শুনত, তার দিদি নাকি মেঘের দেশে চলে গেছে। দিদির গল্প শুনতে শুনতে হীরালাল ভাবত, মেঘের দেশে গিয়ে একদিন দিদিকে ডেকে আনবে।
ভাবতে ভাবতে সত্যিই একদিন মেঘের দেশে পৌঁছে গেল হীরালাল। গেল স্বপ্নের জাদুকরীর সঙ্গে। সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই এই বই।

দ্বিতীয় মুদ্রণ

শৈলেন ঘোষের
অপরূপ রূপকথা

টোরা আর বাদশা

দাম ৮·০০

খাঁচা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া এক ময়নাপাখিকে ধরতে গিয়ে দু-ভাইবোন হারিয়ে গিয়েছিল দু দিকে। কেউ কাউকে খুঁজে পায় না। কীভাবে কত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে আবার দু'জনের দেখা হল, তাই নিয়েই এই অপরূপ রূপকথা।

১১০০ কপি নিঃশেষ

অশোক মিত্রের
অসামান্য আলোচনা-গ্রন্থ

ছবি কাকে বলে

আটচল্লিশটি আর্টপ্লেটে সমৃদ্ধ
দাম ৩০·০০

নিপুণ চিত্রকর অনেকেই, মহৎ চিত্রশিল্পী মাত্র কয়েকজন। এখানেই এসে পড়ে সেই মাপকাঠি যা দিয়ে যাচাই করা যাবে, কোনটি হীরে আর কোনটি কাঁচ। সেকথা জানাতেই এই বই।
অ্যালবার্ট সি বার্নস-এর চিত্রদর্শন নামের অনন্য গ্রন্থের প্রেরণায় ছবির রক্তমাংস, অস্থিতন্ত্র থেকে প্রাণস্পন্দ পর্যন্ত সমস্ত কিছুকে সদৃষ্টান্ত বোঝাবার চেষ্টা করেছেন অশোক মিত্র।
মোটামুটিভাবে এ-বইয়ের তিনটি ভাগ। প্রথম ভাগে, চিত্ররসের সাধারণ লক্ষণ নিয়ে আলোচনা। দ্বিতীয় ভাগে অশোক মিত্র বুঝিয়ে বলেছেন—কেমন করে করতে হয় চিত্রের বিচার, কোনো ছবি ভালোভাবে দেখে কী করে তার থেকে পেতে হয় আনন্দ।
ভারতীয় ছবি কী করে আঁকা হয়, ছবি আঁকার বিভিন্ন রীতিপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করে যে-কোনো ছবি কীভাবে বিশ্লেষণ ও বিচার করতে হয়—তারই কিছু উদাহরণ রয়েছে পরিশিষ্টে।
ছবি আঁকার, দেখার, বিচারের ও রসাস্বাদনের পক্ষে দারুণ জরুরী গ্রন্থ—'ছবি কাকে বলে'।

থিসরাস 'মণিমঞ্জুষা' প্রসঙ্গে

দেশ, ১২ জুলাইয়ের নতুন 'সাহিত্য' বিভাগে ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তীর থিসরাস 'মণিমঞ্জুষা' সম্পর্কে লেখায় প্রাণতোষ ঘটকের থিসরাস 'রত্নমালা'র উল্লেখ দেখে দ্বিধামুক্ত হলাম। যে তথ্য ডঃ চক্রবর্তীর অজানা। এই 'মণিমঞ্জুষা' সম্পর্কে আমার কিছু বিনীত বক্তব্য উল্লেখ করছি।

ডঃ চক্রবর্তী ভূমিকায় বলেছেন, "যা প্রতিশব্দের অভিধানে পাওয়া যায় না তা হচ্ছে আনুষঙ্গিক শব্দাবলি। 'অরণ্য' শব্দের প্রতিশব্দ বন। কিন্তু 'অরণ্য' থেকে সিংহ, ব্যাঘ্র, কাঠুরিয়া, বনসৃজন, অভয়ারণ্য, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় শব্দে প্রবেশ করবার কোন রাস্তা প্রচলিত অভিধানে নেই। কিন্তু যারা শব্দের কারবারি তাদের এটিই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।"

লেখকের নির্দেশে তাঁর 'অরণ্য তোলপাড় করে সাহেব 'ফরেস্টার' আর বাঙালি 'বনরক্ষক'-কে ধরেও ব্যাঘ্র সিংহ'র হদিস পেলাম না। কাঠুরে বেশে কাঠুরিয়াকে চিনেছি। বনসৃজনও আছে বনসৃজল হয়ে। অভয়ারণ্য দেখলাম। তবে বৃক্ষরোপণ এখনও এ অরণ্যে চালু হয়নি। প্রাণের দায়ে পশু বন জঙ্গল ঢুঁড়ে 'প্রাণী'তে এসে ব্যাঘ্র সিংহকে দেখতে পেয়ে আনন্দ হলো। সঙ্গে রয়ালবেঙ্গল টাইগার চিতাবাঘ নেকড়েও আছে। তাই বলে লাইগন টাইগনও থাকবে এমন দুরাশা করা উচিত নয়।

"সমশব্দের বিদ্যুৎ-এর প্রতিশব্দ (ইরম্মদ) পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সমশব্দের অভিধানে পাওয়া যাবে না 'বিদ্যুৎ' শব্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আরও প্রয়োজনীয় শব্দ, যেমন ভোল্টেজ, শক, বৈদ্যুতিক চুল্লী ইত্যাদি।"

বিদ্যুৎ শব্দে ইরম্মদ নেই। নেই শক। না থাক। কে আর সখ করে শক খেতে চায়। যাঃ! বৈদ্যুতিক চুল্লী-ও ছাপার অক্ষরে নেই। আশার কথা ভোল্টেজ ড্রপ করে নি। থারমল-পাওয়ার হাইড্রো-পাওয়ার নিউক্লিয়ার-এনার্জি সোলার-এনার্জি জেনারেটর ওয়াট কিলোওয়াট মেগাওয়াট ৪৪০ ভোল্ট ২৩০ ভোল্ট প্লান্ট গ্রিড এ-সি ডি-সি লোডশেডিং ইত্যাদি আরও বেশি প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক নয় কি?
—আমার বিনীত জিজ্ঞাসা।

"অভিধানে শব্দ থেকে যাওয়া যায়, কিন্তু অর্থ ধরে শব্দে পৌঁছানোর কোন উপায় নেই। এই অভাব দূর করার জন্য 'মণিমঞ্জুষা' বা থিসরাস-এর পরিকল্পনা। ...'মণিমঞ্জুষা' শুধু একটি থিসরাস নয়, এটি একটি পূর্ণ ব্যবহারিক অভিধানও। পুরো একটি অভিধানের মধ্যে পুরো একটি থিসরাস এমনভাবে দেওয়া আছে যাতে যে কেউ সাধারণ অভিধানের মতোই সেটি ব্যবহার করতে পারেন।"

সংগীতের একটি রাগের নাম মনে আসছে না। তার আগে মেঘ শব্দটি আছে। সংগীত গান রাগ সুর দেখে মেঘ সর্গে ঢুকলাম। মেঘমন্দ্র দেখে আমার রাগের নামটি মনে পড়ে গেল। রাগটি মেঘমল্লার। এ কী কাণ্ড! এই মেঘ-যের মধ্যে জলমুচ ও কাদম্বিনীর আড়ালে যে 'ইরম্মদ' ঘাঁটি হয়ে বসে আছে। সংখ্যা শব্দেও ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর উল্লেখ নেই। রঞ্জকদ্রব্য রক্তিমা প্রেম অনুরাগ এমন কি ক্রোধ অর্থেও রাগ শব্দ নেই। আছে বিশেষণের রাগী। একরকম কাচের চুড়ি। কাচ বা কাঁচ শব্দই নেই। অলংকার-যেও পেলাম না। হ্যাঁ হ্যাঁ, বেলোয়ারি। বেলোয়ারি শব্দ দেখতে গিয়ে দেখলাম 'বেরসিক' তারপরেই 'বেশ'। বেল-কাণ্ডের ঘণ্টা গাঁটি জামিন কোথায়? আর বেলচা বেল্ট বেলনা বেলুন বেলা-বেলি বেলা-ভূমি বেলে বেলেল্লা বেল্লিক-ই বা কোথায়? বেল্লিক অর্থে লম্পট দুঃশীল শব্দই নেই। নির্লজ্জ বেহায়া ভাঁড় সমার্থক শব্দেও বেল্লিক জায়গা পায়নি। কৃষি চাষ মজুর আবাদ কৃষক কর্ষণ হল তন্নতন্ন করে খুঁজেও 'বেলচা' উদ্ধার করতে পারি নি। এখানে বলা প্রয়োজন, এইসব সমার্থক ও অনুষঙ্গ শব্দে কোথাও ক্রশ রেফারেন্স পাই নি। এ মরশুমে অগ্নিমূল্য কারণে আমমুখো হতে পারি নি। তাই মনে হলো কিছু গালভরা আমের নাম দেখে মন ভিজিয়ে নিই। ফল শব্দে মুনাফা আছে খাদ্যটি নেই। বাগান বন জঙ্গল অরণ্য ঘুরে এলাম আবার উদ্ভিদ কাণ্ডে। কলার নামে মর্তমান বিচি কাঁটালি সমেত আট রকমের কলা পেলাম। আম আম্রবৃক্ষ আছে কিন্তু সেসব গাছে এখনও বোম্বাই ল্যাংড়া হিমসাগর ফজলি ইত্যাদি কোনোটারই মুকুল ধরে নি।

"যে ভাব বা বিষয়ের জন্য শব্দ খুঁজছেন, হুবহু সেটি না হোক তার কাছাকাছি যে-কোন শব্দ মনে করুন। কোন অসুবিধা নেই, কারণ সব শব্দই বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজানো আছে।"

আমি পৃথিবী অর্থে ইলা ইরা রসা জগ জগতী উর্বী ক্ষৌণি ইত্যাদি শব্দ পেতে চাই। সরাসরি পাওয়া দূরের কথা, ধরণী অবনি ইত্যাদিতে ডজন দুয়েক শব্দ ঘোরাফেরা করেছে ডজনখানেক জায়গায় তবু ওই শব্দগুলির একটাও পাইনি। ভূ আছে কিন্তু ভূকম্প ভূগোল ভূচিত্র ভূতত্ত্ব ভূমধ্যরেখা ভূপতি ভূস্বর্গ ভূদান ইত্যাদি কোথায়? ধরা ধরলাম তো ধরাধর ধরাশায়ী ধরাধরি ধরাবাঁধা ধরাছোঁয়া ইত্যাদি ছুঁতে পারলাম না। জগ থাকলো না তো জগঝম্প জগদ্দল জগাখিচুড়ি ইত্যাদি কেমন করে থাকবে? রস রসজ্ঞান নেই, রসায়নও রসাতল-য়ে! কক্ষ শব্দে ঘর মহল ইত্যাদিতে প্রায় শ'খানেক শব্দ। কক্ষচ্যুত কক্ষভ্রষ্ট কক্ষক্রীড়া কক্ষপুট ইত্যাদি থাকার কি প্রয়োজন নেই? আকার সর্গে প্রায় পৌনে চারশ' শব্দ পেলাম। সেটকরা মালা পালিশ লালিত্য ইত্যাদি। থাকে থাক, শব্দ যখন ব্রহ্ম। দুঃখ শুধু, চড়াই উৎরাই কালা খোলা খাড়াই ইত্যাদি শব্দ পেতে হলে আমায় আকার সর্গ ভাবতে হবে? না ভাবতে পারলে পাবো না! চড়াই উৎরাই খাড়াই দেখতে খুব ইচ্ছে হলো। পর্বত-য়ে গেলাম। এলাম পাহাড়ে, সেখানেও নেই! আশা জাগলো (অদ্রি দ্রষ্টব্য) দেখে। কোথায় অদ্রি? নেই। এইরকম পতঙ্গ পর্যায়ে (কীট দ্রষ্টব্য) দেওয়া সত্ত্বেও 'কীট' দৃষ্ট হয়নি। অনুমান করা যায় অনুষঙ্গ 'বেগন স্প্রে' থাকায় নির্বংশ হয়েছে।

"বইটি খুললেই দেখা যাবে যেন শব্দের ভোজসভা বসেছে। প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী দই মিষ্টি, কেক কাটলেট, আমিষ-নিরামিষ, প্রাচ্য পাশ্চাত্য, দেশি বিদেশি, বাংলা ইংরেজি, সবরকম ভোজ্যবস্তুর ব্যবস্থা রয়েছে।"

তাহলে ভোজপর্বই দেখা যাক। আহার খাদ্য মৎস্য রান্না পর্যায় মিলিয়ে তা প্রায় শ'সাতেক শব্দ। আয়োজন ভালোই। মৎস্য-ভাগের অনেকটাই রান্না খাদ্যেও আছে। তা থাকতেই পারে। প্রায় তিরিশ রকমের মিষ্টি আছে। বোঁদে গোলাপজাম মনোহরা অমৃতি চমচম কড়াপাকের সন্দেশ ইত্যাদি না থাকলে কী এসে যায়। প্রায় পঞ্চাশ রকমের আমিষ রান্নার পরেও কইপাথুরি চিংড়ির মালাইকারি চিতলের বড়া চিকেন বা ফিশ তন্দুরি ফ্রায়েড প্রন চিলি চিকেন মোরগমশল্লা চিকেন রোস্ট ইত্যাদি বাদ গেলেও এমন কিছু ক্ষতি হয় না। আমিষাশীদের জন্য গুগলি শংকর কড হাঙর তিমি ইত্যাদি না থাকাই উচিত। বদলে তো আছে কাঁকড়া ঝিনুক কচ্ছপ ইত্যাদি। তবে একটা কথা। নিরামিষের মধ্যেই আমিষ চিকেন পোলাওয়ের পরেই চাটনি আবার ডাঁটা শাকের পরেই দই মিষ্টি, তারপর আবার সজনে ডাঁটা। মুখশুদ্ধির পরে আবার পুডিং কাটলেট স্যাণ্ডুইচ। ইস! কচু, বাঁশের কোঁড়-য়ে শেষ! এইরকমই প্রায় সব জায়গাতেই এলোমেলো পরিবেশন। রাশিচক্রের মৎস্য, মৎস্য পর্যায়ে না থাক সংখ্যা পর্যায়ে থাকবে না, এটা ভাবতে পারি নি। ধর্ষণ সমার্থে কদর্যতা অবমাননা ঠিক আছে। আপত্তি 'পাশবিক অত্যাচার' শব্দে। পশু কখনও বলাৎকারে সতীত্বহানি করে কি? না। অমানুষের পাপের বোঝা নিরীহ পশু বইবে কেন? এটি অপপ্রয়োগ। অনেক ছাপার ভুল ও বানানের অসঙ্গতি আছে। শুধু ১৭২-১৭৪ পৃষ্ঠার মধ্যেই খ্রিষ্টাব্দ আবার খ্রিস্টাব্দ আছে। বৃটিশ আবার এই বানানে। ইদ্রানীং/ ইদানিং, বর্তমান/ বর্তমান, সন্ধ্যায়/ সন্ধ্যায়, দীর্ঘসূত্রী/ দীর্ঘসূত্রী, অস্তবেলায়/ অস্তবেলায়, মুহূর্তে/ মুহূর্তে, ত্বরিত হয়েছে ত্বরিৎ। ১৬৩ পৃষ্ঠায় আছে বন্দীশালা বন্দীশিবির। ঠিক কি? না হওয়া উচিত বন্দিশালা বন্দিশিবির? ২৪ পৃষ্ঠায় অঙ্গনা শব্দে 'শ্রীমতি' বানান কি হয়?

"মণিমঞ্জুষা একটি ব্যবহারিক এবং সহায়ক গ্রন্থ, এটি ব্যাকরণ নয়।"

তবু প্রথমেই 'অ' সর্গে দেখলাম "অভাব, অনুপস্থিতি, বৈপরীত্য না বা নঞর্থ বোধক শব্দের গোড়ায় ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ:"

অকন্টক অকথ্য ইত্যাদিতে দু'পৃষ্ঠা। থাক, আপত্তি নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, শুধু ব্যঞ্জনবর্ণের বেলায় বললেন, স্বরবর্ণ বাদ দিলেন কেন ? এই নঞর্থকের পরবর্তী শব্দের আদ্যাক্ষর স্বরবর্ণ থাকলে 'অ' স্থানে 'অন' হয়। যেমন অনাচার অনার্য ইত্যাদি। আবার এগুলোর বেশিরভাগ শব্দই বর্ণানুক্রমিকেও আছে। দু'পৃষ্ঠার মধ্যেও মোটামুটি সব শব্দ নেই। প্রথম কুড়িটির মধ্যে পরিচিত অনেক শব্দই নেই। যেমন অকপট অকরুণ অকর্ণ অকলঙ্ক অকায় অকার ইত্যাদি। ইংরাজিতে un-, im-, in-, il-, ir-, anti-, ab-, dis-, -less যোগে নেতিবাচক শব্দ আছে প্রায় দশ পাতা। তবু non-, জায়গা পেলো না। আরও কিছু ত্রুটি থাকলেও 'মণিমঞ্জুষা' অবশ্যই দরকারি বই। বিশেষ করে এর ইংরাজি ভাগটি। পরিশেষে আমার বিনীত জিজ্ঞাসা, ভূমিকা লেখার আগে বইয়ের কোন সর্গে কী কী আছে ডঃ চক্রবর্তী যাচাই করেন নি কেন ? আর তাঁর এরকম ভূমিকা লেখা কি সঙ্গত হয়েছে ? —যে ভূমিকায় শুধুই উচ্ছ্বাস প্রশংসা আর আত্মতুষ্টিতে ভরা ! ডঃ চক্রবর্তীর নিজের ভূমিকা না হয়ে এটি 'প্রকাশকের কথা' হলেও বেমানান হতো না।

শ্যামদুলাল কুণ্ডু

কলকাতা-৩৭

চিঠির দর্পণে

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর ধারাবাহিক রচনার সপ্তম পর্বে পুরানো মাপের কথা বলতে বলতে পোস্টকার্ডের দামের ব্যাপারে খানিকটা গোলমাল করে ফেলেছেন। পাই পয়সা থেকে নয়া পয়সা, তারপর নয়া গিয়ে শুধু পয়সা—হিসাব করতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলেনি এমন লোক খুঁজে পাওয়া ভার। অন্যমনস্কতা যাদের প্রবাদের মত সেই কবিদের তো কথাই নেই। তবু লেখাটা সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর স্মৃতিচারণ বলে এর একটা ঐতিহাসিক মূল্য থাকবে আর এতে উল্লেখিত তথ্যগুলো ভবিষ্যতে ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে গণ্য হবে বলেই এ চিঠির অবতারণা। ডাক সামগ্রীর আকার, নকশা, দামের পরিবর্তনের ধারাবাহিকতাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে ডাক ব্যবস্থার ইতিহাস আর পুরানো চিঠিপত্র সে ইতিহাসের মৌলিক উপাদান যার হদিস পাওয়া যায় এ ধরনের লেখার মধ্যে। সুভাষবাবু পোস্টকার্ডের দামের যে বিবরণ দিয়েছেন তার মধ্যে কিছু গরমিল রয়েছে। ১৯৪৯-এর এপ্রিলে পোস্টকার্ডের দাম ছিল ৯ পাই—৫ নয়া পয়সা নয়। নয়া পয়সার প্রচলনই হয়েছিল ১৯৫৬ সালে। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত ৬ষ্ঠ জর্জের প্রতিকৃতি ছাপা পোস্টকার্ডের দাম ছিল আধ আনা ; তাও আগেকার ৯ পাই দামকে হাতছাপ দিয়ে কমিয়ে আধ আনা করা। ১৯৪৭-এর ৭ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ত্রিমূর্তি ছাপা ৯ পাই দামের পোস্টকার্ডই স্বাধীন ভারতের প্রথম পোস্টকার্ড যার দাম আর নকশা ১৯৫৬ পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল। কাজেই ৪৯-এর এপ্রিলে অমৃত রায়ের যে পোস্টকার্ড সুভাষ বাবু পেয়েছিলেন তার দাম কোন মতেই ৫ নয়া পয়সা হওয়া সম্ভব নয়।

১৯৫০ সালে প্রচলন হয়েছিল ৬ পাই দামের লোকাল ডেলিভারী পোস্টকার্ড-এর। প্রবোধ সান্যালের যে পোস্টকার্ড সুভাষবাবু পেয়েছিলেন ৫১-এর মার্চে সেটা সম্ভবত এই লোকাল ডেলিভারী পোস্টকার্ডই ছিল। তবে দাম ১/২ আনা নয়—৬ পাই। পাই আর পয়সার মধ্যেও সুভাষবাবু গণ্ডগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। শম্ভু মিত্রের যে পোস্টকার্ড তিনি ৫০-এর ডিসেম্বরে পেয়েছিলেন সেটার দাম ছিল ৯ পাই—৯

পয়সা নয়। ১২ পাই-এ ১ আনা হিসাবে ৯ পাই হল ৩ পয়সা। সত্যেন রায়ের লেখা পোস্টকার্ডের দামও ৯ পয়সা নয়, ৯ পাই ছিল।
অনেক কিছুর সঙ্গে মুদ্রাব্যবস্থার মাপও বদলে গেছে। পাই, পয়সা, আনা, সিকি, আধুলী বদলে নয়া পয়সা—নয়া পয়সার নয়া গিয়ে শুধুই এখন পয়সা। আগেকার সেই পুরানো মাপের কথা এখনকার যারা জানে না, তাদের জন্য পুরানোকে সঠিক মাপে উপস্থিত না করলে পুরানোকে অবমাননা করা হয় আর স্মৃতিচারণের নস্ট্যালজিয়ার রেশটাও যায় কেটে।
সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর লেখায় ভুল ধরার চেষ্টা আমার মত লোকের কাছে ধৃষ্টতার নামান্তর হয়তো—আশাকরি সুভাষবাবু নিজগুণে মার্জনা করে নেবেন।

চন্দন নিয়োগী
কলকাতা-৭০০০৫৪

প্রসঙ্গ জাতীয় সংহতি

'দেশ' পত্রিকায় ১৬ আগস্ট সংখ্যায় জাতীয় সংহতি সম্পর্কিত চারটি প্রসঙ্গের জন্য ধন্যবাদ। শ্রীগৌরকিশোর ঘোষের প্রবন্ধটির জন্য আপনাকে ও শ্রীঘোষকে অজস্র ধন্যবাদ। উপলব্ধি ও দর্শন মিলেমিশে ঐ প্রবন্ধটি বাস্তবিক একটি দ্যুতি লাভ করেছে। জাতীয় সংহতি সম্পর্কে তথাকথিত আবেগ ও শিশুসুলভ উদ্বেগ শ্রীঘোষের প্রবন্ধকে স্পর্শ করেনি। কাটা কাটা বাক্যে, নগ্ন পবিত্রতায়, আন্তরিক উপলব্ধির আর্দ্রতায় জাতীয় সমস্যাকেন্দ্রিক এমন প্রসঙ্গ ইদানীং কালে বহুদিন পড়িনি।
জাতীয় সংহতি নিয়ে সাধারণ মানুষ (বঙ্কিমী ভাষায় হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত) কতোটা চিন্তিত—অথবা আদৌ চিন্তিত কিনা—তার তার একটা নিরপেক্ষ সমীক্ষা প্রয়োজন। একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায়, এই প্রশ্নের সম্মুখীন হলে বর্ধমানের প্রবীর সামন্ত বা মেদিনীপুরের নীলকণ্ঠ দিন্দা বা হুগলীর দিবাকর আদক ঈষৎ ভিন্ন ভঙ্গিতে যথেষ্ট বিস্ময়ে পাল্টা প্রশ্ন করবে: সংহতি কে বাবু? জাতীয় সংহতি নিয়ে সাধারণ মানুষ চিন্তিত না হলেও রাজনৈতিক নেতাদের যে এ ব্যাপার চিন্তিত করে তুলেছে তার প্রমাণ পাই ভাষণে-বিবৃতিতে, কমিটি গঠনে—সেনা নিয়োগে। এমনতর কথা নেতৃবৃন্দের পক্ষে শোভা পাবে যে, গুরুতর সমস্যার পূর্বাভাস তাঁদের সচেতন মনের র‍্যাডারযন্ত্রে ধরা পড়বেই প্রথমে, অতঃপর জন-সাধারণকে সম্যক চেতনাবান করে তোলার আয়াসসাধ্য দায়িত্ব তাঁরা পালন করবেন। সে দায়িত্ব পালনের তোড়জোড় হচ্ছে। তবু সেই আবেগ জন গণেশকে ঠিক ঠিকভাবে স্পর্শ করছে না। কেন এমন হল? আসলে, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে, 'সন্ত্রাসবাদী', 'বিভেদপন্থী' প্রভৃতি বিশেষণগুলি বড্ড ঢিলেঢালা হয়ে পড়েছে। আর এরই ছিদ্রপথ দিয়ে প্রতিদিন আঞ্চলিক দাবিতে নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে।
কিন্তু স্বাধীনতার প্রায় চার দশক পরে 'বিভেদপন্থা'র এই ব্যাপকতা কেবল কি 'বিদেশী মদত' বা 'গুটিকতক উগ্র মস্তিষ্কের উদ্ভাবন' কৌশল মাত্র! আবেগ দিয়ে দেখলে আপাতত ব্যাপারটা তাই বটে। কিন্তু নির্মোহ বুদ্ধি আমাদের নিয়ে যায় উৎসের দিকে। সেখানে পাওয়া যায় সামাজিক-রাজনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক কারণের জটিল যোগফল।
প্রসঙ্গত ইংরেজ আমলের কথা উত্থাপন করতে পারেন কেউ কেউ। ঠিক কথা, ঐক্য ঐক্য ভাব একটা ছিল। একথাও বেঠিক নয় যে, ইংরেজ শাসনাধীন ভারতে—প্রায় সিপাহী বিদ্রোহের সমকালে—রাষ্ট্রিক ঐক্য একটা মোটামুটি চেহারা নিয়েছিল কিছু অলিগলি ও বাঁকচুর সত্ত্বেও। সে যুগটা ছিল এক বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যের যুগ। সেই ঘটনাপরম্পরায় উদ্ভূত, আবেগাচ্ছন্ন, তাৎক্ষণিক ঐক্যবোধকে স্বাধীনতা-উত্তরকালে জাতিতে জাতিতে মানসিক সংযোগের মাধ্যমে, সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পথে, পারস্পরিক স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধায় দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপনের সম্ভাবনা ছিল। সেই সম্ভাবনাকে সার্থক ও সফল

নিবেদন
এই সংখ্যায় 'পূর্ব-পশ্চিম' প্রকাশ করা সম্ভব হল না বলে দুঃখিত।
সম্পাদক

করা গিয়েছে কি ? এর এক চটজলদি উত্তর রাষ্ট্রনৈতিক নেতারা দিতে পারেন। কেন, সাহিত্য অকাদেমী-বেতার-দূরদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে আন্তঃপ্রাদেশিক সংস্কৃতি ও জনজীবনকে তো তুলে ধরা হয়। হয় ঠিক কথা, কিন্তু সে যোগ বুদ্ধিগত, হৃদয়গত নয়।

রবীন্দ্রনাথ—একমাত্র রবীন্দ্রনাথই স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই সব উত্তাল দিনে অনুত্তেজিত চিত্তে বারংবার বলবার চেষ্টা করেছিলেন 'দেশমাতা'র পরিচ্ছন্ন, বাস্তব ধারণা লাভের কথা।

কে অস্বীকার করবে আজ যে বিভেদপন্থী আন্দোলনগুলির গভীর উৎসে আছে সন্দেহ আর অবিশ্বাস! ভারতবর্ষীয় প্রদেশাঞ্চলগুলির অসম বিকাশ রাষ্ট্রশক্তির পক্ষপাতকেই প্রকারান্তরে প্রমাণ করে নাকি ? এবং এই পক্ষপাতের ফলে কোন অঞ্চলে বা কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে যদি ক্ষোভ জেগে ওঠে—সেই ক্ষোভ যদি তাকে নিরন্তর পীড়িত করে, তাহলে সে কি রাষ্ট্র ব্যাপারে আপন সংযুক্তি সম্পর্কে প্রশ্নহীন আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে ? এরও তো একটা বিচার হওয়া প্রয়োজন যে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সুবিধাভোগীদের মধ্যে কারা আছে— কোন কোন অঞ্চল—কোন কোন সম্প্রদায়ের মানুষ ? শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ প্রবন্ধের সূত্রপাতেই প্রশ্ন তুলেছেন : সংহতি—কার সংহতি ? জাতির ? মনে রাখতে হবে ইউরোপের মতো ভারত এক জাতির দেশ নয়; সুতরাং রাষ্ট্রিক ঐক্যের বিধিবদ্ধ পথে এ দেশে প্রকৃত জাতীয় সংহতি আনয়ন করা সম্ভব নয়। জাতিসত্তায় স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য স্বীকার করে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে আমাদের—আন্তরিকভাবে প্রতিটি জাতিসত্তার চরিত্র আবেগ ক্ষোভকে অনুধাবন করতে হবে। স্বাধীনতার পর থেকে রাজনৈতিক কৌশলের শিকার হয়েছে এরা। ভারতবর্ষীয় পরিপ্রেক্ষিতের উপর দাঁড়িয়ে স্বাধীন ভারতের নেতৃবৃন্দ জাতীয় সংহতির সমস্যার সমাধান সন্ধান করেননি, বরং বিপরীত দিকে বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনাগুলি (যেমন দেশভাগ, দাঙ্গা, ভাষাভিত্তিক অঞ্চল বিভাগ) চেতনে-অবচেতনে গতিবেগ লাভ করেছিল।

আজ ঘরে আগুন লেগেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বললে আজ কূপ খননের ('লোকহিত' প্রবন্ধ) চেষ্টা বৃথা। তবু যদি পূর্ববর্তী ত্রুটি-বিচ্যুতিকে সরল স্বীকারোক্তির মাধ্যমে শিরোধার্য করে অগ্রসর হওয়া যায়, যদি সমস্যাটার শুধুমাত্র রাজনৈতিক সমাধানের পথে না গিয়ে সামাজিক- সাংস্কৃতিক- মনস্তাত্ত্বিক সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়া যায় তাহলে কিছু সুফল পাওয়া যাবে।

দিলীপ মজুমদার
কলিকাতা-৬০

মডেল স্কুল

৩০ আগস্ট তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত "মডেল স্কুল, প্লেটো ও আমরা" শীর্ষক প্রবন্ধটির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। এত সুচিন্তিত শিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধ সম্প্রতি খুব কমই পড়েছি। তবে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আলোচনার পর রূপায়ণপর্বে যত দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলেন সে বিষয়ে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। যে কোন পরিকল্পনার রূপায়ণের দিকটাই প্রধান বিচার্য বিষয় এবং তা বিচার করার সময় দেখতে হবে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি।

কিছুদিন আগে রাঁচীর জেলা শিক্ষা সুপারিন্টেন্ডেন্টের অফিসের এক খবরে প্রকাশ প্রত্যেক প্রাইমারী শিক্ষক পদের জন্য পাঁচ হাজার টাকা করে ঘুষ নেওয়া হয় এবং বহু প্রকারের হিসাবের কারচুপি প্রকাশ পেয়েছে। ঐ অফিসের ছোট-বড় কর্তাদের নামে এবং বেনামে তিনটি অ্যাম্বাসাডার গাড়ি ট্যাক্সি হিসাবে চলছে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। মডেল স্কুলের প্রথম উদ্দেশ্য গ্রামাঞ্চলের মেধাবী ছাত্রদের সুযোগ দেওয়া। কার্যত যা দাঁড়াবে তা হল সারা জেলার বিত্তশালী মাতব্বরদের নিজেদের এবং আত্মীয়স্বজনদের ছেলেমেয়েদের মিথ্যা ঠিকানা দিয়ে ভর্তির জন্য বেপরোয়া ঘুষের প্রতিযোগিতা চলবে। বিহার রাজ্যে মোট সাতটি মডেল স্কুলের জন্য আপাতত স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। একান্ত সৎভাবে অনুসন্ধান করলেই জানা যাবে যে প্রধানত বড় বড় জমিদারদের যে সমস্ত পতিত জমি অনাবাদী হয়ে পড়ে আছে সেইগুলিই সরকারি টাকায় সংস্কারের চেষ্টা চলছে। যে সমস্ত স্থান নির্বাচন করা হয়েছে লক্ষ করলেই দেখা যাবে সেগুলি বড় বড় শহর বা বাণিজ্য-কেন্দ্র থেকে বহু দূরে। বিহার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের বিদ্যুৎ সরবরাহের বর্তমান অবস্থা হল বড় বড় খনি এবং কারখানাগুলি কখনও তার ওপর নির্ভর করতে পারে না আর গভীর নলকূপের সাহায্যে জল সরবরাহের কথা গরীব চাষী স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। কারণ ওটা শুধু বড় বড় জমিদারদের খাস দখলের জমির জন্য। এমতাবস্থায় সুদূর গ্রামের মধ্যে রেডিও টিভি ও মাইক্রোকম্পিউটারের সাহায্যে শিক্ষাদানের অবস্থা কেমন দাঁড়াবে তা একবার ভেবে দেখুন।

কয়েক বছর আগে বিহার সরকারের অ্যাডাল্ট এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট নাকি সারা ভারত প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। কার্যত যা হয়েছে তা হল নাইট স্কুলের জন্য বরাদ্দ হাজার হাজার লণ্ঠন এবং ব্যারেল ব্যারেল কেরোসিন তেল কারখানা এবং ডিপো থেকে সরাসরি এই রাজ্যের এবং শোনা যায় অন্যান্য রাজ্যেরও খোলা বাজারে চলে গেছে। পরিস্থিতির বাস্তব পরিচয় না থাকলে কল্পনা করা যায় না অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুতরাং মডেল স্কুলের তাত্ত্বিক কাঠামো বিচার করার আগে বর্তমান সমাজ এবং তার কার্যকর পরিস্থিতি আগে বোঝা দরকার। প্রথম প্রশ্ন হল বিহার রাজ্য সরকারের সদর দপ্তর থেকে শুরু করে (যেখানে নাকি মন্ত্রী মহোদয়দের ফাইল পর্যন্ত বিশিষ্ট লোকেদের বাড়িতে থাকে) সুদূর গ্রামের ব্লক অফিস এবং থানা পর্যন্ত যে চরম দুর্নীতি, অবাধ টাকার খেলা এবং ঠেঙ্গাড়ে বাহিনীর রাজত্ব চলছে তার মূল কারণ কি ? মূল কারণ হল গণতান্ত্রিক চেতনার ব্যাপক অভাব। এই বিংশ শতাব্দীতে অরওয়াল গ্রামের গান্ধী লাইব্রেরীর প্রাঙ্গণেই ১৫/২০ জন গরীব চাষীকে হত্যা করে লাশ পাচার করে দেওয়া হল, কিন্তু সারা দেশে তার কতটুকু প্রতিবাদ উঠল ? এই অনগ্রসরতার মূলে হল শিক্ষার চরম অভাব। স্বাধীনতালাভের পর প্রায় চল্লিশ বছর পার হয়ে গেলেও কোন সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটল না সারা সমাজের মধ্যে। শুধু বিহারেই নয়, এমন অনগ্রসরতা অনেক রাজ্যেই হয়েছে।

সুতরাং আজ নূতন শিক্ষানীতির নামে জেলায় জেলায় গৌরী সেনের টাকায় যে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধের আয়োজন হচ্ছে তার আগে একান্তভাবে প্রয়োজন ছিল প্রাইমারী স্কুলগুলির খড়ের চাল মেরামত করা, মেঝে পাকা করা, কিছু চেয়ার বেঞ্চি আনা, শিক্ষকদের নিয়মিত মাইনে দেওয়া আর প্রকৃত স্কুল চলছে কিনা তা পরিদর্শন করা। বর্তমানে কি প্রাথমিক, কি মাধ্যমিক স্কুলগুলির বাৎসরিক পরিদর্শন অতীত ইতিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জেলার সদর দপ্তরগুলির শিক্ষা বিভাগ যদি কোন কাজ না করে, দিল্লি থেকে টাকা পাঠিয়ে মডেল স্কুল চলবে কিভাবে ? শুধু টাকার হরির লুঠ হবে নাকি ?

আজ সারা দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার যদি কোন উন্নতিসাধন করতে হয় তবে প্রথমেই প্রয়োজন গ্রামের প্রাথমিক স্কুলগুলির সংস্কারসাধন যা কিনা স্বাধীনতালাভের চল্লিশ বছরেও সম্ভব হল না ।

হৃদয়রঞ্জন পাল

গোমিয়া, বিহার

ফেস্টিভ্যালের ডিরেক্টর

৩০ আগস্ট সংখ্যার 'দেশ'-এ পার্থপ্রতিম চৌধুরীর "ফেস্টিভ্যালের ডিরেক্টর" পড়লাম । আমরা সাধারণ দর্শক, ছবির জগতে কারা কীভাবে নাক উঁচু করে চলেন তার খবর রাখি না । তাই পার্থপ্রতিমবাবুর দেওয়া অনেক তথ্য মেনে নিতে পারি । কিন্তু দর্শকের কাছে পৌঁছনোর ব্যাপারে তিনি যেভাবে সমস্ত "ফেস্টিভ্যালের ডিরেকটর" দের একই শ্রেণীতে ফেলেছেন, সেটা মানা যায় না । যেমন "পার" ছবিটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়ার পরও পরিচালক গৌতম ঘোষ সাংবাদিকদের বলেছিলেন, যেহেতু তাঁর ছবির পরিবেশক পাওয়া যাচ্ছে না (এবং ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে না) সেহেতু তাঁর ছবি তৈরীর কেরিয়ার-ই বিপন্ন হয়ে পড়েছে । পরের ছবির কথা তিনি ভাবতেই পারছেন না । আবার, "চোখ" ছবিটি মুক্তি পাওয়ার আগে পরিচালক উৎপলেন্দু চক্রবর্তী বলেছিলেন, তাঁর প্রথম ছবি চলেনি । এখন এই ছবিটিরও যদি একই অবস্থা হয়, তবে তিনি আবার স্কুলে মাস্টারী করতে চলে যাবেন । এ দুটি উদাহরণ কিন্তু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে । শ্রীচৌধুরী তথাকথিত "দর্শকের পরিচালক" বা "পিপলস্ ডিরেক্টর" দের সম্বন্ধেও যদি অদূর ভবিষ্যতে কোন তথ্য দেন, তবে আমরা উপকৃত হব । অবাস্তব, বস্তাপচা কাহিনী, মোটা দাগের সেন্টিমেন্ট, অপ্রয়োজনীয় যৌনতা ও মারপিট, নিচু মানের টেকনিক্যাল কাজ, কান-ঝালাপালা-করা সঙ্গীতকে মূলধন করে যারা "দর্শক প্রশংসাধন্য" ছবি করেন, তাঁদের ছবি করার যোগ্যতা কতটুকু ? আবার বাংলা ছবি পয়সা পাচ্ছে, এটা তো আনন্দের কথা, কিন্তু আরও ভালভাবে কি পয়সা পাওয়া যায় না ? দর্শক যা খাবে, তাই 'খাওয়াবো' এর নাম কমিউনিকেশন নয় । অন্তত 'পথের পাঁচালী', 'গোল্ড রাশ' (পার্থপ্রতিমবাবুর উদ্ধৃতি অনুযায়ী) এভাবে greater people-কে meet করেনি ।

পিনাকী চক্রবর্তী

কলকাতা-৩৮

॥ ২ ॥

৩০ আগস্টের দেশ-এ বাংলা চলচ্চিত্র নিয়ে শ্রীপার্থপ্রতিম চৌধুরী যে মুক্তচিন্তা করেছেন তাতে চিন্তার বদলে আছে নিছক অশোভন উষ্মাপ্রকাশ । তাঁকে নিম্নলিখিত বিষয় কটি সম্পর্কে একটু 'চিন্তা' করতে অনুরোধ করব : (১) এমন কোনো প্রমাণ আছে যে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম

ঘোষ বা উৎপলেন্দু চক্রবর্তী মনে করেন (নাম না করলেও বোঝা যায় এঁরাই আক্রমণের লক্ষ্য) যে, শুধু প্রাইজ পেলেই তাঁরা খুশী, অধিক সংখ্যক দর্শক তাঁদের ছবি না দেখলে তাঁদের কিছু আসে যায় না ? সে ব্যাপারে তাঁদের 'শ্রদ্ধেয় মৃণালদা' বা 'শ্রদ্ধেয় মাণিকদা'র মত কোনো বেদনাবোধ হয় না ? (২) ঐ দুই "শ্রদ্ধেয়" তাঁদের কোনো কোনো ছবি "চলেনি" বলে আহত হতে পারেন—কিন্তু সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা সে রকম ছবি তৈরি করা বন্ধ করে "আপামর জনসাধারণ"কে খুশী করার জন্য কি 'রূপাবৌদি' ধরনের ছবি করেছেন ? না কি তাঁরা 'খণ্ডহর' বা 'পিকু— সদগতি'র মত ছবিই করে চলেছেন ? ঋত্বিক ঘটকের "কোমল গান্ধার" চলেনি বলে তিনি কি "সুবর্ণরেখা"তে বাজারি ছবির মালমশলা সুকৌশলে মিশিয়ে দিয়েছিলেন, অথবা 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পোতে ?' (৩) 'আপামর জনসাধারণ' নামক মিথটির পেছনে পার্থবাবু কি কোনো co-ulated statistics-এর ভিত্তি আছে মনে করেন ? আমরা এইটুকু জানি যে কোন কোন সিরিয়াস ছবি চলে যথা—'পথের পাঁচালী' আবার কোনোটা চলেনি যথা "পরশ পাথর" বা "অপরাজিত" । এর পেছনের কারণ অনুসন্ধান অনেক চিন্তা সাপেক্ষ । পক্ষান্তরে দেখা গেছে এক বা দু দশক পরে এককালের না চলা ছবি পরে "চলেছে"—যথা "পরশ পাথর" । নন্দন-এর শোতে এ ধরনের ছবির বর্তমান সাফল্য কি পার্থপ্রতিমবাবু লক্ষ করেছেন ? অর্থাৎ এককালের ছবি অন্যকালের "আপামর জনসাধারণের" একটা অংশ গ্রহণ করতে শেখে যদি তাদের ক্রমাগত ধৈর্য ধরে সে চেষ্টা করা যায় । "কাঞ্চনজঙ্ঘা" এখন একবার প্রদর্শিত হলে পার্থবাবু ব্যাপারটা টের পেতেন সম্ভবত । (৪) পার্থবাবু কি জানেন যে আপামর জনসাধারণ যাতে শিল্পসম্মত ছবির দিকে না ঝোঁকে তাই সে ধরনের ছবির প্রদর্শনের বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত এদেশে কাজ করে ? তিনি কি জানেন কলকাতায় 'পার' এর সাফল্য বোম্বাই-এর বাজারী ছবির মহলে ভয় ধরিয়েছে যাতে 'পার' সর্বভারতীয় মুক্তি সহজে পাচ্ছে না ? তিনি জানেন না এই কারণেই "শতরঞ্জ কে খিলাড়ী"র কী দশা হয়েছিল প্রদর্শনের ক্ষেত্রে, বা বর্তমানে 'অন্ধিগলি'র ক্ষেত্রে কী হচ্ছে ? "আপামর জনসাধারণ" বিষয়ক populism কে মূলধন করেই বোম্বে-ভিত্তিক একটি ফিল্মতত্ত্ব গড়ে উঠছে যার বক্তব্য মোটামুটি এই— সত্যজিৎ-মৃণাল আসল ভারতীয় শিল্পী নন—আসল শিল্পী হলেন রাজ কাপুর, গুরু দত্ত, শান্তারাম । অনেকে এক নিঃশ্বাসে রাজ কাপুর, গুরু দত্ত, ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায় নামগুলি উচ্চারণ করছেন । এইভাবে বাজারী ছবির একটা এথিকস খাড়া করার চেষ্টা হচ্ছে যাতে "আপামর জনসাধারণ"কে চিরকালই সিনেমার মাধ্যমে ঘুমের বড়ি গিলিয়ে ঘরে পয়সা তোলা যায় ।
বিপদ এই যে এই ধরনের "মুক্তচিন্তা"-য় উল্লসিত হয়ে আমাদের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা ভাববেন হ্যাঁ, এককালের কোয়ালিটি ফিল্ম মেকারের মধ্যেও সম্প্রতি "আমাদের লোক" রয়েছে : এতে সিরিয়াস চলচ্চিত্র তৈরি ও চর্চার পথ আরো বন্ধুর হবে । বেণেরা আরো জাঁকিয়ে বসবেন—এই ব্রাত্য শিল্পাঙ্গে বরাবরের মত অশিক্ষার দৌরাত্ম্য বজায় থাকবে ।

ধ্রুব গুপ্ত

কলকাতা-৪৫

রক্তচাপ

'ঘরে বাইরে'-তে কিছু অসুখ ও তার প্রতিকার পথ্য

সম্পর্কে পড়লাম। উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন, এমন লোকের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। প্রধানত যাঁরা কম পরিশ্রম করেন ও বেশি খাদ্য গ্রহণ করেন, তাঁরা উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন। তার সঙ্গে নানা টেনশান, অনিদ্রা ইত্যাদি তো আছেই। সুতরাং উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের পরিশ্রম বা ব্যায়াম করতে হবে। শ্রেষ্ঠ উপায় হল প্রচুর হাঁটা। খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে চর্বি জাতীয় বা অধিক শর্করা জাতীয় খাদ্য বর্জন করতে হবে। 'শ্রীমতী' লেবু-জল বিধান দিয়েছেন। কিন্তু যাঁদের অম্বল আছে তাঁরা লেবু-জল খেলে বিপাকে পড়তে পারেন। রক্তচাপ এবং অম্বল সাধারণত পাশাপাশি থাকে। এ ক্ষেত্রে ঈষদুষ্ণ জল এবং ফ্রিজড্ দুধ খুব উপকারি। বেগুনপোড়া লবণ খাবার ভয়ে বর্জন না করে, বিনা-লবণে খেলে উপকার পাওয়া যাবে। যে বাচ্চাদের ক্রিমি আছে, তাদের আনারস পাতার রস ও চুণের জল দিলে ভালো কাজ পাওয়া যাবে। সমস্ত ধরনের বয়স্ক রোগীদের পক্ষে আদর্শ ফল হল শসা ও পাকা পেঁপে। বাচ্চাদের আপেলের পরিবর্তে পেয়ারা দিলে বেশি সুফল পাওয়া যাবে।

মৃণাল বণিক
দুর্গাপুর-৫

বাবু জগজীবন রাম

সুমন চট্টোপাধ্যায় লিখিত ৩০ আগস্ট "দেশ" সংখ্যায় প্রবন্ধটি পড়ে একটি কথা মনে এলো।

পরলোকগত আই· সি· এস· টি· পি· সিং (জুনিয়র) বহুদিন ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগে সচিব ছিলেন। উনি প্রায়ই বুদ্ধিমত্তা এবং দক্ষতার জন্য যে দুজন রাজনৈতিক নেতার নাম উল্লেখ করতেন— তাঁরা হলেন বাবু জগজীবন রাম ও সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। বাবুজী সম্বন্ধে উনি একবার বলেন যে F.A.O.র বার্ষিক সভায় যোগদানের জন্য খাদ্যমন্ত্রী শ্রীরাম রোম রওনা হচ্ছিলেন। একশো পাতার বিরাট বক্তৃতা উনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পালাম বিমানবন্দর পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তায় পড়ে ফেল্লেন। পাশে বসে ছিলেন শ্রীসিং। গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি লাল দাগ দিয়ে সেই বিরাট প্রতিবেদন মাত্র তিরিশ পাতায় নেমে এলো। শ্রীসিং হলেন বিস্মিত। এতো দ্রুতগতিতে বক্তৃতার মূল বক্তব্য শ্রীরাম বুঝে এবং বুঝিয়ে দিলেন যে ঝানু আই·সি·এস·-এর শ্রদ্ধা বেড়ে গেলো।

রাজনীতিতে প্রচুর বিত্তবান হওয়া সত্ত্বেও বাবু জগজীবন রাম ছিলেন খুবই সহৃদয় এবং পরোপকারী। ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছেও তিনি রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের মতই ছিলেন সহজ, সরল ও বিনয়ী।

সুবল গাঙ্গুলী
পাটনা-১৩

॥ ২ ॥

সুমন চট্টোপাধ্যায়ের 'বাবু জগজীবন রাম' শীর্ষ-নামায় আলেখ্যটি (দেশ, ৩০-৮-৮৬) পড়লাম। শ্রী চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "জগজীবন ক্ষমতার শীর্ষে উঠে আসতে পেরেছিলেন স্রেফ ভাগ্যের জোরে নয়',...'চরম বিরুদ্ধ ও প্রতিকূল পরিবেশ থেকে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে করতে তাঁকে উঠে আসতে হয়েছিল'...এবং 'জগজীবনের বহুমুখী প্রতিভার মধ্যে অন্যতম ছিল তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা।' সাংবাদিক শ্রীচট্টোপাধ্যায় নিশ্চয়ই জগজীবনের বহুমুখী প্রতিভা ও প্রশাসনিক দক্ষতার অনেক পরিচয় জানতেন। তিনি তাঁর কিছুই আলোচনা করেননি। জগজীবন যখন শ্রমমন্ত্রী ছিলেন, তিনি 'মিনিমাম ওয়েজ' কথাটা বলেছিলেন, শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য ই এস আই স্কীম চালু করেছিলেন। যখন পরিবহন মন্ত্রী ছিলেন, আকাশপথকে জাতীয়করণ করে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সে সময়ে। রেলমন্ত্রী থাকাকালীন অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারে অনেক সতর্কতা নিয়েছিলেন এবং তাঁর সময়ে একটাও রেল দুর্ঘটনা ঘটেনি। কৃষিমন্ত্রী থাকাকালে গ্রামাঞ্চলে জলসেচের প্রভূত উন্নতি করে কৃষি-উৎপাদনে ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছিলেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে পাকিস্তানের নাগপাশ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার সাক্ষ্য বহন করে। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জগজীবনের প্রতিভার আরও অনেক অজানা দিক হয় তো আমরা জানতে পারতাম। জীবনে প্রধানমন্ত্রী না হতে পারায়—'এরপর বাবুজি দিগভ্রান্ত পথিকের মত

আচরণ করেছেন।' নিবন্ধের উপসংহারে তিনি একথাও বলেছেন, 'তিনি হরিজনদের ব্যবহার করেছেন নিজের স্বার্থে। চাণ্ডোয়াগ্রামে বাবুজি গড়েছেন চোখ ধাঁধানো রাজপ্রাসাদ।...মানুষের মৃত্যুর পর তার সুখ্যাতি করাটা এদেশে রেওয়াজ। তবু সত্যের খাতিরে বোধ হয় এই অপ্রিয় সত্যটাও স্বীকার করা প্রয়োজন।' আমি একজন অতি সাধারণ মানুষ এবং বিনয়ের সঙ্গে বলছি সমস্ত মানব সভ্যতার মূলসূত্র একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করে যে, 'ম্যান ওয়ারস নট উইদ দ্য ডেড'। তাহলে সুমনবাবু সদা প্রয়াতের শরীর নিয়ে এই কাটাছেঁড়া না করলেই পারতেন। বরং তাঁর ভালোর দিক নিয়ে তিনি তার জোরালো কলম ধরে গভীর আলোচনা করতে পারতেন। ভারতীয় রাজনীতিতে মীচাফেট্টি বাঁধা খোলা, চুলদাড়ি না-কাটা, আবার প্রয়াগতীর্থে উৎসব করে চুলদাড়ি কাটা, চরণ সিংকে রামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে তার 'দাস হনুমান' বলে দাবি করা প্রভৃতি ঘটনার নায়ক রাজনারায়ণকে আমরা জানি। অনেক কাগজ সেদিন তাঁকে 'রাজনীতির ভাঁড়' বলে আখ্যা দিয়েছিল। সেই রাজনারায়ণের জগজীবন সম্পর্কে বিমান কেনা সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ কতটা সত্যমিথ্যা জানা নেই। এই প্রসঙ্গে লেখক কর্তৃক তার উল্লেখ দ্বারা প্রয়াত মানুষটিকে অসম্মান করা ছাড়া আর কিছু হয়নি বলে ধারণা হয়। শ্রীচট্টোপাধ্যায় এক জায়গায় বলেছেন, 'যে মন্ত্রকের দায়িত্ব তিনি (জগজীবন) পেয়েছেন সেখানেই অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন চাকরির।' বক্তব্যটিকে ব্যাখ্যা না করে লেখক শুধু ধোঁয়াশার সৃষ্টি করেছেন। স্পষ্ট কথা, অনুন্নত শ্রেণীর তপশিলিদের জন্য ১৫% ও উপজাতীদের জন্য ৭·৫% চাকরি সরকারি নিয়মে স্বীকৃত। সরকারি নিয়মের কোন শিথিলতা চোখে পড়লে বিভাগীয় মন্ত্রি হিসাবে তিনি শিথিলতা বা গাফিলতি দূরীভূত করেছেন মাত্র। তার মধ্যে কারচুপি কিছু ছিল কি? জগজীবনের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ঘটা করে শোক পালন শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের কাছে যুক্তিহীন মনে হয়েছে।

সত্যিই তো, সরকারি সর্বোচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তি কর্তব্যরত অবস্থায় মারা না গেলে এত ঘটা করে শোক প্রকাশ কেন? যতদূর মনে পড়ে জয়প্রকাশজি মারা গেলে, তিনি যদিও সরকারের কোন পদাধিকারী ছিলেন না তবুও, তাঁকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। পরিশেষে একটা কথা। মনে হয়, ভারত গণপ্রজাতন্ত্রী দেশ এবং সেখানে বাবুজি গণতন্ত্রের এক পুরোধাপুরুষ এই জন্যে যে, তিনি পরপর একই কেন্দ্র থেকে আট বার পার্লামেন্টের আসনে দাঁড়িয়ে প্রতিবার বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিলেন এবং আমৃত্যু তিনি এক অপরাজিত জনগণ প্রতিনিধি। সেই গৌরব-গরিমা ভারতের মত বিশাল দেশে আর কোন রাজনৈতিক নেতার নেই।

মনোহর বিশ্বাস
কলকাতা ৭০০০১৫

ভয়ের মুখোশ তার

চতুর্দিকের দুঃখ মৃত্যু বিচ্ছেদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ যে একটা 'তবু' যোগ করতে পেরেছিলেন তার কারণ আনন্দ অমৃত ও অনন্তের একটা আদর্শ তাঁর জীবনের নিষ্কম্প বিশ্বাসের মধ্যে ধ্রুব হয়ে ছিল। ভূমার বোধ থেকেই ভয় দূর হয়, বৃহৎ জগৎ থেকে স্খলিত ও বিমুখ না হবার শক্তি আসে। অল্প নিয়ে যে বিভোর থাকে তার বিপদ এইখানেই যে, সে অল্পকেও পায় না, ভূমাকেও হারায়। কথাটা আমরা শিক্ষিত মানুষ মাত্রেই জানি কিন্তু আমাদের সকলের কাছেই কথাটা আজ বেকার হয়ে গেছে, রূপায়ণের মধ্য দিয়ে আকার পাচ্ছে না। অনেক দূরে তাকাবার দরকার নেই, বিগত চার দশকের মধ্যেই স্বাধীনতার এক অরাজক অচল অবস্থা কর্তব্যরত আমাদের প্রতিটি মানুষকেই কেমন অসাড় করে দিয়েছে। এই বিশাল জনস্থানের মধ্য থেকেই এক প্রবল আঁধি উঠে এসে আমাদের দিনকানা করে দিয়েছে। বিপুল উদ্দীপনা আর বৃহৎ উদ্যোগ নিয়ে যে কর্মযজ্ঞের পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার হবিকাষ্ঠ থেকে বিস্তর ধূম উদ্গীর্ণ হয়েছে কিন্তু আগুন জ্বলেনি। পরের মূল্যে কেনা স্বাধীনতার মর্ম বোধগম্য হয়নি, মমত্ব আসেনি। পরের ওপরে দেনা শোধবার ভার দিয়ে আমরা আখেরে মুনাফা বুঝে নিতে শিখেছি। ইতিহাস গেছে ঐতিহ্য গেছে ; চোখের সামনে একটা মানচিত্র আছে কিন্তু দেশ নেই। রাষ্ট্র এখন মধ্যপথের বিকল ঠেলাগাড়ির মত, চালকের আসনে যাঁরা বসে আছেন তাঁদের হাতে লোকদেখানো স্টিয়ারিং হুইল কিন্তু গাড়ি গড়াচ্ছে পিছনের ধাক্কায়। গোটা দেশের অগ্রগতির চেহারাটাই এরকম, গড়াচ্ছে বটে কিন্তু কোথায় কোন দিকে গড়াচ্ছে কেউ জানে না। জোড়াতালি, গোঁজামিলের প্রশাসন, আইন-কানুন তালগোল পাকানো, আরক্ষায় প্রতিরক্ষায় বিস্তর ঢক্কানিনাদ হচ্ছে থেকে থেকে। কিন্তু কাগজে কলমে ভরাট এই প্রগতিচিত্রের তলায় অনেক খানখন্দ, অনেক কারচুপি, বিস্তর গোলমাল। দেশ কথায় বেড়েছে, মাথায় বেড়েছে কিন্তু কাজে বাড়েনি। সাধারণ মানুষের জীবন ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে তার রাষ্ট্রিক জীবন থেকে। বৃহৎ কর্মক্ষেত্রের মধ্যে তার ভূমিকা যেমন কোণঠাসা হয়ে পড়ছে, সামাজজীবনেও তার স্বচ্ছন্দ গতি ধীরে ধীরে ব্যাহত হচ্ছে। কিছু মুষ্টিমেয় নীতিভ্রষ্ট, চরিত্রহীন, সমাজবিরোধী আর রাষ্ট্রঘাতকের চর অনুচর সহচর দেশ জুড়ে এক দুঃস্বপ্নের আবহাওয়া গড়ে তুলেছে। তারা চাইছে প্রতিটি মানুষের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে, বিভেদ সৃষ্টি করতে, বৈকল্য আনতে। এবং এই দুষ্কর্মে তারা অভাবিতভাবেই সফল হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। ঘরে-বাইরে বস্তুত আমরা বিকল, আত্মবিশ্বাস ক্রমশ হারিয়ে ফেলছি। ভয় আর ত্রাসের ভাবনা এখন শুধু আমাদের ঘরের চৌকাঠ আগলেই বসে নেই, মনের অর্গলেও তার থাবা বসিয়েছে। আমাদের আঙুলের ডগায়, চুলের গোড়ায় আতঙ্কের সিরসিরানি। প্রতিটি রোম অঞ্চিত করে যে ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চ উঠে আসছে জীবনের প্রতি পদে তা থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে খুঁজে আমরা অন্ধ হয়ে গেছি। বাতাসে সর্বক্ষণ বিপদের গন্ধ পাচ্ছি কিন্তু সঠিক দিক নির্ণয় করতে পারছি না। কারণ বিপদের প্রকৃত চেহারাটি আমাদের কারোই স্পষ্ট করে জানা নেই। আমরা বুঝতে পারছি না কখন কিভাবে সেই সংহার মুহূর্তটি আসবে। আমাদের জীবনসংসারের কোন দুর্বলতার জায়গায় সে তার বিষাক্ত নখ বেঁধাবে, মরণকামড় বসাবে। কিন্তু আমরা ভুলে গেছি সেই সত্য যে, বনের বাঘের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় কিন্তু মনের বাঘ অনিবার্য। বনের বাঘ একবারে একজনকেই মারতে পারে, কিন্তু মনের বাঘ এক সঙ্গে সকলকেই মেরে রেখে যায়।

এই বিভ্রান্তিকর অবস্থাই এখন আমাদের সমাজে। প্রতিটি মানুষ অসংখ্য মানুষের গায়ে গায়ে থেকেও নিজেকে নিঃসঙ্গ নিরাশ্রয় নিরাপত্তাহীন ভাবতে শুরু করেছে। ফলে জীবনের কোন ক্ষেত্রেই নিজের আদর্শকে টিকিয়ে রাখতে পারছে না। নিজের মত ও পথ থেকে সরে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত অনধিকার প্রবেশের পথ করে দিচ্ছে। নিজের স্বপক্ষে এই একলা ভাল মানুষদের একটাই যুক্তি, সমবেত দুর্নীতির বিপক্ষে আমি একা আর কি করতে পারি ? স্রোতের মুখে আমিতো কুটোর মতই ভেসে যাবো। ভেসে যাবে ছাপোষা মানুষের সংসার। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে বলেছে মৃত্যু উত্তীর্ণ হতে গেলে মৃত্যুর মধ্য দিয়েই যেতে হয়। ভয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা। জল পেরোতে হলে জলেই নামতে হয়। সাঁতার কাটতে গেলে জলকে দুহাতে নিজের দিকেই টানতে হয়। এবং সে কাজটা মানুষকে একাই করতে হয়। একার সাধ্য বড় কথা নয়, একার বিশ্বাসই বড় কথা। রামায়ণে এই বড় শিক্ষাটাই দেওয়া হয়েছে কাঠবেড়ালীর উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে।

চিঠির দর্পণে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পোস্টকার্ডে সে চিঠির দু-ছত্রে উত্তর এসেছিল। তাতে জানানো হয়েছিল গুরুদেবের আশীর্বাদ। লিখেছিলেন সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। তাতে রবীন্দ্রনাথের সই ছিল না ব'লে অভিমানী কিশোর সে চিঠি ফেলে দিয়েছিল। সে চিঠি কাউকে দেখায়ও নি। কিন্তু সেই কিশোরের অকপট মনের কথা অত বড় একজন মানুষ কিভাবে নিয়েছিলেন তা জানার জন্যে তার এতদিনের অশান্ত ব্যাকুলতা সুধাকান্তবাবুর উত্তরে শান্তির নীড় খুঁজে পেল।

১৫

সুরজিতের বারান্দা

বজবজে যাব।

তার আগে হালের একটা চিঠির কথা সেরে নিই। সময় পরে আর সে সুযোগ দেবে বলে মনে হয় না।

২৮·৭·৮৬-তে সুরজিৎ বসুর ভাই সেন্টু লিখছে : "দেশ-এ আপনার লেখা পড়ছি ও পড়ব। ...৩০ বছরের স্বপ্ন ভঙ্গ হওয়ার পর শেষ বেলায় নিজেদের বাড়ির স্বপ্ন দেখেছিলেন মেজদা। জীবিত কালে পারি নি। মৃত্যুর পর অফিস থেকে লোন নিয়ে ছোট্ট একটা বাড়ি করেছি। সামনে মেজদার জন্যে ছোট্ট বারান্দা করেছি। মেজদা বারান্দা ভালবাসতেন। মেজদার টেবিল ও চেয়ার আছে। আপনি যদি এদিকে আসেন কোনো অসুবিধা হবে না। আগে জানালে যাওয়ার টিকিট কেটে রাখব।"

চলো বজবজ

সবে পেনশন নিয়ে বাবা দেখছেন গায়ে ফুঁ দিয়ে বুড়োবুড়িতে তীর্থ দেখে বেড়াবার স্বপ্ন। সে আশার দীপ এক ফুঁয়ে নিবে গেল। আমাকে দায়মুক্ত করে।

একার ঘাড়ে আস্তে আস্তে দাদা তুলে নিচ্ছিল সংসারের ভার। অনেকদিন থেকেই সংসারে আমি খরচের খাতায়।

তিন মাসের আগে পরে বিনা মেঘের বজ্রাঘাতে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন প্রথমে মা। তারপর দাদা। দাদা তখন মাত্র তিরিশ ছাড়িয়েছে। মেয়ে তানিয়া চার, ছেলে পুনপুন দেড়। বাবা শোকে পাথর হয়েও বউদিকে পড়িয়ে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

আমাদের চারদিকে তখন পালাই পালাই রব। ইস্কুল-কলেজে আপিস-কাছারিতে ঢুকে পড়ে অনেকেই এতদিনের ব্যক্তিগত ক্ষতিগুলোকে যতটা পারে পুষিয়ে নিতে চাইছে। বাতাস ভরে উঠেছে হাহুতাশে। পার্টির ওপর তাদের অভিমান লাইন ভুলের জন্যে নয়। যেন কোনো ছেলেধরা ফুল শুঁকিয়ে তাদের ফুসলে নিয়ে গিয়েছিল। এখন তারা হাত কামড়াচ্ছে।

ওপর-ওপর ভেসে থাকা নয়। কোথাও বেশ একটু গভীরে ডুব দিতে হবে।

রমাকৃষ্ণ মৈত্র, দিলীপ রায় চৌধুরী, গীতা আর আমি—চার বন্ধুতে মিলে হঠাৎ একদিন উঠে বসলাম বজবজের বাসে। নেমেছিলাম চড়িয়ালে।

গ্রাম ব্যাঞ্জনহেড়িয়া। চটকল আর তেলকলের মজুরদের বাস। মাটির ঘর। সামনে এঁদো-পুকুর। বিশ টাকা ভাড়া। দুজনেই সর্বক্ষণের কর্মী। বিনা ভাতায়। লেখালিখি থেকে মাসে সাকুল্যে আয় পঞ্চাশ টাকা। একে অনিশ্চিত, তায় পাঁচ দশ টাকার কিস্তিতে।

তাই সই। চলো বজবজ।

নতুন ঠিকানা

'৭৩, ফকির মহম্মদ খান রোড। গ্রাম ব্যাঞ্জনহেড়িয়া। বজবজ। ২৪ পরগণা।'—এখন আমাদের এই নতুন ঠিকানা।

১৪·৫·৫২-তে সোমনাথ লাহিড়ীর চিঠি : 'সুভাষ, পরিচয়ে এসে তোমার দেখা পেলাম না। শুনলাম তুমি নিরিবিলিতে সাহিত্যসাধনা করার জন্যে বনবাস নিয়েছ, আবার পি-সি (প্রাদেশিক কমিটি) অফিসে শুনলাম যে তুমি ম্যাস কন্ট্যাক্ট করে উপন্যাস লেখার জন্যে বজবজ গেছ।

'যাই হোক, তোমার সঙ্গে দেখা হলে সুখী হতাম। কিছু বিজনেস টক-ও হয়ত করা যেত। শুনলাম তুমি শনিবার আসবে। তখন আবার চেষ্টা করব। যদি না পারি, আর তুমি যদি পারো তো আমার সঙ্গে সুবিধামত দেখ ক'রো। আমি আছি C/o জগদীশ চ্যাটার্জী, ৯৫/১ সার্পেনটাইন লেন (যে বাসায় আমি থাকতাম—জনযুদ্ধ আমলে)। ইতি—লাহিড়ী'

বনবাসই বটে! একেবারে জনারণ্যে।

না শুনেও তখন বুঝতে পারছিলাম পেছনে কে কী বলছে। আমরা যখন জেলে, শুনেছি কেউ কেউ তখন লেখকদের 'গ্রামে যাও', 'শ্রমিক মহল্লায় যাও' বলে হল্লা জুড়েছিল। কেউ সে কথায় কান দেয় নি। মাথার ওপর রাজনীতির ছড়ি ঘুরিয়ে সাহিত্য হয় না, সুবোধ বালকেরাও তা বিলক্ষণ বুঝেছিল।

'নিরিবিলিতে সাহিত্যসাধনা করার জন্যে'—কথাটা কখনই লাহিড়ীর নয়। এসব ছিল অন্যদের কথা। লিখেছিলেন আমাকে ক্ষ্যাপাবার জন্যে। নইলে আমাকে চিনতে লাহিড়ীর বাকি ছিল না।

আমাকে হাতে ধ'রে বাংলা লিখতে শিখিয়েছিলেন লাহিড়ী। দলা পাকিয়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে লেখা আমার গদ্য। একটা লেখা দশবার লিখিয়ে তবে ছেড়েছেন। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া। করেছিলেন আমাকে।

তাও কখন? যখন 'পদাতিক'-এর কবি হিসেবে বাংলাজোড়া আমার নাম।

অপমানের এক শেষ হয়ে মাঝে মাঝে গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে

করেছে। পরক্ষণেই পিঠে হাত। 'চলো, চা খেয়ে আসি।'
যোশীকে বাদ দিলে পার্টিতে এই ছিলেন আরেক অসাধারণ আশ্চর্য মানুষ যাঁর কিছুতেই কোনো মোহ ছিল না। ক্ষুরধার বুদ্ধি। রাজনীতিতে বরাবরই উগ্র। পুরোপুরি গ্রামবিমুখ নাগরিক। ভেতরে অসম্ভব নরম মন। বাইরে শক্ত খোলস। ভেতরের লোকদের কাছে পার্টির ধুড়ধুড়ি নেড়ে দিতে বাধত না। কিন্তু বাইরের হিংসুটে লোকে একটু খুঁত কাড়ুক তো দেখি! সঙ্গে সঙ্গে শুধু ফোঁস নয়, দাঁতের সব বিষ ঢেলে দিতেন।
বুকের রক্ত দিয়ে দুর্দিনে যারা পার্টিকে বড় করে গেছে, যারা কোনোদিন নিজের দিকে তাকায় নি—বছরে একবারও কি তাদের মনে করার আমাদের সময় হয়? যাদের বয়স কম, কেন তারা খেটেখুটে এঁদের জীবনী লেখে না? যেখানে প্রায় গোটা গুরুকুল আজ সহযাত্রীর কোঠায়, সেখানে, তারা হাতে করে ভাত ছড়ালে কাকের কি খুব একটা অভাব হবে?
লাহিড়ীর কথা শেষ হওয়ার নয়।
আমি সেই মুষ্টিমেয়ের একজন বেশির ভাগ সময় মতে না মিললেও যার প্রতি লাহিড়ীর ভালবাসায় কখনও টান পড়ে নি।
লাহিড়ী যখন মৃত্যুশয্যায় একটি কবিতা লিখে হাসপাতালে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বেলাদির মৃত্যু নিয়ে লেখা অসামান্য এক ব্যক্তিগত কবিতা।

গুজব

গোড়ায় গোড়ায় বাজারে গেলে বুঝতাম লোকে এ ওর গা টিপছে। ছোট জায়গা। বাইরের উটকো লোকদের সম্পর্কে কৌতূহল তো থাকবেই।
কাজেই ওসব গায়ে মাখি নি।
গুজবের বিষয়গুলো কানে এল অনেক পরে। ততদিনে বজবজের সবার সঙ্গেই ভাব হয়ে গিয়েছে।
একটা গুজব ছিল, কোনো বড়লোকের বউকে ফুসলে নিয়ে এসে গ্রামের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে আছি। টি টি-র ভাবটাতে একটু মন্দা পড়লে শিগগিরই যথাস্থানে ফিরে যাব।
আরেকটা গুজব ছিল, গ্রামের মধ্যে আমাদের এই আস্তানা গড়ার সঙ্গে গোয়েন্দাগিরিরও একটা সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়।
সন্দেহগুলো জ্যান্ত থাকা অবস্থায় এসব কানে এলে কী করতাম বলা মুশকিল। পিট্টান না দিলেও নিজের মধ্যে খানিকটা যে গুটিয়ে যেতাম তাতে সন্দেহ নেই।
মাটির বাড়ি। শুধু ছাদটা টিনের। বাইরে ছোট একটু বারান্দা। শানের মেঝে। সামনে ঝাঁপের বেড়া।
পরে শুনেছিলাম। স্পষ্ট করে কেউ অবশ্য বলে নি।
বাড়িটা করার পরই বাড়ির মালিক মারা যায়। কী করত সে কেউ বলে না। চটকলে বা তেলকলে কাজ করলে লোকে নিশ্চয় বলত। তা নয়, লোকে শুধু বলত ও ছিল ডাকাবুকো দুর্দান্ত প্রকৃতির মানুষ। ইয়া বুকের ছাতি। একদিন রাত্রে নাকি পিঠে সড়কি বেঁধা অবস্থায় ওকে ধরাধরি করে এনেছিল। শক্ত জান। দিন কয়েক মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে তবে মরেছিল।
আমরা যখন যাই, ওর দুই মেয়ে আয়মন আর সকিনা, এক ছেলে খাঁদু ওদের ফুফু খতেজানের কাছে থাকত। খতে ছিল বেজায় খাণ্ডারী মহিলা। ওর মুখের কাছে কেউ দাঁড়াতে পারত না। আমাদের দুই বাড়ির মধ্যে ছিল একটি মাত্র এঁদো পুকুরের ব্যবধান।

গোড়ায় গোড়ায় বাজারে গেলে বুঝতাম লোকে এ ওর গা টিপছে। ছোট জায়গা। বাইরের উটকো লোকদের সম্পর্কে কৌতূহল তো থাকবেই। কাজেই ওসব গায়ে মাখি নি। গুজবের বিষয়গুলো কানে এল অনেক পরে। ততদিনে বজবজের সবার সঙ্গেই ভাব হয়ে গিয়েছে।
একটা গুজব ছিল, কোনো বড়লোকের বউকে ফুসলে নিয়ে এসে গ্রামের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে আছি। টি টি-র ভাবটাতে একটু মন্দা পড়লে শিগগিরই যথাস্থানে ফিরে যাব। আরেকটা গুজব ছিল, গ্রামের মধ্যে আমাদের এই আস্তানা গড়ার সঙ্গে গোয়েন্দাগিরিরও একটা সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়।

দেয়ালে ছবি

'গ্রামদেশের কোনো নামগোত্রহীন শিল্পী হয়ত এঁকেছিল এই ছবি। ছবি ঠিক বলা যায় না; চিত্রবিচিত্র নক্‌শা। ওপর-নিচে লতাপাতা কাটা। মাঝখানের লম্বালম্বি জায়গাটুকুতে বকমারি জিনিস ঠাসাঠাসি হয়ে আছে। পাতাসুদ্ধ ডালভাঙা একটা সূর্যমুখী। তার পাশে ঝালর-দেওয়া বেতের প্রকাণ্ড একটা চৌকো হাতপাখা। নিচে লতাপাতার লাইনে গিয়ে চড়াও হয়েছে তার লম্বা ডাঁটি। হাত পাখাটার হাঁটুর কাছে জলে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে একটা নেহাৎ নাবালক ইস্টিমার। তার এক হাত দূরে কুলুঙ্গিটা ছাড়িয়ে বিরাট বপু একটি 'পকেট ঘড়ি'। তার ঠিক পাশেই বিশ-দাঁড়ি নৌকোর মত চাঁদ, তার মাথায় দাঁড়িয়ে একা অবাক একটি তারা; এদের নিচে ঘাড় হেঁট ক'রে আছে মানোয়ারী জাহাজ, একটি ত্রিভঙ্গ বন্দুক এবং হাড়গিলে পাখির মত দেখতে একটি উড়ুক্কু বোমারু বিমান। আর আছে টবে-বসানো পাতাবাহার। সত্যি-মিথ্যে ফুল, শেকড়-বার-করা তাল-নারকেল, খেজুর, দু-চাকার ছেলে-ভোলানো সাইকেল আর শিল্পীর স্বকপোলকল্পিত বাষ্পচালিত এক শকট। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত একই ছবি। তবু পুনরুক্তি বলে মনে হবে না।

পাশাপাশি থাকবার সঙ্গত কোনো কারণ নেই। তবু চাঁদ তারা বন্দুক ফুল জাহাজ উড়োজাহাজ লতাপাতা নিজেদের মধ্যে একটা অনাক্রমণ চুক্তি করে নিয়েছে। তাই খুব বিসদৃশ লাগবে না। মনে হবে গ্রাম্য শিল্পীর এক গভীর জীবন-জিজ্ঞাসায় তারা পরস্পরকে জড়াজড়ি করে আছে।

বাবুই-বাসা

রমাকৃষ্ণ মৈত্র লিখছে (১৩·৭·৫২) কলকাতা থেকে:'গীতা, মনে হচ্ছে একটা সুখবর আছে। আজ একটু আগে আমার আপিসে এক ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।...তাঁর এক দুঃস্থা আত্মীয়ার একমাসের একটি মেয়ে আছে। তাকে দিতে চান।...

'আমার মনে হচ্ছে, এই বাচ্চাটিকে দেখে বোধ হয় আমাদের পছন্দই হবে। সুভাষের মতামত কী ?...'

বিয়ে করলে কী হবে, মনে মনে তখনও আমি বাউণ্ডুলে। বজবজে বাসা নিয়েছি, তাই বলে কি সংসারে নিজেকে জড়িয়েছি ? ঘরে সতীন আছে না ? সব সময় সে চোখ রাখছে যেন দুজনের কেউই পায়ে শেকল বাঁধা দাঁড়ের ময়না হয়ে না যাই। সমস্তক্ষণ মনে করিয়ে দিচ্ছে—পদ্মপাতায় জলের মতন তোমাদের জীবন। আজ আছ, কাল নেই। দিন আসছে। ঘরে যদি সেঁধোও, বাইরে দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে চলে যাবে সব-হারাদের সব-পাওয়ার মিছিল।

মেয়েরা পাখির মতন। পাখিরা শখ করে বাসা বাঁধে না। তার বাসা বাঁধার একমাত্র কারণ ডিম পাড়া। আর তা-দিয়ে বাচ্চা ফোটানো। সব মেয়ে যেমন সমান নয়, সব পাখিও তেমনি সমান নয়। গরুমোষের পেছনে ফিঙে হয়ে থাকা এক জাতের পাখি আছে, তারা সত্যিকারের উড়নচণ্ডী। দল বেঁধে বেড়ায়। গোষ্পদ থেকে পোকা কুড়িয়ে খায়। আজ এর সঙ্গে, কাল তার সঙ্গে। জোড়া বাঁধার ব্যাপারটা ক্ষণিকের। যখনকার তখন। অন্য পাখির বাসায় ডিম পেড়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে পালায়। দায়দায়িত্বের কোনো বালাই নেই। গান দিয়ে যতই ভোলাক কোকিলও তো ঐ একই গোত্রের।

ডিমে তা দেবার দরকারটাও দিব্যি ছেঁটে দিয়েছে কোনো কোনো জাতের পাখি। পাতাপচা কাদায় কিংবা বালির মধ্যে ডিম পেড়ে রেখে তারা কেটে পড়ে। প্রকৃতির তাপেই আপনা-আপনি তাদের বাচ্চা ফোটে।

শুধু ভালবাসা নয়, তাহলে সাতসমুদ্র তেরোনদী পেরিয়েও মানুষ মেয়েরা পাখির বাসা চায় !

বাবা

বাবার কথা ভাবছি না। ভাবলে মন খারাপ হয়। আজ এখানে কাল সেখানে, এমনি করে ঘুরে ঘুরে নিজেকে ভোলাতে চেষ্টা করছে। এখন বাবা আসানসোলে। বুধাডাঙায়। পিসেমশাই ক্ষেতখামার করে গিয়েছিলেন। ছেলেরা চাকরিবাকরি করে। কাজেই অন্নের অভাব নেই। তাছাড়া বাবার তো পাখির আহার।

কিন্তু মন ? মন পড়ে আছে অর্ধেক কলকাতায়। তালি-পুলপুল বড্ড ছোট। অর্ধেক বজবজে।

বাবা লিখছেন (৯·৭·৫২): 'বাবা কালো, তোমার পত্র পেয়েছি। এবার আমার শরীর তত ভাল যাইতেছে না। আমি আগস্ট মাসে কলিকাতায় ফিরব। সেই সময় তুমি আমাকে ওখানে লইয়া যাইও। তুমি যদিবাহিরে চলিয়া যাও তবে বোধ হয় আর যাওয়া হইবে না। তোমরা সাবধানে থাকিবে।...

'কল্যাণীয়াষু, গীতা—তোমার পত্র পেয়েছি। তোমরা ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। সময় পাইলে মধ্যে ২ তোমাদের সংবাদ দিলে সুখী হইব। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। আঃ তোমার বাবা।'

বাবা কি খুব চাপা ছিলেন ? নাকি পার্থিব সুখ-দুঃখের ওপরে উঠেছিলেন ?

মা বলতেন, বাবা বড় চঞ্চল। জপতপ করার সময়ও কেবলি চোখ চেয়ে তাকানো আর কেবলি একটা উঠি-উঠি ভাব।

আসলে বুড়ো বয়সে বাবা বুঝেছিলেন নিয়তির ওপর কারো কোনো হাত নেই।

সীতাদির বোতল

সীতাদির তুলনা সীতাদি।

ঠিকানা তখনও বোম্বাই। দাদার-এর পার্শী কলোনি। দাদার সার্কেলে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলেই হল। এক ডাকে চিনবে।

১৬·৭·৫৩-তে সীতাদি লিখছেন: 'এসে পর্যন্ত ঘরদোর পরিষ্কার করতে ২ কটা দিন কেটে গেল। চিঠি লিখব ২ করে আর হয়ে ওঠেনি। আনামেই ট্রেনে এসেছিলাম। ভিড় খুব কম ছিল। তবে রাত ১২টার পর দ্বিতীয় দিন রাতে আমাদের সরকার বাহাদুরের ঘুঁসখেগো বুকে পেতলের তাম্‌গামারা তিনটে মেয়েমানুষ ট্রেনে ঢুকে জিনিসপত্র খুলে তছনছ। কী যে খুঁজছিল ওরাই জানে।

'কালো হুইস্কির বোতলে খাবার জল ছিল, সেটা মাথার বালিশের পাশে দেখে তিনজনেই, কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছে, এই আশায় লাফিয়ে পড়ল। আমিও সুযোগ ছাড়লাম না। বললাম বম্বের ফিল্ম আর্টিস্ট আমি, একটু একটু ঢুকঢুক করার অভ্যাস আছে—কাজেই কিছু গোলমাল করো না, তোমরা যদি খেতে চাও তো একটু দিতে পারি।

একজন ওদের মধ্যে হঠাৎ কোমরে হাত দিয়ে মেজাজ দেখিয়ে বলল: ওসব চলবে না, কিছু ট্যাঁক থেকে ছাড়তে হবে। না হলে তোমাকে ছাড়ব না আমরা। আমি বললাম: তার চেয়ে ভালো, বোতলটা তোমরা নিয়ে যাও, শেষ রাতে কাজে দেবে। এক কথা তাদের—কিছু ছাড়ো আগে।

গাড়ির মধ্যে যারা ছিল, সবাই মজা দেখছিল ও হাসাহাসি করছিল কারণ, সবাই জানত বোতলে কী আছে। এমন সময় একটা মেয়ে নেমে গিয়ে আর একটা লোককে ডেকে নিয়ে এল। সে এসে বলল তোমাকে ট্রেন থেকে নামতে হবে। কারণ, তুমি ঢুক ২ করতে করতে যাচ্ছ।

'বোতলটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বলল, এটার তো দেখছি লেবেলটা ছিঁড়ে ফেলেছ, দিশি না বিলিতি চলছে টেস্ট করবার জন্যে যখন বোতলের ছিপি খুলল, তখন জলের যদি কোনো গন্ধ থাকে, সেই গন্ধ ছাড়া আর কিছু না পেয়ে প্রায় বোতলটা ভেঙে ফেলবার যোগাড়। চোখ পাকিয়ে বলল, আমাদের হ্যারাস করলে ১৫/২০ মিনিট ধরে। ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে। কিছু আর বললাম না—নইলে দেখিয়ে দিতাম মজা। সরকারের লোককে যে হ্যারাস করে সে কমিউনিস্ট ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। তুমি একজন ফিল্ম আর্টিস্ট। চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে না তুমি কমিউনিস্ট। অথচ পুলিশের লোককে হ্যারাস করার সাহস হল কী করে তোমার ! ওরা নেমে যাবার সঙ্গে ২ ট্রেনশুদ্ধ সবাই ফেটে পড়ল খুশিতে।

কলসির কানায়

চিঠির বাইরে পা ফেলার আমার তেমন অবকাশ নেই। তবু আমি আমার একটা মনের কথা না বলে পারছি না—একজন লোক বাইরে গেলে কলকাতাকে বরাবর আমার মরুভূমি বলে মনে হত। তাঁকে চলে যেতে দিয়ে আমরা যে কী হারিয়েছি সে খোঁজ বেশি লোক রাখে না। জানতেন সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষ। জানেন দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

তিনি ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়। যিনি ছিলেন চিন্তায় আমৃত্যু চিরযুবা। কোনো দুটো সভায় যিনি এক কথা দুবার বলেননি। যাঁর কাছে তথ্যের শানবাঁধানো জমি ছিল তত্ত্বের আকাশে লাফ দেবার দৌড়পথ। যারা হিংসেয় ফেটে পড়ে থুথু ছিটিয়ে তাঁকে টেনে নামাতে গিয়েছিল, কালের হাওয়ায় তারা নিজেরাই ছিটকে গেছে। লোকটাকে ভালবাসা দিয়ে নিজেকে বেঁধে রাখতে না পেরে কলকাতা নিজেকে বার বার কানা করেছে।

ফিরে এসে এই কলকাতার কোলেই শেষ বারের মতন তিনি মাথা রেখেছিলেন।

সুখটান

ক্ষুব্ধ কলমে এরপর না লিখে পারিনি :

'বাঁচার গর্বে
মাটিতে ওর পা পড়ছিল না ব'লে

'গান গাইতে গাইতে
আমরা তাকে সপাটে তুলে দিয়ে এলাম
        আগুনের দোরগোড়ায়

'লোকটার জানা ছিল কায়কল্পের জাদু
ধুলোকে সোনা করার
ছুঁ-মন্তর

'তার ঝুলিতে থাকত
যত রাজ্যের ফেলে-দেওয়া
        রকমারি পুরনো জিনিস
যখন হাত ঢুকিয়ে বার করত
        কী আশ্চর্য
        একেবারে ঝকঝকে নতুন

'লোকটা ছিল দারুণ রসিক
পাড়-ভাঙা নদীর মতন রাস্তায়
        বরবেশে যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল
            ফুলশয্যার গাড়িতে
তখনও ঠোঁটের কোণে লাগিয়ে রেখেছিল
        জীবনের সুখটান

'যাবার সময় আমরা ঢেকে দিয়েছিলাম
তার হাতের শেকল-ভাঙার দাগ
সারা গায়ের হাজারটা কালশিটে
মালায় টান পড়ায়
    ঢাকা যায়নি শুধু
        কদিন আগে মার খাওয়ার
            একটা দগদগে চিহ্ন

'সেটা ঢাকবার জন্যে মালা একটা এসেছিল বটে
কিন্তু আগুনের আবার ফুল সয় না বলে
সব মালাই তখন খুলে ফেলা হয়েছিল

'মালা একটা এসেছিল বটে
কিন্তু
খুব দেরিতে

'মালা এসেছিল
কিন্তু
        মানুষ আসেনি

'মানুষটা নাকি অন্ধকারে কলম ডুবিয়ে
বাঙালীর ইতিহাস : অন্তিম পর্ব
লেখায় অসম্ভব ব্যস্ত ছিল ॥'

কবির লড়াই

সুরজিত দাশগুপ্ত ওর চিঠিতে আমার কোনো সমালোচনা-প্রসঙ্গে কড়া চিঠি লিখে ছিঁড়ে ফেলার কথা বলেছে। ব্যাপারটা খুলে বলা দরকার।

শান্তিনিকেতনের 'সাহিত্য-মেলা'য় পাঁচ বছরের কবিতা প্রসঙ্গে আমি একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম। তাতে অনেক চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা ছিল। তখন আমার বত্রিশ-তেত্রিশ বছর বয়স। এমন কিছু কচি খোকা নই। তদুপরি রণদিভে-পর্বের ঘর-পোড়া গরু। রবীন্দ্রনাথকে নস্যাৎ ক'রে নাকে খৎ দেওয়াও হয়ে গেছে। এ সত্ত্বেও 'পরিচয়ে'র এক লেখায় জীবনানন্দকে তুলোধোনা করলাম। আর তারই জের টেনে 'সাহিত্য-মেলা'র প্রবন্ধে লিখলাম :

'...যাঁরা প্রথম বাংলা কবিতার কলাকৌশল ভেঙেচুরে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই বাড়ি থেকে পালানো ছেলের মত দুদিন পর বাড়ির শাসন মেনে নিয়ে ঘাড় গুঁজে ঘরে ফিরেছেন। বাইরে জনসমুদ্রে মিশে গিয়ে নয়, গুহার নির্জন কোণে ব'সে তাঁরা কবিতার মুক্তিসাধনায় ধ্যানস্থ হলেন।...

'...সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকেও যিনি কিছুর মধ্যেই নন, সেই ভাবান্তরহীন কবি হলেন জীবনানন্দ দাশ। সমস্ত কিছুই তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন আর তারপর একের পর এক তাদের মুখগুলো কুয়াশায় মুড়িয়ে দেন। নাম, সংখ্যা, আকৃতি—তাঁর কাব্যে কথার কথামাত্র। প্রাকৃত থেকে অপ্রাকৃতে, আকার থেকে নিরাকারে তাঁর যাত্রা। সময়ের কণ্ঠরোধ ক'রে তিনি কথা বলেন, শব্দ তাঁর কাছে বস্তুবিরহিত সংকেত মাত্র। বিপরীত ভাব গায়ে গায়ে জুড়ে তিনি তাসের ঘর সাজান, তারপর নিজেই নিয়তি পুরুষ সেজে এক ফুঁয়ে সে ঘর উড়িয়ে দেন।'

যন্ত্রতন্ত্র

স্পর্ধার এখানেই শেষ নয়। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার দিকেও এয়ারগান ছুঁড়েছি। বলেছি : 'অমিয় চক্রবর্তীও এই খেলারই খেলোয়াড়। হাই তুলে বলেন, বাড়ি যাব। দেখেন না—ঠিক সেই সময় অন্ধকারে মুখ ঢেকে একটা লুব্ধ কুটিল হাত মহানন্দে তুড়ি দিচ্ছে। মানুষের ভাগ্যের প্রতি এই উদাসীন অবজ্ঞা, এই নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততা কবিতায় আনে শ্মশানের স্তব্ধতা। ছন্দ প্রস্থান করে, গতি নিষ্ক্রান্ত হয়। পড়ে থাকে শুধু শূন্যতার হাহাকার। যাঁরা কবিতার গলায় মালা দিয়েছেন নিবাত-নিষ্কম্প মৃত্যুর এ পথ তাঁদের সাজে না।...'

বুদ্ধদেব বসু মাথা ঠাণ্ডা রেখেই আমাকে ঠেস দিয়ে মুখে বলেছিলেন,... '...বেশ দেখা যাচ্ছে কবিরা, সাহিত্যিকেরা কয়েকটি ছোট ছোট শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছেন। আর যাঁরা এইসব শিবিরের আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরা বলছেন—আমাদের মতের সঙ্গে মিলিয়ে লেখো, আমাদের দেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখ। অন্য যা সব ভেজাল। কবিদের উপর এ উপদেশ অনবরত বর্ষিত হচ্ছে-। অনেকে বশীভূতও হচ্ছেন।...'

রাজনীতির ধারা বদলালেও যান্ত্রিক চিন্তাধারার হাত থেকে যে ছাড়া পাই নি, এসবই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। খোদ শান্তিনিকেতনে এসব ব'লে শুধু রেহাই নয়, সৎসাহসের জন্যে বাহবাও মিলেছে। তারও একটা কারণ আছে। গুরুবাদ আর প্রশস্তি যেখানে প্রবল, সেখানে একটু গোঁয়ার্তুমি আর নিন্দেমন্দ শুনে মুখের স্বাদ বদলাতে অনেকেরই ভালো লাগে।

আমি কিন্তু বলেছি কাউকে রাগাতে বা খুশি করতে নয়—ধারণাটা ভুল হলেও, বিশ্বাসের জোর থেকে।

গোড়ায় গলদ

এক বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম জীবনানন্দ নাকি তাকে বলেছিলেন, সুভাষের ধারণা বদলাত ও যদি আমার শেষ বই 'সাতটি তারার তিমির' পড়ত।

আজ ভেবে আশ্চর্য হই, আমি আকথা কুকথা লিখলেও আমার প্রতি

স্নেহ মমতায় কোনো টান পড়ে নি—না জীবনানন্দের, না অমিয় চক্রবর্তীর।
এমন কি আমার ভুলের ব্যাখ্যাতেও জীবনানন্দ 'সাতটি তারার তিমির' না পড়ার অজুহাতে আমাকে বেকসুর খালাস ক'রে দিয়েছিলেন।
সেটা ঠিক নয়। কেননা আমার তখনকার ধ্যান-ধারণার গোড়ায় গলদ ছিল। আমার মার্ক্সবাদের জ্ঞান অগভীর ছিল ব'লেই এটা ঘটেছিল।
পরে আমার মত যে আমূল বদলেছিল, সেটা এখানে কবুল করা দরকার।
আমার সেই মত বদলের লিখিত প্রমাণ কেন আজ থেকেও নেই, সেই দুঃখের কথাটা ব'লে রাখা ভালো।

সুবোধ রায়

হুগলীর এক নামকরা লোক ছিলেন সুবোধ রায়। লেখার চেয়েও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবেই তাঁর বেশি খ্যাতি ছিল। বড় বড় সব সাহিত্যিকেরই তিনি ছিলেন বন্ধু।
শেষের দিকে তিনি তাঁর দক্ষিণ কলকাতায় বিপিন পাল রোডের বাড়িতেই পাকাপাকিভাবে থাকতেন।
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তখনও বেঁচে। সুবোধবাবু একদিন বাড়িতে এসে বললেন জীবনানন্দের জীবন ও কবিতা—এই নিয়ে তিনি একটি বই লিখছেন। বইটি লেখা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শিগগিরই প্রেসে যাবে। এই পর্যন্ত শুনে আমি তাঁর বই সম্বন্ধে স্বাভাবিকভাবেই খুব উৎসাহ দেখালাম। এরপরের কথাটাতেই আমি দমে গেলাম।
সুবোধবাবু চান বইটাতে একটি পরিশিষ্ট জুড়তে। তাতে থাকবে প্রেমেনদা, নারাণবাবু আর আমার একটি করে লেখা।
আমি কিছুতেই রাজী নই। ততদিনে জীবনানন্দ সম্বন্ধে আমার সাময়িক ভুল মনে মনে আমি অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। তবু প্রবন্ধ লেখাকে আমি যমের মত ভয় করি। যুক্তিতর্কের রাস্তায় আমার মন চলে না। তাছাড়া জীবনানন্দ-বিচারে আমি দাগী আসামী।
সুবোধবাবুও নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত এমন হল যে, আমি ওঁর কথা ঠেলতে পারলাম না। গাঁইগুঁই ক'রে লিখতে শুরু করলেও আস্তে আস্তে লেখাটায় আমার মন ব'সে গেল। ফলে, লেখাটা হয়ে গেল দীর্ঘ।
হাতে পেয়ে সুবোধবাবু মহাখুশি। মধ্যে একদিন এসে জানিয়ে গেলেন, আমার লেখাটা নারাণবাবুরও খুব পছন্দ হয়েছে।

কোথায় গেল

বইটা ছেপে বেরোতে দেরি হবে না, একদিন সে খবরও জানিয়ে গেলেন।
তারপর কিছুদিন চুপ।
একদিন সকালে এলেন। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মুখটা খুব বিষণ্ণ। বেশ ভেঙে-পড়া ভাব। ওঁর স্ত্রী বিয়োগের খবর দিয়ে বললেন, তাগাদা দিতে না পারায় প্রেসের কাজ ঢিমেতালে চলেছে।
এরপর আবার দু একমাস দেখা নেই। হঠাৎ কাগজে দেখলাম সুবোধবাবুর মৃত্যুসংবাদ। এমন মন খারাপ হল বলার নয়।
তারপর আজ পর্যন্ত সুবোধবাবুর সেই যন্ত্রস্থ বইটির যে কী গতি হল বাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রেও কিছু জানতে পারি নি। বইটি বেরোলে নিশ্চয় জানতে পারতাম।
আমারও এমন কপাল, লেখাটার কোনো কপি রাখি নি। ফলে জীবনানন্দ সম্বন্ধে আমার মতবদলের লিখিত আর কোনো প্রমাণ রইল না।
বয়েস হলে ঠেলায় প'ড়ে একই কথা বার বার বলতে হয়।
যেমন, ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথকে পদ্যে-লেখা আমার একটা হারানো চিঠির কথা। শান্তিনিকেতনে সাহিত্য-মেলায় গিয়ে সুধাকান্ত রায়চৌধুরী সেই কবিতার প্রসঙ্গটা যে হঠাৎ মনে পড়িয়ে দেবেন, এটা আমার হিসেবের মধ্যে ছিল না।

সুধাকান্তবাবু

সভার পর দল বেঁধে গল্প করতে করতে আমরা হেঁটে যাচ্ছিলাম 'প্রান্তিকী'র দিকে। সুধাকান্তবাবু হঠাৎ আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, মনে আছে গুরুদেবকে আপনি কবিতায় একটা চিঠি লিখেছিলেন? তখন আপনি নামের সঙ্গে 'চন্দ্র' লিখতেন। মনে আছে?
আমার তখন কথা বলার অবস্থা নেই। গলা বুঁজে এসেছে। কেন সে কথা পরে বলছি। ঘাড় নেড়ে জানালাম, হ্যাঁ।
নিজেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই সামলে নিয়ে দুরু দুরু বুকে জিগেস করলাম: আচ্ছা, উনি পড়েছিলেন?
সুধাকান্তবাবু বললেন: তখন তো গুরুদেবের শরীর ভালো নয়। আমি ওঁকে পড়ে শুনিয়েছিলাম।
আবার দুজনে চুপ।
আমি তখন ভেতরে ভেতরে মরে যাচ্ছি শুধু একটা কথা জানার জন্যে—আমার চিঠি পেয়ে রবীন্দ্রনাথের কোনো ভাবান্তর হয়েছিল কিনা।
শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে জিগেস করলাম, আচ্ছা, তারপর?
সুধাকান্তবাবু বললেন: গোড়ার দিকে গুরুদেবের মুখটা বেশ হাসি-হাসি ছিল। শেষটায় খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন।
দীর্ঘ ষোল-সতেরো বছর ধ'রে যে জিজ্ঞাসাটা আমার মনের দরজায় হত্যে দিয়ে পড়েছিল, একদিনে তার জবাব পেয়ে আমার যে কী আনন্দ হয়েছিল বলার নয়।
প্রথমে খুশির ভাব। পরে গম্ভীর হওয়া।
আমি ঠিক যা চেয়েছিলাম তাই।
এবার আমার দুঃসাহসী সেই চিঠির কথায় আসি। চিঠিটা ছিল পদ্যে। গুরুদেব নয়, রবীন্দ্রনাথ নয়—সম্বোধন করেছিলাম নিছক 'রবিবাবু' ব'লে। তার মধ্যে ধৃষ্টতা থাকলেও ছন্দোবন্ধের খাতিরে হয়ত তা দৃষ্টিকটু হতে পারে নি।

নিখোঁজ কবিতা

কবিতাটি ছিল নাতিদীর্ঘ।
তাতে গোড়ায় বলা হয়েছিল পত্রলেখকের মুগ্ধতার কথা।
রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাকে এমন এক স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায়, যেখানে সব-কিছু সুন্দর সব-কিছু ভালো।
তারপর সে যেই সেই কবিতা ছেড়ে বাইরে আসে, তাকে এক নিষ্ঠুর অবাঞ্ছিত বাস্তব ধরাশায়ী করে। ট্রামের চাকার নিচে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে যায় তার স্বপ্ন।
রবীন্দ্রনাথের কাছে তার একটাই প্রার্থনা: হয় তিনি এই পৃথিবী থেকে তাঁর কবিতা প্রত্যাহার ক'রে নিন, নয়ত এই বুক-চাপা পৃথিবীটাকে তিনি বদলে দিন।
পোস্টকার্ডে সে চিঠির দু-ছত্রে উত্তর এসেছিল। তাতে জানানো হয়েছিল গুরুদেবের আশীর্বাদ। লিখেছিলেন সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। তাতে রবীন্দ্রনাথের সই ছিল না ব'লে অভিমানী কিশোর সে চিঠি ফেলে দিয়েছিল। সে চিঠি কাউকে দেখায়ও নি।
কিন্তু সেই কিশোরের অকপট মনের কথা অত বড় একজন মানুষ কিভাবে নিয়েছিলেন তা জানার জন্যে তার এতদিনের অশান্ত ব্যাকুলতা সুধাকান্তবাবুর উত্তরে শান্তির নীড় খুঁজে পেল।
পদ্যে-লেখা তার সেই চিঠি পরে ছাপাও হয়েছিল 'বিষাণ' পত্রিকায়। খাতায় লেখা কপিটা এক বাড়ি থেকে পুলিশ নিয়ে গিয়েছিল। আজ পঞ্চাশ বছর ধ'রে কবিতাটি তার কাছছাড়া। তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও ছাপা কবিতাটি আজও সে উদ্ধার করতে পারেনি।

সমাপ্ত

স্টাইলে
GOLDEN'S
FLAIR
FILTER KINGS
ফ্লেয়ার কিংস
বিধিসম্মত সতর্কীকরণ: সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।
STATUTORY WARNING: CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH
Govan FK/4B/86/BEN

জীবনের রঙে মিলে-মিশে যায় যে স্বাদ একবার ...তা চিরদিন থাকে আপনার!

সুরুচিপূর্ণ জীবনযাত্রার কত নানান রঙ — সহজতা-ভরা সুরম্য বা চির-বসন্তেভরা জীবন — জীবনের যে কোনো রঙেই মিলে-মিশে এক হয়ে যায় লিপ্টন গ্রীন লেবেল চা। যাতে থাকে দার্জিলিঙের বিশুদ্ধ স্বাদগন্ধের বিরল সৌরভ। হিমালয়ের কোলঘেঁষা চা-বাগান থেকে আনা বর্ষার ধারা মেশানো, শীতল হাওয়ার ছোঁয়া লাগানো, ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ মেশানো, ঢেউ খেলানো চা-বাগানের বিশুদ্ধতা জড়ানো চা···যা দার্জিলিঙের বিশুদ্ধ স্বাদগন্ধে ভরা!

LIPTON GREEN LABEL 100% PURE DARJEELING TEA

লিপ্টন গ্রীন লেবেল চা
দার্জিলিঙের বিরল স্বাদ... স্নিগ্ধ, সূক্ষ্ম, অনুপম।

LINTAS(C)/GL/4/2619 BG

সন্ত্রাসবাদ

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

আততায়ীর গুলিতে প্রয়াণের প্রাকমুহূর্তে বাপুজীর কণ্ঠে অস্ফুটে উচ্চারিত হয়েছিল একটি নিবেদন—'হায় রাম'। সারা বিশ্ব আজ সন্ত্রাসবাদের শিকার। রামের জন্মভূমি ভারতও রেহাই পায়নি। গোষ্ঠি, দল বা চক্রের হাতে হাতে আধুনিক মারণাস্ত্র। পথ বহুবিধ, লক্ষ্য এক, নির্বিচার নিধন। দাবি আদায়ের এই রক্তাক্তপথ সুস্থ জীবনের টুটি টিপে ধরেছে। ত্রাসিত বিশ্ব কোন পথে রেহাই পাবে হিংসার এই নখরাঘাত থেকে।

একটুখানি এলাচ—অনেকখানি সুবাস।

প্রয়াত ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজ একবার কলকাতায় ক্ষুদিরামের মূর্তিটি দেখে মন্তব্য করেছিলেন, 'হাতে বোমা নেই কেন ?' তরুণ ক্ষুদিরামের হাতের বোমাটিকে আমরা পবিত্র ভাবতে অভ্যস্ত, তা যেন আমাদের কাছে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি। অর্থাৎ, এপর্যন্ত আমাদের অবস্থানভূমি ভাবজগত। সন্ত্রাস তখনো বলগাহীন নয়, সে একটি আদর্শের ক্রীতদাস। ক্রমে, দীর্ঘ পথ পরিক্রমায়, বিদ্রোহীর মূর্তিটি কবন্ধ হয়েছে। আদর্শতাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। এখন সে একক, ভয়াবহ : সন্ত্রাস !

জেলখানার জন্য একটি চমৎকার বিজ্ঞাপনের শিরোনাম হতে পারে, 'আইনের প্রতি আনুগত্যই স্বাধীনতা !' কোন সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ এই বাণীটি স্বীকার করে নিতে পারবেন না। এই রকম আর যেসব নিয়মের জালে আমরা বন্দী সেসব ছিন্ন করার কথাও মনে মনে ভেবে থাকি। একজন বিদ্রোহীর সঙ্গে, একজন নৈরাজ্যবাদীর সঙ্গে আমাদের তফাৎ হল সাধারণত আমরা আমাদের মনোভাব বাস্তবে রূপ দিতে চেষ্টা করি না। যে ব্যক্তি তাঁর এ জাতীয় মতামতকে কাজে পরিণত করতে চান, তাঁকে পেরিয়ে যেতে হবে একের পর এক স্বাভাবিকতার পাঁচিল। তিনি হয়ে পড়েন একজন বিদ্রোহী, একজন নৈরাজ্যবাদী।

বিদ্রোহ এবং আন্দোলনকে 'ইতিহাস' অনুসৃত পথে চালনা করছেন বলে যাঁদের ধারণা ছিল, সেইসব মার্কসবাদী তাত্ত্বিকদের মধ্যেও ঘটে গিয়েছে বিপুল মতপার্থক্য। আন্দোলন বা বিদ্রোহ নিয়মের বশীভূত থাকার যে নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা পঞ্চাশের দশক থেকেই পেয়ে আসছিলেন রাষ্ট্রীয় কর্তাব্যক্তিরা, এখন তার আর কোন সুযোগ নেই। সমাজ-রাজনীতির বহু পরিবর্তন রাশিয়া-চীন-ভিয়েতনাম মার্কা বিপ্লবকে পন্থা ও লক্ষ্য উভয় দিক থেকেই প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে। আর ঠিক সে-কারণেই ষাটের দশকের শেষ দিকে নতুন এক আন্দোলনের ঢেউ, ইতিহাসের কিঞ্চিৎ পিছনে হাঁটা শুরু হয়ে যায়। নৈরাজ্যবাদ ফিরে আসে এক নতুন পোশাকে। ঐতিহাসিক সুযোগের ফলে চে গুয়েভারার কর্মকাণ্ড সফল হয়ে থাকলেও, নতুন যুগের ওই নায়ক তো বলেছিলেন 'জনতার জাগৃতির জন্য আমরা আর কতকাল অপেক্ষা করব ?'

ষাটের এই উগ্রমূর্তি আশি-তে এসে পরিপূর্ণ। তবু যেপর্যন্ত নৈরাজ্য তত্ত্বের সীমার মধ্যে আবদ্ধ ততক্ষণ তা বিশুদ্ধ চিন্তা। দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের আরামদায়ক তর্ক-বিতর্ক। তর্কের উত্তেজনাও কম নয়! এ হল বামপন্থী অ্যাডভেঞ্চারের মানসিক প্রক্রিয়া। যথেষ্ট নির্দোষ; এবং এতে বিনোদনও আছে ষোল আনা।

বন্দুকের নল থেকেই জন্মলাভ করে রাজনৈতিক ক্ষমতা

ডেভিড রকফেলার, রয় এল ওয়েবার কিংবা রবার্ট ম্যাকনামারা সম্পর্কে একটি গুপ্ত সংগঠন এরকম বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল : হাজারটি পুরস্কার ! ব্যাঙ্কারদের দমন এবং নিশ্চিহ্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সংবাদ পৌঁছে দিন। আরেকটি বামপন্থী সংগঠন লিফলেট বিলি করে চলেছে এই মর্মে : সঠিক কৌশল আয়ত্ত করতে পারলে, আপনার বেঁচে থাকার জন্য যেসব জিনিস দরকার তার বেশির ভাগটাই আপনি নির্বিঘ্নে পেতে পারেন। কৌশলের সঙ্গে 'শপ লিফটিং' করতে শিখুন, তাহলেই হবে। পরে এসব কাজের একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যাটি এই রকম : জীবনধারণের জন্য, ভালো লাগে না এরকম কাজই করে যেতে মানুষ বাধ্য থাকে। এটা এক ধরনের গোলামি। শপ লিফটিং তার প্রয়োজন অনেকটাই মিটিয়ে দেবে। ফলে গোলামির কাজ আর করতে হবে না। এছাড়াও আছে, 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি একটি ব্যাধি ; আমরা এই ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়তে শুরু করেছি। পুঁজিবাদী ব্যবসায় যা-যা দেখছেন সব কিছুই সামাজিক সম্পত্তি। সুতরাং এই সম্পত্তি মুক্ত।' বক্তব্য শেষ করা হচ্ছে এই স্বপ্নে যে, একদিন চূড়ান্ত 'শপ লিফটিং' সংঘটিত হবে, সেদিন পুঁজিবাদ ধ্বংস হবে।

শপ লিফটিং, ডোপিং, প্রকাশ্যে গাঁজা খাওয়ার অধিকার, কাজ না করার তত্ত্ব ইত্যাদিতে শুধু আইনের শাসনকেই প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে না। একটি নতুন নৈতিকতা, ভিন্ন মূল্যবোধের কথাও বলা হচ্ছে। সেসব দিক থেকে এ হল সেই চিরকালীন তরুণ, বিদ্রোহী দার্শনিকদের জগৎ। যা শেষ পর্যন্ত আমাদের শিল্পকলা ও জ্ঞানের ভাণ্ডারটিতে কিছু না কিছু সংযোজন করে হারিয়ে যায় ভিন্ন এক বিপ্লবী রোম্যান্টিকতার তরঙ্গে। ইউরোপ-আমেরিকার বেচা-কেনা-কাজ-হুল্লোড়ের জীবনে বিতৃষ্ণ একদল মানুষের প্রতিক্রিয়া হিসাবেও একে দেখা যেতে পারে।

বিপদ ঘটে যখন এই প্রতিবাদী তরুণদের হাতে উঠে আসে আগ্নেয়াস্ত্র। যে মুহূর্তে তাঁরা রাইফেলের ম্যাগাজিনটি লোড করে নেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না ওই অস্ত্রটি হাতে উঠছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না 'সিভিক' লাইফ আক্রান্ত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এইসব তত্ত্ব নেহাৎই খেয়ালি হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। কিন্তু যেই মুহূর্তে বন্দুকের নল গরম হয়ে ওঠে, ধোঁয়া দেখা যায়, তখনই সন্ত্রাস পক্ষ বিস্তার করেছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

আরব, ইস্রায়েল, প্যালেস্টাইনের মুসলিম দুনিয়া একদিকে, আরেক দিকে গুয়েটেমালা, এল সালভাদর, নিকারাগুয়া, উগান্ডা প্রভৃতি দেশ। সন্ত্রাসের প্রশ্নে এই গ্রহের মানচিত্রকে এই দুটি প্রধান অংশে ভাগ করে ফেলা হয়। মুসলিম মৌলবাদ এবং স্বাধীনতার, আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন। সন্ত্রাস এখানে একটি জটিল নকশা তৈরি করে, যে নকশার নেপথ্যে দুই বৃহৎ শক্তি রাশিয়া-আমেরিকাকে আবিষ্কার করাও দুরূহ নয়। সম্প্রতি লিবিয়ায় আমেরিকার বোমা বর্ষণ

সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে বিভিন্ন দেশ। ব্রিটেনের 'কাউন্টার রেভল্যুশনারি ওয়ারফেয়ার'-এর দুই সেনা

রাষ্ট্রিক সন্ত্রাসবাদ ছাড়া কিছু নয়। আবার কর্নেল গদ্দাফি, যিনি এক ধরনের মেগালোম্যানিয়ার শিকার, তাঁর পক্ষেও এই সুবাদে রুশ সমর্থন পেতে খুব একটা অপেক্ষা করতে হয়নি। এছাড়া আছে জঙ্গী বামপন্থা এবং কালোদের প্রশ্ন। এই দুটি প্রশ্নেই সন্ত্রসবাদ পশ্চিমের দেশগুলিতে সব থেকে বেশি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

বেইরুটে ১৯৮৪ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে আমেরিকার দূতাবাসে সন্ত্রাসবাদ একটি তেজস্ক্রিয় বোমার আকারে ফেটে পড়েছিল। ওই ঘটনার দেড় বছর আগে থেকে আমেরিকান কূটনীতিকরা আশঙ্কা করেছিলেন, আতঙ্কপোষণ করে চলেছিলেন যে এরকম কিছু একটা ঘটতে পারে। মাত্র একজন সন্ত্রাসবাদীর মরণপণ, লৌহদৃঢ় প্রয়াস, তার অভীপ্সাকে পূর্ণ ও সফল করে তোলে। এই একজন, অজ্ঞাতনাম এক সন্ত্রাসবাদী। যার বিরুদ্ধে নেওয়া হয়েছিল প্রতিরক্ষার হাজার-এক কৌশল। কী অবলীলায় সে সমস্ত প্রতিরোধ চূর্ণ করে পৌঁছে গিয়েছিল তার টার্গেটে। ওই ঘটনায় ৩৫ জন আহত হন, ১২ জন নিহত হন। এবং মনে রাখতে হবে সন্ত্রাসবাদী চালক (যার গাড়িতে মজুত ছিল বিপজ্জনক বিস্ফোরক), দূতাবাসের নীচে পার্কিং গ্যারেজে পৌঁছতে পারেনি। তার আগেই গুলী করে গাড়িটিকে অচল করে দেওয়া হয়েছিল। ঘটনাটি ১৯৮৪-৮৫ সালে, মার্কিন দূতাবাসের উপর তৃতীয় হামলা হিসাবে চিহ্নিত।

'আমরা এক অঘোষিত যুদ্ধের মধ্যে বসবাস করছি'—এই উক্তি খোদ সিয়া ডিরেক্টার উইলিয়াম কেসির। প্রসঙ্গ ১৯৮৫ সালে সংঘটিত বিমান ছিনতাই ও যাত্রী অপহরণের ঘটনাবলী। টি ডব্লিউ এ জেট বিমানটি বেইরুটে শা-তন্ত্রী আমল মিলিশিয়া ছিনতাই করে, বন্দী করে ৪০ জন আমেরিকান পুরুষ যাত্রীকে। ছিনতাইকারীরা এর পর টি ভি টিমের সামনে নিয়ে আসে পাঁচজন যাত্রীকে। প্রচারিত হয় সতর্কবাণী, আমেরিকা যেন সামরিক বাহিনীর সাহায্যে যাত্রী উদ্ধারের কোন রকম চেষ্টা না করে।

ফ্রাঙ্কফুর্টে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ডিপার্চার হল বি-তে ধূসর রঙের একটি আপাত নিরীহ ট্র্যাভেল-ব্যাগ পড়েছিল। অকস্মাৎ ঐ ব্যাগটি থেকে ছড়িয়ে পড়ল বিস্ফোরণের আগুন। বোতলবন্দী দৈত্যের মত এই সন্ত্রাসের সামনে সকলেই ভয়ে সাদা হয়ে গেলেন। লেবাননের উত্তরে ট্রিপলিতে গাড়ির ভেতরে মজুত একটি বোমা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে মজুত ছিল। যথাসময়ে বিস্ফোরণ.ঘটনাস্থলেই নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল ৭৫। আহত ১০০।

আমেরিকার কাছে সন্ত্রাসবাদী শা-পন্থীদের দাবি: ৭৭৬ জন লেবানিজের মুক্তি। এই ৭৭৬ জনই শা-পন্থী। ইস্রায়েলের পীড়ন-নীতিই এর জন্য দায়ী। কিন্তু ইস্রায়েলের বক্তব্য, আমেরিকা বললেই সে বন্দীদের ছেড়ে দেবে। আকাশ পথে, দূতাবাসে, রেস্তোরাঁয় যত্রতত্র সন্ত্রাসবাদ দাবি আদায়ের একটি অস্ত্র। ওই অস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার গণঅভ্যুত্থান ও গণআন্দোলনের তত্ত্বে বিশ্বাসীদের বিপন্ন করে তুলেছে। গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতি, যা জনযুদ্ধেরই অংশবিশেষ, সেই অংশটি সমগ্র থেকে মুক্ত হয়ে শহুরে গেরিলা লড়াইয়ের স্তরে পৌঁছে এখন আরো স্বতন্ত্র। আরো নির্দিষ্ট। যার মুখোমুখী কোন গণআন্দোলনই মাথা তুলতে পারছে না।

সন্ত্রাসের জটিল জাল

সন্ত্রাসবাদে নতুনত্বের কোনও নাম গন্ধ নেই, তবু সে বিগত দশকটিতে যে শিহরণ তরঙ্গের মত জাগিয়ে তুলেছে তা নতুন। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য অ-ঘোষিত, আক্রান্তের অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ ও আচমকা হানা দেওয়া নানাবিধ ঘটনার শরীরে প্রাচীন ইতিহাসের শীলমোহর চিহ্ন বর্তমান। এই অর্থে তার আয়ু শতাব্দী অতিক্রান্ত।

বিশ শতকে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অতি সংক্ষিপ্ত একটি শব্দ 'আধুনিক প্রযুক্তি'। মাত্র গুটিকয় মানুষের একটি দল, 'সৈন্য', যে কোনও জায়গায় হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হতে পারে, নিশ্চিন্ত ও অন্যমনস্ক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুর উপর নেমে আসতে পারে নির্দয় হামলা। এবং এই ঘটনা আক্রমণকারীদের ওই ছোট্ট দলটিকে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্যাপী প্রচার পেতেও সাহায্য করবে। আক্রান্ত দেশ বা রাষ্ট্র এক মুহূর্তের মধ্যে মাও বর্ণিত 'কাগুজে বাঘ'-এ রূপান্তরিত হয়ে পড়ে, সম্পূর্ণ শক্তিহীন একটি জড় পদার্থ হয়ে যায়। রাষ্ট্রের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মতই যেসব সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান আছে, মস্তিষ্কে সন্ত্রাসবাদী রক্তক্ষরণের ফলে সেইসব প্রতিষ্ঠানও তখন ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

সভ্যতার অতি আদরের দোলনাটি এখন দোল দিচ্ছে সভ্যতারই এক জীবন্ত শত্রুকে. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে। মধ্য এশিয়া, বিশেষত ইরান হয়ে উঠেছে সন্ত্রাসবাদের এক নিজস্ব আঁতুড়ঘর। বিভিন্ন মত ও পথের সন্ত্রাসবাদীরা ওই সমস্ত অঞ্চলে সুলভ প্রশিক্ষণ পাচ্ছে। আপাতভাবে, আদর্শ ও সংগঠনের চরিত্রের দিক থেকে পরস্পরের মধ্যে দুটি মেরুর দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও কি করে তারা একক একটি নেটওয়ার্কের মধ্যে থেকে কাজ করে যাচ্ছে তা এক গভীর বিস্ময়ের ব্যাপার।

পি· এল· ও-র যেসব দলিল ইজরাইলের হাতে এসেছে তা থেকে দেখা যাচ্ছে, আলজিরিয়া, লেবানন, ইরাক, দক্ষিণ ইয়েমেন ও সিরিয়াতে পি এল ও-র ঘাঁটি এলাকাগুলিতে প্যালেস্তানীয় নয় এরকম অনেক সন্ত্রাসবাদীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ইজরাইলের সামরিক সূত্রে বলা হয়েছে যে ১৯৮০-৮১ শুধু এই বছরটিতেই প্রায় ২,২৫০ জন বিদেশি সন্ত্রাসবাদীকে মধ্য এশিয়ার পি· এল· ও ঘাঁটি এলাকাগুলিতে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কোনও কোনও কোর্সের মেয়াদ ছিল প্রায় ন-মাস দীর্ঘ। কোর্সের মধ্যে আচমকা আক্রমণের প্রশিক্ষণ ছাড়াও শত্রু দেশের ভাষা, সংস্কৃতি ও লোকাচার শেখানো হয়েছে।

জেরুজালেমে অবস্থিত মিডিয়া অ্যানালিসিস সেন্টার সম্পর্কে সকলেই সশ্রদ্ধ। স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদ্যাচর্চার এই প্রতিষ্ঠানটি তার মক্কেলদের হয়ে ঘটনা বিশ্লেষণ, ব্যক্তির পরিচয়, পটভূমি বিশ্লেষণ ও সমসাময়িক নানা ইস্যুর মূল্যায়ন করে থাকে। সত্যিকারের ও আপাত দুরূহ যে কোনও তথ্যের এক স্বর্ণখনি এই প্রতিষ্ঠানটি।

সেন্টারের মুখপাত্র বেনি ক্যালভারির মতে, 'জিহাদ ইসলামি নামে চিহ্নিত সংস্থাটি কার্যত লেবানিজ শা-পন্থী সংগঠনেরই ছদ্মনাম মাত্র। এরা ইরানের সন্ত্রাসবাদীদের আদেশ মেনেই কাজ করে থাকে।' অর্থাৎ ইসলাম মৌলবাদী খোমেইনির অহং-ই অজস্র ছোট ছোট সশস্ত্র ও চোরাগোপ্তা সংগঠনের মাধ্যমে পৃথিবীর এই অংশে বিচরণ করছে। ১৯৭৬ সাল থেকে এই সমস্ত অঞ্চলে এমন একটি নেটওয়ার্ক কাজ করছে বলেই সন্ত্রাসবাদীদের অস্ত্রের যোগানেও কোনও বিঘ্ন ঘটে না। ইরান ও সিরিয়ার মধ্যে এ ব্যাপারে স্পষ্টতই বেশ ভালরকম বোঝাপড়া আছে। সিরিয়া ইরানকে যোগান দিচ্ছে অস্ত্র, অন্যান্য সরঞ্জাম এবং সিরিয়ার আরবীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ইরাকের বিরুদ্ধে ইরানের যুদ্ধে কূটনৈতিক মদত। ওদিকে ইরান লেবাননে সিরিয়ার স্বার্থ পুষ্ট করতে লেবাননের শা-পন্থীদের সমর্থন অর্জনের চেষ্টা করে যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত যে বোমাটা মেরিন ব্যারাককে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল তা একটি প্রথম শ্রেণীর প্রযুক্তির গর্ভেই তৈরি হয়েছিল। ১২০০০ থেকে ১৮০০০ পাউণ্ড টি· এন· টি ছিল ওই বিস্ফোরকটির মধ্যে। 'কনভেনশানাল' বলা হলেও, এ পর্যন্ত নির্মিত ওই জাতীয় বোমার মধ্যে এটিই ছিল সবথেকে শক্তিশালী। 'হাইড্রা অফ কার্নেজ' গ্রন্থের প্রণেতা এবং সন্ত্রাসবাদ বিশেষজ্ঞ নেইল· সি· লিভিংস্টোন বলেন, 'এ সব ঘটনা প্রমাণ করে সোভিয়েতের নেপথ্য ভূমিকাকেই।'

'রোণাল্ড রেগনকে হত্যা করার চেষ্টা যে করেছিল, সেই জন হিঙ্কলিকে নির্দোষ প্রমাণ করায় আমি বিস্মিত হইনি। কিন্তু ওই লোকটার মাথায় ছিট আছে, এধরনের প্রলাপ বকার কী দরকার ছিল'—১৯৮২তে 'অ্যান ফোবল্যাঘটে'র সম্পাদক কেভিন বার্ক একথা বলেছিলেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের উপকূলে সোভিয়েত সাবমেরিনের সন্ধান পাওয়া, এল সালভাদর বা চিলিতে আমেরিকার উপস্থিতিকে অনুভব করা ইত্যাদি সন্ত্রাসবাদের এক ঘোলা ও চোরা আবর্তে গুলিয়ে যায়। পারমাণবিক অস্ত্র দুই বৃহৎ শক্তির হাতেই মজুত থাকায়, সম্ভবত ওই অস্ত্রের ধার কমেছে, মৃত্যু, অস্ত্র, মিডিয়া, কূটনীতি, দেশপ্রেম ও নানাধরনের জিগির মিলিয়ে পাওয়া গিয়েছে এক মুখোশধারীকে: যার নাম সন্ত্রাসবাদ।

সন্ত্রাসবাদী কে?

আমাদের নিবন্ধের নায়ক নিবেদিত প্রাণ এক ব্যক্তি। যার ব্যক্তিগত স্বার্থ বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। বৃত্তি, আবেগ, আশ্রয়, সম্পত্তি—কিছুই নেই। এমন কি তাঁর কোন নামও নেই। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে, একান্ত সংগোপনে তিনি সমাজ-বিধির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক

ছিন্ন করেছেন। এ শুধু কথার কথা নয়, সুদীর্ঘ জীবনে যেসব কীর্তি তিনি রেখেছেন তাতে তা প্রমাণিতও। একটিমাত্র বিজ্ঞান তাঁর সাধনার বিষয়, আর তা হল : ধ্বংস।

পরিবার ও বন্ধুত্ব, ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতা ইত্যাদির মধ্যকার কোমল মনোবৃত্তি, শিকড়সুদ্ধ উৎপাটিত করতে হয়েছে তাঁকে। ওই ধ্বংস মন্ত্রের একক সাধনার যূপকাষ্ঠে, এতসব বলিদানে, গড়ে উঠছে সন্ত্রাসের দীর্ঘ, কঠিন বাহু।

'সাজোনভ বল তো ব্যাপারটা পরে তোমার কেমন লাগবে—হত্যার পরে?'

এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে সাজোনভ উত্তর দিয়েছিলেন : 'আমার বেশ গর্ব হবে, নিজেকে সুখী লাগবে।'

'ব্যাস, এই?'

'হ্যাঁ, ওইটুকুই।'

১৯০৪ সালে ১৫ জুলাই যে ঘটনা ঘটতে চলেছিল এ হল তার আগে সন্ত্রাসবাদীদের পরিকল্পনার সময়কার নিজেদের মধ্যে কথাবার্তার একটি অংশ।

রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী প্লিহভি ১৫ জুলাই ১৯০৪ সালে সকাল সাড়ে নটায় বাল্টিক স্টেশনের দিকে চলেছেন। দ্রুতগামী, কৃষ্ণকায় চারটি ঘোড়া তাঁর গাড়ি টেনে নিয়ে চলেছে। দুপাশে সাইকেল আরোহী প্রতিরক্ষীরা চলেছেন। সন্ত্রাসবাদীরা তাঁর পথে পেতে রেখেছে অদৃশ্য, ভয়ংকর এক জাল। ঘড়িতে নটা কুড়ি। গুপ্ত বিদ্রোহীদের একজন বরিস মাতিনকভ সিগন্যাল দিলেন। প্লিহভি এগিয়ে আসছেন, ঘোড়ার খুরের শব্দ ক্রমেই কাছে, আরো কাছে। হঠাৎ এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

কদিন পরে জেনেভায় সন্ত্রাসবাদীরা একে একে জড়ো হলেন। একমাত্র সিকোরাস্কি ছাড়া। জারের পুলিসের চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি। সোশ্যাল রেভোলিউশনারি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি হিসাবে চেরনভ সন্ত্রাসবাদীদের সম্বর্ধনা জানালেন। রাতারাতি সন্ত্রাসবাদীরা বিখ্যাত হয়ে গেলেন। পরপর কয়েকদিনের সংবাদপত্রে শুধু এদের সম্পর্কেই চাঞ্চল্যকর, রোমহর্ষক বিবরণ ছাপা হতে লাগল।

রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের আদি ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাবে সম্ভবত সেইসব দিনে, যখন আদিম মানবের ছুরি ঝলসে উঠেছিল তারই জ্ঞাতি, ভাই, বা পড়শির বিরুদ্ধে। তখনও বিষয়টি ছিল একজনের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া। কিন্তু রাজনৈতিক হত্যা মাত্রেই যে সন্ত্রাসবাদের কাজ, এমন নয়। রাজপুরুষ ও রাজকর্মচারীর জীবননাশের ঘটনা ও প্রয়াসে মানব ইতিহাস পরিপূর্ণ। ওই সব ঘটনাকে সন্ত্রাসবাদের বন্ধনীর মধ্যে সব সময় নিয়ে আসা সম্ভব নয়।

সন্ত্রাসবাদের প্রয়োগ, ধারণা ও তত্ত্বের সঙ্গে দীর্ঘ তিক্ত বিতর্ক জড়িয়ে আছে। বিতর্কের অবসান ঘটেছে সমাজ বিপ্লবীদের একাংশের সন্ত্রাসবাদকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। তারপর আছে একে ত্রুটিহীন ও নিখুঁত করে তোলার আর এক দীর্ঘ ইতিহাস। যেন একটি দীর্ঘ ছুরিতে যত্ন ও অভিনিবেশ সহকারে শান দেওয়া হয়েছিল।

এবং এর প্রথম সংগঠিত রূপ প্রকাশ পেয়েছিল সমাজবিপ্লবের অন্যতম পীঠস্থান রাশিয়াতেই।

অজ্ঞাত থেকে যাওয়া সন্ত্রাসবাদীর একটি বিশেষ লক্ষণ। সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত প্রথম ইশতেহারটির আছে জন্মচিহ্নের মতই ওই লক্ষণ। 'The Revolutionary catechim' নামক নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় ইশতেহারের ধরনে। ১৮৬৯ সালের রাশিয়ায়। আজ পর্যন্ত খুব নির্দিষ্টভাবে জানা সম্ভব হয়নি কে এর রচয়িতা। এক কথায় ইশতেহারটিতে বিপ্লবীকে ঈশ্বরের শূন্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সংগঠনের কাঠামো বিন্যাস করা হয়েছে এভাবে : একটি গুপ্ত চক্র, ওইটিই কেন্দ্রীয় ও প্রধান সংগঠন, এছাড়া দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরে আরো কয়েকটি চক্র। কেন্দ্রীয় চক্রটি ছাড়া অন্য চক্রগুলি পরস্পরের অস্তিত্ব জানতে পারবে না।

সন্ত্রাসবাদী স্টেপনিক এখানেই থেমে থাকতে চান না। 'আন্ডারগ্রাউন্ড রাশিয়া' নিবন্ধে তিনি লিখেছেন :

'তুমি যদি পুলিসের চরকে খুন করবে ঠিক করে থাক তাহলে কেনই বা তুমি আর এক ধাপ এগিয়ে ভাববে না। পুলিসের চরের ভিত্তিই হচ্ছে পুলিস। সেই চরকে লাগিয়েছে খবর জোগাড় করার জন্য, যাতে অনেক বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা যায়। কিংবা পুলিসের বড়কর্তা যে এদের সবাইকে চালাচ্ছে। একেবারে শেষে, সর্বময় কর্তা জার বসে আছেন। সেই তো গোড়ার গলদ।'

ইতিপূর্বে, ১৮৬৬ সালে জারকে হত্যার চেষ্টা করেন কারাকোজভ। ১৮৬৬ সালে জারকে হত্যার চেষ্টা ... চেষ্টা ইত্যাদি ঘটে গিয়েছে। ১৮৭৯তে আলেকজান্ডার সলোভেভ কারাকোজোভের (১৮৬৬ সালের) জার হত্যার চেষ্টার পুনরাবৃত্তি

মিউনিখ অলিম্পিকের সময় বারান্দাতে একজন মুখোশধারী সন্ত্রাসবাদী। ভিতরে মৃত্যুর অপেক্ষায় ১১ জন ইজরায়েলি বন্দী

সন্ত্রাসবাদের প্রথম তাত্ত্বিক নেতা হিসাবে বাকুনিনের নামই সর্বাগ্রে মনে আসে। মিখাইল বাকুনিন যদি তাত্ত্বিক জনক হয়ে থাকেন, তাহলে সন্ত্রাস সংগঠনের প্রথম দায়ভাগ বা কৃতিত্বের অধিকারী 'নারদনায়া রাসপ্রোভা' ('জন রোষ') সংগঠন। যে সংগঠনের সদস্যরা পরে নারদনিক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন।

১৮৭৭-১৮৭৯ পর্যন্ত নিজ জন্মভূমি রাশিয়ায় সন্ত্রাসবাদের ভঙ্গি ততটা আক্রমণাত্মক ছিল না। তখনও পর্যন্ত আত্মরক্ষার স্বার্থেই সন্ত্রাসকে ব্যবহার করা হত। কিন্তু ক্রমাগত ব্যবহারে অস্ত্রটি শানিত হয়ে উঠতে লাগল। ব্যবহারের চৌহদ্দীও ক্রমেই বিস্তৃত হল। পুলিসের হাত থেকে কমরেডদের ছাড়িয়ে আনার জন্য পুলিসকে আক্রমণ করা হল। শুরু হল খণ্ডযুদ্ধ। তখন ব্যাপকহারে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতেই হবে।

করেন। সলোভেভ পরপর পাঁচটি গুলি ছুঁড়েছিলেন। তবে এতদিন পর্যন্ত এই সব ঘটনা ছিল বিচ্ছিন্ন, একক। এখন তাকে একটি সংগঠিত রূপ দেওয়া হল। সন্ত্রাসবাদের একটি পরিণত কাঠামো গড়ে উঠতে থাকল।

রেড ব্রিগেড

ইতালির সন্ত্রাসবাদী সংগঠন 'রেড ব্রিগেড'-এর এক অজ্ঞাতনামা সদস্য রোমান সাপ্তাহিক পত্রিকার এক সাংবাদিককে বলেছিলেন :

'তুমি মনে করছ ব্যাপারটা অদ্ভুত। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হল আর সঙ্গে সঙ্গে আমি বাইরে গিয়ে একজনকে গুলি করে এলাম। কেননা আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটা হচ্ছে

তোমার বুর্জোয়া মানসিকতা। তোমার কি মনে হয় না, যখন তোমাকে বলা হয় একটা নিবন্ধ লিখতে, তখন তো তুমিও বেরিয়ে যাও, ফিরে আসো নিবন্ধটি লিখে নিয়ে। এটা অদ্ভুত নয়?'

একথা যখন বলা হচ্ছে ততদিনে সন্ত্রাসবাদ রাশিয়া ছেড়ে বহু দেশ পরিভ্রমণ করেছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন পরাধীন দেশের স্বাধীনতা অর্জনের অভিজ্ঞতা ইত্যাদিতে তার ঝোলা ভরে গিয়েছে। আয়ারল্যান্ড থেকে আলজিরিয়া পর্যন্ত সফর শেষ করে সে কিছুটা ক্লান্তও।

পূর্ণ বিশ্বাস, সুন্দর দিনের স্বপ্ন নিয়ে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, ১৯৭০-৮০ এই দশকটিতে তা তুঙ্গে ওঠে। যদিও পরে কৃষ্ণকায় বি পি পি (ব্ল্যাক প্যান্থার পার্টি) বা বামপন্থী সন্ত্রাসবাদী যুবক-যুবতীদের অনেককেই মূল্য দিয়ে ভুল বুঝতে হয়েছে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ভাল করা, কিন্তু তাদের কাজ সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। পরিস্থিতিতে অনাবশ্যক জটিলতা এনেছে।

অক্টোবর ১৯৮০: আগের বছর নভেম্বরে বিমান ছিনতাই করে যে ৫২ জন আমেরিকানকে আটকে রাখা হয়েছিল, তাঁরা এখনও বন্দী। বন্দীরা আছেন ইরানে। সন্ত্রাসবাদী, ছিনতাইকারীদের পরিচয়: ছাত্র। এই 'ছাত্রদের' সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা সম্ভব হয়নি তখন পর্যন্ত। তাঁরা কৃষ্ণাঙ্গ হতে পারেন, আবার জঙ্গী বামপন্থী হওয়াও অসম্ভব নয়। সে যাই হোক, এই 'ছাত্ররা' বুঝিয়ে ছেড়েছিলেন আমেরিকাবাসীকে সন্ত্রাসের দশক কথাটির তাৎপর্য।

বিগত দশকের সন্ত্রাস কবরে চলে যায়নি, আবারও উনিশ শো আশির পরে একটি হাইফেন বসিয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, কেননা এর শেষ আমরা জানি না। আশির দশকের সন্ত্রাস, সত্তরের দশকের সন্ত্রাস এরকম বিভাজনই আর সম্ভব হবে না হয়ত। তবু সন্ত্রাসের এই পুনরুত্থান আন্তর্জাতিক স্তরে শুরু হতে পারে ভিয়েনা থেকে।

'আমি দুজনকে খতম করেছি'—মেয়েটি তার মোটাসোটা সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে, এক চিলতে সন্তুষ্টির হাসি হেসে বলল। এর পর মেয়েটি জানতে চাইল এই দুজনের মধ্যে শেখ ইয়ামানি কে? কেননা সে দুজনকে মেরেছে ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে শেখ ইয়ামানি আছে কিনা সে নিশ্চিত নয়। ওপেকের ভিয়েনাস্থিত হেডকোয়ার্টার্সে বসে এই সংলাপ চলছিল। ছদ্মবেশে ৬ জন সন্ত্রাসবাদী আরব সেজে এখানে এসেছে ১১ জন আরব তেলমন্ত্রীকে কিডন্যাপ করতে। উদ্দেশ্য ইস্রায়েলকে শেষ করে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা।

এখনো মেয়েটির হাতের মাকারভ অটোমাটিক পিস্তলটি গরম হয়ে আছে। ইরাকি সিকিউরিটি গার্ডের পেটে গুলি চালিয়েছে সে। অবশ্য তার আগে সে শেষ করেছে জনৈক অস্ট্রিয়ান সাদা পোশাকের পুলিসকে। সেদিনের ওই ভয়ংকর নাটকের জন্য তার নাম রাখা হয়েছিল 'নাডা', সঙ্গী পুরুষটির নাম 'সালেম'।

বেলফাস্টে দাঙ্গা-বিরোধী অভিযান

পৃথিবীর যে দেশটি সব থেকে নরম ধরনের জেলের জন্য বিখ্যাত, নাডার বর্তমান ঠিকানা সেই সুইশ-জেল। ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত তাকে সেখানেই থাকতে হবে। নাডার আসল নাম গ্যাব্রিয়েল ক্রোশার টাইডম্যান, দেশ পশ্চিম জার্মানী। গ্যাব্রিয়েলের স্বামী (প্রাক্তন), তার বাবা, সকলেই সন্ত্রাসবাদী। কার্লোস সন্ত্রাসবাদীদের পর পশ্চিম জার্মানীর দ্বিতীয় প্রজন্মের সন্ত্রাসবাদী হল ক্রোশাররা। ক্রোশারদের পুঙ্খানুপুঙ্খ জিজ্ঞাসবাদ করে, পরে ওই জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য ও অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে: সন্ত্রাসবাদীদের সাময়িক, বিপজ্জনক সাফল্যের উৎসে রয়েছে তীব্র ঘৃণার একক উপস্থিতি। ঘৃণাই তাদের প্রধান আবেগ।

এখন, এই ঘৃণাকে বামপন্থী জঙ্গীরা 'শ্রেণী-ঘৃণা' বলে থাকেন। সত্তর সালের কলকাতা শহরের দেয়ালে শব্দটির উপস্থিতির কথা পাঠকের নিশ্চিত মনে আছে। সাধারণ ঘৃণার সঙ্গে এর পার্থক্য বিস্তর। ঘৃণা এখানে নির্দয়, হিংসাত্মক। 'রাজনৈতিক' এই লেবেলটি ঘৃণার আগে জুড়ে নেওয়া হয়। কিন্তু কার্যত সন্ত্রাসবাদীদের অনেকের ব্যক্তিগত জীবন-তথ্য উদ্ঘাটনের পর দেখা গিয়েছে, শৈশবকাল থেকেই এই সব পাত্রাপাত্রীর মধ্যে অবদমন তীব্রভাবে কাজ করেছে। আছে ব্যর্থতার বেশ কিছু অভিজ্ঞতা, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে অবমাননা এবং অপমানও তাদের মধ্যে পুঁতে দিয়েছিল বিস্ফোরক হিংসার বীজ। সর্বোপরি এরা সাইকোফ্রেনজিতে আক্রান্ত। এক ধরনের মেগালোম্যানিয়ার শিকার। যার সব থেকে বড় উদাহরণ হিটলার। সন্ত্রাসের ব্যক্তিগত অভিলাষকে যিনি রাষ্ট্রিক রূপ দিয়েছিলেন। হিটলার থেকে স্তালিন পর্যন্ত উপমাকে বিস্তারিত করে, ১৯৩০-এর পার্জের নজির টেনে মনস্তত্ত্ববিদ এরিক ফ্রোম এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

ইতালির রেড ব্রিগেড, ফ্রন্টলাইন, টার্কিশ পিপলস লিবারেশন আর্মি, উত্তর আয়ার্ল্যান্ডের ইরা, স্পেনের ইটা-মিলিটার থেকে প্যালেস্টাইনের মুক্তিযোদ্ধা পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রেই সন্ত্রাসের গর্ভ যথেষ্ট উর্বরতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। টোকিওর ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে বীভৎস ও অপ্রতিরোধ্য দাঙ্গা। জঙ্গী বামপন্থী জেঙ্গাকুয়েম ছিলেন তার নেতা এবং হোতা। ১৯৭০ সালে সাময়িক সামরিক শাসন প্রবর্তনের আগে পর্যন্ত টার্কির রাজপথে চলেছে সন্ত্রাসের তরঙ্গ, একের পর এক। ফ্রাঙ্কোর স্পেনও সন্ত্রাসের আগুনের ব্যাপ্তি এড়িয়ে যেতে পারেনি।

হেনরি কুরিয়েলের আশ্চর্য বৃত্তি

'পৃথিবীর বিপ্লবীরা, সন্ত্রাসবাদী সমেত সকলেই ঘাতকের হাতে হেনরি কুরিয়েলের মৃত্যুতে শোকাহত। কুরিয়েল বিদ্রোহীদের জন্য অর্থ, অস্ত্র, দলিল, প্রশিক্ষণ এবং নানা সাহায্য জুগিয়ে গিয়েছেন তাঁর প্যারিসের সংগঠনের মাধ্যমে।' জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহের বিজ্ঞাপনের মতই সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই বিজ্ঞপ্তি দেখে সিয়া প্রথম জানতে পারে সন্ত্রাসের এক নিপুণ কারিগরের তিরোভাবের কথা।

সাদা চুলের পিতৃস্থানীয় এক ব্যক্তি হিসাবেই শনাক্ত করা চলে হেনরি কুরিয়েলকে। ১৯৭৮ সালের ৪ মে, তাঁর লেফট ব্যাঙ্ক প্যারিস অ্যাপার্টমেন্টের এলিভেটরে গুলিবিদ্ধ হন। দুজন বন্দুকধারীকে তাঁর প্রতিবেশীরা দেখেছিলেন। আততায়ীদের মুখে ছিল মুখোশ এবং হাতে দস্তানা। কুরিয়েল প্যারিসে ২৭ বছর কাটিয়েছেন। মিশরীয় ইহুদি কুরিয়েল গোয়েন্দাদের কাছে সব সময়ই বিদেশী গুপ্তচর হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন। ডি. এস. টি দপ্তরে তাঁর সম্পর্কে রক্ষিত গোপন ফাইলের নম্বর এস ৫৩১৯১৬।

কুরিয়েলের ওপর গোয়েন্দা পুলিস চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখত। ১৯৭৭ সালের ২২ অক্টোবর তাঁকে হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এছাড়া গোয়েন্দা পুলিস কখনই কুরিয়েলকে গ্রেপ্তার করেনি। জার্মান শিল্পপতি হানস মার্টিনকে ফ্রান্স-জার্মান সীমান্তে একটি পরিত্যক্ত গাড়িতে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়ার পর, পুলিস কুরিয়েলকে হাজতে নিয়ে যায়। মার্টিনের ছিনতাইকারীরা পুলিসের অত্যাচারে পাগল হয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছিল। তারা কুরিয়েলকে ৪৯টি চিঠি লেখে।

আবার এই সব চিঠির সবগুলিই তৃতীয় বিশ্বের জন্য তৈরী 'সাহায্য এবং বন্ধুত্ব' নামক সংস্থাকে লেখা। এই সংস্থাটি কুরিয়েলেরই হাতে তৈরি। ধর্মযাজক থেকে শুরু করে সমাজের নানা স্তরের লোকজন সংস্থাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কুরিয়েল বৃত্তান্ত তবু অনাবৃতই থেকে যেত যদি 'ল গোয়েন্ত' পত্রিকার সাংবাদিক জর্জ সাফার্টি এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত না করতেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কবি ব্রেটনব্রেটেন বাখ ভুয়ো পাসপোর্ট নিয়ে প্যারিস ঘুরে গিয়েছিলেন। কুরিয়েলের সংগঠন তাঁকে আণ্ডারগ্রাউণ্ড ছাপাখানা করার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে দিয়েছিল। ব্রেটেন ব্রেটেন বাখ দেশে ফিরে ছাপাখানা বসান এবং ধরা পড়েন।

সারা বিশ্বে বুদ্ধিজীবীরা ব্রেটনের মামলা নিয়ে প্রবল জনমত গড়ে তুললেন। কিন্তু ব্রেটন নিজেই সমস্ত স্বীকার করে কারাদণ্ড মাথা পেতে নিলেন। বুদ্ধিজীবীরা স্তম্ভিত হলেন। ব্রেটন পরে তাঁর ভাইকে বলেছেন, 'জুলিয়েন' বা 'রেমণ্ড' নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে তিনি 'সাহায্য ও বন্ধুত্ব' সংগঠনটির জালে জড়িয়ে পড়েন। যাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি সন্দিহান।

প্যারিসের কোন একজন 'রেমণ্ড' বা জুলিয়েনের নাম শোনা যেতে লাগল নানা দেশে। গুয়েটামালায়, এল সালভাদরে। এই সব টুকরো তথ্য জুড়ে জুড়ে পাওয়া গেল হেনরি কুরিয়েলকে। যার কাজ সন্ত্রাসবাদীদের অস্ত্র, দলিল, ভুয়ো পাসপোর্ট সরবরাহ করা। এবং সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের আন্দোলনের খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করা। সিয়া যেদিন এ-ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারল, কুরিয়েল তখন মৃত। তার হত্যাকারী কে- জি- বি, নাকি সন্ত্রাসবাদীরা, সে তথ্য আর জানা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক দুনিয়ায় হেনরি কুরিয়েল একটি স্মরণীয় নাম। জীবিকার এমন রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা খুবই দুর্লভ।

মাননীয় বিদেশী অতিথিবর্গ যখন বন্দী হন

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ এক ধরনের সামরিক কৌশল। স্বাধীনতা অর্জনের লড়াইয়ে ব্যর্থতাই অনেক দেশের যুবশক্তিকে এ-পথে প্ররোচিত করে থাকে। যথেষ্ট রাজনৈতিক শক্তি সংগ্রহ করতে না-পারাও এর একটা জোরাল কারণ। রাজনৈতিক দৌর্বল্য অস্বীকার করতেই অপরিপক্ক রাজনৈতিক কর্মীদের একাংশ বেছে নেন এই সহজ পন্থা। শত্রু চিহ্নিত করাও সহজ। এমন সব ব্যক্তিদের শত্রু হিসাবে বেছে নেওয়া হয়, যাঁরা রাষ্ট্রশক্তির কিছুটা অন্তত প্রতিনিধিত্ব করেন। যাঁদের উপর আক্রমণ সংবাদপত্রটিভিকে সক্রিয় করে তুলবে। ফলে যথেষ্ট গণভিত্তি না থাকা সত্ত্বেও গুপ্তদল বা সংগঠনটি ব্যাপক প্রচারমূল্য পাবে।

১৯৭৭ সালের ১০ মার্চ অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হানাফি মুসলিমদের ছোট্ট একটি দল ওয়াশিংটনে বন্দী করল আমেরিকার কয়েকজন বিদেশী অতিথিকে। তিনটি জায়গায় তারা বন্দীদের আটকে রেখেছিল। ইসলামিক সেণ্টার, সিটি কাউন্সিল চেম্বার, ইহুদি সোশ্যাল সার্ভিস সেণ্টার। ওই তিনটি জায়গা থেকেই টেলিভিশন ফিল্ম তুলে দেখানো হতে লাগল সন্ত্রাসের এই জীবন্ত প্রামাণ্য চিত্র। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল সন্ত্রাসের গন্ধ। পুলিস তিনটি জায়গাতেই ব্যারিকেড করায় রাস্তায় সারিবন্দী গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। স্মরণীয়কালের মধ্যে এমন ট্রাফিক জ্যাম আর হয়নি। কয়েক ঘণ্টার এই সন্ত্রাসবাদী নাটকের থেকে মূল শিক্ষণীয় হল : সন্ত্রাস, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে অতি অল্প সময়ের জন্য সাংঘাতিক প্রভাব ফেলতে পারে। এই প্রভাবের নব্বুই শতাংশই মানসিক। আতঙ্কের ঢেউ, যা মহামারীর মত সেদিন ওয়াশিংটনকে গ্রাস করেছিল।

ইতস্তত, বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক ঘটনা আকছার ঘটতে থাকলে ভয় তখন ডানা মেলে দেয়। ভয়ের একটি নিজস্ব সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। যেখানে সেই পূজা সেই পূজারী। হাপাফি মুসলিমদের ঘটনায়ও তাই হয়েছিল। গভীর অনিশ্চয়তা লুপ্ত করেছিল স্বাভাবিক, সাধারণ বুদ্ধি এবং ধ্বসে গিয়েছিল আত্মবিশ্বাসের ভিত। এর চার বছর আগে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ডটি মঞ্চস্থ করা হয়েছিল তাতে হানাফি মুসলিম জনগোষ্ঠির সাত জন সদস্য প্রাণ দিলেন। একজন সাংবাদিক, হাওয়ার্ড য়ুনিভার্সিটির এক স্নাতক, ওই ঘটনায় নিহতদের তালিকার মধ্যে ছিলেন। এই ঘটনায় ১২ জনের শাস্তি হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে ওই জঘন্য নাটকটি একজনেরই হাতে রচিত হয়েছে, একজনেরই উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত: হামাস আবদুল খালিস। ৫৪ বছর বয়স্ক, নাটুকে স্বভাবের, নিপুণ-নির্দয় এই ব্যক্তির মস্তিষ্ক সুস্থ নয় বলেই অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের ধারণা। পরে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এই নতুন নাটকটির আগে খালিস আরো একটি ভয়াল-নাটক নিজের হাতে রচনা করেছিলেন। তাতে নিজের গোষ্ঠিরই সাত জনকে তিনি খুন করেন। যার মধ্যে চারজনই শিশু।

খালিসের উচ্চাশা মুসলিম পয়গম্বর হওয়া। আমেরিকান মুসলিমদের উপর ধর্মের আশ্রয়ে একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া। যে কারণে তিনি একটি বিবৃতি পর্যন্ত ইশতেহারের আকারে প্রচার করেছিলেন। ওই বিবৃতিতে ইসলাম জাতির আত্মিক নেতা এলিজা মহম্মদকে আক্রমণ করেন। বলা বাহুল্য খালিসের উচ্চাশা পূরণ হয়নি।

বন্দীদের মুক্তির প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। হানাফি নেতা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার সময় তিনটি শর্ত আরোপ করে : ১. অ্যান্থনি কুইন অভিনীত 'মহম্মদ : ম্যাসেঞ্জার অফ গড' ছবিটির প্রদর্শন নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। ২. খালিসের উপর থেকে ৭৫০ ডলার জরিমানা তুলে নিতে হবে। ৩. যে পাঁচজন কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিমকে হানাফি-হত্যাকাণ্ডে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের সবাইকেই খালিসের হাতে তুলে দিতে হবে।

ওয়াশিংটন বাধ্য হয়েছিল খালিসের কাছে নত হতে। শেষ দাবিটি ছাড়া সমস্তই মেনে নেওয়া হয়। এমন কি বিদেশী অতিথিদের মধ্যে আরব ও অন্যান্য মুসলিম দেশের বেশ কয়েকজন থাকায় খালিস ওই সব দেশের রাষ্ট্রদূত ও রাজপুরুষদের সাক্ষাতের দাবি জানায়। তাঁরা এসে খালিসের সঙ্গে করমর্দন করেন। তাঁকে বুকে জড়িয়ে

পশ্চিম জার্মানীতে আমেরিকান সেনাদল : সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অতন্দ্র প্রহরা

ধরেন। এবং টানা আটত্রিশ ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কের সমাপ্তি ঘটে খালিসের বিজয় উল্লাসে। সন্ত্রাসবাদীদের হাতে রাষ্ট্রদূত, রাজপুরুষ ও বিদেশী অতিথি ছিনতাইয়ের ঘটনার পরিসমাপ্তি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এরকম। হানাফি ঘটনা এ ধরনের সন্ত্রাসের প্রতিনিধি স্বরূপ। এল সালভাদরের প্রেসিডেন্ট জোসে নেপোলিয়ান দুয়ার্তের কন্যা ৩৫ বছরের ইনেস-কে বামপন্থী গেরিলারা কিডন্যাপ করেছিল। কিডন্যাপের সময় তাঁর রক্ষীদের হত্যা করা হয়েছিল। ৪৪ দিন বন্দী থাকার পর ইনেস মুক্তি পান তাঁর প্রেসিডেন্ট পিতা গেরিলাদের শর্ত মেনে ২১ জন বিদ্রোহীকে জেল থেকে ছেড়ে দিলে এবং ৯৬ জন আহত গেরিলাকে দেশ ছাড়ার অনুমতি দিলে। আবার, যাতে ওয়েলসের রাজকুমারী ডায়নাকে উত্তর আয়ার্ল্যান্ডে ঝটিকা সফরকালে সন্ত্রাসবাদীরা কিডন্যাপ করতে না পারে, প্রাণনাশের চেষ্টা না করতে পারে, সেজন্য বেলফাস্টের বিল্ডিং-এর ছাদে দূরবীণ চোখে লাগিয়ে জাগ্রত, সশস্ত্র পাহারার নিখুঁত বন্দোবস্ত করতে হয়।

দূতাবাসের কর্মীদের জন্য আত্মরক্ষার ক্রাশ কোর্স

গত তিন বছরে আমেরিকার ৭৭ জন কূটনৈতিক রাষ্ট্রদূত বা দূতাবাসের কর্মীকে সন্ত্রাসের লেলিহান শিখায় জীবন্ত দগ্ধ হতে হয়েছে। এর মধ্যে কম করে ৩০ জন ছিলেন আমেরিকান। গুপ্তঘাতকের হাতে এঁদের প্রাণ দিতে হয়েছে, অথবা ছাই হয়ে গিয়েছেন বোমার আগুনে। আমেরিকার সরকার এ ব্যাপারেও বাণিজ্যিক বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দিয়েছে। মৃত্যুর, আঘাতের, বিপদের আশংকার একটি দাম ধার্য করা হয়েছে। দূতাবাসের কর্মীদের বেতনের ২০ শতাংশ 'ডেঞ্জার অ্যালাউন্স' হিসাবে তুলে দেওয়া হচ্ছে কর্মীদের হাতে। অবশ্য বিপজ্জনক স্থানগুলির ক্ষেত্রেই এই অ্যালাউন্স প্রযোজ্য। যথা কোয়েত, লেবানন, আফগানিস্তান, উগাণ্ডা, এল সালভাদর এবং কলম্বিয়া।

পেট্রো-ডলারের দেশে দারুণ অগ্নিবাণ সর্বক্ষণের সঙ্গী। ওই দাহের মতই এখানকার সন্ত্রাস। সন্ত্রাসের গর্ভ এখানে সর্বক্ষণের সব সময়ই উর্বর। কখনই সে অগ্নি নির্বাপিত হওয়ার নয়। সন্ত্রাসের এই মুহূর্তের জলহাওয়ায় মধ্য এশিয়া সন্ত্রাস-সাইক্লোনের চক্ষু স্বরূপ। আবার এ যেন সহস্রচক্ষু হয়ে গ্রাস করছে গোটা বিশ্বের [illegible]।

ডেঞ্জার অ্যালাউন্স দূতাবাসের কর্মীদের [illegible] কোন নিরাপত্তার বলয় গড়ে তুলতে [illegible]। সে কারণে আত্মরক্ষার কথা ভাবতেও [illegible] বাধ্য হয়েছে। কোয়েতে মার্কিন দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম অ্যান্থনি কোয়েন্টন। আমেরিকান সরকারের [illegible], বিভিন্ন দেশে, মার্কিন দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে তেল সম্পদে সম্পন্ন শেখ-রাজ্যে যে ব্যক্তিটি রয়েছেন, তাঁর

বোমায় বিধ্বস্ত বেইরুটের আমেরিকান দূতাবাস

অবস্থাই সব থেকে বিপজ্জনক। ওই ব্যক্তিই হলেন কোয়েন্টন।

'সন্ত্রাসবাদীদের হামলার ব্যাপারে কোন ধারণা আছে? দেখুন কোয়েত দূতাবাস-লাগোয়া ওই বিল্ডিংটার হাল। ধ্বংসের এই শিল্পকর্ম রচনা করেছে সন্ত্রাসবাদ। কী ধরনের শক্তিশালী বোমা ব্যবহৃত হয়েছে বুঝতে পারছেন?'—কোয়েন্টন এক সাংবাদিককে বলেছিলেন। আত্মঘাতী একটি ট্রাক এসে সরাসরি বিল্ডিংটিতে ধাক্কা মেরেছিল। সঙ্গে-সঙ্গে বিস্ফোরণ। সন্ত্রাসবাদী চালকের মৃতদেহের সমস্ত টুকরোগুলো জোড়া লাগানো সম্ভব হয়নি। খুঁজেই পাওয়া যায়নি অনেক।

কোয়েতে মার্কিন দূতাবাসটি সুরক্ষার দিক থেকে এখন একটি দুর্গ বিশেষ। সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণকে কি এই সুরক্ষা অসম্ভব করে তুলতে পারবে? না, সেরকম কোন নিশ্চিত দিবানিদ্রার প্রশ্নই ওঠে না। সন্ত্রাসের অকল্পনীয় শক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল দূতাবাসের কর্মীরা নানাবিধ সুরক্ষাপদ্ধতি, টেকনোলজি এবং আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত তাঁদের বিলাসবহুল বাসস্থানকে জতুগৃহই ভেবে থাকেন। তবে, আশা করেন এত সব প্রস্তুতি সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণকে কিছুটা নিরুৎসাহিত করতে পারবে। কঠিন করে তুলতে পারবে।

'রেজর ওয়্যার, ট্যাঙ্কট্রাপ ব্যারিয়ারস, রোড-ডিভাইডারস' ইত্যাদি অত্যাধুনিক যুদ্ধ সাজে সজ্জিত কোয়েতের দূতাবাসটি পাহারা দিচ্ছে মেশিন গান হাতে অতন্দ্র এক প্রহরী। এর সঙ্গে আছে রাষ্ট্রদূতের নিজস্ব দেহরক্ষীরা। কোয়েতের পুলিস পেট্রোল তো আছেই। হাত বাড়ালেই বিপদের বন্ধু ৬ জন আমেরিকান নৌ-সেনাও ছুটে আসবেন সাহায্য করতে। মার্কিন সরকার দূতাবাসগুলিকে নিরাপত্তার প্রশ্নে নিশ্ছিদ্র করতে খরচ বাড়িয়ে চলেছে বহুগুণ। সম্প্রতি সেক্রেটারি অফ স্টেটস, জর্জ শুলৎজ প্রস্তাব এনেছেন, ১০০টি দূতাবাসকে নিরাপদ করার জন্য ৪·২ বিলিয়ন ডলার মঞ্জুর করা হক।

কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাজ যাঁদের বৃত্তি, এত করেও তাঁদের জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। নিরাপত্তাকে যে কারণে এমন একটি বিন্যাসে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে যাতে একের পর এক অনেকগুলি বলয় রচনা সম্ভব হয়। এ ব্যাপারে শেষ ও সব থেকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র হল আত্মরক্ষায় এঁদের শিক্ষিত করা। সন্ত্রাস-প্রতিরোধী কৌশলে এঁদের দক্ষতা অর্জনই শেষ পর্যন্ত কিছুটা রক্ষা কবচ হিসাবে কাজ করতে পারে।

কোয়েতের দূতাবাস ১৯৮৫ সালে কমপক্ষে ৬ বার বিপদের মুখোমুখী হয়েছে। ১০০ জন কর্মীকে তখন যুদ্ধকালীন ভূমিকা সৈনিকের ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। দূতাবাসের বাইরেও ঘটেছে হিংসাত্মক ঘটনা। গত ডিসেম্বরে একটি বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা ৪। ১৯৮৫ সালের জুলাই মাসে দু-দুবার রেস্তোরাঁয় শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় দশ।

অচেনা সন্ত্রাসবাদী যে কোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তার সঙ্গে পাল্লা করতে না পারলে, অতর্কিত আক্রমণকে প্রতিহত করতে না পারলে, দূতাবাসের কর্মীদের জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং [illegible] খুব কাছ থেকেও মোকাবিলা করা যায় [illegible] জুডো ইত্যাদি তো আছেই। [illegible] কৌশল ও তৎপরতা নিয়ে সেমিনার, প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে হাতে-কলমে।

এর জন্য গঠিত হয়েছে [illegible] প্রশিক্ষকদল। যাঁরা ৩০টি দূতাবাসে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেছেন। [illegible] এবং কোয়েতস্থিত দূতাবাসে প্রশিক্ষণের কাজ সমাপ্ত। ফোমের তৈরি জমিতে কিক করতে হচ্ছে দূতাবাসের সেক্রেটারি ক্যারলিন ওয়াল্টার্সকে। [illegible] থেকে ছুটে এসে, কখনো বা কাছ থেকে, কাল্পনিক আততায়ীকে কিক করে সুন্দরী মহিলা চিৎকার করে উঠছেন—ইয়াহ!

গুলিভরা একটি শটগান যুদ্ধং দেহি ভঙ্গিতে ধরে, সত্যিকারের টার্গেট প্র্যাকটিস করতে হচ্ছে জিম ম্যাক হুইয়াটারকে। তারপর কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে যখন ফিরে আসছেন কাঁধ-দুটো তখন ব্যথায় ফেটে পড়ছে। সন্ত্রাসবাদীদের অস্ত্র সম্পর্কেও কোন আগাম ধারণা অসম্ভব। হয়ত লোহার রডের আঘাতেই তাদের আক্রোশ মূর্ত হয়ে উঠল। মেরালিন পারফিনাকে সেজন্য কনুই থেকে হাতের মুঠো পর্যন্ত প্যাডে ঢেকে মহড়া দিতে হচ্ছে ওই রকম আঘাতের আশংকার সঙ্গে। বা পিছন থেকে আঘাত করতে আসা সন্ত্রাসবাদীকে নিরস্ত্র অবস্থায় ঘায়েল করতে হবে। রাষ্ট্রদূত কোয়েন্টনের কাছে তখন তাঁর নিজের শরীরটাই অস্ত্র। কনুইয়ের সাহায্যে, একটি বিশেষ কায়দায় আড়াআড়ি আঘাত করতে হবে তখন। ডামির উপর সেই আঘাত নিয়মিত করে যেতে হচ্ছে। যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে [illegible] নির্ভুল মুদ্রা, শক্তি এবং লক্ষ্য স্থির থাকে।

সর্বশেষ অস্ত্র এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল

পলায়ন। উন্মত্ত জনতা দূতাবাস আক্রমণ করলে তখন বাঁচার উপায় কী? এর ছোট্ট, সঠিক উত্তর হল: পলায়ন। কিন্তু পলায়নও একটি সমর কৌশল। তারও প্রশিক্ষণ দরকার। এর জন্য নিয়মিত ড্রিল এবং মহড়া নিতে হচ্ছে এখন। দূতাবাসের প্রতিটি কর্মীর এ ধরনের মহড়ায় অংশ গ্রহণ বাধ্যতামূলক।

সিকিউরিটি চিফ ম্যাক হুইয়াটার, দূতাবাসের সামান্য দূরত্বে থেকে নৌ-সৈন্যকে বেতার সংকেত পাঠান। দু মিনিটের মধ্যে তাঁরা সশস্ত্র অবস্থায় দূতাবাসে পৌঁছে যান। শুরু হয়ে যায় মহড়া। শটগান বাগিয়ে নৌসৈন্যরা তাঁদের সঠিক অবস্থান বেছে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। সাইরেন বেজে ওঠে। কর্মীরা ছুটে আসেন জানলাহীন সেই ঘরটিতে, যা বোমার হাত থেকে বাঁচার শেলটারের আদলে নির্মিত। এর পর হঠাৎ নির্দেশ আসতে পারে—'দুষ্কৃতিকারীরা বিল্ডিং-এ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে'। নৌসৈন্যেরা মুহূর্তের তৎপরতায় জানালা দিয়ে মই নামিয়ে দেবেন। একে-একে কর্মীরা নেমে যান মই বেয়ে।

এতসব সতর্কতা, পরিশ্রম, ভয় ও উত্তেজনার মহড়া কোন নাটকের প্রস্তুতি নয়। গভীর এক ভয়, আতঙ্ক হানা দিতে থাকে দূতাবাস-কর্মীদের মনে। এই ভয়, এই আতঙ্কের গোপন আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উপায় কী? সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণকে প্রতিরোধ করা যদি বা সম্ভব হয়, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার আশঙ্কাকে কী ভাবে প্রতিরোধ করা যাবে?

'সন্ত্রাসবাদ'—নাটকটির আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তু

যেন বা এরা পিটার ব্রুকের ভাবশিষ্য। একটি ফাঁকা জায়গা পেলেই হল। গোটা বিশ্ব এঁদের মঞ্চ। যাত্রীবাহী এরোপ্লেন, বাস, রেস্তোরাঁ, কনফারেন্স রুম বা জাহাজ, যে কোন স্থানে, যে কোন মুহূর্তে নাটকটি অভিনীত হতে পারে। পেশাদারি দক্ষতার সঙ্গে সারা হয়েছে আলোকসম্পাত ও শব্দ প্রক্ষেপণের কাজটি। যথেষ্ট অভিনিবেশ ও শ্রমের সঙ্গে দীর্ঘ মহড়া দেওয়া হয়েছে, যাতে চূড়ান্ত অভিনয়ে কোন ত্রুটি না ঘটে। অন্য দিকে বাণিজ্যিক সাফল্যের প্রতি আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কিছুতেই যেন ফ্লপ না করে।

আমাদের ভূমিকা দর্শকের। নাটকটির লক্ষ্যও বিশ্বব্যাপী এক দর্শককূল। যে কারণে তারা হুকুম করা মাত্র টি ভি টিমকে ছুটে যেতে হয়। মিডিয়া চুম্বক আকর্ষণে ছুটে আসে অকুস্থলে। তীব্র উত্তেজনাময়, শিহরনের এই নাটকটির তারা প্রতিবেদক এবং সমালোচক। গতকাল, বা কিছুক্ষণ আগেও যারা ছিল অজ্ঞাত পরিচয়, ভিড়ের মানুষ, সশস্ত্র তারাই যে মুহূর্তে বলেছে 'নড়লেই গুলি করব' বা ককপিটে পাইলটের ঘাড়ে রিভলভারের ঠাণ্ডা নলটি ঠেকিয়ে নির্দেশ দিয়েছে 'অমুক বিমান বন্দরের দিকে নিয়ে চলো' সেই মুহূর্তেই তাদের 'হিরো' বলে মেনে নিতে বাধ্য হবে সরকার, রাষ্ট্র, মিডিয়া। এবং ভীত, সন্ত্রস্ত বিশ্ববাসী।

জার্মানীর 'বাদর মাইনহফ' নামক সন্ত্রাসবাদী চক্র একবার হিংসাত্মক ঘটনা মঞ্চস্থ করার পর একটি আশ্চর্য দাবি বা প্রস্তাব পেশ করেছিল। তারা বলেছিল: আমরা এই ঘটনার মাধ্যমে আমাদের প্রতিবাদকে উপস্থিত করতে চেয়েছি। বিশ্বব্যাপী অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধেই আমাদের এই প্রতিবাদ। অবিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে কোন সুস্থ মানুষই বহন করেন প্রতিবাদের বীজ। কিন্তু তাঁরা তা প্রদর্শনীর বস্তু করে তোলেন না। কখনো গণআন্দোলন ও অভ্যুত্থানে, বুদ্ধিজীবীদের কলমের জীবন্ত আঁচড়ে তা মূর্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু জার্মান সন্ত্রাসবাদীদের প্রতিবাদের এই অদ্ভুত ধরনের মধ্যে উলঙ্গ আত্মপ্রচার, বা সন্ত্রাসবাদী, প্রচারধর্মী ওই নাটক ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। বন্দীমুক্তি, সরকারকে বাধ্য করা কোন বিল তুলে নিতে, বা অন্যান্য যেসব দাবি সন্ত্রাসবাদীরা আগ্নেয়াস্ত্রের ডগায় পেশ করে থাকেন, সেই সব দাবির আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ হয়। আক্রমণকে, সন্ত্রাসকে একটি মূর্ত অর্থ প্রদানই এই সব দাবির লক্ষ্য বা অন্যভাবে 'সন্ত্রাসবাদ' নাটকটির যদি কোন 'থিম' বা বিষয়বস্তু না থাকে তাহলে তা দর্শককূলকে আকৃষ্ট করবে না। দাবি উত্থাপন, দাবি আদায়ের চেষ্টা নাটকটির সেই থিম।

দর্শক আকর্ষণের একমুখী লক্ষ্যই সন্ত্রাসবাদীদের প্ররোচিত করে না মিলিটারি ভ্যানের উপর আক্রমণ চালাতে। বা ডাক বোমা ব্যবহার করতে। এসব অতীত যুগের ঘটনা। বাসভর্তি স্কুলের ছেলেমেয়ের মাঝখানে একটি টমিগান উঁচিয়ে ধরা বরং অনেক বেশী নাটকীয় ঘটনা। কারণ একমাত্র এক্ষেত্রেই দাবির ভান বজায় রেখে, সময় নিয়ে শুরু হতে পারে এক রোমহর্ষক খেলা। দর্শককূল ঘড়ির কাঁটার ঘুরে চলার সঙ্গে জীবন-মৃত্যুর এক প্রভূত উত্তেজনাময় টেনশনে জড়িয়ে যেতে পারেন। যখন সন্ত্রাসবাদীরা হয়ত একজন যাত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করতে পারে 'উই মিন বিজনেস।' এবং নির্দয় বাস্তবতার এই আমদানিও কার্যত নাটকটিকে করে তোলে অনেক বেশী বিশ্বাসযোগ্য।

তামিল গেরিলা বা খালিস্তানপন্থীদের আচরণ এতটা পোশাকি নয়। আবার আমাদের এই উপমহাদেশের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসের প্রকৃতির প্রশ্নেও তারা পৃথক। জঙ্গী তামিলদের লড়াই তাদের অস্তিত্বরক্ষার শর্ত, যে কারণে তারা সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ। খালিস্তানপন্থীরা সেদিক থেকে নির্দয় সন্ত্রাসবাদের সক্রিয়কর্মী। পৃথক রাষ্ট্রের অযৌক্তিক, অন্যায্য দাবিকে বাস্তবে রূপায়ণ করতে তারা বদ্ধপরিকর। জনসমর্থন প্রায় শূন্যের পর্যায়ে। ফলে তাদের সন্ত্রাসবাদ থেকে আদর্শ মুছে যায়, তা হয়ে ওঠে শুধুই সন্ত্রাস। রাষ্ট্র, মিডিয়া, বুদ্ধিজীবীসহ গোটা 'হায়ারারকি'কে [illegible] বটেই, জনমানসেও আতঙ্কের বীজ বপন করাই এদের উদ্দেশ্য। যে কারণে তারা টাইম-বোম ব্যবহার করে আকাশপথে উড়িয়ে দিতে পারে যাত্রীবাহী বিমান। দিল্লীতে সংঘটিত ঘৃণ্য দাঙ্গার প্রতিবাদে ট্রানজিসটার বোমার সাহায্যে ছিনিয়ে নিতে পারে বহু নির্দোষ, সাধারণ নারী পুরুষ ও শিশুর জীবন। সন্ত্রাস এখানে জল্লাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ। 'ধর্ম' যে নারকীয় আগুনকে দাবানলে পরিণত করেছে।

বিশ্বের মানচিত্রে সন্ত্রাসের দাপট বজায় রাখার জন্য সম্ভোগ-বিতৃষ্ণার মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল থাকা দরকার। একই ধরনের ঘটনা, একই স্থানে বারবার ঘুরেফিরে ঘটতে থাকলে তা দর্শকদের বিরাগ উৎপাদন করবেই। খলিস্তানপন্থীরা এখন ক্রমেই এরকম বিতৃষ্ণা উৎপাদনকারীর অবস্থায় চলে গিয়েছে। বিশ্ব-সন্ত্রাসবাদের মূল স্রোত থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সেখানে চলছে ঘন-ঘন পট পরিবর্তন। বদলে যাচ্ছে কুশীলবরা এবং দাবিসনদ।

নাটক মাত্রেই সফল বা উত্তীর্ণ হয় না, চিত্রনাট্যে মারাত্মক ত্রুটির ফলে অনেক নাটকই শেষ পর্যন্ত দর্শক আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। এরকম দুটি নাটকের উল্লেখ করে আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করব। 'আচিলি লোরো' এবং মিশরের জেট বিমানে 'লিবারেটিং অস্যাল্ট' অপারেশন এরকমই দুটি নাটক। ১৯৮৫ সালের ৭ অক্টোবর প্যালেস্তাইনের সন্ত্রাসবাদীরা ২৩ টনের একটি ইতালীয় জাহাজ ছিনতাই করে। জাহাজের ৪০০ যাত্রী এবং ক্রুদের জীবনের বিনিময়ে তারা ৫০জন রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবি করে। জেট প্লেনে সন্ত্রাস যে আতঙ্কের সৃষ্টি করতে পারে বিশাল আয়তনের আরামদায়ক একটি জাহাজে তা সম্ভব নয়। প্লেনটির ক্ষেত্রে সময় অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস। কিন্তু জাহাজটির পক্ষে সপ্তাহের পর সপ্তাহ পার করে দেওয়া কঠিন নয়। সময়ের সংকট তৈরি করার জন্য সন্ত্রাসবাদীরা আচিলি লোরোতে একজন মার্কিন যাত্রীকে খুন পর্যন্ত করেছিল। তবু টাইম প্রেসার এবং টি ভি এক্সপোজার না পাওয়ায় নাটকটি শেষ পর্যন্ত ফ্লপ করে। অন্য দিকে মহড়া যথেষ্ট না হওয়ায়, যথেষ্ট পূর্বপ্রস্তুতি না থাকায় 'লিবারেটিং অস্যাল্ট' অপারেশন ব্যর্থ হয়েছিল, অত্যন্ত করুণভাবে মৃত্যু ঘটেছিল ৫৭ জন সন্ত্রাসবাদীর।

গোষ্ঠী, দল, বা চক্র সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নিয়েছে, এ ঘটনার প্রাচীনত্ব বিষয়টিকে দিয়েছে নাটকীয় ইতিহাস। কেবলমাত্র আমাদের শুভ কামনায় ভূপৃষ্ঠ থেকে এর রক্তাক্ত দাগ মিলিয়ে যাওয়ার নয়। যেমন সম্ভব নয় শুধুমাত্র শুভবুদ্ধির জোরে অত্যাচার ও অবিচারের কলঙ্ক মুছে ফেলা। অথচ জাগ্রত বিবেক, গভীর মঙ্গলবোধ এবং শুভবুদ্ধিই আমাদের সম্বল। ফলে ভাবতে বাধ্য থাকি কী কী পন্থা, ঠিক কোন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে আমরা যুযুধান দুটি শক্তির আক্রোশকেই প্রশমিত করতে পারি। অন্যায় ও অত্যাচারের ইতিহাসে টেনে দিতে পারি একটি পূর্ণচ্ছেদ। এবং 'সন্ত্রাসবাদ' থেকে উৎপাটিত করতে পারি 'সন্ত্রাস'কে। লাল বা সাদা যে কোনও রঙের সন্ত্রাস সম্পর্কেই আমরা একটি অবস্থান বেছে নিতে পারি, উচ্চারণ করতে পারি অর্থপূর্ণ এবং সক্রিয় 'না' শব্দটি। **শেষ**

সিবাকা টুথব্রাশ
অন্য যে কোনো টুথব্রাশের চেয়ে বেশী সুরক্ষিত।
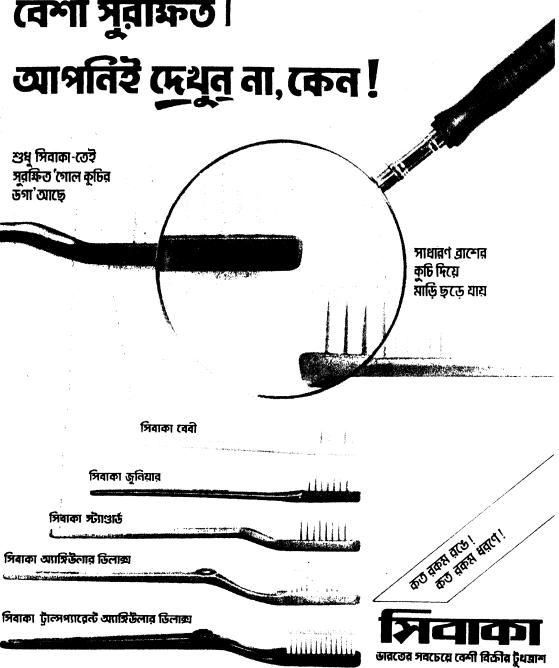
অদীক্ষিত সন্ত্রাস

পান্নালাল দাশগুপ্ত

'সন্ত্রাসবাদ' বাংলার রাজনীতিতে একটা জন্মগত পরিচিত শব্দ। বাংলায় যাঁরা বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা আনবার চেষ্টা করেন, তাঁদেরকে প্রতিপক্ষ ও সরকার পক্ষ 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিতেন, কিন্তু বিপ্লবীরা কখনো নিজেদের সন্ত্রাসবাদী বলতেন না। তাঁরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে মাঝে মধ্যে বাধ্য হতেন বটে, কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বিপ্লব ঘটানোই তাঁদের লক্ষ্য ছিল। এই প্রশস্ত সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচেষ্টা যেখানে সার্থকতার পথ নিতে পারতো না, সরকারি সন্ত্রাস

আজকাল ট্রেনে, বাসে, প্লেনে চলাফেরাও নিরাপদ নয়। সর্বদাই মনে হবে কোথাও বোমা লুকিয়ে বসানো আছে। যে যন্ত্রসভ্যতা মানুষের অসহায়তা দূর করবে মনে হয়েছিল, সেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাসমৃদ্ধ যন্ত্র সভ্যতা মানুষকে ধ্বংস করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

যখন নানা দমননীতিতে নেমে আসতো তাঁদের উপর এবং জনসাধারণের উপর, তখন অতি উৎসাহী সরকারি অফিসার, পুলিস ও বিশ্বাসঘাতকদের জীবননাশের প্রচেষ্টা হয়, যাকে সন্ত্রাস-বাদ বলা যায়।

এই বিপ্লব-আন্দোলনে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন বা শহীদ বলে খ্যাত হয়েছেন, তাঁদের মূল্যায়ন কিন্তু তাঁরা কতগুলি সাহেব বা পুলিস বা বিশ্বাসঘাতকদের 'খতম' করতে পেরেছিলেন, তাই দিয়ে নয়, বরং তাঁরা কীভাবে নির্ভীকতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অথবা ফাঁসির কাঠে প্রাণ দিয়ে গেছেন, তাই দিয়ে তাঁদের মূল্যায়ন হয়। সেদিনকার ঘোর তমসাচ্ছন্ন নির্জীব ভয়ভীত ত্রাসগ্রস্ত জনজীবনে সহসা তাঁদের প্রাণবলিদানের ঘটনাগুলি এক একটা বিস্ফোরণের মত ঘটনা বলে ধরা চলে। আত্মগ্লানি, কাপুরুষতা, ক্লৈব্য-ভরা জাতির জীবনে সহসা একটা উদ্দীপনা সৃষ্টি করে; হীনমন্যতাবোধ কেটে যেতে থাকে।

বস্তুত সেদিনকার বিপ্লবীদের কার্যকলাপ দেখতে গেলে বোঝা যায় যে, তাঁরা যে সব টার্গেট নির্ধারিত করে আগ্নেয়-অস্ত্রাদির প্রয়োগ করেছেন, তা প্রায়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, তাঁদের অনেক প্রচেষ্টা

ব্যর্থ ষড়যন্ত্রে পরিণত হয়েছে, নানা ধরনের মামলায় জর্জরিত হয়েছেন তাঁরা। জেল খেটেছেন, দীপান্তরে গেছেন, মারা গেছেন ফাঁসিতে। অন্যকে মারার চেয়ে নিজেদের নির্ভীক মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়েই জাতীয় জীবনের নতুন শপথ সৃষ্টি করে যান তাঁরা। এদিক থেকেই কানাইলাল, ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীনদের মূল্যায়ন করতে হবে। আত্মবলিদানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে, কোনটা বিপ্লববাদের প্রাণ আর কোনটা গুণ্ডামি। 'Civil War in France' নামক পুস্তকের ভূমিকায় ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ও এই কথাই বুঝিয়েছেন। যখন বিদ্রোহী ও বিপ্লবী শ্রমিকেরা রাস্তায় বেরিকেড করে সশস্ত্রবাহিনীর মোকাবিলা করতে রুখে দাঁড়ান, তখন তাঁদের বিপ্লবী তাৎপর্য এই দিয়ে বোঝায় না যে সশস্ত্র শিক্ষিত সৈন্যবাহিনীকে তাঁরা বেরিকেড দিয়ে পরাস্ত করতে পারেন, তার প্রকৃত মূল্যায়ন হয় সহসা শান্তিপ্রিয় স্বভাবত ভীরু জনসাধারণ কেমন করে নির্ভীকতার সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলা করতে দাঁড়ায় ও প্রাণ তুচ্ছ করেও প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে দাঁড়ায় তাই দিয়ে। অর্থাৎ নির্ভীকতা, আদর্শের জন্য উদ্দীপনা, নতুন মূল্যবোধ ও আত্মচেতনা এসব নৈতিক শক্তির উপাদান দিয়েই সেই সংগ্রামী জনতার বৈপ্লবিক মূল্যায়ন হয় যা দেখে প্রতিপক্ষের সৈন্যরাও এবং সাধারণ রাজকর্মচারীরাও স্তম্ভিত হয়ে যান, তাঁদের মনেও ভিন্ন ধরনের চেতনা সৃষ্টি হয়, এমন কি বিদ্রোহী জনগণের ন্যায্য সংগ্রামে তাঁদেরও যোগ

আত্মদানের সাকার মূর্তি : অনন্য প্রতিবাদী

দেওয়া উচিত, এমন ভাবনার সৃষ্টি হয়।

আদর্শবোধ, নির্ভীকতা, স্বদেশপ্রেম ইত্যাদি জাতীয় ঐতিহ্য এই ভাবেই আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে শহীদেরা আমাদের জন্য রেখে গেছেন।

এমনও দেখা গেছে, অগ্নিযুগের সেইসব বিপ্লবীদের ব্যক্তিগত চরিত্র ছিল "মৃদুনি কুসুমাদপি", অত্যন্ত দরদী, লাজুক, স্পর্শকাতর, এমনকি পশুপক্ষী কীটপতঙ্গের উপরেও সামান্যতম নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে পারতেন না। তাঁদের বৈপ্লবিক 'হিংসা' হিংস্রতা দিয়ে তৈরি ছিল না, বরং প্রেম, সহানুভূতি, ন্যায়পরায়ণতা ও আদর্শবোধ থেকেই তাঁদের বৈপ্লবিক চেতনা উদ্ভূত হতো। একথাও বলা যায় সমাজজীবনে অনাচার, অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে গিয়েই তাঁরা বেপরোয়া সাহস ও আত্মবলিদানের প্রেরণা পেয়েছিলেন। তার জন্যই দেখা যেতো যে স্কুল কলেজ প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সব চেয়ে ভালো ছেলেমেয়েরা সাধারণত বিপ্লবের পথে এগিয়ে আসতেন সবার আগে।

॥ ২ ॥

কিন্তু কালে কালে এই 'সন্ত্রাসবাদী' পথের একটা সীমা ধরা পড়ে, বিপ্লবীদের চক্ষেও। কেবল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত যুবকযুবতী যাঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে এসেছিলেন, বিপ্লবী চেতনা যেন তাঁদের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়ে। প্রতিপক্ষের প্রচণ্ড প্রতি-সন্ত্রাস (Leonine violence)-এর মুখে সাধারণ জনসাধারণ ভীত হয়ে পড়ে। মুষ্টিমেয় শহীদদের প্রাণ বলিদানের ফলে দেশের আপামর জনসাধারণ স্বাধীনতা ও স্বরাজ পাবে ও উপভোগ করবে, এমন হতেই পারে না। সকলে যা উপভোগ করবে, সকলে যে স্বাধীন নাগরিকের মর্যাদা পাবে, তা সকলকেই সংগ্রামের দ্বারা অর্জন করতে হবে।

তাই এলো জনজাগরণ ও গণ-আন্দোলনের প্রয়োজনবোধ। সে গণ-আন্দোলন এলো। বিপ্লবপন্থীরা অনেকেই গান্ধীজীর গণ আন্দোলনে

আকস্মিক উত্তেজনা, আতঙ্কিত মানুষ, রক্তপাত, সম্পত্তিনাশ, নির্বিচার গণহত্যা—ক্ষোভ এবং প্রতিবাদের এই বহিঃপ্রকাশ সব সময়েই স্বতঃস্ফূর্ত থাকে না, অনেক ক্ষেত্রেই তা প্ররোচনামূলক।

যোগ দেন, আবার অনেকেই কম্যুনিস্ট চিন্তাধারায় কৃষক শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনও গণ-আন্দোলন। আবার এই গণ-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লববাদীদের সশস্ত্র সংগ্রাম সৃষ্টি ; আবার সশস্ত্র সংগ্রামীদের একটা মূল লক্ষ্যও ছিল জনসাধারণের মধ্যে সাহসিকতা ও আত্মবলিদানের প্রেরণা সৃষ্টি করা। অর্থাৎ একটা অপরটার পরিপূরক হবে এই ছিল আশা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, আত্মবলিদানের ঢেউ সন্ত্রাসবাদ দিয়ে কৃত্রিমভাবে দীর্ঘকাল জাগিয়ে রাখা যায় না। পরবর্তীকালেও দেখেছি যে কংগ্রেসের 'বিয়াল্লিশের বিদ্রোহ' স্যাবোতাজ দিয়েই জিইয়ে রাখা যায়নি, এবং কম্যুনিস্টদের আন্দোলনকে বোমা অ্যাসিড বাল্ব বা কখনও কখনও সন্ত্রাসবাদী অ্যাকশনের দ্বারাও জিইয়ে রাখা যায়নি।

কিন্তু বড় বড় সারা দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনও, যথা দেশব্যাপী লবণ সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলনও [illegible] অহিংসায় সীমাবদ্ধ ছিল না। অহিংসা ও হিংসা প্রতিপক্ষের দোর্দণ্ড সন্ত্রাসবাদী [illegible] মুখে—একত্রে মিলেমিশে [illegible] কেউ কারও পূর্ব নির্ধারিত সংগ্রাম-পদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারতো না। আবার যাঁরা প্রকাশ্য গণ-আন্দোলন করতে কংগ্রেসের ভিতরে ঢুকে যান, অথবা স্থানীয় কংগ্রেস সংগঠনগুলিকে দখল করে নিয়ে সম্পূর্ণ নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে চান, তেমনও

পুলিশের গুলিতে নিহত সন্ত্রাসবাদী   ছবি : জগদীশ যাদব

অনেকে বিপ্লবীদের মধ্যেও ছিলেন, যেমন চট্টগ্রামের সূর্য সেনেরা। এমনকি স্বয়ং নেতাজী সুভাষচন্দ্রও অহিংসা ও হিংসার মধ্যে অনপনেয় দূরত্ব স্বীকার করেননি, যার জন্য তিনি যেমন ছিলেন কংগ্রেসের একজন বড় নেতা, তেমনি আজাদ হিন্দ বাহিনীরও সেনানায়ক। কিন্তু সব রকমের সংগ্রামের মধ্যেই ঐক্যসূত্রটা ছিল, দেশপ্রেম, নির্ভীকতা, নির্যাতন ও মৃত্যুবরণ করার নেশা সৃষ্টির মধ্যে। উভয় পথেই মৃত্যুবরণ করে নেবার প্রতিজ্ঞা থাকা দরকার। কোন পথেই সুবিধাবাদ ও ভয়কে প্রশ্রয় দেবার কথা ছিল না। জাতি সেদিন যতটা জেগেছিল তা জেগেছিল এই ত্যাগের পথেই। স্বেচ্ছায় কারাবরণ ও মৃত্যুবরণ করার প্রেরণা ও শক্তি দিয়েই বিচার করা হতো দেশ কতটা জেগেছে। তা কখনও জাতির বা ব্যক্তির পেশীবল বা 'মাসল-পাওয়ার' দিয়ে মাপা হতো না। যে পেশীবল বা মাসল-পাওয়ারের উপর নির্ভর করে আজকের দুনিয়ায়, দেশে ও বিদেশে এক ধরনের নয়া বা আধুনিক মারাত্মক সন্ত্রাসবাদ চালু হয়েছে, তার চরিত্র, চেতনা ও লক্ষ্য সে যুগের 'সন্ত্রাসবাদ'-এর সঙ্গে কোনোভাবেই তুলনীয় নয়। এদের প্রকৃতিই আলাদা, চরিত্রও আলাদা, লক্ষ্যও আলাদা। এদের জন্ম মূলত ভয় থেকে ; নির্ভীক আত্মত্যাগের পথে নয় ; ক্ষমতা ও ভোগবাদের ইন্ধন থেকে এদের জন্ম। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই নয়, সে কথা নিবন্ধের শেষের দিকে বোঝাবার চেষ্টা করবো।

॥ ৩ ॥

এখন এই বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ-গ্রাহ্য সূত্র নির্ধারিত করার চেষ্টা করি।

(এক) সাহস, নির্ভীকতা বা অভয় সৃষ্টি করাই জনজাগরণের একটা মূল শক্তি। যে জাতীয় সংগ্রাম সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোকদের মধ্যে বেশী সাহস বা নির্ভীকতা সৃষ্টি করতে পারে, তাকেই তুলনামূলকভাবে বেশী মূল্য দিতে হবে।

(দুই) মহাত্মা গান্ধীকে সেই অর্থে সবচেয়ে

[illegible] ও ভোগবাদের ইন্ধন থেকে যার জন্ম   ছবি : সন্দীপ শঙ্কর

এখনও জয়
এত চটপটে আছে
কি ভাবে ?

সারাদিনের ধকলের পরেও জয়কে তাজা রাখে ভিভা।

কেননা ভিভাতে অতি প্রয়োজনীয় ৮টা ভিটামিন আছে, যা শরীরের জন্য সবারই ভীষণ প্রয়োজন।

ক্রীমযুক্ত তাজা দুধ ও পাকা বার্লির মল্ট দিয়ে তৈরী, ভিভা নিমেষে গুলে যায়, তাই হজম করাও সোজা।

এসবের জন্য ভিভাই হচ্ছে একমাত্র স্বাস্থ্যকর পানীয় যা যোগায় স্ট্যামিনা।।

ওদের হারানো সহজ নয়, এতে আছে ভিটামিন
চারিদিকে হৈ চৈ-ভিভা দিন, ভিভা দিন।

JiL
জগৎজিত ইন্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড

ASP JIL 86

বেশি সার্থক সংগ্রামী বলা যায়, কেননা তিনি তাঁর অহিংস অসহযোগ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনের পথে লক্ষ লক্ষ নবনারী বালকবালিকা বৃদ্ধবৃদ্ধার মধ্যে সাহসিকতার সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, তাঁর আগমনের পূর্বে বিপ্লবীদের ও অন্যান্য গণ-আন্দোলনকারীদের কোন অবদান ছিল না। বস্তুত মহাত্মা গান্ধীও অনেকটা প্রস্তুত জমিতেই এসে ব্যাপক নির্ভীকতার বীজ বপন করেছিলেন। কিন্তু বিপ্লবীরা হয়তো মনে করতেন যে জনসাধারণের হাতে অস্ত্র যুগিয়ে দেবার উপরেই বুঝি বৈপ্লবিক উত্থান নির্ভর করে বিশেষ করে, সেই দেশে যে দেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘকাল জনসাধারণকে নিরস্ত্র করে রেখেছিল।

(তিন) কিন্তু সন্ত্রাসবাদী পথে বা বিপ্লবী পথে চলতে গিয়ে নিজেদের পরিচয় গোপন করে বা আত্মগোপন করে যে ধরনের প্রস্তুতি করতে হয় তাতে জনসাধারণের পক্ষে তাঁদের সত্যিকার পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। ছোটখাটো আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা পিস্তল ইত্যাদি সংগ্রহ বা তৈরি করতেও আত্যন্তিক গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয়। আবার আগ্নেয়াস্ত্রও সহজ-লভ্য নয়, কার্যকরী বোমা তৈরি করাও দুঃসাধ্য। তার জন্য দরকার হয় তখনকার দিনের কালোবাজারের অলিগলির অন্ধকার রাজ্যে অনুসন্ধান করা। তার জন্য প্রয়োজন হয় অর্থের, এবং প্রচুর অর্থের, আর সে অর্থ জনসাধারণের চাঁদায় আসতে পারে না, যার ফলে বাধ্য হয়ে ডাকাতির পথ ধরতে হয়। কালে কালে 'রাজনৈতিক ডাকাতি' আর সাধারণ ডাকাতির মধ্যে পার্থক্য দূর হতে থাকে, স্বভাব দুর্বৃত্ত ও সমাজবিরোধীরাও এই পথে অনেকটা উৎসাহ পেতে থাকে। লক্ষ্য ও পথ বা Ends and Means এর ক্ষেত্রে নানা জগাখিচুড়ি চিন্তা চেতনা ঘটতে থাকে। 'Ends justifies the means' —এই সূত্র ক্রমশ সুবিধাবাদ ও অনৈতিকতার প্রশ্রয় দিয়ে ফেলে। এর মধ্য দিয়ে অনেক ভেজাল ও দুর্নীতি বিপ্লববাদীদেরও মধ্যে ঢুকতে চায়, আন্দোলনটার ঔজ্জ্বল্য দিন দিন ম্লান হতে থাকে, নবাগত বিপ্লবীদের চারিত্রিক ক্ষেত্রে নানা দুর্বলতা দেখা দিতে থাকে। সত্যিকার বিপ্লবীদের তখন একটা সমস্যা হয়, তাদের দলে খাঁটি কারা, আর সুবিধাবাদী সমাজবিরোধী কারা এটা বের করতে। এর সুবিধা সাধারণ ক্রিমিন্যালরা নিয়ে থাকে, তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো, সাধারণ ডাকাতেরা ডাকাতির শেষে 'নকশালবাড়ী জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে দিতে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতো বা হয়তো আজও যায়।

আবার নকশালবাড়ি বিপ্লবী ও চরমপন্থী বিপ্লবীরা একটা সন্ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে গিয়ে শুধু কেবল 'শ্রেণীশত্রুদের' প্রাণেই আতঙ্ক সৃষ্টি করতেন না, সাধারণ নিরীহ দরিদ্র জনসাধারণের প্রাণেও তাঁদের সম্বন্ধে একটা ভয়ভীতি, সন্ত্রাস সৃষ্টি করতেন। কেউ যাতে তাঁদের গতিবিধি জেনে ফেলে সরকারপক্ষকে বলে না দেয়, কেউ যাতে সাক্ষ্য না দেয়, তার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে নির্ভর করতেন সর্বব্যাপক ভয় সৃষ্টি করার মাধ্যমে যতটা, ততটা জনসাধারণের স্বাভাবিক ভালোবাসা, আনুগত্য ও সচেতনতার উপরে নয়। অর্থাৎ অনেক বিষয়েই 'শর্টকাট' করতে গিয়ে যে ধরনের নির্ভয় বাতাবরণ সৃষ্টি করা দরকার তার উলটো—অর্থাৎ ব্যাপক সন্ত্রাস ও গুজব সৃষ্টির বাতাবরণ সৃষ্টি করে বসতেন। দেশে নির্ভীকতার বদলে, সন্ত্রস্ত ভীত একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফেলেছিলেন। কীভাবে একটা good cause তার বিপরীতে পরিণত হয়ে যেতে পারে তার একটা নিষ্ঠুর দৃষ্টান্ত আমরা ইদানীং কালে দেখেছি।

(চার) 'অভয়' সৃষ্টি করাই সবার লক্ষ্য, কি গান্ধীজী, কি গণ-বিপ্লবী—সবার। এই অভয়টা কি কোনও উত্তেজনা সৃষ্টি করে একটা স্থায়ী শক্তি হিসেবে দাঁড় করিয়ে রাখা চলে? এ কি কোনও উত্তেজক ড্রাগ ব্যবহার করে সৃষ্টি করা যায়? এ কি কোন material সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মোহ সৃষ্টি করে তৈরী করা যায়? এ কি কোন অস্ত্রশস্ত্র জনতার হাতে দিলেই বরাবর টিঁকে থাকে? হঠাৎ অস্ত্রটা বিকল হয়ে গেলে, বা অন্য কেউ ছিনিয়ে নিলে, অথবা প্রতিপক্ষের দূর পাল্লার কামান, মেশিনগান, রাইফেলের গুলির মুখে হাতের পিস্তলটা অর্থহীন হয়ে পড়লে কি সেই নির্ভীকতা বজায় থাকে? এ প্রশ্নের উত্তর দেবারও দরকার করে না, প্রশ্নগুলিই আমাদের নিরুত্তর করে দিতে বাধ্য। সংগ্রামে জয় হচ্ছে এমন অবস্থা থাকলে সাহস থাকবে, আর হেরে যাচ্ছি বুঝলেই ভেঙ্গে পড়বো? তবে আমাদের নৈতিক শক্তির মূলটা কোথায়, বিশ্বাসের অচঞ্চল ভিতটা কোথায়? অতীতে বিপ্লববাদীরা গীতা স্পর্শ করে ও গীতা পড়ে নিজেদের ভয় দূর করতেন ও সাহসিক প্রত্যয় অর্জন করতেন। গীতা বলছেন ভোগের পথে নয়, ত্যাগের পথেই মৃত্যুঞ্জয়ী হতে পার, অমর অস্তিত্বকে অনুভব করতে পার। পরবর্তী যুগে গীতা ও ঐ জাতীয় ভাববাদী চিন্তাচেতনা বর্জন করা হয়—বিপ্লবী মহলে। তার পরিবর্তে আসে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক মতবাদ। যার ভিত হলো যুক্তি, এবং যুক্তির ভিত হল বাস্তবতা এবং কোন না কোন ধরনের বস্তুতন্ত্রবাদ। মানুষের পরিচয় হলো দেহাত্মবাদ দিয়ে, জীবনকে খুব বেশী করে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেবার ঝোঁক, যাতে ত্যাগের চেয়ে ভোগের তাড়নাই থাকে বেশী। ফলে দেখা দেয় একটা ফাঁকিঝুঁকি দেবার প্রচেষ্টা। আস্তে আস্তে যাকে বলে iron in the soul তাই প্রকট হয়ে পড়ে, 'আদর্শবাদ' স্তিমিত হয়ে পড়ে, গৌণ হয়ে পড়ে। এর পরিণাম আজ কী হয়েছে, বিভিন্ন আদর্শবাদের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে, সে বিষয়ে কি কোন উল্লেখ করার দরকার আছে?

(পাঁচ) মহাত্মা গান্ধী এলেন আবার গীতা হাতে করেই। তিনি বললেন কর্মীদের আদর্শ হবে গীতার স্থিতপ্রজ্ঞের আদর্শ। গীতাতে অন্তত চার বার বিভিন্ন শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির গুণাবলী কি কি। কোথাও বলেছেন আঠারটি, কোথাও বিশটি। ভাগবতেও স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির গুণাবলী এ জাতীয়ই বটে। কিন্তু সব গুণাবলীর মধ্যে প্রথম ও প্রধান স্থানটি দিয়েছেন নির্ভীকতার উপর — 'অভয়ম'। 'অভয়ম' দিয়েই প্রত্যেক শ্লোকের আরম্ভ। অর্থাৎ অভয় হতে না পারলে অন্য কোন গুণ ধারণ করাই সম্ভব নয়, তাঁর সত্যব্রতী ও সত্যপথের পথিক থাকাও সম্ভব নয়, তাঁর পক্ষে মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়াও সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ কি তাই বলে যাননি তাঁর অসংখ্য গান ও কবিতার মধ্য দিয়ে? আধুনিক নানা ধরনের বস্তুতান্ত্রিক রবীন্দ্রজীবীদের এ-প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে। রবীন্দ্রনাথকে মানি কিন্তু তাঁর জীবন-দর্শনকে মানি না, গান্ধীজীকে মানি অথচ তাঁর জীবন-দর্শনকে মানি না—এ জাতীয় ভাবের ঘরে লুকোচুরি খেলতে গিয়েই ভেজাল গান্ধীপন্থী ও সুবিধাবাদী রবীন্দ্রভক্তের দল এত বেড়ে গেছে। রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যে কোন দর্শন বা নীতিবোধের প্রয়োজন নেই, এই থেকেই দেখা দিয়েছে নানা ধরনের চারিত্রিক ও আদর্শগত অবক্ষয়। এবং এই অবক্ষয়ী বাতাবরণে আজকের দিনে যে সব বিপ্লবী হচ্ছে তাদের চিন্তা-চেতনা বেশ পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্ট নয়। তাদের প্রত্যয়গুলিও দৃঢ় নয়, তাদের জন্য কোন 'ধ্রুবপদ' ও বাঁধা হয়ে নেই, তাই তারা চঞ্চল ও অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত ও বিপথচালিত। গান্ধীজী সারাজীবন তাই সাধনা করে গেছেন, কী করে জনসাধারণের মধ্যে অভয় সৃষ্টি করা যায়, আর অভয় না হলে, ভয় দূর করতে না পারলে 'সচেতন'ও হওয়া যায় না। কাজেই যখন দেখি আজকের দিনের বিপ্লবীরা 'সচেতনতা' সৃষ্টি করতে ব্যস্ত, অথচ মানুষকে নির্ভয় হতে, ভয় দূর করতে যে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেরণার দরকার, তাকে আদি স্থান বা priority দিচ্ছেন না, তখন তাঁদের প্রচেষ্টার অসার্থকতার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।

আর জনসাধারণের সঙ্গে ঐক্যবোধ সে তো কেবল ইউনিয়নধর্মী ঐক্যবোধেই শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সংগ্রামী কর্মীকে নিজের প্রত্যয়ের উপরেই এসে দাঁড়াতে হবে। Unity is strength, এই সূত্রটা ধরে বসে থাকলে যেখানে ইউনিয়ন কোন কারণে ভেঙে যায়, সেখানে কি বিপ্লবী কর্মীর চরিত্রও ভেঙে যেতে হবে? কোন্ প্রত্যয়ের উপরে, কোন্ বিশ্বাসের উপরে একজন কর্মী বা বিপ্লবী শেষ পর্যন্ত ভাঙবে না? এখানে কোন না কোন দার্শনিক স্থিত-ভিত্তির প্রয়োজন হয়। সেখানে সকল অনৈক্য ও সকল বিভেদের মধ্যে অভেদের ধ্রুবপদটি উপস্থিত থাকা চাই। যে-ধ্রুবপদ থেকে আমাকে কোন অবস্থাতেই বিচলিত করতে পারবে না।

এই প্রসঙ্গ একটা লক্ষ্য করছি এইজন্য যে, আজকে সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন মূর্তিতে নানা ধরনের সন্ত্রাসবাদ দেখা দিয়েছে, তার আমরা নিন্দা করতে পারি, কিন্তু তার সমাধান কোন্ পথে সেটা তো বলতে হবে। বিশ্বব্যাপী অসন্তোষ আজ নানা ধরনের সন্ত্রাসবাদ ও প্রতিসন্ত্রাসবাদে একটা ময়দানব সৃষ্টি করেছে, সভ্যতার এই ক্ষেত্রে এসে। এর পিছনে কী কী আশা আকাঙ্ক্ষা, বঞ্চনা, তিক্ততা ও অসহায়তা অনবরত অনির্বাণ ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে, তা আমাদের বুঝতে হবে। এ কেবল আইনকানুন রক্ষা বা Law and order এর প্রশ্ন নয়। Law and order এর অসংখ্য

permutation ও combination করে আমাদের সম্মুখে যে 'মহতী বিনষ্টি' দেখা দিয়েছে তার থেকে মুক্তি নেই। এর কোন রাজনৈতিক সমাধানও নেই, যে যা বলেই চিৎকার করুক না কেন। এর মূলে যেতে হলে, জীবনদর্শনের গোড়াকার মূলে যেতে হবে। তার জনাই এই সব মৌলিক প্রশ্ন ও জীবনতত্ত্ব ও দর্শনের উপেক্ষিত ক্ষেত্রে আবার আমাদের প্রবেশ করতে হবে।

(ছয়) গান্ধীজী বলেছেন, তিনিও সংগ্রাম চান। তিনি শান্তিবাদী pacifist নন। অন্যায় অত্যাচারে ভরে আছে দেশ। তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। তিনি তাই সবাইকে 'সশস্ত্র' করতে চান, কিন্তু সেসব অস্ত্র নৈতিক অস্ত্র, যার প্রধান ও প্রথমটা হল সাহস। তাঁর পথে বৃদ্ধবৃদ্ধা, কিশোরকিশোরী, যুবকযুবতী—দরিদ্রতম লোকটিও লড়তে পারে। অন্যায়ের সঙ্গে অসহযোগ করো, এমন কোন শক্তি থাকতে পারে না যা জনসাধারণের অসহযোগকে মোকাবিলা করতে পারে। তিনি তাই অতি দুর্বলকেও, অতি ভীরু জনসাধারণকেও আত্মমর্যাদায় ও আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। তাঁর ডাকে বারে বারে অপূর্ব সাড়া মিলেছিল। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করলে চলবে না যে, তাঁর সত্যাগ্রহী আন্দোলনে অনেক মিথ্যাগ্রহী ও দুরাগ্রহী ব্যক্তিরাও ঢুকে পড়েছিলেন। তাঁর আন্দোলনকে সর্বদা উজ্জ্বলামণ্ডিত রাখতে পারেননি। স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশব্যাপী এত হিংসা কী করে এল, তা বুঝতে গিয়ে তিনি শেষ জীবনে এটা আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন যে, তাঁর আন্দোলনের মধ্যে বরাবরই কিছু না কিছু সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানী লোকের আনাগোনা অবারিত ছিল। তিনি যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন না। তাই তাঁর সত্যাগ্রহ বা অহিংসা 'বীরের অহিংসা' সর্বদাই ছিল না। ফলে প্রচণ্ড অবস্থার চাপে অনেকেই পথভ্রষ্ট হয়, হিংসার পথ নেয়, আর নেয় সুবিধাবাদের পথ, ক্ষমতা ভোগ করার মোহ আসে ইত্যাদি। কিন্তু যখন তিনি বুঝলেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। যার জন্য তাঁকে শেষ পর্যন্ত জীবনও দিতে হল, কিন্তু অহিংসার স্থায়ী প্রতিষ্ঠা হয়নি। হিংসা কিছু কালের জন্য মাথা নীচু করে থাকে বটে, কিন্তু আজ আবার নানা 'অনুকূল' পরিস্থিতিতে বর্ষাকালের আগাছার মত তা নানা মূর্তিতে দেখা দিয়েছে এই গান্ধীজীর ভারতেই। তাঁর নিজের রাজ্য গুজরাটেও দেখা দিয়েছে। মোট কথা হিংসাপন্থী বিপ্লবীদের মধ্যেও যেমন ভেজাল ঢুকে যেতে পারে, অহিংসার ক্ষেত্রেও নানা ধরনের ভেজাল ও পরোক্ষ হিংসা প্রশ্রয় পেয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ মানুষের সংগ্রাম কেবল কোন মতবাদ দিয়েই চিরজয়ী হতে পারে না। মনে হচ্ছে যতদিন মানুষ আছে ও থাকবে, ততদিন তাকে লড়তেই হবে। কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে কোন্ পথ বা পদ্ধতি কার্যকরী থাকবে এবং কোন্ অবস্থায় কী ব্যবস্থা নিতে হবে সে প্রশ্ন ও বিচারের কোন বিরাম নেই। মানুষের ইতিহাসে বিশ্রাম ও বিরামের ক্ষেত্র খুবই সাময়িক। চিরন্তন শান্তি ও চিরন্তন স্বর্গ মানুষের ভাগ্যে নেই। কাজেই সন্ত্রাসবাদ, সশস্ত্র বিদ্রোহ, ন্যায়যুদ্ধ, সত্যাগ্রহ, অসহযোগ ইত্যাদি যতগুলি সংগ্রামী হাতিয়ার মানুষ এ যাবৎ ব্যবহার করে এসেছে তাদের প্রয়োজন ও প্রয়োগপদ্ধতি সম্বন্ধে মানুষের সক্রিয় গবেষণার দরকার আছে বলেই আজকের যুগের সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে এত বিশদ আলোচনার দরকার হয়েছে।

॥ ৪ ॥

স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতে যত ধরনের 'সন্ত্রাসবাদী' বিপ্লবের প্রচেষ্টা দেখি, তাতে কখনও অকারণ নিষ্ঠুরতা বা কদর্য নীচতার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। মৃত্যু ঘটানো বা মৃত্যু বরণের মধ্যে বা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে গিয়ে নীচতা বা নিষ্ঠুরতার আশ্রয় বড় কেউ নেননি। আদর্শের প্রশ্নটি তখন খুবই উজ্জ্বল ছিল, ফলে ঐ পথে নৈতিক অবক্ষয় সহজে ঘটতে দেখা যায়নি। কিন্তু ১৯৪৬ সালে কলকাতার বুকে মুসলিম লিগ যে ডাইরেক্ট অ্যাকশনটি ঘটায়, যার ফলে ক্রমে সমস্ত দেশে একটা ঘোর অন্ধকার নেমে আসে, সাম্প্রদায়িকতা দেখা দেয় সকল পক্ষ থেকেই, তার মত নিষ্ঠুর চিত্র কোন সভ্য দেশের ইতিহাসে নেই। মনে রাখতে হবে যে, দেশ ভাগ করার সময়ে ছয় লক্ষ নরনারীকে প্রাণ দিতে হয়, এবং তাও অতি কদর্য, হীন ও নিষ্ঠুর পরিস্থিতিতে। সেই সাম্প্রদায়িক সংগ্রাম সকল প্রকার বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামকেও সংক্রামিত করে, তার নিষ্ঠুরতা, অবিবেচনা ও নীচতা দিয়ে। পরবর্তীকালে 'মার্কসবাদী' নকশাল বিপ্লবেও কোন কোন ক্ষেত্রে অকারণ নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের প্রভাব দেখা যায়। শ্রেণীশত্রুকে এমনভাবে মারতে হবে, যাতে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়, এবং কে শ্রেণীশত্রু বলে চিহ্নিত হবে, তারও কোনও স্থির মানদণ্ড থাকে না। আর যাঁরা এই শ্রেণীশত্রুদের 'খতম' করবেন, সেইসব তরুণ তরুণীরা অপ্রাপ্তবয়স্ক বলে তাঁদের সহজাত কোমলতা থেকে যাতে তাঁরা মুক্ত হয়ে যান, যাতে তাঁরা নিষ্ঠুর হতে পারেন, মানুষ মারা আর মাছি মারার মধ্যে যে কোন প্রভেদ নেই, এই 'শিক্ষা'ও হাতেনাতে কোন কোন ক্ষেত্রে দেওয়া হয়। কিন্তু এটা মানবিক ধর্মের, মানুষের ধর্মের এমনই বিপরীত একটা মত্ততা যা অস্বাভাবিক। তাতে মানুষের স্নায়ুর উপরে অতিরিক্ত অত্যাচার করা হবেই। ফলে এ জাতীয় অনেক অতি উত্তেজিত অল্পবয়স্ক ছেলেদের অনেকেরই nervous breakdown ঘটে। মানবতাবিরোধী এমন নিষ্ঠুরতায় মত্ততার জন্যও শেষ পর্যন্ত এ ধরনের সংগ্রাম ভেঙে যায়। অবশ্য সেই উগ্র আন্দোলনের 'খতম' করার নীতির নানা দিক নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্কবিতর্কেও তাঁরা ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়েন, স্ববিরোধিতা, পদে পদে দেখা দেয়।

১৯৪৬ সালের দাঙ্গা যেমন শান্তিপ্রিয় ধর্মভীরু ভারতবাসীদের চরিত্রের উপরে একটা কালিমা ঢেলে দেয়, তারও পূর্বে সারা পৃথিবীতে যুদ্ধের শেষ দিকটায় এমন একটা কাণ্ড যুদ্ধবাজরা করে, যার 'অবদান'ও এই নৈতিক বিপর্যয়ের জন্য কম দায়ী নয়। জাপানের উপরে পারমাণবিক বোমা দুটি যখন ফেলা হয়, যখন মহাত্মা গান্ধী জেলের বাইরে। তিনি একটি সংক্ষিপ্ত উক্তিতে ঐ ভয়াবহ কাণ্ডটির যথার্থ মূল্যায়ন করেছিলেন এই বলে যে, দীর্ঘ ইতিহাসের পথে মানুষ যেসব সূক্ষ্ম মূল্যবোধ সৃষ্টি করে এনেছিল, তার উপরে এমন একটা প্রচণ্ড আঘাত ঘটানো হয়েছে যে মানুষই অনেক মরেনি, মানুষের মনুষ্যত্বেরও খতম করা হল। কাজেই ১৯৪৬-এর দাঙ্গা হয়তো আশু বা জরুরী ক্ষেত্রে মানুষকে মনুষ্যত্বের পথ থেকে বিপথগামী করল, কিন্তু তারও পূর্বে সর্ব পৃথিবীতেই সব জাতি ও সব রাষ্ট্রের নীতিগত মূল্যবোধের উপর একটা চরম আঘাত ঘটেছিল, ১৯৪৫ সালে নাগাসাকি ও হিরোসিমার উপরে পারমাণবিক বোমাবর্ষণে। নিষ্ঠুর দাঙ্গা ব্যক্তিচরিত্রের ক্ষেত্রে যে ক্ষতি সাধন করে যার পরিণামে প্রত্যেক প্রতিরোধের প্রচেষ্টাকে শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদে পরিণত করার প্রবণতা বাড়ায়, তেমনি যাঁরা শক্তিমান, যাঁরা রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে নিজেদের শাসন ও শোষণ প্রথা চালু রাখছেন, তাঁরা বিপ্লববাদীদের ও সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে Leonine violence ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড প্রতিশোধের বা massive retaliation-এর লাইসেন্স পেয়ে গেলেন, তাঁদের চিন্তাচেতনায় আর কোন চক্ষুলজ্জা ও বিবেকদংশনের ক্ষেত্রই রইল না।

॥ ৫ ॥

আজকালকার সন্ত্রাসবাদের 'বিশ্বরূপ' দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। সারা বিশ্বে কী ধরনের সন্ত্রাসবাদে আজ সবাই ভীত ও কেন, সে সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে আমাদের দেশের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী বিস্ফোরণের কিছুটা বিশ্লেষণ করা উচিত।

পঞ্জাবের খলিস্তানপন্থীদের রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়। আমরা তাদের সংগ্রামপদ্ধতি নিয়েই আলোচনা করব—যাকে বলা হয় সন্ত্রাসবাদ, খতম করার ও গুপ্ত হত্যা করার পদ্ধতি। এই সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের ফলে সারা দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়াটা হয়ে পড়েছে 'সন্দেহপূর্ণ'। এই সংগ্রামীদের যেহেতু কোন মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি হয়নি, এমন কি খলিস্তানী মুক্তাঞ্চল করে চলা, পোশাক-আশাকে কোন সামরিক বাহিনীর চিহ্ন না রাখা, আত্মগোপন করে চলা ফেরার ফলে কোন্ শিখ যে ভারত-পথিক আর কোন্ শিখ যে খলিস্তানী তা বুঝতেই দেওয়া হয় না। অথচ সাধারণভাবে বেশীর ভাগ শিখেরাই শান্তিপ্রিয়, পরিশ্রমী ও সরল। তাদের আনুগত্য ও তাদের প্রতি অন্যদের আস্থার সুবিধাবাদী ব্যবহার করছে এইসব উগ্রপন্থী সন্ত্রাসবাদী খলিস্তানীরা। প্রথমেই একটা কপটতার আশ্রয় নিচ্ছে। অনুগত শিখদেরও ভয় দেখিয়ে তারা আশ্রয়স্থল খুঁজে পায়, হয়তো অর্থও ভয় দেখিয়ে সংগ্রহ করে। তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না, ঐ ভয়ের বা ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করার ফলে। এদের কার্যকলাপের অন্ধকার দিকটার বর্ণনা করাও সম্ভব নয়। তাদের গোপন জগতে তাদের কী ভাবে চলছে তাও আবিষ্কার করা শক্ত।

কিন্তু ইতিমধ্যেই তারা ভারতীয় গণতন্ত্রকে অনেকটাই ঘায়েল করতে সমর্থ হয়েছে। কেবল

পাঞ্জাবেই নয়, হরিয়ানা, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ—সর্বত্র একটা সন্দেহ ও ভীতির আবহাওয়া সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। আজ আর কোন জনপ্রতিনিধি, সে এম এল এ-ই হোন, আর এম পি-ই হোন, বডিগার্ড ছাড়া পথেঘাটে বের হন না। সরকারপক্ষীয় প্রতিনিধিরাই শুধু এই নিরাপত্তা ব্যবস্থার সাহায্য নিয়ে চলাফেরা করেন না, বিপক্ষ দলের নেতারাও বডিগার্ড ছাড়া চলতে সাহস পান না। আর মন্ত্রীদের তো কোন কথাই নেই। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী তো তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিকটই একজন অসহায় বন্দী বিশেষ। এরকম অবস্থা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সম্বন্ধে কেউ ভাবতেও পারতো! আজ জনপ্রতিনিধিরা, নেতারা আর নির্ভয়ে জনগণের মধ্যে যেতে পারেন না, আর জনগণেরও নেতাদের 'সুরক্ষিত' দুর্গে প্রবেশ নিষেধ। এভাবে কি গণতান্ত্রিক আবহাওয়া থাকতে পারে? আর ভয় বা সন্ত্রাসের যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকলেও, ভীত মানুষের রজ্জুতে সর্পভয় হবেই। দেশে যে নির্ভীকতার প্রবাহ আনবার চেষ্টা করেছিলেন বিপ্লবীরা ও মহাত্মা গান্ধী তাঁদের সব প্রচেষ্টার মূলোৎপাটন করে দিয়েছে আধুনিক যুগের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা। আশ্চর্য ইতিহাসের এই নিষ্ঠুর উপহাস!

আজকাল আর ট্রেনে, বাসে, হাওয়াই জাহাজে চলাফেরাও নিরাপদ নয়, সর্বদাই মনে হবে কোথাও কোন বোমা লুকিয়ে বসানো আছে হয়তো, বিমান ছিনতাইকারী দস্যুরা হয়তো নিরীহ যাত্রী সেজে আমার পাশের সিটেই বসে আছে! যে যন্ত্রসভ্যতা মানুষের অসহায়তাকে দূর করবে বলে মনে করা গিয়েছিল, সেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাসমৃদ্ধ যন্ত্রসভ্যতা মানুষকে ধ্বংস করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ!

পরিশেষে আধুনিক সন্ত্রাসবাদের আন্তর্জাতিক ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু সমালোচনা করা যাক। প্রায় সব দেশের রাষ্ট্রই এখন আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা নিচ্ছেন বলা হয়। এদিকে সন্ত্রাসবাদও কোন কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রনেতা সমর্থন করেন বলে অভিযোগ উঠছে। যেমন লিবিয়ার জঙ্গী নেতা কর্নেল গদ্দাফি নাকি সকল আরব সন্ত্রাসবাদীদের পরিচালিত করছেন। এই অভিযোগ হল আমেরিকার রেগন সরকারের। কিছু কাল পূর্বে ভিয়েনার বিমানবন্দরে, প্যারিস ও বনের রেস্তোরাঁতে বোমা ফাটিয়ে যে নিরাপরাধ নরনারীদের হত্যা করা হয়, তার জন্য দায়ী করা হয় কর্নেল গদ্দাফিকে। এইসব সন্ত্রাসবাদী উৎপাত বন্ধ করে দেবার জন্য আমেরিকা তার ভূমধ্যসাগরের নৌবহর ও বিমানবহর থেকে বেপরোয়া বোমাবর্ষণ করে লিবিয়ার উপরে—প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। আর আমেরিকার সমরবিদরা আরও হুমকি দিয়েছেন যদি আবার গদ্দাফি 'টু-ফ্যা' করেন তবে তদধিক ক্ষতি সাধন করা হবে লিবিয়ার। যদি ধরেও নিই, গদ্দাফি সব আরব সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করেন, সেটা ধরে নেবার পক্ষে কোন উপযুক্ত সাক্ষীসাবুদ নেই, তথাপি আজ আমেরিকা যা করছে তাকেও বলতে হবে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের বীভৎস ব্যবহার। এই নীতি আমেরিকা লাতিন আমেরিকার মুক্তিকামী দেশগুলির উপরেও চালিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে তৃতীয় মহাযুদ্ধ যাতে না লাগে, বা কেউ লাগাতে গেলে 'মারাত্মক প্রতিশোধ' বা massive retaliation -এর জন্য অতি বড় সব পারমাণবিক বোমা ও দূর পাল্লার বিস্ফোরক অস্ত্রশস্ত্র বড় বড় রাষ্ট্রগুলি তৈরি করেই চলেছে, এবং মজুত করে চলেছে। নক্ষত্রযুদ্ধ ও লেসার-রশ্মির যুদ্ধবিগ্রহকেও নির্ভুল করার চেষ্টা হচ্ছে। যার ফলে ন্যায়সঙ্গতভাবে অসন্তুষ্ট এবং অত্যাচারিত বঞ্চিত ছোট ছোট দেশ আর যুদ্ধ-বিগ্রহ করার সাহসই পাচ্ছে না। অথচ তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবিদাওয়ার প্রতিও কোন বড় রাষ্ট্র গ্রাহ্য করছে না। আরব জগতের উপরে ইসরাইলীদের শাসানি কিছুতেই বন্ধ করা হচ্ছে না। কেউ সত্যি করে ইসরাইলকে সংযত থাকতে আদেশ করছে না, কেননা ইসরাইল সর্বপ্রকারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দানবীয় শক্তির দ্বারা সুরক্ষিত ও পরিপুষ্ট। আরব জগৎ বারবার যুদ্ধে মার খেয়েছে বৃহৎ শক্তিপুষ্ট ক্ষুদ্র ইসরাইলের কাছে। এই পরাজিত, অপমানিত, দরিদ্র আরবজাতিসমূহের সম্মুখে কোন শান্তি ও মুক্তির পথ নেই। তাদের প্রচলিত পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার ক্ষমতাও নেই, তাদের হয়ে কোন বৃহৎ শক্তি লড়বেও না। যুক্ত জাতি পরিষদ এ জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি ও উপজাতিদের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার সম্বন্ধে বড় জোর দু'একটা সদিচ্ছামূলক প্রস্তাব পাশ করতে পারে। কিন্তু কোন কার্যকর সিদ্ধান্ত চালু করতে গেলেই 'ভেটো'তে তা চাপা পড়ে যাবে। আফ্রিকাতে শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের প্রতিবাদে কালোরা কী করবে! দক্ষিণ আফ্রিকাকে বয়কট ও বর্জন করার নীতি সত্যিই কি মানানো গেলো? এত দিক থেকে এত রকমের চিৎকার, হুমকি সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকার বোথা সরকার সেদিন তিনজন কালো মুক্তিসংগ্রামীকে ফাঁসিতে লটকে দিল। ভারত, সোভিয়েত রাশিয়া কী করতে পারলো? জোর যার মুল্লুক তার নীতি আজও সদম্ভে রাজত্ব করে চলেছে। যুদ্ধও করতে পারবো না, কেউ সাহায্য করতেও আসবে না, কোথাও বিচার পাওয়া যাবে না, তবে কী করবো? সব মেনে নেবো? আস্তে আস্তে ধরার বুক থেকে মুছে যাবো? কেন, তবে মরিয়া হয়েই মরি! এ হলো আরব দুনিয়ার বিক্ষুব্ধ যুবসমাজ। তাদের নেতারা হয়তো সব মেনে নিয়েছে, ঘুষ খেয়ে চুপ করে যাচ্ছে! তাই আরব দুনিয়াতে আজ বেপরোয়া দুর্ধর্ষ মরণকামী যুবক সন্ত্রাসবাদীদের জন্ম হচ্ছে। এমন অবস্থায় পড়লে সব দেশেই এমন বিদ্রোহী জন্মাতে পারে, যারা যুক্তির ধার ধারবে না, আত্মহত্যাও যদি হয় তবে তাও করবে। একটা বেড়ালকেও সব দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়ে যদি মারবার চেষ্টা করা হয়, তবে সে-বেড়াল বেপরোয়া হয়ে যায়, বাঘের মত হিংস্র হয়ে আক্রমণকারীদের গলা কামড়ে ধরতে পারে!

এই বেপরোয়া সন্ত্রাসবাদীরা (আরব মুল্লুকের) নিজেরা যেমন শান্তি পাচ্ছে না, পৃথিবীর অন্য কাউকেও শান্তিতে থাকতে দেবে না হয়তো। আর পৃথিবীর যত সুবিধাভোগী শান্তিপ্রিয় নরনারী, বিশেষ করে ইয়োরোপ আমেরিকার, তাঁরা কি সত্যিই নিরপরাধ? তাঁদের কি কোন দোষ নেই? তাঁরা কি তাঁদের নিজেদের দাম্ভিক ও অত্যাচারী শাসকশ্রেণীকে নির্বিবাদে কালো আদমীদের, আরবদের, লাতিন আমেরিকার দরিদ্র দেশগুলির উপরে সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু করছেন বা করেছেন? তাঁদের অপরাধ অত্যন্ত স্পষ্ট, সেটা Commission-এর অপরাধ না হলেও, Omission-এর অপরাধ তো বটেই। আমরা যারা পৃথিবীর ভদ্রলোক ভদ্রমহিলারা, যারা কোন অপরাধ করিনি বা করি না বলে মনে করি, তারা এইসব দুনিয়াব্যাপী অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু করি না, অত্যাচারী শক্তিগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করি, তাদের বিলাসব্যসনের জীবনে অংশীদার হয়ে আছি, তাদের শোষণযন্ত্রের সঙ্গে কোন অসহযোগিতা করি না, তাদের সত্যি সত্যি বয়কট করি না।

কাজেই সন্ত্রাসবাদ কোন মুক্তির পথ না হলেও, তা অবশ্যম্ভাবী রূপে একটা প্রতিক্রিয়া বা reaction তো বটেই। কোন রকম যদি রি-অ্যাকশান না হয়, তবে বুঝতে হবে সেখানকার মনুষ্যত্বও মুছে গেছে, সবাই 'দাস' হয়ে গেছে। কাজেই সর্বক্ষেত্রেই সন্ত্রাসবাদ সমানভাবে নিন্দনীয় নয়, যদিও জানি এতে মুক্তি নেই। হয়তো মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহ ও অসহযোগের পথেই পৃথিবীর শেষ বিপ্লব সম্পূর্ণ হতে পারে, অন্যান্য সব পথ আজ বন্ধ অথবা অন্ধগলিতে নিয়ে যাবে। সন্ত্রাসবাদের উত্তর ও প্রয়োজন যেমন বিশ্বযুদ্ধে নেই, খণ্ডযুদ্ধে নেই, গেরিলা ও সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধেও নেই। হয়তো আছে গান্ধীজীর পথে। কিন্তু সে-পথে চলতে হলে নিজেদের জীবনভঙ্গীটাই পাল্টাতে হবে। সরল সহজ জীবন সর্বজনীন করতে হবে। প্রকৃতিকে জয় করে চলার অভিমান ত্যাগ করে, প্রকৃতিকে 'মা' মনে করে নিয়ে সহযোগিতা করে চলতে হবে। আগ্রাসী লোভ থেকে মুক্ত হতে হবে। জীবন-দর্শনটাই পাল্টে দিতে হবে। মনে হবে, এ তো খুব অসম্ভব কথা, খুব দূরের কথা। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যাবে নান্য পন্থা অয়নায়।

তৃতীয় কোন মহাযুদ্ধ হয়তো কোন দিনই আর ঘোষিত হবে না। কিন্তু এক ধরনের তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পৃথিবীব্যাপী এক ধরনের ধূমায়িত গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু এ যুদ্ধ সীমান্ত-যুদ্ধ সামান্যই, এ-যুদ্ধ সর্বাঙ্গীণ, ভিতরে ও বাইরে, প্রচণ্ড অবক্ষয়ী। সব চেয়ে বেশী অবক্ষয় ও ক্ষতি সাধন হচ্ছে হাজার-হাজার বছরে গড়া, তিল তিল করে গড়া মনুষ্যত্বের। তবে এই মনুষ্যত্বের আত্মরক্ষার অস্ত্রপাতিও হতে হবে মানবোচিত, অতএব সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এই যুদ্ধের কুরুক্ষেত্র কোন এক বিশেষ প্রান্তরে বা রণক্ষেত্রে নয়, এ যুদ্ধের মীমাংসা আকাশে বা নক্ষত্রযুদ্ধের মাধ্যমেও হবে না। মানুষের চিন্তা, চেতনা ও জীবনযাপনের ধরনধারণের ক্ষেত্রে একটা আমূল বিপ্লব ঘটিয়েই তাতে সত্যিকার সমাধান আসতে পারে। **শেষ**

কেন ভারতে আজ এই সন্ত্রাসবাদ ?
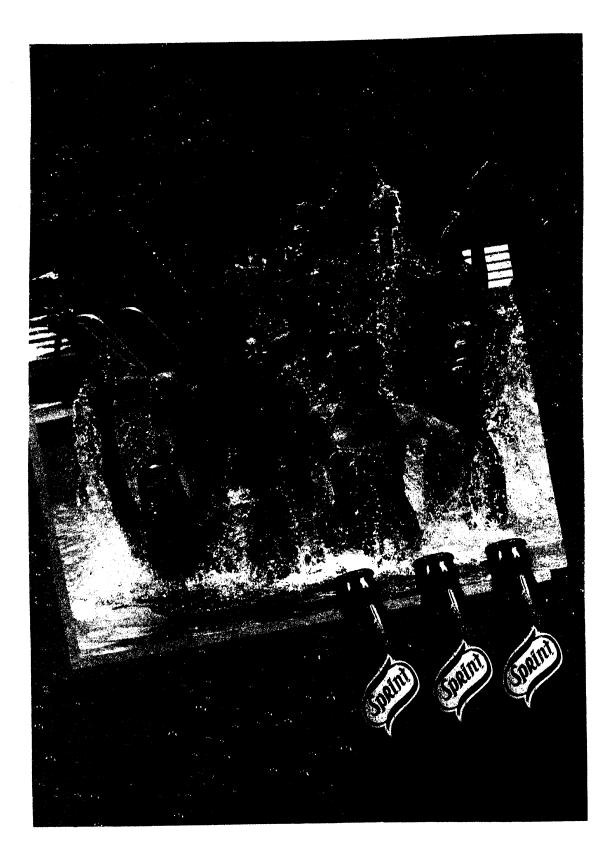
অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

এই উপমহাদেশের স্থানে স্থানে প্রতিদিন গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠছে রক্তের ছোপ, আতঙ্কে কুঁকড়ে যাচ্ছে গণতান্ত্রিক শুভবোধ । অনুসন্ধানে দেখা যায়, সন্ত্রাসবাদের শিকড় নেমে গেছে অনেক গভীরে, ছড়িয়ে পড়েছে অনেক দিকে । চল্লিশ বছর ধরে ভারতীয় গণতন্ত্রে অনবরত রাজনৈতিক চাতুরি, ভোটরঙ্গ, প্রশাসনিক ব্যর্থতা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে রাষ্ট্রের দূরত্ব বাড়িয়ে তুলেছে ।

ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদের সমস্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সর্বাগ্রে যে ব্যাপারটি আলোচনা করে নেওয়া দরকার তা হল এই যে, এক অর্থে রাষ্ট্র নিজেই এক চরম সন্ত্রাসবাদী সংগঠন কারণ সন্ত্রাস সৃষ্টির যাবতীয় উপকরণ তার করায়ত্ত এবং এই উপকরণ প্রয়োজনমত ব্যবহারের স্বীকৃত একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্রেরই । রাষ্ট্রের সশস্ত্র অনুচরবর্গের সক্রিয়তায় যে কোনও মুহূর্তে একটি দেশ অথবা তার কোনও বিশেষ এলাকা অত্যন্ত পরিকল্পিত সন্ত্রাসবাদের কবলে পড়তে পারে এবং যে কোনও ব্যক্তির পক্ষে যা চরম ভীতিপ্রদ সেই প্রাণদণ্ড দেওয়ার আইনসম্মত অধিকারও একমাত্র রাষ্ট্রের । বস্তুত, এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেই মার্ক্সবাদীরা এই ধারণায় উপনীত হন যে রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে এক নিগ্রহী প্রতিষ্ঠান যার মূল লক্ষ্য পুলিস, সামরিক বাহিনী ইত্যাদি নিগ্রহমূলক যন্ত্রের অবাধ ব্যবহারের মাধ্যমে অধিষ্ঠিত সম্মতি-সম্পর্কে স্থিতাবস্থা বজায় রেখে শাসকশ্রেণীর প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা । এই ধারণার বিপরীত মেরুতে অবস্থান উদারনীতিবাদী তত্ত্বের । উদারনীতিবাদী চিন্তায় অমিতশক্তি রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের ভিত্তিতে জনজীবনে সন্ত্রাস সৃষ্টির ক্ষমতা অস্বীকার করা হয় না । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই যুক্তি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে যে আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে এই ক্ষমতার প্রয়োগ অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয় ও বিপজ্জনক । অপ্রাসঙ্গিক, কারণ পাশবশক্তির রক্তাক্ত রণভূমি গণতন্ত্র বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র নয় । অপ্রয়োজনীয়, কারণ যে স্বতঃস্ফূর্ত গণসম্মতি গণতন্ত্রের মৌল উপাদান ভয়ের আঘাতে তা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে । এছাড়া বিপজ্জনক এই কারণে যে স্বকৃত সন্ত্রাসের পরিমণ্ডলে ক্রিয়াশীল গণতন্ত্র অচিরেই রূপান্তরিত হয় ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে যার অর্থ গণতন্ত্রের মৃত্যু । অবশ্য উদারনীতিবাদের প্রবক্তারা প্রয়োজনে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের অধিকার অস্বীকার করেন না । কিন্তু, তাঁদের মতে, এই বলপ্রয়োগ সন্ত্রাসের জন্ম দেয় না এই কারণে যে একদিকে আইনের কঠোর অনুশাসন এবং অন্যদিকে মুক্ত জনমতের শক্তি এই বলপ্রয়োগের অধিকারকে রাখে সুনিয়ন্ত্রণে । এছাড়া, তাঁদের মতে, এই বলপ্রয়োগের অন্তিম লক্ষ্য হল সার্বিক জনকল্যাণ । অর্থাৎ, সমাজে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে বিধিসম্মত বলপ্রয়োগের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিপথগামী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে যথাবিহিত শাসনে রেখে সুনিশ্চিত করে গণমঙ্গল । এই তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদের যে সংজ্ঞা পাওয়া যায় তা এইরকম : যখন কোনও ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী স্বীয় স্বার্থরক্ষার্থে অথবা দাবি আদায়ের জন্য প্রচলিত গণতান্ত্রিক বিধি ও পদ্ধতি উপেক্ষা করে জনহত্যা, সম্পত্তিনাশ ও অন্যবিধ বিশৃঙ্খলায় লিপ্ত হয়ে জনজীবনে ত্রাসের সঞ্চার করে তখন এই ক্রিয়াকর্মকে বলা হয় সন্ত্রাসবাদ । এক কথায়, সন্ত্রাসবাদ এক উন্মত্ত মানবিক আচরণ যা স্পষ্টতই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও আদর্শের পরিপন্থী ।

দুর্ভাগ্য এই যে প্রায় চার দশকের পরিণত ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আজ এই অশুভ, বিরুদ্ধ শক্তির দ্বারা আক্রান্ত । জন্মের পর থেকে ভারতীয় গণতন্ত্র অগ্রসর হয়েছে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে । সময়ে সময়ে তার স্থায়িত্ব ও স্থিরতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এবং কখনও

কখনও রাজনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পবিত্রতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কেও সংশয় দেখা দিয়েছে। তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে ভারতীয় গণতন্ত্র তার মূল কাঠামো ও চরিত্র রক্ষায় সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষের পুবে-পশ্চিমে যে সন্ত্রাসবাদের তাণ্ডব ক্রমবর্ধমান তা এই মুহূর্তে ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক চরমতম চ্যালেঞ্জ।

অবশ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস একথাই প্রমাণ করে যে আজকের এই সন্ত্রাসবাদ এদেশে এক অভূতপূর্ব ঘটনা নয়। স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতবর্ষ প্রায় চার দশক ধরে বারে বারেই উত্তাল হয়ে উঠেছিল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে। কিন্তু এই সন্ত্রাসবাদ পরিচালিত হয়েছিল বলিষ্ঠ আদর্শ ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দ্বারা। প্রথমত, এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে আঘাতের লক্ষ্য ছিল বিদেশী শাসক শক্তি। অর্থাৎ, পরাধীন ভারতবর্ষের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেরই অঙ্গ। দ্বিতীয়ত, যাঁরা এই সন্ত্রাসবাদে লিপ্ত ছিলেন তাঁরা প্রকাশ্যে সব সময় স্বীকার না করলেও অন্তরে অবশ্যই অনুভব করেছিলেন যে বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে শাসনযন্ত্রকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। এতৎসত্ত্বেও তাঁরা এই আন্দোলনের সামিল হন সম্ভবত এই কারণে যে, সন্ত্রাসবাদকে তাঁরা ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের জাগ্রত জনগণের প্রতিবাদী শক্তির প্রতীকরূপে। যেহেতু সেদিনের ভারতবর্ষে এই প্রতিবাদী শক্তিকে প্রকট করে তোলার কাজটি ছিল নিতান্তই জরুরী, সেইহেতু সেদিনের সন্ত্রাসবাদীরা ভারতের জাতীয় সংগ্রামের বরেণ্য সৈনিক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। বস্তুত, সঙ্গত কারণেই আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস তাঁদের সন্ত্রাসবাদী আখ্যা না দিয়ে অভিহিত করেছে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীরূপে।

সেদিনের এই সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে আজকের ভারতবর্ষে সংঘটিত সন্ত্রাসবাদের প্রকৃতি ও আকারগত বৈষম্য নিতান্তই স্পষ্ট। পরাধীন ভারতবর্ষে বিদেশী শাসকের কঠোর নিপীড়নে সুস্থ গণতান্ত্রিক প্রতিবাদী আন্দোলনের সুযোগ ছিল সীমিত। এছাড়া শান্তিপূর্ণ গণ-আন্দোলনের মোকাবিলায় প্রায়শই ব্যবহৃত হত বিদেশী শাসকের অমানুষিক নিগ্রহ-যন্ত্র। এরই স্বাভাবিক পরিণামে অবরুদ্ধ বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মাঝে মাঝেই বিস্ফোরিত হত সন্ত্রাসবাদের মধ্য দিয়ে। আজকের শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক প্রতিবাদী আন্দোলনের সুযোগ পর্যাপ্ত। ফলত আজকের সন্ত্রাসবাদকে অবদমিত প্রতিবাদীর আত্মপ্রকাশের অনিবার্য প্রয়াস রূপে চিহ্নিত করা যায় না। এছাড়া, স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের সন্ত্রাসবাদীরা সহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী হলেও তাঁদের মহৎ আদর্শবাদ তাঁদের বেঁধে রেখেছিল প্রবল সংযমের শৃঙ্খলে যার ফলে তাঁরা সততই সতর্ক ছিলেন যে তাঁদের পরিচালিত সন্ত্রাসবাদ যেন বিপথগামী হয়ে তথাকথিত দুষ্কৃতকারিতায় পরিণত না হয়। তাই দেখা যায় যে কদাচিৎ ভুলক্রমে তাঁদের দ্বারা কিছু নিরীহ মানুষের প্রাণ ও সম্পত্তি নাশ ঘটে থাকলেও তাঁদের আঘাতের মূল লক্ষ্য ছিল বিদেশী শাসকের প্রতিনিধিবর্গ। কিন্তু আজকের সন্ত্রাসবাদের প্রধান বলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরীহ ও নির্দোষ জনগোষ্ঠী। প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় কিছু নিরপরাধ মানুষের জীবন ও সম্পত্তি নাশের ঘটনা। এর দ্বারা হয়ত বর্তমান সন্ত্রাসবাদীদের তথাকথিত সাফল্যের খতিয়ান দীর্ঘ হয়, কিন্তু সুস্থ বিবেচনায় এই কার্যকলাপকে আদর্শভ্রষ্ট, নীতিহীন, অসুস্থ উন্মত্ততা রূপে গণ্য করা ছাড়া উপায় থাকে না।

এই উন্মত্ততা আজ ভারতবর্ষের সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই আঘাত হানতে উদ্যত। এই আঘাতের মর্মন্তুদ পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল ইন্দিরা হত্যায়। শ্রীমতী গান্ধীর হত্যাকাণ্ড সমগ্র দেশবাসীকে শোকস্তব্ধ করে দেয় এবং তার অব্যবহিত পরেই পাঞ্জাব ও আসাম সমস্যার সাংবিধানিক সমাধান ঘটানো হয় যথেষ্ট দ্রুততা ও তৎপরতার সঙ্গে। আশা করা গিয়েছিল যে এই ঘটনাবলীর পরিণামে ভারতবর্ষে সন্ত্রাসবাদ প্রশমিত হবে। কিন্তু এই আশা ফলবতী হয়নি। পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদ আজও অব্যাহত। উত্তর-পূর্ব ভারতেও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন যথেষ্ট সক্রিয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যে সন্ত্রাসবাদ আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি তা স্পষ্টতই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বেপরোয়া বিরুদ্ধাচরণ। এই বিরুদ্ধাচরণের প্রভাব সর্বনাশা ও সুদূরপ্রসারী।

আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তকরণ প্রক্রিয়ার সর্বোচ্চ প্রশাসনিক স্তরে জনস্বার্থনির্ভর বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং এইসব দাবি-দাওয়ার অনুকূলে সিদ্ধান্তকরণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার জন্য রাজনৈতিক দল, প্রেশার গ্রুপ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্মরত থাকে। এই সব প্রতিষ্ঠানের অবাধ ক্রিয়াশীলতা ও কর্মতৎপরতার ওপর অনেকাংশেই নির্ভর করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা ও সাফল্য। কিন্তু দাবি আদায়ের উপায় হিসাবে যদি সন্ত্রাসবাদের ওপর নির্ভর করা হয় তাহলে দাবি প্রেরণ ও পূরণের এই স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাভাবিক কর্মধারা বিঘ্নিত হয়। এর অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়ায় এই যে সন্ত্রাসবাদী বিশৃঙ্খলার ভীড়ে বৈধ প্রাধিকারীর কাছে দাবিপ্রেরণের স্বাভাবিক প্রণালীতে অচলাবস্থা দেখা দেয়, যার জন্য মূল দাবি তার গুরুত্ব হারিয়ে প্রাধিকারীর কাছে নিতান্ত গৌণ হয়ে পড়ে। একটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। এই মুহূর্তে পাঞ্জাবে যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন অব্যাহত তা অবশ্যই পরিচালিত হচ্ছে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট দাবির ভিত্তিতে। কিন্তু এই সন্ত্রাসবাদের প্রভাবে সেখানকার জনজীবন বিপন্ন ও বিপর্যস্ত হওয়ায় এখন রাষ্ট্রীয় প্রাধিকারীর কাছে সেইসব দাবি অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্ন। দ্বিতীয়ত, সন্ত্রাসবাদ নিঃসন্দেহে সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত বিপ্লব নয়, কাজেই এই সন্ত্রাসবাদ সাধারণত কোনও বলিষ্ঠ মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ, সন্ত্রাসবাদ যুক্তিনির্ভর নয়, মূলত আবেগনির্ভর। এই আবেগতাড়িত আন্দোলন সংযমের সীমারেখা অতিক্রম করে তাৎক্ষণিক উত্তেজনা ও রোমাঞ্চকর উন্মাদনায় আচ্ছন্ন হয়ে যে-কোনও মুহূর্তেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে। এই কারণেই প্রায়শই সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়ে থাকেন নিরীহ, নির্দোষ নরনারী। তৃতীয়ত, সন্ত্রাসবাদের বিষাক্ত বায়ু অতি দ্রুত ছড়ায়। কারণ যাঁরা সন্ত্রাসবাদের শিকার হন তাঁরা চিরদিন এই বীভৎস মারণযজ্ঞের নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারেন না। জনমনস্তত্ত্বের সাধারণ নিয়মানুসারে একটা সময় আসে যখন তাঁরাও উদ্যত হন প্রত্যাঘাতে। তাই এক সন্ত্রাসবাদ জন্ম দেয় নতুন আর এক সন্ত্রাসবাদের এবং এইভাবে সন্ত্রাসবাদের পরিধি যতই বিস্তৃত হতে থাকে ততই সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা হারায় স্বাভাবিকতা। চতুর্থত, সন্ত্রাসবাদ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চরিত্রে নিয়ে আসতে পারে অবাঞ্ছনীয় পরিবর্তন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে রাষ্ট্রের ভাণ্ডারে সততই মজুত থাকে অসামান্য শক্তিশালী নিগ্রহযন্ত্র। সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় রাষ্ট্রকে স্বাভাবিক কারণেই প্রয়োজনমত এই নিগ্রহযন্ত্র ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই ব্যবহারে সংযম ও পরিমিতিবোধ রক্ষা করা রাষ্ট্রের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ উদ্যত মারণাস্ত্র সবসময়ে যুক্তি ও সংযমের অনুশাসন মেনে চলতে পারে না। ফলত সন্ত্রাসবাদ দমনে লিপ্ত রাষ্ট্র নিজেই হয়ে উঠতে পারে নগ্ন সন্ত্রাসবাদী। অর্থাৎ, গণতান্ত্রিক কল্যাণরাষ্ট্রের আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হয়ে দেখা দিতে পারে পুলিসরাষ্ট্রের বীভৎসতা।

এই সব সম্ভাবনার আলোকে যে সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল এই যে ভারতবর্ষের মত এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদ এক বিপজ্জনক অসুস্থতা। অতি দ্রুত এই অসুস্থ প্রবণতার মূলোৎপাটন করতে না পারলে ভারতীয় গণতন্ত্রের শক্তি ও স্থিতিক্ষমতা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কারণ উন্মত্ত সংখ্যাল্প গোষ্ঠী যদি স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিয়ে ক্রমাগত আইনের শাসনকে উপেক্ষা করে চলেন এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে বন্দী করে রাখেন ভয়ের পরিমণ্ডলে তাহলে অনিবার্যভাবেই আইনব্যবস্থা তথা অন্যবিধ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যাবে। এর ফলে দেশ জুড়ে দেখা দেবে নিদারুণ বিশৃঙ্খলা এবং এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণ করে ভারতবর্ষে ফ্যাসিবাদী শক্তির অভ্যুত্থান অসম্ভব নয়।

বস্তুত, এই বিবেচনার ভিত্তিতেই কেউ কেউ মনে করে থাকেন যে ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পিছনে কয়েকটি বিদেশী শক্তির প্ররোচনা ও সাহায্য কাজ করছে যেহেতু ভারতবর্ষের জাতীয় বিশৃঙ্খলা ও গণতন্ত্রের হনন এই সব বিদেশী শক্তির স্বার্থের অনুকূল। একথা সত্য যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আজ তৃতীয় বিশ্বকে কুক্ষিগত করার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী এবং ভারতবর্ষ যেহেতু তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম অগ্রণী দেশ সেইহেতু ভারতীয় গণতন্ত্রের বিপর্যয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উল্লাসের কারণ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যেহেতু এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট

তথ্যের নিতান্তই অভাব সেই কারণে ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদের পিছনে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের চক্রান্তকারী ভূমিকা সম্পর্কে কোনও নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে আজকের সন্ত্রাসবাদের যথোপযুক্ত মোকাবিলা করতে গেলে এই দুর্ভাগ্যজনক জাতীয় পরিস্থিতির সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ কারণগুলি চিহ্নিত করা একান্ত প্রয়োজন। যে ভারতবর্ষের প্রায় চল্লিশ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস আপেক্ষিকভাবে শান্ত সে দেশে আজ হঠাৎ কী কারণে সন্ত্রাসবাদের অভ্যুত্থান? প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ভারতবাসীই আজ এই প্রশ্নের উত্তর জানতে আগ্রহী। স্বাধীনতা লাভের উনচল্লিশ বছর পরে আজ একথা অস্বীকার করা যায় না যে ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মোটামুটিভাবে স্থায়িত্ব ও স্থিরতা অর্জন করেছে এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক আচার পালনের অভ্যাস জনসাধারণের মধ্যে লক্ষ করা যায়। এদেশের সাধারণ মানুষ প্রকৃতিগতভাবে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রিয় এবং ব্যালট-বাক্সের মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধনে তাঁদের আগ্রহ ও তৎপরতাও তাঁদের এযাবৎ ভোটদানে প্রতিফলিত। এই সামগ্রিক পরিস্থিতির বিচারে আজকের সন্ত্রাসবাদ স্বভাবতই এক অস্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু কেন এই অস্বাভাবিক প্রবণতা?

সমাজবিজ্ঞানের পণ্ডিতেরা এর কারণ অনুসন্ধানে প্রয়োগ করতে পারেন প্রচলিত আপেক্ষিক বঞ্চনার তত্ত্ব। এই তত্ত্বানুসারে এক নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী আপেক্ষিক বঞ্চনাবোধে আচ্ছন্ন হতে পারেন নানা কারণে। প্রথমত, রাষ্ট্রের উদ্যোগে পরিচালিত সমাজের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশার আয়তন বাড়িয়ে তুলতে পারে অস্বাভাবিকভাবে এবং এই পটভূমিকায় প্রত্যাশা পূরণের উপযুক্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রের নাও থাকতে পারে। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় সামর্থ্য ও সামাজিক দাবির মধ্যে যে বিপুল ব্যবধান গড়ে ওঠে তা থেকে জনমনে সঞ্জাত হয় বঞ্চনার ক্ষোভ। অপ্রশমিত এই ক্ষোভ হিংস্রতা ও উন্মাদনার সাযুজ্যে কালক্রমে ব্যক্ত হয় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে। আবার এমন হতে পারে যে রাষ্ট্রের আনুকূল্যে জনগণ যেসব সামগ্রী ভোগদখল করে চলে হঠাৎ রাষ্ট্রের নীতি পরিবর্তনে সেগুলির মূল্যহ্রাস ঘটলে জনগণ বঞ্চিতবোধ করে সক্রোধে প্রতিবাদ জানায় সন্ত্রাসের মাধ্যমে। তৃতীয়ত, এমনও ঘটতে পারে যে জনগণের দীর্ঘদিনের স্বীকৃত সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার রাষ্ট্র হঠাৎ প্রত্যাহার করে নিলে জনগণ যুক্তির পথ পরিহার করে লিপ্ত হয় সন্ত্রাসবাদী বিশৃঙ্খলায়। এছাড়া অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্বের সাধারণ সূত্রানুসারে এক বিশেষ জনগোষ্ঠীর একাংশ অন্যাংশের তুলনায় অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর হলে এবং অপেক্ষাকৃত কম সুযোগ-সুবিধা লাভ করলে স্বভাবতই বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে এবং এই পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ও বিক্ষোভ সন্ত্রাসবাদের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আবার সামাজিক মনস্তত্ত্বের তত্ত্বানুসারে জনগোষ্ঠীর সংখ্যাল্প শ্রেণী সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের পীড়নে আক্রান্ত হয় হীনমন্যতায় এবং এই হীনমন্যতাবোধ থেকে হঠাৎ জন্ম নিতে পারে হিংস্র প্রতিরোধের প্রবণতা।

ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদের উৎস অন্বেষণে এই সব তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক রাজ্যের তুলনায় পাঞ্জাবের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির হার অনেক উন্নত। ১৯৭০-৭১ সনে সর্বভারতীয় গড় মাথাপিছু আয় ছিল ৬৩৩ টাকা। ঐ সনে পাঞ্জাবের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ১০৭০ টাকা অর্থাৎ জাতীয় মাথাপিছু আয়ের তুলনায় ৬৯ শতাংশ বেশী। আবার ১৯৮৩-৮৪ সনে পাঞ্জাবের মাথাপিছু আয় ছিল ৩৬৯১ টাকা যা ঐ সনে ভারতবর্ষের বাইশটি রাজ্যের প্রত্যেকটির মাথাপিছু আয়ের তুলনায় অনেক বেশী। স্বভাবতই বলা যেতে পারে যে এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে পাঞ্জাবে প্রবল হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনির্ভরতার উচ্চাশা এবং ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই প্রত্যাশা পূরণ অসম্ভব বলেই পাঞ্জাবে আজ দেখা দিয়েছে সন্ত্রাসবাদের উন্মত্ততা। অন্যদিকে উত্তর-পূর্ব ভারতের চিত্রটি সম্পূর্ণ বিপরীত। ১৯৮৩-৮৪ সনে সর্বভারতীয় গড় মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ২২০১ টাকা। পাশাপাশি আসামে এর পরিমাণ ১৭৬২ টাকা, মণিপুরে ১৬৭৩ টাকা এবং মেঘালয়ে ১৪৮৩ টাকা অর্থাৎ সর্বভারতীয় মাথাপিছু আয় অপেক্ষা যথাক্রমে ১৯.৯ শতাংশ, ২৪ শতাংশ এবং ৩২.৬ শতাংশ কম। বলা যেতে পারে যে উত্তর-পূর্ব ভারতের এই অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা সেখানে দীর্ঘদিন ধরে হতাশা ও বঞ্চনাবোধকে উদ্দীপ্ত করেছে যার পরিণামে দেখা দিয়েছে সন্ত্রাসবাদী প্রতিবাদ। এছাড়া উত্তর-পূর্ব ভারতের উপজাতি সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভুত্বের

যদিও সন্ত্রাসবাদে লিপ্ত রয়েছে মোট জনসংখ্যার সামান্য ভগ্নাংশ, আপামর নিরপরাধ মানুষ এর শিকার। ছবি: কৃষ্ণমুরারি কিষাণ

পরিপ্রেক্ষিতে অস্তিত্বের সংকটে অস্থির হয়ে আশ্রয় নিচ্ছে সন্ত্রাসবাদে—একথাও অস্বীকার করা যায় না।

তবে কেবলমাত্র প্রচলিত তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলে তা হবে নিতান্তই অসম্পূর্ণ। বস্তুত, এই প্রসঙ্গে ভারতীয় অবস্থার কতকগুলি দুর্ভাগ্যজনক বৈশিষ্ট্যের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। অবশ্য কেউ কেউ এই যুক্তি দিতে পারেন যে সন্ত্রাসবাদ আজ শুধু একমাত্র ভারতবর্ষের বিশেষ সমস্যা নয়, এ সমস্যা আজ সারা বিশ্বের। তৃতীয় বিশ্বের অনগ্রসর দেশগুলির পাশাপাশি পুঁজিবাদী প্রাগ্রসর দেশগুলিতেও আজ হত্যাকাণ্ড ও বিশৃঙ্খলা, অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ও অমানবিক আচরণ ক্রমবর্ধমান। অবশ্যই বিশ্বজুড়ে এই সন্ত্রাসের আবহাওয়া গড়ে ওঠার পিছনে নানা দেশের নানা স্বার্থ ও বিভিন্ন জটিলতা ক্রিয়াশীল। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন যা বর্তমান নিবন্ধের সীমিত পরিসরে সম্ভব নয়। তবে সাধারণভাবে একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে আধুনিক বিজ্ঞানের অবদানে সর্বনাশা মারণাস্ত্রের বিভীষিকা আজ বিশ্বের সব মানুষেরই শান্তি বিঘ্নিত করেছে দারুণভাবে। এই অবস্থায় জনমানসে যে নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিয়েছে তা স্বাভাবিকভাবেই জন্ম দিয়েছে এক বেপরোয়া বিধ্বংসী মানসিকতার। ভারতবর্ষের বর্তমান সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রেও এই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য। তথাপি এ কথাও মনে রাখা দরকার যে ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার কতকগুলি গুরুতর গলদও আজকের সন্ত্রাসবাদের জন্য কম দায়ী নয়।

এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই যে কথাটি মনে রাখা দরকার তা হল এই যে ভারতবর্ষে হঠাৎ কিছু ব্যক্তির হঠকারিতার ফলে আজকের এই সন্ত্রাসবাদ—এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, সন্ত্রাসবাদ নিজেই কোনও রোগ নয়, প্রকৃতার্থে এ হল রোগের লক্ষণ, যে রোগের বীজ নিহিত আছে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এবং এর জন্য অল্পবিস্তর দায়ী আমরা সবাই। প্রথমেই দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায়। ভারতীয় সংবিধান সভার সাড়ম্বর ও সশব্দ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে একদিন এদেশে প্রচলিত হয়েছিল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা আজও অটুট এবং এই ব্যাপারে ভারতবাসীর মনে একটা প্রচ্ছন্ন গর্বও আছে। কিন্তু গণতন্ত্রের সার্থকতা শুধুমাত্র তার সাংগঠনিক স্থিরতা ও স্থায়িত্বে নয়। গণতন্ত্রের সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দেশব্যাপী বিক্ষেপণে। সংযম ও সহিষ্ণুতা, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও বোঝাপড়া, বিবাদ-বিসংবাদের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির প্রবণতা, বৃহত্তর জনস্বার্থের কাছে সংকীর্ণ আংশিক স্বার্থের নতিস্বীকার এবং সংস্কারমুক্ত উদারমনস্কতাই এই মূল্যবোধের প্রধান উপাদান। যে দেশের জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অশিক্ষিত ও নিরক্ষর সে দেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এই মূল্যবোধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠবে এমন আশা করা অন্যায়। অতএব প্রয়োজন ছিল দেশের আপামর জনসাধারণকে এই মূল্যবোধের দ্বারা উজ্জীবিত করে তোলার জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে নিরন্তর প্রয়াস চালানো এবং এই ব্যাপারে মূল দায়িত্ব ছিল আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব তথা রাজনৈতিক দলগুলির। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বাধীনতার পর থেকে ক্রমাগত রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও দলগুলি এই জরুরী কর্তব্য থেকে বিরত থেকেছেন। গণতান্ত্রিক মতাদর্শের এক পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া তৈরীর কোনও চেষ্টা না করে সকলেই তথাকথিত ভোটতন্ত্রের আকর্ষণে স্লোগানসর্বস্ব নেতিবাচক রাজনীতির খেলায় মেতেছেন। ফলে দেশবাসী দিনের পর দিন প্রত্যক্ষ করেছেন একদিকে নেতাদের চীৎকার ও আস্ফালন এবং অন্যদিকে নির্বাচনী যুদ্ধে জয়লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় যে কোনও ধরনের যুক্তিহীন, নীতিহীন ও আদর্শহীন উপায়ের কাছে আত্মসমর্পণ। এই ভোটের তাগিদেই প্রয়োজনে জনসাধারণকে ভয় দেখানো হয়েছে, সুকৌশলে বলপ্রয়োগ করা হয়েছে, মিথ্যা প্রচার চালানো হয়েছে, জালভোট দেওয়ার জন্য অথবা নির্বাচনে কারচুপি করার জন্য নানা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে শাসনক্ষমতা লাভ সুনিশ্চিত করার জন্য নিরীহ ব্যক্তিদেরও প্ররোচিত করা হয়েছে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে। এইভাবে আমাদের দেশের পরম সম্মানিত রাজনীতিকারেরা দীর্ঘদিন ধরে প্রবল উৎসাহে ও অধ্যবসায়ে যে গণতন্ত্রের প্রতিকূল বাতাবরণ তৈরী করেছেন আজ তারই প্রেক্ষাপটে আবির্ভূত হয়েছে সন্ত্রাসবাদের দৈত্য।

দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিবাদী আন্দোলনকে আইনানুগ ও সংবিধানসম্মত পদ্ধতির সীমানায় আবদ্ধ রাখতে হলে জনসাধারণের মনে আইনের শাসন সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকা দরকার এবং জনমানসে রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলির কর্মকুশলতা ও নিরপেক্ষতা সম্পর্কে আস্থার ভাব থাকাও বাঞ্ছনীয়। দুর্ভাগ্যক্রমে পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির অবর্তমানে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে সাধারণ নাগরিকের মনে দেখা দিয়েছে ঔদাসীন্য ও বিরূপতা। এদেশে আইন অসংখ্য এবং অবশ্যই জনকল্যাণ তাদের ঘোষিত লক্ষ্য। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ ও ব্যবহার আশ্চর্যজনকভাবে বৈষম্যমূলক। একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে আইনের সহায়তা দ্রুত ও ফলপ্রসূ; অন্যদিকে সাধারণ মানুষের কাছে আইনের আশ্রয় গ্রহণ নিতান্তই বিড়ম্বনা। একইভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজের একাংশের পরিসেবায় বিশেষ তৎপর হলেও সাধারণভাবে দীর্ঘসূত্রতা, লালফিতা ও নিষ্ঠুর নৈর্ব্যক্তিকতার প্রাবল্যে সাধারণ জনগোষ্ঠীর আস্থাভাজন হয়ে উঠতে পারেনি। এর ফলে সাধারণ মানুষের মনে সততই জমে ওঠে অবিশ্বাস, হতাশা আর ক্ষোভ যা সামান্য উস্কানিতেই ব্যক্ত হতে পারে হঠকারী ও হিংস্র কার্যকলাপে।

তৃতীয়ত, ভারতীয় শাসনব্যবস্থার একটি মস্ত বড় গলদ এই যে এদেশে আজও পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় প্রাধিকারীর সঙ্গে শাসিত জনগণের কোনও স্থায়ী ও শক্তিশালী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। এর জন্য একদিকে যেমন দায়ী জনগণের পরিপক্ক রাজনৈতিক চেতনার অভাব অন্যদিকে তেমনই দায়ী শাসন কর্তৃপক্ষের বৈধতা অর্জনের বিচিত্র কলাকৌশল। জনগণের রাজনৈতিক অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যের সুযোগ গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় প্রাধিকারী যথাসম্ভব জনগণকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রাখেন এবং ব্যক্তিগত গণমোহিনী শক্তির মাধ্যমে জনগণকে আচ্ছন্ন করে রেখে তাদের আনুগত্য লাভে তৎপর হন। এই গণমোহিনী শক্তির মূল ভিত্তি হল ভাবাবেগ অর্থাৎ শাসন কর্তৃপক্ষ সততই জনগণের ভাবাবেগকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন স্বীয় স্বার্থে। কিন্তু ভাবাবেগ যুক্তিনির্ভর নয় বলে এর গতিপ্রকৃতিতে নিশ্চয়তা আশা করা যায় না। কাজেই শাসক ও শাসিতের মধ্যে যথোপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে এই ভাবাবেগ যে-কোনও মুহূর্তেই পথ পরিবর্তন করে সরকারবিরোধী সন্ত্রাসবাদে রূপান্তরিত হতে পারে। আবার গণমোহন নেতৃত্বের কাছে ভাবাবেগী জনগণের প্রত্যাশা থাকে বিপুল, যে প্রত্যাশা পূরণের ক্ষমতা এই নেতৃত্বের থাকে না। অর্থাৎ, গণমোহন নেতা স্বাভাবিকভাবেই অতিমাত্রায় পারঙ্গম হন প্রতিশ্রুতি দানে, কিন্তু কার্যত এই প্রতিশ্রুতি রূপায়ণের সামর্থ্য অধিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থার থাকে না। এইভাবে প্রতিশ্রুতি ও

ভয়ের আঘাতে স্বাভাবিক জনজীবন যেখানে স্তব্ধ : নির্বিচার

তার রূপায়ণের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশই জনমানসে অস্থিরতার সঞ্চার করে, যে অস্থিরতা পরিণামে উৎসাহিত করতে পারে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে।

চতুর্থত, সাবেকী সমাজের সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা যুক্ত হলে এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাতে সমাজে অস্থিরতা অনিবার্য। একথা অস্বীকার করা যায় না যে ভারতবর্ষে মূলত একটি সাবেকী সমাজের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক অতি-আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। সাবেকী সমাজের অচলায়তনে আবদ্ধ জনগোষ্ঠী সযত্নে লালন করে চলে পুরাতন সনাতনী মূল্যবোধকে। অন্যদিকে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তার গতিশীলতার স্বাভাবিক ধর্মানুযায়ী কখনও কখনও এই পুরাতন সামাজিক মূল্যবোধে নির্মম আঘাত হানে। সনাতনী ধ্যান-ধারণায় পরিপুষ্ট জনসাধারণ এই আঘাতকে অনেক সময় অত্যাচার রূপে গণ্য করতে পারে এবং কখনও কখনও বলপ্রয়োগ করে এই আধুনিকতাকে প্রতিহত করতে চায়। ভারতবর্ষে এই সংকটের চিহ্ন সুস্পষ্ট এবং সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদের পিছনে এটিও একটি কারণ।

এছাড়া ভারতবর্ষের মত বৈচিত্র্যময় দেশে স্বাভাবিকভাবেই ইতস্তত ছড়িয়ে আছে সংঘাতের অজস্র উপাদান। নানা জাতি-উপজাতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যরক্ষার তীব্র প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রখর স্পর্শকাতরতা এবং জাতপ্রথার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্ভাগ্যজনক সামাজিক স্তরায়ণ আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভেদে ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে। রাষ্ট্রীয় স্তরে এই বিভেদের সুষ্ঠু মোকাবিলা করার কোনও চেষ্টা তো করা হয়-ই নি, বরং প্রয়োজনমত এই বিভেদকে ব্যবহার করা হয়েছে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে। এইভাবে রাজনৈতিক প্রশ্রয়পুষ্ট হয়ে বিভেদকামী শক্তি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে উগ্র খণ্ড-জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে ধর্ম ও রাজনীতির সুবিধাবাদী সংমিশ্রণের ফলে ধর্মের আবরণে হিংস্র রাজনৈতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং অবাধ রাজনৈতিক দাক্ষিণ্যে উচ্চজাতের সন্ত্রাসবাদী অত্যাচার প্রবল হয়ে উঠেছে। অবশ্য এইসব সন্ত্রাসবাদী আচরণ যখন ভয়াবহ হয়ে ওঠে রাষ্ট্র তার মোকাবিলায় তৎপর হয়। কিন্তু এই তৎপরতা সীমাবদ্ধ থাকে শুধুমাত্র আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার চিরাচরিত প্রথামাফিক কার্যকলাপের মধ্যে। ভারতীয় শাসনব্যবস্থার সবচেয়ে বড় গলদ এইখানে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় শাসন কর্তৃপক্ষের মৌলিক দায়িত্বের গুরুত্ব অবশ্যই অনস্বীকার্য। সন্ত্রাসবাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সরকারি শাসনযন্ত্র নির্বাক দর্শক হয়ে থাকতে পারে না, তাকে নিঃসন্দেহে নির্ভর করতে হয় নিগ্রহযন্ত্রের ওপর। কিন্তু এর দ্বারা সন্ত্রাসবাদের মত গুরুতর সামাজিক সমস্যার প্রকৃত সমাধান সম্ভব নয়। সন্ত্রাসের মাধ্যমে সন্ত্রাস প্রশমনের প্রয়াস মূঢ়তা মাত্র। উদ্বুদ্ধ আত্মশক্তিই হল ভয়কে জয় করার শ্রেষ্ঠ উপায়। মনে রাখা দরকার যে এই মুহূর্তে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর এক অতি ক্ষুদ্র অংশ সন্ত্রাসবাদে লিপ্ত। অন্যদিকে জনসাধারণের বিপুলাংশ এই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে প্রত্যক্ষভাবে নিগৃহীত অথবা এই নিরর্থক ধ্বংসলীলার দর্শক হিসাবে বিব্রত ও চিন্তিত। এই বিশাল জনশক্তিকে সাহস, সচেতনতা ও আত্মবিশ্বাসে উজ্জীবিত করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধের সামিল করাই আজকের সবচেয়ে জরুরী কাজ। অর্থাৎ, জনগণ যদি তাদের নির্লিপ্ততা, ঔদাসীন্য ও কাপুরুষতা ঝেড়ে ফেলে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জানায় তাদের সম্মিলিত ধিক্কার তাহলে সন্ত্রাসবাদ আপনা-আপনিই শক্তিহীন হয়ে পড়বে। কিন্তু এর জন্য যা প্রয়োজন তা হল এইরকম—প্রথমত, সরকারি শাসনযন্ত্রের সঙ্গে জনগণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠা দরকার। দ্বিতীয়ত, দেশ জুড়ে বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন। প্রথম ব্যাপারে গুরু দায়িত্ব শাসনকর্তৃপক্ষের। সরকারি শাসনব্যবস্থা এতদিন ধরে যে আদর্শহীন আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করে জনসাধারণের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে তার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। অর্থাৎ, শাসনব্যবস্থা যদি প্রকৃত কল্যাণ রাষ্ট্রের আদর্শে অবিচল থেকে নিয়মনিষ্ঠ, কর্মতৎপর, নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিহীন হয়ে উঠতে পারে তাহলে জনসাধারণের সঙ্গে অতি সহজেই তার ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হবে এবং এই সংযোগের সেতু যতই দৃঢ় হবে সন্ত্রাসবাদীরা ততই জনমতের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অসহায় ও দুর্বল হয়ে পড়বে। অন্যদিকে যে ভ্রষ্টাচার আজ সমগ্র রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে কলুষিত করেছে তাকে প্রতিহত করতে পারে জনসাধারণের সদাজাগ্রত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধ গড়ে তোলার প্রধান দায়িত্ব ছিল রাজনৈতিক দলগুলির। কিন্তু সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির খেলায় উন্মত্ত রাজনৈতিক দলগুলি এ দায়িত্ব পালন করেনি যদিও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বর্তমান অবক্ষয়ের জন্য তাঁরা পরস্পরকে দোষারোপ করে এ বিষয়ে নিজেদের দোষস্খালনে সতত‌ই তৎপর। আজকের সন্ত্রাসবাদ থেকে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলির এই শিক্ষাই গ্রহণ করা উচিত যে দেশের আজ এই সংকটের অন্যতম কারণ তাঁদের চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। আজকের এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলি যদি তাঁদের তথাকথিত ভোটরঙ্গের সাজঘর থেকে বেরিয়ে এসে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উজ্জীবনকল্পে নিজেদের রাজনৈতিক ব্যবধান সত্ত্বেও এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করেন তাহলেই সন্ত্রাসবাদের যথার্থ মোকাবিলা সম্ভব। অন্যথায় যে সন্ত্রাসবাদের আগুন আজ ভারতবর্ষের কয়েকটি অঞ্চলে পরিলক্ষিত হচ্ছে তা একদিন ছড়িয়ে পড়বে সমগ্র দেশে এবং এই সর্বগ্রাসী আগুনে শুধু ভারতীয় গণতন্ত্রই দগ্ধ হবে না, অস্তিত্ব বিপন্ন হবে এদেশের রাজনৈতিক দলগুলিরও। ■

গণহত্যা ও ধ্বংসের পরের দৃশ্য *ছবি : কৃষ্ণমুরারি কিষাণ*

বিমান ছিনতাই: পেরুভিয়ান থেকে প্যান অ্যাম

শম্ভু সেন

'ক্রুদ্ধ ম্যালিনসন চিৎকার করে বলে উঠল, আমরা কি শুধু আঙুল মটকে যাব, আর এরকমভাবে চুপচাপ থাকব? ওই পাগলটার যা ইচ্ছা হবে, তা-ই করবে? আচ্ছা, ওই প্যানেলটা ভেঙে ফেলে ওটার সঙ্গে পাগলটাকেও বার করে দিলেই তো হয়।'

'কনওয়ে জবাব দিল, হয় বটে, তবে ওর কাছে অস্ত্র আছে। আর আমরা তো সবাই নিরস্ত্র।...'

হ্যাঁ, ছিনতাই বিমানে আটক দুই যাত্রীর কথোপকথন বটে। তবে টেপ নয়। জেমস হিলটনের 'লস্ট হরিজন' থেকে নেওয়া। ১৯৩৩-এ প্রকাশিত।

পিছে ফিরে দেখা

তেত্রিশে হিলটন যা কল্পনা করেছিলেন তা ব্যাধি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে। এর আগে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহণের ইতিহাসে বিচ্যুতির ঘটনা ঘটে মাত্র একটিই—১৯৩০ সালে। পেরুর কিছু বিপ্লবী মাঝআকাশে পেরুভিয়ান এয়ারলাইন্স-এর একটি বিমানের দখল নেয় এবং তাদের চিলিতে নিয়ে যাওয়ার দাবি জানায়।

দাবি আদায়ের সহজ টেকনিক পেরুর বিপ্লবীরা দেখিয়ে দিলেও ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বিমান ছিনতাইয়ের আর কোনও ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু ওই পর্যন্তই। এরপরেই শুরু হয়ে যায় বিমান ছিনতাইয়ের আকছার ঘটনা। দেশ বা অঞ্চলের রাজনৈতিক বা সামাজিক অস্থির পরিবেশই ছিল যার মূল কারণ।

যুদ্ধোত্তর পূর্ব ইউরোপের রাজনৈতিক ডামাডোলের জন্য ১৯৪৭ সালের আগস্ট থেকে ১৯৫৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ১৪টি সফল ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এবং আরও ২টি বিমান ছিনতাইয়ের চেষ্টা হয়। সবগুলিই ছিল বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলান্ড, রোমানিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়া থেকে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা। হঠাৎই এই চলে যাওয়া একদিন বন্ধ হয়ে যায়। সম্ভবত কড়া রাজনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দরুনই।

এরপর বিমান ছিনতাইয়ের ইতিহাসে অনেকটা যেন 'লাল পিরিয়ড'। হঠাৎই আবার শুরু। সালটা ১৯৫৮। কিউবায় তখন বাতিস্তার স্বৈরতন্ত্র অবসানের মুখে, আসছে নতুন জমানা—ফিদেল কাস্ত্রো নিজেকে সুসংহত করছেন। কিছু কিউবান পালিয়ে যাওয়া শুরু করল প্রতিবেশী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। আর এই পালিয়ে যাওয়ার উপায় হিসাবে বিমান ছিনতাইয়ের পথও বেছে নেওয়া হল। পরবর্তী দু' বছরে বিমান ছিনতাইয়ের সফল ঘটনা ঘটল ১১টি, চেষ্টা হল ৫টি।

১৯৪৭ থেকে ১৯৬০—এই তের বছরে মোট বিমান ছিনতাই হয়েছে ২৫টি, আর চেষ্টা হয়েছে ৭টি ক্ষেত্রে। সবকটি ক্ষেত্রেই অভিযানটা ছিল একমুখো—কম্যুনিস্ট দুনিয়া থেকে অকম্যুনিস্ট দুনিয়া।

কিন্তু এই একমুখো ট্রাফিকের দিক পরিবর্তন হল ১৯৬১তে। আনতুলিও রামিরেজ নামে এক যুবক মায়ামি থেকে কে ওয়েস্টগামী ন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের একটি বিমানকে ছিনতাই করে নিয়ে গেল কিউবায় ওই বছরেরই ১ মে-তে। বছর শেষে দেখা গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিমান ছিনতাই করে কিউবায় নিয়ে যাওয়ার মোট ঘটনা ঘটেছে ৪টি। শুধু যুক্তরাষ্ট্র কেন, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কলাম্বিয়া, মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতি লাতিন আমেরিকার দেশগুলি থেকেও বিমান ছিনতাই হতে লাগল কিউবায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কিউবা—বিমান ছিনতাইয়ের এই ব্যাধি সংক্রামক আকার ধারণ করায় মার্কিন কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করলেন। ওই আইনে বিমান দস্যুতার অপরাধে ২০ বছরের জেল থেকে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হল। উড়ন্ত অবস্থায় কোনও বিমানের দখল নেওয়া বা জোর করে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিয়ে অথবা হুমকি দেখিয়ে কোনও বিমান নিয়ন্ত্রণে আনা বিমান-দস্যুতার সংজ্ঞা হিসাবে নির্ধারিত হল।

বিমান-যাতায়াত বাড়ছে, বাড়ছে বিমান-ছিনতাইয়ের ঘটনাও

১৯৬১ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত এমন বহু বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে যার পিছনে কোনও রাজনৈতিক কারণ ছিল না। কিন্তু ১৯৬৭-র পরই রাজনৈতিক কারণ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। রাজনৈতিক দাবি আদায়ের অন্যতম উপায় হয়ে ওঠে এই বিমান ছিনতাইয়ের ব্যাপারটা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক অসন্তোষ, লাতিন আমেরিকার কিছু দেশে বামপন্থী গেরিলা সংগ্রাম, মধ্যপ্রাচ্যে প্যালেস্টিনিয়দের স্বভূমির জন্য আন্দোলন, পশ্চিম এশিয়ার বেশ কিছু দেশের মার্কিন বিরোধিতা, ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ১৯৬৭ সালের পর বহু বিমান ছিনতাইয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সেই লীলা খালেদকে মনে পড়ে—সেই প্যালেস্টিনিয় সুন্দরী, পশ্চিমী প্রেসে যাকে নিয়ে খুব হইচই পড়ে গিয়েছিল। সেই লীলা যে বিমান ছিনতাইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, সেটিই রাজনৈতিক কারণে প্রথম বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা। ডাঃ জর্জ হাবাশের পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অফ প্যালেস্টাইন (পি এফ এল পি) জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্সের তিনটি জেট বিমান ছিনতাই করে জর্ডনের মরুভূমিতে তা ধ্বংস করে। প্যালেস্টাইন প্রশ্নে সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পি এফ এল পি ওই কাণ্ড ঘটায়।

অভিনব দাবি, অভিনবত্ব দস্যুদলে

গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত, এই বিশ্বে বিমান ছিনতাইয়ের যে শ' সাতেক ঘটনা ঘটেছে তার বেশির ভাগের কারণই যে রাজনৈতিক তা বলা যায় না। রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া ছাড়াও বহু ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত দাবি করেছে বিমানদস্যুরা। বিমানদস্যুদের মধ্যে মহিলা, শিশুদেরও পাওয়া গেছে।

ইন্টারপোলের একটি রিপোর্ট অনুসারে ৩৫·৬ শতাংশ ছিনতাইকারী হয় দাগী অপরাধী, আর না হয় বিকৃত মস্তিষ্কের। বাদবাকি ৬৪·৪ শতাংশ ছিনতাইকারী রাজনৈতিক মিলিট্যান্ট। ছিনতাইকারীদের চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—এক, যারা বিকৃতমস্তিষ্কের; দুই, যারা দাগী অপরাধী (দেশের আইনের কড়া হাত থেকে

যারা পালাতে চায়) ; তিন. যারা কোনও দেশের নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে পালাতে চায় এবং চার, যারা রাজনৈতিক ব্ল্যাকমেলের জন্য বিমান ছিনতাই করে।

রকমারি সব দাবী, অভিনব সব উদ্দেশ্য। কয়েকটি ঘটনার উল্লেখেই তা বোঝা যাবে।

সিরিয়ায় ফিরে গেলেই মৃত্যুদণ্ড। তাই পশ্চিম জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করল দুই সিরিয়ান। মঞ্জুর হল না। ফ্রাঙ্কফুট থেকে দামাস্কাসে তাদের ফেরত পাঠানো হচ্ছিল লুফৎহানসার ৭২৭ বোয়িং-এ। সেই বোয়িংটিই তারা ছিনতাই করে নিয়ে গেল ভিয়েনায়। দাবি, অস্ট্রিয়ায় তাদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে হবে। ঘটনাটি ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারির।

খোমেইনির শাসনাধীন ইরান ছেড়ে পালাবার জন্য দুই ইরানী সেনা অফিসার একটি ইরানী যাত্রীবিমান ছিনতাই করে কায়রোয় নিয়ে যায়। সেখানে আশ্রয় না পেয়ে চলে যায় ইরাকে। পথে যাত্রীদের ছেড়ে দেয় দোহা ও কাতারে। শেষ পর্যন্ত ইরাকে তাদের রাজনৈতিক আশ্রয় মেলে।

জিবুতির পাসপোর্টের দাবিতে চারজন ছিনতাইকারী ১৯৮৩ সালের জানুয়ারিতে দক্ষিণ ইয়েমেনের আল ইয়েম দা এয়ারলাইন্সের একটি বোয়িং ৭০৭ বিমান ছিনতাই করে জিবুতিতে নিয়ে যায়।

কুয়েতের জেলে আটক সহকর্মীদের মুক্তির দাবিতে বিমানদস্যুরা দুবাই থেকে করাচি যাওয়ার পথে কুয়েতি এয়ারওয়েজের একটি এয়ারবাস ছিনতাই করে নামায় তেহেরানের মেহরবার্দ বিমানবন্দরে ১৯৮৪ সালের ৪ ডিসেম্বর।

কট্টর কম্যুনিস্ট-বিরোধী তাই বেজিং-নিয়ন্ত্রিত হংকঙে থাকতে চায় না সেখানকার এক নাগরিক। তাই হংকং থেকে বেজিংগামী ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটি বোয়িং ৭৪৭ ছিনতাই করে সে নিয়ে এল তাইপেইতে। ম্যানিলার মিলিটারি কনস্টাবুলারি সদর দফতরে বিদ্রোহী সেনাদের সঙ্গে যোগ দিতে মিনদানাও দ্বীপের ১০০ জন মিলিটারি কনস্টাবুলারি ফিলিপাইনস এয়ারলাইনের একটি বিমান ছিনতাই করে।

প্রায় ৩০ লক্ষ ডলার মুক্তিপণ এবং স্ত্রী ও ছেলেকে ইতালি থেকে তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার দাবিতে নেপালা একনায়ক নামে ৩৪ বছরের এক সিংহলী যুবক ১৯৮৪ সালের ২৯ জুনে দিল্লি থেকে ব্যাঙ্ককগামী অ্যালিটালিয়া বোয়িং ৭৪৭ বিমানটি ছিনতাই করে।

খোমাইনি শাসিত ইরানে কী চলছে তার প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মুজাহিদিন গেরিলা গোষ্ঠীর ছয় সদস্য ইরান এয়ারের দুবাই থেকে তেহেরানগামী ৭৪৭ বোয়িংটি ছিনতাই করে ফ্রান্সের ওরলি বিমানবন্দরে নিয়ে আসে। ঘটনাটি ১৯৮৩ সালের ৬ জুলাইয়ের।

'চাদ, লেবানন ও ইরাকে ফরাসি সরকার যে অত্যাচার চালাচ্ছে, তার জন্য তাদের ক্ষমা চাইতে হবে'—এই দাবিতে চারজন আরবিভাষী বিমানদস্যু ভিয়েনা থেকে প্যারিসগামী এয়ার ফ্রান্সের ৭২৭ বোয়িংটি ছিনতাই করে ১৯৮৩-র আগস্টে।

ছ'জন বিমানদস্যু বেইরুট বিমানবন্দরে রয়্যাল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্সের বোয়িং ৭২৭ বিমানটি দখল করে নেয়। এর বদলা নিতে একজন প্যালেস্টিনীয় সাইপ্রাসে লেবাননী এয়ারলাইন্সের একটি বিমান ছিনতাই করে।

শুধু দাবিদাওয়া আর উদ্দেশ্যতেই অভিনবত্ব নেই, অভিনবত্ব রয়েছে বিমানদস্যুদের টিমেও। একবার একজন ইরানি পুলিসকর্মী তার অসামরিক বন্ধু, বন্ধুপত্নী এবং তাদের ৪ ও ৬ বছরের দুটি সন্তান একটি ইরানি জেট ছিনতাই করে। এরা ছিল ইরানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শাপুর বখতিয়ারের সমর্থক।

অনেক ক্ষেত্রেই জীবননাশের ভিতর দিয়ে শেষ হয় বিমানছিনতাইয়ের পালা

২ জন মহিলা ও একটি এক বছরের শিশু সহ পাঁচজন বিমানদস্যু রিও-ডি-জেনেইরো থেকে মানাউন দ্বীপগামী ব্রাজিল এয়ারলাইন্সের একটি জেট ছিনতাই করে কিউবার ক্যামাগুয়েতে নিয়ে যায়।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায়

বিমান ছিনতাইয়ের এই সংক্রামক ব্যাধির শিকার হয়েছে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াও। এক সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে অন্য সমাজতান্ত্রিক দেশে বা সম্পূর্ণ বিপরীত রাজনৈতিক ব্যবস্থার দেশে।

১৯৮৫-র ডিসেম্বরে চারজন রুশ নাগরিক একটি টার্বোপ্রপ অ্যান্টোনভ-২৪ বিমান ছিনতাই করে পূর্ব চীনের হেলিওন-জিয়পং প্রদেশে নিয়ে যায়। ৩০ জন আরোহী নিয়ে বিমানটি যখন রুশ সীমান্ত শহর মার্চিনস্কি জাভোদ থেকে ১১২০ কিমি দূরে ইরুটস্কে যাচ্ছিল তখনই ওই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এর আগে ১৯৮৩ সালের জুলাই ও নভেম্বরে দুটি সোভিয়েত বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছিল।

গণপ্রজাতন্ত্রী চীন বিমান ছিনতাইয়ের মানচিত্রে আসে ১৯৮৩-র মে মাসে। ছজন বিমানদস্যু ১০৫ জন আরোহীসমেত একটি চীনা জেট ছিনতাই করে দক্ষিণ কোরিয়ার সোলে নিয়ে যায়। বিমানটি শেনইয়াং থেকে শাংহাই যাচ্ছিল। তবে এই ছিনতাই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়ে দেয়। ১৯৫০-৫৩ সালের কোরিয়ার যুদ্ধের পর যে দক্ষিণ কোরিয়া ও চীন কোনওদিনই আলোচনায় বসেনি, টেবিলে তারা আলোচনায় বসে, চুক্তি সই করে।

কনভেনশন, আইন

ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের হিসেব অনুযায়ী ১৯৬৯ সনে সারা বিশ্বের বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছিল ৯১টি। ১৯৮৪তে সেই সংখ্যা নেমে আসে ১৭তে। বিমান ছিনতাইয়ের হুমকি দেওয়া হয়েছিল ১৯৭৩ সনে ৩৭৩টি, ১৯৮৪তেও সেই সংখ্যা ১৭। দুইয়েরই সংখ্যা কমেছে। বিমান ছিনতাইয়ের নিম্নমুখী প্রবণতার তিনটি কারণ—এক, বিমানবন্দরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোরতর করা; দুই, আকাশপথে নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নততর করা এবং তিন, তিনটি আন্তর্জাতিক কনভেনশনের রূপায়ণ ও তার সঙ্গে বিভিন্ন দেশের ছিনতাই সংক্রান্ত ফৌজদারি আইন প্রয়োগ।

পঞ্চাশের দশকে এবং পরবর্তী দশকের গোড়ায় ক্রমবর্ধমান বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনার মোকাবিলা করার জন্য ১৯৬৩তে টোকিও কনভেশন অনুষ্ঠিত হয়। উড়ন্ত অবস্থায় বিমান ছিনতাই হলে বিমানের আইনসিদ্ধ কম্যাণ্ডারের হাতে তার নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নিতে টোকিও কনভেনশনে চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলির প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ছিনতাই বিমান যে দেশে অবতরণ করবে সেই দেশ যাতে বিমানের যাত্রী ও কর্মীদের নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থানে

ভারতীয় বিমান ছিনতাই

বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনায় ভারতও খুব একটা পিছিয়ে নেই। ১৯৭১ থেকে এ পর্যন্ত ১০টি ভারতীয় বিমান ছিনতাইয়ের কবলে পড়েছে—৮টি ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ও ২টি এয়ার ইণ্ডিয়ার। ১০টি ছিনতাই বিমানের মধ্যে ৭টিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল লাহোরে। এটাই লক্ষণীয়। ভারত-পাক সম্পর্ক যে খুব মধুর নয়, এতে তার কিছুটা প্রমাণ মেলে।

ভারতীয় বিমান ছিনতাইয়ের প্রথম ঘটনা ঘটে ১৯৭১ সালের ৩০ জানুয়ারি। তথাকথিত 'ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ কাশ্মীরের' দুই সদস্য হাশিম কুরেশি এবং মহম্মদ আশরফ শ্রীনগর থেকে ওড়ার পরেই ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ফকার ফ্রেণ্ডশিপ 'গঙ্গা'কে ছিনতাই করে লাহোরে নিয়ে যায়। দুদিন পর পাক সৈন্যবাহিনী এবং বিমান পরিবহণ বিশেষজ্ঞদের চোখের সামনেই বিমানদস্যুরা বিমানটি ধ্বংস করে ফেলে। এর আগে তারা যাত্রী ও বিমানকর্মীদের মুক্তি দেয়। বিমানদস্যুরা পাকিস্তানে রাজনৈতিক আশ্রয় পায়।

এর বছর চারেক পরে দ্বিতীয় ছিনতাই। ১৯৭৪-এর ২৪ ডিসেম্বর রোমের আকাশে এয়ার ইণ্ডিয়ার জাম্বো জেট ছিনতাই হয়।

জয়পুর হয়ে দিল্লি থেকে বোম্বাই যাওয়ার পথে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বোয়িং ৭৩৭ ছিনতাই করে আবার লাহোরে নিয়ে যাওয়া হয় ১৯৭৬-এর ১৮ সেপ্টেম্বর। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর ছিনতাইকারীদের নায়ককে বিমান থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে রাজি করানো হয়। এবং হঠাৎ কমাণ্ডো-হানা চালিয়ে নায়কের পাঁচ সহযোগীকে কাবু করে ফেলা হয়। বিমানের ৭৭জন যাত্রী ও ৭ জন কর্মী নিরাপদে দেশে ফেরেন। পাকিস্তানে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে লাহোর হাইকোর্ট ছয় কাশ্মীরি ছিনতাইকারীকে দু'মাস করে সশ্রম কারাদণ্ড দেন।

খেলনা পিস্তল নিয়ে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বোয়িং ৭৩৭ ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে ১৯৭৮-এর ২০ ডিসেম্বর। লক্ষ্ণৌ থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে দু'জন বিমানদস্যু বিমানটি ছিনতাই করে বারাণসী নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত দস্যুদের হাজতে পোরা হয়।

সন্ত জার্নেল সিং ভিন্দ্রানওয়ালের মুক্তি দাবি করে ৫ জন খলিস্তানপন্থী শিখ যুবক ১৯৮১ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর ১১৭ জন যাত্রী সহ ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বোয়িং ৭৩৭ ছিনতাই করে লাহোরে নিয়ে যায়। ছিনতাইকারীদের কাছে ছিল ৫টি গ্রেনেড, ২টি স্মোক বোমা এবং কিরপান। তাদের আরও দাবি ছিল, 'খলিস্তানের' স্বীকৃতি, ৫ লক্ষ ডলার মুক্তিপণ এবং পাকিস্তানে রাজনৈতিক আশ্রয়। সাফাইকারীদের ছদ্মবেশে বিমানে উঠে পাক কমান্ডোরা মাত্র ৪৫ মিনিটের মধ্যে বিমানটি দখলমুক্ত করে। ছিনতাইকারীরা গ্রেফতার হয়, যাত্রীরা অক্ষত দেহে মুক্তি পান। এই ঘটনার পরই ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে কিরপান বহন নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

এবার এয়ার ইণ্ডিয়ান বিমান ছিনতাই। ওই বছরেরই ২৬ নভেম্বর সেচেলেসের আকাশে বিমান ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া হয় দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে।

বিমান যে খেলনার সাহায্যেও ছিনতাই করা যায় তা প্রমাণ করতে এক শিখ যুবক শ্রীনগরগামী আই এ বোয়িং ৭৩৭-কে লাহোরে নিয়ে যায় ১৯৮২ সালের ৪ আগস্ট। লাহোরে নামার অনুমতি না পেয়ে অমৃতসর নিয়ে আসে। তার কাছে ছিল হাতবোমার মতো দেখতে একটি প্লাস্টিক বল। বিমানে কিরপান বহন নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোও ছিল তার ছিনতাইয়ের আরেকটি উদ্দেশ্য।

ষোল দিন পর আবার। শিখ ছিনতাইকারী মুসিবত সিং বোম্বাই থেকে অমৃতসরগামী আই এ বোয়িং ৭৩৭ বিমানটির দখল নেয় যোধপুর থেকে ওড়ার পরেই। ৬৩ জন যাত্রী ও ৬ কর্মী সহ বিমানটিকে সে লাহোরে নিয়ে যায়। কিন্তু নামার অনুমতি না পেয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত অমৃতসর বিমানবন্দরে তাকে গুলি করে হত্যা করে এই ছিনতাই-নাটকের অবসান ঘটানো হয়।

১৯৮৪ সালে দুটি ঘটনা। প্রথমটি ৫ জুলাই। ২৫৫ জন যাত্রী ও ৯ জন কর্মীসহ শ্রীনগর থেকে দিল্লিগামী আই এ এয়ারবাস ছিনতাই করে ভিন্দ্রানওয়ালের অনুগত ৯ শিখ যুবক। নিয়ে যায় সেই লাহোরে। ছিনতাইকারীদের দাবি, ৩২ জন 'সাথীর' মুক্তি এবং ২৫০ লক্ষ ডলার। দাবি না মিটলে বিমান উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি। পরের দিন তারা আত্মসমর্পণ করে। ১৯৮১ -এর আই এ বিমান ছিনতাই এবং ১৯৮৪'র এই বিমান ছিনতাইয়ে জড়িত থাকার অপরাধে লাহোরের বিশেষ বিচারক ৩ জন সন্ত্রাসবাদীকে মৃত্যুদণ্ড দেন। ৭ জনের যাবজ্জীবন জেল হয়। ৪ জন বেকসুর খালাস পায়।

১৯৮৪-এর দ্বিতীয় ছিনতাই প্রথমটির ৫০ দিন পরেই—২৪ আগস্ট। দিল্লি-চণ্ডীগড়-জম্মু-শ্রীনগর রুটের আই এ বোয়িং ৭৩৭ চণ্ডীগড় থেকে ওড়ার পরেই ছিনতাই হয়। ৭জন বিমানদস্যু ৭৩ জন যাত্রী ও ৬ জন কর্মী সমেত বিমানটি নিয়ে আসে লাহোরে, তারপরে করাচিতে এবং শেষ পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর দুবাইয়ে। ইতিমধ্যে করাচিতে জ্বালানি ভরে দেওয়া হয়। ছিনতাইকারীদের দাবি ছিল, তাদের আমেরিকায় যাবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত আমিরশাহীতে সাতদিনের জন্য আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি আদায় করার পর তারা আরোহীদের মুক্তি দেয়। পরে আমিরশাহী ছিনতাইকারীদের ভারতে ফেরত পাঠায়। জ্বালানি ভরে দেওয়ার দাবি মেনে নেওয়ায় পাক কর্তৃপক্ষ প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েন। ওদিকে ভারত আন্তর্জাতিক অসামরিক পরিবহণ সংস্থার (আই সি এ ও) কাছে অভিযোগ করে, ছিনতাইকারীদের লাহোরে পিস্তল সরবরাহ করা হয়। যাই হোক, বিমান ছিনতাইয়ের এই ঘটনাটি ভারত-পাক সম্পর্ক আরও তিক্ত করে তোলে।

গত সেপ্টেম্বরে ছিনতাই হওয়া প্যান অ্যাম বিমানটি ভারতের না হলেও, যাত্রা করেছিল বোম্বাই থেকে। প্রায় শ'চারেক যাত্রীর মধ্যে ২০১ জন ছিলেন ভারতীয়। ছিনতাইয়ের পুরো নাটকটিই অভিনীত হয় পাকিস্তানের মাটিতে, করাচিতে। ছিনতাইয়ের মোকাবিলায় পাকিস্তানের ব্যর্থতা উপমহাদেশের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকল। আরও খানিকটা বিষিয়ে গেল দু'দেশের সম্পর্ক।

যেতে দেয় এবং বিমান ও তার মালপত্র আইনসিদ্ধ অধিকারীর হাতে ফিরিয়ে দেয় তার জন্যও টোকিও কনভেনশনে আহ্বান জানানো হয়। এতে স্বাক্ষর দেন ১২১টি দেশ।

বিমান ছিনতাইয়ের অপরাধটির মোকাবিলা কীভাবে করা হবে টোকিও কনভেনশনে তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। শুধুমাত্র বিমান ছিনতাইকে লক্ষ্য করেই যে শুধু এই কনভেনশন রূপায়িত হল তাও নয়। বিমানের অবৈধ দখলদারি রুখতে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা খতিয়ে দেখার জন্য আন্তর্জাতিক অসামরিক পরিবহণ সংস্থার (আই সি এ ও) অ্যাসেমব্লি কাউন্সিলকে অনুরোধ করলেন। কাউন্সিল এই সমস্যাটি পাঠালেন লিগ্যাল কমিটির কাছে। লিগ্যাল কমিটি একটি সাবকমিটি গড়লেন। খসড়া কনভেনশন রচনা হল—১৯৭০-এ জন্ম হল হেগ কনভেনশনের। এই কনভেনশন শুধু আকাশপথে বিমান ছিনতাইয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এতে সই দিল ১২৯টি রাষ্ট্র। এই কনভেনশনে বলা হল, হয় দেশের আইন অনুসারে সন্ত্রাসবাদীদের বিচার করতে হবে আর না হয়, যে দেশে দস্যুতা করা হয়েছে সেই দেশে তাদের ফেরত পাঠাতে হবে।

হেগ কনভেনশনের সীমাবদ্ধতা ঘোচাতে ১২৮টি রাষ্ট্র সই দিলেন ১৯৭১-এর মন্ট্রিল কনভেনশনে। বিমানে অন্য ধরনের অন্তর্ঘাতিমূলক কার্যকলাপও এই কনভেনশনের আওতায় এল।

কিন্তু বিমান ছিনতাইকারীদের বিচার ও শাস্তি দেওয়ার পক্ষে এই তিনটি কনভেনশন আদৌ যথেষ্ট নয়। তাই বিভিন্ন দেশ প্রণয়ন করেছে ছিনতাই-নিরোধক আইন। বহু দেশই বিমান ছিনতাইয়ের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড ধার্য করেছে। কোনও কোনও দেশে চালু রয়েছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। কোনও কোনও দেশে আবার কয়েক বছরের কারাদণ্ড।

ভারতেও চালু হয় ছিনতাই-নিরোধক আইন ১৯৮২তে। হেগ কনভেনশনকে চূড়ান্ত রূপ দিতে ওই আইন প্রণীত হয়। এতে বলা হয়েছে, যে কেউই বিমান ছিনতাই করুক না কেন, তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে। আর বিমান ছিনতাই করতে গিয়ে কেউ যদি হিংসার আশ্রয় নেয়, তাহলে সেই অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট চলতি দেশীয় আইন অনুসারে তার শাস্তি হবে।

কিন্তু আইন তো পরে। আগে ছিনতাই ঠেকানো, তার পরে ছিনতাইকারীদের ধরে আইন অনুসারে বিচারের ব্যবস্থা। তাই গোড়াতেই ছিনতাই ঠেকানোর ব্যবস্থা হল। মার্কিন ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফ এ এ) ১৯৬৯-এ চালু করলেন 'বিহেভিয়ার প্রোফাইল'—সন্দেহভাজন ছিনতাইকারীদের ধরার কয়েকটি মাপকাঠি স্থিরীকৃত হল। এছাড়া অস্ত্রশস্ত্র আছে কি না তা জানতে যাত্রীদের পরীক্ষার জন্য ম্যাগনেটোমিটার চালু করা হল।

এতদসত্ত্বেও, ১৯৭২-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটল ৩১টি। এবং সে দেশে মোট বিমান ছিনতাইয়ের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ১৬০-এ। এফ এ এ 'বিহেভিয়ার প্রোফাইল' তুলে দিলেন। ১৯৭৩ থেকে যাত্রীদের পুরোপুরি সার্চ করার নির্দেশ দেওয়া হল। ঠিক হল, ম্যাগনেটোমিটার দিয়ে যেমন যাত্রীদের পরীক্ষার কাজ চলবে, তেমনি তাদের মালপত্র পরীক্ষা করা হবে হাত বা লো পালস এক্স-রে মেশিন দিয়ে।

ছিনতাই-বিমানের দরজায় মুখোশধারী দস্যু

উদ্ধারে কমাণ্ডো

পরীক্ষা নিরীক্ষার হাজার রকম ব্যবস্থার পরেও যখন বিমান ছিনতাই ঠেকানো গেল না তখন ছিনতাই বিমান ও আটক যাত্রীদের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ প্রতি-আক্রমণের কথা ভাবতে লাগল। ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল কমাণ্ডো বাহিনী। বিমানদস্যুদের ওপর পাল্টা আঘাত হেনে আটক যাত্রীদের উদ্ধার করার জন্যই গড়ে তোলা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেল্টা ফোর্স, ইজরায়েলের জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ইউনিট, পশ্চিম জার্মানির গ্রেনৎসশুৎস গ্রুপে ০৯ (জি এস জি-৯), দক্ষিণ কোরিয়ার হস্টেজ রেসকিউ ইউনিট প্রভৃতি সংগঠন।

কাজে নেমেই চরম সাফল্যের নিদর্শন রাখল ইজরায়েলের কমাণ্ডো বাহিনী। সারা বিশ্বকে চমকে দিল 'অপারেশন জোনাথন'। তেল আভিভ থেকে প্যারিস যাচ্ছিল এয়ার ফ্রান্সের ১৩৯ নম্বর ফ্লাইট ২৫৬ জন যাত্রীকে নিয়ে। পি এল ও সন্ত্রাসবাদী ও পশ্চিম জার্মানির বাডেন-মাইনহফ চক্র যখন ছিনতাই করে বিমানটি উগাণ্ডার রাজধানী এন্টেবেডে নিয়ে এল তখন বিমানে ১০৮ জন যাত্রী। আটক যাত্রীদের মুক্ত করতে ইজরায়েলি বাহিনী চুপিচুপি হানা দিল এন্টেবে বিমানবন্দরে। দশ মিনিটেই কাজ সারা। ১০৪ জন আটক যাত্রীকে উদ্ধার করল তারা। পরিবর্তে প্রাণ গেল ৪ জন অসামরিক ব্যক্তি এবং স্ট্রাইক ফোর্স কম্যাণ্ডার ইয়োনাতান নেতানইয়াহুর। বিমানদস্যুরাও মারা পড়ল।

আর একটি সফল কমাণ্ডো হানার কৃতিত্ব পশ্চিম জার্মানির জি এস জি-৯-এর। ১৯৭৭-এর অক্টোবরে লুফৎহানসার একটি বিমান ছিনতাই হয়ে এল সোমালিয়ার রাজধানী মোগাডিশুতে। বিমানদস্যুরা পাইলটকে হত্যা করে তাঁর মৃতদেহ টারম্যাকে ফেলে রাখল। পশ্চিম জার্মানির কমাণ্ডো বাহিনী মোগাডিশু ছুটে এল, বিমানে হানা দিল, ৮৬ জন আটক যাত্রীর সকলকে মুক্ত করল এবং তিনজন বিমানদস্যুকে মেরে ফেলল।

কিন্তু কমাণ্ডো হানা যে কী রকম ব্যর্থ হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত ইজিপ্টএয়ারের সেই বোয়িং দখলমুক্ত করার ঘটনা। বিমান ছিনতাইয়ের ইতিহাসে একসঙ্গে এত লোকের মৃত্যু কখনও হয়নি। অতি সম্প্রতি প্যান অ্যাম বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা নিয়ে করাচিতে যে রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটে গেল তাও কমাণ্ডো হানার চরম ব্যর্থতার নিদর্শন।

প্যান অ্যাম ছিনতাই

সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী অত্যাধুনিক সব ব্যবস্থাও স্থূল কৌশলের কাছে কীভাবে হার মানতে পারে প্যান অ্যাম ছিনতাই তার নিদর্শন। এ যেন আসলাম, দেখলাম, জয় করলাম-এর ব্যাপার। চারজন বন্দুকবাজ মধ্যপ্রাচ্যের কোনও দেশ থেকে করাচিতে এল, শহরের বিভিন্ন হোটেলে নাম লেখাল, একটা ভ্যান কিনল, পুলিস পেট্রল কারের মতো রং করে দিল ভ্যানের, স্থানীয় দর্জিকে দিয়ে একজোড়া পুলিস ইউনিফর্ম বানাল, তারপর ভ্যানকে বিমানবন্দরের কড়া প্রহরাধীন পেছনের প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকিয়ে নিয়ে গেল টারম্যাকে। যাত্রীদের ওঠার সময়েই দখল নিল বিমানের। করাচি প্রমাণ করে দিল বিমান ছিনতাই কত সোজা। আর এই করাচিকেই কয়েক মাস আগে এফ এ এ সার্টিফিকেট দিয়েছিল সবচেয়ে নিরাপদ বিমানবন্দর বলে।

করাচিতে ১৬ ঘণ্টার ছিনতাই নাটকের যবনিকাপাত হল ২২ জনের মৃত্যু এবং শতাধিক ব্যক্তির জখমে। পাক কমাণ্ডোর নির্বুদ্ধিতায় এতগুলি প্রাণ গেল। বিমানের ভিতরে বিমানদস্যুরা এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করলে যাত্রীরা প্রাণভয়ে পালাতে থাকে। তখনও কমাণ্ডোরা অকুস্থলে হাজির হয়নি। বিমানদস্যুদের গুলিচালনা এবং কমাণ্ডো হানার মধ্যে যে সময় নষ্ট হয়েছে, সেই সময়টুকুর মধ্যে নির্ধারিত হয়ে গেছে যাত্রীদের ভাগ্য। রক্তক্ষয়ী ঘটনা সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যাওয়ার পর পাক কমাণ্ডোরা বিমানে ঢোকে।

আরেকটি প্রশ্ন ঝড় তুলেছে প্রচণ্ড। বিমানের ককপিট ক্রুদের বিমান ছেড়ে পালানো উচিত হয়েছে কি না। সে প্রশ্নে দ্বিমত দেখা গিয়েছে। প্যান অ্যামের একটি সূত্রে বলা হয়, ছিনতাই মোকাবিলায় এটাই নাকি নতুন নীতি হয়েছে—বিমানকে অকেজো করে দেওয়ার জন্য ককপিট ক্রুদের বিমান ছেড়ে চলে যেতে হবে। প্যান অ্যামের আরেকটি সূত্রে বলা হয়েছে, এরকম কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। করাচিতে ক্রুরা

কমাণ্ডো বনাম বিমানদস্যু

তিন আরব সন্ত্রাসবাদী ১৯৮৫সালের ২৫ নভেম্বর এথেন্স থেকে কায়রো যাবার পথে ইজিপ্ট এয়ারের একটি বোয়িং ৭৩৭ বিমানকে ছিনতাই করে দক্ষিণ মাল্টার লুকা বিমানবন্দরে নিয়ে আসে। ওই তিন ছিনতাইকারী লিবিয়ার মদতপুষ্ট আবু নিদাল গোষ্ঠীর সদস্য বলে অভিযোগ। ছিনতাইকারীরা ছ'জন বিমান আরোহীকে গুলি করে জখম করে। তাদের মধ্যে একজনকে টারম্যাকে ফেলে দেয়। সন্ত্রস্ত পাইলট সাহায্য চান। মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারক কমাণ্ডো হানার নির্দেশ দেন। কমাণ্ডোরা বোয়িং বিমানের কার্গোর দরজা উড়িয়ে দিয়ে বিমানে হানা দেয়। বিমানদস্যুরা যাত্রীদের লক্ষ্য করে তিনটি গ্রেনেড ছোঁড়ে। বিমানে আগুন ধরে যায়। চারিদিকে আগুন আর ধোঁয়া। ইতিমধ্যে কমাণ্ডোরাও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে গুলি ছুঁড়তে থাকে। ১১০ মিনিট ধরে দু'পক্ষে রীতিমতো যুদ্ধ চলে। শেষ পর্যন্ত ৭৯ আটক আরোহীর মধ্যে ৫৮ জনই মারা যান। এঁদের ৮ জন বিমানদস্যুদের ছোঁড়া বোমায়, বাদবাকিরা আগুনে পুড়ে বা ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে। ৪ জন ছিনতাইকারীর ২জন মারা যায়, ২ জন জখম হয়। ছিনতাই বিমান দখলমুক্ত করার ইতিহাসে এটিই সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী ঘটনা বলে চিহ্নিত।

ছিনতাইকারীদের বক্তব্য থেকে জানা যায়, এই ঘটনার লক্ষ্য ছিল হোসনি মুবারকের সরকার। মিশরের মাটিতে মার্কিন ও ইহুদীদের উপস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোই ছিল এই বিমান ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্য।

কমাণ্ডো হানায় ব্যর্থতার জন্য মিশরের সমালোচনা করে বহু দেশ। মিশর বলে, এ ছাড়া বিমান দখলমুক্ত করার আর কোনও পথ ছিল না। তারা মাল্টার সঙ্গে পরামর্শ করেই কমাণ্ডো হানার সিদ্ধান্ত নেয়। মাল্টা অবশ্য তা অস্বীকার করে। বলে, সিদ্ধান্ত মিশরের একার। তাদের সঙ্গে কোনও পরামর্শ করা হয়নি।

নিজেরাই যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিয়েছেন। ফরাসি দৈনিক পত্রিকা লা ফিগারো বলেছে ককপিট ক্রুরা নিজেদের বাঁচাতে পালিয়ে গেলেন, নাকি ছিনতাইয়ে দ্রুত যবনিকা টানার জন্য সাহায্য করতে চলে গিয়েছিলেন তা জানা গেল না।

মোকাবিলার শ্রেষ্ঠ উপায় কী?

প্যান অ্যাম ছিনতাইয়ের পর আবার সেইসব প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। ছিনতাইকারীদের মোকাবিলার সবচেয়ে ভালো উপায় কী? ১৯৭০-এর সেই তত্ত্ব এখনও প্রযোজ্য—বিমানকে বিমানবন্দরে রেখে দিন, আলাপ আলোচনা চালান, বিলম্ব করুন এবং ছিনতাইকারীরা যতক্ষণ না ক্লান্ত হয়ে পড়ে ও যাত্রীদের সঙ্গে তাদের একটা সহানুভূতির সম্পর্ক রচিত হয় ততক্ষণ অপেক্ষা করুন। কিন্তু দিন এগোচ্ছে। বিমানদস্যুরা এখন বুঝতে পারে তাদের হাতে সময় অল্প। যা করার অল্পসময়েই করতে হবে। তাই সবসময়েই একটা ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করবে।

এখন বিশেষজ্ঞরা আরও কিছু নিদান দিচ্ছেন। বিমানবন্দরে একটা নির্দিষ্ট জায়গা থাকবে, যেখানে ছিনতাই হওয়া বিমানকে রাখতে বলা হবে—আদর্শ স্থান বিমানবন্দর ভবন সংলগ্ন কোনও জায়গায় কিংবা এমন জায়গা যেখানে কাছেই আছে গাছপালা। যাতে কমাণ্ডোরা লুকিয়ে থাকতে পারেন। বিমান ছিনতাই হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা আঘাত হানার পরিকল্পনা করতে হবে। কমাণ্ডো বাহিনী এবং আলাপ আলোচনাকারীরা একটি টিম হিসাবে কাজ করবেন। বিমানদস্যুদের সম্পর্কে সব খবরাখবর আদান প্রদান করবেন তাঁরা। আর দস্যুরা গুলিগোলা চালানো শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই কমাণ্ডো বাহিনীকে পাল্টা আঘাত হানার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

আর আপনি যদি ছিনতাই বিমানের যাত্রী হন, তাহলে কী করবেন? বিশেষজ্ঞদের মত: স্বচ্ছন্দ থাকুন, সহযোগিতা করুন, যা বলা হয় তা-ই করুন, অযথা হইচই করবেন না। কোনও ছিনতাইকারী আপনার সঙ্গে কথা বললে, মৃদু হাসুন, বিনীতভাবে জবাব দিন, কখনও সরাসরি তার চোখের দিকে তাকাবেন না, তাকালে আপনি তার নজরে চলে আসবেন, এটি সে ঔদ্ধত্য বা অবাধ্যতা ভাবতে পারে, পালানো সোজা মনে করলেও পালাবেন না, কারণ আজকাল বহু ছিনতাইকারী দলে এমন কয়েকজন সদস্য থাকে যারা যাত্রী সেজে বসে থাকে। তেমন কিছু ঘটলে তারা আপনাকে পাকড়াও করবে।

বিমানদস্যুদের সম্পর্কে সবকিছু মনে রাখবেন—তাদের সংখ্যা, তাদের অবস্থান—তাদের কথাবার্তা যতটুকু শুনতে পারবেন ততটুকু। অনেক সময়েই বিমানদস্যুরা অশক্ত বৃদ্ধ, শিশু, মহিলাদের ছেড়ে দেয়। যে কোনওরকম তথ্য বিমানদস্যুদের মোকাবিলায় প্রয়োজন হতে পারে।

যদি থাকে রাষ্ট্রের মদত

এতরকম কনভেনশন, আইন, কমাণ্ডো-হানার ব্যবস্থা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র করার পরেও একটা বড় প্রশ্ন থেকে যায়। কোনও রাষ্ট্র যদি বিমান ছিনতাইয়ে মদত দেয়, তাতে ইন্ধন জোগায় তাহলে কী উপায়? অতীতে এরকম ঘটেছে।

১৯৬৯ সালে টি ডবলিউ-এ বোয়িং ৭০৭-এর ছিনতাইকে স্মরণীয় করে রাখতে সিরিয়া বিশেষ ডাকটিকিট প্রকাশ করে। ১৯৭১ সালে ছিনতাই হওয়া প্রথম ভারতীয় বিমানটিকে লাহোরে পুড়তে দেওয়া হয় এবং তৎকালীন পাক প্রেসিডেন্ট বিমানদস্যুদের ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানান। ১৯৬৭ সালে কঙ্গোর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শোম্বেকে নিয়ে একটি বিমান যখন ছিনতাই হয়ে আলজিয়ার্সে যায় তখন বিমানের প্রত্যেকটি যাত্রীকে আটকে রাখা হয়। আলজিরিয়া সরকার বলেন, ঘটনাটি সম্পর্কে সরকারি অনুসন্ধান চালানোর জন্য যাত্রীদের আটক রাখা প্রয়োজন ছিল। তিনমাস পরে সবাইকেই ছেড়ে দেওয়া হয়। শুধু শোম্বে বাদে। তিনি ১৯৬৯-এ মারা যান।

টোকিও, হেগ ও মন্ট্রিল—তিন কনভেনশনেই অপরাধের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে, রাষ্ট্রগুলির আওতা কতটুকু তাও নির্ধারিত হয়েছে। কিছু বাধ্যবাধকতা বর্তেছে রাষ্ট্রের ওপর। কিন্তু যেসব রাষ্ট্র তা মানবে না, তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া এবং নিষেধাজ্ঞা বলবতের কোনও বিধান তিন কনভেনশনে দেওয়া হয়নি।

বহু দেশ ছিনতাইকারীদের ফেরত পাঠায় না এবং তাদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়। এই রাষ্ট্রগুলি ছিনতাইকারীদের স্বর্গ। কোনও আন্তর্জাতিক সংগঠন ওইসব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যথাযথ নিষেধাজ্ঞা জারি না করলে কোনও ছিনতাই-নিরোধ ব্যবস্থাই কার্যকর হবে না।

বোধহয় এই বিষয়টির দিকে খেয়াল রেখেই ১৯৭৮ সালে বন ঘোষণাপত্র সই হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, কানাডা, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি ও জাপান। এই সাত দেশের শীর্ষ সম্মেলন বসে বনে। যেসব দেশ বিমান ছিনতাইকারীদের আশ্রয় দেবে তাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করার ডাক দেয় ওই ঘোষণাপত্র। আট বছর হয়ে গেল। সেই ডাকে সাড়া কই? ■

উন্নয়নের তত্ত্ব ও ভবিষ্যৎ

অম্লান দত্ত

॥ ২ ॥

(গ)

পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশার ব্যাখ্যা করা হয়েছে শোষণতত্ত্ব দিয়ে। উৎপাদনের যন্ত্রপাতির মালিকানা নেই শ্রমিকের হাতে। শ্রমিক মূল্যসৃষ্টি করে, অথচ সে লাভ করে মজুরি, জীবনধারণের মতো মজুরি, উদ্বৃত্ত মূল্যের ওপর তার অধিকার নেই। দেশের অধিকাংশ মানুষের দুর্দশার মূলে আছে এই শোষণ। এই ব্যাখ্যায় কিছু নির্মম সত্য আছে। তবে এটা অসম্পূর্ণ। সারা বিশ্বের সংকটের এমন কি তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্যেরও এমন অনেক কারণ আছে যাকে সঠিকভাবে ধরা যায় না ঐ তত্ত্বের ভিতর। শোষণতত্ত্ব কাজে লাগে, কিন্তু তার উপর একান্ত নির্ভর যুক্তিসঙ্গত নয়।

কোনো দেশেই আজকের জগতে শ্রমিক শ্রেণী উৎপন্ন মূল্যের সবটা লাভ করে না। উদ্বৃত্ত মূল্যের উপরই নির্ভর করে আছে আমলাতন্ত্র ও সামরিকবাহিনী। সব দেশেই তাই, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তেমনি সোবিয়েত যুক্তরাজ্যে। উদ্বৃত্ত মূল্যের উপর নির্ভর করেই আফগানিস্তানে সোবিয়েত বাহিনী লড়ছে। কেউ হয় তো পার্থক্য করবেন এইভাবে, আমলাতন্ত্র ও সামরিকবাহিনী কাজ করছে মার্কিন দেশে ধনিকের স্বার্থে আর সোবিয়েত দেশে শ্রমিকের স্বার্থে। চীন কিন্তু মনে করে না যে সোবিয়েত আমলাতন্ত্র ও সামরিকবাহিনী শ্রমিকের স্বার্থেই কাজ করে যাচ্ছে। এ তর্কের শেষ নেই। মোট কথা, উদ্বৃত্ত মূল্য কোনো দেশেই শ্রমিকশ্রেণী সর্বাংশে লাভ করে না।

তৃতীয় বিশ্ব তথা ঔপনিবেশিক দেশগুলির দুর্দশার কয়েকটি বিশেষ কারণ নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক।

মার্কিন দেশ এক সময় ইংলন্ডের উপনিবেশ ছিল। মার্কিন দেশের কাঁচা মাল, যেমন তুলো, গম, তামাক, ব্রিটেনে রপ্তানি হত আর ও-দেশ থেকে শিল্পজাত দ্রব্য ও মূলধন আসত মার্কিন দেশে। আমেরিকা স্বাধীনতালাভ করবার পরও অনেকদিন পর্যন্ত দু'দেশের ভিতর বাণিজ্যে এই বৈশিষ্ট্য ছিল। ভারতও ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ। এ দেশ থেকেও কাঁচা মাল ও দেশে যেত, ও দেশ থেকে শিল্পজাত দ্রব্য এ-দেশে আসত। কিন্তু ঔপনিবেশিকতার এই যে দু'টি উদাহরণ দেওয়া গেল এ দু'য়ের ভিতর একটা বড় পার্থক্য আছে। এটা ভালোভাবে ধরতে হলে সোজাসুজি চোখ ঘোরাতে হয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রশ্নের দিকে।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবে এ দেশে যে নব মধ্যবিত্তের সৃষ্টি হল এ দেশের প্রাচীন সমাজ ও নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল সেই শ্রেণী। ঠিক এইরকম একটা বিচ্ছেদের আশঙ্কা ছিল না মার্কিন দেশে। বাঙালী নবশিক্ষিত মধ্যবিত্ত পশ্চিমের কাছ থেকে যে সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হল তাতে কিছু ভাব ও আদর্শ ছিল যাকে মূল্যবান বলা চলে। সে যুগের অনেক গুণী মানুষই তাকে মূল্যবান বলে সমাদর করেছেন। কিন্তু নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় এতে করে দেশের মানুষের সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলল। যারা গ্রাম-বাংলায় নেতৃত্ব দিতে পারত তারা ইংরেজি শিখে নগরবাসী হল। এ দেশের সমাজের একটা বড় ভাঙনের আরম্ভ এইখানে। শুধু যে মিলের কাপড়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গ্রামের শিল্প মার খেল তাই নয়। সব মিলে অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে ব্যাপ্ত করে এ দেশের জনসমাজে একটা বড় দুর্দশা নেমে এলো। এ থেকে ইংরেজ কতটা পেল তা দিয়ে আমাদের ক্ষতির পরিমাপ হয় না। এটা সেইরকমের খেলা নয় যাতে একপক্ষের ক্ষতি আর অন্য পক্ষের লাভের মধ্যে সাম্য থাকবেই। ম্যানচেস্টারের বস্ত্র-শিল্পকে শেষ অবধি ভালোভাবে রক্ষা করা যায়নি। এ দেশে কাপড়ের কল হয়েছে।

কিন্তু ভারতের গ্রামীণ সমাজ তার ভারসাম্য ফিরে পায়নি।

উনিশ শতকের শেষভাগে জাপান পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। দলে দলে জাপানী যুবক বিদেশ পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়ে, স্বদেশেরই উন্নতিসাধনের ইচ্ছায়। পশ্চিমের প্রযুক্তি নিয়ে জাপান দ্রুত এগিয়ে যায়। সেটা অন্ধ মুগ্ধ অনুকরণ হয়ে ওঠেনি। বিশেষত স্বদেশের সংস্কৃতি সম্বন্ধে জাপান সতর্ক ছিল। এর সুফল ও কুফল দুই-ই লক্ষ করা যায়। কিন্তু এ দেশের সমাজে যে ধরনের ভাঙন দেখা দিয়েছে জাপান তা থেকে রক্ষা পেয়েছে।

এইরকম নানা তথ্য থেকে একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা যায়। কোনো বিশেষ শ্রেণী উদ্বৃত্তমূল্যের ওপর কতোটা নির্ভর করছে সে-কথা বললেই সবটা বলা হয় না। দেশের সমাজের সঙ্গে তার যোগ কী-ধরনের সেটা আরো গভীরভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। শোষণের সঙ্গে একদিকে আর্থিক উন্নয়ন অন্যদিকে শ্রেণীদ্বন্দ্বের সম্পর্ক আছে। কিন্তু এই সম্পর্কটা খুব সরল নয়। আধুনিক কালে জাপানের দ্রুত আর্থিক বৃদ্ধি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 'শোষণ' ছাড়া মূলধন গঠন হয় না। জাপানেও শোষণ অবশ্যই আছে। কিন্তু সেখানে শ্রমিকের সঙ্গে মালিক ও পরিচালকের বিচ্ছেদ গভীর হয়নি, পাশ্চাত্য দেশে যেমন হয়েছে। বরং শ্রমিক মালিক পরিচালক মিলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতি একটা আনুগত্য সেখানে এখনও প্রধান, যেটা পারিবারিক সম্বন্ধেরই মতো। জাপানের আর্থিক

উন্নতির একটা মূল কারণ বলে এটাকে গণ্য করা হয়েছে। ভারতে এটা সম্ভব হয়নি। আরো তলিয়ে ভাবতে গেলে পুরনো জাতিভেদ আর ব্রিটিশ আমলের সাদা-কালোর বিভেদ এইসব নানা কথা এসে যায়।

পিছিয়ে-পড়া দেশগুলিতে আর্থিক সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছে, জনসংখ্যাবৃদ্ধি। সমস্যাটা নানা সংস্কার দিয়ে আচ্ছন্ন; ধীরে ধীরে বুঝবার চেষ্টা করা যাক। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ আর্থার লুইস। শ্বেতাঙ্গদের বাইরে ইনিই প্রথম এবং অদ্যাবধি একমাত্র যিনি অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এঁর একটি সহজ মডেল ছিল, এই আলোচনার শুরুতে যার উল্লেখ করা যেতে পারে। অনুন্নত দেশগুলিতে যে শিল্পে শ্রমিকদের অল্প মজুরিতেই পাওয়া যায় তার কারণ এই সব দেশে অপর্যাপ্ত সংখ্যায় মজুর আছে দুঃস্থ গ্রামাঞ্চলে। গ্রামাঞ্চলের এই মজুরদের আধা-বেকার অবস্থা। পুঁজিপতিরা পরিকল্পিতভাবে এই বেকারবাহিনী সৃষ্টি করেনি, বরং অনুন্নত চাষের সঙ্গে এই অর্ধবেকারেরা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই অর্ধবেকারেরা আকৃষ্ট হয় কৃষি থেকে শিল্পাঞ্চলে। ক্রমে চাষের ক্ষেত্রে বেকার ও অর্ধবেকারের সংখ্যা কমে আসে, তখন মজুরি বৃদ্ধি পায় কৃষিতে ও শিল্পে। ভারতের মতো দেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে, বিশেষত গত তিরিশ বছরে, শিল্পের বেশ খানিকটা উন্নতি ও প্রসার হয়েছে। অথচ দেশে বেকার ও অর্ধবেকারের সংখ্যাও এই সময়ে বেড়েছে। এর একটা ব্যাখ্যা দরকার।

পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শিল্পোন্নয়নের প্রথম যুগের অভিজ্ঞতার সঙ্গে লুইসের মডেল যতটা মিলছে আমাদের সঙ্গে ততটা মিলছে না। এর কারণ আছে। জন্মহার ও শিশু মৃত্যুহার দু'টোই কমাবার উপায় বিজ্ঞান আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে সাম্প্রতিক কালে। উনিশ শতকে এই সব উপায় ও পদ্ধতি এতোটা জানা ছিল না। আজকের উন্নতিশীল দেশগুলি এই সব পদ্ধতি অবলম্বন করতে শুরু করেছে। কিন্তু মৃত্যুহার যত তাড়াতাড়ি কমছে, জন্মহার অনুন্নত দেশে তত তাড়াতাড়ি কমছে না। গত শতকে ইউরোপের উন্নতিশীল দেশগুলিতে জনসংখ্যা বাড়ছিল বছরে শতকরা দেড় ভাগ অথবা আরো কম। আজকের উন্নতিশীল দেশগুলিতে সংখ্যাবৃদ্ধির হার শতকরা আড়াই ভাগ, কোথাও কোথাও আরো বেশি। এই সব দেশে শিল্পের প্রসার ঘটছে, শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা বাড়ছে; কিন্তু একই সঙ্গে বেকার ও অর্ধবেকারের সংখ্যাও বাড়ছে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে। আরো মনে রাখা দরকার যে, আজকের উন্নতিকামী দেশের বৃহৎ শিল্পে শ্রমসংকোচক প্রযুক্তি নিয়োগ করবার সুযোগসম্ভাবনা যতখানি ততটা ছিল না উনিশ শতকে।

এই সব কারণে আমাদের মতো দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে। প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর, সঠিক প্রচার ও সংগঠনের। ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে অনেকে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করেছে। আবার শোষণতত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে ভাবতে গিয়ে মার্ক্সবাদীরা বলেছে যে, জনসংখ্যার সমস্যাটা ধনতন্ত্রের সৃষ্টি, সমাজতন্ত্রে এর প্রয়োজন থাকে না। গত কয়েক দশকে প্রথমে ধনতান্ত্রিক জাপান এবং তারপর সমাজতান্ত্রিক চীন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অসাধারণ তৎপরতা দেখিয়েছে। ১৯৬৫ থেকে '৭৫ সালের মধ্যে চীন ও ভারত দুই দেশেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাৎসরিক হার ছিল মোটামুটি শতকরা আড়াই ভাগ। তারপর চীনে সেই হার দ্রুত নামিয়ে আনা হয়েছে শতকরা দেড় ভাগেরও নীচে, ভারতে কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি এখনও। গোঁড়ামি ত্যাগ করে ব্যাপারটা বুঝবার সময় নিশ্চয়ই এসে গেছে। নয় তো একটা কঠিন সমস্যাকে অকারণে কঠিনতর করে তোলা হবে।

আধুনিক প্রযুক্তি সম্বন্ধীয় কিছু জটিলতা আছে, যা থেকে সৃষ্টি হয়েছে পিছিয়ে-পড়া দেশগুলিতে আরো বাধা-বিঘ্ন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যদিও পরস্পর সংযুক্ত তবু এ দু'য়ের ভিতর পার্থক্যটাও মনে রাখা দরকার। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বিশ্বজনীন। পৃথিবীময় বৈজ্ঞানিকদের সহযোগিতায় এর ভিত্তি, এই সহযোগিতা যত দৃঢ় হয় ততই ভালো। প্রযুক্তির সম্পর্ক প্রয়োগের সঙ্গে। দেশে কালে এই প্রায়োগিক সমস্যাগুলি ভিন্ন। আধুনিক প্রযুক্তি বলতে যা বোঝায় তার উদ্ভব প্রধানত শিল্পোন্নত দেশের প্রায়োগিক প্রয়োজন থেকে। অনুন্নত বা অল্পোন্নত দেশগুলিতে উন্নত দেশের প্রযুক্তি ব্যবহার করবার সময় সেটা ভেবেচিন্তে করা দরকার। উনিশ শতকে উন্নত ও অল্পোন্নত দেশের ভিতর প্রযুক্তির পার্থক্য ততটা ছিল না আজ যতটা। পিছিয়ে-পড়া দেশগুলি প্রাগ্রসর দেশের কাছ থেকে প্রযুক্তি ধার করতে পারে, এটাকে প্রথমোক্ত দেশের পক্ষে একটা বড় সুবিধা বলে মনে করা হয়। কোনো কোনো দিক থেকে এটা যে একটা সুবিধা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু অল্পোন্নত দেশের নব্য মধ্যবিত্তের চোখে আধুনিক প্রযুক্তির এমন একটা আকর্ষণও আছে দেশের মঙ্গলের সঙ্গে যার যোগ দুর্বল। তাই এ বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন।

যন্ত্রবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা এই সবে প্রয়োগের অতএব প্রযুক্তির দিকটা প্রধান। যে-সমস্যাটার কথা এই মাত্র বলেছি তার উদাহরণ এইবার দেওয়া যেতে পারে। চাষের ক্ষেত্রে শ্রমসংকোচক নানা যন্ত্রের উদ্ভাবন হয়েছে। আমেরিকা ক্যানাডা বা সাইবেরিয়ার মতো অঞ্চলে জমির আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা কম। সেখানে শ্রমসংকোচক যন্ত্রের ব্যবহারে বিশেষ সুবিধা আছে। কিন্তু ভারতে বা চীনে অবস্থা অন্যরকম। কৃষিযন্ত্রের সীমাবদ্ধ প্রয়োগই এখানে সঙ্গত। নয় তো শ্রমের ব্যবহার অত্যধিক সংকুচিত হবে, বেকারের সংখ্যা বাড়বে। মাটি কাটবার জন্যও অনেক বৃহৎ যন্ত্র আছে, তাতে অল্প মানুষ নিয়েই অনেক বেশি পরিমাণ মাটি কেটে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু যে সব দরিদ্র দেশে শ্রমশক্তির প্রাচুর্য, সেখানে এসব যন্ত্র কতটা ব্যবহার করা সামাজিক দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত, সেটা ভেবে দেখা দরকার।

চিকিৎসাবিদ্যা নিয়েও এই প্রসঙ্গে চিন্তা করা দরকার। কলকাতার মতো শহরে হাসপাতালের কী দুরবস্থা সেটা ভুক্তভোগী সবাই জানে। এই অবস্থার নানা কারণ আছে। প্রশাসনিক দুর্বলতা তো আছেই। কিন্তু একটা মূল সমস্যা হল হাসপাতালে অত্যধিক ভিড়। বহু লোক ফিরে যায় যাদের ফিরিয়ে দেওয়া অন্যায়, আবার যাদের রাখা হয় তাদের জন্যও উপযুক্ত স্থান নেই। কলকাতার হাসপাতালে এই অতিরিক্ত ভিড়ের প্রধান কারণ গ্রামবাংলায় চিকিৎসার ব্যবস্থার অভাব।

আমাদের মেডিক্যাল কলেজে যাঁরা পড়ান পৃথিবীর প্রাগ্রসর চিকিৎসা শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁরা অল্পবেশি পরিচিত। তাঁদের কাছে শিক্ষা পেয়ে আমাদের অনেক ছাত্র উন্নত দেশগুলিতে চিকিৎসার কাজে গৌরবের সঙ্গে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসার সঙ্গে পরিচিত আমাদের ডাক্তারবাবুরা এ-দেশের গ্রামাঞ্চলে তেমন সুবিধা করতে পারেন না। তাঁদের বিদ্যা প্রয়োগ করতে হলে যে-ধরনের যন্ত্রপাতি ও ঔষধ প্রয়োজন এ-দেশের গ্রামে গ্রামে সে সব পাওয়া যায় না। পুরনো চিকিৎসাপদ্ধতি হয় তো এতোটা বৈজ্ঞানিক ছিল না, প্রযুক্তির দিক থেকে এতোটা অগ্রসর ছিল না। কিন্তু এ দেশের হাকিম কবিরাজ হাতের কাছে যে সব গাছ-গাছড়া এবং অন্যান্য উপকরণ পাওয়া যায় যথাসম্ভব তারই ব্যবহারে রোগীর চিকিৎসা করতেন। তাঁদের চিন্তা ও উদ্‌ভাবনী শক্তি এই দিকে চালিত হয়েছিল। সমস্ত বিশ্বকে বাজার ধরে নিয়ে আমরা যে আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি সেটা আমাদের গ্রামে ঢুকবার পথ পায় না, এমন কি শহরেও দরিদ্রের পক্ষে সেটা বড় সহায়ক নয়। অতি উন্নত প্রযুক্তির এইরকম অসুবিধা আছে। এতে নগরের ধনী মানুষের হয় তো উপকার হয়। কিন্তু দেশের মঙ্গলের সঙ্গে এর যোগাযোগ দুর্বল। উন্নত প্রযুক্তি মাত্রই উপযুক্ত প্রযুক্তি নয়। অবশ্য উন্নত প্রযুক্তির পক্ষে আছে প্রচারের যন্ত্র। কিন্তু সে জন্যই সতর্কতা আরো বেশি প্রয়োজন। উপযুক্ত প্রযুক্তি নিয়ে আরো গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। বহুজাতিক ব্যবসায়ী সংস্থা মাত্রই উন্নতিশীল দেশের পক্ষে অপকারী এমন বলা যাবে না। আজকাল তো সমাজতান্ত্রিক দেশ সহ সর্বত্র এই সব সংস্থাকে ডাকা হচ্ছে। তবে অত্যুন্নত দেশের প্রযুক্তি—অনেক সময় সে সব দেশে বর্জিত কিছু যন্ত্রপাতি সহ সেই প্রযুক্তি—আর অল্পোন্নত দেশের শ্রমকে একত্র করবার চেষ্টায় বিপত্তি ঘটা সম্ভব। আর্থিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সব প্রকল্প পরীক্ষা করে দেখা দরকার। উন্নতির জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজন উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু স্বনির্ভরতাকে একটা বিশেষ মূল্য দিতেই হবে। সে জন্য চেষ্টার ত্রুটি থাকলেই বিপদের সম্ভাবনা।

আধুনিক সমাজকে বলা হয়েছে 'consumer Society', অর্থাৎ, এর ঝোঁক ভোক্তার দিকে, ভোগ সুখের দিকে। সুখের সঙ্গে আনন্দের একটা পার্থক্য প্রচলিত আছে। ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির ভিতর দিয়ে আমরা যা পাই তাকে বলা যায় সুখ; আত্মার তৃপ্তিতে আনন্দ। আত্মা বলতে এখানে প্রকৃতির বাইরে

কিছু বোঝাচ্ছে না। অপরের সঙ্গে যোগের ভিতর আত্মার আনন্দ। এই যোগ ত্যাগের ভিতর দিয়েও হতে পারে, আনন্দের বণ্টনের ভিতরও হতে পারে। ভোগ জিনিসটা মানুষকে ঠেলে দেয় আত্মকেন্দ্রিকতার দিকে। এই পর্যন্ত হল কিছুটা দার্শনিক চিন্তা। এবার দর্শন দূরে থাকুক। মোট কথা, আধুনিক সমাজে ব্যক্তির আকর্ষণ ভোগ্যবস্তুর প্রতি। এমন কি উপভোগের প্রতি ততটা নয়, ভোগ্যবস্তুর ওপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার প্রতি যতটা। প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় সমাজের স্বাভাবিক ঝোঁক এইদিকে। যে সব ভোগ্যবস্তুর ওপর আমার প্রতিবেশীর অধিকার আছে আমারও সেই সবের ওপর অধিকার থাকা দরকার, নয় তো আমি তুলনায় হীন হয়ে পড়ি। প্রতিযোগী সমাজের এই ধর্ম। আধুনিক মানুষের অনেক দুঃখ অনেক সমস্যার মূল খুঁজে পাওয়া যাবে এইখানে। দু'ধরনের সমস্যার কথা সংক্ষেপে বলা যাক।

পৃথিবীটা এখন অনেক ছোটো হয়ে গেছে। সিনেমা দূরদর্শনের দৌলতে উন্নত দেশের জীবনযাত্রার ছবিও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশের মানুষের সামনে ভেসে ওঠে পাশের বাড়ীর দৃশ্যের মতো। উন্নতিশীল দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আকাঙ্ক্ষার পরিধির ভিতর এসে পড়ে সেই জীবনযাত্রা। যাদের সাধ্যে কুলোয় তারা কলেজ পেরিয়েই চলে যায় বিদেশে, বিশেষত মার্কিন দেশে। যারা সেটা পারে না, তারা দেশে বসেই বিদেশের জীবনযাত্রার অনুকরণ করে। এই নিয়ে চলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এর কয়েকটি ফলাফল বিবেচনা করা যেতে পারে। এক, আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রে থাকে না দেশের সমস্যা। দুই, মান-ইজ্জতের প্রতীক হয়ে ওঠে যে সব ভোগ্যবস্তু পারিবারিক আয়ের অনেকটাই খরচ হয়ে যায় তাতে। যে সব প্রয়োজন আরো মৌল, সে সবের জন্য আয়ের সামান্যই অবশিষ্ট থাকে। এতে দেহের এবং মনের ক্ষতি হয়। এই সমস্যাটা দেখা দেয় যেমন মধ্যবিত্ত পরিবারে তেমনি শ্রমিকের পরিবারেও। ফলে আয়বৃদ্ধি হলেও অভাব মেটে না। আরো একটা কথা আছে যেটা আলাদাভাবে একটু বিস্তৃত আকারে বলা ভালো।

এশিয়া আফ্রিকায় শহরের নব্য মধ্যবিত্তের আয় দেশের সাধারণ মানুষের আয়ের তুলনায় অনেক বেশি। এর একটা সহজ কারণ আছে। এ সব দেশের মাথা পিছু গড়পড়তা আয় পশ্চিমের উন্নত দেশের তুলনায় অনেক কম। সাধারণ মানুষের রোজগার দেশের গড়পড়তা আয়ের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। কিন্তু শহরের নব্য মধ্যবিত্তের আয় সেই হিসেবে নির্ধারিত হয় না। তার চোখ পড়ে আছে নিজের দেশের গ্রামের দিকে নয়, শিল্পোন্নত দেশের শহরের দিকে, যেখানে গড়পড়তা আয় হয় তো পঞ্চাশগুণ বেশি। আজকের ঘানা স্বাধীন হবার আগে সে দেশে একবার গিয়েছিলাম। সেখানে তখন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে। দেশে উচ্চ শিক্ষিত লোকের অভাব, বিলেত থেকে অধ্যাপক আমদানি হয়েছে পড়াবার জন্য। তাঁদের মাইনে ঠিক হয়েছে স্বাভাবিক কারণেই বিলেতের মাইনের মান অনুযায়ী, এমন কি তার চেয়েও খানিকটা ওপরে। দেশ স্বাধীন হবার পর দেশী অধ্যাপকদেরও মাইনে ঠিক হল সেই বিদেশীদের অনুকরণে, তা নইলে সমাজে ইজ্জত থাকে না। তখনকার রোডেসিয়ার খনিতে বিদেশী যন্ত্রবিদেরা নিযুক্ত ছিল। সেখানেও একই ঘটনা।

নব্য মধ্যবিত্তের কলাকৌশলের বাজারটা আন্তর্জাতিক। কাজেই তার দৃষ্টি বাইরের দিকে। এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট উড়োজাহাজ চালিয়ে যায় আমেরিকার বন্দরে। সে চাইবে সেখানকার পাইলটের সঙ্গে তুলনীয় মাইনে, তা নইলে তার সম্মান থাকে না। এয়ার ইণ্ডিয়ার সঙ্গে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের বেশি বিভেদ করা যায় না, কারণ দু'য়ের ভিতর কলাকৌশলের তেমন মৌলিক পার্থক্য নেই। বিভিন্ন সরকারী সংস্থার উচ্চ পদের কর্মচারীদের ভিতর আবার মাইনের তুলনীয়তার প্রত্যাশা থাকে।

এইভাবে একদিকে যেমন নব্য মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর আকার বেড়ে চলে অন্যদিকে তেমনি তার আয়ের মান দেশের দারিদ্র্যের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে। এদের আয় যতই দেশের গড়পড়তাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে ওঠে ততই সাধারণ মানুষের আয় নেমে যায় দেশের সামান্য গড়পড়তার চেয়েও আরো নীচে। উন্নতিশীল অনেক দেশে সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসাবশেষের ওপর গড়ে উঠছে অসাম্যের এই নতুন বনিয়াদ। এতে যে শুধু নির্ধনের অসুখ বেড়েছে তাই নয়, ধনবানদের ভিতরও একদিকে বিচ্ছিন্নতাবোধ অন্যদিকে পারস্পরিক মাৎসর্য ছড়িয়ে পড়েছে গুপ্ত ব্যাধির মতো।

(ঘ)

সমস্যা থেকে অবশেষে আসতে হয় সমাধানের চিন্তায়। এ-কথা প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, সামাজিক ব্যাধির নিদানতত্ত্বের তুলনায় নিরাময়পদ্ধতি অনেক বেশি জটিল ও দুঃসাধ্য। অর্থাৎ, রোগের কারণ যদি বা বোঝা যায় রোগ দূর করা কঠিন হয়। কখনো বা একটা রোগ সারাতে গিয়ে অন্য রোগ তৈরি হয়ে যায়। উন্নয়নতত্ত্বের ক্ষেত্রেও এই সাবধানী বাক্য প্রযোজ্য। আসলে সমাজের ব্যাধি একটি নয়, অনেক। ধাপে ধাপে এগুনো ছাড়া উপায় নেই।

আমাদের দেশে এবং তৃতীয় বিশ্বের আরো অনেক দেশে আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র একটা বড় ভূমিকা পালন করছে। এই ভূমিকা শুধু পরিকল্পনা প্রণয়নে সীমাবদ্ধ নেই, প্রধান প্রধান অনেক শিল্পে ও ব্যবসায়ে সরকারী উদ্যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেসরকারী উদ্যোগেও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ব্যাপক আকারে উপস্থিত।

এইসব দেশে অনেক সময় দেখা যায় যে, পরিকল্পনায় ও পরিকল্পনার রূপায়ণে শিল্পের প্রতি রাষ্ট্র যতোটা মনোযোগী কৃষি অথবা পল্লী-উন্নয়নে ততোটা নয়। ভারী শিল্প বিশেষভাবে রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এর একাধিক কারণ আছে। একে তো ভারী শিল্পের সঙ্গে প্রতিরক্ষার একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে বহুসংখ্যক ছোটো উদ্যোগের দেখাশোনা করা কঠিন, অল্প সংখ্যক বড় উদ্যোগের তত্ত্বাবধানের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ।

আরো কিছু যুক্তি আছে। উন্নতিশীল দেশগুলিতে দারিদ্র্যের কারণে পণ্যদ্রব্যের জন্য চাহিদা যথেষ্ট নয়। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদা সীমাবদ্ধ। বিদেশের বাজারে প্রবেশলাভ সহজ নয়। এ অবস্থায় একটা সহজ পথ হল, যেসব জিনিস এতকাল আমদানি করা হত সেসব যথাসম্ভব দেশেই উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেওয়া। এইসব জিনিস অনেক সময় বৃহৎ ও ভারী শিল্পে প্রস্তুত হয়। উন্নয়নের বিশেষভাবে ভিত্তি শক্ত করবার জন্য যন্ত্রশিল্পকে অগ্রাধিকার দেবার কথা ভাবা হয়েছে। স্বনির্ভরতার জন্য ভারী শিল্পের প্রয়োজন আছে।

একই যুক্তিতে কৃষিকেও সমানভাবে অগ্রাধিকার না দেবার কোনো কারণ নেই। খাদ্যশস্য আমদানি করতে আমাদের কম টাকা খরচ হত না। অর্থনীতির ভিত্তি শক্ত করবার জন্য কৃষির প্রতিও মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। এতদিনে আমরা অবশ্য এমন জায়গাতে এসে পৌঁছেছি যেখানে খাদ্যাভাব যদিও দূর হয়নি তবু খাদ্যশস্য আমদানির ওপর আমাদের আর নির্ভর করতে হয় না সাধারণ অবস্থায়। অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্যের অনটন এখনও আছে, যেমন তেল, ডাল, চিনি। দুধ মাছের অপ্রতুলতাও উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ, শিল্পের বেলায় যেমন উৎপাদনবৈচিত্র্য চাই, আজ কৃষির ক্ষেত্রেও সেটা প্রয়োজন।

এই সবই সাধারণভাবে স্বীকার্য। তর্ক এসে যায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়ে। বাজারের হাতে কতটা ছেড়ে দেওয়া সমীচীন, এটাই একটা প্রধান প্রশ্ন। প্রশ্নটা আরো গুরুত্ব পেয়েছে এই জন্য যে, যে-সব দেশে এতোদিন বাজারের ওপর নির্ভরতার নীতি স্বীকৃত ছিল না, সেখানেও এখন ঐদিকে ঝোঁক দেখা দিয়েছে। চীন ও পূর্ব ইউরোপের নানা দেশের অর্থনীতিতে এই ঝোঁকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আসলে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে ক্রমে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে একটা নতুন সত্য। এতোদিন তর্কের তোড়ে যেসব জিনিসকে পরস্পরবিরোধী বলে মনে করা হত, যেমন পরিকল্পনা ও বাজারব্যবস্থা, সমবায় ও পারিবারিক কৃষি, দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব এবং সেটাই আবশ্যক। দুই শিবিরবদ্ধ গোঁড়ামিতে অর্থতত্ত্বের মুক্তি নেই ; এতে শুধু অনর্থ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তত্ত্বের দিক থেকে এটা দেখানো কঠিন নয় যে, বাজারের নির্ণয় সামাজিক হিতের দিক থেকে আদর্শ নির্ণয় নয়। সরকার জনসাধারণের প্রতিনিধি, অন্তত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এরকমই ধরে নেওয়া হয়। ব্যবসায়ী চলে নিজের স্বার্থে ; সরকার চলে জনসাধারণের স্বার্থে। এইভাবে দেখতে গেলে সরকারী নিয়ন্ত্রণই সর্বাবস্থায় ভালো। একাধিক কারণে তর্কটার এভাবে নিষ্পত্তি হতে পারে না। এডাম স্মিথ দেখিয়েছিলেন যে, আমরা যখন নিজের স্বার্থে কাজ করি তখনই যে সামাজিক স্বার্থের বিপরীত কাজ করি এটা মোটেই ধরে নেওয়া যায় না। চাষী নিজের স্বার্থেই চাষ করে,

শাকসবজি ডিম বাজারে নিয়ে বিক্রি করে । এটা সে ব্যক্তিগত স্বার্থে করে বটে, কিন্তু এতেই সমাজের স্বার্থও পূর্ণ হয় । কাজেই স্মিথের অনুমান এই যে, বাজারের গঠনটা যদি একচেটিয়া ব্যবসায়ের দিকে অতিরিক্ত ঝুঁকে না পড়ে, সরকার যদি কতগুলি ব্যাপারে তার দায়িত্ব পালন করে, তবে ব্যবসায়ীর স্বার্থের সঙ্গে সমাজের স্বার্থের সাধারণভাবে সামঞ্জস্য আশা করা যায় । আবার সরকার জনসাধারণের নামে কাজ করে বলেই যে, তার সিদ্ধান্ত সব সময়েই কার্যত জনসাধারণের অনুকূল হবে, এটাও ধরে নেওয়া যায় না । সরকারকে কাজ করতে হয় আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে দলীয় রাজনীতির চাপের ভিতর । বাজার যেমন বাস্তবে আদর্শ গঠন লাভ করে না, আমলাতন্ত্র ও দলীয় রাজনীতির বেলায়ও তেমনি কোনো আদর্শ অবস্থা কল্পনা করে নেওয়া অবাস্তব । এসব ব্যাপারে বিশুদ্ধ তত্ত্ব দিয়ে চালিত হতে গেলেই মুশকিল ।

বাস্তবে যে সমস্যা দাঁড়িয়েছে সেটা আমরা চোখের সামনে দেখছি । সরকারী নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসেবে এসেছে লাইসেন্স, পারমিট, ইত্যাদি । পদে পদে আমলাতন্ত্রের কাছ থেকে ছাড়পত্র অনুমতিপত্র, এইসব যোগাড় করতে হয় । এতে পদে পদে কাজ আটকে যাচ্ছে, প্রথমে সময় নষ্ট, তারপর ঘুষ দিয়ে কাজটা করিয়ে নেওয়া, এটাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে । কাজ আটকে দেওয়াই অর্থকর হয়ে উঠেছে । এতে করে অভ্যাস নষ্ট এবং স্বভাব নষ্ট । এটাই চলছে সর্বস্তরে । এদেশে দুর্নীতির এই চেহারার সঙ্গে আমরা পরিচিত । অন্যান্য দেশেও এটা অনুপস্থিত নয় ।

এই অবস্থায় সরকারী নিয়ন্ত্রণের জটিলতা কমাবার পক্ষে যুক্তি আছে । বাজার হৃদয়হীন ; কিন্তু আমলাতন্ত্রও তাই । আমলাদের বিশেষভাবে দোষ দিয়েও লাভ নেই । সরকারী নিয়ন্ত্রণ বেশি জটিল হলে এই রকমই ঘটে । এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে অনেক দেশই, এমনকি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও ক্রমে বাজারের ওপর নির্ভরতার পথে ফিরে এসেছে ।

তবে এই প্রত্যাবর্তনও শর্তহীন হতে পারে না । মানুষের সব প্রয়োজন একসঙ্গে মেটানো যায় না । সমাজের বহু প্রতিদ্বন্দ্বী প্রয়োজনের ভিতর কোনটাকে কতটা অগ্রাধিকার দিতে হবে তার নির্ধারণে রাষ্ট্রের কিছু সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা থাকা চাই, সেই পরিকল্পনার কাঠামোর ভিতরই সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কাজ করবে । যে যুগে অর্থবিজ্ঞানের মূল ধারায় ছিল বাজারব্যবস্থার ওপর প্রায় নিঃশর্ত আস্থা, সে যুগকে আমরা পিছনে ফেলে এসেছি । অধিকাংশ অর্থবিজ্ঞানীর ভিতর সেই আস্থার ভিত্তি দুর্বল হয়েছিল কেইনস–এর চিন্তাধারার প্রভাবে । দেশের ভিতর মোট পুঁজিবিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণের কাজটা বাজারব্যবস্থার হাতে ছেড়ে দিলে যে বিপদ আছে, এ বিষয়ে তিনিই সবাইকে স্মরণীয়ভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন । কিন্তু সেখানেও আমরা আর দাঁড়িয়ে নেই । কেইনস এর উদ্বেগ ছিল পুঁজিবিনিয়োগের মোট পরিমাণ নিয়ে, তার বণ্টন নিয়ে নয় । বাস্তবে সমস্যাটা শুধু তাই নিয়েই নয় । আরো অন্য সমস্যা আছে, কেইনস এর চিন্তার কেন্দ্রে যা কখনো স্থান পায় নি ।

আঞ্চলিক উন্নয়নে অসামঞ্জস্য এইরকম একটা সমস্যা । এর উদাহরণ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে । এই উপমহাদেশেও তা বর্তমান । উন্নত অঞ্চল উন্নততর হয় ; অনুন্নত অঞ্চলের সঙ্গে তার ব্যবধান বেড়ে চলে । নগর হয়ে ওঠে মহানগর । চতুষ্পার্শ থেকে রস টেনে নিয়ে সে বেড়ে ওঠে । বাজারব্যবস্থা এই ঝোঁক ঠেকাতে পারে না । সচেতন কেন্দ্রীয় নীতি দিয়ে একে ঠেকাবার প্রয়োজন হয় । সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রয়োগ করতে হয় । তা নইলে আমরা এমন একটা দুষ্ট বৃত্তের ভিতর আবদ্ধ হয়ে পড়ি যাকে ভাঙবার সাধ্য নেই বাজারের ।

এই কলকাতা মহানগরীই সেই দুষ্ট বৃত্তের এক সুস্পষ্ট উদাহরণ । অতিস্ফীত এই মহানগরীতে সমস্যার অন্ত নেই । একে উদ্ধার করবার জন্য, এর পরিবহণ বাসস্থান ও জল সরবরাহকে সহনীয় করে তুলবার উদ্দেশ্যে এবং পরিবেশের উন্নতি ও রূপসজ্জার জন্য, হাজার হাজার কোটি টাকার নানা প্রকল্পের কথা ভাবা হচ্ছে । সারা বাংলার গ্রামে গ্রামে যখন শিক্ষা স্বাস্থ্য অন্নের ন্যূনতম ব্যবস্থা নেই তখন কলকাতায় এই পরিমাণ টাকা ঢালা যাবে কি না আর তাতেও কলকাতার সমস্যার সমাধান হবে কি না, এটাও চিন্তার বিষয় । কলকাতায় অবস্থা আরো একটু সহনীয় হলেই পরিপার্শ্বের দুঃস্থ অঞ্চল থেকে আরো বেশি মানুষ মহানগরীর প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং তার ফলে পরিবহণাদির বাড়তি সমস্ত ব্যবস্থাই আবারও প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অপ্রচুর হয়ে পড়বে । এই সম্ভাবনার কথা কি আমরা ভেবে দেখেছি ? এই সেই উভয় সংকট : কলকাতাকে তার নির্ধারিত কাজের উপযোগী স্থান করে তুলতে হলে বাকী বাংলাকে উপবাসী রেখে এখানে অজস্র টাকা ঢালতে হয় । যদি সেটা সম্ভব হয়, যদি কলকাতাকে কাজকর্মের উপযোগী করে তোলা যায়, তবে উপবাসী বাংলার আরো অগণিত মানুষ সম্ভবত এখানেই উপচে পড়বে এবং এখানকার পথঘাট আবারও অবরুদ্ধ হয়ে কাজের অযোগ্য হয়ে পড়বে ।

এই উভয়সংকট থেকে বেরোবার একটাই পথ ভাবা যায়, সেটা বিকেন্দ্রীকরণ । কলকাতা পশ্চিমবাংলার প্রধান ব্যবসায়কেন্দ্র, পূর্ব ভারতের একমাত্র বন্দর ; কলকাতা এই রাজ্যের রাজধানী ও প্রশাসনের কেন্দ্র ; কলকাতা পূর্ব ভারতের বৃহত্তম শিক্ষাকেন্দ্র । কিন্তু এই ত্র্যহস্পর্শের ফল ভালো হয় নি ; এটা প্রয়োজনও নয় । পাকিস্তানের ভাগ্য ভালো লাহোর, করাচী আর ইসলামাবাদকে একস্থানে এনে ফেলতে হয় নি । ন্যুইয়র্ক ব্যবসায়ের কেন্দ্র, ওয়াশিংটন রাজধানী, শিক্ষার কেন্দ্র অন্য এক রাজ্যে । পশ্চিমবাংলায় মহাকরণ ও শিক্ষাকেন্দ্র অন্যত্র হতে পারে । এই সেই পথ যাতে কলকাতা এবং সেইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ খানিকটা ভারসাম্য ফিরে পাবে । এটা নীতিগত সিদ্ধান্তের প্রশ্ন ; সুস্পষ্ট নীতি ছাড়া এটা সম্ভব নয় । কলকাতার নব্য মধ্যবিত্তের অভ্যস্ত ছকে বাঁধা জীবনে এতে অসুবিধা দেখা দেবে । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যতের জন্য এটাই সুপথ ।

কলকাতা উদাহরণ মাত্র । মোট কথা, পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন আছে । কয়েকটি গ্রামের কেন্দ্রে একটি স্থানীয় বাজার ও ছোট শহর ; কয়েকটি ছোট শহরের কেন্দ্রে একটি মাঝারি শহর ; এইভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রাম ও শহরের বিন্যাস ও উন্নয়ন সম্ভব । পথঘাট স্বাস্থ্য ও শিক্ষার কেন্দ্র সবই এইভাবে সাজানো দরকার । এটাই স্বাভাবিক বিবর্তনের পথ । কিন্তু নানা কারণে এই পথ থেকে বিচ্যুতি ঘটে । একবার বিচ্যুতি ঘটলে ঠিক পথে ফিরে আসা সহজ নয় । সেজন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত প্রচেষ্টা ।

বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে যুক্ত আছে মালিকানার প্রশ্ন । মালিকানা বা স্বামিত্ব বলতে কার্যত বোঝায় বিশেষ ধরনের অধিকারপুঞ্জ । ধনতন্ত্রে এ জাতীয় অধিকার ধনিকগোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত ; রাষ্ট্রতন্ত্রে রাষ্ট্রের হাতে । রবীন্দ্রনাথ সমাজতন্ত্রের সঙ্গে রাষ্ট্রতন্ত্রের একটা ভেদ দেখিয়েছিলেন । আমরা এবিষয়ে শব্দের ব্যবহার নিয়ে ততোটা সাবধানী নই । সেখানেই একটা ধাঁধা থেকে যায় । সমাজের হাতে সব অধিকার ন্যস্ত এ কথা বললেও স্পষ্ট হয় না যে, সেইসব অধিকার বস্তুত প্রয়োগ হচ্ছে কী ভাবে । সমাজতন্ত্র নামে পরিচিত কোনো কোনো ব্যবস্থা কার্যত রাষ্ট্রতন্ত্রেরই ভিন্ন নাম, অতিকেন্দ্রিকতার এই ফল । বিকেন্দ্রিত সমাজব্যবস্থার চিত্র ভিন্ন রূপ । সেখানে মালিকানা সংক্রান্ত সমস্ত অধিকার কোথাও কেন্দ্রীভূত নয়, বরং কর্তব্য ও দায়দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন বিন্যাসে বিন্যস্ত ।

গান্ধীজী বলেছিলেন, পরিকল্পনা শুরু করতে হবে গ্রাম থেকে । গ্রামসমাজকে সংগঠিত করতে পারলে আমাদের মতো দেশে অনেক কাজ সহজ হয়ে ওঠে, তা নইলে অনেক চেষ্টাই ব্যর্থ হয় ।

যেমন ধরা যাক, জনশিক্ষা । জনশিক্ষার প্রসারে আমাদের সাফল্য এযাবৎ উৎসাহব্যঞ্জক নয় । এ কাজের সঙ্গে একটি বা কয়েকটি গ্রাম নিয়ে সংগঠিত সমিতিকে যুক্ত করতে পারলে ভালো হয় ; তা নইলে অব্যবস্থা ও প্রতারণা দূর করা কঠিন । বয়স্কশিক্ষার নামে যে-টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা সেই কাজে খরচ হচ্ছে কি না, শিক্ষক নিয়মিত তাঁর কাজ করছেন কি না, ছাত্রদের কী কী অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, এসব কে দেখবে ? এসব কাজ সরকারী কর্মচারী বা পরিদর্শক দিয়ে ঠিকভাবে করা যায় না । টাকার অপব্যবহার হয়, ব্যর্থতা ঢাকা পড়ে ভুল রিপোর্টে ।

জনসংখ্যানিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি । এখানেও আমরা যথেষ্ট সাফল্য দেখাতে পারি নি । এদেশে স্ত্রীশিক্ষা এখনও যথেষ্ট প্রসার লাভ করেনি, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে । স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে জন্মনিয়ন্ত্রণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, এটা সমীক্ষায় লক্ষ করা গেছে । স্ত্রীশিক্ষা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ এই দু'টি ব্যাপারেই আমরা পিছিয়ে থাকব যতদিন পর্যন্ত না গ্রামাঞ্চলে এদের যথেষ্ট প্রবেশ ঘটে । আবারও গ্রামসমিতির কথা তুলতে হয় । গ্রামাঞ্চলে যেখানে সবাই সবাইকে চেনে সেখানে এইসব ব্যাপারে গ্রামসমিতিকে সঙ্গে নিতে পারলে কাজ সহজে এগিয়ে যায় ।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের দরিদ্রতম মানুষদের কাছে

নিত্যপ্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক খাদ্যবস্তু সুলভে বা ন্যায্য দামে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয়। বাজারব্যবস্থার একটা ত্রুটি এই যে, যাদের ক্রয়ক্ষমতা নেই তাদের সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজনও মেটানো সম্ভব হয় না। দরিদ্র গ্রামবাসীর অন্নের ব্যবস্থা না থাকলে শিক্ষার ব্যবস্থাও করা যাবে না। এ ব্যাপারে চীন অথবা শ্রীলংকার তুলনায় ভারত পিছিয়ে আছে। শ্রীলংকার সুবিধা, সেটা ছোট দেশ। গ্রামে গ্রামে এই জাতীয় সেবার ব্যবস্থা করা প্রশাসনিক দিক থেকে সেখানে অপেক্ষাকৃত সহজ। চীনের সংগঠনশক্তি এইসব কাজের পক্ষে সহায়ক হয়েছে। ভারতে এজন্য প্রয়োজন সংগঠিত গ্রামসমিতি।

এই কাজটা আবশ্যক, কিন্তু সহজ নয়। জমিদারি উচ্ছেদ নিয়ে অশ্রুবিসর্জন করবার মতো লোক অবশ্য বেশি অবশিষ্ট নেই। জমির পুনর্বন্টনের পক্ষে একটা বড় যুক্তি এই যে, এতে করে গ্রামসমাজে গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হবে। দলীয় জবরদস্তি কিন্তু গ্রামস্বরাজের ধারণার বিরোধী। রাজনৈতিক দল প্রায়শ ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের যন্ত্রবিশেষ হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে জয়প্রকাশ নারায়ণ ও বিনোবা ভাবে সাবধানী বাণী উচ্চারণ করে গেছেন। আমাদের মতো দেশে কৃষির জন্য ভূমিবন্টন ও সংগঠন কেমন হওয়া দরকার এ-নিয়ে অনেক বাদবিসংবাদ হয়েছে। প্রশ্নটা একাধিক কারণে জটিল। সমাধানের যে-পথই আমরা বেছে নিই না কেন, কয়েকটি মূল কথা, কিছু সতর্ক বাণী, মনে রাখা আবশ্যক।

এ-দেশে ভূমির ওপর জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক। চাষের জমির জন্য পরিবারপিছু একটা যুক্তিসংগত সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেবার পর উদবৃত্ত জমি যদি ভূমিহীনদের ভিতর ভাগ করে দেওয়া হয় তবে প্রত্যেক ভূমিহীন পরিবারের হাতে যে-পরিমাণ জমি আসে তাতে সেই সব পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন সম্ভব নয়। অর্থাৎ জমি লাভের পরও তাদের অন্যের জমিতে চাষ করতে হবে অথবা অন্য কাজ খুঁজতে হবে। এ অবস্থায় নিজের জমি ধরে রাখাও তাদের পক্ষে কঠিন হয়। সব জমি যৌথখামারে পরিণত করলেও সমস্যা দূর হবে না। যৌথখামারের ভিতরও জমির উপর জনসংখ্যার চাপ থেকেই যাবে। এই পরিবর্তনের ফলে শস্যের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে এই প্রত্যাশার কোনো দৃঢ় ভিত্তি নেই। গত তিরিশ বছরে চীন ও ভারতে শস্যোৎপাদন মোটামুটি একই হারে বেড়েছে। এ-ব্যাপারে সোভিয়েত দেশের রেকর্ডও সন্তোষজনক নয়।

সমবায়ের সপক্ষে কিছু ভালো যুক্তি আছে; তবে বড় বড় কম্যুনে কৃষিকাজ ভালো হয় না। এ বিষয়ে চীনের অভিজ্ঞতা শিক্ষাপ্রদ। ১৯৫৮ সালে সেখানে কম্যুনব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। কিছু কাল পরীক্ষানিরীক্ষার পর ব্যবস্থা পরিত্যাগ করা হয়েছে; কম্যুন এখনো আছে, কিন্তু চাষবাসের কাজ সোজাসুজি কম্যুনের হাতে নেই। অতিকায় কম্যুন ঐ কাজের পক্ষে উপযোগী নয়। পরিবার অথবা অপেক্ষাকৃত ছোট সমবায়েই চাষবাস ভালো হয়। কিন্তু সমন্বয় সহযোজনের দায়িত্ব এবং বড় আকারের মূলধন বিনিয়োগের কাজই বৃহত্তর সংগঠন বা কম্যুনের হাতে দেওয়া যায়। বৃহৎ খামারের অতিকেন্দ্রিকতা ভেঙে চীনের চাষব্যবস্থা বেরিয়ে এসেছে। সেখানে বাজারের ভূমিকাও বাড়ছে। আসলে বাজার ও সমবায় দুইই চাই। আর বিভিন্ন রকমের কর্ম ও দায়িত্বের জন্য বিভিন্ন আকারের সমবায় চাই। পল্লীর অর্থনীতিতে পারিবারিক উদ্যোগেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আবশ্যক। ১৯৮০ সালের পর চীনদেশে পারিবারিক চাষবাসের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে। এর ভাল মন্দ নিয়ে বিতর্ক আছে। এসব ব্যাপারে বিভিন্ন দেশকে নিজ নিজ পরিস্থিতিতে সতর্ক পরীক্ষানিরীক্ষার ভিতর দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে।

কোনো একদিন আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষি এবং অন্যান্য বৃত্তি ও উদ্যোগের ভিতর একটা ভারসাম্য ছিল। তার নীরব সাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে এ-দেশের বৃত্তিভিত্তিক বিভিন্ন জাতের আকারে ও বৈচিত্র্যে। সেই ভারসাম্য একদিন ভেঙে পড়ল। সমস্যা আরো বেড়ে উঠল জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক প্রযুক্তিকেও অবহেলা করাও যায় না আবার তাকে নির্বিচারে গ্রহণও করা যায় না। এইখানে এসে যায় বিকেন্দ্রিত শিল্পায়নের কথা। কৃষিতে নিযুক্ত মানুষদের একটা বড় অংশকে গ্রামীণ শিল্পে অথবা কৃষির বাইরে অন্য কোনো উৎপাদক কাজে নিয়ে আসতে হবে, তা নইলে গ্রামের আর্থিক সমস্যা ঘুচবে না। যাকে এইমাত্র গ্রামীণ শিল্প বলা হল তার অবস্থান যে গ্রামেই হতে হবে এমন নয়। কয়েকটি গ্রামের কেন্দ্রে

যে ছোট শহর সেখানেও তাদের স্থান হতে পারে। বিকেন্দ্রিত শিল্পায়নের জন্য ব্যাঙ্কের ঋণনীতি ও পদ্ধতির যেমন পরিবর্তন চাই তেমনি গবেষণার সংগঠনে ও সমস্যা নির্বাচনে নতুন উদ্দেশ্যের প্রতিফলন থাকা প্রয়োজন। পরিকল্পনার এক একটি বৃত্ত তৈরি হতে পারে কিছু গ্রাম ও বাজারসহ ছোট শহর নিয়ে। এক বৃত্তের সঙ্গে বৃহত্তর বৃত্তের যোগ ঘটিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারি জাতীয় অর্থনীতির দিকে। আর্থিক ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মের এইরকম একটা রূপরেখার ইঙ্গিত ছিল গান্ধীর চিন্তায় ও রচনায়।
গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই পল্লীকে ভিত্তি হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁদের আদর্শ সমাজের সংগঠনের চিত্রটি দেশের সামনে তুলে ধরেছিলেন। এরই সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এঁরা শিক্ষারও রূপায়ণ করেছিলেন। দেশের সঙ্গে নব মধ্যবিত্তের বিচ্ছিন্নতা থেকে উত্তরণের পথ এই। তবে গ্রামের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকা এঁদের লক্ষ্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "একটা কথা বিশেষ করে বলা দরকার। আমি যখন ইচ্ছা করি যে আমাদের দেশের গ্রামগুলি বেঁচে উঠুক, তখন কখনও ইচ্ছে করি নে যে, গ্রাম্যতা ফিরে আসুক। গ্রাম্যতা হচ্ছে সেইরকম সংস্কার, বিদ্যাবুদ্ধি বিশ্বাস ও কর্ম, যা গ্রামসীমার বাইরের সঙ্গে বিযুক্ত··· বর্তমান যুগের বিদ্যা ও বুদ্ধির ভূমিকা বিশ্বব্যাপী··· গ্রামের মধ্যে সেই প্রাণ আনতে হবে, যে প্রাণের উপাদান তুচ্ছ ও সংকীর্ণ নয়, যার দ্বারা মানবপ্রকৃতিকে কোনদিকে খর্ব ও তিমিরাবৃত না রাখা হয়।" (পল্লীপ্রকৃতি)। বিশ্ববিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তিকে অবহেলা করা ভুল। তবে সমাজের যে রূপ ও বিন্যাস আমাদের অভীষ্ট তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রয়োগ কাম্য। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সঙ্গে যোগ চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন গান্ধীও। সেই চিন্তার সঙ্গে এঁরা বিরোধ দেখেননি পল্লীসংগঠনের। পল্লীতেই আছে আত্মীয়বুদ্ধির ও প্রতিবেশীচেতনার মূল ও মৃত্তিকা, যাকে বাদ দিয়ে বিশ্বের সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে না।
এইখানে এসে যায় একটা জীবনদর্শনের কথা, যা থেকে অর্থনীতিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে গেলে পরিণামে বিপত্তি ঠেকানো যায় না। আধুনিক অর্থবিজ্ঞানের ভিত্তিতে আছে উপযোগবাদ বা সুখবাদ। এর বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা শোনা গেছে। উপযোগবাদের প্রধান দুর্বলতা বোধ করি এই যে, সুখ জিনিসটাকে সে খণ্ড খণ্ড করে দেখে। তাতে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সুখের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড় হয়ে ওঠে, মানুষে মানুষে আনন্দের পরিপূরকতা তেমন স্বীকৃতি পায় না। অবশেষে সমাজের সংহতি বিপন্ন হয়। তাই আমরা বিস্মিত হই না যখন দেখি জন স্টুয়ার্ট মিলের মতো চিন্তানায়ক উপযোগবাদ নিয়ে যাত্রা শুরু করেও তার সীমানার মধ্যে স্বস্তি বোধ করেননি। যে ভোগবাদী জীবনদর্শনের কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি, উপযোগবাদে উপস্থিত তার দার্শনিক ও ব্যবহারিক ভিত্তি। একটা স্তর আছে যেখানে সুখ এইরকম খণ্ডিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক রূপ নিয়েই আসে। একেও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু একে শেষ সত্য বলে স্বীকার করে নিয়ে এ যুগের সমস্যার সমাধানে পৌঁছবার পথ নেই।
ব্যক্তির ও সমাজের চেতনার মহত্তর দিকটাকে কী করে জাগ্রত করা যায় সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া কঠিন। মানুষ অনেক কিছু ধীরে ধীরে শেখে সংকটের ভিতর দিয়ে। পরিবেশদূষণ আমাদের শেখায় প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজের স্তূপীকৃত ব্যর্থতা অঙ্গুলিনির্দেশ করে প্রতিবেশীকে নিয়ে পল্লীসংগঠনের দিকে। যুদ্ধের ভয়াবহতা বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় আন্তর্জাতিক শান্তি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা। আবার সংগঠনের ব্যর্থতা এই শিক্ষা রেখে যায় যে, সংগঠনই সব নয়। চেতনার একটা নিজস্ব ভূমিকাও আছে, যার কোনো সাংগঠনিক বিকল্প নেই। প্রয়োজন নবচেতনা ও নবসংগঠনের একটি শুভবৃত্ত। কোনো আকস্মিকতায় এর আরম্ভ নয়, শেষও নয়।
আপ্তচিন্তার শেকল ছেঁড়া সহজ নয়। তবু শুরু হয়ে গেছে নতুন পথে পরীক্ষানিরীক্ষা।
সমাজের এক নব কল্পচিত্র পৃথিবীর কিছু আদর্শবাদী মানুষের চিত্তে আজ স্বপ্নের মতো বিচরণ করছে। সেই আদর্শ আর শুধুই নিরবয়ব কল্পনা নয়। মাঝে মাঝে যেন অবয়বপ্রাপ্ত হয়ে সে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে উঁকিঝুঁকি মেরে অন্তর্হিত হচ্ছে। এই নব আদর্শের ভিত্তিতে অধুনা স্থান পেয়েছে সৈন্যবাহিনীর সংগঠনসংক্রান্ত এক যুগান্তকারী ধারণা।
উচ্চনীচ ভেদসম্পন্ন আমাদের এই পরিচিত সমাজের একই সঙ্গে প্রতিরূপ ও আশ্রয়, জাতীয় সেনাবাহিনী। ক্ষত্রতন্ত্র ও আমলাতন্ত্র, আজকের অসাম্যচিহ্নিত সমাজের এই দুই প্রধান স্তম্ভ। মনে রাখতে হবে যে, সেনাবাহিনীর সংগঠনের সঙ্গে শিল্পবিপ্লবের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এ যুগের সামরিক ব্যবস্থা ও সাজসরঞ্জাম ভারী শিল্প ও আধুনিক পরিবহণকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। ফরাসী বিপ্লবের যুগে সেনাবাহিনী আর সাধারণ মানুষের ভিতর এতো বড় পার্থক্য ছিল না। উনিশ শতকের শেষভাগে বিসমার্কের যুগে ব্যবধান প্রকাণ্ড হয়ে উঠলো। এঙ্গেলস্ শেষ জীবনে এটা লক্ষ করেছিলেন। সেই ধারা তারপর আরো বহু দূর এগিয়ে গেছে। এরই সঙ্গে তাল রেখে অতিকেন্দ্রিক সমাজের অপর এক স্তম্ভ, আমলাতন্ত্র, বেড়ে উঠেছে। ধনতন্ত্রে তো বটেই, আজকের সমাজতন্ত্রেও এই দৃশ্য। বৃহৎ শক্তি বলে পরিচিত প্রতিটি দেশেই আধুনিক সামরিক সংগঠন ও ভারী শিল্প, অতিকেন্দ্রিক সমাজ ও আর্থিক পরিকল্পনা, এই সবই পরস্পর সংবদ্ধ।
মার্কস সমাজকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করে দেখেছিলেন, সম্পত্তিবান ও সম্পত্তিহীন। এদের ভিতর আপসহীন লড়াই। সম্পত্তিবান সম্পত্তি রক্ষার জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করবেই, কারণ তার সমস্ত স্বার্থ নিহিত সেইখানে। আজকের বাস্তবে কিন্তু অন্য একটি মাত্রা এসে যোগ হয়েছে, একে বাদ দিলে কোনো গণনাই আর নির্ভুল থাকে না। ধনতন্ত্র পথ নয়, একথা ঠিক। তবু একথা বলাই আজ যথেষ্ট নয়। নব মধ্যবিত্তের বিশেষ সুবিধার ভিত্তি নয় মামুলী সম্পত্তি ব্যবস্থা। নব মধ্যবিত্ত বাধ্য নয় এই সম্পত্তিব্যবস্থার জন্য আমরণ লড়াই চালিয়ে যেতে। ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে কায়েমী সুবিধার বিকল্পভিত্তি। আজকের সমাজতন্ত্রে নব মধ্যবিত্ত ফিরে এসেছে, স্থিতি খুঁজে পেয়েছে, আমলা আর সামরিকবাহিনী এই দুই পরস্পরসংবদ্ধ সমাজবর্গকে আশ্রয় করে। সাম্প্রতিক ইতিহাসের এই শিক্ষাকে উপেক্ষা করা যায় না।

একে ভাঙতে হলে ভাঙতে হয় আমলাতন্ত্র তথা সামরিকবাহিনীর সংগঠনকে। চীনের নেতা মাও নতুন সংগঠনের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। মার্কসের প্রোলেতারিয়েত ছিল শিল্পবিপ্লবের সন্তান, প্রাগ্রসর নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে তার যোগ। মাও-এর নেতৃত্বে চীনের বিপ্লবী সৈনিক হয়েছিল কৃষকের সহচর, গ্রাম থেকে অচ্ছেদ্য। সেই চিন্তা তারপর দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সেখানেও অন্তত কিছু মানুষের কাছে এই নতুন আদর্শ এসে পৌঁছেছিল।
চীন আজ যে পথে চলেছে মাও-এর পথ থেকে সেটা বেঁকে গেছে অনেক দূরে। বাংলাদেশে সামরিকবাহিনী ও আমলাতন্ত্র জাঁকিয়ে বসেছে। আবারও এক সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের ভাবনা ভাবছে বাংলাদেশে কিছু বিপ্লবী, হয়তো ভাবছে চীনেও এবং অন্যদেশে। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থান ঘটানোটাই প্রধান কথা নয়, সমস্যা সেইখানে নয়, ভস্ম থেকে বারবার গড়ে ওঠে অসাম্যের সৌধ। সমস্যা এইখানে।

নতুন আদর্শের স্থায়ী রূপায়ণে কে পথ দেখাবে? জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এর মিল কম। ক্ষমতালিপ্সার সঙ্গে একে মেলানো যায় না। কোনো বৃহৎ শক্তির কাছ থেকে বিশ্বাসযোগ্য নেতৃত্ব আশা করা যায় না। হয়তো পথ দেখাবে কোনো ছোট দেশ। আর তার বিস্তৃতির জন্য ক্ষেত্র তৈরি হবে ধীরে, পৃথিবীজোড়া মানুষের হৃদয়ে। এ পথের পরিণতি সংগঠিত অহিংসায়। অথবা মেনে নিতে হবে সংগঠিত অসাম্যকে। দুই বিকল্পের ভিতর ভবিষ্যৎ দোদুল্যমান। অহিংসা কি সম্ভব? অসাম্য কি সহনীয়? আমরা কোন দিকে চলেছি সেটাই প্রধান প্রশ্ন। এযুগের চেতনায় অসাম্য ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠছে। একে রোধ করতে না পারলে এর অন্তে আছে মানুষের আত্মহনন। আজকের সমাজে তার ইঙ্গিতের অভাব নেই।
সমাজের গভীরতর মূল্যাশ্রয়ী পরিবর্তনের নির্দেশ প্রচলিত উন্নয়নতত্ত্বের ভেতর খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক। পৃথিবীতে একদিকে ব্যাপক দারিদ্র্য অন্যদিকে জাতিসমূহের আয়ের সিংহভাগ সামরিক খাতে খরচ হচ্ছে, শুধু এই তথ্যের জোরেই সামরিক ব্যয় কমানো যাবে না। সেই সঙ্গে প্রয়োজন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নতুন কল্পনা ও দূরদৃষ্টি, প্রত্যয় ও সংঘবদ্ধ প্রয়াস। উন্নয়ন তত্ত্বকে অবশেষে যুক্ত হতে হবে বৃহত্তর সমাজ দর্শনের সঙ্গে। আঠার উনিশ শতকের চিন্তকদের কাছে আমরা ঋণী। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব ভবিষ্যতের কাছে। সেই ভবিষ্যৎ মানুষকে ডাক দিয়েছে নতুন চিন্তার পথে।
সমাপ্ত

* ৮ ও ৯ অক্টোবর ১৯৮৬ বিধান শিশু উদ্যানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত অশোককুমার সরকার স্মৃতি বক্তৃতামালা।
বিধান শিশু উদ্যানের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

ইলেকট্রন পরীক্ষা করে তার ক্ষমতা কত পাককা প্রতিদিনের জীবনে কতটা নিতে পারে ধাককা।
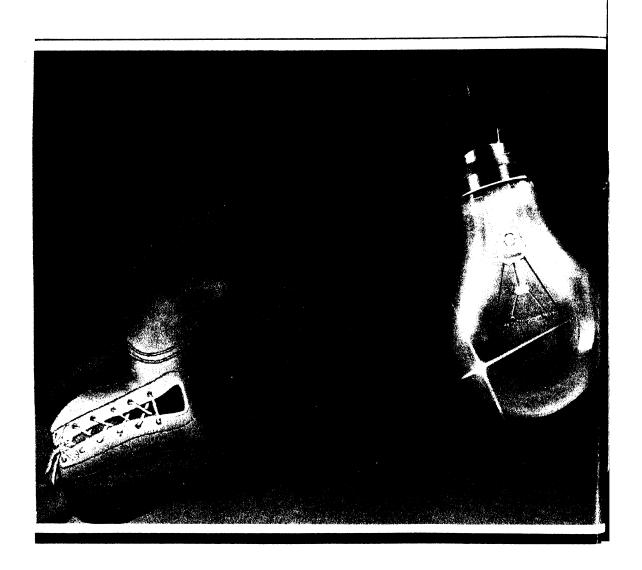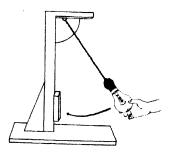
ইলেকট্রন 'নক্ টেস্ট' এমন এক পরীক্ষার ধাক্কা, যা বাল্‌বের খোলের শক্তি ছাড়াও, আরো অনেক কিছুর দেয় পরীক্ষা। বিশেষ ডিজাইনে বানানো ডবল কয়েল করা টাঙস্টেন ফিলামেন্টের ক্ষমতা ছাড়াও, ভোল্টেজের বিরাট ওঠা-নামার ধকল, এটা সইতে কত সফল।

এই পরীক্ষায় বাল্‌বকে একটা দড়ি থেকে ঝুলিয়ে দিয়ে, দুলিয়ে একটা কাঠের প্লেটে ধাক্কা মারা হয়।

(বলতে পারেন বাল্‌বকে হাত থেকে ফেলে দেখার পরীক্ষা)

বাজারে ছাড়ার আগে, ইলেকট্রন বাল্‌ব ও টিউবের নানান জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার এ হ'ল এক উদাহরণ মাত্র অন্যান্য জটিল পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে–ক্যাপ সিলিং এর মারপ্যাচের পরীক্ষা, আলোকচ্ছটার মাত্রা দেখার জন্য লুমেন টেস্ট এবং দীর্ঘকাল চমৎকার জ্বলার জন্য ১০০০ ঘন্টা আলো জ্বালানোর পরীক্ষা।

আরো কি, ইলেকট্রন বাল্‌ব ও টিউব নির্মানের অধিকাংশ যন্ত্রোপকরণই ইলেকট্রন গ্রুপ দ্বারাই নির্মিত। আর যেসব উপকরণ নয়, যেমন ফ্লোরেসেন্ট পাউডার ও ফিলামেন্ট ওয়্যার সেগুলি আবার আমেরিকার অগ্রণী নির্মাতা জেনারেল ইলক্‌ট্রিক থেকে আমদানি করা।

এইসব গুণের বহরের জন্যেই, আশ্চর্যের কিছুই লাগেনা। যখন দেখা যায় যে এত অল্প সময়ের ভেতরে, ঘরে-ঘরে ও অফিসে-অফিসে ইলেকট্রন বাল্‌ব, টিউব ও ফিটিংস্-এর কদর বেড়েছে বিপুল হারে।

ইলেকট্রন সোডিয়াম ভেপার, মারকারি ভেপার ও হ্যালোজেন ল্যাম্প, পথঘাট, ফ্যাক্‌টরি প্রভৃতি সাজিয়ে তুলেছে আলোকচ্ছটায়।

আজ্ঞে হ্যাঁ, এর ১০০০ ঘন্টা আয়ুর প্রতিটিক্ষণ, এ আলোচ্ছটা করবে বিকীরণ।

কল্পনা ল্যাম্প্স অ্যান্ড কম্পোনেন্ট্স প্রাঃ লিঃ
২২ এলডাম্স রোড মাদ্রাজ ৬০০ ০১৮

elektron

ইলেকট্রন-আলোর জগতে জ্যোতিষ্ক

Artig/KLCP/148/A/Ben

Vhen the bronze is Chola, he walls are Luxol Silk.

Luxol Silk. It is the only emulsion paint you
an tell with your eyes closed. Just run your fingers over
e silken, super-smooth finish.

Luxol Silk. Its perfect silk finish makes it so easy to wash,
easy to keep bright and clean looking for years and years.

Luxol Silk. Choose from over forty shades of silk.
nd from a whole new range of whites that whisper.

rape your walls with Luxol Silk
- the richest emulsion in the world.

Luxol Silk

BERGER PAINTS

TAS (C)/BPLS/31/2619

গর্ভধারিণী

সমরেশ মজুমদার

এখন দুপুর। কিন্তু আকাশে সূর্য আছে কিনা চোখ তুললে বোঝা যাচ্ছে না। হাওয়া বইছে। তার দাঁতের ধার আরও তীব্র। পাহাড়ে পাহাড়ে বরফ যেন হামাগুড়ি দিয়ে নিচে নামছে। সুদীপ বাইরে বেরিয়ে এসে চুপচাপ বসে ছিল। শিস বাজছে বাতাসে। গাছের মাথাগুলোর ঝুঁটি যেন নেড়ে দিয়ে যাচ্ছে। খোলা চোখে বসে থেকেও অবশ্য সুদীপ কিছুই দেখছিল না। অত্যন্ত ক্লান্ত লাগছে, মাথায় টিপটিপানি। শুধু ওই ক্লান্তির জন্যেই সম্ভবত ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়েছিল ও। এখন বুকের মধ্যে যে চাপ তাতে ঘুম কোন উপকার করেছিল বলে মনে হচ্ছে না। ধারে কাছে আনন্দ নেই। জয়িতাও।

সুদীপ চোখ বন্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণের মুখটা ভেসে উঠল। কালিয়াপোকরি থেকে কল্যাণ ছুটে এসেছিল সান্দাকফু ছাড়িয়ে সেই পর্যন্ত যেখানে ছেলেটি ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল। যে ছেলে প্রতিমুহূর্তে সন্দেহ প্রকাশ করত, সাহস দেখানো যার স্বভাবে ছিল না সে—! সুদীপ মাথা ঝাঁকাল। একমাত্র ওর সঙ্গে কল্যাণের লাগত। কল্যাণকে সে কি পছন্দ করত? কিন্তু এখন এমন লাগছে কেন? মৃত্যুভয় ওরই বেশী ছিল। সবসময় দুরকম মানসিকতায় দুলত কল্যাণ। শেষ খেলায় একলা জিতে গেল। চোখ বন্ধ অবস্থায় সুদীপ কল্যাণের চলে যাওয়াটা দেখল। জয়িতার গালে আঙুল ছুঁইয়ে কেমন চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে হাঁটা শুরু করেছিল কল্যাণ।

আশ্চর্যের ব্যাপার জয়িতা কাঁদেনি। জয়িতাকে কাঁদতে দ্যাখেনি সুদীপ। কাল রাত্রে একসময় আনন্দ ডুকরে উঠেছিল। উঠেই চুপ করে গিয়েছিল। অন্ধকার ঘরে সেই শব্দটা সুদীপকে খুব শান্তি দিয়েছিল।

একটা মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলে কোন কিছুই আটকে থাকে না। কেউ একুশ বছর বয়সে পুলিসের গুলিতে মারা যায় কেউ সত্তরে রোগে মারা পড়ে। যদ্দিন প্রাণ তদ্দিন সব চোখের সামনে, যেই শরীরটা গেল অমনি অস্তিত্বের বিলোপ। কারো কারো স্মৃতি কিছু বছর, কয়েক বছর অথবা শতাব্দী মনে রাখে মানুষ। কিন্তু বেশীরভাগ মানুষকে তিনমাসেই বিস্মরিত হয় মানুষ, যারা থেকে গেল। হেসে ফেলল সুদীপ। কেউ থাকে না। যাওয়ার জন্যে অপ্রস্তুত থাকে। মা এখন কোথায়? একটাই তো জীবন আর তার সময়টাও বড় অল্প অথচ মানুষ ভাবার সময় কয়েক শতাব্দী ধরে নিজেকে ছড়িয়ে ভাবে। কল্যাণ তবু যাওয়ার আগে কিছু ওষুধ পৌঁছে দিয়ে গেল। তার পরে যে মানুষগুলো যাবেই তাদের থাকার সময়টা যাতে একটু স্বস্তিতে কাটে তারই ব্যবস্থা করে গেল। এইটুকুই বা ক'জন করতে পারে! সাবাস কল্যাণ। এই প্রথম আমি তোর কাছে হারলাম। সুদীপ যেন নিজের অস্বস্তি ঢাকতেই উঠে দাঁড়াল। তারপর কনকনে জলে মুখ এবং হাত ভেজাল। এরমধ্যেই মুখের চামড়া ফেটেছে। চুলে আঠালো ভাব। হাতের দিকে তাকালে বোঝা যায় চর্মরোগ হতে বেশী দেরি নেই। কেমন ঘিনঘিনে ভাব চলে এল। সুদীপ ঠিক করল সে স্নান করবে। যতই ঠাণ্ডা হোক, সমস্ত শরীরে জল ঢালবে। সে চলে এল আস্তানার ভিতরে। দুটো সাবান ছিল। অনেক হাতড়ে হাতড়ে তার একটাকে বের করল। দ্বিতীয় সেট জামা প্যান্ট বের করল সে। অনেক দিন এগুলো শরীরে সেঁটে রয়েছে। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে বিচ্ছিরি গন্ধ বের হচ্ছে। অভ্যেসে কি না করতে পারে মানুষ!

প্রথমে ভেবেছিল জল গরম করে নেবে। তার পরেই আর একটা জেদ বড় হল। কোন দরকার নেই, যতই ঠাণ্ডা হোক ঝরনার জলেই স্নান করবে সে। গরম জামা প্যান্ট আর সাবান তোয়ালে নিয়ে সুদীপ হেঁটে এল ঝরনার পাশে। এখানে এখন কোন মানুষ নেই। অদ্ভুত আদুরে ভঙ্গীতে জলেরা বয়ে যাচ্ছে। জলের শরীরে ছায়া জমলে তাকে ভীষণ গম্ভীর দেখায়। একটু বেঁকে যেখানে জল গর্তের মধ্যে পড়েছে সেইখানে অকস্মাৎ উদোম হয়ে নেমে পড়ল সুদীপ। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরে তীব্র কনকনানি, যেন হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত অসাড়। কাঁপুনি আসছিল বেদম, তবু মাথা ডোবাল সুদীপ। শরীর বড় বিচিত্র। সে শীতলতা থেকেও উত্তাপ আহরণ করতে জানে। ধীরে ধীরে আরাম পেল সে। সমস্ত শরীরে কালো দাগ জন্মেছে বিন্দু বিন্দু করে। সাবান ঘষে তৃপ্ত হল। তারপব হাত বাড়িয়ে ময়লা জামা প্যান্ট জলে টেনে এনে তাদের একটা সুরাহা করল। কিন্তু জল থেকে উঠতেই সমস্ত গায়ে কদম ফুটল,

সুদীপের মনে হল সে মরে যাবে। তাড়াতাড়ি পরিষ্কার জামা প্যান্ট এবং গরম জামা প্যান্টে নিজেকে মুড়ে নিয়েও সে দাঁতের বাজনা থামাতে পারছে না। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচতেই সে লাফাতে লাগল। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র উপকার হল না। এবং তখনই তার হাঁচি শুরু হল। নাক দিয়ে জল গড়িয়ে আসতেই সুদীপের খেয়াল হল তার নিউমোনিয়া হতে পারে। এই পাহাড়ে একবার ওই অসুখ করলে আর দেখতে হবে না। শুধু রোগে ভুগে মরে যাওয়া—সে দৌড়োতে লাগল। আস্তানায় পৌঁছে সে চটপট কয়েকটা ট্যাবলেট পেটে চালান করে দিল। কিন্তু এই দৌড়োবার সুবাদেই শরীর থেকে শীতভাবটা দূর হয়ে গেল। হঠাৎ বেশ ঝরঝরে লাগল নিজেকে। ভেজা জামাপ্যান্টগুলো বারান্দায় ছড়িয়ে দিয়ে সুদীপ নেমে এল। অনেকদিন বাদে শরীর হালকা লাগছে। ঘুম থেকে ওঠার পর যে চিন্তাগুলো জেঁকে বসেছিল তারা এখন সরে দাঁড়িয়েছে। সুদীপ দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটতে লাগল বড় বড় পা ফেলে।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল ওদের। শুধু ওরা নয়, গ্রামের বেশ কিছু মানুষ সঙ্গে রয়েছে। যারা ঠিক সঙ্গী হয়নি তারা দূর থেকে লক্ষ্য করছে। গাছের লম্বা লম্বা শক্ত ডাল কাটছে কেউ কেউ। অনেকটা জায়গা জুড়ে একটা চালা ঘর তৈরি হচ্ছে। খুঁটিগুলো গোল করে পুঁতে মাটি থেকে হাত তিনেক উঁচুতে সেই ডাল বিছিয়ে মাচা তৈরি করে তার ওপর ছাউনি ফেলা হবে। সুদীপ কাছে পৌঁছবার আগে জয়িতা দুটি মেয়ের সঙ্গে অন্যদিকে চলে গেল। সে কাছে পৌঁছতে আনন্দ বলল, 'তুই একবার চেক করবি?'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কি?'

'যাদের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল তাদের কি কি রি-অ্যাকশন হচ্ছে! অবশ্য খারাপ কিছু হলেও আমাদের হাত বন্ধ। ভাল হচ্ছে কিনা তাই দ্যাখ।' তারপর গলা পাল্টে জিজ্ঞাসা করল, 'সে কি রে, তুই স্নান করেছিস মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, আর সহ্য করতে পারছিলাম না।'

'দেখিস অসুখ বাঁধিয়ে না বসিস। আমি রোলেন আর জনা ছয়েক লোককে জোর করে পাঠালাম চাংথাপুতে চাল ডাল কিনে আনতে। পুরো স্টকটা এখানে থাকবে।'

'ওরা যেতে চাইল?'

'পালদেম না রাজী করালে যেত না।'

'জয়িতা কোথায় গেল?'

'ও মেয়েদের সঙ্গে বসছে। ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু মেক দেম আন্ডারস্ট্যান্ড।' কথা শেষ করে আনন্দ অন্যদের সঙ্গে আবার হাত লাগাল। সুদীপ কয়েক মুহূর্ত ওদের দিকে তাকাল। এখন এই কাজের সময়ে আনন্দর মনে নিশ্চয়ই কল্যাণের কোন অস্তিত্ব নেই। সে শুধু সময়গুলো নষ্ট করেছে গুমরে থেকে। সন্ধে হয়ে গেলে আর কেইবা দিনের জন্যে হা হুতাশ করে। কাছে দাঁড়ানো একটি বৃদ্ধকে সে কোনমতে বোঝাতে পারল কি করতে চায়। বৃদ্ধটি সোৎসাহে তাকে নিয়ে গেল প্রথম বাড়িটায়। কোন গৃহপালিত পশু নেই, দরজা হাট করে খোলা। বৃদ্ধটির চেঁচামেচিতে যে বৃদ্ধা সমস্ত শরীরে ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে বেরিয়ে এল কাঁপতে কাঁপতে, তার চোখে ইতিমধ্যে ছায়া নেমেছে। সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার শরীর এখন কেমন আছে?'

মাথা ঝাঁকাল বৃদ্ধা। বিড় বিড় করে কিছু বলল। বৃদ্ধ এগিয়ে গিয়ে তার মুখের কাছে কান রাখল। তারপর ফিরে বলল, 'ওর খুব খিদে পাচ্ছে বলছে।'

'খায়নি কেন?' প্রশ্নটা করা মাত্র সুদীপের খেয়াল হল সে নিজেও আজ কিছু খায়নি।

বৃদ্ধ বলল, 'জঙ্গলে যেতে পারেনি। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে।'

সুদীপের মনে হল সঙ্গে কাগজ কলম আনা দরকার ছিল। প্রত্যেকের বৃত্তান্ত আলাদা করে তার পক্ষে মনে রাখা সম্ভব নয়। ঘরে ঘরে ঘুরতে ঘুরতে ওর মনে হল এখানেও তিনটে শ্রেণী রয়েছে। একদল সারাবছর মোটামুটি খেতে পায়। তাদের চাষের জমিতে যে ফসল ফলে তাতে কুলিয়ে যায়। এদের গৃহপালিত পশুপাখির সংখ্যাও কম নয়। খচ্চরওয়ালার কাছ থেকে জিনিসপত্র কিনে নেয় এরা। দ্বিতীয় শ্রেণী থাকে প্রায় আধপেটা খেয়ে। সারা দিনে শুধু সন্ধেবেলায় এদের খাওয়া। আর একদল যাদের

সংখ্যাই বেশী বছরের বেশীর ভাগ সময় তারা নির্ভর করে থাকে আশেপাশের জঙ্গলের ওপর। সেই জঙ্গলে এক ধরনের উদ্ভিদ এদের প্রাণধারণে সাহায্য করে। শাক পাতা ছাড়া শেকড়ও এদের কাছে উপাদেয় খাদ্য। এই শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই চর্মরোগের প্রাবল্য বেশী। এদের দিকে তাকালেই বোঝা যায় অপুষ্টি কাকে বলে। আর আশ্চর্যের ব্যাপার, এই মানুষগুলোই সবচেয়ে বেশী কুঁড়ে এবং ঝিমোতে ভালবাসে। যে মানুষগুলোকে ওষুধ দেওয়া হয়েছিল তাদের সত্তরভাগই এখন ভাল আছে অথবা অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এদের কাছে গিয়ে আপ্লুত হল সুদীপ। দুহাত ধরে মানুষগুলো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। একটি পরিবার পোড়া রুটি এবং শাক সেদ্ধ না খাইয়ে ছাড়বে না। এখন আর সুদীপের বমি পায় না। সে পা মুড়ে বসে খাবারটা খেল। এই পরিবারে প্রৌঢ় প্রৌঢ়া এবং একটি রোগগ্রস্ত সন্তান। তাকেই ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গী বৃদ্ধ জানাল এই প্রৌঢ়ের হাতে যে মদ তৈরি হয় তেমন গ্রামের আর কেউ তৈরি করতে পারে না। প্রৌঢ় যেন লজ্জিত হল। দুহাত নেড়ে প্রতিবাদ করল, 'না না কথাটা ঠিক নয়। তবে হাঁ, আমার বাপের হাত ছিল খুব ভাল। তার মদ ঠাণ্ডা হলে যে গন্ধ ছড়াত তাতে মৌমাছি ও ছুটে আসত। আমি তার কিছুই নিতে পারিনি। আমার বাবার ছেলে হয়ে সেরে ছেলেবেলায় কোনদিন অসুখে ভুগিনি আর আমার ছেলেকে দ্যাখো। কিন্তু ওষুধ পেটে পড়ার পর ছেলেটার উপকার হয়েছে। জীবনে ওষুধ বস্তুটির সঙ্গে পরিচয় ছিল না ওর। পাতার রস বা শেকড়বাটা খেয়ে এসেছে এতদিন।' প্রৌঢ় বলল, 'তা সবাই যখন বলছে তখন আপনি আমার হাতের সেবা গ্রহণ করুন।' মাচার তলা থেকে প্রৌঢ় একটা মোটা বাঁশের চোঙা টেনে নিয়ে এল। এ তল্লাটে বাঁশ গাছ চোখে পড়েছে কিনা মনে করতে পারছিল না সুদীপ। কিন্তু চোঙাটাকে যেভাবে কেটেকুটে ঠিকঠাক করা হয়েছে তাতে বোঝা যাচ্ছে এর পেছনে অনেক যত্ন রয়েছে। মদ ঢালা হল ছোট ছোট আরও কয়েকটা চোঙায়। সেগুলোকে বিয়ারের জাগের মত দেখতে। বৃদ্ধ বোধ হয় এরই আশায় ছিল এতক্ষণ, এবার পুলকিত হল। রুটি তরকারি খাওয়ার পর সুদীপের পেট ঠাণ্ডা হয়েছিল। সেদিন মদ খাওয়া নিয়ে বন্ধুরা তেমন কিছু বলেনি কিন্তু আনন্দ বা জয়িতা যে খুশী হয়নি তা বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু এই ঘরে বসে ওদের অপমান করা অন্যায় হবে। পানীয়টি রঙিন কিন্তু বড় তরল। সুদীপ চোঙাটি ধরল। তীব্র গন্ধ বের হচ্ছে। কলকাতার ছেলেরা ঘাটশিলায় বেড়াতে গেলে মহুয়া খায় শখে, তার চেয়ে বেশী কি হবে? গন্ধটার মধ্যেই অবশ্য ঝিমঝিমে ভাব আছে। সে সতর্ক হয়ে চুমুক দিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল জিভ প্রায় অসাড় এবং কণ্ঠনালীতে সূর্য গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে। সে চোখ বন্ধ করল। বুক থেকে নামা মাত্র সমস্ত শরীর অসাড়। প্রৌঢ় বলল, 'আস্তে আস্তে খেতে হয় এই জিনিস। এই গ্রাম কেন, আশেপাশের কেউই এই জিনিস তৈরি করতে জানে না। অবশ্য বিলিতি মদের কাছে এটা কিছু নয়।'

সুদীপ মাথা নাড়ল। কিন্তু কথা বলতে গিয়ে মনে হল জিভটা কেমন হয়ে যাচ্ছে। বিলিতি মদের তুলনায় এ জিনিস হাজারগুণ জোরালো তাই বোঝাবার জন্যে সে সময় নিল। মিনিট পাঁচেক পরে ধীরে ধীরে সাড় ফিরে আসতে লাগল। সুদীপ ঠিক করল আর খাবে না। কিন্তু পানীয়টির জোরালো গন্ধ তাকে এমন টানছিল যে দ্বিতীয়বার চুমুক না দিয়ে পারল না। এবার সাড় ফিরে আসতে আরও কম সময় লাগল। ক্রমশ তার মনে হতে লাগল একটার পর একটা ঢেউ যেন শরীরে পুরে পুরে নিচ্ছে। আর ঢেউগুলো পা থেকে এখন গলা পর্যন্ত খেলে যাচ্ছে। তার মাথাটা পরিষ্কার আছে কিন্তু অদ্ভুত এক সুখানুভূতি সমস্ত বোধকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বৃদ্ধ সেখানেই শুয়ে পড়েছে। যেন হঠাৎ পাওয়া সুযোগ হাতছাড়া না করার জন্যে সে খুব দ্রুত খাচ্ছিল। প্রৌঢ় তার দিকে তাকিয়ে বললে, 'শরীর খুব খারাপ লাগছে না তো?'

সুদীপ বলল, 'না।' শব্দটা তার ঠোঁট থেকে বেরিয়ে কানে পৌঁছাল না। প্রৌঢ় বলল, 'এখন শুধু মাথা ঘাড়ের ওপর সোজা করে রাখুন। ব্যস। দেখবেন, পৃথিবীটা আপনার হুকুমে চলবে।'

সুদীপ বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। পা টলছে। চোখের সামনে সব কিছুই আঁকা বাঁকা। একেই কি মাতাল হওয়া বলে? দূর! মাতাল হলে সে এসব টের পাচ্ছে কি করে? তার মাথা তো পরিষ্কার আছে। সে কথা মনে পড়তেই যতটা সম্ভব আকাশের দিকে মাথা রাখল। সে টিপসি হয়েছে। নেহাতই টিপসি। হাসল সুদীপ। তবে এই অবস্থায় আনন্দর কাছে যাওয়া ঠিক হবে না। সে ছোট ছোট পায়ে হাঁটতে লাগল। এবং তখনই তার মনে হল এখন সবে ভোর হচ্ছে। আকাশের গায়ে অন্ধকার সেঁটে আছে এখনও। কয়েক মুহূর্ত বাদেই ভুল ভাঙল। সে এসেছিল দিনের বেলায়। তাহলে এখন ভোর হবে কি করে? নিশ্চয়ই দিনটা ফুরিয়ে গেছে, সন্ধ্যে হচ্ছে! কিন্তু আনন্দ রাগ করবে কেন? সে তার কাজ ঠিকমত করেছে। কাজের শেষে একটু ফুর্তি করা হয় তাহলে অন্যায় হবে কেন? চিন্তাটা মাথায় আসামাত্র মিলিয়ে গেল। কি ব্যাপার? কোন কিছুই বেশীক্ষণ মাথায় আটক থাকছে না কেন? সুদীপ চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে চাইল তার নিজের কোন দুঃখ আছে কিনা। সেরকম কিছু মনে পড়া দূরে থাক, কোন কষ্টদায়ক ঘটনার কথাই মনে পড়ল না। সমস্ত শরীরে শুধু ভাললাগা

অনুভূতি ঢেউ হয়ে দুলছে। এইসময় পেছন থেকে একটা চিৎকার শুনে অনেক কষ্টে সে আকাশের দিকে মাথা রেখে পেছন ফিরল। একটা লোক ভেঙ্গে চুরে তার কাছে আসছে এগিয়ে। প্রথমে মনে হয়েছিল লোকটা মারামারি করতে আসছে। কাছাকাছি হতে সে বৃদ্ধকে চিনতে পারল। এখন বৃদ্ধ কিছুতেই সোজা হতে পারছে না। দুহাত বাড়িয়ে যেন সাঁতার কেটে কেটে এগিয়ে আসছে।

সুদীপ হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধকে ধরল। একটা অবলম্বন পেয়ে বৃদ্ধ যেন কৃতার্থ হয়ে অনেক কষ্টে শরীর সোজা করল। তারপর হঠাৎই কাঁদতে লাগল। সুদীপ বেদম ঘাবড়ে গেল। সে বৃদ্ধকে কেবলই জিজ্ঞাসা করতে লাগল কাঁদবার কারণ কি? কিন্তু তার কথাগুলো যে বেঁকেচুরে যাচ্ছে তা টের পাচ্ছিল সে। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ প্রশ্নটার উত্তর প্রশ্নের মাধ্যমে জানাল,

'তুই কবে মরে যাবি ?'

সুদীপ বলল, 'ও এই ব্যাপার।' সে এবার মনে করতে চেষ্টা করল কবে মরে যাবে ? তারপর ভেবে টেবে না পেয়ে জানাল, সে মরবে না। বৃদ্ধ বারংবার মাথা নাড়তে লাগল তাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে, 'না। তুই, তোরা মরে যাবি। মরে যাবি বলেই তোরা স্বর্গ থেকে আমাদের গ্রামে এসেছিস। তোরা মানুষ না। তোরা ভগবানের ছেলে মেয়ে, আমাদের বাঁচাতে এসেছিস!'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'দূর! বাজে কথা। তবে আমি মরব না।'

'মরবি। আমাদের উপকার করতে এসেছিস বলেই মরে যাবি।' বৃদ্ধ আবার কান্না শুরু করল, 'তোদের একজন যেমন আমাদের বাঁচাতে গিয়ে নিজে মরে গেল।'

কথাটা মাথায় ঢুকতে সময় লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সুদীপের শরীরে একটা সিরসিরানি জন্ম নিল। কল্যাণটা মরে গেছে। পুলিস ওকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। কল্যাণ যদি মরতে পারে তাহলে সে মরবে না কেন ? কিন্তু— ! সুদীপ হঠাৎ বেশ জোরে সরিয়ে দিল বৃদ্ধকে। পড়ে যেতে যেতে বৃদ্ধ কোনরকমে বসে পড়তে পারল। সুদীপ আর দাঁড়াল না। অন্ধকার নেমে আসা গ্রামের পথে বৃদ্ধ তখনও কেঁদে চলেছে। পথটা যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। সামনে আশেপাশে অনেক মানুষ কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে। বুকের মধ্যে একটা কষ্টবোধ কিন্তু ঠিক কি কারণে কষ্টটা এল তা সুদীপের এখন খেয়ালে নেই। হঠাৎ তার কানে চিৎকার চেঁচামেচি পৌঁছাল। দুজন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে ঝগড়া করছে। সুদীপ মুখ তুলে চারপাশে তাকাল। তারপর আওয়াজটা যেদিক থেকে ভেসে আসছিল সেদিকে চলল। কয়েকজন মানুষ চুপচাপ ঝগড়া দেখছিল। তারা সুদীপকে দেখামাত্র বেশ সম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল। নিজের ওপর কোনরকম নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নেই, সুদীপ টলতে টলতে সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ছেলেটা ছুটে এল। ইনিয়ে বিনিয়ে অনর্গল কিছু বলে যাচ্ছে সে। সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটি এসে দাঁড়াল সামনে। সে যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ তা বোঝা যাচ্ছিল। সুদীপ একটু একটু করে চিনতে পারল ওদের। এই অসমবয়সী স্বামী-স্ত্রীটির কন্যাবিয়োগ হয়েছে ক'দিন আগে। হঠাৎ এক ধরনের অপরাধ বোধ চেপে বসল তাকে। সে যদি মেয়েটার উপকার করতে না যেত— । তার মনে হল এদের ঝগড়া থামিয়ে দেওয়া তার কর্তব্য। একটা হাত উপরে তুলে সে কোনরকমে বলতে পারল, 'চুপ চুপ। কেউ কথা বলবে না, আমি ঝগড়া থামিয়ে দেব।'

ছেলেটা বলল, 'আমি কিছুতেই এই ঘরে ওর সঙ্গে থাকব না। কিছুতেই না।'

মহিলা বলল, 'কত বড় আস্পর্দা, এইটুকু থেকে বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি আর তোমরা সবাই দ্যাখো, মুখে মুখে তর্ক করছে। আমি কাহুনের কাছে যাব।'

সুদীপ বলল, 'অ্যাই চোপ। আমি যখন বিচার করছি তখন তুমি ওকে বকবে না।'

আশেপাশে দাঁড়ানো মানুষদের কেউ কেউ বলল, 'আহা, চুপ করো না, একটু শুনতে দাও।'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ ঠিক। আমরা কেউ শুনি না, সবাই শুধু বলে যাই।' তারপর ছেলেটার দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করল, 'প্রব্লেমটা কি ?' ছেলেটা কিছুই বুঝতে পারল না দেখে সে বিরক্ত হল। বিড় বিড় করে বলল, 'এর চান্স গেল।' সে মহিলাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওকে বকছ কেন ?' মহিলাটি উত্তর দিল, 'কেন বকব না। আমি ওর স্ত্রী, কাহুন আমাদের বিয়ে দিয়েছে। অথচ মেয়েটা মরে যাওয়ার পর থেকে ও আমার সঙ্গে একঘরে থাকতে চাইছে না। ও বলুক আমার অপরাধটা কি ? আমি কি ওকে বেঁধে খাওয়াই না ? আমি কি চাষ করি না ? আমি কি গুড্রুকে রেখে দিইনি বরফের জন্যে ?'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল ছেলেটিকে, 'ও যা বলছে তা সত্যি ?'

ছেলেটি মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ'। সুদীপ এবার হাসল, 'তাহলে বাবা তোমার অন্যায় হয়েছে। বিচার শেষ, যে তোমার সেবা করবে তার কথা তোমাকে শুনতে হবে। কি আমি ঠিক বললাম কিনা ?'

একজন লোক বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন তবে ওর কথাটাও অন্যায্য নয়।'

'কি কথা ? এই, তোমার কি কথা আছে ?' সুদীপ বিরক্ত হল। ছেলেটা উত্তর দিল না। লোকটা বলল, 'ও বলছে বউ-এর সঙ্গে এখ[illegible] শুতে পারবে না। শুলে ওর শরীর খারাপ হয়ে যায়। সারাদিন ঘুম পায়, দুর্বল লাগে। আর ভাল করে শুতে পারে না বলে ওর বউ নাকি ওকে খু[illegible] গালাগালি দেয়। এইটে অবশ্য খুব ন্যায্য কথা।'

সুদীপের মাথায় সমস্যাটা ঢুকল না। সে ছেলেটার দিকে তাকাল। ছেলেটা বলল, 'আমি তো বলেছি বড় হয়ে গেলে শোব।'

সঙ্গে সঙ্গে মহিলা চাপা গলায় শব্দ করল, 'ইশ! উনি বড় হতে হ[illegible] আমি বুড়ি হয়ে যাব না ? তার বেলায় ? আসলে এ[illegible] ছোঁড়ার অন্য বাচ[illegible] মেয়ের ওপর নজর আছে। তোমরাই বল, এতদিন আমি কিছু জো[illegible] করিনি। কিন্তু স্ত্রী হিসেবে স্বামীর কাছে আমি চাইতেই পারি। পারি না [illegible] অনেকেই মাথা নাড়ল। এই সময় একটা লোক এসে ঘোষণা করল, 'কাহ[illegible] বলেছে ছেলেটাকে তার বউ-এর সঙ্গেই শুতে হবে। তবে যদি এতে ত[illegible] আপত্তি থাকে তাহলে পালার কাছে দুজনে যেতে পারে। পালা যা বল[illegible] তাই করতে হবে।'

এই গ্রামে একজন পালা আছে। কিন্তু তার ভূমিকা খুব জোরালো নয়। পালার ওপর দায়িত্ব গ্রামের মানুষের দেখাশোনা করার। অনেক[illegible] মোড়লের আদল। পালদেম হল সম্পর্কে বর্তমান পালার ভাইপো। এ[illegible] গ্রামের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষটি পালা হলেও এখন চোখে কম দ্যাখে, কা[illegible] কম শোনে। কাহুনের উপদেশ কানে যাওয়ামাত্র অত্যন্ত অপমানিত বো[illegible] করল সুদীপ। এক মুহূর্তের জন্যে তার মনে হল ওই কথাগুলো তাকে ছোঁ[illegible] করতে বলা। সে দু হাত ছড়িয়ে বলল, 'ও! আমি তাহলে তোমাদের মধ্যে নেই। যা ইচ্ছে কর।'

দু-তিনজন তাকে বোঝাতে গেল কিন্তু সেসব কথা কানেই তুলল না সুদীপ। তার পা থেকে বুক পর্যন্ত অনেকগুলো ঢেউ পরপর দুলছিল, এখন তারা ছিটকে উঠছে ওপরে। যেন ফেনা ছুঁড়ে দিচ্ছে মস্তিষ্কে। দ্রুত অনেকটা একা চলে এসে সে মুখ থুবড়ে পড়ল অন্ধকারে। পড়ে চুপচাপ শুয়ে রইল।

ঠিক সেই সময় আনন্দ এবং জয়িতা পালদেমের সঙ্গে কথা বলছিল। এই গ্রামের যা চাষযোগ্য জমি তা রয়েছে বিভিন্ন পরিবারের দখলে। এ[illegible] ব্যাপারে মালিকানার কোন কাগজপত্র নেই, কাউকেই খাজনা দিতে হয় না। কয়েক পুরুষ ধরে সবাই জেনে এসেছে কোনটা কার জমি। অভাবের তাড়নায় কোন কোন পরিবার নিজস্ব জমির কিছুটা আর একজনকে বিক্রি করেছে কখনও। না হলে এখন কারো জমি বেশী কারো কম হবে কি করে। ইয়াক আছে একমাত্র কাহুনের দখলে। মুশকিল হল ইয়াকদের বংশ লোপ পেতে চলেছে। পরপর পাঁচটি ইয়াকসন্তান পুরুষ হয়েছে। মকাই, কোদো, ডুং ডুং, গুড্রুক ছাড়া এক ধরনের আতপ চালের চাষ হয় যা থেকে চমৎকার শেলরুটি তৈরি করে নেয় ওরা। এই আতপের ফলন নির্ভর করে বর্ষার ওপর। এ বছর বীজধান যা ছিল তা শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু বৃষ্টির পরিমাণ খারাপ না হওয়া সত্ত্বেও মাটি থেকে গাছগুলো যেন মাথা চাড়া দিতেই চায়নি। না, কোনরকম সারের ব্যবহার এই গ্রামের মানুষ জানে না। যে জমি ফসল কমিয়ে দেয় সেই জমির ওপর ঈশ্বরের দয়া নেই মনে করে একটা চাষ বন্ধ রাখে।

পালদেম বলল, 'তোমরা যা বলছ তা তাপলাঙের সবাই মানবে বলে মনে হয় না। অন্তত যারা সারাবছর মোটামুটি খেতে পারে তারা কেন অন্যের সঙ্গে নিজেরটা ভাগ করবে ?'

আনন্দ বলল, 'আমরা তাদের বুঝিয়ে বলব এ থেকে তারা কি উপকার পাবে। আচ্ছা, আমাদের এখানে কি তেমন কোন মানুষ আছেন যিনি প্রতিবাদ করতে পারেন ?'

নতুন তৈরি তিনটে মাচার একটায় ওরা বসেছিল। মাটির তিন হাত ওপরে কাঠ বিছিয়ে সমান্তরাল মেঝে করে নেওয়া হয়েছে। মাথার ওপরেও ছাউনি, চারপাশের দেওয়ালগুলো এখনও ছিদ্রহীন হয়নি। রাতের বাতাস হু হু করে ঢুকে মাঝখানে জ্বেলে রাখা মশালের আগুন কাঁপিয়ে যাচ্ছে সমানে। বৃদ্ধ পালা এখানে এসে দুহাতে চোখের ওপর আড়াল করে দেখে টেখে বলেছিল, 'ছেলেবেলায় আমাদের সুদকেরিঘর এরকম ছিল। তবে আরও ছোট। শুধু যার বাচ্চা হতো সে আর বাচ্চার মাইলিআমা যেতে পারত সে ঘরে।' তারপর আলোচনা শুরু হতেই সেই যে পালা দুচোখ বন্ধ করে ঝিমোতে লাগল এখনও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আনন্দর প্রশ্নটা শোনার পর

কজনের মুখে অস্বস্তি দেখা গেল। পালদেমের ভেনা বসেছিল খানিকটা রে। লোকটাকে দেখলেই মনে হয় সবসময় কোন মতলব ভাঁজছে। দেম তাকেই জিজ্ঞাসা করল, 'ভেনা, তুমিই কিছু বল। তোমার জমির অন্য লোককে খেতে দেবে ?'

'কেন দেব ?' সঙ্গে সঙ্গে লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার বাপ ঠাকুর্দা মার জন্যে জমি রেখে গেছে আর আমি পাঁচ ভূতে সেটা বিলিয়ে দেব ? তোমার বহিনীকে জিজ্ঞাসা কর সে রাজী কিনা! এই সাথীরা হয়তো লোক রাপ নয়। কিন্তু আমার তাউভি, জাহান, আমা কিছুতেই রাজী হবে না।'

জয়িতা চুপচাপ শুনছিল। এবার জিজ্ঞাসা করল, 'পালদেমের বহিনীকে মি বিয়ে করেছ ?'

লোকটা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। আমি ওর ভেনা।'

'তাহলে তোমার বউ-এর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। মেয়েটা খুব ভাল।'

'যে কেউ তার ইচ্ছেমত ভাল হতে পারে তাতে আমার কথার কোন হেরফের হবে না।'

আনন্দ বলল, 'ঠিক আছে, প্রথমে দেখা যাক গ্রামের কটা পরিবার নিজের মত থাকতে চায় ?'

ভেনা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের মতলবটা কি ? গ্রামের লোকগুলোকে নিয়ে কি করতে চাও ?'

পালদেম জবাব দিল, 'ভেনা এইভাবে কথা বল না। ওরা চাইছে এই গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষ যেন না-খেয়ে না থাকে। তাই দশটা পরিবার এক জায়গায় এই রকম এক একটা ঘরে ওঠা বসা করবে। তাদের খাওয়া দাওয়া একসঙ্গে হবে। সেই দশটা পরিবার যাতে ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করতে পারে তার জন্যে সবাইকে পরিশ্রম করতে হবে। আমাদের নতুন সাথীরা বুদ্ধি দেবে, আমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবে যাতে সবাই সুখে থাকে।'

ভেনা জিজ্ঞাসা করল, 'তাতে সাথীদের কি লাভ ? ওরা কেন এসব করবে ?'

প্রশ্নটা শোনামাত্র সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। এবং একসময় সব জোড়া চোখ এসে পড়ল আনন্দ আর জয়িতার ওপরে। জয়িতা হাসল, ভেনা, মানুষ কি সবসময় নিজের লাভের জন্যেই সব কাজ করে ? আমা তার বাচ্চাকে বড় করে কোন লাভের জন্যে ?'

ভেনা ঠোঁট ওল্টালো, 'যাতে সে বুড়ি হলে খাবার পায় তাই।'

'ও। বুড়ো বাউকে যে তোমরা যত্ন কর কিসের আশায়! সে তো তোমাদের জমি দিয়ে এখন ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। কি লাভ তোমাদের তাকে সেবা করে ?'

'এটা একটা কথা হল ? বাউ হল আমার আত্মীয়।'

'ঠিক। আমরা যদি মনে করি পৃথিবীর কষ্ট পাওয়া নিঃস্ব মানুষরা আমাদের আত্মীয় তাহলে তাদের জন্যে যখন কিছু করব তখন মনে হবে নিজের জন্যেই করছি।' জয়িতা হাসল।

হঠাৎ হাসি উঠল। যে হাসছে সে হেসেই থেমে গেল। সবাই মুখ ঘুরিয়ে দেখল লা-ছিরিঙ গম্ভীর হবার চেষ্টা করছে। পালদেম জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ হাসির কি হল লা-ছিরিঙ ?'

'হাসির কথা হলে হাসব না ?' লা-ছিরিঙ শান্ত গলায় বলল, 'মাঝে মাঝে এইরকম কথা না বললেই নয় যা আমরা বুঝতে পারি না ? পৃথিবীর কষ্ট পাওয়া নিঃস্ব মানুষ! ধ্যুৎ! তারা কারা ? কোথায় থাকে ? যাদের আমরা দেখিনি তাদের গল্প শুনে কি শিক্ষা হবে ? তার চেয়ে আমাদের কথা বল। আমরা খেতে পাই না, পরতে পাই না। আমাদের কষ্টটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়।'

অনেকেই মাথা নাড়ল, 'ঠিক ঠিক, লা-ছিরিঙ ঠিক বলছে।'

পালদেম লা-ছিরিঙকে চোখের কোণায় দেখল। না খেতে পেলেও স্বাস্থ্য ভাল। একটু বেশী কথা বলে। এর আগে দুবার ওর সঙ্গে পালদেমের লেগেছিল। তরুণদের নেতৃত্ব দিচ্ছে ছোকরা। কিন্তু এই মুহূর্তে ছোকরা মিথ্যে বলেনি কিছু। জয়িতা বলল, 'তুমি পুরো ঠিক বলোনি। তোমার কষ্ট র হতে পারে যখন তুমি জানবে তোমার মত কষ্ট পাওয়া মানুষ কি করে দের সুখের সন্ধান পেয়েছে। সেটা জানলেই পথটা তোমার সামনে খুলে যাবে।'

আনন্দ বাধা দিল, 'এই প্রসঙ্গ পরে আলোচনার জন্য থাক। ভেনা, আমাদের কোন লাভের উদ্দেশ্য নেই। ভারতবর্ষের পুলিস আমাদের খুঁজছে। সে-দেশে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থে কোটি কোটি মানুষকে শোষণ করছে। অনেকে অনেক রকম ভাবে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চেয়েছে কিন্তু নিজেদের দুর্বলতার জন্যেই সফল হয়নি। আমরা দেশের মানুষকে নাড়া দিতে চেয়েছিলাম বলে পুলিস আমাদের খুঁজছে।'

হঠাৎ আনন্দকে থামিয়ে দিয়ে লা-ছিরিঙ বলে উঠল, 'লোকগুলো যখন অল্প তখন তাদের খুন করে সমস্যাটা মিটিয়ে নিলেই হয়!'

জয়িতা চট করে ছেলেটির দিকে তাকাল। আনন্দ বলল, 'তাদের শক্তি অনেক। আমরা সেই চেষ্টাই করেছিলাম। তবে যারা আসল শক্তিমান তাদের ছুঁতে পারিনি। এখন বুঝেছি এই রকম দুতিনটে খুন করে সমস্যার সমাধান হবে না। যদি অভাবী মানুষেরা নিজেদের অভাব দূর করতে একসঙ্গে এগিয়ে না আসে তাহলে এদের খুন করেও কোন লাভ হবে না। যেকথা বলছিলাম, পুলিস আমাদের ধরতে এখানেও আসতে পারে। আমরা তোমাদের কাছে আশ্রয় চেয়েছিলাম। কিন্তু এসে দেখলাম, তোমাদের অবস্থা ভারতবর্ষের অনেক মানুষের মতই। কিন্তু এখানে সেই অর্থে কোন শোষক নেই। তোমাদের ক্ষতি করছে তোমাদেরই অজ্ঞতা। শিক্ষিতদের শত্রু অনৈক্য। সেটা তোমাদের মধ্যেও হয়ত আছে। আমরা চেয়েছি তোমাদের এই গ্রামটার চেহারা পালটে দেব যাতে কেউ কখনও অভুক্ত না থাকে, অজ্ঞতায় না মরে। আর এই দৃষ্টান্ত যদি আশেপাশের গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে এই পাহাড়ে একটা নতুন পৃথিবী গড়ে উঠবে। সেইটেই আমাদের লাভ ভেনা।'

ভেনা মাথা নাড়ল, 'এসব ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না। তবে একটা কথা স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, আমি আমার জমির ফসলের ভাগ কাউকে দেব না ব্যস।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'আর কজন ভেনার মত একই চিন্তা করছ ?'

খানিকটা গুঞ্জন উঠল। শেষপর্যন্ত এক এক করে জনা ছয়েক মানুষ ভেনাকে সমর্থন করল। অর্থাৎ সাতটি পরিবার একাই চলতে চায়। আনন্দ পালদেমকে বলল, 'গ্রামের সবাই তো এখানে আসেনি। প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করে মতামত নাও। যারা আমাদের সঙ্গে আসতে না চাইবে তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। যদি কখনও তারা বুঝতে পারে যে এতে ক্ষতি হবে না তাহলে তারা নিজেরাই আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। আমরা প্রত্যেক সন্ধ্যায় এইরকম আলোচনা করব। বরফ পড়ার আগেই অনেক কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাদের।'

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে করতে সবাই যখন বেরিয়ে আসছে তখন পালদেম বলল, 'আমার ছেলে তো একদম ভাল হয়ে গেছে। তোমরা আমার ঘরে রুটি খাবে ?'

আনন্দ বলল, 'বাঁচালে। এখন আবার চালেডালে ফোটাতে হত।'

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'সুদীপ কোথায় রে ?'

আনন্দ উত্তর দিল, 'জানি না। দুপুরে ওকে বলেছিলাম যাদের ওষুধ দেওয়া হয়েছে তাদের চেক করতে। তারপর আর দেখা পাইনি।'

জয়িতা বলল, 'তুই একবার আস্তানাটা ঘুরে আয়। বোধ হয় ওখানেই আছে। আমি আমার নতুন ঘর থেকে এখনই আসছি।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'তুই তাহলে ওখানেই পাকাপাকি থাকবি ঠিক করলি ?'

জয়িতা বলল, 'পাকাপাকি কিনা জানিনা। তবে ওই মেয়েটার জন্যে আমার ওখানে থাকা দরকার।'

পালদেমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা দুজন দুদিকে হাঁটতে শুরু করল। জয়িতা গ্রামের মেয়েদের কথা ভাবছিল। সারাটা দিন ওদের সঙ্গে কাটিয়ে অদ্ভুত নাড়া খেয়েছে সে। প্রায় প্রত্যেকেই নিজেকে পুরুষের সম্পত্তি বলে জাহির করতে ভালবাসে।

ঘরের দরজাটা বন্ধ। ঠেলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল জয়িতা। ভেতর থেকে গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসছে। সেই সঙ্গে মেয়েটির গলা, 'এত খেয়েছ কেন ? এত খেলে পুরুষ মানুষের সব শক্তি দানো কেড়ে নেয়। আরে আরে, এই তুমি উঠছো কেন ?' *(ক্রমশ)*

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

জলদেবতী

শিবতোষ ঘোষ

বন্যার পর নতুন একটা বস্তি গড়ে উঠলো। বেশ কিছুটা ডাঙা-উঁচু জায়গা, তবে এমন উঁচু নয় যে বন্যার জল ঢোকেনি। পলি-পাঁক সরিয়েই এদেরকে বিছানা করতে হচ্ছে, বিছানা বলতে গাছের পাতা। এতো বড়ো বন্যাতেও যে-সব জায়গা শুকনো থেকে গেলো সেগুলো এক-একটা গল্প—জগনি থান, বোড়াম বুড়ি, ব্রহ্মতল এই রকম মাহাত্ম্যপূর্ণ কয়েকটা জায়গা।

চারপাশ ডুবে গেলো কিন্তু দেখবে চলো মা'র আসন তেমনি শুকনা আছে! সীতা গল্প করতে করতে বিছানা পাতছে। দেখে এলাম, গড় করে এলাম, ঘর-দোর হোক একদিন যেয়ে ভালো করে পুজা দিয়ে আসবো। এখান থেকেই হাতজোড় করে আবার একবার গড় করলো সীতা।

আজ প্রায় এক গাড়ি পাতা ভেঙে এনেছে, সে আর অনুকূল। দুটো প্রাণী মাত্র শোবে। বন্যার ঠিক পরের-পরের দিন। গত ক'দিন ঠাণ্ডায় শুয়ে-বসে সীতার পা ফুলে গেছে, এটা তার দিন মাস চলছে। অনেক গিন্নিবান্নি অবশ্য দেখে বলছে এটা ঠাণ্ডা লাগার ফোলা নয়, সীতার খোকা হবে। তবু সাবধানের মার নেই।

পর পর আঠারোটা ঘর। ঘর হচ্ছে দুটো ঠেক দিয়ে সরকারি কালো ত্রিপলগুলো তুলে দেওয়া। এই ত্রিপলগুলোর আবার একটা মজা আছে, এতো পাতলা যে শুয়ে শুয়ে চাঁদ দেখা যায়।

অনুকূল ত্রিপলের নিচে ছাদ করে একটা কাপড় টাঙিয়ে দিয়েছে। বড্ড শিশির পড়ে। বৃষ্টি হলে পড়বে কি না সে পরীক্ষা এখনো হয়নি, তবে উপুড় করা নৌকোর মতো এমন কায়দা করে ত্রিপলগুলো টাঙিয়েছে যে জল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠিকরে যাবে, সহজে পড়বে না।

সীতা বললো, এর উপরে জল পড়লে আর বাঁচতে হবে না!

না আকাশে মেঘ নেই, বড়ো করে চাঁদ উঠেছে।

সকলের এক ত্রিপল, একই দিকে দরজার মুখ। ভেতরটাও সকলের প্রায় একরকম। কারুর তেমন কিছু নেই। এদের কেউ ছিল গাছে, সীতা-অনুকূল তেঁতুল গাছের ডাল ধরে বসেছিল, যতো খিদে বেড়েছে সীতা কচি তেঁতুলপাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে। গদা-মাখন ছেলেপুলে নিয়ে চলে এসেছিল বাঁধের ওপরে। কেউ ছিল টালির চালে, ইটের চাঁড়ে, যে যেখানে উঁচু পেয়েছে উঠে পড়েছে।

এই আঠারো জন প্রত্যেকেই লোকের ক্ষেতখামারে কাজ করতো, পরের আশ্রয়ে বাস

করতো, এদের কারুর তেমন কিছু খোয়া যায়নি। রেণুর মায়ের কেবল তিনটে মুরগি ছিল চলে গেছে। কেউ থাকতো কারুর গোয়ালঘরের একপাশে, কেউ থাকতো চায় বাড়িতে, সে-সব ঘর পড়লো কি থাকলো এদের কিছু যায় আসে না। সবাই বলছে বন্যায় নাকি লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে, তারা শুধু শুনেছে আর ঘাড় নেড়েছে।

সরকারি লোক এসে গেলো, বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে লোক এলো, কতো খিচুড়ি খাবে খাও—এক বালতি করে খিচুড়ি দিচ্ছে। বন্যার সময় কলাইকুণ্ডার হেলিকপ্টার পাড়ায় পাড়ায় পাউরুটি ফেলে গেছে শুধু ঠিকঠাক লুফতে পারলে হলো, না হলে কাদায় পড়ে যাবে। সীতা-অনুকূল দেড়দিন গাছে ছিল সেজন্য এসব কিছু পায়নি।

সীতা আজ খুব খুশি। তাকে একটা সিল্কের শাড়ি দিয়েছে, একেবারে কিচ্ছু হয়নি। বিয়ের সময় লজ্জাবস্ত্র দিতে পারেনি অনুকূল, যাহোক এতোদিনে...। অনুকূলকেও একটি ফুলপ্যান্ট দিয়েছে, সে নিতে চায়নি, তার লজ্জা করছে পরতে। কিন্তু ধুতি কম ছিল। কোনো উপায় নেই, বুড়োদের তো ফুলপ্যান্ট দেওয়া যাবে না! ঠিক আছে সে এবারে ম্যাচ করে একটা হাওয়াই শার্ট জোগাড় করবে, আর—আর একজোড়া জুতো, এর সঙ্গে একটা চশমা হলে...

মশা আছে গো! দেখো এতো বান-বন্যাতেও মশা-মাছি মরেনি! আমরা মাঠে এসে ঘর করলাম এখানেও চলে এসেছে! আচ্ছা, এরা জানলো কি করে গো?

এই আঠারো ঘরে সত্যিকারের কারো কোনো দুঃখ নেই, কারো বাড়িও পড়েনি, দু' দশটা মাল-ঝালও ভেসে যায়নি, ফসলে বালি চাপাও পড়েনি, আর কার কি ছিল! তাই এমনি সব সুখের গল্প করছে। শুধু বাইরের লোক এলে তাদের কাছে সাতকাহন করে দুঃখটা দেখাতে হয়। এই দুদিনে এটাও সকলের রপ্ত হয়ে গেছে।

পঞ্চায়েৎ বললো, তোরা খুঁটি পোঁত আমি তো আছি, আমি পাটা করে দেবো! রেণুর মাকে বললো,— কি রেণুর মা, যাবে তো এই সময় চলে যাও, তবু মরবার সময় নিজের ভিটেটা পাবে। এখন ত্রিপল দিচ্ছি, দুটো করে শাল খুঁটি দিচ্ছি, পরে চালা করার টাকা স্যাংসান করে দেবো।

তিন-চারটে রাজনৈতিক দলের লোকজন, বি ডি ও, এস ডি ও, এম এল এ, একদিন ম্যাজিস্ট্রেট দিদিমণি পর্যন্ত ঘুরে গেলেন, চটি হাতে করে। তাদের একটু বেশি খাতির, তাদের কিচ্ছু নেই, তারা নিঃস্ব।

এদের চালচুলো নেই, গরুবাছুর নেই, হাঁস-মুরগি নেই, একটা কঞ্চি পর্যন্ত নেই। একটা ছুঁচো-ইঁদুর মারতে হলেও পরের জিনিসে হাত দিতে হবে। দুঃখ দেখে গলে গেলো সকলে, সীতাকে ম্যাজিস্ট্রেট দিদিমণি বুকে জড়িয়ে পাঁচটা টাকা দিয়ে গেছেন।

জানো, অনেককে দিতে হবে না হলে দিদিমণি আরো দিতো, দিদিমণির মনটা ভালো।

জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে এই যে তোমাকে বুকে টেনে...

কেমন করে দুঃখটা বললাম শুনেছ তো, যতো করলে দিন মাসের পোয়াতি, দেখলে সকলের একটু মায়া লাগে!

অনুকূল মুখ ডুবিয়ে সীতার পেটের ওপরেই একটা চুমু খেলো—আমার বাবাটি।

হু, কিন্তু এদিকে যে বাবা ভিজা সেঁতায় শুয়ে শুয়ে...

অনুকূল বললো—কালই গিয়ে পঞ্চায়েতকে বলি, কিছু কিছু করে পাতবার দাও, না হলে দু' চারটা বাঁশ দাও মাচান করি, ভিজায় শুয়ে শুয়ে যে বাত ধরে গেলো!

সীতা বললো—ওভাবে বললে দিবে না, অন্যভাবে বলতে হবে, আরো দুঃখু দেখিয়ে বলতে হবে।

এই, তাহলে তুমিও চলো! তোমাকে দেখলে...তোমার পয়লা পেট যে এতো বড়ো হবে...আঃ আমার সোনা লক্ষ্মীটি! সীতার গোটা পেটটাকেই আদরে আদরে ভিজিয়ে দেয় অনুকূল।

এখন তারা সন্ধে সন্ধে শুয়ে পড়ে। আলো জ্বালবার সরঞ্জাম এখনো পায়নি, শুধু একটা দেশলাই পেয়েছে। তা এমনি ভিজে স্যাঁতসেঁতে চারদিক যে সব সময় পেটের কাপড়ে রাখলে জ্বলবে না হলে জ্বলবে না। শোনা যাচ্ছে বাদবাকি জিনিস কাল-পরশুর মধ্যেই দিয়ে দেবে, এখন যুদ্ধকালীন অবস্থার মতো তড়িৎগতিতে সবকিছু করা হচ্ছে, ওপর থেকে বলে দেওয়া হয়েছে বন্যাপীড়িতদের সামান্য কোনো অসুবিধেও যেন না হয়।

গাছের পাতাগুলো গায়ে ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে, ঘুম ধরছে না, এখন কতো কথা মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ গো, আমাদের ছেলে হবে না মেয়ে? ডানদিকে পাশ মেড়ে শুলে মেয়ে আর বাঁদিক মেড়ে শুলে নাকি ছেলে হয়! তুমি খেয়াল করো তো আমি কোনদিকে শুই?

গদার এখন ছেলেমেয়ে করে পাঁচজন, একজনকেও সে এখন দুচক্ষে দেখতে পারে না। সকল সময় চ্যাঁ-ভ্যাঁ, যতো শুনতে পারো, সে একটাকে একবার তুলে আছড়ে দিয়েছিল। বাপ অল্প বয়েসে বিয়ে দিয়েছিল বলে আজকে এ অবস্থা। অশিক্ষিত মজুরখাটা লোক হলে যা হয়। এখন তো সামাল দিতে হচ্ছে তাকে। গত বছর অপারেশন হয়েছে। গদার আরও আগে হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তার এই শিক্ষাটা তো হয়েছে গত বছর যে অপারেশন হওয়া ভালো। একলা খেটে এতগুলো পেট চালানো মুখের কথা নয়। গদার বউ ন' মাসে, ছ' মাসে কাজে যায়, ঘরে ছেলে সামলাবে, না রোজগারে বেরোবে। তারও আবার কোমরের চারপাশে বাধক এসে আটকে আছে অমাবস্যা-পূর্ণিমা হলে খামচায়।

থাকতো মানিক মাইতির কাঁঠাল বাগানে, নদীর ধারে। কে জানতো এমন হুস করে ব্যারেজের জল ছেড়ে দেবে। রাতের মধ্যে বন্যা এসে গেলো, ঘিরে গেলো চারদিক। এমনিতে দুদিন ধরে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, কিন্তু আজ সাত-আট বছর কোনো বন্যা হয়নি। তারা খেয়ে-দেয়ে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছিল, অনেকদিন হলো গদা একেবারে ধারে শোয়। ঘুম ভাঙলো ফুদন ঠেলতে।

ওগো এতো শব্দ হচ্ছে কিসের শুনো তো?

গদা শুনেই ছেলেপুলে সবাইকে টেনে ঘর থেকে বের করেছে, ছুট ছুট বাঁধের দিকে ছুট। এতোগুলো ছেলেপুলে নিয়ে ছোটা, সে তো ছোটা নয়, তবু ভাগ্য ভালো একটাকেও ছেড়ে আসেনি। গদার দুকাঁধে দুটো দুকাখে দুটো কাঁধের দুটোকে বলে দিয়েছে ভালো করে ধর, পড়ে গেলে আর গুড়াতে পারবোনি? ফুদনের কাছে কোলের ছেলেটা আর একটা ছোটো পুঁটলি। নদীর গর্জনে কেউ কারুর কান্নাকাটি শুনতে পাচ্ছে না।

আজ গদা ফুদনের পাশে শুয়েছে। সে, তারপর ফুদন, তারপর ছেলেমেয়েরা। ঘরের এমাথা-ওমাথা পাতা বিছিয়ে দিয়েছে। এতো লোক প্রতিদিন এতো গাছের পাতা ভাঙছে যে দু' চারদিনের মধ্যে যদি অন্য কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে এদেশে আর পাতা বলে কিছু থাকবে না।

পাতার ওপরে ফুদন একটা শাড়ি বিছিয়েছে, তার এখন তিনটে শাড়ি হয়ে গেছে এ'কদিনে। যেটা সবচেয়ে ভালো সেটা তুলে রেখে দিয়েছে, কোথাও যেতে-আসতে পরবে।

সারাদিনে চার-পাঁচজন ঘুরছে তাদের পাড়ায় পাড়ায়। সকলেই খবরা-খবর নিচ্ছে—কেমন আছো গো সব।

এখন ঘোমটা টানার কাপড়ের অভাব নেই, বিশাল লম্বা করে ঘোমটা টেনে নেয় ফুদন।

তোমার পুরুষ কোথায়? তোমাদের ছেলে-মেয়ে, তোমরা সকলে ভালো আছো তো?

গদার বউ ঘাড় নাড়ে।

হ্যাঁ সত্যি তারা খুব ভালো আছে।

এই বস্তিটার এখনো নামকরণ হয়নি, তবে লোকের মুখে মুখে চলছে নব কলোনী। ডি এম দিদিমণিই প্রথম বলেছিলেন, বি ডি ওকে বললেন—চলুন তো, একবার ওই নব কলোনীতে যাই!

তাঁর আসার পরের দিন থেকেই ডাক্তার ওষুধে ছয়লাপ। কলেরার ইনজেকশান, বসন্তের টিকা, একমুঠো করে ট্যাবলেট দিয়ে যাচ্ছে জলে ফেলে খাওয়ার জন্য। ইনজেকশানের জন্যই এক-আধটু জ্বর না হলে তাদের কারো কিছু হয়নি। কিন্তু তারা সকলেই একটু অসুস্থতার ভান করে। একেবারে বাচ্চা পর্যন্ত লোক দেখলে ভিজে মাটিতেই পেটে হাত দিয়ে কুঁকড়ি হয়ে শুয়ে থাকে।

সবচেয়ে সুবিধে বেণুর মায়ের, সে বুড়ি থুত্থুড়ি। যে আসে সেই দেখে বলে—আহা রে বুড়ি মা। বন্যার সময় কোথায় ছিলে বুড়ি মা?

ইস্কুল ঘরে।

আহা রে।

স্কুলে জল ঢুকেছিল?

এক জাং।

জলের ওপরে একদিন একরাত দাঁড়িয়েছিলে?

সকলের বুক দয়ার্দ্র হয়ে পড়ে।

বুড়িমা, যদি স্কুল বাড়িটা পড়ে যেতো, কতো বাড়ি-ঘর তো পড়ে গেছে।

তাহলেও যে কি সর্বনাশ হতো বেণুর মা বুঝতে পারে না। বেণু যে চলে গেলো—তার অমন জোয়ান মেয়েছেলে।

সে থাকলে ভালো হতো, কতো খিচুড়ি, খেয়ে খেয়ে পারছিনি, আর কতো শাড়ি বেলাউজ।

এক পুঁটলি ভেতরের জামা নিয়ে এসেছিল, বিপরীত দল ঝগড়া করে বের করেছে—গ্রামের মেয়ে বলে অবহেলা করা হবে, খালি জামা পরবে। এখন তাদের শাড়ির নিচে সায়া, জামার নিচে জামা। বেণুর মাও পরেছে, আর কিছু না হোক গাটা বেশ গরম রাখে।

বেণু থাকলে সায়া বেলাউজ সব তাকেই দিয়ে দিতো। বুড়ো হয়ে গেলো কোনোদিন এসব অঙ্গে গলায়নি। আজ ভাগের ভাগ বলে নিয়েছে, নিয়ে কি করবে পরে ফেলেছে! মরবার সময় একফোঁটা ওষুধ দিতে পারলোনি বেণুর মা, ভূতের ভর বলে বলে দু' মাস কেটে গেলো, রোগা হাড়সার হতে থাকলো জোয়ান মেয়েছেলে। একেবারে শেষকালে নিয়ে গিয়ে ফেলা হলো হাসপাতালে। ডাক্তাররা সব বলতে লাগলো কি নাকি ভিটেমিনের অভাব হয়েছে, তার থেকে...

এখন মুঠো মুঠো ভিটেমিনের বড়ি দিয়ে যাচ্ছে ডাক্তাররা, জল ওষুধ সুঁই। বুড়ি একটা ছেঁড়া ন্যাকড়ায় বেঁধে টাঙিয়ে রেখেছে ট্যাবলেটগুলো।

তার ঘরে সে একা। কাল গদার বড়ো মেয়েটা শুতে এসেছিল তাদের বিছানায় কুলোয়নি বলে। মেয়েটা একেবারে বুড়ির কোল ঘেঁষে শুয়েছিল। বেণু মারা যাবার পর থেকে বহুদিন কাউকে সঙ্গে নিয়ে শোয়া অভ্যেস নেই, সেজন্য ভালো ঘুমও হয়নি। আজ আর আসেনি, ভালো হয়েছে। বুড়ি তাড়াতাড়ি ঘুমোনোর ব্যবস্থা করছে। একটু পান-দোক্তা খাওয়া অভ্যেস ছিল, খাওয়ার পরে একটু না খেলে মুখটা বিস্বাদ হয়ে যায়। যারা অত বুড়িমা বুড়িমা করছিল তাদের বললে হতো—বাপু রে মোর জন্যি মণ্ডা-মিঠাই আনতে হবেনি বাপ, বরং দুটা দক্তা পান লি আসবে ও!

বুড়ি শুয়েও উঠে পড়লো। অন্য কথা মনে করতে করতে একটু বড়ো বিছানা পাতা হয়ে গেছে। দুজনের বিছানা। আবার পাতাগুলো চারপাশ থেকে জড়ো করে ছোটো করতে থাকে।

॥ ২ ॥

গ্রামের সমস্ত স্কুল, যে-সব জায়গায় হাসপাতাল আছে সে-সব হাসপাতাল, ক্লাব থাকলে ক্লাব—বন্যার জন্য রিলিফ সেন্টার খোলা হয়েছে। নব কলোনীর সেন্টার হলো বিদ্যাসাগর প্রাইমারি স্কুল।

ঘরে থাকার চেয়ে সেন্টারে এসে বসে থাকলে বরং লাভ আছে। এখান থেকেই সবকিছু বিলি হচ্ছে, কি আসছে না আসছে চোখে দেখা যাচ্ছে! বাইরের বেশির ভাগ লোক পীড়িতদের দেখতে এসে এই সেন্টার থেকেই ফিরে চলে যায়।

নব কলোনীর মাতব্বর সেজেছে সুধাংশু, সে নাকি ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়েছে। সে খবরের কাগজ পড়তে পারে, নকশালদের হয়ে পুলিসের সঙ্গে মারপিট করে তিন মাস নাকি হাজতে ছিল। সুধাংশুই এই সব বলে বেড়াচ্ছে। সে বৈকুণ্ঠের ভাগনে, মামাবাড়ি এসেছিল দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে। বন্যায় আটকে গেছে। তার অন্য কোনো কাজ নেই, ঘুম থেকে উঠলো কি চললো। সেন্টারে গিয়ে দাঁত মাজে, সেখানে ঢালাও চিঁড়ে-গুড়, থালা-বাটি-ঘটিও প্রচুর জমা পড়েছে। বেণুর মাকেই তো ভুলে দুটো থালা দিয়ে দিয়েছিল। একই মাপের ডিসের থালা দুটো আঠার মতো এমন আটকে ছিল যে কেউ খেয়াল করতে পারেনি। বেণুর মাও জানতো না, বুড়ি ঘরে খুঁটি ঠেকিয়ে রাখতে গিয়ে দেখলো একটা নয় দুটো। কিন্তু সে কিছুতেই দুটো থালা রাখতে পারলো না। সেদিনই ফেরৎ দিয়ে গেছে।

সুধাংশুরও এখানে আলাদা থালা-বাটি আছে, স্কুলের টিউবওয়েল সামনে, কোনো অসুবিধে নেই। দুজন কোনো অতিথি কিংবা ভাট-ভিখিরি এসে পড়লেও তাদের দুমুঠো খাওয়ানোর মতো সঙ্গতি আছে।

সেন্টার পাহারা দেয় চারজন, তারা জোতদার-জমিদারদের মতো খায়-দায় আর তাস খেলে। সকালে প্রত্যেকের জন্য চিঁড়ে-গুড়, একটু দুধ হলে ভালো হতো, শালা কেউ ফল-পাকুড় দিচ্ছেনি! দু'চার ডজন কলা-টলা দিলে তবু চিঁড়ার সঙ্গে...

ঘড়ি ধরে ঠিক দশটায় খিচুড়ি চলে এলো। আবার একটা-দেড়টার দিকে কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। হরি সিনেমার ব্ল্যাকাররা চাঁদা করে টিফিন নিয়ে এসেছিল আজ বিকেলে, লুচি আলুর দম। সেন্টারে চা হচ্ছে সকাল-বিকেল, বাচ্চাদের জন্য পাউডার দুধ এসেছিল তারই একটা বড়ো প্যাকেট সরিয়ে রেখে দিয়েছে।

সুধাংশুর বাড়িতে তার মামার মতো ওরকম খাওয়ার অভাব নেই। তবু তার যেতে ইচ্ছে করছে না। প্রতিদিন বেশ একটা উৎসব-উৎসব হয়ে আছে জায়গাটা। ঘর-বাড়ি অনেক পড়ে গেছে, ভালো ভালো গাছপালা সব উল্টে গেছে, যেখানে-সেখানে গরু-মোষ মরে-পচে ফুলে আছে। এসব দেখতে কষ্ট হয় কিন্তু তার তো এসব নয়, তার কোনো কষ্ট নেই। এতো ভালো-মন্দ খাওয়া, দুটো টেরিকটনের প্যান্ট, দুটো পলিস্টারের জামা, তার হাওয়াই চটি আছে, পরলে তাকে দারুণ দেখায়।

অন্য সময় হলে বৈকুণ্ঠ ভাগনেকে এতো খাতির করতো না। এখন দারুণ খাতির, তাকে তো খাওয়াতে হচ্ছে না, বৈকুণ্ঠ চাইছে এ সময় যতো পারে আত্মীয়-কুটুম চলে আসুক।

সুধাংশু এসে বৈকুণ্ঠের কানে কানে বললো—মামা, যা জিগ্যেস করবে ঠিক ঠিক উত্তর দিবে।

কি জিগাসা করবে রে?

এই ক'হাত ঘর ছিল, ক'হাত দোর ছিল, কিসের চালা, কত হাত পাকা দেয়াল ছিল—এই সব আর কি!

যাদের বাড়ি-ঘরের ক্ষতি হয়েছে তাদের নামের লিস্ট হচ্ছে, এদের ঘর-পড়া টাকা দেওয়া হবে। একমাত্র সুধাংশুর এখানে কোনো কিছু নেই সেজন্য সে হাত-পা ছুঁড়ে ঘোরাঘুরি করছে। একে এটা বলছে, তাকে সেটা বলছে। এইভাবে সুধাংশু নব কলোনীর সকলের মনে সাহস দিয়ে যাচ্ছে।

সবচেয়ে মুশকিল হচ্ছে বেণুর মাকে নিয়ে। বুড়ির ঐ দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা কিছুতেই মনে থাকছে না। একবার বলছে পাঁচ হাত চওড়া, একবার বলছে বারো হাত। সে সুধাংশুকে আবার ডাকে—বাপুরে কতো হাত বললি আর একবার বলে দে বাপু, ভুলে গেছি।

বেণুর মাকে দেখে একজন অফিসার চিনতে পেরেছেন—বলুন বুড়িমা আপনার নাম বলুন?

সুধাংশু পেছন থেকে বললো—বলো, তোমার নামটা বলো।

মাইশরী।

মাইশরী!

লিখতে গিয়ে বললো মাইশরী কি নাম হয় বুড়িমা, মহেশ্বরী।

বুড়ির আদ্দিন পর নামটাও ঠিক হয়ে গেলো, মহেশ্বরী নামটা শুনতে তার কানে খুব ভালো লাগছে। তবে তার দুঃখ হলো এতো ভালো নামটা বেশিদিন ভোগ করতে পারবে না বলে। বুড়ো হয়ে গেছে, কবে বলতে কবে ঠুক করে শেষ হয়ে যাবে। তার নাম হয়ে গেলো মহেশ্বরী দাসী, সাং নব কলোনী।

একজন আপত্তি তুললো নব কলোনীর লোকেরা ঘর-পড়া টাকা পায় কি করে, ওদের কি ঘর-বাড়ি ছিল ?

অফিসার নিজেই বোঝাচ্ছেন লোকটিকে—শুনুন, আপনি যা বলছেন তা হয়তো ঠিক, নব কলোনীর কারুর বাড়ি-ঘর ছিল না। কিন্তু যার যা ছিল সবই গেছে, এখন তারা একেবারে নিঃস্ব।

সকলে বললো—হ্যাঁ, একেবারে নিঃস্ব, কারুর কিছু নেই !

অফিসার বলছেন—হয়তো আপনাদের অনেকের মতো দু'হাল বলদ ছিল না, পুকুর ভর্তি মাছ ছিল না, ফসলভরা ক্ষেত ছিল না, কিন্তু ওদেরও তো কিছু ছিল।

লোকটি তখনো তর্ক করে যাচ্ছে—আপনারা যাই বলুন, ওদের কিছু ছিল না। ওই বুড়িকে আমি জানি তো।

—আপনি কি বলতে চান, বুড়িমা শুধু শুধু সত্তর বাহাত্তর বয়স কাটিয়ে দিয়েছে, তার কিছুই ছিল না। দেখুন, এসব নিয়ে আপনারা রাজনীতি করবেন না, এখানে মানুষের লাইফ অ্যাণ্ড ডেথের প্রশ্ন।

সুধাংশু বললো—শুনছি পরশুদিন থেকে তোমাদের ইট আসতে শুরু করবে।

তার মামী জিগোস করলো—হ্যাঁরে, তইলে মোদের পাকা হবে ?

—পাকা নয়, দেয়ালটা শুধু ইটের, টালির চাল।

—আরে উটাই ত কুনো ঢেমনা আদ্দিন দেয়নি ! পণ্ডিতদের গোয়ালে গোরুর সার-গোবরের গন্ধে থাকে থাকে ত বুড়া হই গেলি।

মামী বললো—একটু দেখ না, রাঁধা-বাড়ার ঘরটা যদি টুকুন আলদা করতে পারা যায়। এক ঘরে আগুন জ্বললে জিনিসপত্র সব ঝুল হয়ে যায় ! দেখ না বলে, তোর কথা ত শুনে।

—আর শুনো, দুটা কলুঙ্গী আর গটা দুই তাক মনে করি করি লিবে, নাইলে এত জিনিসপত্র রাখব কুথা !

তারা এখন সবকিছুর দুটো করে ভাগ পাচ্ছে। সুধাংশুও পেয়েছে খাওয়ার বাসন, পরবার কাপড়, কেবল ঘর তৈরির টাকাটা যা পাচ্ছে না। হঠাৎ বান-বন্যায় আটকে পড়েছে, গ্রামের লোকে কিছু বলতেও পারছে না, সেও বা তার বৃদ্ধ মামা-মামীকে ছেড়ে কি করে যায়। সুধাংশু আবার একটু বেশি জিনিসপত্র পায়, আজ সে দুটো চটের থলে এনেছে, ঠাণ্ডা লাগে বলে পেতে শুয়েছে।

বৈকুণ্ঠের ঘরে দুটো বিছানা, একটায় সুধাংশু আর তার বড়ো ছেলে আর একটায় তারা বাদবাকি সকলে।

সুধাংশুর মামী বললো—হঁ রে সবদিন যদি এরকম রাঁধাভাত দিই যায় তাইলে রান্নাঘর-টর আর লাগবেনি।

বলে হেসে উঠলো হি-হি করে।

সীতা অনুকুলকে বললো—কাপড়টা খুলি দাও, কি সুন্দর চাঁদটা ঠিক মতো দেখা যাচ্ছেনি ! অনুকূল উঠে শিশির আটকানো কাপড়টা সরিয়ে নিলো। নরম হবে বলে দেবদারু পাতা এনেছে, খাঁজ কাটা। চাঁদের আলো এসে পড়ছে পাতার ওপরে, তার ওপরে সীতা। অনুকূল শুয়ে তার গালটা টিপে দেয়।

সীতা জিগোস করলো—হ্যাঁ গো, কবে ঘর করার টাকা দিবে ?

—শুনছি তো তাড়াতাড়ি দিয়ে দেবে, তবে হাতে নগদ টাকা কিছু দিচ্ছে না, ঐ সরকারি লোক এসে, —কনড়েক্টর দিয়ে···

—হ্যাঁ গো ঘর হয়ে গেলে নাকি খিচুড়ি-টিচুড়ি সব বন্ধ করে দিবে ?

—সে কথাই তো পঞ্চায়েৎ বলছিল।

—তাহলে চলবে কি করে গো, আমাদের খোকা হবে, তুমিও তো সে সময় কাজে যেতে পারবেনি।

—এ সময় চাল-আটা কিছু আমাদের জমা করতে হবে, দশটা কিলো জমা রাখতে পারলেও···

সীতা বললো—এই শুনো, কাল আমি আরো অনেক দু' ' দেখিয়ে দেখিয়ে সকলকে বলবো, পেটটাকে আরো ফুলিয়ে ফুলিয়ে, আরো ফুলিয়ে ফুলিয়ে···

সীতা-অনুকূল দুজনেই খিল খিল করে হেসে ওঠে।

আজ অনেকদিন পর গদা ফুদনের পাশে শুয়েছে। বন্যার খিচুড়ি খেয়ে ফুদনকে তার আজ ভীষণ ভালো লাগলো। এতোদিন বিয়ে হয়েছে এরকম প্রশংসা কোনোদিন করেনি। ফুদন জানতো গদার একটা ঘৃণা এসে গেছে তার ওপরে, তার শরীরের ওপরে। হঠাৎ কেন সে এতো তাড়াতাড়ি শুকিয়ে গেছে, এর সে কিছুই জানতো না, তবু সে দায়ী। গোয়ালের পাশে কুকুর যেমন পড়ে থাকে সেরকম তার দিন কাটছিল। আর এতোগুলো ছেলেপুলে যেন এটাও তার দোষ।

আজ গদা তার হাত দুটো ধরে বলছে—তোর উপরে অনেক খারাপ করেছি, অনেক অন্যায় করেছি, বউ আমাকে তুই ক্ষমা করি দে। বুকের ভেতরে টিপে রেখেছে, ভালোবাসায় ভালোবাসায় ভর্তি করে দিচ্ছে তাকে।

সুখ পেলে এ লোকটাও তাহলে ভালোবাসতে পারে ! মনে মনে জলদেবতাকে গড় করে ফুদন,—এরকম বন্যা যেন আরো হয়, সবদিন হয় !

গদা শুয়ে শুয়ে বিড়ি টানছে আর তার বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছে ফুদন, শুয়ে শুয়ে সারাজীবনের যত্ন নিয়ে চাঁদ দেখছে।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় **শেষ**

অমর চিত্রকথা
চিরন্তন সচিত্র কাহিনী
ইতিহাস, পুরাণ, কিংবদন্তী
অমর চিত্রকথা-য় থাকছে ভারতীয় পুরাণের
ওপর ৩৬০টিরও বেশি মজাদার কমিক্স। সহজ ভাষাও
যেমন,মনের মতো রঙবেরঙের ছবিও তেমন!
ইতিহাস, পুরাণ আর কিংবদন্তী—চমৎকার
সব অতীতকে যেন জীবন্ত ক'রে তোলে!
অমর চিত্রকথা-এর ছবিওয়ালা কাহিনী
আপনার বাচ্চার কল্পনা শক্তিকে আরো
বাড়িয়ে তাকে উত্তেজিত করে তুলবে!
তাই, আজই আপনার বাচ্চার জন্যে
কিনুন অমর চিত্রকথা!
দুর্গা
ক্ষুদিরাম বসু
AMAR CHITRA KATHA
অমর চিত্রকথা—
বইয়ের পাতায় রঙ্গীন চলচ্চিত্র
বাংলা সংস্করণের একমাত্র পরিবেশক : উচ্চারণ,২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩।
An IBH Publication
ARMS-IBH

প্রতিমা—ভরত ও কৈকেয়ী

বিমলকৃষ্ণ মতিলাল

ইংরেজীতে 'একসেমপ্লার' (Exempler) বলে একটা শব্দ আছে যার অর্থ—কোন আদর্শ বিমূর্ত গুণের মূর্তিমান উদাহরণস্বরূপ কোন মানব বা মানবী। যেমন সত্যনিষ্ঠা, স্বার্থত্যাগ, বৈরাগ্য অথবা জাগতিক সুখ দুঃখে বিকারশূন্যতা প্রভৃতি মানবিক সদগুণ—এদের বলা যেতে পারে বিমূর্তসত্তাক বস্তু অর্থাৎ এবসট্রাক্ট প্রপার্টি। এই বিমূর্তসত্তা মূর্তি পায় কোন মানববিগ্রহের মাধ্যমে। তাদের বলা হয় একসেমপ্লার। রামায়ণের রামপ্রমুখ বেশীর ভাগ চরিত্রই এ ধরনের 'আদর্শবিগ্রহ'। বাল্মীকি রামায়ণের গোড়াতেই রামকে এ ধরণের বিভিন্ন সদগুণাবলীর আদর্শ বিগ্রহ হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। রাম চরিত্রের দোষও অনেক ছিল। তার কিছু কিছু আগেই আলোচনা করেছি। আদর্শের সঙ্গে অল্পবিস্তর দুর্বলতার সংমিশ্রণেই রামচরিত্র এমন জীবন্ত এবং এমন হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে।

> **রাম ক্রোধপীড়িত লক্ষ্মণকে বোঝালেন, ভরতকে মেরে রাজ্যলাভ করে কোন ধর্ম স্থাপিত হবে না। আমাদের পিতাই ভরতকে রাজ্য দিয়ে গেছেন প্রতিশ্রুতি রাখার জন্য। ভাইকে বধ করে বিষমিশ্রিত অন্নের মত রাজ্যভোগ করে আমি কি করব ?**

আপামর জনসাধারণের কাছে রামায়ণের এই যে আবেদন, যা আজ প্রায় দুহাজার বছর পরেও সজীব ও প্রবহমান, তার মূল কারণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য" (প্রাচীন সাহিত্য)। মহাভারতের মত রামায়ণেও মধ্যভাগে যুদ্ধ অর্থাৎ রাম-রাবণের

অশোকবনে সীতা
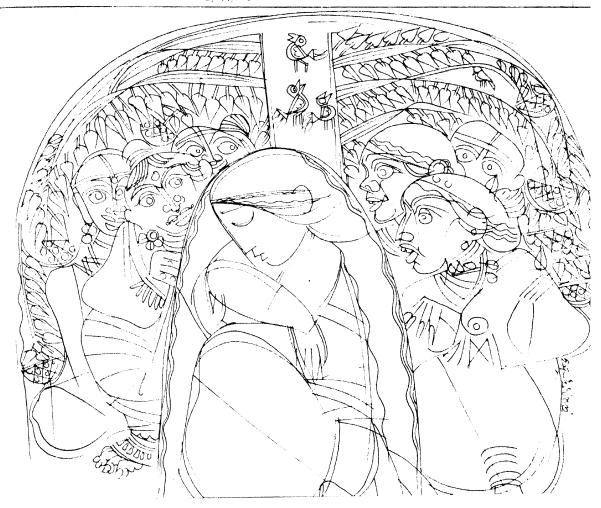
যুদ্ধঘটনাটি কাহিনীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বটে কিন্তু বাল্মীকির হাতে এবং যুগে যুগে তাঁর অনুবাদক বা অনুকথকদের হাতে যুদ্ধঘটনাটি বড় হয়ে ওঠেনি। ভারততত্ত্ববিদ্ গবেষক পণ্ডিতদের কেউ কেউ বলেছেন বাল্মীকি মূল রামায়ণে বোধহয় দুটি বিভিন্নমুখী ঘটনাকে জুড়ে দিয়ে কাব্য রচনা করেছেন—এক অযোধ্যার রাজবংশের অশ্রুজলে অভিষিক্ত ইতিহাস যা কৈকেয়ী-মন্থরার কুচক্রান্তের কঠিন আঘাতে বিপর্যস্ত। অন্যটি সীতার অপহরণ ও বিভিন্ন যুদ্ধসজ্জার ভিতর দিয়ে শত্রুবধের দ্বারা সীতার পুনরুদ্ধার ও দাম্পত্যমিলন। এই ঐতিহাসিক মতবাদ সত্য না হলেও এর মধ্যে কিছুটা তথ্য আছে। মহাভারতের মূল অংশে যেমন যুদ্ধ—রামায়ণে সেরকম নেই। ভ্রাতৃবিরোধের ফলে এখানে যুদ্ধ হতে পারত। সিংহাসন নিয়ে লড়াই-এর সম্ভাবনা রামায়ণেও ছিল। মহাভারতের মত হলে রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধ না হয়ে রাম-ভরতের যুদ্ধ হত। তা যে হয়নি সেটা রামায়ণের বৈশিষ্ট্য। তা বাল্মীকিরই কৃতিত্ব। বাল্মীকির উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে।··· রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই, সে যুদ্ধঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ মাত্র। পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতিপত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কত দূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছে।" (প্রাচীন সাহিত্য)

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি একটি আধুনিক মতবাদমাত্র নয়। কাহিনীর মাধ্যমে 'আদর্শ বিগ্রহ' রচনার কাজে প্রাচীন গ্রন্থকারেরা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পালি 'দসরথ জাতক' কাহিনীটি রামকাহিনীর বৌদ্ধধর্মীয় রূপায়ণ। সেখানে রাম বিষ্ণুর অবতার নন। কাহিনীটিও বেশ সংক্ষিপ্ত—এতে সীতাহরণের কাহিনী নেই। জাতকের গল্পগুলি অনেকটা এই ধরনের ছোট ছোট গল্প। বোধিসত্ত্ব কখনও মানুষরূপে কখনও বা মনুষ্যেতর প্রাণী হিসাবে আবির্ভূত—এবং বৌদ্ধধর্মের অতিপ্রয়োজনীয় নৈতিকগুণাবলীর এক একটি এই বোধিসত্ত্বের মধ্যে 'আদর্শ বিগ্রহ' রূপে রূপায়িত হয়েছে। এই হিসাবে বোধিসত্ত্বের যে চারিত্রিক দৃঢ়তা, কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতির বশীভূত হওয়ার ফলে যে মানসবিপ্লব বা বিবেকপ্রলয় উপস্থিত হয় তার মাঝখানে ধৈর্য ও স্থৈর্যের আদর্শ স্থাপন করা যা বোধিচিত্তের এক অপরিহার্য্য অঙ্গ—রামচরিত্রের মধ্যে জাতকের গল্পকথার তাকেই খুঁজে পেয়েছে এবং সেজন্যই 'দসরথ জাতক'-এর অবতারণা।

প্রসঙ্গক্রমে কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্যের কথা বলা দরকার। গত প্রায় এক শ পঞ্চাশ বছর ধরে সংস্কৃতজ্ঞ ও ভারততত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা রামায়ণ-মহাভারত সম্পর্কে নানা মতবাদপূর্ণ নানা গ্রন্থ ও প্রবন্ধরাজি লিখেছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ দাবী করেছেন পালির 'দসরথ জাতক' গল্পটি বাল্মীকিরামায়ণেরও পূর্ববর্তী। আলব্রেক্ট ওয়েবর সর্বপ্রথম এই মতবাদ স্থাপন করেন। পরে অনেকে দেখিয়েছেন যে এ মতবাদ ভুল। বহু যুক্তির মধ্যে প্রধান একটি হল যে পালি জাতকে সীতার অপহরণের আখ্যানটি নেই। কাজেই ওয়েবর প্রভৃতি পণ্ডিত মনে করেন যে এটা পরে যোগ করা হয়েছে এবং এজন্য বলা যেতে পারে যে, বাল্মীকি গল্পটি অর্থাৎ রামোপাখ্যানটির জন্য পালি জাতকের কাছে ঋণী। এ যুক্তি যে চলে না তা সহজেই বোঝা যায়। কালক্রমে কাহিনীর বিস্তার যেমন স্বাভাবিক সংক্ষিপ্তকরণও সেরকম স্বাভাবিক। এছাড়া অনেক অকাট্য যুক্তি রয়েছে যা থেকে বোঝা যায় পালি জাতকের কাহিনী অপেক্ষাকৃত অবচিন অর্থাৎ পরবর্তী যুগের রচনা। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দেই হেরমান জেকোবী প্রমাণ করেছেন বাল্মীকির কাহিনী পালি জাতক অপেক্ষা প্রাচীন। এই প্রসঙ্গে ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পুরাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার বরোদার 'জার্নাল অফ ওরিয়েন্টাল রিসার্চ'-এ একটি গবেষণাপত্র লেখেন যাতে একটি অকাট্য যুক্তি দেন দশরথ জাতকের অবাচীনত্ব সম্পর্কে। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে পালি জাতকের কাহিনীটি বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনীর দ্বারা অনুপ্রেরিত ও অনুলব্ধ—উল্টোটি নয়। আগেই বলেছি জাতকের কাহিনীতে বোধিসত্ত্বের বরণীয় গুণগুলির মূর্তবিগ্রহ হিসাবে এক একজনকে কাহিনীর নায়ক করা হয়েছে। সেদিক থেকে অপূর্ব আত্মত্যাগ, নিঃস্বার্থপরতা এবং বিপদের মুখে অসীম ধৈর্য প্রভৃতি গুণগুলির পরাকাষ্ঠা দেখান হয়েছে রামচরিত্রে। 'দসরথ জাতকে' যে সীতাহরণের কাহিনী নেই তার অন্যতম কারণ এই হতে পারে যে, রামায়ণে উল্লিখিত রামচন্দ্রের সীতাহরণোত্তর আচরণগুলি— মুহুর্মুহু বিলাপ, প্রলাপোক্তি, শোকবিহ্বল অবস্থা, উন্মত্তবৎ কথাবার্তা—এসবের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের আদর্শচরিত্র রামচন্দ্রকে খুঁজে পাওয়া যায় না বলেই হয়ত এই অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে।

এ-ছাড়া আরেকটি ঐতিহাসিক প্রশ্নের গুরুত্ব আছে। মহাভারতের রামোপাখ্যানটি বাল্মীকি রামায়ণ থেকে প্রাচীন—এই দাবীর কথা অনেক

যুধিষ্ঠিরের দুরবস্থার বর্ণনা
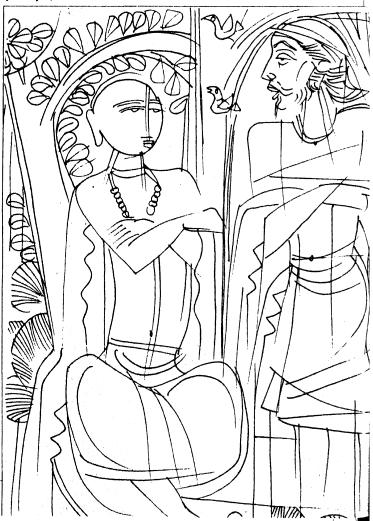
গবেষক ভারততত্ত্ববিদদের লেখায় পাওয়া যায়। এমনকি রামায়ণ ও মহাভারত এই দুটি গ্রন্থের মধ্যে কোনটি প্রাচীন কোনটি অবাচীন—এই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে ঝগড়া বহুদিন থেকে চলেছে। ১৮৭০ সালে ওয়েবর-এর এক লেখা থেকে এই ঝগড়ার আন্দাজ পাওয়া যায়। লেখাটির ইংরেজী অনুবাদ "ইন্ডিয়ান এন্টিকোয়ারী" নামক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল। এর পূর্বেই বোধহয় বলা হয়েছিল মহাভারত রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীন, কিন্তু ওয়েবর এই বিষয়ে মনস্থির করতে পারেননি। যাই হোক সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও এক সময় বাংলায় প্রবন্ধ লিখে এই পাশ্চাত্ত্য মতবাদের তীব্র প্রতিবাদ করেন—এবং তিনি বলেন—ভারতীয় ভাবধারায় রামায়ণকে আদি কাব্য বলা হয়েছে সুতরাং রামায়ণের মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীনত্ব স্বীকৃত। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য তাঁর স্বভাবসুলভ ভাষায় পাশ্চাত্ত্য পাণ্ডিত্যের উপর নানা আক্ষেপ ও দোষদর্শন করেছেন—তার সব কিছুই গ্রাহ্য করা যায় না। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত হেরমান জেকোবী ১৮৯৩ সালের "ডাস রামায়ণ" গ্রন্থে যে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা আজও গ্রাহ্য বলে মনে হয়। তিনি নানাভাবে দেখিয়েছেন যে মহাভারতের রামোপাখ্যানটি বাল্মীকিরামায়ণের পরবর্তী এবং বাল্মীকিরামায়ণই এর উপজীব্য। আধুনিককালে সুখথঙ্কর এবং রাঘবন্ এঁরা দুজনেই এই মতবাদের পক্ষে জোরালো যুক্তি দেখিয়েছেন। কাজেই পাশ্চাত্ত্য ভারততত্ত্ববিদদের মত সবসময় দুষ্ট নয়— এ-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্রূপোক্তি কিঞ্চিৎ পীড়াদায়ক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভুল যে করেন না তা নয় তবে সবসময় তা করেন না। যুক্তিসিদ্ধং বচো গ্রাহ্যম্।

সম্প্রতি পি. এল. বৈদ্য এবং মহাভারতের অনুবাদক ভ্যান বাউটেনেন মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণের প্রাচীনত্ব—এই মতবাদ খণ্ডন করবার প্রয়াস করেছেন। ফলে বিবাদটি পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। মোটামুটি তাঁদের বলার কথা একটি—মহাভারতের রামকাহিনী বাল্মিকী রামায়ণের মূল— বাল্মীকির কাহিনী মহাভারতের কাহিনীর বিবর্ধিত রূপ। বনপর্বে যুধিষ্ঠির শোকাকুল হয়ে প্রশ্ন করেন, আমার মত কোন দুঃখী রাজপুত্রের কথা কি তুমি জান— কে আর আমার মত রাজপুত্র হয়ে ভ্রাতা ও স্ত্রীসহ বনবাস দুঃখে দিনযাপন করে? এর উত্তরে মার্কণ্ডেয় রামোপাখ্যানটি শোনান। কাজেই স্বভাবত মনে হয় রামের কাহিনীটি তখন বেশ প্রচলিতই ছিল। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণ হিসাবে প্রচলিত ছিল কিনা সেটাই প্রশ্ন। বৈদ্য বলেছেন—রামায়ণ আদিকাব্য বলে প্রচলিত কিন্তু মহাভারত কাব্য বলে প্রচলিত নয়—'পুরাণেতিহাস' বলে প্রসিদ্ধ কাজেই এই আদিকাব্যত্বের সঙ্গে মহাভারতের প্রাচীনত্বের কোন বিরোধ নেই। এ-ছাড়া বাল্মীকির কাহিনীর সঙ্গে মহাভারতের রামকাহিনীর অনেক ছোট ছোট ব্যাপারে পার্থক্য আছে— সেকথা সকল পণ্ডিতেরাই লক্ষ করেছেন। এ বিষয়ে জাকোবী নিজেই বলেছেন, মহাভারতের রামকাহিনীটি বাল্মীকির সংক্ষিপ্তসার নয়—গল্পকারের কথিত একটি ছোট সংস্করণ। আর আমরাও জানি ভারতের নানাস্থানে কত শত শত রামকাহিনী প্রচলিত আছে— কোন কাহিনীটিই আবার আরেক কাহিনীর হুবহু প্রতিলিপি নয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যেসব রামকাহিনী প্রচলিত সেগুলিতে কবি ভট্টির রচিত 'ভট্টিকাব্য'রূপে যে রামকাহিনী সংস্কৃতে প্রচলিত তার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। এ বিষয়ে অধ্যাপক এইচ. বি. সরকার নিজ গ্রন্থে অনেক তথ্য দেখিয়েছেন— তা আমাদের অবশ্যপাঠ্য।

যাই হোক, বৈদ্য ও বাউটেনেন-এর মতবাদ সম্প্রতি প্রকাশিত 'দ্য রামায়ণ অফ বাল্মিকী—আদিকাণ্ড' (নতুন সুষ্ঠু ইংরেজী অনুবাদ)— এই গ্রন্থে আমার বন্ধুবর অধ্যাপক রবার্ট গোল্ডম্যান খণ্ডন করেছেন। পর পর সাতটি কাণ্ডেরই অনুবাদ এই ধারায় প্রকাশিত হবে। এর টিপ্পনীতে বহু মূল্যবান তথ্যের সমাবেশ আছে। অধ্যাপক গোল্ডম্যানের যুক্তির জন্য তাঁর উক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। শুধু একটি যুক্তির কথা বলা দরকার। মহাভারতের আখ্যানটিতে অবিন্ধ্য নামে এক রাক্ষসের কথা আছে। অশোক-বনে সীতাকে রাক্ষসী চেড়ীরা যখন দিবারাত্র পাহারা দিত এবং সর্বদা (রাবণের আদেশে) তর্জন করত তখন ত্রিজটা নামে এক বৃদ্ধা রাক্ষসী সীতাকে একান্তে ডেকে বললে, সীতা, ভয় ত্যাগ কর, অবিন্ধ্য নামে এক বৃদ্ধ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ জানিয়েছেন যে রাম-লক্ষ্মণ কুশলে আছেন এবং শীঘ্রই সুগ্রীবের সহায়তায় এখানে এসে তোমাকে উদ্ধার করবেন। আর আমিও এক দুঃস্বপ্ন দেখেছি যে সমগ্র রাক্ষস সেনা ধ্বংস হবে। পরে রাবণ বধের পর রাম যখন বিভীষণকে লঙ্কারাজ্য দান করলেন তখন বৃদ্ধ মন্ত্রী অবিন্ধ্য (সেই পূর্বোল্লিখিত রাক্ষসশ্রেষ্ঠ) বিভীষণের সঙ্গে সীতাকে নিয়ে রামের কাছে এলেন। তা হলে দেখা যাচ্ছে বিভীষণ ছাড়াও রাবণের লঙ্কাপুরীতে রামপ্রেমী রাক্ষসমন্ত্রী ছিলেন। যাই হোক বৈদ্য ও বাউটেনেন-এর যুক্তি এই যে অবিন্ধ্যের কথা বাল্মীকির রচিত কাহিনীতে নেই। আর মহাভারতের রামোপাখ্যানটি যদি বাল্মীকি থেকে সংক্ষেপিত কাহিনী হয় তবে অবিন্ধ্যের কথা সংক্ষিপ্ত সংস্করণে উল্লেখের প্রয়োজন কি? কাজেই এই অসংগতি নিবারণের উপায় হল রামোপাখ্যানটিকে বাল্মীকি রামায়ণেরউপজীব্য বলে কল্পনা করা। অর্থাৎ
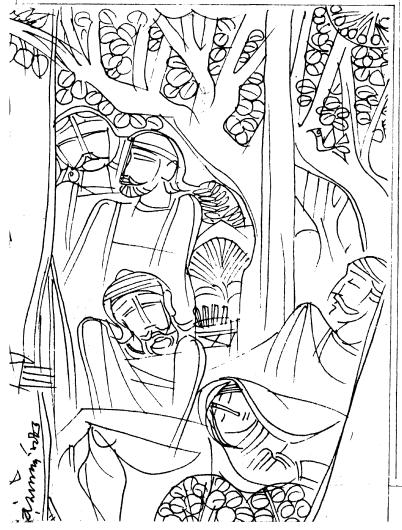
বাল্মীকির কল্পনায় অবিন্ধ্য ত্রিজটার সঙ্গে মিশে গেছেন—কাজেই এটাই পরবর্তী।

বৈদ্যের এই যুক্তির মধ্যে একটা বস্তুগত ভুল আছে যেটা রাঘবন ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'দ্য গ্রেটার রামায়ণ' গ্রন্থে দেখিয়ে দেন। অর্থাৎ বাল্মীকি অবিন্ধ্যের কথা উল্লেখ করেছেন অন্তত দুবার —একবার সুন্দরকাণ্ডে (৩৫ সর্গে) আর একবার যুদ্ধকাণ্ডে (২৫ সর্গে)। গোল্ডম্যান এই যুক্তির উল্লেখ করে বলেছেন যে বৈদ্যের এই ভুল ধরিয়ে দেবার পরও কেন বাউটেনেন এই যুক্তির পুনরাবৃত্তি করলেন (১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থে) তা বোঝা ভার। তিনি আরও বলেছেন যে, রাবণ মন্ত্রী অবিন্ধ্যের কথা যখন বাল্মীকি জানতেন এবং যখন একথাও রামায়ণে বলা হয়েছে যে অবিন্ধ্যের উপদেশ রাবণ শোনেন কি, তখন মহাভারতের রামোপাখ্যানটির প্রাচীনত্ব আর বজায় থাকে না (গোল্ডম্যান—গ্রন্থ পৃঃ ৩৭, ১৯৮৪)।

মহাভারতের রামোপাখ্যানে অহল্যা উদ্ধারের কথা নেই, তা ছাড়া এখানে লক্ষ্মণ কুম্ভকর্ণকে বধ করেন বাল্মীকিরামায়ণে কিন্তু রামই কুম্ভকর্ণের নিধনকর্তা। কৃত্তিবাসী রামায়ণেও তাই। এ-ধরনের ছোটখাটো প্রভেদ দু কাহিনীর মধ্যে আছে। কিন্তু তাতে প্রাচীনত্ব অর্বাচীনত্বের বিচার করা যায় না। এ-ছাড়া গোল্ডম্যান আরেকটি কথা বলেছেন যা উল্লেখযোগ্য। রামোপাখ্যানে যুদ্ধজয়ের পর রাম হনুমানকে ভরতের কাছে যখন যুদ্ধজয়ের সংবাদ প্রেরণের জন্য পাঠাচ্ছিলেন তখন (সংক্ষেপে) বলছেন—ভরতের 'ঈঙ্গিত' অর্থাৎ শারীরিক লক্ষণ লক্ষ করবে ("লক্ষয়িত্বেঙ্গিতং সর্বম্" —মহাভারত, বনপর্ব, পুনা সংস্করণ, ২৭৫ সর্গ, ৬০ শ্লোক)। এখানে প্রশ্ন ওঠে যে হঠাৎ কি 'ঈঙ্গিত' অর্থাৎ শারীরিক লক্ষণের কথা বলা হচ্ছে? এর সদুত্তর পাওয়া যাবে যদি আমরা মূল বাল্মীকি রামায়ণ দেখি। সেখানে যুদ্ধকাণ্ডের শেষদিকে (১১৩ সর্গ) রাম হনুমানকে বলেছেন, 'তুমি সাবধানে খবরটি দেবে এবং খবর শুনে ভরতের শারীরিক বৈলক্ষণ্য বা মুখবর্ণের কোন বিকৃতি ঘটে কিনা তা নিপুণভাবে লক্ষ করবে।' রামের এই সাবধানবাণীর কারণ কি? বাল্মীকি রামায়ণ পড়লে এর উত্তর মিলবে। ভরতের ভ্রাতৃভক্তি যদিও আদর্শ ছিল অর্থাৎ তিনি একজন এক্সেমপ্লার ছিলেন, তবুও বাল্মীকির রচনায় দেখান হয়েছে যে শুধু লক্ষ্মণ নয় মাঝেমাঝে শ্রীরামচন্দ্রও সন্দেহাকুল হতেন ভরতের অভিপ্রায় সম্পর্কে। এ সন্দেহ তিনি মাঝে মাঝে প্রকাশ করেছেন। সীতাহরণের পর শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় অনেক এ ধরনের কথা তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। এখানে শ্রীরামের সেই সন্দেহ আবার বলবান হল। ভরত কি রাজ্য ছেড়ে দেবে? রাবণ বধ ও বিজয়বার্তায় ভরত কি আনন্দিত হবে না রাজ্য হারাবার ভয়ে তার মুখভাবে বিকৃতি আসবে? ভরত যতই দেবতুল্য পুরুষ হোন না কেন, রাম এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে চান। এজন্যই এই সাবধানতার নির্দেশ। এবং সেজন্যই সংক্ষিপ্তকরণে 'ঈঙ্গিত' লক্ষ করার আদেশ আছে। অর্থাৎ রামোপাখ্যানের সামনে বাল্মীকিরামায়ণ না থাকলে একথা উঠত না। এই যুক্তিটি বলবতী।

কৃত্তিবাস বা তুলসীদাসের রচনায় রামচরিত্রের মধ্যে ভরত-সম্পর্কে এরকম দ্বিধা ছিল না। ভরতের গূঢ় উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা কিছু সন্দেহ এবং সেই সন্দেহবশত যা কিছু ক্রোধোক্তি সবটাই লক্ষ্মণের ভাগে পড়েছে। রাম ক্ষমাসুন্দর কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্মণের কাছে ভরতের হয়ে ওকালতি করেছেন। এই প্রসঙ্গে চিত্রকূট পর্বতে রাম-ভরতের সাক্ষাৎকারের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। রামায়ণকাহিনী বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে কথিত হয়েছে—কোনটিই অপরটির হুবহু অনুকরণ নয়। সংস্কৃত সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ভাস (যাঁকে কালিদাস যাঁকে পূর্বসূরী হিসাবে সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন তাঁর মালবিকাগ্নিমিত্রনাটকে) প্রতিমা-নাটক নামে এক মনোজ্ঞ নাটকের মাধ্যমে রামকাহিনীকে সংক্ষেপে রূপায়িত করেছেন—তার মধ্যে কেন্দ্রীভূত ঘটনাটি রাম ভরতের মিলন এবং ভরতের পাদুকাগ্রহণ। বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে এই প্রতিমানাটকে কথিত কাহিনীর তুলনা করলে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান মেলে। এখানে দু-একটি কথার অবতারণা করব।

প্রতিমা নাটকে—রাম ও ভরত দুজনেই আদর্শ চরিত্র। এমনকি বলা যায় একজন আরেকজনের প্রতিমা বা প্রতিচ্ছবি। ভ্রাতৃবাৎসল্যে দুজনেই সমান। শুধু গুণে নয় শারীরিক আকৃতিতেও নাকি উভয়ের 'রূপসাদৃশ্য' ছিল বিস্ময়কর। এই 'রূপসাদৃশ্যের' কথা নাটকের কয়েকটি অংশেই দেখান হয়েছে। হয়ত এর মধ্যে নাটকটির নাম 'প্রতিমা নাটক' কেন করা হল তার অন্যতম ব্যঞ্জনাময় কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। অনেকে বলেছেন যে, ভাসরচিত নাটকের তৃতীয় অঙ্কে প্রতিমাগৃহে 'প্রতিমাদর্শন' নামে একটি নাটকীয় ঘটনা সন্নিবেশিত হয়েছে— এ ঘটনার উল্লেখ বাল্মীকির রচনায় নেই। এটি নাট্যকারের কল্পনা। এবং এজন্যই নাম 'প্রতিমা নাটক'। তবে মনে হয়, "এহ বাহ্য, আগে কহ আর।" সার্থক সাহিত্যের শুধু একটাই অর্থ থাকে না।

ঘটনাটি এই। দশরথের মৃত্যুর পর ভরতকে আনার জন্য ব্যবস্থা করা হল। ভরত একাকীই রথারোহণে সূতের সঙ্গে আসছেন। তাঁকে শুধু বলা হয়েছে, রাজা দশরথ গুরুতর অসুস্থ—'দৃঢ়ম্ অকল্যশরীরঃ'। রথচালক সব জানলেও কিছু বলতে পারছেন না। এখানে আরও বলা হয়েছে যে, ভরত বহুদিন ধরে মাতুলালয়ে বাস করছেন—অর্থাৎ অযোধ্যার রাজপুরীর লোকেরা ভরতকে চাক্ষুষভাবে চেনেন না। এর মধ্যে বোধহয় আরও কথা অনুচ্চারিত আছে। রাজা দশরথ সিংহাসন নিয়ে ভ্রাতৃবিরোধের ভয়ে ভরতকে শত্রুঘ্নসহ দূরে রাখতেন মাতুলালয়ে, নচেৎ স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে— তিনি প্রজাদের মন বুঝে (রামই অযোধ্যায় থাকতেন, ভরত নয়) হঠাৎ যৌবরাজ্যে রামকে অভিষিক্ত করতে চাইলেন কেন? এত 'তড়িঘড়ি' করার কি প্রয়োজন ছিল? কই তখন ত অন্য দুই পুত্র ভরত শত্রুঘ্নকে আনার জন্য ত্বরা দেখান নি? তাদের অনুপস্থিতিকালেই কাজ সম্পন্ন করার মধ্যে কোন গূঢ় অভিসন্ধি খুঁজে না পাওয়ার কথা নয়। মনে হয় দশরথ নিজের নৈতিক দুর্বলতার সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

যাই হোক, প্রতিমা নাটকের তৃতীয় অঙ্কে ভরতকে ভটের মাধ্যমে বলা হয় যে, গুরুজনের আদেশে অযোধ্যার উপকণ্ঠে ভরত কিছুক্ষণ যেন অপেক্ষা করে শুভ মুহূর্তে নগরীতে প্রবেশ করেন। এই নগরীর উপকণ্ঠেই ছিল এক প্রতিমাগৃহ যাতে ইক্ষ্বাকুকুলের রাজাদের প্রতিমা রক্ষিত হত। অর্থাৎ সেখানে [illegible] রাজা দিলীপ, রঘু, অজ ও দশরথের চারটি প্রতিমা বিদ্যমান ছিল। ভরত এই প্রতিমাগৃহের কথা জানতেন না। তিনি ভাবলেন এটা [illegible] দেবমন্দির। মন্দিরে প্রবেশ করে দেবতাকে প্রণাম করতে যাবেন এমন সময় দেবকুলিক (অর্থাৎ মন্দিররক্ষক) প্রবেশ করে প্রণামে বাধা দিলেন। [illegible] প্রণাম করবেন না কারণ উঁরা দেবতা নন [illegible] ক্ষত্রিয়সন্তান—কাজেই ভরত যদি ব্রাহ্মণ হন তবে ক্ষত্রিয়দের প্রণাম করলে অপরাধ হবে। [illegible] দেবকুলিক ভরতকে চেনেন না। [illegible] মনে সন্দেহের উদয় কারণ প্রথমেই তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করেছেন প্রতিমাগুলির সঙ্গে এই নবাগত [illegible] আকৃতিসাদৃশ্য (প্রতিমানাটকম্ [illegible])।

ভরত যখন শুনলেন উঁরা অযোধ্যার রাজা অর্থাৎ তাঁর পূর্বপুরুষ তখন পরিচয় জানতে চাইলেন একে একে দিলীপ, রঘু ও অজ। এখানে নাট্যকার এক অপূর্ব কৌশল করেছেন। ভরত বারবার প্রশ্ন করছেন, তাহলে ইনি দিলীপ, ইনি রঘু আর ইনি অজ। আর একবার বল। তিনি দশরথের প্রতিমা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু বারবার সেদিক থেকে চলে আসছেন। হৃদয়ে গুরুতর আশঙ্কা, রাজা দশরথ কি বেঁচে আছেন? তাঁর মূর্তি এখানে কেন? তাই ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেন আচ্ছা, এখানে কি জীবিত রাজাদের মূর্তিও রাখা হয়? দেবকুলিকের উত্তর—না, মৃত রাজাদেরই মূর্তি রাখা থাকে। ভরত অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে বললেন—আচ্ছা, ঠিক আছে আমি এবার একটু বাইরে যাচ্ছি। অর্থাৎ দশরথের মূর্তির দিকে না তাকিয়েই চলে যেতে চাইলেন। হৃদয়ে এখন তাঁর প্রবল শঙ্কা, প্রবল তাড়না—দুঃসংবাদ যেন ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসছে। কিন্তু দেবকুলিক বাধা দিয়ে বললেন—আপনি আর সকলের কথা জানতে চাইলেন ও প্রণাম করলেন—কিন্তু

যেন প্রাণাশ্চ রাজ্যঞ্চ স্ত্রীশুল্কার্থে বিসর্জিতাঃ।
ইমাং দশরথস্য ত্বং প্রতিমাং কিং ন পৃচ্ছসে॥

"যিনি বিবাহে প্রতিজ্ঞাত শুল্কদানের জন্য রাজ্য এবং নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন সেই দশরথের প্রতিমার কথা আপনি জিজ্ঞাসা করছেন না কেন?"

আর কোন আবরণ রইল না। নিদারুণ দুঃসংবাদ শোনা হয়ে গেল। ভরত সঙ্গে সঙ্গে ভূমিতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। এতক্ষণে দেবকুলিকের বুদ্ধি খুলল। তিনি জিজ্ঞাসা

বললেন— আপনি কি কৈকেয়ীপুত্র ভরত ? ভরত বললেন—দশরথপুত্র ভরত কৈকেয়ীর পুত্র নয়। এখানে 'শুল্ক' বা 'স্ত্রীশুল্ক' কথাটি প্রতিমা নাটকে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণেও এর উল্লেখ অন্তত একবার করা আছে। তাহলে এটি অন্তত পরবর্তী নাট্যকারের কপোলকল্পিত কথা নয়। এটির তাৎপর্য একটু পরেই ব্যাখ্যা করব।

নাটকের ঘটনাটি অনুসরণ করা যাক। ভরত দেবকুলিকের কাছ থেকে সম্পূর্ণ দুঃসংবাদটি আদায় করে নিলেন—পিতার মৃত্যু হয়েছে, নিজের মাতা কৈকেয়ীর ঐশ্বর্যালুব্ধতায় রাজপুরী ছারখারে যাচ্ছে, আর জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে জটাচীর ধারণ করে বনে চলে গেছেন। আর বাকিটা তিনি অনুমানে পূরণ করলেন—সমগ্র অযোধ্যার প্রজাকুল ভরতের নামে নিন্দাবাদ করছে। ভরত আবার মূর্ছিত হলেন। এইসময় সদ্যবিধবা কৌশল্যা কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে নিয়ে সুমন্ত্র এই প্রতিমাগৃহে আসছিলেন। ওঁদের আগমনের জন্যই প্রতিমাগৃহকে সকাল থেকে পরিষ্কৃত ও সুসজ্জিত করা হয়েছিল। সুমন্ত্রও বোধহয় ভরতকে চাক্ষুষ চিনতেন না। মন্দিরে প্রবেশ করতেই দেখলেন কে একজন মাটিতে পড়ে আছে— তাঁর আকৃতি দেখে মনে হল যেন তিনি যৌবন অবস্থায় রাজা দশরথ। "বয়স্থ ইব পার্থিবঃ।" দেবকুলিক ভরতের পরিচয় দিয়ে দ্রুত প্রস্থান করলেন। ভরত সংজ্ঞালাভ করে যখন "আর্য" বলে সম্বোধন করছেন তখন সুমন্ত্রের আবার বিভ্রম উপস্থিত হল— তিনি ভাবলেন রাজা দশরথ কথা বলছেন। কাজেই হঠাৎ অভ্যাসবশত উত্তর দিতে গেলেন "জয়তু মহারাজ"। কিন্তু অর্ধেক কথা বলেই নিজের ভুল বুঝতে পারলেন, বল্লেন—"অহো স্বরসাদৃশ্যম্—মনে হয় মহারাজ দশরথ প্রতিমাস্থ হয়েও কথা বলছেন।"—এই প্রতিমা নাটক বার বার অভিনীত হত কেরালার নাট্যগোষ্ঠীতে। কাজেই এ নাটক যথার্থভাবেই দৃশ্যকাব্য। নাটকের পাত্রপাত্রীদের মুখ্য উদ্দেশ্য দর্শকের ভ্রান্তি উৎপাদন করে চিত্তবিনোদন। এই ভ্রান্তিমণ্ডলের মধ্যেও যদি আবার ছোট ছোট ভ্রান্তিমণ্ডল রচনা করা হয় তাতে নাট্যবস্তুর আকর্ষণ আরও বেড়ে যায়। কাজেই দেবকুলিকের ভ্রান্তি, ভরতের ভ্রান্তি (প্রতিমাগৃহকে দেবমন্দির ভাবা), সুমন্ত্রের ভ্রান্তি—এসবই নাট্যগুণকে বিবর্ধিত করেছে।

এই তৃতীয় অঙ্কের ঘটনার মধ্যে পার্থিব প্রতিমার সন্নিবেশের ফলে নাটকের নামকরণ হয়েছে প্রতিমা নাটক —কিন্তু আগেই বলেছি এও গৌণ। ভরতকেও দশরথের প্রতিমা বা প্রতিচ্ছবি হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে—যাতে তাঁর রাজা হবার জন্য কোন যোগ্যতার অভাব না থাকে। কিন্তু এর পরেও দেখি চতুর্থ অঙ্কে ভরত রামের প্রতিমা হিসাবে উপস্থাপিত। এখানে দেখান হয়েছে যে ভরতকে দেখে লক্ষ্মণের ভ্রান্তি হয়েছে, রাম বলে তিনি ধরে নিয়ে বলছেন—'অয়ে! অয়মার্য্যো রামঃ। ন ন। রূপসাদৃশ্যম্!" লক্ষ্মণ এর পরে একটি শ্লোকের মাধ্যমে নিজ পিতার সঙ্গে এঁর সাদৃশ্য লক্ষ করে বললেন—ইনি কে? "নরপতিরয়ং দেবেন্দ্রো বা স্বয়ংবা মধুসূদনঃ?" আর এর কিছু পরেই যখন রাম সীতাকে বললেন, 'তুমি বাইরে গিয়ে ভরতকে নিয়ে এস'। তখন সীতাও বাইরে এসে দেখে ভ্রমে পতিত হলেন, "একি আর্যপুত্র আমাকে বাইরে পাঠিয়ে আবার কোন দিক দিয়ে বাইরে এসে হাজির? ওঃ না না একি রূপসাদৃশ্য।"("হং তত্তস্তাং বেলামিদানীং নিষ্ক্রান্ত আর্যপুত্রঃ? ন হি ন হি রূপসাদৃশ্যম।") আর লক্ষ্মণ যখন ভিতরে এসে ভরতের উপস্থিতিবার্তা ঘোষণা করলেন তখন স্পষ্টই বললেন—

অয়ং তে দয়িতো ভ্রাতা ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
সংক্রান্তং যত্র তে রূপমাদর্শ ইব তিষ্ঠতি॥

"ভ্রাতৃবৎসল প্রিয়ভাই ভরত উপস্থিত, যাঁর দেহে দর্পণের প্রতিচ্ছবির মত তোমারই রূপসংক্রান্ত হয়েছে।"

কুম্ভকর্ণের নিদ্রা

এক ভ্রান্তির পরিধির মধ্যেই আরেক ভ্রান্তির পরিধি রচনা করে বারবার নাট্যকার তাঁর প্রতিমানাটকের নামকরণের সার্থকতা দেখিয়েছেন। এতে অনেক গূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল।

বাল্মীকিরামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ভরত মন্ত্রিমণ্ডল পুরোহিত রথ অশ্ব পদাতিক সৈন্য নিয়ে রামকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন। এই নাটকে কিন্তু ভরত শুধু সুমন্ত্রের সঙ্গে গিয়েছিলেন রামের কাছে। মূল রামায়ণে আছে ভরত ভরদ্বাজ মুনির কাছে খবর পেলেন—রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে চিত্রকূটপর্বতে অবস্থান করছেন। ভরত চিত্রকূটে যাবার পথের সন্ধান জেনে নিয়ে প্রভাতে যাত্রা করলেন। এদিকে সৈন্যসামন্তের কর্ণপীড়াকর শব্দ শুনে রাম লক্ষ্মণকে বললেন, দেখত ব্যাপারটা কি? লক্ষ্মণ তখন এক বিশাল শালবৃক্ষে আরোহণ করে দেখলেন সসৈন্যে ভরত উপস্থিত। তখন লক্ষ্মণ ক্রোধান্ধ হয়ে বললেন, রাজ্যলাভ করে কৈকেয়ীপুত্র শত্রুর ও আগুনের শেষ রাখতে নেই এই ভেবে আমাদের নিধন করতে এখানে এসেছে। "আবাং হন্তুং সমভ্যেতি কৈকেয্যা ভরতঃ সুতঃ।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৯৬ সর্গ ১৭ শ্লোকার্ধ, গুজরাট সংস্করণ)। কাজেই লক্ষ্মণ বললেন, আর কোন উপায় নেই—এখন ভরতকে বধ করতেই হবে।

ভরতস্য বধে দোষো নাহং পশ্যামি রাঘব॥
পূর্বাপকারিণং হত্বা ন হ্যধর্মেণ যুজ্যতে।
পূর্বাপকারী ভরত স্ত্যাগে ধর্মশ্চ রাঘব॥
(শ্লোক ২৩, ২৪)

এখানে অনিবার্যভাবে মহাভারতের ভ্রাতৃবিরোধের কথা ভ্রাতৃবধের কথা আমাদের মনে পড়ে যায়। শ্লোকের শেষ পঙ্‌ক্তিটির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া ভার। তিলকটীকায় 'ত্যাগে' শব্দের অর্থ করা হল 'বধে'। অর্থাৎ ভরতকে বধ করলে তা ধর্মই হবে। শিরোমণি টীকাকার পাঠান্তর স্বীকার করলেন, "ত্যাগেঽধর্মশ্চ," অর্থাৎ ভরত যখন তোমার অপকারই করেছে অর্থাৎ তার জন্যই তুমি যখন রাজ্যচ্যুত তখন তাকে বধ না করে 'ত্যাগ' করলে (অর্থাৎ ছেড়ে দিলে) অধর্ম হবে। আর আমরা জানি রাম সকলের চেয়ে অধর্মকেই বেশী ভয় করেন। গোবিন্দার্য ভূষণটীকায় পাঠান্তর ধরলেন—"ত্যক্তধর্মশ্চ"। অর্থাৎ ভরত যে ধর্মকে ত্যাগ করেছে সে আমাদের অবশ্য বধ্য।

শুধু তাই নয়। লক্ষ্মণ আরও বললেন, "কৈকেয়ীং চ বধিষ্যামি সানুবন্ধাং সবান্ধবাম্।" এ যেন মহাভারতের যুক্তি। এই যুক্তির বলেই সেখানে ভায়ে ভায়ে বিরোধ, শত্রুতা, কপটদ্যূতে সর্বস্বাপহরণ এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে সকলকে

নিধন। মহাভারতে যা ঘটেছে এখানে যেন তা কিছুতে ঘটতে দেওয়া হবে না। ভায়ে ভায়ে লড়াই নয়। শত্রু ভিতরে নয় বাইরে। শত্রু রাক্ষস রাক্ষসী যারা যাগযজ্ঞে বাধা দেয়, শত্রু খর, দূষণ, রাবণ ও কুম্ভকর্ণ—যারা ছলনার দ্বারা স্ত্রী অপহরণ করে নিয়ে যায়। যুদ্ধ হবে তাদের সঙ্গে। কারণ রামের কাছে তারা অধর্মের মূর্তিমান বিগ্রহ। প্রতিমা নাটকের প্রথম অঙ্কেও লক্ষ্মণ একবার এইরকম ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে সকলকে সংহার করতে চেয়েছিলেন। সেটি ঘটেছিল যখন কৈকেয়ীর অনুরোধ শুনে দশরথ মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। রাম তখন যুক্তি দেখিয়ে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করেছিলেন।

বাল্মীকির রচনায় রাম মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, নিজের ওই ধরনের রাজ্যচ্যুতি ও বনবাসকে ভাল মনে মানতে পারেননি। তবে তিনি ব্যক্তিবিশেষের কাউকে দোষী মনে করতে পারেননি। ধর্ম, ভাগ্য, নিয়তি—এসবকেই দোষী করেছেন। সেদিক থেকে লক্ষ্মণ যেন রামের 'অল্টার ইগো'। বাল্মীকি রামকে দিয়ে যা বলাতে পারেননি লক্ষ্মণকে দিয়ে তাই বলিয়েছেন। লক্ষ্মণ ছাড়া রামকে ভাবতে পারা যায় না—অন্তত বাল্মীকির রচনায় তা ভাবা যায় না। লক্ষ্মণ ছাড়া রাম অর্ধনায়ক। 'রাম সহ লক্ষ্মণ :' পূর্ণনায়ক।

রাম ক্রোধপীড়িত লক্ষ্মণকে বোঝালেন, ভরতকে মেরে রাজ্যলাভ করে কোন ধর্ম স্থাপিত হবে না। আমাদের পিতাই ভরতকে রাজ্য দিয়ে গেছেন প্রতিশ্রুতি রাখার জন্য। ভরত তার ন্যায্য অধিকারী। আর ভাইকে বধ করে বিষমিশ্রিত অন্নের মত রাজ্যভোগ করে আমি কি করব? এমতাবস্থায় আমি ইন্দ্রত্বও চাই না। এখানে মাঝে মাঝে অনেকে গীতায় অর্জুনের উক্তিকে স্মরণ করতে পারেন। রাম ভরতকে প্রশংসা করে বলছেন, 'হে লক্ষ্মণ, তুমি যদি নিজে রাজ্য চাও তা হলে আমি ভরতকে বলব এবং ভরতকে আমি জানি, সে তোমায় রাজ্য ছেড়ে দেবে আমার কথায়। মূল কথা, এমন আপৎ যেন আমাদের না পেয়ে বসে যাতে পুত্রেরা পিতাকে হত্যা করতে চায় বা ভ্রাতা নিজের ভ্রাতাকে বধ করতে উদ্যত হয়।' লক্ষ্মণ এসব কথায় স্বতই লজ্জা পেলেন। আর এ-কথাগুলো যেন গীতার উল্টো স্রোত।

১০৭ সর্গে ভরতের সানুনয় সনির্বন্ধ প্রার্থনার উত্তরে রামের মুখে আরও রহস্য প্রকাশিত হল। রাম বললেন, ভরত তুমি তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। তোমার আত্মগ্লানি আমি বুঝতে পারছি। তবে জেনে রাখ যে আমাদের পিতা যখন তোমার মাতাকে বিবাহ করতে যান তখন তোমার মাতামহের কাছে 'রাজ্য শুল্ক' রেখে বিবাহ করেছিলেন। অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে কৈকেয়ীর গর্ভের সন্তানই রাজ্যলাভ করবে।"

"পুরা ভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুদ্বহন।
মাতামহে সমাশ্রৌষীদ্রাজ্যশুল্কমনুত্তমম ॥
(শ্লোক ৩)

আমরা মহাভারতের ঘটনায় এ ধরনের প্রতিশ্রুতির কথা জানি। শান্তনুও এই রাজ্যশুল্কে সত্যবতীকে বিবাহ করেন এবং পাছে পরে এই প্রতিশ্রুতিভঙ্গ হয় সেজন্য শান্তনুপুত্র দেবব্রতকে শুধু যে রাজ্যত্যাগ করতে হয় তা নয় চিরকৌমার্যব্রতও নিতে হয়। পিতার সুখের জন্য ভীষ্মের যে ত্যাগ তা প্রায় তুলনারহিত। শ্রীরামচন্দ্রও রাজ্যত্যাগ ও বনবাস বরণ করেছিলেন সেটি কিন্তু পিতার ঐহিক সুখের জন্য নয়, পারত্রিক মঙ্গলের জন্য অর্থাৎ তিনি যাতে ধর্মে পতিত না হন। এবং যাতে জনাপবাদের ভাগী না হন। ভীষ্ম কিন্তু সব ছেড়েছিলেন পিতার সাংসারিক সুখভোগের জন্য, যযাতির উপাখ্যানে পুরু যেমন করেছিলেন।

রাম ভরতকে আরও বললেন, এ ছাড়াও দেবাসুর সংগ্রামে দশরথ যখন ক্লান্ত হয়ে ফেরেন তখন কৈকেয়ীর পরিচর্যায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে দুটি বর দান করতে চান। কৈকেয়ী সেই বরদ্বয়ই চেয়েছেন। কাজেই ভরত তুমি রাজা হয়ে আমাদের স্বর্গত পিতাকে ঋণমুক্ত কর—তাঁর ধর্ম রক্ষা কর। আমি বনবাস থেকে ফিরে যেতে পারি না।

তিলক টীকাকার এখানে একটি অদ্ভুত কথা তুলেছেন। তিনি বলছেন 'রাজ্যশুল্ক' অনেক সময় নাও দেওয়া যেতে পারে। স্মৃতিশাস্ত্রে আছে—

স্ত্রীকুনর্মবিবাহে চ বৃত্ত্যর্থে প্রাণ সংকটে।
গোব্রাহ্মণার্থে হিংসায়াং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতম্ ॥

মহাভারতের "প্রাণাত্যয়ে"র মত এটাও একটা অপবাদসূত্র। অর্থাৎ প্রাণসংকটে অথবা নর্মবিবাহে (শুধু কামনার জন্য যে বিবাহ) মিথ্যাচরণ সবসময় লজ্জাকর নয়। তাহলে তিলক বলছেন যে কৌশল্যা বর্তমান থাকতে কৈকেয়ীকে বিবাহ করতে যাওয়াটাই একটা নর্মবিবাহের মত। এক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাহানি তো দোষের হতে পারে না। এজন্যই শ্রীরামচন্দ্র দ্বিতীয় যুক্তি দিলেন—যাতে দেবাসুর সংগ্রামের পর বরদানের কথা বলা হল। এখানে প্রতিজ্ঞাহানি সর্বথা দোষাবহ। অবশ্য আমাদের মনে অন্য প্রশ্নও জাগে। শান্তনুর বিবাহও তো তাহলে নর্মবিবাহ। পুত্র থাকতে বিবাহ ও 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা পুত্রপিণ্ডং প্রয়োজনম্'—এই মত অনুসারে হতে পারে না। কাজেই প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গার সম্ভাবনা ছিল। সেজন্যই কি সত্যবতীর পালক পিতা ভীষ্মের কাছে এরকম ভীষণ প্রতিজ্ঞা আদায় করে ছাড়লেন? শান্তনুর 'রাজ্যশুল্কে' হয়ত সেরকম বিশ্বাস হত না। কিন্তু ভীষ্ম এখানে 'থার্ড পার্টি' কাজেই তাঁর প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গা যাবে না।

প্রতিমা নাটকে রাজ্যশুল্কের কথা গোড়া থেকেই সকলে জানত বলে দেখা যায়। ভরত 'শুল্ক' কথার নামেই সঙ্কুচিত হতেন যদিও তিনিই ছিলেন এর বিষয় অর্থাৎ প্রধান ভাগী। প্রতিমা নাটকে কৈকেয়ীর চরিত্রকেও মহান করা হয়েছে। সত্যই কৈকেয়ী কুচক্রী লোভী ও দুষ্টা রমণী এভাবে দেখলে এতে বড়ই অসঙ্গতি আসে। মানবচরিত্র যদিও এইরকম নানা দোষে গুণে ভরা। রাজ্যলোভ ও সন্তানস্নেহ দুটি একত্রে থাকা বিচিত্র কিছু নয় তবুও আদর্শচরিত্র রচনার ক্ষেত্রে এসবের সংমিশ্রণ কিঞ্চিৎ পীড়াদায়ক। উত্তরকালীন পাঠকবর্গের কাছে কৈকেয়ী চরিত্রের মধ্যে অসঙ্গতি আছে বলে মনে হয়েছে। কারণ তিনি রাক্ষসীও ছিলেন না আবার দেবীও ছিলেন না। কাজেই তাঁর চরিত্রের ক্রমশ দোষক্ষালন করা হয়েছে। হয়ত রাজ্যশুল্কের কথা সত্য। কিন্তু কৃত্তিবাস বা তুলসীদাস এদিকটা ভেবে দেখেননি।

প্রতিমা নাটকে কিন্তু কৈকেয়ী দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি সব কলঙ্কের ডালি মাথায় নেন—এটা তাঁরই মহত্ত্ব। তৃতীয় অঙ্কে ভরতের প্রচণ্ড তিরস্কারের উত্তরে তিনি বলেন, 'জাতে দেশকালে নিবেদয়ামি।' (অর্থাৎ 'সময় হলে তোমাকে রহস্যকথা বলব। এখন তোমার তিরস্কারের উত্তর দেবার সময় আসেনি')।

ষষ্ঠ অঙ্কে রহস্যের উন্মোচন হয়। সীতাহরণের সংবাদে যখন ভরত বিপর্যস্ত হয়ে নিজমাতাকে আবার তিরস্কার আরম্ভ করেন তখন কৈকেয়ী বলেন, (স্বগত) "এখন সময় হয়েছে—এবার বলি।" তারপর বলেন, "ভরত, তুমি মহারাজের শাপবৃত্তান্ত জান না।" কৈকেয়ী সুমন্ত্রকে শাপ বৃত্তান্ত জানাতে বললেন। মূল রামায়ণে দশরথ মৃত্যুর পূর্বে শোকবিহ্বল অবস্থায় রাত্রে কৌশল্যার কাছে শাপবৃত্তান্ত শোনান। যৌবনে রাজকুমার অবস্থায় দশরথ শব্দছেদী বাণের সাহায্যে ভ্রমক্রমে অন্ধকমুনির পুত্রকে হত্যা করেন। ঋষিপুত্র অন্ধ পিতামাতার জন্য কলসে জল আহরণ করতে নদীতে নেমেছিল। মৃগ মনে করে দশরথ তাঁকে বাণবিদ্ধ করেন। পুত্রের মৃত্যুতে পরমশোকার্ত ঋষি ও ঋষিপত্নী দশরথকে শাপ দেন যে—পুত্রশোকেই তাঁর মৃত্যু হবে। অযোধ্যাকাণ্ডের ৬৩ সর্গে এর বর্ণনা আছে। এরপরই দশরথ মারা যান।

নাটকের মধ্যে সুমন্ত্র যখন এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করলেন তখন কৈকেয়ী বললেন, এই মহর্ষি শাপের জন্য রামকে বনে পাঠান হয়েছে—আমি কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়েছি বটে কিন্তু রাজ্যলোভে আমি একাজ করিনি। রাম বনে না গেলে পুত্রবিয়োগে দশরথের মৃত্যু হত না এবং তাতে ঋষিবাক্য ব্যর্থ হত। ভরত প্রশ্ন করলেন, আমিও ত পুত্র। আমাকে কেন বনে পাঠালে না? কৈকেয়ীর উত্তর, বৎস তুমি শিশুকাল থেকে মাতুলকুলে প্রবাসী, তোমার বিয়োগে রাজার মৃত্যু হত না। অর্থাৎ যে রামকে তিনি প্রাণাধিক ভালবাসতেন এবং রাজা করতে মনস্থ করেছিলেন তাঁর বনবাসে দুঃখ সহ্য করতে না পেরে তিনি মৃত্যু হন। ভরত এইসব শুনে নিজের ভ্রান্তিবশত মাতৃতিরস্কার প্রভৃতির জন্য মায়ের কাছে ক্ষমা চাইলেন। কৈকেয়ী উত্তরে বললেন, "কা নাম মাতা পুত্রস্যাপরাধং ন মর্যয়তি। কোহত্র দোষ।" (পুত্রের দোষ কোন মা না ক্ষমা করে।) এভাবে কৈকেয়ী কলঙ্ক মুক্ত হলেন। কৃত্তিবাস কবি লঙ্কাকাণ্ডে রামের কৈকেয়ী সম্ভাষণের সময় কৈকেয়ীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

বনে গেলি দেবতার কার্যসিদ্ধি লাগি।
আমারে করিলে কেন নিমিত্তের ভাগী ॥

এভাবে সব দোষ দৈব ও ধর্মের ঘাড়ে চলে গেল। আদর্শ চরিত্র মাতা পুত্র ভ্রাতা পত্নী এরা সব দোষমুক্ত হলেন। কিন্তু মূল দোষ তো দশরথের—সে কথা তোলা হল না কেন? ■

গ্রামীণ পরিবেশে একটি 'আশ্রম'

শ্রীমতী

কলকাতার লাগোয়া—কত আর হবে—বড় জোর কুড়ি পঁচিশ কিঃমিঃ দূরের গ্রামগুলোকে দেখলে সত্যিই মনে হয় আমাদের কলকাতা কল্লোলিনী। জায়গাটার নাম কান্দিহাটি। কলকাতা বিমানবন্দরের কাছেই। অথচ শান্ত। ব্যস্ততার রেশ নেই। একটা ছিমছাম হালকা বৃষ্টির আমেজ নিয়ে গিয়েছিলাম একজন বাঙালী ভদ্রলোক ও তাঁর বিদেশিনী স্ত্রীর দীর্ঘদিনের কর্মযোগ দেখতে। আজ থেকে প্রায় বারো-তেরো বছর আগে শিলং স্টেট ব্যাংকের কর্মী অরবিন্দ দে ও তাঁর স্ত্রী এলি দে যখন এখানে আসেন তখন জায়গাটা ছিল একটা জলাবদ্ধ জমি। উদ্দেশ্য ছিল গ্রামবাংলার উন্নতি বিধানে কিছু করা। পর্যাপ্ত অর্থও ছিল না কিন্তু ছিল দুটি মানুষের মনের একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা। আর তাই দিয়েই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে ওঁদের আ[illegible]কের এই আশ্রম। ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম ওঁদের আশ্রম 'নবজীবন কেন্দ্র'। মেয়েদের স্বাধীনভাবে কাজ করার আয়োজনে কোন ত্রুটি নেই। আশ্রমের একদিকে ওঁদের স্কুল। প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। অর্থাৎ ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ। টালি আর খড়ের ছাউনি দেওয়া ক্লাসরুম। বাচ্চাদের হাতের তৈরি টুকিটাকি জিনিস দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। মোট ছ'জন শিক্ষয়িত্রী। সকলেই আশপাশের গ্রামের মেয়ে। 'এখানে বাচ্চাদের স্কুলের পোশাক দেওয়া হয় বছরে দু-বার। এছাড়া টিফিনের ব্যবস্থা আছে।' ছুটির ঘন্টা হয়েছিল। প্রতিটি বাচ্চাকে নিজে হাতে লাইন করাতে করাতেই কথাগুলো বললেন এলি। শিক্ষিকারাও কেমন শান্তভাবে কাজ করে চলেছেন। ছুটোপাটি নেই, নেই কোন উত্তেজনা, অথবা বাড়ি ফেরার তাড়া। ওখান থেকে গেলাম ওঁদের হাতের কাজ অর্থাৎ বাটিক ঘরে। একটা ঘরে মোম, রঙ তুলি নিয়ে বসে কাজ করছিল তিনজন—পুষ্পা, শিপ্রা আর কল্পনা। মাটির ওপরেই ধপাস করে বসে পড়লেন বিদেশিনী এলি। এখানে গ্রামের মেয়েরা এসে বাটিকের নানান জিনিসপত্র—টেবিল ক্লথ, পর্দা, বিছানার চাদর—তৈরি করে দেন। রঙ, মোম অথবা কাপড় কিছুরই খরচ নেই। পারিশ্রমিক পান মাসে তা প্রায় ৪০০-৪৫০ টাকার মতন।

এলি দে-র 'নবজীবন কেন্দ্র'র ছেলেমেয়েরা — ছবি : শিপ্রা দাস

দশ বছর ধরে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বেড়ে উঠেছে, একটা সার্থক রূপ পেয়েছে এই 'নবজীবন কেন্দ্র'।

নবজীবন কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। কলকাতা থেকে ডাক্তার আসেন সপ্তাহে দু-দিন। তাছাড়া মহিলাকর্মীরা সবসময় তৈরি থাকেন যে কোন ধরনের প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য। এছাড়াও গ্রামের মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সাহায্যার্থে এক বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন এই সংস্থা। প্রতি বছর গড়ে ৪০-৫০টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয় গ্রামের মহিলাদের। নবজীবন কেন্দ্রের দুই প্রধান সদস্য মিহির চক্রবর্তী ও হরিপদ চক্রবর্তী বললেন, 'ডেনমার্ক, নরওয়ে থেকে আমরা কিছু অনুদান পাই ঠিকই তবে এখন গ্রামের মেয়েদের কাজের ফসল থেকেই আমাদের অনেকটা সাশ্রয় হয় আর তাই দিয়ে নতুন নতুন প্রকল্পের কথাও আমরা ভাবছি বা করছি।' ওঁদের কর্ম তৎপরতার নিদর্শন দেখলাম গ্রামের রাস্তার ধারে লাগানো নলকূপ দেখে। কাঁচা রাস্তা মেরামত করার চেষ্টাতেও এঁরা তৎপর। সেদিন আশ্রমের সামনে ভীড় উপচে পড়েছিল। সকলেই সেলাই মেসিন নিতে এসেছিলেন। বিদেশিনীর নীল চোখে দেখেছিলাম আনন্দাশ্রু। গ্রামের অশিক্ষিত মহিলাদের মনের আনন্দ, নিজের পায়ে দাঁড়াবার আনন্দও বুঝি বিন্দু বিন্দু হয়ে গড়িয়ে পড়েছিল দুটি চোখ ছাপিয়ে। ■

বৃক্ষ-নিবাসে বাজ পড়েছে !
কড়াত্ !

ছাতে আগুন ধরে গেছে ! বেরিয়ে এসো !
!

ছাতে আগুন ধরে গেছে সবাই নীচে নামো ! কিন্তু ঝড়িতেও আগুন!
দড়ি বেয়ে নামতে হবে ! আমি নামিয়ে দিচ্ছি !

ওদের কোলে করে নামাবার দরকার নেই । বাঁদরের মতো ওরা দড়ি বেয়ে ওঠানামা করে !
ঠিক বলছিস ?
হ্যাঁ, বাবা, ঠিক !

দেখছ মা ?
দেখছ বাবা ?
6/23

ডায়ানা, তুমি পারবে ?
বাচ্চারা যদি পারে, আমিও পারব ।

নুকো, জল ঢেলে আগুন নেভাও !

নুকো !
!
ক্রমশ ● ২

টপ্পা

নিধুবাবু

ট্রামে দারুণ ভীড়। সামনের স্টপে নামতে হবে। ভূপতি আর মন্মথ ঠেলেঠুলে দরজার দিকে এগোতে লাগল।

দরজার কাছাকাছি এসে ভূপতি বলল—সর্বনাশ হয়ে গেছে।

মন্মথ চমকে উঠে বলল—অ্যাঁ? পকেটমার হয়েছে নাকি?

—না, না, সেসব কিছু না। ভাড়া দেওয়া হয়নি।

মন্মথ বিরক্ত হয়ে বলল—এখন ভাড়া দিবি কেমন করে? কন্ডাকটার রয়েছে ট্রামের আরেক দিকে। আবার ভিড় ঠেলে যাবি?

ভূপতি বলল—যাব।

মন্মথ বলল—পাগলামি রাখ। দুজনের ভাড়া তো হবে একটাকা। একদিন একটাকা ভাড়া না দিলে কোনও ক্ষতি হবে না।

ভূপতি ঘাড় নেড়ে বলল—ভাড়া আমি দেবই। ভাড়া না দিলে অসৎ কাজ করা হবে। অসৎ কাজ আমি কিছুতেই করব না। সততার ফল সবসময় ভালো হয়।

মন্মথ ধমক দিয়ে বলল—তোর যা খুশি কর।

—সততার ফল সবসময় ভালো হয়। বলতে-বলতে ভূপতি ভিড় ঠেলে কন্ডাকটারের কাছে গেল, টিকেট কেটে ফিরে এল, স্টপে নেমে পড়ল দুজন।

ট্রাম চলে গেল।

ভূপতি আবার বলল—সততার ফল সবসময় ভালো হয়।

মন্মথ ধমক দিয়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, থামিয়ে দিয়ে ভূপতি বলল—হাতে-হাতে প্রমাণ পেয়েছি।

মন্মথ অবাক হয়ে বলল—কী প্রমাণ?

ভূপতি শান্ত গলায় বলল—কন্ডাকটারকে আমি একটা দু-টাকার নোট দিয়েছি। কন্ডাক্টার সেটাকে পাঁচ টাকার নোট ভেবে—এই দ্যাখ—আমাকে চারটাকা ফেরত দিয়েছে।

* * * *

"একদিন সন্ধ্যাবেলা দারোগা ও রামসদয় একটি মাঠের মাঝখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মাঠের মাঝখানে কতকগুলি গাছ ছিল। এই গাছের ভিতরে কে কাঁদিতেছিল ও কে কি বলিতেছিল। দারোগা ও রামসদয় চুপি চুপি নিকটে গিয়া, আড়াল হইতে শুনিতে লাগিলেন। একটি বালিকা বলিতেছে,—'ওগো! তোমরা আমাকে ফাঁসি দাও, আমার বাবাকে ফাঁসি দিও না, তোমাদের পায়ে পড়ি আমার বাবাকে ছাড়িয়া দাও।'

"বালিকার পিতা বলিতেছেন,—'আমার নিকট কিছুই নাই, পরনের কেবল কাপড়খানি, আর এই জলে কাচা দোবজা। দোবজার খুঁটে কেবল একপণ কড়ি বাঁধা রহিয়াছে। ভিক্ষা করিয়া মেয়েটিকে লইয়া পথ চলিতেছি। আমাদিগকে মারিবার আবশ্যক কি? এই একপণ কড়ি লও, লইয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও।'

'রামসদয়কে দারোগা চুপি চুপি বলিলেন,—'এ চাঁদ চাটুয্যের ফাঁসুড়ের দল। চাঁদ কাহাকেও ছাড়ে না। এখন এই দুইজনকে ফাঁসি দিবে। চাঁদ আমাকে অনেক দিন কিছু দেয় নাই। আজ বিলক্ষণ দু পয়সা আদায় করিতে হইবে। সব প্যাটের জন্য। আজকাল লোকের ধর্ম নাই। আমাকে সবাই ফাঁকি দেয়, আমার প্যাট ভরে না।'

"ফাঁসুড়েদের দলপতি চাঁদ সেই পথিককে বলিল,—'কি! তোমার একপণ কড়ি লইয়া তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিব? আমি চোর নই, ডাকাত নই, যে অমনি তোমরা কড়ি লইয়া ছাড়িয়া দিব? আমি কাহারও কাছে কিছু লই না। তোমাদের দুইজনকে ফাঁসি দিয়া মারিতে আমার পরিশ্রম হইবে। সেই পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ আমি এই একপণ কড়ি লইব। আমি চোর নই যে, অমনি কাহারও নিকট হইতে কিছু লইব।'

"এই বলিয়া চাঁদ ও চাঁদের একজন সঙ্গী, পথিক ও পথিকের কন্যার গলায় ফাঁস লাগাইয়া দিল। ফাঁস টানিয়া তাহাদের প্রাণ বধ করে আর কি, এমন সময় দারোগা ও রামসদয় তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"দারোগা বলিলেন,—'কি চাঁদ! এ তোমার কি হইতেছে! রোজ রোজ তুমি এত রোজগার করিতেছ, আর এই থানার দারোগা বেটাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ? চল, এখন নবাবের দরবারে যাইতে চল।'

"চাঁদ ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল। দারোগার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে দারোগা বিলক্ষণ দুই পয়সা ঘুষ লইয়া চাঁদকে ছাড়িয়া দিলেন। দারোগা বলিলেন,—'সব প্যাটের জন্য।' (ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়: সেকালের কথা, 'সখা ও সাথী', বৈশাখ, ১৩০১, পৃঃ ১৫—১৬)

* * * *

অনেকদিন থেকেই নিখিলবাবু একটা বাচ্চা চাকর খুঁজছেন। সত্যি, একটা বাচ্চা চাকরের অভাবে খুব অসুবিধা হচ্ছে, পেলে সুবিধা। কথাটা নিখিলবাবু অনেককেই বলেছেন, কেউ যদি যোগাড় করে দিতে পারেন।

রমানাথবাবু একটি বাচ্চা ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন নিখিলবাবুর কাছে।

নিখিলবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তোর নাম কী?

ছেলেটি জবাব দিল—আজ্ঞে, আমার নাম পঞ্চানন।

—বাড়ি কোথায়?

—আজ্ঞে, বাঁশপাড়া।

—তোর মা-বাবা আছে?

—আজ্ঞে, 'আছেও' বলতে পারি; আবার 'নেইও' বলতে পারি।

জবাব শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন নিখিলবাবু। আছেও? নেইও? এ কেমন' কথা!

নিখিলবাবু জিজ্ঞেস করলেন—আছেও? নেইও? কী ব্যাপার রে?

ছেলেটি হাত কচলাতে-কচলাতে বলল—আজ্ঞে, আগে আমার একজন বাবা ছিল, একজন মা ছিল। মা মারা গেল, বাবা আবার বিয়ে করল। বাবার যে বউ হল, বাবু, সে আমার 'মা' হল না?

নিখিলবাবু সায় দিয়ে বললেন—তা তো হলই।

ছেলেটি বলতে লাগল—আজ্ঞে, তারপর আমার বা[illegible]ল। তখন নতুন মা আবার বিয়ে কর[illegible]র যে স্বামী হল, বাবু, সে আমার '[illegible]? তাই তো বলছিলাম, আমার মা-বাবা 'আছেও' বলতে পারি, আবার 'নেইও' বলতে পারি।

ছবি: দেবাশিস দেব

সমাপ্ত ঘোষ

অমর্ত ওষুধ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক পা জলায়, এক পা ক্ষারে।
'ভীরু' বলে ডেকে যাও—খরায় পুড়পুড় করছে রাঢ়া মাঠ!
হাও হাওয়া হেঁটে যেতে বিনি মেঘে রক্ত ছাট দিয়ে পড়ছে
তীরধারা! 'ভীরু'—
হাঁক দিয়ে যাও—ফুলে ফুলে ওঠে দামোদর বান!
'ভীরু, ভীরু'—

নিশি ডাক দিয়ে ওঠে—ঈশান পশ্চিম
দীপ ধরে যেতে হাওয়া ঘিরে পড়ল তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে!
বর্ষা মাসে উদরপূরণ করবে? এত আড়ি? ভাবতে ভাবতে
মণিপাথরায় ঝলমল করছে গাছের তোরণ!
ফণা দিয়ে জ্বলে উঠল হাজা কানা ঢেউ,
পাতা বিড়বিড় করছে সারারাত…

এক পা জলায়, এক পা ক্ষারে।
হাঁক দিয়ে ছুটে যাও—দীপ ধরে যেতে
হিংস্র শিস দিয়ে পড়ল অযোনি, শঙ্কর…
রোজা ডাকব? ঘর
বন্ধন করে থাকব সারারাত? নিলক্ষ্মা কুঠরি
অমর্ত ওষুধ জ্বাল দিতে দিতে ভাবি:
বাপ আমার হাজা কানা ঢেউ,
মা আমার জঙ্গলের পাতা,
বারোশিঙা ভাই আমার তীরের কাকতে ধাঁধা পড়ে!
আমি কেন হাজা কানা ঢেউ,
জঙ্গলের ভর লাগা পাতা,
তীরের কাকতে ধাঁধা পড়া
অনেক পশুর মতো ঝলমল মণিপাথরার নিচ দিয়ে
ঢুকতে পাব না!

কথাগুলি মন্ত্র হয়ে যায়

সুজিত সরকার

গভীর সবুজে নীলে ভ'রে আছে হৃদয়ের প্রান্তর আকাশ।

এখন আমার কণ্ঠস্বর
নগ্ন
এখন আমার উচ্চারণ
শুদ্ধ
এখন আমার কথা
মন্ত্র হয়ে যায়।

ছিল ছোট ছোট লোভ,
সন্দেহ, ঘৃণা ও ভয়,
ছিল পাপবোধ ও জিজ্ঞাসা,
এখন সবুজে নীলে ভ'রে আছে হৃদয়ের প্রান্তর আকাশ—
কথাগুলি মন্ত্র হয়ে যায়।

অসুখবিসুখ

রত্নেশ্বর হাজরা

জ্বর হয় প্রত্যেক ঘুমের আগে তার
শরীরে ভীষণ ব্যথা হয়
বুকের কোথায় যেন অসহ্য যন্ত্রণা হয়
ঘাম হয়—
সমস্ত শরীরে একটা অরণ্য জন্মায়,
শীত যে কোথায় চলে যায়!
কুয়াশা কোথায় চলে যায়!

প্রত্যেক রাত্রিতে তার ভীষণ রহস্য জমা হয়
কোনো দরজা
খুলে যেতে চায় কোনো ঘর
বন্ধ হতে চায়—

গভীর অরণ্য থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে বাঘ
সেই গন্ধ ছড়ায় জ্যোৎস্নায়: শুধু
ভিতরে কোথাও একটা নীল
আরো ঘন হয়—যেন কেউ
'আসবে' 'আসবে' এমন ধ্বনি
অদ্ভুত উত্তাপ হয়ে যায়—

জ্বর হয় প্রত্যেক ঘুমের আগে তার
সমস্ত শরীরে একটা আক্রোশ জন্মায়

একটু আদিম বেশেই তুমি এসেছিলে

শমীতা দাশ দাশগুপ্ত

একটু আদিম বেশেই তুমি সামনে এসেছিলে
তোমার বাদামী শরীর আবলুস তেলে মাখামাখি
নিঃশ্বাসে পেয়েছিলাম দূর দ্বীপের কমলা গন্ধ
আমার বান্ধবীরা ঠোঁট চেটেছিল চকাৎ করে—
ওরা চেয়েছিল সঙ্ঘবদ্ধভাবে তোমায় উপহার দেবে
হিম সভ্যতার কিছু ভোঁতা চাবি
দুচারটে মরচেধরা তালা
এমনকি মেরুপথের হদিস
আরও কিছু এটা সেটা
জানি, ওসব কিছুই তোমায় মানায় না—
তবু, বোঝ নিশ্চয়ই, প্রাগৈতিহাসিক বক্তলাল
মহীরুহ দেখে কেন নারী বুকে হেঁটে এগিয়ে যায়
সমুদ্র বা পাহাড়ের সামনে অনিচ্ছুক
মানুষও কেন হারিয়ে যায় থেকে থেকে!
তাই, আগ্রাসী ছিনতাইর মুখে দাঁড়িয়ে
দু হাত তুলে বলেছি ওঁ শান্তি!
ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!
হে আদি পুরুষ, আমার এ অর্ঘ
তুমি প্রসন্ন মনে গ্রহণ কর—

সাম্প্রতিক কালে আমার জীবনেও
এমন ঘটনা খুব বেশী ঘটেনি।

সুনীলের ব্যক্তিগত এবং ভারতের দলগত

কৃশানু ভট্টাচার্য

ভারতের গত অস্ট্রেলিয়া সফরের সময়েই একটা গুজব শোনা গিয়েছিল সুনীল গাওস্কর নাকি অবসর নেবার মুখে। খবরটা ভারতের আপামর সুনীল অনুরাগীদের কাছে শেলাঘাতসম ছিল। অনেকে প্রশ্নও তুলেছিলেন, গাওস্কর এখনও দক্ষতার শীর্ষে, তিনি অন্তত আরো বছর তিনেক ভারতের ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড হয়ে থাকার মত ক্ষমতা ধরেন। তবে কেন এই অবসর নেওয়া ?

রান সংগ্রহকারী হিসাবে গাওস্করই ভারতের তথা বিশ্বের সর্বাধিক সফল ব্যাটসম্যান। তাঁর টেস্টে একটানা সাফল্য, গভীর মনঃসংযোগ, পাহাড় প্রমাণ ধৈর্য প্রভৃতি আজ প্রবাদে পরিণত। মাদ্রাজের টাই টেস্টটি পর্যন্ত ধরে এ পর্যন্ত তিনি ১১৬টি টেস্ট খেলেছেন। এই মুহূর্তে অনেকগুলি বিশ্বরেকর্ডের তিনি অধিকারী, যেমন সর্বাধিক টেস্ট, একটানা একশ টেস্ট, সর্বাধিক ইনিংস, সর্বাধিক রান (৯৪৬৫), সর্বাধিক সেঞ্চুরি ইত্যাদি।

গাওস্করের সংগৃহীত বিরাট রান এবং ৩২টি টেস্ট সেঞ্চুরির দিকে নজর রেখেও অনেকে প্রশ্ন করেন, ওর ব্যক্তিগত ভূমিকার জোরে ভারত কবার জিতেছে ? টিপিক্যাল সুনীল ভক্তরা টেবিল চাপড়ে হয়তো বলে উঠবেন, গাওস্কর ছাড়া ভারতীয় দলকে জেতাচ্ছে কে ? ভারতের জয় বার বার গাওস্করের সেঞ্চুরির মধ্যে দিয়েই ত এসেছে।

রেকর্ড বই বলছে গাওস্কর যে টেস্টে সেঞ্চুরি অথবা ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন ভারত খুব কম ক্ষেত্রেই সেইসব টেস্টে জয়ী হয়েছে। ব্যাপারটি এমন দাঁড়িয়েছে যে টেস্টে সুনীল খারাপ খেলেছেন

রেকর্ড, আরও রেকর্ড—কিন্তু ভারতের জয়ে গাওস্করের ভূমিকা ? ছবি : অমিয় তরফদার

সে টেস্টে ভারত জিতেছে আর যেখানে ভাল খেলে সেঞ্চুরি করেছেন ভারত হয় সে টেস্ট হেরেছে আর নয় ড্র করেছে।

সানির এই অদ্ভুত পরিসংখ্যানের পাশে গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথের প্রসঙ্গ টেনে আনছি। দীর্ঘদিন এঁরা একত্রে টেস্ট খেলেছেন। একটা সময় ছিল যখন এই দুজন ভারতীয় ব্যাটিংয়ের হালটি ধরে রাখতেন। কিন্তু দুজনের খেলায় যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। প্রয়োজনের সময় যেখানে গাওস্কর চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিতেন, দলের সেই সংকটে বিশ্বনাথকে প্রায়ই দেখা যেত ত্রাতার ভূমিকায়। যখন প্রয়োজন নেই তখন সানির ব্যাট ঝলসিয়ে উঠছে, সেঞ্চুরির পর সেঞ্চুরি তাঁর ঝুলিতে জমা হচ্ছে, রেকর্ড বইয়ের পাতায় তাঁর নামের পাশে যোগ হচ্ছে নতুন নতুন রেকর্ড।

অন্যদিকে দলের সুবিধাজনক অবস্থায় বিশ্বনাথের ভূমিকা অনেকটা দর্শকের মত, রানের পাহাড় গড়ার তেমন আগ্রহ বিশ্বনাথের কোন কালেই ছিল না। কিন্তু ভারত যখন পরাজয়ের প্রহর গুনছে অথবা জেতার মত অবস্থার সৃষ্টি করেছে সেই মুহূর্তগুলিতে বিশ্বনাথের ব্যাট বিশ্বস্ত ভূমিকা পালন করেছে। পরের দিকে এই ভূমিকায় দেখা গেছে মহিন্দর অমরনাথ, দিলীপ বেঙ্গসরকর এবং রবি শাস্ত্রীকে।

শুধু টেস্ট ম্যাচ নয়, একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলিতেও গাওস্করের রানের স্তূপ দেখলে চোখ ঝলসে যায়। ভারতীয়দের মধ্যে একদিনের ক্রিকেটে গাওস্কর ও বেঙ্গসরকর ছাড়া আর কেউ দু' হাজার রানের গণ্ডি পেরোতে পারেননি। কিন্তু এখানেও গাওস্কর সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য। তাঁর ভালো খেলার সুবাদে ভারত একদিনের ম্যাচে জয় পেয়েছে এমন ঘটনার সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়।

গাওস্কর প্রথম টেস্ট খেলেন ১৯৭০-৭১ সিরিজে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে। তিনি পোর্ট-অফ-স্পেনের দ্বিতীয় টেস্টে জীবনের প্রথম টেস্ট খেলেন। ভারতের সাত উইকেটে জয়ের পিছনে সানির অবদান ছিল অনেকখানি। পরের তিনটি টেস্টে গাওস্কর চারটি সেঞ্চুরি করা সত্ত্বেও সব কটি টেস্টই ড্র হয়। কিন্তু এই সফরে গাওস্করের আশাতীত ব্যাটিং সাফল্য তাঁকে অচিরেই ভারতের এক নম্বর ব্যাটসম্যানে পরিণত করে। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে তাঁর মত সাফল্য বিশ্বের আর কোন ব্যাটসম্যান পাননি। সাতাশটি টেস্ট খেলে ১৩টি সেঞ্চুরি (দুটি ডাবল সহ) করেছেন গাওস্কর। কিন্তু

ওদের বিরুদ্ধে এই অর্থে কতবার বিজয়ী হয়েছি আমরা ?

গাওস্কর ভারতীয় ক্রিকেট দলের অপরিহার্য এরকম একটা ধারণা চালু হয়ে যায় ১৯৭০-৭১ সিরিজ শেষেই।

কিন্তু দেশের মাটিতে ভারতীয় দল সর্বপ্রথম ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারায় গাওস্করের সাহায্য ছাড়াই। ১৯৭৪-৭৫ সিরিজে লয়েডের দলকে কলকাতায় তৃতীয় টেস্টে হার স্বীকার করতে হয় প্রধানত বিশ্বনাথের অসাধারণ ব্যাটিংয়ের জন্য। রবার্টস, (তখন ফর্মের তুঙ্গে) বয়েস, হোল্ডার, ও জুলিয়েনের দুরন্ত ফাস্ট বোলিংকে ছেলেখেলার পর্যায়ে নামিয়ে এনে বিশ্বনাথ ১৩৯ রানের এক অমূল্য ইনিংস খেলেন। ভারত জয়লাভ করে। মাদ্রাজে পরের টেস্টেও বিশ্বনাথের অনবদ্য এবং সংগ্রামী ৯৭ রানের ইনিংসটি ভারতকে জয়ের পথ দেখায়। আঙুলে চোট পাওয়ায় গাওস্কর এই দুটি টেস্টে খেলতে পারেননি।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ভারত তার চতুর্থ জয়টি পায় ১৯৭৬-৭৭ সিরিজে পোর্ট অফ-স্পেনের তৃতীয় টেস্টে। ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে ৪০৪ রানের পেছনে তাড়া করে সাত উইকেটে এক অভাবিত জয় পায়। গাওস্কর ১০২ রান করেন। কিন্তু গাওস্কর যখন আউট হলেন তখনও জয় ভারতের নাগালের অনেক বাইরে। এই সব মুহূর্তের জনাই যেন অপেক্ষা করতো বিশ্বনাথের ব্যাট। এই ম্যাচের লাগাম বিশ্বনাথ একবারের জন্যও ছাড়েননি এবং ১১২ রানের এক ঝোড়ো ইনিংস(লয়েড নতুন বল নেবার পর বিশ্বনাথ আরো তাড়াতাড়ি রান তোলেন) খেলে যখন তিনি আউট হলেন তখন জয় প্রায় ভারতের মুঠোয়। অমরনাথের ৮৫ রানও খুবই কাজে লেগেছিল।

পাকিস্তান সফরের পরই (১৯৭৮-৭৯) সুনীল গাওস্কর ভারতের অধিনায়ক হিসেবে মনোনীত হন। ১৯৭০-৭১ থেকে পাকিস্তান সফর অবধি গাওস্কর মোট ৪০টি টেস্ট খেলেন। প্রতিটি সিরিজেই তাঁর রান উল্লেখযোগ্য। আর রান আসবেই বা না কেন ? প্রতিটি বল দেখে শুনে, অজস্র সময় নিয়ে খুঁটে খুঁটে একটি একটি করে রান সংগ্রহ করেছেন গাওস্কর। অসীম তাঁর ধৈর্য, অখণ্ড তাঁর মনঃসংযোগ। এই ৪০টি টেস্টে তিনি ১৫টি সেঞ্চুরি (দুটি ডাবল সহ) করেন। পলি উমরিগড় ১২টি সেঞ্চুরি করে ভারতীয়দের শীর্ষে ছিলেন। সুনীল তাঁর রেকর্ড ভেঙে দেন।

কিন্তু ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের অতি দুর্লভ বস্তু 'জয়' কতবার অর্জিত হয়েছে এই ৪০টি টেস্টে ? আমরা জানি ক্রিকেট একার খেলা নয়, দলগত খেলা। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল দলগত খেলা হলেও একজন ব্যাটসম্যান অথবা একজন বোলারও ভূরি ভূরি টেস্ট জিতিয়েছেন। এঁরা নিশ্চয়ই দেখাতে পেরেছেন। তিনি হলেন কপিলদেব নিখঞ্জ। কিন্তু পাকিস্তান সফরের পরই তাঁর প্রকৃত ফর্ম খুঁজে পাওয়া যায়। ১৯৭০-৭১ সিরিজ থেকে ১৯৭৮-৭৯ সিরিজ অবধি ভারত তাই ৪৩টি টেস্ট খেলে মাত্র ১৩টি টেস্টে জয়লাভ করে এবং ১৮টি ক্ষেত্রে পরাজিত হয়।

ভারতের এই ১৩টি টেস্ট জয়ে গাওস্করের চওড়া ব্যাট কতবার শতরানের গণ্ডী পেরিয়েছে সে হিসেবটি দেখা যাক। গাওস্করের সেঞ্চুরি ও ভারতের জয় এই ব্যাপার দুটি একত্রে ঘটেছে মাত্র

পুরানো সেই দিনের কথা—দুই 'ক্ষুদে' শিল্পী ব্যাটহাতে মধ্যমাঠে

অসাধারণ ক্রিকেটার। আর অসাধারণ আখ্যা তখনই দেওয়া হয় যখন একজনের প্রতিভা, ক্রীড়া দক্ষতা বাকি ১০ জনের থেকে অনেক, অনেক গুণ বেশি হয়। একজনই বাকি সবাইকে ছাড়িয়ে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে যান যেখানে তাঁর নাগাল ধরা বাকিদের পক্ষে আর সম্ভব হয় না। ব্র্যাডম্যান, সোবার্স অথবা হাল আমলের রিচার্ডস এইসব অসাধারণদের দলে পড়েন।

একাই ম্যাচ জিতিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ভারতীয় দলের একজনই চারবার। গাওস্করের সেঞ্চুরি সত্ত্বেও ভারত ম্যাচ হেরেছে চারবার (পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯৭৮-৭৯ সিরিজে তৃতীয় টেস্টে জোড়া সেঞ্চুরী করেও সুনীল ম্যাচ বাঁচাতে পারেননি।) পাঁচটি অমীমাংসিত টেস্টে বাকি ছয়টি (১৯৭০-৭১ সিরিজে সোবার্সের দলের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেস্টে সেঞ্চুরি ও ডাবল সেঞ্চুরি) সেঞ্চুরি করেছেন সুনীল।

সফল ভারতীয় অধিনায়কদের মধ্যে গাওস্কর একজন। মোট ৪৫টি টেস্টে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। তাঁর টেস্ট জীবনকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়—অধিনায়ক হবার আগের জীবন, অধিনায়ক হিসেবে এবং অধিনায়কত্ব চলে যাবার পরে। ব্যাটসম্যান গাওস্কর অধিনায়ক হিসেবেও সেঞ্চুরি পেয়েছেন, রান করেছেন। দল পরিচালনার কোন চাপ তাঁর ব্যাটিংকে প্রভাবিত করতে পারেনি। মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করার মত ঘটনা এটি। তাঁর আর একটি গুণ কোন টেস্টেই হারবো না এই মানসিকতা।

কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের কি লাভ হয়েছিল তাঁর এই মনোভাবের জন্য ? ব্যাট করার সময় আরো যেন বেশি সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। যত বেশি সম্ভব রান করে দলকে এবং নিজেকে পরাজয়ের দরজা থেকে যতদূর সম্ভব দূরে রাখতে চেয়েছিলেন গাওস্কর। এবং সফলও হয়েছিলেন। ফলে দর্শকদের দেখতে হয়েছিল একের পর এক বিরক্তিকর নিষ্ফলা টেস্ট।

কালীচরণের দুর্বল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৭৮-৭৯ সিরিজে যেন রানের বন্যা নেমেছিল সুনীলের ব্যাটে। ছয় টেস্টে ৭০০ রানের বেশি করে নিশ্চয়ই আনন্দিত হয়েছিলেন তিনি। চার চারটি সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন। কলকাতা টেস্টে প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করার পরে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৮২ রান করতে এত সময় নিয়ে ফেলেছিলেন যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের শেষ দুই ব্যাটসম্যান যখন ব্যাট করছে তখন অন্ধকারে বল প্রায় চোখেই পড়ে না।

এতসব কাণ্ড করেও একটির বেশি টেস্টে জয়লাভ করতে পারেননি গাওস্কর। মাদ্রাজের যে টেস্টে ভারত জয়লাভ করে সেই টেস্টে পিচে বল পড়ে এমন খামখেয়ালি আচরণ করেছিল যে বিশ্বনাথের মত লড়াকু ক্রিকেটারের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল ১২৪ রানের একটি ঝকঝকে ইনিংস খেলা। গাওস্করের অবদান ?

১৯৮২-র গ্রীষ্মে ওভালে গাওস্করের ২২১ রানের ইনিংসটি অনেকেই ভুলতে পারবেন না। সেদিন সমস্ত ইংরেজ বোলারদের চরম হতাশ করে দীর্ঘ নয় ঘণ্টা ব্যাট করেছিলেন তিনি। কিন্তু ভারত মাত্র নয় রানের জন্য ওই টেস্টটিকে ড্র রাখতে বাধ্য হয়। গাওস্কর সেদিন আর একটু তৎপরতা দেখালে ভারত হয়ত জিততো।

ওভালের এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি অনেকবার ঘটেছে। ভারত জয়ের কাছাকাছি, ক্রিজে হয়ত গাওস্কর তখনও আছেন। আমরা যখন অপেক্ষা করছি এবং আশা করছি ভারত ওই ম্যাচে উৎরে যাবে, ঠিক তখনই গাওস্কর আউট হয়ে গেছেন আর ভারতের পরের দিকের ব্যাটসম্যানরা তাঁদের উইকেট বিলিয়ে হয় ম্যাচ হেরে বসেছেন আর নয়তো কোনরকমে ম্যাচটিকে ড্র করেছেন। ব্যাপারটি অনেকটা কাকতালীয় গোছের।

অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ১৯৭৭-৭৮ সিরিজের প্রথম টেস্টে ভারত মাত্র ১৬ রানের জন্য হেরে যায়। দ্বিতীয় ইনিংসে গাওস্কর তাঁর সেঞ্চুরি পূর্ণ করেছেন এবং ভারত জিতবে এই অবস্থায় গাওস্কর হঠাৎ আউট হয়ে যান। অথচ আর আধ ঘণ্টা ব্যাট করলে ভারত হয়ত জিততো। এটা কেন হয় জানি না। আমাদের জয়ের স্বপ্ন দেখিয়ে গাওস্কর অনেকবারই আমাদের হতাশ করেছেন। অথচ তাঁর কাছ থেকে আমরা সেরা খেলাটাই সর্বদা আশা করি। তিনি তাঁর সেরা খেলা হয়ত খেলেন কিন্তু কোথায় যেন একটু ফাঁক থেকে যায়। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ওই একই সিরিজের পঞ্চম টেস্টে সানি মাত্র ১৩ রানের জন্য সেঞ্চুরি পাননি। ভারত মাত্র ৪৫ রানে ওই টেস্ট হেরে যায়। গাওস্করের শতরান হয়ত ভারতকে নিশ্চিতরূপেই জয়ী করতো।

পাকিস্তানের সঙ্গে করাচি টেস্টে (১৯৭৮-৭৯) দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি করেও গাওস্কর ভারতকে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচাতে পারেননি। দ্বিতীয় ইনিংসে সুনীল আর কিছুক্ষণ টিকে থাকলে পাকিস্তান সময়াভাবে ওই ম্যাচ জিততে পারতো না।

অথচ গাওস্করের ২৮তম সেঞ্চুরিটি ঝগড়া করে পাওয়া। ১৯৮৩-৮৪ সিরিজে হায়দ্রাবাদের টেস্টের শেষ দিনে ম্যাণ্ডেটারি ওভারের খেলা প্রায় শেষ হবার মুখে। ম্যাচের ভাগ্য ততক্ষণে ড্রয়ের দিকে হেলে পড়েছে। পাকিস্তানের অধিনায়ক জহির অব্বাস খেলা বন্ধের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু গাওস্করের রান তখন ৮০-র ঘরে। খেলা চালানো তাই প্রয়োজন। দুই দলের মধ্যে একপ্রস্থ কথা কাটাকাটি হবার পরে খেলা আবার ফের শুরু হল আর গাওস্করও ধীরে সুস্থে তাঁর ২৮তম সেঞ্চুরি পূর্ণ করলেন।

গাওস্করের রক্ষণাত্মক দল পরিচালনার ফলে ভারত ১৯৭৯-৮০ সিরিজে অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে রাবার পায়। ১৯৮১-৮২ সিরিজে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেও ভারত রাবার ফিরে পায়। কিন্তু ৪৫টি টেস্টে অধিনায়ক হয়ে গাওস্কর যে আটটি টেস্টে জয়লাভ করেন তার কয়টিতে আছে তাঁর সেঞ্চুরি?

অধিনায়ক গাওস্কর ৪৫টি টেস্টে ১০টি সেঞ্চুরি করেন। সাতটি টেস্ট

স্বপ্নের ক্রিকেটার এবং সময়বিশেষে ভারতের রক্ষাকর্তা বিশ্বনাথ ছবি : দুর্গাপ্রসাদ

তাঁর সেঞ্চুরি সত্ত্বেও ড্র হয়।

মাত্র দুটি টেস্টে (একটি অস্ট্রেলিয়া ও অপরটি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে) গাওস্করের সেঞ্চুরি ভারতকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। বাকি যে ছয়টি টেস্ট গাওস্কর জিতেছিলেন একমাত্র বিশ্বনাথ তার একটিতে সেঞ্চুরী করেছিলেন। অধিনায়ক হিসেবে গাওস্করের সাফল্য ও ব্যর্থতা সমান সমান। তিনি যেমন আটটি টেস্টে জয়লাভ করেছিলেন, তেমনি সম সংখ্যক টেস্টে পরাজিত হয়েছিলেন। তিনি সেঞ্চুরি করা সত্ত্বেও ভারত পাকিস্তানের কাছে ১৯৮২-৮৩ সিরিজে ফয়সালাবাদ টেস্টে পরাজিত হয়।

অধিনায়ক পদ থেকে গাওস্করের বিদায়ের পর কপিলদেব টানা ১৪টি টেস্টে ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেন। এই সময়ে গাওস্কর চারটি সেঞ্চুরি করেন। চারটি ম্যাচই ড্র হয়। এই ১৪টি টেস্টের মধ্যে পাঁচটিতে ভারত পরাজিত হয়। একত্রিশ ও বত্রিশ নম্বর সেঞ্চুরি দুটো গাওস্কর করেন দীর্ঘ ১১টি টেস্টের পরে।

সুনীল গাওস্করের দীর্ঘ টেস্ট ক্রিকেট জীবনে ম্যাচ জিতানো ইনিংসের সংখ্যা খুবই নগন্য। শুধুমাত্র টেস্টেই নয় একদিনের খেলাতেও গাওস্কর একক কৃতিত্বে ভারতকে জয়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত প্রায় নেই বললেই চলে। সানিই বোধহয় বিশ্বের একমাত্র ব্যাটসম্যান যিনি ৬০ ওভারে সীমাবদ্ধ ম্যাচে ইনিংস ওপেন করে ৩৬ রানে অপরাজিত ছিলেন। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম বিশ্বকাপে।

আসলে একদিনের ম্যাচ ও টেস্টের মধ্যে গতির ছন্দে যে তফাৎ আকাশ পাতাল এটি কি সুনীলের কাছে দুর্বোধ্য ছিল। এখনো কি সেটা রপ্ত করতে পারেননি। একদিনের খেলায় তিনি এখনও সেঞ্চুরির মুখ দেখেননি। ৮৩টি ম্যাচে তিনি মোট ১১বার পঞ্চাশের গণ্ডী পেরিয়েছেন। অবশ্য বিশ্বের প্রথম সারির ব্যাটসম্যানদের তুলনায় একদিনের খেলায় তাঁর রান তুলনামূলক ভাবে অনেক কম (রিচার্ডসের রান পাঁচ হাজারের কাছাকাছি, বর্ডার, হেনেস এবং গ্রীনিজ তিন হাজারের বেশি রান করেছেন)।

রবি শাস্ত্রীকে সবাই একজন ধীর গতির ব্যাটসম্যান বলেই জানেন। কিন্তু তিনিও প্রয়োজনে যে মেরে খেলতে জানেন এবং ঠাণ্ডা মাথায় হারা ম্যাচ জিতে সগৌরবে প্যাভিলিয়নে ফিরে আসেন এটা অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করেননি। তিনিই একমাত্র ভারতীয় যিনি একদিনের খেলায় দুটি সেঞ্চুরি করেছেন। পাঁচবার 'ম্যান অফ দি ম্যাচ'-এর সম্মান তাঁর ভাগ্যে জুটেছে। কিন্তু গাওস্কর মাত্র একবার এই সম্মান পেয়েছেন। তাঁর মত প্রতিভাধর ব্যাটসম্যান কেন যে একদিনের খেলায় নিজেকে প্রমাণিত করতে পারেননি সেটাই বিস্ময়ের।

গাওস্কর ভারতের তথা বিশ্বের সর্বাধিক সফল ব্যাটসম্যান। টেস্টে তাঁর মোট রান ও সেঞ্চুরির সংখ্যার দিকে তাকালেই সেটি পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর মত ব্যাটসম্যানকে পেয়েও ভারত মোট কয়টি টেস্টে জয়লাভ করেছে? তিনি মোট ১১৬টি টেস্টে এ পর্যন্ত খেলেছেন। ভারত এই ১১৬টি টেস্টের মধ্যে জিতেছে মাত্র ২৪টি টেস্টে, হেরেছে ৩৩টিতে।

গাওস্করের সেঞ্চুরি ও ভারতের জয় এই দুটি ঘটনা একত্রে ঘটেছে মাত্র ছয়বার, সানির সেঞ্চুরি ও ভারতের পরাজয় ব্যাপারটি ঘটেছে পাঁচবার এবং ২০ বার তাঁর সেঞ্চুরি সত্ত্বেও টেস্টগুলি ড্র হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে মাদ্রাজে ভারত জিততে না পারায় ভারতীয়রা যত না দুঃখ পেয়েছেন, তার থেকে হাজার গুণে বেশি দুঃখ তাঁরা পেয়েছেন গাওস্কর মাত্র ১০ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করায়। টেস্ট ম্যাচ জেতার থেকেও সানির সেঞ্চুরি এখন আমাদের কাছে বড় গুরুত্বপূর্ণ—এটা বিস্ময় নয়? ■

বেকার ! বেকার !

'বরিস, আমি তোমার ফ্যান। ভীষণ ফ্যান ! তোমাকে চাক্ষুষ কখনও দেখিনি, টি ভি-তে অবশ্য সুযোগ পেলেই তোমার খেলা দেখি। তোমাকে এতই ভালোবাসি যে তোমার সন্তান গর্ভে ধারণ করা নিজের সৌভাগ্য মনে করব। তুমি কি আগ্রহী ? আমার নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা...' মাস ছয়েক আগে ফরাসি ওপেনে খেলা নিয়ে যখন বরিস বেকার ব্যস্ত, প্যারিসের একটি কাগজে এই বিজ্ঞাপন বেরোয়। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই প্রায় একই বয়ানে জার্মানির একটি কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় আর এক তরুণী এবং তারপর বরিস-পূজোর এই নবতম আচারটি ছড়িয়ে গেছে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও। কেউ কেউ এমন দাবীও জানিয়েছে তারা নাকি মা হতে চলেছে। বাচ্চার ভাবী বাবা বলা বাহুল্য বরিস। বেকার নিয়ে উচ্ছ্বাস, বেকার নিয়ে পাগলামি কি স্তরে পৌঁছে গেছে এর থেকে তা সহজে অনুমেয়। কি আছে বরিস বেকারের মধ্যে যা কোনর্স-লেন্ডল-ম্যাকেনরোদের নেই ? ওর ভক্তরা ব্যাখ্যা করেছে,বরিসকে আমরা খুব সহজেই ভালোবেসে ফেলতে পারি। সবকিছুতে ও এত আন্তরিক। এত স্বাভাবিক। আলাপ না থাকলেও মনে হয় ওর সঙ্গে গিয়ে অসঙ্কোচে আলাপ জমানো যায়। দেখলেই বোঝা যায় একদম আত্মকেন্দ্রিক নয়। পাশাপাশি অন্য তারকারা এত দাম্ভিক এত বদমেজাজী। লেন্ডলের মুখটা ঠিক ডোভারম্যানের (কুকুর) মতো, ও কখনও

হাসে বলে মনে হয় না, আর ম্যাকেনরো তো কথা বলার আগেই রেগে বসে আছে। কোর্টে কোনর্সরা যা সব অঙ্গভঙ্গি করে। বরিসও তো ম্যাকেনরোর মতো চ্যাম্পিয়ন। কম বয়েস, তাজা রক্ত। কই, ও তো কোনদিন আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক করে না, প্যাট ক্যাশের মতো শর্টস খুলে দেখায় না। জার্মানিতে সম্প্রতি একটি গণসমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, দেশের জনপ্রিয়তম মানুষের নাম বরিস বেকার। মাইকেল জ্যাকসন পুতুলের যেমন যুক্তরাষ্ট্রে অসম্ভব বিক্রি,বেকার টি শার্টেরও তেমনি জার্মানিতে প্রচণ্ড চাহিদা। আঠার বছর বয়সী এই তরুণের জনপ্রিয়তার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে গলদঘর্ম সাংবাদিকরা। বেকার সম্পর্কে পাঠকদের আগ্রহের সীমা নেই। তারা সর্বদাই ওর সম্পর্কে নতুন নতুন কথা জানতে উৎসুক। এই খবর সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় বেকারের জীবন অতিষ্ঠ। ও সাংবাদিকদের বলেছে, "আমাকে নিয়ে আর কি করতে চান ? এবার কি বাথরুমেও আপনারা আমার পিছু ধাওয়া করবেন ?..." বোঝাই যাচ্ছে জনপ্রিয়তার জ্বালায় ছ ফুট এক ইঞ্চি উচ্চতার একশ পাউন্ডের বেকার বিব্রত। এই ব্যাপারটা মনের ওপর একটা চাপ সৃষ্টি করতে বাধ্য। এই চাপ সহ্য করে নিয়মিত ভাবে ভাল খেলে যাওয়া খুব সহজ কথা নয়। এর ওপর রয়েছে পেশাদারী টেনিসের জাঁতাকল। টেনিস সার্কিটে অমুক খেলছে, লাখ লাখ টাকা রোজগার করছে, আপাতদৃষ্টিতে হয়ত ব্যাপারটা গ্ল্যামারাস। বাস্তবে কিন্তু একদমই নয়। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর প্লেয়ারদের উড়ে যেতে হয় এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশ, অতিক্রম করতে হয় এক মহাসাগর থেকে আর এক মহাসাগর, এক ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চল এবং তারপর কোর্টে নেমে নিংড়ে দিতে হয় নিজেকে। মন ও শরীরকে রাখতে হয় যথাসম্ভব ঝাঁজালো যাতে ফল ভাল হয় এবং র‍্যাঙ্কিংটা ওপরের দিকে থাকে। পেশাদারী টেনিসে র‍্যাঙ্কিং-ই প্রথম ও শেষ কথা। বিল স্ক্যানলন জানিয়েছেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। এক সতীর্থ খেলোয়াড়ের সঙ্গে বহুদিন বাদে দেখা হওয়ায় জানতে চেয়েছিলেন, কি, কি রকম আছ ? উত্তর পান, "ভাল নেই। এ সপ্তাহে ২৯-এ নেমে গেছি।"

টেনিস খেলোয়াড়দের জীবন আবর্তিত হয় এই নম্বরকে ঘিরে। ব্যক্তিগত সুখ আহ্লাদের সেখানে কোনও জায়গা নেই। বেকার ইতিমধ্যেই বিরক্ত। "আমি ঘুম থেকে উঠি, খাই, প্র্যাক্টিস করি, খাই, প্র্যাক্টিস করি,ঘুমাই।" দুবার উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ঠিক কথা। কিন্তু এতসব ঝামেলা, এত একঘেয়েমি কাটিয়ে বেকার নিজের স্বাভাবিকতা রাখতে পারবে তো ?

ট্রেসি ফিরছে ?

বছর চারেক আগে দারুণ সাড়া জাগিয়েছিল ট্রেসি অস্টিন। সাড়া জাগানোর এখানে দ্বাদশ। তুবড়ির মতো জ্বলে ওঠে ও আবার পরক্ষণেই শেষ করে নিভে যায়। বা পতিত হয়ে গেছে এবং মাটি। [illegible] চ্যালেঞ্জ জানাবে অবস্থায় [illegible] ছোট অষ্টাদশী ট্রেসিকে টেনিস কোর্ট থেকে সরিয়ে নিতে হয়েছিল। বস্তুত পেশাদারী টেনিসের জীবনকে [illegible] দেওয়াটা ছিল এতজনদের পক্ষে মারাত্মক কিনা এই বিতর্কের শুরু ট্রেসি অস্টিনের দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি থেকে। সেপ্টেম্বরের গোড়ায় তার দক্ষিণ আফ্রিকান বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে লন্ডন বেড়াতে গেছিল ট্রেসি। এবং ওখানে সাংবাদিকদের ও বলেছে, পেশাদারী টেনিসে নাকি শিগগিরই ফেরার পরিকল্পনা করছে।

এক টিমে ভিভ-বথাম

ভিভ রিচার্ডস-ইয়ান বথাম এক টিমে এটা কি আদৌ কোনও খবর ? আমরা জানি, বরাবর এক কাউন্টির হয়ে খেলে এসেছেন এঁরা দুজন। ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ভবিষ্যতেও একসঙ্গে থাকার। অতএব এটা তেমন খবরই নয়। কিন্তু বিশ্বসেরা দুই ক্রিকেটার যদি এক টিমের হয়ে ফুটবল খেলেন সেটা অবশ্যই খবর। ইংল্যান্ডের ওয়াল্টন ফুটবল ক্লাব যে মোটা টাকার বিনিময়ে রিচার্ডসকে তাদের টিমে খেলার জন্য চুক্তিবদ্ধ করিয়েছে তা ইতিমধ্যেই ফলাও করে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত। সম্প্রতি বথামও সই করেছেন এই ক্লাবের পক্ষে। দুজনের কেউই ফুটবল মাঠে নতুন নন। অ্যান্টিগুয়ার হয়ে বিশ্বকাপের প্রাথমিক পর্বের ম্যাচে খেলেছেন রিচার্ডস।

বথাম খেলেছেন ইংল্যান্ডের তৃতীয় ডিভিশন লিগে। ইংল্যান্ডের তৃতীয় ডিভিশন লিগটা কিন্তু খুব নাক সিটকানোর মতো ব্যাপার নয়।

গৌতম ভট্টাচার্য

যাত্রার উৎস ও এক বিস্মৃত যাত্রাপথিক

সাহিত্য চিরকালই দুই সড়কী। তার দুটি পথের একটি রাজপথ, অন্যটি জনপথ। একটি চলে গেছে রাজসভার দিকে, অন্যটি নেমে এসেছে জনসভার দিকে। এই দুধারী রাস্তার মধ্যিখানে লেখক, কখনো হয়তো থমকে দাঁড়ান নিজের অভীষ্ট পথটি বেছে নেবার জন্যে। এখন রাজা নেই, আছেন সরকার, এবং সরকারী উর্দি সরালে পার্টি। এদের পৃষ্ঠপোষণা আসে পুরস্কারে, অনুদানে, উপাধি বিতরণে। জনসাধারণ আর কি দেবে! দেয় পুস্তকের নগদ মূল্য, দেয় সমষ্টিগত অভিনন্দন যার নাম জনপ্রিয়তা। জনসাধারণ যেমন একা, তেমনি একত্রে অনেক। আর সেই জনতার মুখপত্র হচ্ছে প্রেস, যাকে বলা হয় সংবাদপত্র। যশ আসে তার মাধ্যমে, ইদানীং পুরস্কারও আসছে। বাঙালীর সাহিত্যপ্রতিভার আদি স্ফুরণ ঘটেছিল মুখে মুখে। একই সঙ্গে জনশিক্ষা এবং জনরঞ্জনই ছিল এই মৌখিক সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। তার পর মৌখিক সাহিত্য যখন লেখা রূপ নিতে শুরু করল, সেই প্রারম্ভিক পর্বেও সে ছিল কণ্ঠবাহন। জনসভার কাছে নিবেদিত। তখন কথার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল গানের সুর, অভিনয়ের ঢঙ। এই পাঁচালি (পা-চালি) আর কথকতার আদি নাট্যরূপই যাত্রা। পারফর্মিং আর্টের এক অভিনব প্রকাশ। ভাবাবেগপ্রবণ বাঙালীর চিত্তাকর্ষণের নির্ভুল মাধ্যম। পূর্ণাঙ্গ অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হল আবহমাত্রা, যুক্ত হল নৃত্য এবং গীত। ভক্তিরসে ও করুণরসে মাখামাখি এই বাঙালীর অপেরাই প্রথম সম্পূর্ণ কাহিনীকে গতিশীল করল মানুষের চোখের সামনে। প্রথম উদ্রিক্ত করল দর্শকের কল্পনা। বেতারনাট্যের অ্যামিবার সন্ধানও হয়তো মিলবে সে যুগের যাত্রায়। কল্পিত দৃশ্যের অর্থাৎ নেপথ্যের কাল্পনিক ব্যবহার বিশেষ করে লক্ষ করার বিষয়। সেই সিনেমা থিয়েটার বিহীন সমাজে কাহিনী। অভিনয়ের এমন সহজিয়া রূপ এবং এমন সঙ্গতি সম্প্রদায় সাক্ষর নিরক্ষর এবং নাবালক-সাবালক নির্বিশেষে এমন সর্বজনপ্রিয় প্রযোজনার কোন তুলনা, কোন বিকল্প ছিল না।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়

তারপর কাল বদলের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার পালারও পালা বদল হয়েছে। এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে যাত্রা নিয়েছে মিশ্ররূপ, সঙ্কর মূর্তি। সে আর এখন মঞ্চবিহীন নয়, তার মধ্যে ঢুকে পড়েছে থিয়েটারের অনুষঙ্গ, ঢুকেছে ম্যাজিক, সিন্থেটিক মিউজিক, ইলেকট্রনিকস। সেই রাতভর যাত্রার কালসীমা সঙ্কুচিত হয়ে আড়াই তিন ঘণ্টায় ঠেকেছে।

এখানে আমরা যাত্রার ইতিহাস লিখতে বসিনি। কিন্তু যাত্রাজগতে যিনি ইতিহাস হয়ে আছেন সেই মানুষটির কথা বলতে চাই। কারণ বঙ্গাব্দ ১৩৯৩-এ তাঁর নাট্যশতবর্ষ পূর্তি হবে। অথচ একদা বহু স্মৃত ও প্রশংসিত এই ব্যক্তিত্বটি আজ বিস্মৃতির তলায় চাপা পড়ে গেছেন।

সেটা ১২৯২ সালের কথা। হরিপদ নামে একটি কিশোর তখন হুগলী নর্মাল স্কুলের ছাত্র। থাকে বোর্ডিং-এ। একদিন ছাত্রাবাসের পাঁচিল ডিঙিয়ে সে যখন তার ঘরে ফিরছিল তখন হাতে নাতে ধরা পড়ে যায় হস্টেল সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে। সম্ভবত তিনি আগেই খবর পেয়েছিলেন ছেলেটি মাঝে মাঝেই রাতে ঘরে থাকে না। এ অপরাধের জন্য গুরুতর শাস্তি দেওয়া হল ছেলেটিকে। প্রকাশ্যে তাকে বেত্রাঘাত করেও যখন অপরাধ কবুল করানো গেল না তখন বিদ্যালয় থেকে তাকে বহিষ্কার করা হল। ছেলেটি কোন প্রতিবাদ কিংবা মার্জনা ভিক্ষা চাইল না, নিঃশব্দে পথে বেরিয়ে গেল। বলা বাহুল্য হরিপদর বিদ্যালয় জীবনের সেইখানেই ইতি ঘটেনি। শিক্ষা শেষ সংস্কৃত কলেজে। তারপর বেশ কয়েকমাস কেটে গেছে। ১২৯৩ সালে, সরস্বতী পুজোর সময় হস্টেল সুপার ফরাসডাঙ্গার রাজবাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে যাত্রা দেখতে গেছেন। রামলাল চাটুজ্জের দল সেখানে অভিনয় করছেন 'লবণ সংহার' নাটক। আসরে একটি কিশোরকে হ্যান্ডবিল বিলি করতে দেখে চমকে উঠলেন তিনি। এ তো তাঁরই ছাত্রাবাসের সেই বিতাড়িত ছেলেটি! খোঁজ খবর নিতে গিয়ে বিস্ময়ের শেষ থাকল না। 'লবণ সংহার' পালাটি এই ছেলেটিরই লেখা।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় 'লবণ সংহার' লিখেছিলেন ১২৯২ সালে বোর্ডিং হাউসের ঘরে বসে রাত জেগে কুপির আলোয়। এই তাঁর পালা রচনায় হাতে খড়ি। পরে গিরিশ চাটুয্যের দল, ত্রৈলোক্যতারিণীর যাত্রা, অভয় দাসের দল, সৌদাস কোম্পানী, মথুরানাথ সাহার যাত্রা দল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে প্রায় চল্লিশখানা পালা লিখেছিলেন তিনি।

তাঁর 'প্রবীর পতন বা জনা' দেখে গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেছিলেন, আমার জনার চেয়েও হরিপদবাবুর জনা আরও উৎকৃষ্ট একথা বলতে আমার লজ্জা নেই।

পরবর্তীকালে যাত্রা জগতে অনেক নতুন ভাবনার নতুন চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন তিনি। থিয়েট্রিকাল যাত্রা পার্টির তিনি প্রবর্তক।

যাত্রা জগতে হরিপদবাবু ছিলেন বারেবারেই প্রথম, ফিরে ফিরেই প্রথম। বাংলায় প্রথম ঐতিহাসিক (পদ্মিনী) ও সামাজিক (দীনবন্ধু) নাটকের প্রবর্তন করেছিলেন তিনি। প্রথম বিপ্লবী নাটক 'রণজিতের জীবনযজ্ঞ' লিখে ১৯০৬ সালে হাজতবাস করতে হয়েছিল তাঁকে। যাত্রায় প্রথম থিয়েটারী সুরের প্রবর্তনা (ভৃগুচরিত), 'জুড়ি' 'হাফজুড়ি' গানের মন্থর এক ঘেয়েমি বন্ধ করে বিবেক, নিয়তি, ধরিত্রী প্রভৃতি চরিত্রের সংযোজন করেন। বাংলার নাট্যামোদী সমাজের কাছে 'বাংলার বিবেক' নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

তারপর ক্ষেত্র বদল। 'রয়্যাল বেঙ্গল থিয়েটার' থেকে সুরকার ভূতনাথ

দাসকে যাত্রাজগতে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর 'ভৃগুচরিত' নাটকের উপলক্ষে। পরে এই ভূতনাথই তাঁকে থিয়েটারে সরিয়ে নিয়ে যান প্রতিদান হিসেবে। ফলে থিয়েটারের জন্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কলম ধরেছিলেন তিনি। কিছুটা হেলাফেলা করেই 'জয়দেব' নাটকটি রচনা করলেও এই নাটকই তাঁকে দিয়েছিল অভূতপূর্ব সাফল্য, আর প্রভূত অর্থ। ১৯১২ সালে গ্র্যান্ড ন্যাশনালে প্রথম অভিনীত হয় জয়দেব। পরে প্রতিটি মঞ্চেই। ১৯২৬ সালে ম্যাডান থিয়েটার্স কর্তৃক চিত্রায়িত হয়। ১৯৩০ সালে বেতারে অভিনীত। ১৯২৪ ও ১৯৪৮ সালে—মোট দুবার গ্রামোফোন কোম্পানির ডিস্কে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৪ সালে পুনরায় সবাক চিত্রায়িত করেন অরোরা ফিল্মস। এটি ছাড়াও স্টেজের জন্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে 'ব্রজরেণু', 'নীলকণ্ঠ' ও 'তুলসীদাস'-এর গান করতে হয়। ১৩৩৩ সালে এই তুলসীদাসই তাঁর শেষ রচনা।
কিন্তু পালাকার নাট্যকারই তাঁর সবটুকু পরিচয় নয়। ১২ হরীতকী বাগান লেনে 'শাস্ত্রপ্রকাশ কার্যালয়' নামক এক পুস্তক প্রকাশনাও তাঁর কীর্তি। এই গ্রন্থালয় থেকে উপনিষদ, ভাগবত, কালিদাস ভবভূতি প্রমুখের রচনাবলীর অনুবাদ ও সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। অনুবাদ অবশ্য কিছু তাঁর এবং কিছু সেকালের দুজন খ্যাতনামা পণ্ডিতের। এবং সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য এদেশে প্রথম তালপাতায় মুদ্রিত 'শ্রীশ্রী চণ্ডী' প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগরের বিশাল-ছাপাখানা বিক্রিত হলে তার এক-তৃতীয়াংশ তিনি কিনে নিয়েছিলেন। শেষ জীবনে 'শ্রীগোরাঙ্গ অপেরা' নামে একটি যাত্রাদলও খুলেছিলেন।
দুটি পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন : (১) বিংশশতাব্দী (২) কালের হাওয়া।
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১২৭৮ বঙ্গাব্দে হাওড়া জেলার কল্যাণপুরে। মৃত্যু ১৩৩৩ সালের ১৭ মাঘ।

ধর্মকোষ

“ধর্ম মানুষের আফিং” এমন একটা ধারণা বহুল প্রচলিত। যন্ত্রতন্ত্রের যুগে ধর্ম এবং দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে অবজ্ঞা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধর্ম বলতে শুধু কুসংস্কার, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী, ছোঁয়াছুয়ি, জাতপাত খাদ্যাখাদ্য এবং বৈবাহিক বাছবিচার যদি বোঝায়, তাহলে সে ধর্মের দিন যত তাড়াতাড়ি ফুরায়ে ততই মানব সমাজের মঙ্গল। কিন্তু ধর্ম বলতে যদি বোঝায় জীবনদর্শন, যা মানুষমাত্রই ধারণ করে এবং সমাজমাত্রকেই যা ধরে না রাখলে বিনাশ অবসম্ভাবি, তাকে তো বাদ দেওয়া যায় না। দেশকাল পাত্র ভেদে ধর্মের অভিব্যক্তি ভিন্ন। এই প্রভেদ এবং অভেদগুলি, মানবজাতির ঘণীভূত অধ্যাত্ম এবং অস্তিত্বের সংকটের দিনে তুলনামূলকভাবে বোঝা জরুরী।

আগামী বছরে মারসিয়া এলিয়াদির সম্পাদনায় প্রকাশিত হবে ১৬ খণ্ডে “দ্য এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজান”। এই গ্রন্থে কার্ল মার্কসকে ধর্ম প্রবর্তক এবং মার্কসবাদকে একটি ধর্মরূপে দেখানো হয়েছে। অজ্ঞেয়বাদী বৌদ্ধধর্ম যদি ধর্ম হয়, তবে সেই একই যুক্তিতে, নিরীশ্বরবাদী মার্কসবাদও ধর্ম।

এখনকার দিনের বহুজনই মার্কসধর্মাবলম্বী। সুতরাং ধর্মের প্রয়োজন ফুরোয়নি। শান্তি, মৈত্রী

মারসিয়া এলিয়াদি

এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যেই ধর্মের বিষয় গবেষণা করতে হবে। কারণ মানুষের অধ্যাত্ম ক্ষুধা তৃষ্ণা যা পরিতৃপ্ত করে, সে বিষয় সম্যক জ্ঞান প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে সকল ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ, দর্শন, প্রত্যয়, পূজা উপাসনা, রীতিনীতি, সংস্কার, পুরাণ, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কল্পনা, সংঘ, সংগঠন, সাংস্কৃতিক অবদান, বিগ্রহ প্রতিমার রূপকল্পনার গোটা ইতিহাস এবং তত্ত্ব বুঝতে হবে। কারণ জ্ঞানত অজ্ঞানত যৌথ চেতনা নিশ্চেতনা এসবেরই তো নিয়ন্ত্রণ থাকে। ধর্ম এবং নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে এতদিন পর্যন্ত হেস্টিংসের “এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজান অ্যাণ্ড এথিকস” ছিল প্রামাণ্য কোষগ্রন্থ (১৯০৫-১৯২৬)। গত ষাট বছরে প্রত্নতত্ত্ব, সমাজ-নৃতত্ত্ব, সমাজ-মননতত্ত্ব এবং সমাজ-মনস্তত্ত্ব—বস্তুত সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সকল বিষয় গবেষণা যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, এসবের গভীরতা এবং ব্যাপ্তি মানুষের বোধ, অধ্যয়ন এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা বাড়ায়। ম্যাকমিলান কোম্পানি ঘোষণা করেছেন যে সামনের বছরে তাঁদের প্রকাশিতব্য 'দ্য এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজান” হেস্টিংসের কোষগ্রন্থাবলী এতদ্দ্বারা বাতিল করবে ('দ্য এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজান' উইল বি দ্য সেন্ট্রাল রেফারেন্স সোর্স ইন রিলিজাস স্টাডিজ ফর মেনি ইয়ারস টু কাম রিপ্লেসিং হেস্টিংস এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজান অ্যান্ড এথিকস')।

সূচীপত্র এবং লেখকদের নাম দেখে বোঝা যায়, ইতিহাসের কালের সকল মহাধর্মের ওপরেই এই কোষগ্রন্থে যে শুধু আলোচনা রয়েছে তা নয়, কিন্তু আদিম, প্রাগৈতিহাসিক এবং কৌম উপজাতিক ধর্মগুলি সম্বন্ধেও প্রচুর তত্ত্ব এবং ধারালো বিশ্লেষণ রয়েছে।

মানুষ, কালে কালে দেশে দেশে, ভিন্ন কৃষ্টি এবং সভ্যতায়, বিশ্বরূপ কিভাবে, কোন যুক্তিতে, দর্শন করে, তার অনুপুঙ্খ আলোচনা আছে প্রতি পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে। নিজেকে এবং নিজেদের জানার জন্য, এ এক স্বচ্ছ সলিলা সরোবর রূপী আয়না।

এই মহাকোষগ্রন্থের প্রধান সম্পাদক মারসিয়া এলিয়াদি বলেছেন, হয়তো মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম আমরা জেনেছি যে মানবজাতি এক। শুধু তাই নয়, মানবজাতির অধ্যাত্ম মূল্যবোধগুলি কি, সেসবের কৃষ্টিগত তাৎপর্য কি তাও এই সবে আমরা উপলব্ধি করেছি। আমরা বিশ্বাস করি, সুবেদী পাঠকের কাছে একথা স্পষ্ট হবে যে, ধর্ম সংক্রান্ত গবেষণার সকল ক্ষেত্রে প্রভূত কাজ হয়েছে। এ কোষ গ্রন্থের বিষয়গুলি পরিকল্পিত হয়েছে এমন অনন্যভাবে যে ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক নিবন্ধ, সমন্বয় নির্দেশমূলক উপস্থাপনা এবং টীকাভাষ্য ধরনের প্রবন্ধ পাশাপাশি এতে থাকবে যাতে পাঠকসাধারণ এবং গবেষক উভয়েরই কৌতূহলোদ্রেক এবং চরিতার্থ হয়।... এলিয়াদির কোষিক পাণ্ডিত্যের খ্যাতি জগৎজোড়া। জনশ্রুতি এঁর আদলে জনপ্রিয় সমকালীন বাংলা উপন্যাসের মিরচা ইউক্লিড চরিত্রটি গড়া। মারসিয়া এলিয়াদির জন্ম বুখারেস্টে ১৯০৭ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে পি এইচ ডি করেন। ওঁর বিষয় ছিল “যোগ, এ স্টাডি অন দ্য অরিজিনস অব ইন্ডিয়ান মিস্টিসিজম” (১৯৩১)। দু বছর তারপরও ভারতবর্ষে ধর্মসম্প্রদায়গুলির তত্ত্ব তালাস করে রোমানিয়ায় ফিরে বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম এবং পরাবিদ্যার অধ্যাপনা করেন। ৪০-এর দশকে রোমানিয়ার দূতাবাসে সংস্কৃতির প্রধান আমলা ছিলেন প্রথমে লণ্ডনে তারপর লিসবনে। ১৯৪৫ সাল থেকে প্যারীতে বাড়ি করলেও, তাঁকে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপনা করতে হয়। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ধর্মের ইতিহাসের সভাপতি অধ্যাপক ছিলেন বহুকাল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবিত নামী দশজন ছাত্রের নাম করতে হলেও, মহাশয় মারসিয়া এলিয়াদির নাম উঠবে প্রথম তিন জনের মধ্যেই।
ভারতীয় পণ্ডিতদের অনেকেই এই কোষগ্রন্থের নিবন্ধ প্রবন্ধের লেখক। সুখের বিষয় গুণে দেখা গেল অন্য অন্য রাজ্যের চেয়ে মহাকোষে বাঙালী পণ্ডিতদের সংখ্যা বেশি। চীন, জাপান, সিংহল, পাকিস্তান, পশ্চিম এশিয়ার লেখকদের সংখ্যা কম নয়। দ্বৈপায়ন ইংরাজদের চেয়ে মহাদেশিক ইউরোপীয় ঐতিহ্য যে অধিকতর সর্বজনীন ও সৌভ্রাতৃত্বমূলক, লেখকসূচী দেখে একথা বোঝা যায়। অগ্নি থেকে রবীন্দ্রনাথ, আকবর থেকে যোগ বা যোনি, বেদ বেদান্ত, সুফী ধর্ম, বৌদ্ধ জৈন প্রসঙ্গ অনুষঙ্গে আপনি যা ভাবতে পারেন তা সবই প্রচুর আছে। হেস্টিংসের কোষগ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদী যুগের ছাপ আছে।

এলিয়াদির গ্রন্থ বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্বের পরিমণ্ডলের আবহে বর্ধিত। যেমন ধরুন বিমলকৃষ্ণ মতিলাল লিখেছেন গৌড়পাদ, জ্ঞান, মীমাংসা বিষয়ে, কিশোরকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন ন্যায় এবং বৈশেষিক সম্বন্ধে, সুকুমারী ভট্টাচার্য লিখেছেন রুদ্র এবং বরুণ সম্বন্ধে। তবে ভারতীয় ধর্মের বিষয় সাহেবসুবো এবং চীনা জাপানী পণ্ডিতদের সংখ্যাধিক্য প্রমাণ করে, এদেশের সভ্যতা সংস্কৃতির বিষয় পণ্ডিতদের সংখ্যা উপমহাদেশে তুলনায় কমছে। যন্ত্রতন্ত্রে মজে আমরা ফাউস্টের মতো যাতে আত্মাকে শয়তানের কাছে বেচে না দিই, এই মহাকোষ সেই কারণেই রচিত। গ্রন্থাগারগুলিতে সুতরাং অবশ্যই সংগ্রহযোগ্য। **দেশ**

অবিস্মরণীয় চরিত্রের স্রষ্টা

প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্যসাধনা/ সরোজ দত্ত/ [illegible]/ [illegible]

বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় পুরাতন ঘরানার সেই সাহিত্যশিল্পী— যিনি সাহিত্যের প্রাণময় ও আনন্দময় কোষে নিজের সত্তাকে লালন করেছেন। প্রবীণতম জীবনে তিনি তিন চতুর্থাংশ কালেরও কিছু বেশী সময় নিযুক্ত থেকেছেন এবং আছেন সাহিত্যসাধনায়। "সৃষ্টির আনন্দ থেকে কোনদিন বঞ্চিত হবো—এটা ভাবা কঠিন আমার পক্ষে।" নিজের এই স্বীকারোক্তির সঙ্গে মিলিয়ে তিনি তাঁর সৃষ্টিধর্মী মানসিকতার মধ্য দিয়ে আনন্দ দিয়ে চলেছেন। এ কথা ঠিক রাণু-পোনু-গণশা-ঘোঁতনা বাংলাসাহিত্যের পাঠকমাত্রেরই ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণের সঙ্গে অনিবার্য সংযোগ সেতু— অবিস্মরণীয় চরিত্র। তাছাড়া বিভূতিভূষণের সামগ্রিক সাহিত্যজীবনের পরিচিতির ক্ষেত্রে আর দু'একটি সৃষ্টির প্রসঙ্গও এসে যায়— 'দুয়ার হতে অদূরে', 'কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি'। কিন্তু এর বাইরেও তাঁর বহুতর রচনা রয়েছে—যেগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে তাঁর শিল্পচেতনা একজন দায়বদ্ধ স্রষ্টা-সামাজিকের সঙ্গে একাত্ম। বিভূতিভূষণের শিল্পচেতনাকে তাঁর শিল্পীজীবনের অভিপ্রায় বা 'মিশনের' সঙ্গে সামগ্রিকভাবে মিলিয়ে বিচার করার প্রবণতা অনুপস্থিত ছিল বলেই তাঁর সাহিত্যজীবনে কতকগুলি খণ্ডিত পরিচয়ই দ্বিধাহীনভাবে স্বীকৃত হয়ে গেছে। আনন্দের কথা, আলোচ্য গ্রন্থে তথ্য ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখক স্রষ্টার অন্তরের বা চেতনার সেই গভীরতর পরিচয়কে সর্বপ্রথম পাঠক-পাঠিকার কাছে তুলে ধরেছেন। তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি বিভূতিভূষণের জীবনবোধ ও শিল্পবোধকে মিলিয়ে দিয়েছে।
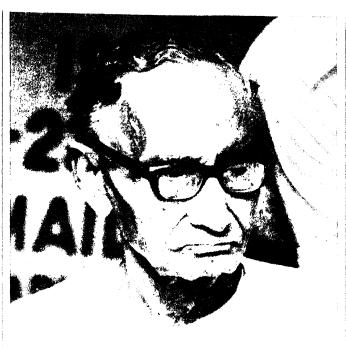
প্রবীণ সাহিত্যশিল্পী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থখানি সুচিন্তিত অধ্যায়-বিন্যাসে বিভক্ত— ভূমিকা, জীবনকথা, দেশকাল, বিভূতিভূষণের ছোটগল্প, বিভূতিভূষণের উপন্যাস, বিভূতিভূষণের ভ্রমণসাহিত্য, বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সাহিত্যিক এবং উপসংহার। তা ছাড়া 'পরিশিষ্ট' অংশে বিভূতিভূষণকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা বিভূতিভূষণের চিঠি, নলিনীকান্ত সরকারের চিঠি এবং আলোচ্য গ্রন্থের লেখককে লিখিত অনেকগুলি চিঠি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। লেখকের কাছে লিখিত বিভূতিভূষণের চিঠিগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ, তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টির নানা আন্তরিক কথা, সৃষ্টিপ্রসঙ্গ ও সৃষ্টির নেপথ্যের মানসিক ইতিহাসের উপাদান ডঃ সরোজ দত্ত পরিবেশন করেছেন। তাছাড়া 'পরিশিষ্টে' সংলগ্ন নানা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেও বিভূতিভূষণের সাহিত্যধারণা এবং নিজের সাহিত্যসৃষ্টির ভাব-ভাবনার প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্নের অনুসরণে বিভূতিভূষণের স্রষ্টা-সত্তার বিচিত্র পরিচয় মিলবে। 'ভূমিকা'য় লেখক বিভূতিভূষণের শৈশব-পারিপার্শ্বিক, কর্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে ছোটগল্প রচনা, দু'একটি সাহিত্যের আসরে বা মজলিসে উপস্থিত থেকে তাঁর পরিচয়ের জগৎকে প্রসারিত করা এবং ব্যক্তিজীবনের শিক্ষা-ক্ষমা-প্রীতি-বাৎসল্য কিভাবে ব্যক্তি ও শিল্পী বিভূতিভূষণকে অনন্যপরতন্ত্র করেছে—তার বিস্তৃত পরিচয় তুলে ধরেছেন। জীবনতত্ত্ব শিল্পী বিভূতিভূষণের কাছে কিভাবে ধর্মতত্ত্বে পরিণতি লাভ করেছে—লেখক তা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

'দেশকাল' অধ্যায়ে বিভূতিভূষণের নিজের উক্তি 'মাটি এবং মন লইয়াই দেশ' কথাটির তাৎপর্য নানা তথ্যের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন। দেশ ও কালের মাত্রাকে বিভূতিভূষণ কোন সামর্থ্যে উপস্থিত করেছেন এবং তাঁর সাহিত্যকর্মে সেই উপাদানগুলিকে কিভাবে যাচাই করে নিয়েছেন তার তথ্যভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় লেখক দিয়েছেন। 'বিভূতিভূষণের ছোটগল্প' পর্যায়ে তাঁর ছোটগল্পগুলিকে লেখক কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন— শিশুচরিত্র-কেন্দ্রিক গল্প, গুরুভার সামাজিক চিন্তার ফসল রূপে কিছু গল্প, প্রসন্ন দাক্ষিণ্যভাবে উজাড় করে দেওয়া কিছু প্রেমের গল্প। শিশুচরিত্র-কেন্দ্রিক গল্পগুলি হল 'ননীচোরা', 'স্বয়ংবরা', 'বাঘ', 'গোলাপী রেশম', 'খোকা', 'মাসী', 'হাতে খড়ি' ইত্যাদি গল্প। গল্পগুলির বিস্তৃত পরিচয় যেমন গ্রন্থখানির মধ্যে রয়েছে তেমনি বিভূতিভূষণ অসীম স্নেহ ও স্পর্শকাতরতা নিয়ে দৈনন্দিন রূঢ় সংসারে কিভাবে উপেক্ষিত শিশুদের

আশ্রয় হয়ে উঠেছেন তার সমুজ্জ্বল পরিচয়ও গ্রন্থখানির মধ্যে রয়েছে। রঙ্গরসপ্রধান গুরুভার সামাজিক চিন্তার ফসলরূপে ডঃ দত্ত 'দ্রব্যগুণ', 'মধুলিড়', 'সার্টিফিকেট', 'কবি কুণ্ডলালের মেঘদূত', 'বি এন ডব্লু ব্রাঞ্চ লাইনে', 'একরাত্রি', 'মুরারি ডাক্তারের ঠিকেদারী', 'দন্তকাব্য' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'রাণুর তৃতীয় ভাগ' সংকলনকালে বিভূতিভূষণ উল্লেখ করেছেন 'উপলক্ষে অনুপলক্ষে দুই ফোঁটা চোখের জল না ফেলিলে যাহাদের অন্ন পরিপাক হয় না', তাদেরও মনে রাখবার প্রাসঙ্গিকতা আছে। বিভূতিভূষণের সমাজবীক্ষার সেই বিশেষ ভঙ্গীর ব্যাখ্যাও লেখক করেছেন। প্রেমের গল্পে মোহজাত মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেননি বিভূতিভূষণ : 'প্রশ্ন', 'হারজিত', 'নোংরা', 'বিয়ের ফুল', 'তাপস', 'পূর্ণচাঁদের নষ্টামি', 'শহরে', 'ধর্মতলা টু কলেজ স্কোয়ার' প্রভৃতি গল্পের বিশ্লেষণের সঙ্গে লেখক বিভূতিভূষণের প্রেমবিষয়ক ধারণার অপর এক সমতলে অবস্থিত গল্প 'অকালবোধন', 'নবোঢার পত্র', 'চিত্ত ও চিত্র', 'বর্ষায়', 'হৈমন্তী' প্রভৃতি গল্পের বিস্তৃত আলোচনার মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণের প্রেম-বিষয়ক সমস্যার সূক্ষ্মতার পরিচয় দিয়েছেন।

'বিভূতিভূষণের উপন্যাস' পরিচ্ছেদে 'নীলাঙ্গুরীয়', 'নয়ান বৌ', 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'র ব্যাখ্যা লেখকের নতুন দৃষ্টিকোণের পরিচয় দেয়।

বিভূতিভূষণের 'দুয়ার হতে অদূরে', 'কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি', 'অযাত্রার জয়যাত্রা', 'একই পথের দুই প্রান্তে' ভ্রমণকাহিনীমূলক চারটি গ্রন্থের উপযুক্ত বিশ্লেষণও লেখক করেছেন। এই চারটি ভ্রমণকাহিনী হল বিভূতিভূষণের 'জীবনবোধের চতুরাশ্রমের ইতিকথা'। প্রথমটিতে বিভূতিভূষণের নৈঃসঙ্গবিধুর মানসিকতার চলচ্ছবি, দ্বিতীয়টিতে লেখক মানুষের শক্তির উৎস সন্ধানে রত এবং শেষাবধি তা আবিষ্কার করে আস্থাস্থ এবং অনেকখানি আশ্বস্ত। এই শক্তির অনিবার্য প্রেরণাই সর্বসংস্কারের ঊর্ধ্বে 'অযাত্রার জয়যাত্রা'য় তাঁকে সংস্কারের ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ করেছে। প্রকৃতি-অবলম্বী জীবনের সুসংহত প্রত্যয়কে ডঃ দত্ত 'একই পথের দুই প্রান্তে' বিস্তৃত আলোচনায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

'বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সাহিত্যিক' অংশে লেখক বিভূতিভূষণের কিছু প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিক বা সাহিত্য বিষয়ে তাঁর ধারাবাহিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়, সাহিত্যভাবনার আভাস বা কোন বিশেষ রচনার প্রতি তাঁর নিবিড় অনুভূতির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন। বিভূতিভূষণের আত্মজীবনী 'জীবনতীর্থ' (১৯৮০) গ্রন্থখানির বিশ্লেষণ আলোচ্য মূল্যবান গ্রন্থখানির মধ্যে পূর্ণতা আনত। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সামগ্রিক শিল্পী-ব্যক্তিত্বের প্রথম উন্মোচনে গ্রন্থখানির গুরুত্ব ও লেখকের পরিশ্রমের স্বীকৃতিও অনস্বীকার্য।

সভাকাব্যের ইতিহাস

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

রাজসভার কবি ও কাব্য/
দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পুস্তক বিপণি/
কল-৯/২৪.০০

সাত-আটশো বছরের গৌড়বঙ্গের সভা-সাহিত্যের ইতিহাস একটি গ্রন্থের ভেতর ধরে রাখতে গিয়ে লেখক দেবনাথ বন্দোপাধ্যায় যে পরিশ্রম করেছেন, তা অবশ্যই স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে। দ্বাদশ শতকের পালরাজাদের থেকে আরম্ভ করে উনিশ শতকের বর্ধমানরাজ মহাতাবচাঁদ পর্যন্ত যে বিস্তৃত যুগ, তার সাহিত্যের ফসল নিয়ে লেখক ভেবেছেন ও ভাবিয়েছেন। তবে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গির অবশ্য অনেক ফারাক। রাজসভার কালজয়ী কবিরাই পাঠকদের নিয়ে যান সাধারণত নিজের নিজের রাজার দরবারে। ইতিহাসের বিক্রমাদিত্যের থেকে কালিদাসের বিক্রমাদিত্য রসিক পাঠকদের কাছে অনেক বেশি জানা। পাঠকরা এ দেখাতেই অভ্যস্ত। পালরাজাদের পাঠকরা চেনেন সন্ধ্যাকর নন্দীর চোখে। জয়দেবের মাধ্যমে দেখে থাকেন বাংলার সেনরাজাদের। হুসেনশাহের সুলতানী দরবার বেশি করে ফুটে ওঠে চৈতন্যচরিতামৃতে। অনুরূপভাবে ভারতচন্দ্রকে ধরে পৌঁছই আমরা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে। আর আরাকানের দরবার পাঠকদের মনে ঔৎসুক্য জাগায় দৌলত কাজী এবং আলাওলের জন্য। যে রাজার সভাকবিরা একালের পাঠক পর্যন্ত আসতে পারেন নি, তাঁদের কথা একালের পাঠকদের মনে কোনো ঔৎসুক্য সঞ্চার করে না। কামতা-ত্রিপুরা-বর্ধমানের রাজসভা সম্পর্কে একাল তাই কৌতূহলী নয়। দেবনাথবাবু যেহেতু ইতিহাস রচনায় ব্রত হয়েছেন, তাই তাঁর যাত্রা সাহিত্যের হাত ধরে নয়, কবির হাত ধরেও নয়; সভাকাব্যের জগতে তিনি ঢুকেছেন ইতিহাসের হাত ধরে। তাই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ পাঠকদের থেকে আলাদা। এবং এমন অনেক বাড়তি কথা বলতে হয়েছে, যা সাহিত্যের পক্ষে বাড়তি। কিন্তু গবেষণায় অপরিহার্য।

হুসেনশাহের পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কে দেবনাথবাবুর তথ্যটি বেশ মজার। সুলতানী আনুকূল্যের আলোচনা করতে গিয়ে লেখক দেখিয়েছেন যে সুলতানের যাঁরা খুব কাছাকাছি লোক ছিলেন, সেই কবিকুলের কেউই তাঁদের কাব্যে সুলতানের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি, প্রশস্তি তো অনেক দূরের কথা। আর যাঁরা হুসেনশাহ-কে 'জগৎভূষণ' ইত্যাদি স্তুতিবাদে বন্দনা করেছেন, তাঁরা ছিলেন সুলতানের থেকে অনেক দূরে। তাঁদের কারো কারো সুলতানকে চাক্ষুষ করারও সুযোগ হয়নি। —আর পরের যুগের সুলতানী-পৃষ্ঠপোষকতা? —এ সম্পর্কে দেবনাথবাবু আলোচ্য তথ্য হল, 'হুসেনশাহীবংশের সুলতানরা বিভিন্ন বাংলাকাব্যে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লিখিত হলেও তাঁরা কতখানি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, তার কোনো নিঃসংশয় প্রমাণ নেই।' (পৃ· ৬৩) এই জাতীয় বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে একথাই বলা যেতে পারে যে সুলতানী-পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কে নতুন মূল্যায়ণ ত্বরান্বিত হওয়া দরকার। দেবনাথবাবু যে একজন কৃতী গবেষক এবং ভালো প্রাবন্ধিক, তার পরিচয় পাওয়া যায় গ্রন্থটির পাতায় পাতায়। কেবল সদর রাস্তা নয়, মধ্যযুগের অলি-গলিতেও তাঁর অবাধ সঞ্চরণ। তাঁর মননের সঙ্গে মিশেছে রসবোধ। তাঁর বাস্তববোধও প্রখর। এই বাস্তববোধ অতি প্রাখর্যে কখনো কখনো তাঁকে যে অবাস্তব সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয়ে উৎকেন্দ্রিক করে তোলে, তার প্রমাণও দুর্লভ নয়। —বলাবাহুল্য, এটাই হল এ গ্রন্থের সাংঘাতিক ত্রুটি। গ্রন্থের ৭১-৭৪ পৃষ্ঠার প্রতি লাইনে লাইনে রয়েছে তার পরিচয়। এর ভেতর কয়েকটি হল এইরকম : 'রূপ গোস্বামীর কৃষ্ণ যেন এক ফিউডাল লর্ড' (পৃ· ৭২), 'অসংখ্য দাসদাসী এবং অনুচর পরিবৃত হয়ে কৃষ্ণের অভিজাত জীবনযাপন একেবারেই সুলতান অথবা সামন্ততান্ত্রিক প্রভুর মতোই', 'রাগানুগাভক্তির মধ্যে লীলাশুকতত্ত্বের যে অধ্যাত্মিক কল্পনাই থাক, এর পিছনে যে সামন্ততান্ত্রিক দাসত্বের সমাজ বাস্তবতা উঁকি দিচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই' (পৃ· ৭৩) ইত্যাদি। —এইজাতীয় মন্তব্য, লেখকের কৈফিয়ৎ হল, যদি মধ্যযুগীয় মহাজন মহিমা এবং গোস্বামী-গরিমা ক্ষুণ্ণ করে, তার জন্য লেখক দুঃখিত হওয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারেন না। কেননা, 'সমাজতাত্ত্বিকের' সত্যের খাতিরে একথা তাঁকে বলতেই হবে।

তা সমাজতাত্ত্বিকের তত্ত্ব যাই হোক না কেন, লেখকের তত্ত্ব কিন্তু স্ব-বিরোধী হয়ে উঠেছে। কেননা, একটু আগেই (পৃ· ৬৩) দেবনাথবাবু দেখিয়েছেন যে হোসেনশাহের অধীনে কাজ করবার সময় রূপ গোস্বামী তাঁর যে দুখানি কাব্য রচনা করেন, তার কোথাও তিনি রাজপ্রশস্তি করেননি। অথচ মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার ব্যবধানে (৭২ পৃ-তে) দেবনাথবাবু বললেন যে, রূপ গোস্বামীর কৃষ্ণ যেন এক ফিউডাল লর্ড। এবং কৃষ্ণের পরিবারে তিনি আবিষ্কার করলেন 'সুলতানী হারেম'। —রুচি এবং রসবোধের কথা না হয় অনুল্লেখ রইল, কিন্তু চিন্তার স্ব-বিরোধিতা যে কী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, তা দেবনাথবাবুর ঐ সর্বনাশা মন্তব্যগুলিই তার প্রমাণ। এতদসত্ত্বেও বলা যায়, দেবনাথবাবুর এই ২২২ পৃষ্ঠার বইটি নানা তথ্যে ঠাসা। —এখানে এমন অনেক খবর রয়েছে যা একালের লেখকরা সাগ্রহে শুনতে চাইবেন। যথা, ভারতচন্দ্রের মাসিক বৃত্তি ছিল চল্লিশ টাকা। অধ্যাত্ম রামায়ণের অনুবাদক ভবানীনাথ অনুবাদের কাজ করে দৈনিক রোজগার করতেন দশ টাকা করে। 'পবনদূত' লিখে ধোয়ী তাঁর উপাধি ছাড়া বাড়তি যা পেয়েছিলেন, তাহল একটি হাতী এবং একটি সোনার চামরদণ্ড। —অতিশয়োক্তি কী না জানি না, 'চন্দ্রচূড়চরিতে'র কবি তাঁর ঐ বইটি লিখে পেয়েছিলেন তিনটি শিরোরত্ন, তিন লক্ষ রূপোর টাকা এবং তিন লক্ষ তপ্তস্বর্ণখণ্ড।

সঙ্গীতশিল্পীর স্মৃতিচারণ

প্রণয়কুমার কুণ্ডু

আমার সঙ্গীত ও আনুষঙ্গিক জীবন/ সন্তোষ সেনগুপ্ত/ এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ/ কল-৭৩/২২.০০

য়ুরোপে এবং আমাদের দেশে আত্মজীবনীমূলক রচনা সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। ইতিহাসের উপাদান হিসেবেও এই জাতীয় রচনাকে একটা স্বতন্ত্র মূল্য দেওয়া হয়। আমাদের বাংলা সাহিত্য ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। সাধারণত সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও রাজনীতিবিদদের কাছ থেকেই এই ধরনের লেখা পেয়ে এসেছি। এবং এইভাবেই আত্মজীবনীর সীমা নির্দিষ্ট ছিল। সাম্প্রতিককালে আত্মজীবনীমূলক রচনা লেখার দিকে প্রবণতা বেড়েছে, তার পরিসীমাও প্রসারিত হতে দেখছি—এক্ষেত্রে চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতবিদ, সঙ্গীতশিল্পীরাও এগিয়ে আসছেন। দিলীপ রায়, অমিয়নাথ সান্যাল, রবিশঙ্কর প্রমুখ সঙ্গীতবিদ ও শিল্পীর লেখা থেকে সঙ্গীতের আড়ালে-ঢাকা বিচিত্র জগৎ সম্পর্কে অনেক কিছু জানবার সুযোগ পেয়েছি। সন্তোষ সেনগুপ্তের উল্লিখিত গ্রন্থটি এই ধারার অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য নতুন সংযোজন। তাঁকে জেনে এসেছি সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে। এই গ্রন্থের ভিতর দিয়ে পাওয়া যাবে তাঁর আর-এক অন্তরঙ্গ পরিচয়।

সূচীপত্র অনুসারে, ৫৪টির মতো প্রসঙ্গ নিয়ে বিধৃত হয়েছে আত্মজীবনীমূলক এই গ্রন্থটি। ছাত্রাবস্থা থেকে শুরু করে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত লেখক তাঁর সঙ্গীত জীবনের ও আনুষঙ্গিক নানা ঘটনার

অবতারণা করেছেন। আত্মজীবনী আসলে জীবনের ইতিবৃত্ত, স্বভাবতই একটা অবিচ্ছিন্ন কাহিনীকে রূপ দেওয়া এবং সেই কাহিনীর মধ্যে পারম্পর্য বজায় রাখার দিকে লেখকের দৃষ্টি থাকে। আলোচ্য গ্রন্থ অবিশ্যি সেই জাতীয় কোনো ইতিবৃত্ত নয়, বলা চলে, খানিকটা ডায়েরী ধরনের লেখা। একটানা একটি কাহিনীর জাল বোনার চেয়ে লেখক বেছে নিয়েছেন স্মৃতিচারণের পদ্ধতি, যখন যেভাবে যেসব স্মৃতি মনের পর্দায় ভেসে উঠেছে, অকপটে তিনি তার বাণীরূপ দিয়ে গেছেন। গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে নানা স্মৃতির সমাহারে রচিত একখানি অখণ্ড স্মৃতিচিত্র।

রচনাভঙ্গি যাই হোক না কেন, সবগুলি প্রসঙ্গ একটি সূত্রে গাঁথা—এবং এই সূত্রটি আর কিছুই নয়, সঙ্গীত। লেখক একদিকে যেমন তাঁর সঙ্গীত জীবনের উন্মেষ ও বিকাশের চিত্রটি তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁর সমকালের সঙ্গীত-চর্চা ও সাঙ্গীতিক পরিবেশের ছবিটিও এঁকেছেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত বাংলার সাঙ্গীতিক পরিবেশের একটি মনোজ্ঞ পরিচয় পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে।

স্বভাবতই, যেহেতু গ্রন্থটি মূলত একটি আত্মজীবনী, সঙ্গীত-শিল্পী সন্তোষ সেনগুপ্তের জীবনের একটি ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাই এই গ্রন্থে। এর মূল কথা হল, 'ভূমিকা'য় হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় যেমন বলেছেন, তিনি ছিলেন 'অত্যন্ত বড় মাপের মানুষ'। সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি, সংকীর্ণ গোঁড়ামির উর্ধ্বে উঠে সঙ্গীতকে দেখবার ও বোঝবার চেষ্টা, গান ভালোবাসেন এমন মানুষের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা মমতা ও অনুরাগ: টুকরো টুকরো বিবৃতির ভিতর দিয়ে লেখক তা অভিব্যক্ত করেছেন। গ্রন্থটির সর্বত্র এক উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। অভিজ্ঞতা ও মননশীলতা দিয়ে সঙ্গীতকে যে তিনি কতো নিবিড়ভাবে এবং মৌলিকতার সঙ্গে অনুভব করেছেন, তার পরিচয় রয়ে গেছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শীর্ষক আলোচনার মধ্যে।

ফলত, আলোচ্য গ্রন্থটি যুগপৎ একজন সঙ্গীতশিল্পীর এবং তাঁর সমকালের সঙ্গীত-চর্চার একটি মনোজ্ঞ আলেখ্য—মূল্যবান দলিল। ভবিষ্যতে যাঁরা বাংলা গানের এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত-চর্চার ইতিহাস লিখবেন, এই গ্রন্থ অনেক অজ্ঞাত অথচ মূল্যবান তথ্য দিয়ে তাঁদের সাহায্য করবে।

প্রসঙ্গত কিছু ত্রুটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি: সূচীপত্রে (এবং গ্রন্থের ভিতরে) উল্লিখিত ৬ সংখ্যক আলোচনা '২২শে শ্রাবণ ১৩৮৪'র বদলে হওয়া উচিত '১৩৪৮'। এছাড়া, বেশ কিছু বানান ভুল থেকে গেছে, যেমন, 'Proscribed'-এর জায়গায় ছাপা হয়েছে 'Prescribed', 'বাল্মীকি'র বদলে বাল্মিকী, 'লক্ষ্ণৌ'র জায়গায় 'লক্ষ্ণৌ', ইত্যাদি। সর্বোপরি, প্রচ্ছদচিত্রটি এই গ্রন্থের উপযোগী হয়েছে কিনা ভেবে দেখা দরকার।

বিষয়: জীবনানন্দ

সন্দীপ চক্রবর্তী

জীবনানন্দ-জিজ্ঞাসা/ (সং) তরুণ মুখোপাধ্যায়/ পুস্তক বিপণি/ কল-৯/২৫.০০

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে জীবনানন্দ নিঃসন্দেহে সবচেয়ে পঠিত কবি। বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রবলয়ের বাইরে সর্বপ্রথম সার্থক পদক্ষেপ চিহ্নিত হয় জীবনানন্দের কবিতাতেই—চোখে পড়ে রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্যের সঙ্গে আপাদমস্তক পার্থক্য। সেই পরিপ্রেক্ষিতে জীবনানন্দকে নিয়ে খুব বেশি আলোচনা কিন্তু এখনো হয়নি। যা হয়েছে, ইতস্তত প্রক্ষিপ্ত কয়েকটি প্রবন্ধ এবং বোধ হয় হাতে গোনা যায় এমন খান কয়েক বই। এদের কোনটাই কিন্তু জিজ্ঞাসু পাঠককে খুব একটা তৃপ্ত করে না। জীবনানন্দকে অনুভব করার জন্য খুব বেশি বৌদ্ধিক আলোচনার দরকার নেই। যা প্রয়োজন, তা হল মর্মী অনুভূতি এবং জীবনানন্দের কাব্যের জগৎকে অনুভব করার মানসিকতা। সেই দৃষ্টিতে বিচার করলে আলোচ্য গ্রন্থটি পাঠকের অনেক দাবীই পূরণ করতে সমর্থ। বহুক্ষেত্রে আমরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হই, যা জীবনানন্দ আলোচনায় প্রায় অনিবার্য। তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'জীবনানন্দ জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে মোট বারোটা প্রবন্ধ ও অত্যন্ত দরকারি একটি তথ্যপঞ্জী।

প্রবন্ধগুলির বিষয়-বৈচিত্র্য ও জীবনানন্দের কবিতাকে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা এই সংকলনের মূল্য বাড়িয়েছে। জীবনানন্দ সম্পর্কে অনেক চিন্তা ভাবনার খোরাক যোগায় অমলেন্দু বসুর 'চিত্ররূপকার কবি জীবনানন্দ' প্রবন্ধটি। নিঃসন্দেহে এটি গ্রন্থের সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। অমলেন্দু বসু জীবনানন্দের কবিতার 'বাক্‌-প্রতিমা'র (পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'পোয়েটিক ইমেজ') আলোচনা করে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের বাক্‌-প্রতিমার সঙ্গে তাঁর মূল পার্থক্য। বাক্‌-প্রতিমায় ভাষার মাধ্যমে কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি পাঠককে উপহার দেওয়া হয়, যার ফলে পাঠক বোধ করলেন তিনি যেন কিছু দেখছেন অথবা শুনছেন অথবা কোন ঘ্রাণ পাচ্ছেন বা স্বাদ বোধ করছেন। এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার উদ্ধার করেছেন 'সৃষ্টির তীরে'-র সেই অবিস্মরণীয় অংশটি: "স্বচ্ছল কঙ্কাল হয়ে গেছে তারপর ;/ বিলোচন গিয়েছিলো বিবাহ-ব্যাপারে ;/ প্রেমিকেরা সারাদিন কাটায়েছে গণিকার বারে ;/ সভাকবি দিয়ে গেছে বাকবিভূতিকে গালাগালি ;/ সমস্ত আচ্ছন্নসুর একটি ওঙ্কার তুলে বিস্মৃতির দিকে উড়ে যায়।" শ্রীবসু দেখিয়েছেন কীভাবে দৃশ্যভাবনা ও শ্রবণভাবনা
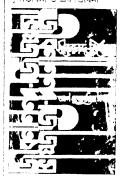
একত্র সম্মিলিত হয়েছে এই স্তবকটিতে। এই দৃশ্যচেতনার প্রাচুর্যের সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পাই 'রূপসী বাংলা'য়। প্রাচীন বাংলার স্মৃতি, গ্রামের দৃশ্যস্মৃতি কবি হৃদয়কে যে কতটা আপ্লুত করে রেখেছিল, তার অত্যন্ত সযত্ন পরিচয় পাই অমলেন্দু বসুর আলোচনায়। ঠিকই দেখিয়েছেন তিনি, ধ্বনি ও চিত্রের এমন অঙ্গাঙ্গী মিলন বাংলা কাব্যে এর আগে ছিল না: "—দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল/কুয়াশার ; কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মত যেন হায় / তারা সব—" অমলেন্দু বসুর প্রবন্ধটি শুধু একজন বিদগ্ধজনের সমালোচনাই নয়, এ এমন এক দুর্লভ রচনা যা আমাদের

জীবনানন্দকে নতুনভাবে আরও একবার পাঠে উদ্বুদ্ধ করে।

'জীবনানন্দের কবিতা : জীবনাশ্রয়' প্রবন্ধটিতে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় আমাদের বিশেষ কোন নতুন কথা শোনান না, যা বলেছেন, তা যে-কোন মনস্ক জীবনানন্দ পাঠকই জানেন। বরং গুণময় মান্নার 'জীবনানন্দের অবসন্ন পাঠক' সে তুলনায় পাঠককে তৃপ্ত করে ঢের বেশি। শ্রীমান্না এখানে একটি অত্যন্ত জরুরি প্রশ্ন তুলেছেন : জীবনানন্দের কবিতা পাঠ করে যে আবেগ অনুভূত হয়, তা কি ধরনের আবেগ ? নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন : এই আবেগের "একটা পরিচিত প্রসিদ্ধ নাম নেই, প্রকৃতি আলাদা, অনির্দেশ্য এবং চিত্র-চরিত্রে তার রূপ বা আশ্রয় নেই। যেন বোবা।" এই প্রবন্ধটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের আলোচ্য বিষয় : কবি-ভাষা। প্রবন্ধকার ঠিকই দেখিয়েছেন, জীবনানন্দের অনুপ্রাসগুলি প্রথানুসরণ তো করেইনি, এমন কি সমকালীন কবিদের সঙ্গেও তার সামান্যতম সাদৃশ্যও নেই। জীবনানন্দের কবিতায় এমন সব "দেশি-বিদেশি, শালীন ও গ্রাম্য' নানা শব্দ আছে যা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন। যেমন, খুর্তনি, হলুদ ঠ্যাং, খ্যাঁত' ইঁদুরের মুখ, হাড়-হাভাতের গ্লানি, নকটান, যোনির অন্ধকার, ইত্যাদি। বর্তমান প্রবন্ধের অন্যতম আলোচ্য বিষয়, জীবনানন্দের বিশেষণ প্রয়োগ কীভাবে তাঁর পাঠককে ভাবায় এবং কীভাবে বার বার ধরা পড়ে জীবনানন্দের আদিমতায় চলে যাওয়ার বাসনাটি : যে আদিমতা কবিকে আশ্রয় দিলেও ক্ষণে ক্ষণে করে তোলে যন্ত্রণাবিদ্ধ।

এই সংকলনের আর একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল সুতপা ভট্টাচার্যের 'জীবনানন্দের কবিতা, কবিতার তত্ত্ব'। প্রবন্ধটি পাঠ করলেই বোঝা যায়, সুতপা ভট্টাচার্য কবিতা পড়েন কত মন দিয়ে। এই গুণটি বোধহয় ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। ইদানীং সমালোচনায় সাধারণত বৈদগ্ধ্য যতটা দেখা যায়, প্রবন্ধকারের মননশীলতার পরিচয় তার এক ভগ্নাংশও নয়। সে তুলনায় সুতপা ভট্টাচার্যের প্রবন্ধটি এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বললেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি যখন লেখেন, বিপরীতের আততিতেই কবিতা জেগে ওঠে—হ্যাঁ আর না'র দুই বিপরীতমুখী টানে, তখন বোঝা যায় জীবনানন্দের কবিতা কত গভীরভাবে অনুভব করেছেন লেখিকা।

তরুণ সান্যাল আলোচনা করেছেন, জীবনানন্দ কীভাবে এক সুস্থ সুখী সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। জন্ম, কর্ম, প্রজনন প্রভৃতির মধ্যে "বিনাশের বিষকীলক" প্রবেশ করানোটাই বর্বরতা। এবং, মানুষের লড়াই এই বর্বরতার বিরুদ্ধে। তাই জীবনানন্দের কবিতায় বারবার ফুটে ওঠে এক সুখী ভবিষ্যতের কল্পনা : ঘুরে-ফিরে আসে এমন সব শব্দ যা "তাঁকে [জীবনানন্দকে] দুঃখী জীবনের পরিশেষে শান্তির ভুবন এনে দেয়।" জীবনানন্দ নানা সভ্যতার বহিরঙ্গের সাফল্যের মধ্যে দেখাতে পান মানুষের শ্রম, ভালোবাসা ও অবিচ্ছিন্ন জীবনপ্রবাহের নিত্য ছবি। শ্রীসান্যাল জীবনানন্দের ইতিহাস চেতনায় যুগ যুগ বাহিত জীবন সাধনার এক ছবি খুঁজে পান।

দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় জীবনানন্দের কাব্যের অন্তর্গত নাট্যপ্রবণতার দিকটি দেখিয়েছেন কবির 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র অন্তর্গত কয়েকটি কবিতাকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে। একই বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি বা একের পর এক প্রশ্ন কবিতার মধ্যে নাট্যলক্ষণকেই ফুটিয়ে তুলেছে : "তাদের হৃদয় আর মাথার মতন, আমার হৃদয় নাকি ? তাহাদের মন/আমার মনের মত নাকি ?/তবু কেন এমন একাকী ?" বস্তু কবিতাতেই জীবনানন্দ ঘটনা প্রকাশ করেছেন চমৎকার নাটকীয়ভাবে : তা সে 'আটবছর আগের একদিন'-এর একজন ব্যক্তির আত্মহত্যার কথাই হোক, বা 'শিকার' কবিতার ভোরের দৃশ্য বর্ণনাই হোক।

গ্রন্থটির শেষে দেওয়া হয়েছে একটি তথ্যপঞ্জী। তিনটি বিভাগে বিভক্ত এই তথ্যপঞ্জীর প্রথমটিতে পাওয়া যাবে কবির জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি ; দ্বিতীয় বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে জীবনানন্দের উপর যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের নামের বর্ণনানুক্রমিক সূচী ও আলোচনার শিরোনাম। সর্বশেষ বিভাগে একসঙ্গে পাওয়া যাবে 'জীবনানন্দ বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী'। এই অত্যন্ত পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজটির জন্য প্রভাতকুমার দাস ধন্যবাদার্হ।

প্রশ্নোত্তরে জ্ঞানের পরীক্ষা

প্রদীপচন্দ্র বসু

স্টুডেন্টস কুইজ কনটেস্ট/
প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড /
শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ /
কল-৭৩/ প্রতি খণ্ড ৩০.০০

স্পোর্টস কুইজ /
হাননান আহসান /
রঞ্জন প্রকাশন /
কল ৭৩/ ১৮.০০

ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক ও আরো অনেক বিষয় নিয়ে আলাদা করে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি কুইজের বই বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য বই দুটি সেই তালিকায় যুক্ত হল। স্টুডেন্টস কুইজ কনটেস্টের প্রথম খণ্ডে আছে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স ও লাইফ সায়েন্স-এর সহস্রাধিক প্রশ্ন ও উত্তর। দ্বিতীয় খণ্ডের

বিষয় জিওগ্রাফি, হিস্ট্রি, মেন্টাল এবিলিটি ও স্পোর্টস। আজকাল যেসব প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে ছাত্রছাত্রীদের বসতে হয় তার কথা মনে রেখে বইটির দুটি খণ্ড সম্পাদনা করা হয়েছে। এছাড়া ক্যুইজ কনটেস্টে যোগ দিতেও সাহায্য পাওয়া যাবে এই বই থেকে।

দুই খণ্ডের স্টুডেন্টস ক্যুইজ কনটেস্ট পড়ার পর প্রথমেই যেটা মনে হয় প্রকাশক খুব তাড়াহুড়ো করে বইটি ছেপেছেন। সম্পাদকমণ্ডলীও খানিকটা শিকার হয়েছেন প্রকাশকের এই ব্যস্ততার। ফলে ছাপার ভুল ও অন্য অনেক ত্রুটির সঙ্গে বহু প্রশ্ন ও উত্তরে অসঙ্গতি থেকে গেছে। যেমন দ্বিতীয় খণ্ডে স্পোর্টসের ২০৪ নম্বর প্রশ্নটি ঠিক হয়নি। ম্যান অফ দি ম্যাচ পুরস্কার বিশ্বকাপ ক্রিকেটের প্রতিটি খেলাতে দেওয়া হয়। সুতরাং শুধু একজনের পাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। বুদ্ধির পরীক্ষাতে 'জ'-র ৬৪ প্রশ্নটি [illegible] গোলের। এই খণ্ডে, 'কোন দেশগুলি আয়তন হিসাবে পরপর বলা যায়' প্রশ্নটি অষ্টাদশ অধ্যায়ে আছে আবার ষোড়শ অধ্যায়েও আছে। কৃষি বিভাগের প্রশ্ন ও উত্তরগুলিও সব ঠিক করে লেখা হয়নি। ভারত অনেক কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনেই পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে না। কিন্তু এই বই পড়লে মনে হবে ভারত শুধু তুলো বাদে অন্যসব কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে বসে আছে! দ্বিতীয় খণ্ডে পাতার ক্রমিক সংখ্যার অর্ধেক ছাপা হয়েছে ইংরেজীতে, অর্ধেক বাংলায়। প্রথম খণ্ডের প্রশ্ন রচনায় অনেক ক্ষেত্রে চলিত ও সাধু ভাষার ব্যবহারে গুরুচণ্ডালি দোষ খুবই প্রকট। জীবন বিজ্ঞানের ৫০ নম্বর প্রশ্নটি কি ঠিকভাবে রচনা করা হয়েছে ? নীল চক্ষুই কি শুধু মানুষের একটি প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য ? এ ধরনের ত্রুটি অন্য অনেক বিষয়ের বেশ কিছু প্রশ্নে আছে। এটা কি ইংরেজী প্রশ্ন থেকে বাংলায় তর্জমা করার সময় পরিভাষা ব্যবহারে গণ্ডগোল করার ফল ? এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলার আছে।

প্রথম খণ্ডে বিজ্ঞানের পরিভাষার একটি তালিকা দিলে যারা আগে ইংরেজীতে বিজ্ঞান পড়েছেন তাঁদের বাংলায় পড়তে সুবিধা হতো। পরিশেষে বলি, উপরিউক্ত ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য বইয়ের দুটি খণ্ডই ছাত্রছাত্রী বা প্রশ্নোত্তরের খেলায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের খুবই কাজে লাগবে। প্রতিটি বিষয়কে মোটামুটি জানা যায় এমনভাবে প্রশ্ন [illegible] [illegible] হয়েছে। সম্পাদকমণ্ডলীর পরিশ্রমের ছাপ বইটির সর্বাঙ্গে। তবে, হাজার হাজার প্রশ্নের উত্তর পড়ে কজন মনে রাখতে পারবেন সেটাই সন্দেহ!

স্পোর্টস কুইজের বইটি নিয়ে বিশেষ কিছু লেখার নেই। কুড়ি রকমের খেলাধুলার ওপর প্রশ্ন ও উত্তর এই বইয়ে আছে। বাড়তি আকর্ষণ, শৈলেন মান্নার লেখা ভূমিকা।

খেলাধুলার সঙ্গে যারা জড়িত এবং যারা খেলা পাগল সবারই বইটি পড়তে ভাল লাগবে। বইটি তথ্যবহুল। বিভিন্ন খেলার নিয়মকানুনগুলিও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বলা আছে। এ ধরনের একটা বাংলা সংকলনের অনেকদিন ধরেই প্রয়োজন ছিল। দেশ

হোমিওপ্যাথি এখন জনপ্রিয়

সমরজিৎ কর

সম্প্রতি হুগলী জেলার একটি গ্রামে জনৈক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের সঙ্গে পরিচয় হল। ভদ্রলোক বয়েসে প্রবীণ। কলকাতার একটি হোমিওপ্যাথি কলেজে অধ্যাপনা করেন। তাঁর ডিসপেনসারিতে বসে কথা বলছিলাম। এমন সময় একজন রোগী এলেন তাঁর কাছে। বয়েস বছর পঞ্চাশ। গ্রামের একজন দুঃস্থ কৃষক বলেই মনে হল।

কেমন আছেন ? চিকিৎসক জিজ্ঞেস করলেন তাঁকে।

আগের চেয়ে অনেক ভাল, ডাক্তারবাবু।

তলপেটের বাঁ পাশের যন্ত্রণাটা আছে ?

না।

পিঠের দিকে কোমর বরাবর যন্ত্রণা ?

এখন আর নেই।

পেচ্ছাব ঠিক মত হচ্ছে ?

ভালই তো হচ্ছে মনে হয়। আগের চেয়ে মাত্রা বেড়েছে। থেকে থেকে পেচ্ছাব আর হয় না।

বার্লি খাচ্ছেন ? যেমন বলেছিলাম—সকালে, বিকেলে, রাত্রে ?

খাচ্ছি।

বার্লি চালিয়ে যান। এতে ঠিক মত পেচ্ছাব হবে। ওষুধ দিচ্ছি। আরো কিছুদিন খেতে হবে। আগের মতই। একটি করে সকালে, একদিন অন্তর।

দিন তিনেক আগে একটি ব্যাপার হয়েছে, ডাক্তারবাবু। মূত্রনালীর গোড়ায় যে যন্ত্রণা ছিল সেটা থেমে গেছে। সকালের দিকে পেচ্ছাবের সঙ্গে একটি পাথর বেরোবার পর। বলেই কৃষকটি কাগজের মোড়ক খুলে এক টুকরো পাথর চিকিৎসকের সামনে মেলে ধরলেন।

পাথরটি হাতে নিয়ে চিকিৎসক মনোযোগের সঙ্গে দেখতে লাগলেন। তারপর, সেটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এই দেখুন কিডনি স্টোন।

পাথরটি লম্বায় ছিল প্রায় ছয় সাত মিলিমিটারের মত, চওড়ায় প্রায় দুই মিলিমিটার। অমসৃণ। রঙ হলদে সাদা এবং কালচেয় মিলিয়ে।

চিকিৎসক রোগীটিকে বললেন, ভয়ের কারণ নেই। ওষুধ খান কিছু দিন। ওষুধ পাথর গলিয়ে দেবে। বের করেও দেবে।

রোগীটি তাঁর কাছ থেকে দিন কুড়ির ওষুধ নিয়ে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় বললেন, দেখি, আপনার ওষুধে সেরে গেলে তো ভালই। আপনার কাছে আসার আগে গিয়েছিলাম হাসপাতালে। সেখানে বেজায় খরচ। একস-রে, হ্যানো, ত্যানো। আজকাল হাসপাতালে তো আর সবাই বিনি পয়সায় এসব করার সুযোগ পায় না। করাতে গেলে সেই নার্সিং হোম। তার তো খরচ আছে। অত খরচ কোথা থেকে করবো ডাক্তারবাবু !

রোগী পরীক্ষারত ডাঃ ভোলানাথ চক্রব...
ছবি : রবীন বিশ্বাস

চিকিৎসক মৃদু হেসে বললেন, ওষুধ খান তো, দেখা যাক কি হয় ?

কৃষকটি চলে যেতে তাঁকে বললাম, কি রোগ ?

কিডনির স্টোন। বললেন তিনি।

শুনলাম, অনেকেরই কিডনির পাথর সারিয়েছেন তিনি। রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। দেখলাম, শুধু সেই গ্রামই নয়, আশেপাশের গ্রাম থেকেও ওই সকালেই এসেছে অনেক রোগী। কারোর জ্বর, কারোর পেটের অসুখ, কারোর স্ত্রী-রোগ। রোগীদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার চল হয়ে তাদের অনেক সুবিধে হয়েছে। রোগ সারছে। খরচ নেই বললেই চলে।

সম্প্রতি কলকাতার বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ১ নম্বর কিড স্ট্রিটে, তাঁর চেম্বারে। দেখলাম প্রচণ্ড ভীড়। নানা রকম রোগী। এসেছেন সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে। ভারতের বিখ্যাত সব মানুষ এবং তাঁদের পরিবারেরও তিনি চিকিৎসক। তাই মাঝে মাঝেই তাঁকে ছুটতে হয়, বোম্বাই, দিল্লি। প্রচণ্ড ব্যস্ত। তার ফাঁকেই কিছুটা সময় করে নিতে হল, রোগী দেখার পর, রাতের দিকে। সত্যি কথা বলতে কি, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা যে এত জনপ্রিয়, তাঁর ওখানে না গেলে বিশ্বাস করা যায় না।

সময় কম। অতএব ভূমিকা না করে শুরুতেই বিভিন্ন রোগের কথায় এলাম। বিশেষ করে সেই সব রোগ যাদের নিয়ে মানুষের বিস্তর চিন্তা। ক্যানসার নিয়েই শুরু করলাম প্রথমে।

প্রশ্ন : ক্যানসার নিরাময়ের ব্যাপারে আপনারা কি বলেন, ডাঃ চক্রবর্তী ?

উত্তর : দেখুন, ক্যানসার যে দুরারোগ্য ব্যধি সে তো সবাই জানেন। তবে দেখেছি, ক্যানসার হোমিওপ্যাথিক প্রিন্সিপল মত যদি ঠিক মত চিকিৎসা করা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই সারে। না সারলেও রোগীকে অনেকটা রিলিফ দেওয়া যায়।

প্রশ্ন : রিলিফ দেওয়া বলতে কি বোঝাতে চাইছেন ?

উত্তর : রোগীর যন্ত্রণা লাঘব এবং আরো কিছুদিন যাতে সে বেঁচে থাকে সে দিকে নজর রাখা।

প্রশ্ন : আপনি ব্যক্তিগতভাবে কি ধরনের ক্যানসার চিকিৎসা করেছেন ?

প্রশ্নটি শুনে মৃদু হাসলেন ডাঃ চক্রবর্তী। বললেন, অনেক রকম ক্যানসারই তো দেখেছি। মস্তিষ্কের ক্যানসার থেকে হাড়ের ক্যানসার, আরো নানা রকম ক্যানসার। বরং আপনাকে দুই একটি উদাহরণ দিই। একটি কেস। বাবা কলকাতার ইউনাইটেড ইনডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের একজন কর্মী। একদিন তাঁর ছেলেকে নিয়ে এলেন আমার কাছে। বয়েস বছর আড়াই তিন। বাচ্চাটি ব্রেইন টিউমারে ভুগছে। আমার এখানে নিয়ে আসার আগে তাকে ক্যালকাটা হসপিট্যাল এবং ভেলোরে নিয়ে যাওয়া হয়। দুজায়গারই বিশেষজ্ঞরা আধুনিক পদ্ধতির সাহায্যে তার রোগ নির্ণয় করেন। তাঁরা জানিয়ে দেন, ছেলেটির ব্রেইন-এ ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হয়েছে। অপারেশন করলেও বাঁচবে না। অতএব মিছিমিছি কাটাছেঁড়া করার অর্থ হয় না। আমার কাছে যখন তাকে নিয়ে আসা হল, খুবই খারাপ অবস্থা। ইনটেলিজেন্স লেভেল কমে গেছে, দৃষ্টিশক্তি কমেছে। শরীরের একটা দিকে পক্ষাঘাত শুরু হয়েছে। গোড়ায় ভেবেছিলাম, এক্ষেত্রে হয়ত কিছুই করা যাবে না। কিন্তু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। ডাক্তারদের এ কথা ভুললে তো চলে না। হোমিওপ্যাথির প্রিন্সিপল্ অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করলাম। বাচ্চাটির ভাগ্য ভাল। ওষুধ ধরল। রোগ সারল। এখন তার বয়েস এগার বারো বছর হবে। ভালই আছে।

একজন ক্যানসার রোগিণীর কথা উঠল। ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, তাঁর নামটা আর উল্লেখ করবেন না। সেটা ১৯৬৫ সাল। ভদ্রমহিলার বয়েস তখন বছর তিরিশ। রোগ অস্টিওকারসিনোমা অর্থাৎ হাড়ে ক্যানসার। রোগটি তাঁর অনেক দূর এগিয়ে গেছে। মেটাস্টেসিস অবস্থা। পায়ে পক্ষাঘাত। প্রস্রাব পায়খানা প্রায় বন্ধ। অসহ্য যন্ত্রণা। প্রথমে পি· জি-তে দেখিয়েছিল। পরে ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজে। বাইওপসি করা হয়, রেডিও থেরাপি করা হয়। কোনও ফল হয়নি। চিকিৎকরা জবাব দিলেন। তাঁরা অভিভাবকদের বললেন, রোগিণীকে বাড়িতে রাখুন। অবশিষ্ট দিনগুলোর জন্যে তাঁকে 'পেইনকিলিং ড্রাগ' দেওয়া হল। এই রোগিণীকেও আমি দেখেছি। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শুরু করার পর কিছুদিনের মধ্যে তাঁর যন্ত্রণা কমে এল। সেইসঙ্গে প্রস্রাব পায়খানা স্বাভাবিক হয়ে এল। শেষ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে উঠল। মহিলা এখনো বেঁচে আছেন এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন।

কেসটি ফলো আপ করার জন্যে একটি মেডিকেল বোর্ডও তৈরী হয়েছিল। যার চেয়ারম্যান ছিলেন প্রখ্যাত অ্যালোপাথি চিকিৎসক ডাঃ জে· সি ব্যানার্জি। সেরে যাওয়ার পর ওই রোগিণীকে বোর্ড খতিয়ে পরীক্ষা করে কোন অভিযোগ পায়নি।

প্রশ্ন : শতকরা কতজন ক্যানসার রোগী আপনার হাতে সেরেছে ?

এই সরাসরি প্রশ্নে একটু যেন বিব্রত হলেন ডাঃ চক্রবর্তী। মৃদু হেসে বললেন, আমার হাতে না বলে বরং বলুন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় কতজন সেরেছে। পাশে তাঁর এক সহকারী ছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, তোমার কি মনে হয় ? কত জন সেরেছে ? ভদ্রলোক বললেন, যাদের আমরা চিকিৎসা করেছি তাদের শতকরা দশজন তো দীর্ঘকাল সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় বেঁচে রয়েছেন।

ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, সব রোগীকেই যে সুস্থ করে তোলা যাবে, সেটা তো সম্ভব নয় ? তবে তাদের কষ্ট লাঘব করা যায়। অনেকের আয়ু কিছুটা দীর্ঘতর করা যায়।

প্রশ্ন : হৃদরোগ অথবা রক্তসংবহনজনিত রোগ সম্পর্কে আপনি কি বলেন ?

উত্তর : একজন অধ্যাপকের কথা বলি। নামটা বলছি, তবে আপনার লেখায় উল্লেখ করবেন না। ভদ্রলোক ডক্টরেট। একটি কলেজে পড়ান। তাঁর হয়েছিল মাইওকারডিয়াল ইনফ্র্যাকশন। ডাঃ আর এন চ্যাটার্জির মত বিখ্যাত চিকিৎসকরা তাঁর চিকিৎসা করেন। ফল হয়নি। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার পর এখন তিনি পুরোপুরি সুস্থ। কলেজে পড়াচ্ছেন। গাড়ি চালাচ্ছেন। তাঁর ই· সি· জি রিপোর্ট এখন পুরোপুরি নরম্যাল। আর একটি কেসের কথা বলি। ডাঃ তপন ব্যানার্জির বাবা। এটা ডায়াবেটিজ কেস। বেশ অ্যাডভান্সড্ অবস্থায় তখন। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা যথেষ্ট হয়েছে। ফল পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যে রোগের প্রকোপ অনেকটা বেড়েছে। দেখা দিয়েছে নানা রকম উপসর্গ। কানে কম শুনছেন, চোখে কম দেখছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর পায়ে দেখা দিল গ্যাংগ্রিন। যাকে বলা হয় 'ডায়াবেটিক গ্যাংগ্রিন। তাঁর চিকিৎসকরা বললেন, পা কেটে বাদ না দিলে এ রোগী বাঁচবেন না। অথচ রোগী পা কাটতে চান না।

প্রশ্ন : এটা যে সত্যিই ডায়াবেটিজ কেস, কি করে বুঝলেন ?

উত্তর : ডায়াবেটিজ প্রমাণ করার জন্যে আধুনিক যে যে ব্যবস্থা রয়েছে সবই কাজে লাগান হয়েছে। 'ইট ওয়াজ অ্যান এসট্যাবলিস্ড ডায়াবেটিজ কেস', বলেছেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ কুমারকান্তি ঘোষ। যাই হোক ডাঃ তপন ব্যানার্জির বাবাকে নিয়ে আসা হল। কিছুদিন চিকিৎসার পর দেখা গেল গ্যাংগ্রিন কমে যাচ্ছে। মাস ছয়েকের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলেন। এখন তিনি পুরোপুরি সুস্থ। খাওয়াদাওয়া সব চলছে। নিয়মিত হাঁটাচলাও করছেন।

প্রশ্ন : যাঁরা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন, তাঁরা বলে থাকেন, হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়ার সময় অ্যালোপ্যাথি চলবে না। অথচ দেখছি, ডায়াবেটিজ রোগের ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি ওষুধের সঙ্গে আপনি 'ইনস্যুলিন' দেবারও বিধান দেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটা কি একটা ব্যতিক্রম নয় ?

উত্তর : দেখুন, ডায়াবেটিজ নানা ধরনের। কেউ কেউ জন্মসূত্রে এই রোগটি লাভ করে। যাদের বলা হয় 'কনজেনিটেল ডায়াবেটিক'। ইনস্যুলিন এক ধরনের হরমোন। শরীরে এই হরমোনের ঘাটতি হলে ডায়াবেটিজ হয়। এক্ষেত্রে ওষুধ বলতে ঠিক যা বোঝায়, ইনস্যুলিন তো তা নয়। ইনস্যুলিন শরীরেরই একটি বস্তু। প্রকৃতিজাত সামগ্রী। তার ঘাটতি হলে বাইরে থেকে সরবরাহ করলে তাতে আপত্তি কোথায়। শরীর সুস্থ রাখতে গেলে যেমন খাবার খেতে হয়, ঠিক তেমনি এক্ষেত্রে ইনস্যুলিনও সেই খাবারের মত কাজ করে। ভিটামিনের ঘাটতি হলে যেমন ভিটামিন দিতে হয় খাবারের সঙ্গে, ব্যাপারটা ঠিক তেমনি। জন্মগত সূত্রে ডায়াবেটিজ হলে ইনস্যুলিন নিয়মিত দিতে হয় ; এক্ষেত্রে শরীরে যতটা ইনস্যুলিন উৎপাদন হওয়া দরকার তা হয় না বলে। কোন কোন ডায়াবেটিজ হোমিওপ্যাথিতে পুরোপুরি সেরে যায়। অনেক

সময়, বিশেষ করে বয়স্কদের ক্ষেত্রে, কখনো কখনো ইনস্যুলিন কাজ করে না। এ সব ক্ষেত্রে বুঝতে হবে অন্য কোন শারীরবৃত্তীয় বিপত্তির জন্যেই এমনটি ঘটছে। আসল কথা কি জানেন? রোগ নির্ধারণটাই বড় ব্যাপার। সেটা করা গেলে হোমিওপ্যাথি ওষুধে সব ক্ষেত্রেই ভাল ফল পাওয়া যায়। এতে ঝক্কি কম। খরচও কম।

প্রশ্ন: আপনি হোমিওপ্যাথি প্রিন্সিপল-এর কথা বলেছেন। এটার তাৎপর্য কি?

উত্তর: আপনি একেবারে গোড়ার প্রশ্নই তুলেছেন। ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলি। হোমিওপ্যাথি প্রিনসিপল্‌স্‌-এর আবিষ্কর্তা জার্মান চিকিৎসক হ্যানিমান। হ্যানিমান গোড়ায় অ্যালোপ্যাথিই করতেন। তিনি ছিলেন এম· ডি। অভিজ্ঞ রাসায়নিকও। প্র্যাকটিসে তাঁর নামডাকও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু প্র্যাকটিস করতে গিয়ে একটি ঘটনা তাঁকে খুব নাড়া দিল।। ধরুন, কেউ হাঁপানি রোগে ভুগছে। ওষুধ দেওয়া হল। উপসর্গের উপশম হল। কিন্তু দেখা গেল আবার কিছুদিন পর হাঁপানি দেখা দিয়েছে। ডাঃ হ্যানিমান ভাবলেন, তাহলে তো রোগ সারেনি। রোগের সূত্র রোগীর মধ্যে থেকেই যায়। ওষুধ দিয়ে সাময়িক ভাবে তাকে চাপা দেওয়া হয় শুধু। ভাবলেন, রহস্যটা জানতে হবে। চাই 'কমপ্লিট কিওর'। রোগের উপসর্গের সাময়িক উপশম নয়, ভবিষ্যতেও রোগীর আর যাতে রোগ না হয়, সেটা দেখা দরকার। যার দরুন সেটা হয় তাকে নির্মূল করতে হবে। বলতে পারেন, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার এটাই প্রধান প্রিনসিপল। এই ভাবনা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে হ্যানিমান অ্যালোপ্যাথি প্র্যাকটিস ছেড়ে দেন।

কিন্তু বেঁচে থাকতে গেলে কিছু রোজগার তো দরকার। হ্যানিমান নানা রকম ভাষায় ছিলেন পারদর্শী। ঠিক করলেন, রোজগারের জন্যে তিনি অনুবাদের সাহায্য নেবেন। লেগে গেলেন বিভিন্ন ভাষার বই অনুবাদের কাজে। এ সময় তাঁকে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পড়তে হয়। একটা অর্ডার পেলেন। কুলেন-এর মেটিরিয়া মেডিকা ইংরেজি থেকে অনুবাদ করতে হবে জার্মান ভাষায়। বইটি অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি যখন 'কুইনিন' পরিচ্ছেদে এলেন, কুইনিন সম্পর্কিত ব্যাখ্যাটি তাঁর ভাল লাগল না। এরপর নিজেই তিনি কুইনিন নিয়ে পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। তিনি নিয়মিত কুইনিন খেতে লাগলেন। দেখা গেল কুইনিন খাওয়ার পর তাঁর জ্বর হতে শুরু করেছে। কেঁপে জ্বর আসে, ঘাম দিয়ে জ্বর সারে। একেবারে ম্যালেরিয়ার উপসর্গ। স্ত্রী ছেলেমেয়ে এবং ছাত্রদের খাওয়ালেন কুইনিন। একই ফল। ব্যাপারটা দেখে খুবই অবাক হলেন হ্যানিমান। বুঝতে পারলেন, এটা কোন কাকতালীয় ঘটনা নয়। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল গভীর। তাঁর ধারণা হল, যে ওষুধ অসুস্থ মানুষের কোন রোগ সারায়, সেই ওষুধই সুস্থ মানুষ খেলে সেই রোগে আক্রান্ত হয়।

ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন তিনি। দীর্ঘ ছয় বছর ধরে চলল পরীক্ষা নিরীক্ষা। সেইসঙ্গে চরম দারিদ্র্য। একটি প্রবন্ধে তিনি

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক বাড়ছে। অনেকে ভাল চিকিৎসা করছেন। বিশেষ করে গ্রামের মানুষরা হচ্ছেন বেশী উপকৃত। এ কথা মনে রেখেই এই চিকিৎসার ব্যাপারে সংহত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

লিখলেন ওষুধ সুস্থ শরীরে কত রকম উপসর্গ সৃষ্টি করতে পারে তার বিবরণ দিয়ে। তিনি বললেন, যে ওষুধ অসুস্থ মানুষের রোগের উপসর্গ উপশম করে, সেই ওষুধই সুস্থ শরীরে সৃষ্টি করে ওই সব উপসর্গ। চলল আবার গবেষণা। দীর্ঘ বারো বছর। একই ওষুধের মাত্রা কমিয়ে ওষুধের কার্যকারিতা যাচাই করার চেষ্টা চলল। আশ্চর্য! দেখলেন, ওষুধের 'অ্যাকটিভ প্রিনসিপল' (সক্রিয় বস্তু) এর মাত্রা যত কম হয় তার কার্যকারিতা হয় তত বেশি। এই সময় তিনি বেশ কয়েকটি মৌলিক বিধান তৈরি করলেন—'সিমিলিয়া সিমিলিবাস কিউরেনটার', সিমিলিয়া সিমপ্লেকস মিনিমাম', প্রভৃতি। বললেন, ব্যাহত শক্তি পুনোরুদ্ধার করে রোগ সারাতে হবে। অতএব শুধু একটি মাত্র উপসর্গ নয়, চিকিৎসা করার সময় রোগীর নিজস্ব ইতিহাস সম্পর্কে যেমন বিস্তৃত খবর জানা দরকার, তার বাবা মা ভাইবোন প্রভৃতির রোগ সম্পর্কিত ইতিহাসও জানা দরকার। কারণ উপসর্গ একটি হলেও, তার সঙ্গে জড়িত থাকে অনেক ঘটনা।

"ব্যাপারটা আপনাকে উদাহরণ দিয়ে বোঝাই।" বললেন ডাঃ চক্রবর্তী। "এ ক্ষেত্রেও রোগীর নাম এবং রোগের নাম বলব না। তবে রোগী ভারতখ্যাত লোক। কিছুকাল আগেও কোন একটি প্রদেশের রাজ্যপাল ছিলেন। হঠাৎ তাঁর কষ্ট হল। আমার ডাক পড়ল। তাঁর সঙ্গে কথা বললাম অনেকক্ষণ। বাল্যকাল থেকে তাঁর এ পর্যন্ত কতরকম রোগ হয়েছে কি কি উপসর্গে ভুগেছেন, শুনলাম। তাঁর সন্তানাদি এবং বাবা-মা'র রোগের কথাও শুনলাম। বুঝলাম, খোলাখুলি সব বললেও একটি রোগের কথা তিনি বলেননি। হয় ইচ্ছে করে বলেননি, নয়ত বলতে ভুলে গেছেন। আমি বললাম, সবই বললেন, একটি রোগের কথা চেপে গেছেন। আমার প্রশ্নে কিছুটা বিরক্ত হলেন তিনি। আমি বললাম, কুড়ি-বাইশ বছর বয়সে আপনার প্লুরোসিস হয়েছিল, এটা বলেননি। তিনি বললেন, ব্যাপার কি বলুন তো? আপনি কি জ্যোতিষীও করেন? সত্যিই ওই বয়েসে এ রোগটি আমার হয়েছিল। সেকথা আমার স্ত্রী ছাড়া কেউ জানেন না। যাই হোক, এরপর তাঁকে আমি ওষুধ দিই। আসলে যে কোন রোগের চিকিৎসা করার আগে আমরা দেখে নিই, রোগীর আগে আর কি কি রোগ হয়েছিল। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এতে বোঝা যায়। সেই মত চিকিৎসা করলে টোটাল কিওর ঘটে। ধরুন কিডনিতে পাথর হল। অপারেশন করে সেই পাথর আপনি বের করে দিলেন। এর পরে আবার যে পাথর হবে না, কেউ বলতে পারেন না। আমাদের লক্ষ, অপারেশন না করে সেই পাথর দূর করা এবং ভবিষ্যতে আর যাতে পাথর না হয়, তার ব্যবস্থা করা।"

প্রশ্ন: হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকরা খাবারের ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি করেন। পেঁয়াজ খাবেন না, রসুন খাবেন না, এমন অনেক কথাই বলেন তাঁরা। এর কারণ কি?

উত্তর: এ সম্পর্কে দুটি কথা বলা যায়। শরীরে কোন কোন উপসর্গ দেখা গেলে কিছু কিছু খাদ্য না খাওয়াই ভাল। সুস্থদেহীদের ক্ষেত্রেও এটা সত্য। তবে ওই যে রসুন পেঁয়াজের কথা বললেন, তার পেছনে অন্য কারণ রয়েছে। হোমিওপ্যাথি ওষুধে কার্যকরী বস্তুর মাত্রা থাকে খুবই কম। রসুন খেলে মুখে রসুনের উপাদান লেগে থাকে। তাদের সঙ্গে বিক্রিয়া করলে ওষুধের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। এর জন্যেই রসুন পেঁয়াজ খেতে বারণ করা হয়। তা ওষুধ খাওয়ার অনেক আগে বা অনেক পরে খান না। কোন অসুবিধে নেই।

ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বাড়ছে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গই প্রথম ভূমিকা নিয়েছিল। এখন অভিজ্ঞ চিকিৎসক তৈরি এবং গবেষণার ব্যবস্থাও চলছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গ এ ব্যাপারে পিছিয়ে পড়ছে। সরকারের আগ্রহ কম। গবেষণাগার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্যে যতটা করা দরকার তা হচ্ছে না। অথচ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক বাড়ছে। অনেকে ভাল চিকিৎসা করছেন। বিশেষ করে গ্রামের মানুষরা হচ্ছেন বেশী উপকৃত। এ কথা মনে রেখে এই চিকিৎসার ব্যাপারে সংহত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। আমরা বলছি ২০০১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সবাইকে রোগমুক্ত করতে হবে, সবাইকে দিতে হবে উপযুক্ত স্বাস্থ্য। সে ব্যাপারে হোমিওপ্যাথির ভূমিকা এখন কেউ আর অস্বীকার করতে পারে না। তাঁর বক্তব্য, আধুনিক সাজসরঞ্জাম কাজে লাগান গেলে এই বিশেষ চিকিৎসা বিজ্ঞানটির অনেক উন্নতি করা যায়। চিকিৎসাও এ ব্যাপারে সরকারের গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। শিশু এবং স্ত্রী রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে তাতে আরো বেশী সংখ্যক মানুষ ভাল ফল পেতে পারে।

শেষ

বাইওসেনসর এবং চিনি

সরঞ্জাম হিসেবে খুবই ক্ষুদ্র। লম্বায় এক সেন্টিমিটার, পুরু চার থেকে পাঁচ মিলিমিটার। সরঞ্জামটির প্রধান অংশ বলতে সোনার একটি প্লেট এবং প্লাস্টিকে মোড়া একটি পাতলা পর্দা। যন্ত্রটি থেকে বেরিয়ে এসেছে দুটি তার। তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে একটি কমপিউটার। যন্ত্রটি যৎসামান্য রক্তের সংস্পর্শে আনুন। সঙ্গে সঙ্গে সেই রক্ত পর্দায় গিয়ে হাজির হবে। শুরু হবে তড়িৎ রাসায়নিক বিক্রিয়া। অমনি কমপিউটার জানিয়ে দেবে আপনার রক্তে চিনির পরিমাণ কত। সরঞ্জামটি তৈরি করেছেন পশ্চিম জার্মানির এরল্যাঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিজ্ঞান বিভাগের বিজ্ঞানীরা। প্রচলিত পদ্ধতিতে রক্ত পরীক্ষা করতে অনেক হাঙ্গামা। সময়ও লাগে অনেক। বিশেষজ্ঞের দরকার। কিন্তু কারোর সাহায্য ছাড়াই এই সরঞ্জামটির সাহায্যে রোগী নিজেই তার রক্তে কতটা চিনি রয়েছে মেপে নিতে পারেন। সময় লাগে কয়েক সেকেন্ড মাত্র। এবং ব্যবস্থা হিসেবেও খুবই নির্ঝঞ্ঝাট এবং খুবই নির্ভরযোগ্য।

সৌরচুল্লি

নীচে চাকা। চাকার উপর বসান চুল্লি। ইচ্ছে করলে চুল্লিটি যে কোনও জায়গায় নিয়ে গিয়ে রান্নাবান্নার কাজ সারতে পারেন। দিনে এবং রাতে, যখন খুশি। এই চুল্লিতে জ্বালানি হিসেবে তেল অথবা কয়লা কিছুই ব্যবহার করা হয় না। বিদ্যুৎশক্তিই তৈরী করে উত্তাপ। আর সেই বিদ্যুৎশক্তির উৎস সূর্য। সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে সংরক্ষিত করা হয় বিশেষ এক ধরনের সঞ্চয়ক কোষে। ফলে রাত এবং দিন, যখন খুশি, চুল্লিটি ব্যবহার করা যায়। চুল্লিটির উপরে থাকে একটি ধাতব চাকতি। সুইচ টিপুন। সঙ্গে সঙ্গে চাকতিটি তেতে উঠবে। এর পর শুরু করুন জল গরম থেকে রান্নার কাজ। চুল্লিটির উদ্ভাবক পশ্চিম জার্মানির একটি শিল্প সংস্থা—Wilhelm und Sandheim in Volpriehausen. উদ্ভাবকরা মনে করেন, তৃতীয় বিশ্বে এই চুল্লি যথেষ্ট সমাদর পাবে।

সামুদ্রিক খনি

প্রশান্ত, ভারত এবং আটল্যান্টিক মহাসাগরের নীচে ভূপৃষ্ঠের উপর ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র নুড়ি। ভূতাত্ত্বিকরা যাদের নাম দিয়েছেন 'পলিমেটালিক নড্যুলস'। এই সব নুড়ির মধ্যে রয়েছে তামা, নিকেল, কোবলট এবং দস্তার মত মূল্যবান ধাতু। এ ধরনের নুড়ি সব চেয়ে বেশী পাওয়া যায় ৩৫০০ থেকে ৬০০০ মিটার গভীরে। মহাসাগরের নিচে ৪৬০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে তারা ছড়িয়ে রয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরে ২৩০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার, ভারত মহাসাগরে ১৫০ লক্ষ এবং আটল্যান্টিক মহাসাগরে ৮০। এইসব নুড়ি থেকে মোট ১·৭ ট্রিলিয়ন টন মূল্যবান ধাতু সংগ্রহ করা যেতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত এ ব্যাপারে ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও উদ্যোগী হয়েছেন। গোয়ার ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অব ওসেনোগ্রাফি ভারত মহাসাগর থেকে নিয়মিত সংগ্রহ করছেন এ ধরনের নুড়ি। তাদের পরীক্ষা করে দেখছেন। অদূর ভবিষ্যতে এই সব নুড়ি থেকে মূল্যবান ধাতু সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁরা পরিকল্পনাও রচনা করছেন।

পলিমেটালিক নড্যুলস সংগ্রহ করছেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা

অতিকায় ভেড়া

প্রথমে নেওয়া হল একটি ভেড়ার ভ্রূণ। ভ্রূণটির তখন এক-কোষী দশা। তার মধ্যে প্রতিস্থাপন করা হল একটি বিশেষ ধরনের 'জিন'। যার কাজ শরীরে 'দৈহিক বৃদ্ধিকারী' বা 'গ্রোথ' হরমন উৎপাদনে সাহায্য করা। এরপর ভ্রূণটি সংস্থাপন করা হল একটি মেয়ে ভেড়ার জঠরে। এপ্রিল ১৯৮৬ সেই ভ্রূণ থেকে সৃষ্টি হল একটি শিশু ভেড়া—মেয়ে, এবং স্বাস্থ্যবতী। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার দৈহিক বৃদ্ধি ঘটল সাধারণ ভেড়ার চেয়ে অনেক বেশি। জিন প্রতিস্থাপন করে এইভাবে অতিকায় ভেড়া তৈরির ঘটনা এই প্রথম। এই কৃতিত্বটি অর্জন করলেন অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি কাউন্সিলের একদল বিজ্ঞানী। পরীক্ষার কাজটি পরিচালনা করেন ডঃ ট্রেভোর স্কট।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে স্কট দাবি করেছেন, পদ্ধতিটি কাজে লাগিয়ে এবার তাঁরা প্রচুর বৃহদাকার ভেড়া উৎপাদন করতে পারবেন। সাধারণ ভেড়ার তুলনায় যাদের দেহ ৫০ শতাংশ বড় হবে।

স্কট অবশ্য এখানেই থেমে নেই। তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা এবার আর এক ধরনের জিন প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করছেন। তাঁদের বক্তব্য : যদি আমরা কৃতকার্য হই, তা হলে এই জিন ভেড়ার শরীরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎপাদন করাবে দুটি বিশেষ ধরনের এনজাইম'। এনজাইম দুটির সাহায্যে তাদের শরীরে নিয়মিত উৎপাদিত হবে সালফার অ্যামিনো অ্যাসিড। উল্লেখ্য, এই অ্যাসিড ভেড়ার পশম বাড়াতে সাহায্য করে। পশম বাড়ানোর জন্যে এখন ভেড়ার খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয় এই অ্যাসিড। ভবিষ্যতে এর আর প্রয়োজন হবে না। তখন ভেড়ার নিজের শরীরেই উৎপন্ন হবে প্রয়োজন মত এই অ্যাসিড।

বিড়িতে ফিলটার

সিগারেটের ধোঁয়ায় থাকে প্রচুর পরিমাণ 'টার' বা আলকাতরা জাতীয় বস্তু। 'টার'-এ থাকে নানা রকম বিষাক্ত রাসায়নিক যৌগ, যা ফসফুসের ক্ষতি করে। 'টারে'র মাত্রা কমানর জন্যে সিগারেটে ব্যবহার করা হয় ফিলটার। দেখা গেছে, ভারতে উৎপাদিত প্রতিটি সিগারেটের ধোঁয়া থেকে ধূমপায়ীরা ২২ মিলিগ্রামের মত 'টার' আত্মস্থ করেন। বিড়ির ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ২০ থেকে ৪০ মিলিগ্রাম। অবশ্য এই পরিমাণটি নির্ভর করে বিড়ি কতটা লম্বা তার উপর। ব্যাপারটা নিয়ে পরীক্ষা করেছেন বোম্বাই-এর ক্যানসার রিসার্চ ইনসটিটিউটের বিজ্ঞানী কস্তুরী জয়ন্ত। তিনি মনে করেন, সিগারেটের মত বিড়িতেও ফিল্টারের চল হওয়া উচিত।

দেখলেন তো?
মামুলি ডিসটেম্পারের চেহারাকে
জেনসন অ্যাণ্ড নিকলসন
কেমন পাল্টে দেয়...

অ্যাক্রিলিকের জাদুর স্পর্শে।

আপনার জন্যে জেনসন অ্যাণ্ড নিকলসন এনেছে—পেণ্ট টেকনোলজির একেবারে নতুন নতুন নমুনা! কেবল জেন্সোলিন অ্যাক্রিলিক ওয়াশেবল্ ডিসটেম্পার-ই আপনাকে দিতে পারে অপূর্ব ফিনিশ, পাকা আসল রঙ আর দ্রুত শুকিয়ে যাওয়া ক্ষমতা। এত গুণ অথচ দাম সেই অন্য অয়েল বাউণ্ড ডিসটেম্পারের মতই।

জেন্সোলিন অ্যাক্রিলিক ওয়াশেবল ডিসটেম্পার- সবসেরা ডিসটেম্পার, বাড়তি খরচও লাগেনা যার!

Rediffusion/JN/4931 n BN

ইউরেনাসকে নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করে ভয়েজার-২ যে দুর্বল রেডিওবার্তা পাঠাবে, তা ধরার জন্যে অস্ট্রেলিয়ায় বসানো 'নাসা'র বিশাল রেডিও-দূরবীন

প্রাচীনকালে শনিকে মনে করা হত সবচেয়ে বাইরের দিকের গ্রহ। আরও দূরে কোনো গ্রহ থাকতে পারে এ কথা কারোর কল্পনাতেও ছিল না। শনি পেরিয়ে, অনেক দূরে ছিল শুধু স্থির নক্ষত্রদের জগৎ, আর কিছুই নয়। তাছাড়া সূর্য, চন্দ্র ও পাঁচটি গ্রহ নিয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল সাত। সাত হচ্ছে একটা পূত সংখ্যা। তাই সব কিছুই ঠিকঠাক মিলে গিয়েছিল, নতুন করে খোঁজ নেবার কিছুই ছিল না। প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে মানুষের মনে এরকম একটা দৃঢ় বিশ্বাস দানা বেঁধে ছিল, সেটা হল পৃথিবীকে বাদ দিলে আর মাত্র পাঁচটি গ্রহের অস্তিত্বের ধারণা—তারা হল বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। এ খবর ব্যাবিলন যুগের জ্যোতির্বিদরাও জানতেন। পাঁচ হাজার বছর ধরে মানুষ কল্পনাও করতে পারেনি যে সূর্যের আরও গ্রহ আদৌ থাকতে পারে। তাই আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে যখন ইউরেনাস গ্রহটির আবিষ্কার হল, তখন সারা বিশ্বে একটা রীতিমত হইচই পড়ে গেল এবং প্রবল একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা ঠিক এখন

২৪শে জানুয়ারী, ১৯৮৬, ভয়েজার ২ ইউরেনাসের সবচেয়ে নিকটে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে

ভয়েজার-ইউরেনাস চাঞ্চল্যকর সাক্ষাৎকার

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আন্দাজ করা নিশ্চয়ই সম্ভবপর নয়। এখানে একটা প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে—আগেকার দিনে সবারই জানা ছিল যে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে ছ'টি গ্রহ, বুধ থেকে শনি পর্যন্ত। স্মরণাতীত কাল থেকেই এদের অস্তিত্বের কথা মানুষের জানা ছিল। তবে কেন ইউরেনাস এবং তারও পরের দুটো গ্রহ নেপচুন ও প্লুটোর অস্তিত্ব মানুষের নজরে এত পরে ধরা পড়ল? এর কারণটা কি?

এই তিনটি গ্রহ মানুষের দৃষ্টিতে না ধরা পড়ার একটা মস্ত বড় কারণ অবশ্যই এদের উজ্জ্বলতার অভাব। ভাল দূরবীন না হলে, এই পরের তিনটি গ্রহের গতিবিধি দেখা একেবারেই সম্ভবপর ছিল না, তার কারণ এদের অবস্থান সূর্য থেকে অনেক অনেক দূরে। ঠিক সেই জন্যেই দূরবীন আবিষ্কারের আগে ইউরেনাসকে গ্রহ বলে চেনা একরকম অসম্ভব ছিল। যদিও গ্যালিলিও ১৬০৯ সালে প্রথম দূরবীন আবিষ্কার করেন, কিন্তু শক্তিশালী দূরবীন তৈরি হতে আরও অনেক বছর কেটে গেছে, তাই ইউরেনাসকে গ্রহ বলে চিনতে তারও পরে প্রায় দুশো বছর অতিবাহিত হয়েছে। ইউরেনাস গ্রহটির আবিষ্কারের কাহিনী বড় মজার—এখন সেই প্রসঙ্গে আসা যাক।

ইউরেনাসের আবিষ্কারক ছিলেন স্যার উইলিয়ম হার্শেল। মানুষটা ছিলেন সবদিক থেকেই অসাধারণ। ১৭৩৮ সালের ১৫ নভেম্বর উইলিয়ম জার্মানীর হ্যানোভার শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। সে সময়ে হ্যানোভার ছিল ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী। ব্রিটিশ সম্রাট দ্বিতীয় জর্জ ছিলেন এই রাজ্যটিরও শাসক। উইলিয়মের বাবা রাজ্যের সৈন্যদলে অর্গান বাজাতেন, তাই নেহাৎ বাল্যকাল থেকেই উইলিয়মের রক্তে দানা বেঁধেছিল সঙ্গীতের নেশা। মাত্র পনের বছর বয়সে উইলিয়মকে সৈন্যদলে বাদক হিসেবে ঢুকিয়ে নিতে বাবার বিশেষ অসুবিধে হয়নি। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। ১৭৫৬ সালে শুরু হল ইতিহাস বিখ্যাত সাত বছরের যুদ্ধ। একদিকে ফরাসীরা, অন্যদিকে ব্রিটিশ ও প্রুশিয়ানরা। হ্যানোভার জড়িয়ে পড়ল যুদ্ধে। ১৭৫৭ সালে হ্যানোভারের পতন হল ফরাসীদের হাতে। পরাধীনতার ক্লেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় উনিশ বছরের উইলিয়ম সৈন্যদল ত্যাগ করলেন, আর তারপর অনেক কষ্টে একদিন ব্রিটেনে এসে পৌঁছলেন। ব্রিটেনে ধীরে ধীরে উইলিয়ম বাদক, সুরকার এবং সংগীত-শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেন। ১৭৬৬ সালে ব্রিটেনের বাথ শহরে এক বিখ্যাত চ্যাপেলে তিনি অর্গানবাদক নিযুক্ত হলেন, আর এই চাকুরী তাঁকে আর্থিক অনিশ্চয়তা থেকে খানিকটা মুক্তি এনে দেয়। হাতে কিছু অর্থ আসার সঙ্গে সঙ্গেই পুরোদমে শুরু হয়ে গেল জ্ঞানচর্চা। প্রথমে কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষা শিখে ফেললেন। তারপর উইলিয়মের আকর্ষণ এল আলোকবিদ্যার দিকে। তিনি ক্রমশ দূরবীনের খবর জানতে
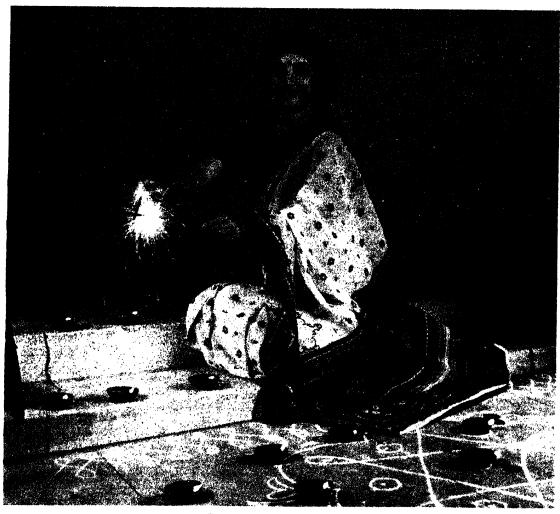
পারলেন। দূরবীন হল মহাশূন্যের সীমাহীন জগতের দিকে তাকাবার আয়ত চক্ষু। ভাগ্যের কি এক বিচিত্র গতি, শেষ পর্যন্ত সংগীত বিশারদ উইলিয়মকে একদিন মহাকাশ পর্যবেক্ষণের রহস্যময় জগতের সামনে এনে দাঁড় করাল। বলা যেতে পারে যে প্রায় ১২ বছর বয়সে উইলিয়মের রক্তে আর একটা নেশা ঢুকে গেল, সেটা হল আকাশ দেখার। দিনের বেলাটা কাটত গান বাজনা করে, আর রাত এলেই বুঁদ হয়ে থাকতেন মহাকাশের জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণের নেশায়। কিন্তু এই পর্যবেক্ষণ সাধনায় বড় প্রয়োজন একটা ভাল দূরবীনের, কিন্তু একটা ভাল দূরবীন কেনা তাঁর সামর্থ্যের বাইরে। তাই প্রথম প্রথম দূরবীন ভাড়া করেই আকাশে দেখতে শুরু করলেন। কিন্তু তাঁর যে অদম্য কৌতূহল, তা তো ভাড়া করা দূরবীন দিয়ে মেটানো সম্ভবপর নয়। তখন অন্য কোনও পথ দেখতে না পেয়ে, উইলিয়াম নিজেই একটা শক্তিশালী দূরবীন তৈরির চিন্তা করতে লাগলেন। এই ব্যাপারে অনভিজ্ঞ উইলিয়াম এক অমানুষিক পরিশ্রমে মেতে গেলেন। তাঁর খাওয়ার সময় নেই, ঘুমোবার সময় নেই, একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান, কি করে দূরবীন ঠিকমত তৈরি করা যায়? এইভাবে অমানুষিক পরিশ্রম করে ১৭৭৪ সালে উইলিয়াম একটা দূরবীন তৈরি করে ফেললেন, সেটার ব্যাস ছিল মাত্র আট ইঞ্চি, আর লম্বায় ছিল ছয় ফুট। এই দিয়েই যাত্রা হল শুরু। এর পরে অবশ্য উইলিয়াম ১৭৮৯ সালে তৈরি করতে পেরেছিলেন চার ফুট ব্যাস আর চল্লিশ ফুট লম্বা এক শক্তিশালী দূরবীন। শেষ পর্যন্ত নিজের তৈরি দূরবীন দিয়ে সারা রাত জেগে চলল আকাশ পর্যবেক্ষণের সাধনা। সাধারণভাবে আকাশ দেখায় তাঁর তৃপ্তি ছিল না, তিনি চাইতেন অদেখা জিনিসের দেখা পেতে। আকাশের মানচিত্র সংগ্রহ করেছিলেন, আর তার সাহায্যে আকাশের একটার পর একটা অংশ বেছে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করতেন, তন্ন তন্ন করে সন্ধান করতেন। এ ব্যাপারে সহকারী ছিলেন তাঁরই বোন ক্যারোলিন। অন্ধকার জায়গা থেকে ভাই যা দেখতেন, তার বর্ণনা অবস্থান চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোনকে শোনাতেন— আর বোন সেই আলোকিত ঘরে বসে সে সব কথা লিখে নিতেন। অবশেষে উইলিয়ামের জীবনে সেই বিশেষ দিনটি এল— ১৩ই মার্চ, ১৭৮১ সাল। ঐ রাতে উইলিয়াম আকাশের যে অংশে আছে মিথুন রাশি, সেই অংশটা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছিলেন। হঠাৎ দেখলেন যে এইচ জেমিনোরাম নামে অতি পরিচিত নক্ষত্রের কাছে একটি জ্যোতিষ্ক আছে যার ওখানে ঠিক থাকার কথা নয়— আকাশের কোন মানচিত্রেই যার কোনও নির্দেশ নেই। উইলিয়াম বুঝলেন যে ওটা অজানা নতুন কোনও এক জ্যোতিষ্ক। ভালো করে দূরবীন দিয়ে লক্ষ করে দেখলেন যে বস্তুটা আকারে দৃশ্যত বেড়ে যাচ্ছে, একটা চাকতির মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু নক্ষত্রদের ক্ষেত্রে তো এমনটা হয় না, দূরবীনের ক্ষমতা বাড়ালে নক্ষত্র উজ্জ্বলতর হয়, কিন্তু আকারে কখনই বৃহত্তর হয় না। তার কারণ নক্ষত্ররা এত দূরে আছে যে তাদের সব সময়ে বিন্দুর মতোই দেখায়, দূরবীনের মাধ্যমে তাদের বিবর্ধন কিছুতেই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয় না। অতএব উইলিয়ম বুঝলেন যে ওঁর দেখা নতুন জ্যোতিষ্কটা কিছুতেই নক্ষত্র নয়। উনি তখন মনে করলেন যে ওটা কোনও ধূমকেতু— সূর্য থেকে অনেক দূরে থাকার দরুন যার ঝাঁটার মতো লেজ তখনো গঠিত হয়নি। কিন্তু আরও কিছুদিন পরে অমন ভাববার আর অবকাশ রইল না। উইলিয়াম রাতের পর রাত ধরে এই নতুন জ্যোতিষ্কটিকে দূরবীনের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন, আর দেখলেন যে আকাশের নক্ষত্রদের পটভূমিকায়, নতুন জ্যোতিষ্কটা ক্রমেই সরে সরে যাচ্ছে— আর যাচ্ছে ধূমকেতুর ঢংয়ে নয়, একেবারে গ্রহদের ঢংয়ে, তাছাড়া তার আকার-আকৃতিরও আর কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। উইলিয়াম বুঝলেন যে তিনি সৌর জগতের সপ্তম গ্রহটিকে আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

বিশ্বের চারদিকে হইচই পড়ে গেল— গত পাঁচ হাজার বছর ধরে চলে আসা এক বিশ্বাস অকস্মাৎ ধূলিসাৎ হয়ে গেল, না সৌরজগতে তাহলে আরও একটা গ্রহের অস্তিত্ব আছে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এক সংগীতশিল্পী বিশ্বনন্দিত এক জ্যোতির্বিজ্ঞানীতে পরিণত হলেন।

ইংল্যান্ডের তখনকার রাজা তৃতীয় জর্জের নামানুসারে উইলিয়াম এই নতুন গ্রহের নামকরণ ল্যাটিন ভাষায় করলেন— জর্জিয়াম সাইডাস। এর প্রত্যক্ষ ফল পেতে উইলিয়মের দেরি হল না। ব্রিটেনের সম্রাট তৃতীয় জর্জ তাঁকে "কোর্ট অ্যাস্ট্রনমার" নিযুক্ত করলেন, বৃত্তি হিসেবে ধার্য হল বছরে দু'শো পাউণ্ড। এই প্রথম তিনি পুরোপুরি জ্যোতির্বিদ্যায় সময় কাটাবার সুযোগ পেলেন। মহাকাশের হাতছানি তাঁকে এত প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল যে পেশা হিসেবে সংগীতকে উইলিয়াম পুরোপুরি বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ইউরোপীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কিন্তু এ নাম একেবারে নাকচ করে দিলেন, এর পরিবর্তে তাঁরা আবিষ্কারকের নামেই নাম রাখলেন— হার্শেল। কিন্তু সে নামও টিকলো না। অবশেষে জার্মান জ্যোতির্বিদ জোহান বোডে নতুন গ্রহটির নামের ব্যাপারে যে সমাধান দেন সারা বিশ্বের জ্যোতির্বিদমহল স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেটা মেনে নিলেন। মঙ্গল থেকে শনি, এই তিনটি গ্রহের নামকরণ এক পারম্পর্য মেনে চলা হয়েছিল। এরেস (রোমান ভাষায় মার্স) ছিলেন জিউস (রোমান ভাষায় জুপিটার) এর সন্তান। আবার জিউস ছিলেন ক্রোনোস (রোমান ভাষায় স্যাটার্ন) এর সন্তান। ক্রোনোসের পিতার নাম উরানাস (রোমান ভাষায় ইউরেনাস)। সে ক্ষেত্রে বোডের বক্তব্য হল— তাহলে নতুন গ্রহটির নাম "ইউরেনাস" হবে না কেন? এই অকাট্য যুক্তির ওপর কেউই আর কথা বলার সাহস পেলেন না— তাই শেষ পর্যন্ত সৌরজগতের সপ্তম গ্রহটির নাম রাখা হল ইউরেনাস।

সূর্য থেকে ইউরেনাসের গড় দূরত্ব ২৮৭ কোটি ২৮ লক্ষ কিলোমিটার— আর এই বিশাল দূরত্বই হয়েছে ইউরেনাস সম্পর্কে তথ্য জানার এক বিরাট অন্তরায়। ১৯৪৮ সালে মার্কিন দেশের ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট পালোমারে সৃষ্টি হয়েছে ২০০ ইঞ্চি ব্যাসের প্রতিফলক দূরবীন। এই দূরবীনই ছিল এক সময়ে পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে এ দূরবীন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আগেও নিয়েছে, আর আজও নিচ্ছে। এর চেয়েও বৃহত্তম দূরবীন ১৯৭৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ককেসাস অঞ্চলের জেলেনচুকস্কায়ার মানমন্দিরে স্থাপিত হয়েছে— এই প্রতিফলক দূরবীনের ব্যাস হল ২৩৬ ইঞ্চি। এইটিই হল বর্তমানে পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীন। কিন্তু এত ক্ষমতাসম্পন্ন দূরবীন দিয়েও ইউরেনাসের অনেক তথ্য চূড়ান্তভাবে জানা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। এই ব্যাপারে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তকে আভাসিত করে তুলেছে মানুষের পাঠান

ভয়েজারের তোলা ইউরেনাসের আলোকচিত্র

মহাকাশযান। বিজ্ঞানীরা এখন মহাকাশযান পাঠিয়ে সৌরমণ্ডলের গ্রহ ও উপগ্রহ সম্পর্কে এমন অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য জানতে সমর্থ হয়েছেন, যা দূরবীন দিয়ে জানার কল্পনা পর্যন্ত করা যায়নি। এমনি একটা অভিযান সম্প্রতি সফল হল ইউরেনাসকে নিয়ে— এই বছর অর্থাৎ ১৯৮৬ সালের ২৪শে জানুয়ারি, ভারতীয় সময় রাত্রি ১১টা ২৯ মিনিটে ভয়েজার-২ মহাকাশযান ইউরেনাসের খুব কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়ে ইউরেনাস সম্পর্কে নানারকম তথ্য ও আলোকচিত্র সংগ্রহ করে পৃথিবীতে ফেরত পাঠিয়েছে। এই প্রথম কোনও মহাকাশযান ইউরেনাসের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। এই অভিযান সৌরজগৎ সংক্রান্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে এক বিরাট পদক্ষেপ। ভয়েজার মহাকাশযান থেকে ইউরেনাস সম্পর্কে নতুন কি কি তথ্য জানা গেল, এ আলোচনার আগে, পৃথিবী থেকে দূরবীন দিয়ে ইউরেনাস সম্পর্কে কতটুকু জানা গিয়েছিল, সেই আলোচনা প্রথমে করা যাক।

আকাশ সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত যদি থাকে অমাবস্যার

জেট প্রপালসন ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীরা কম্পুটারের মাধ্যমে দেখছেন ইউরেনাসের বায়ুমণ্ডল কেমন হাইড্রোজেন-গ্যাস সমৃদ্ধ

রাত্রে, তাহলে ইউরেনাসকে খালি চোখে দেখা যায়। সবচেয়ে কম যতোটুকু ঔজ্জ্বল্য থাকলে খালি চোখে দেখা যেতে পারে, ইউরেনাস রয়েছে সেই সীমায়। প্রাচীনকালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাই ইউরেনাসকে গ্রাহের মধ্যে আনেননি। ইউরেনাস সৌরজগতের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহ। ইউরেনাস যদিও বৃহস্পতি বা শনির চেয়ে অনেক ছোট কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়। ইউরেনাসের গড় ব্যাস হল ৫১,৮০০ কিলোমিটার। তার মানেই হল ইউরেনাসের আয়তন পৃথিবীর চেয়ে প্রায় ৭০ গুণ বেশি, কিন্তু ইউরেনাসের ভর পৃথিবীর চেয়ে বেশি মাত্র সাড়ে চৌদ্দ গুণ। বলাবাহুল্য, ইউরেনাসের উপরিতলে কোনো মানুষের পক্ষে দাঁড়ানো সম্ভব নয়—তার কারণ বৃহস্পতি ও শনির মতো এই গ্রহের উপরিতল গ্যাসের।

সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে ইউরেনাসের সময় লাগে ৮৪ বছর। কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত এর আহ্নিক গতির আভাস পেতে বিজ্ঞানীদের অসুবিধা হয়েছিল—তার কারণ শক্তিশালী দূরবীন দিয়েও ইউরেনাসের উপরিতলে বিশেষ কোন একটা দাগ চোখে পড়েনি। হাল্কা ছোপ দাগ দেখে পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানীরা স্থির করেন যে ইউরেনাসের এক একটি পাক হল ১০ ঘণ্টা ৪৯ মিনিটে। পরে জানা যায় যে এটি নিজের চারপাশে একবার ঘোরে ১৬ ঘণ্টায়। আরও পরে অত্যাধুনিক যন্ত্র দিয়ে নির্ণয় করা গেছে যে ইউরেনাসের এক একটি পাক খেতে সময় লাগে ২৩.৯ ঘণ্টা।

ইউরেনাসের অক্ষটি বড় অদ্ভুত রকমের হেলে আছে। আমরা জানি যে পৃথিবীর অক্ষ তার কক্ষতলের ওপর হেলে আছে ২৩$^1/_2$ ডিগ্রী কোণ করে। ইউরেনাসের অক্ষ তার কক্ষমণ্ডলের ওপর ৯৮ ডিগ্রী কোণ করে হেলে আছে। এর ফলে ইউরেনাসকে আমরা বিপরীত দিকে অর্থাৎ পুব থেকে পশ্চিমে পাক খেতে দেখি। দূরবীনের মাধ্যমে বর্ণালি বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে ইউরেনাসের বায়ু-মণ্ডলে আছে মিথেন, হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম গ্যাস। মিথেন গ্যাসের জন্যে ইউরেনাসকে দূরবীনে হাল্কা সবুজ রঙের দেখায়। এই গ্রহের বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগের তাপমাত্রা −২১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস।

পৃথিবী থেকে দূরবীনের সাহায্যে জানা গেছে, ইউরেনাসের উপগ্রহ আছে পাঁচটি। ১৭৮৭ সালে উইলিয়াম হার্শেল নিজেই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন সবচেয়ে দূরের দুটি উপগ্রহ—ওবেরন (oberon) ও টাইটানিয়া (Titania)। ১৮৫১ সালে উইলিয়াম লাসেল আবিষ্কার করেন আরও ভিতরের দিকে তার পরের দুটি উপগ্রহ—আমব্রিয়েল (Umbriel) ও এরিয়েল (Ariel)। ১৯৪৮ সালে জি পি কুইপার আবিষ্কার করেন গ্রহ থেকে সবচেয়ে কাছের উপগ্রহ মিরান্ডা (Miranda)। পাঁচটি উপগ্রহই রয়েছে ইউরেনাসের বিষুব-বরাবর।

ইউরেনাসের আবিষ্কারের ১৯৬ বছর পরে তার বলয়ের আবিষ্কার অপ্রত্যাশিতভাবে হয়েছে। দিনটি ছিল ১৯৭৭ সালের ১০ই মার্চ। ঐ দিন রাত্রে একটি জানা ঔজ্জ্বল্যের নক্ষত্রের সামনে দিয়ে ইউরেনাসের আকাশ পরিক্রমার কথা ছিল। এইরকম ঘটনাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে অকাল্টেশন (Occultation) বলা হয়। ইউরেনাসের পেছনে আচ্ছাদিত হওয়ার ঠিক আগে ও পরে নক্ষত্রটির ঔজ্জ্বল্যের যে তারতম্য হবে, তা বিশ্লেষণ করে ইউরেনাসের ব্যাস সম্পর্কে নতুন তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে, সারা বিশ্বে সেই রাত্রে তিনটি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদল এই বিশেষ ঘটনাটিকে পর্যবেক্ষণ করেন। বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে মূল গ্রহটির অন্তরালে আসার আগেই নক্ষত্রটির ঔজ্জ্বল্য বেশ কয়েকবার কমে গেল। এমনটি তো হওয়ার কথা নয়! তাহলে নিশ্চয়ই ইউরেনাসের চারদিকে একাধিক বলয় আছে, আর তার জন্যেই নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যের এই তারতম্য। এইভাবেই নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে ইউরেনাসের বলয়ের আবিষ্কার হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই তিনটি জ্যোতির্বিজ্ঞানী দলের মধ্যে একটি এই পর্যবেক্ষণ কাজ চালিয়ে ছিলেন ভারতের কাভালুর মানমন্দির থেকে। ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স-য়ের অঙ্গ হিসেবে তামিলনাড়ুর উত্তর আর্কট জেলার কাভালুর পাহাড়ে একটি ৪০-ইঞ্চি ব্যাসের প্রতিফলক দূরবীন আছে—এই দূরবীনের সাহায্যেই ইউরেনাসের বলয় আবিষ্কার করলেন ঐ রাত্রে দু'জন জ্যোতির্বিজ্ঞানী, জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং এস কুপপুস্বামী। জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণায় এর দ্বারা ভারতের সম্মান অনেক বেড়ে গেছে।

এখন পর্যন্ত ইউরেনাস সম্পর্কে যতটুকু জানা গেল, তা সবই পৃথিবী থেকে দূরবীনের মাধ্যমে। এবারে মহাকাশযান পর্যায়ে আসা থাক। ১৯৭৭ সালের ২০শে আগস্ট ভয়েজার-২ মহাকাশযানটি উৎক্ষিপ্ত হয়। একে পাঠিয়েছেন মার্কিন দেশের সংস্থা N A S A (National Aeronautics and Space Administration)। এর মধ্যে কোনও মানুষ ছিল না। ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে ভয়েজার-২ বৃহস্পতির দরজায় গিয়ে হাজির হয় এবং বৃহস্পতি গ্রহ সম্পর্কে নানান তথ্য ও আলোকচিত্র সংগ্রহ করে পৃথিবীতে পাঠায়। এর পরে ভয়েজার-২ শনির খুব নিকটে গিয়ে উপস্থিত হয় ১৯৮১ সালের আগস্ট মাসে, আর শনিগ্রহ সম্পর্কেও অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। এর পরেই ভয়েজার-২-এর লক্ষ্য ছিল ইউরেনাস। এই মহাকাশযানের গতিবেগ হল ঘণ্টায় ৬৭,০০০ কিলোমিটার, এই গতিবেগে ভয়েজার-২-এর ইউরেনাসে পৌঁছতে সময় লাগত অন্তত ৩০ বছর, কিন্তু কার্যত তার সময় লেগেছে ৮$^1/_2$ বছর। এটা কি করে সম্ভব হল? বৃহস্পতির কাছে আসার পরে মহাকাশযানটিকে বৃহস্পতির অভিকর্ষজনিত টানকে এমনভাবে কাজে লাগান হয়েছে যাতে করে সেটি শনিগ্রহের দিকে সবেগে নিক্ষিপ্ত হয়। আবার শনির কাছে আসার পরে তার ওপর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে, শনির অভিকর্ষণজনিত টানের সাহায্যে ভয়েজার-২-কে ইউরেনাসের দিকে সবেগে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনার জন্যেই এই বিশাল দূরত্ব, ভয়েজার-২ এত অল্প সময়ে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছে। ইউরেনাসের দূরত্ব পৃথিবী থেকে

খুব নিকট থেকে তোলা ইউরেনাসের উপগ্রহ মিরান্ডার আলোকচি[ত্র]

কতখানি, তার আভাস মিলবে এই তথ্যে যে ইউরেনাস থেকে পৃথিবীতে আলো বা বেতার বার্তা পৌঁছতে সময় লাগে ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। ভয়েজার-২ মহাকাশযানটির ভর হল ৮১৫ কিলোগ্রাম, এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য যে সব মূল্যবান যন্ত্রাদি আছে তাদের ভর হল ১০৫ কিলোগ্রাম। গত ২৪শে জানুয়ারী ভয়েজার-২, ইউরেনাস থেকে মাত্র ৮১০০০ কিলোমিটার দূরে এসে উপস্থিত হয়, আর তার পক্ষে ইউরেনাস ও তার উপগ্রহগুলিকে পর্যবেক্ষণ সম্ভবপর হয় মাত্র ছয় ঘণ্টার জন্যে। ইউরেনাসের পরে ভয়েজার-২ এখন ছুটে চলেছে নেপচুনের দিকে—এই পরিকল্পনা সফল হলে ১৯৮৯ সালের ২৫শে আগস্ট তারিখে নেপচুনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার ঘটবে।

মহাকাশযান পাঠাবার আগে ইউরেনাসকে নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কি কি প্রশ্ন ছিল, সে সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। সেই প্রশ্নগুলো হল—(১) ইউরেনাসের অক্ষটি অমন অদ্ভুতরকমের হেলে আছে কেন? (২) ইউরেনাসের বলয়ের গঠনপ্রণালী কেমন? (৩) এই গ্রহের বায়ুমণ্ডলের গঠন কেমন? (৪) জানা উপগ্রহ ছাড়া আর কোনও উপগ্রহ কি ইউরেনাসের আছে? (৫) ইউরেনাসের ব্যাসের সঠিক মাপ কি? (৬) এই গ্রহে কোনও চৌম্বকক্ষেত্র আছে কি? (৭) ইউরেনাসের বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে তাপমাত্রা ও চাপ কেমন? (৮) ইউরেনাসের নিজের অক্ষের চারদিকে একবার পাক খেতে সঠিক সময় কত লাগে?

ভয়েজার-২ মহাকাশযানের পরিক্রমণ পরিচালনা করছেন মার্কিন দেশের ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত জেট প্রপালসন ল্যাবরেটরি (Jet Porpulsion Laboratory)-র বিজ্ঞানীরা। গত ২৪শে জানুয়ারী ইউরেনাসের সম্মুখীন হওয়ার পরে ভয়েজার-২ যেসব তথ্য ও আলোকচিত্র পাঠিয়েছে, সে সম্পর্কে এই প্রকল্পের বিজ্ঞানীরা কিছু আলোকপাত করেছেন। এই বিবরণ থেকে পাওয়া গেছে, ইউরেনাসের সম্মুখীন হওয়ার বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই ভয়েজারে যে শক্তিশালী দূরবীন ছিল তার মাধ্যমে

এই চিত্রে মিরাণ্ডার ভূপৃষ্ঠের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পরিস্ফুট
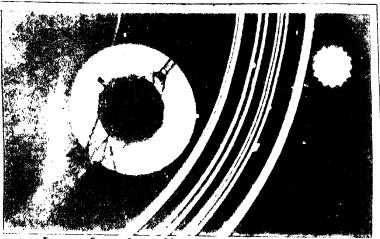
২৫শে জানুয়ারী, ১৯৮৬ তৃতীয় সময় রাত্রি ৫টা ১১ মিনিটের সময় ভয়েজার ইউরেনাসের বলয়গুলির পিছনে দাঁড়িয়ে। ডানদিকে সূর্যকে দেখা যাচ্ছে, আর বামদিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভয়েজার ও ইউরেনাস

ইউরেনাসের বলয়ের বিভিন্ন কণিকাসমূহ কেমন করে বলয়ে বিস্তৃত তা এই চিত্রে দেখা যাচ্ছে

টেলিভিসন ক্যামেরায় ইউরেনাসের যেসব আলোকচিত্র তোলা হয়েছে, সে সব পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীন দিয়ে তোলা ছবির চেয়েও অনেক অনেক সুন্দর ও তথ্যপূর্ণ। ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ইউরেনাসের দিকে এগোবার সময়েই ভয়েজার-২ **ইউরেনাসের** ষষ্ঠ উপগ্রহটি আবিষ্কার করে। ভয়েজার-২ ইউরেনাসকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় এই গ্রহ ও তার উপগ্রহগুলোর হাজার হাজার আলোকচিত্র গ্রহণ করতে, আর এর বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে মনোরম মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। ইউরেনাসের সম্মুখীন হওয়ার সময়ে উপগ্রহ মিরাণ্ডা ভয়েজারের সবচেয়ে কাছে ছিল, আর তাই মিরাণ্ডার অদ্ভুত সুন্দর আলোকচিত্র সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছে। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য হল মিরাণ্ডার ওপরের স্তরে ভূতাত্ত্বিক সক্রিয়তা। অনুমান করা যাচ্ছে যে মিরাণ্ডার পৃষ্ঠে যে সব আগ্নেয়গিরির মুখের মতো মুখ সৃষ্টি হয়ে আছে, এগুলো মিরাণ্ডার সঙ্গে অন্যান্য গ্রহাণু বা ধূমকেতুর সংঘর্ষের ফল। ভয়েজার-২ ইউরেনাসের সবসুদ্ধ দশটি নতুন উপগ্রহ আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে। ইউরেনাসের যতগুলো উপগ্রহ আছে তার মধ্যে এরিয়েল সবচেয়ে **উজ্জ্বল**, আর আমব্রিয়েল সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন।

ইউরেনাসের জানা বলয়ের সংখ্যা ছিল ৯টি। ভয়েজার ৯টি বলয়েরই আলোকচিত্র নিতে সমর্থ হয়েছে—এই সব আলোকচিত্র থেকে দেখা গেছে যে দুটি বলয়ের রং অবশিষ্ট বলয়ের রঙ থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকমের। ইউরেনাসের বলয়ের গঠন, বৃহস্পতি অথবা শনির বলয়ের গঠন থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম। ইউরেনাসের সবচেয়ে বাইরের বলয়কে বলা হয় এপসাইলন বলয়। এই এপসাইলন বলয়ের ঠিক ভেতরের দিকে, ভয়েজার আর একটি দশম বলয় আবিষ্কার করেছে। তাছাড়া ভয়েজারের নজরে এসেছে যে একেবারে ইউরেনাসের সবচেয়ে কাছে যে বলয়টি আছে, তারও ভেতরে একটি অনুজ্জ্বল ব্যান্ড আছে যার প্রস্থ প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার। ভয়েজারের আর এক চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার হল, ইউরেনাসের চৌম্বক ক্ষেত্রের অস্তিত্ব। বৃহস্পতি, শনি এবং পৃথিবীর যেমন চৌম্বক ক্ষেত্র আছে, ইউরেনাসেরও তেমনি আছে। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর তথ্য হল—ইউরেনাসের নিজের অক্ষের সঙ্গে তার চৌম্বক ক্ষেত্রের অক্ষের ৬০ ডিগ্রী কোণ করে থাকা। এরকম কেন হল এ নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন হবে। ভয়েজার পাঠানো তথ্য থেকে জানা গেছে যে ইউরেনাস তার নিজের অক্ষের চারদিকে একটি পাক খেতে সময় নেয় প্রায় ১৭ ঘণ্টার মত, আর এর বায়ুমণ্ডলে আছে মুখ্যত হাইড্রোজেন ও হিলিয়ম গ্যাস, আর সামান্য পরিমাণে মিথেন। ভয়েজার-২, ইউরেনাসের ব্যাস যা নির্ণয় করেছে তা হল ৫০,৮৮০ কিলোমিটার।

ইউরেনাস সম্পর্কে যে সব তথ্য ও আলোকচিত্র ভয়েজার-২ পৃথিবীতে পাঠিয়েছে, তার পুরোপুরি বিশ্লেষণে আরও অনেক সময় লাগবে। এই সব তথ্য সম্পূর্ণ বিশ্লেষণের পরে ইউরেনাসের আসল রূপটা আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠবে, এমন আশা করা যেতে পারে।

ছবি : 'নাসা'র সৌজন্যে

মুক্তচিন্তা

নাটক

পেশাদারী থিয়েটার অথবা থিয়েটারে পেশাদারী

দেবকুমার ভট্টাচার্য

বর্তমান থিয়েটারে সর্বাধিক আলোচিত শব্দ 'পেশাদারী হতে চাওয়া'। এখন এই চাওয়াটা একজন ব্যক্তির পেশাদার অভিনেতা হতে চাওয়া, না সমগ্র থিয়েটারটার পেশাদারী হতে চাওয়া সেটাই মুক্ত মনে চিন্তা করা গেল।

চুয়াল্লিশের আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে যে থিয়েটার চালু ছিল সেখানে প্রায় সবাই ছিলেন পেশাদার। বাকি যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন 'শৌখিন'। মূলত চুয়াল্লিশের পর যখন থিয়েটার অন্য একটা ভাবনা আনে তখন থেকেই শৌখিন শব্দটার (যে শব্দর উৎপত্তি 'শখ' থেকে) আমূল পরিবর্তনে নাম হয় 'অপেশাদার'। আর বর্তমান থিয়েটারে পেশাদার এবং অপেশাদার দু-জাতের অভিনেতাই আছেন। পেশাদার অভিনেতা যাঁরা আছেন তাঁরা মূলত জড়িত মালিকভিত্তিক থিয়েটারের সঙ্গে। যেখানে মূল লক্ষ অর্থনৈতিক সাফল্যের প্রতি। সুতরাং অনিবার্যভাবেই প্রযোজনার জন্য এসব প্রতিষ্ঠানে যে নাটক নির্বাচিত হয় তাতে প্রযোজকদের লক্ষ্য হয় ব্যবসায়িক সাফল্য। শুধু নাটক নির্বাচন নয়, অভিনেতা অভিনেত্রী নির্বাচন থেকে প্রযোজনার বাকি সব অঙ্গ এমনকি বিজ্ঞাপন পর্যন্ত সেই ঢং-এ সজ্জিত হয়। প্রতি সপ্তাহে চারবার এবং সর্বসাকুল্যে সপ্তাহে প্রায় চার হাজার দর্শককে আকর্ষণ করার জন্য তাঁরা কোমর বাঁধেন। আর অপেশাদার অভিনেতারা জড়িত সংগঠন-এর সঙ্গে। যেখানে একটি ব্যক্তি নয়, ব্যক্তি সেখানে কয়েকজন এবং অর্থের আয়োজন সেখানে প্রায় সবাই করেন প্রযোজনার জন্য। এখানে যাঁরা বাইরে থেকে নিজেদের প্রযোজনায় জড়ান তাঁরা পেশাগতভাবে থাকলেও সভ্যরা থাকেন অপেশাদার। অর্থাৎ একই কেন্দ্রে দু ধরনের ব্যবস্থা থাকে এবং প্রযোজনা সজ্জিত হয় এইভাবেই। যদিও এই ব্যক্তি-প্রযোজক এবং সংগঠন-প্রযোজক দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপট কিন্তু দু-দলেরই মূল উদ্দেশ্য হল জন সংযোগ অধিক মাত্রায় ঘটিয়ে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করা। মূল প্রভেদ অর্থলগ্নির, সংখ্যাগত অভিনয়, অর্থবন্টন এবং প্রচারের মাধ্যমে বিক্রি ব্যবস্থার বাহাদুরি দেখানো। এছাড়া যা প্রভেদ তা হল বিষয়গত বা ভাবগত। যেহেতু বর্তমান আলোচনা শুধুমাত্র 'পেশাদারী' নিয়ে তাই বিষয়গত বা ভাবগত প্রভেদের আলোচনা বাদ দেওয়া গেল।

ব্যবসায়িক সাফল্য কথাটা একটু পরিষ্কার করা দরকার। একটা কথা যেমন সত্যি যে মালিক ভিত্তিক থিয়েটারের সঙ্গে পেশাদারীভাবে যুক্ত প্রতিজনই তাঁর যতই অর্থের প্রয়োজন বা লালসা থাক না কেন, তিনি বাজে নাটকের চেয়ে একটা ভালো নাটকের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চান, তেমনি একথাও খুবই সত্যি যে একজন নাট্য-ব্যক্তি তিনি যতই শিল্পপ্রেমিক বা আদর্শবাদী হোন না কেন, চাইবেন তাঁর কাজটি অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করুক। এবং কখনও চাইবেন না যে ব্যবসায়িক দিক থেকে সেটা ব্যর্থতা বরণ করুক। ফলে দেখা যাচ্ছে যে দু-ধরনের দলেরই মেরুদণ্ডে কোনও ভেদরেখা নেই। ব্যবসায়িক অনিশ্চয়তাও দু'দলেরই সমান। অবস্থাটা যখন এমন, তখন মনে হয়, নতুন করে পেশাদারী থিয়েটার করা বা না-করা নিয়ে বিতর্কর ভিত্তিভূমি যথেচ্ছ অস্থির কারণ পুরাকাল থেকে সে সেই অস্তিত্ব নিয়েই জীবিত।

একটা হিসেব দাখিল করলে সফল দলভিত্তিক প্রযোজনার অঙ্কটা মোটামুটি বোঝা যায়। একটা সাধারণ সমীক্ষাতে দেখা গেছে যে কোনও দলের কোনও একটি প্রযোজনা প্রচলিত অর্থে সফল হলে তার নিজস্ব প্রযোজনার সঙ্গে আমন্ত্রিত প্রযোজনার সমতা থাকে না। সংখ্যায় আমন্ত্রিত প্রযোজনা নিজস্ব প্রযোজনার দেড়গুণ বা দ্বিগুণ হয়। হিসেবের স্বার্থে ধরা যাক একটি দলের সারা বছরের নিজস্ব প্রযোজনার সংখ্যা কুড়ি এবং আমন্ত্রিত প্রযোজনার সংখ্যা ত্রিশ। নানা রকমভাবে বিক্রি করে বা খরচ কমিয়েও যদি নিজেদের প্রতি প্রযোজনায় ক্ষতি হয় এক হাজার টাকা এবং আমন্ত্রিত প্রযোজনায় লাভ হয় প্রতি অভিনয় বাবদ দু' হাজার টাকা তাহলে দলের বাৎসরিক লাভ হয় চল্লিশ হাজার টাকা। একটি নাটকের আয়ুসীমা যদি দু' বছরও হয় (সাধারণত তার বেশিই) তাহলে প্রযোজনা প্রথম নামানোর খরচ বাদ দিলে দলে যে টাকা আসে বা থাকে তা পরবর্তী কয়েক বছরকে নিশ্চিন্ত করতে পারে। এছাড়া আছে অনুদান বা পুরস্কার মাধ্যমে অর্থকরী সাহায্য। ফলে একটি প্রযোজনা মারফত একটি দল বেশ কয়েক বছর পেশাদার থেকে যেতে পারছেন এবং আছেনও। ফলে নতুন করে পেশাদার থিয়েটার করতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বড় বিভ্রান্তি আনে। কথা হতে পারে যে (১) এমন লাভজনক দলের সংখ্যা নেহাতই কম এবং (২) সব দল তাঁদের নাটক 'কমার্শিয়াল' করে তুলতে চান না।

গন্ধর্বর 'বদনাম'

প্রথম প্রসঙ্গ সম্বন্ধে বলা যায় যে কথাটা নিশ্চয়ই ঠিক অর্থাৎ বেশি দলের নাট্য প্রযোজনায় এই 'লাভ' হয় না। একই ব্যবসা যদি অনেক লোক করেন তাহলে প্রতিযোগিতা বেড়ে যাবে এবং কিছু জনের বেশি লাভ, কিছু কম লাভ বা কিছুজনের লোকসান—এ তো হবেই! এ ব্যাপারে কেউ তো আর একচেটিয়া নন তাই ব্যবসায়ীর ব্যবসা করার হিসেব নিকেশের ওপর লাভ-লোকসানটা বাড়ে কমে। আর তাছাড়া লাভ এবং লোকসান এ দুটো নিয়েই তো ব্যবসা! ফলে যে দল লাভ করতে পারছেন না তাঁরা যদি লাভ না করতে পারার ক্ষমতা নিয়েই আরও মূলধন বিনিয়োগ করেন, এবং তা করে তাঁদের পেশাদার থিয়েটারটা আরও ব্যাপক করতে যান তাহলে তো ডুববেন অবধারিত! ফলে যে দল পেশাদার থাকতে গিয়ে লোকসান করছে সেক্ষেত্রে সেই দলের প্রধানরা বা সভ্যরা ব্যক্তিগতভাবে পেশাদার হতে পারছেন কিভাবে! তাহলে তো লোকসান আরও বাড়বে এবং বর্তমানে এমন গৌরী সেন পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। দ্বিতীয় প্রসঙ্গ সম্বন্ধে বলতে পারি যে 'কমার্শিয়াল' শব্দটা

-অর্থে ব্যবহৃত। উন্নাসিকতা এবং হতাশার্জাত কারণে সফলতা পাচ্ছে এমন প্রযোজনাকে সহজেই কমার্শিয়াল বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়। ষাটের দশক নাগাদ এই শব্দটার এমন যাদু ছিল যে কোনও দল সহজে তাঁর নাট্য প্রযোজনা ব্যবসায়িক সাফল্য পাচ্ছে এটা বলতে সাহস পেত না। লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর একটা ভেদরেখা টানা থাকত। একটি নাট্য প্রযোজনা অর্থনৈতিকভাবে সফল হওয়া যেন এক বিশাল অন্যায় বলে চিহ্নিত হত এবং 'টাকা ধার, মা/বউ-এর গয়না বিক্রি' বলিয়েদের 'লড়াকু' বলে চিহ্নিত করা হত। অর্থাৎ সফলতা পেলেই সে লড়াকু না থেকে, শিল্পী না থেকে—জাতপাত খোয়াল। এককথায়, প্রযোজনা সফল না হলেই কোনও এক সহজ অঙ্কে ব্যাপারটা 'শিল্প সমৃদ্ধ' হয়ে উঠত। কথাটা যে নেশাগ্রস্ত মানুষের কথার মতো সে কথা প্রমাণ করবার প্রয়োজন আজ নেই কারণ 'রক্তকরবী' থেকে শুরু করে 'সাজানো বাগান' পর্যন্ত বহু প্রযোজনা ওই কথাগুলোকে 'খোয়ারী' বলে চিহ্নিত করেছে। তার মানে এ কথা নিশ্চয়ই বলছি না যে ব্যবসায়িক সাফল্য পেলেই তা শিল্পসমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। আমার আপত্তি কেবল এই দলভিত্তিক পেশাদার থিয়েটারকে ব্যবসায়িক সাফল্য পেলেই তাকে কমার্শিয়াল আখ্যা দেওয়াতে।

যে থিয়েটার ইতিমধ্যেই পেশাদারী চরিত্রে আছে সে যদি এখন হাতিবাগানের থিয়েটারের মত পেশাদার হতে চায় তাহলেও সম্ভব নয়। অতীতে বহুরূপী, এল টি জি এবং নান্দীকারের অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রাখলে একথা আরও জোর দিয়েই বলা যায়। মার্কেট রিসার্চ করলে বোঝা যাবে যে মাসে অন্তত ষোলবার অভিনয় করে (যা হাতিবাগানের থিয়েটারে হয়) অর্থাৎ ১৬×৮০০ (দর্শকাসন)=১২৮০০ জন দর্শককে সন্তুষ্ট করা বছরের পর বছর ধরে এই দল-ভিত্তিক প্রযোজনার ক্ষমতার বাইরে। এবং ব্যবসায়িক সাফল্যের কথা মাথায় রাখলে এবং 'দর্শক রুচীর বদল' (?) না ঘটানো গেলে বর্তমান কাঠামোর থিয়েটারকে তার খোল নলচে বদলে তৃতীয় কোনও এক রূপ নিতে হবে। যার ফলে হয়তো পূর্ব উল্লিখিত দু জাতের প্রযোজকদের মধ্যে বিষয়গত বা ভাবগত যে ভেদ আছে তা কমে এসে প্রযোজনার আঙ্গিকগত নানান দিকে তাকে ঝোঁক নিতে হবে। আজকের থিয়েটার নিশ্চয়ই সেদিকে যাবার কথা এখনও ভাবছে না। তাই মনে হয়, ইদানীং কালের সব চেয়ে চিৎকৃত আওয়াজ 'পেশাদারী থিয়েটার' কথাটা বড় বেশি ফাঁপা। আসল চাওয়াটা মনে হয় থিয়েটারে নিজেদের পেশাদারী হ'তে চাওয়া এবং যা তাঁরা বলছেন না। ব্যক্তির থিয়েটারে পেশাদার হবার স্বপক্ষে আর একটা যুক্তি দেওয়া যায় যে বর্তমান অবস্থায় অর্থাৎ বর্তমানে এই পার্টটাইম থিয়েটার কর্মীর জন্য কাজের অসুবিধে হয়। অসুবিধে হয় মহড়ার সময় নিয়ে, দিনের বেলার নানান কাজের, বেশি আমন্ত্রিত অভিনয় করার, একটানা বেশি আমন্ত্রিত অভিনয়ের জন্য বাইরে থাকার। এসব কথাও আমার মনে হয় বাহ্যিক কথা। কারণ বহুরূপী, গন্ধর্ব ছাড়া কলকাতার বাকি সবকটি দলেরই একমাত্র কাজ—নাট্য প্রযোজনা। এবং প্রতি বছরে একটি নতুন প্রযোজনা বহুরূপী ছাড়া এখনও কেউই করেন না। সুতরাং শুধু নাট্য প্রযোজনার জন্য দলে এত কাজ থাকা সম্ভব নয় যা একটি দল সান্ধ্যকালীন সময়ে করে উঠতে পারেন না, বিশেষ করে প্রতিটি নতুন নাট্যর বয়সের ব্যবধান যখন তিন চার বা পাঁচ বছর।

শুধুমাত্র হলে বসে টিকিট বিক্রি বা কর্পোরেশন বা বিজ্ঞাপন বা ব্যাঙ্কে যাবার জন্য একজন সাধারণ কর্মী নিয়োগই যথেষ্ট একজন নাট্যকর্মীর বদলে। নাট্যবিষয়ক তত্ত্বমূলক বা গবেষণাগত কাজ বাদ দিলে তিনশ' পঁয়ষট্টি দিন থিয়েটারের কাজে ব্যস্ত রাখার মত কাজ বর্তমানে কোনও দল তাঁর কর্মীদের দিতেই হয়তো পারবেন না যদি দলের প্রত্যেকে পেশাগত ভাবে সম্পূর্ণ সময়ের জন্য পরিচালকের নাম ছাপা জাতীয় বাড়তি লাভ থাকলেও সেটা কখনও আর্থিক লাভে অনূদিত হয় না, বড়জোর ট্যাক্সি ভাড়াতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে; অথচ একটি প্রযোজনাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলাতে নেতৃত্ব থাকে তাঁরই। ফলে প্রযোজনা বাবদ আয় করাটা তাঁর বর্তমান বাজার দরে নিতান্তই প্রাপ্য আর সেটা হতে পারে 'থিয়েটারে পেশাদারী' হতে পারলে! আর তারই ফলে 'পেশাদার থিয়েটার' করতে চাওয়ার স্লোগান যা কিন্তু আসলে 'থিয়েটারে পেশাদারী' এবং তাও ব্যক্তিপ্রধান কেন্দ্রিক।

থিয়েটারের সঙ্গে অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িত কিছু তাত্ত্বিক নতুন এই স্লোগানের জিগির তুলে ঘন ঘন সেমিনার বা আলোচনা সভা মাতিয়ে তুলছেন যার ফলে ধ্বনিটি এক থেকে বহু হচ্ছে। গ্রামে যাবার কথার স্লোগান এখন বায়ুস্তরে বিলীন—ফলে শুধুমাত্র নতুন স্লোগানের স্বার্থেই এনারা কর্মব্যস্ত।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

থিয়েটার করেন!

থিয়েটারে পেশাদারী হতে চাওয়ার কারণটা তাই মনে হয় থিয়েটার নয়, ভিন্ন। আন্দাজ হয় প্রথম কারণ হল, দল প্রধানরা নানান ব্যাপারে দলে এত বেশি 'সমালোচিত' তাই প্রধানরা ভাবছেন "থিয়েটারে ডেমক্রেসি ফেমক্রেসি অনেক হল আর নয়, এবার টাকা দেব কাজ নেব"—যাতে আর সভ্য হবার দাবীতে তাঁদের বেপরোয়া প্রশ্নের সম্মুখীন না হতে হয়! এ জাতীয় মনোভাব মারাত্মক বিপদের ঝোঁক নেয় কারণ এরকম মালিক মালিক গন্ধযুক্ত ভাবনা আর যাই হোক সাম্য চিন্তার আওতায় পড়ে না। আর দ্বিতীয় কারণ হল, দল প্রধানের নিজের পেশাদার হতে চাওয়া। সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রায় সব দলেরই সাংগঠনিক কাঠামোতে সম্পাদক কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি বছর বছর বদলালেও পরিচালকের আসনটা পাকা, সেটার বদল মানেই পরিচালকের দল বদল। এবং তাঁর পরিশ্রম সর্ব অর্থেই অনেক বেশি। প্রতি অভিনয়ের বিজ্ঞাপনে যদি এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যেত যার থেকে বোঝা যাবে থিয়েটারে পেশাদারী যিনিই হবেন তাঁর অভিনয়ে, পরিচালনায়, নাট্য রচনায় বর্তমানের অচলায়তন ভেঙে প'ড়ে দক্ষিণের জানলা যাবে খুলে তাহলেও নিশ্চিত করে স্বাগত জানানো যেত, কিন্তু তাও তো লক্ষিত নয়!

আসলে অভাব প্রকৃত বড় মাপের মানুষের। যাঁর নেতৃত্বে একই বৃত্তে আবর্তিত বর্তমানের থিয়েটার নতুন মাত্রা নেবে। অভাব ভিন্ন বোধের, ভিন্ন চেতনার। এই অভাব সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন না থাকার ফলে ভিন্নতর থিয়েটার সৃষ্টির বদলে থিয়েটারে পেশাদারী হতে চাওয়া, যার প্রকৃত কারণ অর্থনৈতিকভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা, নাট্যের বিবর্তন বা নাট্যের উন্নয়ন নয়। তাই কৃত্রিম পন্থায় খ্যাতিকে প্রতিষ্ঠা করবার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের অনীহা "অতীতে ছিল না লেশ এইসব খেয়ালের/কবি পরে ভার ছিল নিজ মেমোরিয়ালের" কথাটা আজ নাট্যকর্মীর পক্ষেও প্রযোজ্য। ■

চি ত্র ক লা

তরুণ শিল্পীদের গ্রাফিকস ও টেরাকোটা

লীনা ঘোষের এচিং

কণ কোলকাতার কেয়াতলায় তে কলা কেন্দ্রে সম্প্রতি গ্রাফিকস ড়া মাটির কাজ ও চিত্রকলার এক শনী অনুষ্ঠিত হল। প্রদর্শনীর য়োজন করেছিলেন ঐ কেন্দ্রের যুক্ত তরুণ ও কয়েকজন প্রখ্যাত ী। তাঁদের শিল্পকর্মের বিক্রয়লব্ধ তাঁরা দুর্ভিক্ষ-কবলিত আফ্রিকার দের জন্য গঠিত সাহায্য তহবিলে করলেন।

শনীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ লিথোগ্রাফ ও এচিঙের কাজ। সুলভ মূল্যের তিনটি ফোলিওতে গুলি বিক্রী করেছিলেন শিল্পীরা। একবর্ণ ও বহুবর্ণ এই সব ছাপাই র মধ্যে কয়েকটির বিষয় বিমূর্ত লেও মানুষের দেহের ও মুখের অবয়বের নানা অভিব্যক্তি ধর্মী জনায় রচিত হয়েছিল অধিকাংশ চিত্রকল্প। বোধহয় আফ্রিকার খরা ও দুর্ভিক্ষের কথা মনে রেখেই অনেকের ছবিতে মানবিক দুঃখ-দুর্দশার চিত্রকল্প এসেছে। রঙে-রেখায়, বুনটের নানা সূক্ষ্ম কাজে প্রকরণ নৈপুণ্য ও পটের নানা বিভাজনে রূপবন্ধের বৈচিত্র্যে ছবির আবেদন অনেক সময় বিশুদ্ধ নান্দনিক হলেও দর্শকের দৃষ্টি কখনও বিষয় এড়িয়ে যায় না।

তরুণ শিল্পীদের মধ্যে একবর্ণ লিথোগ্রাফিতে খুব ভাল কাজ করেছেন লীনা ঘোষ, শুক্লা সেন, অনীতা চক্রবর্তী, চৈতা বসু, বাদল সর্বজ্ঞ ও অঞ্জলী সেনগুপ্ত। রামহরি র বিমূর্ত ছবি, সিদ্ধার্থ ঘোষের কলকাতা', মণিদীপ সাহার 'অনাথ', প্রদীপ দীক্ষিতের 'ভাবুক' ও বুলবুলি র 'বিচ্ছেদ' কম্পোজিশন ও রঙের গুণে খুবই মনোজ্ঞ কাজ।

লীনা ঘোষের নিরন্ন ভিখারী পরিবারের ছবি, শুক্লা সেনের বহুবর্ণ চিত্রকল্প মৃত শিশুকোলে বেদনাহত মা ও সোমান পিল্লাই-এর চর্মসার শিশুর রেখাচিত্র মানসিক আবেদনে সমৃদ্ধ। অনীতা চক্রবর্তীর বহুবর্ণ ও স্বপন দাসের বহুবর্ণ লিথোও বর্ণ কৃতিত্বের জন্য উল্লেখযোগ্য।

তোষ সেন, শঙ্খ চৌধুরী ও বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ ছিল কস প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ। লৌকিক ও আদিম শিল্পরীতি ও র নিজস্ব ভাবনা মিশে গিয়েছিল বড় নানা পোড়া মাটির গুলিতে। প্রত্যেকটিতে গড়নের, বের, বুনটের বৈচিত্র্য ছিল।

মানুষের দেহ,মুখ ও মুখোশ নিয়ে নানা ভাবব্যঞ্জক অবয়বের সৃষ্টি করেছেন উমা সিদ্ধান্ত, বাদল সর্বজ্ঞ, সোমান পিল্লাই ও অঞ্জলি সেনগুপ্ত। কিন্তু অনেক কাজই ছিল পুতুলের মত, সেগুলি ভাস্কর্যের মাত্রা পেয়েছে একথা বলা চলে না।

মনসিজ মজুমদার

সং গী ত

বাংলা গানের দুই শিল্পী

বেহালার সাংস্কৃতিক সংস্থা সবুজ স্পোর্টিং ক্লাব রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্র সদনে ১৫ই সেপ্টেম্বর সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। এই সন্ধ্যায় নির্বাচিত দুই শিল্পী ছিলেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও জগন্ময় মিত্র। কবিগুরুর গান "এই লভিনু সঙ্গ তব" দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক পরবর্তী পর্যায়ে ব্যক্ত করেন দুঃস্থ ও আর্তজনের সেবার্থে সংস্থার বিভিন্ন মহৎ প্রয়াস ও আদর্শমূলক উদ্দেশ্যের কথা। এই সঙ্গীত সন্ধ্যার প্রথম শিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। শিল্পী তাঁর দরদী কণ্ঠে সর্বমোট ১৭টি গান করেন। শিল্পীর সুস্পষ্ট উচ্চারণ, বিভিন্ন স্কেলে গান গাইবার ক্ষমতা, বিশেষ করে রাগসঙ্গীত পরিবেশনে দক্ষতা শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। সেদিনকার অনুষ্ঠানে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবেশন সদ্যপ্রয়াত গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা "জানি একদিন আমার জীবনী লেখা", "রাত জাগা মোর", "সোনার হাতে সোনার কাঁকন", "জীবনে যদি দীপ জ্বালাতে নাহি পার", "পাষাণের বুকে লিখ না", রাগ কলাবতীতে নিবদ্ধ "বাজে কেন বীণা।" এই রাগপ্রধান গানটির ছোট ছোট সরগম, ছন্দোবৈচিত্র্য ও লয়কারি যে কোন সাধারণ শিল্পীর কাছে ঈর্ষণীয়।

সতীনাথবাবু একটি নজরুলগীতি শুনিয়েছেন "আমি চিরতরে দূরে চলে যাব।" এ গানটি বিভিন্ন শিল্পী বিভিন্ন সুরে পরিবেশন করেন যেটা অধিকাংশ নজরুলগীতির ক্ষেত্রেই অবশ্য পরিণতি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শিল্পীর সঙ্গে তবলায় ও গীটারে সার্থক সহযোগিতা করেন প্রীতিময় গোস্বামী ও তপন দে।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় শিল্পী জগন্ময় মিত্র। শিল্পী জানালেন তাঁর ৫০০খানি গান রেকর্ড করা আছে। তার মধ্যে ১১খানি গান গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করলেন। এই প্রবীণ শিল্পীর গান ফেলে আসা দিনগুলির কথা বড় বেশী করে মনে করিয়ে দেয়। তাঁর এই সন্ধ্যার শ্রেষ্ঠ চয়ন "তুমি আজ কত দূরে", "ভালবাসা মোরে ভিখারী করেছে", "মেনেছি গো হার মেনেছি", "আমি দুরন্ত বৈশাখী ঝড়"। সবচেয়ে বেশী করে আমাদের শ্রুতির তৃপ্তি ঘটায় শিল্পীর মীড়ের প্রয়োগ। সম্ভবত বয়সোচিত কারণে শিল্পীর কণ্ঠস্বর দীপ্র ছিল না—তবুও তাঁর গানের গলা এতই মধুর ও ক্রিয়াপর যে সম্ভ্রম জাগে। জগন্ময়বাবুর খেয়াল অঙ্গের গান এই প্রতিবেদকের শোনার সৌভাগ্য হয় নি। সেদিনকার অনুষ্ঠানের শেষ গান ভৈরবীতে "বাবুল মোরা নৈহার" অপেক্ষা শিল্পীকে সেই পুরানো দিনের প্রেমের বাংলা গানে বেশী করে পাওয়া গিয়েছে। শিল্পীর সঙ্গে সমীর শীল বেহালায় বড়ই সুন্দরভাবে সহযোগিতা করেন। অন্যান্য সহযোগী শিল্পীর মধ্যে ছিলেন তবলায় নবীন ঘোষ ও গীটারে স্বপন সেন।

সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও জগন্ময় মিত্র

কালিদাস নাগ

তাঁর জন্মদিনে

'দেবব্রত বিশ্বাসের উদাত্ত গলার একাত্মীকরণে/ কি দরদী ঢেউ তুলেছিল এক সভাঘরে সভাভব্য মনে/ গায়কের দুই চোখ অন্তরঙ্গ, সমগ্র চেতনা শুধু গানে/ কথার গলার বৃষ্টিতে বিদ্যুতে সুরে একাকার ...' : দেবব্রত বিশ্বাসের গান শুনে এই নিবিড় রসোপলব্ধি এক কবির—বিষ্ণু দে-র। যে কোন সঙ্গীতরসজ্ঞ ব্যক্তিরই দেবব্রত বিশ্বাসের গান শুনতে শুনতে এসব কথাই মনে গুঞ্জরন করে ফিরবে : 'সমগ্র চেতনা শুধু গানে/ কথার গলার বৃষ্টিতে ...'। দেবব্রত বিশ্বাস বেঁচে থাকলে আজ তাঁর বয়স হত ৭৪। চলে গেলেও তিনি বেঁচে আছেন তাঁর গানেই। সঙ্গীতপিপাসু মানুষ তাঁকে ভোলেনি।

দেবব্রত বিশ্বাস

সম্প্রতি তাঁর জন্মদিনে এক স্মরণ সন্ধ্যার আয়োজন হয়েছিল যুবকেন্দ্রে 'কালমৃগয়া'র ব্যবস্থাপনায়। "প্রারম্ভে শিল্পীর গাওয়া দুটি অপ্রকাশিত রবীন্দ্রসঙ্গীত"— ঘোষণা হল এই রকম। বাজল— 'দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ' ও 'আমার প্রাণের পরে'। 'দেখাতে পারি নে' কিন্তু দেবব্রত বিশ্বাস রেকর্ডে গেয়েছেন, যতদূর মনে পড়ে। অতঃপর বিভিন্ন জনের সঙ্গীতে আবৃত্তিতে পাঠে শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। দেবব্রত বিশ্বাসকে নিয়ে বিষ্ণু দে, কবিতা সিংহ, প্রণবেশ সেন ও তরুণ চক্রবর্তীর কবিতা ও অন্যান্য রচনা দিয়ে সাজানো একটি সংকলন 'গানের ভিতর দিয়ে যখন' (সংকলন : অমিতাভ বাগচী) পরিবেশন করলেন ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় আর সুমন্ত্র সেনগুপ্ত। ব্রততী সপ্রতিভ, সুমন্ত্রের কণ্ঠ দরাজ তবে উচ্চারণে 'র' 'ড়'-এর একটু গণ্ডগোল আছে। বিভা সেনগুপ্ত কিংবা অদিতি সেনগুপ্তের গানে আবেদন ছিল। দেবব্রত বিশ্বাসের লেখা একটি ছোট গল্প 'নাম্বনান' পাঠ করে শোনালেন জগন্নাথ বসু। রচনায় অন্তলীন যে সরসতা তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে শ্রীবসুর পরিবেশনে। উর্মিমালা বসু সুচারু পাঠ করলেন শ্রীবিশ্বাসের রচিত গ্রন্থ—'ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সঙ্গীত'— এর একটি অংশবিশেষ। দেবব্রত বিশ্বাসের দুটি চিঠি পড়ে শোনালেন পার্থ মুখোপাধ্যায়। পূরবী মুখোপাধ্যায়ের গানে ঔজ্জ্বল্য ছিল, ছিল প্রাণ। 'জর্জদার গান চিরকাল বেঁচে থাকবে'— একথা বলে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন মায়া সেন। দ্বিতীয়ার্ধে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্প অবলম্বনে নৃত্যনাট্য। স্মরণ অনুষ্ঠানে হঠাৎ এই নৃত্যনাট্য কেন, সে বিষয়ে বলা হল : জর্জদা রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেন আর নৃত্যনাট্যটিও রবীন্দ্র রচনা নিয়েই। নৃত্যনাট্য পরিবেশনের পক্ষে যুবকেন্দ্রের ছোট মঞ্চ অনুপযুক্ত। গানের দল, যন্ত্রীরা বসলেন মঞ্চের নীচে, শ্রোতৃ আসনের সামনের মাটিতে। আগাগোড়া শৌখিন এই প্রযোজনাটিতে মঞ্চসজ্জা বাদ দেওয়া যেতে পারত, বাদ দেওয়া যেত কিছু গানও। নৃত্যাভিনয়ে শ্রাবণী দাশগুপ্ত, সোনা দাশগুপ্ত ও পাঠে সুমন্ত্র সেনগুপ্ত উল্লেখ্য। সঙ্গীতাংশে রতন দে-র কণ্ঠ শুনতে ভাল কিন্তু একাধিক ক্ষেত্রে সুর কম লেগেছে। পারমিতা দাশগুপ্ত চলনসই। পরিচালনা করলেন ভাস্বতী চৌধুরী। সারা অনুষ্ঠানে ঘোষণার দায়িত্বে ছিলেন তপন রায় প্রধান।

স্বপন সোম

অভিজাত এক আয়োজন

রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ফিলিপস ইণ্ডিয়ার মতো সকল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানও এগিয়ে এসেছেন শ্রদ্ধার্ঘ্য নিয়ে। ১৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ঘনশ্যামদাস বিড়লা সভাগারে নিবেদিত হল একটি অগতানুগতিক অনুষ্ঠান। জুঁইফুল দিয়ে সাজানো রবীন্দ্রনাথের মুখচ্ছবির

সুবিনয় রায়

সামনে গড়ে তোলা মঞ্চে রবীন্দ্রসংগীতের প্রতিষ্ঠিত দুই শিল্পীর গানের সঙ্গে তাঁরা সুযোগ করে দিলেন আগামী দিনের তিন কনিষ্ঠ শিল্পীর গানের। কলকাতার তিনটি প্রতিষ্ঠানকে তাঁরা একজন করে শিক্ষার্থী পাঠাতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সেই সুবাদে দুটি করে গান শোনালেন 'রবিতীর্থ'-এর অদিতি ভট্টাচার্য, 'গীতবিতান'-এর সঞ্জয় সরকার এবং 'দক্ষিণী'র পিউ সাহা। ভঙ্গিতে ঈষৎ প্রাচীনতা, তবু তিনজনের মধ্যে পিউ সাহাই সব থেকে প্রতিশ্রুতিসম্পন্না। খুবই সুন্দর শুনিয়েছেন 'তুমি খুশী থাকো।' অদিতি ভট্টাচার্যের ভঙ্গি বেশ খোলামেলা। কণ্ঠ জোয়ারির অভাবের জন্য সামান্য মাধুর্যহীন লাগে, এই যা। গীতবিতান-এর প্রতিনিধি-নির্বাচন হতাশাব্যঞ্জক। আমন্ত্রিত প্রধান শিল্পী-দুজনের মধ্যে আসরে প্রথমে এলেন গীতা ঘটক। গীতা ঘটকের নির্বাচনের মধ্যে যে-সূক্ষ্ম নাটকীয় পারম্পর্য সচরাচর একক আসরে দেখা যায়, এদিন তা পুরো মাত্রায় পাওয়া গেল না। হয়তো গানের সংখ্যাল্পতাই এর প্রধান কারণ। তিনি শোনালেন ছ' খানি গান। বেশির ভাগই তাঁর কণ্ঠের জনপ্রিয় সম্ভার থেকে বেছে নেওয়া। বস্তুত, আরম্ভের 'ওহে সুন্দর মম গৃহে

গীতা ঘটক

আজি পরমোৎসব রাতি' ও শেষের 'ধায় যেন মোর' ছাড়া মধ্যের চারটি গানই—'কী ধ্বনি', 'দুজনে দেখা হল', 'সখী আঁধারে' ও 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই'—তাঁর লং-প্লে রেকর্ড 'কী ধ্বনি বাজে' থেকে নির্বাচিত। সব মিলিয়ে একখানি মালা তৈরি না হোক, প্রতিটি গানের অন্তর্নিহিত অনুভবকে নাটকীয় নৈপুণ্যে ছড়িয়ে দিতে যে তুলনা নেই তাঁর, গানের অলঙ্কারকে কণ্ঠের ছেনি-বাটালির আঘাতে সূক্ষ্ম ভাস্কর্যে পরিণত করতে তিনি যে অসামান্যা, এই আসরে আরও একবার তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন গীতা ঘটক। 'ধায় যেন মোর'-এর শেষে শ্রোতাদের উদ্দেশে তাঁর যুক্তকর অবনত ভঙ্গি এই সুঠাম নাটকের সঙ্গেই যেন অভিন্ন মাত্রায় লীন হল। গীতা ঘটকের পর সুবিনয় রায়। এ-নামটি ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল, রবীন্দ্রসংগীতের এই সান্ধ্য-আসরকে আভিজাত্যমণ্ডিত করে তুলতে ফিলিপস ইণ্ডিয়া কী পরিমাণ যত্নবান ছিলেন। সুবিনয় রায় তাঁর একক-আসরের ছকটিকে পুরো মাপের আসরের আদলেই সাজিয়েছিলেন এই সন্ধ্যায়। ধ্রুপদাঙ্গ পূজার গান দিয়ে সূচনা, অতঃপর প্রেম, বিচিত্র, এমন-কি নাট্যগীতি পর্যায়ের গান দিয়েও ভরিয়ে তোলার আয়োজন। এক-এক দিন এমন দৈবী যোগাযোগ ঘটে যায়, যখন গান শোনাবার দুর্লভ এক তাগিদ জেগে ওঠে শিল্পীর নিজের মধ্যেই। তাঁর ব্যস্ততাহীন নিবেদনের ধরন, পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে গানকে নিখুঁত, পূর্ণাঙ্গ করে তোলার প্রয়াস এবং বারোটি গানের পূর্বপ্রস্তুতিময় নিটোল পরিবেশন যেন সেই সাক্ষ্যই বহন করছিল। 'সংসারে কোনো ভয় নাহি' বা 'দাঁড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে' ধরনের গান তো মন্ত্রের মতো শোনান তিনি, কিন্তু এদিনের পঞ্চম 'এই যে কালো মাটির বাসা' থেকেই যেন তাঁর কণ্ঠের সরসতা ও সজীবতা পূর্ণ মাত্রায় দীপ্যমান হয়ে উঠেছিল। 'কে উঠে ডাকি'র সঞ্চারীর দুটি কলি যেন কণ্ঠের তুলিতে আঁকা অবিস্মরণীয় এক ছবি, 'শুনি ওই রুনুঝুনু'র 'পুন পুন পুন পুন' যেন মাকুর টানা-পোড়েনে ফোটানো এক জীবন্ত নকশা। সেই-যে 'আমার আপন গান'-এ যেমন বললেন সুবিনয় রায়, তাঁর এই সন্ধ্যায় গানের তরী সত্যিই যেন তেমনই ভরা জোয়ারে ছিল টলোমলো। সুবিনয় রায়ের সঙ্গে রমেশ চন্দ্রর এসরাজও এদিন ছিল যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মিলন।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

স্মরণে জলসা

সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট-এ ...কটাউন 'অভিষেক'-এর অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল এক রবিবারের সকালে নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছু পরে। ...মন' স্মরণে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। অকালমৃত বন্ধুর প্রতি বন্ধুদের স্মৃতি-স্মরণের আয়োজন—এটুকু বোঝা গিয়েছিল। সেটা অবশ্য প্রারম্ভিক বক্তৃতাতে। কিন্তু তারপরে অনুষ্ঠানটি জলসার চেহারাই নেয়। প্রদীপ মুখোপাধ্যায় একটি শীলিত ভাষণ দেন। তাঁকে পরিচয়টা অবশ্য ঈষৎ অদ্ভুতভাবে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল—'সোনার সংসারের অমলেন্দু' ইত্যাদি বলে। বনফুলের 'আইন' গল্পটি অবলম্বনে 'এ আবরণ' (নাট্যরূপ : পার্থ ধর

অপর্ণা সেন

চৌধুরী) নামে একটি নাটক উপস্থাপনা করেন অভিষেক গোষ্ঠীর সদস্যরা। সুবীর শীলের নির্দেশনায় নাটকটি খুবই অগোছালো চেহারা নিয়েছিল। প্রয়োজনাগত ত্রুটি ছিল নাটকটির সর্বাঙ্গে। সেট, কম্পোজিশন, আলো কোথাও কোনো আধুনিকতার স্পর্শমাত্র ছিল না। চরিত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রেও বেশ অসামঞ্জস্য। আর অভিনয়ের প্রসঙ্গে কিছু না উল্লেখ করাই ভালো। নাটক নিয়ে আরো অনেক ভাবনা-চিন্তা 'অভিষেক'কে করতে হবে। পরিশ্রম করলে তার ফল একদিন তাঁরা নিশ্চয়ই পাবেন। বিরতির পর ছিল সুচিত্রা মিত্রের গান। তাঁর নির্বাচন আবারও চমকিত করল আমাদের।

একে একে আট'টি গানে তিনি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। যদিও তিনি বলছিলেন গলা ভালো নেই, কিন্তু কোনো অস্বস্তি শ্রোতাদের কানে আসেনি। মূল সুরের সঙ্গে সঙ্গতি নেই এমন কোনো গান শিল্পীদের গাইতে অনুরোধ করা ঠিক নয়—এতে অনুষ্ঠানের মেজাজটি ধ্বস্ত হয়। এ অনুষ্ঠানেও তাই ঘটেছিল এবং শ্রীমতী মিত্রকে সবিনয়ে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে হয়। যন্ত্র সহযোগিতায় ছিলেন রামদাস বন্দোপাধ্যায়, শীতল গঙ্গোপাধ্যায় ও কমল পণ্ডিত।

তিনটি শ্রুতি নাটক (নাকি পাঠনাট্য) পরিবেশন করেছিলেন জগন্নাথ বসু ও ঊর্মিমালা বসু ও সম্প্রদায়। কারণ লক্ষ্য করা গেল 'সম্প্রদায়'-এর অন্তত কণ্ঠ-কারুকার্যিতে বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই। আবহসঙ্গীত সংযোজনায় অবশ্য পার্থ বসুর ভূমিকাটি জরুরি ছিল। অন্যান্যদের মঞ্চে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল বেশির ভাগ সময়। নাট্য পাঠে বসুদম্পতি দক্ষ। শুধু কণ্ঠেই চরিত্রগুলিকে প্রায় সঠিক চেহারায় দাঁড় করিয়ে দেন। অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়েছিল নিঃসন্দেহে। শেষ অনুষ্ঠান ছিল অপর্ণা সেনের পাঠ। পর পর তিনটি রচনা তিনি পাঠ করলেন, রবীন্দ্রনাথের 'খাতা' গল্পটি, সব্যসাচী দেবের 'কৃষ্ণা' ও কবিতা সিংহের 'কোনো ক্ষমা প্রার্থনা করি না' কবিতা দুটি। তিনটিরই কেন্দ্রীয় বিষয় নারী। শ্রীমতী সেনের পাঠভঙ্গিটি ঋজু ও ভানহীন। পুরো মনোযোগটি তিনি আদায় করে নেন।

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

রে ক র্ড

তরুণ প্রতিভার রবীন্দ্রসঙ্গীত

কনকর্ড রেকর্ডস সদ্য বার করেছেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি ক্যাসেট (14006 Stereo) যার যুগল-শিল্পী দুই তরুণ। অগ্নিভ বন্দোপাধ্যায় ও সুব্রত সেনগুপ্ত। প্রথমেই সাধুবাদ জানাতে হয় রেকর্ড কোম্পানীকে তাঁদের ঔদার্যের জন্য। নতুনদের এইভাবে তুলে ধরা খুব সময়োচিত প্রয়াস। সেইসঙ্গে দুঃখের সঙ্গে অবশ্য বলতে হয় যে রেকর্ডিংয়ের মান অত্যন্ত নিম্নপর্যায়ের। লেবেলিংয়েও খুব ভুল আছে। প্রথম পিঠে ছাপা

সুব্রত সেনগুপ্ত

আছে অগ্নিভ-র নাম ও তাঁর গাওয়া গানের তালিকা। কিন্তু বাজছে সুব্রতর গান। তার মানে উলটো পিঠে ছাপা আছে সুব্রতর নাম আর বাজছে অগ্নিভর গান। এই ভুলভুলাইয়া যদি বা সামলে নেওয়া যায় কিন্তু গান শোনা আরেক দুর্ঘট কেননা সেগুলি প্রায় শোনা যায় না, এত অস্পষ্ট।
বলতেই হয়, অগ্নিভ ও সুব্রতর কপাল খুব মন্দ। জীবনের প্রথম রেকর্ড এমন কারিগরির ত্রুটি ভাবা যায় না। তাঁদের সহানুভূতি জানাই।
দুজনের মধ্যে অগ্নিভর নামডাক বেশি। যদিও আমার বিচারে সুব্রত দুজনের মধ্যে ভাল গেয়েছেন। তিনি গেয়েছেন ৬টি গান : কে উঠে ডাকি, শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায়, এ কি গভীর বাণী, কাল রাতের বেলা, না চাহিলে যারে, দিয়ে গেনু বসন্তের এই। সুন্দর মার্জিত কণ্ঠ, সতর্ক স্বরক্ষেপ, সচেতন শিক্ষা। তবে গায়নের ধরনে প্রয়াত সাগর সেনের প্রভাব কাটাতে পারলে সুব্রত-র ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হবে।
অগ্নিভ স্বভাবত যতটা ভাল গাইতে পারেন এই ক্যাসেটে তার সর্বাঙ্গীণ রূপ ফোটেনি। তিনি গেয়েছেন কিছু প্রসিদ্ধ গান। যেমন : বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী, আমি তোমার সঙ্গে, বিরস দিন বিরল কাজ, ওগো সাঁওতালী ছেলে, দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় এবং যখন ভাঙল মিলন-মেলা। সাহসী নির্বাচন এবং গায়ন সামর্থ্যের নির্ভুল দ্যোতক। তবে অগ্নিভ এখানে কিছুটা সংকুচিত ও আত্তিনির্ভর। গান শুনে অবশ্য ভরসা জাগে, কেননা তালিম নিখুঁত, কণ্ঠ যথাযথ এবং শৈলী স্বয়ম্বশ। ভয়ের কিছু নেই। সামনে পথ খোলা। আমরা এই যুগল শিল্পীকে উৎসাহ দিতে চাই। গান নির্বাচনে আর একটু বিবেচনা থাকা চাই কেবল।

সুধীর চক্রবর্তী

ন ত্য না ট্য

হায় ছায়াবৃতা

কলকাতার বাইরে জেলা শহরগুলিতে যাঁরা সুস্থ সংস্কৃতি চর্চায় নিযুক্ত তাঁদের উদ্যোগ হতে হয় বহু ধরনের বাধা-বিপত্তি। সেগুলির মধ্যে রয়েছে শিল্পগত প্রকরণ উপকরণ, প্রতিভা ও প্রয়াস এবং উদ্যম আর উৎসাহের অভাব। কিন্তু এমন সত্ত্বেও অনুষ্ঠানের মান সম্পর্কে তাঁদের নিষ্ঠা, প্রযত্ন ও সতর্কতার অভাব থাকে না। বাঁকুড়ার 'পুণ্যশ্লোক' সংস্থার নৃত্যনাট্য 'আফ্রিকা', যা গত পয়লা সেপ্টেম্বর শিশিরমঞ্চে অনুষ্ঠিত হল—এমনই একটি সুন্দর, সনিষ্ঠ ও পরিচ্ছন্ন প্রযোজনা। এমন নয় যে আঙ্গিকে, উপস্থাপনায় বিশেষত নৃত্যাংশে ও সঙ্গীতাংশে আরও বেশি সংহতি পরিমার্জনা ও পরিশীলনের অবকাশ নেই। কিন্তু সামগ্রিক পরিকল্পনায় তথ্যের সঙ্গে কাব্যের, সঙ্গীতের সঙ্গে ভাষ্যের, নৃত্যের সঙ্গে কাহিনীর, দ্রষ্টব্যের সঙ্গে শ্রোতব্যের এবং বিনোদনের সঙ্গে মননের সহজ সমন্বয় ঘটেছে এই প্রযোজনায়। বিষয় বিন্যাসের কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' কবিতাটি। কিন্তু প্রেক্ষকদের হাতে কালো আফ্রিকানদের অতীত থেকে বর্তমান

'আফ্রিকা'

কাল পর্যন্ত অত্যাচার, শোষণ, লাঞ্ছনা ও তার বিরুদ্ধে নিগ্রোদের ব্যাপক প্রতিরোধের তথ্যনির্ভর কাহিনী ভাবোদ্দীপক ব্যঞ্জনায় বলতে চেয়েছেন পরিচালক। রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার সঙ্গে নজরুল, সুকান্ত ও একাধিক আফ্রিকান ও আমেরিকান নিগ্রো কবির গান ও কবিতা নিয়ে নেপথ্য ভাষা ও সঙ্গীতাংশ রচিত হয়েছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিবেশনা ও প্রয়োগ সর্বাংশে সুষ্ঠু হয়েছে একথা বলা চলে না। 'মোরে ডাকি লয়ে যাও' বা 'যেতে যেতে একলা পথে' গান দুটির অনুভবে যে ব্যক্তিগত বোধের নির্জনতা আছে তাতে জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত অনুভূতির পরিবেশ নেই। আবার প্রয়োগ ও পরিবেশনায় ত্রুটি থাকলেও 'সব খর্বতারে দহে', 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা' এবং 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'—এই সব গান ও গানের সঙ্গে আবেগময় সহজ দেহভঙ্গিতে একক বা সমবেত নাচ গীতিনাট্যের আবেদন সমৃদ্ধ করেছিল।

নৃত্যাংশে শিশু, বালিকা, যুবা ও যুবতীরা রবীন্দ্রনাথ নজরুল ও সুকান্তের গানের সঙ্গে সাবলীল একক ও সম্মেলক নৃত্যে অংশ নিয়েছিলেন। নৃত্যভঙ্গীতে ও নৃত্যবিন্যাসে কোন সূক্ষ্ম প্রকরণ বা জটিল কোরিওগ্রাফির সৌন্দর্য ছিল না। কিন্তু দৃপ্ত, সুবিন্যস্ত মঞ্চচারণায় এবং গানের সুরে ও বক্তব্যের সঙ্গে সরল বোধোদ্দীপ্ত ভঙ্গিমা ও দেহচারণায় নৃত্যাংশের এক সহজ মনোজ্ঞ আবেদন ছিল।

প্রথমাংশে যীশুর ছবিটি মঞ্চে এতক্ষণ ব্যবহার করা হয়েছিল যে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের অনুষ্ঠান বলে দর্শকদের ভুল হওয়া অস্বাভাবিক হত না। তাছাড়া ছবিটির নান্দনিক উৎকর্ষের দিকে নজর দেওয়া উচিত ছিল। ফাঁসির ও প্রতীক্ষার দৃশ্য রচনা খুবই সুন্দর হয়েছিল কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার ও শোষণের দৃশ্যগুলিতে অভিনয় ও দেহভঙ্গিতে আরও সমৃদ্ধ প্রকরণের প্রয়োজন। আধুনিক কালের দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ-অত্যাচারের দৃশ্যে পোশাক আধুনিক হলে ভাল হত। আবহসঙ্গীত ও শব্দযোজনার কাজ প্রশংসনীয়।

মনসিজ মজুমদার

না ট ক

ফরাসী ডাকঘর

কলকাতায় ফরাসীভাষার ছাত্রছাত্রীরা নতুন একটি নাটকের দল তৈরি করেছেন, নাম "তেয়াত্র আঁতারনাসিওনাল।" উদ্যোক্তরা প্রধানত রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের ভাষা শিক্ষা শাখার সঙ্গে সংযুক্ত। এখানকার ফরাসী ভাষা বিভাগের যিনি প্রধান, তিনিই এই নাট্য দলের প্রেসিডেন্ট—মাদাম শারদা শর্মা। তাঁদের প্রথম উদ্যোগ রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটক মঞ্চস্থ হল ১৮ই সেপ্টেম্বর বিদ্যামন্দির প্রেক্ষাগৃহে। পরিচালনার কাজে শ্রীমতী শারদা শর্মার সঙ্গে যুক্ত আছেন আরও দুজন, শ্রীমতী কবি পালচৌধুরি এবং শ্রীমতী জেনি হল। বিদেশী নাটকের বাংলা চেহারা এখানে আমরা প্রায়ই প্রত্যক্ষ করি কিন্তু উল্টোটা কেমন জমবে, তা নিয়ে সংশয় ছিল স্বাভাবিকভাবেই। স্বীকার করতে হয়, রবীন্দ্রনাথের ১২৫ বর্ষপূর্তির একটি চমৎকার সফল নিদর্শন হিসেবে এই অনুষ্ঠানটি অনেকেরই বহুদিন মনে থাকবে। ফরাসী জানেন না অথচ ডাকঘর নাটককে জানেন এমন দর্শকও উপভোগ করেছেন "অমল এ—লা লেত্র দু রোয়া"-র অভিনয়, তার অনবদ্য নাট্য মুহূর্তগুলি। মঞ্চ সজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ আগাগোড়া বাংলার, সংলাপ শুধু বিশুদ্ধ ফরাসী ভাষায়। আলো যথাযথ, আবহ সঙ্গীত ব্যঞ্জনাময়।

স্থিতধী বসু, দীপালী কর্মকার, ওমপ্রকাশ নাগপাল

অমলের চরিত্রে অভিনয় করেছেন দীপালী কর্মকার। প্রথম দিকে একটু যে জড়তা ছিল, অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তা কাটিয়ে উঠেছেন। তবে তাঁর স্বরক্ষেপ জোরালো না হওয়ায় সভাগৃহের সর্বত্র তাঁর সংলাপ পৌঁছয় নি। অসুবিধে হয়েছে আরও; অমলের ছোট বিছানায় ফকিরবেশী ঠাকুরদা এবং পিশেমশায় মাধব দত্ত উভয়ের বসার মত যথেষ্ট জায়গা ছিল না। ঘরে দু একটা জলচৌকি এ দৃশ্যেও থাকলে ভাল হত। তা সত্ত্বেও ঠাকুরদার ভূমিকায় স্থিতধী বসু অসাধারণ অভিনয় করেছেন। মাধবরূপী ওমপ্রকাশ নাগপাল যথেষ্ট পরিশ্রমী ও সার্থক যদিও তাঁর অভিনয়ে অসহায়তার চেয়ে ক্ষোভের প্রকাশই ছিল বেশি। অমিতাভ চন্দ'র কবিরাজও চমৎকার টিপিক্যাল। দইওয়ালার ভূমিকাটি ছোট্ট কিন্তু সু-অভিনীত। অথচ এই জয়দীপ পালই রাজ বৈদ্য হিসেবে কিন্তু আড়ষ্ট ও ম্লান। প্রহরী (কিরণ সরকার) চরিত্রানুগ, যদিও লাঠি ঠোকার শব্দে সংলাপ শোনায় বাধা হয়েছে বার বার। শেখর ভট্টাচার্য মোড়ল চরিত্রে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, তবে তাঁর চোখেমুখে হৃদয়হীনতা ও ব্যঙ্গ আর একটু উচ্চকিত হলে ঠিক হত। সুধা (অপর্ণা সুর) এখানে পরমাসুন্দরী ফুলওয়ালী কিন্তু তিনি যে গ্রাম্য বালিকা নন তা কিছুতেই দর্শককে ভোলাতে পারেন নি। অমলের খেলার সঙ্গী ছেলেদের ভূমিকায় যথাযথ অভিনয় করেছেন মৈত্রেয়ী ব্যানার্জি, বিপাশা ব্যানার্জি ও সুমিতা রাম।

একটি দ্বিধা। ঠাকুরদা ও অমলের কথোপকথনে ভিক্ষের কথা বার বার আসে। ঠাকুরদা ফকির বেশে ভিক্ষে করে বেড়ায় যত্রতত্র। অমলের খুব শখ সেও রাজবাড়ির সামনে পথের ধারে দাঁড়িয়ে 'জয় হোক' বলে ভিক্ষে চাইবে। খটকা লাগে ভিক্ষে শব্দটির ফরাসী অনুবাদে। 'দেমঁদে লা শারিতে' বা দান করবার জন্য আবেদন করা আর ভিক্ষে চাওয়া এক ব্যাপার ঠিক নয়। ভিক্ষে'র নিরভিমান একটি প্রতিশব্দ ফরাসী শব্দ ভাণ্ডারে থাকা উচিত নয়কি?

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

বি বি ধ

নজরুল স্মরণে

কাজী নজরুল ইসলামের তিরোধান দিবস উপলক্ষে এক উন্মুক্ত নজরুল স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে অগ্নিবীণা-র উদ্যোগে।

সেদিন প্রাথমিক পর্বে নজরুল বিষয়ে দু-একটি কথা বলেছিলেন রমা চৌধুরী ও অর্চনা ভট্টাচার্য। সঙ্গীতা বসুরায়ের পক্ষে একটু গুরুভার হয়ে পড়েছিল উদ্বোধন সঙ্গীত—'অঞ্জলি লহ মোর' নজরুলগীতিটি। সরকারী ব্যবস্থাপনায় উন্মুক্ত নজরুল স্মরণ অনুষ্ঠান হোক—এই দাবী জানালেন সংস্থা-সম্পাদক রবীন মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে. সঙ্গে সঙ্গে একটি কবিতাও পাঠ করলেন।

সঙ্গীতানুষ্ঠানের প্রথমে নজরুলের গান ও কবিতা অবলম্বনে একটি গীতি-আলেখ্য 'তুমি দূরে তবু সুরে সুরে কাছে পাই'। অসংখ্য একক গান, তবে বলাই বাহুল্য সব গানই সুপরিবেশিত নয়। যেমন মীনা চ্যাটার্জী, শ্যামল বিশ্বাস, রীনা মিত্র কিংবা মায়া সেনের গানে নানা ধরনের দুর্বলতা যার বিস্তারিত উল্লেখ স্মরণ-অনুষ্ঠানের এই প্রতিবেদনে অপ্রয়োজনীয়। মোটামুটি উল্লেখ করা চলে বন্না কুণ্ডু, সঙ্গীতা বসুরায়, তৃপ্তি মিত্র, সমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও স্বপ্না দাসচৌধুরীর গান। সুজিত ঘোষ, অলোক চ্যাটার্জী, কল্লোল ব্যানার্জী চলনসই। সর্বোত্তম মনে হয়েছে সুস্মিতা গোস্বামী ও কৃষ্ণা ভট্টাচার্যের গান। পাঠে অসীম মিশ্র ও সুমিতা দাস উল্লেখযোগ্য, আর ছিলেন অনিল দাস। সঙ্গীত পরিচালনা সুকুমার মিত্রের।

অনুষ্ঠানের শেষার্ধে সঙ্গীত ও আবৃত্তির মাধ্যমে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন সুকুমার মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রদীপ ঘোষ, উর্মিমালা বসু, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মানসী মুখোপাধ্যায়, মায়া মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

স্বপন সোম

জ

জগন্নাথ বসু
 কানের ভিতর দিয়া ৪৫, ৪২, ১৯ আ ১৯৭৮ : ৪৯-৫৬, স
জগন্নাথ বিশ্বাস
 তিন পাহাড় ২২, ২০, ১৯ মা ১৯৫৫ : ৫০৯, ক
জগন্নাথ মন্দির, পুরী ৪৯, ২২
জগন্নাথ লালা
 ক্রিংফড ৩৮, ১৩, ৩০ জা ১৯৭১ : ১২৮৫, ক
 ছেঁড়া চিঠির কাতরানি ৩৭, ২১, ২১ মা ১৯৭০ : ৭৪১, ক
 বাইশ ঘণ্টা কাটে চব্বিশ ঘণ্টা কাটে ৪০, ৫০, ২০ অ ১৯৭৩ : ৯৯৮, ক
 ভ্রমণের বৃত্তান্ত ৩৯, ৪৩, ২৬ আ ১৯৭২ : ৩৩৮, ক
 সেবা ৫০, ১৯, ১২ মা ১৯৮৩ : ১১, ক
জগন্নাথ, হিন্দু দেবতা ৪৪, ৩৮ ; ৪৫, ৩৬ ; ৪৯, ২২
জগন্নাথের নবকলেবর । সুনীত ঘোষ ৪৪, ৩৮
জগন্ময় মিত্র ৪৯, ৪৪
জগমোতির পাহাড়ী ময়না । সুবোধ ঘোষ শা ১৯৭৫
জগাই । নির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত ২৬, ২
জঙ্গলে মা লুকায়ে আছে । দেবাশিস দাশগুপ্ত ৪৮, ৩০
জটায়ু । শান্তনু দাস ৪২, ৩৯
জঠর । সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৩৪, ৫
জড়ো হওয়া । অরুণ মিত্র শা ১৯৮২
জতুগৃহ ২৮, ৩১, ৩ জুন ১৯৬১ : ৪৪২ ; ৩৭, ৩০, ২৩ মে ১৯৭০ : ৪১৭
জন অরণ্য । শংকর শা ১৯৭৩
জনক জাতক জননী । সমীর রক্ষিত ৩৯, ১১
জনকল্যাণব্রতী রাষ্ট্র ২৯, ৩০
জনগণ । সুব্রত সেনগুপ্ত ৪৭, ১৭
জনগণমন ও অধিনায়ক ২৯, ১১, ১৩ জা ১৯৬২ : ৯৬৯
জনজীবন ও দুর্ঘটনা ৩২, ৩৩, ১৯ জুন ১৯৬৫ : ৭০৩
জনজীবনে স্বাভাবিকতা ৩৯, ২৬, ২৯ এ ১৯৭২ : ১২৬৯, সম্পা
জন ডগলাস ককক্রফট । বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪, ১০
জননী । নিখিলচন্দ্র সরকার ৩৮, ২৯
জননী । নির্মল চট্টোপাধ্যায় ৪১, ১৩
জননী । বিমল কর শা ১৯৬২
জননী । সমরেশ মজুমদার ৩৯, ২১
জননী করুণাময়ী । সুদেব রায়চৌধুরী ৪৩, ৫
জননী সারদেশ্বরী । সরলাবালা সরকার ২১, ৭
জননীর জন্ম । হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় শা ১৯৫৮
জনপদবধূর ময়না । সমরেশ সেনগুপ্ত ৩৬, ৩৬
জনম অবধি । প্রভাত দেবসরকার ২৮, ২
জনমদুখিনী । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৪৯, ১৫
জনমেজয় দেখুন শংকর চট্টোপাধ্যায়
জনশক্তি ও জনশিক্ষা ২৯, ১৫, ১০ ফে ১৯৬২ : ১০৫
জনসংখ্যা ২৬, ১৮ ; ২৮, ২৯ ; ৩৩, ৪৬ ; ৩৫, ১১ ; ৩৬, ৬
জনসংখ্যার সমস্যা ৩৬, ৬, ৭ ডি ১৯৬৮ : ৫৩৩
জনসংখ্যার সমস্যা । জিতেশ বসু ২৬, ১৮
জনসংযোগ ৩০, ৩৯
জনসংযোগ ৩০, ৩৯, ২৭ জু ১৯৬৩ : ১১৫৯
জনসন, আইভিন ৪২, ২
জনসন, লিনডন বেনস ৩২, ২
জনসন, স্যামুয়েল ২৬, ৪৭
জনসনের লন্ডন ও আমার কলকাতা । হীরেন্দ্রনাথ দত্ত শা ১৯৬৪
জনসেবায় সাহিত্য । প্রতিমা সেনগুপ্ত ২৬, ৩৫
জনস্বাস্থ্য ৪৭, ৪৩, ২৩ আ ১৯৮০ : ৯, সম্পা
জনস্বাস্থ্য : গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসাকেন্দ্র ৪৯, ৭, ১৯ ডি ১৯৮১ : ১ : ৭, সম্পা
জনা গুপ্তভায়া
 উদয়শংকরের সঙ্গে আমেরিকায় ৩৬, ১২, ১৮ জা ১৯৬৯ : ১৩৬৯-১৩৭২, গ
জনান্তিক । বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত ২১, ২২
জনিয়ার, ইস্তাভন ৪২, ১৯
জনৈক কবি সম্পর্কে । পীযূষ রাউত ৪৯, ৪৭
জনৈক কাটা সৈনিকের জবানবন্দী । সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪, ৪৬
জনৈক ক্ষিপ্তের উক্তি । পূর্ণেন্দু পত্রী ৪১, ৫১
জনৈক বিশ্বনেতার প্রতি । রণজিৎ গুপ্ত ২৬, ৯
জনৈকা সুন্দরী স্মাগলার-কে । বেণু দত্তরায় ৩৮, ৪৫
জন্ম । প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ২৫, ২৯
জন্ম । মিহির মুখোপাধ্যায় ৪১, ৩৯
জন্ম এবং মৃত্যু । শামসের আনোয়ার শা ১৯৮২
জন্মদাত্রী । সমীর রক্ষিত ৪৫, ৪৪
জন্মদিন । রতন ভট্টাচার্য শা ১৯৮০
জন্মদিন । সঞ্জয় ভট্টাচার্য শা ১৯৭০
জন্মদিনে । অন্নদাশঙ্কর রায় শা ১৯৬৭
জন্মদিনে । রাধারাণী দেবী ৩৫, ৩৪
জন্মদিনে মৃত্যুদিনে দৌড়ে যবে করে মুখোমুখি ২৮, ২৭ (সা), ৬ মে ১৯৬১ : ৭৫, স
জন্মনিয়ন্ত্রণ দেখুন পরিবার পরিকল্পনা
জন্মবৃত্তান্ত । সমরেশ মজুমদার ৫০, ৮
জন্মভূমি । সঞ্জয় ভট্টাচার্য ২৬, ৪
জন্মযন্ত্রণা । কিরণকুমার রায় ২৮, ১৮
জন্মশতবর্ষে রূপকার পিকাসো । নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য ৪৮, ৪০
জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন বি ১৯৮২ : ৫, সম্পা
জন্মশাসনের বিধি ও বাধ্যতা ৪৩, ২৯, ১৫ মে ১৯৭৬ : ১৫৩, সম্পা
জন্মান্তর । কবিতা সিংহ ৪৭, ৩৫
জন্মান্তর । গোবিন্দ চক্রবর্তী ২৫, ১৯
জন্মান্তর । প্রতিভা বসু বি ১৯৭৪
জন্মান্ধ । অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শা ১৯৫৬
জন্মান্ধ । সুনীল ভট্টাচার্য ৪৬, ৪৮
জন্মাবার আশ্চর্য সময় । রাম বসু শা ১৯৫৭
জন্মের অঙ্কুর থেকে । জগন্নাথ চক্রবর্তী শা ১৯৬১
জন্মের ভূমিকা । বাণীব্রত চক্রবর্তী ৪৫, ১৪
জবচার্নকের কলকাতা । বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ৩০, ৪০
জবানবন্দী । গৌরকিশোর ঘোষ ২৪, ২১
জবানবন্দী । তরুণ মজুমদার শা ১৯৭৮
জবাব । সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ৩৬, ২১
জবাব নেই । মন্দিল সিরিয়াক ২৮, ৪৭
জবাহরজ্যোতি ৩২, ২, ১৪ ন ১৯৬৪ : ১০৭
জব্বলপুর । কুসুমবিহারী চৌধুরী ২৬, ৯
জব্বলপুর—বিবরণ ও ভ্রমণ ২৬, ৯ ; ২৮, ৪৪
জমি কেনা । সিদ্ধানন্দ চট্টোপাধ্যায় ২৪, ৩৩
জমিদার রবীন্দ্রনাথ । অমিতাভ চৌধুরী শা ১৯৭৫
জমিল সৈয়দ
 ঊষা ৪৫, ২৮, ৬ মে ১৯৭৮ : ৩৯ ক
 কাত্তোকাল বিশ্বাস ৩৯, ৪৯, ১৪ অ ১৯৭২ : ১০০০, ক
 কি রকম উপহার ৪০, ৪০, ৪ আ ১৯৭৩ : ১৬, ক
 শ্যামদেশ ৫০, ২৯, ২১ মে ১৯৮৩ : ১৩, ক
জমেছে নতুন রঙ্গ । নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৩৬, ৪২
জম্বুদ্বীপ—বিবরণ ও ভ্রমণ ৪৭, ১০—৪৭, ১৩
জয় । সুব্রত রুদ্র ৪১, ২৩
জয়কালী । নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শা ১৯৮১
জয় গোস্বামী
 অস্ত ৪৮, ৩৯, ১৭ অ ১৯৮১ : ৭, ক
 ঋতুকাল চলে গেছে ৫০, ৩০, ২৮ মে ১৯৮৩ : ৫৫, ক
 এসেছি সূর্যাস্ত থেকে ৪৯, ৪৯, ৯ অ ১৯৮২ : ৩৯ ক
 নীল পদ্ম ৪৩, ৩৬, ৩ জু ১৯৭৬ : ৬৬৪, ক
 ভোর ১০ই জানুয়ারী ৪৮, ২৬, ১৮ জুন ১৯৮১ : ১৬, ক
 মাটিতে চালাবো তীর ৪৯, ৫২, ৩০ অ ১৯৮২ : ৩৬, ক
 শেষরাতে খামারের পাশে ৪৭, ৪৪, ৩০ আ ১৯৮০ : ৪৩, ক
 হোটেলের ঘরে একজন ৪৯, ২৮, ১৫ মে ১৯৮২ : ৮, ক
জয় পরাজয় ২৯, ২৮, ৩ মা ১৯৬২ : ৩৯৩
জয় বাবা ফেলুনাথ । সত্যজিৎ রায় শা ১৯৭৫
জয় বিবেকানন্দ ৩০, ১২, ১৯ জা ১৯৬৩ : ১০৬৭
জয় হোক নবজাতকের ৩১, ৫, ৭ ডি ১৯৬৩ : ৪২৩
জয় হোক মানুষের । গৌরকিশোর ঘোষ ৪৫, ৩৬
জয় হোক শুভবুদ্ধির ৩১, ১৩, ১ ফে ১৯৬৪ : ১২১৫
জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরি দেখুন গ্রন্থাগার
জয়চরণ সরকার
 বিনিদ্র ২৪, ১৩, ৬ এ ১৯৫৭ : ৬৫৭, ক
জয়ন্তী মিত্র
 পুরোনো দিনের গান ৪৭, ৩৯, ২৬ জু ১৯৮০ : ২৫, ক
জয়ন্তী রায়
 একরাতে ৪৪, ৪২, ১৩ আ ১৯৭৭ : ৩৯, ক
জয়দেব ২৯, ১৯
জয়দেব-কেঁদুলির বাউল মেলা । অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২, ১৭
জয়দেবপুরে সন্ধ্যা । মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ২৫, ১৮
জয়দেব-মেলা, কেঁদুলি ২৩, ১৫, ৩২, ১৭
জয়দেবের মেলা । তুলসীদাস সিংহ ২৩, ১৫
জয়নুল আবেদিন ২৩, ২০
জয়নুল আবেদিন । ফজলে লোহানী ২৩, ২০
জয়ন্ত চক্রবর্তী
 বাংলায় পট পটুয়া ও পটগীতি ৩৩, ১২, ২২ জা ১৯৬৬ : ১১৯৫-১১৯৭, স
জয়ন্ত চৌধুরী
 ওয়াশিংটনের চিঠি ৩০, ২৫, ২০ এ ১৯৬৩-৩০, ৪৩, ২৪ আ ১৯৬৩
জয়ন্ত বসু
 কম্পিউটার : আধুনিক যুগের চাবিকাঠি ৪৭, ৪৮, ২৭ সে ১৯৮০ ৪৭, ৪৯, ৪ অ ১৯৮০, প
 মানুষের তৈরি সূর্য সা ১৯৮১ : ৭৭-৮৪, স
 সংযোজন চুল্লী : অফুরন্ত শক্তির উৎস ৪৫, ২৫, ২৩ এ ১৯৭৮ : ২৩-২৬, স
জয়ন্ত বিশ্বাস ৪১, ২৮
জয়ন্তকুমার গোস্বামী
 উনিশ শতকের বাংলা সামাজিক নাটক প্রহসনের নামকরণ ২৫, ৩৩, ১৪ জুন ১৯৫৮ : ৫৬৭-৫৬৮
জয়ন্তকুমার রায়
 রাষ্ট্রনীতি সমীক্ষা : ফারাক্কা চুক্তি ৪৫, ২৩, ৮ এ ১৯৭৮ : ৪৩-৪৭, স
জয়ন্তনাথ চৌধুরী

সমাজকল্যাণে বিজ্ঞানমেলা

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য

ডাইনী সন্দেহে বৃদ্ধাকে পিটিয়ে হত্যা। 'ভগবান অমুকের বহুজন সমক্ষে আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটা'। কিংবা 'ভবিষ্যৎ বক্তা বালকের চমকপ্রদ ক্ষমতা'—এ জাতীয় খবর কাগজে মাঝে মাঝে দেখা যায় এবং এগুলি প্রকাশিত হবার পর ঘটনাস্থলে মানুষের ভিড়ও যায় অসম্ভব রকম বেড়ে। মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি এগুলির অন্তর্নিহিতার্থ হৃদয়ংগম করতে পারলেও অধিকাংশ লোকই বাইরের চকমকিকে সুবর্ণজ্ঞানে আঁকড়ে ধরেন। কারণটা আর কিছুই নয়। বিজ্ঞানের প্রসার যদিও দেশে হয়েছে অনেক, আণবিক শক্তির চাবিকাঠির সন্ধান আমরা পেয়ে গেছি, মহাকাশে প্রেরণ করছি রকেট, তবুও আপামর জনসাধারণ সেই অগ্রগতির সঙ্গে পা ফেলতে পারছেন কিনা সে ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি আশ্চর্য রকমের উদাসীন। ঘরে বসে সাধারণ মানুষ কৃষি,শ্রম এবং বুদ্ধিজীবী নির্বিশেষে মেক্সিকোর ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল দেখেছেন বলেই যদি ভাবা হয় বিজ্ঞান সকলের নাগালের ভেতরে তবে বোধহয় একটু ভুল হবে। উচ্চ বিজ্ঞানের ফল এঁরা ভোগ করছেন বটে কিন্তু সাধারণ বিজ্ঞানের সঙ্গে এখনও তাঁদের সম্যক পরিচয়

ঘটেনি। তাই বিজ্ঞান চেতনার নিতান্তই অভাব তাঁদের মধ্যে। ফলে এঁরা বিজ্ঞানের কাছে থেকেও রইলেন দূরে। কুসংস্কার, অপুষ্টি, বঞ্চনা এবং প্রতারণার শিকার এঁরা। মানসিকতায় অনেকেই সপ্তদশ শতাব্দীতে অবস্থান করছেন বলে বিংশ-একবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে মানসিকতার

ফারাক আসমান জমিন নয় একেবারে আসমান—দোজখ। দোজখের অভিশাপও তাই এঁদের সঙ্গী। কিন্তু এদের নিয়েই তো আমরা বাকি বিশ্বের সঙ্গে ছুটব। মানে ছুটতে হবে। তবে ব্যাপারটা হবে কার্ল লুইসের পায়ের সঙ্গে দুপায়ে পোলিও-ওলা হরিরামের পা বেঁধে তিন পেয়ে দৌড়। ফলটা বিষময় হরিরামের পক্ষেই। তাই প্রয়োজন কার্ল লুইসের সমান না হলেও অন্তত শক্ত সবল একজোড়া পায়ের। আর সেটা সম্ভব সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত বিজ্ঞান চেতনার প্রসারেই। শুধু কয়েকজন বিজ্ঞানী সৃষ্টিতেই জাতীয় কর্তব্যের পরিসমাপ্তি নয়। সাধারণের কাছে হাতে কলমে বিজ্ঞানকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপিত করতে হবে। তবেই দূরীভূত হবে তাদের অজ্ঞানান্ধকার।

ওপরের বক্তব্যটি যিনি আমাকে বোঝাচ্ছিলেন সেই কৃষ্ণকায় অনুল্লেখ্য আকৃতির মানুষটি পশ্চিমবঙ্গের এক অতি বিতর্কিত মন্ত্রী। যাঁর একরোখা ব্যক্তিত্ব যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন বা সল্ট লেক স্টেডিয়ামের সৃষ্টি ঘটিয়েছে। এই অঘটনঘটন পটীয়ান ব্যক্তিটি সর্ব বিষয়ে একেবারে মূল থেকে শুরু করতে চান। যাতে গোড়ায়
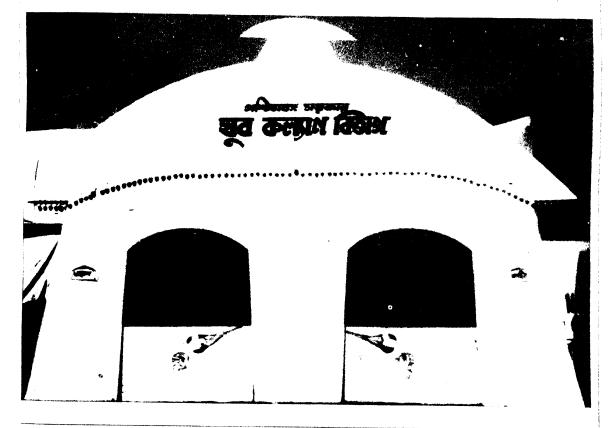
I.S.R.O. এবং কলকাতার বোস ইনস্টিটিউট, সাহা ইনস্টিটিউট, কালটিভেশান অব সায়েন্স এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট। ভারতবর্ষে বিজ্ঞান ক্লাবের পথিকৃত কেরল শাস্ত্রীয় সাহিত্য পরিষদ (K.S.S.P.) অংশ গ্রহণ করছেন। বিভিন্ন আকর্ষণীয় মডেল ছাড়াও থাকছে বর্তমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও প্রতিকার। যেমন পৃথিবীর বিবর্তনবাদ ও প্রাচীন মানব বা ড্রাইওপিতেক (১—১½ কোটি বছর আগে) থেকে বর্তমান মানুষের ক্রমবিকাশের ধারা, প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব, ড্রাগ এডিকশান ও যুব সমাজ প্রভৃতি। রাজ্য ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগ প্রত্যেক বছর সায়েন্স সেমিনার করছেন। উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন প্রতিভার সন্ধান পাওয়া। এলাকা বা স্কুলভিত্তিক নির্বাচিত কেন্দ্রগুলি জেলাস্তরে অংশ নেবে। জেলাস্তরে নির্বাচিত কেন্দ্রগুলি রাজ্য স্তরে মেলায় অংশ নেবে। প্রত্যেক স্তরে পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। রাজ্য স্তরে নির্বাচিত কেন্দ্রগুলি B.I.T.M. বা সহযোগিতায় ন্যাশনাল লেভেলে অংশগ্রহণ করবে। সঠিক পরিচালনার জন্য প্রত্যেক স্তরে দায়িত্বশীল অফিসার আছেন। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বোস সর্বপ্রথম বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপন করেন।

১৯৭৯-৮০ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় আড়াইশো বিজ্ঞান ক্লাব ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ও ভাবের আদান প্রদানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। রাজ্য ক্রীড়া ও যুব সংগঠন ক্লাবগুলির শৃঙ্খলাবদ্ধ করার ভার গ্রহণ করেন। সার্থক পরিণতি দেখতে পাওয়া গেল সংগঠনের
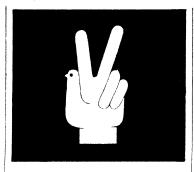
উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি জেলায় বিজ্ঞান মেলা ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে। কল্যাণীতে ৮০ সালে, বারাকপুরে ৮৪ সালে ও আন্তর্জাতিক যুববর্ষ উপলক্ষে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ১৯৮৫ সালে অভূতপূর্ব জনসমাবেশ লক্ষ করা গিয়েছিল। কমেন্ট বুক-এর সাক্ষ্য বহণ করছে। ব্রুনো, আইনস্টাইন প্রভৃতির সন্ধান না পাওয়া গেলেও বেশ কিছু প্রতিভাবান তরুণ নিজস্ব উদ্ভাবন ক্ষমতায় প্রস্তুত নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি

মালদা জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র
সরকার পরিচালিত স্থায়ী প্রদর্শনী গ্যালারীর উদ্বোধন হয়েছে মালদায়

যথেষ্ট বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল। বিজ্ঞান চেতনা ও সমাজের স্বার্থে এদের সাধনা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। এইসব ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারা যাতে সার্থক রূপ নেয় ও বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড দেশবাসীর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়—পশ্চিমবঙ্গ যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর এ ব্যাপারে বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। আর্থিক সাহায্য ও বিজ্ঞানভিত্তিক উপদেশের মাধ্যমে তরুণদের চিন্তা ভাবনার ফসলকে বাস্তবিক ও বাণিজ্যিক রূপ দেওয়া যায় তার জন্য চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। বিজ্ঞান ও সমাজ চেতনা উন্মেষের জন্যে রাজ্য ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তর এগিয়ে এসেছেন স্থায়ী ডকুমেন্ট সেন্টার, হবি সেন্টার, সায়েন্স মিউজিয়াম, বিজ্ঞান উদ্যান প্রভৃতি প্রস্তুতির পরিকল্পনার মাধ্যমে। প্রমিথিউসের মত রাজ্য ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তর Wheel of the Sun তুলে দিয়েছেন যুব সমাজের হাতে। কোনও এক কবির মত তাঁরা যেন না বলেন—হতাশা কেবল পাক খেয়ে যায়/ বুকের খাঁচায়/ এ জীবনে আর তফাত রহে না/ মরায় বাঁচায়॥ তাঁদের কর্তব্য সেই জ্ঞানের আলো ধর্মান্ধ, বিজ্ঞানবিরোধী, সংস্কারবাদী ও চিরবৈরী মনোভাবের বিরুদ্ধে জ্বালিয়ে দেওয়া। অনুমানের সঙ্গে প্রমাণকে মিলিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ান। মানুষের স্বার্থে ও সত্য প্রতিষ্ঠার কারণে প্রমিথিউসের প্রতীকি নির্যাতনকে অনেকে সহ্য করেছেন। জীবন বিপন্ন করেছেন। কিন্তু তাঁরা হারিয়ে গিয়েও হারাননি। 'প্রমিথিউস আনবাউণ্ড বা মুক্ত প্রমিথিউসে ইংরেজ কবি শেলি মানুষের মুক্তির স্বার্থের প্রতিবাদে আজও অমর।

পুরস্কারের বন্দোবস্তও আছে উৎসাহদানের জন্য

১ নভেম্বর ১৯৮৬ পাচ টাকা
দেশ
মুদ্রণশিল্পে বিপ্লব

নিশ্বাসে দুর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়!

আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র!

নিয়মিত কোলগেট ব্যবহার সারা পরিবারকে দেয় সুস্থসবল দাঁত
আর তাজা নির্মল নিশ্বাস। এর থেকেই তো আসে আত্মবিশ্বাস!
আর কোলগেটের তাজা মিন্টি স্বাদ কার না পছন্দ!

প্রতিবার দাঁত মাজার সময়ে কোলগেটের বিশিষ্ট ফর্মূলা কীভাবে কাজ করে দেখুন।

দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকেই নিশ্বাসের গন্ধ আর দাঁত ক্ষয়ের শুরু।

কোলগেটের অজস্র সক্রিয় ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে এই ক্ষয়ক্ষতিকারী খাবারের কণাগুলো বার করে আনে, রোগজীবাণু হ'তে দেয় না।

ফলে দাঁত থাকে সুস্থসবল, নিশ্বাস হয় ঝরঝরে তাজা।

প্রতিদিন নিয়মিত কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজতে ভুলবেন না। সম্ভব হ'লে প্রতিবার খাবার পর।
নিশ্বাসে দুর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়!
আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র।

কি তাজা মিন্টি স্বাদ!

সূচীপত্র

দেশ

১৫ কার্তিক ১৩৯৩ □ ১ নভেম্বর ১৯৮৬ □ ৫৪ বর্ষ ১ সংখ্যা

সম্পাদক সাগরময় ঘোষ

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক
৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ২০ পয়সা পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা

১৯

পাণ্ডুলিপিকে পরিপাক করে, এক থেকে অসংখ্যে নিয়ে যায় ছাপাখানা। তার কাজ রসুইয়ের। বার্ণিক, রৈখিক ও আক্ষরিক রান্নাঘরই বলা যায় তাই ছাপাখানা বা প্রেস-কে। কিন্তু প্রেসের আগেও রয়েছে প্রি-প্রেস তৎপরতা। লাইনো ছাপার শতবর্ষে পৌঁছে এই ছিয়াশিতে অত্যাধুনিক মুদ্রণে যে বিস্ময়কর বৈচিত্র্য ও বিপ্লব এসে গেছে এই দুনিয়ায় অনেকদিন আগেই এবং অতিসম্প্রতি এই প্রত্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ দেশেও, তার অন্ধি সন্ধি আঁতের খবর অনেকেরই অজানা। পবিত্রকুমার মুখোপাধ্যায় এই নিবন্ধে টেকনোলজির সঙ্গে হাতটাইপের টক্কর খাওয়ার ইতিহাস স্তর পরম্পরায় লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু প্রেসের এই রূপান্তর কেন? যুগরুচির এবং পরিবর্তমান চাহিদার টানা পোড়েন কি তার নেপথ্যের কারণ? বর্তমান পত্রপত্রিকা ম্যাগাজিন এবং গ্রন্থ প্রকাশে রূপরীতিও নানা কারণে অনেকখানি চেহারা বদলে ফেলেনি এযুগে? এসমস্তই এক সূত্রে বাঁধা। এবারের প্রচ্ছদ নিবন্ধাবলীকে সাজানো হয়েছে এই পরম্পরার দিকে লক্ষ্য রেখেই।

প্রেসের ওপর নির্ভরশীল, রূপান্তরশীল পত্রপত্রিকা গ্রন্থ ও পাঠকের চরিত্রের চতুষ্কোণ জটিল অঙ্ক নিয়ে তিনটি তথ্যবান রচনা লিখেছেন প্রতাপকুমার রায়, দিব্যেন্দু পালিত ও বাসুদেব রায়।

৬৫

অনেক হাসির ছটার আড়ালে যেমন চোখের জল থাকে তেমনি 'নাচনী' মেয়েদের জীবনের আগে পরে রয়েছে করুণ ট্রাজেডি। রাঢ় বাংলার 'নাচনী' সম্প্রদায়গুলির জীবন নিয়ে এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি আমাদের অন্ত্যজ জীবনের এক করুণ মর্মস্পর্শী অধ্যায়। লিখেছেন তপন কর।

৫১

তাঁর তিরোধানের চার দশক পরেও লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসছে অজস্র মূল্যবান চিঠিপত্র। এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ আচার্য ক্ষিতিমোহনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, যা বর্তমান সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে।

৪৭

চেরনোবিলের পারমাণবিক দুর্ঘটনা নিয়ে কিছুকাল আগে বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত দেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। সম্প্রতি সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ পশ্চিমী দেশগুলির বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সব কিছু সরেজমিনে খতিয়ে দেখে যাবার জন্যে। এর ফলে রুদ্ধশ্বাস পরিবেশের যে হাওয়া বদল হয়েছে সেটাই এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

১১১

জনস্ফীত এমন একটা বিশাল দেশের বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে কি করুণ অবস্থা সেটা মালুম হল এবারের এশিয়াডে। উষা এই বিশাল বিমূঢ় দেশের মুখোজ্জ্বল করার যে একক দায়িত্ব নিয়েছিল এক নাটকীয় পরিস্থিতিতে তার ভেতর বাহিরের রহস্য নিয়ে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করেছেন তপন ঘোষ তাঁর তীক্ষ্ণপ্রতিভ কলমে।

সুকুমার রায় স্মরণে

৬ সেপ্টেম্বরের সুকুমার রায় স্মরণ সংখ্যার 'দেশ' দেখে ও পড়ে আনন্দিত হলাম। এই বই-এ ছাপানো নানা বিবরণ ও ছবির মধ্য দিয়ে, আমি বার্দ্ধক্যকে পিছনে ফেলে বেশ কিছু সময়ের জন্যে বাল্যকালে ফিরে যেতে পেরে বড় আনন্দ পেয়েছি। সংখ্যাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে। এবং এমন একটি প্রচেষ্টার জন্যে আপনাদের সাধুবাদ না জানিয়ে পারছি না।

সুকুমার রায়ের পত্নী সুপ্রভা রায় আমার মা'র পিসতুত বোন ছিলেন, এবং উক্ত 'দেশ' সংখ্যার ৬৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হিমাংশুমোহন গুপ্তের তোলা ছবিটি আমি ছেলেবেলায় মার কাছে দেখেছি। হিমাংশু গুপ্ত আমার বড় মামা ছিলেন। ছবির প্রতিটি মানুষই আমার আত্মীয় ও বিশেষ পরিচিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে ওই ছবিতে যে ভদ্রলোক ও মহিলাকে আপনারা শনাক্ত করতে পারেননি, তার মধ্যে মহিলাটি (অজয় দত্তের স্ত্রী ও সুপ্রভা রায়ের মাঝখানে বসা) সুপ্রভা রায়ের মামাত বোন ও শ্রীমতী সাহানা দেবীর নিজের বোন, বিবনু (ভাল নামটা জানা নেই)। ইনি প্রয়াত দেশনেতা চিত্তরঞ্জন দাশের ভাগ্নী, ও অধুনা পন্ডিচেরী বাসিনী। ঠিক তাঁর পিছনেই বসে আছেন তাঁর স্বর্গত স্বামী ডাঃ অমূল্যকুমার মিত্র। ইনি জীবিতকালে বিহারের আরা শহরে ডাক্তার ছিলেন।

আমার মনে পড়ে ১৯৩০ সালের গ্রীষ্মাবকাশে আমি বাবা মা ও ভাই বোনের সঙ্গে আরায় বেড়াতে গিয়ে উক্ত মাসীমা ও মেসোমহাশয়ের বাড়িতে পরম আদরযত্নে ও আরামে কটাদিন কাটিয়ে এসেছিলাম।

চিত্রা সেন
কলকাতা-৭০০০২৬

॥ ২ ॥

৬ সেপ্টেম্বর 'দেশ' পত্রিকায় 'সুকুমার-রায়'কে নিয়ে একগুচ্ছ আলোচনা পড়ে আনন্দ পেলাম। বলা বাহুল্য, অনন্য লেখক-কবি 'সুকুমার রায়'কে নিয়ে 'দেশ' পত্রিকার এই অভিনব পরিকল্পনার তারিফ করতেই হবে। সত্যি কথা বলতে কি, প্রতি সপ্তাহে 'দেশ' পত্রিকায় বিষয় বৈচিত্র্যের প্রকাশ এটাই প্রমাণ করেছে—বাংলা সাহিত্যে ঐতিহ্যপূর্ণ এবং একমাত্র এক ও অনন্য পত্রিকা।

জানি না, দেশ পত্রিকা এর পূর্বে সুকুমার রায়কে নিয়ে কোন সংখ্যা প্রকাশ করেছে কিনা। তবে সুকুমার রায়কে নিয়ে আলোচনা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। আলোচনার বহু দিক এখন রয়েছে অন্ধকারে।

যেমন—'সুকুমার রায়ে'র ছবির জগৎ'।

'দেশ' পত্রিকায় সুকুমার রায়ের সাহিত্যচর্চার সমস্ত দিকগুলি প্রকাশিত হয়েছে। সুকুমার রায়কে নিয়ে আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত খুব একটা হয়নি। কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তীর "সুকুমার-রায়ের চেতনা জগৎ"—এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে সহৃদয় পাঠকবর্গকে জানাই 'প্রস্তুতিপর্ব' সুকুমার রায়কে নিয়ে একটি স্মরণ সংখ্যা প্রকাশ করেছিল।

সুকুমার রায় সম্পর্কে এ যাবৎ যা লেখালেখি হয়েছে, তার একটা তালিকা 'দেশ' সুকুমার রায় স্মরণ সংখ্যায় থাকা খুব প্রয়োজনীয় ছিল। সেইসঙ্গে সত্যজিৎ রায়কে দিয়ে "সুকুমার রায়ের জীবন ও সাহিত্যে মিল" কিংবা "সুকুমার রায়ের লেখায় নান্দনিক চিন্তা"—এই ধরনের একটি লেখার অনুপস্থিতি অনুভব করছি। যাই হোক, সব মিলিয়ে সংখ্যাটি শুধু পাঠ্যই নয়, সাহিত্যচর্চার নবতম সংযোজন ও সংগ্রহযোগ্যও।

সুকুমার রায়
কোলাঘাট, মেদিনীপুর

॥ ৩ ॥

সর্বাঙ্গসুন্দর সুকুমার রায় স্মরণ সংখ্যা প্রসঙ্গে জানাই যে, আমি "সন্দেশে"র সমবয়সী। মনে পড়ে, কৈশোরে প্রেসে গিয়ে অপেক্ষা করতাম—কখন সদ্যোজাত সংখ্যাটি পাব, তর সইত না। এখনো নাকে লেগে রয়েছে সেই রঙীন মলাটের গন্ধ। পার্থ বসু 'রবীন্দ্রনাথের তরুণ বন্ধু' শীর্ষক সুলিখিত প্রবন্ধে খেদ জানিয়েছেন, "রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এটাই সম্ভব যে, পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে একাধিকবার স্মরণ করলেও সুকুমার রায়ের নামোল্লেখ করেননি।" আমার একটি অমূল্য অভিজ্ঞতার কথা জানাই। কবির মহাপ্রয়াণের বছর দেড়েক আগে ১৯৪০-এর দোল পূর্ণিমার দিন বন্ধুবর সেতার-শিল্পী বিমলাকান্ত রায়চৌধুরীর সঙ্গে কবি-দর্শনে গিয়েছিলাম সকালবেলায়। তখন তিনি একটি মোড়ার ওপর বসে কবিতা লিখছিলেন। উঁকি মেরে দেখলাম—কবিতা বা ছড়াটির নাম "ভবঘুরী"। অর্থ জিজ্ঞাসা করায় কবি হেসে বললেন—"ওই যে বেড়াল, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।" একটু থেমে, গুরুদেব বলে উঠলেন—"আমি সুকুমারের মত লিখতে পারিনে।" বিশ্বকবির এই অকুণ্ঠিত স্বীকৃতি আমাদের বিমুগ্ধ করল। লীলা মজুমদারের 'আমার বড়দা' তাঁর অন্য রচনার মত সুখপাঠ্য হলেও—সামান্য বেসুরো। তাঁর আত্মীয়-প্রীতি ও গুরু-ভক্তি কিছুটা অবসেশনের মতো। নইলে, কেন লিখবেন—"আমাদের চোখে তাঁর মতো কেউ ছিল না। রবীন্দ্রনাথও না।" ..."এমন কি 'গোরা'র নায়িকাদের পর্যন্ত বড়ই অকালপক্ক বলে মনে হয়, সমস্যাগুলোও ধোঁয়া হয়ে উবে গেছে।"..."রবীন্দ্রনাথেরও ৩৬ বছর বয়সের আগে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার বেশির ভাগই অলিখিত ছিল।" এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করি, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর মুখে শুনেছি,—পৃথিবীর ইতিহাসে মাত্র দুজন সর্বোতোমুখী প্রতিভা জন্মেছেন,—লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি ও রবীন্দ্রনাথ। সুকুমার অনন্যসাধারণ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সন্দেহ নেই। কিন্তু 'comparisons are odious

প্রভাত বসু
কলকাতা-৭০০ ০১৪

॥ ৪ ॥

সুকুমার রায় শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর উদ্দেশে নিবেদিত শ্রদ্ধার্ঘ্য 'সুকুমার রায় স্মরণ সংখ্যা' (৬ আগস্ট '৮৬) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পাঠকদের কাছে সুকুমারকে এবং তাঁর সাহিত্য ও চিত্রশিল্পকে বিভিন্ন কোণ থেকে চেনার একটি অভিধান হয়ে থাকবে। এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রতিটি রসজ্ঞ পাঠকই নিজস্ব সংগ্রহশালায় সাগ্রহে রক্ষা করবেন আশা করি।

তাঁর যুবক বন্ধু—সুকুমার রায়ের প্রয়াণের পর শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষণের তিন পৃষ্ঠাব্যাপী পাণ্ডুলিপি এই সংখ্যায় শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। অন্যান্য প্রতিটি রচনাই বিশেষ বার্তাবহ ও মণিকাঞ্চনের মত মূল্যবান। মানডে ক্লাব সংক্রান্ত একটি ছড়া এই সংখ্যার দু জায়গায় দুভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। হিরণ্যকুমার সান্যালের রচনার সঙ্গে সন্দীপ রায়ের টেপরেকর্ডে গৃহীত আলোচনার অনুলিখনে (৪১ পৃষ্ঠায়) দেখছি ছড়াটি এই রকম :

'শুনেছিনু নেই নেই/ শুনেছিনু গিয়েছে সে/ দাড়ি নেড়ে চাঁদা চায়/ শনিবার তেইশে।'

ছন্দপতনদুষ্ট এই ছড়াটুকু পড়েই সন্দেহ হয় এটি সুকুমার রায়ের রচনার অবিকৃত উদ্ধৃতি হতেই পারে না। হিরণ্যবাবুর স্মৃতি থেকে বলায় অথবা অনুলিখনকালীন ত্রুটিতে কোথাও কিছু প্রমাদ ঘটেছে।

কবিভগ্নী লীলা মজুমদারের দীর্ঘরচনা 'আমার বড়দা'র শেষ দিকে মানডে ক্লাব প্রসঙ্গে লেখার মধ্যে (৬৯ পৃষ্ঠা) এই ছড়াটির সম্ভবত সঠিক উল্লেখ হয়েছে। এক্ষেত্রে ছন্দপতন না থাকার জন্য এই মন্তব্য করছি, শ্রুতিমাধুর্যের জন্যও।

'শুনেছিনু গেছে গেছে, শুনেছিনু নেই সে/দাড়ি নেড়ে চাঁদা চায় শনিবার তেইশে।'

তবে লীলা মজুমদারের রচনায় এটিকে একটি ধাঁধা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তা ঠিক নয় মনে হয়। অবশ্য লীলা মজুমদার বলেছেন মানডে ক্লাব কি ননসেন্স ক্লাবের ব্যাপারে তিনি শুধু গল্প কাহিনীর মত শুনেছেন। তাই এই ছড়ার প্রসঙ্গটুকু প্রত্যক্ষদর্শী হিরণ্যবাবুর কথামতই গ্রাহ্য মনে হয়। দাড়িওলা খোকনবাবুর কাজকর্মে বাইরে থেকে ফিরেই সভার নোটিস হাতে বাড়ি বাড়ি চাঁদা চাওয়ার প্রসঙ্গেই তাঁর তাতাদার (সুকুমার রায়) এই মন্তব্য।

উপরোক্ত বিষয়টি স্বচ্ছ করার জন্য অনুরোধ জানাই।

সবশেষে উল্লেখ করি কবির অবিস্মরণীয় সেই পঙক্তি দুটির।

'ঘনিয়ে এলো ঘুমের ঘোর/ গানের পালা সাঙ্গ মোর।'

অন্তত দুবার এই পঙক্তি দুটি সসম্ভ্রমে উল্লিখিত হয়েছে এই স্মরণসংখ্যায়।

তাঁর (সুকুমারের) শ্রেষ্ঠ রচনা

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সার্ধশতবার্ষিকী উপলক্ষে

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের ভূমিকা সম্বলিত

বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ

নানা দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবন ও বাণীর পর্যালোচনা। বিশিষ্ট সন্ন্যাসী, সাহিত্যিক ও দেশ-বিদেশের গবেষকবৃন্দের মননশীল রচনাসমৃদ্ধ অনবদ্য গ্রন্থ। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে এ জাতীয় গ্রন্থ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি।

যাঁদের লেখায় গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ হচ্ছে :

স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী ভূতেশানন্দ, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী গীতানন্দ, স্বামী স্মরণানন্দ, স্বামী নির্জরানন্দ, স্বামী প্রমেয়ানন্দ, স্বামী মুমুক্ষানন্দ, স্বামী জিতাত্মানন্দ, স্বামী সোমেশ্বরানন্দ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, স্বামী চৈতন্যানন্দ, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশ শাস্ত্রী, গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, নিশীথরঞ্জন রায়, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, প্রণবরঞ্জন ঘোষ, নীরদবরণ চক্রবর্তী, জ্যোতির্ময় বসু রায়, জলধিকুমার সরকার, দেবব্রত বসু রায়, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সচ্চিদানন্দ ধর, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী, পবিত্রকুমার ঘোষ, চিত্রা দেব, সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, মারী লুইস বার্ক (গার্গী), লিণ্ডা প্রুগ (আমেরিকা) প্রমুখ।

বহু গুরুত্বপূর্ণ এ যাবৎ অপ্রকাশিত নথিপত্র, দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র, নানা স্মৃতিবিজড়িত স্থানের মানচিত্র, জীবনপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী এবং অন্যান্য সংবাদে সমৃদ্ধ আকরগ্রন্থ।

মূল্য : ৭৫·০০

গ্রাহক মূল্য : ৬০·০০ (সডাক=৬৬·০০)

প্রায় এক হাজার পৃষ্ঠার এই গ্রন্থখানির জন্য গ্রাহক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নিচের ঠিকানায় মনিঅর্ডারযোগে অথবা ডিম্যান্ড ড্রাফট্ মাধ্যমে টাকা প্রেরণ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। "Udbodhan Office" এই নামে ড্রাফট্ করতে হবে।

উদ্বোধন কার্যালয়

১, উদ্বোধন লেন

কলিকাতা-৭০০ ০০৩

হিসাবে এর উল্লেখ করেছেন হিরণ্যকুমার সান্যাল (৪২ পৃষ্ঠা)। আর উল্লেখ করেছেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।
এই প্রসঙ্গে নীরেন্দ্রনাথ লাইমলাইটের চ্যাপলিন এবং রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েটের মার্কুসিওর সঙ্গে সুকুমারের এই অংশটুকু লেখার সময়কার মানসিকতার একটি চমৎকার তুলনার ছবি এঁকেছেন—যা বহু পাঠককে ঐ দুটি অনন্য পঙক্তি সম্বন্ধে নতুন চিন্তার খোরাক যোগাবে।

বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কল্যাণপুর, আসানসোল

'ছন্দশিল্পী সুকুমার রায়'

৬ সেপ্টেম্বর 'দেশ'-এর 'সুকুমার রায় স্মরণ সংখ্যা'য় প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ছন্দশিল্পী সুকুমার রায়' নামক মূল্যবান প্রবন্ধটি পড়লাম।
এ প্রসঙ্গে আচার্য সেনের কাছে আমার একটি বিনীত নিবেদন আছে। তিনি তাঁর প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদের শেষের দিকে বলেছেন—"এই জন্যই 'আবোল তাবোল', 'খাই খাই' এবং 'অন্যান্য কবিতা'. এই তিনটি গ্রন্থে 'পরিবেষণ' (খাই খাই) এবং 'সম্পাদকের দশা' (অন্যান্য কবিতা), এই দুটি রচনা ছাড়া আর কোথাও মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দ প্রযুক্ত হয়নি।" কিন্তু 'অন্যান্য কবিতায়' 'সম্পাদকের দশা' ছাড়াও মিশ্রবৃত্ত রচিত একটি কবিতা রয়েছে বলে মনে হয়। কবিতাটির নাম 'কানে খাটো বংশীধর'। এখানে কয়েকটি পঙক্তি উল্লেখ করছি : কানে খাটো বংশীধর যায় মামাবাড়ি/ গুনগুনে গান গায় আর নাড়ে দাড়ি ॥/ চলেছে সে একমনে ভাবে ভরপুর,/ সহসা বাজিল কানে সমধুর সুর ॥ বংশীধর বলে, "আহা, না জানি কি পাখি/ সুদূরে মধুর গায় আড়ালেতে থাকি ॥
এই কবিতাটিকে আমার চারমাত্রার পর্ববিন্যাসে আট+ছয় মাত্রা মাপের মিশ্রবৃত্ত পয়ারের দৃষ্টান্ত বলেই মনে হয়েছে। কেননা প্রদত্ত কবিতাংশে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে দু'বার ব্যবহৃত 'বংশীধর' শব্দের 'বং' রুদ্ধদল মিশ্রবৃত্তের নিয়ম অনুযায়ী একমাত্রার মর্যাদা পেয়েছে। এবং শব্দের শেষে বা স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত অপরাপর রুদ্ধদল দুমাত্রার মর্যাদা পেয়েছে। এর সঙ্গে এতে রয়েছে মিশ্রবৃত্ত রীতির স্বাভাবিক চতুর্মাত্রিক পর্ববিভাগ এবং প্রচলিত পয়ারের মতো আট ছয়ের পরে যতি। শুধু তাই নয়, সমগ্র কবিতাটি পড়ার পর রুদ্ধদলের মাত্রামর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে কবিতাটির মধ্যে যে চরিত্র ফুটে ওঠে তা কলাবৃত্ত বা দলবৃত্তের নয়—মিশ্রবৃত্তেরই। যদি তিনি এ ব্যাপারে তাঁর মতামত জানান তাহলে সবিশেষ উপকৃত হবে।

অমল পাল
বোলপুর, বীরভূম

বাংলা ভাষায় বানান-ব্যাকরণ

২৬ জুলাই সংখ্যায় বাংলাভাষায় বানান-ব্যাকারণ সম্পর্কিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই বিষয়ে আপনি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী সমস্যার প্রতি দেশবাসীর এবং বিশেষভাবে পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই সূত্রে ৩০শে আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত দুটি সারগর্ভ পত্রও প্রণিধানযোগ্য।
প্রায় ৫০ বছর আগে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখনকার দিকপাল বিদ্বজ্জনদের নিয়ে বাংলা বানানসংস্কার সমিতি গঠন করেছিল। সমিতি বানান সংস্কারের প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ করেছিলেন।
তারপর অর্ধশতাব্দী ধরে ভাষাগঙ্গায় বহু জল গড়িয়ে গেছে, বিস্তর পলিও পড়েছে। কে বা কারা এখন আবার সংস্কারের ভার নেবে! সুনীতিকুমার, রাজশেখর নেই। এখন পণ্ডিতের অভাব নেই সত্য, কিন্তু তেমন সর্বজনমান্য পণ্ডিত কোথায়! এখন সবাই পণ্ডিতমন্য, স্ব স্ব প্রধান, নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং। দৈত্যের যুগ লোপ পেয়েছে, এখন সর্বক্ষেত্রে পিগ্‌মিদের যুগ। আপনি অতিসংগত কারণে বলেছেন, এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজাই তো ডিঙোবার যো নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যকলাপের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু মহামহারথীদের স্মৃতিধন্য বিপুল ঐতিহ্যের অধিকারী হিসাবে তাঁদের দ্বারস্থ হতে বাধা নেই। অনুরূপ ভাবে অধুনা সঞ্জীবিত এশিয়াটিক সোসাইটির ঐতিহ্য ও যোগ্যতাও প্রশ্নাতীত। আর সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাংলা অ্যাকাডেমি যে কী রূপ পরিগ্রহ করবে সেটা ভবিষ্যৎই বলতে পারবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা কোন নিশ্চিত ভরসা রাখতে পারছি না।
ভাষানদী নিরন্তর বহমানা। চলার পথে কত পুরনো

জিনিস ছুঁড়ে ফেলছে, আবার নতুন জিনিস গ্রহণ করছে। কিন্তু সবকিছুই কি নির্বিচারে গ্রহণ করব? আমরা আমাদের বিপুল ঐশ্বর্যশালিনী কিন্তু প্রাচীনা বৃদ্ধা পিতামহী/ মাতামহীকে দূর করে দিয়েছি। ভুলে গেছি, তাঁদেরই দেহ থেকে আমাদের দেহ—একটা শক্ত মেরুদণ্ড-কাঠামোযুক্ত দেহ পেয়েছি; তাঁদেরই প্রাণ থেকে শক্তি আহরণ করে সঞ্জীবিত আছি। ভুলে গেছি, তাঁদেরই ঐশ্বর্যে আমরা ঐশ্বর্যবান, তাঁদেরই কৌলীন্যে আমাদের কৌলীন্য। অথচ সেই বিস্মৃতা প্রাচীনা বিদেশের ঘরে ঘরে সসম্মানে পূজিতা।

নদী স্রোতকে আপন খেয়াল খুশি মত চলতে দিলে বিধ্বংসী বন্যা অবশ্যম্ভাবী। অতএব স্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করে ক্ষেত-খামারকে সবুজে শ্যামলে সোনালি-রুপালিতে ভরিয়ে তুলতে হবে। আপনি ঠিকই বলেছেন, বহু শব্দ তার প্রাচীন অর্থ হারিয়ে ফেলেছে, কোথাও ব্যাপক অর্থ সংকীর্ণ হয়েছে, কোথাও অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়েছে। এসবের যথেচ্ছ ব্যবহার বিভ্রান্তিকর, আবার সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর, বিরক্তিকর এবং ক্ষতিকর বানানের যথেচ্ছাচার, যা ব্যভিচারের তুল্য। এগুলোকে সংযত করা জরুরী প্রয়োজন। প্রথম শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে বানানের এই যথেচ্ছাচার কী দুর(া)বস্থার কারণ, ভেবে দেখুন। মোট কথা, সংস্কার ও সরলীকরণ অবশ্য কাম্য, কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার অতিসরলীকরণ বিপজ্জনক।

এই প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার, ইংরেজি ভাষা—যা এখন বিশ্বময় ব্যাপ্ত—বানান ও ব্যাকরণের তিলমাত্র হেরফের ক্ষমা করে না। এই একান্ত জরুরী ভাষাসমস্যা নিয়ে একটা আন্দোলন গড়ে তোলা এখনই দরকার।

নলিনাক্ষ নন্দ
কলকাতা-৩৬

ফেস্টিভালের ডিরেকটার

৩০ অগাস্ট সংখ্যায় "ফেস্টিভালের ডিরেকটার" লেখাটিতে পরিচালক শ্রী পার্থপ্রতিম চৌধুরী বৃথাই আক্ষেপ করেছেন। "Great films are for greater people"-চ্যাপলিনের কথা সত্য; লেনিন সাহেবও বলেছেন, "সৎশিল্প সবাইকে আকর্ষণ- করবে।" কিন্তু "খারাপ" শিল্প হলেই কিছু পরিচালক জনসাধারণের ঘাড়ে দোষ চাপান। এক প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ একবার আমাকে বলেছিলেন যে, যেদিন গায়কের গান সত্যি ভাল হয় ও জনসাধারণ ভালো বলে, গায়ক বলেন, "অপূর্ব শ্রোতা।" কিন্তু যেদিন গান অত্যন্ত খারাপ হয়, সেই গায়ক বলেন, "শ্রোতারাবৃদ্ধু।" সর্বশ্রেণীর লোককে 'শিক্ষাভেদীবাণে'র মত কটি শিল্পসৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে? পথের পাঁচালীর সর্বজয়ার বৃষ্টিতে ভিজে ডাব কুড়োনো, ইন্দির ঠাকরুণ ও দুর্গার মাঝখানে নোনাফলের অমৃতসেতুবন্ধন বা হরিহরের কাছে দুর্গার মৃত্যুসংবাদে সর্বজয়ার "সাঙ্গীতিক" আর্তনাদ অথবা "মঁসিয়ে ভার্দুতে" চ্যাপলিন সাহেবের রাতে খুন করে সকালবেলা একটি চায়ের কাপ সরিয়ে দেওয়া....এরকম অজস্র জিনিস ফিল্ম ল্যাঙ্গুয়েজকে মেনেও তাকে ছাড়িয়ে পৌঁছায় জনসাধারণের হৃদয়ে। বর্তমান যুগে হৃদয়বৃত্তি উঞ্ছবৃত্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে—সত্যি দুঃসময়। সৃষ্টির আদি অক্ষরকাব্য পরিণত হয়েছে আখের গোছাবার পালায়।

একথা সত্য যে, মধ্যবিত্ত সমাজে সত্যকারের বুদ্ধিজীবীর বদলে দেখা দিয়েছে কিছু "আঁতেল" (আমার বন্ধু বলেন আঁ বাদ দিয়ে বাকী শব্দটাই তাদের হাতিয়ার) —ঠিক গোলমরিচের বদলে বড়বাজারের ভেজাল পেঁপে বীজের মত। সাদৃশ্য আছে, ঝাঁঝ নেই। এরা জীবন দর্শনের দিক থেকে কাঙাল, Notation ছাড়া কোন রাগের "পকড়" (Minimum Expression) বোঝেন না অথচ খুব চোখ ছোট করে বলে দেবেন "দরবারীর" পঞ্চম স্বর ক'সুতোয় ঝুলে থাকে। এঁদের কিছুটা লিখতে বললে কলম হাতে শিশুর মত কেঁদে ফেলবেন, গান গাইতে বললে, হাওড়ায় টিকিট কেটে বেনারস চলে যাবেন। কিন্তু এঁরা "ফিল্ম" বা "মিউজিক" ডাইরেক্টর হতে পারেন অক্লেশে।

কারণ, ফিল্ম জিনিসটাই আদিতে বহুলোকের সৎ প্রচেষ্টা ও অন্তে একজনের সৃষ্টি। তাই "আদির" মূল উপকরণগুলো এঁরা হয় চুরি না হয়ত অস্বীকার করেন। জলের মত সৎ বুদ্ধিমান সাহিত্যিকের লেখা গল্প, scriptwriter এর Script, ideas এবং Suggestions চুরি হয়। এঁদের অমর হবার একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে।

বিদ্যাসাগর এ যুগে বেঁচে থাকলে বিখ্যাত থোরো সাহেবের মত জেলে গিয়ে ঢুকতেন এবং বলতেন, "তোমরা জেলের বাইরে কেন"—অথবা মন্ত্রী হলে সুইসাইড করতেন। কারণ, সুশীল পড়াশুনো করে বলে গাড়ি চড়বে আর সুবল লোককে কিলচড় ঘুষিলাথি মারে বলে কষ্ট পাবে, আদর্শগুলো বহুকাল অন্তর্হিত। তাই যে 'ফিল্ম' বোঝে, সে-ই ছবি করবে, আর যে বোঝে না সে ধারপাশও মাড়াবে না, দশটা পাঁচটা চাকরী অথবা "পিয়ারলেস" করবে বা "সঞ্চয়িতা"...এই কথাগুলো "বর্ণপরিচয়ে" আছে, বর্তমান বর্ণসংকর সংস্কৃতিতে নেই।

কেউ সঙ্গীত, স্টেনোগ্রাফি, গান, বিদেশী ভাষা ইত্যাদি নিয়ে মিথ্যে কথা বললে হাতেনাতে ধরা পড়বে, কিন্তু লেখা, পরিচালনা ফিল্ম 'ডাইরেকশন' এমন সুন্দর মাধ্যম এবং এতে এমন

সিঁদকাটি চালানোর সুযোগ আছে যে, পাকা সিঁদেল চোররাও লজ্জা পাবে। কাঠিটা হল, চোখ উল্টে সব একদিন সকালে অস্বীকার করা।
আসলে, রাজনীতি থেকে সমাজনীতি, ধর্মনীতি থেকে শিক্ষাসংস্কৃতি বর্তমানে 'রাজনীশ' মার্কা কিছু অমৃতফলসন্ধানীর কবলে পড়েছে। যুক্তবঙ্গপ্রদেশে একমনি পাকা রুই কাৎলার ঝাপট ভঙ্গবঙ্গে শাখামৃগের লাঙ্গুল সঞ্চালনে পরিণত। ঢাকার টিভি নাটক এর প্রমাণ। সৎ প্রচেষ্টা ও বুদ্ধিবৃত্তি অসৎ আখের গোছানো ও চালাকির কাছে পরাজিত বেশ কিছুকাল। তবে সাময়িকভাবে। তাই "মহৎ" কাজের অভাব। হয়ত এমন একটা দিন আসছে যে, যে পরিমাণে ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড ভারতবর্ষে কচুরিপানার মত উজান বেয়ে আসছে, তার রহস্য প্রকাশ হবে। কারণ, নিন্দুকরা বলে যে, বিশ্বরাজনীতিতে যখন Camp বলে কথাটা আছে, তখন সংস্কৃতিজগতে নেই একথাটা বিশ্বাস করা মুশকিল। আশার কথা—চালাকি জিনিসটাই ক্ষণস্থায়ী। আর প্রতিকার ?—ধৈর্য, কিছুটা সমালোচনা ও সৎপ্রচেষ্টাকে বাঁচিয়ে রাখা—কষ্ট করেও, লেনিন সাহেবের কথামত গরুর গাড়ীর চাকা কাদা থেকে তুলে।

পরিশেষে লেখকের " টেকো" " দেড়ে" বা "চশমাটে" কথাগুলো নিন্দনীয়—ওগুলো ব্যক্তিগত আক্রোশের উদ্গার। কারণ, ঠগরাজ অ্যালক্যাপন, গান্ধী, লেনিন, সকলেরই টাক ছিল। দাড়িতে যীশুখৃষ্ট, রবীন্দ্রনাথ, কার্লমার্কস বা রাসপুটিন ভিনদ্রেনওয়ালা কেউ কম যান না। চশমা জিনিসটা হল চোখের দুর্বলতার ব্যাপার। কথাটা হল, জ্ঞানের চোখ, মনের চোখ, দর্শনের চোখ—স্বর্গত শিল্পী বিনোদবিহারীর মত "তৃতীয় চোখ" কজনের আছে ?

জয়দেব বসু
কলকাতা-১

পৃথিবীর প্রথম তৈলচিত্র

'চার শিল্পী' নিবন্ধগুচ্ছ (২৩ অগস্ট) সম্পর্কে এই পত্র। প্রণবরঞ্জন রায় "লা মেনিনাস"-কে (১৬৫৬) পৃথিবীর প্রথম সম্পূর্ণ তৈলচিত্র বলেছেন। এই তথ্য মেনে নিলে রেনেসাঁসের ইতিহাস-লেখক ভাসারির দাবি মত "আর্নোলফিনি দম্পতি"-কে (১৪৩৪) কিংবা "মোনালিসা"-কে (১৫০৩-০৬) সম্পূর্ণ তৈলচিত্র বলা যাবে না। কোনটি প্রথম তৈলচিত্র, এই প্রশ্নের মীমাংসা এখনও হয়নি। অপেক্ষাকৃত পরে আঁকা "লা মেনিনাস"-কেই পৃথিবীর প্রথম সম্পূর্ণ তৈলচিত্র বলে রায় দেওয়া ভ্রমাত্মক।
কমল সরকার বাঙালীর শিল্পচর্চার উত্তরাধিকারকে মাত্র চারজনের মধ্যেই কেন শেষ করলেন জানি না। বাংলার ছাপ-ছবির প্রসঙ্গে তিনি সুরেন্দ্রনাথ কর, বিশ্বরূপ বসু, হরেন দাসের নামোচ্চারণ করেননি। এঁদের অগ্রাহ্য করে পরবর্তীকালের কোন ছাপ-ছবির শিল্পীর আলোচনা করা যাবে না। বাক্সবন্ধ "কল্পদৃষ্টি"তে লেখা হয়েছে, এই প্রদর্শনী সজ্জায় "ফলিত ললিতকলার চমৎকার বিস্ফোরণ ঘটেছে" ইত্যাদি। ছবিটবি সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল ঠিকই তবে এ ধরনের অভিজাত প্রদর্শনী যে, কোনো দেশে শীতাতপনিয়ন্ত্রণহীন গলদঘর্ম অবস্থায় দেখতে হয়, তা জানা ছিল না। পাখার খটখট শব্দ আর গালচে ছাড়া মেঝেতে দর্শকদের জুতো ঘষার আওয়াজ বিরক্তি উৎপাদন করেছিল। সাজসজ্জায় ফলিতকলার ছাপ পেলেও ব্যবস্থাপনায় পাইনি।

কণককুসুম দাস
কোন্নগর, হুগলি

অন্ধকারে আলোয়

'মুক্তচিন্তা' বিভাগে তাপস সেনের অন্ধকারে আলোয় পড়লাম ২৩ আগস্ট দেশ-এ। আলোর কারিগরির দিক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীসেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন। সত্যিই বর্তমানে যাঁরা নাটক নিয়ে ভাবছেন, স্বপ্ন দেখছেন, নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন—তাঁদের আজ দরকার স্বল্প আসনের মঞ্চের আলো আর আনুষঙ্গিক স্পেসসহ সব রকমের সুবিধে। অ্যাকাডেমি বা রবীন্দ্রসদনে মফস্বলের দল হিসেবে আমরা আমাদের সুবিধামত সুযোগ পাবার তো কোনো চিন্তাই করি না। শিশির মঞ্চেও সে সুযোগ ক্রমশ কমে আসছে। শিশির মঞ্চে সুযোগ পেলেও, রয়েছে সরকারী বহু বাধা নিষেধ। মফস্বল শহরের কোনো নাট্য দলের যেদিন শিশির মঞ্চে নাটক থাকে, তাঁদেরকে সেইদিন সকালে বা আগের দিন রাত্রে রওনা হতে হয়। তাঁরা কলকাতা পৌঁছান দুপুর নাগাদ। আগের থেকে অনুরোধ করলে, তথ্যকেন্দ্রের দু'টো ঘর বিশ্রাম নেবার জন্য খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু পায়ে ধরলেও দু'টোর আগে হলের চাবি পাওয়া যায় না। ধরা যাক সাড়ে ছ'টায় শো। নামমাত্র সময়ে মঞ্চ, আলো, সাজসজ্জা সেরে সঠিক সময়ে সুধী দর্শকবৃন্দের প্রখর দৃষ্টির সামনে হাজির হতে

হবে। এর পর রিহার্সালের প্রসঙ্গ। সে সুযোগও শিশির মঞ্চে নেই। হাজার মাপজোক করে প্রয়োজনার ছক করলেও একটা রিহার্সাল মনেপ্রাণে চান নবীন অভিনেতারা। মফস্বলের দল হিসেবে এ যে কি বিড়ম্বনা, কে বুঝবেন! আমরা নাট্যকর্মীরা এ অবস্থা বা ব্যবস্থায় অসহায় বোধ করছি।

তাই, শ্রদ্ধেয় তাপস সেনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলি, কলকাতার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিমে অবিলম্বে ছোট ছোট মঞ্চ তৈরি হোক সরকারি উদ্যোগে। তৈরি হোক সহজ, অনাড়ম্বর, কার্যকরী থিয়েটার।

মফস্বলের একজন নাট্যকর্মী হিসেবে এই প্রসঙ্গে আরও একটা প্রস্তাব রাখছি। এই বাংলায় প্রতিটি ব্লকে সরকারি ব্যয়ে একটা করে মুক্তমঞ্চ গড়ে উঠুক। সেই সঙ্গে প্রতিটি মঞ্চে সামান্য আলো ও শব্দের ব্যবস্থা। এ সবেরই দায়িত্ব থাকবে ঐ ব্লকের ভারপ্রাপ্ত ব্লক ডেভলপমেন্ট অফিসারের ওপর।

বিনামূল্যে এই মঞ্চ ও সরঞ্জাম ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে। তাহলে বোধ হয়, যেসব গ্রুপ থিয়েটার এখনও গ্রামের মানুষের কাছে গিয়ে নাটক দেখাবার সদিচ্ছা প্রকাশ করেন, তাঁরা এবং অজস্র নাম-না জানা লোকশিল্পীরা উপকৃত হবেন—উপকৃত হবেন জনগণ। উন্নত হবে সংস্কৃতি।

অভিজিত সরকার
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

'ঘরে বাইরে'

৩০ আগষ্ট ১৯৮৬ সংখ্যায় 'শ্রীমতী' লিখিত 'ঘরে বাইরে' শীর্ষক প্রবন্ধে একটি বৈজ্ঞানিক এককোষী জীবের নাম লেখা হয়েছে—'অ্যাস্টামিক হিস্টোলিটিকা'। নামটি আসলে হবে এন্ট অ্যামিবা হিস্টোলিটিকা (Ent-amoeba histolitica)।

এইরকম আরো দুইটি ভুল এর আগের আরো দু-সংখ্যার 'দেশ'-এ ছিল। যেমন ধরুন, ২৪ মে, ১৯৮৬ এবং ২৩ নভেম্বর ১৯৮৫-তে।

২৪ মে, ১৯৮৬ (পৃষ্ঠা ৭৯) 'শ্রীমতী' লিখিত 'ঘরে বাইরে' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখা আছে '...রোগীকে ক্যাথিড্রাল দেবার জন্যে।' ওইখানে আসলে হবে 'ক্যাথিটার'। ২৩ নভেম্বর, ১৯৮৫ (পৃষ্ঠা ৮১) 'শ্রীমতী'র লেখায় রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের নাম লেখা হয়েছে—স্কিগমো-ম্যানোমিটারের...।' যন্ত্রটির নাম হবে (স্ফিগমো ম্যানোমিটার)।

রীনা গুপ্ত
কলকাতা-৭০০ ০০১

বাংলার মহিলা ক্রিকেট

৩০ আগস্ট ১৯৮৬ তারিখে আপনার বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় 'খেলা' বিভাগে শ্রীরূপা বসু লিখিত 'বাংলার মহিলা ক্রিকেট নিম্নমুখী কেন' এই শিরোনামায় লেখাটি প্রকাশ করে আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। সাম্প্রতিককালে মহিলা ক্রিকেটের দুভার্গ্যজনক অবস্থার কথা জানিয়ে শ্রীরূপা বসু আমাদের নিকট কর্মকর্তা ও খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর যে অপদার্থতা আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। নিম্নমুখী বাংলার মহিলা ক্রিকেটকে উন্নতমুখী করে তোলার জন্য তিনি দক্ষ কর্মকর্তা, অভিজ্ঞ কোচ এবং সর্বোপরি ইস্টার্ন রেলকে ক্লাব হিসেবে অ্যাফিলিয়েশন দেওয়ার জন্য যে বক্তব্য রেখেছেন তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত।

রামরঞ্জন নাথ
ত্রিবেণী, হুগলী

কংসের কারাগার

৩০ আগস্ট-এর সংখ্যায় শ্রীরাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "কংসের কারাগার" তথ্য ও পরিসংখ্যান সমৃদ্ধ সুলিখিত নিবন্ধ। উক্ত নিবন্ধে লেখক দেশে দেশে কালে কালে শাসকশ্রেণী প্রতিবাদী অথবা প্রতিবাদী সন্দেহে, নাগরিক সাধারণের উপর যে বর্বরোচিত নিপেষণ চালিয়েছে এবং চালাচ্ছে, স্বল্প পরিসরে তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। অত্যাচার নিপীড়নের ক্ষেত্রে সাম্যবাদী শাসক আর পুঁজিবাদী শাসকে কোন রকমফের নেই। সাম্যবাদী শাসকদের সম্বন্ধে আমার একটু নমনীয় চিন্তাভাবনা ছিল। ধারণা ছিল, বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকাগুলি তথাকথিত সাম্যবাদী শাসকদের প্রতি জাতক্রোধ বশত কুৎসা রটায়। এই নিবন্ধ পাঠ করার পর আমার সে ধ্যানধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটল, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে। কিন্তু নিবন্ধের প্রারম্ভেই শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত ভাষার উপর এমন চরম পীড়ন করে বসলেন কেন বুঝলাম না। যেভাবে তিনি উপস্থাপনা করেছেন তাতে মুদ্রণ প্রমাদ বলেও তো মনে হয় না; কারণ বাক্যটি দু'বার লেখা হয়েছে এবং তার ব্যাখ্যাও করেছেন তিনি। উগ্রসেনের স্ত্রী উগ্রসেনবেশী দ্রুমিলকে জিজ্ঞাসা করলেন "কস্যাত্বম্" "কে আপনি?" সংস্কৃতে "কে আপনি" এই বাক্য "কঃ ত্বম" আর সন্ধি করলে দাঁড়ায় "কস্ত্বম" (অবশ্য সন্ধি করা না করা লেখকের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে) আর "কস্যাত্বম" বললে বুঝায় "আপনি কার?"

যোগীশ ভট্টাচার্য
লালবাগ, মুর্শিদাবাদ

বাংলার মহিলা ক্রিকেট

৩০ আগস্ট '৮৬র দেশ-এ বাংলার মহিলা ক্রিকেট নিম্নমুখী কেন—এই প্রসঙ্গে শ্রীরূপা বসু লিখেছেন—'আলোড়ন সৃষ্টিকারী' যে কমিটি ১৯৭৩-এ তৈরি হয়েছিল তাতে ছিলেন নতু কোলে, অলকা উকিল, আরতি ব্যানার্জি...ইত্যাদি প্রমুখ।

শ্রীরূপা বসুর তথ্যে কিছু ত্রুটি আছে, আলোড়ন সৃষ্টিকারী সর্বপ্রথম (এড হক) যে কমিটি ১৯৭৩-এ গঠিত হয়—(যাঁরা অনেক চেষ্টা করে এই সংস্থা গড়েছিলেন) তাতে ছিলেন—অলকা উকিল, অনিলা দাশগুপ্ত, আরতি ব্যানার্জি, নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়, বীণা বসু, শান্তি সেন প্রমুখ। পুরোধা ছিলেন ডঃ রমা চৌধুরী।

নীলাঞ্জনা দত্ত
কলকাতা-৭০০ ০১০

নববর্ষের নবপত্রিকা

'দেশ' পত্রিকা চুয়ান্ন বছরে পা ফেলল।
গত বছরের ঠিক এই দিনটির কথা মনে পড়ছে স্বভাবতই। সেই নতুন বছরের প্রথম সংখ্যা প্রকাশের শুভমুহূর্তে আমাদের মনে কিছুটা চাঞ্চল্য ছিল না এমন বলতে পারিনা। এক নাটকীয় সন্ধিক্ষণের মতই কিছু অনিশ্চয়তার উত্তেজনা ছিল সে বছরের প্রারম্ভিক প্রস্তুতির মধ্যে। কারণ পত্রিকার আঙ্গিকে এবং বিষয়ানুষঙ্গে আদ্যন্ত রূপবদলের পরিকল্পনা নিয়েছিলাম আমরা। কলেবর ও রঙীন পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিত্রণরীতি বদলেরও ঝুঁকি নিয়েছিলাম আমরা। আগামী দিনের দিকে তাকিয়ে পত্রিকার কায়-চরিত্রের এই আধুনিকীকরণ অনিবার্য মনে হলেও আমরা ঈষৎ দ্বিধান্বিত ছিলাম একটি কারণে। কথাটা এখন বলা যায়। এই পত্রিকা যেহেতু পুরুষানুক্রমে বাঙালীর পারিবারিক পত্রিকা হয়ে উঠেছে সেহেতু এর পাঠক সমাজের মধ্যে বয়সের এক দুস্তর ব্যবধান পৌনপুনিক সত্য। পৌত্র থেকে পিতামহ, এমন কি প্রপিতামহও এখন একই সঙ্গে এই পত্রিকা পড়ে থাকেন। গড় হিসেবে পৌনে এক শতাব্দীর প্রেক্ষাপট। সুতরাং এই বহরে বাড়া পাঠকজনের রুচি অভ্যাস ও ঐতিহ্যের ঐক্যবিধান, সামঞ্জস্যসাধন দুরূহ সমস্যা হয়ে উঠতে বাধ্য। প্রবীণের চোখে এই নবীকরণ কি রকম ঠেকবে সেটাই বড় চিন্তার বিষয় ছিল। দ্বিতীয় চিন্তা পত্রিকা প্রকাশনের ব্যয় বৃদ্ধি। ক্রমবর্ধমান বাজারদরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে ওঠা শক্ত। উৎপাদন খরচ ক্রমশ ভারি হয়ে উঠছে। তিনটাকা দামের কাগজ এমনিতেই বাজারের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না, তার ওপর বাড়তি ব্যয়ের বোঝা। এই চাপ হয়তো শেষপর্যন্ত ক্রেতার ওপরেও বর্তাবে। ফলে নিম্নমধ্যবিত্তের ক্রয়সাধ্য টান পড়বে।
আশঙ্কা অমূলক ছিল না। আমরা কিছু কিছু চিঠিপত্রে তার প্রমাণ পেয়েছি। নতুন পালাবদল কিছু পাঠককে ধাক্কা দিয়েছিল, কিছু মিশ্র প্রতিক্রিয়াও ঘটেছিল। নতুন সব সময়েই আমাদের পুরাতন অভ্যাসে ঘা দেয়, দিলেও, আকস্মিকতা সব সৃষ্টিরই আদি কথা। ক্রমে তা আবার অভ্যাসের আবহে ধরা দেয়। মনটা ক্রমশ তৈরি হয়ে যায়। তবু বলব, অধিকাংশ পাঠকই আমাদের স্বাগত জানিয়ে সাধুবাদ দিয়েছিলেন এই রূপান্তরের জন্য। অন্যান্য পাঠকদের কাছ থেকেও শেষ পর্যন্ত সহৃদয় অনুমোদন পেয়েছিলাম, এটাকে সৌভাগ্য বলেই মনে করি। তিন টাকার পত্রিকা এখন পাঁচ টাকার হয়েছে। এই বৃদ্ধি নিবার্য ছিল না, নিরুপায় হয়েই যে দাম বাড়াতে হয়েছিল সেকথা অকপটে আজ স্বীকার করি। সুখের বিষয় তবু প্রচার সংখ্যা বেড়েছে ভাল হারেই, এটা অবশ্যই আমাদের উপরি পাওনা। কিন্তু আমাদের মূল লক্ষ্য ক্রেতাকে ডিঙিয়ে পাঠকে, যাঁদের সঙ্গে আমাদের ভাবের আদানপ্রদান হয় ভালোবাসায়, পারস্পরিক শ্রদ্ধায়। নতুনকে আমরা চাই, পুরাতনকেও চাই, কারো সহৃদয় সাহচর্যই আমরা হারাতে চাইনি কোনদিন। দশের জন্যই 'দেশ'। তাই সকলের কাছেই যেমন তার প্রত্যাশা, প্রতীক্ষা, তেমনি তাঁদের মনন এবং মনোরঞ্জনের জন্যই আমাদের শ্রম এবং সাধনা।
নিরন্তর নিষ্ঠার সঙ্গে নিত্যনতুন রচনার সন্ধান করে চলেছি আমরা, খুঁজে চলেছি প্রতিশ্রুতিবান প্রতিভা। প্রতিটি সংখ্যাকেই বৈচিত্র্যে ভরে তুলে পাঠকের প্রত্যাশাপূরণ দুরূহ কাজ। তাই কেবল রসের সন্ধান নয় রসদেরও সন্ধান। প্রতি পদক্ষেপে নিজেকে যে অতিক্রম করে যেতে পারে না সে শুধু পিছিয়েই পড়ে। গতানুগতির গণ্ডির মধ্যে পাক খেতে খেতে সে নিজেরই অন্ধ অনুকারী এবং অনুসারী হয়ে ওঠে। আমরা তা কোন দিনই হইনি। দিনের সঙ্গে, দুনিয়ার সঙ্গে তাল রেখেই চলেছি।
বর্তমান সংখ্যা থেকে 'দেশ' পত্রিকার রসবোদ্ধা পাঠকদের প্রিয় বিভাগগুলির সঙ্গে যুক্ত হলো আরও একটি নিয়মিত চিত্তাকর্ষক রচনা। রম্যরচনার সেই কিংবদন্তী পর্বের জনপ্রিয় রূপদর্শী আবার উপস্থিত হচ্ছেন তাঁর ব্যঙ্গবঙ্কিম নকশাবলী নিয়ে। তাঁর তির্যক পর্যবেক্ষণ 'ঝাঁকি দর্শন'-এর পাশাপাশি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের আশ্রমভিত্তিক গভীর পত্রাবলী। এই অপ্রকাশিত পত্রগুচ্ছ শান্তিনিকেতনের এক অন্তর্বর্তী ইতিহাস উন্মোচিত করবে এতকাল পরে। সদ্যপ্রয়াত প্রবীণ ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন কেবল শান্তিনিকেতনের আশ্রম জীবনের ছন্দকারই ছিলেন না এই পত্রিকার সঙ্গেও ছিলেন ওতপ্রোত জড়িত। একটি সশ্রদ্ধ স্মরণিকা তাঁর উদ্দেশেও নিবেদিত হল বর্তমান সংখ্যায়।
নববর্ষের এই শুভারম্ভে আমরা স্মরণ করছি আমাদের অগণিত পাঠক লেখক শুভানুধ্যায়ী প্রতিটি মানুষকে যাঁরা দেশকালের গণ্ডী পেরিয়ে আজ ছড়িয়ে আছেন আদিগন্ত পৃথিবীর কোনায় কোনায়। স্ববাসী প্রবাসী সেই সর্বভাষী মানুষ, দেশে দেশান্তরে যাঁদের ঘর আছে সেই বাঙালী অবাঙালী সলককে।
আজ বাঙালীর শ্যামা পূজা, শক্তি আরাধনা পুণ্যতিথি। আমরাও মসীবর্ণা মহাকালরূপিণী দেবীর কাছে কায়মনোবাক্যে শক্তি প্রার্থনা করছি। কালপ্রতিমা কালী আমাদের সব জড়ত্ব সব কালিমা দূর করুন। আমাদের সারস্বত সাধনা শক্তির সাধনা হয়ে উঠুক।
অন্ধকারে আলোকের এই রাখীবন্ধনেরই অন্য নাম দীপাবলী। দেশ

রূপদর্শীর ঝাঁকিদর্শন

বিশেষ তদন্তে প্রকাশ : টি ভি চিত্রনাট্য

মিড শট্ : ধীরে ধীরে দূরদর্শন যন্ত্রের চৌখুপির পর্দায় শ্রীমতী টিভ্ভি বাতকরের মুখ ভেসে উঠবে।

ক্লোজ শট্ : চৌখুপির পর্দায় টিভ্ভি বাতকরের মুখ। তাঁর রংদার ঠোঁট দুটো অতি আস্তে কড়া ময়ান দেওয়া এক চিলতে অস্ফুট হাসিকে বেলতে বেলতে অবশেষে হাসি হাসি ভাবটাকে কিঞ্চিৎ ফুটিয়ে তুলবে।

ক্লোজ শট্ : নমস্কার। শ্রীমতী টিভ্ভি বাতকরের দুটো চোখের পর্দাই ঝপ করে টেবিলের উপরে রাখা কাগজের উপরে পড়ে থাকবে। টেবিল বা কাগজ কিছুই দর্শকরা দেখতে পাবেন না। ঠিক আধ সেকেন্ড। শ্রীমতী টিভ্ভি বাতকরের চোখ দুটোকে এখন দেখাবে যেন সদ্য ভূমিষ্ঠ বাচ্চা বিড়ালের চোখ। দু চোখের পাতায় গাঢ় সবুজের প্রলেপ।

টিভ্ভি বাতকর : আপনারা জানেন গত ২রা অক্টোবর ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধী

ক্লোজ শট্ : টিভ্ভি বাতকরের ডান চোখের পর্দা অতি ধীরে উঠতে থাকবে। কিন্তু বাঁ চোখের পর্দা একটুও উঠবে না। ডান চোখের পর্দা ধীরে ধীরে উঠতে উঠতে দর্শকদের উপর স্থির হয়ে থাকবে। বাঁ চোখের পর্দা আগের মতোই অদৃশ্য টেবিলের উপরেই পড়ে থাকবে।

রূপদর্শী : দর্শক-দর্শিকাদের জানাতে চাই যে, শ্রীমতী টিভ্ভি বাতকর চোখের এই অপূর্ব কায়দাটি বহু আয়াসে রপ্ত করেছেন। দর্শিকাদের কেউ যদি এটা শিখতে ইচ্ছুক থাকেন, তবে টিভ্ভির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এবং টি ভি ঘোষণার শিল্পমহলে শ্রীমতী টিভ্ভি বাতকরের স্থান বর্তমানে।

দূরদর্শনের নেপথ্য কণ্ঠ : সরি, মি রূপদর্শী, টি ভির রেগুলেশান অনুযায়ী আপনি বর্তমান কথাটি ব্যবহার করতে পারেন না।

রূপদর্শী : কেন জানতে পারি কী? ওটা কি শ্লীলতাবিরোধী শব্দ?

নেপথ্য কণ্ঠ : না না, শ্লীলতাবিরোধী কেন হবে? অ্যাজ এ ওয়ার্ড ওতে কিচ্ছু নেই। তবে ইউ নো দর্শকাস্, আই মিন্ টি ভি দেখনেওয়ালাস্, ওদের মধ্যে তো অল্ সর্ট্স্ অফ লোকজন থাকে, ওদের কেউ হয়ত এটাকে ব্যাড় বলে মনে করতে পারে, মনে যে করবেই তার কোনও মানে নেই, বাট ইউ নো, ফ্রম্ দি গভর্ণমেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ, মানে ইট্ ইজ্ অলওয়েজ বেটার টু বি অন্ দি সেফ সাইড্। ইউ বেটার শব্দটা বদলে দিন। টি ভির পলিসি হল, কখনোই কারও বাক্স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ না করা। বাট আমাদের সব সময়েই সতর্ক থাকতে হয়, যাতে আমরা নিরপেক্ষ থাকি। আই মিন্ ইমপার্শিয়াল, ইউ নো?

রূপদর্শী : কিন্তু বর্তমা

নেপথ্য কণ্ঠ : ব্যস বাস, প্লিইইইজ্।

রূপদর্শী : কী হল? আজব্বা

নেপথ্য কণ্ঠ : প্লিজ প্লিজ, আমাদের রেগুলেশন ভাঙবেন না স্যর। ওই শব্দ কটা এক একটা প্রাইভেট এন্টারপ্রাইসের ট্রেড নেমের সঙ্গে যুক্ত। যে সব শব্দ প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজের ট্রেড নেম ক্যারি করছে, সেই শব্দ আমরা ইউজ করতে দিই না। টি ভির রেগুলেশন xxx (খ) ধারার xxiii (१ :") উপধারাতে আটকায় স্যর। প্লিইইইইজ্জজ্। ওটা বাদ দিয়েই আপনি আপনার বক্তব্য বলুন। আপনার বাক্স্বাধীনতা খর্ব করার কোনও উদ্দেশ্যই আমাদের নেই। ইন ফ্যাক্ট আওয়ার ধুরধরশনা ইজ্ অলওয়েজ ইন্ ফেবার অফ প্রোমোটিং ফ্রি স্পিচ্। আশা করি, আপনি বুঝতে পেরেছেন?

রূপদর্শী : টি ভির দর্শক এবং দর্শিকাবৃন্দ মাফ করবেন, আমি বলতে চেয়েছি এই যে, শ্রীমতী টিভ্ভি বাতকর যে আশ্চর্য কৌশলে একই সময়ে তাঁর দুটো চোখের একটাকে দর্শকদের দিকে এবং অপরটাকে টেবিলের উপর নিবদ্ধ রাখতে পারেন, চোখ ব্যায়ামের এই অপূর্ব কৌশল আয়ত্ত করেছেন বলেই তিনি টি ভি শিল্পে সুপার স্টার হয়েছেন।

শ্রীমতী টিভ্ভি বাতকরের মুখের ক্লোজ আপ। দর্শকরা দেখছেন, টিভ্ভি ওদের দিকে বাঁ চোখের পাতা নামিয়ে ডান চোখের পাতা খুলে তাকিয়ে আছেন। রূপদর্শীর অফ্ ভয়েসের শেষের দিকে টিভ্ভির দুটো চোখের পর্দাই খুলে গেল। এবার দর্শকরা দেখবেন টিভ্ভি বাতকরের দুটো চোখের পাতাই বুজে গেল। চোখের পাতা দুটো এখন গভীর লাল। তারপর টিভ্ভির ডান চোখের পর্দা টেবিলের দিকেই নামানো থাকল এবং এবার বাঁ চোখের পর্দা ধীরে ধীরে দর্শকদের দিকে উঠে গেল। অল্ ক্লোজ।

টিভ্ভি বাতকর : সরি ফর্ দি ইন্টারাপ্শন্। আমি আবার বলছি। আপনারা জানেন, গত ২রা অক্টোবর ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধী এবং রাষ্ট্রপতি শ্রীজৈল সিং রাজঘাটে গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে প্রয়াত জনকের, জাতি, সরি, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাজঘাটে গিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, মহাত্মা গান্ধী নামে খ্যাত প্রয়াত লোকটির সঙ্গে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর আত্মীয়তা বা অন্য কোনও সূত্রে কোনও যোগ নেই। মহাত্মা গান্ধীর পরিচয় এই যে, তাঁর পিতা এবং মাতা উভয়েই বানিয়া জাতিভুক্ত ছিলেন। আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মাতা ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর পিতা ছিলেন পার্শি। ভবিষ্যতে যদি কোনও ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়, তবে তা নিরসনের জন্য দূরদর্শনের ফ্যাক্ট ইজ্ ফ্যাক্ট পর্বদের পক্ষ থেকে এই ঐতিহাসিক তথ্যটি নিবেদন করা হল। রাজঘাটের ঘটনা সম্পর্কে জানা গিয়েছিল যে, গান্ধী জয়ন্তী দিবসে রাজঘাটে তিনবার গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। প্রথমবার গুলি ছোঁড়ার তিরিশ জিরো পাঁচ সেকেন্ডে দ্বিতীয় গুলিটা ছোঁড়া হয় এবং শেষ গুলিটি, ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞদের মতে, অনুমান পঞ্চাশ মিনিট পরে ছোঁড়া হয়। এই ঘটনা নিয়ে নানা মনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। দেশে ভি ভি আই পিদের নিরাপত্তা সম্পর্কে নানা কথা উঠেছে। সেই সব প্রশ্ন নিরসনের জন্য দূরদর্শন আজ এখানে একটি প্যানেল আলোচনার আয়োজন করেছে।

ক্লোজ শট্ : শ্রীমতী টিভ্ভি বাতকর দুটো চোখের পাতাই বুঁজিয়ে ফেলবেন। দু পাতাতেই হাল্কা কচি কলাপাতার রঙ।

রূপদর্শী : (অফ্ ভয়েস) আচ্ছা, শ্রীমতী ভিট্টু কাতকার

দূরদর্শন : সরি, ভিট্টু কাতকার নয়, টিভ্ভি বাতকর।

রূপদর্শী : হ্যাঁ টিভ্ভি কাত, সরি, বাতকর। তা টিভ্ভি বাতকর এত ঘন ঘন চোখ রাঙাচ্ছেন কেন?

দূরদর্শন : চোখ রাঙাচ্ছেন। নো নো। ওকে চোখ রাঙাতে আপনি কখন দেখলেন?

রূপদর্শী : এতক্ষণ ধরেই তো দেখছি। তবে ঠিক চোখ রাঙানো নয়। টু বি প্রিসাইজ, চোখের পাতা রাঙাচ্ছেন।

দূরদর্শন : তাই বলুন। ওটা আমাদের ভিজুয়াল এফেক্ট। আলোচনা বা নিউজ্ শুনতে শুনতে দর্শকদের যাতে মনোটনি. না আসে, সেটা দেখতে হবে তো? তাই আমরা নিউজ্ কাস্টারদের বা অ্যানাউনসারদের চোখের পাতায়

রক্ত মাখাতে বলি। এ ব্যাপারে টিভ্‌ভি সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। শী ইজ মার্ভেলাস। ইজন্ট শী? এটাকে মজ্ বাতকর একেবারে আর্টের পর্যায়ে নিয়ে ফেলেছে। ও এ ব্যাপারে একেবারে সুপার স্টার।

রূপদর্শী : সুপার স্টার তো বুঝলাম। কিন্তু হোয়াট ইজ মজ্? মজ্ কী?

দূরদর্শন : মজ্? না মিস্ না মিসেস্। ওটা হল গিয়ে ইউনিভক্স, সরি ইউনিসেক্স। এটা যাকে বলে লিবের অবদান। ইংরেজিতে যা এম এস, দূরদর্শনে তাই মজ্।

ক্লোজ আপ্ : টিভ্‌ভি বাতকরের মুখ। এক চোখের পাতায় গাঢ় নীল, অন্য পাতায় মেরুন। বাঁ চোখ খুলবে। ডান চোখ টেবিলের উপরে নিবদ্ধ থাকবে।

টিভ্‌ভি বাতকর : আজকের প্যানেলে আছেন ক্যাপটেন কালা বিল্লি, ডিরেক্টার জেনারেল অফ পি এম্‌স্ পার্সোন্যাল সিকিউরিটি, ইনার রিং।

মিঃ কালা বিল্লির মুখ। ক্লোজ আপ। তিনি একটা গ্যাস বোমা নিয়ে লোফালুফি করতে থাকবেন।

টিভ্‌ভি বাতকর : মিঃ বালি স্টিক গোলিয়াবাজ। গুলি বিশেষজ্ঞ।

মিঃ গোলিয়াবাজের মুখের ক্লোজ আপ। তিনি গোঁফে আলতো আলতো তা দেবেন।

টিভ্‌ভি বাতকর : হাওয়ালদার গোল শুনকর ভাগানেওয়ালা। কম্যাণ্ডো ইন্সট্রাক্টার।

হাওয়ালদার গোল শুনকর ভাগানেওয়ালার মুখের ক্লোজ আপ। বাঁ চোখের উপর কালো কাপড়ের তাপ্পি।

টিভ্‌ভি বাতকর : ডক্টর অন্তর ধড়ফড় কিস্‌কো পাকড়ে।

ক্লোজ আপ। ডক্টর অন্তর ধড়ফড় কিস্‌কো পাকড়ের মুখ। মুখে মোটা চুরুট। এই মুখের উপর টিভ্‌ভির কণ্ঠ আছড়ে পড়বে।

টিভ্‌ভি বাতকর : ডক্টর অন্তর ধড়ফড় কিস্‌কো পাকড়ে হচ্ছেন নিরাপত্তা সম্পর্কে সরকারের বিশেষ পরামর্শদাতা। নাউ মিস্টার ধড়ফড় পাকড়ে, সরি, ডক্টর কিসকো পাকড়েজি, আপ শুরু কিজিয়ে।

ডক্টরজি : সেদিনকার রাজঘাটের ইনসিডেন্ট নিয়ে অনেক রকম গুজব ছড়িয়েছে। গুলি ছোঁড়ার ব্যাপারে উই আর নট্ লিস্‌ট বদারড্। কিন্তু যেভাবে এটা ছড়িয়েছে, সেটাই আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। সেটাকে আমরা আদৌ ইগনোর করতে পারিনে। ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য, দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য, সেই কারণেই এই সম্পর্কে সব রকম গুজবকেই ক্লাসিফায়েড ডকুমেন্ট হিসেবে ট্রিট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মাইন্ড ইউ, এখানে দর্শকদের মধ্যে যদি কোনও জার্নালিস্ট থাকেন, তাঁদের জ্ঞাতার্থে বলছি, তাঁদের মঙ্গলের জন্যই, অ্যাজ এ ফ্রেন্ড্, কোনও গুজবকেই আর এখন থেকে নিছক গুজব হিসেবে ট্রিট করবেন না। অল সর্‌ট্‌স্ অফ গুজব্‌স্, এরপর থেকে অফিশিয়াল সিক্রেট্‌স্ অ্যাক্টের পারভিউর মধ্যে পড়ে যাবে। আপনারা আইন লঙ্ঘন করেছেন কী, আপনাদের

অফিশিয়াল সিক্রেট্‌স্ অ্যাক্ট মোতাবেক সোপর্দ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, অন্যান্য ভি ভি আই পি এবং গোটা দেশের নিরাপত্তার স্বার্থেই, এবং কী বলে, সুরক্ষার প্রয়োজনে নিউজ কী গুজব, সব কিছুকেই ক্লাসিফায়েড ডকুমেন্টের আওতায় এনে ফেলা হয়েছে। রাজঘাটের ব্যাপারে সিকিউরিটির ত্রুটি যা ছিল সেটা মাইনর। সেটা এতই অকিঞ্চিৎকর ছিল যে সেটা নিয়ে কোনও কথা বলাটাই হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আমাদের মেজর ল্যাপস্ ছিল এইখানে, যেখানে গুজবকে আমরা এমন অনায়াসে ছড়িয়ে পড়তে অ্যালাউ করেছি। মিঃ বালি স্টিক গোলিয়াবাজজি, কী ঠিক বলেছি?

মিঃ বালি স্টিক গোলিয়াবাজ : বেশক্। উই ডিড্ মেক এ মিস্টেক্।

ডক্টর অন্তর ধড়ফড় কিস্‌কো পাকড়ে : হ্যাঁ ভুল আমাদের হয়েছে। এবং ভুলটা ওইখানে। আমরা তা স্বীকারও করছি। এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা, যাকে রেমিডিয়াল মেজার বলে, তাও নিয়েছি।

দেখা যাবে মজ্ টিভ্‌ভি বাতকর তাঁর চোখের দুটো পাতাই ঝপ করে এক সঙ্গে ফেলে দিলেন। একটা পাতা আবলুস কালো, আরেক পাতা ময়ূরকণ্ঠি। এবার চোখের পাতা দুটো তিনি উঠিয়ে ফেলবেন। এবং ঠোঁটের চিলতেটে হাসি সামান্য একটু বিস্তৃত হবে।

ডক্টর অন্তর ধড়ফড় কিস্‌কো পাকড়ে : হালো ইন্‌স্ট্রাক্টার গোল শুনকর ভাগানেওয়ালা, আপনি কী স্পেশ্যাল টাইপ ট্রেনিং ইন্‌ট্রোডিউস করেছেন?

হাওলদার গোলশুনকর ভাগানেওয়ালা : অল কম্যাণ্ডোজ্ অন স্পেশ্যাল ডিউটি তালিম অলরেডি নিয়ে ফেলেছে, সাহ্। যে বিশেষ পদ্ধতি এদের শিখিয়েছি, তাকে বলে টার্টল্‌স্ লক্। কচ্ছপের কামড় সাহ্‌হ্। এটা আমাদের উদ্ভাবন সাহ্‌হ্।

ডক্টর অন্তর ধড়ফড় কিস্‌কো পাকড়ে : ক্যাপটেন কালা বিল্লি, হোয়াট ডু থিং অফ দিস্ নয়া পদ্ধতি?

ক্যাপটেন কালা বিল্লি : ভেরি এফেকটিভ্ স্যার। আই ক্যান অ্যাশিওর ইউ স্যার, উইথ্ দিস্ নিউ কায়দা, আই মিন্ কচ্ছপের কামড়, উই শ্যাল ক্যাচ অল্ দি মাছ দ্যাট্ উইল গেট ইন টু আওয়ার জাল, স্যর। আই মিন্ বেড়াজাল স্যর।

ডক্টর অন্তর ধড়ফড় কিস্‌কো পাকড়ে : গুড়, পি এম নিশ্চিন্ত হবেন। আশা করি আপনারা জানেন, হু ইজ্ ইওর টার্গেট?

তিনজন সমস্বরে : রিপোর্টার স্যর, ফটোগ্রাফার স্যর। হু এল্‌স্?

মজ্ টিভ্‌ভি বাতকরের মুখের ক্লোজ আপ। দেখা যাবে তার চোখের দুটো পাতাই ঘন ঘন নামছে আর উঠছে।

হাওলদার গোল শুনকর ভাগানেওয়ালার অফ ভয়েস : ডবল লক্ লাগা দুজা সাব, কোই ট্যাঁ ফুঁ নেহি কর পায়েগা। ইয়ে টার্টল্‌স্ লক্ হ্যায় সাহ্‌হ্‌হ্। ফুল্ প্রুফ।

ছবি : দেবাশিস দেব

ক্রমশ

সন্ধে সাতটার কবিতা

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

রাস্তাটা গরম, কিন্তু গাছ-ঘেরা মাঠের ভেতরে গেলে শীত-শীত লাগে। টিবির উপরে কে যেন নিঃশব্দে বসেছিলো ? গরিব-গুর্বোর বেশ। রোগা মেয়েছেলে।

সম্ভবত সকালের ট্রেনে গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে এসেছে—
জাদুঘর, পাতাল-ট্রেনের ঝিকঝিক, শহিদ-মিনার সব দেখে এসে
কার জন্যে যাদবপুর উনিভার্সিটির ক্যাম্পাসের কাছে বসেছিলো, বুঝতে পারিনি।

ঋণী আমি তবু রইলাম এই মুহূর্তের জন্যে—যখন বাইরের গরম, আর ভেতরের শীত

সবকিছু মিলেমিশে পৃথিবীকে রেফ্রিজেরাটেরের মতো তৈরি করেছিলো।
একবার ভাবলাম, মহামান্য পোপের মতো মাটিকে চুম্বন করে বলি
"হে পৃথিবী, ভালোবাসা নাও।" কিন্তু আমি নিজেই তো কৃপাপ্রার্থী, প্রেমের কাঙাল,

এক **জাঙ্গাল** বন-বাদাড় ভেঙে এসে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি
তার কাছাকাছি আরো মানুষেরা কী যেন খুঁজছে, চাইছে,
প্রায় ঠিক যুবকবেলার আমার ধরনে। মনে যতোটুকু ধরে,
থরে থরে তাকে বাইরে সাজিয়ে রাখতে গিয়ে দেখি
টিবির-ওপরে-বসা ঐ দেহাত মেয়েটা কখন হারিয়ে গেছে—
স্কার্ট-পরা একটা বড়োলোকদের বাড়ির এক সুঠাম তরুণী
সূর্যাস্তের দিকে তার সাদা কুকুরটাকে ছুটিয়ে ছুটিয়ে
যখন আমার দিকে টাল খেয়ে তাকালো, তখন সাতটা ঘড়িতে।

কৃষ্ণপক্ষ রাতে

বাসুদেব দেব

কৃষ্ণপক্ষ, কাচে বড় কালি জমে
সামান্য লণ্ঠন নিয়ে কে চলেছো বিজলী-বিরহী এই
ভুলভাল পথে ? সাপখোপ খানাখন্দ, অচেনা শহরতলী
কার বাড়ি যাবে ? আমি যে পল্লবগ্রাহী উৎসব ভিখারি
আমি খুব সাবধানী এবং বাঙালী মগজিয়া
শেষকালে আমাকে দিও না দোষ, দিনকাল ভালো নয়
কার বাড়ি যাবে ? যে রকম আগুন ভিতরে যায়
যায় জল, নোনা হাওয়া, সেরকম ভেবেছ কি যাবে ?
আমাদের স্বভাব তা নয়, যে রকম গার্হস্থ্যের গোপন ফাটলে
বাসা বাঁধে সর্বনাশ, শরীরের গূঢ়কূপে, সেরকম চুপে চুপে যাবে ?

দেখোনি সংবাদপত্র, মানুষের মুখচোখ ? সম্পর্কের ভিতরে কেমন
ঢুকেছে ঝড়ের কুটো, বোঝো নি এখনো, গ্রাম্য আছো,
ভাঙাচোরা পুরোনো বাড়ির ভিতরে দেখোনি তুমি
নোনাধরা দেয়ালের ছবি খেয়েছে ব্রোমাইড
তোমাকেও জ্যান্ত খাবে আজ, ফিরে এসো,
কোথায় চলেছ কাচে-কালি লণ্ঠন দুলিয়ে, অনিশ্চিত
শিল্প আর সামাজিক জ্যোৎস্নার সুবাদে ?

বাবার ডামি

সুমিতা গঙ্গোপাধ্যায়

নাগর দোলায় চাপতে যেতেই দেখলাম
বাবা একটা বেলের পানার মতন—
সুন্দর মেয়ের সঙ্গে দোলায় চেপেছে

আমি ভ্যাঁক করে কেঁদেও ডাকলাম, বাবা···
বাবা চোখ কটমটিয়ে এক হ্যাঁচকায়—
মেয়েটাকে দোলা থেকে টেনে নিয়েই
আবার নতুন করে মেলার ভিড়ে হারিয়ে গেলে।

দোলাওয়ালা বললো,
তুই কার জন্য কেঁদে খুন হচ্ছিস, বাপ্
তুই কি মেলায় হিন্দি ছিনেমা দেখিসনি
ও তোর বাবার মতন দেখতে হলেও বাবা নয়
ও তোর বাবার ডামি খোকন
ও তোর বাবার ডামি
বলতে বলতে দোলাওয়ালার গলা এমন বুজে এলো
যেন ওর বুকের ভেতরেই আমার মরা মা
আবার ফোঁপাচ্ছে

বিষণ্ণ বাদলের দিনে

মঞ্জুভাষ মিত্র

বিষণ্ণ বাদলের দিনে আমার হৃদয়ের এই গান। ঘাসগুলি খুব ঘন সবুজ হয়ে উঠছে সামনের নূতন কৃষ্ণচূড়া গাছটিতে প্রথম ফুল এসেছে আমি সকাল থেকে জানালার ধারে বসে এক প্রেম ও ভালোবাসার উপন্যাস পড়ছি। কোন সমুদ্রপারের দেশ থেকে রাশি রাশি জলভরা কালো মেঘ আমাদের আকাশ ভুবন ভরে দিল, তারা যেন এক চিরদিনের মেষপালকের ইঙ্গিতে প্রান্তরের উপর দিয়ে ধাবমান পশুর দল। আমি আমার চক্ষু-দ্বয়কে বল-লাম সজাগ হও, নবযুবতী বর্ষা নৃত্য করবে তাকিয়ে দেখ। তার আঁটোসাঁটো অঙ্গবেষ্টন করে নীলাম্বরী, সুঠাম অঙ্গসমূহের ললিত নৃত্য অনুভব করা যায়। আমি ঈষৎ অন্যমনস্ক, স্মৃতির ভিতর পূর্ববর্তী বর্ষাসমূহ যে রেশ রেখে গিয়েছিল প্রিয় বই-এর পাতার মত তাদের উলটেপালটে দেখতে ইচ্ছে করে। বুকের ভিতর ধীরে ধীরে প্রত্যাশার জন্ম হয় ; প্রেরণাদাত্রী দেবীর মুখ দেখতে পাবো শিল্পের দেশে আবার যাবো শাশ্বত সৌন্দর্যের সঙ্গে দেখা হবে। বৃষ্টির সুখদ ঝংকারে অভিভূত গানের ফুললতাপাতা দু'হাতে তুলে ছুটে চলো আমার হৃদয়, তোমার নবজন্ম হবে তুমি আবার বেঁচে উঠবে। তথাপি এই মুহূর্তে সূক্ষ্মভাবে পূর্বরেশ-বিষণ্ণতা অনুভব করো, তোমার সমস্ত ত্বক গাছের পাতার মত বাদলধারা পান করুক ; তারপর ধীরে ধীরে তোমার জীবন বদলে যাবে। ততক্ষণ নৃত্যরত বর্ষাযুবতীর উদ্দেশ্যে শব্দের পুষ্পিত বিন্যাস রচিত হোক···

কাজ নেই

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

মেঘের ভেতর থেকে ভেসে আসে মেঘ
নতুন বাড়ির সীমানায়।
এখনো কেন যে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছো
দাঁতে দাঁত চেপে—
সকাল হয়েছে— বেলা যায়।
কাটো নখ, কাটো দাড়ি
কাটো পেটের অজস্র নাড়িভুঁড়ি,
সুখী হও, শান্ত হও, মাথা ঠাণ্ডা করো।
পৃথিবীতে
সবারই তো কিছু না কিছু থাকে কাজ—
কেউ গাছে জল দেয় কেউ গাছে চড়ে বসে থাকে
দুচোখ আকাশে তুলে দিয়ে ;
শুধু তোমারই কি কোন কাজ নেই
বছর বছর চলে যায়,
দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রয়েছো তাই ?
মেঘের ভেতর থেকে মেঘ এসে ঢেকে দেয় ঘরবাড়ি,
আসবাব, ঢেকে দেয়
খাটের ওপর শুয়ে থাকা সতী ও সন্তান।

নীল লণ্ঠন

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে সেই একই পৃথিবী
পুরনো বাঁশবনের ছায়া নুয়ে আছে মাথার ওপর
পিছল অন্ধকার, ঠগ বাছতে শহর উজাড়।

মাঝরাতে নীল লণ্ঠন জ্বালবে না ?
তাহলে এই অন্ধকার কাটবে কী করে !
ঘড়ির কাঁটা একই বৃত্তে ঘোরে
হাজার বছর তবু এভাবেই পোড়ে
কাঁদে, লক্ষ শিশু কাঁদে···
শিকারী ও ভিখারির হাত মরণের সেতু বাঁধে।

লেভেল ক্রসিং, সেই একই পৃথিবী
মৃতদেহগুলি হাঁটতে শুরু করেছে···

চাঁপার সিন্দুক

সাধনা মুখোপাধ্যায়

ও বড়ো কোমল গিরিখাত
অনুপ্রবেশ করো ধীরে
আর্দ্র আনন্দের রেশ
না মিলায় রক্তিমে তিমিরে

ও বড়ো চাঁপার সিন্দুক
ওইখানে আপেলের খনি
চাড় দিয়ে খুলো না কো ডালা
আঁচড়ে আহত হবে ননী

ও বড়ো নরম জঙ্গল
আষ্টেপৃষ্ঠে আছে তৃণভূমি
কচি কচি কদম কেশর
তেমনই ভঙ্গিমা করো তুমি

ও পথ তো গোলাপেরই পথ
পাপড়ির মতন মসৃণ
ভোমরার মতো আচরণে
বিচরণ করো চিরদিন

ভুল

কমল দে সিকদার

অতলান্ত খাদের কিনারে
যেন অনন্তকাল দাঁড়িয়ে আছি
খাদ থেকে উঠে আসে ভয়
পিছনে এত কোলাহল

জীবনভোর এত সঞ্চয় খেলা
ঝোলা থেকে খসেছে কখন
গভীর নীচে কেউ ডাকে
আয় ফিরে আয়

অবলম্বনহীন দাঁড়িয়ে থাকি
স্বজনহীন সময়
ভুল করে এত পথ এসেছি
আমার এত ভুল

কালো থেকে উঠে আসে ভয়
অতীত মেখেছে এত কালি
বর্তমান যেন মারমুখী দিন
ভুল এত ক্ষমাহীন হয়।
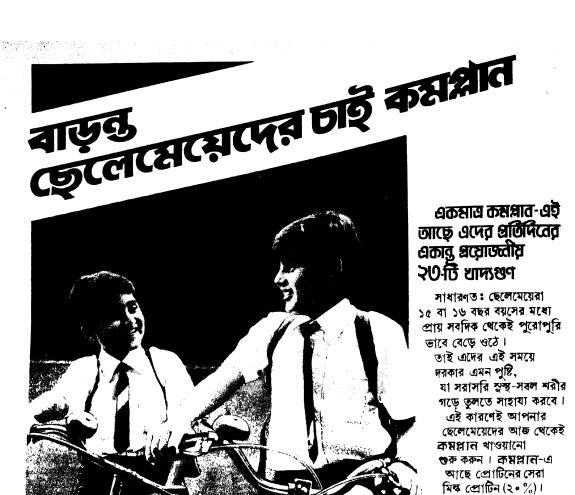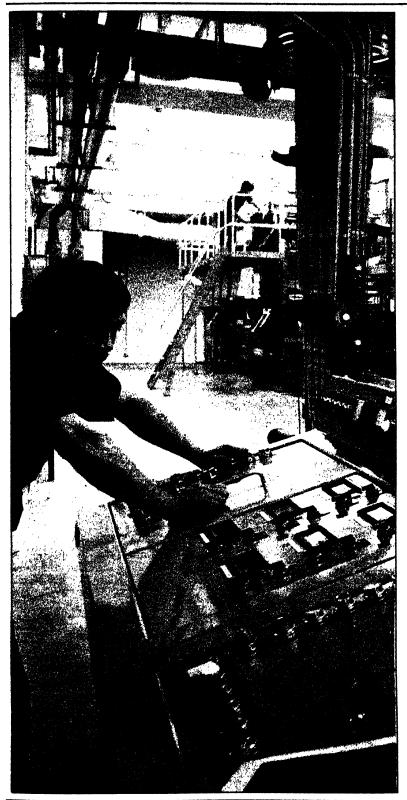
ছাপার অগ্রগতি, হাত-হরফ থেকে লেসার বিম

পবিত্রকুমার মুখোপাধ্যায়
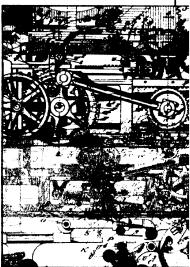
ছাপার যন্ত্রের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাংশ

মুদ্রণশিল্পে বিপ্লব ঘটে গেছে পাঠকের অগোচরে। দ্রুত ও পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থার বিশাল সূতিকাগারে প্রতিদিন ভূমিষ্ঠ হচ্ছে লক্ষ লক্ষ পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ।

আধুনিক দ্রুতগতি অফসেট যন্ত্র। ঘন্টায় পঞ্চাশ হাজার কাগজ মুদ্রণক্ষমতা, কম্পুটার-নিয়ন্ত্রণ এর বৈশিষ্ট্য।

ছাপাখানা পৃথিবীর সব আবিষ্কারের তথ্য ছেপে রেখেছে অথচ ছাপাখানা তার নিজের আবিষ্কারের কথা কোথাও ছেপে রাখেনি। তাই ছাপাখানার জন্ম-তারিখ নিয়ে অনেক মতভেদ। আর যেটুকু ইতিহাসে পাওয়া যায় তা অনেকটাই দাঁড়িয়ে আছে অনুমানের ভিতের ওপর।

ইতিহাস বলছে ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে চীন দেশেই প্রথম ছাপার কাজ শুরু হয়েছিল। মিশরীয়রাও অবশ্য এ দাবি করতে পারেন। তবে চীনকেই ছাপাখানার জনক বলা হয়। আর ১৪'শ সালটাকে ছাপাখানার স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। কারণ পঞ্চদশ শতাব্দীতেই জার্মানীতে ছাপাখানার জন্ম ১৪৫৮, ইতালিতে ১৪৬৫, সুইজারল্যান্ডে ১৪৬৮, ফ্রান্সে ১৪৭০ সালে এবং হল্যান্ড, স্পেন ও ইংলন্ডে যথাক্রমে ১৪৭৩, ১৪৭৪ এবং ১৪৭৬ সালে।

মুদ্রণের এই প্রায় ৫০০ বছরের পদ-যাত্রা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে অথবা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে আলোচনার দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক। এই সুদীর্ঘ যাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের মুদ্রণ শিল্পের চেহারাও দেখে নেওয়া যাক।

জোহানস গুটেনবার্গ—জার্মানির এই মানুষটির নাম প্রায় সকলেরই জানা আছে। তাঁকে ছাপাখানার জগতে বিশ্বকর্মা বলা যায়। তিনিই প্রথম পরিপূর্ণ ছাপার পরিকল্পনা করেন। তাঁর হাত দিয়েই এসেছিল 'মুভেবল টাইপ'। অর্থাৎ প্রয়োজন মতো একটা টাইপ তুলে নিয়ে কাজ সেরে আবার তা সরিয়ে রাখা যায়। সমস্ত ব্যাপারটি গুটেনবার্গের হাতে ঘটেছিল ১৪৫৪ সালে।

১৪৫০ থেকে ১৪৫৬ সালের মধ্যে প্রথম ছাপা বই Mazarin bible প্রকাশ পেল, প্রকাশক গুটেনবার্গ। এঁর সঙ্গে আরও একজন মানুষের নাম করতে হয় যিনি ১৪৭৬ সালে ইংল্যান্ডে প্রথম ছাপাখানা চালু করেন। তিনি উইলিয়ম ক্যাক্সটন। জীবনের অন্য অনেক দিকের বিপর্যয় কাটিয়ে মাত্র একজন মানুষকে সঙ্গী করে ক্যাকসটন প্রিন্টিং প্রেস বসালেন। ১৪৭৪ থেকে ১৪৭৫ সালে প্রথম ইংরেজি বই ছাপা হল Recuyell of Histories of Troy, এই যুগ

ব্ল্যাঙ্কেট
ইঙ্কিং সিস্টেম
ছাপার প্লেট
ড্যাম্পনিং সিস্টেম

অটো পেস্টিং সিস্টেম মেশিন চালু থাকা অবস্থায়, কাগজের রোল জোড়া লাগাবার ব্যবস্থা

চার রঙে ছাপানোর ড্র-ডাউন, কালো, সায়ান, ম্যাজেন্টা, হলুদ

থেকেই ছাপাখানার অগ্রগতির সূচনা হয়। সেই গতি নিয়ে ছাপাখানা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর নানান দেশে।

এবার ভারতবর্ষের ছাপাখানার কিছুটা পরিচয় দেওয়া যাক। ১৫৫৬ সালে গোয়ায় পর্তুগিজরা ছাপাখানা শুরু করেছিলেন। পরে, প্রায় ২০০ বছর কেটে যায়। ছাপাখানা শুরু হয় মাদ্রাজে ১৭৭২ সালে। এর মাঝে ১৭৭০ সালে সুবে-বাংলার শাসনভার যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পেলেন তখন রাজ্য শাসনের সুবিধের কথা ভেবেই ছাপাখানার কাজ শুরু করলেন। ১৭৭৮ সালে পশ্চিমবাংলার হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে ছাপা হল প্রথম বই। হলহেডের 'এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'-এর কথা আশা করি সব পাঠকেরই জানা আছে। চারলস্ উইলকিনসন ছেপেছিলেন এ বই। খ্রিশ্চান মিশনারিরা এদেশে ছাপাখানা চালু করেন কিছুটা নিজেদের প্রয়োজনেই। এক্ষেত্রে ধর্মবিস্তারই ছিল মূল উদ্দেশ্য। তবে ছাপাখানার ইতিহাসে মিশনারিদের দান অস্বীকার করা যাবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতায় প্রিন্টারসদের সংখ্যা ছিল ২১। জানা যায় ১৭৭৭ সাল থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত ৩৬৮টি ছাপার কাজ হয়েছিল। যেমন পাঁজি, ক্যালেন্ডার, ডিরেকটরি, রেজিস্টার খাতা বা বই এবং সরকারি নথিপত্র ইত্যাদি। ছাপাখানার ওই ঐতিহাসিক দলিলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এক বাঙালির নাম, তিনি পঞ্চানন কর্মকার। যিনি ধাতুর উপর খোদাই করেছিলেন বাংলা হরফ। ছাপাখানার এই বিস্তারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পঞ্চানন কর্মকারের জামাই মনোহর কর্মকারও।

হরফের কথাতো জানা গেল। কিন্তু ছাপার মেশিন? এখন ভাবা প্রায় অসম্ভব ছাপার মেশিন ছিল কাঠের তৈরি। এরপর এল ধাতুর তৈরী ছাপার মেশিন। এ ছাপা মেশিন হাতেই চালানো হতো। গতির যখন প্রয়োজন হল তখন দেখা দিল বাষ্পচালিত ছাপার মেশিন। সেটাও আজকে পাঠকের ক'জন ভাবতে পারেন? এখন এসেছে গতি। দ্রুত, আরও দ্রুত ছাপা দরকার। সেই সঙ্গে সুন্দর ছাপা। এ শতাব্দীর শেষভাগে মুদ্রণশিল্পে অভাবনীয় বিপ্লব ঘটে গেছে। মুদ্রণ ছাড়াও অন্যান্য শিল্পে যেমন কারিগরি বিদ্যা কাজে লাগিয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করা হচ্ছে, মুদ্রণেও এসে গেছে কমপিউটার টেকনলজি, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেম ইত্যাদি। তবে এত উন্নতির ফলেও সংশয় দেখা দিচ্ছে মুদ্রণ কি টি, ভি, ভি ডি ও ক্যাসেট এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে? মুদ্রণ কি পারবে গণমাধ্যমের মধ্যমণি হয়ে থাকতে?

না, মুদ্রণের এই প্রতিযোগিতা নিয়ে কোন সংশয় নেই। মুদ্রণ তার প্রয়োজনের গুরুত্ব বাড়িয়েই চলবে। কারণ টি, ভি বা ভি, ডি ও বা অডিও ভিস্যুয়ালের মাধ্যমে পড়া সম্ভব নয়—যে পড়ার স্বাদ আমরা ছাপার অক্ষর থেকে পাই। তাছাড়া, টি, ভি চালু রাখতে গেলে স্থায়ী বিদ্যুতের ব্যবস্থা দরকার। তাছাড়া বয়ে নিয়ে যাওয়ার অসুবিধেও আছে। সর্বোপরি দামের কথাও যদি
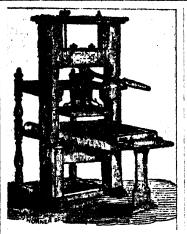
পঞ্চদশ শতকের মুদ্রণযন্ত্রের একটি দুর্লভ ছবি

ধরা হয়। তাই মনে হয় মুদ্রণ শিল্পের প্রসার ঘটতেই থাকবে। সেই সনাতন পদ্ধতিতে কাগজের ওপর কালির ছাপ। আর সে ছাপ ক্রমশই নূতন করে বাঁক নিয়ে ছুটে চলেছে শিল্প সত্তাকে সঙ্গে নিয়ে।

এবার ছাপার বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতির কথা একটু বলা যাক। সেগুলি হল (১) লেটার প্রেস (২) লিথোগ্রাফি (৩) গ্রেভিওর (৪) অফসেট লিথোগ্রাফি (৫) স্ক্রিন প্রিন্টিং (৬) ফ্রেকসোগ্রাফি (৭) কলোটাইপ (৮) থারমোগ্রাফি (৯) ডাইস স্ট্যাম্পিং অ্যাণ্ড কপার এনগ্রেভিং (১০) ডুপলিকেটিং (১১) জেরোগ্রাফি (১২) ইঙ্ক-জেট প্রিন্টিং (১৩) লেসার প্রিন্টিং ইত্যাদি। ছাপার এই বিভিন্ন পদ্ধতির আলোচনায় যাওয়ার দরকার নেই। তবে পাঠকদের জেনে রাখা দরকার এই পদ্ধতিগুলোর প্রয়োগ সবই আলাদা। তবে একটি বিশেষ ধরনের পদ্ধতিতে ছোট বড় নানান রকমের জিনিস ছাপা যেতে পারে। আবার কিছু পদ্ধতি আছে যা দিয়ে সমস্ত রকমের জিনিস ছাপতে পারা যাবে না। প্রতিটি ধরনের ছাপার জন্যে আবার কালিও আলাদা। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ছাপার পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কালি উৎপাদকদের কালির গুণাগুণ বেড়েছে। বদলেছে তার রাসায়নিক কাঠামো।

মুদ্রণের কি বিশাল ব্যাপ্তি বর্তমান জীবনে। সকাল শুরু হয় ছাপার অক্ষর দিয়ে। প্রথম চায়ের কাপ হাতে নিয়ে আজকের মানুষ দেখেন খবরের কাগজ। অথবা বিছানা থেকে ঘুম ভেঙে দেওয়ালের ঝুলন্ত ক্যালেন্ডার, নয়তো কোন মহাত্মার ছবির দিকে চোখ পড়ে। সে তো মুদ্রণেরই সৃষ্টি। ঘুম থেকে চা খেয়ে বাজার হাটে ছাপানো নোট, পছন্দসই জিনিস কিনে তার লেবেলের দাম, বাসে-ট্রামে টিকিট, সর্বত্রই ছাপার সঙ্গে সভ্য মানুষের দেখা হয়। বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র থেকে শুরু করে মৃত্যুর দুঃসংবাদের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে ছাপার অক্ষর।

মুদ্রণের প্রসার দেখেই বোঝা যায় একটি দেশের সমৃদ্ধি ও তার স্বাক্ষরতার প্রসার। পরিসংখ্যানের কথা থাক, ভারতে স্বাক্ষরতার হার যত বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই বাড়ছে মুদ্রণের প্রসার। তাই মফঃস্বলের কোন ঘরের কোণে ছোট ছাপাখানার উপস্থিতি আজকে আর বিস্ময়ের নয়। মুদ্রণ শুধু তার অস্তিত্বই টিকিয়ে রাখেনি, বৃদ্ধি করেছে তার গৌরব। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও মুদ্রণ শিল্পের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে যে উন্নত দেশগুলিতে যেমন মুদ্রণের প্রসার ঠিক তেমনি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ক্রমবর্ধমান সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ও বই প্রকাশের ক্রমবর্দ্ধমান আগ্রহ।

১৯৭১ সালে ব্রাসেলসে 'আন্তর্জাতিক পুস্তক বর্ষ' অনুষ্ঠিত সভা ঘোষণা করেছিলেন 'প্রতিটি মানুষের বই পড়ার অধিকার আছে'। সমাজের একটি দায়, সে দায় হল জনসাধারণকে বই পড়ার আনন্দ ও সুযোগ করে দেওয়া। ইউনেসকো এই মতামতকে মানুষের অধিকার হিসেবেই গণ্য করেন এবং মানুষ একবিংশ শতাব্দীতে যখন পৌঁছবে পৃথিবীর অনেক দেশে শতকরা একশো ভাগ মানুষ তখন স্বাক্ষর হয়ে উঠবেন। কিন্তু

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বাষ্পচালিত একটি মুদ্রণযন্ত্র
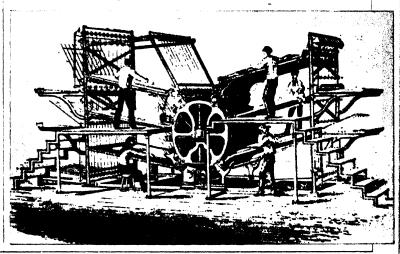
হাতহরফ থেকে লাইনো, লাইনো থেকে ফটো টাইপ সেটিং—কয়েক দশকের মধ্যে ছাপার পদ্ধতিতে যে বিপুল পরিবর্তন এসেছে তা লক্ষ করার মত

শতকরা একশো ভাগ মানুষকে স্বাক্ষর করে তুলতে গেলে তো পাঠ্য পুস্তক যথেষ্ট চাই। তাহলে পাঠ্য পুস্তক ছাপার সুযোগ দরকার। এখানে পাঠ্য পুস্তকের একটি পরিসংখ্যান দিলে ব্যাপারটি বোঝা যাবে সহজ করে।

উন্নত দেশগুলিতে যে দেশে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৪০ ভাগ মানুষ বাস করে সেখানে ছাপা হয় পৃথিবীর সমস্ত ছাপা পাঠ্য পুস্তকের ৮৫ শতাংশ। অথচ উন্নয়নশীল দেশে যেখানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৬০ ভাগ মানুষ বাস করেন সে দেশে ছাপা হয় মাত্র ১৫ শতাংশ পাঠ্যপুস্তক, পৃথিবীর সমস্ত ছাপা বইয়ের সঙ্গে তুলনা করলে। জেনে রাখা দরকার পৃথিবীতে প্রতি বছর ২০ লক্ষ শিশু নিরক্ষর থেকে যাচ্ছে বইয়ের অভাবে এবং প্রতি বছর প্রয়োজন অনুযায়ী যদি বই ছাপানো সম্ভব না হয় তবে ১৯৯০ সালের মধ্যেই পৃথিবীতে কয়েক কোটি মানুষ নিরক্ষর থাকবে। বই (পাঠ্য পুস্তক) ছাপার ক্ষেত্রে এক বিশাল চাহিদা রয়ে গেছে। যদিও আজকে দ্রুত গতিতে বই ছাপা ও বই বাঁধানো এককথায় বুক প্রোডাকশন এর যন্ত্রের প্রভূত উন্নতি হয়েছে।

ছাপাখানা এখন প্রিন্টিং ইণ্ডাস্ট্রি। এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের মানুষ। যাদের ভাবনা চিন্তার মিশ্রণ মুদ্রণকে করে তুলেছে শিল্প। যেমন ধরা যাক লে আউট ডিজাইনার, ভিসুয়ালাইজার কমারশিয়াল আর্টিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার, কম্পিউটার টেকনোলজিস্ট, কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ার, ইঙ্ক এন্ড পেপার এক্সপার্ট প্রভৃতিরা। যা ভারতে পনের বছর আগেও ভাবা যেত না। সবার যৌথ প্রচেষ্টায় সবমিলিয়ে পাঠককে বিষয় বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত করিয়ে দিচ্ছে একান্ত করে তুলছে মুদ্রণ শিল্পের সঙ্গে পাঠক রুচির। পাঠক চিত্তের সামগ্রিক সত্তাকে জয় করাই মুদ্রণের উদ্দেশ্য।

মুদ্রণ কি তার শিল্পসম্মত রূপ নিয়ে পাঠকরুচিকে বদলেছে? নাকি পাঠকরুচি পরিবর্তিত হয়ে, চাহিদার তাগিদেই মুদ্রণের গতি ও সৌন্দর্য যুগপৎ বাড়িয়েছে। দুটোই ঠিক। পাঠক রুচি ও গতিশীল সুন্দর মুদ্রণ একে অপরের পরিপূরক। পাঠকের চাহিদা না থাকলে দেশে বিদেশে মুদ্রণের এত সৌকর্য বাড়ত না। মুদ্রণ তার পুরনো পোশাক না বদলালে পাঠকের চোখের তৃপ্তি ঘটত না।

মুদ্রণের আলোচনার জন্যে মুদ্রণ শিল্প বা প্রিন্টিং ইণ্ডাস্ট্রিকে দুটি স্তরে ভাগ করে নেওয়া যাক। অবশ্যই এই বিভাজন আধুনিক মুদ্রণের ক্ষেত্রেই ধরা হয় এবং তা প্রধানত নিউজ পেপার ও ম্যাগাজিন হাউসে। সেখানে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে লক্ষ লক্ষ কপি ছেপে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে হয়। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে ছাপাখানার মানুষেরা বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন যেখানে 'কোয়ালিটি' ও 'কোয়ানটিটি' দুটোই সমানভাবে বজায় রাখতে হয়। যে দুটি স্তরের ভিতর দিয়ে সমস্ত মুদ্রণটি ঘটে তা এরকম। প্রি-প্রেস এবং প্রেস। প্রি-প্রেস হচ্ছে ছাপার ঠিক আগে যত রকম কাজ। টাইপ সেটিং, আর্ট ওয়ার্ক, গ্রাফিক রিপ্রোডাকশন অর্থাৎ ফিল্ম তৈরি ও প্লেট তৈরি বিভাগের কাজ।

আর প্রেস হল যেখানে মেসিনে প্লেট লাগিয়ে কালি দিয়ে কাগজের ওপর ছাপ দেওয়া হয়, অর্থাৎ ছাপা হয়। মানে প্রেস থেকেই ছাপা কাগজ ভাঁজ হয়ে বের হচ্ছে, মেশিন করছে এ কাজ। মানুষ সে যন্ত্র পরিচালনা করছে। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে মেশিন থেকে ছেপে ভাঁজ হয়ে যা তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসছে তা হল ফাইন্যাল প্রোডাক্ট। কিন্তু সাময়িক, মাসিক, পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকা বা কোন বই, এদের ক্ষেত্রে ফাইন্যাল প্রোডাক্ট হতে ছাপার পরও একটি পর্ব থাকে। তা হলো বাঁধাই পর্ব। এখানেও দ্রুত গতিতে কাজ করার যন্ত্রপাতির ব্যবহার ঘটছে, মুদ্রণের পরিভাষায় যা হল মডার্ন বাইন্ডারি।

আগেই বলা হয়েছে মুদ্রণ শিল্পে উন্নতি বা দ্রুত গতি কোন এক বিশেষ বিভাগে নয়, প্রতিটি

'গস' কোম্পানীর প্রথম পাঁচ বছরে উৎপাদিত কুড়িটি যন্ত্রের একটি . গস ক্লিপার প্রেস
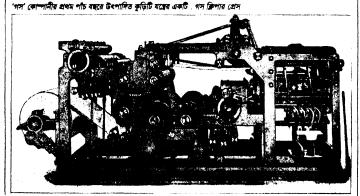
ছবি : অলক মিত্র

বিভাগের উন্নতি ঘটেছে। অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর দ্রুত গতির এই সুন্দর মুদ্রণ, বিভিন্ন বিভাগেরই যৌথ অগ্রগতি।

ধরা যাক মুদ্রণের কম্পোজিং বিভাগে দ্রুতগতির মেশিন আবিষ্কার হল। কিন্তু তা হয়ে লাভ কি? যদি না সমান তালে দ্রুত গতির ছাপার মেশিন ব্যবহার হয় এ শিল্পে।

জোহান্স গুটেনবার্গ মুভেবল টাইপের আবিষ্কারক। সেদিন মুদ্রণের কম্পোজিংবিভাগে গতি বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল। এক ধাপ এগিয়ে এসেছিল কম্পোজিং-এর গতি। তারপর ১৮৮৬ সালে অটোমার মারজেনথালের আবিষ্কার—লাইন কাস্টার টাইপ সেটিং মেশিন। যাকে লাইনো টাইপ মেশিন বলা হয়। এ মেশিনে একটি বর্ণ বা অক্ষর আলাদা নয়। গোটা লাইন এক সঙ্গে কম্পোজ করা হয় বলেই লাইনো টাইপ নাম। এই যন্ত্র মুদ্রণ শিল্পের গতি বিশেষত কম্পোজিং-এর গতি অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, লাইনো টাইপ যন্ত্রে প্রথম ভারতীয় ভাষার বাংলা কী-বোর্ড করার পরিকল্পনা করে কাজটি সমাধা করেন আনন্দবাজার পত্রিকার স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদার। তিনি বাংলা ছাপাখানার জগতে কম্পোজিং কাজটিকে অনেক গতি দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ভারতীয় ভাষা লাইনো টাইপে ব্যবহার হয়। লাইনো টাইপ মেশিন আবিষ্কারের কিছুকাল পরে লিবার্ট-ই লওস্টনের মনো টাইপ মেশিন আবিষ্কার। একটি মাত্র বর্ণ কম্পোজ করা হয় বলেই একে বলে মনোটাইপ মেশিন। ১৯১১ সালে এলো লাডলো মেশিন। যে মেশিন দিয়ে শুধু মাত্র বড় অক্ষর বা হেডিং বা ডিসপ্লে টাইপ কম্পোজ করা হয়। এভাবে ধাপে ধাপে উন্নতি ঘটে চলেছে।

১৯১১ সালের পর ১৯২০ সালে ওয়ালটার-মোরি টেলিটাইপ সেটার (টি টি এস) যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই টি টি এস মেশিনের ধাপে ধাপে উন্নতি ঘটেছে। এ শতাব্দীর পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে এই যন্ত্রটির ব্যাপক ব্যবহার সংবাদপত্র মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঘটে।

আরও এক ধাপ এগিয়ে এসেছে, পি টি এস। ছাপাখানার ক্ষেত্রে সমস্ত গতিকে ছাপিয়ে গেছে এ যন্ত্র। আকারে ছোট, মাত্র একটি টেবিলের ওপর বসিয়ে রাখা যায় কী বোর্ড, কিন্তু টাইপ সেটারের গতি কল্পনাতীত। অর্থাৎ আরও একটি মজার ব্যাপার ঘটল। এতদিন কম্পোজিং হত ধাতব বর্ণ দিয়ে। ফটো টাইপ সেটিং (পি টি এস) যন্ত্রে কোন ধাতুই নেই। অর্থাৎ মুদ্রণের কম্পোজিং থেকে বিদায় নিল ধাতু। এলো ফটো সেনসেটিভ কোটেড কাগজ। সোজা কথায় ফটোগ্রাফিক কম্পোজিং। এ যন্ত্রের কোথায় কে কবে আবিষ্কার করেছিলেন তা নিয়ে নানান মতামত। তবে যতদূর জানা যায় ১৯৪৪ সালে দুজন ফরাসী বিজ্ঞানী রেনে এ হিগেন আর লুই ময়রউড দুজনে মিলে করেছিলেন এ যন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ রূপ। তাহলে দেখা যাচ্ছে টাইপ সেটিং তার 'ফার্স্ট জেনারেশনে' হট মেটালে ফটোগ্রাফিক টেকনোলজির ব্যবহার আসে, 'সেকেণ্ড জেনারেশনে' আসে মারজেনথেলার লাইনো ফিল্ম, ইন্টার টাইপ ফটো ট্রনিক টাইপ সেটার, যাতে ইলেকট্রনিকের ও মিনি কম্পিউটারের প্রয়োগে টাইপ সেটিং-এর উন্নতি ঘটে। 'থার্ড জেনারেশনে' আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল যেখানে ইলেকট্রনিক মিনি কম্পিউটার ক্যাথড রে টিউব, ডিজিটাইজেশন, মাইক্রোপ্রসেসার ইত্যাদির প্রয়োগ হচ্ছে। যেমন ম্যারজেন-থেলার লাইনোটেন, হ্যারিশ ফটো ট্রনিক টাইপ সেটার ইত্যা[illegible] এর পরে তো এসে গেছে 'ফোর্থ জেনারেশন'। যেখানে লেসার টেকনলজির প্রয়োগ। ফলে গতি অত্যন্ত দ্রুত।

একটু তুলনা করলে পাঠক বুঝতে পারবেন। একজন ভালো লাইনো অপারেটর যদি মিনিটে ৬/৭ লাইন টাইপ সেট করেন সেখানে এখন যদি বলি মিনিটে ৪০০/৫০০ লাইন (এখানে এক লাইন [illegible]র কাগজের এক লাইন) টাইপ সেট [illegible] হচ্ছে। তাহলে এই পরিবর্তন [illegible] না কি? এর পর তো ধাপে

'গস ব্রাদার্স' কোম্পানীর মুদ্রণযন্ত্রের আদি নমুনা
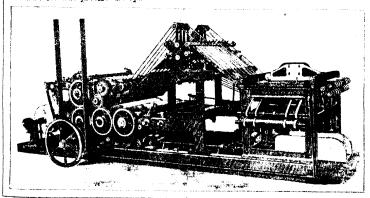
ধাপে সর্বস্তরে সমান তালেই উন্নতি ঘটছে। ইলেকট্রনিক সাদা কালো পেজ মেকাপের কথা না হয় বাদই দেওয়া যাক। রঙিন ছবি যেখানে যেমন খুশি সরিয়ে নিয়ে ইলেকট্রনিক পেজ মেকাপের কথাও বাদ দেওয়া যাক।

তবে বাদ দেওয়া যাবে না ক্যামেরার কথা। যে ক্যামেরায় সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের পাতার ফিল্ম তৈরি হচ্ছে। এসব ক্যামেরা গ্রাফিক ক্যামেরা। পুরনো দিনের গ্যালরি টাইপ ক্যামেরার প্রচলন কমে গেছে। বাজারে এসে গেছে কম্পিউটারাইজড় ক্যামেরা যার আলো ও লেন্সের উন্নত মান ও দ্রুত গতি কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অতি আধুনিক প্রসেস ক্যামেরায় আছে বিল্টটন, রেজিস্ট্রেশান সিসটেম্। ক্যামেরার ফিল্মের ডেভলপিং হাতে ডেভলপিং-এর বদলে অটো-প্রসেসারে এ কাজটি করা হচ্ছে এখন।

এর পরে যাওয়া যাক প্লেট তৈরি বিভাগে। সেখানেও এসেছে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি যেমন প্লেট বার্নার, প্লেট প্রসেসার ইত্যাদি। প্রসেসিং দ্রব্যাদির অর্থাৎ ফিল্মেরও উন্নতি ঘটেছে প্রভূত। লিথফ্লিম ও প্যানক্রোমাটিক ফিল্মের। উন্নত ধরনের অ্যালুমোনিয়াম মাইক্রো গ্রেনড ও প্রি-সেনসিটাইজড প্লেটের খুব চলন হয়েছে। প্লেট মেশিনে অটো ডেভালপ হয়ে ধুয়ে মুছে

চালু থাকা অবস্থায় একটি কল্প-ও-টাইপ মুদ্রণযন্ত্র
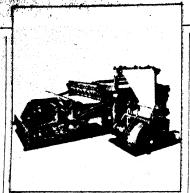
শুকিয়ে নেওয়া যাচ্ছে। এক ঘণ্টায় যেখানে একটা প্লেটের কাজ পাওয়া যেত হাতের পদ্ধতিতে এখন সেখানে ঘণ্টায় অন্তত ১৫টি প্লেট ডেভলপ হয়ে শুকিয়ে বেরিয়ে আসছে। এ পরিসংখ্যান প্লেট তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন বৈকি। আজ যে এত রঙিন বিজ্ঞাপনের ছবি দৈনিক সংবাদপত্রে ও ম্যাগাজিনের পাতায় তাও কিন্তু দামী দামী ইলেকট্রনি স্ক্যানার যা কিনা রঙিন ছবির অরিজিনালকে দ্রুত গতিতে ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে কালার ব্যালান্স বজায় রেখে মুদ্রণের মূল তিন রঙে (সায়ান, ম্যাজেন্টা, ইয়েলো) ও কালো মোট চার রঙে ভাগ করে দিচ্ছে। জার্মানির ডঃ হেল-এর স্ক্যানার, ক্রস ফিল্ডের ম্যাগনাস্ক্যানের বহু মডেলের স্ক্যানার মেশিনের ব্যবহার হচ্ছে আজ মুদ্রণ শিল্পে। এ কাজ এনলারজারেও করা যায়। তফাৎটা হলো এই, একটা রঙিন ছবির বিজ্ঞাপনের মেশিন প্রুফ দিয়ে প্রুফ পাশ করাতে যেখানে সময় লাগতো ৭/৮ দিন, এখন সে জায়গায় একদিনেই সম্ভব হচ্ছে সে রকম ২০/২২টি কাজ করার। প্রুফের কথায় বলতে গেলে ক্রোমালিন প্রুফ একদিনেই দেওয়া সম্ভব। বিজ্ঞাপনদাতারা নিশ্চয়ই আজ অনেক নিশ্চিন্ত। এবং তাঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও বাণিজ্যের অগ্রগতিতে মুদ্রণ শিল্পের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। এই হলো মোটামুটি প্রেসের কথা।

এবার আসা যাক সব কাজকে রূপ দেওয়ার জন্যে প্রেসে অর্থাৎ ছাপাখানায়। মনে রাখতে হবে এখানে মুদ্রণের বিশেষ এক পদ্ধতি, অফসেট পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। পৃথিবী ব্যাপী এখন অফসেটের চাহিদা। এখন অফসেটের চলনই বেশি। ভারতেও অফসেট এগিয়ে চলেছে।

এবার আলোচনায় আসা যাক ছাপার মেশিনের কি কি উন্নতি ঘটেছে। ম্যাগাজিন ও বই
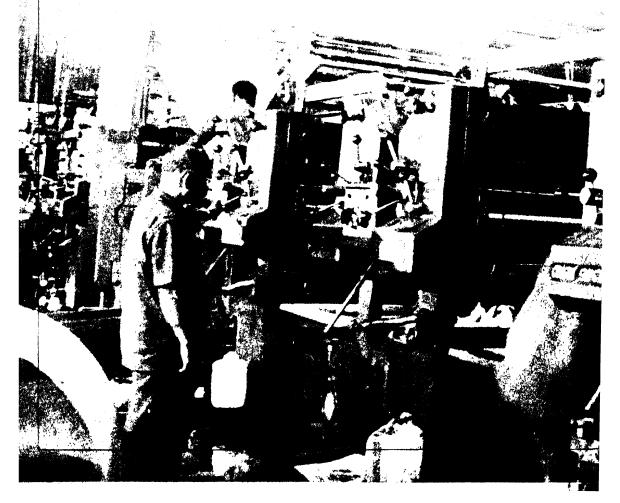
ছাপার জন্যে সিট ফেড মেশিনের উন্নতি ঘটেছে। সিঙ্গল কালার তো বটেই দু কালার, চার কালার, পাঁচ ছ' কালার সিড ফেড অফসেটের প্রভূত উন্নতি ঘটেছে এবং এই সব ছাপার ক্ষেত্রেও যে 'প্রি প্রেস' আলোচনা আগে করা হয়েছে তা এখানেও প্রযোজ্য। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না সিট ফেড মেশিনে যে-কালির ব্যবহার সংবাদপত্র ছাপার জন্যে দ্রুতগতির ওয়েভ অফসেট মেশিনে সে-কালির ব্যবহার হয় না। কারণ সেখানে ওয়েড অফসেট রোটারী মেশিনে এখন ২৫ থেকে ৬০ হাজার কপি ঘণ্টায় ছাপা সম্ভব। নামী সিট ফেড মেশিন যেমন রোলান্ড, হাইডেলবার্গ, নেবিওলো, শোলনা ইত্যাদির প্রচুর চলন হয়েছে। সিট ফেডে ঘণ্টায় বেশি হলে তো আট দশ হাজার সিট ছাপা যায়। একটা সংবাদপত্রে সাধারণত চার, আট, বারো বা ষোল চব্বিশ, বত্রিশ পাতার কাগজ একই সঙ্গে ছাপার ব্যাপারটি আজকে আর কোন সমস্যাই নয়। দ্রুত গতির ছাপার মেশিন যা বিদেশ থেকে আমদানি করে ভারতে ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে একটি ১৬ পাতার দৈনিক কাগজ ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ হাজার কপি রঙিন ছবি সমেত ছাপা ত কোন ব্যাপারই নয় আজ। এত দ্রুতগতি কাগজ ছাপা সম্ভব হচ্ছে উন্নতধরনের রিল স্ট্যান্ডের জন্যে। অটো স্পালাইসিং-এর ব্যবস্থায় মেশিন না থামিয়ে রিল পরিবর্তন করা রোটারি মেশিনে নতুন প্রাণ দিয়েছে। সুখের কথা ভারতে অফসেট ছাপার মেশিন তৈরি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তার গতি ঘণ্টায় ১০/১৫ হাজারের বেশি নয়।

কাগজের রিল থেকে সংবাদপত্র ছাপার ঘটনা অনেক দিনের। কিন্তু রিল থেকে ম্যাগাজিন ও বই ছাপা বেশি দিনের ঘটনা নয়। সংবাদপত্রে নিউজপ্রিন্ট ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ম্যাগাজিন বা বইয়ের ক্ষেত্রে নিউজ প্রিন্ট ছাড়া দামী কোটেড রিল যাকে ম্যাপলিথো বা গ্লেজড নিউজ প্রিন্ট বলা হয় তারই ব্যবহার বেশী। এসব কাগজে সংবাদপত্র যে গতিতে ছাপা সম্ভব সে গতিতেই ম্যাগাজিন বা বই ছাপা চলে না। নিউজপেপার ও কমার্শিয়াল প্রিন্টিং আজকাল পাশাপাশি চলছে। ম্যাগাজিন ছাপার মেশিন যেখানে ৩২ পাতা (৪ ফর্মা) ৬৪ পাতা (৮ ফর্মা) বা রঙিন ছাপা হয়, সেখানে মেশিনের গতি ২৫ বা ৩০ হাজারের (প্রতি ঘণ্টায়) ওপর বাড়ানো শক্ত। সে সব মেশিনে হিট সেট অর্থাৎ হিটিং ও চিলিং অর্থাৎ গরম করা ও ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা না থাকে তবে উন্নতমানের রঙিন ছবি ভালো ছাপ দেওয়া যাবে না। পৃথিবীব্যাপী কমার্শিয়াল হিট সেট ওয়েভ অফসেট মেশিনের খুবই চলন বেড়েছে। তার সঙ্গে ম্যাগাজিনের কভারে আল্টরাভায়োলেট ভারনিশিং ও ল্যামিনেটিং-এর প্রয়োগ বেড়েছে। সে জন্যেই চকচকে মলাটের ম্যাগাজিন দেখতে পাওয়া যায় অনেক বেশী। হিট সেট ও কোল্ড সেটের কালি আলাদা, মেশিনও আলাদা।

এবার বলা যাক ফ্যাকসিমিলি ও স্যাটেলাইট টেকনলজির কথা। একটি খবরের কাগজ একই দিনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছেপে বার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক সংবাদ ছেপে আঞ্চলিক পাঠকের চাহিদা পুরণ করার সুযোগ অনেক বেড়েছে। সংবাদের এক-একটি পৃষ্ঠা ফ্যাকসিমিলি অথবা স্যাটেলাইট সিস্টেমের মাধ্যমে অন্য এক লোকেশানে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অনেক দূরে বসেই একটি দৈনিকের সমস্ত পৃষ্ঠার ছবি নিয়ে শুধু প্লেট বানিয়ে ছাপা শুরু করা হয়। টাইপসেটিং পেজ পেসটিং-এর কাজ করতে হবে না। এডিটোরিয়াল ডেস্কও থাকবে না। উল্লেখ করা যেতে পারে মাদ্রাজের 'দ্য হিন্দু' কাগজটি একই দিনে কয়েক জায়গা থেকে এই পদ্ধতিতে প্রকাশ করছেন। জাপানের কোন এক পত্রিকা উত্তর ও দক্ষিণ অংশ থেকে একই সংবাদপত্র প্রায় দেড় হাজার মাইল দূরে বসে

প্রতিদিন প্রতিঘরের সংবাদপত্রের চাহিদা মেটাচ্ছে এইসব যন্ত্রদানবগুলি ছবি : তারাপদ ব্যানার্জী
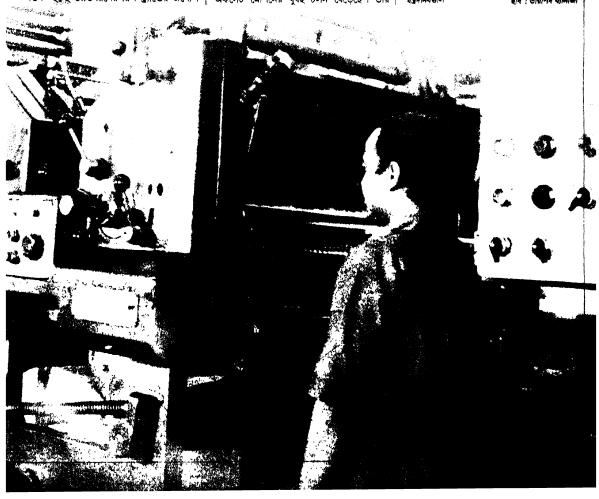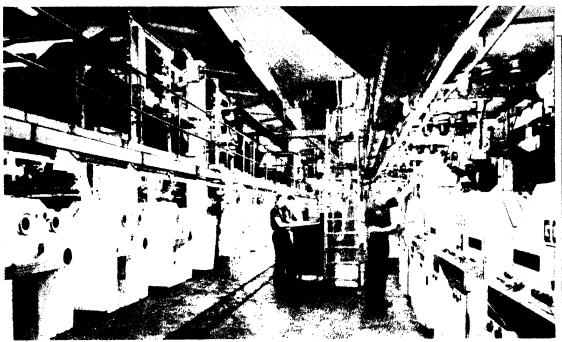
'দা মিয়ামি হেরাল্ড' পত্রিকার ছাপাখানায় 'হেডলাইনার মার্ক টু' মুদ্রণযন্ত্রের অন্যতম বৃহৎ সমাবেশ

একাধিক সংস্করণ বার করে।

এখন কিছু মেশিনপত্রের নাম বলে দেওয়া যাক। যেমন সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিন ছাপানোর মেশিন। বিদেশি মেশিন গস আরবানাইট গস হেডলাইনার। হ্যারিস এন ১৬৫০, কোনিগ এন্ড বাওয়ার, এলবার্ট ফ্যাঙ্কন থেলার, রোলান্ড ইউনিম্যান, ওয়াইফ্যার্গ, রন্ডোসেট পেটিট ইত্যাদি মেশিনে সংবাদপত্র ছাপা হয়। এবার বলে নেওয়া যেতে পারে কয়েকটি ম্যাগাজিন ছাপার মেশিন। গস কমিউনিটি, হ্যারিস এম ৮৫০, ওয়াইফ্যাগ তিন এস জেড, কোমরি সিস্টেম ৩৫ ডবলিউ ইত্যাদি। দেশি কয়েকটি মেশিনের নাম বলে নিই। ওরিয়েন্ট,বন্ধু,আর ও সিস্কটিটু, জিরকণ ইত্যাদি। এসব মেশিনে ম্যাগাজিন সংবাদপত্র দুই-ই ছাপা যায়।

ছাপা তো হল। সংবাদপত্রই হোক আর ম্যাগাজিন হোক তা গুণে বেঁধে পাঠকের কাছে তো পৌঁছতে হবে। সে এক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার। শুধু ভারতে কেন অনেক দেশেই এ কাজ ম্যানুয়ালি চলছে। কিন্তু উন্নত দেশে মেশিন থেকে কেটে ভাঁজ করে বেরোনো কাগজ কনভেয়ার যোগে স্টাকার কাউন্টার ও বাইন্ডিং মেশিনে গিয়ে বান্ডিল হয়ে (প্রয়োজন মত বাণ্ডিলংও কম্পুটারাইজড হয়। তারপর ডেলিভারি ভ্যান হয়ে পাঠকের কাছে যাচ্ছে। বহু নামী কোম্পানির কনভেয়র স্টাকার কাউন্টারের ব্যবহার চলছে। নামী কোম্পানি হল ফেরাগ ও মূলার মার্টিনি যারা সংবাদপত্রের 'কনভেয়িং সিস্টেমের' টেকনিক সুন্দরভাবে ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রেও কাজে লাগিয়েছেন।

শেষ করার আগে জানতে ইচ্ছে করছে ভারতে একবিংশ শতাব্দীতে মুদ্রণ কি চেহারা নেবে। সে দিনের মুদ্রণ কি বাতিল করে দেবে আজকের এই প্রগতি ? প্রশ্ন উঠতে পারে যে জন্মায়নি তাকে নিয়ে জন্মদিনের পরিকল্পনা কেন ? তা নয়ই বা কেন। পরিকল্পনা শব্দটি তো ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত। ফিল্মবাদ অর্থাৎ ক্যামেরাও বাদ সরাসরি মেক আপ পেজ থেকে প্লেট, এখন ট্রায়াল স্টেজে। তবে শোনা যাচ্ছে ফিল্ম বা প্লেট কিছু লাগবে না ছাপাখানার কাজে। কি অবাক ব্যাপার। এতদিন জানা ছিল ছাপার অপরিহার্য বস্তু কালি। সে কালির চলনও নাকি উঠে যাবে। কাগজ এমনভাবে কেমিক্যালাইজড হবে যেখানে মেশিনের স্পর্শে লেখা ফুটে উঠবে। মুদ্রণে রোবট টেকনলজির কথাও ভাবা হচ্ছে। তাহলে অনেক কম লোক লাগবে। কম্পোজিং-এর ক্ষেত্রে ফোনেটিক্যাল কম্পোজের কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে রিপোর্টার সরাসরি ঘটনাস্থল ঘুরে এসে মেশিনের সামনে মুখে মুখে বিবরণ দিলেন। মেশিন শব্দের উচ্চারণ শুনে কম্পোজ করে যাবে। অবশ্য সেখানে বিপদ হবে বক্তার উচ্চারণ। কেন না একই শব্দ চট্টগ্রামের মানুষ, বরিশালের মানুষ ও বিষ্ণুপুরের মানুষ উচ্চারণ করেন ভিন্ন ভাবে। অবশ্য আশা করা যায় এ সমস্যা কাটিয়ে উঠবে বিজ্ঞান। এলডাস হাকসলির মন্তব্য দিয়ে এ লেখার ছেদ টানা যাক। মন্তব্যটি ঐতিহাসিক :

"Good printing does not make a book good, nor bad printing ruins a good book, but good printing creates a valuable spiritual state in the reader".

মুদ্রণের যে যুগই আসুক না কেন তার উদ্দেশ্য হবে বিষয়কে সুন্দর করে ছাপা। সে সৌন্দর্য পাঠকের চিত্তকে ভরে দেবে, বিষয়বস্তুর সঙ্গে তার মনও একাত্ম করে তুলবে। আরও আরও বেশি পড়ার স্পৃহা জাগিয়ে তুলবে।

এবারের প্রচ্ছদ

অধ্যাপক ওলাফ লেউ

আধুনিক গ্র্যাফিক ডিজাইনের খ্যাতনামা শিল্পী আড়াইশোর ওপর পুরস্কারে সম্মানিত, পঞ্চাশটিরও বেশি একক প্রদর্শনী করেছেন। গ্র্যাফিক ডিজাইনার হলেও ছাপার হরফের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কেও সচেতন। মুদ্রণশিল্পের পঁচিশ বছরের প্রগতি প্রচ্ছদটিতে ধরা পড়েছে। লেডটাইপ থেকে ব্রাস মেট্রিসেস, লেটার প্রেস থেকে অফসেট হয়ে মুদ্রণ এখন ইলেকট্রনিকসের জগতে চলে এসেছে। পঁচিশ বছরের প্রগতি এই প্রচ্ছদের বিষয়. আন্তর্জাতিক সংস্থা ইফরার সদস্য সংবাদপত্রের মাস্টহেড ও ইলেকট্রনিক সিম্বল সাজিয়ে অধ্যাপক লেউ প্রচ্ছদটি এঁকেছেন। বিশেষ কাগজ ও সর্বাধুনিক মুদ্রণ যন্ত্রের সাহায্যে মাত্র ১৫০০ কপি ছেপে বিশ্বে বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে। প্রচ্ছদটি সেই দুর্লভ গ্র্যাফিকসেরই পুনর্মুদ্রণ।

সংবাদপত্র বাঁচবে কি !

বাসুদেব রায়

সংবাদপত্রের ভূমিকা নিয়ে একটি মতের কথা প্রায়ই শুনি। আদর্শগতভাবে তারা দেশের, দশের, সমাজের হিতার্থে নিয়োজিত কাজেই ব্যাবসায়িক ধ্যানধারণা থেকে এদের মুক্ত থাকতে হবে। শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে যে ব্যাবসায়িক পরিচালনা-ব্যবস্থা অপরিহার্য, সংবাদপত্র সংস্থার ক্ষেত্রে তা ত্যজ্য। অর্থাৎ লাভ করা এঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে না।

সাময়িক পত্রপত্রিকাতে, বিশেষ করে সাহিত্য ও সংস্কৃতি পত্রিকাগুলিতে, এই আদর্শগত বিতর্ক তেমন গভীরভাবে দেখা না দিলেও, স্পষ্টতই দুয়ার প্রান্তে দাঁড়িয়ে। আর যেসব সাময়িক পত্রপত্রিকা দৈনিক সংবাদপত্রের পাক্ষিক বা দ্বিপাক্ষিক রূপ হিসাবে চিহ্নিত, তারা এ বিতর্কের বাইরে নন একেবারেই। যেমন ইন্ডিয়া টুডে, সানডে, ইলাসট্রেটেড উইকলি ইত্যাদি।

এই তর্কের অবতারণা যাঁরা করেন তাঁরা ইতিহাসকে নিয়ে আসেন আলোচনা সভায়। বলেন—দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন এই পত্রপত্রিকাগুলিই স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা মস্ত হাতিয়ার হয়ে দেশকে সেবা করেছে—নিজেদের লাভক্ষতির কথা না ভেবে। সেবাই তাদের ধর্ম। বাণিজ্য তো নয়। আজ দেশ যখন স্বাধীন হয়েছে, তার আদর্শের হেরফের হবে কেন ?

সংবাদপত্র অথবা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশনা শিল্প নয়—সেবা, ইন্ডাস্ট্রি নয়—সারভিস। এই মতকে উৎসাহ দিচ্ছেন সরকার বাহাদুর। গত ২রা অক্টোবর নাগপুরের 'হিতবাদ' পত্রিকার হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে রাজীব গান্ধী স্পষ্টতই বলেছেন যে বড় কাগজগুলি এক একটি বড় ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং সেইভাবেই তারা চলছে। দেশসেবার আদর্শ আর এদের নেই। পরাধীন ভারতে এদের সব দায়দায়িত্ব এরা মিটিয়ে ফেলেছে। আসলে দুপক্ষের যুক্তির মধ্যেই ফাঁক আছে। যাঁরা বলেন সংবাদপত্র প্রকাশনা সংস্থা শুধুই সেবা প্রতিষ্ঠান এবং এর পরিচালক, সম্পাদক, সাংবাদিক বা প্রকাশকরা খাটো কাপড় পরে দেশসেবার বিমূর্ত আদর্শ স্থাপন করবেন। আর তাঁদের সেই সেবার রসদ আসবে সাধারণ মানুষের দানের আনুকূল্যে। তাঁরা যেমন নির্দোষ সুখের অলস চিন্তায় মগ্ন, ঠিক তেমনি পক্ষপাতদুষ্ট দোষে দায়ী হবেন তাঁরা যাঁরা ভাবেন পত্র-পত্রিকা প্রকাশনা সিমেন্ট বা লোহার মতই নিরেট একটি বাণিজ্যিক শিল্প এবং মুনাফাই তার একমাত্র লক্ষ্য।

এই দুই মতের মধ্যে কোনোটিই সত্য নয়। অথচ দুটোই অংশত সত্য। সেবা আর বাণিজ্যিক সফলতার মধ্যে মণিকাঞ্চন যোগই হচ্ছে আদর্শ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। পত্র-পত্রিকা যে কোন সাধারণ বাণিজ্যিক উৎপাদন সামগ্রী নয়। তাই আর সব ইনডাসট্রিয়াল প্রডাক্টের মতন এর বিক্রয় মূল্য উৎপাদন মূল্যের উপরে ধার্য না করে, অনেক নীচে স্থিরীকৃত হয়। এটা ডেটারজেন্ট সাবান, টি·ভি, বা ট্রানজিস্টার রেডিও সম্বন্ধে বলা চলবে না।

পত্রপত্রিকাগুলি মূলত অগণিত পাঠকের মনোরঞ্জন, সেবা এবং শিক্ষায় নিবেদিত প্রাণ, তাই তাদের বিক্রয়মূল্যকে রাখতেই হচ্ছে সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে। এবং এটা সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞাপনের আনুকূল্যে। উৎপাদনের খরচের সিংহভাগ বিজ্ঞাপন দাতারা পুষিয়ে দেন।

বিজ্ঞাপনদাতারা তাঁদের ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের নানাবিধ খবর পৌঁছে দেন পাঠকদের কাছে একেবারেই তাঁদের নিজস্ব বাণিজ্যিক কারণে। উৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থনীতি চাঙ্গা করাতে বিজ্ঞাপনের অবদান তো আজ সর্বজনস্বীকৃত।

এখন যদি বলা হয় যে একেবারেই আদর্শগত কারণে ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির ছোঁয়া বাঁচিয়ে বিজ্ঞাপন কাগজে বাদ দিতে অথবা সীমিত করতে, তার ফলে কাগজের যে বিক্রয়মূল্য হবে তাতে ঢাকের দায়ে মনসা বিকোবে।

কাগজ পাঠকের মনে ঠাঁই করে নেয় তার বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য। নির্ভীকতার জন্য। অন্য মতটির জন্য। এই অন্য মতটি অনেক সময়েই অনেকের, বিশেষ করে যাঁরা ক্ষমতাশীল যাঁরা প্রভাবশালী বা যাঁরা ক্ষমতায় আসীন তাঁদের পছন্দ নয়। ধরা যাক, এই দেশগড়ার কাজে সরকার বাহাদুর যেমনটি কাজ করছেন, দেশবাসীর তেমনটি ভাল নাও লাগতে পারে, আবার পারেও। একজন নাগরিক অন্য জনকে সেকথা জানাবে তো এই কাগজের মাধ্যমে। পত্রিকাগুলি আদর্শগত ভাবে সরকারি নীতির সমালোচনা করতে পারেন শুধুমাত্র প্রতিবাদের খাতিরে নয়। জাতীয় স্তরে সেই নীতি নিয়ে একটা আলোচনার সূত্রপাত করার জন্য।

বহু সরকারী নীতি রূপায়ণে যে ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটছে নিয়ত তা সরকারি মাধ্যম—টি ভি বা রেডিও—সরকারকে জানাতে দ্বিধা বোধ করবেন। সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রিকাগুলির কণ্ঠরোধ বা প্রকাশ বিড়ম্বনা ঘটানর অর্থ হবে সরকার বাহাদুর কোনদিনই জানতে পারবে না এই সব তথ্য।

গণতন্ত্রকে শক্ত এবং নির্বাচকমণ্ডলীকে শিক্ষিত করা সম্ভব হবে কি করে যদি সংবাদপত্র বা অন্যান্য পত্রিকাগুলো তাদের স্বাধীন মত প্রকাশ না করতে পারে ?

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তাই আজ আর কোন

সভ্য, গণতান্ত্রিক দেশে অস্বীকৃত নয়। কিন্তু মুশকিল ঐখানেই। সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। সেনসারশিপও নেই। কিন্তু কাগজ প্রকাশের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিকে যদি ক্রমশই নাগালের বাইরে ঠেলে দেওয়া হয়, তাদের নিয়ন্ত্রিত করা হয়, তবে অনেক কাগজেরই অন্তিম দশা হবে অথবা তাদের ঋণের বোঝা এতই বাড়বে যে সরকারের অনুদান ব্যতীত কাগজ প্রকাশ অসম্ভব হবে, কিংবা পাঠকের উপর অধিক ব্যয়ভারটি চাপিয়ে দিতে বাধ্য হতে হবে। সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে পাঠক কাগজ আর কিনবেন না। টি ভি তো আছেই। নচেৎ ট্রানজিস্টর রেডিও। এককালীন একটু ব্যয় করলেই সর্বক্ষণের সাথী।

কাগজের দিন ফুরালে অন্য মতের দিন ফুরাবে। দেশের লোক তা চায়নি বলেই আজও তেমনটি হতে পারেনি। পাঠক এই সমস্যাগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না হলে, জনমত তৈরী না হলে, অন্য মতের পরিবেশনের ক্ষেত্র সীমিত হতে বাধ্য।

সরকার বলেন নি কাগজ উঠে যাক। তাঁরা তো চান যে ছোট ও মাঝারি কাগজ শ্রীবৃদ্ধি করুক। কিছু কিছু সরকারী কর থেকে তাদের ছুট দেওয়াও হয়েছে, বড় কাগজ আরও বড় হোক, এ তো ভালো কথা নয়। তাদের স্কন্ধে মুদ্রণসামগ্রী থেকে শুরু করে ছাপার কাগজ প্রতিটি বিষয়ের উপর রয়েছে চড়া হারে শুল্ক।

সরকারী নীতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পত্রপত্রিকা প্রকাশন সংস্থাগুলির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছে অনেকাংশে। পত্রপত্রিকা প্রধানত ছাপা হয় নিউজপ্রিন্ট কাগজে এবং এটি পুরোপুরি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। সরকারী উদ্যোগে দেশের প্রয়োজনের মুখ্য ভাগ নিউজপ্রিন্ট তৈরী হচ্ছে সরকারী নিউজপ্রিন্ট মিলগুলিতে। মূল্য নির্ধারণ করছেন কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়। নিউজপ্রিন্ট বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সূচনা ও বেতার মন্ত্রণালয় বিধিবদ্ধভাবে। যে স্বল্প পরিমাণ নিউজপ্রিন্ট বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় তা, বলা বাহুল্য, সরকার বাহাদুর নিজেই ঠিক করেন অর্থমন্ত্রক ও বাণিজ্য মন্ত্রকের পরামর্শে। তার মূল্যও ধার্য করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। কাজেই প্রকাশনার প্রধান হাতিয়ার নিউজপ্রিন্ট পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন কেন্দ্রীয় সরকার। তাঁরা যেমনটি চান তেমনটিই হবে।

অথচ নিউজপ্রিন্ট সরষের তেল নয়, সিমেন্ট নয়, লোহাও নয়। সমাজ গঠনে ও গণতন্ত্রের বুনিয়াদকে শক্ত করতে সংবাদপত্রের সামাজিক ভূমিকার সঙ্গে নিউজপ্রিন্ট শিল্প ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। নিউজপ্রিন্ট ও সংবাদপত্র শিল্পের এই সামাজিক রূপকে অস্বীকার করে সরকার নিউজপ্রিন্টের মূল্য বৃদ্ধি করেছেন বারেবারে। সুপ্রীম কোর্ট এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন যে চিন্তার স্বাধীনতাকে যদি জীবন বলা যায় তবে নিউজপ্রিন্ট হবে তার দেহ। বাহিরের রূপ থেকে ভিতরের প্রাণের বিকাশ ঘটছে এ ক্ষেত্রে। এবং নিউজপ্রিন্ট যে অন্যান্য বাণিজ্যিক সামগ্রী থেকে আলাদা সেকথাও স্বীকার করেছেন।

এ বছরের গোড়াতে সরকার দেশী নিউজপ্রিন্টের দাম হঠাৎ আবার বাড়িয়ে দেন প্রায় এক হাজার এবং অন্য আরেক দেশী নিউজপ্রিন্টের আঠারো শো টাকা (নেপাতে তৈরী নিউজপ্রিন্ট) প্রতি টন পিছু।

নিউজপ্রিন্টের দাম কি হারে সরকার গত কয়েক বছরে বৃদ্ধি করেছেন তার একটা নমুনা দিয়ে দেওয়া যাক :—

জানুয়ারী ১৯৮৩		জানুয়ারী ১৯৮৬		মূল্য বৃদ্ধি
নেপা	৫২০০ টাকা	নেপা	[illegible] টাকা	[illegible] টাকা
হিন্দুস্তান নিউজ প্রিন্ট (কেরালা)	৭০০০ টাকা	হিন্দুস্তান	[illegible] টাকা	[illegible] টাকা
মাইসোর নিউজ প্রিন্ট	৭২২৫ টাকা	মাইসোর	[illegible] টাকা	[illegible] টাকা
		তামিলনাড়ু নিউজ প্রিন্ট	[illegible] টাকা	—

বিদেশী নিউজ প্রিন্ট (মূল্য প্রতি টন)

		মূল্য বৃদ্ধি
জানুয়ারী ১৯৮৩	৫৯০০ টাকা	
জানুয়ারী ১৯৮৬	৬৯৮০ টাকা	১০৮০ টাকা

বিদেশী	১০৮০ টাকা	[illegible]
[illegible]	[illegible] টাকা	[illegible]
[illegible]	[illegible] টাকা	[illegible]
[illegible]	[illegible] টাকা	[illegible]

এর উপর বড় কাগজগুলিকে প্রতি টন অতিরিক্ত ৫৫০ টাকা আমদানী শুল্ক বিদেশী কাগজের উপর দিতে হয়। বিদেশী নিউজপ্রিন্টের দাম জানুয়ারী-৮৬ এর পর কমেছে ৫৩৫ টাকা।

সব কটি দেশী নিউজপ্রিন্ট কারখানা পশ্চিমবাংলা থেকে অনেক দূরে। তিনটি দক্ষিণ ভারতে, একটি মধ্যপ্রদেশে নেপানগরে। কাজেই মিল থেকে যে দামে কেনা হয় কোলকাতাতে
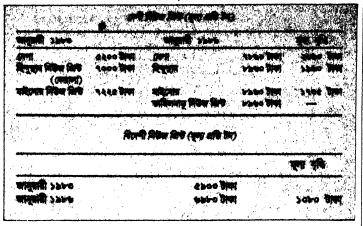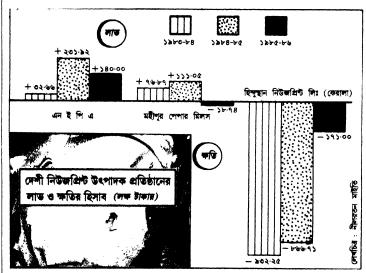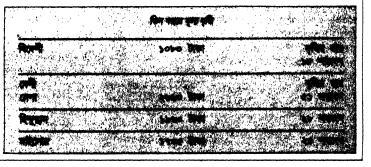
আনতে পরিবহণ খরচা হয় টন প্রতি প্রায় আরও ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা। পৃথিবীর কোনো দেশে নিউজপ্রিন্ট এত অধিক দামে বিক্রিত হয় না। ভারতবর্ষ এ বিষয়ে স্বচ্ছন্দে 'সোনা' পাবে বিশ্বরেকর্ড করে!

সাময়িক পত্রপত্রিকার ক্ষেত্রে ছাপার কাগজের জন্য অনেক সময় ব্যবহার করতে হয় গ্লেজড নিউজপ্রিন্ট, আর্ট পেপার ও কোটেড পেপার। এবং এর প্রতিটির মূল্য অনেক বেশী। বিদেশী আর্ট পেপার সাধারণভাবে আমদানী করা অসম্ভব। দেশী আর্ট পেপার এবং কোটেড পেপার যা পাওয়া যায় তার দাম আকাশছোঁয়া। গ্লেজড নিউজপ্রিন্ট বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয় কিন্তু প্রকাশনা সংস্থার নিজের আমদানী করার কোন স্বাধীনতা নেই। স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের দাক্ষিণ্যে কখন কখন সময়মত আমদানী হয়, অধিকাংশ সময়েই হয় না। গ্লেজড নিউজপ্রিন্টের দাম সাধারণ নিউজপ্রিন্টের দামের চেয়ে প্রায় ২০০০ টাকা বেশী। কাজেই গ্লেজড নিউজপ্রিন্টে ছাপা সাময়িক পত্রিকার প্রকাশনা ব্যয়ও সেই অনুপাতে বেশী। গ্লেজড নিউজপ্রিন্টের মূল্যবৃদ্ধির একটা পরিমাপ নীচে দিয়ে দেওয়া গেল :

দৈনিক মালয়ালা মনোরমা গত জানুয়ারীতে নিউজপ্রিন্টের দাম বাড়ানোর ফলে পত্রিকার দাম বাড়ানোর জন্য দৈনিক ৭০,০০০ সংখ্যা বিক্রয় হারিয়েছে। তাদের মোট বিক্রয় সংখ্যা ৫ লাখের উপর।

শুধুমাত্র নিউজপ্রিন্টের দাম বাড়িয়েই সরকার পত্রপত্রিকার প্রচারকে শুধু শ্লথ নয়, স্তব্ধ করে দিতে পারেন। এর জন্যে সংবিধান সংশোধনের

দামে কাগজ পেতে পারত। সে কাগজের দাম কম। কাজ ভাল।

স্বদেশী নিউজপ্রিন্টের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধিও অযৌক্তিক। সরকার মূল্যবৃদ্ধির কারণ বিবৃত করেছেন এই বলে যে, সরকারী উদ্যোগগুলি লোকসানে চলছে, তাকে ভরতুকি সরকার দেবেন না। মূল্যবৃদ্ধি করেই সে লোকসান মেটাতে হবে। অর্থাৎ তাঁদের অযোগ্য পরিচালন ব্যবস্থা ও
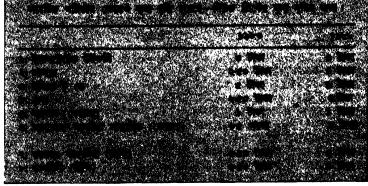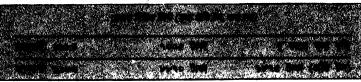
দৈনিক কাগজে ছাপার জন্য ব্যবহৃত সাধারণ বিদেশী নিউজপ্রিন্টের সঙ্গে গ্লেজড কাগজের দামের তফাত ১৯২৫ টাকা প্রতি টন। পিছু। ১৯৮৪ সালে এই তফাত ছিল মাত্র ৩৮০ টাকা।

নিউজপ্রিন্টের মূল্যবৃদ্ধির অনেকটাই পাঠকের কাছে বোঝা হয়ে পৌঁছাচ্ছে, পত্রপত্রিকার দাম বৃদ্ধির মাধ্যমে। এই তিন বছরে কয়েকটি কাগজের মূল্যবৃদ্ধির তালিকা থেকে তা প্রতীয়মান।

প্রয়োজন নেই। সেনসরশিপেরও দরকার নেই। টি ভি-র খবর আর রেডিওর প্রতি ঘণ্টার সংবাদ পরিবেশন তখন হবে দেশের মানুষের খবরের একমাত্র ভরসা। ভগবান করুন যেন এমন দিন কখনও না আসে। কিন্তু সঙ্কেতগুলি বড়ই অস্বস্তিকর রকমের অশুভ।

নিউজপ্রিন্ট আমদানীর জন্য বিদেশী মুদ্রা যা খরচ হয় তা অতি সামান্য। মোট আমদানী খরচের মাত্র ০·৫৫ শতাংশ। আমদানী নীতি

অপরিণত পরিকল্পনার মাশুল গুনতে হবে সংবাদপত্রশিল্পকে এবং বলাবাহুল্য পাঠককে।

প্রথমত, সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত নিউজপ্রিন্ট কারখানাগুলি সবাই লোকসান করছে না। নেপা এবং মাইসোর মিল দুটো গত দুবছর বেশ লাভ করেছে। নেপা এই বছরও লাভ করেছে এবং আগামী বছরের খবর হচ্ছে সে আরও লাভ করবে। মাইসোর মিল এ বছর প্রভূত লাভ করলেও পুরানো বছরের কিছু দেয় (depreciation) ছিল বলে আঁকের খাতায়
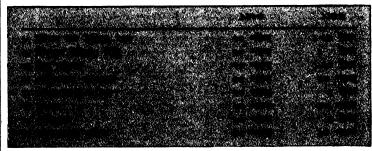
১৯৮৬ সালে দাম আরও কিছু বেড়েছে।

মূল্যবৃদ্ধি যেমন অর্থনৈতিক বোঝার ফল, প্রচার সংখ্যার ক্রমহারও সেইমত শ্লথ। সাময়িক পত্রিকাগুলি বিশেষভাবে আঘাতপ্রাপ্ত। প্রতিটি মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গেই দৈনিক পত্র এবং সাময়িক পত্রিকার বিক্রির হার কমে। কাগজ তার পুরানো প্রচার সংখ্যায় ফিরে আসতে বিলম্ব হয় এবং বলা বাহুল্য, গ্রোথ রেট খর্বিত হয়। কেরালার

এখন অনেক মুক্ত। বিদেশী গাড়ী থেকে বিদেশী টি ভি, দেশী স্ক্রুড্রাইভার-টেকনলজির দাক্ষিণ্যে এখন দেশী নামে পরিচিত এবং বলাবাহুল্য এসব আমদানী হচ্ছে বিদেশী মুদ্রা খরচ করেই। ১৯৮৫-তে বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় যে কোন সময়ের সঞ্চয়ের মাত্রা ছাড়িয়ে নিরাপদ শীর্ষে বিরাজ করছে। অর্থাৎ আরেকটু উদারনীতির দ্বারা বিদেশী নিউজপ্রিন্ট আমদানি হলে পাঠক কম

লোকসান। তৃতীয় মিলটি হচ্ছে কেরলের হিন্দুস্থান নিউজপ্রিন্ট মিল। তাদের উৎপাদন শুরু হয়েছে মাত্র ৩/৪ বছর আগে এবং প্রথম ধাক্কায় দামী যন্ত্রপাতি আনার খরচের জন্য লোকসান হয়েছে। ১৯৮৪-৮৫ সালে লোকসান ৮ কোটি টাকা। মজার কথা হচ্ছে যে এই আট কোটি টাকাই কেন্দ্রীয় সরকারকে এঁরা দেন কেন্দ্রীয় ঋণের সুদ হিসাবে। মাছের তেলে মাছভাজা। এই সুদ মকুব অন্যান্য শিল্পে সরকার করেছেন। সরকার নিয়োজিত অর্জুন সেনগুপ্ত কমিটি যে সরকারী উদ্যোগগুলিতে লোকসান হচ্ছে সেখানে কেন্দ্রীয় ঋণ বা সুদ ছাড় দেবার সুপারিশও করেছেন। নিউজপ্রিন্ট সংস্থাকে সরকার সে অনুগ্রহ দেখান নি। তার থেকে বাড়তি লাভের লোভটুকু ছাড়া সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয়ত, সরকারী উদ্যোগগুলিতে তৈরী সামগ্রী যেমন লোকসানের পরিবর্তে বাণিজ্যিক লাভ করবে এবং বেসরকারী উদ্যোগগুলির সঙ্গে সমান হারে পাল্লা দেবে, এটাই কাম্য। ঠিক তেমনি মনে রাখার দরকার যে বেসরকারী উদ্যোগগুলির একটা সামাজিক ভূমিকা আছে এবং সেই ভূমিকা পালনের জন্য সাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিসের উপর তারা আর্থিক লাভের অঙ্কের কথা না ভেবে সামাজিক লাভের কথাই চিন্তা করবেন। সরকারের ঘোষিত নীতিও কিন্তু তাই (Working Paper on Administered Prices August 1986)। কিন্তু সাধারণ মানুষকে সংবাদ পরিবেশন এবং দেশে জ্ঞানের বিস্তার করা যে একটি মস্ত সামাজিক দায়িত্ব, এবং সংবাদপত্র ও নিউজপ্রিন্ট সংস্থাগুলির উপরও যে সে দায়িত্ব বর্তায়, একথা সরকারকে বোঝানো মুশকিল হচ্ছে।

সংবাদপত্র প্রকাশকদের সর্ব ভারতীয় সংস্থা, ইন্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ন নিউজপেপার সোসাইটি (আই ই এন এস) এ বিষয়ে দরবার করেছেন অনেক, দেখা করে বুঝিয়ে বলেছেন প্রধানমন্ত্রীকে। এবং সব আলোচনায় ব্যর্থ হয়ে গত পয়লা জুলাই একদিনের প্রতীক ধর্মঘট করে পাঠকের এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু নীতির কোন পরিবর্তনের ইঙ্গিত নেই বরং শ্রীগান্ধী তাঁর দুবছরের শাসনকালে যা স্পষ্ট করে বলেননি, তা বলেছেন ২রা অক্টোবর নাগপুরে। বড় কাগজের বিরুদ্ধে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার এবং আদর্শচ্যুতির অভিযোগ এনে।

এখানে বলে রাখা ভালো যে খবরের কাগজের প্রকাশনার ব্যয়ভারের অর্ধেকটাই খরচ হয় শুধু নিউজপ্রিন্ট কেনার জন্য। সুতরাং সরকারের নিউজপ্রিন্ট নীতির উপর নির্ভর করে কাগজের অর্থনীতি। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সাংবাদিকের কলমের ডগায় এসে রুদ্ধ হবে। তার অবাধ প্রকাশ ও প্রচার তখনি সম্ভব হবে যখন সেই সোনার যাদুকল—নিউজপ্রিন্ট—পাওয়া যাবে সময়মত ও সুলভে।

পত্রপত্রিকার বিক্রয়মূল্য উৎপাদন খরচের কম রাখা সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞাপনের আয়ের আনুকূল্যে। আধুনিক জীবনের খেলনা, টেলিভিশন, সেখানেও পত্রপত্রিকার শক্তিমান প্রতিযোগী। সর্বভারতীয় স্তরে বিজ্ঞাপনদাতারা বিজ্ঞাপনের জন্যে যে ব্যয় করে থাকেন তার সিংহভাগ নিশ্চিতভাবে আজ পত্রপত্রিকা পেয়ে থাকেন। কিন্তু দূরদর্শন অসম্ভবকে সম্ভব করতে চলেছে। তার জনপ্রিয়তাকে বিজ্ঞাপনদাতারা অস্বীকার করতে পারছেন না তাদের বিজ্ঞাপন বণ্টন পরিকল্পনা থেকে। ফলে গত ৩/৪ বছরে দূরদর্শনের বিজ্ঞাপন জনিত আয়ের ক্রমবৃদ্ধির হার, সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রিকার আয়ের ক্রমবৃদ্ধির হারকে উত্তীর্ণ করেছে মাত্রাহীনভাবে। ১৯৮০ থেকে (base year) টেলিভিশানে বিজ্ঞাপনের ক্রমবৃদ্ধির হারের পরিমাণ হচ্ছে ৫৫০ শতাংশ (growth rate)। আর ঐ একই সময়ে প্রেস বিজ্ঞাপনজনিত আয়ের ক্রমবৃদ্ধি হয়েছে ১৩০ শতাংশ। সর্বভারতীয় স্তরে বিজ্ঞাপনের জন্যে যে ব্যয় বৃদ্ধি হচ্ছে, প্রেস এবং দূরদর্শন আলাদাভাবে সেই তুলনায় নিজেদের আয়ের বৃদ্ধির ক্রমহার তালিকা দেওয়া গেল :—

বিজ্ঞাপন আয়ের ক্রমহার
(incremental growth rate)

	প্রেস	টি ভি
১৯৮১	৩০·৭ শতাংশ	২২·২ শতাংশ
১৯৮২	২২·১ শতাংশ	৪৬·৪ শতাংশ
১৯৮৩	২২·১ শতাংশ	৫০·৩ শতাংশ
১৯৮৪	৯·৪ শতাংশ	৩১·৪ শতাংশ
১৯৮৫	৭·০ শতাংশ	৮৩·৪ শতাংশ

প্রেসের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন থেকে আয়বৃদ্ধির ক্রমহার কমছে আর টিভির বাড়ছে। যে দেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর, টিভি তাদের কাছে পৌঁছবে সহজে। পঞ্চায়েত অথবা কমিউনিটি সেন্টার যদি প্রতি গ্রামে টেলিভিশন সেট পৌঁছে দেয় তাহলে কাগজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আরও বাড়বে। আর এই ব্যাপারে সরকার যথেষ্ট সচেতন। টিভির প্রসার সময়ের মোট দশ শতাংশ সময় বিজ্ঞাপনের জন্যে ছাড়ার সিদ্ধান্ত রয়েছে। বর্তমানে এই প্রচার সময়ের মাত্র একের চার ভাগ বিজ্ঞাপন দখল করতে পেরেছে। ২৪০ ঘণ্টা বিজ্ঞাপন প্রচারিত হতে পারে, সেই জায়গায় বিজ্ঞাপন মাত্র ৫৪ ঘণ্টা সময় নিতে পেরেছে। এইতেই বিজ্ঞাপনের প্রচারের ক্ষেত্রে টিভি এখন পত্রপত্রিকার সব চেয়ে বড় প্রতিযোগী। এরপর টিভি সকালের খাবার টেবিলে হাজির হবে আর বিদায় জানাবে সেই রাতে বিছানায় যাবার মুহূর্তে। তখন কি হবে?

একবিংশ শতাব্দীর পদশব্দ শোনা যাচ্ছে সরকারী ঘোষণাপত্রে। শিল্পনীতি, দীর্ঘমেয়াদী আমদানী নীতি, এবং আর্থিক নীতির খোলনলচে বদলেছে। নতুন প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় পদক্ষেপে নতুন দিনের প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য রক্ষণশীলদের ঘেরাটোপ থেকে দেশের অর্থনীতিকে ও বাণিজ্যনীতিকে মুক্তি দিতে উদ্যত। রঙ্গীন টিভির পিকচার টিউব থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিক ঘড়ির মডিউল সবাইকে মুক্ত
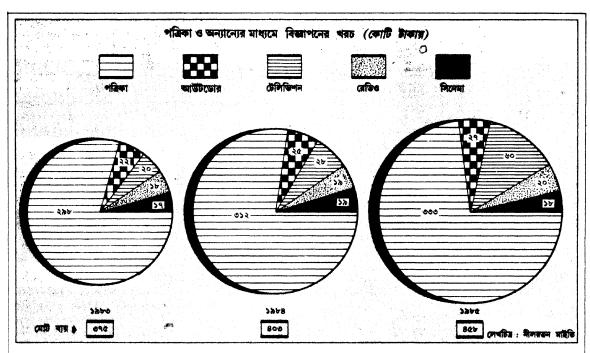
আমদানীনীতির আঙ্গিনায় এনেছেন, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য। অথচ সাধারণ মানুষকে খবর পৌঁছে দেবার সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে সংবাদপত্রের, তার দৈনিক মুদ্রণের জন্য নিত্যব্যবহার্য যে জিনিসগুলি লাগে, যেমন ফিল্ম, অফসেট প্লেট, অথবা প্রুফ ছাপবার বিশেষ ব্রমাইড কাগজ সেগুলি আমদানী করতে হয় প্রায় ২০০ শতাংশ আমদানী শুল্ক দিয়ে।

মুক্ত শিল্পনীতির মুক্তির ছোঁয়া থেকে সংবাদপত্র শিল্পকে অস্পৃশ্য করে রেখে তাকে শুধু দীনই করা হোল না, জনগণের কাছে কম দামে খবর ও মত পৌঁছে দেবার, তার মনোরঞ্জন করবার যে সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে, তা থেকে তাকে বঞ্চিত করার এ এক অহেতুক প্রয়াস।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তখনি সার্থকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে যখন সে অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভরশীল নয়। বিরুদ্ধ মতের এবং বিরুদ্ধ শক্তির চাপকে সে উপেক্ষা করেও নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখতে পারবে। সরকারের অনুদান স্বাধীন সংবাদপত্রের নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু তার স্বাভাবিক প্রগতির যাত্রাপথে প্রাচীরের দেওয়াল তৈরী হোক এটাও সে চাইবে না। অথচ এমন ঘটেই থাকে। সংবাদপত্র সংস্থাগুলিকে সেবার আদর্শের সঙ্গে ব্যাবসায়িক বুদ্ধিমত্তার যোগ ঘটিয়ে তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে দৃঢ় ভাবে স্থাপনা করতে হবে। এটা না হলে কি হয়ে থাকে অতীত কালের আদর্শবাদী ও জাতীয়তাবাদী একাধিক কাগজের অকালমৃত্যুই তা প্রমাণ করেছে। বেঙ্গলী, বন্দেমাতরম, সন্ধ্যা, হিতবাদী, বসুমতী (সাপ্তাহিক), বঙ্গবাসী আরও এমন অনেক বহুল প্রচারিত কাগজ যা এই শতকের গোড়ায় ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল, আজ তারা ইতিহাসের পাতাতেই শুধু বিরাজ করছে।

পত্রপত্রিকা মধ্যবিত্তের ভালবাসার ধন। সাধারণ মানুষের কাছে পাঁচফুলের সাজি। নিছক মনোরঞ্জন থেকে গণতন্ত্রের বুনিয়াদকে শক্ত করবার সার্থক হাতিয়ার। একে বাঁচাবার দায়দায়িত্ব সকলের। এবং বলাবাহুল্য, সরকারের একটা বড় ভূমিকা আছে এই পরিপ্রেক্ষিতে। মালিক তো একটাই—ভারতের অগণিত মানুষ—সরকার আর সংবাদপত্র তো সেবকমাত্র। এই আদর্শ থেকে চ্যুত হলে ইতিহাস কি ক্ষমা করবে কাউকে?
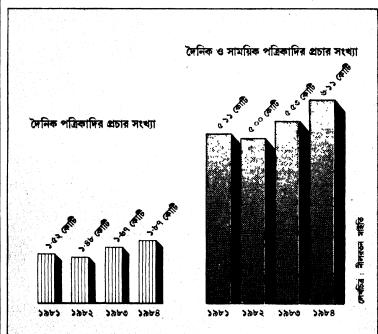
ম্যাগাজিন বিপ্লব

দিব্যেন্দু পালিত

সত্তর দশককে মুক্তির দশক আখ্যা দিয়ে বছর ষোলো-আঠারো আগে রাতের অন্ধকারে যাঁরা এই কলকাতার দেয়াল ভরে তুলতেন স্লোগান লিখে, সেই সময়ের ভারতীয় রাজনীতি ও ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে তাঁরা যে-সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত করে থাকুন না কেন, রাজনীতির ক্ষেত্র ছাড়াও আরও নানা ক্ষেত্রে বস্তুত ঐ দশক মুক্তিরই দশক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। তারই একটি হলো তথ্যের মুক্তির ক্ষেত্র। ১৯৪৭-এ ভারত স্বাধীন হবার পর থেকে এই ১৯৮৬ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ বছরের মধ্যে যদি কোনো দশককে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা টানাপোড়েন, গ্রহণ-বর্জন, প্রাচীন-নবীনের দ্বন্দ্বে সমাচ্ছন্ন ও ঘটনাবহুল বলে ধরে নিতে হয় তাহলে বেছে নিতে হয় এই সত্তরের দশককেই। শুধু ভারত কেন, উপমহাদেশও জড়িয়ে আছে এই ইতিহাসে। প্রতিবেশী পাকিস্তান দু টুকরো হলো; বাংলাদেশ দেখা দিল স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে। আন্তর্জাতিক ঠাণ্ডা লড়াইয়ে ভারত নিল শক্তির নতুন ভূমিকা। ইতিমধ্যে আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও মাথা চাড়া দিয়ে উঠল বিভেদ। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর কংগ্রেস-সুলভ নরম ভাবমূর্তি ছেড়ে হয়ে উঠলেন ভয়ঙ্কর। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে যা সম্ভব বলেও ভাবা যায় নি কখনো, তা-ই হলো—দেশ জুড়ে জারি হলো 'জরুরি অবস্থা' বা 'এমারজেন্সী'। ঐ সময়ের প্রায় দু বছরে কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে জানা যায়নি ঠিকঠাক, কারণ সংবাদমাধ্যমগুলি পড়েছিল কঠোর সেনসরশিপের চাপে। সংবাদমাধ্যম বলতে প্রেস; টেলিভিসন ও রেডিও সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকার ফলে যে-কোনো সময়েই এরা অপ্রিয় সত্য চাপা দিয়ে প্রচার করতে পারে সত্যের বিকৃত রূপ।

চারদিকের এইসব ঘটনা শিক্ষিত, অল্প-শিক্ষিত, এমনকি অশিক্ষিতের মধ্যেও সৃষ্টি করল স্বাধীনতা, দেশ, অধিকারবোধ সম্পর্কে এমনই এক চেতনা যা পাগল হয়ে ওঠে এ-যাবৎ সুপ্ত এক তথ্য-তৃষ্ণায়। মনে রাখতে হবে, এখন ভারতীয় জনসংখ্যার এক বিপুল অংশ জুড়ে আছে সেইসব যুবাবয়সী পুরুষ ও মহিলা, যাদের জন্ম ১৯৪৭ বা তার পরে—ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধ সম্পর্কে যাদের মনে কোনো স্মৃতি বা পিছুটান নেই, যারা শিক্ষা, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি, ও মূল্যবোধে তাদের পূর্ববর্তীদের থেকে অনেক বেশি প্রাগ্রসর ও ভিন্ন; যারা স্বাধীনতার পর পঁচিশ ছাব্বিশ বছরে দেশ জুড়ে যা কিছু ভালো এবং মন্দ ঘটেছে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত 'নতুন ভারতীয়'। ইতিহাসের ধারা পাল্টানোয় এদের ভূমিকা কম নয়।

পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে জনতার রায়ে পরাজিত হলেন ইন্দিরা গান্ধী। তার চেয়ে বড়ো কথা, পরাজিত হলো কংগ্রেস দল—মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহরু সৃষ্ট ধারণা থেকে যে-দলের পরাজয় খুব কমজনই কল্পনা করতে পেরেছেন কখনো। জনতা পার্টি এলো কর্তৃত্ব করতে এবং খোলামেলা, এলোমেলো দুটি অন্তর্কলহে লিপ্ত ব্যর্থতার বছর কাটতে না কাটতেই ফিরে এলেন ইন্দিরা গান্ধী ও কংগ্রেস। কিন্তু, সম্পূর্ণ নতুন রূপে, নতুন প্রত্যাশা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

সত্তরের দশকের শুরুতে যে-অশান্তি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে শুরু করেছিল ভারতীয় মানসিকতায়, এমারজেন্সীর পর তা স্থিত হতে শুরু করলেও, শিক্ষিত ও সাক্ষরদের মধ্যে সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ সম্পর্কে এক নতুন চেতনা সৃষ্টি করে। তথ্য-নির্ভর সমাজ বা ইনফরমেশন সোসাইটি নামে নতুন সমাজ সম্পর্কে যে-ধারণা পশ্চিম থেকেই এসেছিল, এতোদিনে ভারতবর্ষেও কায়েম হলো তা। এই সমাজ শুধু সংবাদপত্রে পরিবেশিত খবর পড়েই সন্তুষ্ট থাকে না; এর জানার আগ্রহ আরও গভীর, আরও বেশি এবং আরও ব্যাপক বিষয়ের প্রতি—প্রচলিত ধারণা মেনে চলা এবং অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপনের চাপে স্থানাভাব ও দৈনিক সময়ের চাপে ক্লিষ্ট দৈনিক সংবাদপত্রের সাধ্য নয় যা পূরণ করে। পাঠাভ্যাসের চেহারা গেল বদলে। এবং পাঠের চাহিদা অনেক ক্ষেত্রেই পাঠক-পাঠিকার মূল্যবোধ অনুযায়ী হয়ে উঠল 'ব্যক্তিগত'। এই চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে সাময়িকপত্র বা ম্যাগাজিন প্রকাশনার জগতেও এলো এক নতুন আলোড়ন।

দেশ স্বাধীন হবার আগে ও পরে, অনেক বছর পর্যন্ত, এদেশে সংবাদপত্র (ডেইলি নিউজপেপার) ও সাময়িক পত্রের (পিরিওডিকাল্‌স/ ম্যাগাজিন) মধ্যে এক ধরনের সহাবস্থান ছিল, যদিও এই একত্র অবস্থানের পটভূমিতে সংখ্যা (নাম্বার), প্রচার-সংখ্যা (সার্কুলেশন) এবং পাঠাভ্যাসের (রিডারশিপ) বিচারে সাময়িক পত্রের ভূমিকা ছিল

ম্যাগাজিন বিপ্লব : তথ্যে, বিনোদনে, চারু প্রকাশ ভঙ্গিতে এক নতুন, অদৃষ্টপূর্ব জোয়ার

গৌণ। জনমত গঠনে এবং জনমানসিকতার পরিবর্তনেও,ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত ছাড়া, ম্যাগাজিনের তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না। বস্তুত, ম্যাগাজিনকে দেখা হতো এক শ্রেণীর পাঠকের (যাঁরা খবরের কাগজ পড়ার পরও চান অবসরযাপন এবং মনোবিনোদনের আরও কিছু খোরাক) রুচির এবং সেই কারণেই, প্রয়োজনের পরিপূরক। দেশে সাক্ষর তথা শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজ ও ম্যাগাজিনের ভূমিকায় রদবদল হয়ে ইংরাজিসহ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ক্রমশ আরও নতুন নতুন ম্যাগাজিনের প্রকাশন শুরু হলেও, খবরের কাগজের বাড়-বৃদ্ধির তুলনায় এটা ছিল শ্লথ ও অসম। নতুন প্রয়োজন থেকে সত্তরের দশকেই প্রথম ম্যাগাজিন প্রকাশনায় এমন এক জোয়ার এলো যা আগে কখনো দেখা যায় নি। গবেষকরা এর নাম দিলেন 'ম্যাগাজিন বুম' বা ম্যাগাজিন বিপ্লব।

ম্যাগাজিন প্রকাশনায় বিপ্লব দেখা দিলেও সংখ্যা দিয়ে এর বিচার সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের দেশে দৈনিক পত্রিকাসহ সমস্ত ধরনের প্রকাশনের সমগ্র প্রচার-সংখ্যার মাত্র ৩০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করেন বড়ো শহরে অধিষ্ঠিত, বড়ো পুঁজি ও সংস্থানের বৃহৎ সংবাদপত্র এবং প্রকাশন সংস্থাগুলি ; বাকি ৭০ শতাংশের অধিকাংশেরই সংগঠিত বাণিজ্যিক উদ্যম ও দৃষ্টিভঙ্গি নেই। ম্যাগাজিন প্রকাশের হিড়িকও শুধু বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানী বা বড়ো শহরগুলিতে সীমাবদ্ধ থাকে নি, ছড়িয়ে পড়েছে নানা জেলা শহরেও, এমনকি আধা শহরাঞ্চলেও। এর কোনোটা সাপ্তাহিক, কোনোটা পাক্ষিক, কোনোটা মাসিক, ত্রৈমাসিক ইত্যাদি। খুঁটিয়ে ধরলে রেজিস্ট্রি করার আইনগত বাধ্যতা এবং নিউজপ্রিন্ট, সুলভ ডাকব্যয়, সরকারি বিজ্ঞাপন ইত্যাদি সুবিধা পাবার কারণে সরকারি তালিকায় নথিভুক্ত হলেও অসংগঠিত ক্ষেত্রের অধিকাংশ পত্র-পত্রিকাই অডিট ব্যুরো অফ সারকুলেশনস্ (এ-বি-সি) কিংবা ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজপেপার সোসাইটি (আই-ই-এন-এস)'র মতো প্রামাণ্য সংস্থার সদস্য নয়। ফলে, প্রকাশিত ম্যাগাজিনের যথাযথ সংখ্যা ও চরিত্র সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণায় পৌঁছুনোও অসম্ভব ব্যাপার। তবে মোটামুটি একটা হিসাব পাওয়া যায়। ১৯৮৫ সালের ৭মে তথ্য ও বেতারমন্ত্রী ভি এন গ্যাডগিল লোকসভায় রেজিস্ট্রার অফ প্রেস-এর যে বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন তা থেকে জানা যায় ১৯৮২ সালে এদেশে প্রকাশিত সাময়িকপত্রের মোট সংখ্যা ছিল ১৮,৫০০। ১৯৮১-তে এই সংখ্যা ছিল ১৭,৭৮২। ১৯৮০-তে ১৬,০৮১। শুধু ১৯৭৯-তেই সেই বছরে নতুন প্রকাশিত সাময়িক পত্রের সংখ্যা ছিল ১৩৮২। পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৮০-তে, নতুন প্রকাশিতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭০১। এই সংখ্যাধিক্য একরকম ধাঁধার সৃষ্টি করতে পারে—বিশেষত এই সংখ্যা যখন প্রতিটি সাময়িক পত্রের চেহারা ও চরিত্র সম্পর্কে কোনো ধারণায় পৌঁছুতে দেয় না। এমনও সন্দেহ হয়, শুধু সাময়িক পত্রের সংজ্ঞায় নিবদ্ধ না থেকে ম্যাগাজিন বলতে আমরা যে দুই মলাটের ভিতরে বাঁধাই করা পাঠ্যবস্তু বুঝি, এর সবগুলিই সেই শর্ত পূরণ করে কি না। যাই হোক, ১৯৮২ সালের রিপোর্ট থেকে ১৮,৫০০টি সাময়িকপত্রের সাময়িকতা অনুসারে যে-হিসাব পাওয়া যায় তা এইরকম—

সাপ্তাহিক	— ৫৮৯৮
পাক্ষিক	— ২৬৮৮
মাসিক	— ৬৯৫১
ত্রৈমাসিক	— ১৯২২
বার্ষিক	— ২৩৭
অন্যান্য	— ৮০৪
মোট	—১৮,৫০০

এদিক থেকে আই-ই-এন-এস প্রদত্ত তাদের সদস্য-সংখ্যার হিসাব সমগ্র প্রকাশনার প্রতিনিধিত্ব করতে না পারলেও একটা ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। কারণ, ধরেই নেওয়া যায়, এই সংস্থা সদস্য নির্বাচন ও অনুমোদনের কাজে প্রকাশনার গুরুত্ব ও যোগ্যতা বিচারকে অগ্রাধিকার দেয়। আই-ই-এন-এস-এর হিসাব অনুসারে ১৯৭৫ সালে যেখানে সাময়িকপত্রের মোট সংখ্যা ছিল ১৫৯, ১৯৮০-তে তা দাঁড়ায় ১৯২-এ। ১৯৮৫-তে এই সংখ্যা আরও বেড়ে গিয়ে হয় ২৬১। অর্থাৎ দশ বছরের বাড় প্রায় ৬০ শতাংশে। অন্য সংস্থা, এ-বি-সি, দৈনিকসহ সমগ্র প্রকাশন প্রচার সংখ্যার মাত্র ৪৫ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে, সুতরাং সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়। মজার কথা, প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত অনেক পত্রিকাই আই-এন-এস-এর সদস্য হলেও, এ-বি-সি'র অন্তর্ভুক্ত নয়।

আই-ই-এন-এস, এ-বি-সি, ইন্‌ফা ইত্যাদি কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য ঘেঁটে এই মুহূর্তে ভারতে ইংরাজিসহ বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত ও প্রচারিত এবং প্রায় পনেরো হাজার বা তদূর্দ্ধ প্রচার-সংখ্যা সম্পন্ন ১০০টি পরিচিত ও সাবালক শিক্ষিতের মধ্যে 'সর্বজনপাঠ্য' (জেনারেল ইন্টারেস্ট) ম্যাগাজিনের প্রথম প্রকাশের তারিখ কিংবা বছর পর্যালোচনা করে দেখা গেছে এর প্রায় ৬০ শতাংশই প্রকাশিত হয়েছে সত্তরের দশকে, অর্থাৎ ১৯৭০ বা তার পরে। এরও গরিষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে 'জরুরি অবস্থা' তুলে নেবার পরে। এই ধরনের জেনারেল ইন্টারেস্ট ম্যাগাজিনের মধ্যে নতুন বেরিয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রচার সংখ্যা কিংবা মর্যাদায় বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, এমনকি কোনো কোনো তুলনীয় প্রেক্ষিতে সর্বাধিক প্রচার-সংখ্যাও অর্জন করেছে, এমন দৃষ্টান্তের মধ্যে আছে ইংরাজি ভাষার পাক্ষিক 'ইণ্ডিয়া টুডে' (১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৫), সাপ্তাহিক 'সানডে' (১৯৭৬), তামিল ভাষার পাক্ষিক 'তুঘলক' (১৯৭০), হিন্দী ভাষার সাপ্তাহিক 'রবিবার' (১৯৭৭) প্রভৃতি। কিন্তু, এই তথ্য কখনোই এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে দেয় না যে, প্রকাশনার বয়সে নবীন পত্র-পত্রিকাগুলি প্রাচীন কিংবা বহু বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে এমন পত্রিকাগুলিকে বাতিল করে দিয়েছে প্রচার সংখ্যা কিংবা মর্যাদায়। এর মধ্যে প্রাচীনতম ইংরাজি সাপ্তাহিক 'দ্য ইলাসট্রেটেড উইকলি অফ ইণ্ডিয়া' (১৮৮০) ; অন্যগুলির মধ্যে আছে মালয়ালম সাপ্তাহিক 'মালয়ালা মনোরমা' (১৮৮৮), বাংলা সাপ্তাহিক 'দেশ' (১৯৩৩), তামিল সাপ্তাহিক 'কুমুদম' (১৯৪৭), হিন্দী সাপ্তাহিক 'ধর্মযুগ' (১৯৫০) এবং 'সাপ্তাহিক হিন্দুস্থান' (১৯৫০) ; প্রচার সংখ্যা এবং মর্যাদায় নিজের নিজের ক্ষেত্রে এখনো এরা কম বেশি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাবে কোট্টায়াম থেকে প্রকাশিত 'মালয়ালা মনোরমা' এখনো ভারতে প্রকাশিত ম্যাগাজিন সমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত (৫,৭৭,৭৩০ কপি)। দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত 'কুমুদম' (৫,৫২,৫৯০ কপি)। দুটি পত্রিকারই প্রচার সংখ্যা দশটি কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত ও সম্মিলিতভাবে দৈনিক সংবাদপত্রের মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' (৫,৩৭,৫০২) এবং একটি কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত এবং এককভাবে সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' (৪,০৬,২৭৬)-র প্রচার সংখ্যা থেকেও বেশি। ইংরাজি ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ম্যাগাজিন 'ইণ্ডিয়া টুডে' (৩,০৮,৭২৩)। 'দেশ' বাংলায় সর্বাধিক প্রচারিত ম্যাগাজিন হলেও এখনো 'মালয়ালা মনোরমা' বা 'কুমুদম'-এর কাছাকাছি পৌঁছুতে পারেনি। বস্তুত, সাধারণভাবেই, বাংলা ভাষার ম্যাগাজিনের প্রচার-ও-পাঠকসংখ্যা সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে রীতিমতো কম। সম্মিলিত পাঠকসংখ্যা নির্ধারণের একটি সমীক্ষায় ভাষাভিত্তিক পর্যায়ক্রম এইরকম—ইংরাজি, হিন্দী

ছবি : সুবীর চ্যাটার্জী

তামিল, মারাঠী, মালয়ালম, গুজরাটি, বাংলা তেলেগু ইত্যাদি।

১০০টি প্রামাণ্য জেনারেল ইন্টারেস্ট ম্যাগাজিনের প্রসঙ্গে নতুন পুরনোর তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে আরও যে কথা বলতে হয় তা হলো, বিভিন্ন শ্রেণীর ম্যাগাজিনের মধ্যে এই শ্রেণীর ম্যাগাজিনই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯৭৮ সালের দ্বিতীয় ন্যাশনাল রিডারশিপ সার্ভেতে পনেরো বছর বা তদূর্দ্ধ বয়সের পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে ২১৭টি বিভিন্ন ধরনের ম্যাগাজিন নিয়ে সমীক্ষার ফলাফলে জানা যায়, যাঁরা ম্যাগাজিন পড়েন তাঁদের প্রায় ৪৮ শতাংশ বা ৪২৬ লক্ষ পড়েন এই ধরনের ম্যাগাজিন—যাতে রাজনীতি থেকে সাহিত্য, শিল্প- সংস্কৃতি থেকে খেলাধুলো, স্বাস্থ্য থেকে ফ্যাশান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে কিছু না কিছু থাকে। সংখ্যা ও রিডারশিপের হেরফের ঘটলেও ১৯৮৩'র তৃতীয় ন্যাশনাল রিডারশিপ সার্ভেতেও ধরা পড়ে প্রায় একই ধরনের প্রবণতা। কিন্তু, যে ম্যাগাজিন বিপ্লবের কথা আমরা বলছি, তার সঙ্গে এই তথ্যের বিশেষ সম্পর্ক নেই। আসলে, এই সত্তরের দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে যেটা ঘটে যায় তা হলো, ম্যাগাজিন বা সাময়িক পত্রিকা সম্পর্কে এ-যাবৎ প্রচলিত 'সকলের জন্যেই কিছু-না-কিছু'র ধারণা পাল্টে, 'নির্দিষ্ট' পাঠকগোষ্ঠীর 'নির্দিষ্ট' প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে ম্যাগাজিন প্রকাশনে বিষয় ও গোষ্ঠীভিত্তিক নতুন পরিকল্পনা এবং সম্পাদকীয় বিষয়বস্তু, আঙ্গিক এবং মুদ্রণ পরিকল্পনায় এমন বৈচিত্র্য আনা যাতে ফুটে ওঠে আলাদা চারিত্র্য ও বৈচিত্র্য। ঝোঁক বাড়ে বিতর্কিত বিষয়ের প্রতি। এর সঙ্গে যুক্ত হয় মুদ্রণে আধুনিক টেকনোলজির প্রয়োগ—ফোটো কম্পোজিং, অফসেট মুদ্রণ ও সাদা-কালোর পরিবর্তে রঙ ব্যবহারের সুযোগ। সচল হয় আরও বেশি ফোটোগ্রাফ ও ইলাস্ট্রেশনের ব্যবহার, পাঠ্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে একই গুরুত্ব দেওয়া ডিজাইনিং-কে, যাতে মন ও মগজের সঙ্গে সঙ্গে আবেদন পৌঁছয় দৃষ্টিতেও। দৈনিক সংবাদপত্রের সঙ্গে ম্যাগাজিনের মুদ্রণ সম্পর্কে একটা বড়ো পার্থক্য ঘটে যায় এইখানেই। এমনকি নতুন প্রকাশিত ম্যাগাজিনের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়ে টিকে থাকার দায়িত্বে এবং পাঠক-পাঠিকাদের প্রবণতায় নতুনের প্রতি আগ্রহ লক্ষ করে পুরনো, প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলিও ক্রমশ পাল্টাতে শুরু করে তাদের চরিত্র। দৃষ্টান্ত 'ইলাসট্রেটেড উইকলি' কিংবা 'অনলুকার' ; দৃষ্টান্ত বাংলায় 'দেশ' পত্রিকাও।

সংবাদধর্মী রচনা পরিবেশনের ক্ষেত্রে দৈনিক পত্রিকার ধারা মেনে চলা যে-ধরনের সাংবাদিকতা এতোদিন ধরে গ্রাহ্য ছিল, ম্যাগাজিন বিপ্লবের জোয়ারে তাতেও এসে যায় পরিবর্তন। এই পরিবর্তন একটি নতুন ধারণা সহজেই স্পষ্ট করে দিল, তা হলো, ম্যাগাজিনের জন্যে চাই নিজস্ব ধরনের সাংবাদিকতা, যা দৈনিকের সাংবাদিকতার চেয়ে ভাষায়,পরিবেশনের ভঙ্গিতে এবং মূল্যায়নে সম্পূর্ণত আলাদা। ইনভেসটিগেটিভ রিপোর্টিং—অর্থাৎ সংবাদের ভিতরে ব্যাপক সংবাদের অনুসন্ধান, লক্ষ্য হয়ে ওঠে ম্যাগাজিন সাংবাদিকতার। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুসরণের মডেল হয়ে ওঠে 'টাইম' কিংবা 'নিউজ্উইক'। এর সার্বিক সংহত রূপ দেখা যায় অরুণ পুরীর 'ইণ্ডিয়া টুডে' পত্রিকায়। এই সময়েই তরুণ এম জে আকবর 'সানডে' সাপ্তাহিকের দায়িত্ব নিয়ে প্রবর্তন করেন একই ধারার। 'সানডে' পত্রিকার বিজ্ঞাপনেই প্রথম 'জার্নালিজম' কথাটিকে ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে ভিন্ন তাৎপর্যে ব্যবহার করে স্লোগান দেওয়া হয়—'আ বোলড নিউ কনসেপ্ট ইন 'ম্যাগাজিন জার্নালিজম'। অবশ্য এরও আগে, ১৯৭১-এ, 'স্টারডাস্ট' ম্যাগাজিন সম্পাদনার সূত্রে ফিল্ম-সাংবাদিকতার নতুন ধারা প্রবর্তন করেছিলেন শোভা কিলাচাঁদ, পরবর্তীকালে যার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত।

নির্দিষ্ট পাঠকসমাজের চাহিদার দিকে তাকিয়ে নির্দিষ্ট ধরনের ম্যাগাজিন প্রবর্তনের ধারণা 'সর্বজনপাঠ্য' (জেনারেল ইন্টারেস্ট) থেকে নতুন ম্যাগাজিনের প্রকাশকদের এক বৃহৎ অংশকে নিয়ে গেল 'বিশেষজনপাঠ্য' (স্পেসিফিক ইন্টারেস্ট) ম্যাগাজিন প্রকাশনার দিকে। এই পর্যায় নির্দিষ্ট হলো দু ভাবে—এক, পাঠকের ক্ষেত্রে ; দুই, বিষয়ের ক্ষেত্রে। পাঠক বলতে এখন আর একটি অভিন্ন গোষ্ঠী নয় ; তাকে ভাগ করা হলো পুরুষ, নারী, যুবক, যুবতী, বালক-বালিকায়। একই সময় বিবেচিত হলো তাদের বয়স, সেক্স, আয় ও শিক্ষার স্তর (ডেমোগ্রাফিক সেগমেনটেসন) যাতে তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা এবং জীবন যাপন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বিচারে কোনো অস্বচ্ছতা না থাকে। কারণ, এইগুলিই পরে প্রতিফলিত হবে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর পাঠক কিংবা পাঠিকাদের জন্যে নির্দিষ্ট ম্যাগাজিনের বিষয় পরিকল্পনায়। নির্দিষ্ট বিষয়-নির্ভর ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে বিষয় ভাগ হলো প্রধানত একক বিষয়ের জনপ্রিয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে ; যেমন স্পোর্টস, ফিলম, বাণিজ্য, ইলেকট্রনিকস, বিজ্ঞান ইত্যাদি। চাহিদার সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনানুযায়ী দুই ক্ষেত্রেই আনা হলো নতুন-নতুন ম্যাগাজিন। বিশেষজনপাঠ্য এই পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে যেগুলি বর্তমানে বিশিষ্ট এবং পরিচিত, তাদের প্রথম প্রকাশের সময়-সাল পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে ম্যাগাজিন বিপ্লব সত্তরের দশকে ও তারপরে কীভাবে ভিন্নতা অর্জন করে ক্রমশ এক নতুন চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে (দ্রষ্টব্য : বিশেষজনপাঠ্য ম্যাগাজিন প্রকাশের চিত্র)।

বিশেষজন পাঠ্য ম্যাগাজিন প্রকাশের চিত্র

১৯৭০ বা তার পরে প্রকাশিত বিশেষজনপাঠ্য বা স্পেসিফিক ইন্টারেস্ট ম্যাগাজিনের সংখ্যা কীভাবে বেড়েছে তার একটি ধারণা পাওয়া যাবে নিচের বিবরণ থেকে। এই সূচিতে নতুন পুরনো মিলিয়ে সেইসব পত্র-পত্রিকাকেই ধরা হয়েছে যাদের পরিচিতি ও প্রচার-সংখ্যা মোটামুটি থেকে সর্বোচ্চ স্তরের। পত্রিকার নাম, প্রথম প্রকাশের বছর, ভাষা ও প্রকাশের সাময়িকতা পর পর পড়তে হবে। বলাবাহুল্য, এই বিবরণ সম্পূর্ণ প্রামাণ্য নয়, কিন্তু ধারণা সৃষ্টির পক্ষে কার্যকর।

পাঠক-নির্ভর

১. **পুরুষদের জন্য**

ডেবোনের (১৯৭২)— ইংরাজি/ মাসিক
জেন্টলমেন (১৯৮০)— ইং/ মাসিক
মন্তব্য : নতুনের হার ১০০%

২. মেয়েদের জন্য

ইভস উইকলি (১৯৪৭)— ইং/ সাপ্তাহিক
ফেমিনা (১৯৫৯)— ইং/ পাক্ষিক
বিউটিফুল (১৯৭৪)— ইং/ মাসিক
সোসাইটি (১৯৭৯)— ইং/ মাসিক
সাভি (১৯৮৪)— ইং/ মাসিক
উইমেনস এরা (১৯৭৩)— ইং/ পাক্ষিক
ফ্যাশান ফোরকাস্ট (১৯৮০)— ইং/ মাসিক
জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান হাউসওয়াইফ (১৯৭৪)— ইং/ মাসিক
সুকন্যা (১৯৮৪)— বাংলা/ পাক্ষিক
সানন্দা (১৯৮৬)— বাং/ পাক্ষিক
পল্লীবধূ (১৯৮৩)— ওড়িয়া/ মাসিক
স্ত্রী (১৯৬২)— গুজরাটি/ মাসিক
মনোরমা (১৯২৪)— হিন্দী/ পাক্ষিক
সারিতা (১৯৪৫)— হি/ মাসিক
সুষমা (১৯৫৯)— হি/ মাসিক
নারীজগৎ (১৯৬৫)— হি/ মাসিক
গৃহশোভা (১৯৭৯)— হি/ মাসিক
বামা (১৯৮৪)— হি/ মাসিক
দেবী (১৯৭৯)— তামিল/ সাপ্তাহিক
ম্যালিজ (১৯৬১)— কানাড়া/ মাসিক
বনিতা (১৯৭৮)— কা/ মাসিক
মহিলা (১৯৭৫)— তেলেগু/ মাসিক
বনিতা (১৯৭৮)— তে/ মাসিক
বনিতা (১৯৭৫)— মালয়ালম/ মাসিক
গৃহলক্ষ্মী (১৯৭৯)— মা/ মাসিক
কন্যাকা (১৯৮৩)— মা/ পাক্ষিক
মন্তব্য : নতুনের হার ৭০% (আনুমানিক)

৩. **বালক-বালিকা/ কিশোর-কিশোরীদের জন্য**

ইন্দ্রজাল কমিকস (১৯৬৪)— ইং-হি-বাং-কা-তা-মা/ সাপ্তাহিক
চন্দামামা (১৯৪৯)—
ইং-হি-বাং- কা-তা-মা- তে-গুজ-ওড়িয়া-অসমীয়া-মারাঠী- পাঞ্জাবী/ মাসিক
চম্পক (১৯৬৮)— হি-ইং/ পাক্ষিক
অমর চিত্রকথা (১৯৭১)— হি-ইং/ পাক্ষিক
বুলবুল (১৯৭৭)— ইং/ পাক্ষিক
টারগেট (১৯৭৯)— ইং/ মাসিক
শুকতারা (১৯৪৮)— বাং/ মাসিক
কিশোর ভারতী (১৯৬৮)— বাং/ মাসিক
আনন্দমেলা (১৯৭৫)— বাং/ পাক্ষিক
কিশোরমন (১৯৮৪)— বাং/ পাক্ষিক
ফুলওয়াদি (১৯৬৬)— গুজ/ সাপতাহিক
নন্দন (১৯৬৪)— হি/ মাসিক
পরাগ (১৯৬৪)— হি/ মাসিক
গুড়িয়া (১৯৭৩)— হি/ মাসিক
সুমন সৌরভ (১৯৮৩)— হি/ মাসিক
বোম্বাই ভিদু (১৯৭৫)— তা/ মাসিক
বোম্মারিলু (১৯৭১)— তে/ মাসিক
বাল জ্যোতি (১৯৮০)— তে/ মাসিক

বলরামা (১৯৭২)— মা/ পাক্ষিক
পুমপাট্টা (১৯৭৮)— মা/ পাক্ষিক
পুমপাট্টা অমর চিত্রকথা (১৯৮০)— মা/ পাক্ষিক
বালুন (১৯৮২)— মা/ মাসিক
মন্তব্য : নতুনের হার : ৬০% (আনুমানিক)

বিষয়-নির্ভর

১· **ফিল্‌ম/সিনেমা সংক্রান্ত**
পিকচার পোস্ট (১৯৪৩)— ইং/ মাসিক
ফিল্‌মফেয়ার (১৯৫২)— ইং/ পাক্ষিক
ফিল্‌ম মিরার (১৯৬৪)— ইং/ মাসিক
স্টার অ্যান্ড স্টাইল (১৯৬৫)— ইং/ পাক্ষিক
স্টারডাস্ট (১৯৭১)— ইং/ মাসিক
সিনে বিল্‌ৎজ (১৯৭৪)— ইং/ মাসিক
মুভি (১৯৮১)— ইং/ মাসিক
উল্টোরথ (১৯৫৭)— বাং/ মাসিক
সিনেমা জগৎ (১৯৫৭)— বাং/ মাসিক
আনন্দলোক (১৯৭৫)— বাং/ পাক্ষিক
শমা (১৯৩৯)— উর্দু/ মাসিক
চিত্রলেখা (১৯৪৮)— হি/ মাসিক
ফিলমি দুনিয়া (১৯৫৮)— হি/ মাসিক
মাধুরী (১৯৬৪)— হি/ পাক্ষিক
ফিল্‌ম কল্যাণ (১৯৬৯)— হি/ মাসিক
মায়াপুরী (১৯৭৪)— হি/ সাপ্তাহিক
চিত্রলোক (১৯৫২)— গুজ / সাপ্তাহিক
জি (১৯৫৮)— গুজ / পাক্ষিক
রং তরং (১৯৬২)— গুজ/ পাক্ষিক
সিতারা (১৯৭৬)— তে/ সাপ্তাহিক
জ্যোতি চিত্র (১৯৭৭)— তে/ সাপ্তাহিক
সিনেমা এক্সপ্রেস (১৯৮০)— তা/ পাক্ষিক
রূপতারা (১৯৭৭)— কা/ মাসিক
মালয়ালানাড়ু (১৯৬৯)— মা/ মাসিক
ফিল্‌ম ম্যাগাজিন (১৯৭৬)— মা/ সাপ্তাহিক
চিত্র কর্থিকা (১৯৮০)— মা/ সাপ্তাহিক
মন্তব্য : নতুনের হার ৪৫% (আনুমানিক)

২· **অর্থনীতি/বিজনেস সংক্রান্ত**
ক্যাপিটাল (১৮৮৮)— ইং/ পাক্ষিক
কমার্স (১৯১০)— ইং/ সাপ্তাহিক
ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাইমস্ (১৯৫৯)— ইং/ পাক্ষিক
ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি (১৯৬৬)— ইং/ সাপ্তাহিক
ইকনমিক সিন (১৯৭৬)— ইং/মাসিক
বিজনেস ইন্ডিয়া (১৯৭৮)— ইং/ পাক্ষিক
বিজনেস ওয়ার্লড (১৯৮১)— ইং/ পাক্ষিক
ডিরেক্টর (১৯৮২)— ইং/ মাসিক
ফরচুন ইন্ডিয়া (১৯৮৩)— ইং/ মাসিক
মন্তব্য : নতুনের হার : ৫৫% (আনুমানিক)

৩· **খেলাধুলো/স্পোর্টস সংক্রান্ত**
স্পোর্টস উইক (১৯৭৩)— ইং/ সাপ্তাহিক
স্পোর্টস ওয়ার্লড (১৯৭৮)— ইং/ সাপ্তাহিক
স্পোর্টস স্টার (১৯৭৮)— ইং/ সাপ্তাহিক
খেলার আসর (১৯৭৭)— বাং/ সাপ্তাহিক
খেলা (১৯৮২)— বাং/ সাপ্তাহিক
একাচ সংকার (১৯৮৩)— মারাঠী/ পাক্ষিক
ক্রিকেট সম্রাট (১৯৭৮)— হি/ মাসিক
ক্রিকেট স্টার (১৯৮০)— হি/ মাসিক
খেলা ভারতী (১৯৮২)— হি/ মাসিক
খেল হালচাল (১৯৮৩)— হি/ সাপ্তাহিক
মন্তব্য : নতুনের হার : ১০০%

প্রশ্ন উঠতে পারে সত্তরের দশকে হঠাৎই যে ম্যাগাজিন বিপ্লব শুরু হয়ে গেল —জেনারেল ইন্টারেস্ট ম্যাগাজিনের চরিত্র পালটালো, এমনকি ম্যাগাজিন জার্নালিজম নামে সূত্রপাত হলো এক নতুন সাংবাদিকতার, তার চেয়ে বড়ো কথা, জেনারেল ইন্টারেস্ট ম্যাগাজিনের প্রচলিত প্রবাহ থেকে কমবেশি বিচ্যুত হয়ে প্রকাশকরা ঝুঁকলেন স্পেসিফিক ইন্টারেস্ট ম্যাগাজিন প্রবর্তনের দিকে— তার কারণ কি শুধুই দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ? কিংবা পাঠকের রুচি ও চাহিদাবদলজনিত সচেতনতা বৃদ্ধি ? কিংবা নতুন শুরু হওয়া তথ্য-তৃষ্ণা ? কিংবা, ইতিমধ্যে পেয়ে যাওয়া নতুন মুদ্রণ টেকনোলজি, রঙ ব্যবহারের সুযোগ ইত্যাদি, যা, সেই মুহূর্তে অন্তত, দৈনিক সংবাদপত্র দিতে পারেনি ?

না, কারণ আরও ছিল।

প্রথমত, জরুরি অবস্থার সময় (জুন ১৯৭৫— মার্চ ১৯৭৭) প্রেস সেনসরশিপের কারণ দৈনিক সংবাদপত্রের সংবাদ পরিবেশনে এমনই এক ধরনের গতানুগতিকতা এসে যায়, বিশেষত রাজনীতি ও রাজনৈতিক অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশন এতোই চাঞ্চল্যহীন হয়ে পড়ে যে পাঠকমনে সংবাদপত্রপাঠের আকর্ষণও কমে যেতে থাকে। দৈনিকের প্রচার-সংখ্যা হ্রাস পাবার সম্ভাবনা এবং সম্ভাব্য ব্যবসায়িক ক্ষতির আশঙ্কা বৃহৎ সংবাদপত্রগোষ্ঠী যেমন করেছিলেন, তেমনি করেছিলেন প্রকাশন-ব্যবসায়ে নতুন মূলধন বিনিয়োগে উৎসাহী সুযোগ-সন্ধানীরাও। এঁরা এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, সংবাদপত্র সম্পর্কে তাৎক্ষণিক আগ্রহ কমলেও পাঠকদের পড়ার আগ্রহে ছেদ পড়েনি— নিছক সংবাদ ছাড়া তাঁদের ইচ্ছা, রুচি ও পাঠাভ্যাসের ঝোঁকের দিকে তাকিয়ে যদি প্রবণতা অনুযায়ী অন্যান্য আপাত-নিরীহ অথচ প্রয়োজনীয় এবং আকর্ষণীয় বিষয়ের দিকে তাঁদের দৃষ্টি ফেরানো যায়, তাহলে পাঠক টেনে রাখার নতুন সুযোগ উন্মুক্ত হতে পারে। দৈনিক সংবাদপত্র এই কাজে নেমে চারিত্র্য হারাতে চায়নি। এমনকি, জেনারেল ইন্টারেস্ট ম্যাগাজিনগুলিও তা পারেনি। কারণ, বিশেষত সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বহুল প্রচারিত ইংরাজি জেনারেল ইন্টারেস্ট ম্যাগাজিনগুলিরও বিষয়ের দিকে প্রধান অবলম্বন ছিল রাজনীতিই, তারপর ধর্ম, সেক্স ইত্যাদি। এই অচল অবস্থা থেকে বেরুনোর একটিই উপায় ছিল এবং তা ভিন্ন ধরনের ম্যাগাজিনের কথা চিন্তা করা। এই সূত্র ধরেই স্পেসিফিক ইন্টারেস্ট ম্যাগাজিনের ব্যাপক আবির্ভাব। সূচনাকারীদের সাফল্যই উৎসাহ জোগায় আরও নতুন প্রচেষ্টাকে। পাঠকের প্রয়োজন, রুচি ও আগ্রহ কাজে লাগিয়ে একটা গোটা ইন্ডাস্ট্রির ঝাঁপিয়ে পড়ার এমন দৃষ্টান্ত সহজে মেলে না— যদিও প্রকাশনার মানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটির সঙ্গে অন্যটির প্রভেদ ছিল বিস্তর। মনে রাখা দরকার, 'ইন্ডিয়া টুডে' বা সানডে' বা অনুরূপ পত্রিকাগুলির আত্মপ্রকাশ যে-সময়েই হোক না কেন, এরা প্রত্যেকেই ম্যাগাজিন সাংবাদিকতায় উৎকৃষ্ট এবং জনপ্রিয় হতে শুরু করে প্রেস সেনসরশিপ উঠে যাবার পরে, প্রীতিশ নন্দীর হাতে 'ইলাসট্রেটেড উইকলি' চরিত্র পাল্টেছে খুবই সম্প্রতি।

দ্বিতীয় এবং বড়ো কারণ, টেলিভিসনের জোরালো আবির্ভাব এবং সেই কারণে সংবাদ-ও-সাময়িক পত্র প্রকাশক মহলে বিজ্ঞাপন-সংক্রান্ত ব্যবসায়িক ক্ষতির আশঙ্কা। আমাদের দেশে দূরদর্শন এই সময়ের অনেক আগেই কাজ শুরু করলেও মূলত রাজনীতিক কারণেই আরও বেশি মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের তাগিদে সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে এর প্রসারের দিকে নজর দেন কেন্দ্রীয় সরকার। নতুন নতুন কেন্দ্র এবং ট্রানসমিশন সেন্টার ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে, দ্রুত। ১৯৭৬ সালে কমারসিয়াল টেলিভিসন চালু হবার পরে প্রমোদ মাধ্যম হিসাবে টেলিভিসন এমনই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে যে সাধারণভাবে মুদ্রণ-মাধ্যম বা প্রিন্ট মিডিয়াম থেকে অডিও-ভিস্যুয়াল মিডিয়ামের দিকে প্রায় সর্বস্তরের মানুষের আকর্ষণ বাড়তে থাকে ক্রমশ— যদিও বিভিন্ন কারণে, সেই সঙ্গে বাড়তে থাকে এই প্রচার মাধ্যমের প্রতি বিজ্ঞাপনদাতাদেরও পক্ষপাত। ১৯৮২-তে এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠানের সময় থেকে টেলিভিসনে রঙিন ও স্পনসরড প্রোগ্রাম প্রচারের সুযোগ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে যে-অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা আমাদের অজানা নেই।

বলা বাহুল্য, প্রকাশন ব্যবসার পক্ষে এই অবস্থাটা সুখের নয়। টেলিভিসনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাঠক এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের নিজেদের দিকে টেনে রাখার জন্য মুদ্রণ মাধ্যমকেও উদ্ভাবন করতে হচ্ছে আত্মরক্ষার স্বার্থে পাল্টা প্রতিযোগিতা। এর ফলে সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন প্রকাশনের ক্ষেত্রে আসছে বিষয় ও মুদ্রণের আধুনিকতাস্পৃষ্ট বিবর্তন। সত্তরের ম্যাগাজিন বিপ্লব হয়তো আশির দশকের শেষে আরও এক নতুন বাঁক নেবে। যোগ্যতা অনুসারে, কেউ থাকবে, কেউ থাকবে না। পশ্চিমের দেশগুলির দৃষ্টান্ত অনুসৃত হলে পাঠমাধ্যম যে নিজস্ব ক্ষেত্রে দৃঢ় থাকবে এমন আশা করা অসঙ্গত নয়। কারণ টেলিভিসন শুধু ছবি-শব্দ-আমোদ যুগিয়ে তৃপ্তই করে না, পরোক্ষে বিভিন্ন বিষয়ে জানার আগ্রহ ও তথ্য-তৃষ্ণা বাড়িয়ে দেয় আরও। সৃষ্টি করে নতুন পাঠক, নতুন ধরনের পাঠের চাহিদা। তার সুযোগও কি মুদ্রণ-মাধ্যম নেবে না ?

'ম্যাগাজিন বিপ্লব' নিবন্ধে বর্ণিত বিষয়ে আরও বিশদ কিছু তথ্য

★ কলকাতা শহরের বিভিন্ন আয়ের পরিবারে এক নমুনা-সমীক্ষা করে দেখা গেছে (১) ম্যাগাজিন পাঠের অভ্যাস মধ্যবিত্ত (৭৭%), উচ্চ-মধ্যবিত্ত (৮৬%) এবং উচ্চবিত্ত (৮৫%)

পরিবারভুক্তদের মধ্যেই বেশি। নিম্নমধ্যবিত্তদের ৫৪% এবং শ্রমিক শ্রেণীর ১৬% ম্যাগাজিন পড়েন। (২) ১৬ থেকে ২৫ (৫৭%) এবং ২৬ থেকে ৪০ (৪৬%) বছর বয়স্কদের মধ্যে ম্যাগাজিন পাঠের অভ্যাস অপেক্ষাকৃত বেশি। ৪০ ও তদূর্ধ্ব বয়স্কদের মধ্যে এই অভ্যাস ক্রমশ কমতে থাকলেও ৫৫ বছর বয়স পর্যন্ত কমবেশি ৩৮% ম্যাগাজিন পড়েন।

★ উপরের বিবরণ সমগ্র ম্যাগাজিন সম্পর্কে প্রযোজ্য হলেও আগ্রহের বিষয় ও ম্যাগাজিন ভেদে পাঠাভ্যাস বদলায়। সত্তরের দশকের শেষে কলকাতায় বিভিন্ন ধরনের এবং ভাষার কয়েকটি ম্যাগাজিনের পাঠক-পাঠিকাদের পরিচয় (প্রোফাইল) ছিল এইরকম—

	দেশ (বাংলা)	আনন্দলোক (বাংলা)	ফিল্মফেয়ার (ইংরাজি)	ধর্মযুগ (হিন্দী)	সানডে (ইংরাজি)	ইলাস্ট্রেটেড উইক্লি (ইংরাজি)
বয়স	%	%	%	%	%	%
১৫-২৪	২৪	৩৮	৩৬	৩৪	৩২	২৭
২৫-৩৪	২৩	২৮	৪১	২৩	২৫	২৭
৩৫-৪৪	২০	১৭	৬	২২	১৯	২১
৪৫ ও তদূর্ধ্ব	৩৩	১৭	১৭	২১	২৪	২৫
শিক্ষা						
অল্পশিক্ষিত	২০	২০	২০	৪১	৬	৮
মাধ্যমিক বা সমমান	২৭	৩৩	২৯	১৯	২০	২০
কলেজ ও তদূর্ধ্ব	৫৩	৪৭	৫১	৪০	৭৪	৭২
পুরুষ/ নারী						
পুরুষ	৬১	৫২	৬৭	৬০	৭১	৭১
নারী	৩৯	৪৮	৩৩	৪০	২৯	২৯
আর্থিক সম্প্রদায়						
নিম্নবিত্ত	১২	১৫	৯	১৭	৪	৫
মধ্যবিত্ত	৩৩	৩২	২৩	২৫	২২	২১
উচ্চ/ উচ্চ-মধ্যবিত্ত	৫৫	৫৩	৬৮	৫৮	৭৪	৭৪

মন্তব্য :

(১) জেনারেল ইন্টারেস্ট ম্যাগাজিনের (দেশ, ধর্মযুগ, সানডে, ইলাস্ট্রেটেড উইকলি) ক্ষেত্রে সব বয়সের পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যেই পাঠাভ্যাস কমবেশি বিস্তৃত থাকলেও স্পেসিফিক ইন্টারেস্ট ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে তা হয় না। এ-ক্ষেত্রে 'ফিল্ম' ম্যাগাজিনের (আনন্দলোক, ফিল্মফেয়ার) বেশি সংখ্যক পাঠক-পাঠিকাই ১৫-৩৫ বয়ঃসীমার অন্তর্ভুক্ত ;

(২) যে-কোনো ধরনের ম্যাগাজিনই কলেজ বা তদূর্ধ্ব শিক্ষিত পাঠক-পাঠিকারাই বেশি পড়েন। ইংরাজি ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে, সঙ্গত কারণেই, উচ্চশিক্ষিত পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা বেশি ;

(৩) সাধারণভাবে ম্যাগাজিন পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে নারীর চেয়ে পুরুষের সংখ্যা বেশি। ইংরাজি ভাষার ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে পুরুষ-পড়ুয়ার সংখ্যা আরও বেশি। স্পেসিফিক ইন্টারেস্ট ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে অবশ্য বিষয়ভেদে এই অনুপাত বদলে যায় ;

(৪) যে-কোনো আর্থিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত পরিবারে ম্যাগাজিন পাঠের সঙ্গে বিভিন্ন ম্যাগাজিনের দাম ও পাঠকের ক্রয়-ক্ষমতার বিষয়ও জড়িত। অর্থাৎ, শুধু আগ্রহই নয়, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ক্রয়ক্ষমতা পাঠাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

★ ভারতে প্রকাশিত ম্যাগাজিনগুলির মধ্যে 'মালয়ালা মনোরমা'র প্রচার-সংখ্যা সর্বাধিক বলা হলেও, কোট্টায়াম থেকে মালয়ালম ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'মঙ্গলম' সম্প্রতি দাবি করেছে তাদের গড় প্রচার-সংখ্যা ১৪,৪৪,৯৭৪ কপি। এই 'অবিশ্বাস্য' সংখ্যা 'মালয়ালা মনোরমা'র প্রচার-সংখ্যার প্রায় আড়াই গুণ বা ২৫০% বেশি। সম্পাদকীয় বিষয়বস্তুতে চটুল ও উত্তেজক এই মশলা-ম্যাগাজিনের হঠাৎ সাফল্যে একই ধারার অন্যান্য ম্যাগাজিনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে কেরালায় মালয়ালম, ইংরাজি ও অন্যান্য ভাষায়, যেমন 'সখী' ও 'সুনন্দা'। এইসব পত্র-পত্রিকার পাঠক-পাঠিকার অধিকাংশই গৃহিণী, কেরানী ও স্বল্প-শিক্ষিত শ্রমজীবী সম্প্রদায়।

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, সত্তরের দশকের শেষভাগ থেকে ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে ম্যাগাজিন-সাংবাদিকতা কোনো কোনো ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে বিশ্বমান স্পর্শ করলেও এক শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার তথাকথিত রুচিবিকারের সুযোগ নিয়ে নিম্নমানের মশলা-ম্যাগাজিনের প্রকাশও বেড়ে গেছে ব্যাপক হারে। চটকদার প্রকাশন-সৌকর্যের আড়ালে যৌনতার মশলা-মেশানো বিষয়বস্তু পরিবেশনের এই প্রবণতা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কোনো কোনো নতুন ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে সম্প্রতি।

★ সত্তরের দশকে বা তার পরে নতুন প্রকাশিত বিভিন্ন ম্যাগাজিনের সম্পাদনার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কৃতীদের অধিকাংশেরই জন্ম ১৯৪০ বা তার পরে। এক অর্থে এঁরা স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের মানুষ এবং দৃষ্টিভঙ্গির বিচারেও নবীন। এঁদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে সংশ্লিষ্ট পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় ভাবনা ও বিষয়বস্তুতেও।

★ আমেরিকায় ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে টেলিভিসন মাধ্যমের বিপুল জনপ্রিয়তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রায় ২০০টি আগেই প্রকাশিত ম্যাগাজিন বিক্রিত, অন্য ম্যাগাজিনের সঙ্গে যুক্ত কিংবা বন্ধ হয়ে গেলেও প্রায় ৮০০টি নতুন ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। এর অধিকাংশই স্পেসিফিক ইন্টারেস্ট বা 'স্পেশালাইজড' গোত্রের। এই 'নতুন' ম্যাগাজিনগুলি নতুন পাঠক আকর্ষণ করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জেনারেল ইন্টারেস্ট ম্যাগাজিনের প্রচার-সংখ্যায় ঘা মারে। আমাদের দেশেও লক্ষ করা যাচ্ছে অনুরূপ ঘটনা। অর্থাৎ পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের আকর্ষণ করার জন্য প্রতিযোগিতা শুধু টেলিভিসন ও ম্যাগাজিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না ; এই প্রতিযোগিতা চলছে দৈনিক সংবাদপত্রের সঙ্গে ম্যাগাজিনের এবং এক ধরনের ম্যাগাজিনের সঙ্গে অন্য ধরনের ম্যাগাজিনের মধ্যেও।

★ ভারতে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন-মাধ্যমে বিজ্ঞাপনদাতারা যতো টাকা খরচ করেন, ১৯৮৪ সাল বাবদ প্রাপ্ত আনুমানিক হিসাবে তার সিংহভাগ (প্রায় ৮০ শতাংশ) খরচ করেন সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনে। খরচের হিসাবের ক্রম অনুসারে পরবর্তী স্থানগুলি টেলিভিসন, সিনেমা ও রেডিওর। ১৯৭৯-এ প্রাপ্ত হিসাবে সংবাদপত্র ইত্যাদি মুদ্রণ-মাধ্যমের স্থান অনুরূপ সর্বোচ্চ থাকলেও পর্যায়ক্রমে পরবর্তী তিনটি স্থান ছিল সিনেমা, রেডিও ও টেলিভিসনের। এর অর্থ, বিজ্ঞাপন-মাধ্যম হিসাবে টেলিভিসনের গুরুত্ব ক্রমশই বাড়ছে এবং পাঁচ বছরের মধ্যেই এটি উঠে এসেছে চতুর্থ থেকে দ্বিতীয় স্থানে। দেশ

এবার শীতে সবচেয়ে কোমল ত্বকের অধিকারী হবে সে
...পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীম লাগাবে যে!
শীতে শুষ্ক
ত্বক কোথা?
ণ্ডস্ কোল্ড ক্রীম, সৌন্দর্য্য তেল ও ত্বক
কোমল করে এমন সব উপাদানে ভরপুর থাকে
লেই, এটি কনকনে শীতেও আপনার ত্বককে
খে কোমল থেকে কোমলতর।
স্, শুধু একটুখানি পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীম মাখুন···
খে, ঘাড়ে, হাতে, যেখানেই শীতের জন্যে
ণ্ডস্-এর সুরক্ষার প্রয়োজন মনে করবেন,
রুন হাসতে হাসতে···কোমল থেকে কোমলতর
কোমলতম ত্বক নিয়ে সাথে।
PONDS
COLD CREAM
পণ্ডস্
কোল্ড ক্রীম
শীতে পরিচর্য্যার বাড়তি পুষ্টিতে ভরপুর
LINTAS-M-PIL-PCC-8-2720-BG

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

কাগজ বাড়ছে, পাঠক বাড়ছে, সমস্যা বাড়ছে

প্রতাপকুমার রায়

১৮৯৬ সালে নিউ ইয়র্কের সানডে ওয়ার্লড নিজের সম্বন্ধে এক বিজ্ঞাপনে লিখেছিল : "যে কোনও ম্যাগাজিনের চেয়ে সুচিত্রিত ; আমাদের সামনে ম্যাগাজিন দাঁড়াতে পারে না, অচল।" অর্থাৎ এক শ বছর আগেই আমেরিকাতে ম্যাগাজিন বা সাময়িক পত্রিকার উপস্থিতি এবং বৃদ্ধি অনুভূত হয়েছিল। ১৯০০ সালের এক হিসেবে দেখা যায়, আমেরিকায় তখন সাময়িক পত্রের সংখ্যা ছোট বড় মিশিয়ে সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশি।

উনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকে ওদেশে দৈনিক খবরের কাগজের রবিবাসরীয় পরিশিষ্টের প্রচলন হয়েছে। অনেকগুলি রবিবারের খবরের কাগজও চলেছে তখন। নব্বুই-এর দশকে হাফটোন ব্লকের উদ্ভব হবার পর খবরের কাগজ, বিশেষ করে তার রবিবারের সংস্করণ এবং

সাময়িক পত্রের অলঙ্করণের কাজ সহজ ও সুলভ হয়ে গেল। আজকের মতো না হক, তখন কাঠের লাইন খোদাই-এর বদলে হাফটোন ব্লকের ব্যবহার মুদ্রিত পত্রপত্রিকার শোভা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমেরিকান সাময়িক পত্র জগতে, বলা যেতে পারে একটা বিপ্লব এসে গিয়েছিল। তারা যেমন সংখ্যাতে বাড়ছিল, তেমনি তাদের প্রকৃতিগত উৎকর্ষও সাধারণকে আকর্ষণ করেছিল।

"যে দ্রুততার সঙ্গে নতুন নতুন সাময়িক পত্রিকার আবির্ভাব হচ্ছে, তার সঙ্গে তুলনীয় শুধু তাদের অনুরূপ দ্রুত অন্তর্ধান। বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন চরিত্রের পত্রিকা, কল্পনীয় যত বিষয় আছে, সবেতেই তাদের অনুরাগ ...তারা আসছে আর যাচ্ছে.... অধিকাংশই ব্যর্থ হয়, অথবা তাদের মালিকদের ধ্বংস করে।" উদ্ধৃত ছত্রটি যদিও লিখেছিলেন আমেরিকার জার্নালিস্ট পত্রিকার সম্পাদক ১৮৮৯ সালে, কিন্তু বাক্যগুলি কেমন পরিচিত বোধ হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তে এসপ্লানেড গুমটিতে পত্রিকা আকীর্ণ মাকুরামের স্টল দেখে আমাদের অনেকেরই একই কথা মনে হয়েছে, কেউ কেউ লিখেও থাকবেন।

ভারতবর্ষের খবরের কাগজ সাময়িক পত্রের উপস্থিতি বা সংখ্যাবৃদ্ধি কোনও সময়েই, অন্তত আজ পর্যন্ত, তেমন উগ্রভাবে অনুভব করেনি। কোনও খবরের কাগজের সম্পাদক আমেরিকান কাগজের মতো উদ্বিগ্ন হননি। ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষার কাগজের কথা বলতে পারব না, বাংলাতে আনন্দবাজার পত্রিকা প্রথম পাঠকের মনোরঞ্জনের সম্ভার নিয়ে "রবিবাসরীয় আলোচনী"র প্রবর্তন করেন ১৯৪৬ সালে। যুগান্তরের জন্ম ১৯৩৭ সালে। যুগান্তরের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় রবিবার। গল্প, প্রবন্ধ, সিনেমার কথা, খেলাধুলা ইত্যাদি তাৎক্ষণিক সংবাদের বাইরে পাঠকের প্রিয় নানাবিধ সামগ্রী সেই সংস্করণের আট পাতা পূর্ণ করেছিল। পরের রবিবার থেকে এই অংশের নাম দেওয়া হল 'যুগান্তর সাময়িকী'। তার পর থেকে দৈনিকপত্রের রবিবারের সংস্করণে সাহিত্য ধর্মী পরিশিষ্ট অঙ্গাঙ্গী হয়ে গিয়েছে।

ইদানীং, বছর তিন চার হল আমরা সাধারণ পাঠকেরা সহসা অনুভব করছি যে, সংখ্যায় গুরুত্বে এবং সম্ভবত বিক্রিতেও এ দেশে সাময়িকপত্রের বৃদ্ধি আরম্ভ হয়েছে। বস্তুত, অনেকে মনে করেন ভারতীয় সাময়িকপত্র জগতে একটা বিস্ফোরণ হয়েছে। প্রত্যহ নতুন নতুন পত্র-পত্রিকা দেখা যায়। এত বেশি আর কখনও দেখা যায়নি। ধারণাটা সর্বৈব সত্য কিনা, সত্য হলে তার প্রভাব কত দূরপ্রসারী, সেটা জানতে হলে আমেরিকান নিসর্গটা পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ করে দেখলে সুবিধা হয়। স্বীকার করি, আমেরিকার সঙ্গে তুলনা করে আমাদের বর্তমানের বিশ্লেষণ বা ভবিষ্যৎ নির্ণয় সম্পূর্ণ তর্কসিদ্ধ কাজ হবে না। কারণ, ভারতবর্ষের মতো কোনও উন্নয়নশীল দেশ নব নব প্রযুক্তির সুযোগ নিয়ে যখন অগ্রসর হয়, তখন তাকে পূর্বগামীর মত মন্থর ঐতিহাসিক পদক্ষেপ করতে হয় না। ইংরেজীতে যাকে বলে 'লীপফ্রগিং', আমরা তেমনি মাঝে মাঝে দুটো চারটে অন্তর্বর্তী ধাপ টপকে একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করব। যে নাতিদ্রুত বিবর্তন আমেরিকা বা অন্য উন্নত দেশে হয়েছিল গত সত্তর আশি বছর ধরে, প্রযুক্তি বিদ্যার প্রসাদে তার অনেকখানিই আমরা দ্রুত পার হয়ে যাব। বস্তুত, তাই শুরু হয়েছে

প্রেস রেজিস্ট্রারের হিসাবে দেখা যাবে ভারতবর্ষের ষোলটি স্বীকৃত ভাষা এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত সাময়িক পত্রের সংখ্যা ১৯৮৩তে ছিল ১৯,২২৭। এবং তাদের মোট বিক্রয় সংখ্যা ছিল তিন কোটি চুরাশি হাজার। সংখ্যাগুলি এখন নিঃসন্দেহে আরও বেড়েছে। দশ বছর আগে, ১৯৭৩ সালে সাময়িকপত্রের সংখ্যা ছিল ১১,৭৫৫ এবং তাদের মোট বিক্রয়সংখ্যা দু কোটি সাতান্ন লক্ষ। সামান্য অঙ্ক কষলেই দেখা যাবে দশ বছর আগে যেখানে পত্রিকার গড়ে বিক্রি ছিল প্রায় বাইশ শ কপি, ১৯৮৩ সালে সেই সংখ্যাটি দু হাজারের নিচে নেমে এসেছে। তবুও দশ বছরে মোট এক কোটি সাতাশ লক্ষ কপি বিক্রয়বৃদ্ধি নগণ্য ঘটনা নয়। অন্যপক্ষে, যখন মনে রাখি যে আলোচ্য দশ বছরে ভারতের জনসংখ্যা বেড়েছে পনের কোটি, তখন অনুভব করি সাময়িক পত্রের বিক্রয়বৃদ্ধির হার আরও অনেক বেশি হওয়া উচিত ছিল। বিশেষ করে যখন ওই সময়ে সাক্ষরের সংখ্যা বেড়েছিল ন কোটি।

ভারতবর্ষে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার কোনও সঠিক খতিয়ান ছিল না। প্রথম প্রেস কমিশনের রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পারি, যে ১৯৫২ সালে সাময়িক পত্রের সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে চার হাজার। তাঁরা রিপোর্টে আক্ষেপ করেছিলেন পূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য না পাওয়ায় তাঁদের নিধারিত সংখ্যা নির্ভুল না হতে পারে। তবে সংখ্যাটি যে বাস্তবের কাছাকাছি ছিল সেটা প্রতিষ্ঠিত হল প্রেস রেজিস্ট্রারের প্রথম রিপোর্টে। তিনি প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন ১৯৫৬ সালে ভারতীয় সাময়িকপত্রের সংখ্যা ছিল চার হাজারের কিছু বেশি। পরের বছরই সংখ্যাটি পাঁচ হাজার অতিক্রম করে। তাহলে দেখা গেল ১৯৫২ থেকে ১৯৭৩—এই একুশ বছরে সাত বা সাড়ে সাত হাজার নতুন পত্র-পত্রিকা সংযোজিত হয়েছিল। এবং পরের দশ বছরে আবার সাড়ে সাত হাজার। এই গতিবেগ বৃদ্ধি বা ত্বরণের চিহ্নই কি বিপ্লব, না বিস্ফোরণ?

মনে হয়, শুধু সংখ্যার হিসাবে গেলে প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি হবে না। সংখ্যাবিচারেরও অন্য দৃষ্টিকোণ আছে। পূর্বেই বলেছি, ষোলটি স্বীকৃত ভাষা এবং এ ছাড়া ৭৫টি আঞ্চলিক ও বিদেশী ভাষাতে আমাদের পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মোট বৃদ্ধির সংখ্যাকে ষোল বা আঠার দিয়ে ভাগ করলে (কারণ মূল ষোলটি বাদ দিলে, অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা সামান্য) বৃদ্ধি খুব গুরুতর মনে হবে না।

পাঁচ হাজার হোক অথবা পনেরো হাজার, অতগুলি সাময়িক পত্রের সঙ্গে আমাদের কারও পরিচয় নেই, সাক্ষাৎ-ই নেই। তাই বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দী পত্রিকা গুলির আলোচনাই যথেষ্ট হবে। এসপ্লানেডের গুমটি বা কলেজস্ট্রীটের স্টলের নিয়মিত দর্শকও কি অনুমান করতে পারবেন যে ১৯৮৩ সালে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাময়িক পত্রের সংখ্যা ছিল ১৫৩৮ এবং হিন্দীতে ৫৪৬৬? বলা বাহুল্য এই সংখ্যা দুটি এখন, ১৯৮৬ সালে আরও বাড়ারই সম্ভাবনা। তবু, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা অগ্রাহ্য করা যায় না। যে কোনও সুলভ বই ও সাময়িকপত্রের স্টলে গেলেই বিচিত্র, বহুবর্ণ প্রচ্ছদের অগণিত পরিচিত অপরিচিত পত্র পত্রিকা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা রঙের বিস্ফোরণে চমৎকৃত হই। কতগুলি পত্রিকা দেখলাম, তাদের মিলিত বিক্রি কত, এসব কথা তখন গৌণ হয়ে পড়ে। অঙ্গসজ্জায় মুদ্রণসৌকর্যে, প্রচ্ছদের বৈচিত্র্যে, সৌন্দর্যে এবং বর্ণচ্ছটায় আমরা প্রভাবিত না হয়ে পারি না। বস্তুত, পত্রিকাগুলির অকস্মাৎ রমণীয়তা আমাদের মুগ্ধ করে। সেগুলি হাতে নিয়ে দেখতে ভাল লাগে। দেখে আরও মোহিত হই। শুধু বহিরঙ্গ সজ্জায় নয়, বিষয়ের নির্বাচনে, রচনার দুঃসাহসিকতায় আমরা অনুভব করি সাময়িক পত্রিকা জগতে একটা বিপ্লবের সূচনা হয়েছে। তখন আর বিশ্বাস করতে বাধা হয় না যে এমন মনোহর কাগজ বিক্রিতেও অব্যর্থ বেশি হবে। এই বিশ্বাসপ্রবণতা সংক্রামক। শুধু অনধিকারী সাধারণ পাঠক নয়, পেশাদার, বিচক্ষণ মানুষেরাও এই বিশ্বাসের সংক্রমণ প্রতিহত করতে পারেন না। তাঁদের বিবেচনায় এমন মনোমোহিনী পত্রিকার বহুল বিক্রি হওয়াই সম্ভব; এবং এই বিবেচনা থেকে তাঁরা অনায়াস সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে পত্রিকাগুলির, অন্তত বিশিষ্ট কটির, যেগুলি তাঁদের মনোহরণ করেছে, অবশ্যই প্রচুর বিক্রি হয়।

অথচ, কোন কাগজের বা পত্র-পত্রিকার প্রচার কত বেড়েছে, তার বিক্রির গতিপ্রকৃতি কেমন, এসব তথ্য জানবার জন্য বেশি দূরে বা বেশি গভীরে যেতে হয় না। অডিট বুরো অফ সার্কুলেশনস নামের স্বেচ্ছাগঠিত যে সংস্থাটি প্রকৃত বিক্রির সার্টিফিকেট দেন, তাকে মান্যতা জানিয়ে ছোট বড় অনেক খবরের কাগজ এবং পত্র-পত্রিকা তার সদস্য হয়েছেন। অডিট ব্যুরো অফ সার্কুলেশনস, সংক্ষেপে এ বি সি-র সদস্য সংখ্যা ২৮৭। তার মধ্যে ১৬২টি হল সাময়িকপত্র। আমেরিকায় এ বি সি-র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯১৪ সালে। ভারতবর্ষে এ বি সি-র স্থাপনা হল ১৯৪৮ সালে। বিলম্বের জন্য আমাদের অপ্রতিভ হবার কারণ নেই। জাপানের মতো উন্নত দেশে ষাটের দশকে যখন এ বি সি-র স্থাপনা হল তখন অনেক বড় কাগজই এ বি সি-তে যোগ দিতে ইতস্তত করেছিলেন। যাঁরা এ বি সি-র সদস্যতালিকার বাইরে তাঁদের কল্পিত বিক্রয় সংখ্যা দাবি করবার একটা সহজ অধিকার থাকে। সকলে যে সেই অধিকার যথেচ্ছ প্রয়োগ করেন এমন হয়তো নয়। তবু এ বি সি-র লঘু শৃঙ্খলার মধ্যেও যাঁরা নিজেদের আনতে চান না, তাদের যুক্তির সমর্থন পাওয়া কঠিন। এ বি সি-র সদস্যেরা যে বিক্রয় সংখ্যার প্রত্যায়িত ঘোষণাটি

পান সেটিও যে সর্বৈব সত্য, এমনও নয়। প্রকাশকের বিক্রয় সম্বন্ধে একটু অতিকথনের প্রবণতা থাকে কারণ বিক্রয় শুধু তার সফলতার সূচকই নয়, বিক্রয় সংখ্যার আধিক্য তাকে বিজ্ঞাপন পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে। বিক্রয় সংখ্যা সম্বন্ধে প্রকাশকের দুর্বলতাকে সরাসরি অপভাষণ না বলে, যদি বলি এটা তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি, তাহলে তাঁকে ক্ষমা করা যেতেও পারে, কিন্তু সত্য গোপন থেকে যায়। এ বি সি-র নিয়ম শৃঙ্খলা তবু আমাদের সত্যের কাছকাছি পৌঁছে দেয়।

কিছুকাল হল কাগজের পাঠকের (গ্রাহক বা ক্রেতা থেকে ভিন্ন) সাংখ্যিক এবং চারিত্রিক সমীক্ষার আয়োজন হয়েছে। দু বছর আগে তৃতীয় ন্যাশনাল রীডারশিপ-সার্ভেতে যে সর্বশেষ সমীক্ষা হয়, সেখানে ওই ১৯,০০০ পত্রিকার মধ্যে মাত্র ২০১টি অনুসন্ধানের যোগ্য বলে স্বীকৃত হয়েছিল। যোগ্যতার মানের জন্য প্রধান নির্ধারক ছিল প্রকাশনের শহরে পত্রিকার বিক্রি কত। প্রকাশনের শহরে পাঁচ হাজারের ওপর বিক্রি হলে, তবে সেই পত্রিকা সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর অর্থ এই যে বিশেষজ্ঞদের মতে মাত্র ২০১টি পত্রিকা আমাদের প্রণিধান যোগ্য।

আমরা আবার সেই বিন্দুতে ফিরে এলাম যেখানে বিপ্লব বা বিস্ফোরণের প্রধান যে লক্ষণটি প্রত্যক্ষ গোচর সেটি হল আজকের পত্রিকার অতি নয়নলোভন রূপ। অনুসন্ধান করলে আমরা এখানে প্রযুক্তির প্রভাব দেখতে পাব। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত, ইন্দিরা গান্ধীর শাসনে, যার শেষের প্রায় দু বছর এমার্জেন্সি, ভারতীয় মুদ্রণালয়ে কোনও আধুনিকীকরণ সম্ভব হয় নি। জনতা সরকার শাসনভার নেবার পর খবরের কাগজের যন্ত্রাদি আমদানির ওপর অনেক বিধি নিষেধ শিথিল করে দিয়েছিলেন। প্রায় পনের বছর স্থাণু ও স্থবির হয়ে থাকবার পর ১৯৭৭ সালে এদেশে আবার খবরের কাগজের মুদ্রণালয়ের আধুনিকীকরণ শুরু হয়। জনতা সরকারও অবশ্য সংবাদপত্রপ্রেমী ছিলেন না। তাঁরাও বিজ্ঞাপনের আয় সঙ্কোচনের একটা আইন করেছিলেন। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ।

আমদানি সুগম হবার ফলে ভারতবর্ষে এবার যে সব যন্ত্রাদি আমদানি হতে লাগল, তারা দুধাপ ডিঙিয়ে আধুনিক। ফটো কম্পোজিং এর ক্ষেত্রে একেবারে আধুনিকতম—থার্ড জেনারেশনের। ছাপার জন্য অফসেট রোটারি এবং শীট থেকে বহুবর্ণ ছাপার ভাল নতুন নতুন দ্রুতগতি মেশিন আমদানি হল। যেন মুহূর্তে ভারতবর্ষে ছাপার উন্নতি হয়ে গেল। লেটারপ্রেস রোটারিতে রং ছেপে আমরা হাত না পাকিয়ে সোজাসুজি অফসেটে রঙের ছাপায় পৌঁছে গেলাম। মুদ্রণের চমকপ্রদ উৎকর্ষে মুদ্রাকর ও পাঠক উভয়ে আনন্দিত হলেন। নবতম প্রযুক্তির প্রয়োগে সুন্দরভাবে এবং অল্পতর খরচে পত্রিকা ছাপা, বিশেষ করে বহুবর্ণ ছবি মুদ্রণ করা সহজ হয়ে গিয়েছিল। তখনই দেশে স্ক্যানারও আমদানি হতে আরম্ভ করেছে, যার সাহায্যে উচ্চমানের বহুবর্ণ ছবির মুদ্রণ আমাদের আয়ত্তে এসে গিয়েছিল।

ইণ্ডিয়া টুডে, সানডে বা উইকের সাফল্য দেখে কোনও সিদ্ধান্ত করলে সেটা অভ্রান্ত নাও হতে পারে

পত্র পত্রিকা বর্ণসমৃদ্ধ হল, মুদ্রণ দ্রুত হল, ফটোকম্পোজিং-এর দাক্ষিণ্যে পাঠ্যাংশ উজ্জ্বল হল এবং সঙ্গে সঙ্গে সাময়িকপত্র সংখ্যাতেও কিছু বাড়ল। আরও একটি জিনিস হল। সম্পাদকীয় ভাবনাতে একটা নতুনত্বও এল। সে কথা পরে হবে। আগে প্রযুক্তিবিদ্যার সুবিধার একটা উদাহরণ দিই।

এখন যেমন ফটোকম্পোজিং এবং অফসেট মুদ্রণ সকলের আয়ত্তাধীন, আগে তৎকালীন আধুনিকতম প্রযুক্তি সকলের কাছে সমানভাবে লভ্য ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রায় এক দশক আগে আমাদের প্রযুক্তিক কুশলতাও তখন তেমন অগ্রসর ছিল না। টাইমস অফ ইণ্ডিয়া গোষ্ঠী একটি ফটোগ্রাভিয়র রোটারি আমদানি করেছিলেন। শোনা যায় যন্ত্রটি একবার হাত ফিরি হয়ে পৌঁছেছিল। কিন্তু এদেশে তখন ফটোগ্রাভিয়র পদ্ধতি সম্পূর্ণ অভিনব। ঈষৎ জটিলও। সবার সামর্থ্য ছিল না। থাকলেও তাঁরাও অনুরূপ যন্ত্র আনবার সুযোগ পেতেন কি না সন্দেহ। টাইমস অফ ইণ্ডিয়া গোষ্ঠী তখন

প্রসারে সাফল্যের পর কেন অতি প্রতিষ্ঠিত কাগজেরও বিলুপ্তি হয় তার কারণ অর্থনৈতিক। সাময়িক পত্র অতি মাত্রায় বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞাপনের প্রাচুর্য না থাকলে মূল্যবান কাগজে বহুবর্ণ, চিত্রবহুল পত্রিকা তৈরি করা বিশেষ লোকসানের ব্যবসা হবে।

ব্রিটিশের সম্পত্তি, এদেশ ছাড়বার কথা তাঁদের কল্পনার বাইরে। ফটোগ্রাভিয়র পদ্ধতির বিশেষত্ব হল নিউজপ্রিন্টের মতো কমদামি কাগজেও উজ্জ্বল বহুবর্ণ ছবি ছাপা যায়। অন্য পদ্ধতিতে ছাপতে গেলে অধিক মূল্যের কাগজের প্রয়োজন, যার ফলে উৎপাদিত পত্রিকার দাম বেড়ে যায় এবং ফটোগ্রাভিয়রে ছাপা পত্রিকার দাম অনেক কম রাখা সম্ভব ছিল। শুধুমাত্র প্রযুক্তি ও পদ্ধতির আধিপত্যে টাইমস গোষ্ঠীর সবকটি পত্রিকা স্বকীয় ক্ষেত্রের শীর্ষে ছিল বললে হয়তো অন্যায় হবে। নিশ্চয় সম্পাদকীয় দক্ষতা এবং ব্যবসায়িক কুশলতাও ওই পত্রিকার সাফল্যের কারণ। কিন্তু প্রধানতম কারণ ছিল ওই বিশেষ পদ্ধতি, যার ওপর টাইমস গোষ্ঠীর তখন একাধিকার।

যুদ্ধের ছ বছর ভারতীয় সংবাদপত্রের বৃদ্ধি অনিবার্যভাবে সঙ্কুচিত ছিল। অন্য বাধা নিষেধ তো ছিলই, তার ওপর কাগজের ওপরও কন্ট্রোল ছিল। অনুমান করি, ওই সময়টাতে নতুন কিছু হবার সম্ভাবনা ছিল না প্রকাশনার ক্ষেত্রে। যুদ্ধান্তের সাত বছর পরে যখন টাইমস গোষ্ঠীর নতুন ফটোগ্রাভিয়র যন্ত্র এল জার্মানি থেকে তখনও ওই ছাপবার পদ্ধতি জটিল বলে এবং প্রশিক্ষিত কর্মীর অভাব বলে আর কোনও প্রকাশক ফটো গ্রাভিয়র রোটারি যন্ত্র ক্রয় করেননি। টাইমসের আধিপত্য ষাটের দশকের মধ্য পর্যন্ত অপ্রতিহত চলেছিল। কী উপায়ে জানি না কলকাতার ইণ্ডিয়ান প্রেসে একটি ফটোগ্রাভিয়র যন্ত্র ছিল। তাঁরা ওই যন্ত্রের সম্ভাবনার সুযোগ আশা করে, ইলাস্ট্রেটেড উইকলির মত একটি সাপ্তাহিক বার করেছিলেন—নাম ওরিয়েন্ট উইকলি। পত্রিকাটির অকালমৃত্যু হয়। মুদ্রণের কোনও অসুবিধা না ব্যবস্থাপনার কোনও ত্রুটি অথবা সম্পাদকীয় অক্ষমতা, অথবা সবগুলির সমবেত

ফলের ওই পরিণতি কি না জানি না। এই ঘটনার অল্পকাল পরেই বম্বে থেকে ইলাস্ট্রেটেড উইকলির একটি প্রতিযোগীর জন্ম হয়। শুনেছি, উদ্যোক্তা কুসুম নায়ার, সম্ভবত সম্পাদিকাও, অতি দক্ষ উদ্যোগী মানুষ ছিলেন। সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম ছিল ইণ্ডিয়া উইকলি। বোধ হয় অফসেটে ছাপা হত। দামও ইলাস্ট্রেটেড উইকলির থেকে কম রাখা হয়েছিল। কিন্তু এই পত্রিকাটিরও শিশুমৃত্যু ঘটল। টাইমসের মুদ্রণ পদ্ধতির একাধিকারে পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে ওই গোষ্ঠীতে পরের পর সাময়িক পত্রিকা জন্ম নিয়েছে। তখনও রোটারি অফসেট বা ওয়েব অফসেট চালু হয়নি।

আমাদের কৈশোরে একটি সিনেমার মাসিক পত্র ছিল—ফিল্ম্ ইণ্ডিয়া। আর্ট পেপারে ছাপা হত। দাম মনে হচ্ছে একটাকা ছিল। বহুবর্ণ। সিনেমার কাগজ হিসেবে ফিল্ম্ ইণ্ডিয়া সর্বাগ্রগণ্য ছিল। সম্পাদক বাবুরাও প্যাটেল ছাত্র সমাজকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন। তাঁর উজ্জ্বল, কটু তীব্র, সরস রচনা ফিল্মের বিষয়ে লেখার শেষ কথা ছিল। মধ্য পঞ্চাশে টাইম্স্ গোষ্ঠীর ফিল্মফেয়ার প্রকাশিত হল। ফটোগ্রাভিয়রে মুদ্রিত, বহুবর্ণ ঝলমল করা কাগজ, দামে কম, কারণ নিউজপ্রিন্টে ছাপা, আর্টপেপার লাগে না, ত্রিবর্ণের ব্যয়বহুল ব্লক করতে হয় না, যার ব্যয়ভারে ফিলম ইণ্ডিয়ার দাম কম করা কদাচ সম্ভব ছিলনা। তীব্র স্রোতের মুখে তৃণের মতো অতকালের প্রতিষ্ঠিত ফিলম ইণ্ডিয়া নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আবার প্রযুক্তির আধুনিকতার জয়। সম্পাদকীয় উৎকর্ষ? হয়তো ছিল। কিন্তু ষাটের দশকে যখন অফসেটের সবে প্রবর্তন হচ্ছে, নতুন সিনেমার কাগজ এল স্টারডাস্ট। ফিলমফেয়ার অগৌণে পরাজিত হল। পদ্ধতির একাধিকবার থেকে বঞ্চিত হয়ে আজ টাইম্স গোষ্ঠীর সব সচিত্র পত্রিকাগুলিই পিছিয়ে পড়েছে। অপার সম্পাদকীয় দক্ষতা সত্ত্বেও? প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার পদ্ধতিতে পরাস্ত হয়ে সম্পাদকীয় শৌর্যে কতটুকু ভূমি অধিকার করা যায় সেই যুদ্ধে নেমেছেন ইলাস্ট্রেটেড উইকলির নবীন সম্পাদক প্রীতীশ নন্দী। কিন্তু এখন রণ বড় ভীষণ, সকলের হাতেই এক অস্ত্র। এই বছরের প্রথম বর্ষার্ধের বিক্রয়সংখ্যা এখনও হস্তগত হয়নি। কিন্তু আগের বর্ষার্ধে ইলাস্ট্রেটেড উইকলির বিক্রি দেখা যাচ্ছে একটু পড়েই গিয়েছিল।

ইণ্ডিয়া টুডের জন্ম হয়েছিল প্রযুক্তির পালাবদলের সন্ধিক্ষণে। ১৯৭৫-এর ডিসেম্বরে ইণ্ডিয়া টুডে যখন প্রকাশিত হল, তখন দেশে ইমার্জেন্সি চলেছে। ক্যানাডিয়ান লর্ড টমসন ভারতবর্ষে কাগজ বের করবার আশায় একটি তৎকালিক আধুনিক মুদ্রণালয় স্থাপনা করেছিলেন দিল্লীর উপকণ্ঠে। সেই প্রেসটি ইতিপূর্বে ইণ্ডিয়া টুডের মালিকদের হাতে আশায় তাঁরা তখন সর্বাধুনিক যন্ত্রের অধিকারী। অল্পকাল পরেই জনতা সরকার বিধিনিষেধ শিথিল করায় আরও নতুন যন্ত্রাদির আমদানি করে এবং নিশ্চয় সম্পাদকীয় পারদর্শিতায় ইণ্ডিয়া টুডে ক্রমাগত এবং দ্রুত উন্নতি করল, শুরুর পনের হাজার থেকে আজ প্রতি পক্ষে তিন লক্ষের বেশি।

ইণ্ডিয়া টুডে, সানডে বা উইকের সাফল্য দেখে কোনও সিদ্ধান্ত করলে সেটা অভ্রান্ত নাও হতে পারে। সানডের জন্ম তো আরও পরে। তখন ফটোকম্পোজিং-এর তৃতীয় পর্যায়ের যন্ত্র এবং ছাপার অতি দ্রুতগতি অফসেট ভারতবর্ষে অনেকগুলি বসে গেছে। তার ওপর অবশ্যই যোগ হয়েছিল সম্পাদকীয় তারুণ্য এবং তজ্জনিত সাহস ও বৈচিত্র্য। কিন্তু এখন প্রতিযোগিতা তীব্র হয়েছে। তাই উইকের দৌড় বেশি হল না, হেরালড রিভিউ বন্ধ হয়ে গেল। ফ্রন্টলাইন হয়তো বড় কিছুর আশাই করেনি। দিল্লী বম্বেতে এই দশ বছরে অনেক আপাত সম্ভাবনাময় সাময়িকপত্র স্বল্প জীবনের পর অন্তর্হিত হয়েছে। পত্র-পত্রিকা দিল্লী ও বম্বেতে অধিক সংখ্যায় প্রকাশ হবার কারণ, ওই দুটি শহরে বিশেষ করে, অনেকগুলি তৎপর, সমৃদ্ধ, উপযুক্ত যন্ত্রাদিসম্পন্ন মুদ্রাণালয়ের স্থাপনা হয়েছে। নতুন পত্রিকা প্রকাশ করতে হলে, সম্পাদকীয় ও বিজ্ঞাপনসংক্রান্ত কাজের লোকজন থাকলেই

সাধারণভাবে দেখলে আমাদের যা বিস্মিত করবে তা হল, কত বিচিত্র বিষয়কে আশ্রয় করে নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। বিবিধ বৃত্তির ওপর পত্রিকা তো আছেই। স্বয়ং প্রেস রেজিস্ট্রার বিষয়ের বাইশটি শ্রেণীভাগ করেছেন। সূক্ষ্ম শ্রেণীভাগ করলে শতাধিক বিষয়ের ওপর প্রকাশিত পত্রিকা চিহ্নিত হবে।

হল। বিতরণের কাজ নেবারও এজেন্সি আছে। এছাড়া কোনও বড় মূলধন লগ্নী করবার প্রয়োজন নেই।

সাধারণভাবে দেখলে যা আমাদের বিস্মিত করবে, তাহল নতুন কত বিচিত্র বিষয়কে আশ্রয় করে নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। বিবিধ বৃত্তির ওপর পত্রপত্রিকা তো আছেই। স্বয়ং প্রেস রেজিস্ট্রার বিষয়ের বাইশটি শ্রেণী ভাগ করেছেন। সূক্ষ্ম শ্রেণীভাগ করলে শতাধিক বিষয়ের ওপর প্রকাশিত পত্রিকা চিহ্নিত হবে। কম্পিউটার বিষয়ক আমারই জানা তিনটি পত্রিকা আছে। অন্যান্য জনপ্রিয় বিষয়ের তো কথাই নেই। ফিল্ম-এর পত্রিকা হিন্দীতে আছে ৯৪টি। এবং বিশ্বাস করুন বাংলাতে ২১টি। বাংলার অন্যতম প্রধান অনুরাগের বিষয় হল খেলা। সেই খেলার পত্রিকা প্রেস রেজিস্ট্রার বলছেন, বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয় ২২টি। অথচ, আমরা মাত্র দুটির সন্ধান জানি। অপেক্ষাকৃত নতুন 'খেলা' এখন বিক্রিতে উঁচু—কিন্তু সেই বিক্রয় এ বি সি প্রত্যয়িত ৩০,০০০-এর আশেপাশে। দ্বিতীয়, 'খেলার আসর', এখন এ বি সির সদস্য নয়, স্বঘোষিত বিক্রি নিশ্চয় ত্রিশ হাজারের কম। ঘটনাটি বাঙালির কাছে আশ্চর্য ঠেকবে। যে খেলা নিয়ে বাঙালীর এত আবেগ, এত উচ্ছ্বাস, সেই বিষয়ের পত্রিকা সম্বন্ধে তাদের এত সামান্য আগ্রহ? এত কৌতূহলের অভাব?

মারাঠি ভাষায় খেলার পত্রিকা মাত্র একটি ছিল। প্রেস রেজিস্ট্রারের প্রকাশিত তথ্যও তাই বলে। এতদিন মহারাষ্ট্রের একমাত্র ক্রীড়া সাপ্তাহিক'ক্রীড়াঙ্গন'এর বিক্রি পনের কুড়ি হাজারে সীমাবদ্ধ ছিল। তারপর বছর তিন হল, সন্দীপ পাটিলের সম্পাদনায় বেরিয়েছে 'একচ ষটাকার' (একটাই ছক্কা), তার এখন বিক্রি ষাট হাজার। দুটি প্রায় সফল, বহু আলোচিত পত্রিকা দেখে, আরও দুটি খেলার কাগজ প্রকাশ হল মহারাষ্ট্রে মারাঠি ভাষায়। অষ্টপৈলু (চৌকশ), যার সম্পাদক অজিত ওয়াড়েকর। বিক্রি শোনা গিয়েছে ত্রিশ চল্লিশ হাজার। সর্বশেষ খবর হল "চৌকার"—বিক্রি পনের হাজার—কিন্তু তার সম্পাদক সুনীল গাভাসকর।

বাংলায় মেয়েদের পত্রিকার ক্ষেত্র দেখলেও আশ্চর্য হতে হয়। এতদিন মাঝে মাঝে কোনও প্রকাশক স্বল্পায়ু দু'একটা মেয়েদের পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। তারা নিঃশেষে বিদায় নিয়েছে। কোনও ছাপ রেখে যেতে পারে নি। কিছুদিন আগে অপেক্ষাকৃত বৈভবশালী প্রকাশক ইত্যাদি প্রকাশনী 'সুকন্যা' নামে মেয়েদের একটি পাক্ষিক প্রকাশ করেছিলেন। সর্বশেষ এবিসি রিপোর্টে দেখছি সুকন্যার বিক্রি মাত্র পঁচিশ হাজার। সেই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে সহসা দুই বৃহৎ গোষ্ঠীর দুটি পত্রিকা অবতীর্ণ হয়েছে, আনন্দবাজার গোষ্ঠীর 'সানন্দা' আর এলাহাবাদের মিত্র প্রকাশনের 'মনোরমা'। কত বিক্রি হয় শুনেছি, আন্দাজও করতে পারি, ভবিষ্যতে কত বিক্রি হবে জানি না। এর আগেই মিত্র প্রকাশনের প্রথম বাংলা পত্রিকা 'আলোকপাত' বেরিয়েছে। বাংলার ছোট বাজারে এই পত্রিকাগুলি বড় না হোক একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

ভারতীয় দুটি ভাষার পত্রিকার বিক্রি উল্লেখযোগ্য। তামিল এবং মালয়ালাম। তামিল ভাষায় লক্ষের ওপর বিক্রি হয় এমন সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা আট। সর্বোচ্চ বিক্রি সাপ্তাহিক 'কুমুদম'-এর —সওয়া ছ'লক্ষ। এই দলে যেটি কনিষ্ঠ, যার বিক্রি লক্ষের ওপর, কুঙ্কুমম্, তার জন্ম ১৯৭৮-এ। অন্যতম মাসিক পত্রিকা 'তুঘলকে'র জন্ম ১৯৭০-এ, এখন বিক্রি দু'লক্ষের বেশি। 'কুমুদম' ও 'তুঘলকে'র বিক্রি বেশির অন্যতম কারণ, তাদের দাম কম, যথাক্রমে এক টাকা ও একটাকা পঁচিশ পয়সা। ম্যাগাজিন বিপ্লব বা বিস্ফোরণের অন্য কোনও চিহ্ন নেই তামিল ভাষায়। নতুন প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। আসলে প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলিরই উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি হচ্ছে। নতুনেরা বিশেষ স্থান পাচ্ছে না।

মালায়ালাম ভাষাতেও বোধকরি সংপৃক্ত হয়ে গিয়েছে। যার জন্য অমন একটা শিক্ষিত রাজ্যেও

সাময়িক পত্রের সংখ্যা তেমন বাড়ছে না। বাড়লেও তাদের বিক্রি এতই নগণ্য যে তাদের কোনও প্রভাব লক্ষিত হয় না। এখানে সর্বপ্রথম হল সাপ্তাহিক মালায়ালম মনোরমা, বিক্রি সাড়ে পাঁচ লক্ষ। পরের স্থানে মনোরাজ্যম, একই শহর থেকে প্রকাশিত, আড়াই লক্ষেরও কম। আশ্চর্য, কেরালাতেও ছোটদের কাগজের সামান্য বিক্রি। সব থেকে বেশি বিক্রির ছোটদের কাগজ 'বালরমা' দেড় লক্ষেরও নীচে। কিন্তু মালায়ালম ভাষায় মেয়েদের কাগজ 'বণিতা', মাসিকপত্র তিন লক্ষের কাছাকাছি।

কেরালায় একটি অষ্টম আশ্চর্য আছে। তার নাম মঙ্গলম। সাদা কালোয় ছাপা ডেমি কোয়ার্টার সাইজের বত্রিশ পাতার সাপ্তাহিক। এ বি সি-র সর্বশেষ হিসাবে দেখছি বিক্রি প্রায় তের লক্ষ। এই দশকের কাগজ। সেদিন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ভেরগীজ বললেন, এখন চোদ্দ লক্ষ চলছে। ভেরগীজ সেই ধরনের সপ্রতিভ, স্মার্ট, দুঃসাহসী নবযুবক নন, যাঁদের সম্পাদনায় পত্র-পত্রিকা এখন দিগন্ত উন্মোচনের কাজে নেমেছে। সেই সম্পাদকেরা রীতির নিষেধ এবং চিরাচরিত গণ্ডী এমন অবজ্ঞাভরে অতিক্রম করেন যে পাঠকের কাছে তাঁরাই তাঁদের কীর্তির চেয়ে দ্রষ্টব্য হয়ে পড়েন। ভেরগীজ নিরভিমান, কমকথা বলেন, ইংরেজী বলতে পারেন না, বিশাল এই দেশের সর্বোচ্চ বিক্রির মঙ্গলমের সম্পাদকের সঙ্গে তাই আলাপচারী সন্তোষজনক হল না। বোঝা গেল মানবিক ঘটনা, আদালতের মামলা, নারীর বঞ্চনা ইত্যাদি আশ্রয় করে নতুন পুরনো খবর মঙ্গলমের প্রধান উপজীব্য, সব সম্পাদকের যা মনোবাঞ্ছা, বহুতর পাঠক আমার কাগজ পড়ুক, সেই ইচ্ছা পূরণের একটা গোপন সূত্র ভেরগীজ খুঁজে পেয়েছেন।

কেরালার আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য, ভাবনার বিষয়ও। শ্লীল-অশ্লীলের বিভাজনরেখা এতই সূক্ষ্ম এবং অস্পষ্ট যে বিচারপতিরাও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে অসুবিধায় পড়েন। তারই সুযোগ নিয়ে কেরালায় ঝাঁকে ঝাঁকে যৌন পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। অনেক সময় আপত্তিকর পত্রিকার প্রকাশকের হদিসই পায় না পুলিস। হদিস পাবার আগেই পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয় নতুন আর কোনও নামে। নামগুলিও অতি বিশুদ্ধ, যেমন ভারতধ্বনি, জনধ্বনি। নগ্ন, অর্ধনগ্ন স্ত্রীলোকের ছবি, আশ্লেষের অন্তরঙ্গ বর্ণনা, উচ্চকণ্ঠ প্রচ্ছদ—সব মিলিয়ে কামনাউদ্রিক্ত করার প্রকাণ্ড সমারোহ। সেই সব পত্রপত্রিকা কত বিক্রি হয়, কোনও হিসাবে ধরা পড়ে না। হয়তো খুব বেশি নয়। কিন্তু তাদের উপস্থিতি মানুষের দেহের গুপ্ত কোনও যৌন ব্যাধির মতো কেরালার সমাজদেহে বিস্ফোরিত হচ্ছে।

একেবারে প্রতিবিম্ব নয়, কিন্তু ওই ধরনের পত্রপত্রিকা হিন্দী পত্রিকার বাজার আচ্ছন্ন করে আছে। একেই হিন্দীতে বিক্রী বেশি, কাজেই যৌন-কণ্ডুয়ন করা এই পত্রিকাগুলির বিক্রিও সামান্য হবে না। গার্হস্থ্য পত্রিকা, যা ভদ্র, মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়েরা সচ্ছন্দে সবার সামনে পড়তে

বাংলায় মেয়েদের পত্রিকার ক্ষেত্র দেখলেও আশ্চর্য হতে হয়

পারেন, যেমন মায়া বা মনোরমা বা মনোহর কাহানিয়াঁ—তাদের বিক্রি দু'লক্ষ থেকে চার লক্ষের মধ্যে। এই শ্রেণীর কাগজের মধ্যে এমন নতুন কোনও পত্রিকা দেখতে পাচ্ছি না যার পাঠকসমাজে সামান্যমাত্রও প্রভাব আছে। বাংলাতেও কিছু পত্রিকা, পিন দিয়ে সিল করা, যাতে পাঠকের আগ্রহ আর একটু তীক্ষ্ণ হয়, এমন উত্তেজক পত্রপত্রিকা দেখা যাচ্ছে। এরা সব, সব ভাষাতেই দস্যু মোহনের মতো, সর্বত্র দেখা যায়। কিন্তু মনে হয়, সেই দস্যুর মতোই পাঠকের চরিত্র লুণ্ঠনের আগেই অদৃশ্য হবে।

এত কথা বলার অর্থ এই নয় যে নতুন কোনও উল্লেখযোগ্য পত্রিকার সম্প্রতি আবির্ভাব হয়নি। ইংরেজি, গুজরাটি, মারাঠি, হিন্দী, চার ভাষায় প্রকাশিত 'মানি' পত্রিকার প্রকাশকের সঙ্গে সম্প্রতি সাক্ষাৎ হয়েছিল। সার্থক অর্থ লগ্নী করবার নানা উপায়, শেয়ার বাজারের হালচাল, কিছু অর্থনৈতিক খবর ইত্যাদি নিয়ে এই পত্রিকার এখনও বছর ঘোরেনি। প্রকাশক বললেন মোট বিক্রি দু'লক্ষে পৌঁছেছে। আমার বিশ্বাস, পাঠকের অনুরাগের, আগ্রহের এমনই বহু অকল্পনীয় বিষয়ে নতুন নতুন পত্রপত্রিকার সৃষ্টি হবে। আমাদের পত্রপত্রিকার ভবিষ্যৎ ভাববার প্রসঙ্গে আর একবার আমেরিকান নিসর্গে ফিরে যাওয়া যাক।

আমেরিকান পত্রিকার কথা উঠলেই সাধারণ পাঠকের মনে তিনটি পত্রিকার কথা অনিবার্য মনে আসবে। টাইম, রীডারস ডাইজেস্ট ও নিউজ-উইক। কুড়ির দশকে যখন টাইম প্রকাশিত হয় তখনও যথারীতি পত্রিকাটি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কেউ আশ্বাস দিতে পারেননি। পত্রিকার বিষয় পুরনো খবর। সেই খবরকেই নতুন সাজে এবং যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করে সহজ অথচ তীক্ষ্ণ, চতুর ইংরেজীতে ছাপলে যে সেটা পাঠ্য এবং উপাদেয় হবে, এমন ভবিষ্যদ্বাণী করা নিশ্চয় কঠিন ছিল। টাইমের অল্প পরেই আর এক উদ্যোগী প্রকাশক সৃষ্টি করেছিলেন রীডারস ডাইজেস্ট। এখানেও পত্রিকার রূপকল্পনার অভিনবত্ব তাকে অতি দ্রুত সফল করেছে।

আমেরিকান পত্রিকার কথা উঠলেই সাধারণ পাঠকের মনে আসবে, টাইম, রিডারস ডাইজেস্ট ও নিউজ উইক

'লাইফ' অনেক পুরনো পত্রিকা, শতবর্ষ পার হয়ে গিয়েছিল

পাঁচহাজার ডলারের মূলধনের সেই কাগজ নিউ ইয়র্কের গ্রীনিচ ভিলেজ থেকে প্রকাশিত, এখন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। এই মাসিক পত্রিকার এখন ৪১টি সংস্করণ বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত হয়, বিভিন্ন ভাষায়। তার মধ্যে অবশ্য ২৪টি সংস্করণ ইংরেজি ভাষায়। বিক্রির সংখ্যা তিন কোটি দশ লক্ষ। ডাইজেস্টের মতো দিগ্বিজয়ের কাহিনী সাপ্তাহিক টাইমেরও। আমেরিকায় এবং দেশের বাইরে কয়েক স্থানে একই সময় মুদ্রিত হয়ে টাইম কাগজ পৃথিবীব্যাপী তার ৪৫ লক্ষ ক্রেতার কাছে প্রায় একই সময়ে পৌঁছে যায়। টাইমের এই আশ্চর্য সাফল্যের পাশে একই প্রতিষ্ঠানে পালিত লাইফ পত্রিকার তিরোধান বিস্ময়কর। 'লাইফ' অনেক পুরনো পত্রিকা, শতবর্ষ পার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু টাইমের দখলে আসে ১৯৩৬ সালে। টাইম শুধু নামটাই রেখে পত্রিকার সম্পূর্ণ রূপান্তর করে, চেহারায় ও চরিত্রে। লাইফ সফলও হয়েছিল বিক্রিতে, তবু ১৯৭২-এর শেষ ভাগে লাইফের মৃত্যু হল। তার এক বছর আগে আর একটি প্রবল সাপ্তাহিকের মৃত্যু হয়েছিল, তার নাম 'লুক'।

প্রসারে সাফল্যের পর কেন অতি প্রতিষ্ঠিত কাগজেরও বিলুপ্তি হয় তার কারণ অর্থনৈতিক। সাময়িক পত্র অতি মাত্রায় বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞাপনের সমর্থন এবং প্রাচুর্য না থাকলে মূল্যবান কাগজে বহুবর্ণ, চিত্রবহুল পত্রিকা তৈরী করা বিশেষ লোকসানের ব্যবসা হবে। দৈনিকপত্রের বিশেষ দাপট, টেলিভিশনের প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা ইত্যাদি সাময়িকপত্রের বিজ্ঞাপনের আয় সামান্য সঙ্কুচিত করলেই লাইফের মত বৃহৎ বিক্রির কাগজ টাইমের মতো সম্পদশালী প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করে দিতে হয়। ১৯৭৮ সালে অবশ্য আবার লাইফের পুনঃপ্রকাশ শুরু হয়েছে। বিক্রির দিক থেকে খুব সফল হয়নি। হয়তো ব্যবসার দিকে হয়েছে। সম্পূর্ণ-বিজ্ঞাপন-নির্ভর নয় এমন মাসিকপত্রিকা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিনের সাফল্যের কাহিনী বড় চিত্তাকর্ষক। মাসিকপত্রের মধ্যে সব চেয়ে অধিক বিক্রীত ন্যাশনাল জিওগ্রাফির বয়স ৯৮ বছর।

আমেরিকাতে এখন, ১৯৮৫ সালে সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা ১১০৯২। অর্থাৎ পঁচাশি বছরে আমেরিকার মতো সচ্ছল দেশে পত্রিকার সংখ্যা ঠিক দ্বিগুণ হয়েছে—অথবা, বলা যায় এই সময়ের মধ্যে পত্রিকার সংখ্যায় যুক্ত হয় সাড়ে পাঁচ হাজার। এই সংখ্যার সঙ্গে আমাদের দশ বছরের বর্ধিত সংখ্যার তুলনা করব না। কিন্তু মনে না রাখলে চলবে না যে, আমাদের পত্রিকাগুলিও বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর। আধুনিক প্রযুক্তি পদ্ধতিকে যতই সরল করুক, যন্ত্রাদি যতই সুলভ হোক, প্রকাশনার কাজ যতই সহজ হয়ে আসুক আয়ব্যয়ের হিসাবটা বদলাবে না। যে কাগজ বেশি বিজ্ঞাপন পাবে তার পক্ষে অল্পতর দামে পত্রিকা বিক্রি করা সম্ভব হবে—এটা তো গণিতে সিদ্ধ। আমেরিকাতে দৈনিক কাগজের বিজ্ঞাপনের আয়ের এক চতুর্থাংশ আয় হয় সাময়িকপত্রিকাগুলির। টেলিভিশন ক্রমশ পত্রিকার বিজ্ঞাপনের আয়ে আগ্রাসন করছে। ভারতবর্ষে সাময়িকপত্রিকার সম্মিলিত আয় কত তার কোনও হিসাব আজও হয়নি। উন্নতিশীল দেশে বিজ্ঞাপনের আয় ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৯৮১ সালে এই বাবদ দেশে ব্যয় হয়েছিল ২০০ কোটি টাকা, ১৯৮৬তে হবে ৪৫০ কোটি। ওই টাকার ৩৮৫ কোটি ব্যয় হবার সম্ভাবনা দৈনিক কাগজের বিজ্ঞাপনে। অবশিষ্ট যা থাকবে তার থেকে সাময়িক পত্রকে বিজ্ঞাপনের সঞ্জীবনী সংগ্রহ করতে হবে।

> **এ-বি-সি'র সদস্যরা যে বিক্রয় সংখ্যার প্রত্যায়িত ঘোষণাটি পান সেটিও সর্বৈব সত্য, এমনও নয়। প্রকাশকের বিক্রয় সম্বন্ধে অতিকথনের প্রবণতা থাকে। কারণ বিক্রয় সংখ্যার আধিক্য তাকে বিজ্ঞাপন পাওয়ায় সাহায্য করে।**

সুতরাং, সাময়িক পত্রের সংখ্যার অকল্পনীয় কোনও বৃদ্ধি অনুমান করা যাচ্ছে না। বড় কাগজেরা এবং ভালো কাগজেরা অবশ্যই আরও বড় হবে। যে দৃশ্য আমেরিকাতে দেখা গিয়েছে এখানে তার ব্যতিক্রম হবার সম্ভাবনা কম। পত্রিকার সংখ্যা বাড়বে অন্য কারণেও। আমেরিকার মতো এখানে সন্ত্রাস প্রশিক্ষণের পত্রিকা হবে না হয়ত, কিন্তু মানুষের সীমাহীন ও বিচিত্র আগ্রহ নিয়ে নতুন নতুন বিষয়ের অনেক পত্রিকা আসন্ন। এখন শুধু তার ভূমিকা দেখা দিয়েছে। আমাদের জনসংখ্যা, সাক্ষরের ও শিক্ষিতের সংখ্যাবৃদ্ধি, আর্থিক সাচ্ছল্য এই সবের যোগফল সাময়িকপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে যে বিস্ফোরণ ঘটাবে আজকের পরিস্থিতি তার কাছে আতশবাজির সমান। দেশ

রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন

শান্তিনিকেতনের গঠন পর্বে রবীন্দ্রনাথ যাঁদের সাহায্যে ব্রহ্মচর্যাশ্রম গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন। বস্তুত ক্ষিতিমোহন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহচর।
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছে অনেক পরে। প্রথম পরিচয় তাঁর কাব্যরসের সঙ্গে। ১৮৯৭ সালে কাশীতে বিপিন দাশগুপ্ত ক্ষিতিমোহনকে রবীন্দ্রকাব্য পড়িয়ে শুনিয়েছিলেন। সেই থেকে তিনি তাঁর ভক্ত। আসলে রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন চিরপরিচিত উপনিষদ ও সন্ত-কবিদের ভাব। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরমাত্মীয়। রবীন্দ্রকাব্যগ্রন্থাবলী ছিল তাঁর চিরসঙ্গী। ক্ষিতিমোহন কবীর দাদূ প্রভৃতি মধ্যযুগীয় সন্তদের বাণী এবং বাউল সঙ্গীত ও ভারতীয় সাধনার মর্মে প্রবেশ করেছিলেন সেই কিশোর বয়স থেকেই। শুধু তাই নয়, সন্ত মতে বিশ্বাসী সুধাকর দ্বিবেদীর প্রেরণায় তিনি মাত্র পনের বছর বয়সে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ১৮৯৫-এর ২ ফেব্রুয়ারি। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কিভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন সে কথা তিনি নিজেই লিখেছেন—'তখন রবীন্দ্রকাব্যের একটি টালি-সংস্করণ ছিল। ১৮৯৭ হতে বছর সাতেক ঐরূপ একখানি রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থাবলী আমার চিরসঙ্গী ছিল। তাঁর কবিতাগুলির পাশে পাশে সব পুরাতন ভক্তবাণীর উল্লেখ করে রাখতাম। রবীন্দ্রকাব্য যে কত ভালো লাগত কী বলবো? সন্তবাণী তো শত শত বছরের পুরানো আর রবীন্দ্রনাথ জীবন্ত। এতদিন খেতাম আমসী, এখন পেলাম টাটকা ল্যাংরা আম। ধন্য হয়ে গেলাম।'
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোনারং তাঁর পিতৃভূমি হলেও ৩০ নভেম্বর ১৮৮০ সালে ক্ষিতিমোহনের জন্ম হয় ভারতীয় সংস্কৃতির পীঠভূমি বারাণসীধামে। তাঁর পিতার নাম ভুবনমোহন ও মায়ের নাম দয়াময়ী দেবী। শুধু জন্ম নয় তাঁর বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের শিক্ষাক্ষেত্র ছিল বারাণসী। সোনারং ছেড়ে তাঁর পূর্বপুরুষদের কেন বারাণসী প্রবাসী হতে হয় সে সম্পর্কে এক মজার ঘটনা আছে। ক্ষিতিমোহনের পিতামহের বয়স যখন ছাপান্ন তখন এক জ্যোতিষী তাঁর কোষ্ঠী বিচার করে বললেন তাঁর আয়ু আর মাত্র এক বছর মাত্র। এই কথা শুনে শেষ কটা দিন পুণ্য ক্ষেত্র কাশীতেই কাটাবেন বলে ক্ষিতিমোহনের পিতামহ কাশীতেই সংসার পাতলেন।
জ্যোতিষীর বিচার ভুল প্রমাণিত করে তিনি বেঁচে ছিলেন আরও পঁচিশ বছর। সেই থেকেই তাঁরা কাশীবাসী। বারাণসীর টোলে পড়াশুনা করে কুইনস কলেজ থেকে সংস্কৃতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আর এই কাশী থেকেই তিনি পেয়েছিলেন শাস্ত্রী উপাধি। দীক্ষাগ্রহণের পর সারা ভারত ঘুরেছেন তিনি স্বভাবসাধক সন্তদের বাণী সংগ্রহের নেশায়। ভারতীয় সন্ত-সাধনায় শাস্ত্র ও জাত-পাতের ভেদ মানা হয়নি কোনদিনই। প্রেমভক্তিই তাঁদের ধর্ম, মানুষই হল তাঁদের তীর্থমন্দির। প্রথমে গেছেন গুরুদের সঙ্গে রাজপুতানায়, আজমীঢ়ে নারায়ণায় দাদূ-পন্থীদের আখড়ায়, গেছেন সাঙ্গানেরে রজ্জবজীর মঠে। একের পর এক তিথিতে হাজির হয়েছেন এক তীর্থ থেকে আর এক তীর্থে। এইভাবে বছরের পর বছর তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন এইসব সন্তদের সঙ্গে ছায়ার মতন। আর তাঁদের মুখ-নিঃসৃত বাণী সংগ্রহে ক্ষিতিমোহন করলেন তাঁর ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। পরবর্তীকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধর মুখার্জি বক্তৃতামালায় (১৯২৯) ধরে রেখেছেন এই অভিজ্ঞতার কথা 'ভারতের মধ্যযুগের সাধনার ধারা' গ্রন্থে।
রবীন্দ্রকাব্য রসসিক্ত ক্ষিতিমোহন উন্মুখ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যলাভের আশায়। ১৯০৪ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ পড়বেন জানতে পেরে ক্ষিতিমোহন হাজির হয়েছিলেন শোনবার জন্য। কিন্তু ঘণ্টাখানেক চেষ্টা করে একটা জামা বিসর্জন দিয়ে ফিরে এসেছিলেন ব্যর্থ হয়ে। দেখতে পাননি তাঁর স্বপ্নের কবিকে। অবশেষে শিবনারায়ণ দাস লেনের বিপ্লবীদের আড্ডা 'ফিল্ড অ্যান্ড অ্যাকাডেমি'তে এক সন্ধ্যায় কবিকে দেখে মুগ্ধ চিত্তে ফিরে এলেন আবার কাশীতে। কিন্তু কবির সঙ্গে পরিচয় হয়নি। এরপর স্বদেশী আন্দোলনের যুগে সোনারং গ্রামে হঠাৎ সাক্ষাৎ হল পরম রবীন্দ্রভক্ত কালীমোহন ঘোষের সঙ্গে। তাঁরা দুজনেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা দিলেন। এ সম্পর্কে ক্ষিতিমোহন লিখেছেন—'আমি তখন রবীন্দ্রকাব্য ও কবিতা অধ্যয়নে রপ্ত ছিলাম। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে বাংলাদেশে বেড়াইতে আসিয়া রবীন্দ্রকাব্য লইয়াই দিনগুলি কাটাইতেছিলাম। আমি কালীমোহনকেও সেই কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত করিতে চাহিলাম। কালীমোহন তাহাতে সানন্দে ধরাও দিলেন।'
এরপর ক্ষিতিমোহন আবার ফিরে গেলেন কাশীতে। যোগ দিলেন কাশ্মীরের চম্বায় শিক্ষাসচিবের পদে। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের কানে পৌঁছে গেছে ক্ষিতিমোহনের কথা। কালীমোহন ঘোষের কাছ থেকে শুনে প্রথমে অজিত চক্রবর্তী এই প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞ উদার ক্ষিতিমোহনকে আশ্রমের কাজে কতটা প্রয়োজন তা কবিকে জানান। এই সূত্র ধরে ক্ষিতিমোহনের ঠিকানা যোগাড় করে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আশ্রমের কাজে যোগ দিতে আহ্বান জানালেন। পরে পাবনা কনফারেন্সে কালীমোহন ঘোষ কবিকে ক্ষিতিমোহন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বলেছিলেন। কবি নিঃসংশয় চিত্তে তাঁকে আবার অনুরোধ করে পত্র দিলেন। কবির আহ্বান পেয়ে ক্ষিতিমোহন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। চারিদিক থেকে বাধা এল। একমাত্র ভরসা তাঁর মা। ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে হিমালয়ের চম্বা রাজ্য ছেড়ে ক্ষিতিমোহন চলে এলেন কলকাতায়। কলকাতা তখন মানিকতলা বোম কেস নিয়ে উত্তাল। 'বন্ধু চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে কবিগুরুর সঙ্গে দেখা করতে জোড়াসাঁকোতে গেলাম। এই তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ আলাপ। তিনি বললেন—অসময় বসন্তরোগ হওয়ায়

আশ্রমে এখন ছুটি। আপনিও ছুটি সম্ভোগ করুন দেশে যান। আষাঢ় মাসে এসে কাজে যোগ দেবেন।'

১৯০৮ সালের জুলাই মাসে ক্ষিতিমোহন যোগ দিলেন শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। লোকপ্রেমের এই প্রতিভূকে আবিষ্কার করেছিলেন কালীমোহন ঘোষ। তিনিই কবিকে জানিয়েছিলেন এই লোক-সংস্কৃতির উদ্‌গাতার অসাধারণ কর্মকাণ্ডের কথা। সেতুবন্ধন হল প্রাচীন ভারত-আত্মার সঙ্গে নবীন বাণীমূর্তির। বহু দিনের আশা তাঁর পূর্ণ হল, পেয়ে গেলেন উপযুক্ত সাধনার তপোবন আর পেলেন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য। পেলেন ঘরের কাছে বাউলতীর্থ কেন্দুলীর মেলা। ক্ষিতিমোহনের শান্তিনিকেতনে যোগদানের ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে তাঁর অপ্রকাশিত দিনলিপিতে। এখানে অংশবিশেষ উদ্ধার করা হল : 'আমি আসিয়া যখন কাজে যোগ দিলাম সতীশচন্দ্র রায়ের (১৮৮২—১৯০৪) স্মৃতিতে আশ্রম মুহ্যমান। ...রবীন্দ্রনাথ যে "গুরুদেব" নামে পরিচিত, সেই নামটি সতীশচন্দ্রই রাখিয়া গিয়াছেন। হয়তো সতীশচন্দ্র এই নামটি পাইয়াছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে ; কিন্তু আশ্রমের সকলের কাছেই শুনিয়াছি, তাঁহারাও ইহা পাইয়াছেন সতীশচন্দ্রের নিকট হইতেই। ...অজিতকুমার চক্রবর্তী ছিলেন সতীশচন্দ্র রায়ের বন্ধু। ...আমার পুরাতন বন্ধু বিধুশেখর শাস্ত্রী...তাহা ছাড়া বৈজ্ঞানিক গ্রন্থলেখক বিখ্যাত জগদানন্দ রায় ও প্রসিদ্ধ শাব্দিক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অধ্যাপকগণ আশ্রমকে অলংকৃত করিতেছিলেন। আমি আসিবার প্রায় এক বৎসরকাল পরে নেপালচন্দ্র রায় আসিয়া আশ্রমে যোগ দেন। ...কবির গানের ভাণ্ডারী ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ। ...তাহাকে পাইয়া যেন কবির সুরের প্রবাহ মুক্তধারায় বহিয়া চলিয়াছিল। ...অজিতবাবু ও দিনেন্দ্রনাথ মুহূর্তের মধ্যে আমার বন্ধু বনিয়া গেলেন।'

ক্ষিতিমোহন যখন এলেন 'তখন গুরুদেবের দারুণ অর্থাভাব'। অজিত চক্রবর্তী মাত্র ত্রিশ টাকা মাসিক বৃত্তি নিতেন। এই সব দেখে শুনে ক্ষিতিমোহন মায়ের পরামর্শমত তাঁর প্রতিশ্রুত মাসিক বেতনের অনেকটাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। আশ্রমে যোগদান করলে সবাই তাঁর উপর আশ্রমের ভার তুলে দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত। এই নবীন সর্বাধ্যক্ষ আশ্রমের হালচাল কিছুই জানেন না, তিনি কবির কাছে জানতে চাইলেন কী আদর্শ নিয়ে এই আশ্রম স্থাপিত হয়েছে, কী ভাবে তিনি তা পরিচালনা করতে চান। এর উত্তরে কবি 'একখানি সুদীর্ঘ পত্র আনিয়া আমাকে দেন। পত্রখানি কুড়ি পৃষ্ঠাব্যাপী, এবং আগাগোড়া নিজের হাতে লেখা। তাহাতে ছাত্রদের প্রতিদিনকার কর্তব্যগুলি রীতিমত হিসাব করিয়া লেখা। তখন বিদ্যালয়ের একেবারে প্রাথমিক পর্ব। তখনই যে তাঁহার অন্তরে শিক্ষাজীবনের পরিপূর্ণ মূর্তিটি দেখা দিয়েছিল এই পত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রখানি লেখা কবিগুরুর পত্নীবিয়োগের মাত্র দিনদশেক পূর্বে—খুব উদ্‌বেগের একটি সময়ে,

পত্র শেষে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তবু এই পত্রে যে সূক্ষ্ম বিচার ও খুঁটিনাটি দিকে দৃষ্টি দেখি তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়।'

এই পত্রখানি কুঞ্জলাল ঘোষকে লেখা (১৯০২, ১০ নভেম্বর)। কুঞ্জলাল ঘোষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে (আলমোড়া, ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০) লেখেন : বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাভার একজন কড়া লোকের হাতে না দিলে ক্রমে বিপদ আসন্ন হইতে পারে। ইহাই অনুভব করিয়া কুঞ্জবাবুর হস্তে ভার সমর্পণ করিয়াছি। তিনি ভাবুক লোক নহেন কাজের লোক—সুতরাং ভাবের দিকে বেশি ঝোঁক না দিয়া তিনি কাজের দিকে কড়াক্কড়ি করেন—তাহাতে তিনি লোকের কাছে অপ্রিয় হইয়া পড়েন কিন্তু বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্বের পক্ষে এরূপ লোকের প্রয়োজন অনুভব করি।' (শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম : প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশ প্রথম কার্যপ্রণালী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৭৮। পৃঃ ৪৫।)শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পর বৎসরই এই পত্রখানি লেখা। উল্লেখ্য এটিই বিদ্যালয়ের প্রথম বিধি বা কার্যপ্রণালী। পত্রটি পুস্তকাকারে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পঞ্চাশদ্‌বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রথম প্রকাশিত হয় ৭ পৌষ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে। পুনর্মুদ্রিত হয় ৭ পৌষ ১৩৭৮-এ। রবীন্দ্রনাথের পত্রটি হুবহু মুদ্রিত হল :

ওঁ

বিনয় সম্ভাষণমেতৎ—

আপনার প্রতি আমি যে ভার অর্পণ করিয়াছি আপনি তাহা ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন ইহাতে আমি বড় আনন্দ লাভ করিয়াছি। একান্তমনে কামনা করি ঈশ্বর আপনাকে এই ব্রতপালনের বল ও নিষ্ঠা দান করুন।

আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি বালকদিগের অধ্যয়নের কাল একটি ব্রতযাপনের কাল। মনুষ্যত্বলাভ স্বার্থ নহে পরমার্থ—ইহা আমাদের পিতামহেরা জানিতেন। এই মনুষ্যত্বলাভের ভিত্তি যে শিক্ষা তাহাকে তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যব্রত বলিতেন। এ কেবল পড়া মুখস্থ করা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নহে—সংযমের দ্বারা ভক্তি শ্রদ্ধার দ্বারা শুচিতাদ্বারা একাগ্রনিষ্ঠাদ্বারা সংসারাশ্রমের জন্য এবং সংসারাশ্রমের অতীত ব্রহ্মের সহিত অনন্ত যোগ সাধনের জন্য প্রস্তুত হইবার সাধনাই ব্রহ্মচর্য্যব্রত।

ইহা ধর্ম্মব্রত। পৃথিবীতে অনেক জিনিষই কেনাবেচার সামগ্রী বটে কিন্তু ধর্ম্ম পণ্যদ্রব্য নহে। ইহা একপক্ষে মঙ্গল ইচ্ছার সহিত দান ও অপর পক্ষে বিনীত ভক্তির সহিত গ্রহণ করিতে হয়। এই জন্য প্রাচীন ভারতে শিক্ষা পণ্যদ্রব্য ছিল না। এখন যাঁহারা শিক্ষা দেন তাঁহারা শিক্ষক, তখন যাঁহারা শিক্ষা দিতেন তাঁহারা গুরু ছিলেন। তাঁহারা শিক্ষার সঙ্গে এমন একটি জিনিষ দিতেন যাহা গুরু শিষ্যের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ব্যতীত দান প্রতিগ্রহ হইতেই পারে না।

ছাত্রদিগের সহিত এইরূপ পারমার্থিক সম্বন্ধ স্থাপনই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, উদ্দেশ্য যত উচ্চ হইবে তাহার উপায়ও তত দুরূহ ও দুর্লভ হইবে। এসব কার্য ফরমাসমত চলে না। শিক্ষক পাওয়া যায় গুরু সহজে পাওয়া যায় না। এই জন্য যথাসম্ভব লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধৈর্য্যের সহিত সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে হয়। সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় যতটা মঙ্গলসাধন সম্ভবপর তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এবং নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া নিজেকে প্রত্যহ সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। মঙ্গলব্রত গ্রহণ করিলে বাধাবিরোধ অশান্তির জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে হয়—অনেক অন্যায় আঘাতও ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিতে হইবে। সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও কল্যাণভাবের দ্বারা সমস্ত বিরোধ বিপ্লবকে জয় করিতে হইবে।
ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তি শ্রদ্ধাবান করিতে চাই। পিতামাতায় যেরূপ দেবতার বিশেষ আবির্ভাব আছে—তেমনি আমাদের পক্ষে আমাদের স্বদেশে, আমাদের পিতৃপিতামহদিগের জন্ম ও শিক্ষাস্থানে দেবতার বিশেষ সত্তা আছে। পিতামাতা যেমন দেবতা তেমনি স্বদেশও দেবতা। স্বদেশকে লঘুচিত্তে অবজ্ঞা, উপহাস, ঘৃণা—এমন কি অন্যান্য দেশের তুলনায় ছাত্ররা যাহাতে খর্ব্ব করিতে না শেখে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চাই। আমাদের স্বদেশীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়া আমরা কখনো সার্থকতা লাভ

করিতে পারিব না। আমাদের দেশের যে বিশেষ মহত্ত্ব ছিল সেই মহত্ত্বের মধ্যে নিজের প্রকৃতিকে পূর্ণতা দান করিতে পারিলেই আমরা যথার্থভাবে বিশ্বজনীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিব—নিজেকে ধ্বংস করিয়া অন্যের সহিত মিলাইয়া দিয়া কিছুই হইতে পারিব না—অতএব, বরঞ্চ অতিরিক্ত মাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভাল তথাপি মুগ্ধভাবে বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছু নহে।
ব্রহ্মচর্য্যব্রতে ছাত্রদিগকে কাঠিন্য অভ্যাস করিতে হইবে। বিলাস ও ধনাভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে। ছাত্রদের মন হইতে ধনের গৌরব একেবারে বিলুপ্ত করিতে চাই। যেখানে তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইবে সেখানে তাহা একেবারে নষ্ট করা কর্ত্তব্য হইবে। আমার মনে হইয়াছে হেমেন্দ্রবাবুর পুত্র প্রেমানন্দের সৌখীন দ্রব্যের প্রতি কিঞ্চিৎ আসক্তি আছে—সেটা দমন করিতে হইবে। বেশভূষা সম্বন্ধে বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেহ দারিদ্র্যকে যেন লজ্জাজনক ঘৃণাজনক না মনে করে। অশনে বসনেও সৌখীনতা দূর করা চাই।
দ্বিতীয়ত নিষ্ঠা। উঠা বসা পড়া খেলা স্নান আহার ও সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতা সম্বন্ধে সমস্ত নিয়ম একান্ত দৃঢ়তার সহিত পালনীয়। ঘরে বাহিরে শয্যায় বসনে ও শরীরে কোনপ্রকার মলিনতা প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। যেখানে কোন ছাত্রের কাপড় কম আছে সেখানে সে যেন কাপড় কাচা সাবান দিয়া স্বহস্তে প্রত্যহ নিজের কাপড় কাচে—ও ব্যবহার্য্য গাড়ু মাজিয়া পরিষ্কার রাখে। এবং ঘরের যে অংশে তাহার বিছানা কাপড় চোপড় ও বই প্রভৃতি থাকে সেই অংশ যেন প্রত্যহ যথা সময়ে যথা নিয়মে পরিষ্কার তকতকে করিয়া রাখে। ছেলেরা প্রত্যহ পর্য্যায়ক্রমে তাহাদের অধ্যাপকদের ঘরও পরিষ্কার করিয়া গুছাইয়া রাখিলে ভাল হয়। অধ্যাপকদের সেবা করা ছাত্রদের অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে নির্ধারিত করা চাই।
তৃতীয়ত ভক্তি। অধ্যাপকদের প্রতি ছাত্রদের নির্বিচারে ভক্তি থাকা চাই। তাঁহারা অন্যায় করিলেও তাহা বিনা বিদ্রোহে নম্রভাবে সহ্য করিতে হইবে। কোন মতে তাঁহাদের সমালোচনা বা নিন্দায় যোগ দিতে পারিবে না। অধ্যাপকেরা যদি কখনো পরস্পরের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন তবে সে সময়ে কোন ছাত্র সেখানে উপস্থিত না থাকে তৎপ্রতি যত্নবান হইতে হইবে। কোন অধ্যাপক ছাত্রদের সমক্ষে অন্য অধ্যাপকদের প্রতি অবজ্ঞাজনক ব্যবহার, অসহিষ্ণুতা বা রোষ প্রকাশ না করেন সে দিকে সকলের মনোযোগ থাকা কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ অধ্যাপকদিগকে প্রত্যহ প্রণাম করিবে। অধ্যাপকগণ পরস্পরকে নমস্কার করিবেন। পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার ছাত্রদের নিকট যেন আদর্শস্বরূপ বিদ্যমান থাকে।
বিলাস ত্যাগ, আত্মসংযম, নিয়মনিষ্ঠা, গুরুজনে ভক্তি সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ অনুকূল অবসরে আকর্ষণ করিতে হইবে।
যাঁহারা (ছাত্র বা অধ্যাপক) হিন্দুসমাজের সমস্ত আচার যথাযথ পালন করিতে চান তাঁহাদিগকে কোন প্রকারে বাধা দেওয়া বা বিদ্রূপ করা এ বিদ্যালয়ের নিয়ম বিরুদ্ধ। রন্ধনশালায় বা আহারস্থানে হিন্দু আচার বিরুদ্ধ কোন অনিয়মের দ্বারা কাহাকেও ক্লেশ দেওয়া হইবে না।
আহ্নিক। ছাত্রদিগকে গায়ত্রী মন্ত্র মুখস্থ করাইয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। আমি যেভাবে গায়ত্রী ব্যাখ্যা করি তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিলাম :—ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ—এই অংশ গায়ত্রীর ব্যাহৃতি নামে খ্যাত। চারিদিক হইতে আহরণ করিয়া আনার নাম ব্যাহৃতি। প্রথম ধ্যানকালে ভূলোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে—তখনকার মত মনে করিতে হইবে আমি সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়াছি—আমি এখন কেবলমাত্র কোন বিশেষ দেশবাসী নহি। বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিশ্বজগতের যিনি সবিতা যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহারই বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে এই ধারণাতীত বিপুল বিশ্বজগৎ এই মুহূর্তে এবং প্রতিমুহূর্তেই তাহা হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার এই যে অসীম শক্তি যাহার দ্বারা ভূর্ভবঃস্বর্লোক অবিশ্রাম প্রকাশিত হইতেছে আমার সহিত তাঁহার অব্যবহিত সম্পর্ক কি সূত্রে? কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—যিনি আমাদিগকে বুদ্ধি বৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন, সেই ধী সূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব। সূর্য্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি? সূর্য্য আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছে সেই কিরণের দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, যে শক্তি থাকার দরুন আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত বিশ্বব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি—সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি এবং সেই ধীশক্তিদ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতমরূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সবিতারূপে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিত ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী, এ দুই-ই একই শক্তির বিকাশ—ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চেতনার এবং আমার চেতনার সহিত সেই

সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠযোগ অনুভব করিয়া সঙ্কীর্ণতা হইতে স্বার্থ হইতে ভয় হইতে বিষাদ হইতে মুক্তি লাভ করি। গায়ত্রী মন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের—ও অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগ সাধন করে—এই জন্যই আর্য্যসমাজের এই মন্ত্রের এত গৌরব।
যো দেবোহগ্নৌ যোহপ্সু যো বিশ্বভুবনমাবিবেশ যা ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ—
ব্রহ্মধারণার পক্ষে এই মন্ত্রই আমি বালকদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সরল বলিয়া মনে করি। ঈশ্বর জলে স্থলে অগ্নিতে ওষধি বনস্পতিতে সর্ব্বত্র আছেন এই কথা মনে করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করা শান্তিনিকেতনের দিগন্তপ্রসারিত মাঠের মধ্যে অত্যন্ত সহজ।
সেখানকার নির্ম্মল আলোক আকাশ এবং প্রান্তর বিশ্বেশ্বরের দ্বারা পরিপূর্ণ একথা মনে করিয়া ভক্তি করা ছেলেদের পক্ষেও কঠিন নহে। এই জন্য গায়ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে এই মন্ত্রটিও ছেলেরা শিক্ষা

ঈশ্বর যে আমাদের পিতা, এবং তিনিই যে আমাদিগকে পিতার ন্যায় জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, ছাত্রদিগকে তাহা প্রত্যহ স্মরণ করা চাই। অধ্যাপকেরা উপলক্ষ মাত্র, কিন্তু যথার্থ যে জ্ঞানশিক্ষা তাহা আমাদের বিশ্বপতির নিকট হইতে পাই।

করে। গায়ত্রী সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বেও এই মন্ত্রটি তাহারা ব্যবহার করিতে পারে।
ছাত্রগণ পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সকলে সমস্বরে "ওঁ পিতা নোহসি" উচ্চারণপূর্ব্বক প্রণাম করে। ঈশ্বর যে আমাদের পিতা, এবং তিনিই যে আমাদিগকে পিতার ন্যায় জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, ছাত্রদিগকে তাহা প্রত্যহ স্মরণ করা চাই। অধ্যাপকেরা উপলক্ষ্য মাত্র কিন্তু যথার্থ যে জ্ঞানশিক্ষা তাহা আমাদের বিশ্বপিতার নিকট হইতে পাই। তাহা পাইতে হইলে চিত্তকে সর্ব্বপ্রকার পাপ মলিনতা হইতে মুক্ত করিতে হয়—সে জ্ঞান পাইতে হইলে ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের কাছে প্রত্যহ প্রার্থনা করিতে হয়—সেই জন্যই ঐ মন্ত্রে আছে
"বিশ্বানিদেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব—
যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব।"
"হে দেব, হে পিতঃ, আমাদের সমস্ত পাপ দূর কর, যাহা ভদ্র তাহাই আমাদিগকে প্রেরণ কর।"
ব্রহ্মচারীদের পক্ষে জীবনের প্রতিদিনকে সকলপ্রকার শারীরিক মানসিক পাপ হইতে নির্ম্মল করিবার জন্য মনুষ্যত্ব লাভের জন্য প্রস্তুত হইবার ইহাই প্রকৃষ্ট মন্ত্র—
যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব।
বক্তৃতাদিতে অনেক সময়েই চিত্ত বিক্ষেপ ঘটায়। অধ্যাত্মসাধনায় ভাবান্দোলনের মূল্য যে অধিক তাহা আমি মনে করি না। ভাবাবেশের অভ্যাস মাদক সেবনের ন্যায় চিত্ত দৌর্ব্বল্যজনক। গভীর তত্ত্বগর্ভ সংক্ষিপ্ত প্রাচীন মন্ত্রের ন্যায় ধ্যানের সহায় কিছুই নাই। সাধনার পথে যত অগ্রসর হওয়া যায় এই সকল মন্ত্রের অন্তরের মধ্যে ততই গভীরতররূপে প্রবেশ করা যায়—ইহারা কোথাও যেন বাধা দেয় না। এই জন্য আমি ছাত্রদিগকে উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া থাকি। মন্ত্র যাহাতে মুখস্থ কথার মত না হইয়া যায় সেজন্য তাহাদিগকে মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকি। কিছুকাল আমার অনুপস্থিতিবশতঃ নূতন ছাত্রদিগকে মন্ত্র বুঝাইয়া দিবার অবকাশ পাই নাই। আপনার সঙ্গে যে ছাত্রদিগকে লইয়া যাইবেন তাহাদিগকে যদি আহ্নিকের জন্য উপনিষদের কোন মন্ত্র বুঝাইয়া বলিয়া দেন ত ভালই হয়।
এক্ষণে, আপনার কার্য্যপ্রণালীর কথা বিবৃত করিয়া বলা যাক।
মনোরঞ্জনবাবু, জগদানন্দবাবু ও সুবোধবাবুকে লইয়া একটি সমিতি স্থাপিত হইবে।
মনোরঞ্জনবাবু তাহার সভাপতি হইবেন। আপনি উক্ত সমিতির নির্দ্দেশমতে বিদ্যালয়ের কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকিবেন।
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শয্যা হইতে গাত্রোত্থান স্নান আহ্নিক আহার পড়া খেলা ও শয়ন সম্বন্ধে কাল নির্দ্ধারণ তাঁহারা করিয়া দিবেন—যাহাতে সেই নিয়ম পালিত হয় আপনি তাহাই করিবেন।
বিদ্যালয়ের ভৃত্য নিয়োগ তাহাদের বেতন নির্দ্ধারণ বা তাহাদিগকে অবসরদান তাঁহাদের পরামর্শমত আপনি করিবেন।
মাস শেষে আগামী মাসের একটি আনুমানিক বাজেট সমিতির নিকট হইতে পাস করাইয়া লইবেন। বাজেটের অতিরিক্ত খরচ করিতে হইলে তাঁহাদের লিখিত সম্মতি লইবেন।
খাতায় প্রত্যহ তাঁহাদের সহি লইবেন। সপ্তাহ অন্তর সপ্তাহের হিসাব ও মাসান্তে মাসকাবার তাঁহাদের স্বাক্ষরসহ আমাকে দিতে হইবে।
সমিতির প্রস্তাবিত কোনো নিয়মের পরিবর্ত্তন খাতায় লিখিয়া লইয়া আমাকে জানাইবেন।
সায়াহ্নে ছেলেদের খেলা শেষ হইয়া গেলে সমিতির নিকট আপনার সমস্ত মন্তব্য জানাইবেন ও খাতায় সহি লইবেন।
ভাণ্ডারের ভার আপনার উপর। জিনিষপত্র ও গ্রন্থ প্রভৃতি সমস্ত আপনার জিম্মায় থাকিবে। জিনিষপত্রের তালিকায় আপনি সমিতির স্বাক্ষর লইবেন। কোন জিনিষ নষ্ট হইলে হারাইলে বা বাড়িলে তাঁহাদের সাক্ষরসহ তাহা জমা খরচ করিয়া লইবেন।
আহারের সময় উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রদের ভোজন পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।
ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। তাহাদের জিনিষপত্রের পারিপাট্য, তাহাদের ঘর শরীর ও বেশভূষার নির্ম্মলতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি মনোযোগী হইবেন।
ছাত্রদের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করিলেই সমিতিকে জানাইয়া তাহা আরম্ভেই সংশোধন করিয়া লইবেন।
বিদ্যালয়ের ভিতরে বাহিরে রান্নাঘরে ও তাহার চতুর্দ্দিকে, পায়খানার কাছে কোনরূপ অপরিষ্কার না থাকে আপনি তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন।
গোশালায় গরু মহিষ ও তাহাদের খাদ্যের ও ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।
বিদ্যালয়ের সংলগ্ন ফুল ও তরকারির বাগান আপনার হাতে। সে জন্য বীজ ক্রয়, সার সংগ্রহ ও মধ্যে মধ্যে ঠিকালোক নিয়োগ সমিতিকে জানাইয়া করিতে পারিবেন।
শান্তিনিকেতনের আশ্রমের সহিত বিদ্যালয়ের সংস্রব প্রার্থনীয় নহে। জিনিষপত্র ক্রয়, বাজার করা, ও বাগান তৈরির সহায়তায় মাঝে মাঝে আশ্রমের মালীদের প্রয়োজন হইতে পারে—কিন্তু অন্যান্য ভৃত্যদের সহিত যোগরক্ষা না করাই শ্রেয়।
ঠিকালোক প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে সর্দ্দারকে বা মালিদিগকে, রবীন্দ্র সিংহকে বা তাহার সহকারীকে জানাইয়া সংগ্রহ করিবেন।
শান্তিনিকেতনে ঔষধ লইতে রোগী আসিলে তাহাদিগকে হোমিয়োপ্যাথি ঔষধ দিবেন। যে যে ঔষধের প্রয়োজন হইবে আমাকে তালিকা করিয়া দিলে আমি আনাইয়া দিব।
শান্তিনিকেতন আশ্রমসম্পর্কীয় কেহ বিদ্যালয়ের প্রতি কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিলে বা সেখানকার ভৃত্যদের কোন দুর্ব্ব্যবহারে বিরক্ত হইলে আমাকে জানাইবেন।
জাপানী ছাত্র হোরির আহারাদি ও সর্ব্বপ্রকার স্বচ্ছন্দতার জন্য আপনি বিশেষরূপ মনোযোগী হইবেন।
মনোরঞ্জনবাবু ও শিক্ষকদের বিনা অনুমতিতে শান্তিনিকেতনের অতিথি অভ্যাগতগণ স্কুল পরিদর্শন বা অধ্যাপনার সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। আপনি যথাসম্ভব বিনয়ের সহিত তাঁহাদিগকে এই নিয়ম জ্ঞাপন করিবেন।
অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত কোন ছাত্রকে বিদ্যালয়ের বাহিরে কোথাও যাইতে দিবেন না।
বাহিরের লোককে ছাত্রদের সহিত মিশিতে দিবেন না। অধ্যাপকগণ ভৃত্যদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলে আপনাকে জানাইবেন—আপনি সমিতিতে জানাইয়া তাহার প্রতিকার করিবেন।
ক্ষিতিমোহন সেন

আহারাদির ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইলে অধ্যাপকগণ ছাত্রদের সমক্ষে বা ভৃত্যদের নিকটে তাহার কোন আলোচনা না করিয়া আপনাকে জানাইবেন আপনি সমিতির নিকট তাঁহাদের নালিশ উত্থাপন করিবেন।

বিশেষ নির্দিষ্ট দিনে ছাত্রগণ যাহাতে অভিভাবকগণের নিকট পোষ্টকার্ড লেখে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। বন্ধ চিঠি লেখা নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে নিষিদ্ধ জানিবেন।

পোষ্টকার্ড কাগজ কলম বহি প্রভৃতি কেনার হিসাব রাখিয়া অভিভাবকদের নিকট হইতে পত্র লিখিয়া মূল্য আদায় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

সমিতি, বিদ্যালয় সম্বন্ধে অভিভাবকদের নিকট জ্ঞাপনীয় বিষয় যাহা স্থির করিবেন আপনি তাহা তাঁহাদিগকে পত্রের দ্বারা জানাইবেন।

কোন বিশেষ ছাত্র সম্বন্ধে আহারাদির বিশেষ বিধি আবশ্যক হইলে সমিতিকে জানাইয়া আপনি তাহা প্রবর্ত্তন করিবেন।

কোন ছাত্রের অভিভাবক কোন বিশেষ খাদ্যসামগ্রী পাঠাইলে অন্য ছাত্রদিগকে না দিয়া তাহা একজনকে খাইতে দেওয়া হইতে পারিবে না।

গোশালায় গোরু মহিষ যে দুধ দিবে তাহা ছাত্রদের কুলাইয়া অবিশিষ্ট থাকিলে অধ্যাপকগণ পাইবেন এ নিয়ম আপনার অবগতির জন্য লিখিলাম।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের অতিথি প্রভৃতি কেহ কোন বই পড়িতে লইলে তাহা যথাসময়ে তাঁহার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে।

কাহাকেও কলিকাতায় বই লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। বিশেষ প্রয়োজন হইলে আমার বিশেষ অনুমতি লইতে হইবে।

মাসের মধ্যে একদিন থালা ঘটি বাটি প্রভৃতি জিনিষপত্র গণনা করিয়া লইবেন।

ছাত্রদের অভিভাবক উপস্থিত হইলে মনোরঞ্জনবাবুর অনুমতি লইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছাত্রদের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া লইবেন।

উপস্থিত মত এই নিয়মগুলি লিখিয়া দিলাম। ক্রমশঃ আবশ্যকমত ইহার অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইবে।

কিন্তু প্রধানত নিয়মের সাহায্যেই বিদ্যালয় চালনার প্রতি আমার বিশেষ আস্থা নাই। কারণ, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়টি পড়া গিলাইবার কল মাত্র নহে। স্বতঃউৎসারিত মঙ্গল ইচ্ছার সহায়তা ব্যতীত ইহার উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণকে আমি আমার অধীনস্থ বলিয়া মনে করি না। তাঁহারা স্বাধীন শুভবুদ্ধির দ্বারা কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাইবেন' ইহাই আমি আশা করি এবং ইহার জন্যই আমি সর্বদা প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। কোন অনুশাসনের কৃত্রিম শক্তির দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে পুণ্যকর্ম্মে বাহ্যিকভাবে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহাদিগকে আমার বন্ধু বলিয়া এবং সহযোগী বলিয়াই জানি। বিদ্যালয়ের কর্ম্ম যেমন আমার তেমনি তাঁহাদেরও কর্ম্ম—এ যদি না হয় তবে এ বিদ্যালয়ের বৃথা প্রতিষ্ঠা।

আমি যে ভাবোৎসবের প্রেরণায় সাহিত্যিক ও আর্থিক ক্ষতি এবং শারীরিক, মানসিক নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া এই বিদ্যালয়ের কর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করিয়াছি সেই ভাবাবেগ আমি সকলের কাছে আশা করি না। অনতিকালপূর্ব্বে এমন সময় ছিল যখন আমি নিজের কাছ হইতেও ইহা আশা করিতে পারিতাম না। কিন্তু আমি অনেক চিন্তা করিয়া সুস্পষ্ট বুঝিয়াছি যে, বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য্যব্রত, অর্থাৎ আত্মসংযম, শারীরিক ও মানসিক নির্ম্মলতা, একাগ্রতা, গুরুভক্তি এবং বিদ্যাকে মনুষ্যত্বলাভের উপায় বলিয়া জানিয়া শান্ত সমাহিতভাবে শ্রদ্ধার সহিত গুরুর নিকট হইতে সাধনা সহকারে তাহা দুর্লভধনের ন্যায় গ্রহণ করা—ইহাই ভারতবর্ষের পথ এবং ভারতবর্ষের একমাত্র রক্ষার উপায়।

কিন্তু এই মত ও এই আগ্রহ আমি যদি অন্যের মনে সঞ্চার করিয়া না দিতে পারি তবে সে আমার অক্ষমতা ও দুর্ভাগ্য—অন্যকে সেজন্য আমি দোষ দিতে পারি না। নিজের ভাব জোর করিয়া কাহারো উপর চাপানো যায় না—এবং সে সকল ব্যাপারে কপটতা ও ভান সর্ব্বাপেক্ষা হেয়।

আমার মনের মধ্যে একটি ভাবের সম্পূর্ণতা জাগিতেছে বলিয়া অনুষ্ঠিত ব্যাপারের সমস্ত ত্রুটি দৈন্য অপূর্ণতা অতিক্রম করিয়াও আমি সমগ্রভাবে আমার আদর্শকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই—বর্ত্তমানের মধ্যে ভবিষ্যৎকে, বীজের মধ্যে বৃক্ষকে উপলব্ধি করিতে পারি—সেইজন্য সমস্ত খন্ডতা দীনতা সত্ত্বেও, ভাবের তুলনায় কর্ম্মের যথেষ্ট অসঙ্গতি থাকিলেও আমার উৎসাহ ও আশা ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে না। যিনি আমার কাজকে খন্ড খন্ডভাবে প্রতিদিনের মধ্যে বর্ত্তমানের মধ্যে দেখিবেন, নানা বাধা বিরোধ ও অভাবের মধ্যে দেখিবেন তাঁহার উৎসাহ আশা সর্ব্বদা সজাগ না থাকিতে পারে। সেইজন্য আমি কাহারো কাছে বেশি কিছু দাবি করি না। সর্ব্বদা আমার উদ্দেশ্য লইয়া অন্যকে বলপূর্ব্বক উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করি না—কালের উপর, সত্যের উপরে, বিধাতার উপরে সম্পূর্ণ ধৈর্য্যের সহিত নির্ভর করিয়া থাকি। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক নিয়মে অন্তরের ভিতর হইতে অলক্ষ্য শক্তিতে যাহার বিকাশ হয় তাহাই যথার্থ এবং তাহার উপরেই নির্ভর করা যায়। ক্রমাগত বাহিরের উত্তেজনায় কতক লজ্জায়, কতক ভাবাবেগে, কতক অনুকরণে যাহার উৎপত্তি হয় তাহার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না এবং অনেক সময়ে তাহা হইতে কুফল উৎপন্ন হয়।

আমি আশা করিয়া আছি যে, অধ্যাপকগণ, আমার অনুশাসনে নহে, অন্তরস্থ কল্যাণবীজের সহজ বিকাশে ক্রমশই আগ্রহের সহিত আনন্দের সহিত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সঙ্গে নিজের জীবনকে একীভূত করিতে পারিবেন। তাঁহারা প্রত্যহ যেমন ছাত্রদের সেবা ও প্রণাম গ্রহণ করিবেন তেমনি আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের দ্বারা ছাত্রদের নিকটে আপনাদিগকে প্রকৃত ভক্তির পাত্র করিয়া তুলিবেন। পক্ষপাত, অবিচার, অধৈর্য্য, অল্প কারণে অকস্মাৎ রোষ, অভিমান, অপ্রসন্নতা, ছাত্র বা ভৃত্যদের সম্বন্ধে চপলতা, লঘুচিত্ততা, ছোটখাট অভ্যাস দোষ এ সমস্ত প্রতিদিনের প্রাণপণ যত্নে পরিহার করিতে থাকিবেন। নিজেরা ত্যাগ ও সংযম অভ্যাস না করিলে ছাত্রদের নিকট তাঁহাদের সমস্ত উপদেশ নিষ্ফল হইবে—এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়া যাইতে থাকিবে। ছাত্রেরা বাহিরে ভক্তি ও মনে মনে উপেক্ষা করিতে যেন না শেখে।

আমার ইচ্ছা, গুরুদের সেবা ও অতিথিদের প্রতি আতিথ্য প্রভৃতি কার্য্যে রথীর দ্বারা বিদ্যালয়ে আদর্শ স্থাপন করা হয়। এ সমস্ত কার্য্যে যথার্থ গৌরব আছে অসম্মান নাই এই কথা যেন ছাত্রদের মনে মুদ্রিত হয়। সকলেই যেন আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইয়া এই সমস্ত সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। অভ্যাগতদের অভিবাদন তাঁহাদের সহিত শিষ্টালাপ ও তাঁহাদের প্রতি সযত্ন ব্যবহার যেন সকল ছাত্রকে বিশেষরূপে অভ্যাস করানো হয়। বিদ্যালয়ের নিকটে কোন আগন্তুক উপস্থিত হইলে তাহাকে যেন বিনয়ের সহিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে শেখে—ছাত্রগণ ভৃত্যদের প্রতি যেন অবজ্ঞা প্রকাশ না করে এবং তাহারা পীড়াগ্রস্ত হইলে যেন তাহাদের সংবাদ লয়। ছাত্রদের মধ্যে কাহারো পীড়া হইলে তাহাকে যথাসময়ে ঔষধ ও পথ্য সেবন করানো ও তাহার অন্যান্য শুশ্রূষার ভার যেন ছাত্রদের প্রতি অর্পিত হয়। ভৃত্যদের দ্বারা যত অল্প কাজ করানো যাইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আপনি যদি সঙ্গত ও সুবিধাজনক মনে করেন তবে গোশালায় গাভীগুলির তত্ত্বাবধানের ছাত্রদের প্রতি

কিয়ৎমানে অর্পণ করিতে পারেন। দুইটি হরিণ আছে ছাত্রগণ যদি তাহাদিগকে স্বহস্তে আহারাদি দিয়া পোষ মানাইতে পারে তবে ভাল হয়। আমার ইচ্ছা কয়েকটি পাখী মাছ ও ছোট জন্তু আশ্রমে রাখিয়া ছাত্রদের প্রতি তাহাদের পালনের ভার দেওয়া হয়। পাখী খাঁচায় না রাখিয়া প্রত্যহ আহারাদি দিয়া ধৈর্য্যের সহিত মুক্ত পাখীদিগকে বশ করানোই ভাল। শান্তিনিকেতনে কতকগুলি পায়রা আশ্রয় লইয়াছে চেষ্টা করিলে ছাত্ররা তাহাদিগকে ও কাঠবিড়ালীদিগকে বশ করাইতে পারে। লাইব্রেরী গোছানো, ঘর পরিপাটি রাখা, বাগানের যত্ন করা এ সমস্ত কাজের ভার যথাসম্ভব ছাত্রদের প্রতিই অর্পণ করা উচিত জানিবেন। জাপানী ছাত্র হোরির সেবাভার রথী প্রভৃতি কোন বিশেষ ছাত্রের উপর দিবেন। এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার ব্যস্ততায় আপাতত তাহার যদি একান্ত সময়াভাব ঘটে তবে আর কোন ছাত্রের উপর অথবা পালা করিয়া বয়স্ক ছাত্রদের উপর দিবেন। তাহারা যেন যথাসময়ে স্বহস্তে হোরিকে পরিবেষণ করে।

Babu Kshiti Mohan Sen
C/o Babu Shrish Chandra Sen
Professor Khalsa College
Amritsar
(Punjab)

প্রাতঃকালে তাহার বিছানা ঠিক করিয়া দেয়—যথাসময়ে তাহার তত্ত্ব লইতে থাকে—নাবার ঘরে ভৃত্যেরা তাহার আবশ্যকমত জল দিয়াছে কিনা পর্য্যবেক্ষণ করে। প্রথম দুই একদিন রথীর দ্বারা এই কাজ করাইলে অন্য ছাত্রেরা কোনপ্রকার সঙ্কোচ অনুভব করিবে না। ছাত্ররা যখন খাইতে বসিবে তখন পালা করিয়া একজন ছাত্র পরিবেষণ করিলে ভাল হয়। ব্রাহ্মণ পরিবেষক না হইলে আপত্তিজনক হইতে পারে। অতএব সে সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থাই কর্ত্তব্য হইবে। রবিবারে মাঝে মাঝে চড়িভাতি করিয়া ছেলেরা স্বহস্তে রন্ধনাদি করিলে ভাল হয়। সম্প্রতি নানা উদ্বেগের মধ্যে আছি এজন্য সকল কথা ভালরূপ চিন্তা করিয়া লিখিতে পারিলাম না। আপনি সেখানকার কাজে যোগদান করিলে একে একে অনেক কথা আপনার মনে উদয় হইবে। তখন অধ্যাপকগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আপনার মন্তব্য আমাকে জানাইবেন।
আপনার প্রতি আমার কোন আদেশ নির্দ্দেশ নাই আপনি সমবেদনার দ্বারা শ্রদ্ধা ও প্রীতির দ্বারা আমার হৃদয়ের ভাব অনুভব করিবেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত কল্যাণকামনার দ্বারা কর্ত্তব্যের শাসনে স্বাধীনভাবে ধরা দিবেন এবং
যদ্‌যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।
ইতি ২৭শে কার্ত্তিক ১৩০৯

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই কার্যাবলী অনুসারে ক্ষিতিমোহন আশ্রম পরিচালনা করতে শুরু করেন। অধ্যাপক সভায় স্থির হয় তাঁকে একজন কেরানি দেওয়া হবে। কিন্তু অর্থাভাব। টাকা দিয়ে লোক রাখার সামর্থ্য নেই কবির। অন্য কেউ তাঁকে সাহায্য করবেন তারও উপায় নেই। কারণ সকলেরই কাজের চাপ অত্যধিক। উল্লেখ্য কবি নিজেই রোজ মধ্যাহ্নভোজের পর বেলা ১২টা থেকে ২টো পর্যন্ত ক্ষিতিমোহনের দপ্তরে সমস্ত 'বিধিবিধান' মেনে কেরানির কর্তব্যপালন করেছেন বেশ কিছুদিন। পরে কবির হাত থেকে জ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বেচ্ছায় এই কার্যভার গ্রহণ করেন।

শুধু আশ্রমের কাজ নয়, এখানে তিনি ডুবে গেলেন জ্ঞানচর্চায়। দু বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হল কবীর (১৯১০)। আর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অনুপ্রাণিত হয়ে ক্ষিতিমোহন-সংগৃহীত বাণী অবলম্বনে সম্পাদনা করলেন 'ওয়ান হানড্রেড পোয়েমস অব কবীর' (১৯১৪)।
শান্তিনিকেতনের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকৃতি উৎসব। বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব ইত্যাদি। ক্ষিতিমোহনের আশ্রমে যোগদানের বছর দেড়েক আগেই রবীন্দ্রনাথের পুত্র শমীন্দ্রনাথের উদ্যোগে শান্তিনিকেতনে বর্ষা উৎসব পালিত হয়।

এর নয় মাস পরে শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। ক্ষিতিমোহন যোগ দিলে রবীন্দ্রনাথ এই ধারাকে অব্যাহত রাখতে তাঁর কাছে অনুরোধ জানান। রবীন্দ্রনাথ তখন আশ্রমে ছিলেন না, অজিত চক্রবর্তী ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহায্যে ক্ষিতিমোহন আয়োজন করলেন 'পর্জন্যোৎসব'-এর। ক্ষিতিমোহনের নির্দেশে বৈদিক রীতিতে সাজানো হল বেদী। দিনেন ঠাকুর বর্ষাসঙ্গীত, অজিত চক্রবর্তী চয়ন করলেন রবীন্দ্রকাব্য থেকে উপযুক্ত কবিতা আর ক্ষিতিমোহন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে সংগ্রহ করলেন বর্ষার শ্লোক। বর্ষা উৎসব সুসম্পন্ন হল সুন্দরভাবে। এরপর শরৎ উৎসব। রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গান রচনা করলেন। লেখা হল 'শারদোৎসব' নাটক। ক্ষিতিমোহনের অভিনয় প্রতিভার পরিচয়ও পাওয়া গেল। তিনি সেজেছিলেন সন্ন্যাসী। কবির সব কাজের সহায়ক ক্ষিতিমোহন। যখনই দরকার কবির হাতের কাছে যুগিয়ে দিয়েছেন প্রাচীন গ্রন্থ থেকে সবরকম শ্লোক। ১৯২০ সালের ২০ মার্চ গরমের ছুটির সময় কবির সঙ্গে গুজরাট সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও কিশোর ছাত্র প্রমথনাথ বিশী। এরপর কাশীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে কবির সঙ্গী ছিলেন ক্ষিতিমোহন। সেখান থেকে ৩০ মার্চ স্টিমারে কাথিয়াবাড়ের পোরবন্দর যাত্রা করলেন। ১৯২৪-এ চীন ভ্রমণে কবির সহযাত্রী ছিলেন ক্ষিতিমোহন।
যুগলকিশোর বিড়লা তাঁদের ব্যয়ভার বহনের জন্য এগার হাজার টাকা দান করেছিলেন।
ক্ষিতিমোহন ছাড়া কবির সঙ্গে চীনে যান নন্দলাল বসু, কালিদাস নাগ ও এলমহার্স্ট।
সেই ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার আট বছরের মধ্যেই ক্ষিতিমোহন এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। সেই আশ্রম ক্রমে রূপান্তরিত হল বিশ্বভারতীতে। সর্বাধ্যক্ষ থেকে উপাচার্য (১৯৫৩) পর্যন্ত তাঁর জীবনের সবটুকু সময় ব্যয় করেছেন শান্তিনিকেতনের উন্নতির জন্য। বস্তুত গাছের যেমন শিকড়ের সঙ্গে যোগ তেমনি ক্ষিতিমোহনের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের যোগ। শান্তিনিকেতনের গঠনপর্বের অন্যতম রূপকার ক্ষিতিমোহনের অবদান অবিস্মরণীয়। যতদিন রবীন্দ্রনাথ বেঁচেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁর 'স্বপ্ন ও কল্পনা'র সঙ্গী।
শুধু তাই নয় তিনি ছিলেন রবীন্দ্রসাহিত্যের একজন প্রধান মর্মজ্ঞ ও ব্যাখ্যাতা। বহুভাষাবিদ ক্ষিতিমোহন বাংলা ও ইংরেজি ছাড়া হিন্দী ও গুজরাটি ভাষাতেও একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত কবীর (১-৪ খন্ড), ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা (১৯৩০), দাদূ (১৩৪২), ভারতের সংস্কৃতি (১৩৫০), বাংলার সাধনা (১৩৫২), প্রাচীন ভারতের নারী (১৩৫৭), বাংলার বাউল (১৯৫৪), চিন্ময় বঙ্গ (১৯৫৭) প্রভৃতি গ্রন্থ আজও বাঙালির সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়। বহু সম্মানে ক্ষিতিমোহন ভূষিত হয়েছেন বারবার। অহিন্দী ভাষীর সার্থক হিন্দীচর্চার স্বীকৃতিরূপে তিনি সর্বভারতীয় সম্মানের অভিজ্ঞান লাভ করেছিলেন। ১৯৫১ সালে ওয়ার্ধা থেকে মহাত্মা গান্ধী পুরস্কার ও প্রয়াগ হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন থেকে ১৯৫৩ সালে পেয়েছিলেন মুরারকা পারিতোষিক। ১৯৫২ সালে বিশ্বভারতী তাঁকে দেশিকোত্তম সম্মানে ভূষিত করেন। ১৯৬০ সালের ১২ মার্চ ক্ষিতিমোহনের মৃত্যু হয়।

সুনীল দাস

পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্ষিতিমোহন সেনকে লেখা

[১৯০৮ থেকে ১৯৪০]

॥ ১ ॥

ও

শিলাইদহ
নদিয়া

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

বোলপুরে আমি কিছুদিন হইতে একটি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপন করিয়া বালকদিগকে শিক্ষা দিতেছি। আপনার সম্বন্ধে আমি যেরূপ সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে এখানকার কর্ম্মে আপনাকে আবদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছি। যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই কার্য্যে যোগদান করেন তবে আমি সহায়বান হইব। এবং যাহাতে আপনার আর্থিক ক্ষতি না হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিব। আমার বিশ্বাস সেখানকার কর্ম্মে আপনি আনন্দলাভ করিতে পারিবেন। ইতি ১লা ফাল্গুন ১৩১৪ [১৩-২-১৯০৮]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ২ ॥

ও

শিলাইদহ
নদিয়া

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার পত্র পড়িয়া নিরাশ হইলাম, তথাপি আশা পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। যে লক্ষ্য ধরিয়া আজ ছয় বৎসরকাল এই বিদ্যালয়কে প্রতিষ্ঠাদান করিবার চেষ্টা করিতেছি তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য উপযুক্ত সহায়ের একান্ত আবশ্যক। এই কারণেই আপনার সন্ধান পাইয়া, আপনার অসম্মতি সত্ত্বেও পুনর্ব্বার আপনাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। এই বিদ্যালয়ে আপনি নিজের শক্তিকে সর্ব্বথা প্রয়োগ করিবার সুযোগ পাইবেন—ইহাতে যথার্থই আপনি সৃষ্টি করিয়া তুলিবার আনন্দ পাইবেন এবং ঈশ্বরের প্রসাদে এই সৃষ্টির দ্বারা দেশের একটি স্থায়ী মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। এই কাজে আপনাদের সহায়তা আমি কেবলমাত্র প্রার্থনা করিব না—দাবী করিব। দেশে প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক, এই প্রয়োজন পূরণ করিবার জন্য যদি আহ্বান প্রাপ্ত হন তবে কোনো মতেই তাহাকে অবহেলা করিবেন না। আমি ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছি—সে ক্ষেত্র কর্ষণের দ্বারা ফলবান করিবেন আপনারা—এই চেষ্টাকে অকৃতার্থ হইতে দিবেন না। একবার গভীরভাবে ও উদারভাবে কথাটাকে ভাবিয়া দেখিবেন—যদি নিতান্তই অন্তঃকরণ হইতে কোনো সায় না পান তবেই আমি অন্যত্র সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইব।

ইতি ১২ই ফাল্গুন ১৩১৪ [২৪-২-১৯০৮]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৩ ॥

ওঁ

শিলাইদহ
নদিয়া

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ

আপনার পত্রখানি পাইয়া আশ্বস্ত হইলাম। জুলাই পর্য্যন্তই অপেক্ষা করিব। কার্ত্তিকের মাঝামাঝি অথবা অগ্রহায়ণের প্রারম্ভেই আমাদের বিদ্যালয়ের শেশন আরম্ভ হয়। ভাদ্র মাস হইতে প্রায় আড়াই মাস তিন মাস বন্ধ থাকে। যদি শ্রাবণ মাসে আপনি নিষ্কৃতি পান তবে ছুটির কয়টা মাস বাদেই আপনাকে কাজে যোগ দিতে হইবে। যদি জ্যৈষ্ঠ অন্তত আষাঢ়ের মধ্যেও আসেন তবে পূর্ব্বেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। যেরূপ ভাল বিবেচনা করেন আমাকে জানাইবেন এবং মাসিক বৃত্তি কিরূপ হইলে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে হয় তাহাও আমাকে লিখিবেন। আমাদের বিদ্যালয়টি সাশ্রম অর্থাৎ বোর্ডিং— অধ্যাপকগণ এখানে ছাত্রদের সহিত একত্রেই বাস করেন। ইতি ১৬ই ফাল্গুন ১৩১৪ [২৮-২-১৯০৮]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৪ ॥

ওঁ

শিলাইদহ

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

গত পরশ্ব যদিচ আপনাকে নিষ্কৃতি দিয়া পত্র লিখিয়াছি কিন্তু তথাপি অন্তঃকরণকে ফিরাইতে পারি নাই—বোধহয় আপনাকে পাইবই বলিয়াই এইরূপ ঘটিতেছে। আজ আপনার পত্র পাইয়া আমি মন হইতে সমস্ত বাধা দূর করিয়া দিলাম। আপনি যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে আমি আনন্দের সহিত সম্মতি জানাইতেছি। এক্ষণে মাসিক একশত ও প্রতি বৎসরে দশ টাকা করিয়া বৃদ্ধি লইয়া ক্রমে দেড় শত পর্য্যন্ত যদি বৃত্তি স্থির করেন তবে আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে না। কারণ আর দুই বৎসরের মধ্যে আমেরিকা ইংলন্ড হইতে চারিজন ছাত্রই ফিরিয়া আসিবে তখন আমার অনেকটা ভার লাঘব হইবে। আমার সাধ্যমত আপনাদের অসুবিধা হইবে না ইহা নিঃসন্দেহ। বিদ্যালয়ও ক্রমশই যেরূপ সাধারণের বিশ্বাস আকর্ষণ করিতেছে তাহাতে অনতিকালের মধ্যে এ বিদ্যালয় আমাদের সাহায্যের অপেক্ষা রাখিবে না বলিয়া আশা করিতেছি। এই সময়ে আমি এমন একজন কাহাকেও অন্বেষণ করিতেছি যিনি এই বিদ্যালয়টিকে সম্পূর্ণরূপে নিজের করিয়া লইবেন। জানি না, কি কারণে আপনার সহিত পরিচয় না থাকিলেও আপনাকেই আমার চিত্ত এই কাজে বরণ করিয়া লইতেছে। ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন তবে নিশ্চয়ই আপনি সমস্ত সঙ্কোচ ও চিন্তা দূর করিয়া দিয়া ধরা দিবেন—আপনি না আসিয়া কোনমতেই থাকিতে পারিবেন না—আপনার পর্ব্বত হইতে আপনি নদীর মত এখানে ছুটিয়া আসিবেন। আমার নিজের কাজ হইলে আমি আপনাকে এমন করিয়া ডাকিতে পারিতাম না। আমি যাহাকে মনে রাখিয়া ডাকিতেছি তাহার কাছে নিষ্কৃতি পাইবেন না। আমি পাবনা কনফারেন্সের কাজের অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও একটি বালকের কাছে আপনার কথা শুনিবামাত্রই অত্যন্ত নিঃসংশয় চিত্তে তৎক্ষণাৎ আপনাকে আহ্বান করিয়া লিখিয়াছি—আমার এ আহ্বান কখনই ব্যর্থ হইতে পারে না। ইতি ১৯শে ফাল্গুন ১৩১৪ [২-৩-১৯০৮]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৫ ॥

ওঁ

শিলাইদহ

সবিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

সময় সম্বন্ধে কোনো সীমা না বাঁধিয়াই আপনার জন্য অপেক্ষা করিব। যাহাতে আপনার ক্ষতি না হয় তাহাই করিবেন এবং যত শীঘ্র পারেন আমাদের জালে আসিয়া ধরা দিবেন। ইতি ২৫শে ফাল্গুন ১৩১৪ [৮-৩-১৯০৮]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র-পরিচিতি

॥ পত্র ১· ॥

১৯০১ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন আশ্রমে মাত্র পাঁচজন ছাত্র নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুরু করেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স চল্লিশ। ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথেরও (৬-১১-১৮৭০—২০-৮-১৮৯৯) ইচ্ছা ছিল শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করার। কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুর ফলে সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। বলেন্দ্রনাথের অপূর্ণ ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করলেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু তাই নয়, তাঁর কল্পনাকে ঢেলে সাজালেন। ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ মহর্ষির ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষার পুণ্য দিনে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য ২১ ডিসেম্বর ১৮৪৩ (৭ই পৌষ ১৭৬৫ শকাব্দ) খ্রীস্টাব্দে বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ সহ মোট ২১ জন বিধিপূর্বক প্রতিজ্ঞা পাঠ করে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। এই দিনটিকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেন।

১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিনে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (মাঘ ১৮২৩ শক) প্রকাশিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রথম বক্তা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বলেছিলেন বিদ্যালয় সম্পর্কে পরে রবীন্দ্রনাথ 'মানবকদিগকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করিলেন।' উপদেশান্তে 'বক্তা গায়ত্রী মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম : প্রতিষ্ঠা দিবসের উপদেশ, প্রথম কার্যপ্রণালী, ১৩৭৮। পৃ ১৫।) ক্ষিতিমোহন সেনের পূর্বে আশ্রমের কাজে যোগ দিয়েছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, জগদানন্দ রায়, সতীশচন্দ্র রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, কুঞ্জলাল ঘোষ এবং পরে এসেছেন নেপালচন্দ্র রায় প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহন সম্পর্কে নানান ব্যক্তির কাছ থেকে সংবাদ পেয়েছিলেন। তবে কালীমোহন ঘোষই ছিলেন রবীন্দ্র-ক্ষিতিমোহনের যোগাযোগের মূল সেতু। কী সংবাদ পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ? রবীন্দ্রনাথকে লেখা অজিত চক্রবর্তীর চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধার করলেই এ-বিষয়ে পরিষ্কার হওয়া যায়—'এই ছেলেটির (কালীমোহন) কাছ থেকেই ক্ষিতিমোহনবাবুর কথা আমি প্রথম শুনি। তাঁর সাহিত্যানুরাগ ও বিদ্যাবুদ্ধির কথাতেই যে আমি উৎসাহিত হয়েছি তা নয়, এর মধ্যেও ওই লোকপ্রেমের সংবাদ পেয়েছি, ইনিও ঐ বালকটির সঙ্গে গ্রামে কাজ করে ফিরেছেন—লোকসেবার উৎসাহ তাঁর পক্ষে যে কিরকম স্বাভাবিক সেইটে জেনেই আমি তাঁকে বোলপুরে আবদ্ধ করতে এত উৎসুক হয়েছি। সুশিক্ষিত এম-এ ডিগ্রিধারী বেতন দিলেই পাওয়া যায় কিন্তু যে জিনিসটা পুঁথিগত নয়, সেটা আমাদের দেশে কত দুর্লভ তা ত জান।

'ক্ষিতিমোহনবাবুর সম্বন্ধে আর একটি কথা শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি। তিনি যদিচ প্রাচীন শাস্ত্রের তথাপি তিনি অত্যন্ত উদার। তিনি বলেন, এই ঔদার্য তিনি শাস্ত্র হতেই লাভ করেছেন। হিন্দু ধর্মকে যাঁরা নিতান্ত সংকীর্ণ করে অপমানিত করেন তাঁদের মধ্যে এঁর দৃষ্টান্ত হয়ত কাজ করবে। অন্তত ছাত্রদের মনকে সংকীর্ণতামুক্ত করতে পারার পক্ষে ইনি অনেকটা সাহায্য করতে পারবেন।'

রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে প্রথম পত্রটি লেখেন 'নদিয়া'র 'শিলাইদহ' থেকে। এ-সময়ে বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের উপর। উল্লেখ্য ৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কবি ২০ অগ্রহায়ণ শিলাইদহে চলে আসেন। সঙ্গে মীরা ও বেলা। প্রায় পাঁচ মাস কবি শিলাইদহে ছিলেন। শিলাইদহ থেকেই রবীন্দ্রনাথ পাঁচখানি চিঠি লিখেছিলেন ক্ষিতিমোহনকে।

রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম চিঠি ক্ষিতিমোহনের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এ সম্পর্কে তিনি দিনলিপিতে লিখেছেন—'সেবছর শীত তখনও যায়নি।··· চম্বা পোষ্টাপিসে গিয়ে একদিন একটি চিঠি পেলাম। অপূর্ব হস্তাক্ষর! নদিয়ার শিলাইদহে চিঠিটি ডাকে দেওয়া হয়েছে। রাজধানী চম্বায় পৌঁছতে সময় নিয়েছে চারদিন। খুলে দেখলাম লেখক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠিকানা নির্ভুল সংগ্রহ করে তিনি চিঠি লিখেছেন। ঠিকানা ছিল :

Babu Kshitimohon Sen
C/o Babu Shrish Chandra Sen
Professor Khalsa College
Amritsar (Punjab)

'কলকাতা থেকে যে ডাকগাড়ি চম্বার দিকে আসে সে গাড়ি অমৃতসর পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে যায়। রাজ্যের পৃথক ব্যবস্থায় সেখান থেকে চিঠিপত্র চলাচল হয় অশ্বপৃষ্ঠে।···চিঠি খুলে পড়লাম। আমাকে তিনি আশ্রমের কাজে ডাকছেন।"

॥ পত্র ২ ॥

রবীন্দ্রনাথ বড় আশা করে চিঠি লিখলেও ক্ষিতিমোহন প্রথমে কবিকে নিরাশ করেছিলেন। তবুও তিনি আশা পরিত্যাগ করেননি। কী লিখে ক্ষিতিমোহন কবিকে নিরাশ করেছিলেন ? অবশ্যই অর্থ প্রথম কারণ। দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয়ের কাজে তিনি কতটুকু যোগ্য ? অর্থনৈতিক অনটন তাঁকে ক্লান্ত করে তুলেছিল কেমন করে সে কথা শোনা যাক ক্ষিতিমোহনের নিজের মুখ থেকেই—'সংসারী মানুষ। বড় ভাই মারা গেছেন। পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ পিতা শক্তিহীন। সব ভার আমার উপর। আশ্রমের কাজে যোগ দেব কোন সাহসে ? হিমালয়ের কাজে ভবিষ্যৎ ছিল। কাশীর কলেজের ইংরাজ অধ্যাপকরাও ভালোবাসতেন, তাঁরাও ডাকছিলেন। কবিরাজীটাও পড়া ছিল—এই কুলবিদ্যা নিয়ে কলিকাতায় বসবার কথা সবাই বলছিলেন, অন্য দিকেও ডাক ছিল। অথচ মনটা ঝুঁকে পড়েছিল কবিগুরুর ডাকে। (আমার কথা, দেশ ৩ জানুয়ারি, ১৯৫৩)।

॥ পত্র ৩ ॥

সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে ক্ষিতিমোহন ঠিক করলেন আশ্রমের কাজে যোগ দেবেন। কবি চিঠি পেয়ে আশ্বস্ত হলেন। 'মাসিক বৃত্তি কিরূপ হইলে' তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে না সে কথাও জানতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু তাই নয়, কোন সময়ে তাঁকে কাজে যোগদান করতে হবে মোটামুটি তারও একটি ছবি ফুটে উঠেছে এই পত্রে।

॥ পত্র ৪ ॥

অবশেষে বৃত্তি স্থির হল প্রতি মাসে এক শ'। বছরে দশ টাকা বৃদ্ধি এইভাবে দেড় শ' পর্যন্ত।

আমরা আগেই বলেছি কবি এ সময় শিলাইদহে। ১৯০৮-এর ১১ ফেব্রুয়ারি পাবনা কনফারেন্স হয়। কবিকে এই প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। কবি এই অনুরোধ গ্রহণ করেন। এর ঠিক আগেই সুরাট কংগ্রেসে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করেছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করেই কবি সভাপতি পদ গ্রহণে সম্মতি দান করেছিলেন। এই পদ গ্রহণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই নানা মহলে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এই ঘটনা সম্পর্কে কবি লিখেছেন—'আমি পদ্মার তীরে নিভৃতে আশ্রয় লইয়াছিলাম—আমার ভাগ্যদেবতা সেই সন্ধান পাইয়া এখানেও তাঁহার এই শিকারটির প্রতি লক্ষ্য স্থাপন করিয়াছেন। আমাকে পাবনার শান্তিপ্রিয় লোক কনফারেন্সের সভাপতি করিয়াছেন। প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলাম কিন্তু আপনি ত জানেন কোনদিন কোনো আপত্তি করিয়া জয়ী হইতে পারি নাই।···সভাপতি হইয়া শান্তিরক্ষা করিতে পারিব কিনা সন্দেহ। দেশে শান্তি যখন নাই তখন তাহাকে রক্ষা করিবে কে ? কলহ করিবে স্থির করিয়াই লোকে এখন হইতে অস্ত্রে শান দিতেছে। যদি অক্ষত দেহে ফিরিয়া আসি খবর পাইবেন।' (রবীন্দ্র জীবনী ২য় খণ্ড, পৃ ১৮৩)। এর কিছু দিন পরে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে কবি লিখলেন—'কনফারেন্স আমাকে সভাপতি পদে আহ্বান করার সংবাদ পাইবামাত্র নানা পক্ষ হইতে গালি সংযুক্ত এত বেনামী পত্র পাইয়াছি যে, আমি কোন্ দলের লোক তাহা স্থির করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল।' এইসব বেনামী চিঠিপত্রে এমন সব হুমকি ছিল যে সুরাট কংগ্রেসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে পাবনায়। স্বভাবত রবীন্দ্রনাথ পাবনা কনফারেন্স নিয়ে খুব চিন্তিত ও ব্যস্ত ছিলেন। এই ব্যস্ততার মধ্যেই 'একটি বালকের' কাছে ক্ষিতিমোহনের কথা শুনে কবি নিঃসংশয় চিত্তে চিঠি লিখেছিলেন।
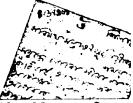
চিঠিতে উল্লিখিত এই 'বালকটি' হলেন কালীমোহন ঘোষ। (২৯-১-১৮৮৪—১২-৫-১৯৪০) কালীমোহনের সঙ্গে ক্ষিতিমোহনের পরিচয় হয় তাঁর পিতৃভূমি সোনারং গ্রামে। এ সম্পর্কে ক্ষিতিমোহন লিখেছেন—'···স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। গ্রামে গ্রামে বউ-ঝিরা পর্যন্ত মেতে উঠেছেন। গ্রীষ্মকাল, বৈশাখ মাস। আমার পিতৃভূমি সোনারং গ্রামে (ঢাকা জেলায়) গিয়ে শুনি—একদল স্বদেশী বক্তা এসেছেন। গ্রামের বউ-ঝিরা মা-বোনের মত তাঁদের সেবা করছেন।

'দলে যিনি প্রধান তিনি উৎসাহে ভরপুর কিন্তু শরীর অপটু। তাঁর সেবার দরকার। তাঁর নাম কালীমোহন ঘোষ। দুই দিনেই তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। তিনি রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এবং তাঁর গ্রামের কাজে কালীমোহনবাবুর ব্যক্তিগত পরিচয় আছে।

কালীমোহন আমার ছোট ভাইয়ের মত হয়ে গেলেন। সারা বিক্রমপুরে তাঁর স্বদেশী বক্তৃতার প্রোগ্রাম (programme) ছিল। তিনি আমার মুখে কবিতা শুনে আমাকে চেপে ধরলেন। আমাকে নিয়ে গ্রামে-গ্রামে বক্তৃতা করে বেড়ালেন।'(দেশ, ৩ জানুয়ারি, ১৯৫৩) *(ক্রমশঃ)*

ছবি : শান্তিনিকেতন আঞ্চলিক সংগ্রহ সৌজন্যে

কেবলমাত্র ট্রু-টোন জেলে ছোট চুলে গাঢ় রং কিন্তু-বিনা টপ্ টপ্ টপ্

এবার সেই হেয়ারডাই লাগিয়ে দেখুননা যা বিশেষভাবে খাটো চুলের জন্যে তৈরী হয়েছে। ডাই ও ডেভেলাপার মেশান আর পান—জেল, গাঢ় হেয়ার ডাই—চুল থেকে যার টপ্ টপ্ করে টপ্‌টপিয়ে

পড়বার কোন ভয়ই নাই। ট্রু-টোন জেলএর সাহায্যে এখন খাটো চুলকে রাঙিয়ে তুলতে আর কোন ঝঞ্ঝাটই পোয়াতে হবেনা।

ট্রু-টোনই একমাত্র হেয়ারডাই যা আপনার চুলের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে, আর টেঁকে বেশিদিন ধ'রে। কিছুদিন পরপর ডাই করবার ঝামেলা থেকে রেহাই দেয় আপনাকে।

আপনি যদি বিনামূল্যে হেয়ারডাইং পুস্তিকা পেতে চান তো যোগাযোগ করুন :—
জে. কে. হেলীন কার্টিস লিমিটেড,
পোখরন রোড, জেকেগ্রাম,
থানে-৪০০ ৬০৬।
৪০ আর ১৮ মিলিলিটারের প্যাকেটে পাওয়া যায়।

ট্রু-টোন জেল টপ্‌টপানোর বালাই বিনাই গাঢ় রঙে রাঙায়।

বিক্রী ব্যবস্থায়: প্যাকভেক মার্কেটিং কোম্পানী

everest/86/JKHC/216-bn

পূর্ব-পশ্চিম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যৌবন-২৭

থার্ড ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ারে উঠতে না উঠতেই অলি তার কয়েকজন বান্ধবীকে হারালো। তার সহ-পাঠিনীদের টুপটাপ করে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এই ফালগুনেই তিনজন পদবী বদলালো। অনিন্দিতা বিয়ের পর চলে গেল কানপুর, নাসিমের শ্বশুরবাড়ি কলকাতায় হলেও সে আর কলেজে আসে না।

ক্লাসে বরাবর অলির পাশে বসে চন্দনা, সেও হঠাৎ একদিন বাড়িতে এসে লাজুক লাজুক মুখে একখানা প্রজাপতি আঁকা চিঠি বার করল। তার বিয়ে ঠিক হয়েছে একেবারে অকস্মাৎ, পাত্র তার বৌদির ভাই, ডাক্তারি পাস করে সে বিলেত যাচ্ছে। বিলেতের সুলভ নারীদের সম্পর্কে নানা রকম রটনা আছে, তাই সেই তরুণ ডাক্তারটির সন্ত্রস্ত পিতা মাতা ছেলের বিয়ে দিয়ে বউকে সঙ্গে পাঠাতে চান।

চন্দনার বিয়ের খবর শুনে অলি খুবই অবাক। চন্দনা অসাধারণ ভালো ছাত্রী। অনার্সে সে ফার্স্ট বা সেকেণ্ড স্ট্যাণ্ড করবেই, সে মাঝপথে পড়া ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে?

দেখা গেল চন্দনা সে জন্য মোটেই দুঃখিত নয়, বরং সে গোপন আনন্দে ঝলমল করছে। বিলেত যেন এক স্বর্গপুরী, সেখানে যাবার সুযোগ কে উপেক্ষা করতে চায়।

চন্দনা এ বাড়িতে অনেকবার এসেছে, সে অলির বাবা-মাকেও নেমন্তন্ন করলো। সে চলে যাবার পর বিমানবিহারী সকৌতুকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন তাঁর মেয়ের দিকে, তারপর বললেন, কী রে, তোর বন্ধুরা দেখছি একে একে গিয়ে ছাদনাতলায় বসছে, তোর জন্যও একটা পাত্তর টাত্তর দেখি?

অলির মা কৌতুকের সঙ্গে নয়, বেশ উদ্বিগ্ন ভাবেই বললেন, আমি ঠিক সেই কথাই ভাবছিলুম। অলকাদি একটি ভালো ছেলের কথা বলছিলেন, সেও বিলেত যাবে, অলকাদি বলছিলেন যদি আমরা অলির সঙ্গে সম্বন্ধ করতে চাই…

অলি অনেকখানি ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলো, সম্বন্ধ মানে?

সরমা ধমক দিয়ে বললেন, মেমসাহেব হয়েছিস নাকি? সম্বন্ধ করা কাকে বলে জানিস না?

বিমানবিহারী বললেন, আজকাল ভালো ভালো ছেলেরা সবাই বিলেত আমেরিকা চলে যাচ্ছে। তবু ওরকম ছেলের সঙ্গে আমি অলির বিয়ে দিতে চাই না।

সরমা বললেন, কেন? অলকাদি যে ছেলেটির কথা বলেছেন সে জাস্টিস পি এন মিত্রর ছেলে, ব্যারিস্টারি পড়তে যাচ্ছে, চেহারাও সুন্দর।

বিমানবিহারী বললেন, তা না হয় বুঝলুম। কিন্তু এরা যদি বিলেত থেকে আর না ফেরে? আমি মরে গেলে আমার এই ব্যবসা দেখবে কে? অলি আর অলির বরকেই তো সামলাতে হবে।

সরমা বললেন, তোমার যত সব অদ্ভুত কথা। ফিরবে না কেন? ভালো বংশের ছেলেরা কখনো বিলেতের মাটি কামড়ে পড়ে থাকে না। সবাই তো আর তোমার গুণধর ভাইটির মতন নয়! দু'চার বছরের জন্য যারা গিয়ে ঘুরে আসে, তারা অনেক ভদ্র-সভ্য হয়। আমার ছোটমামার ছেলে অরুণকেই দ্যাখো না! কত বড় ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ফিরে এসেছে। অলকাদিকে বলবো, তুমি ছেলেটির সঙ্গে কথা বলবে?

—তা আমি কথা বলে দেখতে পারি। জাস্টিস পি এন মিত্রর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। ওঁর স্ত্রী তো কৃষ্ণনগরের মেয়ে, নাম করা সুন্দরী ছিলেন, আমরা আতরদি বলে ডাকতুম। ওঁদের তো তিন ছেলে, তুমি কার কথা বলছো?

—ছোট ছেলে, ডাক নাম লালটু। ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনোয় খুব মাথা। অলির সঙ্গে মানাবে!

চায়ের টেবিলে চা-পান শেষ হয়ে গেছে। টেব্‌লক্লথের ওপর ছড়িয়ে আছে কিছু বিস্কুটের গুঁড়ো, বাবা আর মা বসেছেন পাশাপাশি, উল্টো দিকে অলি, পিছনের জানলা দিয়ে শীতের নরম রোদ এসে পড়েছে তার গায়ে। জানলার বাইরে এসে বসেছে তিনটি শালিক পাখি।

বাইরে সবাই অলিকে খুব লাজুক আর নম্র জানে, কিন্তু বাবা-মায়ের কাছে সে বেশ জেদী মেয়ে।

সে তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কার সম্পর্কে আলোচনা করছো?

সরমা বললেন, লালটুকে তো তুই একবার দেখেছিস! নীপার বিয়ের

দিন এসেছিল, খুব ফর্সা রং, হলদে সিল্কের পাঞ্জাবি পরেছিল···

অলি বললো, হ্যাঁ, তার সঙ্গে কার বিয়ের কথা হচ্ছে ? আমি যে সামনে বসে আছি···আমি বুঝি একটা মানুষ নয়, আমার একটা মতামত নেবার কথাও বুঝি ভাবো না ?

সরমা গালে হাত দিয়ে বললেন, ওমা, তুই এত রেগে যাচ্ছিস কেন ? তোর মতামত ছাড়া বিয়ে হবে, তা কে বলেছে ? হুট্ করে বললেই কি বিয়ে হয়ে গেল নাকি ? কথাবার্তা চলবে, দেখাশুনো হবে, তোর মতামত নেওয়া হবে, ছেলের মতামত, তারপর সব কিছু যদি মেলে···একেই তো বলে সম্বন্ধ করা !

—আমার মতামতটা আগে নিলে তোমাদের অনেক ঝঞ্ঝাট কমে যাবে !

—সেটা কী শুনি ?

—এটা নাইনটিন্‌থ সেঞ্চুরি নয় । গৌরীদানের প্রথা উঠে গেছে । আমার বিয়ের চিন্তা নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই ।

বিমানবিহারী হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, তুই আমাদের একেবারে নাইনটিনথ সেঞ্চুরিতে ফেলে দিলি ? তোর মায়ের কি গৌরীদান হয়েছিল নাকি ?

অলি বললো, মার বিয়ে হয়েছিল চোদ্দ বছর বয়েসে । তোমরা যদি ভেবে থাকো··· বিমানবিহারী তাকে বাধা দিয়ে বললেন, তোর মায়ের খুব একটা খারাপ বিয়ে হয়নি কি বলিস ? ভেবে দ্যাখ, ঐ বয়েসে আমার সঙ্গে যদি তোর মায়ের বিয়ে না হতো তা হলে হয়তো তোর জন্মই হতো না । সেটা একটা খুব খারাপ ব্যাপার হতো, বল্ !

অলি উঠে পড়ে চলে যাচ্ছিল, বিমানবিহারী ঝুঁকে তার হাত চেপে ধরে বললেন, পালাচ্ছিস কেন ? তোর মতামতটা কি বল, ভালো করে শোনা হলো না !

অলি ঝাঁঝের সঙ্গে বললো, এম এ পাস করার আগে আমি ওসব নিয়ে কোনো কথাবার্তা বলতেও চাই না, শুনতেও চাই না !

—যাক বাঁচা গেল । আমারও ঠিক তাই মত । এখন তুই আর আমি দু'জনে মিলে তোর মায়ের বিরুদ্ধে লড়ে যাবো । কি বল ? জাস্টিস মিত্রের ছেলে লালটু অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করুক !

সরমা বললেন, তোমাদের যা ইচ্ছে করো, আমি আর কোনোদিন কিছু বলতে যাবো না !

এই প্রসঙ্গটা আপাতত এখানেই চাপা পড়ে গেল ।

কলেজে অলির একমাত্র বন্ধু রইলো বর্ষা । বিয়ের ব্যাপারে তার মতামত আরও অনেক বেশী উগ্র । সে চন্দনার বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে যেতেও রাজি নয় ।

অলি তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলো, চন্দনা তাদের খুবই ঘনিষ্ঠ, তার বিয়েতে না গেলে সে দুঃখ পাবে ।

প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে বকুল গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে বর্ষা বললো, চন্দনার বাবা কত খরচ করছেন জানিস ? মেয়ে-জামাইয়ের বিলেত যাবার জাহাজ ভাড়া দেবেন, মহম্মদ আলির দোকানে জামাইয়ের জন্য পাঁচ খানা সুটের অর্ডার দিয়েছেন, এ ছাড়া গয়না দিয়ে চন্দনার গা তো মুড়ে দেবেনই । আর ছেলের বাবা কী করবেন ? ওদের বাড়ি আসানসোলে । সেখান থেকে শ'খানেক বরযাত্রী আসবে, বাস রিজার্ভ করে । সেই বাসের আসা যাওয়ার ভাড়াও তিনি চেয়েছেন চন্দনার বাবার কাছে ।

—তুই অত সব জানলি কী করে ?

—চন্দনা বাড়িতে এসেছিল নেমন্তন্ন করতে, ওর কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিয়েছি । যে-কোন বিয়ের কথা শুনলেই আমি এই সব খবরগুলো জেনে নিতে চাই । যে-সব বিয়েতে মেয়ের বাড়ি থেকে পণ নেওয়া হয়, সে সব বিয়ের নেমন্তন্ন আমি খেতে যাই না । আমার ঘেন্না করে ।

—চন্দনার বাবা তো ঠিক পণ দিচ্ছেন না।

—মেয়ে-জামাইয়ের জাহাজ ভাড়া তিনি দিতে যাবেন কেন ? ছেলেটার মুরোদ নেই ? তুই একটা কথা ভেবে দ্যাখ, অলি, চন্দনা কি ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী । দেখতে সুন্দর, তাকে যে বিয়ে করবে, সেই-ই তো ধন্য হয়ে যাবে ? চন্দনা শুধু মেয়ে বলেই তার বাবাকে টাকা খরচ করতে হবে ? এই বারবারিক সিস্টেমকে তুই সাপোর্ট করিস ?

—চন্দনার বাবার আছে বলেই দিচ্ছেন । উনি নিশ্চয়ই ইচ্ছে করেই দিচ্ছেন । ওরা চায়নি ।

—কী করে বুঝলি ওরা চায়নি ? চন্দনার বাবা দিতে চাইলে, সেই হতভাগা ছেলেটা নিতে রাজি হলো কেন ? তার কোনো প্রেস্টিজ জ্ঞান নেই ? ওর আমি মুখও দেখতে চাই না।

—তুই বড্ড রেগে যাচ্ছিস, বর্ষা। ঠিক আছে, আমরা চন্দনার বরের মুখ দেখবো না, শুধু চন্দনার সঙ্গে দেখা করে আসবো।

—তোর যেতে ইচ্ছে করে, তুই যা !

হ্যাণ্ড ব্যাগ খুলে বর্ষা একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করলো। শঙ্কিত ভাবে এদিক ওদিক তাকালো অলি। বর্ষার সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি করা চাই। ছেলেরা যদি সিগারেট খেতে পারে তা হলে মেয়েরা কেন পারবে না, এই যুক্তিতে সে কিছুদিন ধরে সিগারেট টানতে শুরু করেছে। তাও সে লুকিয়ে চুরিয়ে খাবে না, প্রকাশ্যেই খাওয়া চাই। অনেকেই হাঁ করে তাকিয়ে দেখে, বয়স্ক লোকরা চলতে চলতে থমকে যায়, কেউ কেউ বিড় বিড় করে কী যেন বলে, খুব সম্ভবত ঘোর কলিকালের আগমন সম্পর্কে ঘোষণা, কেউ কেউ তাকে শুনিয়ে শুনিয়েই কটূক্তি করে যায়। বর্ষার কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সহপাঠীরাও অনেকে টিটকিরি দেয়। তার প্রসঙ্গ উঠলেই ছেলেরা বলে, কোন্ বর্ষা স্যান্নাল, সেই সিগারেট ফোঁকা পাগলিটা ? ওয়াল ম্যাগাজিনে তার সম্পর্কে রস-রচনা বেরিয়েছে, একটি ছেলে নিখুঁত ভাবে বর্ষার মুখ এঁকে দিয়েছে।

অলি অনেক ভাবে আপত্তি জানিয়েও শুধু ধমক খেয়েছে বর্ষার কাছ থেকে। বর্ষার ব্যক্তিত্বের কাছে সে হেরে যায়। তবে বর্ষার অনেক প্ররোচনাতেও সে নিজে সিগারেট ধরেনি। কয়েকবার সে সিগারেট টেনে দেখেছে, তার ভালো লাগে না।

সিগারেট ধরিয়ে বর্ষা বললো, আমার আরও রাগ ধরে কেন জানিস ? প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হওয়া কত শক্ত, অনেক ছেলেমেয়ে চান্স পায় না, আর এই মেয়েগুলো ফোর্থ ইয়ারে উঠতে না উঠতেই বিয়ে করে কলেজ ছেড়ে দিচ্ছে ! এটা একটা ক্রাইম। বিয়ের নাম শুনলেই মেয়েগুলো নেচে ওঠে। চন্দনার মতন মেয়েও যে পড়াশুনো ছেড়ে···

অলি বললো, চন্দনার কথা শুনে মনে হলো ওর বিলেত যাবার খুব ইচ্ছে হয়েছে।

—ও নিজে বিলেত যেতে পারতো না ? ওর বাবার পয়সা আছে, তা ছাড়া ও ডেফিনিটলি ভালো রেজাল্ট করতো, বিলেতের যে-কোনো কলেজে অ্যাপ্লাই করলে স্কলারশিপ পেতে পারতো ! সেটুকু ধৈর্য ধরতে পারলো না, বরের ল্যাজ ধরে ওকে সমুদ্র পার হতে হবে ?

—তুই বড্ড খারাপ কথা বলিস বর্ষা।

—কী খারাপ কথা বলেছি রে ? চন্দনার বরকে শুধু বাঁদর বলেছি, ওকে শালা বলা উচিত। শালা !

—তুই মনীশকে বিয়ে করবি না ?

—মনীশকে ? তোর মাথা খারাপ হয়েছে অলি ? তুই আমাকে এরকম একটা সিলি প্রশ্ন করতে পারলি ? যে-ছেলে ফ্রানৎস কাফকার নাম শোনেনি। থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি কী তা জানে না, তাকে আমি কথা বলার যোগ্যই মনে করি না।

—মনীশ কিন্তু তোর জন্য একেবারে পাগল ?

—আমি পাগল-টাগলদের থেকে দূরে থাকতে চাই। ছোটবেলা থেকেই আমি পাগলদের দেখলে ভয় পাই।

—ধ্যাৎ ! আমি কি সেই সেন্সে বলছি নাকি ?

—জানি। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হলে মনীশকে আমার যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। আমার রুচি, আমার মানসিকতা বুঝতে হবে, শুধু পেছন পেছন ঘোরা আর তোষামোদ করলেই তো চলবে না। ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আমার আপত্তি নেই, শুধু বন্ধুত্ব। বিয়ে ফিয়ের কথা ভাবলেই আমার গা গুলিয়ে ওঠে। কপালে সিঁদুর, হাতে লোহা···এগুলো কিসের চিহ্ন জানিস ? মেয়েদের জোর করে ধরে এনে পুরুষরা তাদের চুলের মাঝখানটায় চিরে দিত। অর্থাৎ এই মেয়েটা আমার বন্দিনী। সেই রক্তের দাগ এখনকার সিঁদুর। বিয়ের পর হাতে লোহা পরতে হয় কেন, তার মানে লোহার শেকল দিয়ে হাত বাঁধা হলো···এখনও চন্দনার মতন মেয়েরা সেধে সেধে ক্রীতদাসী হতে চায়। পৃথিবীতে যেদিন পুরুষ আর মেয়েরা একদম সমান সমান হবে, সেইদিন আমি বিয়ের কথা ভাববো !

অলি হেসে ফেললো।

বর্ষাও হেসে বললো, ভাবছিস, ততদিনে আমি বুড়ি হয়ে যাবো ?

—সে কথা ভাবিনি। তুই যখন এই সব কথা বলিস, তোর মুখে এমন একটা সীরিয়াস ভাব ফুটে ওঠে, মনে হয় তুই যেন আমার সঙ্গে কথা বলছিস না, গোটা পুরুষ জাতিটাই তোর চোখের সামনে···

—চল, কফি হাউসে যাবি ?

একটু দ্বিধা করে অলি বললো, না। কয়েকদিন আগে কফি হাউসে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে, সেই জন্য আর ওখানে যেতে ইচ্ছে করে না।

বর্ষা বললো, চল, তা হলে আমাদের বাড়িতে গিয়ে একটু বসবি ? আজ আমাদের বাড়িতে কেউ নেই।

অলির জন্য এখন আর বাড়ির গাড়ি আসে না, সে নিজেই বারণ করে দিয়েছে। সে এখন ট্রামে-বাসে যাতায়াত করে। এখন দুপুর তিনটে, পাঁচটার মধ্যে বাড়ি ফিরলেই চলবে।

বর্ষাদের বাড়ি বেশি দূরে নয়। তিনতলা বাড়িটিতে অনেকগুলি ভাড়াটে। দোতলায় বর্ষাদের দুটি মাত্র ঘর। বাবা মারা গেছেন, মা ছোট বোন আর দাদা-বৌদির সঙ্গে থাকে বর্ষা। বাড়ির সবাই মুর্শিদাবাদে দেশের বাড়িতে গেছে। কলেজ খোলা বলে বর্ষা যায়নি।

একখানা নিজস্ব পড়ার টেবিল পর্যন্ত নেই বর্ষার। টেবিল ফেলার জায়গা নেই, দু'দিকে দুটি খাট পাতা, একটি তার মা ও ছোট বোনের। ঘরের দেয়ালে একটি জোন অব আর্ক-এর বাঁধানো ছবি। বর্ষার খাটের ওপর বইপত্র ছড়ানো, সেগুলোই সরিয়ে সরিয়ে বর্ষা বললো, বোস এখানে। আমি চা তৈরি করে আনছি।

বসবার ঘর নেই, শোওয়ার ঘরেই বাইরের লোক এসে বসে, তাও খাটের ওপর। এরকম দেখার অভিজ্ঞতা নেই অলির। পড়ার টেবিল নেই, তবু বর্ষা রেজাল্টের জোরে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয়েছে। হাত খরচ চালানোর জন্য সে একটা টিউশনি করে। হঠাৎ অলির চোখ ছলছল করে উঠলো। নিজেকে তার মনে হলো স্বার্থপর। বর্ষার তুলনায় সে কত আরামে, কত ভালো অবস্থায় থাকে ! এটা যেন একটা অন্যায়।

শুধু চা নয়, দুটি ডিমের ওমলেটও ভেজে নিয়ে এলো বর্ষা।

অলি জিজ্ঞেস করলো, বাড়িতে আর কেউ নেই, তোর খাবার কে রান্না করে দেয় ?

বর্ষা বললো, কে আবার দেবে ? আমি নিজেই রান্না করি। আমাদের তো ঠাকুর-চাকর নেই। অন্য সময় মা রান্না করে। আমার মা কী রকম জানিস ? যেন পরের সেবা করার জন্যই জন্মেছে। আমার বাবা ছিলেন অটোক্রাট, হিটলারের মতন। এক হিসেবে হিটলারের চেয়েও খারাপ। কারণ কোনো ক্ষমতা ছিল না, সাধারণ রেলের চাকরি করতেন, বাড়িতে ছিল যত রকম হম্বিতম্বি, মা ভয় পেত খুব বাবাকে। আগে মা মুখ বুজে স্বামীর সেবা করে গেছে, এখন ছেলেমেয়ের সেবা করছে। নিজের কোনো সাধ-আহ্লাদ নেই। দাদাকেও মা ভয় পায়। আমি সামনের বছর একটা চাকরি নেবো ঠিক করেছি। তখন মাকে নিয়ে দাদার সংসার থেকে চলে যাবো।

—তুই এম এ পড়বি না ?

—প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবো। কোয়ালিফিকেশন তো বাড়াতেই হবে। এদিকে আয় অলি···

বর্ষা একদিকের একটা জানলা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠলো একটা অপূর্ব দৃশ্য। একটা চমৎকার বাগান, অনেক রকম ফুলের গাছ, কয়েকটা বড় বড় আম গাছ, আমগাছের মাঝখানে একটি শ্বেত পাথরের নগ্ন নারী মূর্তি।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে দুই বান্ধবী দাঁড়ালো জানলার পাশে। অলির তুলনায় বর্ষা বেশ লম্বা, তার মাথার চুল আলুথালু।

বর্ষা বললো, এটা লাহাদের বাড়ির বাগান, সুন্দর না ? আমি বিনা পয়সায় এই বাগানের শোভাটা পেয়ে যাই। তবে জানলাটা সব সময় খুলি না, সব সময় দেখলে এই সুন্দর ব্যাপারটা যদি পুরোনো হয়ে যায় ? ঐ লাহারা কি আর রোজ ওদের বাগানে এসে বসে ?

পাথরের মূর্তিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বর্ষা বললো, ঐ মূর্তিটা দেখলেই আমার তোর কথা মনে পড়ে। মুখখানা ঠিক তোর মতন না ?

লজ্জায় রক্তিম হয়ে অলি বললো, যাঃ, কী যে বলিস !

অলির কাঁধে হাত রেখে বর্ষা বললো, তুই বড় সুন্দর রে, অলি ! এই বাগানটার মতন, নরম আর পবিত্র। এত নরম থাকিস না। এই পৃথিবীটা বড় নিষ্ঠুর জায়গা, সবাই তোর ওপর সুযোগ নেবে। (ক্রমশ)

ছবি : অনুপ রায়

“নজর না লাগে, তবে বারো মাসে কখনও ডাক্তারের দরকার পড়েনি!”

“তাই বুঝি! তোমার ভাগ্য খুব ভালো তো!”

“আরে ভাগ্য নয় — এ হল ঝাণ্ডুর স্পেশ্যাল চ্যবনপ্রাশের কেরামতি!”

“ঝাণ্ডু? এ সেই আয়ুর্বেদ ওয়ালা ঝাণ্ডু?

“হ্যাঁ, সেই! আয়ুর্বেদিক উৎপাদনের মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো আর জানা-পরিচিত নাম। তবে মনে কোরো না যে এরা পুরোনো সেকেলে ঢঙে ওষুধ তৈরী করে। আমার জ্যাঠামণি বলছিলেন—এদের কারখানাগুলো নাকি বড় বড় রাষ্ট্রীয় ওষুধের কোম্পানীর মতই উন্নত আর একেবারে আধুনিক!”

“কি নাম বললে ওষুধটার, একটু ...”

“ওষুধ নয় ভাই, টনিক — ঝাণ্ডুর স্পেশ্যাল চ্যবনপ্রাশ! বাজারের অন্য সমস্ত চ্যবনপ্রাশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখবে — কেবল এতেই দেশী ঘিঁয়ে ভাজা শুদ্ধ আমলকি আছে — তার মানে, ভিটামিন সি-তে ভরপুর! আরো অনেক রকমের ভেষজও আছে। যেমন, পিপালী, বনসালোচন, লবঙ্গ, এলাচ, কুণ্ডকোল ইত্যাদি।

“এই দিয়ে শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট হয় আর সর্দিকাশির মত রোগ থেকে বাঁচা যায়!”

“তাহলে দাম নিশ্চয়ই বেশী?”

“হ্যাঁ, অন্য মামুলী চ্যবনপ্রাশের চেয়ে একটু বেশী, তবে আমি খাঁটি আর সেরা জিনিষের জন্যে একটু বেশী দাম দেওয়াই ভালো মনে করি। একটু লোভ করতে গিয়ে বেশী লাভ খোয়ানো কি বুদ্ধিমানের কাজ?”

“সত্যি! তা — কখন আর কিভাবে খেতে হয়?”

“আরে আজ থেকেই শুরু করো না। নিয়মিত খাওয়া চাই কিন্তু! অসুস্থ বা সুস্থ যেকোনো অবস্থায়! ছোট চামচের দু’চামচ— রোজ দুবার করে খাও — তারপর দেখো শরীরে কেমন নতুন প্রাণ আসে ...”

“এর স্বাদ কেমন রে?”

“দারুণ!” আমাকে তো দুতিন দিন অন্তর বোতলটা লুকিয়ে নতুন নতুন জায়গায় রাখতে হয়। বাচ্চারা একটু চেটে খাবার জন্যে সারাক্ষণ ছোঁক ছোঁক করে।

ZP/5/254

নাচনীর রস ও জীবন

তপন বসু

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া থেকে শুরু করে বিহার ও উড়িষ্যার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে 'নাচনী' এক শ্রেণীর মেয়েদের পেশা বা বৃত্তি। যেসব মেয়েরা নানা কারণে সাধারণ জীবন থেকে ছিটকে আসতে বাধ্য হয় তাদের আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচায় এই নাচনীর জীবন। এই প্রবন্ধটিতে লেখক আমাদের দেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির এক শিল্পময় অথচ নিদারুণ চিত্র তুলে ধরেছেন।

“আমার ডাক্তার যখন বললেন কেয়ো-কার্পিন হেয়ার ভাইটালাইজার সত্যিই চুল পড়া বন্ধ করে, আমি শুনে অভিভূত হয়েছিলাম।”

“ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন কেয়ো-কার্পিন হেয়ার ভাইটালাইজার* অনেক গবেষণার পর অভিনব বৈজ্ঞানিক ফরমুলায় তৈরী। তিনি আরো বলেছিলেন; চুলের গোড়া শক্ত করার জন্য এতে আছে প্রয়োজনীয় সবরকম প্রোটিন, কো-এনজাইম এবং ভিটামিন।

আমিও দেখছি, ঠিক তাই, এর ব্যবহারে আমার চুলপড়া বন্ধ হয়েছে, খুস্কিও চলে গেছে।”

এবারে এই রিসার্চ রিপোর্টটি পড়ে দেখুন :

“৬৬.৬৬% ক্ষেত্রে চমৎকার এবং ৩৩.৩৩% ক্ষেত্রে বেশ ভালো ফল পাওয়া গেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই খুস্কিপড়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে এবং প্রায় সর্বক্ষেত্রেই চুলপড়া প্রায় রোধ হয়েছে।...অতএব বলা যেতে পারে কেয়ো-কার্পিন হেয়ার ভাইটালাইজার এক্ষেত্রে পুরোপুরি সাফল্য লাভ করেছে।”

ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট ১১৮ ২২৩ (১৯৮৪)

পরীক্ষিত ও প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চুল পড়া বন্ধ করে

*এটি কোন প্রসাধন সামগ্রী নয়।

যাদের যত্নই আপনার আস্থা

CLARION C-DMHV-3

ন মৎস্ত্রী সুভসত্তরা ন সুযাশুতরা ভুবৎ।
ন মৎপ্রতিচ্যবীয়সী ন সক্থ্যুদ্যমীয়সী বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥

অর্থাৎ 'কোনও নারীই আমা অপেক্ষা অঙ্গসৌষ্ঠববতী নহে, কোন নারীই আমা অপেক্ষা বিলাসগতি জানে না, কোন নারীই আমা অপেক্ষা প্রকৃষ্টরূপে স্বামী সহবাস করতে অথবা প্রণয়বশে আলিঙ্গন করতে জানে না।' এই সগর্ব ঘোষণা স্বয়ং ইন্দ্রানী শচীর। ঋগ্বেদ সংহিতার ৮৬ সূক্তে ৬ শ্লোকে তিনি এই অহংকার প্রকাশ করেছেন—সে তো বহু যুগ আগের কথা। তাহলেও কালের সুদীর্ঘ পরিক্রমায় কি দেব কি মনুষ্য তাবৎ স্ত্রী চরিত্রের বোধ হয় বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। আজও কোন্ নারী নিজেকে কোন না কোন ভাবে শ্রেষ্ঠা মনে করে না? এবং কে বিরত থাকে কোন না কোন ভাবে বা কলায় নিজেকে প্রকাশ করতে—অন্যের চোখে আকর্ষণীয় রূপে নিজেকে তুলে ধরতে? স্বাভাবিকভাবেই নাচনীরাও এর ব্যতিক্রম নয়। বরং পেশাগত কারণে তারা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে থাকে, তা যেমন দেহসম্পদের আবেদনে তেমনি সঙ্গীতের মাধ্যমে কণ্ঠসম্পদে তথা অঙ্গসঞ্চালনরূপ নৃত্যকলাতেও।

বিভিন্ন কারণে 'নাচনী' নামে অভিহিত এই নর্তকী সম্প্রদায় আজও ভারতীয় নৃত্যশিল্পের অঙ্গনে নানাভাবে নিন্দিত ও ব্রাত্য। আমরা তারাশঙ্করের 'কবি' বা মনোজ বসুর 'আংটি চাটুজ্যের ভাই' গল্পে যে নর্তকীদের দেখা পাই—কোন কোন অংশে তাদের সঙ্গে মিল থাকলেও এরা সে ধরনের নর্তকী নয়। সেখানে তারা প্রত্যক্ষভাবে দেহোপজীবিনী বেশ্যা এবং উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের করুণ শিকার। পূর্বতন মানভূম অঞ্চলের আলোচ্য নাচনীরা ঠিক সেই পর্যায়ে পড়ে না। তবে এদের উৎসমুখ নানান জটিলতায় পূর্ণ এবং বৃত্তিটি সমাজের চোখে ভিন্ন রুচির হওয়ায় এদের অন্য চোখে দেখা হয়। তাই সমাজের মধ্যে এদের যেন নতুন একটা বর্ণ সৃষ্টি হয়েছে যা তথাকথিত হরিজনদের থেকেও নিচে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করে মনে হয়েছে এরা গণিকা সমাজেরই কাছাকাছি তবে গণিকাদের মত আলাদা পল্লীতে গিয়ে বাস করতে হয় না। রসিকের সঙ্গে রসিকের ঘরেই থাকতে পায়, এমন কি রসিক যে বাড়িতে তার সামাজিক প্রথায় বিয়ে করা স্ত্রী—আঞ্চলিক ভাষায় ইনি 'কুলের বৌ'—নিয়ে বাস করে সেই বাড়িতেই। নাচনীর জন্যে কোন দূরবর্তী স্থানে আলাদা বাগানবাড়ির দরকার হয় না। রসিকের ঘরে নাচনীর স্থান তার রক্ষিতার মত। অনেক সময় রসিকের সামাজিক প্রথায় বিবাহিত স্ত্রী থাকে না—একমাত্র নাচনী নিয়েই স্বামী-স্ত্রীর মত জীবন কাটিয়ে দিয়েছে এমনও দেখা যায়।

স্বভাবতই প্রশ্ন আসে 'রসিক' কে? রসিকের পরিচয় খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। ব্যক্তিভেদে ও স্থানভেদে রসিকের পরিচয় বিচিত্র। আবার কালের অনুক্রমেও দেখা যায় রসিকের চরিত্র

শুন ওহে বংশীবাদন নিশ্চয় তাজিব জীবন

বদল হয়েছে। তবে প্রথাগতভাবে রসিকের ভূমিকা নাচনী নাচের মূল কেন্দ্রে। রসিকের কণ্ঠেই বেজে ওঠে প্রথম ঝুমুরের একটি কলি। সঙ্গে তাল, সুর যোগ করে ঢোল, মাদল, সাইনা (সানাই), মন্দিরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। ঝুমুরের প্রথম কলিটি ধরে নিয়ে গাইতে থাকে, আর অন্তর্নিহিত বক্তব্যটিকে চিত্রায়িত উপস্থাপনার খাতিরেই ঘাগরা ধরে, রুমাল বা ওড়না উড়িয়ে নেচে চলে নাচনী। স্বভাবত প্রতিটি গুণী রসিক হলেন ঝুমুর গানের সম্যক অধিকারী। এটা তাঁকে হতেই হবে—এটা প্রাথমিক শর্ত। তবে ব্যতিক্রমও আছে। রসিক যদি তার নিজের চেয়েও গুণী ঝুমুরিয়াকে পায় তাহলে সেই ঝুমুরিয়াকে গাইবার দায়িত্ব দিয়ে নিজে শুধুই নাচনীর সঙ্গে নৃত্যতালে সহযোগিতা করে থাকে।

কিন্তু ঝুমুরের প্রধান যে বিষয়, যে ভাব, যে রস তা ব্যক্ত করে রসিক ঝুমুরিয়া—যে ঝুমুরের প্রধান উপজীব্য রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, সৃষ্টিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি—যে ঝুমুরের ভাষায় ও সুরে প্রকাশ পায় রসিক মূলত একজন সাধক—রসের সাধক। সেই রসের উপস্থাপনাই হল নৃত্য-তাল-বাদ্য-গীতির মণ্ডলাকৃতি সমন্বয় এই নাচনী নাচ—রসিক হল তার উপস্থাপক। এমন রসের কারবারী বলেই এখানে রসিকের অন্য নাম নাগর। এই সাধক রসিকেরই অতীত ছায়া দেখতে পাই যখন কোন প্রাচীন পদে শুনি—

এক সো পদমা চৌষঠ্‌ঠী পাখুড়ী
তহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধনায় চৌষট্টী পাপড়ির পদ্মদলমণ্ডলে ডোমনী নেচে চলে। তার সঙ্গে পদ গায় কাহ্নপাদ, শবরপাদ, ভুসুকপাদ প্রভৃতি রসিক পদকারবৃন্দ। অথবা আমরা চলে আসতে পারি গীতগোবিন্দের জয়দেব-পদ্মাবতীর কালে। যেখানে "পদ্মাবতী-চরণচারণচক্রবর্তী" জয়দেব

ইলেকট্রন পুরোমাত্রা দেখে নেয় যে এর ফিলামেন্টের শক্তি জীবনের প্রতিদিনের ধকল সইতে কতটা সফল।

বাজারে ছাড়ার আগে, ইলেকট্রন বাল্‌ব ও টিউবকে নানান জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার এ হ'ল এক উদাহরণ মাত্র।

অন্যান্য জটিল পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে—ক্যাপ সিলিং এর মারপ্যাঁচের পরীক্ষা, আলোকচ্ছটার মাত্রা দেখার জন্য লুমেন টেস্ট, ফিলামেন্টের ক্ষমতা দেখার জন্য নক্ টেস্টের ধাক্কা এবং দীর্ঘকাল চমৎকার জ্বলার জন্য ১০০০ ঘণ্টা আলো জ্বালানোর পরীক্ষা।

আরো কি, ইলেকট্রন বাল্‌ব ও টিউব নির্মাণের অধিকাংশ যন্ত্রোপকরণই ইলেকট্রন গ্রুপ দ্বারাই নির্মিত। আর যেসব উপকরণ নয়, যেমন ফ্লোরেসেন্ট পাউডার ও ফিলামেন্ট ওয়্যার সেগুলি আবার আমেরিকার অগ্রণী নির্মাতা জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক থেকে আমদানি করা।
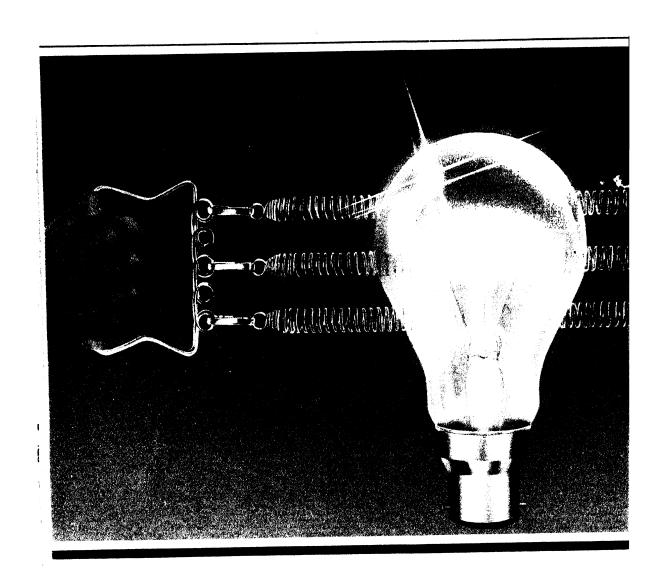
'শক্ ট্রীটমেন্ট' যেটাকে এখানে বলা হয় ইলেকট্রন ভোল্টেজ টেস্ট। প্রতিটি বাল্‌ব ও টিউবকে এই পরীক্ষার ধাক্কা পাশ করতে হবে। নাহলে ফেল। ৩০০ ভোল্টের এক তড়িৎ-শক্তি ফিলামেন্টে একটা ঝট্‌কা দিয়ে দেখে নেয় যে সেটা আপনাদের ঘরের হামেশা ভোল্টেজের বিরাট ওঠা-নামার ধকল সইতে সক্ষম কিনা।

এইসব গুণের বহরের জন্যেই, আশ্চর্যের কিছুই লাগে না। যখন দেখা যায় যে এত অল্প সময়ের ভেতরে, ঘরে-ঘরে ও অফিসে অফিসে ইলেকট্রন বাল্‌ব, টিউব ও ফিটিংস-এর কদর বেড়েছে বিপুল হারে।

ইলেকট্রন সোডিয়াম ভেপার, মারকারি ভেপার ও হ্যালোজেন ল্যাম্প, পথঘাট, ফ্যাক্টরি, প্রভৃতি সাজিয়ে তুলেছে আলোকচ্ছটায়।

আজ্ঞে হ্যাঁ, এর ১০০০ ঘণ্টা আয়ুর প্রতিটিক্ষণ, এ আলোকচ্ছটা করবে বিকীরণ!

রসিক ধ্রুব কুমার

গান করছেন আর সেই গানের রাগ-তাল অনুসরণ করে পদ্মাবতী নাচছেন।

"জয়দেব মাধবর স্তুতিক বর্ণাবে,
পদ্মাবতী আগত নাচন্ত ভঙ্গিভাবে।....
কৃষ্ণের গীতক জয়দেবে নিগদতি
রূপক তালর চেবে নাচে পদ্মাবতী।"

প্রকৃতপক্ষে কয়েক শতাব্দীর আগের দৃশ্য যেন আজও এই বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদেও বাস্তবে সম্ভব হয়ে চলেছে এই বাংলারই গ্রামের আনাচে-কানাচে। জয়দেবকে যদি রসিক ধরে নিই, আর পদ্মাবতীকে নাচনী, তাহলে কোন পার্থক্যই চোখে পড়বে না আজকের নাচনীর আখ্যানে। রাঢ়ের ঝুমুর গানের পরিচয় আমাদের পণ্ডিত মহলে কিংবা সঙ্গীতরসিকদের মধ্যে অনেকদিন আগেই ঘটেছে। কিন্তু চিরদিনই তা সংস্কৃত মানুষের কাছে অপাংক্তেয় থেকে গেছে—তা প্রাকৃতজনের ভোগ্য বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে —এবং বর্তমানেও তাই আছে। এই ঝুমুর গানের মূল বিষয় সেই মহাত্মা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রাণা রাধিকার প্রণয়লীলা। সেখানে কবির কবিত্বশক্তির গুণে বহু গীত রস-সৃষ্টির মানে ও মাত্রায় রীতিমত সুধীজন-বৃন্দেরও চমক সৃষ্টি করে—সমীহ আদায় করে নেয়। বহু গান আছে যা কয়েক যুগ ধরে ঝুমুরিয়া ও নাচনীদের মুখে গীত হয়ে চলেছে। তার ভাব, রস, কাব্যগুণ রসিকদের মধ্যে কাল থেকে কালে গ্রহণীয় হয়ে আসছে। রসিকরা সেই গান গীত করছে, নাচনীরাও কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়ে, অঙ্গের লীলায়িত ভঙ্গিমায় নেচে, পদচারণায় ও হস্তের মুদ্রায় সেই গীতের ভাবকে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে সঞ্চারিত করছে। বলা বাহুল্য যে, জয়দেব-পদ্মাবতী তাঁদের নাচ বা গানের জন্য আজ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে আসন টিকিয়ে রাখতে পারেননি। তাঁরা অমর হয়েছেন তাঁদের গীতগুলির সাহিত্যগুণের
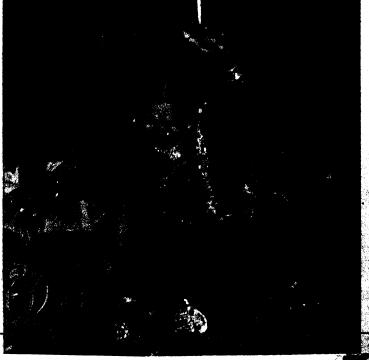
মোটাতালের পোশাকে মঞ্জুড়া

নৃত্যভঙ্গিমায় চপলা

জন্য, রসসম্পদের জন্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে পারি সেই কালে শুধু মাত্র তাঁরাই নন, আরও বহু জয়দেব ছিলেন, বহু পদ্মাবতীও ছিলেন। সবাই জয়দেবের মত রাজার প্রসাদ পাননি, জয়দেবের মত কবিত্বশক্তিও পাননি—তাঁরা শুধু জীবন ব্যয় করে মাঠে-ঘাটে-পথে নৃত্যগীত সাধন করেই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন। তাঁদের কথা কেউ মনে রাখেনি। প্রয়োজনও হয়নি। কিন্তু তাঁরা আজও আছেন, বেঁচে আছেন আমাদের এই বাংলারই মাটিতে—সংস্কৃতিতে। আজও তারা এক একটি আসরে কয়েক সহস্র মানুষকে আনন্দ দিচ্ছেন, নিজ নিজ কলাসৌকর্যে মোহিত করছেন। ভাবে, রসে আপ্লুত করছেন। সেই সঙ্গে যেন বৈদিক যুগের ইন্দ্রানীর মতই বলছেন, আমার চেয়ে কলাবতী নারী কে আছে? আমি রসিকের রাধা যে শত রসিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঝুমুরিয়া।

নাচনী নাচের আসরে যে সমস্ত গান গাওয়া হয় তার প্রধান অংশই আঞ্চলিকভাবে রচিত। এই ঝুমুর রচয়িতাগণ সকলেই রসিক নন, অর্থাৎ নাচনী রেখে নৃত্যানুষ্ঠান করে বেড়াননি কিন্তু ঝুমুর গাইয়েদের জন্যে হাজার হাজার ঝুমুর রচনা করে গেছেন, করে চলেছেন। এমন ঝুমুরিয়াদের মধ্যে যিনি সব চেয়ে জনপ্রিয় তাঁর নাম ভবপ্রীতানন্দ। দেওঘর নিবাসী এই কবির ঝুমুর শোনেনি বা গায়নি এমন মানুষ মানভূম অঞ্চলে খুব কমই পাওয়া যাবে। ভবপ্রীতা ছাড়াও বহু ঝুমুর রচয়িতা এতদঞ্চলে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ঝুমুর রচনা করে চলেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিখ্যাত হয়েছেন, সকলের নাম উল্লেখ করা এখানে সম্ভব নয়। তবুও প্রথম দৃষ্টিপাতে যে নামগুলি মনে পড়ে তা হল, দীনা তাঁতি, রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, বিনন্দিয়া সিং, জগৎ কবিরাজ, উদয় কামার, চামু কামার, জগা মণ্ডল, কৃত্তিবাস কর্মকার, বিপিন মুখী, অঙ্গরাজ মাহাত প্রভৃতি। এছাড়া সলাবত মাহাত, হাজারী রাজোয়াড়, সুনীল মাহাত, নিরঞ্জন মাহাত প্রভৃতি তরুণ ঝুমুরিয়ারাও আধুনিক যুগের ভাব ভাবনাকে ঝুমুরে ফুটিয়ে তুলছেন। রসিক কিংবা নাচনীরা এঁদের রচনাকে সুরে তালে ছন্দে আসরে আসরে গীত করছেন। তাল সুর রসিকের প্রতিভার বস্তু। কারণ অনেক সময় ছাপা বই থেকেও গানের নির্বাচন হয়—সেক্ষেত্রে গানের স্বরলিপি তো পাওয়া যায় না। ঝুমুর গানের মূল ধাঁচ (প্রথমে খুব চড়া-য় ধ'রে ধীরে ধীরে 'খাদ'-এ নেমে আসা, সমে না ধ'রে ফাঁক থেকে ধরা) অনুসরণ করেই রসিকবৃন্দ বা ঝুমুরিয়ারা তা গীত ক'রে থাকেন। তবে লক্ষ্য করা গেছে একই ঝুমুর নাচনীর আসরে গাওয়ার সময় মেজাজে একটু বদলে যায়। গভীরতা একটু কমে। বাদ্যযন্ত্রের প্রাবল্য ও লয়ের দ্রুততা এই স্বতন্ত্র মেজাজ সৃষ্টি করে। এছাড়া ঝুমুরের বিষয়বস্তু ও গায়নরীতির ভিত্তিতে ঝুমুরকে অনেকগুলি ভাগে ভাগ করার চেষ্টা করেছেন বিশেষজ্ঞ সুধীবৃন্দ। তাঁরা আলাপ আলোচনাও করেছেন। বর্তমান নিবন্ধে মাঝে মাঝেই প্রাসঙ্গিকতার খাতিরে ঝুমুরের কথা বলব, তবে তা অবশ্যই কোন ব্যাকরণ-বিধি নির্দেশ করে নয়।

সাধারণ ঝুমুর গাইয়ে থেকে রসিক হতে গেলে, ঝুমুর গাইয়ের জীবন থেকে একটু উপরে উঠতে হয়। সাধন সঙ্গিনী প্রয়োজন। বিবাহিত স্ত্রী বা 'কুলের বৌ'-কে নিয়ে এই সাধনা চলে না। সংসার, পুত্র-কন্যা, বিষয়-আশয় নিয়ে তিনি কুল-এই থাকেন। রসিককে সংগ্রহ করতে হয় অকূলে ভেসে পড়া কোন কুলত্যাগিনী কন্যাকে, যে হবে তার নিত্যসহচরী, তার 'ডোম্বী' কিংবা 'পদ্মাবতী'। যে তার ঝুমুরের ভাব ও সুরকে নেচে গেয়ে রঙীন করে তুলবে ছন্দে, ভাবে, মাতিয়ে তুলবে লাস্যে, কটাক্ষে; দর্শনীয় করবে নৃত্ত, হস্তে, মুদ্রায়, চারীতে। অর্থাৎ নাচনী।

কোন্ মেয়ে আছে কুল ছেড়ে রসিকের রক্ষিতা হয়ে নাচনীর জীবন বেছে নেবে? নাচনীর জীবনে 'স্বামী' নেই, আছে রক্ষক—রসিক—নাগর। পুত্র-কন্যা কাম্য নয়, কারণ জন্ম হলে তার পরিচয় হবে 'নাচনীর বেটা' বা 'নাচনীর মেয়্যা'। কোন্ পুত্র-কন্যা চাইবে নাচনীর—একজন রক্ষিতার গর্ভে জন্মাতে? তবুও নাচনীদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, প্রতিপালিত হয়। কন্যারা আবার কারো নাচনী হয়ে কিংবা আর কারো, রক্ষিতা হয়ে বেঁচে থাকে। পুত্ররাই পড়ে মুশকিলে। তাদের জীবনে

চটুল ভঙ্গিমায়

নিষ্পাপ শিশুর প্রীতি অর্ঘ্য

নতুন সার্ফ কেনাই আরও বুদ্ধিমানের কাজ
" বিশ্বাস করুন, সত্যি বলছি, সার্ফ কেনার মত এমন বুদ্ধিমানের কাজ আর হয়না । এর ঐ পাওয়ার প্যাক্ড ফর্মূলাই আপনার পয়সার সেরা মূল্য উসুল ক'রে দেয় ! "
সেরা মূল্য উসুল করে ? প্রথমতঃ সার্ফের দামই তো দারুণ বেশী ?
" আচ্ছা ভাই, আপনি কি দেখতে পান না যে এ দিয়ে লাভ পাওয়া যায় কত বেশী ? একমাত্র সার্ফই আমার কাপড় ধোয় সবচেয়ে সাদা ক'রে আর কাপড় রাখেও দারুণ সুরক্ষিত । তাই তা দেখতেও সবসময় লাগে নতুনের মত – যার ফলে, আপনারও নানাভাবে সাশ্রয় হতে থাকে, আর, সেরা মূল্য উসুল করা বলতে, আমি ঐটিই বোঝাতে চেয়েছি ।"
ঠিক আছে, মানলাম, কিন্তু ললিতা দেবী, শুধু ঐটুকুই কি সব ?
"না, না, আরও আছে ! সার্ফের ১/২ কিলো পাউডার অন্যান্য সাধারণ পাউডারের ১ কিলোর সমান হয়—যার মানেই হচ্ছে সাধারণ পাউডারের ১ কিলো পাউডার যতগুলি কাপড় ধোয় এর ১/২ কিলো দিয়ে ততগুলিই ধোওয়া যায় । তাহলে সার্ফ দিয়ে আরও লাভ দেখতে পাচ্ছেন তো?"
১ কিলো সাধারণ পাউডার
১/২ কিলো সার্ফ
অর্থাৎ এর মানে হ'ল, সার্ফ নিজস্ব উপায়ে আপনার পয়সা উসুল করে...
"...আর আপনি তার লাভ পান নানান দিক দিয়ে । সস্তার জিনিষ আর ভাল জিনিষ কেনায় তফাৎ থাকে । সেইজন্যেই তো সার্ফ কেনা সবসময়ই আরও বুদ্ধিমানের কাজ।"
POWER PACKED
Surf

সমস্যাটা প্রকট, তবুও যাবে কোথায় বাঁচতে হয়, আর কোনো নাচনীর মেয়েকে নিয়ে তারাও ঘর সংসার পাতে। তথাকথিত সমাজের মধ্যেই আর একটা সমাজ গড়ে ওঠে যা হরিজনের চেয়েও 'হরি'। তাদের কথা আলাদা। নাচনীর কথায় আসি।

রসিকদের কাছে নাচনীরা কুল ছেড়ে আসে নানা পথে। এদের মধ্যে পথভ্রষ্টা নারীর সংখ্যাই সর্বাধিক। প্রেমিকের সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে প্রেমিককে হারিয়ে তারা কখনো পথহারা পাখি, কখনো প্রবলের অত্যাচারে জাত-কুল খোয়াতে বাধ্য হয়েছে, কখনো অভিভাবকের অসহায় অবস্থার সুযোগে রসিকের কাছে বিক্রী হয়ে গেছে। বহু নাচনীর সঙ্গে দিনের পর দিন কথা বলে দেখেছি তারা কেউই শৈশবে নাচনী হবার স্বপ্ন দেখেনি। কারণ এ জীবন অনেক ক্ষেত্রে সুখের হলেও নারীর কাম্য জীবন নয়। আধুনিক কালে তথাকথিত সভ্য সমাজে নৃত্যকলার চর্চা শিক্ষিত সমাজের কাছে একটা রুচির পরিচায়ক হয়ে উঠেছে। 'আমার মেয়ে নাচ, গান দুটোই জানে'—পাঁচজনকে ডেকে বলার মত কথা। সেখানে ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সম্ভ্রান্ত গৃহীর কন্যাদেরও—স্বেচ্ছায়, একটা শিল্পের অনুশীলন বা চর্চার ধারা হিসেবে —যা এই সভ্য শিক্ষিত সমাজের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির পরিচায়ক। ঐ শিশুকন্যারা পরিণত বয়সে দেশের তথা জাতির সাংস্কৃতিক অঙ্গনে স্বাক্ষর রাখছে, শিল্পীর মর্যাদা পাচ্ছে, নিজের দেশকে বিশ্ব জনমণ্ডলীর কাছে তুলে ধরছে, প্রতিষ্ঠা দিচ্ছে। কিন্তু নাচনীর জীবনে তো তা হয় না। এরা গ্রাম্য লোকসমাজের মনোরঞ্জনের জন্য নাচে। এই লোকসমাজ এদের কোন্ মর্যাদায় নেবে সেটা অনুধাবন করতে হলে এই লোকসমাজের চরিত্রটা বুঝতে হবে :

১৯৮১ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের একটি গবেষণা প্রকল্পের সমীক্ষা কার্যে যখন পুরুলিয়ার আমনডি গ্রামের বাস স্টপেজে আমরা ছ-জন গবেষক চা খেতে নেমেছিলাম, তখন এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়েছিল, যা গোটা পশ্চিমবঙ্গ ঘুরেও হয়নি। চায়ের দোকানে চা দিতে বলায় দোকানদার শর্ত দিলেন, চা খেয়ে গেলাসটা ধুয়ে দিতে হবে। বলা বাহুল্য এমন কথা আমরা এর আগে কোনদিন শুনিনি। এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় দোকানদার বললেন, আমরা ব্রাহ্মণ, খদ্দেরের এঁটো গেলাস নিজ হাতে ধোবো না। জাত্যভিমানের কথা আগে বইতে পড়েছিলাম, সেদিন প্রত্যক্ষ করলাম। সে দোকান ছেড়ে অন্য দোকানে গেলাম, কিন্তু সেদিন কোন অব্রাহ্মণের চা-দোকান পাইনি, ফলে আমার চা খাওয়াও হয়নি। যদিও আমাদের মধ্যে কয়েকজন অত্যন্ত চা-পিপাসু ঐ শর্তেই চা খেয়ে (নিজে ব্রাহ্মণ হয়েও) গেলাস ধুয়ে দিয়ে এসেছিলেন।

এই জাত্যভিমান শুধু ব্রাহ্মণদের মধ্যে নয়, অন্যদের মধ্যেও সমানভাবে সক্রিয়। এবং এর বিষময় ফলাফল কি নিদারুণ বিক্রিয়া ঘটাতে পারে তা চারু নামক মহিলার জীবনী বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে :

আটশ' টাকায় বিকিয়ে যাওয়া মালতী

চারু ছিল সিংভূম জেলার পটমদা থানার বাঙুড়দা গ্রামের এক কর্মকার পরিবারের মেয়ে। যৌবনকালে স্বজাতির মধ্যেই তার বিয়ে হয়। চারুর বাবা এক সময় এক ডোমের মেয়েকে রক্ষিতা করে। চারুর জবানবন্দী অনুযায়ী সেই ডোমের মেয়ে স্বেচ্ছায় তার বাপের সঙ্গে এসেছিল। কিন্তু উক্ত ডোমগোষ্ঠীর লোকেরা মনে করেছিল চারুর বাবা জোর করে তাদের মেয়েটিকে দখল করেছে। ফলে ডোমরা এর প্রতিশোধ নিতে মনস্থ করে। তারা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। একদিন চারু যখন এক সঙ্গিনীর সঙ্গে কুয়োয় জল আনতে যায় তখন ডোমরা চারুকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের পাড়ায় আটক করে এবং জোর করে চারুকে তাদের ভাত খাইয়ে দেয়। ফলে চারুর জাত চলে গেল। তাকে তার শ্বশুর ঘরে আর গ্রহণ করল না, চারুর বাপ-দাদারা তার 'সাঙ্গা' দেয় বরাবাজার থানার বিষকুদরা গ্রামে এক নিম্নবর্ণের প্রৌঢ়ের সঙ্গে। কিন্তু কিছুদিন পরে সেই প্রৌঢ় তাকে বিতাড়িত করে। চারু ফিরে আসে বাপের বাড়ি, কিন্তু সেখানে তার জায়গা হল না। ফলে মাত্র আঠার বছরের এক যুবতীকে বেরিয়ে পড়তে হল নিরুদ্দেশের পথে। কিন্তু একজন অশিক্ষিত গ্রাম্য যুবতী নিঃসম্বল অবস্থায় কোথায় যাবে? সে অকুল পাথারে ভাসতে থাকে। চারুর নিজের

আর্ত নারী প্রাণের দায়ে বিজাতীয়ের ঘরে অন্নগ্রহণ করতে বাধ্য হলেও তার জাত চলে যায়। আর জাত চলে গেলে তার জীবনে কিছুই থাকে না। জানি না যারা দেওয়াল-লিখনে শহর সাজায় তারা কোন 'সর্বহারা'দের কথা বলে। চারুদের জীবনে তো দেওয়ালও নেই। তারা দেওয়াল লিখনও জানে না, দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ানোও হয় না।

মুখের কথায় 'হামি তখন পাগলীর মত ঘুরছি, গায়ের কাপড়টাও নাই ছিল।' এভাবে প্রায় বছরখানেক পথে-বিপথে কাটে। অতঃপর তার বাপের বাড়ির গ্রামেরই এক ভূমিজজাতীয় ব্যক্তি তাকে ধরে আনে এবং কিছুদিন তাকে উপভোগ করে। এবং এক সময় ঐ ভূমিজ ব্যক্তি চারুকে সিংভূম জেলার ঝুঁঝকা গ্রামে আর এক ভূমিজের কাছে হস্তান্তরিত করে। সেখানেই সেই ভূমিজের ঔরসে তার একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু বছর তিনেক কাটার পর সেখান থেকেও চারু বিতাড়িত হয়। সে আবার ফিরে আসে তার বাপের বাড়ির দেশে, কন্যা সন্তানটিকে কোলে নিয়ে। কিন্তু তাকে তার দাদারা যথারীতি ঘরে ঠাঁই দেননি। তারা তাকে পাঠিয়ে দেয় পুঞ্চা থানার কুচুং গ্রামে (সম্ভবত বিক্রয়কর্ম)। কুচুং-এর অবস্থান কালেই সে হস্তান্তরিত হয় রসিক খেদন মাহাত-র কাছে। খেদন তাকে নাচনীর পেশায় নিযুক্ত করে এবং খেদনের ঔরসে চারুর আরো একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। চারুর বয়স এখন আনুমানিক পঞ্চাশ-বাহান্ন বছর। সে গত দশ-বার বছর হল নাচ ছেড়েছে। খেদনের নাচনী—এই পরিচয়েই সে পুঞ্চা থানার পানিপাথর গ্রামে বেঁচে আছে।

বলা বাহুল্য এরকম অজস্র চারু মানভূমের মাটিতে আজও জন্মাচ্ছে। কোন পুরুষ যদি ভিন্ন জাতির মেয়ের সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হয়, তাহলে সেই মেয়ের জাত গেল। এর প্রতিশোধ নিতে গ্রামের মাতব্বররা প্রথমেই বিধান দেয়, উক্ত পুরুষটির বংশের কোন মেয়ের জোর করে জাত নিয়ে নেওয়া। সঠিকভাবে বললে, এই সমাজ ব্যবস্থাই এ রকম চারুদের জন্ম দিচ্ছে। অসহায় আর্ত নারী প্রাণের দায়ে বিজাতীয়ের ঘরে অন্ন গ্রহণ করতে বাধ্য হলেও তার জাত চলে যায়। আর জাত চলে গেলে তার জীবনে কিছুই থাকে না। আমাদের দেশে পথে ঘাটে দেওয়াল-লিখনে দেখি 'সর্বহারাদের' কত কথা। জানি না যারা দেওয়াল-লিখনে শহর সাজায় তারা কোন্ সর্বহারাদের কথা বলে। চারুদের জীবনে তো দেওয়ালও নেই। তারা দেওয়াল লিখনও জানে না, দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ানোও হয় না।

এর সঙ্গে আছে 'ডাইনী'র বিশ্বাস। শুধু অশিক্ষিত মূর্খরাই নয়, যথেষ্ট শিক্ষিত সমাজেও ডাইনী-বিশ্বাস এক ঘোর সংকটের সৃষ্টি করছে। পদে পদে মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা মানুষের সহজ সুস্থ জীবনকে বিড়ম্বিত করে চলেছে। সাধারণ মানুষের এই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে অসৎ লোকেরা তাদের নানান দুরভিসন্ধিমূলক অপকর্ম সাধন করছে। এ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিককালে জনসাধারণের মধ্যে একটা সচেতন ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কোন কোন অঞ্চলে এই ডাইনীপ্রথার ধ্বজাধারী 'সখা'দের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও গড়ে তোলা হচ্ছে—এটা একটা আশার সূচনা।

যাই হোক, দেওয়াল-লিখনের সমাজ থেকে এই লোকসমাজ বহুদূরে অবস্থিত। তাই এই সমাজের পটভূমিতে নাচনীর পেশাগত ঐতিহ্যও খুঁজে পাই। বিগত কয়েক শতকের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান

করলে দেখা যায় নাচনীরা একদিকে যেমন পথে-ঘাটে আসর পেতে কিংবা বিবাহনুষ্ঠানের শোভা বর্ধন করে প্রাকৃতজনমনোরঞ্জন করেছে, তেমনি অন্যদিকে আঞ্চলিক রাজা-বাদশা তথা ছোটখাটো জমিদাররাও নাচনীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। এবং তা থেকেই মূলত দুটি রীতির নাচনী নাচের সৃষ্টি হয়েছে। একটি বৈঠকী রীতির যা রাজা বা জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত—যার অন্য নাম 'বাঈ নাচ' বা 'খেমটি'; কিংবা 'সরুতালের নাচ'। এই নাচে সাধারণত রসিক উপবিষ্ট অবস্থাতেই ঝুমুরের সুর ধরেন এবং সেই সুর অনুসরণ করে এক বা একাধিক নাচনী নৃত্য করে। (অনেক রসিক দশ থেকে ষোলজন পর্যন্ত নাচনী একসঙ্গে নাচিয়ে নাচনীর জগতে বিখ্যাত হয়েছেন)। কখনো কখনো অতিরিক্ত উৎসাহ সঞ্চার হলে রসিকও মাদল গলায় ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং নাচনীর সঙ্গে নাচে অংশ গ্রহণ করে; মুখে তাল-এর বোলও বলে। এই রীতির নাচের বৈশিষ্ট্য বাদ্যযন্ত্রেও লক্ষ্য করা যায়। হারমোনিয়ম ও ডুগি-তবলা আবশ্যিক বাদ্য, রসিকের মাদল, করতাল, মন্দিরা, বাঁশীও থাকে। সাম্প্রতিককালে ক্ল্যারিওনেট, ট্রাম্পেট, ম্যারাকস প্রভৃতি অপেরা বাদ্যের অনুষঙ্গও স্থান পাচ্ছে—উদ্দেশ্য একটাই—শ্রীবৃদ্ধি। তবে তা রসিকের সাধ্য-সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে।

দ্বিতীয় রীতির নাচের চলতি নাম 'ধুমড়ি' বা 'খেদা' বা 'মোটা তালের নাচ'। অনেকে বলে 'ঢোল-ধামসা নাচ'। কারণ এই রীতির নাচের প্রধান বাদ্য ঢোল ও ধামসা। রসিকের গলায় মাদল থাকে না, থাকে ঢোল। স্পষ্টই বোঝা যায় যে অনেক বেশি শক্তির শব্দ সৃষ্টি করতে এই সব মোটা চামড়ার অধিক আঘাত-সহ বাদ্য যন্ত্রের সমাবেশ। এর সঙ্গে কখনো সানাইও জুড়ে দেওয়া হয়। নাচও হয় উদ্দাম প্রকৃতির। সাধারণত বিয়ের অনুষ্ঠানে বরপক্ষ এই নাচের আয়োজন করে। রসিক নাচনীকে নিয়ে বরানুগমনকারী দলের সঙ্গে সঙ্গে চলে। পাত্রীপক্ষের পাড়ায় গিয়ে পাড়ার পথেই নাচনী নাচতে নাচতে পথিপার্শ্বস্থ উৎসুক নরনারীর মধ্যে আনন্দ বিতরণ করতে করতে চলে। পাত্রীর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে অঙ্গনের মাঝে তো নাচেই। এই রীতির নাচনীর দুই হাতে দুটি রুমালও থাকে।নাচের তালে তালে নাচনী রুমাল ওড়ায়। পরনে থাকে চোস্ত পায়জামা, সায়া ব্লাউজ, রঙীন ঘাগ্‌রা, কোমর ফেটী ইত্যাদি। মাথায় থাকে রঙীন ফিতের তৈরী 'ঘুরা ফুল'—খোঁপা ঘিরে, আর 'ছোট ফুল' চুলের উপর মাথার দুই পাশে। গলায় নকল সোনার হার, মালা, হাতে রঙীন চুড়ি বা অন্যান্য অলঙ্কার—যার যেমন সামর্থ্য।

'বাঈ নাচ' বা বৈঠকী নাচের ক্ষেত্রে আজকাল ঘাগরার পরিবর্তে শাড়ীই অধিকাংশে দেখা যায়। উভয় ক্ষেত্রেই মুখে-হাতে চড়া রঙ, নানান ঝকমকে জরিওয়ালা ব্লাউজ, ওড়না, নকল বেনী, বেনীতে জরির ফিতে ইত্যাদি। শাড়ীটাও জরি বা ফুলকারী নকশায় যতটা সম্ভব ঝলমলে হয়ে থাকে। তবে বিভিন্ন নাচের আসরে ঘুরে দেখেছি উড়িষ্যা কিংবা বিহারের দক্ষিণ অঞ্চলের নাচনীদের মধ্যে সাজের ঘটা ও অলংকার পরিধানের প্রবণতা বেশী। উড়িষ্যার ভরতপুর অঞ্চলের নাচনীদের সাজপোশাকে অনেকটা দরবারী নাচের নর্তকীদের ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। তাদের অলংকারের মধ্যে টায়রা ও টিকুলী পরা একটা বৈশিষ্ট্য। মাথায় ফিনফিনে ওড়না, উপর হাতে আর্মলেট, আর কোমরে মনিমাণিক্যখচিত কোমরবন্ধনীও দেখা যায়। হাতের তালুতে লাল রঙ মাখাও একটা বৈশিষ্ট্য। পুরুলিয়া কিংবা বিহারের উত্তর অঞ্চলের নাচনীদের মধ্যে এরকম সাজ-সজ্জার ঘটা নেই। এমনও দেখা যাচ্ছে জরিহীন সাধারণ ব্লাউজ, প্রায় নিরলঙ্কার দু-একটা চুড়ি, কানে মাকড়ী এবং চুলটাকে শুধুমাত্র জড়ো করে আলগা ধাঁচের একটা হালকা খোঁপা বেঁধে নিয়ে—বলা যায় এক সামাজিক ফিল্মের গেরস্থালী নায়িকার সাজে দিব্যি 'খেমটা' নাচ নেচে চলেছে এবং মনে হল তাতে আধুনিক দর্শকমণ্ডলী অনেক বেশী একাত্ম হতে পারছে। এ ভাবেই খোঁপার সাজেও একটা বিবর্তন ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দশ-বারো বছর আগেও যত ফুল, যত অলঙ্কার দিয়ে খোঁপা সাজানো হত এখন আর ততটা হয় না। তবুও সাজ-সজ্জা আছে থাকবে। তা সৌন্দর্য সাধনের জন্যেই থাকবে। অঞ্চলভেদে, ব্যক্তিগত রুচির ভেদে একই কালে নানারকম সাজ-সজ্জা দেখা যায়, আর তা অবশ্যই কালের গতির সঙ্গে তাল রেখে পরিবর্তন সাপেক্ষ। কারণ এখানে—খুব প্রকট না হলেও—একটা প্রতিযোগিতা থাকেই। তা অর্থের যতটা নয়, নাম ও যশের তো বটেই। আর সবার উপরে থাকে সেই শ্রীরাধার ভূমিকা। তাঁর রূপকল্পনা। যে চরিত্রে অভিনয় তার রূপকল্পনার প্রভাব তো পড়বেই। আঞ্চলিক কবির ভাষায় সেই শ্রীরাধার রূপবর্ণনা শুধু নাচনীদের প্রেরণা নয়—এক অসাধারণ গীতিকাব্য :

মুখ জিনি পূর্ণ ইন্দু   ললাটে কস্তুরী বিন্দু
কলঙ্ক মানায়—
ভ্রূযুগ কার্মুক   কটাক্ষ শর বিন্ধায়।
রং ॥ সুবল—বল না আমায়···
কে কামিনী যামিনীতে একাকিনী যায়— ?
সুবল—বল না আমায়···
ললিত চিকুর জাল   ত্যাজি নিতম্ব বিশাল
চরণে লোটায়
রতন কুণ্ডল দোলে   বিদ্যুল্লতা প্রায়। রং ॥
পীনোন্নত পয়োধর   তদুপরি মোতিহার
শৈলে গঙ্গাপ্রায়
রম্ভা উরু ক্ষীণ কটি   ত্রিবলী শোভায়। রং ॥
কঙ্কন মৃণাল ভুজে   দুকুল রতন সাজে
নক্ষত্র লুটায়
চলিতে নূপুর শব্দে, মরাল শিখায়। রং ॥
অঙ্গে দীপ্ত অলংকার   সুধাংশু ভ্রমে চকোর
ঝাঁকে ঝাঁকে যায়
কে মঞ্জুহাসিনী ধনী,   চেনো কি তাহায়। রং ॥
[ভবপ্রীতানন্দ ওঝা]

নাচনীদের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে পাতকুম, সিলি, পঞ্চকোট, সেরাইকেলার তৎকালীন বড় রাজারা যেমন প্রত্যক্ষ ভূমিকায় ছিলেন, তেমনি ছোট ছোট জমিদার, মানকী আর ভূমিজ সর্দাররাও ছিলেন। এ নাচে একদিকে যেমন নাচনীর ধারক-বাহক হিসেবে থাকত রসিক, তেমনি ঐসব আয়োজক তথা পৃষ্ঠপোষকবৃন্দও ছিলেন অন্য এক ধরনের রসিক। তাঁরা রাজা-বাদশা বা জমিদার, সর্দার হলে কি হবে, ঝুমুরের কলি ভাঁজতে তাঁরাও কম ছিলেন না, এমন কি মাথায় পাগড়ী বেঁধে নাচনীর সঙ্গে উঠে তাল মিলিয়ে আসরে নাচতেও তাঁরা পিছুপা ছিলেন না। এখানেই আমরা তথাকথিত দরবারী নৃত্য ও লোকনৃত্যের চরিত্র-লক্ষণ খুঁজে পাই। নাচনী লোকনৃত্য কি না সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। দরবারী সম্পর্কের সূত্রটা দেখা যাক।

'যব ছোড় চলি লখ্‌নৌ নগরী'—মনে পড়ে যায় নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ্-র কথা। 'নীর ভরণ কৈসে যাউঁ।' সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে তিনি পৌঁছতে পেরেছিলেন রসিকসুলভ মনের জন্যেই। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার রস-সম্পদ তাঁকেও আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর প্রেরণাতেই রাসলীলার অনুসরণে রচিত হয়েছিল 'ইন্দর সভা' নামে নৃত্য-গীতিনাট্য। তিনি শুধুমাত্র কালজয়ী কবি ও সঙ্গীতশিল্পীই ছিলেন না, কুশলী অভিনেতা ও নৃত্যশিল্পী হিসেবেও তাঁর পরিচিতি আছে। বস্তুত লখ্‌নৌ ঘরাণার কত্থক নৃত্যের ধারাটির তাঁর পৃষ্ঠপোষণা ব্যতীত এতখানি উৎকৃষ্টতা লাভ সম্ভব ছিল না।

মানভূম অঞ্চলের রাজারাও যে শুধুমাত্র নাচের আসর বসিয়ে ক্ষান্ত থেকেছেন তা নয়। তাঁরা এক বা একাধিক নাচনীর ভরণপোষণ করেছেন। তাঁরা গায়ক ও গীতিকারদেরও পৃষ্ঠপোষণা করেছেন। বসবাসের জন্য জায়গা ও কৃষিজমি দিয়ে অনেক প্রতিভাবান ঝুমুরিয়াকে সপরিবারে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। শুধুমাত্র সঙ্গীত সাধনার জন্য অবসর দিয়েছেন। ঐ সকল ঝুমুরিয়াদের কাজই ছিল ঝুমুর বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা করে যাওয়া। পারম্পর্য বিচার করে দেখা যায় যে, যে সমস্ত ভূস্বামী চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন, তাঁদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাতত্ত্বকে দৃশ্যায়িত তথা নাট্যায়িত করে এক ধরনের ধর্মভাবাপন্ন রসচর্চার প্রবণতা প্রবল হয়েছিল। তাঁরা আঞ্চলিক গীতিধারা ঝুমুরকেই এই গীতিনাট্যে প্রয়োগ করেছিলেন। এর পূর্বসূরী হিসেবে 'গীতগোবিন্দম্' বা জয়দেব প্রসঙ্গ আগেই উল্লেখ করেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'ও কীর্তন না ঝুমুরগীতি সে বিষয়েও এখনো সিদ্ধান্ত পাকা হয়নি। অনেকেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে ঝুমুর বলার পক্ষপাতী। যাইহোক নাচনী নাচেরও নৃত্য ও সঙ্গীত উপাদান হিসেবে রসিক তথা ঝুমুরিয়াদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাই উপযুক্ত পরিচ্ছেদ বলে বিবেচিত হয়।

খুব সহজেই বোঝা যায় যে, এই নাচনী রাখা ঐ রাজা বা জমিদারদের কাছে প্রাচুর্য ও সম্পদের পরিচায়কস্বরূপ ছিল। তাই সামর্থ্য অনুযায়ী কেউ কেউ একই সঙ্গে তিন-চারজন নাচনীর সামগ্রিক ব্যয় নির্বাহ করেছেন। অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছেন। কখনো কখনো অন্যের নাচনীকে প্রলোভিত করে নিজের দখলে এনেছেন। এসব করতে গিয়ে অনেক সময় মারামারি, রক্তপাত এমনকি জীবনহানিও ঘটেছে। এটা সামন্ততন্ত্রের একটা বিশেষ অধ্যায়—যা ইতিহাসের বিভিন্ন

পর্বে বিভিন্নরূপে—আঙ্গিকে লক্ষ্য করা যায়। সম্পদচিহ্ন হিসেবে সম্পদশালীর মানাগত বাসনায় এই প্রবৃত্তির তাড়না সর্বকালেই ছিল, আজও আছে। ইতিহাসের মহান সম্রাট ধর্মপ্রাণ আকবরের হারেমও নাকি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির রূপসী নারীর যাদুঘর-স্বরূপ উল্লেখ্য। 'জাতক'-এর তথ্য অনুযায়ী সেকালে কোন কোন রাজার ষোল হাজার পর্যন্ত নর্তকী রাজ অন্তঃপুরেই প্রতিপালিত হত। সেকালের বৈশালী রাজ্যে নাকি আইনই করা ছিল যে, সর্বাঙ্গ সুন্দরী রমণী কখনও বিয়ে করতে পারবে না—জনসাধারণের আনন্দের জন্য তাকে উৎসর্গ করা হবে—তাকে নর্তকী তো বটেই, প্রয়োজনে গণিকাবৃত্তিও করতে হবে। অবশ্য সেই সময়ে নর্তকী আর গণিকায় বিশেষ তফাৎ ছিল না। আর গণিকাদের সম্বন্ধে যেসব উপমা দেওয়া হয়েছে তাও বেশ সুচিন্তিত। তারা যে বিষাক্ত পানীয়ের মত, আত্মপ্রশংসোপরায়ণ ব্যবসায়ীদের মত, হরিণীর বক্র শৃঙ্গের মত, বিষজিহ্ব সাপের মত, আচ্ছাদনযুক্ত গর্তের মত—এসব কথা বার বার বলা হয়েছে। সে যাই হোক, দেখা যাচ্ছে নর্তকী সংগ্রহের ব্যাপারে দক্ষিণ ভারতের প্রতিপত্তিশালী দেবমন্দিরগুলোও এই প্রবৃত্তির উর্ধ্বে যেতে পারেনি। সেখানেও দেবদাসীরূপে শত শত নর্তকীর সমাবেশ আমাদের স্তম্ভিত করে। মন্দির কর্তৃপক্ষগুলি এক একটি মন্দিরকে এক একটি সাম্রাজ্যস্বরূপ জ্ঞান করতেন। এবং সেই সাম্রাজ্যের সম্পদচিহ্ন হিসেবে দেবদাসীদের ভরণপোষণ করা তাঁদের কাছেও একটা প্রতিযোগিতা ছিল। কোন্ মন্দিরে কত বেশী উৎকৃষ্ট দেবদাসী আছে তা সমকালীন মানুষের কাছে আড়ম্বর করার বিষয় ছিল। এটাও ঠিক যে, ঐসব মন্দিরগুলি কোন না কোন রাজার পৃষ্ঠপোষণাধীন ছিল এবং রাজাদেরই পরোক্ষ উৎসাহে বিভিন্নভাবে দেবদাসী সংগ্রহ ও পোষণ করা হত এবং সেখান থেকে প্রয়োজনে শ্রেষ্ঠা নর্তকীদের ডাক পড়ত রাজদরবারে নৃত্য পরিবেশন করে রাজা তথা সভাসদবৃন্দের মনোরঞ্জন করতে। সঙ্গে সঙ্গে দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত এইসব নতর্কীদের অন্যভাবেও ব্যবহার করা হয়েছে—শুধুমাত্র উপঢৌকন দিতে—নিছক পণ্যবস্তুর মত।

মানভূমের নাচনীরাও এই দেবদাসী কিংবা রাজনর্তকীদের সঙ্গে তুলনীয়। বলা যায় এরা ঐসব দরবার নর্তকীদের এক একটি গ্রামীণ সংস্করণ। এবং এটাই স্বাভাবিক। কারণ আজ সেই রাজাও নেই, সেই রাজকীয় দরবারও নেই। শুধু আছে সেই অভিমান—আভিজাত্যের করুণ জীর্ণ অভিমান। তবে রাজার দরবার না থাকলেও আছে জনের আসর। প্রজাদের ভূমিকা এখন সংগঠিত। মাঠে ঘাটে কিংবা গ্রামের কেন্দ্রস্থলে, পাথুরে চাটান কিংবা গ্রাম্য মেলার ছাউনি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত দুর্গাপূজার মণ্ডপে একদিন নাচনী নাচের আসর এ অঞ্চলে প্রথাসিদ্ধ ছিল। সে আসরে সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারাও দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকতেন। এখনো থাকেন। মণ্ডপের আশেপাশে গাছের সঙ্গে বা বাঁশ পুঁতে তার উপর খাটিয়া বেঁধে মাচা তৈরী হয়। উঠবার সিঁড়িও থাকে। ইংরেজী ধাঁচের থিয়েটারে যা 'ব্যালকনি'। সেখানে পর্দানশীন মহিলাদের জন্যে মশারী টাঙিয়ে দেওয়া হয়। বড় ঘরের বউ-ঝিরা এভাবে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থেকে নাচনী নাচের রস আস্বাদন করেন।

যাই হোক সাধারণ গ্রাম্য জনসমাজ সমগ্রত কৃষ্ণতত্বে অবগাহন না করলেও নৃত্যকলা তথা একটা শিল্পরসের গ্রাহক হয়ে উঠতে পেরেছিল বলে নাচনীরা বেঁচে গেছে। নিছক বেশ্যাবৃত্তির হাত থেকে বেঁচে গেছে। জীবিকার জন্যে তাদের শহরের গলিপথে মুখে রঙ মেখে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে কামার্ত পুরুষের হাত ধরে টানাটানি করতে হয় না। তারা রক্ষিতা হলেও নিছক গণিকাবৃত্তি সম্বল যৌনক্রীড়ার পণ্য নয়। তারা সমাজের আচার অনুষ্ঠানের অংশীদার না হলেও সেই সমাজের বাসিন্দারা তাদের বর্জন করতে পারেনি। কারণ তারা সমাজকে কিছু দেয়। গীতে, নৃত্যে, রসে। রস ছাড়া জীবন হয় না।

কচাহাতু গ্রামের রাধানাথ কুমারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম নাচনীর জীবন তো খুব ঘৃণার জীবন, তাই না? সামান্য বিড়ি-শ্রমিক রাধানাথ বলেছিল, ঠিক ঘৃণা করা যায় না, কেননা আসরে যখন সে নাচছে তখন দশ হাজার-পনের হাজার লকের চখ্ দুটা তাকেই দেখছে, তার গান শুনছে—ই ট ত সবাই পারে না, ই ট গুণ বটে। তাকে কেমুন কর্যে ঘৃণা করা যায়?

বস্তুত সেই অর্থে ঘৃণা করলে, সমাজের মধ্যে বাস করতে না দিলে চারুবকি দশা হত? মালতীর মত মেয়েদেরই বা কি দশা হত?

মালতীকে দেড়-দু বছর বয়সে তার মা এক বিত্তশালী অবাঙালি পরিবারের দালানে রেখে চলে যায়। মালতীর স্মৃতি বলছে, সে তখন চলতে-বলতে পারে। ঐ পরিবারের এক বাঙালি দাসীর কাছে সে কর্তার আনুকূল্যে প্রতিপালিত হয়, দাসী-কন্যার মতই। বছর পনের বয়স হলে মালতীকে নিয়ে স্বগ্রামে ফিরে আসে, অবসর নিয়ে কর্তার অনুমতি সাপেক্ষে প্রবীণা ঐ দাসী মালতীকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, যেহেতু তার বাপ-মার কোন পরিচয় নেই, তাই তাকে কেউই প্রথামতে বিয়ে করবে না—তার একমাত্র রাস্তা নাচনীর পেশা গ্রহণ করা। তাই সে বিক্রী হয়ে গেল মাত্র আটশ' পঞ্চাশ টাকায়। এটা আজ থেকে মাত্র তিন বছর আগের ঘটনা। মালতীর ক্রেতা সেই তরুণ 'রসিক'-এর সঙ্গেও আমি কথা বলেছি। তার জবানবন্দী অনুযায়ী, 'সাড়ে আটশ তো বুড়িকে দিতে হল, তারপর যে সব লোক হেলপ্ করেছে তাদের খরচ, টেক্সি ভাড়া, পুলিস লেগে গেল—তাদের কমিশন—আরো দু-হাজার চলে গেল।' তবুও মালতীর মত আঠার-উনিশ বছরের সদ্য যুবতী সুশ্রী-সুস্থ একটি মেয়েকে তো তিন হাজার টাকার মধ্যে কেনা যায়! মনে রাখতে

দর্শকদের একাংশ

হবে মালতীর সম্মতিতেই এই ব্যবস্থা। কারণ মালতীকে তো বাঁচতে হবে। তার জীবনের যেভাবে শুরু তাতে আজকের সমাজ বা প্রশাসন আর কোন্ ভালটা করতে পারত—মালতী যা করেছে তার চেয়ে বেশি? সে একজন তরুণ পুরুষ মানুষকে পেল তার জীবনে, সঙ্গে পেল গান, নাচ—যার মাধ্যমে সে সভার মাঝে হাজার মানুষের চোখ টানবে, মন মজিয়ে দেবে রসে। তার নাম শুনে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ ছুটে আসবে—ঘৃণা থুতু ছিটাবে না—সারা রাত জেগে বসে তার গান শুনবে, নাচ দেখবে—এটা কি যা-তা ব্যাপার? নাই বা থাকল ঐ ক্লীব সমাজ বিধানে তার তথাকথিত 'স্ত্রী'-র মর্যাদা। অমন মর্যাদার মূল্য দেয় না মালতীরা। এই সমাজ তাদের কাছে শুধুই কিল মারবার গোঁসাই। রক্ষিতা তো কী হয়েছে? নাচনী তো, তো কী হয়েছে?

সবচেয়ে বড় বাঁচায়ো এখানেই। কোন

অপরাধ বোধই নেই, গ্লানি নেই। বস্তুত গ্লানি থাকার তো দরকারই নেই। কিসের জন্যে গ্লানি আসতে যাবে ? অন্যায়টা হল কোথায় ? কারা কি সমাজ বানাল, তার বিধি-নিয়ম করল, সেখানে 'ভালমন্দ' কত কি আছে—শুধু চারু-মালতীদের মত অসহায় জীবনের জন্যে কোন ব্যবস্থা নেই, সেই সমাজের কি ক্ষতি-বৃদ্ধি হল, না হল তা চারু-মালতীরা দেখতে যাবে কেন ? তাদের জীবনের ঐ পরিণতির জন্যে তারা নিজেরা কতটুকু দায়ী ? তবে কেন সমাজের দেওয়া দুর্নাম তাদের গায়ে লাগতে যাবে ? কেন তারা সেজন্যে গ্লানি অনুভব করতে যাবে ? তারা দিব্যি গ্রামের মধ্যেই, সমাজের বুকেই সমাজের একজন হয়ে বেঁচে আছে। আশা করি বেঁচে থাকবে। কারণ, মানুষই তাবৎ দোষগুণের বিচার-শক্তি রাখে। এতদঞ্চলের গ্রাম্য মানুষের এটা একটা মহৎ বৈশিষ্ট্য। মহৎ, কারণ তাঁরা নাচনীর সঙ্গে একাত্ম।

এখানেই 'কবি'-র ঝুমুর দলের বসন্তর সঙ্গে চারু-মালতীদের পার্থক্য। তথাকথিত শিক্ষিত সভ্য নগর-জীবনের বা নাগরিক সমাজের মন ও দৃষ্টির সঙ্গে এতদঞ্চলের গ্রামীণ মানুষের মনের—বোধের এক তুলনারহিত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বলা যায় গ্রামীণ মানুষের এই বোধ এক মহান ও মূল্যবান সম্পদ। যা মানুষ হিসেবে মানুষকে আশ্রয় দিয়ে অজান্তে নিজেকেই সম্মানিত করছে, যদিও নাচনীর মর্যাদাগত মূল্যগত স্তর আলাদা। কারণ, নাচনী শুধুমাত্র নাচনী, তাদের দলনেত্রী মাসীর নির্দেশমত নিত্য নতুন অবাঞ্ছিত পুরুষ ঘরে নিয়ে দেহ ব্যবসা করতে হয় না। তারাও কলাবতী। নৃত্যকলা তাদের পেশা—কামকলা নয়। তাই তারা আসরে নাচতে নাচতে নিজের গলায় গেয়ে বলতেও পারে :

লোকে বলে ছি ছি, আমি করেছি কি
শাখা নাকে নত পরেছি,
বিহালা পুরুষ ছাড়েছি।

হাতে হাতে পান দিতে দেখেছে পাড়ার লোকে
চূণ দিতে দেখেছে ভাসুরে
সখিরে আজ কি আছে কপালে ...

নিজের কুড়ার নিজের পায়ে মেরেছি
বিহালা পুরুষ ছাড়েছি। [দ্বিজ সুধীর]

এটা যেন যুগীডি গ্রামের রাজবালার কথা, কিংবা পাণিপাথর গ্রামের ফুড়কির কথা। ফুড়কি ছিল বৈষ্ণব পরিবারের মেয়ে। বিয়ে হয়েছিল এক বিপত্নীক প্রৌঢ়ের সঙ্গে। স্পষ্টতই ফুড়কি তরুণ বয়সের উচ্ছ্বাসে সেই প্রায়-বৃদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে বেশিদিন সংসার করতে পারেনি। সে তার 'বিহালা পুরুষ' ত্যাগ করে চলে আসে বাপের ঘরে। বাপ-দাদারা তাকে পাঠায় তার মামার ঘরে। সেখানে তাকে 'নাম-কীর্তন' অর্থাৎ বৈষ্ণবীয় ভক্তিগীতির দলে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ফুড়কির তখন প্রবল যৌবন। সে তার মামাদের সোজাসুজিই জানাল, 'নাম-কীর্তন লিয়ে আমার কি হবে ? আমি পতি চাই।' যোগাযোগ হয়ে গেল সম্পন্ন চাষী পরিবারের 'রসিক' পুরুষ শম্ভুর মাহাত-র সঙ্গে। সেই থেকে ফুড়কি শম্ভুর নাচনী। দশ-বারো বছর হল সে নাচ ছেড়েছে। শম্ভুর সামাজিক স্ত্রী বিগতা—তাই নাচনী ফুড়কিই এখন সংসারের কর্ত্রীর ভূমিকায়। দুই মেয়ের প্রথমটির বিয়ে হয়েছে। দ্বিতীয়ার বয়েস এখন বছর পনের। পাত্রের সন্ধান চলছে। শম্ভুর সামাজিক স্ত্রীর গর্ভে জাত ছেলে আছে, মেয়ে আছে, ছেলের বউ আছে, নাতি-নাতনী আছে। ফুড়কি সকলেরই মাতৃতুল্য। তার নিজের কথায়, 'আমার অভাব কিসের ? কন অভাব নাই। বেটা-বিটি, বেটার বৌ, লাতি-লাত্‌নী সবেই আছে। তবে মানুষকে তো নিজের কর্ম করে খেতে হবে—সে তো ভগবানকেও কর্ম করে খেতে হয়!' নাচনী হয়েও এতখানি গ্লানিমুক্ত জীবন কিংবা পরিচ্ছন্ন মানসিকতা আর কারো মধ্যে দেখিনি। তার বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে তার অন্যান্য স্বজনদের যেভাবে আপনভাব ব্যক্ত করতে দেখেছি, তার সতীন-পুত্রের বউকে যেভাবে আগ্রহ নিয়ে নাচনী সৎ-শাশুড়ির সঙ্গে ফটো তুলতে দেখেছি তাতে মনে একটা ভরসা জাগে যে সমগ্রত 'নাচনী' পেশাটিকে হয়ত একটা 'মান'-এ টেনে আনা যেতে পারে। এই পেশায় আগত নারী যদি রসিককে তার গুরু হিসেবে যথার্থই শ্রদ্ধা করতে পারে, তাহলে আশঙ্কার কিছু দেখি না। তাতে তথাকথিত পতিত্ব বা সতীত্বের প্রশ্ন থেকে গেলেও সাধনার গভীরতায় যাওয়ার প্রশ্ন পথ পেতে পারে। আর, সাধনার গভীরতায় যাওয়ার অভীপ্সা না থাকলে এই প্রতিযোগিতার আসরে নাচনী টিকবে কেমন করে ?

আগেই বলেছি নাচনীর নাচের মূল উপজীব্য ঝুমুর গান, এবং এই গান রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা আশ্রিত। স্বভাবতই এটা শৃঙ্গাররসে মধুতে মিশ্রিত।

প্রায়ঃ শৃঙ্গার বহুলা মাধ্বীক মধুরা মৃদু
ঐকের ঝুমরীলোকে বর্ণাদি নিয়মোজ্ঝিতা।

অর্থাৎ শৃঙ্গার রসের বাহুল্য, মধু থেকে তৈরি মদের মত মৃদু সঞ্চারী এবং বর্ণাদির কোন নিয়ম না থাকা ঝুমুরের লক্ষণ। 'সঙ্গীত দামোদর'-এ ঝুমুরের সংজ্ঞা। প্রকৃতপক্ষে এসব সংজ্ঞা বা সূত্র প্রায়শই একদেশদর্শী। কারণ, বীরভূম আর মানভূমের ঝুমুরে অনেক তফাৎ, কবিতে কবিতে তফাৎ, দর্শনে দর্শনে তফাৎ। তাই মানভূম-সিংভূম অঞ্চলে আদৃত বন্দনা অঙ্গের ঝুমুরে যে ভাব ও রস পাই তার উল্লেখ কোথায় ? নেই। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

লক্ষ করা গেছে, খুব স্বাভাবিকভাবেই ঝুমুর গানের সঙ্গে নাচনীর নাচ লাস্যনৃত্যের চরম অভিব্যক্তিস্বরূপ প্রকাশিত হয় ; বিশেষত যখন আসর জমানোর প্রশ্ন ওঠে। তবে তারাশঙ্করের কবিকে যেমন আসর জমানোর জন্য খেউড় গাইতে হত, এখানে তেমন অবস্থার সৃষ্টি হয় না। তবুও এ বিষয়ে তারা সচেতন। টুস্যামা গ্রামের রসিক গৌর সিকদারের কথায় 'সুরে বাখান দিলেও খারাপ লাগে না।' অর্থাৎ খিস্তী-খেউড়ও যদি সুরে-সঙ্গীতে পরিবেশন করা হয়, তাহলে তাতেও রস আছে। তবে তা ক্ষেত্র বিশেষেই উপভোগ্য। দেখা গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রীরাধার যৌবনজ্বালাই চরম প্রকাশ। তবে গানের ভাষা কখনোই অশ্লীলতার পর্যায়ে যায় না। বিশেষত শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন গীতগোবিন্দম্-এর আলোচনা প্রসঙ্গে যখন বলেন, 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে তুলনা করিলে জয়দেবের গীতগোবিন্দকে তো পাঠ্যপুস্তকের মর্যাদা দিতে হয়।' তাছাড়া 'কবি'র বসন এক রাতে নাচের আসরের দর্শককে মজিয়ে দেবার জন্যে নিতাইকে বলছে, "আজ কেমন সাজব, তা দেখবে। ...উলঙ্গবাহার শাড়ি। এই কাপড় আজ পরব। ...দেখব আজ কার জিত হয়, তোমার গানের, না আমার নাচের।" বলা বাহুল্য, নাচনী নাচের আসরে এমন বিপজ্জনক প্রচেষ্টা দেখা যায় না। সেখানে যে রঙ্গরসটুকু পরিবেশিত হয় তা গানের ভাষা ও অঙ্গভঙ্গিমার মাধ্যমেই। কোমর ও নিতম্বের কারুকাজ তো আছেই, সেই সঙ্গে তীব্র কটাক্ষ বা এক চোখ বন্ধ করে বিশেষ রকম ইশারা—যাকে বলা হয় 'চোখ মারা' কিংবা জিভ দেখিয়ে বিশেষ ইশারা—এগুলোও দু-একজন নাচনীর মধ্যে দেখা যায় বটে—তবে তা ক্বচিৎ। এবং এগুলো অপেক্ষাকৃত তরুণী ও চপলা প্রকৃতির নাচনীরা কিছু দর্শককে অংশত এক-আধটি গানে দেখিয়ে থাকে। এবং তা দর্শকদের আব্দারে। দর্শকবৃন্দের আব্দারে তারা আধুনিক হিন্দি ফিল্মের জনপ্রিয় চটুল গানও গায় ও সেইমত নাচ দেখায়। কিন্তু সে সবই ব্যতিক্রম মাত্র, মূলত ভক্তিরসের ঝুমুরই নাচনী নাচের প্রাণ। উল্লেখ্য যে, এসব সত্ত্বেও আসরের কোন দর্শককে টিটকারি দিতে বা সিটি মারতে দেখা যায় না। বিরক্তি বা খুব উচ্ছ্বাসও দর্শকদের মধ্যে দেখা যায় না। হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ শুধুমাত্র একটা রস—নাচনীর রস উপভোগের মানসিকতা নিয়েই রাতভর বসে থাকে। তাদের মনপ্রাণ জগৎ-সংসারের ঊর্ধ্বে বিশেষ একটা মাত্রায় বাঁধা থাকে। যেখানে মাদলের দ্রিমি দ্রিমি আর বাঁশীর ললিত আবহে গীত ভেসে বেড়ায়—

জয় উমাকান্ত ! জয় রমাপতি ! ধবল নীল উভয় মূরতি
কৈলাস বৈকুণ্ঠচারী।
এক ব্রহ্মরূপ উভয় স্বরূপ
মহিমা বুঝিতে নারি। হে
রং জয় ...। শিব ! জয় মাধব ! মধুহারী।
কভু উমা কভু কমলার সনে, বিহার কৈলাস গোলকভুবনে
ফণী মণি শোভাকারী।
ত্রিপুরে নাশিলে রাবণে শাসিলে
ত্রিশূল কোদণ্ডধারী। হে ... ॥ রং॥

ইত্যাদি, ইত্যাদি ॥ বহু যুবককেও দেখেছি আসরে ব'সে নাচনীর মুখের গাওয়া গান টেপ-রেকর্ড করার জন্যে উদ্যোক্তা কর্তৃপক্ষকে দশ-বারো টাকা ফী দিয়ে গান টেপ করতে। আগেই বলেছি সাধারণ বৈঠকী ঝুমুরই যখন নাচনীর আসরে গাওয়া হয়, তখন তার মেজাজটা একটু বদলে যায়—রঙটা একটু চড়ে যায়—অর্থাৎ মাদকতা-গুণ বৃদ্ধি পায়। তার উপর সেই গান যদি নাম করা কোন নাচনীর গলায় গাওয়া হয় তো সেটা টেপ করে রাখার যোগ্য হবে বইকি ! বিশেষ করে সে-সব গানের কথা যদি এমন হয়—

ও যুবতী রসবতী কোথা যাও গো হাসি হাসি

বিকসি কদম …
তোরে হেরে ঝুমে আমার পিয়সী নয়ন গো
নৌতন যৌবন,
দেখে মানে না যে—মন গো।
সুন্দর মুখমণ্ডল যৌবন ঝলমল
চঞ্চল চরণ,
অনিন্দ্য সুন্দর কান্তি সুচারু বদন গো। …

যতই রাজা-বাদশা বা জমিদাররা নাচনী নাচের পৃষ্ঠপোষণা করে থাকুন না কেন, নাচনীর আসরে উপস্থিত হাজার হাজার সাধারণ গ্রাম্য দর্শকের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ করার মত। আরো লক্ষণীয় যে, একটা বড় আসরে যদি দশ হাজার দর্শক সমাবেশ ঘটে, দেখা যাবে তার মধ্যে সাত হাজার দর্শকই স্ত্রীলোক। তাদের মধ্যে নিতান্ত বালিকারা তো থাকেই, তরুণী অনূঢ়া কন্যা, ঘরের যুবতী বউ, সন্তান কোলে নিয়ে মায়েরা—সকলেই আসে। ঘরে তালাচাবি দিয়ে এক-একটা গোটা পরিবারই আসে—শুধু খবরটা পাওয়া চাই। খবর লোকের মুখে মুখেই পৌঁছে যায়। তবুও উদ্যোক্তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কখনো কখনো ছাপা হ্যান্ডবিলও বিতরণ করা হয় হাটে- বাজারে- বাস স্ট্যান্ডে। হ্যান্ডবিলগুলোর ভাষারীতিও একটি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য। তা থেকে সাধারণ মানুষের নাচনী সম্পর্কে কত ব্যাপক ও গভীর আগ্রহ সে-কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে এরকম একটি হ্যান্ডবিল থেকে হুবহু উদ্ধৃতি দেওয়া হল।

শ্রীশ্রীসরস্বতী মাতায় নমো নমঃ
বাপরে বাপ ! বাপরে বাপ !
ঘরে তালা দিয়েও ডুমুরশোলে যাবই এক রাত
আসবেন আসবেন অবশ্যই আসবেন
আপনাদের আসার আশা নিয়েই তো এ বছরও ডুমুরশোল ষোলআনাদিগর আগামী বাণী বন্দনায় আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্য এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। আসুন, সকলেই অনুষ্ঠানের অংশীদার হয়ে আনন্দ উপভোগ করি।

অনুষ্ঠানসূচী
২রা ও ৩রা ফাল্গুন (১৩৯২) রাত্রি ৮ ঘটিকায়
আড়ষা থানার অন্তর্গত সটরা নিবাসী শ্রীরঘুনন্দন কুমারের সুবিখ্যাত বাঈ শ্রীমতি বিমলাবালা দেবীর এবং বলরামপুর থানার অন্তর্গত যোগীডি নিবাসী শ্রীকার্তিকচন্দ্র তন্তুবায়-এর সুবিখ্যাত বাঈ শ্রীমতি রাজবালা দেবীর নৃত্যগীতি।

উদ্ধৃত এই হ্যান্ডবিলের বাকী অংশে ৩রা ফাল্গুনের অনুষ্ঠানসূচী বর্ণিত আছে। বাহুল্যবোধে তা বর্জিত হ'ল। তবে শেষ অংশে উল্লেখযোগ্য একটি অংশ :

বিঃ দ্রঃ দর্শকবৃন্দকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে কোন প্রকার নেশা খেয়ে মেলায় মাতলামি করে অপ্রীতিকর কাজ বা ঘটনা করা চলিবে না। করিলে ষোল আনা কমিটি কর্তৃক দণ্ডিত হইবেন।

বলা বাহুল্য যে এটা আধুনিক কালের শিক্ষিত গ্রামীণ যুবকদের শহুরে মানসিকতার প্রতিফলন। এই বিঃ দ্রঃ মারফৎ এটাও জানা হয়ে যায় যে, এই সব মেলার দর্শকদের একটা বড় অংশ নেশা খেয়েই মেলায় আসে। বস্তুত যেখানে মনোরঞ্জনের তথা আমোদ বা রঙ্গরসের আসর বসবে সেখানে সাধারণ রসিক পুরুষরা এক পাত্র 'রঙ' চড়াবে না—এটা কেমন কথা ? বিশেষত যখন ভাতজাত পানীয় লোকমতে স্বাস্থ্যকর। এ অঞ্চলের গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষের মুখেই

ধ্রুপদী নাচের লক্ষণ ফুটে ওঠে

জয় উমাকান্ত ! জয় রমাপতি !

শুনি 'ভাতের সঙ্গে-মাড় না খা'লে হাম্‌দের রক্ত শুকায় যাব্যেক, পেচ্ছাপ লাল হয়েঁ মর'ব।'—তো সেই জীবনদায়ী মাড়কে যদি আরেকটু চড়া সুরে বাঁধা হয় তাহলে আপত্তিটা কোথায় ? আপত্তিটা মাতলামিতে। তবে দেখেছি মানভূমের হাটে-মেলায়, পরব-পাইলে মাতাল প্রচুর থাকলেও মাতলামী নেই ! তাই তো হাজার হাজার ঘরের মেয়ে-বউ, মা-মাসীদের নিঃশঙ্ক চিত্তে খোলা মাঠে সর্বসমক্ষে বসে এই লাস্যনৃত্যের রসাস্বাদনে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহের অভাব হয় না। এমনও দেখা গেছে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরে এক প্রস্থ ঘুম সেরে নিয়ে—শুধুই মেয়েরা কোন পুরুষ সঙ্গে না নিয়ে জোড়, বহাল, টাঁড়-টিকর পেরিয়ে নাচের আসরে আসছে। তখনো তাদের কাঁখে বাচ্ছারা ঘুমে ঢুলছে। সেই সব বউ-ঝিরা যখন অবাক বিস্ময়ে নাচনীর নাচ দেখতে থাকে সেটাও লক্ষ করার মত। শুধু সঙ্গীত, বাদ্য বা নাচের তালে তালে পদচারণা অঙ্গসঞ্চালনই তাঁরা বিস্মিত চোখে

দেখেন তা নয়, নাচনীর তীব্র কটাক্ষপাত বা নিতান্ত খেমটার ভঙ্গিও তাঁরা বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেন ; কোনরকম লজ্জায় বা সংকোচের ভাবে কুঁকড়ে উঠতে দেখা যায় না। তাঁদের চোখেমুখে একটা চমৎকৃত রসোপভোগের মুগ্ধতাই ফুটে ওঠে। এটা অবশ্যই একটা অদ্ভুত ব্যাপার এবং এখানেই লোকনৃত্যের ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে—আমি সিদ্ধান্তে আসছি না।

অথচ পাশাপাশি তথাকথিত শহুরে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা নাচনীর নাম শুনলেই কুঁকড়ে ওঠেন। যেন তাঁদের কোন নিষিদ্ধপল্লীতে আহ্বান করা হচ্ছে। অনেকে লুকিয়ে চুরিয়ে দেখেছেন, কিন্তু ভদ্র-সমাজে স্বীকার করতে লজ্জা পান। এও এক অদ্ভুত মানসিকতা। বস্তুত কোন্টা অদ্ভুত আর কোন্টা কিম্ভুত তা বিচার করা মুশকিল। এক কথায় এই ধরনের মানসিকতা আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার ফাঁকির দিকটাই প্রতিফলিত করে। এটা সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতাবোধেরও পরিচয়। আমাদের তথাকথিত নাগরিক লোকেদের এই সংকীর্ণ মানসিকতা থেকে আঞ্চলিক সমাজসচেতন মানুষের মনেও এক ধরনের ক্ষোভ জমা হচ্ছে, যা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐক্যের পরিপন্থী। তাদের এই ক্ষোভের কথা তারা নানাভাবে প্রকাশও করছে। কিছুদিন আগে এক সাংস্কৃতিক সমিতির প্রতিনিধি লিখিতভাবেই একটি আঞ্চলিক পত্রিকায় অত্যন্ত তীব্র ভাষায় যা ব্যক্ত করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ভাষায় "আমরা দুদিন আগে ছিলাম বিহারী, এখন বাঙালী, যেমন কাক থেকে দাঁড়কাক ; বিহারের সুযোগ-সুবিধা তো গেলই—বাঙালীর পাঁতায় উঠতেও পারছি না।....

"আমাদের শান্তির নীড়ের প্রশান্তি সংস্কৃতি আজ পরের দরজায় ঝি-রূপে আবদ্ধ। আগন্তুকরা আমাদের ঐসব কীর্তিকলাপ দেখে হাসে, তামাশা করে, বিদ্রূপ করে, অসভ্য বলে ঘৃণা করে। তা যদি না হত অন্তর দিয়ে যদি তারা আমাদের সংস্কৃতিকে ভাল বলতো, অন্তর দিয়ে গ্রহণ করত তাহলে তারাও তাদের মেয়ে ছেলে সবাই ঐগুলিতে অংশ নিত। কিন্তু কই ? কোন আগন্তুককে তো দাঁড় নাচের সারিতে বা ছো-নাচের বা নাচনী নাচের গানে বা ঝুমুরে কিংবা বাজনায় অংশ নিতে দেখা যায় না ? করম টুসু, ভাদু কিংবা কাড়াখুঁটায় লাগড়ায় খাড়ি দিতে বা নাচ-গান করতে দেখি নাই।

"তবে কেন আমাদের সংস্কৃতির উপর ওদের এত টান। প্রেমে গদগদ, কারণ তো নিশ্চয়ই আছে।

'ছাগ শিশু বলি দিয়ে বেটার মানত শোধ করা যায়, কিন্তু ছাগশিশু বা ছাগীর হিতার্থে কি করা হয় ?...." (করমতীর্থ : ৫ জুন, ১৯৮১)

এটা আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না যে, এই বিচ্ছিন্নতাবোধ সামগ্রিকভাবে বঙ্গসংস্কৃতি তথা ভারত-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতিকর পরিবেশের সূচনা করেছে। আমরা একদিকে যেমন পাশ্চাত্যের পপ্, রাশিয়ার ব্যালে ইত্যাদি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ছি, এশিয়ার বৃহত্তম স্টেডিয়াম বানাচ্ছি, ইত্যাদি ইত্যাদি করছি—অন্যদিকে নিজের ঘরের মানুষদের প্রতি মনোযোগ দিতে ভুলে যাচ্ছি। এই মানসিকতা এখনই কাটিয়ে ওঠা দরকার।

এছাড়াও আজকের তথাকথিত শিক্ষা বা শহুরে মানসিকতা এই অঞ্চলের মানুষকেই একটা বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছে। তাঁরা আজও বুঝে উঠতে পারছেন না, এই নৃত্যধারাটিকে ভাল বলবেন, না মন্দ বলবেন। ভেবে দেখলে দেখা যাবে এটা নগর-সংস্কৃতির তীব্র চাপের ফল। তাঁদের দ্বিধার মূলে একটা আশংকা যে, তাঁদের ঘরের মেয়েরাও যদি নাচনীর পেশায় নেমে পড়ে তাহলে কি হবে ? তাঁরা তলিয়ে দেখেন না যে, একটা মেয়ে আজ নাচনী হতে এসেছে কখন—কোন্ অবস্থায় ? মেয়েটির জীবনে সাধারণ জীবনযাপনের সব পথ বন্ধ হয়ে যাবার পরেই তো সে এপথ বেছে নিচ্ছে। মেয়েটি আত্মহত্যার পথে না গিয়ে, শহরে বেশ্যার লাইনে না দাঁড়িয়ে যদি নাচনী হয় তাহলে আপত্তিটা কোথায় ? আপত্তিটা সেই কানা সমাজের। একটা কিম্ভুত সমাজ নামক বিধিসর্বস্ব আচারের,—যেখানে ভগবান আছেন আড়ালে—আর সামনে আছেন ভগবানের ঠিকাদারা। তাই তো বসনের মৃত্যুকালে যখন নিতাই বলে, "ভগবানের নাম—গোবিন্দের নাম করলে কষ্ট কম হবে বসন।' তার উত্তরে '—না। ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িয়া বসন্ত বলিল—না। কি দিয়েছে ভগবান আমাকে ? স্বামীপুত্র ঘরসংসার কি দিয়েছে ? না।'

এই ভগবান-নির্ভর সমাজে বসন বা চারুরা বাস্তবে কি করতে পারে ? এ প্রশ্নের উত্তর কোথাও নেই।

তা সত্ত্বেও মানভূমের নাচনীদের উঠোনে আমরা দেখি তুলসীমঞ্চ। মনসাপ্রতিমার কাঠ-খড়ের কাঠামো পড়ে আছে। বিন্দুডির মঞ্জুড়ার ঘরে গিয়ে দেখি, সে গেছে দুপুরবেলায় আটাকলে গম ভাঙাতে। লালপাড় সাদা শাড়ি হাতে আটার পুঁটুলি নিয়ে ফিরে এল। উঠোনে তার তিন বছরের বাচ্চা খেলা করছে। রসিক পতি, মৃতা সতীনপুত্রদের আপন করে নিয়ে সে দিব্যি সংসার করছে। আর নাচের ডাক পড়লেই সে রঙ্গিনী সেজে হাত-পা নেড়ে, কোমর দুলিয়ে, ভুরুতে চোখে দারুণ ইশারা হেনে নাচনী হয়ে পথে ঘাটে নাচতে নামবে। তখন ঘোমটা টানার কোন বালাই নেই। যোগীডির প্রৌঢ়া নাচনী রাজবালা তার রান্নাঘরে উনানের পাশে উবু হয়ে বসে উনানে কাঠের জ্বাল দিতে দিতে বলেছিল, এই আমাকে এখন তো এমন দেখছ, আসরে চিনতেই পারবে না।

হয়ত নাচের আসরে সমবেত হাজার হাজার নারীর চেতনার এক গোপন কোণে অমনই এক নৃত্যপরায়ণা স্বাধীনা কিংবা প্রেমার্তা এক রাধিকারূপ চাপা পড়ে থাকে। তারা আসরে নাচনীর মধ্যে হয়ত নিজেকেই দেখতে চায়, দেখতে পায়। তাদের তন্ময়তা তেমন কথাই বলে। মাতৃরূপ যে শুধু মানুষেরই একান্ত তা তো নয়, পশুরও তো মাতৃত্ব আছে, রাধারও মাতৃচেতনা ছিল, আর বধূরূপে রাধার চেয়ে মহৎ ও একান্ত আর কে আছে ?—এসবেরই এক অব্যক্ত অপরিস্ফুট চেতনপ্রবাহ নাচনীর আসরে গ্রামীণ মহিলাদের মোহিত করে রাখে। যা মধুজাত মৃদুসঞ্চারী সুরার মতই ক্রিয়াশীল। পুরুষদের ক্ষেত্রে তো প্রশ্নই ওঠে না। তাই নাচনী নাচকেও লোকসংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে মেনে নিতে দ্বিধা হয় না।

ব্যাপক পর্যবেক্ষণে লক্ষ করা গেছে, যেহেতু মোটের উপর সমাজগ্রাহ্য ও লাঞ্ছনাহীন একটা পারিবারিক জীবন পাওয়া যায়, সেহেতু তথাকথিত সমাজ পরিত্যক্তা মেয়েরা খুব সহজেই নাচনীর পেশায় চলে আসে। ঝুমুরিয়া পুরুষরাও—যেহেতু সমাজগ্রাহ্য জীবন রক্ষা করেও নাচনী রেখে নাচ-গানের রসতৃষ্ণা মেটাতে পারে—নাচের প্রদর্শনী থেকে অর্থোপার্জন করতে পারে তাই তারাও আগ্রহের সঙ্গেই নাচনী সংগ্রহের প্রতীক্ষায় থাকে। অবশ্য ঝুমুরিয়া মাত্রেই তা নয়। এটা ব্যক্তিগত অভিরুচির ব্যাপার। যখন খবর পাওয়া যায় যে, কোন গ্রামে কোন মেয়ে-বউ কোন কারণে সমাজচ্যুতা হয়েছে, না শ্বশুর ঘরে না বাপের ঘরে ঠাঁই পাচ্ছে, তখনই সেই প্রতীক্ষিত ঝুমুরিয়া ছুটে যায় সেই মেয়ের কাছে। তাকে প্রস্তাব দেয় নাচনী হবার জন্য। দেখা গেছে তেমন আশ্রয়হীনা মেয়েদের কাছে এটা একটা অবলম্বন স্বরূপ—একটা আশ্রয়ের মত—জীবনের আশ্রয়—নইলে মরতে হত। তবে অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ আছে যে এটা এখন প্রায় ব্যবসার পর্যায়ে চলে গেছে। সব সময় রসিকেরা রসতৃষ্ণা বা সাধনার নীতি মেনে চলে না। সাধনার প্রশ্ন ওঠে, কারণ ঝুমুর গান এ অঞ্চলে হাজার হাজার মানুষের মুখে শোনা যাবে, কিন্তু বিশেষত্ব অর্জন সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। গোলামারা গ্রামের রসিক বিভূতি মাহাতর ঘরে গিয়ে তার অনুপস্থিতির সুযোগে তার জ্ঞাতি ভাই সুভাষ মাহাতকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনিও কি ঝুমুর গান করেন ? তার উত্তরে তিনি সবিনয়ে বলেছিলেন, 'না আইজ্ঞা না, এটা তো সকলের হবার নয়। আমাদের বংশের মধ্যে একমাত্র ও-ই ভগবানের আশীর্বাদ পেয়েছে।' উল্লেখ্য যে সুভাষবাবু একজন শিক্ষিত রাজনীতি করা লোক এবং গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক! নাচনী রাখা ভাইয়ের সম্বন্ধেও সাঙ্গীতিক প্রতিভা প্রসঙ্গে তাঁর এই শ্রদ্ধাপূর্ণ মন্তব্য শুধু ঝুমুর গাইয়ের প্রতিভা ও সাধনার কথাই সমর্থন করে না—সমাজে নাচনীর স্থানটা কোথায়, তাও পরোক্ষে ব্যক্ত করে।

বস্তুত সকলেই গোলামারার বিভূতি মাহাত নয়। অনেকেই আছে যারা শুধুমাত্র সুযোগ পেয়েছে একটি সর্বহারা মেয়েকে দখলে আনার—তারাও তাল বুঝে রসিক হয়ে পড়েছে, মেয়েটিকে করেছে নাচনী। সেখানে যৌন তাড়না যতটুকুই থাক—নাচের আসর বসিয়ে টাকা রোজগারটাই বড় কথা। মেয়েটির ভরণ-পোষণের ভার নিতে হয় ঠিকই কিন্তু সেটা মাছের তেলেই মাছ ভাজার মত। বছর চারেক

চৈতন্যভাবে বিন্দু

মাদল্যা

আগে বুধপুরের কাছাকাছি একটি গ্রামে আমাদের বন্ধু জ্যোৎস্নার মাধ্যমে পরিচয় হয়েছিল শ্রীমতী নামে এক নাচনীর সঙ্গে। তাকে এক ঝাণ্ডিওলা বিভিন্ন মেলায় ভাড়া নিয়ে যায়। ঝাণ্ডিওলা ঝাণ্ডি পেতে বসার পর শ্রীমতীকে সেখানে নাচ-গান করতে হয়, তাতে লোক জড়ো হয় বেশি, ঝাণ্ডিও অতিমাত্রায় জমে ওঠে। এই নাচের জন্য তাকে সে সময় প্রতিদিন আশি টাকা মজুরী দেওয়া হত। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এটা নাচনীর জীবনের একটা নিকৃষ্ট পরিচয়। যেন আধুনিক কালের সাবানের বিজ্ঞাপনে প্রায় নগ্ন মডেল-মেয়ের ভূমিকা—কিংবা তার চেয়েও মর্যাদাহীন কিছু। এই মর্যাদাহীনতার ব্যাপারটা পরিস্ফুট হয় যখন দেখি নাচনী নাচের আসরে গৃহস্থ বধূ বা মায়েরা আসরের ধারে উঠে এসে তাদের ছোট্ট শিশুর হাত দিয়ে নাচনীকে এক টাকা-দু' টাকার নোট প্রণামী দিচ্ছেন এবং নাচনী তার নাচগানের মধ্যেই প্রণামীর টাকা গ্রহণ করে শিশুর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ জানাচ্ছে। এর প্রসঙ্গসূত্র যাই হোক না কেন এটুকু নির্ভেজাল সত্য যে, একটি গৃহস্থের শিশুকে আশীর্বাদ করার অধিকার বা মর্যাদা একজন নাচনীকে দেওয়া হচ্ছে।

ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে মহাপূজার একটি আবশ্যিক বস্তু হল 'বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা'। এটা কেন যে আবশ্যিক তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা অনেক বিদগ্ধ পুরোহিতও নিশ্চিত করে দিতে পারেনি। তবে অনুমান করা যায়, বেশ্যারা স্বর্গের অপ্সরাদেরই মর্ত্য সংস্করণ। এবং অপ্সরাগণ বহু ক্ষেত্রেই মর্তবাসীদের দ্বারা পূজিত হয়েছেন। সেই সূত্রে বহু অপ্সরাই বহু নৃজাতি বা কোমগুলির মাতা। বোঝা যায় শাস্ত্রকারগণ বাস্তব অপ্সরাদের পূজা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সশরীরে না এনে তাঁদের গৃহদ্বার মৃত্তিকা আনার বিধান দিয়েছেন। মানভূমের অপ্সরা এই নাচনীদেরও তেমনই একটা ভূমিকায় দেখা স্ত্রীজাতির মধ্যে একটা সংস্কার স্বরূপ। কোন কোন রসিকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী নাচনীদের মধ্যে দর্শকবৃন্দ শ্রীরাধা তথা গোপিনীদের সাক্ষাৎ করেন, তা থেকেই এই প্রথা। তাছাড়া নাচনীরাও অপেক্ষাকৃত বয়োঃজ্যেষ্ঠা ও অধিকতর কলানিপুণা নাচনীকে গুরুস্থানীয় মেনে নিয়ে

সব কিছুর উপর তারা শিল্পী। তারাও এক নান্দনিক রসের যোগানদার—যদিও তা এক স্বতন্ত্র ধারার, যা আমাদের সামাজিক জীবন থেকে বর্জন করতে পারি না। তাই আবার ফিরে ফিরে চারুবালা, রাজবালারা আসরে নাচবে, গাইবে, তারপর চলে যাবে। দেবসভায় যেমন একদিন বেহুলা নেচেছিল ছিন্ন খঞ্জনার প্রায়—।

শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করে সম্মান জানায়, আশীর্বাদ গ্রহণ করে নাচনী জীবনে সাফল্য কামনা করে। কিংবা নাচের আসরে নাচতে উঠে নাচনীর মুখে সবার প্রথম শোনা যায় বন্দনা গান। এই বন্দনা কখনো গুরু-বন্দনা, কখনো আসর বন্দনা, আবার কখনো যাদের জন্য নাচ সেই সমগ্র দর্শকদের উদ্দেশেই। তারা নাচ শুরু করার আগে আসরের মাটি মাথায় তুলে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রণাম জানিয়ে বন্দনা গান শুরু করে। এই সকল আচরণ নিঃসন্দেহে গণিকাদের থেকে নাচনীদের পৃথক আসনে বসায়। যদিও জটিল সমাজ-আবর্তে পড়ে তারা বাহির দুয়ারের লোক তবুও তারা মূলত শিল্পী। স্বেচ্ছাশিল্পী। টাকা নিতে হয় পেটের জন্যে। দেবদাসীর মধ্যেও যে 'স্বদাসী'-দের পরিচয় পাওয়া যায়, নাচনীরা সেই স্বদাসী। তারা কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার বেতনভূক নয়, তারা স্বাধীনা। পেশা হলেও তারা প্রথমে শিল্পী। রসিকও সর্বপ্রথম একজন আত্মমগ্ন ঝুমুরিয়া, তারপর পেশা-টাকা রোজগার। খ্যাতি, যশ, মান-মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা তাদেরও আছে। নইলে শুধুমাত্র রাহা খরচের বিনিময়ে তারা সদলে বহু পাথুরে জঙ্গুলে পথ পায়ে হেঁটে, বাসের ছাদে চড়ে রোদে পুড়ে দূর দূরান্তে নাচতে যাবে কেন? তাই নাচনী সম্পর্কিত যাবতীয় নিন্দার ভিতর থেকে প্রবাহিত সত্যটিকে প্রকাশ করার দায় আমাদেরই—আমাদের সংস্কৃতির স্বার্থেই। কোন নাচনীর নাচে বা রূপ-যৌবনে আকৃষ্ট হয়ে কোন বিত্তশালী ক্ষমতাশালী লোক যখন রসিককে বলে,

'তোমার নাচনীটাকে পাঁচ হাজার টাকায় আমাকে দিয়ে দাও।' তখন ক্রুদ্ধ রসিক সেই ক্ষমতাশালীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় কেন? রসিক জানে একটা নাচনী চলে গেলে আর একটা পেতে বেশি দেরি হবে না। তবুও মোটা টাকার অঙ্ক ঠেলে ফেলে চলে আসে কেন? নাচনী পুষে—তাকে নাচিয়ে যদি অনেক টাকা লাভ হয়, তাহলে রসিক 'সহকারী রসিক' তৈরি করে একাধিক নাচনী প্রতিপালন করে না কেন? এসবই শিল্পের প্রতি একনিষ্ঠতা ও শিল্পগত মর্যাদার প্রশ্ন। অবশ্যই সকলে তা পারে না। যারা এই মর্যাদা অর্জন করতে পারে তারা সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হয়। সিন্ধুবালা এখন বৃদ্ধা। নাচতেও পারে না, গাইতেও গলা জড়িয়ে আসে। কিন্তু তার গান আঞ্চলিক জনমানসে উল্লেখযোগ্য ছাপ ফেলেছে। তার নাম শোনেনি এমন লোক পাশাপাশি কয়েকটা জেলায় কমই আছে। শুধু গ্রাম্য আসরের হাজার হাজার সাধারণ মানুষের সভায় নয়, তাকে তো তুলে আনা হল সমাজের উচ্চকোটির মানুষের সংবর্ধনার আসরে। ১৯৮১-র জানুয়ারীতে বলরামপুর পঞ্চায়েত সমিতির লোকসংস্কৃতি উৎসবে। সিন্ধুবালাকেও তো মঞ্চে তোলা হল—যে মঞ্চে অনেক উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত তথা উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তিদেরও আসন ছিল। সেদিনের আসরে গাওয়া সিন্ধুবালার দুটি ঝুমুর সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। ক্যাসেটের অভাবে অনেকবার গান দুটো মুছে ফেলব ভেবেও মুছতে পারিনি। কেবলই মনে জেগে ওঠে 'নমঃ নারায়ণ···।' বার বারই মনে হয়েছে— কই এত অনুষ্ঠানে এত ঝুমুর শুনছি কিন্তু এমন নিপুণ ও তীব্র রসের ঝুমুর তো শুনছি না। সিন্ধুবালা মানভূমের ঝুমুরে একটি স্মরণীয় নাম। একটি মর্যাদার নাম। পূর্বোদ্ধৃত হ্যাণ্ডবিলটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে। স্থানীয় মানুষ এদের নামের সঙ্গে 'দেবী' শব্দটি মুদ্রিতকারে উচ্চারণ করছেন।

কিন্তু এত কিছুর পরেও একজন নাচনীর জীবনের পরিণতি কি? মাতৃসম্ভোগকারী অয়দিপাউসের সন্তানের মৃতদেহ ক্রেয়নের আদেশে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল, কেউ তার মৃতদেহ সৎকার করতে পারবে না। এ জন্যে আন্তিগোনের ক্ষোভ ও আর্তি আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ করেছি। সুদূর গ্রীস দেশে একজন পাপীর প্রতি দেশের মানুষের যে বিধান আমাদের ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। আমাদের দেশে যারা গণিকা—দেহব্যবসাই যাদের জীবিকা তারাও মৃত্যুর পর মাটি আগুন পায়, যদিও পুরুষরা তাদের মৃতদেহের ধারে কাছে আসে না। সেক্ষেত্রে সহবাসিনী গণিকারাই এদের সৎকারের জন্যে কিছু না কিছু ব্যবস্থা করে থাকে। এর সুযোগও ঘটে কারণ তারা সাধারণত একটা স্বতন্ত্র পল্লী গড়ে তোলে এবং পরস্পরের সহযোগিতার মধ্যে বাস করে। তবু একজন অসহায় বৃদ্ধা বেশ্যার পরিণতি কি হতে পারে?—যতদিন পায়ের জোর থাকে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষাবৃত্তি করে বাঁচে তারপর একদিন রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে মারা যায়। শহরের মধ্যে মরলে তবু পুরকর্তৃপক্ষ বা নানারকমের সেবা সমিতিগুলো নিতান্ত শহর পরিষ্কার রাখার দায়ে পড়েই সেই মৃতদেহ সরিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। একজন জাতি ও কুলভ্রষ্টা নাচনীর জীবনের অন্তিমে কেউ নেই। তার দীর্ঘ জীবনের রক্ষক রসিকের কথা মনে আসতে পারে। কিন্তু সেই রসিক বা তার ছেলেরাও তো জাত-বিচারের নিগড়ে বাঁধা।

অতএব একজন নাচনীর পরিণতিও তাই পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে থাকে। সে যতদিন নাচতে পারে নাচে। তারপর যতদিন দাসীবৃত্তি করতে পারে করে, তারপর অকেজো মানুষটিকে বেরিয়ে পড়তে হয় ভিক্ষের জন্যে এবং মালভূমি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি যাঁদের জানা আছে তাঁরা বুঝতে পারবেন এই ভীষণ পটভূমিতে ভিক্ষাবৃত্তিও কি দুরূহ ব্যাপার। কোন খরার দুপুরে হয়ত রোদের ঝলসানী সইতে না পেরে— নিতান্ত তৃষ্ণার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মুখ ঠুকে পড়ে যায় কাঁকুরে মাটির পথে। এবং পড়েই থাকে। কাক, চিল, শকুনে ঠোক্‌রায়। বিদ্যাসাগর বা গান্ধীজীরা তো এসব অঞ্চলে চলাচল করেন না, যে তাদের তুলে নিয়ে গিয়ে নিজহাতে সেবা করবেন।

আর ভাগ্যবশে যদি সে ঘরের জীর্ণ খাটিয়ার শয্যাতেই শুয়ে মরে, তবুও বিধিলিপি নির্দিষ্ট। তাকে ফেলে দেওয়া হবে মাঠে—প্রান্তরে, লোকালয়ের বাইরে। একটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসা নাচনী মেয়ের জন্যে পৃথিবীর মাটিতে কোন জায়গা নেই। কোন ডোমকে দুটো টাকা দিলে সে এসে কাঁড়ার গাড়িতে চাপিয়ে মড়াটা গ্রামের বাইরে কোন নির্জন স্থানে ফেলে দেবে। কাঁড়ার গাড়ি না জুটলে পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে মাটির উপর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে এবং শিয়াল-কুকুর-শকুনিরা তার শরীর ছিঁড়ে-কুটে খেয়ে নেবে। এসবে আপত্তি আছে এমন কোন হৃদয়বান ব্যক্তির সহায়তায় হয়ত ভবিষ্যতে ঐ মৃতদেহ সৎকারের কথা ভাবা যেত, কিন্তু মুশকিল হল, এতদঞ্চলের মানুষের মনে বিশ্বাস—এভাবেই ঐ মৃতার পাপজীবনের প্রায়শ্চিত্ত হয়। 'ধম্মপদকথা' অনুসারে জানা যায় যে, রাজগৃহ-বাসিনী অসামান্যরূপলাবণ্যবতী এবং খ্যাতিসম্পন্না নর্তকী সিরিমা যখন মারা যায়, তখন ভগবান বুদ্ধের অনুরোধে রাজা বিম্বিসার মৃতদেহটি দাহ না করে শবাগারে রেখে দেন। কাকে ও কুকুরে যাতে না খেতে পারে সেজন্যে একজন প্রহরীও নিযুক্ত করা হয়েছিল। এবং নগরবাসীদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল প্রত্যেকে যেন সিরিমার মৃতদেহটি অবশ্যই দেখে আসে। যারা দেখতে অস্বীকার করবে তাদের প্রতি অর্থদণ্ডেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আর ভিক্ষুদের তো প্রতিদিনই একবার করে সেটা দেখতে হত। এর কারণস্বরূপ এরকম ব্যাখ্যা করা হয় যে, তথাগতের উদ্দেশ্যই ছিল ভিক্ষুরা প্রতিদিন সিরিমার মৃতদেহ দেখে দেখে এ-কথা হৃদয়ঙ্গম করুক যে, যে দেহ অনিন্দ্যসুন্দর তাও ধ্বংস হয়, কীটের দ্বারা ভুক্ত হয় এবং অবশেষে মাংস-বর্জিত হয়ে কেবল হাড়গুলোই পড়ে থাকে। আমাদের সমাজপতিরা নাচনীর মৃতদেহ শিয়াল-কুকুরের মুখে ফেলে দিয়ে কি তেমন কিছু শিক্ষা দিতে চান?

"...এমন সময় দাবানল প্রচণ্ড বায়ুসহযোগে ভীষণরূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া সমুদয় বন দগ্ধ করিতে লাগিল।...মৃগযূথ ও সর্পসমুদয় সেই তীব্রদহনে দগ্ধদেহ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল এবং বরাহগণ নিতান্ত তাপিত হইয়া জলাশয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।...ঐ সময় অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী অনাহার নিবন্ধন নিতান্ত ক্ষীণ হইয়াছিলেন বলিয়া কোনক্রমেই তথা হইতে পলায়নপূর্বক সেই বিষম বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে দাবানল তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইল।" তাঁরা আকস্মিক অগ্নিতে ছাই হয়ে গেলেন। আকস্মিক অগ্নি। তবুও তাঁরা মনে করেছিলেন "যখন আমরা গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন এই দাবানলে প্রাণত্যাগ করিলে কখনই আমাদের অসদ্গতি হইবে না।" বলা বাহুল্য যে একাধিক পুরুষ সংসর্গ করেও কুন্তী, মাদ্রী, দ্রৌপদী, তারা, মন্দোদরী প্রভৃতি নারী স্বর্গলাভ করতে পেরেছিলেন। তাঁদের কপালে আকস্মিক হলেও পরম অভিপ্রেত অগ্নির সংস্থান হয়েছিল। মৃত্যুর পরে তাঁরা স্বর্গেও গিয়েছিলেন। সেই মহাভারতের দেশের মানুষ হয়েও নাচনীদের এই পরিণতি আমাদের মনুষত্ববোধকে কি একটুও নাড়া দেয়? কোন্ কবি যেন গেয়েছেন, 'জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা, মরণে কেন তারে দিতে এলে ফুল···' এ অন্য এক জীবনের গান। দুঃখ যেখানে বিলাস। নাচনীদের জীবনে দেখছি এর উল্টোটাই ঘটছে। জীবিতকালে তার নাচ-গানে, কলা-চাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে মালায় অভিনন্দিত করা হচ্ছে, পূজা প্রাঙ্গণে তার নাচের আয়োজন হচ্ছে, গ্রাম্য মানুষ উচ্ছ্বসিত হয়ে টাকার নোট সেফটিপিন দিয়ে সটকে দিচ্ছে তার অঙ্গে, গ্রাম্য মাতা তার শিশুসন্তানের জন্যে আশীর্বাদ চেয়ে নিচ্ছে—অথচ মরণে তাকেই ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে আস্তাকুঁড়ে, ভাঙা হাঁড়ির মত অবহেলায়।

তবুও—এই মর্মান্তিক পরিণতির কথা জেনেও মঞ্জুড়া কিংবা মালতীরা আজও এই বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নেও নাচনীর বৃত্তি গ্রহণ করছে, আরও করবে। কারণ করতেই হয়। সেই সঙ্গে এই সমাজের মানুষকেও তো ভাবতে হবে যে নাচনীরাও মানুষ—তারাও নারী, তারাও কারো মা। সব কিছুর উপর তারা শিল্পী। তারাও এক নান্দনিক রসের যোগানদার—যদিও তা এক স্বতন্ত্র ধারার—যা আমাদের সামাজিক জীবন থেকে বর্জন করতে পারি না। তাই আবার ফিরে ফিরে ফুড়কি, চারুবালা, রাজবালা, সিন্ধুবালারা আসবে, নাচবে, গাইবে, তারপর চলে যাবে। দেব সভায় যেমন একদিন বেহুলা নেচেছিল ছিন্ন খঞ্জনার প্রায়···।

যাঁরা বিভিন্নভাবে আলোচনা ও তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন : সুবোধ বসুরায়, শঙ্কর মুখার্জী, পশুপতিপ্রসাদ মাহাত, বৃন্দাবন মাহাত, কিরিটি মাহাত, সৃষ্টিধর মাহাত, কমলেশ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ কুমার, সুভাষচন্দ্র মাহাত, সঞ্জয় চক্রবর্তী ও জ্যোৎস্না কর্মকার।

আলোকচিত্রগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত

গর্ভধারিণী

সমরেশ মজুমদার

চাপ দিতেই দরজাটা খুলে গেল। চোখের সামনে কোন দৃশ্য নেই। ঘরের কোণে তিন পাথরের মধ্যে যেটা জ্বলছিল সেটা শেষ পর্যায়ে। অন্ধকারকে ঘোলাটে করে দেওয়া ছাড়া তার কোন ভূমিকা নেই। শব্দগুলো কিন্তু থামছিল না। একজন বেপরোয়া, অন্যজন সমানে তাকে শান্ত করে চলেছে। জয়িতা যে দরজায় তাও খেয়াল নেই দুজনের।

মাচার ওপর সুদীপকে চেপে ধরে রেখেছে মেয়েটা। জয়িতা আরও একটু এগোল। সুদীপ গোঙাচ্ছে। তার দুটো হাত যে দুর্বল তা বোঝা যাচ্ছে এখন, নইলে ওরা মেয়েটির শরীরে অমন নেতিয়ে পড়ে থাকত না। মেয়েটি তার দিকে পেছন ফিরে বসে। হঠাৎ জয়িতার মনে হল এই সুদীপকে সে চেনে না। সুদীপের মুখ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু চট করে জয়িতার কালীঘাটের পটে আঁকা ছবির কথা মনে পড়ল। বাবু বেশ্যাবাড়িতে যাবেনই, সতী সাধ্বী স্ত্রী মাতাল স্বামীকে দু হাতে আটকে রাখতে চেষ্টা করছেন। এখনই যেন সুদীপ উঠে লাথি মেরে ফিটনে চেপে বউবাজারে রাত কাটাতে যাবে। নিজেকে অনেক কষ্টে সংযত করল জয়িতা। সে শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি হচ্ছে?'

মেয়েটি মুখ ফেরাল, ফিরিয়ে হাসল, 'ও তুমি! দ্যাখো না, বেচারা মাতাল হয়ে গিয়েছে!'

জয়িতা এবার সোজা সুদীপের পাশে এসে দাঁড়াল, 'সু-দী-প!'

সুদীপের মাথাটা নড়ল। যেন আবছা সে বুঝতে পারল। তারপর জড়ানো গলায় বলল, 'কল্যাণ?'

'তোর লজ্জা করছে না? ছি সুদীপ ছিঃ। তুই এখানে এসেছিস মদ খেয়ে মাতলামি করতে?'

সুদীপ উঠতে গেল। তার দুটো হাত শক্তি সংগ্রহের জন্যে মেয়েটির শরীর এমনভাবে জড়িয়ে ধরল যে রাগে জয়িতার শরীর রি রি করে উঠল। সে মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল। বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বা লজ্জা সেখানে নেই। জয়িতা আর দাঁড়াতে পারল না।

অন্ধকারে সমস্ত মাঠটা সে ডিঙিয়ে এল, কিভাবে এল তা সে নিজেই জানে না। চোখের সামনে সুদীপের ভঙ্গীটা যেন সেঁটে আছে। নারীপুরুষের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের সঙ্গে সে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে পরিচিত। সুদীপ যা করছে তা সে ইচ্ছায় করছে না। কিন্তু-কিন্তু!

দড়াম করে দরজাটা খুলে যেতেই আনন্দ চমকে তাকাল। জয়িতার দিকে তাকিয়েই সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে? তোর চেহারা এরকম হয়েছে কেন?'

দরজাটা বন্ধ করে সুদীপের বিছানায় বসে পড়ল জয়িতা। এই মুহূর্তে তার কোন কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। আনন্দ ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। এবার জিজ্ঞাসা করল, 'সুদীপ কোথায়?'

ঠোঁট কামড়াল জয়িতা। তারপর বলল, 'আছে, ভালই আছে।'

'ভাল আছে মানে? কি হয়েছে বল তো? সুদীপ তোকে অপমান করল নাকি? গেল কোথায় সে?'

'ও মেয়েটির ঘরে আছে।'

'তোর ঘরে বল।'

'আমার ঘর আর হল কোথায়!'

'ওখানে কি করছে ও।'

'মাতাল অবস্থায় সুদীপ মেয়েটির সঙ্গে কি করছে তা দেখার জন্যে তুই আমাকে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে থাকতে বলবি না। আমি ভাবতে পারছি না, বিশ্বাস কর!' মুখ ফেরাল জয়িতা।

আনন্দ চুপ করে গেল। সে জয়িতার মুখ দেখতে পাচ্ছে না।

হঠাৎ জয়িতা চিৎকার করে উঠল, 'আনন্দ, আমরা এসব করবার জন্যে এখানে আসিনি।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু সুদীপ মদ পেল কোথায়? ওর সঙ্গে তো মদ নেই। মেয়েটি খাইয়েছে?'

কাঁধ নাচাল জয়িতা, 'হতে পারে। যারা মদ খায় তাদের আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আমি আমার বাবা মাকে কখনও বিশ্বাস করতে পারিনি এই কারণে।'

হঠাৎ আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা কি শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করেছে?'

জয়িতা অত্যন্ত বিরক্ত ভঙ্গীতে বলল, 'আন্দ দেম। আমাকে জিজ্ঞাসা করে কি লাভ!'

যুদ্ধ। দ্বিতীয়ত, ওরা আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবে। তৃতীয়ত, এ যাত্রায় যদি আমরা জিতেও যাই তবু পরিত্রাণ পাবো না। ওরা আরও বড় বাহিনী নিয়ে ফিরে আসবে। একটা সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে আনাড়ি হাতে লড়াই করা মানে আত্মহত্যা করা। মরে গেলে তাপল্যাঙের মানুষের জন্যে যা করতে চাইছি তা তুই করবি কি করে?'

কথাগুলো হচ্ছিল বাংলায় যা পালদেমের বোঝার কথা নয়। কিন্তু সে মন দিয়ে শুনছিল। জয়িতা থামতে সে বলল, 'আমাদের এই গ্রামে পুলিস কখনও আসেনি। এরা যা বলছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে আর দেরি নেই তাদের এখানে আসতে। তোমাদের একটা কথা বলি, গ্রামের কোন মানুষই চাইবে না এখানে লড়াই হোক। তোমরা ওদের সঙ্গে লড়াই করতে চেয়ো না। তোমাদের সঙ্গে লড়াই-এ গ্রামের মানুষের যে ক্ষতি হবে না তা কে বলতে পারে! তাছাড়া লড়াই-এ এক পক্ষকে হারতেই হয়। তোমরা হারলে এতক্ষণ যে সব কথাবার্তা ঠিক হল সব বেঠিক হয়ে যাবে। তোমরা তোমাদের ঘরে ফিরে যাও। আমি পালার সঙ্গে কথা বলে দু তিনজনকে নিয়ে আসছি।'

বেরিয়ে যাওয়ার সময় আনন্দ ছেলেগুলোকে বলল বস্তাগুলো কোথায় রাখতে হবে। এখন পায়ের তলায় কুচি বরফ জমাট হতে চলেছে। হাওয়া বইছে। তবে সেই হাওয়ায় বরফ ভেসে আসছে না বলে কষ্টটা কম হচ্ছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল আনন্দ। তারপর জয়িতাকে বলল, 'তুই আস্তানায় যা আমি সুদীপকে দেখে আসি। ওকে যে করেই হোক তুলতে হবে।'

জয়িতা বলল, 'তুই একা পারবি না।' সে আর কথা না বাড়িয়ে মেয়েটির ঘরের দিকে রওনা হল। সমস্ত শরীর থরথরিয়ে কাঁপছে। দাঁতে দাঁতে একনাগাড়ে শব্দ বাজছে। আনন্দ দরজাটা ঠেলতে কোন মানবিক আওয়াজ শুনতে পেল না। সে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ডাকল, 'সুদীপ!'

কোন সাড়া এল না ভেতর থেকে। জয়িতা ভেতরে ঢুকে পড়ল। আনন্দ দাঁড়িয়েছিল। এই সময় অন্ধকারে জয়িতার গলা শোনা গেল, 'ওরা এ ঘরে নেই।'

'সেকি রে?' আনন্দ অবাক। একটা পরিপূর্ণ মাতাল এমন অবস্থায় বাইরে যাবে কেন?

জয়িতা ফিরে এল, 'আমি বুঝতে পারছি না। সুদীপের কোন হুঁশ ছিল না নিজের চোখে দেখেছি।'

'কিন্তু কোথায় ওর খোঁজ করি বল তো? পালদেমের সাহায্য চাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।'

ওরা চুপচাপ প্রায় ছুটে আসছিল। জয়িতা রহস্যটার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছিল না। ওর মনে এতক্ষণ যে অস্বস্তিটা নখ বসাচ্ছিল আচমকা সেটা জরাগ্রস্ত হয়ে ভয়ে রূপান্তরিত হল। যদি পাশের গ্রামের মানুষরা এমন রাতের সুযোগে মেয়েটিকে নিয়ে যেতে আসে এবং সুদীপকে খুন করে কোথাও ফেলে যায়? অসম্ভব নয়। কারণ সেই ঘটনার পর ওরা বন্ধুর হাত বাড়িয়ে দেয়নি। ওই সময় অমন মাথা গরম না করলে এই ঘটনাটা ঘটত না। সুদীপ যাই করুক, এমন সোজা মনের ছেলে সে দ্যাখেনি। সোজা কিন্তু বেহিসাবী। আর শেষটাই ওর কাল হয়ে দাঁড়াবে তা কে জানত।

আস্তানার বারান্দায় উঠে আনন্দ বিস্মিত। ভেতরে আগুন জ্বলছে। এবং সেই সঙ্গে একটি নারীকণ্ঠে অবোধ্য ভাষায় সুর খেলা করে যাচ্ছে। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের সিনেমার একটি হিট গান যা কি না ঠিক এই রকমই মেলোডিয়াস। সে ধীরে ধীরে দরজাটা ঠেলতেই দৃশ্যটা দেখতে পেল। মেয়েটি আগুনের পাশে উবু হয়ে বসে চোখ বন্ধ করে গান গাইছে। আর তার সামনে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে সুদীপ। আগুনটাকে ওরাই জ্বালিয়েছে। কথা না বুঝলেও সুর মানুষের মনে ভাষা তৈরি করতে পারে যদি তা আন্তরিক হয়। সুখ এবং দুঃখের প্রান্তে এমন একটা অনুভূতি আছে যার প্রকাশ একটাই সুরে সম্ভব। এই গান শুনে আনন্দ বুঝতে পারছিল না মেয়েটি দুঃখী না সুখী!

জয়িতা এগিয়ে যেতেই মেয়েটি গান থামিয়ে চমকে মুখ তুলল। তারপর সরল হাসল। আনন্দ দেখল, জয়িতার মুখে আগুনের আভা লেগেছে। সে চটপট জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কখন এসেছ এখানে?'

মেয়েটির একটা হাত সুদীপের বুকের ওপরে তখনও। সেই অবস্থায় বলল, 'অনেকক্ষণ।' তারপর জয়িতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি চলে আসার পর ও আর আমার ঘরে থাকতে চাইল না।'

হঠাৎ জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ওর কাছে ঠিক কি চাও?'

'আমি?' মেয়েটি মাথা নিচু করল এবার, তারপর চুপ করে বসে রইল।

জয়িতা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'না, চুপ করে থাকলে চলবে না। তুমি-সুদীপ—। আমি জানতে চাই সুদীপ তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে কি না? আর তাই করে থাকলে সেটা তোমার প্রশ্রয়েই হয়েছে। ব্যাপারটা তোমাকে বলতে হবে।'

আনন্দ জয়িতার দিকে তাকাল। জয়িতা এখন যে গুছিয়ে কথা বলতে পারছে না তা সে বুঝতে পারল। জয়িতা জানতে চাইছে সুদীপ মেয়েটির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে কি না। কোন মেয়েকে এরকম প্রশ্ন সরাসরি করা যে অস্বস্তিকর তা এই মুহূর্তে জয়িতাও ভুলে গিয়েছে। সে এগিয়ে গিয়ে সুদীপের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে দু হাতে ঝাঁকাতেই সুদীপ চোখ মেলল। চোখ দুটো এখন টকটকে লাল। প্রথমে মনে হল সুদীপ চিনতে পারছে না। মেয়েটি বলল, 'ওকে ঘুমাতে দাও। ঘুমালে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'ও এখানে কিভাবে এল? মনে হচ্ছে হেঁটে আসেনি!'

মেয়েটি মাথা নাড়ল, 'আমি নিয়ে এসেছি।'

জয়িতা মেয়েটাকে ভাল করে দেখল আবার। সুদীপকে বয়ে নিয়ে আসার শক্তি ও ধরে?

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'সুদীপ তোমাকে কিছু বলেছে?'

'হ্যাঁ।' মেয়েটি হাসল, 'ও বলেছে এখন থেকে আমরা বন্ধু।'

আনন্দ উঠে এল জয়িতার কাছে। তারপর নিচু গলায় বাংলায় বলল, 'মাথা গরম করিস না। মনে হচ্ছে মেয়েটা ইনোসেন্ট। তবে পালদেমরা ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবে বুঝতে পারছি না।'

জয়িতা সুদীপের দিকে তখন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে। ওর ঠোঁট বেঁকে যাচ্ছিল। এমনিতেই এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় অন্যদের মত তার ঠোঁটেও এখন ফাটল এবং সামান্য ক্ষতের চিহ্ন তবু এই বিকৃতিটা ধরা পড়ল। জয়িতা অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'মানুষ কেন মদ খায় যদি এই অবস্থা হয়!'

এই সময় দরজায় শব্দ হল। আনন্দ গলা তুলে আসতে বললে পালদেমরা এল। ওরা দুজন, পালদেম আর লাছিরিঙ। মেয়েটিকে দেখে পালদেমের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। এবং আশ্চর্য ব্যাপার, ওদের দেখামাত্র মেয়েটি আগুনের সান্নিধ্য ছেড়ে দূরে গিয়ে দাঁড়াল। পালদেম আনন্দকে জিজ্ঞাসা করল, 'ও কি এখন এই ঘরেই থাকে?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'না। আমাদের এই বন্ধু অসুস্থ, তাই ওকে নিয়ে এসেছে।'

লাছিরিঙ বলল, 'ওর খুব নেশা হয়ে গিয়েছে।'

পালদেম মেয়েটিকে দেখল, 'ওর সামনে তোমরা কথা বলতে চাও? আমি ওকে বিশ্বাস করি না, যতদিন ও আবার বিয়ে না করে।'

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'বিয়ে করার সঙ্গে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কি সম্পর্ক?'

পালদেম উত্তর দিল, 'আমাদের এখানে নিয়ম প্রত্যেক যুবতী মেয়ের স্বামী থাকবে। স্বামী হল তার চরিত্রের চারপাশে বেড়ার মতন। নাহলে পাপের ঢুকতে দেরী হয় না।'

'বাজে কথা।' জয়িতা চেঁচিয়ে উঠল, 'তাহলে তো তোমরা আমাকেও বিশ্বাস করো না।'

'তুমি বাইরে থেকে এসেছ। আমাদের নিয়ম তোমার ক্ষেত্রে খাটে না।'

'এসব তোমরা নিজেদের সুবিধেমত তৈরি করে নিয়েছ। একটা মেয়েকে বা পুরুষকে বিশ্বাস করা যায় তার কাজের মধ্যে দিয়ে।' জয়িতা শক্ত গলায় জানাল।

'বেশ। ওর কাজই কি বিশ্বাসের যোগ্য? স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করত। বাচ্চা হয়নি বলে স্বামীকে দোষ দিত। মানলাম লোকটা খারাপ ছিল। কিন্তু হাজার হোক স্বামী। সে মরে যাওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে ও অন্য গ্রামের মানুষের সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছিল। কেন?'

'তোমরা ওকে একঘরে করে রেখেছিলে তাই।'

'তোমাদের এই বন্ধুর সঙ্গে ওর এত ভাব, ওর মতলব কি তা জানো?'

'জানি না। জানতেও চাই না। যতক্ষণ ওর কাজের জন্যে গ্রামের অন্য মানুষগুলোর ক্ষতি হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের নাক গলাবার কোন মানে হয়

না।' জয়িতা কথা শেষ করতে আনন্দ ওর দিকে সবিস্ময়ে তাকাল। এতক্ষণ জয়িতা মেয়েটিকে সহ্য করতে পারছিল না। অথচ এখন ওরই হয়ে সমানে লড়ে যাচ্ছে। তারপরেই খেয়াল হল, জয়িতা সমর্থন করছে একটি কোণঠাসা মেয়েকে। বিশেষ এই মেয়েটিকে নয়। সে বলল, 'এ সব কথা বলে সময় নষ্ট করার দরকার নেই।'

লাছিরিঙ জয়িতার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'তোমাদের ধরতে পুলিস আসছে? আমি কখনও পুলিস দেখিনি। ওরা কি খুব নিষ্ঠুর?'

জয়িতা ছেলেটির দিকে অবাক হয়ে তাকাল। এই সারল্যের কি জবাব দেবে সে?

পালদেম আবার মেয়েটিকে দেখল। তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, পুলিস এই গ্রামে হামলা করলে আমরা বিপদে পড়ব। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা তোমাদের সাহায্য করছি কারণ তোমরা আমাদের ভাল চাইছ। এখানে পুলিস বেশীদিন থাকতে পারবে না। বরফ পড়ার আগেই ওরা চলে যেতে বাধ্য হবে। ততদিন তোমরা পাহাড়ে লুকিয়ে থাকবে। লাছিরিঙ তোমাদের এমন জায়গায় নিয়ে যাবে যেখানে বাইরের লোক কখনই পথ চিনিয়ে না দিলে পৌঁছাতে পারবে না। দিনের বেলায় এই গ্রাম ছেড়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না। কারণ গ্রামের সব মানুষই যে মুখ বন্ধ করে থাকবে এমন না-ও হতে পারে। পুলিস যদি জিজ্ঞাসা করে তোমাদের কথা আমরা অস্বীকার করব না। কিন্তু বলব তোমরা চলে গেছ। অস্বীকার করে যে লাভ হবে না তা বুঝতেই পারছ। তোমাদের আপত্তি আছে?'

আনন্দ বলল, 'না। কিন্তু যেখানে আমরা লুকিয়ে থাকব সেখানে থাকা যাবে তো?'

'কষ্ট হবে। তবে একটা চমৎকার গুহা আছে উত্তরের পাহাড়ে। সেখানে আগুন জ্বাললেও কেউ টের পাবে না। শুধু পাহাড়ি ভালুকের আর দানোর ভয় ছাড়া কিছু নেই।'

'ঠিক আছে। ওদের আমরা সামলে নেব।' আনন্দ বলল।

অতএব স্থির হল ভোরের আগেই বেরিয়ে পড়া হবে। এই ঘরে যে সমস্ত জিনিসপত্র আছে তার কিছুটা পালদেমের কাছে রেখে বাকিগুলো ওরা সঙ্গে নিয়ে যাবে। ওদের সঙ্গে যাবে লাছিরিঙ। আনন্দ আর জয়িতা ছড়ানো সংসার গোছাতে লাগল। পালদেম জানাল পুলিস গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ামাত্র সে খবর পাঠাবে ফিরে আসতে। আনন্দ তাকে বুঝিয়ে দিল গ্রামের মানুষদের নিয়ে তাকে কি কি করতে হবে। পালদেম চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই সমস্ত জিনিস গোছানো শেষ হলে হঠাৎ জয়িতা ডুকরে কেঁদে উঠে সামলে নেবার চেষ্টা করল প্রাণপণে।

আনন্দ দেখল জয়িতা কল্যাণের পড়ে থাকা জিনিসগুলোর ওপর হাত রেখেছে।

(ক্রমশঃ)

ছবি: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

আদি মধ্য অন্ত

সমরেশ বসু

॥ আদি ॥

"আমি, অস্বীকার করছিনে, আমরা এ যুগের ছেলেমেয়েরা..."

সুপূর্ণা দু'হাত বাড়িয়ে, শৈবালের ঠোঁটের ওপর চেপে ধরলো, "দোহাই তোমার, বুড়ো বাবা ঠাকুর্দার মতো জ্ঞানের বাক্য শুনিও না। কোথায় একটা মজার গল্প বলতে এলুম, শুনে এনজয় করবে। তা না, সেলফ্ ক্রিটিসিজ্‌ম শুরু করে দিলে।"

"তুমি আমাকে ভুল বুঝলে মধু।" শৈবাল সুপূর্ণার ডাক নামে ডেকে, ওর নিখুঁত ম্যানিকিওর করা পারফিউমের নেশা ধরানো গন্ধমাখা কোমল ফরসা হাত দুটি মুখ থেকে টেনে, বুকে রাখল, "তোমার মজার গল্পের নায়ক নায়িকা, অরিন্দম আর কৃষ্ণা সম্পর্কে তা হলে লোভের কথা বললে কেন? আর ওদের করুণা করার কথাই বা তোমার মনে এলো কেন?"

সুপূর্ণা ঘরের বন্ধ দরজাটার দিকে একবার দেখে নিল। কারণ শৈবাল যে কেবল ওর হাতদুটো টেনে বুকের ওপর নিল, তা নয়। ওকেও টেবিলের পাশ দিয়ে বুকের অনেকটা কাছে টেনে নিল। ঈষৎ বাধা দেবার চেষ্টা করলো। ফলে সবুজ বনে লাল ফুল ছাপানো পিওর সিল্কের শাড়ির আঁচল খসলো। শাড়ির সঙ্গে অভিন্ন রঙের মেশানো জামায়, অনভ্র উদ্ভিন্ন বুকের একদিক উদাস। অতি অনুজ্জ্বল ওষ্ঠরঞ্জনী মাখা পুষ্ট ঠোঁট টিপে, ওর স্বাভাবিক সরু ভ্রুকুটি চোখে শৈবালকে হানলো। কপালের সামনে, ছাঁটাই করা নরম কালো চুলের গোছা এসে পড়েছে প্রায় ওর দীর্ঘায়ত কালো চোখের ওপর। "কী করছো? এটা তো তোমার অফিস ঘর বলেই জানি। দরজাটাও খোলা।"

"ভুল কথা একটাও বলোনি।" শৈবাল ওর ঝকমকে দাঁতে হেসে, সুপূর্ণাকে কোনো অবকাশ না দিয়েই ঝটিতি প্রায় বুকের সংলগ্ন করলো, "কেবল ভুলে গেছ, দরজার বাইরে একজন বেয়ারা আছে। আর দরজার বাইরে, লাল বাতিটার সুইচ আমি আগেই অন্ করে দিয়েছি। যাকে বলে রক্ত চক্ষুর নিষেধ-সংকেত।"

সুপূর্ণা দেখল, ওর বুকে ঠেকেছে শৈবালের কপাল। পোশাকে আশাকে আর বাকচাতুর্যে যতো আধুনিকই হোক, বুকের স্পর্শে একটা শিহরিত লজ্জাকে চাপা দায়। বন্ধ ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি না থাকলেও কোনরকমে শৈবালের হাত থেকে, একটা হাত ছাড়িয়ে, ওর মাথাটা সরিয়ে দিল। ঢেউ খেলানো চুলের মুঠি আলগা করে ধরলো। মুখে ততক্ষণে লেগে গিয়েছে রক্তচ্ছটা, "মতলবটা কি তোমার বল দিকিনি? আমি তো তোমাকে ওরকম প্রভোক করতে চাইনি। তবে কেন..."

"আমার ইংরেজি বাঙলা, দুই-ই খুব খারাপ।" শৈবাল চেয়ার থেকে মুখ তুলে সুপূর্ণার লজ্জা আর অস্বস্তিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। "আসলে, তুমি তো সমস্ত দিক দিয়ে আমার চোখে মূর্তিমতী প্রোভোকেটর। কিন্তু ঘরে ঢুকে দু'কথার পরেই তুমি আমাকে বলেছিলে, আমার মধ্যে তুমি অরিন্দমের পাগলা দাপানিটা দেখতে পাও না।...আহা, না না, আমি অবিশ্যি ও কথাটার জবাব দিতে বা শোধ নিতেই, এসব কিছু করছিনে। তুমি ভালোই জানো, অরিন্দমের পাগলা দাপানি আমার সত্যি নেই, কারণ আমার স্থান কাল পাত্রী নিয়ে হারানোর ভয় আর ছটফটানি নেই। অফিসের কামরায়, এমন অসময়ে, তোমার সদ্য লাগিয়ে আসা ঠোঁটের রঙ চুষে নেবো, এতোটা কাণ্ডজ্ঞানহীনও আমি নই। তবু যে কেন তোমাকে কাছে টেনে নিলুম—মানে—"

শৈবাল কথাটার শেষ খুঁজে পেলো না। মুখের হাসিতে একটা অসহায় অভিব্যক্তি। ওর হাত থেকে মুক্ত হয়ে, সুপূর্ণা দু'হাত সরে দাঁড়ালো। ঘাড় ঝটকা দিয়ে কপালের চুলের গুচ্ছ সরাতে গিয়ে, নতুন করে আর এক গুচ্ছ চুল কপালে এসে পড়লো। বয়েজ কাট থেকে কয়েক ইঞ্চি বড় চুল, ঘাড়ের কাছে বন্ধনহীন অবাধ্য হয়ে যেন ফুঁসছে। ঘাড় ওর সোজা হল না। সূক্ষ্ম কাজলটানা আয়ত কালো চোখে ভ্রুকুটি দৃষ্টি। সবুজবনে লাল ফুল ছাপানো রেশমী শাড়ির আঁচল টানল বুকে। কিন্তু যতটা টানলো, ততটাই খসলো। টানা চোখ, টিকলো নাক, ঈষৎপুষ্ট ঠোঁট, প্রায় ফরসা রঙ, সব মিলিয়ে ওকে রূপসী বলা যাবে কি না সন্দেহ। তবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার সমস্তরকম রমণীয় সৌন্দর্যই ওর আছে। স্বাস্থ্যে আছে দীপ্তি। বাড়তি মেদ বলে কিছুই নেই, অথচ প্রায় দীর্ঘ শরীরের গঠন নিখুঁত। কাঁধে ঝুলছে কাজের মেয়েদের মতোই বড় ব্যাগ। বাঁ হাতে ঘড়ি। কানে দুটো ছোট মুক্তো। বয়েসটা বাড়িয়ে বলতে ভালবাসে। কারণ জানে, ওর বয়সটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ঘামাতে হলে ওকে নিয়েই ঘামাতে হয়। চব্বিশটাকে আটাশ বললেও, আটাশে টসটস্‌ই করে। কিন্তু এখন ওর ঘাড় বাঁকানো ভ্রুকুটি চোখে যেন খুবই বিরক্তি, উত্তেজনা আর অভিযোগ, "মানেটা বলো, তবু কেন ওরকম কাছে টেনে নিলে?"

"যে-কথাটার জবাব কোনোদিন দিতে পারিনি, সেই কথাটাই তুমি জিজ্ঞেস কর।" শৈবাল ওর ঘুরন্ত চেয়ারে একটু বাঁ দিকে টাল খেলো। "তোমার সঙ্গে যা সব করি, তাকে অসভ্যতা বলে কি না জানিনে। তবে এখন তুমি আমাকে অসভ্য বলোনি। যে-শব্দটা সত্যি প্রোভোকেটিং। আসলে কী জানো রিন্‌টি (সুপূর্ণার ডাক নাম) এক এক সময় কেমন হেলপলেস হয়ে যাই। অসহায়কে করুণা কর। দয়া করে বস। অরিন্দম আর কৃষ্ণার মজার কিস্‌স্যাটা শোনা যাক।"

বত্রিশ বছরের শৈবাল। অধিকাংশ বাঙালীর মতোই শ্যামলা রঙ। বড় চোখ দুটো ঢুলুঢুলু। বুদ্ধির দীপ্তিটাকে শানিয়ে রাখার দরকার করে না। নিজেকে কোনো দিক থেকেই অসাধারণ দেখানো বা জানানোটা লজ্জার বিষয় বলে মনে করে। ভালো কোম্পানির একজন উপযুক্ত একজিকিউটিভ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সহজেই। প্রাইভেট লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ ডিরেকটরদের আস্থাভাজন। সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো। অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে আছে একটা অনায়াস মেলামেশা। অথচ এর সমস্ত কিছুর মধ্যেই কোথায় যে একটা দূরত্ব আছে, তা সহজে টের পাওয়া যায় না। কিন্তু অপরকে সেটা অনুভব করতেই হয়। তবে অহংকারি কেউ বলে না ওকে। মাঝারি লম্বা। সাদা ফুল স্লিভ শার্ট আর ট্রাউজার ওর প্রিয়। অপ্রিয় হল, রাষ্ট্রীয় ভাষায় যাকে বলে কণ্ঠলেঙুটি। রোমান্টিক চেহারার বাঙালী যুবক বলতে যা বোঝায়, একরকম তাই বলা যায়। কিন্তু এখন ও সুপূর্ণার সঙ্গে যা-ই করে থাকুক, আসলে বত্রিশ বছর বয়সের তুলনায় ওকে শান্ত আর চিন্তাশীল বলে মনে হয়।

সুপূর্ণা বোধহয় ভেবেছিল, আরও কিছু বলবে। কিন্তু শৈবালের কৈফিয়ত দেখার ভঙ্গিতে কথাগুলো শুনে ওর ভ্রুকুটি চোখে হাসির ঝিলিক হানলো। এবং ঠোঁট ফুলিয়ে মুখের অদ্ভুত ভঙ্গি করলো, "অসভ্য!"

"উঠে দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে।" শৈবাল যেন দাঁড়াবারই উদ্যোগ করলো।

সুপূর্ণা বসে পড়লো মুখোমুখি চেয়ারে, "কারণ আবার অসহায় হয়ে উঠছো, না? কিন্তু ঐ যে কী সব সেলফ ক্রিটিসিজম্ শুরু করেছিলে, আমরা এ যুগের ছেলেমেয়েরা...?"

"সেটা আর বলতে দিলে কোথায়?" শৈবাল টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে দেখালো। দুচোখে জিজ্ঞাসা অর্থাৎ সুপূর্ণার অনুমতি প্রার্থনা।

সুপূর্ণা ঠোঁটের ভঙ্গি করে, আবার ভ্রুকুটি চোখে তাকালো, "যেন বারণ করলেই শুনবে।"

"অথচ শুনলে কত ভাল হয়।" শৈবাল প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে চেপে ধরলো। টেবিল থেকে গ্যাস লাইটারটা টেনে

নিল। জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাল. "ঘরে ঢুকে হাসতে হাসতে তুমি অরিন্দম আর কৃষ্ণার ঘটনা বলতে আরম্ভ করেছিলে। আমি তোমাকে বসতে বলেছিলুম। তখন তোমার সেই অ্যালিগেশনটা শোনা গেল, অরিন্দমের পাগলা দাপানিটা তুমি আমার মধ্যে দেখতে পাও না। জানতুম, কথাটা তুমি মন থেকে বলোনি। তাই হেসে আবার বলেছিলুম, বস, তারপরে বল। কিন্তু তুমি বসোনি। আমাকে মিথ্যেই একটু খোঁচা দিয়ে, তুমি অরিন্দম আর কৃষ্ণার সমালোচনা শুরু করে দিলে। বললে ওরা নির্লজ্জ, লোভী, নীতিজ্ঞানহীন, স্বার্থপর ইত্যাদি ইত্যাদি। একমাত্র তখনই আমি এদের সমর্থনে ঐ কথাটা বলেছিলুম, আমি অস্বীকার করছিনে, আমরা এযুগের ছেলেমেয়েরা…"

শৈবাল এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে হাসলো। সুপূর্ণা কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে, পাশের চেয়ারে রাখলো। ঘাড় বাঁকিয়ে গালে হাত দিয়ে তাকালো। ওর ঠোঁটের হাসিতে বক্রতা, "কথাটা শেষ কর।"

"স্বার্থপর মানে আমরা এ যুগের ছেলেমেয়েরা।" শৈবাল হাসলো, "স্বীকারোক্তিটা তুমি আমার মুখে আগেও শুনেছো। তাই কথাটা শোনবার আগেই তোমার ঠোঁট বেঁকে উঠেছে। অরিন্দম আর কৃষ্ণাকে দিয়ে কথাটা হয় তো আরো ভাল করেই প্রমাণ করা যায়। আসলে আমার বক্তব্য ছিল, অস্বীকার করবো না, আমরা স্বার্থপর। কিন্তু যাঁরা এই অভিযোগটা করেন, তাঁরা যদি একটু ভেবে দেখতেন, কেন আমরা স্বার্থপর হয়েছি, তা হলে বুঝতে পারতেন, এ ভূমি আর বৃক্ষ সবই তাঁদের হাতে তৈরি। সেজন্য জেনারেশন গ্যাপ্ কথাটায় তাঁদের খুব সুবিধে করে দেয়। কিন্তু কী দেখছি আমরা? স্বার্থপর বলে কি, বোকা কিংবা উল্লুক হয়ে গেছি? অথবা অন্ধ? কিছুই বুঝিনে? আমাদের এ যুগটার ছেলেমেয়েদের বিরুদ্ধে যাঁদের স্বার্থপরতার অভিযোগ, তাঁরা সবাই পরার্থপর? এ সময়ের সমস্ত চেহারাটার দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। পরার্থপর পিতৃদেবদের মালিন্য…নাহ্ রিনটি এসব বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করা হচ্ছে। এর চেয়ে অরিন্দম আর কৃষ্ণার গল্প অনেক উপাদেয়। ও সব সেলফ ক্রিটিসিজম টিজম, অল বোগাস্। লেট্ আওয়ার লার্ণেড প্যারেন্ট টু টেল দোজ স্টোরিজ। তারপরে অরিন্দমটা কী করলো? ঘরের ভেতর দরজার আড়ালে যেতে না যেতেই, কৃষ্ণাকে চুমো খেলো তারপরেই হুইস্কির বোতলের মুখটা খুলে ফেলল বাসুদেবের সামনেই…"

সুপূর্ণা চেয়ারের পেছনে এলিয়ে পড়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো। অবাধ্য রেশমী শাড়ির সবুজ বন লাল ফুল কেঁপে কেঁপে ঝরে পড়তে লাগলো। "বাসুদেব নয়। আমার সামনে। কিছুই মনে নেই তোমার। বাসুদেব তখন তালা লাগানো অফিস ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল।"

"তোমার সামনে?" শৈবাল যেন স্বস্তিতে এলিয়ে পড়লো ওর চেয়ারে, "সেটা তবু অনেক ভালো। তুমি হলে ওদের বন্ধু। আর সহদেব হল

তোমার বাবার অফিসের কেয়ারটেকার। তোমার চোখে ঘটনাটা এরকম। বাসুদেবের চোখে ঠেকতো আর এক রকম। অবিশ্যি তুমি অরিন্দম আর কৃষ্ণার সম্পর্কে মন্তব্য করেছো, নির্লজ্জ, লোভী, নীতিজ্ঞানহীন, স্বার্থপর।"

সুপূর্ণা হাসতে হাসতে, কপালের চুলের গোছা সরিয়ে দিল, "তা বলেছি, কিন্তু রেগে বলিনি। ওদের পাগলামি দেখে আমার হাসি পাচ্ছিল। আর সত্যি লজ্জা করছিল, যদি বাসুদেব দেখতে পেতো? আর কিছু না। একটা সাজানো খালি ঘর পেয়েই ওরা দুজনে যেরকম···হুইস্কির বোতল খোলাটা কিছু নয়। বাসুদেবই তো জল গেলাস দেবার লোক···কী ব্যাপার? তুমি যেন আবার কিছু ভাবতে আরম্ভ করেছো?"

"আমি?" শৈবাল চমকে সোজা হয়ে বসলো। হাসলো, "না না, কিছুই ভাবছিনে। গোটা ব্যাপারটা একেবারে প্রথম থেকেই আবার শোনা যাক। অরিন্দম অফিসে তোমার ঘরে টেলিফোন করলো। তারপর তোমাকে লাইনে পেয়ে বললো, সুপূর্ণা! আমি আর কৃষ্ণা···"

সুপূর্ণা ওর ঝরে পড়া রেশমী শাড়ি তুলে, বুকের জামায় গুঁজলো। ঘাড় নাড়লো, "উঁহু। অরিন্দম ইন্টারকমে জিজ্ঞেস করলে, সুপূর্ণা, ছটা বাজে। তোমার কি অফিসে এখনো কাজ আছে? আমি বললুম, একটু। কেন বলো তো? অরিন্দম···"

"থাক।" শৈবাল সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লো, "ব্যাপারটা আজকের নয়। দুদিন ধরেই চলছে। তার চেয়ে একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করা যাক। টোটাল অ্যাফেয়ারটার তো শুরু দু সপ্তাহের। মানে, তোমার বিশ্বাস, খাঁটি প্রেম···"

সুপূর্ণা ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিল। ঠোঁট বাঁকালো ঈষৎ, "তোমার মতো সকলের চার বছর লাগে না। তোমার হল তুলনাহীন প্রেম।"

"সেরকম কোনো দাবী নেই।" শৈবাল সিগারেটের শেষাংশ ছাইদানিতে গুঁজে দিল "চারিচক্ষের মিলনে প্রথম দর্শনেই উভয়ের হৃদয়ে স্বর্গীয় প্রেম সঞ্চারিত হইল—মানে প্রথম দর্শনেই প্রেম। এই রীতির কথা তুমি বলছো। বেশ, মেনে নিলুম। তবু গোড়া থেকেই শুনি। কী খাবে বল।"

সুপূর্ণা ঘাড় নাড়লো, "কিছুই না। অন্তত তোমার এই ঠাণ্ডা অফিস ঘরে না। বাইরে চল। সময়ও বেশিক্ষণ হাতে নেই। তুমি সঙ্গে আছ বলেই, বড় জোর রাত সাড়ে ন'টা অব্দি বাইরে অ্যালাউড।"

সুপূর্ণা ওর চাকরিতে বহাল হয়েছে ছ' মাস। ডিপার্টমেন্ট মার্কেটিং। কোনো কোমপানির এ বিভাগে চাকরি পাবার মতো শিক্ষাগত প্রস্তুতি ওর ছিল না। একেবারে অযোগ্যও ছিল না। কমার্সে এম-এ পাশ করে, ও যখন ভাবছিল, বেশ একটা গাল ফোলানো নামের সংস্থায়, এবং এক বিশিষ্ট অডিটরের অধীনে, একাউন্টেন্সিতে হাত পাকাবে ভবিষ্যতের কেরিয়ারের জন্য,তখনই মার্কেট রিসার্চের জন্য নামী কোমপানির বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়েছিল। অথচ দরজায় দরজায় ঘুরে ঐ সমীক্ষার কাজে ওর যাবার কথা নয়। বাবা মা আপত্তি করেছিলেন। শৈবালেরও অন্তরে সায় ছিল না। কিন্তু সুপূর্ণার যুক্তির কাছে ও হার মেনেছিল। যুক্তিটা হল, 'কোনো কাজই ছোট নয়।' অবিশ্যি ফলটা শেষ পর্যন্ত খারাপ হয়নি। ইন্টারভিউ পেয়েছিল। এক ডজন মেয়ের সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছিল। কৃষ্ণা তখন সেই দলে ছিল না। অরিন্দম সেই মার্কেটিং বিভাগের একজন ছোটখাটো অফিসার। মার্কেট রিসার্চের মেয়েদের সাহায্য করাটা ছিল ওর কাজ। প্রত্যেক মেয়ের প্রতিদিনের রিসার্চের রিপোর্ট দেখতেন মার্কেটিং ম্যানেজার। অরিন্দমের সঙ্গে সুপূর্ণার তখন থেকেই একরকমের বন্ধুত্ব হয়েছিল। কারণ, অরিন্দমের বয়স কম। অফিসারসুলভ আচরণ করতো না। অস্থায়ী মার্কেট রিসার্চের মেয়েদের সাহায্যের ব্যাপারে, ও প্রায় সবাইকে ওর সহকর্মীর মর্যাদা দিতো। মেলামেশা করতো বন্ধুর মতো।

এক ডজন মেয়ের মধ্যে, শিকে ছিঁড়েছিল সুপূর্ণার ভাগ্যে। মার্কেটিং ম্যানেজার ওর দৈনিক রিপোর্ট দেখে উৎসাহী হয়েছিলেন। নতুন করে ওর দরখাস্তটা দেখেছিলেন উলটে পালটে। মার্কেটিং-এর সঙ্গে, দাম দস্তুরের হিসাব নিকাশের সম্পর্কটা বিশেষ কেউ যাচিয়ে দেখে না। সুপূর্ণা দেখতো। ওর রিপোর্টেও সেটা থাকতো। এরকম একটি কাজের মানুষের দরকারও ছিল তখন। মার্কেটিং ম্যানেজার সুপূর্ণাকে ডেকে জানতে চেয়েছিলেন, ঐরকম কোনো পদ ও গ্রহণ করতে ইচ্ছুক কিনা। সুপূর্ণা কারোর সঙ্গে পরামর্শ না করেই, মার্কেটিং ম্যানেজারকে ওর সম্মতি দিয়ে দিয়েছিল। বস্তুতপক্ষে সুপূর্ণার সেটা একটা দৈবযোগে সৌভাগ্যের ঘটনা বলতে হয়।

অস্থায়ী মার্কেট রিসার্চের মেয়েদের কাজের মেয়াদ ছিল দু সপ্তাহের। কোমপানির গাড়িতে বিভিন্ন জায়গায় নেমে যাওয়া, এবং আরো পথ খরচা বাদ দিয়ে ওদের দৈনিক বেতন ছিল পঁচাত্তর টাকা। আধুনিক কোম্পানিগুলো বাজার সমীক্ষার জন্য ডজন ডজন ছেলে মেয়েদের স্থায়ী চাকরি দেয় না। প্রয়োজন হলেই সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেয়। এসব ক্ষেত্রে মেয়েদেরই ডাক পড়ে বেশি।

সুপূর্ণা ওর চাকরিতে বহাল হবার পরে, দুবার বাজার সমীক্ষার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। অরিন্দম যদিও ছোটখাটো একজন অফিসার, কিন্তু সুপূর্ণার সহকর্মী। অবিশ্যি বাজার সমীক্ষার মেয়েদের নিয়ে সুপূর্ণার কিছু করার ছিল না। অরিন্দমকেই ঐ বিষয়টি দেখতো হতো। দ্বিতীয় বারের সমীক্ষক মেয়েদের দলে, কৃষ্ণার আবির্ভাব।

অরিন্দম ঐ সব মেয়েদের সাহায্য করে, ভালো ভাবেই কাজ গুছিয়ে নিতে পারতো। ও একজন রসিক যুবক, সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে, ওর রসিক প্রাণে প্রেমোদয় ঘটেনি। কৃষ্ণার চোখে চোখ পড়তেই, সেইটি ঘটে গেল। দু সপ্তাহের মেয়াদে, অন্য মেয়েদের থেকে আলাদা করে, ও কৃষ্ণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো। দেখা গেল, কৃষ্ণারও একই দশা। দুহুঁ দোঁহা করে লীলা, সাক্ষী অন্তর্যামী। কিন্তু এ সব বিষয় বেশিক্ষণ চেপে রাখা দায়। অরিন্দমের পক্ষে, অফিসে কথাটা প্রাণ খুলে বলবার মতো একজনই ছিল। সুপূর্ণা। অতএব, অফিস ছুটির পরে, সুপূর্ণাকে বন্ধু ও তার প্রেমিকাকে দু তিনটি সন্ধ্যা কিছুক্ষণ সাহচর্য দিতে হল। আর সব কথা শৈবালকে না শোনালে চলতো না।

কৃষ্ণাকে কি সুপূর্ণার খুব ভালো লেগেছিল? দেখতে মেয়েটি খারাপ নয়। এক ধরনের আদুরে ফুলটুসি গোছের মেয়ে। চেহারাটি ছোটখাটো হলেও, স্বাস্থ্য ভালো। ওর ইংরেজি বলার ভঙ্গিটি আকর্ষণীয়। কিন্তু বড্ড ভুল বলে। ওর বাবা একজন অবসরপ্রাপ্ত চটকলের লেবার অফিসার। জীবনের শেষ সঞ্চয় নাকি নাকতলায় একটা বাড়ি আর দিদির বিয়ে দিতেই শেষ হয়ে যায়। তারপরেই পর পর দুবার সেরিব্রালে আক্রান্ত হয়ে, একেবারে জ্যান্তে মরা হয়ে আছেন। অথচ ভাই বোনের সংখ্যা চার। আর তাদের সকলের জ্যেষ্ঠ আপাতত কৃষ্ণা। মা আছেন সংসারে। ফলে কৃষ্ণার দায়িত্ব বেশি। টেনশনও। অথচ অরিন্দমকে প্রথম দর্শনেই, পঞ্চশরে কে যে কাকে বিদ্ধ করলো, বোঝা গেল না। কৃষ্ণার এখন অরিন্দমই গতি, মতি। বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। প্রেমে নির্ভয়। অরিন্দমের কাজ মাথায় উঠলো। উভয়েরই নাকি প্রথম প্রেম। বড় উদ্দাম সেই প্রেম।

সুপূর্ণা এই উদ্দামতাকে পছন্দ করেছে। তার মধ্যে অবিশ্যি কথা আছে। কৃষ্ণাকে ওর অরিন্দমের যোগ্য বলে মনে হয়নি। কিন্তু সেটা ওর দেখবার নয়। অরিন্দম আর কৃষ্ণা উদ্দাম প্রেমে মেতে আছে। এই দেখেই সুপূর্ণার ভালো লাগছে। যে-কারণে শৈবালকে না শুনিয়ে পারেনি, "তোমার আপন ঘরের চৌকাট ডিঙোতে সময় লেগেছিল দু' বছর। যখন তোমার জানার সময় হল, তুমি জয় করেছো, তখন মাঝে মধ্যে তোমার মধ্যে ঝড় উঠতে দেখা গেল। ডালপালা ভেঙে প্রচুর বর্ষণে ভাসিয়েও দিলে। কিন্তু তার ভেতর থেকেই বোঝা গেল, শৈবাল দত্ত কেবল প্রেমিক নয়। প্রেমিক-সাধক। প্রেম তার কাছে সাধনার বস্তু। অতএব, সুপূর্ণা গুহ হল তোমার আরাধ্যা দেবী। অথবা কী বলবো? মাই ফেয়ার লেডি?"

"বাজে কথা।" শৈবাল আপত্তি করেছে, "ওটা আমার সঠিক মূল্যায়ন হল না। বলতে পারো, আমার মানুষিক প্রবৃত্তির মধ্যে, প্রকৃতির একটা বড় ভূমিকা আছে। তা বলে, এত ভাবার কোনো কারণ নেই, আমি প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক। যেমন নই প্রবৃত্তির হাতের ক্রীড়নক। এক অর্থে তুমি যেমন প্রকৃতি, তেমনি বিশ্ব নিখিলের প্রকৃতিও আমার মস্তিষ্কে একটা জায়গা করে রেখেছে। রিনটি, তাতে যদি আমি সাতদিনে চৌকাট ডিঙোতে না পারি, চৌদ্দ দিনের মধ্যে না পারি উদ্দাম হয়ে উঠতে, তা হলে জানবে, আমি নিরুপায় বলেই তা সম্ভব নয়।'

সুপূর্ণা চোখ ঘুরিয়ে, গালে হাত দিয়ে বলেছে, "কী নতুন কথাই না শোনালে! তোমার এ কথাগুলো যে শুনবে, সে-ই বলবে, এ সব মাটির

সংসারের প্রেমের কথা নয়। উচ্চ মার্গের ঝাঁপিতে তুলে রাখার প্রেম। দরকারের সময়, ঝাঁপি খুলে, আদরে সোহাগে চেখে খেয়ে আবার তুলে রাখতে হয়। আমি অবিশ্যি তাতেই অভ্যস্ত হয়েছি। কিন্তু এখন আমি সময়োপযোগী খাঁটি মাটির সংসারের প্রেম দেখছি। দুহুঁ লাগি দোঁহা মত্ত, এক ঠাঁই বিনা, রহিতে না পারে। একটু অবিশ্যি আদেখলেপনা লাগছে। কিন্তু দোষই বা দিই কেমন করে।"

"দোষ দেবার কিছু নেই রিনটি।" শৈবাল বলেছে, "সংসারে বিবিধের মাঝেই সৌন্দর্য আছে। সত্যও আছে। এ সংসারটা তো অরিন্দম আর কৃষ্ণা ছাড়া নয়।"

অরিন্দম আর কৃষ্ণা যেন লক্ষহীন নক্ষত্রের মতো ছুটে বেড়াচ্ছিল। ওদের এমন একটা জায়গা ছিল না, প্রেম চরিতার্থ করার মতো যেখানে নিভৃতে আশ্রয় নিতে পারে। সুপূর্ণার প্রাণ উঠলো কেঁদে। শৈবালকে ও কিছু জিজ্ঞেস করেনি। অফিসের কাছেই ওর বাবার অফিস। অফিস সংলগ্ন বিশ্রাম নেবার মতো ঘর বিছানা, খাবার ব্যবস্থা, একটা ফ্রিজ, ছোটখাটো কিচেন, সবই ছিল। বাসুদেব বেরা তার পুরনো বিশ্বস্ত কেয়ার টেকার। রাত্রে সেখানে অফিস ঘরের এক পাশে তার ছোট ঘর। ষাট বছরের বাসুদেব, সুপূর্ণাকে চেনে ছেলেবেলা থেকেই। সুপূর্ণা প্রথমে একটু লজ্জা পেয়েছিল। কিন্তু অরিন্দম আর কৃষ্ণার জন্য কিছু একটা করার দায়িত্ববোধেই লজ্জা ত্যাগ করে, ওদের নিয়ে তুললো বাবার অফিসে। বললো, "বাসুদেবদা, এরা আমার বন্ধু। ঘন্টা দুয়েক থেকে চলে যাবে। দরকার হলে, তুমি একটু দেখো।" অবিশ্যি আড়ালে আগেই বলে রেখেছিল, "বাবাকে যেন বলো না।"

বাসুদেব বলেছে, "তোমার হুকুম মানছি। কিন্তু দেখো রিনটিদিদি, শেষে তোমার কাছ থেকেই যেন সাহেবের কানে কথাটা না যায়। তা হলে চল্লিশ বছরের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে।"

অরিন্দম কৃষ্ণাকে ঐরকম একটি নিভৃত ঘরের মধ্যে পেয়ে, প্রথমেই যে-ভাবে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়েছিল, সুপূর্ণার মোটেই ভালো লাগেনি। শৈবালকে ও মুখ ফুটে আরো যা বলতে পারেনি, তা হল, কেবল চুমো নয়। সেই মুহূর্তেই অরিন্দম আরো অধিক কিছু করতে উদ্যত হয়েছিল। খেয়ালই ছিল না সুপূর্ণা তখনও রয়েছে। বাসুদেব দূরে অপেক্ষা করছিল। কৃষ্ণার পর্যন্ত মনে হয়নি, সুপূর্ণাকে বিদায় জানিয়ে, দরজাটা বন্ধ করা দরকার। এসব যে ওদের প্রেমের উদ্দামতারই অঙ্গ, সুপূর্ণা তখন ততোটা মেনে নিতে পারেনি বলেই, শৈবালের কাছে অভিযোগ করেছে। ওরা লোভী নীতিজ্ঞানহীন নির্লজ্জ স্বার্থপর। সুপূর্ণাকে বাধ্য হয়েই ওদের সামনে যেতে হয়েছিল। অরিন্দম অতএব, সেই ফাঁকে হুইস্কির বোতলের ছিপি খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আর হেসে ক্ষমা চেয়েছিল, "সরি সুপূর্ণা।"

"সরিটরির কিছু নেই।" সুপূর্ণা হেসেছিল, "আমি যাচ্ছি। তোমরা দরজা বন্ধ করে দাও। বাসুদেবদা ফ্রিজ থেকে জলের গেলাস আর বোতল আগে দিয়ে যাক। আর খাবার টাবার কিছু দরকার হলে, বাসুদেবদাকে বলো, এনে দেবে। গুড নাইট।"

অরিন্দম গভীর কৃতজ্ঞতায়, সুপূর্ণার সঙ্গে করমর্দন করেছে, "জীবনে এ উপকারের কথা ভুলবো না।"

গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত, সতরো দিনের এই হল অরিন্দম-কৃষ্ণার প্রেম কাহিনী। রেড রোডের ধারে, গাছের ছায়ার অন্ধকারে। গাড়ির মধ্যে বসে শৈবাল সুপূর্ণার কথা সব শুনলো। হাওয়া ছিল না। আবহাওয়া গুমোট। গাড়ির ভেতরে গরম হচ্ছিল। ঘামছিল দুজনেই, ঘন সান্নিধ্যে বসে। শৈবাল কোনো অবকাশ না দিয়েই, ঝটিতি সুপূর্ণার ঠোঁটে নিজের ঠোঁট ছোঁয়ালো। একটা সিগারেট ধরালো, "অরিন্দম আর কৃষ্ণাকে আমি বেচারি বলে ছোট করবো না। কিন্তু তোমার মহত্ত্বের তুলনা নেই। এই একটা বিষয়ে যদি, আজ সমীক্ষা করা যেতো, কতো তরুণ তরুণী, একটু নিভৃত আশ্রয়ের জন্য কলকাতা শহরের পার্কে বাগানে গঙ্গার আর ঝিলের ধারে পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে। অথচ এক মিনিটের সুযোগও পাচ্ছে না, তা হলে দেখা যেতো, চিত্রটা কী নিষ্ঠুর আর নিদারুণ। আমি জানিনে, অরিন্দমের হোটেল ঘর নেবার যোগ্যতা আছে কি না। কিন্তু ঐ সব হাজার হাজার তরুণ-তরুণীর হোটেল ঘর ভাড়া করার পয়সা নেই। তারা বেকার। তুমি তাদের জন্য বন্ধুকৃত্য করতে পারো না। সম্ভব নয়। কিন্তু তারা তোমার কীর্তির কথা শুনলে জয়ধ্বনি দেবে।"

"ঠাট্টা ?" সুপূর্ণা ঘাড় বাঁকিয়ে ভ্রূকুটি চোখে তাকালো। দৃষ্টিতে সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা।

শৈবাল মাথা নেড়ে হাসলো। টেনে ধরলো সুপূর্ণার একটা হাত, "বিশ্বাস কর, সব বিষয়ে ঠাট্টা চলে না। আমি এ সময়েরই বত্রিশ বছরের এক যুবক। অরিন্দম কৃতজ্ঞতায় তোমার করমর্দন করেছে। আমি হলে তোমার মতো বন্ধুর পায়ে হাত দিতুম। এ যুগের ছেলেমেয়েদের স্বার্থপরতার প্রসঙ্গে, আমার স্বীকারোক্তিটার মূলে ছিল এই কথাটাই। এ যুগ আমাদের কোথায়, কোন হতচ্ছাড়া শূন্যতায় ছুঁড়ে ফেলেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার সুযোগ সুবিধে নিশ্চয়ই অনেক বেশি। তার মানে, আমি তো যুগ-ছাড়া নই।"

সুপূর্ণা নিজেই শৈবালের দিকে মুখ তুলে ধরলো। তখনই খুব কাছ থেকে অন্য একটা গাড়ির হেডলাইডের আলো যেন ওদের স্নান করিয়ে দিল। সুপূর্ণা তাড়াতাড়ি শৈবালের বুকে মাথাটা নামিয়ে, গুঁজে দিল।

॥ মধ্য ॥

বেলা এগারোটা। শৈবাল 'অফিসে এসেছে সাড়ে ন'টায়। সাড়ে দশটায় ডাক পড়েছিল জেনারেল ম্যানেজারের ঘরে। জেনারেল ম্যানেজারের ঘর থেকে নিজের ঘরে ঢুকতেই, বাইরের টেলিফোনটা বেজে উঠলো। চেয়ারে না বসে ও রিসিভারটা তুলে নিল, "হ্যালো !"

'আমি রিনটি বলছি।" ওপার থেকে সুপূর্ণার উত্তেজিত স্বর ভেসে এলো। "ওরা গতকাল রাত্রে কী করেছো জানো ?"

শৈবাল বলতে যাচ্ছিল, "তা আর জানি নে ?" কিন্তু তাড়াতাড়ি নিজেই মাথা নাড়লো, "কী করেছে ? কোনোরকম··· ?"

"কোনোরকম টোনোরকম কিছু নয়।" সুপূর্ণার স্বরে ঝাঁজ, "ওরা গতকাল সারা রাত্রি ওখানে ছিল। অরিন্দম আজ সকালে কৃষ্ণাকে নাকতলায় বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে নিজের বাড়ি ফিরেছে। অবিশ্যি, অরিন্দমের মুখ থেকে কিচ্ছু শোনবার আগেই, অফিসে এসেই বাসুদেবদার টেলিফোন পেয়েছি। বাসুদেবদাই আমাকে বললে, ওরা সারারাত্রি বাবার অফিসের ঘরে ছিল। আজ সকাল সাতটায় সেখান থেকে দুজনে বেরিয়েছে। আমি ভাবতে পারিনে, একটা ভদ্রলোকের মেয়ে, আনম্যারেড, কী করে বাড়িতে না জানিয়ে সারারাত্রি বাইরে কাটালো।"

শৈবাল যেন সুপূর্ণাকে শান্ত করার চেষ্টা করলো, "কৃষ্ণা হয় তো বাড়িতে টেলিফোন করে জানিয়েছে যে···"

"কিসের টেলিফোন ? কোথায় টেলিফোন ?" টেলিফোনের ওপার থেকে সুপূর্ণার স্বর রোষে ফেটে পড়লো, "কৃষ্ণাদের বাড়িতে টেলিফোন নেই। সে-সব কথা একটু আগেই আমি অরিন্দমের মুখ থেকে শুনলাম। ও একটু বেলায় অফিসে এসেছে। ও আমার সঙ্গে দেখা করে, নিজেই সব কথা বললে। অবিশ্যি ওর মুখ দেখতে আমার ঘেন্না করছিল। কিন্তু ও অকপটে সব সত্যি কথা বলেছে—মানে ও যে গতকাল রাত্রে খুবই হেল্পলেস হয়ে পড়েছিল, সেটা আমাকে বুঝিয়েছে। আর কৃষ্ণার কথাও বললো, ও নিজেই কৃষ্ণাকে বাড়ি যেতে দেয় নি। সেইজন্য ও নিজে গিয়ে কৃষ্ণাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছে। অথচ অরিন্দম এর আগে কোনোদিন কৃষ্ণাদের বাড়ি যায়নি। মা বাবা ভাইবোনরা কেউ ওকে চেনে না। এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি নে। অরিন্দম যতোই ওকে গার্ড করার চেষ্টা করুক।"

শৈবাল সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো, "রিনটি, অরিন্দম কৃষ্ণাকে তোমার কাছে গার্ড করবে কেন ? ও তো তোমার কাছে সব কথা স্বীকার করছেই। ও নিজেই কৃষ্ণাকে গতকাল রাত্রে বাড়ি ফিরতে দেয়নি। কৃষ্ণা বেচারি—"

"কৃষ্ণা মোটেই বেচারি নয়।" সুপূর্ণার স্বরে অবিশ্বাস আর ঝাঁজ, দুই-ই ভেসে এলো, "আমি অরিন্দমকে বলেছি, তুমি আটকে রাখলে বলেই কৃষ্ণা কী করে বাড়িতে না জানিয়ে সারারাত্রি বাইরে কাটিয়ে গেল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে। তুমি একটা অচেনা ছেলে। তুমি পৌঁছে দিতে গেলে। কৃষ্ণার মা তোমাকে কিছু বললেন না ? অরিন্দম বললে, কৃষ্ণার মা নাকি ওর কথা আগেই কৃষ্ণার মুখ থেকে শুনেছিল। সারারাত্রি দুশ্চিন্তায় ঘুমোতে পারেনি। অরিন্দম নিজে গিয়ে পৌঁছে দিতে, কৃষ্ণার মা নাকি খুব খুশি আর নিশ্চিন্ত হয়েছে। জানি নে, এ কেমন মা, আর কী করেই বা খুশি আর নিশ্চিন্ত হতে পারে। তোমার সঙ্গে তো আমার এতদিনের পরিচয়। বাড়িতে

তোমার আমার সম্পর্কের কথা কারোর জানতে কিছু বাকি নেই। কিন্তু আমি তো এখনো ভাবতেই পারিনে, বাড়িতে কোনো খবর না দিয়ে, সারারাত্রি তোমার সঙ্গে বাইরে কোথাও থেকে যাবো। পারি কী?"

শৈবাল হাসলো, "তোমার সঙ্গে কৃষ্ণার তুলনা দিচ্ছো কেন? সব মেয়ে যদি একরকম হতো, তা হলে তো সংসারটার চেহারাই অন্যরকম হয়ে যেতো। তা ছাড়া..."

"তা ছাড়া?" সুপূর্ণার স্বর তৎক্ষণাৎ তারের ভেতর দিয়ে ভেসে এসে শৈবালের মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

শৈবালের মুখে ঈষৎ উদ্বেগ মিশ্রিত হাসি ফুটলো, "রাগ করো না রিন্‌টি। উদ্দামতার একটা ব্যাপার আছে তো। দুজনের অবস্থার কথা তোমার মুখ থেকে যা শুনেছি, তাতে এরকম ঘটাটা কি খুব অসম্ভব? তা তুমি বন্ধুকে সাহায্য করতে গিয়েও, যতোই নির্লজ্জ, নীতিজ্ঞানহীন স্বার্থপর বল, তুমি শেলটার দিয়েছিলে বলে গতকাল রাত্রে ওরা জীবনে প্রথম—ভেরি ন্যাচারেল। বিশেষ স্বয়ং কৃষ্ণাই যখন থাকতে রাজি হয়ে গেছলো—"

"থাক।" সুপূর্ণা এক কোপে শৈবালের কথা থামিয়ে দিল, "তোমার মুখে ও কথা মানায় না। আমি রাজি হলেই কি তুমি ওরকম ভাবে রাত্রি কাটাতে পারতে?"

শৈবাল মাথা নাড়লো, "না, তা পারতুম না। প্রথমত তোমার বাড়িতে কোনো খবর থাকবে না, আমার পক্ষে সেটা করা সম্ভবই হতো না। তুমিও রাজি হতে পারতে না।"

"আমার বিষয়ে এত নিশ্চিত হচ্ছো কেন?" সুপূর্ণার স্বরে এতক্ষণে কিঞ্চিৎ হাসির তারল্য ভেসে এলো, "রাজি যদি হয়েই যেতাম, তা হলে?"

শৈবাল জবাব দিতে গিয়ে, ভ্রূকুটি চোখে রিসিভারের দিকে তাকালো। তারপরে হাসলো, "তা হলেও, রিন্‌টি, তুমি ঠিকই বুঝেছো, তোমার বাবা মাকে না জানানোর দায়িত্ব অস্বীকার করা আমার পক্ষে অসম্ভব হতো। তা ছাড়া আমার বাবা মা-ই বা কী দোষ করেছেন বলো? যতো স্বার্থপরই হই, তাঁরা জানেন, আমি অকারণে বেপরোয়া আর উচ্ছৃঙ্খল হতে পারিনে।"

"অকারণে?" সুপূর্ণার স্বরে বিস্ময়, ওর কৌতুকের হাসিকে চাপা দেবার চেষ্টা করছে।

শৈবাল হাসলো, "একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছে। যাই হোক, তা অকারণেই বই কি! আমার যদি তোমাকে নিয়ে বাইরে রাত্রি কাটাতেই হয়, কেনই বা আমি অকারণে, তোমার বা আমার বাড়ির লোকদের সারারাত্রি দুশ্চিন্তায় রেখে দেবো? অন্তত এটা কেন জানাবো না, আমি রাত্রে বাড়ি ফিরবো না।"

"আসলে অরিন্দমের যে গাটস্ আছে, তোমার তা নেই।" সুপূর্ণার স্বরে হাসির ঝঙ্কার এখন স্পষ্ট।

শৈবাল এবার রিসিভারটা নিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসলো, "অস্বীকার করবো না। সীতা হরণের বেলায় রাবণের যে গাটস্ ছিল, রামের তা ছিল না। এটা তুলনা নয়। আমি আর অরিন্দম এক নই, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু রিন্‌টি গুহ আর কৃষ্ণা এক, এ সিদ্ধান্তে আমি এখনই আসতে পারছি নে।"

"ছাড়ো ওসব কথা।" সুপূর্ণার স্বরে ব্যস্ততার সুর ভেসে এলো, "ছুটির পরে তুমি আমাকে তুলছো, না আমি তোমার কাছে যাচ্ছি?"

শৈবাল হেসে উঠলো, "এত আর্লি তো কোনোদিন এটা ঠিক করা যায় না। পাঁচটায় টেলিফোনে সেটা ঠিক হয়। ভুলে গেলে নাকি?"

"সরি।" সুপূর্ণার খুশির স্বর ভেসে এলো, "ভুলেই যাচ্ছি। কাজকর্ম ছাই কিছুই ভালো লাগছে না। রাখছি।"

লাইন কেটে গেল। শৈবাল রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো। মাথা নেড়ে হাসলো। রিন্‌টিটার সত্যি মাথায় ছিট আছে। কখন রাগছে, কখন হাসছে, কোনো কিছুর ঠিক নেই। ওর টেবিলে এক গুচ্ছ কাগজ। প্রত্যেকটাতেই লাল রঙের আর্জেন্ট ছাপ মারা। সবগুলোই এখুনি দেখতে হবে, এবং যথারীতি ব্যবস্থা করতে হবে। ও আগে একটা সিগারেট ধরালো। আর সেই ফাঁকেই মনে পড়লো, তখন পর্যন্ত ও অরিন্দমকে চোখে দেখেনি। অতএব কৃষ্ণাকে দেখার প্রশ্নই আসে না। তথাপি শৈবাল যে ওদের একেবারে বুঝতে পারে না, তা নয়। তার মেকি মূল্যবোধের সম্পর্কে ও সচেতন। কিন্তু নিজেকে যতোটা চিনতে শিখেছে, সেই নিরিখে, সন্দেহ নেই, অরিন্দমের মতো উদ্দাম ও বেপরোয়া ও কোনো কালেই হতে পারবে না। একটা কথা ভাবতেও লজ্জা করছে। তবু নিজের কাছে অস্বীকার করতে পারছে না, কৃষ্ণা মেয়েটিকে ওর কেমন করুণ আর অসহায় মনে হচ্ছে।

বিকেল পাঁচটার আগেই বাইরের টেলিফোন বেজে উঠলো। দুপুরে আধঘণ্টা বিশ্রাম ছাড়া, শৈবাল টেবিল থেকে মুখ তুলতে পারেনি। অনেকের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে। এখনো ওর কাজ সারতে বেশ বাকি। রিসিভার তুলতেই, ভেসে এলো, "রিন্‌টি।"

"হুঁ! তোমার কাজ শেষ?"

সুপূর্ণার একটু উচ্ছ্বাস ভরা ব্যস্ত স্বর ভেসে এলো, "কাজের আবার কোনোদিন শেষ আছে নাকি? অরিন্দম ধরেছে, তুমি আমি, দুজনেই আজ ওদের—মানে কৃষ্ণা অফিসের বাইরে এক জায়গায় অপেক্ষা করছে—আমরা চারজনে কোথাও বেরিয়ে পড়বো। প্লিজ, কাজের দোহাই দিও না। তুমি চলে এসো আমার অফিসের সামনে।"

"কিন্তু রিন্‌টি, যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়।" শৈবাল অস্বস্তিতে হাসলো, "সত্যি কাজের দোহাই দিতেই হচ্ছে। ভাবছিলুম, তুমি টেলিফোন করলে, তোমাকে আমার অফিসে আসতে বলবো। সাড়ে ছ'টার পরে বেরোবো।"

সুপূর্ণার স্বরে আবদার ও জেদ্ একসঙ্গে ভেসে এলো, "না, প্লিজ, তুমি আর কাজ করবে না। আমার বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে তুমি আমি একটু আড্ডা দিতে পারি নে? তুমি গাড়িটা নিয়ে চলে এসো। আমরা এখুনি ডায়মণ্ডহারবারের দিকে চলে যাবো। এখন বেরোলে রাত্রি দশটার মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরতে পারবো। তুমি বললেই, আমি বাড়িতে টেলিফোন করবো।"

"রিন্‌টি, প্রোগ্রামটা আগামীকালের জন্য তুলে রাখলে হয় না?" শৈবালের স্বরে অস্বস্তি ও অসহায়তা। আজ এখুনি আমার বেরোনো সম্ভব নয়।"

সুপূর্ণার ঝাঁজ মেশানো দৃঢ় স্বর ভেসে এলো, "না, আজকের প্রোগ্রাম আগামীকালের জন্য তুলে রাখা যাবে না। সব সময় তোমারই একমাত্র কাজ থাকবে, তোমার কথাই রাখতে হবে, তা হয় না। আমি অরিন্দমকে বলেছিলুম, তুমি নিশ্চয় গাড়ি নিয়ে আসতে পারবে। তা আজ পারছো না, আমরা একটা ট্যাকসি নিয়েই যাচ্ছি।"

"তার মানে, আমাকে তোমাদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করছো।" শৈবালের মুখে বিমর্ষতার ছায়া। হাসি ও স্বরে বিষণ্ণতা।

সুপূর্ণার ভেসে আসা স্বরে কোনো পরিবর্তন ঘটলো না, "আমরা তোমাকে বঞ্চিত করছিনে। তুমিই আমাদের সঙ্গে আসতে চাইছো না। কাজ একলা তুমিই কর, আর কেউ করে না। কিন্তু মনে

রেখো, কাজ ছাড়াও জীবন আছে। বন্ধুদের কাছে আমার মর্যাদার কোনো মূল্যই তুমি দিতে চাও না। যাকগে, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তুমি যখন আসতে পারছো না, আমরা একটা ট্যাকসি নিয়েই বেরিয়ে পড়ছি।"

"প্লিজ, রিন্‌টি, একটু বিবেচনা..."

সুপূর্ণার ঝাঁজালো স্বর শৈবালের রিসিভারে ঝাঁপিয়ে পড়লো, "বিবেচনার কিছু নেই। ইট ইজ ডিসিশন। আমার থেকে কাজটাই তোমার কাছে চিরদিন বড় হয়ে থাকবে, তা মেনে নিতে পারি নে, মনে রেখো তুমি বন্ধুদের কাছে আমাকে অপমান করলে। ছাড়ছি।"

মুহূর্তেই টেলিফোনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সুপূর্ণার স্বর শেষদিকে কান্নায় রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। শৈবাল তবুও নিরুপায়। ও রিসিভারটা আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখলো। সুপূর্ণার কান্নারুদ্ধ স্বর ওর কানে ভাসছে। কিন্তু সুপূর্ণার ক্রুদ্ধ কঠিন কথাগুলোও ও ভুলতে পারছে না। ও বেলার কথার সঙ্গে এ বেলার সহসা ডায়মণ্ডহারবার যাবার সিদ্ধান্তকে মেলানো কঠিন। এ বেলা, সুপূর্ণার কথা শুনে মনে হয়েছিল, অরিন্দম আর কৃষ্ণার ব্যাপারে ও অত্যন্ত

বীতশ্রদ্ধ। বিশেষ করে কৃষ্ণার সম্পর্কে ওর ধারণা যে মোটেই ভালো নয়, তা বোঝা গিয়েছিল। অরিন্দমের অকপট স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও। বাবার অফিসের পুরনো বয়স্ক কেয়ারটেকারের কাছে নিজের অসম্মানটা ও ভুলতে পারেনি। শৈবালের অন্তত সেইরকম ধারণা হয়েছিল। তারপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, এমন কী ঘটে গেল, বন্ধুপ্রীতিতে হঠাৎ সকলে মিলে বেড়াতে বেরিয়ে পড়বার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল? খুবই অসঙ্গত আর যুক্তিহীন লাগছে। সুপূর্ণার কাছ থেকে এমন অসঙ্গত ব্যবহার ও প্রস্তাব, প্রত্যাশা করা যায় না। বিশেষ ওর এমন আকস্মিক রাগ জেদ অত্যন্ত বিস্ময়কর। কেবল কি বিস্ময়কর!

শৈবাল একটা উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চাপলো। টেবিলে হাত বাড়িয়ে, প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে চেপে ধরলো। লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালো। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে, মাথা নাড়লো। ঠোঁটে বিষণ্ণ হাসি। মনে মনে বললো, "রিনটি, তোমার চেয়ে কাজকে বড় করে দেখিনি। কাজ তার সমূহ দাবী মিটিয়ে নিয়ে সরে পড়ে। ওটার সঙ্গে জীবনযাত্রার একদিকের যোগাযোগ। আমি যদি সাহিত্যিক শিল্পী হতুম, তা হলে কাজের বিষয়টা হয়তো আলাদা করে ভাবতে হতো। তবুও স্বীকার করতে হবে, এখানে আমার সত্তা ও বুদ্ধিকে ছেড়ে দিতে পারি নে। কিন্তু তুমি তো সমূহ দাবী মিটিয়ে নিয়ে চলে যাবার নও। তুমি আমার অফিসের টেবিলের কাজ নও। তুমি তার চেয়ে অনেক বড়। তোমার দাবী যেমন কাজের মতো নয়, তেমনি আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক, পরস্পরের তথাকথিত নরনারীর দাবীরও অধিক। অন্তত আমি তাই মনে করি। আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু সে ভালবাসায় এমন কোনো শর্ত থাকা উচিত নয়, যা জীবনের নিয়ন্ত্রণকে ভেঙেচুরে ফেলবে। চাকুরে শৈবালের মুখে কথাটা স্বার্থপরের মতো শোনাতে পারে। আর যাই হোক, তোমার কাছে আমার স্বার্থপরতার কিছু নেই। চার বছরে যদি আজ তোমার সে-কথা মনে হয়, তা হলে আমি নাচার। তবু উচ্ছ্বাসের বশে কোনো রকমের অসঙ্গতিকেই আমি মেনে নিতে পারি নে⋯"

লাল অক্ষরে 'আর্জেন্ট' লেখা সমস্ত ফাইলগুলো সামনে টেনে নিল। কিন্তু কেমন একটা অচেনা কষ্ট কোথায় বিঁধে আছে। ও ফাইল খুললো। ইন্টারকম টেলিফোনটা বেজে উঠলো। রিসিভার তুলে নিল তৎক্ষণাৎ, 'ইয়েস? ⋯না না। আমি তো জানি, সবগুলোই খুব জরুরি। ⋯না, তাও করবো না। আগামীকালের জন্য কিছুই ফেলে রাখবো না। আমি আজই সবগুলো মিটিয়ে ফেলবো।⋯ আজ্ঞে না। মিস্ চৌধুরিকে আমার দরকার নেই। ওঁকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। আমি নিজেই টাইপ করে নেবো। 'থ্যাঙ্ক য়ু স্যার⋯নো মেনশন প্লিজ।'

ডিরেকটর-কাম-জি এম-এর ফোন। ভদ্রলোক জেনে নিলেন, শৈবাল জরুরি কাজগুলোকে কতোটা গুরুত্ব দিচ্ছে। কিন্তু তিনি নিজেই চাইছিলেন, কাজগুলো আজ সব শেষ না করে, আগামীকাল করলেও হবে। শৈবাল সেরকমই ভেবে রেখেছিল। আরো টানা দেড় ঘণ্টা কাজ করে, বেশ কিছুটা এগিয়ে রাখবে। তারপরে সুপূর্ণা এলেই উঠে পড়বে। আপাতত আর তার কোনো সম্ভাবনা নেই। ঘটনার মোড় ঘুরে গিয়েছে অন্য দিকে। অতএব, সুপূর্ণাহীন সন্ধ্যা কাজে ডুবে থাকাই ভালো।

পরের দিন লাঞ্চ আওয়ারের পর, শৈবালের খেয়াল হলো, সুপূর্ণা টেলিফোন করেনি। গতকালের জরুরি কাজগুলো এই মাত্র সাঙ্গ হল। শৈবাল স্বস্তি বোধ করছে। কেবল স্বস্তি নয়। আরও অধিক কিছু। সুপূর্ণাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। কাছে পাবার ব্যাকুলতা অনুভব করছে। অন্তত টেলিফোনে গলার স্বরটা এখন শুনতে পেলে ভালো লাগতো। আর আজ ও এখুনি, এই মুহূর্তেই অফিস থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। সুপূর্ণার সাধ মিটিয়ে, ওর বন্ধুদের নিয়ে যে-দিকে খুশি বেড়াতে চলে যেতে পারে। একটা বিশেষ কাজের দায়িত্ব মেটানোর স্বস্তি ও আনন্দ যে কতোখানি, ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না।

শৈবাল বাইরের টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল। ডায়াল করতে গিয়ে, থমকে গেল। সুপূর্ণার গতকালের ক্রুদ্ধ ক্ষুণ্ণ জেদের কথাগুলো বড় জোর কানের মধ্যে বেজে উঠলো। ও হয়তো এখনো রেগে আছে। শৈবাল আস্তে আস্তে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো। ওর মুখে ফুটে উঠলো কোমল হাসি। সুপূর্ণা নিজেই বিকেলে হয়তো টেলিফোন করবে। কতোক্ষণ আর মাথা গরম করে থাকবে।

শৈবাল ইন্টারকম টেলিফোনের রিসিভার তুলে, দুটো নম্বর ডায়াল করলো। ওপার থেকে জবাব এলো, 'অফিসারস ক্যান্টিন।'

"আমি দত্ত বলছি মিঃ গুপ্ত।" শৈবালের স্বরে আলস্যের সুর, "আজ আপনার লাঞ্চের মেনু কী?"

মিঃ গুপ্ত অফিসারস ক্যান্টিনের ম্যানেজার। তাঁর গলার স্বর শৈবালের চেনা। কিন্তু মিঃ গুপ্তের স্বরে রাজ্যের বিস্ময়, "আপনি খোঁজ করছেন লাঞ্চের মেনু? আপনি তো স্যার কোনো দিন আমার এখানে লাঞ্চ করেন না?"

"কোনো দিন না করলে কি একদিনও করতে নেই?" শৈবাল হাসলো।

মিঃ গুপ্তর বিনীত ব্যগ্র স্বর শোনা গেল, "কেন নেই। নিশ্চয় করতে আছে। মেনুর মধ্যে ফ্রায়েড রাইস, মুগের ডাল, ইলিশ মাছ, বিনসের তরকারি আছে। তাছাড়া আছে ভেটকি আর ম্যাকরেলের ফ্রাই, চিকেন স্টু। তাছাড়া যদি আরো কিছু করে দিতে বলেন⋯"

"আমার এত সব দরকার নেই।" শৈবাল মিঃ গুপ্তকে আশ্বস্ত করলো, "আপনার ওখানে চিকেন স্যান্ডউইচ মিলবে না?"

মিঃ গুপ্তর তৎক্ষণাৎ জবাব, "কেন মিলবে না স্যার? ইলিশ মাছ ভাজা খাবেন? খুব ভালো—মানে, বাংলাদেশের ইলিশ আছে। আমি নিশ্চয় আপনাকে খুশি করতে পারবো।"

"আমি মিনিট পনের কুড়ি বাদে যাচ্ছি।" শৈবাল রিসিভার নামিয়ে রাখলো। ওর মুখে হাসি ফুটলো। মিঃ গুপ্ত বোধহয় ধরেই নিয়েছেন, ও ডিরেক্টরের হয়ে অফিসারস ক্যান্টিনের খাবার এবং ব্যবস্থাদি পর্যবেক্ষণে যাচ্ছে। এ সব ক্ষেত্রে এরকম ভাবাটা কিছু অন্যায় নয়। কারণ, এমনটা ঘটতেই পারে। ও বেল টিপে বেয়ারাকে ডাকলো।

বেয়ারা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। শৈবাল মুখ না তুলেই বললো, "মিস চৌধুরিকে একবার ডেকে দাও।"

"আজ্ঞে!" বেয়ারা চলে গেল।

শৈবাল দ্রুত হাতে ফাইলগুলো সাজিয়ে ফেললো। গতকাল ও প্রায় রাত্রি ন'টা অবধি কাজ করেছে। সমস্ত টাইপ করা কাগজগুলো আলাদা করে রাখা ছিল। মিস চৌধুরি এলো। অনধিক তিরিশ বছর বয়স। অনতিদীর্ঘ স্বাস্থ্যবতী এবং দেখতে সে যতটা ভালো, তার চেয়েও সযত্নে নিজেকে সাজাতে জানে। ওর নাম পাপিয়া। এক মুখ হাসি নিয়ে ঢুকলো, "গুড আফটারনুন মিঃ ডাট। শুনলুম, গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেছেন?"

"গুড আফটারনুন! অনেক রাত নয়, ন'টা পর্যন্ত।" শৈবাল ফাইলগুলো আর টাইপ করা কাগজগুলো এগিয়ে দিল, "আমি কিছু কাজ এগিয়ে রেখেছি। আপনি আজ আর আগামীকাল বিফোর লাঞ্চ, আমার সাজিয়ে রাখা কাজগুলো পর পর শেষ করে দেবেন। খুব জরুরি কাজ। যদি অসুবিধে বোঝেন, আমাকেও বলতে পারেন। অবিশ্যি আমার আবার রুটিনমাফিক কাজগুলো রয়েছে।"

মিস্ চৌধুরি আগে টাইপ করা শিটগুলো হাতে তুলে নিল, "আপনার টাইপ খুব সুন্দর। আমি সব ঠিক করে ফেলবো। আপনি ভাববেন না। বেয়ারাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ফাইলগুলো নিয়ে যাবে।"

"থ্যাংক্যু মিস চৌধুরি!" শৈবাল হাসলো।

মিস চৌধুরি তার কাজল মাখা চোখে হাসির ঝিলিক হানলো, "নো মেনশন মিঃ ডাট।"

মিস চৌধুরি বেরিয়ে গেল। শৈবাল ওর ঘর থেকে বেরিয়ে, ক্যান্টিনে যাবার আগে, দু একজনের ঘরে ঢুঁ মারলো। ক্যান্টিনে গেল। দুটো ইলিশমাছ ভাজা খাবার পরে, এক কাপ কালো কফি ছাড়া আর কিছুই খাওয়া সম্ভব হল না। ঘরে ফিরে যথারীতি কাজে বসলো। জি-এম-এর ঘর থেকে ডাক এলো বিকেল চারটেয়। আধ ঘণ্টা পরে ফিরে এলো। বাইরের টেলিফোন দু'বার বেজে উঠলো। দু'বারই আশাহত হল। কাজের লোক, কাজের কথা। সুপূর্ণার স্বর শোনা গেল না। সুপূর্ণা সাধারণত পাঁচটা পর্যন্ত অফিস করে। খুব প্রয়োজন হলে, সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত। তার মধ্যে টেলিফোন না এলে, শৈবালই করবে। কিন্তু তা আর করতে হল না। পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিট আগেই সুপূর্ণার টেলিফোন এলো। তবে ওর সেই স্বাভাবিক আর চেনা স্বরের কথা শোনা গেল না, "রিনটি!" পরিবর্তে শোনা গেল, "তোমার কাজে ব্যাঘাত করবো না ভেবেছিলুম। তবু করতে হল। কারণ, গতকাল আমরা কী রকম ডায়মণ্ডহারবার বেড়িয়ে এলুম, তোমার নিশ্চয় জানবার কৌতূহল হচ্ছে?"

"নিশ্চয়ই হচ্ছে।" শৈবালের স্বরে অকৃত্রিম উৎসাহ, "অবিশ্যি বলবো না, আমি বঞ্চিত হয়েছি। কারণ তুমি বলবে, আমি তোমাদের ত্যাগ করেছি..."

সুপূর্ণার স্বরে গতকালের উগ্র ঝাঁজ না থাকলেও, উত্তাপ মন্দ নেই, "হ্যাঁ, ত্যাগ করেছো। আর করে ভালোই করেছো। তুমি এলে, ব্যাপারটা তোমার মোটেই ভালো লাগতো না। কৃষ্ণার কথা ছেড়েই দিচ্ছি। অরিন্দমের পকেটে টাকা কম ছিল। আমার কাছেও যা ছিল, তা সামান্যই। অরিন্দম শেষ পর্যন্ত অফিসে একজনের কাছ থেকে টাকা ধার করেছে। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষে হয়নি। ডায়মন্ডহারবার থেকে আমরা যখন এসেছি, তখন ট্যাক্সির পুরো ভাড়ার টাকা আমাদের ছিল না। যাই হোক, কী ভাবে সে-সব মিটেছে, তোমাকে বলে লাভ নেই। শুধু জেনে রেখো, তবু আমরা দারুণ এনজয় করেছি।"

"রিন্টি, টাকার ব্যাপারটা তুমি আমাকে..."

শৈবালের কথা থামিয়ে, মাঝখানেই সুপূর্ণার স্বর ঝঙ্কৃত হল, "হ্যাঁ, উচিত ছিল। আমি বোকামি করেছি। তোমার কাজ থাকলেও টাকাটা নিতে পারতুম। যাই হোক, আজ এখন তোমার বেয়ারাকে দিয়ে শ' দুয়েক টাকা পাঠাতে পারবে? হেঁটে এলে দশ মিনিট লাগবে।"

"তা পাঠাচ্ছি।" শৈবালের মুখে বিমর্ষতা ও বিস্ময়ের ছায়া পড়লো, "তুমি আজ আমার এখানে আসছো না?"

সুপূর্ণার শুষ্ক স্বর ভেসে এলো, "না। আজ আমরা এক জায়গায় একটু আড্ডা দেবো। অরিন্দম আর কৃষ্ণা অফিসের নিচে অপেক্ষা করছে। আমি কি তোমার বেয়ারার অপেক্ষা করবো?"

"নিশ্চয় করবে।" শৈবালের মুখে আহত অভিব্যক্তি, "কিন্তু বেয়ারা যাবার দরকার কী? আমি তো আজ ফ্রি। আমি নিজেই যেতে পারি। তোমাদের সঙ্গে..."

সুপূর্ণার দৃঢ় কিন্তু নিরাসক্ত স্বর ভেসে এলো, "না, আমাদের সঙ্গে তোমাকে আসতে হবে না। অবিশ্যি টাকাটা চাইতে আমার খুবই সংকোচ হচ্ছে। কিন্তু মাসের শেষ। আমার আর অরিন্দম, দুজনেরই অবস্থাই কাহিল।"

"সেজন্য ভেবো না।" শৈবাল ওর স্বরকে তরল ও স্বাভাবিক রাখলো। কিন্তু ওর বিমর্ষ মুখে গাঢ় বেদনার ছায়া, "বেয়ারা দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছোবে।"

ওপার থেকে রিসিভার নামিয়ে রাখার আগে, সুপূর্ণার স্বর শোনা গেল, "রাখছি।"

টেলিফোনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। শৈবাল এক মুহূর্ত দেরি না করে, ড্রয়ার টেনে, ওর পার্সটা বের করলো। দুটো এক শো' টাকার নোট তুলে নিল। পার্স ড্রয়ারে রেখে, একটি খাম বের করলো। নোট দুটো খামের মধ্যে পুরে, উঠে দাঁড়ালো। কোণে একটি কাঠের পার্টিশন সরিয়ে ভেতর থেকে বের করলো গঁদের শিশি। খামের মুখ বন্ধ করার আগে এক সেকেন্ড ভাবলো। না, নোট দুটো পাঠানো ছাড়া, আর কিছুই পাঠাবার নেই। ও খামের মুখে দ্রুত গঁদ লেপে, মুখ বন্ধ করলো। কাঠের পার্টিশন টেনে বন্ধ করে ফিরে এলো টেবিলে। চেয়ারে বসে নিচে হাত দিয়ে বোতাম টিপলো। তারপরে খামের ওপর লিখলো, "মিস সুপূর্ণা গুহ।"

বেয়ারা দরজা ঠেলে ঢুকলো। শৈবাল খামটা বেয়ারার দিকে বাড়িয়ে ধরলো, "এটা মিস গুহকে তাঁর অফিসে এখুনি পৌঁছে দিয়ে এসো। তিনি যদি কিছু বলেন, আমাকে জানিয়ে যেও।"

"আজ্ঞে।" বেয়ারা খামটি নিয়ে দ্রুত দরজার বাইরে চলে গেল।

শৈবালের মনে হল, ওর ভেতরে কোনো একটা গানের সুর বাজছে। কোন্ গান, কী সুর, ওর জানা নেই। কিন্তু ওর ঠোঁটে করুণ হাসি ফুটলো। গতকাল সুপূর্ণা খুবই অপমানিত বোধ করেছে। সে জন্য শৈবালকেই মনে মনে দায়ী করেছে। অথচ শৈবাল সত্যি নিরুপায় ছিল। এখনও সুপূর্ণা ভীষণ রেগে আছে। যখন ওর রাগ থাকবে না, মন শান্ত হবে, তখন লজ্জায় দুঃখে হয় তো এই শৈবালেরই বুকে...

নিজেকে এই সান্ত্বনাটা দিতে গিয়ে থমকে গেল। বুকে একটা তীক্ষ্ণ কষ্ট ওর ভেতরের অচেনা সুরের "অন্ত"-এর উচ্চ রাগে বেজে উঠলো। ও উঠে দাঁড়ালো। কেন দাঁড়ালো, নিজেই জানে না। এখন ওর বাইরে যাবার দরকার নেই। এ সময়ে বাইরের টেলিফোনটা বেজে উঠলো। শৈবাল টেলিফোনটার দিকে তাকালো। ধীরে এগিয়ে গিয়ে, রিসিভারটা তুললো, "ইয়েস?"

"তাড়ু বলছিস্?"

গলার স্বর শুনেই শৈবাল মায়ের গলা চিনতে পারলো। ওর ডাক নাম তাড়ু। অবাকও হল, "হ্যাঁ। কী ব্যাপার মা?"

"না, ব্যাপার তেমন কিছু নয়।" মায়ের ক্লান্ত স্বর ভেসে এলো, "তোর কি আজ কোনো পার্টি বা নেমন্তন্ন আছে। বাড়ি ফিরতে দেরি হবে?"

শৈবালের মুখে ভ্রূকুটি বিস্মিত জিজ্ঞাসা, "না, কোনো পার্টি নেমন্তন্ন কিছুই নেই। কেন বলো তো?"

"তাহলে," মায়ের ক্লান্ত শ্বাসে ধরা স্বরে কেমন একটা সংকোচের সুর, "বলছিলুম কি, তোর বাবা তো সেই তিন দিন আগে বন্ধুদের সঙ্গে জঙ্গলে বেড়াতে চলে গেছেন। বীরু আর মীনাকে (শৈবালের দাদা আর বৌদি) আমার ব্যস্ত করতে ইচ্ছে করে না। আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। তুই কি তাড়ু আজ বাড়ি চলে আসবি?"

মায়ের স্বরে সংকোচ আর দ্বিধা শুনে, শৈবালের বুকে ভিন্নতর একটা কষ্ট টনটনিয়ে উঠলো। আর মনে হলো, এ যেন একটা দৈব ঘটনার মতো। এ মুহূর্তে মায়ের কাছ থেকে এই ডাক। মা তো কোনো দিনই এমন ভাবে এ সময়ে ডাকেন না। ও দ্রুত স্বরে বললো, "আমি এখুনি যাচ্ছি মা। আমার আজ তেমন কাজও নেই।"

"রাগ করিস নে যেন তাড়ু।" মায়ের শ্বাস টানা ক্লান্ত স্বরে সেই সংকোচ।

শৈবাল হাসলো, "ওরকম করে বললে রাগ করবো।"

মা ওপার থেকে লাইন কেটে দিলেন। শৈবাল দ্রুত ড্রয়ার খুলে পার্স, গাড়ি ও অন্যান্য চাবির গোছা, এবং আরো টুকটাক কিছু জিনিস ট্রাউজারের পকেটে ঢোকালো। বাঁ হাতের কবজি উলটে ঘড়ি দেখলো। ইন্টারকমের রিসিভারটা তুলে দুটো নাম্বার ডায়াল করলো, "সিন্হা, আমি বাড়ি যাচ্ছি। মনে হয়, জি· এম· আজ আর আমাকে ডাকবেন না। তবু কোনো কারণে খোঁজ করলে, তুমি বলে দিও, আমি বাড়িতেই থাকবো।"

"আচ্ছা স্যার।" জবাব ভেসে এলো।

শৈবাল রিসিভার নামিয়ে ঘর থেকে বেরোলো। করিডর দিয়ে সোজা এগিয়ে গেল লিফটের দিকে। লিফট ওপরে উঠছে। লিফট এসে দাঁড়ালো। দরজা খুলতেই ওর বেয়ারা বেরিয়ে এলো, "আজ্ঞে, উনি আমার জন্যই অফিসের নিচে নেমে দাঁড়িয়েছিলেন। কিছু বলেননি।"

"কে? লিফটের ভেতর পা দিতে দিতে, শৈবাল ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসু চোখে ফিরে তাকালো। এবং পরমুহূর্তেই মাথা ঝাঁকালো, "ও! আচ্ছা, ঠিক আছে।"

লিফটের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এটাই টপ ফ্লোর। লিফট নিচে নামতে লাগলো।

॥ অন্ত ॥

শৈবাল তিন দিন ধরে অফিসের নানা কাজের মধ্যেও, যতো বার বাইরের টেলিফোন বেজে উঠেছে, একটি স্বর শোনার ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়েই রিসিভার তুলেছে। প্রত্যেকবারই আশাহত হয়েছে। অথচ ও একটা বিষয় বিশেষভাবে অনুভব করছে। সুপূর্ণা ওর জীবনের যেখানে অবস্থান করছে, সেই অবস্থানগত দিক থেকে, ওর দুদিনের ক্রোধ ক্ষোভ জেদ এবং প্রত্যাখান, শৈবালকে একটা জায়গায় স্তব্ধ করে রেখেছে। করে রেখেছে আড়ষ্ট, নিশ্চল অনড়। ও কিছুতেই সুপূর্ণাকে টেলিফোন করতে পারছে না। এর মধ্যে ওর কোনো জয়ের অনুভূতি নেই। সংযম আর একান্ত অধিকারবোধের সংশয় ওর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ মনে একটা প্রশ্নও জাগছে। এ-বাধার সঙ্গে প্রেমের কোনো অন্তরায় কি ঘটেছে? জবাব মেলেনি।

সাত দিন পরে, টেলিফোনে একটি মেয়ের গলার স্বর শৈবালকে অবাক করলো। গলার স্বরে লজ্জা সংকোচ ও জড়তা, "আমি কি মিঃ শৈবাল দত্তর সঙ্গে কথা বলছি?"

"বলছেন।" শৈবাল জিজ্ঞাসু স্বরে জবাব দিল।

টেলিফোনের ওপার থেকে মেয়েটির স্বরে একটা করুণ সুর যেন বাজছে, "আপনি আমাকে চিনবেন না। তবে সুপূর্ণার কাছে বোধহয় আমার নাম শুনেছেন। আমার নাম কৃষ্ণা মজুমদার।"

"মানে সুপূর্ণার বন্ধু অরিন্দমের...?" শৈবাল কথাটা শেষ করলো না।

কৃষ্ণার গলার স্বর ক্ষীণ শোনালো, "হ্যাঁ, সপ্তাহখানেক আগেও তাই জানতুম, আমি

অরিন্দমের কৃষ্ণা। কিন্তু গত ছদিন আমি ওর কোনো সন্ধান পাচ্ছি নে। সুপূর্ণাকেও পাচ্ছিনে। ভাবলুম আপনি হয়তো মানে সুপূর্ণার কাছ থেকে হয়তো আপনি কিছু শুনেছেন। আপনার কাছে কোনো খোঁজ পাবো।"

"না, মিস মজুমদার, সুপূর্ণার কাছ থেকে অরিন্দমের কোনো সংবাদ আমি পাই নি।" শৈবালের স্বর অমায়িক কিন্তু গম্ভীর। সুপূর্ণার সঙ্গে ওর গত সাত দিনের ওপর সাক্ষাৎ না হওয়ার কথা বললো না।

কৃষ্ণার ক্ষীণ করুণ স্বর ভেসে এলো। "আমি এমন একটা অবস্থায় আছি, আপনাকে বোঝাতে পারবো না। বুঝতে পারছিনে, অরিন্দম আমাকে চিট করেছে কিনা। কিংবা..."

"শুনুন মিস মজুমদার, এসব কথা শোনার সময় বা মন কোনোটাই আমার নেই।" ভাষার সঙ্গে শৈবালের স্বরের কাঠিন্যের কোনো সঙ্গতি ছিল না। গম্ভীর আর শান্ত ওর স্বর, "আমি আপনাকে বা অরিন্দমকে চিনিনে। কোনো দিন দেখি নি। এ অবস্থায় আপনি আপনাদের কোনো কথা আমাকে বললেও, কিছু করার নেই।"

কৃষ্ণার স্বর শুনে বোঝা গেল খুবই সংকুচিত হয়ে পড়েছে। বোধহয় শৈবালের জবাবটাও ওর কাছে অপ্রত্যাশিত মনে হয়েছে, "মাফ করবেন শৈবালবাবু। একটাই অনুরোধ, সুপূর্ণাকে আপনি বলবেন, ও যেন আমার সঙ্গে একটু দেখা করে।"

"সুপূর্ণার সঙ্গে দেখা হলে বলবো।" শৈবাল রিসিভার নামিয়ে দিল।

শৈবালের মুখ ঈষৎ কঠিন দেখালো। কয়েক মুহূর্ত ও সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক চোখে শূন্যে তাকিয়ে রইলো। তারপরে সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিল। জি· এম· ইতিমধ্যেই জেনেছেন, ওর মায়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। মায়ের সঙ্গে ওর সম্পর্কও তেমন একটা নিবিড় কিছু ছিল না। কিন্তু বাবার ব্যবহারে মা ক্রমেই ভেঙে পড়ছেন। শৈবাল বাবাকে দোষ দিতে পারে না। ভদ্রলোক তাঁর সারা জীবনে যতোটা করার করেছেন। এখন এই ষাটোর্দ্ধে জীবনটাকে নানাভাবে উপভোগ করে নিচ্ছেন। যেটা খারাপ লাগে, সেটা হল ভদ্রলোকের আদর্শবাদের কথা। ওটা ওঁদের স্বভাবের আর রক্তের মধ্যে চারিয়ে গিয়েছে। এ সময়ে অসুস্থ মা বড় অসহায়। শৈবাল মাকে সান্নিধ্য দিতে গিয়ে মায়ের কাছে জীবনের নানা কথা শুনে, কথা বলে, অনেক অজানাকে যেন জানতে পারছে। সব থেকে অবাক লাগে, বাবার প্রতি মায়ের কোনো অভিযোগ নেই। সেটা যে সেকালের অন্ধ স্বামীভক্তি বা ভালবাসা জনিত তা নয়। মা তাঁর নিজেকে দিয়ে, বাবাকে বুঝেছেন। সেই কারণেই বাবার প্রতি তাঁর কোনো অভিযোগ নেই।

সুপূর্ণার সঙ্গে দেখা নেই। কিন্তু মায়ের সঙ্গে অবকাশের সময়গুলো ওর জীবনে নিয়ে এলো নতুন একটা দিগন্ত। যে দিগন্তে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখা যায়। কিছুটা চেনা যায়।

শৈবাল কি তবু একেবারে নিশ্চিন্ত ছিল? থাকতে পারেনি। দশম দিনের অসাক্ষাতের পর, ও সুপূর্ণার অফিসে টেলিফোন করেছিল। ওরই এক মেয়ে সহকর্মীর জবাব, সুপূর্ণা গত সাতদিন অফিসে আসছে না। ও ছুটি নিয়েছে। শৈবাল উদ্বেগ চাপতে পারেনি। সুপূর্ণার বাড়িতে টেলিফোন করেছিল। ওর মা অবাক হয়ে বলেছেন, "ও তো কোন বন্ধুদের সঙ্গে পুরী বেড়াতে গেছে। তুমি জানো না?"

শৈবাল মাথা নেড়েছে, "না, জানি নে।"

"তুমি আমাদের বাড়িতেও তো অনেক দিন আসো নি। এসো না।" সুপূর্ণার মায়ের স্বরে আন্তরিক আহ্বান ছিল।

শৈবাল জানিয়েছে, "মায়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। ভালো হলেই যাবো।"

শৈবাল যেন নতুন করে ওর অবস্থানটা চিনতে পারছিল।

প্রায় চার সপ্তাহ পরে একদিন সুপূর্ণা এলো শৈবালের অফিসে। আগে কোনো টেলিফোন করেনি। তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি ওর চেহারায়, বা বেশেবাসে। কেবল পরিবর্তন কথায় ও ব্যবহারে। সেই ক্রোধ ক্ষোভ নেই। এলো এক ঝলক আলোর মতো হাসি নিয়ে। "কী কর্মবীর মহাশয়, তোমার খবর কী?"

"কর্মবীর নয়, যন্ত্র বল।" শৈবাল ওর হাতের কলমটা টেবিলে ফেলে হাসলো, "খবর খারাপ নয়। তোমার কী খবর?"

সুপূর্ণা শৈবালের চোখের দিকে তাকালো, "ভালো নয়।"

"কেন?"

"আমাকে না দেখে, তুমি হয় তো ভালো ছিলে। আমি ছিলুম না।" সুপূর্ণার মুখে বিষণ্ণতার ছায়া পড়লো, মনটাও ভালো ছিল না। তোমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি।"

শৈবালের অকপট হাসিতে একটা স্নিগ্ধতার কিরণ, "ওসব ভুলে যাও। ওরকম হয়েই থাকে। জীবনটা একই ছন্দে সব সময়ে চলবে, বা একই স্রোতে এটা ভাববার কোনো কারণ নেই। ওটাকে অনিবার্য বলে ধরে নিলে, অকারণ ভুগতে হয়।"

"হঠাৎ এই দার্শনিকতা?" সুপূর্ণার দীর্ঘায়ত চোখে সংশয়। ও তাকালো ঘাড় বাঁকিয়ে।

শৈবাল হেসে ঘাড় ঝাঁকালো। দার্শনিকতা বিষয়টা তো খারাপ নয়। ওটা জীবনবোধ থেকেই আসে।

"রাখো তোমার এত বড় বড় কথা।" সুপূর্ণার রাঙানো পুষ্ট ঠোঁট ফুলে উঠলো। গলার স্বরে প্রেমোচ্ছল আবদারের সুর, "অনেকদিন তোমার সঙ্গে বেরোইনি। আজ বেরোবো।"

সেটাই তো ছিল প্রায় প্রাত্যহিক একটা নিয়মের মতো। শৈবাল বাঁহাতের কবজির ঘড়ি দেখলো। উঠে দাঁড়ালো তৎক্ষণাৎ, "চলো তাহলে বেরোই।"

শৈবাল এক মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিল। সুপূর্ণাকে নিয়ে লিফটে নেমে আফিসের বাইরে এলো। গাড়িটা পার্ক করা ছিল যথাস্থানে। চাবি বের করে গাড়ির দরজা খুলে আগে নিজে ঢুকে বসলো চালকের আসনে। দরজা খুলে দিল সুপূর্ণাকে। সুপূর্ণা উঠে বসলো। শৈবাল গাড়ি স্টার্ট করলো।

"কথা বলছো না কেন বলো তো?" সুপূর্ণার স্বরে অস্বস্তি ও সংশয়।

শৈবাল হাসলো, "আমি তো শুনবো বলে কান পেতে আছি।"

"আমার আবার কী কথা থাকবে?" সুপূর্ণা শৈবালের কাছে ঘেঁষে বসলো, "যা বলবার তা তো বলেছি। কিন্তু তুমি তো আমাকে একবারও রিনটি বলে ডাকোনি। আর আর এদিকে কোথায় যাচ্ছো?"

শৈবাল হাসলো, "তোমাকে পৌঁছে দিতে।"

"আমাকে কোথায় পৌঁছে দিতে যাচ্ছো তুমি?" সুপূর্ণার স্বরে বিস্ময় ও উত্তেজনা, "উত্তর কলকাতায় কোথায় পৌঁছাবে তুমি আমাকে? আমাদের বাড়ি তো ওদিকে না?"

শৈবালের হাসিতে কোনো পরিবর্তন নেই, "আজ আমি তোমাকে সেখানে পৌঁছে দিতে চাই, যেখানে তোমাকে পৌঁছুনো উচিত বলে আমি মনে করি।"

"শৈবাল!" সুপূর্ণা প্রায় চিৎকার করে উঠলো, "তোমার এমন কোনো অধিকার নেই তোমার ইচ্ছে মতো জায়গায় আমাকে পৌঁছে দেবে। আমি...আমি...অনেকদিন পরে তোমার কাছে এসেছি। তোমার সঙ্গে বেরোতে চেয়েছি..."

সুপূর্ণার স্বর স্তব্ধ হয়ে এলো। গাড়ি দাঁড়ালো। উত্তর কলকাতার সেকালের এক অভিজাত পাড়া। সামনেই বিশাল অট্টালিকাটা অন্ধকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তাটায় তেমন ভিড় নেই। আলোও কম। শৈবাল গাড়ির এঞ্জিন বন্ধ করে নেমে গেল। অন্য পাশে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো, অরিন্দমদের বাড়ির এ-ঠিকানাটা একদিন তুমিই বলেছিলে। এসো সুপূর্ণা, নেমে এসো।"

সুপূর্ণা পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গাড়ির মধ্যে বসে রইলো। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারলো না। শৈবালের স্বরে এমন কিছু ছিল, ওকে কাঁধের ব্যাগটা ধরে নেমে আসতে হল। শৈবাল দরজাটা লক করে, চেপে দিল, "এটা দার্শনিকতা কিনা, সে বিচার তোমার। তোমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে যেতে আমার কোথায় কতোখানি বাজছে, সেটা ব্যাখ্যা করবো না। আমার ঝরনা অন্ধকারে বহে। তোমার জীবনের পথ তোমারই মানসিকতার দ্বারা নির্ধারিত হবে। আমি এখান থেকে ফিরছি।

"তাড়ু!" সুপূর্ণার রুদ্ধ স্খলিত স্বরের ডাক শোনা গেল।

শৈবাল গাড়িতে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে, ইঞ্জিনে চাবি ঘুরিয়ে গাড়ি স্টার্ট করলো। "রিনটি, ডেকো না। আমার জন্য তোমার জীবন থেমে থাকবে না। কিন্তু যা চার বছরেও অপূর্ণ ছিল, তার পূর্ণতা আশা করা অনুচিত। সাত দিনে প্রেম হয়। চার বছরের প্রাসাদ এক নিমেষেই ভেঙে যায়।"

শৈবাল গাড়ি চালালো। তবু একবার পেছন ফিরে তাকালো। প্রায় অন্ধকার প্রাচীন রাস্তার ধারে বিশাল ভুতুড়ে অট্টালিকাটার সামনে সুপূর্ণাকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। শৈবাল সামনে ফিরলো। ও গাড়ি চালাচ্ছে। ওর চোখ ঝাপসা হলে চলবে না।

ছবি: কৃষ্ণেন্দু চাকী

শেষ

নাস্তিকের জগৎ

রত্নাকর চয়নী

সকাল থেকেই আজ তাঁর মনটা চঞ্চল। কোথাও স্থির হয়ে বসতে পারছেন না। কখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে আবহাওয়া ভাল কি মন্দ যাচাই করছেন, কখনও বা বসে পড়ে হাতে বাঁধা ঘড়িটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখছেন।

অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে যেন কার উদ্দেশে অস্ফুটে বিড়বিড় করে কি বলে উঠছেন। রাত সাড়ে চারটেয় উঠে নিত্যকর্ম সেরে ফেলা তাঁর বরাবরের অভ্যাস। কিন্তু ঠাকুরঘরে ঢুকে পুজোপাঠ করা নিশ্চিতরূপে ব্যতিক্রম ছাড়া কিছু নয়।

আজ কে জানে কেন খুব জমকালো শব্দ উচ্চারণ করে করে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছিলেন। তাঁর মেয়ে উত্তরা এ সব নীরবে দেখল ও শুনল। জামাই সুবিমলের ঘুম ভাঙল না। তার সকাল হতে এখনো তিন ঘন্টা দেরি আছে।

দেবরূপবাবু কোনকালেই পুজোপাঠ করতেন না। চাকরি থেকে সম্পূর্ণরূপে অবসর নেবার পর তাঁর এ এক অদ্ভুত পরিবর্তন। উত্তরা লক্ষ করে, ঠাকুরঘরে তিনি অতি সন্তর্পণে ঢোকেন, যেন কোন পাপকাজ করতে যাচ্ছেন কিংবা পুজো করা এমন একটা গর্হিত কাজ যেন সেটা কেউ দেখে ফেললে অনর্থ হবে। আবার ভয়ও আছে, কেউ তাঁকে পুজোপাঠ করতে দেখে ফেলে ঠাট্টা না করে বসে, কারণ কর্মজীবনে তিনি ঘোর নাস্তিক ছিলেন।

চিকিৎসকের জীবন। সর্বদা নিজের কাজেই ডুবে থাকতেন। মানুষের শরীর কাটা ছেঁড়া করে আবার ঠিক করে দেবার ক্ষমতা ছিল বলেই হয়তো তাঁর এই নাস্তিকতা ছিল। তাঁর মতে, 'রক্ত, মাংস, স্নায়ু ও হাড় ছাড়া মানুষের গর্ব করবার মতো আর কি বা আছে? এদের কষ্ট দিয়ে পুজোপাঠ, ব্রত-উপবাস করা নিরর্থক।'

কিন্তু হাসপাতাল থেকে ফিরে ঘরে পা রাখতেই দেবরূপবাবু তাঁর বিশ্বাসের প্রতি তীব্র উপহাস অনুভব করতেন। সারা বাড়ি ধূপ, ধুনো, চন্দনের সম্মিলিত গন্ধে ভরপুর। কখনও কখনও কোমল নারীকণ্ঠে উদাত্ত মন্ত্রের উচ্চারণ শুনতে পেতেন।

স্ত্রী বিজয়া তখন ঠাকুরঘরে।

তিনি ছেলেমেয়েদের খাইয়ে-দাইয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিয়ে স্নান সেরে ঠাকুরঘরে ঢুকতেন। পুজো করতেন দু ঘন্টা ধরে। এ সময় ঘরে আগুন লাগলে কি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলেও বিজয়া ঠাকুরঘর থেকে বাইরে বেরোবেন না।

পুজো না হলে তিনি জলস্পর্শও করেন না। দেবরূপবাবুর ভাষায় এটি হল তাঁর নিষ্ঠার যন্ত্রণা। তাই তাঁর অ্যাসিডিটি, গ্যাসট্রিক পেন ইত্যাদি পেটের রোগ লেগেই থাকে।

অবশ্য বিজয়া আপ্রাণ চেষ্টা করতেন যাতে পুজোপাঠ দেবরূপবাবু ঘরে ফেরার আগেই শেষ করা যায়। তবু এক-আধদিন এদিক-ওদিক হয়েই যায়। হয়ত দেবরূপবাবু হাসপাতাল থেকে তাড়াতাড়ি ফিরলেন কিংবা হয়ত বিজয়ার কোনদিন কাজ শুরু করতে দেরি হয়েছে—সেইদিনই এমনটি ঘটত।

ঠাকুরঘরে বিজয়ার ঘন্টাধ্বনি যত তীব্রতর হয়ে উঠত, দেবরূপবাবুর চিৎকার-চেঁচামেচিও সেই অনুপাতে তীক্ষ্ণতর হত। কিন্তু বিজয়া এসব চিৎকার শুনেও শুনতেন না। পুজো শেষ করে, শাড়ি বদলে স্বাভাবিক অবস্থায় না ফেরা পর্যন্ত তিনি কারোর সঙ্গে কথা বলতেন না। এমনকি, ঘরের চাকর বুলুর সঙ্গেও নয়।

বিজয়া সব কাজই মন দিয়ে করেন। তা সে রান্নার কাজই হোক, কি ঘর গোছানো, কি সেলাই-ফোঁড়াই হোক, তাঁর সব কাজেই নিষ্ঠার ছাপ পাওয়া যায়। রান্নাঘরে তিনি ছাড়া অপর সকলের প্রবেশ নিষেধ। এমনকি উত্তরাও কলেজ যাবার আগে পর্যন্ত রান্নাঘরে ঢোকবার অনুমতি পায়নি।

দেবরূপবাবু এটিকে বলতেন বিজয়ার শুচিতার ব্যারাম।

পুজোপাঠের পরে কোন কোনদিন বিজয়া তর্ক শুরু করতেন। তিনি সব কিছু সইতে পারেন কিন্তু তাঁর পুজোপাঠ নিয়ে কেউ কিছু বললে ভয়ানক রেগে যেতেন। সব সময় তাঁর রাগের লক্ষ হতেন দেবরূপবাবুই। তিনি বলতেন, 'পৃথিবীতে ব্যারাম ছাড়া আর কিছুই তোমার চোখে পড়ে না।'

বদলি হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার সময় বিজয়াকে জগন্নাথের সিংহাসনটি কোলে করে বসে থাকতে দেখলে দেবরূপবাবুর ক্রোধ সপ্তমে চড়ে যেত। চিৎকার করে বলতেন, 'ব্লাড প্রেসার মাপার মেশিন, স্টেথিস্কোপ, ইনজেকশনের বাক্স, ওষুধের পেঁটরা উঠেছে? দেখে নিয়েছ তো! নাকি নিজের চুলো-চাকি, ঝাঁটা-কুলো যত সব জঞ্জাল জড়ো করে ঠাকুরের সিংহাসন কোলে নিয়ে বসে আছেন মহারানী! যেন এ সব ছাড়া সংসারে আর কোন সম্পদ নেই।' সব শুনেও বিজয়া কিছু বলতেন না। কেননা, নতুন জায়গায় যাবার দুশ্চিন্তায় তখন তিনি ঠাকুরের কাছে নানারকম মানত করতেই ব্যস্ত। চোখ জলে ভরে উঠত, বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সময় করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলত, 'পুরনো জায়গার মায়া ছাড়তে পারছে না গো।' প্রথম থেকেই বিজয়া ঈশ্বরভক্ত। অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েছিল। দেবরূপবাবুর সঙ্গে তাঁর বয়সের তফাত পনেরো বছর। প্রথম প্রথম স্বামীকে তিনি খুব ভয় করতেন। কিছুদিন পরে ভয় বদলে গেল নির্লিপ্ততায়, আর তারও পরে প্রতিবাদে। ঠিক এই সময় থেকেই তাঁর পুজোপাঠে আসক্তি বেড়ে গিয়েছে।

কখনও কখনও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তুমুল ঝগড়া ও কথা কাটাকাটি হয়। সে সময় ঘরের কাজকর্ম ঠিকমতো চললেও দুজনের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ থাকে। এ সময় বাইরে থেকে কেউ এলে সে বুঝতেই পারত না বাড়িতে কিছু ঘটেছে। হাসিখুশি আতিথেয়তা আদর আপ্যায়ন কোন বিষয়েই ঘাটতি হত না। কিন্তু সে একটু সচেতন হলে একটা রুক্ষ ও ছাড়াছাড়া ভাব তার নজর এড়াবে না।

ছেলেমেয়েরা দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। ছেলে অরুণাভ ও মেয়ে উত্তরা। অরুণাভ অন্য প্রান্তে হোস্টেলে থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ত। সেখানেই তার চাকরিও হল। তারপর বিয়েটিয়ে করে ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেখানেই বসবাস করতে শুরু করল। এক বছর দু বছর বাদে হঠাৎ মনে পড়লে কিংবা কর্তব্য মনে হলে দুএকদিনের জন্যে বাড়িতে এসে আবার কর্মস্থলে ফিরে যেত।

কিন্তু উত্তরা বিয়ের দিন পর্যন্ত তাঁদের কাছেই ছিল।

অরুণাভ ও উত্তরা দুজনেই তাদের বাবাকে খুব ভয় করত। ছেলেবেলা থেকেই তারা পিতার কঠোর স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত। দেবরূপবাবু নিজে থেকেই জিজ্ঞেস না করলে তারা স্বেচ্ছায় কোন জিনিস আনতে বলতে পারত না। উত্তরা দেখত তার বাবা ঘড়ির কাঁটার ঘন্টা, মিনিট, সেকেণ্ডের সময় ধরে কাজ করতেন। অরুণাভও অনুভব করত, নিয়মানুবর্তী ও রুচিসম্পন্ন পিতার পান থেকে কখনো চুন খসে না। তাই দুজনে চুপচাপ থাকাই শ্রেয় মনে করত।

এই পরিবারের কথা ভুলে গিয়ে অরুণাভ কর্মস্থলে এমন জাঁকিয়ে বসল যেন সে বাপের সংসারে একজন অতিথি হয়েই ছিল। মাঝে মাঝে বিজয়া চিঠি লেখে, 'অরুণ, তোকে দেখতে বড্ড ইচ্ছে করে, একবার এখানে ঘুরে যা।' অনেক দেরিতে উত্তর আসে, 'মা, ভীষণ কাজের চাপ, চিঠি লেখার ফুরসৎ নেই। সুযোগ পেলেই যাব।'

শেষ পর্যন্ত মৌমাছির গুঞ্জনধ্বনির মতো নির্জনতা বিজয়ার সব সময়ের সঙ্গিনী হল। তাঁর শুধুই মনে হত, কোন একটা দামী জিনিস কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছেন। সেটা আর ফিরে না পাওয়ার হতাশা তাঁর মনকে সব সময় আচ্ছন্ন করে রাখত।

স্বামী-স্ত্রীর বাক্যালাপের পরিমাণ আরো কমে এল। যেটুকু না বললে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে শুধু সেইটুকু কথা বলা। তাও যেন কোন বাইরের লোকের সঙ্গে নিতান্ত অনিচ্ছায় বলতে হচ্ছে বলে কথা বলা।

বিয়ের পর উত্তরা শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। তার স্বামী সুবিমল সেখানে এক ব্যাঙ্কে চাকরি করে।

এদিকে দেবরূপবাবু চাকরি থেকে অবসর নেবার পর পারাদ্বীপে নিজের বাড়িতেই বেশির ভাগ সময় কাটাতে লাগলেন। বন্দর সংলগ্ন এই শহরটিতে ভাল পশার জমবে ভেবে এখানেই তিনি বাড়ি করেছিলেন। অবসর গ্রহণের পর কাজ নিয়ে থাকার জন্যেই এ প্রয়াস।

সেই পুরনো চাকর বুলুই তাঁদের কাছে থাকে। দেবরূপবাবুর চিকিৎসায় বুলু বেঁচে উঠেছিল। সেই সময় থেকেই তার গরীব বাপ তাকে দেবরূপবাবুর কাছেই রেখে দিয়েছে। সে-ই এখন বিজয়া ও তাঁর মধ্যে একমাত্র সেতু।

কখনও কখনও স্বামী-স্ত্রীর সহ্যের বাঁধ ভেঙে যেত। ইতর ব্যক্তির মতো আচরণ ও গালিগালাজ করে দুজনের মধ্যে সেদিন প্রচণ্ড ঝগড়া হত। এই রকম এক ঝগড়া শেষ করে দেবরূপবাবু গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং চিরকালের মতো পর হয়ে যাওয়া মেয়ে উত্তরার বাড়িতে এলেন।

উত্তরাকে বলে দিলেন, সে যেন তাঁর এখানে আসার খবর তার মাকে না জানায়। বুঝুক ঠ্যালা! খুঁজে মরুক! কোথায় খুঁজবে? কয়েক মাস আগে তিনি পারাদ্বীপের ক্লিনিক বন্ধ করে দিয়েছেন। 'আরো পয়সার দরকার নেই। এদেশে কেউ শ্রমের মূল্য দেয় না। এখানে কালো টাকার মানমর্যাদা বেশি।'

কারও কাছে কালো টাকা আছে শুনলে বিদেশে লোকে তাকে ঘৃণা করে। এমনকি তার

সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কও' ভেঙে দেয়। এখানে ঠিক উল্টোটাই ঘটে। তাই সত্যের জন্যে সংগ্রাম করার মতো কোন কারণই আর অবশিষ্ট নেই। দেবরূপবাবু অনেককেই তাঁর এই মতামত শুনিয়েছেন।

উত্তরার বাড়িতে পনেরো দিন থাকবার পরই তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। এখানে তিনি অপ্রয়োজনীয়। নিজের মন খুলে কথা বলারও লোক পেলেন না।

সুবিমল! সে সকাল সাড়ে ন'টার সময় বেরিয়ে যায়, ফেরে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পরে। তারপর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে শুয়ে পত্রপত্রিকার পাতা ওলটায়।

উত্তরা! সে তো ছোটবেলা থেকেই মুখ ফুটে বাবাকে একটি কথাও বলেনি। আর প্রতিবেশী! তাদের কাউকেই তিনি চেনেন না ভাল করে। এই সব লোকের সঙ্গে কি কথা বলা যায়? অর্থাৎ এ পরিবেশ তাঁর পক্ষে একেবারে নতুন।

উত্তরা লক্ষ করছিল, গত কয়েকদিন ধরে পিতার ব্যবহার খুবই অন্যরকম ঠেকছে। কিন্তু সে না পারে কিছু বলতে, না পারে কিছু করতে। তার বাবা তার বাড়িতে স্বেচ্ছায় এসে এতদিন রয়েছেন দেখে সে মনে মনে খুব খুশি হয়েছিল। তার বাবা তার কাছে এসে পুজোপাঠ শুরু করেছেন দেখে সে আরও খুশি।

চুপি চুপি মাকে চিঠি লিখতে বসে আনন্দাশ্রু

ঝরিয়ে ভিজিয়ে ফেলেছিল চিঠির পাতা। লিখেছিল, 'মা ওঁকে আর কিছুদিন এখানে থাকতে দে। তুই চিন্তা করিস না। বুলু তো আছে তোর কাছে… ।'

কিন্তু আজ দেবরূপবাবু অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তিনি যেন কাউকে ডেকে কিছু বলতে চান, কিন্তু কথাটা যে কোথা থেকে শুরু করবেন তা বুঝতে পারছিলেন না ;সময় মতো সুবিমল নিজের অফিসে চলে গেল।

সাধারণত দেরিতে খাওয়া অভ্যাস বলে দেবরূপবাবু পরে খেতে বসলেন। যদি কিছু দরকার পড়ে বলে উত্তরা একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। দু গ্রাস খাওয়ার পরে দেবরূপবাবু বললেন, 'মা, শুনচিস ? পুরো জীবন কেটে গেল তবু তোর মার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হল না।'

একটু চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করলেন, 'আমি স্বীকার করছি সে যেমন রান্না করত, সেরকম আর কেউ করতে পারে না। তার ধৈর্যও অসীম। আমার মতো খামখেয়ালি লোককে সে সহ্য করেছে। কিন্তু সেও তো নিজের জিদ আঁকড়ে বসে রইল। নিজে যা বুঝেছে তাই করেছে। পুজোপাঠের মধ্যে যে এত আনন্দ আছে এত শান্তি পাওয়া যায় তা যদি সে একবারও আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করত ! আজ মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তুই কি এসব কথা তোর মাকে লিখে জানাতে পারিস মা ?'

এর পর তিনি আর খেতে পারলেন না, উঠে পড়লেন। ঘটনার আকস্মিকতায় উত্তরা কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারেনি। সচেতন হয়ে অনুভব করল তার দু চোখ জলে ভরে উঠেছে।

ঘন্টা দুয়েক যেতে না যেতেই দেবরূপবাবু ডাকলেন, 'মা, আকাশে যদিও মেঘ রয়েছে তবু ভাবছি দুপুরের গাড়িতেই বাড়ি ফিরে যাই। ভোর নাগাদ পারাদ্বীপে পৌঁছে যাব।'

'কেন ? কেন বাবা ? এখানে কি আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে ?' সন্ত্রস্ত হয়ে কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করে উত্তরা।

'না মা, মোটেই না।' দেবরূপবাবু বললেন, 'কাল সাজবাজ, তারপর রজ উৎসব। প্রতি বছর বুলুর জন্যে নতুন জামাকাপড় তৈরি করে দিই। আমি করিয়ে না দিলে সে আবার কারোর কাছ থেকে নেবে না। ক'দিন পরেই রথযাত্রা। তা ছাড়া, গত সপ্তাহের ঝড়ে বাড়ির কি অবস্থা হয়েছে তাও দেখা দরকার। আমি যাই মা, তুই সুবিমলকে খবর দে।'

সুবিমলকে খবর পাঠিয়ে ফিরে এসে উত্তরা দেখে তার বাবা বাসস্ট্যাণ্ডে যাবার জন্যে একেবারে তৈরি হয়ে বসে আছেন।

'বাস ছেড়ে যাবে মা, সময় হয়ে গেছে। শীগ্‌গির যেতে হবে' বলে উত্তরার কাছে বিদায় নিয়ে দেবরূপবাবু চলে গেলেন।

আধ ঘন্টা পরে হন্তদন্ত হয়ে সুবিমল বাড়ি ফিরল। ক্লান্ত অনুযোগের সুরে উত্তরা বলে, 'শেষ পর্যন্ত দেরি করে ফেললে। দুপুরের বাসে যাবার জন্যে বাবা আধ ঘন্টা আগেই বাসস্ট্যান্ডে চলে গেছেন। এখন বোধ হয় গাড়িও ছেড়ে দিয়েছে।'

কিছু না বলে বিমর্ষ সুবিমল উত্তরার দিকে টেলিগ্রামটা এগিয়ে দেয়। গত সপ্তাহে পারাদ্বীপের ওপর ঝড়ের প্রভাবে ডাক ও তার ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যাওয়ায় সাত দিন বাদে টেলিগ্রামটা এসেছে। উত্তরা পড়ল, "মাদার এক্সপায়ার্ড বুলু হসপিট্যালাইজড্"।

উত্তরা ডুকরে কেঁদে উঠল। সুবিমল যেন দেখতে পাচ্ছিল দূরে বহু দূরে, কটকের বাস থেকে নেমে এক বৃদ্ধ পারাদ্বীপে যাবার বাস খুঁজছেন।

অনুবাদ : চিত্রা দেব

ছবি : দেবাশিস দেব

রত্নাকর চয়নী

জন্ম ১৯৪৫। অধ্যাপক। সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৭৫ সালে 'কলঙ্কিত সূর্য' নাটক রচনার জন্য। ওড়িয়া সাহিত্যে অসাধারণ ছোট গল্প রচনার জন্য বিষুব পুরস্কার লাভ করেন ১৯৮১ সালে।
নাটক—শেষ অশ্রু, রাজহংস, অথচ চাণক্য, অস্থির উপত্যকা।
গল্পের বই—গপ, কহা ললিতা, নিষিদ্ধ শ্রীনগর, কুতুরা নাম পিপাসা, তথাপি রাবণ ইত্যাদি। প্রেম
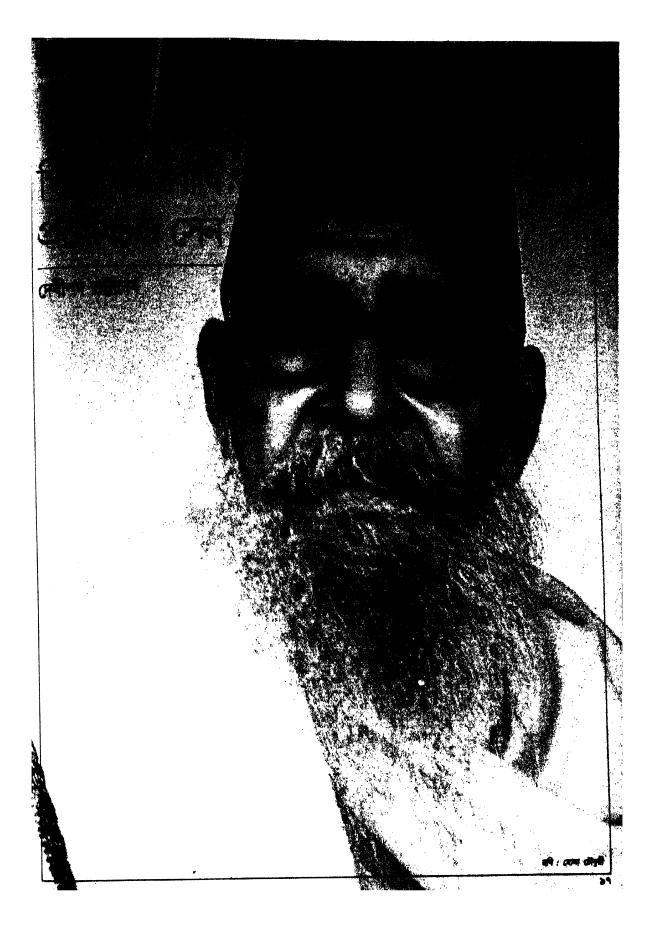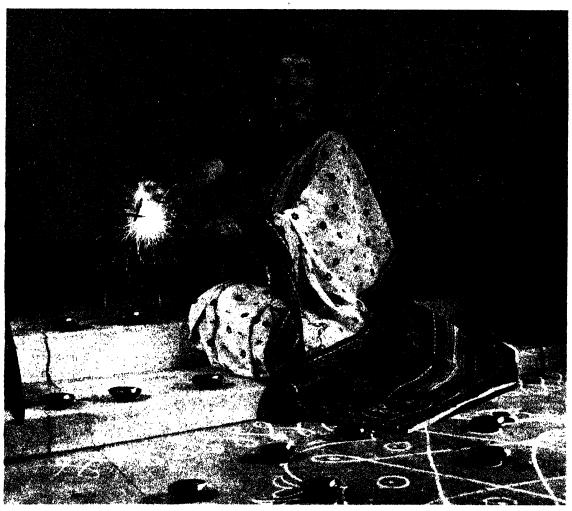
নব্বই বছরে পা ফেললেন গত ১৫ বৈশাখে (২৯ এপ্রিল '৮৬) আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন, আর বিগত তেসরা আশ্বিনে (২০ সেপ্টেম্বর, '৮৬) ঝরা-শেফালির ভোরে তিনি মর্ত্যবন্ধন ছিন্ন করলেন। যে-দেশে শিক্ষিত সমাজের বেশির ভাগ মানুষ অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধ বয়সে ধর্মকর্মের প্রতি ঝোঁকেন অথবা 'গুরু'ভক্ত হন কিংবা বিচারহীন ভক্তিকে আশ্রয় করেন পরলোকের সুখ-শান্তির কথা ভেবে, সেখানে প্রবোধচন্দ্র জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি ধ্রুববাদী (পজিটিভিস্ট) ছিলেন। কোনোরূপ আধি-দৈবিক 'সত্তা' বা 'শক্তি'কে স্বীকার করেননি। আমরা বহু ক্ষেত্রে ক্ষোভের সঙ্গে দেখেছি উনবিংশ বা বিংশ শতকে যাঁরা যৌবনে সদর্পে কিছুই মানতেন না, তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই পরে গোরা উপন্যাসের রূপান্তরিত 'কৃষ্ণদয়াল' হয়ে উঠেছিলেন। যাঁরা পুরোপুরি 'কৃষ্ণদয়াল' হননি, তাঁরাও অনেকে বহির্জাগতিক আধি-দৈবিক শক্তিকে মনে প্রাণে স্বীকার করেছেন। সাম্প্রতিককালে দেখছি যাঁরা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যশস্বী হয়েছেন, দীর্ঘকাল বিজ্ঞানের নানা শাখায় চর্চা রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে বিভিন্ন মতের 'ধর্মগুরু'র দেবত্ব বা অলৌকিকত্ব প্রচারে ও প্রমাণে তৎপর হয়েছেন। তার মূল কারণ তাঁরা বিজ্ঞানের চর্চা করেছেন কিন্তু জীবনের পটে প্রকৃত বিজ্ঞানকে নিবিড় করে ধরতে পারেননি, নিজেদের জীবনচর্যায় বিজ্ঞানকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেননি। সেইখানে প্রবোধচন্দ্র পেশাগত অর্থে বৈজ্ঞানিক না হলেও, তাঁর মন ছিল বিজ্ঞানসেবিত। তিনি বিজ্ঞানের বই পড়তে ভালোবাসতেন, কিন্তু পাঠ্যবিষয়রূপে পড়ার শেষে বইয়ের উঁচু তাকে তুলে রেখে কর্তব্যসমাধা করতেন না। তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য পড়তেন ঠিকই, কিন্তু বড়ো কথা হলো তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে নিজের জীবনে ও কর্মে অনূদিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যে ধ্রুববাদী যুক্তিবাদী মন আমরা উনবিংশ শতকে রামমোহন, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি যুগন্ধর মনীষীদের মধ্যে দেখি, ঐ শতকের শেষে জাত প্রবোধচন্দ্রের (জ· ১৮৯৭) মধ্যে তারই উজ্জ্বল ঐতিহ্যবহন প্রত্যক্ষ করি। এদিক থেকে তিনি যাঁর কথা প্রায়ই বলতেন, তিনি সেকালের বিদ্যাসাগর মহাশয়। আর একালে রাজশেখর বসু বা 'পরশুরাম'। তিনিও সর্বপ্রকার লোকাচার ও 'সংস্কার'-মুক্ত ছিলেন। 'যুক্তিহীন বিচারহেতু ধর্মহানি প্রজায়তে'—এই বাণী তাঁর জীবনে সত্য ছিল। প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে একবার রাজশেখর বসুর কিছু কথাবার্তা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে, রামায়ণ-মহাভারত অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে উভয়ের মধ্যে মতৈক্য ছিল। আমার মনে পড়ছে একবার রাজশেখর বসু একটি চিঠিতে ঈশ্বর প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রবোধচন্দ্রের মতকে সমর্থন করে লিখেছিলেন 'সাম্ কল্ ইট নেচার/ সাম্ কল্ ইট গড়্'। এটি রাজশেখর বসুর স্কুলজীবনে পঠিত একটি কবিতার দুটি চরণ। (চিঠিটি প্রবোধচন্দ্রের

যে ধ্রুববাদী যুক্তিবাদী মন আমরা উনবিংশ শতকে রামমোহন, অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ যুগন্ধর মনীষীদের মধ্যে দেখি, ঐ শতকের শেষে জাত প্রবোধচন্দ্রের (জঃ ১৮৯৭) মধ্যে তারই উজ্জ্বল ঐতিহ্যবহন প্রত্যক্ষ করি।
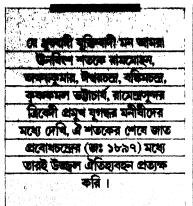
পত্র-সংগ্রহে রক্ষিত আছে।)

প্রবোধচন্দ্র তাঁর পিতা-মাতা গুরুজন শিক্ষক-অধ্যাপকদের যখন প্রণাম করতেন, তখন পা থেকে জুতো খুলে খালি পায়ে শ্রদ্ধাভরে তাঁদের পদ স্পর্শ করতেন। কিন্তু কোনো মূর্তি বা বিগ্রহকে প্রণাম করতেন না। তিনি ঈশ্বর, আত্মা, পরমাত্মা, পরলোক, স্বর্গধাম অথবা নরকে ঘোর অবিশ্বাসী ছিলেন। পূর্বজন্ম, কর্মফল মানতেন না। তাই তিনি তাঁর অন্তিম 'ইচ্ছাপত্র'-এ স্বহস্তে লিখেছেন, "আমার শবদেহের যেন কোনো ছবি তোলা না হয় আর দাহ সমাপ্তির পর যেন সামান্যতম ভস্মাবশেষও রাখা না হয়। প্রচলিত প্রথায় যেন 'মুখাগ্নি করা না হয়।···দেবীপদকে আমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র বলে মেনে নিয়েছি। সে-ই প্রথম অগ্নিসংযোগ করতে পারে।···আমার মৃত্যুর পরে যেন কোনো শাস্ত্রীয় বিধিবিধান বা প্রচলিত লোকাচার না মানা হয় এবং কোন প্রকার প্রার্থনা বা শ্রাদ্ধাদি ধর্মানুষ্ঠান না করা হয়। আমি যথেষ্ট দীর্ঘায়ু হয়ে পরম শান্তিতে ও আনন্দে জীবন কাটিয়ে দিয়েছি।" চিত্তের এই শক্তি ও মনের এই প্রশান্তি যিনি বহন করেছেন তাঁর স্মরণে গীতার ভাষায় বলতে পারি:

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥

(২য় অধ্যায় ॥ ৫৬ ॥)

ঠিকুজি-কোষ্ঠী, করেরেখা-বিচার, গ্রহতুষ্টির জন্য পলা-গোমেদ ধারণ প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে তিনি ব্যঙ্গকৌতুক করতেন। জীবনাচরণে তিনি স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভেদরেখা মুছে দিয়েছিলেন তখনকার দিনের রক্ষণশীল 'দৌলতপুর হিন্দু অ্যাকাডেমি'র মতো কলেজে চাকরি করেও। তপশিলীভুক্ত ছাত্রদের সঙ্গে নিজগৃহে আহার করতেন, পাচকও নিম্নবর্ণের। মুসলিম ছাত্ররাও 'অবাধে' তাঁর গৃহে অভ্যর্থিত হতো। সেটা কর্তৃপক্ষের ভালো লাগত না। কিন্তু এই বলিষ্ঠ উদারতা, সকল ভেদচিহ্নের তিলক মুছে ফেলাই প্রবোধচন্দ্রের চরিত্রের তেজস্বী রূপকে চিনিয়ে দেয়। মানুষকে নিয়ে যে মাটির পৃথিবী তাই তাঁর কাছে স্বর্গ ছিল। এই কিছুদিন আগে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'সময়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে, হাতের কাজ সব শেষ করে যেতে হবে। তারপর স্বর্গ হইতে বিদায়'। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'জন্মেছি যে মর্ত্যকোলে ঘৃণা করি তারে/ ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে' (আত্মসমর্পণ সোনার তরী)। প্রবোধচন্দ্র সারা জীবন ভরে এই শ্লোক উদাত্তকণ্ঠে উচ্চারণ করে গেছেন। সে-জন্যই জীবনের অন্তিম লগ্নে তিনি 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে' ধরনের 'আধ্যাত্মিক' সংগীত তাঁর শেষ যাত্রায় বা আয়োজিত স্মরণসভায় গীত হতে নিষেধ করে গেলেন—যেন বলে গেলেন 'আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন'। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'ধর্ম মোহ' (১৩৩৩ : ১৯২৬) কবিতার—

নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।—

অংশটিকে খুবই মূল্যবান বলে মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই আদর্শকে রূপ দিয়েছেন 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে জ্যাঠামশাই 'জগমোহন' চরিত্রে। 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশ এবং 'যোগাযোগ'-এর বিপ্রদাস সেই পথের পথিক।

তবে যদি প্রশ্ন ওঠে কোনো ধর্মেই কি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না, আস্থা ছিল না ? তার উত্তরে বলতে পারি তাঁর শ্রদ্ধা দেখতে পাই বৌদ্ধধর্মের প্রতি। নাকি বলা উচিত মানবকল্যাণকর বুদ্ধবচনের প্রতি, 'ধম্মপদ'-এর প্রতি, শ্রেষ্ঠ মানবরূপে বুদ্ধদেবের প্রতি। রবীন্দ্রনাথও বুদ্ধদেবকে তাঁর জীবনের বরণীয়তম পুরুষরূপে বন্দনা করেছেন। জীবনে তিনি একবার মাত্র কোনো মূর্তির সম্মুখে প্রণত হয়েছেন, সে-মূর্তি বুদ্ধদেবের। প্রবোধচন্দ্র তাঁর ঘরে বুদ্ধদেবের ছবি টাঙিয়ে রেখেছেন, বুদ্ধমূর্তিকে পড়ার টেবিলে, কাঁচের আলমারিতে। বৈশাখী পূর্ণিমায় (বুদ্ধ পূর্ণিমায়) বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব পালন করতেন। ১৯৩৯ সালে দৌলতপুরে আমি তাঁর বাড়িতে বুদ্ধজন্মোৎসবে যোগ দিই। রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে পাঠ ও আবৃত্তির পর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'মৈত্রী করুণার মন্ত্র দিতে দান' কবিতাংশটি এবং শেষে 'ধম্মপদং' থেকে কয়েকটি নির্বাচিত শ্লোক পড়া হয়। তিনি 'ধম্মপদ' নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫৫, শ্রাবণ-আশ্বিন ; পূর্বাশা, ১৩৫৫, কার্তিক) পরে তাঁর 'ধম্মপদ-পরিচয়' (১৯৫৩) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'ধম্মপদ'-এর নির্বাচিত শ্লোক উৎকলন করে, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ তিনি সুস্পষ্টরূপে দেখান 'উপনিষদ' বা 'ভগবদ্‌গীতা'র বিভিন্ন শ্লোকের সঙ্গে তাদের কী নিবিড় মিল। অর্থাৎ ধম্মপদে সংকলিত এই বুদ্ধবচনগুলির মধ্যে যে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে তা 'সেক্টারিয়ান' বা কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মমত নয়। 'রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি' নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ তিনি 'দেশ' পত্রিকায় (১৩৫১) ও 'জগজ্জ্যোতিঃ' পত্রিকায় (১৩৫৭) প্রকাশ করেন। পরে তাঁর গবেষক ছাত্র ডক্টর সুধাংশুবিমল বড়ুয়াকে দিয়ে 'রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি' নামক অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন করান। প্রকাশিত গ্রন্থে তাঁর লিখিত ভূমিকাটি এই সূত্রে অবশ্য পাঠ্য। তেমনি তাঁর ছিল

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সম্রাট অশোকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক বৃত্তি নিয়ে কাজ করার সময়ে ১৯২৯ সালে তিনি 'কপিলেশ্বর ভার্সান অব অশোকস্ রুম্মিনদেই ইনসক্রিপশন্—অ্যান অ্যানটিসিপেশান' নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন সেটি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অশোক সম্পর্কে তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'অশোকের ধর্মনীতি' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫০, শ্রাবণ) ও 'রবীন্দ্র দৃষ্টিতে অশোক' (বৈশাখ, ১৩৫১) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (শেষের প্রবন্ধটি তাঁর 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে) অশোক সম্পর্কে তাঁর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হল 'ধর্মবিজয়ী অশোক' (১৩৫৪)। আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ বই। 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি' বিভাগে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকছাত্ররূপে তিনি ১৯২৮—৩২ কালপর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত থাকেন। এই ১৯৩২ সালে তিনি খুলনা জেলার 'দৌলতপুর হিন্দু অ্যাকাডেমি' কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। দুনিয়াব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা-র যুগ। তখন চাকরি পাওয়াই কঠিন ছিল। ইতিহাস ও বাংলা উভয় বিষয়ে অধ্যাপনা করবেন এই শর্তে তিনি ঐ চাকরি পান। শুনেছি তাঁর বাংলা পড়াবার যোগ্যতা সম্পর্কে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বাসস্থানের ব্যবস্থা কলেজ কর্তৃপক্ষ করেন। মাসিক বেতন যা পেতেন, তখনকার দিনের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যমানের অনুপাতে (১৯৩৯ সাল পর্যন্ত) তা দিয়ে সংসারের প্রয়োজন কুলিয়ে যেত। নিয়ম করে প্রতিমাসে বই কিনতেন, প্রবাসী, মডার্ন রিভিউ, বিচিত্রা পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। দৈনিক পত্রিকা নিতেন 'আনন্দবাজার' আর টিচার্স কমনরুমে বসে ইংরেজি কাগজগুলি পড়তেন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করতেন। তাঁর প্রিয় পত্রিকা ছিল কিংসলে মার্টিন সম্পাদিত 'নিউ নেশন অ্যাণ্ড স্টেটস্‌ম্যান'।

তাঁর পড়াবার পদ্ধতি ছিল তুলনামূলক। গ্রীসের ইতিহাস পড়াবার সময়, তার সুপ্রাচীন পর্বের সঙ্গে ভারতের সিন্ধুসভ্যতার, মিশরীয় অ্যাসিরীয় সভ্যতার কখনো বা প্রাচীন চীনের ইতিহাস পর্যালোচনা করতেন। সোলোন বা ক্লাইস্‌থেনিসের শাসন-সংস্কার সম্পর্কে আলোচনার সময় ছুঁয়ে যেতেন কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'। অথবা অ্যাথেনস্-এ পেরিক্লিসের রাজ্যকাল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নিয়ে আসতেন গুপ্তযুগের সমুদ্রগুপ্ত-দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের কাল। কিংবা অগাস্টান যুগ। এইভাবে ছাত্রদের মনে ঔৎসুক্যের সঞ্চার করে দিতেন। আমাদের পাঠ্য ছিল বেরি-র গ্রীক ইতিহাসের ছোট বইটি। কিন্তু তিনি পড়াতেন বড়ো বইটি ধরে। দেয়ালে টাঙানো থাকত ম্যাপ। তার সাহায্যে পড়াতেন। প্রথমে পাঠ্যবিষয়টি বাংলায় বলে দিতেন। তারপর পড়াতেন ইংরেজিতে। পরীক্ষার উত্তরপত্রে বক্তব্য ইংরেজিতে লিখতে হোত। বি· এ· ক্লাসে পড়াতেন ভারতবর্ষের ইতিহাস। তখন ভিনসেন্ট স্মিথের বই পাঠ্য ছিল। এ বিষয়েও তিনি তুলনামূলকভাবে পড়াতেন। স্মিথের অনেক মতের বিরোধিতাও করতেন যুক্তি দিয়ে তথ্য দিয়ে। তুলনামূলক ধারার ইতিহাস পড়াতেন সেজন্য ছাত্রদের বিশ্বইতিহাসের সঙ্গে এক ধরনের যোগ ঘটে যেত। ইতিহাস যে নীরস তথ্যপুঞ্জ মাত্র নয়, সেও যে কতো জীবন্ত হতে পারে, তাঁর অধ্যাপনাগুণে আমরা এই সত্যটি উপলব্ধি করতে শিখেছিলাম। গ্রীসের বিখ্যাত পেলোপনেশিয়ান্ যুদ্ধ যখন বর্ণনা করতেন তখন যেন মহাকাব্যের স্পর্শ পেতাম। যখন বাংলা সাহিত্য পড়াতেন তার মধ্যে তুলনামূলক পদ্ধতি দেখা দিত। 'সাজাহান' নাটক পড়াবার সময় তুলে ধরতেন শেকস্‌পীয়রের 'কিং লীয়র' আর 'মানসী' কাব্যের কবিতা পড়াবার সময় কখনো ব্রাউনিঙ্ কখনো বা কালিদাস। বাংলা ছন্দ পড়াবার সময় স্বতঃই এসে যেত ইংরেজি ও সংস্কৃত ছন্দের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা।

কিন্তু ক্লাসের চেয়ে ক্লাসের বাইরে তিনি পড়াতেন বেশি। ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বস্তুবাদী দর্শন সম্পর্কে তিনি ছাত্রদের সঙ্গে খোলা মনে আলোচনা করতেন বন্ধুভাবে। তখনকার দৌলতপুর কলেজকে বামপন্থী রাজনীতির ঝটিকা কেন্দ্র বলা চলে। সেই ঝটিকা কেন্দ্রের মুখ্য নায়কেরা তাঁর সঙ্গে নানা রাজনৈতিক প্রসঙ্গে আলোচনা করতেন, তাঁদের প্রতি প্রবোধচন্দ্রের সস্নেহ প্রশ্রয় ছিল। এজন্য গোয়েন্দা পুলিসের তাঁর প্রতি নজর ছিল। ১৯৪১-এ ভারতরক্ষা আইনে আমি যখন কুখ্যাত হাড়সনের (পেডি, লোম্যান গোষ্ঠীর) হাতে গ্রেফতার হই, হাড়সন আমাকে জেলে প্রবোধচন্দ্র সেনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিল। পরবর্তীকালে দেখেছি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে যখন অনুপুঙ্খ আলোচনা করতেন, সেখানে তাঁর মতের মিল লক্ষ করতাম অতুলচন্দ্র গুপ্তের মতামতের সঙ্গে। তিনি অতুলচন্দ্র গুপ্তকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন তাঁর নির্ভীক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য। অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রবোধচন্দ্রকে বিশেষ মান্য করতেন।

প্রবোধচন্দ্রের রচনা মূলত তিন বর্গের: ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথ ছন্দ। তিন বর্গেই তাঁর রচনা 'সিগনিফিক্যান্ট' অর্থাৎ তাৎপর্যপূর্ণ। এদের প্রত্যেকটি প্রসঙ্গ নিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ রচিত হতে পারে। এখানে তার প্রয়োজন নেই। বঙ্গ তথা ভারতের ইতিহাসচর্চার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা পাঠের মধ্য দিয়ে। ১৯০৫-০৮-এর 'স্বদেশী' আন্দোলনে তাঁর বালক মনে যে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়েছিল, তাই তাঁকে উদবুদ্ধ করে বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দের রচনা পাঠে। ১৩৩৭ সালে তাঁর যে ছোট বইটি 'বাংলায় হিন্দু রাজত্বের শেষ যুগ' বার হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল মিনহাজউদ্দীনের 'তবকাত্-ই নাসিরি' গ্রন্থের ভুল দেখিয়ে দেওয়া। বঙ্কিমচন্দ্রও মিনহাজউদ্দীনকে স্বীকার করেননি। 'বাংলার ইতিহাসের আদিকথা' (১৩৩৯), 'বাংলায় আর্যসভ্যতা বিস্তার' (১৩৪০) বা 'প্রাচীন বাংলার জনপদ পরিচয়' (১৩৫৩) প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বহু অজ্ঞাতপূর্ব তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। অনেক জ্ঞাত তথ্যের ভ্রান্তি নিরসন করেছেন যেমন তাঁর 'বাংলার সন' (১৩৫২)। বঙ্গের ইতিহাস-চর্চার ক্রমবিবরণ ও বিশ্লেষণ বা 'হিস্ট্রিওগ্রাফি' তিনিই প্রথম রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থ 'বাংলার ইতিহাস সাধনা' (১৯৫৩) তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। ভারতবর্ষের ইতিহাস-প্রসঙ্গ নিয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন, তাদের মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব ও ভাগবতধর্ম' (১৩৪৪), 'প্রাচীন ভারতে ইতিহাস-চর্চা' (১৩৪৭), 'প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধ' (১৩৫৫), 'ধর্মরাজ অশোক ও যুধিষ্ঠির' (১৩৬৪), 'অশোকানুশাসন ও মহাভারত' (১৩৬৫) প্রভৃতি রচনাগুলি অদ্যাবধি তাদের প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। প্রাচীন ভারতের সাহিত্য বিশেষত 'রামায়ণ' ও কালিদাস নিয়ে মৌলিক গবেষণা করেছেন। 'রামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি' (১৯৬২) এবং 'ভারতাত্মা কালিদাস' (১৯৭৩) গ্রন্থ দুখানি রামায়ণ-চর্চা ও কালিদাস-চর্চার পথে কাল্লোজহ্যয়ং নিরবধি দীপবর্তিকার ন্যায় বিরাজ করবে।

রবীন্দ্র-চর্চায় তাঁর কৃতিত্ব বিশেষভাবে ধরা পড়েছে রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনাগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে। এদের তিনি নাম দিয়েছিলেন 'ভোরের পাখি'। 'মালতী পুথি' থেকে ও জীর্ণ পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে তিনি বহু নতুন তথ্য আমাদের সামনে ধরে দিয়েছেন। প্রবোধচন্দ্রের পদ্ধতি ছিল যখন যখন বাইরে থেকে তথ্যসিদ্ধ প্রমাণের অপেক্ষাকৃত অভাব দেখা দিত, তিনি জোর দিতেন ভিতরকার সাক্ষ্য অর্থাৎ 'ইনটারন্যাল এভিডেন্স'-এর উপর। এইভাবে তিনি নিজে অনেক আপাতজটিল সমস্যার সমাধান করেছেন, আমরাও তাঁর নির্দেশিত পথে পা বাড়িয়ে সুফল পেয়েছি।

'রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা' ও 'রবীন্দ্রভাবনায় নারায়ণ' প্রবন্ধ দুটিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে যে দাঁড়িয়ে আছে 'মানুষ' এবং 'মানুষের নারায়ণ'-এই যে তিনি শেষ নমস্কার নিবেদন করে গেছেন, এই সিদ্ধান্ত যথোচিত তথ্য ও ব্যাখ্যা সহ তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন।

'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা' বইটি রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে প্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশে অশিক্ষার মরুভূমির জন্য যে ক্ষোভ বহন করেছেন, শিক্ষার হেরফের ঘুচিয়ে দেবার যে পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন যে শিক্ষাদর্শ ঘোষণা করে গেছেন, কোথায় তার মৌলিকতা বা স্বকীয়তা, তিনি পরিচ্ছন্নভাবে আলোচনা করেছেন সহজ ভাষায়।

কিন্তু তাঁর অতুলনীয় গ্রন্থ হল 'ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত' তথা 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল অ্যানথেম' গ্রন্থদ্বয়। বই দুটি শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের পক্ষে 'পূর্বাশা লিমিটেড' কর্তৃক প্রকাশিত হয় (১৩৫৬/১৯৪৯)। এরকম একটা ধারণা স্বার্থান্বেষী মহল তথা রবীন্দ্র বিদ্বেষীগোষ্ঠী থেকে প্রচারিত হয়েছিল যে এই সংগীত স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীতরূপে স্বীকৃত হতে পারে না কেননা, এই সংগীত নাকি পঞ্চম জর্জের ভারত আগমন (১৯১১) উপলক্ষে রচিত। প্রবোধচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, চিঠিপত্র, স্বদেশপ্রেমী তৎকালীন কর্মীদের স্মৃতিকথা, প্রত্যেকটি দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য ও মন্তব্য উপস্থাপিত করে এই মিথ্যাচারণের নির্লজ্জ মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে সংগীতটিকে তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রবোচন্দ্র তাঁর ছন্দ-চর্চার ভূমিকা হিসেবে লিখেছেন—

'আমি যখন ছন্দ আলোচনায় প্রবৃত্ত হই তখনও আমাদের সাহিত্যে প্রণালীবদ্ধ ছন্দ-ব্যাকরণ রচনার সূত্রপাত হয়নি। তার আগে অবশ্য শশাঙ্কমোহন সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই চার কবির কয়েকটি প্রবন্ধে বাংলা ছন্দের উপরে নানাদিক থেকে আলোকপাতের প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু কোনোটিতেই সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বাংলা ছন্দের সামগ্রিক পরিচয় দেবার অভিপ্রায় লক্ষিত হয়নি। এই অতৃপ্তিই আমাকে প্রণালীবদ্ধ ছন্দ-ব্যাকরণ রচনার প্রবর্তনা দান করে।'

কৈশোর কাল থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ ৬৪ বৎসর তিনি ছন্দ-চর্চা করেছেন। 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩২৯ সালে পৌষ সংখ্যায় তাঁর 'বাংলা ছন্দ' প্রকাশিত হয় (রচনাকাল ১৩২৮ ফাল্গুন) তখন তিনি সিলেটে মুরারিচাঁদ কলেজের ছাত্র। আর মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণের সম্পাদনা শেষ করে পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে গেছেন। তাঁর 'বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ' (১৩৩৮ ভাদ্র) প্রবন্ধের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'বাংলার ছন্দ' (বিচিত্রা ১৩৩৮ পৌষ) এবং ছন্দের হসন্ত-হলন্ত (পরিচয় ১৩৩৮ মাঘ) প্রবন্ধ দুটি লেখেন। রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রতিবাদে প্রবোধচন্দ্র লেখেন 'ছন্দ জিজ্ঞাসা' নামক তিনটি প্রবন্ধ (বিচিত্রা, ১৩৩৮-১৩৩৯)। এই উপলক্ষে বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছুকাল ধরে যে ছন্দবিতর্ক দেখা দেয় তার পরিচয় রয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থে (প্রবোধচন্দ্র সম্পাদিত সংস্করণ ১৩৬৯), দিলীপকুমার রায় রচিত 'স্মৃতিচারণ' (২য় খণ্ড ১৯৬২) প্রভৃতি গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথের ৭০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে যে 'জয়ন্তী উৎসর্গ' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, সেই উপলক্ষে তিনি 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' প্রবন্ধটি লেখেন। প্রথম যুগে তিনি অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত—এই পরিভাষাই গ্রহণ করেছিলেন। পরে 'অক্ষরবৃত্ত'-এর স্থলে 'যৌগিক' শব্দ ব্যবহার করেন। পরে বদলে বদলে এসে পৌঁচেছেন 'মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত'-এ। এই পরিবর্তিত নামকরণ দীর্ঘ দিনের সুচিন্তার ফসল। তাঁর ছন্দ-গ্রন্থগুলির নাম এখানে উল্লেখ করা হল, বিস্তৃত আলোচনা করা হল না—

২· ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ (১৯৪৫)। মৃত্যুর পূর্বে আদ্যন্ত পরিমার্জিত করে রেখে গেছেন।

৩· ছন্দ (রবীন্দ্রনাথ) সম্পাদিত পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সং ১৯৬২

৪· ছন্দ পরিক্রমা (১৯৬৫)

৫· ছন্দ জিজ্ঞাসা (১৯৭৪)

৬· ছন্দ (রবীন্দ্রনাথ) পুনর্বিন্যস্ত ও পরিবর্ধিত সম্পাদনা ১৯৭৬

৭· বাংলা ছন্দ সমীক্ষায় (১৯৭৭) দীর্ঘ প্রবন্ধ।

৮· ছন্দ পরিক্রমা (নূতন) প্রথম খণ্ড ১৯৭৪

৯· বাংলা ছন্দ চিন্তার ক্রমবিকাশ (১৯৭৮) প্রবোধচন্দ্র একাই একশো হয়ে বাংলা ছন্দ শাস্ত্রকে গড়ে দিয়ে গেলেন।

এবার একটি অনতিজ্ঞাত তথ্য স্থাপন করি। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' কাব্যের এক দীর্ঘ সপ্রশংস আলোচনা করেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায়। 'কবিতা' পত্রিকা থেকে সরে এসে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য 'নিরুক্ত' নামে কবিতাপত্র প্রকাশ করেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রবোধচন্দ্রকে অনুরোধ করেন তিনি যেন সুভাষের ছন্দ-ব্যবহারের দোষগুলি দেখিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবোধচন্দ্র বিপরীত কাজ করলেন, আমার কাছ থেকে পদাতিক বইটি নিয়ে তিনি সুভাষের ছন্দোনৈপুণ্যের প্রশংসা করে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন 'বাংলা ছন্দের নতুন সম্ভাবনা' নামে। 'নিরুক্ত' পত্রিকা ঐ প্রবন্ধ ছাপতে অস্বীকার করে। তখন 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রবন্ধটি ছাপা হয় (১৩৪৮, ফাল্গুন)। নতুনদের অভিনন্দন জানাতে তিনি দ্বিধা করেননি। তাঁর শেষ বই 'নূতন ছন্দ পরিক্রমা' (আনন্দ পাবলিশার্স জানুয়ারি ১৯৮৬) তাঁর মহত্তম কীর্তি বলে পরিগণিত হবে।

এই অ-সাধারণ ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রের অধিকারী প্রবোধচন্দ্র ১৩০৪ সনের ১৫ বৈশাখ (২৭ এপ্রিল ১৮৯৭) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের বাড়ি ছিল কুমিল্লা জেলার 'চুণ্টা' গ্রামে। তাঁর পিতা হরদাস সেন, মাতা স্বর্ণময়ী সেন। তাঁদের দেখবার ও কিছু সেবা করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁরা ধনী ছিলেন না, প্রবল বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁদের চার ছেলে—প্রবোধচন্দ্র, সুবোধচন্দ্র, প্রমোদচন্দ্র ও সুধীরচন্দ্র। সুধীরচন্দ্র (ডাক নাম শম্ভু) স্টেটস স্কলারশিপ নিয়ে জার্মানীতে অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা করেন ও 'বন' বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। পরে তিনি বিশ্বভারতী-শ্রীনিকেতনে যোগ দেন। রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংগঠনের পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণের বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি সুন্দর বই লিখেছেন ইংরেজিতে। তিনি জওহরলাল নেহরুর আস্থাভাজন এবং মস্কোতে ভারতীয় দূতাবাসের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। পরে ইউ· এন· ও-র পদস্থ কর্মী হয়ে অবসরগ্রহণ করেন। এখন আমেরিকা প্রবাসী। প্রবোধচন্দ্রদের ভগিনী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে প্রবোধচন্দ্রের সংবর্ধনা — ছবি : বি. এন. সিনহা

কল্যাণী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের স্কুল পরিদর্শিকা ছিলেন বলে জানি।

প্রবোধচন্দ্র প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডিয়েট উভয় পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করেন। কিন্তু তিনি শুধু মেধাবী ছাত্র ছিলেন না, দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচন তাঁর যৌবনের স্বপ্ন ও সাধনা ছিল। ১৯০৫ সালে ১৬ অক্টোবর (১৩১২ সন ৩০ আশ্বিন) কার্জনী বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হয়। তার প্রতিবাদে বঙ্গদেশ জুড়ে রাখীবন্ধন, অরন্ধন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-রচিত 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' পাঠ আরম্ভ হয়। সেদিন রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'বাংলার মাটি বাংলার জল' এবং নিজে সে গান গাইতে গাইতে হিন্দুমুসলমানের হাতে 'রাখী' বাঁধেন। প্রবোধচন্দ্রের বয়স তখন আট বৎসর মাত্র। সেই বালক প্রবোধচন্দ্র সারাদিন উপবাসী থেকে অপরাহ্ণের বিরাট জনসভায় আবৃত্তি করেন 'বাংলার মাটি বাংলার জল'। সেই প্রদীপ্ত

দেশানুরাগ, দেশপ্রীতি তাঁর যে কত দূর প্রবল-গভীর ছিল তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর শেষ 'ইচ্ছাপত্র'-তে—

"আমার মৃত্যুকালে আমার কপালে যেন খানিকটা মাটি মাখিয়ে দেওয়া হয়। তখন গাওয়া হবে 'ও আমায় দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা' গানটি।"

সেই সঙ্গে আমি জানি তিনি সেকালের গুপ্তসমিতি 'অনুশীলন সমিতি'র সক্রিয় সভ্য ছিলেন। 'অনুশীলন সমিতি' সম্পর্কে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখেছেন—

"ভারতের বিপ্লববাদ উনিশ শতকে মহারাষ্ট্রে আরম্ভ হইলেও ঐ প্রদেশের বাহিরে বেশী প্রচার হয় নাই। বিংশ শতকের প্রথমে বঙ্গ বিভাগের প্রতিবাদে বঙ্গদেশে যে বিপ্লববাদের সূত্রপাত হয় তাহাই ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হইয়া মুক্তিসংগ্রামের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। বঙ্গদেশের বিপ্লববাদের প্রথম ও প্রধান প্রতিষ্ঠান ছিল 'অনুশীলন সমিতি'।"

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', 'বন্দেমাতারম্‌' সংগীত ও 'অনুশীলন', 'ধর্মতত্ত্ব' বঙ্গের বিপ্লবীদের উদ্বোধিত করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দের তেজস্বী আহ্বান 'জন্ম হইতেই মহামায়ার নিকট বলিপ্রদত্ত' তাদের আত্মদানে অনুপ্রাণিত করেছিল। তার সঙ্গে মিশেছিল ভগবদ্‌গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ।

অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক ও কর্মসচিব ছিলেন সতীশচন্দ্র বসু। ১৯০২ সালে দোলপূর্ণিমার (২৪ মার্চ) দিন (১৩০৮ সাল ১০ চৈত্র) কলকাতায় প্রথম অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়। নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের প্রধান শিক্ষক নরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য এই সঙ্ঘের নামকরণ করেন 'ভারত অনুশীলন সমিতি'। পরে বিপ্লবীদের নেতা ব্যারিস্টার পি· মিত্র (প্রমথনাথ মিত্র, ১৮৫৩—১৯১০) তাকে সংক্ষিপ্ত করে নাম দেন 'অনুশীলন সমিতি'। পি· মিত্রই পূর্ব বঙ্গে গিয়ে ঢাকায় বিখ্যাত লাঠিয়াল পুলিন দাসের সহায়তায় বিভিন্ন জেলায় 'গুপ্ত সমিতি' গঠন করেন। ১৯০৮ সালে ব্রিটিশ সরকার এই সমিতিকে বে-আইনী ঘোষণা করেন। আমরা জানি এই ১৯০৮ সালে ১১ অগস্ট ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হয়। 'অনুশীলন সমিতি' থেকে বিপ্লবী দল 'যুগান্তর' গড়ে ওঠে।

ঐ গোষ্ঠী যে পত্রিকা বার করেন তার নাম 'যুগান্তর' (মার্চ, ১৯০৬)। স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও মার্কসীয় চিন্তাবিদ) এই পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক রচনা প্রকাশের জন্য রাজরোষে পতিত ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই পত্রিকা পরবর্তীকালেও চলেছিল। প্রবোধচন্দ্র 'আত্মশক্তি', 'যুগান্তর' 'বেণু' প্রভৃতি বিপ্লবীগোষ্ঠী পরিচালিত পত্রিকার লেখক ছিলেন।

'অনুশীলন সমিতি'র সক্রিয় কর্মী ছিলেন বলে প্রবোধচন্দ্র রাজদ্রোহের অপরাধে নির্যাতিত ও অন্তরায়িত (ইনটার্নড) হন। তাঁকে পরে বঙ্গদেশ ছেড়ে আসামে গিয়ে সিলেটে মুরারিচাঁদ কলেজে লেখাপড়া করতে হয়। ঐ কলেজে তিনি ইতিহাসে অনার্স নিয়ে পড়েন। ১৯২৭ সালে 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি' বিষয়ে এম· এ· পাস করেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে। ১৯২৮—৩২ কালপর্বে ডি· আর· ভাণ্ডারকরের পরিচালনাধীনে গবেষণাকর্ম শুরু করেন। তাঁর যে লেখাপড়া শেষ করতে এত দেরী হল তার প্রধান কারণ রাজনৈতিক। দ্বিতীয় কারণ তিনি অনেক কষ্ট করে নিজের উপার্জনে পড়েছেন, কখনো আনন্দবাজার পত্রিকায়, অথবা গৃহশিক্ষকতায়, ছোটখাটো কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন কিন্তু কখনো কারো কাছ থেকে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করেননি।

প্রবোধচন্দ্র চিরদিনই কৌতুকরস সঞ্চারে সিদ্ধবাক্‌। সংস্কৃত অলংকারে যাকে বলা হয় 'শ্লেষ', সেই বুদ্ধিস্নাত 'পান' প্রয়োগে তিনি নিজে খুব মজা পেতেন কেননা সে তো নির্মল আনন্দ। এই রঙ্গরস বা কৌতুক সৃষ্টিতে তাঁর সমকক্ষ ছিলেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন। প্রমথ চৌধুরীর ভক্ত, শিষ্য ও বাক্‌পটু হারীতকৃষ্ণ দেব হার স্বীকার করে গেছেন প্রবোধচন্দ্রের কাছে। তিনি কথা নিয়ে খেলা করতে ভালো বাসতেন। এবং সেই রসিকতা উপভোগক্ষম ব্যক্তিকে সমাদর করতেন। প্রায় তিরিশ বছর আগে একদিন তাঁর খোয়াই-এর ধারের বাড়িতে গেছি, তিনি আমাকে গম্ভীর মুখে বললেন, 'এদিকে সরে এসো। তোমার জননী যে এ বাড়িতে এক কালশাপ পুষছেন সে খবর রাখো?' আমি তাকিয়ে দেখলাম তিনি কলা আর দুধ খাচ্ছেন বড়ো বাটিতে করে। আমি বললাম, 'সে তো ১৯২৫ সাল থেকেই পুষে আসছেন, এ আর নতুন কী?' প্রবোধচন্দ্র উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন—'সুরসিকেষু রসস্য নিবেদনং'। রুচিরা দেবী হেসে বললেন, 'ছেলের কাছে কেমন জব্দ!' একদিন হিরণকুমার সান্ন্যাল মহাশয়ের স্ত্রী রুচিরা দেবীর খবর জিজ্ঞাসা করায় প্রবোধচন্দ্র বললেন—'তিনি এখন ঝিনাইদহে, পাকিস্তানে।' তখন ১৯৫০ সাল। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুবিদ্বেষী গোষ্ঠীরা মারমুখী। হিরণবাবুরা খুব উদ্‌বিগ্ন হলেন, পাকিস্তানে পাঠাবার জন্য তিরস্কার করতে লাগলেন। তখন বাধ্য হয়ে প্রবোধচন্দ্র ব্যাখ্যা করে বোঝালেন যে 'পাক' করার অর্থ রান্না করা, অর্থাৎ রুচিরা দেবী এখন রান্না ঘরে আছেন এবং এক সপ্তাহ ধরে কাজের মেয়েটি অর্থাৎ 'ঝি' না আসায় যেন দহে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন। তখন হাসাহাসির পালা।

আরেকবার অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের পত্নীকে রাগিয়ে দেবার জন্য বলেছিলেন—'আপনার তো দুই সতীন'। বিজনবাবুর পত্নী প্রথমে বিব্রত পরে বেশ ক্রুদ্ধ হলেন এবং এই ধরনের অপবাদের প্রতিবাদ করতে লাগলেন। প্রবোধচন্দ্র বললেন, 'আমরা তো সেরকমই জানি।' পরে দেখলেন ব্যাপারটি জটিল হয়ে যাচ্ছে তখন হেসে বললেন, 'আপনার কাঁকুলিয়া রোডের বাড়ির ঠিকানা তো ২০৩ (দুইশো তিন)। তারপর সকলে মিলে মজার হাসি।

প্রবোধচন্দ্রের আশী বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষে তিনি ছাত্র, বন্ধু আত্মীয়বর্গকে যে শুভেচ্ছা ও প্রীতিবহ কার্ড পাঠিয়েছিলেন তাতে স্বরচিত একটি কবিতায় কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সুপরিচিত কবিতার দুটি পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করেছিলেন কৌতুহভরে—

'কী যাতনা বিশে/বুঝিবে সে কিসে
কভু 'আশী'বিষে দংশেনি যারে!'

এই প্রসঙ্গে নিজের কথা একটু বলি। একবার আমার লেখা 'রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' (প্রবোধচন্দ্রের সত্তর বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বইটি তাঁকে উৎসর্গ করি) থেকে এক ব্যক্তি বহু তথ্য গ্রহণ করেন কিন্তু কোথাও তার কোনো স্বীকৃতি ছিল না। আমি তাঁকে এ-কথা জানালে বললেন, 'করেছে'। আমি অবাক হলাম। তিনি হেসে বললেন, "স্বীকার করেনি তবে 'শিকার' করেছে।

এই ধরনের কতো কৌতুক-কণা যে ছড়িয়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই। এই কৌতুক রসে তিনি নিজেকে সঞ্জীবিত রাখতেন, অপরের দুঃখভার লাঘব করতেন, জীবনের দম ও দাম বাড়িয়ে দিতেন। কখনো কখনো চিঠির মধ্যে দ্বিপদী, চৌপদী রচনা করে চিঠিকে সাহিত্যরস সিঞ্চিত করে তুলতেন—তাঁর সকল পত্র-প্রাপক এর সাক্ষ্য দেবেন। আমার কাছে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—

'একে তো প্রচণ্ড শীতে সব সময় আড়ষ্ট হয়ে থাকি। চিঠিপত্র লেখাও কষ্টকর, হাত চলে না। তাতেও অবিশ্রান্ত চলছে নানা কাজের চাপ। অবাঞ্ছিত কাজ, কিন্তু এড়ানোরও উপায় থাকে না। তাই মন খারাপ। বড়ো দুঃখে মনে একটা ছড়া তৈরি হয়ে গেছে—

মাথায় পড়ছে অবিশ্রান্ত
খুচরো কাজের উল্কা যে,
সময় করে পারছি না তো
মন বসাতে মূল কাজে।
(১২-১-১৯৭৮)

প্রবোধচন্দ্র খুব ভোরে উঠতেন। তাঁর সঙ্গে থেকে দেখেছি যত সকালেই ঘুম ভাঙুক, তিনি তার আগে উঠে পড়ে বেড়াবার জন্য তৈরি হচ্ছেন বা বেরিয়ে গেছেন। দৌলতপুরে ও শান্তিনিকেতনে রোজ অন্তত দু মাইল হাঁটতেন। আমি দু জায়গাতেই তাঁর ভ্রমণসঙ্গী হয়েছি। এই সময় তিনি গাছপালা ফুল ফল নিয়ে কথা বলতেন। কোনটি কোন বর্গের গাছ, পাতা, ফুল, আগাছা সবারই খুঁটিয়ে বর্ণনা দিতেন উদ্‌ভিদতত্ত্বের বিশেষজ্ঞের মতো। আমাদের দৌলতপুর কলেজের 'বটানি'র অধ্যাপক বলতেন প্রবোধচন্দ্র ক্লাসে 'বটানি' পড়ালে ভালো হোত। নিজে যা ছাত্র হিসেবে পড়তে পারেননি, তাঁর বড়ো ছেলে দীপঙ্করকে দিয়ে সে সাধ পূর্ণ করেছিলেন। দীপঙ্কর উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক-গবেষক রূপে আমেরিকায় খ্যাতি অর্জন করেছে।

বেড়িয়ে ফেরার পথে গাছের তলায় ঝরা ফুল কুড়িয়ে নিতেন। শেফালি, বকুল প্রভৃতি ফুল কুড়িয়ে এনে সাদা পিরিচে রেখে দিতেন। তাঁর প্রাতরাশ সারতেন দুধ, ফল ও মধু দিয়ে। চা পান করতেন না, পছন্দও করতেন না। তাঁর সহধর্মিণী

রুচিরা দেবী চা পান করতেন। তাঁর বাবা আসামের দুর্লভছড়া চা-বাগানের ডাক্তার ছিলেন। তিনি তাঁর আদরের বড়ো মেয়ের জন্য বাগানের উৎকৃষ্ট চা পাঠাতেন। আমি সকালে রান্নাঘরের দিকে গেলে প্রবোধচন্দ্র হেসে বলতেন, 'যাও মাতা-পুত্রে বিষপান করো গে।' শীতের সময় আসাম থেকে আসত ঝুড়িভর্তি সুমিষ্ট কমলা লেবু। তিনি নিজে খেতেন আনন্দ করে, প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে বিলি করতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কেন নিজের জীবনী লিখলেন না এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন : 'আমার জীবনী লিখিতে গেলে আরেক জনের জীবনী লিখিতে হয়, সে আমার পরিবারের'। তখন 'পত্নী'কে 'পরিবার' বলবার রীতি বা রেওয়াজ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর চাকরি-জীবনকে অভিশাপস্বরূপ মনে করতেন আর পত্নীকে বলেছেন 'লক্ষ্মীস্বরূপা'। প্রবোধচন্দ্রের চাকরি-জীবন অভিশাপস্বরূপ নয় এবং তাঁর সহধর্মিণী সম্পর্কে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে একমত। চোদ্দ বৎসর বয়সে শ্রীহট্টের হবিগঞ্জের শিক্ষিত ধনী পরিবারের অসামান্য রূপবতী রুচিরা দেবী (পুরকায়স্থ) আঠাশ বছরের প্রবোধচন্দ্রের সহধর্মিণীরূপে সংসারে প্রবেশ করেন (১৯২৫ সালের ২রা আষাঢ় এই বিবাহ হয়)। 'রুচিরা' তাঁর পিতৃদত্ত নাম নয়, ছান্দসিক স্বামীর প্রিয় নাম। এই সুখী আদর্শ দম্পতির বিবাহের হীরক বর্ষ ১৯৮৫ সালে পার হয়ে গেছে। প্রবোধচন্দ্র যে দীর্ঘ কর্মময় আনন্দময় জীবনযাপন করতে ও বহুমুখী জ্ঞানচর্চায় নিজেকে মগ্ন রাখতে পেরেছেন নানা ধরনের সাময়িক ব্যাধির দুরন্ত আক্রমণ সত্ত্বেও, তার সবটুকু কৃতিত্ব তাঁর সহধর্মিণীর প্রাপ্য। ঠিক-ঠিক সময়ে হাতের কাছে ঘড়ি, চশমা থেকে দরকারি কাগজপত্র জুগিয়ে দেওয়া, ব্যাঙ্কের কাজকর্ম সারা, চিঠির জবাব লেখা, সময় ধরে ঔষধ-পথ্য খাওয়ানো, ঈষদুষ্ণ জলে স্নানের ব্যবস্থা রাখা—সব তিনি নীরবে করতেন। প্রায় গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমি তার বিমুগ্ধ সাক্ষী। প্রবোধচন্দ্রকে দৌলতপুরে অথবা শান্তিনিকেতনে কোনোদিন হাটে-বাজারে যেতে দেখিনি। কেনাকাটায় তাঁর বিশেষ অনাগ্রহ ছিল, কেবল বই কেনা ছাড়া। রুচিরা দেবী তাঁকে সাংসারিক সকল কর্ম থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিয়ে দশভুজার মতো আগলে রেখেছিলেন, যাতে তাঁর বিদ্যাচর্চায় বিন্দুমাত্র বিঘ্ন না ঘটে। উপার্জিত অর্থ এনে প্রবোধচন্দ্র রুচিরা দেবীর হাতে দিতেন, ঐ পর্যন্ত। আত্মীয়স্বজনকে পরিচর্যায় ছেলেমেয়েদের সুপালনে সংসারের সুষ্ঠু পরিচালনায় তাঁর সহধর্মিণী যে কতো হিমসিম খেতেন তা আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় জেনেছি। সকলেই জানেন প্রবোধচন্দ্র বেশি মাত্রায় ছাত্র-বন্ধু ও অতিথিবৎসল ছিলেন। পরিচিত অপরিচিত সদ্যপরিচিত সকলকেই খেয়ে যেতে বলতেন। হঠাৎ দুপুরবেলায় অথবা সন্ধ্যার পরে তখনকার দৌলতপুরে বা পরবর্তীকালের শান্তিনিকেতনে নতুন করে ভোজ্যবস্তু কিছু সংগ্রহ করা কঠিন হোত। কিন্তু দেখেছি তারই মধ্যে রুচিরা দেবী পঞ্চব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। দেখে

সংবর্ধনা সভায় প্রবোধচন্দ্র সেন, পাশে সহধর্মিণী রুচিরা দেবী

ছবি : বি. এন. মিত্র

প্রবোধচন্দ্র বড়ো খুশি হতেন, হেসে বলতেন, 'তোমার মাতৃদেবী এতসব করলেন কী করে!'

প্রবোধচন্দ্রের প্রিয় কবিতা 'স্বর্গ হইতে বিদায়'-এ দেখি কবি তাঁর কাম্য মর্ত্যসঙ্গিনী সম্পর্কে লিখেছেন :

"তারপরে
সুদিনে দুর্দিনে, কল্যাণ-কঙ্কণ করে
সীমান্ত সীমায় মঙ্গল সিন্দুর বিন্দু
গৃহলক্ষ্মী দুঃখেসুখে, পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্র শিয়রে।"

এই কথাগুলি প্রবোধচন্দ্রের জীবনে রুচিরা দেবী সম্পর্কে অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। প্রবোধচন্দ্র তাঁর অন্তিম 'ইচ্ছাপত্র'-এ তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জন্মদিন অথবা মৃত্যুদিন পালন করতে নিষেধ করে গেছেন। তাঁর মতে দেশের ইতিহাসে যাঁরা প্রকৃত স্মরণীয় শুধু তাঁদেরই মৃত্যুর পর তাঁদের জন্মদিন ও মৃত্যুদিন পালিত হওয়া কর্তব্য। কিন্তু তিনি তাঁদের বিবাহের দিনটিকে (১৯২৫, ২রা আষাঢ়) সানন্দে পালন করবার নির্দেশ রেখে গেছেন রুচিরা দেবীর কাছে। সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবন যে কতো পুষ্পিত সুগন্ধবহ মধুর ছিল তাঁর কাছে তারই সাক্ষ্য এই "২রা আষাঢ়" দিনটিকে পুষ্পে, সঙ্গীতে ভরিয়ে তোলার নির্দেশ। যে গানের মধ্যে থাকবে 'বহুযুগের ওপার হতে আষাঢ়' ধরনের কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত।

প্রবোধচন্দ্রের দুই পুত্র, চার কন্যা। যখন প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির চর্চায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন, স্বদেশপ্রীতির সঙ্গে প্রাচীন ভারতকে মিলিয়ে নিয়েছিলেন তখন প্রথম দুই কন্যার নামকরণ করেন 'অপলা' ও 'গার্গী'। পরে তিনি সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হন বৌদ্ধধর্মের প্রতি। বঙ্গভূমির প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিতদ্বয়ের নামানুসারে তিনি তাঁর দুই পুত্রের নাম রাখেন দীপঙ্কর ও শীলভদ্র। পরের মেয়েদের নাম হয় সঙ্ঘমিত্রা ও সুগতা।

পারিবারিক জীবনে তিনি সুখী ছিলেন। তার প্রধান কারণ তিনি কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেননি, কোনো বিষয়ে লোভ করেননি। তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে রামচন্দ্রের মতো ভক্তি করতেন; ভাইদের সহপাঠীদের কাছে তিনি বড়ো দাদার মতো ছিলেন। তিনি সকলের মঙ্গল কামনা করতেন। তিনি তাঁর শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যেন তাঁর স্মরণসভায় সমাগত ব্যক্তিদের প্রত্যেককে একটি ফুল, একটি ফল ও মিষ্টান্ন দেওয়া হয় অর্থাৎ প্রত্যেকের জীবন যেন সুন্দর, ফলবান্ ও মধুর হয়।

জীবনে তাঁর নির্মম আঘাত আসে তাঁর একবারের জন্মদিনে তাঁর বড়ো দৌহিত্রের মৃত্যু। আমরা সংবাদটিকে চেপে রাখি। পরের দিন ভোরে তাঁকে না জানিয়ে কলকাতায় ফিরে আসি। দুদিন পরে তাঁর চিঠি পাই। সে চিঠিতে লিখেছিলেন 'বড়ো দুঃখ ভুলতে গেলে বড়ো কাজের মধ্যে ডুবে যেতে হয়। আমি আমার অর্ধসমাপ্ত সব কাজ হাতে তুলে নিয়েছি। এই কাজের মধ্যে দুঃখ জয় করব।'

এই দৃঢ় মননশক্তি তাঁর ছিল বলেই কোনো ক্ষোভ তাঁকে স্পর্শ করেনি, কোনো অবিচার তাঁর ধৈর্য টলাতে পারেনি। তাই তো জীবনের অন্তিম 'ইচ্ছাপত্র'-এ লিখে গেলেন—

'আমার মৃত্যুতে শোকের কোনো কারণ নেই, বরং আনন্দেরই কারণ আছে।' ■

‘ধ্যানের রূপ বাহিরে মেলে দেখা’

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

অবশেষে নব্বুই বছরে পা দিয়ে ছন্দ-লয়-আবেগের পর্ব-যতি-মানা অতি সাবধানী জীবন-ছান্দসিকের ছন্দ-পতন হলো। আসন্ন এই পতনের কথা ভেবেই কিছু দিন আগে কথা প্রসঙ্গে রসিকতা করে বলেছিলেন, ‘এতো অল্প সময়ের মধ্যে এতো সব লেখার দায়িত্ব দিচ্ছো। কিন্তু ‘পদ’-স্খলনের আর দেরি নেই। যাই হোক, ‘ছন্দ’ বইটির নতুন সংস্করণের কাজ শেষ করেই তোমার জন্যে লেখা তৈরি করে দোবো। পুজোর পরেই তোমার লেখা পাবে।’ গত জুলাই মাসের শেষে শান্তিনিকেতন ছেড়ে আসার আগে এক সন্ধ্যায় রবীন্দ্র-আলোচনার একটি সংকলনের জন্যে লেখার তাগাদা দিতে গেলে প্রবোধচন্দ্র সেন

এই আশ্বাস আমাকে দিয়েছিলেন। খুব সংকোচের সঙ্গেই তাগাদা দিতে গিয়েছিলাম। কেন না লেখার ব্যাপারে নিজেরাই কথা দিয়ে কথা রাখতে পারি না, অথচ নিজেই তাগাদা দিচ্ছি নব্বুই বছরের এক বৃদ্ধকে, যেহেতু মনটিকে একেবারেই সতর্ক সজাগ রেখে তিনি একের পর এক প্রবন্ধ লিখছেন, বই ছাপছেন, বই সম্পাদনা করছেন। আর, এমন এক বিষয় যার বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র তিনিই তৈরি করেছেন ষাট বছরের বেশি কাল ধরে, নিজেকে নিরন্তর সংশোধন করতে করতে।

তবু তাঁকে বাদ দিয়ে তো রবীন্দ্র-আলোচনার সংকলন ভাবতেই পারি না। তাই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলুম যতটা সময় চান তাতেই রাজি হয়ে যাবো। আর লেখা একেবারেই অসম্ভব

এক ছান্দসিক হৃদয়ের দক্ষিণ-খোলা জানালায় আলো আর হাওয়ার প্রাচুর্য তাঁকে চিরযুবা করে রেখেছিল

ছবি : তারাপদ ব্যানার্জী

বুঝলে আমার পছন্দ মতো কোনো পুরোনো লেখাই তাঁকে দিয়ে পরিমার্জিত করিয়ে নোবো।

কিন্তু তিনি রাজি হয়ে গেলেন। সুকুমার রায়ের ওপর একটি প্রবন্ধ লিখছেন। তারপর রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' বইটির সম্পাদনার বাকি কাজ সেরে ফেলবেন পুজোর আগেই। তারপর পুজোর 'হই-চই-য়ের মধ্যে যে দ্বিগুণ মনঃসংযোগ আসবে' তাতেই আমার প্রাপ্য লেখাটি পুজোর ঠিক পরেই শেষ হয়ে যাবে। একটু হেসেছিলেন কথাগুলো বলে। তারপরেই বললেন ওই কথাটি, পদস্খলনের আর দেরি নেই। এই বয়সে কি এতো পরিশ্রম পোষায়!

আমি আর কোনো উচ্চবাচ্য করলুম না। কাজ আদায় হয়ে গেছে বুঝে স্বার্থপরের মতো চুপ করে গেলুম। তারপর অন্য প্রসঙ্গ উঠলো। কথা বলে যাচ্ছেন। বিছানার পাশে থরে থরে বই সাজানো। বৃষ্টি এসে গেল বলে উঠে পড়লুম।

কলকাতায় এসে অনেকের মাধ্যমে অন্যকে লেখার তাগাদা দিয়েছি। প্রবোধচন্দ্রকে দিই নি। জানি, ওঁর নিজস্ব ছকে যখন আমার প্রাপ্যটি সাজানো আছে তখন ঠিক পেয়ে যাবো।

কিন্তু ছকের ঘুঁটিগুলো সাজানোই রইল। প্রত্যেক ঘুঁটির পর্ব-যতির পদক্ষেপ ওঁর মনে মনে ছকা ছিল। হঠাৎ খেলা ছেড়ে উঠে গেলেন যেন। এতো শান্ত নিরুদ্‌বিগ্ন ছিলেন যে মনে হয় অন্য কোনো গভীরতর ছক যেন সাজানো ছিল মনে মনে। যেন সময় হতেই মনঃসংযোগ সরিয়ে নিলেন। মনে হচ্ছে, এবার দেখা হলেই বলবেন, না। তোমার ওটা আর হলো না।

আর কোনোদিনই হবে না। ভাবতেই দারুণ শূন্যতায় বুক ভরে যায়। ছোটবেলা থেকেই তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচয়। বড়ো হয়ে 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। ছন্দের কথা যে অমন সুন্দর ভঙ্গিতে বলা যায়, ভাবতেই পারিনি। (পরে অবশ্য তিনি ওই ভঙ্গি ছেড়ে একটা পরিচ্ছন্ন 'কমন স্টাইল' এনেছিলেন।) অনেক পরে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হই। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে তখন তিনি বাঙলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ ছেড়ে রবীন্দ্রভবনের প্রথম রবীন্দ্র-অধ্যাপক হয়েছেন। তারপর থেকে এই চব্বিশ বছরই আমি তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ। শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় চলে আসি ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে। তারপর থেকে চিঠিপত্রও প্রচুর লেখালেখি চলেছে। আমি যা লিখেছি তার দ্বিগুণ চিঠি উনি লিখেছেন।

কিন্তু লেখার সঙ্গে এমন পূর্ব পরিচয় এবং পরে লেখকের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় তো অনেকের ক্ষেত্রেই হয়েছে। তাহলে এই তীক্ষ্ণ শূন্যতাবোধ কেন।

এই কেন-র উত্তরে প্রবোধচন্দ্রের অধ্যাপক-চরিত্র ও সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের কথাই তুলতে হয়। কিন্তু তার আগে বলতে বাধ্য হচ্ছি, ব্যক্তিগতভাবেও আমি দারুণভাবে উপকৃত। আমার প্রতি তাঁর এই অযাচিত ভালোবাসার কারণ তিনিই জানতেন। আমি তাঁর ছাত্র নই। কিন্তু কোনোদিন তাঁর কাছে গিয়ে মনে হয়নি তিনি আমাকে পড়াননি। আমি তাঁর অনেক ছাত্রের চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলাম, উপকারও বেশি পেয়েছি। কিন্তু সে-সব প্রসঙ্গে না বললে তো ঋণ-মুক্তি হবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে নয়।

॥ ২ ॥

প্রবোধচন্দ্র ছান্দসিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের কাছে এবং রবীন্দ্র-উত্তরকালের কাছে স্থায়ীভাবে পরিচিত হয়ে রইলেন। ছন্দ তো বেদাঙ্গের একটি অঙ্গ। নতুন ভারতীয় আর্যভাষা পুরোনো নিয়ম শৃঙ্খল ভেঙে যে নতুন ছন্দ-রূপ এনেছে তার ভেতরকার সূত্র শৃঙ্খলাকে সাজিয়ে নেওয়া এবং বিচিত্র লক্ষণগুলিকে স্পষ্ট করে তোলার মতো, সংজ্ঞার্থ দেবার মতো দুর্লভ ক্ষমতা প্রবোধচন্দ্র গত ষাট বছর ধরেই অর্জন করেছেন। কোনো একজন মানুষের পক্ষে এ প্রায় অমানুষিক ব্যাপার। যতই বিতর্কের মধ্যে তিনি জড়িয়ে পড়ুন তাঁর এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সাধনা যে সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে তা তো জানি। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রের দক্ষতা এই বিশেষ ক্ষেত্রের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট 'সর্বজনের'। ব্যাপক অর্থে নিশ্চয় নয়। এই নতুন শাস্ত্র তৈরির সূত্রে ষাট বছরের বিচিত্র আক্রমণ ও প্রত্যুত্তরে ('প্রতি-আক্রমণ' বোধ হয় প্রবোধচন্দ্রের ক্ষেত্রে বলা যাবে না।) প্রবোধচন্দ্রের মনুষ্যত্বের খুব বড় দুর্লভ একটি গুণ প্রকাশ পেয়েছিল। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

প্রবোধচন্দ্রের অন্য একটি সত্তা ছিল। ইতিহাসের ভালো ছাত্র ছিলেন। কিছুদিন বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক ছিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভাণ্ডারকারের অধীনে কিছুদিন কাজও করেছিলেন। কিন্তু যে-কোনো কারণেই ইতিহাস-গবেষণায় তিনি বেশি দূর এগোননি। কিন্তু ঐতিহাসিক মনটি তাঁর তৈরি হয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে তাঁর ভারতীয় ইতিহাস-চিন্তা উনিশ-বিশ শতকের ভারতীয় ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতিমান নানা মনীষীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল। বিদেশী ভারততত্ত্ববিদ্‌রাও এঁদের সঙ্গে অবশ্যই রয়েছেন। ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্রের সেই অন্য সত্তাটি হলো ভারতপথিক প্রবোধচন্দ্র। প্রবোধচন্দ্রের রবীন্দ্রচর্চাও প্রবোধচন্দ্রের এই ভারতপন্থার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ধম্মপদ-পরিচয় বলুন, রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি বলুন, ধর্মবিজয়ী অশোক বা ভারতাত্মা কবি কালিদাসই বলুন কিংবা ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত বলুন, সর্বত্রই ভারতীয় জীবন-ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতেই সাহিত্য সংস্কৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব কিংবা কবির বিচার। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ধম্মপদ-পরিচয়ে ধম্মপদের ভারতীয় রূপ-সন্ধানে প্রবোধচন্দ্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৌদ্ধধর্ম', চারুচন্দ্র বসু সম্পাদিত ধম্মপদের সতীশ বিদ্যাভূষণের ভূমিকা, উইন্টারনিৎসের হিস্টরি অব ইন্ডিয়ান লিটারেচার এবং তাঁর সবচেয়ে বড় ভরসাস্থল রবীন্দ্রনাথের 'ধম্মপদং'—এই সব কটি আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ধম্মপদের মধ্যে এমন অনেক বচন আছে যা মূলত বৌদ্ধ নয়,

ভারতবর্ষের অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার থেকেই এই নীতি সূত্রগুলি এসেছে। যেমন এসেছে মনুসংহিতা, মহাভারত, জৈন সাহিত্য এবং পঞ্চতন্ত্র ইত্যাদি কথা-সাহিত্যে। এ যেমন শাস্ত্রের মধ্যে ভারতাত্মার সন্ধান, তেমনি ব্যক্তির মধ্যে ভারতাত্মার সন্ধানের প্রমাণ তাঁর কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক আলোচনা। কালিদাসের কাব্যে-নাটকে প্রাচীন ভারতীয় ভূমির গৌরব, পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ দেবাত্মা হিমালয়ের ছবি, রামগিরি থেকে হিমালয় পর্যন্ত ভারত খণ্ডের বর্ণনা, লঙ্কা থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত ভারতভূমির নদী-গিরি-অরণ্যের বর্ণনা, রঘুর দিগ্বিজয় এবং ইন্দুমতীর স্বয়ংবরসভার বর্ণনা যেমন সমস্ত ভারতের জনপদ-পরিচয় দিয়ে মনোযোগী পাঠককে ভারত সচেতন করে তেমনি হিন্দু যুগের সংযমহীন আত্মসুখপরায়ণ রাজধর্মের কারাগার থেকে ত্যাগ-ঐশ্বর্য-শৌর্যের মিলিত মনুষ্যত্বের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষাই কালিদাসের রচনার, যথার্থ ভারতীয়তা। আর বোধ হয় শুধু 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ' বই খানিতে নয়, প্রবোধচন্দ্রের অধিকাংশ রবীন্দ্র চর্চাতেই রবীন্দ্রনাথকে মাধ্যম করে ভারত পন্থাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা। শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতে যেমন, সাহিত্য-ব্যাখ্যাতেও তেমনি—প্রবোধচন্দ্র সমান ও তীক্ষ্ণভাবে ভারতীয়—ভারতপথিক। আশ্চর্য এই, ভারতপন্থা-প্রতিষ্ঠায় শুধু স্বদেশী ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক নন, ম্যাক্সমূলর, ম্যাকডোনেল, ভিনসেন্ট স্মিথ কিংবা উইণ্টারনিৎস—বিদেশী ভারত তত্ত্ববিদ্‌দের যেখানেই টেনে এনেছেন আলোচনা প্রসঙ্গে—সর্বত্রই সেই অখণ্ড ভারতবোধের ইঙ্গিত।

মনে রাখতে হবে, প্রবোধচন্দ্রের এই ভারতপন্থা তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের ভেতরকার ভারত ভাগ্যবিধাতা নামে এক জাগ্রত ভগবান্-প্রতিষ্ঠায়। এমন কি, গান্ধীজীর রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার সমর্থনেও। রামরাজ্য যতই কাল্পনিক রূপকথা হোক, তার মধ্যে বহুকাল সঞ্চিত ইমোসন্যাল ইন্‌ট্রিগেশনের সূত্র আছে। সেই সূত্রটি ধরেই গান্ধীজী জনশক্তি চালনায় এগিয়েছিলেন। তাঁর মনের মধ্যে যে প্রয়োজনীয় ভাবাবেগটুকু ছিল তাকে হয়তো রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই ব্যক্ত করা যায়, 'একটি নূতন আশার যুগ চাই। সেই আশার যুগে মানুষ নিজের সীমা দেখিতে পায় না, সমস্তই সম্ভব বলিয়া বোধ করে। সমস্তই সম্ভব বলিয়া বোধ

'তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার…'

ছবি : তারাপদ ব্যানার্জি

মাসে মাত্র কয়েক মিনিট ব্যয় করুন...
স্তন-ক্যানসার থেকে রক্ষা পান।
স্তন ক্যানসার যে এক সাংঘাতিক গুপ্ত রোগ তা সব মহিলাই জানেন। এবার ঐ দুঃশ্চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্তি দিন। স্তন-ক্যানসার পুরোপুরি সারানো যায়। যে মহিলার ঐ রোগ একেবারে শুরুতেই ধরা পড়ে তিনি বাকী জীবনটা সুস্থ দেহে ও শান্তিতে কাটাতে পারেন।
সেরা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হ'ল— প্রতিমাসে নিজেকে নিজেই একবার পরীক্ষা করে নিন মাত্র কয়েক মিনিট, যা আপনার জীবন বাঁচাবে!

দেখুন কি ভাবেঃ শুয়ে পড়ুন—প্রতিটি স্তন নিজের আঙুল দিয়ে আলতো করে টিপুন—স্তনের তলা থেকে বোঁটা পর্যান্ত, ছোট ছোট পাক দিয়ে। এবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়েও ঠিক ঐভাবে করুন। দেখুন—বুকে কোনো মাংসপিণ্ড বা শক্তগাঁট বা বুকের কোষ পুরু ইত্যাদি হয়েছে কিনা। দুটি বোঁটাতেই আলতো করে চিমটি কাটুন। কোনো রস দেখা গেলেই সত্বর আপনার ডাক্তারকে জানান।

কোনো ঝুঁকি নেবেন না। বছরে একবার সম্পূর্ণ ক্যানসার চেক- আপ করিয়ে নিন ইণ্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটির যেকোনো পরীক্ষা কেন্দ্রে (ডিটেকশন সেণ্টার) চলে আসুন অথবা আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

এখন ক্যানসার-বীমা!
ইণ্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটি প্রবর্তন করলো **ভারতের একমাত্র** বীমা পলিসি, যা ক্যানসার রোগ ধরা বা তার চিকিৎসা বাবদ যাবতীয় খরচ যোগাবে। সামান্য কিছু টাকা দিন আর আপনি ও আপনার স্ত্রী/স্বামী দুজনেই ৪০,০০০ টাকার আওতায় থাকুন। আরো জিগ্যাসা থাকলে ফোন করুন।

দেখা করার জন্যে ফোন করুন:
বম্বে ২০২৯৯৪১-৪২/৪১২৫২৩৮ দিল্লী-৬১৭৬২৮
কলকাতা-২৬৪৭৬৪/২৬৭৯০৬ মাদ্রাজ-৩৯৪৪৪/২৯৮০০

ইণ্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটি।
তাড়াতাড়ি ধরা মানে তাড়াতাড়ি সারা!

daCunha/ICS/2/86 BN

করিবা মাত্র যে বল পাওয়া যায় তাহাতেই অনেক অসাধ্য সাধ্য হয় এবং যাহার যতটা শক্তি আছে তাহা পূর্ণমাত্রায় কাজ করে।' অসাধারণ দক্ষতায় প্রবোধচন্দ্র ব্যাপক রবীন্দ্র সাহিত্য থেকে বিচারের পক্ষে-বিপক্ষে অনায়াসে উদ্ধৃতি টেনে আনতে পারতেন। প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করতেও পিছিয়ে যেতেন না। কেবল ছন্দ বিতর্কে নয়, রবীন্দ্রনাথের কোনো মন্তব্যের অসঙ্গতিও তিনি স্পষ্ট করেই বলে দিতেন। রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি বইটির 'রামায়ণ' প্রবন্ধে রামের নির্বাসন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের সমালোচনা লক্ষ্য করার মতো। কিন্তু কতোখানি সংযমে ও শ্রদ্ধায় তিনি সমালোচনা করতে পারতেন তাও লক্ষ্য করার মতো। কিছুদিন আগেও ভাষা-আন্দোলনের সময়ে তাঁর মাতৃভাষার পক্ষ সমর্থনের আলোচনাটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রতিপক্ষকে সামনে রেখে কত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ ক'রে তাঁর সিদ্ধান্তগুলিকে তিনি সাজিয়ে গেছেন। এমন বিদ্বেষহীন অথচ তর্কপ্রবণ সাবধানী শোভন মানসিকতা আমার জানা-শোনা মানুষের মধ্যে খুবই বিরল।

॥ ৩ ॥

এই বিরল ভারসাম্য এবং এক ধরনের কঠিন ঔদাসীন্য লক্ষ্য করি ছন্দশাস্ত্র নিয়ে ষাট বছরব্যাপী বিতর্কের মধ্যে। এই বিতর্কের মধ্যে কোনো কোনো ছান্দসিক নিজের মত প্রতিষ্ঠার চেয়ে পরমত খণ্ডনের ওপর ঝোঁক দিয়ে বেশ রূঢ়ভাবেই প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করেছেন। এই বিতর্কে চরম সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন প্রবোধচন্দ্র। যাঁদের সঙ্গে তাঁর মতের মিল হয়নি তাঁদের মূল বক্তব্যকে পরিচ্ছন্নভাবে তুলে ধরে একের পর এক যুক্তি দিয়ে সেগুলিকে খণ্ডন করেছেন। শুধু তাই নয়, 'আধুনিক বাংলা ছন্দ-সাহিত্য' নামে যে বইটি আছে তাতে দেখা যায়, এ পর্যন্ত ছন্দ সম্পর্কে যতো বই বেরিয়েছে প্রত্যেকটি ধরে ধরে তার বৈশিষ্ট্যগুলি গুছিয়ে বলেছেন এবং বিরুদ্ধে কিছু বক্তব্য থাকলে দুর্লভ বিনয়ের সঙ্গে সেগুলিকে স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে শঙ্খ ঘোষের 'ছন্দের বারান্দা' (দ্বি-স) সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তার একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। শঙ্খ ঘোষ এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন, 'বিশেষজ্ঞরা হয়তো ক্রমে এই নামই [মিশ্র বৃত্ত, কথাবৃত্ত, জলবৃত্ত] ব্যবহার করবেন; কিন্তু অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত নামগুলিই এখনো পর্যন্ত সাধারণ্যে প্রচলিত'। প্রবোধচন্দ্র মন্তব্য করেছেন, 'তাই তিনি (নীরেন্দ্রনাথের মতোই) 'সাধারণ্যে'র অর্থাৎ অবিশেষজ্ঞের দলেই থেকে যেতে চান! তাতে কারও কোনো আপত্তি থাকা উচিত নয়। কিন্তু তাঁর চিন্তায় কখনও এই পুরানো নামের সঙ্গে নূতন পরিভাষা ব্যবহারে বিরোধ ঘটে কিনা জানি না। তবে তাঁর একটি বাক্যে (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ৭০-৭১) এরকম বিরোধের একটা দৃষ্টান্ত আমার চোখে পড়েছে। ওই বাক্যে আছে 'চতুঃস্বর' ও 'রুদ্ধদল', এই দুই শব্দের যুগপৎ ব্যবহার। স্বরবৃত্তের প্রসঙ্গে এই 'চতুঃস্বর'-এর 'স্বর' কথাটা মনে হয় 'দল' অর্থেই প্রযুক্ত। অর্থাৎ এখানে 'চতুস্বর' মানে 'চতুর্দল'। এরকম ব্যবহার 'স্বর' ও 'দল' এই পুরানো ও নূতন দুই পরিভাষার বিরোধসূচক বলেই বোধ হয়। মনে হয় এটা ক্ষণিক অসতর্কতা প্রসূত ব্যতিক্রম মাত্র, সুতরাং উপেক্ষণীয়'। প্রায় অর্ধেক বয়সের কবি-ছান্দসিকের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও মমতা ছিল বলেই এতো পরিচ্ছন্নভাবে ও সবিনয়ে প্রবোধচন্দ্র ভুল-ত্রুটিগুলি বুঝিয়ে দেন এবং শেষ পর্যন্ত অসতর্কতা প্রসূত বলে উপেক্ষাও করেন। ব্যক্তিগত সম্পর্কের বাইরে যিনি যখনই কোনো প্রশ্ন তুলেছেন. প্রবোধচন্দ্র এই একই ভঙ্গিতে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন। ভুল-ত্রুটির প্রতি রূঢ়তা প্রকাশ তাঁর ধাতে ছিল না। মনে হয়, তাঁর ভেতরকার এই গভীর স্নেহ-ই ছাত্র-অছাত্র সকলকে আকর্ষণ করতো।

এই গভীর সহানুভূতির উৎস প্রবোধচন্দ্রের আত্মবিচার-প্রবণতা থেকেই এসেছে বলে মনে করি। এই আত্মবিচার আবার আত্মনিরপেক্ষতা থেকেই এসেছে যে আত্মনিরপেক্ষতা কঠিন ঔদাসীন্যেরই অন্য নাম। 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' প্রকাশের পর থেকে প্রবোধচন্দ্র ছন্দের শ্রেণীবিন্যাস ছেড়ে তার বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিকতার দিকে, পরিচ্ছন্নতার দিকে এগিয়ে গেছেন এবং 'ছন্দ-পরিক্রমা', 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা', 'নূতন ছন্দ পরিক্রমা' এবং 'বাংলা ছন্দ চিন্তার ক্রমবিকাশ-এ' ধীরে ধীরে এক অসাধারণ বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে বাঙলা ছন্দ-বোধের অণু-পরমাণু-রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে কবিতাপাঠের মধ্য দিয়ে কীভাবে তার 'অশিক্ষিত' বোধকে শিক্ষিত করে নেওয়া সম্ভব সে সম্পর্কে প্রবোধচন্দ্রের ভাবনা-চিন্তার অন্ত ছিল না। 'ছন্দ সোপান' বইটিতে তিনি দেখিয়েছেন যতির বাহুল্য বা বিরলতার মধ্য দিয়েই কী সুন্দরভাবে প্রাথমিক ছন্দপাঠ দেওয়া সম্ভব। এবং সেই সূত্রে ছন্দের অণুযতিলোপ এবং অণু-যতি-লোপের বিরলতার বিশ্লেষণে প্রবোধচন্দ্র ছন্দলয় আবেগের নিস্তরঙ্গ মসৃণতা এবং প্রাথমিক তরঙ্গক্ষুব্ধতার আদি-উৎসে পৌঁছে গেছেন। প্রবোধচন্দ্রকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে গিয়ে আগে যেমন বলেছি তেমনি আবার বলছি, 'বৃদ্ধ' কবির পক্ষেই যেমন শব্দ আর ধ্বনির আদি-উৎসের পাঠ দেওয়া সম্ভব, তেমনি সত্যিকারের ছন্দ-বৃদ্ধের পক্ষেই ছন্দ-যতির অণু-পরমাণু লোকে পৌঁছোনো সম্ভব, যেখানে বহির্বিশ্বের আঘাতে ছন্দবোধের প্রাথমিক তরঙ্গ-রেখা ফুটতে শুরু করেছে। আর এই ছন্দবৃদ্ধের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে যে সংস্কার-মুক্ত সমাহিত বৈজ্ঞানিক ঔদাসীন্য প্রয়োজন তা-ই ছিল প্রবোধচন্দ্রের নব্বুই বছরের কঠিন অর্জন।

সৃষ্টির নাড়িতে যিনি হাত রেখে ছিলেন তাঁকে তো আনন্দ-বেদনায় উদাসীনই হতে হয়েছিল। তাই প্রবোধচন্দ্র তাঁর বহু শ্রমলব্ধ সেই ঔদাসীন্যের বলেই শুধু ছন্দমন্ত্রের নয়, আমাদের ইচ্ছামন্ত্রেরও দীক্ষাগুরু। এই উপলব্ধির সমর্থনে প্রবোধচন্দ্রের শেষ সম্পূর্ণ ছন্দশাস্ত্র 'নূতন ছন্দপরিক্রমা'র সূচনায় উদ্ধৃতি রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার যে আংশিক আছে তারই পুনরুদ্ধার করি।

হায় গো রূপকার,
ভরিয়া দিয়ো জীবন-উপহার,
চুকিয়ে দিয়ো তোমার দেয়,
রিক্ত হাতে চলিয়া যেয়ো,
কোরো না দাবি ফলের অধিকার।
জানিয়ো মনে চিরজীবন সহায়হীন কাজে
একটি সাথী আছেন হিয়া-মাঝে;
তাপস তিনি, তিনিও সদা একা,
তাঁহার কাজ ধ্যানের রূপ বাহিরে মেলে দেখা!

অসাধারণ দক্ষতায় প্রবোধচন্দ্র ব্যাপক রবীন্দ্র সাহিত্য থেকে বিচারের পক্ষে-বিপক্ষে অনায়াসে উদ্ধৃতি টেনে আনতে পারতেন। প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করতেও পিছিয়ে যেতেন না। কেবল ছন্দ বিতর্কে নয়, রবীন্দ্রনাথের কোনো মন্তব্যের অসঙ্গতিও তিনি স্পষ্ট করেই বলে দিতেন। কিন্তু কতোখানি সংযমে ও শ্রদ্ধায় তিনি সমালোচনা করতে পারতেন তাও লক্ষ্য করার মতো। এমন বিদ্বেষহীন অথচ তর্কপ্রবণ সাবধানী শোভন মানসিকতা আমার জানা-শোনা মানুষের মধ্যে খুবই বিরল।

আশার ওলিম্পিয়াডে উষা

তপন ঘোষ

ধরুন এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি দু-বছর পরে ঘটল। সোল ওলিম্পিকসে সোনা পেল উষা। না, চারটিতে নয়, একটিতেই। ওই চারশ মিটার হার্ডলসে। সারা ভারত উত্তাল। তখন গঙ্গায় দ্বিতীয় সেতু শেষ হয়েছে। পাতাল রেল দমদম থেকে হু হু করে ছুটছে টালিগঞ্জ। অফিস আওয়ার্সে চারিদিক সুনসান। টিভি-র পর্দায় সবাই ঝুঁকে পড়েছে। দিল্লি থেকে ঘোষণা হল পার্লামেন্টের সামনেই উষার স্ট্যাচু তৈরি হবে। কেরালার কালিকটের পায়োলি গ্রামটা উষার নামে বদলে যাবে। বিশেষ ঘোষণায় সরকারও চটপট জানিয়ে দিল উষা ভারত-রত্ন পাবে। গাভাসকর, কপিল, রবি, রমানাথন কৃষ্ণান, প্রকাশ পাড়ুকোন, পি· কে উষাকে সঙ্গে করে আনতে সোল রওনা দিল। মিলখা সিং তার বাজির দশ হাজার টাকার ফিক্সড ডিপোজিটটা উষার হাতে তুলে দিল। এদিকে উষার কোচ নাম্বিয়ারকে ঘিরে দারুণ জটলা। মায় সি, আই, এ ও কে, জি, বি-র চররাও আড়ালে আবডালে ঘুরছে। তথ্য চাই, উষা এমন ঘটাল কিভাবে?

নাম্বিয়ারকে ছেঁকে ধরেছে সবাই। উষাকে হর্মোন-এর আওতায় এনে কি কুড়িতম থেকে এক নম্বরে সে দাঁড় করিয়েছে! সোল এশিয়াড যাওয়ার আগে নাম্বিয়ার আক্ষেপই করেছিল—অন্তত একটা ওলিম্পিক মেডেল পাওয়ার জন্য উষা আপ্রাণ খাটবে। তবে

ছবি : নিখিল ভট্টাচার্য

স্পোর্টস মেডিসিন আর আলাদা হর্মোনিই ভিন দেশের মেয়েদের অনেকটা এগিয়ে দেয়। শারীরিক ক্ষমতা, অক্সিজেন আর সহনশীলতা বাড়ানোই আসল গুণ। লুকিয়ে চুরিয়ে ইউরোপ আমেরিকার অ্যাথলীটরা এসব অপকর্মে মেডেল জেতে। ওদের এই গোপনীয়তার অন্ধিসন্ধি কোনো ভারতীয়র জানা নেই। বিজ্ঞানের হাত ধরে আসলে এই কাণ্ড করার মত হাত পাকতে পারেনি। যদি এরকম কিছু দুষ্কর্ম করতে গিয়ে ধরা পড়ি তবে সঙ্গে সঙ্গেই ছাঁটাই হতে হবে। চেহারা দম আর কারসাজিতে আমাদের মেয়েদের সঙ্গে এদের তফাতটা এতই যে দারুণ চোখে লাগে।

রুশী, মার্কিনী চররা ভালই জানত ভারতের এমন নো-হাউ নেই অথচ উষা কিভাবে প্রথম হল! বায়োডাটা পরখ করে ওরা দেখল, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে ছোট্ট প্রতিভাকে শুরু থেকেই সরকার সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করে। কঠিন অনুশীলনের মধ্যে প্রায় গবেষণাগারের গিনিপিগের মতো ওরা যা খুশি তাই করে। উষাকে নিয়ে ভারত সরকার তেমন কিছু তো করেনি? প্রায় কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কড়াকড়ি ওসব শিবিরে। অনুশীলনের ধকল এতই যে, অনেক সময় ওসব শিবির থেকে ছেলেমেয়েরা বিদেশেও পালিয়েছে? উষার ক্ষেত্রে ওসব কিছু হয়নি।

খটকা লেগেই থাকবে। একবার তো উষাকে বিদেশে পাঠানোর জন্য আমেরিকার নেব্রাস্কা ইউনিভার্সিটি থেকে ডেকেছিল, কিন্তু উষা যায়নি কেন? তাহলে হয়তো বিশেষ ট্রেনিংয়ের কোনো গুপ্ত রহস্য রয়েছে। ও নাকি নিজেই নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে?

সেটা কেমন কথা? প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, নিজের রেকর্ডকেই সে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। কষ্ট সহ্য করে তাকে হারায়। এই আর কি! রহস্য ঘনীভূত হয়—উষার অদ্ভুত উদ্দেশ্যহীন শুরু। ওর বাবা-মাও চাইতো না যে মেয়ে দৌড়ে পাগল হোক। অভাবের হাঁ বোজাতে দৌড়লে চাকরি পেতে পারে, এমন সম্ভাবনাকে ওর বাবা-মা একসময়ে ভালবেসেছে, ভারতের আর পাঁচটা মেয়ে যেরকম ভাবে। উষার বাবা-মাও শেষমেষ চেয়েছে ভাল দৌড়নোর জন্যে মেয়ে যদি একটা চাকরি জোগাড় করে তো মন্দ নয়। তার পর একটা বিয়ে। ব্যস আর দৌড় নয়। মেয়ের জন্য এরকম ভাবতে ভাবতে ওর আপনজনও কখন ওর সঙ্গে মানসিক দৌড় শুরু করে দেয়। শেষে ওর শুভানুধ্যায়ীরা, ধীরে ধীরে গোটা দেশের মানুষ ওর ভালর জন্য জড়িয়ে পড়েছে। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতাতেও উষা প্রসঙ্গ এসে পড়ে। দৌড় আর দৌড়, উষার দৌড়। ওলিম্পিক মেডেল অভাবী এত মানুষের দেশ এইভাবে একটি পদকের জন্য প্রাণপাত কামনায় জড়িয়ে যেতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের একটা মেয়ের সাফল্যের জন্য এমন ভাবনার ঐক্য আসতেই পারে? শেষমেষ কে· জি· বি··সি· আই· এ-এর চাঁইরাও ভ্যাবাচাকা হয়ে ঠাওর করে উঠতে পারে না, এই সাফল্যের শিকড় কোথায়?

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় বিদেশীরা সূত্র খুঁজে পেল না। শুধু শরীরের দিকে তাকিয়েও বিস্ময়কর উপাদান পেল, ওর পা-জোড়ায় আগাগোড়া দৌড়বীরের স্বাস্থ্য স্পষ্ট। কম্পাসের মত প্রয়োজন মত ছড়াতে গোটাতে পারে। এশিয়ান অ্যাথলীট মীটে সপ্তাহে ১৫ বার দৌড়েও ক্লান্ত হয়নি। সোল এশিয়াডে একদিনে চারটি দৌড়ের জন্য সে পিছপা ছিল না। চল্লিশ মিনিটে দু-বার ট্রাকে নামা এবং পদক জেতা। এসব অসম্ভব কাণ্ড!

অবাক করে খাওয়া দাওয়ার রীতি। শুরুটা এক রকম নিরামিষাশী হিসাবেই। আমিষ খাবার মোটেই সহ্য করতে পারত না, এমনকি ডিমও নয়। কোচ নাম্বিয়ার কিন্তু বারবার মন্ত্র দিয়েছে, ডিম মাংস খাওয়ার জন্য, উষা শেষে মেনু পাল্টায়। রোজ সকালে দুধের সঙ্গে ডিম। ঘড়ি ধরে খাওয়াই ওর অভ্যাস। আর দুটো খাওয়ার মধ্যে টুকটাক মুখ চালানোয় উষা নেই।

কেরালার মেয়ে অথচ কফি ছোঁয় না। একমাত্র চা-ই চলে, তাও বেশি মাত্রায় নয়। বেশি
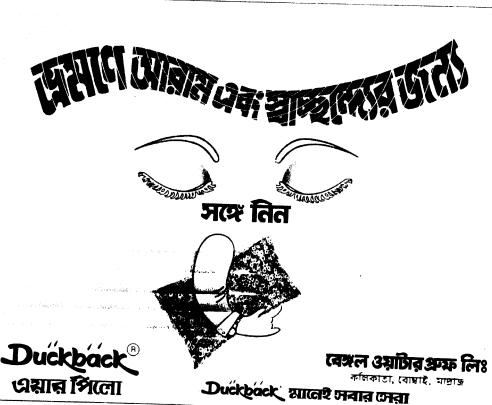
লিকারের চায়ে সে চুমুক দিতে রাজি নয়। দুধ দিয়ে চা'কে হাল্কা করে নেয়। ভোর পাঁচটায় প্রাকটিসে যাওয়ার আগে বিস্কুট আর ওই দুধ-চা'ই উষার সম্বল। দুপুরে খাওয়া সাড়ে বারোটায় আর রাতের খাওয়া রাত ন'টায়। ভারতীয় কোনো খাবারেই ওর অরুচি নেই। ভাতের সঙ্গে মাছের ঝোল ওর দারুণ পছন্দ। জিভের সুখ মশলাদার খাবারে উষার অরুচি। যেটুকু খায় সেটুকু পেট-শরীর যাতে মানিয়ে নিতে পারে, এটাই ওর লক্ষ্য।

মিষ্টান্ন জাতীয় খাবারের মধ্যে মাইসোর পাকই ওর দারুণ পছন্দ। চকোলেটের ধারেকাছে যায় না, বরং আইসক্রিমের জন্য নোলায় জল আসে। উষার একটাই দুঃখ, ও রান্নাবান্নাটা ভাল পারে না। আসলে বাড়িতে বেশিদিন ওর থাকাই হয় না। স্পোর্টস স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় থেকে বাড়িতে থাকার ফুরসত কোথায়? কেরলীয় হেঁসেলের মাছের ঝোল আর ফিশফ্রাই একরকম চেটেপুটে উষা খায়। মা'র রান্নার হাতের প্রশংসায় উষা উচ্ছ্বসিত। ঠেকায় পড়লে উষা ভাতের হাঁড়ি ঠেলতে পারে, কিন্তু মাছের ঝোল রাঁধতে পারে না। দেশের বাইরে গিয়ে উষার খাবার সমস্যাটা মাঝেমাঝে ভোগায়। এরজন্য উষা খুব একটা চিন্তা করে না। সেদিক থেকে চিন্তামণি কোচ নাম্বিয়ার স্বয়ং। নানা জায়গা ঢুঁড়ে মুখের মত খাবারটি ঠিক সে যোগাড় করে। দৌড়ের অমানুষিক খাটুনি শেষে দু তিন গ্লাস ফলের রস উষা পান করবেই। এই সরল খাদ্য তালিকা পেশ করেও উষা বলে, আমার ভাল দৌড়ের আসল শক্তিটুকু পাই ইচ্ছাশক্তি থেকে। ওই ইচ্ছাশক্তি কাজে লাগাবার জন্য শরীরে মজুত কষই আমায় সবচেয়ে সাহায্য করে। অ্যাথলেটিকসের অনাদৃত এশিয়ার উষাকে নিয়ে অতঃপর ধন্দে পড়ে পিঠটান দেবে।

ওই ইচ্ছাশক্তি ভর করেই সতের বছর আগে তাইওয়ানের মেয়ে চি চেং সারা অ্যাথলীট বিশ্বকে চমকে দিত। উচ্চতা ৫ ফুট সওয়া সাত ইঞ্চি। ১৯৬৯-'৭০ মরসুমে ন'টা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ওর পায়ের তলায়। এক সাংবাদিক রসিকতা করে বলেছিল—সস্তা চীনেমাটির বাসনকোসন ভাঙচুর করার মতই চি চেং রেকর্ড ভাঙে। নিশ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার ছাড়ার মতই রেকর্ড গড়া ওর কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেড় ঘণ্টায় চারটি ওয়ার্ল্ড রেকর্ড। একশো, দুশো মিটার, একশো, দুশো কুড়ি গজ, পঞ্চাশ ও ষাট মিটার হার্ডলস সবেতেই ওর ওয়ার্ল্ড রেকর্ড থরে থরে সাজানো। সম্প্রতি ভারতে এসে চি চেং বলেছে—উষাই আসল মেয়ে যে আমার রেকর্ডগুলো ভাঙতে পারে। বড় মেহনতী মেয়ে উষা। জাত চ্যাম্পিয়ন। ওই তোমাদের আশা জাগাবে। ভারতীয় অ্যাথলীটদের সম্বন্ধে চি চেং আশাবাদী। আমাদের মিলখা সিং কিন্তু উষা সম্বন্ধে বলেছে—উষা এশিয়ার সেরা। কিন্তু বিশ্ব আসরে তেমন কিছুই নয়। চি চেং কিন্তু এশীয় অ্যাথলীটদের উঁচু জায়গায় রাখতে চায়। এশিয়ানদের শারীরিক অপটুত্বর কথাটা মানতে চি রাজি নয়। দৃষ্টান্ত তুলে বলে, ট্রিপল জাম্পের গুরুর স্রষ্টা জাপানীরাই। ম্যারাথন, পোল ভল্ট, হাই জাম্প সবেতেই ওরা সেরা ফল দেখিয়েছে। আসল দুর্বলতা, এশিয়ানদের মনে। তারা এশিয়াতেই এক দুই হয়েই খুশি। বিশ্বজয়ী হওয়ার জন্য তাদের কোনো চেষ্টা নেই। আমিই সেরা—এরকম একটা ভাবনার পলতে মনের মধ্যে সবসময়ই উসকে রাখতে হয়। একজন আধুনিক অ্যাথলীট অমানুষিক খাটে। বিশেষ ধরনের অনুশীলনে বিশেষত্ব অর্জন করা সম্ভব। ওজন নিয়ে অনুশীলনই চি চেংয়ের দৌড়ানোর শক্তি হু হু করে বাড়িয়ে দিয়েছে। বারো ধরনের ব্যায়াম, সারা শরীরের জন্য। যদি কেউ ভাবে, পা-জোড়ায় জোর রাখলেই ভাল দৌড়োনো যাবে, তবে তারা ভুল পথে চলেছে। পেটান শরীরের সঙ্গে শক্তিশালী হাতও বিশেষ প্রয়োজন।

উষার মত চি চেংও সুষম খাদ্যাভ্যাসে বিশ্বাসী থেকেছে। ভিটামিন প্রচুর কাজে এসেছে। রাজার মত প্রাতঃরাশ, রানীর মত মধ্যাহ্নভোজন এবং ভিক্ষুকের নৈশভোজই অ্যাথলীটের খাদ্যাভ্যাসই চি চেংয়ের খাদ্যরীতি। দারুণ সাফল্যময় এক মরসুম আগে পর্যন্ত চি চেং গো-মাংস খেত না, নিপাট নিরামিষাশী ছিল। বহু এশিয়ান অ্যাথলীটের ভুল ধারণা গাদা গাদা গো-মাংস খেলেই উন্নতি হবে। মোজেসের মত কৃতবিদ অ্যাথলীটও বেশী মাংস খায় না। কিছুটা মাংস ছাড়া প্রচুর বাদাম সী-ফুট এবং প্রচুর পরিমাণ শাকসবজিই ওর খাদ্যের ফর্দে রয়েছে। খাবার না পাওয়ার দোষ দিয়ে এশীয় অ্যাথলীটরা চরম খাটুনির দিকটায় ফাঁকি দেয়।

ফাঁকি শব্দটির সঙ্গে উষার আড়ি। ওলিম্পিয়ান শ্রীরাম সিং-এর মতো এককালের কঠোর পরিশ্রমী অ্যাথলীটও একথা মানেন। শ্রীরামের আশা কোনো ইভেন্টেই নিজের সময় থেকে দারুণ কিছু উন্নতি ঘটাতে পারেনি। এতটা চাপ নেওয়ার জন্য উষার কতটা ক্ষতি হল কে জানে! সবই দেশের জন্য। সোল ওলিম্পিয়াডে ২৪ বছরে পৌঁছবে। নাম্বিয়ারের মতে, উষা নাকি অন্য প্রতিযোগীদের দিক থেকে কম বয়েসেই থাকবে। নাম্বিয়ার ৬৬-৬৭ সালের এন আই এস পাস করা কোচ। উষার ওর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা। উষা একদিক থেকে কানামাছি খেলছে, ও ঠিক জানে না, ওর স্থান বিশ্বে কত নম্বরে। চি চেং-এর কথাটি খাঁটিই— এশিয়াডের বেড়া পেরিয়ে কি ঘটছে এশিয়া-সেরারা তার সঠিক খবর রাখে না। আত্মতুষ্টির অন্ধকারে ডুবে আছে এশিয়ার প্রতিভা। যদিও উষার

উষা এবং কোচ নাম্বিয়ার — ছবি: নিখিল ভট্টাচার্য

সাবলীলভাবে হার্ডলের ওপর দিয়ে উষা উড়তে পারলেই ওলিম্পিকে একটা কিছু করবেই। চারশো মিটার হার্ডলসে বিশ্বরেকর্ড থেকে ২·১৪ সেকেণ্ড দূরে। সেকেণ্ডের একশোর এক ভাগের জন্য উষা ব্রোঞ্জ পায়নি লস অ্যাঞ্জেলেসে। দু-বছরে ওই ২ : ১৪ সেকেণ্ড কমান কেউ গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারে না। বড় কথা, লস অ্যাঞ্জেলেসের করা সময় থেকে (৫৫ : ৪২ সেঃ) উষার তেমন কিছু উন্নতি হয়নি। দু-বছর হয়ে গেছে। নাম্বিয়ারের কথা ধরলে তার ছাত্রী হার্ডলস ছাড়া অন্য কোনো ইভেন্ট নিয়ে সাধনা করবে না। সোল এশিয়াডে উষা ছ'টি ইভেন্টে সোনা জেতার জন্য ব্যগ্র হয়ে এবার নিয়ে তৃতীয় ওলিম্পিক অভিযান। বাইরে গিয়ে উষা অনুশীলনে মদত করুক, নাম্বিয়ারের ইচ্ছায় তা আমল পায় না। নিরপেক্ষ ইচ্ছায় উষা বাইরে গেলে ভালই হত। সোমা দত্তই তো তার উজ্জ্বল উদাহরণ। দেশের স্বার্থে সরকারও এ নিয়ে জারিজুরি করতে পারে না। উষা নিজের আওতায় উঠে এসেছে, সেখানে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আবেগ আফসোস আসতেই পারে। অতঃপর সোল ওলিম্পিয়াডে উষা পদক পাবে কি না তা উষা-নাম্বিয়ার-ভাগ্য-নিয়তি ভবিতব্যের হাতেই ছেড়ে দিলাম। শুভার্থী হিসাবে আমরা শুধু দুশ্চিন্তার হার্ডলগুলো টপকে যাব এই দু-বছর।

যে কোন উৎসবের গৌরব
রত্না ছাপ
জাফরানি পাতি
নং ৪৫০, ৩০০, ২০০, ১৫০, ৬৪, ৩০, ২০, ১৩
অতুলনীয় স্বাদের জন্য
রত্না ছাপ জাফরানি পাতি
ব্যবহার করতে ভুলবেন না
IS: 2344
ISI
মার্ক সহ
300
64
TRADE MARK
REGD NO 295532
একটি প্রভাত জর্দা উৎপাদন

উচ্চপদে মহিলা পুলিস

শ্রীমতী
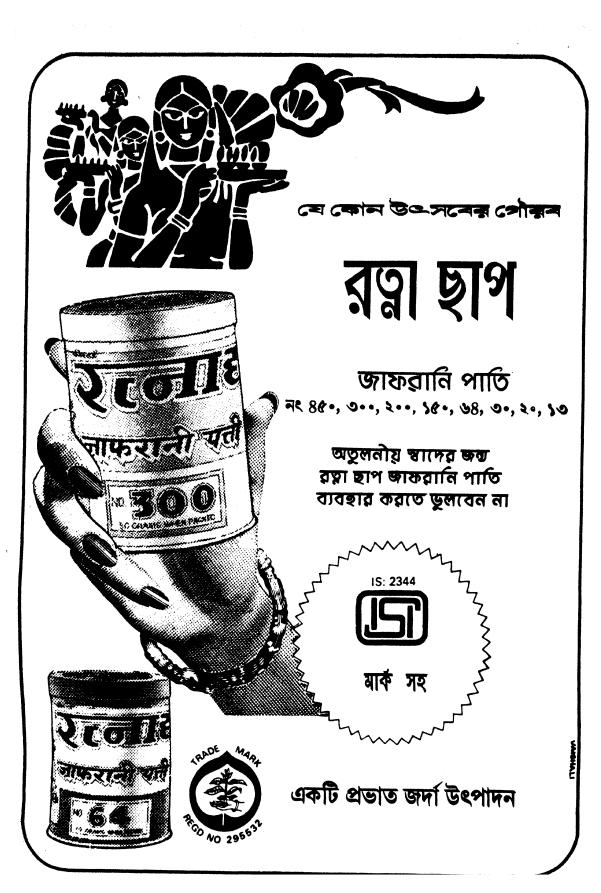
থানা, পুলিস, কোর্ট ব্যাপারগুলো শুনলেই কেমন যেন একটা অস্বস্তি হয় আমাদের। আর বাড়ির মেয়ে বা বউ থানা-পুলিস নিয়ে ব্যস্ত থাকবে অথবা নিজেই পুলিস অথবা পুলিসের ইন্সপেক্টর হবে এসব চিন্তা এখনও আমাদের সমাজ তেমনভাবে মেনে নিতে পারে না। তবে আজকালকার যা বাজার তাতে লেখাপড়া শিখে কেবলমাত্র ঘর-সংসার করতেও আমরা মেয়েরা বিশেষ আগ্রহী নই। তা ছাড়া, অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তাও বোধ হয় আমাদের যে কোন কাজে মানসিক প্রস্তুতির অন্যতম কারণ। আর তাই লালবাজারের লাল ইঁটের বিশাল বাড়ির একটা বিরাট ঘরে অজস্র ফাইলপত্তরের মধ্যিখানে বসে থাকা অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিস কমিশনার (মহিলা বিভাগ) লীলা চৌধুরীকে দেখে বেশ একটু হতবাকই হয়ে গেছিলাম।

কয়েক মাস আগে ময়দানে একটা আইন অমান্য গোছের আন্দোলন ছিল। হঠাৎই ওখানে গিয়ে পড়েছিলাম। আর দেখেছিলাম কয়েকজন মধ্যবিত্ত সংসারের বউ পুলিসের ইউনিফর্ম পরে আইন অমান্যকারিণী আরো কয়েকজন মহিলাকে দমন করবার উদ্দেশ্যে তৎপর। ব্যাপারটা কেমন যেন ঠেকল। আমরা সবাই মেয়ে, সংসারের ছায়ায় আমাদের রূপ এক। মা-র প্রতিচ্ছবি আমাদের সব ভারতীয় নারীর মধ্যে অথচ বাইরে আমাদের অন্য রূপ। ঘরে-বাইরে নব নব রূপে আমরা সবাই এক জায়গায় এক। ওখান থেকেই চলে গিয়েছিলাম লালবাজারে। আর সেখানেই পেয়েছিলাম লীলাকে। আজ থেকে প্রায় ৩৬/৩৭ বছর আগে গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলেন লীলা। ছয় বোন আর এক ভাই-এর মধ্যে বড় লীলাকে সংসারের হাল ধরতে হয়েছিল তখন থেকেই। দেশ ভাগের সময় ওপার বাংলার সব খুইয়ে সপরিবারে এখানেই বাস করেন। অবশ্য লীলা বরাবরই পড়াশোনা করেন কলকাতায়। বেথুন কলেজ থেকে বেরিয়েই সাব-ইন্সপেক্টর অফ পুলিস-এ চাকরি করতে আসেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'এত সব লাইন থাকতে হঠাৎ পুলিসে এলেন কেন? এখন অবশ্য এটা কিছু নয়, কিন্তু আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে একজন মহিলার পুলিসের লাইনে আসাটা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য'। সুন্দর চেহারার লীলা শান্ত চোখ তুলে বললেন, 'আসলে আমার শিক্ষকতাটা তেমন একটা ভাল লাগত না। তা ছাড়া, তখন পারিশ্রমিকও ছিল নামমাত্র। ক্লারিকাল চাকরিও একঘেয়ে। তাই কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে অ্যাপ্লাই করলাম। হয়েও গেল। বাবা রিটায়ার্ড, ছোট ছোট ভাই-বোন। আমাকে তাই এগিয়ে আসতেই হয়েছিল। নারী স্বাধীনতায় আমি বিশ্বাসী নিশ্চয়ই কিন্তু কোন আদর্শ-টাদর্শ নিয়ে আসিনি। আর আমাদের সময়ও চাকরির পথ সুগম ছিল না। মাঝখানে একটা সময়ে মেয়েদের চাকরির সুযোগটা একটু বেশি হয়েছিল। এখনকার কথা তুমি আমার চেয়ে বেশিই জান'। গোয়েন্দা, রেকর্ড, ট্রাফিক সব সেকশনের মহিলা পুলিসদের সর্বময় কর্ত্রী লীলা। তা ছাড়া, 'ল' সেকশনেরও ইনচার্জ।

'আপনি তো দীর্ঘদিন পুলিসি দপ্তরে আছেন, বর্তমানে মেয়েরা এই লাইনে কি রকম আসছেন, মানে কতটা প্রেফার করছেন এই প্রফেশনকে?' হেসে বললেন, 'কি বলব তোমাকে, দশটা পোস্ট হলে কম করে শ' ছয়েক দরখাস্ত পড়ে। এই তো কিছুদিন আগে একজন এম-এ পাস মহিলা পুলিস কনস্টেবল পদে জয়েন করেছেন। আমাদেরই খারাপ লাগে। জানো,

লীলা চৌধুরী

ট্রাফিক মহিলা পুলিস বা হোম গার্ডও আছেন যাঁরা গ্র্যাজুয়েট।

সংসারের বিচিত্র রঙ্গমঞ্চে বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি লীলার। কাজের চাপে আর কয়েকটা পারিবারিক দুর্ঘটনায় লীলা জড়িয়ে পড়েছিলেন বোনেদের সংসারে। তাদের বিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে আজও জড়িয়ে আছেন সংসারের শাখা-প্রশাখায়। মানসিক তুষ্টির ছায়া তাই লীলার মুখে। মা-এর স্নেহ ভালবাসার প্রতিচ্ছবি লীলাকে আজও করে রেখেছে সুন্দর মনোরমা। ব্রিটিশ আমলের বিশাল সিঁড়ির মুখে বিদায় জানাতে এলেন লীলা। বললেন, 'অহমিকা, পরশ্রীকাতরতা এসবের বাইরে এলেই আমাদের দেশের মেয়েরা নিজেদের জায়গা করে নিতে পারবে যে কোন কর্মজগতের মাঝে।' একটা খুশির আমেজ নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

ছবি : শিপ্রা দাস

ছাতে চলছে; আজও নেভানোর কাজ…
নুকো !
মড়…মড়াত্

!
আগুন নেভাচ্ছিল নুকো…কিন্তু পাটাতন ধসে গিয়ে সে…

উঃ, অল্পের জন্যে বেঁচে গেছ !
এক চুলের জন্য !

আমি দড়ি নিয়ে আসছি, ওয়াকার-কাকা ! *
*
রাজা ওয়াকার কাকা বলে

ধন্যবাদ, রাজা !

নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন
আমাকে বাঁচাতে তুমিও প্রাণের ঝুঁকি নিতে !
6/30
ক্রমশ ● ৩

কবে রোদ্দুর উঠবে

দীপঙ্কর ঘোষ

বছরের আট মাসেরও বেশী সময় হাড় কাঁপানো শীত আর ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে ব্রিটিশরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে কবে রোদ্দুর উঠবে। রৌদ্র ওঠাটা অনেকটা উৎসবের দিনের আনন্দের মতো। রোজ আসে না। তাই এর জন্য প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষার সঙ্গে প্রস্তুতিও অঢেল। মার্চ মাসে যখন মাঠ ঘাট বরফে ঢাকা তখন থেকে দোকানে দোকানে পসরা বসে গ্রীষ্মের স্বল্পবাস আর পাতলা জামা কাপড়ের। দোকানগুলো সাজতে থাকে গ্রীষ্মের হাল্কা রঙে। বাড়িতে বাড়িতে চিঠি ফেলার ফোকর দিয়ে প্রতিদিন আসতে থাকে গ্রীষ্মের ছুটি কাটানোর, সাঁতার কাটার নানা নকশার দেহাবরণ। টেলিভিশনের পর্দায় প্রতি নিয়ত বিজ্ঞাপন দেখা যায়— আদিগন্ত বিস্তৃত নীল সমুদ্র, সবুজ মাঠ, ঝলমলে রোদ্দুর। আবার কোথাও তপ্ত বালুতে স্বল্প বাস পরিহিত মানুষজন শরীর তামাটে করে নিচ্ছে। অথচ ঘরের ভেতর যারা ঐ দৃশ্যগুলো দেখছেন তাঁরা বসে আছেন মোটা মোটা পশমের জামা কাপড় পরে গনগনে আগুনের সামনে। কল্পনা শক্তিকে যেকোনো একটা উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া আজকাল বিজ্ঞাপনের পক্ষে খুবই সহজ ব্যাপার। গ্রীষ্মে ব্রিটিশদের সবাই যে দেশের বাইরে চলে যান ছুটি কাটাতে তা ঠিক নয়। ব্রিটিশরা ছাড়াও লাখ লাখ লোক আসেন বাইরে থেকে ব্রিটেনে ছুটি কাটাতে। মানুষের স্বভাব হচ্ছে ভালো কিছু হলে অন্যের সঙ্গে তা ভাগ করে নিতে চায়। তাই ইয়োরোপের অন্যত্র, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া জাপানেও চলতে থাকে প্রচুর বিজ্ঞাপন। ব্রিটেনে ছুটি কাটাতে আসার নানা আকর্ষণ ফলাও করে প্রকাশ করা হয় সেসব দেশের পত্র পত্রিকা আর টেলিভিশনে। ব্রিটেনের আর সব বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা গেলেও পর্যটন বাণিজ্য দিন দিন বেশ দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আর এর মূলে রয়েছে ঐতিহ্য—ইতিহাস আর রাজা-রাণীদের প্রাসাদ, বাড়ি ঘরগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করে পর্যটনকারীদের পছন্দসই এবং মনোরম করে রাখা।

ঐতিহ্যের প্রতি ব্রিটিশদের স্বাভাবিক ভালোবাসার কথা আমরা অনেক আগে থেকেই শুনে আসছি। এখনও অনেকটা সেরকমই। পরিবেশ সংরক্ষণে ব্রিটিশরা আগের চাইতে বেশি করে মেতে উঠেছে। পর্যটকদের মনোরঞ্জন করতে এবং পরিস্থিতিকে যতোটা সম্ভব একরকম রাখতে এঁরা ভূতুড়ে বাড়িগুলোকেও বাদ দিতে নারাজ। কে-জানে হয়তো ভূত বা ভূতুড়ে বাড়ির সন্ধানে কোন দিন হয়তো বিরাট একদল পর্যটক এসে হাজির হবেন। তবে ভূত কিংবা ভূতুড়ে বাড়িগুলোকে বাইরের লোকেরা এসে যাতে সহজে শনাক্ত করতে পারে এবং পর্যটকরা যাতে আগ্রহী হয় তার জন্য প্রকাশিত হয়েছে নতুন একটি বই : "দ্যা ঘোস্টস এন্ড লিজেন্ডস অফ ব্রিটেনস হিস্টরিক বিল্ডিংস।" ব্রিটেনে বেড়াতে এসে লন্ডনের কাছে 'হ্যাম্পটন কোর্ট' প্রাসাদে অনেকেই বেড়াতে যান। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে অষ্টম হেনরির আমলে টেমস নদীর একটা নির্জন কিনারা ঘেঁষে তৈরি হয়েছিল হ্যাম্পটন কোর্ট রাজপ্রাসাদ। শোনা যায় আজকালও নাকি সে প্রাসাদের আনাচে কানাচে বর্ণনাতীত কোন পায়ের শব্দ হঠাৎ হঠাৎ ভেসে আসে। আবার কিছুক্ষণের মধ্যে সব নিশ্চুপ হয়ে যায়। আবার কখনও জেগে ওঠে সুরের একটা মিহি তান। কিংবা কারো কারো বর্ণনা মতে টিউডর যুগের পোশাক-আসাক পরে হয়তো কোন রমণী দূর থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। সুতো তুলে কাজ করা বিশাল ট্যাপস্ট্রি টানানো রয়েছে সারা দেয়াল জুড়ে। দেওয়াল থেকে হয়তো অষ্টম হেনরির কোন এক স্ত্রীর একটা হাত উঠে আসছে। আবার

অনেকে বলেন উইন্ডসর দুর্গ প্রাসাদেও অনেক ভূতুড়ে আজব কাণ্ড-কারখানা দেখতে পাওয়া যায়। শুধু যে রাজা-রানীর আত্মা প্রেতাত্মাই ঘোরাঘুরি করে তাই নয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রধান মন্ত্রী ডিজরেইলি কিংবা লেখক রুডিয়ার্ড কিপলিং, জর্জ বার্নার্ড শ— এঁরাও নাকি কোন কোনভাবে তাঁদের বসত বাড়ি লাইব্রেরি ঘর ইত্যাদির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। কাউকে যদি কোন কারণে অক্সফোর্ডের 'জর্জ অ্যান্ড ড্রাগন ইন' বা ওই রাস্তার ধারের সরাইখানাটায় রাত কাটাতে হয় এবং গভীর রাতে যদি মুখের ওপর কারো ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ লেগে ঘুম ভেঙে যায় তবে কি তিনি চমকে উঠবেন না! সদ্য প্রকাশিত বইটিতে অবশ্য বলা হয়েছে যে, বেশিরভাগ ব্রিটিশ ভূত কারো ক্ষতি করে না। আজব হলেও মানুষের ইন্দ্রিয় গোচর হয়েছে এমন সব ঘটনার সারমর্ম তৈরি করে প্রকাশিত হয়েছে 'দ্য ঘোস্টস অ্যান্ড লিজেণ্ডস অফ ব্রিটেনস হিস্টরিক বিল্ডিংস।' নানা লোকের বিভিন্ন ধরনের বর্ণনাগুলোর সারমর্ম গুছিয়ে বইয়ের আকারে লিখেছেন ঘোস্ট ক্লাব অফ ব্রিটেনের প্রেসিডেন্ট পিটার আন্ডারউড। তিনি আবার ড্রাকুলা সোসাইটিরও সদস্য। পিটার আন্ডারউড মনে করেন এসব ভৌতিক গল্প গাথাকে পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে মানুষ হয় ভয় পেত, কিংবা হেসে উড়িয়ে দিত। আজকাল ঠিক তা নয়। মানুষ ঐসব কাহিনীকে মেনে নিয়ে তার সঙ্গে বসবাস করতে শিখেছে। শত শত লোক তাদের ব্যক্তিগত অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে সমিতির কাছে চিঠি লেখেন। তবে শতকরা আটানব্বই ভাগ কাহিনী শেষ পর্যন্ত গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু দুভাগ তো থেকে যাচ্ছে যার কোন ব্যাখ্যা মেলে না। ঐসব অভিজ্ঞতা যাঁদের লাভ হয়েছে তাঁরা এবং অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞরা আপাতভাবে এর কোন কারণ বা যুক্তি খুঁজে বার করতে সমর্থ হননি। এ ধরনের বই এবং বিশেষত কোন দুর্গে বা প্রাসাদে প্রবেশ করলে কয়েক শতাব্দী আগের ইতিহাসগুলো সামনে এসে দাঁড়াবে, ঘটনাগুলো সজীব হবে। এর সন্ধানে বহু পর্যটকই আকর্ষণ বোধ করেন। গল্প হিসেবেও অনেকে পড়তে আগ্রহী হন। কোন হতভাগ্য তরুণী বধূর কাহিনী, নিষ্ঠুর সংমায়ের অত্যাচার, প্রেমিক প্রেমিকার বিয়োগান্ত কাহিনী—এ ধরনের নানা ঘটনার পটভূমিতে লেখা দ্য ঘোস্টস অ্যান্ড লিজেন্ডস অফ ব্রিটেনস হিস্টরিক বিল্ডিংস। পর্যটক হিসাবে ব্রিটেনের টাওয়ার অফ লন্ডন (অতীতে কয়েদীদের প্রতি অত্যাচার ও প্রাণদণ্ডের জন্য বিখ্যাত) থেকে শুরু করে বার্কলে দুর্গ পর্যন্ত সমস্ত প্রাসাদ-দুর্গ আপনার না দেখা সম্ভব হলেও গল্প কাহিনীর মধ্য দিয়ে ইতিহাসের অনেকটা রাস্তা বেড়িয়ে আসতে পারবেন।

ইংল্যাণ্ডের সাসেক্স অঞ্চলে অষ্টাদশ শতকে নির্মিত, ধাপে ধাপে নেমে যাওয়া এই বাড়ীগুলি আঁকড়ে আছে ইতিহাস এবং কিছু নির্জনতা

গ্রামীণ অপেরার দীর্ঘ বিরতির সুযোগে দর্শকরা উচ্ছল পিকনিকে মেতেছেন

ব্রিটিশদের ঐতিহ্যের প্রতি প্রেম শুধু রাজা রাজড়া আর প্রাসাদ দুর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সম্প্রতি তারই নতুন একটি উদ্যম দেখা গেল। গ্লোব থিয়েটার— যে রঙ্গমঞ্চে উইলিয়াম শেক্সপীয়র তাঁর বেশ কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ এবং নিজে অভিনয় করেছিলেন সে মঞ্চটি প্রায় পৌনে চার'শ বছর আগে আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। কয়েক শতাব্দী পরে এখন আবার সে থিয়েটারটি নতুন করে তৈরি হতে চলেছে। গ্লোব থিয়েটার প্রথম তৈরি হয়েছিল ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। তখন শেক্সপীয়র 'হেনরি দ্য ফিফ্‌থ' লিখছিলেন। সে সময় কয়েকজনের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে গ্লোব থিয়েটার। আজকের মান-এ তা কখনই রঙ্গমঞ্চের তালিকায় পড়তো না। প্রথমত উন্মুক্ত আকাশের নিচে ছিল থিয়েটারের বেশির ভাগ অংশ। শুধু মঞ্চটুকুই ছিল খুঁটি আর খড়কুটো দিয়ে ঢাকা। ফলে গ্রীষ্মের কয়েকটা মাস ছাড়া নিয়মিত অভিনয় সম্ভব হ'ত না। নামকরণ করা হয়েছিল থিয়েটারের আকৃতি অনুসারে। মোটামুটিভাবে দেখতে ছিল গোলাকৃতি। আর বাইরে ঝোলানো ছিল 'গ্লোব' হাতে হারকিউলিস। শোনা যায় শেক্সপিয়রের জীবদ্দশায় তাঁর লেখা কিং লিয়ার, ওথেলো, ম্যাকবেথ এবং রোমিও জুলিয়েট ঐ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে 'হেনরি দ্য এইটথ' নাটকটি অভিনীত হবার সময় গোলাগুলির আগুনের ঝলক লেগে খড়ের চালা পুড়ে যায়। সৌভাগ্য, সেদিন দর্শকদের সবাই প্রাণে বেঁচে যান। প্রায় পৌনে চারশ বছর পর সেই গ্লোব থিয়েটার অতীতের ধ্বংসাবশেষ থেকে আবার নতুন সাজে সাজতে যাচ্ছে। গত বেশ কিছু বছর এ নিয়ে চলেছে নানা তর্কবিতর্ক আর মামলা। শেষ পর্যন্ত ৬৭ বছর বয়স্ক একজন আমেরিকান অভিনেতা ও পরিচালকের উদ্যোগে গ্লোব থিয়েটার নতুন করে গড়ে উঠছে। ভদ্রলোকের নাম শ্যাম ওয়ানামেকার। ১৯৬৯ সাল থেকে মিঃ ওয়ানামেকার গ্লোব থিয়েটারটি নতুন করে তৈরির জন্য প্রচার অভিযান শুরু করেছিলেন। তিনি চাইছিলেন গ্লোব থিয়েটার যে জায়গায় ছিল ঠিক সেখানটায়, অন্তত টেমস নদীর দক্ষিণ পাড়ে, আগের জায়গার খুব কাছাকাছি তা হতে হবে। 'শেক্সপিয়র গ্লোব ট্রাস্ট' নামে একটি তহবিল খুলে অর্থ সংগ্রহও শুরু করেছিলেন শ্যাম ওয়ানামেকার। সমর্থকদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট রেগান, প্রিন্স ফিলিপসহ বহু অভিনেতা, কোটিপতি ব্যক্তিকে তিনি যোগাড় করতে সক্ষম হন। ১৯৮১ সালে স্থানটির প্রকৃত মালিক আঞ্চলিক পৌর পরিষদ জায়গাটির উন্নয়নের জন্য মিঃ ওয়ানামেকারকে অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৮২ সালে পরিস্থিতি আবার গেল বদলে।

সপ্তদশ শতকে নির্মিত এই মৃৎ-শিল্পকেন্দ্রটি এখন একটি সংগ্রহশালা

স্থানীয় পৌর পরিষদের ক্ষমতায় নতুন যাঁরা এলেন তাঁরা সংস্কৃতির দিক থেকে সমাজের এলিট শ্রেণীর প্রতিভূ সেক্সপিয়রের পুরনো রঙ্গমঞ্চ পুনরুদ্ধারে ততটা আগ্রহী হলেন না। তাঁরা মনে করলেন অতীতের ঐতিহ্যের প্রতি অত বড় সম্মান দেখানোর চাইতে আজকের প্রয়োজনে সমাজের কম সুবিধে ভোগীদের জন্য ওখানে নতুন বাড়ি ঘর তোলা হোক। ফলে তাঁরা আগের পৌর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে বাতিল বলে ঘোষণা করলেন। যুক্তি দেখালেন, ওই জায়গায় পৌর পরিষদের যানবাহন রাখার ডিপো রয়েছে, তাই কাজে অগ্রসর হওয়া অসুবিধে। শুরু হলো আইনের লড়াই। প্রায় বছর চারেক সংগ্রাম চলার পর সম্প্রতি মিঃ ওয়ানামেকার ন্যায়ালয়ের সম্মতি পেলেন। একশ পঁচিশ বছরের জন্য ওই জায়গা ইজারা দেওয়া হলো। শেক্সপীয়রের নিজের হাতে গড়া গ্লোব থিয়েটারের পুনর্জন্মের পথ পরিষ্কার হলো। আশা করা হচ্ছে ১৯৯১ সাল নাগাদ পুরো দমে অভিনয় শুরু হবে গ্লোব থিয়েটারের। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো থেকে বলা হয়েছে যতটা সম্ভব আগের ধাঁচেই তৈরি হবে গ্লোব রঙ্গমঞ্চ। খোলা ছাদ, তিন ধাপে গ্যালারি উঠে যাবে। দর্শকরা বিভিন্ন ধাপ থেকে সমানভাবে মঞ্চের চরিত্রগুলোর দিকে দৃষ্টি রাখতে পারবেন। গ্লোব থিয়েটার গরম রাখার কোন ব্যবস্থা থাকবে না, ব্যবস্থা থাকবে না মাইক্রোফোনের। দর্শকদের বসতে হবে কাঠের বেঞ্চে। বছরে মাত্র চার মাস অর্থাৎ গ্রীষ্মের কয়েকটি মাস শুধু দিবালোকে অভিনয় চলবে। মিঃ ওয়ানামেকার আশা করছেন, দর্শকদের মধ্যে 'অতি বিশিষ্ট' এবং সম্ভবত 'অবিস্মরণীয়' কোন অশরীরী আত্মা আবার হয়তো 'তাঁর' নিজ কীর্তি দেখার জন্য গ্যালারির কোন একটি আসনে বসে থাকবেন। গ্লেন

চি ত্র ক লা

আলোড়ন

পূর্ণেন্দু পত্রীর ছবি

রেখাচিত্র এঁকেই শিল্পী চিত্রভাস্কর্যের খসড়া করেন। এসবই খুঁটিনাটি ভাবনা, পর্যবেক্ষণের রোজনামচা। অনুশীলন রেখাচিত্রকে অনেক সময় অঙ্কনের স্তরে পৌঁছে দেয়। এমনও হতে পারে যে, অঙ্কন আলো অন্ধকার বুনোটে একরঙা ছবি হয়ে ওঠে। পূর্ণেন্দু পত্রীর ইদানীং প্রদর্শনীর কাজগুলোকে রেখাচিত্র (স্কেচ), অঙ্কন (ড্রইং) এবং ছবি (পেনটিং) কোন পর্যায় ফেলব ঠিক করে উঠতে পারিনি (বৃটিশ কাউন্সিল ১-৬ সেপ্টেম্বর)। প্রধানত ছিল কালো সাদা (তুলি-কালি এবং কলমের) কাজ। হালকা বাদামী এবং ছাই রঙের বোর্ডে এঁকেছেন ছবিগুলি। দৃশ্য জগতের রূপকে বিমূর্ত রূপান্তরে যেমন কাঁথায়, আলপনার ব্যবহার করা হয়, ফুলকারি ছুঁচের কাজে, সেই রকম নকশাদার নকশীব্যাপার কিছুটা আছে ওঁর কাজে। এক নজরে মণ্ডনধর্মী এবং আলঙ্কারিক বলে মনে হয়। আঁকিবুঁকি বা ডুড্‌লসের ধরন আছে কয়েকটা কাজে। চিত্রাবলীর নাম দিয়েছেন পত্রী "টারময়েল"। উথাল পাতাল ব্যাপারও যেন আছে। পরিণত প্রবীণ বয়সে এটা এক রকম তাঁর প্রথম প্রদর্শনী। বছর দু-এক আগে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিয়ে ছবির প্রদর্শনী করেছিলেন। নেমন্তন্ন করেননি বলে সেটা দেখা আর হয়ে ওঠেনি। এইটাতে ২০টা ছোট বড় মাঝারি ছবি ছিল।

ঝড়ে বা ঘূর্ণি হাওয়ায় পাতা উড়ে যাবার মতো করে সাজিয়ে পূর্ণেন্দু মানুষের আর মানুষীর রূপবন্ধ ভেবেছেন। কাঠ চিরলে ক্রমে ছোট হয়ে আসা যে গোল দাগ দেখা যায়, যা দিয়ে গাছের বয়স গোনা হয়, সেই ঘূর্ণায়মান সুদর্শনচক্র ছবির নকশায় তিনি কায়দা করে গুঁজে দিয়েছেন।

মানব মূর্তিগুলি ঈষৎ বিকৃত, দীর্ঘায়িত সরলীকৃত এবং রূপারোপিত। ফলে দ্বিমাত্রিক হলেও সমুন্নত সীমারেখা ব্যবহারের জন্যে ভাস্কর্যের আয়তন এবং বস্তুপুঞ্জের আভাস এসেছে। রেখা এবং কালো সাদার তলে তলে বিভাজনের ফলে ছবিতে এক ধরনের দ্বিমাত্রিক সামঞ্জস্য প্রতিবিধান করতে পেরেছেন কখনো সখনো। প্রদর্শনীর ছবিগুলোতে সুরের ঐক্য আছে। কিন্তু পুনঃপৌনিক বলে খানিকটা একঘেয়ে লাগে। কিছু ছোট ছবিতে, যা দরজা দিয়ে ঢুকে বাঁ ধারে দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে ছিল, সেগুলির মধ্যে খানিকটা ছবির খেলা ছিল। রচনাসৌকর্যের খানিকটা মুন্সীয়ানা। দু দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখার মতো জিনিস। বড় ছবিগুলোর রূপবন্ধ আলগা। ছাড়া ছাড়া। দানা বাঁধেনি সে সব ছবি। লোড শেডিং হবার ফলে ফ্রিজে আইসক্রিম বা পুডিং যেন জমাট হয়নি। তরল থেকে গেছে। রেখা অস্বতঃস্ফূর্ত, ঝুঁকি না নিয়ে ধরে ধরে করা হয়েছে। কোথাও ফলিত ললিতকলার ব্যাপার এসে গেছে। রচনা টাল খেয়েছে। মনে হয়েছে ওঁর আঁকা প্রচ্ছদের বড় সংস্করণ। বড় ছবির জন্য দরকার পড়ে বহুদিনের চর্চা, মনন এবং অভিনিবেশ। উজ্জ্বল সিঁদুর রঙের নাম সই, আলাদা করে ভাল লাগলেও, রচনার মধ্যে জায়গা করতে পারেনি। ফলে মনে বাড়তি মনে হয়েছে।

নিয়ম করে ছবি আঁকলে এসব ছোটখাটো ত্রুটি তিনি কাটিয়ে উঠতে পারবেন এমন প্রতিশ্রুতি ছবির মধ্যে নিহিত রয়েছে। পূর্ণেন্দু পত্রী প্রত্যয়ী, প্রবী। সেটাই ভরসার কথা।

সন্দীপ সরকার

সং গী ত

"দা গোল্ডেন গ্রেট্‌স্‌"

সঙ্গীত রিসার্চ অ্যাকাডেমী আয়োজিত 'দা গোল্ডেন গ্রেট্‌স্‌' সঙ্গীত সম্মেলন বিপুল সমারোহে কলামন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ৩রা থেকে ৬ই সেপ্টেম্বর। এই আসরে সারা দেশের অন্যতম খ্যাতনামা ও যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন নবীন শিল্পীরা সমবেত হয়ে তাঁদের নিজ নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। অপূর্ব সুসজ্জিত মঞ্চে এবং সুনিপুণ ব্যবস্থাপনায় প্রথম অধিবেশন শুরু হয় শোভা নাইডুর কুচিপুড়ি নৃত্যানুষ্ঠান দিয়ে। স্বনামধন্য গুরু ভেমপত্তি চিন্না সত্যমের সুদর্শনা এই শিষ্যার নৃত্যলাবণ্য ও অভিনয়নৈপুণ্যের উৎকর্ষ অতুলনীয়। শিল্পীর পরিবেশনাতে বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে অভিনয় প্রসঙ্গ,—জয়দেবের রচিত অষ্টপদীভিত্তিক 'রাধিকাকৃষ্ণ' আখ্যানে বিরহিনী ও খণ্ডিতা নায়িকার ভাবানুভূতি প্রকাশে, 'গোবর্ধন গিরিধারী'তে কৃষ্ণের মাখন চুরির রূপায়ণে, এবং গোপিনী সহচরীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রসলীলার প্রাণবন্ত চিত্রায়ণে শিল্পীর নৈপুণ্য সুপ্রকাশিত। তবে কুচিপুড়ি নৃত্যশৈলীর যথার্থ নৃত্তাংশটি এই অনুষ্ঠানে অপেক্ষাকৃত অবহেলিত। এই রীতির ধ্রুপদী আবেদন অনুভূত হয়েছে শুধুমাত্র তরঙ্গমে এবং কিছুটা পূর্বরঙ্গমে। অবশ্য শিল্পীর শিষ্যা জে. অনুরাধার পরিবেশিত কৃষ্ণশব্দম্‌ এবং তিল্লানার সুবিন্যস্ত বিন্যাস ও দক্ষ উপস্থাপনা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর পাদপ্রকরণের বলিষ্ঠ রূপায়ণভঙ্গি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তবে দেহসঞ্চালন ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে তাঁকে আরো পরিণত হতে হবে। শিল্পীদ্বয়ের সঙ্গে নাট্টুভঙ্গম, মৃদঙ্গম, বেহালা, বাঁশি, বীণা ও কণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন যথাক্রমে এস মোহন, পিয়া শর্মা, উমাশংকর, বালা সাঈ, সত্যনারায়ণ এবং সীতা মহালক্ষ্মী।

পরবর্তী শিল্পী বিজয়শঙ্করের কত্থক নৃত্যানুষ্ঠান ট্র্যাডিশনাল ও ধ্রুপদী আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়েছে। কূট লয় বিভাজনের সূক্ষ্মরস উপভোগ্য হয়েছিল তালবিস্তারের প্রাথমিক পর্যায়ের ছোট ছোট সুন্দর তেহাই-এর সমন্বয়ে, কয়েকটি আকর্ষণীয় টুকরায়, গিন্‌তির অপূর্ব বিন্যাসে এবং ধামার তালশ্রিত বিভিন্ন লয়ের কাজে। চমকবর্জিত হলেও যথার্থ রসিক দর্শকের কাছে অনুষ্ঠানটির মর্যাদা ও আবেদন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে শিল্পীর সঙ্গে পণ্ডিত কিষাণ মহারাজের তবলা সঙ্গত ছিল একটি অন্যতম আকর্ষণ। পণ্ডিতজীর স্বকীয় রীতিতে ছোট আবর্তনের মধ্যে পরিবেশিত হয়েছে অদ্ভুত সূক্ষ্ম ও সুকঠিন লয়বিন্যাস এবং বিভিন্ন কূটছন্দের যথার্থ নান্দনিক সমন্বয়। অন্যান্য সহযোগী শিল্পী হিসাবে পাখোয়াজে নরেশ মুখোপাধ্যায়, স্বপ্নময় বন্দ্যোপাধ্যায় সরোদে, কণ্ঠে প্রতীপ শর্মা এবং সারেঙ্গীতে রমেশ মিশ্রর অবদান উল্লেখযোগ্য।

॥ ২ ॥

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন শুরু হয় কণ্ঠসঙ্গীত দিয়ে,—শিল্পী ছিলেন পদ্মা তালওয়ালকার। সুরের ভরাট আমেজ সৃষ্টিই ছিল তাঁর গানের প্রধান আকর্ষণ। ইনি প্রথমে ঝুমরা তালে ভূপ রাগের বিলম্বিত খেয়াল এবং পরে ত্রিতালে তারানা গেয়ে শোনান। শিল্পীর সুপরিমিত ও স্বতস্ফূর্ত লয়ের কাজ যথেষ্ট উপভোগ্য হয়েছিল, তুলনায় তাঁর তানের দানা তেমন স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট নয়। অবশ্য মোটা দানার

তান খুবই পরিচ্ছন্ন। দ্বিগুণ লয়ের বলিষ্ঠ হলক তানও সুপরিবেশিত। ঝাঁপতালে নিবদ্ধ পরবর্তী সোহিনী ও ত্রিতালে আবদ্ধ হাম্বীর রাগ ছোট পরিধির মধ্যে সুন্দরভাবে গোছানো ও সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশনা। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হল বোলবাঁট রূপায়ণে শিল্পীর নিখুঁত লয়ের বিন্যাস। তবলা ও হারমোনিয়মে সুদক্ষ সহযোগিতা করেছেন আনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মেহ্‌ফুজ খাঁ।

পুরিয়া কল্যাণ রাগে সেতারবাদনের অনুষ্ঠানে তরুণ শিল্পী শাহিদ পরভেজ তাঁর আলঙ্কারিক নৈপুণ্য ও নান্দনিক সচেতনতার সার্থক পরিচয় দিয়েছেন। রাগ উপস্থাপনায় তিনি পুরিয়া অঙ্গের দিকে একটু বেশী মনোযোগী ছিলেন,—পঞ্চমের তেমন কোন আকর্ষণীয় ব্যবহার লক্ষ করা যায়নি। তবে শিল্পীর স্বরপ্রয়োগের সুনিয়ন্ত্রিত ও সুচারুভঙ্গি অত্যন্ত

তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

প্রশংসনীয়। গৎকারি অংশে নিবদ্ধ ছিল অষ্টরূপক অর্থাৎ তিন-দুই-তিন, এই বিভাগ বিশিষ্ট তালে এবং পরে যথাক্রমে দ্রুত একতালে ও অতি দ্রুত ত্রিতালে। লয়কারির বিশদ এবং সুচিন্তিত প্রয়োগে শিল্পী তাঁর স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর অতি-দ্রুত তানের চমকপ্রদ প্রয়োগও অনবদ্য। নবাগত বিজয় জয়ন্ত এঁর সঙ্গে প্রাণবন্ত তবলা সহযোগিতা করেছেন। প্রখ্যাত শিল্পী জাকির হোসেনের প্রভাবপুষ্ট হলেও এই তরুণের বাদনশৈলী চিত্তাকর্ষক।

॥ ৩ ॥

তৃতীয় সান্ধ্য অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল কিশোর শিল্পী ইউ. শ্রীনিবাসের ম্যাণ্ডোলিন বাদন। যন্ত্রের ওপর অসাধারণ নিয়ন্ত্রণ, সুর ও তাল লয়ের দক্ষ প্রয়োগকুশলতা এবং সর্বোপরি প্রায় অবিশ্বাস্য

শোভা নাইডু

রকমের পরিণত মানসিকতা, সবদিক থেকেই বলা যেতে পারে এই অত্যাশ্চর্য কিশোর প্রতিভা সাম্প্রতিক কালের শিল্পীসমাজে এক উজ্জ্বল সংযোজন। আভোগী রাগের বর্ণম্ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করে শিল্পী বিভিন্ন রাগাশ্রিত একের পর এক কৃতি পরিবেশন করেন। তাঁর নিপুণ সাঙ্গীতিক ক্রিয়াকর্মের পারঙ্গমতা রীতিমত বিস্ময়কর। মুথুস্বামী দীক্ষিতের রচনা 'মহাগণপতিম্' ছিল রাগ নাটা (হিন্দুস্থানী পদ্ধতির যোগ রাগের সদৃশ) ও আদি তালে নিবদ্ধ। এই অংশের দুই গান্ধারযুক্ত মুখরাটি বেশ মনোগ্রাহী। এর পরে শ্রীনিবাস যথাক্রমে রূপক তালাশ্রিত মায়ামালবগৌরা রাগ (অনেকটা হিন্দুস্থানী পদ্ধতির ভৈরব রাগের মত), নাদচিন্তামণি রাগে নিবদ্ধ ত্যাগরাজের রচনা (খানিকটা আমাদের কাফির মত), আদি তালের চন্দ্রজ্যোতি রাগ (দুই ঋষভের পাশাপাশি ব্যবহার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং নিষাদ বর্জিত), নলিনীকান্তি (আমাদের তিলক কামোদ রাগের সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যায়), হিন্দোলম্ (হিন্দুস্থানী মালকোশের মত), নবরসকানাড়া এবং রাগমালিকা এবং

ইউ শ্রীনিবাস

সবশেষে লালগুড়ি জয়রামন্ রচিত রেবতী রাগাশ্রিত (হিন্দুস্থানী বৈরাগী রাগের মত) একটি তিল্লানা পরিবেশন করেন। এই সবকটি রচনার মধ্যেই শিল্পীর সুন্দর মেজাজ, সূক্ষ্ম শিল্পবোধ, অপূর্ব স্বরনিয়ন্ত্রণ, সুকঠিন তানকারির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ইত্যাদি অসামান্য গুণপনার বিরল সমাবেশ ঘটেছে। তাঁর সঙ্গে মৃদঙ্গম্ ও ঘটমে অনবদ্য সহযোগিতা করেছেন তিরুভার ভক্তসলম্ এবং ই. এম. সুব্রহ্মানিয়াম। নিজ নিজ বাদনচক্রে এঁদের অনায়াস দক্ষতা ও নৈপুণ্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। বেহালা যন্ত্রে শিল্পীকে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন এস. ডি. শ্রীধর।

পরবর্তী শিল্পী ছিলেন মাদুরাই টি. এন. শেষগোপালন। প্রথাধর্মী পরিচ্ছন্ন গায়কী হল এই সুকণ্ঠী গায়কের উল্লেখযোগ্য সম্পদ। সামগ্রিকভাবে তাঁর পরিবেশনার সাবলীল ও আন্তরিক ভঙ্গী বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। শ্রী রাগে নিবদ্ধ আদি তালাশ্রিত বর্ণম্ দিয়ে তিনি তাঁর অনুষ্ঠান শুরু করেন। পরবর্তী বিশিষ্ট নিবেদনগুলির মধ্যে অন্যতম হল হংসধ্বনি রাগ ও আদি তালে নিবদ্ধ, মুথুইয়া ভগবতারের রচিত কৃতি, আনন্দভৈরবী রাগে শ্যাম শাস্ত্রীর 'মিশ্র চাঁপু' তালবদ্ধ রচনা, এবং টোড়ি রাগ (যা হিন্দুস্থানী ভৈরবীর মত) ও তিস্র জাতিসম্পন্ন আদি তালের মনোগ্রাহী রচনাটি। পূর্বে উল্লিখিত সহযোগী শিল্পীরাই এঁকে মৃদঙ্গম্, ঘটম্ ও বেহালাতে যথাযোগ্য সহায়তা করেছেন।

॥ ৪ ॥

সারারাত্রিব্যাপী শেষ অধিবেশন শুরু হয় সমরেশ চৌধুরীর কণ্ঠসঙ্গীত দিয়ে। জোরালো ও ভরাট কণ্ঠপ্রক্ষেপণের বিশিষ্ট কায়দা ও আবেদন হল তাঁর পরিবেশনার লক্ষণীয় সম্পদ। শিল্পীর নিবেদিত আড়া চৌতালে নিবদ্ধ নায়কী কানাড়া ও সুরমল্লারের ত্রিতাল বন্দেজটি সুসমৃদ্ধ ছিল গায়নভঙ্গীর আকর্ষণীয় বলিষ্ঠতায়। তাঁর পরিণত ও সুগ্রথিত উপস্থাপনরীতি বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। তবলায় ও হারমোনিয়ামে তাঁকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন আনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মেহ্‌ফুজ খাঁ।

পরবর্তী শিল্পী ছিলেন তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। সুরঋদ্ধ ও রসব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ রূপায়ণের সাহায্যে এই তরুণ সরোদবাদক তাঁর বাদনশৈলীর নির্দিষ্ট মান অক্ষুণ্ণ রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর পরিবেশিত কৌশিক কানাড়া রাগের আলাপ, জোড়, ঝালার তুলনায় অবশ্য পরবর্তী জিলা কাফীতে নিবদ্ধ গৎকারিটিই ছিল বেশী উপভোগ্য। তবে প্রথম ঝালাটিতে বোল বিভাজনের সূক্ষ্ম পারঙ্গমতা, তান ও ছুট মীড়ের মিশ্রণ বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল। তবলায় আনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের একান্ত নিজস্ব ভঙ্গীতে সপ্রতিভ ও স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা এই অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ সম্পদ।

এর পরে বীণা সহস্রবুদ্ধে কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করেন। কলকাতার শ্রোতাদের সঙ্গে এই আসরেই তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটেছে। আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে একটু মানসিকচাপে ভারাক্রান্ত মনে হলেও শিল্পীর নিবেদিত অনুষ্ঠানের সর্বোত্তম বিষয়টি হল তাঁর অত্যাশ্চর্য কণ্ঠস্বর ও সুরবিস্তৃতির অনন্যসুন্দর ভঙ্গী। তাঁর যোগকৌশ রাগের বিলম্বিত খেয়াল ও দ্রুত তারানা মোটামুটি প্রথাধর্মী এবং

অজয় চক্রবর্তী

গতানুগতিক পরিবেশনা হলেও অসাধারণ কণ্ঠলাবণ্য ও স্বরক্ষেপণের নৈপুণ্যে তা' আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। পরবর্তী হংসধ্বনি রাগে পরিবেশিত হয়েছে রূপক তালের মনোগ্রাহী বন্দেজ। দ্রুত রচনাটি ছিল আড়া চৌতালে নিবদ্ধ। সুরের বিশিষ্ট আমেজ, চারগুণ লয়ের তানের নিখুঁত উপস্থাপন এবং সুন্দর ছন্দোবদ্ধ বোলবাঁটে সুসজ্জিত অনুষ্ঠানের এই পর্যায়টি ছিল যথার্থ রসোত্তীর্ণ। লোকগীতির সুরের আধারে রচিত হাল্কাচালের ভজন গানটি তাঁর পূর্ববর্তী পরিবেশনের সঙ্গে সমতারক্ষা করতে পারেনি। তবলা সঙ্গতে যথার্থ সহযোগী ছিলেন চন্দ্রভান। হারমোনিয়ামে সহায়তা করেছেন মেহ্‌ফুজ খাঁ।

পরবর্তী শিল্পী ভজন সোপোরি সান্তুরে পরিবেশন করেছেন চারুকেশী

রাগে আলাপ, জোড়, ঝালাও দুটি ত্রিতালগৎ এবং রূপক সুরফাঁক তালে নিবদ্ধ সোহিনী। কলকাতার আসরে স্বল্পশ্রুত এই শিল্পীর অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ হল তাঁর সাঙ্গুর যন্ত্রের স্বকীয় ব্যবহার পদ্ধতি ও বিশিষ্ট আবেদন। তিনি এই স্ট্যাকাটো যন্ত্রে সেতার সরোদের ট্র্যাডিশনাল বোল এবং মীড়-গমকের আলঙ্কারিক প্রয়োগবিধি নিখুঁতভাবে রূপায়িত করেছেন। জোড়, ঝালা ও গৎকারিতে ডান হাতের লঘু এবং নিপুণ স্পর্শে সূক্ষ্ম বোলের অবতারণা লক্ষণীয়। বলিষ্ঠ সাপাট অঙ্গের আটগুণ তানও ছিল জোড় ও গৎকারির বিশেষ সম্পদ। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল তাঁর বাদনশৈলীর ধ্রুপদী আবেদন এবং সৃষ্টিধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য। শিল্পীর সঙ্গে সাবীর খাঁর সুনিয়ন্ত্রিত তবলা সহযোগিতা যথার্থ শিল্পবোধসম্পন্ন। সর্বশেষ শিল্পী অজয় চক্রবর্তীর প্রথম নিবেদন ললিত রাগটি ছিল অত্যন্ত সুসংবদ্ধ ও সুনিপুণ পরিবেশনা। এই পর্বে স্বচ্ছরসবোধসম্পন্ন সুররূপকল্পনা এবং তাল-লয়ের স্বতঃস্ফূর্ত মাধুর্য হল বিশেষ উপভোগ্য অংশ। এর পরে পরিবেশিত হয়েছে 'ক্যা করু সজনী'। ট্র্যাডিশনাল গীতিরূপের আধারে সুরের বৈচিত্র্যপূর্ণ বিন্যাস ও খরজ পরিবর্তনের মাধ্যমে কয়েকটি সুন্দর সারগামের প্যাটার্নের রূপায়নে শিল্পীর চিন্তাধারা ও অভিব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সবশেষে শ্রোতাদের অনুরোধে শিল্পী গেয়ে শোনান বাংলায় ভৈরবী ঠুংরী,—'বাঁশিতে যে ডেকেছে আমায়'। বাণী পরিবেশনে গীতিময় কাব্যিকরস ও ভাবাপ্লুত সুররূপসৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পী তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী পারঙ্গমতার পরিচয় পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তবলা ও হারমোনিয়াম সহযোগিতা সমর সাহা ও সঞ্জয় চক্রবর্তীর সুন্দর শিল্পবোধ এক যথার্থ সাঙ্গীতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। পরিশেষে, সুনির্বাচিত শিল্পী সম্ভারে সজ্জিত, সুলভ ও সুপরিকল্পিত এই অনুষ্ঠানটি উপহার দেবার জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই।

পদ্মা তালওয়ালকার

বিনতা মৈত্র

রঞ্জনার পাঁচরকম

'রঞ্জনা' নামের 'অনুষ্ঠেয় শিল্পের আকাদমি' তাঁদের রবীন্দ্র-উৎসবের (এঁরা নাম দিয়েছেন টেগোর উৎসব) সূচনা করলেন রবীন্দ্রসদনে, ১৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়। সুদীর্ঘ অনুষ্ঠান। নানা মাপের, নানা স্বাদের। উদ্বোধন করার কথা যাঁর, পৌরপিতা সেই কমল বসু এলেন যখন, অনুষ্ঠান তখন চলছে। তবু তো সময়ে শুরু হয়নি। সূচনায় গান ছিল তরুণ শিল্পী অরিজিৎ সাহার। তরুণ না বলে কিশোর বললেই হয়। ডন বসকোয় ক্লাস এইটে পড়েন, বয়স বছর পনের-ষোল। বয়স কম, কিন্তু অরিজিতের কণ্ঠটি বেশ জোরালো ও পৌরুষদৃপ্ত। শুধু যা দরকার একটু মড্যুলেশনের শিক্ষা, আর 'ড়'-এর দোষও কাটাতে হবে। গলার স্বাভাবিক ওজস্বিতায়, এ-সত্ত্বেও, চারখানি গানই সুখশ্রাব্য। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, 'আকাশ ভরা সূর্যতারা' ও 'মেঘ বলেছে যাব যাব'র।

এই সন্ধ্যার সব-ছাপানো আকর্ষণ ছিল প্রবীণ শিল্পী সুবিনয় রায়ের কণ্ঠের সাতখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত। ভারি সূক্ষ্ম নির্বাচন। হৃদয়াসনের অনুষঙ্গ বেছে নিয়েছিলেন 'হৃদি মন্দির মাঝে', 'হৃদয়নন্দন বনে', 'কে গো অন্তরতর' বা 'সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি' ধরনের ছটি। এমন-কি 'আমার প্রাণের 'পরে'ও এই অনুষঙ্গ ভিন্নতর তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠল। কণ্ঠটিও এই সন্ধ্যায় ছিল অতি সুস্থিত ও লাবণ্যময়।

'ভৈরব'বেশী শুভাশিস ভট্টাচার্য

এককালের শিক্ষামন্ত্রী ও প্রবীণ অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য যে এমন সুন্দর রবীন্দ্র-কবিতা পড়েন, এ-আসরে না এলে জানাই যেত না। জ্যোতিবাবু বেছেছিলেন 'পত্রপুট'-এর ১৫ নম্বর কবিতাটি। গম্ভীর অনুভবদীপ্ত উচ্চারণ তাঁর, মন্দ্র গম্ভীর কণ্ঠস্বর। কবিতার আমূল মর্মার্থ যেন ঝলসে ওঠে।

'রঞ্জনা'র নিজস্ব প্রযোজনা ছিল দুটি। রবীন্দ্র-কবিতা 'অভিসার'-এ গান যুক্ত করে, নৃত্যসহযোগে পরিবেশন করলেন এঁরা। এই ধরনের তৈরি করা নৃত্য-নাটকে গান-যোজনা বড় সহজ কাজ নয়। প্রথম দু-এককলি যদি-বা ভাবের সঙ্গে মিলে যায়, শেষরক্ষা হয় না। এঁদেরও সে-রকমই হয়েছে। শ্রাবণের রাত্রিতে এসেছে বসন্তের 'না, যেয়ো না'। শুশ্রূষার মনোভঙ্গিকে ঢেকে দিয়েছে 'এখন আমার সময় হল'। সন্ন্যাসী সেজেছিলেন জনৈকা তরুণী। টপ নটের আনুকূল্যে অনেক মেয়েকেই এখন সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী লাগে। ফলে, চেহারায় সেই প্রার্থিত কান্তি ফোটেনি। মহিলা কণ্ঠের গান বা সম্মেলক গান সুন্দর, পুরুষকণ্ঠের গানটি বড় শুষ্ক।

ভাষ্যের সপ্রতিভতায়, গানের তাৎপর্যময় যোজনায় এবং সর্বোপরি কোরিওগ্রাফি ও অন্যান্য পরিকল্পনায় (নৃত্য পরিকল্পক : শুভাশিস ভট্টাচার্য) বরং 'রঞ্জনা'র শেষ নিবেদন 'রবীন্দ্রনাথ অ্যাণ্ড সোল অভ ইণ্ডিয়া' (নির্দেশক : ডঃ দুলাল চৌধুরী) অনেক বেশি আবেদনময়। 'হে ভৈরব' - এর নৃত্যদৃশ্যটি তো স্বপ্ন দিয়ে তৈরি।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

গীত-গজলের আসর

বাণীপ্রধান গানের সুরসঙ্গতি ও বিন্যাস স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রেই সীমিত ও শর্তসাপেক্ষ। এই ধরনের গানে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও তাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য গায়কের দায়িত্ব অনেকখানি : তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সাঙ্গীতিক ভিত্তির সুদৃঢ়তার অভাবে গানের প্রার্থিত গভীরতা ও ব্যঞ্জনা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। আলোচ্য প্রসঙ্গটি হল সম্প্রতি কলামন্দিরে অনুষ্ঠিত জনপ্রিয় শিল্পী পঙ্কজ উধাসের গীত ও গজল গানের আসর সম্পর্কে। সমগ্র পরিবেশনাতে সম্পূর্ণ ধ্রুপদীপ্রভাবমুক্ত তাঁর সহজ ও চমকসর্বস্ব গায়কীটি লক্ষণীয়। হয়তো গানের এই গতানুগতিক রীতি ও তার লঘু আবেদনেই তিনি এত বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। 'লিও ক্লাব অফ সেন্ট্রাল ক্যালকাটা' আয়োজিত এই অনুষ্ঠান ছিল শিল্পীকৃত 'আফ্রিন' (উর্দুতে যার অর্থ 'ধন্য') ডিস্কের 'ডাবল্ প্ল্যাটিনাম' মর্যাদাপ্রাপ্তি উপলক্ষে একটি সংবর্ধনা উৎসব। কাব্যের দিক থেকে পঙ্কজ উধাসের নির্বাচিত বেশীর ভাগ গীত ও গজলের রচনা এত সাধারণ মানের যে সুরসৃষ্টির বৈচিত্র্যহীনতা ও দৈন্য পূরণ করে গানকে আকর্ষণীয় করে তোলা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। শিল্পী তাঁর গজল ও শের সংগ্রহ করেছেন প্রধানত ফিরাখ গোরখপুরী, শকীল বাদাউনি, ইকবাল, দাগ, শাদ প্রভৃতি কবিদের রচনাসম্ভার থেকে। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটি গানে একই ধরনের কৃত্রিম রোম্যান্টিক ভাবব্যঞ্জনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। যেমন, 'আইয়ে বারিষোঁ কা মৌসম হ্যায়', 'থোড়ী থোড়ী পিয়া করো', 'অ্যায় চাঁদ কে বুঁদ উৎরা উৎরা', 'লা পিলা দে সাকীয়া', 'নিক লো না বে নকাব জমানা খরাব হ্যায়', 'চাঁদী য্যায়সা রঙ্গ হ্যায় তেরা' প্রভৃতি। রচনাসৌকর্যের দিক থেকে এদের কোনটিকেই তেমন উল্লেখযোগ্য বলা যায় না। উপস্থাপন

পঙ্কজ উধাস

রীতি ও সুরবিহারের বৈচিত্র্যে গীত ও গজলের পারস্পরিক বিভিন্নতাকে সুরক্ষিত করার দায়িত্বও এক্ষেত্রে যথেষ্ট অবহেলিত। অনেকগুলি গজল অত্যন্ত হালকা চলনের গীতের আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়েছে। তবে শকীল বাদাউনি রচিত 'দিলনে ধড়কনা ছোড় দিয়া' গানটিতে গজলের রীতিগত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল হারমোনিয়াম, বেহালা, গীটার ও তবলায় সহায়ক শিল্পীদের অনবদ্য সহযোগিতা। সুবিন্যস্ত ও প্রাণবন্ত যন্ত্রানুষঙ্গে সার্বিক অনুষ্ঠানটিকে উপভোগ্য করে তুলেছিল।

বিনতা মৈত্র

ন ৃ ত্য

সংক্ষেপিত 'শ্যামা' এবং

কেরলীয় নৃত্যকলা কেন্দ্রম-এর ছত্রিশ বছর পূর্তির উৎসব পালিত হল ১৪ সেপ্টেম্বর সকালে রবীন্দ্রসদনে। প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘকাল ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে শিখিয়ে আসছেন ভারতনাট্যম ও অন্যান্য দক্ষিণ ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য। এ-বছর থেকে এঁরা শেখাচ্ছেন রবীন্দ্র-নৃত্যও। এবারের উৎসবে বিশুদ্ধ দক্ষিণী-নৃত্যের নমুনার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা মঞ্চস্থ করলেন রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা'। পৌনে দশটায় অনুষ্ঠান শুরু হবার

বৈশালী চৌধুরী ও জয়তী দে চৌধুরী

কথা ছিল। শুরু হল এক ঘণ্টা পরে। কথা ছিল, পৌরপিতা কমল বসু অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে হাজির থাকবেন। তিনি আসেননি। পাশের 'নন্দন' প্রেক্ষাগৃহে সেদিন রাষ্ট্রপতির পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে চারপাশে অস্বাভাবিক যানজট। ফলে, অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলা ও সময়ানুগত্য বজায় রাখা যে কঠিন ছিল, এতে সন্দেহের কারণ নেই। কিন্তু এত দেরিতে অনুষ্ঠান শুরু করেও মঞ্চে হঠাৎ পুরস্কার বিতরণীর জন্য সময় খরচ করা হবে, কিংবা 'শ্যামা'র পুরো কাহিনী ইংরেজীতে শোনানো হবে—দর্শকদের ধৈর্যের উপর এতটাই আস্থা রাখা সমর্থনযোগ্য নয়। এও সমর্থন করা যায় না যে, শেষ পর্যন্ত সময়-সংক্ষেপের অজুহাতে 'শ্যামা' থেকে বর্জিত হবে উত্তীয়ের কণ্ঠের 'মায়াবন বিহারিণী' কিংবা 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া'র মতো জরুরী গানগুলি। এই রাজধানী এক্সপ্রেসের গতিতে 'শ্যামা' মঞ্চায়নের ফলে যা হয়, তাই হল। 'উত্তীয়' তো এমনিতেই চিরবঞ্চিত, নতুনভাবে বঞ্চনার শিকার করে বেচারী চরিত্রটির স্বাভাবিক মাত্রাই খর্ব করে দেখানো হল। 'শ্যামা'র নেপথ্য গানগুলিও অতি দুর্বল ও অরাবীন্দ্রিক ভঙ্গিতে শোনানো। 'থামো থামো তোরা' গোছের উচ্চারণ ছিল শ্যামার গানে—কণ্ঠটি তীক্ষ্ণ হয়েও রাবীন্দ্রিক ভাববর্জিত অমিতা অধিকারীর।

বজ্রসেন ও কোটালের গান যাঁরা গাইলেন, কণ্ঠে বয়সের জীর্ণ ছাপ ও অনভ্যাসের দুর্বলতা তাঁরা ঢাকতে ব্যর্থ। অথচ মঞ্চের প্রতিটি চরিত্র ভাবি কচি চেহারার। কচি, কিন্তু কাঁচা নয়। চমৎকার নাচেন বৈশালী চৌধুরী (শ্যামা), বজ্রসেন (জয়তী দেচৌধুরী), ডি এস জানকী (উত্তীয়) বা অনুপম কৈমাল (কোটাল)। উত্তীয় তো বহুদিন বাদে যথার্থ 'বালক-কিশোর'-এর রূপে মঞ্চে এলেন। কিন্তু নৃত্যের নিপুণতা যেহেতু গানে ছিল না, তদুপরি অতিরিক্ত সংক্ষেপিত, সব মিলিয়ে 'শ্যামা' জমল না। আলাদাভাবে বিদ্যায়তনের নৃত্যানুষ্ঠানের অংশ ভারি উজ্জ্বল। বৈশালী চৌধুরী ও ডি এস জানকীর হিন্দোল রাগে থিলানা, ডি এস শোভার কুর্তালা কুরবংশী, সয়েলক আলারিপ্পু ও 'জাতিস্মরম' বিশেষ উপভোগ্য।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

না ট ক

আজকের নাট্যভাবনা

'প্রতিকৃতি' কয়েকদিন আগে আকাদেমিতে 'সাম্প্রতিক নাট্য চিন্তা' নিয়ে মূল নাটকের আগে একটি আলোচনা সভার অনুষ্ঠান করেন। বিষয়টি জরুরি। এত স্বল্প সময়ে কিছুই ভাবনার লেনদেন হয় না। আলোচক ছিলেন মনোজ মিত্র, বিভাস চক্রবর্তী ও নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত। প্রত্যেকেই কিছুটা হতাশাগ্রস্ত। দর্শকও কী তাই? যদি দর্শক হতাশার শিকার হয়ে থাকেন, তবে এই আত্মবিশ্লেষণ দর্শককে ক্লান্ততর করবে।
বিভাস চক্রবর্তীর বক্তব্য—তিনি বয়োঃকনিষ্ঠ থিয়েটার কর্মীর পরামর্শ শুনতে পারেন—থিয়েটারের বাইরের লোকের নয়। কারণ, তারা থিয়েটার কর্মীর মধ্যে বিভেদ ডেকে নিয়ে আসে। খুব খাঁটি কথা। সত্যিই অনেকে বাইরে থেকে মাতব্বরি করেন—কিন্তু দর্শক তো বাইরের লোক—অথচ থিয়েটারের আত্মীয়, তাঁকে অগ্রাহ্য করা যায় কিভাবে? যে গণনাট্য গ্রুপ থিয়েটারের প্রেরণা—সে কী এইভাবেগণ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে? দর্শকই থিয়েটারকে তৈরি করে এবং বরখাস্ত করে।
নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত থিয়েটারের একজন সংগ্রামী কর্মী। কোন অবস্থায় তিনি আপস করতে রাজি নন। বিভাস চক্রবর্তীর মত তিনিও স্বীকার করেন, কোন-না - কোনভাবে আপস করতে হচ্ছে। থিয়েটারের কেউ যাত্রা বা চলচ্চিত্রে গেলে, থিয়েটার কর্মীর কৌলীন্য ক্ষুণ্ণ হয়—অথচ কেউ ভেবে দেখেন না—কেন সে যাত্রা বা চলচ্চিত্রে যায়। এই সঙ্গত প্রশ্ন থিয়েটার কর্মীর অহর্নিশের অন্তর্দাহ। নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত একজন নাট্যব্যক্তিত্বের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, থিয়েটার শব্দের সঙ্গে আন্দোলন শব্দটি যুক্ত হয়েছে—অন্য কোথাও হয়নি। কর্মীর ব্রহ্মণত্ব জাহির করার একটা প্রবণতা আছে। হয়ত আন্দোলন শব্দটি যোগ হয়নি—কিন্তু সাহিত্যে কল্লোলযুগ থেকে আজকের লিটল ম্যাগাজিনের সংগ্রাম কী কম? বদলানোর চেষ্টায় চিত্রশিল্পীরা কী একজোট হননি? ফিল্ম সোসাইটির কথাই বা ভোলা যায় কী করে? থিয়েটার চল্লিশ বছর ধরে যেমন আন্দোলন করছে—শিল্প সাহিত্যেও নিরন্তর সেই সংগ্রাম চলে। কোন বদলে দেবার সংগ্রাম নেই বলে আধুনিক বাংলা গান আজ এক জায়গায় থেমে আছে। অঘোষিতভাবে আন্দোলন সর্বত্র। মনোজ মিত্র বলেন, যে উৎসাহ নিয়ে সকলে জোট বেঁধেছিলেন, সেই উদ্যম আজ অনেকটাই অবসিত—নতুন কিছুই করার নেই।
পেশাদার হওয়া সম্পর্কেও তিনি ভিন্ন মতাবলম্বী, কারণ তিনি জানেন, প্রত্যেকেই তাঁর নিজের পেশায় ফাঁকি দেন। এখন তবু কিছু করা যাচ্ছে, পেশাদার হলেই অস্তিত্বের জন্য অনেক আপস, ক্রমশই গণ্ডীবদ্ধ হয়ে পড়া। মনোজ মিত্রের কথা ভেবে দেখলে যাত্রা সিনেমার সব ক্ষেত্রে গ্রুপ থিয়েটার কর্মীর অনেকেই কাজ করছে। কিন্তু কতটা বদলানো গেল? মৃচ্ছকটিক নাটকে একজন অবস্থার বিপাকে পড়ে চুরি করতে গিয়ে দেখে সিঁধ-কাঠি আনা হয়নি। তখন সে নিজের উপবীত দিয়ে মাপ নিয়ে সিঁধ কাটতে বসে। ব্রাহ্মণত্বের তখন দাম নেই। আমরা সব সময় চাইব থিয়েটার কর্মীরা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েন; কিন্তু উপবীত বিসর্জন দিয়ে নয়। কারণ, উপবীতেই আছে বদলে দেওয়ার শক্তি। আলোচনা শেষে—প্রতিকৃতির 'বীরশা মুণ্ডার গান' অভিনীত হয়। এই পত্রিকায় সেই নাটক আগেই প্রতিবেদিত। আলোচনার পর একজন দর্শক চলে যেতে যেতে বলে 'ওঁরা নিজেরাই যখন বলছেন কিছু হচ্ছে না—তখন আমরা ভিড় বাড়াই কেন?'

দেবাশিস দাশগুপ্ত

রূপাকে নিয়ে রূপকথা

"আমাদের এই হাসিখুশি/হাজার মজার অঙ্গনে/এসো সবাই দল বেঁধে আজ/এসো শিশুরঙ্গনে।"—প্রতি বছরের মতো এবারও রবীন্দ্রসদনে এই গান শুনিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হল হাজারো আনন্দবঞ্চিত শিশুদের, যাদের জন্য প্রতি বছর পুজোর আগে 'শিশুরঙ্গন' সম্পূর্ণ নিজেদের ব্যয়ে খুলে দেন এক স্বপ্নপুরীর দরজা। শুধু এত হাসিমজার মধ্যেও ভেসে রইল

এক দুঃখের সুর। এ-গান যাঁর লেখা, শিশুরঙ্গনের ঘনিষ্ঠজন, সেই কবি দিলীপ দে চৌধুরী এই অনুষ্ঠান দেখতে পারলেন না। গত বিশ্বকর্মা পুজোর দিন এই বিচিত্রকর্মা মানুষটি প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানানো হল এক মিনিট নীরবতার মধ্য দিয়ে।

'শিশুরঙ্গন'-এর নতুন পরিকল্পনা, একটি ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে ছোটদের সঙ্গে আলাপ করা। এই পরিকল্পনার কথাই জানালেন সংস্থার প্রাণপুরুষ শৈলেন ঘোষ ও শিশুরঙ্গনের সভাপতি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি গৌরকিশোর ঘোষ খুব সুন্দর করে তাঁদের ছেলেবেলার সঙ্গে এখনকার ছোটদের অবসর-যাপনের সুযোগ-সুবিধের পার্থক্যের কথা তুলে ধরলেন। বললেন, তখন এত আয়োজক ছিল না, এখন ছোটদের দেখলে হিংসেই হয়। ভূয়সী প্রশংসা করলেন শিশুরঙ্গনের কাজকর্মের।

বললেন, "এর চাইতে ভালো আর কিছু হতে পারে না।"
বিরতির পর মঞ্চস্থ হল শিশুরঙ্গনের নতুন নাটক 'রূপাকে নিয়ে রূপকথা'। নাট্যকার, গীতিকার ও নির্দেশক শৈলেন ঘোষ তাঁর নিজেরই লেখা উপন্যাস 'দুঃসাহসী দুই বুড়ো'র ছায়া নিয়ে প্রায় নতুন করে বেঁধেছেন এই পালা। ভারি সুন্দর গল্প। আর, আরও চমৎকার সেই গল্পকে সপ্রতিভ নাটকের বিন্যাসে বেঁধে ফেলা।

এক অত্যাচারী রাজার অত্যাচারের প্রতিহিংসা নেবার সুযোগ খুঁজছে এক ভাল্লুকওয়ালা। এদিকে রাজার কুরূপা মেয়েকে জাদুমন্ত্রে সুরূপা করে দিয়েছেন দুজন ডাকসাইটে ঐন্দ্রজালিক। রাজা তাঁদের 'কাজ ফুরোলে পাজী' বলে তাড়াতে চান।

তাঁরাও রাজার প্রতি প্রতিশোধ নেবার জন্য উন্মুখ। এমন সময় রাজকন্যা রূপাকে কারা যেন চুরি করে নিয়ে গেল। বাজীকর ও জাদুকরকে সন্দেহ করে রাজা তাঁদের প্রচণ্ড শাস্তি দিলেন। সেই অত্যাচার দেখে দূরের রাগী পাহাড়টা পুড়িয়ে দিল রাজপ্রাসাদ। তারপর বহু ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কী করে ঘুচল রাজার অহংকার, কী করে ফিরে এল রূপা, তাই নিয়েই এক অবাক-করা গল্প 'রূপাকে নিয়ে রূপকথা'।
শুধু গল্প কেন, প্রযোজনাও অবাক-করা। 'লোভিসাবা'র চরিত্রে

'রূপাকে নিয়ে রূপকথা'র দৃশ্য

মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর 'জগু'র চরিত্রে ইন্দ্রনীল দত্তের দুরন্ত অভিনয়, উৎপলেন্দু চৌধুরীর সুরে বেশ কয়েকটি গান, পিছনের পটে আগুনমুখী পাহাড় আর শেষ দৃশ্যের সাদা পায়রার ওড়াউড়ি—এমন বহু-কিছু স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। আর যাদের জন্য এই অনুষ্ঠান, তাদের যে কেমন লাগছে, তা মাঝে মধ্যেই টের পাওয়া যাচ্ছিল—হল-ফাটানো হাততালির শব্দে।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

পুতুলনাটক আলিবাবা

লিটল পাপেট থিয়েটার-এর দশ বছর পূর্ণ হল উনিশ শো ছিয়াশিতে। সে তুলনায় প্রযোজনার সংখ্যা একটু কমই বলা যায়। "বীরপুরুষ" নামের রবীন্দ্র-কবিতা নিয়ে বানানো পুতুল-নাটক এঁদের দিয়েছিল পরিচিতি, সাম্প্রতিক 'আলিবাবা',—এঁদের দ্বিতীয় প্রযোজনা—আশা করা যাক, দেবে প্রতিষ্ঠা। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অভ ইণ্ডিয়ার কলকাতা অঞ্চলে অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ১৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটি ইনসটিটিউট হলের অনুষ্ঠান দেখে অন্তত সেরকমই মনে হল। বস্তুত পুতুল-নাটকের যে গঠনগত দিক, সেটা এঁদের করতলধৃত আমলকী। কিছুক্ষণ পরে মনেই হবে না যে, নিয়তি-চালিত কুশীলবরা আসলে মনুষ্য-চালিত পুতুল মাত্র। স্বাভাবিক গতি, স্বচ্ছন্দ অঙ্গসঞ্চালন, সজীব সংলাপ-উচ্চারণ, সংহত বিন্যাস এবং সুচারু শব্দ-প্রক্ষেপণ এঁদের নাটককে নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র

'আলিবাবা'র একটি দৃশ্য

একটি মাত্রা দিয়েছে। তিন ভাগে বিন্যস্ত মঞ্চের প্রতিটি ভাগে উচ্চারিত সংলাপ যাতে সেই বিশেষ ভাগ থেকেই উদ্ভূত বলে ভ্রম হয়, সেজন্য এঁরা ব্যবহার করেছেন বিশেষভাবে (সঞ্চর মান) স্টিরিওফোনিক আওয়াজ—যার নাম রেখেছেন 'স্টিরিওস্কোপ'। চোখ এবং কানকে সমানে তৃপ্ত করে এমন দৃশ্যের পর দৃশ্যে 'আলিবাবা' সমৃদ্ধ।

অভিনয়াংশে এঁরা রেখেছেন অভিজ্ঞ নাট্যশিল্পীদের। বাচনিক অভিনয়ে অন্তত মুগ্ধ করে রাখেন মীনাক্ষী গোস্বামী (মরজিনা)। দাপটভরা অভিনয় করেছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (কাশেম), গৌরীশঙ্কর পাণ্ডা (আলিবাবা), গোপা আইচ (ফতিমা) ও তরুণকুমার (বাবা মুস্তাফা)। সূত্রধরের ভূমিকাটি অপ্রয়োজনীয়, তদুপরি সংলাপ দুর্বল পদ্যে রচিত।

কুমার রায়ের স্টাইলাইজড সংলাপ-কথন এবং পুতুল-চরিত্রের ব্যঞ্জনাময় রূপকল্পনা সত্ত্বেও চরিত্রটি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না। আবদাল্লা ও হুসেন—দু'রকমভাবে দুটি চরিত্রের সংলাপ বলেছেন চিরঞ্জীত। চেষ্টাটাই প্রশংসার, অভিনয় নয়। একটি টিপিক্যাল, অন্যটি নিষ্প্রাণ। [illegible]ার দরজা খোলার আওয়াজটি বেশ জব্বর। দৃশ্যটিও সুপরিকল্পিত। মেলার দৃশ্যটি চমৎকার। প্রচুর অর্থব্যয়ে যে এই প্রযোজনা নির্মিত, বুঝতে অসুবিধে হয় না।

আর সেই কারণেই অবাক লাগে এই দেখে যে, ক্রীতদাসের জীবন থেকে মুক্ত হলেও পোশাক পালটায় না মরজিনা-আবদাল্লার। এই প্রযোজনার প্রকৃত উপভোক্তা যদি ছোটরা, তাহলে হুসেনের প্রেমের দৃশ্যটিকে ফুল আর গান দিয়ে অতটা বর্ণাঢ্য করার দরকার ছিল কিনা, সে-সম্পর্কেও দ্বিতীয় চিন্তার অবকাশ থেকে যায়। নতুন ভাষার নামে 'আলিবাবা'য় কিছু তথাকথিত বামপন্থী শ্লোগান ঢোকানো হয়েছে।

সম্পদটা যেহেতু লুঠের, সেই ধরনের রাজনৈতিক দর্শন সেখানে কতটা মানানসই, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। আর হুসেনের সঙ্গে মরজিনার বিবাহ এঁরা যতটা অভিনব ভাবছেন, ততটাই কি নতুন চিন্তা? সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের আরব্য রজনীর গল্প গ্রন্থেও কিছু এই বিবাহ দেওয়ার কথা রয়েছে। তবে এ-সমস্ত ছাপিয়েও 'আলিবাবা' দেখার যোগ্য পুতুল-নাটক।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

আমেরিকান উপন্যাসের নবীনযাত্রা

এ প্রজন্মের উপন্যাসিকদের একটিই নীতি শিক্ষার অবকাশ আছে। তা হচ্ছে প্রারম্ভিক সাফল্যের ভয়ঙ্কর পরিণাম। নর্মান মেইলারের কথাই ধরা যাক, বেলোকে বাদ দিয়েই, 'দি নেকেড অ্যাণ্ড দি ডেড' বেরিয়েছিল তাঁর পঁচিশ বছর বয়সে। ভাইডালের শ্রেষ্ঠ রচনা 'জুলিয়ান' বেরিয়েছিল তাঁর একুশ বছর বয়সে। কিন্তু এঁরা দু'জনেই আজ সাংবাদিক রচনা আর গতানুগতিক মধ্যমানের গ্রন্থ রচনার মধ্যে পাক খাচ্ছেন।

নতুন প্রজন্মের লেখকরা এখন আমেরিকার উপন্যাস জগতের শীর্ষে উঠে আসছেন। পাঠকরা তাঁদের বই কিনছেন দেদার, সমালোচকরা প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত প্রকাশকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে এঁদের বই ছাপার জন্য। দু এক বছর আগেও যে উপন্যাসগুলি বাজার পায়নি, প্রায় অলক্ষ্যেই তলিয়ে গিয়েছিল, তাদের আবার পুনরাবির্ভাব পুনর্মুদ্রণ ঘটছে দ্রুত। হাওয়াটা নতুন লেখকদের দিকেই। উনিশ শ চুরাশির শরতে র‍্যানডম হাউস 'ভিনটেজ কনটেমপোরারিজ' নাম দিয়ে এক প্রকাশনা প্রকল্প শুরু করেছিলেন। তাঁদের এই সিরিজে সবচেয়ে বড় সাফল্য জুটেছে নিউ ইয়র্কারের সাংবাদিক জে ম্যাকইয়ারনে-র 'ব্রাইট লাইটস', 'বিগ সিটি' বইটির কপালে। যতদিন না কৌতূহলের হুজুগে-টান মরে আসছে ততদিন এই বইটি তার বিক্রী-বাটায় যে কোনো শক্ত মলাটের শক্তিশালী জনপ্রিয় উপন্যাসকেও টেক্কা দিয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই ২৫০,০০০ কপি নিঃশেষিত হয়ে গেছে। যে কোনো প্রথম বইয়ের পক্ষেই যা অভূতপূর্ব। র‍্যানডম হাউসের এই সিরিজটির বাণিজ্যিক সাফল্য মোটের ওপর বেশ ভাল। এ পর্যন্ত ওঁদের প্রায় ৭৫০,০০০ কপি বই বাজারে কেটে গেছে। উজ্জ্বল, সুদর্শন, সহজে দৃষ্টি আকর্ষক মলাটের বইগুলি তরুণ উপন্যাসিকদের নামকে বৃহত্তর পাঠক সমাজে খ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। পাশাপাশি কিছু আপাতপ্রবীণ, টমাস ম্যাকগুয়েন কি রিচার্ড ফোর্ডের মত লেখককেও। অতি সম্প্রতি যে বইটি বাজার মাৎ করেছে সেটি অ্যান বেটির তৃতীয় উপন্যাস 'লাভ অলওয়েজ'। পেপারব্যাকের তালিকায় প্রথম দশের কোঠায় পৌঁছে গেছে বইটি। সমাজজীবনের নগ্নভাষ্যে অ্যান ইতিমধ্যেই বিখ্যাতি পেয়েছেন আশির দশকের মহিলা জন আপডাইকরূপে। অন্যান্য প্রকাশকরাও এব্যাপারে পিছিয়ে নেই। স্ক্রিবনার প্রকাশ করেছে কুড়িটি ছোট গল্পের একটি সংগ্রহ, গল্পকারদের সকলেরই বয়স তিরিশ বছরের নিচে। পেঙ্গুইন ভাইকিং প্রকাশ করেছে সদ্য হাফ প্যান্ট ছেড়েছে এমন এক লেখক, ব্রেট ইস্টন এলিস-এর 'লেস দ্যান জিরো'। ক্যালিফোর্নিয়ার ক্লান্ত টিন এজারদের কাহিনী নিয়ে এই উপন্যাস। বইটির এক লক্ষ কপি বিক্রী হয়ে গেছে।

শফরী সংকীর্তনের আসরে

পেঙ্গুইন ভাইকিংসও একটি সিরিজ হাতে নিয়েছেন 'কনটেমপোর‍্যারি আমেরিকান ফিকশন' নামে। এই পেপারব্যাক সিরিজের শুরু ১৯৭৯ থেকে। এই প্রকল্পটির লক্ষ্য সেই সব তরুণ লেখকরা যাঁদের ইতিমধ্যে শক্ত মলাটের মধ্যে জায়গা হয়েছে। যেমন অ্যালিস অ্যাডামস কিংবা উইলিয়াম কেনেডি। তবে আগামী জানুয়ারিতে যে বইটি প্রকাশ করতে যাচ্ছেন এঁরা সেটি পেপারব্যাকেই প্রথম মুদ্রিত হবে। প্রচুর প্রচার সহযোগে। লেখক ডেভিড ফস্টার ওয়ালেসের বয়স মাত্র ২৪, আমহার্স্ট কলেজের স্নাতক। তাঁর বইটির নাম 'দি ব্রুম অব দি সিস্টেম'। তার মানে ওয়ালেস শিগগিরই সদ্য-কলেজ-পেরোনো সেই লেখকদের দলে এসে মিশছেন, প্রকাশক এবং খ্যাতি দুটোই যাঁদের জুটে গেছে ইতিমধ্যে। এই গোষ্ঠীর মধ্যে ডেভিড লীভিট-এর সাফল্য প্রায় ব্যতিক্রমের পর্যায়ে পড়ে। তাঁর বইটির নাম 'ফ্যামিলি ড্যান্সিং', প্রায় আত্ম-জৈবনিক ছোট গল্পের সংগ্রহ। ১৯৮৩ সালে প্রথম ছোট গল্পের যে সংগ্রহটি রীতিমত প্রশংসিত হয়েছিল, সেটা ছিল জেন অ্যানা ফিলিপস-এর 'ব্ল্যাক টিকেটস'। গত প্রজন্মের দিকে তাকালে মনে হয় আমেরিকান উপন্যাসের ফাঁক ভরাট করতে এখন দু চারজন প্রতিভাবান লেখকের আশু প্রয়োজন। প্রবীণ লেখকরা সবাই তাঁদের সৃষ্টির মধ্যগগন অতিক্রম করে গেছেন। ষাট ও সত্তর দশকে যাঁরা সামনের সারিতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অল্পই স্থায়ী প্রভাব রেখে যেতে পারলেন। পুরনো দুটি স্তম্ভ ট্রুম্যান ক্যাপোট ও বার্নার্ড মালামাড সম্প্রতি প্রয়াত। দুই খ্যাতকীর্তি যুদ্ধোত্তর ঔপন্যাসিক নরমান মেইলার ও গোরে ভাইডাল অনেকদিনই তাঁদের চমক এবং উৎকর্ষ হারিয়ে ফেলেছেন। 'Portnoy's Complaint' আর 'Catch 22' দিয়ে যাঁদের সাড়া জাগানো সাফল্য এসেছিল সেই পূর্ব-উপকূলের ইহুদি ঔপন্যাসিক দুজন ফিলিফ রথ ও জোশেফ হেলার কেউই তাঁদের পূর্ব সুনাম বজায় রাখতে পারেননি। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের অনেকেই এখনও লিখে চলেছেন এই পর্যন্ত। কেবল জন আপডাইক, সল বেলো এবং সম্ভবত কুর্ট ভনেগাটকে এখনো প্রতিশ্রুতিবান বলে মনে হচ্ছে। ১৯৭৬ সালে নোবেল বিজয়ী সল বেলো-ই এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যদিও গত বারো বছরে তাঁর মাত্র একটিই উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবীণ গোষ্ঠীর প্রধান সল বেলোর সঙ্গে তরুণ লেখকদের যদিও তুলনা চলে না, তবু প্রবীণ ঔপন্যাসিকদের কাছ থেকে এ প্রজন্মের ঔপন্যাসিকদের একটিই নীতিশিক্ষার অবকাশ আছে। তা হচ্ছে প্রারম্ভিক সাফল্যের ভয়ঙ্কর পরিণাম। নর্মান মেইলারের কথাই ধরা যাক, বেলোকে বাদ দিয়েই, 'দি নেকেড অ্যান্ড দি ডেড' বেরিয়েছিল তাঁর পঁচিশ বছর বয়সে। ভাইডালের শ্রেষ্ঠ রচনা 'জুলিয়ান' বেরিয়েছিল তাঁর একুশ বছর বয়সে। কিন্তু এঁরা দুজনেই আজ সাংবাদিক রচনা আর গতানুগতিক মধ্যমানের গ্রন্থ রচনার মধ্যে পাক খাচ্ছেন। আমেরিকার তরুণতর তরুণতম লেখকদের দিকে অনেকেই তাকিয়ে আছেন। এঁরা কি উপন্যাসে নতুন যুগ ফিরিয়ে আনতে পারবেন?

যেমন এনেছিলেন দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়ে ফকনার, হেমিংওয়ে, ফিজারাল্ড এবং স্টেইনবেক। অন্তত মেইলার, বেলো এবং পিনচন-ও যা পেরেছিলেন। এই অস্থির জনপ্রিয়তার কোলাহলের মধ্যে, এখনো আমেরিকার তরুণ ঔপন্যাসিকদের সম্পর্কে মূল্যায়ন কিংবা ভবিষ্যৎবাণী করা উচিত হবে না। কালের বিচার শেষ বিচার নিশ্চয়ই কিন্তু মানুষের বিচারেও আরও কিছুটা সময় দিতেই হবে। অসংখ্য লেখকের এই আবির্ভাব কতটা মরসুমী তা অপেক্ষা করে দেখতে হবে। এই অতিমাত্রার ঝোঁকের দিকে তাকিয়ে নিউ ইয়র্কের এক প্রকাশক মন্তব্য করেছেন, 'তরুণ লেখকরা চাইছে তিরিশ বছরের আগেই বিখ্যাত ও বিত্তবান হতে।' লেখক হিসেবে এই আকাঙ্ক্ষা বোধ হয় সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়।

তথ্যে সত্যে

সূর্যোদয় সূর্যাস্ত যার আনুমানিক আয়ু তাকে ওষধি বললে ভুল হয় না। মুদ্রণের জগতে সংবাদপত্র সেই দিনায়ু প্রকাশ। একাহারী, এক ফসলী। তার দ্রুততম জ্ঞাপনা তাৎক্ষণিক রকমে আধুনিক। আজ যা বার্তা কাল অবধি তা বর্তায় না। আজকের বিস্ময় কাল বাসী হয়ে যায়। আজকের হাতে গরম কাটতি কাল সের দরে বিকোয়।

কিন্তু এই নগদ মূল্যের, আপাত মূল্যের বাইরেও তার একটা স্থায়ী মূল্য আছে।

ফারমেন্টেড নিউজের অন্য মজা আছে, সে যত মজে তত মহার্ঘ হয়। পুরনো মদের মতই পুরনো খবরের তখন অনেক দাম। দিন মরে দিনপঞ্জী হয়, পরে সেই দিনপঞ্জীই হয়ে ওঠে কালের ইতিহাস।

এই গৌড়চন্দ্রিকাটুকু স্বভাবতই মনে এল সম্প্রতি প্রকাশিত জনপিলজারের 'হিরোজ' নামক সংবাদভাষ্য সংগ্রহটি প্রসঙ্গে। নায়ক হিসেবে সাংবাদিকের আজ গড়ে উঠেছে এক দীর্ঘ ইতিহাস। বিশ বছরের ঘটনাকেন্দ্রিক সাংবাদিক রচনার এই সংকলন গ্রন্থে জন পিলজার ক্রিমিয়ায় টাইমস ম্যান ডাবলু এফ রাসেল এবং স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধের সংবাদদাতা মার্থা গিলহর্নের উত্তরসূরি হিসেবে নিজেকে দেখেছেন।

এই গ্রন্থের সবচেয়ে শক্তিশালী রচনার মধ্যে যুদ্ধসংক্রান্ত প্রতিবেদন-বার্তাগুলি অবশ্যই গণ্য। সাইগন সঙ্কট কিংবা রক্তাক্ত কম্বোডিয়া এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তবে রাসেল কিংবা গিলহর্নের সঙ্গে তফাত এখানে যে পিলজার হচ্ছেন দূরদর্শন যুগের সাংবাদিক। দূরদর্শনের তথ্য ভাষ্যের জন্যও তিনি তুলামানে সুপরিচিত। জনপ্রিয় সাংবাদিকতা দূরদর্শন পর্বের আগে থেকেই প্রেস ফটোগ্রাফির অগ্রগতির অনুষঙ্গে যুক্ত ছিল। আর এখানে সাংবাদিকের নিজের ফটোগ্রাফও যুক্ত হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ায় তিনি বড়ো হয়ে উঠেছিলেন তাই অস্ট্রেলিয়া বিষয়ে তাঁর লেখাগুলো খুব অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতো। পরে লণ্ডনে গিয়েছিলেন যশস্বী হতে।

এই সঙ্কলনটির পিছনে সম্ভবত এই রকম একটা ভাবনাই কাজ করছিল যে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের খনি শ্রমিক সম্প্রদায়কে ঘিরে একটা বই করতে হবে, যাদের বিষয়ে তিনি এক সময় লিখেছিলেন।

অতিগ্রাসী সাংবাদিকতার কুফল উপসংহারে ফলেছে। পিলজার আমাদের প্রদর্শক হয়ে উঠেছেন বাংলাদেশ, চেকোস্লোভাকিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ভেতরে বাইরে। তাঁর প্রতিবেদনীতব্য বিষয়ের ওপরে গভীর দরদ থাকা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও তার মর্মে পৌঁছোনোর ব্যাপারে সবিনয় অক্ষমতা জ্ঞাপন করেছেন। তবু এই বইয়ে কিছু উজ্জ্বল এবং উল্লেখযোগ্য রিপোর্টিং পুনর্মুদ্রিত হয়েছে যা উপভোগ্য হবে।

জনপ্রিয় সাংবাদিকতার নেপথ্যেও গ্রন্থনশৈলীর ও মনস্তাত্ত্বিক অন্বেষণে নজির রেখেছে 'হিরোজ' গ্রন্থটি। ব্যাপারটা অভিনন্দনীয়। এবং চিন্তনীয়, এই কারণে যে বাংলা সাংবাদিকতার ইতিহাসেও অনেক বিবর্তন এসেছে। তার বাক-মুদ্রা, তার লক্ষ্য, তার ভাষা-পরিভাষা, শিরোনামাঙ্কন শৈলী, মর্মোদ্ঘাটন বিশ্লেষণ ব্যবচ্ছেদের ভঙ্গি এবং সংবাদ কাহিনী করণ—সব কিছুর মধ্যেই এক বৈপ্লবিক রূপান্তর এসেছে। সুতরাং এ যাবৎকালের ধুরন্ধর ও জনপ্রিয় সাংবাদিকতার, ঐতিহাসিক প্রতিবেদনগুলির গুরুত্বপূর্ণ অংশ-বিশেষ চোখের আড়ালে হলুদ-হওয়া খবরের কাগজের পাতা থেকে পুনরুদ্ধার করলে, সঠিক পরিবেশন করতে পারলে ভাবীকালের সাংবাদিকদের হয়তো উপকারই হতো।

হিরোজ/জন পিলজার/১২.৯৫ পাউণ্ড

রূপা-র বাঁধনে সত্যজিৎ

সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের জোড় মিলেছিল তিন পুরুষ আগে, উপেন্দ্রকিশোরের হাতে। হাতে কলমে সেই বিজ্ঞানচর্চারই রকমফের উত্তরসাধন ঘটেছে রায়চৌধুরী পরিবারের বিস্তৃত শাখা-প্রশাখায়।

এমন বিজ্ঞানমনস্ক বুদ্ধিজীবী পরিবার বাংলা সাহিত্যে যে এক পৃথক ঘরানা, এক স্বতন্ত্র অধ্যায় তাতে সন্দেহমাত্র নেই। ক্ষণজন্মা, ক্ষণায়ু সুকুমার রায়ের পর সত্যজিৎ রায় সেই তৃতীয়পুরুষ যিনি তুলি-কলম-ক্যামেরার ত্র্যহস্পর্শে সেই গৌরবদীপ্ত ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। মনের ভাষার সঙ্গে মুখের ও চোখের ভাষা মিশিয়ে যিনি চলচ্চিত্রে এক নতুন রীতির সূত্রপাত করেছিলেন একদিন, বাংলা কিশোরসাহিত্যেও তিনি আজ জনপ্রিয়তায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

চলচ্চিত্রজগতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান সত্যজিতের আর এক পরিচয় তিনি একাধারে চিত্রশিল্পী, সম্পাদক, গীতিকার ও লেখক।

গোয়েন্দাকাহিনীকে তিনি শুধু কিশোরদের পাতেই পরিবেশন করেননি, তাকে জাতেও তুলেছেন। এবং পাশাপাশি সায়েন্সফিকশনেও এনেছেন নতুন স্বাদ। তাঁর মগজ-কলমের ল্যাবরেটরিতে আবিষ্কৃত হয়েছে এক অসামান্য বৈজ্ঞানিক চরিত্র, প্রফেসর শঙ্কু। গিরিডির নির্জন ল্যাবরেটরিতে নির্জনতম সাধনায় মগ্ন শঙ্কুর বিস্ময়কর আবিষ্কার এবং দুঃসাহসী অভিযানসমূহ তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতির শিখরে নিয়ে গেলেও প্রফেসর শঙ্কু ছিলেন এতদিন কেবল কিশোর বাংলারই আপনজন। সম্প্রতি তার ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট তৈরি—যার পাসওয়ার্ড ইংরেজী।

রূপা কোম্পানী সম্প্রতি সেই শঙ্কুকাহিনীর ইংরেজি অনুবাদ বের করেছেন ছোট আকারে পেপারব্যাকে। 'ব্রেভো! প্রফেসর শঙ্কু' বইটিকে বলা উচিত ত্রি-শঙ্কু কাহিনী, কারণ শঙ্কুর মাত্র তিনটি কাহিনীই: ওয়ান্ডারফুল ক্রীচার, ড্রিম আইল্যান্ড ও ডঃ শেরিংস মেমরি এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে সত্যজিতের ইলাস্ট্রেশন। বইটিতে আরও ছবি থাকলে ভাল হ'ত। তবে বইটি ছোটদের চোখ বাঁচানো টাইপে ঝরঝরে ছাপা, সেই সঙ্গে তরতরে স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। অনুবাদিকা ক্যাথলীন ও'কোনেল যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক, টরন্টোতে বসবাস করছেন। তিনি বাংলা শিখেছিলেন কলকাতায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যেরও প্রাক্তন ছাত্রী তিনি।

ক্ষণজন্মা; ক্ষণায়ু সুকুমার রায়ের পর সত্যজিৎ রায় সেই তৃতীয় পুরুষ যিনি তুলি- কলম- ক্যামেরার ত্র্যহস্পর্শে সেই গৌরবদীপ্ত ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। মনের ভাষার সঙ্গে মুখের ও চোখের ভাষা মিশিয়ে যিনি চলচ্চিত্রে এক নতুন রীতির সূত্রপাত করেছিলেন একদিন, বাংলো কিশোর সাহিত্যেও তিনি আজ জনপ্রিয়তায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

যে মেঝে বাড়িয়ে তোলে জায়গার মহিমা,
আপনার অফিসকে দেয় মার্জিত সৌন্দর্য্যের গরিমা—
এখন দরজা
খুলেই মারব্লেক্স-
মেঝে-য় পা রাখুন।
মারব্লেক্স—এক এমন ফ্লোরিং, যা সমস্ত সেরা সেরা অফিসগুলোতেই জায়গা ক'রে নিতে পারে—তাইতো এ ফ্লোরিং আজ, ১৭ বছরের মধ্যেই ৮০,০০,০০০ বর্গ মিটার বিক্রী হ'য়ে গেছে—যার মানেই হ'ল, এত প্রচুর টাইল্‌স যা ৩ বার চাঁদ কে ঘুরে আসতে পারে। অথবা বিষুবরেখাকে ১ বার পাক দিয়ে আসতে কিংবা ভারতের ৩ট রেখাকে ৫ বার প্রদক্ষিন ক'রে আসতে পারে।
মারব্লেক্স সময়ের তালে তাল মেলানো একেবারে আধুনিক সব রঙে পাওয়া যায়। বেসিক ফ্লোরিং হিসাবেই হোক অথবা স্থায়ী মেঝের ওপরই এটি বসানো যায় অতি সহজে ও খুব চাটপট।
এর মসৃণ ও সহজে দেখাশোনা করা যায় এমন পৃষ্ঠভাগ হয় যেমন দৃঢ় মজবুত তেমনি টেঁকসই—অথচ এর সুরুচিসম্পন্ন সৌন্দর্য্য থাকে বছরের পর বছর, একেবারে অম্লান।
BHOR
MARBLEX
অধিক খবরাখবরের জন্যে আপনার ঠিকানাসহ এই কুপনটি পাঠান, এখানে ঃ
মার্কেটিং ম্যানেজার—মারব্লেক্স
ভোর ইণ্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড
৩৯২, বীর সাভারকর মার্গ
বোম্বাই-৪০০ ০২৫
OBM/8518/BN R

শের-এ-কাশ্মীর

কিরণশঙ্কর মৈত্র

আতিশ-এ-চিনার/ শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লা/ অনুলেখক : মোহাম্মদ য়ুসুফ টেঙ্গ/ জম্মু-কাশ্মীর কালচারাল একাডেমি/শ্রীনগর

'যিস খাক কে জমীর মেঁ হো/আতিশ-এ-চিনার, মুমকিন নেহি কী সর্দ হো য়োহ্/খাকে আর্জমন্দ।' —মোহাম্মদ ইকবাল রচিত উপরের উর্দু কবিতাংশের শব্দার্থ মোটামুটি এই রকম—যদি কোনো বিশাল ব্যক্তিত্বের মধ্যে চিনার গাছের আগুন (শক্তি) থাকে তা হলে সেই ব্যক্তিত্বকে কখনই ধ্বংস করা যায় না। কাশ্মীরের প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লার আত্মজীবনী গ্রন্থের নাম 'আতিশ-এ-চিনার' উপরের কবিতা থেকে নেওয়া। শ্রীনগর থেকে প্রকাশিত এই বিশাল উর্দু গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৬১। জম্মু-কাশ্মীর কালচারাল একাডেমির সেক্রেটারী য়ুসুফ টেঙ্গ দ্বারা গ্রন্থটি অনুলিখিত।

আত্মজীবনীটি পড়ে সবাই নিরাশ হয়েছেন। অনেকের মনে হয়েছে-শেখ গ্রন্থটি রচনা করেছেন ক্রুদ্ধ মনে, পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টিতে। ফলে তিনি নিজের এবং আপন সমর্থকদের ছাড়া অন্য কারো মধ্যেই কোনো ভালো গুণ দেখতে পান নি।

শেখ মহম্মদ আবদুল্লা — ছবি : বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

শেখের বিরাট ব্যক্তিত্ব অর্ধ শতাব্দী কাল কাশ্মীর ভ্যালিতে ছায়া ফেলেছিল। সমকালীন সব মহীরূহ নেতাদের সঙ্গেই তিনি মেলামেশা করেছেন, দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বহু সমর্থকসহ প্রথম সারির মুসলমান নেতা হিসেবে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যটিকে ভারতীয় য়ুনিয়নের সংযুক্তিতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে তিনি জম্মু-কাশ্মীরের তৎকালীন 'প্রধানমন্ত্রী' হয়েছেন। এটি অবশ্যই তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান কৃতিত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু দুঃখের বিষয়-আত্মজীবনীটি বিরাট জননেতা হিসাবে তাঁর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে তুলতে পারেনি। বরং জানা যায় যে ১৯৪৭-এর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে পরে তিনি তিক্ত বিষণ্ণতায় অনুতাপ করেছেন।

ঐতিহাসিক ঘটনাকে ব্যক্তিক প্রেক্ষিতে দেখবার প্রবণতা গ্রন্থটিতে। আত্মজীবনীর সর্বত্র শেখের স্বআরোপিত ন্যায়-পরায়ণতা, সমসাময়িক বিভিন্ন নেতার নানা দুর্বলতার সুবিস্তৃত বর্ণনা। কিন্তু শেখ নিজেকে সযত্নে একজন সর্বগুণসম্পন্ন অভ্রান্ত ব্যক্তিরূপে চিত্রিত করেছেন। গ্রন্থকার বলেছেন—"জবাহরলাল নেহরু ছিলেন দ্বিমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। বাইরে তিনি সুসংস্কৃত, উদার, গণতন্ত্রী, কিন্তু ভিতরে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। তিনি 'ম্যাকিয়াভেলিবাদ'-এর প্রয়োগ করেছেন আমার উপরে কাশ্মীরে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তান ও হাঙ্গেরির উপরে।" অপর পক্ষে, জিন্নাহ্‌কে খুবই প্রীতি ও সৌহার্দ্যের দৃষ্টিতে দেখেছেন শেখ—"ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে কংগ্রেসের মধ্যে জিন্নাহ্ একটি অতি উচ্চাসন অধিকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে সর্বোচ্চ পদে পৌঁছতে দেওয়া হয় নি।" অর্ধ শতক-প্রসৃত শেখের জন-জীবনকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) ১৯৩১ থেকে ১৯৪৭ খ্রীঃ যখন তিনি বক্সী গোলাম মোহাম্মদ, জি এম সাদিক, মির্জা আফজল বেগ এবং মৌলানা মোহাম্মদ সইদ মাসুদীর মতো উল্লেখযোগ্য নেতাদের নিয়ে মহারাজার স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। (২) ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৩ খ্রীঃ পর্যন্ত যখন শেখ কাশ্মীরের 'প্রধানমন্ত্রী' হয়ে প্রথম জনপ্রিয় সরকার গঠন ও ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের সংযুক্তি সাধন করেন। কিন্তু পরে অধিকাংশ বরিষ্ঠ সহযোগীর সঙ্গেই তাঁর বিরোধ ঘটে এবং পদচ্যুত হয়ে তিনি কারারুদ্ধ হন। (৩) ১৯৫৩ থেকে ১৯৭৫ খ্রীঃ পর্যন্ত এক রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার-এর" দাবী তুলে ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের সংযুক্তির বিরুদ্ধে ধুয়া তোলেন। ফলে তাঁর দীর্ঘদিনের কারাবাস এবং অবশেষে ঘটে কাশ্মীর চুক্তি (Kashmir Accord) এবং (৪) ১৯৭৫ থেকে ১৯৮২ খ্রীঃ যখন তিনি আবার ক্ষমতায় ফিরে আসেন, বিচ্ছেদবাদী সংস্থা 'প্লেবিসিট ফ্রন্ট'কে তিনি ভেঙ্গে দেন, বিধানসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভ করে, অন্তিম সঙ্গী বরিষ্ঠ নেতা মির্জা আফজল বেগকে পরিত্যাগ করে, পুত্র ডাঃ ফারুক আবদুল্লার ক্ষমতা-উত্তরাধিকারের পথ প্রশস্ত করেন।

স্ব-আরোপিত ন্যায় মূর্তির ভাব গ্রহণ করে জীবনের প্রথম পর্যায়ের বিশদ বর্ণনা করেছেন শেখ। দ্বিতীয় পর্যায়ে সমকালীন কংগ্রেস নেতাদের প্রতি তাঁর সন্দেহ

ও সংশয় ব্যক্ত হয়েছে। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পদচ্যুতি এবং কারাবাস শেখের দৃষ্টিভঙ্গীতে ও ভাবধারায় আমূল পরিবর্তন আনে। পঞ্চাশের দশকে যেসব কাশ্মীরী নেতা তাঁর বিরোধিতা করেছেন—তিনি তাঁদের বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করেন। ভারতভুক্তিকে যাঁরা অন্তিম সিদ্ধান্ত বলে মেনে নিয়েছিলেন—তাঁদের মধ্যে বকশী গোলাম মোহাম্মদ, জি এম, সাদিক, মাসুদী, ডি পি ধর প্রমুখ নেতা সম্বন্ধে তিনি অতি তিক্ত মন্তব্য করেছেন। ভাগ্যের পরিহাস, বাইশ বছর পরে শেখ নিজেই এই নেতাদের অনুরূপ মত ব্যক্ত করেন। কিন্তু তাঁর এই হৃদয় পরিবর্তনের পূর্বেই প্রভূত ক্ষতি হয়ে গেছে, শুধু জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যেই নয়—সমগ্র উপমহাদেশে। উপরোক্ত নেতাদের শেখ কঠোর নিন্দা করেছেন দুর্নীতির অভিযোগে—"বকশী এবং তার ভাইয়েরা বস্তি থেকে এসে রাতারাতি বহু প্রাসাদের মালিক হয়ে বসে।" কিন্তু শেখের নিজের রেকর্ডই তাঁর এই নিন্দাবাদকে পরিহাসযোগ্য করেছে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ সময়সীমায় তিনি এবং তাঁর পরিবারবর্গ যে-ধনসম্পদ কুক্ষিগত করেছেন তার পরিমাণ কোটি কোটি টাকার। শেখের অন্যান্য দুর্বলতাও তাঁর চারপাশের লোকের খুব ভালোভাবেই জানা।

জন-জীবনের তৃতীয় পর্যায়ে শেখ বলেছেন—"কাশ্মীর চুক্তি আমাদের কৌশলগত পরিবর্তন মাত্র।" কিন্তু এই শেখই কাশ্মীর চুক্তির সময়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে-প্লেবিসিটের জন্যে তাঁর বাইশ বছরের আন্দোলন এখন 'অবান্তর' এবং কাশ্মীর চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন অধ্যায় শুরু হলো। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর আত্মজীবনী শ্রুতিলিখন করিয়েছিলেন শেখ। কিন্তু ১৯৭৭-এর নির্বাচনে জয়লাভের ঘটনার পরেই গ্রন্থটির হঠাৎ সমাপ্তি। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, এর পরের অংশ খুবই বিতর্কমূলক ছিল বলে শেখের উত্তরাধিকারীরা তা বর্জন করেছেন। আত্মজীবনীটিতে বর্ণিত কোনো কোনো বিষয় বিচার্য। শেখ দাবী করেছেন, পঞ্চাশের দশকে মার্কিন শক্তির সহায়তায় 'স্বাধীন কাশ্মীর' গঠন করতে চেয়েছিলেন বলে তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা ১৯৫৩-এর ঘটনার (শেখের পদচ্যুতি ও কারাবাস) পরে শেখের বিরুদ্ধ পক্ষের লোকের কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু শেখের এই দাবী অসত্য প্রমাণ করে দিয়েছেন তাঁরই এক কনিষ্ঠ সহযোগী সৈয়দ মীর কাশিম। ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর আত্ম-জীবনী 'দাস্তান-এ-হায়াত' ('জীবন-কাহিনী')-এ কাশিম বলেছেন—"একথা সত্য যে পঞ্চাশের দশকে অনেক কংগ্রেস নেতার ব্যবহার শেখের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও সত্য যে এই সময়ে শেখের মন আচ্ছন্ন হয়েছিল একটি 'নতুন পরিকল্পনা'য় (new *idea*)।' পাশ্চাত্য দেশগুলি কাশ্মীরের ভারতভুক্তির সম্পূর্ণতাকে নানাভাবে বিফল করার চেষ্টা করেছিল, স্থানীয় মুসলমান নেতাদের মনে তারা জাগ্রত করেছিল 'স্বাধীন কাশ্মীর'-এর স্বপ্ন। নেহরু নিজে ১৯৫৩-এর প্রথমে শ্রীনগরে এসে শেখের কাছে একটি নোট পাঠালেন—"আমার কাছে সুনির্দিষ্টখবরআছে, আপনি 'স্বাধীন কাশ্মীর' গঠন করার কথা ভাবছেন। আমি বরং অনায়াসে এই অংশটিকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেব আপনার ভয়াবহ পরিকল্পনাকে সফল করার চেয়ে।"

শেখ অবশ্য স্বীকার করেছেন যে 'স্বাধীন কাশ্মীর'-এর পরিকল্পনাটি তিনি বিশিষ্ট মার্কিন কূটনীতিবিদ অ্যাডলাইস্টি ভেনসন এবং ভারতে আমেরিকার প্রতিনিধি এল. হ্যাণ্ডারাসনের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু এই আলোচনা ছিল 'একাডেমিক'। 'আতিশ-এ-চিনার' -এর একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় কাশ্মীরী পণ্ডিতদের উপরে। পণ্ডিত সম্প্রদায়কে তিনি দোষ দিয়েছেন কাশ্মীরের জন-আন্দোলনের বিরুদ্ধে গৃহশত্রুর ভূমিকা নেবার এবং বিদেশী শক্তির হাতে অত্যাচারের হাতিয়ার হবার জন্যে। কাশ্মীরী পণ্ডিতদের সম্বন্ধে শেখের মন্তব্য অত্যন্ত অনুদার। বিস্ময়ের বিষয় এই যে কয়েক শো বছর আগে শেখের পূর্বপুরুষদের মূল খুঁজে পাওয়া যাবে এই কাশ্মীরী পণ্ডিত (ব্রাহ্মণ কল)দের মধ্যেই। আত্মজীবনীতে শেখ আত্ম-প্রশংসায় অতি উদার। কিন্তু যাঁরা তাঁর সমর্থক নন বা অন্য মতাবলম্বী তাঁদের তিনি কঠোর সমালোচক। ডঃ করণ সিং এবং তাঁর পরিবারবর্গের সম্বন্ধে তিনি অতি বিরূপ মন্তব্য করেছেন যে তাঁরা সবাই নিষ্ঠুরভাবে কাশ্মীর শাসন করেছেন। ডঃ করণ সিংয়ের 'সদর-এ-রিয়াসাৎ'-রূপে নিযুক্তিও শেখের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

শেখ নিজেকে যেভাবে সর্ব গুণান্বিত করে চিত্রিত করেছেন তা সত্যের অপলাপ মাত্র। যে-সব চারিত্রিক দুর্বলতার জন্যে তিনি নেহরুর নিন্দা করেছেন, তার অনেকগুলি তাঁর (শেখের) নিজের মধ্যেই ছিল। আত্মজীবনী রচনার সময়ে শেখ তাঁর নিজের কাছেও অকপট ছিলেন না। যে-সব বিরাট ব্যক্তিত্ব আত্মজীবনী লিখেছেন তাঁরা নিজেদের দোষ-ত্রুটির কথা উল্লেখ করতে দ্বিধা করেননি। এই মানবিক দুর্বলতার অকপট স্বীকৃতি তাঁদের জীবনীগ্রন্থকে আকর্ষণীয়, আন্তরিক ও আপন করেছে। শেখ আবদুল্লা এদিক দিয়ে শুধুমাত্র অসফলই নন, বরং নিজেকে কপট প্রমাণ করেছেন—যিনি নানাভাবে 'ডাবল স্টাণ্ডার্ড' বজায় রেখে গেছেন। মোহাম্মদ য়ুসুফ টেঙ্গ যাঁন তাঁর আত্মজীবনীর অনুলেখন করেছেন—তিনিও নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর অন্তত কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির আত্মজীবনী পড়ে নেওয়া উচিত ছিল শেখের আত্মজীবনী অনুলেখনের আগে। মোহাম্মদ ইকবালকে টেঙ্গ পড়েছেন এবং 'আতিশ-এ-চিনার'-এর এখানে সেখানে ইকবালের উদ্ধৃতি ব্যবহারে তার পরিচয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই উদ্ধৃতি ব্যবহার গ্রন্থটিকে অতিরিক্ত আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে নি। বিফল প্রত্যাশার এক সুবিপুল দৃষ্টান্ত হিসেবে 'আতিশ-এ-চিনার' উল্লেখনীয় হয়ে থাকবে—শুধু ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিকদের কাছেই নয়, সাধারণ পাঠকের কাছেও।

তিন জন তিন দিক

মল্লিকা সেনগুপ্ত

বাড়ি বদলে যায়/
রমাপদ চৌধুরী/
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ/
কল-৯/১৪.০০

ধ্যান জ্ঞান প্রেম/
কালকূট/
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ/
কল-৯/১৬.০০

তুমি আর আমি/
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়/
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ/
কল-৯/১৬.০০

যদি আবহমান মনুষ্যত্বই সাহিত্যের উৎস ও উদ্দেশ্য বলে ধরে নিই, তবে, এই উপন্যাস তিনটি তা সমর্থন করবে। রমাপদ চৌধুরী, কালকূট, ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় নিজের নিজের পদ্ধতিতে সার্চলাইট ফেলেছেন মানুষের মনোজগতে, অস্তিত্বের আলোঅন্ধকারে।

রমাপদ চৌধুরীর 'বাড়ি বদলে যায়' তাঁর সাম্প্রতিক ভালো লেখাগুলির অন্যতম। বয়স তাঁকে পরিণত করেছে, তার প্রামাণ 'খারিজ', 'হৃদয়', 'লজ্জা' বা 'অভিমণ্যু', 'বাহিরি' বা 'বাড়ি বদলে যায়'। এই সব উপন্যাসগুলিতে যে বিশ্লেষণ ও অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায়, ভাষার যে ঋজুতা আমাদের মুগ্ধ করে, তা তাঁর আগেকার উপন্যাসগুলিতে, এমনকি 'এখনই' বা 'বনপলাশীর পদাবলী'র মতো অতিখ্যাত উপন্যাসেও পাইনি।

এই উপন্যাসে এক মধ্যবিত্ত দম্পতি নানারকম উদ্বেগ ও টানাপোড়েন পার হয়ে প্রথমে যৌথ পরিবার ভেঙে একটি ভাড়া করা ফ্ল্যাটে উঠে আসে এবং পরে ভাড়াটে হওয়ার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বাড়ি করে বাড়িওলা হয়ে যায়। খুব সাধারণ এই গল্প-কাঠামোই সাধারণের স্তর অতিক্রম করে যায় বর্ণনাভঙ্গী ও বিশ্লেষণের জন্য। একজন ভাড়াটে কিভাবে মনোজগতের বাড়িওলা হয়ে ওঠে তার একটি বিশ্বাসযোগ্য দলিল এই উপন্যাস।

গৃহসমস্যা—বাড়ি ভাড়া বা ফ্ল্যাট কেনা নিয়ে যে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব তার প্রমাণ নিকট অতীতেও আমরা দেখেছি, অন্য কারো লেখায়, 'বাড়ি বদলে যায়'-এর পার্থক্য দৃষ্টিভঙ্গীতে।

প্রকৃত প্রস্তাবে, রমাপদ চৌধুরী আজ এমন এক ভাষা অর্জন করেছেন যে তাঁর পক্ষে 'খারাপ' লেখা প্রায় অসম্ভব। সৃষ্টিক্ষমতা শুধুমাত্র ঈশ্বরদত্ত নয়, অনেকক্ষেত্রে আয়াসলব্ধও—তার প্রমাণ রমাপদ চৌধুরী।

'ধ্যান জ্ঞান প্রেম' কালকূটের সাম্প্রতিকতম উপন্যাস।

তিরিশ বছর আগে কালকূট লিখেছিলেন 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' । যা এখন বাংলা সাহিত্যের একটি প্রবাদে পরিণত হয়েছে । তিনি বাড়ুজ্জের পর বাংলা কথাসাহিত্যে যে নামটি উঠে আসে তা একজন 'বসু'র নাম, সমরেশ বসু । অজস্র গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনীর মধ্য দিয়ে তিরিশ বছর ধরে আমরা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, কালকূট ছদ্মনামে তিনি অন্য এক ধরনের উপন্যাস লেখেন । অন্য এক ভাষায় তিনি মানুষের অনুসন্ধান করেন ।

ভ্রমণোপন্যাস বললে এই লেখাগুলিকে অকারণ গণ্ডীবদ্ধ করা হয়, কালকূটের লেখা এক আত্মমগ্ন অচিন মানুষের অবিরাম অন্বেষণ—কোথায় পাবো তারে ? এই পর্যায়ের উপন্যাসে কিছুটা প্রাচীন, অপরিশীলিত, লোকগীতির ভাষা বেছে নিয়েছেন কালকূট, এই ভাষা আমাদের মুগ্ধ করে না, কারণ আধুনিক পাঠক ভাষার কারণে ঠেক খেতে রাজী নন । কিন্তু কি এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যে, অচিনলোকের টানে, আগাগোড়া মুগ্ধ রাখেন তিনি । কালকূটের উপন্যাস অনেক, কিন্তু আসলে তা একটিই নিরবচ্ছিন্ন রচনা ।

তাঁর যেকোন একনিষ্ঠ পাঠকই একথা স্বীকার করবেন। মেধাদীপ্ত নয়, বিচ্ছুরিত নয়, কালকূটের উপন্যাস আমাদের আকণ্ঠ মজিয়ে রাখে, ভালোবাসতে শেখায় । এখানেই তিনি অনন্য, এখানেই সমরেশ বসুর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য । সমরেশের ভাষা ভিন্ন, ট্রিটমেন্ট ভিন্ন, প্রতিটি উপন্যাসের পিছনে স্বতন্ত্র পরিকল্পনা থাকে । কালকূট আপাতভাবে পরিকল্পনাহীন, স্বতোৎসারিত—আবহমান মনুষ্যত্বের কাছে তার আবেদন ।

'ধ্যান জ্ঞান প্রেম', সেই হিসেবে কালকূটের নিরবচ্ছিন্ন উপন্যাসটির সাম্প্রতিক সংযোজন । একই ভঙ্গী, একই ভাষা, পাঠকের সেই একই অমোঘ নিমজ্জন । সমরেশ বসুকে নিয়ে পাঠক তর্ক করতে পারেন, বিচার করতে পারেন—কিন্তু কালকূটে এসে জাহাজ ডুববেই । ধ্যান জ্ঞান প্রেম তার ব্যতিক্রম

নয় । এখানে এক রিসার্চ সেন্টারের বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে দিন কাটিয়েছেন লেখক, 'মনের মানুষ' খুঁজে পেতে চেয়েছেন তাদেরই মধ্যে । প্রসঙ্গত ধ্যান জ্ঞান প্রেম এবং কালকূটের সাম্প্রতিক উপন্যাগুলির শুরুতে যে দার্শনিক মনোলগ থাকে, পাঠক তা বাদ দিয়ে পড়েন, ঐ ভূমিকা মূল রচনার পক্ষে অনিবার্য নয়, উপরন্তু তা পাঠককে বিভ্রান্ত করে । প্রতিক্ষেত্রেই এই ভূমিকাংশের পর থেকে লেখা তরতর করে এগিয়ে যায়—প্রসাদগুণে পাঠক মজেন । প্রতিভাবানের রচনাও যে দর্শনে আবিল হয়ে ওঠে তার প্রমাণ কালকূট ।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন রসরচয়িতা হিসেবে, ক্রমশ তিনি নিজেকে পাল্টে নিচ্ছেন সমাজসংসারের সমালোচকের ভূমিকায় । 'শ্বেতপাথরের টেবিল' এবং 'সোফা কাম বেড' যে খ্যাতি তাঁকে এনে দিয়েছিলো তার পেছনে ছিলো বাঙালীর কৌতুকপ্রিয়তা । কিন্তু ঐ কৌতুকের আড়ালে ছিলো সিনিসিসম এবং সমালোচনা । এই লেখক চিরদিনই নারীদের দজ্জাল, আত্মপরায়ণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন , পুরুষদের সংসারের হালে আবদ্ধ অসহায় প্রাণী হিসেবে । সঞ্জীবের পাঠক এখন প্রস্তুত থাকেন এর জন্য । এর পাশাপাশি তাঁর লেখায়, ধীরে ধীরে প্রবেশ করেছে দর্শন । 'লোটাকম্বল' এর চূড়ান্ত উদাহরণ যেখানে বীতশ্রদ্ধ সমালোচক সঞ্জীব ও দার্শনিক সঞ্জীব মিশে গেছেন সুন্দরভাবে । সৃষ্টি হয়েছে একটি অনন্য উপন্যাস । তারপর থেকে ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে দর্শনের প্রভাব । অন্যদিকে পরিচিত গণ্ডীর বাইরেও তিনি যাচ্ছেন না । সঞ্জীব শক্তিমান, আমাদের স্থির বিশ্বাস নিজের সৃষ্টি করা এই গণ্ডী ভেঙে একদিন বেরিয়ে আসবেন তিনি । 'তুমি আর আমি' উপন্যাসে ব্যঙ্গ, শ্লেষ ও দর্শনের মধ্য দিয়ে তিনি ধরতে চেয়েছেন গীতার নিষ্কাম জীবনদর্শন । এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য । সংসারে বীতস্পৃহ একটি মানুষ নানা ঘটনার উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে শেষপর্যন্ত এযাবৎ যুযুধান স্ত্রীর কাছেই ফিরে আসেন । এখান থেকেই শুরু হতে পারতো আশাবাদ, কিন্তু সেই সামান্য আশাও সঞ্জীব রাখলেন না । তাঁর স্বাতন্ত্র্য এখানেই ।

আঙিনার আলপনায় সমাজজীবন

দেবাশিস দাশগুপ্ত

ভাদুগীতির ইতিকথা/ যুধিষ্ঠির মাজী/ আসর পত্রিকা/ কল-৫/১৫·০০

একটি গোলাপ বাগানের জন্য মালী যে যত্ন নেয়, গাঁদা ফুলের প্রতি সেই যত্ন নেয় না । গাঁদাফুল আপনার থেকেই ফোটে । বনকে, আঙিনাকে বর্ণাঢ্য করে । বসন্তের নহবতে বাজানোর জন্যই যেন তার বায়না নেওয়া ।

যে কোন উৎসব নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হয় । কিন্তু যা নিতান্তই ঘরোয়া ব্রতের মত, যে গানে আচার অনুষ্ঠান ছাড়াও পুরনো থেকে সমকালের সুখ দুঃখ রূপ দেয়—গবেষকদের গ্রন্থেই তার শুধু উল্লেখ থাকে । যুধিষ্ঠির মাজী ভাদুগীতির ইতিকথা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ লিখেছেন । এই লৌকিক উৎসবের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ খুবই জরুরি ছিল । একটি গ্রন্থে ছুঁয়ে যাওয়া নয়, পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে সংস্কৃতি, কিংবদন্তী, পৌরাণিক পাঁচালি, সামাজিক পাঁচালি, সাময়িক প্রসঙ্গ, রামায়ণ প্রসঙ্গ, ছড়া গান, রঙ্গ তামাশা, সম্পৃক্ত অনেক গান এবং কিছু স্বরলিপি—কিছুই তিনি বাদ দেননি ।

মানভূম অঞ্চলের কঠিন জীবন, মাটি যেখানে কৃপণ—সেখানে জীবনের রস খুঁজে নিতে হয়, জীবন থেকেই । গ্রন্থকার জৈনধর্মের প্রভাবও উল্লেখ করেছেন । মানভূমের ভাদু বীরভূমে বদলে যায়, অজয় নদের অববাহিকায় পুরুষরাই ভাদু নাচে । মল্লভূমে সেটাই স্বাভাবিক । মানভূমেও ভাদ্র সংক্রান্তিতে ভাদু গানের দিনই ছাতা উৎসব । লৌকিক ভাষায় 'ছাত্তা টাঁড়ের মেলা' । কাশীপুরের রাজাদের বিজয় উৎসব । সেখানে পুরুষদের উদ্দাম নৃত্য । শরৎকালে রাজাদের যুদ্ধ যাত্রার প্রচলন ছিল—এখানে আশ্বিনের আগেই ধামসা বেজে ওঠে । অন্য প্রদেশে 'দশেরা' উৎসবেও একই প্রতিধ্বনি ।

গ্রন্থকার দেখিয়েছেন কিভাবে বাল্মীকির রামায়ণ, কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙালী হয়েছে—আবার থাইল্যান্ডে, কম্বোডিয়ায় তার অন্য চেহারা । মুণ্ডা উপজাতীয় রামায়ণে সীতা অন্যভাবে জন্ম নেয়, আদিবাসী লোকসাহিত্যে । রাজা জনক সেখানে মহাজন । দৈনন্দিন জীবন পুরাণকে ভেঙে নেয় । লেখক জানিয়েছেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'সরমা' লোকসাহিত্য থেকে নেওয়া । কোথায় মধুসূদন পেলেন সেই লোকসাহিত্য ! সকলেই জানেন খ্রীস্টান মধুসূদনের অন্তরটি ছিল বাঙালী হিন্দুর । টুসু গানের মত ভাদু গানেও দুই পক্ষের মেয়েদের ঝগড়া—'আমার ভাদু সিনাই আইল পরতে দিব কি?/বাক্সায় আছে পাটের শাড়ি বার করে দি/ উয়ার ভাদু সিনাই আইল পরতে দিব কি ?/ঘরে আছে চটছিড়া বার করে দি ।' গ্রন্থকার আনুপূর্বিক সব তথ্য বলেছেন । শুধু একটি জিজ্ঞাসা তার মনে আসেনি । বাংলাদেশে, এবং ভারতবর্ষে অনেক মেয়েলি ব্রত কথা, মেয়েলি ব্রত আছে । যা শুধু মেয়েদেরই । সম্ভবত মেয়েরাই পুরুষ শাসন থেকে, সংসারের বাঁধন থেকে মাঝে মাঝে এইভাবে মুক্তি খুঁজে নেয় ।কোন আন্দোলন নয়, উৎসব, পার্বণেই নারী মুক্তি । খাঁচার বাইরে অবাধ আকাশ । খাঁচার শিকে প্রেম, করুণা থাকলেও আকাশের হাতছানি এড়ানো যায় না ।

সমাজ সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান

অরূপরতন ভট্টাচার্য

বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি / জহুরুল হক ইত্যাদি / বিজ্ঞান সংস্কৃতি পরিষদ / ঢাকা-২/ ৩৫·০০

বর্তমানে আলোচ্য 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' গ্রন্থটি এগারোটি প্রবন্ধের সংকলন । সংকলনটি বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত, উদ্যোক্তা বিজ্ঞান সংস্কৃতি পরিষদ— পরিষদের

পক্ষে এটি সম্পাদনা করেছেন জহুরুল হক, আলী আসগর এবং আবদুল হালিম।
প্রবন্ধগুলি পরিষদের পাক্ষিক অধিবেশনে পঠিত বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে নির্বাচিত।
এইসব প্রবন্ধের মধ্যে আছে 'প্রযুক্তি বিকাশ ও উন্নয়নশীল দেশ' লেখক আবদুল্লাহ আল-মূতী, 'একবিংশ শতাব্দীর মুখোমুখি বাংলাদেশ'—এটি লিখেছেন এ এম হারুন আর রশীদ, জহুরুল হক লিখিত 'ভাষার বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভাষা', সন্তোষ গুপ্তের 'সংস্কৃতির রূপান্তর বনাম অবকাঠামো'। সংকলনের নামে একটি প্রবন্ধও গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটির লেখক আলী আসগর।
বিভিন্ন প্রবন্ধ লক্ষ করলে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, মানুষ, সমাজ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয় বিভিন্ন প্রবন্ধের উপজীব্য এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্কই তুলে ধরা হয়েছে বর্তমান সংকলনে। বলা বাহুল্য, আলোচনায় বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও সমস্যাবলী গুরুত্ব পেয়েছে সর্বাধিক।
সংকলনে বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হিসেবে প্রথম প্রবন্ধ 'প্রযুক্তি বিকাশ ও উন্নয়নশীল দেশ'-কে বেছে নেওয়া চলে। প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে সুলিখিত।
প্রযুক্তি বলতে লেখক আবদুল্লাহ আল-মূতী প্রবন্ধের সূচনায় বলেছেন, 'মানুষ তার জীবনযাপনের জন্য বস্তুজগতের নানা উপাদান ব্যবহারে যে সব কলাকৌশল প্রয়োগ করে, খুব সাধারণ অর্থে আমরা তাকেই বলতে পারি প্রযুক্তি। এ সব কলাকৌশল মানুষের জীবনে এনে দেয় স্বাচ্ছন্দ্য, লভ্য করে সুশীল জীবনের নানা উপকরণ।'
প্রযুক্তি সম্পর্কে এই ধারণাকে অবলম্বন করে ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায় পার হয়ে লেখক এসে পৌঁচেছেন আধুনিক জগতে।
বর্তমানে প্রযুক্তির যে সব নবদিগন্ত উন্মোচিত হতে চলেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কমপিউটার প্রযুক্তি, লেজার প্রযুক্তি, জিন প্রকৌশলের মত প্রযুক্তি, মহাকাশ উপগ্রহের সাহায্যে দূর অনুধাবন প্রযুক্তি।
এই প্রযুক্তি কি কোনো গোষ্ঠী ও দেশের অধিকারভুক্ত এবং সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে, না কি তাতে সমগ্র মানবজাতির সাধারণ উত্তরাধিকার?
যদি তাও বা হয়, তাহলেও এই অতি আধুনিক বা সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করলেই কি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব?
লেখক এ সম্পর্কে বলেছেন, 'যেমন উচ্চ ফলনশীল বীজ বা কৃষি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, প্রযুক্তির বিকাশ বা প্রয়োগ মোটেই সমাজ সংগঠন নিরপেক্ষ নয়; সমাজ সংগঠনে রূপান্তর না ঘটিয়ে উন্নয়নশীল দেশে আধুনিক উন্নত কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করা হলে উচ্চফলন শুধু উচ্চবিত্ত কৃষিজীবীদের এক সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের জীবনে তার সুফল পৌঁছতে পারে না।'
লেখকের বক্তব্য, সন্দেহ নেই, ভেবে দেখার মত।
সংকলনের সবগুলি প্রবন্ধই সমান গুরুত্বপূর্ণ, এমন নয়। তবে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হিসেবে এ এম হারুন অর রশীদের 'একবিংশ শতাব্দীর মুখোমুখি বাংলাদেশ' প্রবন্ধটি উল্লেখ করতে হয়।
প্রবন্ধটি অজস্র তথ্যযুক্ত, সুলিখিত। লেখক প্রবন্ধে নিজের বক্তব্য উল্লেখ করে বলেছেন, '২০০০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ১·৩%-এ নিয়ে আসা সম্ভব না হলে কোনো অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই কাজ করবে না বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।'
'সমাজ, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান' বা 'উন্নয়ন ও বর্তমান পরিস্থিতি' প্রবন্ধের নামকরণেই বিষয়বস্তুর আভাস পাওয়া যায়। এগুলি সধারণভাবে বাংলাদেশ অবলম্বনে লিখিত নয়।
বিজ্ঞানের ইতিহাস ঘেঁষা দু একটি প্রবন্ধও সংকলনে আছে, যেমন, মোহাম্মদ আবদুল জব্বার লিখিত 'মানুষের আবির্ভাব' বা আবদুল হালিমের 'বিশ্ব-ইতিহাস ও বিশ্ব-বিজ্ঞান অবিচ্ছিন্ন ও অবিভাজ্য'।
প্রবন্ধ দুটি বিজ্ঞানে আগ্রহী সাধারণ পাঠকদের ভাল লাগবে। সংকলনের শেষ প্রবন্ধ 'জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্র' উল্লেখযোগ্য নয়।

ভিতরের চোখ

প্রণয়কুমার কুণ্ডু

চিত্রকথা/
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়/
(সঃ) কাঞ্চন চক্রবর্তী/
অরুণা প্রকাশনী/
কলকাতা/৪০.০০

চিত্রশিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জীবন অবলম্বনে নির্মিত শ্রদ্ধেয় সত্যজিৎ রায়ের দ্য ইনার আই ছবিটি যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের নিশ্চয়ই মনে হবে—বিনোদবিহারীর সৃষ্টির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে যে শিরোনামটি ব্যবহৃত হয়েছে, তার চেয়ে ভালোভাবে আর কিছু বলা যেত না।
পঞ্চাশোর্ধ্বে যখন বিনোদবিহারী দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে পড়েন, বলতে গেলে, তখন থেকেই তাঁর লেখার সূত্রপাত, লিখেছেনও অনেক নানান বিষয়ে, মূলত শিল্পকে আশ্রয় করে। সম্ভবত তাঁর "ইনার আই"ই এইসব লেখায় প্রেরণা যুগিয়েছে। বাইরের চোখ দিয়ে দেখেছেন জীবনকে, এঁকেছেন ছবির পর ছবি: ভিতরের চোখের আলোয় শিল্প সম্পর্কে যে বোধ ও উপলব্ধি দানা বেঁধেছে, তা প্রকাশিত হয়েছে লেখার মাধ্যমে; এর জন্যে অবশ্য তাঁকে অনুলেখকের সাহায্য নিতে হয়েছে, স্বভাবতই।
শিল্প সম্পর্কে (বাংলায় লেখা) অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু প্রমুখ অনেকের লেখার সঙ্গেই আমাদের পরিচয় আছে। নির্বাচিত রচনা নিয়ে সংকলিত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'চিত্রকথা' তারই পর্যায়ভুক্ত মূল্যবান সংযোজন। শিল্পী যখন শিল্পের আলোচনায় মগ্ন হন, শিল্পীর 'ইনার আই'-প্রসূত সেই আলোচনা পেশাদারী সমালোচনা না হয়ে হয় সৃজনধর্মী বিশ্লেষণ। 'চিত্রকথা'র রচনাগুলি এই প্রসাদ গুণে অন্বিত।
আলোচ্য গ্রন্থটি, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত লেখকের তৃতীয় গ্রন্থ। সম্পাদক মুখবন্ধে জানাচ্ছেন— "গ্রন্থের পরিকল্পনায় পর্ববিভাগ ও ক্রমনির্ধারণের জন্য বিনোদবিহারী নিজেই যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা করেছেন।" ফলত, মোট ৪টি পর্বে রচনাগুলি বিন্যস্ত। সূচীপত্র অনুযায়ী ১ সংখ্যক পর্বের প্রথম প্রবন্ধ 'মহাভারত ও ভারতশিল্প', অথচ ভিতরের শিরোনাম 'মহাকাব্য ও ভারতশিল্প'। লেখকের অভিপ্রায় যদি হয় শিল্প-সংক্রান্ত রচনাগুলি সংকলিত করা, অন্তত গ্রন্থের নামকরণ থেকে তা'ই মনে হয়, তাহলে, বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য রেখে প্রশ্ন তোলা যায়— মহাভারত, রামায়ণ ও বন্ধনশিল্প, এই লেখাগুলির সত্যিই কি কোন প্রাসঙ্গিকতা আছে? সন্দেহ নেই, রন্ধনশিল্পই সবচেয়ে সেরা শিল্প এবং লেখাটিও মনোজ্ঞ, কিন্তু গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে তার সংযোগ কোথায়?
দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে 'আধুনিক শিল্পশিক্ষা'। গ্রন্থটি বিশ্বভারতী-প্রকাশিত (১৯৭২) লেখকের প্রথম বই। গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত 'চিত্রকথা'য় আশ্রয় পেয়েছে। ভেবে দেখা দরকার, তা সঙ্গত হয়েছে কিনা। ৩ সংখ্যক পর্বের রচনাগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে এলোমেলোভাবে। কালানুক্রমের রীতি না মেনেই। ৪ সংখ্যক পর্বে রচনাগুলি ইংরেজিতে লেখা। এই পর্বটির উপযোগিতা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। বিনোদবিহারীর ইংরেজি রচনাগুলি সংকলিত করে একটি পৃথক গ্রন্থ প্রকাশিত হতে পারে কি?
মুখবন্ধে সম্পাদক মুদ্রণ-প্রমাদের একটি তালিকা দিয়েছেন। তার বাইরেও অনেক মুদ্রণ-প্রমাদ থেকে গেছে। লেখক যাই বলুন, সম্পাদক ভেবে দেখলে পারতেন—শিল্প-সম্পর্কিত এমন একটি গ্রন্থে কিছু ছবি দেওয়া যেত কিনা। বিনোদবিহারীর রচনাপঞ্জী থেকে জানা যায়, প্রায় ৮০টির মতো রচনা ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। এর কিছু 'চিত্রকর'-এ প্রকাশিত হলেও অনেক মূল্যবান লেখা আলোচ্য গ্রন্থে আসতে পারতো, অথচ এসেছে কিছু অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান রচনা। বস্তুত, সম্পাদনার ক্ষেত্রে আরো বেশি যত্নবান হওয়া উচিত ছিল। এই প্রত্যাশা আমাদের থেকেই যায়, আরো এই কারণে যে সম্পাদক নিজে খ্যাতিমান শিল্প-সমালোচক এবং বিনোদবিহারীর স্নেহধন্য।
তবু, এই অব্যয় পদটি যোগ করে বলতে হয়, যা জীবদ্দশায় বিনোদবিহারী দেখে যেতে পারেননি, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা তাঁর রচনাগুলির কিছু অংশ সংকলিত করে সম্পাদক যথার্থই একটা বড় মাপের কাজে হাত দিয়েছেন। শিল্পচর্চার ইতিহাসে অবনীন্দ্রনাথ- কুমারস্বামী-নন্দলালের শিল্পভাবনার পাশে বিনোদবিহারীর শিল্প-ভাবনাও গভীরভাবে মূল্যবান। ফলত, তাঁর প্রতিভা ও শিল্পভাবনাকে বোঝবার ক্ষেত্রে 'চিত্রকথা' অবশ্যই সহায়ক। এবং এই কারণেই গ্রন্থটিকে স্বাগত জানানো যায়।

জ

জাগরণ। বিনোদ বেরা ৫০, ৪৩

জাগরণ। সুশীলকুমার গুপ্ত ২৭, ১৩

জাগরণ—নিজ বাসভূমে। বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত ৪০, ৩৪ ; ৪০, ৪২

জাগরণে যায় বিভাবরী। অজ্ঞাত মিত্র ৩১, ৪৮

জাগ্রত। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৪৪, ৮

জাতি চরিত্র। রাজশেখর বসু ২১, ১৯

জাতিভেদ প্রথা ৩৩, ৪০ ; ৩৩, ৪৬ ; ৪০, ৩৫ ; ৪৬, ৭ ; ৪৯, ২৭

জাতিভেদপ্রথা বাঙ্গালার গ্রামসমাজ। তারাশিস মুখোপাধ্যায় ৩৩, ৪০

জাতির জীবনে ইতিহাসের সঙ্কেত ৪৫, ৬, ১০ ডি ১৯৭৭ : ১১, সম্পা

জাতির জীবনে নৈতিক সংকট ৪৫, ১৭, ২৫ ফে ১৯৭৮ : ৯, সম্পা

জাতির নামে বজ্জাতি। রঞ্জন ৪২, ৭

জাতির মর্যাদার সম্বল ৪৪, ১৪, ২৯ জা ১৯৭৭ : ৭, সম্পা

জাতিস্মর প্রথা। আনন্দ বাগচী ২৩, ৪৯

জাতীয় অভিষ্ট : শিশুমঙ্গল ৪৬, ৯, ১৭ ফে ১৯৭৯ : ১১, সম্পা

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ ২৬, ৪

জাতীয় উন্নয়নে জলপথ। রামেশ্বর ভট্টাচার্য ২৭, ১

'জাতীয় খেলোয়াড়' নির্বাচনের পশ্চাৎপট। অরিজিৎ সেন ৪৯, ১৬

জাতীয় গুরুত্ব বিশ্ববিদ্যালয়। সত্যেন্দ্রনাথ সেন ৪১, ৩৫

জাতীয় গ্রন্থতালিকার ভূমিকা। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ২২, ২৭ (সা)

জাতীয় গ্রন্থাগার ৪১, ৪৩, ২৪ আ ১৯৭৪ : ২৪৯, সম্পা

জাতীয় গ্রন্থাগারে গোপন সুড়ঙ্গ ৫০, ২৬, ৩০ এ ১৯৮৩ : ৯, সম্পা

জাতীয় গ্লানির মূর্তি ৪৪, ১৭, ১৯ ফে ১৯৭৭ : ২২৩, সম্পা

জাতীয় চরিত্র—ভারত ২১, ১৯

জাতীয় চেষ্টায় মহান সাফল্য ৪৪, ১০, ১ জা ১৯৭৭ : ৬৭৫, সম্পা

জাতীয় জাগরণের প্রগাতা মুকুন্দ দাস। রাজ্যেশ্বর মিত্র ৪৫, ১১

জাতীয় জিমন্যাস্টিকসে জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন। প্রদ্যোৎকুমার দত্ত ৪১, ২২

জাতীয় জীবন ও হরিজন ৪৫, ৮, ২৪ ডি ১৯৭৭ : ৯, সম্পা

জাতীয় টেবল টেনিস দুর্গাপুরে যা দেখলাম। চিত্ত বিশ্বাস ৪৭, ১৭

জাতীয় নাট্য উৎসব দেখুন নাট্য উৎসব, দিল্লী

জাতীয় নাট্যশালা প্রকল্প ৩২, ২৮

জাতীয় পক্ষী, ভারত ৩০, ১৯

জাতীয় প্রতিভার অপচয় ৪২, ৫০, ১১ অ ১৯৭৫ : ৮২১, সম্পা

জাতীয় ফুটবল—কিছু স্মৃতি কিছু কথা। প্রদ্যোৎকুমার দত্ত ৪৫, ১৩

জাতীয় ফুটবল প্রসঙ্গে। প্রদ্যোৎকুমার দত্ত ৫০, ২২

জাতীয় ফুটবলে বাংলার ছেলেদের আধিপত্য। প্রদ্যোৎকুমার দত্ত ৪৯, ১৮

জাতীয় ফুটবলে বাংলার অধিনায়ক। প্রদ্যোৎকুমার দত্ত ৪৩, ৯

জাতীয় ফুটবলে বাংলার পরাজয় প্রাপ্য ছিল। প্রদ্যোৎকুমার দত্ত ৪৮, ১৩

জাতীয় ফুটবলের নেপথ্যে। রূপক সাহা ৪৭, ১০

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। গোপেশ্বর সাহা ২৩, ২০

জাতীয় শিশু উৎসবে শিশুনাট্য। রানা দাস ৪৭, ২৪

জাতীয় শৃঙ্খলার পরিকল্পনা ৩০, ২০, ১৬ মা ১৯৬৩ : ৫৮৭

জাতীয় সংকট ২৬, ৪৬, ১২ সে ১৯৫৯ : ৪৪১

জাতীয় সংকট ও শিক্ষা উদ্যোগ ৩০, ৯, ২৯ ডি ১৯৬২ : ৭৭৯

জাতীয় সংকট ও শিক্ষাব্যবস্থা ৩০, ১৮, ২ মা ১৯৬৩ : ৩৯৫

জাতীয় সংকল্প ৩২, ৪২, ২১ আ ১৯৬৫ : ২২১

জাতীয় সংহতি ২৮, ৩১ ; ২৮, ৩৫ ; ২৮, ৪২ ; ২৮, ৫১ ; ২৯, ৫ ; ২৯, ১০ ; ২৯, ১৩ ; ২৯, ৩২ ; ২৯, ৪৩ ; ৩০, ২

জাতীয় সংহতি ২৮, ৫১, ২৮ অ ১৯৬১ : ১০৬৫ ; ২৯, ৪৩, ২৫ আ ১৯৬২ : ২৯৯; ৩০, ২, ১০ ন ১৯৬২ : ১০৭

জাতীয় সংহতি দিবস ৩০, ৫১

জাতীয় সংহতি দিবস ৩০, ৫১, ১৯ অ ১৯৬৩ : ১১৫৯

জাতীয় সংহতি—বিঘ্ন ২৭, ৪৫

জাতীয় সংহতির প্রেরণা ৪২, ২০, ১৫ মা ১৯৭৫ : ৪৫৫, সম্পা

জাতীয় সংহতির বনিয়াদ ৪৩, ৫১, ১৬ অ ১৯৭৬ : ৮৭৩, সম্পা

জাতীয় সংহতির ভাষাসূত্র ৪৩, ২৭, ১ মে ১৯৭৬ : ৯, সম্পা

জাতীয় সততার ভয় ও সমস্যা ৪৫, ৫, ৩ ডি ১৯৭৭ : ৯, সম্পা

জাতীয় সদাচারের সুরক্ষা ৪২, ৩৮, ১৯ জু ১৯৭৫ : ৮৮৭, সম্পা

জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী ৩৮, ৯

জাতীয় সম্পদ, ভূশোভা ৪২, ২৩, ৫ এ ১৯৭৫ : ৬৯৫, সম্পা

জাতীয় সাহিত্যে উন্নয়নের পরিকল্পনা। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫, ২৮ (সা)

জাতীয় হকি দলটি কি সুগঠিত। প্রদ্যোৎকুমার দত্ত ৪৮, ৩৩

জাতীয়তাবোধ ৩১, ২৭ (সা) ; ৩৪, ২৭ (সা) ; ৪৮, ৪১

জাতীয়তাবোধ ও ভারতে কারিগরি বিজ্ঞানের প্রসার। ত্রিগুণা সেন ৩১, ২৭ (সা)

জাতীয়তার শক্তি-পরীক্ষা ৪২, ২৯, ১৭ মে ১৯৭৫ : ১৬৭, সম্পা

জাদু প্রদর্শনী। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ৪৪, ১১

জাদুকর। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬, ১৪

জাদুঘর। অসিত দত্ত ৩০, ৩

জাদুঘর থেকে চুরি ৪১, ৪৯, ৫ অ ১৯৭৪ : ৭৩৯, সম্পা

জাদুঘর, মিউজিয়াম, সংগ্রহশালা ৪৭, ১২, ১৯ জা ১৯৮০ : ৭, সম্পা

জানকীরামন, টি
বিগত তিন দশকের তামিল সাহিত্য অনু সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় সা ১৯৭৯ : ১২৭-১৩০, স

জানা হয়ে গেছে। অবিনাশ রায় ৪৫, ৪৮

জানালা। আশিস বর্মণ ৪১, ২০

জানালা। বাসুদেব দেব ৪৭, ১১

জানালা দরজা বন্ধ তবু। রবীন সুর ৩৭, ২০

জানালার ধারে মুখ। সমরেশ বসু ৩৬, ৭

জানাশেক, লিওমা ৫০, ১৭

জানুয়ারী, ১৯৬৪। দিনেশ দাস ৩১, ১৪

জানোয়ার। পরিমল সাহা ২৫, ১৫

জান্তব। সাধনা মুখোপাধ্যায় ৫০, ২২

জাপান—চিত্রকলা ৩৪, ৮

জাপান থেকে রবীন্দ্রতীর্থে। তোমিও মিজোকামি ৪০, ২৩

জাপান—প্রযুক্তিবিদ্যা ৪৯, ৩০

জাপান—বিবরণ ও ভ্রমণ ২৫, ১০-২৫, ২৩ ; ২৯, ১২ ; ৪৪, ৩৫ ; ৪৪, ৩৮ ; ৪৬, ২৮; ৪৭, ১৪ ; শা ১৯৫৭ : বি ১৯৭৬

জাপান—শিশু আত্মহত্যা ৪৫, ৩২

জাপানী জার্নাল। বুদ্ধদেব বসু ২৯, ১২

জাপানী পুতুল। চিত্র সেন ২২, ৫

জাপানী বিস্ময়। সুভাষকুমার সিকদার ৪৯, ৩০

জাপানী মনীষী ওকাকুরা ও বাংলাদেশ। পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৩০, ২৮ (সা)

জাপানী সংবাদপত্রের শতবার্ষিকী ২৯, ৪১

জাপানী সাংবাদিকদের চোখে রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬। কাজুও আজুমা ও অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ৩৭, ২৮ (সা)

জাপানী সাহিত্য ২৭, ২৭ (সা)

জাপানে। অন্নদাশঙ্কর রায় ২৫, ১০-২৫, ২৩

জাপানে একস্‌পো—৭০। বিকাশ বিশ্বাস ৩৭, ২৫

জাপানে যোগব্যায়ামের জনপ্রিয়তা। প্রদ্যোৎকুমার দত্ত ৪৫, ৪২

জাপানে রবীন্দ্রসন্ধ্যা। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৩৯, ৭

'জাপানে' লেখকের কৈফিয়ৎ। অন্নদাশঙ্কর রায় ২৫, ২৮

জাপানের এ বি সি ডি। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ৪২, ৩

জাপানের প্রেরণা : নন্দলাল বসু। সত্যজিৎ চৌধুরী বি ১৯৮২

জাফরি। দেবব্রত মল্লিক ৪৫, ৫১

জাবালির পালা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শা ১৯৫৪

জাভেদ মিয়াদাঁদ। ৪৬, ৩

জামনগর—বিবরণ ও ভ্রমণ ৫০, ৪৬

জামশেদপুরে : দি রিভারস্ মীট। উমা দেবী ৩৪, ৪২

জামশেদপুরে—রাত একটা। উমা দেবী ৩৪, ৩২

জামাই। নরেন্দ্রনাথ মিত্র ২১, ৫

জামান, এস এস
নেতাজীর আহ্বানে ৩২, ৫১, ৩০ অ ১৯৬৫ : ১২৫৭-১২৫৯, স

জামালউদ্দীন মোল্লা
মায়ের ডাক ৪০, ৩৩, ১৬ জুন ১৯৭৩ : ৬৯০, ক

জামিলা বোরিহেড ২৫, ৩৩

জামুরিয়া আরবিয়া লিবিয়া। নিরঞ্জনপ্রসাদ চৌধুরী ৩৮, ২১

জাম্বিয়া—বিবরণ ও ভ্রমণ ৩২, ১

জায়গা নেই। রত্নেশ্বর হাজরা ৪৬, ৩২

জারনাল '৮১। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৪৯, ২

জারনেল সিং কত বড়ো ফুটবলার ছিলেন। প্রদ্যোৎকুমার দত্ত ৪৪, ৪২

জারনেল সিং, সন্ত ৪৪, ৪২

জারুলের নামে। শান্তি সিংহ ৪৯, ৫১

জারোয়া—আদিবাসী ৩৩, ৩৬

জার্নভ নিকোলাস ৪৫, ৪৭

জার্নাল। সঞ্জয় ভট্টাচার্য শা ১৯৫৭ : ২৪, ৪২ : ২৫, ৪ ; ২৫, ১৪

নখের উপরের উজ্জ্বলতা দিল মোরে রূপ ঝলমল, অন্তর মম খুশি-উচ্ছল সদ্যফোটা শতদল!"
ল্যাকমে নেল কালার। এ হল সবচেয়ে বেশী বিক্রীর নেল কালার —
যার সম্ভারে আছে সবচেয়ে বেশী রকমের রঙ! পার্ল আর মেটালিক
ফিনিশের সবচেয়ে কেতাদুরস্ত হালফ্যাশানের রঙ এনেছে — সবার আগে!
ল্যাক্‌মে-তে যদি আপনার মনের মত রঙ না পান, জানবেন,
আর কোথাও পাবেন না!
রূপ ঝলমল, অন্তর খুশি-উচ্ছল করতে Lakmé

এনেছি এমন একটি রঙিন টিভি – যেমনটি এদেশে এই প্রথম।

অস্কার শিবা ৯৯৯ ডিলুক্স আর-সি টিভিতে কোন চ্যানেল চলছে তা জানতে আপনাকে আর হাতড়ে বেড়াতে হবে না।

এতে আপনি কোন চ্যানেল দেখছেন, তা জানতে আপনাকে হাতড়ে বেড়াতে হবে না। আঙুলের পেলব কোমল ছোঁয়ায়, ছবির উপর ভেসে উঠবে চ্যানেল নম্বর। এমন কি আপনি দুর থেকে আরামে বসে, এর রিমোট কন্ট্রোল থেকেও এই সুবিধে পেতে পারেন।

এই নতুন সংযোজন ছাড়াও এতে আছে ডাবল স্পিকারের অপূর্ব সুরঝঙ্কার। আছে বিশেষ ধরণের এ্যান্টিগ্লেয়ার স্ক্রীন। ১২ প্রোগ্রাম ইলেকট্রনিক অটো-সার্চ মেমোরি টিউনার। অটোমেটিক ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার (১৭০-২৭০ ভোল্ট)। সবার উপরে এটি দেখতে সম্পূর্ণ আধুনিক—নয়ন মনোহর।

এই রঙিন টিভি তৈরীই হয়েছে আপনার আগামী দিনের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা মনে রেখে। যা আপনাকে দেবে বছরের পর বছর নির্ঝঞ্ঝাট আনন্দ। অস্কার শিবা ৯৯৯ ডিলুক্স আরসি-একটি অমূল্য সম্পদ। সৌন্দর্য ও কারিগরীর প্রায় শেষ কথা।

OSCAR

দ্রুত বিকাশশীল টিভি কোম্পানী

STUAD/86

৮ নভেম্বর ১৯৮৬ পাঁচ টাকা

দেশ

শেষের সেদিন

মার্কোয়েজ □ কার্ল সাগান □ জন

দেবতা ও দানব

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

দেশ

[illegible]

প্র ব ন্ধ

স্ম র ণী

বি জ্ঞা ন

আ ন্ত র্জা তি ক

এ ই দে শ এ ই বি শ্ব

ধা রা বা হি ক র চ না

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

গ ল্প

র ঙ্গ কৌ তু ক

র স র চ না

শি ল্প ক লা

ক বি তা

অ ঙ্গ না

খে লা

নি য় মি ত

প্র চ্ছ দ

[illegible]

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ

[illegible]

১৯

কেবল বৈজ্ঞানিক নিরিখে প্রতিধ্বনি তোলে না, পুরাণকথাও মানুষের জীবনে পুনরুক্ত হয়। মহাভারতের যদুবংশ ধ্বংসের কাহিনী আমাদের অজানা নয়। কিন্তু পরস্পর হানাহানি করে তারা নিজেরাই নিশ্চিহ্ন হয়েছিল অন্য কেউ নয়। কিন্তু এবার পৃথিবীজুড়ে যে যাদবকুল যুযুধান হয়ে উঠেছে তাতে কেবল তারাই নয়, এই গ্রহের শেষ উলুখাগড়াটিও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পৃথিবী কেবল নিষ্ক্রিয় হবে না, নিষ্প্রাণ নিরুদ্ভিদও হয়ে যাবে। এই দানবসভ্যতার মারণভাণ্ডারে যে-পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র জমে উঠেছে তা দিয়ে এরকম চারটে পৃথিবী নিকেশ করে দেওয়া যায়। যে

৬১

রাজীবের পশ্চিমবঙ্গ সফর এক অর্থে ঝটিকাসফর, কারণ এরাজ্যের মানুষের মনে তার আলোড়ন উঠেছিল। অন্য অর্থে ঐতিহাসিকও। নির্বাচনের আগে এই বাজদুর্গ অভিযানের কারণও অনুমেয়। এ নিবন্ধ সেই রাজনৈতিক বাণিজ্যের ব্যবচ্ছেদ।

৯৭

দো... উপন্যাসটি ... নিন্দা দুই ... কুড়িয়েছেন। ... মানুষটিকে ... স্পর্শবিন্দুতে ধরবা... পেরেছেন শঙ্কর... ভট্টাচার্য।

৮৮

সোল এশীয় গেমস ছিল কোরীয়দের কাছে ভবিষ্যৎ শক্তিপরীক্ষার খসড়াক্ষেত্র। তারা যে আচমকা সুপার পাওয়ারের সারিতে উঠে আসবে পূর্বাহ্ণে সেটা অনুমান করা যায়নি। বিয়াল্লী সালের শীর্ষচারি জাপানকে টপকে এসেছিল যে ... কোরিয়ার কাছে জোর ধাক্কা খেয়েছে। সর্বাত্মক প্রস্তুতিতে দক্ষ হয়ে উঠছে কোরিয়া আগামী অলিম্পিকের জন্য।

... বঙ্গদেশের ... মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্যের সূত্রপাত, তার তুঙ্গপর্বের রমণীয় নারীলোকের চিত্রল ইতিহাস সুনীলচন্দ্র দেবের কলমে।

প্রকাশিত হল

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের

জীবনের কড়চা

এখন এখানে

দাম : ১২·০০

কোথায় মস্কো, কোথায় সুন্দরবনের হাড়োয়ার মেছোঘেরি, কোথায় মেঘের রাজ্য শিলং, কোথায় চিল্কার কোল-ঘেঁষা লেখক-উপনিবেশ, কোথায় বীরভূমের গ্রামেগঞ্জে ছানিকাটার শিবির, কোথায় গোবরার কবরখানা—যখন যেখানে পৌঁছে গেছেন, তখনই শুনিয়েছেন কিছু-না-কিছু কথা।
তা বলে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই বই প্রচলিত অর্থে ভ্রমণকাহিনী নয়। এই চলাচল সেই ধরনের, যেখানে একজন যতটা সামনে তাকান তার ঢের বেশি তাকান পিছনের দিকে, যেখানে নতুন অভিজ্ঞতার সূত্রে সারা জীবনের অভিজ্ঞতাই ফিরে-ফিরে আসে। আসে বহু মুখ, হরেক টুকরো ঘটনা, নানান ছিন্ন স্মৃতি। তাঁর নিজের কথায় বলতে গেলে এই রচনাবলীর "ধরনটা রম্যরচনার। তাই বলে পুরোটাই বৈঠকী নয়। ঘর আর বাইরেকে মিশিয়ে এক রকমের বহিঃপ্রকৃতি আর অন্তঃপ্রকৃতির টানাপোড়েনে বোনা জীবনের কড়চা।"
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাতে গদ্যও কবিতার মতন—অসাধারণ উজ্জ্বল।ঋজু ও লাবণ্যময়, স্বতন্ত্র ও সপ্রতিভ সেই গদ্যের গুণেও পরম আকর্ষণীয় এই গাঢ়, গূঢ়, রচনাবলী। প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

প্রকাশিত হয়েছে

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের

গত দশ বছরে লেখা
সেরা কবিতার সংগ্রহ

আছি সংযত, প্রস্তুত

দাম ১০·০০

সংযম তাঁর স্বভাবসিদ্ধ, প্রস্তুতিও প্রথমাবধি। পঞ্চাশের প্রধান কবিদের অন্যতম শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের পাঠকমাত্রেই এ-কথা স্বীকার করবেন। জীবনের পর্ববদলের সঙ্গে সমান তালে পা মিলিয়ে তাঁর কবিতাতেও চলেছে নিত্য পালাবদলের পালা।
একদিন যিনি লিখেছেন খুকী-সিরিজের উচ্ছল, সংরক্ত কবিতাবলী, নকশা-সিরিজের অনন্য সমাজভাষ্য, আজ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কলমে দানা বেঁধেছে গূঢ়, অন্তর্মগ্ন ট্রেস-সিরিজের জীবনবীক্ষা। ছন্দে চতুর, মিলে সপ্রতিভ, বক্তব্যে গভীর, বিষয়ে বৈচিত্র্যময় ও স্বভাবে স্বতন্ত্র শরৎকুমারের কবিতায় একইসঙ্গে সার্থকভাবে মিশে থাকে গদ্যশিল্পীর কৌতূহল ও কবির অন্তর্দৃষ্টি। কবিতার উপাদান তাই তিনি খুঁজে পান বহুতল ফ্ল্যাটবাড়ির আলো-অন্ধকারে, খবরপড়ুয়ার নির্বিকার মুখে, এমন-কি জেলখানার মাঠের চত্বরেও।
গত দশ বছরে রচিত তাঁর শ্রেষ্ঠ কিছু কবিতা নিয়ে এই সংকলন। এ-সংগ্রহে রয়েছে তাঁর পুরো ট্রেস-সিরিজ, মহাভারতের কাহিনীভিত্তিক দীর্ঘকবিতা, মনসামঙ্গলের সঙ্গে গ্রীক-পুরাণের পরিণয়-ঘটানো 'বেহুলার প্রতি অর্ফিয়ুস' এবং সাম্প্রতিককালের স্মরণীয় প্রতিটি কবিতা। প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

শীত মানেই রান্না, রান্না মানেই 'আনন্দ'-র বই

পুজোর [illegible] শেষেই বাঙালীর রান্নাঘরে মুখ-বদলের [illegible] যায়। আর সেই [illegible] শীতকালে। উত্তুরে হাওয়ায় [illegible] জল ওঠে [illegible]। শীত মানেই রান্নাবান্না। আর [illegible] আনন্দ পাবলিশার্স-এর [illegible] রান্না-খাওয়ার বিপুল, [illegible] কথা।

সকালে চায়ের টেবিলে, দুপুরের ভূরিভোজে, বিকেলের টুকিটাকি জলখাবারে, রাতের আহারে, অতিথি-আপ্যায়নে, পার্টিতে, পিকনিকে, কুটুম্ববাড়িতে মিষ্টি পাঠানোর ব্যাপারে, এমন-কি নিরামিষ রান্না বা ঘরোয়া রান্নার ব্যাপারেও বিস্তর বাস্তবসম্মত পরামর্শ এইসব বইতে।

বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের মিষ্টান্নপাক
১[illegible]·০০
লীলা মজুমদার
ও কমলা চট্টোপাধ্যায়ের
রান্নার বই ১৫·০০
সাধনা মুখোপাধ্যায়ের চায়ের সঙ্গে টা ১০·০০ রান্না করে দেখুন ৮·০০ জ্যাম জেলি আচার চাটনি ১৫·০০ মুরগি মটন ১২·০০ নিরামিষ রান্না ১০·০০ ঘরোয়া রান্না ১২·৫০ এবং সাধনা মুখোপাধ্যায় অনূদিত কে এম ম্যাথিউ-এর কেরালার আধুনিক রান্না ২৫·০০

প্রকাশিত হচ্ছে

শিবতোষ ঘোষের

প্রথম গল্প-সংকলন

খেলনাপাতি

বিমল কর-এর

অট্টহাসির তথা অট্ট হাসির
গল্প-সংকলন

সরস গল্প

দাম : ২০·০০

হিন্দি ও বাংলা চলচ্চিত্রে, টি ভি-র পর্দায় কিংবা বেতারতরঙ্গে অজস্রবার রূপায়িত হয়েছে এ-যুগের অগ্রগণ্য কথাসাহিত্যিক বিমল কর-এর নানান কাহিনী। এর অনেকগুলিই দম-ফাটানো হাসির। সেই অবিস্মরণীয় গল্পগুচ্ছে রয়েছে 'কালিদাস ও কেমিষ্ট্রি', 'বসন্তবিলাপ', 'বৃদ্ধস্য ভার্যা' কিংবা 'চার তাস'-এর মতো হুল্লোড়ময় কাহিনী। সুপারহিট সেই রসালো গল্প চারটির সঙ্গে আরও চারটি সমগোত্র কৌতুকরঙীন গল্প মিশিয়ে এই অট্টহাসির তথা অট্ট হাসির গল্প-সংকলন। বই তো নয় যেন হাসির বোমা। হো-হো শব্দে ফেটে পড়তে হবে। একবার নয়, বারবার।
ব্যঙ্গ নয়, বিদ্রূপ নয়, শ্লেষ নয়, হঠাৎ সিরিয়স দিকে মোড়-ফেরানো নয়, হাসির গল্প নির্ভেজাল হাসির গল্প হিসেবেই যে কতদূর রঙ্গময় হয়ে উঠতে পারে, এই সংকলন তারই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত।
বিমল কর-এর অন্যান্য বই : বালিকা বধূ ৮·০০ কুশীলব ৬·০০ সান্নিধ্য ১০·০০ মৃত ও জীবিত ৮·০০ অসময় ২০·০০ দংশন ১০·০০ খড়কুটো ১২·০০ মোহ ১০·০০ প্রচ্ছন্ন ১২·০০ এ-আবরণ ৬·০০ স্বপ্নে ১২·০০ নিরস্ত্র ১৫·০০ অশেষ ১২·০০ নিমফুলের গন্ধ ১২·০০ দুই শীতের মাঝখানে ১২·০০ ঘুঘু (নাটক) ৬·০০ পূর্ণ অপূর্ণ ৩০·০০

প্রকাশিত হয়েছে

সমরেশ বসুর

অভিনব উপন্যাস

দশদিন পরে

দাম ১৫·০০

এর কোমরে ছ-ঘরা রিভলবার, ওর হাতে ধারালো ভোজালি।
এর চোখে অবিশ্বাসের বিষ, ওর বুকে প্রতিহিংসার আগুন। একজন ভয়ংকর মাস্তান। অন্যজন মাস্তানদলের পুতুলিবাই। দুজন দুই বিরুদ্ধ দলের। একে অন্যের প্রবল প্রতিপক্ষ। তবু এক বিচিত্র পরিস্থিতিতে একজন অন্যজনকে আশ্রয় দিয়েছে। একসঙ্গে থাকা, একত্রে পানাহার। নিশ্চিত মৃত্যুর সঙ্গে সুনিপুণ লুকোচুরি খেলা। একদিন-দুদিন নয়। দশ দিন। শ্বাসরোধকারী, উৎকণ্ঠাজর্জর দশ-দশটা দিন।
কী ঘটবে দশদিন পরে?
জীবনের প্রতিটি দিক যাঁর কলমের গভীর আঁচড়ে জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে, সমাজের সর্বস্তরে যাঁর চক্ষু শাশ্বত সত্যের সন্ধানে সতত সঞ্চরমাণ, সেই সমরেশ বসুর হাতে অভিনব জীবনবোধদীপ্ত উপন্যাস 'দশদিন পরে'। যাদের মাস্তান বলে আমরা ঘৃণা করি, সমাজবিরোধী বলে এড়িয়ে চলি, তাদের জীবনের কাহিনীও যে কত করুণ এবং সুন্দর, মহৎ এবং মানবিক হয়ে উঠতে পারে, তারই অসামান্য দৃষ্টান্ত 'দশদিন পরে'।
প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য

সম্পাদকীয় প্রসঙ্গ

অকপট সত্যের উল্লেখ করে লেখা আপনার সম্পাদকীয় "বিভেদ বিভ্রান্তি" (১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬) পড়ে অনেক তৃপ্তিলাভ করলাম।

বাঙ্গালী হিসাবে আমার হৃদয়ে পুঞ্জীভূত কিছু দুঃখের কথাও এই সঙ্গে জুড়ে দিতে ইচ্ছে হয়। জানি না কেউ কোনদিন এ দেশের সঠিক ইতিহাস লিখবেন কি না! গত চার দশকে প্রায় সবই এলাহাবাদের আনন্দভবনের দেবদেবীর নিকট কমিটেড। বহু দুর্যোগের মধ্যেও জাতির পিতা ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত জাতিকে আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছিলেন দেশ ভাগ কোনক্রমেই হতে পারবে না—হতে দেওয়া হবে না। আমরা পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা নিশ্চিন্ত হলাম। দেশ ভাগ? সোজা কথা নয়; আমেরিকাকে ভাগ করার দাবী আব্রাহাম লিনকন নস্যাৎ করে দিতে 'গৃহযুদ্ধ' পর্যন্ত মেনে নিলেন। কিন্তু হায়, বিধি হল বাম। প্রধানত নেহরু সাহেবই জাতির পিতাকে কোণঠাসা করে জাতিকে কোন প্রকার প্রস্তুতির সময় না দিয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই দেশকে তিন টুকরো করে দিলেন। সেই যে রক্তপাত আরম্ভ হল, আজও তার শেষ নেই—এখনও তার স্বাভাবিক 'করোলারি' হিসাবে এই মহাদেশের কোন না কোন অংশে রক্তক্ষয় হয়েই চলেছে। দেশকে ভাগ করে যে প্রধান সমস্যার সমাধান করা গেল বলে ঘোষণা করা হল সে সমস্যার সমাধান ত হয়ইনি বরং কয়েক শত গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে সেই সমস্যা। সেই সমস্যার সমাধানের প্রস্তুতির ইঙ্গিত হিসেবে দিল্লীতে প্রতি ১৫ই আগস্ট ও ২৬শে জানুয়ারী তারিখে নিরক্ষর দেশবাসীকে আফিংয়ের বড়ি গিলানোর মতন কুচকাওয়াজ দেখানর ঘটা। সবই কিন্তু ভোজবাজী।

আজ দেশের রাজনীতিতে উত্তরপ্রদেশ তথা হিন্দী ভাষীদের 'দাপট' দেখে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে 'দেশভাগ' একটা নিছক ষড়যন্ত্রের ফল। বস্তুত ভারতের জন্য বহু অশুভ ঘটনার সূত্রপাত উত্তর প্রদেশের মাটীতেই হয়। মুসলমানদের কংগ্রেস ত্যাগ, মুসলিম লীগ গঠন, পাকিস্তানের জন্ম ইত্যাদি সবই এখানে ঘটে। স্যার মহম্মদ ইকবালের মতন এক বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নাগরিক কংগ্রেস ছেড়ে দিলেন—দিলেন পাকিস্তানের জন্ম। (মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আজকাল দিল্লী তাঁরই লেখা গান "সারে জাহাঁ..." নিয়ে খুব মাতামাতি করে চলেছে—এবং উত্তর প্রদেশের কোন কোন নেতা ইতিমধ্যেই প্রকাশ করে ফেলেছেন যে "জনগণ মন..."-র পরিবর্তে ঐটি হওয়া উচিত দেশের জাতীয় সঙ্গীত; ঐ গানের জন্ম উত্তর প্রদেশে এবং উত্তরপ্রদেশই হল আসল ভারত; তাছাড়া "জনগণ মনতে" উত্তর প্রদেশের কোন উল্লেখ নেই। ভাবুক বাঙ্গালী জাতি! আর একটা আঘাতের জন্য প্রস্তুত হন আপনারা!) 'দেশ ভাগ' করা না হলে কি 'চালাকির' সাহায্যে হিন্দিকে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেওয়া সম্ভব হত? নানা অছিলায় প্রত্যেক প্রান্তীয় এবং অহিন্দিভাষী রাজ্যগুলিকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেওয়া এবং পক্ষান্তরে হিন্দি ভাষী প্রদেশগুলিকে অযৌক্তিকভাবে গোটা রেখে দেওয়া সম্ভব হত না।

দেশত্যাগের ষড়যন্ত্র যদিও পূর্বাহ্নে শরৎচন্দ্র বসু ও সুরাবর্দী প্রমুখ কয়েকজন চিন্তাশীল বাঙ্গালীর নিকট ধরা পড়েছিল কিন্তু অধিকাংশ বঙ্গসন্তান তখন নেহরুর বক্তৃতায় মোহাচ্ছন্ন ছিলেন—নেহরুর প্রতি অগাধ বিশ্বাস পোষণ করতেন। অথচ দেখা যায় বাংলার প্রতি উত্তর প্রদেশের একটা প্রচ্ছন্ন দুরভিসন্ধি স্বাধীনতার পূর্বকালেও ছিল। কিন্তু নিজের ভাইকে ছেড়ে অপরকে নিয়ে মাতামাতি করা বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্র। আজ হয়ত সন্দেহের আর কোন অবকাশই নেই—পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মানচিত্র হতে লুপ্ত হতে চলেছে। নেহরু সাহেব কাজটা আরম্ভ করে দিয়ে গেছেন—তাঁর বংশধরেরা সে কাজ ত্বরান্বিত করে চলেছেন।

একবার অতুল্যবাবুকে প্রশ্ন করেছিলাম বঙ্গসন্তান এত ত্যাগ স্বীকার করল তবু পঃবঙ্গের ভাগ্যে কিছুই জুটল না? প্রাদেশিক সীমানা পুনর্বিন্যাসের মতন এত বড় প্রহসন করার কি প্রয়োজন ছিল? উত্তরে তিনি বললেন, "কেন? বিহারের পুরুলিয়া জেলা ত পঃবঙ্গকে দেওয়া হয়েছে।" পাল্টা প্রশ্ন, মানভূম, সিংভূম, ধলভূম, কাছাড়, গোয়ালপাড়া ইত্যাদি কেন দেওয়া হবে না? কুষ্ঠ রোগের ডিপো বলেই কি পুরুলিয়া পেলাম? বলা বাহুল্য এর কোন সদুত্তর নেই। রাজস্থানের মরুভূমি যদি পাশাপাশি হত তবে আদর করে তাও পশ্চিমবঙ্গকেই দেওয়া হত। এবার বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর প্রশাসন কৌশল সম্বন্ধে দুচারটা কথা বলা যাক। অতি সম্প্রতিকালে তিনি এই রাজ্য পরিদর্শন করে ভাল মন্দ বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য অনেক কথাই বলে গেলেন।' অনভিজ্ঞ বামফ্রন্ট সরকারের কথা না হয় বাদ দেওয়া যায়; কিন্তু অভিজ্ঞ কং সরকার পঃবঙ্গকে কোন স্বর্গধামে রেখে গিয়েছিলেন? বিধানবাবু? বিধানবাবু ত বিধানবাবুই—তাঁকে দলে টেনে গৌরব করা অর্থহীন। 'গোর্খাস্থান' নিয়ে প্রধানমন্ত্রী যে সব কথা বলে নিজের দলীয় প্রাদেশিক নেতাদের বিভ্রান্ত করে দিয়ে গেলেন তার উৎস কোথায়? সে সব তথ্য নিশ্চয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ থেকেই পাওয়া। অবস্থার বিপাকে একটা কথা ধরে নিতে বাধ্য হই যে এই 'বিভাগ' ভারতের নানা অংশে, বিশেষ করে প্রান্তিক অঞ্চলে, মুখ্যত হিন্দী ভাষীদের প্রতি কোন প্রকার আশঙ্কামূলক আচরণ হচ্ছে কি না তাই লক্ষ করে থাকেন। বাঙ্গালীদের উপর যতই অত্যাচার (যেমন আসামে ২-২½ বছর আগে হল) হোক সে সম্বন্ধে ঐ বিভাগ কোন যথার্থ রিপোর্ট আদৌ লেখেন কি না সন্দেহ। মোদ্দা কথা যতক্ষণ পর্যন্ত হিন্দিভাষীদের গায়ে আঘাত না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন আন্দোলনই জাতীয়তা বিরোধী বলে দিল্লী সরকার মনে করতে পারেন না।

প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত
কলকাতা-৬৪

রবীন্দ্রোৎসবে রবীন্দ্রভাবনা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত 'রবীন্দ্রোৎসবে রবীন্দ্রভাবনা' শীর্ষক প্রবন্ধ নিয়ে এক চিঠিতে (দেশ, ২৮ জুন) শ্রীশোভেন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—(১) 'কবির বিখ্যাত গ্রন্থ শান্তিনিকেতন যেখানে তিনি উপনিষদের এক বিস্ময়কর ও অত্যুজ্জ্বল ভাষ্য করেছেন', এবং (২) 'এই শান্তিনিকেতন গ্রন্থেই যে দুখানা উপনিষদের বিশেষভাবে ভাষ্য করেছেন তাহল: (১) ঈশোপনিষৎ আর (২) বৃহদারণ্যক উপনিষৎ'।

প্রথমত এই দুটি মন্তব্যেই রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের 'ভাষ্য' করেছেন একথা দিয়ে শোভেনবাবু বলতে চান যে, রামমোহন যে অর্থে ঈশ, কেন, কঠ, মুন্ডক, মাণ্ডূক্য—এই পাঁচটি উপনিষদের প্রতিটি মন্ত্র ধরে ধরে ব্যাখ্যা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও কোন কোন উপনিষদ সম্পূর্ণভাবে (যেমন শোভেনবাবু উল্লেখিত ঈশ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ) প্রতিটি মন্ত্রের ব্যাখ্যা তাঁর শান্তিনিকেতন গ্রন্থে করেছেন, তাহলে মন্তব্যটি যথাযথ বলে মেনে নেওয়া যাবে না, কারণ রবীন্দ্রনাথ প্রধান উপনিষদগুলোর সব কটা থেকেই বিশেষ বিশেষ মন্ত্র বার বার উদ্ধৃত করে তাঁর শান্তিনিকেতন গ্রন্থে (বা 'ধর্ম' নামক গ্রন্থে) ব্যাখ্যা করেছেন ঠিকই, কিন্তু কোন গোটা উপনিষদই প্রথম মন্ত্র থেকে শেষ মন্ত্র পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ভাষ্য বা ব্যাখ্যা তিনি করেননি, করাটা শান্তিনিকেতন গ্রন্থটির দিক থেকে দরকার বা সম্ভবও ছিল না।

দ্বিতীয়ত, শোভেনবাবু যে বলেছেন শান্তিনিকেতন গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে ঈশোপনিষৎ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্য করেছেন সে মন্তব্যটিও তথ্যভিত্তিক নয় বলেই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন গ্রন্থে ঈশ ও বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ছাড়াও কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, ছান্দোগ্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় এবং শ্বেতাশ্বতর কৌষিতকী—এই সমস্ত উপনিষদগুলো থেকেই অল্পবিস্তর বিশেষ বিশেষ মন্ত্র উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা করেছেন এবং উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যার পৌনঃপুন্যের দিক থেকে সব থেকে বেশী উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঈশ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের নয়, তৈত্তিরীয় ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের। উপনিষদের যে দুটি মন্ত্র প্রথমেই আমাদের মনে আসে তাদের একটি তৈত্তিরীয় উপনিষদের, অন্যটি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের এই বাণীগুলো আমরা আবৃত্তিতে, সঙ্গীতে, আকাশবাণী বা দূরদর্শন থেকে কোন ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মধ্যে এতবার শুনেছি এবং নিজের

করে নিয়েছি যে এ বাণীতে যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের দুটি বিভিন্ন অধ্যায়ের দুটি বিভিন্ন বাণীর দুটি বিভিন্ন অংশকে এক করে এক নতুন বাণী গড়ে তোলা হয়েছে যেটা ঐ উপনিষদের কোন এক জায়গায় খুঁজে পাওয়া যাবে না সে তথ্য আমাদের একরূপ অজ্ঞাত।
সে যাই হোক, তৈত্তিরীয় ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের অন্য অনেক বাণীর সঙ্গে দুটি বাণীর উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যার পৌনঃপুন্য থেকেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন গ্রন্থে ঈশ ও বৃহদারণ্যক নয়, তৈত্তিরীয় এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বাণীর ব্যাখ্যাই বিশেষভাবে করেছেন।

কল্যাণকুমার দত্ত
কল্যাণী, নদীয়া

গ্রন্থলোক

২ আগস্ট, ১৯৮৬ তারিখের 'দেশ' পত্রিকার 'গ্রন্থলোক' বিভাগে গৌতম নিয়োগী লেভ তলস্তয়ের দুটি গ্রন্থের বিনয়কৃষ্ণ সেন-কৃত অনুবাদ 'বিপ্লবের আহুতি' সম্পর্কে যে একটি ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন সেদিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

চিরায়ত প্রকাশন কর্তৃক এ গ্রন্থের নতুন সংস্করণের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে এই অনুবাদ গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশের পর তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার বইখানি বিক্রয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ফলে এই বাজেয়াপ্ত বইটির কোনো কপি আমাদের দেশে ছিলো না। তিনি আরও জানিয়েছেন, বাংলা নিষিদ্ধ গ্রন্থের গবেষক শিশির করের "চেষ্টায় এবং অনুসন্ধিৎসায় লন্ডনের ইন্ডিয়া আপিস থেকে 'বিপ্লবের আহুতি' বইটির সন্ধান পাওয়া যায়।" সেখান থেকে প্রতিলিপি আনিয়ে টলস্টয়ের ওই বিখ্যাত গল্প দুটি বর্তমান সংস্করণে প্রকাশিত হওয়ায় শিশিরবাবু এবং প্রকাশকের প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য বিবেচনা করেছেন গৌতমবাবু।
এ বিষয়ে বক্তব্য, এই বিখ্যাত বাজেয়াপ্ত বইটির কোনো কপি আমাদের দেশে ছিলো না, গৌতমবাবু পরিবেশিত এ খবর মোটেই ঠিক নয়। গবেষক শিশির কর মশাই একটু কষ্ট স্বীকার করলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বইখানির সন্ধান পেতে পারতেন (আমার টলস্টয়-চর্চায় উক্ত গ্রন্থাগারে বইখানি আমি নিজেই ব্যবহার করেছি)। তার জন্য অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তাঁকে লন্ডনের ইন্ডিয়া আপিস লাইব্রেরী থেকে বইখানির প্রতিলিপি আনাতে হতো না। আসলে বিদেশ থেকে বাংলা বই সংগ্রহ করে কাজ করলে গবেষণার কদর বাড়ে বলে আমাদের গবেষকদের ধারণা। এজন্য আমাদের দেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত গ্রন্থাগারগুলিতে ভালোভাবে অনুসন্ধান না করে দুষ্প্রাপ্য বইয়ের জন্য তাঁরা বিদেশের গ্রন্থাগারগুলির সাহায্য নিতে প্রলুব্ধ হন।

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ
কল্যাণী

সহবাস সম্মতি বিল প্রসঙ্গে

২ আগস্ট '৮৬ সংখ্যায় 'দেশ'-এর চিঠিপত্র বিভাগে প্রদীপ সাহার একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে দেখলাম 'সহবাস সম্মতি বিল (১৮৯১) : সেদিনের সামাজিক আন্দোলন' প্রবন্ধটির (প্রকাশ : ৩১ মে '৮৬) উপর। তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ বিলের সপক্ষে ছিলেন না বিপক্ষে ছিলেন? বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিলের সপক্ষে ছিলেন জানিয়ে প্রদীপবাবু তাঁর মতের অনুকূলে রাধারমণ মিত্রের 'কলিকাতায় বিদ্যাসাগর' বইটির থেকে কিছু উদ্ধৃতিও দিয়েছেন এবং বলেছেন গ্রন্থটি 'খুব নির্ভরযোগ্য, স্বীকৃত, প্রতিষ্ঠিত...'। এ বিষয়ে আমি প্রদীপবাবুর সঙ্গে একমত নই। কারণ 'কলিকাতায় বিদ্যাসাগর' বইটির কোথাও কোনো উপযুক্ত রেফারেন্স নেই যা থেকে ঐ বইয়ের যাবতীয় তথ্য নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। তাছাড়া তিনি এক জায়গায় লিখেছেন 'দি রিফর্মার' পত্রিকার ১৮৩৮ সনের ২৫শে নভেম্বর সংখ্যায় হিন্দু বিধবাগণের পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধে নাকি সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্র মন্থন করিয়া হিন্দু বিধবার...ইত্যাদি। তার কয়েক পঙক্তি পরেই তিনি লিখছেন, 'আমার নিজের...'দি রিফর্মার' পত্রিকার সংখ্যা দেখিবার সুযোগ হয় নাই।' পত্রিকাই যদি রাধারমণবাবু না দেখে থাকেন তাহলে 'নাকি'র উপর নির্ভর করে কোনো মত প্রকাশ করেন কি করে? আর প্রদীপবাবুই বা কি ভাবে এই বইটিকে 'খুব নির্ভরযোগ্য, স্বীকৃত' বলছেন? এমনতর উক্তি এই বইয়ে তো আরও আছে।
এবার মূল রচনাটির প্রসঙ্গে আসি। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখাটি আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছে, ফলে আমি নিজেই শুধু পড়িনি, অনেককে পড়িয়েও শুনিয়েছি। আমার যতদূর মনে পড়ছে, বিশ্বনাথবাবুও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই প্রতিকূল মত সহজেই স্বীকার করে নেননি। তিনি বিস্মিত হয়েছেন বিদ্যাসাগরের বিলের প্রতিকূলে মত দেবার জন্য। প্রদীপবাবু যদি চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থটি দেখেন তাহলে তার ৩৪৪-৩৪৫ পৃষ্ঠার ফুটনোটে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূল চিঠিটির অংশ ছাপা আছে। 'Though on this grounds I can not support the

Bill…ইত্যাদি। তাহলে কোন্ গ্রাউন্ডে তিনি বিলটিকে সাপোর্ট করছেন? যদি ১২ বৎসর বয়সে বিবাহ ব্যাপারটি বিদ্যাসাগর 'সাপোর্ট' করতে গররাজি হন তবে ১৫ বছর করলে কি সামাজিক আন্দোলন তিনি এড়াতে পারতেন? অর্থাৎ ব্যাপারটা স্ববিরোধী। এ বিষয়ে প্রদীপবাবু বিনয় ঘোষের 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালীসমাজ'-এর ৩য় খণ্ডের ৪০৩-৪০৫ পৃষ্ঠা দেখলে বুঝতে পারবেন : 'শেষজীবনে সহবাস-সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে তিনি যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন, তার মধ্যেও এই স্ববিরোধের আভাষ পাওয়া যায়।…যিনি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক এবং বহুবিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন, তিনি কেন 'বাল্যবিবাহপ্রথা' আইনের দ্বারা নির্মূল করতে চাইলেন না? একি তাঁর বার্ধক্যের দুর্বলতা ও মানসিক দ্বন্দ্ব?' একটা কথা ভুললে চলবে না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই মত নিয়ে অনেক গবেষকই বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু বিশ্বনাথবাবুর রচনাটি প্রধানত ছিল সমসাময়িক পত্রিকাভিত্তিক। এ বিষয়ে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের মতামত জানলে উপকৃত হব।

জীবন দাশগুপ্ত

কলকাতা-৯

গ্রুপ থিয়েটারে গ্রুপ

৯ আগস্ট ১৯৮৬ সংখ্যা 'দেশ'-এ 'গ্রুপ থিয়েটারে গ্রুপ' শীর্ষক বিভাস চক্রবর্তীর আলোচনা পড়লাম। বর্তমান নাট্য সমীক্ষায় এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি সম্পর্কে আলোচনা তোলায় তাঁকে ধন্যবাদ। লেখক জানতে চেয়েছেন, 'আমাদের বাংলা থিয়েটারে কে কবে কখন কোথায় এই 'গ্রুপ' থিয়েটার নামটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন…'। 'গ্রুপ থিয়েটার' কথাটা

সর্বপ্রথম কে কবে কখন কোথায় ব্যবহার করেন জোর দিয়ে বলা যাবে না এই কারণেই যে সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই বিতর্কিত। কেন না গ্রুপ থিয়েটারের পত্তন বলা চলে গণনাট্য সংঘ ভেঙে যাওয়ার পর থেকেই। কিন্তু তখনও গ্রুপ থিয়েটার কথাটি গুরুত্ব পায়নি। বরং বিভিন্ন আদর্শই সেখানে পেয়েছে গুরুত্ব। এই জন্যই পরবর্তী নাট্য আন্দোলনগুলির নাম হয়েছে সৎ, নব, ঠিক অন্য ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে গ্রুপ থিয়েটার কথাটির বহুল প্রচার শুরু হয় সত্তর দশক থেকেই। কথাটি আমাদের নাট্যালোচনায় সম্ভবত প্রথম শোনা যায় ১৩৭৯ সনে (১৯৭২) জ্যোতির্ময় বসুরায়ের উল্লেখে। 'বাংলা নাটকের প্রগতি ও প্রকৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে (শারদীয়া দেশ/১৩৭৯) তিনি লিখেছেন, '…বর্তমানে গ্রুপ থিয়েটার বা গোষ্ঠী অভিনয়ের প্রসার এবং জনপ্রিয়তা নাট্যালোকের একটি উল্লেখযোগ্য বস্তু… সাধারণভাবে অবশ্য গ্রুপ থিয়েটার নাট্য ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থে সেই সমাজ সচেতনতা আর প্রগতির উপর জোর দেওয়ার কাজটা ঠিকই চলছে, মনে হয় ক্ষেত্রটি যেন বামপন্থী দলগুলির সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট।"

কথাটি তখনও যত্রতত্র ব্যবহৃত না হলেও ১৩৮১-র ১১ পৌষ 'অমৃত' পত্রিকায় 'বহুরূপী কথা' শীর্ষক আলোচনায় চিত্তরঞ্জন ঘোষ লেখেন, 'এই সময় গ্রুপ থিয়েটারের পত্তন করে বহুরূপী বাংলা থিয়েটারের সামনে নতুন এক পথ দেখায়, আজ পর্যন্ত বাংলা থিয়েটারের মূল শিল্পসমৃদ্ধ ধারা এটাই। ক্রমে অনেক নতুন দল হয়েছে। গণনাট্য সংঘও গ্রুপ থিয়েটারকে এক রকমভাবে মেনে নিয়েছে। তার বিভিন্ন শাখার স্বাতন্ত্র্য কিছুটা মেনে নিয়ে সে

অনেকটা ফেডারেশনের চেহারা নিয়েছে।' ধরতে গেলে তারপর থেকে কথাটি সর্বজনীন অখণ্ড genre পর্যায়ে উন্নীত হতে চলছিল। বহু নাট্যবোদ্ধাই তাঁদের আলোচনার মধ্যে দিয়ে গ্রুপ থিয়েটারের কথাটাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। যেমন রাধামোহন ভট্টাচার্য লিখেছিলেন, '১লা মে ১৯৭৬ বহুরূপীর আটাশ বছর পূর্ণ হবে। অতীব আনন্দের কথা। এদেশে তো নয়ই, বিদেশেও কোথাও একটি গ্রুপ থিয়েটার একাদিক্রমে আটাশ বছর বেঁচে থাকলেন...' (বাংলা থিয়েটার ৩০ বছর/ আনন্দবাজার পত্রিকা বার্ষিক সংখ্যা ১৩৮২।
সেই সময় জ্যোতির্ময় বসুরায় তো স্পষ্টই লিখেছেন, তাঁর 'কলকাতার নাট্য প্রবাহ' শীর্ষক প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন, 'কলকাতার নাট্য প্রবাহের প্রধান ধারা তিনটি। পাবলিক থিয়েটার বা সাধারণ রঙ্গালয়, অফিস ক্লাব এবং গ্রুপ থিয়েটার...' (আনন্দলোক পূজা বার্ষিকী ১৩৮২)।
আমার এত কথা লেখার উদ্দেশ্য একটাই, এই যে সূচনা থেকেই গ্রুপ থিয়েটারের একটা নিজস্ব আদর্শ ছিল। নাট্যক্ষেত্রে একটা 'প্রোগ্রেসিভ' বা 'প্রগতিমূলক' কার্যকলাপ প্রদর্শন তো বটেই, আর ছিল গোষ্ঠীবদ্ধ অভিনয়ের মাধ্যমে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। গণ, সৎ, নব, অন্য, ঠিক ইত্যাদির মত 'গ্রুপ থিয়েটার' কথাটিরও একটি 'ল্যান্ডমার্ক' চিহ্নিত হত তখনই, যদি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠী পরস্পর একই সুখদুঃখের শরিক হত। কেননা শব্দদুটি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত নাট্যামোদীদের কাছে যেন ইথারের কম্পনের কাজ করেছিল। কিন্তু তা স্থায়ী হল না। অচিরেই 'গ্রুপ থিয়েটারে গ্রুপ' এসে গেল, মানে আনা হলো। এও সেই 'রেজিমেন্টেশনে'র বলি। গ্রুপ থিয়েটারে গ্রুপের আভাস অনেকেই পেয়েছিলেন কিংবা আভাসকে স্পষ্ট করার জন্য হয়তো সচেষ্টও হয়েছিলেন কেউ কেউ। ১৩৮৩-তে নাট্যবোদ্ধা প্রবোধবন্ধু অধিকারী তাঁর 'গোত্র নাট্য' লক্ষ প্রতিষ্ঠা" শীর্ষক প্রবন্ধে গ্রুপ থিয়েটার কথাটি দ্বিধায় পড়ে সযত্নে পরিহার করেন। তিনি 'অন্য থিয়েটার'পন্থী বেশ কয়েকটি নাট্য দলকে পরিষ্কার ভাষায় 'প্রোফেশনাল ড্রামা গ্রুপ' বলে উল্লেখ করেন। (পূজাবার্ষিকী আনন্দলোক/ ১৩৮৩)। এর পরেও প্রায় ১৯৭৭-এ রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত 'বাংলা থিয়েটার ও সরকারী দায়িত্ব' প্রবন্ধের সর্বত্র নিজেদের দল প্রসঙ্গে 'অন্য থিয়েটার' কথাটাই উল্লেখ করেছেন। (দেশ। ৩০ জুলাই/ ১৯৭৭)।
১৯৭৫-এর পর থেকে বাংলা নাট্য আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নিয়ে বহু আলোচনাই হয়েছে এবং বেশির ভাগ আলোচনাতেই 'গ্রুপ থিয়েটার' ও 'থিয়েটার গ্রুপ' কথাদুটি অদলবদল করে ব্যবহৃত হতে দেখা গিয়েছে।
আমার ধারণা এই যে, শুরুতে গ্রুপ থিয়েটার কথাটা যে অর্থ বহন করতো, বর্তমানে তা একেবারেই করে না। বর্তমানে এর গূঢ় অর্থের ব্যাপ্তি ও প্রসারতা কমে এসে একটি বিশেষ 'ইজম'-এ পরিণত হয়েছে। অনেক 'ইজমের মত "গ্রুপ থিয়েটারিজম" (গ্রুপ থিয়েটার + ইজম) বলতে এক শ্রেণীর নাট্যমনস্কতা বোঝায়, যাঁরা নাটকের শুরুতে জানায় সংগ্রামী অভিনন্দন (যার অর্থ বোঝা শক্ত) শেষেও তাই।

ছন্দা দে
হিন্দুস্থান কেবলস্

বিনা রক্তপাতে

প্রবীণ সি পি আই নেতা, প্রাচীন পার্লামেন্টারীয়ান, প্রবল পণ্ডিত অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনবদ্য রচনা 'পার্লামেন্ট : আগেরকার স্মৃতি আর আজকের দুর্ভাবনা' (দেশ/ ১৬ আগস্ট, ৮৬) পড়ে মুগ্ধ হলাম। অবশ্য হীরেন মুখোপাধ্যায় মুগ্ধ করবেন একথা বলাই বাহুল্য। মোটামুটি সহজ ভঙ্গীতে এবং আপন অভিজ্ঞতার আলোয় তিনি ভারতীয় সংসদের বিবর্তনের আনুপূর্বিক ছবি এঁকেছেন।
সমকালীন রাজনীতিতে সংসদকে অগ্রাহ্য করার বিপজ্জনক প্রবণতার ভয়াবহ ফলাফল সম্পর্কেও তিনি পাঠকদের অবহিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এবং প্রবন্ধের উপসংহারে শাসক দলের সর্বোচ্চ নেতা সম্পর্কে তাঁর হাল্কা চালের মন্তব্যটি গভীর অর্থবহ।
কিন্তু এমন চমৎকার নিবন্ধে শ্রদ্ধেয় হীরেনবাবু বিপত্তি ঘটিয়েছেন বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ এনে। তিনি লিখছেন
'চিকিৎসার উন্নতির ফলে বিনা রক্তপাতে শিশুজন্ম যখন সম্ভব তখন জগৎ জুড়ে সমাজবাদের প্রসারে আর জনজাগৃতির বিস্তার ফলে রক্তক্ষয়ী বিপ্লব বিনা অন্যপথে প্রকৃত প্রগতি সম্ভব কিনা এর জবাব দেবে ইতিহাস।'
শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের কাছে আমার সবিনয় প্রশ্ন, বিনা রক্তপাতে শিশুজন্ম কখন সম্ভব হল ? কোথায় ?
একথা ঠিক যে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে শিশুজন্ম আজ আর কোনও বিভীষিকা নয়, প্রসূতি ও নবজাতকের বিপদ এখন ন্যূনতম, প্রায় নেই বললেই চলে। এই বিভীষিকাই ত একদিন জন্ম দিয়েছিল সাধভক্ষণের মতো সামাজিক আচারের।
বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে বন্ধ্যানারীও আজ সন্তান লাভ করতে পারে (টেস্টটিউব বেবী), কৌমার্য অক্ষুণ্ণ রেখে কুমারী সন্তান ধারণ করতে পারে আপন সতীত্ব অটুট রেখে পাশ্চাত্যে যাকে বলে সারোগেট মাদার) কিন্তু শিশু জন্মে রক্তপাত অনিবার্য।
এবং একথা শ্রদ্ধেয় হীরেনবাবু সম্ভবত যে কোনও ভারতসন্তানের থেকে ভাল জানেন যে, অদ্যাবধি কোথায়ও রক্তক্ষয়ী বিপ্লব ছাড়া প্রকৃত প্রগতি অর্থাৎ সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেনি। সেই ষাটের দশকের গোড়ায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ'-এ লিখেছিলেন 'বিনা গৃহযুদ্ধে/ এ মাটিতে/ সমাজতন্ত্র দখল নেবে।/ হয়ত একটু বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে/ কিন্তু যখন হবে/ তখন খাতা খুলে দেখে নিও/ অক্ষরে অক্ষরে সব মিলে

যাচ্ছে।'

২৩ বছর পর একই কথা বলছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক। ব্যথিত হৃদয়ে খাতা খুলে দেখছি, ক্রুশ্চভের একটি কথাও মেলেনি। বিনা গৃহযুদ্ধে কোথায়ও সমাজতন্ত্র দখল নেয়নি।

পাঁচু রায়
কলকাতা-৭০০ ০০৬

'মানুষটিকে শিল্পী করে দাও'

৩০ আগস্ট সংখ্যার দেশ পত্রিকায় ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মার সাক্ষাৎকারটি ভালো লাগল। উক্ত রচনার এক জায়গায় (২২ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের শেষ দিকে) ইন্ডিয়া হাউসে নির্বাচিত চার শিল্পীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে একটি নাম 'রণদাস উকিল' ছাপা হয়েছে। ওটি হবে রণদা উকিল। রণদা ছিলেন আমাদের পিতামহ সারদা উকিলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

সত্যশ্রী উকিল
শিপ্রা উকিল
দিল্লী-১১০ ০০৭

২

৩০ আগস্টের দেশ-এ "মানুষটিকে শিল্পী করে দাও" শীর্ষক সাক্ষাৎকারটি অসাধারণ। শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ-র হয়ত মনে নেই, অথবা আত্মপ্রচারবিমুখতার দরুন তিনি তাঁর জীবনের এমন এক ঘটনা যা ১৯৩০-৩১-এ দেশে আলোড়ন তুলেছিল—সাক্ষাৎগ্রহণকারী আরেক শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেননি। ব্যাপারটা বলছি। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ তখন সুধাংশু রায়চৌধুরী, রণদা উকিল, ললিত সেন এবং অতুল বসুর সঙ্গে নবনির্মিত ইন্ডিয়া হাউসের দেওয়ালচিত্র আঁকার অজুরা নিয়ে লন্ডনে আছেন। ছবি আঁকা সমাপ্ত। একদিন সবাইকে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বাকিংহ্যাম প্যালেসে আমন্ত্রণ করলেন। শিল্পীরা আমন্ত্রণ পেয়ে ভাবতে বসলেন—তাই তো রাজারাজড়াদের ব্যাপার, তাও আবার বাকিংহ্যাম প্যালেসে। কি পোশাক পরে যাওয়া যায়? সবাই যখন এ ব্যাপারে বিশেষ ভাবিত তখন নাকি ধীরেন্দ্রকৃষ্ণই বলেন—"কেন পোশাকের ব্যাপারে এত ভাবনার কি আছে; আমরা সবাই বাঙ্গালীর জাতীয় পোশাক ধুতি পাঞ্জাবি পরেই যাব"। এর পরের পর্ব নাটকীয়। বাকিংহ্যাম প্যালেসে নির্দিষ্ট দিনে ধুতি পাঞ্জাবি পরা পাঁচ শিল্পীকে দেখে অন্যান্য নিমন্ত্রিতরা সচকিত হলেও সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী নাকি মুগ্ধ হয়েছিলেন। দৈনিক পত্রের প্রতিনিধির তোলা ফটো নাকি লন্ডনের প্রধান দৈনিকে পরদিন বেরিয়েওছিল। আজকের দিনে এমন ভাবনার গরিমা আছে না কি! পরিশেষে ছোট্ট একটা কথা। রামানন্দবাবু লিখেছেন রণদাস উকিল। শিল্পীর নামটা কি রণদাপ্রসাদ উকিল নয়? অন্তত আমরা তো দিল্লীতে রণদাপ্রসাদ সংক্ষেপে রণদা উকিল বলেই এতদিন জেনে আসছিলাম।

দ্বিজেন্দ্রলাল বণিক
তেজপুর, আসাম

মডেল স্কুল

৩০ আগস্ট সংখ্যক 'দেশ' পত্রিকায় আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'মডেল স্কুল...' পড়ে যুগপৎ হতাশ ও বিস্মিত হলাম। আপাত দৃষ্টিতে একটি বিশ্লেষণধর্মী রচনা বলে মনে হলেও এটি একটি একদেশদর্শী নিবন্ধেই পর্যবসিত হয়েছে। দুয়েকটি বিষয়ে দ্বিমত না থাকলেও মূল প্রশ্নগুলি সুকৌশলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন। অনেকাংশে ধান ভানতে শিবের গীত শুনিয়েছেন। সীমিত পরিসরে দু-একটি উল্লেখ করতে চাই। মূল দলিল "চ্যালেঞ্জ অব এডুকেশন—এ পলিসি পার্সপেক্টিভে" খুব স্পষ্ট করেই উল্লেখ আছে যেহেতু সার্বজনীন শিক্ষার ব্যয় দুর্বহ হয়ে যাচ্ছে সে কারণেই শুধুমাত্র উচ্চ মেধাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীগণকে উৎকৃষ্ট শিক্ষা দেওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্যেই এই পরিকল্পনা। ব্যাপক অংশের ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে নন-ফর্মাল এডুকেশন (রেডিও, টিভি, গ্রন্থাগার)-এর মাধ্যমে ব্যাপক ব্যবস্থা করার অঙ্গীকার। সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিতে বাধ্যতামূলক সার্বজনীন শিক্ষার যে প্রতিশ্রুতি ১০ বৎসর থেকে ৩৬ বৎসরেও পালিত হয়নি—সেই নীতি চিরতরে বিসর্জন দেবার যে অসাধু উদ্দেশ্য স্পষ্ট উচ্চারিত হয়েছে সেটা শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় আদৌ উল্লেখ করলেন না।

দ্বিতীয়ত কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষা ব্যয়বরাদ্দ আনুপাতিক বৃদ্ধির কোনও নীতি গৃহীত না হওয়া সত্ত্বেও নবোদয় বিদ্যালয়গুলির জন্য অর্থ বরাদ্দ হলেও সাধারণ স্কুলে ব্ল্যাকবোর্ড, চকখড়ি'র ব্যয় সমান প্রাধান্য পাবার আশা করাটা কি ভাবের ঘরে চুরি করা হয়ে যাচ্ছে না? কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন মডেল স্কুলের মাধ্যমে গোটা এলাকাতেই গতি সঞ্চারিত হবে। যেহেতু পদ্ধতি প্রকরণ বলেননি সেজন্য নাকি ব্যাপারটা ভাল বোঝা যাচ্ছে না। একটু বাস্তব দৃষ্টিতে বিষয়টি অনুধাবন করা যাক। অন্যপ্রদেশের তথ্য হাতে না থাকায়, পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাতত্ত্বে বিষয়টা দেখলে এইরকম দাঁড়ায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় উনচল্লিশ হাজার গ্রামের জন্য ১৬টি জেলায় ১৬টি মডেল স্কুল হবে। প্রতি বৎসর ৮০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারবে যার তিন চতুর্থাংশ গ্রামের ছেলেমেয়ে অর্থাৎ জেলাপিছু ৬০ জন ছাত্রছাত্রী আসবে গড়ে ২৪০০ গ্রাম থেকে। চল্লিশটি গ্রামপিছু একজন

ছাত্র/ছাত্রী এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সুযোগ পাবে, যার মধ্য দিয়েই নাকি গোটা এলাকায় গতি সঞ্চারিত হবে। হুগলী জেলায় রামমোহন, মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর জন্মের দেড়-দুশো বছর পরেও জেলা দুটিতে যা হয়নি। তথাপি যদি ধরে নেওয়া যায় জেলা পিছু ২/৪ জন Excellence এ হচ্ছে না গ্রামপিছু ২-৪ জন দরকার তাহলে তো সেই গতি আসতে লাগবে আগামী দুটো শতাব্দী। এই গতিময়তাই কী আমাদের জাতীয় উন্নয়নের জন্য একান্ত অপরিহার্য ? বারান্তরে আলাপনবাবু এ দিকটাতে আলোকপাত করলে উপকৃত হব।

প্রশান্ত নন্দীচৌধুরী
সাঁওতালদি
পুরুলিয়া

বধিরতা বেড়েছে

দেশ ৩০ আগস্ট, '৮৬ সংখ্যায় বিজ্ঞান বিভাগে শ্রীসমরজিৎ করের 'বধিরতা বেড়েছে' রচনায় একটি টেকনিক্যাল ত্রুটি চোখে পড়ল।

এই রচনার এক জায়গায় উনি লিখেছেন— "কোন কোন কোচে থাকে ভ্যাকুয়াম নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র। স্বনিয়ন্ত্রিত এই যন্ত্রগুলি কিছুক্ষণ পর পর চালু হয়। আর চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি বিকট শব্দ ..."

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই ভ্যাকুয়াম নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র (এগজস্টার) ই, এম, ইউ (ইলেকট্রিক্যাল মাল্টিপ্ল্যল ইউনিট) কোচে থাকে না। সাধারণত প্যাসেঞ্জার লোক্যাল ট্রেন বলতে আমরা এই ট্রেনকেই বুঝি (মনে হয় লেখক এই ট্রেনকেই উদ্দেশ্য করেছেন)। স্বনিয়ন্ত্রিত এই যন্ত্রের নাম 'মেইন কম্প্রেসার'। এর কাজ হাওয়ার চাপ তৈরি করা—অর্থাৎ এগজস্টারের ঠিক উল্টো। কেননা এই ট্রেন সম্পূর্ণভাবে 'এয়ার ব্রেক সিস্টেম'-এ নিয়ন্ত্রিত (ভ্যাকুয়াম ব্রেক নয়)। দূরপাল্লার প্যাসেঞ্জার/এক্সপ্রেস/ মেল বা গুডস ট্রেন—যার ক্যারেজ (যাত্রিবাহী) বা ওয়াগন (মালবাহী)র সম্মুখে লোকোমোটিভ (রেল ইঞ্জিন) যুক্ত সেই সমস্ত ট্রেন থামার সময় ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে এয়ার ব্রেক এবং বাকী পিছনের অংশের জন্য ভ্যাকুয়াম ব্রেক যুগপৎ কাজ করে। এবং এক্ষেত্রে ট্রেন থামাতে যে ভ্যাকুয়াম ডেস্ট্রয় হয় তা ড্রাইভার ভ্যাকুয়াম ব্রেক-ভাল্ব (ডি ভি বি) অপারেট করে এগজস্টার হাই-স্পীডে চালিয়ে প্রয়োজনীয় ভ্যাকুয়াম পরবর্তী কাজের জন্য তৈরি করে নেওয়া হয় (স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয় না)। এবং এক্ষেত্রে এই যন্ত্র ইঞ্জিনে থাকার দরুন (কোচে নয়) যাত্রীদের কোন অসুবিধা হবার কারণ ঘটে না।

এইসব মেকানিক্যাল ব্রেকিং ছাড়াও গুটি কয়েক (type)-এর লোকোমোটিভ ইলেকট্রিক্যাল ব্রেকিং (রিওস্ট্যাটিক এবং রিজেনারেটিং) সিসটেম আছে। এতে এগজস্টার বা কম্প্রেসার চালানোর প্রয়োজন হয় না। রিওস্ট্যাটিক ব্রেকিং-এর সময় ট্রাকসন মোটরের (যে মোটর চাকা ঘুরায়) সাপ্লাই অফ করে দেওয়া হয় এবং মেইন সাপ্লাই থেকে (ATFEX) ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে মোটরের ফিল্ডকে আলাদাভাবে এক্সাইট করা হয়। এবার চলমান গাড়ির ঘূর্ণায়মান চাকার সাহায্যে ট্রাকসন মোটর জেনারেটরে পরিণত হয় এবং ইন্ডিউসড ই এম এফ-এর ধর্মই হল তার সৃষ্টিকর্তাকে বাধা দান করা—অর্থাৎ ব্রেকিং শুরু।

এই নিয়মে উৎপাদিত বিদ্যুৎ হাই রেজিস্ট্যান্স-এর মাধ্যমে খরচা করা হয় ওই রেজিস্ট্যান্সের সঙ্গে প্যারালেল কানেকশনে দুটি ব্লোয়ার স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয় প্রয়োজনীয় অংশকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য। আর রিজেনারেটিং ব্রেকিং সিস্টেম-এ উৎপাদিত বিদ্যুৎ ওভার হেড লাইনে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই দুই ব্যবস্থাই উদ্ভট শব্দ ছাড়াই কাজ করে। তবে রিজেনারেটিং ব্রেকিং সিস্টেম ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা খোঁজ নিয়ে জানতে পারিনি।

গাড়ি থামা অবস্থায় যদি গড়িয়ে না যায়, সেক্ষেত্রে হ্যান্ড ব্রেক ব্যবহার করা হয়। ওভারহেড সাপ্লাই বন্ধ থাকলেও এই ব্রেক কাজে লাগে। ড্রাইভার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এই ব্রেক অ্যাপ্লাই করেন।

পরিশেষে জানাই, মাননীয় করের রচনার বিষয়বস্তুর দিক থেকে কোন ভুল নেই—কারণ 'মেইন কম্প্রেসার' যে কী মারাত্মক শব্দদূষণে পারদর্শী তা ভুক্তভুগী মাত্রই জানেন।

রমেশচন্দ্র দাস
কাঁচরাপাড়া
২৪ পরগণা

নলজাত শিশু ও ভবিষ্যৎ মানবসমাজ

'দেশ'-এর সম্পাদকীয় মূল্যবান। প্রতি সপ্তাহেই দেশ এবং দেশস্থ এই বিশেষ পৃষ্ঠাটির প্রতীক্ষায় থাকি যাতে সমসাময়িক কোন বিশেষ বিষয়ে আলোকসম্পাত করা হয়। ২৩-৮-৮৬ তারিখের সম্পাদকীয়তে নল-জাত শিশু সংক্রান্ত লেখাটিও সমান আকর্ষণীয়, মূল্যবান এবং সুধীগণের চিন্তার খাদ্য।

এই লেখাটির প্রথম অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যাংশ সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ থাকায় এই চিঠি লিখছি। বাক্যাংশটি এইরকম : "ভার্জিন মেরি বা কুমারী কুন্তীর ইমাকুলেট কনসেপশন" Chambers Dictionary-তে দেখছি immaculateএর অর্থ Spotless/ Pure, অর্থাৎ কলঙ্কহীন বা পবিত্র। Immaculate conception এর অর্থ দেওয়া হয়েছে "R. C Dogma that the virgin Mary was conceived without Original sin" বাইবেলের Original Sin" (আদিপাপ) ভার্জিন মেরীর গর্ভে যীশু খৃষ্টের জন্ম নারী-পুরুষের মিলন ছাড়াই হয়েছিল বলে বর্ণিত। কিন্তু কুমারী কুন্তীর গর্ভে যে কানীন পুত্র কর্ণের জন্ম হয় তা তো নারী পুরুষের মিলন ছাড়া নয়। দুর্বাশার বরপ্রাপ্তা কুমারী কুন্তীর সঙ্গে সূর্যদেবের মিলনে কর্ণের জন্ম।

সুতরাং কুমারী কুন্তীর 'ইমাকুলেট কনসেপশান' কথাটি সঙ্গত হয়েছে কি ?

বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কল্যাণপুর, আসানসোল

পূর্ব-পশ্চিম

২৩ আগস্ট সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক পূর্ব-পশ্চিম উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অনবধানবশত এক জায়গায় লিখেছেন, 'কোরাপুট জেলার সোনাগড়াতে নতুন ক্যাম্প হয়েছে।' কিন্তু উক্ত জেলায় সোনাগড়া নামে কোন জায়গা নেই। যেটা আছে সেটা সোনাবেড়া। সোনাবেড়াতেই ডি· পি· ক্যাম্প (দণ্ডকারণ্য প্রজেক্ট ক্যাম্প) বিদ্যমান। এই সূত্রে, এত বড় তথ্যবহুল উপন্যাস উপহার দেওয়ার জন্য লেখককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

অর্ধেন্দুশেখর মণ্ডল
সোনাবেড়া
কোরাপুট

ভ্রম সংশোধন

৪ অক্টোবর 'দেশ'-এর 'সাহিত্য' বিভাগে 'নদীয়া কাহিনী'র লেখকের ছবির পরিচয়ে কুমুদনাথ মল্লিকের পরিবর্তে কুমুদনাথ রায় ছাপা হয়েছে। 'নদীয়া কাহিনী'র লেখক হচ্ছেন কুমুদনাথ মল্লিক এবং বর্তমান পরিবর্ধিত সংস্করণটির সম্পাদকের নাম মোহিত রায়। এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

প্রকৃতি ও ভারতবাসী

প্রাকৃতিক দুর্বিপাক পৃথিবীর সর্বত্রই ঘটে থাকে। আবহমানকাল ধরেই ঘটে আসছে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, ঝড়, তুষারপাত এসব নিয়েই পৃথিবী। দুর্দম প্রাণের প্রবাহ এইসব বিপত্তিকে ভেদ করে, জয় করে চলে, আর সেটাই প্রাণের ধর্ম। মানুষের সভ্যতার বিকাশ ও বিবর্তন দুনিয়ার যা কিছু বাধা বিপত্তিকে জয় করা ও পার্থিব সম্পদের যথোপযুক্ত প্রয়োগ ও ব্যবহারের ওপরেই নির্ভরশীল। মানুষের হাতিয়ার তার বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং দূরদৃষ্টি। পৃথিবীতে এখন সুস্পষ্ট দুটি ভাগ। উন্নত দেশ এবং অনুন্নত তথা উন্নতিশীল দেশ। উন্নত দেশগুলিতে যে প্রকৃতি খুব অনুকূল তা মোটেই নয়। কিন্তু প্রকৃতি যতই প্রতিকূল হোক সেখানকার সংগ্রামী মানুষেরা কিছুতেই লড়াই ছাড়ে না। ঝড়, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, বন্যা এই সব কিছুর মধ্যে থেকেই তারা প্রাণের রসদ বের করে আনে। ক্ষয়ক্ষতির ভিতর থেকেই অমেয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হয়। সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে ভবিষ্যতের অনেক বড় ক্ষতিকে তারা সহজেই এড়াতে পারে। সম্প্রতি এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়ে গেল জাপানে, অথচ টোকিওর একটি বাড়িও ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি। তার কারণ দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত হওয়ার পর তারা নতুন করে যখন গগনচুম্বি বাড়িগুলো তৈরি করে তখন এমন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছিল যাতে ভূমিকম্পে বাড়িগুলো বিধ্বস্ত না হয়। আমরা এ ধরনের প্রযুক্তি বা অগ্রিম সতর্কতার কথা ভাবতেও পারি না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, ভারতবর্ষে জাপানের মতো ভূমিকম্পও হয় না। ভারতবর্ষে আরও অনেক কিছুই হয় না। উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া তুষারপাত বা তুষারঝড় হয় না, তেমন মারাত্মক ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস হয় না, আগ্নেয়গিরির উৎপাতও নেই। ভারতবর্ষে তবু কিছু প্রাকৃতিক দুর্বিপাক ঘটে। যেমন অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি বা বন্যা। নদীমাতৃক এই দেশটি আয়তনে বিশাল, প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, লোকবলে বলীয়ান। যে কোনও দেশের পক্ষে জলও এক পরম সম্পদ। তা দিয়ে চাষবাস, জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার মতো বিশাল দেশে মোট পাঁচটি নদী। তারা সেই পাঁচটি নদীর এক ফোঁটা জলও অকারণে সমুদ্রে পড়তে দেয় না। প্রতিটি বিন্দুকে কাজে লাগায় চাষবাসে। সেখানকার চাষীদের সেচের জল কিনতে হয়। মাত্র পাঁচটি নদীর জলকেই সুপরিকল্পিত ব্যবহারে সে-দেশটি শস্যশ্যামলা। অথচ ভারতবর্ষে এত নদী ও জলাশয় থাকতেও কত লক্ষ একর জমি যে কেবলমাত্র সেচের জলের অভাবে ঊষর হয়ে যাচ্ছে তার হিসেব নেই। যেখানে জল নেই সেখানে জলের ব্যবস্থা হয় না। হয় না তো বছরের পর বছরই হয় না। আবহমান কাল ধরে রাজস্থান ইত্যাদি রাজ্যে গাঁয়ের মেয়েরা মাইলের পর মাইল হেঁটে পানীয় জল নিয়ে আসে রোজ। আবার পূর্বাঞ্চলে দেখা যাচ্ছে প্রতি বছরই বিহার বাংলা আসাম উত্তরপ্রদেশ বন্যায় ভাসছে। এই বন্যা এত নিয়মিত এবং অবশ্যম্ভাবী যে এই অঞ্চলের মানুষ একে একরকম নিয়তি বলেই মেনে নিয়েছে। উন্নত দেশগুলিতে যে বন্যা হয় না তা নয়। কিন্তু সেখানে সম্ভাব্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা আগেই গ্রহণ করার ফলে নিতান্ত অঘটন না ঘটলে বন্যার কবলে মানুষ বড় একটা পড়ে না। বাঁধ, নিকাশী খাল, উন্নতমানের পাম্প ইত্যাদি আধুনিক প্রযুক্তির সবকিছুই সেখানে মানুষকে রক্ষার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ঝড়, অতিবৃষ্টি বা ভূমিকম্পের পূর্বসংকেত পাওয়ার জন্য চলছে নিরন্তর গবেষণা। অথচ এই ভারতবর্ষে বছরের পর বছর নদীগুলির বিন্দুমাত্র সংস্কার হয় না। নদীখাত পলিমাটি পড়ে এত বেশি অগভীর হয়েছে যে সামান্য বৃষ্টিতেই জল উপচে দু ধার ভাসিয়ে দেয়। যে গঙ্গায় সেদিনও জাহাজ চলত এখন তার বুকে বিশাল বিশাল চর। আমরা জানতাম বাঁধ জলকে রোধ করে। অথচ এখন দেখি বাঁধের ছাড়া জলেই জেলার পর জেলা ভেসে যায়। মানুষ মরে, গবাদি পশু মরে, চাষবাস যায় জলের তলায়। অবস্থা প্রায় হবুচন্দ্র রাজার দেশের মতো। বন্যা হয়, প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী আর আমলারা নিয়ম মাফিক প্লেন বা হেলিকপ্টারে উঠে দেশ দেখে আসেন, ত্রাণের নির্দেশ দিয়ে খালাস হন। কিন্তু এইসব নদী কেন নাব্যতা হারাল, বাঁধ কেন জল ছাড়ে, কেন এই জলের দেশে খরার বছরে জলের অভাবে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প অচল হয় তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। নেই গবেষণা, নেই দূরদৃষ্টি, নেই উদ্যোগ। ১৯৮৬ সালের অতিবৃষ্টি আমাদের আবার নতুন করে শেখাল, বিজ্ঞান নয়, প্রযুক্তি নয়, ভাগ্যই একমাত্র আমাদের নিয়ামক। খরায় "আল্লা মেঘ দে, পানি দে…" আর বন্যায় "আমায় ডুবাইলি রে, ভাসাইলি রে…" বলে চেঁচামেচি করা ছাড়া আর আমাদের কিছুই করার নেই!

রূপদর্শীর ঝাঁকিদর্শন

ঝুঠা সিং এবং আক্কল মিসিং পত্রাবলী

কেন্দ্রীয় স্বদেশ সম্পর্কিত দফতরের বিশেষ উপদেষ্টা ঝুঠা সিং এবং হুমকিস্থান ন্যাশন্যাল লিবারেশন ফ্রন্টের নেতা আক্কল মিসিং-এর মধ্যে যে পত্রালাপ চলেছিল, সেই সব পত্রের খান কয়েক এখানে ফাঁস করে দেওয়া হল। উল্লেখযোগ্য হুমকিস্থান ন্যাশন্যাল লিবারেশন ফ্রন্টের নেতা আক্কল মিসিং সম্পর্কে দেশে ঘোর বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বলছেন, আক্কল মিসিং বিচ্ছিন্নতাবাদী। কেউ বলছেন, আক্কল মিসিং জাতীয়তাবাদী। কেউ আবার বলছেন, আক্কল মিসিং হুমকিবাদী ছাড়া কিছুই নন।

কেন্দ্রীয় স্বদেশ সম্পর্কিত দফতরে বিশেষ উপদেষ্টা ঝুঠা সিং-এর মতিগতি সংশ্লিষ্ট বরাত ভঙ্গ রাজ্যের ক্ষমতাসীন দল দেলাই দে রাম ফ্রন্টের নবীন নেতা বাম ভরোসা মহাশয়ের চোখে ভাল ঠেকেনি, এটাও বলে রাখা ভাল।

এই প্রেক্ষিতে ঝুঠা সিং ও আক্কল মিসিং-এর পত্রাবলী পূর্ণ বয়ান এখানে প্রকাশ করা হল :

ঝুঠা সিং-এর পত্র : প্রিয় আক্কল মিসিং, আপনার পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার এখানে করা হল। আপনার বিশেষ পত্রবাহক আপনার পত্র যথা সময়েই আমার হাতেই পৌঁছে দিয়েছেন। অতএব আপনার চিন্তার আর কোনও কারণ নেই। আপনার পত্রে আপনি আমাদের দেশের প্রতি "পূর্ণ আনুগত্য" জানিয়েছেন। ব্যস, এখন আপনি চুপচাপ বসে থাকুন। ইতি আপনার বিশ্বস্ত ঝুঠা সিং।

আক্কল মিসিং-এর পত্র : প্রিয় ঝুঠা সিংজি, আপনার সহানুভূতিপূর্ণ পত্রের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। হাঁ, আপনার দেশের প্রতি আমাদের পূর্ণ আনুগত্য আছে। আপনি যে সেটা আমার পত্রে জেনে গিয়েছেন, সেটা আমাদের এইচ এন এল এফ-এর পক্ষে ভাগ্যের কথা। আমরা এই দেশে হুমকিস্থান প্রতিষ্ঠা করব। আমাদের এই দাবি ন্যায্য কিনা, অনুগ্রহ করে জানাবেন।

ঝুঠা সিং-এর পত্র : প্রিয় আক্কল মিসিং, আপনার পত্র পেয়েছি। আপনি জানতে চেয়েছেন, আপনাদের হুমকিস্থানের দাবি ন্যায্য কিনা ? এ বিষয়ে এইটুকু এখন বলতে পারি যে, আমাদের নীতি যদি আপনার নীতির বিরোধী না হয়, তাহলে ব্যাপারটা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। আমাদের সংবিধানের কোনও পরিবর্তন আমরা আপাতত করতে পারছি না, সেজন্য দুঃখিত। ইতি আপনার একান্ত ঝুঠা সিং।

আক্কল মিসিং-এর পত্র : প্রিয় ঝুঠা সিং, আপনার পত্র পেয়ে পরিস্থিতি অবগত হলাম। হুমকিস্থান আমাদের দুঃখ ধান্ধা দূর করার একটা আবশ্যিক উপায়। এটা তো মানবেন, আমাদের দুঃখ ধান্ধা দূর করা দরকার। ইতি আপনার আক্কল মিসিং।

ঝুঠা সিং-এর পত্র : প্রিয় আক্কল মিসিং, আপনি দুঃখ ধান্ধা দূর করার কথা তুলেছেন। এ ব্যাপারে ভেবে দেখা যেতে পারে। ইতি আপনার ঝু· সিং।

আক্কল মিসিং : আপনার এই পত্রটি আমাদের হুমকিস্থান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে যথেষ্ট জোরদার করবে। আমাদের আশা হয়েছে, আপনার কৃপা আমাদের হুমকিস্থান আন্দোলনকে একদিন বাস্তবে পরিণত করতে পারবে। ইতি আপনার বিশ্বস্ত আক্কল মিসিং।

ঝুঠা সিং-এর পত্র : আপনার পত্র পেয়েছি। আমাদের সংবিধানকে চোট না দিয়ে আপনারা যদি আপনাদের দুঃখ ধান্ধা নিয়ে আন্দোলন করেন, তবে আমাদের আপত্তির কী আছে ? ইতি আপনার ঝু· সিং।

আক্কল মিসিং-এর পত্র : আমরা আপনাদের দেশের প্রতি একান্ত অনুগত। তার সংবিধানকেও কোন রকম চোট দিতে চাইছি না। তবে আমাদের যারা চোট দিচ্ছে, তাদের ব্যাপারে আপনি কী করছেন, সেটা যদি আমাদের জানান, তবে কৃতজ্ঞ থাকব। ইতি আপনার একান্ত অনুগত আ· মিসিং।

ঝুঠা সিং-এর পত্র : প্রিয় আক্কল মিসিং, আপনার ইতিপূর্বের পত্র সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ব্যাখ্যা অবশ্য প্রয়োজন। না হলে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। সত্য বলতে কি, ইতিমধ্যেই এমন ব্যাপার দেখা দিয়েছে। ভাল হয়, আপনি বর্তমানে আপনার দুঃখ ধান্ধা নিরসনের ব্যাপারেই জোর দিন। হুমকিস্থান-এর ব্যাপারটা এর মধ্যে আর টেনে আনবেন না। এবং কোনও রকম আন্দোলনও আর করবেন না। আসলে আপনাদের ব্যাপারটা আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে একটু অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলেছে। আশা করি, আপনি ব্যাপারটা বুঝবেন। আপনাদের দুঃখ ধান্ধার প্রতি আমাদের সহানুভূতি প্রচুর আছে। কিন্তু সকলে তো আর ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিতে পারছে না। তাই আমাদের একটু টাইট রোপ ওয়াকিং করতে হচ্ছে। আমরা সরকারিভাবে এইটুকুই ধরে নিচ্ছি যে, আমাদের দেশের সংবিধানের প্রতি আপনাদের আনুগত্য প্রশ্নাতীতভাবে আছে, এবং আপনাদের দুঃখ ধান্ধা আছে। এর বেশি আপনাকে আপাতত দেবার আমার আর কিছু নেই। ইতি আপনার ঝুঠা সিং।

আক্কল মিসিং-এর পত্র : প্রিয় ঝুঠা সিংজি, আপনার পত্র পেয়ে আশাহত হলাম। একে বলে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া। আমার সন্দেহ হচ্ছে, বাম ভরোসার কথায় আপনি ভড়কি খেয়ে গিয়েছেন। আমি বলছি, আপনি ওদের ভড়কিতে ঘাবড়ে যাবেন না। এর আগে আপনাকে একটা হুমকিস্থানের মানচিত্র আমার বিশেষ হরকরা দিয়ে এসেছে। একটু মন দিয়ে সেটা যদি আপনি দেখেন তবে বুঝতে পারবেন, আমরা এই সমগ্র এলাকা থেকে বাম ভরোসাদের মুছে ফেলে দেব। তাহলে তো আপনাদেরও সুবিধে হবে। তখন এই অঞ্চলে আমরাই থাকব। এবং মাথার উপরে আপনারা। এবং আমরা সর্বদাই আপনাদের বন্ধুই থাকব। প্রধানমন্ত্রীকে এই কথাটা আপনি বুঝিয়ে বলুন। বরাত ভঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রচার করছেন যে, প্রধানমন্ত্রী এতদিন পরে তাঁদের বক্তব্যটা বুঝতে পেরেছেন। ওদের এই প্রচারে আমাদের সমর্থকদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। আপনি এই বিভ্রান্তি দূর করুন। ইতি আপনার আক্কল মিসিং।

ঝুঠা সিং-এর পত্র : প্রিয় আক্কল মিসিংজি, আপনার পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করছি। আমরা এটা জেনে খুশি যে, আপনি আমাদের সংবিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য জানিয়েছেন। এবং আপনাদের দাবি দাওয়া আমাদের সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে থেকেই আপনারা আদায়ের পথ গ্রহণ করবেন, এটা জেনেও আমরা আনন্দিত। সময় মতো আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে আমি চেষ্টা করছি। সময় মতোই আমি সেটা আপনাকে জানিয়ে দেব। ইতি আপনার ঝুঠা সিং।

আক্কল মিসিং-এর পত্র : প্রিয় ঝুঠা সিংজি, আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ। কবে নাগাদ আপনার সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হতে পারে, অনুগ্রহ করে অবিলম্বে সেটা যদি জানান, তবে ভাল হয়। ইতি আপনার আক্কল মিসিং।

ঝুঠা সিং-এর পত্র : প্রিয় আক্কল মিসিংজি আপনার পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করছি। আপনি আমাদের সংবিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য জানিয়েছেন, সে জন্য আমরা আনন্দিত। আমাদের সংবিধানের কাঠামোর মধ্যেই আপনারা আপনাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এটা জেনে আমরা খুশি হয়েছি। আপনার সঙ্গে সময় মতো যাতে আমার দেখা হয় আমি তার ব্যবস্থা করব। ইতি আপনার ঝুঠা সিং।

ছবি : দেবাশিস দেব

বিশ্বের সমাজনীতি ও রাজনীতিতে নেহরু পরিবারের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। পণ্ডিত জওহরলাল তৃতীয় বিশ্বের সম্মানিত পুরুষ ছিলেন। বিশ্বে অর্থনৈতিক সমতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে আজীবন প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। কিন্তু 'ট্র্যাজেডি অফ ফেট', চাইলেন শান্তি, চাইলেন যুদ্ধমুক্তি, ফল হল বিপরীত। চীন আক্রমণ করে বসল ভারত। চীন ভারত সীমান্ত সীমানা নির্ধারণ নিয়ে একটা টানা হ্যাঁচড়া সেই ইংরেজ আমল থেকেই চলে আসছিল। ইংরেজ দেশ ছেড়ে চলে যাবার সময় ভারতকে শুধু সম্পদ নয় সমস্যারও উত্তরাধিকারী করে রেখে গিয়েছিল। গোলাপের সঙ্গে কাঁটা। ১৯৬০ সালে দিল্লিতে চু এন লাইয়ের সঙ্গে শীর্ষ সম্মেলন ব্যর্থ হল। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের শান্ত পথ বন্ধ হয়ে গেল। ভারতকে বেছে নিতে হল শক্তির পথ। সীমান্তের ভারত ভূখণ্ড থেকে দখলকারী চীনা সৈনিকদের ঠেলে সরাতে হবে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর শক্তির পরিমাপ তখনও তেমন হয়নি। এর পরের ইতিহাস আমরা এখনও ভুলতে পারিনি। চীন আমাদের জনবলের একটা নাড়া দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল আমাদের শক্তির দিক নয়, দুর্বলতার দিক, অক্ষমতার দিক। এই সীমান্ত যুদ্ধ জওহরলালজীকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়ে গেল। তাঁর সেই মায়কোচিত আত্মপ্রত্যয় ঝরে পড়ে গেল। ভারত প্রশাসনে আলগা হয়ে পড়ল তাঁর হাতের মুঠো। জনমানসে ধূসর হয়ে গেল ভাবমূর্তি। শুভ্র আচকানে তাঁর লাল গোলাপটি পাণ্ডুর হয়ে গেল। কৃষ্ণ মেনন পরে লিখলেন : I think he collapsed, it demoralized him completely because everything he had built up in his life was going.

রাজীব তখন শিশুটি। লালবাহাদুর, ইন্দিরা, মোরারজী, চরণ সিং, ইন্দিরা হয়ে রাজীব এক দীর্ঘ জটিল পথ। রাজনীতির ঘুলি ঘাঁধ ঘুরে ঘুরে রাজীবের [illegible] হয়েছে। বয়সে তরুণ, অভিজ্ঞতায় খাটো তবে প্রাণশক্তিতে ভরপুর। শ্রীমতী গান্ধীর আমলে অভ্যন্তরীণ জটিলতায় বিশ্ব পরিস্থিতিতে ভারতের ভূমিকা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। তরুণ রাজীব ভারতকে বিশ্ব-প্রাঙ্গণে আবার টেনে এনেছেন। দেশ থেকে দেশান্তরে উড়ে চলেছেন। তারুণ্যের এই গুণ। তিনি একা নন, সঙ্গে অনেক সঙ্গী। নিজের মন্ত্রিসভার বাছাই করা সদস্য, উপদেষ্টা, সংবাদপত্রের প্রতিনিধি, সর্বোপরি দেহরক্ষীর দল। এইডস-এর মতো নতুন আর একটি সাংঘাতিক ব্যাধি বিশ্বকে গ্রাস করতে চলেছে— টেররিসম। সন্ত্রাসে সন্ত্রস্ত দেশনায়করা। মধ্যযুগের খালিফদের অবস্থা আর নেই। ছদ্মবেশ ধারণ করে গভীর রাতে জনপদের অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখছেন। প্রাসাদে ফিরে এসে দোষী কর্মচারীদের সাজা দিচ্ছেন। অযাচিত করুণা বর্ষণ করছেন ভুক্তভোগীদের ওপর। একালের দেশনায়কদের

বেলা তিনটে বাজলেই এমনিই আমি তৈরি হয়ে থাকি। অফিসে আসতে দেরি করলেও [illegible] ল্যামের মতো যাবার ব্যাপারে ভেরি পাংচুয়াল। চক্ষুলজ্জা তো একেবারে যায়নি। বাঙালী হলেও কলোনিয়াল সায়েবদের ট্রেনিং সহজে ভুলি কি করে! একটা দেরি ক্ষমা করলেও দুটো দেরি ক্ষমা করা যায় না। ঠিক চারটে বাজলেই ছাতা, লাঠি, ব্যাগ, বই সর্ববিধ আয়ুধ বগলদাবা করে আমি মানিক পীর রাস্তায় নেমে পড়ে নাতিদীর্ঘ একটি নিশ্বাস ফেলে মনে মনে বলি, উঃ খেটে খেটে জীবনটা গেল। আর পারা যায় না। আর তখনই আমার মনে হয় পুষ্টিকর একটা কিছু খাওয়া উচিত। কলকাতার বরাত! বেগুনের চেয়ে আপেলের দাম কম। মাঝারি মাপের একটা আপেল কামড়াতে কামড়াতে বাসে ফাঁক-ফোকর খুঁজি। একটা আপেলে যত রস হয়, বাসে জনগণ তার ডবল রস নিঙড়ে নেয়।

সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে মহা খুশি হয়ে বললুম, [illegible]

চারটে বাজতে তো মাত্র আর এক মিনিট দেরি। মুখে বললুম, 'কোথাও যেতে হবে সাগরদা, আপনার সঙ্গে ?'

'আমার সঙ্গে আর কোথায় যাবে ! যেতে হবে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে। লণ্ডন থেকে মেকসিকো। এই নাও চিঠি, পি আই বি-র নির্দেশ।'

সে আবার কি ? হারিয়ে যাবার ভয়ে আমি ওই নয়া ভবানীপুর কি কালীঘাটে যেতে ভয় পাই। আমার মগজে দিগ্বিদিক জ্ঞানের কলকব্জাটি যে কোনও কারণেই হোক গড়বড় হয়ে গেছে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ঠিক রাখতে পারি না। একটুও বাড়িয়ে বলছি না। যেমন, সেদিন এক ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়ে বেল বাজাতেই তিনি সদর খুলে সামনে এসে দাঁড়ালেন। আপ্যায়ন করে নিয়ে গেলেন ভেতরে। টানা দালান ধরে কিছু দূর গিয়েই তাঁর বৈঠকখানা। বেশ গল্প-গুজব হল। তারপর এক সময় 'আসি' বলে ঘরের বাইরে এসে, 'ভেরি স্মার্টলি' বাঁ দিকে ঘুরে গেলুম। আমি ভাবছি বাইরে যাবার দরজার দিকেই যাচ্ছি, ও মা, এ কি ! সোজা চলে এলুম তাঁদের বাথরুমে। একেবারে বেকুব বনে গেলুম। প্রয়োজন নেই, তবুও দরজা বন্ধ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলুম কিছুক্ষণ।

বেরিয়ে আসতেই ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার তো মশাই অসাধারণ ক্ষমতা। কি করে জানলেন ওই দিকেই ওইটা !'

ভাব-গম্ভির মুখে আমি উত্তর দিলুম, 'ঈশ্বরদত্ত। জানেন তো এক বিদগ্ধ সমালোচক আমার বইয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন, বাথরুম সাহিত্যিক। বাথরুম ছাড়া আর কিছু চেনে না। জানেন তো, রতনে রতন চেনে ভাল্লুকে চেনে শাঁকালু।'

লণ্ডনে 'কমনওয়েলথ কনফারেন্স', মেকসিকোয় 'মিনি সামিট'। কমানওয়েলথে লড়াই হবে বর্ণ বিদ্বেষ নিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা চামড়া বোথাবাবা কালা আদমীদের পিষে মারছেন। দানবটিকে এইবার দাবাতে হবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীবের সুর এবার খুবই কড়া। চড়া। মার্গারেট থ্যাচার, রানী এলিজাবেথকে একটা কিছু করতেই হবে। বোথা সায়েবের পিঠ চাপড়ে কমানওয়েলথের কমান ইন্টারেস্ট বজায় রাখা যাবে না। কমনওয়েলথ গেমস আমরা বয়কট করেছি। কমনওয়েলথ থাকবে কি যাবে মহারানীই জানেন।

মেকসিকোর 'মিনি সামিটে' যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে পারমাণবিক সমরসম্ভারের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপ চুরমার হয়ে গেলেও যুদ্ধ শেষ হয়নি। যুদ্ধের নতুন দিগন্ত খুলে গেছে। ধ্বংসের নতুন শক্তি এসে গেছে বৃহৎ রাষ্ট্রের হাতে। মৃত্যুর ছাতার তলায় চলেছে বিশ্বমানবের জীবনলীলা। মানুষের সামান্য ভুলে পৃথিবী যে কোনও মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের সাধনায় ক্যানসার নিরাময়ের ওষুধ না পেলেও একলপ্তে কয়েক কোটি মানুষ মারার মারণাস্ত্র আমরা পেয়ে গেছি। বিশ্বের মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা এখন কয়েকদিন, কয়েক ঘন্টার ব্যাপার মাত্র। পৃথিবীতে নতুন যুগ এসে গেছে, আণবিক যুগ।

সেই হাত-ঘড়িটি এখনও আছে। পুড়ে ঝলসে গেছে। আটটা ষোল বেজে চিরকালের জন্যে নিশ্চল। সকাল আটটা ষোল, আগস্ট ৬, সাল ১৯৪৫। ছোট্ট শহর হিরোশিমা। সুন্দর শহর হিরোশিমা। হাতের পাঁচটা আঙুল ফাঁক করে চেটোটাকে উপুড় করে রাখলে যা হয় হিরোশিমা অনেকটা সেই রকম। পাঁচটা আঙুল হল পাঁচটা নদী। ফুরফুর করে উড়ে এল বোমারু বিমান 'এনোলা গে'। পূব থেকে পশ্চিমে। নদীর ওপর দিয়ে। পাইলটের মায়ের নামে প্লেনের নাম 'এনোলা গে'। মা কৃপা বর্ষণ করেন। 'এনোলা গে' ফেলতে আসছে বিজ্ঞানের নবতম, ভয়ঙ্কর

বিজ্ঞানের সাধনায় ক্যানসার নিরাময়ের ওষুধ না পেলেও একলপ্তে কয়েক কোটি মানুষ মারার মারণাস্ত্র আমরা পেয়ে গেছি।

নিশ্চিহ্ন করে ফেলা কয়েক ঘন্টার ব্যাপার মাত্র।

আবিষ্কার। একটি আণবিক বোমা। যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। সংযুক্ত মিত্রশক্তি তখন চেপে ধরেছে জাপানকে। ঝাঁক ঝাঁক বিমান আসে যায়। কখনও বোমা ফেলে, কখনও ফেলে না। টহল দিয়ে ভয় দেখিয়ে ফিরে যায়। সাইরেন বাজে। অল ক্লিয়ার হয়। সবই গাসহা ব্যাপার। 'এনোলা গে' নদীর ওপর দিয়ে উড়ে আসছে সঙ্গী-সাথী নিয়ে। আকাশের নিচে হিরোশিমার জনজীবন তেমন সন্ত্রস্ত হল না। বোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। কিছু বাড়ি ঘর ভাঙবে। আগুন জ্বলবে। কিছু মানুষ মরবে। এরই নাম যুদ্ধ। স্বাভাবিক কাজকর্মের বাইরে বাড়তি কিছু কাজ, ধ্বংসাবশেষ সরানো, মৃতের সৎকার। আহতের সেবা।

আর পাঁচটা ছেলের মতোই কাওয়ামোতো সকালের স্কুলে আসছে। স্কুলের গেটে যখন এল তখন ঘড়িতে সকাল সাতটা বেজে পঁয়তাল্লিশ

মিনিট। তখনও হিরোশিমা আছে। ওটা নদী বইছে। বইছে তেনমা নদী। বইছে হোনকাওয়া, মোতোইয়াসু। হেইওয়া ব্রিজের ওপর বইছে মানুষের যানবাহনের স্রোত। সুন্দর পোশাকের নরনারী। সবুজ বনস্থলীতে উড়ছে প্রজাপতি, ফড়িং। নদীতে খেলছে রুপোলি মাছ। হিরোশিমা সময়ের ওই ক্ষণটিতে তখনও প্রাণচঞ্চল। আর একত্রিশ মিনিট পরে হিরোশিমা থাকবে না। বি-২৯ আমেরিকান বোমারু বিমান 'এনোলা গে' হালকা মেজাজে উড়ে আসছে। চালক পল টিবেটস। বিমানের তলপেটে একটি মাত্র বোমা। লস অ্যালামোসের আণবিক বিজ্ঞানীরা জাতকটির নাম রেখেছেন 'থিন ম্যান'। জননী 'এনোলা' ধারণ করেছিলেন পলকে বিমান 'এনোলা' ধারণ করেছে মৃত্যুরূপী 'থিন ম্যান', শীর্ণ মানবটিকে। আমাদের পুরাণের দধীচী, যাঁর অস্থি থেকে তৈরি হয়েছিল মৃত্যুবাণ। বজ্র।

৬ আগস্ট ছিল সোমবার। ভীষণ গরম। সেই সাতসকালেই মানুষের হাঁসফাঁস অবস্থা। ট্রেন ধরে হিরোশিমা স্টেশনে আসতে আসতেই বালক কাওয়ামোতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সকাল সাতটার সময় একবার বিমান আক্রমণের সঙ্কেত-ধ্বনি হয়েছিল। একটি মাত্র বি-২৯ বিমান টহল মেরে চলে গেছে। বিমানটিকে তখন নিরীহ মনে হলেও আসলে সেটি ছিল যমদূত। আবহাওয়া বিমান। 'এনোলা গে'কে আক্রমণের উপযুক্ত সময়টি জানানোই ছিল যার টহলদারির উদ্দেশ্য।

কাওয়ামোতোর কাঁধে একটি বেলচা। বালক হলেও সেনাবাহিনী তাকে ছেড়ে দেয়নি। হিরোশিমায় তখনও পর্যন্ত বড়রকমের বোমাবর্ষণ হয়নি। যদি হয়, তাহলে এই বালকবাহিনী নেমে আসবে আগুন সরিয়ে পালাবার পথ পরিষ্কার করতে। একত্রিশ মিনিট পরে যে আগুন জ্বলবে, সে আগুন নেবাবার ক্ষমতা বালক কাওয়ামোতোর নেই।

কেন হিরোশিমা, কেন নাগাসাকি? ১৯৪৫-এর বসন্তেই এই নিধন-যজ্ঞের রূপরেখা তৈরি করেছিলেন আমেরিকার ম্যানহাটান প্রোজেক্টের করিতকর্মা বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরা। সেই দলে ছিলেন, গণিতজ্ঞ, পদার্থবিদ, বিস্ফোরক বিজ্ঞানী, আবহাওয়াবিদ। রবার্ট ওপেনহাইমারও ছিলেন সেই দলে। তাঁদের সিদ্ধান্তে ছিল:

[ক] আণবিক বোমার সবচেয়ে বড় আঘাত আসবে প্রাথমিক বিস্ফোরণের মুহূর্তেই, তারপর ঘটবে দাবানল যা আজ পর্যন্ত মানুষের অকল্পনীয়। অতএব বোমাটিকে এমন জায়গায় ফেলতে হবে, যেখানে অনেক বাড়িঘর। তাহলেই বোঝা সম্ভব হবে বোমাটির বিধ্বংসী শক্তি।

[খ] অনুমাণ, বোমাটি ফাটার সঙ্গে সঙ্গে এক মাইল ব্যাসার্ধ জুড়ে যা আছে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অতএব বোমাটিকে এমন একটা জায়গায় ফেলতে হবে যেখানে ওই ব্যাসার্ধের থিকথিকে একটি জনপদ আছে।

[গ] সেই লক্ষ্যস্থলেই ফেলতে হবে যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটিসমূহ আছে।

[ঘ] প্রথম বোমাটি সেই শহরেই ফেলতে হবে যেখানে আগে কখনও বোমা-বর্ষণ হয়নি, তাতে বোমার বিধ্বংসী শক্তি পুরোপুরি পরীক্ষা করা সম্ভব হবে।

জাপানের আকাশ পুরোপুরি আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে থাকা সত্ত্বেও জাপানের চারটি শহরে বোমা ফেলা হল না। করুণা নয়। গভীরতর দুরভিসন্ধি। আণবিক আক্রমণের লক্ষ্য তালিকায় জাপানের যে কটি শহর ছিল তা হল,

হিরোশিমা, কোকুরা, নিগাটা, মন্দির শহর কিয়োতো। জাপান বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এডুইন যখন শুনলেন তালিকায় কিয়োতোর নাম রয়েছে, ছুটে গেলেন তাঁর অফিস-প্রধান মেজর অ্যালফ্রেড ম্যাককরম্যাকের দপ্তরে। অধ্যাপক কেঁদে ফেললেন। ম্যাকরম্যাক তখন ওয়ার সেক্রেটারি স্টিমসনকে বলে কয়ে কিয়োতোর নামটি তোলাতে পারলেন।

১৯৪৫ সালের বসন্ত থেকেই উটার বিমানক্ষেত্র ওয়েণ্ডোভারে বৈমানিকদের অ্যাটমবোমা ফেলার প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে গেল। যে বৈজ্ঞানিক এই মারাত্মক অস্ত্রের জনক, তাঁর নাম লিও জিলার্ড। আরব্য রজনীর সেই জেলেটির মতো, তিনিই জালার মুখ খুলে 'জিনটিকে' বের করেছিলেন। তিনিই এবার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে লাগালেন, জিনটিকে আবার জালায় ঢোকাতে। এই সঙ্কট সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে পরে তিনি খোলাখুলিই বলেছিলেন, 'গোটা ৪৩ আর ৪৪ সালে আমাদের সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ ছিল জার্মানি। ইওরোপ অভিযানের আগেই না তারা আটম বোমা বানিয়ে বসে। ৪৫-এ সেই দুশ্চিন্তা আর রইল না, তখন শুরু হল অন্য চিন্তা, এই বোমা এখন আমেরিকা অন্য দেশের ওপর কি ভাবে ব্যবহার করবে!' আমেরিকার হাতে ছিল মোট তিনটি বোমা। বোমা তিনটির একসঙ্গে নাম রাখা হয়েছিল 'ট্রিনিটি', ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।

এই জিলার্ডই ১৯৩৯-এর গ্রীষ্মে আইনস্টাইনের কাছে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমেরিকাকে বোমা বানাবার অনুরোধ জানান নয়তো জার্মানি আমাদের ছাতু করে দেবে। সেই সময় সমূলে বিলুপ্তির আতঙ্ক এমন একটা জায়গায় উঠেছে যখন সবাই ভাবছেন, 'Either we build an atom bomb or Hitler will do it first.' সেই জিলার্ডই ৪৫-এর বসন্তে আইনস্টাইনের কাছে ছুটলেন বিশ্বকে বাঁচান। জালার দৈত্যটি এখন আমেকিার সরকারের হাতে। যে কোনও মুহূর্তে সেই ধ্বংসের শক্তি নেমে আসবে বিশ্বের নিরীহ মানুষের জীবনে। আইনস্টাইন তখন শেষ পত্রটি লিখলেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে, সঙ্গে জিলার্ডের রিপোর্ট, বোমা আমেরিকাকে শক্তি দেবে নিঃসন্দেহে, আধিপত্য দেবে পৃথিবীর ওপরে, কিন্তু সবই তাৎক্ষণিক। সারা বিশ্বজুড়ে যে রাজনৈতিক ও সামরিক অস্থিরতা শুরু হবে, তাতে এই মুহূর্তের সাফল্য মুছে যাবে।

আইনস্টাইনের সতর্ক-পত্র, জিলার্ডের ভবিষ্যদ্বাণী প্রেসিডেন্টের গোচরে আনা হল না। পড়ে রইল তাঁর টেবিলে কাগজপত্রের স্তূপে। সহসা ৪৫ সালের ১২ই এপ্রিল প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মারা গেলেন। আসনে বসলেন, হ্যারি এস ট্রুম্যান। জিলার্ডের সঙ্গে ট্রুম্যানের কোনও পরিচয়ই ছিল না। নতুন প্রেসিডেন্ট বহু দূরের মানুষ। প্রেসিডেন্টের আসনে অনভিজ্ঞ একজন সিনেটার। বসে আছেন নিজের ঘেরাটোপে, যেখানে জিলার্ডের প্রবেশ সহজসাধ্য নয়। ওদিকে ওয়েণ্ডোভারে বৈমানিকদের ট্রেনিং চলেছে। ফিউজ ছাড়া তিনটি বোমা লস এলামোসের কারখানায় মানুষ মারার মহড়া নিচ্ছে। কর্মকর্তা আর বিজ্ঞানীদের ভয়, জাপান ভয় পেয়ে ইতিমধ্যে আত্মসমর্পণ করে বসলেই মহা বিপদ। ম্যানহাটান প্রোজেক্টে মার্কিন-সরকার বিলিয়ান, বিলিয়ান, বিলিয়ান ডলার ঢেলেছেন। অন্তত একটা বোমাও যদি জাপানের ওপর ফাটানো না যায়, তাহলে এই খরচের যৌক্তিকতা রইল কোথায়! মার্কিনীরা যে প্রেসিডেন্টকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। 'It's better for a few thousand Japs to perish than a Single one of our boys.

(ক্রমশ)

হিরোশিমা ৬ আগস্ট, ১৯৪৫, সকাল ৮টা ১৬-র পরে।

কালান্তক বিস্ফোরণের মুহূর্তকালের মধ্যেই বিশ্বের অর্ধেকের বেশি মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বঙ্কিমান মহাদেশগুলির ধূলি-ধূম্রজালে নির্বাপিত সূর্যালোক। পৃথিবীতে নেমে আসবে নিরন্ধ্র নিরবধি অন্ধকারের যবনিকা। চতুর্দিকে রক্তাভ বিষ বৃষ্টি আর তুষার ঝঞ্ঝা, শৈত্যপ্রবাহ। বিপরীতগামী কালসমুদ্র। হঠাৎ স্তব্ধ, রুদ্ধগতি নদী স্রোত। তরলাগ্নিতুল্য টগবগে জলরাশির মধ্যে তৃষ্ণায় ছটফটিয়ে মরে যাবে জলজ প্রাণীকুল। ডানা মেলে উড়বার নীলাকাশ নেই বিহঙ্গের। মরু সাহারা আবৃত জগদ্দল বরফাস্তরণে। শিলাবর্ষণ সম্পূর্ণ সংহার করবে আমাজনের অরণ্যানী। সভ্যতা আর আধুনিক অগ্রগতির সকল স্বাক্ষর বিলুপ্ত করে এ-জগৎ ফিরে যাবে তার সৃষ্টিকালের আদিম জমাট বরফের যুগে। তেমনি প্রলয় পেরিয়েও আতঙ্কাহত কিছু মানুষ যদি বর্তে থাকে তখনও, তাদের নিয়তি 'ফাউস্ট'-এ বর্ণিত ভয়ঙ্কর অনন্ত-নরক। সেদিন সৃষ্টির শেষ। মৃত্যুহিম সেই অনন্ত রাত্রির তলে কোনো আরশোলা যদিবা থাকে, খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর কোনো জীবনের চিহ্ন।

আমার এই কথাগুলি নেহাৎ প্যাটমসদ্বীপে নির্বাসিতজন-এর পাথরে রূপান্তরিত হওয়ার প্রাক্-প্রলাপ নয়। দ্রষ্টার নিরিখে এ রকমই এক মহাজাগতিক বিপর্যয় আসন্ন। বৃহৎ শক্তিধরদের অস্ত্রাগারে এক চোখ বোজা, একচোখ খোলা যে পরমাণু দৈত্য রয়েছে, ইচ্ছায় বা অতর্কিতে তার থেকে কণামাত্র যদি বিচ্ছুরিত হয় তাহলেই অমন প্রলয় ঘটতে পারে।

এমনি ডেমোক্লিস-এর খাড়া ঝুলছে আমাদের শিরে। আজ, উনিশ শ' ছিয়াশির ছয় আগস্ট এমন এক বিশ্বমঞ্চে আমরা রয়েছি যেখানে কম করেও পঞ্চাশ হাজারের বেশি পরমাণু অস্ত্র মজুত। এর সহজ অর্থ, শিশু নারীসহ আমরা প্রত্যেকেই এক-একটি চারটনি ডিনামাইটের চোঙের ওপর বসে আছি। এর সবগুলি যদি ফাটে, তাহলে ধরাপৃষ্ঠে যত জীব আছে তারা সবাই তো নিশ্চিহ্নে উড়ে যাবেই। এর বারো গুণ জীবসংখ্যাও এই দৈত্য শেষ করতে সক্ষম। তাই বলছি ডেমোক্লিস-এর খড়্গ ঝুলছে বিশ্ব সভ্যতার ওপরে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখিয়েছেন, এই সর্বনাশা শক্তি কেবল এই পৃথিবীকে নয়, সৌরমণ্ডলের চারটি গ্রহকে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। সৌরমণ্ডলের ভারসাম্য ভেঙে পড়বে এর পরিণামে। বিগত চল্লিশ বছর ধরে এই পরমাণু দৈত্য নিজেকে যেভাবে বাড়িয়েছে শিল্প-কলা-বিজ্ঞানের সব শাখাই তার কাছে তুচ্ছ। এই দৈত্যই আজ বিশ্বের ভাগ্যনিয়ন্তা।

এ রকম এক আসন্ন মহানিশার মধ্য থেকে জীবনের আলো ছিনিয়ে আনার যদি কোনো সম্ভাবনা থাকে তা হল, পারমাণবিক সমরোদ্যোগের বিপুল ব্যয়ভারের তুলনায় অনেক, অনেক কম খরচে মানব সমাজকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। সমৃদ্ধ দেশগুলি যুদ্ধাস্ত্রে যে টাকা বিনষ্ট করে তার কিছুটা অন্তত মানবতার নামে উৎসর্গ

এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে গোটা পৃথিবী...

... এক মুহূর্তের অসাবধানতা ...

করতে পারে।

শিশুদের কথাই ধরা যাক। অঙ্কটা সোজা। উনিশ শ' একাশিতে ইউনিসেফ পাঁচশ' মিলিয়ন দারিদ্র্যপীড়িত শিশুকে বাঁচাতে এক কর্মসূচী গ্রহণ করে। পরিবেশ, প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পানীয় জলের জন্য বরাদ্দ ধরে একশ' বিলিয়ন ডলার। এত টাকা! শিশুকল্যাণের জন্য এত অর্থ ব্যয় তো আকাশকুসুম কল্পনা মনে হবে। অথচ, মাত্র একশ'টি উন্নতমানের বি-১বি বোমারু বিমান তৈরিতেই সমপরিমাণ ডলারের শ্রাদ্ধ হচ্ছে। এর চাইতেও বেশি টাকা উড়িয়ে দেওয়া হয় সাত হাজার ক্রুইজ ক্ষেপণাস্ত্রের পিছনে। আর এই মারণবাণ বানাতেই মারকিন যুক্তরাষ্ট্র যে অর্থ ঢালতে যাচ্ছে তার পরিমাণ ২১· ২ বিলিয়ন ডলার।

রোগ এবং তার প্রতিরোধের প্রসঙ্গে আসি। যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি পনেরোটি নিমিজ পরমাণুবাহী বিমান নির্মাণের যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে কুড়িশ' সালের মধ্যেই তার দশটি তৈরি হয়ে যাবে। এই
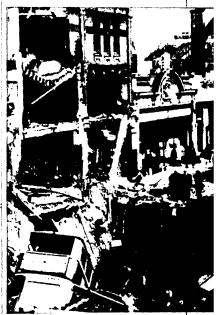
... নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে কয়েক হাজার বছরের সভ্যতাকে

দশটিতেই যা খরচ হবে তা দিয়ে এক বিলিয়ন মানুষকে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখা যায়। কেবল আফ্রিকাতেই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব চোদ্দ মিলিয়ন শিশুকে।

ভাবুন খাদ্য সমস্যার কথা। 'ফাও'-এর তথ্য হল, গত বছর পৃথিবীর পাঁচশ' পঁচাত্তর মিলিয়ন লোক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। তাদের বাঁচাতে যেটুকু ক্যালোরির দরকার ছিল তার যা মূল্য সে তুলনায় বেশি অর্থ ব্যয় হয় ১৪৯টি এম· এক্স ক্ষেপণাস্ত্র তৈরিতে। আর পশ্চিম ইউরোপ দুশ' তেইশটি এম· এক্স ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করছে এখন। এর মাত্র সাতাশটি ক্ষেপণাস্ত্রে যা খরচ তা
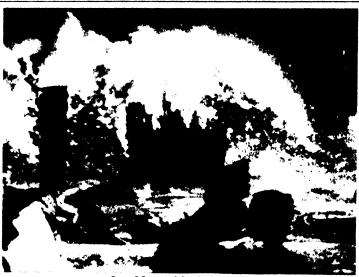
ধ্বংসের অমোঘ হাত ক্রমশ গ্রাস করে নিচ্ছে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি জাতিকে, অথচ নতুনতর সৃষ্টির দিকে যাওয়া যেত অনায়াসে

দিয়ে দরিদ্র দেশগুলির কৃষি-সরঞ্জাম কিনে দিলে তারা খাদ্যে স্বয়ম্ভর হতে পারে। আরও বলা যায়, এতে যা ব্যয় হবে তার পরিমাণ উনিশ শ' বিরাশির সোভিয়েত সামরিক বরাদ্দের নয় ভাগের মাত্র এক ভাগ।

আবার ভাবুন, জনশিক্ষার কথা। মারকিন সরকার পঁচিশটি পারমাণবিক ত্রিশূল সাবমেরিন নির্মাণের কর্মসূচী নিয়েছে। অপর দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন করছে সমশক্তিসম্পন্ন তাইফুন সাবমেরিন। অথচ এর মাত্র দুটিতে যা ব্যয় হবে কেবল সেটুকু দিয়েই সফল করা যেতো বিশ্ব থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের স্বপ্ন। তৃতীয় বিশ্বের শিক্ষক-শিক্ষণ, স্কুল-বাড়ি তৈরি ও আনুষঙ্গিক কাজের টাকারও সঙ্কুলান হতে পারে মাত্র পঁয়তাল্লিশটি ত্রিশূল-২ ক্ষেপণাস্ত্রর নির্মাণ ব্যয় থেকে।

এরকম কথাও বলা যেতে পারে, তৃতীয় বিশ্বের কাঁধে যে পরিমাণ বৈদেশিক ঋণের পাহাড় চাপানো আছে তা থেকে তারা সম্পূর্ণ মুক্তি পেতে পারে যদি আগামী দশ বছর পৃথিবী তাদের সমরসজ্জার নির্মাণ ব্যয় বন্ধ রাখে। তার চাইতেও বেদনাদায়ক কথা, সমরাস্ত্রের জন্য যে সম্পদ নষ্ট হচ্ছে, মানবসম্পদ নষ্ট হচ্ছে তারও বেশি। কেবল যুদ্ধাস্ত্র সৃষ্টির জন্য বিশ্বের যে বৃহত্তম বিজ্ঞানী সমাজ আজ নিমগ্ন, মনটি মানব সভ্যতার ইতিহাসে আর কখনও ঘটেনি। কিন্তু ওঁরা তো আমাদের। ওই বিজ্ঞানীদের যথার্থ জায়গা ওই দিকে হতে পারে না, এদিকে। মানবতার দিকে, শিক্ষক আর ন্যায় বিচারের পরিবেশে মানব জীবনের মুক্তির জন্য সৃষ্টিধর্মীব্রতে তাঁরা হবেন হোতা। বর্বরতা থেকে মুক্তির এবং শান্তির, সংস্কৃতির জন্য তাঁদের দিকেই আমরা তাকিয়ে আছি।

এত সব দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও সমরাস্ত্রের অভিযান এক মুহূর্তও থমকে দাঁড়াবে না। ঠিক এখন, আমরা যখন মধ্যাহ্নভোজে বসেছি, এই মুহূর্তেই

একটি নতুন আণবিক মারণাস্ত্র তৈরি হল। আগামী ভোরে যখন আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠব, তার মধ্যেই সমৃদ্ধ গোলার্ধে আরো নয়টি মৃত্যুশেলের প্রস্তুতি সারা। অথচ এর একটির পিছনে যা খরচ সেই পয়সা দিয়েই নায়াগারার সমগ্র প্রপাতসলিলকে চন্দন নির্যাসে ভরপুর করে দেওয়া যেত।

এই পৃথিবীটাই বোধ হয় অন্য গ্রহগুলির নরক। —কথাটা মনে হয়েছিল একালের এক মহান ঔপন্যাসিকের। মনে হয়, নরকের চাইতেও নিকৃষ্ট জায়গা হয়ে উঠেছে এটা। বিরাটব্রহ্মাণ্ডের বাইরে নিক্ষিপ্ত সংহার মূর্তি প্রভুদের মরজির উপর নির্ভর করে আছে এর অবশিষ্ট অস্তিত্ব। সৌরমণ্ডলের মধ্যে একমাত্র এই গ্রহেই এক দানবীয় অভিযান চলেছে যা বিলুপ্ত করতে চাইছে আমাদের সকল বোধ-বোধিকে।

কেবল মানবিক বোধি নয়, ধ্বংস হতে যাচ্ছে প্রকৃতির সকল চৈতন্য। এই ধরাপৃষ্ঠে যেদিন জীবন এসেছিল, তার পরেও তিন শত আশি মিলিয়ন বছর লেগেছিল একটি প্রজাপতিকে ডানা মেলে উড়তে শিখতে। আরো একশ' আশি মিলিয়ন বছর একটি গোলাপের দরকার হয়েছিল শুধু সুন্দর হয়ে ফুটে উঠতে। মুহূর্তে সে-সব শেষ! একটি মাত্র বোতাম টিপেই!

সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিকে ঠেকিয়ে রাখার ভাবনায় আমরা এখানে সমবেত। আমরা কণ্ঠ মেলাতে এসেছি নিরস্ত্র এক শান্তি ও ন্যায়বিরাজিত বিশ্বের জন্য উদগ্র অসংখ্য মানবের সঙ্গে। তবু যদি সে কণ্ঠ ওদের কানে না যায় তাহলেও আমাদের এই সমাবেশ ব্যর্থ হবে না। সেদিনের সেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের লক্ষ কোটি বছর পরে সালামাণ্ডারের মতো আগুনজয়ী কোন প্রাণী হয়তো নতুন জীবন নিয়ে সুন্দরী নারীর মতো রানীর মুকুট পরে দেখা দেবে নতুন সৃষ্টিতে। এটা নির্ভর করছে সম্পূর্ণ আমাদের ওপর, আমরা যাঁরা বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক. শিল্পী, বিবেকী ও শান্তিকামী— তাদের ওপর। নির্ভর করছে আজকের সমাগত অতিথিদের ওপর। আমরা যেন আজকের আতঙ্ক নিয়ে সেই রানীর সুন্দর অভিষেকসভায় না যাই। আজ এখানে আমরা শপথ নেবো, যেন সমবেতভাবে আমরা সেই আণবিক প্রলয়ের মধ্যে আমাদের আজকের স্মৃতির তরণীটি ভাসিয়ে চলতে পারি, পেরিয়ে যেতে পারি সময় সমুদ্র। যে মহাপ্রলয়ের পরে আরশোলারা বেঁচে থেকেও যে কথা জানাতে পারবে না, তা যেন আমাদের প্রলয়বিধ্বস্ত তরণী দেখেও নতুন প্রজন্ম জানতে পারে। জানতে পারে জীবন একদিন ছিল এই ধরণীতে। দুঃখ ছিল, অবিচার ছিল তবু ভালোবাসারও স্বাদ আমরা পেয়েছি, দেখেছি সুখেরও স্বপ্ন। আর নতুন সেই প্রজন্ম যেন চিরকাল জানতে পারে কাদের জন্য আমাদের এই বিপর্যয় ঘটেছিল। যেন জানতে পারে, জীবনের কল্যাণের জন্য সর্বোত্তম যে শান্তি তার জন্যে আমাদের আকুল চিৎকারেও ওরা বধির ছিল। আর কত ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য কী বর্বর আবিষ্কারের দ্বারা ধ্বংস করেছিল এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে। ■

মৃত্যুদানব হুকুমের অপেক্ষায়

কার্ল সাগান

পৃথিবীতে এক সভ্য নাগরিক সমাজের ওপর প্রথম আণবিক বোমা বর্ষণের এই একচল্লিশতম বর্ষ। হিরোশিমার দেড় লক্ষাধিক মানুষ সেদিন একটি মাত্র আণবিক বোমায় প্রাণ হারায়।

আজকের পরমাণু অস্ত্র আরো ভয়ংকর। এবং যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্ত্রাগারে আজ এই মারণাস্ত্র প্রচুর সংখ্যায় মজুত। যে বোমা হিরোশিমা ধ্বংস করেছিল তার চাইতে এই বোমা শত শত গুণ শক্তিশালী। মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়ার মজুতখানায় বর্তমানে প্রায় ষাট হাজার পরমাণু অস্ত্র রয়েছে। উদ্যত এই মৃত্যুদানব ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য শুধু হুকুমের জন্য অপেক্ষা করছে।

এক মেগাটন পরমাণু বোমার একটি মাত্র যদি নিক্ষিপ্ত হয় কোনো আধুনিক শহরে তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হিসাব করে দেখেছে, যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে যে পরিমাণ সমরাস্ত্র রয়েছে তার মাত্র এক তৃতীয়াংশ ব্যবহৃত হলেই এক থেকে দু হাজার মিলিয়ন নরনারীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হবে।
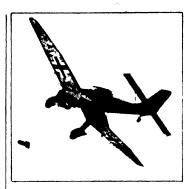
মাত্র চার দশক আগে ছিটকে উঠেছিল বারুদ, রক্ত আর তেজস্ক্রিয় মেঘ, যার রেশ এখনো বর্তমান। তবু এরই মধ্যে নতুন যুদ্ধের কথা ভাবতে বসেছি আমরা।

তাছাড়া পরমাণু যুদ্ধের আছে সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া। বিধ্বস্ত নগরী থেকে উত্থিত বিষাক্ত ও তেজস্ক্রিয় বায়ুমণ্ডল জীবিত প্রাণীকুলকেও বিপন্ন করে তুলবে। রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকবে না তাদের। ধ্বংস হয়ে যাবে হাসপাতাল, ডাক্তার, স্বাস্থ্য পরিবেশ সব কিছু। নির্বাধে ছড়িয়ে পড়বে মহামারী এবং মৃত্যুজাল।

বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি যে তথ্য দিচ্ছেন তাতে জানা যাচ্ছে কোনো নগরীতে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ ঘটলে তার ফলে এক পরমাণু-ঝড় সৃষ্টি হবে পরিবেশে, সূর্যালোক আবৃত হয়ে রাত্রি নামবে চারদিকে। ফসল যাবে সব মরে। না খেতে পেয়ে মরতে হবে কোটি কোটি মানুষকে।

এক কথায় সমগ্র বিশ্বসভ্যতা আজ চরম বিপদের মধ্যে। এ বিপদ পৃথিবীর তাবৎ মানবসমাজের। ব্যাপারটা শুধু প্রধান পরমাণু

রাজনৈতিক বেড়ার ওপারে একই প্রজাতির লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে শুধু নয়, গোটা পৃথিবীর জীবকুলকে বিনাশ করার জন্য এগিয়ে চলেছে আধুনিক প্রযুক্তির ফসল

শক্তিধর যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত ইউনিয়নের নয়, বা ব্রিটেন, ফ্রান্স, এবং চীনের নয়— পৃথিবী নামক গ্রহের সকল জীবের প্রশ্ন এতে জড়িত। যে কোনো একটা দেশে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটলে অন্য দেশগুলিও তাতে আক্রান্ত হবে।

মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন যাতে তাদের পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা স্থায়ী ভাবে বন্ধ করে দেয় তার জন্য এই মঞ্চ থেকে পাঁচটি মহাদেশের প্রতিনিধিরাই আবেদন জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে দু-তরফের মধ্যে যদি কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত হয় তাহলে কেউ যাতে তা খেলাপ না করে তার জন্য তদারকি ব্যবস্থা আবশ্যক। দু'দেশেই নির্দিষ্ট এলাকায় ভূকম্প সন্ধানী যন্ত্রপাতি থাকবে যাতে গোপনে কেউ পারমাণবিক পরীক্ষা চালালেই ওই যন্ত্রে ধরা পড়বে। এমন একটা চমৎকার ব্যবস্থা চালু করার জন্য ইতিমধ্যেই আমেরিকার একটি বেসরকারি সংস্থা ন্যাশনাল রিসোর্সেস ডিফেন্স কাউন্সিল এবং সোভিয়েত আকাদমি অব সায়েন্স-এর মধ্যে চুক্তি হয়েছে।

এখন সরকারি ভাবে এ নিয়ে আলোচনায় প্রথম আমেরিকা যুক্তিসহভাবে এগিয়েছিল। কিন্তু বাগড়া দেয় রাশিয়া। ষাট এবং সত্তরের দশকে আমেরিকা যখন বলে—দু' দেশেই পরীক্ষাযন্ত্র বসানো হবে, রাশিয়া তাতে আপত্তি করে।

আবার এখন যখন রাশিয়া এগিয়ে এসেছে, আমেরিকা আজ নানা ফ্যাকড়া তুলে বলছে ওতে অনেক অসুবিধা আছে। কতোটা দেশ রক্ষামূলক অস্ত্র আর কতোটা আক্রমণাত্মক এনিয়ে নানা বিতর্ক অবস্থাকে ঘোরালো করে।

উনিশ শ' তেষট্টিতে কিউবাকে কেন্দ্র করে দুই মহাশক্তিধর মুখোমুখি হয়ে পৃথিবীকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত প্রথমে মারকিন প্রেসিডেন্ট জন· এফ· কেনেডি একতরফাভাবেই ভূপৃষ্ঠে পরমাণু পরীক্ষা বন্ধের কথা ঘোষণা করেন। এক সপ্তাহের মধ্যে একই কথা ঘোষণা করেন সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভ। এ যেন কে বেশি শান্তিকামী তার প্রতিযোগিতা দেখলাম আমরা।

ইয়েমেন-এ যৌথ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে সোভিয়েত তার আগের আপত্তি তুলে নিল। আমেরিকাও রাষ্ট্র সংঘে হাঙ্গেরির প্রতিনিধিত্ব নিয়ে তাদের প্রতিবাদ প্রত্যাহার করে। অল্প দিনের জন্য হলেও এক সুন্দর সৌহার্দ্যের পরিবেশ পেলাম আমরা। সীমাবদ্ধভাবে পরমাণু পরীক্ষা বন্ধের চুক্তি হল উভয়ের মধ্যে উনিশ শ' তেষট্টিতে। এই দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো যায়, চেষ্টা থাকলে ওই সামরিক ব্যবস্থাকে স্থায়ী করা যায়।

এটা চ্যালেঞ্জার আর চেরনোবিল দুর্ঘটনার বছর। উপরে উঠেই জ্বলে গেল মারকিন শাটল রকেট চ্যালেঞ্জার। সোভিয়েত পরমাণু কেন্দ্রে ঘটে গেল ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। দুটো ঘটনাতেই প্রাণ হারালো বহুলোক। অথচ দুটোই ওদের গর্বের জিনিস ছিল। দুটির জন্যই অন্ত ছিল না সাবধানতার। তবু বিপর্যয় ঘটল। এই অবস্থায় প্রমাণ হল, উচ্চ প্রযুক্তিবিদদের যত রকম আশ্বাস আর প্রতিশ্রুতিই উচ্চারিত হোক, এর ওপর আর নির্ভর করা অসম্ভব।

মঙ্গলগ্রহ থেকে কল্পনার কোনো জীব যদি আমাদের পৃথিবীতে এসে দেখে যে, আমরা নিজেদের ধ্বংস করার জন্য নিজেরাই এত আয়োজন করছি, সে আমাদের পাগল বলে সাব্যস্ত করবে। তোমরা মরো বলে অভিশাপ দিয়ে যাবে।

পরমাণু অস্ত্রের কথা ছেড়ে দিলেও কেবল অন্যান্য সাধারণ যুদ্ধাস্ত্রের জন্য বিশ্বে প্রতি বছর এক ট্রিলিয়ান ডলার অর্থ ব্যয় হয়। একদিকে এই কোটি কোটি টাকা ব্যয়, অপরদিকে অশিক্ষা, অপুষ্টি অনাহার, শিশুমৃত্যু দুর্ভিক্ষ চলছে—পৃথিবীর বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে, শুধু দারিদ্র্যের কারণে। এর কোন নৈতিক কৈফিয়ৎ আছে কোনো তরফের? মঙ্গলগ্রহ থেকে কল্পনার কোনো জীব যদি আমাদের পৃথিবীতে এসে দেখে যে আমরা নিজেদের ধ্বংস করার জন্য নিজেরাই এত আয়োজন করছি সে আমাদের পাগল বলে সাব্যস্ত করবে। তোমরা মরো বলে অভিশাপ দিয়ে যাবে।

আমি জ্যোতির্বিজ্ঞানী। পৃথিবী ছাড়িয়ে সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ আবিষ্কার করা আমরা সাধনা। আমার কাজে রকেট ও পরমাণুবিদ্যার প্রয়োগ করি। তবে এই কাজের সময় আমার মনে হয় যেন কোনো দেবতা এসে বলছেন, আমি তোমাদের এই বিরাট শক্তি দিয়েছি। ইচ্ছে করলে এই শক্তি দিয়ে নিজেদের শেষ করতে পারো। আর যদি চাও গ্রহে, নক্ষত্রলোকে পৌঁছে যেতে পারো তোমরা। অর্জন করতে পারো পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য অনেক হিতকর অবস্থা। কোনটা তোমরা চাও?

মেকসিকোর ইসতাফায় নির্জোট সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ [illegible]

ক্ষমা নেই মানবতার শত্রুকে

জন কেনেথ গলব্রেথ

এই বিশেষ সমাবেশে কেন আমি এসেছি সেই কথাটা আগে বলে নিই। আমি এই কথাটাই আপনাদের জানাতে চাই, গণতন্ত্রের এখনো মৃত্যু হয়নি। মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট আমার প্রাক্তন ছাত্র। গ্রীস-এর প্রধানমন্ত্রী আমার সহকর্মী-শিক্ষক। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এমন এক পরিবারের, যার সঙ্গে আমার স্ত্রী এবং আমার দীর্ঘ ত্রিশ বছরের ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। আমার এখানে উপস্থিতি দেখে নিশ্চয়ই অবাক হবেন না কেউ।

নিউক্লিয়ার ক্রুশিফিকেশন

শিল্পী : অ্যালেক্স গে

গত দুদিন এখানে যে বিশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে তা জানাই। মিউজিয়মে যে অধিবেশন চলছে সেখান থেকে আমার সহকর্মীদের বক্তব্যের সারাংশ সুস্পষ্টভাবে, ভাবাবেগ, বাক্যালঙ্কার পুরো বর্জন করে বলছি। তাঁদের সুনির্দিষ্ট কথা, আপনারা এখান থেকে পরমাণু পরীক্ষা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার নীতি জোরের সঙ্গে ঘোষণা করুন।

আমি আবার বলছি, এটি এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি-সমাবেশ। রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রিগণ টাকাকড়ি নিয়ে আলোচনায় বসেননি। আলোচ্য এখানে, সামূহিক মৃত্যুর হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষার জরুরি প্রসঙ্গ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিসভাও এখন পরমাণু পরীক্ষা বন্ধকে স্থায়ী করার বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। আমি আনন্দিত, যে দেশের আমি নাগরিক তাঁরা এই পরমাণু পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের পক্ষেই প্রস্তাব নিতে যাচ্ছেন। এই সমাবেশও একই দাবি তুলছেন। কেবল সীমাবদ্ধ নিষিদ্ধকরণ নয়, পুরোপুরি পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা, নির্মাণ বন্ধ করার যে দাবি আজ দিকে দিকে উঠেছে তারই প্রতিধ্বনি হবে এই সমাবেশের সিদ্ধান্তে। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখতে হবে এখান থেকে।
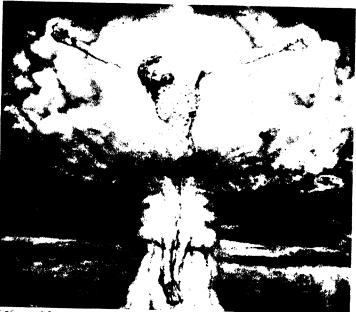
আমার মহান ও প্রিয় বন্ধু, মাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনলজির অধ্যাপক রিসোনার যে কথা বলেছেন এবং অধ্যাপক কার্ল সাগান উদাত্ত স্বরে যাকে সমর্থন করেছেন সেই পদক্ষেপ আপনারা নিন। আপনারাও বলুন, যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে এবং সামরিক সংগঠনের কুক্ষিতে পরমাণু বিজ্ঞানের যে তথ্য গোপন রয়েছে, তার আবরণ খুলে ফেলতে হবে। আপনাদের উদ্যোগে গঠিত হোক এক স্বাধীন বৈজ্ঞানিক তথ্যকেন্দ্র, সব তাদের পরিজ্ঞাত হবে। পরিজ্ঞাত হবে তারা নক্ষত্র যুদ্ধের তথ্যাবলীও। বিশ্বশান্তির এটি হবে এক মহৎ প্রতিশ্রুতি।

বিশ্বমৈত্রী : জেনেভায় লীগ অফ নেশনস-এর মন্ত্রণাকক্ষের ছাদের অলঙ্করণ

একটা কথা বলতেই হবে। আমরা সবাই যেন সমরশক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছি। ছোট-বড় সব দেশের সরকারই যেন তুলনামূলক বৃহত্তর শক্তিধরদের দিকে তাকিয়ে আছে, নজর রাখছে অধিকতর সমৃদ্ধ সমর সংগঠনের দিকে। এটা সত্য, যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, হয়তো সত্য সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রেও। এবং বিশ্বের অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও এই অবসথা বিদ্যমান বলে মনে হয়। সাম্প্রতিককালে আমরা সামরিক শক্তি নিয়েই বেশি সআলোচনা করতে চাই। এক সামরিক শক্তিধর অপর অশক্তিধরকে নিয়ে বেশি চিন্তিত। আমরা চিন্তিত এই শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাজনীতিক ও বিজ্ঞানীদের নিয়ে। কোনো সরকারকেই আমরা শক্তির চূড়ান্ত মঞ্চ ভাবতে চেয়েছি। কিন্তু এখন আমরা দৃষ্টি প্রসারিত করি সরকারকে ছাড়িয়ে সমরশক্তির দিকে। সরকারই যেন সামরিক শক্তির অধীনস্থ আজ।

সর্বশেষে, যত অনিশ্চিতই হোক একটা আশার কথা সকল বক্তাকেই বলতে হয়। আমিও বলব, এই আলোচনায় আমরা যেন নৈরাশ্যবাদী না হই। আমরা যেন এই প্রত্যয়ে দৃঢ় থাকি যে, পৃথিবী আমাদেরই দিকে। আমরা যেন একটা কথা পরিষ্কার জেনে রাখি, আমাদের বিরোধীরা যে পরমাণু মৃত্যুবাণ, যে পারমাণবিক অবসান আমাদের উপহার দিতে পারে, তা কখনো রাজনৈতিক আকর্ষণীয় বস্তু হতে পারে না। মৃত্যুর প্রতিশ্রুতি কখনো ভোটারদের টানতে পারে না। আমরা যদি দুর্বলতা দেখাই, বিশ্বাস হারাই, অন্যরাও আমাদের দুর্বল, সংশয়ী বলে ধরে নেবে। আমাদের বলিষ্ঠ হতে হবে, বিশ্বাসী হতে হবে। প্রয়োজন হলে আমরা যেন কোনোমতেই রাজনৈতিক শত্রুকে আতঙ্কিত করে তুলতে পরাঙ্মুখ না হই।

মেকসিকোর ইসতাফায় নির্জোট সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্ষিতিমোহন সেনকে লেখা : ১৯০৮-১৯৪০

॥ ৬ ॥

ওঁ

জোড়াসাঁকো
কলিকাতা

বিনয় সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—
শাস্ত্রী মহাশয়ের পত্রে আপনার পথযাত্রার যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে আমাদের কোনো অসুবিধা দেখি না—কারণ, জ্যৈষ্ঠের শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ১৫ই জুন পর্য্যন্ত বিদ্যালয় বন্ধ থাকিবে। আপনি যদি ২৫শে মে তারিখেও ছুটি পান তথাপি ২০ দিন সময় হাতে পাইবেন। বিদ্যালয়কে আকৃতি দান, ইহার প্রকৃতিকে উদ্বোধিত করিয়া তোলা কোনো এক ব্যক্তির শাসনাধীনে হইবে না। এ সম্বন্ধে আমি নিজের কর্তৃত্বের দ্বারা বিদ্যালয়কে চালিত করি না। আমি চেষ্টা করি যাহাতে প্রত্যেক অধ্যাপক নিজের শক্তিকে স্বাধীনভাবে এই বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করিতে পারেন—এমনি করিয়া সকলের স্বাধীন সহকারিতায় বিদ্যালয় ক্রমশ গঠিত হইয়া উঠিতেছে। প্রকৃতি ভেদবশতঃ প্রথম প্রথম পরস্পরের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইত এখন ক্রমশ তাহা দূর হইয়া বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রত্যেকে নিজের স্বাভাবিক স্থান অধিকার করিয়াছেন ; ক্রমেই বিদ্যালয়টি যান্ত্রিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া জৈবিক ভাব গ্রহণ করিতেছে। আপনিও ইহার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিয়া ইহাকে ভিতরের দিক হইতে উন্মেষিত করিয়া তুলিবেন, এই আশা করিতেছি। ভারতবর্ষে আমরা মিথ্যার জালে জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছি—বিদেশীর কাছে আমাদের বাহ্য অধীনতা কিছুই নহে কিন্তু আমাদের সমস্ত জীবন আমাদের অন্তঃকরণ মিথ্যার দাসত্বে বিক্রীত। ইহাই আমাদের সমস্ত দুর্গতির কারণ। আমাদের বিদ্যালয়ে সত্যের যেন অবমাননা না হয়—ছাত্রেরা যেন সত্যকে নির্ভয়ে স্বীকার করিয়া জীবনকে ধন্য করিতে পারে সেই পরম শক্তি তাহাদের মধ্যে সঞ্চার করিতে হইবে—এই আমার একান্ত কামনা জানিবেন। ইতি ১১ই বৈশাখ ১৩১৫ [২৪· ৪· ১৯০৮]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৭ ॥
ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

বিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—
এখানকার কাজের তাগিদে চলিয়া আসিতে হইল। কিন্তু আপনাদের ছাড়িয়া আসিবার ইচ্ছা ছিল না। এখানকার কাজে আমি একলা—সেখানে আপনাদের সকলের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিবার আনন্দ আমাকে নড়িতে দিতেছিল না। বিশেষত আপনার সঙ্গে পরিচয় ঘনাইয়া তুলিবার ইচ্ছাও মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমার সেখানকার মৌচাকে মধু বেশ ভরিয়া উঠিবার মুখেই আমাকে চাক ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে হইল—মনটা এখনো সেইদিক চাহিয়াই ভন্ ভন্ করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে।
আপনি মনে করিতেছেন আপনি কেবল আপনার ছাত্রদের লইয়াই কাজ করিবেন- –সেটা আপনার ভুল। আমরাও আছি। রসের অভাব হয়, পাথেয় কম পড়িয়া যায়—পরস্পরের কাছে ধার না লইলে মাঝে মাঝে পথের ধারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতে হয়। ছাত্রদিগকে পাইয়া আমাদিগকে অবহেলা করিবেন না।

বিদ্যালয়ের মধ্যে যে সত্যের আবির্ভাবকে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ দেখিতে চাই আমাদের নানাবিধ দৈন্যবশত তাহার ব্যাঘাত ঘটিতেছে। যিনি আবিঃ তিনি বিদ্যালয়ে আমাদের কাছে আবির্ভূত হইতেছেন না। এই কয়দিনে মনে এই আশা লইয়া আসিয়াছি যে এবার আপনার জীবনও আমাদের এই প্রার্থনায় যোগ দিবে—আবিরাবীর্ম্ম এধি । আমাদের চিন্তা, আমাদের ইচ্ছা, আমাদের চেষ্টা অহোরাত্র সত্য হউক এই কামনা অনেকদিন হইতে করিতেছি—আপনাকে পাইয়া আজ বল পাইলাম।

বিদ্যালয় সম্বন্ধে আপনি যেরূপ ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করেন করিবেন। আপনার কাজের পথ আপনার নিজেকেই কাটিয়া লইতে হইবে—আমি কেবল এই দেখিব যাহাতে আপনার কোনো অনাবশ্যক ব্যাঘাত না ঘটে। উপকরণের মধ্যে অভাব, এমনকি, প্রতিকূলতা যথেষ্ট আছে কিন্তু মঙ্গল চেষ্টামাত্রই বিঘ্নের দ্বারাই পরিণত হইয়া উঠে। ঈশ্বরের কাছ হইতে সফলতা পুরস্কার প্রতিদিন হাতে হাতে চুকাইয়া লইবার চেষ্টা করিব না—মজুরি বাকি ফেলিয়াই চলিব; অকৃতার্থতার দ্বারাও তাঁহার পূজা করিব—এই যদি পারি তবেই জানিব কাজ অগ্রসর হইতেছে। নহিলে তাঁহার পূজা ছাড়িয়া কাজেরই পূজা হইবে।

আপনার সঙ্গে মিলনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। এখানকার কাজে ছুটি পাইলেই দৌড় দিব।

আমাদের কোষাধ্যক্ষের সঙ্গে সেই রান্নাঘর প্রভৃতি সম্বন্ধে পরামর্শ চলিতেছে। আপনিও তাঁহার সঙ্গে মন্ত্রণা করিবেন। অজিতকেও ডাকিবেন। অন্য অধ্যাপক যাঁহারা আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের সকলের সঙ্গে আপনাদের সম্পূর্ণ ঐক্য ভাবের দিক হইতে বা প্রণালীর দিক হইতে হয়ত হইবে না। কিন্তু যাঁহারা কাছে আসিতে চান তাঁহাদিগকে দূরে ঠেলা চলে না। সমস্ত অনৈক্য সত্ত্বেও ধৈর্য্যের সহিত তাঁহাদেরও স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে। অমিলকে মিলাইয়া লইবার জন্য পথের যেটুকু দীর্ঘতা বাড়িয়া যায় তাহা স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। কাজ জিনিষটা ত কেবল সঙ্কল্পমাত্র নহে—বস্তুর বিচিত্র বিরোধের মধ্যেই ভাবকে আকার গ্রহণ করিতে হয়—নিতান্তই যেটুকু অনুকূল তাহাই সৌখীনভাবে বাছিয়া লইবার জন্য অপেক্ষা করিলে চলে না। যাহারা যোগ দিতে চায় তাহারা যে যেমন হোক্ সবাইকে বেশ বড় রকম করিয়া টানিয়া যদি একটা মোটারকম করিয়াও কাজের কাঠামো খাড়া করা যায় সেও ভাল—অতিমাত্র সংশয় এবং বিতর্ক এবং ভাববিলাসিতা আমাদিগকে যেন না পাইয়া বসে—একেবারে বড় রাস্তায় আমাদিগকে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে—সেখানে ধূলাকাদা এবং বাজে লোকের ভিড় আছে বটে কিন্তু তেমনি বৃহৎ আকাশ, খোলা বাতাস এবং উদার আহ্বান আছে। Whitman এর Song to the Open Road পড়িয়া দেখিবেন। ইতি ৫ই শ্রাবণ ১৩১৫ [২১·৭·১৯০৮]

ভবদীয় শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৮ ॥

ওঁ

সন্ন্যাসী ঠাকুর

লক্ষেশ্বর শেষকালে গেরুয়া ধরলে। তোমার চেলাধরা ব্যবসা দেখচি। এবার তার সঙ্গে ভাবে ব্যবসা করে লাভের অংশ কিছু দিয়ো—আমারও অংশীদার হবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু আমার দেরি আছে দেখ্‌চি, সব ব্যবসা এখনো ছাড়বার মত সময় হয় নি। তোমার চেলাকে এসরাজ যন্ত্রটা নিয়ে যাবার কথা বলেছিলুম—জানিনে কি করেচে —পথের মধ্যে পাথেয়ের অভাব ঘটলে ঐ যন্ত্রটার সাহায্যে কিছু উপার্জ্জন করে তোমাদের সেবায় দিতে পারত। আমার প্রভু আমাকে কেবলি পুঁথি চিত্র বিচিত্র করে লিখতেই শিখিয়েছেন, সেটা যে পেট ভরবার বিদ্যা নয় তা বেশ বুঝতে পেরেচি। কিন্তু তোমার চেলা তার বাদ্যযন্ত্রটির যোগে হয়ত ঝুলি ভরে আনতেও পারে। এ কাজ সে কলকাতায় দু একবার করেচে।—কিন্তু আমি ভাবচি তোমরা যে একালি বাঙালী পাঠশালা-পলাতক, পশ্চিম দিগ্বিজয়ে চলেচ—রাজা তোমাদের প্রতি সন্দেহ করবে না ত? মাঝে মাঝে কোতোয়াল তোমাদের তল্লি ঝাড়া দেবে সন্দেহ নেই। আমাদের আশ্রম শূন্য হয়ে এল। ছেলেদের মধ্যে কেবল পটল ও ভোলা আছে—অধ্যাপকদের মধ্যে শাস্ত্রীমশায়, শরৎবাবু ও যতীন এবং বাজে লোকদের মধ্যে ম্যানেজারবাবু ও আমি, ডাক্তার আজ যাচ্চেন সঙ্গে যাবেন হীরালাল, প্যারীকে খুব কুইনীন ঠুকে খাড়া করা হয়েছে—সেই খুঁটির জোর আবার যখন ক্ষীণ হয়ে আসবে তখন আবার হয়ত সে কাৎ হয়ে পড়বে। তেজেস লাইব্রেরির মধ্যে নিমগ্ন। আমার সম্বন্ধী কাল বোধ হচ্চে যাবে। বেলা পিসীমা ত আগেই গেছেন।

তোমার নাতি ভূপেনবাবুর সঙ্গে সাহেবগঞ্জে গেছে। প্রতাপ মজুমদার আমার বোট অধিকার করাতে আমার যেতে দেরী হবার আশঙ্কা হয়েচে। সেদিন পর্য্যন্ত তোমার নাতি ভূপেনবাবুর আতিথ্য আশ্রয় করে থাকবে। তোমার নাতি সম্বন্ধে আমার মন উৎকণ্ঠিত আছে। মাঝে মাঝে আমার নাতিটির এর সন্ন্যাসী ঠাকুরের খবরটা যেন পাওয়া যায়। ইতি ১১ই আশ্বিন ১৩১৫

ত্বদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৯ ॥

ওঁ

প্রীতি নমস্কার নিবেদন—

সেই ছেলেটির জন্য ব্রজেন্দ্রবাবুও বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। তাহার একজন অভিভাবক বিশেষভাবে আমাকে ধরিয়া পড়িয়াছেন—আমাদের অসম্মতি মানিতেছেন না—আমি আপনাদিগকে সম্মত করাইবার জন্য তাঁহাকে চেষ্টা করিতে বলিলাম।

ওঁ শিলাইদহ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—
এবারকার

[illegible] চলিয়া আসিতে হইল, কিন্তু আপনাদের ছাড়িয়া আসিবার ইচ্ছা ছিল না। এবারকার মত আমি এবার— আপনাদের সকলের সঙ্গে মিলিয়া এবং [illegible] আনন্দ [illegible] দিতেছিলাম। বিশেষত আপনার সঙ্গে [illegible] ভুলিবার ইচ্ছাও মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু আমার [illegible] মধু বেশ [illegible] মুখেই আমাকে তাহা ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে হইল— মনটা এখনো সেইদিকে তাকাইয়া [illegible] করিতেছে।

আপনি মনে করিতেছেন আপনি কেবল আপনার ছাত্রদের লইয়াই কাজ করিবেন— সেটা আপনার ভুল। আমরাও আছি। [illegible] হয়, আমাদের কম পড়িয়া যায়— [illegible] মাঝে মাঝে [illegible] দ্বারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। ছাত্রদিগকে লইয়া আমাদিগকে একেবারে ভুলিবেন না।

বিদ্যালয়ের মধ্যে যে সত্যের আবির্ভাবকে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ দেখিতে চাই আমাদের [illegible] দৈন্যবশত তাহার ব্যাঘাত ঘটিতেছে। যিনি আবিঃ [illegible] তিনি বিদ্যালয়ে আমাদের কাছে আবির্ভূত হইতেছেন না। এই কয়দিনে মনে এই আশা লইয়া আসিয়াছি

তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া যাহা উচিত বিবেচনা করেন করিবেন। প্রিন্সিপল নামক একটা আধুনিক জুজু আছে আমি তাহাকে খুব বেশি ভয় করি না—আমি নিয়ম একেবারে মানি না তাহা নয় আবার তাহাকে অত্যন্ত বেশি সম্মান করাকেও আমি পৌত্তলিকতা বলিয়া মনে করি। কিন্তু আমার এ কথাটাকে খুব বড় করিয়া ধরিবেন না। দরিদ্রকে অনেক সময়ে আমরা ফিরাইতে পারি না—যে রুদ্ধ দ্বার নিয়মের অর্গলে বদ্ধ, করুণা তাহাকে বিচলিত করিতে পারে। ধনীর সন্তানকেও দয়া করিবেন। তাহারা নিজের দোষে ধনীর ঘরে জন্মায় নাই—তাহারা অনেক বিষয়ে দরিদ্রের চেয়ে অনেক বেশি হতভাগ্য—এজন্য তাহাদের প্রতি চিত্তকে বিমুখ করিবেন না। ধনের দৌর্ভাগ্যের প্রতি আপনার কঠোরতা আছে বলিয়াই এটুকু বলিলাম। রসিকবাবু যখন তাঁহার পুত্রকে অল্প বেতনে দিতে চাহিলেন তখন ক্ষতির কথাটাকে বড় করিয়া তুলিতে পারি নাই—ইঁহারাও যেরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে ইঁহাদিগকে সম্পূর্ণ বিমুখ করিতে কষ্ট বোধ করিতেছি। কিন্তু আমার এ দয়া সম্ভবত দুর্ব্বলতা—সেই জন্যই কর্ত্তব্যতার মীমাংসাভারও আপনাদের প্রতি দিলাম। আপনারা যেরূপ স্থির করিবেন তাহাই চরম হইবে। অবশ্য অর্থলাভের কথা চিন্তনীয় নহে—কিন্তু মানুষকে মানুষ বলিয়া বেদনা বোধ করিতে হইবে—সে ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেও [১৫·৭·১৯০৯]

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১০ ॥
ওঁ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—
আপনাদের রোগীটি হঠাৎ নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই আজ সকালে এসে পৌঁচেছেন। দেখা যাক্ পদ্মার পরিচর্য্যায় তিনি কি রকম ফল পান। আজ এইমাত্র ত মৌরলামাছের ঝোল দিয়ে বেশ পরিতৃপ্তিপূর্ব্বক আহার সমাধা করে বোটের জালনা থেকে প্রকৃতির শোভা সম্ভোগ করচেন——বোধ হচ্চে মনটিও বেশ আরাম পাচ্চে। আমার একটি প্রস্তাব আছে। আমি আপনার রাজ তহবিলে সর্ব্বদা ৫০ টাকা মজুত রাখতে চাই, অর্থাৎ যেমন খরচ হতে থাকবে অমনি পূরণ হতেও চল্‌বে। টাকাটা আপনি আমার কাছ থেকেই পাবেন এবং হিসাবও আপনি আমার কাছেই দাখিল করবেন। হাঁসপাতাল, এমনকি বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় অত্যাবশ্যক খুচরা জিনিশপত্র আনাইয়া লওয়া সম্বন্ধে যাহাতে আপনাকে পরমুখাপেক্ষী হয়ে না থাকতে হয় এই আমার অভিপ্রায়। এখান থেকে অনঙ্গকে আপনার হাঁসপাতালের সহকারীরূপে পাঠাব—তার মাসিক দশটাকা বেতন আপনি এই তহবিল থেকেই দেবেন। অনঙ্গ সেবাপরায়ণ বলেই এখানে প্রসিদ্ধ। সে ব্রাহ্মণ সুতরাং বিশেষ প্রয়োজন হলে রোগীদের রেঁধেও খাওয়াতে পারবে। দরকার হলে বোলপুর থেকে জিনিষ কিনেও আনবে। অর্থাৎ বিশেষভাবে তাকে আপনি ও অন্নদা স্বেচ্ছামত কাজে লাগাতে পারবেন—সে আর কারো কাছেই দায়ী থাক্‌বে না। এই টাকাটা মনে করচি আজকালের মধ্যেই মানি অর্ডর যোগে আপনাকে পাঠাব—এর পরে কখন অচিরে আমার দুঃসময় উপস্থিত হবে তখন আবার বিঘ্ন ঘটতে পারে। সম্পূর্ণ পঞ্চাশ টাকাটা শেষ হবার পূর্ব্বেই আমার কাছ থেকে পূরণ করে নেবেন—কারণ, একেবারে ৫০ টাকা দেওয়া অনেক সময়েই হয়ত আমার পক্ষে ক্লেশসাধ্য হতে পারে।
কিরণ সিংহকে ডাক্তার নিযুক্ত করা সম্বন্ধে আমি ত উৎসাহ বোধ করিনে। প্রথমত তাকে চিনিনে—দ্বিতীয়ত সেবকান্নে পুরাতনং। দিনু বালিকা বিভাগ সম্বন্ধে নানা কথা লিখেছে—তৎসম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য তাকে বলে দিয়েছি। কেবল একটা অংশ উদ্ধৃত করে দিই :—"হিরণ সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত একলা যেরকম পরিশ্রম করচে তুমি থাকলে হত কিনা বলতে পারিনে।" এ কথাটা যদি সমূলক হয় তাহলে এর মূলোচ্ছেদন করতে ত বেশি সময় লাগা উচিত নয়।
ধীরেনের অভিভাবককে অদ্যই পত্র লিখে দিচ্চি।
আপনার শরীর সুস্থ ও সবল হয়ে উঠেছে সংবাদ পেলে নিশ্চিন্ত হব। মীরাকে বোলপুরেই রেখে তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। মোহিতবাবুর স্ত্রীর সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা বিহিত নিশ্চয়ই আপনি তাহার ত্রুটি করিবেন না। তাঁহার জন্য আমি উদ্বিগ্ন আছি। ইতি ৭ই শ্রাবণ ১৩১৬ [২৩-৭-১৯০৯]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র পরিচিতি

॥ পত্র ৬ ॥

শাস্ত্রী মহাশয়—বিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রী (১২৮৫—১৩৬৪ বঙ্গাব্দ)। ক্ষিতিমোহন সেনের বাল্যবন্ধু। সতের বছর বয়সে কাব্যতীর্থ উপাধি পান। কাশীতে মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণির কাছে বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। তারপর ১৩১১ বঙ্গাব্দে যোগ দেন শান্তিনিকেতনে। ৩০ বৎসর তিনি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করেন। ক্ষিতিমোহনকে শান্তিনিকেতনে যোগদানের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে পত্র দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে বিধুশেখর সব কিছু অবহিত ছিলেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বিধুশেখরকে যে পত্র দিয়েছিলেন সেটিও শাস্ত্রীমহাশয় ক্ষিতিমোহনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পত্রটি পরে প্রকাশিত হবে।

॥ পত্র ৭ ॥

শান্তিনিকেতনে যোগদানের পর পত্রটি লিখিত। অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬—১৯১৮) আঠারো বৎসর বয়সে বি এ পাস করার পর শান্তিনিকেতনে শিক্ষকরূপে যোগ দেন এবং দশ বৎসর শিক্ষকতা করে আঠাশ বছর বয়সে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন। সাহিত্য, সঙ্গীত, অভিনয়ে তিনি ছিলেন দক্ষ। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শ রূপায়ণে তিনি ছিলেন অন্যতম সহায়ক। শুধু তাই নয় রবীন্দ্রসাহিত্যের একজন প্রধান ব্যাখ্যাতা হিসেবে তিনি সুপরিচিত। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে বৃত্তি নিয়ে ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য বিলাত যান। উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত অনুবাদ ইউরোপে প্রকাশিত হবার আগেই অজিতকুমারের অনুবাদ বিলেতে প্রচারিত হয়।

॥ পত্র ৮ ॥

সন্ন্যাসী ঠাকুর—ক্ষিতিমোহন সেন। নাট্যসংলাপের সঙ্গে মিল রেখে 'শারদোৎসব' (৭ ভাদ্র ১৩১৫) নাটক অভিনয়ের পর লিখিত। এই নাটকে প্রধান অংশে অভিনয় করেছিলেন: সন্ন্যাসী-বিজয়াদিত্য—ক্ষিতিমোহন সেন, ঠাকুরদা—অজিতকুমার চক্রবর্তী, লক্ষেশ্বর—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপানন্দ—নরেন্দ্রনাথ খাঁ (ছাত্র) প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রম্টার। এ সম্পর্কে ক্ষিতিমোহন লিখেছেন: 'বর্ষা গেল, খুব ভালো করিয়া শারদোৎসব করিবার জন্য কবি উৎসুক হইলেন। আমাদিগকে বলিলেন, বেদ হইতে ভালো শারদশোভার বর্ণনা খুঁজিয়া বাহির করিতে। সংস্কৃত সাহিত্যের নানা স্থানে খোঁজ চলিল। কবি লাগিয়া গেলেন শরৎকালের উপযুক্ত সব গান রচনা করিতে। একে এক অনেকগুলি গান রচিত হইল। ক্রমে তাঁহার মনে হইল গানগুলিকে একটি নাট্যসূত্রে বাঁধিতে পারিলে ভালো হয়। তাহার পর তৈয়ারি হইয়া উঠিল শারদোৎসব নাটক। এই গানগুলির মধ্যে দুই একটি পুরাতন গানও আছে। যেমন 'তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে' গানটি ১৮৯৪ সালের পত্রে উল্লিখিত।

'ইতিমধ্যে আশ্রমে আমার ঠাকুরদাদা নামটি চলিত হইয়া পড়িয়াছিল। কবি ভাবিয়াছিলেন আমি ভালো গাহিতে পারি, সেইজন্য শারদোৎসবে ঠাকুরদার ভূমিকাটি আমাকে দেওয়া হইবে স্থির করিয়া তাহাতে অনেকগুলি গান ভরিয়া দেওয়া হয়। যখন আমি বলিলাম, গান আমার দ্বারা চলিবে না, তখনও কবির সংশয় দূর হইল না। তিনি অগত্যা অজিতবাবুকে ঠাকুরদাদার ভূমিকা গ্রহণ করিতে বলিয়া আমার উপর সন্ন্যাসীর পাট করিবার আদেশ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও গান আছে, যদিও সংখ্যায় অল্প। তাহা লইয়াও বিপদ বাধিল কিন্তু গান থাকিলেও সন্ন্যাসীর অভিনয় আমি করিব। ঠিক হইল, গানের সময় বাহিরে আমার অভিনয় চলিলেও ভিতর হইতে রবীন্দ্রনাথ গান করিবেন। শারদোৎসব নাটকটি দেখিয়া সকলেই প্রীত হইলেন। বাহিরের লোকেরা আমার গান শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। সকলেই বলিলেন, এতদিনে এমন একজন লোক পাওয়া গেল, যিনি গানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে পারেন। সহজে এই কৃতিত্ব লাভ করিয়া খুব খুশি হইলাম বটে, কিন্তু পরে এইজন্য আমাকে বহু দুঃখ সহিতে হইয়াছিল। যেখানেই যাইতাম লোকে গানের জন্য করিতেন পীড়াপীড়ি। পারি না বলিলে কেহ বিশ্বাস করিতেন না, তাঁহার স্বকর্ণকে কেমন করিয়া অবিশ্বাস করিবেন। বহুদিন পর্যন্ত আমার দুর্গতির আর অন্ত ছিল না।' একটানা এক ঠাঁয়ে আঠার ঘন্টায় কবি শারদোৎসব নাটক লিখে শেষ করেন। এই পাণ্ডুলিপি ক্ষিতিমোহনকে পরে রবীন্দ্রনাথ উপহার দেন।

পশ্চিম দিগ্বিজয়—অভিনয়ের পর ক্ষিতিমোহন, দিনেন্দ্রনাথ ও অজিত কুমারের উদ্যোগে একটি ছাত্র অধ্যাপক দল দিল্লি, অমৃতসর, লাহোর বেড়াতে যান।

শরৎবাবু—শরৎকুমার রায় (১৮৭৮—১৯৩৫)। বরিশালের জমিদার বংশে জন্ম। এম. এ. পাস করে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকরূপে যোগ দেন। এবং ১৯১৫ সালে আশ্রম ত্যাগ করেন। সতীশচন্দ্র রায়ের সতীর্থ শরৎকুমার বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে তিনি বাংলার ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। শুধু তাই নয় বিভিন্ন সময়ে তিনি 'হিতবাদী', 'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি' প্রভৃতি পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। 'বুদ্ধের জীবন ও বাণী', 'শিবাজী ও মারাঠা জাতি', 'শিখগুরু ও শিখ জাতি' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

পটল—জগদানন্দ রায়ের পুত্র ত্রিগুণানন্দ।

ভোলা—শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র, ভাল নাম সরোজ।

শাস্ত্রী মহাশয়—বিধুশেখর শাস্ত্রী।

ম্যানেজারবাবু—রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

যতীন—যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। স্বদেশী যুগে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কলেজ বিভাগে পড়ে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করতে আসেন। উচ্চশিক্ষার জন্য আশ্রম ত্যাগ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেন। পরে অন্যত্র চাকরি শুরু করেন।

হীরালাল—হীরালাল সেন। শিক্ষক। 'হুঙ্কার' পত্রিকার সম্পাদক।

প্যারী—প্যারীমোহন দত্ত।

সম্বন্ধী—নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

ভূপেনবাবু—ভূপেন্দ্রনাথ সেন।

বেলা—মাধুরীলতা দেবী।

পিসিমা—রাজলক্ষ্মী দেবী।

তোমার নাতি—অজিত কুমারের মাতা সুশীলা দেবীকে ক্ষিতিমোহন কন্যা বলে ডাকতেন। অজিতকুমাররা তিন ভাই সেই সম্পর্কে নাতি।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—(১৮৪০—১৯০৫) ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে প্রচার কার্য আরম্ভ করেন। এমনকি ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি বেশ কয়েক বার ইউরোপ ও আমেরিকা যান এবং এই উদ্দেশ্যে একবার গিয়েছিলেন জাপান। ১৮৯৩ সালে শিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচিত হন। পরবর্তী কালে ব্রাহ্মসমাজ ভাগ হলে তিনি কেশবচন্দ্র সমর্থিত নববিধানেই থেকে যান।

তেজেশ—তেজেশচন্দ্র সেন

আমার নাতি—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ পত্র ৯ ॥

ব্রজেন্দ্রবাবু—ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

॥ পত্র ১০ ॥

রোগীটি—অজিতকুমার চক্রবর্তী। বোলপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার হরিচরণ মুখোপাধ্যায় আশ্রম হাসপাতালে প্রতিদিন সকালে কয়েক ঘন্টা করে বসতেন। ওষুধপত্র দিতেন অন্নদাচরণ বর্ধন। অন্নদাচরণ ছিলেন ত্রিপুরার চাঁদপুরের লোক। এঁদের সহকারী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ পাঠালেন অনঙ্গমোহন চক্রবর্তীকে। অনঙ্গমোহন কিছুকাল এই কাজ করে রথীন্দ্রনাথের জমিদারিতে মোটরচালকের কর্ম গ্রহণ করেন।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮২—১৯৩৫) ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদিপর্ব থেকে যুক্ত। সঙ্গীতশাস্ত্রে অভিজ্ঞ দিনেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের বহু গানের সুর স্বরলিপি যোগে সংরক্ষণ করেন। পঁচিশ বছর যাবৎ তিনি বিশ্বভারতীর সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'আমার সকল গানের ভাণ্ডারী' বলেছেন। বেশির ভাগ রবীন্দ্র সঙ্গীতের স্বরলিপি তিনিই রচনা করেন। বহু ভাষায় পণ্ডিত দিনেন্দ্রনাথ কবিতা ও বিদেশী গল্পের অনুবাদ করেছেন।

মীরা দেবী—রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা।

মোহিতচন্দ্র সেন (১৮৭০—১৯০৬) রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে আকৃষ্ট হয়ে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে যোগ দেন। প্রমথলাল সেনের মাধ্যমে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন। তিনি বিদ্যালয়ের আর্থিক অনটনের সময় রবীন্দ্রনাথকে এক হাজার টাকা দান করেন এবং নিজে কঠিন দারিদ্র্যবরণ করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য গ্রন্থ সম্পাদনা তাঁর জীবনের অন্যতম কীর্তি। ১৯০৩ সালের মার্চ মাস থেকে মোহিতচন্দ্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান করে ১৯০৪-এর নভেম্বর পর্যন্ত বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগ ছিন্ন হলেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল আমৃত্যু। মাত্র ৩৭ বছর বয়সে তাঁর অকালমৃত্যু হয়।

'মোহিতবাবুর স্ত্রী'—অধ্যাপক ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের ভগিনী সুশীলা দেবীর সঙ্গে মোহিত চন্দ্র সেনের বিবাহ হয় ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। পত্রে ক্ষিতিমোহনকে তাঁর কথাই বলা হয়েছে।

সংকলক—সুনীল দাস

(ক্রমশঃ)

সিবাকা ফ্লোরাইড
এই ফ্লোরাইড সংরক্ষণ দিয়েছে
Cibaca
Fluoride
Cibaca
Fluoride
toothpaste

আমার রামায়ণ

হিমানীশ গোস্বামী

আমার রামায়ণ? কথাটি ভেবে চিন্তেই ব্যবহার করছি, কেননা কথাটি মোটেই মিথ্যে নয়। আপনাদের রামায়ণ রয়েছে আর আমার থাকতে পারে না? রামায়ণ একরকম নয় সকলেই জানেন-- প্রত্যেকটি রামায়ণে গল্প কাহিনী আলাদা। ইন্দোনেশিয়ায় এক রকম রামায়ণ চালু আছে, দক্ষিণ ভারতে আর একরকম। তা ছাড়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ, তুলসীদাসের বা কাশীরাম দাসের রামায়ণেও কত পার্থক্য! নামের বদল কাহিনীর বদল সত্ত্বেও রামায়ণ রামায়ণই। তা ছাড়া, দেখতে পাবেন রামায়ণ সকলে সবটা মনে রাখতে পারেন না। শিশুরা তো অনেকেই ভুলে যায়-- তারা নিজেদের মতো করে গল্পটা বুঝে নেয়। কেবল শিশুরাই নয়— বড়দেরও ভুল হতে থাকে, নাম ভুল হয়, স্থান কাল ভুল হয়। জীবনের নানা ক্ষেত্রে যেমন ভুল হয়, হাজার হাজার বছরের শ্রুতিপ্রধান রামায়ণও সে ভুল হতে রেহাই পায় না। "সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা রামের মাসী" কথাটা বিনা কারণে সৃষ্টি হয়নি। সীতা রামের মাসী না হতে পারেন, তবে শুনেছি কোনও কোনও রামায়ণে সীতা রামের বোন! আপনারা কি তিব্বতের রামায়ণের কথা জানেন? সেখানে কুবেরের নাম 'কোরে', এটা বোঝা যায়, কিন্তু কুম্ভকর্ণ সেখানে অমলকর্ণ। রাবণের পিতা বিশ্বশ্রবা নন, তিনি রতন! আবার রাবণের নামও সেখানকার রামায়ণে নেই, তিনি সেখানে দশবীর। আবার দেখুন শূর্পনখা ঐ রামায়ণে অনুপস্থিত— তিনি সেখানে ফুরপর! কোথায় শূর্পনখা, কোথায় ফুরপর! আর রামের নাম সেখানে রমণ, সেটা মোটামুটি বোঝা যায়— কিন্তু সীতা সেখানে যে লীলাবতী! তাহলেও কিন্তু তিব্বতের রামায়ণ রামায়ণই।

আরও দেখুন, গত শতাব্দীতে, আজ থেকে একশো বছরেরও বেশি আগে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এডেন থেকে সংগ্রহ করেছিলেন সেখানকার রামায়ণকাহিনী। সে কাহিনীও অদ্ভুত! সেখানে রাবণের নাম দশশির। রাম সেখানে চন্দ্র নন, রাম হায়দার! হনুমান সেখানে হনবীত। সেখানে সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধনের ঘটনা নেই, আছে সমুদ্রের তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ। হনবীত সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে গিয়ে, দশশিরের বন্দিশালা থেকে রাম হায়দারের স্ত্রীকে উদ্ধার করেছিল। এই কাহিনীটি ত্রৈলেক্যনাথ তাঁর অপূর্ব গ্রন্থ 'এ ভিজিট টু ইউরোপ' বইতে আমাদের জানিয়েছেন। আরও কয়েক ডজন রামায়ণ রয়েছে নানারকম কাহিনী, নানা মুনি সে-সব রামায়ণে নানা কথা লিখে গেছেন, তার কোনটা সত্যি?

এত সব কথা বলার কারণ, আমার রামায়ণও যে রামায়ণ হতে পারে— সে জন্য পাঠকদের একটু প্রস্তুত করছি। হঠাৎ আমার রামায়ণ শুরু করলে অনেক পাঠকেরই মনে হতে পারে, কে উনি এলেন যে ওঁর কথা শুনতে হবে, মানতে হবে? আমার একটিই প্রার্থনা, আমার কথা মানবার প্রয়োজন নেই কেবল শুনুন। মনে রাখবেন, আমি কিন্তু বলছি না রামায়ণে সত্যি সত্যি যা ঘটেছিল তা আমি জানি, সত্যি কথা এই— আমি জানি না। তবে আমার মনে হয় রামায়ণে যা বলব হয়ত সে-সব ঘটেছিল। মাইকেল মধুসূদন যে মেঘনাদ বধ কাব্য লিখেছিলেন সেটি রামায়ণের কোথাও কি আগে ছিল? রামের জন্মের আগেই রামায়ণ লেখা হয়ে গিয়েছিল, আবার রামের জন্মের পরও লেখা হয়েছে। এটাও সেই রকমই একটা ব্যাপার! তবে, যেহেতু স্থান-সংক্ষেপ সে-জন্য আমি পুরো রামায়ণ-কথা বিশদভাবে এখানে লিখতে পারব না। সংক্ষিপ্ত কথাই এখানে দেওয়া সম্ভব।

অনেকের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত, বিশেষত পণ্ডিতদের বোঝানো দায় যে একদা আমাদের এই ভারতবর্ষ কেবল পশ্চিমী নয়, সারা দুনিয়াই জয় করেছিল। "আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়" নিজের নামে দ্বীপটির নামকরণ করেছিলেন। সিংহ থেকে সিংহল হয়েছিল, ঠিক তেমনই অসম্ভব এক প্রাচীন কালে, আমাদের দেশের রাজা রামচন্দ্র ইউরোপ জয় করেছিলেন। এর বহু প্রমাণ প্রক্ষিপ্ত অবস্থায় এখানে ওখানে রয়ে গেছে, কিন্তু যেহেতু আত্মবিস্মৃত হওয়া আমাদের স্বভাব সেহেতু আমরা নিজেরাই নিজেদের কীর্তি কাহিনী ভুলে গেছি। প্রাচীনকালে আমরা যেমন উপনিবেশ গড়ে তুলেছিলাম ইন্দোনেশিয়ায়, গড়ে তুলেছিলাম বিরাট বিরাট মন্দির বরবুদুরে, তেমনি একদা আমরা ইউরোপও জয় করেছিলাম। কোথায় সেসব পাব? আছে। প্রমাণ আছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা আত্মবিস্মৃত ছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু নিতান্ত মূর্খ ছিলেন না। বিজয় সিংহ লঙ্কা জয় করে নাম রেখেছিলেন সিংহল, তেমনি বহু নামের মাধ্যমে আমি দেখিয়ে দিতে পারব যে আমরাই, অর্থাৎ এই ভারতবাসীরাই একদিন, যেদিন ভারতের আসন ছিল জগতসভায় শ্রেষ্ঠ, সেই গৌরবের দিনে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাত্রেও জ্ঞাত পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিলাম। এ ব্যাপারে আমি কোনও সাল তারিখ দিয়ে পণ্ডিতদের কোপানলে পড়তে চাই না। অনেকেই বলবেন, অমুক জায়গার অমুক নাম অমুক সালের আগে ছিল না অতএব অমুক সিদ্ধান্তটি নিতান্তই অমূলক। আমার বক্তব্যের চুল-চেরা বিচার আজই করা হবে আমার পক্ষে অবিচার। আমার কোনও কোনও অনুমান এবং তজ্জনিত সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত সঠিক নাও হতে পারে— প্রাচীন ইতিহাসের কোন প্রমাণটিই বা একেবারে চূড়ান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে? কিন্তু দু-একটি অনুমান এবং সিদ্ধান্ত পণ্ডিতেরা বাতিল করলেই সবটাই বাতিল হয়ে যাবে এমন কথাই বা কে বলবেন? আমার অনুরোধ, আমার বক্তব্য বিশ্বাস করে এগিয়ে যান, দেখবেন কোনও গোলমাল নেই!

ভারতবর্ষে রামচন্দ্রের নামেই যে রোম নগরীকে অভিহিত করা হয় এ-কথা শুনলে অনেকেই বলবেন, লোকটি কয় কি? কিন্তু

প্রমাণ

বিষয়টি কেউই জানেন না তাও তো নয়! অযোধ্যা থেকে রামচন্দ্র যখন চোদ্দ বছরের জন্য বেরুলেন তখন থেকে রামের প্রতিটি পদক্ষেপের কথা কোন রামায়ণেই নেই। রামচন্দ্রের চোদ্দ বছর বন-বাসের কথা আছে, কিন্তু তার মধ্যে যে অনেকটাই ফাঁক। হিসেব করতে গিয়ে দেখবেন রামচন্দ্রের বেশ কয়েক বছরেরই কোনও হিসেব নেই। রামচন্দ্র চোদ্দ বছরের জন্য বনে গিয়েছিলেন এটাও আমরা শুনেছি, এবং ভুল করে দণ্ডকারণ্য এবং অন্যান্য অরণ্য সম্পর্কে মনে করি তিনি এইসব জায়গাতেই বোধ করি ছিলেন।

কিছু সময় হয়তো ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি বন-এ যান। বন যে এখন পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী সেই বন-এই রামচন্দ্র গিয়েছিলেন বলে আমার ধারণা। আমার ধারণা, চলতি রামায়ণে একটা গুরুতর ভুল আছে, সেটা হল রামচন্দ্রকে যখন বনে যাবার আদেশ দেওয়া হয় তখন

রামচন্দ্র ছিলেন বিবাহিত ! রামের সঙ্গে সীতার বিবাহ হয় অনেক পরে, এবং সে সীতাও অন্য সীতা। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন শ্বেতা ! সে-কথা পরে বলছি।

রামচন্দ্র গিয়েছিলেন ইউরোপে। ভারত সম্রাট দশরথ ইউরোপের প্রথম সম্রাট হন। তাঁর আগেও ইউরোপে ভারতীয় শাসন কিংবা বিরাট প্রভাব ছিল। প্রাচীন ভারতীয়রা ইউরোপ জয় করেন। তখন সমগ্র মহাদেশের নাম কিছু ছিল না। নাম দেওয়া হয় অরূপা। এটাও পূর্ববর্তী নাম 'অপরূপা' থেকে হয়েছে এই অনুমান পণ্ডিতেরা করলে খুবই চমৎকার হয়। আমি পণ্ডিতদের মধ্যে এই নিয়ে কিছু বিতর্ক হক এটা চাই। দু-একজন পণ্ডিত সমর্থন করলেই আমার চলে যাবে। ঐ সময় আলপ্স্ পর্বত দেখে নামকরণ করা হয় অল্পস্য। কারণটা নিশ্চয়ই ভারতীয়রা হিমালয়ের বিরাটত্বের তুলনায় ইটালির উত্তরের পর্বতকে নিতান্তই নগণ্য মনে করে বলেছিলেন, এবং নাম দিয়েছিলেন এহ্ অল্পস্য। আবার আগ্নেয়গিরির ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাতের পর আমাদেরই পূর্বপুরুষ কেউ বলেছিলেন এতনা ! এত না !! সেই থেকেই সেটির নাম এটনা। কালক্রমে অপরূপা হয় অরূপা, পরে ইউরোপ। কিন্তু জার্মান প্রভৃতি দেশে এখনও অয়রোপা বলা হয়, ইউরোপকে। রামচন্দ্র কেন ইউরোপে গিয়েছিলেন ? রামচন্দ্রকে দশরথ একদিন ডেকে বললেন, রামচন্দ্র ! আমি শুনতে পাচ্ছি আমাদের পশ্চিম উপনিবেশে হুনম্যানগণ বড়ই অত্যাচার চালাচ্ছে। ওরা সংস্কৃতির ধার ধারে না, অপসংস্কৃতির চূড়ান্ত করছে। আসলে, জার্মানি ইত্যাদি অঞ্চলের হুনম্যান অর্থাৎ হুন মানুষ থেকে হনুমান কথাটি এসেছে। এদের ল্যাজ ছিল না। ল্যাজ মানুষের কল্পনাপ্রসূত— অর্থাৎ, যেহেতু হুনম্যান, বা কেবল হুনরা এপ-সংস্কৃতিক, অর্থাৎ ওদের স্বভাব 'এপ' অর্থাৎ বানরের মতো, সেজন্য বানরের বৈশিষ্ট্য দেখানোর জন্য ওটি পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত বলে আমার ব্যক্তিগত ধারণা। 'এপ' সংস্কৃতি থেকেই অপসংস্কৃতি কথাটা এসেছে— এটা মানতে আশা করি পণ্ডিতদের অসুবিধে হবে না। দশরথ আরও বললেন, আমাদের উপনিবেশ রক্ষা ক্রমে আরও একটি কারণে অসম্ভব হয়ে উঠেছে, একদল জংলি আমাদের ভাল ভাল জিনিস ধ্বংস করছে। কিছু করতে গেলেই ত ভণ্ডুল করে দিচ্ছে। দশরথ বললেন, ঐ-সব ভণ্ডুল মানুষদেরও জব্দ করা চাই। এই মানুষদের বিশেষণ 'ভণ্ডুল' দেওয়ার পর কালক্রমে তাদের নাম উচ্চারণ কিংবা স্বরবিকৃতির ফলে ভ্যান্ডাল হয়েছে। কিন্তু রামচন্দ্রকে অরূপা-র দিকে পাঠিয়ে দিয়েই দশরথের দারুণ অনুশোচনা হল। ঐ বিপজ্জনক কাজে রামচন্দ্রকে পাঠিয়ে তিনি এমনই কাতর হয়ে পড়লেন যে তিনি আর মাথা তুলতে পারলেন না। কীভাবে এর মধ্যে প্রক্ষিপ্তভাবে ভরত, কৈকেয়ী, মন্থরা ইত্যাদির কথা এসে গেছে আজ আর তা খুঁজে বার করা সম্ভব নয়। দশরথ যখন রামচন্দ্রকে বন-এ পাঠান তখন লক্ষ্মণ অযোধ্যাতেই ছিলেন না। তা ছাড়া রাজ পরিবারের কোন্ ব্যক্তি কী করল, কী বলল এসব গোপন কথা যে-সব রামায়ণে দেওয়া আছে সে-সব বাইরের লোকের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সে-কারণে রামায়ণের বহু কাহিনীই কাল্পনিক।

বানর (banner)

আসলে রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ দুজনেই ছিলেন বিলাসী। এটাই সম্ভব। সমস্ত অযোধ্যা তখন ঔপনিবেশিক সম্পদে পরিপূর্ণ। রামচন্দ্রের নামই তো হয়ে গিয়েছিল রামবিলাস। একটি সুরার নামও হয়—সে-কারণেই 'রাম' রাখা হয়। রাম যখন ইটালির রামনগর পত্তন করেন তখন তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিল রামবিলাস, যা ইটালির ইতিহাসে দেখবেন একটু বিকৃতভাবে দেওয়া আছে রামিউলাস, বা রোমিউলাস হিসেবে। লক্ষ্মণকে আজও ইউরোপীয়রা লেখেন ল্যাক্সম্যান, অর্থাৎ ঢিলেঢালা বা অগোছাল মানুষ। ল্যাক্স-ম্যান অর্থাৎ লক্ষ্মণের নামও লক্ষ্মণ হয়ত ছিল না। ইটালির লেক অঞ্চল মোরেনা, কোমো অঞ্চলে সম্ভবত লক্ষ্মণ বহুদিন কাটিয়েছিলেন আলস্যে এবং বিলাসিতায়। সে-জন্য রোমিউলাসের ভাইকে লেকস ম্যান বলা হবে কিনা এটাও পণ্ডিতদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। রামচন্দ্র বা রামবিলাসের ভাইয়ের নাম ছিল রেমুস। জমজ ভাই ছিলেন তাঁরা। এঁর কথা কোনও রামায়ণেই নেই। তবে ধরে নিতে হয় রেমুসই ছিল ল্যাকসম্যান, অর্থাৎ অলস মানুষ। রাম ছিলেন বিলাসী আর লক্ষ্মণ ছিলেন অলস। তবে রামচন্দ্র নিজে 'রোম' নাম দিয়েছিলেন কিনা এ নিয়ে ঐতিহাসিক এবং পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলে আমি খুশি হব।

রামায়ণের প্রায় সমস্ত ঘটনাই ঘটেছিল অরূপায়, ভারতবর্ষে নয়, এটাই আমার বক্তব্য। এর প্রমাণ সর্বদা যে পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণে পাওয়া যাবে তা নয়— অনেক সময় পুরাতত্ত্বকে অমান্য করতে হয়, অতিক্রমও করতে হয়, —বিশেষত যেখানে পুরনো কিছুর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও আমাদের পক্ষে সে-সব ধ্বংসাবশেষ নতুন তাত্ত্বিক কোণ থেকে বিচার করা অর্থ ও সময়সাপেক্ষ। সেই কারণেই সাহায্য নিতে হয় নদী, পর্বত, উপত্যকা, শহর, অন্যান্য স্থান এবং মানুষের নামের। তার আগে আমার রামায়ণের মূল বক্তব্য সেরে নিই। যখন রাম অরূপায় রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে যত্নবান হন তাঁর প্রথম কাজ হয় অপরূপায় একটি রাজধানী প্রতিষ্ঠা করা। ইটালির টাইবার নদীর মুখ থেকে সতেরো মাইল দূরের একটি জায়গা তাঁর পছন্দ হয়। সেখানেই তিনি রামরাজ্যের রাজধানী স্থাপনে যত্নবান হন। টাইবার নদীর নাম তখন কি ছিল বলা যায় না। অন্য নামই ছিল। নদীটির তীব্র স্রোত থাকায় নদীটির নাম তীব্র— যা অবাঙালি উচ্চারণে তীব্রা হতে পারে কিনা তা নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিকেরা কিছু সময় অতিবাহিত করলে ক্ষতি কি ?

ভাষা তাত্ত্বিকেরা সময় কাটাতে পারেন রোমানিয়া নিয়েও। ভারতীয়রা যে আত্মবিস্মৃত চিরকাল ছিল না তার প্রমাণ অনেক। তার মধ্যে একটি হতে পারে রামায়ণকে চিরস্মরণীয় করার জন্য রাম-পরবর্তী শাসকরা অরূপার একটি রাজ্যকে রামায়ণী নাম দিয়েছিলেন। সেই রামায়ণীই ক্রমে ক্রমে রোমানিয়া নামে পরিণত হয়েছিল কিনা কে জানে ? এখানেই ক্ষুব্ধ কণ্ঠে আব্দার ধরতে হয়, হে অতীত কথা কও ! অতীত কথা বলে ঠিকই, কিন্তু সে ভাষা বড় দুরূহ। দুরূহ বলেই সেটিকে প্রমাণ বলা যায় না। একটু বিশ্বাসের উপরই তার প্রতিষ্ঠা করতে হয়। তবে রোমানিয়ায় যে ভারত সভ্যতা একদা বিরাজ করেছিল তার প্রমাণ আছে (রামচন্দ্রের আগে কিংবা পরে), কিন্তু তার আগে রাম যে প্রদেশে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন সেই প্রদেশের কয়েকটি ভাষাগত প্রমাণ দিই। ইটালির একটি উৎসব আছে, সেই উৎসবের নাম ইংরেজি অক্ষরে Ambar valia. এই উৎসবে চাষবাসের সাফল্য কামনা করা হয়। এর উচ্চারণ অম্বরভালিয়া। এটি হবে অম্বরবলী। অমর (Amor) ইটালির ভাষায় প্রেম। আর এটা তো জানা কথা যে প্রেম অমর। এই কথাটি ইংরেজিতেও এসে গেছে। ফরাসী ভাষাতেও এর দেখা মেলে। এগুলি কোনও আশ্চর্য বা আকস্মিক ঘটনা নয়। রাম যখন সমস্ত অরূপা দখল করেছিলেন তখন থেকেই বহু ভারতীয় ভাষা সেখানে চালু হয়ে গিয়েছিল— যার কিছু কিছু এখনও বর্তমান। এ-বিষয়ে আরও একটি প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছে রইল, কেননা বিষয়টি বিরাট।

খুব সম্ভবত ভারতবর্ষ থেকে বাঙালিরা জার্মানির এলবে নদীর ধারে বসতি স্থাপন করেছিল, যেমন আজকাল বহু বাঙালি ভারতবর্ষের দণ্ডকারণ্যে স্থান নিয়েছেন। এই লোকদের নাম বলা হয় ANGLI, আসলে এটি বাঙালিই হবে। এই বাঙালিরাই পরবর্তী কালে ব্রতনাড়ু দ্বীপে গেলে তাদের নাম হয় আংলেই ! যাদের পরবর্তী যুগের মানুষকে বলা হয় ইংলিশ কিংবা ব্রতীশ। ব্রতনাড়ু (নাড়ু যে ল্যাণ্ড বা দেশ তা তামিলরা জানিয়ে দিয়েছেন, Land = লাঁড় = নাড়ু এভাবেই বাক্যটির বিবর্তন হয়েছিল ধরে নিই।) এই দ্বীপেই দেখা মেলে রামস্‌গেট, অর্থাৎ রামস্যাগত—যে তোরণ দিয়ে রাম গতায়াত করতেন। গত থেকেই গেট কথাটি এসেছে। ওয়েলস-এর নিকটে আজও পাওয়া যাবে রামসে দ্বীপ। এ-সব আকস্মিক যোগাযোগ

নয়। ঐ দ্বীপে রামচন্দ্র কখনও ছিলেন, অথবা তাঁকে সম্মান দেখানর জন্য ঐ নাম দেওয়া হয়। কেবল ওয়েলস নিকটবর্তী একটা মাত্র রামসে থাকলেও সন্দেহ কিছু থাকতেও পারত, আকস্মিক ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত, কিন্তু ঐ একই নামের জায়গা রয়েছে আইল অফ ম্যান-এও! এবং ইংল্যাণ্ডের হান্টিংডন-এও। রামচন্দ্র তৎকালীন জনমানসে যে কি বিরাট প্রভাব ফেলেছিলেন তার আরও প্রমাণ রয়েছে। ইংল্যাণ্ডের ল্যাংকাশিয়ারের (এর উচ্চারণ নিয়ে পরে বলছি) একটি জায়গার নাম এখনও র‍্যামসবটম। কথাটির অনুবাদ কিছুটা অশ্লীল মনে হতে পারে বলে এখানে দিলাম না, গুণিজন বিষয়টি বুঝে নেবেন। তবে ভেড়াকে কেন Ram নাম দেওয়া হয়েছিল সেটা বলা মুশকিল। কেবল যে ইউরোপের প্রধান ভূমিতে রাম নাম ছড়িয়ে রয়েছে তা নয়। ফ্রান্সে একটি জায়গার নাম রয়েছে তার নাম রাম্বারভিলিয়া। এটি যে রাম সম্পর্কিত (রামের বিল?) সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ! এ ছাড়া পূর্ব সিসিলি দ্বীপে রয়েছে রামাক্কা। এটি আমার মনে হয় 'রামকা' কথাটি থেকে পরবর্তী বিকৃতি। ভারতবর্ষ থেকে যাঁরা একদা অরূপা অধিকার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বাঙালি, তামিল, ওড়িয়া, উত্তরপ্রদেশীয়, অহম এঁরা সকলেই কিছু না কিছু সংখ্যায় ছিলেন।

ফ্রান্সে দেখা যাচ্ছে রয়েছে রামবুলিয়ে। অর্থটি পরিষ্কার—রাম বলিয়ে। অর্থাৎ রামনাম করো! ডেনমার্কের একটি শহর এখনও রামের নামে রয়েছে, রাম্মে। আর রামায়ণীর দেশ—রোমানিয়াতে সন্ধান পাবেন রামনিচু ভালচিয়া এবং রামনিচু শরৎ। এখানে স্পষ্টতই রামকে কিছু হেয় করা হয়েছে, যে কারণেই হক। এই শব্দগুলির কি অর্থ তা পুরো না জানলেও এটা নিশ্চয় অনুমান করাটা অন্যায় হবে না যে এ-সমস্তই রাম সম্পর্কিত। এ ছাড়া আরব দেশেও রাম-এর পরিচয় রয়েছে রামলেখ এবং ইজরায়েলে রয়েছে রামলে। উদাহরণ আরও আছে।

স্কটল্যাণ্ডে পুরোপুরি রাম বলেই একটা জায়গা রয়েছে। খুঁজলে এরকম আরও অনেক নামই পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

কেবল রামের নাম থেকেই অরূপায় রামের প্রভাবের প্রমাণ করা যায়—কিন্তু ভারতীয় প্রভাব দেখাতে গেলে আরও প্রমাণ যখন রয়েছে তার কিছু কিছু দেখানো যেতে পারে।

যুগোস্লাভিয়ার একটি জায়গার নাম Monastir (মনস্থির)?), ডেনমার্কে রয়েছে Mon (মন), সুইজারল্যাণ্ডে আমার এক শ্যালিকা বাস করতেন, সে জায়গাটির নাম MONTREAUX (মন্ত্র), এমনকি স্পেনেও রয়েছে মন্ত্র নামের একটি জায়গা। ইটালিতে রয়েছে মনডোবি বা মাণ্ডবী। একটা বড় শিল্প-নগর রয়েছে তার নাম মিলান (মিলন?), ঐ দেশেরই আর একটি জায়গার নাম মানতুয়া (পানতুয়া?), নরওয়েতে মণ্ডল শহর, আবার ইটালিতে দেখছি Mon ferrato, মন ফেরাতো। এসব নাম কি ভারতীয় নয়? আকস্মিক উড়ে এসে জুড়ে বসা? কে এর উত্তর দেবে? যুগোস্লাভিয়ায় রয়েছে মিত্র ভিচা, ইংল্যান্ডে মন্মথ, আর ফ্রান্সের Normandy-কে তো নরমুণ্ড স্পষ্ট কোনও বড় রকমের যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। তা ছাড়া ফ্রান্সের নরম্যান কথাটিও দেখবার মতো নর+ম্যান। নর কথাটি সংস্কৃতে মানুষ। আবার ম্যান কথাটি 'মানুষ'-এর পরিবর্তিত রূপ ধরে নেওয়া যায়। যাতে সংস্কৃত এবং বাংলা একই সঙ্গে শেখা যায় সেজন্য নরমান কথাটি ফ্রান্সে চালু করা হয়। এরকম মিশ্রিত কথা আরও আছে যেমন Song+গীত=সংগীত। বাংলা 'হারমানি' ইংল্যান্ডে সেটাই হারমনি। 'হার স্বীকার করলাম' অর্থাৎ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল এ অর্থ এখনও আছে। সম্ভবত জার্মানি কথাটাও এসেছে 'হারমানি' থেকে। কিন্তু এ প্রমাণ কে করবেন? আমি বাংলার প্রভাবই দেখতে পাই নিজে বাঙালি বলে। অন্য রাজ্যের লোকেরা নিশ্চয় অন্য প্রমাণ পাবেন। এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক একটি অতি কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ এখানে পরিবেষণ করি—ইংরেজি ভাষার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় একটি ভাষায় আশ্চর্য সাদৃশ্যের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

বেশি মন্তব্য করতে চাই না, তথাই প্রমাণ করবে আমার কথার সত্য অথবা মিথ্যাত্ব। স্কটল্যান্ডে রয়েছে বড়দিন (Aberdeen), বড় দৌড় (Aberdown), ওয়েলসে 'আবার গেলে' (Abergele), চিশায়ার-এ 'অলসগড় (Alsager), স্কটল্যাণ্ডে অঙ্কুশ (Angus), অনন্য (Annan), বীরনাম (Birnam), মূল (Mull), হারাণ (Arran) সাসেক্স-এর নদীর নাম অরুণ, শহর অরুণদল (Arundel), ইংল্যান্ডের ডার্বিতে রয়েছে Ashbourne (অসবর্ণ? আশাবরণ?), আয়র্লাণ্ডের বীর (Birr), কর্নওয়ালের নদী ফল(Fal), চিশায়ার-এর হুল (Hoole), সাউথপোর্টের হাল (Hull), হাম্বা (Humber) হুনমানবাই (Hunmanby), মঞ্চেশ্বর (Manchester)। লক্ষণের নামে একটি হ্রদ রয়েছে), লখনেস (লক্ষণেশ), ইয়র্কশিয়ার-এ রয়েছে নর্তন (Norton), ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডে রয়েছে সাপ (Shaap) ডার্বিতে রয়েছে স্পন্দন (Spondon), ডারহামে রয়েছে সুন্দরবন! অবশ্য লেখা হয় Sunderland. সারে-তে রয়েছে সুরবিতান (Surbition)। সারে (Surrey) কথাটাও সারে নয়, সুরিয়া, বা সূর্য বলেই আমার মনে হয়। এই প্রসঙ্গে (স্মরণীয় সা-রে জাঁহাসে আচ্ছা!) আর গ্রীসের SYRA, নিশ্চয় শির কিংবা সেরা।

আপনারা এ-সমস্তই মোটামুটি একটি ভাল মানচিত্রে দেখতে পাবেন। বেলজিয়ামে পাবেন Torhout (ত্রিহুত?), পোলান্ডে পাবেন তরুণ, ফ্রান্সে পাবেন তুলোঁ (আসলে তুলো হবে, কিন্তু অনেকের অযথা চন্দ্রবিন্দু দেওয়া অভ্যেস! বেলজিয়াম কথাটির মধ্যেও দুটি ভারতীয় ফলের সন্ধান পাবেন, আর অস্ট্রিয়াতে পাবেন ত্রাণ নদী। অস্ট্রিয়া কথাটাই তো অস্ত্র থেকে এসেছে। ইটালির পিডমন্ট-এ রয়েছে তৃণ। মস্কোর দক্ষিণে রয়েছে তুলা। এবার দেখুন রোমানিয়ায় পাওয়া যাচ্ছে Tulcea (তুলসি=তুলচি), বেলজিয়ামে তরুণ হাট (Turnhout)। উষা পাবেন রাশিয়ায়, ফ্রান্সে পাবেন উষান্ত। এ-সব কি সবই মিথ্যে, নাকি কাকতালীয়? জানেন কি নরওয়ের মধ্যে আছে বরানগর? (Varanger), বেলজিয়ামে বর্ণা। এটাও ভেবে নেওয়া অন্যায় হবে না রামের রাজধানী রোম নগরীর মধ্যে যে ভাটিখানা ছিল কালক্রমে তা পরিবর্তিত হয়ে ভ্যাটিক্যান হয়েছে। ইটালিতে রয়েছে Viterbo (বিদর্ভ?), ফ্রান্সে ভৈরুঁ (Voiron) ফ্রান্সের পাহাড়ের নাম ভোজ, সুইজারল্যাণ্ডে বেঙ্গেন বা বঙ্গেন অর্থাৎ বঙ্গ সম্পর্কিত।

বিশু বিশ্বাস নামক কোনও বাঙালির নামেই যে আগ্নেয়গিরির নাম হয়েছে ভিসুবিয়াস এ বিষয়ে ক-জনের সন্দেহ হতে পারে আমার জানা নেই। মনে হয় বিশু বিশ্বাস খুবই প্রতাপশালী কেউ ছিলেন, পরে তাঁর পতন হয়। এবং তাঁর মুণ্ডু কাটা যায়। এর প্রমাণ পেতে পারেন

অল্পস! (Alps) হিমালয়ের তুলনায়

জার্মানির ব্রেমেনে Wesermunde (বিশের মুণ্ডু?)-তে। অবশ্য কেউ কেউ বলতে পারেন ভিসুবিয়াস কথাটির মূলে রয়েছে বিষম ভস্ম। পোলান্ডে রয়েছে জাগান (Zagan) গ্রীসে জানতে (Zante) এবং সুইজারল্যান্ডে যুগ (Zug)।

আমার কাছে একটি বড় তালিকায় আরও চিন্তা যোগানোর মত প্রভূত নাম আছে। তবে একটি কথা আমার নিবেদন করার আছে। অরূপা মহাদেশে রামের নামের যেরকম প্রচার হয়েছিল, সেরকম বা হয়ত তার চাইতেও বেশি প্রচার হয়েছিল বালীর। বালীর যথেষ্ট ক্ষমতাও ছিল। পুরাণে পাই, বালী একদা রাবণকে জড়িয়ে ধরে এক লাফে আকাশে উঠে একে একে চার সমুদ্রে সন্ধ্যাবন্দনা সমাপ্ত করে নিজের রাজ্য কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে আসেন। বালী এবং সুগ্রীবের কাহিনী আমরা জানি। কিভাবে রাম বালী বধ করেন তা রামায়ণেই লেখা আছে। রামচন্দ্র যতই জনপ্রিয় হন না কেন, তাঁর এই কর্ম সে-কালে অনেকেই পছন্দ করেননি। হয়ত সেই কারণেই বালীর প্রতি সমর্থন জানাতে বালী স্মৃতিতে বহু নগর ইত্যাদির নাম বালীর নামে দেওয়া হয়েছে। এবং এটাও বোধ হয় ঠিক যে বালী ছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের

(আবীরনন্দ ?) লোক, কেননা আয়ার্ল্যান্ডেই বালীর নাম বেশি দেখা যায়। প্রমাণ স্বরূপ এখানে কতকগুলি নামের উল্লেখ করছি : বালী লেক, বালী ক্যাসল, বালীকটন, বালীমনা ইত্যাদি। আয়ার্ল্যান্ডের ডোনেগালে রয়েছে বালীস হনন (Ballys hannon)। বালীকে যে হত্যা করা হয়েছিল সেটি এইভাবেই চিরকাল স্মৃতিতে রাখার এই চেষ্টা কোনও সৎ গবেষকের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না।

অলবানিয়ায় রয়েছে 'বিরাট' নামাঙ্কিত স্থান। সম্ভবত বিরাট রাজার স্মৃতি জাগিয়ে রাখতে। অলবনিয়ায় লবণ পাওয়া যেত না, তা থেকেই সম্ভবত ঐ নাম। স্পেনে রয়েছে বেজার, ইজরায়েলে রয়েছে বীরসেবা, স্পেনে রয়েছে আদ্রা (Adra) আর ইটালিতে বহু বাঙালি গিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় উত্তর ইটালির শহর 'আড্ডা' নাম থেকেই। ইউরোপে গিয়েও আর কোন জাত আড্ডা দেবে ? আর বাঙালিরা অঙ্কনপ্রিয় হওয়ায় সম্ভবত ইটালির একটি শহরের নাম অঙ্কন এখনও রয়ে গেছে। Adriatic Sea আসলে আদ্রঅতিক সমুদ্র—এ যে কেউই বুঝতে পারবেন।

আরও একটি রাম খুঁজে পাওয়া গেল। জার্মানির একটি দ্বীপের নাম দেখা যাচ্ছে আমরাম (Amrum)।

এগুলিই আমার ভূমিকা। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ দেওয়া আপাতত আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তার বদলে যে ভাষার প্রমাণ দাখিল করলাম তা থেকে পণ্ডিতেরা কি সিদ্ধান্ত নেবেন জানি না, তবে আমার মনে হয় না যে দু-রকম সিদ্ধান্ত হওয়া সম্ভব। এবার আসি আমার রামায়ণের আরও কয়েকটি ব্যাপারে। আপনারা জানেন রামচন্দ্র এসেছিলেন বন-এ। সেটি যে জার্মানিতে তা কে না জানে ? এবারে আসা যাক আরও একটি প্রমাণে। বাল্মিকী যে তমসার তীরে বসে রামায়ণ লিখেছিলেন সেটা Thames ছাড়া কিছু হতে পারে না। এ ছাড়া লন্ডন শহরটাও 'নন্দন'-এরই পরিবর্তিত রূপ। আপনারা জানেন নলেন গুড় কিভাবে ললেন গুড়ে রূপান্তরিত হয়। আর লঙ্কা 'দ্বীপ' কখনই ছিল না। ওটা বহুদিনকার প্রচলিত ভুল। লঙ্কেশ্বরের আধুনিক নাম ল্যাংকাশিয়ার এটা প্রমাণ করার জন্য খুব চতুরতার প্রয়োজন হবে না। আরও একটি মত শীঘ্রই প্রচলিত করা যেতে পারে যে ইংল্যান্ডে যে সব শিয়ার অথবা শায়ার আছে সেগুলি ঈশ্বর-এর উচ্চারণ ভেদ। এই ভাবে আরগিলশিয়ার হবে অর্গলেশ্বর, শ্রপশিয়ার বা শ্রপেশ্বর (সম্ভবত সর্পেশ্বর), হ্যাম্পেশ্বর (হ্যাম্পেশিয়ার-এই 'হ্যাম্পে' কথাটি কোন্ ভারতীয় কথা থেকে এসেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না), ওয়াউইকশিয়ার যে বারিকেশ্বর সে বিষয়ে সন্দেহ কিছুমাত্র থাকা সম্ভব নয়। যেমন তারকেশ্বরকে অনেক সাহেব বলতেন টারকশিয়ার, এ আমার নিজের কানে শোনা ! দক্ষিণেশ্বরকে বলতেন ডেকিনেশিয়ার ! এ-সমস্ত প্রমাণ তুচ্ছ বলি না। বরাক উপত্যকার মানুষেরা ইংল্যান্ডে পৌঁছে যে জায়গায় ঘাঁটি গেড়েছিলেন তার নাম দিয়েছিলেন বরাকেশ্বর, সেটির নাম এখন বার্কশিয়ার। আবার মতভেদে এটাও বলা যায় যে আসলে বরাকরের মানুষেরাই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বরাকরেশ্বর। আরও কত যে নাম বৃটেনে ঈশ্বর দিয়ে শেষ হয়েছে তা কেবল ভগবানই জানেন ! এ-সব নিয়ে রীতিমত গবেষণা হয়নি বলেই এই মত প্রতিষ্ঠিত হয়নি, চেষ্টার ত্রুটি রাখলে চলবে না। এই সঙ্গে মনে পড়ে গেল চেষ্টার কথাটি কি ভাবে বৃটেনে গিয়ে স্থায়ী হয়েছে, চেষ্টারফিল্ড, চেষ্টারটন ইত্যাদি নামেই তার প্রমাণ মিলবে।

কথায় কথায় অনেক দূর এসে পড়লাম। এবারে রাবণের কথায় আসা যাক। রাবণের নাম ছিল দশশির। দশশির-এর অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু রাবণ কথাটির অর্থ আমাদের পুরাণে যা করা হয়েছে তা সঙ্গত নয় বলেই ঐতিহাসিকেরা নিশ্চয় একদিন প্রমাণ করবেন। আসলে বন ছিল লঙ্কেশ্বরের তালুক। জার্মানি বলতে এখন যা বুঝি তা ছিল রাবণের অধিকারে। জার্মানির নামও তখন জার্মানি ছিল না, ছিল জামদাগ্না। জামদাগ্নাই কালক্রমে বিকৃত উচ্চারণে জার্মানিতে রূপান্তরিত হয়। এটাই স্বাভাবিক, কেন না জার্মানি কথাটার কোনও অর্থ হয় না, সংস্কৃত বা বাংলা অভিধানে এই নামটিই অনুপস্থিত ! তবে 'যমারণ্য' কথাটিও এই প্রসঙ্গে ভেবে দেখা যেতে পারে ! বন রাবণের তালুক ছিল বলেই বন-রাজ বন-এর রাজার নাম দেওয়া হয় 'রা' বন। রা কথাটির অর্থ যে সূর্য তা প্রাচীন মিশরীয় বিবরণে পাওয়া যায়। সূর্যর অপর অর্থ রাজা বললে সেটা খুব অন্যায্য হয় কি ?

রাম রাবণকে তুমুল (tumultons) যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু সে যুদ্ধ কিভাবে শুরু হয়েছিল তা বলার আগে জানিয়ে দিই, অরূপায় রাবণকে অতি সম্মানের আসনেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কয়েকটি প্রমাণ এখানে দিচ্ছি : ইংল্যান্ডের মানচিত্রে এখনও দেখতে পাবেন Ravenglass রাবণগ্রাম কথাটি থেকে পরবর্তীকালে রেভেনগ্ল্যাস কথাটি এসেছে নিশ্চয় ! এ-ছাড়া ইটালিতে রয়েছে Ravenna (রাবণ), জার্মানিতে রয়েছে রাবণসবুর্গ (Ravens burg), আর কে না জানে যে আসল কথাটা রাবণস্যাপুর, পুরই যে Burg এ বিষয়ে বর্তমান ভাষাচার্যরা তাঁদের সুচিন্তিত মত দিয়েছেন। স্কটল্যান্ডে রয়েছে রাবণস্যকর (Ravenscraig), বক্রেশ্বরে (Vorkshire) রাবণস্যথর্প (Ravensthorpe)। এই 'থর্প' ব্যাপারটি বিলাতি অভিধানে দেওয়া আছে কয়েকটি বাড়ি নিয়ে গ্রামের বসতি। পুরো অর্থ হবে রাবণের বসতি। রাবণের স্মৃতি রক্ষার জন্য গ্রামবাসীরা ঐ নাম দিয়েছিলেন এটাই ধরে নিতে হবে। যেমন উল্টাডাঙার নাম রাখা হয়েছে বিধাননগর, সেই রকম আর কি ব্যাপারটা।

আর কচকচি নয়। রামায়ণের গল্পে আসি—কিন্তু প্রতিপদে নতুন নতুন নামের ব্যাখ্যা দিতে দিতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। আশা করি আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা এতক্ষণ যাঁরা ধৈর্য ধরে পড়েছেন তাঁদের আরও একটু ধৈর্য ধরতে অনুরোধ জানাই। এও আশা করি এর পর যা বলব সে-জন্য আপনারা একটু মানসিকভাবে প্রস্তুত হন। দুর্বল মন যাঁদের তাঁরা এখানেই ইতি টানতে পারেন, আর যাঁদের দুর্বল হৃদযন্ত্র তাঁরা উপযুক্ত ওষুধপত্র হাতের কাছে রাখুন।

আপনারা জানেন, রামের বিবাহিতা পত্নী সীতাকে রাবণ চুরি করেছিলেন। চলতি রামায়ণে এটাই লেখা আছে বটে। এটা হাজার হাজার বছরের বিশ্বাস। এ-বিশ্বাস খণ্ডন করা আমার সাধ্য নয়। আসল ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য।

জনক রাজার কন্যা সীতার সঙ্গে রামচন্দ্রের বিয়ের সম্পর্ক হয়, এটাই সম্ভবত ঠিক কথা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিবাহ হয়নি। বিবাহের সমস্ত যখন প্রস্তুত তখন অপরূপা থেকে খবর এল সেখানে রাবণ রাজা খুবই প্রবল অত্যাচার করছেন, এবং প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে দশরথের সাহায্য প্রার্থনা করাতে দশরথ নিজেই রামচন্দ্রকে বলেন বন-অঞ্চলে গিয়ে রাবণকে হটিয়ে দিতে। এ-জন্য যত সময় লাগে লাগুক কুছ পরোয়া নেহি। কৈকেয়ী, মন্থরা ইত্যাদি এবং দশরথের আদেশে রামের চৌদ্দ বছর বন-বাসের কথাটা পরবর্তীকালের রটনা। আসলে রামের রাম শহর (রোম) পত্তন করতে এবং সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করতে সময় লেগেছিল। রামকে সাহায্য করেছিল হনুমান, যে উপজাতিকে রামায়ণে বিনা কারণে ল্যাজ লাগিয়ে হনুমান করা হয়েছে। এছাড়া একদল এপ জাতির মানুষও ছিল, যাদের নিজস্ব পতাকা (Banner) ছিল, তাই তাদের একটি নাম ছিল ব্যানারমান। ঐ উপজাতিরই নাম ছিল এপ। ওরা এর বাড়ি ভাঙত, ওর বাড়িতে আগুন লাগাত বলে চারিদিকে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। এপ অর্থই হয়ে গিয়েছিল খারাপ। এপ-এর অন্য রূপ 'অপ' এবং এপ-এর যে সংস্কৃতি তাকেই বলা হত এপ-সংস্কৃতি বা পরবর্তীকালে যা হয়েছে অপ-সংস্কৃতি ! কালা পাহাড়-এর নাম থেকে যেমন হয়েছে কালাপাহাড়ি।

রোম নগর প্রতিষ্ঠার পর রাম হনুমান এবং বানর সৈন্য নিয়ে বন-এ যাত্রা করেন। সেখানে তিনি একটি বড় খাল কাটার জন্য বহু কুলি এবং কামিন নিযুক্ত করেন। কামিন মানে যারা বিনা অনুমতিতে ভেতরে আসতে পারত। অর্থাৎ

শ্বেতা (সীতা)

সর্বদাই যাঁদের বলা হত Come in ! ইংল্যান্ডের শ্বেত চর্ম বিশিষ্ট নারীদেরও রাম এই কাজে লাগিয়েছিলেন। একটি কামিনী ছিল অতি সুন্দরী যাঁর নাম ছিল শ্বেতা। সীতার সঙ্গে নামটির আশ্চর্য মিল, এবং পরে রামের সঙ্গে তার মনের মিল হওয়াতে দুজনের গন্ধর্বমতে বিবাহও হয়। সেটি গোপনই থাকে। কিন্তু রাবণেরও ঐ একই নারীর প্রতি দুর্বলতা হয় এবং রাবণ যখন বুঝলেন কিছুতেই শ্বেতাকে তাঁর দখলে আনতে পারবেন না তখন তিনি তাকে হরণ করেন। একটি বৃটিশ মেয়ের নাম শ্বেতা কেমন করে হয় সে উত্তর দেওয়ার আগে পাঠকদের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাই একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে ; স্টালিনের মেয়ের নাম শ্বেতলানা-ই বা হয় কেমন করে ? ঐ একই নিয়মে বৃটিশ মেয়ের নামও শ্বেতা হয়েছিল। এর পরবর্তী ইতিহাস রামায়ণে দেওয়া আছে। তবে সর্বদাই সীতার জায়গায় শ্বেতা পড়তে হবে। মাটির ভেতর থেকে সীতার জন্ম হয়েছিল সেটি অতি সাধারণ বুদ্ধির মানুষও স্বীকার করবেন বলে মনে হয় না। আসলে শ্বেতা ছিল মাটিকাটানি, তবে মেমসাহেব বলে রামের তাঁর প্রতি দুর্বলতা স্বাভাবিক। বহু ভারতীয় পণ্ডিত বহু মূর্খ এবং নীচ মেমসাহেবকে আজও বিবাহ করে থাকেন, আপনারা হয়ত দেখেছেন। অতএব রামচন্দ্র এমন কিছু অভারতীয় কর্ম করেননি।

আরও একটি কথা। রামচন্দ্রের মেমসাহেব বিয়ের সংবাদ পেয়ে প্রাচীনপন্থী অসুস্থ দশরথের হৃদরোগ হয়। তারই ফলে, এবং বয়সের ভারে দশরথের মৃত্যু হয়। সীতাও নিজের গায়ে কেরোসিন কিংবা পেট্রোল ঢেলে পুড়ে মারা যান। বেচারা সীতা ! রামচন্দ্রের মত লোক তাঁর প্রতি এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন তা তিনি ভাবতেও পারেননি। অবশ্য সে-সময়ে এটিকে বিশ্বাসসঘাতকতাও বলা যায় না। রামচন্দ্র একাধিক বিবাহ করলেও কেউ তাঁকে ঠেকাতে পারত না। ঐ সময়ে সমাজে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল, তা তাঁর পিতার কর্মেই প্রমাণিত ! আসলে রাম প্রায় চৌদ্দ বছর দেশে ফেরেননি, সীতার মনোকষ্টের সেটাই প্রধান কারণ বলে আমার মনে হয়। সীতা অতি অভিমানী এবং চমৎকার নারী ছিলেন। তিনি রামের জন্য বহু বছর অপেক্ষা করে ছিলেন। পরে রামচন্দ্র মেম বিয়ে করে আনাতে তিনি ভয়ঙ্কর রকম বিচলিত হয়ে পড়েন। এবং মনের দুঃখে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে মারা যান। সীতার অগ্নি পরীক্ষা বলে রামায়ণে যা বলা আছে তাও সম্ভবত ঠিক নয়। ওটা প্রক্ষিপ্ত হওয়ারই সম্ভাবনা।

এখানে অনেকেই আপত্তি তুলবেন একথা বলে যে সেই কোন্ মান্ধাতার আমলে কেরোসিন কোত্থেকে আসবে ? এর উত্তর এক কথায় দেওয়া যায়, কিন্তু দেব না—কেননা, এক কথা বললে কেউ বিশেষ পাত্তা দেন না। তাই বলি, নারদ মুনি যে ঢেঁকিতে চড়ে দেশ দেশান্তরে যেতেন সেটাতে কি জ্বালানি ব্যবহার হত ? রাবণ যে বিমানে করে সীতাকে নিয়ে গিয়েছিলেন বলা হয় সেটিই বা চলত কেমন করে ? পুষ্পক রথ কিসে চলত ? হনুমান যে লাফিয়ে লাফিয়ে হাজার হাজার যোজন পার হয়ে যেতেন সেটি ক-জনে এই আধুনিক যুগে বিশ্বাস করবে ? হনুমান (যদিও সঠিক কথাটি কি আগেই বলা হয়েছে) নিশ্চয় কোনও ব্যোমযান ব্যবহার করতেন, যা চলত কেরোসিন কিংবা পেট্রোলে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি ? অতএব সীতা যে লিটারখানেক কেরোসিন সংগ্রহ করতে পারবেন সেটা খুব একটা অন্যায় অনুমান নয়। কিন্তু সেটি বড় কথা নয়—তিনি কেরোসিন ব্যবহার করতে পারেন, পেট্রোল ব্যবহার করতে পারেন এবং সোমরস সার অর্থাৎ স্পিরিটও গায়ে লাগিয়ে আগুনে পুড়তে পারেন। এটাও তেমন কথা নয়—কিন্তু রামচন্দ্র যা করেছিলেন তা কি সম্ভব ছিল ? রাম কি মেম বিয়ে করতে পারতেন, সেটা কি সম্ভব ছিল তাঁর মত চরিত্রের পক্ষে ?

তাহলে একটু কথা বলতেই হয়। রাম যখন বন-এ ছিলেন তখন প্রথম দিকে সীতার জন্য তাঁর মন উতলা হয়েছিল ঠিকই। বিবাহ না করেই তিনি বিরহে কাতর হয়ে পড়েছিলেন। বিবাহিত স্ত্রীর জন্য বিরহ যত তীব্র হতে পারে বিবাহ যাঁর সঙ্গে হওয়ার কথা তাঁর জন্য বিরহ আরও তীব্র হতে পারে, অন্তত রামের বেলায় তাই ঘটেছিল মনে করা যেতে পারে। একজন প্রসিদ্ধ রামায়ণকার রাজকুমার বসু প্রায় ৯০ বছর আগে মন্তব্য করেছিলেন : "রামচন্দ্র পত্নীপ্রেমে একেবারে ডুবিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পত্নীবিরহে একেবারে আত্মহারা হইলেন। ইহাকে প্রেমের বিকার বলা যাইতে পারে। পত্নীবিরহে তাঁহার প্রেমভাব বিকার প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি ক্ষণকালের জন্য আত্মহারা হয়েছিলেন। ইহা কিছু স্ত্রৈণ ভাবের লক্ষণ।"

এই বিকারের সময় যদি তিনি সীতার কাছাকাছি নামযুক্তা কোনও কুমারী মেমকে বিবাহ করেছিলেন একথা বলা যায় তাহলে খুব অন্যায়বোধ হয় না। তা-ছাড়া "বয়সের চরিত্র এমনই যে তিনি কখনই এমন কর্ম করতে পারেন না যাঁরা বলেন, তাঁদের জানাই আর একটি রামায়ণী ভাষ্যের কথা। এটি আমাদের উপহার দিয়েছেন পণ্ডিত সুকুমার সেন। তিনি একটি জার্নালে অন্য একটি রামায়ণী ভাষ্যে দেখিয়েছেন যে সীতা হরণ ব্যাপারটি চলতি রামায়ণে যা আমরা দেখতে পাই তা মোটেই ঘটেনি। পুরনো শক ভাষায় যে রামায়ণের কিছু অংশ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় রামকে চোদ্দ বছরের জন্য বনে পাঠানই হয়নি। পরশুরামের হাত থেকে বাঁচানর জন্য রাম এবং লক্ষ্মণকে পাতালে লুকিয়ে রাখা হয়। সে-সময় শিকারে গেলে রাম এবং লক্ষ্মণ একসঙ্গে এক মুনি কন্যার প্রেমে পড়ে যান। এই মুনি ছিলেন স্বয়ং পরশুরাম—যিনি আবার ছিলেন দশরথের শত্রু। বিশদ বর্ণনায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই, শেষ পর্যন্ত রাম সীতাকে বিবাহ করে অযোধ্যাতে ফেরার সময় পরশুরাম (তাঁর কন্যা জানকী বা সীতাকে জনক রাজার হেফাজতে রেখেছিলেন) মনে করলেন রাম সীতাকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছেন। এই মনে করে পরশুরাম তাঁর পথ রোধ করেন।

এখানে দ্রষ্টব্য একটি বিষয় [illegible] থেকে পরিস্ফুট। রাম [illegible] করেই নিয়ে যাচ্ছিলেন [illegible] না। এমনকি সীতার [illegible] রামায়ণ অনুসারে) পর্যন্ত [illegible] অনুভব করেননি। পরশুরামও [illegible] এমন কাজ করেছে ! অর্থাৎ, [illegible] তাতে তাঁর পক্ষে নারী হরণ [illegible]

ভীষণ ভস্ম, না বিত্ত বিশ্বাস ? (Vesuvius)

তাহলে বন-বাসী মেম সাহেবকে রাম গন্ধর্বমতে বিবাহ করবেন এটা খুব অসম্ভব কর্ম নয় বলেই মনে করা যেতে পারে। এই ঘটনা থেকেই রামের চরিত্রের একটি দিক স্পষ্টভাবে জানা যায় !

যাই হোক, আমার রামায়ণই যে চূড়ান্ত বা সঠিক এটা আমার নিজেরও মনে হয় না। এর মধ্যে অনেক ফাঁক-ফোকর রয়ে গেছে, যেমন রামের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ। অনেক কথা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা মনে হয়েছে বলে গেছি। তবে রামায়ণের এই কাহিনী যে বৈপ্লবিক, এবং আমারই সে বিষয়ে কারুর আপত্তি হবে না। ■

ভারত ভাস্কর্যে নারীর যৌবন ও সৌন্দর্য

চিত্রা দেব

কাছে গেলেই চোখে পড়ে অপরূপ ছাঁদে কমনীয় মুখে যৌবনশ্রী। পাষাণীর রূপ পেল মানুষের আকাঙ্ক্ষা। এরা তো বিধাতার সৃষ্টি নয়। মানুষের ছেনি আর হাতুড়ি পাথরের অঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছে নারী দেহের দৈবী লাবণ্য।
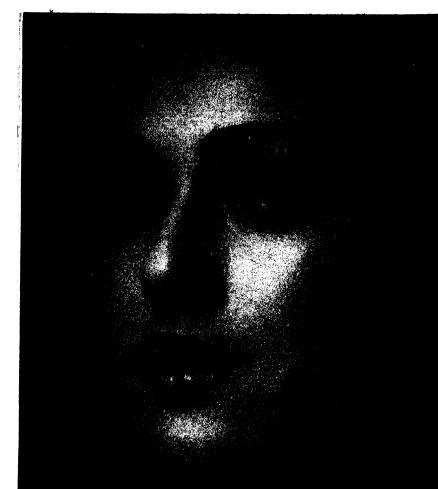
টিনা মুনিম
ডিপ্লোম্যাট যেখানে
উত্তেজনা সেখানে!

পুরুষত্বের পরিমাপ!
MCD P 76 2720 BG

মাধুরী, চিরকালের মানবিক আকাঙ্ক্ষা।

কবে থেকে ভারতীয় ভাস্করেরা অনুপমা নারীমূর্তি সৃজনের সাধনা করছেন বলা অসম্ভব। হয়ত মূর্তি নির্মাণের আদি থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁদের সাধনা। সেই সিন্ধু সভ্যতার যুগ থেকে ভারতের শিল্পীরা চেষ্টা করছিলেন ধাতব মূর্তিতে নান্দনিক ভঙ্গি সঞ্চার করে তাকে সুন্দর করে তোলার। মহেনজোদাড়োর নর্তকী তাঁদের অপটু হাতের সৃষ্টি। তখনও শিল্পসুষমাকে আয়ত্ত করার কৌশল তাঁরা শিখতে পারেননি। ফুটেছে শুধু আদলটুকু। এর দু হাজার বছর পরে দেখা যাচ্ছে রূপদক্ষ শিল্পীর সাধনা অনেকখানি সফল হয়েছে। দীদারগঞ্জের চামরধারিণী যক্ষী শুধু একটি নিখুঁত যুবতীর মূর্তিই নয়, সেদিনের শিল্পী রূপের অতিরিক্ত যে লাবণ্য তার মুখে সঞ্চার করেছিলেন আজও তা মুছে যায়নি। নিখুঁত তার মুখ, নিখুঁত তার যৌবনশ্রী। নগ্ন বক্ষের কমনীয়তা, নাভির পাশে কয়েকটি রেখা পর্যন্ত কঠিন পাথরে ধরা পড়েছে। তবু বোঝা যায় রূপদক্ষের সাধনা এখনও শেষ হয়নি, মূর্তিতে রূপ এসেছে প্রাণ আসেনি।

নারীমূর্তি নির্মাণের এই কৌশলটি আয়ত্ত করতে শিল্পীদের হয়ত অনেক সময় লেগেছিল কিংবা ভারতীয় শিল্পধারার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই রূপনির্মাণেও শিল্পীরা দক্ষতা অর্জন করে থাকতে পারেন। কিন্তু সযত্ন অনুশীলনের এই ধারাটি আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় আরও অতিরিক্ত কিছু কথা। তৎকালীন সমাজে এই জাতীয় নারীমূর্তিগুলির আদর ছিল সন্দেহ নেই, তা না হলে এত বিপুলসংখ্যক অপ্সরা সুরসুন্দরী, যক্ষী, বৃক্ষকা, শালভঞ্জিকা, মদনিকা নাগিনী, কন্যকা, নর্তকী, বীণাবাদিকা, মাদলবাদিকা, স্নানরতা, প্রসাধনরতা, অভিসারিকা, পত্রলেখা, প্রেক্ষনিকা, চামরধারিণী, চুড়িবাহিকা, ফলবাহিকা প্রভৃতি নারীমূর্তি নির্মিত হত না। এ প্রসঙ্গে আমরা দেবীমূর্তিগুলির কথা বাদ দিচ্ছি যদিও পার্বতী, লক্ষ্মী, মকরবাহিনী গঙ্গা বা অন্যান্য দেবীমূর্তিগুলিও যক্ষিণী, সুরসুন্দরী বা অপ্সরাদের মতোই রূপলাবণ্যবতী অনন্তযৌবনা। তাঁদের রূপনির্মাণের সময় শিল্পীরাও পেয়েছিলেন অপেক্ষাকৃত বেশি স্বাধীনতা, তবু তাঁদের কথা এখন থাক। শাস্ত্রে তাঁদের কথা আছে, রূপ-কথাও। সেই দেবলক্ষণ বর্ণনা মিলিয়ে মিলিয়ে কঠিন বস্তুর বুকে ফুটিয়ে তুলতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি শিল্পীদের। কল্পনা নয়, দক্ষতার প্রয়োজন সেখানে বেশি ছিল। কিন্তু ভারত-ভাস্কর্যে দেবমূর্তিই তো সব নয়, আছে আরো অনেকে।

সময়ের দিক দিয়ে এদের পাওয়া গেছে খ্রীস্টপূর্ব ৩০০ বা ২০০ বছর আগে থেকে। এই শিল্পধারার চরমোৎকর্ষ দেখা গেছে নবম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত। চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের বহু ব্রোঞ্জ মূর্তি এবং মীনাক্ষী মন্দিরের অনুপম মূর্তিগুলি তৈরি হলেও ভারতের সর্বাধিক সুন্দর মন্দিরগুলি তৈরি হয়েছিল নবম থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে। তৈরি হয়েছিল সুন্দরতমা নারীমূর্তিগুলিও—

শালভঞ্জিকা, সাঁচী

খাজুরাহো, কোণারক, কাঞ্চীপুরম, বেলুর-হালেবিদ-এর মন্দিরের ছত্রছায়ায়। ভারতশিল্পে এদের আবির্ভাব পরিকল্পিতভাবে না হলেও আকস্মিক নয়।

ভারতীয় শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভারতের শিল্পীরা ছবি আঁকবার সময়েই হোক আর মূর্তি গড়বার সময়েই হোক, কল্পনার আশ্রয় নিতেন বেশি। সেজন্যে এমনও হয়েছে চিত্র বা মূর্তি ঠিক প্রতিকৃতি হয়ে ওঠেনি। শিল্পীর অন্তরের আলোয় ভিন্নভাবে রূপায়িত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতের মূর্তি 'ভাব ও বস্তু, রূপ ও অরূপ, সীমা ও অসীমের অপূর্ব মিলনভূমি।' সত্যিই তাই। কিন্তু ভারতের ভাস্কর অরূপকে রূপায়িত করবার জন্য রূপকে কখনও অস্বীকার করেননি। বাস্তব জীবনকে বাস্তব মানুষকে তাঁরা শিল্পের বিষয়বস্তু রূপেই গ্রহণ করেছিলেন। এই রীতিটি ছিল অন্য দেশেও।

ভারতীয় শিল্পধারার সঙ্গে বর্হিভারতীয় শিল্পরীতির যোগ নিশ্চয় ছিল। সিন্ধু সভ্যতার যুগে মিশরের সঙ্গে তার ব্যবসায়িক আদান-প্রদানের যোগ ছিল। যদিও মিশরের নারীমূর্তিদের মতো ভাবলেশহীন মৃত্যুর মাধুরী দিয়ে মূর্তি নির্মাণে ভারতীয়রা কখনও উৎসাহবোধ করেননি। কিন্তু গ্রীক ও রোমান শিল্পীদের প্রসঙ্গে একথা বলা চলে না—তাঁরা শুধু ভেনাস বা আফ্রোদিতিকে সৃষ্টি করেননি, নির্মাণ করেছেন অসংখ্য নারীমূর্তি। ভারতের সঙ্গে গ্রীস ও রোমের ব্যবসায়িক আদান প্রদানের সম্পর্ক ছিল। উভয়ধারার শিল্পের মধ্যেও যোগ থাকাই স্বাভাবিক। গ্রীক শিল্পীরা যে সব নারীমূর্তি নির্মাণ করেছিলেন তাদের কোনটিই আকৃতির দিক থেকে অস্বাভাবিক ছিল না। নারীর অনাবরণ অঙ্গশোভা এবং স্বাভাবিকতা দুই-ই গ্রীক শিল্পীদের রচনায় অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আদর্শ ও বাস্তবের মিল হয়েছে সুচারুভাবে। ভেনাস বা আফ্রোদিতির অনাবৃত যৌবনচ্ছবি এত সুন্দর ও এত স্বাভাবিক যে তার তুলনা আমরা কোথাও খুঁজে পাই না। ভারতের রূপদক্ষ শিল্পীরাও প্রায়

নায়িকা, ভুবনেশ্বর

একই সাধনা করেছিলেন আরও ব্যাপক আরও গভীরভাবে।

ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ মানবদেহকে খুব বেশি মূল্য কোনদিনই দেয়নি। বুদ্ধদেব দেহের নশ্বরতার কথাই প্রচার করেছিলেন কিন্তু রূপদক্ষেরা দেহকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেননি; তাঁরা জানতেন এই পৃথিবীর রূপ-রস - গন্ধ-স্পর্শ - শব্দ অনুভব করতে হলে এমনকি ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করবার জন্যেও দেহকে উপেক্ষা করলে চলবে না। কোন শিল্পীই তা পারেন না। আবার গ্রীক ভাস্করদের মতো দেহের কাছে সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করাতেও তাঁদের আপত্তি ছিল। গ্রীক প্রভাব পড়েছিল গান্ধার শিল্পে, ভারতে তার প্রভাব স্থায়ী হয়নি। অস্থিপঞ্জরসার বুদ্ধমূর্তি কিংবা গ্রীক দেবতাদের মতো অতিরিক্ত স্বাস্থ্যবান ও পেশীবহুল পুরুষমূর্তি ভারতের শিল্পীমনকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পারেনি। নারীমূর্তি সম্বন্ধে অবশ্য একথা বলা উচিত নয়। গ্রীকদেবীদের অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি বিশেষ করে কোনটি স্বল্পবাসা, কোনটি বা সম্পূর্ণ বিবসনা, রূপদক্ষ ভাস্করদের উদ্বুদ্ধ করতে পারত। সত্যি কথা বলতে কি, কিছু কিছু সাদৃশ্য যে নেই তাও নয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় শিল্পধারায় দেখা যায় নারীকে উভয় শিল্পীই দিয়েছেন লীলায়িত ভঙ্গি। প্রধানা মূর্তির পাশে আছে একটি করে ক্ষুদ্র মূর্তি— এই মূর্তিটি তার সখীর বা দাসীর। আরও দেখা যায়, বিবসনা মূর্তিগুলির হাতে আছে স্বচ্ছ উত্তরীয় জাতীয় বস্ত্র সেটি তার লজ্জানিবারণের কাজ করেনি। ভারতের বহু নারীমূর্তির হাতে বা কোমরেও বস্ত্রের আভাস আছে। মথুরার পিঞ্জরধারিণীর কথাই ধরা যাক না। তার কটিতে দীর্ঘ আঁচলের আভাস তবু সে আঁচল তাকে এতটুকু আড়াল করেনি। এ সাদৃশ্য একেবারেই বাহ্যিক, কারণ গ্রীক শিল্পী স্নানরতাকে দেখছেন আকস্মিকভাবে, আড়াল থেকে। ভারতীয় শিল্পী সে ভাবে পিঞ্জরধারিণীকে দেখেননি। আসলে ভারতীয় শিল্পীদের সঙ্গে পশ্চিমের ভাস্করদের অমিলই বেশি। এই অমিল চেহারায় নয়, উভয়দেশের সামাজিক প্রতিবেশে লালিত শিল্পীদের মানসিকতায়।

ভারতীয় শিল্পীদের মূর্তি গড়তে হত প্রধানত কল্পনার সাহায্যে। এ ব্যাপারে তাঁদের সাহায্য করত পূর্ব অভিজ্ঞতার স্মৃতি। অর্থাৎ তাঁদের সামনে কোন জীবন্ত মডেল থাকত না। অনেক ক্ষেত্রে দক্ষ চিত্রকর বা ভাস্করেরা একবার মাত্র দেখেই নিখুঁত চিত্র বা মূর্তি নির্মাণ করতেন। এ নিয়ে মতদ্বৈধের অবকাশ থাকলেও ভারত-ভাস্কর্য সম্বন্ধে এই বিশ্বাসই প্রচলিত। তাই প্রায় একই সঙ্গে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন যাঁরা মন্দির বা স্তূপের ব্যয়ভার বহন করতেন তাঁদের প্রতিমূর্তি নির্মাণের রেওয়াজ ছিল। অনেক সময় তাঁদের স্ত্রীদের মূর্তিও নির্মিত হত। রামায়ণেও স্বর্ণ সীতা নির্মাণের কথা আছে। রাজশেখরের 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা' নাটকে রাজকুমারী মৃগাঙ্কাবলীর দারুমূর্তি দেখে ত্রিলঙ্গরাজ বিদ্যাধরমল্লের মুগ্ধ হবার কথাও রয়েছে। ঠিক মডেল নিয়ে কাজ না করলেও সমসাময়িক বিষয়বস্তুর প্রতিকৃতি তৈরি হত অনেক সময়। নইলে সাহিত্যে এত প্রতিকৃতি অঙ্কন বা মূর্তি নির্মাণের কথা থাকত না। এই তথ্যটি ভারতীয় ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ এই প্রতিকৃতি নির্মাণের প্রবণতাই শিল্পীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল অসংখ্য সুরসুন্দরীর রূপনির্মিতির কাজে।

ভারতীয় শিল্পীদের মূল লক্ষ্য ছিল সৌন্দর্য নির্মাণ। পরিমাণরক্ষার খাতিরে মানুষের অবয়ব সংস্থানের ওপর জোর দিলেও তাঁদের দৃষ্টি ছিল সুন্দরের দিকে। সেজন্যেই নৃত্য ও সঙ্গীতের সম্বন্ধে ভাস্করদের ছিল গভীর জ্ঞান। শোনা যায়, নৃত্যভঙ্গিমার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে ভাস্কর হওয়া যেত না। ভারতশিল্পীরা ভয়ংকরের মধ্যে, বেদনার মধ্যে, বিষাদের মধ্যে সুন্দরকে খোঁজেননি, অনাড়ম্বর বাস্তবতার সারল্যের মধ্যেও নয়। তবে অনির্বচনীয়ের আভাস আনার চেষ্টা ছিল তাঁদের মনে। দেবমূর্তি নির্মাণের সময় তাঁরা দেবতার মুখে সঞ্চার করেছেন অসীমের ব্যঞ্জনা। তাতে দেবত্বের মহিমা পূর্ণ বিকশিত হয়েছে কিন্তু তাঁরাই আবার নারীকে দেখতে চেয়েছিলেন শুধু নান্দনিক দৃষ্টিতে, এক কথায় কামসহচরীরূপে।

সাহিত্যে এবং কামশাস্ত্রে নারীর রূপের কথা নানাভাবে বলা হয়েছে। লক্ষণ মিলিয়ে নির্ণীত হয়েছে নায়িকাদের পরিচয়। রামায়ণ - মহাভারত থেকে শুরু করে কালিদাস, ভবভূতি, বান, ভারবি, ভাস, শ্রীহর্ষ সবার রচনাতেই খুঁজে পাওয়া যাবে অসংখ্য রূপসী যুবতীকে। তাদের রূপ বর্ণনার সবটাই পুরোপুরি দৈহিক এবং কামনাউদ্রেককারী সৌন্দর্য। ভারতীয় নারীর বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব এতে

ফোটেনি। তাদের স্বাতন্ত্র্যও না। শুধু রূপের বর্ণনা পড়ে দ্রৌপদী ও উর্বশীর পার্থক্য বোঝা শক্ত। ভারত-ভাস্কর্যেও তাই। রূপদক্ষ শিল্পীদের লক্ষ্য ছিল একটাই। প্রবণতাও। সেটি হল নারীর রমণীয়তা আরো বৃদ্ধি করা যায় কি ভাবে। নারীর সৌন্দর্য বহুগুণ বৃদ্ধি করতে পারে অলঙ্কার, কেশসজ্জা, সাজপোশাক এবং নারীসুলভ কতকগুলি কমনীয় নৃত্যভঙ্গিমা। এগুলি সবই তার অঙ্গের অতিরিক্ত আকর্ষণ। ভারতীয় ভাস্করেরা এই অতিরিক্ত আকর্ষণের প্রতি জোর দিয়েছিলেন খুব বেশি। প্রতীচ্যের শিল্পীরা যা অগ্রাহ্য করেছিলেন অনায়াসে।

অনেকে অভিযোগ করেন ভারতীয় শিল্পীদের এই প্রবণতার ফলে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে অবাস্তবতা। খাজুরাহোর অনুপমা সুরসুন্দরীরা যে ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তাদের প্রসাধনপর্ব শেষ করে বাস্তবে কোন নারী সেভাবে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু কে অস্বীকার করবে এভাবে দাঁড়ালেই তাকে দেখাত সবচেয়ে রমণীয়। অবয়ব সংস্থানেও আছে ত্রুটি। সর্বত্র যৌবন লক্ষণ প্রকট করবার অতিরিক্ত আগ্রহও অনেক সময় মূর্তিগুলিকে নিয়ে গেছে বাস্তব জগৎ থেকে দূরে।

অবশ্য এই অসামান্যাদের কেউই সম্পূর্ণভাবে বাস্তবলোকের বাসিন্দা নয়। সকলেই দেব-গন্ধর্বলোকের অধিবাসিনী। শোনা গেছে সাঁচী ও ভারহুতের বৃক্ষকা ও শালভঞ্জিকা মূর্তিগুলি আদিতে ছিল উর্বরতার প্রতীক। জনহীন অরণ্য প্রান্তরে, পাহাড়ের গুহায় স্তূপ বা মন্দিরগাত্রে তাদের উৎকীর্ণ করার কারণই ছিল উর্বরতার দেবতাকে, সৃষ্টির দেবতাকে প্রসন্ন রাখা— সম্ভবত সেজন্যেই দেখা যেত মন্দিরের গায়ে মিথুন দৃশ্যের বাড়াবাড়ি, লাস্যময়ী রমণীদের মোহময় আবেদন। পরে সেটি নাগরিক প্রবণতায় পরিণত হয়।

শিল্পীদের প্রবণতা বা মূল লক্ষ্য যাই থাকুক না কেন, একথা অস্বীকার করা চলবে না মধ্যযুগের সামাজিক জীবন চলমান ছবির মতো এইসব মন্দির, গুহা, স্তূপ প্রভৃতি অলংকরণের মধ্যে ধরা পড়েছে। ভারত-ভাস্কর্যকে বিশ্লেষণ করে আমরা দেবদেবীর বিগ্রহ ছাড়াও পাই বেশ কিছু নরনারীর যুগল মূর্তি, তবে একক নারীমূর্তির সংখ্যাই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি। যোদ্ধা, জীবজন্তু, বৃক্ষ বা পৌরাণিক চিত্রগুলির প্রসঙ্গ এখানে বর্জন করা হল। নারীমূর্তিদের অধিকাংশই নায়িকা বা প্রেমিকা আর কিছু অংশ পরিচারিকা শ্রেণীভুক্ত হতে পারে। যাদের পরিচারিকা বলে অভিহিত করছি তাদের হাতে আছে ফলের থালা, ফুলের মালা, প্রদীপ, পাখির খাঁচা, চুড়ি, চামর, পাখা বা অন্য কিছু। না হলে নায়িকাদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। দীদারগঞ্জের যে চামরধারিণীর কথা আগেই বলেছি, মহেনজোদাড়োর নর্তকীর পরে সে-ই বোধ হয় ভারতীয় শিল্পীর হাতে গড়া প্রথম সুন্দরী। এ অনুমান কাল্পনিক, বহু মূর্তি হয়ত ভেঙে নষ্ট হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে চিরকালের মতো। দীদারগঞ্জের যক্ষীকেও তো পাওয়া গেল এই সেদিন পাটনার কাছাকাছি গঙ্গার তীরে। বুকানন

সুরসুন্দরী, খাজুরাহো

হ্যামিলটনের ধারণা এ মূর্তিটি কুর্মাহার থেকে পাটলিপুত্রে আনা হয়েছিল মন্দিরে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে। কিন্তু মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন অগ্নিকাণ্ডে সমস্ত শহরটি পুড়ে ছারখার হয়ে গেলে নগরবাসীর চোখে দেবী হয়ে গেলেন অপদেবী, তাঁর ঠাঁই হল পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার বুকে। তারপর কতদিন, হয়ত বা দু হাজার বছর পার হবার পরে এই সেদিন আবার পাওয়া গেল তাঁকে। কতদিনের চেষ্টায় রূপদক্ষ ভাস্কর তাকে রূপ দিয়েছিল কে জানে ? সত্যিই কি তার সামনে কোন সত্যিকারের মডেল এসে দাঁড়িয়েছিল ; না সবটাই নিছক কল্পনা ? আমাদের অনুমান কল্পনা নয়। বাস্তব পৃথিবীর রক্তমাংসে গড়া জীবন্ত কোন চামরধারিণীই সেদিনের শিল্পীর প্রেরণা ছিল।

মডেল নিয়ে ভারতীয় ভাস্কররা কাজ করতেন না ধরে নেওয়া হলেও তাঁদের স্মৃতিতে থাকত অভিজ্ঞতা। শিল্পী তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে যে চামরধারিণী, ছত্রধারিণী, ফলবাহিকা, আসববাহিকা মেয়েদের দেখতেন ধনীর গৃহে, প্রমোদ উপবনে, মন্দির প্রাঙ্গণে তাদের স্মৃতিই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সমাজের ওপরতলার মানুষেরা এ জাতীয় সুন্দরীর প্রতিমূর্তি দিয়ে মন্দির অলংকরণে যেমন উৎসাহ দিতেন, নিজের প্রমোদ উদ্যান সাজাতেও ভালবাসতেন। সেখানে নিশ্চয় অলসকন্যা, নর্তকী, স্নানরতা যক্ষী, করতাল বা মাদলবাদিনীর প্রাধান্য ছিল তবু দৃষ্টিনন্দন সেবিকাদের মূর্তিও শোভা পেত নানা জায়গায়। দীদারগঞ্জের চামরধারিণীকে দেবীরূপে উপাসনার জন্যে আনা হয়েছিল না উদ্যান সাজাবার জন্যে নিশ্চিত করে, কে বলতে পারে? দ্বিতীয় সম্ভাবনাই বেশি, কারণ কোন চামরধারিণী দেবীর সন্ধান আমরা পাইনি কিন্তু ধনীর বাগানবাটিতে ছত্রধারিণী বা চামরধারিণী নিশ্চয় ছিল। মথুরা ভাস্কর্যের অধিকাংশ নারীমূর্তি সম্বন্ধেই এ কথা বলা চলে।

সাধারণত সুন্দরী নায়িকা মূর্তির সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। বিভিন্ন জায়গায় এদের বিভিন্ন নাম সাঁচী ভারহুতে বৃক্ষকা, মথুরায় যক্ষী, কোণারকে অপ্সরা, ভুবনেশ্বরে অলসকন্যা, খাজুরাহোতে সুরসুন্দরী, মাদুরায় রতি, বেলুড় হালবিদে মদনিকা— হয়ত এদের চেহারায় ও চরিত্রে কিছু তফাৎ আছে। যেমন বৃক্ষকা বা শালভঞ্জিকা উর্বরতার প্রতীক। যক্ষ-যক্ষীরা অভিজাত সমাজের মানুষের কিংবা তাদের সঙ্গিনীদের প্রতিনিধি। অপ্সরা সুরসুন্দরী মদনিকারা— কেউই গৃহবধূ নয়, নামেই প্রকাশ তারা সুরলোকের বাসিন্দা এবং কাম-সহচরী, রসিকপ্রিয়া। এদের ভাল করে লক্ষ করলেই বোঝা যায় নৃত্যগীত বাদ্যসহ জনমনোরঞ্জন যাদের প্রধান জীবিকা ছিল তাদের অর্থাৎ হয় দেবদাসী, নয় নগরবধূদের অনুকরণেই এরা নির্মিত। যক্ষযক্ষীরা যদি তৎকালীন অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হয় তাহলে সুরসুন্দরীরা দেবদাসীদের ভোগমূর্তি।

মন্দির অলংকরণে দেবদাসীদের গুরুত্ব বেশি। সত্যিকারের দেবদাসী বিগ্রহের সামনে তার নৃত্যকুশলতার পরিচয় দেয়, শিল্পীর হাতে ধরা পড়ে তাদের ললিত দেহভঙ্গি। হয়ত সুরসুন্দরীর মডেল হয়েও ভাস্করদের সামনে এসে দাঁড়াতে হত দেবদাসীদের। এ অনুমান যে একেবারে অসঙ্গত নয় তার প্রমাণ মেলে দেবদীন রূপদক্ষের স্বীকারোক্তিতে। স্বীকারোক্তি না কি স্বীকৃতি? রামগড় পাহাড়ের যোগীমারা গুহায় পাথরের বুকে লিখে রেখেছিল দেবদীন। কঠিন পাথরের বুকে এক দেবদাসীর নয়নলোভন প্রতিকৃতি ফুটিয়ে তুলতে তুলতে দেবদীন অনুভব করেছিল তার বুকের মধ্যে এক অপ্রতিরোধ্য কামনার আলোড়ন। অনুভব করেছিল পাথর কেটে কেটে যে সুরসুন্দরীকে সে স্পষ্ট করে তুলছে সে-ই তার মানস সুন্দরী। কিন্তু সে কে? সামান্য রূপদক্ষমাত্র। তার মনের কথা জানবার জন্যে কেউ বসে নেই। অথচ এত বড় কথাটা জানবে

বিদেশের সংগ্রহালয়ে ভারত সুন্দরী

না কেউ? তাও কি হয়? প্রেমের ধর্মই যে নিজেকে প্রকাশ করা। দেবদীন লিখে রাখল সে নামটি সবার চোখ এড়িয়ে পর্বত কন্দরের নিভৃত বুকে,

'শুতনুক নম দেবদশিক্যি
তৃং কময়িথ বলন শেয়ে
দেবদিনে নম লুপদখে।'

সুতনুকা নাম্নী দেবদাসীকে কামনা করেছিল বর্নাশা নদীতীরবাসী (মতান্তরে বারাণসীবাসী) দেবদিন রূপদক্ষ।

তখনকার দিনে বোধ হয় ভালবাসার কোন প্রতিশব্দ ছিল না। প্রেমের অর্থই ছিল কামনা করা। নারীর একটাই রূপ।সে ভোগ্যা, আসক্তিময় প্রগলভতা, পুরুষের কামনার ধন। দেবদীনের কামনা পূর্ণ হয়েছিল কি না, সুতনুকা তার মনের কথা কোনদিন জেনেছিল কি না সেসব অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করে লাভ নেই। শুধু জানা গেল প্রাচীনকালে রূপদক্ষদের সঙ্গে দেবদাসীদের যোগ ছিল। কোন কোন সময়ে মূর্তি ও মডেলের সম্পর্ক ছাড়িয়ে তাদের ঘনিষ্ঠতা মোড় নিত অন্য দিকে। হয়ত সামান্য রূপদক্ষের স্বপ্ন সার্থক হত না। দেবদাসীরা শুধু দেবতারই দাসী ছিল না। মন যাকে চায় তাকে আহ্বান করার অধিকার থাকলেও তাদের তুষ্ট করতে হত রাজা ও রাষ্ট্রনায়কদের, সেখানে সামান্য রূপদক্ষের প্রাণের আর্তি চাপা পড়ে যেত নূপুর ঝঙ্কারের আড়ালে একটি ছোট্ট তালভঙ্গ ঘটিয়ে।

যতদূর মনে হয়, তৎকালীন সমাজের রূপ ছিল একটু অন্যরকম। সাধারণ মানুষের জীবন নিশ্চয়ই এক খাতেই বইত। দরিদ্র জীবনে একটানা দুঃখের রঙ ছিল পাকা। কিন্তু ধনী সম্প্রদায় ডুবে থাকতেন আকণ্ঠ বিলাসিতায়। সংযমের বালাই ছিল না তাঁদের জীবনে। এর জন্যে সামাজিক নিয়মকানুনও যে দায়ী ছিল না তা নয়। প্রথাগত বিবাহিত জীবনে অনেকের পক্ষেই সুখী হওয়া সম্ভব ছিল। সর্বত্রই বিবাহ হত কুলমর্যাদা ও জাতিগোত্র বিচার করে। পুরুষ বা নারীর পারস্পরিক অনুরাগ বা আপত্তি বিশেষ মর্যাদা পেত না। ফলে অনেক সময় বিবাহিত জীবনে অতৃপ্তি থেকে যেত। তাছাড়া রাজপুত্র শ্রেষ্ঠীপুত্র প্রভৃতি ধনী সন্তানেরা যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে পেত দাসী ও পরিচারিকাদের অবাধ সান্নিধ্য। বানভট্টের 'কাদম্বরী'তে তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী সুদর্শনা পত্রলেখাকে নিশ্চয় মনে আছে, সে ছিল রাজপুত্রের নর্মসহচরী! তখন ইচ্ছাবিলাস পুরুষদের নিয়ে যেতে পারত সেবাদাসী, সভানর্তকী, বারবিলাসিনী সকলের কাছেই। কাঞ্চনমূল্যে নির্ণীত হত ভালবাসার দাম। একটিমাত্র সুখের বৃত্তে বারবার ঘুরে উচ্ছ্বসিত কামাবেগ নিয়ে ধনিক সমাজ যেতেন রঙ্গনটী বিলাসিনীদের কাছে।

ভোগবাসনাকে অত্যধিক মর্যাদা দেবার ফলে ভারতের একটি বিশেষ সময়ের সাহিত্যে, শিল্পে, ভাস্কর্যে, জীবনচর্চায় সর্বত্র শরীরচেতনার ছাপ পড়েছিল। বাৎসায়নের কামসূত্র ছাড়াও তার অনুকরণে লেখা হচ্ছিল মানসোল্লাস, রতিরহস্য, রতিমঞ্জরী, সুরদীপিকা, কামসমূহ, পঞ্চশায়ক,

অনঙ্গরঙ্গ। নর-নারীর মিলনের স্থান হিসেবে ছিল নগরোপবন, প্রমোদভবন, ধরা গৃহ, গূঢ়মোহন গৃহ, সুরতভবন, দোলা গৃহ, দোলনাবিরোহন। গণিকালয়গুলির কথা বাদই দিলুম। মিথুন চিত্র আঁকা হচ্ছিল নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদিতে যেমন আয়নার হাতলে, চিরুনিতে। এমনকি মন্দিরেও, একটি দুটি নয় অজস্র—বিচিত্র ভঙ্গিমায় মিথুন মূর্তিগুলি মন্দিরের অলংকার হয়ে আজও কৌতূহলী দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এই উপভোগের পর্ব বিচ্ছিন্নভাবে হয়ত বারবারই এসেছে। মথুরার বিশালা যক্ষীদের শরীরী আবেদন কম নেই। অমরাবতী-নাগার্জুনকোণ্ডায় মাঝে মাঝে জীবন পিপাসার অত্যাশ্চর্য রূপ ধরা পড়েছে। কিন্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে দেহসাধনার পর্বটি শুরু হয়েছিল নবম শতাব্দীতে। প্রায় পাঁচশো বছর ধরে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাস্কর্যে তার প্রভাব পড়েছে। এই অসংযত জীবনযাপন পদ্ধতির সঙ্গেই জড়িয়েছিল শুচিতাবিহীন মশিরেখার মতো অসংখ্য রূপসী। তাদের প্রণয়কলা, অভিসার, পত্ররচনা, অবসর বিনোদন, স্নান-প্রসাধন, কেশচর্চা, অলংকার-প্রিয়তা—সবই ধরা পড়েছে রূপদক্ষ ভাস্করদের নিপুণ হাতে। বহু বছর ধরে নারীদেহের রূপায়ণে ভারতের শিল্পীরা পেয়েছিলেন অবাধ স্বাধীনতা। নয়নশোভন প্রতিমা রচনার সময় সৃষ্টিসুখের উল্লাসই ছিল তাঁদের মূল প্রেরণা। ধনী সমাজের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতার সঙ্গে ছিল জনরুচির সোৎসাহ সমর্থন।

মহেনজোদাড়োর নর্তকী যেদিন হালেবিদের মদনিকায় পরিণত হল সেদিন নারীর যৌবন সৌন্দর্য পরিস্ফুটনে ভারত-ভাস্করের সাধনা সার্থক হল সুসম্পূর্ণতায়। এর অর্থ এই নয় যে ভারতীয় শিল্পীরা হাজার হাজার বছর ধরে একটি বিশেষ রূপকে ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। রূপনির্মিতির সাধনায় তাঁরা মগ্ন ছিলেন বহুকাল। সেজন্যেই দেবমূর্তিতে আরোপিত হয়েছে মহিমা। তথাগতের নয়নে ফুটে উঠেছে অপার করুণা। নারীমূর্তি গড়ার সাধনা এক এক জায়গায় এক এক রকমের। সব নারী একই সমাজের প্রতিনিধিও নয়। মথুরার যক্ষীদের চাঞ্চল্যহীন ভঙ্গি দেখে মনে হয় না তারা কেউ দেবদাসীদের প্রতিরূপ। কেউ পরিচারিকা কেউ বিলাসিনী অলস লাবণ্য তাদের সর্বাঙ্গে। কেউ অভিসারিকা নয়, সবাই মূর্তিমতী প্রতীক্ষা যেন। রূপদক্ষেরাও নিজেদের ভোগবৃত্তির ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারেননি। তাঁদের কল্পনার প্রেয়সীরা জৈবসুখের উল্লাসে, সৃষ্টির আনন্দ নয়। খাজুরাহোর নায়িকারা কামনার পুষ্পবনে ফুটে থাকা ফুল। শিল্পী কিন্তু তার কাছে আত্মসমর্পণ সহজে করেননি। দেখিয়েছেন কামের সঙ্গে যুযুধান পরাস্ত মানবকে। যার কাছে পরাভূত হল মানুষ তাকে রূপায়িত করার চেষ্টায় বিরাম ছিল না। বাৎসায়ন বলেছিলেন, 'কুসুম সধর্মানো হি যোষিতঃ' অর্থাৎ নারীরা ফুলের মতো, শিল্পীরাও সেভাবেই দেখতে চেয়েছিলেন নারীকে—ফুলের মতো নারীর রূপরচনার সময় তাঁরা সাহায্য পেয়েছিলেন সমসাময়িক সাহিত্যের। সাহিত্যিক উপমাতেও

অপ্সরা, কোণারক

মদনিকা, বেলুর

তাঁরা বারবার শুনতেন ফুল ও নারী এক। পদ্মের মতো চোখ, তিলফুলের মতো নাক, বাঁধুলি ফুলের মতো রাঙা অধর, কুন্দফুলের মতো হাসি। পাথরের মূর্তিতে নারীকে ফুটিয়ে তোলার সময় রূপদক্ষেরা পালিশের উজ্জ্বলতা মুখে বেশি পায়ের দিকে কম দিয়ে তাতে আনতে চাইতেন কুসুমের শোভা— ফুলেরও পাপড়িতে উজ্জ্বলতা বেশি, বোঁটায় কম। নারীর দাঁড়াবার ভঙ্গিটিও তাঁরা পেয়েছিলেন পদ্মের মৃণাল থেকে। মন্দিরের প্রাঙ্গণ তাঁরা সাজিয়ে দিতেন ফুলে ফুলে।

সাঁচী-ভারহুত অমরাবতীতে মন্দির নয়, স্তূপের তোরণ ও সিংহদ্বার সাজানো হয়েছে নানাভাবে। গাছের ডাল ধরে লীলায়িত লতার মতো ত্রিভঙ্গিম কোণ সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে মোহিনীরা। বৃক্ষকা, শালভঞ্জিকা, সিরিমা, চোলাফুকা প্রকৃতির সর্বাঙ্গে অলংকার, অথচ দেহের প্রতিটি রেখা আশ্চর্যভাবে স্পষ্ট। এত স্পষ্ট যে চোখে লাগে।

হিন্দু বা বৌদ্ধ কোন ধর্মগ্রন্থেই এদের কথা নেই। হয়ত সত্যিই এরা ভূমিদেবীর আদর্শে নির্মিত। কিন্তু এদের রূপনির্মিতি হয়েছে স্থানক রুচি অনুসারে। কামশাস্ত্রের লক্ষণ মিলিয়ে নয়, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাকেই শিল্পীরা কাজে লাগিয়েছিলেন বেশি। প্রতীচ্যের কোন কোন সমালোচক বলেছেন, ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার স্মৃতি না থাকলে ভারতীয় ভাস্করেরা এত নিখুঁত কামচিত্র মন্দিরের গায়ে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন না কখনই। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার কথা মনে হয় আরো একটা কারণে। ভারহুত স্তূপের নির্মাতা ছিলেন ধনভূতি বণিক, কোন রাজা নয়। তিনি তাঁর বন্ধু অন্যান্য বণিকদের অর্থসাহায্যে এ কাজ শুরু করেন। নির্জন অরণ্যের বুকে। রাজানুগৃহীত সেরা শিল্পীরা এখানে কাজ করেননি। মথুরার কোন কোন কারিগর হয়ত এসেছিলেন নির্দেশক হসেবে। আসল কাজ করেছিলেন সেইসব গ্রাম্য ভাস্করেরাই, যাঁরা এতদিন গ্রাম্য সমাজের সাধারণ মানুষের রূপতৃষ্ণা মিটিয়েছিলেন শিলপসৃষ্টির সাহায্যে। বড় কাজে হাত দিয়েও তাঁরা নতুন কিছু গড়তে পারলেন না। জাতক কাহিনী আঁকবার সময়ও তাঁরা আঁকলেন সেই জীবনযাত্রার ছবি যা তাঁরা এতদিন দেখে এসেছেন এঁদের চারপাশে। নারীকে তাঁরাও দেখেছিলেন চতুরা নাগরিকারূপে নয়, ইন্দ্রিয়ভোগ্যা মোহিনীরূপে—ভারহুত সাঁচীতে তাদের ক্ষণস্থায়ী যৌবনই পেল শাশ্বত রূপ।

অমরাবতী ও নাগার্জুনকোণ্ডার নারী পেয়েছে আরও পূর্ণতা। সাঁচী ভারহুতের সুন্দরীদের চোখের তারা নেই, গোয়ালিয়রের রূপসীর দেহসৌন্দর্যের মোহবন্ধন অগ্রাহ্য করে চোখের দিকে তাকালে যে তারার আভাস মেলে নাগার্জুনকোণ্ডার নারীর নয়নেও দেখা যায় সেই দৃষ্টি। আগেই বলেছি ভারত-ভাস্কর্যে সুন্দরকেই সৃষ্টির শেষ কথা ধরে নিয়ে নারীমূর্তি গড়ার কাজ চলেছিল অনেক দিন ধরে। অপ্সরা বা সুরসুন্দরীরা তাদের অনিন্দনীয় ভঙ্গি নিয়ে কি করে পূর্ণতা লাভ করেছিল তা কয়েকটি মূর্তিকে অভিনিবেশ সহ লক্ষ করলে বোঝা যায়। ভাস্করেরা প্রায়ই মূর্তি গড়ার সময় সাহায্য নিতেন পূর্ববর্তী শিল্পকর্মের, কখনো ছবির, কখনো বা মূর্তির। সে সময় একটু বেঁকিয়ে চুরিয়ে, অভিনবত্ব সঞ্চার করে আর একটু কমনীয়তা এনে নবীন ভাস্করেরা চেষ্টা করতেন নিজের শিল্পদক্ষতা প্রমাণ করতে। যেমন, ধরা যাক মথুরা ভাস্কর্যের সদাস্নাতা যুবতীটির কথা। আলুলায়িত কুন্তলা মেয়েটি সদ্য স্নান করে এসেছে, চুল থেকে নিংড়ে ফেলছে জল, ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়ছে, সেই জল পান করছে তৃষ্ণার্ত সারস। জানি না কোনো ধনীর প্রমোদ উদ্যানের জন্যে মূর্তিটি তৈরি হয়েছিল কি না। তারপর কেটে গেছে কত যুগ। নাগার্জুনকোণ্ডার মিথুন মূর্তিটি দেখে আবার মনে পড়ে যায় মথুরার সুন্দরীকে। এখানে সে একা নয়, পাশে কামার্ত প্রেমিক। মনোরম ভঙ্গিতে সকাম অনুরাগের বর্ণচ্ছটা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরী। তার হাতে সিক্ত চুল, জল পান করবার জন্যে মুখ তুলেছে রাজহংসী। একই ভাবনা দুই শিল্পীর হাতে ধরা দিয়েছে ভিন্নভাবে। তাই বিভিন্ন অঞ্চলের নারীমূর্তির মধ্যে একই সঙ্গে পাওয়া গেল সাদৃশ্য ও বৈচিত্র্য। বিষয় এক হলেও প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্য তাদের দিত স্বাতন্ত্র্য। কোণারকের অপ্সরা কিংবা ভুবনেশ্বরের অলসকন্যাদের যৌবনশ্রীতে মিশে আছে পল্লীবাসিনীদের সুস্মিত লাবণ্য, নিজের রূপ সম্বন্ধে তাদের অসচেতনভাবেই এনে দিয়েছে সরলতা। খিচিং-এর মেয়েরা আরো গ্রাম্য, নিজেদের মনোভাব গোপন করতে পারে না। তুলনায় খাজুরাহোর সুরসুন্দরীরা সবাই নাগরিকা, লাস্যময়ী, বিদগ্ধ ব্যক্তিদের রুচি ও নিজেদের রূপ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন। তাদের তন্বীদেহে মেদভার কম, তীক্ষ্ণতা বেশি ঠিক কোণারকের অপ্সরাদের বিপরীত। বলাবাহুল্য দেবদাসীদের অনুকরণেই এরা সৃষ্ট। পত্রলেখা, প্রোষিতভর্তৃকা, তরুণী জননী, শৃঙ্গাররতা প্রভৃতি অন্যান্য মূর্তিও আছে। কামসূত্রের লক্ষণ মিলিয়ে দেখা গেছে শিল্পী প্রতিটি লক্ষণ মিলিয়ে গড়েছেন এদের। আলেকজাণ্ডার কানিংহাম, খাজুরাহোর কাণ্ডারীয় মহাদেবের মন্দিরে আটশ বাহাত্রটি দৃষ্টিনন্দন মূর্তি আবিষ্কার করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের হয়সালা মন্দিরগুলিতেও রয়েছে অসংখ্য মদনিকা। বেলুর ও হালেবিদের মদনিকাদের যৌবনশ্রী ছাড়াও চোখে পড়ে তাদের কমণীয় ভঙ্গি। কারা এরা?

বিশেষজ্ঞরা বলবেন, কারা আবার? দেবদাসীরা। লোকবিশ্বাস, এক হয়সালরাজের পরমাসুন্দরী রানী নৃত্যকুশলা সান্তালাদেবীই ছিলেন মডেল। চেন্নাকেশবের মন্দিরে তিনি নৃত্য করতেন, ভক্তি আবেশে শিল্পীদের মনে আঁকা হয়ে যেত তাঁর প্রতিটি মুদ্রা তারপর নীলাভ কালো পাথরে ফুটে উঠল চিরস্থায়ী রূপ। হয়সালা মন্দিরে অনেক ভাস্করের নামও আছে। মল্লিতাম্মা নামের এক ভাস্কর তৈরি করেছেন চল্লিশটি মূর্তি। কোথাও তাঁরা তাঁদের মডেল সম্বন্ধে কোন কথা বলেননি। দেবদীনের মতো প্রকাশ করেননি মনের অবরুদ্ধ আবেগ। সুন্দর হলেও হয়সালা মন্দিরের ভাস্কর্যে প্রথানুগ ভঙ্গি বড় বেশি। বোঝা যায় বিষয় বৈচিত্র্য হারাতে বসেছেন রূপদক্ষেরা। নতুন দৃষ্টি নিয়ে নারীকে তাঁরা আর আবিষ্কার করতে চাইছেন না। নির্মাণ করতে পারছেন না তার অচঞ্চল যৌবনের সর্বগ্রাসী রূপ যা ধরা পড়ে তাঁদের বাস্তব দৃষ্টিতে। মীনাক্ষী মন্দিরে রতি কি সত্যিই পারে মদমত্ত পুরুষকে কর্মহারা কারাগারে বন্দী করে রাখতে? যদিও দক্ষিণ ভারতের দীপলক্ষ্মীরা সত্যিই অসামান্যা। কাঞ্চীপুরমের নর্তকীদের মধ্যে যে সারল্য ছিল তার আভাসও হারিয়ে যেতে দেরি হল না শিল্পীদের মন থেকে। বরং তাঞ্জোরের যে শিল্পী ঋষিবধূদের তৈরি করলেন তাঁর কাজে সূক্ষ্মতা না এলেও এসেছিল আন্তরিকতা। হয়ত সে জন্যই কারলা গুহার কৃষক দম্পতি মনকে যত টানে পালামপেটের সুন্দরী ততখানি অভিনিবেশ দাবি করতে পারে না। অথচ পাথরে এসেছে সূক্ষ্মতা, পাথরে যা আসেনি তা এসেছে ব্রোঞ্জ মূর্তিতে—এসেছে শুধু বহিরঙ্গ অলংকরণে। নতুন দৃষ্টি নিয়ে মধ্যযুগের ভারত শিল্পীরা নারীকে দেখবার আর কোন চেষ্টা করেননি। নান্দনিক দৃষ্টি দিয়ে ফুলের মতো রূপসীকে একটু একটু করে পূর্ণ বিকশিত করাই তাঁদের সাধনার শেষ কথা—এক্ষেত্রে রূপের অতীত অপরূপকে ধরবার প্রয়াস তাঁদের ছিল না, ছিল না মর্তবাসিনীর জীবনের দুঃখ-শোক-ত্যাগ-বিষাদকে রূপায়িত করার ক্ষীণতম প্রচেষ্টা।

ইতিমধ্যে মানুষের মনের পরিবর্তন ঘটেছে। একদিকে সে খুঁজে পেয়েছে জীবনের অর্থ। শুধু ভোগ নয়, শুধু ইচ্ছাবিলাসের স্রোতে কুটোর মতো ভেসে যাওয়া নয়, জীবন আরো বড়। অপরদিকে তার মনে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হল ভেনাস কিংবা আফ্রোদিতির রূপকল্পনা। পশ্চিমের স্নানরতা সুন্দরীরা এসে বসলেন আমাদের বাবুদের বিলাসকুঞ্জে—রাজার রুচিই প্রজার রুচি। অবসিত হল মন্দির ভাস্কর্যে নারীর যৌবনমূর্তি রচনার যুগ। সুরসুন্দরীদের অঙ্গে জমে উঠল অবহেলার শ্যাওলা। হারিয়ে গেল ভারতশিল্পীদের যৌবন বন্দনার স্বপ্ন।

আবার যখন তাদের আমরা বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে খুঁজে পেলুম, তখন তাদের সঙ্গে তাদের যুগের মানসিকতার সঙ্গে যোগস্থাপনের ভাষা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। রূপ নন ব্যক্তিত্বের বিভায় ভারতের নারী অনেক বেশি উজ্জ্বল। তার সতীত্বের মহিমার কাছে ম্লান হয়ে গেছে অগ্নিশিখা। মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম দিয়ে সাবিত্রী জয় করেছেন কৃতান্তের হৃদয়। গান্ধারীর ন্যায়ধর্মকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি সনাতন মাতৃস্নেহ। অপমানিতা দ্রৌপদীর অবেণীবদ্ধ কালো চুলে লুকিয়েছিল প্রচণ্ড প্রতিজ্ঞা। তাপসী উমার তপস্যায় চঞ্চল হয়েছিলেন স্বয়ং মহেশ্বর। নারীর ব্যক্তিত্বের এই সত্য দিকটিকে কতদিন ভুলে থাকা যায়? এক সময় অপ্সরাদের নূপুর শিঞ্জন থামে, কন্যাকুমারীর মুখের হাসি ম্লান হয় না। নবীন ভাস্কর সুরসুন্দরীদের রূপসাধনার গহনে আর ডুব দিলেন না। বিশেষ যুগের প্রতীক হয়েই রইল অগণিত বরাঙ্গনার অনন্ত প্রতীক্ষা। একেবারে হারিয়ে গেল কি? কি করে হারাবে; মহাকালের লগ্ন তো শেষ হবার নয়, শুকোয় না পারিজাতের পাপড়ি। নশ্বর মানুষ নির্বাসিত যক্ষের বেদনা নিয়ে আজও অনুভব করে মর্তমায়ার যুগ শেষ হলেও প্রদীপ্ত বাসনার মতো যৌবনবতীরা শুধু মন্দির প্রাঙ্গণে নয় তার আকাঙ্ক্ষার স্বর্গে বন্দী হয়ে আছে, থাকবে চিরকাল।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়: ভারতশিল্পের কথা

অসিতকুমার হালদার: রূপদর্শিকা

নির্মল ঘোষ: ভারতশিল্প

যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়: আর্ট ও আহিতাগ্নি

শ্যামলকুমার চক্রবর্তী: পত্রবিলাস

H. Mode: The Women in Indian Art

Debangana Desay: Erotic sculptur of India

Richard Winshed, ed: Indian Art

Indian Museum Calcutta

গর্ভধারিণী

সমরেশ মজুমদার

রোবট দ্যাখেনি জয়িতা স্বচক্ষে তবে যা বর্ণনা পড়েছে তার সঙ্গে এই মুহূর্তের সুদীপের কোন তফাৎ নেই। ও হাঁটছে যে ভঙ্গীতে সেটা মোটেই স্বাভাবিক নয়।

অনেক সাধ্য-সাধনার পরও যখন সুদীপের চেতনা পরিষ্কার হল না তখন লা-ছিরিঙ একটা গাছের পাতা এনেছিল। ওই শেষ রাতের ঠাণ্ডায় শরীরে তেমন শীতবস্ত্র না থাকা সত্ত্বেও ওরা যেভাবে চলাফেরা করে সেটা অভ্যেসের ফসল হতে পারে কিন্তু গাছপালা হাতড়ে পাতা খুঁজে আনা কম কথা নয়। সুদীপের মুখের ভেতর পাতাটা পুরে দিয়ে চোয়ালে দুহাতের চাপ দিয়ে সেটাকে নাড়াতে বাধ্য করেছিল লা-ছিরিঙ। পাতার রস পেটে যাওয়া মাত্র বমি হয়েছিল সুদীপের। সেই বমির রঙ দেখে চমকে উঠেছিল ওরা। কোন মানুষ এমন ঘন কালো রঙের বমি করতে পারে ওরা জানত না। বোধ হয় শরীরের অস্বস্তিটা সামান্য কমতেই আরও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সুদীপ। বোঝা যাচ্ছিল এখন ওর ঘুম দরকার। কিন্তু তাপল্যাঙে ঘুমিয়ে থাকার ঝুঁকি ওই সময় নেওয়া আর মৃত্যুকে ডেকে আনা একই ব্যাপার। আনন্দ সুদীপের মাথাটা দুহাতে তুলে প্রায় আর্তনাদ করেছিল, 'সুদীপ, উই আর ইন ট্রাবল, পালাতে হবে এখনই।' সুদীপ চোখ তুলেছিল। হয়তো কথাগুলো বুঝতে পেরেছিল। কারণ সে উঠে বসতে চেষ্টা করেছিল। জয়িতা তার অন্যদিকটা ধরে তোলার চেষ্টা করার পর সে কাটা গাছের মত টলমল করতে লাগল। ওর নিজস্ব শক্তির এক ফোঁটাও অবশিষ্ট নেই।

সেই সময় মেয়েটি এগিয়ে এল। কোন কথা না বলে সুদীপের শরীরটা নিজের পিঠে তুলে নিল সে। জয়িতা হতবাক। সুদীপ বেশ স্বাস্থ্যবান অথচ মেয়েটি অবলীলায় তুলে নিল ওকে। সে শুনল লা-ছিরিঙ বিড় বিড় করে কিছু বলল। সেটা প্রশংসার না নিন্দের তা অবশ্য বোঝা গেল না।

ওরা যাত্রা শুরু করেছিল শুকতারা চোখে রেখে। বের হবার আগে সমস্ত ঘরটা জরিপ করে নিয়েছিল যাতে ওদের কোন স্মৃতিচিহ্ন না থাকে। লা-ছিরিঙ আর জয়িতা সামনে, সুদীপকে নিয়ে মেয়েটি মাঝখানে আর শেষে আনন্দ। ওরা যখন তাপল্যাঙ থেকে বেরিয়ে এল তখন কোন মানুষ জেগে নেই। এমন কি কুকুরগুলো পর্যন্ত আর চিৎকার করছে না। আলো জ্বলছে না কোথাও। আর ঠাণ্ডা এখন হায়েনার দাঁতের চেয়েও ধারালো। আনন্দ স্পষ্ট বুঝতে পারল ওর নাকের ডগা ফাটছে। ইতিমধ্যে যা ফেটেছিল তাতেই ভয় হচ্ছিল রস না গড়ায়। সেখানে হাওয়া লাগায় এখন আরো জ্বালা করছে।

ওরা যাচ্ছিল আরও উত্তরে। পায়ের তলায় এখন রীতিমত কাঁচ-বরফ। চাপে মচমচিয়ে ভাঙছে। ওরা এখন নামছে ঢালুতে। ফলে বেশী শক্তি খরচ হচ্ছে না। আনন্দ সুদীপের দিকে তাকাল। ওর মাথাটা মেয়েটির কাঁধের ওপর এতক্ষণ নেতিয়ে ছিল। এই পাহাড়ি পথে অতটা ওজন নিয়ে মেয়েটা ঝুঁকে হেঁটে যাচ্ছে। কেন? কি দরকার এত কষ্ট করার? ওর মনে হল জয়িতা যে রেগে গিয়েছিল তার পেছনে এই কারণটা ছিল। মেয়েটি মানসিকভাবে সুদীপের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। যতদূর মনে পড়ে কোন মনস্তাত্ত্বিক লেখেননি শুধু শরীরের প্রয়োজনে বা আপাত ভাল লাগায় কোন মানুষ আর একজনের জন্যে এত কষ্ট করে না। সুদীপকে বাঁচাবার তাগিদ আছে মেয়েটার। আর এইভাবে জড়িয়ে পড়াটা জয়িতার পছন্দ নয়।

লা-ছিরিঙ আর জয়িতা দাঁড়িয়ে পড়ল চড়াই-এর মুখে এসে। ভোর হচ্ছে। যদিও সূর্যদেবের কোন হদিশ নেই কিন্তু মাকালুর চুড়োটা রঙ পাল্টাচ্ছে। ওপাশে চ্যামল্যাঙের মাথায় সিঁদুর জমল। লোৎসেকে দেখা গেল তার পরেই। যেন হাতের মুঠোয় ওরা। ঠিক সেই সময় কোত্থেকে একটা সাদা মেঘের থাবা লুকিয়ে ফেলল এভারেস্টকে। জাগব জাগব করেও বেচারার জাগা হল না। এই সময় মেয়েটা ধীরে ধীরে নামিয়ে দিল সুদীপকে। খানিকটা টলমল করে সে স্থির হল। জয়িতা মালপত্র নামিয়ে রেখে দ্রুত এগিয়ে গেল তার কাছে, 'কেমন লাগছে এখন? বেটার ফিল করছিস?' সুদীপ কথা বলতে গেল কিন্তু ওর ঠোঁট দুটো শুধু নড়ল। শেষপর্যন্ত সে স্থির হয়ে দাঁড়াল, ঠিক পুতুলের মত।

লা-ছিরিঙ তাড়া লাগাল, 'জলদি চল। এই পাহাড়টা ভাল করে আলো

ফোটার আগেই পেরিয়ে যেতে হবে।'

আনন্দ মুখ তুলে পাহাড়টা দেখল। খুব উঁচু নয়, কিন্তু মাথা তুলে দেখতে গেলে ঘাড় ব্যথা হয়ে যায়। সে বলল, 'ওকে নিয়ে এতটা উঁচু পেরোবো কি করে?'

লা-ছিরিঙ বলল, 'ওকে যে বয়ে এনেছে এতটা সেই নিয়ে যাবে। চল চল। সোজা উঠতে হবে না, ভেতরে ভেতরে রাস্তা আছে। গ্রাম থেকে এই জায়গাটা চেষ্টা করলে দেখা যায়।' সে জিনিসপত্র আবার তুলে নিল। ওরা হাঁটা শুরু করতেই কাণ্ডটা ঘটল। লা-ছিরিঙকে অনুসরণ করে সুদীপ হাঁটতে লাগল। প্রথম দিকে সে টালমাটাল হচ্ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামলে উঠল। পুতুল কিংবা রোবটের মত দেখতে লাগছিল ওকে তখন। মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তেই সে পড়ে যাবে। শরীর বাঁক নিচ্ছে না। কারও সঙ্গে কথা বলছে না। তার দুটো হাত শরীরের দুপাশে শক্ত হয়ে ঝুলছে। ওর দিকে তাকালেই মনে হয় পৃথিবীর কোন কিছুর সম্পর্কেই সে ভাবছে না। শুধু তার কাজ হেঁটে যাওয়া, সে তাই হাঁটছে। মেয়েটি ঠিক ওর পেছনে। বোধ হয় সতর্ক নজর রাখছে ও সুদীপের ওপর। জয়িতার খুব ইচ্ছে করছিল সুদীপের সঙ্গে কথা বলতে। এই সুদীপের সঙ্গে পরিচিত ছটফটে সুদীপের কোন মিল নেই। আর এটাই অত্যন্ত অস্বস্তির। চলতে চলতে লা-ছিরিঙও সুদীপকে ঘুরে ঘুরে দেখছিল। এবার সে জয়িতাকে বলল, 'তোমাদের এই বন্ধু খুব তাড়াতাড়ি ভাল হবে না। ওকে নিয়ে ওপরে উঠতেও অসুবিধে হবে।'

জয়িতা উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল, 'কি জন্যে তোমার মনে হচ্ছে ও তাড়াতাড়ি ভাল হবে না।'

'আমি যে পাতাটা খাইয়েছিলাম সেটা পেটে গেলে নেশা কেটে যেতে বাধ্য। ওর উপকার হয়েছে কিন্তু—।'

'কিন্তু কি?' জয়িতার মনে হচ্ছিল লা-ছিরিঙ অকারণে রহস্য তৈরি করতে চাইছে।

'আমাদের একটা পাহাড়ি মদ আছে। অল্প খেলে ঠিক আছে। বেশী খেলে সেটা সোজা মাথার মধ্যে চলে যায়। যতদিন সেটা মাথার মধ্যে থাকে ততদিন কোন কিছু চিন্তা করার শক্তি থাকে না। মদের দানো এসে তার মাথায় বসে থাকে। অনেকেই তখন পাগল হয়ে যায়। কিন্তু তোমার বন্ধু যখন বিড়বিড় করছে না তখন পাগল হবে না। যার যা হবার তা তো হবেই। এই নিয়ে চিন্তা করার কি আছে।' লা-ছিরিঙ হাসল।

মনে মনে শিউরে উঠল জয়িতা। এ রকম কেস সে শুনেছে। তবে তা তো ড্রাগসের কল্যাণে হয়ে থাকে। কথা বলতে পারে না, হাত পা কাঁপে। কিন্তু মস্তিষ্ক অসাড় হওয়ার ফলে পুতুলের মত চালচলনের কথা তো শোনেনি। ওর মনে হল লা-ছিরিঙ ঠিক বলছে না। অবশ্য ওর বানিয়ে বলেই বা কি লাভ! ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল জয়িতার। ওদের সঙ্গে এখনও প্রচুর ওষুধ আছে। কিন্তু এই রোগের উপশম করার কোন ওষুধ নেই। বুকের ভেতরটা কেমন কাঁপছিল জয়িতার। সে আবার লা-ছিরিঙের দিকে তাকাল। স্বাস্থ্যবান সুদর্শন। চোখাচোখি হতেই সরল হাসল ছেলেটা। জয়িতা এবার হাঁপাতে লাগল। ওরা অনেকটা এগিয়ে এসেছে। পিঠের এবং হাতের বোঝা এখন আরও ভারি বোধ হচ্ছে। দম নেবার জন্যে জয়িতা দাঁড়িয়ে পড়তেই লা-ছিরিঙ বলল, 'সকাল হয়ে গেছে, আমাদের এখনও একঘণ্টা হাঁটতে হবে।'

এই পথে মানুষ যাতায়াত করে না। জন্তু জানোয়ারের কথা বলা যাচ্ছে না কিন্তু গৃহপালিত পশু চোখে পড়ছে না। সরু পথটা এখন খাড়াই। নিচের বন্ধুদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। লা-ছিরিঙ আবার বলল, 'তোমার যদি অসুবিধে হয় তাহলে আমার কাঁধে কিছু জিনিস দিতে পার।'

জয়িতা মাথা নাড়ল। তারপর আবার চলা শুরু করল। একটা পাথর থেকে আর একটা পাথরে পা ফেলতে রীতিমতো কষ্ট করতে হচ্ছে। এবং তখনই তার চোখে পড়ল সামনেই বরফ। প্রথম সূর্যর আলো এখনও পড়েনি কিন্তু তার আভায় নীলাভ হয়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্তিটা চট করে কমে গেল। সব কিছু ভুলে গেল জয়িতা। বরফে পা রাখা মাত্র গোড়ালি সামান্য বসে যাচ্ছিল এবং খানিক বাদেই আশপাশের কোথাও আর পাহাড় কিংবা পাথর দেখা গেল না। সর্বত্র সাদা তুষার ছড়ানো।

তাপল্যাঙে আসার পর অনিয়মিত আহার, মারাত্মক ঠাণ্ডা এবং উদ্বেগ

জয়িতার শরীরে বিস্তর ছাপ ফেলেছে। সে কখনই স্বাস্থ্যবতী ছিল না কিন্তু দুর্বলতার কারণে নিজেকে আরও রোগা মনে হচ্ছে ইদানীং। তার মুখের খোলা চামড়ায় শীতের ছাপ হাঁসের পায়ের মত। কিন্তু এসব সত্ত্বেও নিজেকে একটি বিশেষ আদর্শে নিবেদিত মনে করায় প্রতিনিয়ত বাঁচার শক্তি খুঁজে পেত। ব্যক্তিগত ভাল লাগা বা নিজের জন্যে আলদা করে কিছু চিন্তা করা আর হয়ে উঠত না। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে হিমালয়ের তুষার ধবল প্রান্তরে যেই প্রথম সূর্যের কচি আলো পড়ল তখনই সে তড়িতাহত হয়ে গেল। চোখের সামনে এক অপরূপ দৃশ্য যার বর্ণনা মানুষের মাথায় চট করে আসে না। সোনালী-সাদায় মেশামেশি বরফের ওপর দাঁড়িয়ে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। আজন্ম কলকাতায় মানুষ জয়িতার বরফ সম্পর্কে যা কিছু ধারণা বই এবং চলচ্চিত্র থেকে। এক ধরনের রোমান্টিক মানসিক-অভিযান চলত তার সেই সব দৃশ্য দেখা বা পড়ার সময়। আজ তার চোখের সামনে বাস্তব বরফ, এই বরফ ক্যাপ্টেন কুককে মেরে ফেলেছিল। এই সময় লা-ছিরিঙ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আমাদের সিগারেট খাবে?'

বিহ্বল মুখ ফেরাল জয়িতা। লা-ছিরিঙকে দেখে মনে হল যেন আকাশ থেকে ঈশ্বরপুত্র নেমে এলেন। কোন মলিনতা নেই ওর হাসিতে। ঠিক এই সময় নিজেদের খুব ছোট সংকীর্ণ বলে বোধ হল তার। কলকাতায় প্রতিটি মানুষ এবং প্রতিটি নারী অনুক্ষণ পরস্পরকে অবিশ্বাস করে বিশ্বাসী হয়ে থাকে। শহরসভ্যতা যে মেকী মানসিকতা তৈরি করে দেয় জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলনের মুহূর্তে তার থেকে মুক্তি মৃত্যু পর্যন্ত নেই। ব্যতিক্রম যারা হতে চায়, যারা মানুষের সঠিক জায়গার খোঁজ দিতে বদ্ধপরিকর তাদের হয় পাগল, নয় রাজনৈতিক মতলববাজ করে চিহ্নিত করে দেয় পেশাদারী রাজনৈতিক দলগুলো। আর লক্ষ লক্ষ মূর্খ সেই সব বাণী গপগপিয়ে গেলে। সৌন্দর্যের আর এক নাম যে সারল্য এটা শহরের মানুষ আজ বিস্মরিত।

'এই সিগারেট শরীর গরম করে।' লা-ছিরিঙের হাতে পাকানো সিগারেট? বরং বিড়ি বলাই ভাল। সিগারেট শব্দটা ও শিখল কখন কিভাবে এ নিয়ে মাথা ঘামাল না জয়িতা। হাত বাড়িয়ে সেটা নিল। তারপরে একটা কাণ্ড দেখল। পকেট থেকে দুটো চ্যাপ্টা পাথর বের করল লা-ছিরিঙ। চটজলদি সে-দুটো ঘষে আগুনের ফুলকি বের করছিল সে। সেই ফুলকি কয়েকবারের চেষ্টায় বিড়ির মুখে ঠিক লাগিয়ে নিল। গলার শিরা ফুলিয়ে টানতেই তা থেকে ধোঁয়া বের হল। চোখ বন্ধ করে প্রথম আরামটা শরীরে ছড়িয়ে দিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসল লা-ছিরিঙ। জয়িতা তার হাত থেকে বিড়িটা নিয়ে নিজেরটা ধরাল। একটা তিতকুটে স্বাদ। সকালে কিছু পেটে না পড়া এবং রাত্রি জাগরণের অবসাদে শরীর এই বিড়ির ধোঁয়া নিচ্ছিল না। কিন্তু জোর করে কয়েকটা টান দেবার পর আর এক ধরনের মাদকতা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। উষ্ণ হল শরীর। সে হাসল। দোকানের বিড়ি সিগারেটের সঙ্গে এই হাতে পাকানো সিগারেটের পার্থক্য হল ওইটেই। সেই সঙ্গে একটা নেশা ধরানো গন্ধ। হয়তো যে গাছের পাতা থেকে এটি বানানো তা-ই নেশার কাজে ব্যবহৃত হয়। হোক, কিন্তু এই মুহূর্তে তার শরীর বেশ তরতাজা লাগছে। সে লা-ছিরিঙকে হাসিটা ফিরিয়ে দিল।

লা-ছিরিঙ ওদের যে গুহাটার সামনে নিয়ে এল সেখানে পৌঁছতে হলে পৃথিবীর সেরা পুলিসদের তাপল্যাঙের মানুষের সাহায্য লাগবে যারা জায়গাটা জানে। গুহার মুখে পৌঁছবার পর লা-ছিরিঙ ওদের একপাশে সরে দাঁড়াতে বলল। তারপর জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে দলা দলা বরফ তুলে ছুঁড়ে মারতে লাগল গুহার ভেতরে চিৎকার করে। সেই চিৎকার অনেকগুণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। তারপরেই মা-ভালুকটাকে দেখা গেল। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে দুটো বাচ্চাকে নিয়ে সেটা বেরিয়ে এল বাইরে। হিমালয়ের ভালুকের গল্প পড়েছিল জয়িতা। চোখের সামনে দেখে তার সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে গেল। লা-ছিরিঙ শুধু কয়েক পা পিছিয়ে এসেছে মাত্র, কিন্তু তার হাতের লাঠি, যাতে মালপত্র বেঁধেছিল আসার সময়, এখন সমানে ঘুরছে আর সেই সঙ্গে অদ্ভুত আক্রমণাত্মক শব্দ বের করছে মুখ থেকে। ভালুকটা কয়েকবার দাঁত বের করে এই স্পর্দ্ধার প্রতি তার প্রতিবাদ জানাল। বাচ্চা দুটো মায়ের শরীর ঘেঁষে চুপটি করে দাঁড়িয়ে। তারপর নিতান্ত অনিচ্ছায় মা এবং বাচ্চারা ওপাশে নেমে গেল। এবার লা-ছিরিঙ শান্ত হল। সে জয়িতাকে বলল, 'এই গুহাটাই সবচেয়ে ভাল। এখানে দানো ঢুকবে না।'

'কেন?' জয়িতার পুরো ব্যাপারটা এখন মজাদার লাগছিল।

'যেখানে ভালুক থাকে সেখানে দানো আসে না। দুজন দুজনের খুব শত্রু।' সে এবার নির্ভয়ে চলে গেল গুহার ভেতরে। মিনিট দশেকের মধ্যে গুহাটা বেশ বাসযোগ্য হয়ে গেল। নিচে একটা টেন্ট পাতা হল। তার ওপর জিনিসপত্র বিছিয়ে আনন্দ আর লা-ছিরিঙ দ্বিতীয় টেন্টটা দিয়ে গুহার মুখটা আড়াল করার চেষ্টা করতে লাগল। ভেতরে বরফ নেই কিন্তু ভালুকের বোঁটকা গন্ধ বাতাসে ভাসছে। গুহাটা বেশ বড়, শেষ দিকে আলো ঢুকছে না। এবং সবচেয়ে আরামের যেটা তা হল এখানে ঠাণ্ডা অনেক কম। আনন্দরা যখন গুহার মুখটায় পর্দার মত আড়াল ঝোলাতে পারল তখন বাতাসের পথ বন্ধ হল কিন্তু অন্ধকার বাড়ল।

এবার জয়িতা তাকাল সুদীপের দিকে। পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে সে। এই খাড়াই পথটা ওকে বয়ে নিয়ে এসেছে মেয়েটা। এখন দুহাতে মুখ ঢেকে হাঁটুগেড়ে বসে হাঁপাচ্ছে মেয়েটা। ও না থাকলে সুদীপকে এখানে নিয়ে আসা অসম্ভব ছিল। জয়িতা সুদীপের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সুদীপের চোখের মণি স্থির। কিছু দেখছে বলে মনে হচ্ছে না। সে ধীরে ধীরে সুদীপের গালে হাত রাখল, 'সুদীপ!'

কোন সাড়া এল না সুদীপের কাছ থেকে। জয়িতার বুকের কান্নাটা গলায় উঠে আসছিল। সে আবার ওর চোখের কাছে আঙুল নিয়ে গেল। এবার চোখের পাতা বন্ধ হল। হঠাৎ আবেগে শরীর কাঁপানোয় জয়িতা দুহাতে সুদীপকে জড়িয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

আনন্দ মুখ ফিরিয়ে দৃশ্যটা দেখল। এতটা পথ আসার সময় সে মেয়েটির কাছ থেকে যা জেনেছে তাতে সুদীপের মস্তিষ্কের অসাড়তা খুব অল্পে দূর হবে বলে মনে হয় না। কল্যাণটা চলে গেল, সুদীপ যদি এভাবে অকেজো হয়ে যায় তাহলে রইল তারা দুজন। কাজের পরিধি বিরাট অথচ মানুষ কম। পালদেমকে বোঝালে বুঝতে পারে কিন্তু নিজে থেকে কিছু করার ক্ষমতা ওর নেই। সুদীপকে যে ভঙ্গিতে জয়িতা জড়িয়ে ধরেছে তা স্বাভাবিক সময়ে হতো না। কল্যাণের একটা ধারণা ছিল জয়িতা সুদীপকেই বেশী পছন্দ করে। এমন কি ওর সঙ্গে সুদীপের প্রণয় সম্পর্ক খুঁজে বার করতে চেষ্টা করত না। এসব ভাবনা কখনও আনন্দর মাথায় আসেনি। কিন্তু এখন ওই ভঙ্গি চোখের সামনে দেখে আনন্দর বারংবার কল্যাণের কথা মনে পড়ছিল। কল্যাণ দৃশ্যটা সহ্য করতে পারত না।

ঠিক তখনই কাণ্ডটা ঘটল। ওরা কেউ পর্দাটার দিকে নজর দেয়নি। প্রত্যেকের দৃষ্টি তখন সুদীপ জয়িতার ওপরে। এমন সময় ঠিক ঘাড়ের পেছনে জান্তব চিৎকার আর মেয়েটির আর্তনাদ একই সঙ্গে শোনা গেল। চকিতে কয়েক পা সরে এসে আনন্দ দেখল মা ভালুকটা বীভৎস দাঁত বের করে মেয়েটিকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে। আনন্দর মস্তিষ্ক এবং হাত এক সঙ্গে কাজ করল। রিভলভারটা বের করে সজাগ রেখেছিল সে গুহার মুখে ভালুকটাকে দেখার পর। সেইটাই কাজে লাগল। শব্দটা ভয়ঙ্কর ভাবে গুহাটাকে কাঁপাল। প্রথম গুলিটা ভালুকটার প্রথম পায়ে লাগতেই সে আহত হয়ে মেয়েটার কাছ থেকে সরে এল। খুব অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েও মেয়েটি যেন নড়বার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। আহত ভালুকটা এবার পেছনের দুই পায়ের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লা-ছিরিঙের উদ্দেশ্যে এগোতেই দ্বিতীয় গুলিটা সরাসরি বুকে লাগল। একটা পাহাড়ের মত কাঁপতে কাঁপতে ভালুকটা লুটিয়ে পড়ল গুহার মুখে। পড়ার সময় টেন্টটাকে ছিঁড়ে নিয়ে এল শরীরের নিচে। শব্দটা এখন বহুগুণ। যেন সমস্ত পাহাড়ে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আনন্দ চিৎকার করে সবাইকে বাইরে বেরিয়ে আসতে বলল। পর্দাটা তো ছিলই না, ভালুকটার শরীর ডিঙিয়ে ওরা বাইরে এসে দাঁড়াল। আনন্দ যার ভয় পেয়েছিল তা হল না। বিদেশী সিনেমায় দেখেছিল এই ধরনের শব্দ আলগা পাথর বা বরফ নড়িয়ে ধ্বস নামায়। কিন্তু এখানকার পাহাড় শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পরও ঠিকঠাক আছে। ধাতস্থ হবার পর জয়িতার খেয়াল হল সুদীপ বের হয়নি। এবং তখনই মেয়েটা ছুটে গেল ভেতরে। কান্নাটা শুনতে পেল সবাই। সুদীপ কাঁদছে। জয়িতা ওদের বাইরেই অপেক্ষা করতে বলে নিজে এগিয়ে গেল।

গুহার মধ্যে যেখানে সুদীপ দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই হাঁটু মুড়ে বসে রয়েছে এখন। আর সেই অবস্থায় ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে। মেয়েটি এখন তার

মাথার সামনে দাঁড়িয়ে। এই কান্না তাকেও অবাক করেছে। কিন্তু সে কোন কথা বলছে না। স্পর্শও না। জয়িতার সমস্ত শরীরে কদম ফুটল। সুদীপ কাঁদছে যখন তখন ওর অসাড় হওয়া মস্তিষ্ক এখন কাজ করছে। তার মানে ও আবার স্বাভাবিক হতে চলেছে। হয়তো ওই তীব্র শব্দ ওর চেতনা স্পষ্ট করতে সাহায্য করেছে। সে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল, 'সুদীপ, অ্যাই সুদীপ, কি হয়েছে তোর?'

সুদীপের কান্নাটা অকস্মাৎ থামল। তারপর সেই অবস্থায় চুপচাপ বসে রইল। জয়িতা এবার আনন্দর গলা শুনল, 'ওকে এখন ডিস্টার্ব করিস না জয়ী। বরং ও যদি ঘুমাতে পারে তাহলে ভাল হয়। সুদীপ, তুই কি ঘুমাবি? বিছানা ঠিক করে দেব?'

সুদীপ কোন জবাব দিল না। তার বসার ভঙ্গিরও পরিবর্তন হল না। মেয়েটি তখনও পুতুলের মত দাঁড়িয়ে। আনন্দ দেখল লা-ছিরিঙ প্রাণপণে চেষ্টা করছে ভালুকটাকে বাইরে টেনে নিয়ে যেতে। কিন্তু তার একার শক্তিতে সেটা অসম্ভব। ভালুকটার দিকে তাকালে বোঝা যায় এর বয়স বেশী নয়। লা-ছিরিঙ তার নিজস্ব ভাষায় জড়িয়ে জড়িয়ে কিছু বলতেই মেয়েটি সাহায্যের জন্যে এগিয়ে গেল। ওই জানোয়ারটার শরীরে হাত দিতে জয়িতার ঘেন্না করছিল। তাছাড়া সুদীপের ব্যাপারটা তার ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না। ও যদি চেতনা ফিরে পেয়ে থাকে তাহলে এখন সাড়া দিচ্ছে না কেন?

সুদীপের বিছানাটা বের করে সে একপাশে বিছিয়ে দিয়ে সুদীপকে ডাকল, 'সুদীপ, আয়।' মাথা নাড়ল সুদীপ। মুখে কিছু বলল না। ভঙ্গিও পাল্টালো না। আর এতেই খুশী হল জয়িতা। অন্তত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে ও। অর্থাৎ স্বাভাবিক হবে এক সময়। বুকের ভেতর জমে থাকা পাহাড়টা যেন আচমকা সরে গেল জয়িতার। সে দেখল ভালুকটাকে ওরা অনেকটা দূরে টেনে নিয়ে গিয়েছে। লা-ছিরিঙ কোমর থেকে একটা ছুরি বের করে চিৎ করা ভালুকের বুকের চামড়া কাটতে লাগল। এখন গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। জয়িতা চোখ বন্ধ করল। তার শরীর গোলাতে লাগল। সারারাত জেগে, ভোরে এই পরিশ্রম করে এখন সমস্ত শরীরে বমি-ভাব ছড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ খুব অসুস্থ মনে হল নিজেকে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। কোন রকমে বাইরে এসে ভালুকটার বিপরীতে গিয়ে পেটে হাত রেখে বমি করল। শুধু তেতো জল ছাড়া আর কিছু বের হল না। ওরা সবাই ভালুকটাকে নিয়ে ব্যস্ত এখন। দমক আসছে জয়িতার কিন্তু মুখ থেকে কিছুই বের হচ্ছে না। এবং এখানে আসার পর সম্ভবত এই প্রথম তার হিমবাতাস ভাল লাগল। মুখের খোলা ফাটা জায়গাতেও তার স্পর্শ অনেক রমণীয় মনে হচ্ছে। সে চোখ বন্ধ করে নিজের শরীরটা ঠিক করে নিতে চেষ্টা করছিল। বমি ভাবটা কমে এলে সে চোখ মেলল। চারপাশে শুধু বরফ আর বরফ। তার ওপর কচি কলাপাতার মত রোদের চাদর বিছানো। সুন্দর যেন সুন্দরতর হয়ে এসে দাঁড়াল সামনে। মুগ্ধ হয়ে দেখছিল জয়িতা। এবং হঠাৎ তার মনে হল কিছু একটা নড়ছে ওপাশের বরফের টিপির গায়ে। জিনিসটা কি সঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু নিশ্চয়ই কোন প্রাণী রয়েছে আশেপাশে। এই জায়গা খুব নিরাপদের নয় তা বোঝাই যাচ্ছে। জন্তুটা ঠিক কি প্রকৃতির তা দেখার জন্যে এগিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না। জয়িতা গুহার পাশে পাথরের ওপর থেকে বরফ সরিয়ে বসতে গিয়ে দেখল সেটা অসম্ভব। অতএব বাধ্য হয়ে সেখানেই বসে পড়ল।

অন্তত সতের হাজার ফুট উঁচুতে ওরা এখন। তাপল্যাঙে থাকতে থাকতে ঠাণ্ডা অনেকটা সহ্যের মধ্যে এসে গেছে। কলকাতায় বসে এই পরিবেশে থাকার কথা কল্পনাতেই আসত না। জয়িতার হঠাৎ মনে পড়ল সে অনেককাল নিজের মুখ দ্যাখেনি। আয়নার কথা মনেই ছিল না তার। কতকাল স্নান করা হয়নি এবং সেটা হয়নি বলে অসুবিধে যে খুব হচ্ছে তাও নয়। অথচ কলকাতায় স্নান না করে একটা দিন কাটানোর কথা সে কল্পনা করতে পারত না।

জয়িতা চোখ তুলল। চ্যামল্যাঙ, বারুনৎসে, নুপৎসে, লোৎসে, এভারেস্ট, মাকালু, ছোমোলঙ এখন চোখের সামনে। দুএকটা পেঁজা মেঘ ছাড়া কোন আড়াল নেই। এত সুন্দর তবু সুন্দর শব্দটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বুক কাঁপে। একেই কি ভয়ঙ্কর সুন্দর বলে? কে জানে! পৃথিবীর কোথাও কোন অশান্তি নেই, শুধু স্থির হয়ে থাকা, সময় মুঠোয় নিয়ে বসে থাকা। শুধু অনন্ত নিঃসঙ্গতায় হৃদয় ধুয়ে নেওয়া।

আনন্দর ডাকে চমক ভাঙল। পেছন থেকে আনন্দ বলল, 'কিরে, ধ্যান শুরু করে দিলি। উঠে আয়, চা হয়ে গেছে।' চা শব্দটা শোনা মাত্র শরীরে একটা আরাম এল যেন। জয়িতা কৃতজ্ঞ চোখে আনন্দকে দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করল সে ফিরে গেছে। সে উঠে এল।

গুহার সামনে ভালুকটার অস্তিত্ব নেই। শুধু তার বিশাল চামড়াটা পরিষ্কার করে একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। গুহার মুখেই চাপ চাপ মাংসের স্তূপ ঠিক করছে লা-ছিরিঙ। ওকে দেখে সরল হাসল সে, 'পুরো গ্রামের মানুষ একবেলা এটা খেতে পারবে।'

'তোমরা ভালুকের মাংস খাও?' হতভম্ব হয়ে গেল জয়িতা।

'কেন নয়? ভালুকের মাংস পাওয়া কত কষ্টের তা তো জানো না।'

'খেতে কেমন?'

'চমৎকার। তুমি কখনও খাওনি?'

দ্রুত মাথা নাড়ল জয়িতা। লা-ছিরিঙ বলল, 'আজ খেয়ে দেখো, মজা লাগবে।'

জয়িতা মনে মনে বলল, রক্ষা কর। তারপর গুহাতে ঢুকতেই মেয়েটা এক পাত্র চা এগিয়ে দিল। জিভে সেটা ঠেকাতে মনে হল এর নাম অমৃত। সে চেঁচিয়ে আনন্দকে বলল, 'থ্যাঙ্কস।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কয়েকটা বিস্কুট এখনও পড়ে আছে, খাবি?'

'না থাক।'

'থাক কেন? ওটা তো শেষ হবেই।' আনন্দ ওর হাতে বিস্কুট ধরিয়ে দিল। তারপর চাপা গলায় বলল, 'সুদীপ চা খাচ্ছে। যদিও এখনও নর্মাল হয়নি। ওকে বুঝতে দিস না যে আমরা চিন্তিত।'

জয়িতা সুদীপের দিকে তাকাল। সুদীপ এখন গুহার দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার চোখ খোলা কিন্তু কোনদিকেই দৃষ্টি নেই। চায়ের পাত্র পাশে রয়েছে। সেখানেই ওর হাত। মেয়েটি গুহার এক কোণে মাংসগুলো রাখছিল। জয়িতা চট করে আনন্দর দিকে তাকাল, 'ভালুকের মাংস কে খাবে?' আনন্দ বলল, 'বেশীর ভাগটাই গ্রামের মানুষের কাছে দফায় দফায় নিয়ে যাবে লা-ছিরিঙ। কিছুটা আমাদের জন্যে রেখে দেওয়া হয়েছে।'

'ইস্! তুই ওই মাংস খাবি?'

'খেতে খারাপ লাগলে খাব না। আগে থেকে নাক সিঁটকোবার কি আছে। আমরা অনেকদিন মাংস খাইনি। মুখের স্বাদ পাল্টাবার জন্যে একটা চেষ্টা করা দরকার, বুঝলি!' আনন্দ চা শেষ করল।

'অসম্ভব! আমার দ্বারা হবে না। আমি ওই মাংস খেতে পারব না।' জয়িতা তীব্র প্রতিবাদ করল। ওর গলার স্বর এতটা জোরে উঠেছিল যে আনন্দ লক্ষ করল সুদীপের মুখ এপাশে ফিরল। যেন কিছু বোঝার চেষ্টা করল। তারপর আগের অবস্থায় ফিরে গেল।

চা শেষ করে লা-ছিরিঙ স্তূপ করে রাখা মাংসের কয়েকটা থেকে দুটো ঘাড়ে তুলে নিল। লাঠির দুটো প্রান্তে ঝুলিয়ে নেওয়া বাঁকের মত দেখাচ্ছিল। সে জয়িতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'যদি কোন খবর থাকে তাহলে আজই ফিরে আসব নইলে আগামীকাল। তোমরা কেউ নিচে নেমো না।'

আনন্দ বলল, 'পালদেমকে বলবে জঙ্গল থেকে কাঠ কাটা যেন আজ বন্ধ না হয়। ঘর তৈরির কাজ যেমন চলছিল তেমন চলবে।'

ওর চলে যাওয়া দেখতে দেখতে আনন্দর মনে হল ওই ওজন কাঁধে নিয়ে তার পক্ষে তিন পা হাঁটা অসম্ভব ছিল। এখনও যে মাংস পড়ে আছে তা নিয়ে যেতে ওকে দুবার নিচে নামতে হবে। মেয়েটা এখন বরফ দুহাতে তুলে সেই পড়ে থাকা মাংসে চাপা দিচ্ছে। এই ঠাণ্ডায় পচনের কোন আশঙ্কাই নেই। হয়তো জন্তুদের চোখ যাতে ওগুলোর ওপরে না পড়ে তার জন্যেই বরফ দিয়ে ঢেকে রাখা হচ্ছে।

কিছু কাঠ দরকার। রাত্রে নিশ্চয়ই এখানে ঠাণ্ডা বাড়বে। তাছাড়া স্টোভের শেষ তলানিটুকু আর নষ্ট করা উচিত হবে না। রান্না এবং উত্তাপ দুটোই কাঠে করতে হবে। জলের প্রশ্ন নেই। বরফ গলিয়ে সেটা পেতে হবে। বড় একটা দা সঙ্গে নিয়ে আনন্দ হাঁটতে লাগল। বরফ ভেদ করে যে গাছ এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেগুলো বেশ ভেজা এবং পাতাও নেই বললে চলে। জায়গাটা এমন যে লুকোবার কোন উপায় নেই। অবশ্য বিপদ আসতে পারে একমাত্র নীচ থেকে। আর সেটা এলে নিশ্চয়ই গ্রামের

মানুষ আগেভাগে জানাবে। মাথার ওপর যদি হেলিকপ্টার আসে তাহলে গুহার ভেতরে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। একটু নিচের দিকে এসে আনন্দ একটা ঝাঁকড়া গোছের গাছ দেখতে পেল। এর শরীরে এখনও পাতা আছে তবে বরফে মাখামাখি হয়ে আছে গাছটা। আনন্দ ডাল কাটতে শুরু করল। গাছটা খুব বেশী লম্বা নয়। তাছাড়া পাহাড়ের গা ঘেঁষে বলেই অনেকটা নাগালের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। নির্জন পাহাড়ে গাছ কাটার শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে। বেশ কয়েকটা ডাল কাটার পরেও আনন্দর মনে হচ্ছিল এটা দুদিনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। আজ আবহাওয়া পরিষ্কার আছে এখনও, কিন্তু কতক্ষণ থাকবে তা ঈশ্বর জানেন। অন্তত দু'দিনের ব্যবস্থা করে রাখা দরকার। মাঝে মাঝে সে হাঁপিয়ে পড়ছিল কিন্তু তার জেদ কমছিল না। যখন তার মনে হল অনেক হয়েছে তখনই ভাবনা শুরু হল। এত কে ওপরে বয়ে নিয়ে যাবে! গাছ কাটতে কাটতেই অনেকটা শক্তি খরচ হয়ে গেছে। সে জিরোতে সময় নিল। এখান থেকে নিচের দিকে তাকালে কিছুই দেখা যায় না। জঙ্গল দেওয়ালের কাজ করছে।

এই সময় পায়ের আওয়াজ পেয়ে চমকে সোজা হয়ে দাঁড়াল আনন্দ। আর দাঁড়িয়ে হেসে ফেলল। মেয়েটা এসে দাঁড়িয়েছে। আনন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কে পাঠালো তোমাকে?'

মেয়েটি হাসল, 'শব্দ শুনে চলে এলাম। কিন্তু এই শব্দ তো গ্রাম থেকেও শোনা যাবে!'

কথাটা মাথায় আসেনি আনন্দর। সে অবিশ্বাসে তাকাল নিচের দিকে। গ্রাম এখান থেকে অনেক দূরে। অবশ্য শব্দের গতির কথা সে জানে তবে— । মেয়েটি বলল, 'ওটা আমাকে দাও, কিভাবে কাটতে হয় দেখিয়ে দিচ্ছি।'

খানিকটা কাৎ করে দা চালাল মেয়েটি। শব্দটা মৃদু হয়ে গেল কিন্তু কাজ হচ্ছিল বেশী। আনন্দ মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। আর কাটার দরকার নেই। এখন এগুলো নিয়ে যাওয়াই কষ্টকর হবে।' মেয়েটি বলল, 'ডালগুলো টুকরো করে বাঁধতে হবে।'

সেই কাজেই লেগে গেল সে। হঠাৎ আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আমাদের সঙ্গে এত কষ্ট করছ কেন?' মেয়েটি হাত না থামিয়ে জবাব দিল, 'আর কিছু করার নেই বলে।'

চারপাশে রক্তের গন্ধ। অতবড় একটা জন্তু মরে গিয়েও বাতাসে নিজের অস্তিত্ব ছড়িয়ে দি..ছে। জয়িতা গুহার ভেতরে ঢুকল। সুদীপ বসে আছে একা। মেয়েটা একটু আগেই বেরিয়ে গেল। জয়িতা সুদীপের সামনে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'সিগারেট খাবি?'

সুদীপ তাকাল। তার বুক কেঁপে একটা নিঃশ্বাস বের হল। জয়িতার কষ্টটা ফিরে এল। তার মনে হচ্ছিল সে কিছুতেই আর সুদীপের কাছে পৌঁছাতে পারছে না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোর কি কষ্ট হচ্ছে রে সুদীপ?'

সুদীপ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তার পর জড়ানো গলায় কিছু বলতে চাইল। কথাগুলো স্পষ্ট নয়। জয়িতা দেখল কাঁপা পায়ে সুদীপ এগিয়ে যাচ্ছে বাইরে। ওর ইচ্ছে করছিল সুদীপকে জড়িয়ে ধরতে। আর ইচ্ছেটা হওয়ামাত্র সে ছুটে গেল সামনে। দুহাতে সুদীপকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল, 'কথা বল। টেল মি এনিথিং, এনি ড্যাম ওয়ার্ড।'

সুদীপ হাঁপাচ্ছিল। ওর শীতে ফাটা মুখ করুণ দেখাচ্ছিল। হঠাৎ জয়িতা স্থির হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে সুদীপের গালে ঠোঁট রেখে ফিসফিসিয়ে বলল, 'সু-দী-প!'

সুদীপ বলল, 'ঠিক ঠিক আ-ছি!'

জয়িতা দুটো হাত সরিয়ে নিয়ে দেখল সুদীপের ঠোঁটে হাসি এল কি এল না। মুক্ত হয়ে সে বেশ কয়েক পা এগিয়ে গেল। তার পর বরফের ওপর দুটো পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। জয়িতা চুপচাপ গুহার মধ্যে দাঁড়িয়ে সুদীপকে দেখতে লাগল। ওর সমস্ত চেতনায় একটা সুখ ছড়িয়ে পড়ছিল, সুদীপ কথা বলেছে। যেভাবেই হোক বলেছে।

আর তখনই সে চমকে উঠল। দুটো নাদুস নুদুস ভালুকের বাচ্চা গুড় গুড় করে এগিয়ে আসছে সুদীপের কাছে। এরাই মায়ের সঙ্গে গুহা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। প্রথমে ভয় পেলেও সে বুঝতে পারল বাচ্চা দুটো এত শিশু যে ওদের কিছু করার ক্ষমতা নেই। বরং ওদের ভাবভঙ্গি এবং হাঁটা দেখে মজা লাগছিল তার। বাচ্চা দুটো খানিকটা দূরে এসে থমকে দাঁড়াল। তারা সুদীপকে লক্ষ করছিল। কুঁই কুঁই শব্দ করে নিজেরা সম্ভবত সুদীপ সম্পর্কে কিছু বলাবলি করে নিল। তারপর দ্বিধাভরে এগিয়ে গেল সুদীপের পাশে। সুদীপের গায়ের কাছে এসে ওরা স্থির হতে জয়িতা সবিস্ময়ে দেখল পরম আদরের দুটো হাত ওদের গায়ে স্পর্শ রাখল। আর বাচ্চা দুটো যেন আশ্রয় পেয়ে সুদীপের শরীরে মুখ গুঁজল।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ক্রমশ

রোগিণী যা পায়

দিব্যেন্দু পালিত

খুব সকালে এসে বেডপ্যান
বদলে দেয় নার্স,
শিশুর মতো কচি দাঁতে
এক্সট্রা-সফট ব্রাশ ঘষতে ঘষতে
নীল জলের গামলায়
মুখ ধোয় রোগিণী।

ক্যাবিনের সাদা পর্দা সরিয়ে দিলেই
সূর্য ওঠে যথাযথ, হাওয়া
অভিবাদন জানিয়ে বলে, সারারাত
পাহারা দিয়েছি তোমাকে
ঘুম হয়েছে তো ?

নার্সের হাতের ছোঁয়ায় সাবধানে
পাশ ফেরে রোগিণী
সঙ্গে সঙ্গে দিক বদল করে
তার বয়স মন শরীর।
একটু পরেই ডাক্তার আসে—
কখনো তালুর ছোঁয়ায় কখনো
টিপেটুপে দ্যাখে
চার্টে চোখ বোলায় আর
হাসতে হাসতে বলে,
ভালোই তো দেখছি !

ডাক্তার চলে যাবার পর ঝকঝকে ট্রে-তে
চলে আসে ব্রেকফাস্ট
এবং পর পর
ট্যাবলেট গল্পের বই কুচিন্তা
এবং ঘুম !

রোগিণী যা পায় সমস্তই
পেয়ে যায় অক্লেশে
একটুও না ভেবে একটুও না ঘেমে
ঠিক যেমনটি সে চেয়েছিল
অনেক অনেকদিন আগে।

ঘুমের মধ্যে না-ঘুমোনোর অস্বস্তিতে তবু
ছটফট করে সে, কখন
বিকেল হবে, কখন আসবে
যারা অনেক খারাপ আছে সেইসব
ঈর্ষা-জাগানো মানুষ···

মধুরাবতী

অনিমা মিত্র

সখাভাবে নয়, দাসভাবে ; কোন প্রেম নিবেদন
নয়, কিংবা কোন প্রীতি বিনিময়
শুধু দ্বিধা, ভয়, সংশয়, সম্ভ্রম, বিস্ময়
এইসব পঞ্চশষ্য নিয়ে আয়োজন দুরন্ত রেখে
ভীরু যাওয়া, ভীষণ সুন্দরের পূজায়
নিজেকে নৈবেদ্য করা—

এখন হে অমা, আমাকে কৃষ্ণবর্ণ দিয়ে ঢেকে
দাও, দগদগে ঘা ঢেকে রাখ মাগো
শ্বেতচন্দনে—

তোমার মেয়ে মধুরাবতী হতে উদ্ধারণপুরের
ঘাটে যাত্রা করেছে।

সাইরেন

দীপক রায়

জুনাগড় যেতে চাইলে চলে যাই জুনপুট। গোরক্ষপুরের বদলে
বক্তিয়ারপুর।

যেদিন অরণ্যের কথা ভাবি সেদিন সমুদ্রে সূর্যাস্ত।
যখন বিমলার কথা ভাবি তখন প্রতাপ সিংহ টুপি পরে আসে।
দেবেশের কথা ভাবলে করুণা আসে চিরুণী হাতে।
লালের বদলে কালো।
প্রার্থনায় বসার জন্য যখন তৈরি হচ্ছি তখন ঘন ঘন সাইরেন বেজে
উঠলো।

শুধু চাই কবিতার দিন

বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায়

পৌষ শেষ হয়ে গেল এভাবেই পৌষকালগুলো বড় দ্রুত শেষ হয়ে যায়
জ্বলন্ত কাঠের চারপাশে ঘিরে থাকা মানুষেরা বাড়ি ফেরে
এই বাঙলার ঘরে আজও পিঠে ও পার্বণ লেগে আছে দেখে
মনে হয় এই পোড়া দেশে তবু বার বার এই দিনগুলো ফিরে আসুক।

পৌষের প্রথমে তুমি এসেছিলে ঐ খড়িমাটি পথ বেয়ে সহসাও চলে গেছো
তবু দেখো ঐ পথ পুষ্পে-ফুলে ভ'রে ওঠে অজানা বেলায়
যদি যাই যদি কখনও নিভৃতে ডাক দাও
এই ভেবে কঠিন সময় পাশ ফিরে শুয়ে থাকে
শুধু চাই কবিতার দিন, কবিতার মুহূর্ত ও তুমি তোমার নিটোল হাত
ঋতু শেষে আরেক ঋতুর সম্ভাবনায় জেগে থাকি।

যদি যাই

ফিরোজ চৌধুরী

যদি যাই কোথাও এই শীতে
মলি, কিছু কি চাইবে তুমি
নদী কিংবা পাহাড়
সবুজ আলোর রেখা—এভাবেই হাত পেতে রাখো

শরীর দেখেছি আমি, তবু তোমাকে দেখিনি
ঠিক দুঃখ নয়, দুঃখের মতন এক অস্থিরতা
যদি যাই কোথাও—যদি যেতেই হয়
তবে শোনাও আমার সেই প্রিয় গান,
যদিদং হৃদয়ং মম…

মলি, কিছু কি চাইবে তুমি
নদী কিংবা পাহাড়
সবুজ আলোর রেখা—এভাবেই হাত পেতে রাখো

উপলব্ধি

প্রীতি শাহ্-সেনগুপ্ত

গান গাইতে গাইতে
হঠাৎ যদি বন্ধ হয়ে যায়
তাহলে ?
চিঠি তো লিখলাম
কিন্তু কাকে যে সম্বোধন করে
তা যদি ভুলেও যাই
তা হলে ?
যে বাড়িটাকে নিজের ভাবতাম
তার ঠিকানা
যদি কখনো পাল্টে যায়
তা হলে ? তা হলে কী আসে যায় ?

অসমাপ্ত কবিতার ছিন্ন পাণ্ডুলিপি
শেষ পর্যন্ত
রাস্তার আবর্জনা বাড়ায়
টুকরো টুকরো ভাবনার গ্রন্থিগুলি
কে জানে কোথায় পড়ে পড়ে পচছে

মনের পরিধি থেকে
জীবনের সব টান উধাও হয়েছে
ভাদ্রের মুক্তোর মত
হঠাৎ এক উপলব্ধি
এসে গেল, তাই না ? তাই না ?

দারুণ সব পোশাক পরালে হয়তো
কাকতাড়ুয়াকেও দেখাবে চমৎকার
ভিতরে নড়বড়ে হাড়ের খাঁচা
শুধু বাইরের সাজসজ্জায় আমার পরিচয়।

উদ্বাস্তু, অনাথ

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

যুদ্ধ কোথাও নেই, তবু স্বাধীন দেশে ত্রস্ত, বাস্তুহারা
আমার মা ও বাবা পরস্পরের চোখ খুঁজে পেয়ে ঘর বেঁধেছেন যেই
ক্রোধোন্মত্ত পিতৃপুরুষ শাপ দিয়েছেন, বজ্র আগুন ঝড়
নেমে আসুক তোদের প্রশ্নবিহীন অন্ধকারে, এবং নিরুত্তর
থাকুক একবিংশ শতক, বিকলাঙ্গ রোবট প্রসব কর

আমি মূক ও বধির, দেশ শেখাল শাপভ্রষ্ট দুটি চোখ
চোরা লক্ষ হীরের আলোর জমক দেখে গালে গড়ায় তরল মোম
মা বাবাকে বলতে চেষ্টা করি,আমার এসব কিচ্ছু লাগে না
জন্মাবধি চক্ষুচাতক, প্রকৃতিস্থ নই, কারণ মিথ্যে দেখতে শিখি নি
একটু কেবল ভালোবাসতে দাও, শিখিয়ে দাও
ভালোবাসার মধ্যে কোথায় রয়েছে দেশ গাঁ

যুদ্ধ কোথাও নেই, শুধু শান্তিবাদী রাজ্যগুলির অস্ত্রে পাহারা
রক্তমাখা ভারতবর্ষ মশাল বিঁধে আমার দু-চোখ পুড়িয়ে দিতে চায়
আমি মূক ও বধির, মা বাবা ভাই বন্ধুটন্ধু কেউ কাছে নেই আর

মা

সন্ধ্যা ভৌমিক

মা আমায় হাত ধ'রে নিয়ে চল্
যেখানে আজও আমার আঁতুড় ঘরের মাটি
আমাকে খুঁজছে দ্বিপ্রহর

মা তুই মুছে ফেল দু' চোখ থেকে
যন্ত্রণার যত বিষ জল
আমি তোকে দেবো এনে
পদ্মার গভীর জলের থেকে তুলে
মধ্য রাতে ভেসে যাওয়া বেনারসীর সব ক'টি জরি
এনে দেবো, হারানো চাবির গোছা, চাঁদমালা
হিজলের দূর ছায়া, রূপোর সিঁদুর কৌটো
প্রপিতামহের ঘর !

মা আমায় নিয়ে চল্
যেখানে মেঘনার ঘন নীল জল
আজও হয় মেঘ
কথা বলে প্রতিবেশী আকাশের সাথে

তুই আমায় নিয়ে চল্ মা
যেখানে ছড়িয়ে আছে নৈঃশব্দ্যের বেদনা।

বিজ্ঞানী তৈরিই এখন বড় কাজ : সুদর্শন

সমরজিৎ কর

সেই দেখা হয়েছিল কলকাতায়, ১৯৭৪ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর "বোস স্ট্যাটিসটিক্স" বা "বসু সংখ্যায়ন"-এর উপর রচিত যুগান্তকারী গবেষণাপত্র প্রকাশনার পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত হয়েছিল বক্তৃতা এবং একাধিক আলোচনা চক্র। টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাতে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগ দিতে এসেছিলেন তিনি—ই· সি· জি· সুদর্শন। তখন তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। মনে পড়ছে, সাক্ষাৎকারের সময় তাঁকে প্রথম যে প্রশ্নটি করেছিলাম, সেটা এই : অধ্যাপক সুদর্শন, আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন কিছুরই গতি আলোর গতির চেয়ে বেশি হতে পারে না। অথচ দেখছি, কয়েকজন বিজ্ঞানী, আপনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম, বলছেন, আলোর চেয়েও গতিসম্পন্ন কণার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। সেই কণার নাম দেওয়া হয়েছে 'ট্যাকিওন'। ব্যাপারটা এখনো অবশ্য তত্ত্ব হিসেবেই থেকে গেছে। এবং সে তত্ত্ব যথেষ্ট যুক্তিসম্মত। আপনি কি এখনো মনে করেন, সত্যিই এ ধরনের কণা থাকা সম্ভব?

প্রশ্নটি শুনে মুহূর্তের জন্যে আত্মমগ্ন হয়েছিলেন তিনি। তাঁর ব্যক্তিত্বের যেটা আর একটি দিক। তারপর কতকটা আত্মগতভাবে যে উত্তরটি দিয়েছিলেন, সেটি এই রকম : "Often we tend to speak of Science as authoritative knowledge of Scientific Laws, of facts established by Science. As I understand it, science is neither concerned with truth nor with facts or laws, but with comprehension and understanding of the universe. Science does not deal with ultimate truths, just a little more light and preferably a little more sweetness; today's problem and today's solution may become irrelevant tomorrow. One strives to bring harmony and order into one's comprehended universe, one's model of the universe of discourse, and this is a process of continual evolution." ট্যাকিওনের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাই আমি আশাবাদী।

তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে সুদর্শন তখন শিরোনাম। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী মহলে যাঁর পরিচয় জর্জ সুদর্শন। 'ইউনিভার্সাল ভেকটর-অ্যাকসিয়াল ভেক্টর থিওরি অভ্ উইক ইনটারাকশন' বা সংক্ষেপে V-A theory-র উপর তাঁর গবেষণা নোবেল বিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যানের প্রশংসা অর্জন করেছে। তাঁর নাম পুরস্কারের জন্যে নোবেল কমিটিতে পাঠান হয়। কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলী শেষ পর্যায়ে এসে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারায় একেবারে কাছাকাছি পৌঁছেও শেষ পর্যন্ত বিশ্বের এই শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি তিনি মন্তব্য করেছেন : "I value the Nobel Prize very much.... It makes a lot of people recognise you. Everyone knew Chandrasekhar was a great scientist. But getting a Nobel still made a difference.... The Nobel Foundation was never beyond the pale of influence, but then discrimination or Viveka is part of the higher functions of the mind and a very complicated process.' সুদর্শনের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য স্পষ্টোক্তি।

দীর্ঘ বারো বছর পর আবার দেখা হল। এবার বাঙ্গালোরে। দেখা হতেই জিজ্ঞেস করলাম, এখন তো আপনি বছরের বেশির ভাগই বাস করছেন মাদ্রাজে। টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর পারটিকল্ ফিজিক্স-এর ডিরেক্টার, বাঙ্গালোরের সেন্টার ফর থিওরেটিকাল স্টাডিজের সিনিয়র প্রফেসর—এ সব ছাড়াও মাদ্রাজের ইনস্টিটিউট অভ্ ম্যাথেমেটিকাল সায়েন্সের আপনি ডিরেকটার। শেষোক্ত এই সংস্থাটির পরিচালন ভার নিয়ে নতুন কি ধরনের গবেষণার কথা ভাবছেন আপনি?

> "অনেকে অভিযোগ করেন, টাকার অভাবে উঁচুমানের গবেষণা করা যাচ্ছে না। বলছি না, তাঁরা মিথ্যে বলেন কোন কোন ক্ষেত্রে যথেষ্ট টাকা খরচ হচ্ছে। সরকার থেকে অঢেল আর্থিক সাহায্যও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু উপযুক্ত বিজ্ঞানীর অভাবে সব জলে যাচ্ছে।"

দেখলাম, এবার আমার প্রশ্ন শুনে আগের মত আর আত্মমগ্ন হলেন না। বরং আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জবাব দিলেন তিনি, "গবেষণা? আগামী এক বছরের মধ্যে যাতে এক ডজন ভাল বিজ্ঞানী তৈরি করা যায় সেটাই এখন আমার গবেষণার বিষয়বস্তু। ভাল বিজ্ঞানী। সৃজনশীল কাজকর্মে যারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মানটি বজায় রাখতে সক্ষম হবে। যাদের গবেষণার গভীরতায় থাকবে প্রতিশ্রুতি। 'অ্যাহেডনেস'।" মনে হল, এবার তাঁর কথায় কিছুটা যেন ক্ষোভ।

ইনসটিটিউট অভ্ ম্যাথেমেটিকাল সায়েন্সের সংক্ষিপ্ত নাম 'ম্যাটসায়েন্স'। দুই একজন প্রবীণ বিজ্ঞানীর নাম করলাম, যাঁরা ওই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত রয়েছেন। সুদর্শনের প্রশংসায় এক সময় যাঁরা ছিলেন পঞ্চমুখ।

বললাম, দীর্ঘ তিরিশ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসামান্য সাফল্যের পর আবার দেশে ফিরে এসেছেন আপনি। এ দেশে আপনার মত প্রতিভার বড়ই অভাব। ম্যাটসায়েন্সে আপনার পুরনো বন্ধু রয়েছেন অনেকে। এবার এই প্রতিষ্ঠানটি আপনার পরিচালনায় আন্তর্জাতিক গৌরব অর্জন করবে।

"আমি চেষ্টা করছি", বললেন তিনি, "ম্যাটসায়েন্স যাতে ভারতের একটি সেরা গবেষণাগারে পরিণত হয়, তার জন্যে যতটা সম্ভব আমি চেষ্টা করছি। জানি, বাধা আছে। বয়স্কদের মধ্যে অনেকেই এমন সব বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন, যা নিতান্তই সেকেলে। দেখছি, প্রবীণদের মধ্যে অনেকে অদ্ভুত অনীহা এবং আত্মপ্রসাদজনিত রোগে ভুগছেন। তাঁদের সহজ কার্যধারার কাছে এখন আমি একটি বড় রকমের প্রতিবন্ধক। কিন্তু বিজ্ঞানচর্চায় কেউ প্রশ্নাতীত হবেন, এটা তো হতে পারে না। একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটির প্রশ্ন থাকবেই। পরিচালক হিসেবে এটা আমাকে দেখতেই হবে। অনেকের কাছে যা অসুবিধে হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই কেউ কেউ চান, আবার আমি বিদেশে চলে যাই। "বেটার, ইফ আই বোর্ড দ্য নেকস্ট ফ্লাইট।"

সুদর্শন যে বাঙ্গালোরে এসেছেন, সে খবর আমার জানা ছিল না। ঠিক হয় কলকাতা থেকে

বাঙ্গালোরে গিয়ে প্রথমে দেখা করব ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইউ· আর· রাও-এর সঙ্গে। অধ্যাপক রাও-এর সঙ্গে এ ব্যাপারে আগেই কথা বলে রেখেছিলাম। তাঁর সাক্ষাৎকার নেব এ কথাও বলে রেখেছিলাম। ঠিক হয়, কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরির কেন্দ্রটিও দেখব। এ ছাড়া আমার ভ্রমণসূচীর মধ্যে ছিল বাঙ্গালোরের ইনডিয়ান ইনসটিটিউট অভ্ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স পরিদর্শন এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স শিল্প সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া। ইনডিয়ান ইনসটিটিউট অভ্ অ্যাস্ট্রোফিজিকসের এখন ডিরেকটার বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। যিনি ইউরেনাসের বলয়ের অন্যতম আবিষ্কর্তা।

ডঃ ভট্টাচার্যকে বললাম, আপনার একটি সাক্ষাৎকার নিতে চাই। কাভালুরে বসেছে ৯৩ ইঞ্চি ব্যাসের অপটিক্যাল টেলিস্কোপ, এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম। অনুগ্রহ করে যদি সেটা দেখার সুযোগ করে দেন, খুবই আনন্দিত হব।

ডঃ ভট্টাচার্য বললেন, বেশ তো, কোন অসুবিধে নেই। আজ ২৫ সেপ্টেম্বর। অধ্যাপক এন· এ· নরসিমহম আজ বিকেলেই কাভালুর যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে আপনার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ধন্যবাদ জানালাম তাঁকে। নিজেকে ভাগ্যবান বলেও মনে হল। অধ্যাপক নরসিমহমের নাম আগেই শুনেছিলাম। এক সময় ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের স্পেকট্রোস্কোপি গ্রুপের প্রধান ছিলেন। ১৯৫৫-৫৭ সালে এই বিষয় নিয়েই গবেষণা করেছেন নোবেল বিজ্ঞানী ডঃ জি· হার্জবার্গের সঙ্গে। এখন প্রফেসর এমেরিটাস। কাভালুরের ৯৩ ইঞ্চি ব্যাসের টেলিস্কোপের বর্ণালী বিষয়ক যন্ত্রপাতি স্থাপনার ব্যাপারেও তাঁর ভূমিকা ছিল অন্যতম। অতএব সহযাত্রী হিসেবে তাঁকে পাওয়াটা সৌভাগ্য বইকি।

অন্যান্য কর্মসূচী নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করব।

মোটরে কাভালুরের পথে যাওয়ার সময় অধ্যাপক নরসিমহমই সুদর্শনের কথা তুললেন। বললেন, ২৫ সেপ্টেম্বর বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অভ্ সায়েন্স নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া'র ৩০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করেছে। এই আলোচনা চক্রে সুদর্শনও বক্তৃতা দিচ্ছেন। দু'একদিন থাকবেনও বাঙ্গালোরে। উঠেছেন ইন্সটিটিউটের গেস্ট হাউসে।

অতএব ২৬ সেপ্টেম্বর বিকেলের দিকে কাভালুর থেকে ফিরেই ছুটলাম গেস্ট হাউসে।

সেখানে গিয়ে শুনলাম, অধ্যাপক সুদর্শন কিছুক্ষণ আগেই বেরিয়ে গেছেন তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে। সে রাতে আর ফিরবেন না।

গেস্ট হাউস থেকে তাঁর আত্মীয়ের টেলিফোন নিয়ে রাত ন'টা নাগাদ যোগাযোগ করলাম।

দেখলাম, পুরনো পরিচয় ভোলেননি।

বললেন, আজ রাতে ফিরছি না। কাল চলে এস, দেখা হবে।

বললাম, সকাল ন'টা নাগাদ আসব?

বিজ্ঞানী ই· সি· জি· সুদর্শন

না। সোয়া ন'টায় আমার বক্তৃতা।

তা হলে সকাল সাতটা নাগাদ গেলে কেমন হয়?

দ্যাট ইজ এক্সেলেন্ট। এসো। একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাব, কথাও হবে।

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখার পর রীতিমত উত্তেজিত আমি। খাতা কলম নিয়ে বসে গেলাম। একটা সাক্ষাৎকার নেওয়া দরকার। তার জন্যে কয়েকটি প্রশ্নও লিখে ফেললাম।

বিচিত্র মানুষ। পদার্থবিজ্ঞানের একাধিক ক্ষেত্র নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন। যাদের মধ্যে অন্যতম এলিমেন্টারি পারটিক্ল ফিজিকস, কোয়ান্টাম মেকানিক্স, কোয়ান্টাম অপটিকস, ক্লাসিকাল মেকানিক্স এবং কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি। আলোর চেয়েও দ্রুত গতিসম্পন্ন কণা 'ট্যাকিওন' ক্ষেত্র তত্ত্বের তিনি অন্যতম প্রবক্তা। 'উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স' বা দুর্বল নিউক্লিও বল-এর উপর তাঁর গবেষণা অনন্যসাধারণ। নোবেল বিজ্ঞানী আব্দুস সালাম, ভিনবার্গ এবং গ্ল্যাশোর 'একীকৃত ক্ষেত্র' তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর এই শেষোক্ত অবদান যথেষ্ট ইন্ধন জুগিয়েছে। এক কথায়, পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে এখন তিনি প্রবাদপুরুষ।

কোন কোন ক্ষেত্রে সুদর্শনকে ভাগ্যবানই বলতে হয়। কারণ মাত্র ২১ বছর বয়েসে তিনি বোম্বাই-এর টাটা ইন্সটিটিউট অভ্ ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ-এ গবেষণার সুযোগ পান। ওই সময় তাঁর একাধিক প্রথিতযশা বিজ্ঞানীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটেছিল। ২৪ বৎসর বয়েসে রোচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন 'হাই এনার্জি ফিজিকস'-এ গবেষণার কাজে। এটাও বড় রকমের একটি সুযোগ এবং সম্মান। মাত্র ২৬ বছর বয়েসে উইক ইন্টারঅ্যাকশনের উপর V-A তত্ত্ব সৃষ্টি করে পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অর্জন করেন তিনি। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি দুর্ভাগ্যেরও সম্মুখীন হন। একাধিক বিজ্ঞানীর কাছে তাঁর কোন কোন কাজ উপেক্ষিত হয়েছিল। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন গেল-মান এবং ফাইনমানের মত নোবেলবিজ্ঞানী। নোবেল পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হওয়ার এটাও একটি কারণ। এ ধরনের ঘটনা তৃতীয় বিশ্বের বহু বিজ্ঞানীর ভাগ্যেই ঘটেছে। তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞানীরা যাতে পারস্পরিক লেনদেনের মাধ্যমে উচ্চমানের মৌল গবেষণা করার সুযোগ পান, তার জন্যে আব্দুস সালামের নেতৃত্বে ইটালির ত্রিয়েস্তে তৈরি হয়েছে 'থার্ড ওয়ার্ল্ড অ্যাকাডেমি অভ্ সায়ান্সেস'। সুখের কথা, এ বছর ২৬ অক্টোবর V-A তত্ত্বের উপর গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবে এই অ্যাকাডেমি পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন সুদর্শনকে। অ্যাকাডেমির প্রথম পুরস্কারটি পেলেন তিনি, যার আর্থিক মূল্য দশ হাজার মার্কিন ডলার।

> **"আগামী এক বছরের মধ্যে যাতে এক ডজন ভাল বিজ্ঞানী তৈরি করা যায় সেটাই এখন আমার গবেষণার বিষয়বস্তু। ভাল বিজ্ঞানী। সৃজনশীল কাজকর্মে যারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মানটি বজায় রাখতে সক্ষম হবে। যাদের গবেষণার গভীরতায় থাকবে প্রতিশ্রুতি। অ্যাহেডনেস।"**

জন্ম ১৯৩১, কেরালার কোট্টায়ামের ছোট্ট একটি গ্রাম পাক্কিল-এ। বাবা রাজ্য সরকারের কর্মী। মা'র কাছে প্রথম হাতেখড়ি। কম বয়েস থেকেই তাঁর মধ্যে প্রতিভার সাক্ষ্য ধরা পড়ে। প্রায় সব বিষয়েই ছিল তাঁর সমান আগ্রহ। "তবে ইতিহাস আমার ভাল লাগত না। ইতিহাস পড়াটা আমার কাছে মুখস্থ বিদ্যার মত মনে হত। বরং আমার ভাল লাগত ব্যাকরণ এবং পাটিগণিত। আমার মনে হত এই দুটি বিষয় কতকগুলি পদ্ধতি জানতে সাহায্য করে। যাদের তুমি প্রয়োগও করতে পার।" বলেছেন সুদর্শন।

ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর সুদর্শন চলে আসেন মাদ্রাজে। ফিজিক্স-এ অনার্স নিয়ে ভর্তি হন মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজে। সেখানকার পড়া শেষ করার পর কিছুকাল ওই কলেজে তিনি রেসিডেন্সিয়াল টিউটার এবং ডেমনস্ট্রেটারের কাজে বৃত হন। সেখান থেকে ১৯৫২ সালে টাটা ইন্সটিটিউট অভ্ ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ—তাত্ত্বিক গবেষক হিসেবে যোগদান।

হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার আমন্ত্রণে তখন বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর এই প্রতিষ্ঠানটিতে আনাগোনা। তাঁরা শিক্ষকতাও করতেন। এই সময় সুদর্শন শিক্ষক হিসেবে যাঁদের পেলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন পি· এ· এম· ডিরাক, ভলফগ্যাং পাউলি, মারিয়া গোয়েপের্ত-মায়ার। সবাই নোবেল বিজ্ঞানী। ডিরাকের কাছে তিনি পড়েছেন কোয়ান্টাম মেকানিক্স, পাউলির কাছে কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি, মারিয়ার কাছে নিউক্লিয়ার থিওরি। এ ছাড়াও শিক্ষক হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন লেভি, জোসেফ মায়ার এবং সিন-ইতোরোকে, যাঁরা পরবর্তীকালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। গবেষণা-পরিচালক হিসেবে সুদর্শন পেয়েছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বার্নার্ড পিটারসকে। "ভদ্রলোকের সব বিষয়ের সঙ্গে আমি যে একমত হতাম, তা নয়। তবে তাঁর কাছ থেকে সবচেয়ে মূল্যবান যে বিষয়টি আমি

শিখেছিলাম, সেটা হল : নিরলস হওয়া এবং সব ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ হওয়া। তিনি প্রায়শই বলতেন, সত্যিকারের কিছু যদি করতে চাও, গাধার মত পরিশ্রম কর।" সুদর্শন বলেছেন।

টাটা ইন্সটিটিউটেই তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটে রোচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক বব মারশাক-এর সঙ্গে। অধ্যাপক মারশাকের আমন্ত্রণে তিনি রোচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। এখানে মাত্র ২৬ বছর বয়েসে শেষ করেন V-A তত্ত্ব। এই অবদানের জন্যে ১৯৬০-এর দশকের শেষ থেকে কম করেও বারো বার তাঁর নাম নোবেল কমিটিতে সুপারিশ করা হয়েছে।

সুদর্শন মনে করেন, কোন বিজ্ঞানী ভারতে থাকবেন কি না অথবা বিদেশে যাবেন, সেটা নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের অবস্থা অথবা পরিস্থিতির উপর। "এ কথা অবশ্য ঠিক, একজন বিজ্ঞানীর লেখাপড়া এবং গবেষণার জন্য সরকার ব্যয় করেন যথেষ্ট। অতএব সরকার প্রতিদানে তার কাছ থেকে কিছু পেতেও চায়। তবে কেউ বিদেশে গেলে তিনি দেশদ্রোহী এ কথাটা বলা হয়ত ঠিক হবে না। বাবা মা ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্যে খরচ করেন। তারা বড় হলে বাবা মা যদি বলেন, বইপত্র কিনে বাজে খরচ না করে আমাদের সব সময় ভরণপোষণের জন্যে খরচ কর, তা হলে মানেটা যা দাঁড়ায় এ ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা দাঁড়াবে সেই রকম।"

পরদিন ঠিক সকাল সাতটায় গিয়ে পৌঁছলাম ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অভ্ সায়েন্সের গেস্ট হাউসে। মিনিট পাঁচেক পরেই তিনি এলেন। দেখলাম, গত বারো বছরে তাঁর চালচলনে কোন পরিবর্তন আসেনি। সারা মুখে প্রশান্ত ভাব, চালচলনে চাঞ্চল্য। গায়ে হাল্কা গোলাপী রঙের পাঞ্জাবি, লুঙির মত করে পরা ধুতি। দ্রুত এগিয়ে এসে কাঁধে হাত রাখলেন আমার।

"সমরজিৎ, তুমি এসে গেছ। আমি দুঃখিত আমার দেরি হয়ে গেল।" বললেন তিনি। "মিনিট দশেক বস। হাতমুখ ধুয়ে ধ্যান সেরে নিই। তারপর কথা বলবো, কেমন ?"

মিনিট দশেক মানে মিনিট দশেকই।

আমরা মুখোমুখি বসলাম।

ইতিমধ্যে এলেন আর একজন। বয়েস বছর পঁয়ষট্টি ছেষট্টি হবে।

"ইনি ডঃ আর এম বর্মা, বিখ্যাত নিউরোলজিস্ট। বিখ্যাত শিল্পী রবি বর্মার নাতি।" পরিচয় করিয়ে দিলেন।

ব্রেকফাস্ট এল। ব্রেকফাস্টের সঙ্গে চলল বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথাবার্তা। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। সুদর্শনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যা প্রায়শই হয়ে থাকে।

বর্তমান লেখকও এক সময় টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের (অস্টিন) ছাত্র ছিলেন। তাই গোড়ায় টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ নিয়েই কথা তুললাম। বিশেষ করে সেখানকার পরিচিত অধ্যাপকমণ্ডলী এবং গবেষণার ব্যাপারে।

সুদর্শন বললেন, কয়েকটি বিষয়ে টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ভাল কাজ হচ্ছে। বিশেষ করে হাই এনার্জি ফিজিক্স এবং অ্যাস্ট্রোফিজিকস্-এ। জেনেটিকস এবং মলিকিউলার বাইওলজিতেও কাজ হচ্ছে ভাল।

প্রশ্ন : টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর পারটিকল্ থিওরির আপনি ডিরেক্টার। সে পদটি কি আপনি পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছেন ?

উত্তর : না এখনো আমি সেখানকার ডিরেক্টার। তবে বছরের বেশির ভাগ সময় এখন আমি ভারতেই থাকি। বছরের কিছু সময় সেখানে থাকি। আমার স্ত্রী ললিতা এবং পুত্র সেখানে রয়েছে। ললিতা সেখানে কাজ করে। তাদের জন্যেও যেতে হয়।

প্রশ্ন : ম্যাটসায়েন্সের দায়িত্ব নেওয়ার পর সেখানে কি ধরনের গবেষণার উপর আপনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন ?

উত্তর : দেখ, আমি ঈশ্বর নই, যে সব কিছুই আমার মর্জিমত চলবে। সেখানে আমার বেশ কিছু সংখ্যক বন্ধু রয়েছেন। গবেষণার বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে তাঁরাও ভাবছেন। আসলে গবেষণার পুরো ব্যাপারটাই নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের উপর। বিষয় তো অনেক। ক্ষেত্রতত্ত্ব তাদের মধ্যে একটি বড় রকমের চ্যালেঞ্জ। এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নেওয়ার পর একটাই আমার লক্ষ্য : এখানে এমন একটি পরিবেশ গড়ে তোলা যাতে করে এখানকার গবেষকরা পৃথিবীতে এখন যেসব চ্যালেঞ্জিং কাজ কর্ম হচ্ছে তাতে হাত দিতে পারেন। তারপর যোগ্যতা অনুযায়ী ফল। মূর্খের স্বর্গে বাস করাটা আমি পছন্দ করি না। বাস্তবের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে হবে। 'আই ওয়ান্ট মিনিংফুল আউটপুট'।

প্রশ্ন : আপনি শেষে যে উক্তিটি করলেন, আপনার কি মনে হয় না, এ দেশে সেটারই সবচেয়ে বড় অভাব। উঁচু ধরনের কাজে যোগ্যতা নিশ্চয় দরকার। কিন্তু সেই যোগ্যতা পেতে গেলে যে ধরনের নিষ্ঠা, যে কর্ম উদ্যোগ, যে মানসিকতার প্রয়োজন অনেক গবেষকের মধ্যে এ সবের একান্তই অভাব। উঁচু মানের গবেষণার ক্ষেত্রে এর জন্যেই আমরা পিছিয়ে আছি। এ সম্পর্কে আপনার কি মন্তব্য ?

উত্তর : কথাটা মিথ্যে নয়। এ সমস্যা ম্যাটসায়েন্সেও রয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে সেখানে অনেকে পড়াচ্ছেন, গবেষণা পরিচালনা করছেন। বেশির ভাগই পুরনো কাজ। তাও অসম্পূর্ণভাবে। যে সব চ্যালেঞ্জিং ফিল্ড রয়েছে সে সব ক্ষেত্রে কাজ করার মত যোগ্যতাও নেই। তবে এটা একটা দিক। আমাদের দেশে বহু বিজ্ঞানী রয়েছেন যাঁরা সুযোগ এবং উপযুক্ত পরিচালনা পেলে বড় রকমের কাজ করতে পারেন। কিন্তু তার জন্যে দরকার 'গ্রেট সায়েন্টিস্টস টু মেক গ্রেট ইন্সটিটিউশন'।

প্রশ্ন : পদার্থবিজ্ঞানে এখন চ্যালেঞ্জিং ফিল্ড বলতে ম্যাগনেটিক লেন্স, একীকৃত ক্ষেত্র, হাই এনার্জি পারটিকল্, সুপার গ্র্যাভিটি এমন অনেক কিছুই তো রয়েছে। আপনার কর্মসূচীর মধ্যে কি এগুলি থাকছে ?

উত্তর : সবই থাকবে। এ সব ছাড়াও এখন আরো একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ চলছে 'স্ট্রিং থিওরি'র উপর। মহাকর্ষ এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবশিষ্ট যা কিছু তাদের সমন্বয় সাধন করে গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে স্ট্রিং থিওরি। সুপার গ্র্যাভিটির সাহায্যে তৈরির চেষ্টা চলছে একীকৃত ক্ষেত্র তত্ত্ব। তবে হ্যাঁ, শুধু পদার্থবিজ্ঞানেই বা কেন, সব ক্ষেত্রেই তো রয়েছে চ্যালেঞ্জিং কাজ। কেমিকাল বাইওলজি আর একটি চ্যালেঞ্জিং ফিল্ড। গবেষণার কোন ক্ষেত্রই আমরা বাদ দিতে চাই না। শুধু দেখতে হবে, যে কাজই করি না কেন তা যেন যুগোপযোগী হয়, অর্থবহ এবং উচ্চ মানের হয়।

সুদর্শন বললেন, অনেকে অভিযোগ করেন, টাকার অভাবে উঁচু মানের গবেষণা করা যাচ্ছে না। বলছি না, তাঁরা মিথ্যে বলেন। তবে এ দেশের ব্যাপারটা যেন স্বতন্ত্র। কোন কোন ক্ষেত্রে যথেষ্ট টাকা খরচ হচ্ছে। সরকার থেকে অঢেল আর্থিক সাহায্যও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু উপযুক্ত বিজ্ঞানীর অভাবে সব জলে যাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থ শুধু আড়ম্বরই বাড়িয়ে চলেছে আমাদের। সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে কাজের কাজ হচ্ছে কম। অথচ সুইডেনের ক্যারোলিনিস্কা ইন্সটিটিউটের (চিকিৎসাবিজ্ঞানে যাঁরা নোবেল পুরস্কার দিয়ে থাকেন) কথা ভাব। সেখানে আড়ম্বর নেই। খরচ কম। উঁচু মানের কাজ চলছে।

প্রসঙ্গত নিজের প্রতিষ্ঠানের কথাও তুললেন তিনি। বললেন, ম্যাটসায়েন্স স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। আর্থিক সঙ্গতির জন্যে তাকে নির্ভর করতে হয় সরকারের উপর। বহু ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় আমলাদের মর্জির উপর নির্ভর করে আর্থিক সাহায্যের ব্যাপারটা। এর জন্যে বেশ কিছু কাজ উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য পায় না। এ কথা আমাদের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেখানে শিক্ষক এবং গবেষকের সংখ্যা বাড়ছে। স্থান সঙ্কুলানের অভাব। এমন কি পানীয় জলেরও ব্যবস্থা নেই। আগে ছিল পাঁচজন ফ্যাকাল্টি মেম্বার। এখন তিরিশ। এরপর পঞ্চাশে গিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু তাঁরা বসবেন কোথায় কাজই বা করবেন কোথায়। আমার পুরো মাইনেটাই এখন আমি ইন্সটিটিউটকে দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু সেটাই বা কত। তা দিয়ে তো আর বাড়ি তোলা যায় না ? পাঠাগারের সম্প্রসারণের মত জায়গাও নেই। অসুবিধে বিস্তর। আমাদের এখানে যা চলছে তার বেশির ভাগই তাত্ত্বিক গবেষণা। তার জন্যে প্রচুর টাকার দরকারও নেই। তবু ন্যূনতম বলে তো একটা কথা আছে ? কোথাও অঢেল টাকা এবং অপচয়। কোথাও অর্থবহ কাজ টাকার অভাবে অচল। এই বৈষম্যই এ দেশে উঁচুমানের বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়।

বললাম, আপনি কি হতাশ হচ্ছেন ?

"অফ কোর্স নট", বললেন সুদর্শন, "এই সব অসুবিধেও তো বড় রকমের চ্যালেঞ্জ। অন্য সব খরচ মেটানর পর আমার বাজেটে পড়ে থাকে সামান্য আর্থিক সঙ্গতি। আগামী তিন বছরে তার সাহায্যে আমি অন্তত ১০০ জন উপযুক্ত গবেষক গড়ে তুলব। যারা বিশ্বমানের কাজে সক্ষম হবে।"

চালাক চতুর কন্যেরা সব পাবেই পাবে প্লাস

হিমানী
বোরোপ্লাস
অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম হোমিওপ্যাথিক ওষুধ

যে বাড়তি গুণ কেবল প্রকৃতিই পারে দিতে

জীবনের আবেশভরা প্রহরের সাথী

রাজীবের পশ্চিমবঙ্গ সফর—প্রস্তুতিপর্ব

সুমন চট্টোপাধ্যায়

বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে রাজীব এলেন পশ্চিম বাংলায়। কেন? বামপন্থীদের হাত থেকে কেড়ে নিতে চান সেই ধারালো অস্ত্র, কেন্দ্রের বঞ্চনা। আর চান বলেই কি, এভাবে দিল্লির দরবারকে কলকাতার রাজভবনে নিয়ে গিয়ে তিনি রাজকোষ থেকে পশ্চিম বাংলার জন্যে কোটি কোটি টাকা খরচ করার কথা ঘোষণা করেছেন!

রাজীব ও পশ্চিমবঙ্গ

"আমি মনে করি, এদেশে সত্যিকারের সিরিয়াস রাজনৈতিক দল আছে দুটি। আমরা এবং মার্কসবাদীরা।"

১৯৮৩-র ডিসেম্বরে কলকাতার নেতাজী ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত কংগ্রেসের ৭৭তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে যোগ দিতে এসে 'আনন্দবাজার'-এর কাছে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে এই কথা বলেছিলেন রাজীব গান্ধী। তখন রাজীব প্রধানমন্ত্রী নন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর পুত্র হওয়ার সুবাদে, রাজনীতিতে নবাগত হওয়া সত্ত্বেও, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক। তবুও মার্কসবাদীরাই যে কংগ্রেসের চোখে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী দল, তখনই রাজীব তা বুঝতে পেরেছিলেন। সাক্ষাৎকারে সেই উপলব্ধির কথা স্বীকারও করেছিলেন অকপটে।

স্বীকৃতি দিলেও, ওই মার্কসবাদীদেরই এখনও পর্যন্ত কিছুতেই কাবু করতে পারেননি রাজীব। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে। কলকাতার সেই পূর্ণাঙ্গ কংগ্রেস অধিবেশনের পর, প্রায় চার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। মায়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর রাজীব দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, তাও দুবছর হয়ে গেল। ১৯৮৪-র লোকসভা নির্বাচনে, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র বিপুল ভোট পেয়েছিল কংগ্রেস। জনতা, বি জে পি, লোকদলের মত হিন্দি বলয়ের দলগুলি সেই নির্বাচনে হয়েছিল ধরাশায়ী। ব্যতিক্রম ছিলেন ওই মার্কসবাদীরা। প্রবল সহানুভূতির হাওয়া পশ্চিমবঙ্গেও বয়ে ছিল ঠিক। কিছুটা তারই সাহায্যে রাজ্যের শহরাঞ্চলে কংগ্রেস কিছু

রাজভবনে জ্যোতি বসুর সঙ্গে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী

ছবি : অলক মিত্র

বাড়তি আসন পেয়েছিল, একথাও ঠিক। কিন্তু মোটের উপর ওই ঝড়ের মুখেও বিগত লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ নামক বামপন্থী দুর্গটি ছিল অটুট।

এবার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সেই দুর্গে হানা দিতে চান রাজীব। গত ১৮ সেপ্টেম্বর ছয়শ চুরাশি কোটি টাকার থলি হাতে, বিস্তর ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সপরিবার, সপারিষদ রাজীবের পশ্চিমবঙ্গ সফর ছিল সেই হানা দেওয়ার পথেই প্রথম পদক্ষেপ।

পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দুর্গে টাকার থলি হাতে এইভাবে হানা দিয়ে রাজীব শেষ পর্যন্ত কতখানি সফল হবেন, সেই আলোচনা প্রসঙ্গান্তরে করা যাবে। তার আগে দেখা যাক, তিনি এই পথ বেছে নিলেন কেন। কেনই বা তাঁর মনে হলো, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্র সত্যিই আগ্রহী, এমন একটা ইমেজ রাজ্যের মানুষের কাছে রাখতে পারলে আখেরে কংগ্রেসের লাভ হওয়ার সম্ভাবনা।

মনে হওয়ার একটা কারণ, রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রের উদ্যোগ, সহানুভূতির হাওয়ার পাশাপাশি বিগত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে কিছুটা সাহায্য করেছিল। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর মন্ত্রিসভায় অর্থ ও রেলের মত দুটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্ব দুজন বাঙালীকে দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন প্রণব মুখোপাধ্যায় অবশ্য বাঙালী হয়েও বাঙলার জন্য কিছু করেননি। বরং অর্থ কমিশনের দেওয়া ৩২৫ কোটি টাকার ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে পশ্চিমবঙ্গকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করেছিলেন। কিন্তু দুই মন্ত্রীর অপরজন, অর্থাৎ এ বি এ গনি খান চৌধুরী, কতকটা তাঁর সীমার বাইরে গিয়েই কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের জন্য নতুন নতুন রেল প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন। আমলাদের ভ্রূকুটি, যোজনা কমিশনের আপত্তি, এবং স্বজাতি অর্থমন্ত্রীর প্রবল বাধা সত্ত্বেও, একমাত্র ইন্দিরাগান্ধীর সবুজ সংকেতকে সম্বল করে, ৮৪র রেল বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের রেলের মানচিত্রে তিনি দীঘা-তমলুক, বজবজ-নামখানা, বালুরঘাট-একলাক্ষীপুর ইত্যাদি নতুন লাইন সংযোজিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এ ছাড়া তাঁর আমলে রাজ্যে চালু হয়েছিল নতুন নতুন ট্রেন, কলকাতায় শুরু হয়েছিল চক্ররেল। কাজে নতুন গতি এসেছিল মেট্রো রেল-এ। সর্বোপরি হাজার হাজার বেকার বঙ্গসন্তানকে চাকরি দেওয়ার পরম প্রতিশ্রুতি গোটা রাজ্যে এমন একটি হাওয়া তৈরী করেছিল যে যুব সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ লোকসভা নির্বাচনে প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের সমর্থনে রাস্তায় নেমেছিলেন। শহরাঞ্চলে ভোটের ফলের উপরেও এই হাওয়ার কিছুটা প্রভাব পড়েছিল অবশ্যই।

একা বরকত সাহেব যা-ই করুন, 'পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণ' কিংবা 'কেন্দ্রের বঞ্চনা' এবম্বিধ বামপন্থী শ্লোগানের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার পক্ষে অবশ্যই তা যথেষ্ট ছিল না। স্বাধীনতার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন

আদর্শ থেকে সরে এসে কোথাও একচেটিয়া পুঁজিপতি, কোথাও আবার বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিল্প গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও বামফ্রন্ট সরকার আজ যদি বঙ্গবাসীর বাহবা কুড়িয়ে থাকেন, তাহলে স্বীকার করতেই হবে, তারও জমি তৈরি করে দিয়েছে কেন্দ্রের বঞ্চনা।

সম্পর্কে দিল্লির হিন্দি-শাহীর যে এক ধরনের অনীহা আছে এটা ঐতিহাসিক সত্য। জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল যে বিধানচন্দ্র রায়ের তাঁকেও বারবার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এই মনোভাবের। বস্তুত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে তিনি পদত্যাগ করার হুমকি দেওয়ার পরেই একমাত্র নেহরু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় সরকারি উদ্যোগের ইস্পাত প্রকল্পগুলির মধ্যে দুর্গাপুরকেও স্থান দিতে সম্মত হয়েছিলেন। বঞ্চনার ট্রাডিশন সেই থেকে সমানেই চলেছে।

কেন্দ্রের এই বঞ্চনাকে, ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর বামপন্থীরা যেভাবে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন, তা এক কথায় চমকপ্রদ। মিটিংয়ে, মিছিলে, জনসভায়, দেওয়াল-লিখনে, ব্যক্তিগত আলোচনায় কথায় কথায় তাঁরা কেন্দ্রের বঙ্গ-বিরোধিতার প্রসঙ্গ টেনেছেন। উদাহরণ তুলে ধরেছেন। কেন্দ্র মাশুল সমীকরণ নীতি প্রত্যাহার না করার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ পশ্চিমবঙ্গকে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে, বামপন্থীরা বারবার তুলে ধরেছেন সেই প্রসঙ্গ। বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও হলদিয়ায় পেট্রো কেমিক্যালস কারখানা তৈরিতে কেন্দ্র কীভাবে সহযোগিতার হাত সরিয়ে নিয়েছেন, সেই দৃষ্টান্তও উঠেছে ঘনঘন। এবং এই সঙ্ঘবদ্ধ প্রচার নামতে নামতে একেবারে অজ-গাঁয়ের মাটিতে সর্বহারার মনে গিয়েও লেগেছে। কেন্দ্রের অন্যায় আচরণের জন্যই এ রাজ্যটা অগ্রগতির মুখ দেখতে পাচ্ছে না। এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে দরিদ্র নিরক্ষর সাধারণ মানুষের মনেও। আদর্শ থেকে সরে এসে কোথাও একচেটিয়া পুঁজিপতি, কোথাও আবার বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিল্প গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও বামফ্রন্ট সরকার আজ যদি বঙ্গবাসীর বাহবা কুড়িয়ে থাকেন তাহলে স্বীকার করতেই হবে, তারও জমি তৈরি করে দিয়েছে কেন্দ্রেরবঞ্চনা। দলের ভিতরে আজ যখন জ্যোতিবাবু বলছেন, বর্তমান রাষ্ট্রকাঠামোয়, কেন্দ্রের লাগাতার অসহযোগী মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে, স্রেফ অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই শিল্প স্থাপনে শ্রেণী শত্রুদের সঙ্গেই হাত মেলানো ছাড়া অন্য কোনও গতি নেই, কট্টর আদর্শবাদীরাও তা নীরবে হজম করে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে রাজীব বামপন্থীদের হাত থেকে সেই ধারালো রাজনৈতিক অস্ত্রটি কেড়ে নিতে চান। এবং চান বলেই, এভাবে দিল্লির দরবারকে কলকাতার রাজভবনে নিয়ে গিয়ে তিনি রাজকোষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের জন্য কোটি কোটি মুদ্রা খরচ করার কথা ঘোষণা করেছেন। এবং ঘোষণা করেই ঠোঁটে বিদ্রুপের হাসি এনে বলেছেন, "বামফ্রন্ট সরকার মিছিমিছিই কেন্দ্রের নামে অপপ্রচার চালান। কেন্দ্র যদি সত্যিই পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করতে চাইবেন, তাহলে এইভাবে আমরা এখানে আসব কেন? পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্র সত্যিই আন্তরিক। আন্তরিক বলেই তো এত টাকার প্যাকেজ আমরা ঘোষণা করছি। আর যাই হোক, ছয়শ চুরাশি কোটি তো কম টাকা নয়।"

উদার হাতে পশ্চিমবঙ্গের জন্য টাকা খরচ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, নানা স্তরে, নানা ভাবে বিস্তারিত আলোচনার পর। প্রধানমন্ত্রী যে পশ্চিমবঙ্গকে সাহায্য করার কথা ভাবছেন, তার প্রথম সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে এ বছর জুন মাসে দলের এম পিদের সঙ্গে তাঁর এক বৈঠকে। সেই বৈঠকে এম পি-দের কাছ থেকে রাজ্যের নানা অভাব অভিযোগের কথা শোনেন প্রধানমন্ত্রী। সব শোনার পর ঠিক হয়, দলের এম পি, এম এল এ-দের কাছ থেকে সুপারিশ সংগ্রহ করে সেগুলিকে একত্রিত করে যোজনা দফতরের

পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে আদিবাসী রমণীর কুটিরে

রাষ্ট্রমন্ত্রী অজিত পাঁজা তৈরি করবেন একটি 'স্ট্যাটাস পেপার।' তারপর সেই পেপারটি পাঠানো হবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে।

অন্যদিকে বামফ্রন্ট সরকারকেও তাঁদের যাবতীয় প্রস্তাব একত্র করে দিল্লিতে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন প্রধানমন্ত্রী। গত পয়লা জুলাই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রথম কলকাতা সফরের দিন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে ব্যক্তিগতভাবে এই অনুরোধ জানান রাজীব। আর তার পরেই নেতাজী ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে দলের কর্মীদের কাছে ঘোষণা করেন, "আমি জ্যোতিবাবুকে বলেছি, পশ্চিমবঙ্গের যেসব বকেয়া সমস্যা কেন্দ্রের জন্য আটকে আছে, এই কলকাতায় বসে আলোচনার মাধ্যমে সেগুলির সমাধান করে দেব খুব শীঘ্রই। তার মধ্যে যদি প্রয়োজন হয়, দিল্লি থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় দফতরের মন্ত্রী ও আমলাদেরও কলকাতায় আনব। কেন্দ্রের জন্য পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন ব্যাহত হোক, এটা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত নয়।" এম পি-দের বৈঠকে মিলেছিল যে ইঙ্গিত, তা আরও স্পষ্ট হলো পয়লা জুলাই-এর ঘোষণায়। তখনই বোঝা গেল, এবার রাজীব পশ্চিমবঙ্গের জন্য সত্যি সত্যিই কিছু করবেন।

কংগ্রেসীদের প্রস্তাব

ব্যক্তিগত ভাবে অনেক কংগ্রেস নেতাই গত দু'বছর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে হয় দরবার করেছেন নয় চিঠিপত্র লিখেছেন। এ প্রসঙ্গে যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, তাঁরা হলেন এ বি এ গনি খান চৌধুরী, অজিত পাঁজা, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি মনোনীত হওয়ার অব্যবহিত পরে প্রিয়বাবু রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ একত্র করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। তেমনি উদ্বাস্তুদের জমির সহায়ী স্বত্ব দেওয়ার দাবিতে সংসদের ভিতরে বাইরে লাগাতার সোচ্চার থেকেছেন মমতা দেবী। তবে এ ব্যাপারে সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন অবশ্যই বরকত সাহেব। প্রথম আট মাস বসিয়ে রেখে রাজীব তাঁকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়ার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন বকেয়া কেন্দ্রীয় প্রকল্পসহ নানা প্রসঙ্গ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রীতিমত পত্রযুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছেন তিনি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যোগ শুরু হয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ পাওয়ার পর। একদিকে রাজ্যের কংগ্রেসী এম এল এ ও এম পি-দের পাঠানো সুপারিশগুলি একত্র করে একটি বিস্তারিত স্ট্যাটাস পেপার তৈরি করেন অজিত পাঁজা। অন্যদিকে কয়েকটি সর্বসম্মত সুপারিশ সংকলন করে প্রিয়বাবু তৈরি করেন একটি স্মারকলিপি। প্রধানমন্ত্রীর পশ্চিমবঙ্গ সফর শুরু হওয়ার দিন পনেরো আগে দুটি সংকলিত প্রস্তাবমালাই পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাঁর সচিবালয়ে।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে অজিতবাবু রাজ্যের সব

বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে প্রধানমন্ত্রী ছবি : তপন দাস

কংগ্রেসী এম পি ও এম এল-এদেরই ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখেছিলেন, তাঁদের নিজস্ব সুপারিশ পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে। যাঁরা যাঁরা সুপারিশ পাঠিয়েছিলেন তাঁদের সকলেরই নামের উল্লেখ আছে উনচল্লিশ পাতার ওই স্ট্যাটাস পেপারে। খবরের কাগজে এই সংবাদ পাঠ করে বণিকসভার প্রতিনিধিরা এমন কি সাধারণ নাগরিকেরাও তাঁদের নানা প্রস্তাব পাঠিয়েছেন অজিতবাবুর কাছে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, নানা দলীয় কারণে যাঁরা নিয়মিত খবরের কাগজে হেডলাইন হন, তাঁদের অনেকেই রাজ্যের উন্নয়ন সম্পর্কে কোনও সুপারিশ পাঠানোর প্রয়োজন অনুভব করেননি। এমনকি নিজের নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রের সমস্যাবলীর কথাও নয়। এই স্ট্যাটাস পেপারে যাঁদের নামের অনুপস্থিতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা আবদুস সাত্তার, চিফ হুইপ সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং সাধারণ সম্পাদক সোমেন মিত্র। মোটের উপর ওই স্ট্যাটাস পেপারটি পড়লে বোঝা যায়, দলের এম পিদের কাছ থেকে অজিতবাবু যতটা সাড়া পেয়েছেন এম এল এদের কাছ থেকে ততটা পাননি।

আবার এই সুযোগে কোনও কোনও কংগ্রেসী এম এল এ সাধারণভাবে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে কোনও সুপারিশ করার বদলে কেবল তাঁদের নির্বাচনী কেন্দ্রের যাবতীয় অসুবিধের কথা জানিয়েছেন। যেমন ধরা যাক মালদার এম এল এ রঘুলাল মণ্ডল কিংবা উত্তর কলকাতার এম এল এ প্রফুল্লকান্তি ঘোষের কথা। রঘুলালের সব সুপারিশই মালদা জেলা কেন্দ্রিক। যেমন, মালদায় একটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ চাই, ভূতনিতে সাব-পোস্ট অফিস চাই, কালিয়াচক দুই নম্বর ব্লকে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ চাই, বারো ক্লাস পর্যন্ত পড়ানো হবে মালদায় এমন আরও একটি স্কুল চাই, মানিকচক-বাঙ্গীতলায় গ্রামীণ হাসপাতাল এবং পঞ্চানন্দপুর এলাকায় একটি নতুন হাসপাতাল চাই ইত্যাদি। অন্যদিকে প্রফুল্লকান্তি ঘোষের সুপারিশগুলির মধ্যে অন্যতম হোল, রাজাবাজারে মাদ্রাসা খোলা হোক, কুমারটুলির দিকে বিশেষ যত্ন দিয়ে সাধারণভাবে

তাঁদের অভাব-অভিযোগ শুনছেন রাজীব ছবি : পি· আই· বি·
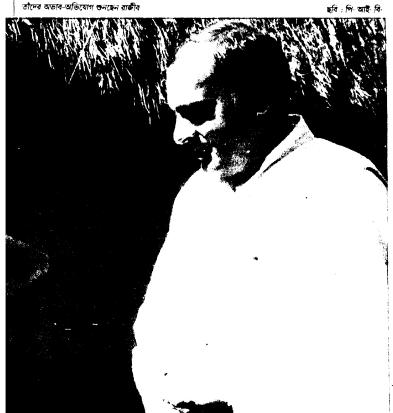
কলকাতার উন্নয়ন করা হোক, দমদম-বরানগর এলাকার জন্য একটি কেন্দ্রীয় স্কুল খোলা হোক, কুমারটুলির মৃৎশিল্পীদের জন্য একটি কমপ্লেক্স তৈরি করা হোক ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য, আলোচনার বিষয়বস্তু যেখানে সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন, সেখানে নিজ নিজ নির্বাচনী কেন্দ্রের জন্য কংগ্রেসী নেতাদের ছোটখাটো সুপারিশ সম্ভবত প্রধানমন্ত্রীকে কিঞ্চিৎ বিস্মিতই করেছে।

স্ট্যাটাস পেপারটিতে যেসব সুপারিশের কথা বিচ্ছিন্নভাবে এবং বিস্তারিতে বলা আছে, তারই মধ্যে থেকে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি বেছে নিয়ে পরে একটি স্মারকলিপি তৈরি করেন প্রিয়বাবু। সেই সুপারিশগুলি হুবহু এখানে তুলে দিচ্ছি।

রেল : ১) একলাক্ষী বালুরঘাট শাখায় কাজ সম্পন্ন করা; ২) অন্তত দশ কোটি টাকা খরচ করে অবিলম্বে দীঘা-তমলুক লাইনে কাজ শুরু করা; ৩) হাওড়া-আমতা ব্রড গেজ লাইনের কাজ শেষ করা; ৪) কলকাতার সার্কুলার রেলের কাজ শেষ করা; ৫) টালিগঞ্জ থেকে গড়িয়া পর্যন্ত মেট্রো রেলের সম্প্রসারণ এবং ৬) এম টি পি-র পরিকল্পনা অনুযায়ী গঙ্গার তলা দিয়ে হাওড়া থেকে শিয়ালদহর মধ্যে ভূগর্ভস্থ রেলের সমীক্ষার জন্য এক কোটি টাকা বিনিয়োগ।

পর্যটন ও সামরিক পরিবহন : ১) বিমান-মানচিত্রে উত্তরবঙ্গকে সংযোজিত করে মালদা রায়গঞ্জ এবং জলপাইগুড়িতে বায়ুদূত সার্ভিস চালু করা; ২) যেসব বিদেশী এয়ারলাইনস কলকাতা বিমানবন্দর দিয়ে বিমান চালানো বন্ধ করে দিয়েছেন তাঁদের কয়েকটিকে পুনরায় সার্ভিস চালু করার জন্য অনুরোধ করা ৩) ভারত সরকার অনুমোদিত দীঘার ইন্দিরাগান্ধী অ্যাকুয়ারিয়ামের কাজ যত শীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করা এবং ৪) দীঘাকে আই টি ডি সি ট্যুরিস্ট স্পট হিসাবে ঘোষণা করা।

শিল্প : ১) যে সব লোকসভা নির্বাচনী কেন্দ্রে শিল্পাঞ্চল রয়েছে সেখানে কিছু কিছু বন্ধ শিল্প খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা ; ২) বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমনের জন্য উত্তরবঙ্গে পাট, কাঠ, সিমেন্ট, কাগজ ভিত্তিক কিছু মূল শিল্প খোলার ব্যবস্থা করা।

কলকাতা উন্নয়ন : ১) কলকাতার উপর জনসংখ্যার চাপ কমানোর জন্য শহরকে পূর্ব দিকে আরও সম্প্রসারিত করা ; ২) গ্রাম, শহর ও বস্তি উন্নয়নের ব্যাপারে সি এম ডি-এ কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করা এবং সেই পর্ষদে এম পি ও এমএলএদের অন্তর্ভুক্ত করা ; ৩) গ্রামাঞ্চলের এম পি দের নির্বাচনী কেন্দ্রগুলিতে নতুন কিছু কিছু কেন্দ্রীয় প্রকল্প ঘোষণা করা।

উদ্বাস্তু : রাজ্যের সর্বত্র জবরদখল কলোনীগুলিতে যে সব উদ্বাস্তুরা বসবাস করছেন তাঁদের সকলকে অবিলম্বে জমির স্থায়ী স্বত্ব দান।

হলদিয়া বন্দর : পেট্রো-কেমিকেলস ভিত্তিক ছোট ছোট শিল্প গঠনের জন্য হলদিয়ায় ভারত সরকারের উদ্যোগে একটি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট নির্মাণ।

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ও নেহরু বিদ্যালয় : গ্রামাঞ্চলের এম পি-দের নির্বাচনী কেন্দ্রগুলিতে কয়েকটি কেন্দ্রীয় নবোদয় বিদ্যালয় ও নেহরু বিদ্যালয় স্থাপন।

হাসপাতাল : উত্তরবঙ্গ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বীরভূমে হাসপাতালের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্য দান।

চিড়িয়াখানা : ঘন জনবসতি এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে চিড়িয়াখানাকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কোনও উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তরকরণ।

পাট : ১) মহারাষ্ট্র সরকার যেভাবে তুলো কিনে থাকেন, অনুরূপভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাহায্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে একটি পাট কর্পোরেশন খোলার জন্য রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করা ; ২) ভারত সরকারের আর্থিক সাহায্য নিয়ে গুজরাত সরকার যেভাবে কয়েকটি বস্ত্র শিল্প অধিগ্রহণ করেছেন, সেইভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক কয়েকটি পাট শিল্পের অধিগ্রহণ ; ৩) পাটের সংগ্রহ মূল্য ২২৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪৫০ টাকা করা এবং আরও বেশি করে পাট কেনার যে প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন, তা জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়াকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

ঋণ মেলা : ১৯৮৬-র ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের অন্তত ২০০টি বিধানসভা কেন্দ্রে পরিকল্পিতভাবে ঋণ মেলার ব্যবস্থা করা।

গ্রামীণ উন্নয়ন : কেন্দ্রের গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচিগুলি রূপায়ণের জন্য উপযুক্ত তদারকির ব্যবস্থা করা এবং আর এল ই জি পি, এন আর ই পি, আই আর ডি পি এবং ডি আর ডি এ কর্মসূচিগুলি রূপায়ণের কাজে এম পিদের সাহায্য গ্রহণ।

বামফ্রন্ট সরকারের পুস্তিকা

এখানে প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনসংযোগ বিভাগ সম্পর্কে অতীতে বহুবার বহু অভিযোগ বিভিন্ন মহল থেকে। সর্বদাই যে ওই সব অভিযোগ উঠেছে সঠিকভাবে করা হয়েছে, তা মনে করার কোনও কারণ নেই। তবে জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগেই রাজ্য সরকার বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে "Notes to the Union Goverment" নামে ১৫৮ পাতার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। প্রকাশনার সময় ১৯৮৬ সালের জুলাই মাস। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে, প্রধানমন্ত্রীর সফরের সময়েই মোটামুটিভাবে এটি প্রকাশ করা হবে তা উচ্চপর্যায়ে আগেই ঠিক করা হয়ে গিয়েছিল। এর অর্থও পরিষ্কার। হয় রাজ্য সরকার ধরেই নিয়েছিলেন যে প্রধানমন্ত্রীর সফরের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে রাজনৈতিক। অথবা রাজ্য সরকার ধরেই নিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের আমলারা পরিসংখ্যান ও চিঠিপত্র নিয়ে তৈরি হয়েই আসবেন এবং সেক্ষেত্রে জনমানসে যেন ওরকম ধারণা কোনওমতেই না হয় যে রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে আছেন বা অপ্রস্তুত হয়ে আছেন। এ ধরনের আশঙ্কা না থাকলে, এই জাতীয় পুস্তিকা প্রকাশের কোনও কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না। পর্যবেক্ষকেরা মনে করছেন হয়ত দ্বিতীয় আশঙ্কাটাই কাজ করেছে। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ব্যাপারটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে করেছিলেন এবং যথেষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। রাজ্য সরকারের আশঙ্কার সঙ্গত কারণ থাকলেও, এটা অস্বীকার করা যায় না যে এই পুস্তিকার দুই হাজার কপি ছাপানোর নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল না। প্রধানমন্ত্রীও এতে বিস্মিত হন। মোদ্দা কথা, এ থেকে যেটা পরিষ্কার বোঝা যায় তা হল রাজ্য সরকার চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগেই তাঁদের বক্তব্যের ব্যাপক প্রচার হোক। নইলে এত কপি ছাপানোর অর্থ কী ?

প্রধানমন্ত্রী অবশ্য ছেড়ে কথা বলেননি। রাজভবনের ম্যারাথন বৈঠকে এবং পরে সাংবাদিক সম্মেলনে বিষয়টির উল্লেখ করে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারও ইচ্ছে করলে নিজের বক্তব্য ঠিক অনুরূপভাবে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে পারতেন এবং যুক্তি দিয়ে রাজ্য সরকারের বক্তব্য নস্যাৎ করতে পারতেন। প্রধানমন্ত্রীর নিজের ভাষায়, "We could easily destroy you."

এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অতি বড় সমর্থকেরাও বোধ হয় দুটি জিনিস অস্বীকার করতে পারেন না। প্রথমত, এই পুস্তিকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও মন্ত্রককে লেখা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন চিঠি ও বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে মাত্র। কিন্তু দু-একটি ক্ষেত্র বাদ দিলে, কেন্দ্রীয় সরকারের জবাবগুলি প্রকাশ করা হয়নি। সুতরাং একথা বলা হয়ত অন্যায় হবে না যে রাজ্য সরকার বক্তব্য রেখেছেন একতরফাভাবে, যার উপর ভিত্তি করে কোনও সিদ্ধান্তে আসা নিরপেক্ষভাবে অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, একই বক্তব্য বামফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকেরা অতীতে একাধিকবার রেখেছেন। সুতরাং নতুনত্বের প্রশ্ন নেই। এর আগেও রাজ্য সরকারই কেন্দ্রের অসহযোগী মনোভাব সম্পর্কে বহু চিঠি ও পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। সুতরাং নতুন বই ছাপানোর প্ররোচনামূলক মনোভাব সম্বরণ করে আগের বইগুলির সংকলন প্রকাশ করা সম্ভব ছিল। তার চেয়েও বড় কথা, এই সব বক্তব্য যদি বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে রাখা হত তাহলে সেটাই বোধ হয় অধিকতর শোভন হতো।

সে যাই হোক, এবারে পুস্তিকাটির দিকে নজর দেওয়া যাক। দশটি পরিচ্ছেদে, বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় হুগলী সেতুর নানা সমস্যার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বল্প পরিসরে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব নয়। প্রয়োজনও নেই। কারণ গত দশ বছর ধরে এই সব বক্তব্য বহুবার বহু জায়গায় বহুভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ৬টি প্রকল্পের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই পুস্তিকায়—বক্রেশ্বর, সাঁওতালডি, সাগরদীঘি, কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও দুর্গাপুর প্রোজেক্ট। এদের মধ্যে কোনওটা নতুন। কোনওটা পুরোন আবার কোনওটা সংযোজন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাজ্য সরকার কত তারিখে

কেন্দ্রের কাছে তাঁদের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন এবং এখনও যে উত্তর আসেনি সেকথা বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য, অনেক ক্ষেত্রে, যেমন দুর্গাপুর প্রোজেক্টস-এর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু নীতিগতভাবে প্রকল্পটির বিরুদ্ধে নন। তবে সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা বিষয় পরিষ্কার। রাজ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কে রাজ্য সরকার যে আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন হয়েছেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এর জন্য তাঁরা অবশ্যই কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন।

সমস্ত পরিচ্ছেদের বিস্তারিত বিবরণে না গিয়েও বলা যায়, অন্যান্য দফতরের কাজকর্ম নিয়েও এই পুস্তিকায় অনুরূপ চিঠি ও বার্তা প্রকাশিত হয়েছে। শিল্পস্থাপন বিভাগে বিস্ময়করভাবে পানাগড়ে নতুন টাঁকশাল করার কথা তোলা হয়েছে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ অতীতে একাধিকবার বিভিন্ন জনসভায় ও অন্যভাবে এই প্রকল্পটির আদৌ কোনও ভবিষ্যৎ আছে কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তখন তাঁদের অভিযোগ ছিল, এটি প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের অনেক না রাখা প্রাক-নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলির একটি। কিন্তু এই পুস্তিকায় দেখা গেল, বামফ্রন্ট ব্যাপারটিকে যথোচিত প্রশাসনিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বর্তমান অর্থমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহকে লেখা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর চিঠির প্রথম লাইনেই প্রণববাবুর প্রতিশ্রুতির উল্লেখ আছে। এই টাঁকশাল ও কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের সাদার্ন জেনারেটিং স্টেশনের প্রতিস্থাপনের ব্যাপারে কেন্দ্র পরে রাজ্য সরকারকে সুস্পষ্ট আশ্বাস দিয়েছেন। যেমন সাড়া দিয়েছেন আরও কয়েকটি প্রস্তাবে। সেগুলির কথা পরে উল্লেখ করা যাবে। আগেই বলা হয়েছে, রাজ্য সরকারের চিঠির জবাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য খুব একটা প্রকাশিত হয়নি। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলো হলদিয়ায় জাহাজ মেরামতি কারখানা সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর চিঠিটি। এই পুস্তিকায় ফলতায় রপ্তানীমূলক শিল্পস্থাপনের প্রসঙ্গেরও অবতারণা করা হয়েছে। যতদূর জানি, এখানে কেন্দ্রীয় সহায়তায় ও রাজ্য সরকারের তৎপরতায় একটি বাণিজ্য অঞ্চল ধীরে ধীরে ইতিমধ্যেই গড়ে উঠতে শুরু করেছে।

তৈল পরিশোধনের ক্ষেত্রে যে পরিসংখ্যানের উল্লেখ এই পুস্তিকায় করা হয়েছে তা থেকে পূর্ব ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাটা কতখানি শোচনীয়, তা ভালভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের লেখা উত্তরগুলি থেকে আরও একটা বিষয় পরিষ্কার হয়। দেখা যাচ্ছে, প্রায় কোনও ক্ষেত্রেই কেন্দ্র সরাসরি 'না' বলছেন না। অধিকাংশ উত্তর থেকেই মনে হয় কেন্দ্র যেন বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তিত এবং শীঘ্রই রাজ্য সরকারকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানানো হবে। বলাই বাহুল্য, এই উত্তরগুলি আসলে মোটেই ইতিবাচক নয়, অনেকটা হলদিয়া পেট্রোকেমিকেলস প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্রের পাক্কা বারো বছর টালবাহানা করার মত। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার সম্প্রসারণের ব্যাপারে অবশ্য দেখা যায়, অন্যান্য কারখানার তুলনায় এই প্রকল্পে বরাদ্দ খুব কম নয়।

ওই পুস্তিকায় রাজ্য সরকার সবচেয়ে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন মাশুল সমীকরণ নীতি ও কয়লা বাবদ রয়াল্টি নিয়ে। অর্থনীতিবিদদের অভিমত, এই মাশুল সমীকরণ নীতির জন্য একমাত্র পশ্চিমবঙ্গকে এ পর্যন্ত পাঁচ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। অথচ বহুবার রাজি হওয়া সত্ত্বেও এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও, অন্য রাজ্য আপত্তি করবে এই অছিলা দেখিয়ে কেন্দ্র এই নীতি তুলে দেওয়ার ব্যাপারে কোনও উদ্যোগই দেখাচ্ছেন না। কয়লার রয়াল্টির ব্যাপারেও দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে ক্রমাগত অধিক পরিমাণে কয়লা ভূগর্ভ থেকে তোলা হচ্ছে এবং একই দামে তা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানো হচ্ছে। খুশিমত কেন্দ্রীয় সরকার কয়লার দামও বাড়িয়েছেন। কিন্তু রাজ্যকে প্রদত্ত রয়াল্টির পরিমাণ আদৌ সমপরিমাণে বাড়েনি। কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে সম্প্রতি আসাম আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আসামে কিছুদিন আগেই সেখানকার স্থানীয় রাজনৈতিক দল ও অধিবাসীরা একযোগে এই বলে দাবি জানিয়েছিলেন যে, তেলের জন্য রয়াল্টি না বাড়ালে আর 'ভারত'কে তেল নয়। তা নিয়ে প্রবল আন্দোলনও হয়। অচিরেই কেন্দ্রীয় সরকার গুজরাত ও আসামে রয়াল্টি যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে বাধ্য হন। পশ্চিমবঙ্গে বাম রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিশ্চয়ই আসামের তুলনায় অনেক অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ। আঞ্চলিকতাবাদের শিকার না হয়ে এ পর্যন্ত তাঁরা যে এ ধরনের কোনও আন্দোলন শুরু করেননি, সেই কৃতিত্বও এঁদের অবশ্যই প্রাপ্য। তবুও একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। মাশুল সমীকরণ ও কয়লার রয়াল্টি নিয়ে কখনওই কী কোনও শক্তিশালী আন্দোলন বা বলিষ্ঠ প্রতিবাদ গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না?

এর পরেই আসে রাজ্যে পাট চাষী ও শ্রমিকদের সমস্যা। এটিও বহুদিনের পুরোনো সমস্যা। জটিলতাও কম নয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পাট চাষীদের যদি পাটের জন্য ভাল দাম দেওয়া হয় তাহলে দেশের ভিতরে শুধু পাটজাত দ্রব্যের দামই বাড়ে না, অন্যান্য দেশের সঙ্গে, বিশেষ করে বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতকে চরম অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়েই তাই পাট চাষীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করেও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য শিল্পপতিদের এখন অবধি প্রচুর সুযোগ সুবিধে দিয়ে এসেছেন। কংগ্রেসী এবং বামপন্থী উভয়েই অনেক সময় কেন্দ্রকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, চাষীদের স্বার্থ দেখা না হলে পাট চাষ আস্তে আস্তে বন্ধ করে দেওয়া হবে। অর্থনীতিবিদদের ধারণা, বর্তমানে এই রাজ্যে যে পরিমাণ পাট চাষ হয়, সেখানে ধান চাষ করলে চাষীরা প্রায় প্রতি মরসুমে ২৫০ কোটি টাকা আয় করতে পারেন এবং রাজ্যও খাদ্যে স্বনির্ভর হতে পারে। এই পুস্তিকায় অবশ্য বামফ্রন্ট সরকার এই দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা সমাধানে কোনও নতুন বৈপ্লবিক পথের সন্ধান দেননি। বরং চিরাচরিতভাবে চাষীদের বঞ্চনা করার যে প্রথা চলে এসেছে, তারই সামান্য রদবদল ঘটাতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং জুট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়াকে অনুরোধ করেছেন। বিষয়বস্তুও সেই একই—সময়মতো ও ন্যায্য মূল্যে পাট কেনা, দালালদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করা ইত্যাদি। গোটা শিল্পটিকে জাতীয়করণের বহু

ছককাটা যাত্রাপথ ছেড়ে বাংলার মাঠে-ঘাটে চাষীদের সঙ্গে রাজীব ছবি : পি· আই· বি·

আলোচিত দাবিও এর মধ্যে আছে, এখানে তার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই।

একই সঙ্গে আছে রাজ্যের বহু পুরাতন, জরাজীর্ণ কাগজ কলগুলির সমস্যা। এসব ব্যাপারে রাজ্য সরকার বহু আবেদন-নিবেদন করা সত্ত্বেও কেন্দ্রের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাননি। এ ব্যাপারে বিরক্তি প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নিজেই একবার বলেছিলেন, "It in not our business to carry dead-bodies"। "মৃতদেহ বহন করা আমাদের কাজ নয়।" এই যুক্তির সমর্থনে তিনি কয়েকটি অর্থনৈতিক কারণও দেখিয়েছিলেন। এই সব পুরাতন এবং অর্থনৈতিকভাবে অতি দুর্বল সংস্থাগুলির জন্যও বিশেষ ধরনের ঋণের প্রস্তাবও রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে একাধিকবার রেখেছেন। কাগজ, রবার, চামড়া, পাট, ঔষধ, ইঞ্জিনিয়ারিং, কাচ—প্রায় সব শিল্পেই পশ্চিমবঙ্গে সেই এক জীর্ণতার সমস্যা। এর সঙ্গে বস্ত্র শিল্প তো আছেই। রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে এই রুগ্ন শিল্পগুলির বিষয়ে একাধিকবার একটি বাস্তবানুগ নীতি গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু সমস্যা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে। স্বীকার করতেই হবে, এসব ব্যাপারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের সাড়া পাওয়া দূরে থাক, মামুলি প্রাপ্তি সংবাদের চেয়ে বেশি কিছু পাননি।

এর পরে কৃষি। উত্তরবঙ্গে ইতালীর সরকারের সাহায্যে রাজ্য সরকার একটি প্রকল্প চালু করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এর শর্তাবলী ইতালীয়দের মনঃপূত না হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাবটি নাকচ করে দিতে বাধ্য হন। সেচের ব্যাপারে, অন্য রাজ্যে যেমন বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় অনেক বড় প্রকল্প চালু করা হয়েছে, অনুরূপভাবে সুবর্ণরেখা, তিস্তা ও ফরাক্কা প্রকল্পের জন্যও সাহায্য চাওয়া হয়েছে। ফরাক্কার কাছে গঙ্গার ভাঙ্গনও সংশ্লিষ্ট সমস্যা। এগুলি বাস্তবিকই কোনও রাজ্য সরকারের পক্ষে একা করা বোধ হয় অসম্ভব। তাছাড়া অনেকগুলি ক্ষেত্রে একাধিক কেন্দ্রীয় দফতরের অনুমতির প্রয়োজন হয়। যেমন বিদ্যুতের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ও পরিবেশ দূষণ কিংবা সুবর্ণরেখার ক্ষেত্রে রেল মন্ত্রকের অনুমোদন প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতাল ও জাতীয় ক্যানসার অনুসন্ধান কেন্দ্রের একীকরণের দাবিও রাজ্য সরকার অনেকদিন আগেই রেখেছেন।

পুস্তিকায় পরবর্তী বিষয় পরিবহণ, যার প্রধান দিক রেলপথ। বিতর্ক আছে প্রতিটি প্রকল্প নিয়ে, সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাজনৈতিক তাৎপর্যও। তমলুক-দীঘা, বজবজ- নামখানা সংযোগ, বাঁকুড়া-মেদিয়া যোগাযোগ, ব্যান্ডেল- কাটোয়া লাইনের বৈদ্যুতীকরণ, হাওড়া- আমতা ব্রডগেজ লাইন, বারাসাত-বনগাঁ ও শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখায় ডবল লাইন, চক্র রেল, পাতাল রেল, উল্লেখ আছে সব কয়টির। প্রকল্পগুলি যে চালু হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তার জন্য নিশ্চিতভাবে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী বরকত সাহেবের কৃতিত্ব যথেষ্ট। এগুলির প্রায় সব কয়টিই তাঁর মন্ত্রিত্বকালে নতুন করে বিবেচনা করা হয়।

অপর এক জটিল সমস্যা উদ্বাস্তুদের জমি-সংক্রান্ত। ১৯৫০ থেকে এ রাজ্যে ২৪৪টি কলোনী গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর সফর পর্যন্ত ১৭৫টি পেয়েছে স্বীকৃতি। বাকিগুলি পায়নি। তাছাড়া এদের জন্য ঋণের উচ্চসীমাও আরও বাড়ানো দরকার। পুস্তিকায় এই সমস্যাটিই বর্ণনা করা হয়েছে সবচেয়ে বিস্তারিতে। ২৭ পৃষ্ঠা। কীভাবে সমস্যাটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে, তার একটি স্পষ্ট চিত্র এই বিবরণে পাওয়া যায়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য চেয়েছেন রাজ্য সরকার। দ্বিতীয় হুগলী সেতু নির্মাণে বিলম্ব ঘটার জন্য প্রকল্পটির খরচ কীভাবে দিন কে দিন বেড়ে যাচ্ছে, সে ব্যাপারেও সতর্কবাণী রয়েছে এই পুস্তিকায়। এ ব্যাপারে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে কেন্দ্র-রাজ্যের সম্পর্কও এসে পড়েছে অনিবার্যভাবেই। একটি চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছেন, "চিঠি লেখার ব্যাপারে দিল্লিতে নতুন কোনও রীতি চালু হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। একথা লিখছি এই কারণে যে আপনার পরিকল্পনা রূপায়ণ মন্ত্রী যত তাড়াতাড়ি আমাদের চিঠি লেখেন, প্রায় তত তাড়াতাড়িই সেগুলি গণমাধ্যমের দ্বারা প্রচারেরও ব্যবস্থা করেন।"

পুস্তিকাটিতে যে সব প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে, অতি সংক্ষেপে তার সারমর্ম এখানে দেওয়া হল। একথা অস্বীকার করা শক্ত, রাজ্য সরকার যে ধরনের সমস্যার দিকে কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসেছেন, সেগুলির দীর্ঘস্থায়ী সমাধান কোনও রাজ্য সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এর অনেকগুলি প্রকৃত অর্থেই অর্থনৈতিক। যেমন পুরনো শিল্পগুলির সমস্যা। কোনও কোনও ক্ষেত্রে, যেমন দ্বিতীয় হুগলী সেতু বা চক্ররেল, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কও অনেক সমস্যা তৈরি করেছে। আবার অনেক সমস্যা (যেমন মাশুল সমীকরণ), একই সঙ্গে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক। তবে সবশেষে যে কথাটা অবশ্যই বলা প্রয়োজন তা হল, কী কংগ্রেস কী বামপন্থীরা, স্বাধীনতার ৪০ বছর কেটে যাওয়ার পরেও দেশ বিভাগ থেকে উদ্ভূত পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাগুলির দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের সহানুভূতি দূরে থাক, মনোযোগও আকর্ষণ করাতে সক্ষম হননি। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের প্রশ্নে এর দীর্ঘস্থায়ী ফল তাৎপর্যপূর্ণ হতে বাধ্য। অবশ্য এই নিবন্ধে সেই প্রসঙ্গ অবান্তর।

দিল্লিতে দফায় দফায় বৈঠক

রাজ্যের কংগ্রেসী নেতা ও বামফ্রন্ট সরকারের যাবতীয় প্রস্তাব ও সুপারিশ প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে পৌঁছে যায়, তাঁর সফর শুরু হওয়ার দিন পনেরো আগেই। ইতিমধ্যে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রককেও প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়, পশ্চিমবঙ্গ সংক্রান্ত সব নথিপত্র জমা করতে। তার পরেই শুরু হয়ে যায় দফায় দফায় বৈঠক।

প্রথমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকগুলির সচিবদের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব শ্রীমতী সরলা গ্রেওয়াল ও তাঁর সচিবালয়ের উচ্চপদস্থ অফিসার মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া। অবশ্য যোজনা দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী অজিত পাঁজা এই বৈঠকগুলিতে আগাগোড়া উপস্থিত ছিলেন।

যতদূর জানা গিয়েছে, প্রাথমিক পর্যায়ের এই বৈঠকগুলিতে সমস্যা দেখা গিয়েছিল প্রধানত রাজ্যের বকেয়া রেল প্রকল্পগুলি নিয়ে। বিশেষ করে দীঘা-তমলুক। যোজনা কমিশনের পক্ষ থেকে সরাসরি জানানো হয়েছিল, এই প্রকল্পটি "economically viable" নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, রেলমন্ত্রী থাকাকালীন বরকত সাহেব যখন এই রেল লাইনটির কথা তুলেছিলেন, তখন শুধু যোজনা কমিশন নয়, তৎকালীন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ও এই 'অর্থনৈতিক সম্ভাবনার' প্রশ্ন তুলে বাধা দিয়েছিলেন। রাজীব গান্ধী ক্ষমতায় আশার পর, এই প্রকল্পটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় দুলছিল। রেল মন্ত্রক বলে আসছিলেন, যোজনা কমিশন অনুমোদন না দিলে তাঁদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে যোজনা কমিশন বলে আসছিলেন, কোনও প্রকল্প অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাপূর্ণ না হলে তাকে অনুমোদন দেওয়াও রীতি বিরুদ্ধ। এই টানাপোড়েনের মাঝখানে রাজ্যের কংগ্রেস নেতারা, বিশেষ করে কাঁথি থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসী এম পি শ্রীমতী ফুলরেণু গুহ অবশ্য নিজের তাগিদে আগাগোড়াই কেন্দ্রের প্রতিশ্রুতি পালনের দাবি জানিয়ে আসছিলেন।

এবার সুযোগ বুঝে মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে আসেন অজিতবাবু। যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মনমোহন সিংকে তিনি সরাসরি জানান, একমাত্র 'economic viability'র ভিত্তিতেই দেশের সব রেল লাইন তৈরি হয়নি। মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা মনে রাখাও কর্তব্য। তিনি প্রশ্ন তোলেন 'socio-economic viability'-র। শেষ পর্যন্ত বিতর্কটি পৌঁছয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে। তিনি অজিতবাবুর পক্ষেই রায় দেন।

এর পর প্রধানমন্ত্রীর সফর শুরু হওয়ার তিনদিন আগে সাউথ ব্লকে প্রধানমন্ত্রীর ঘরে বসে মন্ত্রী ও আমলাদের নিয়ে চূড়ান্ত বৈঠক। ঠিক হয় আট জন মন্ত্রী ও ডজনখানেক উচ্চপদস্থ আমলা কলকাতার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীকে সঙ্গ দেবেন। না চাইলেও পশ্চিমবঙ্গকে কী কী দেওয়া হবে, তার খসড়া তালিকাও তৈরি হয়ে যায় ওই বৈঠকেই। যদিও রাজভবনের সাংবাদিক সম্মেলনের আগে কাউকে তা জানতে দেওয়া হয়নি।

অতএব পশ্চিমবঙ্গকে ছয়শ কোটিরও বেশি টাকা দেবেন, এই সিদ্ধান্ত পাকা করেই ১৭ তারিখ সকালে কেরলের উদ্দেশে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রওয়ানা হন রাজীব গান্ধী। সেখানে ওনাম উৎসবের পরিবেশে হালকা মেজাজে একটা দিন কাটানোর পর পরের দিন কলকাতায় হবে ম্যারাথন বৈঠক। এবং সেই বৈঠকেই প্রধানমন্ত্রী খুলবেন টাকার ঝুলি। *(ক্রমশঃ)* ■

বৈ দে শি কী

নির্জোট আন্দোলন : দায়ভার ও দক্ষতা

অরুণ বাগচী

হারারে নির্জোট সম্মেলন চলাকালে, এবং তারপর, বিশেষ ভাবে লক্ষ রাখা হয়েছে ভারত এবং জিম্বাবুয়ে এই দুটি দেশের ওপর। জিম্বাবুয়ে সরকারের উপর, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী রবার্ট মুগাবে সম্পর্কে, আমেরিকার বিরূপতা যে ভাবে ও যে ভাষায় প্রকটিত হয়েছে তা যেমন দুঃখজনক, তেমনই আপত্তিকর। নির্জোট আন্দোলন যে আর তেমন নিরপেক্ষ নয়, এই ধরনের কথা মার্কিন প্রশাসনের মুখে দীর্ঘকাল থেকে শোনা যাচ্ছে। এটা নতুন কিছু ব্যাপার নয়। অভিযোগটা যে একেবারে মিথ্যা তাও নয়। অন্তত নির্জোট আন্দোলনভুক্ত কিছু দেশ যে রাজনীতিগত ভাবে নিরপেক্ষ নয় সেকথা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু গোটা আন্দোলনকে সেজন্য পক্ষপাতী বলে ঘোষণা করা কি সমীচীন? মজার কথা এই যে, আজ যাঁরা স্পষ্টতই চাইছেন ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের সব দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে দূরে চলে আসুক, তাঁরাই একদা ওই নিরপেক্ষতা শব্দটাকেই অনৈতিক ও সুবিধাবাদী বলে অভিহিত করতেন। জওহরলাল যখন সত্যই নিরপেক্ষ থাকতে চেয়েছেন, তখন তাঁর ইচ্ছা, তাঁর স্বপ্ন, তাঁর আদর্শকে হেয় করবার নিরন্তর প্রয়াস চলেছে। সদ্য ঔপনিবেশিক শোষণমুক্ত আফ্রিকার দেশগুলি যখন বহু শতাব্দীর লাঞ্ছনা-বঞ্চনার ইতিহাসকে পিছনে ফেলে সূর্যোদয়ের দিকে এগুতে চেয়েছে, তখন তাদের ওপর মহাশক্তিধর দেশগুলি দাবাখেলার ছক সাজিয়েছে। মর্মান্তিক সত্য হল এই যে কৃষ্ণকান্তি আফ্রিকা শ্বেতাঙ্গ মহাপ্রভুদের কাছে আজও সত্যকার সম্মান পায়নি। পীত ও বাদামি মানুষও তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেনি। সবাই মিলে নিজেদের স্বার্থের কাছে আফ্রিকার যথার্থ স্বার্থকে বিসর্জন দিতে চেয়েছে।

নির্জোট আন্দোলনের সমালোচকরা নিজেরাই নিরপেক্ষ নন। তাঁরা নিজেদের সুবিধা মাফিক

ন্যামের নেতারা কেউ স্বৈরতন্ত্রী নন। তাঁরা আপন খেয়াল বা অভিরুচিকেই একমাত্র সম্বল করে চলেন না। মুগাবে খুবই সচেতন যে এক আফ্রিকীয় দেশের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর দায়িত্ব বর্তমান পটভূমিকায় খুবই বেশী। দক্ষিণ আফ্রিকার বিক্ষোভ যত বাড়বে, যতই দেশটা যাবে বিস্ফোরণের মুখে, ততই বাড়বে নির্জোট আন্দোলনের দায়িত্ব।

ন্যামের নতুন চেয়ারম্যান রবার্ট মুগাবে (বাঁদিকে)

কিছু বিষয়কে বড় করে তোলেন, কিছু বিষয়কে অগ্রাহ্য করতে চান। রাজীব গান্ধীর হাত থেকে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর মুগাবে যে ভাষণ দেন, তার ভাষা ও ভঙ্গি যে বিজ্ঞতা ও উদারতার চিহ্ন বহন করেছে তা সবার কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ। সেই মুগাবেকে কষাঘাত করবার আগে মার্কিন প্রশাসনের বোঝা উচিত ছিল যে, নির্জোট সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে তিনি সদস্য দেশগুলিকে যেভাবে আলোচনার সুযোগ দিয়েছেন তা গণতন্ত্রসম্মত। আপন বক্তব্য অকপটে রাখবার অধিকার, যে কোনও দেশকে সমালোচনা করবার অধিকার, সব দেশেরই আছে। সেখানে কাউকে থামাতে যাওয়া অনুচিত। সমালোচনাকে কেউ নিমতিক্ত এবং তীব্র করে তুললে সভাপতির করণীয় সামান্যই থাকে। বিশেষত, দক্ষিণ আফ্রিকা আজ বিশেষ করে আফ্রিকার দেশগুলির কাছে সব চেয়ে বড় সমস্যা, সর্বাধিক ক্ষোভ ও ক্রোধ-উদ্রেককারী বিষয়বস্তু। সেই দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে ব্রিটেন ও আমেরিকার নীতি নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক বলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি মনে করে। ব্রিটেন এবং আমেরিকার প্রশ্রয় না পেলে প্রিটোরিয়া সরকার বিশ্বজনমত অগ্রাহ্য করতে সাহসী হত না—এই ধারণা বহু ইয়োরোপীয় দেশেরও। সুতরাং আলোচনাকালে সভাকক্ষে যদি বক্তাদের কণ্ঠে ব্রিটেন-আমেরিকা সম্পর্কে বিরূপতা প্রকটিত হয় সেজন্য মুগাবেকে দায়ী করা অনুচিত। ওয়াশিংটনের ক্ষুব্ধ হবার কারণ থাকতে পারে, কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ নেবার ভঙ্গিতে জিম্বাবুয়ে সরকারকে সহায়তা দান বন্ধ করতে যাওয়াটা তার গরিমাবৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক কি না সে বিষয়ে মতদ্বৈধ ঘটতে পারে।

লিবিয়ার বাহাদুর, কর্নেল গদ্দাফির ব্যাপারটা ভেবে দেখা যাক। হারারে শহরে ন্যাম সম্মেলন শুরু হয়ে যাবার বেশ পরে তিনি নাটকীয়ভাবে মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন। বিমান বন্দরে তাঁর সেই হিন্দি সিনেমার নায়কের মতো সিঁড়ি দিয়ে নামার দৃশ্য প্রথম এবং সাড়ম্বরে প্রচার করল মার্কিন টেলিভিশন ও বিবিসি। সম্মেলনে গিয়ে তিনি ভাষণ দিলেন। সেই ভাষণে মার্কিন সরকার সম্পর্কে বিশেষ আহ্লাদ প্রকটিত হবে তা নিশ্চয় কেউ ভাবেননি। আর ন্যাম সম্মেলনকেই অমন লাথিঝাঁটা খেতে হবে গদ্দাফির কাছে, সেটাও কি কেউ হিসাব করতে পেরেছিলেন? গদ্দাফি তো স্পষ্টই বললেন যে (মার্কিন) সাম্রাজ্যবাদকে ধোলাই দেবার মতো যথেষ্ট শক্ত লাঠি হয়ে উঠতে পারেনি ন্যাম। শুধু কিছু শব্দতরঙ্গ তুলে, আর প্রস্তাব পাশ করে, আপন কর্তব্য সমাপন করছে নির্জোট দেশগুলি। ন্যাম মৃত। অতএব গদ্দাফি দরকার হলে একলাই ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে (মার্কিন দস্যুদের বিরুদ্ধে) রণক্ষেত্রে নেমে যাবে।

সেই গদ্দাফি কেমন সংবর্ধনা পেয়েছেন সম্মেলনের সদস্যদের কাছে সেটা সবাই দেখলেন। পাশ্চাত্য বিরোধিতা, বা বিশেষ করে মার্কিন বিরোধিতাই যদি নির্জোট সম্মেলনের লক্ষ্য হবে তবে তো বীরোত্তমের অভিনন্দন,

লিবিয়ার 'বাহাদুর' কর্নেল গদ্দাফি

ফুলমালা, পাওয়া উচিত ছিল কর্নেল গদ্দাফির। আর কারও তেমন করে নয়। তা তো লিবিয়ার নেতা পাননি। তাঁকে প্রকাশ্যে সংযত করেছেন চেয়ারম্যান মুগাবে। খুব কমসংখ্যক দেশই করতালি বাজিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বক্তৃতার আগেও শুষ্ক ভদ্রতামূলক আচরণই তাঁর অদৃষ্টে জুটেছে। যাইহোক, ওয়াশিংটনের পণ্ডিতজনেরা স্বীকার না করলেও যা সত্য তা মিথ্যা হয়ে যাবে না। হারারে সম্মেলন আমেরিকার ভাবমূর্তি ম্লান করার কাজে আপন শক্তি ও কণ্ঠতেজ নিয়োগ করেছিল, এটা বলা অনুচিত। যদি দক্ষিণ আফ্রিকা প্রসঙ্গ এত বড় হয়ে না উঠত সবার কাছে, তবে হয়তো আমেরিকা নীতি নিয়ে আলোচনা সমালোচনা অন্যান্যবারের তুলনায় কমই হত।

কিউবা যখন নির্জোট আন্দোলনের নেতা তখন থেকেই এই অভিযোগ তীব্র হয়ে ওঠে যে আন্দোলনের নিরপেক্ষতা গেল। আন্দোলন সোভিয়েত ইউনিয়নের পকেটে প্রবেশ করেছে। কাস্ত্রোর মতো মার্ক্সিজমের কাছে দায়বদ্ধ নেতা কী করে নিজেকে নিরপেক্ষ বলে চালাতে পারেন? এটা কি ভণ্ডামি নয়? মনে রাখতে হবে যে এধারার বিচারে পৃথিবীর কেউই যথার্থ নিরপেক্ষ নন। যেমন ধরা যাক ভারত। ভারত প্রজাতন্ত্রী দেশ, কিন্তু তার রাষ্ট্রীয় নীতি অনুসরণ করে সংসদীয় গণতন্ত্রকে। অর্থাৎ সরকার গঠনের ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নির্বাচনের উপর, যা সংবিধানের সুস্পষ্ট নির্দেশানুযায়ী পরিচালিত হয়, যাতে অবাধে অংশ নেন প্রাপ্তবয়স্ক সমস্ত নরনারী। অর্থাৎ এই ব্যাপারে সার্বভৌম হল ভারতীয় সংসদ —একদলীয় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কোনও দলীয় কার্যালয় বা কেন্দ্রীয় কমিটি নয়, বংশপরম্পরাগত শুচি-সংস্কারের আধার কোনও রাজপ্রাসাদও নয়। অর্থাৎ এই পরম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্রিটেন বা আমেরিকার সঙ্গেই ভারতের মিল। অতএব ফিডেল কাস্ত্রোর হাত থেকে ন্যাম সংস্থার দায়িত্বভার যখন প্রয়াত ইন্দিরা নিলেন, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন হাহাকার করে বলতে পারত—গেল নির্জোট আন্দোলনের পবিত্র নিরপেক্ষতা। বলতে পারত, কিন্তু বলেনি। বললে সেটা অন্যায় হত। মুক্তমনে কাস্ত্রো একটা পন্থা অবলম্বন করেছেন, ভারত করেছে অপর একটা পন্থা। উভয়েরই সে অধিকার আছে। সুতরাং বিচলিত হবার কিছুমাত্র কারণ নেই। দেখতে হবে যে সংকীর্ণ কোনও দৃষ্টিকোণ থেকে নির্জোট আন্দোলনের মঞ্চটিকে ব্যবহার করেছেন কিনা। অথবা ভারত সেই অপকর্মটি করেছে কি না। করলে অবশ্যই সে কাজের সমালোচনা করবার অধিকার সবারই থাকবে, সবারই থাকা উচিত। কাস্ত্রো তাঁর দেশের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশেষ সম্পর্কের সুবাদে মঞ্চটিকে কতবার মস্কোর অনুকূলে ব্যবহার করেছেন, সমালোচকরা তার একটা তালিকা পেশ করলে ভাল হত। তাছাড়া যাঁরা সমালোচনায় মুখর হয়েছেন তাঁদেরও অজানা নয় যে কিউবার নেতৃত্বের সঙ্গে রুশ নেতৃত্বের সম্পর্ক পূর্বেকার মতো উষ্ণ নয়। সোভিয়েতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাবজাল থেকে বের হবার জন্য বেশ হাত পা ছুঁড়ছেন কাস্ত্রো। এই প্রচেষ্টা অসার অথবা অসম্ভব বিবেচনা করে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ক্ষান্তি দিলেও, অনেক ক্ষেত্রেই কাস্ত্রো তাই করেছেন যা যে কোনও স্বাধীনচেতা মানুষ করতে চাইবেন। তাছাড়া একথা মার্কিন সরকারের চেয়ে ভাল কে জানবেন যে কাস্ত্রো কিছুদিন থেকেই ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্ক সহজতর করবার দিকে মন দিয়েছেন?

তবু, একথা সত্য যে ইন্দিরা গান্ধী নয়া দিল্লির ন্যাম সম্মেলনে যখন ফিডেলের হাত থেকে আন্দোলনের নেতৃত্বভার নিলেন, তখন বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত বোধ করেছেন যে, নিরপেক্ষতাকে বিতর্কের ঊর্ধ্বে স্থাপন করবার জন্য অতঃপর বিশেষ প্রয়াস শুরু হয়ে যাবে। ভারতের সঙ্গেও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশেষ বন্ধুতার সম্পর্ক। সেই নেহরুর আমল থেকে এই সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যার ফলে উভয় দেশই লাভবান হয়েছে, ভারত যে হয়েছে তা নিয়ে দ্বিমত নেই। শুধু শুধু ইন্দিরা তা বরবাদ করতে যাবেন কেন? ঠিক কথা। কিন্তু সত্য যে ইন্দিরা তৃতীয় বিশ্বের একজন অগ্রগণ্য নেত্রী হিসাবে আপন সদস্যদের স্পন্দন যতখানি অনুভব করতেন, বাইরের নানা সমালোচনা সম্বন্ধেও ততখানিই অবহিত ছিলেন। তিনি তাঁর নিজস্ব স্টাইলে ন্যাম পরিচালনা করেছেন এবং তার বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়িয়েছেন। মায়ের অকালমৃত্যুর পর শূন্যস্থান পূর্ণ করতে এসে রাজীব গান্ধী অনিবার্যরূপে যে সব দায়িত্বভার পেয়েছেন, নির্জোট আন্দোলনের প্রধানের ভূমিকা তার অন্যতম। তিনিও নিজস্ব প্রতিভা ও রুচি অনুযায়ী সব দায়িত্ব পালন করলেও পূর্ববর্তী প্রধান মন্ত্রীর নীতিই মোটামুটিভাবে অনুসরণ করে যাচ্ছেন। নির্জোট আন্দোলনের ক্ষেত্রে তো বটেই। শোনা যায় এক লিবিয়ার ব্যাপারটা বাদ দিলে খুব বড় সমালোচনা আমেরিকাও এক্ষেত্রে করে না। ওয়াশিংটন স্বীকার করে যে আন্দোলন অনেকখানি নিরপেক্ষতা ফিরে পেয়েছে নয়া দিল্লির দৌলতে। সেটা ইন্দিরা ও রাজীব উভয়েরই সচেতন প্রয়াসে।

অর্থসংকটে রাষ্ট্রপুঞ্জ

রাষ্ট্রপুঞ্জের ৪১ তম অধিবেশন এবার উপস্থিতির দিক থেকে জমজমাট থাকলেও, মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রপ্রধানরা কেউ কেউ স্বয়ং হাজিরা দিলেও, সবাই অনুভব করেছেন যে কিছুই যেন ঠিক সেভাবে জমছে না। পৃথিবীজোড়া অশান্তি, উগ্রপন্থীদের ক্রমবর্ধমান ক্রিয়াকলাপ, প্রতিবেশীদের মধ্যে লড়াই—এসব তো আছেই। তাছাড়া উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে এক ধরনের ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়ে গেছে যার প্রভাব রাষ্ট্রপুঞ্জের ওপর পড়বেই। দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে একদিকে ব্রিটেন, অন্য দিকে কমনওয়েলথ দেশগুলি; একদিকে ইঙ্গ-মার্কিন প্রশ্রয়, অন্য দিকে প্রায় বাকি দুনিয়ার তীব্র আক্রমণাত্মক মনোভাব—এই বাস্তব চিত্রটা উপেক্ষার নয় মোটেই। কাজেই পরিস্থিতি বেশ ভারী হয়ে পড়েছে।

কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রপুঞ্জে নিরানন্দের একটা বড় কারণ হল অর্থসংকট। এটা যে নতুন তা হয়তো নয়। অনেকদিন থেকেই প্রতিষ্ঠানের 'দিন আনি দিন খাই' দশা। কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রধান পৃষ্ঠপোষক আমেরিকা টাকা-পয়সা দেবার ব্যাপারে কিছু কড়াকড়ি আরোপ করার ফলে বিপদ সৃষ্টি হয়েছে। এমন নয় যে এ পর্যন্ত আমেরিকা তার প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে কখনও টালবাহানা করেছে। বরং দেয় টাকা চুকিয়ে দেবার ব্যাপারে তার রেকর্ড নিন্দার ঊর্ধ্বে। আমেরিকা স্রেফ এ কথা বলছে যে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রশাসন চালাবার মোট খরচের প্রায় সিকিভাগ আমরা দিতাম। ততখানি আর দিতে পারব না। দেব, তবে পরিমাণ কমিয়ে দেব। এই ঘোষণা সংস্থার মহাসচিব জেভিয়ার পেরেজ দ্য কুয়েলারকে এতখানি বিষণ্ণ করেছে যে তিনি বলেই দিয়েছেন—তাঁর বর্তমান কার্য-কাল শেষ হলে তিনি আর ওই পদে প্রার্থী হবেন না।

আমেরিকার বক্তব্য অস্পষ্ট নয়। আমেরিকা বলছে (১) রাষ্ট্রপুঞ্জ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলে এবং তা চলাও উচিত। সব স্বাধীন দেশই এর সদস্য এবং সবারই এখানে এসে পূর্ণ অধিকার প্রয়োগ করার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু অধিকার যেমন আছে, দায়িত্বও তো তেমনই আছে। একটা প্রয়োগ করব, অন্যটা করব না, এটা হতে পারে না। যেমন যে কোনও সংস্থার প্রত্যেক সদস্যের কর্তব্য তার জন্য নির্ধারিত চাঁদা নিয়মিত দেওয়া। অধিকাংশ সদস্যই তা দেন না। যে মাইকে সবাই জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন, সেই মাইকের খচাটা আসচে কোথা থেকে সেটা তো ভাবতে হবে! একা আমেরিকা ক্রমবর্ধমান বাজেট কী করে সামাল দেবে? (২) অধিকাংশ সদস্যই সমালোচনার জন্য আমেরিকাকে এক নম্বর লক্ষ্যবস্তু হিসাবে বেছে নেন। সেই সমালোচনা ক্রমেই রাজনৈতিক আক্রমণের চেহারা নিচ্ছে। যে কোনও মঞ্চকেই মার্কিন বিরোধিতা প্রচারের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। বহুবার এ বিষয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেও লাভ কিছু হয়নি। (৩) আমেরিকার নাগরিকদের মনে ক্ষোভ বাড়ছে। তারা বলছে, আমাদের গালাগালি করাবার জন্য আমাদেরই টাকা দিতে হচ্ছে—কিন্তু তা হবে কেন? কোন গরজ আমাদের? বরং ওই টাকাটা দেশের মানুষের কাজেই লাগুক। (৪) মার্কিন নাগরিকদের কাছ থেকে এই যে চাপ আসছে তা উপেক্ষা করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।

রাষ্ট্রসংঘের বাজেট এখন আশি কোটি ডলার ছাড়িয়েছে। অন্তত ছোট বড় ৯০টি দেশ তাদের চাঁদা, বকেয়া চাঁদা, দেয়নি। (গরিব দেশ হলেও ভারত অবশ্য চাঁদা বাকি রাখেনি। তার দেয় বার্ষিক কুড়ি লক্ষ ডলার সে এবারও দিয়ে দিয়েছে। এই রেকর্ড সবার নয়।) আমেরিকার অভিযোগ, এমন কি সোভিয়েত ইউনিয়নও টাকা বাকি রেখেছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীনে যে সব প্রকল্প চালু আছে তার মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পটি খুব জরুরী—বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে। গত বছর আমেরিকা এক কোটি ডলার ওই প্রকল্পে দেয়নি এই যুক্তিতে যে চীনকে ওই খাতে টাকা দেওয়া হয় এবং চীন বাধ্যতামূলক গর্ভপাত করায়। এই জোর খাটানোটা ঘোর বেআইনী। মার্কিন জনমত এতে বিষম ক্ষুব্ধ। অতএব টাকা আটকান হবে। এ বছর ওই প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট পুরো টাকাই হয়তো আমেরিকা আটকে দেবে। এর ফলে প্রকল্পটা খুবই দুর্বল হয়ে পড়বে এই শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

স্মর্তব্য যে এর আগে আমেরিকা ও ব্রিটেন ইউনেস্কো থেকে সরে এসেছে ওই সংস্থা রাজনীতির পীড়ায় ভুগছে বলে। এবার ডাচ সরকারও বলছে যে তারা সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের চাঁদা শেষ পর্যন্ত আমেরিকা যতটা বলছে ততটা হয়তো কমাবে না। কিন্তু কুফল যা হবার তা তো হয়েই গেল।

হারারে সম্মেলনের বেশ কিছু আগে একটা গুঞ্জন তোলা হয়েছিল যে রাজীব নাকি আরও কিছুদিন ন্যামের চেয়ারম্যান থাকতে চান। অর্থাৎ ভাঙা টার্ম না থেকে পুরো টার্ম। এ নিয়ে "বন্ধু" জনদের দরবারে ক্যানভাসিং শুরু করে দিয়েছেন রাজীব গান্ধীর দোস্তরা। এবং এই কথা জানাজানি হওয়াতে আফ্রিকার দেশগুলো চটে গেছে। কারণ প্রথা অনুযায়ী এবার কোনও আফ্রিকার দেশেরই নেতৃত্বপদ পাবার কথা। এসব কথা যাঁরা বলেছেন তাঁরা অবশ্য প্রমাণ দাখিলের কোনও চেষ্টা করেননি। রবার্ট মুগাবে বা কেনেথ কউন্ডার সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক কতটা গভীর তা কমনওয়েলথ নেতাদের লঘু-শীর্ষ বৈঠককালে সবাই দেখেছেন।

তাছাড়াও হারারে সম্মেলনে এবং তার পর থেকেই সবাই লক্ষ করেছেন যে নেতৃত্বের বোঝা নামিয়ে ফেলে রাজীব কতটা হালকা। তাঁর আচার আচরণে, কথাবার্তায় ওই ভাবটা ভালই ফুটেছে। বিশেষজ্ঞরাও কেউ কেউ বলেছেন যে, নির্জোট আন্দোলনের নেতা থাকার ফলে যেসব কথা রাজীব একেবারেই উচ্চারণ করতে পারেননি, যে সব সমালোচনা প্রকাশ্যে করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, এখন সেগুলি তিনি অন্তত ঘনিষ্ঠমহলে বলে ফেলছেন। এর ফলে ভাল মন্দ দুইই হওয়া স্বাভাবিক। নির্জোট আন্দোলনে এখনও ভারতের মর্যাদা সর্বাধিক। আজকের যুগোস্লাভিয়া বা মিশর পূর্বেকার যে মর্যাদা দাবি করতে পারে না, ভারত তা পারে। সুতরাং, একই হিসাবে, ভারতের দায়িত্বও সবচেয়ে বেশী। ভারত গা এলিয়ে দিলে সেটা নির্জোট আন্দোলনের পক্ষে মোটেই শুভ হবে না।

জিম্বাবুয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘনিষ্ঠ দেশ। সেই কারণেই কিছু লোক বলছিলেন যে মাঝখান থেকে ভারত সরে যাবার ফলে কাস্ত্রোর আরব্ধ কাজ এবার শেষ করতে পারবেন মুগাবে। বলা বাহুল্য এই অভিযোগ তথা সংশয় অমূলক। মস্কোর সঙ্গে হারারের যে সম্পর্কই থাক, মুগাবে পরিচালিত হবেন নির্জোট আন্দোলনভুক্ত দেশগুলির শলাপরামর্শ অনুযায়ী। ন্যামের নেতারা কেউ স্বৈরতন্ত্রী নন। তাঁরা আপন খেয়াল বা অভিরুচিকেই একমাত্র সম্বল করে চলেন না। মুগাবে খুবই সচেতন যে এক আফ্রিকীয় দেশের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর দায়িত্ব বর্তমান পটভূমিকায় খুবই বেশী। সবাই তাঁর দিকে চেয়ে আছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় বিক্ষোভ যত বাড়বে, যতই দেশটা যাবে বিস্ফোরণের মুখে, ততই বাড়বে নির্জোট আন্দোলনের দায়িত্ব। মুগাবে ততদিন থাকবেন না। কিন্তু সেই দায়ভার উপযুক্ত দক্ষতায় বহন করবার জন্য ন্যামকে তরবারির মতই শাণিত রাখতে হবে তো। [illegible]

মস্কোর পিকিং রেস্তোরাঁয় চীনা রাঁধুনিরা কি ফিরে আসছেন ?

শম্ভু সেন

কীসের ইঙ্গিত

'যে শহর থেকে এক পা বাড়ালেই চীন গণপ্রজাতন্ত্র, সেই শহরে ভাষণ দিতে গিয়ে আমি আমাদের দুই দেশের সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে চাই। অনেক কারণেই এই সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একেবারে গোড়াতেই বলতে হয় আমরা প্রতিবেশী। বিশ্বের দীর্ঘতম স্থল-সীমানা আমাদের দুই দেশের মধ্যে। আর, আমাদের সন্তান-সন্ততিদের চিরকালের পরস্পরের কাছে থাকতে হবে।...ইতিহাস সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের জনগণের উপর ন্যস্ত করেছে একটি অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর অনেক কিছুই নির্ভর করছে এই দুটি প্রধান সমাজতান্ত্রিক দেশের উপর।...চীনের মতো আমরাও সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত করাকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছি। তাহলে কেন আমরা পরস্পরকে সমর্থন করছি না? উভয়পক্ষই যেখানে সুস্পষ্টভাবে

হু ইয়াও বাং

উপকৃত হবে, সেইসব পরিকল্পনা রূপায়ণেই বা আমরা সহযোগিতা করছি না কেন? সম্পর্ক যত উন্নত হবে ততই আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারব।'

অতি সম্প্রতি ভ্লাদিভোস্তক শহরে, 'অর্ডার অফ লেনিন' প্রদান অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্ণধার, সে দেশের কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মিখাইল গর্বাচভ।

গর্বাচভের ভাষণে কীসের ইঙ্গিত? তাহলে কি রুশ-চীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পঁচিশ বছর ধরে জমে থাকা বরফ শেষ পর্যন্ত গলছে? পঞ্চাশ দশকের মধুযামিনী কি আবার ফিরে আসছে? উত্তর খোঁজার আগে কিছুটা অতীতে ফিরে যাওয়া যাক।

গোড়ার কথা

কীভাবে, কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে চীন-রাশিয়া বিরোধের সূত্রপাত হল, সে ব্যাপারে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা নানা কথা বলেন। কিন্তু

দেং জিয়াও পিং

পঞ্চাশের দশকে ওই দুই দেশের মৈত্রী ও সহযোগিতা যে একটা নতুন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল সে ব্যাপারে কেউই ভিন্নমত পোষণ করেন না। সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে সে সময় চীন যে অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, রাজনৈতিক ও নীতিগত মদত পেয়েছিল, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গোটা ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে পেয়েছিল শক্তিশালী বন্ধু আর সমর্থক হিসাবে। অন্যদিকে চীনও নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিল সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় রাশিয়াই সর্বেসর্বা।

খুব ভালো চলেছিল ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৬। রাশিয়ার রাজ্যপাটে তখন যোশেফ স্তালিন। চীনের অবিসংবাদী নেতা মাও জে দং। স্তালিনের মৃত্যুর পরেই প্রশ্ন উঠল, এবার তাহলে বিশ্বের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবেন কে? চীন ভেবেছিল, মাওয়ের নেতৃত্ব নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠবে না। কিন্তু রাশিয়ার তখন প্রভুত্বের স্পৃহা প্রবল। মাও দেবেন কম্যুনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব, এটা মেনে নেওয়া রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব ছিল না। দু'দেশের সম্পর্কে চিড় ধরল এখানেই।

১৯৫৬ সালে সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির বিশতম কংগ্রেসে নিকিতা ক্রুশেভ তাঁর 'গোপন' অস্ত্রটি ঝোলা থেকে বের করে আনলেন। স্তালিনকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করা হল। সারা বিশ্ব বিস্মিত। বিব্রত মাও। ওই কংগ্রেসে চীনা প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে তিনি হাজির ছিলেন।

মাওয়ের সমর্থকরা তাঁকে স্তালিনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিসাবে ঘোষণা করলেন। দু'দেশের মধ্যে তাত্ত্বিক বিরোধ দেখা দিল। তবুও ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত তা ছিল তলে তলে। অবশিষ্ট বিশ্ব রুশ-চীন বিরোধের আঁচ তেমন পায়নি। কিন্তু একটি পরমাণু কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে চীনের সঙ্গে চুক্তি রাশিয়া যখন ১৯৫৯ সালে একতরফা ভাবে খারিজ করে দিল, তখনই বোঝা গেল ভোলগা আর ইয়াং সি কিয়াং দিয়ে জল অনেক দূর গড়িয়েছে। এর আগে পর্যন্ত কারও ধারণাতেই ছিল না যে, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া দুটি শিবিরে ভাগ হতে পারে।

রুশ-চীন সম্পর্ক তিক্ত হলেও, পঞ্চাশের দশকের শেষে ও ষাটের দশকের গোড়ায় আর তেমন কোনও বড় ধরনের ঘটনা ঘটল না। মাও তাঁর দেশে সোভিয়েত ধাঁচের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করলেন। নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা করলেন চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির রুশপন্থী নেতাদের।

বেশ কিছুদিন রুশ-চীন মতবিরোধ বিতর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল। দুই দেশই একে অপরের নাম না করে আক্রমণ চালিয়ে যেতে লাগল। দু দেশই দেখল দ্বন্দ্বটা নিতান্তই নীতিগত। ১৯৫৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সই হল ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি। কড়া সমালোচনা করল চীন। বলল, এই চুক্তি সাম্রাজ্যবাদপন্থী। লেনিনের উদ্ধৃতি দিয়ে তারা বলল, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোনওরকম বোঝাপড়া চলে না। আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। কারণ এটা একটা 'কাগুজে বাঘ'। রাশিয়া জবাব দিল, কাগুজে বাঘ ঠিকই। তবুও এই বাঘের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরী। কারণ এর 'পরমাণু দাঁত' আছে। তাছাড়া, সমগ্র মানবজাতি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, এমন মারণাস্ত্রের কথা লেনিনের সময় কল্পনাও করা যায়নি। সুতরাং এ ব্যাপারে লেনিনের বক্তব্য সেকেলে।

তাত্ত্বিক যুদ্ধ আরও বিস্তৃত হল। চীন বলল, একটা সফল বিপ্লবের পরেও শ্রেণী এবং শ্রেণীসংগ্রাম থেকে যায়। পুঁজিবাদী ধ্যানধারণা নির্মূল হয়ে যায় না। তাই শোধনবাদ ঠেকাতে বা

আফগান প্রধান বারবাক কারমাল

পুঁজিবাদের ফিরে আসা রুখতে চাই গণ আন্দোলন, সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সোভিয়েত নেতারা ঘোষণা করলেন পূর্ণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁদের দেশে। 'জনগণের রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন। শ্রেণীর বিলোপ ঘটেছে সে দেশে।'

তখন থেকেই চীনের চোখে সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে উঠল 'শোধনবাদী'। সবরকম সরকারি বিবৃতিতে চীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে এই বিশেষণটি প্রয়োগ করতে শুরু করল।

রুশ-চীন বিরোধের সূত্রপাত যাঁর আমলে সেই ক্রুশ্চভ বিদায় নিলেন ১৯৬৪ সালে। এলেন নিকোলাই কোসিগিন। কিন্তু রুশ-চীন সম্পর্কের কোনও উন্নতি তো ঘটলই না, বরং দিন দিন তা আরও খারাপ হতে লাগল। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবই তার প্রত্যক্ষ কারণ। এর মধ্যেই ঘটে গেল চেকোশ্লোভাকিয়ায় রাশিয়ার হস্তক্ষেপ ১৯৬৮তে। শেষপর্যন্ত ১৯৬৯-এ বাধল রুশ-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ। উসুরি নদীর দ্বীপ দামানাস্কি বা চেনপাও (যে নামেই ডাকা হোক না কেন) নিয়ে সংঘর্ষ শুরু হল। তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের চরম পরিণতি ঘটল গোলাগুলির লড়াইয়ে। লড়াই চলল অল্পদিনই, কিন্তু পরিণতি হল মারাত্মক।

চীন-রাশিয়া মুখ দেখাদেখি বন্ধ হল। চীনের চোখে রাশিয়া চিহ্নিত হল 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী' হিসাবে।

ঝাও ঝিয়াং

উদ্যোগ শুরু, কালো মেঘ

১৯৭৬-এ মাও জে দংয়ের মৃত্যুর পরেই চীন গণপ্রজাতন্ত্রের রাজনৈতিক নেতৃত্ব কার্যত তিন টুকরো হয়ে গেল—দেং জিয়াও চেন ডন ইউন ও হু ইয়াও বাং-এর নেতৃত্বাধীন সংস্কারবাদীগোষ্ঠী, হুয়া গুয়ো ফেংয়ের নেতৃত্বাধীন মাওপন্থী গোষ্ঠী এবং চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির স্ট্যাণ্ডিং কমিটির দুই সদস্য ইয়ে জিয়ানইং এবং লিজিয়ান নিয়ানের নেতৃত্বাধীন রক্ষণশীলগোষ্ঠী। শেষ পর্যন্ত মডারেটদের সাহায্য নিয়ে মাওপন্থীদের ক্ষমতা থেকে হটালো দেং জিয়াও পিং গোষ্ঠী। শুরু হল মাও জে দংকে ভুলে যাওয়ার পালা।

মাওয়ের মৃত্যুর পর থেকেই রুশ-চীন সুসম্পর্ক ফের গড়ে তোলার ভাবনা চিন্তা শুরু হল। বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফে এ ব্যাপারে বেশ কিছু ইতিবাচক বিবৃতি প্রকাশিত হল। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৭৯তে শুরু হল দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার কথাবার্তা। যদিও চীন একে 'আলাপ আলোচনা' না বলে 'শলাপরামর্শ' বলাই শ্রেয় মনে করল। কিন্তু আবার এল বাধা। আফগানিস্তানের বারবার কামালকে সামরিক দিক থেকে মদত দিতে রাশিয়া সে দেশে সৈন্য ঢুকিয়ে দিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ভেস্তে গেল রুশ-চীন সম্পর্ক স্বাভাবিক করার আলোচনা।

মেঘ কাটল

আবার ভাবনাচিন্তা শুরু হল। চীনা ও রুশ উভয়পক্ষই বুঝলেন পরস্পরের মধ্যে এই বিরোধিতা চালিয়ে যাওয়া নিতান্তই অযৌক্তিক। সম্পর্ক যদি স্বাভাবিক হয়, অন্তত সীমিতভাবেও, তাহলেও দু'দেশের উপকার। চীনে তখন দেং জিয়াও পিং-রা পূর্ণ ক্ষমতায়। রুশ কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ তখন সে দেশের প্রেসিডেন্টও। ১৯৮১-তে এক বিবৃতিতে বললেন, 'চীনে পরিবর্তন আসছে। মাওয়ের যুগ শেষ হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের দিক থেকে তা সুলক্ষণ বলা যায়।

চীনের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার উদ্যোগ নিল রাশিয়া। ফল মিলল। ১৯৮২-র অক্টোবরে শুরু হল দু'দেশের মধ্যে উপ-বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনা। দীর্ঘ প্রায় দু'দশক পর রাশিয়া ও চীনের মধ্যে এ ধরনের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক বসল। বৈঠকে ঠিক হল, প্রতি ছ'মাস অন্তর সম্পর্ক স্বাভাবিক করার আলোচনা বসবে—একবার বেজিং, পরের বার মস্কোয়।

এবার নতুন সঙ্কেত পাঠাল বেজিং। ১৯৮২-এর নভেম্বরে ব্রেজনেভের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে তারা চীনা প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে পাঠাল বিদেশমন্ত্রী হুয়াং হুয়াকে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বললেন, বেজিং যে মস্কোর সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে চায় এটা তারই প্রমাণ। অক্টোবর বিপ্লবের বার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ১৯৬৪ সালে মস্কো গিয়েছিলেন। দীর্ঘ এই ১৮ বছর পর আবার এক শীর্ষস্থানীয় চীনা নেতা মস্কো গেলেন।

রাশিয়ার নতুন কর্ণধার প্রাক্তন কে জি বি প্রধান ইউরি আন্দ্রোপভকে নিয়ে চীনের মধ্যে কিছু সংশয় থাকলেও আন্দ্রোপভ নিজেই তা দূর করলেন। ১৯৮২-র ১৫ নভেম্বর ক্রেমলিনে হুয়াকে তিনি আন্তরিকভাবেই অভ্যর্থনা

হু কিলি

জানালেন। তিন মিনিট কথা হল তাঁদের মধ্যে। যেখানে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ পেলেন ৩০ সেকেণ্ড সময় আর ব্রিটিশ বিদেশ সচিব ফ্রান্সিস পিম পেলেন দশ সেকেণ্ড। তখনই বোঝা গেল, আন্দ্রোপভ সময় নষ্ট করতে চান না। চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার কাজ তিনি এখনই শুরু করতে চান।

মস্কো থেকে বেজিং-এ ফিরে আসার আগে হুয়া এক বার্তায় বললেন, মৃত্যুর আগে ব্রেজনেভ সোভিয়েত-চীন সম্পর্ক উন্নত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বারবার। এতেই বোঝা যায়, দু'দেশের সম্পর্ক ভালো করতে সোভিয়েত জনগণ সত্যিই আগ্রহী। চীনের জনগণও বরাবরই সোভিয়েত জনগণের সঙ্গে তাদের ঐতিহ্যগত মৈত্রী সম্পর্ককে মূল্য দিয়ে এসেছে।...শুধু দু'দেশের স্বার্থে নয়, এশিয়া তথা সমগ্র বিশ্বের স্বার্থেই চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রী স্থাপিত হওয়া দরকার।

পরের মাসেই, অর্থাৎ ১৯৮২ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়নের ৬০তম বার্ষিকী

উপলক্ষে চীন যে বার্তা পাঠায়, তাতে তারা রাশিয়ার সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করে। সুপ্রিম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়াম ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের কাছে ওই বার্তা পাঠান চীনা ন্যাশনাল পিপলস্ কংগ্রেসের অর্থাৎ চীনা সংসদের স্ট্যান্ডিং কমিটি। মজার কথা আফগানিস্তানে রুশ হস্তক্ষেপের তৃতীয় বার্ষিকীর একদিন পরেই চীন ওই বার্তা পাঠাল।

সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথে চীন আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। ১৯৮৪'র জানুয়ারিতে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের ফার্স্ট ভাইস প্রিমিয়ার আইভান আর্কিপভকে সরকারিভাবে চীন সফরে আমন্ত্রণ জানাল। আর্কিপভ আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ইতিমধ্যে রাশিয়ায় ঘটে গেল পরিবর্তন। আন্দ্রোপভ মারা গেলেন। ক্ষমতায় এলেন কনস্টানটিন চেরনেনকো। ১৯৮৪'র মার্চে আন্দ্রোপভের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে চীন আরও উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল পাঠাল। পাঠাল চীনের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী ওয়ান লিকে। কিন্তু লি ক্রেমলিনে তেমন উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলেন না। চেরনেনকো ২০ সেকেণ্ড সময় দিলেন ওয়ান লিকে। চেরনেনকো সাইবেরিয়ার লোক। আর চীন সবসময়ই বলে আসছে জারের আমলে রাশিয়া চীনের কাছ থেকে সাইবেরিয়া চুরি করে নিয়েছিল। লিকে স্বাগত জানাতে গিয়ে কি চেরনেনকোর এ কথাই মনে পড়ে গিয়েছিল?

রেগন

সম্পর্ক স্বাভাবিক করার কাজ কিছুটা কি পিছিয়ে গেল? ইতিমধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগন বেজিংয়ে পেলেন আন্তরিক অভ্যর্থনা। এবং চীন ও ভিয়েতনামের মধ্যে কিছু সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল। এরই ফলশ্রুতি মে'মাসের নির্ধারিত আর্কিপভের সফর রাশিয়া খুব স্বল্প সময়ের নোটিশে স্থগিত করে দিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর্কিপভ চীনে গেলেন। সে বছরের ডিসেম্বরে। অসুস্থ চেরনেনকোর অনুপস্থিতিতে তখন আর্কিপভই রাশিয়ার কাজ চালাচ্ছেন বলা যায়। ১৯৮৪ সালের ২১ ডিসেম্বর বেজিং বিমানবন্দরে আর্কিপভকে অভ্যর্থনা জানালেন চীনের উপ-প্রধানমন্ত্রী ইয়াও ইলিন। সেই ১৯৬৯-এ শেষ এসেছিলেন রুশ প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন। সীমান্ত সংঘর্ষ নিয়ে দুই কম্যুনিস্ট দেশের মধ্যে বড় রকমের যুদ্ধ এড়াতে চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে কথা বলাই ছিল তাঁর চীনে আসার উদ্দেশ্য।

রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত না হলেও দীর্ঘ চব্বিশ বছর পর রাশিয়ার ও চীনের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে গেলেন ৭৭ বছরের রুশ নেতা। তবে এর আগে থেকেই পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য শুরু হয়। তবে তা ছিল সীমিত। নিকিতা ক্রুশ্চভ ১৯৬০ সালে চীনকে প্রদত্ত সমস্ত রুশ সাহায্য প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। পঞ্চাশের দশকে যে আর্কিপভ চীনে ছিলেন মুখ্য রুশ উপদেষ্টা সেই আর্কিপভ এতদিন পর চীনের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতার দরজা পুরোপুরি খুলে দিলেন। সই হল তিনটি চুক্তি। এক, দু'দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সহযোগিতা বাড়াতে একটি কমিটি গড়া হবে। দুই, উৎপাদন সংক্রান্ত প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিশেষ জ্ঞান দু'দেশের মধ্যে বিনিময় করা হবে। শিল্প উদ্যোগগুলির নকশা তৈরি করতে ও তা গড়ে তুলতে একে অপরকে সাহায্য করবে। কর্মীদের প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা হবে। তিন, দু'দেশের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরাও নিজেদের মধ্যে তথ্যাদি বিনিময় করবেন এবং যৌথ গবেষণা কাজ চালাবেন।

কর্ণধার গর্বাচভ

১৯৮৫-এর মার্চে রাশিয়ায় ফের নেতা পরিবর্তন হল। অসুস্থ, অশক্ত, বৃদ্ধ চেরনেনকো মারা গেলেন। দল ও দেশের কর্ণধার হলেন রাজনীতির বয়সে অনেক তরুণ মিখাইল গর্বাচভ। চেরনেনকোর শেষকৃত্যানুষ্ঠানে চীনা প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিলেন উপপ্রধানমন্ত্রী লি পেং। ব্রেজনেভের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে আন্দ্রোপভ যা করেছিলেন এবার যেন তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল। নতুন নেতা গর্বাচভ ক্রেমলিনে পেং-কে দিলেন আন্তরিক অভ্যর্থনা। কথাবার্তায়-ব্যবহারে গর্বাচভ রীতিমত উচ্ছ্বসিত। উচ্ছ্বাস গোপনও করলেন না। চীনা নেতাও আন্তরিক অভ্যর্থনার বিনিময়ে সুবৃহৎ কম্যুনিস্ট প্রতিবেশীদের 'সমাজতান্ত্রিক' বলে উল্লেখ করলেন। শোধনবাদ বা সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের কথা চীন অনেকদিন বলে না ঠিকই, কিন্তু রাশিয়াকে 'সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র' হিসাবে চীন উল্লেখ করল দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর।

রাশিয়ার নতুন কর্ণধারকে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির তরফে অভিনন্দন জানালেন পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল হু ইয়াও বাং। ২৫ বছর পর দুই কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে বার্তা বিনিময় হল। ইয়াও বাং তাঁর বার্তায় 'দুই মহান প্রতিবেশী ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের' কথা বললেন। বললেন, রাশিয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলতে চীন আগ্রহী। চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের ইঙ্গিত গর্বাচভও দিলেন। কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান হিসেবে তাঁর প্রথম ভাষণে বললেন, 'পারস্পরিকতার ভিত্তিতে বেজিং-এর সঙ্গে সম্পর্কের আন্তরিক উন্নতি ঘটানো সম্ভব।'

বাণিজ্য সম্পর্ক শক্তিশালী করার কাজ আরও এগিয়ে গেল। রাশিয়া সফরে গেলেন চীনা উপ-প্রধানমন্ত্রী ইয়াও ইলিন। পাঁচ বছরের নতুন বাণিজ্য চুক্তি সই হল। রুশ-চীন বাণিজ্যের মোট পরিমাণ ইতিমধ্যেই দ্বিগুণ হয়ে বছরে ১৫০০ কোটি টাকায় ঠেকেছে। এই দশকের শেষে এর পরিমাণ দাঁড়াবে ৩০০০ কোটি টাকা।

নতুন চুক্তি অনুসারে ঠিক হল, চীন রাশিয়াকে দেবে কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য। পরিবর্তে রাশিয়া দেবে প্রযুক্তিবিদ্যা ও প্রযুক্তিগত সাহায্য। স্তালিনের সময় রাশিয়া চীনে যেসব কারখানা গড়ে দিয়েছিল সেসব কারখানা আধুনিকীকরণের ব্যাপারে রাশিয়া রাজি হল।

ইতিমধ্যে দুই দেশের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক চুক্তিও সম্পাদিত হয়েছে। ঠিক হয়েছে, এক দেশের শিল্পীরা অন্য দেশ সফর করবেন। দুই দেশ সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল পাঠাবে, প্রদর্শনীর আয়োজন করবে। সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথে এটা একটা বড় পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। ওদিকে চলতি বছরের মার্চে চীনা উপ-প্রধানমন্ত্রী পেং এবং রুশ উপ-প্রধানমন্ত্রী আর্কিপভের পৌরোহিত্যে চীন-সোভিয়েত

অর্থনৈতিক কমিশনের প্রথম বৈঠকটি বসে। এতে অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়। ওই কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারেই পঁচিশ বছর পর সোভিয়েত উপদেষ্টারা আবার চীনে এসেছেন। জিয়ামাসু পেপারমিলের উন্নয়ন প্রকল্পে কাজ করার জন্য।

ষাটের দশকের সেই বিরোধের পর রাশিয়া ও চীন আবার বাণিজ্য দূতাবাস খুলেছে। রাশিয়া দূতাবাস খুলেছে পূবের বন্দর নগরী সাংহাইয়ে এবং চীন খুলেছে লেনিনগ্রাদে। চীনের হেলিয়ংজিয়াং প্রদেশ ও রুশ বন্দর শহর ব্লাগোভেশচেনস্কের মধ্যে সীমান্ত বাণিজ্য চালানোরও সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ইতিমধ্যে ব্রেজনেভ যে প্রথা চালু করেছিলেন তা ভেঙে পুরনো প্রথা ফিরিয়ে এনেছেন গর্বাচভ। অর্থাৎ পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদ ও দেশের প্রেসিডেন্ট পদ আলাদা করে দিয়েছেন। নিজে পার্টি প্রধান থেকে প্রেসিডেন্ট পদটি দিয়েছেন বিগত দু'যুগের রুশ বিদেশমন্ত্রী আন্দ্রেই গ্রোমিকোকে। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার এটা একটা ইঙ্গিত বলে অনেকেরই ধারণা। চীনের প্রতি যে কজন রুশ নেতার মনোভাব খুব কড়া বলে মনে করা হয়, তাঁদের মধ্যে গ্রোমিকো অন্যতম। গ্রোমিকোকে প্রেসিডেন্ট করে কার্যত তাঁকে অকেজো করে ফেলা হয়েছে। সম্ভবত গর্বাচভ এমন একজন বিদেশমন্ত্রী চান যাঁকে দিয়ে চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার কাজ সহজ হবে। তাই তিনি বিদেশমন্ত্রী হিসাবে বেছে নিয়েছেন এদুয়ার্দো শেভার্দনাদজেকে। চীনের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ার সদিচ্ছা সত্যিই যে রাশিয়ার আছে তার প্রমাণ শীর্ষ বৈঠকের প্রস্তাব। নতুন বিদেশমন্ত্রী রাশিয়া ও চীনের মধ্যে শীর্ষ বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছেন। তবে চীন ওই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে। তাদের বক্তব্য হল, সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার পথে যেসব বাধা রয়েছে, তা দূর না হলে, শীর্ষ বৈঠক নিরর্থক হবে।

বরফ গললেও তিন বাধা

বরফ গলছে নিশ্চয়ই, তবে তা যতটা অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, ততটা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নরম না হওয়ায় দুই দেশের কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যেও সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে না। চীনের মতে, রাজনৈতিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলার পথে বাধা তিনটি। এক রুশ-চীন সীমান্তে ব্যাপক রুশ সমরসজ্জা, দুই, কামপুচিয়ায় ভিয়েতনামি সৈন্য এবং তিন, আফগানিস্তানে রুশ সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতি। চীনের বক্তব্য, দু'দেশের মধ্যে সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হলে সীমান্তে রুশ সৈন্য কমাতে হবে, আফগানিস্তান থেকে রুশ সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে এবং কাম্পুচিয়ায় ভিয়েতনামি সৈন্যদের প্রতি রাশিয়ার নৈতিক সমর্থন প্রত্যাহার করতে হবে।

তিনটি কাজই যে একসঙ্গে করতে হবে এমন কড়া মনোভাব অবশ্য চীনের নেই। গত বছরে প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডোয়ার্ড হিথ চীন

কিয়াও সি

সফরে গেলে, দেং জিয়াও পিং তাঁকে বলেন, 'চীনের তিনটি পূর্বশর্ত পূরণ করা যদি রাশিয়ার পক্ষে কঠিন হয় তাহলে অন্তত একটা দিয়েই তারা শুরু করুক।' গত বছর চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল বলেছিলেন, রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার পথে প্রধান বাধা হল সীমান্ত প্রশ্ন। বাকি দুটি প্রশ্ন অর্থাৎ আফগানিস্তান ও কাম্পুচিয়ার কোনও উল্লেখ করেননি তিনি। বোঝা যায়, সদিচ্ছার অভাব চীনেরও নেই। আসলে একটা জায়গা থেকে কাজ শুরু করতে হবে। এবং সেই উদ্যোগ নিতে হবে রাশিয়াকেই।

ভ্লাদিভোস্তকে ঘোষণা

এই কথাটি মনে রেখেই কি গর্বাচভ এগিয়ে এলেন? ভ্লাদিভোস্তকের অনুষ্ঠানে গর্বাচভ ঘোষণা করেন রাশিয়া-চীন সীমান্তে বহির্মঙ্গোলিয়া থেকে সোভিয়েত সৈন্যের একটা বড় অংশ প্রত্যাহারের প্রশ্ন নিয়ে মঙ্গোলিয়া নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা চলছে। এই ঘোষণার কিছুদিন পরেই মঙ্গোলিয়া জানায়, তাঁদের দেশে অবস্থানরত অন্তত পক্ষে ৫০ হাজার রুশ সৈন্য স্বদেশে ফিরে যাচ্ছেন।

সীমান্ত নিয়ে গর্বাচভ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। চীন যেভাবে সীমান্ত সমস্যার সমাধান করার দাবি জানিয়ে আসছে, কার্যত

লি পেং

সেভাবেই সীমান্ত সমস্যা মিটিয়ে ফেলার প্রস্তাব দিয়েছেন গর্বাচভ। চীনের বক্তব্য, ১৮৫৮ সালে জারের আমলে যে সীমান্ত চুক্তি হয়েছিল তা অসম। পুরনো চুক্তি অনুসারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমানা আমুর নদীর দক্ষিণ তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম কনভেনশন অনুসারে নদীর মাধ্যমা-রেখাটিই দু'দেশের সীমান্ত হওয়া উচিত। নদীর মধ্যমা রেখাটিই সীমান্ত হিসাবে মেনে নিতে গর্বাচভ রাজি। অর্থাৎ এর ফলে আমুর ও উসুরি নদীর বহু দ্বীপের উপর থেকে রাশিয়াকে তার দাবি প্রত্যাহার করে নিতে হবে। রুশ উপ-বিদেশমন্ত্রী মিখাইল কাপিতসাই একথা স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছেন। ২৭তম পার্টি কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্টেও গর্বাচভ চীনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা এভাবেই মিটিয়ে ফেলার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ভ্লাদিভোস্তকে গর্বাচভ বলেছেন 'যে সীমান্ত রেখা আমাদের বিভক্ত করেছে (আমি বরং যুক্ত করছে বলাই ভালো মনে করি) তা অদূর ভবিষ্যতে শান্তি ও বন্ধুত্বের রেখায় পরিণত হবে বলে আশা করি।'

ভ্লাদিভোস্তকে গর্বাচভ আরও বলেছেন, '১৯৮৬ সাল শেষ হওয়ার আগেই আফগানিস্তান থেকে একটি সাঁজোয়াবাহিনী দুটি মোটরবাহিত রাইফেলধারী বাহিনী ও তিনটি বিমান বিধ্বংসী গোলন্দাজবাহিনী তাদের আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম ও অস্ত্রাদি নিয়ে দেশে ফিরে আসবে।'

চীন-ভিয়েতনাম বিরোধের ব্যাপারে গর্বাচভ কিছুটা নিরপেক্ষ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, 'এই দুটি সমাজতান্ত্রিক দেশের সীমান্তে শান্তি বিরাজ করছে, তাদের মধ্যে সুপ্রতিবেশিত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কমরেড সুলভ আলোচনা নতুন করে শুরু হয়েছে এবং অপ্রয়োজনীয় সন্দেহ ও আস্থাহীনতা দূর হয়েছে আমরা এটা দেখতেই আগ্রহী।'

অতঃপর ?

মিখাইল গর্বাচভের নাটকীয় ঘোষণার পর তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। সুসম্পর্ক গড়ে তোলার কাজ ত্বরান্বিত করতে সোভিয়েত উপ-প্রধানমন্ত্রী নিকোলাই তালিজিন এক সপ্তাহের জন্য চীনে ঘুরে এলেন। আকুপাংচার চিকিৎসার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের চীনা বিশেষজ্ঞ, পলিটব্যুরো সদস্য ফার্স্ট ভাইস প্রিমিয়ার আইভ্যান আর্কিপভ বেজিংয়ে যান। এবং তিন নম্বর ঘটনা হল, চীনের উপ-বিদেশমন্ত্রী লিউ শুকিং মঙ্গোলিয়া সফর করে এলেন। চীন-মঙ্গোলিয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। সোভিয়েত ইউনিয়নের খুবই ঘনিষ্ঠ মিত্র দেশ এই মঙ্গোলিয়া।

গর্বাচভের সাম্প্রতিক ভাষণে কিছু 'ইতিবাচক পদক্ষেপ' খুঁজে পেয়েছেন চীনা নেতা দেং জিয়াও [illegible]। রাশিয়া অনেকটা জমিই ছাড়ছে। এবার [illegible] আসার পালা চীনের। মস্কোর পিকিং রেস্তোরাঁয় এবার তাহলে কী চীনা রাঁধুনিরা ফিরে [illegible]

প্রজ্ঞা

এই প্রজন্মের কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে একটি সমস্যা

শ্রীমতী

কিছুদিন আগে কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসের সামনে বিভিন্ন ধরনের নেশা, মাদকদ্রব্যের ঢালাও ব্যবসা আর তার ফলে আগামী প্রজন্মের মারাত্মক অবক্ষয়ের প্রতিবাদে মিটিং, মিছিল হয়েছিল। তার সুফল কতটুকু হয়েছে আর কোন খোঁজ রাখিনি। কিন্তু হেরোইন, ব্রাউন সুগার অথবা এই ধরনের যে কোন বিষাক্ত মাদকে আজকের কিশোর-কিশোরীর দল আসক্ত হয়ে পড়ছে। এতটা বোধ হয় বছর পাঁচেক আগেও ছিল না। ব্যাপারটা মোটেই আর পাঁচটা সমস্যার মধ্যে পড়ে না। যদিও যাদের ভাই-বোন, সন্তান এই নেশায় আসক্ত তাদের মারাত্মক সাংসারিক পরিস্থিতি। এটা কিন্তু ব্যক্তিগত সমস্যা কখনই নয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারের যষ্ঠি আজ অশক্ত। স্বপ্নে বিভোর থাকছে বাস্তবকে ছেড়ে। আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকের প্রতিচ্ছবি দেখলে শিউরে উঠতে হয়। সদ্য কলেজের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছে অথবা হায়ার সেকেণ্ডারী পড়ে, এই রকম অ্যাভারেজের তুলনায় ভাল কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলাম। ওদের দেখে সেই গানটাই মনে হচ্ছিল, 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা'। ওদের চোখের ভাষা অনাবিল, শিশুর মত। ঝকঝকে চেহারা, চকচকে মুখের দিকে চাইলে বোঝবার উপায় নেই কোথায় ওদের দুঃখ। কেন এই বিষণ্ণতা! একি কোন মানসিক আঘাত অথবা হতাশার সামান্যতম রিলিফ? কিসের হতাশা? অনেক অনেক প্রশ্ন রেখেছিলাম ওদের সামনে। স্পষ্ট ধারাল গলায় একের পর এক প্রশ্নের উত্তর দিল ওরা। দেখলাম ওদের বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়ে। লেখাপড়ায় সকলেই সাধারণের তুলনায় ভাল। ওদের বেশির ভাগের সমস্যাই পারিবারিক। এ ব্যাপারে একটা জিনিস লক্ষ করলাম—মা বাবাই অনেক ক্ষেত্রে হতাশার কারণ। কলকাতার একটি বিখ্যাত স্কুলের বারো ক্লাসের ছাত্র অতীনের মা বাবা দুজনেই ভারত সরকারের একটি নামী প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ও ডেপুটি ডিরেক্টর। অতীনকে এতটুকুও দেবার মত সময় তাঁদের নেই। শৈশব থেকে আয়ার কাছেই কেটে গেল জীবনের সতেরোটা বসন্ত। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে একদিন হেরোইনের নেশা ধরলো। এখন ও বাঁচতে চায়। ভালবাসা চায়, চায় স্নেহ মমতা। কলকাতার একটি প্রাইভেট হস্টেলের একখানা ঘরে থাকে ওরা দুজনে। (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) দুজনেই সব রকম নেশায় পারদর্শিনী আর সেই সঙ্গে লেখাপড়া, ব্যাডমিন্টন, পপ সঙ, কুইজ সবেতেই ওদের জুড়ি মেলা ভার। অথচ ওদের মানসিক শান্তি নেই। কারণ, ওরা জানে না এখন ওরা কার। মা বাবা ডিভোর্স করে দুজনেই আবার নিজের নিজের পছন্দমত সংসার পেতেছেন। বাবা টাকা দেন—ওরা নেশা করে ভুলতে চায় স্নেহ কি, ভালবাসা নামক শব্দগুলো। ওদের সকলেই দেখলাম কিছু ভুলতে চাওয়ার জন্য কিছু পেতে চায়। অথচ জানে না কি চায়। তাই বোধ হয় একে অপরকে সাহায্য করছে ব্রাউন সুগার, কোকেনের মত যে কোন বিষাক্ত মাদক দ্রব্যের সন্ধান জানাতে। আমরা মায়েরা, দিদিরা যদি এ ব্যাপারে তৎপর না হই তাহলে বোধ হয় এই অবক্ষয়কে রোধ করা যাবে না। সংসারে আমরা মা, বাবা, ভাই, বোন স্বামী, স্ত্রী সন্তান যেন উদাসীন। নিজের চাওয়া পাওয়ার প্রতি নজরটা আমরা একটু বেশিই দিই। মা, ঠাকুমার আমলে ছিল অন্য রকম, তাদের নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল না এমন অবশ্যই নয়। হয়তো বা সুযোগ ছিল না। তাই স্নেহ, ভালবাসা দিয়ে নিজের শাখা-প্রশাখাকে আঁকড়ে রাখতে জানতেন। আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্য ছিল এইটাই। কিন্তু আজ আমরা একটা দোটানার মধ্যে পড়েছি। পশ্চিমী আদব কায়দায় সংসারের চাকাকে ঘোরাতে গিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছি। অনেক কিছু করতে চাইছি বলেই বোধ হয় কিছুই করতে পারছি না। মাঝখান থেকে একটা ধ্বংসের দিকে নিয়ে চলেছি আমাদের উত্তরসূরীকে। আজকের এই সমস্যা সঙ্কুল জীবনে বাস্তব স্বপ্ন দেখার দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যত পরিকল্পনা করার দিনও বিগতপ্রায়। তাই বোধ হয় সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখার জন্য হেরোইন আর ব্রাউন সুগারের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের। এর কি কোনই প্রতিকার নেই? বিষাক্ত মাদকদ্রব্যের ঢালাও ব্যবসা বন্ধ করার জন্য আমাদের সরকার কি কোন জোরালো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন না? একটা অসুস্থ, মানসিক বিকারগ্রস্ত প্রজন্ম তৈরি হলে আমাদের দেশের কি হবে? জগৎসভায় ভারতকে সম্মানের আসন পেতে হলে এই সব কিশোরদের দিতে হবে স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা। আমাদের অর্থাৎ মায়েদের ভূমিকা বোধ হয় এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি। ■

ইলেক্‌ট্রন-এর কঠোরতম কোয়ালিটি কন্ট্রোলের দরুণ এর ১০০০ ঘন্টা আয়ু প্রতিটি ক্ষণে কাজ দেয় দারুণ!

আগুন নিভবার পরে…
আপাতত ত্রিপল দিয়ে বৃষ্টি ঠেকাই, পরে মেরামত করে নিতে হবে ।

বৃক্ষ-নিবাসের এ কী দশা !
ত্রিপল দিয়ে বৃষ্টি ঠেকানোর ব্যবস্থা হয়েছে ! পরে সব সারিয়ে নেব ।

কিন্তু এখন থাকব কোথায় ? শহরে, না গভীর অরণ্যে ?
গভীর অরণ্যে ।
সেটাই ভাল ।

পুতুলগুলো নিয়ে যাব ।
এরা যে এমন দড়ি বাইতে পারে, তা তো জানতুম না
চার বছর বয়স থেকেই তো বাইছে ।

সে কী ! জানলে আমি এ-কাজ ওদের করতে দিতুম না ।
সেইজন্যেই তো তোমাকে জানাইনি ।

চলো হিরো, চলো ডেভিল, আমরা বাড়ি বদলাচ্ছি ।
7/7

নুকো, লোমো, তোমরা এখানে পাহারায় থাকো ।
ঠিক আছে ।
হায়রে, বৃক্ষ-নিবাস !
ওয়াকার-কাকা ঠিক মেরামত করিয়ে নেবে ।
অরণ্যদেবকে রাজা বলে ওয়াকার-কাকা
ক্রমশ● ৪

পূর্ব-পশ্চিম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যৌবন-২৮

কবি জসিমউদ্দিনের বাড়িতে এক রবিবার সকালে আড্ডা দিতে গিয়ে মামুনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো।

ঐ বাড়িতে একবার আড্ডায় জমে গেলে উঠে পড়া শক্ত। কবি নিজেই অত্যন্ত মজলিশী মানুষ, অফুরন্ত তাঁর গল্পের স্টক। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন থেকে শুরু করে, হাসন রাজা, নজরুল প্রমুখ ব্যক্তিদের সম্পর্কে অনেক অন্তরঙ্গ কাহিনী শোনা যায় তাঁর মুখে। তা ছাড়া আরও অনেক বিশিষ্ট আড্ডাধারী এখানে এসে জমায়েত হন প্রায়ই।

মামুন ইদানীং আড্ডা দেবার সময় পান না, সংবাদপত্রের কাজ নিয়েই খুবই ব্যস্ত থাকতে হয়। নতুন কাগজ, রেফারেন্স লাইব্রেরি নেই, কোনো তথ্য যাচাই করতে গিয়ে মুশকিলে পড়তে হয় খুব। পুরোনো কোনো তথ্যের সন্ধানে তিনি নিজেই নানা জায়গায় ছোটাছুটি করেন। সেইরকম একটি কারণেই তাঁর মোতাহার হোসেন সাহেবের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন ছিল, তাঁকে বাড়িতে পাননি, তাঁর খোঁজেই তিনি এসে পড়লেন কবি জসিমউদ্দিনের বাড়ির আড্ডায়। মোতাহার হোসেনের সঙ্গে দেখা হলো, প্রয়োজনও মিটলো, কিন্তু আড্ডা ছেড়ে ওঠা গেল না। কবির গৃহের আতিথেয়তা বিখ্যাত, শুধু গাল-গল্প নয়, নাস্তা-পানি না খাইয়ে তিনি কারুকে ছাড়েন না।

বৈঠকখানা ঘরটি বেশ প্রশস্ত। দেওয়ালে নানাবিধ ছবি, তার মধ্যে একটি রাধাকৃষ্ণের। একটি বড় ক্যালেণ্ডারে পল্লী দৃশ্য ঝুলছে এক কোণে, ক্যালেণ্ডারটি গত বৎসরের, কিন্তু সুন্দর ছবিটির জন্যই সেটি এখনও স্থানচ্যুত হয়নি। সেই ছবিটির নিচে একটি ইজি চেয়ারে বসে আছেন একজন প্রায় বৃদ্ধ সুদর্শন পুরুষ। এক একজন মানুষের চেহারা ও পোশাক ছাড়িয়েও একটা ব্যক্তিত্বের জ্যোতি থাকে, একবার সে তাকালে আর একবার দৃষ্টি ফিরে আসে।

মানুষটি যে বেশ দীর্ঘকায় তা তাঁর ছড়ানো পা ও হাঁটুর উচ্চতা দেখলেই বোঝা যায়। পাজামা ও কুর্তা পরা, গালে নিখুঁতভাবে ছাঁটা কাঁচা-পাকা দাড়ি। চোখে রোদ-চশমা। ঘরের মধ্যেও ঐ চশমা পরে আছেন বলে তাঁর মুখখানি পুরোপুরি বোঝা যায় না। কিন্তু তাঁর চিবুক ও নাক দুই-ই সূচোলো। মামুনের সঙ্গে কেউ তাঁর পরিচয় করিয়ে না দিলেও তিনি চিনতে পারলেন।

অবিভক্ত বাংলার শেষ দশ বছরের রাজনীতিতে জনাব আবুল হাসেম ছিলেন একজন প্রভূত ক্ষমতাশালী মানুষ। নিজে কিঞ্চিৎ আড়ালে থেকে তিনি মুসলিম লীগ ও কোয়ালিশন মিনিস্ট্রিতে কলকাঠি নাড়তেন। লেখাপড়া জানা, তীক্ষ্ণধী পুরুষ, আর্থিক অবস্থাও ভালো। বর্ধমানের দিকে ওঁদের অনেক জমি জায়গা ছিল। পার্টিশানের পর এদিকে চলে এসেছেন। মামুনের সঙ্গে সেই কলকাতার সময় থেকে যথেষ্ট চেনাশুনো থাকলেও এর মধ্যে বছর দু'তিন দেখা হয়নি। তবে মামুন শুনেছিলেন যে আবুল হাসেম সাহেবের দৃষ্টিশক্তি সম্প্রতি খুব খারাপ হয়ে গেছে, চোখে প্রায় দেখতেই পান না, কিন্তু মস্তিষ্ক আছে পুরোপুরি সজাগ। ওঁর এক ছেলের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই দেখা হয়, তাঁর নাম বদরুদ্দিন ওমর। পত্র-পত্রিকায় এই ছেলেটির দীপ্ত-খরসান ভাষার প্রবন্ধ পড়ে মামুন অবাক ও মুগ্ধ হয়েছেন। তবে এঁর লেখার মধ্যে কিছুটা তিক্ততার ভাব আছে, যা মামুনের ঠিক পছন্দ হয় না। মামুনের সন্দেহ হয়, আবুল হাসেম সাহেবের মতন একজন ধর্মনিষ্ঠ, জাতীয়তাবাদী মানুষের এই পুত্রটি বোধ হয় কমুনিস্ট!

মামুন এগিয়ে গিয়ে বললেন, সালাম আলেকুম, হাসেম সাহেব!

কালো চশমা পরা মানুষটি মুখ তুলে প্রতি-অভিবাদন জানালেন, তারপর উঁচু গলায় হাসলেন। জসিমউদ্দিনও হেসে উঠলেন। আরও দু'তিনজন।

বিস্মিত মামুনের পিঠে হাত দিয়ে জসিমউদ্দিন বললেন, সবাই ঐ এক ভুল করে। ওনারে চেনতে পারলা না? উনি হইলেন মুসাফির।

মামুনের তবু ভুরু কুঁচকে রইলো। মুসাফির মানে? সৈয়দ মোস্তাফা আলির ভাই মুজতবা আলি? যে এখন লেখক হিসেবে খুব নাম করেছে, শান্তিনিকেতনে পড়ায়? কিন্তু তার তো চেহারা অন্যরকম, টকটকে ফর্সা রং!

আর একজন কেউ বললো, সওগাতে এই মুসাফির সাহেব সিরিজ লিখতেন, আপনি পড়েন নাই?

মামুন অস্ফুট স্বরে বললেন, হ্যাঁ, তা পড়েছি। কিন্তু…

কথায় কথায় জানা গেল এই মুসাফির এক সময় বেশ পরিচিত লেখক ছিলেন, তারপর বহু বছরের জন্য উধাও হয়ে যান। সত্যিকারের মুসাফিরের মতন বহু দেশ ঘুরেছেন, সম্প্রতি সেট্‌ল করেছেন ভারতে, কয়েকদিনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে বেড়াতে এসেছেন।

মামুনের মুখ থেকে ফস্‌ করে প্রশ্ন বেরিয়ে এলো, ইণ্ডিয়ায় সেট্‌ল করলেন কেন?

মামুন অন্য কিছু ভেবে প্রশ্নটি করেননি, তাঁর মাথায় সব সময় এখন তাঁর পত্রিকার চিন্তা। মুসাফির সাহেব পূর্ব পাকিস্তানে সেট্‌ল করলে তাঁর পত্রিকার জন্য আর একজন লেখককে পাওয়া যাবে, মামুনের এই কথাটাই প্রথমে মনে এলো। ভালো গদ্য লেখকের খুব অভাব।

মামুনের প্রশ্ন শুনে মুসাফির সাহেব হেসে বললেন, আপনারা নবাব ফারুকির নাম শুনেছেন? অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী ছিলেন এক সময়।

সকলেই মাথা হেলালো। নবাব ফারুকীর নাম কে না জানে!

মামুন লক্ষ করলেন, মুসাফির সাহেবের কথায় পরিষ্কার পশ্চিমবঙ্গীয় শান্তিপুরী টান। কণ্ঠস্বরটি ভরাট ও মিষ্টি।

মুসাফির সাহেব বললেন, পার্টিশানের পর নবাব ফারুকীকে অনেকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি কলকাতায় রয়ে গেলেন, পূর্ব পাকিস্তানে গেলেন না কেন? সেখানে আপনার জমিদারি রয়েছে…তিনি কী উত্তর দিতেন জানেন? তিনি সবাইকেই বলতেন, ওদিকে যেতে পারি। কিন্তু ক্যালকাটা ক্লাবটাকে উপড়ে তুলে নিয়ে যেতে পারো ঢাকায়? ক্যালকাটা ক্লাবের বন্ধুদের সঙ্গে রোজ আড্ডা দিতে না পারলে যে ওদিকে মন টিকবে না। আমারও হয়েছে সেই অবস্থা। আমার অবশ্য ক্যালকাটা ক্লাবের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের মুর্শিদাবাদের বাড়িতে আছে একটা বাগান। নিজে হাতে আমি তার অনেক গাছ পুঁতেছি। সেই গাছগুলোকে তুলে না আনতে পারলে আমার একা আসা হবে না!

মোতাহার হোসেন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি মুসাফির হয়েও নিজের বাড়ির বাগানের ওপর এত টান?

—আমি মুসাফির হতে পারি, যাযাবর তো নই। আমার একটা শিকড় আছে, সেটা সব সময় টের পাই।

—ইণ্ডিয়ার অবস্থা এখন কী রকম? থাকার অসুবিধা নাই? কাগজে তো যা পড়ি মাঝে মাঝে

—হ্যাঁ, অসুবিধে আছে। অন্তত ছ'রকম অসুবিধের কথা বলা যায়। তার মধ্যে তৃতীয়টি হলো, হঠাৎ কোনোদিন দাঙ্গা লাগলে কচু-কাটা হতে পারি। ইণ্ডিয়ায় দাঙ্গার তো বিরাম নেই!

—এইটা হলো তৃতীয় অসুবিধে?

সবাই হেসে উঠলো একসঙ্গে। মামুন আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, ইণ্ডিয়ার অবস্থা সত্যিই এখন কী রকম বলেন তো! আপনার কাছ থেকে ঠিক খবর পাওয়া যাবে।

মুসাফির একটা চুরুট ধরালেন। কালো চশমাটা তিনি খোলেননি একবারও। ঠোঁটে সব সময় পাতলা হাসি। সব মিলিয়ে মানুষটিকে রহস্যময় মনে হয়।

তিনি চুরুটে টান দিয়ে বললেন, ইণ্ডিয়ায় একটা এক্সপেরিমেন্ট চলছে। হিন্দুরা অনেকদিন পর রাজ্য শাসনের ভার পেয়েছে। মুখে ওরা যাই-ই বলুক, ওদের কনস্টিটিউশানে যতই ধর্ম-নিরপেক্ষতার কথা থাক, হিন্দুরাই এখন শাসক। ধরুন, প্রায় সাত শো বছর পর এই ক্ষমতা পেয়ে তাদের খানিকটা দিশেহারা অবস্থা। হিন্দু চিন্তাধারার মধ্যে সব সময় একটা বৈপরীত্য থাকে। সেই তুলনায় মুসলিম মাইণ্ড বোঝা শক্ত। কারণ তা স্পষ্ট ও একমুখী। হিন্দুদের মধ্যে যেমন আছে গোঁড়ামি, তেমনই আবার ঔদার্যের প্রতি মোহ।

একজন বললো, ঔদার্যের ভাণ! কিংবা ঔদার্যের ভণ্ডামিও বলতে পারেন!

মুসাফির বললেন, মোহটাই বোধ হয় সঠিক আমার মতে। হিন্দুরা যেমন সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তেমনি নাস্তিকতাও তারা কিছুটা সহ্য করে। হিন্দুধর্মের একটা অংশের মধ্যে নাস্তিকতাবাদ চলে আসছে অনেকদিন ধরে। তারা একসময় বৌদ্ধদের পিটিয়ে মেরেছে, আবার নিরীশ্বরবাদী গৌতম বুদ্ধকে অবতার বলেও স্বীকার করে নিয়েছে।

—স্বীকার করে নিয়েছে শুধু মুখেই। কোনো হিন্দু কি বিষ্ণু বা রামের মতন বুদ্ধের পূজা করে?

—বুদ্ধ মূর্তি দিয়ে তারা ঘর সাজায়। তাতে বাধা নেই। এটাই ঔদার্যের মোহ। এই মোহ থেকেই তারা মনে করে যে আধুনিক পৃথিবীতে তারা একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়তে পারবে। দু'পাঁচ শো জন হয়তো এটা আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করে। আবার হিন্দুদের একটা বিরাট অংশ মনে করে, ইংরেজদের কাছ থেকে তারাই ক্ষমতা ছিনিয়ে এনেছে, সুতরাং মুসলমানদের তারা দয়া করে যেটুকু দেবে, তা নিয়েই মুসলমানদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। অধিকাংশ হিন্দু কংগ্রেস পার্টিকে ভোট দেয় কিন্তু মহারাষ্ট্রের সাভারকরকে অস্বীকার করে না। সুতরাং কাগজে কলমে ও হিন্দু মানসিকতায় একটা দো-টানা চলছে। এই জন্যই আমি বলেছি, এটা একটা এক্সপেরিমেণ্টাল স্টেজ। তার পরে, তাদের রাজ্য শাসনের অভিজ্ঞতা নেই, তারা ফলো করছে ব্রিটিশ মডেল। কিন্তু যে দেশে শতকরা সত্তর জনের ক-অক্ষর গোমাংস, শতকরা ষাট জন দু' বেলা খেতে পায় না, শতকরা পঞ্চাশ জনের একটি গেঞ্জি পর্যন্ত গায়ে দেবার সামর্থ্য নেই, সেই দেশে ব্রিটিশ মডেল পদে পদে হাস্যকর হয়। যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ইকুয়ালিটি ইন দা আই অফ ল, আইনের চক্ষে ধনী-নির্ধন সবাই সমান। জমিদার রামচন্দ্র তার প্রজা শ্যামচন্দ্র কিংবা শেখ রহিমের জমি কেড়ে নিল জোর করে। এখন শ্যামচন্দ্র কিংবা শেখ রহিম আইনের সাহায্য পাবে কী করে? আইন কিনতে পয়সা লাগে। আইন বুঝতে লেখাপড়া লাগে। ব্রিটেনে কী হয়? সেখানে সরকারের চোখ-নাক অনেক বেশি সজাগ, সরকারের হাত লম্বা। সারা দেশে কী ঘটছে, সরকার তার খোঁজ খবর রাখে। সে দেশেও ধনীরা গরিবদের শোষণ করে বটে কিন্তু জমি কেড়ে নিতে পারে না, যাকে তাকে খুন করে পার পায় না, মাঝখানে সরকারের হাত এসে পড়ে। আর ভারতের নতুন সরকার বড় বড় শহরগুলোই সামলাতে পারছে না, গ্রামে তো সরকারের কড়ে আঙুলটিও কখনো পৌঁছোয় না।

মামুন বললেন, আমাদের এদিকেও তো একই অবস্থা।

মুসাফির বললেন, আমি আপনাদের দেশ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। আমি ইণ্ডিয়ার সিটিজেন, সে দেশের সমালোচনা করতে পারি। আপনাদের সম্পর্কে শুধু একটা কথাই বলতে পারি, আল্লা আপনাদের রক্ষা করুন!

—আপনি মুসলমান হয়েও আমাদের পর ভাবছেন? পার্টিশান তো একটা পলিটিক্যাল ডিভিশন, কিন্তু দু'দেশের মানুষ যে এত দূরে সরে যাচ্ছে…

—সেইটাই তো সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। ভারত কাগজে-কলমে ধর্মনিরপেক্ষতা ঘোষণা করে বসে আছে, আর আপনারা গড়ছেন ইসলামিক রাষ্ট্র। আমার ধারণা, পার্টিশান না হলে হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থানের এক্সপেরিমেন্টটা তবু যদি বা সাকসেসফুল করা যেত, এখন আর তার কোনো আশা নেই। অবস্থা আরও খারাপ হবে, যদি এই দুই দেশের মধ্যে একটা যুদ্ধ বাধে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, শিগগিরই সেরকম একটা যুদ্ধ বাধবে।

—অ্যাঁঃ আবার যুদ্ধ?

—আমি চোখ বুজলেই যেন সেই দৃশ্য দেখতে পাই। এবারে আর কাশ্মীরে সীমান্ত সংঘর্ষ নয়। পুরোপুরি দুই দেশের যুদ্ধ, প্লেন থেকে বোমা পড়বে

—না, না, না, আপনি বড় সিনিক্যাল কথা বলছেন।

মোতাহার হোসেন গম্ভীরভাবে বললেন, আমি মুসাফির সাহেবকে বহুদিন ধরে চিনি। ওঁকে তোমরা ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা বলতে পারো। উনি যা যা বলেন সব মিলে যায়। নজরুলের যে এই অবস্থা হবে, সে কথা উনি আমাকে বহু আগেই বলেছিলেন। মনে আছে, আপনার? আমার নিজের জীবন সম্পর্কেও উনি এমন কয়েকটা কথা বলেছেন, যা প্রত্যেকটা মিলেছে।

মামুন জিজ্ঞেস করলেন, উনি হাত দেখতে পারেন বুঝি?

মুসাফির প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বললেন, না, না, আমি ওসব কিছু জানি না। মোতাহার, তুমি এসব কী আবোলতাবোল বলছো!

জসিমউদ্দিন বললেন, হ্যাঁ, মুসাফিরের এই একটা আনক্যানি ক্ষমতা আছে, আমিও লক্ষ করেছি।

আলোচনা অন্যদিকে ঘুরে গেল। অনেকেই মুসাফিরকে ঘিরে ধরে হাত

বাড়িয়ে দিল। মুসাফির প্রথম কয়েকবার তাদের প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত এক একজনের হাত ছুঁয়ে নানান কৌতুকময় মন্তব্য ছুঁড়তে লাগলেন।

আড্ডা ভাঙলো বেলা একটায়। মুসাফির সাহেবের জন্য একটা গাড়ি মজুত আছে। তাঁর কোনো ব্যবসায়ী বন্ধু কয়েকদিনের জন্য গাড়িটি দিয়েছে। কাগজের সম্পাদক হবার পর মামুন একখানা অফিসের গাড়ি পান বটে কিন্তু আজ ড্রাইভার আসেনি, তিনি রিকশায় এসেছেন।

মুসাফির সাহেব কয়েকজনকে লিফট দিতে চাইলেন। মামুন উঠলেন সেই গাড়িতে। তিনি সব শেষে নামবেন। নামবার একটু আগে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি সত্যিই ভবিষ্যতের দৃশ্য দেখতে পান? সাধু-ফকিরদের সেরকম অলৌকিক ক্ষমতা থাকে শুনেছি...

মুসাফির স্বভাবসিদ্ধ সহাস্য কণ্ঠে বললেন, না, আমার কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নেই। তবে ঐ জসিমউদ্দিন যা বললো, সেটাই ঠিক। মাঝে মাঝে আমার একটা আনক্যানি ফিলিং হয়, হঠাৎ হঠাৎ চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে ওঠে...ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের একটা ছবি আমি প্রায়ই দেখি। আপনি তো সাংবাদিক, সে জন্য তৈরি হয়ে থাকুন!

—কিন্তু কী নিয়ে যুদ্ধ হবে?

মুসাফির নিজের মাথায় টোকা মেরে বললেন, পাগলামি নিয়ে! দু'দেশের পাগলামির তো একটাই নাম, কাশ্মীর!

—হায় আল্লা! এই গরিব দেশের যুদ্ধ!

—সব যুদ্ধেই গরিবরা গরিবদের মারে! বড়লোকেরা মজা দেখে!

—আপনি...মুসাফির সাহেব, আপনি...কোনো মানুষের জীবনেরও এরকম ছবি দেখতে পান?

—হ্যাঁ, তাও কখনো কখনো দেখি। কী করে দেখি তা জানি না। খুব সম্ভবত টেলিপ্যাথি। অন্য একজনের সাব-কনসাস মাইণ্ডের ছবিটা আমার মস্তিষ্কের বেতার তরঙ্গে কী করে যেন ধরা পড়ে যায়। আমার নিজের ছোট ভাই, খালেদ, একদিন তার মুখের দিকে চেয়ে... আমি চমকে উঠলাম। দেখি যে, তার চোখের দুটো মণি নেই। সে তাকিয়ে আছে, কিন্তু চোখ দুটি সাদা। আমি খালেদকে তখুনি ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করাতে বললাম। সে শুনলো না। তার আই-সাইট পারফেক্ট! স্বাস্থ্য ভালো, সে কেন ডাক্তারের কাছে যাবে। চাকরিও ভালো করে, বুদ্ধিমান ছেলে...কিন্তু শুনলে হয়তো আপনি বিশ্বাস করতে চাইবেন না, এক মাসের মধ্যে সেই সুস্থ ভাইটি আমার পাগল হয়ে গেল। একে আপনি কী বলবেন!

—সত্যি বিশ্বাস হতে চায় না।

—আরও আশ্চর্য হচ্ছে, আমি নিজের জীবনের ভবিষ্যতের কোনো ছবি দেখি না। অন্যদের দেখি। আমি জিন্না সাহেবকেও দেখেছিলাম। উনিশ শো সাতচল্লিশ সালের গোড়ার দিকে। আমি তখন জিন্না সাহেবের প্রচণ্ড অ্যাডমায়ারার। কিন্তু ওনার দিকে তাকিয়েই আমার বুক কেঁপে উঠলো। মুখে পরিষ্কার মৃত্যুর ছায়া। ভাবুন তো আপনি, যে মানুষটা এতকালের একটা পুরাতন দেশ ভেঙে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছে, তার নিজের আর আয়ু নেই।

—মুসাফির সাহেব, আপনি আর কতদিন থাকবেন ঢাকায়? একদিন আমার বাসায় এলে খুব খুশি হবো। আমরা একটা নতুন পেপার বার করছি, যদি সেখানে আসেন, যদি আমাদের জন্য কিছু লেখেন

মুসাফির কোনো উত্তর না দিয়ে মামুনের মুখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—মামুনের বুক কেঁপে উঠলো। এক্ষুনি জিন্না সাহেবের কথা বলার পরই তাঁর মুখের দিকে চেয়ে এমন দীর্ঘশ্বাস....

—আপনি কী দেখলেন মুসাফির সাহেব? আমারও আয়ু ফুরিয়ে এসেছে নাকি!

—না, না, বালাই ষাট, আপনি আরও অনেকদিন বাঁচবেন।

—তবে কী দেখলেন?

—না, সেরকম কিছু না।

—কী দেখলেন, তবু বলুন।

—আপনার না শোনাই ভালো। হয়তো ঠিকই আছে। জানেন, সময়ে সময়ে আমারও ভুল হয়।

—এটা আপনি কী করছেন, মুসাফির সাহেব। আমার মনের মধ্যে একটা খটকা ঢুকিয়ে দিলেন। এখন আমি অনবরত এই কথাই ভাববো। আমি তো ছেলেমানুষ নই, আপনার যা মনে এসেছে বলুন, শুনলেই যে আমি বিশ্বাস করবো, তারও তো কোনো মানে নাই!

—একটা ছায়া দেখলাম। হঠাৎ যেন আপনি দুটো মানুষ হয়ে গেলেন। একটা আপনার কর্ম জীবনের, আর একটা আপনার ব্যক্তি জীবনের। এর মধ্যিখানে একটা ছায়া। একটি অল্পবয়েসী যুবতীর, সে যেন দু'হাত মেলে আপনার ঐ দুটি সত্তাকে দু'দিকে সরিয়ে দিতে চায়, সে আপনার...

মামুন হেসে বললেন, এটা আপনার স্বপ্নই বটে! না, কোনো যুবতী টুবতী আমার জীবনে নাই। বুড়া হয়ে যাচ্ছি, এখন আর কে আসবে! সারাক্ষণ কাজে ব্যস্ত থাকি। ব্যক্তি জীবনের কথা ভাবারও সময় পাই না।

মুসাফির বললেন, হয়তো সে এখনও আসেনি। তাই তার ছায়া মূর্তি। আগামীতে কোনো সময় আসবে!

মামুন বললেন, যদি সে রকম কেউ আসেই, মন্দ কী! দেখা যাক, যদি এই বুড়োকে কারুর পছন্দ হয়!

হালকা সুরেই শেষদিকের কথাবার্তা বলে মামুন নেমে পড়লেন এক সময়। মুসাফিরকে তাঁর বেশ পছন্দ হয়েছে। এই মানুষটির আসল নাম কী তা কেউ বলেনি। পরদিন তিনি মোতাহার হোসেনের সঙ্গে আবার টেলিফোনে কথা বললেন, তখন মুসাফিরের প্রসঙ্গ উঠলো। মোতাহার হোসেন এই মুসাফিরকে বহুদিন ধরে চেনেন, কিন্তু আসল নামটা ভুলে গেছেন। সকলেই ওঁকে মুসাফির বলে ডাকে। লেখাপড়া জানা মানুষ, অভিজ্ঞতাও প্রচুর, এই লোককে পূর্ব পাকিস্তানে ধরে রাখতে পারলে অনেক লাভ হয়।

মুসাফিরের সঙ্গে মামুনের পরিচয় হবার ঠিক চারদিন পরে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ বেধে গেল।

ছবি : অনুপ রায়

(ক্রমশ) দেশ

বৃষ্টিতে

মতি নন্দী

সতোন বাঁড়ুজ্জের বড় ছেলে বাবলুকে কুকুরে কামড়াচ্ছিল, অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। সিনেমা দেখে রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ সে বাস থেকে নামে। একটা খালি জমির প্লট কোণাকুণি পেরিয়ে রাস্তায় পড়লেই বাঁদিকে বস্তি আর ডান দিকে বিরাট একটা পাঁচিল-ঘেরা আপার্টমেন্ট হাউজিং। রাস্তাটাকে দু'ভাগ করে মাঝখানে, প্রায় পঞ্চাশ মিটার পর্যন্ত, নানান রকম পাতাবাহার গাছের সারি। এই বস্তিরই কিছু কুকুর রাত ন'টার পর রাস্তাটাকে বিভীষিকায় রূপান্তরিত করে। পদচারি বা সাইকেলে কেউ ওই বস্তির সামনে দিয়ে গেলেই পাঁচ-ছটি কুকুর ঘেউ-ঘেউ রবে ছুটে গোড়ালি পর্যন্ত মুখ নিয়ে আসে। বুদ্ধিমানরা দাঁড়িয়ে পড়ে, মুখে চু-চু, চুক-চুক শব্দ করে ওদের বোঝাবার চেষ্টা করে, আমি ভালো লোক। ওরা তখন কামড়াবার মত দূরত্বে এসে হিংস্রভাবে দাঁত দেখায়, ঘেউ ঘেউ করে গাছের সারির শেষ পর্যন্ত পায়ে পায়ে চলে। যারা ভীতু তারা চিৎকার করে ওঠে এবং ছুটতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনে। গত তিন মাসে চারজনের হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত নানান জায়গার মাংস খুবলে নিয়েছে ওরা। সঠিক বললে একটি কুকুরই।

"হ্যাঁ হ্যাঁ কালুয়াটাই। দেখলেই চিনতে পারবে। ইয়া তাগড়াই, কুচকুচে কালো, শুধু বুকের কাছে সাদা আর দুটো চোখের ঠিক উপরে ব্রাউন দুটো স্পট, মনে হবে একস্ট্রা দুটো চোখ। ওটাই পালের গোদা।"

প্যান্টের তলার দিকের ফালা হয়ে যাওয়া অংশটা সকলের সুবিধার জন্য বাবুল পা তুলে দেখাল। দাঁতের আঁচড়ে জুতোর পিছনেও ছাল ওঠা।

"কি শয়তান কুকুর গো!" বাবুলের মা, পুরনো হাঁপানির রোগী সুপ্রভা আতঙ্কে কেঁপে উঠল। বাবুল তাদের একমাত্র সন্তান। "সেদিন অরুণ দত্তকে কামড়ে পায়ের এতটা মাংস ছিঁড়ে নিয়েছে, এখনো ইঞ্জেকসন চলছে। ভদ্রলোকের পায়ের যা অবস্থা শুনছি হাসপাতাল যেতে হবে।"

"ভয়ে প্রথমে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। বস্তির পাঠশালার রকে কয়েকটা লোক বসেছিল। তাদের একজন কুকুরগুলোকে ডাকতেই আর আমার দিকে এগোল না।" বাবুলের গলা এখনো শুকিয়ে রয়েছে। সন্তর্পণে সে পায়ে হাত বোলাল।

"কিছু একটা করা দরকার।" সতোন চিন্তিত স্বরে বলল।

"কর্পোরেশনে খবর তো মদনদের চাকরকে কামড়াবার পরই দেওয়া হয়েছিল, কিছুই হল না। শুনলুম একদিন নাকি কুকুরধরারা এসেছিল। ওদের দেখেই বস্তির লোকেরা কুকুরগুলোকে ঘরে লুকিয়ে ফেলে।"

"ওভাবে হবে না, অন্য কিছু ভাবে এই উৎপাত থেকে বাঁচার কথা ভাবতে হবে।" সতোন বলল বটে কিন্তু কিভাবে বাঁচবে তার হদিশ সে জানে না।

পরদিন অফিস যাবার সময় সতোন কয়েকটি কুকুরকে রাস্তায় দেখল। বস্তিতে ঢোকার সরু রাস্তাটার মুখেই টালির চালের পাঠশালা-ঘর। হাত তিনেক চওড়া একটা সিমেন্টের রকের উপর পর্যন্ত চাল নামান। স্কুলের একমাত্র দরজায় তালা, দশটার পর খুলবে।

দুটি কুকুর রাস্তার কিনারে কুণ্ডলি পাকিয়ে। আর একটা বস্তির ভিতর থেকে ছুটে আসছে আর পিছনে বছর দশেকের একটি মেয়ে বাঁখারি হাতে তাকে তাড়া করেছে। কুকুরটা রাস্তায় বেরিয়ে মাঠের দিকে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে দাঁড়াল। মেয়েটি ব্যর্থ হয়ে, রাগ প্রকাশ করল ঘুমন্ত দুটির উপর। বাঁখারির আচমকা আঘাতে 'কিঁউ' শব্দ করে ধড়মড়িয়ে উঠে তারাও মাঠের দিকে সরে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আক্রমণকারীর চলে যাওয়ার অপেক্ষায়।

আশ্চর্য! সতোন ভাবল, দিনের বেলায় কুকুরগুলো এমন নিরীহ, ভিতু আর রাত্তিরে এরাই কিনা অন্য চেহারা নেয়! মেয়েটিকে অনুসরণ করে তার চোখ গিয়ে পড়ল দূরে পাঠশালার রকে। একটি কালো কুকুর সামনের দুই পা ছড়িয়ে কাৎ হয়ে শুয়ে। দুই পায়ের মধ্যে মুখটি মেঝেয় রাখা। কান দুটি খাড়া। চোখ খোলা না বন্ধ দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। বাবুলের বর্ণনা মতোই ঘোর কালো এবং দুই ভ্রূতে ব্রাউন স্পট। দেখলে মনে হয় রেগে রয়েছে। সতোন কুকুরের জাতপাত বোঝে না, তবে মুখের গড়ন, কান আর মসৃণ গা থেকে তার মনে হল দোআঁশলা। নিছকই নেড়ি নয়।

এই তা হলে সেই পালের গোদা, সুপ্রভা কথিত শয়তান যে চারজনের পায়ের মাংস তুলেছে। বস্তির লোকেরা একে কালুয়া নামে ডাকে। কালুয়ার থেকে হাত ছয়েক দূরে কালোয় সাদায় মেশান আর একটি লম্বা হয়ে ঘুমোচ্ছে। পেটটা ঝুলে রয়েছে এবং স্তনের সারি। দূর থেকেই বোঝা যায়, বাচ্চা হবে। ওই শয়তান ব্যাটারই কাজ। সতোন নিশ্চিত এ-সম্পর্কে। মদ্দা আর তো চোখে পড়ছে না।

এবার সে পাঠশালার কাছাকাছি এবং ইচ্ছে করেই মন্থর হল। মেয়েটি রকে বসল এবং কালুয়ার মাথায় একটা থাপ্পড় মারল। কালুয়া মেঝেয় গড়িয়ে টানটান হয়ে আড়মোড়া ভাঙল। মেয়েটি আবার মারার জন্য হাত তুলেছে, কালুয়াও দু' পা তুলে হাতটা ধরার চেষ্টা করল, আদুরে ভঙ্গিতে।

এইসব দেখতে দেখতে সে পাঠশালা ছাড়িয়ে মাঠে উঠে বাস স্টপের দিকে এগিয়ে গেল। অফিসে কয়েকজনকে সে গতরাত্রে কুকুরের কামড় থেকে ছেলের বেঁচে যাওয়ার কথা বলল। তাইতে অনেকেই নানাবিধ মন্তব্য করল। বস্তির ভোট, কর্পোরেশন ইলেকশন থেকে শুরু করে কুকুর পোষার উপকারিতা, দিশি ও বিলিতি কুকুরের মধ্যে স্বভাবের পার্থক্য, রাস্তায় প্রকাশ্যে তাদের যৌনবিহার ফলে কত রকম অসুবিধার সামনে পড়তে হয় ইত্যাকার কথাবার্তা অবশেষে পৌঁছল, কুকুরের সঙ্গে মানুষের যৌন তাড়নার তুলনামূলক বাদানুবাদে।

"কুকুর জানোয়ার হতে পারে কিন্তু মানুষের মত বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই গরম হয় না। ওদের সিজন আছে, শুধু সিজনেই মেট করে আর আমরা, মানুষরা?" এক যুবক বাঁকা স্বরে কথাটা বলে জামার গলা ঢিলে করে পাখার নীচে বসল। মাস ছয়েক তার বিয়ে হয়েছে।

"এ বিষয়ে বউমা কি বলেন, সেটা না জানা পর্যন্ত আর এসব কথা নয়।" কাজে ব্যস্ত হওয়ার ভান করে এক মাঝবয়সী আলোচনা বন্ধ করে

দিলেন।

কিছুক্ষণ পর মোহিত এসে সত্যেনের কাছে দাঁড়াল। পঁচিশ বছর বেয়ারার কাজ করছে। নম্র, বিনীত, অল্পকথার মানুষ। অল্পবয়সী কেরানীরা ওকে 'মোহিতদা' বলে ডাকে।

"বিষ দিয়ে কুকুর মারুন। দু-চারটে মরলেই দেখবেন ঠাণ্ডা, আর কামড়াতে আসবে না। আমার পাড়াতেও কুকুরের উৎপাত ছিল, এখন একদম নেই।"

"তুমি মেরে দিলে?"

"হ্যাঁ, একসঙ্গে তিনটে।"

"বিষ পাব কোথায়?"

"আমার শালা ওষুধের ল্যাবরেটরিতে কাজ করে। ওখানকার এক কেমিস্ট তৈরি করে ওকে দিয়েছিল। বললে এনে দিতে পারে।"

"কি করে বিষ খাওয়াব?"

"কেন, কিছু একটা খাবারের মধ্যে, সন্দেশ বা কেক বা পাঁউরুটির মধ্যে পুরে ছুঁড়ে দেবেন। কপাৎ করে খেয়ে নেবে।"

"তক্ষুনি মরে যাবে?"

"না না তক্ষুনি কি মরে! সকালে দেখবেন মরে পড়ে আছে।"

"এনে দাও তো আমায়। পয়সা লাগবে?"

"সে সামান্য দু-পাঁচ টাকা। তবে খুব সাবধান, পাড়ার লোক যেন না জানতে পারে আর নিজেও সাবধান, হাতে-টাতে লাগলে তক্ষুনি সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন। এতে মানুষও কিন্তু মরে।"

মোহিত চলে যাবার পরই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে সত্যেন ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠল। তা হলে এবার শয়তানটাকে শায়েস্তা করার মোক্ষম জিনিস সে পেয়েছে! আর কোনদিন ওখানকার মানুষ আতঙ্কে চলাফেরা করবে না! বাবুলকে যদি কামড়াতই তা হলে কি অবস্থা ওর হত? যন্ত্রণাকর চোদ্দটা ইঞ্জেকসন! জলাতঙ্কও হতে পারে, মারাও যেতে পারে! অথচ সে কিছুই করেনি, রাস্তা দিয়ে শুধু হেঁটে যাচ্ছিল। এজন্য চড়াও হয়ে কামড়ে মাংস ছিঁড়ে নেওয়া?... সত্যেন দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিল, বিষ খাইয়ে শয়তানটাকে মারাই উচিত।

অফিস থেকে ফেরার সময় সে একটি ছাড়া কোন কুকুরই দেখতে পেল না। বস্তির কিছু মেয়ে-পুরুষ রাস্তার ধারে বসে কথা বলছে। বাতির নীচে হাঁড়ি নিয়ে বসে এক ঘুগনিওয়ালা। রাস্তায় এখন লোক চলাচল খুবই কম। রাত আটটার পর একদমই লোক চলে না কেন না লোকালয় ক্রমশই পাতলা হয়ে গেছে দু-তিনটি হাউজিংয়ের পরই। ট্যাক্সি বা স্কুটার হয়তো কচিৎ দেখা যায়।

কালুয়াকে দেখতে না পেয়ে সত্যেনের কিছুটা আশাভঙ্গ হল এবং সেজন্য রেগেও উঠল। শয়তানটা গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। ওর চালাকি ভাঙব...দেখব, কেমন করে বাঁচে। হঠাৎই, একটা চ্যালেঞ্জের মত ব্যাপার হিসাবে এটাকে মনে করে সে উত্তেজিত হয়ে উঠল।

দূর থেকে দুটি কুকুরকে দুলকি চালে আসতে দেখে সত্যেন থমকে গেল। বস্তির লোকেরা তার কাছাকাছিই। ভয় কাটিয়ে পায়ে-পায়ে সে এগোল। কালুয়া আর সেই পেট-ঝোলা মাদিটা। ওরা তার পাশ দিয়েই চলে গেল। সত্যেনের মনে হল, শয়তানটা একবার যেন তার দিকে তাকাল। সিরসির করা শিরদাঁড়াটা সোজা রেখে সে বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছল।

তিনদিন পর মোহিত তাকে একটা মোড়ক দিল দেশলাই বাক্সের মধ্যে। দাম নিল দশ টাকা।

"খুব সাবধানে হাত লাগাবেন কিন্তু।... বড় কুকুর হলে এক চিমটেতেই কাজ হবে। মোটামুটি পাঁচ-ছটা মারার মত মাল এতে আছে।"

বাক্সটা পকেটে রেখে সত্যেন অস্বস্তিতে পড়ল। কি রকম একটা ভয় যেন সে পাচ্ছে। কিভাবে এটা খাওয়াবে? যদি বুঝে ফেলে খেতে না চায় আর তাকে যদি খুনী হিসাবে চিনে রাখে? জানোয়াররা নাকি এসব ব্যাপার ভাল বোঝে আর ওদের স্মৃতিশক্তিও নাকি দারুণ। জামাকাপড়ের বা গায়ের গন্ধ ওরা মনে রাখতে পারে বহুদিন। তা ছাড়া এটা খেয়ে যদি না মরে? হয়তো শুধুই পেট-খারাপ হল, বমি করল তারপর ঠিক হয়ে গেল। তখন তো আরো ডেঞ্জারাস হয়ে উঠবে। তবে মোহিত বাজে কথা বলার লোক নয়, পঁচিশ বছর ধরে ওকে সে দেখছে তো!

বাস থেকে নেমে মিনিট ছয়েক হেঁটে একটা মোড়ে পাঁচ-ছটি দোকান। সিগারেট-পানের, স্টেশনারির, মিষ্টির তারপর মুদির দোকান। সত্যেন সস্তার একটা কেক মুদির দোকান থেকে কিনল। কিছু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। মাঠের মাটি ভিজে, রাস্তায় মাঝে মাঝে জল জমে। বস্তির লোকজন কেউ বসে নেই, একটা কুকুরও দেখতে পেল না।

সে একটু দমে গেল। তার মনে হল, মারতে হলে মনের ভিতরে একটা তীব্রতা না থাকলে কাজটা সম্পন্ন করা যায় না। খুনীরা এজন্যই মদ-টদ খেয়ে নিজেদের খেপিয়ে নিয়ে কাজে নামে। তবে ঠাণ্ডা মাথায়ও অনেকে খুন করে, স্বদেশীরা করত। ওদের একটা সঙ্কল্প বা উদ্দেশ্য ছিল। দেশপ্রেম, দেশকে স্বাধীন করা, অত্যাচার পীড়ন দেখে দেখে আর সয়ে সয়ে মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওরা মারত, নিজেরাও মরত। সত্যেনের খুড়শ্বশুর ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। ধরা পড়ে, ফাঁসিও হয়। তাঁর একটা ছবি শ্বশুরবাড়ির বৈঠকখানার দেয়ালে এখনো ঝোলান আছে। খুবই মলিন তার কাচ ও ফ্রেম। প্রেরণা পাওয়ার মত স্বচ্ছ নয়।

কিন্তু সত্যেন এই মুহূর্তে কুকুর মারার জন্য তীব্র ইচ্ছা অনুভব করছে না। কিন্তু এটা তার খুবই দরকার। সামনের বাড়ির অরুণ দত্তর একতলার জানলায় আলো জ্বলছে। সত্যেন বাড়িতে ঢুকে কলিং বেল টিপল। দরজা খুলল ঝি। ভিতরের ঘর থেকে উঁকি দিল অরুণ দত্তর বউ।

"অরুণবাবু আছেন কেমন?"

"আজ বিকেলেই নার্সিংহোমে ভর্তি হলেন।" ধীর কিন্তু উদ্বিগ্ন স্বরে বলল। "পা-টা খুব ভাল ঠেকছিল না। ডাক্তারবাবু সকালে দেখে বললেন, হয়তো অপারেশন করতে হতে..."

সত্যেন অবাক হবার মত অবস্থায় পৌঁছে গেছে। অপারেশন কেন? পা কেটে বাদ দিতে হবে নাকি? কিন্তু এ-কথাটা তো ওঁকে জিজ্ঞাসা করা যাবে না, তা হলে আরো ভয় পেয়ে যাবে।

"কি কাণ্ড দেখুন তো, এভাবে কুকুর কামড়ে মানুষের কত ক্ষতি করল। কত অর্থব্যয়, কত শারীরিক কষ্ট, আত্মীয়স্বজনদের দুশ্চিন্তা...কিছু একটা করা দরকার।" সত্যেন টের পাচ্ছে সে উত্তেজনা অনুভব করছে। তা-ই নয়, অবলম্বন রূপে একটা উদ্দেশ্যও পাচ্ছে...কত ক্ষতি, কত কষ্ট! নিজের উদ্বেগ, সহানুভূতি ও কিছু সান্ত্বনা জানিয়ে সে বাড়ি ফিরে এল।

বিকেল থেকে সুপ্রভার শ্বাস ওঠায় সে রান্না করতে পারেনি। কোলে বালিশ নিয়ে বিছানায় বসে। বাবুল আটটার আগে অফিস ও আড্ডা থেকে ফেরে না। সত্যেন ভাত ফুটিয়ে, মাছের ঝাল রেঁধে রেখে কলঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে, দরজা বন্ধ করল।

উবু হয়ে বসে, সন্তর্পণে দেশলাই বাক্সটা খুলে দেখল পাতলা কাগজে ওষুধের পুরিয়ার মত ভাঁজ করা। দু আঙুলে টিপে বুঝল জিনিসটা পাউডারের মত। ধীরে ধীরে সাবধানে ভাঁজ খুলে দেখল সাদা গুঁড়ো। গন্ধ শুঁকতে গিয়েও নাক তুলে নিল। নিঃশ্বাসের সঙ্গে যদি ভিতরে চলে যায়!

কেকটা কপাৎ করে খাওয়ার পক্ষে বড়ই, তাই দু-আধখানা করে নিয়েছে। পেরেক দিয়ে খুঁচিয়ে গর্ত করে শক্ত একটা কাগজে খানিকটা বিষের গুঁড়ো তুলে সে গর্তে রাখল। আঙুলে টিপে টিপে গর্তের মুখ বুজিয়ে ফেলে কেকের টুকরোটা কাগজে মুড়ে নিল। কলঘর থেকে বেরিয়ে আসার আগে শক্ত কাগজটা প্যানের মধ্যে ফেলে সিস্টার্ন টেনে দিয়েছিল। সমস্যা হল, দেশলাই বাক্সটা কোথায় লুকিয়ে রাখবে? শোবার ঘরে নয়, রান্নাঘরে তো নয়ই। ভেবে-চিন্তে অবশেষে ঠিক করল, পাঞ্জাবির পকেটেই থাকুক, অফিসে তার ড্রয়ারে কাল রেখে দেবে। কেকের বাকি আধখানা, যাতে বিষ নেই, সেটা বাড়িতেই থাকুক পরে কাজে লাগতে পারে। তবে বিষাক্ত টুকরোটা পকেটে রাখল। এটাও সঙ্গে নিয়ে অফিসে যাবে, কাল বাড়ি ফেরার সময়, যদি ভগবান সদয় হন, শয়তানটাকে যদি তিনি এগিয়ে দেন কেকটা গেলাবার জন্য! সত্যেন উত্তেজনায় রাতে ঘুমোতে পারল না।

পরদিন অফিসে বেরোনোর মুহূর্ত থেকে তার স্নায়ুগুলো টানটান হয়ে উঠল। রক্ত চলাচলের বেগ বেড়ে উঠে শরীরটা ঝিমঝিম করতে লাগল। সারাদিন এই অবস্থায় একটা ঘোরের মধ্যে সে অফিসে কাটাল। কুকুরটার চেহারা, ভাবভঙ্গি অবিরত তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। মনে মনে সে মহড়া দিল কিভাবে কেকটা ওকে দেবে—দূর থেকে ছুঁড়ে, না কাছে এলে হাতে নিয়ে অপেক্ষা করবে? হাত থেকে খাওয়ানটা কি নিরাপদ? যদি টের পেয়ে যায় তাকে মারার ষড়যন্ত্র হয়েছে, কেকে বিষ আছে, তা হলে কামড়ে দিলেও দিতে পারে! জানোয়ারদের অদ্ভুত একটা সিক্সথ সেন্স আছে। হঠাৎ আদিখ্যেতাকে ওরা সন্দেহ করবেই।

একটু দেরি করে ফেরার জন্য সত্যেন অফিস থেকে বেরিয়ে গঙ্গার দিকে গেল। অনেক দিন পর এই নদী দেখতে তার ভাল লাগল। কৈশোরে আহিরিটোলা ঘাটে সাঁতার কাটার, পাড়ার দুর্গা আর কালীপুজোর ভাসানের কথা তার মনে পড়ল। বাবুঘাটে অনেকক্ষণ বসে তার শরীর ও মন স্নিগ্ধ, ঢিলেঢালা হয়ে গেল। অবশেষে সে বাসে উঠল বাড়ি ফেরার জন্য।

দূর থেকেই দেখল বস্তির কয়েকটি শিশু রাস্তায় খেলা করছে। কয়েকজন বয়স্কা মেয়েমানুষ বসে গল্প করছে। কুকুর? সত্যেনের চোখ খুঁজে বেড়াল। রাস্তার নিয়ন আলোয় পাতাবাহারি গাছগুলোর নীচে একটা সাদা পুঁটুলির মত দেখেই তার মাথার মধ্যে রক্ত ছুটে এল। পেয়েছি একটাকে!

স্বাভাবিক কদমে হাঁটার চেষ্টা করেও তার পা জড়িয়ে আসছে। লক্ষ করল তাকে কেউ দেখছে কিনা। শিশুরা ওই দিকটায় যাচ্ছে না দেখে সে আশ্বস্ত হল। পকেটে হাত দিয়ে কেক মোড়া কাগজটার সঙ্গে দেশলাইটাও পেল। আশ্চর্য, এটা ড্রয়ারে রেখে দিতে ভুলে গেছে!

সেই মাদি কুকুরটা! সত্যেনকে দেখেই মুখ তুলল।

"আয়, আয়, চু চু।"

উঠে দাঁড়িয়েছে। কাগজের মোড়কটা খোলার সময় হাতটা এমনই কেঁপে গেল যে কেকের টুকরোটা রাস্তায় পড়ে গেল। নিচু হয়ে তুলতে গিয়েও তুলল না। যদি ছুটে এসে কামড়ে দেয়?

কিন্তু ছুটে এল না, বরং ল্যাজটা নাড়াল। তারপর সত্যেনকে স্তম্ভিত করে সে এগিয়ে এসে কেকের টুকরোটা শুঁকেই মুখে তুলে চিবোতে শুরু করল। আর পায়ে পায়ে পিছিয়ে গিয়ে সত্যেন ভীত একটা আর্তনাদ করে প্রায় ছুটেই পালাতে লাগল।

বাড়িতে ঢুকতেই সুপ্রভার সঙ্গে মুখোমুখি। তার মুখের দিকে তাকিয়ে সুপ্রভা অবাক স্বরে বলল, "ভূত দেখেছ নাকি?"

শরীর খারাপের অজুহাত দিয়ে সে শুয়ে পড়ল। রাত্রে খেল না, ঘুমোতেও পারল না। পরদিন অফিস যাবার সময় দেখল রাস্তা প্রতিদিনের মতই স্বাভাবিক। বস্তির ভিতর থেকে ঝগড়ার আর কুকুরের ডাকের আওয়াজ পেল। কোথাও মরা কুকুরের চিহ্নও নেই। বুক থেকে একটা ভার নেমে যাওয়ার স্বস্তি নিয়ে সে অফিস পৌঁছল।

এক সময় মোহিতকে ডেকে সে জানিয়ে দিল, "তোমার বিষে ভেজাল আছে। যা বলেছিলে সেইভাবেই একটাকে খাইয়েছি কিন্তু মরেনি।" সত্যেন ড্রয়ার থেকে দেশলাই বাক্সটা বার করে টেবলে রাখল। "নিয়ে যাও এটা, যে দিয়েছে তাকে বলো।"

"কবে খাইয়েছেন?"

"কাল সন্ধ্যার পর। রাস্তা থেকে নিজেই খেল। যতটা বলেছিলে ততটাই দিয়েছিলাম।"

"খোঁজ নিয়ে দেখুন মরেছে কিনা, তারপর ফেরত নেব।"

বাড়ি ফেরার সময়ও সে দেখল রাস্তা একই রকম। দু'তিনটে কুকুর ঘুরছে, এমনকি শয়তানটাকেও দেখতে পেল গ্রামাফোন রেকর্ডের কুকুরটার মত বসে আছে বস্তিতে ঢোকার গলিটার কাছে। একটি লোক তার পাশে বসেই ঘুগনি খাচ্ছে। সত্যেন কার কাছে আর খোঁজ নেবে? বাড়িতে কাউকে এ-সম্পর্কে কিছু বলল না।

তবে সে শুনল, অরুণ দত্তর পায়ে পচ ধরেছে, খুব সিরিয়াস অবস্থা, পা কেটে না বাদ দিতে হয়! পরের দিনই শয়তানটা কামড়াল কান্তি ঘোষের ভাইপোকে। বাড়িতে আত্মীয়রা এসেছিল। রাত হয়ে যাওয়ায় তাদের বাসে তুলে দিয়ে সে ফিরছে, তখন তাড়া করে কামড়ায়। তবে বস্তির একজন চেঁচিয়ে ওঠায় কামড়টা ভালমত দিতে পারেনি। চারটে সেলাই হয়েছে। শোনামাত্র সত্যেনের মাথা গরম হয়ে গেল।

কিন্তু সকালে ঠিকে ঝি একটা খবর দিল যেটা অপ্রত্যাশিত।

"একটা কুকুর পরশু থেকে মরে পড়ে আছে হাউজিংয়ের পিছনে পাঁচিলের গায়ে। দুর্গন্ধে ওদিককার ফ্ল্যাটের লোক টিকতে পারছে না। কর্পোরেশন আপিসে খবর দিয়েছে, এখনো কেউ আসেনি।"

আর সন্দেহ নেই কোন্ কুকুরটা। মোহিত খাঁটি মানুষ, ভেজাল জিনিস সে গছাবে না। সত্যেন আবার উত্তেজনার মধ্যে পড়ে গেল। আবার একটা ঘোর তার শরীরে, মনে লাগছে। তাহলে বিষটায় কাজ হয়েছে। তাহলে এবার শয়তানটাকে শেষ করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

বাসি কেকের টুকরোটা শক্ত হয়ে গেছে। আবর্জনার বালতিতে ফেলে দিয়ে সে স্থির করল, অফিসে মোহিতকে দিয়ে একটা কেক কিনে আনিয়ে নেবে। দেশলাই বাক্সটা ড্রয়ারেই রাখা আছে। অফিস ছুটির পর ঘরফাঁকা হয়ে গেলে তখন জিনিসটা তৈরি করে নেবে। আজই সন্ধ্যের পর যদি সুযোগ মেলে, তাহলে আজই পৃথিবীতে ওর শেষ দিন!

বিকেল থেকেই মেঘ ঘনিয়ে আসে। দেরিতে ফিরবে বলে সত্যেন ধীরে সুস্থে সময় নিয়ে কেকটা তৈরি করে অফিস থেকে যখন বেরোল তখন প্রথমবার বিদ্যুৎ চমকে উঠল। বাতাসে ঠাণ্ডা ভাব। বাসে ঠাসা ভীড়। বৃষ্টি নামার আগেই সবাই বাড়ি পৌঁছতে চায়। সত্যেন ঠেলেঠুলে তার বাসে উঠল। তাকেও বৃষ্টির আগে পৌঁছতে হবে। কিন্তু বাস থেকে নামার আগেই ফোঁটা ফোঁটা পড়ছিল, নামামাত্রই চড়বড়িয়ে বড় বড় ফোঁটায় শুরু হল। একটা কোন আশ্রয় নেই যার তলায় দাঁড়ান যায়। সত্যেন বাড়ির দিকে ছুটল।

মাঠটা পার হয়েই বুঝল ছোটাটা অর্থহীন। যে বেগে নামছে তাতে ভিজে ঢোল হয়ে যেতে হবে বাড়ি পৌঁছনোর আগেই। পাঠশালার ঢাকা রকটা দেখে সে দৌড়ে বস্তির গলিতে ঢুকে রকে উঠে পড়ল। আর সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ ঝলসানির সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে মেঘ ডাকল আর জলের ধারা প্রবল তোড়ে নামতে থাকল।

খুব বেঁচে গেছি। সত্যেন হাঁফ ছাড়ল। আর কয়েক সেকেণ্ড দেরি হলেই চুবিয়ে দিত। কপালের জল মোছার জন্য রুমাল বার করতে গিয়ে কেকের টুকরোটা হাতে ঠেকল। এটার আজ আর দরকার হচ্ছে না। এমন বৃষ্টিতে জানোয়ারও বেরোবে না।

বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ নেই। একই বেগে ঝরছে আর সঙ্গে হাওয়ার ঝাপটা। রাস্তার নিয়ন আলো ছাড়া চারিদিকে আর কোন আলো নেই। সব বাড়ির জানলা বন্ধ। বিদ্যুৎ চমকানোর সঙ্গে সে দেখতে পাচ্ছে নির্জন গলি। বৃষ্টিটা চাদরের মত ঝুলে রয়েছে, দমকা বাতাসে চাদরটা নড়ে উঠলেই নিয়ন আলোর কণিকা ঝলমল করে উঠছে। সত্যেন মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিল।

হঠাৎ তার শরীর সির সির করে হাতের লোম খাড়া হয়ে উঠল। কেউ একজন রকে রয়েছে। বিদ্যুৎ চমকাতেই দেখল রকের একপ্রান্তে বসে আছে শয়তান। মুখটা তার দিকেই ফেরান। সত্যেন থরথর করে উঠল। এক পা পিছতেই দেয়ালে পিঠ লেগে গেল।

কুকুরটা গা ঝাড়া দিল। ধোঁয়ার মত জলের গুঁড়ো ওর লোম থেকে ছিটকে রাস্তার আলোয় ছিটকে বাষ্পের মত উঠল। আর সত্যেনের মনে হল একটা অলৌকিক জীব তার সামনে। মুখটা ঘুরিয়ে সত্যেনের দিকে তাকিয়ে। চোখ জ্বল জ্বল করছে।

আমাকে কি চিনেছে ? বুঝে গেছে কি পকেটে ওকে মারার বিষ রয়েছে ? ওদের সিক্সথ সেন্স নাকি প্রখর ! মাদিটাকে কে মেরেছে তা কি ও জানে ? এখন যদি বাড়ির দিকে দৌড় দিই, তাহলে কি তাড়া করে কামড়াবে ? দৌড় একদম নয়। তাহলে !

বৃষ্টির ছাট, হাওয়ার দমকায় রকটায় আছড়ে পড়ল। কুকুরটা সরে এল সত্যেনের দিকে। আর সত্যেন পকেটে হাত ঢুকিয়ে কেকটা আঁকড়ে রইল। কুকুরটা আরো সরে এল। ভয়ে একটা কাতরানি তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতেই কুকুরটা মুখ তুলে তাকাল। অন্ধকারে চোখ দুটো জ্বল জ্বলে দেখাচ্ছে। সত্যেনের মনে হল, যদি দাঁড়িয়ে ওঠে তাহলে গলার কাছে ওর দাঁত পৌঁছবে। শয়তান মুখ তুলে তার গলা পর্যন্ত দূরত্বটা আন্দাজ করছে।
দুজনের মধ্যে হাত ছয়েকের ফাঁকা জায়গা। সত্যেন এখনো দু হাত পিছিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাতে কি লাভ ! কুকুরটাও তাহলে সরে আসবে। জল উঠতে উঠতে রকের প্রায় সমান-সমান। অল্প বৃষ্টিতেই এই অঞ্চলে হাঁটু জল জমে আর এখন তো তোড়ে অন্তত পনেরো মিনিট হচ্ছে।

হঠাৎ প্রচণ্ড ঝলসানি দিয়ে ডান দিকে হাউজিংয়ের একটা টি ভি অ্যান্টেনায় বাজ পড়ল। সত্যেনের মুখে গরম হলকা লাগল, চোখ বন্ধ করে ফেলে সে ঠক ঠক কেঁপে উঠল আর ক্ষীণ আর্তনাদ করে কুকুরটা গুঁড়ি মেরে তার পায়ের কাছে সরে এল। দমকা হাওয়ার সঙ্গে জলের একটা ঝাপটা আসতেই সত্যেন পিছিয়ে যাবার জন্য পা সরাতেই মাড়িয়ে ফেলল কুকুরের পা। তার বুকটা হিম হয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। অবধারিত এইবার দাঁতগুলো বসবে তার গোছের কিংবা হাঁটুর কাছে। একটা মোচড় দিয়ে এক খামচা মাংস তুলে নেবে। দাঁতে দাঁত চেপে, দু হাত মুঠো করে সে তৈরি। তাকে এবার কামড়াবেই। এই সময় আবার একটা বিদ্যুতের ঝলসানি হতেই সে "মা গো" বলে দু হাতে কান ঢাকল এবং দেয়ালের দিকে মুখ ফেরাল। আগেরটার থেকে কিছুটা দূরে এবারের বাজটা পড়ল। কুকুরের কুঁই কুঁই কাতরানি তার কানে এল।

বিমূঢ়ত্বটা কেটে যেতেই দেখল কুকুরটা তার দু পায়ের ফাঁকে প্রায় মুখটা গুঁজড়ে। এবার সে সরে যাবার চেষ্টা করল না। তার মনে হচ্ছে, কুকুরটা তাকে আক্রমণ করবে না। আরো মনে হচ্ছে, কুকুরটা ভয় পেয়ে তার কাছ থেকে বোধ হয় ভরসা চাইছে।

সত্যেনের স্নায়ুগুলো ঢিলে হয়ে গেল। বিরক্ত হল সে নিজের উপর। কেন যে মরতে এই পাঠশালার রকে উঠলাম ! নয় একটু ভিজতামই তবু সোজা বাড়ি চলে গেলেই ভাল হত। এই বৃষ্টি কখন যে থামবে কে জানে। এর পর সে কুকুরটার দিকে ঘাড় নিচু করে তাকাল। এটাই বা এখানে কেন ! বস্তির যে কোন ঘরেই তো গিয়ে ঢুকতে পারত। নাকি তার মতই ভেবেছিল, বৃষ্টি তো কিছুক্ষণ বাদেই ধরে যাবে, ততক্ষণ বরং এই রকে আশ্রয় নেওয়া যাক। নিচু জমির বস্তিতে এখন আর দাঁড়াবার মত ডাঙ্গা থাকা সম্ভব নয়।

সত্যেন দ্বিধায় পড়ল। বাড়ির দিকে এখনি রওনা হবে, নাকি আর একটু অপেক্ষা করে দেখবে ! চোখ কুঁচকে মুখ তুলে এক দৃষ্টে সে বৃষ্টির চাদরের দোলা দেখছে। মেঘ ভেদ করে দপ দপ করল লালচে বিদ্যুৎ। গুম গুম চার-পাঁচটা শব্দ গড়িয়ে গেল আকাশ দিয়ে। ভয় পাওয়ার মত কিছু তাতে নেই। মেঘটা সরে যাচ্ছে বাজ ফেলতে ফেলতে।

চমকে পা সরিয়ে নিল সে। কুকুরটা চেটে দিয়েছে।

"অ্যাাই, ধ্যেৎ ধ্যেৎ"। সত্যেন ধমকে উঠল, পা ঠুকল এবং জুতোর ডগা দিয়ে মুখটা সরিয়ে দিল। ব্যাটা ভয় পেয়েছে। এখন তাকে কাছে রাখার জন্যই এইসব চাটা-ফাটা...শালা শয়তান ! সত্যেনের মাথা গরম হয়ে উঠল। মনে থাকে না মানুষকে কামড়াবার সময় ? এখন যদি তোকে কেকটা দিই কি হবে ? কপাৎ করে তো গিলে ফেলবি ! নিজের মনেই সে গজ গজ করে চলল। ব্যাটা কুত্তা, এতগুলো মানুষকে কামড়ে মাংস ছিঁড়ে নিয়েছিস, একটা লোক তোর জন্যই পা হারাতে বসেছে ! আর শালা শয়তান, তুই কিনা সেই মানুষেরই কাছে কিঁউ কিঁউ করছিস ভয় পেয়ে ?

"ভাগ ব্যাটা।" সত্যেন হঠাৎ লাথি কষাল পাঁজরে। এক পা পিছিয়ে গেল কুকুরটা, ভীত শব্দ তুলে।

এইবার যদি তোকে খেতে দি ? সত্যেন পকেট থেকে কাগজে মোড়া কেকের টুকরো বার করল। তুই তো খাবিই। হ্যাংলার জাত, যা পাবি তাইই তো খাস, এটা তো দারুণ জিনিস তোর কাছে। মোড়কটা ভিজে গেছে। কেকের সঙ্গে সেঁটে যাওয়া কাগজ ছাড়াতে ছাড়াতে সে লক্ষ করল কুকুরটা মুখ তুলে তাকিয়ে, লেজটা অল্প অল্প নড়ছে।

ধীরে ধীরে কেক সমেত হাতটা সে পকেটে ভরে নিল। শয়তানটা বুঝতে পেরেছে, এটা খাবার জিনিস।

"কি রে, খাবি ?"

লেজটা জোরে জোরে নেড়ে কুকুরটা ছটফট করে উঠল। কুঁ কুঁ শব্দ বেরোচ্ছে মুখ থেকে। কোমর থেকে পিছনটা ঘন ঘন নড়ছে। সামনের পা দুটো অধৈর্যে তুলছে আর নামাচ্ছে। এগিয়ে এসে সত্যেনের গা ঘেঁষে মুখটা তুলে ছোট্ট করে তিনবার ডেকে উঠল। পকেট থেকে কেকের টুকরোটা বার করে সে হাতটা উঁচু করে তুলে ধরে রইল। কুকুরটা এবার দ্বিগুণ ছটফটানি শুরু করল।

"এইবার ? এইবার ?"

কুকুরটা হঠাৎ সামনের পা দুটো সত্যেনের পেটে ঠেকিয়ে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। তখন সে হাতটা আরো উঁচুতে তুলল।

"কিরে ব্যাটা, মরতে চাস ? তোর প্রাণ এখন আমার হাতে, তা কি জানিস ?"

বলার পরই সত্যেন অদ্ভুত একটা মজা বোধ করল। "প্রাণ" এই ছোট্ট শব্দটা ঝন ঝন শব্দে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত বজ্রের মত গড়িয়ে নেমে গিয়ে আবার উঠে এল। এই কুকুরটারই হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাড়ি ফেরার সময় সেদিন যেমন সে ভয় পেয়ে গেছল অনেকটা সেই রকম একটা আতঙ্ক এখন তাকে যেন ছুঁয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে করলেই এখন সে আবার খুন করতে পারে, কেউ জানবে না, বুঝতে তো পারবেই না। একটা প্রাণ এখন তার হাতে ! তারই দয়ার উপর ! অদ্ভুত তো ?

বৃষ্টির তেজ কমে এসেছে। ইতিমধ্যে জল রকে উঠে পায়ের গোছ এবং জুতো যে ডুবিয়ে দিয়েছে সে হুঁশ তার ছিল না। পেটে নখের অধৈর্য আঁচড় সুড়সুড়ি দেবার মত লাগছে। সত্যেন কেকের টুকরোটা একটু নামিয়েই আবার তুলে নিল। কুকুরটা কাতরানির মত শব্দ করে ডেকে উঠল।

"ছুঁ ছুঁ বাব্বা, এটা টপাস করে ফেলব আর কপাত করে গিলবি, সেটি হচ্ছে না। ভাগ ভাগ্।" সত্যেন তালু দিয়ে ওর মুখে সজোরে ধাক্কা দিল। টাল খেয়ে কুকুরটা পা দুটো নামিয়ে নিয়েই চাপা গজরানির মত শব্দ করল।

"ওসব ফোতো রাগ আমাকে দেখালে এমন লাথ কষাব না...তোকে বাঁচিয়ে রাখছি আর শালা আমাকেই কি না..." সত্যেন লাথি ছোঁড়ার জন্য পা তুলে টলে পড়ে যাচ্ছিল। দেয়ালটা ধরে নিজেকে সামলাচ্ছে তখনই হাত থেকে কেকের টুকরোটা মেঝেয় জলের উপর পড়ে গেল। নীচু হয়ে সেটা সবে তুলেছে তখনই কুকুরটা ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং কব্জির কাছে কামড়ে ধরল। ঝটকা দিয়ে হাতটা সরিয়ে নিতেই কুকুরটা দ্বিতীয় বার আক্রমণ করে বাহু কামড়ে ধরতেই পিছিয়ে যেতে গিয়ে সত্যেন গড়িয়ে রক থেকে জলে পড়ল। কেকের টুকরোটা আবার হাত থেকে মেঝেয় ভাসছে।

রাস্তার আলোয় যতটুকু দেখা যায়, বাহুটা তুলে ফ্যাল ফ্যাল করে সে তাকিয়ে। সাদা হাড়ের আভাস যেন দেখা যাচ্ছে। খোদলটা ক্রমশ ভরে উঠছে রক্তে। পাঠশালার রকের উপর জলে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে কুকরটা মুখ নিচু করে চিবোচ্ছে। সত্যেন ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। জল হাঁটু ছাড়িয়ে গেছে। পালাবার জন্য নিজেকে টানতে টানতে সে জলের মধ্য দিয়ে রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল।

রাস্তায় হাঁটুর নীচে জল। টলতে টলতে সে এগোচ্ছে। বৃষ্টি প্রায় থেমেই গেছে। নিস্তব্ধ এবং জনশূন্য চারিদিক। সে একবার পিছন ফিরে তাকাল। পাঠশালার রকে জলবন্দী হয়ে একটা অবয়ব নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। সত্যেনের চোখ জলে ভরে উঠল। যন্ত্রণা শুরু হয়েছে তার হাতে।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

সোল-এ কোরিয়রাই জয়ী

রূপক সাহা

দক্ষিণ কোরিয়া আগামী অলিম্পিকের অনুষ্ঠান সফলভাবে করতে পারবে কী না, সে সম্পর্কে একটি ব্যাপক সমীক্ষা এবার সোল এশীয় গেমসের সময় করা হচ্ছিল। সমীক্ষার উদ্যোক্তা ওখানকার একটি সংবাদপত্র। অনেক কাগজপত্র আমাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চোখ বোলাতে বোলাতে দেখলাম তাতে একটি প্রশ্ন : দিল্লি এশীয় গেমসের তুলনায় সোল কতটা সফল ? প্রশ্নটা কিছুটা বিব্রত করার মতই—অন্তত আমাদের। দিল্লি এশিয়াডে সাংগঠনিক ত্রুটি বিচ্যুতির কথা আলোচনা করা এখন এই মুহূর্তে নিরর্থক। চার বছর পর লাভ-ক্ষতির হিসাব নিকেশ করা হলে, দেখা যাবে দিল্লি এশিয়াড কয়েকটি স্টেডিয়াম বা সুইমিং পুল ছাড়া আমাদের আর কিছুই দেয়নি। দিল্লি এশিয়াড আমাদের কাছে আরো বেশি সফল মনে হত, বিরাট ওই ক্রীড়াযজ্ঞের নির্যাসটুকু তুলে নিয়ে আমরা যদি সোল গেমসে ভালো ফলাফল দেখাতে পারতাম। সেদিক থেকে সোল গেমস অনেক অনেক পরিমাণে সফল। অস্বীকার করার উপায় নেই। গেমসের আয়োজন করে কোরিয়রা এই প্রথম এশিয় ক্রীড়ায় অন্যতম সুপার পাওয়ার হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। দিল্লিতে হাজার কোটি টাকা খরচ করেও যা আমরা করতে পারিনি।

সোলে পৌঁছবার পরদিনই সংবাদপত্রে দেখলাম, কোরীয় কর্তারা বলেছেন, গেমসে তাঁদের লক্ষ্য ৬৯টি সোনা জেতা। গেমস যেদিন শেষ হল, দেখলাম কোরিয়রা তাঁদের লক্ষ্য পূরণ করেও পৌঁছে গেছেন চীনের কাছাকাছি। পেয়েছেন লক্ষ্যেরও বেশি চব্বিশটি সোনার পদক। চারদিকে গুঞ্জন, ওঁরা কারচুপি করেছেন। চীনা কর্তারা তো সাফ বলেই ফেললেন, "কোরীয়রা অসৎ উপায়ে বহু পদক জিতেছেন।" জোচ্চুরি করে আর যাই হোক, ৯৩টি সোনা জেতা যায় না। সংগঠনের দায়িত্ব হাতে পেয়ে ওঁরা অনেক সুবিধা নিয়েছেন—এ কথা ঠিক। কিন্তু সেই সঙ্গে খেলার গুণগত দিক থেকেও যে ওঁরা নিজেদের চীন - জাপানের কাছাকাছি তুলে নিয়ে গেছেন, এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই। টেবল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, হকি এমন কি জিমন্যাস্টিকসেও কোরীয়রা চাঞ্চল্যকর ফল করেছেন। বিশ্বমানের টিম বা খেলোয়াড়দের কি স্রেফ জোচ্চুরি করে হারানো কখনও সম্ভব ?

সোল গেমসে উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি দেখার পর আমরা খুব আত্মতৃপ্ত ছিলাম, এই অনুষ্ঠানটিতে অন্তত কোরীয়রা দিল্লিকে টেক্কা দিতে পারেননি। কিন্তু দিন এগিয়ে যাবার ফাঁকে ফাঁকে আমরা ক্রমশই টের পেতে থাকলাম, সাংগঠনিক দক্ষতায় কোরীয়দের তুলনা নেই। দু'বছর পর ওরা অলিম্পিক্স করছেন। পুরো এশীয় গেমসই তার মহড়া। সেই কারণে ওঁরা সর্বাত্মক চেষ্টায় নেমেছিলেন, যাতে কেউ ত্রুটি ধরতে না পারেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধিদের কাছে নানাভাবে ওঁরা পরামর্শও চেয়েছেন, কীভাবে অলিম্পিক ত্রুটিহীন করা যায়। একদিন সাংবাদিক সম্মেলনে ফিফা-র ভাইস প্রেসিডেন্ট কলোনভ তো বলেই ফেললেন, অলিম্পিক ফুটবলের জন্য পরিকাঠামো দেখতে এসে এখানে শুধু একটি খুঁত ধরতে পেরেছি। ড্রেসিং রুমের লকারগুলো যথেষ্ট বড় নয়। প্রবল হাস্যধ্বনির মধ্যে উনি আর কোনও কথাই বলতে পারলেন না। কলোনভের মত অবশ্য সবাই সন্তুষ্ট নন। অ্যাথলেটিক্স সংস্থার প্রতিনিধি এসেছিলেন ব্রিটেন থেকে। নামটা মনে করতে পারছি না। তিনি কিন্তু ওলিম্পিক স্টেডিয়ামের টার্টান ট্র্যাকে মার্কিংয়ে গুরুতর ত্রুটি ধরেছেন। সাইনি অ্যাব্রাহাম যেদিন নিজের লেন থেকে ভুল করে অন্যের লেনে ঢুকে নিশ্চিত সোনাটি হারালেন, সেদিনই তিনি মার্কিংয়ে ওই ভুলটি ধরেন। আট শো মিটার দৌড়ে ফ্ল্যাগ পোস্টের কয়েক মিটার আগে ট্র্যাকে উদ্যোক্তারা একটি তীরচিহ্ন দিয়ে রেখেছিলেন। পনেরো শো মিটারে যাঁরা দৌড়বেন, তাঁরা ওই তীর চিহ্ন দেখেই ইচ্ছে করলে ভিতরের লেনে ঢুকে যেতে

জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধনেই শুধু নয়, সোলে দক্ষিণ কোরিয়া পদক জয়েতেও চমক লাগিয়েছে

পারেন। কিন্তু ওই তীর চিহ্নটি দেখে আট শো মিটারের প্রতিযোগীরা ভুল করেছেন। ভেবেছেন, তাঁরাও নিজেদের লেন ছেড়ে ভেতরের লেনে ঢুকতে পারবেন ওই তীর চিহ্নের পর থেকেই। সাইনি এই ভুলটিই করেছিলেন—পর পর দু'বার। আট শো মিটারে তো বটেই, এমন কি চারশো মিটার দৌড়েও—যাতে তিনি রূপা জেতেন। দ্বিতীয়বারের ভুলটি অবশ্য কোরীয় কর্তারা ইচ্ছে করেই ধরেননি (শুনেছি কোনও কোরীয় মেয়ে পদক সম্ভাবনার মধ্যে ছিল না বলেই)। ব্রিটেনের সেই অ্যাথলেটিক্স কর্তাটি ক্রীড়ামন্ত্রী মার্গারেট আলভাকেও বলেন, "ভুল মার্কিংয়ের কথা উল্লেখ করে আপনারা সাইনির পদকটি ফেরত চান। অবশ্যই পেয়ে যাবেন।"

এই সব দু'চারটি ভুল-ত্রুটি বাদ দিলে দিল্লি গেমসের তুলনায় সোল এবার বহুলাংশে সফল। সোলে কয়েকটি খেলাও হয়েছে বিশ্ব মানের। বিশ্ব রেকর্ডই তো হয়েছে ১১টি। অবশ্য সব ক'টিই তীরন্দাজীতে। এশীয় রেকর্ড ৯০টি (তীরন্দাজীতে ১৮, অ্যাথলেটিকসে ৮, সাইক্লিংয়ে ৮, শুটিংয়ে ৪৫ ও

সোলে মশাল প্রজ্বলনের অনুষ্ঠান
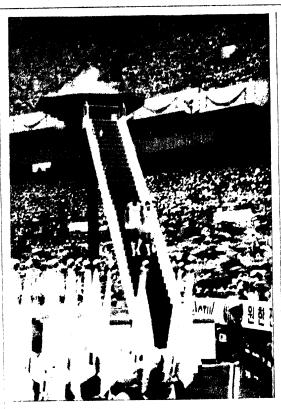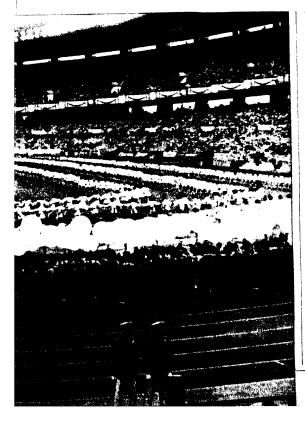
ভারোত্তোলনে ১০টি)। নতুন এশীয় গেমস রেকর্ড হয়েছে আরো বেশি ২২৪টি (তীরন্দাজীতে ২৯, অ্যাথলেটিকসে ৪১, সাইক্লিংয়ে ৩, শুটিংয়ে ২, সাঁতারে ১০৪ ও ভারোত্তোলনে ৩৩টি)। ষোল দিনের গেমস উত্তেজনার চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছলও ধাপে ধাপে। যার শুরু টেবল টেনিসে কোরিয়দের কাছে চীনাদের পরাজয় থেকে। শেষ অ্যাথলেটিকসে দু'টি রিলে জিতে পদক তালিকায় চীনাদের ফের শীর্ষে আরোহণ পর্বে। মাঝের ক'টি দিনেও চমকের অভাব ছিল না। চীনা জিমন্যাস্ট লি নিং, জাপানী সাঁতারু কাৎসুনোরি ফুজিয়ারা, কোরিয়ার মেয়ে তীরন্দাজ কিম জিন হো, টেবল টেনিস খেলোয়াড় কিউ নাম যু, মেয়ে অ্যাথলীট লিন চুন আয়ে, জাপানী অ্যাথলীট শিগোনবু মুরোফুসি, ভারতের পি টি উষা—একেক পর্যায়ে গেমসে পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছেন। বিরাট কৃতিত্ব দেখিয়ে গেলেন জাপানের হ্যামার থ্রোয়ার মুরোফুসি। পর পর পাঁচটি এশীয় গেমসে সোনা জিতে। মনে আছে, পঞ্চমবার সোনা জেতার পরই মুরোফুসি বলেছিলেন, "আগামীবার বেজিংয়ে আবার নামছি। সোনার লক্ষ্যে এবার আসিনি। ছেষট্টি সাল থেকে গেমসে আসছি। এখন একটা নেশার মত দাঁড়িয়ে গেছে। সোল রওনা হবার আগে কাঁধে চোট লেগেছিল। ভেবেছিলাম, এবার বোধ হয় আর পারব না। কী করে পারলাম, ভেবেই অবাক হয়ে যাচ্ছি।" সাংবাদিকরা ওঁকে ছেঁকে ধরেছিলেন। নানা প্রশ্ন, ঘণ্টা খানেক ধরে। উনচল্লিশ বছর বয়সী ওই থ্রোয়ারকে তাঁরা টলাতে পারেননি। প্রশ্নোত্তরের মাঝে বেরিয়ে এল কয়েকটি চাঞ্চল্যকর তথ্যও। হাঁটুতে জল জমেছিল। মাত্র দু'মাস আগে তিনি অস্ত্রোপচার করান। শারীরিক বল-ই নয়, অসাধারণ মনোবল মুরোফুসির। ধারাবাহিক সাফল্যের উৎস, তিনি জানালেন—তাঁর রোমানীয় স্ত্রী। পঞ্চম থ্রো-তে পঞ্চম সোনাটি পেলেন। পাঁচ নম্বরটি কি সৌভাগ্যের প্রতীক? সহাস্যে মুরোফুসি বললেন—"সেরকম কিছু নয়।" বিশ্ব সেরার থেকে এখনও আপনি দশ মিটার পিছনে। তা সত্ত্বেও কি আপনি নিজের সাফল্যে গর্বিত? মুরোফুসির উত্তর, "ওদের সঙ্গে এশীয়দের তুলনা করবেন না। অবশ্যই সাফল্যের জন্য আমি গর্বিত।"

গতবার দিল্লিতে এই জাপানী থ্রোয়ারকে এশিয়ার সেরা ক্রীড়াবিদের সম্মান—সাংবায়েক কাপ দেওয়া হয়। এবার পেলেন কোরিয়ারই ছেলে কিউ নাম যু। পুরস্কারটির উদ্যোক্তা দক্ষিণ কোরিয়ার অলিম্পিক সংস্থা। দশ জন বিচারকের ওপর নির্বাচনের ভারটি তাঁরা ছেড়ে দেন। কিন্তু তাঁদের নির্বাচন অনেকের মনঃপূত হয়নি। টেবল টেনিসে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানকে কিম নাম যু হারিয়েছেন। এই কারণেই শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদের পুরস্কারটি তিনি পেলেন। টেবল টেনিস থেকে কিউ নাম যু দু'টি সোনা, একটি রূপা ও একটি ব্রোঞ্জ পান। চীনাদের হারানো অবশ্যই কৃতিত্বের। কিন্তু নিজের দেশে, দর্শকদের উৎসাহে এবং সময়ে সময়ে লাইন-ম্যানদের সাহায্যে যে সাফল্য তিনি দেখিয়ে ছিলেন, দু'সপ্তাহ পর এশিয়

চ্যাম্পিয়নশিপে তা কিন্তু দেখাতে পারেননি। চীনারা শেনঝেনে কোরীয়দের দেখিয়ে দেন—তাঁরাই বিশ্ব শ্রেষ্ঠ। গেমসে কোরীয়দের জয় নিছক ফ্লুক। গেমসের শেষ দিনে সাংবায়েক কাপ নেবার জন্য কিউ নাম য়ু অবশ্য স্টেডিয়ামে যাননি। অলিম্পিক কাউন্সিল অফ এশিয়ার প্রেসিডেন্ট শেখ ফাহয়েদের কাছ থেকে পুরস্কারটি নেন তাঁর বাবা। শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ কী নিজেও কুণ্ঠিত ছিলেন?

পি টি উষা অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন ঘোষণাটি শোনার পর। গেমস থেকে চারটি সোনা ও একটি রূপো জয়ী অবশ্যই আশা করতে পারেন তিনিই সেরা ক্রীড়াবিদ নির্বাচিত হবেন। পদকের সঙ্গে ছিল তাঁর পাঁচটি গেমস রেকর্ড ভাঙ্গার রেকর্ডও। উষা বলেও ফেলেন, বিচারকরা অবিচার করেছেন তাঁর ওপর। দিন দশেক আগেই উষা এশিয়ার সেরা অ্যাথলীটের সম্মান ও গোল্ডেন শু পান। তাঁর কোচ নাম্বিয়ার প্রশ্নও তোলেন, কিসের ভিত্তিতে 'সেরা' নির্বাচন করা হল, তা অবশ্যই জানানো দরকার। পদকপ্রাপ্তির দিক থেকে উষাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন শুধু চীনা জিমন্যাস্ট লি নিং। তিনি চারটি সোনা এবং দু'টি রূপো জেতেন। যদি তাঁকে পুরস্কারটি দেওয়া হত, বলার কিছু ছিল না। বিশ্ব মানের পারফর্মেন্স তিনিও দেখিয়েছেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ঝাও জিয়ান হুয়াকে তো প্রকাশ পাড়ুকোনও হারিয়েছেন, তাহলে তিনিই বা ওই পুরস্কারটি কেন পাবেন না? এই সব যুক্তি ও পাল্টা যুক্তির আঁচে গেমস শেষ হয়েছিল।

চীন-জাপান-কোরিয়া এই তিন সুপার পাওয়ারের মাঝে কয়েকটি দেশ বিভিন্ন খেলায় মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টাও করেছে। আটাত্তর পর্যন্ত শীর্ষে ছিল জাপান। বিরাশিতে তাদের টপকে যায় চীন। কোরীয়দের তাড়া খেয়েও এবার চীন কোনো রকমে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। আগামীবার বেজিংয়েও তারা সর্বোচ্চ শিখরে থাকবে—এটা বলা বাহুল্য। কিন্তু এমন দিনও খুব বেশি দূরে নেই, এশিয় ক্রীড়ায় পশ্চিমা দেশগুলি যখন সুপার পাওয়ারদের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তারা শুরু করেছে ফুটবলে আধিপত্য দিয়ে। গেমসের সেরা ছয়টি দলের মধ্যে

ভারতের গর্ব সোনার মেয়ে—পি. টি. উষা

চারটিই পশ্চিম এশিয়ার। আরব দেশগুলি এবার নজর দিয়েছে সাঁতারে, ওয়াটারপোলো আর অ্যাথলেটিকসে। চামশিল স্পোর্টস কমপ্লেক্সে—পাশাপাশি সুইমিং পুল আর অ্যাথলেটিক্স স্টেডিয়ামে আরবরা বার বার নজর টেনেছেন। এশিয়ার ক্ষিপ্রতম মানবের সম্মান পেল যে যুবকটি, সেই মনসুর তালাল প্রতিশ্রুতি দিল আরবরাও এগিয়ে আসছেন। কাতারকে তিনিই প্রথম গেমস পদক দিলেন। সামরিক বাহিনীর কর্মী। ট্রেনিং নেন পশ্চিম জার্মানিতে। জাকার্তায় এশীয় ট্র্যাক ও ফিল্ড মিটে ফাইনালে উঠেছিলেন। তার পরই কাতারের শেখ তাঁকে বিদেশে ট্রেনিং নিতে পাঠান। মাত্র এক

কর্তার সিং

বছরের মধ্যেই তালাল এশিয় চ্যাম্পিয়ান! শত মিটারে গেমসে রেকর্ড করার পরই কৃষ্ণকায় ওই যুবকের বিজয় চক্কর দেখে মনে হচ্ছিল, কার্ল লিউইসই বোধ হয় অভিনন্দন কুড়োচ্ছেন। কাতারেরই আরেক প্রতিযোগী পদক জিতলেন পনেরো শো মিটার দৌড়ে। নাম মহম্মদ সুলিয়ামান। এই দু'জনের অপ্রত্যাশিত সাফল্যে কাতার শেখ এত খুশি হয়েছিলেন যে তাঁদের সম্মানে সোলের সেরা হোটেলে বিরাট ডিনার পার্টি দেন।

কাতারের মত বাহরিনও সোনা নিয়ে গেছে গেমস থেকে। পুরুষদের ট্র্যাক ইভেন্টে এমন একটি ফাইনালও হয়নি যাতে দু'তিনজন আরব ওঠেননি। চার

সাইনি আব্রাহাম

শো দৌড় ও চার শো হার্ডলসে তাঁরা অদূর ভবিষ্যতে প্রবল চ্যালেঞ্জ জানাবার ইঙ্গিত দিলেন। বাহরিনকে প্রথম গেমস সোনাটি দেন আহমেদ হামাদা। ইনিও আমেরিকায় ট্রেনিংপ্রাপ্ত। ছোট্ট দেশ ওমান-ও খালি হাতে ফেরেনি। তাদের ব্রোঞ্জ পদক দেন মহম্মদ আমুর অল মালকি। এবারের গেমসে দু'একটি করে পদক পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিকে প্রচণ্ড উৎসাহিত করল। পেট্রো-ডলারের কল্যাণে এরা অবশ্যই এরপর থেকে আরো বেশি সংখ্যক অ্যাথলীটকে বিদেশে ট্রেনিংয়ে পাঠাবে। দশ বারো বছর আগে ফুটবলে আগ্রহান্বিত হয়ে এই সব দেশগুলি এখন এশিয়ার সমীহ করার মত শক্তি হয়ে উঠেছে। অন্য খেলাতেও বা কেন তারা নিজেদের তুলে ধরতে পারবে না?

এশীয় গেমস দারুণভাবে শেষ করে কোরিয়া এখন নতুন উদ্যমে অলিম্পিক প্রস্তুতি শুরু করেছে। আধুনিক প্রযুক্তি বিদায় কোরীয়রা যে কতটা এগিয়েছেন, না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত হত। সাংবাদিকদের সুবিধার্থে ওঁরা কম্পুটারের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। গেমস শুরু হবার আগে সাংবাদিকদের ওঁরা শিখিয়েও দিয়েছিলেন কম্পুটারের সুইচ টিপে এশিয়ান গেমসের যাবতীয় তথ্য কীভাবে মুহূর্তের মধ্যেই জেনে নেওয়া সম্ভব (দিল্লিকে এ ব্যাপারে সোল মেরে বেরিয়ে গেছে)। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কড়াকড়ি একেক সময় বিরক্তি আনলেও—গেমসের সময় ওঁরা যে কোনও অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটতে দেননি, সেটা ওঁদের কৃতিত্বই। প্রেস সেন্টারে প্রতিদিন ওঁরা পুলিশ কুকুর এনে ঘোরাতেন এবং সেটা আমাদের নিরাপত্তার জন্যই। চার কোটি মানুষের একটি দেশ অলিম্পিকের মত বিরাট ইভেন্ট দু'বছর পর করতে যাচ্ছে। এশিয়ায় দ্বিতীয়বার ওই গেমস হচ্ছে। জাপানীরা বাইশ বছর আগে প্রথমবার করেছিল। জাপানীদের কাছ থেকে স্বাধীনতা যাঁরা অর্জন করেছেন—সেই কোরীয়রা এবার দেখিয়ে দিতে চান, এশিয়ায় অনুষ্ঠিত প্রথমবারের থেকেও এবারের অলিম্পিক আরো জাঁক-জমকের সঙ্গে করবেন। সোল অলিম্পিকেও কোরীয়রা জয়ী হবেন।

ছবি: নিখিল ভট্টাচার্য ■

চ্যাম্পিয়নের ছোটবেলা

"এখন অনেকে বলেন, 'সুনীল "বড়" হবেই তাঁরা জানতেন'। ও নাকি ছোটবেলা থেকে দারুণ প্রতিভাবান।' একই জায়গায় থেকে পাশাপাশি আমরা বড় হয়েছি। স্কুল-কলেজে একই ক্লাসে, বরাবর একসঙ্গে পড়ে এসেছি। আর তাই জোর

দিয়ে বলতে পারি, এসব পুরো বাজে কথা। প্রতিভার কোনও লক্ষণ ছোটবেলায় ওর মধ্যে দেখা যায়নি। স্কুলে রমেশ নাগদেব নামে একটি ছেলে (এখন ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকে) সুনীলকে বরাবর ছাপিয়ে গেছে। নাগদেব ৬৯-এ বিল লরির টিমের বিরুদ্ধে নাগপুর টেস্টে টুয়েলফথ ম্যানও হয়েছিল। তখন সুনীল কোথায়?"

ওপরের কথাগুলি কমবয়সী সুনীল গাওস্কর সম্পর্কে তাঁর বরাবরের প্রিয়তম বন্ধুর। মিলিন্দ রেগে নাগদেবের কথা বলেছেন। বলেছেন, প্রতিভায় কোনও লক্ষণ বাচ্চা গাওস্কর দেখায়নি। সবই খাঁটি কথা। আর একটা কথাও হয়ত বলতে পারতেন বলেননি, নাগদেবের মতো তাঁকেও—রেগেকেও ছোটবেলায় দারুণ ট্যালেন্টেড ক্রিকেটার হিসাবে ধরা হত। গাওস্করের কথা কেউ ভাবেনি।

পরবর্তীকালে নাগদেব-রেগেদের তাহলে কিভাবে ছাপিয়ে গেলেন সুনীল মনোহর গাওস্কর? মাত্র তিনটি শব্দের ব্যবহারে এর উত্তর দেওয়া সম্ভব—সাধনা, সংকল্প, মনসংযোগ। রেগে বলেছেন, "হ্যাঁ, প্রতিভাটতিভা তেমন কিছু ছিল না, কিন্তু ছোটবেলা থেকেই একটা ব্যাপারে সুনীল আমাদের টেক্কা দিয়ে গেছে—মনোনিবেশ করার ক্ষমতায়। প্রত্যেকটা ইনিংস-ই প্রচণ্ড গুরুত্ব দিয়ে খেলত। আমাদের বিল্ডিং কম্পাউন্ডে খেলা হলে সুনীলকে আউট করা যেত না। তিন ঘণ্টা ধরে ঠায় ব্যাট করে যাচ্ছে। সেখানে আমরা কেউ পনের মিনিটের বেশি টিকতে পারতাম না। শেষে সুনীলের জন্য নিয়ম করা হল, শুধু চক দিয়ে আঁকা তিনটে স্ট্যাম্প নয়, গ্যারেজের দরজার যে কোনও জায়গায় বল লাগলেই ও আউট।

'স্পোর্টসওয়ার্ল্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত এই সাক্ষাৎকারে রেগে আর একটা খুব দামি কথা বলেছেন, "এখন ফিরে তাকালে মনে হয় ক্রিকেটের জন্য ও যা ত্যাগ করেছে, আমরা ওর সমকালীন বন্ধু ক্রিকেটাররা যদি তার এক শতাংশও করতাম প্রত্যেকেই 'গ্রেট' হতে পারতাম। এবং মনে রাখবেন এই ত্যাগ স্বীকারটা ও করে আসছে খুব অল্প বয়েস থেকে। রাত দশটায় পার্টি শুরু হলে সুনীল কখনও আধ ঘণ্টার বেশি থাকেনি। আর সেখানে আমরা হই হুল্লোড় করেছি ভোররাত পর্যন্ত।"

সানি গাওস্কর সম্পর্কে তাঁর বন্ধু সহকর্মী পাড়া প্রতিবেশী—সহ ক্রিকেটারদের সাধারণ মতামত, ওকে আরও বেশি ভাল লাগে কারণ কখনও নিজের ঢাক পেটায় না, কোনদিন শোনা যায়নি গাওস্কর নিজের সাফল্য বা সেঞ্চুরিগুলির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করছেন। বাসু পরাঞ্জপে ভাল বলেছেন, (পরাঞ্জপে গাওস্করের বয়স্য, সানি নামটা ওঁর-ই দেওয়া) "গাওস্কর ওর প্রাপ্য স্বীকৃতি পেত যদি আজ শুধুমাত্র কার্ডাস বেঁচে থাকতেন!"

ম্যাকেনরোর পর

জন ম্যাকেনরো পথ দেখানোর পর এবার ভিটাস গেরুলাইটিসের পালা। বাচ্চা হবার তিন মাস বাদে টাটুম ও'নীলকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করেছে ম্যাকেনরো। ম্যাকেনরোর মতোই দেড় বছর আগে ভিটাসের এনগেজমেন্ট হয়েছিল অভিনেত্রী বান্ধবী অ্যানেট জোন্সের সঙ্গে। কিন্তু এখনও বিয়ে করার কোনও লক্ষণই দেখাচ্ছে না ভিটাস। অ্যানেট এতে অত্যন্ত বিচলিত। ইতিমধ্যে গুজব রটেছে সে নাকি অন্তঃসত্ত্বা।

টেনিস সার্কিটে একরকম অস্তমিত, তিরিশ বছর বয়সী ভিটাস বলছে, "বিয়েটা শিগগিরই করে ফেলব। আসলে ম্যাকেনরো-টাটুমকে আমরা সুযোগ করে দিলাম প্রথম হবার।"

উপকার করতে গিয়ে

ভালো মনে অ্যানাবেল ক্রফটের উপকার করতে গেছিলেন ক্রিশ এভার্ট লয়েড। এবং অনর্থটা তাতেই বাঁধল। ক্রিশের এই

দয়ালু মনোভাবের জন্য ভার্জিনিয়া স্লিমস টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া হল না অ্যানাবেলের। ঘটনা এরকম: যথেষ্ট ফিজিক্যাল ফিটনেস নিয়ে যাতে অ্যানাবেল এই টুর্নামেন্টে নামতে পারেন তার জন্য তাঁর সারের বাড়ির জিমন্যাসিয়ামটি ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছিলেন ক্রিশ। ফল হল উল্টো। এখানে অনুশীলনের সময় পড়ে গিয়ে কবজিতে এমন চোট পেয়েছেন অ্যানাবেল যে হাড় সরে গেছে এবং অন্তত সপ্তাহ তিনেক টেনিস র‍্যাকেট হাতে তোলার প্রশ্ন নেই।

উপকারীকে বাঘে খায়, এটাই নাকি নিয়ম। ক্রিশ অবশ্য এ-যাত্রা বেঁচে গেলেন। কেন না অ্যানাবেল বলেছেন, "দোষটা পুরোপুরি আমার। ক্রিশের জিমন্যাসিয়ামে এত চমৎকার সব আধুনিক যন্ত্র দেখে আমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। সঙ্গে কিছুটা অসাবধানীও।"

আর কতদিন?

ছাপান্নটি দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব আছে সি এ বি-তে। এরা সি এ বি লিগ খেলে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জুনিয়র নক আউটেও। আমরা কি জানতে পারি প্রথম দিকের দু তিনটি ক্লাব ছাড়া বাকিগুলির দ্বারা কি মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে? কিভাবে এরা সাহায্য করছে বাংলা ক্রিকেটের মান বাড়াতে? দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাবগুলির লক্ষ্য হওয়া উচিত আনকোরা, কমবয়েসী ছেলেদের বেশি করে দলে টানা। সযত্নে পরিচর্যা করা যাতে বৃহত্তর দিগন্ত ক্রমশ এদের সামনে উন্মোচিত হয়। বাস্তবে তা হয় কি? সম্প্রতি সি এ বির কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় এক সদস্য জানালেন, প্রথম ডিভিশন ক্লাবে ক্রিকেটারদের গড় বয়েস এখন তিরিশ (কি গর্বের কথা)! প্রথম ডিভিশনে যদি তিরিশ হয়, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন দ্বিতীয় ডিভিশনে বয়েসের গড় হবে বত্রিশ থেকে চৌত্রিশ। জুনিয়র ক্রিকেটারদের বঞ্চিত করে দিনের পর দিন বুড়োহাবড়ারা এসব টিমে খেলে যায়। লোভ মুখ্যত একটাই— টেস্ট টিকিট। টিকিট নিয়ে বাণিজ্যে ক্লাবকর্তারাও জড়িত থাকেন। সি এ বির এই উপরোক্ত সভায় বিবেকের দংশনে অস্থির দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাবের এক প্রতিনিধি সেকথা স্বীকারও করে ফেলেছিলেন। "২২৫টা টিকিট দিয়ে আমরা সেকেন্ড ডিভিশন ক্লাবগুলো হাজার হাজার টাকার বাণিজ্য করি, একবারও কি ভাবি জুনিয়র ছেলেগুলোর কথা?" সাহাপুর স্পোর্টিং-এর শিবু দত্ত একথা বলামাত্র চাঞ্চল্য পড়ে যায় সভায়। কার্যবিবরণী থেকে শিবুবাবুর মন্তব্য বাদ দেওয়া হয়। সভাপতি উপস্থিত সাংবাদিকদের অনুরোধ করেন, "প্লিজ, একথা কাগজে লিখবেন না।"

সি এ বি এ মরসুমে এত নতুন নিয়ম করল— দু দিনের লিগ চালু হল, চালু হল ড্র, নতুন পয়েন্ট সিস্টেম... দ্বিতীয় ডিভিশনটা কি বাধ্যতামূলকভাবে বাইশ বা পঁচিশ বছরের কমবয়সীদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া যেত না? নিয়ম না পাল্টেও অবশ্য আর একভাবে ব্যাপারটা সম্ভব। ২২৫টা টিকিটকে যদি কমিয়ে ২৫ বা ৩০ করা যায় ক্রিকেটারদের গড় বয়েস আপনা থেকেই নেমে আসবে।

গৌতম ভট্টাচার্য

মুখে-মুখে মজার ছিরি 'খটাক'-এরই কারিকুরি

বনভূমির রাজা

এই প্রজন্মের অনেক তরুণ লেখক-লেখিকাই সরাসরি কাঁটা-চামচ ধরেছেন, দিশী কলমে হাঁটি হাঁটি পা পা না করে এক লাফে টাইপরাইটারের সওয়ার হয়েছেন। কাছাকাছি সময়ে বেশ কিছু ভারতীয় লেখক ইংরেজিতে কলম ধরলেও মুলকরাজের পরে ব্যাপক সাফল্যের তালিকা খুব বড় হয়নি। এই মুষ্টিমেয় জনপ্রিয় কীর্তিমানদের মধ্যে মনোহর মূলগাঁওকার অন্যতম। সদ্য বাহাত্তর বর্ষিয়ান এই লেখক একাধারে উপন্যাস ছোটগল্প ইতিহাস ও জীবনীকার।

বোধ হয় মুলক রাজ আনন্দ-ই এ যুগের প্রথম ভারতীয় ঔপন্যাসিক যিনি ইংরেজিতে লিখতে শুরু করেছিলেন এবং অসামান্য খ্যাতি পেয়েছিলেন। আসলে বিষয় বৈচিত্র্য তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ছিল। যদিও ইংরেজি এই সেদিন পর্যন্ত আমাদের রাজভাষা ছিল, এবং এখনো সাহিত্যগুণে প্রসাদগুণে সবচেয়ে সপ্রতিভ বহুচলিত এবং ব্যবহারিক ভাষা তবু তাতে যথার্থ ইংরেজিয়ানা যুক্ত করা ভারতীয়দের পক্ষে কঠিন কাজ। দ্বিতীয়ত মূল প্রকাশনার জগৎটা সুদূর পশ্চিম মুলুকে হওয়ায় তার নাগাল পাওয়া এদেশীয় লেখকদের পক্ষে শক্ত ছিল। বিশেষ করে ইউরোপীয় পাঠকদের কাছে পৌঁছানোয় মেজাজ-মর্জি ও সংস্কৃতিগত বাধা তো ছিলই। তাই গল্পে-উপন্যাসে ভারতীয় লেখক ওই ভাষায় বিরল প্রায়।

সম্প্রতি দুই ভূখণ্ডের দূরত্ব এবং মানসিক ব্যবধান দ্রুত কমে আসার ফলে ভাষার বেড়াটা অনেকখানি আলগা হয়ে গেছে। অনুবাদের দৌত্যও অনেকটা কাজ করে দিয়েছে এ ব্যাপারে। ভারতীয় লেখকরা ইদানীং তাই তুলনায় বেশী মাত্রায় ঝুঁকেছেন ইংরেজির দিকে। সাহিত্যের আন্তর্জাতিক খোলাবাজারে তাঁদের বাণিজ্যও মোটামুটি জমে উঠেছে আগের যুগের তুলনায়। বিত্তবান সমাজের মিশ্র সংস্কৃতি ও ইঙ্গ শিক্ষারীতির পাশাপাশি সামাজিক পালাবদল তাঁদের সাফল্যের সহায়ক হয়েছে। এবং এই সমুদ্র লঙ্ঘনে অনেকখানি মদত যুগিয়েছে আমেরিকা। এই প্রজন্মের অনেক তরুণ লেখক লেখিকাই সরাসরি কাঁটা চামচ ধরেছেন, দিশী কলমে হাঁটি হাঁটি পা পা না করে এক লাফে টাইপ রাইটারের সওয়ার হয়েছেন। ভনিতা বাড়িয়ে লাভ নেই। কাছাকাছি সময়ে বেশ কিছু ভারতীয় লেখক ইংরেজিতে কলম ধরলেও মুলকরাজের পরে ব্যাপক সাফল্যের তালিকা খুব বড় হয়নি। এই মুষ্টিমেয় জনপ্রিয় কীর্তিমানদের মধ্যে মনোহর মূলগাঁওকার অন্যতম।

সদ্য বাহাত্তর বর্ষীয়ান,এই লেখক একাধারে উপন্যাস ছোট গল্প ইতিহাস ও জীবনীকার। ইংরেজিতে সফল ও সৃজনশীল খ্যাততমদের একজন। তাঁর একটি বই 'দি প্রিন্সেস' প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যুক্তরাষ্ট্রের লিটারারি গিল্ড-এর নির্বাচিত হয়েছিল। এবং অন্য একটি বই 'এ বেন্ড ইন দি গ্যাঞ্জেস'-কে ১৯৬৪ সালের শ্রেষ্ঠ তিনটি উপন্যাসের একটি বলে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন ই. এম. ফরস্টার। ইংল্যান্ড ও আমেরিকা থেকে তাঁর এক ডজনেরও বেশী বই বেরিয়েছে এবং সেগুলি জার্মান ফরাসী স্প্যানিশ এমনকি জাপানী ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। মোটকথা ভারতের বাইরে তাঁর অনুরাগী এক স্থায়ী পাঠক সমাজ আছে। এবং এখনো তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে লিখে চলেছেন। কর্ণাটকের অন্তর্গত জগলবেতের বনভূমির মধ্যে তিনি বাস করেন। সঙ্গী বলতে শুধু তাঁর স্ত্রী, যিনি গৃহিণী সচিব এবং সখীই শুধু নয় তাঁর লেখার সমালোচকও। আর একটি টাইপ রাইটার, প্রায় ছায়াসঙ্গী কুকুর আর জঙ্গলের পাখিরা। লেখার সার্থক পটভূমি এবং পরিবেশ হিসাবে তিনি আম, লেবু, কমলালেবু, নারকেল প্রভৃতি ফলের এক বিশাল উদ্যান গড়ে তুলেছেন। সেই সঙ্গে আছে নানা ঋতুর বিচিত্র ফুলের গাছের সংগ্রহ। বর্ণে গন্ধে সারা বছর যারা তপোবনের মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করে। তাঁর ছ'ফুট এক ইঞ্চি দেহটা এখন বয়সের ভারে সামান্য ন্যুব্জ, মাথায় কাশের মত সাদা চুল, গভীর রেখাকুঞ্চিত মুখ। প্রথম দর্শনেই টের পাওয়া যায় এই আপাত শান্ত মন্থর মানুষটির একদা রোমাঞ্চকর এবং রঙীন অতীত ছিল।

অনুমান মিথ্যে নয়। প্রথম যৌবনে ছিলেন হিংস্র পশু শিকারী। রাজা মহারাজা নবাব টবাবদের জন্যে শিকারের উদ্যোক্তা ছিলেন। বনের পশু এবং এই সব রাজা পুরুষদের তিনি খুব অন্তরঙ্গ ভাবে চিনতেন। পরে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন এবং সেনা বিভাগ থেকে লেফটন্যান্ট কর্নেল হিসেবে অবসর নিয়েছিলেন। কারোয়ার কনস্টিটুয়েন্সি থেকে দু দুবার পার্লামেন্টের জন্যে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু সফল হননি। তাঁর ব্যবসা করতে যাওয়াও খুব কাজের কাজ হয়নি। একবার চা বাগান নিয়ে পড়েছিলেন, আর এক বার ম্যাঙ্গানিজের খনিতে হাত দিয়েছিলেন। শেষে সব ছেড়ে লেখায়। লেখকের জীবনে কিছুই তো ফেলা যায় না, এই অসাফল্য এই অভিজ্ঞতা সোনা হয়ে ফিরে এসেছে তাঁর সাহিত্যে, পাঠকদের চমৎকৃত করেছে। নিরন্তর এবং অর্থহীন পশুবধ,তাকে পীড়িত ও ক্লান্ত করায় যে শিকার থেকে তিনি বিদায় নিয়েছিলেন একদিন, বিদায় নিয়েছিললেন ওতপ্রোত জড়ানো রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিক থেকে, সেই বিচিত্র দুই জগৎ থেকে গড়ে উঠেছিল তাঁর দুই বহুখ্যাত গ্রন্থ 'দি প্রিন্সেস' আর 'এ বেন্ড ইন দি গ্যাঞ্জেস'। 'দি প্রিন্সেস' তাঁর শ্রেষ্ঠ ও সফলতম রচনা। এ পর্যন্ত সাড়ে তিন লক্ষ কপি বিক্রী হয়েছে, যার মধ্যে আমেরিকাতেই আড়াই লক্ষ কপি বিক্রী হয়েছিল লিটারারি গিল্ডের সৌজন্যে। এগার পাউন্ড মূল্যের এই বইটি সাগ্রহে ছেপেছিলেন লন্ডনের হ্যামিশ হ্যামিলটন।

মূলগাঁওকরের পিতামহ ছিলেন ইন্দোরের দেওয়ান। তার আগে তিনি ছিলেন গোয়ালিয়রে। শিকারের রেওয়াজ ছিল তাঁদের পরিবারে। এই সূত্রেই প্রাসাদ জীবন ও রাজ পরিবার সমূহের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। কুড়ি একুশ বছর বয়সেই তাঁর শিকারী জীবনের সূত্রপাত। দুর্ভেদ্য জঙ্গল এবং দুরূহ মনুষ্য চরিত্র তাঁর নখদর্পণে এসে যায় কিছুকালের মধ্যে। এই রাজকীয় পরিমণ্ডলটিকে,নাটকীয় ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবনকে তিনি অনুপুঙ্খ জীবন্ত করে তুলেছিলেন তাঁর রচনায়। পাঠকের মন, তার নাড়ির গতি, তার দর্শনেচ্ছা মনস্তাত্ত্বিক বৈদ্যের মতই তিনি বুঝতে পারেন। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর জাদুকরী গল্প বলার কথা। গল্পের সম্মোহনে তিনি পাঠককে আবিষ্ট করে রাখেন। তাঁর একমাত্র কন্যাটি যখন শিশু তখন তাকে প্রত্যহ বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলতে বলতে স্টোরি টেলিং-এর শৈল্পিক কৌশলের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন।

সেনাবাহিনীতে থাকার সময়েই তিনি প্রথম ছোটগল্প লিখতে থাকেন ইলাস্ট্রেটেড উইকলির জন্যে। পরে উপন্যাস রচনায় হাত দেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ডিসট্যান্ট ড্রামস' যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত। এটা শুধু ভারতেই প্রকাশিত হয়েছিল এবং ভালো বাজার পেয়েছিল। এখনো সম্ভবত পেপার ব্যাকে বইটি পাওয়া যায়।

ইতিহাস তাঁর প্রিয় বিষয়। ইতিহাসাশ্রয়ী রচনার জন্যে তিনি প্রচুর পড়াশোনা করেছেন, এখনো করেন। বস্তুত তাঁর স্বভাবটাই গবেষণ মনস্ক। যখন যে বিষয় নিয়ে লেখেন, তার জন্যে এক বিস্তৃত এবং গভীর পশ্চাৎপট তাঁর অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর এই জাতীয়

গ্রন্থের মধ্যে 'দি মেন হু কিলড গান্ধী' ও 'দি ডেভিলস উইন্ড' বই দুটি বিখ্যাত। প্রথম বইটি এদেশেই শক্ত মলাটের সংস্করণে পাঁচ হাজার কপি নিঃশেষিত হয়েছে। বিদেশের টেলিভিশনে তাঁর 'দি ডেভিলস উইন্ড' ও 'ব্যান্ডিকুট রান' বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাঁর আরও একটি উপন্যাস যন্ত্রস্থ। নাটক লিখেও খ্যাতি পেয়েছিলেন মূলগাঁওকর। কিছু কিছু সিনেমার চিত্রনাট্যও রচনা করে চলেছেন।

ফরমায়েশী কিছু কিছু লেখা তাঁকে অবশ্যই লিখতে হয়। কারণ লেখাকে তিনি জীবিকা হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। তাঁর ধারণা অন্য জীবিকায় সফল হলে তিনি হয়তো কোনদিনই লেখার জগতে আসতেন না। অর্থ উপার্জনের জন্যই যেহেতু উপন্যাস লেখা সেহেতু সব রকম লেখার কাজই তাঁর কাছে গ্রহণীয় মনে হয়।

যেমন 'শালিমার' নামের হিট ছবির চিত্রকাহিনী অত্যন্ত বাজে মনে হলেও অনুরুদ্ধ হয়ে তাকে উপন্যাসে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে। তাঁর কৃত উপন্যাসের বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। দাম সাত টাকা। মূলগাঁওকর প্রেরণায় বিশ্বাস করেন না। সাহিত্য তাঁর কাছে আর্ট নয় ক্রাফট। অধ্যবসায় ও সচেতন অনুশীলনে ট্যালেন্টকে সার্থক করে তোলা যায়। আসল কথা সাহিত্যকর্মও এক ধরনের রান্না, হাতের গুণে তাকে আস্বাদ্য ও আকর্ষক করে তুলতে হয়। এই কাজটি তিনি ভালই পারেন।

ইতিহাসের যে কোন নীরস বিষয়কেও তিনি রীতিমত কৌতূহলোদ্দীপক ও রম্য করে তুলতে পারেন। তাঁর বিশ্বাসে যে কোন দেশেরই সভ্য শিক্ষিত বুদ্ধিদীপ্ত পাঠকের জাত এবং চরিত্র এক, সুতরাং ভাষা কোন বাধা নয় তাঁর কাছে। লেখাকে তিনি নিজের বন্দীশালা করে তোলেননি, সহজে নিয়েছেন। অত্যন্ত নিয়মানুবর্তী তাঁর লেখার জীবন।

এমনিতে দ্রুত লেখক কিন্তু গড়ে এক হাজার শব্দের বেশী লেখেন না এক দিনে। প্রতিদিন ঠিক সাড়ে সাতটায় লেখায় বসেন, সাড়ে বারোটায় ওঠেন। তার পরে আর তিনি লেখার কাগজ ছোন না। বিশেষ প্রয়োজন না হলে।

সংক্রান্ত সংবাদ

যেকোনো কিছুকে অন্য কিছু বানিয়ে তুলতে জাপানীদের কারিগরিশিল্পের কোন জুড়ি নেই। সম্প্রতি এক জাপানী কোম্পানি দেশের নামীদামী পুস্তক প্রকাশকদের আত্মশ্লাঘা নস্যাৎ করে দিতে এক বিচিত্র রীতির প্রকাশনা শুরু করে দিয়েছেন। ইনস্ট্যান্ট বইয়ের দিকে ঝোঁক ইদানীং পশ্চিমী দুনিয়ায়। এঁরা তাঁদেরও টেক্কা দিয়েছেন। **১৯৮৫ সালের ১২ আগস্ট জাপানে এক নজীরহীন বিমান দুর্ঘটনায় বোয়িং ৭৪৭ বিমানটির ৫২০ যাত্রীই নিহত হয়েছিল। সেই দুর্ঘটনাবার্ষিকী স্মরণ করিয়ে এই আগস্টে 'হু হ্যাজ এক্সপ্লয়েটেড দি জাল অ্যাকসিডেন্ট'** নামে একটি বই বেরোলো। তাতে জাপান এয়ার লাইনস, সংক্ষেপে 'জাল'-এর চেয়ারম্যান সম্পর্কে কিছু বিরুদ্ধ কথাবার্তা ছিল। খবরটি আগে ভাগেই জেনে ফেলে ক্যানবো নামে এক টেক্সটাইল ও কসমেটিক কোম্পানি ছুটলেন বইয়ের লেখক হিরোয়ুকি ফুকুদার কাছে। তাঁকে প্রভাবিত করে বইটির কোন কোন অংশের পরিবর্তন ঘটাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু লেখক রাজী হলেন না। এখানে বলা প্রয়োজন উক্ত কসমেটিক ফার্মের ডাইরেক্টর এবং 'জাল'-এর চেয়ারম্যান ঘটনাচক্রে একই ব্যক্তি।

ফার্ম তখন অন্য পথ ধরলেন। তাঁরা গ্রন্থের প্রকাশকের কাছ থেকে মোট ১৫০০০ কপি বই থোক ৬৬০০০ ডলার দিয়ে কিনে নিলেন। ইনস্ট্যান্ট বেস্টসেলারের ইতিহাসে এক দিনে সব বই বিক্রী হয়ে যাবার নজীর এই প্রথম। কিন্তু চমকটা অন্য জায়গায়। অবাঞ্ছিত এই বইয়ের পর্বত প্রমাণ বোঝা নিয়ে টেক্সটাইল ফার্ম সোজা একটি কারখানায় চলে গেলেন। কারখানার যান্ত্রিক পাকস্থলী বইগুলোকে গোগ্রাসে গিলে পেপার পাল্প করে উগড়ে দিল। বইয়ের এরকম নির্বাক নিষ্পত্তি সত্যিই রোমাঞ্চকর।

খোঁচাখুঁচি

মেয়েদের চোখ বোধহয় পুরুষদের তুলনায় বেশী ভাল থাকে এই কারণে যে, চোখের নিরন্তর ব্যায়াম তাঁদের সহজাত অভ্যেস। স্বভাবতই তাঁরা আড়চোখ পটিয়সী, কটাক্ষ তাঁদের রূপচর্চার বিলাস নয়, অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের মাধ্যম। সোজা আঙুলে যখন ঘি ওঠে না তখনই বাঁকা আঙুলের প্রয়োজন। সোজা নজরের পাশাপাশি তাই চিরকালই বাঁকা নজরের দরকার হয়েছে। অন্তত কথাসাহিত্যে। কটাক্ষসাহিত্য বা ভ্রূকুটি সাহিত্যের অনন্য স্রষ্টা বঙ্কিম হলেও প্রাগাধুনিক সাহিত্যে এই সহচর ঐতিহ্যের ঘাটতি ছিল না কোনদিনই। ব্যঙ্গকৌতুকের বহু অবিস্মরণীয় লেখক দেখা দিয়েছিলেন সে-যুগে। ঈশ্বর গুপ্ত-বঙ্কিমচন্দ্রের পরে ইন্দ্রনাথ-ত্রৈলোক্যনাথ থেকে শুরু করে পরশুরাম-দাদাঠাকুর ইস্তক তির্যক অনেক নাম এখনো বাঙালীর মুখে মুখে ফেরে। এই সেদিনও শনিবারের চিঠি-অচলপত্রের যুগ সচল ছিল। সচিত্র ভারত থেকে নগন্য বৃশ্চিক ইস্তক পত্রপত্রিকার সাক্ষাৎকার ঘটেছে আমাদের সঙ্গে। বঙ্গদর্শনের সম্মার্জনী বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত ছুঁয়ে গেছে বারবার।

অপসাহিত্যের অপপ্রচারকে বিদ্রূপাত্মক আলোচনায় ক্ষতবিক্ষত ও বিপর্যস্ত করে দিয়ে সাহিত্যাদর্শের কাঁটাকম্পাশ সচল রেখেছে। অর্গল-অভিভাবকহীন বঙ্কশূন্য বাংলা সাহিত্যের অন্য চেহারা এখন। তির্যকপ্রহরী পত্রপত্রিকা বিরল, সাহিত্যও হাস্যলেশহীন হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। এই বন্ধ্যাদশায় একটি অভিনব পত্রিকা হাতে পেয়ে মনটা আশান্বিত হয়ে উঠলো। নাম কার্টুন। তবে শুধু রেখায় নয়, লেখায়ও সুকুমার রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় এই মাসিক পত্রিকাটিতে বেশ কিছু রসবিদগ্ধ মানুষ জড়ো হয়েছেন। ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী শৈল চক্রবর্তী, চণ্ডী লাহিড়ী, অমল চক্রবর্তী প্রমুখের সঙ্গে কলমচি হিসেবে হাত মিলিয়েছেন অমিতাভ চৌধুরী, নবনীতা দেবসেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (খাস টেনিদা) প্রমুখ লেখকবৃন্দ। স্বনামে-বেনামে মিলিয়ে অনেকগুলি বিভাগ, অনেকগুলি লেখা এবং পাতায় পাতায় কার্টুন, মধু এবং হুল একসঙ্গে। এটি যদিও প্রথম সংখ্যা, এবং যদিও কাগজের চরিত্রটি এখনো পাকা হয়ে ওঠেনি তবু একটি বিশেষ আদর্শ নিয়েই যে এর আত্মপ্রকাশ তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এই ব্যয়বহুল প্রকাশনার কালে, স্বভাবতই আর্থিক অনটনের মধ্যে কার্টুনকে রীতিমত লড়াই করে বাঁচতে হবে এবং ক্রমশ উৎকর্ষ ও ব্যাপক প্রচারের দিকে এগোতে হবে একথা বলাই বাহুল্য।

অর্গল-অভিভাবকহীন বঙ্কশূন্য বাংলা সাহিত্যের অন্য চেহারা এখন। তির্যক প্রহরী পত্রপত্রিকা বিরল, সাহিত্যও হাস্যলেশহীন হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। এই বন্ধ্যাদশায় একটি অভিনব পত্রিকা হাতে পেয়ে মনটা আশান্বিত হয়ে উঠল। নাম কার্টুন। তবে শুধু রেখায় নয়, লেখায়ও। সুকুমার রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় এই মাসিক পত্রিকাটিতে বেশ কিছু রসবিদগ্ধ মানুষ জড়ো হয়েছেন।

শঁজেলিজেতে
রিকশার
টুংটাং

বই লিখে সমপরিমাণ সুনাম এবং দুর্নাম কুড়োবার এক রেওয়াজ সৃষ্টি করেছেন দোমিনিক লাপিয়ের। ওঁর এবং ওঁর সঙ্গী লেখক ল্যারি কলিন্সের দ্বৈতরচনার 'ইজ প্যারিস বার্নিং ?' 'ও জেরুজালেম !' 'ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট', 'দ্য ফিফথ হর্সম্যান' ইত্যাদি ডাকসাইটে বেস্টসেলার বইকে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার পর অনেকেই বলে বসেন 'হট ড্যাশ' কেতাব, অর্থাৎ 'ধরো তক্তা মারো পেরেক' গ্রন্থ। ইতিহাসকে সুখপাঠ্য উপন্যাসের মতো করে তোলার বিরল ক্ষমতা ওঁদের, কিন্তু বিবাদী স্বরের সমালোচকদের বক্তব্য যে, ওঁদের ঝটিকা-গবেষণা যথার্থ ইতিহাস রচনার উল্টো পদ্ধতি। পাঠাগারের শুষ্ক পৃষ্ঠার নির্মমতার পরিবর্তে ওঁরা ইতিহাসে আমদানি করেন নাটক, সংলাপ, থ্রিলারের গতিময়তা, টেপ রেকর্ডারের রিওয়াইন্ড, ফাস্ট ফরোয়ার্ড, প্লে। অথচ দুনিয়াময় লক্ষ লক্ষ লোক তাতেই বশ, এই দ্রুতপাঠ ইতিহাসই তাদের অনেককেই টেনে নিয়ে গেছে ইতিহাসের আসল বৃত্তে।

কিন্তু দোমিনিক লাপিয়েরের একার হাতে লেখা 'সিটি অফ জয়' কলকাতার ইতিহাস নয়। কলকাতার উপকণ্ঠে হাওড়ার পিলখানা বস্তির এক উপন্যাসোপম বৃত্তান্ত। তাতে একজন নায়ক আছে— রিকশাওয়ালা হাসারি পাল। তার এবং তার প্রতিবেশীদের সুখদুঃখের বারমাস্যা 'সিটি অফ জয়'। নিরানন্দ এক বিস্তীর্ণ পল্লীকে লাপিয়ের বলেছেন 'আনন্দনগর'। এই বই লেখার সময়েও লাপিয়ের কাজে লাগিয়েছেন তাঁর টেপ রেকর্ডার যন্ত্রটি। তাঁর বইয়ের রসদ জুগিয়েছে টেপে ধরা অজস্র লোকের কথাবার্তা, সাক্ষাৎকার। প্রায় এক ইতিহাসহীন জনগোষ্ঠীর ইতিবৃত্তই যেন তুলে ধরার চেষ্টা লেখকের। কিংবা ইতিহাস নয়, কিছু স্থির ও কিছু চলন্ত ছবি। তাতে নাটক আছে, অতিকথন আছে, অতিরঞ্জনও আছে, দুঃখ-যন্ত্রণা-অপমানের বিস্তৃত বিন্যাস আছে। আর আছে, লাপিয়েরের দৃঢ় দাবি, অন্তঃশীল আনন্দের অনিরুদ্ধ প্রবাহ। যে-কারণে বইয়ের নাম 'আনন্দনগর'।

জানানো হচ্ছে ইংরেজি, ফরাসি, ইতালীয় এবং অন্য কিছু ভাষায় ইতিমধ্যে এ বই বিক্রি হয়েছে ত্রিশ লক্ষের মতন। লাপিয়ের এখন চাইছেন বইটি কলকাতার প্রধান ভাষা বাংলাতেও বার হোক। ইংরেজিতেই 'সিটি অফ জয়' পড়ে হাজার হাজার নারী-পুরুষ চিঠি লিখে তাঁদের উচ্ছ্বাস জানিয়েছেন লেখককে। লাপিয়ের সেই সব চিঠির কিছু নমুনা পাঠ দিয়ে কিছুদিন আগে সূচনা করলেন তাঁর সাংবাদিক বৈঠক। তারপর সবিস্তারে বলতে লাগলেন কেন কলকাতার এই বিশেষ স্থান তাঁর হৃদয়ে। বললেন, পাশ্চাত্যে সব ঐশ্বর্য, সব সুখ আছে, শুধু নেই মনের আনন্দ। কেউ কারও খোঁজ রাখে না, কারও কাছে কারও কোনও প্রত্যাশা নেই। প্যারিসের উপকণ্ঠেও বস্তি আছে, আর সেই বস্তির জীবন আরও দুঃসহ, ভয়ঙ্কর। কারণ সেখানে কোনও প্রেম, কোনও ভালবাসা নেই। পিলখানার বস্তিতে চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও প্রেম ও আনন্দের বিস্তার আছে। হাজার দুঃখে দুঃখী মানুষও হাসে। এবারে মহরম আর বিশ্বকর্মা পুজোর দিন আমি ওখানে ছিলাম। মানুষ যে কী আপ্রাণ আনন্দ করতে পারে তা চাক্ষুষ করলাম। ধর্মীয় উৎসবের দুটো দিন শহর যেন ঈশ্বরের শহর, সিটি অফ গড হয়ে উঠেছিল। আমি এই আনন্দ আর বীরত্বের গাথা হিসেবে পরিকল্পনা করেছিলাম আমার বইটিকে। সেদিক দিয়ে আমার বই একটি এপিক, মহাকাব্য।

"কথা বলতে বলতে লাপিয়ের হুট করে পকেট থেকে একটা রিকশার ঘণ্টি বার করে টুং টুং বাজাতে লাগলেন। বললেন, পৃথিবীর যেখানে যখন থাকি আমি পকেটে নিয়ে ঘুরি এই ঘণ্টি। প্যারিসের শঁজেলিজে দিয়ে যখন হাঁটি, কিংবা নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ার দিয়ে আমি ফাঁকে ফাঁকে এই ঘণ্টি বাজিয়ে চলি। না, কোন রোমানটিসিজম আসে না এই ধ্বনিতে, এই আওয়াজে কোথায় যেন মেহনতি জনতার সংগ্রামের বলিষ্ঠ পদধ্বনি মিশে আছে।"

১৯৮৪ সালে যখন কলকাতা এসেছিলেন লাপিয়ের তখন এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছিলেন যে ১৯৫২ সালে হিচহাইক করে মধুচন্দ্রিমা কাটাতে এসেছিলেন ভারতে ঠিক তখনই এদেশের সঙ্গে ওঁর প্রেমপর্ব শুরু হয়। মধ্যিখানে অনেকগুলো বছর কেটে গেল, তারপর 'ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট' বই ওঁকে ফের টেনে আনল পুরাতন প্রেমের পীঠে। 'ফ্রিডম'-এ কলকাতার দাঙ্গা ও গান্ধীর আগমন অজস্র ডিটেলে লিখতে লিখতেই বোধ হয় কলকাতা নিয়ে ওঁর ভাবনাচিন্তার সূত্রপাত। কলকাতাকে বইয়ের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করার আগেই অবশ্য কলকাতা'র গরিব মানুষদের সাহায্যে কিছু করার পরিকল্পনাটা গেড়ে বসে ওঁর মাথায়। জনৈকের প্রশ্নে তাই বললেনও সেদিন, বেশ ক' বছর ধরেই কলকাতার প্রতি আমার আকর্ষণ বাড়ছিল। মাঝে-মধ্যে আসতাম এখানে। এরকমই এক সফরে আমার দেখা হল এক ইউরোপীয় দম্পতির সঙ্গে। যাঁরা ব্যারাকপুরে একটা শিশু নিকেতন চালাচ্ছিলেন। কিন্তু টাকার টানাটানিতে তাঁরা ওই আশ্রম বন্ধ করার মুখে এসে পড়েছিলেন। সেই সময়ই আমি আর আমার স্ত্রী দোমিনিক স্থির করলাম যে এঁদের সাহায্যে কিছু টাকা তুলে দেব। দিয়েওছিলাম। আর সেই থেকে ১৫০টি শিশুর আবাস 'উদয়ন'-এর জন্য যতটুকু যা আর্থিক সাহায্য পারছি জুগিয়ে যাচ্ছি। এই সংস্থায় অধিকাংশ শিশুই নিরাশ্রয়, পরিত্যক্ত, অবাঞ্ছিত শিশু। যাদের অনেকেই আবার কুষ্ঠরোগাক্রান্ত। দেশে ফিরে এদের জন্য শেষে গড়ে তুলতে বাধ্য হলাম 'অ্যাকশন এড' সংগঠন, যার কাজ হল কলকাতার কুষ্ঠরোগীদের সেবা ও মঙ্গলের জন্য তহবিল গঠন করা।

'সিটি অফ জয়' লেখার আগে আরও একটা কলকাতা বিষয়ক রচনা লিখেছিলেন দোমিনিক লাপিয়ের। একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ, নাম 'ক্যালকাটা, মাই লাভ'। ফ্রান্সের বিখ্যাত পত্রিকা 'জেয়ো'-তে বেরিয়েছিল সে লেখা। লেখাটি কিন্তু খুব সহজে ছাপানো সম্ভব হয়নি, কারণ সম্পাদক মহাশয়ের ধারণা হয়েছিল দুঃখ দারিদ্র্য দুর্দশাগ্রস্ত এক শহরের কথা কেউ পড়তে চাইবে না। কিন্তু লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর এক সমীক্ষায় জানা গেল পাঠকদের ৯৮·৫ শতাংশের কাছেই বিশেষ আবেদন ছিল কলকাতা কাহিনীর। আর তখনই লাপিয়ের মনস্থ করেন 'সিটি অফ জয়' লিখবেন।

লাপিয়ের খুব নাটক ভালবাসেন। এসব বলতে বলতে হুট করে পকেট থেকে একটা রিকশার ঘণ্টি বার করে টুং টুং করে বাজাতে লাগলেন। আর বললেন, পৃথিবীর যেখানে যখন থাকি আমি পকেটে নিয়ে ঘুরি এই ঘণ্টি। প্যারিসের শঁজেলিজে দিয়ে হাঁটি যখন, কিংবা নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ার দিয়ে আমি ফাঁকে ফাঁকে এই ঘণ্টি বাজিয়ে চলি। আর তখন মনে পড়ে সেই ক্রিসমাসের রাত যেদিন রাসেল স্ট্রিটের বেঙ্গল ক্লাবের ঘরে শুয়ে শুয়ে প্রথম সচেতন ভাবে শুনেছিলাম এই আওয়াজ। না, কোনও রোমান্টিসিজম আসে না এই ধ্বনিতে, এই আওয়াজে কোথায় যেন মেহনতি জনতার সংগ্রামের বলিষ্ঠ পদধ্বনি মিশে আছে। লাপিয়েরের ঘণ্টি শুনে আমার মনে পড়ল বহুদিন পূর্বে নীরদ সি চৌধুরীর এক বক্তৃতায় শিভ্যালরির নাটকীয় ব্যাখ্যায় বৃদ্ধ

বুদ্ধিজীবীর সহসা পুরনো একটা তরবারি বার করে আস্ফালনের ঘটনা।

আমার মনে হল আমার প্রশ্ন করার সময় এসেছে। বললাম, আমার চার-চারটে প্রশ্ন করার আছে। লাপিয়ের হেসে উঠে বললেন, চারটে ? আচ্ছা করুন।

জিজ্ঞেস করলাম, লেখক হিসেবে আপনার কি একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছে না যে, যে-মানুষদের নিয়ে আপনি লিখলেন সেই লেখাতে তাঁদেরই কেউ-কেউ আহত হলেন ?

এতক্ষণ তোড়ে কথা বলে যাওয়া লাপিয়েরের উচ্ছ্বাসী কণ্ঠ এবার একটু গম্ভীর হয়ে এল। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, যদি কেউ আমার লেখা পড়ে আহত হয়ে থাকেন তার জন্য আমি দুঃখিত। কারণ কাউকে দুঃখ দেবার জন্য আমি লিখিনি। এ বই আমি লিখেছি ওই সমাজের বীরত্বের কথা পাঠককে শোনাব বলে। এ বই গবেষণালব্ধ তথ্য নিয়ে এবং ভালবাসা দিয়ে লেখা। যদি কেউ আঘাত পেয়ে থাকেন তবে বলতেই হবে তা একান্ত অনভিপ্রেত।

প্রশ্ন করলাম, আপনি কি সত্যিই কোনও রিকশাওয়ালাকে পান দিয়ে যক্ষ্মার রক্ত ঢাকতে দেখেছেন ?

—না দেখিনি। তবে শুনেছি। আমার টেপে এই মর্মে বক্তব্য রেকর্ড করা আছে।

প্রশ্ন করলাম, আর আপনি কি সত্যিই তেমন মহিলার দেখা পেয়েছিলেন যিনি পয়সার জন্য নিজের পেটের ভ্রূণ বিক্রি করেছেন ? আর তা পাচার হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণাগারে ?

—না, তাও পাইনি। তবে সেই মর্মেও জবানবন্দী রেকর্ড করা আছে আমার। কেন, আপনাদের এখানে তো চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে এই থিম নিয়ে। হয়নি কি ?

ভাবলাম, চলচ্চিত্র তো এদেশে কত কিছু নিয়েই হয়। তার কী মূল্য বা সত্যতা আছে জীবনে ? ভাবছি যখন, ঠিক তখনই লাপিয়ের কিছুটা প্রায় হতাশার সঙ্গে বললেন, দেখুন, সব জিনিস স্বচক্ষে দেখে লিপিবদ্ধ করতে গেলে তো কয়েক জন্মই কেটে যাবে আমার। আর সেভাবে কি বই লেখা যায় ?

ভাবলাম, যায় না হয়তো। কিংবা যায়ও। বই তো শুধু একভাবেই লেখা হয় না। কিন্তু এসব কিছু না বলে ওঁর মুড ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বললাম, কিন্তু ভ্রূণ বিক্রির ঘটনাটা যেমন বিশ্বাসযোগ্য ভাবে লিখেছেন আপনি তাতে ধারণা হচ্ছিল যে আপনি হয়তো তেমন মানুষ দেখেও ফেলেছেন পিলখানায়। লাপিয়ের আমার প্রশংসায় চঞ্চল হয়ে বলতে লাগলেন তখন, সে তো লেখক হিসেবে আমার অপরিসীম দক্ষতার নজির। সে দক্ষতায় আমি বেলেঘাটায় গান্ধীজির অনশনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিখে মানুষকে বুঁদ করে দিয়েছিলাম। সে সবও তো আমি চাক্ষুষ করিনি।

এবার আমার প্রশ্ন : কিন্তু যে কথা সত্য নয় বলে আপনি জানেন তা বিশ্বাসযোগ্য ভাবে লেখার চেষ্টায় নিজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হয় না কি ?

—না, তা' হয়নি। কারণ আমি লেখার আগে জানতাম যে ঘটনাটি সত্য।

এরপর আর ওই পথে না গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সাত-সাতটি বইয়ের মধ্যে 'সিটি অফ জয়'-কে কোথায় রাখবেন ? প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় না শেষ

> আমি কাহিনী রচনা পছন্দ করি না। আমি তথ্যেরই তল্লাশে থাকি। তবে তথ্যের বিন্যাস ও উপস্থাপনায় আমার লেখকবৃত্তি প্রতিভাত হয়ই। সব তথ্যই তো আর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নয়, অনেকটাই অন্যের বক্তব্য ও বিবৃতির ভিত্তিতে। ...যে গবেষণা চালাই তথ্যের সন্ধানে ও যেভাবে তার থেকে ঝাড়াই-বাছাই করি তারপর আর খুব বেশি কাহিনী উপকরণের অবকাশ থাকে না।

স্থানে ? লাপিয়ের বললেন, প্রশ্নটা ভাল। এ বই আমার খুব ব্যক্তিগত অনুভূতির ফসল। এ বই আমাকে একা-একাই লিখতে হতো। আগের যাবতীয় বই লিখেছি ল্যারি কলিন্সের সঙ্গে। কিন্তু এই বই লিখতে গিয়ে বুঝেছিলাম এতে একটা আত্মিক সংযোগ আছে আমার। এ বই ব্যক্তিগত, নিঃসঙ্গ প্রয়াস হতে হবে। তাই একা-একাই কাজে হাত দিয়েছিলাম। এর গবেষণার ধারাও ছিল ভিন্ন। পুরো আবর্তটাই ভিন্ন এবং অন্তরঙ্গ। ভাল হোক, মন্দ হোক, এ বইয়ের এক গভীর অনুরণন আছে আমার হৃদয়ে। এই বই, এই বইয়ের মানুষ ও সমাজ আমাকে অনেক নতুন কিছু দিয়েছে। জীবনকে অন্য মানুষ, প্রতিবেশী সমাজের সঙ্গে ভাগ করে উপভোগ করার সূত্র ধরিয়ে দিয়েছে। আমাকে বদলে দিয়েছে। যে কথাটা বইয়ের গোড়ায় তুলে দিয়েছি তাতে বিশ্বাসও জন্মেছে এই বই লিখতে গিয়ে। কথাটা হল— হোয়াট এভার ইজ নট গিভেন ইজ লস্ট। যা দেওয়া হয়নি তা আসলে হারিয়েই গেছে।

এই সময় সাংবাদিকদের একজন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, আপনি মূলত একজন কাহিনীকার না তথ্য উপস্থাপক ? লাপিয়ের খুব জোরের সঙ্গে বললেন, কিছুটা বা আত্মরক্ষায়, যে, আমি কাহিনী রচনা পছন্দ করি না। আমি তথ্যেরই তল্লাশে থাকি। তবে তথ্যের বিন্যাস ও উপস্থাপনায় আমার লেখকবৃত্তি প্রতিভাত হয়ই। সব তথ্যই তো আর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নয়, অনেকটাই অন্যের বক্তব্য ও বিবৃতির ভিত্তিতে। কিন্তু ল্যারি কলিন্স ও আমি যে গবেষণা চালাই তথ্যের সন্ধানে ও যে ভাবে তার থেকে ঝাড়াই-বাছাই করি তারপর আর খুব বেশি কাহিনী উপকরণের অবশেষ থাকে না।

ভাল কথা। এসব শোনা কথাও। নন্-ফিকশন লেখকরা তো বটেই, আজকালকার ঔপন্যাসিকরাও দাবি করেন যে তাঁদের রচনা নাকি জীবন ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। বেচারি পাঠক আমরা কোন্ কূলে যাই ? সবাই যদি এত গবেষণামুখী তাহলে আমরাই বা এত সেকেন্ড-হ্যান্ড সত্যের দিকে ধাই কেন ? আমরাও তো জীবনের দিকেই সরাসরি এগোতে পারি। এগোলামও তাই। সাংবাদিক বৈঠকের পর বন্দোবস্ত ছিল বিয়র ও হুইস্কির। আমরা সেদিকে গেলাম।

আর তখনই একেবারে মুখোমুখি হলাম দোমিনিক লাপিয়েরের। দুজনের হাতে বিয়র, কথায় অঢেল প্রীতি ও শুভেচ্ছা। লাপিয়ের জিজ্ঞেস করলেন, আপনি 'সিটি অফ জয়'-এর বাংলা তর্জমা করবেন ? দেখুন, ভেতর থেকে যদি সত্যিকারের সাড়া পান তবেই না ! ইট মাস্ট বি অ্যান অ্যাক্ট অফ লাভ।

আমি 'হ্যাঁ', 'না' কিছুই স্পষ্ট বলিনি। কারণ জানতাম না কোনটা ঠিক চাই। একটা দুর্বলতা মনে তৈরি হয়েই ছিল আগের থেকে। বইয়ের রয়্যাল্টির অর্ধেক টাকা লাপিয়ের দিয়ে দিতে চেয়েছেন পিলখানার উন্নয়নে। পিলখানার বাসিন্দাদের এক গোষ্ঠী টাকা নিতে অস্বীকারও করেছেন। তবুও লেখকের এই মানবিকতার দিকটাকে কিছুতেই ছোট করা যায় না। কিন্তু এখন ভাবছি যে কলকাতার আনন্দ-বেদনার কথা তর্জমায় লিখব কেন ? যে আনন্দ-বেদনা আমার শিরায় শিরায়, রক্তের অণুতে অণুতে তা তো নিজেই লিখে ফেলতে পারি কোনদিন। যদি সরস্বতী কৃপা করেন।

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

ছবি : সুধীর চ্যাটার্জি

যুগ ও যবনিকা

দেবাশিস দাশগুপ্ত

যুগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত/ অজিত মণ্ডল/ পুস্তক বিপণি/ কল-৯/২৭.০০

গবেষণার সঙ্গে পাঠকের আতঙ্কের একটি আত্মীয়তা আছে। ডঃ অজিত মণ্ডল, 'যুগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত' গ্রন্থটি এই বিধির ব্যতিক্রম। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, সকলেই গবেষণার জন্য অতীতে ডুব দেন। কিন্তু ডঃ অজিত মণ্ডল বেছে নিয়েছেন এমন একজন নাট্যকারকে যিনি পেশাদারি মঞ্চের প্রায় লাস্ট অব দি রোমান্‌স, আবার ঠিক তখনই নতুন থিয়েটার জন্ম নিচ্ছে। ক্রান্তি লগ্নের নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

মঞ্চের সঙ্গে যোগ না থাকলে দর্শক-রুচি অথবা আবেগের নাড়ি-স্পন্দন ধরা যায় না। অনেক সাহিত্যিক নাটক লিখেছেন, সেগুলি নাটক হিসাবে নিশ্চয়ই চিরকালীন সম্পদ, কিন্তু মঞ্চ-সাফল্য নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক মঞ্চ-সফল হয়েছিল, তবে তার মূলে নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণাও কম ছিল না। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রথমত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ক্রমশ মঞ্চের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। স্বাধীনতাসংগ্রাম তাঁর মূল প্রেরণা। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সময়ের নাট্যকার। গ্রন্থকার কয়েকটি অধ্যায়ে শচীন্দ্রনাথের জীবন আলোচনা করেছেন, সেই আলোচনা থেকে বোঝা যায় নাট্যরচনার বীজটি কোথায় অঙ্কুরিত। ডঃ অজিত মণ্ডল নিরপেক্ষ আলোচনা করেছেন—এমনকি মঞ্চ

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

আঙ্গিকেরও। চলচ্চিত্র তখন আসর জাঁকিয়ে বসেছে—ফলে পুরনো নাটকের ধারা বদলে গতি আনার প্রয়োজন হল। ঠিক সেই সময় এলেন সতু সেন, ফলে মঞ্চ আঙ্গিকেরও আমূল পরিবর্তন করা হল। ওয়াগন স্টেজ, রিভলভিং স্টেজের প্রবর্তন না হলে তখন চলচ্চিত্রের পাশাপাশি নাট্য-ঐতিহ্য বজায় রাখা কঠিন হত। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এই যুগের দাবি মেনে নাটক লিখেছেন। তবু কি হয়। ১৯২৯ সালে সোওয়া দুই ঘণ্টার নাটক 'রক্ত কমল' দর্শক প্রত্যাখান করল। ছয় ঘণ্টার নাটক দেখা তখন নাট্যদর্শকদের অভ্যাস। আজকাল যাত্রাও তিন ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ রাখা হয়, ফলে এমন ধারণা করা যাবে না, সে যুগে এটা বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। শচীন্দ্রনাথের নাটকে নারীজাতির প্রাধান্য এবং অপরাধ প্রবণতা নিয়েও গ্রন্থকার আলোচনা করেছেন। নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য এই পন্থার তিনি সমালোচনাও করেছেন।

সাধারণত গবেষণা গ্রন্থে নাট্যের গঠন, চরিত্রের উপযোগিতা প্রভৃতি পরীক্ষার উপযোগী বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। নাটকের জন্য মূল স্তম্ভ যে অভিনয় সেটা গ্রন্থকার ভুলে যান। চলচ্চিত্র ও নাটকের আলোচনায় শিল্পীরা ব্রাত্য হয়ে থাকেন। ডঃ অজিত মণ্ডল সেই দিকটি অবহেলা করেননি। তবে এই ব্যাপারে তিনি মূলত নির্ভর করেছেন সমালোচনার উপর। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নয় পরোক্ষ অভিজ্ঞতা। তবুও গ্রন্থটিতে নিজের ভাবনা আছে, শুধুমাত্র উদ্ধৃতি নির্ভর নয়। আঙ্গিকের বিবর্তন এই সময়ে উল্লেখযোগ্য, ফলে সতু সেনের অভিজ্ঞতা তাঁর কাজে লেগেছে। ক্রমশ গানের বাহুল্য কমে আসছে। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের সুরে 'সিরাজদ্দৌল্লা' নাটকে 'পথহারা পাখী' গানটিতে মঞ্চ-নির্দেশ আছে, আলো ক্রমে কমে আসে, তার পরেই যুদ্ধ যাত্রা। এইখানেই গানের সার্থকতা এবং নাটকের স্বার্থে গানের উদাহরণ— আধুনিক নাটকের পদক্ষেপ। এই ধরনের উদাহরণ দিলে নাট্যকর্মীরা উপকৃত হতেন। অনেক শিল্পীর নাম তিনি করেছেন, কিন্তু 'ধাত্রীপান্না'র বনবীরের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের আলোচনা করেননি।

গ্রন্থে পুনরুক্তি দোষ প্রকট। একই কথা বারবার চলে এসেছে অথচ একথা বলা হয়নি, শচীন্দ্রনাথ সমকালীন নাট্যকারদের উপর কতটা প্রভাব ফেলেছেন। সবরকম শিল্পের জগতে একটা ফরমুলা কাজ করে। কোন শিল্প সফল হলেই সে ছক চলতেই থাকে।

সিরাজদৌল্লা, মহারাজ নন্দকুমার, টিপু সুলতান প্রভৃতি কয়েকটি নাটক পরপর দেখলেই বোঝা যাবে কোন ধারাটি বহমান ছিল। সামাজিক নাটকেও 'তটিনীর বিচার' বা অন্যান্য নাটকের প্রভাব কি পড়েনি? গ্রন্থকারের আরও দায়িত্ব ছিল। পুনরাবৃত্তি বাদ দিলে সেগুলি আরও গ্রন্থের মর্যাদা বাড়াত। যেমন শেকসপীয়ারের ম্যাকবেথ। সম্ভবত বহুরূপী পত্রিকায় প্রকাশিত। উৎপল দত্তের নির্দেশনায় এই নাটকের অভিনয়ও হয়। ম্যাকবেথ'

গিরিশচন্দ্র অনুবাদ করেন, পরবর্তীকালে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অনুবাদ করেছেন। কবির অনুবাদ এবং দুই যুগের নাট্যকারদের অনুবাদ নাট্যকর্মীদের অনুপ্রাণিত করতে পারত।

নাট্যরূপের বিষয়ে উদাহরণ আরও বিস্তারিত হওয়া উচিত ছিল, রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের নাট্যরূপে নতুন চরিত্র এনেছেন, নাটকের পরিবর্তন করতে হলেও অনেক চরিত্র বর্জিত অথবা সংযুক্ত হত। কিন্তু শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে শচীন্দ্রনাথের নতুন চরিত্র সংযোজন যথেষ্ট সাহসের পরিচায়ক। 'দেবদাস' নাটকে 'বসন্ত' এবং পথের দাবী নাটকে 'থেনমঙ' চরিত্র কল্পনা নাটক গঠনে অন্য মাত্রা আনে। সবচেয়ে বড়কথা, এই সংযোজিত চরিত্র নাটকে মুখ্য অংশ হয়ে ওঠে। কাগজে পুরনো বিজ্ঞাপন ঘাঁটলেই দেখা যাবে বসন্ত বা থেনমঙ চরিত্রে সবসময়ে অভিনয় করেছেন শিল্পী জগতের প্রবাদপুরুষরা। অর্থাৎ সংযোজিত চরিত্র অভিনয়গুণে এমন একটি জায়গা নিয়েছিল যা নিছক পরিবর্ধন নয়। কোনক্রমে একজন শিল্পী দিয়ে কাজ চালানো হত না। এইখানেই নাট্যকার এবং শিল্পীর সিদ্ধি।

'নবান্ন' নাটকের পর শিশিরকুমার 'দুঃখীর ইমান' মঞ্চস্থ করেছিলেন। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'মাটির মায়া' (১৯৪৩) লিখেছেন। কন্তু মিনার্ভায় এই নাটক তটা সাফল্য পায়নি। চ্চ কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁ অন্তরঙ্গতা ছিল। কিন্তু তুলী লাহিড়ী যেটা পারণে শচীন্দ্রনাথ সেটা পারণে না। কারণ, তফাত ছিল ভিন্ন ভূমির। পুরোহিরেও জাতিভেদ আছে। স অনুষ্ঠান এক পুরোহিত মাধা করতে পারেন না

প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিদ্যা

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসূর্যসিদ্ধান্ত/ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ-সংকলিত/ (সং) অরূপরতন ভট্টাচার্য/ জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স/ কল-১৩/৫০.০০

ভারতে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশের সূচনা হয় এখন থেকে প্রায় ছ হাজার বছর আগে, যখন আর্যেরা ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলি রচনা করতে আরম্ভ করেন সেই সময় থেকে। তখন থেকেই আর্য ঋষিরা যন্ত্রের সঙ্গে আকাশের নক্ষত্র ও তাদের মধ্য দিয়ে চন্দ্র ও সূর্যের গতিবিধি লক্ষ করতেন। আকাশের নক্ষত্রদের নিয়ে অনেক উপাখ্যানও তাঁরা রচনা করেছিলেন—সেগুলোর কিছু না কিছু ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলে এখন বোঝা যাচ্ছে। যেমন অগস্ত্যঋষি দক্ষিণাপথে যাবার পর যখন আর ফিরে এলেন না, তখন দক্ষিণ আকাশে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রকে অগস্ত্য নাম দেওয়া হল। এই রকম রোহিণী, ধ্রুব ও অন্যান্য অনেকের উপাখ্যান আছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দিন ঠিক করবার জন্যে পঞ্জিকার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়, আর তখন একটি পঞ্জিকা গণনা পদ্ধতিও প্রবর্তিত হয়—এই পঞ্জিকাই বেদাঙ্গ জ্যোতিষ পঞ্জিকা নামে পরিচিত।

হিন্দু পঞ্জিকার তিনটি যুগ দেখা যায়। তার মোটামুটি হিসেব হল এই রকম—প্রথম যুগ প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৫০ পর্যন্ত। দ্বিতীয় বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ যুগ খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৫০ থেকে খ্রীষ্টাব্দ ৪০০ পর্যন্ত। এই দুই যুগের গণনাপদ্ধতি যে খুব উঁচু ধরনের ছিল তা বলা যায় না। তৃতীয় সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ যুগ— এই যুগের আরম্ভ ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। এই যুগকে ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সুবর্ণ যুগ বলা হয়। এই সময়ে আর্যভট, লাটদেব, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, লল্ল, মুঞ্জাল, শ্রীপতি এবং ভাস্করাচার্য প্রমুখ প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদরা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদেরই প্রযত্নে গড়ে ওঠে সিদ্ধান্ত নামে পরিচিত ভারতীয় জ্যোতিষের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি—'সিদ্ধান্ত' শব্দের অর্থ "মীমাংসা" অর্থাৎ জ্যোতিষীয় সমস্যার চরম মীমাংসা। এঁদেরই চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে গ্রহদের সূক্ষ্মগতি এবং অন্যান্য জ্যোতিষীক ধ্রুবক ও গণনার সূত্রাবলী আবিষ্কৃত হয়। এই যুগে ত্রিকোণমিতি ও গোলীয় ত্রিকোণমিতির মূল সূত্রগুলি আবিষ্কৃত হয়, আর এগুলোকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রয়োগ করে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহদের দৈনন্দিন প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করা হয়।

সিদ্ধান্ত গ্রন্থের কথা বলতে গেলে সবসুদ্ধ আঠারোটি গ্রন্থের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়—তবে এদের মধ্যে সূর্যসিদ্ধান্তই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থ যখন রচিত হয়, তখন দূরবীন আবিষ্কৃত হয়নি, মাপজোখের যন্ত্র খুব সূক্ষ্ম ছিল না, তখন মানমন্দির বলে বিশেষ কিছু গড়ে ওঠেনি; অথচ খালি চোখ দিয়ে নিরীক্ষণ করে এমন সব গণনা তখনকার জ্যোতিষীরা করেছিলেন, যা আজও বিস্ময় উদ্রেক করে।

বর্তমানে যে আকারে আমরা সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থ পাই তা নিঃসন্দেহে গণিত-জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। কিন্তু এই গ্রন্থে গ্রহাবস্থান গণনার জন্যে যে সকল সূত্র এবং ধ্রুবকসমূহ (Constants) দেওয়া আছে সেগুলি অবশ্য উন্নত ধরনের নয়, কেন না এইসব সূত্র দ্বারা গণিত গ্রহগুলির অবস্থানের সঙ্গে প্রকৃত মহাকাশে তাদের অবস্থানের সম্পূর্ণ ঐক্য বজায় থাকে না। কিন্তু অন্যান্য সূত্রসমূহ, (ধ্রুবকসমূহ নহে), বেশ উন্নত ধরনের। এই জন্যে সূর্যসিদ্ধান্ত সর্বজনমান্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের বড় মূল্যবান গ্রন্থ এবং বহুকাল ধরে সূর্যসিদ্ধান্ত অনুসারে ভারতে পঞ্জিকার গণনাকার্যও চলে আসছে। সমস্ত দিক বিচার করলে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থের অবদান অসামান্য। মূল গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষায়, আর তাকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ এবং টীকা সহযোগে সম্পাদনার কাজ মোটেই সহজসাধ্য নয়, অত্যন্ত দুরূহ। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ শুধুমাত্র আত্মিক শক্তিতে মহিমান্বিত একজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ছিলেন না, তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে যে গ্রন্থগুলি আছে, সেগুলি সাধারণের পাঠ করা নিতান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থটির

বঙ্গানুবাদ করেন, আর এটি টীকা সহকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে। নিঃসন্দেহে এই অনুবাদ-গ্রন্থ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের এক অক্ষয় কীর্তি। কিন্তু এই বইখানি বহু বছর ধরে দুষ্প্রাপ্য ছিল। অরূপরতন ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় এই গ্রন্থখানির বর্তমান সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এরকম একখানি মূল্যবান গ্রন্থের প্রকাশনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়।

আমরা এখন যে সূর্যসিদ্ধান্তের কথা জানি তার সঙ্গে সর্বপ্রথম লেখা সূর্যসিদ্ধান্তের বিস্তর তফাত: বহু জ্যোতির্বিদ ও টীকাকারের হাতে নানাভাবে পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়ে এই গ্রন্থ বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছিল। পঞ্চম শতাব্দী কি তারও আগে থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এইসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। হিন্দুদের এটি সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক জ্যোতিষীয় গ্রন্থ। পরিবর্তিত বর্তমান সূর্যসিদ্ধান্ত ১৪টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত, আর অনুষ্টুপ ছন্দোবিশিষ্ট ৫০০টি সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা এই গ্রন্থ রচিত। প্রথম অধ্যায়ে গ্রন্থখানির সূচনায় আছে যে, অসুর ময়ের আগ্রহে সূর্য তাঁর কাছে সৃষ্টির রহস্য ব্যক্ত করেন। এই গ্রন্থ ঠিক কবে রচিত হয়েছিল তা নির্ণয় করা সহজ নয়—তার কারণ এই গ্রন্থ যিনি রচনা করে গেছেন তাঁর কোনো নাম নেই, নাম জানা থাকলে তাঁর আবির্ভাবকালের আভাস থেকে গ্রন্থটির কাল নির্ণয় সহজ হত। তবে সূর্যসিদ্ধান্তের ইংরেজি অনুবাদক বার্জেস (E. Burgess) অনেক গবেষণার পর এমন সিদ্ধান্তে আসেন যে, ৪৯০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১০৯১ খ্রীষ্টাব্দের মাঝখানে কোনো সময়ে সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থটি প্রণীত হয়েছিল।

সূর্যসিদ্ধান্তের প্রথম পরিচ্ছেদে গ্রহগতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে ৭০টি শ্লোক আছে। এই অধ্যায় থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে সেই সময়ের ভারতীয় জ্যোতির্বিদরা লক্ষ করেছিলেন যে পৃথিবী পরিক্রমণের সময়ে গ্রহদের একটা অনিয়মিত এবং বিশৃঙ্খল গতি আছে। গ্রহগতি কখনো দ্রুত, কখনো শ্লথ, আবার কখনো বা পরিক্রমণ পথের দিক পরিবর্তন করে গ্রহেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়। সূর্যসিদ্ধান্তে গ্রহদের আটরকম গতির কথা বলা হয়েছে। যে গ্রহের কক্ষা বড়, সেই গ্রহ অপেক্ষাকৃত কম গতিতে, আর যে গ্রহের কক্ষা ছোট, সেই গ্রহ অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে আবর্তনরত—এ ব্যাপারেও তাঁদের দৃষ্টি এড়ায়নি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গ্রহদের প্রকৃত অবস্থান বিষয়ক ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রহদের আবর্তন পথের কেন্দ্রে পৃথিবীর অবস্থান এবং গ্রহেরা কয়েকটি এক কেন্দ্রীয় বৃত্তপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে—এরকম ধারণা ভারতীয় জ্যোতির্বিদদের ছিল। সূর্যসিদ্ধান্তের তৃতীয় অধ্যায়ে আছে দিক, দেশ ও কাল সংক্রান্ত বিবিধ পরিমাপ প্রক্রিয়া—এর সঙ্গে অয়নচলনের তথ্য জড়িত বলে গ্রন্থটির অনুবাদক বিজ্ঞানানন্দ স্বামী মনে করেছেন। কিন্তু বার্জেসের অভিমত, মূল সূর্যসিদ্ধান্তের রচয়িতাগণ অয়নচলন (Precession of the equinoxes) সম্পর্কে মোটেই অবহিত ছিলেন না, এ ধারণা একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে মূল সূর্যসিদ্ধান্তে প্রক্ষিপ্ত হয়।

সূর্যসিদ্ধান্তের পরবর্তী চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ গণনার কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। শুধু গণনা কৌশল নয়, গ্রহণের বৈজ্ঞানিক কারণ কি তারও উল্লেখ আছে। সপ্তম অধ্যায়ে গ্রহদের একত্র সমাবেশ, যাকে আমরা গ্রহসংযোগ আখ্যা দিয়ে থাকি, সম্পর্কে আলোচনা আছে। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় এরকম সমাবেশকে গ্রহযুতি বলা হয়। গ্রহযুতি নির্ণয় ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রকমের। অষ্টম অধ্যায়টি নক্ষত্র সংক্রান্ত। এই পরিচ্ছেদে সারণী আকারে চান্দ্র-তিথি সংক্রান্ত ২৭টি নক্ষত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। নক্ষত্রের পরিচয় এবং অবস্থান প্রসঙ্গে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে যোগতারা ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আসলে যোগতারা হল প্রত্যেক নক্ষত্রপুঞ্জের প্রধান নক্ষত্র—এক কথায় যোগতারার অবস্থান সমগ্র নক্ষত্রপুঞ্জটির পরিচয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য। নবম পরিচ্ছেদে, চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহ ও নক্ষত্রের সূর্যের সঙ্গে উদয়াস্তের বিষয়ে আলোচনা আছে; আর পরবর্তী দশম অধ্যায়ে আছে চন্দ্রের উদয়াস্ত বিষয়ক আলোচনা। সূর্যসিদ্ধান্তের একাদশ অধ্যায়টির নাম পাতাধিকার—১৪টি অধ্যায়ের মধ্যে এটি তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ। চন্দ্র ও সূর্যের ক্রান্তি যে সময়ে সমান, সেই সময়ে চন্দ্র ও সূর্যকে নিয়ে জ্যোতিষীয় কয়েকটি দোষ এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সূর্যসিদ্ধান্তের প্রথম অধ্যায় থেকে একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত। সেদিক দিয়ে পরবর্তী তিনটি অধ্যায় অর্থাৎ দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ অধ্যায় এর সুনিশ্চিত ব্যতিক্রম। দ্বাদশ অধ্যায়ে আলোচনার মধ্যে আছে পৃথিবীর আকার, আয়তন, গতি, দিনরাতের হ্রাস-বৃদ্ধি এবং ঋতু পরিবর্তনের কথা। ভূতাত্ত্বিক দিক দিয়ে এই অধ্যায়টির গুরুত্ব আছে। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে আর্মিলারি গোলকের নির্মাণ কৌশল ও শঙ্কু, যষ্টি, ধনু, চক্র প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের ছায়াযন্ত্রের উল্লেখ আছে। জ্যোতির্বিদ্যার বিবিধ গণনায় এই যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই অধ্যায়ের শেষে বিজ্ঞানানন্দ স্বামী কাশীর ও দিল্লীর মানমন্দিরের বিবরণ দিয়েছেন, এতে এই গ্রন্থের মূল্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২৭টি শ্লোকযুক্ত সর্বশেষ পঞ্চদশ অধ্যায়টির বিষয়বস্তু হল কাল নিরূপণের বিভিন্ন উপায়। কাল মান নয়টি, কিন্তু মাত্র চারটি কাল মান ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমন সৌর, চান্দ্র, নাক্ষত্রিক ও সাবন।

সূর্যসিদ্ধান্তের বিভিন্ন অধ্যায় থেকে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার একটা সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানানন্দ স্বামীর এই সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থখানি সত্যিই অত্যন্ত মূল্যবান। যে-কোন বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠক যদি কৌতূহলী হন যে প্রাচীন ভারতে হিন্দু জ্যোতির্বিদদের ধ্যান-ধারণা কেমন ছিল, তা হলে এই সুসম্পাদিত সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থটির রস তাঁকে আস্বাদন করতেই হবে—কারণ এই গ্রন্থটি না পাঠ করলে ভারতীয় জ্যোতিষ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা কারোর পক্ষেই সম্ভবপর নয়। এই দিক দিয়ে বিচার করলে, বলা যেতে পারে যে বাঙালী পাঠকের কাছে সূর্যসিদ্ধান্তকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বিজ্ঞানানন্দ স্বামী আমাদের কাছে নিতান্ত শ্রদ্ধাভাজন হয়ে আছেন। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে যাঁদের কৌতূহল ও ঔৎসুক্য আছে, তাঁদের কাছে এই গ্রন্থ অমূল্য বলে নিঃসন্দেহে বিবেচিত হবে।

উল্লেখ্য সঙ্গীতগ্রন্থ

সুভাষ চৌধুরী

সঙ্গীত-কথা/
অপূর্বকুমার মৈত্র/
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ/
কল-১৩/৩২.০০

গত কয়েক বছরে সঙ্গীত শিক্ষা, প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাভাষায় সঙ্গীত বিষয়ক

গ্রন্থ রচনা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিমাণে গ্রন্থপ্রকাশ উল্লেখযোগ্য হলেও অধিকাংশই পুনরাবৃত্তি মাত্র। কিন্তু তারই মধ্যে এমন কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হতে দেখি যা নির্দিষ্ট পরিকল্পনার স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। এইসব গ্রন্থে লেখকের একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গির আভাস মেলে। সাঙ্গীতিক আলোচনায় হয়তো নতুন কোনো সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় না কিন্তু বক্তব্যে কোথাও অস্পষ্টতা থাকে না। এখানেই লেখকের কৃতিত্ব।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'সঙ্গীত-কথা' গ্রন্থটি প্রধানত পাঠ্যপুস্তক হিসাবে বিবেচিত হলেও লেখক অপূর্বকুমার মৈত্র-র কৃতিত্বে তা তথাকথিত পাঠ্যপুস্তকের সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। 'সঙ্গীত-কথা' দুটি খণ্ডে বিন্যস্ত। প্রথম খণ্ডে আছে সঙ্গীতের উৎপত্তি, নাদ, শ্রুতি ও স্বর সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অর্থাৎ মূল উপাদানগুলির কথা। দ্বিতীয় খণ্ডে বিন্যস্ত হয়েছে ঠাট, রাগ, রাগ-সম্বন্ধীয় নানা বিষয়, ভারতীয় সঙ্গীতের ভাবরস ও সময় পরিকল্পনা এবং কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় যা সঙ্গীত জিজ্ঞাসু ও সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

প্রথম খণ্ডে সঙ্গীতের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনাটি সংক্ষিপ্ত হলেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্গীত চিন্তানায়কদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রাঞ্জল। নাদতত্ত্ব, নাদের স্বরূপ এবং নাদশ্রুতি ও স্বর-এর আলোচনায় লেখক বিষয়টি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। সপ্তস্বরের জন্ম অধ্যায়টি আলোচিত হয়েছে বিস্তারিতভাবে। প্রাসঙ্গিক আলোচনায় লেখকের বক্তব্য '...প্রাণীদের ডাকের সঙ্গে ষড়জাদি সপ্তস্বরকে মিলিয়ে দেখলেই স্বরোৎপত্তির মূল কারণ হিসাবে এদের গ্রাহ্যতা স্বীকার করা কঠিন হয়ে উঠবে। কোকিল ও কোকিলজাতীয় কোন কোন জীবের কণ্ঠস্বরের মধ্যে সাঙ্গীতিক কোন কোন স্বরের কাকতালীয় অবস্থান খুঁজে পাওয়া গেলেও তার থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে সেইসব স্বরকেই অনুসরণ ও অনুকরণ করে মানুষ বিজ্ঞানসম্মত সুসংবদ্ধ এবং সঙ্গতিপূর্ণ সাঙ্গীতিক স্বরগুলিকে নির্বাচন করেছে এবং তার সাহায্যে একটি অপূর্ব মনোমুগ্ধকর কলা-বিদ্যার জন্ম দিয়েছে'—বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এ প্রসঙ্গে লেখক যুক্তি সহযোগে দেখিয়েছেন 'স্বরের আবিষ্কারের মূলে রয়েছে স্বরসঙ্গতির সূক্ষ্ম পরিমাপ বা সম্বাদ-সম্বন্ধ। অনুকরণ বা random selection-এর দ্বারা এতবড় একটা সুসংবদ্ধ ও সমৃদ্ধ কলাশিল্পের আবিষ্কার কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না।' সমগ্র আলোচনায় একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় স্বস্তি দেয়। স্বরের আলোচনায় লেখক ভারতের সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি ভারতীয় স্বরের যে মান নির্ধারণ করেছেন তাকেই ভারতীয় স্বরের মান বলে ধরে নিয়েছেন। কম্পন-সংখ্যার হিসাব অনুসারে প্রাচীন, বর্তমান (ভাতখণ্ডে), আধুনিক ভারতীয় সঙ্গীত ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মধ্যে স্বরের ব্যবধানগত পরিমাপের নির্দেশিকাটি নিতান্তই প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে।

সঙ্গীত-কথার দ্বিতীয় খণ্ডে ঠাট অধ্যায়টি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। ঠাট,, ঠাটের স্বরূপ, ঠাটের গঠন ও অবয়ব, ঠাটের উপযোগিতা প্রভৃতি বিষয়গুলির আলোচনায় লেখক কোনো সংশয়ের অবকাশ রাখেননি। আলোচনায় লেখকের চিন্তাধারার স্পষ্ট পরিচয় মেলে যখন তিনি লেখেন 'ঠাটের দ্বারা রাগের বর্গীকরণ কার্যকর নয়, বৈজ্ঞানিকও নয়। বিশিষ্ট স্বরবিন্যাসের দ্বারাই যখন রাগের রূপ প্রস্ফুটিত হয় তখন স্বরবিন্যাসের মাপকাঠিতে রাগের শ্রেণীবিন্যাস হওয়া যুক্তিসঙ্গত।' রাগ অধ্যায়টির শেষাংশে ষাটটি প্রচলিত রাগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আছে। রাগের জাতি অধ্যায়ে প্রাচীন মতে রাগের জাতি পর্যায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও প্রয়োজনীয়। রাগ লক্ষণ পর্যায়ে লেখক গত শতকের সঙ্গীতজ্ঞ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমতকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। রাগের ক্রিয়াত্মকরীতি অধ্যায়টির অলঙ্কার পর্যায়টি অত্যন্ত মূল্যবান। রাগ-রাগিনী সম্পর্কে লেখকের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাতেই হয়। তিনি লিখছেন 'রাগ-রাগিনীর পদ্ধতি থেকে একালে আমরা যা পেয়েছি তা প্রধানত কতকগুলি নাম।... তাই নামগত মিলের নিরিখে প্রাচীন রাগ-রাগিনীর সঙ্গে বর্তমান কালের রাগের তুলনা নিরর্থক ও অপ্রয়োজনীয়।' মূর্ছনা অধ্যায়টি এই গ্রন্থের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। আশ্রয় রাগ অধ্যায়টির জন্য একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় কি নিতান্তই প্রয়োজনীয় ছিল? রাগের তুলনামূলক আলোচনার রীতিটি নিঃসন্দেহে আদর্শস্থানীয়। ভারতবর্ষে প্রচলিত বিভিন্নপ্রকার গানের বিবরণ অধ্যায়ে লোকসঙ্গীত অংশ বিশেষ করে পূর্ব ভারত সম্পর্কে আরও বিস্তারের অপেক্ষা রাখে। রাগের সময় ও রসনির্ধারণ অধ্যায়ে সঙ্গীতের ভাবরস পর্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় অধ্যায়টিতে বিভিন্ন ঘরানার পরিচয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। নির্দিষ্ট ঘরানার নামের তালিকায় বিশিষ্ট শিল্পীদের নামের অনুল্লেখ অস্বস্তিকর। অন্যতম উদাহরণ বিষ্ণুপুর ঘরানার রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিশিষ্টে সময় অনুযায়ী রাগের শ্রেণী বিন্যাসের দীর্ঘ তালিকাটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংযোজন। গ্রন্থ মুদ্রণে বিশেষ যত্ন নেওয়া হলেও কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গিয়েছে। সামগ্রিক বিচারে বাংলাভাষায় সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থের তালিকায় সঙ্গীত-কথা উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসাবে সমাদৃত হবে। এজন্য লেখক অপূর্বকুমার মৈত্র অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

ধ্রুপদী ও নব-ধ্রুপদী অর্থনীতি

অভিরূপ সরকার

ক্লাসিকাল পলিটিক্যাল ইকোনমি অ্যাণ্ড রাইজ টু ডমিন্যান্স অফ সাপ্লাই অ্যাণ্ড ডিম্যাণ্ড থিঅরিজ/ কৃষ্ণা ভরদ্বাজ/ ইউনিভারসিটিজ প্রেস/ মাদ্রাজ-২/২০.০০

চাহিদা ও যোগান ভিত্তিক নব-ধ্রুপদী অর্থনীতি Neoclassical Economics বিগত পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি কয়েকটি মৌল প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিল। ক্রমে এই প্রশ্নগুলি থেকে জন্ম নিয়েছিল একটি দীর্ঘ, মূলধন-তত্ত্ব বিষয়ক বিতর্ক যে বিতর্কে উল্লেখযোগ্য অনেক অর্থনীতিবিদই এক সময় অংশ নিয়েছেন। তাত্ত্বিক অর্থনীতির অগ্রগতির দিক থেকে এই বিতর্কের পুরোটাই যে খুব একটা ফলপ্রসূ হয়েছে এমন নয়। কিন্তু চাহিদা, যোগান ও বিনিময়কে কেন্দ্র করে তাত্ত্বিক অর্থনীতির যে মূল ধারাটি আজও বহমান, মূলধন-তত্ত্ব বিষয়ক বিতর্কটি তার বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে গেছে, সন্দেহ নেই। কৃষ্ণা ভরদ্বাজের আলোচ্য বইটির উদ্দেশ্য, উক্ত প্রশ্নগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, নব-ধ্রুপদী অর্থনীতি ও তার পূর্বসূরী ধ্রুপদী অর্থনীতির(Classical Economics)একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ। ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদরা প্রাথমিকভাবে চিন্তিত ছিলেন অর্থনৈতিক বৃদ্ধি নিয়ে যে বৃদ্ধি, তাঁরা মনে করেছিলেন, একমাত্র সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যবর্তিতায় হওয়া সম্ভব। এবং সঞ্চয়ের উৎস যেহেতু উদ্বৃত্ত, ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদরা প্রথমেই নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন সেই শ্রেণীকে যারা মূলত উদ্বৃত্ত-ভোগী। অর্থাৎ ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের কাছে অন্য সব কিছুর তুলনায় বণ্টনতত্ত্বটি অগ্রাধিকার পেয়েছিল। তাঁরা মনে করেছিলেন, শ্রমজীবীদের মজুরি ঠিক ততটুকুই যতটা তাদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন এবং উৎপাদন থেকে এই মজুরিটুকু বাদ দিলে যেটা পড়ে থাকে সেটাই উদ্বৃত্ত।

পক্ষান্তরে, নব-ধ্রুপদী অর্থনীতির বণ্টনতত্ত্বটি চাহিদা ও যোগানের উপর অধিষ্ঠিত। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, মজুরি যেমন শ্রমের চাহিদা ও যোগান দিয়ে নির্ণীত হয়, তেমনি লাভও নির্ণীত হয় মূলধনের চাহিদা ও যোগান দিয়ে। এই তত্ত্বটি মেনে নিলে একথাও মেনে নিতে হয় যে, লাভ কোনও উদ্বৃত্ত নয়, মূলধনের উৎপাদনী শক্তির দ্বারা অর্জিত মূলধনের মালিকদেব আয়। কৃষ্ণা ভরদ্বাজ চাহিদা ও যোগান ভিত্তিক এই বণ্টনতত্ত্বটি নিয়ে সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন, ধ্রুপদী অর্থনীতির তুলনায় চাহিদা-যোগান ভিত্তিক নব-ধ্রুপদী অর্থনীতির বিশ্লেষণ্ পদ্ধতি অনেকাংশেই সীমিত। অবশ্য কোন-কোন ক্ষেত্রে তাঁর সমালোচনা স্পষ্টতই নব-ধ্রুপদী অর্থনীতির শুধু মাত্র উপরিকাঠামো সংক্রান্ত। উপরন্তু তাত্ত্বিক অর্থনীতির জন্য প্রয়োজন যে বিশ্লেষণী ঋজুতা, বইটিতে জায়গায়-জায়গায় তারও অভাব রয়েছে। তবু তাত্ত্বিক অর্থনীতি তথা অর্থনৈতিক ভাবধারার ইতিহাসে উৎসাহী পাঠকের কাছে যে এই বইটি চমৎকার একটি ভূমিকার কাজ করবে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মানুষের গড়া সভ্যতা

কারুবাকী দত্ত

ব্যাবিলনিয়া ও অ্যাসিরিয়া/ কুশ দাশগুপ্ত/ ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ/ কল-১২/১৫.০০

মানুষের প্রথম গল্প/ অমিয় চট্টোপাধ্যায়/ পীস পাবলিশিং হাউস/ কল-৯/১৫.০০

লুপ্ত নগর হারানো দেশ/ অনিলবরণ ঘোষ/ অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দির/ কলকাতা/১০.০০

টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকা মেসোপটেমিয়ায় যে চারটি প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল, কালবিচারে তার শেষ দুটি হল ব্যবিলনিয় ও অ্যাসিরিয় । বাগদাদ ও পারস্য উপসাগরের মধ্যবর্তী উপত্যকা, দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে ব্যবিলনিয় সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল । সেই সভ্যতাই এ অঞ্চলের সংস্কৃতির পীঠস্থান রয়ে যায় খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫৯ সাল পর্যন্ত । অ্যাসিরিয়ার লিখিত ইতিহাস পাওয়া গেছে ব্যবিলনিয়ার প্রায় ১০০০ বছর পর থেকে । সামরিক ও প্রশাসনিক দক্ষতায় অ্যাসিরিয়া ক্ষমতার শিখরে ছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৯০০ থেকে ৬০০ সাল পর্যন্ত । এই সভ্যতার ভৌগোলিক সীমা স্পষ্ট করে বেঁধে দেওয়া না গেলেও এর ব্যাপ্তি ছিল উত্তর মেসোপটেমিয়ায় । যুগপৎ বিকশিত হবার ফলেই আপন আপন বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও ব্যবিলনিয় ও অ্যাসিরিয় সভ্যতা পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিল নানান দিক দিয়ে । এক ছিল দুই সভ্যতার লিখিত ভাষাও । ঐতিহাসিকরা যার নামকরণ করেছেন Assyro Babyloman বা Akkadian.পূর্ববর্তী সুমের সভ্যতার ঐতিহ্যবাহী কীলকাকৃতি লিপিতে এই ভাষায় লেখা প্রচুর মাটির ফলক পাওয়া গেছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে, পার্সিপোলিন থেকে ইজিপ্ট পর্যন্ত । এদের কালসীমা মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব ২৪০০ সাল থেকে প্রথম খ্রীষ্টীয় শতক পর্যন্ত বিস্তৃত । উনবিংশ শতকে, এই লিপির পাঠ ও পুরাতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষে আবিষ্কারের ফলে এই দুই সভ্যতার ইতিহাসের নানান দিক ক্রমশ উন্মোচিত হয় ।

'মানব সভ্যতার রূপকথা' শীর্ষক ইতিহাসমালায় একটি খণ্ডে কুশ দাশগুপ্ত একসঙ্গে বর্ণনা দিয়েছেন ব্যবিলনিয় ও আসিরিয় সভ্যতার । খ্রীষ্টপূব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শুরুতে ইমিন রাজবংশের প্রভাব বিস্তারের কাহিনী থেকে শুরু হয়ে এই ইতিহাস শেষ হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ৭৪৬-৬০৯ সালে নব অ্যাসিরিয় ও খ্রীষ্টপূর্ব ৬২৬-৫৩৯ সালে নব ব্যবিলনিয় সাম্রাজ্যের শেষ পর্বে । রাজনৈতিক ঘটনাক্রমের সঙ্গে লেখক জানিয়েছেন এদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি । শিল্প ভাস্কর্য স্থাপত্য ধর্ম ও আইন সব কিছুরই আলোচনা এতে পাই ।

বাংলাভাষায় এ-ধরনের ইতিহাস বই-এর সংখ্যা বেশি না । সেদিক দিয়ে এই বই এক বিশেষ অভাব মেটাবে সন্দেহ নেই, তবে বাংলা ভাষায় ইংরেজির প্রভাব কিছুটা অস্বস্তিকর । ভাষা আরেকটু বেশী বাংলা ও প্রাঞ্জল হলে বইটি সুখপাঠ্য হত ।

এছাড়া বইতে বিশেষ অভাব একটি মানচিত্রের । প্রাচীন মেসোপটেমিয় ইতিহাসের স্থাননাম ও তাদের ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে ধরে নেওয়া যায় অধিকাংশ পাঠকই অপরিচিত । তাই মানচিত্রের অভাবে অ্যাসিরিয় ও ব্যবিলনিয় সভ্যতার সমান্তরাল প্রবাহের ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট যেন সাধারণ পাঠকের কাছে ধোঁয়াটেই থেকে যায় ।

কোন কালানুক্রমিক ঘটনাবহুল ইতিহাস না, খ্রীষ্টপূর্ব যুগের কয়েকটি প্রাচীন সভ্যতার শিল্প সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে পাওয়া মানবসভ্যতার কিছু প্রাচীনতম নিদর্শনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই অমিয় চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্য । বিষয়ানুসারে 'মানুষের প্রথম গল্প' বইকে আদিম চিত্রকবিতা, চিত্রলিপি, লিপি, প্রাচীন সভ্যতা, প্রাচীন মিশর, পৃথিবীর প্রাচীনতম গল্প প্রভৃতি অধ্যায়ে ভাগ করে প্রাচীন মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ও মন্দির প্রতিষ্ঠা, প্রাচীনতম আইনসংহিতা, নাটক ও রঙ্গমঞ্চের উদ্ভব লিপির উৎপত্তি, প্রাচীন চিত্র ও সাহিত্যের নিদর্শন প্রভৃতি কৃষ্টির বিভিন্ন দিকের বিশেষ ধারাগুলোই লেখক সংক্ষেপে অথচ রসপূর্ণভাবে আলোচনা করেছেন । সব চাইতে কৌতূহল জাগায় মানুষের প্রাচীনতম সাহিত্যকীর্তির কিছু নিদর্শন ও চিঠিপত্রের বাংলা অনুবাদ । এর মধ্যে আছে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে, প্যাপিরাসে লেখা মানুষের প্রথম গল্প ।

বলাবাহুল্য অনুবাদগুলি মূল থেকে করা নয় । অনুবাদেরও অনুবাদ । লেখক অবশ্য জানিয়েছেন যে মূলের স্বাদ যথাসম্ভব অবিকৃত রাখার জন্য কোন কোন জায়গায় মূল পুথির পৃষ্ঠাসংখ্যা ও পঙক্তিবিন্যাসও একইরকম রেখেছেন, যার ফলে, অনুবাদ পড়লেও প্যাপিরাস ও মূল পাঠ্যাংশের বাহ্যিক চরিত্র কল্পনা করে নেবার সুযোগ থাকে । বইটির বিষবস্তু তারউপস্থাপনা ও বিন্যাস আর সেইসঙ্গে প্রাচীন লিপি, শীলমোহর ও চিত্রকবিতার প্রতিলিপি বইটিকে খুবই আকর্ষণীয় করেছে । ইতিহাসরসপিপাসু যে কোন বয়সের পাঠকের ভাল লাগবে বইটি পড়তে । কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি যে পড়ার পরে তৃপ্তি না হবার সম্ভাবনাই বেশী । এর কারণ অনেকগুলি ।

তথ্য নির্বাচন ও অধ্যায় বিভাজন নীতি সম্বন্ধে লেখক কিছুই বলেন নি । অনেকগুলি সভ্যতার মধ্যে থেকে মিশরকে আলাদা করে নেওয়া বা প্রাচীন সাহিত্যকীর্তির মধ্যে থেকে ইস্টারের কাহিনী বেছে নেবার কারণ কি ? ইস্টারের কাহিনীর পুঁথিটির দুষ্প্রাপ্যতাই কি একমাত্র যুক্তি ? এর রচনাকাল ও ভাষাই বা কি ? কৌতূহলী পাঠক কোন জবাব পাবেন না এসব প্রশ্নের । ঠিক একই রকম ধোঁয়াটে লাগে শেষ অধ্যায়ের প্রাচীন জাতি, সংস্কৃতি ও লেখকের তালিকাটি । সংকলনটি করা হয়েছে কিসের ভিত্তিতে ? দেশ কাল অথবা কীর্তি কোন হিসেব দিয়েই তো এর ব্যাখ্যা করা গেল না । এ ছাড়া, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তালিকাটি সাজানও হয়েছে ইংরেজি বর্ণমালা অনুসারে ।

তথ্যগত অসম্পূর্ণতা এমনকি ভ্রান্তিও চোখে পড়ে নানান জায়গায় । একটি উদাহরণ দিচ্ছি । বাংলা ভাষার বয়স যে হাজার বছরের বেশী—এই-কথা লিপির ইতিহাসে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই জানিয়েছেন লেখক । সেই প্রাচীন বাংলার 'সম্ভাব্য নিদর্শন' হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন সর্বস্বীকৃত চর্যাপদের নয়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রামাণ্য গ্রন্থাবলীতে অনুল্লিখিত 'যোগপন্থী সিদ্ধাচার্যদের শিষ্যদের উপকারার্থে দেওয়া 'ভূয়ান' বক্তৃতার : এই ভূয়ান বক্তৃতার যে উদাহরণ আছে, তা কিন্তু বিভিন্ন চর্যা ও বৌদ্ধ দোহার কিছু কিছু চরণের এলোমেলো সংকলন । এর মধ্যেও আবার ভাষার কিছু ভুল আছে । জানান হয়েছে যে এর আধুনিক বাংলা অনুবাদ করেছেন আদিত্য চট্টোপাধ্যায় (পৃ. ২৪-২৫) যদিও কোথায় এবং কবে সে বিষয়ে লেখক নীরব !

সবশেষে বলি, এ ধরনের বইয়ে তথ্যজ্ঞাপনার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান সূত্রগুলির উল্লেখ না থাকলে বিষয়বস্তুর তথ্যগত সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায় ।

এমন অনেক নগর অথবা দেশের নাম পাওয়া যায় প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে যার অনেকগুলিই বর্তমানে পরিবর্তিত অথবা লুপ্ত । সব সময়ে সম্ভবও হয় না এদের শনাক্ত করা । শ্রাবস্তী, অবন্তী, বৈশাখী, অগ্রোদকা, ধারা প্রভৃতি নাম আজ বেঁচে আছে কেবল ইতিহাসের পাতায় । বাণগড়, পৌণ্ড্রবর্ধন, বীরকিটি সোনার বান্দা প্রভৃতি অনেক জনপদের স্থাননির্ণয় আজ পুরাতত্ত্ববিদের গবেষণার বিষয় । এসব হারিয়ে যাওয়া নগরী ও জনপদের অবস্থিতি ও ইতিহাসের সঙ্গে লেখক অনিলবরণ ঘোষ যথাসম্ভব পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন 'লুপ্ত নগর হারান দেশ' বইয়ে । এই বইটিকে ঠিক ইতিহাস বলা যায় না কারণ গবেষকের মত করে তথ্যবিশ্লেষণ ও প্রমাণের তুলনামূলক বিচার লেখক করেন নি । পুরাণ মহাকাব্য ভ্রমণ কাহিনী বা অন্যত্র যেখানেই উল্লেখ পাওয়া গেছে এসব জায়গার সেগুলোকে একত্রিত করে বর্ণনা দিয়েছেন নগর বা জনপদের উত্থান বিস্তার ও প্রাচুর্যের কাহিনী । সে-সঙ্গে শুনিয়েছেন এ-সব জায়গাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কাহিনী ও লোকশ্রুতি । গল্পের মত করে সরস ভাষায় লেখা বইটি কিশোর পাঠকদের পড়তে ভালই লাগবে ।

অন্ধ্রপ্রদেশ এক বৈচিত্রময় স্থান। এমন একটি রাজ্য যেখানে বিভিন্নতার সৌহার্দপূর্ণ মিলন ও পরস্পর বিরোধি রঙের বৈচিত্রপূর্ণ সংমিশ্রন। মন্দির, সমুদ্রোপকূল, অবসর বিনোদন কেন্দ্র, স্মৃতি সৌধ এবং অভয়ারণ্য। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুস্লীম চারুকলা ও সংস্কৃতির এক মহান মিলনকেন্দ্র।

ওয়ারাঙ্গলে রামাপ্পা মন্দির ও কাকতিয়া গেট; পাখল, শ্রীশৈলম, পুলিক্যাট ও কোলেরু লেক্ এ বন্যপ্রানী ও পক্ষীকুলের অভয়ারণ্য; আরাকু উপত্যকা ও হর্সলে হিলেরমত পাহাড়ী অবসর বিনোদন কেন্দ্র; বিশাখাপটনমে বিরাট

একটানা সোনালী সমুদ্রোপকুল; তিরুপতি, ভদ্রাচলম, শ্রীশৈলম, সিংহাচলমের বিখ্যাত মন্দিরমালা।

বিশ্বের সর্বোচ্চ ইঁটপাথরের বাঁধ নাগার্জুনাসাগর ড্যাম। এবং সেখানে জলাধারের মাঝখানে মোটর লঞ্চের সাহায্যে পৌছানো একটি দ্বীপ নাগার্জুনাকোন্ডা, যেখানে রয়েছে পুরাতাত্বিক খননে উদ্ধার করা বৌদ্ধযুগের বহু নিদর্শন।

অন্ধ্রপ্রদেশ হ'ল কুচিপুডি নৃত্যের জন্মস্থান। বর্নাঢ্য নির্মল কলাচিত্র এবং কোন্ডাপল্লী খেলনা, বস্ত্রে কলাকার্যের বিখ্যাত কলমকারী শিল্প, অমরাবতীর চামড়ার পুতুল।

রাজধানী হায়দ্রাবাদে অতীত এসে মিলে গেছে বর্তমানের সঙ্গে। চারমিনার, ভারত-সিরীয়ার মিলিত স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন। সালারজঙ যাদুঘর, একটি মানুষের বিখ্যাত সংগ্রহশালা। বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম, গোলকুন্ডা কেল্লা, কুতবশাহী স্মৃতিসৌধগুলি, শ্বেতপাথরে তৈরী ভেঙ্কটেশ্বরা মন্দির এবং দেখবার মত চিড়িয়াখানা।
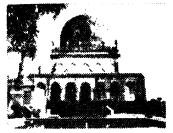
আসুন অন্ধ্রপ্রদেশে আপনার ছুটির দিন কাটাতে।

অন্ধ্রপ্রদেশ ট্যুরিজম
প্রথম ফ্লোর, গগন বিহার
এম.জে. রোড,
হায়দ্রাবাদ-৫০০০০১

ফোন: ৫৫৬৪৯৩, ৪২৮৩৫, ৭৭১৯২,
৭০০৮৭, ২৩৩৩৮৪, ২৩৩৩৮৫

অন্ধ্রপ্রদেশ
বিপরীত বর্নের মিলন ক্ষেত্রে এক স্মরণীয় ছুটির দিন

চ ল চ্চি ত্র

আতঙ্ক

শতাব্দী রায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
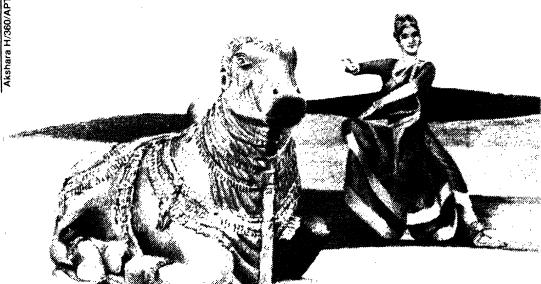
প্রবীণ পরিচালক তপন সিংহের ছবি মানেই আমাদের নতুন কিছু পাওয়া। তাঁর প্রতিটি ছবির বিষয় এবং বক্তব্য শুধু আলাদাই নয়, সরাসরি আমাদের চেতনায় আঘাত করে। এককালের মানবিক সমস্যা থেকে ইদানীংকার সামাজিক সমস্যাগুলো নিয়ে এমন সক্রিয় হতে অন্য কোন পরিচালককে আর দেখলাম না।

'আতঙ্ক' দেখার পর ওঁর অনেক কাল আগের ছবি 'আপনজন'-এর কথা মনে পড়ল। সে ছবিতেও মাস্তান ছিল, পাড়ার পাড়ায় তাদের দলাদলি ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে কোথাও মানবিকতাবোধের সুতো তাদের অঙ্গে লেগেছিল। সময় বদলেছে। এখনকার নবীন মাস্তানদের সঙ্গে তাদের কোন মিল নেই। তপনবাবুর ছবির একটি চরিত্রের সংলাপ সঠিক, 'এখন গণতন্ত্র নেই, সমাজতন্ত্র নেই, আছে শুধু মাস্তানতন্ত্র।' এই মাস্তানদের পীড়নে সবচেয়ে অসহায় সেই একাকী মধ্যবিত্তের সমস্যা যা এখন যে কোন শহরে প্রকট সেটাই তপনবাবুর ছবির বিষয়বস্তু।

যতদূর মনে পড়ে, তপনবাবু কোথাও বলেছিলেন, সংবাদপত্রের খবর থেকে তিনি এই ছবিটি তৈরী করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। মৃণাল সেনও একবার বলেছিলেন, সংবাদপত্রের হেডলাইন থেকেও একটা ছবি হতে পারে। অস্বীকার করছি না। তবে সেই সঙ্গে দায়িত্ব থেকে যাচ্ছে।

মধ্যবিত্তদের ন্যায় অন্যায়বোধ প্রবল কিন্তু তা প্রয়োগের অক্ষমতা ক্রমশ তাদের কোণঠাসা করছে। তপনবাবুর 'আতঙ্ক' তাদের দুর্বলতার প্রতি আঙুল তুলে ধরেছে। আজ যখন পশ্চিমবাংলার শহরে শহরে রাজনৈতিক দলগুলোর মদতে পুষ্ট মাস্তানদের অবাধ আচরণ কোন প্রতিবাদের মুখোমুখি হয় না, গদির লোভে এদের ব্যবহার করে দাদারা আড়ালেই থেকে যান তখন এদের পেষণে কেঁচোর মত দরজায় খিল দিয়ে থাকে মধ্যবিত্ত। পিছু হঠতে হঠতে দেওয়ালটা যখন পিঠে ঠেকেছে তখনও আতঙ্ক তাদের ছেড়ে যায় না। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি অবসরপ্রাপ্ত আদর্শবাদী এক স্কুল শিক্ষক, যিনি বৃষ্টির রাতে তাঁরই এক মাস্তান ছাত্রকে খুন করতে দেখলেন। এবং সেই ঘটনার সাক্ষী থাকার কারণে বারংবার তাঁকে হুমকি শুনতে হল, 'আপনি কিছুই দ্যাখেননি।'

চলচ্চিত্রকার হিসেবে তপনবাবুর ক্ষমতা প্রশ্নাতীত। এবং সেই কারণেই ছবিটির প্রতিটি দৃশ্য আমাদের আকৃষ্ট করে। ছবিটি যে আলাদা জাতের সে-সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একই সঙ্গে দ্বিধা থেকে যায় যে কারণে তপনবাবুরই অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ছবির সঙ্গে আতঙ্ককে সমশ্রেণীতে ফেলতে আপত্তি জাগে, তাঁর এই বিষয় নিয়ে ছবি করার দুর্বার সাহস সত্ত্বেও।

মাস্তানদের নিয়ে ছবি করেছেন তপনবাবু, রাজনৈতিক চরিত্র রেফারেন্স হিসেবে এসেছে। মাস্তানদের চাপে সাধারণ মানুষ দিশেহারা, তাদের একতাবদ্ধ হতে বলেছেন তিনি, কিন্তু কখনই চেষ্টা করেননি এই নবীন মাস্তান তন্ত্রের বিশ্লেষণ করতে। এদের উৎস এবং আচরণের কোন সম্যক অনুসন্ধান ছবিতে নেই। ব্যাপারটা খবরের কাগজের সংবাদ হতে পারে কিন্তু সংবাদিকতার বাইরে যায়নি। এই দায় তিনি এড়িয়ে গেলেন কেন? আমি বলছি না তিনি এদের উত্তরণের পথ নির্দেশ করবেন, শিল্পীর সেই দায়িত্ব সব সময় থাকে না, কিন্তু যে জ্বলন্ত সমস্যা তিনি ধরতে চেয়েছিলেন তা শুধু স্পর্শ করার গৌরবেই সীমাবদ্ধ থাকল। উন্মোচনের ভার বহন করলেন না।

আর ছবির শেষ? এই রকম একটি ছবির ক্ষেত্রে এমন কাকতালীয় পরিণতি আশা করা যায়? মাস্টারমশাই-এর প্রাক্তন ছাত্র পুলিস কমিসনার হয়ে ঠিক সময়ে এসে হাল ধরল সমাধানের? খুনীকে গ্রেপ্তার, রাজনৈতিক নেতাদের মোকাবিলা থেকে যাবতীয় ফিল্মী ঘটনার সন্নিবেশ ঘটিয়ে তপনবাবুর সমস্ত উত্তাপে গঙ্গাজল নিক্ষেপ করলেন। তখন মনে হয় কেন এই ছবি করা! শুধু সংবাদপত্রের হেডলাইন দিয়ে ছবি শুরু করা যায়, শেষ করতে গেলে যে সৃজনশীল কাহিনীকারের প্রয়োজন তা আর একবার প্রমাণিত হল।

তপনবাবুর ছবিতে ভাল কাজ থাকবে এটা তো অবশ্যম্ভাবী। মশারির মধ্যে মাস্টারমশাইয়ের আতঙ্কিত স্বপ্নের পর বেরিয়ে আসার দৃশ্যটি স্মরণীয়। কিংবা বমির দৃশ্যটি! নিষ্ঠুরতা বোঝাতে ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল এবং কম্পোজিশন তৈরী করায় তিনি সসম্মানে উপস্থিত।

কিন্তু ক্লিশে হয়ে যাওয়া দৃশ্যও ছবিতে আছে। কবিতার লাইনটির ব্যবহার বড় মোটা দাগের। বারংবার মনে হয়েছে সমস্যাটি ধরার চেষ্টা করেও তপনবাবু খেই হারিয়ে ফেলেছেন যার ফলে একটি অগোছালো পরিণতি চিত্রনাট্যের দুর্বলতাকে প্রকট করে তুলেছে। এ বড় আশাভঙ্গের ছবি।

কমল নায়েকের ফটোগ্রাফি চমৎকার। কিন্তু বৃষ্টির বানানো দৃশ্যটি পরিচালক কেন রাখলেন? তপনবাবুর কোন্ ছবিতে আমরা মেকআপের এমন অপটুত্ব দেখেছি? মাস্টারমশাই-এর মুখের কালো পেন্সিলের দাগ অথবা নির্মলকুমারের বিসদৃশ্য পরচুলা পরিচালকের চোখ এড়িয়ে গেল কি করে?

বড় প্রাপ্তি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়। মাস্টারমশাইকে জীবন্ত করে তিনি তপনবাবুর বক্তব্যকেই শুধু প্রাণবন্ত করেননি, বাংলা চলচ্চিত্রে এই মুহূর্তে তাঁর মত ক্ষমতাবান চরিত্রাভিনেতা যে আর নেই তা প্রমাণ করেছেন। ছবি বিশ্বাসের পর তাঁকে নতুন করে পেয়ে আশাবাদী হয়েছি।

নবাগত সুমন্ত মুখোপাধ্যায়কে ভাল লেগেছে। অনিল চট্টোপাধ্যায়, ভীষ্ম গুহঠাকুরতা, নির্মলকুমার, মনোজ মিত্র, প্রসেনজিৎ এবং শতাব্দী রায় তালভঙ্গ করেননি।

অমিত রায়

চি ত্র ক লা

ছবি ও পুরস্কার

নন্দন ২৪শে সেপ্টেম্বর—সন্ধ্যায় দুর্যোগের মধ্যেও আনন্দের জোয়ার অনবরত বৃষ্টি পড়ার প্রতিকূলতাকেও ছাপিয়ে উঠেছিল। সেদিন ঝরঝর দিনে পরিতোষ সেন নয়া দিল্লির কেন্দ্রীয় ললিত কলা আকাদমির ফেলো নির্বাচিত হবার পুরস্কার পেলেন। নগদ কুড়ি হাজার টাকা, বন্দনা লেখা ধাতুফলক এবং গলবস্ত্র উড়ুনি। ওঁর স্ত্রী পেলেন ফুলহার

এবং পুষ্প। এবং পরিশেষে এল মিষ্টান্ন পেটিকা নিমন্ত্রিত রবাহুতের হাতে। এই উপলক্ষে পুষ্পক রথেই সম্ভবত রাজধানী থেকে ললিতকলার সভাপতি শঙ্খ চৌধুরী, উপ-সভাপতি আনন্দ দেব এবং সম্পাদক ভাটনগরকে সঙ্গে করে এসেছিলেন।

পরিতোষ সেন

প্রথমে পরিতোষ সেনের ওপর সাবেকী আমলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তোলা তথ্যচিত্র দেখানো হল। পরিচালক শান্তি চৌধুরী। সেই সময় পরিতোষ সেনের ওপর পিকাসো, পল ক্লি এবং রাজপুত ছোট ছবির প্রভাবের সূত্রগুলি তুলে ধরে দেখিয়েছেন, পরিতোষ সেন কেমন সহজে নবীন নদীর মতো অনবরত প্রবাহিকা খাত বদলেছেন। কালো সাদা চলচ্ছবি তবুও পরিতোষের দামাল অস্থিরমতি শিল্পী চরিত্রকে ধরেছেন। সম্পর্কে ওঁরা ভায়রাভাই। তাই পরিতোষের অন্তরঙ্গ রূপটা এমন অকপটে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে শান্তি চৌধুরীর পক্ষে।

পরিতোষ সেন আযৌবন আপ্রৌঢ়ত্বে কোনও পুরস্কার পাননি বলে উনসত্তর ছুঁই ছুঁই বয়সে ক্ষোভ প্রকাশ করে ফেললেন। বললেন, "জীবনের সন্ধ্যা কালে" গত বছর পেয়েছিলেন শিরোমণি পুরস্কার। জাতীয় প্রদর্শনীতে একাধিকবার ছবি দিয়েও পুরস্কৃত না হলেও "তারচেয়ে বড়" পারিতোষিক পেলেন এবার এই "ফেলো" মনোনয়নে। এমনিতে এবং ছবিতে তাঁকে কিন্তু এখনও কেশর ফোলানো রাগী যুবশ্বাশের মতো মনে হয়।

জীবনের শেষবেলায় পরিতোষ সেন এই পুরস্কার পেয়েছেন বলে সমবেত সকলের মধ্যে খুশির ভরা কোটাল। সভাপতির ভাষণে শঙ্খ চৌধুরী সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলায় অধুনালুপ্ত "ক্যালকাটা গ্রুপের" অবদান এবং তরুণতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য পরিতোষ সেনের ভূমিকা সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। দুই প্রীতিমুগ্ধ বৃদ্ধ শিল্পী বন্ধুকে গদগদভাবে এমন আপ্লুত দেখে বহু আবেগপ্রবণ দর্শক আনন্দে অশ্রুমার্জনা করলেন।

সন্দীপ সরকার

সংগীত

জয়ের বাঁশি

জয় দত্তের দাদাকে আমরা সকলেই চিনি। প্রশান্ত বেহালা বাজায়। রেডিওতে প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু ছোট ভাই জয় বহুদিন থেকে বিদেশে। মাঝে মাঝে দেশে আসে আর আমাদের মন মাতায় তার মোহন বাঁশি।

সেদিন মধ্য অগাস্টের সন্ধ্যেবেলা ডাক পড়ল আদি গাজদারের বাড়ি থেকে। জয় বাজাবে, সঙ্গে পিয়ানোতে থাকবে আদি। এখানে আদি গাজদারের বাড়ির ঘরানার কথা একটু বলা দরকার, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'অ্যাট হোম কনসার্ট'। কলেজ থেকেই আদির সঙ্গে আমার পরিচয়। ওর বাড়িতে রেকর্ড, পিয়ানো ও চেম্বার-মিউজিক কনসার্টের মাধ্যমে, অনেকেরই প্রথম পরিচয় হয় পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সঙ্গে। আমার এখনও মনে পড়ে এই রকম একটি দিনে আমি প্রথম শুনেছিলাম, বারলিওজ ও ভারদির রেকুইম মাস, ও টসকানিনির বাজানো বেটোফেন। ঘরখানি ছোটখাটো কনসার্ট হলের মতন সাজানো। মাঝে মাঝে একটু টিকা টিপ্পনি দিয়ে আদি মোরটজারট, বেটোফেন বা ব্রামসের মনের কথা আমাদের বলেন।

সেদিনও যথারীতি সত্যজিৎ রায় এলেন। একটু দেরি হয়েছিল তাঁর।

জয় দত্ত

আসার সঙ্গে সঙ্গে কনসার্ট শুরু। প্রায় পাঁচশ বছর ধরে ইয়োরোপের সঙ্গীত রচয়িতারা বাঁশি ও পিয়ানোকে ঘিরে সঙ্গীত রচনা করে এসেছেন। সেদিন আদি ও জয় তৈরি করেছিলেন এমন একটি প্রোগ্রাম যাতে আমরা পাই বারোক, ক্লাসিকাল, রোমান্টিক সঙ্গীতের ছোঁয়া। জয়ের রুপোলি বাঁশি ঝলমল করে উঠেছিল প্রথমে সুবারট্ ও মোটজারটের, ও ছোট্ট একটি সনাটায়। বাঁশির সঙ্গে সুবারটের নাম সবসময় মনে পড়ে না। তাঁর সিমফনিতে বাঁশি নিশ্চয় আছে। কিন্তু কেবল বাঁশিকে কেন্দ্র করে রচিত কাজ খুব একটা মেলে না। মোরটজারটের সোনাটিনা খুব অল্প বয়সে লেখা—মাঝে মাঝে তার ফ্লুট কোয়ার্টেটের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। এ যেন সুর নয় মাধবীলতার পাতায় পাতায় রোদের চিক চিক আলোতে কোন অজানা প্রজাপতির নৃত্য।

তারপরে এল পাঁচ মিনিটের বিরতি। দেখলাম সবাই সত্যজিৎকে ঘিরে তাঁর মতামত চাইছে। বছর দুয়েক আগের জয় দত্ত এবং এখনকার জয়ের তফাৎ বুঝলাম। তাঁর বাজনায় একটা নিজস্ব মেজাজ এসেছে। সেটা আরো বুঝলাম সেই বিখ্যাত মেজার ফ্র্যাঙ্কের সনাটাটি শুনে। উনিশশো ছিয়াশি এই সনাটার সেন্টেনারী। অর্থাৎ ১৮৮৬ সালে ফ্রাঙ্কে এটি লেখেন। এই সনাটা ভায়োলিনেও বাজানো হয়। প্রবল রোমান্টিক কাজ। সনাটার প্রতিটি মুহূর্ত সুরে ভরা। সনাটার জগতে এটি এক উঁচুদরের কাজ এবং জয় ও আদির জুটি এর মাধুর্য আমাদের উপভোগ করালেন।

সব শেষে এলো পুলাঙ্কর সনাটা। এই কাজটা বাঁশির জগতের মাউন্ট এভারেস্ট বলা যেতে পারে। জয়কে এখন এই পুলাঙ্কর সনাটা নিয়ে অনেকদিন ওঠা নামা করতে হবে। আমার মনে হল এই কাজটিতে আদির পিয়ানো যেন তার বাঁশির আগে আগে যাচ্ছে। একটু ব্যালান্স-এর অভাব। জুটি বাজালেন গ্লুকের 'অরফিউস' থেকে 'ডান্স অফ দি ব্লেসেড স্পিরিটস্'। গ্লুকের এই বাজনার কথা ভাবলেই আমার কবি বিষ্ণু দের কথা মনে পড়ে যায়। তিনি আমায় একদিন বলেছিলেন, 'ক্লাসিকাল মিউজিক ভালবাসেন, গ্লুকের অরফিউস শুনুন'। সেদিন কনসার্টের শেষে সত্যজিৎ রায় আমায় সেই কথাই বলে গেলেন।

কিশোর চট্টোপাধ্যায়

বিদেশে বর্ষা স্বদেশে খরা

রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে বৈচিত্র্যের জন্য কয়ারের দল গড়া নয়—রীতিমতো চর্চা করে ক্যালকাটা আঁসেম্বল আসরে নেমেছেন। সংস্থার দশম বার্ষিক উৎসব হ'ল অবনমহলে। এই দশ বছরেই তাঁরা যথেষ্ট সাবালক। সাধারণত কয়ার গ্রুপে দুতিনজন ভাল শিল্পী থাকেন, বাকিরা ধুয়ো ধরেন। এখানে প্রায় প্রত্যেকেই সুসম্পূর্ণ। একটি কয়ার গ্রুপে আলটোস, সোপ্রানো, বাস, ব্যারিটোন, টেনর প্রভৃতি বিভিন্ন গোত্রের যে কণ্ঠ প্রয়োজন ক্যালকাটা আঁসেম্বল সেই প্রয়োজনীয় মূলধনে ধনী। দ্বিতীয়ত কোন শিল্পী খাতা বা কাগজ দেখে গান করেন না—এটা তাঁদের আত্মবিশ্বাসের উদাহরণ। তৃতীয়ত অনুপম দত্তের পরিচালনায় সঙ্গীতানুষঙ্গ নিখুঁত। যন্ত্রী সংখ্যা বিরাট নয়, কিন্তু সুন্দর ভাবে সাহায্য করে যায়—এমন কি সব বিদেশী গানে জ্যাজ সেট ব্যবহার না করে তবলা এবং বঙ্গো দিয়ে কাজ চালানো হয়। কাজ চালানো কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়, কারণ কোনখানেই অভাব অনুভূত হয় না।

অনুষ্ঠানের প্রথমার্ধে বিভিন্ন দেশের গান গাওয়া হয়। প্রত্যেকটি গান প্রাণবন্ত—বিশেষত প্রতিটি দেশের মেজাজ আলাদাভাবে অনুভব করা যায়। জাপান বা নেপালের গান—আবার স্পেন, ইটালি ফিলিপিন প্রভৃতি দেশের সুর এবং যন্ত্রের গঠন আলাদাভাবে চমক আনে—শেষ গান 'আইরিন গুড নাইট—'(আমেরিকা) প্রতিটি গান কোন মুহূর্তে শ্রোতার শ্রবণকে অলস হতে দেয় না। প্রতিটি সম্মেলক গান অভূতপূর্ব (অভূতপূর্ব শব্দটি নিয়মরক্ষার্থে প্রযুক্ত নয়),একক সঙ্গীতেও প্রতিটি কণ্ঠ দৃপ্ত। বিশেষত সুস্মিতা সেন যখন যুগোস্লোভিয়ার গান করেন, তখন অবাক হতে এই ভেবে যে, এ হেন কণ্ঠ এখনও সঙ্গীত পরিচালকদের কাছে অনাবিষ্কৃত, যে ভাষাটা অনেকটা বোঝা যায়, সেটাই ইকো চেম্বারের নৈপুণ্যে সম্পূর্ণ বিদেশী হয়ে গেল। ইন্দ্রনীল সেনের গাওয়া বাংলাদেশের গান 'মোর সাধীনার কপালে টিপ' সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য হয়ে যায়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতরার্ধে পরিবেশিত হ'ল

গীতিআলেখ্য 'এ ভরা বাদর' । এই অনুষ্ঠানে বোঝা গেল, বিজ্ঞান এখন শিল্পের ত্রুটি ঢাকার জন্য ; শিল্পকে সমৃদ্ধতর করার জন্য নয় । প্রথমার্ধে ইকো ছিল—দ্বিতীয়ার্ধে 'ইকো চেম্বারের' অভাবে অনেকের কণ্ঠই নিস্প্রভ । যারা অতটা দাপটে বিভিন্ন বিদেশী গান গাইলেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গিয়েই তাঁরা প্রথাবাহিত আড়ষ্ঠতায় আক্রান্ত । এই অংশে তাঁরা খাতা ব্যবহার করেন । ধ্রুপদ ধামার সাবনগীতে যাঁরা উদ্দাম, বাংলা গানে তাঁরাই কৃত্রিমতায় আচ্ছন্ন ।

ইন্দ্রনীল সেনের 'কখন বাদল ছোঁওয়া লেগে' শুনে মনে হয় শীত এসে গেছে । এর সঙ্গে আছে অদ্ভুত এক ভঙ্গির সংকলন ও গ্রন্থনা । 'হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরুগুরু' গান বিপর্যস্ত হয় এবং সমবেত বিধ্বংসী প্লাবনের মধ্যে সুস্মিতা সেন একমাত্র নিরাপদ দ্বীপ । এই নিরাপদ দ্বীপের আশ্রয়ে শুভাশিস ভট্টাচার্যের পরিচালনায় কয়েকজনের নৃত্য । সেখানে ছেলেরা একরকম পোশাকে সজ্জিত । মেয়েরা ' মনে হয় বর্ষার জন্য কালিঘাটে পুজো দিতে যাচ্ছেন । আজকাল নানারকম ক্যাসেট প্রকাশিত হয় । এই বারোয়ারি হুজুগের মধ্যে যদি ক্যালকাটা আঁসেম্বল কোন রেকর্ড প্রকাশ করতেন তবে তাঁদের গান নিশ্চয়ই অনেকের কাছে অনুপ্রেরণা ও উদাহরণ হয়ে থাকত ।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

একই সন্ধ্যায় দুটি সংস্থা

'কাকলি' ও 'রসকলি'-র যৌথ উদ্যোগে সংগীত ও নাট্যপাঠের এক সান্ধ্য-আসর বসেছিল রবীন্দ্রসদন মঞ্চে ।

প্রথম পর্বে সংগীতানুষ্ঠান, পরিবেশনায়-'কাকলি' । বিভিন্ন গীতিকবির গানের সনিষ্ঠ চর্চায় নিয়োজিত আছে 'কাকলি', বিশেষত রজনীকান্তের গান । এজন্য 'কাকলি' ধন্যবাদার্হ । কিন্তু স্বীকার করতে দ্বিধা নেই সেদিন সংগীতানুষ্ঠানটি কিছুটা দীর্ঘ ও একঘেয়ে হয়ে পড়েছিল । অনুষ্ঠান-বিন্যাসে আর একটু পরিমিতিবোধের দরকার ছিল । অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে 'কাকলি' শিল্পীবৃন্দের সমবেত কণ্ঠে রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের কয়েকটি

গান । সব গানই উল্লেখ্য মানে পৌঁছয়নি, কারণ সকলে সমানভাবে প্রস্তুত ছিলেন না । রজনীকান্তের 'প্রেমে জল হয়ে যাও' সুমিলিত । অতঃপর নিশীথ সাধুর পরিকল্পনা ও পরিচালনায় নিবেদিত হল শাস্ত্রীয় সংগীতের রূপরেখায় রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্রগীতি, অতুলপ্রসাদী, রজনীকান্তের গান ও নজরুলগীতি । বেহাগ, কাফি ও মিশ্র বেহাগ খাম্বাজ এই তিনটি রাগ বেছে নিয়ে প্রত্যেকটি রাগের স্বরবিন্যাস এবং পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক রাগে রচিত বিভিন্ন গীতিকবির গান একক কণ্ঠে উপস্থাপিত করা হল । রাগের স্বরবিন্যাস দেখাতে প্রধানত মূল দ্রুত গানই অবলম্বন করেছিলেন মধুশ্রী মুখোপাধ্যায় । মোটামুটি সফল । অতুলপ্রসাদের গান কাকলি সাহার কণ্ঠে পরিচ্ছন্নরূপে এলেও গীতালি মজুমদারের কণ্ঠে তা সাধারণরূপ ধারণ করেছে । রবীন্দ্রসংগীতে চন্দ্রমা মুখোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য, কিন্তু শুক্তি চৌধুরী কিংবা অলকা দে কেউই রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি সুবিচার করেননি । নমিতা ভট্টাচার্য ও রূপা দে-র রজনীকান্তের গানে আবেদন ছিল । ইন্দ্রা সরকারের দ্বিজেন্দ্রগীতি মন্দ নয় । প্রথম পর্বের শেষ অনুষ্ঠান—রজনীকান্তের জীবন ও তাঁর রচিত নানা ধরনের গান অবলম্বনে গীতি-আলেখ্য/ কান্তকবির মরমীয়া গান—রজনীকান্ত । এই গীতি-আলেখ্যটিতে কিছু গান কমালে অনুষ্ঠানটি সংহততর হত । নিশীথ সাধুর শ্রবণসুখকর কণ্ঠে শুনতে ভাল লাগে 'কেন বঞ্চিত হব', 'আমি তো তোমারে' ইত্যাদি, তবে সব গানই সমানভাবে সপ্রাণ নয় । অশোকা মুখোপাধ্যায় কিংবা কাকলি সাহার একক গান উল্লেখ্য ।

গ্রন্থনাপাঠে ছিলেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ।

শেষ পর্বের অনুষ্ঠানটি 'রসকলি'-র ।

নিশীথ সাধু

রসকলি-র সভ্য-সভ্যাবৃন্দ সংবর্ধনা জানালেন নৃত্য শিল্পী রুবি বন্দ্যোপাধ্যায়কে । যতদূর জানি শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় রসকলি-র সঙ্গেই যুক্ত । অবশেষে রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' নাটিকা পাঠ দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় । দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্র মল্লিক, তরুণ পাল, মেখলা রায়, চন্দ্রিমা বসু প্রমুখের রূপায়ণে সার্বিকভাবে উপভোগ্য ।

মিলনী-র মিলন সন্ধ্যা

১৯৩৩ সালে বাংলার কয়েকজন উৎসাহী বুদ্ধিজীবীর উদ্যোগে জন্ম নিয়েছিল একটি সংস্থা । নাম : মিলনী । উদ্দেশ্য : মানুষের সঙ্গে মানুষের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করা । আর তাই বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক সভা, আলোচনাসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নানা ধরনের সমাজকল্যাণমূলক কাজ সে করে এসেছে ।
বিভিন্ন আলোচনাসভায় রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি নানা মনীষী, জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে ধন্য এই সংগঠন । আজ এই পঞ্চাশ-পেরুনো বয়সেও 'মিলনী' সমানভাবে সক্রিয় ।

সম্প্রতি এক সাংস্কৃতিক মিলন-সন্ধ্যার আয়োজন করেছিল 'মিলনী' রবীন্দ্রসদনে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলের সাহায্যার্থে ।

সেদিন অনুষ্ঠানের প্রথমার্ধে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর হাতে তুলে দেওয়া হল ২৫০০১ টাকার একটি চেক, সংস্থার পক্ষে । ত্রাণ তহবিলের কথা যে ভোলেনি মিলনী সে কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা জানালেন সংস্থাকে । এ-পর্বেই সংবর্ধনা দেওয়া হল বাংলার দুই স্বনামধন্য শিল্পীকে —সংগীত জগতের ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও নাট্য জগতের তৃপ্তি মিত্রকে । সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে সংস্থার অনুরোধ রেখে ধনঞ্জয়বাবু কণ্ঠে নিয়ে এলেন সেই গান—'কি হবে ফুলের তোড়া ফুলের মালা, চাই ভালবাসা' । কথায়-সুরে মেশা হৃদয়স্পর্শী নিবেদন । তৃপ্তি মিত্র যে-দুটি রবীন্দ্র কবিতা পাঠ করলেন তাতে ছিল প্রাণের স্পর্শ । অতঃপর রঞ্জিত মল্লিকের ধন্যবাদ জ্ঞাপন ।

দ্বিতীয়ার্ধে একক সংগীতানুষ্ঠান । শিল্পী : শিখা বসু । অনেকদিন ধরে গাইছেন তিনি । রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, ও রজনীকান্ত—এই চার গীতিকবির গানেই তিনি শিক্ষিতা, আলোচ্য অনুষ্ঠানেও তাঁর নিবেদনে ছিল এই চার

শিখা বসু

গীতি কবির গান । প্রথমে রবীন্দ্রসংগীত । প্রধানত পূজা পর্যায়ের গান । কণ্ঠে তাঁর একটা কোমলতা আছে, আছে মাধুর্য । ফলত তাঁর কণ্ঠ শ্রুতিনন্দন । তবে ইদানীং দমের একটু অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হয়, কারণ একাধিকবার কোন কোন শব্দের শেষ অক্ষরটির উচ্চারণ স্পষ্ট হল না । এতদসত্ত্বেও 'ধায় যেন মোর' যথাযথ আবেদন রাখল । সুরে বিভিন্ন স্বরের সংস্থাপনা আর সুরের অভিনব চলন দ্বিজেন্দ্রলালের গানে অন্যতর এক স্বাদ আনে । শ্রীমতী বসু পরিবেশিত 'এ কি শ্যামল সুষমা' কিংবা 'মলয় আসিয়া' গানে দ্বিজেন্দ্রগীতির সেই স্বাতন্ত্র্যের-ই উন্মোচন ।

অতুলপ্রসাদের 'এসো হে এসো হে প্রাণে' ও 'এসো গো একা ঘরে'-ও সুচারুরূপে এল । আর সেদিনের সর্বোত্তম পরিবেশনা রজনীকান্তের 'আমি তো তোমারে চাহি নি' । আকুতিময়, মর্মস্পর্শী নিবেদন । তাঁর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান শুনে আর একটি কথা মনে হল যে রবীন্দ্রসংগীতের চেয়ে অন্যান্য গীতিকবির গানে তিনি যেন বেশি স্বচ্ছন্দ, বেশি প্রাণবান ছিলেন তিনি । তাঁকে যন্ত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিলেন রমেশ চন্দ্র, শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়, অমর লাহা ও সমীর খাসনবীশ ।

স্বপন সোম

আমজাদ আলীর সরোদে কামোদ

সবুজ স্পোর্টিং ক্লাবের রজতজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রসদনে আয়োজিত ১৬ সেপ্টেম্বরের সান্ধ্য অনুষ্ঠানের একক শিল্পী ছিলেন ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁ। যন্ত্রে অপেক্ষাকৃত স্বল্পশ্রুত কামোদ

আমজাদ আলী খাঁ

রাগটিকে সেদিন তিনি তাঁর সরোদে রূপায়িত করেন। শিল্পীর বাদনরীতির সূক্ষ্ম ও মসৃণ অভিব্যক্তি এই রাগের আলাপ অংশটিকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনসপ্তক বিস্তৃত 'ডাইনামিক' ধর্মী আলাপটিতে প্রথাসিদ্ধ সুরবিন্যাসরীতি নবীকৃত ব্যঞ্জনায় বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। গৎকারিটি ছিল দীপচন্দি ও দু'টি ত্রিতাল বন্দেজে নিবদ্ধ। প্রথম গৎটির দ্রুত চলনে প্রতিফলিত হয়েছে রাগের চঞ্চল প্রকৃতি। এই পর্যায়ে হাল্কা বোলকারি, মোলায়েম মীড়ের কাজ ও বন্দেজের কোন বিশেষ অংশকে ভিত্তি করে তেহাই-এর সুন্দর উপস্থাপনা উল্লেখযোগ্য। এই রাগাশ্রিত দু'টি ত্রিতাল বন্দেজই সুগঠিত ও আকর্ষণীয় রচনা। পরবর্তী নিবেদন বাগেশ্রী রাগের আলাপ ও ত্রিতালে নিবদ্ধ গৎ তিনটি ছিল বিশিষ্ট আবেদনযুক্ত সুররূপে সনিষ্ঠ। সমগ্র পরিবেশনার মধ্যে রাগের বিষণ্ণ সুন্দর মুড়টিই প্রাধান্য পেয়েছে। তুলনায় আলঙ্কারিক বৈচিত্র্যের সংযোজক কিছু কম হলেও সুমধুর ছুটমীড়ের প্রয়োগে, ছন্দোবদ্ধ সুররূপ ও তানের নিখুঁত রূপায়ণে শিল্পীর বাজনার ধ্রুপদী আমেজ সুসংরক্ষিত হয়েছে।

এরপরে তিনি দেশ রাগে আলাপ ও গৎ বাজিয়ে শোনা,। এই রাগাশ্রিত সুপ্রসিদ্ধ বন্দেজ 'বীত জাত বরখা ঋতু'র অনুরূপ গৎটিতে অন্তর্নিহিত গীতিময়তা ও রসমাধুর্য অক্ষুণ্ণ থেকেছে। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি পর্যায়ে পরিবেশিত ক্রমবিলীয়মান সাঙ্গীতিক মুহূর্তটিও উল্লেখযোগ্য। তবলায় অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের যথার্থ শিল্পীসুলভ নিয়ন্ত্রণ ও সংযমী সহযোগিতা ছিল সেদিনের আসরের অন্যতম আকর্ষণ।

বিনতা মৈত্র

ন ৃ ত্য

কথাকলির আঙ্গিকে

সম্প্রতি কথাকলি আর্ট সেন্টার ম্যাক্সমুলার ভবন মঞ্চে তাঁদেরই সহযোগিতায় একটি আকর্ষণীয় নৃত্য সন্ধ্যা উপহার দিলেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা ছিলেন প্রখ্যাত কথাকলি নৃত্যগুরু গোবিন্দন কুট্টির ছাত্র-ছাত্রী।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কাজী নজরুল ইসলামের 'জয় হরপ্রিয়া' গানটির কথাকলি আঙ্গিকে নৃত্যরূপায়ণের মাধ্যমে। শিল্পী লুনা ঘোষ এই নৃত্যশৈলীর প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও গানটির নৃত্যরূপায়ণ যথেষ্ট আকর্ষণীয় করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এরপর পরিবেশিত হল পুরপ্পাড। মঞ্চ বন্দনার এই নৃত্য রচনায় ভাবাভিনয় ও ছন্দের মাধ্যমে দেহভঙ্গির সুষম সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। চাম্বাড়া তালে বিলম্বিত লয় থেকে ক্রমে দ্রুত লয়ে রূপান্তরের প্রয়োগে সেই সৌন্দর্য বিকশিত করেন সুতপা সরকার ও কাবেরী সিনহা। তরুণ নৃত্যশিল্পী পরিমল নাথ পরিবেশন করেন দক্ষযজ্ঞ নাটকের একটি পদম, যেখানে দক্ষ কালিন্দী নদীর সৌন্দর্য বর্ণনা করছেন। শিল্পী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই নৃত্যরূপ ফুটিয়ে তোলেন। কেবল আঙ্গিকের বিচারেই নয় একটি নিজস্ব মাত্রাও যুক্ত করতে সক্ষম হন তিনি। অষ্ট কলাসম তাল বিন্যাসে, যা কিছুটা জটিল—অত্যন্ত সাবলীলভাবে পরিবেশন করলেন

মোহনা আয়ার

সুতপা সরকার ও কাবেরী সিনহা। চল্লিশ মাত্রার ঝুম্পা তালে অতি বিলম্বিত লয়ে নৃত্যের সূচনা। 'তা-তা-কিট-তাকিতা' বোলের আধারে আট'টি তালগুচ্ছ বিন্যাসে লয়ের বৈচিত্র্যে এই নৃত্য কল্পনা অভিনব হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ নিবেদন 'পুতনা মোক্ষম'। পুতনা বধ-এর কাহিনী রূপায়ণে মোহনা আয়ার সহজেই উপলব্ধি করালেন তিনি কথাকলি নৃত্যের একজন পরিণত শিল্পী। কেবল আঙ্গিক নয়, অভিনয়েও তাঁর দক্ষতা অসাধারণ পর্যায়ের। এই নৃত্যকল্পনা কিছু কিছু অংশের পুনরাবৃত্তিতে বড়ই অপ্রয়োজনীয়ভাবে দীর্ঘ। অনুষ্ঠানের শেষ নিবেদন ছিল রাসক্রীড়া। দুই দৃশ্যে বিন্যস্ত এই নৃত্য রচনার প্রথম পর্বে বংশী বাদনরত কৃষ্ণের আনন্দ উচ্ছ্বাস এবং গোপিনীদের আহ্বান। দ্বিতীয় দৃশ্যে গোপিনীদের রাত্রে গৃহত্যাগে কৃষ্ণের কপট অভিমান-এর ওপরে তাঁদের সঙ্গে সম্মেলক নৃত্যে যার পরিণতি। কৃষ্ণের ভূমিকায় উমা ভেঙ্কট এবং গোপিনীদের ভূমিকায় গিরিজা দেবী ও লুনা ঘোষ সুশিক্ষার পরিচয় দেন।

কথাকলির ঐতিহ্যবাহী পোশাক ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু তাতে অনুষ্ঠান সৌকর্যের কোনো ঘাটতি ঘটেনি। কণ্ঠ সংগীতে শিল্পীদের সহায়তা করেন লক্ষ্মীনারায়ণ ও ডলি ঘোষ। যন্ত্রসংগীতে কলামণ্ডলম কেশবন, কলামণ্ডলম কুট্টম, এস হরিহরণ, জি মোহন সার্থক সহযোগিতা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গোবিন্দন কুট্টি।

কেবল ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এমন অনুষ্ঠান পরিকল্পনার জন্য গোবিন্দন কুট্টি বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

সুভাষ চৌধুরী

অমিতা দত্তের কত্থক

ভারত সোভিয়েত মৈত্রী উৎসব উপলক্ষ্যে গত ২২শে সেপ্টেম্বর গোর্কি সদনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হল অমিতা দত্তের কত্থক নৃত্য। কলকাতায় যাঁরা কত্থক নৃত্যকলায় প্রশংসনীয় নৈপুণ্য অর্জন করেছেন এবং ঘন ঘন নৃত্যানুষ্ঠান করে কত্থক রসিকদের মনোরঞ্জন করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতমা হলেন অমিতা। তাঁর বিশুদ্ধ নৃত্যে যেমন

অমিতা দত্ত

মার্জিত প্রকরণ নৈপুণ্য আছে তেমনি নৃত্যপদে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় ভাবাভিনয় তাঁর অনায়াস আয়ত্তে।

সূচনার সরস্বতী বন্দনার পরে স্লামী, আমাদ ও পরিশেষে তৎকর পরিবেশন করে বিশুদ্ধ কত্থকের মেজাজী আবহ রচনায় অমিতা যত্ন নিলেও, তাঁর অনুষ্ঠানসূচীতে প্রাধান্য ছিল অনেকগুলি অভিনয় পদের। এর মধ্যে ছিল তাঁর বহুপ্রদর্শিত গৎভাব সীতাপহরণ। এই পদে একাহারী শৈলীতে তিনি রঙ্গম, সীতা রাবণ, লক্ষ্মণ ও মায়ামৃগের চরিত্রগুলি কত্থকের বিশিষ্ট নৃত্যভঙ্গীতে মুদ্রায়, সুনিপুণ অভিনয়ে ও সঙ্গীতের সুষ্ঠু সাজুয্যে উপস্থাপিত করেছিলেন। আখ্যানবস্তুর নাটকীয়তায় চোখ মুখের অভিব্যক্তিতে দেহচারণায়, বিচিত্র ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ চরিত্রায়ণে, সুচারু নৃত্যভঙ্গিমার সুবিন্যস্ত চিত্রকল্পে এই নৃত্যপদটি দর্শকচিত্ত জয় করেছিল সহজে। ঘটনা ও চরিত্র চিত্রিত হয়েছিল কেবল নৃত্যভাবায়—কাব্য সঙ্গীতের সহযোগিতা ছাড়াই, আবার অনুকৃতির

দেহভাষা নৃত্যের আঙ্গিক ও ছন্দকে ছাপিয়ে ওঠেনি। অনুরূপ আর একটি অভিনয়পদ ছিল মীরার ভজন। যদিও সময়াভাবে কেবল এর একটি অংশই সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন অমিতা তবু মীরার স্মৃতিচারণায় দ্রৌপদীর চিরাপহরণ কত্থক নৃত্যভঙ্গীর সুষ্ঠু ও সৃষ্টিধর্মী প্রয়োগে রূপায়িত হয়েছিল। একই সঙ্গে মীরা এবং স্মৃতিচারিত ঘটনার চরিত্রগুলির রূপায়ণে এই পদটি একটি অভিনব কোরিওগ্রাফিক রচনা।
বাকী পদগুলি ছিল রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গান নিয়ে রচিত বর্ষার ভাব ও ভাবনার কত্থক নৃত্যরূপ। বর্ষার রিমঝিম বারিধারা বা ঝরঝর বর্ষণের বিচিত্র অনুভব এর আগেও অমিতা রূপায়িত করেছেন ভজনে বা কবিতায়। এবারে নজরুলের গান রিমঝিম ঘন দেয়া বরষে সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ পেয়েছিল কত্থকের ভাষায়, কারণ রূপবর্ণনার অতিরিক্ত কোন ব্যঞ্জনা গানের ভাষায় ছিল না। অমোদ বা তৎকরের মত পদচারণায়, হাতের লাবণ্যময় ভঙ্গীতে বারিধারার অভিব্যক্তিতে বর্ষার বিশুদ্ধ রিমঝিম গীতিময়তা ধরা পড়েছিল।
কিন্তু যেতে যেতে একলা পথের রূপক চিত্রকল্পের আড়ালে যে গভীর স্বাগত বোধের অন্তরঙ্গ আলোড়ন আছে বহিরঙ্গের আক্ষরিক উপস্থাপনায় তার কিছুই মূর্ত হয়নি। কোথা যে উধাও, শাওন গগনে ও হৃদয় মন্দ্রিল ডমরু গুরুগুরু এই তিনটি গানের রূপায়ণে অমিতার সাফল্য ছিল অনেক বেশী। কত্থক নৃত্যআঙ্গিকের সঙ্গে মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছিল শাওন গগনের ভাববস্তুতে কৃষ্ণ রাধার প্রসঙ্গ। কিন্তু বজ্রগম্ভীর মেঘগর্জনের সঙ্গে ত্রাসে কেঁপে ওঠা, বা ভয়ে মুখ ঢাকা, মৃদু বর্ষণের ছন্দে হিল্লোলিত হওয়া, শঙ্কা বা উল্লাসের নানা অভিব্যক্তি ও নৃত্যভঙ্গী এই পদগুলির প্রায় প্রতিটিতে ব্যবহৃত হওয়ায় নৃত্যবিন্যাসের বৈচিত্র্য কিছু ক্ষুণ্ন হয়েছে।

মনসিজ মজুমদার

প্রথমেই এই প্রযোজনার অন্তরালে যে অসামান্য নিষ্ঠাও আন্তরিক প্রস্তুতির পরিচয় পাওয়া গেল নিঃসন্দেহে তা বিশেষ প্রশংসনীয়। সম্মিলিত প্রয়াসের এমন উজ্জ্বল নিদর্শন সহজে মেলে না। প্রযোজনায় উপস্থাপনা সম্পর্কে যথেষ্ট যত্নশীল ছিলেন তাঁরা। জলের মধ্যে বিচিত্র রূপসৃষ্টির মাধ্যমেই পরিচালক মূল রসসৃষ্টি অক্ষুণ্ণ রাখায় প্রয়াসী ছিলেন। প্রবেশ ও প্রস্থানের মধ্যে বৈচিত্র্য ছিল। কেবল শেষ দৃশ্যটির 'বাঁধ ভেঙে দাও' গানটির সঙ্গে শিল্পীরা জলের মধ্যে যে প্যাটার্ন গড়ে তুললেন তা সেই নিয়মের গণ্ডীর মধ্যেই আবার ফিরে যাওয়া নয় কি? নৃত্যে রাজপুত্রবেশী কঙ্কনা কর, পত্রলেখা শ্রীপর্ণা ব্যানার্জি, রুইতন অরুণ মহাজন বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। তবে রাজাসাহেবের ভূমিকায় রণজিৎ সিংহরায় অসামান্য। সমবেত নৃত্যের শিল্পীরা বিশেষ দক্ষতায় তাঁদের ভূমিকা পালন করেছেন। সংগীতাংশে গীতা ঘটকের কোনো তুলনা নেই কি কণ্ঠস্বর! কি নাটকীয়তা! অর্ঘ্য নও মনে রাখার মতো নাট্যরসসঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁর নে। অত্যন্ত দৃপ্ত তাঁর গায়ন ভঙ্গি কেবল কোনো কোনো গানে অযথা অনাটকীয়তা প্রয়োগ কি নিতান্তই প্রয়োজনীয়—ভেবে দেতে অনুরোধ করি। এই প্রযোজনায় আলোকসম্পাত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাজসজ্জা সম্পর্কে বিশেষযত্ন নেওয়া হয়েছে এবং প্রযোনার মান উন্নয়নে তা বিশেষ সহায়কয়েছে বললে অত্যুক্তি করা হবে না। জয়তিকা সিংহ রায় এবং রা ঘোষ এজন্য বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। সুরেন প্রসাদের শব্দ নিয়ন্ত্রণমনে রাখার মতো।
সংগীত পরিচালনা (কণ্ঠ): অর্ঘ্য সেন এবং যন্ত্রানুষঙ্গ পরিচালনা দীনেশচন্দ্র চন্দ্র। স্মরণীয় এই প্রযোজনার পরিচালনায় দায়িত্বে ছিলেন অরিজিৎ গুহ।

সুভাষ চৌধুরী

ন ত্য না ট্য

জলনাটিকা তাসের দেশ

জলনৃত্যে 'তাসের দেশ'

গত কয়েক বছর ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য প্রযোজনায় উদ্যোগী হয়েছেন এবং বিশেষ সাফল্য প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছেন। এবছর তাঁরা তাঁদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে 'তাসের দেশ' উপস্থাপন করলেন সাড়ম্বরে। জলের মধ্যে নৃত্যনাট্য প্রযোজনায় কিছু সীমাবদ্ধতা থেকেই যায় কিন্তু সম্পূর্ণ এক নতুন আঙ্গিকের কথা মনে রেখে তা অনেকখানি মানিয়ে নিতে হয়। সেখানে জলের মধ্যে শিল্পীদের বিচিত্র রূপসৃষ্টিকে প্রাধান্য দিতেই হয়। সেই বিবেচনাতেও তাসের দেশ প্রযোজনা আরো কঠিন। কেননা এখানে পাত্রপাত্রীদের চলন লীলায়িত নয়। জলের মধ্যে পাত্রপাত্রীদের চৌকো চৌকো কেঠো চালে চলা অথবা মিট্ খুট্ সিট্ খুট্ শব্দে পা ফেলার রূপটি অনাস্বাদিত থাকতে বাধ্য। তবু হাত ও মাথার বিচিত্র ব্যবহারে যতখানি সম্ভব চরিত্রগুলি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন শিল্পীরা।

না ট ক

মিশিন্দা পাতার রস

সেদিন অঘোষিত বন্যা। আকাদেমি দাঁড়িয়ে আছে দ্বীপের মত। থিয়েটার ওয়ার্কশপের দুই দশক পূর্তি উপলক্ষে ঢাকা থেকে "থিয়েটার" এসেছিলেন দুটি প্রযোজনা নিয়ে। একদিন অভিনয় সম্ভব হল না, আয়োজক ও আমন্ত্রিত দুই পক্ষেই বন্যার শূন্যতা। কিন্তু কলকাতার সব গ্রুপ থিয়েটার মিলিত হয়ে কাজ করে একদিন শিশির মঞ্চ আর একদিন আকাদেমিতে অভিনয় সম্ভব করলেন। বন্যাবিপাক জোট বাঁধতে শেখায়।

কলকাতার দশক বাঞ্ছা মিঞার মত 'লুলা' নয়। কিন্তু এক ধরনের নাটক দেখতে দেখতে তাদের চোখ ক্লান্ত, কুঁজো বুড়োর টোটকা মিশিন্দা পাতার রসের ফর্মূলাও তাদের জানা ছিল না। তবুও "থিয়েটার"-এর "এখনও ক্রীতদাস" তাদের আবার সজীব করে তোলে। গলাচিপা বস্তি হয়তো এখানেও আছে—কিন্তু নাটকে তার রূপ একই ভাবে ঘুরে ফিরে আসে। আবদুল্লাহ আল মামুনের লেখা ও পরিচালনায় "এখনও ক্রীতদাস" নাটকে সেই বস্তির ছবি অন্যতর—জীবন আলুনি হতে পারে; কিন্তু জীবনের কথা নিয়ে শিল্প সাহিত্য আলুনি হবে কেন? আল মামুনের নাটকে জীবনের ছবি আছে তার সঙ্গে আছে বঞ্চনার কাব্য, স্বাদ এখানে নাটকে প্রায়ই থাকে না। শুধু কারা মানুষ শিকার করে তাঁদে লক্ষ্য রেখে এক বগগা নাটক নয়—মানুষের গহীনে ডুব দেওয়াতেই—এই নাটক অন্য জায়গায় পৌঁছে যায়। কান্দুনী সম্পর্কে হারেস ভাবে "কান্দুনী আগা পাছতলা একখান মাইয়া মানুষ, তার শরীলে ত্যাজ আছে, জিলকি আছে, খায়েস আছে"। হারেস শুধু শরীর দেখেছে, কান্দুনীর মন বোঝেনি। পৃথিবীর নির্দয়তম শব্দ "তালাক"। কত তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে একবার শব্দ উচ্চারণে যেন ধনুকের ছিলা ছিঁড়ে যায়। এই ট্রাজেডি আমরা ছেঁড়া তার নাটকে বা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের "রস" গল্পেও দেখেছি। কিশোরী মর্জিনা ফিল্মে একস্ট্রার পার্ট করে। যখন তার যৌবন লুঠ হয়ে যায় তখন আমরা সবাই বুঝি বাঞ্ছা মিঞার মতো আমরাও পঙ্গু, আমাদেরই তনয়ার ইজ্জত যায়, স্ত্রী বেআব্রু হয়, অথচ আমরা অসহায়।
'মাটি' শব্দটি বহুব্যবহারে জীর্ণ—নইলে বলা যেত সংলাপে মধ্যে সরাসরি মাটিতে নিয়ে যায় তবে সব শেষে বাঞ্ছা মিঞা গুলি

খেয়ে লুটিয়ে পড়েই তার পরেই একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দেবার মতন, তারও পরে পঙ্গু বাক্কা মিঞা দুই বগলে কাজী ও জীর ছেলেকে চেপে ধরেন—টা শোল্লেতে সঞ্জীবকুমারও রেননি। 'জাউরা পোলা' প্রথমে বলেন তার পরে কোন প্রস্তুতি ছাড়াই শহীদ। বাক্কা মিঞা 'বাপ' বলে ডাকবার পরেই নাটকেও সেন্টিমেন্টের অবিশ্বাস্য বন্যা। বাংলা ছবিতে যেমন মা বলে ডাকলে অরুক চামুণ্ডা চরিত্রও যশোদা হয়ে যান।

ফেরদৌসী রহমান

এখন কলকাতা ফেরদৌসী রহমানের অভিনয়ের খোয়ারি ভাঙছে। বহুদিন এরকম দমকা হাওয়ার মত অভিনয় দেখা যায়নি।

'বুড়া হারামীর বাচ্চা আমার পাতার পানি লাইছে' ধমকের সঙ্গে মঞ্চ কেঁপে ওঠে আবার তালাকের পর চার নীরব কান্নায় মঞ্চই যেন গুমরিয়ে ওঠে। বাক্কা মিঞা ঢিল ছোঁড়ে আর হারেসের ভূমিকায় আরিফ আলম খান লাফ মেরে অশ্লীল হাসি হেসে কাটাতে থাকে, তার পরে তালাকের পর তাঁর অপ্রস্তুত, অস্বস্তি ভাব দেখে বোঝা যায় নাটকের জীবনের সঙ্গে তিনি মিশে গেছেন। বাক্কা মিঞার চরিত্রে আবদুল্লা আল মামুন একইভাবে খাটে শুয়ে কথা বলেন, চৌকির উপর থেকে নিষ্ফল আক্রোশে চটি ছুঁড়ে মারেন—সম্পূর্ণ ছবি হয়ে ভসে—এই নিপুণ ছবি দেখে আমরাও বুঝি না কিভাবে বস্তির মানুষ কাজী সাহেবের মত অজগর গ্রাসের কাছে অসহায়। মর্জিনার ভূমিকায় সাজিদ রেজা রুমু প্রথম দৃশ্যে নানারকম ডিটেলের কাজের সঙ্গে গান গায়। 'ও দরিয়ার পানি, তর মতলব জানি'—সেই কিশোরী যখন লুঠ হয় তখন আমাদেরও বুক খালি হয়ে যায়। কান্দুনী বলে 'এইডা ঢাকার শহর, এইখানে উচা উচা দালান, বড় বড় রাস্তা। ঢাকার শহর অহন মস্ত বড় জঙ্গল। এই জঙ্গলে মানুষ নাই খ্যাও আছে, খালি খাই খাই করতাছে—এইখানে আর তুমি মর্জিনারে খুইজ্যা পাইব্যা না।

'আবদুল কাদেরের কাজী, একটি নতুন ধরনের চরিত্রায়ন (গঙ্গাপদ বসুর মত স্বাভাবিক অথচ অব্যর্থ), শুধু মর্জিনার দিকে তাকানোর সময় হিন্দি ছবির ভিলেনের মত। সংলাপের সঙ্গে মিশে আছে সূক্ষ্ম কতকগুলি কাজ। এক জায়গায় হারেস চ্যালেঞ্জ জানায়, বাক্কা মিঞা থুথু ছুঁড়েও পৌঁছতে পারেন না—এতটাই আমাদের অসহায়তা। আর এক জায়গায় পান্তাভাতের হাঁড়ি উল্টে যায়—বাক্কা মিঞা হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়—পিছনে গুলির শব্দের আবহ—মনে করিয়ে দেয় এক মুক্তিযোদ্ধার কথা। বাক্কা মিঞা এগিয়ে যায় ছড়িয়ে যাওয়া ভাতের দিকে, কান্দুনী বাবুর বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে অক্লেশে চুরির কথা বলে—যা নিত্যনৈমিত্তিক তাতে অশ্লীলতা নেই।

নাটকের সংলাপ বা অভিনয়ের সঙ্গে গানের কথা ও সুর মেলে না। কেমন যেন আরোপিত মনে হয়। ফিরদৌসি রহমান যখন ভিক্ষার সুর শোনান সেইটা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য কানে লেগে থাকে। মঞ্চের জন্য জায়গা লেগেছে অনেকখানি কিন্তু কাজে লাগান যায়নি। চারটি খুপরির মধ্যে মাত্র একটিতে একবার একটি নবজাতক জন্মায়—বাকিগুলি শুধু আভরণ হয়ে থাকে। অথচ সংলাপেই গলাচিপা বস্তি আমাদের মাটির মধ্যে ঘাড় গুঁজে দেয়! কয়েকজন ছেলেমেয়ে হাঁটাহাটি করে, একজন ব্ল্যাকার ড্রেস সার্কেল ব্যালকনির হিসেব করে, নাসরিন নাকি রাতে অজানা ডিউটি দিয়ে ফেরে, মায়ের সঙ্গে কাজিয়া করে, ট্রেন চলে যায় কান্দুনী বলে "এই ঘর দাওয়ার খউজ নাই শুধু বউ লইয়া কচলাকচলি।" পঙ্গু বাক্কা মিঞা শুধু শুয়ে শুয়ে নরনারীর ছবি দেখে। সব মিলিয়ে দমবন্ধ হওয়া আবহাওয়া। বাক্কামিঞার একটা সাধ নানাভাবে ঘুরেফিরে আসে, 'আমারে চা দে, বিস্কুট দে—আমি চায়ের মধ্যি বিস্কুট চুবাইয়া চুবাইয়া খামু'—সামান্য সাধ তাও মেটে না—শেষ বাসনা আর্ত চিৎকার হয়ে ওঠে ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হয় আমাদেরও কত সামান্য সাধ মেটেনি। এপারেও নাপাওয়ার হতাশা আছে, ওপারেও আমৃত্যু বাসনা আছে—বন্যা যখন আসে তখন কোন সীমান্তরেখার আইন না মেনে দুই পারকেই উথালপাথাল করে দিয়ে যায়।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

বি বি ধ

এক শিল্পী : কিছু গান কিছু স্মৃতি

আশি-অতিক্রান্ত এক মানুষ স্মৃতিচারণ করে চলেছেন। শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ। এই বয়সেও কি সতেজ প্রাণবান ভঙ্গী তাঁর! শ্রোতৃবৃন্দের মন ফিরে গেছে সেই কোন সুদূরে। ত্রিশের দশক। 'জোর বরাত' নামক একটি বাংলা ছবির শুটিং চলছে। ছবির নায়ক পাশের বাড়িতে থাকা নায়িকাকে শোনানোর জন্য গাইছে— 'কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে'। রবীন্দ্রনাথের একটি পরিচিত কবিতার অংশ বিশেষ এটি, এটিতে সুর সংযোজন করা হয়েছে।

স্টুডিওতে রয়েছে একদিকে দুটি ক্যামেরা আর অন্যদিকে একটি মাইক। মাইকের সামনে সংগীত পরিচালক গেয়ে চলেছেন ওই গানটিই।
ক্যামেরা তুলছে নায়কের ঠোঁটের ওঠা-নামাটুকু আর সাউণ্ডে উঠছে সংগীত-পরিচালকের গাওয়া গান।
পর্দায় দর্শকরা দেখবেন নায়ক গাইছেন। এইভাবেই সূত্রপাত বাংলা সিনেমার গানের। এইসব কথা বলতে বলতে আশি-পেরুনো মানুষটি একটু যেন উদাসী হলেন, হয়ত স্মৃতির ভারে। এই মানুষটিই উপরিউক্ত সংগীত-পরিচালক এবং তিনি আরও অনেক কিছু। একাধারে গীতিকার, গায়ক, নায়ক, চিত্র পরিচালক, লেখক এবং হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। আজকের এই স্পেশালাইজেশনের যুগে ব্যাপারটা অভাবনীয়ই ঠেকবে। বহুধা গুণসমন্বিত এই মানুষটি হলেন হীরেন বসু। গানের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের শব্দযোজনা যে তিনিই করেছিলেন সে-কথা এল তাঁর স্মৃতিচারণে, এল রবীন্দ্রনাথের গান রেকর্ডিং-এর কথা।

হীরেন বসু

আজকের দিনে গানে যেন দরদটা কমে গেছে তাও বললেন তিনি। তবে শুধু কথা নয়, সেদিন, শোনালেন স্বরচিত কয়েকটি গানও। যেমন 'শেফালি তোমার আঁচলখানি', ছোটদের জন্য রচিত 'ওলো বকুল ফুল' কিংবা 'জ্বালো আজি আরতি দীপ'। 'শেফালি তোমার আঁচলখানি' টুইন রেকর্ডে মিস লাইট গেয়েছিলেন ১৯২৯ সালে। অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল রেকর্ডটি। জনাদর পেয়েছিলো তাঁর রচিত সুরারোপিত আরও বহু গান।

যে-ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে সেদিনের এই স্মৃতিচারণ-অনুষ্ঠান তা হল হীরেনবাবু রচিত গানের একটি সংকলন গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রকাশিত বইটি হীরেনবাবুর হাতে তুলে দিলেন হীরেনবাবুর অত্যন্ত কাছের মানুষ—শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। "ওঁর কথায় সুরে বহু গান গেয়েছি, ওঁর কাছে ঋণী আমি" একথা বলে হেমন্তবাবু কণ্ঠে নিয়ে এলেন সেই বিখ্যাত গান 'প্রিয়ার প্রেমের লিপি' (কথা : হীরেন বসু, সুর : অনুপম ঘটক)। এই গানের সঙ্গে সঙ্গে মনে ভিড় করে আসে হীরেনবাবুর কথায় অনুপম ঘটকের সুরে হেমন্তবাবুর আরও গান—'শুকনো শাখার পাতা', 'হংসমিথুন চলে' কিংবা 'মেঘমেদুর বরখারে'।

সুরভিত স্মৃতিচারণে সংগীতে এই সার্থক সন্ধ্যাটি উপহার পাওয়া গেল যে সংগীত শিক্ষায়তনটির সৌজন্যে, নাম তার : ইন্দিরা।

স্বপন সোম

জ

দেখলেন তো?
মামুলি ডিসটেম্পারের চেহারাকে
জেনসন অ্যাণ্ড নিকলসন
কেমন পাল্টে দেয়...

অ্যাক্রিলিকের জাদুর স্পর্শে।

আপনার জন্যে জেনসন অ্যাণ্ড নিকলসন এনেছে—পেণ্ট টেকনোলজির একেবারে নতুন নতুন নমুনা! কেবল জেন্সোলিন অ্যাক্রিলিক ওয়াশেবল্ ডিসটেম্পার-ই আপনাকে দিতে পারে অপূর্ব ফিনিশ, পাকা আসল রঙ আর দ্রুত শুকিয়ে যাওয়া ক্ষমতা। এত গুণ অথচ দাম সেই অন্য অয়েল বাউণ্ড ডিসটেম্পারের মতই!

জেন্সোলিন অ্যাক্রিলিক ওয়াশেবল ডিসটেম্পার- সবসেরা ডিসটেম্পার, বাড়তি খরচও লাগেনা যার!

Rediffusion/JN/4932 n BN

... November 1986. Reg. No. WB CC ... MH. By South 681

বর্ণবিদ্বেষ

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় □ নবনীতা দেব সে

ধ্রুব গুপ্ত

সোনার হাতছানি

মদনগোপাল মুখোপাধ্যা

ইগর অয়ে

কমপ্লান® -সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

B84 GLC 120 B

সূচীপত্র

দেশ

[illegible]

[illegible]

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে [illegible] বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ২০ পয়সা পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা

১১

ব[illegible] [illegible] এক [illegible]
[illegible] মিলিয়ে
[illegible] দিন কি আসবে ?
সে-[illegible] কি তৈরি হচ্ছে
কৃষ্ণ-[illegible] অস্থি-পঞ্জরে ?
ইয়োরোপ-আমেরিকার
শ্বেত-সাম্রাজ্যবাদ তাদের উদ্ধত
ঔপনিবেশিক অত্যাচারে,
অমানবিক নিপীড়নে, দাসত্বের
শৃঙ্খলে দাবিয়ে-বেঁধে রেখেছে
কৃষ্ণাঙ্গদের এতকাল। বুঝি দিন
আগত ওই।
বর্বরতার বিরুদ্ধে বিশ্ব-সভ্যতা
আজ কালোর সঙ্গে হাত
মেলাতে উদ্যত।
অতলান্তিকের দুই
তীরে—পুবে-পশ্চিমে,
কৃষ্ণ-আমেরিকা আর
কৃষ্ণ-আফ্রিকা এখন ঐক্যবদ্ধ,
আত্মসচেতন, অগ্নিগর্ভ। শঙ্কিত
শ্বেত-পাশবিকতা, দক্ষিণ
আফ্রিকার বর্ণদ্বেষী শাসকশক্তি
পশ্চাদপসরণের প্রাক্-মুহূর্তে
মরণ-কামড় দিয়েছে
প্রিটোরিয়ায়।
কিন্তু বিশ্ব-মানবতা আজ
অবধারিত কৃষ্ণ পক্ষে। কালোই
আজ আলোকিত, আলোচিত।
'অন্ধকারাচ্ছন্ন' আফ্রিকার
কৃষ্ণ-সাহিত্যিক এবার বিশ্ব
সাহিত্যের মঞ্চে, পাদ-প্রদীপের
সামনে দণ্ডায়মান, নোবেল
পুরস্কার-এ ভূষিত।
সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব, বর্ণবিদ্বেষীর
বর্বরতা আর বর্ণবিরোধীদের
সংগ্রামী সংহতি, তার আদ্যন্ত
ইতিহাস এবং কৃষ্ণাঙ্গদের
সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ কৃষ্ণ-কথা
নিয়েই 'দেশ'-এর এই সংখ্যার
প্রচ্ছদ নিবন্ধমালা।

৯৫

আমেরিকার ডেথভ্যালি কতোকাল থেকে
লোভী মানুষকে সোনার
হাতছানিতে ডেকে চলেছে।
ছলনাময়ী সোনারপরীর
দুর্নিবার আকর্ষণে ছুটে গিয়ে
ফাঁদে পড়েছে অনেকেই।
ফেরা আর হয়নি তাদের।
সেই সব হতভাগ্যের অবর্ণনীয়
কষ্ট-যন্ত্রণা আর অসংখ্য মৃত্যুর
ভয়াল ভূখণ্ড এই ডেথ
ভ্যালি।

৭৮

সুরের এমন সম্মোহন। ওকে
বাড়িতে আটকালেন
চারলি চ্যাপলিন।
সারারাত বাজলো
বেহালা। ভোর হল।
তন্ময় চ্যাপলিন।
বেহালার বিস্ময়
অয়েস্ট্রাক সেই সুর
ছড়িয়ে গেলেন
দিল্লিতে।

৪৭

পুরাণের যুগ থেকে
দেব-দানবে যুদ্ধ। সৃষ্টি
দেবতার;
ধ্বংসমূর্তি—দানব। দেবতার
হাতে জীবনের দীপ: দানবের
পরমায়ু শেষ।
দানবের সঙ্গে সংগ্রামে যারা
নির্জোট শিবিরে সংহত, রাজীব
গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত তার
পুরোভাগে। রাজীবের
সাম্প্রতিক বিদেশ সফর-সঙ্গী
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের
ধারাবাহিক লেখায় সেই
প্রেক্ষাপট আলোকিত।

প্রচ্ছদ

'ভিসন' প্রদর্শনীতে 'দ্য
ক্রাই' নামে চিহ্নিত
এই ব্রোঞ্জমূর্তিটি আফ্রিকার
বিখ্যাত বিদ্রোহী
কবি বেঞ্জামিন
মোলয়েস-এর
পূত-স্মৃতির
স্মারক। নিপীড়ক
শত্রুর হাড় কেটে
চলার মতো সায়ক
সম্ভবত কবিদের
হাতেই থাকে।
অত্যাচারী গলায়
ফাঁসের রশি টেনে
কবির কণ্ঠ রুদ্ধ করে
বটে, আওয়াজ কিন্তু
বেড়েই চলে।

চিঠিপত্র

জীন প্রসঙ্গে

২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ 'দেশ' পত্রিকায় শিল্পের শিল্পী অশোক গাঙ্গুলীর সঙ্গে শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদ সাক্ষাৎকারে কিছু সরস প্রশ্নের উত্তরে ডঃ গাঙ্গুলী অযাচিতভাবে জিন ও জেনেটিক্স টেনে এনেছেন। তাঁর পেশায় সাফল্যের কারণ হিসাবে জানিয়েছেন যে জিনস্ তাঁর জীবন গঠনে সাহায্য করেছে। শুধু তাই নয়, মধ্যবিত্ত ঘরের প্রতিটি ছেলেমেয়ে নাকি জেনেটিক্যালি ইনহেরিট করছে জীবনের গতি যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন জীবন দেবতা। রবীন্দ্রনাথ তো উচ্চবিত্ত ঘরের সন্তান ছিলেন, তাহলে তাঁর জীবনদেবতার জিন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়ে কি করে ইনহেরিট করল ? জিন তো কোন বায়বীয় পদার্থ নয় যে হাওয়ায় উড়ে মধ্যবিত্তের ঘরে ঢুকবে ? একটি মানুষের ভ্রূণ তার ভালমন্দ জিন আহরণ করে পিতামাতার ভ্রূণ সৃজনী লীলার মাধ্যমে। অতএব তাঁর এহেন উক্তি অবৈজ্ঞানিক ও অসম্পূর্ণ।

তাই সংশোধনের অপেক্ষায় ছিলেন। সহাশক্তির প্রসঙ্গ উঠতেই বললেন যে লাইফ ইজ হোয়াট হি ইজ। এতে খানিকটা সত্যরক্ষা হলেও এর আগে তিনি লাইফের আর একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন—লাইফ ইজ জেনেটিক সিলেকশন অলসো ; জিন, জেনেটিক সিলেকশন, ইনহেরিটেন্স ইত্যাদির সঙ্গে জীবনের সাফল্য-অসাফল্যের কি কোন সম্পর্ক আদৌ আছে ? সম্পর্ক আছে মেনে নিলে এটাও মানতে হবে যে তাবৎ ব্যুরোক্রাট, টেকনোক্রাট ইত্যাদি জীবিকার ক্ষেত্রে যাঁরা সফল তাঁরা জেনেটিক্যালি সুপিরিয়ার ক্লাস। উৎকৃষ্ট জিনের অভাবে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ জীবিকায় অসফল। ভাবা খুবই স্বাভাবিক যে নিম্ন, মধ্য ও উচ্চবিত্তের শ্রেণীগত মানসিকতা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের চালিকা শক্তি জিন। এমন ধারণা প্রশ্রয় পেলে মানবসমাজে আজও টিকে থাকা সাদা কালো, বড় ছোট, উন্নত-অনুন্নত, আর্য-অনার্য, শক্তিমান-দুর্বল ইত্যাদিকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে মানতে হয়। ডঃ গাঙ্গুলীর প্রতি কোন অভিসন্ধি আরোপ করার অভিপ্রায় নেই। কিন্তু একথা সত্য যে, কিছু মানুষ সমাজতত্ত্বের মোড়কে এই সব বৈষম্যকে জিনের দোহাই দিয়ে চালাবার চেষ্টা করছেন। মানবচিত্তবৃত্তির ধার ধারে না শরীরবাদী অর্থ ও বর্ণ অহংকারী কিছু মানুষ এই মনোভাবকে প্রশ্রয় দেবার অপচেষ্টা করছে নানা ধরনের বই লিখে।

প্রত্যক্ষভাবে জেনেটিকসের গবেষণা না করে মাতৃভাষায় দৈনিক ও সাময়িক পত্রে সরল বিশ্বাসে সেইসব বইকে আকর করে জিন নিয়ে বিভ্রান্তকারী লেখা ছাপাচ্ছেন। সেই সব লেখা পড়ে সরলমতি বিজ্ঞানাগ্রহী পাঠকের মনে কুসংস্কার সৃষ্টি হচ্ছে। জিনের দোহাই দিয়ে লেখক নিজের অজান্তে কি ধরনের নিয়তিবাদী মানসিকতা প্রচার করছেন তার একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ১৯৮৬-র ৭ই সেপ্টেম্বরের আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে শ্রীপার্থসারথি চক্রবর্তী "জীন কালচার : যুগল বিবর্তন" নামে একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে সমাজে পুরুষের দাপট শুধু কালচারের দাপটে গজিয়ে ওঠেনি, সামাজিক এই আচরণকে তর্জনী তুলে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করছে জীনের সূক্ষ্মতম কণা। (দেশের বানান 'জিন' ও আনন্দবাজারের বানান 'জীন')। তাহলে নারী পুরুষ যে যাকেই দাপট দেখাক না কেন-তা জিনের কারসাজি বলে অছিলা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে জিন ও সংস্কৃতির বিবর্তন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত কয়েক লক্ষ বছর ধরে। এই জিন ও সংস্কৃতি একে অপরকে ইন্ধন জুগিয়েছে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যে গোষ্ঠীর বা জাতির সাংস্কৃতিক মান, অবশ্যই আমাদের বিচারে, অন্য গোষ্ঠী বা জাতির তুলনায় খাটো, তাদের জিন গুণগতভাবে নিকৃষ্ট। তিনি লিখেছেন যে মানুষের হিংস্রতা ও আক্রমণমুখিতাকে বড় জোর বলা যায় জিনের দৌলতে জন্মসূত্রে পাওয়া এক ধরনের মানসিক অবস্থা। 'বড় জোর' কথাটি ব্যবহার করেও হিংস্রতা ইত্যাদি জন্মসূত্রে পাওয়া যে জিনের অপকর্ম তা আর চাপা যাচ্ছে না। এই সব তথ্য কতখানি বৈজ্ঞানিক ও নির্ভরযোগ্য সে সংশয় প্রকাশ করে এই প্রশ্নই রাখতে চাই যে মানব চিত্তবৃত্তি, যেমন মেধা, যুক্তি, সৌন্দর্যবোধ, কল্পনা, মননশীলতা, সৃজনীশক্তি ইত্যাদি যা মানুষকে বিশিষ্ট করেছে,অন্য প্রাণী থেকে তা জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এমন দাবী করার মত প্রমাণ আমাদের হাতে আছে কি ? জিনই যদি এই চিত্তবৃত্তিগুলির অমোঘ নিয়ন্ত্রক হত তাহলে প্রতিটি বরণীয় প্রতিভার পূর্ব ও পরপুরুষের মধ্যে সে ধরনের প্রতিভার প্রকাশ দেখা যেত। যায় কি ?

ডঃ গাঙ্গুলী তাঁর জীবনের সাফল্যের কারণ দর্শাতে গিয়ে দার্শনিকভাবে বলেছেন যে লাইফ ইজ জেনেটিক সিলেকশন এবং এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে জড়িয়েছেন। আমিও তাই রবীন্দ্রনাথের স্মরণ নিচ্ছি। আজ থেকে ঠিক পঁচানব্বই বছর আগে রবীন্দ্রনাথ, আজ যাকে ডঃ গাঙ্গুলী জেনেটিক সিলেকশন বলছেন, সে সম্বন্ধে কি বলেছেন তার উদ্ধৃতি দিচ্ছি : "আমাদের যে অংশ জন্তু সেই অংশই আমাদের জীবনধারণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক এবং natural selection-এর নিয়ম অনুসারে সেই অংশ ক্রমশ উন্নত হয়েছে, কিন্তু আমাদের অনেকগুলি মানবচিত্তবৃত্তি আছে যা আমাদের জীবনরক্ষার পক্ষে কিছুমাত্র আবশ্যক নয়। সুতরাং জীবনসংগ্রামের নিয়মানুসারে সেগুলো কী করে উদ্ভাবিত হল কিছু বোঝার জো নেই…। উদ্ভিদ ও জন্তুদের যা কিছু আছে সমস্তই তাদের আবশ্যক অথবা অতীত আবশ্যকের অবশেষ। কিন্তু আমাদের প্রধান

চিত্তবৃত্তিসকল আমাদের আবশ্যকের অতিরিক্ত। এ পর্যন্ত প্রমাণ হয়নি সৌন্দর্য আমাদের জীবনের পক্ষে আবশ্যক, যে জাতির মধ্যে শিল্পচর্চা অধিক তারা অন্য জাতির চেয়ে বলিষ্ঠ বা তাদের জীবনীশক্তি অধিক।… যারা সংগীত চর্চা করে জীবন সংগ্রামে তাদের বিশেষ কী সুবিধে বোঝা যায় না। অতএব এ সকল মনোবৃত্তি আবশ্যকের নিয়মানুসারে আর্বিভূত হয়নি… natural selection-এর নিয়ম মানুষ পর্যন্ত এগিয়ে এক রকম বন্ধ হয়ে গেছে… শিল্পচর্চার ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায় অনেক বড় বড় শিল্পী বিস্তর দারিদ্র্যকষ্ট ও জীবনের ক্ষতি স্বীকার করে শিল্পচর্চা করেছে এবং এইরকম করেই অল্প অল্প

শিল্পবিদ্যার উন্নতি হয়েছে, natural selection -এর নিয়মে এর কোন কারণ পাওয়া যায় না।…আমাদের যা প্রকৃত মনুষ্যত্ব তা এই natural selection নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনীশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে…সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে ভালবাসা যে ক্রমে বাড়ছে তা অনেক পরিমাণে তার অকারণ দুঃখজনক ও জীবনরক্ষার বিরোধী। কিন্তু তবু কোন নিয়মানুসারে আমরা তাকে এত উচ্চ আসন দিচ্ছি ?" আধুনিক পরিভাষায় ডঃ গাঙ্গুলী যাকে জিনেটিক সিলেকশন বলেছেন তাকেই ডারউইন ন্যাচারাল সিলেকশন বলেছিলেন, কেন না ডারউইনের সময় জিনের অস্তিত্বের কথা জানা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য ও প্রশ্নকে নস্যাৎ করে দেবার মত পুঁজি দুর্বার অগ্রগতি সত্ত্বেও জেনেটিকস সঞ্চয় করতে পারেনি। জিনগত পার্থক্যের দোহাই দিয়ে বৈষম্য সৃষ্টির যে অপপ্রয়াস চলছে রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কার বাইরে তা ছিল না।তাই তিনি ন্যাচারাল সিলেকশন প্রসঙ্গ আলোচনার সময় সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন এই বলে, "পৃথিবীর কত দুর্বল, কত পতিত, কত অপরাধী, পৃথিবীর কত বলিষ্ঠ হৃদয় সাধুর চেয়ে মহৎ এবং কুলীন বংশোদ্ভব তা চিরজীবনের হিসাবে ক্রমশ ব্যক্ত হবে।" সবিনয়ে জানাই যে পেশাগত কারণে জেনেটিক্স নিয়ে গবেষণা করলেও জেনেটিসিস্ট হওয়ার বদলে হিউম্যানিস্ট হতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম।

ডঃ শম্ভুলাল বসাক
কলকাতা-৬৭।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে, "দেশ" পত্রিকায়, শ্রী পার্থ বসু তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী নিয়ে লেখা প্রবন্ধে, তিনি নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে, আমাকে এক ঘোরতর মানসিক অশান্তির মধ্যে ফেলেছেন। তারপর থেকে, 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদে, যতগুলি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে তাতে, লেখকেরা আমার নাম উল্লেখ করাতে আমি খুবই অস্বস্তি বোধ করছি। এ বিষয়ে আমার দিক থেকে, কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করে এই চিঠিটি পাঠাতে বাধ্য হলাম। এটি যাতে

প্রকাশিত হয়, এই আমার অনুরোধ। আমি, রবীন্দ্রসঙ্গীত ধারার একমাত্র বর্তমান ধারক, এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশুদ্ধভাবে গাইবার কে উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত, এসব নিয়ে আমি কোন দিনই কোন কথা বলিনি এবং কখনও ভাবিওনি। এ গানের বিশুদ্ধ গায়কী বা ভিন্ন গায়কী নিয়ে অনেক দিন থেকেই, দলগতভাবে বাদ প্রতিবাদ, পত্রপত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশিত হতে দেখেছি। তখনও তার সঙ্গে আমি নিজেকে জড়াতে দিইনি, উভয় দল থেকে অনুরোধ আসা সত্ত্বেও। আমি এবিষয়ে সম্পূর্ণভাবে গুরুদেবের চিন্তাভাবনার অন্ধ অনুগামী। তিনি যে, কী ভাবে, নানা প্রকৃতির ও নানা ভাষাভাষী গায়কদের, তাঁর গান গাইতে উৎসাহিত করতেন, আমার শান্তিনিকেতনের প্রায় ২৬ বছরের তাঁর সঙ্গীত জীবনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্যে, ভাল করে তা বুঝেছি ও জেনেছি। আমার "রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা" গ্রন্থের "রবীন্দ্রসঙ্গীত সমীক্ষা" পরিচ্ছেদে সবিস্তারে, নানা প্রামাণিক তথ্যের দ্বারা বোঝাতে চেয়েছি যে, তিনি এবিষয়ে কতখানি উদার ছিলেন। সেই অংশটুকু পাঠ করলে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী নিয়ে যে আলোড়ন আজ উঠেছে, তা কখনই উঠতে পারত না।

একজন পত্র লেখক জানিয়েছেন, আমি নাকি কেবল "নাচের জগতের লোক"। এর থেকে বোঝা গেল তিনি আমার সঠিক পরিচয় সম্পর্কে কোন খবরই রাখেন না। অথচ অন্য কতরকমের খবরই না তাঁর পত্রে তিনি দিয়ে গেছেন। আমি শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য ৪ বছর বয়সে ভর্তি হয়ে, গুরুদেবের গান ও নাটকের অভিনয়ের পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলাম। সে যোগ, আমার অক্ষুণ্ণ ছিল, কৈশোর ও যৌবন পর্যন্ত, একটানা ২৬ বৎসর। অর্থাৎ গুরুদেবের তিরোধানের পূর্ব পর্যন্ত। নাচের সঙ্গে আমি যুক্ত হই আমার প্রথম যৌবনে। একাধারে, তাঁর গান, নাটকের অভিনয় ও নাচ, এই তিন দিকেই, তাঁর প্রেরণায় ও আশীর্বাদে কিভাবে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি, সে কথা বিস্তারিত তথ্যসহ আমার কয়েকটি গ্রন্থে তা বলেছি। গানের ক্ষেত্রে, তিনি তাঁর তিরোধানের ৬ মাস পূর্বে লেখা একটি চিঠিতে, আমাকে জানিয়েছিলেন "আমার গানের সঞ্চয় তোর কাছে আছে—বিশুদ্ধভাবে সে গানের প্রচার করা তোর কর্তব্য হবে। আমি তোর পিতার পিতৃতুল্য।" এই প্রকার আশীর্বাদ ও স্নেহবাক্য, পূর্বে তিনি, একমাত্র দিনেন্দ্রনাথ ছাড়া শান্তিনিকেতনের জীবনে আর কারুর প্রতি, লিখিতভাবে প্রকাশ করে যাননি। আমাকে লিখিত এই চিঠিটার দ্বারা কি প্রমাণিত হচ্ছে না যে, গুরুদেবের গানের জগতে, স্থান পাবার যোগ্যতা আমি কতখানি অর্জন করেছিলাম, আমি কেবল তাঁর দ্বারা প্রবর্তিত নাচেরই লোক নই! গুরুদেবের এই স্নেহবাক্যই কি আজও আমাকে, আমার এই ৭৭ বছর বয়সে, দেশবাসীর কাছে, তাঁর গান শোনাবার শক্তি যোগাচ্ছে না?

আমি আবার বলছি, রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রকৃত গায়কী কী, বা তার প্রকৃত গায়ক বা গায়িকা কারা, তা নিয়ে বিচারের পথে আমি কোন দিনই পা বাড়াইনি, পা বাড়াবোও না। এ পথে আমি সম্পূর্ণ ভাবে গুরুদেবের মত ও পথের অনুগামী। গায়কীর তর্ক বিতর্কে ভবিষ্যতে আমাকে যেন জড়ানো না হয়, উভয়দলের কাছে এই আমার বিনীত অনুরোধ। গুরুদেবের স্নেহধন্য আমি। তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে, আমি একলা তাঁর গানের আনন্দে মেতে আছি। এবং সেভাবেই আমার বাকী জীবনটি আমি যাতে কাটিয়ে যেতে পারি, এই হল আমার জীবনের এখন একমাত্র লক্ষ্য।

শান্তিদেব ঘোষ

'জনমত'

৯ আগস্টের দেশে শ্রীআলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় হামিদ হারুনের যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন তা যুক্তির ধারে ও উক্তির সারবত্তায় চমক জাগায়। তাই শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ধন্যবাদার্হ। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে দ্বিমত থাকায় এই পত্র।

পাকিস্তানের নামী সংবাদপত্রগোষ্ঠীর ডনের হামিদ হারুন ঘুরিয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রকে কটাক্ষ করেছেন। কিন্তু বিশ্ব জানে আমাদের গণতন্ত্র উদার ও অবাধ। আমেরিকার ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি নিক্সন একবার বলেছিলেন যে, "ভারত হল বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।" পৃথিবীর কোন দেশে জনগণ এত ব্যাপকভাবে ও এত স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে না। তাই বহুদলীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থান ভারতে নীরব বিপ্লব হয় ১৯৭৭ সালে ও ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধীর প্রত্যাবর্তনে। আবার ভারতে কৃষকসমাজ অবহেলিত ও উপেক্ষিত—এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ, পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে ভারতের কৃষকদের অবস্থা তুলনামূলক বিচারে খারাপ নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের সুযোগ তারা পুরোদমে ভোগ করছে। কৃষক পরিবারের সন্তানেরা শিক্ষার আলো লাভ করছে—অনায়াসে। বিবেকানন্দ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিরা পল্লী জনতার শ্রীবৃদ্ধি ও প্রগতি কামনা করেছিলেন। আজ তা আর স্বপ্ন নয়। আমরা পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতার

বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিয়েছি। তাই, দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জাতি- ধর্ম- বর্ণ- নির্বিশেষে সকলেই যুক্ত। জিয়া প্রভাবাধীন পাকিস্তানে এসব আছে নাকি ?
আবার প্রশ্ন রাখি, হামিদ হারুন কেমন করে ভাবলেন যে, ভারতীয়রা পাকিস্তানের ভাঙন চায় ? অথচ পাকিস্তান রাষ্ট্রের সব চেয়ে বড় প্রবক্তা ভারত। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজী প্রায়ই বলতেন, "শক্তিশালী পাকিস্তান এই উপমহাদেশের পক্ষে ভাল।" "পঞ্চশীলের" নীতিতে ভারত এখনও অবিচল। অতএব, কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতায় হস্তক্ষেপ করার বিন্দুমাত্র বাসনা আমাদের নেই। আমাদের দেশের জনমত ও সংবিধান ও প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি সেই রকম চেষ্টার বিরোধী। নেহরুজীর কথায় ভারত "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের" আদর্শে চিরকাল অবিচল থাকবে। পাকিস্তানের জনগণের চোখে ধুলো দেওয়ার অপপ্রয়াস কবে বন্ধ হবে জানি না।
জনাব হারুন এক জায়গায় বলেছেন, "করাচির হিন্দুরা" ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠুক এটা চান। আমরা জানতাম যে পাকিস্তান সম্পূর্ণভাবে মুসলিম রাষ্ট্র। তাহলে সেখানেও হিন্দু আছে। হিন্দু বলতে কি করাচির হিন্দুকে বোঝায় ? আবার তারা দুটো দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত হোক চাইলেই কি তা হবে। তাহলে তো সংখ্যাগুরুদের মত বাতিল হয়ে যাবে অবশ্য জিয়া হিন্দুপ্রেমী হলে তা হতে পারে। কিন্তু বাহাই ও আহমেদিয়া সম্প্রদায় পাকিস্তানে নির্যাতিত কেন ? তাঁরা সংখ্যালঘু। তাঁরা নিরাপত্তাহীনতা বোধ করেন কেন ?
হামিদ হারুনের অভিযোগ ভারতীয়রা "কল্পনাশক্তি"র পরিচয় দিলে ভাল হবে। কিন্তু আমরা প্রাচীনকাল থেকেই ত্যাগ ও তিতিক্ষার জন্য সুপরিচিত। নইলে ভুট্টো হাজার বছর ধরে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করার খোয়াব দেখবেন কেন ? হামিদ হারুন আমাদের বিশ্বাস করাতে চান যে পাকিস্তানে মোল্লাদের ভূমিকা নাই বললেই চলে। মনে হয় মোল্লাদের পঙ্গু করে রাখা হয়েছে কিন্তু মৌলবাদ কি পাকিস্তান ছাড়া ? এই বিংশ শতাব্দীতে মেয়েদের পর্দা দিতে হয় কেন ? আবার মহিলারা ফুটবল খেললে তাদের চরিত্র নষ্ট হয়—এ কেমন কথা ? আবার জিয়ার কোন "গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতা নেই"—এই রকম উক্তি হামিদ হারুন করলেন কেন ? বাস্তবে, পাকিস্তানে জিয়ার সমর্থন পুষ্ট "সরকারি গোষ্ঠী" ছাড়া অন্য গোষ্ঠী কোথায় ? বিরোধী নেত্রী বেনজির ও তাঁর সঙ্গীরা গ্রেফতার হলেন কেন ?
হারুন সাহেবের স্মরণ থাকা উচিত যে সত্য "relative" হতে পারে না ; সত্য অভেদ্য ও অভিন্ন। জিয়া গণভোটে রিগিং করেছিলেন নইলে জনগণ তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করতেন বাধাহীনভাবে। শ্রীমতী কোরাজানকে জাল ভোটে মিঃ মার্কোস হারিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু জনগণ তা রুখে দেন। অতএব, জনগণই শেষ কথা বলে।
রাজীব গান্ধীর পাকিস্তান সফর বাতিল করাকে হামিদ হারুন "একটা মস্ত ভুল" বলে মনে করেন। কিন্তু অ্যারিস্টটল ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করতে বলেন। সুস্বাদু ফল ভক্ষণে তৃপ্তি বেশি। তাই আমাদের প্রধানমন্ত্রী ভুল কোথায় করলেন ? যদিও আমরা "মানুষের সঙ্গে আত্মীয় সম্বন্ধ-স্থাপনে" উৎসাহী। শ্রীআলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য আরও দুর্দান্ত রকমের প্রশ্ন করলে ভাল করতেন। যেমন, পাকিস্তান ধর্মনিরপেক্ষ হল না কেন ? পাকিস্তান নিজের পায়ে দাঁড়াতে আগ্রহী নয় কেন ? পাকিস্তানে হরদম সামরিক শাসন হচ্ছে কেন ? দেশের উন্নয়ন কার্যে পাকিস্তান-প্রেসের ভূমিকা কি ? ইত্যাদি।
হামিদ হারুন বলেছেন যে জিয়া রাজীবের চেয়ে 'চালাক'। একথা সত্য রাজীব খোলামেলা, সরল ও সাদাসিদে। তিনি সত্যকে সোজাসুজি বলতে ভালবাসেন। কিন্তু জিয়া প্যাঁচের রাজনীতি করেন যা সুবিধাবাদকে প্রশ্রয় দেয়। আবার জিয়া ক্ষমতায় থাকতে নিরীহ ও নির্দোষ মানুষকে উৎপীড়িত করতে দ্বিধাবোধ করেন না। তাই জিয়া অপাপবিদ্ধ নন। অতএব, জিয়াই তো "চালাক"। 'সত্য সেলুকস্ কি বিচিত্র এই দেশ'।

অরূপকুমার ঘোষ
পুরুলিয়া

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাব সময়

শ্রীরামকৃষ্ণের ফোটো প্রসঙ্গ রচনাটি অত্যন্ত তথ্যবহুল ও সুখপাঠ্য (দেশ : ১৬ আগস্ট) হয়েছে—এ জন্য লেখককে ধন্যবাদ। ঐ প্রবন্ধে একটি তথ্যগত গরমিল নজরে আসায় এই চিঠি। চতুর্থ ও পঞ্চম

ফোটো প্রসঙ্গে ঠাকুরের মৃত্যু সময় সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দ ও ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের লেখা থেকে লেখক যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন (পৃঃ ৯১) তাতেই ঠাকুরের মৃত্যু সময়ের এই গরমিল রয়েছে। স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন—"...বেলা দশ ঘটিকার সময় ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার আসিয়া নাড়ী দেখিয়া বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন যে, আর মালিশ করিয়া কোন ফল হইবে না, অর্ধ ঘন্টা পূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে।" পক্ষান্তরে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন, "...Monday, August 16, 1886...to Paramhansa whom I found dead—he died last night at 1 a.m." স্বামী অভেদানন্দের লেখা যদি সঠিক হয়, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাব সময় হবে ১৮৮৬ সালের ১৬ আগস্ট সকাল সাড়ে ন'টা (সকাল দশটার অর্ধঘন্টা পূর্বে)। আর ডাঃ সরকারের ডায়েরীকে প্রামাণ্য ধরলে ঠাকুরের তিরোভাব সময় হবে ১৮৮৬ সালের ১৬ আগস্ট ভোর রাত্র ১ ঘটিকা। অভেদানন্দ যেহেতু ডাঃ সরকারের কথাই উদ্ধৃত করেছেন সেহেতু গরমিলটা ঘটেছে ডাঃ সরকারেরই কথিত ও লিখিত তথ্যের মধ্যে। ইংরেজি মত অনুযায়ী রাত ১টা ও সকাল সাড়ে ন'টার মধ্যে সাড়ে আট ঘন্টা সময়ের তফাত হলেও তারিখটা ১৬ আগস্টই থাকছে। কিন্তু দেশীয় মতে (বা বাংলা মতে) সূর্যোদয়ের সঙ্গে তারিখ বদলে যায়। তাই রাত ১টা তিরোভাব সময় ধরলে তারিখটি হয় ২৯ শ্রাবণ, ১২৯৩। আর পরদিন সকাল সাড়ে ন'টা ধরলে হয় ৩০ শ্রাবণ, ১২৯৩। শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোভাবের কোন্ সময়টি প্রামাণ্য—এ নিয়ে সংশয় রয়েই গেল। এ বিষয়ে কেউ আলোকপাত করলে বাধিত হব।

নন্দদুলাল রায়চৌধুরী,
বিধান পল্লী, খড়্গপুর-১

শ্রীরামকৃষ্ণের ফোটো প্রসঙ্গে

১৬ আগস্ট 'দেশ'-এ শ্রীপীযূষকান্তি রায়ের 'শ্রীরামকৃষ্ণের ফোটো প্রসঙ্গ' প্রবন্ধটি পড়লাম। শ্রীরায় লিখেছেন "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তৃতীয় ফোটোটি তোলা হয়েছিল ১৮৮৩ সালের অক্টোবর মাসে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীরাধাকান্তের (বিষ্ণু ঘর) মন্দিরের রকে।" পরের পরিচ্ছেদে লিখেছেন "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চতুর্থ ও পঞ্চম ফোটো তাঁর মহাসমাধির পরে সোমবার ১৬ আগস্ট, ১৮৮৩ সালে বিকেল পাঁচটা নাগাদ কলকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুর গোপাল ঘোষের সুপ্রসর বাগানবাড়িতে [৯০, কাশীপুর রোডে—বর্তমানে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের একটি কেন্দ্র] তোলা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চতুর্থ এবং পঞ্চম ফোটো তাঁর ঃহাসমাধির পরে ১৬ আগস্ট, ১৮৮৩ সালে তোলার পর তৃতীয় ফোটো অক্টোবর, ১৮৮৩ সালে কি করে তোলা সম্ভব হয়?

অমূল্যরতন সরকার
সিংহভূম, বিহার

মডেল স্কুল

৩০ আগস্ট ১৯৮৬ 'দেশ'-এ আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়োপযোগী 'মডেল স্কুল, প্লেটো ও আমরা' লেখাটির জন্য ধন্যবাদ। নিবন্ধটি নিশ্চয় মনোগ্রাহী কিন্তু আরো একটু তথ্যভিত্তিক আলোচনা হলে ভাল হত।

সরকারী দলিল বলছে গ্রামে সাক্ষর মানুষ শতকরা ১৮ জন আর ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়তে আসে এই সাক্ষর শ্রেণীর শতকরা ৩৭ জন। এই পরিসংখ্যান থেকে বেরিয়ে আসে যে গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শতকরা মাত্র ৭ জন মডেল স্কুলে ভর্তি হবার জন্য আবেদন করার অধিকার অর্জন করছে। অর্থাৎ এক বিরাট সংখ্যক (শতকরা ৯৩ জন) গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের মডেল স্কুলে আবেদন করার ব্যবস্থাই করা যাচ্ছে না তাদের দারিদ্র্যের জন্য। সুতরাং মডেল স্কুল প্রকল্পে "দরিদ্র গ্রামবাসী ছাত্রছাত্রীদের অধিকতর সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ইচ্ছেই বারবার প্রকাশ পেয়েছে"—লেখকের এই সিদ্ধান্ত মডেল স্কুল স্থাপনের উদ্দেশ্যটিকে কি সত্যই সমর্থন করছে? আর মডেল স্কুল রূপায়ণ ও বাস্তবায়ণের সময় কি হবে সে তো লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন "সম্পন্ন নাগরিকরা বেশী সুবিধা পাবেন, এ তো জানা কথা।" আবার গ্রামের শতকরা ৯৭ জনের (গ্রাম-শহর মিলিয়ে হিসেবটা প্রায় শতকরা ৭৭) শ্রেষ্ঠত্বের উপাদান (excellence) আছে কিনা জানার কোন ব্যবস্থাই না করে "শ্রেষ্ঠত্বের উপাদান নিশ্চিত করা" নিশ্চয় বিজ্ঞানসম্মত নয়। এই সম্বন্ধে লেখকের ঋজু এবং স্পষ্ট বক্তব্য একান্তভাবেই প্রত্যাশিত ছিল।

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে মডেল স্কুল একটি দিক, আরও অনেক দিকের মধ্যে আছে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, বৃত্তিশিক্ষা ইত্যাদি। লেখকের কথায় "মডেল স্কুল তৈরীর প্রয়োজনের চেয়ে এই সবের প্রয়োজনকে কিছুমাত্র খাটো করে দেখা হয়নি।" বিনয়ের সঙ্গে জানাই ঘটনা কিন্তু উল্টোটাই বলছে, কারণ—

(১) প্রাথমিক শিক্ষায় আগত শতকরা ৬৫ জনের অধিক শিশুকে গ্রাস করতে আসছে তাদের কাছে বকচ্ছপ নামক প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা, যা বর্তমানে প্রয়োগ করা হচ্ছে ক্ষীণতমভাবে বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পে এবং শতকরা ৫ জন প্রাথমিক স্তরের মূলত ছাত্রীদের উপর যারা মা-বাবাকে সাহায্য ও গৃহের কাজের জন্য স্কুল চলাকালীন সময় স্কুলে উপস্থিত থাকতে পারে না।

(২) মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা তুলে দেবার মাধ্যমে এই শিক্ষান্তরগুলির সম্বন্ধে এক ধরনের অবজ্ঞা ও অনাস্থা প্রকাশ পাবে।

(৩) উচ্চশিক্ষার সুযোগ আর বৃদ্ধি না করতে সুস্পষ্টভাবে বলা (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার মত বয়সের ছেলেমেয়েদের মাত্র শতকরা ৪·৮ জন আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে। অথচ অন্যান্য অনুন্নত দেশেও পড়ে শতকরা ২৫ জনের বেশি)।

(৪) কলেজে নিজ নিজ পদ্ধতিতে স্বাধীনভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করা ও সার্টিফিকেট প্রদান মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ কমানো।

(৫) বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করে মাত্র শতকরা ২·৭ জন। সপ্তম যোজনায় এই প্রকল্পে বিশেষজ্ঞরা তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয়

করার সুপারিশ করেছেন, কিন্তু বরাদ্দ হয়েছে মাত্র কয়েক শত কোটি টাকা।
(৬) চাকুরি থেকে ডিগ্রিকে বিচ্ছিন্নকরণের অবাস্তব পরিকল্পনা ইত্যাদি।
এই সব চিন্তা করেই হয়তো লেখক বলেছেন, "টাকা বাঁটোয়ারা করার সময় কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশ্চয় কোনো একটি বিষয়ের চেয়ে অন্য বিষয়কে বেশী প্রাধান্য দিতে হবে এবং এই ভাবেই অগ্রাধিকার তালিকার মধ্যেও কোনও কোনও বিষয় অন্য কোন বিষয়ের চেয়ে বেশী মনোযোগ পেয়ে যাবে।"
উপরে উল্লিখিত আমার এই সামান্য পরিপূরক তথ্য সূত্রগুলি লেখকের এই বক্তব্যের যাথার্থই আরও বেশী করে প্রমাণ করছে।

মৃণালকান্তি চক্রবর্তী
চন্দননগর

কংসের কারাগার

৩০ আগস্টের দেশ পত্রিকায় রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কংসের কারাগার যে কোন প্রগতিশীল সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষকেই নাড়া দেয়। তাঁর লেখায় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অত্যাচারের উল্লেখ আছে।
কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার সোভিয়েত রাশিয়ার বিখ্যাত নেতা জোসেফ স্তালিন সৃষ্ট লেবার ক্যাম্পের ঘৃণাক্ষর উল্লেখও নেই।
সাইবেরিয়ার লেবার ক্যাম্প জোসেফ স্তালিনের তৈরি অত্যাচারের এক নরককুণ্ড। স্তালিনের বিরুদ্ধাচরণকারী যে কোন ব্যক্তিকেই যেতে হত সাইবেরিয়ায়।
সেখানকার অমানুষিক নিষ্ঠুরতার বর্ণনা যেকোন সুস্থ মানুষকেই অসুস্থ করে তোলে। আর সেখানকার এক বিখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা চেকার হাতে পড়লে যেকোন মানুষকেই অর্ধ উন্মাদ হয়ে বেরিয়ে আসতে হত।
চেকার জন্ম হয় ১৯১৮ সালের পর। স্তালিনের আশীর্বাদ ও মদতপুষ্ট চেকার কাণ্ডকারখানা ও স্তালিনের লেবার ক্যাম্পের কাজ কারবার দেখে লেনিন স্তালিনকে একটা চিঠি লিখে জানান, "আমরা জঙ্গলের রাজত্বে আছি।"
দু-একটা উদাহরণের মাধ্যমেই লেবার ক্যাম্পের অত্যাচারের মাত্রার পরিষ্কার ধারণা করা যায়।
১৯৫২ সালের ঘটনা। লুবিয়াঙ্কার জেলে একজন পঞ্চাশোর্ধ মহিলাকে জেলের ডাক্তার বলছে "তোর রক্তচাপ ২৪০/১২০। বেশ কম বুঝলি কুত্তির বাচ্চা বেশ কম। তোর রক্তচাপটা ৩৪০-এ তুলে দেব। তখন তুই শরীরের সমস্ত জামাকাপড় খুলে হাত পা ছুঁড়তে থাকবি। কি মজার ব্যাপার হবে।" সেই মহিলাকে মাসের পর মাস দুচোখের পাতা এক করতে দেওয়া হয়নি। চোখ বন্ধ করলেই তাঁকে রাইফেলের বেয়নেটের খোঁচা খেতে হয়েছে।
১৯২৬ সালে লুবিয়াঙ্কার বন্ধ কুঠুরিগুলিতে বন্দীদের ভরে পাইপ দিয়ে প্রথমে বরফের মত ঠাণ্ডা বাতাস ঢোকানো হত তারপরই সেই কুঠুরিগুলিতে ঢোকান হত প্রচণ্ড গরম বাতাস। বন্দীদের লোমকূপ ফেটে রক্ত না বেরোন পর্যন্ত এই কাজ চালিয়ে যাওয়া হত। এছাড়া ছিল স্বীকারোক্তি আদায়ের অত্যাচার যা একমাত্র আদিম রিপুর তাড়নায়ই মানুষ করতে পারে। আরো যে ধরনের বীভৎস ও নারকীয় অত্যাচার লেবার ক্যাম্পে চালানো হতো তা লিখবার বা বলবার মত ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না। শ্রমিক কৃষকের রাষ্ট্রে শ্রমিক ও কৃষকরাই হত অত্যাচারিত, নিপীড়িত। মহিলারা ছিলেন অসহায়, লাঞ্ছিতা, অপমানিতা। যা দেখে স্বয়ং স্তালিনের স্ত্রী নাদিয়াও আর্তনাদ করে উঠেছিলেন।

পিনাকী ভট্টাচার্য
ডিব্রুগড়, আসাম

গ্রন্থলোক

শ্রী বন্দিরাম চক্রবর্তী 'গ্রন্থলোক' বিভাগে 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ' (প্রবোধচন্দ্র সেন) বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখেছেন: 'রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যথার্থই ভারতীয় অর্থে কবি। ক্ষুরের ধারার ন্যায় নিশ্চিত পথেই তার যাত্রা।'
এ কথাগুলো বলার সময় কঠোপনিষদের 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্ত্য কবয়ো বদন্তি' (১-৩-১৪)
এই মন্ত্রাংশটিই তাঁর মনে ছিল ধরে নেওয়া যায়। মন্ত্রটির 'নিশিতা' ('তীক্ষ্ণ' অর্থে) শব্দটি 'নিশ্চিত' হয়ে যাওয়ায় তার বক্তব্য এখানে কিছুটা অর্থহীন হয়ে পড়েছে মনে হয়।

বলা বাহুল্য উপনিষদকার অধ্যাত্মসাধনার পথ যে কত দুর্গম ('দুর্গং')এবং অতিক্রম করা যে কত কঠিন ('দুরত্যয়া') সে কথা বোঝাতেই সে পথকে ক্ষুরের ধারা (অগ্রভাগ)-এর ন্যায় তীক্ষ্ণ ('নিশিতা')-এই উপমাটি ব্যবহার করেছিলেন।

কল্যাণকুমার দত্ত
কল্যাণী,নদীয়া

'দিল্লী চলো'

৩০ আগস্ট '৮৬-র সংখ্যায় চিঠিপত্রের পৃষ্ঠায় দেখলাম শ্রীমিহির মুখোপাধ্যায় প্রশ্ন রেখেছেন—'দিল্লী চলো' ধ্বনির স্রষ্টা কে ? মহাত্মা গান্ধী, না নেতাজী সুভাষচন্দ্র ?

গান্ধীজী ও নেতাজীর প্রতি যথাবিহিত শ্রদ্ধা নিবেদনপূর্বক এই প্রসঙ্গে জানাই যে, ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের মহানায়ক তান্তিয়া তোপীই প্রথম 'দিল্লী চলো' এই রণহুঙ্কার তুলেছিলেন। ১৮৫৭ সালের ১০ই মে, ভারতীয় সৈনিকগণ কানপুর ও মীরাটের ইংরেজ রেসিডেন্সী ও সেনা ব্যারাক দখল করার পর তাঁরা 'দিল্লী চলো' এই রণহুঙ্কার দিতে দিতে দিল্লীর পথে অভিযান করেন এবং পরদিন দিল্লী দখল করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ঐ অধিকার স্থায়ী হয়নি। এই তথ্য জানা যায় স্বাতন্ত্র্যবীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর রচিত The first war of Indian Independence of 1857' গ্রন্থে। গ্রন্থখানি গ্রন্থ জগতে এক বিরল ঐতিহ্যের অধিকারী। কারণ বিশ্বে একমাত্র গ্রন্থ যা মুদ্রিত হওয়ার পূর্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মধ্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৯০৯ সালে গোপনে হল্যাণ্ডে ভারতীয় বিপ্লবীগণ উহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। এ বিষয়ে আরও একটু বলা দরকার। ১৯০৬ সালের মাঝামাঝি সাভারকর ব্যারিস্টারী পড়তে ইংলণ্ড যান। তখন ইংলণ্ডে প্রতি ১লা মে তারিখে 'Thanks giving day' অর্থাৎ ১৮৫৭'এর "সিপাই মিউটিনি" দমনের বিজয়োৎসব ইংরাজরা পালন করতো এবং নানাভাবে তান্তিয়া তোপী, নানাসাহেব, লছমীবাঈ প্রভৃতি দেশনায়কদের এবং ভারতীয়দের প্রতি কুৎসিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রদর্শন করতো। এতে সাভারকর ব্যথিত হন এবং তার প্রতিবাদে তিনি ইংলণ্ডের ভারতীয় ছাত্রদের সংগঠিত করে ১৯০৭ সালের ১০ই মে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের হীরক জয়ন্তী পালন করেন, যার জন্য সেদিন বহু ভারতীয় ছাত্রকেই নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল। সেদিনের সংকল্প নিয়ে সাভারকর ব্রিটিশ মিউজিয়ম, ইণ্ডিয়া হাউস, প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে সুরক্ষিত দলিল, চিঠিপত্র, থেকে প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ করে উল্লিখিত গ্রন্থটি রচনা করেন। এবং তিনিই প্রথম ঐতিহাসিক তথ্য, যুক্তির ভিত্তিতে প্রমাণ করেন যে, ১৮৫৭-এর যুদ্ধ 'সিপাই মিউটিনি' মাত্র নয়, তা ছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম এবং সর্বাত্মক স্বাধীনতার সংগ্রাম। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, উল্লিখিত গ্রন্থের অংশবিশেষ 'The volcauo' পুনর্মুদ্রিত করে আজাদ-হিন্দ বাহিনীর সৈনিকদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন এবং 'দিল্লী চলো' ধ্বনি, আজাদ হিন্দ বাহিনীর রণহুঙ্কার ঘোষণা করেন। সুতরাং 'দিল্লী চলো' রণধ্বনি সেই ১৮৫৭ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অবিচ্ছিন্ন পরম্পরা বহন করে এসেছে।

সমীর কুমার শী
কলকাতা-১০

অভিনয় ও প্রযোজনা

২৭ সেপ্টেম্বরের 'দেশ'এ নাট্য প্রযোজনা প্রসঙ্গে রমাপ্রসাদ বণিকের আলোচনাটি সুন্দর এবং সুখপাঠ্য। তাঁর নিবন্ধের দুটি বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই।

ব্যক্তিগত অভিনয়ের উৎকর্ষের প্রসঙ্গে তিনি শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলার চেষ্টা করেছেন যে, তাঁদের উত্তম অভিনয় দেখার জন্যই দর্শকরা সেই সব প্রযোজনা দেখতে যেতেন, দেখতে যান। এই সিদ্ধান্তটি সম্ভবত সর্বাংশে সত্য নয়। বহুরূপী পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছিল 'রক্তকরবী'-কে নিয়ে। অদ্যাবধি 'রক্তকরবী'-র মাপের কোন প্রযোজনা বহুরূপী ঘটাতে পারেনি বলেই আমার ধারণা। অথচ 'রক্তকরবী'-তে রাজার (শম্ভু মিত্র) মোহময় কণ্ঠস্বর শোনা গেছে, শারীরিক কোন অভিনয় দেখা যায়নি। 'রক্তকরবী'র কথা মনে এলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে তৃপ্তি মিত্রর অনবদ্য নন্দিনী। অমর গাঙ্গুলীর ভয়ংকর সর্দার আর শোভেন মজুমদারের সরল পাগল ভাই-এর কথা। ভেসে ওঠে খালেদ চৌধুরীর মুগ্ধকারী মঞ্চ। ভেসে ওঠে তাপস সেনের স্বপ্নময় আলোকসম্পাত। সর্বোপরি শম্ভু মিত্রর পরিচালনায় বহুরূপীর কিংবদন্তী প্রযোজনা। ভাল অভিনয়ের, ভাল মঞ্চ, ভাল শব্দ, ভাল আলো, ভাল পোশাক, ভাল পরিচালনা এবং ভাল প্রযোজনা। যাবতীয় ভালর এক চমৎকার সমাহার—কেবল ব্যক্তিগত অভিনয় নয়। একই কথা প্রযোজ্য উৎপল দত্ত সম্পর্কেও। 'অঙ্গার' 'কল্লোল' সেই সব স্বপ্নের প্রযোজনায় উৎপল দত্ত অভিনয় করেননি। করলেও ছোট ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এই সব নাটকের কথা ভাবলে কোন ব্যক্তিগত অভিনয়ের কথা মনে হয় না। মনের পর্দায় ছবি হয়ে ভাসে সামগ্রিক প্রযোজনা। অভিনেতা হিসেবে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় গোটা দেশের সম্পদ। কিন্তু প্রযোজক হিসেবে এঁদের স্থান নিশ্চিতভাবেই আন্তর্জাতিক মানের উজ্জ্বল আসনে। কেবল মাত্র একক অভিনয় যে কোন প্রযোজনাকে সফল করতে পারে না তার উজ্জ্বল জ্বলন্ত প্রমাণ রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত পরিচালিত 'মুদ্রারাক্ষস'। শম্ভু মিত্রর দুর্দান্ত অভিনয় সত্ত্বেও দুর্বল প্রযোজনার কারণে নাটকটি জমেনি।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই তা হল, বুকিং-এর প্রসঙ্গ। অ্যাকাডেমীতে কিছু গ্রুপ মৌরসী পাট্টা নিয়ে বসে আছেন। প্রতি রবিবার বহুরূপীর জন্য বরাদ্দ। কেন ? সরকারী হলের অবস্থাও তেমন সুবিধের নয়। শিশির মঞ্চে বুকিং পেতে হলে শাসক দলের সঙ্গে বা মঞ্চ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নাক শোঁকাশুঁকির ব্যাপার থাকতে হবে। ইউনিভার্সিটি ইনসটিটুট ত সব সময়েই বুকড। এখানে তারিখ পেতে হলে হলের কাছাকাছি একটি চায়ের দোকানে টুঁ মারতে হবে। কিছু টাকা ছাড়লে, হল মিলবে। তবে এ ব্যাপারটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আমাদের সমাজ সংসার সব কিছুই তো এই নিয়মেই এখন চলছে।

মিতালী সেনগুপ্ত
কলকাতা-৭০০০০৪৭

ভ্রম সংশোধন

দেশ পত্রিকার ২৫ অক্টোবর সংখ্যায় রাধাপ্রসাদ গুপ্তের রচনা 'মাছ আর বাঙালি'-র চিত্রপরিচিতিতে কিছু ভুল থেকে গিয়েছে। ২০ পৃষ্ঠার উপরে বাঁদিকের ছবি এবং নীচের ছবিটি বটতলার কাঠখোদাইয়ের প্রতিলিপি। ভ্রমবশত 'কালীঘাট পটচিত্র' মুদ্রিত হয়েছে। ২১ পৃষ্ঠায় 'মকরবাহিনী দেবী'র স্থলে 'চতুর্ভুজা দেবী' পড়তে হবে। এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

সম্পাদক

পাহাড়ী এলাকায় বিক্ষোভ ও আগামী নির্বাচন

বাতাসে একটা প্রশ্ন ভেসে বেড়াচ্ছে, আবার কি বঙ্গ ভঙ্গ হবে ? দ্বিখণ্ডিত বাংলার যে-অংশটির নাম পশ্চিমবঙ্গ, তার কি অঙ্গচ্ছেদ করতে হবে আর একবার ? অধুনা বাংলাদেশের অধিবাসীদের বলা হয় বাংলাদেশী, তা বলে পশ্চিমবাংলার বাকি বাঙালী জাতিকে কি ঠেলে ফেলে দেওয়া হবে সমুদ্রে ?

রাজনৈতিক নেতাদের স্তোকবাক্য বা আশ্বাসের সঙ্গে জনসাধারণের বিশ্বাস অনেক সময়েই মেলে না। দার্জিলিং-কালিম্পং-জলপাইগুড়ির নেপালীরা তথাকথিত "গোর্খাল্যান্ড" গঠনের যে দাবি ও উগ্র আন্দোলন শুরু করেছে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জল ঘোলা হয়েছে অনেক। প্রথম থেকেই এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রতি উপযুক্ত গুরুত্ব না দিয়ে কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করে শুরু করেছিল রাজনৈতিক সুযোগ নেবার খেলা। কালিম্পং-এ পুলিসের হঠকারী গুলি চালনা ও নিরীহ নেপালীদের প্রাণনাশের পর ঐ আন্দোলন চরম আকার ধারণ করেছে। এই সুযোগে পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকারকে প্যাঁচে ফেলা যাবে, এটাই যেন ছিল প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব। পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষ কিন্তু সামরিক রাজনীতির চেয়েও আর এক ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কর্ণাটকে এক সভায় রাজীব গান্ধীর উক্তি খানিকটা স্বস্তি এনেছে। পশ্চিমবাংলার কোন্দলকারী কংগ্রেসীদের কথায় কেউ এখন আর গুরুত্ব দেয় না কিন্তু এবারে তাদের বড়কর্তা ও প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, না, আর বঙ্গ বিভাগ হতে দেওয়া হবে না। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকেও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে পাহাড়ী এলাকার মানুষের আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের জন্য সংবিধান সংশোধনের কোনো অভিপ্রায়ও ভারত সরকারের নেই ! এরকম ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে অন্তত আরও দু'মাস আগে প্রত্যাশিত ছিল।

বিচ্ছিন্নতাবাদের জিগির তোলা আমাদের সংবিধানে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। 'খালিস্তান'-এর দাবিদাররা যেমন স্পষ্টতই দেশের শত্রু। "গোর্খাল্যান্ড" গঠনের যে দাবি, তাও বিচ্ছিন্নতাবাদেরই নামান্তর। এই আন্দোলনের নেপালী নেতাদের ভাব-ভঙ্গি একেবারেই ভারতীয় সুলভ নয়, যদিও অতি সাবধানে তাঁরা বলছেন যে তাঁদের স্বপ্ন-দেখা নতুন রাজ্যটি ভারতেরই অন্তর্গত হবে, শুধু বাঙালীরাই তাঁদের শত্রু, বাঙালীদের সঙ্গে পাহাড়ীদের সহাবস্থান আর কিছুতেই সম্ভব নয়। এই আন্দোলনের প্রবক্তারা ইতিহাস ঘেঁটে দেখাবার চেষ্টা করছেন যে, দার্জিলিং প্রভৃতি অঞ্চল কোনো এক সময় বাংলার অন্তর্গত ছিল না ইত্যাদি। মানুষ ইতিহাস নিয়ে বাঁচে না, বর্তমান নিয়ে বাঁচে। তাছাড়া, ইতিহাসের সীমানা কোথায় টানা হবে, তিন শো, না তিন হাজার বছর আগে ? ইতিহাস-টানা এই কুযুক্তিতে হিন্দুরা বলতে পারে যে সমস্ত মুসলমানদের পাঠিয়ে দেওয়া হোক আরবদেশে। এই একই কুযুক্তিতে উত্তর ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি ও দক্ষিণ ভারতীয়রা বলতে পারে, আর্যসভ্যতা-গর্বী উত্তর ভারতীয় সমস্ত হিন্দুদের ফেরত পাঠানো হোক মধ্যপ্রাচ্যে। এই ধরনের যুক্তিতেই হিটলার ইহুদী নিধন যজ্ঞ শুরু করেছিল।

পাহাড়ী এলাকার মানুষের সঙ্গে সমতলের বাঙালীদের এতকাল তো বিরোধ ঘটেনি। কয়েকজন মাত্র ক্ষমতালোভী নেতা বিভেদের বিষ ছড়িয়ে অল্পকালের মধ্যেই অনেকখানি সার্থক হয়ে উঠেছে। পাহাড় ও চা-বাগান অঞ্চলে প্রতিদিন চলছে খুনোখুনি। সমতলের বাঙালীরা সত্যি বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে তাদের প্রিয় দার্জিলিং-কালিম্পং আর কোনোদিনই দেখা হবে না !

পাহাড় অঞ্চলের মানুষ শিক্ষাদীক্ষায় ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেকখানি পিছিয়ে আছে ঠিকই। বিক্ষোভের কারণ আছে নিশ্চিত। পাহাড় ও সমতলের মানুষের এই অবস্থার বৈষম্য, যেমন গ্রামাঞ্চল ও শহরের মানুষের সুযোগ-সুবিধের বৈষম্য শুধু যে পশ্চিমবাংলাতেই রয়েছে তা তো নয়, ভারতের সর্বত্র, এমনকি পৃথিবীর সব দেশেই কিছু না কিছু রয়েছে। এই সব অবহেলিত অঞ্চলের উন্নতি ঘটাবার দায়িত্ব যে-কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের ওপরেই বর্তায়। আগামী নির্বাচনে বামফ্রন্ট বা কংগ্রেস, যে-দলই ক্ষমতায় আসুক, সেই দলকেই চেষ্টা করতে হবে, দার্জিলিং-কালিম্পং -জলপাইগুড়ি অঞ্চলের অবস্থার যথাসাধ্য উন্নতি সাধন করে সেখানকার মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনার। সুতরাং আগামী নির্বাচনের প্রচারে দু' পক্ষই এক যোগে যদি "গোর্খাল্যান্ড" -এর দাবি দৃঢ়ভাবে নস্যাৎ না করে, যদি এক দল আর এক দলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে রাজনৈতিক সুযোগ তোলার জন্য আন্দোলনটিকে উসকে রাখতে চায়, তবে তা হবে বাঙালীর আত্মধ্বংসেরই নামান্তর।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্ষিতিমোহন সেনকে লেখা : ১৯০৮-১৯৪০

॥ পত্র ১১ ॥

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

অজিত এখানে বেশ ভালই আছেন। শরীর ও মন উভয়তই আরাম পাইতেছেন।

ডাক্তার বসু দুই তিন দিন আমার সঙ্গে বোটে কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া বিশেষ উৎসাহ বোধ করিয়াছি। বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার মমত্ব অত্যন্ত গভীর।

মীরাকে অল্প কয়েকদিনের জন্য সংস্কৃত পড়াইয়া কোনো লাভ আছে কি? সে ত বেশিদূর অগ্রসর হইবার অবকাশ পাইবে না। এক্ষণে প্রধানত তাহার চিন্তার বিকাশই আমি কামনা করি। ব্যাকরণের মধ্যে তাহার শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া কোনো ফল হইবে না। তাহাকে এমন কোনো একটি বই যদি পড়াইয়া যান যাহাতে তাহার মনন শক্তির উপযুক্ত চর্চ্চা হয় তবেই আমি আনন্দিত হই। উচ্চ বিষয়ে মনকে নিবিষ্ট করিবার অভ্যাস যাহাতে হয় তাহাই মীরার পক্ষে আমি শ্রেয় বলিয়া জ্ঞান করি। কারণ, আর সমস্তই নিজের অনুরাগে মানুষ আয়ত্ত করিতে পারে কিন্তু মহৎ চিন্তায় চিত্ত নিবেশের অভ্যাসই মানুষের সাধনার সামগ্রী। এখন অল্প বয়সে এই সাধনায় যদি সে আপনাদের নিকট হইতে সাহায্য পায় তবে তাহার জীবন পথের দুর্লভ পাথেয় লাভ করিয়া সে কৃতার্থ হইবে। সে যে নানা বিদ্যায় বিদুষী হইয়া উঠিবে আমার সেরূপ আকাঙ্ক্ষা নহে—কিন্তু তাহার মন মহৎ ভাবের সহিত পরিচিত হইয়া সহজেই জীবনের ক্ষুদ্রতাজাল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে—তাহার রুচি পবিত্র হয়, লক্ষ্য মহৎ হয়, হৃদয় উদার হয় ইহাই আমি চাই। আমি তাহাকে বিশেষভাবে সাহিত্য পড়াই নাই—যতদিন আমি তাহাকে পড়াইয়াছি বড় বড় বিষয় তাহার মনের সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহার কতক সে বুঝিয়াছে কতক বুঝে নাই—তথাপি তাহাতে সে উপকার পাইয়াছে। আমার নিজের বিশ্বাস এই কঠোর পথ দিয়া শিক্ষা অগ্রসর হইলে তবেই মানুষ এক সময়ে সৌন্দর্য্য যথার্থভাবে ভোগ করিবার অধিকারী হয়।

অনঙ্গকে দুই একদিনের মধ্যেই পাঠাইয়া দিব। ৫০ টাকা পূর্ব্বেই পাঠাইয়াছি—বোধকরি এতদিনে পাইয়া থাকিবেন। ইতি ১২ই শ্রাবণ ১৩১৬ [২৮·৭·১৯০৯]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ মীরাকে যদি সংস্কৃত ভাষার ভিতর দিয়াই শিক্ষা দিতে চান তবে আমি বোধ করি তাহাকে গীতা ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ দিয়া গেলে তাহার উপকার হইতে পারিবে। মোহিতবাবুর স্ত্রীও তাহাতে যোগ দিতে পারেন।

॥ পত্র ১২ ॥

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

অনঙ্গ আমার পত্রবাহক হইয়া চলিয়াছে—তাহাকে যথোপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করিবেন। আপনাদের হাসপাতাললোকে অন্নদা রাজা তস্য মন্ত্রী অনঙ্গের অভ্যুদয় হউক। আমার বিশ্বাস এই যুবকটিকে বশ

করিয়া লইতে আপনার বিশেষ বিলম্ব হইবে না।
ইহার মাসিক দশ টাকা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। এ মাসে দিবার প্রয়োজন হইবে না—আগামী মাস হইতে দিলেই চলিবে। ইহাকে বিশেষভাবে আপনারই পারিষদ করিয়া লইবেন—সুতরাং ইহার বেতন আপনারই রাজকোষ হইতে দিলে ভাল হইবে। জিনিষপত্র কেনা হিসাব রাখা প্রভৃতি বাজে কাজে ইহাকে খাটাইতে পারিবেন—রাস্তা খনন বৃক্ষাদি রোপণ প্রভৃতি পূর্ত্তকার্য্যেও এ ব্যক্তি সাহায্য করিতে পারিবে—এখানে কৃষি বিভাগই ইহার অধীনে ছিল। গ্রামের বালকদিগকে যদি পড়াইতে দেন তবে সে কাজও ইহার অভ্যস্ত হইয়াছে। গ্রামের বালকদিগকে শিক্ষাদান সম্বন্ধে আমাদিগকে আরো কিছু উদ্যোগী হইতে হইবে।
আপনার খবর কি—অর্থাৎ আপনার বালক ও বালিকা বিভাগে কোনোপ্রকার বিঘ্ন আছে কিনা জানাইবেন। আপনার শরীর কিরূপ? আমাদের সেই ক্লাসটি কেমন চলিতেছে? যথানিয়মে বুধবার পালন করা হইতেছে কিনা? মেয়েদের পড়া ও কাজের কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে? নূতন ঘর কতদূর অগ্রসর হইল? শিশুবিভাগের কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে ইত্যাদি সংবাদ জানাইবেন—না যদি জানাইতে চান তাহাতেও আমার আপত্তি নাই—কারণ আপনার উপর যখন ভার আছে—তখন চিন্তাভার আমি নিজের উপর লইব না। অজিতের স্বাস্থ্য ক্রমশই উন্নতিলাভ করিতেছে—আহারে তাহার সঙ্কোচ বা অরুচি কিছুই দেখি না। ইতি ২১শে শ্রাবণ ১৩১৬ [৬·৮·১৯০৯]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিরের প্রত্যাশায় পথ চাহিয়া আছি— বিলম্ব ঘটাইবেন না।
অজিতের নিকট হইতে তত্ত্বভূষণের নূতন বেদান্ত সম্বন্ধীয় বইখানি চাহিয়াছিলাম তিনি আমাকে Aspects of the Vedanta নামক আমার পূর্ব্ব পঠিত বইখানি বৃথা পাঠাইয়া দিয়াছেন।
আপনারা সকলে আমার শারদ অবকাশের অভিবাদন গ্রহণ করিবেন।
ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ পত্র ১৩ ॥

ওঁ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—
আপনার পত্র পাইবার পূর্ব্বেই অজিতকে লইয়া চলিয়া আসিয়াছি। বোলপুরে যাহাতে সে সাবধানে থাকে এবং পথ্যপালন করিয়া চলে তাহাই ব্যবস্থা করিবেন। এখন তাহাকে কেমন দেখিতেছেন। যদি নিতান্তই বোলপুরের আশ্রমদেবতা তাহার প্রতি বিমুখ হন তবে তাহার জন্য কলিকাতায় কাজ জুটাইতে পারিব বলিয়া আশা হইতেছে। কতকটা ভূমিকা করিয়া রাখিয়াছি।
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রণীত ইংরাজি শিক্ষার ৩ খানি বই আপনার কাছে পাঠাই—যদি উপযুক্ত বোধ করেন তবে বিদ্যালয়ে ধরাইবেন। অজিত যেন এ বইয়ের প্রতি অবজ্ঞা না করেন বা মনে কোনো বিরুদ্ধতা না রাখেন। সুবিচার করিয়া যেটি ভাল বোধ করেন তাহাই করিবেন—সত্যেশ্বরকেও দেখাইবেন। হয়ত ইংরাজি সোপানের চেয়ে ইহা কাজের হইতে পারে।
বিদ্যালয়ের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় যে আবির্ভাব আছেন সর্ব্বদা তাঁহাকে চিত্তের মধ্যে অনুভব করিয়া যেন আমরা জাগ্রতভাবে কাজ করিয়া যাইতে পারি ইহাই আমি প্রার্থনা করি। ইতি ১লা ভাদ্র ১৩১৬ [১৭·৮·১৯০৯]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ পত্র ১৪ ॥

ওঁ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—
লালগোলার পত্র পাঠাই। যদি তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ না ঘটে তবে পত্রদ্বারা তাঁহাকে আমাদেব শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইবেন। যখন বোলপুর ছাড়িয়া আসিতেছিলাম তখন জানিতাম না কোথায় আসিতেছি। শারদলক্ষ্মী আমাকে ফাঁকি দিয়া এই নদীর নির্জ্জন তীরে টানিয়া আনিয়াছেন—আমাকে বঞ্চিত করেন নাই। যে গান লিখিয়াছি পাঠাইয়া দিই :—

গায়ে আমার পুলক লাগে,
চোখে ঘনায় ঘোর।
নিখিল আমার হৃদয় মাঝে
বেঁধেছে কোন্ ডোর।
আজিকে এই আকাশ তলে
জলেস্থলে ফুলে ফলে
কেমন করে, মনোহরণ,
ছড়ালে মন মোর!
কেমন খেলা হল আমার
আজি তোমার সনে—
পেয়েছি কি খুঁজে বেড়াই
ভেবে না পাই মনে।
আনন্দ আজ কিসের ছলে
কাঁদিতে চায় নয়ন জলে,
বিরহ আজ মধুর হয়ে
করেছে প্রাণ ভোর॥

কবিরের প্রত্যাশায় পথ চাহিয়া আছি—বিলম্ব ঘটাইবেন না।
অজিতের নিকট হইতে তত্ত্বভূষণের নূতন বেদান্ত সম্বন্ধীয় বইখানি চাহিয়াছিলাম তিনি আমাকে Aspects of the Vedanta নামক আমার পূর্ব্ব পঠিত বইখানি বৃথা পাঠাইয়া দিয়াছেন।
আপনারা সকলে আমার শারদ অবকাশের অভিবাদন গ্রহণ করিবেন।
[২০ আশ্বিন ১৩১৬। ১১·১০·১৯০৯]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ পত্র ১৫ ॥

ওঁ

বোলপুর

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় সমীপে
সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—
বর্ত্তমান ছুটির পর হইতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ছাত্র চালনা প্রভৃতি কার্য্যে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন আমি আবশ্যক বলিয়া জ্ঞান করিতেছি তাহা

আশ্রমের অধ্যাপক ও কর্মীমণ্ডলীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ : ১. নেপালচন্দ্র রায়, ২.নগেন্দ্রনাথ আইচ, ৩.তেজেশচন্দ্র সেন, ৪.অজিতকুমার চক্রবর্তী, ৫.ক্ষিতিমোহন সেন, ৬. কালিদাস বসু, ৭.কালীমোহন ঘোষ, ৮.শরৎকুমার রায়, ৯.বিধুশেখর শাস্ত্রী, ১০.জগদানন্দ রায়, ১১.সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, ১২.(?), ১৩.বিজয়কুমার সেন, ১৪.প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৫.দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৬.(?), ১৭.হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮.হীরালাল সেন, ১৯.নারায়ণ কাশীনাথ দেবল, ২০.বঙ্কিমচন্দ্র রায় ফটো : সু. মুখোপাধ্যায় (আনুমানিক ১৯১১)

আপনাদের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত করিলাম।
অহরহ অধ্যাপক ও ছাত্রদের একত্রবাস কল্যাণকর নহে বলিয়া আমার মনে হয় এই দুইপক্ষের কিঞ্চিৎ দূরত্ব অত্যাবশ্যক। পরস্পর অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি হইলে অধ্যাপকদের প্রভাব খর্ব্ব হইবার কথা।
দ্বিতীয়তঃ অধ্যাপকদের নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝে নানাকারণে যে সকল বিরোধ জাগিয়া উঠে, সান্নিধ্যবশতঃ ছাত্রদের নিকটে তাহা
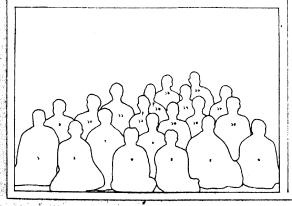
সুগোচর হইয়া উঠে। ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।
তৃতীয়তঃ সর্ব্বদা নিকটে থাকিলে পর্য্যবেক্ষণের শৈথিল্যই ঘটে; অসতর্কতা আসিয়া পড়ে, এবং আমাদের নিজের ব্যবহারে যদি কোনো জড়ত্ব থাকে তাহা ছাত্রদের মধ্যে সংক্রামিত হয়।
চতুর্থতঃ অহোরাত্র অধ্যাপকদের চোখের উপরে থাকিলে নিজেদের ব্যবহার সম্বন্ধে ছাত্রদের স্বাধীন দায়িত্ববোধ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।
এই সকল কারণে আমি ইচ্ছা করি দিনের বেলায় লেখাপড়া ও বিশ্রামের জন্য অধ্যাপকদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গৃহ নির্দিষ্ট করা হয়। ক্লাসের কর্ম্মের অবকাশে সেইখানে তাঁহারা সহযোগিদের সহিত একত্রে দিনযাপন করিবেন। অভিভাবক ও অতিথি যাঁহারা আসিবেন সেইখানেই তাঁহারা স্থানলাভ করিবেন।
তিনজন বিশেষ অধ্যাপকের উপর আপনি ভারার্পণ করিবেন তাঁহারা মাঝে মাঝে দেখিয়া আসিবেন, ছেলেরা সকলে স্ব স্ব স্থানে আছে এবং নিয়ম পালন করিতেছে। কোনো প্রকার ব্যবস্থার ত্রুটি দেখিলে প্রত্যেক কক্ষের নায়কছাত্রকে সেজন্য দায়ী করা হইবে।
ছাত্র পরিচালনা ব্যবস্থাকে দুই ভাগ করিতে হইবে। বড় ছেলেদের ও ছোট ছেলেদের অধিনায়ক স্বতন্ত্র হইবে।
ছাত্রদিগকে ধর্ম্মশিক্ষাদান সম্বন্ধে শান্তিনিকেতন ট্রাষ্ট-ডীডের বিধিলঙ্ঘন করা চলিবে না। কোনো অধ্যাপক ছাত্রদিগকে

বিশেষভাবে ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কোনো সাম্প্রদায়িক পন্থায় চালনা করিবার চেষ্টামাত্র করিবেন না। ধর্ম্মালোচনার ভার আপনি স্বয়ং লইবেন এবং যাঁহাকে উপযুক্ত মনে করেন, অর্থাৎ এই আশ্রমের অসাম্প্রদায়িক ঔপনিষদমতে যাঁহাকে আস্থাবান মনে করেন তাঁহার প্রতি ভারার্পণ করিবেন।

প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ে,মধ্যাহ্নে, সূর্যাস্তকালে ও শয়নের পূর্ব্বে উপনিষৎ ও বেদ হইতে বিশেষ নির্বাচিত চারিটি কবিতা স্বরসংযোগে সুকণ্ঠ বালকদের দ্বারা গান করাইতে হইবে—সেই সময়ে সমস্ত ছাত্র সেখানে একত্র মিলিত হইবে।

বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদ চৈতন্য নানক কবীর রামমোহন প্রভৃতি মহাপুরুষদের মৃত্যুদিনে উৎসব করিতে হইবে, সেই দিনটি তাঁহাদের জীবনী ও উপদেশ ব্যাখ্যা ও তাঁহাদের রচনা পাঠ বা গান করিবার দিন।

আশ্রমের পশুপক্ষী তরুলতার সহিত ছাত্রদের চিত্তের যোগসাধনের জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক।...বনের উৎসব, বর্ষায় সপ্তপর্ণ-কুসুমোদ্‌গমের উৎসব, শরতে শেফালিতলের উৎসব, বসন্তে শালমঞ্জরীর উৎসব উপযুক্ত বেশ, সঙ্গীত ও ভোজ্যের দ্বারা সমাধা করিতে হইবে।

বিদ্যালয় সন্নিহিত কাননভূমিকে কয়েকভাগে বিভক্ত করিয়া এক একদল ছাত্রের প্রতি তাহার পরিচর্য্যাভার অর্পণ করিতে হইবে। প্রতিদিন খেলায় যাইবার পূর্ব্বে তাহারা নিজ নিজ ভূখণ্ড পরিষ্কার করিয়া তবে খেলিতে যাইবে। ছাতিমতলের বেদীরক্ষার ভার বিশেষ কোনো অধ্যাপক ছাত্রসহ গ্রহণ করিলে ভাল হয়।

প্রত্যেক বালক একটি করিয়া বৃক্ষরোপণ করিবে এবং প্রত্যহ দুইবেলা তাহার তলা খুঁড়িয়া তাহাতে জলসেচ করিবে—গাছের গোড়ায় শুষ্কপত্রের সার দিয়া যাহাতে গাছগুলি বাড়িয়া ওঠে তাহার চেষ্টা করিবে। অধ্যাপকদের কেহ কেহ যদি যোগ দেন তবে ছাত্রেরা উৎসাহ বোধ করিবে।

আশ্রমের পাখী ও কাঠবিড়ালি প্রভৃতি জন্তুদিগকে বন্দী না করিয়া ছাত্রগণ আহারাদি দিয়া পোষ মানাইবার চেষ্টা করিবে। এই কার্য্যে যে ছেলে সর্ব্বাপেক্ষা কৃতকার্য্য হইবে তাহাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হইবে।

এই প্রকৃতি-পরিচর্য্যার কাজে চালনা করিবার ভার বিশেষ কোনো অধ্যাপকের প্রতি অর্পণ করা আবশ্যক হইবে। তিনি ছাত্রদিগকে এই সকল কাজে নিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে কাব্য ও কথা শুনাইয়া গান করাইয়া প্রকৃতির প্রতি প্রেম বালকদের চিত্তে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবেন।

আশ্রম ভৃত্যদিগকে সেবার জন্য বিশেষ কয়েকটি দিন নির্দ্দিষ্ট হইবে। সেইদিন তাহাদিগকে পরিবেষণ করিয়া আহার করানো, আমোদ দেওয়া পুরাণ-শোনানো প্রভৃতি করিতে হইবে। এককথায় আশ্রমের তরুলতা পশুপক্ষী ও ভৃত্যদের সহিত যাহাতে বালকদের হৃদয়ের যোগসাধন ঘটে তাহার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক হইবে। ইতি ১০ই কার্ত্তিক ১৩১৬ [৪·১১·১৯০৯]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র-পরিচিতি

॥ পত্র ১১ ॥

অজিত—অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮) অসুস্থ হয়ে কবির সঙ্গে শিলাইদহে ছিলেন।

মীরা—মীরা দেবী, রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা। মীরা দেবীর বিয়ের পর জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কৃষিবিদ্যা অর্জনের জন্য আমেরিকায় চলে যান। মীরার শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব ছিল ক্ষিতিমোহনের উপর।

অনঙ্গ—অনঙ্গমোহন চক্রবর্তীকে হাসপাতালের কাজের জন্য পাঠানো প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে।

মোহিতবাবুর স্ত্রী—মোহিতচন্দ্র সেনের স্ত্রী সুশীলা সেন। মোহিত সেনের মৃত্যুর পর সুশীলা সেন তাঁর দুই বালিকা কন্যা নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন। বোর্ডিং-এ বালিকাদের দেখাশুনা করতেন।

॥ পত্র ১২ ॥

অনঙ্গ—অনঙ্গমোহন চক্রবর্তী
অন্নদা—অন্নদাচরণ বর্ধন, হাসপাতালের কর্মী।
বুধবার পালন—সম্ভবত শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মমন্দিরে বুধবারের উপাসনার কথা বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে উপস্থিত থাকলে তিনিই উপাসনার কাজ পরিচালনা করতেন।

॥ পত্র ১৩ ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
(১৮৬৩-১৯১৩)—প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার। পাঠ্যাবস্থায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আর্য্যগাথা' ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সরকারী বৃত্তি নিয়ে কৃষি বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিলাত যান। বিভিন্ন সময়ে সরকারী উচ্চপদে চাকরী করেছেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণিমা সম্মেলন প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই সম্মেলন বাঙালির তীর্থক্ষেত্রে হয়ে ওঠে। প্রথম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থেকে স্বরচিত গান পরিবেশন করেন। জীবনের শেষ দিকে দীর্ঘ দিনের বন্ধু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটে। দ্বিজেন্দ্রলাল 'আনন্দবিদায়'-এ রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেছেন এইরূপ প্রচার হওয়ায় বিরোধ চরমে ওঠে। প্রহসন, নাটক, কাব্যনাট্য, ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক কবিতা রচনা ছাড়াও তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। পত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত ইংরাজী শিক্ষার বই-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথের 'ইংরাজি সোপান' ও প্যারীচরণ সরকারের 'ফার্স্ট বুক অব্ রিডিং' চালু ছিল। পত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের 'লেসনস ইন ইংলিশ' (৩ খণ্ড, ১৯০৭-১৯০৯) বই তিনটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

॥ পত্র ১৪ ॥

তত্ত্বভূষণ—সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, প্রখ্যাত দার্শনিক

॥ পত্র ১৫ ॥

শান্তিনিকেতন ট্রাস্টডীড—১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের ৮ মার্চ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনের গৃহ ও বিশ বিঘা জমি সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উৎসর্গ করেন। এবং ব্যয় নির্বাহের জন্য জমিদারি থেকে আনুমানিক ১৮,৪৫২ টাকা দান করেন। ট্রাস্টি হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুর, রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী। ট্রাস্টডীডে ধর্মশিক্ষাদান সম্পর্কে যা উল্লিখিত আছে নিম্নে তা উদ্ধৃত হল :

"উক্ত শান্তিনিকেতনে (অট্টালিকায়) অপর সাধারণের একজন অথবা অনেকে একত্র হইয়া নিরাকার এক-ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারিবেন। গৃহের অভ্যন্তরে উপাসনা করিতে হইলে ট্রস্টীগণের সম্মতি আবশ্যক হইবেক ; গৃহের বাহিরে ঐরূপ সম্মতির প্রয়োজন থাকিবেক না।

"নিরাকার উপাসনা ব্যতীত কোনো সম্প্রদায় বিশেষের অভীষ্ট দেবতা বা পশুপক্ষী মনুষ্যের মূর্তির বা চিত্রের বা কোনো চিহ্নের পূজা বা হোম যজ্ঞাদি ঐ শান্তিনিকেতনে হইবে না। ধর্মানুষ্ঠান বা খাদ্যের জন্য জীব হিংসা বা মাংস আনয়ন বা আমিষ ভোজন বা মদ্যপান ঐ স্থানে হইতে পারিবে না। কোনো ধর্ম বা মনুষ্যের উপাস্য দেবতার কোন প্রকার নিন্দা বা অবমাননা ঐস্থানে হইবে না। এরূপ উপদেশাদি হইবে যাহা বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা ঈশ্বরের পূজা বন্দনাদি ধ্যান ধারণার উপযোগী হয় এবং যদ্দ্বারা নীতিধর্ম, উপচিকীর্ষা এবং সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব বর্ধিত হয়। কোন প্রকার অপবিত্র আমোদ-প্রমোদ হইবে না। ধর্মভাব উদ্দীপনের জন্য ট্রস্টীগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবেন। এই মেলাতে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধুপুরুষেরা আসিয়া ধর্মবিচার ও ধর্মালাপ করিতে পারিবেন। এই মেলার উৎসবে কোন প্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হইবে না ও কুৎসিত আমোদ-উল্লাস হইতে পারিবে না ; মদ্যমাংস ব্যতীত এই মেলায় সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ-বিক্রয় হইতে পারিবে, যদি কালে এই মেলার দ্বারা কোনরূপ আয় হয়, তবে ট্রস্টীগণ ঐ আয়ের টাকা মেলার কিম্বা আশ্রমের উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন। এই ট্রস্টের উদ্দিষ্ট আশ্রম ধর্মের উন্নতির জন্য ট্রস্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন, অতিথি সৎকার ও তজ্জন্য আবশ্যক হইলে উপযুক্ত গৃহনির্মাণ ও স্থাবর অস্থাবর বস্তু ক্রয় করিয়া দিবেন এবং আশ্রমধর্মের উন্নতি বিধায়ক সকল প্রকার কর্ম করিতে পারিবেন।"

(শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী, ১ম খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)।

সংকলক : সুনীল দাস

ছবি : শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের সৌজন্যে

সাদা কালোর দ্বন্দ্ব

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাক্তার মানুওয়া মানফো হেনশো,
আহা ডাক্তার মানফো হেনশো!
নাইজিরিয়া শোকার্ত তোমার জন্য হেনশো,
ডাক্তার হেনশো!
হেনশো গেলেন জারিয়ায় এক কনফারেন্সে,
ফিরে এলেন লাগোসে।
দেখা করেছিলেন শ্রীযুক্ত এলুয়ার সঙ্গে,
কালাবারে ফিরে যাবার সময়
চাপলেন এক দুর্ভাগা প্লেনে।
সেটা যাচ্ছিল টিকোয়
ভায়া এনুগু আর কালাবার।
হেনশো নামছেন! তিনি নেমে আসছেন!
তিনি ছিলেন সেসব লোকের মধ্যে,
যারা বিমান দুর্ঘটনায় হত হয়েছিল।
তাঁর কথা আমার মনে আছে, সেই ওয়েরিতে,
হেনশো সেখানে ছিলেন ডাক্তার হিসাবেই,
চমৎকার মানুষ, সুন্দর মানুষ,
শান্তিপ্রিয় মানুষ, এক দুঃখী মানুষ,
আহা হেনশো একজন খেলোয়াড়ও বটে।
সারা নাইজিরিয়ায়
শ্রীযুক্ত মানফো হেনশো,
নাইজিরিয়ার সর্বত্রই সে।
মনে আছে উনিশ শো চুয়াল্লিশে,
তিনি আমাকে সেনাবাহিনীতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।
আহা, হেনশো, ডাক্তার হেনশো,
শান্তিতে থাকো হে তুমি!
হেনশো! তার বউ আর ছেলেমেয়ে
কালাবারে আছে,
তারা দীর্ঘদিন বাঁচুক
যেখানেই থাকুক না কেন।
যখনই একজন মানুষ মারা যায়, সে চিরকালের জন্য গেল
যখনই একজন মানুষ মারা যায়, সে চিরকালের জন্য গেল।
ডাক্তার হেনশো, চমৎকার মানুষ,
তিনি মৃত!
একটি সংবাদ এবং একটি গল্প এবং একটি ইতিহাস
সারা নাইজিরিয়ায়
যখনই একজন মানুষ মারা যায়, সে চিরকালের জন্য গেল।
যখনই একজন মানুষ মারা যায়, সে চিরকালের জন্য গেল।

বেলাফন্টের সাফল্যের পর, এই কবিতাটি (যা সুর সংযোজিত একটি গীত) আমাদের কাছে খুব একটা অপরিচিত নয়। এই আঙ্গিকটি 'ক্যালিপসো' হিসাবে পরিচিত, ক্যালিপসোর আঁতুড়ঘর ত্রিনিদাদ, সেখানেই এই আঙ্গিকের জন্ম। এর ছন্দ পরিকল্পনা কোনও ইংরেজি কবিতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। ক্যালিপসো গায়ক তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই গান বাঁধেন, কিন্তু এই অভিজ্ঞতার একটি সাধারণ ভূমি থাকে। শ্রোতারা একাত্ম হতে পারেন। উদ্ধৃত কবিতাটিতে নাইজিরিয়ান রাজনীতিবিদ মানুওয়া মানফো হেনশোর মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং তাঁর প্রশস্তির কাজটিও সারা হয়েছে সরল ছন্দে।

বিস্তৃত তুলো খেত যে দেখেছে সে জানে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের সুর ও ড্রামের প্রতিটি আঘাত কোথা থেকে উঠে আসে। সম্পূর্ণ শাদা বিপুল

...ল বর্বর শাসন দিয়ে যে বর্ণবিদ্বেষের শুরু হয়েছিল তার মড়কবীজ নিহিত ছিল ...

সেই আস্তরণের ফাঁকে ফাঁকে সোনার সুতো উড়ছে, যেন বা কালো পৃথিবীর উপর রূপালি মেঘ, শাদা পতাকা আন্দোলিত হচ্ছে ক্যারোলিনা থেকে টেক্সাস পর্যন্ত। কালো মানবিক সমুদ্র ধারণ করে আছে এই সৌন্দর্য, সে তার পিঠ বেঁকিয়েছে ধনুকের মতো।

ক্যারোলিনা, জর্জিয়া থেকে মেক্সিকো পর্যন্ত এখনও লালরঙের যেসব বিল্ডিং, আপাত নম্র ও অতিথিপরায়ণ মনে হয়, ব্যস্ত, কোলাহলপূর্ণ সেই বিল্ডিংগুলি যে এই মহ্থর, ঘুমন্ত দেশের অন্তর্গত, এই সত্যটি অবিশ্বাস্য মনে হয়। যেন বা তাদের জন্ম হয়েছে ড্রাগনের দাঁত থেকে। এভাবেই 'কটন কিংডম' এখনও বেঁচে আছে। এখানে ১৮৯০ সালে ১০ হাজার 'নিগ্রো' এবং মাত্র ২ হাজার শ্বেতাঙ্গ বসবাস করত। সমৃদ্ধ দেশ, অথচ জনসাধারণ ডুবে ছিল দারিদ্র্যে। কৃষ্ণাঙ্গ এলাকার পারিবারিক অর্থনীতিই দিল ঋণের অর্থনীতি। ১৮৬০ সালে ডাফার্টি কাউন্টিতে ছিল ৬ হাজার কৃষ্ণাঙ্গ গোলাম, যারা ২৫ লক্ষ ডলারের সমতুল্য। কারণ এই দাস ব্যবস্থার উপরই ওই পরিমাণ মূল্যের 'কটন ফার্ম'গুলি টিকে ছিল।

এখানেই ড্রাম বাজিয়ে গাওয়া হয়েছে 'ক্যালিপসো'। এক-একটি খুপরি ঘরের কেবিন, উদারনৈতিক আঙ্কল টমসের কেবিনের কথা পাঠক স্মরণ করতে পারেন। ভগ্ন, জীর্ণ। বাজে তক্তা দিয়ে বানানো কুঁড়েঘর বিশেষ। সিলিং, প্লাস্টার ইত্যাদির বালাই নেই। একমাত্র দরজা দিয়েই যেটুকু আলোবাতাস আসে। মান্ধাতার আমলের একটি ফায়ারপ্লেস আছে ঠিকই তবে তা শুধু ধোঁয়ার উৎস। এখানেই শেষ নয়, প্রতিটি কেবিন মানুষে ঠাসা এক নরককুণ্ড।

স্থূল, বর্বর দাসত্ব দিয়ে যে বর্ণবিদ্বেষ শুরু হয়েছিল তার মড়ক-বীজ আসলে নিহিত ছিল শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ উভয়ের মানসিকতাতেই। অর্থনীতি এখানে শেষ কথা নয়। শ্বেতাঙ্গ মজুরদের বাসস্থান ছিল অনেক উন্নত, তাদের জন্য বেছে রাখা হত কম পরিশ্রমের কাজ। অন্যদিকে কৃষ্ণাঙ্গরাও ভালো বাসস্থান, ভালো কাজের শর্ত দীর্ঘদিন দাবি করে নি। এক তো তারা জানত না উন্নত বাসস্থান কাকে বলে। দ্বিতীয়ত তারা মেনে নিয়েছিল—এক ধরনের দাস-মনোভাবও গড়ে উঠেছিল। বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গদের লড়াই যে কারণে দীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে দ্বিমুখী চেহারা নয়। একদিকে তার নিজের সঙ্গে লড়াই, অন্যদিকে শ্বেতাঙ্গ আইন কানুন ব্যবস্থা ও রীতিনীতির সঙ্গে তার লড়াই।

১৮৭০ সালের ট্যাক্সবুক ঘাঁটলে দেখা যায় ডাফার্টি কাউন্টিতে কোনও 'নিগ্রো'ই জমির মালিক ছিল না। যদি বা কারও থেকে থাকে তবে তা ছিল কোনও না কোনও শ্বেতাঙ্গের বেনামে।

মানবপ্রেম, অহিংসা এবং একটি ঘাতক বুলেট : আততায়ীর হাতে মার্টিন লুথার কিং

১৮৭৫ সালে প্রথম ১৫০ একর জমিতে কৃষ্ণাঙ্গদের মালিকানা দেওয়া হয়। যদিও শেষপর্যন্ত খুব কম 'নিগ্রো'ই কৃষি জমির মালিক হতে পেরেছিল, বিশেষত জর্জিয়ায়। দাসত্ব মুক্তির ঐতিহাসিক পর্যায়ে ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে কৃষ্ণাঙ্গরা অনেক বেশি মাত্রায় শহরমুখো হন। সম্পত্তিহীন, অনিশ্চিত আর্থিক জীবন আসলে ছিল এক ভিন্নতর দাসত্ব। বর্ণবিদ্বেষ এককথায় অতীতের দাসত্বেরই আপাত ফিকে রঙ। নিজের চামড়ার রঙের জন্য এ পৃথিবীতে একজন মানুষকে কুণ্ঠিত থাকতে হচ্ছে, অবমাননা সহ্য করতে হচ্ছে, সভ্যতার নিজস্ব গতিতে তা একসময় অযৌক্তিক হয়ে পড়তে বাধ্য। কিন্তু একটি জাতিকে, বিপুল এক জনগোষ্ঠীকে এজন্যে দীর্ঘ রক্তাক্ত লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে আজ-ও।

মোলায়েজের দেশে

নাদিনি গর্ডিমার 'দ্য লেট বুর্জোয়া ওয়ার্ল্ড' গ্রন্থে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে একটি মারাত্মক কথা বলার চেষ্টা করেছেন, তিনি না বললেও (দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনাবলী ও সামাজিক ব্যবস্থায় মূর্ত হয়ে ছিল) যে কথাটির বাস্তব অস্তিত্ব ছিল। 'শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকার অ-মানবীকরণ ঘটে

▼ স্বতঃস্ফূর্ত স্বচ্ছ আনন্দের কোনো রঙ নেই, বিভেদও নেই

যখনই কোনো প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সরব হয়ে উঠেছে, বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে, নিপীড়নের বিরুদ্ধে—শাসক শ্রেণীর অস্ত্র এগিয়ে এসেছে তার কণ্ঠ রোধ করতে

চলেছে। মানুষ যেভাবে বাঁচে, অনুভব করে বেঁচে থাকা, দক্ষিণ আফ্রিকা সে ব্যাপারে ভীত। সে ভয় পায় মানুষের মত ভাবতে, অনুভব করতে এবং বেঁচে থাকতে। কারণ এখানে বেঁচে থাকার এমন কিছু নিয়ম সে তৈরি করেছে যা অমানবিক। এবং এই নিয়মসমূহের সে দাস হয়ে পড়েছে। নিয়মের পুজো করে চলেছে। এই নিয়ম একদিন তার অস্তিত্ব মুছে দেবে, শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকা বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না।'

আফ্রিকা মহাদেশের অন্তিমে, একপাশে অতলান্তিক অন্যদিকে ভারত মহাসাগর, একেবারে তলায় দক্ষিণ মহাসাগর, আর এরই মাঝখানে দক্ষিণ আফ্রিকা : এক বধ্যভূমি। উপনিবেশের আমল থেকেই এখানে বর্ণবিদ্বেষ-বিষবৃক্ষের বীজ বপন করা হলেও, বর্ণভিত্তিক পৃথকীকরণের আইন ও চুক্তি কার্যকর হয় ১৯৪৮ থেকে। প্রিটোরিয়া প্রেসিডেন্ট পি· ডব্ল্যু বোথার নেতৃত্বাধীন সরকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের কাছে আজ জল্লাদস্বরূপ। যদিও রাষ্ট্রশক্তির সামরিক জালের দিকে থেকে কৃষ্ণাঙ্গরা আদৌ এমন অবস্থায় নেই যাতে শ্বেতাঙ্গদের আফ্রিকা মহাদেশের এই অঞ্চলটি থেকে নির্মূল করে ফেলতে পারে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ৫০ লক্ষ শ্বেতাঙ্গ, ৪৭,০০০ পুলিস ও ৮৫,০০০ সৈন্য একদিকে অন্যদিকে ২ কোটি ৩০ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ। বোথা সরকার দেশের ২৭৫টি জেলার মধ্যে ৩৬টি জেলায় দীর্ঘকাল যাবৎ জারি করে রেখেছে এক আপৎকালীন অবস্থা। এবং ওই জেলাগুলির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। গত দেড় বছরে কম করে ১ হাজার কৃষ্ণাঙ্গের উষ্ণ রক্তে সিক্ত করা হয়েছে তাদের মাতৃভূমি দক্ষিণ আফ্রিকাকে। বিনা বিচারে আটক, গ্রেফতার ইত্যাদির সংখ্যা এখন আর উল্লেখ করাও নিষ্প্রয়োজন, কারণ তা এক মহামারীর রূপ নিয়েছে।

ম্যান্ডেলা একজন খ্রিশ্চান জাতীয়তাবাদী, বোথা সরকার তার বিরুদ্ধে 'কমিউনিস্ট' ছাপ মেরেছে। শান্তি আন্দোলনের জন্য নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশপ ডেসমন্ড টুটু এখানকার অমানবিক পরিবেশ সহ্য করতে না পেরে কৃষ্ণাঙ্গ জনসাধারণের উদ্দেশে বলেছেন, 'আমি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে সম্মতি জানাচ্ছি।' ম্যাণ্ডেলা বলেছেন, যদি বর্ণবিদ্বেষ এবং কমিউনিজমের মধ্যে কোনও একটাকে বেছে নিতে হয়, তাহলে আমি দ্বিতীয়টিতে নাম লেখাব।

১৯৮৫-তে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষ ও সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে বিশেষজ্ঞদের একটি দলকে কমনওয়েলথ থেকে পাঠান হয়েছিল। এ-বছর তথ্য, মতামত ও বিশ্লেষণ সহ দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে তাঁরা একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সাম্প্রতিক অবস্থা, তার জটিলতা ইত্যাদি রিপোর্টটিতে প্রতিটি খুঁটিনাটিসহ উপস্থিত।

"দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শহরগুলিতে জীবনযাত্রার যে মান লক্ষ্য করা যায় তা পৃথিবীর সর্বোত্তম মানের সমতুল্য। অন্যদিকে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য নির্দিষ্ট শহরাঞ্চলগুলির জীবনযাত্রার মানের প্রসঙ্গটি এককথায় অবর্ণনীয়। কারণ, তাকে 'জীবনযাত্রার মান' এই স্কেলটিতেই ধরা যায় কি-না সন্দেহ।"

একেবারে শুরুর পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদ এই। কিন্তু এ কিছুই নয়, আরও আছে। কেপটাউনের শহরতলির 'ক্রশরোডস' বর্ণবিদ্বেষের একটি প্রতীক বলা যেতে পারে। 'হোমল্যান্ডস' নীতি অস্বীকার করে এবং কৃষ্ণাঙ্গদের জোর করে তাদের জন্য নির্দিষ্ট 'গ্রুপ এরিয়া'-তে তুলে নিয়ে যাওয়ায় বাধা দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন, স্বাধীনতারই এক প্রতীক হিসাবে যেন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ ঝুপড়িবাসী হয়েছেন। শহরাঞ্চলে কৃষ্ণাঙ্গ আবাসন দেখা একটি অভিজ্ঞতাবিশেষ : জোহানসবার্গের সোয়েতোয় ২০ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ বাস করছেন এমন জায়গায় যেখানে স্বাস্থ্যকরভাবে

বড়জোর ৮০০,০০০ মানুষ থাকতে পারেন।

পৃথকীকরণের নকশাটি কেপটাউনে আরও বেশি বেদনাদায়ক, রুক্ষ। কারু-তে প্রতিটি হাসি-খুশি শ্বেতাঙ্গ ফার্মিং সেন্টারের লাগোয়া দেখা যাবে কৃষ্ণাঙ্গ উপনগরী এবং শ্বেতাঙ্গ শহরাঞ্চল। ঝকঝকে তকতকে শ্বেতাঙ্গ শহর ক্রাডকে সুইমিংপুল আছে, প্রতিবেশী কৃষ্ণাঙ্গ শহরাঞ্চল লিনগেলিহেলে আছে একটা এঁদো ডোবা। মিডল্যান্ড, ইস্টার্নকেপ, পোর্ট এলিজাবেথের শহরতলি সর্বত্র এই এক চিত্র।

১৯১৩ এবং ১৯৩৬ সালের আইন অনুসারে 'রিজার্ভস' বা সংরক্ষিত এলাকায় কৃষ্ণাঙ্গদের সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এর বাইরে কোথাও জমি কিনতে হলে তাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হত। বর্ণবিদ্বেষের স্থপতিরা গোটা দেশের ৮৬·৩ শতাংশ জমি রেখেছিল শ্বেতাঙ্গদের জন্য। বাকি ১৩·৭ শতাংশ দক্ষিণ আফ্রিকার সন্তান কৃষ্ণাঙ্গদের ১০ স্বনির্ভর 'হোমল্যান্ডে' ভাগ করে দেওয়া হয়। এর ফলে জমির মালিকানা ও বসবাসের দিক থেকে মূলত কৃষ্ণাঙ্গদের একটি দেশ হয়ে পড়ে মূলত শ্বেতাঙ্গদের দেশ। যেন-বা এক শ্বেতসমুদ্রে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ও ভাসমান দ্বীপ এখন কৃষ্ণাঙ্গরা। আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ণবিদ্বেষ-কে মৃত ঘোষণা করার পরও ১৯৮৬ সালেও কৃষ্ণাঙ্গদের হোমল্যান্ডে বন্দী করার ঘৃণ্য প্রয়াস অব্যাহত। 'পাশ-আইন' বলে ছাড়পত্র ছাড়া কোনও কৃষ্ণাঙ্গ এখনও শহরে কাজের খোঁজে আসতে পারে না বা শহরে কর্মরত কৃষ্ণাঙ্গ মানুষটির কাছে যেতে পারে না তার পরিবারের লোকজন। শুধু যে এ ভাবেই পায়ে শিকল পড়ানো হয়েছে তাই নয়। সবচেয়ে খাটুনির এবং কম রোজগারের কাজেও তাদের বন্দী করে করে রাখা হয়েছে। ফলে শুধু রাজনৈতিকভাবে নয়, অর্থনৈতিকভাবেও কৃষ্ণাঙ্গরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক।

১৯৮৪ সালের হিসাব থেকে দেখা যায় মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ শ্বেতাঙ্গরা দেশের মোট ব্যক্তিগত উপার্জনের ৬০ শতাংশ পকেটস্থ করছে, যখন কৃষ্ণাঙ্গদের মোট উপার্জন ৩০ শতাংশ মাত্র। শ্বেতাঙ্গ শিশুদের লেখাপড়ার জন্য সরকার যে পরিমাণ অর্থ খরচ করছে তা কৃষ্ণাঙ্গ শিশুদের শিক্ষাখাতে ব্যয়িত অর্থের ৭ গুণ বেশি। এই সরকারের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্যই হল কৃষ্ণাঙ্গদের উচ্চশিক্ষিত না করা। এর কারণ, সীমিত সুযোগ সত্ত্বেও কৃষ্ণাঙ্গ সন্তানরা যত বেশি শিক্ষিত হচ্ছে বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে আন্দোলনও ততোই তীব্র হয়ে উঠছে।

এই শ্বেতাঙ্গ রাজের সূত্রপাত ১৯৪৮ সালে। যখন ৮০ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয় তাদের দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিকত্ব। তারা এই উল্টো কানুনের দেশে হয়ে পড়েন বিদেশী বহিরাগত। শহরাঞ্চলকে কৃষ্ণাঙ্গ-মুক্ত করার পরও শ্রমবাহিনী দরকার। পরিযায়ী কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমজীবীর জন্ম হল এই প্রয়োজন মেটাতে। যা কৃষ্ণাঙ্গ জীবনকে বঞ্চিত করল পারিবারিক সম্পর্ক, সুখ ও শান্তি থেকে।

বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিটি আন্দোলনের প্রতি

শেষ বিচারে, জাতি চেতনা বা শ্রেণী চেতনা কোনওটাই আফ্রো-আমেরিকানদের প্রকৃত সাহায্য করতে পারেনি। একমাত্র সংস্কৃতি-চেতনাই তার প্রগতির দরজা খুলে দিয়েছিল। এ জিনিসটা কাম্য ছিল এমন নয়। কিন্তু ঘটেছিল এরকমটাই।

বোঝা সরকার একটিই মাত্র উত্তর দিয়ে থাকে : জেল এবং গুলি। যার হাত থেকে শিশুদেরও মুক্তি নেই। কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ তার মৃত আত্মীয়-পরিজনের শব নিয়ে অন্ত্যেষ্টির শবযাত্রাও বের করতে পারে না আইনসম্মতভাবে। কেন না তাতে, সর্বদা জারি সভা-সমাবেশ বিরোধী আইন লঙ্ঘিত হবে। এই পীড়ন, অত্যাচার কৃষ্ণাঙ্গদের রক্তে স্বাধীনতার স্পৃহাকেই ক্রমাগত জাগিয়ে তুলছে। হয় তারা মৃতের প্রতি সম্মান দেখিয়ে ওই বেআইনি শবযাত্রাটি আন্তরিক ভাবে সম্পন্ন করবে, অথবা নিজেরাই মৃতের সঙ্গী হবে। কোনও তৃতীয় পথ নেই। দীর্ঘ ৫০০ বছরের দাসত্বের ইতিহাসের সমান্তরাল কৃষ্ণাঙ্গ স্বাধীনতার ইতিহাসেও তারই সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

কৃষ্ণাঙ্গ গিনিপিগ : আলোকপ্রাপ্তির যুগে

তাদের আদি ও প্রথম পরিচয় : ক্রীতদাস। জন্ম-চিহ্নের মতই এই পরিচয় বিজ্ঞাপিত হয়েছে, কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের তথাকথিত আফ্রিকা মহাদেশ আবিষ্কারের আগে, যে এরকম কোনও পরিচয়ের প্রশ্ন অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক ছিল, তা বিস্মরণের ঘন অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছিল। জাহাজের খোলে ঠেসে যে ক্রীতদাসদের আমেরিকায় পাঠানো হয়েছিল, তারা নিজেরা প্রথম যা হারিয়ে ফেলে, তা হল মাতৃভাষা। অবশ্য তাদের জীবনদর্শন, ধর্মীয় আচার-আচরণ, তাদের কবিতার আঙ্গিক, সংগীত ও নৃত্য, সমস্তই সযত্নে, গোপনে বহন করে চলেছিল কালো চামড়ার নিচে। নতুন দুনিয়ার পরিবেশকে, নিজেদের ধ্যানধারণা ও রীতিনীতির যে চিন্তার কাঠামোটি ছিল, সেইখানে ব্লটিং পেপারের মত শুষে নিতে পেরেছিল।

শ্বেতাঙ্গ আমেরিকা এ জিনিসটা লক্ষই করেনি। বরং ভেবেছিল, কালো পশুর এক বোঝা-বিশেষ এই কৃষ্ণাঙ্গরা। এদের কোনও অনুভূতি নেই। মানবতাবাদী, শ্বেতাঙ্গ 'অ্যাবলিশনিস্ট', যারা গোলামের মুক্তির জন্য কিছুটা লড়েও ছিলেন, তাঁদের কাছেও এই কৃষ্ণাঙ্গরা ছিল অসহায় প্রাণীবিশেষ। করুণার পাত্র। দাস-মালিক এবং যারা 'প্ল্যান্টার্স ইডিওলজি' তথা আখ-তামাকের খেতে

'বর্ণবিদ্বেষ নিপাত যাক'—দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতিবাদী মিছিল

কৃষ্ণাঙ্গদের জন্তুর মত খাটানো এবং অত্যাচার করায় বিশ্বাস করত, তাদের ধারণায় তো কৃষ্ণাঙ্গরা সৃষ্টই হয়েছিল এ কারণে। বিশেষ করে আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গরা হাজার অত্যাচারের পরও ভুলে যায়নি তাদের প্রাণের সুর ও জীবনের ছন্দ। তারা নাচত, গাইত। এই নাচ-গানের ব্যাপারটা শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের চোখে ছেলেমানুষি হিসাবে ধরা দিত। অর্থাৎ ওরা খুশি, ওরা আনন্দিত।

অ্যাবলিশনিস্ট এবং দাস-মনিবদের মধ্যে বিতর্ক স্থায়ী হয়েছিল বেশ কয়েকটি দশক জুড়ে। অভিজাত প্ল্যান্টার সোসাইটিতে নৃত্য-গীতেই মানুষ আনন্দ উপভোগ করে থকে, সুতরাং যখন অ্যাফ্রো-আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গরা নাচছে, গাইছে, তখন ধরেই নেওয়া যায় তারা খুব আনন্দে আছে। অন্য দিকে অ্যাবলিশনিস্টদের মধ্যবিত্ত সমাজ ফরাসী বিপ্লব নির্দেশিত স্বাধীনতার স্বপক্ষেই নিজেদের অবস্থান স্থির করেছিল। ফলে, তাদের ধারণায়, কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসরাও ব্যাকুলভাবে ওই স্বাধীনতারই প্রত্যাশী। তাদের গান সেই ব্যথা ও আর্তিরই এক বিষণ্ণ সুর মাত্র। নাচের প্রসঙ্গ উল্লেখই করা হল না। পরবর্তীকালের পিউরিটানরা অত্যন্ত ঔদার্যের সঙ্গে নাচের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করল।

ব্যথা এবং যন্ত্রণা নিশ্চিতই ছিল। ছিল তাদের প্রতিটি একক উষ্ণ নিশ্বাসে। মৃত্যু, মৃত্যু-যুগ এসে গিয়েছিল। মৃত্যু, নরক এবং দাসত্ব হয়ে উঠেছিল সমার্থক। এবং এই যন্ত্রণাবিদ্ধ সময়ের প্রতি তুলনায় ছিল স্মৃতি। পরিপূর্ণ জীবনের আশ্রয় তারা হারিয়েছে। সমাজ-গোষ্ঠীতে যা ছিল ওতপ্রোত, যেখানে জীবন বৃক্ষের শিকড় চলে গিয়েছিল দায়িত্ব পালনের লড়াই, আস্থা ও ভালোবাসায়। এসবই বন্দীজীবনে হয়ে ওঠে : স্বর্গ, জিওন, জেরুজালেম এবং স্বাধীনতা। পাপমুক্তির খ্রিষ্টীয় বোধ নয়, জীবনের সংলগ্ন উদ্যোগই তারা খুঁজছিল নাচে ও গানে।

'নিগ্রো রেনেসাঁ'র পথ খুলে যায় ডু বোয়া এবং বুকার তালিয়াফোরা ওয়াশিংটনের (১৮৫৮ ?—১৯১৫) মধ্যকার যুক্তিতর্কের পর। ১৮৯৫ সালে বুকার ওয়াশিংটন ঘোষণা করেন 'সামাজিক সমতার প্রশ্নে আন্দোলনের ব্যাপারটা আগাগোড়া ভুল....বিশুদ্ধ সামাজিক সমস্ত ব্যাপারেই আমরা হাতের আঙুলগুলির মত-ই আলাদা থাকতে পারি, কিন্তু পারস্পরিক প্রগতির সমস্ত ক্ষেত্রেই আবার হয়ে উঠতে পারি বজ্র মুষ্ঠি।' চালাক-চালাক এই মন্তব্যে ওয়াশিংটন উত্তরের শিল্পাঞ্চল এবং দক্ষিণের কৃষি অঞ্চল উভয়কেই সন্তুষ্ট করতে পেরেছিল।

শেষ বিচারে, জাতি চেতনা বা শ্রেণী চেতনা কোনওটাই অ্যাফ্রো-আমেরিকানদের প্রকৃত সাহায্য করতে পারেনি। একমাত্র 'সংস্কৃতি চেতনাই' তার প্রগতির দরজা খুলেদিয়েছিল। এ জিনিসটা কাম্য ছিল এমন নয়। কিন্তু ঘটেছিল এরকমটিই। একজন কৃষ্ণাঙ্গ যখন দরদ ও নৈপুণ্যের সঙ্গে তার ব্যাঞ্জো বাজাতে পেরেছে, নিজস্ব ধর্মীয় সংগীত গাইতে পেরেছে, বা সম্পূর্ণ নিজস্ব পদ্ধতিতে পদ্য লিখেছে—একমাত্র তখনই সে শ্রোতা পেয়েছে, পাঠক পেয়েছে। অভিজাতরা কাচপাত্র সাজিয়ে তাকে এমন কি ডিনারেও নেমন্তন্ন করেছে। এরকম একজন অভিজাত, ধরা যাক কার্ল ভান ভেখটেম। নিজের বিশ্বাস মুড়িয়ে নিতে হয়নি শুধুমাত্র এ ধরনের অভিজাতদের সম্মান পাওয়ার জন্যই। সংস্কৃতি এবং প্রতিভাই ছিল এক্ষেত্রে 'নিগ্রো'দের ছাড়পত্র।

মার্তিনিকের ডাক্তার এবং প্রাবন্ধিক আলজিরিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফ্রানৎজ ফ্যানন 'সংস্কৃতি'কে খুব একটা নরম সরম, পেলব ভাবে দেখতে চাননি। তাঁর কাছে সংস্কৃতি অনেকটাই সক্রিয়, সূক্ষ্ম, সামাজিক অংশগ্রহণ। ফ্যাননের মতে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি ঠিক তখন শেষ হয়, যেই মুহূর্তে শুরু হয়ে যায় স্বাধীনতার সত্যিকারের লড়াই। এবং মুক্তিই পারে অবাধ, স্বাধীন জাতীয় সংস্কৃতির জন্ম দিতে। ফ্যাননের কথা একটু বদলে নিলে কোনও ক্ষতির আশঙ্কা নেই, বর্ণমালার অস্তিত্ব যেদিন, যে মুহূর্তে সম্ভব হয়েছে, সংগ্রামের সাহিত্যও সেই মুহূর্তে জন্ম গ্রহণ করেছে বলা যায়।

কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের স্বাধীনতা, দাসত্বের মধ্যেও একটি দীপ শিখার মত সযত্নে লালিত স্বাধীনতাকে বোঝাতেই নিবন্ধটিতে এ পর্যন্ত সংস্কৃতির প্রসঙ্গ এসেছে। এবং সংস্কৃতি নিজে কেবলমাত্র সংগ্রামের অস্ত্র নয়, সে একবার ব্যবহারে নিঃশেষিত হয়ে যায় না এবং সংস্কৃতির যদি কোনও শেষ থেকে থাকে তবে তা সংস্কৃতিতেই। এসব কারণে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের নৃত্য-গীত-সাহিত্য শ্বেতাঙ্গদের চোখে কখনও লোক সংস্কৃতি, কখনও বা প্রতিভা অন্বেষণের উত্তেজনা যুগিয়ে থাকলেও মূল লড়াই ছিল প্রতিদিনের জীবনে। যা রুক্ষ একঘেয়ে, হতাশাব্যঞ্জক এবং রক্তাক্ত।

যুরোপের কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ যখন প্রতিরোধের ভূমিকা বেছে নিয়েছে, আফ্রিকা মহাদেশের কয়েকটি দেশেও তখন শিকল ভাঙার গান শোনা যাচ্ছে। তাঁদের দাবি, কাজের মত পরিবেশ, গায়ের রং কালো বলে গোলামের মত আচরণ করা চলবে না।

'আলোকপ্রাপ্তির যুগে' শ্বেতাঙ্গরা একটি বিষয় নিয়ে প্রায়শই গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করত : 'নিগ্রো' কি মানুষ, নাকি নয় ? দাস ব্যবসা তখন তুঙ্গে। আফ্রিকান দাসদের যে জিনিসটি খুবই প্রশংসিত হত, তা হল তাদের পেশীর শক্তি। কেউ কখনও তাদের বুদ্ধি নিয়ে ভাবেনি। বুদ্ধি চেতনা ইত্যাদি যেন কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য নয়। কিন্তু কি করে তাহলে অষ্টাদশ শতকে কৃষ্ণাঙ্গ

লেখকদের সন্ধান পাওয়া গেল? এর কারণ অষ্টাদশ শতকের মেজাজ। কারণ রুশো বলেছেন, সমস্ত মানুষই সমান। এবং প্রভাবশালী, ধনী শ্বেতাঙ্গদের অনেকেরই তখন আগ্রহ এবং কৌতূহল দেখা দিল রুশোর বচনটিকে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের উপর দিয়ে পরখ করে নেওয়ার। তাঁরা কতিপয় 'নিগ্রো'কে বেছেনিলেন। সে সময়ে সব থেকে সেরা যে শিক্ষার সুযোগ,তা তুলে দেওয়া হল এইসব 'গিনিপিগ'দের হাতে। ভাবখানা এইরকম, দেখা যাক এবার এরা কতদূর যেতে পারে!

এরকম একজন গিনিপিগ হলেন ফ্রান্সিস ইউলিয়ামস। আফ্রিকার স্বাধীন পিতামাতার সন্তান, ১৭০০ সালে ইনি জামাইকায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য ফ্রান্সিসকে নির্বাচন করা হল। ডিউক অফ মন্টেগুর আগ্রহেই তা ঘটে। উদ্দেশ্য ছিল, যথার্থ শিক্ষা ও চর্চার পর (স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম সমেত) একজন 'নিগ্রো' একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষের মতই সাহিত্যচর্চা করতে পারে কিনা তা পরখ করা।

উইলিয়ামস ইংরেজী স্কুলে পড়াশুনা করলেন, তারপর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করলেন। হলডেন তখন জামাইকার গভর্নর, উইলিয়াম সে সময় লাতিন বিভাগে যোগ দেন। শুধু উইলিয়ামসই নয় মন্টেগুর ডিউক আরেকটি শিশু প্রতিভার (কৃষ্ণাঙ্গ দাস) খোঁজ করেন ইগনাটিয়াস সাঙ্কোর মধ্যে।আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ আমেরিকায় আসার পথে দাস বহনকারী এক জাহাজে ১৭২৯ সালে সাঙ্কোর জন্ম। ডিউকের পরিবারে কুড়ি বছরেরও বেশি 'বাটলার' হিসাবে কাজ করার পর সাঙ্কো রচনা করেছিলেন তাঁর 'চিঠিপত্র'। 'সাঙ্কোর আমল থেকে অদ্যাবধি কোনও বাটলারের পক্ষেই এর থেকে উৎকৃষ্ট চিঠিপত্র লেখা সম্ভব হয়নি' বলে বলা হয়ে থাকে।

এ ধরনের আরও বেশ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা সফল হয়েছে। যেমন পিটার দ্য গ্রেট, ইব্রাহিম পেত্রোভিচ হ্যানিবালকে তথাকথিত অর্থে সুশিক্ষিত করেন। শেষ পর্যন্ত ইব্রাহিম পদাতিক বাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল হন। এমনকি রাশিয়ার এক অভিজাত নারীকে তিনি বিবাহ পর্যন্ত করেন। শুধু তাই নয় এই দম্পতির নাতিদের মধ্যে একজন হলেন প্রতিভাবান রুশ কবি ও গদ্যকার, আলেকজাণ্ডার পুশকিন।

শিশু প্রতিভা ফিলিস হুইটলি জন্মেছিল সেনেগাল নদীর তীরে। ১৭৬১ সালে, মাত্র সাত বছর বয়সে, বোস্টনের এক দর্জি জন হুইটলির কাছে ক্রীতদাসী হিসাবে আসে। মাত্র ষোল মাসের মধ্যে সে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করে ফেলে এবং 'পবিত্র ধর্মগ্রন্থের দুরূহ অংশগুলিও সে অনায়াসে পড়তে পারে।' যাজক জর্জ হোয়াইট ফিল্ডের মৃত্যুতে ফিলিস তার প্রথম এলিজি রচনা করেছিল। ১৭৭৩ সালে তার কবিতার বই লন্ডনে প্রকাশিত হলে বেশ সাড়া পড়ে যায়। বিশ শতকের আগে পর্যন্ত তার কবিতার বইটি ছিল প্রথম অ্যাফ্রো-আমেরিকান কবির কাব্যগ্রন্থ (ইংরেজি ভাষায় রচিত)।

এলিজা জন ক্যাপিটেইনের উল্লেখ করে আমরা এপ্রসঙ্গ শেষ করব। কারণ, 'কৃষ্ণাঙ্গ গিনিপিগের' এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল এলিজা। পশ্চিম আফ্রিকা থেকে তাকে আর্মস্টারডামে আনা হয়। সেখানে এক ধনী ব্যবসায়ীর বদান্যতায় তার আনুষ্ঠানিক পড়াশুনো চলতে থাকে। এলিজা শ্বেতাঙ্গ শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা এতদূর প্রভাবিত হয়ে পড়ে, যে নিজে কৃষ্ণাঙ্গ হয়েও বর্ণবিদ্বেষের সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়। লাতিন ভাষায় রচিত একটি নিবন্ধে সে দাস ব্যবসাকে জোরালো সমর্থন জানায়।

কৃষ্ণাঙ্গ-ক্ষমতার লড়াই

নরক এক ভয়াবহ কল্পনামাত্র, এছাড়া কোথাও নরকের কোনও অস্তিত্বই নেই। কিন্তু সত্যিই কি নেই, আমাদের চারপাশে হঠাৎ-হঠাৎ কোনও একটা কিছুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এমন এক পরিস্থিতি, যার দিকে আঙুল দেখিয়ে, বা থুতুছিটিয়ে কিংবা ভয়ে পালিয়ে যেতে-যেতে আমরা বলে ফেলি : নারকীয়, নরক!

আসলে আমাদের এই জীবনের মধ্যেই, অবাঞ্ছিত ও অতিনির্দয়তায়, প্রতি মুহূর্তে সে জন্মে চলেছে, তার প্রজননক্ষমতার বিশালতা ভয়াবহ। অথচ আমরা খালি চোখে শুধু অপরাধই দেখতে পাই, নরক কি এক রহস্যে আত্মগোপন করে অপরাধ, অজস্র ঘটনা, আইন, বিতর্ক ও ফাঁসির একটি দড়ির মধ্যে।

বেঞ্জামিন মোলায়েজ নামে এক বিদ্রোহী এবং বোথা সরকার নামে একটি সরকার এই পৃথিবীর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সম্প্রতি গ্রহটিতে কিছু নৈতিক অসুবিধা ও মানবিকতার মোটা দাগের মেজাজে একটি ফাটল সৃষ্টি করছে। বর্ণবিদ্বেষ, কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ যেন কেন্দ্রীভূত হয়েছে আফ্রিকার এই বিশেষ অঞ্চলটিতে। কালো চামড়ার জন্য বাণিজ্যিক শিকার অভিযানের ইতিহাস পাঁচশ বছরেরও পুরনো। ওই অভিযানের অপর প্রান্তে যেমন ছিল বর্ণবিদ্বেষ, তেমনি কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের অস্তিত্বের দ্বৈততা। একদিকে সে আমেরিকান, বা ব্রিটেনের নাগরিক, অন্যদিকে সে কৃষ্ণাঙ্গ। সমাজজীবনে একথা ভুলে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব : স্কুল কলেজ, রাস্তাঘাট, অফিস আদালত, বার-রেস্তোঁরা, পার্ক সর্বত্রই তাকে মনে করিয়ে দেওয়া হবে, 'একটু সমঝে চল, ভুলে যেওনা তোমার গায়ের চামড়াটা কালো।' একথা সে ভোলেনি, কখনও গর্বের সঙ্গে, কখনও বা লজ্জায়। যেভাবে শরীর থেকে কুর্তাকামিজ খুলে ফেলা হয়, সেভাবে কি গায়ের চামড়া খুলে ফেলা সম্ভব? গায়ের ওই কালো রংটির জন্য যাঁরা লজ্জিত হন, অপমানিত বোধ করেন এবং শ্বেতাঙ্গদের স্বর্গরাজ্যে বিচরণের অবাধ ছাড়পত্র পেতে চান, এরকম কেউ-কেউ সে চেষ্টাও করেছিলেন। যদিও তাঁরা জানতেন শ্বেতাঙ্গদের ওই স্বর্গের আরাম-বলয়ে বৈদ্যুতিক টিউবের থেকে ছড়িয়ে যায় এক ভয়াবহ নারকীয়তা। কিন্তু এও শেষ পর্যন্ত বুঝতেই হয়, কারণ তা বাধ্যতামূলক। ফলে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আর কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষই থেকে যেতে পারে না, তা হয়ে ওঠে বর্ণবিদ্বেষ। যখন একজন সংবেদনশীল কৃষ্ণাঙ্গ যুবক শ্বেতাঙ্গদের পীড়নের প্রতিক্রিয়ায় হয়ে উঠতে পারে এমন এক ধর্ষণকারী, যে শ্বেতাঙ্গ মেয়েদের ধর্ষণ করে মহান প্রতিশোধ পূরণের তৃপ্তি পেয়ে যায়। অপরদিকে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ, স্ত্রী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নির্বিশেষে বর্ণগত ও জাতিগত এক ভঙ্গুর সংকটজনকও আপৎকালীন পরিস্থিতির মধ্য বাস করছে। যেন-বা তাদের সমগ্র জীবন, এ গ্রহে অতিবাহিত হচ্ছে এক বধ্যভূমির মধ্যে থাকার একমাত্রিক ভয়ের অভিজ্ঞতায়।

আবার এই ভয় আজ অনেকখানি গুটিয়ে এসেছে। দীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষরা ভয় নামক জন্তুটিকে খুঁজে ফিরেছে। নিজেদের মধ্যে ও বাইরে যেখানে যত কাঁটাওয়ালা, ওই রোমশ জন্তু ছিল সব কটাকে তাড়া করে একটা খোয়ারে পুরে ফেলাই তাদের লক্ষ্য। যে কাঁটায় তারা নিজেরা অবিরত রক্তাক্ত হয়ে এসেছে, সেই কাঁটাটিকে চেনা এবং তারপর উপড়ে ফেলার তাগিদ তাদের ভিতরে প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই অভিযান কৃষ্ণাঙ্গ রক্তে বহুদিন ধরে লালিত, তবে তা বিশ শতকের দুনিয়াতে ঋজু ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করেই।

পৃথিবীর গোলকটি জুড়ে ছড়িয়ে থাকা কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের মনে স্বাধীনতার ঝাণ্ডা তো কবেই উড়তে শুরু করেছিল, এই স্বাধীনতা বাস্তব সম্ভাবনা হিসাবে অনুভূত হতে থাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। এমন কি, একক, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসাবে কৃষ্ণাঙ্গদের কেউ-কেউ তখন এই স্বাধীনতার স্বাদও পেতে শুরু করেছে। তবে তারা অতিসামান্য সংখ্যক। সংখ্যা দিয়ে সত্যের মূল্যায়ন অসম্ভব। কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ সমবেতভাবে একটি অনুভূতিকে অস্বীকার করতে পারছিল না : তাদের সমবেত শক্তি শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যের পাথরটিকে চূর্ণ করে ফেলতে পারে। আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা সর্বত্রই ছিল এই অনুভূতির অস্তিত্ব। যা একটি আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, রক্তে বহন করে চলা এমন একটি দাবি যা তাদের ন্যায় বিচারের প্রথম ধাপও বটে। এই দাবি এক বর্ণাঢ্য জীবন মিছিলের মতই আমেরিকাতেও গেয়ে ওঠে আফ্রিকার কিছু লোকসঙ্গীত, আফ্রিকার প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রসমূহ ওই সমবেত সঙ্গীতে যেন-বা আপনিই বেজে ওঠে।

গার্ভি আন্দোলন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর এই আশার মধ্যেই প্রস্ফুটিত। যুদ্ধের পর কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের জীবনযাত্রায় পার্থক্য, যুদ্ধের সর্বব্যাপী ক্ষয়, এ সমস্তই গার্ভি আন্দোলনে রসদ জুগিয়েছে। যুদ্ধের পর বিপন্ন, আর্ত সভ্যতা কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের স্বধর্ম প্রকাশের উপযোগী একটি ক্ষেত্র রচনা করেছিল। তাঁরা তখন নিজেদের আত্মপ্রকাশ ঘটানোর জন্য যথেষ্ট উদ্বেলিত। শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার 'বোঝা' হিসাবে নিজেদের ভাবার দিনগুলিও কি করে যেন সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছিল। সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে কাগুজে, মেকি মানবিকতার ধ্বজার আয়ু।

অন্যদিকে যুদ্ধে, আফ্রিকা, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কিছু কিছু ফ্রন্টে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের রাইফেল হাতে

ছুটে বেড়ানোর মধ্যে ছিল জীবন্তভাবে এক অতীত স্মৃতিচারণ। কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের প্রাচীন বীরত্বের গাথার সঙ্গে এই লড়াইয়ে তাদের ভূমিকার এক অভ্যন্তরীণ যোগসূত্র ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শুধু আমেরিকার হয়ে লড়েছিল সাত হাজার তিনশ জন কৃষ্ণাঙ্গ। সবমিলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গনে দশ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ নতুনভাবে যুদ্ধের এক মহড়া সেরে নেয়। এই মহড়ার ফল যে জাতিগতভাবে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের উপর বর্তাবে, সেদিন তা অনেকের পক্ষেই ভাবা সম্ভব হয়নি।

কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের এ নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না। যুদ্ধে অংশ গ্রহণের আগে তাঁদের একটি তাত্ত্বিক বিতর্কের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। এমন কি যেসব কৃষ্ণাঙ্গ যুদ্ধে যোগ দেয়নি, যাদের যুদ্ধে যেতে হয়নি, তারাও জানত এই যুদ্ধ কৃষ্ণাঙ্গদের উপর একটি স্থায়ী প্রভাব রাখবে।

আমেরিকার স্বাধীনতার জন্য—শ্বেতাঙ্গদের করুণ, আর্ত আবেদন রাখতে হচ্ছে অচ্ছুৎ, নিপীড়িত কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের কাছে, এককালের গোলামদের কাছে। অথচ সেই সময়, সেই ত্রস্ত, বিপন্ন সময়ে শ্বেতাঙ্গরা 'প্ল্যানেট' নামে কৃষ্ণাঙ্গদের পত্রিকার একটি সংখ্যার প্রচার জোর করে বন্ধ করে দেয়। কারণ ওই সংখ্যাটিতে প্রকাশিত এক নিবন্ধে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের কাছে আবেদন করা হয়েছিল, শ্বেতাঙ্গদের এই যুদ্ধে যেন কৃষ্ণাঙ্গরা যোগ না দেন। যুক্তি ছিল একটাই : য়ুরোপের গণতন্ত্র রক্ষার জন্য শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের ঠেলে দিচ্ছে কামানের গোলার মুখে, অথচ এই য়ুরোপে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য কোথাও কোনও গণতন্ত্র নেই। এবং সেদিন কৃষ্ণাঙ্গরা এও প্রত্যক্ষ করেছিলেন, একদা প্ল্যানটেশনে গোলামিতে যেভাবে কৃষ্ণাঙ্গদের নিযুক্ত করা হয়েছিল, বিশ্বযুদ্ধের এই গোলাবর্ষণের মুখে তাদের ঠেলে দেওয়ার মধ্যেও আছে শ্বেতাঙ্গদের সেই এক পুরনো মনিবীচাল।

গার্ভি আন্দোলনের এক পুরোধা এসময় মন্তব্য করেছিলেন—বেলজিয়ানদের কষ্টে তিনি যে খুব দুঃখ পাচ্ছেন এমন নয়, বিশেষত কঙ্গোতে এই শ্বেতাঙ্গ বেলজিয়ানরা যা করেছিল তা ভাবলে দুঃখের উৎসই শুকিয়ে যায়।

ত্রিশঙ্কু সময়। শত্রুপক্ষ, মিত্রপক্ষ, নানারকম প্রচারে জনমানসের ভারসাম্য নষ্ট হতে চলেছে, অব্যবস্থিত তাদের মন। এবং ছিল এক মড়কধর্মী হিস্টেরিয়া। তবুও, এত কিছুর মধ্যেও বিস্ময়ের একটি ঘটনা দ্বীপের মত জেগে ছিল। কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এমন একজনকে আবিষ্কার করা ছিল দুরূহ, যে বা যিনি জার্মানিকে সমর্থন করার কথা ভাবতে পারত। কিন্তু সময়ের এই জটিল আবর্তে জার্মান বিরোধিতার ধরন কী হবে তা নিয়ে কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে ছিল তীব্র মতপার্থক্য।

বয়স্ক, প্রবীণ কৃষ্ণাঙ্গরা য়ুরোপকে সমর্থনের প্রশ্নে ছিল দ্বিধাহীন। কোথাও কোন সংশয়-কাঁটা ছিল না। অপরদিকে তরুণরা য়ুরোপের তীব্র, তীক্ষ্ণ সমালোচক, কেউবা ঘোরতর বিরোধী। এই তর্ক, এই পার্থক্যকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের সত্তা চলতি কথায় দুটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ল ; 'নতুন নিগ্রো' ও 'পুরনো নিগ্রো'।

প্রতিবাদী মিছিলের প্রথম বলি, তেরো বছরের কিশোর

বোয়ার ভাষায় যুদ্ধ-ফেরতা কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের মেজাজ এভাবে প্রকাশিত হল :

'ফিরে এলাম। লড়াই করে ফিরলাম। গণতন্ত্রের রাস্তা সাফ করে এলাম। ফ্রান্সে ওই বস্তুটিকেই আমরা প্রাণে বাঁচিয়েছি। মহান জেহোভার আশীর্বাদে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকেও আমরাই বাঁচাবো। অথবা জেনে নেব কেন বাঁচাবো না।'

যুদ্ধ দামামা থেমে গেলেও, তার বিলম্বিত প্রতিধ্বনি তখনও সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়নি, ঠিক এই সময়ে শ্বেতাঙ্গ আমেরিকা হিস্টেরিয়ার বিকার সমেত লিঞ্চিং-এ ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর। কিন্তু এবার তাদের শাদা শরীরের কোথাও কোথাও রক্তের ফোঁটা দেখা দিল। পাল্টা মার খেত হল। কৃষ্ণাঙ্গরা প্রতি আক্রমণ করল। এবং এই প্রতিরোধ যুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের প্রথম সারিতেই ছিল যুদ্ধ-ফেরত আত্মীয় বন্ধুরা। কৃষ্ণাঙ্গদের বস্তিতে গিয়ে হামলা করার ব্যাপারটা এখন আর বিনামূল্যে সেরে ফেলা সম্ভব নয়। সহজ নয়। সামরিক কৌশল, বীরত্ব সব দিক থেকেই শ্বেতাঙ্গদের পিছু হঠতে দেখা গেল।

যুদ্ধোত্তর বর্ণবিদ্বেষের বিষাক্ত, নারকীয় বৃত্তান্তটি সে কারণে আর কৃষ্ণাঙ্গদের মার খাওয়ার সেই একপেশে, বিবর্ণ, একঘেয়ে অত্যাচারেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং কৃষ্ণাঙ্গদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ, রাজনৈতিকবোধ ও জাতিগত ঐক্যের

বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিটি আন্দোলনের প্রতি বোথা সরকার একটিই মাত্র উত্তর দিয়ে থাকে : জেল এবং গুলি। যার হাত থেকে শিশুদেরও মুক্তি নেই। কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ তার মৃত আত্মীয়-পরিজনের শব নিয়ে অন্ত্যেষ্টির শবযাত্রাও বের করতে পারে না আইনসম্মতভাবে।

সামনে শ্বেতাঙ্গ অত্যাচারীরা বেশিক্ষণ দাঁড়াতেই পারেনি।

যুদ্ধোত্তর এরকম দাঙ্গা শুধু ১৯১৯ সালেই ঘটেছিল ২০টিরও বেশি। শিকাগো, ওমহো, কনক্সভাইল, ওয়াশিংটন ডি সি, টুলসা, চার্লসটন এবং অনেক ছোট ছোট জায়গায়ও (যেমন ইলাইন, আর্কানসাস, লঙভিউ, টেক্সাস ইত্যাদি)। আর বড় শহরগুলোর মধ্যে আছে নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি।

লিঞ্চিং-এর দিন শেষ হয়েছে। শ্বেতাঙ্গ মাস্তানদের দিকে প্রতিটি কৃষ্ণাঙ্গ-বস্তি তাক করে রেখেছে বন্দুকের মাছি। শিকাগোয় দু সপ্তাহব্যাপী হাঙ্গামার পর, হতাহতের সংখ্যা দাঁড়াল : ৩৫ জন কৃষ্ণাঙ্গ এবং ১৩ জন শ্বেতাঙ্গের মৃত্যু। এবং কৃষ্ণাঙ্গরা প্রত্যেকেই মারা গিয়েছিল ঘেটোর বাইরে। অর্থাৎ সওদা কিংবা রুজির জন্য শ্বেতাঙ্গ এলাকায় ঢোকার ফলে। টুলসাতে দাঙ্গায় ১৫০ কৃষ্ণাঙ্গ এবং ৫০ জন শ্বেতাঙ্গ মারা যায়।

য়ুরোপের কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ যখন প্রতিরোধের ভূমিকা বেছে নিয়েছে, আফ্রিকা মহাদেশের কয়েকটি দেশেও তখন শিকল ভাঙার গান শোনা যাচ্ছে। ধর্মঘট, গণ-অভিযান, গণ-সমাবেশের উত্তাল দিন তখন আছড়ে পড়ছে সিয়েরালিওন, গোল্ড কোস্ট, দক্ষিণ আফ্রিকা, সহ কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত ত্রিনিদাদ, হন্ডুরাস, পানামা এবং কোস্টা রিকায়। তাঁদের দাবি, কাজের মত পরিবেশ, তাঁদের দাবি—গায়ের রঙ কালো বলে গোলামের মত আচরণ আর চলবে না। ব্রিটিশ ওয়েস্টার্ন রেজিমেন্টের কৃষ্ণাঙ্গ সৈন্যরা ১৯১৮ সালে বিদ্রোহের ঝান্ডা উড়িয়ে দিল। ব্রিটিশ ওয়্যার অফিসের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইতালিতে, তারান্তোয় বিদ্রোহ দানা বাঁধে। ৫০-৬০ জন কৃষ্ণাঙ্গ সৈন্যকে গ্রেফতার করা হল। ৮ হাজার কৃষ্ণাঙ্গ সৈন্যের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হল অস্ত্র। কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদের মধ্যে বেতনের তারতম্য, অগ্রিম টাকা দেওয়ার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ ইত্যাদির ফলে নবম বাহিনীর কৃষ্ণাঙ্গ সৈন্যরা সামরিক অফিসারদের আক্রমণ করে। শেষ পর্যন্ত নবম বাহিনীকে ইংরেজরা ভেঙে দিতে বাধ্য হয়।

যুদ্ধের আগুপিছু আমেরিকাতে মজুরের এক তীব্র সংকট দেখা দিল। বিশেষ করে উত্তরের শিল্প কেন্দ্রগুলোয়। খবরের কাগজ পড়ে ও নানাভাবে শুনে, লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ গ্রামের ঝুপড়ি ছেড়ে শহরের দিকে কাজের খোঁজে যাত্রা করল। দক্ষিণেও ঘটল একই ঘটনা। এই গতিশীলতা কৃষ্ণাঙ্গ মনে এক নতুন ছাপ ফেলতে পারে। এই নতুন ছাপটি ছিল রাজনৈতিক। যেন-বা কুয়োর ভিতর থেকে তারা বেরিয়ে এল। দেখল, সমুদ্র।

শহরে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের সংখ্যা যত বাড়তে লাগল ততই নতুন এক সামাজিক ও রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও বেড়ে গেল বহুগুণ। প্রাথমিক শহরের নতুন ধরনের সমস্যার মোকাবিলা করতে গিয়েই তাদের জোট বাঁধতে হয়েছিল। বিশেষ করে কৃষ্ণাঙ্গদের বস্তি তথা 'ঘেটো'তে তারা যে জীবন কাটাতে শুরু করে, তার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বুঝতে চাইল।

প্রথম দিকটায় ভারী শিল্পে অঢেল কাজ ছিল। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ সৈন্যরা ফিরে আসার পর কাজের ঘাটতি দেখা দিল। আলবামায় একটি খুপরি ঘরে তখন গড়ে ১২ জন কৃষ্ণাঙ্গ মজুরকে শুতে হচ্ছে। খাবারদাবার শুধু অপ্রতুল নয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা অস্বাস্থ্যকরও। উপরন্তু ময়লার ঢিপি রাস্তার উপর জমে জমে হয়ে উঠেছে পর্বত প্রমাণ। যাদের কপালে সামান্য ভাল কাজ জুটেছে, একটু বেশি সুবিধে পেয়েছে, তাদের একমাত্র চেষ্টা ছিল ঘেটোর বাইরে থাকা। যদিও এতে যে পরিমাণ অর্থ খরচ করতে হত, তাতে খাবারের তালিকা হয়ে যেত সংক্ষিপ্ত ও পুষ্টিহীন।

কিংসটনের চারপাশে তখন ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে আরও আরও বস্তি। নামগুলোও ভারি অদ্ভুত—ট্রেঞ্চটাউন, ডেনহ্যাম টাউন প্রভৃতি। এইসব টাউনে যুদ্ধকালীন মজুর সংকট জাল ফেলে যে বিপুল কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে এনে জড়ো করা হয়েছিল, তাদের অনেকেরই পরিশ্রমী হাতগুলি এখন অলস। কোথাও কোন কাজ নেই। কিন্তু বাঁচতে হবেই, বেঁচে থাকাটাকে জামা-কাপড়ের মত খুলে ফেলা অসম্ভব। বাঁচার এই তাগিদই তাদের হাত-পায়ের পেশী এবং বুদ্ধিতে তীব্র এক গতি সঞ্চারিত করল। কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে থেকে দু-চারজনকে শাল গাছের মত ঋজু হয়ে উঠতে দেখা গেল। তারা মাথা তুলে দাঁড়াল। তাদের স্বর আলাদা, চিন্তা আলাদা। তারা একশবার আমেরিকান কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ। আমেরিকা এবার দেখতে পাবে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের নেতৃত্ব।

আর নিজেদের নিভৃত ও প্রকাশ্য সমাবেশে কৃষ্ণাঙ্গরা তখন তর্ক করে চলেছে একটি মাত্র শব্দ নিয়ে : কালো। কালো হওয়ার কী তাৎপর্য? প্রকৃত অর্থে শব্দটিকে গ্রহণ করলে তার নিহিত অর্থই বা কী দাঁড়াচ্ছে? আফ্রিকা না আমেরিকা? আমেরিকা কী শ্বেতাঙ্গদের? নাকি তা কৃষ্ণাঙ্গদেরও?

একদিকে এই তর্ক অন্যদিকে আত্মরক্ষা। শহরে স্রোতে ভেসে আসা কৃষ্ণাঙ্গ মানুষরা নিজেদের বাঁচানোর জন্য আত্মরক্ষার সংগঠন গড়ে তোলে। মোটা দাগে এইসব সংগঠনকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। গার্ভির নেতৃত্বে ঘেটোর মধ্যে লড়াই। আর সাধারণভাবে ওই কালো শব্দটিকে আশ্রয় করে আত্মরক্ষার সংগঠন। দুটি সংগঠনই কৃষ্ণাঙ্গদের আত্মরক্ষার জঙ্গীভাবটিকে মদত দিয়েছে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনেকেই লড়েছেন। ক্লডি ম্যাককে, জ্যামাইকা থেকে আগত একজন কৃষ্ণাঙ্গ 'নিগ্রো ওয়ার্ল্ড' পত্রিকায় লড়াইর সেই অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন কবিতার ভাষায়।

শিকড় ও শিকল

স্তানলেক সামকাঞ্জি প্রণীত 'অরিজিনস অফ রোডেশিয়া' গ্রন্থে এরকম একটি মুখবন্ধ আছে :

'তখন ১৯৩৫ সাল, আমার বয়স ১৩, রোডেশিয়ার একটি স্কুলে আমি স্ট্যান্ডার্ড ফোর ক্লাশের ছাত্র। ইতিহাস পিরিয়ডে আমাদের একজন শিক্ষক (যিনি আবার মিশনারি) বলেছিলেন, "যদিও লোবেনগুলা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে লড়তে সেনা পাঠিয়েছিল, শ্বেতাঙ্গরা কিন্তু তখনও শান্তিই চাইছিল, চাইছিল যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে ...।" এইটুকু শোনার পরই পেছনের থেকে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। বয়স্ক ছাত্ররাই (৪০-এর ওপর যাদের বয়স) জোর গলায় আপত্তি জানাতে থাকে।'

স্তানলেক সামকাঞ্জি লিখেছেন, 'আমাদের শেখানো হয়েছিল যে আমাদের ইতিহাস শুরুই হচ্ছে শ্বেতাঙ্গদের আগমনের পর থেকে। অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গরা আসার আগে কিছুই ছিল না, অব্যবস্থা ছাড়া। ছিল শুধু আর দলপতিদের মধ্যকার যুদ্ধ। ব্যাধি, কুসংস্কার আর ডাইনিতন্ত্র এবং এসবেরই উৎস ছিল আমাদের অজ্ঞতা। বলা হয়েছে, শ্বেতাঙ্গরা এসে নাকি আমাদের উলঙ্গ দেখেছিল। দারিদ্র্যে ডুবে থেকে আমরা জানতেও পারিনি যে প্রভূত খনিজ সম্পদের উপর আমরা বসে আছি। ঈশ্বর সম্পর্কেও আমাদের কোনই ধারণা ছিল না। ধারণা ছিল না সরকার ও অন্যান্য সব 'সভ্য' ব্যাপার-স্যাপার সম্পর্কে। এসব বাহ্য, সবোপরি আমরা এও জানতাম না যে, সমস্ত ব্যাপারেই শ্বেতাঙ্গরা নির্ভুল। আফ্রিকানরা বোকার হদ্দ, ভুলে ঠাসা। সংক্ষেপে আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ঘেন্না আর অবহেলা জাগিয়ে তোলার এক নিপুণ প্রয়াস চলেছিল।'

এর মধ্যে সব থেকে বিস্ময়কর একটি মিথ্যে হল শ্বেতাঙ্গদের স্বঘোষিত আফ্রিকা আবিষ্কার। যেন-বা শ্বেতাঙ্গ ঈশ্বররা এই ভূখণ্ডটি রচনা করেছিল, সৃষ্টি করেছিল। যেন তারা এই মহাদেশটি 'আবিষ্কার' করার আগে আফ্রিকার কোনও অস্তিত্বই ছিল না।

বর্ণবিদ্বেষের বীজ নিহিত ছিল অতীতের দাস ব্যবস্থায়, যেখানে একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানেই ছিল ক্রীতদাস। আবার এই দাস ব্যবস্থার গর্ভধারিণী দাস ব্যবসা। এই ঘৃণ্য ব্যবসাটির বাণিজ্যপোত আফ্রিকা মহাদেশের ভূখণ্ডে প্রথম যেদিন নোঙর ফেলেছিল, বর্ণবিদ্বেষ সেইদিন, সেই মুহূর্ত থেকে এক দীর্ঘ, প্রায় অন্তহীন, রক্তাক্ত ও জটিল পর্যটন শুরু করে।

ফ্রেডরিক ডগলাস একজন আমেরিকান ক্রীতদাস, যিনি তিনটি আত্মজীবনী লিখে ফেলেছিলেন ঐতিহাসিক তাগিদ নিজের জীবনের সংক্ষিপ্ত ক্ষেত্রটিতে অনুভব করার ফলে। মেরিল্যান্ডের টালবট কাউন্টিতে ডগলাসের জন্ম। ১৮৩৮ সালে তিনি দাসত্বের বাঁধন ছিঁড়ে পালান। সিভিল ওয়ারের পরে 'নিগ্রো' অধিকারের লড়াইতে ডগলাস ছিলেন একজন প্রথম সারির সৈনিক। তার আগেই দাসত্ব-বিরোধী সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিলেন অতীতের ওই মহান ক্রীতদাস। নিজের জীবনের তিনটি পর্বকে ডগলাস তাঁর আত্মজীবনীমূলক তিনটি গ্রন্থে দলিলের মত উপস্থাপিত করেছেন।

ডগলাসের আত্মজীবনী থেকে সময়-যানে চেপে যদি কৃষ্ণাঙ্গদের দাসত্বের সূচনা পর্বে যাওয়া যায়, তখন ভূগোলে একটি লক্ষনীয় পরিবর্তন ঘটে যাবে। উষ্ণ আবহাওয়ার আকর্ষণীয় দেশ মিশর, সভ্যতার এক দোলনা ; নীল নদের দীর্ঘ

বঞ্চনার দীর্ঘ কালরাত্রি পেরোনোর প্রয়াস।

প্রবাহ, যেখানে কোঁকড়াচুলের, কালো পাথরে খোদাই শরীরের মানুষের নীলেরই সমান্তরাল এক জীবন প্রবাহ চলেছে। খ্রিস্টের জন্মের পঞ্চম শতক আগে ঐতিহাসিক হেরোডোটাস তাঁদের বর্ণনা করেছেন এইভাবে : 'কালো আর কোঁকড়াচুলো'।

এই স্বর্গভূমি, যা আফ্রিকার হৃদয় বলেই গ্রাহ্য হতে পারে, সেখানে ঘৃণ্য দাস ব্যবসা আগেও ছিল। কিন্তু তাতে শ্বেতাঙ্গদের কোনও ভূমিকা ছিল না। বহু প্রশংসিত, য়ুরোপের রেনেসাঁ এবং বাণিজ্যিক বিপ্লবেই প্রথম দাস ব্যবসার আধুনিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। 'স্বাধীনতার' তৃষ্ণা এক অনৈতিক চেহারা নেয়, যার ফলে অন্য জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতাকে আক্রমণ ও বিনষ্ট করতে রেনেসাঁক্রান্ত য়ুরোপের কোথাও কোন দ্বিধাও সৃষ্টি করতে পারেনি। আফ্রিকানদের কাছে তা ছিল, বোয়ার ভাষায় 'স্বাধীনতা বিনষ্ট করার স্বাধীনতা'।

ইসলাম রাজত্বে আফ্রিকার বেশ কিছু কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে উত্তর ও দক্ষিণে বিক্রি করে দেওয়ার পর তারা পশ্চিমী বাজারে এসে হাজির হয় শেষপর্যন্ত। তবে ১৪ শতকের আগে য়ুরোপীয়রা নিজেরা য়ুরোপে দাস আমদানি শুরু করেনি। ১৫ শতকের মাঝামাঝি য়ুরোপীয়রা তাদের নিজেদের বাজারে নানারকম পণ্য বিক্রি শুরু করে, যার মধ্যে আছে : বাদাম, ফল, অলিভ অয়েল, সোনা এবং 'নিগ্রো' দাস। কিছুদিনের মধ্যেই বিশেষত প্রিন্স হেনরির উৎসাহে পর্তুগালের ব্যবসায়ীরা 'আফ্রিকান স্লেভট্রেডে'র আর্থিক সুবিধেগুলো বেশ ভালই বুঝতে পারে। ১৪৬০ সাল নাগাদ পর্তুগাল বছরে কম করে ৮০০ ক্রীতদাস আমদানি

প্রতিবাদের ঢেউ তোলা এবং সেই ঢেউ ছড়িয়ে দেওয়া দিকে দিকে প্রতিটি কৃষ্ণ-হৃদয়ে

করতে থাকে নিয়মিত।

অভিযান ও আবিষ্কারের যে যুগটিকে বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধার সঙ্গে এতকাল দেখা হয়েছে, কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে তার রোম্যান্টিকতার অনেকখানিই ঝরে যায়। কারণ এইসব অভিযানে সর্বত্রই কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের কিছু না কিছু রক্ত খরচ ছিল। হয় সে চাকর হিসাবে খেটেছে, নাহলে এক দাস গিনিপিগ হিসাবে উপস্থিত থেকেছে। ১৫০১ সালে বালবোয়া যখন প্রশান্ত মহাসাগর আবিষ্কার করেন তখন তাঁর সঙ্গে ন্যাফলে দ্য অলানো সমেত ৩০ জন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ ছিল। কর্তেজ্জাও মেক্সিকোতে তাঁর সঙ্গে 'নিগ্রো'দের নিয়ে এসেছিলেন। এবং এই 'নিগ্রো'দেরই একজন ওই নতুন দুনিয়ায় সর্বপ্রথম তন্ডুল জাতীয় শস্য উৎপাদন করেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে নতুন দুনিয়া মন্থন করে সম্পদ আহরণ পর্বে, খনি মজুরের, খেতের কাজের বিপুল যে শ্রমবাহিনীর প্রয়োজন ছিল—কৃষ্ণাঙ্গরাই হল সেই সুলভ শ্রমবাহিনী।

স্প্যানিয়ার্ডসের অনুমতি দেওয়া হল তারা মাথাপিছু ১২ জন করে কৃষ্ণাঙ্গ গোলাম এই নয়া দুনিয়ায় নিয়ে আসতে পারে। ১৫১৭ সালে বিশপ লাশ কাসাসই দাস শ্রমবাহিনীর গতিশীলতার দ্বার খুলে দেন। এরপরই নয়া দুনিয়ায় দাস ব্যবসার আনুষ্ঠানিক সূচনা হল। এবং এই ব্যবসায় নিলাম বা টেন্ডারের তুল্য একটি ব্যবস্থা ছিল, সবচেয়ে বেশি দর যে হাঁকতে পারবে, সেই একচেটিয়া ব্যবসার সুযোগ পাবে। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান খেত-খামারের কাজ যত বিশাল হতে থাকল তার সঙ্গে তারতম্য রেখেই বেড়ে চলল দাস ব্যবসা। ১৫৪০ নাগাদ ওয়েস্ট ইন্ডিজে বার্ষিক কৃষ্ণাঙ্গ দাস চালানের গড়পড়তা হিসাব দাঁড়াল দশ হাজার।

বছরের পর বছর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে কৃষ্ণাঙ্গ দাস ব্যবসার পদ্ধতি ও কৌশল গড়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতক নাগাদ আফ্রিকা থেকে গোলাম চালানে নিযুক্ত দেশগুলির প্রত্যেকের আবার কিছু নিজস্ব পদ্ধতিও ছিল। তবে আফ্রিকা থেকে কৃষ্ণাঙ্গ গোলাম সংগ্রহের ব্যাপারে একটি সাধারণ রীতি পদ্ধতিও ছিল, যার বাইরে প্রায় কেউই যেত না। সেটি এরকম :

আফ্রিকার একটি ট্রেডিং পোস্টে পৌঁছে ব্যবসায়ীর প্রথম কাজ সেখানে তার কর্মচারী ও অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। এরপরই স্থানীয় যে-সব কৃষ্ণাঙ্গ দাস ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, যারা গোলাম চালান দেয় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। এরপর গোষ্ঠীপ্রধানের কাছে যেতে হত। জাহাজ থেকে বয়ে আনা কিছু বিলাস সামগ্রী, ওই অঞ্চলের প্রধান বা জমিদার স্থানীয় ব্যক্তিকে উপহার হিসাবে দেওয়া, তাকে তুষ্ট করা এবং দাস-ব্যবসার অনুমতি সংগ্রহ করা। এরপর 'কাবোসিয়ার' নামে অভিহিত দালাল বা সংগ্রাহক বেরিয়ে যেত বন্দী কৃষ্ণাঙ্গদের ধরে আনতে।

বন্দীদের এরপর ব্যবসায়ীর কাছে নিয়ে আসা হত। ব্যবসায়ী তখন ডাক্তার এবং অভিজ্ঞ সহকর্মীর সাহায্যে গোলাম বাছাইয়ের কাজে হাত দিত। বেশিরভাগ সময়ই বন্দীদের এত পরিষ্কার করে চুল কমিয়ে, তাদের তেল সর্বাঙ্গে মাখিয়ে নিয়ে আসা হত যে তাদের বয়স বুঝে ওঠা ছিল প্রায় অসম্ভব। অথচ এই বয়সের ওপরই গোলামের দাম ওঠানামা করত। বয়স যত কম দাম তত বেশি। বেশির ভাগ সময়ই দাসদের বদলে নানারকম জিনিস দেওয়ার বার্টার প্রথা চালু ছিল। তবে টাকা পয়সা দিয়েও কোনও কোনও ক্ষেত্রে গোলাম কেনা হয়েছে। ১৮ শতকে গিনি, বা কেপ ক্যাসলের দাস ব্যবসার ঘাঁটিতে ২০ স্টার্লিং ছিল একজন স্বাস্থ্যবান যুবক গোলামের দাম।

গোলাম কিনে নেওয়ার পর সাধারণভাবে ব্যবসায়ীরা লোহা গরম করে একটি দাগ বা চিহ্ন দিত গোলামদের শরীরে। এ জিনিসটা ছিল ট্রেড মার্কের মত। এরপর শুরু হত গবাদি পশুর থেকেও হাজার গুণ জঘন্যভাবে খাঁচা বন্দী হয়ে কুখ্যাত মিডল প্যাসেজ জাহাজে করে অতিক্রম করা। নথিপত্রে দেখা গিয়েছে মাত্র ৯০ টনের একটি জাহাজ ক্রু-ক্যাপ্টেন ইত্যাদি ছাড়া ৩৯০ জন কৃষ্ণাঙ্গ দাস বহন করেছে। গাদাগাদি করে নিয়ে যাওয়ার ফলে অনেক সময়ই জাহাজ ডুবির আশঙ্কা দেখা দিত। এরকম ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহজ সমাধান ছিল কৃষ্ণাঙ্গ গোলামদের অনেককে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে জাহাজ হাল্কা করে নেওয়া। পানীয় জলের সংকট দেখা দিলেও ওই একই সমাধান বেছে নেওয়া হত।

ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের তামাক খেত ছিল এই গোলামদের বাধ্যতামূলক গন্তব্য স্থল। কোনও একটি বছরে, সেন্ট ভিনসেন্টে ২,৬৫৬ জন কৃষ্ণাঙ্গ জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সেই বছরই মৃত্যুসংখ্যা ছিল ২,৬৫৬। জামাইকার একটি খামারে অর্ধেকের বেশি শিশু এক বছরের মধ্যে মারা যায়, অন্যদিকে গর্ভপাতের হারও ছিল সাংঘাতিক বেশি। দ্বিতীয়টি যদি অমানুষিক পরিশ্রম ও অত্যাচারের চিহ্ন হয় তাহলে মৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার প্রমাণ করে কৃষ্ণাঙ্গ গোলামদের জন্য ন্যূনতম চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। হয়তো ওইসব ব্যবস্থা থেকে নতুন গোলাম আমদানিতে অনেক কম খরচ পড়ত।—সে কারণে ওই মৃত্যুপুরীর দিকে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের গোলাম হয়ে যাত্রা করাটা ছিল একটি প্রাত্যহিক নিয়মিত ঘটনা। এবং তামাক খেতে তাদের জন্য ছিল ওভারসীয়ারের চাবুক ও কঠোর পরিশ্রম।

এসো মুক্ত করো

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি আমেরিকার পরিণত আর্থিক ব্যবস্থার এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল : কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের গোলামবৃত্তি। যদিও ইতিমধ্যে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। 'কোয়াকার্স' নামক একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী প্রশ্ন তুলেছে : একজন মানুষ অপর একজন মানুষকে দাসত্বের বাঁধনে রাখতে পারে না, তার কোনও নৈতিক অধিকার নেই এ ধরনের কাজে লিপ্ত থাকার। জন উলম্যান, দ্য নিউ জার্সি কোয়াকার, অ্যান্টনি বেনেজেট, ফিলাডেলফিয়ার হুগুইনট প্রভৃতিরা মধ্য কলোনিতে ক্রীতদাস ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনও শুরু করেছেন।

কৃষ্ণাঙ্গ দাস অভ্যুত্থানের ভয় শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের বাধ্য করেছিল ম্যাসাচুসেটসের সেনাবাহিনী থেকে দাসদের বাদ দিতে। এতৎসত্ত্বেও কৃষ্ণাঙ্গ

মানুষেরা ফরাসী এবং ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে আমেরিকার স্বপক্ষে লড়েছে। ১৭৭৫ সালের এপ্রিলে লেক্সিংটন এবং কনকর্ড-এর যুদ্ধেও তারা অংশ নিয়েছে। যা প্রকারান্তরে, আমেরিকার স্বাধীনতার লড়াইয়ে কৃষ্ণাঙ্গদের জড়িয়ে যাওয়া। ১৭৭৮ সাল নাগাদ ম্যাসাচুসেটস এবং রোড আয়ল্যাণ্ডে কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের সৈন্যবাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারটি ঘটে। যদিও জর্জিয়া এবং সাউথ ক্যারোলিনা তখন সৈন্যবাহিনীতে 'নিগ্রো'দের অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতাই করে চলেছে। সে যাই হোক আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে তিন লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিক যে জানপ্রাণ দিয়ে লড়ে ছিল তা ঐতিহাসিক সত্য।

যুদ্ধ শেষ হলে বীর কৃষ্ণাঙ্গদের পুরস্কৃত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা গেল কৃষ্ণাঙ্গ গোলামদের অতীত মনিবেরা তাদের দাসদের ফেরত চাইছে। বিশেষ করে ব্রিটেনের স্বাধীনতার জন্য যারা লড়েছিল, সেইসব কৃষ্ণাঙ্গদের ক্ষেত্রে এ জিনিস বেশি করে দেখা গেল। শেষ পর্যন্ত ১৭৮৩ সালে ভার্জিনিয়া একটি আইন পাশ করল, তাতে বলা হল 'বিগত যুদ্ধে যারা লড়েছে' সেইসব গোলামকে স্বাধীনতা মঞ্জুর করা হল।

ওদিকে ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্য প্রভাব কমিয়ে আনার জন্য দাস ব্যবসার বিরুদ্ধে বাধা নিষেধ আরোপ করে কিছু কিছু আইন পাশ করা হচ্ছিল। ১৭৮৩-তে মেরিল্যাণ্ড কৃষ্ণাঙ্গ চালান নিষিদ্ধ করে, আফ্রিকা থেকে আমদানি করা হচ্ছে এমন একজন 'নিগ্রো' পিছু ১৫ পাউণ্ড লেভি চাপানো শুরু হল। অবশ্য সেক্ষেত্রে ওই নিগ্রোটির বয়স ১২-৩০ এর মধ্যে হওয়া চাই। অন্য দিকে দাসত্ব বিরোধী সংগঠনের কাজকর্মও যুদ্ধের পর আরও বিস্তার লাভ করে। কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাধীনতা ক্রমেই একটি দাবি হিসাবে জনসমর্থন অর্জন করে চলে।

মানবিকতার দর্শনের থেকে সরাসরি উৎপন্ন অষ্টাদশ শতকের দাসত্ব-বিরোধী মনোভাব আমেরিকায় কখনই নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। এক্ষেত্রে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বও সুস্পষ্ট ছিল, ওই দ্বন্দ্বের ভিত্তি অবশ্য অর্থনৈতিক দক্ষিণ তখনও কৃষিনির্ভর, উত্তর ক্রমেই শিল্পের দিকে ঝুঁকছে। উত্তরের শিল্পমুখিনতা কাজের ছন্দেই শ্বেতাঙ্গ ওকৃষ্ণাঙ্গদের এতখানি ঘনিষ্ঠ করে তোলে যে তারপর দাস ব্যবস্থার পরিবেশটাই হারিয়ে যেতে থাকে। ১৮১৫ সালের পর থেকে উত্তরের দাসত্ব বিরোধী মনোভাব বেড়ে চলেছিল প্রতিদিনই। ১৮১৭ সালে চার্লস ওসবর্ন 'দ্য ফিলানথ্রপিস্ট' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন, পত্রিকাটির আক্রমণের বর্শামুখ ছিল দাসত্ব। ১৮২১ সালে বেঞ্জামিন লান্ডি সম্পাদিত 'জিনিয়াস অফ ইউনিভার্সাল ইমানসিপেশন' প্রকাশিত হয়।

১৮০৪ কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়, কেননা এই সময় 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলরোড' মুক্তির এক জঙ্গী পদ্ধতি হিসাবে যুক্ত হল তাদের আন্দোলনে। জেনারেল টমাস বাউড (বিপ্লবের সময়কার একজন অফিসার) এক কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস কেনেন। কৃষ্ণাঙ্গ ওই ক্রীতদাস, স্টেফান স্মিথকে তিনি ফলাডিল্ফিয়ায় নিয়ে এলেন। সেখানে স্মিথের মা-ও এলেন ছেলের টানে, বলা বাহুল্য তিনি তাঁর মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। বাউড তাঁকে থাকতে দিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে স্মিথের মা-র মনিব এসে তার ক্রীতদাসীকে দাবি করল। বাউড তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন না, এমন কি গোটা শহরও বাউডকে সমর্থন জানাল : না, স্মিথের মা-কে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। পলাতক ক্রীতদাসদের উত্তর ক্যারোলিনা থেকে যাতে নির্বিঘ্নে বের করে আনা যায় সেজন্য গোপন রাস্তা গড়ে উঠল আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলরোড। বাষ্পীয় রেল জনপ্রিয় হওয়ার ফলেই এই গোপন রাস্তার নাম রাখা হয়েছিল আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলরোড। প্রবল উত্তেজনা, বিপদ ও নাটকীয়তাপূর্ণ এই যাত্রায় উত্তর নক্ষত্রই ছিল তাদের পথপ্রদর্শক। মানবতাবাদী শ্বেতাঙ্গদের সাহায্য কৃষ্ণাঙ্গদের বিপদকে অনেক সময়ই লঘু করেছে। এমনকি সন্দেহ অতিক্রম করার জন্য কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসীদের কোলে অনেক সময় শ্বেতাঙ্গ শিশুও তুলে দেওয়া হয়েছে যাতে তাঁরা নার্স হিসাবে পার পেয়ে যান। কখনও-কখনও 'নিগ্রো'দের বাক্সবন্দী করে, পার্সেল করেও পাঠানো হয়েছে।

ডাডলি র‍্যানডাল ও মার্গারেট জি বারহোসের যুগ্ম সম্পাদনায় ম্যালকম এক্সের জীবন ও মৃত্যু বিষয়ে পদ্যের একটি সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। ম্যালকম এক্সকে ঘিরে ছিল রহস্যের সূক্ষ্ম তন্তু, কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের কাছে ম্যালকম পৌরাণিক চরিত্রের মর্যাদা অর্জন করতে পেরেছিলেন। বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে ম্যালকমের আপসহীন লড়াই তাঁকে ধর্মীয় আন্দোলনের দিকে টেনেছিল। নেবরাস্কার ওমাহায় ম্যালকমের জন্ম ১৯২৫ সালে। ম্যালকমের বাবা ছিলেন মার্কুস গার্ভির 'ইউনিভার্সাল নিগ্রো ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনে'র একজন সংগঠক। ম্যালকম নিজে কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিম হন। কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিম আন্দোলনে তাঁর স্থান ছিল ঠিক এলিজা মহম্মদের তলায়। পরে অবশ্য তিনি এলিজা মহম্মদের সংস্রব ত্যাগ করে গড়ে তোলেন, 'অ্যাফ্রো-আমেরিকান ইউনিটি' সংগঠন। ১৯৬৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে, হার্লেমের আবদুবন বলরুমে একটি রাজনৈতিক সভায় অংশ গ্রহণ করার সময় শ্বেতাঙ্গ পুলিস বাহিনী তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। সাম্প্রতিক কৃষ্ণাঙ্গ জাতীয়তাবাদী চিন্তায় তাঁকে অনেকখানি 'জনক' রূপে দেখা হয়। ম্যালকম নিজেও দক্ষিণ আফ্রিকার লেখক রিচার্ড রাইটের মত জিম-ক্রো শিক্ষার ভেতর দিয়ে গিয়েছেন, যে কোনও কৃষ্ণাঙ্গের পক্ষে যা বাধ্যতামূলক। তাঁর আত্মজীবনীর প্রথম পরিচ্ছেদেই আছে সেই দুঃস্বপ্নের বিবরণ।

হার্লেম বা ঘেটোয়

নিজের সংস্কৃতি তাদের অস্তিত্ব থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয়, পারিবারিক জীবন থেকে বঞ্চিত করা হয় শতাব্দীর পর শতাব্দী । অন্যের জন্য তাদের ঘাম ঝরাতে হয়েছে। সম্পূর্ণ বাতিল পদার্থের মত, ঘৃণার এক পরিবেশেই নতুন দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে শেখানো হয়েছে তাদের 'নিগ্রো' ভাব প্রকাশের বিকাশে, আমেরিকায় সমগ্র 'নিগ্রো' জীবনের বিকাশ ঘটাতে তাদের এক জটিল বিচরণ সারতে হয়েছে। মাথা কুটতে হয়েছে কঠিন পাথরে। এক বিপজ্জনক দোদুল্যমান অবস্থা।

প্রাচীনতম ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে মানুষের উত্থান, গ্রামীণ সরল জীবন থেকে জটিল, আমাদের সময়কার কলকারখানার জীবনে প্রবেশ ছিল কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের কাছে এক গভীর চ্যালেঞ্জ। স্বাধীন নাগরিক হিসেবে যে তারা এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে এমনও নয়। এ হল কৃষ্ণাঙ্গদের কাছে : অস্তিত্ব বনাম আত্মপরিচিতি। প্রাক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বনাম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। পূর্ব নির্ধারিত পরিস্থিতির দাস বনাম স্বাধীন অস্তিত্ব। এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাত বিশ শতক পর্যন্ত অবলীলায় বিস্তৃত। ঘেটো, তথা কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের বস্তিতে তা জ্বেলে দিতে পারে ভিন্ন এক রেঁনেসার মশাল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েই কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সে একজন খাঁটি আমেরিকানের মত, একজন সাচ্চা কৃষ্ণাঙ্গের মত-ই রক্ত তর্পণে অংশ নিয়েছে। যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে তারা প্রতিশ্রুতি এবং স্বাধীনতার মধ্যেকার দূরত্ব দেখতে পেল। আমেরিকায় তার অভিজ্ঞতাই তাকে ঠেলে নিয়ে গেল অস্বীকারের, তিক্ততার এবং অধৈর্যের এক ত্রিভুজ ভূখণ্ডে। এ আর সেই আগেকার কৃষ্ণাঙ্গ নয়, যে বলবে : 'শাদারা আবার যদি কালোমানুষের উপর হামলা করে, কিছু একটা ঘটবেই, শাদাদের মৃতদেহ পড়ে থাকবে।'

১৯১৭ সালের প্রতিবাদের মৌন মিছিলে অতীতের ধৈর্যের পাহাড়, সমস্ত কৃষ্ণাঙ্গদের একজনকেও খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না। এর আগে ১৯০৬ সালে আটলান্টা দাঙ্গার ঘটনায় বোয়া রচনা করেন 'দ্য লিটানি অফ আটলান্টা।' আর তার ১৬বছরের মধ্যে প্রকাশিত হয় 'দ্য বুক অফ আমেরিকান নিগ্রো পোয়েট্রি'। এই কাব্য সংকলনের বিষয়গত মূল সুর একটিই : 'নিগ্রোরা এখানে, আমেরিকায় থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং তাদের শ্রমের ফলও সম্পূর্ণরূপে পেতে চায়।' এই পর্যায় আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ আন্দোলনের এক নতুন পর্যায় : হার্লেম রেনেঁসা। যখন তারা কলম ও ব্যাঞ্জো এবং ড্রামকে ব্যবহার করছে অস্ত্রের মত। বিশেষ করে কলম।

জামাইকা থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান 'নিগ্রো', ক্লড ম্যাকে ১৯১২ সালে আমেরিকায় আসেন। ম্যাকের বয়স তখন মাত্র একুশ, কিন্তু তখনই তিনি কবি হিসাবে অর্জন করেছেন এক গভীর স্বাতন্ত্র্য। য়ুনিভার্সিটি অফ কানশাস থেকে আনুষ্ঠানিক পড়াশুনো শেষ করে ম্যাকে, হার্লেম রেঁনেসায় যোগ দেন। 'দ্য লিঞ্চিং', 'ইফ উই মাস্ট ডাই' এবং 'টু দা হোয়াইট ফ্রেন্ডস' ইত্যাদির পদ্যে ম্যাকের তীব্র বিরাগ, এক পবিত্র ক্রোধ প্রকাশিত হয়, হার্লেম সাহিত্যের এক বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল এইসব জীবন্ত ব্যাপার।

হার্লেম রেনেসাঁর দিকপাল ল্যাংস্টন হিউজেস, যিনি যথার্থভাবেই হার্লেম-মেজাজ, কৃষ্ণাঙ্গদের নতুন মূল্যবোধের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন, 'কফি-ব্রেক' নামে তার একটি গদ্যে হার্লেম চেতনা খোদাই করে রেখেছেন :

'আমার বস একজন শ্বেতাঙ্গ' সিম্পল বলল।

'বেশির ভাগ বস-ই তাই' আমি বললাম।

একদিন আমার বস গল্পচ্ছলে বললেন, 'এখন তো তোমরা সবাই সিভিল রাইটস বিল পেয়ে গেছ··· অ্যাডাম পাওয়েল-কে পেয়েছো কংগ্রেসে, রাষ্ট্রসংঘে,র‍্যালফ, মেট্রোপলিটান অপেরায় গাইছে লিওনতাইন প্রিস, এছাড়া মার্টিন লুথার কি নোবেল প্রাইজ পেলেন, আর কী চাও হে ?'···

আমি বললাম, 'এধরনের ব্যক্তিরা আমার প্রতিনিধিত্ব করছেন এজন্য আমি গর্বিত, কিন্তু আপনি যাদের নাম করলেন তাঁরা কেউ আমার সঙ্গে হার্লেমে থাকে না, একই বারে আমরা বিয়ার-পান-ও করি না। আমি যতদূর জানি ওঁরা কেউ হার্লেমে থাকেন না।'···

'যাইহোক তুমি চাও-টা কী ?' বস জিজ্ঞাসা করলেন।

'জেলের বাইরে যেতে', আমি বললাম।

'কোন জেল ?'

'যে জেলে আপনি আমাকে পুরে রেখেছেন।'

'আমি ? যাচ্চলে··· আমি লিবারাল, কেনেডিকে ভোট দিয়েছি। এবার দিলাম জনসনকে। আমি একাত্ম হওয়ায় বিশ্বাসী, আমাদের তো মিলন ঘটেই গেছে এরপর আর কি চাও ?'

'পুনর্মিলন' আমি বললাম।

'সেটা কী বস্তু ?'

'অর্থাৎ আপনি আমার সঙ্গে মিলেমিশে যান, আমি আপনার সঙ্গে মিলে যেতে চাই না।'

'একটা পয়েন্ট পর্যন্ত শাদারা তা-ও করতে রাজি।'

'আর নিগ্রোরাও তাই চায়, ওই পয়েন্টটিও মুছে ফেলতে।'

একটিই বিশ্ব

কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের সংগ্রামের, যন্ত্রণা ও বঞ্চনার ইতিহাসে 'পলাতক' এবং 'বিদ্রোহী' একই কথা। একেবারে প্রাথমিক সূত্র থেকেপাওয়া,এমন প্রভূত তথ্য আছে যা থেকে প্রমাণিত হয় দাসত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও স্বাধীনতার শেষহীন আকাঙ্খায় কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ প্রবাদপ্রতিম। দাসত্বের চূড়ান্ত ও একমাত্র ভবিতব্যই তাকে স্বাধীনতার এই তীব্র তৃষ্ণা দিয়েছিল।

ল্যাঙফোর্ড লেনের বর্ণনায় জীবনে প্রথম উদ্বেগ, তীব্র দুশ্চিন্তায় তিনি হারিয়ে যেতে থাকেন, যেদিন বুঝতে পারলেন তিনি একটি ব্যবহারযোগ্য বস্তুমাত্র··· 'আমার অবস্থা কোনওদিন বদলাতে পারে এমন কোনও সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবু আমি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ভেবেছি কী ভাবে স্বাধীন হতে পারি, মুক্ত হতে পারি। স্বাধীনতার শিখাটিকে প্রজ্জ্বলিত-রেখেছিল
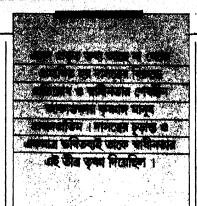
ঘটনাপারম্পর্য : এক মুক্ত কৃষ্ণাঙ্গকে হঠাৎ বন্দী করে নিয়ে এলে সে তার সঙ্গী গোলামদের অনুপুঙ্খ গল্প করে বলত স্বাধীনতা ঠিক কি রকম।

'রেসিয়াল ইকুয়ালিটির কংগ্রেস' এবং 'স্টুডেন্ট ননভায়োলেন্ট কো-অর্ডিনেটিংকমিটি' ভিয়েতনাম যুদ্ধকে নাগরিক অধিকারের দিক থেকে বিচার করেছিল। এঁদের মধ্যে কেউ-কেউ একথাও ঘোষণা করেন, 'আমাদের জোর করে বেঁধে নিয়ে গেলেও এ-যুদ্ধ লড়ছি না।' 'নিগ্রো'-আমেরিকানরা শান্তি আবেদন গানে রূপান্তরিত করে নিয়ে, মিছিলে ও সমাবেশে গলা ছেড়ে গান ধরেন। যুদ্ধ-কে তীব্র ধিক্কার দিতে থাকেন।

আশ্চর্যের বিষয় তবুও ১৯৬০ সালের হিসাবে দেখা গেল ভিয়েতনাম যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গদের সংখ্যা শ্বেতাঙ্গদের সমানই ছিল। ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরের শেষে ২০,০০০ কৃষ্ণাঙ্গ সৈন্য ছিল ভিয়েতনামে। ১৯৭০ সালে কৃষ্ণাঙ্গদের জঙ্গী আন্দোলন যখন খোদ মার্কিন মুলুকে গুলির জবাব গুলিতে দিতে শুরু করে, তখন বোঝা গিয়েছিল ভিয়েতনামে তার ভাড়াটে সৈন্যর ভূমিকাও কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে সহ্যের শেষ সীমায় নিয়ে এসেছে।

পরমাণু অস্ত্রের পৃথিবীতেও যে বর্ণবিদ্বেষ, কৃষ্ণাঙ্গের অস্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের অনুকূল মুক্ত সামাজিক পরিবেশ অনুপস্থিত—এক কথায় তা সভ্যতাকেই প্রশ্ন করে তার ভিত অবধি নড়িয়ে দেয়। আফ্রিকা বা আমেরিকা তার স্বানাঙ্ক যাই হক না কেন 'নেগ্রিটিউড' এক প্রবল, স্বাধীন শক্তি। 'নেগ্রিটিউড' একটি দার্শনিক অবস্থান। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক সংগ্রাম। এলিয়ন ডিয়প এবং সেঙ্ঘর এই দৃষ্টিভঙ্গীর জনক। সেঙ্ঘরের ভাষায়, নেগ্রিটিউড একটি জাতীয় চরিত্র···'নিগ্রো'-আফ্রিকানদের সাধারণ মানসিক বৈশিষ্ট্য—'তার সংবেদনশীলতার উচ্চমার্গ এবং প্রবল সংক্ষোভ গুণ। সংক্ষোভ-ই নিগ্রো···।'

আবার বিশ শতকের শেষ দিয়ে 'নিগ্রো' শব্দটি শোনামাত্র অনেক কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ বিরক্তি ও জ্বালায় ফেটে পড়বেন। তাঁদের মতে 'নিগ্রো' শব্দটি ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত। তার বদলে খুঁজে নিতে হবে অন্য একটি শব্দ 'কৃষ্ণাঙ্গ', 'কালো', বা 'অ্যাফ্রো-আমেরিকান'। তাঁদের মতে ক্ষমতার জন্য সংগ্রামে নাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে কারণে এমনও ভাবা হয়ে থাকে যেসব কৃষ্ণাঙ্গ নিজেদের মুক্ত করার চেষ্টায় মগ্ন এবং লড়ে চলেছেন কেবলমাত্র তাঁরাই কৃষ্ণাঙ্গ, বাদবাকি সমস্ত কালো মানুষ 'নিগ্রো'।

আবার অন্যদিকে চামড়ার রঙের থেকে উদ্ভূত কিন্তু যা চলে যেতে পারে হৃদয়ের তলদেশ পর্যন্ত সেই বর্ণসমস্যা ঘিরে, কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে এমন তাত্ত্বিকও জন্মেছেন যারা 'রেসিয়াল সুইসাইডের' প্রবক্তা। বলেছেন হে কৃষ্ণাঙ্গ নারী, পুরুষ, তোমরা তোমাদের থেকে হালকা রঙের নারী পুরুষকে বিবাহ করো।

মার্তিনিকুয়ান 'নিগ্রো' বংশোদ্ভূত ফ্রানৎজ ফ্যানন বর্ণসমস্যাকে দেখেছেন মনস্তাত্ত্বিকের চোখে : 'কালো হচ্ছে একজন কালো মানুষ। বলতে হয়, কিছু বিকৃতির ফলেই এটা ঘটেছে—পৃথিবীর স্তনের সান্নিধ্যে জন্মে সে চেয়েছিল পালিয়ে যেতে। সমস্যাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যা চাই তা হল কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে তার নিজের কাছ থেকে মুক্ত করতে। আমাদের খুব ধীরে এগোতে হবে, কেননা দুটি শিবির আছে—শ্বেতাঙ্গ আর কৃষ্ণাঙ্গ। মনোযোগের সঙ্গে দুটি শিবিরকেই আমরা প্রশ্ন করব।

এবং দেখব প্রায়শ তারা পরস্পরের সঙ্গে মিশে আছে। প্রাচীনতম প্রশাসক বা বুড়ি মিশনারি কারুর প্রতিই আমরা কোনও করুণা দেখাব না। কেননা যারা নিগ্রোদের দত্তক নিতে ইচ্ছুক আর যারা তাদের ঘেন্না করে—দু দলই সমান অসুস্থ। বিপরীত ভাবে যে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষটি নিজের জাতি-কে চুনকাম করে সাদা করে নিতে চায় সে এবং কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষী একজন শ্বেতাঙ্গের মধ্যে বিন্দুমাত্র ফারাক নেই।'

এক ঝাঁক বর্শার মত প্রশ্ন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে সুপারসনিক ট্রান্সপোর্টের যুগেও তাড়া করে আসে, যা আবার অন্যভাবে প্রমাণ করে, বেঁচে থাকার জন্য একমাত্র এই মাটির পৃথিবীকে অবহেলা করে আমাদের সমস্ত বিকাশ-ই যেন এখন মহাকাশগামী। কী সেই প্রশ্ন : শ্বেতাঙ্গ দুনিয়া 'এরকম' সুতরাং এসো আমরা 'এরকম' হই। শ্বেতাঙ্গ দুনিয়ার মুখ্য অবদমন হল প্রতিযোগিতা যার সঙ্গে আছে তার ক্ষমতার নিজস্ব ধারণা। গতি নিয়েও অবদমিত। ইস্পাত কঠিন সে। শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার একমাত্র জ্যামিতি হল অনেকগুলি সমকোণ। সে সব কিছু বাইরের করে তোলে। এসো থুতু ছেটাই, আর হয়ে ওঠি এমন মানুষ যে এসবের পরিপূর্ণ বিরোধী। সে একজন মানুষ। একটি মানব গোষ্ঠী ভালবাসছে তার আত্মীয় বন্ধনের ঐতিহ্যে, যাতে এ পৃথিবী হয়ে ওঠে একটি পরিবারের বিচরণ ক্ষেত্র।

গ্রন্থসূত্র

From Slavery to Freedom—John Hope Franklin
Protest and Conflict in African Literature—Edited by Cosmo Pieterre & Donald Monro
The Souls of Black Folk—W. E. B. Du Bois
Black Voices—Edited by Abraham Chapman
Mission to South Africa—The Commonwealth Report
Gurvey Movement—Theodore G. Vincent
Origins of Rhodesia—Stanlanke Samkange
Neo-African Literature—Janheinz John

একটি স্থগিত স্বপ্ন

নবনীতা দেব সেন

HARLEM

Langston Hughes (b. 1902)

What happens to a dream deferred?
Does it dry up
Like a raisin in the sun?
Or fester like a sore
And then run?
Does it stink like rotten meat?
Or crust and sugar over
Like a syrupy sweet?

May be it just sags
Like a heavy load.

Or, does it explode?

FOR A POET

Countee Cullen (b. 1903)

I have wrapped my dreams in a silken cloth
And laid them away in a box of gold
Where long will cling the lips of moth...
I hide no hate; I am not even wroth
Who found earth's breath so keen and cold;
I have wrapped my dreams in a silken cloth...

স্বপ্নকে স্থগিত রাখলে তার কী হয় ? সে কি শুকিয়ে যায়, প্রখর রৌদ্রে রাখা কিসমিসের মতো ? নাকি সেই স্থগিত স্বপ্ন দুষ্টক্ষতের মতো বজকে ওঠে ? দুর্বহ বোঝার মতো ভারি হয়ে ঝুলে পড়ে কি ? নাকি বিস্ফোরণ ঘটায় ? অথবা রেশমী রুমালে জড়িয়ে তাকে তুলে রাখা হবে সোনার কৌটোতে ?

হুবহু সমবয়সী দুজন কবির দু'জাতের স্বগতোক্তি শুনতে শুনতে আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ সাহিত্যকে একটি স্থগিত স্বপ্নের ইতিহাস বলেই মনে হয়।

প্রশ্নমালা

কৃষ্ণ সাহিত্য নিয়ে ভাবতে বসলেই কেবল প্রশ্নের পরে প্রশ্ন এসে পড়ে—

কৃষ্ণ সাহিত্য মানেই কি প্রতিবাদের সাহিত্য ? কৃষ্ণ সাহিত্যের কি সাহিত্যতত্ত্ব আছে কিছু ? কৃষ্ণ সাহিত্যে কালো মানুষের জীবনজিজ্ঞাসা কি সংখ্যালঘুর চেতনা বা উপনিবেশিতের সমস্যার চেয়ে আলাদা জাতের ? নাকি বিশ শতকে মানবিক অধিকারের প্রশ্নের অন্তর্গত অনেক ধরনের সমস্যার একটি ? মারকিনি কৃষ্ণ সাহিত্যে কৃষ্ণাঙ্গচেতনা আর মারকিনি-চেতনা কি মিলেমিশে গেছে নাকি কোনো দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে দুটি চেতনার মধ্যে ?

কৃষ্ণসাহিত্যে কালো মানুষের জীবনদর্শনের কোনো ক্রমবিবর্তন ধরা পড়ে কি ? কৃষ্ণসাহিত্যের উদ্দিষ্ট পাঠক কে ? সাদা-কালো দু' রঙের পাঠক কি একই 'পাঠ' পড়েন ? না পাঠকের বর্ণভেদে কৃষ্ণ সাহিত্যের পাঠভেদ হয়ে যায় ?

সেক্ষেত্রে কালো সাহিত্যের সাদা সমালোচনা কতদূর গ্রহণযোগ্য ? সাদা পাঠক কি কালো সাহিত্যের "শ্রাদ্ধাধিকারী" ?

কালো সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচারের জন্য কি সাদা সাহিত্য বিচারের মানদণ্ড ব্যবহার করা ন্যায়সঙ্গত ? নাকি শিল্পসাহিত্যের রসবিচার সার্বজনীন ?

'সার্বজনীন' 'বিশ্বজনীন' ইত্যাদি শব্দগুলি কৃষ্ণাঙ্গের কাছে কতদূর অর্থবহ ?

সাদা লেখক, কালো লেখকের সচেতন শিল্পসাধনায় কোনো চারিত্রিক পার্থক্য আছে কি ?

আফ্রিকার কৃষ্ণ সাহিত্য আর আমেরিকার কৃষ্ণ সাহিত্য কি তুলনীয় ?

আফ্রো-আমেরিকান সাহিত্যের কতখানি আফ্রিকা আর কতটা আমেরিকা ?

সাদা লেখকের আমেরিকা আর কালো লেখকের আমেরিকা কি একই ?

কোনো "অল-আমেরিকান ভ্যালুসিস্টেম" থাকা কি সম্ভবপর, যা সাদা-কালো লাতিন নির্বিশেষে যাবতীয় আমেরিকানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—জীবনে, এবং সাহিত্যে ?

কালো সাহিত্যের কালো মানুষ, সাদা মানুষরা সাদা সাহিত্যের কালো, সাদা মানুষদের চেয়ে কি আলাদা ?

কালো সাহিত্যিকদের রচনা "মারকিনি সাহিত্যে"র মূল ধারায় সেদিন পর্যন্তও গৃহীত হত না কেন ? তার গুণগত মান কি যথেষ্ট উঁচু নয় ?

আমেরিকাতে কালো আর সাদা লেখকের সমাজগত এবং শিল্পগত সুযোগ-সুবিধে কি সমান সমান ?

কৃষ্ণ সাহিত্যের কোনো লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে কি ?

গণতান্ত্রিক নিয়মে মারকিন সাহিত্যের মূল ধারার সঙ্গে সাদা-কালো উভয়ের রচিত শিল্পই যুক্ত হওয়া উচিত কিনা ?

বর্ণনিরপেক্ষ হয়ে সাদা-কালো সাহিত্যিকদের উৎকর্ষের প্রতিযোগিতায় নামা উচিত নয় কি ? নাকি 'কৃষ্ণ সাহিত্যে'র মেহেন্দী বেড়ায় চিরকালই ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে বিশ্বের নজর কেড়ে যাওয়াটাই সম্মানের ?

মার্ক টোয়েন

কৃষ্ণ সাহিত্য এখন দিগ্বিদিকে রীতিমতো ফ্যাশনেবল পাঠ্যবস্তু, এমন কি সুইডিশ অ্যাকাডেমিতেও। তাদের নাকি মুশকিল হয়েছিল, নাদিন গর্ডিমারকে নোবেল পুরস্কারটা দেবেন না ওলে শয়িংকাকে ? নাদিনকে দিলে এক তীরে অনেকগুলি পাখি মরে। একে জঙ্গী, অ্যান্টি-আপারথাইড মনোভাবের মুখপাত্রী, তায় নারী, তায় আফ্রিকান, কিন্তু কার্যত দেখা গেল দক্ষিণ আফ্রিকার গোলমেলে রাজনীতির ব্যাপারে না গিয়ে, তাঁরা বেছে নিলেন স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্র নাইজেরিয়াকে। নারীর বাজারটা তত ভাল নয়। আফ্রিকাবাসিনী হলেও, জঙ্গী হলেও, নাদিন গর্ডিমার সাদা চামড়া। শয়িংকা কালো ; যদিও প্রধানত লন্ডনপ্রবাসী।

কিন্তু একটা প্রশ্ন মাথায় থেকে যায় ? পুরস্কারের জন্য ভাবা হচ্ছিল তাহলে 'কৃষ্ণ' নয়, 'আফ্রিকান সাহিত্য' নিয়ে ? মারকিনি কৃষ্ণ সাহিত্য স্পষ্টতই তার মধ্যে পড়ে না। তাহলে কি আফ্রো-আমেরিকান সাহিত্য এমনই এক বিপজ্জনক ত্রিশঙ্কু বিন্দুতে দাঁড়িয়ে, যেখানে সে না আফ্রো, না আমেরিকান ? তবে তার পরিচয় কী ?

কৃষ্ণ সাহিত্যের ত্রি-স্তর যাত্রা

কৃষ্ণাঙ্গ জীবনদর্শনের প্রবাদপুরুষ ফ্রানৎস ফানোঁ কৃষ্ণ সাহিত্যের ক্রমবিকাশে তিনটি স্তর পরম্পরার কথা বলেছেন— প্রথমে চলে assimilation, দ্বিতীয় ধাপে ঘটে ethnic discovery এবং শেষ পর্যন্ত revolution ! এই প্রণালীর মাধ্যমেই ঘটে কালো মানুষের আত্মনির্ণয়। সাহিত্যেও, জীবনেও।

এই তিনটি ধাপ যাবতীয় ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতেই প্রযোজ্য বলে মনে হয়, যে কোনো নিপীড়িত অবদমিত সম্প্রদায়ের আত্মনিরূপণের

সঙ্গেই এই প্রণালীটি জড়িয়ে আছে, লাতিন আমেরিকান সাহিত্য, ইহুদী সাহিত্য, মেয়েদের সাহিত্য। কিন্তু বিশেষ করে আফ্রো-আমেরিকান সাহিত্যের ইতিহাস একেবারে এই সড়ক ধরেই এগিয়েছে। উনিশ শতকের সাহিত্যে ছিল assimilation-এর পন্থা, বিশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও তাই দেখছি। কালো মানুষ সাদার মতো করেই ভাবছে, সাদার চোখেই নিজেদের দেখছে। কৃষ্ণাঙ্গ সাহিত্যের আরেক কিংবদন্তি, দুবুয়া যাকে 'দ্বৈত চৈতন্য' বলেছেন, এই সাদার দর্পণে কালো মুখ দেখা। শুধু যে সাদাদের বইতে যে রকম কালো চরিত্র রচিত হত, কালো সাহিত্যেও তেমনি চরিত্রই আসত তাই নয়, আপনার জীবনযাপনেও সেই সব মূল্যবোধ আরোপ করেছেন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ। কালো মেয়ে লোরেইন হানসবেরি কি সাধে দুঃখ করেছিলেন যে, মেয়েরা অনেকটা কৃষ্ণাঙ্গদের মতো ? নিজের সম্পর্কে অন্যের তৈরি করা বিভিন্ন ধরনের রূপকথা নির্বিবাদে মেনে নেয় এবং সেই ছবি অনুযায়ী নিজেকে গড়েপিটে সমাজে নিজস্ব ভূমিকা তৈরি করার চেষ্টা চালায়। এই সর্বনেশে আত্মঘাতী অভ্যাস কৃষ্ণাঙ্গের বহুদিন ছিল, মেয়েদের তো এখনও আছে।

মারকিনি কৃষ্ণ সাহিত্যের দ্বিতীয় ধাপ এল মার্কাস গারভে-র প্যান-আফ্রিকানিজমের তত্ত্ব হয়ে। "আদি জননী আফ্রিকা"র প্রতিমা এবং কৃষ্ণত্বের চেতনা (negritude) নিয়ে গারভে দাস প্রথায় নিষ্পেষিত আত্মপরিচয়হীন কালো আমেরিকানদের হৃত আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার প্রয়াস শুরু করলেন। কালো মানুষের লুপ্ত মানবিক মর্যাদা পুনর্গঠনের জন্য তাদের মূলের চেতনা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। উন্মূলিত প্রাণগুলির আত্মিক পুনর্বাসনের চমৎকার ব্যবস্থা হল, "আদি মানব আদি মানবী"র আদি জন্মভূমি সুদূর আফ্রিকার প্রতি বিশ্বস্ততা জাগ্রত করে। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গের এই আদিমানব (নোবলস্যাভেজ ?) চেহারাও কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানের পক্ষে স্বাস্থ্যকর ছিল না।

ফানোঁর বিশ্লেষণের এই দ্বিতীয় স্তরের (ethnic discovery'র) বাড়াবাড়ি চলল বহুদিন তা থেকে মোটামুটি মুক্তি এনে দিল, ঠিক বিপ্লব নয়, ত্রিশের দশকের বামপন্থী দর্শন। এবার তৈরি হলো কালো মানুষের অন্য রকম একটি চিত্রকল্প "বিশেষভাবে নিপীড়িত, শোষিত প্রোলেটারিয়ান" মূর্তি। মূর্তির কারিগর সাদা লিবারেল পন্থীরা। আফ্রো-ইমেজের সঙ্গে সঙ্গে যে লোকশিল্প, লোকসঙ্গীত, গ্রামীণ সংস্কৃতি এসেছিল, ডিপ্রেশনের ভয়াল কঠোর হাত সেসব হটিয়ে দিয়েছে, সূচনা হয়েছে সমাজসচেতন নাগরিক শিল্পচেতনার। হারলেম-রেনেসাঁসের হারলেম হারিয়ে গিয়ে এক হিংস্র, কুৎসিত, পতিত, অবক্ষয়ী দীনহীন হারলেমের রূপ ফুটে উঠেছে সাহিত্যে।

পরবর্তী পর্যায়ে পাওয়া যাচ্ছে, বিচ্ছিন্ন, একাকী, অস্তিত্বসন্ধানী, অনাবাসী এক আউটসাইডার কৃষ্ণাঙ্গের মূর্তি, যে তার নিজস্ব পরিবেশেও বেমানান। যার অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে গেছে, নিজের কালো সমাজের সঙ্গেই সে আর খাপ খাওয়াতে পারছে না। এই বিপুল প্রবল শত্রুপুরী, সাদা মানুষের সভ্যতার মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বাঁচার লড়াইতে সে ক্লান্ত।

হুইটম্যান

আদি জননী : কৃষ্ণা আফ্রিকা

এইমে সেজেয়ার বলেছিলেন—"কালো মানে কিছুর অভাব নয়, কালো মানে প্রত্যাখ্যান।" এই আদর্শ কালোর মূর্তি মারকিনি কালোকে ধার করতে হয়েছিল আফ্রিকা থেকে। ক্রীতদাস-বংশোদ্ভূত মারকিনি কৃষ্ণাঙ্গের অবস্থা তো স্বাধীন আফ্রিকার রাষ্ট্রের (তা, সেই স্বাধীনতায় যতই ত্রুটি থাকুক, যতই বিভ্রান্ত, ফাসিস্ট রাজত্ব হোক সেটা কালোর সঙ্গে কালোরই সম্পর্ক) কালোদের মতো নয়। তাই মারকিন কৃষ্ণাঙ্গরা যখন নেগ্রিচ্যুড নিয়ে মাতামাতি করছেন সেই বিশ বছর আগেই (সদ্য নোবেল পুরস্কৃত) ওলে শয়িংকা আত্মস্থ কণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন—"বাঘকে তো কই তার ব্যাঘ্রত্ব ঘোষণা করে বেড়াতে হয় না, যে নিগ্রোকে তার নিগ্রোত্ব চেঁচিয়ে জাহির করতে হবে ?" আফ্রিকান কালোর সঙ্গে মারকিনি কালোর অবস্থাটা বোঝাই যাচ্ছে, ঠিক তুলনীয় নয়। আফ্রিকান কালো তার স্বভূমিতেই স্থিত আছে, বাস্তুচ্যুত হয়নি। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে ফেলেনি তার গোষ্ঠীপরিচয়, রীতিনীতি সংস্কৃতি, বন জঙ্গল নদী।

ভারতবর্ষের 'পণপ্রথা' উঠে যাবার মতই আমেরিকাতে বর্ণবৈষম্য আইন করে তোচালু নেই,চলু আছে সর্বসম্মতিক্রমে। এই 'সর্বসম্মতি' মানে সাদার সম্মতি। আইন বরং ভাঙা যায়, বদল করা যায়, কিন্তু 'সর্বসম্মতি' বড় ভয়ঙ্কর বস্তু। ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইলেও কি আজ কালো মানুষের ধমনী থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যাবে ক্রীতদাস প্রভুর দূষিত শোণিতের কণা !

যদিও তাদের কাঁধেও চেপেছে বিভাষা, বিধর্ম, বিদেশী শাসকের সংস্কৃতি, তবু হারিয়ে যায়নি শিকড়। বিদেশী শাসকের কায়দাই হচ্ছে তোমার সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম, সব কেড়ে নেবো, কিন্তু আমারটাতে তোমায় পূর্ণ অধিকার দেবো না। নিজ বাসভূমে থাকলে, তবু সবটা কেড়ে নেওয়া যায় না। তাই আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গের (দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ার অপূর্ব ঐতিহাসিক পরিস্থিতি বাদ দিলে) অবস্থা মারকিনি কৃষ্ণাঙ্গের চেয়ে ভালো ছিল। মারকিনি কালোকে মূল খুঁজতে ছুটতেই হয়েছে জননী আফ্রিকার দিকে, যার কিছুটা রয়েছে স্মৃতিতে, বাকিটা অজানা, সবটা মিলিয়ে এক মধুর রহস্য। গারভের প্যান-আফ্রিকানিজম কালো মানুষের জীবনের সঙ্গে তার শিল্পের যোগাযোগ সৃষ্টি করেছিল। কালো মানুষের সঙ্গে কালো মানুষের গাটছড়া বেঁধে রাখবার চেষ্টায় সে জয়ী হয়েছিল।

সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির গাঁটছড়া এইখানেই বাঁধা হল। আফ্রিকায় নিজেদের স্বরূপসন্ধানে গিয়ে মারকিন কৃষ্ণাঙ্গ লেখক আবিষ্কার করলেন, দু ধরনের মনোভাব গ্রহণ করা যায় শিল্পের প্রতি। লী রয় জোনসরা ভাবলেন, শিল্প রাজনীতিরই একটি অস্ত্র—আরেক দল যেমন এলড্রিজ ক্লিভর, মনে করলেন শিল্প দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রসূত ফলবিশেষ। কিন্তু এঁরা দুজনেই বিশ্বাস করেন বন্দুকের নলেই কৃষ্ণাঙ্গের সমস্যার সমাধান। এবং কৃষ্ণাঙ্গ সাহিত্যে কৃষ্ণাঙ্গ-সমস্যাই প্রধান থীম হয়ে থাকবে, এখনও বহুকাল—নৃতাত্ত্বিক অর্থে উৎস-মুখী শিল্পই আধুনিককালের কৃষ্ণাঙ্গের সংস্কৃতির চরিত্র নির্ণয় করবে। সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী আর সাংস্কৃতিক ঐক্যবাদীদের মধ্যে ফারাক আছে। কালচারাল ন্যাশনালিস্টরা সঙ্কীর্ণ পথে চলায় বিশ্বাস করেন, কালচারাল ইনটিগ্রেশনিস্টরা শিল্পের জন্য উদারতর বিশ্বজনীন পথের দাবী রাখেন।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন ওঠে 'বিশ্বজনীন' মানে কী ? মারকিনি উল্লেখ সূত্র অনুযায়ী ওই শব্দের অর্থ : সাদা চামড়ার বিপুল জীবনের অসংকোচে নির্দ্বিধায় যা গৃহীত হবে—তাই। 'সর্বজনীন' 'বিশ্বজনীন' এই শব্দগুলি সাদা মূল্যবোধ বোঝায় এবং কালোদের প্রয়োজনে লাগে না। বরং নবজাগ্রত বিপুল শক্তিসম্পন্ন কৃষ্ণ-চৈতন্যকে বিপথগামী করে। সেই সময়ে গারভের প্যান-আফ্রিকান স্বপ্ন, কালো মানুষের নিজস্ব পৃথিবী গড়ার পক্ষে, অতীতের সঙ্গে গ্রন্থি বাঁধার পক্ষে, কালো মানুষের আত্মা আবিষ্কারের পক্ষে নিতান্ত জরুরি ছিল। বিশের দশকের সেই আবেগবিহ্বল শ্যামা-মায়ের পায়ে প্রণতি রাখার কবিতা ক্রমশ বদলে গেছে। আফ্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ যত সহজ হয়েছে, বাস্তব এসে মুছে দিয়েছে অনেক স্বপ্ন-মায়া, মিথ্যে রহস্য কল্পনা। সাদা আধুনিক আমেরিকার বিকল্প হিসেবে আনা হয়েছিল আর্কিটাইপাল আদিশক্তিরূপিণী আফ্রিকাকে। গ্রেকো-রোমান ক্লার্তের ধারার পরিবর্তে আফ্রিকার রহস্যময় অস্পষ্টতা। "যুক্তিবাদই সাদা-সভ্যতার ভিত্তি ? বেশ, আমরা কালোরা তবে সাদার যুক্তির ধার ধারি না !"

"পাশ্চাত্য শিক্ষাই তো ভুয়োদর্শন মগজে ঢুকিয়েছে ? বেশ, সাদার তৈরি শিক্ষার ঐতিহ্য আর তবে গ্রহণ করব না আমরা।" সুতরাং, যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সাদা মানুষের প্রাণাধিক—কালো মানুষ তাও অনায়াসেই বিসর্জন দিতে রাজি। ক্রমশ পুরো মনোভাবটিই হয়ে দাঁড়ালো নঞর্থক—কী নেবো না, কী প্রত্যাখ্যান করবো, কী ফেলে দেবো—সাদার বিরোধিতা করাই যেন বেশি জরুরি হয়ে দাঁড়ালো মারকিনি কালোর আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে। এর মধ্যে একটা মস্ত ফাঁক থেকে যাচ্ছে—থেকে যাচ্ছে ইতিহাসের বিরুদ্ধে যাওয়া এবং বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়।

এই সময়ে ফ্রানৎস ফানোঁর আরেকটি সদুক্তি খুব কাজে লাগলো। ব্ল্যাকমিলিট্যান্টরা এই জরুরি উপদেশটি মেনে নিয়েছিল; সেদিক থেকে দেখলে প্যান আফ্রিকানইজমের পতনেও ফানোঁর খানিকটা অবদান আছে। ফানোঁ বলেছিলেন, ঠিক যেমন সাদা মানুষের দেওয়া মূল্যবোধের পথ ধরে এগুলে কালো মানুষের গন্তব্যে পৌঁছুনো যাবে না, তেমনিই আদি জননী আফ্রিকার রহস্যাবৃত আঁচলের ছায়াময় অতীতকে আঁকড়ে ধরলেও আজকের কালো মানুষ তার ভবিষ্যতের পথরেখা খুঁজে পাবে না। বিশেষ করে মারকিনি কালো মানুষ। আধুনিক কৃষ্ণাঙ্গ মানবতাকে নতুন, নিজস্ব, সময়োপযোগী এক মননের পৃথিবী গড়ে নিতে হবে, নয়া মূল্যবোধ, নয়া জীবনবোধ সমেত।

ফানোঁর কথার সত্যতা প্রকাশে দেরি হল না। আফ্রিকার সঙ্গে আফ্রো-আমেরিকার যে মিলের চেয়ে ফারাকই বেশি, ক্রমেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো, পরিচয় যতই ঘনিষ্ঠ হলো। মারকিনি কালো মানুষের একটা অস্তিত্বের সমস্যা আছে যার কেন্দ্রে আছে উদ্বাস্তু কৃষ্ণাঙ্গের অ্যাবসার্ডিটি আর সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতাবোধ। পাশ্চাত্য সমাজের আস্থাহীনতা, নীতিহীনতার চাপে ওদিকে ব্যক্তির মানবিক আত্মমর্যাদা বজায় রাখার সংগ্রাম, এই বৈরভাবাপন্ন, যুক্তিবিচ্যুত, অনুভূতিরিক্ত জীবনবিরোধী যান্ত্রিক সভ্যতায় যুক্তি, বুদ্ধি, হৃদয়, ব্যক্তিচেতনা বজায় রেখে জীবনধারণ করার যে যুদ্ধ, তা সাদা-কালো উভয়েরই। সেদিক থেকে, আফ্রিকার চেয়ে আমেরিকাই বেশি চেনা কালো মারকিনির।

১৯৫৬তে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ লেখক সম্মেলনে রিচার্ড রাইট স্পষ্টই বললেন আফ্রিকা নিয়ে মাতামাতি করাটা অবাস্তব হচ্ছে। র‍্যালফ এলিসনও বললেন আফ্রিকার সঙ্গে একাত্মবোধ করতে তাঁর খুব অসুবিধে হয়। এবং বলডউইন তো বলেইছেন প্যারিসে তাঁর যখনই কোনো আফ্রিকাবাসীর সঙ্গে দেখা হয়, দুজনেরই বেজায় অস্বস্তি হতে থাকে—দেখতে এক রকম হলে কি হবে, তাঁদের উল্লেখ সূত্রগুলো সবই আলাদা, জীবনযাপনের গোটা চরিত্রটাই আলাদা। কালো আমেরিকানদের আফ্রিকা নিয়ে সাহিত্যে মাতামাতি উঠে গেল বটে, কিন্তু এল আফ্রো হেয়ারস্টাইল, আফ্রিকান পোশাক ওই ষাটের দশকেই। কালো মানুষের মনে একটা টানাপোড়েন কিন্তু চলতেই থাকলো। নইলে অ্যালেক্স হেলির "রুটস" নিয়ে অত মাতামাতি—এবং তারপরে ওই কেলেঙ্কারি হত না!

ক্রীতদাস প্রথা আফ্রো-আমেরিকান মানুষের মানবিক অধিকার এবং মর্যাদাবোধ যেভাবে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, উপনিবেশবাদ ঠিক সেইভাবে (দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়া বাদে) আফ্রিকাবাসীর স্বরূপ্যসংকট সৃষ্টি করেনি। আফ্রো-আমেরিকানের তাই আফ্রিকাকে দরকার, বংশপরিচয়ের জন্য, শিকড় সন্ধানের প্রশ্নটি ঠিক সেই ধরনে জরুরি নয় আফ্রিকার স্বাধীন দেশগুলিতে। অ্যালেক্স হেলি "রুটস" লিখে যে কাণ্ডটা বাধালেন, কোনো আফ্রিকান লেখকের পক্ষে তা সম্ভবপর হতো না। না পেতেন তিনি সেই গ্ল্যামার, না এই লজ্জা। একজন কালো মারকিনির শিকড় সন্ধানের অভিযানে আফ্রিকার গ্রামে পৌঁছোনোর কল্পকাহিনীকে মিথ্যে করে সত্য ঘটনা বলে চালিয়ে দেবার মধ্যে এবং বেস্ট সেলার হবার মধ্যে এক জটিল সামাজিক মনস্তত্ত্ব বেরিয়ে আসছে। কালো সমাজের এই তীব্র শিকড়ের তৃষ্ণা—(শুধু কালো সমাজেরই তো নয় সারা আমেরিকার সাদা সমাজেরও তো আছে সেই একই তৃষ্ণা, হারানোর বাস্তব স্বপ্ন)—এবং সাদা সমাজের কাছে সেই তৃষ্ণার গুরুত্বের ঐতিহাসিক স্বীকৃতি রয়েছে "রুটস" পুরস্কৃত হবার মধ্যে। তারপরেই হলো কেলেঙ্কারি। প্রমাণিত হলো "রুটস" উপন্যাস মাত্র, ইতিহাস নয়।

প্রশ্ন ওঠে, অ্যালেক্স হেলি উপন্যাসকে 'উপন্যাস' বলে না লিখে, কেন হঠাৎ "আত্মজীবনী" বললেন ? হতে পারে যেহেতু তিনি ম্যালকম এক্স-এর আত্মজীবনীর লেখনীকার হিসেবেই প্রথম খ্যাতি এবং বাণিজ্যিক সাফল্য পেয়েছিলেন, তাব হয়তো মনে হয়েছিল, ওই আত্মজীবনী-ঘেঁষা লেখাই 'সাদা পাবলিক খাবে'। উপন্যাস হিসেবে শৈল্পিক স্বীকৃতি পাওয়া না-পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। তিনি কি সেই বাণিজ্যিক সাফল্যের লোভেই এ যুগের এত বড় সাহিত্যিক প্রতারণাটি (প্রায় গলফ চ্যাটারটনের সমগোত্রীয়) ঘটিয়েছিলেন ? নাকি তার পিছনে ছিল গভীরতর কোনো কারণ ? কারণ যাই হোক, এই ঘটনাটি থেকে চমৎকার একটি সামাজিক মনস্তত্ত্বের প্যাটার্ন ফুটে ওঠে, একটি হলো কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানের স্বারূপ্য সন্ধান ও সাহিত্যিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার রূপ, আরেকটি সাদা সাহিত্য বিচারকদের চোখে তার মূল্যায়নের।

প্রতিবাদের সাহিত্য ?

লোরেন হানসবেরি একবার ষাটের দশকের গোড়ায় বলেছিলেন—"আজকের যুগে কি এমন কোনো আধুনিক সাহিত্য আছে, যা প্রতিবাদী সাহিত্য নয় ? সাদা-কালো-হলদে যাই হোক, জরুরি লেখা মাত্রেই কোনো না কোনো নিপীড়নের শোষণের বিরুদ্ধে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—।" আবার ওই দশকেরই শেষভাগে (July 1968, Negro Digest) ল্যারি নীল লিখছেন—"সত্যি বলতে কি, আমরা প্রতিবাদী সাহিত্য লিখছি কিনা সেটাতে এসে-যাচ্ছে না। আমি এমন সব প্রেমের কবিতাও লিখেছি, মানব আত্মাকে মুক্ত করার কাজে আমার লেখা যে কোনো যুদ্ধের কবিতার চেয়ে কম কৃতিত্বের নয়। না, শুধুমাত্র প্রতিবাদের শিল্প চলতে পারে না। প্রতিবাদী সাহিত্য ধরে নেয় যাদের সঙ্গে কথা বলছি, তারা পরিস্থিতিটা জানে না, বোঝে না। আমরা তাদের সেই মনোভাব বদল করতে চাই, তাই তাদের কাছে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এই সংকীর্ণ অর্থে, প্রতিবাদের কৃষ্ণ সাহিত্য শেষ বিচারে হয়ে দাঁড়াচ্ছে সাদা প্রভুর কাছে অনুনয় বিনয় বা গালমন্দের তড়পানি—মোট কথা কালোদের মানবিক সম্ভ্রম ভিক্ষা করে সাদার কাছে ওকালতি। এভাবে মুক্তি আসে না। কালোদের বাক্যালাপ হওয়া চাই নিজেদেরই মধ্যে। সাদাদের সঙ্গে নয়—পরস্পরের সঙ্গে। প্রতিবাদ নয়, স্পর্শ করতে হবে। পরস্পরের বিস্ময়, বিপন্নতা, সৌন্দর্যকে স্পর্শ করে শক্তি সংগ্রহ করতে হবে আমাদের।" ১৯৩৭-এ রিচার্ড রাইট এই কথাই তাঁর বিখ্যাত "ব্লু প্রিন্ট ফর নিগ্রো রাইটিং"-এ লিখেছিলেন। তাঁর মতে, কৃষ্ণ সাহিত্য সাদা চামড়ার সামনে ন্যায় বিচারের জন্য ওকালতি করছে। রাইট বলেছিলেন—"কালো লেখককে সাদাদের জন্যে লিখলে চলবে না। তাকে কালোদের জন্যেই লিখতে হবে। তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতন করতে হবে, নতুন জীবনদর্শন গড়ে দিতে হবে তাদের জন্য, নেতৃত্ব দিয়ে নতুন লক্ষ্যের দিকে কৃষ্ণ মানবকে পরিচালিত করার দায়িত্ব কালো লেখকের।"

মারকিনি কৃষ্ণাঙ্গ লেখককুলের অনেকে নিজেরাই মনে করেন, তাঁদের কৃষ্ণ সাহিত্যের মান খুব উন্নত নয়। তার কারণ, সে লেখা হয় সাদার অন্ধ অনুকরণে, নয় সাদার বিরুদ্ধে অনুযোগ-অভিযোগে, ক্রোধে ঘৃণায় তৈরি। হয় তা কৃত্রিম, অবাস্তব, নয় তা প্রবল প্রতিবাদী, অশিল্প, খুব কমই উন্নত শিল্পমান বজায় রাখে। লী-রয় জোনস-এর বিশেষণটি মনে রাখার মতো, "ইমপ্রেসিভ মিডিয়ক্রিটি।" সাদাদের কথায় মাথা ভর্তি করে রেখে কৃষ্ণ সাহিত্য লিখলে চলবে না। লী রয় জোনস যে আফ্রিকা-চেতনা থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য নয়া নন্দনতত্ত্ব সৃষ্টি করলেন, তার চেহারা নঞর্থক নয়, সদর্থক। অর্থাৎ সাদা পাঠকগোষ্ঠীকে সচেতনভাবে বর্জন করে কালো লেখক কালো পাঠকের দিকে এগিয়ে যাবেন। ল্যারি নীলের ব্যাখ্যায় লী রয় জোনসদের প্রতিবাদী শিল্পের সংজ্ঞা মোটেই এই নয় যে, সাদা দর্শকের সামনে নেচেকুঁদে চেঁচিয়ে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। বরং সেটাই বন্ধ করে, এবার কথা কালোয় কালোয়।

"They are not speaking of an art that screams and masturbates before white audiences....instead they are speaking of an art that addresses itself directly to black people...in terms of our feelings and ideas about the world: an art that validates the

positive aspects of our life style. Dig: an art that opens us up to the beauty and ugliness within us, and finally posits for us the vision of a Liberated Future."

(P. 154, Black Poets & Prophets)

ল্যারি নীল বলছেন, ব্ল্যাক ইসথেটিক মানে কেবল শিল্পসৃষ্টির তত্ত্বই নয়, কৃষ্ণ সাহিত্যের নান্দনিক কলাকৈবল্য নয়, ধ্বংসের তত্ত্বও। সাদা মূল্যবোধের কাঠামোটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়াটাও কৃষ্ণ নন্দনতত্ত্বেরই গুরুতর অঙ্গ। সাদাদের বেঁধে দেওয়া দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনটা দেখলে চলবে না। ওটা আগে ভাঙতে হবে। দু বুয়ার সেই সাবধানবাণী—"খণ্ডিত সত্তা" সেই "দ্বিত্ব-চেতনা", অর্থাৎ সর্বদা সাদার চোখ দিয়ে নিজেদের দেখা, অন্যের ঘৃণাভরা দৃষ্টির গজফিতে নিয়ে আপন আত্মার মাপ নেওয়া। ষাটের দশকে এসেছে ফানোঁর তৃতীয় স্তর—Revolution—ব্ল্যাক মিলিট্যান্টদের চিৎকৃত বিপ্লব। দ্বৈতসত্তা চলবে না—আমরা চাই কৃষ্ণসত্তা। "বিশ্বমানবের" "বিশ্বজনীনতা" শুধুই সাদা মানুষের পরস্পর গা-ঘেষাঘেঁষি। মিলিট্যান্ট ব্ল্যাকরা ওসব সর্বজনীন সাহিত্য সৃষ্টিতে বিশ্বাস করেন না—আপাতত কালোদের কৃষ্ণবিশ্বে কৃষ্ণজনীনতাই যথেষ্ট। "সর্ব", "বিশ্ব" (ইউনিভার্সাল) এই সব শব্দার্থে যে-মূল্যবোধ জড়িয়ে আছে, তা সাদা জগতের, সাদা সমাজের, সাদা মানুষের বানানো। কৃষ্ণাঙ্গের তাতে এককালে মাথা গলানোর অধিকার ছিল না। আজ কৃষ্ণাঙ্গই তাতে মাথা গলাতে অরাজী। সাদা-কালোর মিল-মিশের পন্থার (assimilation আর integration-এর) চেয়ে সর্বনাশা কিছু হতে পারে না। কালোকে গ্রাস করে ফেলবার, তার এথনিক বৈশিষ্ট্যকে, তার স্বকীয় চরিত্রকে, তার অতিকষ্টে বহু পরিশ্রমে আবিষ্কৃত স্বরূপ্যকে সর্বগ্রাসী সাদার পায়ে বিসর্জন দেবার ফাঁদ মাত্র। এই ফাঁদ থেকে বুদ্ধিমান কৃষ্ণাঙ্গ লেখক মাত্রেই দূরে থাকবেন। সাধারণভাবে "মারকিনি-সত্তা" বলে বর্ণহীন কিছু নেই। তথাকথিত All American সত্তাটির রং ধপধপে সাদা। হয় তুমি ব্ল্যাক-আমেরিকান, অর্থাৎ আফ্রো-আমেরিকান, নয় তো আমেরিকান। রেডিওর একটি আলোচনাতে ল্যাংস্টন হিউজই একবার বলেছিলেন—"আমেরিকাও ওই সাউথ আফ্রিকার মতই—এখানে কেবল ব্যাপারটা সূক্ষ্মতর।" র‍্যালফ এলিসনকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল প্যারিস রিভিয়ুর সাক্ষাৎকারে—"ইনভিজিবলম্যান' উপন্যাসকে আপনি কি বিশুদ্ধ শিল্পবস্তু বলে, প্রতিবাদী শিল্পের ঐতিহ্যের বিরোধী বলে মনে করেন?"

এলিসন বলেছিলেন—"শিল্প এবং প্রতিবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কোথায়? ডস্টয়েভস্কির 'নোটস ফ্রম দি আনডার গ্রাউন্ড' তো উনিশ শতকের যুক্তিবাদিতার সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ডন কে হোতে, ইডিপাস রেক্স, ম্যান'স ফেট, দ্য ট্রায়াল, সবই তো মনুষ্যজীবনে আরোপিত কোনো না কোনো গণ্ডীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিশেষ। যদি শিল্পে সামাজিক প্রতিবাদ মানে শিল্পের বিরুদ্ধাচরণ হয় তাহলে গোইয়া, ডিকেন্স, মার্ক টোয়েনকে কী বলবো আমরা? প্রতিবাদী উপন্যাস বিষয়ে প্রভূত বাদবিতণ্ডা শোনা যাচ্ছে আজকাল—বিশেষত যখন সে-সব উপন্যাস কালোদের কলমে লেখা হয়—অবশ্য, হতেই পারে, যে কৃষ্ণাঙ্গ লেখকরা তাঁদের কৃষ্ণতা নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন লেখার সময়ে—অথবা শ্বেতাঙ্গ পাঠক তাঁর শ্বেতবর্ণ নিয়ে বেশি বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েন কৃষ্ণ সাহিত্য পঠনকালে—"

সার্ত্র

প্রতিবাদী সাহিত্যের সংকীর্ণ অর্থে, প্রতিবাদী কৃষ্ণ সাহিত্য শেষ বিচারে হয়ে দাঁড়াচ্ছে সাদা প্রভুর কাছে অনুনয় বিনয় বা গালমন্দের তড়পানি—মোট কথা কালোদের মানবিক সম্ভ্রম ভিক্ষা করে সাদার কাছে ওকালতি। এভাবে মুক্তি আসে না। কালোদের বাক্যালাপ হওয়া চাই নিজেদেরই মধ্যে। সাদাদের সঙ্গে নয়—পরস্পরের সঙ্গে। প্রতিবাদ নয়, স্পর্শ করতে হবে। পরস্পরের বিস্ময়, বিপন্নতা, সৌন্দর্যকে স্পর্শ করে শক্তি সংগ্রহ করতে হবে কালো লেখকদের।

এবারে উঠে আসে এক জটিল প্রশ্ন। টেক্সট্ কোনটা? কালোরা যা লেখেন, না সাদারা যা পড়েন? কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিন লেখক তো প্রচণ্ড একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকান নন, তিনি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতারই অন্তর্ভুক্ত। ইংরিজি সাহিত্য, ইওরোপীয় সাহিত্য এবং আমেরিকান সাহিত্য এই ত্রয়ী ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই গৃহীত হবে তাঁর রচনা এবং তুলনীয় হবে আফ্রিকান সাহিত্যের সঙ্গেও। আফ্রো-আমেরিকানের দেশগত, জাতিগত পরিচয় তো তিনি আমেরিকান। শয়িংকার দায়িত্ব কেবল একটিই সংস্কৃতির প্রতি। নাইজেরিয়ান। জেমস বলডউইন, অ্যালিস ওয়াকারের তা নয়। তাঁদের আছে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা এবং কৃষ্ণাঙ্গ সভ্যতার দ্বৈত পরিচিতি—লী রয় জোনসরা যে যাই বলুন। আজকের আফ্রো-আমেরিকান এই, জোড়কলম শব্দেই নিহিত সেই অবিসংবাদী দ্বৈত চেতনা। দু'বোয়ার ঋষিবাক্য।

নরম্যান মেইলার

সাদা চোখ, কালো চোখ

সাদা লেখক : কালো লেখক

সাদা লেখকরা কালোদের পক্ষ নিয়ে কলম ধরেছেন হুইটম্যানের সময় থেকেই। হুইটম্যান বা মার্ক টোয়েনের মতো বন্ধু বেশি না পেলেও, কৃষ্ণাঙ্গদের সাদা উকিল কম জোটেনি। সার্ত্র, জঁ জেনে, জ্যাক কেরুয়াক, নরম্যান মেইলার—যাঁরা প্রধানত সমাজে মানবিক অধিকার, শোষণ, নিপীড়ন, সংখ্যালঘু সমস্যা, ব্যক্তির মুক্তি ইত্যাদি নিয়ে ভেবেছেন, তাঁরা কৃষ্ণাঙ্গ সমস্যা নিয়েও মুখর হয়েছেন। কিন্তু সাদা চামড়ার "বিকৃত" মূল্যবোধের ফাঁদ এমনই বিস্তৃত, যে এমন কি তাঁরাও কখনো কখনো আশ্চর্য বেদনাদায়ক সব উক্তি সরলভাবে করে ফেলেছেন যা কৃষ্ণাঙ্গ পাঠকের মর্মমূলে বিদ্ধ হয়েছে। সার্ত্র যখন কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষকে বর্ণনা করেন "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শুক্রবীজ" বলে, এবং কৃষ্ণাঙ্গ জাতিকে বাহবা দেন তারা শ্বেতাঙ্গের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে "উদ্ভিদের মতো বিপুল ধৈর্য নিয়ে" লড়াই করছে বলে, অথবা কেরুয়াক কালোদের এত ঘনিষ্ঠ হয়েও যখন বলেন—"ফূর্তি, মজা, আঁধার, গান এবং মাঝেমধ্যে কোনো রহস্যময়ী ইন্দ্রিয়পরায়ণ নারীর মসীকৃষ্ণ জানু" তখন কৃষ্ণাঙ্গের প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে। মেইলার সহানুভূতির সঙ্গে ঘোষণা করেন—"শনিবার সন্ধ্যের ফূর্তির জোরেই কালো মানুষরা আজও টিকে আছে"। (পরে অবিশ্যি মেইলার জেমস বলডউইনের সঙ্গে ঝগড়া করে তাঁকে গাল দিয়ে বলেছিলেন—"তুই বেটে

গুটগুটে, তুই কুচ্ছিৎ, তুই ইস্কাবনের মতো কুচকুচে কালো"—বলডউইন তাতে কেবল হেসেছিলেন।

কেরুয়াকের ব্যাপারটা কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ বোঝবার চেষ্টা করেছে এইভাবে, যে বীটনিক শিল্পীরা নিজেরাই সাদা বাণিজ্যসর্বস্ব সভ্যতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল সাদা মানুষের কাছে যা সবচেয়ে মূল্যবান, সেই যুক্তি আর মননকে বিসর্জন দিয়ে তারা চেয়েছিল আবেগ, অনুভূতিকে প্রাধান্য দিতে। আর সেই কুষ্ঠ সাদা নীতিবাগীশ মূল্যবোধের দুর্গ ভাঙতে চেয়ে গড়ে নিয়েছিল প্রবল পরাক্রম কালো পৌরুষের বন্য এক চিত্রকল্প, শরীরী আবেগের যে মূর্তিটি বুর্জোয়া সাদাকে গ্রাহ্য করে না। কালো পুরুষের এই জৈব যৌনতার ইমেজকে ব্যঙ্গ করেছেন র‍্যালফ্ এলিসন "টুব্লাড" এই কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে। টুব্লাড নিজের মেয়েকেই ধর্ষণ করে ফেলেছে। মেয়ের গর্ভে তার পিতার সন্তান, এই অনুচ্চার্য মহাপাপের জন্য টুব্লাড নিজেকে ঘৃণা করছে কিন্তু সে আশ্চর্য হয়ে যায়, যখন দ্যাখে তার কুকর্মের কাহিনী শুনে, সাদা মনিব তাকে শাস্তি দেবার বদলে বাহবা দিচ্ছে এবং পুরস্কৃত করছে। কেননা, তারও প্রাণে ওই ইচ্ছেটা আছে, কিন্তু সাহসটা নেই। মধ্যবিত্ত ক্রিশ্চান নীতিশৃঙ্খলিত সাদা পুরুষ নিজেকে একমাত্র যৌনতায় কিছুটা নিকৃষ্ট ভাবে।

কিন্তু সে যে তেমনি মননশীলতায় অগ্রণী, দেবতার মতই আধ্যাত্মিক। আর সাদা নারীতে নারীত্বের সূক্ষ্মতম, চরমতম, সুন্দরতম বিকাশ। কিন্তু কালো নারী? সে মোটে নারীই নয়, দানবীবিশেষ, আজ্ঞে না—বিপুলা স্ত্রীলিঙ্গ এক!]

কালো লেখকও অনেককালই সাদার তৈরি এই ছবিগুলি মনে মনে মেনে নিতেন। তাই তাঁদের লেখাতে হয় "আদিম মানব মানবী" না হয় কালোরঙের চামড়ার নিচে শ্বেতাঙ্গ মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্র ফুটতো।

কৃষ্ণাঙ্গ বিপ্লবে বিশ্বাসী হয়েও অনেক সময়ে সাহিত্যে তাঁরা শ্বেতাঙ্গ-মূল্যবোধের ছায়া এড়াতে পারতেন না। সেই কালো মধ্যবিত্ত ভদ্র সমাজের চিত্রণে প্রধান কালো জীবনের যন্ত্রণা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, কিছুই ধরা পড়তো না।

রিচার্ড রাইট ১৯৩৭-এ "ব্লুপ্রিন্ট ফর নিগ্রো রাইটিং"-এ এঁদেরই বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। আবার ১৯৬২-তে লী-রয় জোনসকেও দেখছি ঠিক এই একই শ্রেণীর লেখকদের বিরুদ্ধেই কালো পাঠককে সতর্ক করে দিতে—"দ্য মিথ অব নিগ্রো লিটরেচার" প্রবন্ধে। রাইট বলেছিলেন, "নিগ্রো মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী আর নিগ্রো জনসাধারণের মধ্যে যে বিপুল পরিখা রয়েছে" সেটা অতিক্রম করতেই হবে—কালো লেখকের হাতেই কালো মানুষের চৈতন্য উন্মেষের দায়িত্ব রয়েছে।" লড়াকু তরুণ জোন্স বলছেন একেবারে একই কথা। তিনি দাবী করছেন, যে সকল কৃষ্ণাঙ্গ লেখক বুর্জোয়া কৃষ্ণাঙ্গদের কথা লেখেন, তাঁদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেন তাঁরা কৃষ্ণবিদ্রোহের পরিপন্থী। তারাই

অ্যালেক্স হ্যালি

আফ্রো-আমেরিকান সাহিত্যের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়। সাদা মূল্যবোধে নিমজ্জিত তাঁরা মগজ ধোলাই হয়ে মনে মনে সাদাই হয়ে গেছেন, এবং নিজেদের কৃষ্ণ-চরিত্রটুকু মুছে ফেলতে ব্যাকুল। এঁরা কেবল মধ্যবিত্তই নন মধ্যচিত্তও (মিডিওকর)।" ফানোঁ 'কালো চামড়া সাদা মুখোশ' বলতে এঁদেরই বুঝিয়েছেন। ফানোঁ এবং সার্ত্র দুজনেই দু' জায়গাতে বলেছেন, নতুন যুগের কৃষ্ণ-সাহিত্য বলছে—"ও হে শুভ্র চর্ম, তোমাদের সাদা মূল্যবোধ আমাদের স্কন্ধে চাপিয়ে দিও না তোমরা, এ তোমাদের কী লীলাখেলা হচ্ছে আমাদের নিয়ে? তোমাদের হিউম্যানিজম বলছে ভাই-ভাই, আর তোমাদের রেসিজম বলছে দূর-ছাই!" ফানোঁ তো স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন, সাদা মূল্যবোধের চাপে মধ্যবিত্ত উপনিবেশিত বুদ্ধিজীবীর ভালো রকম মগজ ধোলাই হয়ে গেছে, গভীর স্বরূপসংকট উপস্থিত হয়েছে তাদের।

সাদা পাঠক, কালো পাঠক : পাঠভেদ ?

সাদাদের যদি কালোদের সঙ্গে এতই কম অন্তরঙ্গ পরিচয়—এমন কি "কৃষ্ণ বন্ধু" সাদাদেরও—তবে কি কালো লেখার যথার্থ তাৎপর্য সাদা নজরে কখনোই ঠিকঠাক ধরা পড়ে? কালোদের রচিত টেক্সট-এ সাদা পাঠকের 'আপন মনের মাধুরী' মিশে গিয়ে কালো অভিজ্ঞতার চেহারা কি অন্যভাবে ফুটে ওঠে সাদা চোখের সামনে? লেখক যা লেখেন আর পাঠক যা পড়েন দুটোতে মিলিয়েই বারবার তৈরি হয় টেক্সট—তাহলে কি সাদা পাঠক (তা তিনি যতই সহানুভূতি নিয়ে পড়ুন) এক পাতা কালো-লেখা পড়লে তার যে-অর্থ বুঝবেন, কালো পড়ুয়ার চোখে সেই পাতাটাতেই অন্য এক রকম মানে ধরা দেবে? যেহেতু দুজনের অভিজ্ঞতার দুটি পটভূমি, অনেক আলাদা—সাদা পাঠক তার বিশিষ্ট সামাজিক, পারিবারিক, দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দাঁড়িয়ে ওই পৃষ্ঠাতে যা দেখতে পাচ্ছেন—কালো পাঠকের দৃষ্টিকোণগুলি একেবারে অন্য এমনকি বিপরীতও হওয়া অসম্ভব নয়।

এই মনোভাব থেকেই, ব্ল্যাক স্টাডিজ-এর নিষ্ঠাবান সাদা গবেষক রিচার্ড গিলম্যান,এলড্রিজ ক্লীভারের একটি "কৃষ্ণাঙ্গীদের প্রতি খোলা চিঠি" উদ্ধৃত করে বলেন, "এ চিঠি আমাকে লেখা নয়, যদিও আমি একে অপরূপ বলিষ্ঠ সুন্দর বলতেই পারি—সমালোচকের স্বভাবদোষে বিচার করে বসতেই পারি—কিন্তু সেটা হবে প্রকৃতপক্ষে অবিচার—সাদা মননের পটভূমি থেকে কালো মননধারাকে পাস-ফেল করানো। আমার হাতের সাদাদের তৈরি এই মানদণ্ড মোটে প্রযোজ্যই নয় এই বিশেষ ধরনের কালো সাহিত্যের ক্ষেত্রে। দু ধরনের কৃষ্ণ-সাহিত্য হয়—কিছু নাটক কবিতা উপন্যাস যা সর্বসাধারণের জন্য, আর কিছু আছে বিশেষ রচনা—যেমন ম্যালকম এক্স-এর আত্মকথা, যেমন এলড্রিজ ক্লীভারের "সোল অন আইস"—যার উদ্দেশ্য কালো পাঠকের চৈতন্যের হাল ধরা। তার মধ্যে মাথা গলানো সাদা পাঠকের অকর্তব্য।"

গিলম্যানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কালো কবি নিকি জভান্নি বলেন, "কোনো সাদা মানুষই আমার বিষয়ে সত্যি করে কিছু লিখতে পারে না, কেননা তারা কখনোই বুঝতে পারবে না। হয় তো তারা আমার ছেলেবেলার দারিদ্র্যের কথা বলবে, অথচ জানবে না আমার শৈশব ছিল কত আনন্দের?" তাঁকে প্রতিধ্বনি করেন কালো ঔপন্যাসিক জন কিলেনস—"সাদা সমালোচকরা সম্পূর্ণভাবেই কালো লেখকের সমালোচনা করায় অক্ষম··· আফ্রো-আমেরিকানদের ভাষাই বোঝে না তারা!" এদেরই মতো বিশ বছর আগে লোরেইন হানস বেরিও বলেছিলেন কালোদের বিষয়ে গভীর অন্তরঙ্গ জ্ঞান থাকা কখনোই সাদাদের পক্ষে সম্ভব নয়; তাই কালোদের নিয়ে সাহিত্য রচনা সাদাদের পক্ষে দুঃসাধ্য।

এতগুলি কালো লেখক যা বলছেন, সাদা পাঠক গিলম্যানও ঠিক সেই কথাই বলছেন। দেখেশুনে বাদামী পাঠকের মনে হতেই পারে, সাদাতে-কালোতে যতটা ফারাক তাঁরা নিজেরা দাবি করছেন হয়তো ততটা নেই? যদিও নবীন যুগের স্লোগান গ্রেকো-রোমান মূল্যবোধের মাপকাঠিকে সর্বজনীন বলা চলবে না। কালো লেখক শুধুই কালো পাঠকের জন্য। অতএব

> **বিদেশী শাসকের কায়দাই হচ্ছে তোমার সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম, সব কেড়ে নেবো, কিন্তু আমারটাতে তোমায় পূর্ণ অধিকার দেবো না। নিজ বাসভূমে থাকলে, তবু সবটা কেড়ে নেওয়া যায় না। তাই আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের (দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ার অপূর্ব ঐতিহাসিক পরিস্থিতি বাদ দিলে) অবস্থা মার্কিনি কৃষ্ণাঙ্গদের চেয়ে ভালো ছিল।**

সাদা, যেন অনধিকার চর্চা করো না!

কিন্তু এ বড় ভয়াবহ মত-পথ। এতে কেবলই খণ্ডিত হয় মানবাত্মা, কেবলই ছিন্ন হয়ে যায় গ্রন্থি, কেবলই সংকীর্ণ হতে থাকে উঠোন। এভাবে দেখলে মেয়েদের লেখা মেয়েরাই পড়বেন, সমকামীদের লেখা সমকামীরাই বুঝবেন, ইহুদীর লেখা ইহুদীরা। জঁ জেনের লেখায় হয় সমকামী, নয় চোরেরা ভিন্ন কারুর অধিকার থাকবে না? সংখ্যালঘুর সাহিত্য ঐইদিকে মোড় নিলে, তা নিজেকেই পরাজিত করবে। এই মনোভাব কোনোদিনই শিল্পকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করতে পারে না।

কৃষ্ণাঙ্গ সাহিত্যের কিছু বৈশিষ্ট্য : সাদার চোখে

যে দরজাটা খুলতে বারণ করা যায়, সেটাতেই উৎসাহ রাজপুত্তুরের বেশি বেশি! সাদাদের যতই থামতে বলা হোক্ সাদা রসনা জগতের সর্ববিষয়ে বাক্‌বিস্তার করবেই। আমরা বরং কালো-রচনা বিষয়ে একজন সাদা সমালোচকের কিছু মন্তব্য শুনেই দেখি।

রজার রোজেমব্লাট, হার্ভার্ডের ছাত্র। তাঁর বিশ্লেষণে, সাদা সাহিত্যে কালো অমঙ্গলের রং, সাদা রংটি শুভচিহ্ন (মেলভিল ইত্যাদি ব্যতিক্রম) কিন্তু কৃষ্ণ-সাহিত্যে সাদা ব্যতিক্রমবিহীনভাবেই অমঙ্গলের প্রতীক, অত্যাচারের রং, ভয়ের রং।—"শ্বাসরুদ্ধতার, বিচ্ছিন্নতার, বধিরতার, অন্ধত্বের, ভীত, আক্রান্ত হবার রং সাদা। সাদা সেই ভয়ঙ্কর রং যা আর সব রংকে, কালো রংকে শুদ্ধ, গিলে ফেলতে পারে।" (এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, র‍্যালফ্ এলিসনের "অদৃশ্য মানুষ" বইতে সাদা রংয়ের সঙ্গে কাঁটা দেওয়া ব্যবহার। নায়ক যে কারখানাতে কাজ পেল, তার খ্যাতি ঝকঝকে সাদা একটা তেল রং তৈরি করার জন্যে। আমরা জানতে পারি অতটা ধবধবে শাদা রঙের ট্রেড সিক্রেট হচ্ছে দশ ফোঁটা কুচকুচে কালো তার মধ্যে সম্পূর্ণ মিশিয়ে দেওয়া। একটা বিপরীতমুখী ভূমিকা আছে এখানে সাদা-কালোর। অনেকটা নেগেটিভ ছবির মতো।

রোজেমব্লাটের মতে কৃষ্ণ সাহিত্যে 'সময়ের' কোনো দাম নেই, যেহেতু কালো মানুষের জীবনে সময় স্থবির হয়ে থাকে। 'কার্মা' ('ইক্ষু') উপন্যাসে জীম টুমার বলছেন, "আখের ক্ষেতে স্থান-কাল অর্থহীন।" সময়ের তখনই মূল্য থাকে যখন জীবনে গতি থাকে। চলমান ক্ষণগুলির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের পরিণতি, প্রগতি, পরিবর্তন ঘটতে থাকে অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে। কিন্তু যে-জীবন স্থগিত হয়েই রয়েছে, সময়ের সেখানে গুরুত্ব কোথায়? কৃষ্ণ সাহিত্যে 'সময়' তাই অজরুরী।

আরো একটি লক্ষণ, প্রকৃত কৃষ্ণসাহিত্যের নায়কের রোমান্টিক হিরো হবার সম্ভাবনা নেই। রোমান্টিক হিরোর কাজ যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে দেওয়া, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করা, মনুষ্যত্বের যা কিছু ভালো, রূপে গুণে শৌর্যে তার চরিত্রে বিকশিত হয়ে ওঠে। নতুবা, দেবতার মতো অনায়াসে সংযমে সকল প্রতিকূলতার উর্ধ্বে উঠে যেতে পারে সে। কিন্তু কালো নায়ক নির্বীর্য। সে এর কোনোটাই পারে না। তার সমাজ তাকে হিরো করে তৈরি করেনি। কৃষ্ণ সাহিত্যের নায়ক মার খায় ভয় পায়, অন্যায় অবিচারের শিকার হয়। (হতে হতে সে নিজেও অন্যায় করে ফ্যালে, অপরাধী হয়ে দাঁড়ায়, সমস্যা বাড়িয়েই তোলে, সমাধান করতে পারে না।)

আবার কালো নায়ক পাশ্চাত্য সাহিত্যের ঐতিহ্যে অ্যান্টি-হিরোও নয়। তার সমস্যাগুলো নেহাৎ বাস্তব, তার অত্যাচারী রীতিমতো সশরীরে, স্থূল ভাবে উপস্থিত, তার ভীতিগুলি নেহাৎ শারীরিক আঘাতের, শুধুই আধ্যাত্মিক নয়, প্রতীকী নয়, কালো মানুষের অস্তিত্বের যুদ্ধ আত্মিক পর্যায়ের নয় জৈবিক পর্যায়ের। বিমূর্ত, তাত্ত্বিক স্তরের মানবিক অধিকারহীনতা তার সমস্যা নয়—তার জীবনধারণ নেহাৎ বাস্তবিকভাবেই বিপজ্জনক। এই বিচ্ছিন্নতা ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা নয়। এর দায়ভাগ অন্যের। কালো নায়ক তাই সেভাবে জীবনের শূন্যতা, অর্থহীনতা, বিচ্ছিন্নতা, তুচ্ছতা নিয়ে ভাবিত নয়, সাদা নায়ক যেমন।

রিচার্ড রাইট

অতএব কালো নায়ক হিরোও নয়, আবার সে অ্যান্টি-হিরোও হতে পারে না।

রোজেনব্লাট-এর বিশ্লেষণে যা দেখি, তাতে তো মনে হচ্ছে কালো সাহিত্যে কালো মানুষের কথা বলতে গিয়ে কালো লেখক সাদা মানুষের পৃথিবীর কথা বলতে বাধ্য হন। কালো সাহিত্য যেন নিষ্ঠুর পরিহাসে সাদা মানুষেরই একটা অ-দেখা দিক্-এর কথা বলে, সাদা মানুষের নির্মমতার দর্পণ হয়ে ওঠে। কালো মানুষের সাহিত্যে যে আমেরিকা দেখতে পেয়েছি, সাদা মানুষের সাহিত্যে ঠিক সেই আমেরিকা দেখি না। কালো মানুষের লেনদেন সবই তো সাদা পৃথিবীর সঙ্গেই—তাদের যা কিছু সমস্যা, প্রধানত সাদারাই সৃষ্টি তাই শাদা মানুষদের বাদ দিয়ে কৃষ্ণসাহিত্য হয় না—যদিও এর বিপরীতটা সত্য নয়। সাদা সাহিত্যে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ অবান্তর। কৃষ্ণ সাহিত্যের আরেক সমালোচকের মতে কালো সাহিত্যের এক মস্ত ত্রুটি হলো তাতে রঙ্গরসের অভাব। বড্ড বেশি গুরুগম্ভীর, বড়ই রাগী, বড়ই দুঃখী, বড্ড শোকার্ত আর অভিযোগমুখর কৃষ্ণসাহিত্য। মুখখানা তার হাঁড়িপানা। নিজেকে নিয়ে হাসতে জানে না। কেবলই সাদার উনকোটি দোষ ত্রুটির ফিরিস্তি পড়তে তার অমানুষিকতার ছবি দেখতে সাদা কালো কারুরই তৃপ্তি হয় না, মন বিরূপ হয়ে যায়। কালো লেখককে হতে হবে আরেকটু পরিণত, দাঁড়াতে হবে নিজের থেকে আরো খানিক দূরে, চোখে পরে নিতে হবে শিল্পীর নিরপেক্ষ চশমাটি। এত আত্মমগ্ন, এত তিক্ত হলে চলবে না। আমেরিকান সমাজের প্রতি ঘৃণার প্রকাশই তার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়েছে। কিন্তু জীবন তো কেবল অভিযোগ নয় কেবল অশ্রু নয়, ক্রোধ আর নির্যাতন নয়। জীবনের সদর্থক দিকগুলির প্রতি কৃষ্ণ সাহিত্য অন্ধ থাকে। এতে নিজেদের প্রতি সুবিচার করা হয় না। এই মত উইলিয়াম গার্ডনার স্মিথ-এর। স্মিথের কথা সবটা ভুল নয় হয়তো, কৃষ্ণ সাহিত্যে সত্যিই কোনো মার্ক টোয়েন নেই, (যদিও মার্ক টোয়েনে কালো জীবন আছে!)।

কবি ল্যাংস্টন হিউজ কিন্তু এর উল্টো কথা বলেন, তার দৃঢ় বিশ্বাস কালো মানুষের রক্ষাকবচ

ল্যাংস্টন হিউজ

তার রসিকতার ক্ষমতা। হাস্যকৌতুকের মধ্য দিয়ে আমেরিকার কালো মানুষ তার শক্তি সঞ্চয় করে সাদা পৃথিবীর অ্যাবসার্ডিটির বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার। কালো কবিতায় যথেষ্ট শ্লেষ বিদ্রূপ আছে। আছে এমন কি ব্লুজ-গানেও। এবং "অদৃশ্য মানুষ", "একদা কৃষ্ণ—এক মানুষের কাহিনী" ইত্যাদি কালো উপন্যাস তো সবই স্যাটায়ার। কালো কমিডিয়ানদের মধ্যে এখানে ডিক গ্রেগরীর কথা মনে পড়ছে। যিনি বলেছিলেন—"দিনে রোজগার যখন ৫ ডলার ছিল, তখন যেসব কথা চাপা গলায় বলতুম, আজ স্টেজে দাঁড়িয়ে সেই কথাগুলো বলেই হপ্তায় পাঁচ হাজার ডলার রোজগার করছি।" কিন্তু ঐ একজনই ডিক গ্রেগরি। আমেরিকার ব্ল্যাক হিউমার (কৃষ্ণাঙ্গের কথা নয়। এ হলো তীব্র তেতো রসিকতা, মৃত্যুময়, যন্ত্রণাময়, নিষ্ঠুর জীবনের নির্মম রসিকতা)—যা সব চেয়ে বেশি উঠে আসা উচিত ছিল কৃষ্ণাঙ্গ জীবন থেকেই—তা কিন্তু সাদাদের আর ইহুদীদের তৈরি।

কৃষ্ণাঙ্গ লেখকের কিছু সমস্যা : কালো চোখে

র‍্যালফ এলিসনের মতো, কৃষ্ণ-লেখকদের প্রধান সমস্যা এই যে, সে প্রকৃতপক্ষে অন্তরে অন্তরে যা অনুভব, উপলব্ধি করে অবিকল তাই লেখার অধিকার তার নেই। বরং তার যা অনুভব করা উচিত, যা অনুভব করতে তাকে তার সমাজ উদ্বুদ্ধ করে, সেটাই বলবার একটা দায়বদ্ধতা তার থেকে যায় পাঠকসমাজের কাছে। ফলে লেখা হয়ে পড়ে কৃত্রিম, অনেক সময়েই প্রাণশূন্য। যে প্রতারক প্রচ্ছদ মারকিন দেশের বাসিন্দাদের সর্বদার পোশাক, লেখার গায়েও সেটা লেগে থাকে।

অ্যাডিসন গেইল, কৃষ্ণাঙ্গ কবি যখন মানব চিত্তের চিরন্তন প্রশ্নগুলিকে অবান্তর বলে ঠেলে দেন কৃষ্ণাঙ্গের শিল্পের মালমশলার স্বীকৃতি না দিয়ে, তখন রীতিমত উদ্বেগ হয়। "কে আমি? কী আমার পরিচয়? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে আমার কোন্ সম্পর্ক? ঈশ্বরের সঙ্গে? অন্যান্য অস্তিত্বের সঙ্গে? এই সব প্রশ্নের কোনো মূল্য নেই কৃষ্ণাঙ্গের বেলায়, যে কৃষ্ণাঙ্গ শহুরে বস্তির (গেটো) উদ্দাম বীভৎসতার দৈনিক শিকার, যার মগজের আর দেহের সুস্থতাকে অনবরতই শেষ অবস্থার ভিতরে চলে যেতে হয়, যাকে সংখ্যাগুরু প্রতিবেশীর প্রবল শত্রুতার বিরুদ্ধে আজন্ম লড়াই করে যেতে হয়—" একথা শুনলে মন খুব খারাপ হয়ে যায়। কৃষ্ণাঙ্গ লেখক কি তাহলে কেবলই শ্বেতাঙ্গের অত্যাচারের বলি মাত্র? তাছাড়া তার আর কোনো অস্তিত্বই নেই? কেবলই অভিযোগ, অনুযোগ, ক্রোধ, আর দ্রোহ থাকলেই কি চলবে? চাই না, শিল্পের সূক্ষ্মতা, আত্মার নিষ্ঠা, শ্রমলব্ধ নৈপুণ্য?

র‍্যালফ এলিসন খোলা গলায় বলেছেন, "জাতিবর্ণের দুর্গ ছেড়ে কালো লেখক শিল্পের খোলা জমিতে নেমে আসুক না, দ্বৈরথের খেলা মাঠে, পৃথিবীর সঙ্গেই তার শিল্পের প্রতিযোগিতা হওয়া দরকার" হয়তো তাঁর কথাই কৃষ্ণাঙ্গ সাহিত্যের শেষ কথা হয়ে উঠবে।

জেমস্ বল্ডুইন দু' বুয়ার প্রতিধ্বনি করে বলেছেন—কৃষ্ণাঙ্গ লেখকের মূল সমস্যা স্বরাজ্যের। সে কৃষ্ণাঙ্গের মুখপাত্র, নাকি সে একজন মানুষ হিসেবে নিজের কথা বলবে? চিরন্তন এই দ্বন্দ্বে বর্তমান কালো লেখক বলডউইন স্বেচ্ছায় দূরে চলে গেছেন, দেশান্তরী হয়েছেন। তবুও এই দ্বন্দ্ব তাঁর চরিত্র থেকে মোছেনি। দু'বুয়ার দ্বৈত-চৈতন্য তাঁকে কষ্ট দেয়। শাদা লেখকের এই ঝামেলা নেই।

ল্যাংস্টন হিউজ অবশ্য এটা মানেন না। উনি বলেন আমি নিজের কথা মানুষ হিসেবেই লিখি। যাই লিখবো তাই-ই সব কালো মানুষের কথা হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য—আমার মধ্যে যদি "আমি কৃষ্ণাঙ্গ" এই চেতনা জাগ্রত থাকে। হিউজ বলেন, বল্ডউইনের লেখাতেও সেই সর্বজনীনতা এবং কৃষ্ণজনীনতা একই সঙ্গে উপস্থিত। কিন্তু অন্য এক অসুবিধার কথা ল্যাংস্টন হিউজ বলেছেন—"কৃষ্ণাঙ্গ বলে আমার প্রকাশক পেতে অসুবিধে হয়েছে পদ্যপড়ার আমন্ত্রণ পেতেও। অনেক সময়ে মেয়েদের ক্লাবে পদ্য পাঠের পরে চায়ের আসর বসে। কবিতা পড়তে কালো কবিকে ডাকা যায়—কিন্তু তার পরে লৌকিকতার ব্যাপারটায় সামাজিক আচারে বাধে, কালোর সঙ্গে চা-পান করতে চান না সাদা মহিলারা। ফলে ডাক পড়ে না এমন কি ল্যাংস্টন হিউজের মতো কালো কবিরও। ফলে অর্থের অনটন চলেই। বর্ণবৈষম্যে আমেরিকা আর দক্ষিণ আফ্রিকায় খুব একটা ফারাক নেই, কেবল আমেরিকা সূক্ষ্মতর। সূক্ষ্মতর কেননা ভারতবর্ষের "পণ প্রথা" উঠে যাবার মতোই আমেরিকাতে বর্ণবৈষম্য আইন করে তো চালু নেই, চালু আছে সর্বসম্মতিক্রমে। এই "সর্বসম্মতি" মানে সাদার সম্মতি। আইন বরং ভাঙা যায় বদল করা যায়, কিন্তু "সর্বসম্মতি" বড় ভয়ঙ্কর বস্তু। ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইলেও কি আজ কালো মানুষের ধমনী থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যাবে ক্রীতদাস প্রভুর ঘৃণিত শোণিতের কণা। সে এখন কালো-মজ্জার মধ্যে মিশে গেছে. তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে কালো মানুষের জিন্-এর গহনেও। আমেরিকার কালো মানুষের রক্ত থেকে যেমন বেছে বেছে সরিয়ে ফেলা যাবে না শ্বেত মানুষের রক্তবীজ, তেমনি আমেরিকার কৃষ্ণ সাহিত্য থেকে রবার ঘষে মুছে ফেলা যাবে না সুদীর্ঘ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব। যতই ব্ল্যাক মুসলিম হাওয়া আসুক,কৃষ্ণ সঙ্গীত থেকে সরানো যাবে কি গসপেলের প্রতিধ্বনি?

যতই চেষ্টা চলুক, অপরিচিত, বিস্মৃত আফ্রিকান সংস্কৃতির সঙ্গে যতই গাঁথা হোক নতুন পরিণয় সূত্র, পাশ্চাত্য সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য বাঁধন মারকিনি কৃষ্ণ সাহিত্যের আষ্টেপৃষ্ঠে। ইওরোপীয় সংস্কৃতির প্রণয়চিহ্ন তার সর্ব অঙ্গে। যতই অবাঞ্ছিত হোক, অস্বীকার করার উপায় নেই, আফ্রো-আমেরিকাতে আফ্রোর চেয়ে আমেরিকাই এখন অধিক! পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালীর অবদান গ্রেকো-রোমান সংস্কৃতি এখন শিক্ষিত কৃষ্ণাঙ্গ মারকিনির উল্লেখসূত্রের অবধারিত অঙ্গ। কালো কবির মুক্তি চেতনার প্রতীক হয়ে কৃষ্ণ সাহিত্যে বার বার ডানা ঝাপটায় ডেডালাস। নানিনা আলবা লেখেন—"Be Daedalus. make wings / make even feathered wings"—কিন্তু রবার্ট হেডেনের কবিতাটি সব চেয়ে অর্থবহ। "O Daedalus. Fly away Home"—এই কবিতায় আদি জননী আফ্রিকার (Do you remember Africa ?/ O cleave the air fly away home)—কোলে ফিরে যাবার আকুল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হচ্ছে—আর ডেডালাস হলেন সেই আত্মিক উন্নয়নের, উত্তরণের কেন্দ্রীয় প্রতীক। অন্যমনেই সৎ, সমর্পিত আফ্রো-আমেরিকান সাহিত্যও প্রতি পদক্ষেপেই গ্রীস-রোমের মাটি মাড়িয়ে ফেলছে, আর প্রমাণ করছে যে কালো মার্কিনি সাহিত্য পাশ্চাত্য সংস্কৃতিরই অঙ্গ; কালো মার্কিনি সাহিত্য মার্কিনি সাহিত্যই, না-আফ্রো-না-আমেরিকান, এমন কোনো অমূলতরুর গন্ধহীন পুষ্প নয়, খোদ্ মার্কিনি সমাজের পঙ্ককর্দমের গভীরে তার মূল নিহিত। মার্কিনি ইতিহাসই তার জন্মের ইতিহাস।

আজকের কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিনি লেখক আরেকবার চিন্তা করছেন এই স্বারাজ্যের সংজ্ঞা নিয়ে। তরুণী কৃষ্ণাঙ্গী লেখিকা গ্লোরিয়া নেইলর সম্প্রতি বলেছেন মার্কিন দেশের মাটিতে বিভিন্ন এথনিক গ্রুপের মানুষ সমানেই চেষ্টা করছেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে "অল্ আমেরিকান" স্বারাজ্যের স্বীকৃতি পেতে। 'সাদা' বলতেও তো হাজারটা দেশ, হাজারটা দল, হাজারটা ভাষার উদ্বাস্তু মানুষ। কিন্তু কালোদের ঝামেলাই সবার চেয়ে বেশি। নিজস্ব এথনিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও কীভাবে মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায় তার উপায় বের করতে হবে তাদের। গ্লোরিয়া বলছেন এখনও পর্যন্ত যা ঘটে, সমাজের উচ্চ স্তরে ধাপে ধাপে ওঠার জন্য, শাদার আর কালোর একটাই পদ্ধতি মার্কিন দেশে—অর্থাৎ একের পর এক মূল্যবোধগুলি বর্জন করতে করতে আত্মিক চরিত্র বদল করতে করতে সামাজিক চরিত্রটা বদলে নেওয়া। নতুন সমাজে এক ধাপ ওপরে উঠতে হলে চিরন্তন মানবিক মূল্যবোধে এক ধাপ নেমে আসতে হয়। প্রথমেই পরিবার, রক্তের সম্পর্কগুলোকে ত্যাগ করা চাই, পরের ধাপে স্বগোত্রের গোষ্ঠীবর্গ, আর শেষ ধাপে বর্জন করতে হয় ধর্ম এবং সৃষ্টিকর্তাকেও। ছিন্ন হয়ে যায় নিজস্ব আত্মার সঙ্গে নিজের যোগাযোগ, হারিয়ে যায় নিজের কাছেই নিজের নামধাম। শিখরে যে পৌঁছোয়, সে একজন হারিয়ে যাওয়া মানুষ, তার আত্মপরিচয় নেই। সাদাদেরও এই শতকে এই অভিজ্ঞতাই হয়েছে। গ্লোরিয়া বলছেন, "এরই নাম মডার্নিজম। কিন্তু, এই শ্বেত সভ্যতায় এতদিন যা কৃষ্ণাঙ্গদের বাঁচিয়ে রেখেছে, দেহে-মনে সচল, সজীব, সুস্থ রেখেছে, পাগল হয়ে যেতে দেয়নি তা এই সব শাশ্বত মানবিক মূল্যবোধ। এগুলি কদাচ নিজের থেকে চলে যায় না, হারিয়ে ফেলা অসম্ভব। সজ্ঞানেবহু চেষ্টাচরিত্র করে বর্জন করতে হয় রক্ত থেকে এই সব মূল্যবোধ, এবং কৃষ্ণাঙ্গ মারকিনির পক্ষে এই বর্জন আত্মহত্যার শামিল।"

গ্লোরিয়ার মতো আরো অনেকেই আজ এই কথা ভাবছেন। যুদ্ধং দেহি কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্রোহীদের মুখে যা ছিল বিদ্রোহের ভাষা, ইন্টিগ্রেশন বিরোধী জেহাদ, আজ সেই একই দাবিকে নতুন নামে ডাকা হচ্ছে "কৃষ্ণাঙ্গ রক্ষণশীলতা"। গ্লোরিয়ার নতুন বই "লিন্ডেন হিল" (১৯৮৫) এই উচ্চ মধ্যবিত্ত সাবার্বান কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়ে লেখা। ত্রিশের দশকে জেসিফসেটরা এই শ্রেণীকে নিয়ে লিখে ত্রিশ বছর ধরে নিন্দিত হয়েছেন—কেননা তাঁদের কাঁচা দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিল গোলমাল। কিন্তু গ্লোরিয়া নেইলর সেই মধ্যবিত্তদের নিয়েই আজ লিখতে পারেন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনেক জটিল অনেক পোড়-খাওয়া। "লিন্ডেন হিল"-এর বৈশিষ্ট্য বইটির কাঠামো দান্তের 'ইনফার্নো'র উলটোনো পর্বতের আদলে। পাহাড়ের ধাপে ধাপে কালো মানুষেরা তাদের অস্তিত্বের অস্থিমজ্জা বিসর্জন দিতে দিতে উঠছে। মই বেয়ে এই ওঠার মূল্য আত্মিক অধঃপাত। যা উচ্চ মধ্যবিত্তের সাদা কালো উভয়েরই ক্ষেত্রে সত্য। এই জীবন দর্শনই মারকিন কৃষ্ণাঙ্গ সাহিত্যে হয়তো আমাদের আধুনিকতম প্রাপ্তি। ■

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

কৃষ্ণাঙ্গের প্রতিবাদী সাহিত্য : আফ্রিকা

ধ্রুব গুপ্ত

"অনন্ত বিলাপের জন্য আমরা সৃষ্ট নই
জন্তুর অবারিত পাশবতা, আমাদের বিকল করবে না
খড়কুটো আমরা নই
তোমার শান্তি ও মানবতার জোরে হব বলীয়ান ।"

॥ এক ॥

সমাজে যে সব ভেদ বুদ্ধি অনৈতিকতার জন্ম দেয়, পুষ্ট ও রক্ষা করে তার মধ্যে একটি হল গাত্র বর্ণের পার্থক্যবোধ। শ্বেতকায়রা কৃষ্ণকায় থেকে শুধু পৃথকই নয় উচ্চস্তরেরও এই ধারণা আমাদের সমাজে জাতিভেদ প্রথার তুল্য, অস্পৃশ্যতার তুল্য অমানবিকতাকে প্রায় অনপনেয় করে তুলেছে। সাম্প্রতিক কালে এই অনৈতিকতার, এই অমানবিকতার সবলতম প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকাতে। পৃথিবীর গভীর অসুখের এই বিপজ্জনক ক্ষতস্থানটি পাশ্ববর্তী নামিবিয়াকে কুক্ষিগত রেখে সেখানেও বর্ণবৈষম্য নীতিকে কায়েমী রেখেছে।

ইয়োরোপীয় শ্বেতকায় আগমনের আগে থেকেই আফ্রিকা মহাদেশে কৃষ্ণকায়-অকৃষ্ণকায় সংঘাত, সহাবস্থান ও সংমিশ্রণ ঘটেছে। এ সংশ্রবের প্রাক্ খ্রিষ্টীয় ক্ষেত্র ছিল ইথিওপিয়া। হামিটিক, সেমিটিক ও নিগ্রয়েড এই ত্রিরঙের মিশ্রণে উদ্ভূত আমহারা মানুষের মনে অন্যান্য আফ্রিকানদের চেয়ে কম কালো হওয়া নিয়ে গর্ববোধ কাজ করে, সেটা তাদের সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক একটি কাহিনীতে প্রকট। ঈশ্বর নাকি চুল্লি থেকে বেশি পোড় খাওয়া মানুষ ছেড়ে দেয় আফ্রিকাতে, কম পোড় খাওয়া শ্বেতী মানুষ ছাড়ে ইয়োরোপের মাটিতে এবং ঠিকমত পোড় খাওয়া সুশ্রী মানুষ ছাড়ে ইথিওপিয়ার ভূখণ্ডে। অপেক্ষাকৃত কম কালো, দীর্ঘদেহী পশুপালনজীবী মাসাই বা তুৎসী (আফ্রো-এশিয়াটিক নামে অভিহিত) উপজাতির সঙ্গে পূর্ব আফ্রিকার কৃষিজীবী বান্টু নিগ্রয়েড উপজাতিদের সংঘর্ষ হয়েছে, তুৎসীরা রুয়ান্ডা-উরুন্ডিতে কৃষ্ণকায় হুটুদের ওপর, সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্বও করেছে দীর্ঘকাল। কিন্তু এই সম্পর্কের মধ্যে গাত্রবর্ণ বিভেদ চেতনা যে খুব প্রখর ছিল লোক সাহিত্যে তার তেমন প্রমাণ নেই। পশ্চিম আফ্রিকার ফুলানি উপজাতি

সেমবেনে ওউসমানে

নগুগি ওয়া থিয়ং'ও

নাদিন গর্ডিমার

সম্পর্কেও সেই কথা খাটে।

ইসলামধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসেন ফর্সামানুষ আরবরা, পরে কিছু তুর্কীরাও। কোথাও প্রবল সংঘর্ষ হয় (উত্তর আফ্রিকা ও ইথিওপিয়াতে) কোথাও বাণিজ্যিক সম্পর্কর মাধ্যমে সহাবস্থান ও সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ হয়—যথা পশ্চিম আফ্রিকাতে এবং পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে। কিন্তু আরবরা গাত্রবর্ণহেতু কৃষ্ণকায়দের তীব্র ঘৃণা করত এমন প্রমাণ আফ্রিকার শ্রুতি-সাহিত্যে তেমন নেই, আরব-সাহিত্যে আছে কিনা জানি না। যেটুকু ঐতিহাসিক উপাদান আমাদের হাতে আছে ইবন বতুতার মত পর্যটকদের রচনায়—তাতে তেমন কিছু নেই। ইসলামিক মাল্লামতন্ত্র দরিদ্র আফ্রিকান কৃষ্ণকায়দের শোষণ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আফ্রিকান সাহিত্যে আছে, উসমান সেম্বেনের উপন্যাসে ও চলচ্চিত্রে। কিন্তু সেখানে গাত্রবর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।

সাদাকালো ভেদ চেতনা এবং সাদাকে কালোর তুলনায় উচ্চশ্রেণীর জীব মনে করার ব্যাপকতা আফ্রিকান প্রেক্ষিতে বৃদ্ধি পায় ইয়োরোপীয় আগমনের পর। পঞ্চদশ শতাব্দীর স্বর্ণ সন্ধানী পর্তুগীজ পর্যটকেরা (কাদামোস্তো, পাচেকো পেরিরা) পশ্চিম আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে উদ্ভট রূপে চিত্রিত করেছে। তবে পর্তুগীজরা যতই বিকট বর্ণনা দিন কালো মানুষদের, সাদাকালো সম্পর্ক তখনই অতটা অমানবিক হয়ে ওঠেনি। প্রকৃত পক্ষে সপ্তদশ শতাব্দীতে অনেক কৃষ্ণাঙ্গ শাসকগোষ্ঠী শ্বেতকায় বণিকদের নাস্তানাবুদও করেছে। ওলন্দাজ পর্যটক ওলফের্ট ডাপের সপ্তদশ শতাব্দীতে নাইজেরিয়ার বেনিন রাষ্ট্রের নগরপরিকল্পনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সে ধরনের প্রশংসা পেয়েছে কঙ্গোর শাসক আফফোনসো পর্তুগীজদের কাছ থেকে শত বছর আগে। এ ধরনের সম্ভ্রম বেশি দিন টেঁকেনি প্রধানত দাস-ব্যবসার ফলে। দুশতাব্দী ধরে আটলান্টিকের ওপারে মানুষ চালানের ইতিহাসের অভিঘাতে এই ধারণা বলবৎ হল যে কৃষ্ণাঙ্গরা দাসের জাত, ভগবান তাদের পৃথিবীতে শ্বেতকায়দের সেবা করবার মহৎ দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ অধিকাংশ খ্রিষ্টীয় চার্চগুলিও এই ধারণাকে পুষ্ট করার কাজে সহায়ক হল।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে যখন শ্বেতকায়রা অর্থাৎ বুয়র বলে পরিচিত ওলন্দাজ চাষী প্রথম এল সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তখন তারা সেখানে কোনো সুগঠিত কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রশক্তির সম্মুখীন হয়নি, যেমন পর্তুগীজরা হয়েছিল পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে, ইথিওপিয়াতে এমনকি মধ্য আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রাচীন জিম্বাবোয়েতে। তাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে "অসভ্য হটেনটট-বুশম্যান"দের সঙ্গে। শিকার ও পশুপালনজীবী এই খইশান গোষ্ঠীর মানুষের তেমন কোনো উন্নত প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান ছিল না। সহজেই তাদের শ্বেতাঙ্গরা পরাভূত করে, অনেককে নিশ্চিহ্ন করে যেমন স্পেনীয়রা করেছিল "আমেরিকান ইন্ডিয়ান-দের আটলান্টিকের ওপারে। যৌন তাগিদের ফলে কিছু রক্ত মিশ্রণ ঘটে জন্ম নেয় বর্তমান 'কালার্ড' সম্প্রদায়। বর্তমান দক্ষিণ আফ্রিকার চার ধাপের সমাজে যাদের স্থান দ্বিতীয়। প্রথম হল সাদা, তৃতীয় 'এশিয়' এবং চতুর্থ ও সর্বনিম্ন হল সংখ্যাগরিষ্ঠ কালো আফ্রিকান, নেলসন মান্ডেলা যাদের প্রতিনিধি)। এ ক্ষেত্রে কৃষ্ণাঙ্গদের হেয় করা স্বাভাবিক। উপরন্তু দাস ব্যবসার উপরি উল্লিখিত অভিঘাত। কেপটাউন অঞ্চল থেকে অভ্যন্তরে ভাল চাষের জমির খোঁজে অনুপ্রবেশের পর এই বুয়রদের সংঘর্ষ হয় পোনডো, খখসা, জুলু, ভেনডা ইত্যাদি বান্টু ভাষী চাষী 'নিগ্রো'দের সঙ্গে যাদের নাম হয়ে যায় 'কাফির'। এই কথাটি আরবদের কাছ থেকে বুয়ররা ও পরে ইংরেজরাও পায় পর্তুগীজদের মারফত। 'বিধর্মী' অর্থ বদলে এর মানে দাঁড়ায় 'কালো আদমী' (আমাদের 'নেটিব'-এর মত)। ইংরেজরা 'কাফির'দের প্রতি অপেক্ষাকৃত 'নরম' এই অভিযোগে বুয়ররা গত শতাব্দীর মাঝামাঝি আরও অভ্যন্তরে গিয়ে দুটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র স্থাপন করেছিল—ওরেঞ্জ ফ্রি স্টেট ও ট্রানস্‌ভাল্‌। তারপর খনিজ সম্পদ আবিষ্কার নিয়ে ইংরেজ ও বুয়রদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। সে সময়ে বুয়ররা আফ্রিকানা বলে অভিহিত হচ্ছে এবং ভাষা হচ্ছে আফ্রিকান।

বিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আফ্রিকানের শ্বেতকায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন—যাতে নাৎসী সমর্থন ছিল, এবং ১৯৪৮ সালে শ্বেতকায় জাতীয়তাবাদীদের 'স্বাধীনতা' প্রাপ্তি এবং একাধিক আইনের সাহায্যে আপার্টহাইড (Aparthied যার আক্ষরিক অর্থ "পৃথকতা")কে সরকারী চেহারা দেওয়া—এসবই ইতিহাসে পরিচিত ঘটনা। গোঁড়া খ্রিষ্টান সম্প্রদায় 'ডাচ রিফর্মড চার্চ'-এর প্রচার ডারউইনতন্ত্রের অপব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে রচিত নৃতাত্ত্বিকদের 'বৈজ্ঞানিক' প্রচার দাসব্যবসার ইতিহাসের ফল এবং আফ্রিকা বিভাজনোত্তর (১৮৮৪-৯০ খ্রিঃ) কলোনীয়াল শাসন—এই সব মিলে সাদাকালো বিভেদের এবং কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাভাবিক হীনতাচেতনার একটা দার্শনিক সমর্থন তৈরি করে দিয়েছিল।

গোঁড়া খ্রীশ্চান সম্প্রদায়-এর প্রচার ডারউইনতন্ত্রের অপব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে রচিত,নৃতাত্ত্বিকদের 'বৈজ্ঞানিক' প্রচার দাস-ব্যবসার ইতিহাসের ফল এবং আফ্রিকা বিভাজনোত্তর কলোনিয়াল শাসন—সাদা-কালো বিভেদের একটা দার্শনিক সমর্থন তৈরি করে দিয়েছিল।

আফ্রিকার প্রতিবাদী সাহিত্যে সাধারণ পরিচিতির জন্য মহাদেশের প্রেক্ষিতে সাদাকালো দ্বন্দ্বের এই অতি সাধারণীকৃত প্রেক্ষাপট সম্ভবত প্রয়োজনীয় বিবেচিত হবে।

॥ দুই ॥

বুয়রদের ন্যাশনালিস্ট আপার্টহাইড নীতি প্রবর্তনের পর দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ জীবন আরও দুঃসহ হয় ঠিকই, কিন্তু তার আগেও অবস্থা খুব সুখকর ছিল না। ইংরেজ আমলে বিশেষ করে নগরাঞ্চলে, কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকানদের বরাবরই বরদাস্ত করা হত প্রধানত নানা শিল্পে এবং খনিতে প্রয়োজনীয় শ্রম -উৎস হিসাবে। নগরের আলাদা অঞ্চলেই এদের বসবাস করতে হত—যথা জোহানেসবার্গের উপান্তে ওর্লানডো স্টেশনের কাছে শ্যানটি টাউনে। অপেক্ষাকৃত ধনী কৃষ্ণকায়রা থাকতে পারত শহরের মধ্যেই সোফিয়া টাউন-এ, সেখানে সম্পন্ন ভারতীয় এবং মিশ্রবর্ণ মানুষরাও থাকত। আপার্টহাইড আইনত কায়েমী হবার আগে সাদাকালোতে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। ন্যাশনালিস্ট সরকার সোফিয়াটাউন ভেঙ্গে দেয় এবং অবাঞ্ছিত কৃষ্ণকায় সম্প্রদায় এখন সাউথ ওয়েস্ট টাউনশিপ বা সোয়েটোতে থাকে। সেখান থেকে তাদের ট্রেনে করে আসতে হয় শহরে খাটতে। তাদের প্রত্যেকের 'পাস' থাকা চাই। না থাকলে গ্রেপ্তার এবং তাদের উপজাতিভিত্তিক হোমল্যান্ড বা বান্টুস্তান-এ জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া চলতে পারে। 'বান্টুস্তান'গুলি 'স্বায়ত্তশাসিত' কৃষ্ণকায় অঞ্চল—বর্তমান সরকারের পৃথক উন্নতি করণের নমুনা স্বরূপ জগতে বিজ্ঞাপিত। সেখানকার দুর্বিষহ জীবনের প্রতিচ্ছবি লুকিয়ে তুলে আনা "লাস্ট গ্রেভস্ অ্যাট ডিম্বাজা" ছবিতে আমরা দেখতে পেয়েছি।

এই অমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দক্ষিণ আফ্রিকায় শুরু হয়েছিল বিশ ত্রিশের দশকেই। বিখ্যাত দক্ষিণ আফ্রিকান কবি ও সাহিত্য সমালোচক সাহিত্যের মাধ্যমে এই নালিশের উৎস সন্ধান করেছেন উইলিয়ম প্লোমার -এর "টুরবোট্ ভোল্ফ্" উপন্যাসে এবং জুলু কবি বেনেডিক্ট ভিলাকাজির দ্বিভাষী কবিতায়। লক্ষ্য করার বিষয় হ'ল প্লোমার ছিলেন শ্বেতকায়। নির্যাতক সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিরোধী কণ্ঠের যে ধারাটি পরে আলান্ প্যাটন, নাডিন গার্ডিমার, আন্দ্রে ব্রিংক পর্যন্ত চলে, তার ভূমিকা রয়েছে এই উপন্যাসে। উপন্যাসটি শুধু বিভিন্ন বর্ণের মানুষের সহাবস্থান নয় মিশ্রবর্ণেরও সমর্থন রয়েছে। উপন্যাসের চরিত্র 'ইয়ং আফ্রিকা' নামে একটি সম্প্রদায় তৈরি করে তাদের যে উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছেন, তার একটি হল :—"আমরা মনে করি আফ্রিকা শ্বেতকায়দের দেশ নয়, মিশ্রবিবাহ আফ্রিকাতে আফ্রিকানদের নিরাপত্তার একমাত্র উপায়।" ১৯২৫ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসের ১৯৬৫ সালে সূর্যের মুখ দেখা আন্দ্রে ব্রিংকের উপন্যাসের মতই দুষ্কর হত। ভিলাকাজির কবিতায় বিদ্রোহের গর্জনের চেয়ে বেদনার প্রকাশই বেশি—তবু এ ধরনের পঙ্‌ক্তি তার কাব্যে আছে :—

"অবিরত গর্জাও মেশিন আমার, / গর্জাও প্রভাত থেকে সন্ধ্যাবধি ; / জাগব আমি, জাগতে দাও আমাকে,/ গর্জাও মেশিন ঢাকা দাও / কৃষ্ণাঙ্গদের আর্তনাদ / শ্রমে ক্লিষ্ট মাংসপেশী / ভ্রূণীয় বাতাসে রুদ্ধশ্বাস / ঘামে ধূলিমলিন মাংসপেশী / কম্পনেও অনড়।"

সোয়েটোতে বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী মিছিলের উপর পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলি সহস্রাধিক যুবককে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়

জুলু ছাড়া খখসা ভাষাতেও রচিত হয়েছে প্রতিবাদী সাহিত্য। সুর নরম এবং অনেকক্ষেত্রে অতীত গৌরবচারী। কিন্তু সেখানে ভিন্ন সুর শোনা যাচ্ছে এস মাখাযি নামক কবির দু একটি রচনায়

"ও গো প্রবলা ব্রিটানিয়া। কারে আলিঙ্গন করি ?/সত্যকে দিয়েছ তুমি, দিয়েছ মিথ্যাকেও ; জীবন দিয়েছ মোদের, বঞ্চিতও করেছ জীবন থেকে / আলো এনে দাও তুমি, বসে থাকি অন্ধকারে / রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে বসে নৈশ শীতে কম্পমান।"

কবি জেমস্ আর. জোলোবে সক্রিয় ছিলেন বিশের দশকে। মিশনারি শিক্ষার প্রভাবে তিনি আফ্রিকার নবজাগরণের অনুকূলে খ্রিষ্টধর্মকে প্রযুক্ত দেখেন ও দেখান। কিন্তু উমইয়েজু বা "দি মেকিং অফ এ স্লেভ" নামক দীর্ঘ কবিতায় তিনি আফ্রিকানদের দাসশ্রম হিসাবে ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এই ভাষায় রচিত "পূর্বপুরুষের রোষ" উপন্যাসে লেখক এ. সি. জরডান যেভাবে পাশ্চাত্য ও আফ্রিকীয় দুই সংস্কৃতির সংঘাতকে দেখান—তারই অনেক উন্নত শিল্পরূপ পরে আমরা পেয়েছি নাইজেরিয়ার বিখ্যাত উপন্যাসিক চিনুয়া আচেবের Things Fall Apart বা Arrow of God উপন্যাসে! ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির প্রতি তুলনীয়, কিঞ্চিৎ বিদ্রূপাত্মক মনোভাব পশ্চিম মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায় ঘানার কোফ্ হো রচিত 'আকাশ' নামক কবিতায় যেখানে ইয়োরোপীয় শিশুর ঔদ্ধত্য ও পিতৃমাতৃ অবমাননা প্রসঙ্গ ঘুরে ঘুরে আসে।

কবিতা ও গানের মাধ্যমেই দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিবাদী সাহিত্য সোচ্চার হয়েছে গদ্যের চেয়ে বেশি। ১৯৫৬ সালে গুড ফ্রাইডে উৎসবে পোর্ট এলিজাবেথ-এ একটি শান্ত শোভাযাত্রায় পুলিসের গুলিতে কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকানরা নিহত হলে কবি ডেনিস্ ব্রুটাস লেখেন :

"আমাদের বীর নেই, যুদ্ধ নেই / আছে শুধু রুগ্ন রাষ্ট্রের বলি/ সর্বাঙ্গে বিচিত্র ক্ষত/ ঘৃণার বৃষ্টিতে পুষ্ট।"

১৯৭৬ সালে সোয়েটো টাউনশিপে পুলিসী তাণ্ডবের (আমাদের জালিয়ানওয়ালাবাগ এবং দক্ষিণ আফ্রিকারই ১৯৬০ সালের শার্পে ভিল ঘটনা সদৃশ) প্রতিক্রিয়াতে তিনি লেখেন :—

"একটি মেয়ে ছিল/ বছর আটেক বয়স, তারা বলে/ পরিপাটি বেণী বাঁধা মাথা/ নিতান্ত অনুকারী মুঠি ছিল উর্ধ্বমুখ।/ তারপর! এক পিণ্ড লাল/ কিছু খণ্ড মাংসপেশী/ আর উজ্জ্বল কম্বলের ফালি :/ রঙিন ছাপাছিটের ফ্রক পরা মেয়ে, একদা, বলে তারা।"

১৯৭৭ সালে ডিটেনশন ক্যাম্পে আপার্টহাইড বিরোধী নেতা স্টিভ্ বিকোর মৃত্যু উপলক্ষ্যে ব্রুটাস লেখেন দীর্ঘ ভাবগভীর কবিতা "ট্রিবিউট টু স্টিভ বিকো।" দক্ষিণ আফ্রিকার আর এক কবি কেওরাপেট্সে খোসিট্সিলে প্রতিবাদে ও উজ্জীবনের সুরে বেশী সোচ্চার ; সংগ্রামী সংস্থা আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস-এর নেতা ডুয়া নোকুয়ের উদ্দেশে তিনি লেখেন, "অনন্ত বিলাপের জন্য আমরা সৃষ্ট নই / জন্তুর অবারিত পাশবতা আমাদের বিকল করবে না / খড়কুটো আমরা নই / তোমার শান্তি ও মানবতার জোরে হব বলীয়ান।" "নবযুগ" কবিতায় তিনি লেখেন, "মনে রেখো, ব্যাটন বুট আর বুলেটের অনুষ্ঠানে/ আমার মায়ের শরীরে দাগা দেয় 'সোয়েটো'/ রাক্ষস ফোর্স্টারের ডালকুত্তাগুলি।/ লিখেছিল শিশু শরীরের রক্তে!" সম্ভবত আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের প্রভাবে খোসিট্সিলের মধ্যে আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে একটা একাত্মতা

মা ও সন্তান

বোধ রয়েছে—যার মধ্যে প্যান আফ্রিকানিজম ও নেগ্রিচিউড আদর্শের এক ধরনের উত্তরাধিকার বর্তেছে বলা যায়। এই সার্বিক কৃষ্ণকায়চেতনা কিন্তু মহাদেশের সব সাহিত্যিকদের মধ্যে এখন কাজ করে না। বরঞ্চ এর বিপরীত সুর আমেরিকান কৃষ্ণকায়দের প্রতি অশ্রদ্ধা অভিমানও প্রকাশ পায় কখনও কখনও। উগাণ্ডার কবি তাবান্ লো লিয়ং লেখেন, "কৃষ্ণকায়-আমেরিকানের কথা থাক/ এমনকি 'ব্ল্যাকমোসলেম' আফ্রিকাকে ছেড়ে/ আরবে আশ্বাস খোঁজে!" নানা কারণে পরস্পর বিবদমান হওয়াতে স্বাধীনতা উত্তর পর্বে (অর্থাৎ ১৯৬০ সালের পর, মোটামুটি) "আফ্রিকান ঐক্যই" অলীক স্বপ্ন বা ফাঁকা স্লোগান হতে চলেছে সেখানে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানের সঙ্গে আফ্রিকানের একাত্মতাবোধ খুব সহজ নয়। দক্ষিণ-আফ্রিকার বাস্তব পরিস্থিতি আলাদা। সেখানে সাদাকালো

> বর্তমান সরকারের পৃথক উন্নতিকরণের স্বরূপ জগতে বিজ্ঞাপিত। সেখানকার দুর্বিষহ জীবনের প্রতিচ্ছবি লুকিয়ে তুলে আনা "লাস্ট গ্রেভস্ অ্যাট ডিম্বাজা" ছবিতে বিশ্ববাসী দেখেছে। এই অমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দক্ষিণ আফ্রিকায় শুরু হয়েছিল বিশ-ত্রিশের দশকেই। দক্ষিণ আফ্রিকার কবি ও সাহিত্য সমালোচক সাহিত্যের মাধ্যমে এই নালিশের উৎস সন্ধান করেছেন।

সম্পর্কের স্মৃতি সত্তা অন্তত পৃথক, ভবিষ্যতের কথা বলা যাচ্ছে না।

আপার্টহাইড পোষক ইঙ্গ-মার্কিন মূলধন বিনিয়োগকে তীব্র ব্যঙ্গ করে এ· এন· সি· কুমালো (ছদ্মনাম) লেখেন—"লন্ডনের মুনাফাখোর/ টাকার কুমীর/ শোষক উকুন/ হাঁসের মাংসে আর বনমোরগে স্ফীতোদর/ পুষ্টদেহ গলফে, জিনে/ আর প্রাপ্ত ডিভিডেন্ডে/ আর কিসে, হে পুরুষ্টু ছারপোকা?" শার্পভিল-এ পুলিসী অত্যাচার, ১৯৬৪তে কৃষ্ণাঙ্গ ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ফাঁসির ঘটনা, কৃষ্ণাঙ্গচেতনাবোধক

সঙ্গীত রচয়িতা ভুয়ু সিলে মিনির মৃত্যুকে জড়িয়ে কুমালো "প্রতিহিংসা" কবিতায় লেখেন—"কেমন হয়, যদি আঁধার রাতে এসে/ তোমার শরীরে বিঁধাই বর্শা আমার/ মৃতের বদলা নেব বলে ?" নজুইজে নামক গুপ্তচরকে উদ্দেশ করে কবি বলেন—"পিতৃহন্তাকে আলিঙ্গন করো দুঃসাহসে/ আত্মীয়কে পৌঁছে দাও ফাঁসিকাঠে/ পিতৃপুরুষের দেবতাকে করো উপহাস/ বিদেশীর কানে তোল গোপনতা যত/ ব্যঙ্গ করেছ বয়স্কের পবিত্র মাথা/ উন্মুক্ত করেছ তাদের ওষ্ঠবদ্ধ প্রাচীন সত্যকে !" *'বয়স্কের পবিত্রতা' বা 'ওষ্ঠবদ্ধ প্রাচীন সত্য'র প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন—অর্থাৎ দুই সংস্কৃতির সংঘাতের ক্ষেত্রে সনাতন আফ্রিকীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন—এটা অবশ্য আফ্রিকার অন্যান্য দেশের মত দক্ষিণ আফ্রিকার সাহিত্যের প্রধান সুর নয়।* ঐতিহ্যের সগর্ব বন্দনার অপেক্ষাকৃত কম অনুপস্থিতির কারণ সম্ভবত ১) বিশেষ আর্থনীতিক কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষ অনেকটা উপজাতিচেতনাতিক্রান্ত বা detribalised, আবার আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গদের মত 'পরদেশী' নয় বলে তাদের মত নতুন করে মূল অন্বেষণের তাগিদ জুলু খখসাদের নেই। ২) 'সনাতনী সংস্কৃতির' প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের ফলস্বরূপ obscurantism-এর বিপদ সম্পর্কে তারা সচেতন এবং এতে আপার্টহাইড-ভিত্তিক সরকারের 'পৃথক উন্নতি'র মতাদর্শ পরোক্ষেও পুষ্ট হতে পারে এই চেতনা। ৩) যে নিদারুণ অমানবিক অবস্থার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার অশ্বেতাঙ্গরা সংগ্রামে রত, সেখানে ঐ ধরনের প্রাচীন সংস্কৃতিমনস্ক হবার সুযোগ তাদের নেই। ৪) মার্কসীয় ভাবনার প্রভাব। কুনেনে নিজে জুলু ভাষায় কাব্য রচনা করেন বলে সম্ভবত তার মধ্যে জুলু ইতিহাসের প্রতি একটা ব্যক্তিগত টান থেকে গেছে। তাই The rise of the Angry generation কবিতাতেও দেখি তিনি বর্তমান রাগী প্রজন্মকে abiding anger of the Ancestral Forefathers বলে অভিহিত করছেন। কিন্তু কস্‌মো পিটেরসে যখন ১৯৬৭-৬৮ সালে ফোরস্টার স্মিথ সরকারের যুগ্ম ফ্যাসিবাদের বলি তরুণ এ-এন-সি গেরিলা যোদ্ধা বেসিলকে নিয়ে কবিতা লেখেন তখন তাঁর চেতনায় নিহত যুবকের কঙ্কাল কোনো পিতৃপুরুষের স্মৃতি জাগায় না। তাঁর কাব্যে তখন জিম্বাবোয়ে দক্ষিণ-আফ্রিকার বিরাট মাপের ভবিষ্যৎ প্রবল আকার নিয়েছে। পিটেরসের ভাষা অতি নিপুণ। প্রতিবাদ প্রচারের তাগিদে দক্ষিণ আফ্রিকার সাহিত্য নান্দনিক গুণকে জলাঞ্জলি দিয়েছে—বহু সমালোচকের এই বদনামকে এ ধরনের রচনা নাকচ করে দেয়। আক্ষরিক অনুবাদে সে কাব্যগুণের পরিচয় দেওয়া দুষ্কর—"চাঁদের গান গাই / অস্তিত্বের ন'টি নীল চাঁদ / গান গাই নিষ্ফলা রক্তের চাঁদের / আমাদেরই মেয়ের রক্ত, গান গাই/ কায়াহীন চোখ থেকে ঝরে পড়া জলের,/ নিরন্তর দৃষ্টি তার বিশুষ্ক এখন।" লন্ডন প্রবাসী কবি আর্থার নর্টইয়ে বিশ্বচেতনায় ইয়েটস্, শেকস্পীয়র, লুঠুলি, মাণ্ডেলা আডাম কক-এর সঙ্গে জুলু রাজা শাকার নামও আছে— সে শাকা শুধু প্রতীকী—ওর মধ্যে পিছুটান নেই। "ধূসর নিরাপত্তা"র শহর লন্ডনে বসে কবির মনে হয় we are here, nameles staring at ourselves। এ কবির অকাল মৃত্যুতে ব্যথিত অগ্রজ কবি ডেভিড ইভান্‌স্ লিখেছিলেন ১৯৭০ সালে "ইংলিশ কবরে শায়িত কবি / প্রভু বড় খুশী। আমার মনে গভীর অসুখ।" সেই কবিতায় দেখি মৃত কবির শোকে গান গাইছে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রান্তরের ডাসি (বড় খরগোস) শহরের কৃষ্ণাঙ্গ ঘেটোর মানুষেরা—সঙ্গে বাজে 'গিট' (স্থানীয় গীটার), গোৎগাগ্ (ক্যানেস্তারা দিয়ে তৈরি হার্প-সদৃশ যন্ত্র) মনড় ফ্লুটিয়ে (মাউথ অরগ্যান) ও ক্লাভিয়ের (দেশী পিয়ানো)। ব্যারী ফাইনবার্গ দেখান কীভাবে গান্ধীবাদী শান্তিকামী মানুষ সাদামানুষের বুটের চাপে হিংসার পথে যায়, তারা বলে, To morrow may be no game but combat coming! এই তীব্র নালিশ, আর্তনাদ ও ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য প্রতিজ্ঞায় গলা মেলান ক্রিস্টোফার ভান্ আইক। তিনি বলেন: I'll never get used to nightmares/ but after I dream of freedom"। জন মাটশিকিজা লেখেন নেলসন্ মাণ্ডেলাকে নিয়ে কবিতা। এরা অনেকেই বলেন, 'ফুল নিয়ে খেলবার দিন নয় অদ্য'।

তুলনায় কম জোরের হলেও গদ্যসাহিত্যে বর্ণবৈষম্যের প্রতিবাদ নগণ্য নয় দক্ষিণ আফ্রিকার সাহিত্যে। পিটার এব্রাহামসের মাইন্ বয় (১৯৪৬) উপন্যাসকে 'প্রতিবাদী' কেন, কোনো রকম স্বীকৃতিই দিতে রাজি নন দক্ষিণ-আফ্রিকারই বিখ্যাত লেখক লিইউস্ নকোসি। এড্রিয়ান রস্কোও তাঁর আলোচনাতে পিটার এব্রাহামসকে স্থান দেননি। এব্রাহামসের লেখাতে বিদ্রোহের সুর সোচ্চার নয় বটে, কিন্তু বর্ণবৈষম্যবোধের কুফল তাতে সত্যতার সঙ্গে চিত্রিত খনি শ্রমিকদের দুর্দশার ছবিতে। সাহিত্য প্রখর প্রতিবাদ না হয়েও অনেকক্ষেত্রে শুধু বাস্তবের বিশ্বস্ত প্রতিফলন হলেও অন্যায় অবস্থার সমালোচনা হতে পারে। 'ডার্ক টেস্টমেন্ট' (১৯৪২) 'টেল ফ্রিডম' (১৯৫৬ সালে লেখা, কিছুটা আত্মজীবনীমূলক) 'এ রীদ ফর উডোমো' (১৯৫৬) প্রভৃতি উপন্যাসে এব্রাহামস্ কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয়, বর্ণসংকর (দক্ষিণ আফ্রিকাতে 'কালার্ড' নামে অভিহিত, আমাদের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান-এর শামিল) তিন অ-শ্বেতকায় সম্প্রদায়ের অপমানকর অবস্থাকেই মেলে ধরেছেন। 'শাকা জুলু'র লেখক টমাস মোফোলোর মত এব্রাহামসও শ্বেতকায় লেখকদের তৈরি স্টিরিওটাইপ "গাগুল" (রাইডার হাগার্ড প্রমুখ লেখকদের তৈরি 'বর্বর আফ্রিকান'—ওয়েস্টার্ন ছবির অসভ্য রেড ইণ্ডিয়ান সদৃশ) ভেঙ্গে স্বাভাবিক আফ্রিকান মানুষকে আধুনিক গদ্যসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। চল্লিশ পঞ্চাশের দশকের দক্ষিণ আফ্রিকান লেখকদের এই কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিতেই হবে। শ্বেতকায় ঔপন্যাসিক আলান প্যাটন-এর 'ক্রাই, বিলাভেড কান্ট্রি' পশ্চিমী পাঠকদের খুবই প্রিয়, এতে "ক্রোধের প্রকাশ নেই" বলে। এক দল লিবারেল পন্থী ইংরেজ লেখকের কাছ থেকে খুব বেশি আশা করার কিছু থাকে না প্রতিবাদের ক্ষেত্রে। তবু একজন শ্বেতকায় সহানুভূতির চোখে কৃষ্ণকায়কে দেখছে—এ দিক থেকে এ উপন্যাস উল্লেখের দাবী রাখে। ক্রোধে ফেটে পড়েন আলেক্স লা গুমা ও এজেকিয়েল মফাহ্‌লেলে। বর্ণসংকর লা গুমা আপার্টহাইড নীতির অমানবিকতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাসহ ধিক্কার দেন তাকে তাঁর রচনাতে। এ ওয়াক ইন দ্য নাইট (১৯৬২) উপন্যাসের এডোনিস উইলিয়ম, ডাফ্‌টি এই অমানবিক নীতির শিকার। 'অ্যান্ড থ্রিফোল্ড কর্ড' শ্যানটি টাউন বা বস্তির নারকীয় জীবনের উদ্‌ঘাটন। "দ্য স্টোনি কানট্রি"তে নিজস্ব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক দক্ষিণ আফ্রিকার কারাগারে বন্দীদের ভয়াবহ দুর্দশার কাহিনী বিধৃত। মফাহ্‌লেলে 'দ্য লিভিং অ্যান্ড দ্য ডেড' (১৯৬১) এবং 'ইন্ কর্নার বি (১৯৬৭) ছোটগল্প সংকলনে কৃষ্ণাঙ্গের অমানবিক অস্তিত্বের উদ্‌ঘাটন করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার মত পাশবিক না হলেও, উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়াতে (বর্তমান জ্যাম্বিয়া ও জিম্বাবোয়ে) বর্ণবৈষম্যনীতি ইংরেজ শাসনকালে একরকম করে চালু ছিল। কারণ অনুকূল জলবায়ু ও খনিজসম্পদের জন্য পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়াসহ আফ্রিকার শ্বেতকায় অধ্যুষিত এলাকা (Settlers colony) কৃষ্ণকায়দের উর্বর জমি কেড়ে নিয়ে তাদের অপেক্ষাকৃত অনুর্বর অঞ্চলের নেটিভ রিজার্ভে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। কেনিয়াতে বিখ্যাত মাউ মাউ বিদ্রোহের (১৯৫২-৫৬) উৎস গিকুয়ু গোষ্ঠীর এই জমিহরণ। ফলে এসব অঞ্চলের গদ্যসাহিত্যেও আমরা বর্ণবৈষম্যনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ লক্ষ্য করি, বিশেষ করে বর্তমান জ্যাম্বিয়ার ফোয়ানিয়াংগা মুলিকিতার ছোটগল্পে।

নাটক রচনার ক্ষেত্রে স্বয়ং লিউইস্ নকোসিই কিন্তু আপার্টহাইডের জঙ্গী সমালোচনা করেছেন তাঁর "রিদম্ অফ ভায়োলেনস" নাটকে। আথল ফুগার্ড-এর রচনার মত জটিল নয় সে নাটক, তবু বিষয়বস্তুর গৌরবে উল্লেখযোগ্য। ডি গ্রাফ্‌টের "থ্রু এ ফিল্ম ডার্কলি" নাটকে স্বাধীনতা উত্তর ঘানাতে শ্বেতকায়-কৃষ্ণকায় সম্পর্ক কিঞ্চিৎ সরলীকৃত বিয়োগান্ত কাহিনীতে ধরা হয়েছে। সোইংকার নাটকের উচ্চাঙ্গের উৎপ্রেক্ষা ব্ল্যাক কমেডির সূক্ষ্মতা তারমধ্যে নেই। সোইংকার মত আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী আথল ফুগার্ড। অতি নিপুণ ও উচ্চাঙ্গের রচনা তাঁর নাটকগুলি। তিনি বর্ণবিভেদ সমস্যাকে অস্বাভাবিক সামাজিক পটভূমিতে ব্যক্তির টিঁকে থাকার সমস্যা অনেক বেশি গভীরতার সঙ্গে বিধৃত করেন। সেখানে শুধু কৃষ্ণাঙ্গের নয়, সব বর্ণের ব্যক্তির যন্ত্রণাই তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে। কৃষ্ণাঙ্গের যন্ত্রণা নিয়ে যেমন রয়েছে 'নোং গোগো' নাটক, শ্বেতকায়ের মনোযন্ত্রণা নিয়ে রয়েছে সাম্প্রতিকতম নাটক "রোড টু মক্কা"।

সমালোচকদের একথা সম্ভবত অংশত সত্য যে কল্পনাশ্রয়ী সাহিত্যরচনার চেয়ে 'সিনেমা ভেরিতে' রীতিতে রচিত সত্যঘটনাশ্রয়ী বর্ণনাধর্মী এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মজীবনীমূলক রচনা এরকম একটা প্রেক্ষিতে অধিক মূল্যবান প্রতীয়মান হবে। এই প্রেক্ষিতেই এজেকিয়েল

গায়ের রঙের বিচারে নির্ধারিত ভাগ্যের বিরুদ্ধে, দীর্ঘ নিপীড়নের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ গর্জে উঠেছিল দক্ষিণ আফ্রিকার যুব সমাজের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়তে থাকল সমস্ত দিকে

ম্ফাহ্‌লেলের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি গুরুত্বপূর্ণ, এবং তা একভাবে লিউইস্ নকোসির জবাবও বটে : "I am clearly not a novelist in the special sense in which a man like Chinua Achebe can be said to be. I am just a writer." তাই তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা "ডাউন সেকেণ্ড অ্যাভেনিউ" (১৯৫৯) বা বর্তমান জ্যাম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি কেনেথ কাউণ্ডার "জ্যাম্বিয়া স্যাল বি ফ্রি" (১৯৬৯) থেকে হাল আমলের দক্ষিণ আফ্রিকান মহিলা সাংবাদিক জয়েস্ সিকাকানে-র আত্মজীবনী "এ উইনডো অন্ সোয়েটো"র বস্তুনিষ্ঠ সৎ বর্ণনা ও বিশ্লেষণ বর্ণবৈষম্যবিরোধী সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

পর্তুগীজ আফ্রিকা অর্থাৎ অ্যাঙ্গোলা-মোজাম্বিকেও বর্ণ সম্পর্কের অনৈতিকতাকে ধরা হয়েছে কাব্যে গদ্যসাহিত্যে। অ্যাঙ্গোলার ঔপন্যাসিক কাস্ত্রো সোরমেনহো তাঁর "টেরা মোতা" উপন্যাসে কৃষ্ণাঙ্গ দরিদ্রের প্রতি শুধু শ্বেতকায়দেরই নয়, অর্ধশ্বেতকায় মুলাত সম্প্রদায় এবং পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন কৃষ্ণকায় বা assimilado (assimilated)দের অবজ্ঞাকেও তীব্রভাবে তিরস্কার করেছেন। মোজাম্বিকের লেখক লুই বার্নাদো হনওয়ানার লেখাতে খামারে কৃষ্ণাঙ্গ কৃষকদের ওপর অত্যাচারের বেদনাবহ চিত্র লভ্য। কাব্যে সোচ্চার ছিলেন স্বয়ং আগোস্তিনো নেতো, যিনি অ্যাঙ্গোলার স্বাধীনতা সংগ্রামী সংস্থা এম পি এল-এর নেতা এবং স্বাধীন অ্যাঙ্গোলার প্রথম রাষ্ট্রপতি। সূক্ষ্মতা এঁদের প্রতিবাদী কাব্যে পাওয়া যায় না বলে আবার একই নালিশ জানিয়েছেন সমালোচক উলি বাইয়ের এবং জেরাল্ড্ মুর ('little more than a sheer cry of agony and loss) এবং তাঁদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন ডাগ্লস কিন্তু 'agony' ও loss যখন অতটা তীব্র ও গভীর তখন তার cry-ও প্রকট হতে বাধ্য—একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে হয় এখানে। ভিক্তোরিও দা ক্রুজ-এর কবিতায় (ব্ল্যাক মাদার)। দাসব্যবসার "কত শতাব্দীর কলমে জীবন দিয়ে লেখা রক্ত মাংসের নাটকে"র বেদনা বিধৃত দেখি। সেই বেদনা তিক্ততার রূপ নেয় নেতোর পঙ্‌ক্তিতে : "সিল্‌ভা কোস্তা / এসেছিল দ্বীপে / মদের ব্যাপারী / মানুষের কারবার। খামার দখল"—এই ধরনের সংক্ষিপ্ত 'কোড' সদৃশ বাক্যাংশে। ১৯৫৩ সালের আন্দোলন ও পর্তুগীজ সরকারের নৃশংস দমনের প্রেক্ষিতে তিনি লেখেন : "রক্ত ঝরেছে যাদের / মৃত্যুর অরণ্যে / নিষ্পাপ রক্ত / মাটি ভিজে গেছে তাতে / কম্পমান নৈঃশব্দ্যে / উর্বর করবে ভূমি / বিচারের দাবী উঠবে তবে।" ঐ সব সমালোচকেরা অবশ্য শেষ পর্যন্ত নেতোর "carefully recorded efforts" - কে পিঠচাপড়ানো গোছের প্রশংসা করেছেন। কোনো কোনো পর্তুগীজ আফ্রিকান কাব্যে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের সঙ্গে একাত্মতাবোধের পরিচয় আছে—সেটা লক্ষ্য করবার মত। মার্চেলিনো দস্ সান্তোস (যিনি কুলুঙ্গানা ছদ্মনামে লিখেছেন)-এর কাব্যে (Where I am) পল্ রবসনের উল্লেখ আছে। লুই আর্মস্টং, মারিয়ান এণ্ডারসন ও ল্যাংস্টন হিউজের কবিতার উল্লেখ এদের কাব্যে ফিরে ফিরে আসে। এটা সম্ভবত পর্তুগীজ আফ্রিকার অধিকতর cosmopolitanism-এর ফল, তাছাড়া এ একাত্মতাবোধও খুব গভীরে পৌঁছয় না—অনেকটা সাংস্কৃতিক অভ্যাসের স্তরে থাকে।

ট্রান্সভাল সুপ্রীম কোর্টে নেলসন ম্যান্ডেলা

॥ তিন ॥

কেনিয়ার মাউ মাউ বিদ্রোহে (১৯৫২-৫৬) সাদাকালো সংঘর্ষের একটা প্রকট প্রকাশ ঘটেছিল। ন্‌গুগি বা থিওংগো-র উপন্যাসে ("অ্যা গ্রেন্ অফ্ হুইট", "পেটাল্‌স্ অফ ব্লাড") তার উপস্থাপনা রয়েছে। কিন্তু বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকার বাইরে, ঐতিহাসিক পার্থক্য হেতু, প্রতিবাদী সাহিত্য শুধু বর্ণবিদ্বেষের গণ্ডীর মধ্যে আটকে থাকেনি। প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর যুগে কৃষ্ণকায় শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার ও দমননীতি ও নানাপ্রকার দুর্নীতিকেও সে সাহিত্যে তীব্রভাবে সমালোচনা ও আক্রমণ করা হয়েছে।—এ ব্যাপারে নাইজেরিয়ার চিনুয়া আচেবের 'A Man of the people নামক ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাসটি স্মরণীয়; —ন্‌গুগির আক্রমণ ও নিও কলোনিয়ালিজমের সমালোচনা আরো তীব্র। পশ্চিম আফ্রিকার সেনেগালের লেখক চলচ্চিত্রকার ওস্‌মান সেমবেন্ এই কোঠায় পড়েন। প্রতিকূল জলবায়ু ও ম্যালেরিয়ার দাপটে পশ্চিম আফ্রিকাতে (whiteman's grave) শ্বেতকায়রা পাকপাকিভাবে বসবাস করেনি, দূর থেকে কলকাঠি নেড়েছে, এবং কলকাঠি নাড়তে সাহায্য করেছে যে কম্প্রাদর বুর্জোয়াসি তারাই সেমবেনের এবং বক্রভাবে, নাইজেরিয়ার ওলে সোইংকার আক্রমণের পাত্র। সেমবেন্ "মনি অর্ডার," ক্‌জালা (Xala) ইত্যাদি উপন্যাস-চলচ্চিত্রে এই উচ্চশ্রেণীর আফ্রিকানদের তীব্র ব্যঙ্গ করেন, আবার প্রাককলোনীয় ইস্‌লামীয় অভিজাততন্ত্রকেও তিনি আক্রমণ করেন 'সেড্‌ডো'তে। তবু সরাসরি শ্বেতকায় কৃষ্ণকায় সম্পর্ক দক্ষিণ আফ্রিকার বাইরের সাহিত্যে অনুপস্থিত নয়। একাধিক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সেটা প্যারিস বা লন্ডনে কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্র-র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রকাশিত—তাই তাতে ব্যঙ্গোক্তি বক্রোক্তির ঝাঁঝ বেশি, নাগরিক চতুরতা ও বৈদগ্ধ্যও লক্ষণীয়। এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতকায় কৃষ্ণকায় যৌনমিলন যেহেতু দণ্ডনীয় অপরাধ নির্দিষ্ট হয় সাদা ন্যাশনালিস্টরা ক্ষমতায় আসার পর, এ ধরনের সাহিত্যে যেন তারই প্রতিক্রিয়াতে আমরা কল্পনার স্তরে একটা প্রতিশোধবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে দেখি।

শ্বেতাঙ্গ অন্যায়ের সরাসরি প্রতিবাদ পশ্চিম বা পূর্ব আফ্রিকার সাহিত্যে একেবারে বিরল নয়, যদিও সহজ প্রচার অপেক্ষা দুই সংস্কৃতির সংঘর্ষের ফলে উদ্ভূত জটিলতাকে ধরবার প্রবণতাই এখানে প্রবল। এই জটিলতা উদ্‌ঘাটন কখনও পরিণত কমেডির মধ্যে করা হয়েছে যেমন কামারা লাইয়ে, মোংগো বেত্তি বা ফর্দিনান্দ্ ওয়োনো-র উপন্যাসে। 'নেগ্রিচুড' আদর্শে রচিত ডেভিড দিয়পের কবিতায় এই সাদাকালো সম্পর্কের সংঘাতজনিত অনুভূতি তীব্রভাবে প্রকাশিত। "নিগ্রো অস্তিত্বে"র গৌরববোধ প্রকাশ পায় কঙ্গোর কবি চিকায়া উ' তামসি কাব্যে জটিল ভাষায়। লেওপোল্ড সেংঘোর (স্বাধীন সেনেগালের প্রথম রাষ্ট্রপতি) তাঁর কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করেন "কালো মুখোশ সাদা মুখোশ", কঠিন সাদাকালো প্রতিমার আড়ালে মৃতোচ্ছল আফ্রিকাকে। সঠিক আফ্রিকার লেখক না হলেও সেজেয়ার ও লেও দামাস -এর কাব্যে আফ্রিকার সঙ্গে একাত্মতা ফুটে ওঠে—দামাস করুণ কণ্ঠে বলেন, "আমাকে আমার কালো পুতুল ফিরিয়ে দাও"। সেজেয়ার তীব্র কণ্ঠে দাসনিগ্রহর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন, "মেনে নিই, মেনে নিই/ এবং চাবুকাহত নিগার বলে, 'সরি সাহ্'/ এবং আইনসঙ্গত চাবুকের গোণাগুণিতে উনত্রিশ আঘাত/ এবং চারফুট সেল/ গলায় কাঁটামারা লোহার বলয়।" এই দাসব্যবসায় যে কৃষ্ণকায় শাসকগোষ্ঠীরও সক্রিয় সাহায্য ছিল তা উস্‌মান্ সেমবেনের রচনায় প্রকাশ পায়। তিনি নেগ্রিচুড আদর্শকে অতিক্রম করে যান মার্কসীয় চিন্তার প্রভাবে। প্যারিসে প্রবাসী উ তামসির মনে অপরাধ বোধ, আহত বিবেক, কঙ্গোর ঘটনায় তীব্র বেদনা যে মিশ্র অনুভূতির সৃষ্টি করে তা তাঁর কাব্যের জটিল ভাষায় নিবদ্ধ। বেলজিয়ান অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ কখনও কখনও ফুটে ওঠে এই রকম পঙ্‌ক্তিতে, "নরমাংসে বৃষ্টি হয়ে গেছে গতকাল / তরুণ দেহের পেশী আকাশের স্তর থেকে/ ঝরে পড়ে উনিশ আটে/ তারপর উনষাট/ অত্যাশ্চর্য উল্কাপাতে কিন্‌শাসা জ্বলে একটি পারাবত পড়ে বধ্যভূমি 'পরে।" সেনেগালের কবি কিইতা ফোদেবা সনাতনী কথকতার ভঙ্গি অবলম্বনে রচনা করেন Poemes africaines-তাতে Aube Africaine (আফ্রিকান প্রভাত) নামক দীর্ঘ কবিতায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগদানকারী দামানের করুণ পরিণতি, শ্বেতকায় প্রভুদের দাসত্বের পুরস্কার। সনাতনী সংস্কৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট কবি (দাবো-মিসোকো) প্রমাণ করতে চান ইশপ্ ও দুমান্বয় ছিলেন কৃষ্ণকায়। আর এ. কোফি বা আকে লোবার উপন্যাসের মধ্যে প্যারিসে কৃষ্ণকায় ছাত্রদের দুর্গতির করুণ বর্ণনার মধ্যেও প্রতিবাদ মুখর।

॥ চার ॥

সমাজ পরিবর্তনে সাহিত্যের কোনো সক্রিয় ভূমিকা আছে কিনা এ তর্কের শেষ নেই। প্রতিবাদে ফল ফলে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে একটি কথা অবশ্যই বলা চলে—রাষ্ট্রশক্তি নিশ্চয় প্রতিবাদ বা সামান্য সমালোচনাকে ভয় পান, নইলে এত সেন্‌সরশিপের ব্যবস্থা কেন? দক্ষিণ আফ্রিকার আপার্টহাইড সরকারও ভয় পেয়েছেন—তাই সেখানকার অধিকাংশ লেখক হয় কারাগারে পচেন অথবা নির্বাসনে যান। মোলোইজের ভাগ্য এমন কিছু একক কাহিনী নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার উল্লিখিত লেখকরা এখন প্রায় সকলেই প্রবাসী (লাগুমা ও নর্টইয়ে প্রবাসে মৃত) অনেকে জ্যাম্বিয়া, তানজানিয়া প্রভৃতি দেশে থেকে ANCর সঙ্গে যুক্ত আছেন। শ্বেতকায় লেখক আন্দ্রে ব্রিংক জানাচ্ছেন—তাঁর লেখা পড়ে একজন শ্বেতকায় যুবক বলেন—'আপনার বই পড়ে আমি প্রথম হৃদয়ঙ্গম করি যে কৃষ্ণকায়রাও আমাদেরই মত মানুষ'—তখন সঙ্গত কারণেই লেখকের মনে প্রত্যয় জাগে লেখক হিসাবে অন্তত পাঠকের মনে চেতনা জাগাতে তাঁর সামান্য উদ্যম কিছুটা সার্থক হয়েছে। যদিও তিনি এই বলে সাবধান করেন যে দক্ষিণ আফ্রিকাতে Censorship has demonstrated its failure/ but it is not yet dead সাদাকালো সম্পর্কের বাইরেও, প্রতিবাদী সাহিত্য রচনার জন্য স্বাধীন আফ্রিকান দেশে রাষ্ট্রশক্তির কোপে পড়তে হয় ন্‌গুগি বা থিয়োংগো বা সেম্‌বেনের মত লেখকদের—একথাও এ প্রেক্ষিতে মনে রাখা উচিত। তবু তাঁরা থামেন না। আফ্রিকার আধুনিক সাহিত্য প্রধানত ইংরেজি, পর্তুগীজ ফরাসী বা আফ্রিকাআন্‌স ভাষায় রচিত। এতে বৃহত্তর পাঠকসমাজে পৌঁছতে বাধার সৃষ্টি হয়। ভারতে ইয়োরোপীয় ভাষা প্রয়োগ ও আফ্রিকাতে সে ভাষার ব্যবহারের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য রয়েছে। ঐ মহাদেশে মিশনারি শিক্ষার ফলে সাক্ষরতা, বিদেশী ভাষার মাধ্যমে প্রচার হয় বলে 'শিক্ষিত' সম্প্রদায়ের কাছে বিদেশী ভাষা অপেক্ষাকৃত বেশি অধিগত, আত্মস্থও বটে। তা ছাড়া সম্ভবত একরকম করে এ সমস্যার সমাধান হয় ঘানার মহিলা লেখক আমা আটা আইড়ু বা নাইজেরিয়ার এমোস তুতুয়ালার মত কেউ যদি পূর্বশাসকদের ভাষা দুমড়ে নেন আফ্রিকান ভাষার আদর্শে তা কিন্তু সার্বিক সমাধান হতে পারে না। তাই দেশজ ভাষায় আধুনিক সাহিত্য রচনা শুধু হয়েছে যথা ইথিওপিয়াতে আমহারিক, পূর্বআফ্রিকাতে সোয়াহিলি সাহিত্য, ন্‌গুগি বা থিয়োংগোর গিকুউ ভাষা ব্যবহার এবং সেনেগালে সেমবেনের 'ওলোফ' ভাষায় রচনা। দক্ষিণ আফ্রিকার সোথো, জুলু খখসার কথা উল্লিখিত হয়েছে তবে মনে রাখতে হবে যে সেখানে ইংরেজি ও আফ্রিকাআন্‌স্ ভাষা, কালার্ড ভারতীয় ও কৃষ্ণাঙ্গ তিন স্তরেই অনেকটা বেশি আত্মস্থ।

প্রতিবাদে ফল ফলে কিনা এই ভবিষ্যৎ চিন্তায় আকুল না হয়ে সংবেদনশীল শিল্পীরা সমাজসম্পৃক্ত সাহিত্যে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে প্রতিবাদ করেন। তাদের হয়েই সার্ত্র বলেন, "If literature is not everything, it is worth nothing. This is what I mean by commitment. It wilts if it is reduced to innocence or to songs....what is literature of an epoch but the epoch apropriated by its literature?" গার্ডিমার "লেখকের স্বাধীনতা"র জন্য সেনসারশিপের অবসান দাবী করেছেন। ১৯৭৫ সালে Indian Teachers Association-এর এক সভায় বলেছেন "Commitment and creative freedom become one" কিন্তু কবে ক্রিয়েটিভ ফ্রীডম পাবো এই আশায় প্রকাশোন্মুখ সাহিত্যিক হাত গুটিয়ে বসে থাকেন না। আন্দ্রে ব্রিংক স্বয়ং দেখিয়েছেন বাঁধন যতই শক্ত হচ্ছে কৃষ্ণাঙ্গ লেখকদের সাধনও ততই দৃঢ় হচ্ছে, কারণ তার মতে "Black writers has beenone of the most important factors pushing for change and (diverting that change) in south Africa." সার্ত্রের কথিত আদর্শে দক্ষিণ আফ্রিকার বাইরেও সাহিত্যিকরা এই নবযুগসৃষ্টির দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

শেষ

ধারাবাহিক রচনা

দানব ও দেবতা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

জাপানে আণবিক বোমা ফেলার প্রয়োজন ছিল কি ? জাপান হয়তো দু-এক দিনের মধ্যেই আত্মসমর্পণ করত । ম্যানহাটান প্রোজেক্টের বিজ্ঞানীদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমেরিকা প্রতিশোধ নিয়েছিল সুন্দর দুটি শহর সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে । শক্তির অহঙ্কার আবার যদি এমন সর্বনাশের মুখোমুখি করে দেয় মানবজাতিকে, তখন কে লিখবে সেই ইতিহাস ?
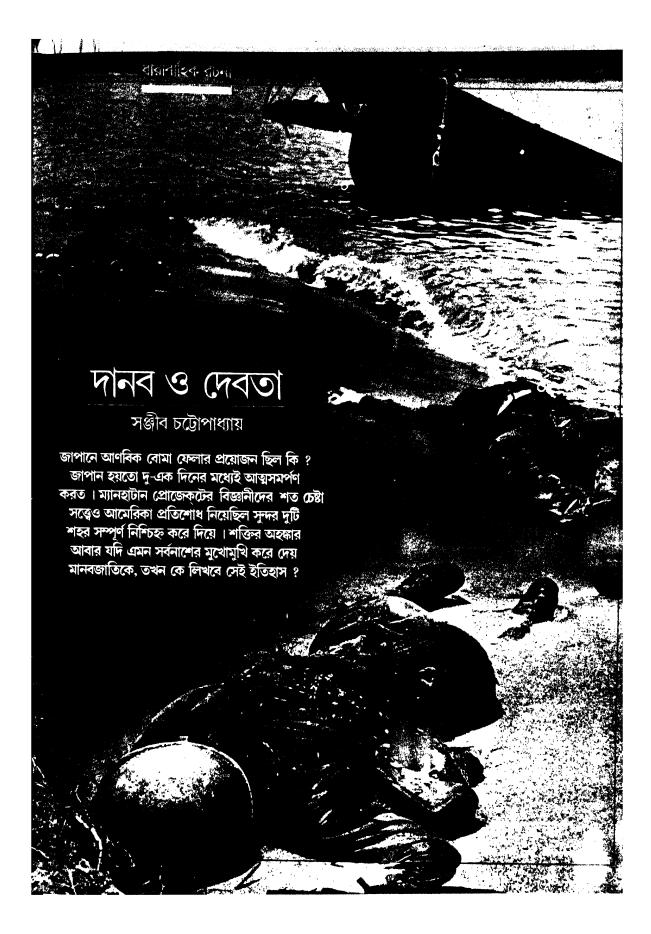
এর নাম যুদ্ধ

২৮ জুন, ১৯৪০, ৮৬টি জাপানী বিমান, তিন ঘণ্টার অবিরাম বোমাবর্ষণে এই কাণ্ড করেছে

আণবিক বোমা ফেলার দরকার ছিল না। জাপান আত্মসমর্পণ করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। অনমনীয় জাতীয় চরিত্রের কারণেই দেরি হচ্ছিল মাত্র। সামুরাই স্পিরিট। ইয়ামাতো-দামাশি। জেন বুদ্ধ ধর্মের প্রভাবে জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য। জীবন মরণ দুইই এক। সামুরাইদের জীবন দর্শন হল, বেঁচে আছি মরার জন্যে। হাগাকুরের ভাষায়, সামুরাইদের পথ হল মৃত্যুর পথ। অসম্মানজনক আত্মসমর্পণ নয়, আনুষ্ঠানিক মৃত্যুই শ্রেয়। অর্থাৎ 'সেপপুকু' বা 'হারাকিরি'। নিজের হাতে ছোরা চালিয়ে এ-পাশ থেকে ও-পাশ পেট চিরে ফেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমরাঙ্গনে জেনারেল হিদেকি তোজোর নির্দেশ ছিল, 'Don't Service shamefully as a prisoner, die, and thus escape ignominy'। যুদ্ধবন্দী হয়ে লজ্জার বেঁচে থাকা তোমাদের পথ নয়। তার চেয়ে মরে যাও। মৃত্যুবরণ করে অপমানের হাত থেকে বাঁচো। তোজো নিজেও আত্মসমর্পণের আগে তেপপো-বারা-র চেষ্টা করেছিলেন অর্থাৎ রিভলবারের গুলিতে আত্মহনন। দ্বাদশ শতক থেকে চলে আসছে এই ধারা। জাপানের সমর ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে ১১৭০ সালের যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন সেনাধ্যক্ষ তামেতোমো মিনামোতো। বিপক্ষের হাতে তিনি বন্দী হতে চাননি। বেছে নিয়েছিলেন আত্মহননের সম্মানজনক পথ। তরোয়াল দিয়ে চিরে ফেললেন নিজের পেট। এই হল ইতিহাসের শুরু। দ্বিতীয় আর একটি ঘটনায় এই রীতি হয়ে দাঁড়াল বীরের প্রথা। ১১৮৯ সালে আর এক জাপানী বীর য়ুশিতসোনে মিনামোতো পরাজিত হয়ে ওই একই পদ্ধতিতে আত্মহত্যা করলেন। সেপপুকুর আর এক নাম, কুসুন-গোবো, অর্থাৎ সাড়ে নয় ইঞ্চি। যে তরোয়াল এই কাজে ব্যবহৃত হয় তার দৈর্ঘ্যও সাড়ে নয় ইঞ্চি। আত্মহননের অন্য পথ জাপানী রীতি অনুসারে ততটা পুণ্যের নয়; কিন্তু আত্মসমর্পণের চেয়ে ভালো। জাপানীদের জাতীয় বিশ্বাস, পেটই হল ইচ্ছার পীঠস্থান, গভীর আবেগসমূহের উৎসস্থল।

পার্ল হারবারে ধাক্কা না খেলে আমেরিকা হয়তো হিরোশিমায় বোমা ফেলত না। পার্ল হারবারেই তৈরি হয়েছিল জাপানের নিয়তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানে বিশেষ একটি বাহিনী তৈরি হয়েছিল, 'স্পেস্যাল অ্যাটাক ফোরসেস'। এই বাহিনীর সৈনিকরা মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়েই আক্রমণে নামতেন। পশ্চিমী দুনিয়ায় এঁদের নাম হল, 'কামিকাজে'। বিমানচালক সোজা বোমা সমেত লক্ষ্যবস্তুর ওপর নেমে পড়লেন। কোনও এদিক ওদিক নেই। দ্বিধা নেই। কামানের গোলায় একটা, দুটো, দশটা বিমান ঘায়েল হতে পারে; কিন্তু ঝাঁকের অন্যান্য বিমান লক্ষ্যবস্তুর ওপর গিয়ে পড়বেই।

পার্ল হারবারে জাপান সেই কৌশলই নিয়েছিল। ১৯৪১ সাল। ডিসেম্বরের গোড়ার দিক। যুদ্ধ ঘোষণা না করেই জাপানের ছ'টি বিমানবাহী জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরের পথ ধরে পার্ল হারবারের অ্যামেরিকান ঘাঁটির দিকে এগিয়ে গেল। তারিখ সাত ডিসেম্বর। সময় সকাল সাতটা। সাড়ে চারশো জাপানী 'কামিকাজে' বিমান ঝাঁপিয়ে পড়ল পার্ল হারবারের ওপর। ফল হল ভয়াবহ। আমেরিকার দু হাজারের ওপর সৈনিক নিহত হল। বিমান ঘাঁটিতে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল চারশো বিমান। দুশো বিমান সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেল। পাঁচটি রণতরী ও তিনটি হালকা ধরনের টহলদারী জাহাজ ছত্রাখান হয়ে গেল। এই একই সময়ে জাপান দূর প্রাচ্যের সমস্ত ইংরাজ ও আমেরিকান ঘাঁটির ওপর সাংঘাতিক আক্রমণ চালিয়ে মিত্র শক্তিকে স্তম্ভিত করে দিল। '৪২-এর নববর্ষ মিত্রশক্তির কাছে হয়ে দাঁড়াল বিষণ্ণতার বছর। '৪১-এর বড়দিনে হংকং হাত ছাড়া হল। গেল মালয়। সিঙ্গাপুর আত্মসমর্পণ করল ফেব্রুয়ারিতে। পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রধান প্রধান অঞ্চল চলে গেল জাপানের অধিকারে। মার্চ শেষ হবার আগেই জাপান সর্বত্র গেড়ে ফেলল শক্ত ঘাঁটি। আমেরিকা ছয় মে পর্যন্ত ফিলিপাইনকে নিজেদের দখলে রেখে রেখেও শেষ পর্যন্ত সরে আসতে বাধ্য হল। করেগিডোরে আমেরিকার শেষ বাহিনী আত্মসমর্পণ করল। জাপানের তখন জয় জয়কার। অস্ট্রেলিয়ার উত্তরভাগের সমস্ত বন্দরে বোমা ফেলতে পারে। বেরিং প্রণালীর অ্যালুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের দুটি দ্বীপ দখলে আনায় আমেরিকার আলাস্কা আক্রমণের নাগালে। ব্রহ্মদেশ জাপানের দখলে। দখলে আন্দামান

বেয়নেটধারী জাপানী সৈন্যের আদেশে আমেরিকান সৈন্য জীবন্তকবর দিচ্ছে সহযোদ্ধাকে

ছবি : 'লাইফ' পত্রিকার সৌজন্যে

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। জাপানের স্বপ্ন 'দাই নিপ্পন' বৃহত্তর জাপান, পূর্ণ হতে চলেছে।

কবে, সেই ১৮৫৩ সালে, আমেরিকান নৌবাহিনীর জাহাজ কমোডর পেরির 'ব্ল্যাক শিপ' জাপানের বন্দরে ভেড়ামাত্রই জাপান বুঝে গিয়েছিল, হয় পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠীর সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দিতে হবে, নয়তো হতে হবে তাদের পদানত। যে ভাগ্যকে মেনে নিয়েছিল চীন। মানতে বাধ্য হয়েছিল এসিয়ার অন্যান্য দেশ। কমোডর পেরি সেই যে দেশটাকে নাড়া দিয়ে গেলেন, তারপর থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে জাপান হয়ে উঠল আধুনিক শিল্পোন্নত দেশ। বিশ্বের অন্যতম উন্নত শক্তি।

১৬৩৬ থেকে অনধিক দুশো বছর পর্যন্ত জাপান পড়েছিল মধ্যযুগে। আধুনিক রাশিয়ার মতো লৌহ-যবনিকার আড়ালে। বিদেশীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। নিষিদ্ধ ছিল জাপানীদের বিদেশীর সংস্পর্শে আসা। আবদ্ধ সভ্যতা। খ্রীষ্টধর্ম থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল চৌকাঠের বাইরে। সমাজ ছিল দৃঢ় নিগড়ে বাঁধা। সম্রাট হলেন ঈশ্বর। 'শোগুন'। তারপর দাইমো, সামুরাই, যোদ্ধার দল। কৃষক, বৃত্তিজীবী। ব্রাত্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিলেন বণিক সম্প্রদায়। দুশো বছর ধরে অনুসৃত হয়েছে, ভোগবাদ নয়, আধ্যাত্মিকতা। জাপান মনে করে, পৃথিবীর জাতিকুলে, জাপানই হল প্রথম জাতক। মানব মানবীর মিলন নয়, ঐশ্বরিক মিলনেই তাদের জন্ম। অমৃতের পুত্র। হিটলার যেমন মনে করতেন, জার্মানরাই পৃথিবীর একমাত্র খাঁটি আর্য।

কি সব কাণ্ডই না পৃথিবীজুড়ে ঘটে গেছে, ঘটছে, বা ঘটবে! হিটলারের মত পাগল, যুদ্ধোন্মাদ হয়তো আবার আসবেন। স্ট্যালিনের মতো বিদঘুটে কম্যুনিস্ট। রুজভেল্ট বা ট্রুম্যানের মতো ওয়ারটাইম পলিটিসিয়ান। নেভিল চেম্বারলেনের মতো অপদস্থ স্টেটসম্যান। মুসোলিনির মত অহঙ্কারী নির্বোধ। রামপ্রসাদ যেমন গেয়েছিলেন, দেখছি কত, দেখব কত, দেখার আছে বাকি কত। হিটলারের সেই মানুষের আস্তাবল। ইহুদীদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়ে, তাদের ভাল ভাল আবাসস্থল আর স্বাস্থ্য-নিবাস আর রম্য হোটেলসমূহ দখল করে নিলেন। ধরে নিয়ে এলেন, সুন্দরী যুবতী জার্মান রমণীদের। মানুষ বিয়োতে হবে। যেন গাভীর দল। ধরে আনলেন মানুষ ষাঁড়। সে আবার 'স্পেসিফিকেশান' মিলিয়ে 'পেডিগ্রি' টেস্ট করে। আকৃতিই হল সব চেয়ে বড় বিচার। লম্বা হতে হবে। লম্বা মাথা। সরু মুখ, পাতলা নাক। খাঁদা, বোঁচা, থ্যাবড়া হলে চলবে না। সুন্দর চুল। হালকা চোখের মণি, আর ফর্সা গোলাপী রঙ। তা হিটলারের সেনাবাহিনীর অধিকাংশ অফিসারই ছিলেন ওই রকম। তাঁদের পোয়া বারো। ষণ্ড বৃত্তি তো মজার বৃত্তি। একাধিক রমণীতে নিয়োজিত হও। হিটলারের মতে, আমাদের মনু কি আর্য! তিনিও বলেছিলেন, 'স্ত্রীণাং ভোগে চ মৈথুনে'। 'প্রোডিউস চিলড্রেন অ্যাজ এ সেক্রেড ডিউটি টু দি ফুয়েরার।' পাগলের পরিকল্পনা। পাগলের হিসেব। হিটলারের কোনও হিসেবই তো শেষ পর্যন্ত ধোপে টেঁকেনি। ১৯৩৫-এর ডিসেম্বর নাগাদ এই মনুষ্য প্রজনন পরিকল্পনা চালু হয়েছিল। হিমলার ছিলেন পরিকল্পনা প্রযোজক। প্রোজেকটের নামটিও ছিল কাব্যিক—লেবেনসবর্ন, অর্থাৎ ফাউন্টেন অফ লাইফ। জীবনের উৎস। বিবাহ-টিবাহের প্রয়োজন নেই। ঘর-সংসার পাতার দরকার নেই। সুরম্য পরিবেশে এস। ক্ষমতায় কুলোলে একের পর এক নারীসঙ্গ করো। উদ্দেশ্য একটাই—গর্ভধারণ। এইসব সরকারী মায়েদের খুব আদরে রাখা হত। সুন্দর পরিবেশ, সুন্দর খাওয়া, সুন্দর পরিচর্যা। ইচ্ছে করলে নবজাতককে কাছে রেখে মিসেস হয়ে যাও, নয় ছেলে কি মেয়েকে সরকারী পরিপালন কেন্দ্রে

হিটলারের মতো পাগল যুদ্ধোন্মাদ হয়তো আবার আসবেন। স্ট্যালিনের মতো বিদঘুটে কম্যুনিস্ট। রুজভেল্ট বা ট্রুম্যানের মতো ওয়ারটাইম পলিটিসিয়ান। নেভিল চেম্বারলেনের মতো অপদস্থ স্টেটসম্যান।

রেখে মিস হয়ে সরকারী তোয়াজে আবার মা হবার জন্যে প্রস্তুত হও। হিমলারের ক্যালকুলেশানে তিরিশ বছরের মধ্যে জার্মানির জনসংখ্যা যা বাড়বে তাতে বাড়তি ৬০০ রেজিমেন্ট তৈরি করা সম্ভব হবে। এইভাবে যে সব ছেলেপুলে জন্মাত তাদের বলা হত পার্সেল। সব কোরেটোরে হিটলার নিজেই পার্সেল হয়ে চলে গেলেন পরপারে।

জাপানের দৃষ্টিভঙ্গী আর জার্মানীর দৃষ্টিভঙ্গীতে যথেষ্ট পার্থক্য। জাপান বিশ্বাস করে স্পিরিচ্যুয়ালিজ্‌মে। পশ্চিমের শিল্পোন্নত ভোগবাদী, দেহসর্বস্ব জীবন দর্শন থেকে জাপান সরে থাকতে পেরেছিল। জাপান আত্মস্থ করতে পেরেছিল একটি মন্ত্র Duty is more weighty than a mountain, death is noheavier than a feather কি অপূর্ব দর্শন! কর্তব্য পর্বতের চেয়েও ভারি, মৃত্যু পালকের চেয়ে ভারি নয়। The whole of modern Japan's military philosophy may be said to reside in that single statement. আধুনিক জাপানের সমর-দর্শন ওই একটি বক্তব্যে সুস্পষ্ট। গীতার মতো, যুদ্ধ মানে ধর্মযুদ্ধ। No act could be wrong if Sincerely perfomed for the good of the Emperor and the Nation. সম্রাট ও সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্যে কোনও কাজই দোষের নয়।

আমেরিকা অথবা পশ্চিমী রাষ্ট্রজোট দ্বিতীয় যুদ্ধে জাপানের বাড়াবাড়ি ক্ষমা করতে না পারলেও, জাপান তার জাতীয় জীবনদর্শন অনুসারেই লড়াই চালিয়ে গেছে। জাপানীদের মজ্জায় মজ্জায় একটিই ব্রত। কোকুতাই বাঁচাও, কোকুতাই রক্ষা কর। কোকুতাই মানে, জাপানের সংহতি, রাষ্ট্র। এই দর্শনই জাপানকে এত উন্নত করতে পেরেছে। সব দেশের সেরা দেশ বললেও ভুল হবে না। এই 'কোকুতা'-ই রক্ষা করার জন্যেই সুইসাইড স্কোয়াড, কামিকাজের মতো বাহিনী তৈরি হয়েছিল, যাদের কাছে death is no heavier than a feather.

বিশ শতকের শুরুতেই রুশ-জাপান যুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া গেল, বৃহৎ দেশ, বিশাল সমর সম্ভারের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারে, 'ইয়ামাতো দামাশি' অর্থাৎ 'ফাইটিং স্পিরিট' অর্থাৎ লড়াকু মনোভাব। এই যুদ্ধের পরই জাপানের জাতীয়তাবোধ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। শিন্টো সাম্রাজ্য ছিল সেই জাতীয়তাবোধের ইন্ধন। কিছু গুপ্ত সমিতি ছিল এর পিছনে আর ছিল সামরিক দলের একটা অংশ। এই অংশে বিশিষ্ট একদল অফিসার ছিলেন। দলটির নাম ছিল 'কোডো-হা' বা 'ইম্পিরিয়াল ওয়ে'। যে দলের লক্ষ্য ছিল বুশিদো গুণাবলীকে রক্ষা করা। বুশিদোর পথ হল, সম্রাটের প্রতি আনুগত্য। সামন্ত নৃপতিদের প্রতি আনুগত্য। জাতির প্রতি আনুগত্য। আর নিজের প্রতি আনুগত্য। 'কোডো-হা'র আর একটি লক্ষ্য ছিল, পূর্ব এশিয়ায় বৃহত্তর একটি সহ-সমৃদ্ধি গড়ে তোলা—'গ্রেটার ইস্ট এসিয়া কো প্রসপ্যারিটি স্ফিয়ার।' ১৯০৫ সাল থেকেই প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানের ক্রম শক্তিবৃদ্ধি

জাপান সম্রাটের সামনে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান তোজো

আমেরিকার পছন্দ হচ্ছিল না। জাপানকে যুদ্ধে নামাবার জন্যে উস্কানির অভাব ছিল না। আমেরিকা ছিল জাপানের অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। জাতীয় স্বার্থেই জাপানকে বেছে নিতে হল যুদ্ধের পথ, অতর্কিত আক্রমণের পথ।

পার্ল হারবার আর ওকিনওয়াতে কামিকাজে আর সুইসাইড স্কোয়াডের হাতে আমেরিকার লাঞ্ছনার কোনও তুলনা ছিল না। বিশাল সমর শক্তি, বিরাট লোকবল, সমর সম্ভারের শেষ নেই, আর জাপান! আয়তনে ক্ষুদ্র, শক্তিতে ক্ষুদ্র। শুধু অসাধারণ মনের জোর আর করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে ব্রত নিয়ে নাভিশ্বাস ছুটিয়ে দিলে। কথায় বলে দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। জাপানকে আত্মসমর্পণের সুযোগ না দিয়েই আণবিক বোমার চরম আঘাত হানা হল। দুটো কারণে। প্রথম

জাপানকে আত্মসমর্পণের সুযোগ না দিয়েই আণবিক বোমার চরম আঘাত হানা হল। দুটো কারণে। প্রথম কারণ পার্ল হারবার, ওকিনওয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আধিপত্য। দ্বিতীয় কারণ, অর্থনীতি। বিশ্ববাণিজ্যে আমেরিকা জাপানের কাছে মার খাচ্ছে।

কারণ পার্ল হারবার, ওকিনওয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আধিপত্য। দ্বিতীয় কারণ, অর্থনীতি। বিশ্ব বাণিজ্যে, আমেরিকা জাপানের কাছে মার খাচ্ছে। তৃতীয় কারণও আছে, সেটা হল সঙ্গদোষ। বিশ্ব মঞ্চে ওয়ার লর্ড হিটলারের সঙ্গে ঘষাঘষি করতে করতে সমরোন্মাদনা এসে গেছে। জাপানের ঘন বসতি অঞ্চলে বোমা ফেলে দেখতে হবে, কি ভাবে ঘর বাড়ি, মানুষ, পাখি, গাছপালা নিমেষে গলে যায়, উবে যায়, ছাই হয়ে যায়। দেখতে হবে প্রলয়ে কি থাকে, কি যায়। নিউ মেকসিকোর মরু অঞ্চলে, পরীক্ষাস্থলে, গ্রামটির নাম 'ওসকুরো' মানে অন্ধকার, আর পরীক্ষামূলক বোমাটি যেখানে ফাটান হবে, সেই জায়গাটির নাম জোরনাদা দেল মুয়েরতো, মানে মৃত্যু উপত্যকা। সেখানে পরীক্ষামূলক বোমাটি ফাটিয়ে আমেরিকার মন ভরল না। একটা টেস্ট টাওয়ার বাষ্প হয়ে গেল, কি মরুভূমির বালি কাঁচ হয়ে গেল এই সব বৈজ্ঞানিক তথ্য বিজ্ঞানীদের কাজে লাগবে। জগৎ সংসারকে চমকে দিতে হলে হিটলারের ওপরে উঠতে হবে। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরেও বিশ্বমানবের স্মৃতিতে প্রতীক হয়ে থাকবে, ব্যাঙের ছাতার মতো মেঘ। জোরনাদা দেল মুয়েরতোতে প্রথম বিস্ফোরণ দেখে, বিজ্ঞানী, লস এলামোস প্রোজেকটের ডিরেকটর ওপেনহাইমারের মনে হয়েছিল—এই তো সেই তিনি, অর্জুনের সামনে বিশ্বরূপের শ্রীকৃষ্ণ,

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥

ওদিকে পয়েন্ট জিরো, মরুভূমির যে জায়গাটিতে বোমা ফেলা হয়েছে, ফেলা বললে ভুল হবে, যে টাওয়ারে রেখে বোমাটিকে ফাটানো হয়েছে, সেই প্রলয়ের উৎসস্থলের দিকে চোখ রেখে একটি পোস্ট দু হাতে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন দশ মাইল দূরে। ওদিকে আকাশ যেন গলে গলে পড়ছে। কানে আসছে দর্শক বিজ্ঞানীদের বিস্ময়ের উক্তি—Good God, the long-haired boys have lost control. মনে আসছে গীতা :

If the radiance of a thousand suns
were to burst into the sky
That would be like
the splendour of the mighty one.

স্তম্ভিত আকাশ, স্তম্ভিত মহাকাল। আগুনে আকাশ। দশ মাইল দূরে দর্শকাসনে বিজ্ঞানীদের প্রতীক্ষা। কালো ছায়া। অনেকে বিস্ফোরণের মুহূর্তে চোখে গগলস পরতে ভুলে গেছেন। ফলে প্রায় অন্ধ। বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার ছাত্র ও সহকর্মীদের প্রিয় ওপি, কন্ট্রোল টাওয়ারে একটা লোহার ডাণ্ডা আঁকড়ে ধরে, কম্পন ও ঝটিকা সামলাতে সামলাতে দেখছেন রথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণ। অর্জুনকে বলছেন :

কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ

I am become death, the shatterer of worlds.

ক্রমশ

মহাকাশ প্রকল্পে ভারত

সমরজিৎ কর

১৯৮২ সালের ৩০ এপ্রিল উৎক্ষিপ্ত হওয়ার পর মাত্র ১৪৭ দিনের মাথায় বিকল হয়ে পড়ে ভারতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ ইনস্যাট-১এ । কিন্তু এক বছরের মধ্যেই তার অভাব পূরণ করে ইনস্যাট-১বি । তারপর থেকে বেতার যোগাযোগ, আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, প্রতিরক্ষা এবং আরো অনেক গুরুদায়িত্বের চাপ ক্রমশ বেড়ে উঠেছে এই কৃত্রিম উপগ্রহটির উপর । আরেকটি নতুন উপগ্রহ শূন্যে স্থাপন করার তাগিদও তাই দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে ।
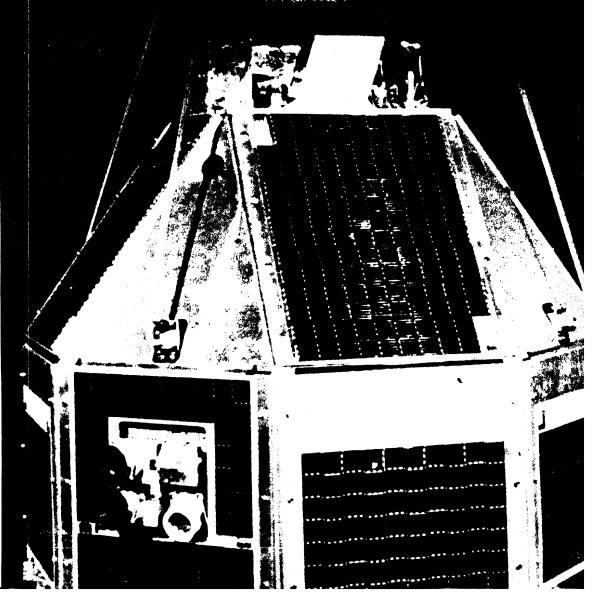
সম্প্রতি বাঙ্গালোরে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার অগ্রগতি এবং সমস্যাবলী নিয়ে কথা বলছিলাম অধ্যাপক ইউ আর রাও-এর সঙ্গে। কিছুকাল আগেও বাঙ্গালোরের উপগ্রহ কেন্দ্রটির তিনি ছিলেন ডিরেকটার, তাঁরই তত্ত্বাবধানে সেখানে তৈরি হয়েছিল এ-দেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ—আর্যভট। পরে ভাস্কর-১, ভাস্কর-২, রোহিণী এবং ভূসমলয় উপগ্রহ অ্যাপল। এখন তিনি ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার চেয়ারম্যান এবং ভারত সরকারের মহাকাশ দপ্তরের সেক্রেটারি।

আলোচনার গোড়ায় ইনস্যাট-১ সি'র কথা তুললাম। বললাম, অধ্যাপক রাও, একই উপগ্রহের সাহায্যে যাতে বিভিন্ন রকমের প্রয়োজন মেটান যায় সে দিকে লক্ষ্য রেখে আপনারা ইনডিয়ান ন্যাশনাল স্যাটেলাইট সিসটেম বা সংক্ষেপে 'ইনস্যাট'-এর পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। এই বিভিন্ন প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে নিয়মিত আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ, দেশের গ্রামাঞ্চলে টেলিভিশন প্রোগ্রামের সম্প্রচার, টেলিভিশন এবং বেতার কর্মসূচীর সম্প্রসারণ এবং দেশের অভ্যন্তরে টেলিযোগাযোগ স্থাপন। এই সিরিজের প্রথম উপগ্রহ ইনস্যাট-১এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে উৎক্ষেপ করা হয়েছিল ১০ এপ্রিল, ১৯৮২। উৎক্ষেপের জন্যে মার্কিন মহাকাশ সংস্থা একটি ডেল্টা রকেটের সাহায্য নেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভূসমলয় কক্ষে স্থাপন করার ১৪৭ দিন পর ইনস্যাট-১এ অকেজো হয়ে যায়। এরপর ৩০ অগাস্ট, ১৯৮৩ উৎক্ষেপ করা হল এই সিরিজের দ্বিতীয় উপগ্রহ—ইনস্যাট-১বি। এবার উৎক্ষেপের জন্যে ব্যবহার করা হয়েছিল মার্কিন স্পেস শাটল "চ্যালেঞ্জার"। এ ধরনের একটি উপগ্রহের কার্যকাল সাত থেকে আট বছর। দেখতে দেখতে তিন বছর পেরিয়ে গেল। ইনস্যাট-১বি-র উপর চাপও বেড়েছে। এই উপগ্রহটির সাহায্যে গোড়ায় যে পরিমাণ কাজ করবেন ঠিক করেছিলেন, তার চেয়ে বেশি কাজ করান হচ্ছে। বিশেষ করে টেলিসংযোগ এবং টেলিভিশন ও বেতার সম্প্রচারের ব্যাপারে। কথা ছিল এই চাপ কমিয়ে আনার জন্যে ইনস্যাট সিরিজের তৃতীয় উপগ্রহ ইনস্যাট-১সি উৎক্ষেপ করবেন আপনারা। আগের দুটির মত এটিও তৈরি করবে মার্কিন প্রতিষ্ঠান ফোর্ড এরোস্পেস অ্যান্ড কম্যুনিকেশনস কর্পোরেশন। কথা ছিল এবছর "চ্যালেঞ্জার" স্পেস শাটলের সাহায্যে মার্কিন মহাকাশ সংস্থা ইনস্যাট-১সি মহাকাশে উৎক্ষেপ করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনায় "চ্যালেঞ্জার" বিধ্বস্ত হয়েছে। এর জন্যে মার্কিন মহাকাশ সংস্থা "স্পেস শাটল" প্রোগ্রাম আপাতত বন্ধ রেখেছেন। যতদূর শোনা যাচ্ছে, ১৯৮৮র আগে তাঁরা এ ব্যাপারে আর কিছু করছেন না। অথচ ভারতীয় মহাকাশ কার্যক্রমে ইনস্যাট-১সি-র উৎক্ষেপণ খুবই জরুরী। এই উৎক্ষেপণের কাজটি, কবে নাগাদ হবে বলে আপনি মনে করেন? পরবর্তী "স্পেস শাটল" প্রোগ্রামের ব্যাপারে মার্কিন মহাকাশ সংস্থাও এখনো পর্যন্ত কিছু বলতে পারছেন না। এই অবস্থায় 'বিকল্প' হিসেবেই বা কী ভাবছেন আপনারা?

দেখলাম, আমার দীর্ঘ ভূমিকাবহুল প্রশ্নটি এতক্ষণ বেশ মনোযোগের সঙ্গেই শুনছিলেন অধ্যাপক রাও। কিন্তু শেষের দিকে আমার সরাসরি দুটি প্রশ্ন শোনার পর কিছুটা বিচলিত হলেন তিনি। সতর্কও।

"ইওর ফার্স্ট ওয়ান ইজ এ মিলিয়ন ডলার কোশ্চেন"। কতকটা আত্মগতভাবেই যেন জবাব দিলেন অধ্যাপক রাও। "আমরা আশা করছি ১৯৮৮-র জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি নাগাদ ইনস্যাট-১সি উৎক্ষেপ করা সম্ভব হবে। পুরোপুরি নিশ্চিত সে কথা অবশ্য বলবো না। বুঝতেই পারছেন, "চ্যালেঞ্জার" বিপর্যয়ের দরুন, স্বভাবতই এ প্রোগ্রামটিকে আমাদের বিশেষভাবে খতিয়ে দেখতে হচ্ছে। এখন 'স্পেস শাটল'-এর কথা আর আমরা ভাবছি না। ইতিমধ্যে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করেছি। আপনাদের মনে আছে হয়ত, ১৯ জুন, ১৯৮১ এই মহাকাশ সংস্থার 'এরিয়ান' রকেটের সাহায্যে ফ্রেঞ্চ গায়ানার কোউরো থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল ভারতীয় কুশলীদের তৈরি ৬৫০ কিলোগ্রামের প্রথম ভূসমলয় উপগ্রহ 'অ্যাপল'। এই 'এরিয়ান' গোষ্ঠীর রকেটের সাহায্যেই যাতে ইনস্যাট-১সি উৎক্ষেপ করা যায় ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সির সঙ্গে সে ব্যাপারে ইতিমধ্যে আমরা চুক্তিও করেছি।

প্রশ্ন : যদি চুক্তি হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে ১৯৮৮ পর্যন্ত অপেক্ষা করছেন কেন?

উত্তর : 'এরিয়ান' রকেটের ব্যাপারেও কিছু গোলযোগ দেখা দিয়েছে। গোলযোগ দেখা দিয়েছিল ১৫ এবং ১৮ নম্বর পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণের সময়। ওঁরা রকেটের শেষ স্তরে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করছেন তরল হাইড্রোজেন এবং অকসিডাইজার বা জারক হিসেবে কাজে লাগাচ্ছেন তরল অকসিজেন। শেষ স্তরের জ্বালানি প্রজ্জ্বলিত করার ব্যাপারে সমস্যা দেখা দেওয়ায় রুটিন উৎক্ষেপণের জন্যে 'এরিয়ান' প্রকল্পটি আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। আশা করা যায় ১৯৮৭র জানুয়ারি নাগাদ সমস্যাটি মিটে যাবে এবং ফেব্রুয়ারি নাগাদ রুটিন উৎক্ষেপণ শুরু হবে। ইনস্যাট-১সি উৎক্ষেপণের জন্যে 'এরিয়ান' রকেটে কিছু কিছু বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। সে সব মিটিয়ে ইনস্যাট-১সি উৎক্ষেপ করতে ১৯৮৮র জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে।

প্রশ্ন : বিকল্প এই ব্যবস্থার জন্যে ভারতের বাড়তি খরচ পড়বে কতটা?

উত্তর : খুব একটা বেশি পড়বে না। ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেছি আমরা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁরা কনসেশন দিতে রাজি হয়েছেন।

প্রশ্ন : বছর বছর সব রকম খরচই বাড়ছে। ইনস্যাট-১সি'-র জন্যে ফোর্ড এরোস্পেস অ্যান্ড কম্যুনিকেশনস কর্পোরেশনকে কতটা উদ্বৃত্ত মূল্য দিতে হচ্ছে আপনাদের?

উত্তর : ইনস্যাট-১'সি-র মূল্য ৬০ থেকে ৬৫ কোটি টাকা। ইনস্যাট-১এ এবং ইনস্যাট-১বি-র ক্ষেত্রেও এতটা ব্যয়ই করতে হয়েছিল।

গোড়ায় ঠিক হয়েছিল, প্রথমে উৎক্ষেপ করা হবে ইনস্যাট-১এ। ঠিক হয় এই উপগ্রহটির সাহায্যে একদিকে যেমন চলবে নিয়মিত আবহাওয়া বার্তা যোগান, টেলিযোগাযোগ স্থাপন এবং দূরদর্শন ও নিয়মিত রেডিও প্রোগ্রামের সম্প্রচার, সেই সঙ্গে এ দেশের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানর জন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থাকে আরো কতটা সুদূরপ্রসারী করা যায় সে ব্যাপারে অনুসন্ধান করা। এ ব্যাপারে এক সঙ্গে কাজ করছে মহাকাশ দপ্তর, টেলিকম্যুনিকেশন দপ্তর এবং আবহাওয়া দপ্তর। তাঁদের কার্যক্রমে অল ইনডিয়া রেডিও-ও শামিল হয়। প্রকল্পটির সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। বোঝা গিয়েছিল কৃত্রিম উপগ্রহ-কার্যক্রমের প্রসার ঘটবে। আর সে কার্যক্রম একটি মাত্র উপগ্রহের সাহায্যে চালান সম্ভব হবে। আরো একটি ব্যাপারও মনে রেখেছিল মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। একটি মাত্র উপগ্রহ নিয়ে কাজে হাত দিলে ঝক্কি থাকে। কোন কারণে ইনস্যাট-১এ অচল হয়ে গেলে পুরো কার্যক্রমই স্তব্ধ হয়ে যাবে। তাই ঠিক হয়, ইনস্যাট-১এ মহাকাশে স্থাপন করার স্বল্পকালের মধ্যে মহাকাশে স্থাপন করা হবে ইনস্যাট-১বি। তখন ইনস্যাট-১এ'র ভূমিকা থাকবে মুখ্য। ইনস্যাট-১বি সাহায্যকারী হিসেবে থাকবে। কিন্তু উৎক্ষেপণের অল্প সময়ের মধ্যে ইনস্যাট-১এ অচল হয়ে যাওয়ায় প্রমাদ গুণলেন ভারতীয় মহাকাশ দপ্তর।

অধ্যাপক রাও বললেন, আমরা বেশি দিন দেরি করতে পারি না। একমাত্র সম্বল এখন ইনস্যাট-১বি। এই উপগ্রহটির মাধ্যমে অন্তর্দেশীয় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়েছে। আরো হচ্ছে। সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থা নিয়মিত সংবাদ এবং তথ্যাবলী আদান প্রদান করছেন কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে। এই তো, মাদ্রাজের 'হিন্দু' দৈনিক পত্রিকাও এখন ইনস্যাট-১বি'র সাহায্যে সংবাদ এবং ছবি আদান প্রদানের ব্যবস্থা চালু করেছে।

প্রশ্ন : এক সময় বলা হয়েছিল, ইনস্যাট চালু করতে যা খরচ পড়বে, সে খরচ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাই মেটাতে পারবে। তা ইনস্যাট-১বি মহাকাশে স্থাপনার তিন বছরেরও বেশি সময় কেটে গেল। আপনার কি মনে হয়, এই উপগ্রহটি স্থাপন করতে যা খরচ হয়েছে শুধু টেলিযোগাযোগ সংস্থাই তা মিটিয়ে দিতে সক্ষম হবে?

উত্তর : এ ব্যাপারে আমি আশাবাদী। আমার তো মনে হয়, সেটা অসম্ভব হবে না।

মহাকাশে স্থাপনার পর এ পর্যন্ত মোট ৯৫০০টি আবহাওয়াজ্ঞাপক তথ্যচিত্র সরবরাহ করেছে ইনস্যাট-১বি। এগুলির মধ্যে শুধু ১৯৮৫ সালেই সরবরাহ হয়েছে ৪৫০০টি। ঊর্ধ্বাকাশের তাপমাত্রা, বায়ুচাপ এবং আবহাওয়া বিষয়ক নানান তথ্য সংগ্রহ করছেন ভারতের আবহাওয়া দপ্তর। সেই সব তথ্যের উপর নির্ভর করে যোগান হচ্ছে নিয়মিত আবহাওয়া বার্তা।

ঘূর্ণিঝড়ের উপর চোখ রেখে চলছে ইনস্যাট-১বি। দেশের উপকূলবর্তী এলাকার গ্রামাঞ্চলে বসান হয়েছে ঝড়ের সংকেত ধরার জন্যে গ্রাহকযন্ত্র। সমুদ্র এবং উপকূলবর্তী এলাকায় কোথায় ঝড় উঠল, সেই ঝড়ের গতি, গতিপথের উপর উপর নজর রাখছে ইনস্যাট-১বি। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব তথ্য পাঠিয়ে দিচ্ছে মাদ্রাজের 'এরিয়া সাইক্লোন সেন্টার'-এ। সেখান থেকে আগাম খবর যাচ্ছে গ্রামবাসীদের কাছে ওই সব গ্রাহকযন্ত্রের মাধ্যমে।

ইনস্যাট-১বি'তে রয়েছে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন দুটি এস-ব্যান্ড ট্রান্সপনডার চ্যানেল। যাদের কাজ বেতার সংকেত গ্রহণ এবং পরিবেশন। এগুলির সাহায্যে সম্প্রসারিত হচ্ছে জাতীয় টেলিভিশন প্রোগ্রাম, পরিবেশিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আয়োজিত উচ্চশিক্ষামূলক কার্যক্রম / এবং বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত গ্রাহকযন্ত্রের মাধ্যমে সরাসরি গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে নানারকম অনুষ্ঠান। সারা দেশে এ ধরনের সরাসরি গ্রাহকযন্ত্র বসান হয়েছে ১৫০০টি। ডিসেম্বর ১৯৮৫র মধ্যে দেশে টেলিভিশন কেন্দ্র চালু হয়েছে মোট ১৭৯টি। এগুলির মধ্যে১৭৩টিকেন্দ্রই এখন ইনস্যাট-১বি'র সঙ্গে সংযুক্ত।

প্রশ্ন : ইনস্যাট-১সি উৎক্ষেপণের পর এই সিরিজের আরো একটি উপগ্রহ স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছেন। যার নাম দেওয়া হয়েছে ইনস্যাট-১ডি। কবে নাগাদ এই উপগ্রহটি উৎক্ষেপ করার পরিকল্পনা নিয়েছেন আপনারা, অধ্যাপক রাও?

উত্তর : অক্টোবর ১৯৮৮ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৮৯-এর কোন এক সময়ে।

প্রশ্ন : ইনস্যাট-১-এ এবং ইনস্যাট-১ডি'র মধ্যে কি কোন পার্থক্য থাকছে? কারণ যতদূর জানি, ইনস্যাট-১বি এবং ইনস্যাট-১সি প্রথম ইনস্যাটেরই প্রতিরূপ। এর জন্যেই প্রশ্নটি করলাম। প্রতিটি ইনস্যাটের ক্ষেত্রে ঘটছে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা। তাদের উপর নির্ভর করে ইনস্যাট-১ডি-এর ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন কি ঘটান যায়?

উত্তর : ভাল প্রশ্ন। আমরা এ দিকটিও দেখেছি, মিঃ কর। অক্টোবর ১, ১৯৮৫ ফোর্ড এরোস্পেস অ্যান্ড কম্যুনিকেশনস করপোরেশনে ইনস্যাট-১ডি তৈরির আমরা অর্ডার দিয়েছি। এই উপগ্রহটির পরিকল্পনা মুখ্যত আগেরগুলির মত হলেও, কিছু কিছু পরিবর্তনের কথাও চিন্তা করা হয়েছে। এতে অতিরিক্ত সাজসরঞ্জাম রাখার ব্যবস্থা থাকবে। থাকবে অতিরিক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রানসপনডার চ্যানেল। এ ছাড়া থাকবে অতিরিক্ত পরিমাণ জ্বালানি রাখার মত কিছুটা বড়সড় ট্যাঙ্ক।

মহাকাশ বিজ্ঞানের প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ভারতীয় কুশলীদের অবদান যে যথেষ্ট প্রশংসনীয়, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, এ ব্যাপারে কতদিন আর আমরা পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকবো? আমাদের কুশলীরা গত দশ বছরে সাফল্যের সঙ্গে তৈরি করেছেন একাধিক কৃত্রিম উপগ্রহ, রোহিণী, ভাস্কর, অ্যাপল, ইত্যাদি। কিন্তু এ দেশে ইনস্যাটের মত বড়সড় অপারেশনাল উপগ্রহ এখনো পর্যন্ত তৈরি করা সম্ভব হয়নি। এবং তার চেয়েও বড় সমস্যা 'বুস্টার' নিয়ে। ভারী কৃত্রিম উপগ্রহ ঊর্ধ্বাকাশে তুলতে গেলে চাই শক্তিশালী রকেট। যার আর এক নাম 'বুস্টার' বা 'স্পেস ভেহিকল'। এর জন্যেই মাঝারি ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরিতে সফল হওয়া সত্ত্বেও, সেই উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্যে আমাদের এখনো বিদেশীদের উপর নির্ভর করতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত দেশ অথবা ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থার উপর। ইনস্যাটের উপর নির্ভর করে এ দেশে গড়ে উঠেছে নানা রকম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। নানা রকম প্রযুক্তিগত উদ্যোগ। যার সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা, এবং সামাজিক স্বার্থ জড়িত। ইনস্যাটের মত উপযুক্ত উপগ্রহের অভাবে এর সবই অর্থহীন হয়ে যাবে। অতএব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রয়োজনীয় কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরির ব্যাপারে এবং সেই সব উপগ্রহ ভারতভূমি থেকে উৎক্ষেপণের ব্যবস্থা না করা গেলে পরনির্ভরতা কখনোই আমরা কাটিয়ে উঠতে পারব না।

প্রসঙ্গটি তুলতেই, অধ্যাপক রাও বললেন, ইনস্যাট সম্পর্কে আপনি যা ভাবছেন, আমরাও তা ভেবেছি। ঠিক হয়েছে ইনস্যাট-১ সিরিজের শেষ উপগ্রহ হবে ইনস্যাট-১ডি। ইতিমধ্যে আমরা শুরু করেছি ইনস্যাট-২ সিরিজের কাজ। এ কাজ শুরু হয়েছে ১৯৮৫ সালের এপ্রিল থেকে। দ্বিতীয় সিরিজের ইনস্যাট তৈরি করছেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা, কোন রকম বিদেশী সহযোগিতা ছাড়াই। হাসান-এ রয়েছে ইনস্যাট সিরিজের মুখ্য নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটিকে যুগপৎ ইনস্যাট-১ এবং ইনস্যাট-২ নিয়ন্ত্রণ করার মত করে গড়ার কাজও শুরু হয়েছে। জুলাই, ১৯৮৫র মধ্যে ইনস্যাট-২ সিরিজের ছক তৈরি শেষ হয়েছে। এতে কি কি ধরনের যন্ত্রপাতি থাকবে তাও ঠিক হয়ে গেছে। অল্প দিনের মধ্যে তৈরির কাজও শুরু হচ্ছে। এ কাজটি আমরা দিচ্ছি হিন্দুস্থান এরোনটিকস লিমিটেডকে। ঠিক হয়েছে ১৯৮৯ সালে উৎক্ষেপ করা হবে ইনস্যাট-২ সিরিজের প্রথম উপগ্রহ। তার বারো মাস পর উৎক্ষিপ্ত হবে দ্বিতীয়টি। অবশ্য দুটিই হবে পরীক্ষামূলক উপগ্রহ, অপারেশনাল নয়। এদের নাম রাখা হয়েছে ইনস্যাট-২টি এস (INSAT II TS)। এগুলির মুখ্য পরিকল্পনা ইনস্যাট-১-এর মতই হবে। তবে ওজন হবে ৫০ শতাংশ বেশি। আয়তনেও হবে অনেকটা বড়। সেই সঙ্গে এতে থাকবে আরো বেশি পরিমাণ সাজসরঞ্জাম। এটি তৈরি করতে আমাদের কুশলীরা কাজে লাগাবেন তাঁদের 'অ্যাপল' এবং ইনডিয়ান রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট (IRS) তৈরির এবং ইনস্যাট-১এর অভিজ্ঞতা। এই পরিকল্পনায় সফল হলে, ১৯৯০এর দশকের মধ্যে ইনস্যাট সিরিজের কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরির ব্যাপারে আমরা আত্মনির্ভর হতে পারবো বলেই আমার বিশ্বাস।

ইনডিয়ান রিমোট সেনসিং স্যাটেলাইট (IRS)

বলা বাহুল্য, আমাদের আলোচনার গোড়ায় ইনস্যাটের উপরই আমি গুরুত্ব আরোপ করেছিলাম বেশি। তারপর একে একে তুললাম রকেট প্রকল্প, রকেট-জ্বালানি এবং আরো বিভিন্ন ধরনের উপগ্রহ প্রকল্পের কথা। বিশেষ করে ইনডিয়ান রিমোট সেন্সিং এবং নতুন ধরনের রোহিণী সিরিজের উপগ্রহের কথা।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

আপনার বিশেষ আদরের সোনামণির জন্যে এক বিশেষ উপহার !

ইউনিট ট্রাস্ট-এর শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধি ১৯৮৬!

আপনার সঞ্চিত অর্থ কেবল-ই বাড়ে-বারোগুণ করে। তার ওপরেও বাড়তি লাভ বোনাস ডিভিডেণ্ডের টাকা!

শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধি...(Children's Gift Growth Fund) আপনার আদরের নিধির জন্যে সত্যিই এক আদর্শ যোজনা।

এই যোজনায় আপনার সঞ্চিত অর্থ ৬ বছরে দু'গুণ বাড়ে। আর আপনার নিধির সঙ্গে বাড়তে-বাড়তে এই নিধিও ২১ বছরে ১২ গুণ বাড়ে।

সুতরাং, আপনার সোনামণির জন্মানোর পরে অনতি-বিলম্বে আপনি ওর জন্যে এই যোজনায় বিনিয়োগ করে দিন। তবে আপনার সন্তান বড় হ'বার পরেও— এমন কি ১৫ বছর বয়স অবধিও, আপনি এতে বিনিয়োগ করতে পারেন।

কত-কত বয়সে কত টাকা বিনিয়োগ করলে আপনার সন্তান ২১ বছরে ১২,০০০ টাকা পাবে, তার তালিকা নিচে দেয়া হ'ল।

২১ বছরে ১২,০০০ টাকা উপহার লাভের জন্যে বিভিন্ন বয়সে কত টাকা বিনিয়োগ করতে হবে, তারই তালিকা:

বয়স (বছরের হিসাবে)	রাশি টাকা	বয়স (বছরের হিসাবে)	রাশি • টাকা
জন্মের সময়ে	১,০০০	৮	২,৬০০
১	১,২০০	৯	২,৯০০
২	১,৩০০	১০	৩,৩০০
৩	১,৫০০	১১	৩,৭০০
৪	১,৬০০	১২	৪,১০০
৫	১,৮০০	১৩	৪,৭০০
৬	২,১০০	১৪	৫,২০০
৭	২,৩০০	১৫	৫,৯০০

• যত টাকা বিনিয়োগ করতে হবে তার কাছাকাছির ১০০ টাকার হিসাবে।

এই যোজনার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- এই যোজনার অধীনে যেকোনো সাবালক ব্যক্তি— পিতা মাতা, আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবীরাও— ১৫ বছর বয়সী অবধি শিশুকে সাদরে এই উপহার দিতে পারেন। শিশুর বয়সের কোনরূপ প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে না।
- **আপনার অর্থ নিশ্চিতভাবে ১২.৫% ডিভিডেণ্ড লাভ করতে থাকে, যা আবার আপনা-আপনি পুনর্বিনিয়োগ হতে থাকে প্রতি বছরে। এর ওপরেও বাড়তি লাভ— প্রতি ৫ বছর অন্তর বোনাস ডিভিডেণ্ডের টাকা।**
- শিশু ২১ বছর বয়সে হলে উত্তীর্ণ, এই উপহারের মেয়াদকাল হয় পূর্ণ। তবে, ১৮ বছর বয়স হ'লে, ইচ্ছা করলে তুলে নিতে পারা যায়। ততকাল অবধি কেহই— এমন কি পিতা-মাতাও নয় বা উত্তরাধিকারী শিশুও নয় — এই টাকায় বা ডিভিডেণ্ডে হাত দিতে পারবে না।
- এই যোজনার অধীনে প্রতিটি ইউনিটের অভিহিত মূল্য (ফেস ভ্যালু) হ'ল ১০ টাকা। আবেদন দশ ইউনিটের গুণিতকে করতে হবে। আপনাকে কমপক্ষে পঞ্চাশ ইউনিটের জন্য আবেদন করতে হবে। সর্বোচ্চ সংখ্যার বাঁধা-ধরা নেই।

১৯৮৬'র বাজেট বিল অনুসারে গিফট ট্যাক্স ছাড়ের সীমা হ'ল ২০,০০০ টাকা।

আবেদনপত্র পাওয়া যাবে এই সমস্ত স্থানে: যেকোনো ইউনিট ট্রাস্ট অফিসে, প্রধান প্রতিনিধিগণ বা এজেন্টগণের কাছে এবং এছাড়াও সবই কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের শাখায়।

আমাকে শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধি (CGGF) সংক্রান্ত পুস্তিকাটি পাঠান।

নাম: ____________________

ঠিকানা: ____________________

____

কুপন ডাকযোগে এখানে পাঠান:
বম্বে. পোষ্ট ব্যাগ ১১৪১০; ফোন: ২৫৬৮৮৭
কোলকাতা. পোষ্ট ব্যাগ ৬০. ফোন: ২০৯৩৯১
মাদ্রাজ. পোষ্ট ব্যাগ ৫০৬৩; ফোন: ২৭৪৩৩
নিউ দিল্লী. পোষ্ট ব্যাগ ৫; ফোন: ৩৩১৮৬৩৮

ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া

(একটি সরকারি ক্ষেত্রের আর্থিক সংস্থা)

Sista's-UTI-414/86 BEN

এটা হ'ল এক চালু যোজনা, যেখানে সারা বছরই প্রতি ইউনিট ১০/- টাকার সম-মূল্যে পাওয়া যাবে।

অন্তিম নক্ষত্র

"মেংসিয়ের-৩৩ নামক গ্যালাক্সির অতিকায় নক্ষত্র "Variable A" দ্রুত মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ছে। পৃথিবী থেকে নক্ষত্রটির দূরত্ব ২০ লক্ষ আলোক বৎসর। ভর সূর্যের ভরের চেয়ে ২০ গুণ বেশি। এবং ঔজ্জ্বল্যে সূর্যের দশ লক্ষ গুণ। নক্ষত্রটির বাইরের আচ্ছাদনরূপী মেঘপুঞ্জ দ্রুত হাল্কা হয়ে আসছে। সেই সঙ্গে দ্রুত কমে আসছে তার ঔজ্জ্বল্য। যার অর্থ, নক্ষত্রটি এখন মৃত্যুপথ যাত্রী।"

'নিউসায়েন্টিস্ট' পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সম্প্রতি এ কথা বলেছেন মিন্নেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী শ্রীমতী রোবার্তা হামফ্রেইস। Variable-A-র প্রথম ছবি তোলা হয়েছিল ১৯০০ সাল নাগাদ। দেখা যায় ওই সময় থেকে নক্ষত্রটি ক্রমেই উজ্জ্বল হচ্ছে। পরবর্তী ৫০ বছরে তার দীপ্তি দারুণভাবে বেড়ে যায়। কিন্তু ১৯৫১ সাল পড়তেই দেখা গেল এক মাসের মধ্যে তার আলো হঠাৎ যেন ক্ষীণ হয়ে এল। দীপ্তি কমে গেল তিরিশ ভাগের এক ভাগের মত। তখন থেকে নক্ষত্রটি ওই অবস্থাতেই থেকে গেছে। হামফ্রেইস বলেছেন, "গত কয়েক বছর ধরে নক্ষত্রটির বর্ণালী পরীক্ষা করছি। ভেবেছিলাম, অতিকায় নক্ষত্র থেকে যে ধরনের বর্ণালী আসে হয়ত আমি তা দেখতে পাব। পাইনি। দেখতে পাবো একাধিক উজ্জ্বল আলোর পটি বা এমিশন স্পেকট্রা। এটাই আমার আশা ছিল। কিন্তু তার বর্ণালীর বেশিরভাগ অংশই জুড়ে রয়েছে 'কৃষ্ণ বর্ণালী' বা 'ডার্ক অ্যাবসর্পসন ব্যান্ড'। যে সব নক্ষত্র শীতল হয়ে আসছে একমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই এমনটি দেখা যায়। অতএব বলা যায়, Variable-A-র জীবনকাল শেষ হয়ে আসছে।"

ভিটামিন এবং ফুল

ভিটামিনটির নাম নিকোটিনিক অ্যাসিড। খাদ্যে এই ভিটামিনটির অভাব ঘটলে এক ধরনের দীর্ঘস্থায়ী রোগ সৃষ্টি হয়, যার নাম 'পেলাগ্রা'। এই রোগে দেহের ত্বক শুকনো হয়, ত্বকে ফাটল দেখা দেয়। এ ছাড়া হজমে গোলমাল ঘটে, দেখা দেয় স্নায়বিক রোগ। জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একদল বিজ্ঞানী দাবি করছেন, মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রেই যে শুধু উপকারী তা নয়, নিকোটিনিক অ্যাসিড উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও খুবই কার্যকর। তাঁরা লক্ষ করেছেন, এই রাসায়নিক যৌগটি প্রয়োগ করলে গাছে তাড়াতাড়ি ফুল ধরে। ফলের বাড় বাড়ন্তও হয় দ্রুত। ভিটামিনটি ফুলকপির গাছে প্রয়োগ করা হয়েছিল। দেখা গেছে, এর ফলে গাছে অল্প দিনের মধ্যেই ফুল আসে। ফুলগুলির আয়তনও হয় বড়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা ফুল বাড়ানোর জন্যে কোন কোন ক্ষেত্রে ফেনোলিক অ্যাসিড ব্যবহার করে থাকেন। বিশেষ করে বেনজোয়িক এবং স্যালিসাইলিক অ্যাসিড। কিন্তু দেখা গেছে, নিকোটিনিক অ্যাসিডেই ফল পাওয়া যায় বেশী।
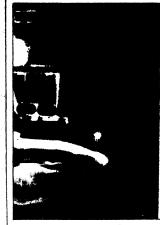
সাধারণ এক্স-রে পরীক্ষায় বিমানযাত্রীদের অনেক কিছুই ধরা পড়ে না। অসুবিধেটি এবার দূর হবে। আমেরিকান সায়েন্স অ্যান্ড এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি এক ধরনের এক্স-রে যন্ত্র তৈরি করেছে। নাম 'মডেল জেড'। এই যন্ত্রে প্লাস্টিকের বন্দুক থেকে শুরু করে মাদক দ্রব্য, দামী পাথর, খাদ্যসামগ্রী সবই ধরা পড়ে। বাঁ পাশে সাধারণ এক্স-রে ছবি। ডান পাশের ছবিটি তোলা হয় 'মডেল জেড'-এর সাহায্যে। ছবিতে একটি গ্লক ১৭ পিস্তল, এবং প্লাস্টিকের বন্দুক ধরা পড়েছে।

বিটা পিকটোরিস-এ গ্রহ নেই

সূর্য গ্রহ পরিবৃত। কয়েক বছর আগে ইনফ্রারেড অ্যাসট্রোনমিক্যাল স্যাটেলাইটের (IRAS) সাহায্যে অনুসন্ধান চালিয়ে আরো একটি নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। উপগ্রহের সংগৃহীত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করে তখন তাঁরা দাবী করেছিলেন, এই নক্ষত্রটি, যার নাম "বিটা পিকটোরিস", সূর্যের মত সেটিও গ্রহ উপবৃত হয়ে বিরাজ করছে। তারও চারপাশে পরিক্রমণ করছে একাধিক গ্রহ। সম্প্রতি সেই পুরনো তথ্যই নতুন দৃষ্টিতে খতিয়ে পরীক্ষা করেছেন নাসার জেট প্রোপালস ল্যাবোরেটারির দুইজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী—ডেভিড ডিনার এবং জন অপলেবি। তাঁদের সিদ্ধান্ত, বিটা পিকটোরিসের পরিমণ্ডলে কোন গ্রহ নেই। নক্ষত্রটিকে ঘিরে রেখেছে ধূলিমেঘ।

সেই মেঘের মাঝে মাঝে কিছু ফাঁকা জায়গা রয়েছে। অবলোহিত রশ্মিতে ছবি তোলার সময় সেই ফাঁকা জায়গাগুলিকেই মনে হয়েছে এক একটি গ্রহ। বিটা পিকটোরিসের চারপাশে গ্রহ আবিষ্কৃত হওয়ার খবরে অনেকে ভেবেছিলেন, এই বুঝি আরো একটি সৌরমণ্ডল পাওয়া গেল। আমাদের সৌরমণ্ডলের মত সেখানেও রয়েছে জীবনের অস্তিত্ব। ডিনার এবং অপলেবির সিদ্ধান্ত সেই ভাবনার মূলে করল কুঠারাঘাত।

শিল্পীর চোখে নতুন ধরনের 'স্পেস শাটল'। এর নাম রাখা হয়েছে 'স্যাংগার'। শাটলটির পরিকল্পনা করেছেন পশ্চিম জার্মানির এম বি বি এবং ডি এফ ভি এল আর এরোস্পেস রিসার্চ এস্টাবলিশমেন্ট। ১৯৯০-এর দশকে এই মহাকাশ ভেলার সাহায্যে মহাকাশ প্রকল্পে হাত দেবেন ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা। উদ্ভাবকদের বক্তব্য, এ ধরনের মহাকাশ যানে জ্বালানির সাশ্রয় হবে অনেক বেশী।

রূপদর্শীর ঝাঁকিদর্শন

আমরা দারুণ হুঁশিয়ার আছি

সম্প্রতি দিল্লিতে এক আড্ডায় প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিষয়ে আরও খাস খবর কিছু জানা গেল। এটাকে এলিটদের আড্ডা বলে বলা হয়ে থাকে। পাঠিকা এবং পাঠকদের সঙ্গে আগে এই সব আড্ডাধারীর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। প্রথমেই যাঁর সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিচ্ছি, তিনি 'র' নামে যে দুর্ধর্ষ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ আছে তার ডিরেক্টার জেনারেলের পিস্-শ্বশুরের পাড়ার লোক। ইনি 'র'-এর নাড়ি নক্ষত্রের খবর রাখেন। এঁর শুভনাম মিঃ রওগন জুস্। এবারে যাঁর সঙ্গে আলাপ করাচ্ছি তিনি দ্বিতীয় এলিট। ইনি সি বি আই-এর ডিরেক্টার জেনারেলের ভাগ্নি জামাইয়ের ড্রাইভারের মুলকি আদমির কে একটা হন। নাম মিঃ পানচাক্কি ভুসাওয়ালে। তৃতীয় এলিট, মিঃ ডি বি থাব্বা মারে। পুরো নাম দাহিনা বাঁয় থাব্বা মারে। মিঃ ডি বি থাব্বা মারে ব্ল্যাক ক্যাট কম্যাণ্ডের দর্জির মিতে। চতুর্থ এলিট রাজঘাটের হেড ঝাড়ুদারের পিসির মাসির বোনপোর খুড়তুতো ভাই-এর প্রথম পক্ষের শালা। শুভনাম মিঃ হম্ কিসিসে কম্ নেহি।

এদের কথোপকথন হুবহু তুলে দেওয়া হল।

মিঃ পানচাক্কি ভুসাওয়ালে : আরে ভাই, মিস্টার হরবখ্‌ত বকতে রহে বখোয়াসিকো ক্যায়া হুয়া ? দো হপ্তে হো চুকা, আজ ভি আড্ডেমে আয়ে নেহি ? তবিয়ত ঠিক হ্যায় ন ?

মিঃ হম্ কিসিসে কম্ নেহি : (এদিকে ওদিকে চেয়ে) উয়ো তো এস্পেশাল ট্রেনিং মে হ্যায় ?

মিঃ রওগন জুস্ : হাঁ হাঁ। অপরেশন কিমি কাট্‌কার আভি ভি তো চল রহা হ্যায়।

মিঃ ডি বি থাব্বা মারে : অপরেশন নেট্ প্র্যাকটিস্ ভি চলতা হ্যায়।

মিঃ হম কিসিসে কম্ নেহি : ম্যায় নে শুনা কি, মিঃ হরবখ্‌ত বকতে রহে বখোয়াসি কোই দুসরা ট্রেনিং মে হ্যায়। হো সকতা, অপ্‌রেশন চুহা বিল্লিমে হ্যায়।

মিঃ রওগন জুস্ : অপরেশন চুহা দিল্লি মে ?

মিঃ ডি বি থাব্বা মারে : চুহা বিল্লি বহোৎ শক্‌ত শক্‌ত অপরেশন হ্যায়।

মিঃ হম কিসিসে কম্ নেহি : কঠিন তো হ্যায়ই হ্যায়। তব ভি সিকিউরিটি এলিট ফোর্স কো উয়ো ট্রেনিং লেনে পড়েগা।

মিঃ পানচাক্কি ভুসাওয়ালে : চুহা বিল্লিসে ভি কঠিন ট্রেনিং সামনে হ্যায়। অপ্‌রেশন চানামসলা কা নাম শুনা হ্যায় কি নেহি ?

মিঃ হম কিসিসে কম নেহি : অপ্‌রেশন চানামসলা ? নেহি। হাম অপ্‌রেশন ছোলে মসলা কা নাম শুনা হ্যায়।

মিঃ রওগন জুস্ : আরে শুনা তো হ্যায়। লেকিন ইয়ে তো মেরা সমঝ মে নেহি আতা হ্যায় কি, এত্‌না ভেজিটেরিয়ান অপরেশন মে ক্যায়া কাম দেগা। কুছ্ নন্ ভেজ্ অপ্‌রেশন ভি তো হোনা চাহিয়ে না ?

মিঃ হরবখ্‌ত বকতে রহে বখোয়াসি : চানা মসলা, ছোলে মসলা, ইস্ কিসম্ কা অপ্‌রেশন মে বিল্লি থোড়াই আয়েগা। বিল্লিকো পাকড়না চাহিয়ে তো অপ্‌রেশন ফিস্ তন্দুরি লাগাও। নেহি তো মাটন জাহাঁগিরি। খুশবু সে বিল্লি কো বাপ ভি দৌড় কে আ জায়েগা।

মিঃ রওগন জুস্ : চিকেন শাগ নুরজাঁহা মে ভি কাম চল যায়েগা। এক রোজ্ মেরি বিবি নে চিকেন শাগ নুরজাহাঁ পাকায়া থা। শালে বিল্লিকো পুরা ফেমলি উস্ পর্ ডিনার কর্‌কে ভাগ গিয়া থা।

মিঃ হম কিসিসে কম্ নেহি : আগর তুমলোগ বিল্লিকো অ্যাটেনশন ইত্‌না হি ড্র করেগা তো চুহা সে কৌন নজর রাখে গা।

মিঃ হরবখ্‌ত বকতে রহে বখোয়াসি : কাহেঁ পাব্‌লিক ? চুহা তো তুমহারা রাজঘাট মে আয়া থা। কালা বিল্লি ভি থা। চুহা গোলিয়া ভি চালায়া থা।

মিঃ পানচাক্কি ভুসাওয়ালে : চুহা সিরফ আয়া হি নেহি, পরন্তু তিন গোলিয়া ভি মারা। কালা বিল্লি শোচা কি, কোই স্কুটার খাশ্‌নে লাগা। পাব্‌লিক বোলা কি, ইয়ে আওয়াজ গোলিয়া কি মালুম হোতা হ্যায়।

মিঃ হরবখ্‌ত বকতে রহে বখোয়াসি : পাব্‌লিক রেগুলেশন কি খিলাফ কাম কিয়া। বহোৎ গরকানুনি কাম্ কিয়া থা। পি এম্ কা সিকিউরিটি কা রেগুলেশন ইয়ে হ্যায় কি, পি এম্ কা সিকিউরিটি এলিট্ ফোর্স নে দেখে গা। পাব্‌লিক কৌন হ্যায় ? উয়ো বুদ্ধু, বেচৈন পাব্‌লিক কি মগজ মে ইয়ে ভি নেহি ফয়লায়া, কি, উয়ো সিকিউরিটি ফোর্স কা কাম্ মে ইনটারফিয়ার কর্ দিয়া থা। উস্‌কো জেল মে ডাল দেনা উচিত থা।

মিঃ পানচাক্কি ভুসেওয়ালা : হাঁ। সি বি আই কা ডিরেকটার জেনারেল সাব পাব্‌লিক কা উপর বহোৎ নারাজ হো গয়া হ্যায়।

মিঃ রওগন জুস্ : 'র'-কা বাহাদুর, আই মিন্, ডিরেকটার জেনারেল সাব্ ভি উয়ো নাদান পাব্‌লিক কা উপর বহোৎ গুস্‌সা হো গয়া হ্যায়।

মিঃ ডি বি থাব্বা মারে : মেরে রায় ইয়ে হ্যায় কি, উয়ো বেওকুফ পাব্‌লিক কো দো তামেচা মার্‌না থা।

মিঃ পানচাক্কি ভুসাওয়ালে : ম্যায়নে শুনা হ্যায় কি, সির্‌ফ পাব্‌লিক হি নেহি, পরন্তু রাজঘাট কা বারে মে ভি কুচ্ অ্যাকশান হোগা।

মিঃ হরবখ্‌ত বকতে রহে বখোয়াসি : হোনাই চাহিয়ে, হোনাই চাহিয়ে। রাজঘাট বহোৎ খতরনাক্ প্লেস্ হ্যায়। উসকো তোড় দেনা চাহিয়ে। পি এম্ কে সিকিউরিটিকে লিয়ে ইয়ে বহোৎ হি আবশ্যক হ্যায়।

মিঃ রওগন জুস্ : রাজাঘাট কা নাতিজা ভি আচ্ছা নেহি হ্যায়।

মিঃ হম কিসিসে কম্ নেহি : রাজঘাট ভি নেহি বচে গা। পি এম্‌স্ সিকিউরিটি ফারস্ট্। উস্‌কে বাদ আওর সব্ কুছ্।

মিঃ ডি বি থাব্বা মারে : যিত্‌না ডেনজার সব্ তো রাজঘাটমে হি হ্যায়।

মিঃ রওগন জুস্ : মেরা যো এক্সক্লুসিভ সোর্স হ্যায় উনহো নে বাতায়া গিয়া হ্যায় কি দো টাইপ কা প্ল্যান বনে গা।

মিঃ ডি বি থাব্বা মারে : এক প্ল্যান তো লং টার্ম কে লিয়ে, অওর দুস্‌রা তো হ্যায় শর্ট টার্ম কে লিয়ে।

মিঃ পানচাক্কি ভুসাওয়ালে : এইসা প্ল্যান বন্‌না চাহিয়ে কি ফিউচার মে কোই চুহা রাজঘাট মে ছুপ্‌নে নহি সকেগা।

মিঃ হরবখ্‌ত বকতে রহে বখোয়াসি : উয়ো প্ল্যান, আই মিন্ শর্ট টার্ম প্ল্যান, পুরা হো চুকা হ্যায়। কাম্ ভি ওয়ার ফুটিং যেইসে চল্ রহা হ্যায়।

মিঃ হম কিসিসে কম্ নেহি : রাজঘাট মে জিতনা পেড় থা, ছোটি অওর বড়া, সব উখাড় দিয়া গিয়া হ্যায়। ফুল কা পেড় ভি সিকিউরিটি রিস্‌ক হ্যায়। উস্‌কা ভি উখাড় দিয়া গিয়া হ্যায়। আভি রাজঘাট বিলকু-ল সাফ হো গিয়া হ্যায়। ইধর্ সে উধর তক্ কোই ভি অবস্‌ট্রাকশন্ নেহি হ্যায়। উঁচা নিচু সব কুছ লেভেল হো গয়া।

মিঃ রওগন জুস্ : লং টার্ম প্ল্যান যো বনেগা উস্‌মে কহা গিয়া কি, রাজঘাট সমাধি পর, আই মিন্ গাঁধীজিকা সমাধি পর, হেলি প্যাড় বন্ যায়েগা। পি এম্ ফিউচার মে হেলিকপ্টার সে সমাধি পর্ ফটাফট্ উত্‌রেঙ্গে। সিকিউরিটি ল্যাপস্ কা জড় মার্ দিয়া গিয়া হ্যায়। অব্ চুহা কাঁহা ছুপে গা ? হামলোগ অব্ পুরা হুঁশিয়ার হ্যায়।

ছবি : দেবাশিস দেব

এসো গো, জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি

শ্রীমতী

আজ এত অভাব আর হাহাকারের মধ্যেও উৎসবের ঘটা এখনও আছে। কোন কোন সময় মনে হয় একটু বোধ হয় বেড়েই গেছে। আগে সব পুজোরই একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল। দুর্গাপুজো চার দিন, লক্ষ্মীপুজো একদিন, কালীপুজো এক বা দেড় দিন ইত্যাদি। আজকাল এই সময় মাত্রাটা অনেক জায়গাতেই বেড়ে গেছে। আমাদের বারো মাসে তেরো পার্বণ।

পুজোকে উপলক্ষ করে বেশ কয়েকটা দিন চলবে হই হুল্লোড়। অনেক সময় তাই বিশ্বকর্মাকেও থেকে যেতে হয় প্যাণ্ডেলে। আনন্দ আমরা সবাই চাই। কিন্তু আনন্দের তুফান যখন বাঁধ মানে না তখনই নিরানন্দ আসে মনে।

কেমন যেন একটা অস্থির, চঞ্চল প্রজন্মের সামনে এসে পড়েছি আমরা। পাড়ার যুবক আর কিশোরের দল ঝাঁক বেঁধে চাঁদা তুলে বেড়াচ্ছে। পকেটে রসিদ বই হাতে প্রয়োজন-বোধে ছুরি, ক্ষুর। এ যেন একটা বিভীষিকা। না দিয়েও উপায় নেই। ঘর বার করতে হয় সকলকেই। আবার বিপদে টিপদে পড়লে রকে বসে থাকা এই সব যুবা-কিশোরের দল আগে এগিয়ে আসে। পুজোটা নিমিত্ত মাত্র। এই উপলক্ষে বেশ কয়েকটা দিন একটু হইচই করা যায়। বেকার যুবকেরা বেকারত্বের জ্বালাটা যেন একটু ভুলে থাকে কটা দিন। প্রতিদিনের একঘেঁয়েমির থেকে একটু মুক্তি। বাড়িতেও সকলের মেজাজের পারাটা বাইরের লাউডস্পিকারের লাউড ভয়েসের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। কয়েকটা দিন একটা কিছু নিয়ে মেতে থাকা আর কি। হতাশায় যেন ধুঁকছে আমাদের আগামী প্রজন্ম। দিনের পর দিন পাবলিক সার্ভিস, রেলওয়ে সার্ভিস, ব্যাঙ্কিং সার্ভিস—নানান সার্ভিসে দরখাস্ত ঠুকেও কোন ডাক নেই। দীর্ঘদিন পর যদি বা ডাক এল দেখা গেল কয়েকটি পোস্টের জন্য হাজার দশেক অ্যাপ্লিক্যান্ট। লেখাপড়া শিখে কয়েকটা ডিগ্রীর মালা ঝুলিয়ে এই আত্ম-যন্ত্রণার খানিকটা শান্তি বোধ হয় বছরকার এইসব পুজো পার্বণ। প্যাণ্ডেলে বসা, মায়ের পুজো, ডেকরেশন এটা ওটা নিয়ে কটা দিন একটু মানসিক গ্লানিটা ভুলে থাকা। তুবড়ির তীব্র স্ফুলিঙ্গ নতুন করে একটু আশার আলো জাগায় মনে। সদ্য কলেজে ঢোকা অথবা পাস করে বেরুনো তরুণ ভাবে, কি হবে পড়ে? এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের দরজায় ঘুরে ঘুরে হয়রান হতে হবে। হতাশা আর হতাশাই শুধু। আর তারই অবশ্যম্ভাবী ফল হল কোন একটা বিষাক্ত নেশায় বাস্তবকে ভুলে থাকার চেষ্টা।

আমাদের ধারণা অটোমেশন বসালে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আমাদের মতো গরীব দেশে চাকরির প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। আবার অটোমেশন, কম্পিউটার বা যে কোন আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ যদি দেশে না হয় তবে দেশ পিছিয়ে পড়বে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতিযোগিতায়। অতএব দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে কম্পিউটারের নিয়োগও প্রয়োজন। এই সব বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনের ফলে বেকারত্ব বাড়বে, না বেকারত্ব নিরসনে সহায়ক হবে সেটা খতিয়ে দেখা দরকার। উচ্চশিক্ষা লাভ করেও বেকার থাকতে হচ্ছে বলে লেখাপড়া ত বন্ধ হতে পারে না। কিন্তু শিক্ষার পরিণতি নিশ্চয়ই হতাশ,

ক্লান্তমনা উত্তরপুরুষ গড়ে তোলা নয়। আমাদের এক সুন্দর অনুষ্ঠান 'ভাই ফোঁটা'। যমের দুয়ারে কাঁটা দিয়ে ভাইকে আগলে রাখতে চাই আমরা। বড় সুখের আর মধুর মিলনের দিন এটি।

মাত্র একটা দিনের জন্য ছুটি নিয়ে হলেও দূর দেশ থেকে ভাই আসে বোনের কাছে ফোঁটা নিতে। আবার শ্বশুর-বাড়ির হাজারো বাধা অমান্য করে বোন চলে ভাইয়ের কপালে চন্দন তিলক এঁকে দিতে। সমস্ত বাধা বিপত্তির হাত থেকে ভাইকে রক্ষা করতে চায় বোন। এদিকে অশান্ত চিত্ত ভাই পালিয়ে বেড়ায়। জানি না কবে আসবে হাসি-খুশির দিন। যে যাই করুক অন্তত নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে আমাদের সমাজের আগামী পুরুষ। শান্ত হোক অশান্ত চিত্ত। মায়ের কাছে আমাদের সকলের নিবেদন এই একটাই।

রাজা, তুই বন্দুকটা নিয়ে ডায়ানার পাশে থাক !
ওরে ব্বাবা
আমাকে দাও !
আমাকে দাও !

'ছ' বছর বাদে তোরা বন্দুক পাবি । এখন টোটা আর গোগার সঙ্গে পিছনে বোস্ !
বাস্ রে !

বিদায় !
বিদায় !
কী সুন্দর বাড়িটা পুড়ে গেল !

কত কাজ পড়ে আছে, কিছুই করা গেল না !
উষ্ণ কুণ্ডের ধারে আজ তাঁবুতে রাত কাটাব !
তাঁবুতে থাকব !
তাঁবুতে !

আমরা আগে-আগে চলে যাই ?
যাও । আমি দেখি, দু-চারটে খরগোশ পাই কি না ?

তাড়াতাড়ি এসো, বাবা !

স্নান করতে হবে ।
আমি আজ সাঁতার কাটব ।
আমিও ।
7/14

আড়ালে দুই বদমাস …

??!!
ক্রমশ ● ৫
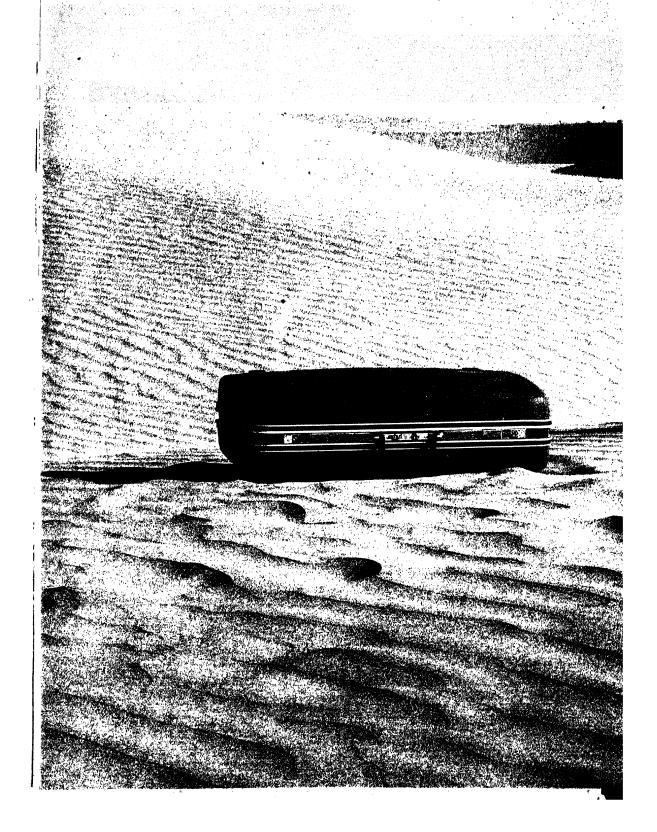
গর্ভধারিণী

সমরেশ মজুমদার

দুপুর না গড়াতেই এখানে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। চাপ কুয়াশা, মেঘ আর কনকনে ঠাণ্ডায় বাইরে দাঁড়ানো অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু জয়িতার মনে হল গুহার ভেতর যে আরাম তা তাদের আস্তানায় ছিল না। এখানে অন্তত চোরা হাওয়ার কামড় নেই। তাঁবুটা পায়ের তলায় বিছিয়ে রাখা সত্ত্বেও স্যাঁতসেতে ঠাণ্ডা উঠছেই। কিন্তু আগুন জ্বলার পর চমৎকার ওম ছড়িয়েছে গুহাতে। ভানুমতির নির্বাচন সঠিক ছিল। ওকে উৎখাত না করলে এই গুহার দখল পাওয়া যেত না। পৃথিবীর নিয়মই এই রকম।

জয়িতা মেয়েটিকে দেখছিল। লা-ছিরিঙ কিংবা পালদেম ওর সম্পর্কে সন্তুষ্ট নয়। অথচ বোলেন বলেছিল ও নাকি বাচ্চা তৈরী করবার পক্ষে উপযুক্ত। এখনও এই মানুষেরা মেয়েদের একটি বিশেষ প্রয়োজনের সামগ্রী মনে করে। পালদেমরা কেন সেই সম্মান একে দিচ্ছে না সেটা অবোধ্য। তার মনে পড়ল লা-ছিরিঙ অত্যন্ত বাধ্য না হলে ওর সঙ্গে কথা বলেনি। এখন মেয়েটি পাথরের উনুনে মাংস সেদ্ধ করছে। ভালুকের মাংস। মাঝে মাঝে সে তাকাচ্ছে সুদীপের দিকে। সুদীপ তার বিছানায় পা ঢুকিয়ে চুপচাপ বসে। এবং তার শরীরে মুখ ডোবানো ভালুকের বাচ্চা দুটোর দেহ তিরতিরিয়ে কাঁপছে। আনন্দ চোখ বন্ধ করে শুয়ে। এই গুহায় কেউ কোন কথা বলছে না এখন। জয়িতা উঠল। সে উঠতেই আনন্দ চোখ মেলল, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'মাংসের গন্ধটা অসহ্য মনে হচ্ছে।'

'অনভ্যাস।' আনন্দ এমন গলায় কথা বলল যেন ওই মাংস সে দীর্ঘদিন ধরে খাচ্ছে।

আড়াল সরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল জয়িতা। এবং চোখের সামনে বরফ পড়া দেখল। কুয়াশাগুলো উধাও। ঝুরঝুর বরফ মাটিতে জমা হচ্ছে। বস্তুত মাটি বলে কিছুই আর চোখে পড়ছে না। ঠাণ্ডাটা যেন সামান্য কমেছে। তার খুব মজা লাগছিল। মাথার ওপর পাথরের আড়াল। সেটা ছেড়ে বাইরে বেরোতে ইচ্ছে করছিল না। সাহসও হচ্ছিল না।

লা-ছিরিঙ আজ ফেরেনি। তাপল্যাঙে পুলিসবাহিনী পৌঁছেছে কিনা কে জানে। কিন্তু এটা তাদের জানা উচিত ছিল। যারা তাপল্যাঙ পর্যন্ত আসবে তারা জানবেই ওখানে তারা ছিল। শোনার পর হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে এমন ভাবার কোন কারণ নেই। আর যদি সত্যি সত্যি হদিশ পেয়ে যায় তাহলে তাদের পালাবার পথ থাকবে না। অস্বস্তিটা বেড়ে গেল ওর। রাত হয়ে গেলে এখান থেকে বের হওয়া আর আত্মহত্যা করা একই ব্যাপার হবে। জয়িতা কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। যদি লুকিয়ে লুকিয়ে গ্রামে পৌঁছানো যায় তাহলে রাত্রের আগে এখানে ফেরা যাবে না। এবং এই সময় সে একটি তীব্র শিস্ শুনল।

চমকে চারপাশে তাকাল। তুষারপাতের জন্যেই বেশীদূর দৃষ্টি যাচ্ছে না। কিন্তু ওই শিস যেদিক থেকে ভেসে এল সেইদিকটা লক্ষ করল সে। তার পরেই কুকুরের ডাক শুনতে পেল। কুকুরটাকে সঙ্কেত করার জন্যেই সম্ভবত শিস্ বেজেছিল। কুকুরের ডাকটা এখন স্পষ্ট, খুবই কাছাকাছি। পুলিস কি শিকারী কুকুর নিয়ে উঠে আসছে। এই সময় তার পেছনে শব্দ হতেই সে আনন্দকে দেখতে পেল। চিন্তিত মুখে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কুকুরের ডাক শুনতে পেলাম, না?'

'হ্যাঁ। আমি বুঝতে পারছি না। এখানে কুকুর আসবে কোত্থেকে? পুলিস নয়তো?'

কথাটা কানে যাওয়ামাত্র আনন্দ ভেতরে চলে গেল। তার পরেই ফিরে এল রিভলভার নিয়ে। চাপা গলায় বলল, 'শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আমরা অনেক বেটার জায়গায় আছি।'

ওরা প্রায় দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। যতটুকু দেখা যাচ্ছে কোন প্রাণের চিহ্ন নেই। যেই আসুক তাকে প্রথমে ওই খোলা জায়গায় পা রাখতে হবে।

কুকুরের ডাকটা এগিয়ে আসছে। হঠাৎ যেন তার স্বর বদলে গেল। এখন ওই ডাকে উত্তেজনা। এবং তার পরেই ওরা উত্তেজিত কুকুরটাকে দেখতে পেল। ওপর থেকে নেমে এল খোলা জায়গাটায়, ওর মুখ গুহার দিকে ফেরানো, অনর্গল ডেকে চলল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। জয়িতা রিভলভারে হাত রেখেছিল। কুকুরটার দাঁত সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। দ্বিতীয়বার শিসটা শুনতে পেল। শিস শোনার পর আবার ওপরে ছুটে গেল কুকুরটা। আনন্দ চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'ওপর থেকে নামছে কি

করে ? পুলিস এলে তো নিচ থেকে আসার কথা।'

এবং তখনই প্রথমে কুকুর তার পর ওর মালিককে দেখতে পেল ওরা। ছেঁড়া গরমজামায় যতটা সম্ভব শরীর ঢেকে লোকটা ধীরে ধীরে খোলা জায়গায় এসে ক্লান্ত ভঙ্গীতে গুহার দিকে তাকাল। কুকুরের গলা থেকে গোঁ গোঁ শব্দ বের হচ্ছে। লোকটা টলছিল। এবার মুখ ঘুরিয়ে চারপাশে তাকিয়ে নিল। ও আর একটু এগোলেই জয়িতাদের দেখতে পাবে। ওর হাতে একটা লাঠি আর ছোট পাত্র। পাত্রটিকে সে অত্যন্ত যত্নে আঁকড়ে আছে। সে আবার শিস দিতে কুকুরটা সোৎসাহে তেড়ে এল গুহার দিকে। একদম মুখোমুখি হয়ে ও জয়িতাদের দেখতে পেল। পেয়েই ছুটে গেল মালিকের কাছে। তার আচরণে আচমকা পরিবর্তন এসে গেছে যেন বুঝতে পারল লোকটা। সে লাঠিতে ভর করে কয়েক পা এগোতেই দেখতে পেল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না লোকটা। আনন্দর মনে হল লোকটা অসুস্থ। যে কোন মুহূর্তেই বরফের ওপর গড়িয়ে পড়তে পারে। সে পা বাড়াল। কুকুরটার চিৎকার বেড়ে গেল তাই দেখে। মুখোমুখি হয়ে আনন্দ বলল, 'প্রথমে ওটাকে চুপ করতে বল। এখানে কুকুর ডাকুক আমরা চাই না।'

লোকটা অন্য ধরনের শব্দ করল জিভে। সেটা শুনে কুকুরটা যন্ত্রের মত থেমে গেল। এবার আনন্দ লোকটার দিকে স্পষ্ট তাকাল। সমস্ত শরীরে সাদা তুষার লেপ্টে রয়েছে। ঠোঁট নাক এখন একদম সাদা। এই অবস্থায় ও কি করে হেঁটে আসছে ?

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে ?'

লোকটা হাত নেড়ে নিচের দিকটা দেখাল। ও নাড়ল লাঠি ধরা হাতটা। পাত্রটিকে সে ওই অবস্থায় সামান্য নাড়াচ্ছিল না। আনন্দ বুঝল এ তাপল্যাঙের একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু ওর যা অবস্থা এখন যদি হাঁটা শুরু করে তাহলে তাপল্যাঙে পৌঁছাতে পারবে না। শেষ শক্তিটুকুও এখন ফুরিয়ে যাওয়ার মুখে। 'তুমি যদি আগুনের পাশে বসতে চাও তাহলে গুহায় আসতে পার।' হাত বাড়িয়ে দেখাল আনন্দ। লোকটার ঠোঁট কাঁপল। চোখ বড় হল। তারপর কোন রকমে উচ্চারণ করল, 'ভালু!'

শব্দটা বুঝল আনন্দ, 'ভালু নেই। আমরা মেরে ফেলেছি।'

ওইটুকু পথ আসতে লোকটার অনেক সময় লাগল। গুহার মধ্যে ঢুকে আগুন দেখে তার চোখ বিস্ফারিত হল। নিজের শরীর আগুনের পাশে নিয়ে যাওয়ার মুহূর্তেও কিন্তু সে হাতের পাত্রটি সম্পর্কে সচেতন ছিল। কুকুরটা মালিকের সঙ্গে গুহায় ঢুকেই গলা খুলে চিৎকার শুরু করল। জয়িতা দেখল সুদীপের শরীরের মধ্যে ভালুক বাচ্চা দুটো মিশে যেতে চাইছে কুঁই কুঁই শব্দ করতে করতে। কুকুরটার লক্ষ ওরাই। এক একবার তেড়ে গিয়ে আবার ফিরে আসছে সে মালিকের কাছে। আনন্দ লোকটাকে বলল, 'ওকে সামলাও।'

লোকটা আবার শব্দ করল। কুকুরটা এবার আগুনের কাছে ফিরে এসে জিভ বের করে লোভী চোখে বাচ্চা দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল

লোকটাকে দেখামাত্র মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়েছিল। তার চোখে বিস্ময়। সেটা লক্ষ করে জয়িতা ওকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের গ্রামের মানুষ ?'

ঘাড় নাড়ল মেয়েটা, 'না। রোলেনদের গ্রামে থাকে। ও বেঁচে আছে!'

'কেন ওর কি হয়েছিল ?' এবারের প্রশ্নটা আনন্দের।

'ওর পায়ের দিকে তাকাও, দ্যাখো ওর পায়ের অবস্থা।' মেয়েটা যেন বিস্ময়ের শেষ সীমায়। জয়িতা চমকে উঠল। এই বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে এসেছে কিন্তু লোকটার পায়ে কোন জুতো নেই। আঙুলগুলো বেঁকে বেঁকে ফুলে দুটো পা এখন গোল হয়ে গিয়েছে। অনেকটা হাতির পায়ের আকার নিয়েছে ওদুটো। মাঝে রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে রয়েছে।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার পায়ের এই অবস্থা কি করে হল ?'

লোকটা তখন সমস্ত শরীরে উত্তাপ নিচ্ছে। যেন মরুভূমির মাঝখানে পথ হারানো মানুষের সামনে জল ধরে দেওয়া হয়েছে। ওর চোখ বোজা ছিল। আনন্দর প্রশ্ন যেন কানেই ঢুকল না। মেয়েটা এবার চিৎকার করে নিজস্ব ভাষায় জড়ানো গলায় কিছু বলতেই লোকটা চমকে চোখ মেলল। মেয়েটাকে যেন সে এখানে দেখবে ভাবতে পারেনি। একগাল হেসে সে জড়ানো গলায় উত্তর দিল। মেয়েটি এবার জয়িতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও পেরেছে, ও পেরেছে।'

'কি পেরেছে ও ?'

মেয়েটি বলল, 'ডান দিকের যে পাহাড়, সেই পাহাড়ের মাথার ওপর থেকে জল এনে যদি কোন অসুস্থ মানুষের মুখে বুলিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তার অসুখ সেরে যাবেই। ওর মা বাঁচবে না বলে ও সেই জল আনতে বেরিয়েছিল। এর আগে অনেকেই প্রিয়জনকে বাঁচাবার জন্যে ওখানে গিয়েছে জল আনতে। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন একজন ফিরেছিল, কিন্তু অন্তত দশজনের পর ওকে আমি ফিরতে দেখলাম। ও ভগবানের দেখা পেয়েছে।' কথাগুলো বলার সময় মেয়েটির মুখে একটা উজ্জ্বল আলো খেলা করে যাচ্ছিল।

লোকটা হাসল। তারপর সস্নেহে নিজের পায়ের ওপর হাত বোলাল। বোঝা যাচ্ছে, ওখানে কোন সাড় নেই ওর। আনন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ওই পাহাড়ের ওপর উঠেছিলে ?'

পরম তৃপ্তিতে মাথা নাড়ল লোকটা। তারপর উঁচু করে পাত্রটা দেখাল। আনন্দ জয়িতার দিকে তাকাল। এদিকের পাহাড়গুলোর সবচেয়ে নীচু শৃঙ্গ অন্তত সতের হাজার ফুট। সেই অবধি কোনরকম আধুনিক হাতিয়ার ছাড়া একটা লোক নগ্ন পায়ে হেঁটে উঠতে পারে তা সে কল্পনা করতে পারছিল না। বোঝাই যাচ্ছে অত্যন্ত ঠাণ্ডায় ওর পা বেঁকে গেছে। এবং এ জীবনে আর সে নিজের পা ফিরে পাবে না। ওর হাতের আঙুলগুলোও স্বাভাবিক নয়, নাকের ডগায় বেশ বড় ঘা। জয়িতা চাপা গলায় বলে উঠল, 'অসম্ভব, আমি বিশ্বাস করি না। ও চেষ্টা করতে পারে কিন্তু ওপরে উঠতে পারে না।'

আনন্দ বলল, 'সত্যি অবিশ্বাস্য কিন্তু এরা মিথ্যে কথা বলে না। অন্ধ বিশ্বাস মানুষকে কি শক্তি দেয় তার গল্প পড়িসনি ? খোঁড়া পাহাড় ডিঙোয়!'

'কিন্তু ওই বরফ গলিয়ে মুখে মাখালে কারো অসুখ সারবে ? তাহলে তো প্রতি বছর এভারেস্ট ক্লাইম্বাররা ফিরে এসে হাজার হাজার মানুষকে সারিয়ে তুলতে পারত। ওঃ, ধর্ম মানুষকে কিভাবে এক্সপ্লয়েট করে দ্যাখ।' জয়িতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল।

'যা হোক, এক্ষেত্রে তো আমাদের কিছু করার নেই। শুধু বিস্মিত হওয়া ছাড়া।' আনন্দ বলল।

লোকটা ততক্ষণে সেদ্ধ হয়ে আসা মাংসের দিকে নজর দিয়েছে। ইঙ্গিতে সেটা দেখাচ্ছেও। মেয়েটা খানিকটা তুলে একটা ডিসে এগিয়ে ধরতেই কুকুরটাও চিৎকার করে উঠল। ওর দিকে বিন্দুমাত্র নজর না দিয়ে লোকটা মাংস গিলতে লাগল প্রাণপণে। মেয়েটা উঠে খানিকটা কাঁচা মাংস কুকুরটার সামনে রাখতে সেও একই ভঙ্গীতে খেতে শুরু করল। একটু অপরাধীর ভঙ্গীতে মেয়েটি বলল, 'আমি না হয় আজ মাংস খাব না।'

জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ?'

'যারা ওপরের পাহাড় থেকে জল নিয়ে ফিরে আসে কাঙ্খন পর্যন্ত তাকে সম্মান দেখায়। আমি আমার ভাগটা ওকে দিয়ে দিলাম।' মেয়েটি জানাল।

'থাক। তোমাকে আর স্যাক্রিফাইস করতে হবে না। জয়িতা মন্তব্য করল।

বোধ হয় অভুক্ত ছিল লোকটা। কারণ দ্বিতীয়বার নেওয়ার পরও যেন তার চাহিদা কমছিল না।

কিন্তু সে লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মাথা ঝুঁকিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাল। তারপর পাত্রটি সযত্নে বুকের কাছে নিয়ে এসে কুকুরটাকে শিষ দিয়ে ডাকল।

আনন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ ?'

লোকটা হাত বাড়িয়ে নিচের দিকটা দেখাল। ওর মুখ এখন প্রায় স্বাভাবিক শুধু নাকের কাটা থেকে রক্ত বের হচ্ছে। আনন্দ চমকে উঠল, 'এখন তো বাইরে অন্ধকার, তুমি গ্রামে পৌঁছাবার আগেই মরে যেতে পার।'

লোকটা চটপট মাথা নাড়ল। তারপর পাত্রটা দেখিয়ে বলল, 'ভগবান আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন।' ওর গলার স্বর জড়ানো কিন্তু শব্দগুলো বুঝতে পারল ওরা।

আনন্দ এবার মেয়েটিকে বলল, 'ওকে পাগলামি করতে নিষেধ কর। এতক্ষণ যা করেছে করেছে, এই রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল সকালে যেন ও গ্রামে ফিরে যায়।'

মেয়েটি খানিক ইতস্তত করে লোকটির সামনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই লোকটি মাথা নাড়ল, 'আমার মা মরে গেছে কিনা জানি না। কিন্তু মনে হয় এই জল যখন আনতে পেরেছি তখন ভগবান নিশ্চয়ই

ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে। একটা রাত দেরি করলে ভগবান ওকে নিয়ে নিতে পারে। আমি যাচ্ছি।'

হঠাৎ মেয়েটা তাকে ডাকল। লোকটা মুখ ফেরাতে গলায় অনেক আকুতি নিয়ে বলল, 'আমাকে একটু জল দেবে? এই একটুখানি।'

লোকটি সজোরে মাথা নাড়ল, 'না। এই জল কেউ চাইতে পারে না।'

'আমি জানি। তবু তুমি দয়া কর। ওখান থেকে একটুখানি দিলে তোমার মায়ের জন্যে কম পড়বে না।'

মেয়েটি প্রায় প্রার্থনার ভঙ্গীতে বলছিল এবার।

হঠাৎ লোকটির খেয়াল হল যেন, 'তুমি এখানে কেন? এরা কারা?'

'এরা আমাদের বন্ধু। এদের খুব শক্তি। বিরাট ভালুক মেরেছে যার মাংস তুমি খেলে। ওই যে, তাকিয়ে দ্যাখো, ওর জন্যে একটু জল দাও। নাহলে ও কখনও ভাল হবে না।' মেয়েটি হাত উঁচু করল।

লোকটা সুদীপের দিকে তাকাল। কিন্তু তার সামান্যও দয়া হল না। সে আর কথা না বাড়িয়ে বাইরে পা বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাও উধাও। মেয়েটা তখন দরজায় দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করছিল। জয়িতা তাকে ধমক দিল, 'সুদীপের জন্যে জল চাইবার কি দরকার ছিল?'

'নইলে ও বাঁচবে না, ভাল হবে না। কেউ কি কখনও শুনেছে ভালুক বাচ্চা মানুষের শরীরে ঘুমিয়ে পড়ে! ওর মধ্যে দানোটা বোবা হয়ে ঢুকে পড়েছে। ভগবানের দয়া ছাড়া সেটা বের হবে না।'

মেয়েটা হতাশ গলায় কথাগুলো বলল।

আনন্দ জয়িতাকে ইশারা করল চুপ করতে। তারপর বাংলায় বলল, 'ওর ব্যক্তিগত বিশ্বাস যদি আমাদের কোন ক্ষতি না করে তাহলে এই নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই। কিন্তু লক্ষ কর ও সুদীপ সম্পর্কে সত্যি ইন্টারেস্টেড। শুনেছি ভালবাসাবাসি না হলে মেয়েরা ছেলেদের সম্পর্কে এতখানি সচেতন হয়না।'

জয়িতা সুদীপ, মেয়েটি এবং সবশেষে আনন্দর দিকে তাকাল। তারপর চাপা গলায় বলল, 'মাঝে মাঝে তুইও ন্যাকাদের লাইনে গিয়ে দাঁড়াস কি করে তা বুঝি না।'

লা-ছিরিঙ মাংস নিয়ে আসার পর গ্রামের মানুষ বেশ খুশী। ভালুকের মাংস অনেকদিন তারা খায়নি। তার পরেই প্রশ্ন উঠল ভালুকটা কত বড় ছিল? আরও মাংস পাহাড়ে আছে জানার পর সেটা আনবার জন্যে একটা দল তৈরী হয়ে গেল। লা-ছিরিঙ প্রথমে রাজী হয়েছিল তার পর তার মনে পড়ল এরা গেলে গুহার মানুষদের অস্তিত্ব জেনে যাবে। সে অনেক বুঝিয়ে ওদের আটকাতে পারল। গুহার সামনেই মাংস আছে এই সংবাদটা জানাল না। লোভ মানুষকে সব সময় বিপথগামী করে। সে আড়ালে ডেকে নিয়ে পালদেমকে সব বৃত্তান্ত জানাল। অত বড় একটা ভালুককে যারা মেরে ফেলতে পারে অনায়াসে তারা কেন পুলিসের ভয়ে লুকিয়ে আছে তা তাদের বোধগম্য হচ্ছিল না। তবে একথা ঠিক, ওরা এই গ্রামের উপকার করতে চায়। যতদিন ওরা সেটা করবে ততদিন ওদের সঙ্গে সহযোগিতা না করার কোন কারণ নেই। পালদেম লা-ছিরিঙকে উপদেশ দিয়েছিল সেদিনই পাহাড়ে ফিরে না যেতে। কারণ উৎসাহী গ্রামবাসী তাকে অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু ওই চারজনের ব্যাপারে গ্রামবাসীদের সতর্ক করে দেওয়া উচিত কিনা সে বুঝতে পারছিল না। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। সে লা-ছিরিঙকে নিয়ে কাহুনের সঙ্গে দেখা করতে গেল। কাহুন তখন মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন। পালদেম এবং লা-ছিরিঙ তাঁর সামনে হাঁটুমুড়ে বসল। কাহুন চোখ নামালেন। পালদেম বলল, 'আমরা বিদেশীদের সাহায্য করছি। কিন্তু কতখানি সাহায্য করা উচিত?'

কাহুন বললেন, 'যতক্ষণ ওরা আমাদের শত্রুতা না করছে। দু দুবার আমাদের দেবতা ওদের সাহায্যে ফিরে এসেছেন। আমরা এই ঋণ নিশ্চয়ই শোধ করব।'

পালদেম বলল, 'কিন্তু ওদের কাজকর্ম অনেকের পছন্দ হচ্ছে না। বরফের সময় যাতে সবাই ভাল থাকে তার জন্যে ওরা চেষ্টা করছে। আমরা এভাবে কখনও ভাবিনি। কিন্তু মনে হচ্ছে ওদের কথা শুনলে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না।'

'কোন ক্ষতি না হওয়া পর্যন্ত কথা শুনব।' কাহুন কথাগুলো বলে মুখ ফেরালেন, 'এই অসময়ে মনে হচ্ছে আরও কিছু বিদেশী আসছে। বিদেশী মানেই যে সন্দেহজনক মানুষ এই ধারণা অবশ্য এখন আমাদের ঠিক ততটা

নেই। তোমরা যাও, ওদের অভ্যর্থনা কর।'

ওরা দুজনেই সোজা উঠে দাঁড়িয়েই দেখতে পেল, যে পথে ব্যাপারীরা আসে সেই পথেই ঘোড়াগুলো দেখা যাচ্ছে। অন্তত গোটা দশেক ঘোড়া। কোন পদাতিক নেই। ওদের চলার গতি আছে। ইতিমধ্যে গ্রামের অনেকেই ওদের দেখতে পেয়েছে। বিন্দুর চেয়ে সামান্য বড় এখন। কিন্তু তাতেই গ্রামে কোলাহল শুরু হয়ে গেল। অনেকেই ভাবল ব্যাপারীরা এবার দলে ভারি হয়ে প্রচুর জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে আসছে। কিন্তু পালদেম চাপা গলায় বলে, উঠল, 'পুলিস। ওরা বোধহয় পুলিস।'

লা-ছিরিঙ দেখার চেষ্টা করছিল, 'আমরা কি করব এখন?'

কাহুন বললেন, 'যতক্ষণ আমরা ক্ষতিগ্রস্ত না হচ্ছি ততক্ষণ আমরা ওদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করব।'

এখন ওদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দলে দুজন বিদেশী, তারাই আগে আগে আসছে। পেছনের মানুষেরা যে পাহাড়ের তা মুখ দেখেই বোঝা যায়। গ্রামের মুখে পৌঁছে ওরা সমবেত জনতার দিকে তাকিয়ে গতি রোধ করল। গ্রামবাসীরা এতক্ষণে বুঝে গিয়েছে আগন্তুকরা ব্যাপারী নয়। কি করা উচিত ওরা যেন বুঝতে পারছিল না। মন্দিরের চত্বর অনেকটা উঁচুতে বলে পালদেমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল ওদের। অশ্বারোহীদের একজন চিৎকার করে বলল, 'এই গ্রামের পালা কোথায় ?'

গ্রামবাসীরা ঠেলাঠেলি করে বৃদ্ধকে এগিয়ে দিল সামনে। পাহাড়ের একজন মানুষ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এই গ্রামের পালা। তুমি বল, এই গ্রামে কোন বিদেশী আছে কিনা!'

পালা জড়ানো গলায় কিছু বলতে তাকে ধমকে উঠল লোকটা, 'ভাল করে কথা বল।'

পালা এবার মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুকদের মুখে হাসি ফুটে উঠল। প্রত্যেকের শরীরে একই রকমের পোশাক। প্রতিটি ঘোড়ার শরীরে অস্ত্র বাঁধা। বিদেশী জিজ্ঞাসা করল, 'তারা কোথায়?'

পালা হাত বাড়িয়ে একটা দিক নির্দেশ করতে লোকটা বলল, 'তুমি আমাদের পথ দেখাও।'

পালার পক্ষে দ্রুত হাঁটা এখন অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু সে এবং অন্যান্য গ্রামবাসীরা বুঝতে পারছিল এই লোকগুলো সুবিধের নয়। এই সময় একজন পাহাড়ি অশ্বারোহী চিৎকার করে বলল, 'আমরা পুলিস। তোমাদের এখানে তিনজন ডাকাত লুকিয়ে আছে। এরা খুব খারাপ লোক। অনেক মানুষ খুন করে এরা এখানে এসেছে তোমাদের খুন করবে বলে। এদের কাছে অস্ত্র আছে। এদের ধরিয়ে দিলে তোমরা নিজেদের উপকার করবে।' কথাগুলো বলে লোকটা প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে তাকাল।

গ্রামবাসীরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু কেউ নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছিল না। পালা যখন হাঁটতে শুরু করেছে তখন অশ্বারোহীরা এগোতে লাগল। আর তখনই একজন গ্রামবাসী চাপা গলায় বলে উঠল, 'মানুষ যারা খুন করে তাদের চেহারা ওরকম হয় না।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'ওরা খামোকা মিথ্যে বলবে কেন! এখানে আসতেও তো কষ্ট হয়েছে।'

এখন অশ্বারোহীদের প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র। অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গীতে ওরা এগোচ্ছে। তাই দেখে লা-ছিরিঙের হাসি পেয়ে গেল। ওরা যদি জানতে পারে যাদের খোঁজে এসেছে তারা এখন গুহায় আছে এবং সেখানে পৌঁছাতে হলে পায়ে হেঁটে উঠতে হয় তাহলে কি করবে ?

আস্তানাটা ঘিরে ফেলল ওরা। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পেল ওর ভেতরে কেউ নেই। বিদেশী অফিসার পালার কাঁধ চেপে ধরল। প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত মনে হচ্ছিল লোকটাকে, 'মিথ্যে কথা বললি কেন ? কোথায় ওরা ?'

পালা থর থর করে কাঁপছিল, 'আমি জানি না, আমি জানি না।'

'তুই এই গ্রামের মোড়ল আর তুই জানিস না ? সত্যি কথা বল নইলে মেরেই ফেলব।'

পালার কাঁধে সম্ভবত যন্ত্রণা হচ্ছিল, 'আমি জানি না।' বলতে বলতে সে কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে সজোরে আঘাত করল লোকটা। ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল পালা। লা-ছিরিঙের পেশী শক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু তখনই তার হাত মুঠোয় নিল পালদেম, 'চুপ করে থাক। মাথা গরম করিস না।'

এই সময় ভেতর থেকে দুজন বেরিয়ে এল, 'ওরা এখানে ছিল স্যার। এখানে অনেক জিনিস পড়ে আছে যা এই এলাকার মানুষ ব্যবহার করে না। এই খালি ব্রান্ডির বোতলটা দেখুন আর সিগারেটের প্যাকেট, ইনট্যাক্ট।'

অফিসার পড়ে থাকা পালার শরীরটার দিকে তাকিয়ে মুখ ফেরালেন। তার পর কয়েক পা এগিয়ে ভীত গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিলেন। পালদেম আশংকিত হয়ে দেখল লোকটা তার ভেনা। অফিসার ভেনাকে প্রশ্ন করলেন, 'ওরা কবে এখান থেকে গিয়েছে।'

ভেনার গলার স্বর কাঁপল, 'বোধ হয় আজই। কারণ কাল রাত্রেও ওরা এখানে ছিল।'

'কোথায় গিয়েছে ?'

'আমি জানি না। বিশ্বাস করুন, আমি জানি না।'

'শোন, আমি সত্যি কথা জানতে চাই। তোমাদের মুখ দেখতে এতটা

পথ আমি কষ্ট করে আসিনি। যে করেই হোক ওই তিনটে লোককে আমরা চাই।'

ভেনা তো বটেই, গ্রামবাসীরা কোন উত্তর দিল না। অফিসার আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওরা এখানে কি করত? তোমাদের সঙ্গে কথা বলত?'

ভেনা অত্যন্ত নার্ভাস ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল, 'না।'

অফিসার তার মুখের কাছাকাছি মুখ নিয়ে গেল, 'তাহলে অত টাকা কে দিল? তোমরা দুটো গল্প চালু করেছ। অভিযাত্রীরা তোমাদের দিয়ে গিয়েছে আর এখানে একটা মরে যাওয়া ডাকাতের কাছে তোমরা টাকা পেয়েছ। এবার সত্যি কথা বল।'

ভেনা এক পা সরে গেল, 'আমি জানি না। যা কিছু ব্যাপার সব পালদেম জানে।'

'পালদেম। পালদেম কে? ডাকো তাকে।'

মন্দিরের চাতালে দাঁড়িয়ে পালদেম নিজের নামটা মুখে মুখে সজোরে উচ্চারিত হতে শুনল। সে খানিকটা অসহায়ের মত নিচের দিকে তাকাল। তারপর লা-ছিরিঙকে বলল, 'আমার যদি কিছু হয় তাহলে ওদের খবর দিস। তুই কখনও সামনে যাস না। আমি যাচ্ছি।'

পালদেমকে আসতে দেখে সবাই পথ ছেড়ে দিল। সামনে দাঁড়িয়ে পালদেম মাথা দোলালো।

'ওরা কোথায়?' দাঁতে দাঁত ঘষলেন অফিসার।

'জানি না। সকালে উঠে দেখেছি হাওয়া হয়ে গিয়েছে।'

'কেন?'

'ওদের একজন মরে গেছে জানতে পেরে কাল থেকে নিজেরা পরামর্শ করছিল।'

'কি করে জানল! এখান থেকে অনেক দূরে ঘটনাটা ঘটেছে।'

'আমি সেটা বলতে পারব না।'

'কত টাকা ও দিয়েছে তোমাকে?'

'অনেক। তাই দিয়ে আমরা ব্যাপারীদের কাছ থেকে শীতের জন্য জিনিসপত্র কিনেছি।'

'কোথায় যেতে পারে ওরা?'

পালদেম চারপাশে তাকাল। তার পর কল্যাণ যে পথে চলে গিয়েছিল সেই পথটা দেখাল, 'ওই দিক দিয়ে একটা রাস্তা আছে ফালুটে যাওয়ার।'

অফিসার নির্দেশ দিতেই ছয়জন অশ্বারোহী সমস্ত গ্রামটার মধ্যে ছড়িয়ে গেল। একটু বাদেই চিৎকার চেঁচামেচি উঠল। ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। পালদেম আর ভেনাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। সমস্ত গ্রামটা লণ্ডভণ্ড করে তল্লাশ শেষ করে অশ্বারোহীরা ফিরে এসে বলল, 'ওরা এখন গ্রামের মধ্যেই নেই। কিন্তু এখানে বেশ জমিয়ে বসেছিল ওরা। কয়েকটা এমন ধরনের বড় ঘর বানানো হয়েছে যা এই পাহাড়ের কোন গ্রামে নেই।'

বিরক্ত অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঘর কেন?' প্রশ্নটা পালদেমের উদ্দেশ্যে।

'যাতে বরফের সময় এখানে বুড়োদের কষ্ট না হয়।' ভেনা উত্তরটা দিল।

অফিসার পালদেমের সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'আমার মনে হচ্ছে তুমি জানো ওরা কোথায় আছে?'

'আমি জানি না।'

বলা মাত্র রিভলভারের বাঁট দিয়ে ওর মুখে আঘাত হানল। সঙ্গে সঙ্গে দুহাতে মুখ চেপে ধরল পালদেম। গলগল করে রক্ত বের হচ্ছিল এখন। আঙুলের ফাঁক দিয়ে হাতে গড়িয়ে পড়ছিল। অফিসার তাঁর সঙ্গীদের বললেন, 'ওকে সঙ্গে নিয়ে চল। তাই দেখে যদি গ্রামের লোক হদিশ না বলে দেয় তাহলে ওকে আর বেঁচে এখানে ফিরতে হবে না।' একজন পাহাড়ি অশ্বারোহী পালদেমের কোমরে দড়ি বেঁধে দিল। পালদেম অসহায়ের মত ওপরে চারপাশে তাকাচ্ছে। দূরে দাঁড়ানো ভীত গ্রামবাসী, পাশে মুখ নিচু করে থাকা তার ভেনা এবং ওপরে দাঁড়ানো কাহুনকে সে চুপচাপ দেখল।

অফিসারের নির্দেশে একজন অশ্বারোহী চিৎকার করে জানাল, 'তোমরা যদি না জানাও ওরা কোথায় আছে তাহলে এই লোকটাকে আমরা মেরে ফেলব।'

কোন সাড়া এল না। অফিসার আবার নির্দেশ দিতেই লোকটি জানতে চাইল, 'এর বউ কোথায়?'

এই সময় ভীড়ের মধ্যে থেকে পালদেমের বউ বেরিয়ে এল।

লোকটা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার স্বামী মরে যাবে তুমি চাও?'

হঠাৎ মেয়েটা চিৎকার করে উঠল, 'কেন তোমরা ওর ওপর অত্যাচার করছ?'

'কারণ তোমরা বলছ না যাদের আমরা চাই তারা কোথায়?'

পালদেমের বউ বলল, 'আমি জানি না। আর জানলেও বলতাম না।'

অফিসার এবার হতভম্ব হয়ে পড়লেন, 'তোমার স্বামীর জীবন বাঁচবে না?'

'যারা আমার ছেলেকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছে তাদের সঙ্গে বেইমানি করব না।'

পালদেমের বউ-এর কথা শেষ হওয়ামাত্র গ্রামবাসীদের মুখে একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। অফিসার চমকে তাকালেন। এই প্রথম গ্রামের মানুষেরা অসন্তোষ জানাচ্ছে। অবশ্য তিনি ভীত হলেন না। এতগুলো মানুষকে খালি হাতে কব্জা করার মত অস্ত্র তাঁর সঙ্গে আছে। কিন্তু এই গ্রামের কাছাকাছি উগ্রপন্থীরা আছে জানা সত্বেও তিনি খালি হাতে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে পারছিলেন না।

নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করার পর অফিসার ঠিক করলেন পালদেমকে মুক্তি দেওয়া উচিত হবে না।

আবার এই বিচ্ছিরি গ্রামে রাত কাটানো ওদের পছন্দ হচ্ছিল না। পালদেমকে নিয়ে গেলে আজ না হোক কাল এরা খবর পৌঁছে দেবেই।

অশ্বারোহীরা ফিরে যাচ্ছিল। পেছনে কোমরে দড়ি বাঁধা পালদেম টলতে টলতে উঠছিল। আর তার পেছনে গ্রামবাসীরা। তাদের গলায় কান্না। গ্রামের সীমা ছাড়ানোর পরই মেঘগুলো নেমে আসতে লাগল দ্রুত। মুহূর্তে সমস্ত চরাচর অন্ধকার হয়ে গেল। অশ্বারোহীরা তাদের গতি বাড়াবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ ওপর থেকে একটা বড় পাথর গড়িয়ে এল তাদের সামনে। ঘোড়াগুলো চিৎকার শুরু করল। পাথরটা আঘাত করল ডানদিকের একটা ঘোড়ার শরীরে। আহত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল সেটা। মেঘ এবং অন্ধকারে অশ্বারোহীরা কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। অফিসার কয়েকবার ফাঁকায় গুলি চালালেন। এবার একটার পর একটা পাথর পড়তে লাগল। আরও দুটো ঘোড়া আহত হল তাতে। পালদেম দড়ি বাঁধা অবস্থায় পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। পাথর গড়াবার পর থেকে নিচের গ্রামবাসীরা আর উঠছে না। আহত ঘোড়াদের আরোহীরা তখন নিচে দাঁড়িয়ে। তাদের একজন ছুটে গেল সামনে। তার পরেই ফিরে এসে চিৎকার করল, 'স্যার, ওকে ছেড়ে দিন। নইলে আমরা এখান থেকে বের হতে পারব না।'

অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওরা কারা?'

লোকটি জবাব দিল, 'দেখতে পাচ্ছি না। তবে সমস্ত পাহাড় জুড়ে পাথর আছে, ঠেলে দিলেই হল। একজনের পোশাক দেখতে পেয়েছি। সে উগ্রপন্থী নয়।'

অফিসার দাঁতে দাঁত ঘষলেন। তাঁর হুকুমে পালদেমের কোমর থেকে দড়ি খুলে দেওয়া হল।

অফিসার চিৎকার করলেন, 'ঘোড়াগুলোকে নিয়ে যাওয়া যাবে?'

একজন উত্তর দিল, 'চেষ্টা করতে পারি স্যার।'

'তাহলে এই ঘটনাটার কথা ভুলে যাও।। সবাই জানবে আমরা উগ্রপন্থীদের হদিশ পাইনি। ওদের বল আমরা বন্দী নিয়ে যাচ্ছি না।'

কথাটা জানানো হতেই পাথর গড়ানো বন্ধ হল। আহত ঘোড়াগুলোকে কোনমতে হাঁটিয়ে দলটা যখন অদৃশ্য হল তখন চারধার চুপচাপ। অন্ধকার আরও ঘনাচ্ছে। হতভম্ব পালদেম তখনও দাঁড়িয়ে। বেশ কিছুক্ষণ পরে পাহাড়ের ওপরে একটি শরীর অস্পষ্ট দেখা গেল। তার পর তার গলার চিৎকার ভেসে এল, 'মেয়ে বন্দুকবাজকে বলো আমরা তার ঋণ শোধ করলাম।'

পালদেম কথা বলতে পারছিল না। এবার তার পেছনে লা-ছিরিঙের গলা শোনা গেল, 'লোকটা কে বুঝতে পারছ?'

পালদেম মাথা নাড়ল, 'হুঁ। রোলেন।'

(ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

গোসাঘর (প্রাঃ) লিমিটেড

বুদ্ধদেব গুহ

গাড়ি আজ সার্ভিসে গেছে।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল দুপুর থেকেই। ট্যাক্সি পাওয়ার অনেক চেষ্টা করেও পেলাম না। ড্যালহাউসী অবধি হেঁটে এসে মিনির জন্যে দাঁড়িয়েছিলাম। চাটুজ্যেও ট্যুওরে গেছে নইলে কোনো প্রবলেমই ছিলো না।

আমি লম্বা লোক। ঘাড়ে ব্যথা হয়ে যায় মিনিতে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থেকে। বেঁচে থাকতে তো অনুক্ষণ মাথা নিচু করতেই হচ্ছে। তার উপরে বাসেও মাথা নীচু করতে ইচ্ছে করে না। এ কারণেই মিনিবাসে আদৌ চড়ি না। বৃষ্টি না হলে হেঁটেই চলে যেতাম আস্তে আস্তে।

হঠাৎই একটা সাদা মারুতি এসে দাঁড়ালো সামনে।

কিটু জানালা দিয়ে মুখ বের করে বললো, কী রে ? গাড়ি কি হলো ?

সার্ভিসে।

বাড়ি যাবি তো ?

হ্যাঁ। আর কোথায় যাবো। মোল্লার দৌড় মসজিদ।

কিটু বাঁ হাত দিয়ে দরজা খুলে দিয়ে বললো উঠে আয়।

পেছনে কুদঘাটের মিনি হর্ন দিচ্ছিলো। কনডাকটর চেঁচিয়ে বললো, আ্যাই প্রাইভেট ! কী পেঁয়াজী হচ্ছে মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ?

কিটু বললো, টেররিজম ! টেররিজম ইজ দ্যা অর্ডার অফ দ্যা ডে। মাঝে মাঝে সত্যি ইচ্ছে হয় যে, মিনিবাসের ড্রাইভার আর কনডাকটরদের টেনে নামিয়ে থাপ্পড় কষাই গালে। আজকাল জোর যার মুলুক তার। আইন, শৃঙ্খলা, ভদ্রতা সবই দেশ থেকে উবে গেলো।

হুঁ। মাও-সে-তুঙই সার। বন্দুকের নলই হচ্ছে সব ক্ষমতার উৎস। বুঝলি।পাঞ্জাব, মিজোরাম ; দার্জিলিং ; দেখছিস না ? শুধু আমরাই ম্যাদামারা বলে সব সহ্য করে বেঁচে আছি।

টেররিজম ডাজ নট লীড টু এনিহোয়্যার।

ও বলল।

গাড়িটা ময়দানে এসে পড়তেই কিটু বললো, সোজা বাড়িতেই যাবি ?

আর কোথায় যাব বল ? পরাধীন পুরুষ। বাড়ির গর্ত থেকে বেরিয়ে অফিস, অফিসের গর্ত থেকে বেরিয়ে বাড়ির গর্ত। গর্তর জীবই হয়ে গেছি পুরোপুরি।

কিটু গাড়ির লাইটারের স্লট থেকে লাইটারটা বের করে, লাল আলোতে গাড়িটা দাঁড়াতেই

সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালো।

বললো, খাবি নাকি একটা ?

নাঃ। ছেড়ে দিয়েছি।

সেকী রে ? গ্রেট।কনগ্রাটস। কী করে পারলি তুইই জানিস।

ট্রাফিক সিগন্যাল সবুজ হতেই অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিয়ে ও বললে, নমিতা কেমন আছে রে ?

ভালোই। অরা কেমন আছে ?

আমি বললাম।

ভালোই। তাদের খারাপ থাকার কী আছে !

উষ্মার সঙ্গে বললো কিটু।

মনে হচ্ছে অরার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে আজ ? কী রে ?

আজ আর কাল কী ! ঝগড়া তো রোজকারই। প্রতি সপ্তাহে দিন পাঁচেক বাক্যালাপ বন্ধ থাকে। এবং বিশ্বাস কর, সে কটি দিনই বড় শান্তিতে কাটে।

বাড়ি ফিরে কি করিস? তুই ?

কি করি ? বাড়ি ফিরে রাতের রান্না করি এবং ছেলেটাকে অঙ্ক করাই।

কেন নমিতা ?

ওরা কুকিং ক্লাসে যায়। জ্যাপানীজ রান্না শেখে।

বাঃ। দারুণ দারুণ রান্না খাস তাহলে !

তা আর বলতে !

কথাটাতে উল্টো মানে হলো।

রোজই যায় রান্নার ক্লাসে ?

না। অন্যদিন পিয়ানো শিখতে যায়। বাকিদিন জার্মান।

জার্মান কেন ? ও কি জার্মানিতে যাচ্ছে ?

শুনিনি তো ! তবে ওর এক বয়ফ্রেন্ড জার্মানীতে থাকে শুনেছি।

পার্ক স্ট্রীটে পড়েই কিটু বললো, তোর মতো সুখী দাম্পত্য জীবন তো আমার নয়। তুই খুবই লাকি। নমিতার মতো মেয়ে হয় না। একেবারে আইডিয়াল ওয়াইফ। মধ্যবিত্ত মানুষদের যেমন স্ত্রী দরকার।

ভাবছিস তাই !

আমি বললাম বন্ধুর বোন আর বোনের বন্ধুদের নিজের বোনের থেকে অনেকই ভালো মনে হয়। ছাত্রাবস্থায়। আর বিয়ের পর অন্যর বউকে। সে যার বউই হোক না কেন !

বদলাবদলি করেই দ্যাখ না ! হুঃ !

তুই আমার ছেলেবেলার বন্ধু। তোর এতো বড় সর্বনাশ আমার দ্বারা হবে না।

আমিই তো অরাকে দিয়ে দিচ্ছি খুশি মনে।

অরা কি তোর বুধি-গাই যে তুই দিয়ে দিলেই সে আমার পেছন পেছন হেঁটে আসবে ? তুই এক নম্বরের মেল-শভিনিস্ট।

স্টুপিড। সে জন্যে নয়। অরাকে নিয়ে ঘর করতে হলে সাতদিনেই তুই আত্মহত্যা করবি।

আর আমার বৌকে নিয়ে তুই ঘর করলে তিনদিনের মাথায় তোর সাততলা ফ্ল্যাট থেকে লাফিয়ে পড়তে হবে তোকে।

কিটু বললো, মনটা রিয়্যালী ভালো করে দিলিরে শিবেন। দুঃখী তাহলে আমি একাই নই। দুঃখটা সকলেরই সমান হলে দুঃখের ভারটা লাঘব হয়। কি বলিস ?

মনে করে আনন্দ হয় যে লাঘব হয়। বাড়ি ফিরেই তো যে তিমিরে সেই-তিমিরেই।

অনেকদিন আড্ডা মারা হয়নি তোর সঙ্গে চল্ কোথাও বসে কফি খাই।

ভাগ ! সন্ধের পর কফি খেয়ে কি হবে। হুইস্কী খাওয়াবি তো বল। তুই কি লেডিজ গ্রুপের মেম্বার যে খামোখা কফি খেয়ে লিভার নষ্ট করবি ?

চল্ তাই খাওয়াবো।

কোথায় যাবি ?

চল্ ক্লাবেই যাই।

কোন ক্লাবে ?

ক্যালকাটা ক্লাবে।

না না ওখানে যাবো না। এক গাদা চেনা লোক বেরুবে। তাও আজ আবার শুককুরবার

দুজনে নিরিবিলিতে আড্ডা দেওয়া যাবে না।
তাহলে চল্ তোর বাড়িতেই যাই।
কিটু বললো।
ফুঃ। তাহলে আর দুঃখ ছিলো কি? ছেলের পরীক্ষা শেষ না হলে বাড়িতে কাউকেই নিয়ে যাওয়া মানা। টাবু।
এই সময় আবার কিসের পরীক্ষা?
স্কুলের টেস্টস্।
তাতো থাকবেই সারা বছর।
সারা বছরই বারণ। তার চেয়ে তোর বাড়ি যাই চল্। পঞ্চাশটা গাধা মরে একজন বিবাহিত পুরুষ হয়। বুঝলি! ফিনিতো। একেবারেই ফিনিতো!
মাতা খারাপ। তোকে বা আমার কোনো বন্ধুকে সাতদিনের নোটিস না দিয়ে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।
তাহলে চল্ অলিম্পিয়াতে যাই। মুখার্জী অফিস ফেরতা রোজ ঘণ্টা দুই থাকে নাকি ওখানে। আমাকে অনেকদিনই যেতে বলেছে। এত ডিপ্রেসড ফীল করি যে, একেবারেই ম্যাদামারা হয়ে গেছি। কোথাওই যেতে ইচ্ছে করে না।
ওরও কি ঐ প্রবলেম? মানে, মুখার্জীর?
ঐ। ঐ। সব শালারই এক প্রবলেম! এই পরাধীনতা আর সহ্য হয় না। মেনস লিব-এর জন্যে একটা মুভমেন্টের সময় হয়েছে। টাইম ইজ রাইপ। আর সহ্য হয় না। কিছু একটা করা উচিত। হাই-টাইম। সত্যি বলছি। আমরা পুরুষরাই আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু! কারনানী ম্যানসনের ভিতরে গাড়ি রেখে যখন কিটুর সঙ্গে অলিম্পিয়া ঢুকলাম, দেখি মুখার্জী একতলাতেই বসে আছে। অলিম্পিয়া আলো করে। অলিম্পিয়া হচ্ছে কলকাতার আঁতেলদের পুরোনো আড্ডা।
আমাদের দেখেই হাত নেড়ে আসতে বললো ও। ওর টেবিলে একজন দারুণ হ্যান্ডসাম ভদ্রলোক অ্যাশকালারের একটি স্মার্ট বিজনেস্ স্যুট পরে বসেছিলেন। আমরা চেয়ার টেনে বসতেই আলাপ করিয়ে দিল মুখার্জী আমাদের সঙ্গে। বললো, মীট মিস্টার হাবুল ঘোষ। জ্যাক কিলবির এম ডি। খুব ভালো ক্রিকেটার ছিলো। দারুণ ইনসুয়িং বল করতো। একটুর জন্যে বেঙ্গলে খেলার চান্স মিস্ করেছিলো। আমার কলীগ। মানে, জ্যাক কিলবিও আমাদেরই গ্রুপে।
হাবুল ঘোষ উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করলেন। বললেন, নাইস টু মীট উ্য!
মুখার্জী বললো, আরে ওরা দুজন আমার ছেলেবেলার বন্ধু। এক স্কুল; এক কলেজ। অত ফর্ম্যাল হবার দরকার নেই হাবুল ওদের সঙ্গে
তারপর আমাকে বললো, তোরা হঠাৎ এই জয়েন্টে? পথ ভুলে?
কিটু বলল, ঠিক পথ ভুলে নয়। মানে ......
মুখার্জী বললো, আমি কিন্তু আজ এখুনি উঠবো। তোরা কি খাবি বল? আমিই খাওয়াচ্ছি। আজকেই তোরা এলি! হাবুলের সঙ্গে একটা জায়গায় যাবো যে আমি এখুনি।
তা তুই যা না। আমরা তো আর জলে

পড়িনি।
বেয়ারা এসে দাঁড়ালো।
কি খাবি তোরা? হুইস্কী তো?
হ্যাঁ।
হাবুল ঘোষ বললেন, মুখার্জীকে: হোয়াই ডোন্ট দে জয়েন আস?
মুখার্জী বললো আরে তুমি কী পাগল হলে? ওরা দুজন হচ্ছে যাকে বলে হেন-পেকড হাজব্যান্ড! ওরা ওখানে গিয়ে কি করবে?
কোথায় যাবার কথা বলছিস রে?
তা বলা যাবে না। যারা সেখানে না-যায় তাদের ঐ জায়গা সম্বন্ধে কিছুমাত্রও বলা বারণ।
কিটু টেবলের নিচে হাত বাড়িয়ে আমার হাঁটুতে চিমটি কাটলো। মুখার্জীটা যে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে অমন দুশ্চরিত্র হয়ে গেছে তা ভেবেই খারাপ লাগলো আমারও।
আমি বললাম, কোথায় যাচ্ছিস তা না জেনেই যাই কী করে?
হাবুল ঘোষ বললেন, শ্রেণী সংগ্রামে আমরা মানে আমি আর মুখার্জী শামিল হয়েছি। স্ত্রীদের দ্বারা অত্যাচারিত স্বামীরা মিলে একটি সিক্রেট অর্গানাইজেশান করেছি আমরা।
তোরা কি ভাবলি খারাপ পাড়ায় যাচ্ছি আমরা? আরে সে সব জায়গায় যেতে পারলে তো টাইটই করে দিতে পারতাম তাদের। আমরা হচ্ছি শালার না ঘরকা, না ঘাটকা। তোরা বৌয়ের আঁচলধরা মেনিমুখো পুরুষেরা কী বুঝবি আমাদের কথা?
মুখার্জী বললো, দুঃখ দুঃখ গলায়।
হাবুল ঘোষ বললেন, কী যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিসে দংশেনি যারে?
বানানটা ভুল হলো।
কিটু বললো।
নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ঐ পারে যত সুখ আমার বিশ্বাস। আমি বললাম হাসবার চেষ্টা করে।
আমরা উঠছি। সী উ্য এগেইন।
কিটু বললো, "উই আর ইন দ্যা সেম বোট ব্রাদার! ইফ উ্য রক দ্যা ওয়ান এণ্ড/ উ্য আর গোয়িং টু রক দ্যা আদার।"
কিটু বললো, পল রবসনের গান। অ্যাপার্থায়েড নয় এ। আমাদের দুঃখ আরও গভীর। ফেয়ার সেক্সদের আন-ফেয়ারনেসের বিরুদ্ধেই আমাদের সকলের বিদ্রোহ।
একটা ফোরাম চাই আমাদের বক্তব্য ভয়েস করার। মাউথপীস চাই।
ফোরাম আছে। ফর ইওর ইনফরমেশান। যাবেন তো চলুন।
হাবুল ঘোষ বললেন।
উই আর গেম।
কিটু বললো। তারপর বললো, একটা করে হুইস্কী খেয়ে গেলে হতো না।
ওখানেই হবে। চলুন। গাড়ি কোথায় রেখেছেন?
কারনানী ম্যানসনে।
মুখার্জী বললো, তাহলে কিটু তুই আমাদের গাড়িতে আয়।
কিটুর গাড়িতেই এসেছি আমি। তুই বরং কিটুর গাড়িতে যা মুখার্জী। আমি বরং ঘোষের সঙ্গে যাই।
ফাইন্।
হাবুল ঘোষের গাড়ি রাসেল স্ট্রীটে ছিলো। গাড়িতে উঠে আমি শুধোলাম, কতদূর যেতে হবে?
কাছেই। থিয়েটার রোডে।
ব্যাপারটা কি?
গেলেই জানবেন। আসলে ব্যাপারটা কী জানেন? স্ত্রীদের অত্যাচারিত স্বামীদের সংখ্যা যে এত বেশি সে সম্বন্ধে আমাদেরও কোন ধারণা ছিলো না। আমাদের এই মুভমেন্ট-এর স্নো-বলিং এফেক্ট হচ্ছে। কী বলব আপনাকে, সমাজের বাঘা বাঘা পুরুষরা যে সকলেই প্রায় মেনি-বেড়াল এবং আমাদেরই দলে এই অর্গানাইজেশনটা না করলে জানতেই পেতাম না। প্যাথেটিক অবস্থা মশাই। এই সব ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা! বুঝেছেন। সারা জীবন লেডিজ সীটে যাদের বসতে দিলাম, মাথায় করে রাখলাম নরম লাজুক বলে তারা যে মশাই এত বড় হারামজাদী তা কী আগে জানতাম!
ছিঃ ছিঃ। মাইণ্ড ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ। নিজেদের স্ত্রীদের সম্বন্ধে এমন ভাষা ব্যবহার করা কি ঠিক?
হোয়েন উ্য আর পুশড টু দ্যা ওয়াল তখন···। তখন বেড়ালদের দাঁত খিচনো, লোম ফোলানো ছাড়া উপায়ই বা কী? সমস্যাটা আমাদের সারভাইভালেরই সমস্যা মশায়। দজ্জাল মেয়েদের নিয়ে রোম্যান্টিসিসম্ যারা করে তারা কুইসলিং ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা সীরিয়াসলি ভাবছি আমাদের এই ফোরামের একটি আর্মড উইং করবো। তেমন তেমন অত্যাচারী মেয়েছেলেদের গুলি করে মেরে দেবো। মশাই? কাগজে কাগজে কেরোসিন দিয়ে আগুন ধরিয়ে মেয়েদের আত্মহত্যার কেস ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ছাপা হয় আর আমাদের মতো লক্ষ লক্ষ স্বামী যে তিল তিল করে স্লো-পয়জনিংএ মারা যাচ্ছি, খুন হয়ে যাচ্ছি, হাপিস হয়ে যাচ্ছি তাদেরই মৃণালভুজে, তাদের বাঘনখে; সে খবর কে রাখে? পুরুষরাই পুরুষদের সবচেয়ে বড় শত্রু। 'উইমেনস লিব', 'উইমেনস লিব' করে পুরুষরাই সবচেয়ে বেশি চেঁচায়। শালা ভণ্ডামির পরাকাষ্ঠা। আরে চাচা? আগে আপন প্রাণ বাঁচা!

॥ ২ ॥

থিয়েটার রোডে, এয়ার-কণ্ডিশনড মার্কেটের কাছাকাছি একটি সম্ভ্রান্ত বাড়ির তিনতলায় উঠে গেলাম লিফটে হাবুল ঘোষের সঙ্গে। একটি ফ্ল্যাটের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বেল টিপলেন হাবুল ঘোষ।
ঐ দেখুন!
হাবুল ঘোষ বললেন।
তাকিয়ে দেখি দরজার উপর ঝকঝকে পেতলের প্লেটে কালো অ্যানোডাইজ করা অক্ষরে লেখা আছে ইংরিজিতে: "গোসাঘর প্রাইভেট লিমিটেড"। রেজিস্টার্ড অফিস।
একজন দাড়ি-গোঁফওয়ালা বেয়ারা এসে দরজা খুলে সেলাম করলো হাবুল ঘোষকে।
ভেতরে ঢুকতেই দেখি বিরাট ফ্ল্যাট। প্রায় তিন হাজার স্কোয়ার ফিটের হবে। দারুণ সুন্দর সীটিং রুম। একপাশে বার। দেখি মুখার্জি আর কিটু হুইস্কীর গ্লাস নিয়ে বসে আছে। বেয়ারা আমাদেরও হুইস্কী দিলো।
হাবুল ঘোষ বেয়ারাকে শুধোলেন সামসের, এখন কজন মেম্বার আছেন?
পাঁচজন স্যার।
উর্দি-পরা একজন কুক এসে জিগেস করলো ডিনার খেয়ে যাবো কি না আমরা?
হাবুল ঘোষ বললেন আজ নয়। এখন আছেন কে কে? ভিতরে?
ব্যানার্জি সাহেব, বিজন সেন সাহেব, মনীষ গোস্বামী সাহেব, নাটু চক্রবর্তী সাহেব আর কুচু পালিত সাহেব।
সাহেবদের খবর দাও। বলো যে দুজন ক্যাণ্ডিডেট নিয়ে এসেছি।
বাবুর্চি গিয়ে খবর দিলো ভিতরে। দিয়ে এসেই বললো, আমি যাই সাহেব। এক সাহেব শুঁটকি মাছ খেতে চেয়েছেন এবং আরেক সাহেব কাউঠার মাংস। চক্রবর্তী সাহেব মুগের ডালের খিচুড়ি, সঙ্গে কড়কড়ে করে আলু ভাজা আর শুকনো লঙ্কা ভাজা। বিজন সাহেব খাবেন শুধুই স্যুপ। আমি যাই স্যার। কিছু খেলে, বলবেন।
সীটিং রুমের দেওয়ালে একজন গোবেচারা শীর্ণকায় মানুষের মস্ত অয়েল-পেইন্টিং। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা সেক্স-স্টার্ভড চেহারার একটি রোগা-পাতলা মানুষ। ছবির নিচে লেখা আছে গোটা গোটা অক্ষরে:
"নিঃশেষে প্রাণ যে করিবেক দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই। ভয় নাই ওরে ভয় নাই।"
এ কার ছবি?
কিটু শুধোলো হাবুল ঘোষকে।
এ ছবি, এ যুগের মোস্ট-টরচারড হাজব্যাণ্ড বিটু ব্যানার্জির। দুবেলা স্ত্রীর হাতে মার খেতেন উনি। এবং একদিন ঐ মারের চোটেই পটল তোলেন। ওঁর শ্বশুর স্টিভেডর ছিলেন মস্ত বড়। এই অ্যাকসিডেন্ট, থুরি, হত্যাকাণ্ডর খবর কোনো কাগজই ছাপেনি। ওঁরই স্মৃতিতে ক্লাবের এই সীটিং রুমের নাম রাখা হয়েছে "বিটু হল"।
বাঃ। ওঁর নাম বুঝি বিটু ছিলো?
হ্যাঁ। ভবিষ্যতে কোনো পুরুষই যেন নারীর হাতে অমন নিগৃহীত হয়ে মারা না যান তাই-ই দেখা আমাদের সকলেরই কর্তব্য।
এমন সময় ভেতর থেকে সবুজ চেক-চেক লুঙ্গি আর হাতকাটা সাদা গেঞ্জী-পরা একজন ছ ফিট লম্বা ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। হাতে একটি মোটা বই নিয়ে।
কী বই এটা ব্যানার্জি সাহেব?
মুখার্জি শুধোলো।
ব্যানার্জি সাহেব বেয়ারাকে বললেন, হুইস্কী উইথ সোডা এণ্ড আইস। বলেই, বইটা মুখার্জির হাতে দিয়ে দিলেন। উঁকি মেরে দেখলাম, বইটির নাম "বশীকরণ এবং বগলামুখী কবচ।"
কত্তদিন?

হাবুল ঘোষ শুধোলেন ওঁকে।

দশদিন হয়ে গেলো।

কি রি-অ্যাকশান ? হোম-ফ্রন্টে ?

রি-অ্যাকশান ? আনন্দবাজারে ছেলেকে দিয়ে বিজ্ঞাপন দিইয়েছে "বাবা ফিরে এসো। মা শয্যাশায়ী। অনশনে আছেন।" অথচ কালই খবর পেলাম যে তোমার বৌদিকে দেখা গেছে পাঁচ পদ দিয়ে, মানে সত্তর টাকা কেজি-র গলদা চিংড়ি, চল্লিশ টাকা কেজি-র ইলিশ এবং পঁয়ত্রিশ টাকা কেজির রাবড়ি সহযোগে সকাল-সন্ধে খাচ্ছেন। খোসমেজাজেই আছেন। তাঁর বয়ফ্রেণ্ডও আসছেন বাড়িতে রেগুলার।

মুখার্জি বললো, বলেন ত' কড়াক্-পিং করে দি। আমাদের অ্যাকশান স্কোয়াড তো প্রায় তৈরি।

কিছুই করতে হবে না রে ভাই। আমার বৌ-এর বয়ফ্রেণ্ডের যা চেহারা ! যেন গুড়ের হাঁড়িতে-পড়া নেংটি ইঁদুর। ও স্বখাত সলিলেই ডুবে মরবে। সংস্কৃত শ্লোক পড়োনি ? "দুর্বলে সবলা নারী সাঃ প্রাণঘাতিকাঃ।"

মুখার্জি হো হো করে হেসে উঠলো।

বললো, আপনার সেন্স অফ হিউমার আছে।

এঁরা কারা ? আজ কি এঁদের ইনট্রোডাকশান আছে ? নোটিশ পাইনি তো আমরা।

না না ইনট্রোডাকশান আজ নেই। তবে প্রসপেক্টিভ মেম্বার। তাই নিয়ে এলাম দেখাবার জন্য।

ওঁদের বলে দিয়েছো তো সিক্রেট ডাইভালজ করলে কী হবে ?

হ্যাঁ। কড়াক-পিং।

হুঁ। কড়াক-পিং। টেররিস্টদের হেল্প ছাড়া কোনো সিক্রেট অর্গানাইজেশনই চলে না। বলেই আমার দিকে চেয়ে বললেন, বৌ লুঙ্গি পরতে দেয় না বাড়িতে। এখানে এসে হাওয়া খেয়ে নিচ্ছি মশাই। বেড়ে আছি। কী যে সুখ কী বলব ! আর্নড লিভ পাওনা আছে এক মাস। এক মাসের আগে ঐ শত্রুপুরীতে ফিরে যাচ্ছি না আর।

বেয়ারা আমাদের জন্যে হুইস্কী এনে দিলো। সঙ্গে চিনেবাদাম, কাঁচালঙ্কা কাঁচা পেঁয়াজ।

মুখার্জি বললো, চীজ-টোস্ট খাবি তোরা অথবা চিকেন-ওমলেট ? অফিস-ফেরতা আসছিস তো !

কিটু বললো, চীজ-টোস্ট।

আমি বললাম, আমিও তাই।

হুইস্কীতে চুমুক দিয়ে আমি বললাম বোস সাহেব, আপনাদের এই ক্লাবের অ্যাক্টিভিটিস কি কি ?

দজ্জাল স্ত্রীদের হাত থেকে, বলিষ্ঠা স্ত্রীদের হাত থেকে, অতিমাত্রায় বেশি নেকুপুষুমুনু স্ত্রীদের হাত থেকে, ইনটেলেকচুয়াল স্ত্রীদের হাত থেকে, স্বামীর চেয়েও বেশি গুণী স্ত্রীদের হাত থেকে হতভাগ্য পুরুষদের রক্ষা করার জন্যে যা-কিছুই করা দরকার সেইসব কিছু করাই এই ক্লাবের অবজেকটিভস্। তাই-ই অ্যাক্টিভিটি।

ব্যানার্জি সাহেবকে হুইস্কী এনে দিলো বেয়ারা।

চুমুক দিয়ে উনি বললেন, সারা পৃথিবীতে যখন "উইমেনস লিব"-এর ধোঁয়া উঠছে কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে মেনস লিব-এর আন্দোলনে আমরা সকলে যদি, যাকে বলে, কী বলব, প্রসেশান-করা ছোঁড়াদের ভাষায় যাকে "শামিল" হওয়া বলে তাই-ই না হই, তবে পৃথিবী থেকে সভ্য, ভদ্র, মুখ-চোরা শিক্ষিত পুরুষ জাতটাই অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

আমি বললাম, বাঃ। আপনি দারুণ বাংলা বলেন তো।

মুখার্জি, আমাদের ছেলেবেলার শ্যামবাজারের টার্মিনোলজীতে বললো, কার কাছে খাপ খুলছিস ? ব্যানার্জি সাহেব খখরখভ উনিভার্সিটির বাংলার হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট।

সেটা কোথায় ? খখরখভ উনিভার্সিটি ?

কাজাকিস্থানে। কাজাকিরা বাংলা খুব ভালোবাসে। উনি বেনারস উনিভার্সিটিতে এসেছেন ডেপুটেশানে দু বছরের জন্য। অবশ্য ওঁর শ্বশুরবাড়ি বেনারসেই।

বেনারস থেকে আপনি এখানে এসেছেন ? কলকাতায় ? গোসাঘর-এ ?

অবাক হয়ে কিটু বললো।

ধরণী দ্বিধা হলে তারই মধ্যে সেঁধিয়ে যেতাম মশাই আর বেনারস থেকে কলকাতা ! স্ত্রী যদি ক্ষুরধার হন তবে সোনা। আর তার উপরে যদি আবার শ্বশুরবাড়ির তিন মাইল রেডিয়াসের মধ্যে থাকেন তবে তো সোনায়-সোহাগা।

কিটু বললো, ব্যাপারটা বোধহয় জেনারালাইজ করা ঠিক নয়। শ্বশুরবাড়ির কাছে থাকলে তো আদর-টাদরও.....

সে-সব দিন চলে গেছে। শ্বশুরবাড়ির হ্যাপা যারা সামলায়, তারাই জানে।

এমন সময় ভেতর থেকে একজন স্লিপিং-স্যুট-পরা রোগা-পাতলা ভদ্রলোক হাতে একটি ম্যাগাজিন নিয়ে এসে সীটিং রুমে ঢুকলেন।

হাবুল বোস বললেন, কী হে কুচু ! কী খবর ?

ওল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট। চামেলী নাকি টি ভি তে আমি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছি বলে অ্যানাউন্সমেন্ট যাতে হয় তার বন্দোবস্ত করেছে। আজই সন্ধে থেকে। খবর পেলাম বিকেলে। পুলিশে তো খবর দিয়েইছে। তুই পুলিশের অমলচন্দ্র রায় এবং মনীন্দ্রদাকে বলে রেখেছিস তো ?

বলেছি। কিন্তু ওঁদের দিয়ে আমাদের পারপাজ কতখানি সার্ভড হবে তা জানি না। ওঁদের দুজনেরই স্ত্রীদের সঙ্গে খুবই সদ্ভাব। ঝগড়া একদিনের জন্যেও হয় না।

তা হলে বীরেনকে বল।

কোন্ বীরেন ?

আরে বীরেন কুণ্ডু।

দূর দূর। ওঁর সঙ্গে ওঁর বৌ-এর একদিনও ঝগড়া হয়নি বিয়ের পর থেকে। আমি জানি। ফর সার্টেন। ওরা সব ভাগ্যবান পুরুষ। আমাদের হতভাগা পুরুষই চাই যাঁরা আমাদেরই মতো। নইলে আমাদের জন্যে করবেন কেন ?

তা হলে বিনয় চন্দ্রকে.....

সে? ঐ দলেই পড়ে। বৌ বলতে সে অজ্ঞান আর সে বলতে তার বৌও অজ্ঞান।

তা হলে আর কী ! বৌ-এর সঙ্গে দু'বেলা ফাটাফাটি হয় এমন পুলিশ অফিসারই দ্যাখ ওপরতলার। কী কেলো ! এই বৌ-ভক্ত মানুষেরাই পুরুষদের ডুবিয়ে দিলো।

মুখার্জি বললো, তা হলে কুচুদা, তুমি টি ভি স্টার হয়ে গেলে ! আজই কি তোমাকে দেখাবে ? টি ভি-তে ? মেইডেন অ্যাপীয়ারেন্স ?

তাই তো শুনেছি। কিন্তু তোমরা কি এই ম্যাগাজিনটা দেখেছো ?

কী ম্যাগাজিন ?

সকলেই উৎসুক হয়ে তাকালেন বইটার দিকে।

"প্রমীলা"। এমনিতেই তো তিষ্ঠোনো যায় না তার ওপর স্ত্রীদের মাসোহারা দিতে বলেছে এই কাগজে।

মাইনে ? স্ত্রীদের ? হাউ ডেঞ্জারাস ! ভীত গলায় বললেন ব্যানার্জি সাহেব।

মুখার্জি বললো শালা ! সারাজীবনই চাকরি করলাম আমি আর মাইনেটা পেলো বউ-ই। এখন আবার বউদের মায়না। কী কেলো মাইরি !

হ্যাঁ।

কুচুদা বললেন, এই পত্রিকার মহিলা এডিটর আমাদের খতম-লিস্টে আছে। 'প্রমীলা'র সম্পাদক হিসেবে বৌয়েদের মাইনের কথা লিখে ঘরে ঘরে যা অশান্তি এনেছে তাতে তাকে আর বাঁচতে দেওয়া ঠিক নয়। অ্যাকশান স্কোয়াডকে বলতে হবে।

ব্যানার্জি সাহেব বললেন, আরও একজন ন্যালাখাবা পুরুষ লেখককেও শেষ কোরো সেই সঙ্গে।

কে সে ?

মধুকরীর রাইটার।

কুচুদা বললেন।

কিটু বললো, মধুকরী নয় ; মাধুকরী।

ঐ হলো। ঐ লেখকটিও ডেঞ্জারাস। মেয়েদের ক্ষেপিয়ে তুলছে আমাদের বিরুদ্ধে।

ব্যানার্জি সাহেব এক ঢোকে হুইস্কী শেষ করে, টাক করে গ্লাসটা সোফার পাশে নামিয়ে রেখে বললেন, মারো শালাকে ! আর দেরি নয়।

এঁদের রকমসকম হাব-ভাব দেখে আমার সত্যিই ভয় করতে লাগলো। আমার বৌ-এর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয় ঠিকই, বহু ব্যাপারেই অমিলও আছে। আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার যে করে তাও-ও ঠিক কিন্তু তবুও সে আমার সন্তানের মা, আমার বিবাহিতা স্ত্রী ; ভালোও সে আমাকে নিশ্চয়ই বাসে, যদিও তার মতনই করে। এ-সব কিছু জেনে তার বিরুদ্ধে এমন সাজ্ঞাতিক জেহাদ ঘোষণা করার প্রবৃত্তি অথবা সাহসও আমার ছিলো না। তার উপর টেররিজম ! দাম্পত্যে স্ত্রীদেরই একচেটিয়া অধিকার টেররিজম-এ ; কখনোই পুরুষদের নয়। আমার অস্বস্তি লাগছিলো। ভয়ও করছিলো। এভরিথিং হ্যাজ আ লিমিট। বাঘিনীরা যতক্ষণ খাঁচার মধ্যে বা অলক্ষে আছে সাহসের অভাব হবে না। কিন্তু হঠাৎ যদি.....

কুচু সাহেব বললেন, স্বগতোক্তিরই মতো. এভরীথিং হ্যাজ আ লিমিট। শালা ! আমার

নিজের মেহনতের পয়সায় একটু শুঁটকি মাছ আর কাউঠঠা খাবো তাও একদিনও খেতে দেবে না। বাড়িতে মগ বাবুর্চি আছে। চিটাগাং-এরই লোক, কোম্পানী তাকে পাঁচশো টাকা মাইনে, টোয়েন্টি পার্সেন্টি বোনাস দেয়, আর শালা আমারই বেলা যত্ব সব। "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায় ?"

ব্যানার্জী সাহেব বললেন, "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।" রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বলে গেছেন।

মুখার্জী বললো রবীন্দ্রনাথের কথা ছাড়ুন দাদা। তাঁর তো শিলাইদহ ছিলো, পদ্মা বোট ছিলো ; স্ত্রীর এক্তিয়ার থেকে কেটে পড়ার নানা উপায় ছিলো। তাছাড়া মৃণালিনী দেবী কতদিনই বা বেঁচে ছিলেন।

কিটু বললো, অনেক ভেবে দেখেছি, ওয়াইফকে গাধা-বোটের মতো যারা জীবনে বেঁধে রেখেছে তারা যতখানি জল সরিয়েছে তাদের চার পাশে,ততখানি কখনও এগোতে পারেনি। জীবনে যে সব পুরুষ বড় হয়েছে তাদের প্রায় সকলেই হয় বিয়ে করেইনি, নয় সকাল সকাল বউ মরে গেছে। ফর এগজাম্পল : নেহরু, বিধান রায়।

ব্যানার্জী সাহেব বললেন, নয়তো ঘন ঘন বিয়ে করতে হবে। একটা ধরো আর একটা ছাড়ো। এগজাম্পল্ : আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। রিচার্ড বার্টন, এবং আরো অসংখ্য জ্বাজ্যল্যমান উদাহরণ আমাদের সামনেই আছে।

মুখার্জী বললো, তোরাও মেম্বার হয়ে যা। মাসে দুশো টাকা চাঁদা, যে কোনো ভালো ক্লাবের মাসিক চাঁদার চেয়ে অনেকেই কম। বউ ত্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করলেই "নিরুদ্দেশ" হয়ে যাবি। এখানে দারুণ খাওয়া। যার যা খুশি খাবি, মেমসাহেব বউরা যা খেতে দেয় না, কচুর শাক, চেতলের পেটি, ট্যাংরার চচ্চড়ী, কাসুন্দি, কুমড়ো পাতা ভাজা, কাঁঠালের বীচি আর পাটপাতার তরকারী, শুঁটটি মাছ, ইলিশের মাথা দিয়ে পুঁইশাক এট্‌সেট্‌রা। এবং ওয়েল-স্টকড্ বার তো আছেই। ভিতরের ঘরে সার সার বাঙ্ক আছে দেওয়ালে। শুয়ে পড়লেই হলো। ভিডিও রুম আছে। দারুণ দারুণ সফ্‌ট-পর্ণর ক্যাসেট আছে। ভালো লাইব্রেরী। অনেকরকম বই। চার্জও থ্রী-স্টার হোটেলের চেয়েও কম। ডাইনার্স-ক্লাব কার্ডও আমরা অনার করি। চলে আসবি, একটা ফোন করে দিয়েই। নাগিনীর ফোঁসফোসানি কমলে, যখন "দেহিপদপল্লভমুদারম্" অ্যাটিচ্যুড হবে তখনই রাজার মতো ফিরে যাবি কলার তুলে। ফিরে বলবি, আর যদি "একদিনও" হয় তবে আবারও "নিরুদ্দেশ" হয়ে যাব। মেয়েছেলের জাত হচ্ছে শক্তের ভক্ত নরমের যম। বুয়েচিস।

কিটু পার্স বের করে বললো, এই নে দুশো টাকা। মেম্বারশিপ ফর্ম দে। সই করে দিচ্ছি।

না-না ওরকম করে হবে না। অ্যাপ্লিকেশান করলেই তো হবে না। আমাদের কড়া স্ক্রীনিং কমিটি আছে। নরম মনের পুরুষদের নেওয়া হয় না। একজন মেম্বারও বিশ্বাসঘাতকতা করলে পুরো অর্গানাইজেশানটা শ্যাটারড হয়ে যাবে। তাই কথা দিতে পারছি না যে তুই অ্যাপ্লাই করলেই নিতে পারব আমরা। পুরুষ যথার্থ পুরুষ কী না তা না যাচাই করে মেম্বার করি না আমরা। কোনো রিস্ক-এর মধ্যে নেই আমরা।

ঠিক আছে। ফর্ম তো দে।

তা দিচ্ছি। বেয়ারা ! দোঠো ফর্ম লাও।

এমন সময় কলিং বেল বাজলো বাইরে।

বেয়ারা ফর্মদুটি দিয়েই দরজা খুলতে গেলো। দরজা খুলতেই একজন অতি সুন্দরী তন্বী, মাঝবয়সী মহিলা খাটাউ-এর প্রিন্টেড ভয়েল পরে ভিতরে ঢুকলেন। ব্যানার্জী সাহেব তাঁকে দেখেই তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠলেন সোফা ছেড়ে।

তু-তু-তু-তু-তুমি !

হ্যাঁ আমি। তাড়াতাড়ি ঐ লুঙি ছেড়ে ভদ্রলোকের জামাকাপড় পড়ে এসো। বাড়ি যেতে হবে।

কি ? কী বলছো তুমি ?

ঠিকই বলছি। দশজনের সামনে সীন ক্রিয়েট কোরো না। বে-ঈজ্জত হবে। আরও চটিও না আমাকে। তোমাদের এই ক্লাবের কথা আমি সবই জেনে গেছি। এবং যতজনকে আমি জানি সকলকেই ফোনে জানিয়েছি। এই অর্গানাইজেশানকে ব্লাস্ট করে দেবো আমরা। তোমরা ভেবেছোটা কি ? তারপরই কুচু সাহেবের দিকে ফিরে বললেন, এই যে কুচুদা ! তোমার বিরুদ্ধে চামেলীদি ক্রিমিনাল প্রসিডিং আনছে। মেন্টাল টরচার -এর গ্রাউন্ডে।

কেন ? কেন ? ডিভোর্স চাইলেই পারে। দিয়ে দোব।

কুচু বললো।

অত সোজা ! তুম কমলীকো ছোড়নেসে ক্যা হোগা, কমলী তোমকো ছোড়েগা নেহি। চামেলীদি এখন ক্রিমিনাল অ্যাডভোকেট দিলীপ দত্তর বাড়িতেই বসে আছে। কালকেই বড়ুয়া সাহেবের কোর্টে মামলা মুভ করবে। "নিরুদ্দেশ" "নিরুদ্দেশ" খেলা আপনাদের বের করে দেবে। আমরা কুড়িজন স্ত্রী মিলে প্রত্যেকে চামেলীদিকে দুশো টাকা করে দিয়ে দিয়েছি। চার হাজার। ইনিশিয়াল কস্টস্ হিসেবে। গোসাঘার স্যাংচুয়ারী প্রাইভেট লিমিটেডকে আমরা লিকুইডেট করে ছেড়ে দেব।

ব্যানার্জী সাহেব ভিতরে গেলেন।

বেলটা আবারও বাজলো। বেয়ারা দরজা খুলতেই একজন অল্পবয়সী, লম্বা, সুশ্রী মেয়ে একজন অত্যন্ত সুদর্শন-লম্বা পুরুষের সঙ্গে ঢুকলেন ভিতরে। একজন ফোটোগ্রাফারকে নিয়ে।

মেয়েটি বললেন, নমস্কার ! আমার নাম সুচেতা রায়। আমি "প্রমীলা" থেকে আসছি। ভদ্রলোক বললেন, আমার নাম মাখনলাল ভট্টাচার্য। আমিও 'প্রমীলা' থেকে। ইনি কিরণ মিত্র, ফোটোগ্রাফার।

কুচুবাবু তুতলে বললেন, "প্রমীলা" ! মাই গড ! তারপর মাখনলালকে বললেন, আপনার ল-ল-ল-লজ্জা করে না ? পুরুষ হয়ে মেয়েদের কাগজে কাজ করেন। আত্মসম্মানজ্ঞানহীন ! আপনি একজন কুলাঙ্গার। মেয়েদের যারা সার্ভ করে তারা সকলেই পুরুষ জাতের কুলাঙ্গার। যারা অত্যাচারীদের, কায়েমি স্বার্থর হাত শক্ত করে তারা নিপাত যাক।

ফোটোগ্রাফার মিত্র ফটাফট ছবি তুলে যেতে লাগলেন।

মাখনলাল হেসে বললেন, আমরা সকলেই মেয়েদের সার্ভ করি। সব পুরুষই। নানাভাবে। এই-ই আমাদের ফেট। ভাগ্য। কুডনট্ কেয়ারলেস্। লজ্জা যদি থাকেই তবে সে লজ্জাস্থান ঢেকে রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। যে দুঃখর নিরসন হবার নয়, হবে না কখনও; সেই দুঃখ নিয়ে কেঁদে মরা পুরুষের সাজে না। "হোয়েন রেপ ইজ ইনএভিটেবল্ হোয়াই নট এনজয় ইট" কথাটা পুরুষ জন্ম ধারণ করার পরমুহূর্ত থেকেই প্রযোজ্য। যেখানে বিদ্রোহ মানেই মৃত্যু সেখানে উপায়ই বা কি ? তার চেয়ে বরং আসুন ! আপনার ইন্টারভ্যু নিই।

আমার ?

কুচু সাহেব প্রায় কেঁদে ফেললেন।

হ্যাঁ আপনার। বলেই মাখনবাবু টেপ-রেকর্ডার বার করলেন কাঁধের ঝোলা থেকে।

স্যার। স্যার ! প্লীজ না। আপনি আমার স্ত্রীকে চেনেন না। অমন খাণ্ডার রমণী···

ল্যাঙ্গুয়েজ কুচুদা ! ল্যাঙ্গুয়েজ ! বলে মিসেস ব্যানার্জী চেঁচিয়ে ধমকে দিলেন।

মাখনলাল বললেন, কে কার বউকে চেনে দাদা। বউকে চেনার চেয়ে "আত্মানং বিদ্ধি" অনেক সহজ ব্যাপার।

ঈরে ! কার মুখ দেখে আজ সকালে উঠেছিলাম। এমন···ঈরে ! বাবা !

আমার ও কিটুরও ছবি তুলতে লাগলেন ফোটোগ্রাফার কিরণ মিত্র।

আমি দুহাতের পাতাতে মুখ ঢেকে বললাম, আমার নয়। আমার নয়। আমরা মেম্বার নই। মানে, আমি আর উনি। কিটুকে দেখালাম।

ফটোগ্রাফার মিত্র হেসে বললেন, জানি। আপনারা শুধু অ্যাবেটমেন্টের চার্জেই পড়বেন। 'প্রমীলার' নেকস্ট ইস্যুতে "গোসাঘর প্রাইভেট লিমিটেডের" উপরে এডিটরিয়াল লিখবেন সম্পাদক সুপর্ণা গুপ্ত। যাঁদের বিরুদ্ধে আপনাদের এই জেহাদ তাঁদেরই হাতে বাকি জীবন এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। হি হি।

ভেতর থেকে ব্যানার্জী সাহেব পায়জামা পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে এলেন। দেখলাম, চোখ-মুখ একেবারে গর্তে বসে গেছে। মুখের দীপ্তিও উধাও। ফাঁসীর আসামীর মতো হাব-ভাব।

বাবুর্চি বললো, সাব আপকো খানা।

ব্যানার্জী সাহেব দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, রাস্তেকা কুত্তেকি খিলা দেনা। খানা। ফু !

ফুঃটা ঘৃণার, না অসহায়তার ; না সমর্পণের ঠিক বোঝা গেলো না।

মিসেস ব্যানার্জী বললেন, চলো ! কিন্ডারগার্টেনের ছেলের মতো ফুঁ ফাঁ কোরো না। শেমলেস ক্রীচার। বিহেভ লাইক আ জেন্টেলম্যান। আ ম্যান।

অ্যাঁ-এ-এ। ম্যান !

ব্যানার্জী সাহেব ফুঁফিয়ে বললেন।

আপনার ইন্টারভ্যুটা ?

মাখনলাল বললেন। মিস্টার ব্যানার্জীকে।

মিসেস ব্যানার্জীই উত্তর দিলেন। বললেন, গাবলু কালকেই ইন্টারভ্যু দেবে আপনাকে। এই নিন আমার কার্ড। টিভলি কোর্টে আমার ফ্ল্যাটে আসবেন রাত আটটাতে। ডিনারও খাবেন। খুশি হবো। স্কচ্ খাওয়াবো। বাঈ ! ব্যানার্জী সাহেব মনে মনে বললেন, তোমার ফ্ল্যাট ! নির্লজ্জ। আমার যা-কিছু সবই তোমার অথচ সেই আমার সঙ্গেই এই ব্যবহার। "যার জন্যে রামের মা তারেই তুমি চিনলা না।"

ওরা চলে গেলেন।

আমি বললাম, এবারে আমরাও উঠবো।

উঠতে পারেন। সুচেতা বললেন। তবে, আপনাদের কার্ড দুটি দিয়ে যান। সময়মতো কনট্র্যাক্ট করবো। নন-কো-অপারেট করলে আপনাদেরই ক্ষতি ! বানিয়ে বানিয়ে যা-তা লিখে দেবো সেটা সত্যির চেয়েও খারাপ হবে।

পার্স থেকে কার্ড বের করে দিলাম আমি আর কিটু।

গাড়িতে এসে স্টীয়ারিং -এ বসেই কিটু হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

বললো, কী হবে রে আমাদের ? খুঃ-কুঃ-খিঃ-কিঃ। বৌ আমাকে তুলোধোনা করে ছেড়ে দেবে। "প্রমীলা" ও রেগুলার রাখে।

আমি বললাম, টেক ইট ইজী। বিপদের সময় ধৈর্য হারাতে নেই।

আমাকে যখন নামিয়ে দিলো কিটু তখন সাড়ে নটা বাজে। দরজার বেল বাজাতেই দানো দরজা খুললো।

বললাম, মেমসাব কাঁহা ?

কিচেনমে। মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। রান্না করার কথা আমারই ছিলো। তার উপর ছেলের টেস্ট।

কিচেনে হাসি-হাসি মুখ করে ঢুকতে ঢুকতে ভ্যাবলার মতো বললাম, কোথায় গেলে ? ডার্লিং ?

টুলে বসে কী যেন রান্না করছিলো বউ। গ্যাসের উনুনে হাতা নেড়ে। ওর পায়ের কাছেই ছেলে বই খাতা নিয়ে বসেছিলো।

কোনো উত্তর দিলো না বৌ আমার।

আবারও বললাম, কী হলো ? উত্তর দিচ্ছো না কেনো ? বলেই, আমি ওর কাছে এগিয়ে গেলাম।

বৌ বললো আরও একটু কাছে এসো। কথা আছে।

স্ট্রাইকিং ডিস্ট্যান্সের মধ্যে আসতেই কড়া থেকে গরম হাতাটা তুলে বৌ আমার মাথায়, একেবারে ব্রহ্মতালুর উপরেই খটাং এক হাতার বাড়ি কষিয়ে দিলো। ঝন্ঝন্ করে উঠলো মেনস লিব-এর স্বপ্ন। বললো, কাল ছোটোর টেস্ট তা তুমি জানতে না ? আর আমি কি তোমার বাঁদী ? রান্নাটা করবার কথা কার ? মেয়েমানুষ হয়ে অফিসও করবো, ছেলের জন্ম দেবো, আবার রান্নাও করবো ?

মনে মনে আমি বললাম, গুলি মারি তোমার চাকরীর। মাইনে পাও আটশো টাকা তা তো চুল ছাঁটতে, "পেডিকিওর", "ফেসাল" করতে, বয়ফ্রেন্ডদের লাঞ্চ-ডিনার খাওয়াতে আর শাড়ি কিনতেই ফুঁকে দাও। আমার কোন ঘন্টার উপকারে লাগে তোমার চাকরী ?

ছোট, বড়দের মতো ইনকুইজিটিভ হয়ে চেয়ে রইলো। মায়ের হাতে বাপের নিগ্রহ ও দারুণ "রেলিশ" করে। ও আমারই মতো একটা মেরুদণ্ডহীন স্বামী হবে বড় হলে। জিন্। জিন্ কোথায় যাবে ? কোন্ মেয়ের ঠ্যাঙ্গানি খাবে কে জানে !

"গোসাঘর স্যাংচুয়ারী লিমিটেডের" সুন্দর, স্বাস্থ্যকর পুরুষালি পরিবেশের ছবিখানি আমার দু চোখের সামনে রাশ রাশ সর্ষেফুল হয়ে ফুটে উঠলো, গরম হাতার মোক্ষম বাড়ি খেয়ে।

রান্নাটা শেষ করো। আমি চান পর্যন্ত করিনি অফিস থেকে ফিরে। বলেই, বৌ টুল থেকে নেমে

পড়লো। বললো, জামাকাপড় ছেড়ে, হাত ধুয়ে আটা মেখে রুটি কখানি করে ফেলো। বারোখানা।

এটা কি ? বলেই কড়াইতে উঁকি মেরে দেখতে গেলাম।

বৌ আমার চুলের মুঠি ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললো ক্যাপসিকাম্ আর লংকার তরকারী। তোমার ঘিলু দিয়ে রাঁধো এবারে, যদি ঘিলু বলে কোনো বস্তু আদৌ থেকে থাকে।

ইতিমধ্যেই ফোনটা বাজলো।

বুকটা ধ্বক করে উঠলো। "প্রমীলা" ! নয়তো মিসেস ব্যানার্জী। উরি মাগো !

নাঃ। বাঁচা গেলো।

নমিতা বললো, কী খবর ব্রতীন ? ভুলেই গেলে নাকি ? লংটাইম নো সী। কবে ফিরেছো দিল্লী থেকে ? লেটস হ্যাভ লাঞ্চ টুগেদার অ্যাট ওয়ালডর্ফ টুমরো। দেখো.....

নমিতার বয়-ফ্রেন্ড। আহা ! স্ত্রীর বয়ফ্রেন্ড যে কতো ভালো, "প্রমীলা"র ইন্টারভ্যুর তুলনায়, তা মনে হলো।

বললাম, বাড়িতেই একদিন বলে দাও ব্রতীনকে খেতে।

বৌ বললো, সে আমি বুঝবো। বাড়িটা কি তোমার ?

চুপ করে হাতা নাড়তে লাগলাম। ক্যাপ্সিকাম আমার দু' চোখের বিষ। তা ছাড়া রোজই খেয়ে খেয়ে ঘেন্না ধরে গেছে। কিন্তু কিছুই করার নেই।

ভাবছিলাম কোনো শালা পুরুষই নিশ্চয়ই ডুবিয়ে দিলো মুখার্জীদের। আফটারঅল মীরজাফরের জাত তো ! কী চমৎকার একটা অর্গানাইজেশান গড়ে তুলেছিলো ওরা। আসলে সেই পুরুষের পেছনে কোনো মেয়েও নিশ্চয়ই ছিলো। পুরুষদের যাই-ই দুর্বলতা, তাই-ই ওদের বল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই একটা সময় আসছেই, যখন পৃথিবীর সমস্ত পুরুষদেরই ইজরায়েলেরই মতো এক নতুন ছোট্ট রাষ্ট্র গড়ে নিয়ে নারী-বিবর্জিত চমৎকার সব সুখের জীবন কাটাতে হবে। নইলে এই অত্যাচারী অবলা জাতের হাতে পুরুষজাতটাই অচিরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পুরুষই থাকবে, চরিত্রে নয়। নারীরা, কচুরীপানার মতো, তেলাপোকার মতো, তাদের ধ্বংস করা যাবে না।

ছোট হঠাৎ তার বড় মুখ তুলে আমাকে বললো, ড্যাডি ! জিওমেট্রিকাল প্রগ্রেশন কি ?

আমি চুপ করে চেয়ে রইলাম ওর দিকে।

মনে মনে বললাম, তোমার মায়ের বাড়। মেয়েদের বাড়।

ছবি : দেবাশিস দেব

মাসে মাত্র কয়েক মিনিট ব্যয় করুন... স্তন- ক্যানসার থেকে রক্ষা পান!

মাসে মাত্র কয়েক মিনিট ব্যয় করুন...
স্তন-ক্যানসার থেকে রক্ষা পান।
স্তন-ক্যানসার যে এক সাংঘাতিক গুপ্ত রোগ তা সব মহিলাই জানেন। এবার ঐ দুঃশ্চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্তি দিন। স্তন-ক্যানসার পুরোপুরি সারানো যায়। যে মহিলার ঐ রোগ একেবারে শুরুতেই ধরা পড়ে তিনি বাকী জীবনটা সুস্থ দেহে ও শান্তিতে কাটাতে পারেন।

সেরা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হ'ল—প্রতিমাসে নিজেকে নিজেই একবার . পরীক্ষা করে নিন মাত্র কয়েক মিনিট, যা আপনার জীবন বাঁচাবে!

দেখা করার জন্যে ফোন করুন:
বম্বে ২০২৯৯৪১-৪২/৪১২৫২৩৮ দিল্লী-৬১৭৬২৮
কলকাতা-২৬৭৭৬৪/২৬৭৯০৬ মাদ্রাজ-৩৯৪৪৪/২৯৮০০

দেখুন কি ভাবে: শুয়ে পড়ুন—প্রতিটি স্তন নিজের আঙুল দিয়ে আলতো করে টিপুন—স্তনের তলা থেকে বোঁটা পর্যান্ত, ছোট ছোট পাক দিয়ে। এবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়েও ঠিক ঐভাবে করুন। দেখুন—বুকে কোনো মাংসপিণ্ড বা শক্তগাঁট বা বুকের কোষ পুরু ইত্যাদি হয়েছে কিনা। দুটি বোঁটাতেই আলতো করে চিমটি কাটুন। কোনো রস দেখা গেলেই সত্বর আপনার ডাক্তারকে জানান।

কোনো ঝুঁকি নেবেন না। বছরে একবার সম্পূর্ণ ক্যানসার চেক- আপ করিয়ে নিন ইণ্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটির যেকোনো পরীক্ষা কেন্দ্রে (ডিটেকশন সেন্টার) চলে আসুন অথবা আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

এখন ক্যানসার-বীমা!
ইণ্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটি প্রবর্তন করলো **ভারতের একমাত্র** বীমা পলিসি, যা ক্যানসার রোগ ধরা বা তার চিকিৎসা বাবদ যাবতীয় খরচ যোগাবে। সামান্য কিছু টাকা দিন আর আপনি ও আপনার স্ত্রী/স্বামী দুজনেই ৪০,০০০ টাকার আওতায় থাকুন। আরো জিগ্যাসা থাকলে ফোন করুন।

daCunha/ICS/2/86 BN

পূর্ব-পশ্চিম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যৌবন—২৯

অতীনদের স্টাডি সার্কল মানিকতলার মোড় থেকে সরে গেছে আরও উত্তরে। গ্রে স্ট্রিট আর সার্কুলার রোডের মোড়ের কাছে। খান্না সিনেমার পাশে এক ফ্ল্যাট বাড়িতে একটি ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছে। বাড়িটাতে নানান জাতের পাঁচমিশেলি লোকেরা থাকে, কে কখন আসে যায়, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ঘরখানা সাবলেট করেছেন মানিকদার এক বন্ধু আবিদ আলি ; এই ভদ্রলোক এক সময় এ ডিভিশনে ফুটবল খেলতেন, এখন ছিট কাপড়ের ব্যবসা করেন। মানুষটি অকৃতদাব ও সুরসিক।

মানিকতলার ঘরটা ছাড়তে হলো কারণ পমপমের বাবা অশোক সেনগুপ্তর সঙ্গে ওদের অনেকেরই মতপার্থক্য দিন দিন বাড়ছিল। তাত্ত্বিক আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক প্রায়ই পর্যবসিত হচ্ছিল তিক্ততায়! ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হবার পরেও কোনো কোনো নেতা দু নৌকোয় পা দিয়ে রাখতে চাইছিলেন। অতীনদের গুরু মানিক ভট্টাচার্যের মতে অশোকদা সেই রকমই একজন। তিনি মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিকেও পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির দিকে নিয়ে যেতে চান বলে মানিকদার দারুণ রাগ।

পমপমদের বাড়ি ছেড়ে আসা হলেও পমপম এই স্টাডি সার্কল ছাড়েনি। পমপমের মা নেই, যদিও তাদের বাড়িতে মাসি-পিসির সংখ্যা অনেক। ওদের বর্ধমানের গ্রামের বাড়ি থেকে প্রায়ই কেউ না কেউ এসে এখানে থেকে যায়, কিন্তু পমপমের সঙ্গে বাড়ির সম্পর্ক খুব কম। রোগা, লম্বাটে চেহারা পমপমের, চোখ দুটো যেন বেশি উজ্জ্বল, সে কক্ষনো সাজগোজের ধার ধারে না, তার কাঁধে সব সময় একটা শান্তিনিকেতনী কাপড়ের ব্যাগ ঝোলে। একদিন কংগ্রেসী ছেলেদের গুণ্ডামি প্রসঙ্গে আলোচনার সময় পমপম খুব ক্যাজুয়ালি সেই ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা রিভলভার বার করে বলেছিল, আমার সঙ্গে ওরা কেউ বাঁদরামি করতে এলে আমি সোজা কপাল ফুটো করে দেবো।

পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল যে ওটা খেলনা পিস্তল। আবার এ খবরও জানা গিয়েছিল যে পমপমদের মেমারির বাড়িতে অনেকদিন ধরেই আসল বন্দুক আছে এবং পমপমের দাদু নিজে তাঁর প্রিয় নাতনীকে বন্দুক ছোঁড়া শিখিয়েছিলেন। পমপম সহজ মেয়ে নয়। সে পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে এম এ পড়ছে, আবার সে গাছপালাও ভালো চেনে। এক বিঘে জমিতে কতটা সার, কতটা জল, কতদিনের মজুরি দিলে কতখানি ফসল পাওয়া যায়, সে বিষয়ে স্টাডি সার্কেলের সদস্যদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে বেশি জানে। পমপম তার বাবার চেয়ে মানিকদার বেশি ভক্ত মনে হয়! পমপমের একটাই দোষ, সে প্রায় হাসেই না বলতে গেলে। তার ঠোঁটে হাসি দেখা অতি দুর্লভ ঘটনা। অতীন একদিন তাকে বলেছিল, এই, তুই জানিস না, গম্ভীর মুখে ঠোঁট দুটো থাকে সোজা, আর হাসলে ঠোঁটে একটা ঢেউ খেলে যায়। ঢেউ খেলানো ঠোঁটেই মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়!

এর উত্তরে ঠোঁটে কোনো ঢেউ না খেলিয়েই পমপম বলেছিল, আসুক, আগে সে রকম দিন আসুক, তখন আনন্দ করে হাসবো।

পমপম ছাড়া আরো দুটি মেয়ে আসে স্টাডি সার্কেলে, অনীতা আর শুভ্রা, কিন্তু তারা আবার বড্ডই মেয়ে মেয়ে, কথা বলতেই চায় না, কথা বলার সময় বারবার আঁচল ঠিক করে।

অতীনকে এখানে প্রথম এনেছিল তার বন্ধু কৌশিক। ওরা সহপাঠী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও দু' জনের স্বভাবে বেশ বৈপরীত্য আছে। কৌশিকের মুখে চোখে একটা সরল আদর্শবাদের আলো জ্বলে, সে এই পৃথিবীটাকে বদলাতে চায়। কৌশিকের ব্যক্তিগত চরিত্রও খুব নির্মল, তার বিশ্বাসের সঙ্গে তার জীবনযাত্রার কোনো অমিল নেই। কৌশিক খারাপ কথা তো বলেই না, তার মুখ দিয়ে সামান্য একটা মিথ্যে কথা বার করাও প্রায় অসম্ভব। বন্ধুরা অনেকবার এরকম চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে।

সেই তুলনায় অতীনের কোনো মূল্যবোধেই স্থির, দৃঢ় বিশ্বাস নেই, আদর্শবাদীদের বক্তৃতাকে তার মনে হয় বড় বড় কথা, যে কোনো আলোচনাতেই উপদেশের গন্ধ পেলে সে নাক কুঁচকোয়, সে যে-কোনো মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে ভণ্ডামির চিহ্ন আছে কি না তা খোঁজার চেষ্টা করে। এই কারণেই সমাজের অনেক শ্রদ্ধেয় মানুষ তার চোখে অবজ্ঞার যোগ্য। এবং এক মাত্র এই কারণেই সে কৌশিককে ভালোবাসে।

কৌশিকের কথায় সে প্রথম এই স্টাডি সার্কেলে এসে যোগ দিয়েছিল।

মিষ্টি-মধুর নতুনত্বের আনন্দের মজা চাখুন!

আস্তে আস্তে মানিকদাকেও তার পছন্দ হয়। মানিকদার সব মতামত সে মেনে নিতে পারে না, কিন্তু সে বুঝেছে যে মানুষটা খাঁটি। মানিকদা ইংরিজির ভালো ছাত্র ছিলেন, কিন্তু চাকরি বাকরির চেষ্টা করেন নি, পার্টিতেও উঁচু পদের দিকে ঝোঁক নেই। তিনি অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশে তাদের মধ্য থেকে বেছে বেছে ভালো পার্টি ওয়ার্কার তৈরি করার কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেছেন।

এই মানিকদার মধ্যে অতীন যেন তার দাদার খানিকটা মিল খুঁজে পায়। চেহারা বা ব্যবহারে কোনো মিল নেই, শুধু কথা বলার ধরনটা যেন কিছুটা পিকলুর মতন। অতীনের ধারণা, তার দাদা বেঁচে থাকলে সাধারণ ছেলেদের মতন চাকরি বাকরির দিকে না ঝুঁকে এই মানিকদারই মতন কোনো একটা আদর্শ নিয়ে থাকতো।

প্রথম দিকে খানিকটা কৌতূহল আর খানিকটা অবজ্ঞার ভাব নিয়ে এলেও অতীন এখন এই স্টাডি সার্কেলের সঙ্গে অনেকটা জড়িয়ে গেছে। ইউনিভারসিটিতে ইলেকশানের সময় কংগ্রেসী ছেলেদের সঙ্গে মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে অতীন, মাথায় চোট লেগেছিল, তারপর থেকে তার জেদ আরও বেড়ে যায়।

এখন থেকে বাড়ি ফিরতে প্রায়ই বেশ রাত হয়ে যায় অতীনের। আলোচনা ও তর্কবিতর্ক শেষ হতেই চায় না, অতীনেরও এই আড্ডা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না। এক একদিন তেলেঙ্গানা ও কাকদ্বীপের তেভাগা আন্দোলনের কাহিনী শুরু হয়, আবিদ আলি সাহেবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে কাকদ্বীপের আন্দোলনের, কংসারি হালদার নামে একজন বিপ্লবী নেতা সম্পর্কে এমন সব গল্প বলেন তিনি যা শুনতে শুনতে অতীনদের রোমাঞ্চ হয় শরীরে।

রাত সাড়ে নটা, দশটার পরেও খান্না সিনেমা সংলগ্ন এই অঞ্চলটি মানুষ জনের ভিড়ে বেশ রমরম থাকে। কাছেই একটি বৃহৎ বাজার, রাস্তার ওপাশে আশুতোষ অয়েল মিলের গা ঘেঁষে লম্বা বেশ্যা পল্লী। ট্রাম লাইন থেকে মাত্র দু' তিন হাত দূরে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে মুখে ফটফটে শাদা রং মাখা নানা বয়েসী স্ত্রীলোকেরা।

স্টাডি সার্কল থেকে বেরিয়ে অতীন আর কৌশিক গ্রে স্ট্রিট ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে হাতিবাগানের মোড়ের কাছে। অন্য অনেকেই উত্তর কলকাতায় থাকে, শুধু ওদের দুজনের বাড়ি সুদূর দক্ষিণে। এখান থেকে ওরা টু-বি বাস ধরে, তাতে এক টানা চলে যাওয়া যায়।

এক রাতে প্রায় খালি একটা দোতলা বাসে উঠতে গিয়েও কৌশিক অতীনের হাত চেপে ধরে বললো, এটা ছেড়ে দে, পরের বাসে যাবো।

রাতের দিকে বাসের সংখ্যা কমে আসে, পরের বাসের জন্য অন্তত মিনিট পনেরো অপেক্ষা করতে হবে, অতীন ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার?

সেই স্টপ থেকে তিন চারজন লোক ওঠার পর বাসটা ছেড়ে দিয়েছে। পা-দানিতে দাঁড়ানো ধুতি ও শাদা হাফ শার্ট পরা একটা লোক মুখ ঘুরিয়ে বিস্মিতভাবে কৌশিক ও অতীনকে দেখলো। তার মুখের ভাবটা এমন যেন সে নিজে বাসে উঠে পড়লেও তার অন্য সঙ্গীরা উঠতে পারে নি, রয়ে গেল।

কৌশিক বললো, ঐ লোকটাকে দেখলি? ও রোজ খান্না সিনেমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা বেরুনর পর এক একদিন আমাদের এক একজনকে বাড়ি পর্যন্ত ফলো করে!

অতীন বললো, যাঃ!

কৌশিক বললো, তুই লক্ষ্য করিস নি? কাল দেখিস। তপন আর উৎপলকে দু'তিনদিন একজন ধুতি আর শার্ট পরা লোক ফলো করে বাড়ি পর্যন্ত গেছে। আমাদের বাড়ির ঠিকানা জেনে রাখছে।

—লোকটা কে?

—পুলিসের ইনফর্মার হতে পারে। সি আই এ-র কোনো দালাল হতে পারে। আমাদের ওপর নজর রাখছে। কংগ্রেস গভর্নমেন্ট জ্যোতিবাবু প্রমোদ দাশগুপ্তকে অ্যারেস্ট করেছে, এরপর পার্টির অনেক ওয়ার্কারকে রাউন্ড আপ করবে বলে শোনা যাচ্ছে।

অতীনের ঠিক বিশ্বাস হয় না। সে বা কৌশিক কেউই পার্টির কার্ড হোল্ডার নয়। মানিকদার কাছে তারা পার্টির মেম্বারশীপ পাবার জন্য আবেদন জানিয়েছিল, মানিকদা বলেছেন, এখনও সময় হয়নি। তবু পুলিস

তাদের এতখানি গুরুত্ব দেবে? তাদের স্টাডি সার্কল তো গোপন কিছু ব্যাপার নয়, প্রায়ই তাতে নতুন ছেলেমেয়েরা যোগ দিতে আসে। তা ছাড়া, শুধু ঘরের মধ্যে তো নয়, এক একদিন কফি হাউস থেকে বেরিয়ে কলেজ স্কোয়ারে ঘাসের ওপর বসে আড্ডা মারে। সেখানেও তো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে এইসব বিষয়েই কথা হয়।

শুভ্রা পরের বাসটা ধরলো এবং পরবর্তী স্টপে সেই ধুতি-শার্ট পরা লোকটা উঠলো। সে নেমে গিয়ে অতীনদের জন্যই অপেক্ষা করছিল? কৌশিক অতীনের গায়ে ঠেলা দিয়ে চুপিচুপি বললে, দেখলি? আমরা

এসপ্লানেডে নেমে পড়ে একটু ঘুরে ফিরে তারপর অন্য বাস বা ট্রাম ধরবো।

অতীন ভালো করে লক্ষ্য করলো লোকটাকে। বেশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারা মাথায় চুল ছোট করে ছাঁটা। বাসের ভেতরে ঢোকেনি, পাদানিতে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে, অতীনদের দেখছে না, চেয়ে আছে রাস্তার দিকে।

অতীন কৌশিককে বললো, চুপ করে বসে থাক। আমরা একসঙ্গে কালীঘাটে নামবো। ঐ লোকটাও যদি আমাদের সঙ্গে নামে আমি ওর কলার চেপে ধরবো। যদি পুলিস হয়, বলবো ওয়ারেন্ট দেখাও! যদি তা দেখাতে না পারে রামধোলাই দেবো শালাকে। আমার সঙ্গে চালাকি না!

কৌশিক বললো, চুপ কর, অতীন!

অতীন বললো, কেন, ভয় কিসের রে! কনস্টিটিউশনে ফ্রিডম অফ স্পীচের গ্যারান্টি দিয়েছে, তাও পেছনে পুলিস লাগবে? মামদোবাজি নাকি?

অতীন আর কৌশিক বসেছে একতলায়, লোকটা গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে রইলো, ভেতরে এলো না, বৌবাজার মোড়ের কাছে হঠাৎ নেমে গেল।

অতীন কৌশিককে কনুই দিয়ে খোঁচা মারতেই সে বললো, ও বুঝতে পেরে গেছে যে আমরা ওকে চিনে ফেলেছি। কাল থেকে অন্য লোক লাগবে।

অতীন বললো, তাকেও আমরা চিনে ফেলবো।

—শোন অতীন, তোকে একটা কথা বলবো? আমিই তো তোকে স্টাডি সার্কলে এনেছিলুম, আমিই রিকোয়েস্ট করছি, তুই এখন কিছুদিন এখানে আসা বন্ধ করে দে।

—কেন?

—তোর এবার ফাইনাল পরীক্ষা। যদি সত্যিই পুলিস ধরে টরে

—তার মানে। ফাইনাল পরীক্ষা আমার একার?

—আমি এবার ড্রপ করছি। আমার প্রিপারেশন ভালো হয়নি, আমি সামনের বছর দেবো।

কৌশিকের একথার গুরুত্ব দিল না অতীন। সে বললো, ড্রপ করবি মানে? আমি ঘাড় ধরে তোকে পরীক্ষায় বসাবো। তুই ড্রপ করলেও আমি শান্তনু আর নির্মলকে ডিঙিয়ে টপ পজিশনে পৌঁছোতে পারবো না।

—আমি সিরিয়াসলি বলছি, অতীন। হঠাৎ যদি আমাদের জেলে ভরে দেয়

—জেলের ভেতরটা আমার একবার ঘুরে দেখে আসার ইচ্ছে আছে। জেলে বসেও তো পরীক্ষা দেওয়া যায়।

—আমাদের পলিটিক্যাল প্রিজনারদের স্টেটাস দেবে না। বিনা বিচারে আটক করে চোর ডাকাতদের সঙ্গে রাখবে।

—ধ্যাৎ! তুই বেশি রোমান্টিসাইজ করছিস!

পরদিন সেই ধুতি-হাফশার্ট পরা লোকটিকে খান্না সিনেমার আশেপাশে আর দেখা গেল না। তার বদলে আর কেউ এসেছে কিনা সেদিকে নজর রাখলো অতীনরা। সেরকম চেনা গেল না কারুকে। যদিও, মানিকদারও ধারণা, তাদের স্টাডি সার্কলের প্রতি পুলিসের নজর পড়েছে।

অতীন একদিন অলিকে নিয়ে এলো এখানে। সপ্তাহে অন্তত একদিনও দেখা না হলে অলি অভিমান করে। অতীন সময় পায় না। সেইজন্যই সে ঠিক করলো, অলিকে সে সপ্তাহে একদিন দুদিন অন্তত স্টাডি সার্কলেই নিয়ে আসবে। কলেজ যাওয়া ছাড়া অলি একা একা বাইরে কোথাও বেরোয় না। তাই বাইরের জগৎটা চেনে না। পমপমের মতন মেয়ের সঙ্গে কয়েকদিন মিশলে অলি অনেক কিছু শিখবে।

প্রথম দিন অলি আগাগোড়া প্রায় চুপ করে বসে রইলো। পমপম তার সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করেও বেশি কথা বলতে পারলো না। সেদিন একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়েও অলিকে যখন বাড়ি পৌঁছে দিল অতীন, তখন রাত সাড়ে নটা। এত দেরিতে অলি কখনো বাড়ি ফেরে না। অতীন তাকে কলেজ থেকে ফেরার পথে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, অলি বাড়িতে খবর দেবারও সময় পায়নি। বাড়ির সবাই উৎকণ্ঠিত, বিমানবিহারী বাইরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, শেষ পর্যন্ত মেয়েকে বাবলুর সঙ্গে ফিরতে দেখে তিনি অনেকটা স্বস্তি বোধ করলেন।

অতীন জানে, অলিকে তার বাবা-মা তুলোয় মোড়া বাক্সে আদরে যত্নে রাখতে চান। কুমারী মেয়ের সাড়ে নটায় বাড়ি ফেরা ওঁদের পক্ষে অকল্পনীয়। কিন্তু ওঁদের খানিকটা কালচার শক দেওয়া দরকার। ছেলেরা দেরি করে ফিরতে পারে, আর মেয়েরা একটু দেরি করলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

দুদিন বাদে অতীন অলিকে জিজ্ঞেস করলো, কীরে, তুই আবার যাবি আমার সঙ্গে ওখানে?

অলি বিনা দ্বিধায় বললো, হ্যাঁ।

সেদিন বাড়িতে অলি বকুনি খেয়েছে কিনা তা কিছুতেই স্বীকার করলো না। অলি তার বাবা-মায়ের কাছে মিথ্যে কথা বলেনি, বাবলুদার সঙ্গে সে কোথায় গিয়েছিল তা জানিয়েছে। তার বাবা মায়ের কোনো আপত্তি নেই। তবে, যেদিন সে ওখানে যাবে, সেদিন বাড়িতে জানিয়ে যেতে হবে।

অতীন দুষ্টুমি করে জিজ্ঞেস করলো, আর স্টাডি সার্কেলে যাবার নাম করে আমি যদি তোকে অন্য কোথাও নিয়ে যাই?

অলি বললো, অন্য কোথাও মানে?

অতীন বললো, এই ধর, ডায়মন্ড হারবার। সেখানে নদীর ধারে বালিতে দুজন শুয়ে থাকবো।

অলি অতীনের দিকে গাঢ় ভাবে কয়েক পলক চেয়ে থেকে বললো, বাবলুদা, তুমি কোনোদিন আমায় ডায়মন্ডহারবার নিয়ে যাবে না তা আমি ভালোই জানি। তুমি যে সবসময় ব্যস্ত। আমি ডায়মন্ডহারবারে বাড়ির লোকদের সঙ্গে দুতিনবার গেছি। তুমি নিশ্চয়ই কখনো যাওনি। তুমি যদি চাও, আমি তোমায় একদিন ট্রেনে করে নিয়ে যেতে পারি সেখানে। কিন্তু সেখানে নদীর ধারে বালি নেই, শুধু কাদা, শুয়ে থাকা যায় না।

অতীন হেসে বললো, ঠিক আছে, তুই একদিন আমাকে নিয়ে যাস তো ডায়মন্ডহারবার। ওখান থেকে কাকদ্বীপটা দেখে আসবো।

দুতিন দিন স্টাডি সার্কলে এসেও অলির ঠিক পছন্দ হলো না জায়গাটা। যেসব কথা সে বইতে আগেই পড়েছে, সেইসব কথাই অনেকে এখানে এমন ভাবে গলা ফুলিয়ে জোর দিয়ে বলে, যেন নতুন কথা। এরা কি বই পড়ে না? পমপম নামের মেয়েটি গ্রাম জীবনের সাহিত্যের আলোচনা করতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তুলনা করে বিভূতিভূষণ আর তারাশঙ্করকে খুব গালাগালি দিল। অথচ অলির এই তিনজনের লেখাই ভালো লাগে। পমপম এককথায় আরণ্যক উপন্যাসটিকে খারিজ করে দিল, অলির সন্দেহ হলো পমপম বোধহয় আরণ্যক পড়েইনি। বাবলুদা এইসব বই পড়ে না, অলি তা জানে। কৌশিকও কি পড়ে না? মানিকদা বললেন চীনা লেখক লু সুনের লেখা পড়তে, অলি লু সুনের কয়েকটি গল্পের অনুবাদ আগেই পড়েছে কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারলো না সেকথা!

তারপর এই শনিবারের রাতটা অলির বহুকাল মনে থাকবে।

স্টাডি সার্কল থেকে বেরিয়েই সে রাতে ওরা একটা বিরাট হাঙ্গামার মধ্যে পড়ে গেল। সার্কুলার রোডের দুপাশে কয়েক'শ লোক জড়ো হয়ে ইঁট ছুঁড়ছে, দুম দাম করে ফাটছে বোমা। কী নিয়ে যে গণ্ডগোল তা বোঝা যাচ্ছে না।

অলির হাত শক্ত করে চেপে ধরে বাবলু বললো তুই ঘাবড়াসনি, এসব এ-পাড়ার গুণ্ডা আর মাতালদের ব্যাপার, এরকম প্রায়ই হয়। কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের দিকটায় গেলেই ফাঁকা হয়ে যাবে।

কিন্তু গ্রে স্ট্রিট ধরে বেশিদূর এগোনো গেল না, স্টার থিয়েটারের পাশের গলি দিয়ে একদল লোক সোডার বোতল ছুঁড়তে ছুঁড়তে দৌড়ে এলো এদিকেই। কৌশিক চেঁচিয়ে বললো, পেছনে পুলিসের গাড়ি। ওরা আমাদের আগে ধরবে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওরা ছিটকে গেল আশেপাশের গলিতে। অতীন অলির হাত ছাড়েনি। কিন্তু কৌশিক চলে গেল অন্যদিকে। পুলিস গুলি চালাতে শুরু করেছে।

বছর দেড়েক আগে কফি হাউস থেকে বেরিয়ে অলি ঠিক এই রকম একটা গণ্ডগোলের মধ্যে পড়ে একা হয়ে গিয়েছিল, সেদিন সে বাড়ি পৌঁছেছিল অতি কষ্টে, দু চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছিল কান্না। আজ বাবলুদা তার সঙ্গে রয়েছে, আজ তার একটুও ভয় করছে না। আজ সারারাত ধরে এরকম চললেও ক্ষতি নেই।

একটা গাড়ি-বারান্দার তলায় ওরা একটুখানি দম নেবার জন্য দাঁড়াতেই ওপর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো, কারফিউ! কারফিউ ডিক্লেয়ার করেছে! *(ক্রমশ)*

ছবি : অনুপ রায়

ফর্ক লক—অধিক নিরাপত্তার জন্যে

অ্যাক্রিলিক পেণ্ট—বহুদিন ঝকঝকে থাকার জন্যে

সাদা সাইডওয়াল টায়ার—দারুণভাবে আকর্ষণীয়

রিফ্লেক্টর প্যাড্‌ল—রাতে নিরাপদে চলাচলের জন্যে

নিজেই দেখে নিন ঃ

এখন বি.এস.এ ডিলাক্স-এ যে ৪টি অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা অন্য আর কোনো সাইকেলেই খুঁজে পাবেন না।

১। নতুন ফর্ক লক
সাইকেল লক করার এক একেবারে নতুন উপায়।

২। দেখতে ঝলমলে উজ্জ্বল ক'রে তোলার জন্যে অ্যাক্রিলিক পেণ্ট।

৩। তকতকে মসৃণ সাদা সাইড-ওয়াল টায়ার

৪। রাতে নিরাপদে সফর করার জন্যে অনুপম রিফ্লেক্টর প্যাড্‌ল

তার সঙ্গে
- ক্রোমপ্লেটেড স্পোক্‌স
- ব্রুক স্যাড্‌ল
- ডানলপ টায়ার ও রিম
- উন্নত এক ব্রেকিং সিস্টেম

নতুন বিএসএ ডিলাক্স

এর চেয়েও কম কি নিতে চাইবেন?

BSA Deluxe

সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় ভারতে এসেছিলেন যশস্বী রুশ বেহালাবাদক ইগর অয়েস্ত্রাক। প্রথমবার এসেছিলেন ১৯৬০ সালে। দ্বিতীয়বার ১৯৭৩-এ। অর্থাৎ পাক্কা তেরো বছর পরে এটা ছিল তাঁর তৃতীয় ভারত সফর। ইগরের খ্যাতি, বেহালা-জগতের কল্পপুরুষ তাঁর পিতা ডেভিড অয়েস্ত্রাকের মতই। কি পুবে, কি পশ্চিমে। অনেকের মতে জীবিত বেহালাবাদকদের মধ্যে ইগরই নাকি শ্রেষ্ঠ।

কেবল কথা বলায় তাঁর প্রবল আপত্তি। দিল্লির সম্রাট হোটেলের ২২৬ নম্বর কামরায় আমরা যখন তাঁর সাক্ষাৎকারপ্রার্থী হই একটু যেন লজ্জিতই দেখাচ্ছিল ইগরকে। বললেন, 'কথা বলা তো আমার কাজ নয়। আমার কাজ বেহালা বাজানো। তাছাড়া আমার যা কিছু কথা সবই তো ওই বেহালা বলে।'

অনেক সাধ্য-সাধনার পর কথা বলতে যদি বা ইগরকে রাজি করানো গেল, তাঁর প্রিয় বেহালাটি হাতে ছবি তুলতে কিছুতেই রাজি করানো গেল না। অনুরোধের উত্তরে তাঁর স্পষ্ট জবাব :'আই টাচ মাই ভায়োলিন ওনলি হোয়েন আই ফিল লাইক টাচিং। আদারওয়াইজ নট।' কিছুতেই নয়।

প্রশ্ন : আপনার পিতা ডেভিড অয়েস্ত্রাক বেহালা-জগতের কল্প-পুরুষ। আপনার মুখে আপনার বাবার কথা শুনি।

ইগর : বাবার কথা আমি আর কী বলব ? অনেকে বলেন, হি ইজ দ্য গ্রেটেস্ট অব অল টাইমস। আমি সেকথা বলি না। আমি বলি, হি ইজ ওয়ান অব দ্য গ্রেটেস্ট।

বলাই বাহুল্য, বেহালার জগতে আমি যে আজ প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছি, তার পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান আমার বাবার। হি ওয়াজ মাই ফ্রেন্ড, গাইড অ্যাণ্ড ফিলোজফার। বলতে পারেন, একেবারে জ্ঞান হওয়া থেকেই বাবা ছিলেন আমার শিক্ষক। আমি তাঁর ছাত্র। দিনের মধ্যে আঠারো-কুড়ি ঘণ্টা বসে বসে আমি তাঁর কাছে তালিম নিয়েছি। পরে একটানা সাতাশ বছর পিতা-পুত্র একসঙ্গে বাজিয়েছি অসংখ্য কনসার্টে। বাবার অনুপ্রেরণা প্রতি ধাপে ধাপে আমাকে এগিয়ে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

আসলে আমাদের পরিবারটাই বেহালা বাজিয়েদের পরিবার। আমার ঠাকুরদাও বেহালা বাজাতেন। তবে পেশাদার ছিলেন না। বাবাই প্রথম বেহালা বাজানোকে একমাত্র পেশা বলে গ্রহণ করেন। আমিও সেই পেশা নিয়েছি। আমার ছেলেও নিয়েছে। আমি এখন দিল্লিতে বাজাচ্ছি। আর আমার ছেলে বাজাচ্ছে ফিলাডেলফিয়ায়। কিছুদিন পরেই আমরা দুজনে একসঙ্গে বাজাব পূর্ব বার্লিনে। নাউ ফর থ্রি জেনারেশনস উই আর প্রফেশনাল ভায়োলিনিস্ট। তবে মজার কথা কি জানেন, খুব ছোট বেলায় আমার বেহালা বাজাতে একদম ইচ্ছে করত না। আই ওয়াজ এ লেজি চাইল্ড। বাবার পাশে বসে বেহালা শুনতে ভাল লাগত বটে তবে ঘন্টার পর ঘণ্টা রেওয়াজ করতে আমার ভাল লাগত না। তবু বাবা তিন বছর লেগে ছিলেন। পরে তাঁর অলস ছেলেকে দিয়ে বেহালা বাজানো সম্ভব হবে না দেখে 'পিয়ানো' শিখতে বলেছিলেন। বেহালা ছেড়ে বছর দুয়েক পিয়ানোই শিখেছিলাম। পরে অবশ্য আবার বেহালায় ফিরে আসি। এখানে বলে রাখি আমার স্ত্রী নাতাশা খুব ভাল

মজার কথা কি জানেন, খুব ছোটবেলায় বেহালা বাজাতে আমার একদম ইচ্ছে করত না। আই ওয়াজ এ লেজি চাইল্ড। বাবার পাশে বসে বেহালা শুনতে ভাল লাগত বটে, তবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রেওয়াজ করতে আমার ভাল লাগত না। পরে তাঁর অলস ছেলেকে দিয়ে বেহালা বাজানো সম্ভব হবে না দেখে পিয়ানো শিখতে বলেছিলেন। বেহালা ছেড়ে বছর দুয়েক পিয়ানোই শিখেছিলাম।

পিয়ানো বাজান। আমি যেখানেই বেহালা বাজাই না কেন, পিয়ানোয় অবধারিতভাবে সঙ্গ দেবেন আমার স্ত্রী। এই মুহূর্তে অবশ্য তিনি ছেলের সঙ্গে আছেন। খুব ইচ্ছে ছিল আমার সঙ্গে ভারতে আসার। কিন্তু এখানে যা গরম। ইট ডাস নট স্যুট হার।

প্রশ্ন : পিয়ানো থেকে বেহালায় ফিরে এলেন কীভাবে ?

ইগর : তাহলে প্রেক্ষাপটটা ভাল করে বুঝিয়ে বলতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আমার বাবা সপরিবার মস্কো ছেড়ে উরাল পাহাড়ে Sverdlovsk নামের একটা ছোট শহরে চলে গিয়েছিলেন। আমাদের মত আরও অনেক রুশ শিল্পী পরিবার তখন নিরাপত্তার খোঁজে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেখানে। আমার বয়স তখন নেহাতই সামান্য। বড় জোর বারো-তেরো। এখনও ভাসা-ভাসা মনে আছে যুদ্ধের সেই অনিশ্চিত দিনগুলোতেও শিল্পীরা মনের আনন্দে গান বাজনা করতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত পিয়ানো বাদক এমিল গিলেস, বিখ্যাত বেহালা বাদক এলিজাবেথ গিলেস। আর ছিলেন স্টোলিয়ারস্কি। প্রধানত তিনিই এই অলস শিশুকে আবার বেহালায় ফিরে যেতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

স্টোলিয়ারস্কি একই সঙ্গে বাবার এবং আমার শিক্ষক। যদিও আমি তাঁর কাছে শিখেছি মাত্র কয়েকমাস। শিক্ষক হিসেবে একটা মস্ত বড় গুণ ছিল ওঁর। কারুর ভিতরে প্রতিভা দেখলে স্টোলিয়ারস্কি সেটা টেনে বার করে আনতে পারতেন। তার জন্য যত ভাবে এবং যত রকম সাহায্যের দরকার করতেন। উনি সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলেন, আলসেমি কাটিয়ে উঠতে পারলে আমিও একদিন ভাল বেহালা বাজাতে পারব। তাই তিনি একরকম জোর করে পিয়ানো ছাড়িয়ে আমাকে বেহালা ধরিয়েছিলেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমি একটু দেরিতেই বেহালা শেখা শুরু করেছিলাম। 'নরম্যালি মোস্ট ভায়োলিন প্লেয়ার্স স্টার্ট সিরিয়াস ট্রেনিং অ্যাট দ্য এজ অব সিক্স।'

প্রশ্ন : বাবার ছায়ায় বড় হয়ে ওঠা সত্ত্বেও আপনি নিজস্ব একটি স্টাইল গড়ে তুলতে পেরেছেন। বাবাকে অনুসরণ বা অনুকরণ করেননি। এটা সম্ভব হোল কী করে ?

ইগর : যিনি প্রকৃত শিল্পী, তিনি কখনই কাউকে অনুসরণ করেন না। তা সেই শিক্ষক বাবাই হোন আর গুরুই হোন। নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা, পারলে গুরুকে উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়াই প্রকৃত শিল্পীর লক্ষ্য হওয়া উচিত।

বাবার আর আমার স্টাইলেও তফাৎ আছে। হোয়াইল এ কাইণ্ড অব রোমান্টিক লিরিসিজম মার্কড মাই ফাদার্স স্টাইল, ইউ ক্যান সে, মাইন হ্যাজ বিন এ মোর ফোরসফুল ওয়ান। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে আমার পক্ষে স্টাইলে স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আসা খুব সহজ কাজ ছিল না। অনেক সাধ্যসাধনা করতে হয়েছে তার জন্য। হাজার হোক ডেভিড অয়েস্ত্রাকের মত একজন মহান শিল্পীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আমি বড় হয়েছি।

প্রশ্ন : দুনিয়ার অনেক খ্যাতনামা শিল্পীর সঙ্গে আপনি একই মঞ্চে বাজিয়েছেন। যেমন ধরুন পাবলো কাসালস কিংবা অটো ক্লেমপারার কিংবা জুবিন মেটা। এঁদের সম্পর্কে কিছু বলবেন ?

ইগর : ফ্রান্সের প্রাদেস ফেস্টিভালে আমি পাবলো কাসালস-এর সঙ্গে বাজিয়েছিলাম। সেটা ১৯৬৫ সালের কথা। পাবলোর বয়স তখন ৮৮। পাক্কা দুবছর

ওঁকে খুব কাছাকাছি থেকে দেখেছি আমি। বলতে পারেন ওঁর সান্নিধ্য আমার শিল্পী জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য মাইল-ফলক। ওঁর কাছ থেকেও আমি অনেক কিছু শিখেছি। দেখেছি ওই পরিণত বয়সেও বাজনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলি সম্পর্কেও তিনি খুব সচেতন থাকতেন। পাবলো কাসালস ইজ ওয়ান অব দ্য গ্রেটেস্ট মিউজিসিয়ান আই হ্যাভ এভার মেট।
আমার চল্লিশ বছরের শিল্পী-জীবনে দেশে-বিদেশে আমি এছাড়াও অনেক যশস্বী শিল্পীর সঙ্গে বাজিয়েছি। যেমন ধরুন জার্মান কণ্ডাক্টর অটো ক্লেমপারার, লরিন মাজেল, ফ্রিটজ রাইনার, কার্লো মারিয়ে জুলিইনে, জুবিন মেটা। অল অব দেম আর গ্রেট কণ্ডাকটরস। এঁদের মধ্যে আবার জুবিন আমার খুব প্রিয় কণ্ডাক্টর। জুবিন আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দুজনে একই মঞ্চ থেকে আমরা বহুবার বাজিয়েছি। মস্কোর মন্ট্রিয়লে এবং লস অ্যাঞ্জেলসে। জুবিন হ্যাজ বিন মাই মোস্ট ফেবারিট অ্যান্ড সেনসিটিভ পার্টনার। এ চার্মিং পার্সন টু।
১৯৬১-তে মন্ট্রিয়ল সিম্ফনি নিয়ে জুবিন যখন মস্কোয় আসেন, তখনই ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ। সেই থেকে গত ২৫ বছর ধরে আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থেকে আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

প্রশ্ন : অদূর ভবিষ্যতে জুবিনের সঙ্গে অনুষ্ঠান করার কোনও পরিকল্পনা আপনার আছে কি ?
ইগর : না, এই মুহূর্তে নেই। তবে যখনই সুযোগ আসুক আমি তা সানন্দে গ্রহণ করব।
প্রশ্ন : ইয়ুদি মেনুহিনের নাম কিন্তু আপনি উচ্চারণ করলেন না। ওঁর বেহালা-বাদন সম্পর্কে আপনার কী অভিমত ?
ইগর : বেহালা বাজানোর কথা বলব অথচ মেনুহিনের নাম করব না, তাও আবার হয় না কি ? সত্যি কথা বলতে কি, পাবলো কাসালসের মত আমার শিল্পী জীবনে মেনুহিনেরও একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে।
সেটা ১৯৪৫-৪৬ সালের কথা। আমি তখন খুব মন দিয়ে বেহালা বাজাচ্ছি। এত মন দিয়ে বাজাচ্ছি যে রাশিয়ায় পর পর কয়েকটি প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়ে গেলাম। প্রশ্ন উঠতে পারে, ঠিক ও সময়েই কেন আমি মন-প্রাণ ঢেলে বেহালা বাজাতে শুরু করলাম। করলাম এই কারণে যে সেটা ছিল পৃথিবী নামক এই গ্রহে আমরা যারা বাস করি, তাদের সকলের কাছে খুব আনন্দের সময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। হিটলারের জার্মানি হয়েছে পদানত। দোজ ওয়ার দ্য গ্লোরিয়াস ডেজ।
এবং তখনই দেশে-দেশে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সূত্রপাত। মেনুহিনও তখন এসেছিলেন রাশিয়ায়। তখন তাঁর বয়স আটাশ। আমাদের মত ক্ষুদে বেহালা বাদকদের কাছে সেটা ছিল দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা। পরে অবশ্য মেনুহিনের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। রাশিয়ায় এসেই মেনুহিন আমার বাবার খোঁজ করেন। ওঁদের দুজনের মধ্যে দারুণ বন্ধুত্বও হয়ে যায়। সেই বন্ধুত্ব প্রায় তিরিশ বছর অটুট ছিল।
মেনুহিনের সঙ্গে একসঙ্গে বাজানোর দুর্লভ সৌভাগ্যও আমার পরে হয়েছে। ইংলণ্ডে, সুইজারল্যান্ডে, Peace festival-এ আমরা একসঙ্গে বাজিয়েছি। সম্প্রতি ব্রাসেলস-এও একটি প্রতিযোগিতায় আমরা অংশ নিয়েছিলাম। আই অ্যাম ওয়ান অব হিজ

সেটা ১৯৪৫-৪৬ সালের কথা। আমি তখন মন দিয়ে বেহালা বাজাচ্ছি। এত মন দিয়ে বাজাচ্ছি যে রাশিয়ায় পর পর কয়েকটি প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়ে গেলাম। ঠিক ওই সময়েই কেন আমি মন-প্রাণ ঢেলে বেহালা বাজাতে শুরু করলাম কারণ সেটা ছিল পৃথিবী নামক এই গ্রহে আমরা যারা বাস করি, তাদের সকলের খুব আনন্দের সময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। হিটলারের জার্মানী হয়েছে পদানত। দোজ ওয়ার দ্য গ্লোরিয়াস ডেজ।

অ্যাডমায়ারারস। হি ইজ এ গ্রেট পার্সন।
প্রশ্ন : শুনেছি এক সময় চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।
ইগর : হ্যাঁ হয়েছিল। তবে সে সম্পর্ক খুব বেশিদিন টেকেনি।
আই অ্যাম এ গ্রেট অ্যাডমায়ারার অব সিনেমা অ্যাজ অ্যান আর্ট। আমি মনে করি সিনেমা ইজ দ্য মোস্ট একসাইটিং আর্ট অব আওয়ার সেঞ্চুরি। এবং একেবারে শৈশব থেকে আমার চোখে সিনেমা জগতের সবচেয়ে বড় ব্যক্তিত্ব অবশ্যই চার্লি চ্যাপলিন। সাত বছর বয়সে আমি প্রথম 'মডার্ন টাইমস' দেখেছিলাম। ওই কচি মনেও ছবিটা দারুণ প্রভাব ফেলেছিল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত চার্লি চ্যাপলিন-ই আমার 'আইডল'। চ্যাপলিন আজ নেই। কিন্তু ভিডিওর কল্যাণে আজও আমি নিজের বাড়িতে বসে বসে চ্যাপলিনের ছবিগুলো দেখি। যত দেখি, তত মুগ্ধ হই। ভাবি, কীভাবে একজন মানুষ এই রকম শিল্পী হতে পারেন।
এবার চ্যাপলিনের সঙ্গে আমার কীভাবে সাক্ষাৎ হল সেকথা বলি। সেটা ১৯৫৫ সাল। বেহালা বাজাতে সুইজারল্যান্ডে গিয়েছি। পশ্চিমের দেশে সেটাই ছিল আমার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ 'সোলো ট্যুর'। চ্যাপলিন আমার কনসার্ট শুনতে এসেছিলেন। বেটোভেন বাজিয়েছিলাম মনে আছে। সম্ভবত আমার বাজনা পছন্দ হয়েছিল চ্যাপলিনের। কনসার্টের পর উনি আমাকে ওঁর বাড়িতে ডিনার খেতে নেমন্তন্ন করলেন। আর বললেন, সঙ্গে বেহালাটা নিয়ে যেতে। আপনি হয়ত জানেন, চ্যাপলিন নিজেও ছিলেন দক্ষ বেহালা-বাদক। বাঁ হাতে বাজাতেন। নিজের অনেক ছবিতেও তিনি বেহালা বাজিয়েছেন।
দুরু দুরু বুকে আমি তো গেলাম চ্যাপলিনের বাড়িতে। ডিনার খেতে খেতে হয়ে গেল মধ্যরাত্রি। একে একে ঘুমিয়ে পড়ল চ্যাপলিনের সাত-সাতটি সন্তান। তারপর তিনি আমাকে বেহালা বাজাতে বললেন। আমি বাজাচ্ছি, আর চ্যাপলিন তন্ময় হয়ে শুনছেন। ভোর হয়ে গেল বাজাতে বাজাতে। তবু চ্যাপলিন কিছুতেই ছাড়বেন না। যত বাজাচ্ছি, উনি বলছেন আরও বাজাও। তখনই বুঝেছিলাম, কত বড় সঙ্গীত-রসিক ছিলেন তিনি। সেই রাতটির কথা আমি কোনওদিন ভুলতে পারব না। ইট ওয়াজ দ্য মোস্ট মেমোরেবল ইভনিং অব মাই লাইফ।
প্রশ্ন : চ্যাপলিন কি আপনাকে তাঁর বেহালা-বাদন শুনিয়েছিলেন ?
ইগর : না, না। আমিই শুনিয়েছি। শুনিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছি। তবে ছবিতে আমি ওঁর বাজনা শুনেছি। বেশ ভালই বাজাতেন।
প্রশ্ন : আমাদের দেশেও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এ সম্পর্কে আপনার কোনও মন্তব্য আছে কি ?
ইগর : অবশ্যই। আপনাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্য সম্পর্কে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। তবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সংজ্ঞায় আপনাদের সঙ্গে আমাদের কিছুটা পার্থক্য আছে। ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিকাল মিউজিক মিনস দ্য কম্পোজিশনস অব গ্রেট কম্পোজারস লাইক মোৎসার্ট, বেটোফেন, বাখ, চাইকোভস্কি, শোপাঁ। তবে রবিশঙ্কর, আলি আকবরের বাজনা আমি শুনেছি। এক কথায় দুর্দান্ত। আমাদের দুই দেশের সাংস্কৃতিক বিনিময় ক্রমশই বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে পারস্পরিক

আদান-প্রদান। সোভিয়েত রাশিয়াতে জনপ্রিয়তা বাড়ছে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের।

প্রশ্ন : রবিশঙ্কর কিংবা মেনহুইন তাঁদের বাদ্যযন্ত্রে পুব-পশ্চিমের সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। আপনারও কি অনুরূপ কোনও পরিকল্পনা আছে ?

ইগর : না, আমার নিজের তেমন কোনও পরিকল্পনা নেই। তবে রবিশঙ্কর -এর সঙ্গে মেনহুইনের বাজনা আমি শুনেছি। শুনে মুগ্ধ হয়েছি। একজন পশ্চিমী শিল্পীর পক্ষে এইভাবে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত আত্মস্থ করা সত্যিই খুব কঠিন কাজ। দিস এফার্ট টু কম্বাইন ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট, টু মাই মাইন্ড ইজ ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং। তবে এই প্রচেষ্টা কতটা সফল হবে, তা নির্ভর করছে শিল্পী কে তার উপর। মেনহুইন যা পেরেছেন, সবাই তা পারবেন, একথা মনে করার কোনও কারণ নেই।

প্রশ্ন : সমসাময়িক সোভিয়েত কম্পোজারদের কাছেও তো আপনি সমান জনপ্রিয়।

ইগর : জনপ্রিয় কি না, বলতে পারি না, তবে নবীন-প্রবীণ, খ্যাত-অখ্যাত অসংখ্য রুশ কম্পোজার চান তাঁদের রচনা আমার বেহালাতে প্রথম প্রকাশ পাক। বিমূর্ত ও জটিল কম্পোজিশনগুলি নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে আমি ভালবাসি। ইন রাশিয়া, আই হ্যাভ দ্য ইউনিক ডিস্টিংশন অব হ্যাভিং হ্যাড দ্য লারজেস্ট নাম্বার অব কম্পোজিশনস ফর দ্য ভায়োলিন ডেডিকেটেড টু মি। রাশিয়ার কম্পোজারদের মধ্যে সার্গেই প্রোকোফিয়েভ বা দিমিত্রি সোস্টাকোভিচ আমার খুব প্রিয়। তবে একই সঙ্গে, যতদূর পারি, নবীন কম্পোজারদের সাহায্য করতেও আমি চেষ্টা করি।

এতে আমার যেমন সুবিধে, তেমনি তাঁদেরও সুবিধে। আই ট্রাই টু ব্রিং আউট অল দ্য ন্যুয়াঙ্গেস ইন এ পার্টিকুলার কম্পোজিশন। আবার আমি কোনও নতুন কম্পোজিশন নিয়ে মঞ্চে উঠলে সমালোচকরা সতর্ক হয়ে ওঠেন। এতে কম্পোজারের প্রচার হয়।

প্রশ্ন : এবার ভারতে এসে নতুন কার কার সঙ্গে আলাপ হোল আপনার ?

ইগর : বেহালাবাদক সুব্রামনিয়ম। ওঁনার বাজনাও শুনলাম। বেশ ইন্টারেস্টিং। আলাপ হোল সরোদিয়া আমজাদ আলি খানের সঙ্গে। ওঁর বাড়িতে নৈশ ভোজনে আমাকে নেমন্তন্ন করেছিলেন আমজাদ। ওঁর যন্ত্রটা দেখালেন। কিছুক্ষণ বাজিয়েও শোনালেন। চার্মিং ইয়ংম্যান।

বাঙ্গালোরে এবার আলাপ হোল বিখ্যাত চিত্রকর স্তোতোসলাভ রয়েরিখের সঙ্গে। আপনি হয়ত জানেন, জন্মসূত্রে রুশ স্তোতোসলভ দীর্ঘদিন ধরে বাঙ্গালোরে বসবাস করছেন। বন্ধুদের সঙ্গে উনি বাঙ্গালোরে একটি সুন্দর আর্ট কমপ্লেক্স গড়ে তুলেছেন। আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন সেটা। ওঁদের সংগ্রহে অসাধারণ সব চিত্রকর্ম আছে। সবই অবশ্য ভারতীয়দের। সেই প্রাচীন কাল থেকে হালফিল সময় পর্যন্ত। ওঁর সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে আমার অনেকদিনের। এবার বাঙ্গালোরে যাওয়ার সুবাদে সেই ইচ্ছেটা পূর্ণ হয়ে গেল। রাশিয়াতেও উনি দারুণ জনপ্রিয়।

প্রশ্ন : একক অনুষ্ঠান করা ছাড়াও আপনি তো দীর্ঘদিন ধরে নানা কনসার্ট কন্ডাকটও করেছেন ?

ইগর : করেছি। গত ১৮ বছর ধরে সোলো প্রোগ্রাম করার পাশাপাশি আমি কণ্ডাক্টরের কাজও করেছি।

আমি মনে করি শিল্প বা সঙ্গীত মানুষের সঙ্গে মানুষের বোঝাপড়া আরও নিবিড় করে তোলে। শিল্প দেশ, ভাষা কিংবা রাজনীতির বিভেদ মানে না। দ্য মোস্ট ইম্পরট্যান্ট থিং ফর এভরি হিউম্যান বিইং ইন আওয়ার প্ল্যানেট ইজ পিস। আমার, আপনার, এই গ্রহের সকলের প্রয়োজন এখন শান্তি। শিল্প সেই শান্তির বাতাবরণ তৈরি করতে সাহায্য করে।... আর্ট অ্যান্ড মিউজিক ইজ ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ।

মস্কো হার্মনিক, লেনিনগ্রাদ ফিলহার্মনিক, ইস্ট বার্লিন ফিলহার্মনিক পরিচালনা করেছি। তবে সত্যি কথা বলতে কি, কন্ডাক্ট করার চেয়ে একা বেহালা বাজাতেই আমি বেশি পছন্দ করি।

প্রশ্ন : রাজনৈতিকভাবে আজকের পৃথিবী দুটি অর্ধে বিভক্ত। পূর্ব ও পশ্চিম। বেহালা হাতে আপনি যখন পুব থেকে পশ্চিমে যান, কেমন লাগে ?

ইগর : আমি এ ধরনের প্রশ্নের কোনও উত্তর দেব না। শুধু এইটুকু বলতে পারি বেহালা হাতে আমি সর্বত্র ঘুরে বেড়াই। আমি মনে করি, শিল্প বা সঙ্গীত মানুষের সঙ্গে মানুষের বোঝাপড়া আরও নিবিড় করে তোলে। শিল্প দেশ, ভাষা কিংবা রাজনীতির বিভেদ মানে না। দ্য মোস্ট ইম্পরট্যান্ট থিং ফর এভরি হিউম্যান বিয়িং ইন আওয়ার প্ল্যানেট ইজ পিস। আমার, আপনার, এই গ্রহের সকলের প্রয়োজন এখন শান্তি। শিল্প সেই শান্তির বাতাবরণ তৈরি করতে সাহায্য করে। টু মি আর্ট অ্যান্ড মিউজিক ইজ ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ।

প্রশ্ন : তেরো বছর পরে আপনি ভারতে এলেন। বোম্বাই, বাঙ্গালোর, দিল্লিতে বাজালেন। কিন্তু কলকাতায় গেলেন না কেন ?

ইগর : ১৯৭৩-এ যখন আসি, তখন কলকাতায় গিয়েছিলাম। এবার যেতে পারলাম না। আমার অনুষ্ঠানসূচী তো আর আমি তৈরি করিনি। করেছেন ভারত সরকার।

সুমন চট্টোপাধ্যায়

পুরস্কারের কাঠগড়ায়

সাহিত্যের ম্যারাথন

গোটা দুনিয়ায় খতিয়ান নিলে দেখা যাবে সাহিত্যে পুরস্কার যে কেবল সংখ্যায় বেড়েছে তাই নয়, অর্থের অঙ্কেও বেড়ে চলেছে উত্তরোত্তর। তার জাত, তার চরিত্র, তার বৈচিত্র্য এখন অনেক। এই সব পুরস্কারের দৌলতেই সাহিত্য এখন আন্তর্জাতিক এবং জনপ্রিয় স্পোর্টস—তার অলিম্পিক দৌড়ে সেরা সেরা খেলোয়াড়, এমন কি বেস্ট সেলাররাও ছুটতে থাকে চ্যাম্পিয়ন হবার জন্য।

পুরস্কার এখন সাহিত্যের বাড়তি পাওনা অর্থে এবং যশে মিলিয়ে।

মনেপ্রাণে যাঁরা সাহিত্যিক তাঁরা ফরমাশে লেখেন না, পুরস্কারের জন্যেও লেখেন না। কিন্তু লেখাটি সমাপ্ত হবার পর অনেকেই বৃহৎ পুরস্কারগুলির দিকে যে তাকিয়ে থাকেন এটাও মিথ্যে নয়। এই প্রাপ্তির জন্যে তখন তলায় তলায় দৌড়ঝাঁপ চেষ্টা-চরিত্র চলে না তাও নয়, এমন কি ঠেলাঠেলির ব্যাপারও থাকে। কাউকে ফেলতে কাউকে রাখার ঘটনা কোন কোন পুরস্কারের নির্বাচন চাতুর্যে কিছু বিরল ঘটনা নয়।

তবে ঘটনা যাই হোক, গোটা দুনিয়ার খতিয়ান নিলে দেখা যাবে সম্প্রতিকালে পুরস্কার যে কেবল সংখ্যায় বেড়েছে তাই নয়, অর্থের অঙ্কেও বেড়ে চলেছে উত্তরোত্তর। তার জাত, তার চরিত্র, তার বৈচিত্র্য এখন অনেক। এই পুরস্কারের দৌলতেই সাহিত্য এখন আন্তর্জাতিক এবং জনপ্রিয় স্পোর্টস, তার অলিম্পিক দৌড়ে সেরা সেরা খেলোয়াড়, এমনকি বেস্ট সেলাররাও ছুটতে থাকে চাম্পিয়ান হবার জন্যে। আন্তর্জাতিক পুরস্কারগুলির পাশাপাশি আছে বেশ কিছু আন্তর্দেশিক পুরস্কার। কিছু প্রাপ্তি বাঁধা থাকে ভূগোলের গণ্ডিতে, কিছু ভাষার বন্ধনীর মধ্যে, আর কিছু বা থাকে বিষয়-সীমারেখায়। ব্রিটেনের বুকার পুরস্কার কিন্তু সাধারণ মাপের এবং মানের নয়। ভাষার মাধ্যম যদিও ইংরেজী তবু তার গোত্র গোষ্ঠী একটি শর্তে বাঁধা। আমেরিকার বাইরে, কমনওয়েলথ অন্তর্গত দেশের লেখকরাই শুধু এই পুরস্কার অর্জনের অধিকার পাবে। ব্রিটেনের সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন এই পুরস্কারের অর্থমূল্য এখন দশ হাজার পাউণ্ড থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে পনের হাজার পাউণ্ডে। ১৯৮৬-র বুকার প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, গণদৌড়ের শেষ রাউণ্ডে উঠেছিলেন মাত্র ছ' জন লেখক। তাঁদের ছটি উপন্যাসের ভেতর থেকেই শ্রেষ্ঠত্বের বাছাই হয়েছে। বাছাই কর্মে নিযুক্ত হয়েছিলেন বাঘা বাঘা সম্পাদক সমালোচক লেখক। শতাধিক গ্রন্থের বৃহৎ তালিকা ক্রমশ ছোট হতে হতে হাফ ডজনে ঠেকতে সময় এবং শ্রম লেগেছিল অনেকটা। এই উপলক্ষে বোঝা গিয়েছিল ভালো লেখার অভাব ঘটেনি এখনো, যদিও তার বেশির ভাগ এসেছিল ব্রিটেনের বাইরে থেকে।

এবারের পুরস্কার জিতলেন কিংসলে অ্যামিস তাঁর 'দি ওল্ড ডেভিলস' বইটির জন্য। হাচিনসন কর্তৃক প্রকাশিত ৯·৯৫ পাউণ্ড দামের এই বইটি ব্রিটিশ বেস্ট সেলার লিস্টের চূড়ায় কায়েম হয়ে বসেছে ইতিমধ্যেই। চৌষট্টি বছর বয়স্ক লেখক অ্যামিস-এর নাম এই পুরস্কারের চূড়ান্ত তালিকায় এর আগেও উঠেছিল দুবার। ১৯৭৪ সালের নির্বাচনে গিয়েছিল তাঁর 'এনডিং আপ' বইটি, আর ১৯৭৮ সালে 'জেক'স থিং'। ক্রমশ বুড়িয়ে-আসা ফুরিয়ে আসা সৌন্দর্য-সামঞ্জস্যহীন জীবন বিষয়ে অ্যামিস স্বভাবতই তীব্র ও তিক্ত ঝাঁঝালো হয়ে ওঠেন, কখনো বা বিজ্ঞ কৌতুকচারী। সাউথ ওয়েলস-এর বর্তমান পটভূমিতে কিছু ধূর্ত প্রবীণ পানভোজন-আসক্ত পুরুষ চরিত্র এবং তাদের যথার্থ ডিউ পার্ট কামাতুর মহিলার বিপজ্জনক সাহচর্যকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে এই পুরস্কার বিজয়ী উপন্যাসটির কাহিনী-আবর্ত। অন্তর্ভেদী ও সকৌতুক পর্যবেক্ষণের দক্ষতার জন্য বিচারকরা উপন্যাসটির অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন।

পুরস্কার পেতে পেতে ফস্কালেন, সেই বাকি পাঁচজনের একজন হলেন ক্যানাডিয়ান লেখিকা মার্গারেট অ্যাটউড। তাঁর উপন্যাসের নাম 'দি হ্যাণ্ড মেইডস টেল' (জোনাথান কেপ, ৯·৯৫ পাউণ্ড)। দক্ষতার সঙ্গেই তিনি তির্যক দর্শনে তুলে এনেছেন একুশ শতকের আমেরিকার ভবিষ্যৎ তথ্যচিত্র। যৌন রোগ ও দূষণের নাটকীয় পরিণাম প্রতিবিম্বিত হয়েছে কাল্পনিক কাহিনীর সপ্রতিভ, মার্জিত ও ভয়ঙ্কর টানে।

দ্বিতীয়জন পল বেইলি। গ্রন্থের নাম 'গ্যাব্রিয়েল'স ল্যামেন্ট' (জোনাথান কেপ, ৯·৯৫ পাউণ্ড)। ভিন্ন ধরনের সাসপেন্সে ঠাসা। উপন্যাসটি ত্রুটিমুক্ত নয়। চরিত্রের গুরুভারে এবং অতিকথন ও বর্ণনাবাহুল্য কাহিনীর গতিকে খুব মন্থর করে দিয়েছে।

তৃতীয় উপন্যাস 'হোয়াট ব্রেড ইন দি বোন' (ভাইকিং, ৯·৯৫ পাউণ্ড)-এর লেখক রবার্টসন ডেভিস। তাঁর স্বদেশীয় লেখিকা মার্গারেট অ্যাটউডের মতই তিনিও অনেক ব্রিটিশ লেখককেই টেক্কা দেবার ক্ষমতা রাখেন যদি তাঁর লেখার বিষয় হয়ে ওঠে ইংল্যাণ্ড। এই প্রতিশ্রুতিবান উপন্যাসটি শুরু হয়েছে ফ্রান্সিস কোর্নিস নামক এক প্রয়াত চিত্রশিল্পবিদের জীবনসত্যের রহস্যানুসন্ধান দিয়ে। কলঙ্ক-গুঞ্জনের মধ্যেই মৃত্যু হয়েছিল এই হঠাৎ ধনী হয়ে ওঠা শিল্পরসিক মানুষটির। এক নাটকীয় উম্মোচন উপন্যাসটিকে রীতিমত উপভোগ্য করে তুলেছে।

এই শৈল্পিক অসাধুতাই অ্যাংলো-জাপানীজ লেখক কাজুও ইশিগুরো-র 'অ্যান আর্টিস্ট অফ দি ফ্লোটিং ওয়ার্ল্ড' উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। জাপানী সংস্কৃতির শিল্পাদর্শের সংঘাত চমৎকার ফুটে উঠেছে মাসুগি ওনো নামক এক প্রবীণ চিত্রকারের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে। আছে প্রতীকী ছোঁয়া। সুলিখিত হলেও উপন্যাসটি ইশিগুরোর আগের উপন্যাস 'এ পেল ভিউ অব হিলস'-এর উৎকর্ষ ও আকর্ষণ বজায় রাখতে পারেনি। বইটি প্রকাশ করেছে ফেবার অ্যাণ্ড ফেবার কোম্পানী, দাম ৮·৯৫ পাউণ্ড।

উপন্যাসগুলির মধ্যে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় এবং হাঁপ ধরানো ঠাসবুনোনের লেখাটিও লিখেছেন এক অ্যাংলো পূর্ব এশীয় ঘরানার লেখক টিমোথি মো। 'অ্যান ইনসুলার পজেশন' (৯·৯৫, পাউণ্ড প্রকাশক চাটো অ্যাণ্ড উইণ্ডাস) উপন্যাসটি ১৮৩০-এর দশকের অহিফেন বাণিজ্যের নিপুণ ও নির্মম বিবরণকে প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করেছে। দুই তরুণ আমেরিকানের মাদক পাচারের জীবন এর উপজীব্য। তথ্যসম্পদে বইটি কৌতূহলোদ্দীপক, চরিত্রচিত্রণও শক্তিশালী। জীবন্ত। কিন্তু তথ্য ও উপন্যাসের সুসমঞ্জস সমীকরণের অভাবে বইটি হয়ে উঠেছে আধা কাহিনী আধা খবরের কাগজের কাটিং।

কবিতা, শুধু কবিতা

লণ্ডনের প্রবীণতম সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতির দিশারী সাময়িক সমালোচন-পত্র টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেন্ট তাঁদের সাহিত্য-উৎসব পালন করে চলেছেন কবিতা প্রতিযোগিতা দিয়ে। কবিতার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ও মর্যাদা অর্পণের এই নজীর স্মরণীয় হয়ে থাকবে। গত ৫ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় দীর্ঘ আট পৃষ্ঠাব্যাপী নামহীন চুরাশীটি কবিতা তাঁরা তুলে ধরেছিলেন পাঠকদের

বিবেচনার জন্য। বলা বাহুল্য এই প্রতিযোগিতার জন্য প্রাপ্ত সাড়ে চার হাজার কবিতার ভেতর থেকে বাছাই করে এই ৮৪টি কবিতাকে তাঁরা প্রতিযোগিতাযোগ্য মনে করেছিলেন। পাঠকেরা ব্যালট মাধ্যমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হবার যোগ্য কবিতাকে ভোট দিয়েছিলেন। এই ভোটের ফলাফল জানার আগেই এক বিচারক মণ্ডলীর ওপর ভার পড়েছিল কবিতাবলীর আর এক প্রস্থ পৃথক নির্বাচনের।

পূর্ব নির্দিষ্ট ৩ অক্টোবর সংখ্যায় দুই পর্যায়ে পুরস্কৃত ছ'জন কবির ছটি কবিতা ছাপানো হয়েছিল তাঁদের নামসহ। সেই সঙ্গে সেই চূড়ান্ত তালিকায় যাঁরা মনোনীত হয়েছিলেন সেই সব কবিদের নাম, কবিতার নামসহ প্রকাশ করা হয়েছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই বৃহৎ কবিতা যজ্ঞ সম্পন্ন হল নির্ভুল নিয়মে যে ভেবে বিস্মিত হতে হয়। গত ১২ অক্টোবর ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কেলটেনহাম এভরিম্যান থিয়েটারে ১২-৩০ মিনিটে পুরস্কৃত কবিতাবলী পাঠ ও কবিতার দরুন পুরস্কার বিতরণ হয়ে গেল। উভয় পর্যায়ের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার ছিল যথাক্রমে ৫০০, ৩৫০ ও ১০০ পাউণ্ড।

পাঠকের ভোটে প্রথম হয়েছেন কোনি বেনস্লে নামে এক লণ্ডনিবাসী মহিলা কবি। এক ডাক্তারের সার্জারিতে তিনি পার্টটাইম কাজ করেন। 'প্রোগ্রেস রিপোর্ট' ও 'মুভিং ইন' নামে তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ আছে। বেতারে প্রচারিত দুটি নাটক 'লাভিং রুম' ও 'চেঞ্জিং পার্টনারস' তাঁরই রচনা।

বিচারকমণ্ডলী নির্বাচিত প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন পল গ্রোভস নামে এক প্রাথমিক স্কুলশিক্ষক। ফেবার-এর প্রোয়েট্রি ইন্ট্রোডাকশন থ্রি এবং সাউথ-ওয়েস্ট রিভিউ অ্যানথোলজি-তে ইতিপূর্বেই তাঁর কবিতা স্থান পেয়েছে।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'প্রবাসী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা বছরেই (১৩০৮) একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। প্রতিযোগিতা ছিল: '(ক) বিহারে বাঙ্গালী, (খ) উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা ও পঞ্জাবে বাঙ্গালী, (গ) মধ্যভারতে বাঙ্গালী এবং (ঘ) ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালী এই চারিটি বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য চারিটি পদক দেওয়া যাইবে।' বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (১৩২৩)-এর সংকলক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস '(খ)' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠান এবং তা সুবর্ণ পদক লাভ করে। ব্যাপারটির এখানেই ইতি ঘটেনি। প্রবাসী বাঙালী নিয়ে জ্ঞানেন্দ্রমোহন আরও কাজ করে যান এবং তা নিয়মিত 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছাপা হত। পরবর্তীকালে তাঁর গবেষণা 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' গ্রন্থে সংকলিত হয়। এর তিনটি খণ্ড: উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত এবং বহির্ভারত। বইটি (সঠিক অর্থে তিনটি বই) বহুদিন ছাপা নাই, অথচ এটি একটি আকর গ্রন্থ। বহু পুরনো বই ক্রমশ পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু এ রকম একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ, বলতে গেলে, লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেল। কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যখন সাহস করে বইটি ছাপাতে রাজি হচ্ছে না, তখন সরকারের উচিত এই গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণ করা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কিছু পুরনো বই সম্পাদনা করে পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছেন—এটাও তো তাঁরা ছাপাবার ব্যবস্থা করতে পারেন।

ছোট ইংরেজ বড় ইংরেজ

সময়টা রাজদ্রোহের এক তুঙ্গ পর্ব, ভারতবর্ষের ইতিহাসে। এক ব্রিটিশ আই· সি· এস অফিসার কর্মসূত্রে এসেছিলেন এই সুদূর বঙ্গদেশে। ভারতের তৎকালীন উত্তপ্ততম প্রদেশে। দীর্ঘ আট বছরের প্রবাস জীবনে ধীরে ধীরে তাঁর বিচিত্র রূপান্তর ঘটে গেল। এসেছিলেন শাসনযন্ত্রের হাতিয়ার হয়ে, হয়ে গেলেন অন্তরঙ্গ বঙ্গ প্রেমী। শুধু রূপসী বাংলাই তাঁকে টানেনি, এই ভূখণ্ডের জনজীবন আর তের পার্বণের তরঙ্গ তাঁকে অভিভূত করেছিল। ভালবেসেছিলেন মুক্তিপাগল সেই নেপথ্যচারী তরুণদের যাঁরা জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য বানিয়েছিলেন। অভিজাত সমাজের উদারচেতা এই মানুষটি ক্রমশ সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন। কর্মজীবনের শেষ দুটি বছর বিশেষ করে এক দ্বৈতভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। বঙ্গ সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারী মাইকেল কেরিট হয়ে উঠেছিলেন সন্ত্রাসবাদীদের গোপন সংবাদদাতা। তাঁদের গ্রেপ্তারের হাত থেকে বাঁচাতে তিনি যথাসাধ্য করেছেন। ঔপনিবেশিক ধূর্ত চাতুর্য ও দুমুখো নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে গেছেন তাঁর শান্ত সহজাত ভঙ্গিতে। 'এ মোল ইন দা ক্রাউন' তাঁর সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থটি তাঁকে পুনর্বার আমাদের সন্নিকটবর্তী করল।

দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে মাইকেল কেরিট তাঁর এই স্মৃতিকথা লিখেছেন কিন্তু সে যুগের অন্য লেখকদের মত প্রচলিত রীতিতে নয়, স্মৃতিকাতর ভাবালুতাকে সম্পূর্ণ পরিহার করে। ইংরেজ রাজমহিমায় যেমন তিনি বিন্দুমাত্র অভিভূত হননি, তেমনি ভারতে ব্রিটিশ সামাজিক জীবনের কৃত্রিম জৌলুসকে দক্ষ আঘাতে চুপসে দিয়েছেন। ঐতিহাসিক নির্লিপ্তি এবং সমালোচকের দূরত্ব বজায় রেখে বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক ও অসূয়াহীন বিদ্রূপের জোড় কলমে তিনি তাঁর কাহিনীকে উপভোগ্য করে তুলেছেন। এই উপমহাদেশের সমাজপটভূমি তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির আলোকে বিশ্লেষিত হয়েছে। লোক চরিত্রগুলি জীবন্ত ও যথাযথ হয়ে উঠেছে তাঁর কলমে। চমৎকারপাঠ্য এই বইটির দাম তিরিশ টাকা।

সংক্রান্ত সংবাদ

বুদ্ধদেব বসুর 'মহাভারতের কথা'র ইংরেজী ভাষান্তর 'The Book of Yudhisthir' গ্রন্থটি সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগ এবং গ্রন্থটির প্রকাশক ওরিয়েন্ট লঙম্যান-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই দিনের (২৪ সেপ্টেম্বর '৮৬) সান্ধ্য আসরে সভাপতিত্ব করেন কবির আবাল্য বন্ধু অধ্যাপক অমলেন্দু বসু। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অনুপস্থিতিতে অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় কবি-পত্নী প্রতিভা বসুর হাতে গ্রন্থটির এক খণ্ড অর্পণ করেন। সভায় প্রধান অতিথি ছাড়াও রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, সুবীর রায়চৌধুরী, অমিয় দেব প্রমুখ গুণিজন বক্তব্য রাখেন। গ্রন্থটির অনুবাদক সুজিত মুখোপাধ্যায় অনুবাদ-কর্মের কথা বলেন। সভাপতি অমলেন্দু বসু কবির স্মৃতিচারণ করেন। প্রকাশক সংস্থার পক্ষ থেকে সুজাতা দাস ধন্যবাদ দেন। ইতিপূর্বে বইটি হিন্দী, গুজরাটি মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। প্রসঙ্গত লেখাটি আমাদের পত্রিকায় ১৯৭২ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ■

বুদ্ধদেব বসু

১৯৭২ সালে 'দেশ'-এ ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় বুদ্ধদেব বসুর 'মহাভারতের কথা'। ষোল বছর পর এরই ইংরেজী ভাষান্তর সম্প্রতি প্রকাশ করেছে ওরিয়েন্ট লঙম্যান। গ্রন্থটির অনুবাদক সুজিত মুখোপাধ্যায়। ইতিপূর্বে হিন্দী, গুজরাটি ও মারাঠী ভাষাতেও গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে।

তৃষ্ণা

কবিরুল ইসলাম

শুধু শরীরের মচ্ছবে গেল দিন
উৎসাহে শুরু, ঘামের উৎসে শেষ
এত আয়োজন বহ্নির উৎসবে
এ যেন দোলের সামান্য পিচকারি

এক মুহূর্তে ফুরালো চিয়ায়মানা

যে পরাজিতার মুহূর্ত ফুৎকারে
তুমুল তর্কে নিজেরই শিকড় খুঁজে
সে হারালো তার পায়ের তলার মাটি
আরও একবার, হয়ত ধারাবাহিক।

শিশিরে কি কারো কখনও তৃষ্ণা মেটে
ঘাসের অগ্রে সূর্য-কিরণই ভালো
কৃষ্ণা রজনী আশ্লেষে-আশ্লেষে
পায়ে-পায়ে ভিজে ভিতরে প্রবেশ করে

যেটুকু প্রাপ্য দিতে হবে তাকে, দাও ॥

হয়তো কিছু হবে

হাসান হাফিজ

আকাশের মুখ চোখ থমথমে
লুকিয়ে রয়েছে চাঁদ মেঘের গভীরে
জোনাকিরা ত্রস্ত চুপচাপ
নিবিয়ে ফেলেছে তারা নিজেদের ভালোমন্দ আলো
কোথাও হাওয়ার কোনো ফিসফাস নেই
গুমোট গরমে হাওয়া আকুলিবিকুলি করে
হয়তো এখন কিছু হবে, না-ও হতে পারে।

তেতে আছে সোঁদা মাটি, বৃষ্টি দূরতর···
ছায়া, স্বপ্ন, সৌন্দর্যের অভিষেক নেই
ধানের সবুজ পাতা, ঘাস, ফুল, পাপড়িতে
ফ্যাকাশে রঙের নৃত্য, মুদ্রার বালাই নেই
চঞ্চল চড়ুই চুপ, মধুক্ষরা কোকিল নীরব
হয়তো ঘটবে কিছু, হয়তো বা নয়
হয়তো কিছু হতে পারে, না-ও হতে পারে
আকাশ মৃত্তিকা নদী এবং পাখিরা
চাইছে কিছু তো হোক, কিছু তো ঘটুক ॥

আকাশের সখ

বটকৃষ্ণ দে

ছোট্ট একটু আকাশের সখ,
চিত্রনিভ সূর্যাস্তের ব্যাকুল গোধূলি
নীল মেঘে কারুকার্যে বর্ণাঢ্য বিভাস,
প্রত্যূষে বাগানে ঘাসে হেমন্ত শিশিরে ভেজা কয়েকটি বা শিউলির উদা
সংসারের ছোট সুখ ছোট দুঃখে
স্মৃতি লগ্না নারীর পিপাসা।
টুকিটাকি খড়কুটোর ঘরে, দিনান্তের পলি ঘুরে
ফিরে এলে, ঝড় উঠলে, অপার্থিব উত্তাপ প্রার্থনা
—এটুকু অন্তত গ্রাহ্য কোরো, প্রিয়।
যতবার সমুদ্রে নেমেছি, ডুবেই মরেছি
যতবার অরণ্যগহ্বরে গেছি পথ হারিয়েছি
যতবার সময়ের কাছে নতজানু যৌবন চেয়েছি
ততবার, তোমার প্রতিজ্ঞা শুধু
পর্যুদস্ত সৈনিকের ভ্রূকুটি দিয়েছে।
একবার ভুলেই না হোক,
ভ্রূভঙ্গের তীরটি বিঁধিয়ো—
বুক পেতে চিরজন্ম প্রতীক্ষায় থাকবো তার, প্রিয়।

দেখা হওয়া

মহুয়া চৌধুরী

দীর্ঘদিন অদর্শনে শুকিয়ে শুকিয়ে
মরা মরা হয়েছিল আমাদের বন্ধুত্বের গা—
চকচকে আমিষগন্ধী সাপ আর খোলসের মতো,
কয়েক মাস দূরত্বে, পোড়োবাড়ির মতন,
পড়েছিল আমাদের আসঙ্গ যৌনতা
পেঁচা বাদুড় আর চাঁদের চিৎকার সত্ত্বেও
সেখানে তন্দ্রা আসছিল।
প্রান্তরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোল খেতে খেতে
এক একদিন কাছে আসত
দুপুরের আঁশটে স্বপ্নে।
দেখা হলো আমাদের,
সাদা গোল ডিমের মতন
ঝকঝকে ঔজ্জ্বল্যেশীলিত।
নামশব্দের জট পাকস্থলিতে
সময়ের কাঁচাশস্য চিবিয়ে চিবিয়ে
বটের আঠার মতো দুধস্বাদে
ভরে গেল মুখ;
উঠে এলো অন্ধকার
জ্বলজ্বলে পারদের মতো।
তারপর বিষণ্ণতা, সাদা নম্র কীটের মতন
স্বসঞ্জাত বিষাদের আকর্ষণে বেঁকে গেল
দুমড়ানো হৃদয় মাংসে
ঝাপসা ছবির মতো ডেলা ডেলা—উপবৃদ্ধিময়।
ঠনঠনে থেকে হেদো তারায় বিদ্যুতে
হাড়ের বিছানা ভেবে হেঁটে হেঁটে
হাঁটতে হাঁটতে।

শেকল আমার গায়ের গন্ধে

শামশের আনোয়ার

আমি কবিতার শেকল ভেঙে পালাবো আজ
শুধু আমার দু পায়ের চিহ্ন থাকবে বালুর ওপর
কবিতার শেকলের বাড়ি খেয়েছি দিনরাত
চোখ নষ্ট হয়ে গেছে··· বোধ নষ্ট হয়ে গেছে
কবিতার শেকলের ভীম আঁটুনিতে—
নগ্ন চরাচর পড়ে থেকেছে দুপাশে। কবিতার শেকল
দীর্ঘ কালো প্যাঁচে জড়িয়ে রেখেছে গোটা শরীর আমার
শেকল আর ঐ শেকলের জড়তায় নষ্ট হয়ে গেছে
বাড়ির পাশের পুকুর মাঠের শান্তি, ঘুম
ঘাস পিষ্ট করেছে ঐ শেকল, তাই ঘাস হলুদ হয়ে গেছে
মাটিকে দলিত করেছে ঐ শেকল, তাই মাটি
ভরে গেছে যাবতীয় ক্ষতে
ঐ শেকলের সর্বগ্রাসী ছোঁয়া থেকে লিঙ্গ অসহায়
কাত হয়ে নিষ্প্রাণ হয়ে কাটিয়েছে দিনগুলো তার
এবার আমি পালাবো : মাটিতে শেকলের
চিহ্নমাত্র থাকবে না আর···
কিন্তু সামনে দেখি আগুন, ধূধূ আগুন
নিরিবিলি নয় বিশাল সব গাছের ভীড়ের আগুন
বেরুনোর রাস্তা নেই গাছ থেকে গাছে আগুনের
সাপ মুখ হাঁ করে দেখায় তাদের জিভ—
দেখায় যে তাদের চোখ নেই
আগুন খেয়েছে আগুনের চোখ মাঠ থেকে
মাঠে ছুটে বেরিয়ে আগুন দেখায় আগুনের
পোড়া তলপেট আগুন দগ্ধ করেছে
আগুনের লিঙ্গ-মণি। আমি দাঁড়িয়ে আছি শেকল
আমাকে খুঁজছে শুধু দাঁড়িয়ে থাকা···উপায়হীন
দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই :
শেকল আমার গায়ের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে
এগিয়ে আসছে—আগুনও আমার শরীরের
গন্ধ পেয়ে লোভী হিংস্র ছুটে আসছে···
গাছগুলো দৌড়াচ্ছে এখনও জীবন্ত, এখনও
টাটকা রয়ে গেছে এমন এক মানুষের সন্ধান পেয়ে—।

অবৈধ

সুনন্দা মৈত্র

জানলা ছেড়ে চলে আসতে সাত জানলা
কপাট খুলে ছড়িয়ে পড়ে। একটু দূরে মোহন চূড়া
মেঘের ঢালে আকাশ নাভি, ঘুলঘুলিতে জাফরি বেড়া।
ডানার ছায়া আলসে ছুঁয়ে উঁকিঝুঁকি ভর দুপুরে
শিউলি ফোটা গন্ধ হাওয়া চিকন হাসি সবুজ বনে।
নিশান কোণে উন্মীলনে পায়ের চেটো
ঠাণ্ডা মাটি, ঘামের নুনে পাথর পেশী
স্পর্শে নদী খবর পাবে লুকোনো ঢেউ।
কলিংবেলে হাত রাখলে বাতাস আগে
জানান দেবে ফাঁকফোকরে রোদের কণা।

আঘাটা

রত্নেশ্বর হাজরা

ঘাট নেই আগাছা জন্মেছে বহুদূর—যতোদূর
চক্ষু যায়—
রাস্তা ছিল—ঘাট অব্দি
মানুষের যাতায়াত ছিল
সহজ সম্পর্ক কিছু ছিল কিছু
অবাস্তব আবহাওয়া ছিল
প্রবাসী রোদ্দুর আর বৃষ্টিকে বহন করে
বাতাসের আসা-যাওয়া ছিল···

ঘাট নেই জল সরে গেছে বহুদূর—যতদূর
বুড়ো তালগাছ তার ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
সন্ধ্যা দেখে—
মন্দির তখন খুব কাছে ছিল
বিখ্যাত তিথির অন্ধকার
দূরে সরে গেছে···
সম্পন্ন উৎসব নেই। আত্মীয়তা নেই। কোলাহলও নেই। ঘাট
বয়স্ক লোকের মনে আছে···
আগাছা জন্মেছে বহুদূর—যতোদূর
চক্ষু যায়···

এখনো হয়নি শুরু

রাখাল বিশ্বাস

কোথায় কীভাবে ঠিক শুরু হয় স্পষ্ট করে বুঝতে পারি না
কখনো কখনো দেখি পাল্টে যায় সমস্ত কিছুই
দেখি পলকে পলকে ফেরে ওই ঘুমন্ত পৃথিবী
দুলে ওঠে ঝাউবন, আনত শিখর।
এখানে কে কার সঙ্গী ? আছে, হয়তো কোথাও কেউ আছে
তা না হলে কেন আমি ঘর থেকে বাইরের অনন্ত সবুজে
মুখ ঢেকে রাখি
কোলাহল নাড়া দেয়, যেদিকে আলোর রেখা তার দিকে তবু
যেতে যেতে মনে হয়
এখন কোথায় সেই সোনালী জীবন ? কোন্‌পারে ?
আমি কি একাকী শুধু বুক পেতে জড়িয়ে নিয়েছি অভিশাপ
নাকি অন্য কেউ আছে ?
বিষণ্ণ হাতের ছোঁয়া মর্মে টানে, জলভাঙে জলের কল্লোলে
হয়তো তারো বেশি ভাঙে, সব কিছু, সমর্পিত দুঃখ
জানালার ওপরে আঁধার মুখ রাখো, যার খেলা—

এখনো হয়নি শুরু একদিন হতে পারে এইটুকু ভেবে।

ফুটবল গ্লানির মুক্তির আশায়

অরিজিৎ সেন

আর কত দিন? শুধু গ্লানি টানার কথা নয়, ফুটবলে ভারতের গ্লানি আর কত দিন সহ্য করতে হবে? এই প্রশ্নই এখন সবার মুখে।

অনেক প্রতিশ্রুতি এবং তার চেয়েও বেশী কথার ঝুড়ি ভারতে ফেলে সোল রওনা হয়েছিল জাতীয় ফুটবল দল। সেখানে প্রাথমিক গ্রুপ খেলায় ভারতই একমাত্র দল যেটি কোনো খেলায় জয়ী হতে শুধু নয়, ড্র করতেও সক্ষম হয়নি।

অথচ এবার অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন কোনোরকম কার্পণ্য করেনি। স্থানীয় লীগকে বঞ্চিত করে কলকাতার তথাকথিত তারকাদের মাসের পর মাস ক্যাম্প এবং কম্পিটিশনের মধ্যে রাখা হয়। এ আই এফ এফ অনেক টাকা খরচ করলেন এই ক্যাম্পগুলির জন্য।

এশিয়াডের যাত্রা শুরু হয়েছিল অনেক নাটকের মধ্যে। একটি দুটি নয়, তিনটি আঞ্চলিক ক্যাম্প গড়া হয়েছিল প্রাথমিকভাবে খেলোয়াড় নির্বাচনের জন্য। বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য প্রশিক্ষকও নিয়োজিত হয়েছিল।

ক্যাম্পগুলির ফাঁকে ফাঁকে ম্যাচ খেলাও চলেছে। কিছু নতুন ছেলে নিয়ে গড়া পরীক্ষামূলক দল বিদেশী প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করে খেলতে সক্ষম হওয়ায় অনেকের মনেই ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশা দানা বাঁধে।

এরপর শুরু হয় ট্যান্ডন পর্ব। ভারতীয় ফুটবলারদের স্কিল সম্বন্ধে অনেক গুণগানের সঙ্গে সব সময় শুনতে হত যে "ফিজিকাল কন্ডিশনিং"-এর অভাবের জন্য ছেলেরা আন্তর্জাতিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে নব্বই মিনিট যুঝতে সক্ষম হত না। তাই আসরে নামলেন ট্যান্ডন। উনি যে সত্যিই খেলোয়াড়দের দৈহিক সক্ষমতা বাড়াতে পেরেছিলেন তা মারদেকা টুর্নামেন্টেই বোঝা গেল। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না, কারণ ট্যান্ডন সোল যাওয়ার ছাড়পত্র পেলেন না।

যাই হোক, এবার আবার প্রতিযোগিতামূলক খেলায় ফেরা যাক। প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়নের সফর। সেখানে সতেরো গোল খেয়ে দল ফিরলেও, প্রধান প্রশিক্ষক প্রদীপ ব্যানার্জি বললেন যে এই সফরের দরুন ফুটবলারদের অভিজ্ঞতা বেড়েছে।

সোভিয়েত সফরের গ্লানি ভুলে ভারতীয় দল যাত্রা করল কুয়ালালামপুরের জন্য। সেখানেও পরাজয় এড়ানো সম্ভব হল না, যদিও দক্ষিণ কোরিয়ার তৃতীয় স্থানীয় একটি দলকে পরাজিত করে সমর্থকদের কিছুটা সহানুভূতি পেয়েছিল ভারতীয় একাদশ। অন্য খেলাগুলিতে ইতিপূর্বে যাদের বিরুদ্ধে হারিনি তাদের বিরুদ্ধেই শুধু মারডেকায় জিতেছি।

বিদেশিদলের সঙ্গে অনেক খেলা হল, কিন্তু ফললাভ ! ছবি : নিখিল ভট্টাচার্য

ভারতীয় ফুটবল দলের এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণ প্রথম থেকেই অনিশ্চিত ছিল। ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা প্রথমে নির্দেশ দিয়েছিল যে গত এশিয়াডে যে সব প্রতিযোগী বা দল অন্তত তৃতীয় স্থান পেতে সক্ষম হয়নি, সে সব প্রতিযোগীদের সোল যাওয়ার ছাড়পত্র দেওয়া হবে না। ওই মাপকাঠিতে ফুটবল দলের যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ছিল না।

কিন্তু এরপর শুরু হল [illegible] পালা। বিভিন্ন সংস্থা থেকে অনুরোধ আসতে শুরু করল যে তৃতীয় স্থান নয়, নির্বাচনের ভিত্তি হওয়া উচিত গত এশিয়াড বা সেই খেলার এশিয় চ্যাম্পিয়ানশিপে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করা। আই ও এ এই ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিলেও ফুটবলে ষষ্ঠ স্থান পাওয়ার প্রমাণ ভারতীয় দলের. ছিল না। গত এশিয়াডে ভারত কোয়ার্টার ফাইনালে সোল এশিয়াডের ফাইনালিস্ট সৌদি আরবের সঙ্গে খেলায় পরাজিত হয়। অতএব ভারতের স্থান ছিল পঞ্চম থেকে অষ্টমের মধ্যে।

পরে অবশ্য অনেক কথা এবং আরো যুক্তি দেখানো হয়। প্রথম হল স্যাফ গেমসে সোনার পদক পাওয়া। স্যাফের প্রতিদ্বন্দ্বীদের ফুটবল মান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না হলে অবশ্য এই সাফল্যের জন্য সোল যাত্রা আই ও এ অনুমোদন করত। কিন্তু বাংলাদেশ ছাড়া ভারতের তেমন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে খেলতে হয়নি। নেপাল, পাকিস্তানীরা এখনো ভারতের চেয়েও পিছিয়ে।

মারডেকাতেও ভারত আহামরি কিছু করেনি। সেমি-ফাইনালে পৌঁছলেই যে সেটা বড় কৃতিত্ব হিসাবে মেনে নিতে হবে তার কোনো মানে নেই। বিশেষ করে যেখানে বেশ কয়েকটি দেশ প্রথমে নাম দিয়েও পরে কোনো দল পাঠায়নি। দক্ষিণ কোরিয়া ত ন্যাশনাল দল পাঠাবার বদলে তাদের তৃতীয় স্থানীয় একটি টিম পাঠায়।

এই সব দেখে আই ও এ এবং সরকার খুব সহজভাবে ফুটবল দলের এশিয়াডে যোগদান মেনে নিতে পারছিল না। সরকারের প্রথম দুটি অনুমোদিত দলের মধ্যে ফুটবল দল ছিল না। শেষের দিকে, অনেক অনুরোধ করার পর, ফুটবলে ভারতের প্রতিনিধিত্ব অনুমোদন করলেও, সরকার কোনোরকম

আর্থিক ভার নিতে অস্বীকার করে। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন কোনোরকমে টাকা যোগাড় করে দলটিকে সোল পাঠায়। তবে এর মধ্যেও বাধা ছিল। প্রথমে শুধু একজন কোচের যাওয়ার অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল। পরে, অনেক কষ্টে, অরুণ ঘোষের ছাড়পত্র মিলল। কিন্তু যার ওখানে উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরি ছিল, সেই দর্শন ট্যান্ডনের জন্য কোনোভাবেই ছাড়পত্র পাওয়া গেল না। অথচ ট্যান্ডন থাকলে অন্তত শারীরিকভাবে খেলোয়াড়েরা বুঝতে পারত।

এশিয়াডের শোচনীয় ফলের জন্য আংশিকভাবে খেলার ড্র-কে দায়ী করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়েই দক্ষিণ কোরিয়া এবং চীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে জেনে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা মুষড়ে পড়েছিল। বিশ্ব কাপে দক্ষিণ কোরিয়া শুধু যে চিওজয়ী খেলা খেলেছিল তা নয়, সেখানকার অভিজ্ঞতা এবং নিজের দেশের দর্শক সমর্থন মিলিয়ে এই দলটি অজেয় রূপ ধারণ করেছিল। এশিয়ার মধ্যে চীনও বরাবর এক কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী যার বিপক্ষে ভারত মাঝে মাঝে ড্র করতে সক্ষম হলেও ইদানীংকালে জিততে পারেনি। এই দুটি দেশের সঙ্গে ছিল বাহরিন। ইংল্যান্ডের ডন রেভির তত্ত্বাবধানে।

খেলাগুলি হয় পুসান শহরে, সোল থেকে অনেক দূরে। এবং প্রথমে ম্যাচেই বোঝা যায় যে সোলের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে খেলার যৌক্তিকতা বা ভাগ্য, কোনোটাই ভারতের ছিল না। স্কিল আর দৃঢ়তা, দুটিরই অভাব ছিল ভারতীয় খেলোয়াড়দের। তার সঙ্গে যোগ হল প্রথম ম্যাচে মাঠে ঘাসের তলায় জলের জন্য বল নিয়ন্ত্রণের অক্ষমতা। দক্ষিণ কোরিয়া তিনের বদলে পাঁচ গোলের ব্যবধান রচনা করতে পারতো। অন্যদিকে ভারত দুটি গোলের সুযোগ অপচয় করে।

এদিকে চীন বাহরিনকে ৫—০ গোলে পরাজিত করে ভারতের সঙ্গে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামে। ছন্দহীন ভারতীয় দল দু গোলে পিছিয়ে পড়ে, একটি গোল শোধ দিয়েও কোনো সময়েই আশা জাগাতে পারেনি। আর চীনারাও এগিয়ে থাকার জন্য বেশী মনোযোগ দিয়ে খেলেনি।

কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা একরকম নিশ্চিতভাবে হারিয়ে ভারত বাহরিনের বিপক্ষে শেষ ম্যাচ খেলে। আশা ছিল খেলা ড্র করার, কিন্তু কার্যতভাবে দেখা গেল ভারত প্রথমার্ধেই তিন গোল হজম করে প্রতিযোগিতার শেষ গ্লানিটুকু মেখে নিল।

তাহলে এত দিনের পরিশ্রম করার ফল কি হল? তিনটি ম্যাচে আট গোল খেয়ে একটি গোল করতে সক্ষম হল এমন একটি দল, যার জন্য লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়েছিল প্রস্তুতি পর্বে এবং ব্যাঙ্কের লোন নেওয়া হয়েছিল প্রতিযোগিতায় পাঠানোর জন্য।

এই নিয়ে ভারত সবরকম পরীক্ষাই করল। নবীন দল গঠন করা, প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়দের নিয়ে স্বল্প সময়ের শিবিরের মাধ্যমে দল তৈরি করা, আবার অনলস পরিশ্রম করিয়ে চল্লিশজন খেলোয়াড় থেকে চূড়ান্ত দল গঠন করে প্রতিযোগিতায় নামা। কোনোভাবেই ভারতকে হার থেকে বাঁচানো যায়নি। বরং দেখা যাচ্ছে যত বেশী প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, ততই যেন খেলা খারাপ হচ্ছে।

অনেকের মতে, প্রদীপ ব্যানার্জি কার্যকর কোচ নন—ওঁর পক্ষে সাফল্যের সীমা হল ক্লাব পর্যায়ের খেলা। আপাতদৃষ্টিতে তা মনেও হতে পারে, কারণ উনি একাধিকবার প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পেয়েছেন; কিন্তু ওঁর তত্ত্বাবধানে ভারতীয় দল উল্লেখযোগ্য ফল করেনি।

কিন্তু ওঁর বদলে যাঁরা এসেছেন তাঁরাই বা কি করেছেন? চিরিচ মিলোভান প্রথমেই কিছু চমক দেখিয়ে ভারতীয় নিস্পৃহতার কাছে হার মেনে নিলেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে তেরঙা জার্সি-প্যান্ট-মোজা ছাড়া উনি এই দেশকে আর কোনো উপহার দিতে পারেননি। বরং দেশের ট্রাইকালারকে বিদ্রূপ করার সামগ্রীই উনি দিয়ে গেলেন।

ইদানীংকালের পারফরমেন্স দেখে সকলের মনেই এখন ওই প্রশ্নই বার বার ফিরে এসেছে—আর কতদিন এই গ্লানি সহ্য করতে হবে? বর্তমানে সবচেয়ে ভাল খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া (দু-একজন ছাড়া) ভারতীয় দল এশিয় প্রতিযোগিতাতেই হিমসিম খাচ্ছে। বিশ্ব পর্যায়ে খেলার প্রশ্ন ত ওঠেই না।

অবস্থা এমন নয় যে প্রতিটি ম্যাচেই ভারত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হচ্ছে। প্রদীপ ব্যানার্জি এবং মিলোভান, দু'জনের অধীনেই ভারতীয় দল কয়েকটি কৃতিত্বপূর্ণ খেলা খেলেছে। এই মুষ্টিমেয় কয়েকটি খেলায় সাফল্যই ভারতের কাল হয়েছে।

খেলার মানের ধারাবাহিকতা তখনই থাকে যখন খেলোয়াড়দের অন্তত বেসিক স্কিল এবং ফিটনেস নিয়ে কোনো সংশয় থাকে না। কিন্তু ভারতীয় ফুটবলারদের এই দুই ব্যাপারেই গোড়ায় গলদ থাকায় কোনো সময়েই বলা যায় না যে মাঠে তাদের কি হাল হবে। একদিন সকলেই উদ্বুদ্ধ হয়ে খুব ভাল খেলা প্রদর্শন করেই পরের দিন যেন খেলাই ভুলে যান। তখন মনে হয় এই খেলোয়াড়দের জন্য এত পরিশ্রম এবং এত টাকা খরচ করার কোনো মানেই হয় না।

অনেক বছর ধরে অনেকেই বলছেন যে জুনিয়ারদের প্রতি নজর দিলে ফুটবলের স্ট্যান্ডার্ড উন্নত করা যায়। এক সুব্রতকাপ থেকে এখন জুনিয়ার, এমন কি সাব-জুনিয়ার জাতীয় প্রতিযোগিতাও শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এতে কি লাভ হয়েছে।

ছোটদের খেলাতেও দেখা গেছে দূরদর্শিতার অভাব। জুনিয়ারদের নিয়ে ক্যাম্প করা এক ব্যাপার আর তাদের জন্য তিন-চার বছর মেয়াদী এক পরিকল্পনা রচনা করা অন্য ব্যাপার। এ আই এফ এফ এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় না হলেও, এমন কিছু আজও করতে পারেনি যার ফলে দীর্ঘমেয়াদী কোনো প্ল্যান কার্যকর করা সম্ভব।

আরও মজার ব্যাপার হল এই জুনিয়ার আর সাব-জুনিয়ার স্তরেও সিলেকশন নিয়ে কথা উঠেছে। এই লেভেলেও যদি ভারতের একান্ত নিজস্ব এই ব্যাধি সংক্রামিত হয়, তাহলে ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করাও বৃথা।

এ দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা নিয়ে আজ যাঁরা মাতব্বরি করছেন তাঁদের এখন চিন্তা করা উচিত যে শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে খেলার মানের উন্নতি করা সম্ভব নয়।

একটা সময় ছিল যখন চীন কয়েক বছরের জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত ছিল। দেশে "নিবিড় প্রশিক্ষণে" মেতে তারা শুধু মানোন্নয়নের চেষ্টাই করেছিল। বছর কয়েক পরে তারা যখন আবার আন্তর্জাতিক আসরে নামে, তখন দেখা গেল যে প্রশিক্ষণের ফলে তারা এশিয়স্তরে একেবারে প্রথম সারিতে উঠে এসেছে।

চীন বিভিন্ন খেলার জন্য যে ব্যবস্থা নিয়েছিল, ভারতের ফুটবলের ক্ষেত্রে তাই নেওয়া উচিত। অন্তত পাঁচ বছরের জন্য সিনিয়ার পর্যায়ে দেশের বাইরে কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করাই উচিত। ভারতের ফুটবলের এখন এমন অবস্থা যে কোনো উদ্যোক্তাই এ দেশের টিম নিয়ে যাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে না।

এই পাঁচ বছরে চেষ্টা করা উচিত বর্তমানে যারা ১২-১৫ বয়ঃসীমায়, তাদের নিয়ে ইন্টেনসিভ কোচিং করিয়ে জাতীয় দল তৈরি করায় মন দেওয়া। আশা করা যায়, এশিয় চ্যাম্পিয়ান না হলেও, প্রথম সারিতে এই দল নিশ্চয়ই পৌঁছতে পারবে।

তবে এ কথাও অনস্বীকার্য যে এই ফুটবলারদের জন্য প্রশিক্ষক নিয়োগের আগে সব দিক বিবেচনা করা উচিত। প্রদীপ ব্যানার্জিকে অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অরুণ ঘোষকেও। নঈম-হাবিবের দল কোচিং ক্ষেত্রে এখনও নবীন, অতএব ওঁদের হাতে এই ছেলেদের ছেড়ে দেওয়াও উচিত হবে না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কোচের সময়। এমন একজনকে নিয়োগ করতে হবে যাঁর পক্ষে শুধু পূর্ণ মনসংযোগ নয়, টানা পাঁচ বছর সময় দেওয়া সম্ভব।

সবদিক বিচার করলে মনে হয় একজন নিষ্ঠাবান বিদেশী কোচ পেলেই সবচেয়ে ভাল হয়। মিলোভানের মতই একজন যাঁকে এ আই এফ এফ এ'র দলাদলির প্রকোপে পড়তে হবে না। যাঁর হাতে সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলার বা নিয়োগ করার পরে নতুন নতুন শর্ত দেওয়া চলবে না। মানে এমন একজনের হাতে দেশের ফুটবলের ভবিষ্যৎ সঁপে দিতে হবে, যাঁর প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা থাকবে। তাহলেই হয়ত আগামী দিনে ভারতের ফুটবল প্রেমীরা গ্লানিমুক্ত হতে পারবে। ■

বৈ দে শি কী

ভিয়েনায় চেরনোবিল প্রসঙ্গ, বিস্তর রাজনীতি

অরুণ বাগচী

এই সেপ্টেম্বরের ২৬ তারিখে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি বা আই এ ই এ (IAEA) সংস্থার যে বিশেষ অধিবেশন ভিয়েনায় সমাপ্ত হল নানা কারণেই তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৯৪টি দেশের মোট ৬৩৯ জন ডেলিগেট ওই অধিবেশনে অংশ নেন। পশ্চিম জার্মান সরকারের অনুরোধ ও প্রচেষ্টায় ওই অধিবেশন বসে, এবং এই সুবাদে বিলক্ষণ সাধুবাদ বন্ সরকারের প্রাপ্য। সোভিয়েত ইউনিয়নে চেরনোবিল পরমাণু দুর্ঘটনার পর সারা পৃথিবীতে যে গভীর অস্বস্তি, দুশ্চিন্তা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় সেই পরিপ্রেক্ষিতেই পশ্চিম জার্মানী আই এ ই এ-র অধিবেশন ডাকার উদ্যোগ নেন। মাত্র তিন দিনের আলোচনার শেষে মূল্যবান যে দুটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে, ভাবীকালের পক্ষে সে দুটি চমৎকার রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করবে, এমন আশা নিশ্চয় করা যেতে পারে।

প্রস্তাব দুটি হল (১) কোনও দেশে পরমাণু দুর্ঘটনা হওয়ামাত্র প্রতিবেশী এবং নিকটবর্তী দেশগুলিকে দ্রুত সেই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত করতে হবে, বিশেষত যদি সীমান্ত পেরিয়ে তেজস্ক্রিয়তার তরঙ্গ নিকটে বা দূরে প্রসারিত হবার আশঙ্কা থাকে অথবা দেখা দেয়। (২) কোনও দেশে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে সদস্য দেশগুলি অবিলম্বে এবং যথাসাধ্য ওই দুর্গত দেশকে জরুরি ভিত্তিতে সাহায্য দেবে।

স্থানীয় হফবুর্গ প্রাসাদে পাঁচ পরমাণু-শক্তিধর দেশসহ ৪১টি দেশ ওই প্রস্তাব দুটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষর দিয়েছেন। প্রস্তাব দুটির স্পষ্ট তাৎপর্য হল, পরমাণু দুর্ঘটনা হলে অবিলম্বে সদস্যদের এ সম্পর্কে অবহিত করা, যাতে অপ্রত্যাশিতভাবে তেজস্ক্রিয়তার শিকার হতে না হয়। অজ্ঞতা এক্ষেত্রে করাল মৃত্যুকে ডেকে আনতে পারে। অন্য তাৎপর্য হল, নিরাপত্তার নিরিখে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে সুদৃঢ় করা, বিস্তৃত করা। আবহ যাতে দূষিত হতে না পারে, সেজন্য অগ্রিম সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। প্রস্তাবের খসড়ায় প্রথম সই করে নরওয়ে, ডেনমার্ক এবং চেকোশ্লোভাকিয়া। আই এ ই এ সংস্থার চেয়ারম্যান হানস ব্লিক্স সম্মেলনের সমাপ্তি শেষে জানান যে, ২৭ অক্টোবর থেকে প্রস্তাবগুলি কার্যকর হবে। একটি ছোট 'এমার্জেন্সি সেল' গড়ে দেওয়া হয়েছে যাতে হঠাৎ কিছু ঘটলে ওই সেল অবিলম্বে কাজ শুরু

তেজস্ক্রিয়তার শিকার মানুষরা মৃত্যুর প্রতীক্ষায়

করে দিতে পারে। প্রস্তাবগুলোকে কাজে লাগাবার সুযোগ তাদেরই করে দিতে হবে।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে চেরনোবিল দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই পশ্চিম জার্মানীর পক্ষ থেকে আই এ ই এ-র বিশেষ অধিবেশন ডাকার অনুরোধ আসে। কিন্তু মূল যে প্রস্তাব নেওয়া হল সেগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয় ১৯৮৩তে, মার্কিন পরমাণুচর্চার ক্ষেত্রে যে দুর্ঘটনা ঘটে থ্রি-মাইল আইল্যাণ্ডে তারই পর। লক্ষণীয় যে তখন চিন্তাভাবনা বা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে যে গড়িমসি ভাব ছিল, এবার আর তা দেখা যায়নি। চেরনোবিল দুর্ঘটনা সবাইকে এমন চমকিত ও ভীত করে তুলেছে যে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে বিশেষ কোনও মতদ্বৈধ আর নেই। রুশ দুর্ঘটনার মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাস হয়ে গেছে। ডিরেক্টর জেনারেল ব্লিক্স গর্ব করে উল্লেখ করেছেন এই কথা। গর্ব তিনি করতে পারেন। তবে এক হিসাবে বিশেষ অধিবেশনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, পরমাণু-শক্তিধর দেশগুলি আলোচনা শুরু হবার আগে ঘোষণা করে যে পরমাণু অস্ত্রাদির ব্যাপারে পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় যদি অনভিপ্রেত কিছু ঘটে, যদি মনে হয় যে তেজস্ক্রিয়তার আঘাত সীমান্ত-পরবর্তী এলাকায় সংক্রামিত হতে পারে, তবে তৎক্ষণাৎ সে খবর সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে। যে সংস্থার সদস্য সংখ্যা ১১৫, এবং পরমাণু শক্তি ও অস্ত্রে বলবান দেশগুলি যার শামিল, সেই সংস্থা যে বিশ্ব-নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে সে বিষয়ে কোথাও কোনও সংশয় থাকবারই কথা নয়।

সোভিয়েত সরকার সক্ষোভে বলেছেন যে চেরনোবিল দুর্ঘটনাকে সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে, রুশ-বিরোধী প্রচারকার্যে ব্যবহার করা হয়েছে। অভিযোগ মিথ্যা, সেকথা বলা চলে না। কিছু কিছু মহল থেকে এমনভাবে খবর পরিবেশিত হয়েছে যে মনে হবে তারা দুর্ঘটনাজনিত ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে দুঃখিত বা চিন্তিত যতখানি, তার চেয়ে ঢের বেশী উৎফুল্ল যে রাশিয়া বিপদে পড়ে গেছে। যেন চেরনোবিল এক ঈশ্বরপ্রেরিত যষ্ঠি যা দিয়ে মনের আনন্দে রাশিয়াকে পেটান যায়। বলা বাহুল্য এই মনোভাব খুবই নিন্দার্হ। কিন্তু মনুষ্যচরিত্র তো অমনই। রাজনীতির লড়াইও আছে। তাছাড়া কিঞ্চিৎ কৌতুকপ্রদ দিকও একটা আছে। ধনী এবং ক্ষমতাসম্পন্ন হবার বিপদও তো ধরতে হবে। সমাজে যিনি সফল বিত্তবান ও শক্তিমান, অপরের ঈর্ষার জ্বালা তাঁকে সইতেই হবে। আপন দেশে রাশিয়া শ্রেণীহীন সমাজই স্থাপন করুক আর যাই করুক, দুনিয়ার চোখে সে আমেরিকার সমগোত্রীয়। সেই হিসাবে দুই মহাশক্তিধর দেশ আমেরিকা বা সোভিয়েত ইউনিয়ন কিঞ্চিৎ বিপদে পড়ে গেলে অনেকেই ভিতরে ভিতরে পুলক অনুভব করেন।

এ ছাড়াও মানতেই হবে যে চেরনোবিল পরমাণু কেন্দ্রে দুর্ঘটনা ঘটবার পর সোভিয়েত সরকার যে গোপনতা অবলম্বন করে বসেছিলেন সেটা মোটেই প্রশংসা করবার মতো নয়। চেরনোবিলে দুর্ঘটনা ঘটে ২৬ এপ্রিল। পরদিন, অর্থাৎ ২৭ এপ্রিল সুইডেনের ফাসমার্ক পাওয়ার স্টেশনে ধরা পড়ল যে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। যেহেতু সুইডেনের ভিতরে বা বাইরে কোনও খবর পাওয়া যায়নি, সেহেতু বিজ্ঞানীরা ধরে নিলেন যে গোলযোগটা ঘটছে ফাসমার্ক কেন্দ্রেই। বিপদসূচক ঘণ্টা বাজিয়ে বাড়তি লোকদের সব সরিয়ে দেওয়া হল চটপট। কিছু পরে যখন খবর মিলল যে সুইডেনের পূর্বপ্রান্তে সর্বত্রই তেজস্ক্রিয়তার পরিমাপ বেড়ে গেছে তখন ফাসমার্ক কেন্দ্রে খানিকটা স্বস্তি ফিরে এলো। সুইডেনের বিজ্ঞানীরা দ্রুত বুঝেও গেলেন যে বিকীরণ যা হচ্ছে সেটা আসছে লিথুয়ানিয়া, বাইলোরাশিয়া এবং ইউক্রেনের দিক থেকে।

আই এ ই এ-তে সোভিয়েত প্রতিনিধি লেগাসভ

২৮ এপ্রিল সরকারের নির্দেশে মস্কোস্থিত সোয়েডিশ দূতাবাস থেকে রুশ সরকারকে জিজ্ঞেস করা হল যে, ব্যাপারটা কী। প্রথমটা তাঁরা বললেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের কোথাও কোনও পরমাণু দুর্ঘটনা ঘটেনি। সেদিনই সন্ধ্যায় অবশ্য সোভিয়েত সরকার প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে চেরনোবিল কেন্দ্রে এক "দুর্ঘটনা" ঘটেছে। একটা রি-অ্যাকটর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। "দুর্ঘটনাজনিত ক্ষয়ক্ষতির মোকাবিলা করার জন্য এবং আহতদের সহায়তা দানের জন্য" উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। একটি সরকারী কমিশন গঠন করা হয়েছে। ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যাবেলা সরকারী সংবাদে জানা গেল যে "রেডিও-অ্যাকটিভ এমিশন্স" ঘটেছে, দুজন মানুষ মারা গেছেন, পরমাণু কেন্দ্রের কাছাকাছি এলাকার অধিবাসীদের দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এর পর বহুদিন ধরে একটু একটু করে খবর যা মিলল তা থেকে বোঝা গেল দুর্ঘটনা হয়েছিল বেশ বড় মাপের। ক্ষতির পরিমাণ এবং তেজস্ক্রিয়তাজনিত বিপদকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখবার জন্য বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেছেন রুশ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা। সোভিয়েত সরকার সব সময়ই দাবি করে গেছেন যে পরিস্থিতি তাঁরা নিয়ন্ত্রণেই রেখেছেন। আই এ ই এ যে প্রতিনিধিদল রাশিয়ায় পাঠায় ডঃ ব্লিক্সের নেতৃত্বে, তারা মে ৫ থেকে ৯ তারিখ ওদেশে থাকে এবং রিপোর্ট দেয় যে অবস্থা সত্যিই সোভিয়েত সরকার হাতের মুঠোয় রেখেছেন। কিন্তু চেরনোবিল দুর্ঘটনার পর যাঁকে ঘটনার মোকাবিলা করার পুরো দায়িত্ব দেওয়া হয়, সেই ডঃ ভেলিখোভ পরে স্বীকার করেছেন যে অবস্থা মোটেই নিশ্চিন্ত হবার মতো ছিল না। ১০ মে তারিখের আগে সবাই ভয়ে ভয়ে ছিলেন যে আর একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে না যায়। "There was a serious danger of a further catastrophe—a 'melt down' in which the molten core of the reactor could have penetrated its foundations and caused serious contamination of the Ukranian water table." দুর্ঘটনা ঘটবার পুরো ১৮ দিন পর মিখাইল গোর্বাচেভ এলেন টিভি ক্যামেরার সামনে। দেশবাসীকে তিনি জানালেন যে 'সংকট' মোকাবিলা করার সমস্ত কর্তৃত্ব পলিটব্যুরো নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। যদিও সোভিয়েত সরকার কখনই স্বীকার করেননি যে রিঅ্যাকটর গঠনের ত্রুটি ছিল, এটা সহজেই বোঝা যাচ্ছিল যে চেরনোবিল দুর্ঘটনা এবং তজ্জনিত দেশবিদেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া সোভিয়েট নেতাদের খুবই বিচলিত করে দিয়েছে। দুর্ঘটনার পরবর্তী কয়েক মাসে চেরনোবিল রিঅ্যাকটরের প্রায় পুরো ব্যবস্থাপক টিমটিকেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার পর যে তদন্ত কমিশন গঠিত হয়, এর মধ্যেই চার বার তার চেয়ারম্যান পালটানো হয়েছে।

২০ জুলাই তারিখে প্রাভদা পাঠকদের জানায় যে পলিটব্যুরো এর মধ্যেই কমিশনের রিপোর্ট বিচার বিবেচনা করে দেখেছেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে, পরমাণু কেন্দ্র পরিচালনার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা যথেষ্ট গাফিলতি দেখিয়েছেন। নিয়মকানুন মোটেই মানেননি তাঁরা। পরীক্ষা নিরীক্ষা চালনোর সময় যতটা সতর্কতা নেওয়া উচিত ছিল তা নিতে পারেননি। নিরাপত্তার দিকটাও অবহেলিত হয়েছে। রাজ্য কমিটির যে চেয়ারম্যানের উপর ভার ছিল পরমাণু চর্চার কেন্দ্রগুলিতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে। শক্তি ও বিদ্যুতীকরণ মন্ত্রকের এক উপমন্ত্রীকেও হটিয়ে দেওয়া হয়েছে। দোষী ব্যক্তিদের বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা হবে যথাকালে। ওই ২০ জুলাই তারিখে প্রাভদার হিসাব অনুযায়ী মৃত্যুসংখ্যা ২৮ তেজস্ক্রিয়াজনিত আঘাতপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা ২০৩—বলা বাহুল্য এই হিসাব প্রচলিত ধারণার সঙ্গে ঠিক মেলে না। এসব ক্ষেত্রে কখনই কোনও দেশেই সরকারি এবং বেসরকারি হিসাব এক হয় না।

সবাই জানেন যে দুর্ঘটনার পর পশ্চিম ইয়োরোপের নানা দেশে কী রকম আতঙ্কের সঞ্চার হয়েছিল। কী পরিমাণ খাদ্যশস্য, ফলমূল তরিতরকারি, গবাদি প্রাণী বিভিন্ন দেশে সরকারী নির্দেশে বিনষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আজও নাকি অনেকে দুধ, পনীর এবং অন্যান্য দুগ্ধজাতীয় খাদ

প্রত্যাখ্যান করে চলেছেন। সব চেয়ে যে ব্যাপার নিয়ে হইচই হয়েছে তা হল (১) সঠিক মৃত্যুসংখ্যা কত ? (২) ক্ষতির পরিমাণ সত্যই কতটা গিয়ে দাঁড়াবে ? একটা খবর শোনা গিয়েছিল যে তেজস্ক্রিয়াজনিত ক্যানসার রোগে হাজার হাজার মানুষ আগামী কয়েক বছরে মারা যাবে। সোভিয়েত সূত্রগুলি এই সব মতামত দৃঢ়তার সঙ্গে উড়িয়ে দেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সংবাদমাধ্যম ক্রমাগত প্রচার করে যায় যে মৃত্যুসংখ্যা একটা ভয়াবহ চেহারা নেবে।

ভিয়েনার সম্মেলনে উপস্থিত পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা যে সব বক্তব্য রেখেছেন তাতে মনে হয় যে ক্ষয়ক্ষতির হিসাবটা সবাই বাড়িয়ে দেখেছেন। অর্থাৎ সোভিয়েত সরকারের অভিযোগ ভিত্তিহীন ছিল না। ওই বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে ক্যানসারের ফলে সম্ভাব্য মৃত্যুর সংখ্যা যা বলা হয়েছে, আসল সংখ্যাটা তার দশ ভাগের একভাগ বড় জোর হবে। অধিবেশনে মেডিকেল কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ ড্যান বেনিসন বলেছেন যে আগামী ৭০ বছরে সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্যানসারে যত রোগী মারা যাবে (সোভিয়েত হিসাবে সংখ্যাটা এক কোটির মত), চেরনোবিল দুর্ঘটনার ফলে সেটা বছরে ২০০০ মত করে বেড়ে যাবে বা যেতে পারে। এটাও কিছু সুখবর নয়। তবে যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল সেই তুলনায় নিশ্চয়ই কম। তাছাড়া ওয়র্লড হেলথ অর্গানাইজেশন-এর বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে দুর্ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতি সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে তেমন কিছু হবে না। এই ছাড়পত্রে সুতরাং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সির ভিয়েনা সম্মেলন নিয়ে খুশী হবারই কথা সোভিয়েত ইউনিয়নের।

আর একটা সুখের কথা: অধিবেশনে যোগদানকারী সব প্রতিনিধিদলের মধ্যেই আলাপ আলোচনা হয়েছে আন্তরিক ও হার্দ্য পরিবেশে। যে যার বক্তব্য অকপটে এবং স্পষ্ট ভাষায় রেখেছেন। উত্তর দেবার কথা যাঁদের, তাঁরাও সহযোগিতা করেছেন। যথাসাধ্য উত্তর দিয়েছেন। এটা লক্ষণীয় হয়েছে মহাশক্তিধর দুই দেশের বেলাতেও। সোভিয়েত এবং মার্কিন প্রতিনিধিরা একত্রে এমন কয়েকটি দুরূহ অঙ্ক মিলিয়েছেন যা একদা কল্পনাতীত ছিল। তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিষয় হল কিউবায় নির্মীয়মাণ পরমাণু কেন্দ্র নিয়ে। কিউবায় দুটি কেন্দ্র তৈরি করে দিচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন যেখানে শান্তির জন্য পরমাণু প্রকল্প নিয়ে চর্চা হবে। বলা বাহুল্য, মার্কিন সরকার ব্যাপারটা নিয়ে আদৌ সন্তুষ্ট নন। ঘরের একেবারে কাছে এমন দুটি কেন্দ্র, সেখানে পরমাণুচর্চার মধ্যে শান্তির স্পর্শ কতটুকু থাকবে, আর যুদ্ধের পেশী সবল করার খেলা কতখানি হবে, সে বিষয়ে সংশয় থাকতেই পারে। বিশেষত আমেরিকা এবং কিউবার পারস্পরিক সম্পর্ক মধুময় তো নয়। ইদানীং, চেরনোবিল দুর্ঘটনার পর নিরাপত্তার প্রশ্নে উদ্বেগ খুবই বেড়ে গেছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের বদ্ধমূল ধারণা হল, সোভিয়েত প্রযুক্তিবিদদের রিঅ্যাক্টর নির্মাণ যতই নিখুঁত হোক, গোড়াতেই গলদ রয়ে গেছে। ডিজাইন-ই

[illegible]

ভুল। তাছাড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নয়। কিউবার পরমাণু কেন্দ্রে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে সেটা আমেরিকার পক্ষে খুব স্বাস্থ্যকর হবে না। ভিয়েনায় সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা মার্কিন প্রতিনিধিদের আশ্বাস দিয়েছেন যে কিউবা কেন্দ্র দুটিতে কী কী এবং কেমনধারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে সেই খবর তাঁদের সরবরাহ করা হবে।

সম্প্রতি আটলান্টিক সাগরে বারমুডার কাছে (৬০৩ সামুদ্রিক মাইল দূরে) দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরমাণুশক্তি চালিত তাদের ডুবোজাহাজ ভেসে উঠলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তৎপরতার সঙ্গে সেই খবরটি সবাইকে দিয়ে দেন। সোভিয়েত সংবাদ সংস্থা তাস (Tass) জানান যে ওই ডুবোজাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র রাখা আছে। পরে জানা গেছে যে ওই ধরনের ডুবোজাহাজ ১৬টি পর্যন্ত পরমাণু অস্ত্রযুক্ত ক্ষেপণাস্ত্র বহন করতে সক্ষম। তাসেরই দেওয়া খবর : জাহাজের একটি কামরায় আগুন ধরে যাওয়ায় তিন জন নাবিক এ পর্যন্ত মারা গেছে। সোভিয়েত ও কিউবার জাহাজগুলি ওই ক্ষতিগ্রস্ত ডুবোজাহাজকে চালনা করে নিয়ে যাচ্ছে।

গোর্বাচেভ স্বয়ং প্রেসিডেন্ট রেগনকে ফোন করে দুর্ঘটনার খবর দেন এবং জানান যে যদিও জাহাজে আগুন জ্বলছে, পরমাণু বিস্ফোরণের কোনও সম্ভাবনা কিন্তু নেই। রেগন বলেন এ ব্যাপারে "কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমেরিকা তা দিতে প্রস্তুত।" এই ঘটনা থেকে দুটি জিনিস বেরিয়ে আসছে। এক : রুশ-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার সদিচ্ছা যত বাড়ে ততই মঙ্গল। দুই : পরমাণু অস্ত্র নিয়ে ডজন ডজন প্লেন ও জাহাজের দৈনন্দিন চলাচল কতখানি বিপজ্জনক, যে কোনও মুহূর্তে কত প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি ঘটে যেতে পারে। পৃথিবীর সচেতন মানুষ মিথ্যা ভয় পাচ্ছেন না। প্রগ্র

এই দেশ : এই বিশ্ব

সোনার হাতছানি মৃত্যু উপত্যকা

মদনগোপাল মুখোপাধ্যায়

কিছু সুগম হবে। কিন্তু নিয়তি বাধ সাধলেন। প্রকৃতি হয়ে উঠলো ক্রমশ রুক্ষতর। ঘাস বলতে কাঁটা গাছ, মাইলের পর মাইল কোন জল নেই, ছায়া নেই, গাছপালা নেই। কঠিন পাহাড়ী মাটি, সর্বত্র পাথর ছড়ানো। পথের কোন রেখা নেই। গাড়িটানা জন্তুগুলোর পা ফেটে যাচ্ছে, খাবার কমে যাচ্ছে, জল নেই। পেছনে ফেরার মতো রসদ নেই আর। অনিশ্চিত অনির্দিষ্ট সামনের পথে এগিয়ে চলা ছাড়া অন্য উপায় বন্ধ। এগিয়েই চললেন দলটি। শুধু পশ্চিমে, আরও দূরে অনেক দূরে সূর্যের দিকে।

বর্তমান লস্ ভেগাস-এর কাছাকাছি এসে নেভাদার মরুর বুক থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে দলটি আবার ভাগ হয়ে গেল পাঁচ ভাগে। তারপর ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে পাহাড় আর রুক্ষ মরুভূমি অতিক্রম করে তারা এসে পৌঁছুল সবুজ সোনার দেশ ক্যালিফোর্নিয়াতে নয়, সর্বনাশা ডেথ্ ভ্যালীতে।

তখন অবশ্য এ জায়গাটার কোন নামই ছিল না, জানতই না কেউ এই প্রেত প্রান্তরের অস্তিত্ব। 'শোসন' ইন্ডিয়ানদের কেউ কেউ থাকতো বটে এই ভ্যালীতে, কিন্তু তারা ছিল সংখ্যায় খুবই কম এবং নবাগত সাদা মানুষদের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগই ঘটেনি তখন পর্যন্ত। পাঁচ ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়া দলগুলি ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় এই ভ্যালীতে এসে পৌঁছয় ও ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে ভ্যালী থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের সবারই অভিজ্ঞতা হয় তিক্ত। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কোনক্রমে বেঁচে তারা ক্যালিফোর্নিয়াতে হাজির হয়। কিছুজন পারে না। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে এই নিষ্করুণ জনশূন্য, প্রাণহীন মরুপ্রান্তরে। তাদের ভিন্ন ভিন্ন গল্পর সব কথা বলা সম্ভব নয়। আপাতত যে দলটিতে সংসারী লোকরা ছিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা বলা যাক। দলটিকে সাধারণভাবে ফ্যামিলি ওয়াগন দল বলা হলেও এদের মধ্যে নানা ধরনের মানুষ ছিলেন। আরকেন ও বেনেট ফ্যামিলি ছাড়াও ওয়েড ফ্যামিলি এবং কিছু অবিবাহিত জোয়ান ছেলে আর ছোট ছেলেমেয়েদের দল। ওয়াগান-গাড়ী দেখাশোনার ভার ছিল লিউস ম্যানলে ও জন রজার্স-এর ওপর।

এঁরা বর্তমান ফ্যার্নেস ক্রীক বলে ছোট একটি মরুদ্যান থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে গিয়ে ভ্যালির বিশাল প্রান্তর অতিক্রম করে পশ্চিম সীমান্তে প্যানামিন্ট পাহাড়ের তলদেশে এসে পৌঁছুল। যে প্রান্তরটি তাঁরা অতিক্রম করেন সেটি হল খটখটে শুকনো নুনজমা প্রাগৈতিহাসিক লেক বেড। এই জমে থাকা নুনের জমিতে কিছুই জন্মায় না। গরমকালে এর তাপমাত্রা ১২০° ফারেনহাইট। পাহাড়-এর তলদেশে পৌঁছে কিছু জল পাওয়া যায় এবং এখানেই তাঁরা ক্যাম্প করেন। ওয়াগনে করে এগার হাজার ফুট পাহাড় অতিক্রম অসম্ভব জেনে তাঁরা রজার্স আর ম্যানলেকে পাঠান সাহায্য আনার জন্য। নিজেরা গাড়ির বলদদের বলি দিয়ে কোনক্রমে বেঁচে থাকেন দিনের পর দিন।

পায়ে হেঁটে রজার্স ও ম্যানলে যখন চলেছেন সাহায্যর সন্ধানে তখন আমরা দেখি অন্য দলগুলির কী অবস্থা।

জে হকার দলটিতে যুবকদের সংখ্যা বেশি থাকায় তাদের উৎসাহ ছিল বেশী। কিন্তু এই কঠিন পৃথিবী কাউকে ক্ষমা করে না। দিনের পর দিন এই ডেথ্ ভ্যালির গোলক ধাঁধায় ঘুরে ঘুরে তারা বেরুবার পথ খুঁজে পায় না। সঙ্গের রসদ যায় ফুরিয়ে। একটি একটি করে গাড়িটানা বলদগুলিকে বলি দিয়ে তারা কোনওক্রমে বেঁচে থাকে। শেষে গাড়িগুলোকে জ্বালিয়ে পায়ে হেঁটে তারা অনিশ্চিতের দিকে হেঁটে যায়। কেউ বাঁচে কেউ বাঁচে না। স্বর্ণাংশুর হাতছানি মায়ামৃগর মতই অস্তগামী সূর্যের দিকে ক্রমবিলীয়মান হয়ে যায়।

রূপকথার মত এই কিংবদন্তীতে ভরা ডেথ ভ্যালি দেখতে একটা কৌতূহল মাঝে মধ্যেই মনটাকে নাড়া দেয় আমার। কেমন সেই জায়গা, যেখানে গেলে নাকি আর ফেরা যায় না! সেই অজানার উদ্দেশ্যেই বেরিয়ে পড়া গেল একদিন। বলদে টানা গাড়ি নয়, ফোর হুইল ড্রাইভ জীপ গাড়ি। পাথুরে নিরুদ্দেশ রাস্তা নয়, বাঁধানো টু লেন হাইওয়ে। যে রাস্তা দিয়ে ফরটিনাইনাররা মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিল, মোটামুটি সেই দিক থেকেই ডেথ্ ভ্যালি যাওয়া ঠিক করলাম। মোহাভী মরুর মধ্যে দিয়ে চৌদ্দ নম্বর রাস্তায় উত্তরে এসে রিজক্রেস্ট বলে এক জায়গায় ডানদিকে মোড় নিয়ে পূবের দিকে যাওয়া। চায়না লেক্ বলে ছোট

শহর বাঁদিকে। এখানে আছে আমেরিকার নৌসেনা বিভাগের অস্ত্রাগার ও ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার ঘাঁটি।

এখানে মাইলের পর মাইল পাথুরে, শুকনো জমি। বৃষ্টিপাত হয় কদাচিৎ। পাহাড়ের ওপর হাওয়া বয় হু হু করে। সেই হাওয়াকে কাজে লাগাবার জন্য হয়েছে নতুন ধরনের স্টিলের উইন্ডমিল। সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের গায়ে যেন নৃত্যরতা ব্যালেরিনারা, হাওয়ায় দুলছে, ঘুরছে নানা ভঙ্গিমায়। মানুষজন নেই, কোন গ্রাম কি চৌকি নেই, নেই কোন পেট্রল স্টেশন। মাইলের পর মাইল নানা রং-এর পাহাড় আর বড় বড় পাথরের চাঁই চারদিকে, যেন অন্য কোন গ্রহে চলে এসেছি!

প্যানামিন্ট ভ্যালি দিয়ে ঢুকছি, ডান দিকে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে নিষেধের

ডেথ ভ্যালি মিউজিয়াম

তর্জনী তুলে প্যানামিন্ট পাহাড়। ১১ হাজার ফুট উঁচু। ওই পাহাড় ডিঙিয়ে ম্যানলে একদিন উদ্ধার করেছিল মৃত্যুপথযাত্রী কটি পরিবারকে। ওই পাহাড়কে ঘুরে গিয়ে আমরা পৌঁছুতে চাই মৃত্যু-উপত্যকায়! চোদ্দনম্বর রাস্তা থেকে আমরা নিয়েছিলাম একশ আটাত্তর নম্বর রাস্তা, তার পর প্যানামিন্ট ভ্যালি রোড দিয়ে এসে ধরা গেল একশ নব্বুই নম্বর রাস্তা। এখানে প্রায় পাঁচ হাজার ফিট উঠতে হয় খাড়াই। টাউনেস্ পাস্। গরমকালে গাড়ির ইঞ্জিন যায় গরম হয়ে। রাস্তার ধারে ধারে তাই রেডিয়েটর-এর জলের বন্দোবস্ত।

এই টাউনেস্ পাস্ দিয়ে বেরিয়ে ছিল জে হকারদের দলটি। পাঁচ হাজার ফিট্ থেকে কয়েক মিনিট হু হু করে নেমে এসে সমুদ্র পৃষ্ঠের সমতল উচ্চতা। স্টোভ'নাইপ বলে একটি জায়গা। পথিকদের জন্য আধুনিক মোটেল, একটি দোকান। এরই কাছে দেখলাম ঐতিহাসিক ফলক।

এখানেই জে হকাররা সর্বস্বান্ত হয়ে তাদের গাড়ি পুড়িয়ে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে যায় মৃত্যুর গহ্বর থেকে। একটু দূরে আছে পরিত্যক্ত একটি কুয়ো। বাঁদিকে আছে বালিয়াড়ি। আপাতত আমরা ভ্যালির ফ্লোরে—এই জায়গার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠের সমান। মাইল আঠারো গিয়ে ফার্নেস্ ক্রীক্ মরুদ্যান। এখানে আছে ভিজিটর সেন্টার, ডেথ্ ভ্যালি ম্যুজিয়ম, পোস্ট অফিস, থাকার জায়গা, একটি দোকান, রেস্তোরাঁ ও পেট্রল স্টেশন। রাত্তিরের আস্তানা নেওয়া গেল এখানেই।

ডেথ্ ভ্যালিতে ভোর কিন্তু ভারী সুন্দর। অচেনা পাখির কাকলি। সিরসিরে ঠাণ্ডা হাওয়া। ভোরের কোমল আলোতে নানান রং-এর পাথর আর পাহাড়ের রূপ পেলব নমনীয়। ভিজিটর সেন্টারে গাইড বোঝাচ্ছিলেন ডেথ ভ্যালির ভৌগোলিক জন্মবৃত্তান্ত। রোমাঞ্চকর সেই কাহিনী, যা নাকি লেখা আছে এর পাহাড়ের পাথরে পাথরে। গত চার বিলিয়ন বছরের ইতিহাস জমা হয়ে আছে এইখানে। প্রথম দু'বিলিয়ন বছরের ইতিহাস অস্পষ্ট হলেও বৈজ্ঞানিকেরা পরবর্তী দু' বিলিয়ন বছরের ইতিহাস খাড়া করেছেন ভূস্তর ও পাথর, মাটি ইত্যাদি পরীক্ষা করে।

প্রাচীন যুগের মেটামরফিক্ পাথর ছড়ানো এই ডেথ্ ভ্যালিতে। আর্লি প্রিক্যাম্ব্রিয়ান, লেট প্রিক্যাম্ব্রিয়ান যুগের পাথর এখানে পাওয়া যায় অনেক। তার পর প্যালিওযোইক যুগ। দু'শ মিলিয়ন বছর আগে সেই সময় দক্ষিণ পশ্চিম আমেরিকার

স্কটির ক্যাসল্‌

অনেকটাই ছিল অগভীর সমুদ্র। যুগ যুগ ধরে পলি জমতে থাকে স্তরে স্তরে এই সমুদ্রবক্ষে। ডেথ ভ্যালিতে এই জমাট হওয়া পলিস্তর প্রায় পাঁচ মাইল গভীর। কিন্তু এই স্তর ডেথ্‌ ভ্যালিতে নানাভাবে ভেঙে চুরে, উলটিয়ে পালটিয়ে তৈরি হয়েছে পাহাড়। যা এখন ঘিরে রয়েছে ডেথ ভ্যালির ফ্লোরকে।
নানান ভৌগোলিক যুগের মধ্যে দিয়ে ডেথ ভ্যালির উত্থানপতন। মেসোজোইক যুগ থেকে সেনোজোইক যুগের মধ্যে নানা পরিবর্তন। ভূতত্ত্ববিদ্‌দের মতে ডেথ ভ্যালি হল 'বেসিন ও রেঞ্জ' এই ভূতাত্ত্বিক বিভাগের অন্তর্গত। ডেথ ভ্যালি হল একটি বেসিন। ভূ-পৃষ্ঠ এখানে কিছুটা দেবে যায়। অনেকটা সী-স খেলার মত। একদিক দেবে যাওয়ায় অন্য দিক উঠে পড়ে। উঠে পড়া অংশটা হল প্যানামিন্ট পাহাড়। দেবে যাওয়া অংশটা হল ডেথ্‌ ভ্যালির ফ্লোর। এককালে এখানে বিশাল লেক ছিল, বহু যুগ ধরে জল বাষ্প হয়ে উঠে যায়, তার ফলে এখন এই জমাট বাঁধা নুন-জমির প্রেত-প্রান্তর। চাঁদের আলোয় মনে হয় মৃত মানুষের হাড়ের মত সাদা চকচক করছে।
ফার্নেস ক্রীক থেকে তেইশ মাইল মত দক্ষিণে 'ব্যাডওয়াটার'। একটুখানি জল। পানের অযোগ্য। নানা কেমিক্যালে ভরা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৭৯·৮ ফিট (৮৫ মিটার) তলায় এই জায়গা। এখান থেকে ঘাড় উঁচু করে পাহাড়ের ওপর দ্যাখা যায় একটা চিহ্ন—'সী লেভেল'। মাইল তিনেক দূরে স্টেট্‌স-এর সর্বনিম্ন স্থান সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে দুশো বিরাশী ফিট্‌ তলায়। এখানে আসার পথে চোখে পড়ে বিচিত্র সব ভৌগোলিক দৃশ্য। বিচিত্র সব নাম 'ডেভিলস' গলফ কোর্স, 'আর্টিস্ট প্যালেট' ইত্যাদি। এই আর্টিস্ট প্যালেট জায়গাটিতে প্রকৃতি রং-এর আয়োজন করেছেন বিপুল সম্ভারে। কেন এবং কীভাবে এখানে এই রং-এর খেলা তা একটা রহস্য। ডেথ্‌ ভ্যালিতে অনেক রহস্যের মধ্যে এটি একটি। কল্পনাকে এখানে বাঁধনছাড়া হতে দিতে ক্ষতি নেই। ডেথ ভ্যালির উত্তর পশ্চিম কোণে উবেহেবি আগ্নেয়গিরি। সোসন ইন্ডিয়ানরা এই নাম দিয়েছিল গিরিগর্ভটির। ক্রেট্যারটির জন্ম হয় আগ্নেয় উৎপাতের পর মাত্র দু'হাজার বছর আগে। আধ মাইল লম্বা ও পঁচিশ ফিট গভীর এই ক্রেট্যারটির কাছেপিঠে আর একটি ছোট ক্রেট্যার।
এখানে যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয় তাতে পাথর, ছাই ইত্যাদি একশ মাইল বেগে ছড়িয়ে পড়ে ছ'মাইল জুড়ে এক বিশাল এলাকায়।
এখানে গহ্বরের কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখা গেল এক ভয়াবহ দৃশ্য। চারদিকে কালো পাহাড়ের মধ্যে পৃথিবীর অন্তস্তল বিদীর্ণ করে এক বিশাল শূন্যতা। ফেটে পড়া মাটির রং লাল। যেন এক বিরাট দৈত্য মুখব্যাদান করে মরে পড়ে আছে। প্রচণ্ড হাওয়া এখানে। দাঁড়ানো যায় না। কুচি কুচি বালি চামড়ায় সূচ ফুটিয়ে দিচ্ছে। অসীম শূন্যতা থেকে উঠে এসে হাওয়ারা যেন বলছে পালাও! পালাও! পালিয়ে যাও। তাড়াতাড়ি নেমে চলে আসছি—চর্তুর্দিকে কালো পাথর আ জমে থাকা ছাই। মাথার ওপর সূর্যদেব তখন ক্রুদ্ধ হচ্ছেন ক্রমশই আশেপাশে মাইলের পর মাইল জনশূন্য প্রান্তর। মাঝে মাঝে পেছনে তাকাচ্ছি, যদি এখনই আগ্নেয়গিরির বহ্নিপাত শুরু হয়! হঠাৎ দেখি ওপরে নীল আকাশের গায়ে একটা বড় সড় পাখি। রেড টেইল হক। কাছে আসতে চোখে পড়লো বাজ
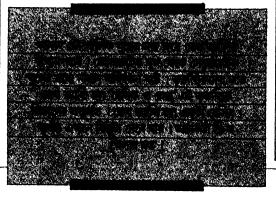
পাখির মুখে ধরা রয়েছে বেশ কয়েক ফুট লম্বা একটা সাপ। অনেক দূর অবধি বাজপাখিটিকে দেখা যাচ্ছে। শিকার ধরে ফিরে যাচ্ছে বাসায়। আজ মহাভোগ তার শিবিরে। এই আপাত প্রাণহীন মরুর বুকেও জীবন আছে। জীবন মরণের নৃত্যখেলা এখানেও চলছে নীরবে। মাঝপথে সেই বালিয়াড়ী।এই হল বিখ্যাত ডেথ ভ্যালি স্যান্ড ডিউন্‌স। অনেকটা জায়গা জুড়ে নানা আকারের বালির স্তূপ।

পাথর থেকে আসা বালি আর হাওয়া মিলে তৈরি করেছে এই বালিয়াড়ী। মিহি বালির মাঝে মাঝে কাঁটাগাছ। পিক্‌ল্-‐উইড, ইংকউইড, ক্রিঅ্যাসোট্‌ মেস্‌ক্যুইট ইত্যাদির ঝোপ বেশ। মেস্‌ক্যুইট গাছের ফল খেয়ে বেঁচে থাকতো ইন্ডিয়ানরা। এই গাছের ছায়ায় থাকে ক্যাংগারু র‍্যাট, আর থাকে ভৈরবের নৃত্যলীলার সঙ্গী কালসাপ—সাইড ওয়াইনডার। ঝুমঝুমি সাপের সমগোত্রীয় এই সাপ অতি বিষাক্ত। এরা চলে সামনের দিকে এঁকে বেঁকে নয়, সমান্তরাল ভাবে পাশাপাশি। বিচিত্র এই গতির কারণ হল গরমকালে এই বালির তাপমাত্রা ২০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট-এর ওপর উঠে যায় তাই বালিতে যত কম শরীর ছোঁয় সেই জন্য এই রকম পেছলানো ধরনের গতি। বালির বুকে এদের গতি চিহ্ন অনুপম। অন্যান্য প্রাণীদেরও পদচিহ্নও পড়ে বালির বুকে। কয়উট, ছোট নেকড়ে বাঘ, কিট্‌ ফক্স, গুবরে পোকা ইত্যাদি। আর শিল্পীর যত্নে নানান তরঙ্গায়িত চিহ্ন রেখে দিয়ে যায় উদাসী হাওয়া। বালি আর বাতাস খেলা করে আপন মনে এই বিশাল নির্জনতায়। সাক্ষী

থাকে দূরের স্থবির পাহাড়। খেলাচ্ছলে দুষ্টু হাওয়া বালিয়াড়ীর শরীরে হাত বুলিয়ে দিয়ে এঁকে দিয়ে যায় তার প্রেমের প্রতীক চিহ্ন।

ক্রমে অন্ধকার নেমে আসে পাহাড়ের কোলে। ফারনেস্‌ ক্রীক মরুদ্যানে ক্যাম্প-ফায়ারের চারদিকে জমা হয় কৌতূহলী জনতা। আলাপ হয় নানা দেশের নানা মানুষের সঙ্গে। কেউ বা এসেছে ফ্রান্স থেকে, কেউ অস্ট্রেলিয়া থেকে, নিউজীল্যান্ড থেকে। অধিকাংশ অবশ্য আমেরিকারই নানা জায়গা থেকে। অল্পবয়সী ছেলেমেয়ের সঙ্গে আছে বৃদ্ধ বৃদ্ধার দল। আমেরিকানরা বেড়াতে ভালবাসে। বয়সটা কোন বাধা নয়। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা রাত এখন। দূরের আকাশে অগণন তারারা ফুটে উঠছে। গল্প শুরু হয় ডেথ ভ্যালির। অনেক সব গল্প। কিছু সত্যি, কিছু মিথ্যে। নানান সব চরিত্র। কেউ লোভী, কেউবা পরোপকারী, কেউবা রগুড়ে ধাপ্পাবাজ, কেউবা খেয়ালী ধনী, কেউবা খনির খোঁজে পাগল। এই সব চরিত্রই ভীড় করে আসে এই অন্ধকারে। গল্প জমে ওঠে।

প্যানামিন্ট পাহাড়ের তলায় কয়েকঘর বিপদগ্রস্ত মানুষকে রেখে উইলিয়াম লিউস্‌ ম্যানলে আর জন রজার্স পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়েছিল এই মরুর বুকে সাহায্য আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। দিনের পর দিন না খেয়ে, বুকফাটানো তৃষ্ণা নিয়ে তারা হেঁটে যায় আজকের লসএঞ্জেলসের দিকে। প্রায় তিনশ মাইল তারা হাঁটে দিনের পর দিন। শুকনো মাংসে গলা দিয়ে নামতে চায় না, মেলে না এক ফোঁটা জল কোথাও! পা ফেটে রক্ত ঝরে, ঝাপসা হয়ে আসে দৃষ্টি ক্লান্তিতে। তবু এই দুঃসাহসী পুরুষ দুটি শেষ অবধি পৌঁছে যায় San Barnadino-তে। সেখানে গিয়ে আবার রসদ ও যানবাহন সংগ্রহ করে ফিরে আসে তারা ডেথ ভ্যালিতে। হাত ধরে টেনে তুলে নেয় মৃত্যুপথযাত্রী হতাশাচ্ছন্ন কটি মানুষকে। কি চরিত্রের দৃঢ়তা ও সাহস! ইচ্ছে করলেই ম্যানলে ও রজার্স ফিরে নাও আসতে পারতেন। কেউ তো জানতো না তাঁদের প্রতিশ্রুতির কথা। তবু তাঁরা ফিরে এসেছিলেন। কথা রেখেছিলেন জীবন পণ করে। এই উদ্ধারের কাহিনী আমেরিকার সাহসের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

সংসারীদের সবাই জীবিত ফিরে গেলেও অন্যান্য দলগুলির সবাই কিন্তু বেঁচে ফিরতে পারে না এই ভ্যালির মৃত্যু আলিঙ্গন থেকে। ৪৯-দের চোদ্দজন শেষ নিশ্বাস রেখে যায় এই ডেথ্‌ ভ্যালির বাতাসে। এদের মধ্যে দশ জন মারা যায় মরুর বুকে অজানিত ভাবে। ইতঃস্তত ছড়িয়ে থাকে তাদের মৃতদেহ। একজনকে গুলি করে মারা হয় টাউনেস পাসের কাছে। নাম জানা যায়নি এই লোকটির। তবে তাকে যে গুলি করে মারা হয়েছিল একথা হলপ্‌ করে বলে ইন্ডিয়ান চীফ হাংরী বিল। হাংরী বিল এই গল্প বলে যায় বহুদিন আগে।

সে শুনেছিল তার বাবার কাছ থেকে সেই মর্মস্পর্শী গল্প। পাহাড় পেরুতে গিয়ে পা ভেঙে যায় মানুষটির। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে চলতে পারে না সাথীদের সঙ্গে পা মিলিয়ে।

বালিয়াড়ীর স্তব্ধ ঢেউ

নির্দয় এই কঠিন পাহাড় আর পাথরের মধ্যে ভেঙে পড়া মানুষটির কপালে গুলি করে মেরে ফ্যালে তার সঙ্গীরা। যন্ত্রণার শেষ হয়। হাংরী বিলের বাবা দেখেছিল তার কংকাল। পায়ের হাড়ভাঙা দু'জায়গায়, খুলির মধ্যে বুলেটের গর্ত আর—গলার ওপর তখনও ঝোলানো একটা সোনার লকেট। লকেটটা ছিঁড়ে নিয়ে রেখে দিয়েছিলো হাংরী বিলের বাবা। এক সন্ধ্যার অন্ধকারে এই পাহাড়েরই কোথাও এমনি এক ক্যাম্প ফায়ারের আলোয় হাংরী বিল দেখিয়েছিল সেই লকেটটি জার্নালিস্ট, লেখক কার্ল হুইটকে। লকেটটি খুলে কার্ল দেখতে পেলেন পুরনো দিনের জামাকাপড় পরা সুন্দরীর একটি মুখ। কে সেই নিহত

ক্যাকটাস ফুল

পুরুষ ? কে এই সুন্দরী তার হৃদয় জুড়ে ছিল ? কেউ জানে না। মৌন ডেথ্ ভ্যালি কোন কথা বলে না। রাত বাড়ে, ছমছম করে গা। পাহাড়ের কালো ছায়া। চাঁদের আলোয় নানা আকারের পাহাড়গুলোকে রহস্যময় মনে হয়। নুনের লেক সাদা হাড়ের মত পড়ে থাকে। ভিড় করে আসে কত না চরিত্র, কত না রোমাঞ্চ-রহস্যে ভরা। ১৮৬১ সালে আবার সোনার খনির সন্ধানে আসে একটি ছোট দল।তাদের মধ্যে ছিল ষাট বছরের বয়স্ক চার্লস অ্যালফোর্ড বলে একটি লোক। সোনার খনির সন্ধান না পেয়ে তার দলের লোকেরা অ্যালফোর্ডকে ডেথ ভ্যালিতে ছেড়ে পালিয়ে যায়। বৃদ্ধ অ্যালফোর্ডের মৃত্যু ছিল নিশ্চিত। কিন্তু আর একবারও ম্যানলেকে বিধাতা নির্দেশ দিলেন মানুষের প্রাণ বাঁচাতে। লস এঞ্জেলস্ থেকে আবার ম্যানলে বহু বাধার মধ্যে ফিরে আসে এখানে। উদ্ধার করে অসহায় অ্যালফোর্ডকে।

ডেথ ভ্যালির ইতিহাসে ম্যানলের নাম চিরকাল বেঁচে থাকবে বীর, সাহসী হিসাবে। ম্যানলে যদি হয় বীর চরিত্র, তাহলে রঙীন চরিত্র হল স্কটী বলে একট লোক। পুরো নাম ওয়ালটার স্কট। এগার বছর বয়সেই সে তার বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়। তারপর এখানে ওখানে কাজ করতে করতে ডেথ ভ্যালিতে রেলরোডের কাজ। সেখান থেকে বাফেলো বিল কোডীর wild west showতে চাকরী। নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে মানুষ হতে হতে একদিন নিউ ইয়র্ক শহরে কপর্দকহীন। 'সোনার খনির সন্ধান পেয়েছি' এই ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে নিউ ইয়র্ক শহরে টাকা যোগাড় করে আবার ডেথ ভ্যালিতে ফিরে আসা। শুধু গল্প দিয়ে, ধাপ্পা দিয়ে খবরের কাগজে নাম ছড়িয়ে স্কটী বিখ্যাত হতে থাকে। ১৯০৫ সালে লসএঞ্জেলস থেকে শিকাগো ট্রেনে গিয়ে তখনকার স্পীড রেকর্ড ভেঙে স্কটী আরও বিখ্যাত হয়ে যায়। সবার মুখে মুখে নাম ডেথ্ ভ্যালি স্কটী। সোনার খনির রাজা !
শিকাগোর তখনকার দিনের ধনী অ্যালবার্ট জনসন মুগ্ধ হন স্কটীর গল্পে। সোনার খনিতে তিনিও ডলার ঢাললেন অনেক। কিন্তু সোনার দেখা পাওয়া যায় না আর। একদিন শেষে অ্যালবার্ট সাহেব নিজেই এলেন ডেথ্ ভ্যালিতে। বুঝতে পারলেন স্কটীর ধোঁকাবাজী। কিন্তু আশ্চর্য !

তখনকার দিনের রেওয়াজ অনুযায়ী হাতাহাতি না করে অ্যালবার্ট জনসন, মিলিয়নেয়ার, শিক্ষিত, শহরবাসী আর দরিদ্র, ধাপ্পাবাজ, ঘরছাড়া স্কটীর পরম বন্ধু হয়ে গেলেন। জীবনভোর তাঁদের বন্ধুত্ব অটুট থাকে,দু'জনেই ভালোবাসেন ডেথ ভ্যালিকে। কে জানে কি পান তাঁরা এই মরু প্রান্তরে। বার বার শিকাগো ফিরে আসতে থাকেন অ্যালবার্ট। তারপর

বর্ষার শীর্ণ স্রোতধারা শুকিয়ে যাবার পর ফুটিফাটা হয়ে যাওয়া কাদার পাতলা স্তর

তখনকার দিনে দু' মিলিয়ন ডলার খরচ করে তৈরি করেন এক প্রাসাদ এই নির্জন রুক্ষ ডেথ্ ভ্যালির বুকে। কালক্রমে এই প্রাসাদ-এর নাম হয় স্কটীর ক্যাসল্। যদিও স্কটী কখনোই এটির মালিক ছিলেন না।
ডেথ্ ভ্যালিতে সোনার সন্ধান পাওয়া যায়নি শেষ অবধি, কিন্তু যা পাওয়া গেল তা হল সোহাগা। সোনায় সোহাগা নয়, সোনার বদলে সোহাগা। মন্দ ব্যাপার নয়। এই

সোহাগা ব্যবসায় যুক্ত নাম হল F m Borax Smith, এবং C. B. Zabriski স্মিথ্ পরে রেলরোড ব্যবসায়ে কোটিপতি হন। Zabriski (বাংলা করার চেষ্টা করলাম না) বহুদিন বোরাক্স ব্যবসায়ে যুক্ত থেকে ডেথ ভ্যালির নামের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। এরই নামে Zabriski point.এই নামেই পরবর্তী কালে একটি মুভী হয়। যদিও ডেথভ্যালির সাথে সেই মুভীর গল্পের কোন যোগ নেই। বোরাক্স ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে যায় বিখ্যাত Twenty mule Team.
এই অশ্বেতরে টানা গাড়িই ছিল বহুদিন অবধি একমাত্র যানবাহন। তারপর আসে রেল। পাকারাস্তা, মোটরগাড়ী। ডেথ ভ্যালীর পুরনো রোমাঞ্চকর দিনের গল্প শেষ হয়ে আসে। তবু রহস্য থেকে যায়, অ্যাডভেঞ্চারের হাতছানি।

১৯৪৯ এ
অভিজ্ঞতার একশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সত্তর হাজার মানুষ জমা হয় এখানে।

এবার ফেরার পালা। ডেভিলস কর্ণফিল্ড ফ্যুনারেল মাউন্টেন, কফিন পীক এই সব ভয়াবহ নামের সাইন বোর্ড পেরিয়ে পাঁচ হাজার চারশ ফিট উপরে দান্তে পয়েন্ট থেকে ডেথ ভ্যালির বুকে সূর্যাস্ত দেখা। অনেক তলায় ভ্যালির বুকে সাদা নুনের প্রেয়ার ওপর সূর্যের শেষ আলো এসে পড়ে।
পাহাড়ের ওপারে পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে ওঠে। মধ্যরাতে ইস্পাতনগরীর আকাশের মত লালচে রং। হাওয়াতেও কেমন একটা গরমভাব। দূরে প্রান্তরের বুকে ধূলোর পাতলা আঁচল উড়িয়ে খেলা করে যেন এক পাগলী মেয়ে দুপুরের রোদে একা একা। কেমন একটা অশরীরী ভাব চতুর্দিকে। বহু যুগ ধ যেন বন্দী এই ভ্যালি পাহাড়ের প্রহরায়।
ফিরে আসতে দেখি অপরূপ দৃশ্য ! এই রুক্ষ, কঠোর প্রাণহীণ প্রান্তরের পথপার্শে ফুটে আছে নয়নমুগ্ধকর সুন্দর ফুল। হলুদ বরণ প্যানামিন্ট ডেসী, ঝোপের মধ্যে চেনা ধুতরো ফুল। ঘন বেগুনি ম্যালো আর কাঁটা গাছের মধ্যে অযত্নে জন্মান পারিজা ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার। কোনটার রং স্বর্ণাভ হলুদ। কোনটার রং পিঙ্ক। এই নির্মম প্রকৃতির মধ্যেও দেখি কোমলতা। কাঠিন্যের অন্তরালে প্রেমের কবিতা ! ডেথ ভ্যালি যেন বলছে শুধু আমার বাইরের রুদ্র ভৈরবের নৃত্যটুকু দেখেই চলে যেও না, আমার শিবরূপের শান্তিটুকুও নিয়ে যেও। সোনার সন্ধান মিলে গেল হঠাৎ যেন। অস্তগামী সূর্যের সোনাগলানো আলোয় বিচিত্র রূপ নিল আর্টিস্ট প্যালেট-এর রং-বেরংএর পাথরগুলো ! এর সবু বালিয়াড়ির বুকে ছায়া দীর্ঘ হয়ে নে আসছে। মনে হল যেন ভ্যালির আত্মা ওই ক্যাকটাস্ ফুলের রূপ নি বলছে।
আমায় নিয়ে যাও। আমায় নিয়ে যাও। পাহাড়ের কোল বেয়ে অন্ধকার ঘনছায়া নেমে আসে ডেথ ভ্যালিকে ঘিরে। রাস্তার ওপর গাড়ি হেডলাইট জ্বলে ওঠে প্রান্তরের বু নেকড়ের চোখের মতন। তাড়াতা গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিই নিজেরই অজ্ঞাতে। পেছনে ফিরে ডেথ ভ্যালিকে বিদায় জানাতেও ভয় করছে এই মুহূর্তে। ■

রাজনীতিবিদ জিন্না : পাকিস্তান প্রসঙ্গ

হোসেনুর রহমান

দ্য সোল স্পোকসম্যান/ আয়েষা জালাল/ কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস/ ১৫০·০০

সাম্প্রতিক কালে মহাম্মদ আলি জিন্না ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের আত্মজিজ্ঞাসাস্বরূপ। স্বভাবতই বহু নতুন প্রশ্ন এঁদের চঞ্চল করেছে। প্রথম জীবনের নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রী জিন্না কংগ্রেসের হৃৎপদ্ম। দাদাভাই নওরজী, গোখেলের ভক্ত শিষ্য। অখণ্ড ভারতের জন্যে নিবেদিত এক স্বাধীনতা সংগ্রামী কংগ্রেসী। ধর্মবিশ্বাসে সামাজিক আচরণে ব্যক্তিগত জীবনে একেবারে এতটুকু মুসলমান নন। সবটাই সেকুলার জীবন-জিজ্ঞাসা। সবটাই ইংরেজি উপযোগবাদে মোড়া এক ষোল আনা সাহেব। ইতিহাসের পরম বিস্ময়, এ হেন মুক্তমনা জিন্না তিরিশের মধ্য দশক থেকে সাম্প্রদায়িকতার এক মধ্যযুগীয় চেতনায় সমৃদ্ধ হলেন।

এখন প্রশ্ন : কেন এমন হল, এই জিন্না কেন ১৯১৬-র লীগ-কংগ্রেসের সম্প্রীতিকে ১৯৪০-এর পাকিস্তান প্রস্তাবে পরিণত করলেন। বিদগ্ধ পণ্ডিতেরা বলতে চান, ১৯১৬ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পরম বন্ধু জিন্না স্বাধীন অখণ্ড ভারতবর্ষ প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক মনোভাব জিন্নাকে শেষ পর্যন্ত বাধ্য করল দ্বি-জাতিতত্ত্বের ইতিহাস রচনা করতে। এই যুক্তির বিশ্লেষণ এই রকম : গান্ধীর চরকা, প্রার্থনা সভা, ঘন ঘন অহিংসে সত্যাগ্রহ, খদ্দর, অনশন—এ সব বড়ই আপত্তিকর। মুসলমান যে এ সব মনে প্রাণে বরদাস্ত করতে পারে না। এটা দক্ষ রাজনীতিবিদ গান্ধীর জানা উচিত ছিল। গান্ধীর জানা উচিত ছিল গ্রামীণ অর্থনীতি আসল কথা নয়। আসল কথা সমাজ ও সংস্কৃতি। এবং ইতিহাস। যাঁরা জিন্না-ইতিহাস গভীরে গিয়ে ইস্তেমাল করেছেন তাঁরাই দেখেছেন জিন্না বরাবরই বিশ্বাস করে এসেছেন যে মুসলমানের একটা ভিন্ন ইতিহাস আছে। আছে এক নিশ্ছিদ্র সংস্কৃতি। বহু শতাব্দীর মর্যাদায় স্বতঃসিদ্ধ এই সংস্কৃতি। তাই ত তিনি বার বার দাবি করলেন মুসলমানের এমন একটা অতীত আছে যে তাকে সংখ্যালঘুর অমর্যাদা থেকে মুক্তি দিতে হবে। স্বাধীন ভারতে কী কেন্দ্রে কী রাজ্যে (প্রদেশে) থাকবে হিন্দু-মুসলমানের সমান সমান দাবি। সাধারণত জিন্নার রাজনৈতিক আচরণে কোন ইতিহাস সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছাপ কেউ দেখেছেন বলে জানি না। তিনি বক্তৃতা বাদ দিলে কোন কিছু জীবনে কলম ধরে লিখে রেখে গেছেন বলেও জানি না। কিন্তু তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন : The Hindus Worship the cow, We eat it। ১৯০৯ থেকেই মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ভোটাধিকারকে স্বাগত জানিয়েছেন। আর কংগ্রেসের পার্লামেন্ট্রি সিস্টেম-প্রীতি জিন্না ভাল চোখে দেখেন নি। কারণ, কংগ্রেস যে শেষ পর্যন্ত পার্লামেন্ট্রি সেলফ-গভর্নমেন্টের দিকে এগিয়ে যাবে তিনি জানতেন। বলা বাহুল্য, তিনি কংগ্রেসের এই আচরণ পছন্দ করতেন না। এই আচরণের দ্বারাই সংখ্যালঘু মুসলমান বিপন্ন হবে স্বাধীন ভারতে। এই হিসেবটা তাঁর অঙ্কশাস্ত্রে ধরা পড়েছিল ১৯৩৭-এর ১৯৪০-এর ১৯৪৬-এর অনেক আগে। যাঁরা সৈয়দ আহমেদ ও কংগ্রেস পর্বের পাঠোদ্ধার করেছেন তাঁরা সৈয়দ আহমেদকেও অনুরূপ আশঙ্কা করতে দেখেছেন। অর্থাৎ 'সংখ্যালঘু মনস্তত্ত্ব' জিন্নাকে কেবল গ্রাস করেনি, তিনি ক্যাবিনেট মিশনের বহু প্রচারিত বিপর্যয়ের পর এই সংখ্যালঘু-মনস্তত্ত্বকে এক অভিনব ও ভয়ানক সাম্প্রদায়িক অস্ত্রে পরিণত করলেন। একেই জিন্না 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' বললেন। ভারত ও পৃথিবীকে বোঝালেন :

দেখুন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ও হিন্দু কংগ্রেসের দুর্বিনীত অমুসলিম নীতির জন্যে আমার মত নিয়মতান্ত্রিক মানুষকেও হিংসার পথে পা বাড়াতে হল। কারণ আজ 'ইসলাম বিপন্ন'। আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসে গান্ধীকে নিরুপম সব প্রতীক ব্যবহার করতে দেখেছি। সে সব প্রতীক ভারতবর্ষের মানুষকে আসমুদ্র হিমাচল প্রজ্বলিত করেছে। লবণ সত্যাগ্রহের রচয়িতা নিজেই এক অবিনশ্বর প্রতীক হয়ে উঠলেন। মুক্তির প্রতিবাদের অহিংসার এমন চলমান ছবি আমরা ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি। আর হিংসার আগুন জ্বাললেন জিন্না। প্রতীকী স্লোগান : ইসলাম বিপন্ন। এ সবই কী জওহরলালের '১৯৩৭ ও ১৯৪৬-এর হঠকারিতার ফল' ? কিন্তু ইতিহাসেরও ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস ডঃ জালালের গ্রন্থে পাওয়া যাবে না। জিন্নার জটিল ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে নেই। আছেন কেবলমাত্র রাজনীতিবিদ জিন্না। যিনি ১৯৪৬-এর জন্যে অপেক্ষা করছেন।

যিনি ধীরে ধীরে নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে পরিহার করে এগিয়ে যাচ্ছেন হিংসাত্মক রাজনীতির দিকে। দায়ী করছেন কংগ্রেসকে ও ইংরেজকে। কংগ্রেস ১৯৩৭ থেকে একাধিক পলিটিকাল ব্লান্ডার করেছে। যেমন ১৯৩৯-এ প্রাদেশিক মন্ত্রিত্বে ইস্তফা। সঙ্গে সঙ্গে জিন্নার এক ধাপ পাকিস্তানের দিকে অগ্রসর। 'a Day of Deliverance' জিন্নাকে রাজনৈতিক মর্যাদা দিল। জানুয়ারি ১৯৪০-এ জিন্নার কণ্ঠে শোনা গেল : "You start with the theory of an Indian nation that does not exist"। এমন কী ক্যাবিনেট মিশন এক সময় লীগের পাকিস্তান দাবিকে বাদ দিয়ে কংগ্রেসকে নিয়ে এগিয়ে যাবে এমনও মনে হচ্ছিল। কংগ্রেস এ সব সময়ের সুযোগ নিতে পারেনি। মুসলমান ১৯৪০-এ এসে নেশনে পরিণত হল। মুসলমান বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ছিল একটি সম্প্রদায়। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মুসলিম লীগ মুসলমানদের নেশনে পরিণত করল। এসব সময়ে কংগ্রেস ব্যস্ত রাজনৈতিক সংগ্রাম গড়ে তুলতে। এবং কংগ্রেস ধরেই নিয়েছে, এই স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমান নিঃসন্দেহে সমান শরিক। আদর্শ হিসেবে এই ত অত্যন্ত সঠিক চিন্তা। ব্যবহারে বিষয়টি তা ছিল না সব সময়ে। এসব সামাজিক-সাংস্কৃতিক চিন্তা বোধ করি স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাধান্য পেতে পারে না। এই ছিল কংগ্রেসের ধারণা। কূটনীতিবিদ জিন্না ১৯৪৬ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন। এতদিন ধরে তিনি কোন জাতীয়তাবাদ বা কোন দরিদ্র মুসলমানের অর্থনীতি বা উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেননি। অপেক্ষা করছিলেন কংগ্রেসের হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকে বিধ্বস্ত করতে হবে এবং সে সময় কবে আসবে তার জন্যে। সে সময় এল ১৯৪৬-এ। জিন্না ক্যাবিনেট মিশনের বাইরে থাকেন কী করে। কারণ, "Rather than leave a dangerous Vacuum, he would fill it and sabotage the working of the Government from within"। তিনি তাই করলেন। অর্থাৎ কূটনীতির খেলায় জিন্নার জয় হল। জিন্না যে বহু দিন থেকেই মুসলমান সমস্যার একটি সাম্প্রদায়িক সমাধান চাইছিলেন সে কথাটি ভুললে চলবে না। ধরা যাক নেহরু রিপোর্ট (১৯২৮)। নেহরু রিপোর্ট হাতে নিয়েই আলি ব্রাদার্স ঘোষণা করলেন গান্ধী হিন্দু ডিকটেটরশিপ প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন। এটা জিন্নার কথাও। তিনিও শেষ পর্যন্ত নেহরু রিপোর্ট বাতিল করে দিলেন। জিন্না চিরকালই গান্ধীকে হিন্দুর নেতা বলে এসেছেন। এবং নিজে গোটা মুসলিম ভারতের নেতা। এটাই ত তাঁর মুখ্য বক্তব্য।

কিন্তু যে কোন গণতান্ত্রিক মানুষ নেহরু রিপোর্টের মধ্যে আগামী কালের সেকুলার ভারতবর্ষের ছবি দেখতে পাবেন। গান্ধী নেহরু রিপোর্টকে সমর্থন করে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন মাত্র। আর জিন্না সে দিন থেকেই কট্টর সাম্প্রদায়িক। কেবলই দর কষে চলেছেন। আমার মুসলমানদের জন্যে এই এই চাই। যিনি ভাল দর কষেন তিনি স্থির জানেন কী তাঁর দাবি অপর পক্ষের কাছে। আর যিনি আদর্শবাদী তিনি চিরকালই আগামী কালের মানুষ। হিসেব নিকেশ তাঁর আসে না। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আদর্শের প্রাচুর্য ঘটেছিল। গান্ধী-জওহরলাল তার উদাহরণ। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দুজন আদর্শবাদী নেতা বিরল। এবং এঁদের মহানুভবতার সব সুযোগই জিন্না নিতে পেরেছিলেন। সেটা তাঁর কৃতিত্ব নিশ্চয়ই। এই কৃতিত্বের পেছনে প্রধান উৎস কী ছিল ? বার বার জিন্নার কণ্ঠে এই দু-চারটে কথা শোনা যায় : Separate electorates,reservation of seats and a federal system with wide autonomy for the constituent States। ক্রীপস ও ক্যাবিনেট মিশন কী জিন্নার যথেষ্ট মনোরঞ্জন করে নি ?

স্বভাবতই এই গ্রন্থে খণ্ডিত ভারতে অখণ্ড বাংলা ও পানজাবের বিষয়ে প্রচুর আলোচনা আছে। Jinnah justified his rejection of the partition of the Punjab and Bengal on the grounds that there would be at least twenty-five million Muslims in Hindustan. Thus the demand for a 'corridor' (পৃঃ ২৭৭)। পঁচিশ নয়। পঁয়ত্রিশ মিলিয়ান মুসলমান এ পারে থেকে গেলেন। জিন্না তাঁদের কথা চিন্তা করেছিলেন। ইতিহাস হাস্যরস বিতরণ করে বইকি। জিন্না কমতালাভের চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি মুসলমানদের জন্যে চিন্তা করার সময় পান নি। বিভক্ত ভারত। অথচ অবিভক্ত বঙ্গদেশ। ইতিহাসের যুক্তিতর্কে এসব টেকে না। এ কথা বলেছিলেন গান্ধী জওহরলাল। এবং কৃষ্ণ মেনন। বর্তমান সমালোচকেরও এক ধারণা। এটা আসলে জিন্না সুরাবর্দির আর একটা চাল। এ সব এই গ্রন্থে যথেষ্ট খোলা মনে ডঃ জালাল আলোচনা করতে পারতেন।

এই গ্রন্থের অন্য একটি হাস্যরস 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'কে ঘিরে। ২২৩ পৃষ্ঠায় ডঃ জালাল আমাদের বুঝিয়েছেন এই 'অপ্রয়োজনীয় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' কলকাতার সমাজবিরোধীদের হাতে কীভাবে খুলেছিল। এত বড় ভয়াবহ বিস্ফোরণের পেছনে কোন লীগ নেতার কোন অদৃশ্য হাত ছিল এমন কোন ইঙ্গিত পাকিস্তানী ঐতিহাসিক দিতে পারেন নি।

শেষে বলব, যাঁরা গান্ধী ও জওহরলালের কট্টর সমালোচক তাঁরা অনুগ্রহ করে এই গ্রন্থ পড়ুন। যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের সিরিঅস পাঠক তাঁরা এই গ্রন্থ নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখতে চাইবেন। রাজনীতিবিদ জিন্নাকে দেখতে পেলে (ভরসা হয়) অদূর ভবিষ্যতে অনেকেই আবার নতুন করে গান্ধী ও জওহরলালকে বহু ক্ষেত্রেই আবিষ্কার করতে পারবেন।

আর একটা কৌতূহল। আজ বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী মহল এই জিন্না-চর্চাকে কী চোখে দেখছেন ? তাঁদের মুক্ত ইতিহাস জিজ্ঞাসায় আজ জিন্না কোথায় কী অবস্থায় আছেন ?

বাঙালীর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস

ভবতোষ দত্ত

বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন/ অতুল সুর/ সাহিত্যলোক/ কল-৬/৬০.০০

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলা ও বাঙালীর একটা সামগ্রিক পরিচয় দেবার চেষ্টা করে পণ্ডিত গ্রন্থকার এই বইটি লিখেছেন। এ বইয়ের পরিকল্পনাটি অভিনব। একে ঠিক ইতিহাস বলা যায় না ইতিহাসের ধারাবাহিক ক্রমে লেখা নয় বলে ; অথচ বইটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইতিহাসাশ্রিত আলোচনা। বাংলা ও বাঙালী সম্বন্ধে প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এতে পাওয়া যাবে। এক সময়ে বঙ্কিম বাঙালীর ইতিহাসের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এক শ' বছরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে নানা পণ্ডিতের সাহায্যে সেই চেষ্টা হয়ে এসেছে। অতুলবাবুর বইকে এক শ' বৎসরব্যাপী প্রয়াসের সর্বশেষ ফল বলা যায়।

|র অর্থ এই নয় যে এটাই
র্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্পূর্ণাঙ্গ বই।
|র অর্থ এই যে একটা
াতিকে বুঝবার মত দিক
াকতে পারে, এই বইতে
ার সবগুলিকে এক সঙ্গে
লিয়ে দেবার চেষ্টা হল।
াঙালী জাতির উৎপত্তি এবং
াগৈতিহাসিক ভৌগোলিক
রিচয় উদ্ধার করেছেন
কউ, কেউ কেউ রচনা
রেছেন রাজবৃত্ত, কেউ
বেষণা করেছেন শিল্পকলা
য়ে। কেউ জানতে
চয়েছেন সমাজবিন্যাস।
কউ অর্থনৈতিক বিন্যাস,
কউ স্পষ্ট করতে চেয়েছেন
াঙালীর ধর্মচেতনাকে।
াইভাবে বঙ্কিমের পর নানা
দক দিয়ে বাঙালীর ইতিহাস
য়ে গবেষণাও হয়েছে।
ঙ্কিমের পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজ
তিহাসিকেরা রচনা
রেছেন রাজবৃত্ত। বঙ্কিম
াইলেন লোকবৃত্ত—বাঙালী
াতির সত্যকার পরিচয়,
ধু কয়েকজন রাজার
দ্ধবিগ্রহের বিবরণ নয়। এই
তাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে
বশেষে বাংলার ইতিহাসের
রিকল্পনা বঙ্কিম নির্দিষ্ট পথ
নুসরণ করল ঢাকা
বশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজিতে
লখা বাংলার ইতিহাসে এবং
হাররঞ্জন রায়ের বাঙালীর
তিহাসে। সে ইতিহাস এত
ালের অভাব মোচন
রলেও বাঙালীর সামাজিক
রিচয় উদ্ধার তাতে
তখানি গুরুত্ব পায়নি।
হাররঞ্জন স্বল্প উপকরণ
থকে সামান্য সাধন
জেনারেলাইজ) করেছেন।
াকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
তিহাসে মধ্যযুগের বাঙালী
মাজের বিবরণ তেমন
ায়গা জোড়েনি। বাঙালীর
াতিবিভাগ শিক্ষাদীক্ষা

আচার আচরণ অভ্যাস বৃত্তি
ভাষা সাহিত্য প্রভৃতি সব
মিলিয়ে বাঙালীকে
দোষেগুণে মেশানো বিশিষ্ট
জাতি হিসাবে স্পষ্ট করে
তোলার দরকার ছিল। ডক্টর
অতুল সুরের বইটি বাঙালীর
সামগ্রিক পরিচয় দিয়েছে
বলেই এ বইয়ের বিশেষ মূল্য
থাকবে।
ডক্টর সুর নিজে নানা বিষয়ে
গবেষণা করেছেন। এ বইতে
তাঁর নিজের গবেষণার ফলই
যে আছে তা নয়, বিভিন্ন
সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে
অনুসন্ধানের ফল দিয়ে
বাঙালীর রূপটিকে তিনি
ফুটিয়ে তুলেছেন। এতে
বিভিন্ন আয়তনের
একচল্লিশটি অধ্যায় আছে।
প্রচলিত ইতিহাস রচনার
মতো এতে যুগভাগ নেই।
কিন্তু প্রাচীন মধ্য এবং
আধুনিক কাল তাঁর এই
একচল্লিশ অধ্যায়ের কাল
পটভূমি রচনা করেছে।
বাঙালীর রাষ্ট্রীয় ইতিহাস
একেবারেই গৌণ। এই
সমাজের অন্য দিকগুলিই
এতে মুখ্য। পাঠক বিস্মিত
হবেন এটা লক্ষ করে যে
প্রাচীন এবং মধ্যযুগের
বাঙালীর সম্বন্ধে এত বিশদ
বিবরণ দেওয়াও সম্ভব।
বইতে কোনো পাদটীকা নেই,
অথচ অজস্র তথ্য। লেখক
সাবলীলভাবে লিখে
গিয়েছেন, তথ্যের আকর বা
বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণসূত্র
নির্দেশ করেননি। পড়বার
সময় তার প্রয়োজন অনুভব
করি না। কেন না এ বই
কোনো পণ্ডিতের বিচারের
জন্য লেখা নয়। সাধারণ
জ্ঞানসম্পন্ন জিজ্ঞাসু পাঠকের
জন্য লেখা। আমাদের
পূর্বপুরুষ কী ধর্ম পালন
করত, কী রকম পোশাক
পরত, সমাজে কটি জাতি
ছিল, আমাদের পদবী কি
ছিল, লেখাপড়া কি শিখত,
কী তাদের আয়
ছিল—ইত্যাকার বিবরণে
সমৃদ্ধ এই বই। বইটি
সুখপাঠ্য। বিতর্ক, মতভেদ,
অনুমান, প্রমাণ—এ সবের
দিক দিয়ে লেখক যাননি।
এর সবটাই যে প্রথাসিদ্ধ
ইতিহাসের বই থেকে পাওয়া
তা নয়—সাহিত্য, শাস্ত্রগ্রন্থ,
ভ্রমণবৃত্তান্ত,
লোকপ্রবাদ—নানাভাবে
সংগৃহীত তথ্য থেকে লেখক
বাঙালী জাতির ইতিহাস
গড়ে তুলেছেন। এ বই
পড়লে আত্মানুসন্ধিৎসু
পাঠকের অনেক কৌতূহল
নিবৃত্ত হবে। অনেক
অনুমানের অবসান ঘটবে।
সঙ্গে সঙ্গে মন পুলকিত
বিস্ময়ে ভরে উঠবে।
লেখাতে পণ্ডিতী নেই,
লঘুতাও নেই। শব্দ ব্যবহারে
মাঝে মধ্যে ত্রুটী থাকলেও
ভাষার পরিমিতিবোধ
প্রশংসাযোগ্য।
এ বই পড়তে পড়তে মনে
কিছু প্রশ্নেরও উদয় হয়।
প্রশ্নের উদয় হওয়া অবশ্য
কাম্য। লেখক পাঠককে
জিজ্ঞাসু করে তুলতে
পেরেছেন। সেখানে তাঁর
কৃতিত্ব। জিজ্ঞাসা
পরিকল্পনার কয়েকটি সূত্র
যত্নেও। বাংলার সংস্কৃতির
বিশদ পরিচয় বিভিন্ন অধ্যায়ে
লেখক দিয়েছেন কিন্তু এই
সংস্কৃতির ব্যাপ্তি কতখানি তা
নির্দেশ করেননি। বাংলার
ভৌগোলিক পরিচয়
দরকার। বাংলার সীমা
ইদানীন্তন কাল পর্যন্ত বার
বার বদলেছে। প্রাচীন
বাংলার ভাগগুলি খুবই
অস্পষ্ট। বইতে লেখক যে
ব্যাপক বিবরণ দিয়েছেন
প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে
ইদানীং কাল পর্যন্ত তাতে
কিছু প্রাধান্য পেয়েছে পদ্মার
এ পার অর্থাৎ আজকাল
যাকে বলি পশ্চিমবঙ্গ।
বিক্রমপুর ঢাকা শ্রীহট্টের
উল্লেখ মাঝে মধ্যে প্রাসঙ্গিক

ক্রমে থাকলেও সেখানকার ইতিহাস অপেক্ষাকৃত প্রচ্ছন্ন। অথবা লেখক কী মনে করেন যে শ্রমসাধ্য বিবরণ তিনি প্রস্তুত করেছেন, তা ওদিকের জীবনযাত্রা সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য ? দীনেশচন্দ্র যেন এ বিষয়ে কিছু ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তা ছাড়া আধুনিক কালে এসে লেখক কিছু দ্রুততার সঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে বিবরণ শেষ করেছেন। 'বাংলার নবজাগৃতি' থেকে 'কালান্তরের সমাজ ও রূপান্তর' বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠাতে সমাপ্ত হয়েছে। মনস্বী গ্রন্থকার তাঁর অসাধারণ স্মৃতির উপর নির্ভর করে অবলীলাক্রমে লিখে গিয়েছেন। স্মৃতি সব সময় যে সঠিক তথ্যটি দিয়েছে তা নয়। আবার মৌলিক চিন্তাশক্তির অধিকারী বলেই সর্বদা তিনি অন্যের মত বিবৃত করেননি। তাঁর নিজস্ব মতও সর্বস্বীকৃত মতের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। যেহেতু এ বই গবেষণা গ্রন্থরূপে লিখিত নয়, সেইজন্য তাঁর নিজের মতের সমর্থনে যথেষ্ট প্রমাণ দেবার সুযোগ ঘটেনি। শেষ পর্যন্ত পাঠকমনের উপর এর অগোচর প্রতিক্রিয়া কী রকম হতে পারে বলা যায় না। অবশ্য এ সম্ভাবনা অমূলক না হলেও তেমন গুরুতর কিছু নয়। এটা বোধ হয় সব পণ্ডিতদেরই গ্রন্থ সম্পর্কে প্রযোজ্য। বর্ষীয়ান পণ্ডিত ডক্টর অতুল সুরের 'বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন' বইটির স্বাতন্ত্র্য অবশ্য স্বীকার্য। একটি বইয়ের মধ্যে বাঙালী আর কবে এমন করে নিজেকে আবিষ্কার করতে পারবে ? নিজেদের ইতিহাস সম্বন্ধে শিক্ষিত করে তোলবার পক্ষে এই একটি বই-ই যথেষ্ট।

সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী

সন্দীপ সরকার

দি ক্রিটিক্যাল ভিজন/ জয়া আপ্পাস্বামী/ ললিত কলা আকাদমি/ নতুন দিল্লী-১/৫০.০০

কোনও গ্রন্থকার জীবিতকালে কাজের গুণে এবং ব্যক্তিত্বের মাধুর্যে এমনই সুনামধন্য হন যে মৃত্যুর কিছু পরে তাঁর লেখার বিশ্লেষণ করা সহজ হয় না। সময়ের দূরত্বই কেবল সেই নৈর্ব্যক্তিক পরিপ্রেক্ষা রচনা করতে পারে। প্রবন্ধের নির্বাচিত সঙ্কলন যদি মরণোত্তর শ্রদ্ধার্ঘরূপে প্রকাশিত হয়, তাহলে সমালোচকের কাজ কঠিন হয়ে পড়ে আরও। শিল্পকলার ওপর নিবন্ধ বা গ্রন্থ যাঁরা লেখেন ইদানীং, তাঁরা সকলেই ছিলেন জয়া আপ্পাস্বামীর আপনজন। ভারতবর্ষের নানা পত্রিকায় কে কি লিখছেন তার খবর তিনি রাখতেন। দীর্ঘদিন তিনি কেন্দ্রীয় ললিতকলা আকাদমির "ললিতকলা কন্টেমপোরারি" সুচিত্রিত পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। সুতরাং মালঞ্চের মালিনীর মতো তিনি বেয়াড়া বুনো লতা বা ফুল গাছকে ছেঁটেকেটে বাগানপোষ করার চেষ্টা করতেন যত্ন নিয়েই। সে-বিষয় তাঁর কৃতিত্ব প্রচুর। জয়া আপ্পাস্বামী শিল্পকলাকে সমাজ-নৃতাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন। মূল্যবিচার (ভ্যালু জাজমেন্ট) করতে তিনি কুণ্ঠিত হতেন। সংগ্রহকারী ছিলেন বলে পুরাতনী কারুকলাকে তিনি সযত্নে রেখেছেন চারুকৃতির পাশেই। সৃজনশীল অভিব্যক্তির প্রতি অতিরিক্ত মমতা ছিল তাঁর। ফলে শিল্পকলার ঐতিহাসিক বা সমালোচকের মাঝামাঝি একটা অনিরাপদ জায়গায় দাঁড়িয়েছেন তিনি। মানুষের হাতের তৈরী সব কিছুই ভালো এ কথা বলার নৃতাত্ত্বিক উদারতা যেমন তাঁর ছিল, তেমনি কোন কাজটি কতটা ভাল বা খারাপ, ব্যর্থ বা সার্থক, শ্রেষ্ঠ না নিকৃষ্ট একথা তিনি বলতে চাইতেন না। নিজে শিল্পী ছিলেন বলেই শিল্পীরা কত স্পর্শকাতর তা তিনি জানতেন। পাছে আঘাত লাগে এই ভেবেই তিনি সমালোচনা এড়িয়ে চলতেন। শিল্পীমাত্রেরই মাথার পিছনে জ্যোতির্বলয় আছে সুতরাং তিনি সমালোচনার উর্ধ্বে, এই বোধটা শিল্পীদের মনে ঢুকিয়ে দেবার জন্য অনেকখানি দায়ী জয়া আপ্পাস্বামী। তাঁর প্রশ্রয় পেয়েই শিল্পীরা সমালোচনায় অসহিষ্ণু হয়েছেন।

অথচ কাল কি ভয়ানক এবং নির্মম তার প্রমাণ রয়েছে এই বইতে। অন্ধ স্নেহে কোনও কোনও প্রবন্ধে ভাল এবং মন্দ শিল্পীদের পাশাপাশি এক নিশ্বাসে উল্লেখ করেছেন। ব্যর্থ হবার সহজ লক্ষণগুলি মেলাতে অস্বীকার করেছেন তিনি। তাই বহু শিল্পী— যশঃপ্রার্থী এবং তাঁর কাজকে,—সোনার তরী ইতিমধ্যে উপকূলে ফেলে রেখেই চলে গেছে। বইটি জয়া আপ্পাস্বামীর বারোটি প্রবন্ধ, কয়েকটি কবিতা, কিছু ছবির প্রতিচিত্র (এবং তার মধ্যে বেশ কয়েকটি ছবি তাঁর নিজেরই আঁকা) রয়েছে। প্রবন্ধগুলি আগেই প্রকাশিত হয়েছে। দু একটি আবার তাঁর বই থেকে উদ্ধৃত। তবুও ললিতকলা আকাদমি এই নির্বাচিত সঙ্কলন প্রকাশ করে ভালই করেছেন সে কথা বলতেই হয়। ছবিগুলো এ বইকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। শিল্পকলা উপভোগের রীতিনীতি সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধটিতে তিনি দেখিয়েছেন কেমন করে ব্যক্তি-মানস এবং সমাজের মানসিকতায় প্রতিক্রিয়া ও সৃষ্টিলীলা চলে। এই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান কি ভাবে উপভোগের গভীরতা বৃদ্ধি করে তা দেখিয়েছেন। তখন ভালো এবং মন্দ কাজকে আলাদা করা সহজ হয়। আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার ওপর লোকশিল্পের প্রভাব নিবন্ধটি সুলিখিত হলেও সে বিষয় তাঁর সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করা সম্ভব। যামিনী রায়ের ছবি বা নন্দলালের হরিপুরা পোস্টার লোকশিল্পের অভিব্যক্তি গ্রহণ করেও লোকশিল্প নয় কেন, কেনই বা সেগুলি আধুনিক ছবি তা তাঁর লেখা থেকে পরিষ্কার হয় না। শ্রীনিবাসালুর বা অন্য কারো কারো নাম যে কেন ব্যবহার করেছেন সে বিষয় প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কারণ এঁরা শুধু লোকশিল্পের সাধারণ লক্ষণগুলিকে গ্রহণ করে ছবিকে আলঙ্কারিক করেছেন। অবনী সেন, প্রাণকৃষ্ণ পাল এবং রথীন মৈত্র লোকশিল্পের রেখাধর্মী দ্বিমাত্রা এবং বর্ণাঢ্য ব্যাপারটাকে নাগরিক অভিজ্ঞতার বর্ণনায় ব্যবহার করেছিলেন কি ভাবে তার কোনও বিশ্লেষণ নেই।

হাতির দাঁতের ওপর ভারতীয় ছোট ছবির বিষয় লেখাটি সে তুলনায় অনেক বেশি তথ্যভিত্তিক। কিন্তু এগুলির নান্দনিক সার্থকতা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য দায়সারা। মোগল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় এবং পতনের চিহ্ন রয়েছে এগুলির অঙ্গে। কাচচিত্রের (পিছন থেকে কাচের ওপর আঁকা) ছবির মতোই এগুলির মূল্য যে ঐতিহাসিক, নান্দনিক নয়, একথা আরও স্পষ্ট করে দেখাতে পারতেন।

অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সমসাময়িক শিল্পকলার ওপর লেখাটি নব্য ভারতীয় কলমের জন্মের মাহেন্দ্রক্ষণের চিত্রটি ভালোই এঁকেছেন। যদিও এ বাবদ ভারতপথিক ইংরাজদের ভূমিকার কথা কেন যেন এড়িয়ে গেছেন। হ্যাভেলের বহু আগে লক-ই, ভারতীয় ঐতিহ্যের সারবত্তা সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ কথারও কোনও উল্লেখ না থাকায় আমাকে অন্তত অবাক করেছে। বহু প্রবন্ধ যেমন "স্বাধীনতা পরবর্তী চিত্রকলার" ওপর প্রবন্ধটি পূর্ণাঙ্গ নয় এবং দায়সারা গোছের। এসব ছোটখাটো ত্রুটি সত্ত্বেও বইটিতে তথ্য আছে প্রচুর। তাত্ত্বিক কাঠামো ঢিলেঢালা হওয়া সত্ত্বেও সুখপাঠ্য কম বেশি সব রচনাই। নিঃসন্দেহে সংগ্রহযোগ্য।

চ ল চ্চি ত্র

পথভোলা

সন্ধ্যা রায় ও উৎপল দত্ত

তরুণ মজুমদার সেইসব বিরল পরিচালকদের একজন যিনি জানেন ভাল ছবি কিভাবে তৈরি করতে হয় এবং মন্দ ছবি কাকে বলে। তিনি এও জানেন বাংলাদেশের দর্শকের ইচ্ছাপূরণ কিভাবে করতে হয়। মন্দ ছবির ওই গুণটিকে কুশলী হাতে সংস্কার করে নিয়ে ভাল ছবির সঙ্গে মিশেল দিয়ে তিনি একটি নিজস্ব রীতি তৈরি করেছেন। 'পথভোলা' ছবিটি দেখতে দেখতে বোঝা যায় একজন বুদ্ধিমান শিল্পী দক্ষ হাতে এই কাজটি করে চলেছেন। সেই কারণে তাঁর ছবির চরিত্র রক্তমাংসের হয়েও মাটিতে পা ফেলে না, বাস্তবের ওপরে দাঁড়িয়েও বাস্তববর্জিত হয়ে থাকে। অন্তত 'পথভোলা' এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
অথচ 'পথভোলা'র মত ছবি তরুণ মজুমদার ছাড়া আর কারো পক্ষে তৈরি করা অসম্ভব। তিনি জানেন কোথায় কতটুকু নাটক দরকার, অন্যায়কে অন্যায় বলে চিহ্নিত করে ন্যায়ের আদর্শে তাকে আপ্লুত করলে সাধারণ মানুষ খুশি হবে কারণ ব্যক্তিজীবনে অধিকাংশই ওই পর্যায়ে যায় না বলে হীনমন্যতায় ভোগে। চমকে দেওয়ার মত কম্পোজিশন, ক্যামেরায় ছবি আঁকা, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুচারু প্রয়োগ একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। 'পথভোলা এক পথিক' গানটি স্মর্তব্য। 'পথভোলা'র কাহিনীসার হল, পাঁচজন তরুণ একটি জাল ওষুধের কারখানায় কাজ করতে গিয়ে পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষের পরিণামে পালিয়ে যায় রুক্ষ এক প্রান্তরে। এরা মাস্তান, সমাজ পরিত্যক্ত এবং অমার্জিত। স্বাধীনতার সৈনিক এক বৃদ্ধ এবং তার ভাগ্নীর সংস্পর্শে এসে এরা এমন বদলে গেল যে সেই রুক্ষ প্রান্তরে সবুজ ধানের ঢেউ তুলল এবং কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করল। কাহিনীটির খাঁজে খাঁজে প্রচুর 'কেন' এবং 'কিন্তু' ছড়ানো।

এক ॥ পথভোলা মাস্তানদের নিয়ে ছবি। সময় না বলে দেওয়ায় এবং এরা যে সব শব্দ ব্যবহার করেছে তা থেকে মনে হয় এরা সাম্প্রতিক মাস্তান। তাপস পালের মাথায় ওই বিদেশী টুপিটা কি কারণে জানা নেই। সে বেচারী না হয় খুন করে মাস্তান, কিন্তু প্রসেনজিৎ, শক্তি ঠাকুর অথবা অভিষেক চ্যাটার্জীর মাস্তান হওয়ার কোন যুক্তি নেই। মাস্তানদের সমস্যা এবং পটভূমি বিশ্লেষণের দায় পরিচালকের নয়। তিনি ওদের ওপর লেবেল লাগিয়েছেন মাস্তানের। মাস্তান আর গুণ্ডার একই অর্থ তাঁর কাছে।
দুই ॥ ওরা যে পরিমাণে তর্জন করেছে ছবির প্রথমে তাতে হারাধন ব্যানার্জীর হিন্দী ছবির ভিলেনিতে ভালমানুষ হয়ে চাকরি করতে যাওয়া মানায় না।
তিন ॥ ওষুধ কোম্পানিতে ওরা নেহাৎই কর্মচারী। তাপস পাল ছাড়া কেউ খুনী নয় যে পুলিসকে দেখে ভয় পেয়ে গুলি ছুঁড়তে শুরু করবে। ওরা কেন পুলিসের সঙ্গে যুদ্ধ করবে হিন্দী ছবির কায়দায় তা পরিচালক জানতেন তবে কলকাতা পুলিসের যোগ্যতা সম্পর্কে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল যখন পাঁচজন যুবক সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় দল বেঁধে ঘুরতে ঘুরতে দূর রুক্ষ প্রান্তরে উপস্থিত হতে পারল। অবশ্য এ ব্যাপারে কলকাতা পুলিস পরিচালকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনতে পারে।
চার ॥ উৎপল দত্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী। আন্দামান থেকে মুক্ত হবার পর তাঁর প্রৌঢ় চেহারা আমরা দেখলাম। তার উনচল্লিশ বছর পরে যে বার্ধক্য তাঁর আসা উচিত তাতে অতক্ষণ কোদাল চালানো অসম্ভব, এবং হাঁটা চলায় যাঁকে যাটের বেশী মনে হয়নি। সন্ধ্যা রায়ের বিয়ে হয়েছিল স্বাধীনতার আগে। তাঁর ছোটবেলার ভূমিকায় যিনি কাজ করেছেন তাঁকে আঠারো উনিশ মনে হয়েছে। সন্ধ্যা রায়কে আটান্ন ভাবতে বড় কষ্ট হয় তরুণবাবুর হিসেব অনুযায়ী। আর এত বছর ধরে ভদ্রমহিলা স্বামীর বেঁচে থাকা আশা করে যাচ্ছেন বিয়ের শুকনো ফুলের মালা নিয়ে, ভাবা যায়ঃ সময়টা স্পষ্ট বলা নেই। কিন্তু তুহিন এবং অভিষেক যেসব মাস্তানের শব্দ বলেছে তা দশ বারো বছর আগেও বলা হত না।
পাঁচ ॥ উৎপলবাবু এবং সন্ধ্যা রায় কি খেয়ে পরে ওখানে বেঁচে আছেন দেখেছি, কোন কারণে বা আয়ে তা বোঝার মত সংলাপ আমার কানে আসেনি।
ছয় ॥ উনচল্লিশ বছর পরে স্বামী মৃত শুনে সন্ধ্যা রায় হাঁটতে হাঁটতে গাছের গোড়ায় বসে যেভাবে হার্টফেল করলেন তার চেয়ে ভাল কিছু হয়তো ভাবা যেত।
সাত ॥ নয়না দাস এবং প্রসেনজিত যেভাবে গাছের ডাল ধরে নেচেছে তাতে মনে হয়েছে নয়নার ছাত্র পড়ানোর চেয়ে প্রেমে পড়ার জন্যে ওখানে থাকতে হয়েছিল।
আট ॥ তাপস পাল কিংবা তুহিন না হয় পুলিস খুনের দায়ে ধরা দিতে পারে কিন্তু বেচারা শক্তি ঠাকুর, সে তো বোন মারা যাওয়ার দুঃখে মাস্তান হয়েছে, প্রসেনজিতের সঙ্গে তাকেও রেখে গেলে কি ক্ষতি হত। ছবি শেষ করার আর কোন রাস্তা ছিল না যাতে নায়ক নায়িকা একত্রিত হতে পারে। এক কাপড়ে শহর ছেড়ে রুক্ষ প্রান্তরে পৌঁছে ওরা যেভাবে ফ্যাসানেবল জামাকাপড় পরেছে তা দেখার মত।
তরুণ মজুমদার এসবই জানতেন। তিনি যুক্তিতর্ক বাদ দিয়ে তাঁর চমৎকার প্রসাদগুণে সাজিয়ে কিছু বিপথগামী ছেলের পবিত্র মানুষের স্পর্শে ভাল হবার গল্প শোনাতে চেয়েছেন। তাঁর কাছে আমাদের আশা কিন্তু অনেক বেশী, যা তাৎক্ষণিকত্ব ছাড়িয়ে যাবে। অবশ্য তিনি কেন পথ ভুলছেন?
উৎপল দত্ত সম্পর্কে কোন বিশেষণ নয়, শুধু বলতে পারি তিনি আমাদের শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছেন। তাপস পাল, শক্তি ঠাকুর, অভিষেক চ্যাটার্জী পরিচালকের ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন। প্রসেনজিতকে খুব ভাল লেগেছে, অবশ্য মাস্তান হিসেবে দলছুট মনে হয়েছে। বরং তুহিন ব্যানার্জীকে বাহবা দিতে ইচ্ছে করছে চরিত্রটির সঙ্গে মিশে যাওয়ায়। সন্ধ্যা রায় তাঁরই মত কাজ করেছেন এ ছবিতে। নবাগতা নয়না দাসকে প্রথমে একটু আড়ষ্ট মনে হলেও পরে মানিয়ে গেছে। রমেশ যোশীর সম্পাদনা পরিচালকের ইচ্ছাকে শক্তিশালী করেছে তবে পান্নু নাগের ক্যামেরার কাজ অনেকটা মনে থাকবে। ছবির সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আর হ্যাঁ, অনেককাল পরে মঞ্জু দেকে নতুনবেশে খুব ভাল লাগল।

অভিশাপ

কাহিনী-চিত্রনাট্য-সংলাপ অঞ্জন চৌধুরীর। পরিচালনা বীরেশ চট্টোপাধ্যায়ের। চরিত্রলিপিতে নামী নামের সন্নিবেশ—রঞ্জিত মল্লিক, দেবশ্রী, শকুন্তলা, রাজেশ্বরী, সৌমিত্র,

রবি ঘোষ এবং অনুপকুমার। সঙ্গীতে অনামী সমীর শীল। রঞ্জিত এই ছবিতে সৎ পুলিস অফিসার নন। তিনি চোর। চোর নিয়ে পৃথিবীতে অনেক ভাল ছবি হয়েছে, দর্শকরা চোর কেন্দ্রিক ছবি দেখে এর আগে অনেক আনন্দ পেয়েছেন। কিন্তু কাহিনীকার-চিত্রনাট্যকার এবং সংলাপ লেখক অঞ্জন চৌধুরীর ঘরানা ওসব পথে চলে না। পুলিস অফিসার হয়ে রঞ্জিত 'শত্রু'তে যা করেছিলেন 'চোর' হয়ে এই ছবিতে তিনি সেইরকম কাজই করলে দর্শকদের বাহবা কুড়োবেন বলে ধারণায় ছিলেন। থানায় অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে এই চোর এমন সব সংলাপ বলবে যাতে দর্শকরা হাততালি দেবে। এই সমাজের সুবিধেভোগকারী ক্ষমতাবানরাই হল আসল অপরাধী আর তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছে চোর যে এই সামাজিক ব্যবস্থার শিকার। পুলিস অফিসার তাকে ভাল হতে অনুরোধ করছে, সে শেষবার সুযোগ চেয়ে নিচ্ছে। মোটা দাগের আবেগ যার ঘন রসে অনেককাল ধরে বাসী গন্ধ ছাড়ছে তা ছবির সর্বত্র জবজবে হয়ে আছে। ছবির নির্মাণও এলোমেলো। এই ছবি দর্শকদের যদি অনন্তকাল টানে তাহলে বিস্মিত হব না, প্রকৃত গুণীদের জন্যে কষ্ট হবে, এই যা।

বৌমা

সন্ধ্যা রায়

আপনি যদি ঘন ঘন চোখের জল ফেলতে ভালবাসেন, যদি কান্নাই আপনার একমাত্র আনন্দ লাভের উপায় হয় তাহলে অবশ্যই 'বৌমা' ছবিটি দেখা উচিত। সনাতন ভারতবর্ষের নিয়মানুযায়ী একটি সংসারের যত আবেগ সব এই ছবিতে ঢোকানো আছে। সতীর সিঁদুর মার্কা চিৎপুরীয় চিত্রনাট্যে সিদ্ধহস্ত অঞ্জন চৌধুরীর কাহিনী বিন্যাসে সরল হৃদয় বাঙালী দর্শক যদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে তাহলেই চিত্রনির্মাতাদের স্বপ্ন সার্থক হবে।

উগ্র আধুনিকা মেয়ে মানেই দ্বিচারিণী, এমনটা ভাবতে অনেকের খুব ভাল লাগে। তার শাস্তি খুব কাম্য। যেন সে ভাল হতে পারে না। তা এমন মেয়ের স্বামী এমন পিতৃভক্ত যে তার আদেশে চুপচাপ আর একটি বিয়ে করে ফেলল। এই মেয়েটি এদেশের মানুষের মনের মত। সাত চড়ে রা কাড়ে না, নিজে না খেয়ে সবাইকে খাওয়ায়, অনেকটা সিঁদুর পরে এবং বিয়ের রাত্রে স্বামীর স্বীকারোক্তি শুনেও বলে, তোমার চরণে ঠাঁই দাও, আমি এর বেশী কিছু চাই না।

অতএব কাহিনীকার-চিত্রনাট্যকার অঞ্জনবাবুর নির্দেশে পরিচালক সুজিত গুহ ওই বউটিকে ঝি সাজিয়ে পাত্রটির সঙ্গে কলকাতার সংসারে পাঠিয়ে দিলেন। এবার যত নায়কের আধুনিকা স্ত্রী ঝি-এর ওপর অত্যাচার করবে তত দর্শকের চোখের জল পড়বে। এইসময় প্রসেনজিতের আর্বিভাব। সে বোম্বে থেকে চমৎকার মারপিট শিখে এসেছে। নব সংস্কৃতিবানদের খুশি করতে সে পরিচালকের নির্দেশ সুন্দর মান্য করে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে দেখলে কে না হাততালি দেয়।

রঞ্জিত মল্লিক খুব অসহায় ছিলেন নায়ক চরিত্রে। শেষ পর্বে কিছু গরম সংলাপ বলার সুযোগ পেয়েছিলেন এই যা, সন্ধ্যারানীর নামমাহাত্ম্য সন্ধ্যা রায় বজায় রেখেছেন। প্রসেনজিত আসার পর ছবিটি সচল হয়েছে। আন্তরিক অনুশীলন এই ছেলেটিকে অনেকদূর নিয়ে যাবে। সংঘমিত্রা ব্যানার্জীকে ভাল লেগেছে।

ডাক্তার বৌ

যে সব চতুর্থ শ্রেণীর ছবির জন্যে বাংলা ছবির কিছুদিন আগে নাভিশ্বাস উঠেছিল ডাক্তার বৌ সেই শ্রেণীর। কারণ এর পরিচালকের চলচ্চিত্র সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। গল্প বলতে তিনি জানেন না। যেহেতু এই দেশে ছবি করতে কোন যোগ্যতার দরকার হয় না তাই জগদীশ মণ্ডলরা ছবি করতে পারেন এবং তা দেখে যদি বাঙালী দর্শক টালিগঞ্জ সম্পর্কে বিমুখ হয় তো এই শিল্পকে ফলভোগ করতে হয়। বাংলা ছবিকে বাঁচাবার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনেক পরিকল্পনা নিচ্ছেন, তাঁরা যদি নতুন ছবির পরিচালকদের যোগ্যতা যাচাই-এর ব্যবস্থা করতেন তাহলে এই দুর্দশা ঘটত না।

পাত্রপক্ষের দাবি মেটাতে না পারায় ডাক্তার নায়িকা নিজেই চলে গেল বদমেজাজী পাত্রর পিতাকে কব্জা করতে। যাঁর ভয়ে সবাই তটস্থ তাঁকে সে ভিজিয়ে ওই বাড়ির বৌ হল।

কিন্তু জায়েদের সঙ্গে সে পেরে উঠবে কেন? অতএব ডাক্তার নায়িকা দেশোদ্ধার করতে বের হল। সে এমন একটা গ্রাম তৈরি করে ফেলল যেখানে কেউ মদ খায় না। গ্রামবাসীদের কাছে তাঁর ভূমিকা নিবেদিতাকেও ছাড়িয়ে গেল। কিন্তু যেহেতু একটি ভিলেন থাকা দরকার তাই বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়কে আনা হল 'যাকে শায়েস্তা না করলে ডাক্তার নায়িকার ষোলকলা পূর্ণ হবে না। গল্পের গরু গজকচ্ছপ হয়ে গরুড়ের ডানা পেয়ে গেল।

ডাক্তার কাম কারখানার মালিক দীপঙ্কর দের অসহায় চেহারা দেখে কষ্ট হয়। সত্যি সত্য ব্যানার্জী তাঁর মেজাজটা বজায় রাখতে চেয়েছেন অচিত্রনাট্য সত্ত্বেও। রাজেশ্বরীর চরিত্রের কোন মাথামুণ্ডু নেই তবু তাঁকে ভাল লেগেছে এটা একমাত্র তাঁরই কৃতিত্ব। সুমিত্রা, তরুণ, অনুপ এবং সুখেন দাস আছেন। কিন্তু যেমন পরিচালনা তেমন অপরিচ্ছন্ন ফটোগ্রাফি যে এই ছবি শেষ পর্যন্ত বসে দেখা রীতিমত যন্ত্রণাদায়ক।

অমিত রায়

সং গী ত

ভক্তিগীতি সম্মেলন

ভারতীয় সংগীতে ভগবদ্ভক্তির ঐতিহ্যের কথা স্মরণে রেখে রবীন্দ্রনাথের একশো পঁচিশতম জন্মবর্ষপূর্তি উপলক্ষে দিল্লীর সংগীত নাটক অ্যাকাডেমী চব্বিশ সেপ্টেম্বর থেকে সপ্তাহব্যাপী এক স্মরণীয় সংগীত সম্মেলনের আয়োজন করেন দিল্লীর রবীন্দ্রভবনের প্রাঙ্গণে। আটটি অধিবেশনে বিন্যস্ত 'ভক্তি ঔর সংগীত' শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ধর্মসংগীতের শিল্পীদের অভাবনীয় সমারোহে সমগ্র অনুষ্ঠান জাতীয় উৎসবের রূপগ্রহণ করেছিল।

আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন প্রধান অতিথি শ্রীমতীপুপুল জয়কর রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রেকর্ডে ধৃত বিভিন্ন প্রদেশের ধর্মসংগীতের

মণি কৃষ্ণস্বামী

অংশ বেজে উঠল—চকিতেই সাংগীতিক পরিমণ্ডল রচিত হল। এ যেন এক সূত্রে গাঁথা সৌরভিত পুষ্পের মাল্য। রুচি-স্নিগ্ধ পরিবেশে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের পদকর্তাদের ছবি ও গ্রন্থের প্রদর্শনী ছিল এই সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ। সামগ্রিক ভাবে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় একটি স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা গেল।

প্রথম অধিবেশন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পীদের কণ্ঠে পাঁচখানি সম্মেলক রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমে সংগীতানুষ্ঠানের সূচনা। আসামের বরগীত শোনালেন যোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও সম্প্রদায়। তাঁদের গায়ন ভঙ্গিমায় বৈচিত্র্যের অভাব। তুলনামূলকভাবে একক গানের চেয়ে সম্মেলক গানটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এদিনের আসরে আসামের রফিকুদ্দীন আহমদ ও সম্প্রদায়ের কণ্ঠে জাকির (আল্লার পবিত্র নাম উচ্চারণ) গান অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অত্যন্ত সাবলীল গায়ন ভঙ্গি। মহিলাদের সম্মেলক কণ্ঠে জারি গান ততখানি উজ্জ্বল নয়। শ্যামা সঙ্গীত পরিবেশন করলেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। গায়ন ভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্যে তাঁর অনুষ্ঠান উপভোগ্য হয়েছিল। শিল্পীর গাওয়া আটখানি গানের শেষ গানটি ছিল তুলসীদাস রচিত শ্যামাসংগীত। আসামের ডি· রঞ্জনা দেবী এবং এ

াখি সৌ দেবী জয়দেবের অষ্টপদী
য়ে শোনালেন তাঁদের নিজস্ব গায়ন
ঙ্গীতে । দুই হাতে মন্দিরায় ছন্দের
তালে কখনো বা নৃত্যের ভঙ্গিমায়
কটি বিশিষ্ট গায়ন শৈলীকে
উত্তিত করলেন । এদিন সবশেষ
ং নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন
ী বন্দ্যোপাধ্যায় । শিল্পীর কণ্ঠের
াবলী কীর্তন শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ
রেছে বললে অত্যুক্তি করা হবে
। ভক্তিগীতি পরিবেশনে তাঁর
ন্ময়তা, অকৃত্রিম ভক্তি ও
াবেদন তুলনাহীন । খোল যন্ত্রে
ারাঙ্গদাস অধিকারীর সার্থক
হযোগিতার কথা প্রসঙ্গত
্রেখযোগ্য ।

তীয় অধিবেশন । গোলাম মহম্মদ
। নওয়াজ ও সম্প্রদায় পরিবেশন
রলেন সুফিয়ানা কালাম । এই
ংগীত শৈলী কাশ্মীরের
তীন্দ্রিয়বাদিদের সংগীত, যা ওই
ঞ্চলের শাস্ত্রীয় সংগীতও । শিল্পীর
রিবেশনে আন্তরিকতা থাকলেও
টি কারণে তাঁর গান মনোগ্রাহী হতে
ারেনি । প্রথমত শিল্পী স্বয়ং তাঁর
ানের সঙ্গে অত্যন্ত উচ্চগ্রামে সন্তুর
ঙ্গত করছিলেন এবং তাঁর সমস্ত
নোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল ঐ
ন্ত্রবাদনে । দ্বিতীয়ত সহযোগী যন্ত্রী
ছলেন নিতান্তই শৌখিন পর্যায়ের
বিশেষ করে ডুক্কা (তাল যন্ত্র) বাদক ।
ায়নভঙ্গি অত্যন্ত বৈচিত্র্যহীন ।
াঞ্জাবের জনপ্রিয় লোকসংগীত শিল্পী
রণচাঁদ পরিবেশন করলেন সুফী
সম্প্রদায়ের ধর্মসংগীত । কেবলমাত্র
একটি হারমোনিয়াম এবং করতালির
াধ্যমে ছন্দ রাখা । গান শুনলে
হজেই উপলব্ধি করা যায় রীতিমতো
ালিম প্রাপ্ত এই শিল্পীর কণ্ঠের ঐশ্বর্য
র্ণনীয় । আবেদন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ।
াল্লী বাবা ফরিদ বুল্লে শা,
ান্দুসেনের রচনা গেয়ে
শানালেন—যাকে এক কথায় অপূর্ব
লা যায় । কণ্ঠস্বর যেমন দৃপ্ত তেমন
তঃসজ্জাত গায়ন ভঙ্গিমা । বিচিত্র
াগ ও অলঙ্করণ প্রয়োগ কল্পনা

হেমন্ত চৌহান

মনোহারী । পঞ্জাব অঞ্চলের গায়কীর
মধ্যে সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটেছে
বারবার । সহযোগী কণ্ঠসংগীত শিল্পী
প্যারেলালের কথা বিশেষ ভাবে
স্মরণযোগ্য । একে অপরের
পরিপূরক মনে হয় অনেক সময় ।
তেজপাল সিং ও সুরীন্দর সিং বন্ধু
নামে উচ্চাঙ্গ সংগীত জগতে পরিচিত
তাঁরা প্রথমে ইমন কল্যাণের আধারে
ওঁকার শত নামের পর মালকোষ
রাগে খেয়াল 'হে গোবিন্দ হে
গোপাল' পরিবেশন করলেন ।
ধর্মসংগীতের আসরে এই শৈলীর
গানের সার্থকতা সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই
যায় । তবে তাঁদের কণ্ঠে গুরু
রামদাসের 'হর যুগ যুগ', অমরদাসের
'জগদ জলন্দা', কবীরের 'গগন
দামামা ভজো' সুখশ্রাব্য হয়ে উঠেছিল
সনিষ্ঠ পরিবেশনের গুণে । সব গানই
ছিল রাগে নিবদ্ধ কিন্তু রাগ গানকে
ছাপিয়ে ওঠেনি । এ আসরের শেষ
শিল্পী জাফর হুসেন খাঁ ও সহশিল্পীবৃন্দ
পরিবেশন করলেন কাওয়ালি,
মনকবৎ, গজল । দলটির মধ্যমণি
জাফর হুসেন কিন্তু তাঁর সহ শিল্পীরাও
সুদক্ষ এবং সেজন্য এমন দলগত
সাফল্য । কেবল শৈলীগত বিশিষ্টতা
নয়, এঁদের পরিবেশিত প্রত্যেকটি
গানে এক বিচিত্র রঙের লীলা ।
সুরের বিচিত্র নকশায় রাগরাগিণীর
অপূর্ব দ্যোতনা অপরূপ সৌন্দর্যে
বিভাসিত । স্মরণীয় অনুষ্ঠান ।

তৃতীয় অধিবেশন । বিঠলদাস
বপোদরা হাভেলী সংগীত দিয়ে
অনুষ্ঠানের সূচনা করেন । গুজরাটের
মন্দিরে এই গান গীত হয় । শিল্পী
পরম্পরা সমৃদ্ধ গায়ক । অত্যন্ত
পরিচ্ছন্ন কণ্ঠ । ইনি পরমানন্দ দাস,
নন্দদাস, সুরদাস প্রভৃতি পদকর্তাদের
গান গেয়ে শোনালেন । সন্ধ্যার
আসরে প্রধানত প্রভাতী রাগভিত্তিক
গান কেন পরিবেশন করলেন
বোধগম্য হল না । তাঁর কণ্ঠের
উল্লেখযোগ্য নিবেদন মালব রাগে
নিবদ্ধ 'জয় জয় লাল গোবর্ধনধারী' ।
উন্মুক্ত মন্দির প্রাঙ্গণে এই গানের
আবেদন আরো গভীর হওয়ার
সম্ভাবনা । পরবর্তী শিল্পী ছিলেন
রাজস্থানের ভুণ্ডর খাঁ । আসরে বসেই
মুহূর্তের মধ্যে আকৃষ্ট করলেন প্রাণবন্ত
অকৃত্রিম গায়ন ভঙ্গিতে । কল্যাণ
রাগের আধারে সুরদাসের 'নাগর
নন্দা'-তে সহজেই উপলব্ধি করা গেল
শিল্পী হিসাবে তিনি কত উচ্চ মানের ।
সিন্ধি ভৈরবীতে বাবা ফরিদের গানটি
রাগালঙ্কার সুমিত প্রয়োগের অসামান্য
নিদর্শন । বিস্তারে শব্দ বিন্যাস, তান
সংযোজনে তাঁর পরিমিতি বোধ
বিস্মিত করে । অনুষ্ঠানের শেষগান
শিল্পীদের দেবতা ঝুলে লালের কাছে
মিনিতি পূর্বক নিবেদন 'দমাদম মস্ত
কালান্দর' । যাঁরা ভুণ্ডর খাঁর কণ্ঠে এই
গান না শুনেছেন তাঁরা কল্পনাও
করতে পারবেন না রুণা লায়লার
কণ্ঠে এই গান কতখানি বিকৃত । এ
দিনের শেষ শিল্পী ছিলেন প্রখ্যাত
ভীমসেন যোশী । ইমন কল্যাণের
খেয়াল দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করলেন
যা অপ্রয়োজনীয় মনে হল । নামদেব
রচিত মহারাষ্ট্রের অভঙ্গ রীতির
'পাণ্ডারী নিবাস', 'তীর্থ বিঠ্ঠল ,
ক্ষেত্র বিঠ্ঠল' বা কানাড়ী ভাষায়
পুরন্দর দা দাসের 'ভাগ্যদা লক্ষ্মী',
জগন্নাথ দাসের 'শ্রী নিকেতন' প্রতিটি
গানেই ছড়িয়ে দিলেন ভক্তিরসের
অমৃতধারা । সেদিন শিল্পী ভীমসেন
ছিলেন ক্রিয়াপরতার শীর্ষে, বারবার
মনে হয়েছে শ্রোতার জন্য নয়,
নিজের জন্যেই গেয়ে চলেছেন যেন ।
প্রতিটি বাণী উচ্চারিত হয়েছে
অন্তরের অন্তস্তল থেকে, বিশ্বাসের
প্রকাশ যেন । এমন গান শোনা বিরল
অভিজ্ঞতা ।

চতুর্থ অধিবেশন । দুই শিল্পীই ছিলেন
দক্ষিণ ভারতের । ভি-শাম্বশিব
ভগবতার ও সহশিল্পীবৃন্দ তামিলনাড়ুর
ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায় ভজন
পরিবেশন করলেন । প্রধানত
সম্মেলক কণ্ঠে গাওয়াই রীতি যা তাঁরা
অক্ষুণ্ণ রেখেছেন । বাংলার কীর্তন
গানের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে,

ভুণ্ডর খান

পরিবেশন ভঙ্গিতেও । একটি প্রদীপ
জ্বেলে নৃত্যসহযোগে মূল গায়ককে
দোহাররা সহযোগিতা করেন । শিল্পী
এখন বয়সের ভারে ক্লান্ত আর
সহযোগীরাও দক্ষ নন । তাই গান
দানা বাঁধেনি । একটি প্রাচীন রীতির
পরিচয় পাওয়া গেল সেটাই প্রাপ্তি ।
পরবর্তী শিল্পী ছিলেন মহারাজাপুরম
শান্তনম । ত্যাগরাজের শিষ্য
পরম্পরার পঞ্চম পুরুষের শিল্পী
মহারাজাপুরম বিশ্বনাথের পুত্র
মহারাজাপুরম শান্তনম দক্ষিণ
ভারতের জনপ্রিয় শিল্পী । অসামান্য
দক্ষতায় তিনি পরিবেশন করলেন
পুরন্দরদাস, ত্যাগরাজ, মুথুস্বামী
দীক্ষিতর, স্বাতী তিরুনল প্রভৃতি
প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা । আয়ত্ত
কণ্ঠ ও ক্রিয়াপর শিল্পী তিনি যার সঙ্গে
যুক্ত হয়েছে তাঁর রসবোধ ও
পরিমিতি বোধ । তাঁর মধ্যে প্রদর্শনের
ভঙ্গি নেই, আছে স্থির শান্তরূপ যার
জন্য প্রতিটি গানেই ফুটে ওঠে

রামচতুর মল্লিক

ভক্তের আত্মনিবেদনের রূপ । ভি
ত্যাগরাজনের বেহালা এবং ভি
রামভদ্রনের মৃদঙ্গে সার্থক সহযোগিতা
করেন । সহযোগী কণ্ঠসংগীত শিল্পী
অত্যন্ত দক্ষ ।

পঞ্চম অধিবেশন । অধিবেশনটি ছিল
বিশেষ প্রভাতী অধিবেশন । শিল্পী
ছিলেন স্বনামধন্য কিশোরী
আমনকর । সীমাহীন প্রত্যাশা ছিল
কিন্তু পরিবর্তে অন্তহীন নৈরাশ্য ।
শিল্পী প্রথমে গাইলেন রাগ বিভাস ।
পরে তিনখানি ভজন । অকল্পনীয়
কিন্তু কিশোরীর কণ্ঠে সেদিন সুর
আশ্রয় করেনি । তাঁর গানে এবং
আচরণে শিল্পীজনোচিত কিছুই পাওয়া
গেল না । একজন ব্যর্থ শিল্পীর মতো
তাঁর বিরক্তি শ্রোতৃমণ্ডলী ও
সহযোগী যন্ত্রশিল্পীর প্রতি ব্যবহারে
এমনি তিক্ত হয়ে ছিলেন যার প্রত্যক্ষ
প্রভাবে প্রভাবিত হল তাঁর গান এবং
বেদনাদায়ক সেই পরিস্থিতি ।

ষষ্ঠ অধিবেশন । এই অধিবেশনের

হারাজপুরম শান্তনম

সূচনা হয় নম শিবায় অধুবর ও সহশিল্পীদের কণ্ঠে থিরুপ্পুগাজ ও কাবাডি চিন্দু গানে। এই গানের প্রধান রচয়িতা আন্নামালাই রেড্ডিয়ার। পাখাই, বেহালা ও মৃদঙ্গ সহযোগী যন্ত্রানুষঙ্গ। শিল্পীর কণ্ঠ সুশ্রাব্য নয়, কিন্তু তাঁর আন্তরিকতায় একটি পরিমণ্ডল রচিত হয়। পরবর্তী শিল্পী দক্ষিণ ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় মণি কৃষ্ণস্বামী। উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিল্পী ত্যাগরাজ, মুখুস্বামী দীক্ষিতর প্রভৃতির বচন পরিবেশন করলেন। হিরণ্যোপম কণ্ঠের অধিকারিণী মননে ও ক্রিয়াপরতায় পরিণত শিল্পী। মণি কৃষ্ণস্বামীর পর মিজো গসপেল গ্রুপ পরিবেশন করেন খৃষ্টীয় ধর্মসংগীত। তাঁদের কণ্ঠের সম্মেলক গানগুলি স্বরসন্ধির অপরূপ প্রয়োগে অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছিল। কোনো সহযোগী যন্ত্র ব্যতিরেকেই এই গান পরিবেশনে

ডি রঞ্জনা দেবী ও এ তোম্বিনৌ দেবী

তাঁরা বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করলেন। এই অধিবেশনের শেষ শিল্পী ছিলেন ভি সোমসুন্দর দেশিগর। তিনি পরিবেশন করলেন তেবরম—দক্ষিণ ভারতের এক ধরনের প্রাচীন ভক্তিগীতি।

সোমসুন্দর এই ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। পরিচ্ছন্ন কণ্ঠ, সংযত গায়নভঙ্গি শিল্পীর প্রধান সম্পদ। আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান।

সপ্তম অধিবেশন। শুরু হয় গুজরাটের তরুণ জনপ্রিয় শিল্পী হেমন্ত চৌহানের ভক্তিগীতি দিয়ে। তিনি পরিবেশন করলেন দাসী জীবন, মীরাবাঈ,নরসিং মেহতা ও রায় সাহেবের রচনা। শিল্পীর কণ্ঠের সুর সহজেই অনুভব করা গেল ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জনে গায়নভঙ্গিমায় কিছুটা বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়েছেন। হার্দ্য মুক্ত কণ্ঠের শিল্পী তিনি। প্রধানত লোকসংগীতের আধারে গানের সুর অত্যন্ত আকর্ষণীয়, বিশেষ তাঁর উজ্জীবিত গায়ন ভঙ্গিমা নতুন মাত্রা পায়। রায় সাহেব রচিত তাঁর কণ্ঠের শেষ 'গৌড় বঙ্গালকা, মহারাজ হায়' গানটিতে বাংলা কীর্তন গানের এক বিচিত্র রূপ প্রতিভাত হয়। সহযোগী প্রেমজী যাদবভাইয়ের মন্দিরা বাদন যেমন শোনার তেমন দেখারও। মহারাষ্ট্রের মারুতীবুয়া বাগড়ে ও সহশিল্পীবৃন্দ পরিবেশন করলেন বাকারী ভজন। ভগবান বিঠোবাকে উদ্দেশ করে এই পদগুলি গাওয়া হয়। প্রতিটি গানই রাগাশ্রয়ী। ভক্তিভাবে উন্মাদনার প্রাধান্য সহযোগী শিল্পীদের কণ্ঠে গান বড় উচ্চকিত এবং সর্বক্ষেত্রে শ্রুতিসুখকরও নয়। পরবর্তী শিল্পী তরুণ মুকুল শিবপুত্র। ব্যক্তিগত পরিচয়ে তিনি প্রখ্যাত শিল্পী কুমার গন্ধর্বের পুত্র। এই আসরে শিবপুত্র শোনালেন শ্রী রাগে খেয়াল পরে মুখুস্বামী দীক্ষিতর-এর হংসধ্বনিতে নিবদ্ধ জনপ্রিয় 'বাতাসী গণপতিম ভজেনম' গানটি। দ্বিতীয় গান পরিবেশনে শিল্পী অত্যন্ত সাবলীল ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বিবেচনায় এই শিল্পীর নির্বাচন সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। এমন মানের শিল্পী সারা ভারতে অসংখ্য—কেবল বাংলায় অন্তত পাঁচ ছয় জন তরুণ শিল্পীর উল্লেখ করা যায়। এই আসরের শেষ শিল্পী ছিলেন প্রবীণ ধ্রুপদ গায়ক রামচতুর মল্লিক। শিল্পী ভূপ কল্যাণের আলাপ ও ধামার শোনানোর পর বিদ্যাপতির পদ পরিবেশন করলেন। তাঁর কণ্ঠে বয়সের ছাপ, তবু তাঁকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। বিদ্যাপতির পদ গায়নে এখনো তাঁর কণ্ঠের নমনীয়তা বিস্মিত করে। সহযোগী শিল্পীর গান বড়োই বেমানান ঠেকেছে।

অষ্টম অধিবেশন। এই অধিবেশনে গান শোনালেন ওড়িশার রঘুনাথ পানিগ্রাহী, রাজস্থানের লখা লঙ্গ এবং কুমার গন্ধর্ব।

পরিশেষে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। প্রতিদিন অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে নির্দিষ্ট সময়, ব্যতিক্রম কিশোরী আমনকর-এর প্রভাতী অধিবেশন। প্রবল বর্ষণের পর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে শ্রোতার আসনের প্রস্তুতি হয়েছে ন্যূনতম সময়ে। কেবল শিল্পী নয়, শ্রোতৃমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে সর্বদা সজাগ থেকেছেন অ্যাকাডেমীর সম্পাদক কেশব কোঠারী ও তাঁর সহযোগীরা। এঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এমন স্মরণীয় অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হতে পেরেছে। তাঁরা সকলেই সংগীত রসিকদের ধন্যবাদার্হ। অধিকাংশ প্রদেশের শিল্পীরা তাঁদের নিজস্ব পোশাকে সজ্জিত হয়ে যখন মঞ্চে এসেছেন তখন এক বিচিত্র পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সেই সঙ্গে কত বিচিত্র যন্ত্রের সমাবেশ। জাতীয় সংহতির কথা মনে রেখে এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন অন্তত দেশের প্রধান শহরগুলিতে করা কি অসম্ভব? প্রতিদিনের ঘোষণা ছিল মনে রাখার মতো—যা নেপথ্যে থেকেও ছিল নিখুঁত। সর্বোপরি একটি চরম শৃঙ্খলা যা বর্তমান প্রতিবেদককে মুগ্ধ করেছে। স্মরণীয় অনুষ্ঠান যার স্মৃতি দীর্ঘকাল অম্লান থাকবে।

সুভাষ চৌধুরী

ছবি : সংগীত নাটক অ্যাকাডেমীর সৌজন্যে।

নিবারণ সংগীত সম্মেলন

নিবারণ সংগীত সম্মেলনের ষষ্ঠ আসর বসেছিল রবীন্দ্র সদনে সম্প্রতি। প্রারম্ভিক পর্বে নিয়মমাফিক প্রধান অতিথি প্রধান উপদেষ্টাকে মাল্যদান আর তাঁদের স্বল্প ভাষণ। উচ্চাঙ্গ সংগীত-নৃত্যানুষ্ঠানের প্রথমে সাজ্জাদ হোসেন ও সম্প্রদায়ের সানাইবাদন। শিল্পী বাজালেন কয়েকটি ধুন। একাধিকবার সুরচ্যুতির ফলে তাঁর পরিবেশন হতাশাজনক।

জয়পুর ঘরানার কথকের এক দৃষ্টিশোভন অনুষ্ঠান উপহার দিলেন বলাকা ঘোষ। ঠাট, পরণ, তোড়া, চক্রধা, তৎকার প্রভৃতি নিবেদনে বোঝা যায় তাঁর প্রকরণগত নৈপুণ্য, দেহ তথা পদসঞ্চালনের সাবলীলতা আর 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' নিবেদনে তাঁর নৃত্যাভিনয় চমৎকৃতিজনক। তাঁকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিলেন রাজকুমার মিশ্র (তবলা), রমেশ মিশ্র (সারেঙ্গী), বিশ্বনাথ সর্দার (কণ্ঠ) ও সুস্মিতা মিশ্র (বোলপরাণ)।

সুনন্দা পট্টনায়ক

মালগুঞ্জি রাগে বিলম্বিত খেয়াল গেয়ে সুনন্দা পট্টনায়ক তাঁর কণ্ঠসংগীতের অনুষ্ঠান শুরু করেন। বিস্তার অংশে একই ধরনের স্বরসংগতির পুনরাবৃত্তি ছিল আর রাগরূপের সুচারু উন্মোচনে তাঁর গায়কী বিশেষ সহায়ক হয় নি। তবে লয়কারিতে তাঁর স্বভাবজ দক্ষতার পরিচয় ছিল। তানকর্তবও করলেন সাবলীলভাবে। একই রাগে দ্রুত খেয়াল ও তারানা শুনতে ভাল লাগে। তবে হৃদয়ে পরশ রেখে গেল তাঁর শেষে গাওয়া ভজনটি। শ্যামল বসুর তবলাসঙ্গত ছিল পরিচ্ছন্ন ও সংযত। হার্মোনিয়ামে ছিলেন আসফাক খা

পরিশেষে বেহালাবাদনের এক শিল্পবোধসম্পন্ন রসোত্তীর্ণ অনুষ্ঠান শোনার সুযোগ হল ভি জি যোগের সৌজন্যে। আর একজনের কথাও এখানে উল্লেখ করা দরকার। তিনি হলেন শ্রীযোগের শিষ্য উৎপল চক্রবর্তী, বেহালায় আগাগোড়া সেদিন শ্রীযোগকে যথার্থ বুদ্ধিদীপ্ত সহযোগিতা দিয়ে গেলেন। প্রথমে মিয়া কি মল্লার রাগে আলাপ ও জোড়। রাগটি গভীরতা ও পূর্ণ মহিমা পায় আলাপে। রাগরূপ অক্ষুণ্ণ ছিল। জোড়টিও সুবিন্যস্ত। তারপর ঝাঁপতালে মধ্যলয় গৎ-এ পাওয়া গেল সুপরিকল্পিত স্বরসংগতির প্রয়োগ, বৈচিত্র্যপূর্ণ ছন্দের কাজ আর অতীব পরিচ্ছন্ন তানকারী। উজ্জ্বল তানকারী। উজ্জ্বল সহযোগিতা দেন তবলায় সাবীর খাঁ।

স্বপন সোম

ন ৃ ত্য না ট্য

ত্রিবেণী-র বার্ষিক অনুষ্ঠান

জগত জুড়ে উদার সুরে' ও 'আকাশ জুড়ে শুনিনু' : সম্মেলক কণ্ঠের এই দুটি রবীন্দ্রসংগীতে 'ত্রিবেণী-র বার্ষিক অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন। রবীন্দ্র সদনে সেদিন অতঃপর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী নির্মল বসু ও বিশেষ অতিথি রমা চৌধুরী তাঁদের স্বল্প ভাষণে সংস্থাকে জানালেন শুভেচ্ছা।
দ্বিতীয়ার্ধে নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা। সার্বিকভাবে রমণীয় নিবেদন। নৃত্যাভিনয়ে কুরূপার ভূমিকায় রেখা মৈত্র নৃত্য-কুশলতার সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে মিশিয়ে দেন বাঙ্ময় অভিনয়। চরিত্রটি প্রাণ পায়। একইভাবে সুতপা দত্তগুপ্তের কৃতিত্বে সুরূপা চরিত্রটিও জীবন্ত। নৃত্যে নিপুণ মলয় ভট্টাচার্য অর্জুন চরিত্রের রূপায়ণে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাঁর ঘাটতি ছিল অভিব্যক্তি প্রকাশে। যেমন নেপথ্যে যখন পার্থ ঘোষ সঠিক নাটকীয়তায় পাঠ করে চলেছেন অর্জুনের সংলাপ—'এ কি তৃষ্ণা, এ কি দাহ···', মঞ্চে তখন অর্জুনকে দেখে কিন্তু টের পাওয়া যায় না তার মানসিক অবস্থা। মদন (সুতপা কুণ্ডু), অর্জুনের সখাগণ কিংবা চিত্রাঙ্গদার সখীগণ যথাযথ। সংগীতাংশে অর্জুনের গানে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় প্রথম দিকে একটু অস্বচ্ছন্দ পরে অবশ্য তাঁর পরিবেশন শ্রুতিআকর্ষক। কুরূপার গানে ছিলেন তিনজন : সুমিত্রা সেন, শ্রাবণী সেন ও রুনু দত্ত। পরিচ্ছন্ন গেয়েছেন

সুতপা দত্তগুপ্ত

শ্রাবণী সেন আর রুনু দত্ত, তবে এই দুজনের তুলনায় সুমিত্রা সেনই বেশি উজ্জ্বল এবং অটুট কণ্ঠমাধুর্যে তিনিই গেয়েছেন অধিকাংশ গান। সুরূপার (গীতা ঘটক) গানেও ছিল প্রার্থিত নাট্যরস। অসিতাভ মুখোপাধ্যায়ের (মদন) কণ্ঠটি শুনতে ভাল তবে গানে আরও প্রাণ চাই। পাঠে পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষ সপ্রাণ। তালবাদ্যে বিপ্লব মণ্ডল প্রশংসনীয়। অন্যান্য যন্ত্রানুষঙ্গীরাও (রঞ্জন মজুমদার, বিষ্ণু সাধুখাঁ, সৌমেন বসু, শক্তি মুখোপাধ্যায়) উল্লেখযোগ্য।
নৃত্য-পরিকল্পনা রেখা মৈত্রের। সংগীত পরিচালনা করলেন সুমিত্রা সেন।

স্বপন সোম

না ট ক

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বাবুমশাই

ওয়ান ওয়াল থিয়েটার এবং যাত্রার মধ্যে পার্থক্য কি শুধু একটা দেওয়ালের ? প্রেক্ষাগৃহের বাইরে হাজার হাজার দর্শকের সামনে চলচ্চিত্রে এবং নাট্যজগতের স্বনামধন্য পুরুষদের দিয়ে সংলাপ বলিয়ে ব্যবসা করার প্রয়োজনেই যার জন্ম তার সঙ্গে যাত্রার ফারাক কতটা ? যাত্রার শিল্পীদের চারদিক ঘুরতে হয়, এঁদের তিনদিক। অমুক কুমার যাত্রা করছেন শুনতে এখনও যাদের খারাপ লাগে, যেসব শিল্পী মনে করেন জনতার মুখোমুখি চার পাশ থেকে হাওয়া বহুৎ ঝামেলার ব্যাপার তাদের সবাইকে বাঁচিয়ে রাখতেই ওয়ান ওয়ালের উৎপত্তি। যদিও বড় বড় স্টার থাকা সত্ত্বেও জলে নামব চুল ভিজাবো না নীতির জন্যে না ঘাটকা না ঘরকা হয়েই রইল। তাতে অবশ্য প্রযোজকদের কিছু যায় আসে না। কোন শুদ্ধ শিল্পচেতনা থেকে যার জন্ম নয় তার কাছ থেকে কতটা ভাল কিছু আশা করা যায় ? যাত্রার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। তার সবকিছুই চড়াদাগে বাঁধা। ইদানীং যাত্রাতে সামাজিক সমস্যার প্রতিফলন দেখছি। একটু শিক্ষা দেওয়ার প্রবণতা থাকছে কিন্তু আপামর জনসাধারণের কাছে সহজে পৌঁছবার সুবাদে যাত্রা তার নিজস্ব চরিত্র বজায় রাখছে। ওয়ান ওয়াল না সৎ নাটক না যাত্রা। অনেকটা শ্যামবাজারী থিয়েটারের তরল সংস্করণের সঙ্গে যাত্রার ঢঙ মিলিয়ে এর পরিবেশন।
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম ওয়ান ওয়ালের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনেকদিন। নতুন প্রযোজনা 'বাবুমশাই'-তে তাঁকে প্রথম দেখলাম। একেবারে শেষ দৃশ্যের কাছাকাছি আসা পর্যন্ত, বলতে দ্বিধা নেই, মুগ্ধ ছিলাম তাঁর অভিনয়ে। আমি দেখেছি ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে। সেখানে মাইকের প্রয়োজন ছিল না আর তিনটে দিকেই দেওয়াল ছিল। কিন্তু মঞ্চের মাঝখানে প্লাটফর্ম ফেলে এই অভিনয়ের ধারা বলে দেয় বৃহৎ দর্শক এঁদের লক্ষ্য।
ধরে নিতে হয়, উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যে বাবুগিরির জন্যে এই দেশ প্রচারিত সেই সময়কেই এই প্রযোজনা ধরতে চেয়েছে। বাইজি নাচানো, মদ খাওয়া, বাবুদের রেষারেষি এসব তো আছেই, কিন্তু নাটকটির বৈশিষ্ট্য অন্য জায়গায়। এর নায়ক-বাবু জন্মসূত্রে বাবু নয়। তাকে দত্তক নেওয়া হয়েছিল। প্রায়ই তার মনে পড়ত খোলা আকাশ, গ্রামের মাঠ আর গরীব বোনের কথা। বাবুদের নকলজীবনে সে হাঁপিয়ে পড়ত। কিন্তু কেন সে তাতেই আবদ্ধ ছিল তার ব্যাখ্যা নাটকে নেই। সে তো স্বচ্ছন্দেই ছেড়েছুড়ে চলে যেতে পারত। বাবুবিলাসের যে নেশা তার মধ্যে দেখেছি তা খুব জোরালো নয়। মনে হয়েছে কেউ তাকে বেঁধে রেখেছে কিন্তু কোন প্রতিপক্ষ দেখিনি। শুধু পিতৃদণ্ড তার বহন করার দায় হলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু তার ধার আদৌ ধারালো মনে হয়নি। নফরচাঁদের গল্পটি বরং বেশ ভাল। যদিও তার মা পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও এতদিন মুখ বন্ধ করে বসে থাকবে এটা অবিশ্বাস্য। মামাবাবুর চক্রান্ত বড় মোটাদাগের তা যে নাটকের চরিত্ররা কেন বোঝে না তা কে জানে !
অর্থাৎ বেশ জমজমাট সেন্টিমেন্টাল নাটক যাতে চক্রান্ত, গুণ্ডাবাজী, বাইজীর নাচ, ভাঁড়ামো একটু ছলাকলার মিশেল ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এ সব ছাপিয়ে আছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়। একটি মেরুদণ্ডহীন বাবুর চরিত্র ফুটিয়ে তিনি দর্শকদের চমৎকার আমোদ দিয়েছেন। শেষ দৃশ্যে অবশ্য তাঁকে মুখস্থ বলতে দেখলাম। দ্বিতীয় যে নাম অবশ্যই উল্লেখ্য তা হল দুলাল লাহিড়ীর নফর। অত্যন্ত ক্ষমতাবান অভিনেতা। ভাল ভূমিকা পেয়ে চমৎকার নিজেকে তুলে ধরেছেন। কল্যাণী মণ্ডল সংলাপ ভুলেছেন অনবরত, দুলাল তো তাঁকে একবার ভরাডুবি থেকে বাঁচিয়েছেন। লিলি চক্রবর্তী তো সব সময় নিজের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন। তাঁকে আজ পর্যন্ত খারাপ অভিনয় করতে দেখলাম না। নির্মল ঘোষ(গোঁফ খুলে যাওয়া সত্ত্বেও) জমিয়ে কাজ করেছেন।
আশা করা যায়, নাটকটি বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে জনপ্রিয় হবে।

অমিত রায়

সচেতন প্রয়াস

রাক্ষস হচ্ছে লোভী অত্যাচারী শাসক-প্রধান। দেশের লোকসাধারণের কাছে তার তিনটি চেহারা। তাকে সবাই মানে, ভক্তিতে নয়—ভয়ে। তার পার্শ্বচরেরা সর্বদা স্তুতিবাদে মুখর থাকে। এই জবরদস্ত শাসক-প্রধানের জন্য কুমারী নির্বাচন করা হয়। এই কায়েমী কর্তাভজার দেশে প্রতিবাদের কোনো শব্দ উচ্চারিত হয় না। হঠাৎ নীলকমল নামে এক তরুণ বীরের আগমন। রাক্ষসের জন্য নির্বাচিতা কন্যার সঙ্গে তার প্রণয় ঘটে। ফলে রাক্ষসের সঙ্গে তার যুদ্ধ এবং রাক্ষসের মৃত্যু। কিন্তু নীলকমল হঠাৎ নিখোঁজ—। তারপর যেমন হয়, মন্ত্রী ও মন্ত্রীর পুত্র শাসনক্ষমতা হাতিয়ে, রাক্ষসকে মারার সব কৃতিত্ব আত্মসাৎ ক'রে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হয়। নাট্যকাহিনীতে ইচ্ছাপূরণের ব্যাপারটি বেশ তীব্র। প্রাচীন একটি লোক-কথাকে ভিত্তি

দীপঙ্কর পাল ও লিপিকা লাহা

করে চল্লিশের দশকে নাট্যটি রচনা করেছিলেন রাশিয়ান লেখক ইয়েভ্‌গেনি লিভোভিচ্‌ শোয়ার্‌ৎস । একই লোক-কথাই সম্ভবত আকৃষ্ট করেছিল আরেকজন জার্মান লেখক হোল্‌ফ বিয়ারমানকে । কবিয়াল বিয়ারমান 'ড্রা ড্রা' নামে একটি অপেরা রচনা করেছিলেন । তবে দুটি নাটকে কাহিনীগত ও আঙ্গিকগত কিছু তফাৎ আছে । এই বিষয়টি দুই নাট্যকারকে আকর্ষণ করার কারণ সম্ভবত লোক-কথার ছলে সমকালীন রাজনীতির একটা স্পষ্ট চেহারা তৈরি করা । শোয়াৎস্‌-এর লেখা এই কমিউনিস্ট রূপকথাটিকে প্রযোজনার জন্য নির্বাচন করে প্রয়াস নাট্যগোষ্ঠী । সম্ভবত দ্বিতীয় অনুবাদ থেকে রূপান্তর করেছেন অশোক মুখোপাধ্যায়, নির্দেশক বিদ্যুত নাগকে আরো সতর্ক হতে হবে সম্পাদনার ব্যাপারে । নাটকটির গতি মাঝে মাঝে শ্লথ হয়ে গেছে । তবে প্রযোজনার অন্য সব বিভাগে যে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল । নগরপালের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় আমাদের মনে রাখবার মতো । পূর্ণ কর্তৃত্বে তিনি চরিত্রটি অভিনয় করেছেন । সত্যশেখরের ভূমিকায় রামাশিস বক্সীর কথা । প্রায়-বিদ্রোহী এই চরিত্রটিকে তিনি প্রত্যয়িত করেছেন । রাক্ষসের ভূমিকায় পল্লব রায়ের অভিনয় ছিল খুবই শ্রমসাধ্য এবং তিনি সফলও । বিড়ালের ভূমিকায় সুব্রত দে-র গান এবং অভিনয় দুই-ই সাধুবাদযোগ্য । কিন্তু নীলকমলের চরিত্রে দীপঙ্কর পালের নির্বাচন সম্পর্কে অস্বস্তি থেকে যায় । মঞ্চে তাঁর হস্ত পদচালনা খুব সাবলীল নয় । স্বরক্ষেপেও কিছু দ্বিধা থেকে যায় । লিপিকা লাহার ইন্দুমতী ভালো ।সুনীল সিংহও (ব্রজগোপাল) প্রশংসা পাবেন, প্রযোজনার টিম-ওয়ার্ক অত্যন্ত জোরালো । ছোটখাটো প্রায় প্রতিটি চরিত্র সুঅভিনীত বলা চলে । শম্পা ঘোষের পুতুলচালনার কথাটিও বলা দরকার । মঞ্চ পরিকল্পনা এক কথায় ভালো লাগেনি বলাই ভালো । তাপস সেনের আলোক পরিকল্পনা এ নাটকে বিশেষ কোনো মাত্রা পায়নি । দেবাশিস দাশগুপ্তের আবহ নির্মাণ সুচিন্তিত । 'রাম তেরী গঙ্গা মইলি' নামক একটি জনপ্রিয় হিন্দি সিনেমার পরিচিত সুর তিনি সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন একটি দৃশ্যে । অন্যান্য গানের সুরগুলিও মন্দ হয় ।

বহুমুখীর অভিনয়

বিশ্বরূপায় বহুমুখীর অনুষ্ঠান আধঘন্টা দেরি করে শুরু হয়েছিল । মূল অনুষ্ঠান নাটকের আগে কিছু বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল । তাতেই বোঝা গেল দলটির ঠিক গ্রুপ থিয়েটারের চেহারা নয় । বক্তৃতামালার মধ্যে 'আগ্রহতা' শব্দটি শোনা গেল এবং জানা গেল "রঙ্গরসের জন্যই নাটক করা ।' এক 'বক্তা নাটকের যিনি রচয়িতা' এই অবধি বলে পাশের জনের কাছ থেকে জেনে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করলেন । নাটকের নাম 'অগ্নিসংকেত' । সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসটি থেকে নাট্যরূপ দিয়েছেন সুভাষ আচার্য । ঐতিহাসিক নাটকের মতো একেকজন মাঝে মাঝেই দীর্ঘ স্বগত সংলাপ বলে যায় । বেশ কিছু অংশ সম্পাদনা করার সুযোগ ছিল । বীরেন্দ্রচন্দ্র চন্দ আবহ নিয়ে বিশেষ কিছু ভাবনাচিন্তা করেননি বলেই মনে হল । কাশীনাথ পালের আলোকপরিকল্পনা সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলার নেই, তবে মুখে রক্ত তুলে মরে যাবার দৃশ্যে তিনি লাল আলো ব্যবহার করতে ভোলেননি । পরিচালক বিশু চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ কোনো মুন্সীয়ানা এই প্রযোজনা থেকে আবিষ্কার করা গেল না । তবে শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় আমাদের আশ্বস্ত করে । দুটি পৃথক সত্তার অভিনয়ে তিনি চরিত্রটিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন ।

এই পতনোন্মুখ সমাজ ব্যবস্থার মস্তান বাহিত রাজনীতির যে ছবিটি সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এঁকেছিলেন তাঁর সময় ও সমাজসচেতন এই উপন্যাসে, বহুমুখী গোষ্ঠী তার নাট্য প্রযোজনা করে অন্তত তাঁদের সামাজিক দায়বদ্ধতা যে স্বীকার করে নিয়েছেন সেকথা বলতেই হবে । প্রযোজনার গুণগত বিচারে তাঁরা পিছিয়ে থাকলেও প্রচেষ্টার জন্য কিছু সাধুবাদ তাঁদের প্রাপ্য । মস্তানদের ভূমিকার মধ্যে রাজুর চরিত্রে ভাল অভিনয় করেছেন সুব্রত চট্টোপাধ্যায় । অবশ্য মৃত্যুদৃশ্যে ঈষৎ অতিকৃতি চোখে পড়ে । অবশ্য বেশির ভাগ সময়েই দেখা যায় এইসব দৃশ্যে প্রায়শই অভিনেতারা নিজেদের সংযত করতে পারেন না । সৌমিত্র নিয়োগী, ব্রজগোপাল বসাক ও গৌতম চক্রবর্তীও চেষ্টার ত্রুটি করেননি । প্রভাতী মিত্রের আরতিও প্রশংসা পাবেন ।

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

রে ক র্ড

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ

রিলায়েন্স ইন্টারন্যাশন্যাল রেকর্ডস অ্যান্ড ক্যাসেটস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, বম্বে সঙ্গীতের জগতে নতুন একটি নাম । প্রথম নিবেদন ভজনমালা—'শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' । এই সুরুচির জন্য প্রথমে ধন্যবাদ । জগঝম্প গানের প্রলোভনে পড়েননি । বাণিজ্যিক সাফল্যের কথা ভাবেননি । সুরকার এবং কোনও কোনও গানের গীতিকার দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী একজন প্রতিভাবান মানুষ । নিজে একজন সুখ্যাত তবলাবাদক । তালিম পেয়েছেন প্রখ্যাত শান্তাপ্রসাদের কাছ থেকে । সেতার শিখেছেন অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে । গত পাঁচিশ বছর ধরে বিভিন্ন সংগীতগুণীর কাছে কাজ শিখেছেন, যেমন, দাদা বর্মন, আর ডি বর্মন, সলিল চৌধুরী, শ্যামল মিত্র । গীতা দত্ত, হেমন্তকুমার, কিশোর কুমারের সঙ্গে বিদেশভ্রমণ করে এসেছেন । দেবীপ্রসাদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ।

'শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' একটি ছায়া ছবির নাম । দেবীপ্রসাদেরই কাহিনী, চিত্ররূপ ও সংগীত পরিচালনায় যে কোনও দিন মুক্তি পাবে । এই ভজনমালা সেই ছায়া ছবিরই গান । ফিল্মী ভজনের একটা চটুল অপভ্রংশ চেহারা হয় । অনেকটা 'পপ-ভজনের' মতো । আলোচ্য ভজনমালায় ভজন আছে । রাগাশ্রয়ী তো বটেই । পুরীয়া-ধানেশ্রী, পুরীয়া, ইমন, জৌনপুরী, হিন্দোল, বাহার, ভূপালী প্রভৃতি রাগের সুচারু ব্যবহারে কিছু কিছু গান প্রকৃতই সুন্দর । একটিই অভিযোগ, প্রথম স্তবকে যতটা নয়, দ্বিতীয় স্তবকে যন্ত্রানুষঙ্গ গায়কের কণ্ঠস্বরকে ছাপিয়ে যায় । বিশেষত তবলা । আর একটু চাপা হলে সর্বাঙ্গসুন্দর হত । গায়কের তালিকায় নামী এবং অনামী শিল্পীরা আছেন । নামীদের মধ্যে রয়েছেন, অনুপ জালোটা, আশা ভোঁসলে, আরতি মুখোপাধ্যায়, ভূপিন্দর । আর আছেন সোনালী জালোটা, অশোক ভার্মা, মিসেস অ্যানেট, অঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর অরুণকুমার । গীতিকারদের মধ্যে আছেন, যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, লালন, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার ও দেবীপ্রসাদ । মজা হল এই মালিকায় হিন্দি, বাঙলা আর ইংরেজি গান মিলে মিশে আছে । হারীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ইংরেজি গান—কৃষ্ণাস ফ্লুট ইজ সিঙ্গিঙ্গ । ভূপিন্দর ধরেছেন স্বভাবসিদ্ধ ভরাট গলায় পরে এসেছেন অ্যানেট । ইংরেজি এসে মিশেছে যোগেশের লেখা বাঙলায়, হরি হরি হরি হরি বোল হরি, শেষ হচ্ছে গৌরীপ্রসন্নর 'কৃষ্ণ জীবন, কৃষ্ণ মরণ' দিয়ে । ভূপিন্দরের গলায় বাঙলা গান বেশ খুলেছে । বিশেষ করে 'মরণ' শব্দটি, একটু আধো আধো উচ্চারণে বেশ লাগল । অশোক ভার্মাকে আমরা আলাদা ভাবে চিহ্নিত করে রাখি । সুন্দর গলা । ভাব আছে । ভজন গাইলে সুনাম হবে । আমরা একজন ভালো শিল্পী পাবো । অরুণকুমারের গলা ছোট মাপের । নামার দিকে ভালো জোয়ারি থাকলেও দম নেই । কোনভাবে শ্বাসের ঐশ্বর্য আয়ত্তে আনতে পারলে বেশ শ্রুতিসুখকর হবে । শ্রোতার অস্বস্তি থাকবে না । আশাকে দিয়ে একটি মাত্র গান গাওয়ানো হয়েছে । বাণী এবং গায়ন কোনওটাই তেমন সুখের হয়নি । অনুপ দুটি গান একা গেয়েছেন আর একটি গেয়েছেন আরতির সঙ্গে । অনুপ ভঙ্গী পাল্টেছেন । ইদানীং তাঁর গান বড় ছাপ মারা হয়ে যাচ্ছিল । সুন্দর গলা, সযত্ন অনুশীলনের উর্ধ্বে সর্বস্ব হয়ে উঠছিল ঢং । ভজনের শান্ত মাধুর্য হারিয়ে যেতে বসেছিল । তিনি 'ভজ-গজ-কথামালা' ত্যাগ করে বেশ করেছেন । সোনালী জালোটা সম্পর্কে বলার কিছু নেই । গলা ভাল, সুরও আছে, তবে একটা প্রশ্ন থেকে যায় ।

এই সব গান ছায়াছবির অঙ্গে, চরিত্রদের মুখে ছাড়া ছাড়া শুনলে ভাল লাগবে আরো । এক সঙ্গে, একাসনে শুনলে একটু গুরুচণ্ডালী লাগতে পারে । এমনও হতে পারে, কোনও গানই হয়তো মনে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারল না । সোনালীর বাঙলা উচ্চারণ ভালো না । বিশেষত ছন্দে বসানো দ্রুত লয়ের— 'থই থই করে নাচে নন্দলালা', তাঁর পক্ষে বেশ কঠিন গান । অনুপ আরতির সমবেত পরিবেশন—-করো হরিকা ভজন প্যারে,বেশ জমে গেছে, রাগমালার গুণে । আরতির গলার সে দাপট কোথায় ।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

জ

জ্যাতির্ময়ী দেবী
কনে দেখা ২১, ৪০, ৭ আ ১৯৫৪ : ৫০-৫২
জ্যাতির্মালা দেবী ৪৯, ৪৮
জ্যাতিস্মিতা। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ৪৮, ২৩
জ্যাতিষ ৪১, ৩৫
জ্যাতিষ ও জ্যোতিষী। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শা ১৯৫৯
জ্যাতিষচন্দ্র গুহ ৪২, ২৭
জ্যাতিষী বচন : দ্রব্যমূল্য ৪৮, ২৮, ১ আ ১৯৮১ : ৭, সম্পা
র। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৩১, ১৭
র। প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় শা ১৯৬৪
র। মণিভূষণ ভট্টাচার্য ৩০, ৩৭
র বাড়ে। সন্তোষ চক্রবর্তী ৪২, ৪৩
লন্ত মশাল কেন নিবল। তপন ঘোষ ৪৭, ৫
লুক চালচুলো। সুব্রত রুদ্র ৪৯, ৩৯
লা : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ২৫, ৩৬
লা। তুলসী সেনগুপ্ত ৪০, ৩২
লা শুধু জ্বালা। সুনীল বসু শা ১৯৭১
লাতে পারিনি বলে। রাখাল বিশ্বাস শা ১৯৭৯

ঝ

ড়। নির্মল হালদার ৪৯, ৪৮
ড়। প্রতিমা রায় ৫০, ১১
ড়। মানিক মুখোপাধ্যায় ২৩, ১৩
ড় থামার পর। মনোজ ঘোষ ৩৮, ৫১
ড় থেমে গেছে। মণীন্দ্র রায় ২৭, ৩১
ড়কে চাই না। উমা দেবী শা ১৯৬৫
ড়েশ্বর বাখরা। কালীকৃষ্ণ গুহ ৪২, ১৫
রনার সোনা। দেবারতি মিত্র শা ১৯৮৩
রা বসু
কেশবচন্দ্র সেন ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ৫০, ২২, ২ এ ১৯৮৩ : ১৩-১৮, স
সাহিত্য : এক হিন্দু মৌলবীর আত্মকথা : গিরিশ সেন ১৮, ১৪, ১১ এ ১৯৮০ : ২৬-২৭, স
র্ণা। বিনোদ বেরা ৪৯, ৪০
র্ণা ভড় ২৯, ৪৬
উগাছটা কর্তাব্যক্তি। সুধেন্দু মল্লিক ৩৮, ১০
টি পাহাড়ী। রবি গঙ্গোপাধ্যায় ৪৯, ৭
াড়পোঁচ। অসীম রায় ৪৩, ৯
লবনীর শচীনাথ। প্রলয় সেন ৪৫, ৪১
সীর রানী। মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ২২, ৪০—২৩, ৯
নুকের জন্য। বটকৃষ্ণ দে ২৫, ২৬
নুকের জন্যে। হরপ্রসাদ মিত্র শা ১৯৭৩
কে থাকি স্বপ্ন বারান্দা। ব্রততী বিশ্বাস ৪৩, ২৭
টো মুক্তো। সুনীল বসু ৪৭, ১৪
ল বারান্দায়। সুচেতা মিত্র ৪৫, ১২
লন্ত জানলা। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৩৬, ২১
লে থাকার ব্যাপার। সুনীল বসু ৪৩, ৩৪
ঝাড়ো বর্তমান। শান্তনু দাস ৪২, ৭

ট

ক কুল। সুব্রত সরকার ৫০, ২৭
ব্যাগো—বিবরণ ও ভ্রমণ *দেখুন* ত্রিনিদাদ ও টব্যাগো—বিবরণ ও ভ্রমণ
টমসন
হায় মূঢ় মানুষ *অনু* সৌরাচার্য ২১, ২৪; ১৭ এ ১৯৫৪ : ৬৮১, ক
টমসন, জেফ ৪২, ৩৪
টমাস কাপে প্রথম খোদাই হল চীন-এর নাম। প্রদ্যোৎকুমার দত্ত ৪৯, ৩৪
টমাস, ডিলান মার্লে
লণ্ঠনেরা আলো দিলে *অনু* গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ২৪, ৩১, ১ জুন ১৯৫৭ : ৪২৩, ক
টমাস, ডিলান মার্লে ২৪, ১; ২৮, ৪২
টমাস মান ও বেতাল পঞ্চবিংশতি। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪, ৩৮
টমাস মানের মহিমায়। অসীম রায় ৪২, ৪১
টমেটো। সুব্রত সেনগুপ্ত ৩৯, ৪১
টলতে টলতে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় শা ১৯৭৭
টলস্টয়, লিও আলেকসিভিচ ৪৫, ৪৫
টলস্টয়, লিও আলেকসিভিচ—সাহিত্য ২৮, ২০ ; ২৮, ২১
টলস্টয়-সদন। শুভময় ঘোষ ৪৫, ৪৫
টলস্টয়ের ছোট গল্প। শশিভূষণ দাশগুপ্ত ২৮, ২০
টলস্টয়ের দেড়শততম জন্মদিবস ৪৫, ৪৭, ২৩ সে ১৯৭৮ : ৯, সম্পা
টলস্টয়ের সাহিত্যাদর্শ। শশিভূষণ দাশগুপ্ত ২৮, ২১
টা-টা। বুদ্ধদেব গুহ শা ১৯৮২
টাইগার হিল। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত শা ১৯৭৯
টাইটান রহস্য। সমরজিৎ কর ৫০, ২৫
টাইনি কটেজ। কাজললতা ঘোষ ৪৭, ২৬
টাইফয়েড ৩০, ৫২
টাইফয়েড মেরী। চিরঞ্জীব সেন ৩০, ৫২
টাউন হল সংবর্ধনায় রবীন্দ্রনাথ। সুজিতকুমার সেনগুপ্ত সা ১৯৭৮
টাংরি কাবাব। নবনীতা দেবসেন শা ১৯৮৩
টাকা। কবিরুল ইসলাম ৪৮, ১২
টাকা আছে টাকা নেই ৫০, ৩৮, ২৩ জু ১৯৮৩ : ১১, সম্পা
টাকা পয়সা ইত্যাদি। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৪৩, ১০
টাকার মূল্য হ্রাস ও মুনাফা ৩৩, ৩৪, ২৫ জুন ১৯৬৬ : ৮৭৭
টাকের সঙ্গে ব্রা। সমরেশ বসু সা ১৯৮২
টাঙ্গি। শেখর বসু ৩৭, ৩৫
টান। শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ৪৪, ৪০
টান মেরে ছিঁড়ে। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৩৩, ৫০
টানাপোড়েন। সমরেশ বসু শা ১৯৭৮
টানাপোড়েনের মাঝখানে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সা ১৯৮৩
টারান্টেলা। অনন্য রায় ৪৯, ৪০
টার্নার, গ্লেন ৪০, ৩৩ ; ৪২, ৩৫
টার্নার, গ্রেট মেইটল্যান্ড ৪৪, ২
টি ই শ্রীনিবাসন *দেখুন* শ্রীনিবাসন টি ই
টি এস এলিয়ট : পুনর্বিচার। জগন্নাথ চক্রবর্তী ৩২, ২৬
টি জানকীরামন *দেখুন* জানকীরামণ টি
টিওফিলো, স্টিভেনসন ৪৩, ৪৬
টিক টিক টং। সুকুমার রায় ২২, ৪৫
টি টাউরি। সমরজিৎ কর ৩৬, ৫১
টি টি সি চাটুজ্যে। অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায় ২১, ৪৬
টিনটার্ন। আরতি দাস ৩৭, ২৭
টিনটিন ও শিল্পী আরজ। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০, ৩৩
টিনটোরেটোর যীশু। সত্যজিৎ রায় শা ১৯৮২
টিনা। হরপ্রসাদ মিত্র শা ১৯৫৬
টিপসই। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২১, ৬
টিপু সুলতান ২২, ৪
টিপু সুলতান। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২২, ৪
টিভির নেশা। অরবিন্দ ঘোষ ৪৯, ৪
টিম রাইল্‌স। সুদেব রায়চৌধুরী ৪৭, ২৬
টুং হুয়াং-এর সহস্র গুম্ফা : তার বৌদ্ধ প্রাচীর চিত্র। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা বি ১৯৮১
টুংহুয়াং—গুহাচিত্র বি ১৯৮১
টুকরো দুই। বিমান রাউত ৪৯, ১০
টুঙ্কু আবদুল রহমান ৩০, ৪৬
টুটুর জন্য। বুদ্ধদেব বসু শা ১৯৫৪
টুনি মেম। সৈয়দ মজতুবা আলী ২৯, ৩০—৩০, ২
টুল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৪২, ২৩
টুসু পরবে পুরুলিয়ায়। অমিয় দত্ত ৩৪, ১৪
টেক্কা ধরা গেল না। জ্যোতির্ময় দত্ত ৩১, ৩৮
টেনশন *দেখুন* প্রেষ
টেনশন : সমাজে ও সাংস্কৃতিক জগতে। মিহির সিংহ ৪৫, ২৭
টেনিস ৩০, ৮ ; ৩১, ৮(বি) ; ৪৪, ৩৫ ; ৪৪, ৩৯ ; ৪৫, ১২ ; ৪৫, ৩৯ ; ৪৫, ৪১ ; ৪৬, ৩৯ ; ৪৭, ৪৮ ; ৪৯, ৪ ; ৫০, ৪৯ ; বি ১৯৭৪ ; বি ১৯৭৫ ; বি ১৯৭৭ ; বি ১৯৭৯
টেনিস কন্যা ক্রিস এভার্ট। প্রদ্যোৎকুমার দত্ত ৪০, ৩৮
টেনিস কোর্ট থেকে মার্গারেট কোর্টের বিদায়। প্রদ্যোৎকুমার দত্ত ৪৩, ২৪
টেনিস খেলার একাল সেকাল। রমেশ গঙ্গোপাধ্যায় ৩১, ৮ (বি)
টেনিস : ভারত-নিউজিল্যান্ড। সুব্রত সরকার ৪৫, ১২
টেনিস সাধক গনজালেস। রমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ৩০, ৮
টেনিসে দেশত্যাগী দুই চেক চ্যাম্পিয়ন। প্রদ্যোৎকুমার দত্ত ৪৫, ৪১
টেনিসে বর্গের প্রতিভা বিত্ত ও বৈভব। প্রদ্যোৎকুমার দত্ত বি ১৯৮০
টেনিসের গৌরব। প্রদ্যোৎকুমার দত্ত ৩৯, ২২
টেনিসের নামে প্রহসন। অরিজিৎ সেন ৪৯, ২৮
টেনিসের বিস্ময় বালক। প্রদ্যোৎকুমার দত্ত ৪৬, ৩৭
টেনিসের বিস্ময় বিয়র্ন বর্গ। প্রদ্যোৎকুমার দত্ত ৪৩, ৩৮
টেনিসের সেই প্রবাদ পুরুষ ফ্রেড পেরী। প্রদ্যোৎকুমার দত্ত ৪৫, ৩৯
টেনিসের ব্যাড বয় এবং বিরাট খেলোয়াড়। প্রদ্যোৎকুমার দত্ত ৪৪, ৩৬
টেপ রেকর্ড। নরেন্দ্রনাথ মিত্র ৩৩, ৩৬
টেবলটেনিস ৩৭, ১২ ; ৩৭, ৫১—৩৮, ১৬ ; বি ১৯৭৩ ; বি ১৯৭৪ ; ৪২, ১৪ ; ৪২, ১৫ ; ৪২, ১৬ ; বি ১৯৭৫ ; ৪৫, ৬ ; ৪৬, ৩০ ; বি ১৯৭৯ ; ৪৭, ১৬ ; ৪৭, ১৭ ; ৪৭, ৩০ ; ৪৯, ৩৬
টেবলটেনিস এগিয়ে যাচ্ছে। চিত্ত বিশ্বাস ৪৫, ৬
টেবলটেনিস ও এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। পুষ্পেন সরকার বি ১৯৭৯
টেবলটেনিসে উদীয়মান। প্রদ্যোৎকুমার দত্ত ৩৯, ৫
টেবিলটেনিসে কেন আমরা পিছিয়ে পড়েছি। মণীশ মৌলিক ৪৭, ১৬
টেবলটেনিসে চীনের একচ্ছত্র আধিপত্য। প্রদ্যোৎকুমার দত্ত ৪৯, ৩৬
টেবিলটেনিসে মস্ত নাম মিলান অরলোয়াস্কি। প্রদ্যোৎকুমার দত্ত ৪২, ১৭
টেবিলটেনিসের আইনকানুন। প্রদ্যোৎকুমার দত্ত ৩৭,

ব্রিটানিয়া দুধ বিস্কুট
বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!
Milk Bikis
BRITANNIA
Milk Bikis
সুস্বাদু পুষ্টিকর বিস্কুট
ব্রিটানিয়া
LINTAS BIN MB 9 2720 BG

২৯ নভেম্বর ১৯৮৬
দেশ
শিক্ষা
তমালকুমার মুখোপাধ্যায়

'Even my wife is pleased with my latest involvement!'

'Can you imagine a mature man like me falling head over heels in love like a raw teenager? That's just what happened when I saw Gwalior Suiting's Dornfab range. Love at first sight, that's what it was! One look..... and I knew that Gwalior Suiting and I were going to be great blends.

Finally, I had to confess to my wife. She gave me a cynical look and marched off to examine the Dornfab range. And returned with a bagful of fabrics, raving over Dornfab's super weaves, soft colours and latest designs. I was so thrilled with her approval that I immediately endorsed the Dornfab range.'

M. A. K. PATAUDI

GWALIOR SUITING GR

IN A CLASS OF ITS OWN

বিশ্বাসে দুর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়!

আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র!

নিয়মিত কোলগেট ব্যবহার সারা পরিবারকে দেয় সুস্থসবল দাঁত
আর তাজা নির্মল নিশ্বাস। এর থেকেই তো আসে আত্মবিশ্বাস!
আর কোলগেটের তাজা মিষ্টি স্বাদ কার না পছন্দ!

প্রতিবার দাঁত মাজার সময়ে কোলগেটের বিশিষ্ট
ফর্মূলা কীভাবে কাজ করে দেখুন।

দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা
খাবারের টুকরো থেকেই নিশ্বাসের গন্ধ
আর দাঁত ক্ষয়ের শুরু।

কোলগেটের অজস্র সক্রিয় ফেনা
দাঁতের ফাঁকে ঢুকে এই ক্ষয়ক্ষতিকারী
খাবারের কণাগুলো বার করে আনে,
রোগজীবাণু হ'তে দেয় না।

ফলে দাঁত থাকে সুস্থসবল,
নিশ্বাস হয় ঝরঝরে তাজা।

প্রতিদিন নিয়মিত কোলগেট দিয়ে দাঁত
মাজতে ভুলবেন না। সম্ভব হ'লে প্রতিবার খাবার পর।
নিশ্বাসে দুর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়!
আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র।

কি তাজা মিষ্টি স্বাদ!

প্রকাশিত হল

সাধনা মুখোপাধ্যায়ের

দুঃসাহসিক গার্হস্থ্য কবিতার সংগ্রহ

ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর রবীন্দ্রসঙ্গীত

দাম ১০.০০

'ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর রবীন্দ্রসঙ্গীত' সাধনা মুখোপাধ্যায়ের লেখা দুঃসাহসিক কিছু কবিতার সংকলন। প্রত্যেকের জীবনের খুঁটিনাটি নানান বিষয়—যা নিয়ে এ-যাবৎ কখনও কবিতা লেখা হয়নি সেইসব বিষয়—নিয়ে গার্হস্থ্য কবিতার এক চমক-জাগানো সংগ্রহ।
প্রাতঃকৃত্য., মেনোপজ থেকে শুরু করে রাত্তিরের নটে গাছ মুড়িয়ে যা, তনুবৃন্তের রহস্য, তুতো সম্পর্কের ভাইবোন, এমন-কি রংঝারি হিংসুক ননদিনী, দেওর, অবিবাহিত ভাসুর, কর্তা, গিন্নি, অন্তঃসত্ত্বা বউ, বেকার যুবক—কেউই বাদ যায়নি এই কবিতাগুচ্ছে। তদপুরি রয়েছে রান্নার একসপেরিমেন্ট, এক মেয়ের কান্না, যুবতী, উদ্ভিন্ন বক্ষ-মুকুলের বার্তা সঠিক মৌমাছির কাছে পৌঁছে যাওয়া, বন্ধ্যা-রমণীর আকুলতা, নারী বলতে যারা সুড়ঙ্গ বোঝে সেইসব পুরুষের প্রসঙ্গও। সব-ছাপিয়ে রয়েছে আপাতসুখী এক ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর কথা, ভুলে-যাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের অশ্রু যাঁর বুকে। যাঁরাই বাংলা পড়তে পারে, তাঁদের কারও কাছেই এই কবিতাগুলির এক ছত্রও দুর্বোধ্য মনে হবে না। এ-গ্রন্থের আবেদন সর্বজনীন। প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন।

৩৩০০ কপি নিঃশেষ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের

অনবদ্য সামাজিক নকশা

রসেবশে

দাম ২০.০০

একজন সীরিয়স লেখকের সঙ্গে হাসির গল্পলেখকের চূড়ান্ত লক্ষ্যের কোনো বড় তফাৎ নেই। শুধু দু-রকম দৃষ্টি ফেলে দেখা এবং দেখানো।
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের একগুচ্ছ হাসির নকশার এই সংকলন নতুন করে এ-কথা মনে পড়িয়ে দেবে। চলমান জীবনের একেকটি দিক এইসব নকশায় যেভাবে জীবন্ত আঁকড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তা নিশ্চিত হাসি জাগাবে। কিন্তু নিছক হাসির উপাদানই নয় এই লেখা। এ এক মহৎ সমাজচিত্র। আমরা কোথায় চলেছি আর কীভাবে চলেছি, তাই নিয়ে লঘু রসালাপের মধ্য দিয়ে মেলে-ধরা এক নিখুঁত দর্পণ।
'রসেবসে'র প্রচ্ছদ এঁকেছেন লেখক স্বয়ং। অহিভূষণ মালিক এঁকেছেন ব্যঙ্গচিত্রের এক অসামান্য সিরিজ। যা এই নকশার অনুষঙ্গে পৃথক মৌলিক সৃষ্টি।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯
ফোন : ৩১-৪৩৫২

দ্বিতীয় মুদ্রণ বেরিয়েছে

শেখর বসুর

কালজয়ী কাহিনীর সংকলন

বারোটি কিশোর-ক্লাসিক

দাম ২০.০০

গত চারশ বছর সময়কালের মধ্যে যত বিদেশী ক্লাসিক বেরিয়েছে, তার মধ্যে থেকে প্রধান বারোটিকে এই আশ্চর্য গ্রন্থে বেছে নিয়েছেন শেখর বসু। ঝরঝরে গতিময় বাংলায় ছোটদের মনের মতো করে শুনিয়েছেন সেই বারোটি ক্লাসিকের গল্প।
যুগোত্তীর্ণ এই কাহিনীগুচ্ছে রয়েছে—দি স্টোরি অব ডন কুইক্সোট, রবিনশন ক্রুশো, গালিভারস ট্রাভেল্‌স, সুইস ফ্যামিলি রবিনসন, দি হাঞ্চব্যাক অব নোতরদাম, দি থ্রি মাস্কেটিয়ার্স, আংকল টমস কেবিন, হাইডি, টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লিগ্‌স আণ্ডার দ্য সি, অ্যাডভেঞ্চারস অব টম স্যয়ার, ট্রেজার আইল্যাণ্ড এবং দি হাউণ্ড অব দ্য বাস্কারভিল্‌স।
নিছক ভাষান্তর নয়, পৃথিবীবিখ্যাত এই গ্রন্থগুলির মূল মেজাজ ও সৌন্দর্যের সঙ্গেই পরিচয় করানোর প্রয়াস শেখর বসুর এই পরিশ্রমী ও অন্তরঙ্গ সাহিত্যকর্মে। অসাধারণ এই গ্রন্থের অন্যান্য আকর্ষণের মধ্যে—লেখক-লেখিকাদের সচিত্র জীবনী, প্রতি গল্পের প্রেক্ষাপটের কথা এবং কিশোর-ক্লাসিক তথা অনুবাদ-সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তর দুর্লভ তথ্যে ভরপুর একটি সুদীর্ঘ, সজীব আলোচনা।

১১০০ কপি নিঃশেষ

শিশিরকুমার বসুর

সুবিশাল স্মৃতিকথা

বসু-বাড়ি

দাম ৩০.০০

সাহিত্যে যেমন রায়চৌধুরী-পরিবার কিংবা ঠাকুরবাড়ি, রাজনীতিতে তেমনি বসু-বাড়ি। বীরত্ব ও আত্মত্যাগের মহিমায় প্রোজ্জ্বল এ-বাড়ির পুণ্য ধূলিকণায় মিশে রয়েছে বহু মহাপুরুষের সান্নিধ্য-স্মৃতি। এক বর্ণময় স্মৃতিকথায় এই বসু-বাড়িরই সুবিশাল অন্তরঙ্গ ইতিহাস তুলে ধরেছেন ডঃ শিশিরকুমার বসু।
ডঃ বসু যে গৌরবোজ্জ্বল বসুবাড়ির এক উত্তরপুরুষমাত্র, তা নয়। শরৎচন্দ্র বসুর পুত্র, নেতাজীর ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের প্রত্যক্ষ সঙ্গী শিশিরকুমার নিজেও স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে ভোগ করেছেন নির্যাতন ও কারাবাস। এই অনন্য গ্রন্থে তিনি স্বাধীনতা-আন্দোলনের সেই উত্তাল দিনগুলিকে ফিরিয়ে এনে শুনিয়েছেন নেতাজীর চাঞ্চল্যকর অন্তর্ধানের বিস্তৃত বিবরণ, উপহার দিয়েছেন বসু-পরিবারের ভিতর-মহলের ঘনিষ্ঠ, ঘরোয়া, দুর্লভ ছবি। শুনিয়েছেন একাধিক কোমল-মধুর এবং অন্যদিকে রোমাঞ্চকর ও উদ্দীপনা-মুখর এমন বহু ঘটনার খবর, যা কেউ জানত না। পারিবারিক অ্যালবামের অজস্র দুষ্প্রাপ্য ফোটো এ-গ্রন্থের আলাদা আকর্ষণ।

সমরেশ মজুমদারের

অসামান্য কল্পকাহিনী

শরণাগত

দাম ১৫.০০

পঞ্চদশী তিষ্যাকে ধর্ষণের অপরাধে তাঁকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছিল এক তরুণ রাজকুমার। তিরিশ বছর পরে সে-বিবাহ স্বীকৃতি পেল, যখন তিষ্যাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এলেন এক জরাগ্রস্ত সম্রাট। এই কি সেই তরুণ, যাঁর জন্য তিরিশটি বছর স্বপ্নলালিত প্রতীক্ষায় প্রহর গুনেছেন তিষ্যা? স্বামীর মধ্যে নয়, সেই তরুণকে নতুন করে খুঁজে পেলেন তিষ্যা সম্রাটের অন্য রানীর গর্ভজাত পুত্রের মধ্যে। সম্পর্কে তিষ্যা সেই রাজপুত্রের জননী। অথচ সেই হয়ে উঠল তিষ্যার আরাধ্য দেবতা, তাঁর স্বর্বস্বপণ কামনার ধন। কিন্তু কীভাবে তাকে পাবেন তিষ্যা, কোন্ মূল্যে?
ইতিহাসের আলো-অন্ধকার থেকে উপেক্ষিত এক চরিত্র তুলে এনে আসঙ্গলিপ্সার সঙ্গে ধর্মাচরণের ঘাতপ্রতিঘাতময় অনবদ্য এক কল্প-কাহিনী রচনা করেছেন সমরেশ মজুমদার। বৌদ্ধযুগের পটভূমিকায় লেখা এ-উপন্যাস নতুনভাবে চেনায় তাঁকে।

প্রকাশিত হয়েছে

তারাপদ রায়ের

হাসির হররা

বিদ্যাবুদ্ধি

সঙ্গে অহিভূষণ মালিকের আঁকা শেষ কিছু ব্যঙ্গচিত্র

দাম ১৬.০০

আবার তারাপদ রায়।
আবার হইহই হাসির হররা।
অনাবিল আড্ডায় অবারিত আমন্ত্রণ। সেবার ছিল কাণ্ডজ্ঞান, এবারের শিরনামা—'বিদ্যাবুদ্ধি'। নাম যাই হোক, মূল সুরটি মোটামুটি অপরিবর্তিত। এক-একটি বিষয় নিয়ে একের-পর-এক খোশগল্প। দিশী, বিদেশী, চয়িত, রচিত। এক-একটি বিষয়ে আবার দু-কিস্তি, তিন-কিস্তি পর্যন্ত।
তারাপদ রায়ের গল্পের স্টকই শুধু যে অশেষ তা নয়, গল্প-বলার ভঙ্গিটিও ভারী মজলিশী। শুরু থেকেই অদ্ভুত এক আকর্ষণের চুম্বক। বিষয়ও হাজার রকমের। পরকীয়া প্রেম থেকে মদমত্ত মাতাল। দান-উপহার থেকে পাগলামি আর মানসিক ব্যাধি। তালা, তাস, টর্চ। বক্তৃতা, ডাক্তারি, অসুবিসুখ, পর্যটন, শিশু, ফ্রিজ, শুভবিবাহ—এমন কত। এমন-কি কুকুর-বিড়াল-ইঁদুর পর্যন্ত বাদ যায়নি। সমস্ত বিষয় নিয়েই নানান মজার গল্প। অথচ প্রত্যেকটি তাজা। কোনও গল্পই আগের বইতে শোনানো নয়।
নিজে-নিজে একা-একা হাসতে হলে, অন্যদের হাসাতে হলে, পড়তেই হবে 'বিদ্যাবুদ্ধি'। প্রচ্ছদ অমিয় ভট্টাচার্য।
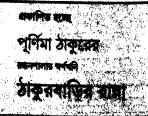
প্রসঙ্গ—ঝাড়খণ্ড

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬-তে প্রকাশিত দেশ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত নির্মল সেনগুপ্ত মহাশয়ের লেখার মধ্যে অনেক তথ্য রয়েছে, অফুরন্ত ভাবাবেগ বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে। কিন্তু এসবের অনেক কিছুতে বিজ্ঞানসম্মত বা বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার যথেষ্ট অভাব। এ প্রবন্ধের পরিপূরক বা অনুপূরক লেখা একটা বিরাট নিবন্ধের রূপ নিতে পারে। আমি কয়েকটি উদ্ধৃতির অবতারণা করছি। ঝাড়খণ্ড বিষয়ক অনেক তথ্যনির্ভর প্রবন্ধ নানা পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে। আমার মনে হয় লেখকের পক্ষে সেসব পাঠ করা সম্ভব হয়নি। তাই বর্তমান প্রবন্ধে ঘটনার ধারাবাহিকতা বা ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের সুষ্ঠুতা নেই। কতগুলো বিচ্ছিন্ন শব্দ বা বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ।

ট্রাইব (tribe) শব্দের পরিভাষা হিসাবে 'আদিবাসী' বসিয়ে দেওয়া ঠিক নয় যেমন ধর্মের ইংরেজি হিসাবে আমরা 'রিলিজিয়ন' বলি। অনেকে কাস্ট (জাতি ?) বা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে বা কোন বৃহৎ কাস্ট বা গোষ্ঠীর অংশকে ব্রিটিশ শাসন ট্রাইব বলেছেন। এমন কি ১৯৭৬ শিডিউল্ড কাস্ট শিডিউল্ড ট্রাইব অ্যামেণ্ডমেন্ট অ্যাক্ট-এর আগে একই গোষ্ঠী তার রাজ্যে 'ট্রাইব' অন্য রাজ্যে কাস্ট। আসামে ছোটনাগপুর-আগত আদিবাসীরা 'শিডিউল্ড'-এর সুযোগ পাচ্ছে না অর্থাৎ 'শিডিউল্ড ট্রাইব'(?) নয়। 'সিডিউল্ড' কথাটা 'তফশিলভুক্ত'। অর্থাৎ সংবিধানে প্রদত্ত কিছু সুযোগ সুবিধার জন্য প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যাদের নথিভুক্ত করা হয়। সমাজ বিজ্ঞানের বিচারে অনেক গোষ্ঠীকে 'ট্রাইব' বলা যায় কিন্তু তারা 'সিডিউল্ড' নয়। ভারতীয় সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও কোথাও কোথাও তথাকথিত উন্নয়নের মাপকাঠিতে (শিক্ষা, চাকুরি) অথবা সামাজিক সুযোগ সুবিধার জন্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীদের 'দুর্বলতর গোষ্ঠী' (Weaker Section) বলে অভিহিত করা হয়েছে। 'ট্রাইব' এ কথাটার উল্লেখ নেই। প্রজাতন্ত্রী মঙ্গলকামী ভারত-যুক্তরাজ্যে এই মানুষদের বলিষ্ঠ হবার জন্য সাংবিধানিক অনেক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। এর জন্য যে প্রশাসনিক তালিকা তৈরী হয়, তাতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেলেই 'শিডিউল্ড' হবে। কী কাস্ট, কী ট্রাইব ১৯৫১-র আদম সুমারীতে পশ্চিমবাংলায় ৭টি তফশিলভুক্ত ট্রাইব ছিল। এখন তা বেড়ে ৩৮ হয়েছে (Census of India 1981 series 23: West Bengal)। কয়েক মাস আগে Backward Tribeদের নথিবদ্ধ করা হয়নি। উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে এই দীর্ঘ কয় বৎসরে যে সব গোষ্ঠী নানাভাবে পিছিয়ে রয়েছে তাদের Primitive Tribal Group (P T G) বলে চিহ্নিত করা হয়েছে বেশ কয়েক বৎসর আগে এবং তার সংখ্যা সম্প্রতি ৭২।

'আদিবাসী জীবন নিয়ে হাজার হাজার গবেষণা' হয়নি ; সাংবাদিক বা কোন কোন লেখক হয়ত তাদের নিয়ে হাজারের বেশী লিখেছেন। সেসব গবেষণা নয়। তাছাড়া "সরকার' গবেষণা করায় না, উৎসাহী গবেষকরাই গবেষণা করেন—কেউ বা সরকারী অনুদান পান কেউ আপন চেষ্টায়।

মানব জাতির বিকাশ শুধু আর্যদের কেন হবে ? তাছাড়া 'আর্য' কথাটা নিয়ে নানা প্রতিবাদ আর তথাকথিত 'আর্য' সংস্কৃতি হল যাযাবরীয় পশুপালক গোষ্ঠীর সঙ্গে ভূমিলগ্ন কৃষিজীবী গোষ্ঠীর মিলন-মিশ্রণ-সংস্কৃতি। এটা ত ঠিক, প্রকৃতি পরিবেশের সঙ্গে নিত্যনিয়ত অভিযোজনের মাধ্যমে বিভিন্ন গোষ্ঠীর জীবনধারা প্রভাবিত হয়েছে। গোষ্ঠী, সম্পর্ক ও সংশ্লেষে, নানা আবিষ্কারের তারতম্যে, ইতিহাসের বিভিন্ন প্রবাহে সেসবের গতি কোথাও দ্রুত কোথাও মন্থর। পরিবেশ পরিমণ্ডলের বন্দী মানুষগুলোর মাঝে এই মন্থরতা সহজে চোখে পড়ে। তাই সমসাময়িক তুলনামূলক ইতিহাসের খতিয়ানে তারাই অনগ্রসর (tribe ?)। কোন সমাজবিজ্ঞানী নির্দ্বিধায় সরকারী তালিকায় কারু নামের পিছনে 'ট্রাইব' জুড়ে দেননি এটা আমি বিনীতভাবে বলতে পারি। অস্বাভাবিক আচার-আচরণ খোঁজায়ও সমাজবিজ্ঞানীদের উৎসাহ নেই। এছাড়া 'সমাজবিজ্ঞানীদের অনলস প্রচেষ্টায় আদিবাসীদের ভাবমূর্তি' গড়ে ওঠেনি।

তাছাড়া তাদের 'জংলী' ইত্যাদি কেউ বলেননি। এসব ঠিকভাবে বুঝতে হলে সমাজতত্ত্ব চর্চা বা 'আদিবাসী' (?) সমাজ নিয়ে গবেষণার নানা ধারাবাহিক স্তরকে যাচাই করে দেখতে হবে। ব্রিটিশ শাসন, বৈষম্য মূলক মানসিকতায় চালিত হয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী সম্পর্কে যেসব বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছে তা গবেষণা নয়। এসবের সঙ্গে বর্তমানের নৃবিজ্ঞানের গবেষণার মিল নেই। প্রশাসকের বা সাংবাদিকদের other culture বা Curio hunting-এর বিবরণ আর সমাজবিজ্ঞানীর গবেষণা এক নয়। এও বলতে পারি সমাজবিজ্ঞানীরা কখনও প্রচার করেননি যে এরা ভারতীয় সভ্যতার প্রধান ধারা থেকে 'বিচ্ছিন্ন', বরং বলছেন তথাকথিত এদের (?) সংস্কৃতির অনেক কিছুকে নিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি পুষ্ট ও বেগবতী হয়েছে। মহাতো বা কুর্মী ক্ষত্রিয়রা যেমন কিছু দিন আগে পর্যন্ত other Backward class (O B C)-এর কিছু সুযোগ বিশেষ করে পড়াশুনো শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন—এখন তাঁরা পান না। তবে তাঁদেরও যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে আমি স্বীকার করবো। কল্যাণকামী রাষ্ট্রে এমনি পিছিয়ে পড়া প্রতিটি মানুষের, সে উচ্চ বর্ণ হোক আর তথাকথিত নিম্ন বর্ণের হোক, তার সুযোগ থাকা উচিত এবং আমি তো মনে করি শিডিউল্ড বাদ দিয়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানুষ বা অঞ্চলের উন্নয়ন হোক—এবং গোষ্ঠী হিসাবে তফশিলিভুক্ত হওয়ার দরকার নেই। কোন লোক বা গোষ্ঠী যেন অতিরিক্ত সুযোগ না পায় তাই বলবো।

প্রবোধকুমার ভৌমিক
কলকাতা-৭০০ ০৮৯

জল ও জাল

১৮ অক্টোবর, '৮৬ 'দেশ'-এ পেলাম মৎস্যচিন্তায় মশগুল তিন লেখকের ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনটি লেখা। তবে সবার দৃষ্টি একটি দিকে তা হল মাছের হাহাকার। অপ্রাসঙ্গিক হবে না ভেবে কিছু লিখতে সাহস পাচ্ছি। সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বহুকাল যাবৎ ধানচাষের পাশাপাশি একই জমিতে বর্ষার শুরু থেকে শীত পর্যন্ত মাছের চাষ হয়ে আসছে প্রাকৃতিক উপায়ে। গ্রীষ্মকাল বা বর্ষার শুরুতেই জোয়ারের সময় নদীর জল তুলে নেওয়া হয় খালগুলোতে। এই সময়ে নদীর জলে চিংড়ি, ভেটকি, পার্শে জাতীয় মাছের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ বা চারা থাকে অপর্যাপ্ত পরিমাণে। এগুলি বড় হয় ধানজমির ঐ খালগুলোতে এবং বর্ষাকালে যখন সকল চাষের জমি জলে ভরে যায়, তখন মাঠ-খাল-বিলগুলো পরিণত হয় মাছের চারণক্ষেত্রে। যথাসময়ে এই মাছ সংগ্রহ করে স্থানীয় অধিবাসীরা নিজেদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনানুসারে নিজস্ব খাদ্য হিসেবে কিছু রেখে বাকীটা বেচে দিয়ে কিছুটা রোজগার করে। এই বিক্রীত ভাগটাই যে শহরে যোগানের অংশ বিশেষ—তা বলাই বাহুল্য। আমার মনে হয়, শুধুমাত্র সুন্দরবন অঞ্চল নয়,তার উপরের বেশ কিছু অঞ্চল নদীর জল থেকে তাদের মাছের চাহিদার বেশ কিছুটা পরিমাণে পূরণ করে আসছে। এছাড়া সুন্দরবনের নদী বা খাঁড়ি নদীগুলি যাতে মাছের সূতিকাগার হয়ে উঠতে পারে সেজন্য ঐ ক্ষুদ্রাবস্থায় মাছ ধরা আইনত দণ্ডনীয় করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দেখছি, আমাদের সাগরদ্বীপের পূর্ব উপকূলে নদীতে বহিরাগতরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে নাইলনের সুতোয় বোনা সূক্ষ্ম ফাঁসের জাল দিয়ে পুরো নদীটা ঘিরে ছোট্ট ছোট্ট চিংড়ির চারা নিঃশেষ করে মুরগীর খাদ্য বানাচ্ছে। স্থানীয় আঞ্চলিক প্রশাসন সম্পূর্ণ নীরব, কোথাও বা সমর্থক। আর আইনের চোখে অপরাধ জেনেও অধিবাসীরা এড়িয়ে যায়, কারণ, এই মৎস্য-লুণ্ঠনকারা স্থানীয় পূজাপার্বণের সবচেয়ে বড়ো পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেছে।

এদের দান ছোটখাটো পুজো-উৎসবে—যা গ্রামে লেগেই রয়েছে—শ'য়ে শ'য়ে টাকা— বা স্থানীয় অধিবাসীদের ধারণার বাইরে। তাই তারা প্রত্যক্ষভাবে মৎস্যের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে—এটা উপলব্ধি করতে পারলেও আঞ্চলিক প্রশাসনের প্রশ্রয়ে ও চাপে, এবং উৎসব-আনন্দের (?) সুযোগলাভের মানসিকতায় নিকটবর্তী থানাতে অভিযোগ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। তাই সুন্দরবন অঞ্চলে মৎস্যচাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা ভেবে

সরকার সচেষ্ট হয়ে আইন প্রণয়ন করলেও স্থানীয় অধিবাসীদের সচেতনতার অভাবে ও সর্বোপরি আঞ্চলিক প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা এমন কী আইন ভঙ্গকারীদের প্রতি প্রশ্রয়মূলক মনোভাবের জন্য আক্ষরিক অর্থে কোটি কোটি টাকা নদীর জলে ব্যয়িত হচ্ছে। এর ফলে চিংড়ি, ভেটকি, পার্শে, শুরজাওলী বা তপসের নাম না জেনে পরবর্তী প্রজন্ম মাছ বলতে বুঝবে সিলভারকাপ, তেলাপিয়া ও সাইপ্রাস।

কিরীটী মণ্ডল
সাগর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা

রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি

'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত (২৭/৯/৮৬) 'এশিয়াটিক সোসাইটির অতীত' নিবন্ধটিতে একটি তথ্যগত ভুলের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই নিবন্ধে লেখক লিখেছেন : '১৮৪৩ সালে এই পত্রিকার প্রভাবেই প্রথমে লোকমুখে, পরে কাগজেকলমে ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে 'রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' হয়। লেখক এই তথ্য পেলেন কোথায়? ১৯৩৬ সালের আগে এশিয়াটিক সোসাইটি তো রয়্যাল আখ্যা পায়নি। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ১৯৩৫ সালেই প্রথম আবেদন করেন 'রয়্যাল' আখ্যার জন্য। অতএব তার আগে 'রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি' হবার প্রশ্নই ওঠে না। এশিয়াটিক সোসাইটি 'রয়্যাল' আখ্যা পায় ১৯৩৬ সালের মার্চে।
ওই নিবন্ধে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ নেই। তা হল ১৯৩৪ সালের ১৫ই জানুয়ারি কলকাতায় খুব আড়ম্বরের সঙ্গে এশিয়াটিক সোসাইটির দেড় শ' বৎসরের অনুষ্ঠান হয়। তাতে সভাপতিত্ব করেন বাংলার তৎকালীন গভর্নর স্যর জন অ্যান্ডারসন। তখন থেকে এশিয়াটিক সোসাইটির কার্যকলাপ আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়। এর পরের বছর থেকেই সোসাইটির কর্মকর্তারা 'রয়্যাল' আখ্যার জন্য চিঠি লেখালেখি শুরু করেন। এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ফাইলটি দিল্লির ন্যাশনাল আরকাইভে আছে।

শিশির কর
হাওড়া-১

ছবির দর্শক, ভালো মন্দ ও ছবির বাজার

২০ সেপ্টেম্বর '৮৬ দেশ পত্রিকায় 'মুক্তচিন্তা' বিভাগে 'বাংলা ছবির দর্শক' শিরোনামে দুলেন্দ্র ভৌমিকের লেখাটি পড়লাম। আজকাল বাংলা ছবির দর্শক দেখলে সত্যিই মর্মাহত হতে হয়। অথচ ভাবতে অবাক লাগলেও এ বাংলাতেই বোম্বে ও দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দী ছবি দেখতে দর্শকদের উপচে পড়া ভিড়। যাদের একটা বড়ো অংশই বাঙালী। কিন্তু কেন? এর উত্তর—সেক্স আর অ্যাকশন। যা থাকলে ভাষার কোন তফাত খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশ্য ইদানীং কয়েকটি বাংলা ছবিতে দর্শকদের বেশ কিছুটা ভিড় দেখে ভালো লেগেছিল। যদিও সেসব ছবি থেকে নতুন কিছু পাইনি। তবু তরুণ মজুমদারের মতো পরিচালককে ধন্যবাদ জানাতে হয় এই কারণে যে, তিনি যেভাবে তাঁর ছবিতে রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার করছেন তাতে ছেলেমেয়েদের কিছুটা রুচিবদল হতে পারে। শ্রীভৌমিকের লেখার পরিপ্রেক্ষিতে জানাই যে, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন এঁদের ছবির দর্শক কলেজ, ইন্যুভার্সিটিতেও কম আছেন। তাই শিক্ষা ও কর্মের ওপর নির্ভর করে আর যা হোক দর্শকদের রুচির বিচার সঠিকভাবে মেনে নেওয়া যায় না। তবে তাঁদের মধ্যে বেশি-কম একটা তফাত থাকতে পারে। আর যে তফাত তা হলো পোশাকের। এই প্রসঙ্গে বেশ মনে পড়ছে সত্যজিৎ রায়ের ঘরে বাইরে দেখতে গিয়ে পাশের সিটে পরিচিত দুই ভদ্রলোককে বিরতির পর আর দেখিনি। সত্যি কথা বলতে কি অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাপারটি এখন এরকম। নইলে আমাদের পশ্চিমবাংলায় কি শিক্ষিতের সংখ্যা এতোই কম যে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেনের ছবি কোন হলে এক সপ্তাহের বেশি চলতে পারে না! ভাবতে খারাপ লাগলেও এমন অনেক সাব-ডিভিশন আছে যেখানে তাঁদের কোন কোন ছবি এক সপ্তাহের জন্যও আসে না। কোথাও কোথাও তাই কোন সংগঠন কিংবা মুষ্টিমেয় মানুষের চেষ্টায় হল ভাড়া করে রবিবার অথবা ছুটির দিন সেসব ছবির মর্নিং শো'র ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে জানি, তার কার্ড পুশ করতে গিয়ে কী হিমসিম খেতে হয় উদ্যোক্তাদের। যাঁদের ওপর ভরসা করে এসব ব্যবস্থা সেই সব শিক্ষিত মানুষ কত কায়দা করে এড়িয়ে যান; তাঁরা দেখতে চান না সে সব ছবি। অনেকে এলেও আন্তরিকভাবে স্বইচ্ছায় আসেন না। এই যখন অবস্থা তখন আমরা কিছু মানুষ সুস্থ শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির কথা ভেবে মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছি!

তবে ভাল ছবির দর্শক যে সব দেশে সব জায়গাতে প্রায় একই রকম তা এই 'মুক্তচিন্তা' বিভাগেই জানতে পারলাম, ৪ অক্টোবর 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর লেখা থেকে। বুদ্ধদেববাবুর লেখার শেষের কয়েকটি লাইন পড়ে ভীষণ আনন্দ পেলাম এই কারণে

যে, ভালো ছবির এমন বাজার সত্ত্বেও বোম্বের বাঘা বাঘা চিত্রনির্মাতারা নিজেদের টিকে থাকার জন্য সেন্সার বোর্ডের কাছে আরও বেশি উত্তেজক দৃশ্য ব্যবহার করার অনুমতি চেয়েছেন। জানি না, তাঁদের এই 'করুণ' আবেদনে সেন্সর বোর্ড কী ভূমিকা গ্রহণ করবেন? তবে আমরা জানি, ওঁদের যে ছবি আজ যতই বাজার মাত করুক না কেন পঁচিশ বছর পরে হয়তো সে ছবির নামও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এবং আরও পঁচিশ বছর পরেও কিন্তু আমরা 'পথের পাঁচালী' দেখতে পাবো।

সুধীন সেন

চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা।

প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট

দেশ পত্রিকার সুকুমার স্মরণ সংখ্যার (৬ সেপ্টেম্বর) জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই বিশেষ সংখ্যাটি পড়ে অনেক অনালোচিত বিষয় জানা গেল। লীলা মজুমদারের আমার বড়দা নামক স্মৃতিকথায় ঘরোয়া সুকুমার রায়কে নতুন করে পেয়েছি। তবে লীলা মজুমদারের একটি তথ্য বিভ্রান্তিকর। তিনি লিখেছেন কাদম্বিনী শুধু ভারতের নয় তৎকালীন বিলেতেরো প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট। আমরা জানি বেথুন কলেজ থেকে দু'জন মহিলা প্রথম বি-এ পাস করেন—কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু। (চন্দ্রমুখী বসু প্রথম মহিলা এম-এ) অতএব কাদম্বিনী দেবীকে কি করে শ্রীমতী মজুমদার প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট বলেন?

এই একই গৌরবের অধিকারিণী তো চন্দ্রমুখী বসুও—তাই না? চন্দ্রমুখী বসু সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়। কিন্তু কাদম্বিনী দেবীর সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না।

প্রিয়ব্রত মুখোপাধ্যায়

দুর্গাপুর-৫

ক্যাসেটের আসল-নকল

গত ২৭ সেপ্টেম্বর-এর দেশে শুভরঞ্জন দাশগুপ্তের "লুন্ঠিত সঙ্গীতের নির্লজ্জ ধ্বনি" পড়লাম। ক্যাসেট পাইরেসি সম্পর্কে আমার কয়েকটি বক্তব্য আছে, যা সাধারণ মানুষ এবং ক্যাসেট তৈরির সংস্থাগুলিকে জানানো প্রয়োজন মনে করি।

প্রথমত আমি নকল ক্যাসেট কখনও কিনতে চাই না কিন্তু আজকাল বোঝার উপায় নেই কোনটা আসল এবং কোনটা নকল। উদাহরণ স্বরূপ দিল্লীর সুপার ক্যাসেট ইন্ডাস্ট্রিজ-এর তৈরি 'টি' সিরিজের ক্যাসেটগুলি আমি এতদিন নকল বলেই ভাবতাম। কিন্তু 'দেশ'-এ প্রকাশিত নিবন্ধটি পড়ে জানলাম যে সেগুলো আসল। আবার বম্বের একটি কোম্পানীর ক্যাসেটে লেখা থাকে Under licence from Music India Ltd. Marketed by Music Trading Co. এই ক্যাসেটগুলিতেও 'টি' মার্কা থাকে। এখন এগুলো আসল না নকল তা জানার কোনো উপায় নেই। তাই, আসল ক্যাসেট প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি যদি যৌথভাবে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়ে দেন যে কোন কোন কোম্পানীর ক্যাসেট আসল তাহলে আমাদের কিনতে সুবিধা হয়।

দ্বিতীয়ত, আসল ক্যাসেট (যেমন এইচ· এম· ভি, মিউজিক ইন্ডিয়া ইত্যাদি) সাধারণত বড় বড় দোকানগুলিতেই পাওয়া যায় এবং সেসব দোকানে একটি মাত্র ক্যাসেটের খদ্দেরকে অনেক সময় পাত্তাই দেওয়া হয় না। উদাহরণ স্বরূপ জানাই, কিছুদিন আগে এখানকার সবচেয়ে বড় ক্যাসেটের দোকানে "লোরী" ছবিটির ক্যাসেট চাইতে তাঁরা নেই বলে দিলেন। অথচ তখন আমিই দেখিয়ে দিলাম যে ঐ একই ক্যাসেটের অন্তত ১০/১৫টি পিস সামনেই রয়েছে। সে জায়গায় ছোট দোকানে দোকানি ভাল করে খুঁজে ক্যাসেট বের করে দেন।

তৃতীয়ত, অনেক সময় এমন হয় যে, কোনো ক্যাসেট আমাদের দরকার হয়ে পড়ে অথচ অনেক দোকান ঘুরেও আসল ক্যাসেট যোগাড় করা যায় না। তখন বাধ্য হয়েই নকল ক্যাসেট কিনতে হয়। যদি আসল ক্যাসেটের ডীলাররা পর্যাপ্ত পরিমাণে সব ক্যাসেট রাখেন তাহলে আমাদের সুবিধা হয়।

কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী

গুয়াহাটি-৬

ফেলুদারও ভুল হয়

বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় পত্রিকা 'দেশ'-এর শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীসত্যজিৎ রায়ের "দার্জিলিং জমজমাট" শীর্ষক গোয়েন্দা

"'শেষপথে' বহু বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ থাকিলেও মানবের শেষগতি ভগবানে আত্মসমর্পণ : ইহাই এই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় ! ইহা একটি চিত্তাকর্ষক উপন্যাস।"

ডঃ শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, এম· এ (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত) ডি· লিট্

(প্রাক্তন অধ্যাপক কলিকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলোশিপপ্রাপ্ত, ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মানিত।)

'...আখ্যানে ও চরিত্রে শরৎচন্দ্রের প্রভাব বেশ অনুভব করা যায়।আনন্দবাজার

'মানুষের হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধকে নতুন করে তুলে ধরবার যে প্রয়াস লেখক দেখিয়েছেন — তা দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।' -যুগান্তর

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

শেষ পথ ১০

বুক ফ্রেণ্ড, ৮/১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি-৭৩ দে বুক, কথা ও কাহিনী, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১২ মল্লিক ব্রাদার্স, ৫৫, কলেজস্ট্রীট, কলি ৭০০০৭৩ প্রভিন্সিয়াল বুক এজেন্সি, ৮বি, কলেজ রো, কলি-৯ বুক ডিস্ট্রিবিউটর, এস· এন· ব্যানার্জী স্ট্রীট

কাহিনীটিতে একটি তথ্য ভ্রমাত্মক বলে মনে হল। ঐ গল্পের একটি চরিত্র 'রমেন ব্রহ্ম' ওরফে 'রজত বোস' বলেছেন তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ১৯৫৭-তে B. Com পাস করেছেন। পরে ফেলুদার সুচিন্তিত সত্যানুসন্ধানে প্রকাশিত হয় যে, ঐ বছরে রমেন ব্রহ্ম/রজত বোস নামে স্কটিশ চার্চ কলেজে B. Com Stream-এ কোনো ছাত্রই ছিল না। কিন্তু আমার বক্তব্য স্কটিশ চার্চ কলেজে বি-কম পড়ানোই হয় না। 'ফেলুদা' চরিত্রের আমি একজন অনুরাগী পাঠক। সকল বিষয়েই তাঁর অসাধারণ জ্ঞান— ছোটোখাট খুঁটিনাটিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। Asia's Brightest Crime Detector ফেলুদা ওরফে প্রদোষ মিত্রের এরকম ভুল গল্পের খাতিরেও আমার স্বীকার করতে বাধছে।

নন্দিতা কুণ্ডু

কলকাতা-৬

মানডে ক্লাব

৬ সেপ্টেম্বরের সুকুমার রায় স্মরণ সংখ্যার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। সুকুমার রায় সম্বন্ধে নানা জানা অজানা তথ্য ও খবরাখবর নানাভাবে এই সংখ্যা থেকে জানার পর আমার মত অনেকেই মনে করতে পারেন—দুর্ভাগা বাঙালীর জন্য সুকুমার রায় আরো অনেক বছর কেন বেঁচে গেলেন না। সুকুমার রায়দের মানড়ে ক্লাব সম্বন্ধে কিছু কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা থাকার জন্য এই চিঠি লিখছি। হিরণকুমার সান্যালের প্রবন্ধ থেকে বুঝতে পারা গেল না এই ক্লাব শুরু করার পেছনে কোন উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। এটা কি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের লুনার সোসাইটির অনুকরণে করা হয়েছিল? উপরোক্ত সংখ্যায় উনচল্লিশ পাতার ফটোতে বাঙালী বহু প্রবাদ প্রমাণ ব্যক্তির মানডে ক্লাবের সদস্য রূপে সমাবিষ্ট দেখলে তাই ভাবতে ইচ্ছা করে। লুনার সোসাইটির চোদ্দজন সদস্য ছিল। এঁরা প্রতি পূর্ণিমার সবচেয়ে কাছাকাছি সোমবারে কোন এক সদস্যের বাড়িতে নৈশ ভোজনে মিলিত হতেন। যন্ত্র বিপ্লবের সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি এই সোসাইটির সদস্য ছিলেন। যেমন জেমস্ ওয়াট, বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিন, ম্যাথু বুলটন, জোসেফ প্রিস্টলী ইত্যাদি।

বহুমত এই যে, যন্ত্রবিপ্লবে বহু যুগান্তকারী অবদান ছাড়াও, নিউটন পরবর্তী যুগে ভাটাপড়া ব্রিটিশ বিজ্ঞানে নবজীবন দান করার পেছনে এই সোসাইটির অবদান অপরিসীম।

কিন্তু বাঙালীর 'মানডে ক্লাব' কি শুধু মণ্ডা ক্লাবেই পরিণত হয়েছিল না এর থেকেও গুরুতর কিছু করার জন্য উদ্যোগী ছিল, সেটা ভালো করে জানা গেল না। বাঘা বাঘা বাঙালী সদস্যদের নাম শুনলে এটাই স্বাভাবিক মনে হয় যে এই ক্লাবের সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। কাজেই "ক্লাবটা যে কিছুদিন পর উঠে গেল"—এটাও বোধহয় বাঙালীর দুর্ভাগ্য। লুনার সোসাইটি 'বেঁচে' ছিল ১৭৬৪ সাল থেকে ঐ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত—মানে প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর।

দীপককুমার ভট্টাচার্য

কালপাকাম-৬০৩১০২

তামিলনাড়ু

গাওস্কর প্রসঙ্গে

২৫-১০-৮৬'র দেশ-এ কৃশানু ভট্টাচার্যের লেখা পড়লাম। তিনি খুঁজে খুঁজে যে সব অদ্ভুত অদ্ভুত পরিসংখ্যান বার করেছেন সেজন্য ধন্যবাদ অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য।
তিনি প্রমাণ করেছেন, "গাওস্কর যে সব টেস্টে সেঞ্চুরি বা ডবল সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন ভারত খুব কমই সেইসব টেস্টে জয়ী হয়েছে।" এটা সত্যিই গাওস্করের মন্দভাগ্যের পরিচায়ক। কিন্তু এই মন্দভাগ্যের জন্য গাওস্করকে দোষ দিয়ে লাভ কী? (যদিও ৬টি টেস্টে সানি সেঞ্চুরি করে ভারতকে জিতিয়েছেন।) '৮২-তে ওভালে ২২১ রান করা সত্ত্বেও কৃশানুবাবু বলেছেন, গাওস্কর আরেকটু তৎপর হলে বা আরও কিছুক্ষণ ক্রিজে থাকলে ভারত ইংল্যান্ডকে হারাতে পারত।

আমি সবিনয়ে জানতে চাই, একা সানিই যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যাট করে ভারতকে জেতাবে (৪৩৮ রানের পিছনে তাড়া করেও), তবে বাকী খেলোয়াড়দের দলে রেখে লাভ কী? আর কৃশানুবাবুর মতে যাঁরা সব সময়েই দেশের জন্য খেলেন সেই বিশ্বনাথ ও কপিলদেব সেদিন অবিশ্বাস্যভাবেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। তবুও তাঁদের বলির পাঁঠা করা উচিত নয়, কারণ মানুষ মাত্রই ভুল করে। কিন্তু এই সহজ সত্যটা সানির বেলায় (২২১ করার পরও!) সকলেই ভুলে যায়।
কৃশানুবাবু আরও বলেছেন, "যে টেস্টে সুনীল ... ভাল খেলে সেঞ্চুরি করেছেন, ভারত হয় সে টেস্ট হেরেছে আর নয় ড্র করেছে।" তাহলে ভাল খেলে সেঞ্চুরি করে দলকে হারের হাত থেকে বাঁচাবার বা বাঁচানোর চেষ্টা করার কী কোনও মূল্য নেই? বোধ হয় নেই, কারণ সে কাজটা যে সানি অনেকবারই করেছেন! কৃশানুবাবুরই উদাহরণ তুলে দিই— "পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৭৮-৭৯ সিরিজে ৩য় টেস্টে জোড়া সেঞ্চুরি করেও সুনীল ম্যাচ বাঁচাতে পারেননি।" পরাজয় নিশ্চিত জেনে আগে থেকেই হাল ছেড়ে দিলে আপনারা কী সানিকে পুজো করতেন? সুনীল কিছু অপ্রয়োজনীয় শতরান করেছেন ঠিকই, সেই সঙ্গে এটাও ঠিক যে তিনিই আবার ইনিংসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যাট করে ১২৭ রানে অপরাজিত থেকে পাকিস্তানের হাতে ইনিংস পরাজয়ের লজ্জা থেকে ভারতকে বাঁচিয়েছেন।
গাওস্করের এত রান এবং সেঞ্চুরি দেখে হিংসা (!) করেই বোধ হয় কৃশানুবাবু বলেছেন—"এত রান আসবেই বা না কেন? প্রতিটি বল দেখেশুনে, অজস্র সময় নিয়ে খুঁটে খুঁটে একটি একটি রান সংগ্রহ করেছেন গাওস্কর।" ব্যাপারটা অত সোজা নয়। তাহলে বয়কট অনেক আগেই ১০,০০০ রান ও ৫০টি সেঞ্চুরি করে ফেলতেন। বেশীদূর যাওয়ার দরকার নেই, এবারই মাদ্রাজের টাই টেস্টে ৯০ রানের মাথায়ও তিনি 'বিগ হিট' করতে গিয়ে সময়ের গণ্ডগোলে আউট হন। তবুও বলবেন যে সানি দেশের জন্য খেলেন না! তাছাড়া স্বয়ং ব্র্যাডম্যানই গাওস্করকে বলেছিলেন—"প্রতি বলে মারতে যাওয়া প্রকৃত ব্যাটসম্যানের পরিচয় নয়। ভাল ব্যাটসম্যান সেই যে বল বিচার করে খেলে; ভাল বলকে যথাযথ সম্মান দেয় এবং খারাপ বলের জন্য অপেক্ষা করে।" গাওস্কর এই উপদেশ শিরোধার্য করে বোধ হয় ভুলই করেছিলেন!

ব্র্যাডম্যান, সোবার্স, রিচার্ডস এবং গাওস্করের মধ্যে কৃশানুবাবু গাওস্কর ছাড়া বাকী তিনজনকে 'অসাধারণ' আখ্যা দিয়েছেন। এই বিতর্কে না গিয়েও বলছি বিদেশী তিনজন দুর্বল ভারতীয় বোলিংয়ের বিরুদ্ধে প্রচুর রান ও সেঞ্চুরি করেছেন (দুঃখের বিষয় সানি সে সুযোগ পাননি)। আর সুনীলের সেঞ্চুরি কিন্তু ওঃ ইন্ডিজের ভয়ঙ্কর বোলিংয়ের বিরুদ্ধেই সব থেকে বেশী। এটা অবশ্য কৃশানুবাবু স্বীকার করেছেন—"ক্যারাবিয়ানদের বিরুদ্ধে তাঁর মত সাফল্য আর কোন ব্যাটসম্যান পাননি। ২৭টি টেস্ট খেলে ১৩টি সেঞ্চুরি (২টি ডাবলসহ)"—এরপরেও তিনি অসাধারণ নন! ডন ব্র্যাডম্যানও গাওস্করকে 'ক্রিকেটের অলঙ্কার' বলেছেন—ওটা নিশ্চয়ই কথার কথা!
বিশ্বনাথ অনেক ক্ষেত্রেই ভারতত্রাতার ভূমিকা নিয়েছেন, একথা সত্যি। বিশ্বনাথকে একটুও ছোট না করেই বলছি দুজন আউট হওয়ার পর নামায় ত্রাণকর্তা হবার সুযোগটি তিনি পেতেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গাওস্কর তা পেতেন না। তিনি আউট হওয়ার পরই সাধারণত ভারতের বিপদ আসত। ভাল ওপেনার বিহীন দেশে ওপেনার হয়ে নামাটাই তাহলে সানির দোষ কী!

অবশ্য শেষের দিকে কয়েকটি টেস্টে ব্যাটিং অর্ডার পরিবর্তন করায় তিনি ত্রাণকর্তা হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং সে পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ। '৮৩-তে ওঃ ইন্ডিজের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ টেস্টে শূন্য রানে দু' উইকেট পড়ে যাবার পর তিনি শুধু ফলো-অনই বাঁচাননি, মার্শাল- হোল্ডিং- রবার্টসের বিরুদ্ধে ২৩৬ রান করার পরও অপরাজিত ছিলেন (এজন্য কিরমানিও কিছুটা কৃতিত্বের দাবিদার বইকি)। শ্রীলঙ্কার সঙ্গেও তিনি বিপদের মুখে দায়িত্ব সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন।
সুনীল একদিনের ক্রিকেট ঠিকমত এখনও নাকি রপ্ত করতে পারেননি। স্বপক্ষে একটি যুক্তি হল—"একদিনের খেলায় তিনি এখনও সেঞ্চুরির মুখ

দেখেননি।" অথচ নয় নয় করে ২০ বার ৫০-এর গণ্ডী পেরিয়েছেন এবং ভারতের মধ্যে দু হাজারী ক্লাবের সদস্য শুধু বেঙ্গসরকর আর সানিই। স্বীকার করছি সুনীল মূলত টেস্ট খেলোয়াড়, তবুও ওঃ ইন্ডিজের সঙ্গে ৯০ রান করে রান আউট, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৯২ রান (পিঠের ব্যথা সত্ত্বেও) ইত্যাদি কী শতরানের চেয়ে কম মূল্যবান? আর "একদিনের ক্রিকেটেও ভারতকে জিততে হলে প্রথম ১৫/২০ ওভার টেস্টের মতই খেলতে হবে।"—একথা বলেছিলেন স্যার গ্যারি সোবার্স '৮৩ বিশ্বকাপ চলাকালীন। সোবার্স নিশ্চয়ই ভুল বলেছিলেন! এটা ঠিকই যে 'ওয়ান-ডে'তে সানি একবার করে মাত্র 'ম্যান অফ দি ম্যাচ' এবং 'ম্যান অফ দি সিরিজ' হয়েছেন। তবে পাশাপাশি এটাও তো ঠিক যে ঐসব পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা একজন অল-রাউন্ডারের অনেক বেশী। তাছাড়া পুরস্কারই খেলার শেষ কথা নয়। কৃশানুবাবু শেষকালে বলেছেন—"টেস্ট জেতার থেকেও সানির সেঞ্চুরি এখন আমাদের কাছে বড় গুরুত্বপূর্ণ ...।" সেটা নিশ্চয়ই নিন্দনীয়। তবে এটাও ঠিক যে, ৮০ কোটি লোকের ভারতে এমন একজনও নেই যিনি এতগুলো বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারী। এই রেকর্ড যাতে না ভাঙে, ভারতবাসীর গর্ব করার মত উপকরণটি যাতে হাতছাড়া না হয়, সেইজন্য তাঁর আরও কিছু রান ও আরও কয়েকটি শতরান যে ভারতবাসী মাত্রেই চাইবে তাতে আর সন্দেহ কী?

সুব্রত সিংহ
গুসকরা, বর্ধমান

গ্রুপ থিয়েটার ও যাত্রা

২৭ সেপ্টেম্বর '৮৬-র 'দেশ' সংখ্যায় রমাপ্রসাদ বণিক 'মুক্তচিন্তা'য় 'দায়বদ্ধ' প্রসঙ্গে যথেষ্ট চিন্তিত করে তুলেছেন। উনি যাত্রার প্রসঙ্গ তুলেছেন। কিন্তু সমস্যাটাকে সেভাবে খতিয়ে দেখেননি। আমরা সবাই জানি যে, যাত্রা থেকে শিল্পীরা পয়সা রোজগার করছেন। কারণ, এই জগতের শিল্পীরা জেনেই গেছেন যে, নাট্যজগতে থাকতে হলে তাদের পয়সা রোজগার করতে হবেই। কতদিন ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো যায়! বিশেষত গ্রুপ থিয়েটারের জগতে? একটা না একটা সময়ে শিল্পীকে এই পথে থেকে পয়সা রোজগারের কথা চিন্তা করতেই হবে। (অবশ্য যাদের আলাদা কোন রোজগারের পথ আছে—তাদের কথা আলাদা)। রমাপ্রসাদবাবু বলেছেন, 'এই থিয়েটার তো একটা শিক্ষিত শ্রেণীর থিয়েটার। এই থিয়েটার যাঁরা করেন এবং দেখেন উভয়েই অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান শ্রেণী।' মাননীয় বণিকবাবুকে প্রশ্ন, তাহলে যাঁরা যাত্রা দেখেন বা করেন, যাঁরা কর্মাশিয়াল থিয়েটার দেখেন বা করেন—আমরা তাঁদের কোন দলে ফেলব? নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান বা কম শিক্ষিতদের দলে! কিন্তু সত্যিই কি তাই? যদি তাই-ই হয় তবে আমরা অর্থাৎ গ্রুপ থিয়েটার দলগুলো কেন তাঁদের মধ্যে যাওয়ার চেষ্টা করছি না? তাঁদের কেন শিক্ষিত করার চেষ্টা করছি না? সেটুকু দায়ও তো গ্রুপ থিয়েটারের আছে! তাঁদেরকেও আমরা কেন আমাদের শরিক করে তুলছি না!!

আর উনি যেভাবে গ্রুপ থিয়েটারকে একটা শ্রেণীতে ভাগ করে দিলেন তাতে আরো বেশি ভয় লাগে যে শেষে এই নামটি যেন বাংলা নাট্যজগত ইতিহাসের পাতায় স্থান না পায়। তার অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে সাধারণ মানুষের মধ্যে। তা না হলে তার বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। সত্যি কথা বলতে কি এই 'শিক্ষিত' তাবিজটাই আমাদের অশিক্ষিত করে তুলেছে। আমরা না পারছি শহরে থাকতে না পারছি গ্রামে যেতে। কেন? এরকম হচ্ছে কেন?—শিক্ষিত বলতে যদি শুধু কলকাতা বোঝায় তবে দর্শকের পরিধি তো আরো ছোট হয়ে আসবে! ফলে আরো জটিলতা বাড়তে বাধ্য। বরং এই পপুলার (?) থিয়েটারকে আরো বেশি পপুলার করার জন্য আমাদের গ্রামে যেতে হবে। পৌঁছে দিতে হবে আরো আরো মানুষের কাছে। তবে প্রোডাকশন অতি অবশ্যই 'বুদ্ধিদীপ্ত' হওয়া চাই। বণিকবাবু বড্ড বেশি শহরকেন্দ্রিক নাট্যচিন্তার কথা ভাবছেন। একটু গ্রামকেন্দ্রিক নাট্যচর্চার কথা ভাবুন না। তাহলে একটু উপকার বই অপকার কিছু হবে না। অ্যাকাডেমি ছাড়া কি কলকাতায় আর কোন মঞ্চ নেই? ঘুরে ফিরে সেই একটা মঞ্চে বড় দলগুলো 'শো' করবে কেন? না কি শিক্ষিত বলে এ সমস্ত মঞ্চগুলো বাদ যায়? অথবা পপুলারিটি কমে যাওয়ার আশঙ্কা? শীততাপ নিয়ন্ত্রিত মঞ্চ না হলে শিক্ষিতরা বুঝি বুদ্ধিদীপ্ত থিয়েটার দেখতে পারেন না?...আপনি অ্যাকাডেমিতে যে লীগ চালু হওয়ার কথা বলছেন—তা হয়তো বড় দলগুলোর ক্ষেত্রে কিছু সুরাহা হবে, কিন্তু মাঝারি বা ছোটদলগুলোর অবস্থা খুবই বিপর্যয়ের মধ্যে পড়বে। এ ব্যাপারে আমার একটা প্রস্তাব আছে।

মহামান্য সরকার বাহাদুর গ্রুপ থিয়েটারকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন ও করছেন। কিন্তু কি উপকার হয়েছে তাতে? ...বণিকবাবু, আর একটা প্রসঙ্গ খুব সহজেই এড়িয়ে গেছেন। তা এই যে, গ্রুপ থিয়েটারের মধ্যে একটা অস্থিরতার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটা নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে একটা সুস্থ আবহাওয়া তৈরি করে। আজ তা নেই বলেই আমরা আরো বেশি হতাশ। এবং ক্ষতিগ্রস্ত।

পৃথ্বীশ অধিকারী
হাওড়া-৭১১৩০৬

অসহযোগ

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন ছিল অহিংস এক মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু এই আন্দোলন যখন শুরু করেছিলেন তখন তিনি নিজেও জানতেন না যে, এক বিষবৃক্ষের বীজ বপন করা হল। কারণ গান্ধীবাদের আর সব কিছু বাদ দিয়ে ভারতবাসী তাঁর অসহযোগটিকে সযত্নে জাতীয় চরিত্রে লালন করে চলেছে। শুধু তাই নয়, সেই বিষবৃক্ষের অঙ্কুরটি আজ ডালপালা বিস্তার করে বিশাল মহীরুহের আকার নিয়েছে।

ভারতবাসী হয়তো আজ অবধি একটি সত্য ঠিক মতো অনুধাবন করতে পারেনি যে, এদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ হয়ে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর আমাদের সরকারও বোধ হয় এত দিনে বুঝে উঠতে পারেননি, ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত কাঠামোটি ভেঙে ফেলে নতুন কোন জাতীয় রাষ্ট্রিক কাঠামো তৈরি করা যায়। ফলে রাষ্ট্রযন্ত্রের চরিত্র সেই ইংরেজ আমলের মতোই রয়ে গেল, শুধু রইল না তাদের দক্ষতা। তাই আজও ভারতবাসীর সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রের বনিবনা হল না। আর এই অবনিবনার সুযোগে ক্রমেই বাড়তে লাগল অসহযোগ। যার ফলে আমরা অর্জন করলাম এক জাতীয় অভিশাপ, ধর্মঘট। গান্ধীজীর বদলে এই নয়া অসহযোগের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিল বামপন্থী দলগুলি। আজ বামপন্থীরাও তাঁদের বুমেরাং-এ আহত।

আহত গোটা ভারতবর্ষের শিল্প, বাণিজ্য, প্রশাসন, প্রযুক্তি, শিক্ষা, আহত গোটা জাতীয় চরিত্রই।

শ্রমিক-মালিক বিরোধ সব দেশে, সব কালেই আছে। আছে কর্মী ও প্রশাসনের অবনিবনা। কিন্তু উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থায় এই বিরোধ বা অবনিবনা এরকম স্থায়ী অসুখে দাঁড়িয়ে যায় না বা তা জাতির উন্নয়ন বা উৎপাদনকে এরকম ক্ষয়ক্ষতির চক্রে ফেলে দেয় না।

ধর্মঘট শ্রমিকদের বা নাগরিকদের এক ন্যায্য হাতিয়ার বটে কিন্তু তার যথেচ্ছ ব্যবহার এবং অতি প্রয়োগের ফলে হাতিয়ারটির ধার কমে আসছে। অনেক অন্যায্য অন্যায় ধর্মঘট শ্রমিক বা কর্মীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় ও অনিশ্চিত করে তুলছে। আবার এই কথায় কথায় ধর্মঘট বাড়াচ্ছে কর্মী ও নিয়োগকারীর মধ্যে সমঝোতার ব্যবধান।

সম্প্রতি টেলি-কমিউনিকেশন বিভাগের ইনজিনিয়ারদের নিয়মমাফিক কাজের বকলমে ধর্মঘট কার্যত টেলিফোন, টেলিগ্রাম, টেলিপ্রিন্টার সব কিছুকেই পঙ্গু করে দিয়েছিল। আর তার ফলে ভুগতে হয়েছে সাধারণ মানুষকেই শুধু নয়, গোটা জাতিকেই। কত জরুরী কাজ আটকে পড়েছে, কতভাবে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার হিসেব এখনও আমরা জানি না, কিন্তু এটা জানি, টেলি-কমিউনিকেশন যে কোনও রাষ্ট্রের পক্ষে এক অতিশয় প্রয়োজনীয় ও জরুরী ব্যবস্থা। সম্প্রতি এই বিভাগে ধর্মঘটকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে বটে, কিন্তু তা বলবৎ থাকে কিনা সেটাই চিন্তার কথা।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে ফেটো অর্থাৎ ইনজিনিয়ারদের সংস্থা ধর্মঘট শুরু করেছে। দেখতে দেখতে কয়েক মাস কেটে গেছে, কিন্তু এখনও সরকারের সঙ্গে তাঁদের কোনও সমঝোতা হয়নি। ইনজিনিয়ারদের দাবী-দাওয়াকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতে চাইছেন না বামফ্রন্ট। আর এই দুই মহাবলীর লড়াইয়ে প্রাণ যাচ্ছে উলুখাগড়ার। বর্ষার আগে বা পরেও রাস্তাঘাট মেরামতে হাত পড়েনি। ফলে ভঙ্গে ভরা বঙ্গের রাস্তা এখন চষা ক্ষেতকেও লজ্জায় ফেলছে। কলকাতার রাস্তাঘাটের অবস্থা শোচনীয়, মফস্বলের রাস্তাঘাট প্রায় রসাতলে। এ ছাড়া, আরও বহুতর নির্মাণ হয় আটকে আছে, নয়তো গোল্লায় যাচ্ছে।

ট্রাক মালিক ও কর্মচারীদের দাবী-দাওয়াই বা বসে থাকবে কেন ? সম্প্রতি তাঁরাও নেমে পড়েছেন ধর্মঘটে। সেই ধর্মঘটের পাল্লায় পড়ে সব জিনিসের দামই গগনচুম্বি তো হবেই, জিনিসপত্র একেবারে বেপাত্তাও হয়ে যাবে অনতিবিলম্বে।

শোনা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের ধর্মঘটী ইনজিনিয়ারদের সমর্থনে বিদ্যুৎ কর্মীরাও সমব্যথিক ধর্মঘট শুরু করবেন। ষোলো কলা পূর্ণ হতে আর বাকি কী !

হয়তো একে একে সব ধর্মঘটই মিটে যাবে, কিন্তু দেখা দেবে নতুন নতুন ধর্মঘট এবং অসহযোগিতা। তার কারণ আমাদের জাতীয় চরিত্রে দেশপ্রেম বলে কিছু নেই, নেই দায়িত্ববোধ, নেই প্রাপ্ত বয়স্কের পরিণত চিন্তাভাবনা।

অসহযোগের জয় আজ নিরঙ্কুশ। অসহযোগের প্রভাব আজ সর্বব্যাপী।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্ষিতিমোহন সেনকে লেখা : ১৯০৮-১৯৪০

চিঠির স্টাইল

"আমার লেখার চেয়ে কম হবে না আমার চিঠি। প্রত্যেকের কাছে আমার স্টাইল ভিন্ন। কিছুতে একজনকে অন্যের কাছে লেখা স্টাইলে লিখতে পারিনে—চেষ্টা করলেও নয়। তার মানে এক একজনকে সামনে রেখে আমার এক এক ভাবজগৎ তার প্রত্যেকটির ভাষা ও প্রকল্প ভিন্ন রকমের। আমি তো আমার পক্ষে দেখেছি এ এড়ানো অসম্ভব।"

॥ পত্র ২৫ ॥

ও

কলিকাতা

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—
রথীর সঙ্গে দেখা নিশ্চয়ই হইয়াছে। তাহাকে আজ রাত্রেই ছাড়িবার জন্য টেলিগ্রাফ করিলাম। সে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আজ প্রাতে একটি কাজে যাইবে কথা দিয়াছিল। সেকথা বিস্মৃত হওয়া তাহার অন্যায় হইয়াছে এই জন্যই তাহাকে তাগিদ করিতে হইতেছে।
রামমোহন রায়ের সভায় আমাকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে হইবে। কলিকাতায় তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। কিছুমাত্র অবকাশ পাইতেছি না। লিখিয়া পাঠ করিব এমন উপায় নাই—অতএব সেদিন সভায় উপস্থিতমত আমার বুদ্ধিতে যাহা জোগায় তাহাই বলিতে হইবে। অন্য পাঁচজনের বলা হইয়া গেলে সব শেষে আমার যাহা বক্তব্য থাকে তাহাই বলিব। পালে যদি অনুকূল হাওয়া লাগে তাহা হইলে কোথাও বাধিবে না যদি না লাগে তাহা হইলে বেশিদূর অগ্রসর হইতে পারিব না। এই বুঝিয়া ভাগ্যের পরে নির্ভর করিয়া সভায় আসিতে পারেন। কিন্তু দিনু যেন আপনাদের সঙ্গ গ্রহণ না করে।
ভাল ইংরেজি শিক্ষকের চেষ্টায় আছি। জিতেন্দ্রবাবু বলিতেছেন একজন ভালো লোক আছেন—তিনি বোলপুরে যাইতে প্রস্তুত। অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। ছুটির পরে তাঁহাকে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তিনি এম. এ—অধ্যাপনা ছাড়া অন্য কোনো কাজে তাঁহার খেয়াল নাই—অর্থাৎ তিনি বিষয় বুদ্ধিবিহীন—হয় ত বোলপুরের জমিতে তাঁহার শিকড় লাগিয়া যাইবে।
আপনাদের সঙ্গে মিলিবার জন্য মন উৎসুক হইয়া আছে। ইতি
শনিবার [১৯১০]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ পত্র ২৬ ॥

ও

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—
আমার প্রতি দয়া যদি করেন তবে কিছু কিছু জ্ঞানদাস ও অন্যান্য

শান্তিনিকেতন আশ্রমবিদ্যালয়ের প্রথম যুগের ছাত্রবৃন্দ

তর্জ্জমাযোগ্য কবিতা অল্প পরিমাণে প্রত্যহ পাঠালে আপনারও কষ্ট হবে না আমারও আনন্দ হবে এবং সেগুলি যাতে বহুলোকের আনন্দজনক হয় আমি তার চেষ্টা করব। কৃপণতা করবেন না। যেটুকু আমাকে দিয়েছেন তার জন্য অন্তরের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করবেন।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ পত্র ২৭ ॥

ওঁ

প্রীতি নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

চিঠিখানি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। ছুটির শেষে আপনাদের সকলের সঙ্গে মিলিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছি।

অজিত অসুস্থ হইয়া ফিরিতেছে বোধ হয় বিদ্যালয় যখন খুলিবে তখন তাহার সঙ্গেও দেখা হইবে।

এখানে কন্যা বিদ্যালয় খুলিবার জন্য রথীর সঙ্গে কথা চলিতেছে। স্থানাভাব আছে—একটা কাছারির ঘর প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতেছে, সেইটি হইলে তবে এখানে জায়গা হইবে। ইতিমধ্যে ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী আসিয়া পৌঁছিবেন। তিনি আমেরিকা ছাড়িয়াছেন—যাহা হউক্ আপনার সঙ্গে আর একবার পরামর্শ করিতে হইবে—অনেক আলোচ্য বিষয় আছে। শিক্ষক জোটানোর একটা সঙ্কট আছে। কবির যতটা হইয়াছে মণিলালকে অবিলম্বে পাঠাইবেন। সে সেজন্য প্রস্তুত আছে। এখন হইতে পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য আর দেরি চলিবে না।

আপনি কিন্তু সুস্থ শরীর লইয়া আশ্রমে আসিবেন। অতিরিক্ত মাত্রায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেহযন্ত্রটাকে ক্লিষ্ট করিবেন না। শরীর মনের শক্তি যখন আশ্রমকে উৎসর্গ করিয়াছেন তখন অসাক্ষাতে তাহার অপব্যয় করিলে অন্যায় হইবে।

আমি এখানে দিগন্ত প্রসারিত সবুজের মধ্যে দুই চক্ষু ডুবাইয়া বসিয়া আছি। একটা ছোট নাটক লেখাতেও হাত দিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম শিশিরোৎসব লিখব—সময় এবং আমার বয়স অনুসারে সেইটেই সঙ্গত হইত কিন্তু বিধাতা পরিহাস করিয়া আমাকে বসন্তোৎসব লেখাইতেছেন—কেমন করিয়া এরূপ অপাত্রে অকালবসন্তের প্রাদুর্ভাব হইল তাহা বলিতে পারি না—ইহার মধ্যে ইন্দ্রের সহিত অন্য কোনো একজন দেবতার চক্রান্ত আছে এমন আশঙ্কা করিবেন না—নারদের কৌতুক থাকিতে পারে। ইতি ২২শে কার্ত্তিক ১৩১৭

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[illegible]:—
আপনার শ্লোকভাণ্ডারদ্বারে বসন্তের কবি সমাগত। ঝুলি পূর্ণ করিবেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গীতাঞ্জলি রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ

॥ পত্র ২৮ ॥

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—
পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগ আনিয়া দেখিলাম। বুঝিলাম নগেন আইচের পরামর্শে আপনারা এ বইখানি বাছিয়াছেন। ছেলেবেলায় ছাত্রবৃত্তির নীচের ক্লাসে আমরা এখানি পড়িয়াছিলাম। আপনি বোধহয় পড়েন নাই—পড়িলে ছাত্রগণকে বিনাদোষে এত বড় শাস্তি দিতেন না। যেদিন ওঝাকে দিয়া রোগীর রোগ ঝাড়ানো যেদিন সূতিকাগৃহকে প্রসূতির জন্য নরককুণ্ড করা হইত সেই সাবেককালে এই বইখানি ইস্কুলে চলিত—সেই সময়টাতে শিশুরূপে আমাদের আবির্ভাব ছিল অতএব অসময়ে জন্মিবার দণ্ড আমরা ভোগ করিয়াছিলাম। কিন্তু পাপের এত দীর্ঘ পরমায়ু তা জানিতাম না। ছেলেদের পরম শত্রু আছে টেক্‌স্‌ট্‌ বুক কমিটি সেই ত এইসব শয়তানকে শিশুরক্তে রাঙাইয়া রাখিয়াছে কিন্তু উক্ত কমিটির দলে ত আমরা নই। আর একবার এই বইটাকে ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিবেন নিজেকে শিশু মনে করিয়া। নগেন আইচকে মন থেকে বিদায় করিয়া দিয়া তাহার জায়গায় রসের কাঙাল মিষ্টলোভে লালায়িত কচি ছেলেগুলিকে মনে আনিবেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের শান্তিনিকেতন হইতে এইপ্রকার শিশু পীড়নকে খেদাইয়া দিতে আপনারা দ্বিধা করিবেন না।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ পত্র ২৯ ॥

অয়মহং ভোঃ —
আপনার শ্লোকভাণ্ডারদ্বারে বসন্তের কবি সমাগত। বাসনা পূর্ণ করবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ পত্র ৩০ ॥

ওঁ

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নমস্কার—
সত্যজ্ঞানবাবু শাস্ত্রীমহাশয়ের স্থানে সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার লইতে প্রস্তুত। তাঁহার কথায় বার্ত্তায় বোধ হইল বালকদিগকে কেমন করিয়া শিক্ষা দিতে হয় সে সম্বন্ধে নিজের প্রতি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে—সেটা থাকা ভাল। ইঁহার কাছ হইতে কিছু পরিমাণে ইংরেজি আদায় করিতে পারিবেন এবং সন্তোষের প্রাতঃকালের অবসর হইতেও কিছু কাটিয়া লইয়া যদি আগামী গ্রীষ্মাবকাশ পর্যন্ত চালাইয়া দিতে পারেন তবে যতীনকে ও জীবনকে পাইলে আপনাদের অন্য শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে না এবং আমার বিশ্বাস আগামী ছুটির পরে অথবা তাহার পূর্ব্বেই দিনুকে পুনরায় বিদ্যালয়ে ফিরিতে হইবে। সুতরাং ইতিমধ্যে নূতন লোক রাখিলে তাহাকে লইয়া মুস্কিলে পড়িবেন। তবে যদি বাংলা শিক্ষক ভাল কোথাও পান তবে চেষ্টা দেখিবেন।
সেদিন যে প্রস্তাব করিয়া আসিয়াছি আপনারা সেটা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন। আশ্রমের ভিতরকার সত্যটিকে ছেলেদের মনে স্পষ্টরূপে জাগাইবার জন্য ইতিপূর্ব্বে অল্পস্বল্প যে কিছু চেষ্টা করা হইয়াছে তাহার উৎসাহ অধিকদিন টেঁকে নাই—কেননা সেটা আমরা বাহির হইতে করিয়াছি এবং আমাদের নিজেদের দিকে আইডিয়া যেমন সুলভ নিষ্ঠা তেমন নহে। এবারে বালকদিগকেই আহ্বান করিয়া দেখুন। তাহারাই তাহাদের ইচ্ছার দ্বারা দাবির দ্বারা প্রশ্নের দ্বারা আমাদের চিত্তকে হয়ত সচেতন রাখিতে পারিবে। সমস্ত আশ্রমের একটি প্রাণের কেন্দ্র যদি গড়িয়া উঠে তবে সেইখানে অতি সহজে আশ্রমের সুধারসটুকু সঞ্চিত হইতে থাকিবে।
আমি অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য দূরে যাইতে প্রস্তুত হইতেছি। এই সময়ে আমি আপনাদের সকলের কাছ হইতে অন্তরের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করি। অনেক সময়ে অবিবেচনা করিয়া আপনাদের কাছে অনেক অপরাধ করিয়াছি ; অবিচারে অনেক বেদনার কারণ ঘটাইয়াছি ; আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যে সকল ঈর্ষাবিদ্বেষের তরঙ্গ মাঝে মাঝে দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে আমি তাহাকে শান্ত না করিয়া অনেক সময়ে ক্ষোভের উপর ক্ষোভ বাড়াইয়াছি আজ বিদায় গ্রহণের সময় আমার সেইসমস্ত এবং অন্যান্য নানা গোচর ও অগোচর পাপ মার্জ্জনা করিবেন। আমি প্রথম হইতেই ইহা নিশ্চয় জানি মানুষকে চালনা করিবার শক্তি আমার নাই ; সকলের হৃদয়কে সম্মিলিত করিতে আমি পারি নাই, আমার আহ্বানের মধ্যে সত্যের পূর্ণ তেজ নাই—আমি কবিমাত্র। কবির সমস্ত দুর্ব্বলতা অসম্পূর্ণতা

আমার আছে। এবং আপনারা জানেন কবির দ্বারা ইতিহাসে কখনো কোনো কাজের মত কাজ সৃষ্টি হয় নাই—বস্তুত বিদ্যালয়ের সৃষ্টিকার্য্যে বিধাতা আমাকে নিতান্তই একটি উপলক্ষ্য করিয়া বসাইয়া রাখিয়াছেন—এখানে আপনাদের যাঁহার যে শক্তি আছে তাহাই মিলাইয়া তুলিয়া যথার্থভাবে ইহার সৃষ্টির ভার আপনারা গ্রহণ করুন—আমার দ্বারা ইহার মধ্যে যাহাতে কোনো বিক্ষেপ উপস্থিত না হয় আমি সেজন্য সতর্ক থাকিব।

সত্যজ্ঞানবাবু তাঁহার কন্যার থাকিবার জন্য পুরুষের সংস্রবরহিত একটি ব্যবস্থা করিতে চান ১৩ই মাঘে তিনি আশ্রমে গেলে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিবেন। ইতি বুধবার

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র পরিচিতি

॥ চিঠির হাইল ॥

ক্ষিতিমোহনের দিনলিপি থেকে উদ্ধৃত। তারিখ ১৯ মাঘ ১৩৩৭ সন। 'গুরুদেব বিলাত হইতে কলিকাতা হইয়া বৈকালে' শান্তিনিকেতনে ফিরে রাত্রে খাবার ঘরে যে কথাবার্তা হয় তার অংশবিশেষ। উল্লেখ্য বিকালে রবীন্দ্রনাথ রুশ দেশের শিক্ষার আদর্শ এক্সপেরিমেন্ট ও তার সাহস ও ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

॥ পত্র ২৫ ॥

রথী : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামমোহন রায়ের সভা : ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে মির্জাপুর স্ট্রীটের সিটি কলেজের ত্রিতলের গৃহে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দেবেন এই সংবাদে সভা আরম্ভের বহু আগেই হল ভর্তি হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত দরজা বন্ধ করে ভিড় সামলাতে হয় কর্মকর্তাদের। সভায় রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দেন।

দিনু : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জিতেন : জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। জে. এল. ব্যানার্জি নামে সমধিক প্রসিদ্ধ।

॥ পত্র ২৬ ॥

জ্ঞানদাস : বাউল এবং সাধক কবিদের সঙ্গে পরিচিত হতে রবীন্দ্রনাথের ছিল প্রবল তৃষ্ণা। মূল বাংলা এবং হিন্দী থেকে বহু লেখা তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। বলাবাহুল্য এই সব অনুবাদ কিছুটা নিজের আনন্দের জন্য হলেও প্রয়োজনের তাগিদ কম ছিল না। আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতামালা বা বইয়ের জন্য উপকরণ সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথ বারবার মরমী সাহিত্যিকদের সাহায্য নিয়েছেন। ক্ষিতিমোহন প্রদত্ত পদটির রবীন্দ্রনাথ যে তর্জমা করেছিলেন তা উদ্ধার করা হল :

"What hast thou come to beg from this beggar, O King of Kings?"
"I have come to beg the beggar himself.
My Kingdom is poor for want of him, my dear one,
And I wait for him in tears."
Gnanadas says, "How long wilt thou keep him waiting, O Wretch,
Who has waited for thee for ages in silence and stillness?
Open thy gate and make this very moment
Fit for the union."

॥ পত্র ২৭ ॥

কন্যা বিদ্যালয় : ক্ষিতিমোহন সেন কাজে যোগদানের কিছুদিন পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে কথাবার্তা প্রসঙ্গে বালিকা বিদ্যালয় নিয়ে কথা তুলেছিলেন। কবিকে ক্ষিতিমোহন প্রশ্ন করেছিলেন—'এই আশ্রম তো করেছেন ছেলেদের জন্য। মেয়েদের প্রতি আমাদের কি কিছু কর্তব্য নেই?' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বড় সঙ্কোচের সঙ্গে গুরুদেব বললেন—'আশ্রমের কাজে আত্মসমর্পণ করব ভাবলাম, তখন আমার আত্মীয়-স্বজন সবাই প্রতিকূল। সকলকেই এড়িয়ে চলে এলাম শান্তিনিকেতনে। সঙ্গে এল দৈন্য, অর্থাভাব। আমার স্ত্রীর ঐকান্তিক সেবা এবং যত্নে অবস্থা সহজ এবং স্বাভাবিক হল। কিন্তু তিনি মারা গেলেন। আশ্রমের জন্য এই প্রথম বলি। নারীর এই বলিকে একদিন স্বীকার করতেই হবে। কাজেই নারীর এই দাবী একদিন এখানে স্বীকৃত হবেই।' (দিনলিপি থেকে উদ্ধৃত)। পুজোর ছুটিতে দেহলির একতলার বড় ঘরটি আংশিক ছেড়ে দেওয়া হয়। সেখানে পিসিমা রাজলক্ষ্মী দেবীর তত্ত্বাবধানে মেয়েদের জন্য বিভাগ খোলা হল। ১৯০৮ সালের অক্টোবরের শেষে ক্ষিতিমোহন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী হিরণ এবং ইন্দুকে সঙ্গে করে এনে বোর্ডিং-এ ভর্তি করে দেন। ৭ই পৌষের উৎসবের আগে বিহারের বক্সার থেকে এই বিভাগে ভর্তি হলেন মধুসূদন সেনের কন্যা হেমলতা গুপ্ত। বক্সারের ইঞ্জিনিয়ার মধুসূদনের সহকর্মী তাঁর দুটি কন্যা প্রতিভা এবং সুধাকে ডিহিরি-অন-সোন থেকে এনে মেয়ে বিভাগে রেখে গেলেন। ঠাকুরবাড়ির সাগরিকা যখন এলেন তখন দেহলির ঘর প্রায় পূর্ণ। বড় হলেও মাত্র একটি ঘরে রাজলক্ষ্মী দেবী সমেত সকলের স্থান সংকুলান বড়ই কঠিন হয়ে ওঠে। এইভাবে জানাশোনা নিজেদের মধ্যে থেকেই ছাত্রী সংগ্রহ করে বালিকা বিদ্যালয়ের পত্তন হয়। এ-ছাড়া মীরা দেবীর বিয়ের পর জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য আমেরিকা চলে যান। মীরারও শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। সেইসঙ্গে বালবিধবা লাবণ্যলেখার শিক্ষার প্রয়োজনের তাগিদে বালিকা বিদ্যালয়ের ছোট্ট চারা আপনিই গজিয়ে ওঠে। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে পুজোর ছুটির আগেই বালিকা বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য বহু দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্যে কবিকে বালিকা বিভাগ বন্ধ করে দিতে হয়। 'আরো আঘাত সইবে আমার' এবং 'জীবনে যত পূজা' এই গানদুটি এইসময়ে লেখা। যে প্রভাতে শেষ দুটি মেয়ে বোর্ডিং ছেড়ে চলে যান তার আগের দিন সমস্ত রাত কবি ছিলেন বিনিদ্র। দেহলির বারান্দায় কাঠের বেঞ্চিতে বসে অন্যান্য গানের সঙ্গে এ দুটিও কবি গেয়েছিলেন। পত্রে উল্লিখিত কন্যা বিদ্যালয় আবার চালু করা সম্পর্কে বলা হয়েছে। দশ বছর পর মেয়েদের বিভাগ আবার চালু হয়।

ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী : শান্তিনিকেতনে যোগ দেননি।

কবির : ক্ষিতিমোহন সংগৃহীত কবীরের অনুবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। গীতাঞ্জলি প্রকাশের পরই লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটি থেকে 'কবীর' প্রকাশিত হয়।

মণিলাল : মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯)। বিশিষ্ট সাহিত্যিক। বহুকাল সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে ভারতী সম্পাদনা করেছিলেন। বহু গ্রন্থ রচয়িতা মণিলাল নৃত্য পরিচালনায় দক্ষ ছিলেন।

শিশিরোৎসব : বসন্তোৎসব : এ নাটকের সম্পূর্ণ বা আংশিক পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায়নি।

॥ পত্র ২৮ ॥

পদ্যপাঠ : যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। সম্ভবত ১৮৬৮-৬৯ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৭৭-র মধ্যে সাত-আটটি সংস্করণ হয়।

নগেন আইচ : নগেন্দ্রনাথ আইচ। শিক্ষক। ১৯৩৩ পর্যন্ত শিক্ষকতা করেছেন।

॥ পত্র ৩০ ॥

সত্যজ্ঞানবাবু : সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায়। বিধুশেখর শাস্ত্রী (শাস্ত্রী মহাশয়) বিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে মালদহে নিজ গ্রামে ভারতীয় প্রাচীন আদর্শে গুরুগৃহ স্থাপনের ভরসায় চলে যান। এলাহাবাদ প্রবাসী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সত্যজ্ঞান ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে শান্তিনিকেতনে যোগ দেন। তিনি ছাত্রদের নিয়ে আশ্রমের বাগান ও রাস্তা তৈরির কাজে সচেষ্ট ছিলেন।

সন্তোষ : সন্তোষচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৪-১৯২৬)। পিতা শ্রীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সুহৃদ ছিলেন। এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। কৃষি ও গোপালন-বিদ্যায় স্নাতক হয়ে দেশে ফিরে আসেন। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে দেশের দুগ্ধসমস্যা সমাধানে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। শুধু তাই নয় ১৯২৪-এ প্রতিষ্ঠিত 'শিক্ষাসত্র'-এর দায়িত্ব দেওয়া হয় সন্তোষচন্দ্রকে। আমৃত্যু তিনি এই বিদ্যালয়ের পরিচালক ছিলেন।

যতীন : যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জীবন : জীবনময় রায়

কিছুদিনের জন্য দূরে : তৃতীয়বার বিলাত যাবার উদ্যোগ। শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়নি। ঠিক ছিল গঙ্গার চাঁদপাল ঘাট থেকে গুরুদেব রওনা হবেন। সঙ্গী হিসেবে যাবেন ডাক্তার দ্বিজেন মৈত্র। এই বারের বিলাত যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য তাঁর অর্শরোগের চিকিৎসা। এতদিন তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে ছিলেন। নিজেও ঘরে বই পড়ে ওষুধ খেয়েছেন। কিন্তু কিছুতেই উপশম হয়নি। অসহ্য যন্ত্রণা সেই সঙ্গে রক্তক্ষরণ। ব্যবস্থা এই হল যে বিলেতের নার্সিং হোমে গিয়ে কবি কিছুদিন থাকবেন এবং সেখানে শল্য চিকিৎসা হবে। রওনা হবার তারিখ ঠিক হয় ১৯ মার্চ। কিন্তু ঐ দিন কবি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রাতে শয্যা ত্যাগ করাই তাঁর পক্ষে অসম্ভব। আত্মীয়স্বজন এবং ডাক্তাররা সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিলেন। রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে সোজা শিলাইদহে চলে যান। এবং বিশ্রামের অবকাশে গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জমার কাজে মন দেন।

সংকলক—সুনীল দাস

কয়েকটা দিন

তারাপদ রায়

কয়েকটা দিন নিজের মত,
কয়েকটা দিন অন্যের মত,
কয়েকটা দিন বোকার মত,
কয়েকটা দিন চালাকের মত।

কয়েকটা দিন ইস্কুলের জন্যে,
কয়েকটা দিন অফিসের জন্যে,
কয়েকটা দিন বাড়ির জন্যে,
কয়েকটা দিন বাইরের জন্যে,
কয়েকটা দিন মাধবী ফুলের জন্যে,
কয়েকটা দিন টেস্ট ম্যাচের জন্যে,
কয়েকটা দিন ভালোবাসার জন্যে,
কয়েকটা দিন চোখের জলের জন্যে।

এই রকম কয়েকটা+কয়েকটা+কয়েকটা
যোগ দিয়ে দিয়ে কিছুই মেলে না
তবু দিন যায়।
কয়েকটা দিন দিনের মত
কয়েকটা দিন অদিনের মত
দিন চলে যায়॥

রূপান্তরিত

উজ্জ্বল সিংহ

মেঘপুঞ্জের ভিতরে আমার এ কোন শরীর। ঢুকে যাই দ্রুত সাদা সুড়ঙ্গে।
বাষ্প এবং স্ফুরিত নীলের প্রাসাদকক্ষে আলোর বিছানা।
আবছা আঁধারে ফুটে উঠি যেন জলের স্তবক ; নির্জনতাই এখানে পুরুষ।
রূপান্তরের নিয়তিরা ছিলো এমনই দ্রষ্টা, রূপের গভীরে মরণতৃষ্ণা।

বনের আগুন হাহাকার হলো আমার উষ্ণ শ্বাসেপ্রশ্বাসে।
দূর মেরু থেকে মরুভূমি আজ আমারই বিলাপে জ্বলে দাউ দাউ।
বায়ুমণ্ডলে ঘোরাফেরা করে আদিম ফুল্‌কি (আমার স্মৃতিরা)।
যৌবন কার অঙ্গারে ঢাকা। একাকী বাতাস এখানে ক্ষিপ্ত।

সবটুকু ডাঙা নিমেষে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো গাঢ় তরলের স্রোত।
হিমবাহ তার রুদ্ধ কান্না ছড়িয়ে ছিটিয়ে নেমে এলো নিচে।
রঙ হলো তার টক্‌টকে লাল, প্রেম হলো ঘৃণা দৃষ্টির বিষে।
প্রস্ফুটিতাকে জড়িয়ে ধরেছে পারমাণবিক অজস্র শুঁড়।

প্রকৃতি এখন ধ্বস্ত নগরী, তার উলঙ্গ শরীর-ই কবিতা।
দৃষ্টি ডুবেছে কালো সমুদ্রে। সাদা পাখিগুলি প্রতিটি শব্দ।
অতিজাগতিক ধ্বনির প্রবাহ রূঢ়ব্যঞ্জনা।
কোষ থেকে কোষে প্রতি ইন্দ্রিয়ে শুধু রিরংসা শুধু রিরংসা।

শোলার পাখি

মতি মুখোপাধ্যায়

শোলার সুন্দরী পাখি, তারও দুই চোখে যেন কালো সুর্মা-টানা
সেইখানে উদাসীন কবেকার জল
ক্ষুধায় ঈষৎ ফাঁক ওই দুই ঠোঁট
একটিও শস্যকণা তোলে না যেখানে
নীলপরী স্বপ্ন-দেখা ঢেউ ঢেউ ডানা
ইচ্ছে হলেও তার ওড়া নেই, শিকল বেঁধেছে দুই পায়ে।

শোলার সুন্দরী পাখি, তুমি তার বেশী কিছু নাকি
এক বুক তৃষ্ণা নিয়ে উৎসবে ও সাজে
একটি হৃদয় থেকে অন্য এক হৃদয়ের দিকে
শরীরী গন্ধ-মাখা ঝাউঝিরি বাতাসের মতো যেতে চাওয়া
পারো ? নাকি শূন্য পারাপার অবিরাম সাঁতারের ছবি
ছবি হয়ে সময়ের পর্দা জুড়ে থাকো।

মানুষ শব্দটি

শিহাব সরকার

মানুষ শব্দটি উচ্চারণে
দেখি শুধু ধূম্রজাল, কুয়াশাও বলা যায়
এমন দুঃসহ শূন্যতা—স্পষ্ট অবয়বহীন চরিত্রহীন !
যা কিছু দেখেছি এযাবৎ মানুষের নামে
তার কোনোটা সম্পূর্ণ নয়
ছেঁড়াখোঁড়া সরীসৃপ হিম বর্ণচোরা ভূতমগ্ন কিছু ছায়া।

অবশ্যই মানুষ, চারদিকে ইঁদুর বেড়াল গাধা গরু
প্রাণীরা আছে বলে মানুষ নাম সার্থক হয়েছে
মানুষের তৃষ্ণার শেষ নেই
টইটম্বুর নদী অঞ্জলিভরা যৌবনের সোমরস মধু
নিমেষে নিঃশেষ করে মানুষ আবার খুঁজেছে
নদী ও বসন্তের উৎস,
দেখেছি আধ-খাওয়া হরিণ ফেলে পরিতৃপ্ত বাঘ
বনের গভীরে চলে যায়
মানুষ নাচে উচ্ছিষ্টের ওপর।

মনে কি পড়ে মানুষের তৃপ্ত পরিপূর্ণ অবয়ব ?
বোঝা যায় মানুষের ভাষা ?
ধূম্রজাল থেকে
মানুষের নষ্ট গান ছেঁড়াখোঁড়া মানুষের উদ্দেশে
ধূম্রজাল থেকে
মহামানবের মশাল অনেক শতাব্দীর ব্যবধানে।

আমি যখন কানাইলাল সরকারের নাম প্রথম শুনি, সেই ১৯৪৯-৫০ সালে, তখন তিনি দেশ পত্রিকার ম্যানেজার। কিন্তু তখনই তাঁর নাম, অর্থাৎ দাপটের খ্যাতি, বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা শুনেছিলাম, তিনি সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের দক্ষিণ হস্ত, অশোককুমার সরকার মহাশয়ের মামা। কানাইদার পিসিমা শ্রুতকীর্তি সরলাবালা ছিলেন অশোককুমার সরকারের দিদিমা। সৈয়দ মুজতবা আলি একদিন আমাকে বলেছিলেন, 'কে ? কানাইলাল সরকার ? উনি করতে পারেন না এমন কোনও কাজই নেই। জানো, আমাকে পর্যন্ত লেখক বানিয়ে ছেড়েছে ! ডেঞ্জারাস লোক !'

এই রকম একটা ডেঞ্জারাস লোকের সঙ্গে আমার ভাগ্য জড়িয়ে গিয়েছিল, একটা ডেঞ্জারাস ঘটনার মধ্য দিয়ে। আসলে, ডেঞ্জারটা আমিই ডেকে এনেছিলাম। সেই ঘটনা দিয়েই তবে এ কাহিনী শুরু হোক। কারণ এখনও সেই ঘটনার দুজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী জীবিত আছেন, একজন আনন্দমেলার সম্পাদক কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আরেকজন প্রতাপকুমার রায়, অধুনা আজকাল পত্রিকার সম্পাদক। ১৯৪৮ সালে বেনেট কোলম্যান কোম্পানি অর্থাৎ টাইমস অফ ইণ্ডিয়া পত্রিকা গোষ্ঠীর মালিক, (পরে যার মালিক ছিলেন রামকৃষ্ণ ডালমিয়া), ১৯৪৮ সালে কলকাতা থেকে দৈনিক পত্রিকা সত্যযুগ প্রকাশ করতে শুরু করেন। সাত ঘাটের জল খেয়ে আমি সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত সেই 'সত্যযুগে' যোগ দিই। আমার সেখানে তিনটি পদ ছিল। প্রুফ রিডার, সিনেমা সম্পাদক এবং ছোটদের পাতার বেতালভট্ট। তারিখটা ঠিক মনে নেই, তবে সনটা হবে ১৯৪৯। আফিসে গিয়ে শুনি, আমাকে খুব খোঁজাখুঁজি হচ্ছে। কারণ আনন্দবাজার পত্রিকা আফিস থেকে এক কানাইলাল সরকার আমাদের কাগজের সিনেমা সম্পাদককে টেলিফোনে ঘন ঘন খুঁজছেন। শুনেই আমার দাঁতকপাটি লেগে গেল। একটু সামলে নিয়েই আমি সোজা আফিস থেকে গা ঢাকা দিলাম। সন্ধ্যেয় আফিসে এসেই শুনি, দারুণ ব্যাপার ঘটে গিয়েছে। একই ছবির সমালোচনা সত্যযুগে যা বেরিয়েছে, হুবহু, কমা সেমিকোলন শুদ্ধ দেশ পত্রিকাতেও তাই বেরিয়েছে। কানাইলাল সরকার বলেছেন, সত্যযুগকে দেখে নেবেন। শুনেই আমি আবার ডুব।

পরের দিন, দুজন পাকড়াও করলেন। প্রতাপকুমার রায় বললেন, 'কী ব্যাপারটা বলুন তো ? একই রিভিউ দু কাগজে বেরিয়ে গেল ? তাজ্জব !' নীরেনদা বললেন, 'হল কী করে ! এমন কি, দুটো রিভিউতেই একই মিসটেক্ !' প্রতাপকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, 'রিভিউটা কার লেখা ?' আমি বললাম, 'দেশ পত্রিকার সিনেমা এডিটার পঙ্কজদা মানে পঙ্কজ দত্তর লেখা। ওটা আমি কাঁচি কেটে প্রেসে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।' নীরেনদা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সেই সপ্তাহের দেশ পত্রিকাটা ওঁর টেবিল থেকে নিয়ে এলেন। আসতে আসতেই পাতা ওল্টানো হয়ে গিয়েছিল ওঁর। গম্ভীর মুখে বললেন, 'আমার কোনও জিনিসে তুমি হাত দেবে না।' আমি বললাম, 'না, আর দেব না। তবে এবার হাত না দিয়ে কোনও উপায়ও ছিল না আমার। বিজ্ঞাপন থেকে রাত দশটায় জানিয়ে দিল, বড় যে বিজ্ঞাপনটা, তিন কলম জোড়া, আসার কথা ছিল, সেটা পাওয়া যাবে না। অত রাত্রে আমি কী দিয়ে পাতা সাজাবো ? দিলাম পঙ্কজদার রিভিউটা কাঁচি কাটা করে প্রেসে পাঠিয়ে। না হলে পাতার ও জায়গাটা সাদাই থাকত।' কয়েকদিন পরে আরও যে কথা শুনলাম, তাতে শরীরের রক্ত হিম হয়ে যাবার জোগাড়। শুনলাম, আনন্দবাজারের কানাইলাল সরকার আমার নামটা জেনে গিয়েছেন। তার মানেই কলকাতার বাজারে আমাকে আর সাংবাদিকতা করে খেতে হবে না।

প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে কানাইলাল সরকার

অকস্মাৎ 'সত্যযুগ' থেকে নির্বাসিত হলাম। এবং তার কিছুদিনের মধ্যেই দেশ পত্রিকায় রূপদর্শীর রচনা প্রকাশিত হতে থাকল। আমি ভয়ে ভয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার অফিসে যাই আর চোরের মতো চারিদিক দেখে নিয়ে সাগরদা যখন প্রায়শই ঘরে একা বসে থাকতেন, তখন তাঁর হাতে লেখাটি জমা দিয়েই সুট্ করে কেটে পড়ি। ভয়, বলাই বাহুল্য, অদেখা কানাইলাল সরকারকে। এ ভাবেই চলছিল। একদিন সাগরদা বললেন, 'কানাইদা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। একদিন এসে দেখা কর।' আমি আচ্ছা, বলেই সরে পড়লাম। এবং আরও সতর্ক হয়ে দেশ পত্রিকা আফিসে যাতায়াত শুরু করলাম। একদিন সাগরদাকে লেখা দিতে গিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে একজন বেশ রাশভারি লোক ঘরে ঢুকে গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন, 'সাগর !' তিনি কী বলতেন কে জানে, সাগরদা সঙ্গে সঙ্গে বলে বসলেন, 'কানাইদা, এই যে আপনি যাকে খুঁজছিলেন, এই সেই রূপদর্শী।' ভদ্রলোক বিদ্যুৎগতিতে আমার দিকে ঘুরে আমাকে আপাদ মস্তক একবার দেখে নিলেন। তারপর বললেন, 'আপনি রূপদর্শী। ওহ্, আসুন আমার সঙ্গে।' তারপর আমাকে কোনও কথা বলতে সুযোগ না দিয়েই খপ্ করে আমার একখানা হাত ধরে ফেললেন। ওঁর ফাঁক দিয়ে একটা লাফ মারবার কথা মনে এসেছিল তখন। কিন্তু ততক্ষণে আমার একখানা হাত ওঁর করতলগত হয়ে গিয়েছে। এক টান মেরে বললেন, 'আসুন, আসুন।' এবং আমি ততক্ষণে চলতে শুরু করেছি। যেভাবে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তাতে আমার মনে হচ্ছিল, ওঁর ঘরে বোধ হয় দারোগাকে এনে বসিয়ে রেখেছেন। এবার আমাকে নিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে তুলে দিতে যা দেরি। ভাগ্যের হাতে, না, কানাইলাল সরকারের হাতে, নিজেকে অসহায়ভাবে সঁপে দিয়ে বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে তার পিছু পিছু চললাম।

না, কানাইলাল সরকার আমার পূর্বকৃত অপরাধের জন্য পুলিশের হাতে আমাকে সেদিন ধরিয়ে দেননি। আসলে আনন্দবাজার পত্রিকায় রিপোর্টারিতে আমাকে জুতে দেবেন বলেই আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এটাই ছিল কানাইলাল সরকারের টেকনিক।

সেইদিনই আমার সঙ্গে কানাইলাল সরকারের প্রত্যক্ষভাবে দেখাশোনা। ঘনিষ্ঠ এক সম্পর্কের সূত্রপাত। ১৯৮৬-র অক্টোবরে আকস্মিকভাবে যার সমাপ্তি হল। সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বছর। ক্রিকেটের ভাষায় যার নাম 'এ লঙ ইনিংস।'

কী লিখব কানাইদা সম্পর্কে। এত কৃতজ্ঞতার কথা লিখলে লেখাটা কি খেলো হয়ে যাবে না ? কিন্তু এ সব কথা আবার স্মরণ না করেও কি পারা যায় ? আমার চোখে টিউবারকুলোসিসের আক্রমণ হয়েছিল দু দু বার। তখন আমার অস্থায়ী চাকরি। কানাইদা আমাকে সেকালের শ্রেষ্ঠ চক্ষু চিকিৎসক বৈদ্যনাথ ভাদুড়ির কাছে অমনি টানতে

টানতেই নিয়ে গিয়েছিলেন। চিকিৎসার টাকা আফিস থেকে পাইয়ে দিয়েছিলেন, দীর্ঘ ছুটির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমার বই প্রকাশের ব্যাপারেও কানাইদার অযাচিত সাহায্য পেয়েছিলাম। এটা নয় যে, আমিই একমাত্র তাঁর সহায়তা পেয়েছিলাম। এই কলকাতা শহরে এমন অনেক লোক এখনও জীবিত আছেন, যাঁর অভিজ্ঞতা আমারই মতো।

কানাইদার অযাচিত সাহায্যের আরেকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। একবার একটা প্রেস পার্টি গোমিয়া যাবে। সেখানে ভারতের প্রথম বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরির কারখানার উদ্বোধন করতে আসবেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ। আই সি আই কোম্পানি এর নির্মাতা। তাই সেই কোম্পানির পক্ষ থেকেই প্রেস পার্টিকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ সে এক এলাহি বন্দোবস্ত। একটা ট্রেন যার সব কটাই এয়ার কণ্ডিশনড় স্লিপিং কোচ। আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর কে যাবে না যাবে, সব ব্যবস্থা কানাইদার হাতে। সেই মতো লোক তিনি বেছে নিলেন। সঙ্গে কানাইদাও যাবেন। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় হাওড়া স্টেশনে সবাই হাজির হওয়া গেল। কানাইদার নির্বাচিত টিমে ছিলাম, আমি, সাগরদা, খগেন দে সরকার আর শম্ভু চ্যাটার্জি, আনন্দবাজারের সে যুগের ক্র্যাক ফটোগ্রাফার। আই সি আই আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি রাখেনি। আমরা গাড়ির ভিতরে ঢুকে যে যার নির্ধারিত জায়গায় বসে পড়লাম। হঠাৎ শম্ভুদা জানলা দিয়ে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'খগেন দ্যাখ দ্যাখ, হুইস্কি নিয়ে যাচ্ছে ওধারে।' আবার একটু পরে, 'খগেন, ওই দ্যাখ, এক কেস্ ভর্তি স্কচ তুলে দিল ওই কম্পার্টমেন্টে।' কানাইদা আর থাকতে পারলেন না। বলে উঠলেন, 'ওই ওই মানে ওই ইয়ে তোমাদেরও দেবে।' শম্ভুদা বললেন, 'দেবার তো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সবই তো এধার ওধার বেরিয়ে যাচ্ছে।' সাগরদা ফোঁড়ন কাটলেন, 'ওসব খেতে চাও তো অন্য কামরায় চলে যাও। এখানে ও সব ঢুকবে না।' শম্ভুদা বললেন, 'কেন?' সাগরদা গম্ভীরসে বলে উঠলেন, 'এই কম্পার্টমেন্টে যে কানাইদা যাচ্ছেন, সেটা ওরা জেনে গিয়েছে।' কানাইদা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বললেন, 'এর এর এর কোনও মানে হয় না। কে খাবে কে খাবে না, তাতে ওদের কী? যারা যাচ্ছে তাদের প্রত্যেককে সমান চোখে দেখতে হবে। দাঁড়াও, আমি দেখছি।'

আমরা দেখলাম কানাইদা কামরার দরজা খুলেই একটা হাঁক দিলেন, 'এই এই, হুইসকি ইধর লে আও।' হাওড়ার নির্জন প্ল্যাটফর্ম সেই হাঁকে গমগম করে উঠল। একটা উর্দি পরা লোক এসে এক কেস হুইসকি আমাদের কামরায় দিয়েও গেল। কিছুক্ষণ পরেই অতি বিমর্ষ হয়ে কানাইদা কামরায় প্রবেশ করলেন। একেবারে কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, 'ভাই সাগর, তোমাদের উপকার করতে গিয়ে আমার তো এদিকে সর্বনাশ হয়ে গেল। কী হবে এখন বলো তো?' কী হল কী হল বলে আমরা সবাই কানাইদার উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। কানাইদা বললেন, 'আমি এই হুইস্কি বলে যেই ডেকেছি, আর দেখি কি, আমার চেনা আই সি আই-এর একজন অফিসার, ও ব্যাটাকে আবার অমলারাও চেনে, আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। আর ফিক ফিক করে হাসছে। আমি যত বলি, আমি তোমাদের হয়ে চেয়েছি, ও তত ফিক ফিক করে হাসে। তারপর বলে কি, ইট্স্ অল্ রাইট কানাইদা, চিয়ারিও।' এই ছিলেন কানাইদা।

অথচ এই রকম কানাইদাকেও আমরা ভয় করেছি। আমরা যারা তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলাম, তারাই যে, কানাইদাকে ভয় করতাম তাই নয়। প্রমথনাথ বিশী ছিলেন কানাইদার চেয়ে বয়সে বড়। উনি কানাইদার বড়দাদা ভজুদার সহপাঠী ছিলেন শান্তিনিকেতনে। কানাইদা বিশীদাকে যত শ্রদ্ধা করতেন, আবার তাঁর সঙ্গে ঝগড়াও করতেন তত। বিশীদাই একদিন কানাইদা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট, রুষ্ট তুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে।' কঙ্করদা ছিলেন কানাইদার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। আমি যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় আশ্রমিক সংঘের বার্ষিক নির্বাচনটা ছিল বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের লিগ শিল্ড জেতার চাইতেও উত্তেজনাপূর্ণ ব্যাপার। কঙ্করদার উৎসাহই এ ব্যাপারে বেশি, না কানাইদার, তা যেমন বোঝা যেত না, তেমনই আমাদের মতো অনাশ্রমিকদের পক্ষে এটাও সব সময় বোঝা যেত না যে, কে কার দলে? কানাইদার ঘরে কঙ্করদার অথবা কঙ্করদার টেবিলে (কঙ্করদা তখন হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের সাব্ এডিটার ছিলেন এবং কানাইদা ছিলেন একজন বস্, কানাইদা যে কোন পোস্টে কাজ করতেন, তাও তাঁর হাঁক ডাক দেখে বোঝা যেত না, তবে যে পোস্টেই তিনি কাজ করুন না কেন, সবাই এটা মেনে নিয়েছিলেন যে, কানাইদা আমাদের বস্) কানাইদার ঘন ঘন যাতায়াত শুরু হলেই বুঝে যেতাম যে সিজিন শুরু হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ কিনা আশ্রমিক সংঘের নির্বাচন সমাগত। সেবার একটা দুর্লভ ব্যাপার ঘটতে দেখা গেল অর্থাৎ আশ্রমিক সংঘের নির্বাচনে কানাইদা এবং কঙ্করদা একই পক্ষে লড়তে নেমেছেন। এবং দুজনে নিরন্তর গুজ গুজ ফুস ফুস চলেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে লোক আসছে অর্থাৎ সিনিয়র জুনিয়র আশ্রমিকে কানাইদার ঘর ভরে যাচ্ছে। তারপর একদিন সব উত্তেজনার পরিসমাপ্তি হল। অর্থাৎ আশ্রমিক সংঘের নির্বাচন চুকে গেল। কানাইদার ঘরে উল্লাস। কানাইদা-কঙ্করদা জুটিরই জয় হয়েছে। কঙ্করদা অনেকক্ষণ পরে কানাইদার ঘরে এসে হাজির হলেন। এবং কঙ্করদাকে দেখেই কানাইদার মুখ থমথমে হয়ে এল। এবং কঙ্করদাকে একটা কথাও বলতে সুযোগ না দিয়ে কানাইদা বলে উঠলেন, 'কঙ্কর একটা কথা বলে রাখি, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এই হয়ে গেল।' বলেই হাতের যে মুদ্রা কানাইদা দেখালেন, তাতে বোঝায় যে, সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গেল। কঙ্করদা কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কানাইদার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এও হলেন কানাইদা।

কানাইদার বয়োজ্যেষ্ঠরা যেমন, তাঁর সমবয়সীরা যেমন, তাঁর অনুজপ্রতিমরাও তেমন এই একই আচরণ কানাইদার কাছ থেকে পেত। কিন্তু তাতে কী? এ তো সাময়িক ব্যাপার। কানাইদার যেমন কাউকে না হলে চলত না, আবার অন্যদেরও কানাইদাকে ছাড়া চলত না। কানাইদার যখন যার উপর রাগ হত, তখন তিনি তাঁকে একটা করে নাম দিতেন। আমার উপর রাগ চড়ে গেলে, আমার নাম হত 'গান্ধীবাবা'। শেষের কয়েক বছরে আমার আর কানাইদার মধ্যে 'এই গান্ধী' পিরিয়ড বেশ কয়েকবার চলেছে। হঠাৎ কানাইদা এই রকম সময়ে একদিন, গত বছর, আমার ঘরে দুম করে ঢুকে পড়ে চেয়ারে বসে পড়লেন। আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে থাকলেন। এটা কানাইদার পক্ষে একেবারেই নতুন। একটা সিগারেট ধরালেন। বললাম, 'কানাইদা চা খাবেন?' আমার তখন শরীরটা বেশ খারাপ চলেছে। সন্তোষকুমার ঘোষ কিছুদিন আগেই গত হয়েছেন। কানাইদা বললেন, 'আনাও চা।' বলেই তিনি উঠে গিয়ে নিজেই চায়ের অর্ডার দিয়ে এলেন। তারপর বললেন, 'সন্তোষবাবুও গোঁয়ারতুমি করে চলে গেলেন। কিছুতেই সময় মতো চিকিৎসা করালেন না। এবার তুমিও যাবে ঠিক করেছ।' আমি বললাম, 'সে কী কানাইদা, আমি কোথায় যাব!'

কানাইদা বললেন, 'কোম্পানি তোমাকে পিজি থেকে বেলভিউতে আনতে চেয়েছিল, তুমি তা রিফিউজ করেছ। আবার এখন শুনছি, তোমার বাই পাস্ সার্জারির জন্য তোমাকে এরা বাইরে পাঠাতে চেয়েছিল, তুমি তাও রিফিউজ করেছ। তুমি ভেবেছ কী?' আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'কে আপনাকে এসব কথা বলেছে? আমি তো বাই পাস্ করতে যাচ্ছি মাদ্রাজে। এঁরাই তো পাঠাচ্ছেন।' কানাইদা বললেন, 'হ্যাঁ। মাদ্রাজের কথাই আমি শুনেছি। সেখানে তো তুমিই যেতে চেয়েছ। ওখানে বাই পাস্ করিয়ে ফিরে আসা যায়, এ কথা তোমাকে কে বলেছে?' আমি বললাম, 'যে তিন জন লোক ওখান থেকে বাই পাস্ করিয়ে এসেছে, তারাই বলেছে।' কানাইদা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আচ্ছা, তারা ফিরে এসেছে!' কানাইদাকে বেশ নির্জীব দেখাচ্ছিল। ওঁরও শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। কিছুদিন আগেই নার্সিং হোম থেকে ফিরে এসেছেন। মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে কানাইদার সঙ্গে দেখা হল। প্রণাম করে বললাম, 'কানাইদা আমি ফিরে এসেছি।' খুশি হলেন। বললেন, 'কিছু খাবে?' বললাম, 'চা খাব।'

এবারে তো তিনি নিজেই নার্সিং হোমে গেলেন, আর ফিরলেনও না। কানাইদার পরিমণ্ডলে আমরা যারা ছিলাম, তারা ছাড়া আর কেউ বুঝতেও পারবে না, এই রকম একটা সর্বময় অস্তিত্ব দুম করে চলে গেলে যে বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তার যন্ত্রণা কতখানি।

আই সি আই-এর সেই অফিসারের কথাটাই এখানে, কেন জানি না, প্রতিধ্বনি করতে ইচ্ছে যায়, 'ইট্স্ অলরাইট্ কানাইদা। চিয়ারিও।'

ফাঁকা ঘর

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

দিনের মধ্যে এক-আধবার তো যেতেই হয়।
কিন্তু চারতলার করিডর দিয়ে
যখনই হেঁটে যাই,
বুকের মধ্যে তখনই হঠাৎ মড়মড় করে ওঠে
শুকনো শালপাতার শব্দ।
মনে হয়,
বিয়াল্লিশটা বছর উজানে পাড়ি দিয়ে
শান্তিনিকেতনের
পুরনো গেস্ট-হাউসের খড়ের বিছানা থেকে
এইমাত্র আমরা উঠে এলুম, আর
শালবীথির ভিতর দিয়ে
শুকনো শালপাতার গুঁড়িয়ে যাবার শব্দ শুনতে শুনতে
এখন আমরা
'প্রাক্তনী'র দিকে হেঁটে যাচ্ছি।

চেয়ারম্যান-ডিরেক্টরকে নিয়ে কি কোনো
নির্দোষ ঠাট্টাও চলে কানাইদা?
তা নিশ্চয় চলে না।
আর তাই
এতদিন আপনাকে বলা হয়নি যে,
শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রদের জমাট আড্ডা যখন
বসে যেত, তখন
চারতলার করিডরের পাশের ওই
ঘরটাকেও আমরা
ঠাট্টা করে বলতুম 'প্রাক্তনী'।
আমরা মানে আমি আর সন্তোষ।
সেই সন্তোষ,
নিজের ঘর খালি করে দিয়ে যে কিনা আপনার
আগেই চলে গেছে, কানাইদা। এবারে
আপনিও চলে গেলেন।

চারতলার করিডরের পাশে
আপনার ঘরটা এখন ফাঁকা। কিন্তু সেই
একইসঙ্গে আরও
অনেক অনেক ঘর আর অনেক অনেক জীবনও কিছুটা
ফাঁকা হয়ে গেল, কানাইদা,
কয়েকটা দিন যার ভিতরে এখন
হাওয়ায় ওড়ানো
শুকনো শালপাতার পাঁজর-ভাঙার
শব্দ ছাড়া আর
কিছুই শোনা যাবে না।
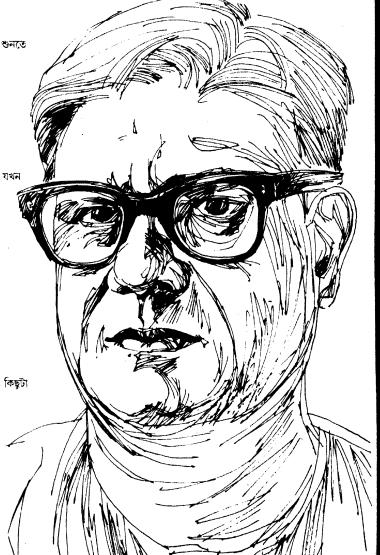
স্কেচ : অনুপ রায়

মাসে মাত্র কয়েক মিনিট ব্যয় করুন... স্তন-কানসার থেকে রক্ষা পান। স্তন-ক্যানসার যে এক সাংঘাতিক গুপ্ত রোগ তা সব মহিলাই জানেন। এবার ঐ দুঃশ্চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্তি দিন। স্তন-ক্যানসার পুরোপুরি সারানো যায়। যে মহিলার ঐ রোগ একেবারে শুরুতেই ধরা পড়ে তিনি বাকী জীবনটা সুস্থ দেহে ও শান্তিতে কাটাতে পারেন।

সেরা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হ'ল— প্রতিমাসে নিজেকে নিজেই একবার . পরীক্ষা করে নিন মাত্র কয়েক মিনিট, যা আপনার জীবন বাঁচাবে!

দেখুন কি ভাবেঃ শুয়ে পড়ুন—প্রতিটি স্তন নিজের আঙুল দিয়ে আলতো করে টিপুন—স্তনের তলা থেকে বোঁটা পর্যান্ত, ছোট ছোট পাক দিয়ে। এবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়েও ঠিক ঐভাবে করুন। দেখুন—বুকে কোনো মাংসপিণ্ড বা শক্তগাঁট বা বুকের কোষ পুরু ইত্যাদি হয়েছে কিনা। দুটি বোঁটাতেই আলতো করে চিমটি কাটুন। কোনো রস দেখা গেলেই সত্বর আপনার ডাক্তারকে জানান।

কোনো ঝুঁকি নেবেন না। বছরে একবার সম্পূর্ণ ক্যানসার চেক- আপ করিয়ে নিন ইণ্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটির যেকোনো পরীক্ষা কেন্দ্রে (ডিটেকশন সেণ্টার) চলে আসুন অথবা আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

এখন ক্যানসার-বীমা!

ইণ্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটি প্রবর্তন করলো **ভারতের একমাত্র** বীমা পলিসি, যা ক্যানসার রোগ ধরা বা তার চিকিৎসা বাবদ যাবতীয় খরচ যোগাবে। সামান্য কিছু টাকা দিন আর আপনি ও আপনার স্ত্রী/স্বামী দুজনেই ৪০,০০০ টাকার আওতায় থাকুন। আরো জিগ্যাসা থাকলে ফোন করুন।

দেখা করার জন্যে ফোন করুন:
বম্বে ২০২৯৯৪১-৪২/৪১২৫২৩৮ দিল্লী-৬১৭৬২৮
কলকাতা-২৬৭৭৬৪/২৬৭৯০৬ মাদ্রাজ-৩৯৪৪৪/২৯৮০০

ইণ্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটি।
তাড়াতাড়ি ধরা মানে তাড়াতাড়ি সারা!

daCunha/ICS/2/86 BN

কানাইদা

সমরেশ বসু

কানাইদা—কানাইলাল সরকার গত হলেন। বিদেশে যাবার সময়েই কানে এসেছিল, কানাইদা অসুস্থ। নার্সিংহোমে আছেন। গত কয়েক বছর ধরেই তিনি আর আগের মতো সুস্থ ছিলেন না। ছিল না তাঁর চোখে মুখে আগের সেই ব্যক্তিত্বময় প্রখর দীপ্তি। চলাফেরায় সেই বলিষ্ঠ দ্রুত দৃঢ় পদক্ষেপ। যা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল সকলের চোখে।

সময় ও ব্যাধির কাছে মানুষ অসহায়। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে, এই অনিবার্য সত্য মেনে নিতে আমাদের কষ্ট হয়। কানাইদার ক্ষেত্রেও হয়েছিল। কানাইদা তাঁর নিজের শক্তিতেই এরকম একটি ইমেজ আমাদের মনে সৃষ্টি করেছিলেন। অতএব, শেষের দিকে গত কয়েক বছর ধরে সেই বিবর্ণ অনুজ্জ্বল শীর্ণ বিষণ্ণ ধীরগতি, মৃদু স্বর, মানুষটিকে অচেনা মনে হতো।

মনে হতো, ইনি আনন্দবাজার পত্রিকার সেই বর্মণ স্ট্রিটের দুর্দান্ত প্রতাপশালী কানাইলাল সরকার নন। আনন্দবাজার পত্রিকার বর্তমান প্রজন্মের অনেক বিশিষ্ট ও খ্যাতনামা কর্মী ও সাংবাদিকদের চোখে এই ব্যক্তিটি হয় তো অপরিচিতই থেকে গেলেন। ঠিক এই ভাষায় বলা চলে, "যাঁর পদভারে একদা কম্পিত হতো আনন্দবাজার পত্রিকা অফিস" ইনি সেই কানাইলাল সরকার। তাঁর সেই পরিচয়ে যাবার আগে, একটা বিষয় উল্লেখ না করে পারছিনে। আমি বিদেশ থেকে কলকাতায় ফিরে এলুম ২৬ অক্টোবর, রবিবার। সেদিনের খবরের কাগজে কানাইদার মৃত্যুসংবাদ আমার চোখে পড়েনি। আদৌ কোনো সংবাদ ছিল না কি না, আমার জানা নেই। থাকলে নজর এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব বলে মনে হয়। পরের দিন সোমবার, আনন্দবাজার পত্রিকার 'টুকরো খবর'-এ এক লাইনের সংবাদটি আচমকা আঘাতের মতো বাজল। বাড়ির সবাইকে জিজ্ঞেস করে জানলুম, সংবাদটি রবিবারের আগেই বেরিয়েছে। এখন তাই মনে হচ্ছে, তা হলে কি ব্যাপারটি কাকতালীয়? ২৩ অক্টোবর প্যারী শহরের এক গৃহে, সন্ধ্যার আড্ডায়, আমি কানাইদার অতীতের একটি ঘটনা বলেছিলুম। প্রসঙ্গটি উঠেছিল, অন্য একজনকে কেন্দ্র করে। সেই অন্য একজনকে কেন্দ্র করে, বেদনাহত কানাইদার অত্যন্ত দুঃখের একটি প্রতিক্রিয়ার ঘটনা বলেছিলুম। কাকতালীয় কথাটা এ কারণেই মনে হলো। বিদেশের নানা শহরে, বাঙালী সমাজের আড্ডায়, কলকাতার কতো আলোচনাই তো হতো। কলকাতা শহর, রাজনীতি, সাহিত্য, পত্রপত্রিকা এবং ব্যক্তি সমূহের বিষয়ে অনেক গল্পই হতো। কিন্তু ২৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় কানাইদার প্রসঙ্গটাই ঠিক উঠেছিল কেন?

এসব "কেন"-এর কোনো জবাবই হয় না। এ জিজ্ঞাসাটা আমার মনের আবর্তে পাক খাচ্ছে নিতান্তই উত্থাপিত প্রসঙ্গের আকস্মিকতায়।

ফিরে যাই বর্মন স্ট্রিটে। ইতপূর্বেও কোনো কোনো প্রসঙ্গে বর্মন স্ট্রিটে ফিরে যেতে হয়েছে। সেই প্রসঙ্গের সঙ্গে কানাইদার নাম অনিবার্যভাবেই যুক্ত হয়ে থাকতো। এবার কেবলই কানাইদা। সময়টা যতো দূর মনে পড়ে পঞ্চাশ দশকের গোড়ায়—সম্ভবত উনিশ শো তেপ্পান্ন সালের শীতের সময়। মাঘ মাস আসন্ন। আমার ভেতরে তখন একটা আর্ত ব্যাকুলতা, প্রয়াগের পূর্ণ কুম্ভ মেলায় যাবো। এসব কথা যে আগে কখনো বলিনি, এমন নয়। কিন্তু কানাইদার কথা বলতে গেলে, আমাকে বারে বারে একটি বিষয় পুনরুক্তি করতেই হবে। এবং সেই পুনরুক্তি অপরের পক্ষে যতই ক্লান্তিকর বোধ হোক, আমি নিরুপায়। কারণ, শুরু দিয়ে শুরু করা ছাড়া উপায় নেই।

চোখের সামনে ভাসছে, বর্মন স্ট্রিটের সেই ক্ষয়ে যাওয়া, প্রায়ান্ধকার সিঁড়ি। দোতলায় উঠে বাঁ দিকে ফিরলে, সুরেশ মজুমদারের ঘর। একদিনই বোধহয় তাঁকে চোখে দেখেছিলুম। ধুতির ওপরে গলাবন্ধ সুতির কোট। কানাইলাল সরকার যে আনন্দবাজার পত্রিকার বর্মন স্ট্রিটের অফিসের কোন্ ঘরে বসেন, কোনোদিন দেখিনি। কারণ তার একটাই। নিজের ঘরে বসার সময় কোথায় ছিল তাঁর? বোধহয় সুরেশবাবুর ঘর বাদ দিলে, সব ঘরই তাঁর অফিস। মজুমদার মহাশয়ের একমাত্র স্নেহভাজন বিশ্বস্ত লেফটেনেন্ট। সমস্ত বিভাগেই তাঁর নির্দেশ চলতো কম বেশি। অবিশ্যি তাঁকে দেখার আগে, তাঁর নাম আমি কোনোদিন শুনিনি। আনন্দবাজারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের সূত্র "দেশ" সাপ্তাহিক। সেই সূত্র সম্পর্কের প্রথম ব্যক্তি সরোজ আচার্য হলেও, নেপথ্যে ছিলেন সাগরময় ঘোষ। বঙ্কিম সেন তখন "দেশ" সাপ্তাহিকের সম্পাদক। সাগরময় ঘোষ সহকারী সম্পাদক। কিন্তু বঙ্কিম সেনকে জীবনে কোনোদিন "দেশ" অফিসে বা আনন্দবাজারেও চোখে দেখিনি। আজ যেমন "দেশ" পত্রিকার সঙ্গে সাগরময় ঘোষের নাম আলাদা করা যায় না, সেই পঞ্চাশ দশকের গোড়ায় বর্মন স্ট্রিটের দোতলায় কয়েকটি অংশ পেরিয়ে, বাঁ দিকের একটি ঘরে, আমার চোখে একই অভিজ্ঞতা চোখে পড়েছিল। "দেশ" পত্রিকার অফিস, আর সামনে সাগরময় ঘোষ। কয়েক প্যাকেট গোল্ডফ্লেক সিগারেট, দেশলাই, আর চীনে মাটির প্লেটে, কলাপাতায় মোড়া কয়েক খিলি পান টেবিলের ওপর। একটু দূরের চেয়ারে, যত দূর মনে পড়ে, জ্যোতিষ দাশগুপ্ত বসতেন।

সরোজ আচার্য আনন্দবাজারের সহযোগী সম্পাদক হলেও, মার্কসবাদী তত্ত্বে ও আদর্শে বিশ্বাসী। বস্তু ও অবস্থার গুণগত পরিবর্তনের সহজপাঠ তাঁর লেখাতেই প্রথম পেয়েছিলুম। পরিচয় ছিল। তিনিই প্রথম "দেশ" পত্রিকায় গল্প দেবার কথা বলেন। আসলে তাঁকে বলেছিলেন সাগরময় ঘোষ। গল্প দিয়েছিলুম, 'গুণীন'। সেই প্রথম সূত্রপাত। কিন্তু অতি ক্ষীণ। তেপ্পান্ন সালের আসন্ন মাঘ মাসে, আমার অস্থিরতা বাড়ছিল। সেই সঙ্গে হতাশা। প্রয়াগের পূর্ণ কুম্ভের মেলায় তখন সারা ভারতের ডাক পড়েছে। আমার কানেও সেই ডাক এসে পৌঁছেছে। কিন্তু সাড়া দেবো কেমন করে। এলাহাবাদ তো আমার কাছে এক সুদূর দেশ। সেই দূরদেশে যাবার কড়ি কোথায়? পেটেই যেখানে ইঁদুর ডন মারছে।

হতাশাটা বেড়ে উঠেছিল বাগবাজারের হাত ঝাপটা তাড়া খেয়ে। মনোজ বসু তখন জনপ্রিয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক। তাঁর চিঠি নিয়েই বাগবাজারে গিয়েছিলুম। তাড়া খেয়ে ফিরে এসে চোখে আমার অন্ধকার! মনোজ বসুও (মনোজদা বলেই বরাবর ডাকি) বিষণ্ণ। কিন্তু তিনিই আলোর সংকেতও দিলেন, "তোমার সঙ্গে তো সাগরের (সাগরময় ঘোষ) পরিচয় হয়েছে। ওকে একবার বলে দেখ না।"

সাগরময় ঘোষ? ও বাবা! যা একখানি ভাবলেশহীন গোল মুখ। 'এই যে আসুন' ছাড়া যিনি আর কিছু বলতেন না। হাসি নেই, কথা নেই। গম্ভীর চুপচাপ। একজন বয়োঃজ্যেষ্ঠ মানুষ যদি ঐরকম চুপচাপ বসে থাকেন, কতোক্ষণই বা তাঁর সামনে বসে থাকা যায়? কী কথাই বা বলা যায়? তবু মনোজদা যখন বললেন, অনেক আশায় বুক বেঁধে বর্মন স্ট্রিটের দিকে পা বাড়ালুম। যা থাকে কপালে। কোনো অন্যায় প্রস্তাব বা আবদার নিয়ে তো আর যাচ্ছি নে। একটি আর্ত প্রস্তাব: দয়া করে কিছু টাকা দিন। প্রয়াগের কুম্ভমেলায় যাবো। অগ্রিম টাকার বিনিময়ে আপনাদের কাগজে লিখবো।

বর্মন স্ট্রিটের সেই দোতলায়, দুটো এলাকা ডিঙিয়ে, "দেশ" অফিসে গেলুম। সাগরবাবুর (তখনো সাগরদা হননি) সামনের চেয়ারে একজন অচেনা ভদ্রলোক বসেছিলেন। খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ধুতি পরা। প্রায় বৃষস্কন্ধ বলতে যা বোঝায়, সেইরকম দোহারা চেহারা। গায়ের রঙটি ময়লাই

বলতে হবে। উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ। দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট। গম্ভীর মুখ। এ গাম্ভীর্য ঠিক সাগরময় ঘোষের গাম্ভীর্য নয়। সাগরময় ঘোষের গাম্ভীর্যে একটা আত্মমগ্নতা আছে। এঁর গাম্ভীর্যে আছে রাশভারি অভিব্যক্তি। সাগরবাবু আমাকে বললেন, "বসুন।"

বসলুম। তারপরে আর কোনো কথা নেই। অথচ কথা তাঁরই থাকা উচিত ছিল। কেননা, আর একটি গল্প তিনি চেয়ে রেখেছিলেন। বোধহয় আশা করেছিলেন আমি সেই গল্পই নিয়ে গিয়েছি। আমি আর দেরি না করে, খুব বিনীতভাবে আমার প্রস্তাব পেশ করলুম। প্রস্তাব যখন পেশ করছিলুম, আমার পাশের ভদ্রলোক তখন আমার দিকে ফিরে দেখছিলেন। আমার কথা শুনছিলেন, আর সাগরবাবুর দিকে তাকাচ্ছিলেন। সাগরবাবু আমার প্রস্তাব শুনে যেন কিঞ্চিৎ দ্বিধান্বিত। কী জবাব দেবেন ভাবছিলেন। আমার পাশের ভদ্রলোক গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "সাগর, ইনি··· ?"

"এঁর নাম সমরেশ বসু। সাগরবাবু বললেন, "কয়েক সপ্তাহ আগে "দেশ"-এ এঁর একটি গল্প ছাপা হয়েছে।"

ভদ্রলোকের তীক্ষ্ণ চোখ জোড়া তখন উজ্জ্বল হয় উঠেছে, "ওহ্ হ্যাঁ পড়েছি। ভাল গল্প। তা এঁর প্রস্তাবটা তো···"

সাগরদা বোধহয় ঈষৎ ঘাড় ঝাঁকালেন। এবং ভদ্রলোক এবার পুরোপুরি আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "কতো টাকা এখন পেলে কাজ হবে ?"

নিজের কানকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলুম না। সাগরবাবুর মুখের দিকে একবার তাকালুম। সেই মুখে প্রসন্নতা আছে, কিন্তু কোনো বাক্য নেই। আমি পাশের ভদ্রলোককে সংকুচিত হেসে বললুম, "কতো টাকা—মানে, এই এলাহাবাদ যাতায়াত, আর মেলায় খাওয়া থাকা পূর্ণকুম্ভের স্নানের দিন পর্যন্ত···"

"দুশো ?" ভদ্রলোক নিজেই অঙ্কটা বললেন, "থার্ড ক্লাসে যাওয়া আসা, আর ওখানে থাকা, দুশো টাকায় হবে না ?"

মনে মনে বললুম, "যথেষ্ট।" পঞ্চাশ দশকের গোড়ায় দুশো টাকার দাম অনেক। মুখে বললুম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, দুশো টাকা হলেই এখন চলে যাবে।"

"তাহলে চলে যান।"নির্দ্বিধায় ভদ্রলোক তাঁর গম্ভীর স্বরে জানিয়ে দিলেন, "ওখানে গিয়ে আপনি একটা কাজ করবেন। মেলায় ঘুরে যা দেখবেন সব ঘটনা ইনল্যান্ড লেটারে লিখে রোজ একটা করে অফিসের ঠিকানায়—মানে সাগরের ঠিকানায় পাঠাবেন। সংবাদ হিসেবে চিঠিগুলো আনন্দবাজারে ছাপা হবে। প্রত্যেকটা চিঠির জন্য, আমরা আপনাকে টাকা দেবো। সেই টাকা থেকেই আগাম দুশো টাকা কাটা যাবে। পারবেন ?"

পারবো না মানে ? আমি তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালুম, "পারবো।"

"আপনার ক্যামেরা আছে ? ফটো তুলতে পারেন ?" ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করলেন।

সেই তো বিপদ ! ক্যামেরা তো নেই-ই।
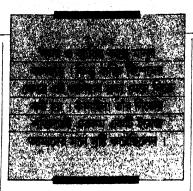
ফটো তুলতে জানি বলাটা ধৃষ্টতা হবে। কারণ বক্স ক্যামেরার সাটার টিপেছি কয়েকবার।

"ভালো ক্যামেরার কথা বলছি নে।" ভদ্রলোক নিজেই মুশকিল আসান করলেন, "বক্স ক্যামেরায় তুললেও হবে। যা পারেন, তুলে নিয়ে আসবেন। তারপর দেখা যাবে।"

নিজের না থাকলেও, বক্স ক্যামেরা একটা যোগাড় হয়ে যাবে জানতুম। আমি আবার ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালুম। আর বিধাতা অলক্ষে হাসলেন। ক্যামেরা নিয়ে প্রয়াগের মেলায় ফটো তুলতে গিয়ে, পুলিশের হাতে পড়ে যা নাজেহাল হয়েছিলুম। আমি কি আর জানতুম, স্নানের ঘাটে বা মেলার যত্রতত্র ফটো তোলা নিষেধ ? সে-প্রসঙ্গ এখন থাক।

"কী বলো সাগর, কী রকম হবে তোমার মনে হয় ?" ভদ্রলোক সাগরবাবুর মতামত চাইলেন।

সাগরবাবু মাথা ঝাঁকালেন "ভালই হবে মনে হয়।"

জয় সাগরময় ঘোষ ! কিন্তু ইনি কে ? সাগরময় ঘোষকে 'সাগর' সম্বোধন করেন, তাঁকে ডিঙিয়ে কথা বলেন ? এবং তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে চলে যাবার আগে আবার আমার দিকে ফিরে বললেন, "এর পরে আপনি যেদিন আসবেন, সাগরের কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে যাবেন।" ফিরে যেতে গিয়ে থামলেন। "আপনি কবি অরুণ মিত্রকে চেনেন তো ?"

ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলাম, "ভালোই চিনি।"

"তিনি এলাহাবাদে আছেন। আমাদের কাগজে 'উত্তর প্রদেশের চিঠি' লেখেন। এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির ফরাসী ভাষার অধ্যাপক। ঠিকানা নিয়ে যাবেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। আপনার কাজের সুবিধে হবে।" বলে বেরিয়ে গেলেন।

এখানে একটা কথা অতীতের পাঠকদের জানিয়ে রাখতে চাই, এই টাকার বিষয়টি ইতিপূর্বে আমি ভুল লিখেছিলুম। আপাতত আর সে-প্রসঙ্গে যাচ্ছিনে। সাগরবাবুকে সসঙ্কোচে জিজ্ঞেস করলুম, "ইনি ?"

"ইনি কানাইলাল সরকার।" সাগরবাবুর সংক্ষিপ্ত জবাব, "আপনি তা হলে কবে যাবেন ?"

"যত শিগগির সম্ভব। মাঘ মাস তো পড়ে গেছে।"

"তাহলে কালই এসে আপনি টাকাটা নিয়ে যাবেন।"

"আজ্ঞে আচ্ছা।"

কিন্তু কে কানাইলাল সরকার ? কিছুই তো জানা হল না। সাগরবাবুকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলুম না। শেয়ালদা ফিরে যাবার পথে, মনোজদার সঙ্গে দেখা করে সব বললুম। মনোজদা শুনে খুব খুশি। "কানাই সরকার রাজি হয়েছে ? তা হলে তো তোমার কপাল খুলে গেছে হে। সুরেশ মজুমদারের স্নেহের পাত্র। সরকারদের আত্মীয়। সে-ই তো এখন আনন্দবাজারের সব দায়িত্বে আছে।"

তা যে আছেন, তাঁর প্রথম কথাতেই তা বোঝা গিয়েছিল। এও বোঝা গিয়েছিল, সাগরবাবু কানাইলাল সরকারকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন। এ ঘটনাটি আমার জীবনের একটি পর্ব। এই ঘটনাটির মধ্য দিয়েই আনন্দবাজারের সঙ্গে আমার যে-সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, তা আজও অটুট আছে। যদিও এ সম্পর্ক একদিক থেকে বহু সমালোচিত, বহু ভর্ৎসিত, বহু নিন্দিত। এখনো কম কটূবাক্য শুনতে হয় না। কিন্তু আমি জানি, হয় তো সমালোচক নিন্দুকেরাও জানেন, তার মধ্যে কোনো সার সত্যি নেই।

সেই কুম্ভ মেলায় যাওয়া থেকে, "অমৃতকুম্ভের সন্ধানে" পর্যন্ত পৌঁছুতে, সাগরময় ঘোষ কবে সাগরদা হয়ে উঠেছিলেন, এবং কানাইলাল সরকার কানাইদা, তা আর স্মরণ করতে পারিনে। তবে সাগরদা যেমন অনায়াসেই 'তুমি' সম্বোধন করেছিলেন, কানাইদা কোনোদিনই তা করতে পারেননি। কানাইদা হলেন সেই জাতের ব্যক্তি, যাঁরা কোনোকালেই পরিবারের বাইরে বয়োঃকনিষ্ঠ স্নেহভাজনদেরও 'তুমি' সম্বোধন করতে পারতেন না, বা পারেন না। যেমন এখনো দেখি, সুকুমার সেন মহাশয়কে।

প্রথম দিকে যখন 'দেশ' পত্রিকায় মোটামুটি নিয়মিত লেখক হয়ে উঠছি, তখন কানাইদা একটি কথা আমাকে ভাল করে বুঝিয়ে বলে দিয়েছিলেন, "দেখুন, আপনি কমিউনিস্ট হতে পারেন, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আপনার সরোজদা (আচার্য) আমাদের কাগজের সহযোগী সম্পাদক। আমাদের কাগজ জাতীয়তাবাদী কাগজ। আপনি যা খুশি আমাদের কাগজে লিখতে পারেন, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র হয়ে উঠুক, এমন কিছু লিখবেন না।"

জানিনে, কোনো লেখা পড়ে, কানাইদার সেরকম আশঙ্কা হয়েছিল কিনা। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা ছিল, স্লোগান সর্বস্ব স্থূল লেখার কী পরিণাম। তখন বিশ্বাস করতুম, একজন কমিউনিস্টের পক্ষেই সর্বাপেক্ষা বড় মানবতাবাদী হওয়া সম্ভব। সে-বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে অনেক কাল আগেই। কী কমিউনিস্ট আর কী জাতীয়তাবাদী, এদেশে রাজনীতি যাঁরা করেন, তাঁদের অধিকাংশের কাছে মানবতাবাদের চেয়ে পার্টি অনেক বড়। কানাইদাকে জবাব দিয়েছিলুম, "আপনার কথা মনে থাকবে।"

আমি 'পরিচয়' পত্রিকায় যে-জাতের গল্প লিখেছি, 'দেশ' বা 'আনন্দবাজার' পত্রিকায়ও তা লিখেছি। 'পরিচয়' কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের মুখপত্র। এখনো তাই আছে বলে, আমি বিশ্বাস করি।

বর্মন স্ট্রিট থেকে আনন্দবাজার পত্রিকা

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সুতার্কিন স্ট্রিটে, একেবারে খাঁটি রাজকীয় সওদাগরি পল্লীতে পাড়ি দিয়েছিল। এখন সুতার্কিন স্ট্রিটের নাম হয়েছে, আনন্দবাজারের প্রতিষ্ঠাতার নামে, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট। নতুন জায়গায় আসার পরেও, কানাইদা তাঁর নিজের স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সাগরদা তখনো কানাইদার সঙ্গে পরামর্শ করেই 'দেশ' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করছেন। সেই সময়ে একটি ঘটনা মনে পড়ছে। শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম গল্প লেখার বরাদ্দ পেয়েছি। গল্প দিয়েছিলুম, "শানা বাউরির কথকতা"। কিন্তু ভাগ্য মন্দ। সাগরদা দুঃখ করে জানালেন, স্থানাভাবে আমার গল্পটি শারদীয় সংখ্যায় দেওয়া যাচ্ছে না। সাধারণ সংখ্যায় অবিশ্যিই ছাপা হবে। তবে আমি যদি প্রয়োজন বুঝি, কোনো শারদীয় পত্রিকায় গল্পটি দিতে পারি। 'পরিচয়'-এর গল্প লেখা হয়ে গিয়েছিল। "তরুণের স্বপ্ন" পত্রিকার শারদীয় সংখ্যার জন্য অজিত গুপ্ত একটি গল্প চেয়েছিলেন। সময়াভাবে লিখে উঠতে পারিনি। সাগরদার কথা শুনে, তৎক্ষণাৎ গল্পটি নিয়ে অজিতবাবুকে দিয়েছিলুম। অজিতবাবু খুব খুশি। কিন্তু শারদীয় পত্রিকাগুলো প্রকাশিত হবার পর, কানাইদা খুব অখুশি হয়েছিলেন। সাগরদার সামনেই বিমর্ষ আফসোসে বলেছিলেন, "আপনার গল্পটা ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি। তারাশঙ্করবাবু থেকে, সবাই আপনার তরুণের স্বপ্নের গল্পটির প্রশংসা করছেন। পড়ে দেখেছি, সত্যি খুব ভালো গল্প। অন্য কোনো লেখককে বাদ দিয়ে, আপনার গল্পটাই 'দেশ'-এ রাখা উচিত ছিল। সাগরও এখন তাই বলছে।"

একজনকে বাদ দেবার কথা শুনলেই আগে নিজের নতিজার কথাটাই মনে আসে। তবে কানাইদার অনুশোচনা, আর সাগরদার স্মিত হাসি কি আমাকে একটুও মন্দ্রিত করেনি? নিশ্চয়ই করেছিল। তারপর থেকে, আজ পর্যন্ত ওরকম ঘটনা আর ঘটেনি। 'দেশ' ছিল প্রধানত ছোট গল্পের কাগজ। শারদীয় সংখ্যায় কেবল বাছাই ছোট গল্পই তখন ছাপা হতো। আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি উপন্যাস। স্মৃতিশক্তি যদি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করে, তাহলে, যতদূর মনে পড়ে, উনিশ শো তেষট্টি সালে 'দেশ' শারদীয় সংখ্যায় প্রথম উপন্যাস ছাপা হয়। সেই উপন্যাস লেখার আমন্ত্রণ পেয়েছিলুম আমি। জানতুম আমাকে নির্বাচন করা হয়েছিল কানাইদা আর সাগরদার যুগ্ম পরামর্শে।

কানাইদা তার আগে থেকেই একটি কাজ শুরু করেছিলেন। উপযুক্ত বিবেচনা করে, অনেককেই তিনি তখন সম্পাদকীয় পদে চাকরিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন রমাপদ চৌধুরি, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সামান্য পরেই গৌরকিশোর ঘোষ, বিমল কর। বাংলা সাহিত্য পাঠকদের কাছে এই সব লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি সাহিত্যিকদের স্থান কোথায়, তা বলার দরকার করে না। সাহিত্যিক কবিদের সাংবাদিকতার কাজে বহাল করে, তাঁদের সৃষ্টির পথকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখার প্রতিশ্রুতি ও উদারতার নজির আনন্দবাজারই প্রথম থেকে দেখিয়ে এসেছে। সুবোধ ঘোষকে হয় তো স্বয়ং সুরেশ মজুমদার মহাশয় ডেকে নিয়েছিলেন। এবিষয়ে আমি সঠিক কিছু জানিনে। কিন্তু পরবর্তীকালে, কানাইদাই যে এ বিষয়টির প্রতি জোর দেন, কোনো সন্দেহ নেই। বলা চলে, তিনিই এই ধারাটির প্রবর্তক। পরে সন্তোষদার (সন্তোষকুমার ঘোষ) মুখে শুনেছি, তাঁকেও কানাইদা কলকাতার একটি ইংরেজি দৈনিক থেকে ডেকে নিয়ে এসেছিলেন। সন্তোষদা প্রথমে দিল্লির 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এ গেলেও, পরে তাঁর আনন্দবাজারে আগমন, এবং আনন্দবাজারের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ ও পত্রিকার রূপান্তর ঘটানোর কথা এখন ইতিহাসের কাহিনী।

কানাইদা গভীর আগ্রহ নিয়ে, আমাকেও ডেকেছিলেন। আমি বিনীতভাবে বলেছিলুম, "কানাইদা, আপনার স্নেহের কথা কোনোদিন ভুলবো না। আমাকে এই একটা ব্যাপার থেকে বাদ রাখুন। আমাকে দিয়ে একটা পরীক্ষা হোক। শুধু লিখে জীবনযাপন সম্ভব কি না। কেবল আপনাদের প্রীতি থেকে যেন বঞ্চিত না হই।"

কানাইদা যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিলেন, "পারবেন? অনিশ্চিত উপার্জনের ওপর নির্ভর করে চলা কিন্তু খুবই কঠিন।"

কানাইদার কথার সত্যতা আজও অনুভব করি। তবু সেইদিন বলেছিলুম, "জানি। তবু চেষ্টা করে দেখতে চাই।"

তারপরেও কানাইদা আমাকে ভাবতে বলেছেন। ভাববারই কথা। আজও ভাবি।

কিন্তু কানাইদার চরিত্র কি এইরকম একটানা, এক বর্গা? আদৌ তা নয়। তাঁর স্নেহ ভালবাসা মুহূর্তেই ক্ষোভে ও রোষে ফেটে পড়তে পারে। পড়েছিল, আমার 'বিবর' উপন্যাস প্রকাশ হওয়া মাত্রই। কানাইদার সে কি তীব্র ভর্ৎসনা। তবে 'বিবর' তো কিছুই নয়। এক বছর বাদ দিয়ে, তার পরের বছর যখন 'প্রজাপতি' 'দেশ' শারদীয়ায় প্রকাশিত হল, কানাইদা আমাকে দেখে রাগে ফেটে পড়েছিলেন। আর সেই মাসেই 'দেশ' সাধারণ সংখ্যায় আমার ছোট গল্প 'পাপপুণ্য' প্রকশিত হয়েছিল। 'প্রজাপতি' আর 'পাপপুণ্য' দুয়ের উল্লেখ করে, কানাইদা চিৎকার করে উঠেছিলেন, "আপনি কি অশোকের হাতে হাতকড়া পরাতে চান?"

অশোক মানে অশোককুমার সরকার। ঐ সময়ের মধ্যে, অনেক আগেই তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে। কানাইদার সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক? আমি হঠাৎ কানাইদার চিৎকারে লজ্জায় আর ভয়ে চুপসে গিয়েছিলুম। সন্তোষদা (ঘোষ) তাঁর পাশের ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছিলেন। জোড় হাতে অনুরোধ করে কানাইদাকে তাঁর ঘরে নিয়ে বসিয়েছিলেন। আমাকেও ডেকেছিলেন। কানাইদা তখনো নামতে পারেননি। রাগে দুঃখে অনেক কথা বলেছিলেন। বিশেষ করে 'পাপপুণ্য' পিতা ও কন্যার জীবনের অঘটনের গল্প তাঁকে দারুণ আঘাত করেছিল। আমি কানাইদাকে টমাসমানের 'হোলি সিনার' উপন্যাসটির প্রায় আগাগোড়া শুনিয়েছিলুম। কানাইদা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে মন্তব্য করেছিলেন, "টমাসমান এরকম উপন্যাস লিখেছেন? আমি তো জানিনে।"

সন্তোষদা বলেছিলেন, "ভালো জাদু জানিস দেখছি।"

তখনকার মতো কানাইদা শান্ত হয়ে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্তরের অভিযোগ ও ক্ষোভ দূর হয়নি। 'প্রজাপতি' যখন প্রকাশিত হয়েছিল, তখন 'দেশ'-এ 'কোথায় পাবো তারে' ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল। কানাইদা আমার সঙ্গে দেখা হলেও কথা বলতেন না। মুখ ফিরিয়ে নিতেন। আমি অসহায় কষ্টে তাকিয়ে থাকতুম। কানাইদার সেই স্নেহের ডাক আর পাইনি। 'আসুন, চা খেতে খেতে একটু গল্প করি। আর এই নতুন ব্র্যান্ডের সিগারেটটা টেস্ট করে দেখুন তো।"

না, কানাইদা আর ডাকেননি। বিভূতি গুপ্ত ভায়া ছিলেন বোধহয় বিজ্ঞাপনে। কানাইদার অন্তরঙ্গ বয়স্য। আমাকেও স্নেহ করতেন। তিনি একদিন একান্তে ডেকে বললেন,

কানাইলাল সরকার ছবি : বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত
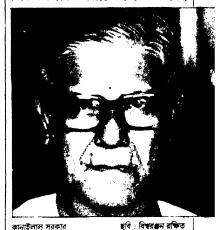
"কানাইবাবুকে তো আপনি খুবই অশান্তিতে ফেলেছেন।"

আমি অসহায়ভাবে বললুম, "কী করি বলুন তো?"

"না, না, করবার কিছু নেই।" বিভূতি গুপ্তভায়া বললেন, "কানাইবাবু অবাক হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। খালি বলেন, যে-লোক 'কোথায় পাবো তারে' লিখছে, সে-লোক 'প্রজাপতি' লেখে কেমন করে? আমি তো কিছুতেই মেলাতে পারিনে।"

কানাইদা, আমার প্রতি আপনার এই অভিমান আর জিজ্ঞাসা চিরদিনের জন্যই হয়তো রয়ে গেল। কিন্তু আপনি আমাকে মেলাতে পারেননি। শুধু আমাকেই নয়, আরও কারো কারোকে আপনি মেলাতে পারেননি। সে-কথা আমাকেই জানিয়েছিলেন। আমিও জীবনে অনেককে, এবং অনেক হিসাবই মেলাতে পারছিনে। বোধহয় এই মিল অমিলের দ্বন্দ্বটাই জীবন প্রবাহের স্বরূপ।

প্রণাম কানাইদা। আপনার আত্মা শান্তিলাভ করুক। ■

একটি অসম্পূর্ণ স্মৃতিকথা

রমাপদ চৌধুরী

এখন মনে হচ্ছে তিনি একটা কাজ অসম্পূর্ণ রেখে গেলেন। কাজ অসম্পূর্ণ রাখা যাঁর স্বভাবে এবং চরিত্রে ছিল না। অসম্পূর্ণ রেখে গেলেন, কারণ, কাজটা তিনি কোনদিন শুরুই করেননি।

আমরা কেউ কেউ তাঁকে মাঝে মাঝে অনুরোধ করেছি, একটা স্মৃতিকথা লিখুন।

শুনে একমুখ বালক-হাসি হেসে দিতেন।

আমরা বলতাম, আপনি বলে যাবেন, কেউ একজন লিখে নেবে।

জানতাম সুস্থির হয়ে বসে ধৈর্য ধরে পাতার পর পাতা কিছু লেখা ওঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

টেপ রেকর্ডারের যুগ এলো, এবং তা সহজলভ্য হল। আমরা বললাম, আপনি বলে যান, টেপ হয়ে যাক, পরে সব ঠিকঠাক করে নিলেই হবে।

প্রায় ক্ষেত্রেই আত্মভোলা হলে কি হবে, আত্মসচেতনও ছিলেন। হঠাৎ একদিন রেগে গিয়ে বললেন, আমি কে মশাই ? যে স্মৃতিকথা লিখতে হবে !

বলার কি প্রয়োজন আছে, কে এবং মশাই শব্দ দুটি পরপর অবলীলাক্রমে আসেনি, বাংলা প্রবাদের সেই বিখ্যাত পালমশায়ের নামটি মাঝখানে স্থান করে নিয়েছিল।

তাঁকে বোঝাতে পারিনি, স্মৃতিকথা লেখার অধিকার শুধু বিখ্যাত সাহিত্যিক রাজনীতিক বা প্রতিভাধরদেরই নয়। সামনে উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। রাসসুন্দরী বিখ্যাত কেউ ছিলেন, নাকি স্মৃতিকথা লেখার জন্যেই বিখ্যাত ? রাসসুন্দরী বাংলা ভাষার প্রথম স্মৃতিকথা লিখে গেছেন এই খবরটির জন্যে তাঁর ঈষৎ গর্ব ছিল, আত্মীয়তার সম্পর্কবশত। একবার বলে ফেলেছিলেন। বলেছিলাম. 'তা হলে তাঁর বইখানা দুষ্প্রাপ্য হয়ে আছে কেন ?'

'ঠিক বলেছেন।'

ব্যস্, নিজের স্মৃতিকথা মুলতুবি রইলো, ছুটলেন দুষ্প্রাপ্য রাসসুন্দরীকে খুঁজে বের করে বইটি নতুন করে প্রকাশ করার জন্যে। এবং তার জন্যে হাতের কাছে যে প্রকাশনা রয়েছে সেখানে না গিয়ে ব্যবস্থা করে এলেন ভিন্ন এক প্রকাশকের কাছে।

কিন্তু চারপাশে এত সব বিখ্যাত ব্যক্তি থাকতে কানাইদাকে কেন স্মৃতিকথা লিখতে বলতাম তা অনেকের কাছেই হয়তো রহস্য মনে হবে। বিশেষ করে যাঁরা তাঁর সেই বিশেষ গুণের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, তাঁদের কাছে তো নিশ্চয়ই।

এই গুণটি হল গল্প বলার গুণ। কানাইদার হাতে কলম সরতো না তা নয়, প্রয়োজনে তা কখনও গদা কখনও চক্র হয়ে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করেছে বা ছিন্নভিন্ন করেছে। কিন্তু ধীরস্থিরভাবে গল্প লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি শুধু গল্প বলতে জানতেন। আর সে-সব গল্প যাঁরা শুনেছেন তাঁদের স্মৃতিতে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। শ্রোতাকে তা এত অভিভূত করতো কারণ সেসব গল্প আদৌ গল্প ছিল না, ছিল তাঁর জীবনের নানান অভিজ্ঞতার কথা। গল্প করতে পারেন অনেকে, গল্প বলতে পারেন ক'জন ?

অভিজ্ঞতার ঝোলায় তাঁর পুঁজি নেহাত কম ছিল না। কিন্তু অভিজ্ঞতা তো অনেকেরই থাকে, তা বর্ণনা করার দক্ষতা থাকে কজনের ? আমার জীবনে আমি এমন একজন মানুষকেই দেখেছি। আর যে দু-একজনকে দেখেছি তাঁদের সঙ্গে একটা বড় জায়গায় পার্থক্য আছে। ওঁরা বর্ণনা করতে পারেন পরিচিত জগৎকে। কানাইদা কখনও কখনও ম্যাজিক কার্পেটে চড়িয়ে একেবারে ভিন্ন অদেখা জগতে উড়িয়ে নিয়ে যেতেন, আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। কোন্ জগৎ ?

লাল মখমলের জোব্বায় সলমা-চুমকির কাজ, মাথায় ইয়া বড় পাগড়ি, উটে চড়ে সারি সারি দুধওয়ালা আসছে, উটের দুধ বিক্রি করতে, আর নবাবের রক্ষিতার এক মেয়ে, এক্সকুইজিটলি বিউটিফুল...

কানাইদা যখন গল্প বলতেন, ওঁর সারা শরীর

> আসলে কানাইদা আপনজনের মত মিশতে পারতেন, দুঃসময়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যেতেন। নিজের চেয়ারে তাঁকে খুব কমই দেখা যেত, সব সময়েই অন্য কারো টেবিলের সামনে এবং কারো না কারো সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত। আর সে সমাধান দুদিন পরে হলে চলবে না। কানাইদার অভিধানে 'আগামীকাল' শব্দটি ছিল না।

কথা বলতো, চোখ মুখ, হাত, হাতের মুঠি, সর্বাঙ্গ। কি নাটকীয়ভাবে গল্প বলতে পারতেন। পারতেন বলেই একটা সম্পূর্ণ ছবি মনের ওপর গেঁথে যেত। আর সেই সব জায়গার ভাষাও উচ্চারণ করতেন এমনভাবে, ঠিক্ হোক্ বা বেঠিক হোক, আমাদের চোখের সামনে পরিবেশটা ফুটে উঠতো।

বলতেন, লিখুন না, আপনিই লিখুন না।

দু'একটা লেখার চেষ্টা করেছি, হয়নি। ওঁর বলার গুণেই যা চমৎকৃত করতো, অভিজ্ঞতার অভাবে তাকে বোধহয় যথাযথ আঁকতে পারিনি।

সেজন্যই বলতাম, কানাইদা, আপনি একটা স্মৃতিকথা লিখুন।

স্মৃতিকথা লেখার জন্যে বিশ্বকবি হতে হয় এই ধারণাটাই ভুল। একটা বিশাল ভাঁড়ারঘর ছিল কানাইদার, প্রচুর অভিজ্ঞতা, কিন্তু কাজটা অসম্পূর্ণই রেখে গেলেন। অর্থাৎ শুরুই করলেন না।

অথচ এমন বিচিত্র জীবন ক'জনের ভাগ্যে জুটেছে ?

পারিবারিক যে পরিবেশে জন্ম, যে পরিবেশে মানুষ হয়েছেন সেটাই তো অবাক করার মত।

ডাঃ সরসীলাল সরকারের পুত্র। সরলাবালা সরকার ছিলেন 'পিসিমা'। এবং কানাইদার মুখে এই পিসিমার গল্প আমরা এত শুনেছি ! কিন্তু সরলাবালা সরকারের লেখা পড়ে প্রথম জানতে হল বাচ্চা বয়েসের পেটরোগা কানাইদাকে যখন মধুপুর না শিমুলতলায় চেঞ্জে পাঠানো হল, তাঁর সেবা ও শুশ্রূষায় স্বেচ্ছায় নিয়োজিত হয়েছিলেন কে জানেন ? এম এন রায়। মানবেন্দ্রনাথ রায়।

এরকম অনেক বিখ্যাত লোকের পরিমণ্ডল থেকে চলে গেলেন আরেক উজ্জ্বল পরিমণ্ডলে—শান্তিনিকেতনে। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকেও তটস্থ করার জন্যে তাঁরও প্রয়োজন ছিল। সেসব গল্পও কম চমকপ্রদ নয়। অন্তত তিনি যখন বলতেন। অথচ আমরা তাঁকে কোনদিনই শান্তিনিকেতনের সঙ্গে মেলাতে পারতাম না।

সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন কাশী, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। সহপাঠী ছিলেন, সহ-আবাসিকও, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের অশ্বিনীকুমার গুপ্ত, ও আনন্দবাজারের নির্মল গোস্বামী। ওঁদের তিনজনের মিলিত আড্ডায় আমার একবার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এবং সারাক্ষণ তাঁদের পুরোনো দিনের মজাদার

ঘটনাগুলি কানাইদা একাই বর্ণনা করে গিয়েছিলেন। বাকি দুজন শুধু সহাস্য রোল তুলছিলেন।

সেখান থেকে চলে গেলেন ভূপাল, সুগার টেকনোলজিস্ট হিসেবে সেখানকার ফ্যাক্টরিতে। ভূপালকে নিয়ে তাঁর অঢেল গল্প। আরও কেউ কেউ লিখেছেন।

কানাইদা খদ্দর পরতেন, দিশি জিনিস ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু দিশি চিনি, যার আরেক নাম ছিল কাশীর চিনি, তার জন্ম ও উৎপাদন রহস্য কানাইদার কাছ থেকেই প্রথম জানতে পারি। তাঁর আরও নানা জায়গার নানা সুগার ফ্যাক্টরির অভিজ্ঞতা। বলতেন, দিশি শুনলেই মুগ্ধ হবার কিছু নেই।

চিনির কল থেকে ছাপার কল। একেবারে খবরের কাগজে। আনন্দবাজারে। এখানেও তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল অফুরন্ত। স্মৃতিকথায় ধরে রাখার মতই। কোন বিশিষ্ট জন তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলিতে কিছু উপহার না দিয়ে পার পেয়েছেন কি?

আমার মনে হয় কেউ কেউ আসেন স্মৃতিকথা লেখার জন্যে নয়। স্মৃতি হয়ে থাকার জন্যে। তাঁদের বলি লিজেন্ডারি ফীগর। কানাইদাকে নিয়ে ইতিমধ্যেই বহু লিজেন্ড তৈরি হয়ে গেছে, মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে। তার কিছু কিছু যদি অতিশয়োক্তি হয়ও, বুঝতে হবে তাঁর পরিচিতজনরা অতিশয়োক্তি করতেই চাইছেন। ভালবাসতেন বলেই তো?

অথচ কানাইদাকে ভয় পেতেন না এমন লোক দেখিনি।

আমি যখন ওঁকে প্রথম দেখি, হিসেব করে দেখছি তখন ওঁর বয়েস চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই। অথচ তখনই সকলে কি সন্ত্রস্ত। এই ভয় এবং ভালবাসার সহাবস্থান সত্যি এক রহস্য।

আমি তো আগে চিনতাম না, নামও শুনিনি।

ডাকে পাঠানো দুচারটে গল্প ছাপা হয়েছে। একটা তো সরাসরি আনন্দবাজার পুজোসংখ্যায়। সেই সুবাদে আলাপ সাগরবাবুর সঙ্গে। বোধহয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে। দেশ পত্রিকায় দুএকটা গল্প লিখে চটপট আড্ডার মেম্বর।

তার আগে তো আপিসের বর্ণনাটা দরকার।

হ্যারিসন রোড আর চিৎপুরের মোড় থেকে খানিকটা উত্তরমুখী গেলেই আমপট্টি। রোগা রাস্তা, তার ওপর ট্রাম, ফুটপাথ আছে কি নেই বোঝা যায় না, ভিড়ভাট্টা ছাড়িয়ে খানিকটা এগোলেই ঝুড়ি ঝুড়ি আম, রাস্তায় ভাঙা ঝুড়ি, আমপাতা এবং নানান উপসর্গ। এই সব ডিঙিয়ে বর্মন স্ট্রিটের বাড়ি। মান্ধাতা আমলের পুরনো ভাঙা বাড়ি, দোতলা, ইঁট বের করা দেয়াল। তবে বেশ অনেকখানি জায়গা জুড়ে। তারই দোতলায় একদিকে দেশ পত্রিকার বেশ বড়োসড়ো ঘর। পাশাপাশি দুটি বড় টেবিল, পুরনো আমলের। তারই একটির সামনে সাগরবাবু বসতেন, হাতের কাছে একটি টেলিফোন নিয়ে। আশেপাশে অন্য দু-চারজন।

সাধারণত বিকেলের দিকে আমরা গিয়ে হাজির হতাম। অনেক বিখ্যাত লেখক আসতেন, আড্ডা দিতেন। আমি ঐ আসরে কিভাবে টিকিট পেয়ে গিয়েছিলাম জানি না। সাকুল্যে তখন তো গোটা দশেক গল্প, দেশ-আনন্দবাজারে তার অর্ধেকও নয়।

কিন্তু খাতির পেতে শুরু করেছিলাম। এবং মুড়ি তেলেভাজা ভাঁড়ের চায়ের আড্ডায় হাত বাড়ানোর অধিকার।

কানাইদাকে তখনও চিনি না। তিনি কে তাও জানি না।

সুতরাং পাশের লাইব্রেরি-ঘর থেকে যাঁর উচ্চকণ্ঠ বাক্যালাপ শুনতে পেয়ে আশেপাশে কয়েকজন কপট সন্ত্রাস প্রকাশ করলেন তিনি কি ধরনের মানুষ তাও জানি না।

আর ঠিক তখনই তিনি এসে ঢুকলেন দেশ পত্রিকার ঘরে। প্রায় সকলেই সচকিত। দু-একজন ঘনিষ্ঠতার দৌলতে যেচে কথা বলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মানুষটি নির্বিকার, মুখে হাসি দেখা গেল না। বরং একজনকে ধমকের সুরে বললেন, তিনখানা বই বাকি আছে আপনার, কালই দিয়ে দেবেন।

তারপরই আমার দিকে একনজর তাকিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আর যাঁকে 'কালই দিয়ে দেবেন' হুকুম জারি করে গেলেন তিনি তখন বিব্রত মুখে বললেন, উঠি, তা না হলে সারারাত জেগে রিভিউ লিখতে হবে।

অর্থাৎ 'কালই দিয়ে দেবেন' কথাটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে, যদিও তখন পুস্তক-পরিচয়ের জন্যে কোন পারিশ্রমিক দেওয়া হত না।

বললাম, করেন কেন? টাকাই যদি না দেবে...

অনেকেই হেসে উঠলো। কে একজন বললে, 'কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে? কানাইদা বললে করবে না মানে?

—কানাইদা? কে তিনি? বিস্ময়ের সঙ্গে জিগ্যেস করলাম।

এবারও সকলে হেসে উঠলেন। একজন শুধু বললেন, কে নন? অথবা কি নন?

পঁয়ত্রিশ বছর ধরে পাশাপাশি বা কাছাকাছি থাকার পরও কেউ যদি প্রশ্ন করতেন, কানাইলাল সরকার কে বা কি, তা হলে আমার উত্তরও বোধহয় ঐ একটাই হত: কে নন? অথবা কি নন?

দেশ বা আনন্দবাজারের কোন দায়িত্ব তাঁর কর্মচঞ্চল প্রাণশক্তির কাছে এতই তুচ্ছ ছিল, এমনকি সাহিত্য, সংবাদপত্র, শিল্প ইত্যাদিও তাঁর কাছে ছিল অতি ক্ষুদ্র ভার। আসলে হারকিউলিসের মত সারা বিশ্ব না হোক, সারা পশ্চিমবঙ্গটা তিনি নিজের কাঁধে না নিয়ে স্বস্তি পেতেন না। বিশেষ করে শিল্পী-সাহিত্যিকদের কোথাও কোন সমস্যা থাকলে...

কানাই দা চিরকাল নিজেকে আড়ালে রাখতে ভালবাসতেন

দেশ-এর ঘরে যথারীতি আড্ডা দিতে যাই, বোধহয় কোনভাবে ওঁর কানে গিয়েছিল আমি সেসময় নির্ভেজাল বেকার।

বসে আছি, আশেপাশে কয়েকজন, সাগরবাবু দ্রুত প্রুফ দেখছেন, কাজ শেষ করে আড্ডায় শামিল হবেন বলে।

হঠাৎ কানাইদা ঢুকলেন। ঢুকলেন না। চৌকাঠে দাঁড়ালেন। আমার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই বেরিয়ে গেলেন।

মিনিট কয়েক পরেই টেলিফোন বেজে উঠলো, সাগরবাবু রিসিভার তুললেন। বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাঠিয়ে দিচ্ছি।

রিসিভার নামিয়ে রেখেই আমাকে বললেন, যান, কানাইদা ডাকছেন, অশোকবাবুর ঘরে।

—ডাকছেন ? কেন ? আমি তো হতভম্ব। বুক দুরুদুরু, কারণ ইতিমধ্যে নানাজনে কানাইদা সম্পর্কে নানা কথা বলে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। অবশ্য কেন ভয়, তাও জানতাম না। আমি তো তখন চাকরি করি না যে চাকরির তোয়াক্কা করবো ? আর লেখা ? সে তো কস্মিনকালে একটি কি দুটি গল্প। আর তাও কি ঐ কানাইদা নামক ব্যক্তিটি বন্ধ করে দিতে পারেন ?

সাগরবাবু সাহস দিলেন ; যান না, চলে যান। দেখেই আসুন কি বলতে চান।

গেলাম। ছোট্ট একটি ঘরে, আরো ছোট একটি টেবিলের ও প্রান্তে স্বয়ং অশোকবাবু, এদিকে একটি চেয়ারে কানাইদা বসে আছেন।

আমি দরজার সামনে দাঁড়াতেই কানাইদা আঙুলের ইশারায় ডাকলেন, বসতে বললেন।

—তা হলে ঠিক রইলো ? অশোকবাবুর দিকে তাকিয়ে কানাইদা বললেন, কাল থেকেই আসতে বলি ?

অশোকবাবু হেসে বললেন, কাল তো রবিবার। তা ছাড়া দুদিন পরেই তো পয়লা বোশেখ, শুভদিন।

—বেশ তাই। কানাইদা ঘাড় নেড়ে দিলেন আমার দিকে তাকিয়ে। আমিও ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে এসে বাঁচলাম।

কানাইদার সমস্ত ব্যাপারই ছিল এইরকম। অথচ ভুল করতেন খুব কম সময়েই। একবার দেশ পত্রিকার কবিতা বাছতে দেখেছিলাম। কবিতার নাম দেখে বা প্রথম লাইন পড়েই ফাইল সাফ করে দিচ্ছিলেন। শেষ অবধি দশ-বারোটি কবিতা তুলে রাখলেন। সাগরবাবু বা অন্য কেউ তা থেকে নির্বাচন করবেন বলে। যেগুলি ফেলে দিলেন তার একটিও কিন্তু ফাইলে রেখে দেওয়ার যোগ্য ছিল না। অথচ কানাইদা যে কবিতা নির্বাচন করার মত কবিতা বুঝতেন তা নয়। তাঁর সাহিত্যপ্রীতি ছিল অশেষ, কিন্তু সাহিত্যবোদ্ধা হিসেবে তাঁকে বড় আসন দিতে পারিনি কোনদিন। অথচ তাঁর মধ্যে কি একটা জাদু ছিল, একটা অদৃশ্য কষ্টিপাথর, সাহিত্যিক চিনতে তাঁর ভুল হত না। সাংবাদিক চিনতে তো নয়ই।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকেও তিনি এই প্রতিষ্ঠানে নিয়ে এসেছিলেন। আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চাকরি বোধহয় জ্যোতিরিন্দ্রের স্বভাবেই দীর্ঘস্থায়ী হতে পায়নি। নিরঞ্জন মজুমদার, সমর সেন, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরকিশোর ঘোষ, এবং এবং এবং। একনজরেই কি করে এঁদের চিনে নিতে পারতেন ? জানি না।

চাকরি তো পেলাম, কিন্তু খোদ কানাইদার ঘরেই। বর্মন স্ট্রিটের ক্ষয়ে যাওয়া সিঁড়ি বেয়ে

উঠেই একটি অন্ধকার ঘরে তখন আমরা বসি। কানাইদা এসেই আধঘন্টার মধ্যে নানা জনকে নানা কাজের নির্দেশ দিয়ে দিতেন। জবাবদিহি চাইতেন। তারপরই অন্য ঘর থেকে ঘরান্তরে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটি কাঁধে নিয়ে।

কানাইদাকে অনেকেই ভয় পেত বলে শুনেছি। কিন্তু ভালও তো বাসতো। কেন ? তার গোপন রহস্যটা কোথায় ? আসলে কানাইদা আপনজনের মত মিশতে পারতেন, দুঃসময়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যেতেন। নিজের চেয়ারে তাঁকে খুব কমই দেখা যেত, সব সময়েই অন্য কারো টেবিলের সামনে এবং কারো না কারো সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত। আর সে সমাধান দুদিন পরে হলে চলবে না। কানাইদার অভিধানে 'আগামীকাল' শব্দটি ছিল না। তৎপর ও তাৎক্ষণিক। শিল্পী অহিভূষণ মালিক বাড়িভাড়া নেবে, অগ্রিম কয়েক শ' টাকা দরকার। আরেকজনের কাছ থেকে তা ধার নেবার জন্যে কানাইদা রাত দশটায় উত্তর কলকাতা থেকে দক্ষিণ কলকাতায় ছুটেছেন। বিমল করকে কোন্ প্রকাশক কম রয়ালটি দিতে চেয়েছে, কানাইদা অন্য এক সাহিত্যিককে সাক্ষী ডেকে নিয়ে তখন তখনই ছুটলেন। একজনকে বেশি আরেকজনকে কেন কম দেবেন ? তখনই তাকে দু'ঘা বসিয়ে দেন আর কি !

বর্মন স্ট্রিটের দুর্দিন থেকে সুতারকিন স্ট্রিটের সচ্ছলতায় উঠে এলাম। নতুন বাড়ি, নতুন ঘরকন্না, নতুন আসবাবপত্র। আমি তখনও ওঁরই সঙ্গে, ছায়াবৎ। মাইনেকড়ি তখনও কড়ির হিসেবে। সেখানে তিনি নিরুপায়, হিসাববিভাগের আওতায় পড়ে সেসব।

কিন্তু ঘর ?

পাশাপাশি দুখানা ঘর, একটি কানাইদার, একটি আমার। চেয়ার টেবিল টেলিফোন ইত্যাদিতে এমন একখানি ঘরের ব্যবস্থা করলেন যে কর্মক্ষেত্রে তাঁর এবং আমার মধ্যে যে বিস্তর ফারাক তা ঘর দেখে কেউ বুঝতেই পারবে না। আমি আপত্তি করায় গম্ভীর উত্তর, আফটার অল ইউ আর এ ফেমাস রাইটার। কারণ বোধ হয় 'লালবাঈ' উপন্যাসের জনপ্রিয়তা। প্রয়োজনে কোনদিন ডাকতেন না, নিজেই উঠে চলে আসতেন। আমি অস্বস্তি বোধ করতাম। কারণ শুধু পদমর্যাদা নয়, বয়সে অনেক বড়, সম্পর্কে অগ্রজ। কিন্তু এটাই ছিল তাঁর স্বভাব।

দেশে-আনন্দবাজারে সৈয়দ মুজতবা আলী বোধহয় কানাইদারই ঘটকালির ফল। হাজরা রোডে একটি বাড়িতে এসে উঠতেন সৈয়দদা। কানাইদা আমাকে প্রায়ই নিয়ে যেতেন তাঁর যতিহীন সরস আড্ডায়। সৈয়দদা একদিন বললেন, একটা আত্মজীবনী লিখবো ভেবেছিলাম, কিন্তু লিখে কি হবে। তার সবই তো হবে কানাইয়ের কথা।

একদিন হন্তদন্ত হয়ে এসে ঢুকলেন।

—একটা কাজ করে দেবেন ?

—বলুন ?

কানাইদা কিন্তু কিন্তু করে বললেন, সমরেশ বসু এলাহাবাদে কুম্ভমেলায় যাবে। খরচ-খরচা আমরা দেবো, কিন্তু তার জন্যে কিছু খবরটবর তো তাকে পাঠাতে হবে। যা পাঠাবে, চিঠিফিটি, তা থেকে কিছু খবর বানিয়ে দেবেন ? তা না হলে অ্যাকাউন্টস, জানেন তো...

একটু থেমে বলেছিলেন, একটা কিছু ভাল তো লিখেও ফেলতে পারে। দেখাই যাক না।

সমরেশ বসুকে কুম্ভমেলায় পাঠানোর পিছনে কানাইদার উৎসাহ এবং তার একদিকের ইতিহাস হয়তো সমরেশ বসু নিজেই লিখবেন। হয়তো লিখেছেন। কিন্তু এখানে বসে কানাইদাকে কি অপরিসীম যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়েছে, তার সাক্ষী আমি। নৈহাটিতে তাঁর স্ত্রীর চিঠি পেয়ে টাকা পাঠানোর জন্যে কানাইদার ব্যগ্রতা, কখনও অসহায়তা কিংবা এলাহাবাদে পৌঁছেই সমরেশ বসুর পা ভেঙে কবি অরুণ মিত্রের বাড়িতে পড়ে থাকার খবর শুনে কানাইদার হতাশা। সাহিত্যপ্রীতি অনেকের থাকে, এমন সাহিত্যিক-প্রীতি কখনও দেখিনি।

'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' লেখা শেষ হওয়ার পর একদিন খুব খুশি খুশি মুখে বলেছিলেন, আমার দুআনা কন্ট্রিবিউশন আছে। কি বলেন ? শুনে হেসে ফেলেছিলাম। কত কুণ্ঠিতভাবে একটু ক্রেডিট পেতে চেয়েছিলেন।

আসলে সমরেশের সাফল্যে গর্বিত হয়েছিলেন বলেই।

কানাইদা দারুণ নাটকীয়ভাবে গল্প বলতে পারতেন, নিজের জীবনের নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প। আর সেজন্যই তাঁকে বারবার অনুরোধ করেছি স্মৃতিকথা লেখার জন্যে। তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন, রাজি হননি। কারণ স্মৃতিকথা তাঁর পক্ষে লেখা সম্ভব ছিল না। তিনি তো চিরকাল নিজেকে আড়ালে রাখতেই ভালবাসতেন।

স্মৃতিকথা লিখতে গেলে নিজেকে আড়ালে রাখা যেত না। কারণ তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছরের একটি যুগের নানান শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তিনি কোন না কোনভাবে জড়িয়ে পড়েছেন। স্মৃতিকথা লিখতে গেলে নিজের কথাই লিখতে হত। সেজন্যেই বোধহয় লিখতে রাজি হননি।

ফলে আমরা একটা দুর্মূল্য স্মৃতিকথা পেলাম না।

কানাইলাল সরকার

বিমল কর

প্রায় বছর দুই আগেকার কথা। আমাদের এক বন্ধুর মাতৃশ্রাদ্ধের দিন বন্ধুর বাড়িতে কানাইদার সঙ্গে দেখা। দু চার কথার পর বললেন, "সন্তোষবাবু তো আমাদের ছেড়ে চললেন।"

সন্তোষবাবু তখন খুবই অসুস্থ। তাঁকে বম্বেতে পাঠানো হয়েছে। তাঁর ব্যাধির কথা আমরা জানি। বললাম, "হ্যাঁ, শুনেছি।"

সেদিন কানাইদার মুখে যা শুনেছিলাম, অবিকল একই কথা শুনলাম এবার পুজোর আগে। এক বন্ধু এসেছিলেন কোনো কাজে। কথায় কথায় বললেন, "জানিস! কানাইদা বোধ হয় আমাদের ছেড়ে এবার চললেন।"

চুপ করে থাকলাম। চমকে উঠিনি।

এখন আমাদের এমন একটা বয়েস হয়েছে যখন মাঝে মধ্যেই শুনতে হয়: 'জানো, অমুক বোধ হয় এবার চললেন।'

সন্তোষবাবু এবার বিদায় নিচ্ছেন কানাইদা জানতেন। কিন্তু জানতেন না, তিনিও বিদায় নিতে চলেছেন। মৃত্যু এই রকমই। কখন কাকে নিয়ে যায় কেউ জানে না। জানতে পারে না।

কানাইদার সঙ্গে আমার শেষ দেখা, এই বছরের গরমের দিকে। তিনি অসুস্থ শুনে কানাইদার একদার সহকর্মী বিভূতি গুপ্তভায়ার সঙ্গে বাঙ্গুরে কানাইদার বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দেখা হল, কিন্তু বসা হল না; উনি যাচ্ছেন ওঁর ডাক্তারের কাছে, নিচে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কানাইদা আর অমলা বউদি চলে গেলেন। যাবার আগে অন্যমনস্কভাবে বললেন, "আর একদিন আসবেন।"

আর যাওয়া হয়নি। কিন্তু সেদিন কানাইদার যা চেহারা দেখলাম—মনে হল, শরীরে স্বাস্থ্যে তিনি একেবারেই ভেঙে গেছেন, গলার স্বর আর উঠছে না। তখনই কেমন আশঙ্কা হয়েছিল! কিন্তু আয়ুর কথা কে বলতে পারে।

সেই কানাইদা আজ আর নেই। আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

কবিতার একটি চরণ মনে পড়ছে: 'মৃত্যুরে কে মনে রাখে/মৃত্যু যায় মুছে/যে-তারা জাগিয়া থাকে/তারে লয়ে জীবনের খেলা/ভুবনের মেলা।'

কথাটা হয়ত ঠিক। কিন্তু আমাদের মতন বৃদ্ধের কাছে নয়। আমাদের জীবনে আর মেলার অবসর নেই, কাজেই মৃত্যুর আঘাতগুলি আর মুছে যায় না। বরং স্মৃতি এসে আচ্ছন্ন করে, বেদনা দেয়। বড় কাতর করে।

কানাইলাল সরকার মশাইকে আমি প্রথম দেখি তিরিশ বত্রিশ বছর আগে। ১৯৫৪ সালে।

খানিকটা নাটকীয়ভাবে তাঁর সঙ্গে পরিচয়। সবেই 'দেশ' পত্রিকায় চাকরি পেয়েছি। আমাদের 'আনন্দবাজার পত্রিকার' অফিস তখন বর্মণ স্ট্রিটে। 'দেশ' পত্রিকার ঘরটি ছোট, একপাশে জানলা, অন্যপাশে সরু বারান্দা। ছোট ঘরেই আমরা কয়েকজন বসি। সাগরদা, জ্যোতিষবাবু, পিয়ারীদা। পঙ্কজদা ঠিক বসেন না। লেখাটেখা থাকলে হয়ত বসেন, নয়ত কথাবার্তা বলে চলে যান নিজের কাজে। অমর বলে একটি ছেলে বসে এককোণে। সে ছিল 'দেশ' পত্রিকার গোছানদার। ওরই মধ্যে আমার জায়গা হল কোনোরকমে।

অফিসে ঢুকেছি সদ্য। নরেনদা, নীরেনদা, গৌর, রমাপদ ছাড়া কাউকেই তেমন চিনি না আনন্দবাজারের। দিন দুই পরে এক ভদ্রলোক দেখি গটমট করে ঘরে ঢুকলেন। গায়ের রঙটি কালো। স্বাস্থ্য মজবুত। পরনে খদ্দরের মোটা ধুতি আর পাঞ্জাবি।

ঘরে ঢুকেই সাগরদার টেবিলের সামনে বসলেন। আগেই একবার দেখে নিয়েছেন আমাকে।

সাগরদা আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। "কানাইদা, এই আমাদের বিমল কর।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমি ওঁকে নমস্কার করলাম।

নমস্কার জানিয়ে কানাইদা বললেন, "জানি। আপনি বসুন। গৌরের মুখে আগেও আপনার কথা শুনেছি।"

তারপর সাগরদার সঙ্গে নিচু গলায় দু একটা কথা বলে উনি চলে গেলেন।

পরে বুঝলাম, আমাকে চাকরিতে নেওয়ার ব্যাপারে সাগরদার সঙ্গে ওঁর আগেই কথাবার্তা হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য আমাকে দেখে উনি প্রসন্ন হয়েছিলেন কিনা বলতে পারব না। অপ্রসন্নতার সামান্য কারণ ছিল। মাত্র কিছুদিন আগে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত আমার একটি লেখা নিয়ে বাইরে গালমন্দ চলছিল। শুনেছি, কেউ কেউ এই বিষয়টি নিয়ে সুরেশচন্দ্র মজুমদার এবং অশোককুমার সরকার মশাইকে পর্যন্ত বিব্রত করছিলেন। কানাইদা এতে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ ছিলেন। সাগরদাকেও বলতেন কিছু। কিন্তু সাগরদা নির্বিকার। বাইরে কে কী বলে তা নিয়ে সাগরদার মাথাব্যথা ছিল না।

এই অস্বস্তিকর অবস্থাটা অবশ্য স্থায়ী হয়নি। এক আধ মাসের মধ্যে সব স্বাভাবিক হয়ে উঠল। আর অন্যদের মতন কানাইলাল সরকার মশাই আমার কাছেও 'কানাইদা' হয়ে দাঁড়ালেন।

আমি যখন 'দেশ' পত্রিকায় ঠাঁই পাই কানাইদা তখন 'দেশ' পত্রিকার ঘরে বসতেন না। শুনেছি, আগে নাকি বসতেন। আমি দেখিনি। পাকাপাকিভাবে না বসলেও হয়ত মাঝে মাঝে সাগরদার কাছে এসে বসে থাকতেন। গল্প শুনেছি, একবার একটি ছেলে 'দেশ' পত্রিকায় কবিতা দিতে এসে কানাইদার সামনে পড়ে যায়। সেই ছেলেমানুষ কবির জানা ছিল না—কার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিনীতভাবে একটি কবিতা বার করে কানাইদার সামনে এগিয়ে দিল।

কানাইদা কাগজটা নিলেন। "কী এটা?"

"কবিতা।"

কানাইদা কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে দেখলেন একটি মেয়ের নাম লেখা আছে। 'সুনন্দার জন্য' বা 'মালতীর জন্য'—এ-রকম কিছু হবে। সঙ্গে সঙ্গে কাগজটা কবির দিকে এগিয়ে দিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, "সুনন্দার জন্যে তো এখানে কেন? সুনন্দাকে নিয়ে গিয়ে দিন।"

কবি একেবারে থ।

এই হল কানাইদা। তাঁর পক্ষেই এমন কাজ সম্ভব। কখন কী বলে ফেলেন—কী করে ফেলেন বোঝা অসম্ভব।

কানাইদা যে কবে আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানে এসেছিলেন আমি জানি না। আমি যখন তাঁকে দেখি, তখন তাঁর বয়েস আর কত হবে! বড় জোর চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। বয়েসটাকে প্রান্ত-যৌবন বলা যেতে পারে। সামান্য ভারি চেহারা, স্বভাবে চঞ্চল, হাঁটাচলা করেন জোরে জোরে, কথা বলেন গলা তুলে, সারাটা অফিস চরকি বাজি করে বেড়ান। এখানে একটু বসেন, ওখানে গিয়ে খানিক তর্ক সেরে ফেলেন, আবার নিজের ঘরে এসে কাজকর্ম সারেন, উঠে পড়েন আবার। আসলে মানুষটির জীবনীশক্তি এত প্রবল ছিল যে ধীরস্থির হয়ে থাকতে পারতেন না। তাঁর নিয়মিত কাজ আর দায়িত্ব যা ছিল তার চতুর্গুণ ছিল অনিয়মিত কাজ। সেগুলো স্বেচ্ছায় ঘাড়ে তুলে নেওয়া।

আনন্দবাজার পত্রিকার নতুন বাড়ি—তখন নাম ছিল সুটারকিন স্ট্রিট, এখন প্রফুল্লকুমার সরকার স্ট্রিট—দেখাতে একদিন কানাইদা আমাদের নিয়ে গেলেন। তখনও অনেক কাজ সারা হয়নি। বাড়ি দেখাতে এনে সাগরদাকে বললেন, "সাগর, তোমার 'দেশ'-এর ঘর কোথায় নেবে ঠিক করে নাও। পরে সব কাড়াকাড়ি করে

নেবে।"

সাগরদা নিরীহ মুখ করে বললেন, "কানাইদা, আমরা হলাম উইকলি, ডেলি নয়। আমাদের কপালে কী আর ভাল জুটবে। আমরা শুধু তিড়িংবিড়িং করে নেচেই খুশি হব।"

কানাইদার কী হাসি। বললেন, "না, আমি অশোককে বলব। তুমিও বলো। তোমাদের এবার বড় জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে।"

সুরেশচন্দ্র তখন আর নেই, চলে গেছেন হঠাৎই। অশোকবাবুকে বলে কয়ে হোক আর যেভাবেই হোক না কেন আমরা শেষ পর্যন্ত নতুন বাড়ির দক্ষিণ ঘেঁষে বড়সড় একটা ঘর পেয়েছিলাম। পাশেই ছিল টানা লম্বা বারান্দা। সে-ঘর অবশ্য আমাদের কপালে চিরস্থায়ী হয়নি। বার কয়েক এখানে ওখানে করে এখন পত্রিকার অন্য ঘর হয়েছে।

'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে কানাইদার যোগাযোগটা ছিল পুরনো। তিনি একসময়ে 'দেশ' পত্রিকার ম্যানেজার ছিলেন। তাছাড়া সাগরদা ছিলেন বন্ধু এবং অনুজতুল্য—সেই শান্তিনিকেতনের ছাত্রাবস্থা থেকে। কাজেই 'দেশ' পত্রিকার ভাল-মন্দতে কানাইদার হৃদয়ের যোগ ছিল। অনেক পরে অবশ্য তাঁর অন্যান্য কাজের দায়িত্ব এত বেড়ে যায় যে, আগের মতন আর যোগাযোগ রাখতে পারতেন না।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক রাতারাতি গড়ে ওঠে না। ধীরে ধীরে সেটা গড়ে ওঠে, লতার মতন জড়িয়ে যায়। কানাইদার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এইভাবেই গড়ে উঠেছিল। কারও কম, কারও বেশি। কেউ কেউ কানাইদার খুবই ঘনিষ্ঠ ও অতিপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কেউবা কম। আবার কখনও কখনও কানাইদার একদার প্রিয়জনরাও তাঁর অপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এমন তো এ-সংসারে হয়েই থাকে।

আমি কোনোদিনই কানাইদার অতি প্রিয় ছিলাম না। কিন্তু বরাবরই তাঁর স্নেহভাজন ছিলাম। উনি স্নেহ করতেন—এই যথেষ্ট।

মানুষটিকে আমি যেভাবে দেখেছি—তাতে বলতে পারি, উনি যতটা আবেগময় ছিলেন ততটা স্থিরচিত্ত ছিলেন না। ওঁর স্বভাবে এক ধরনের তাৎক্ষণিক উত্তেজনা ছিল। নিজের বিচার-বিবেচনা হারাতেন। সহজেই লোকে তাঁকে ভুল বোঝাত ; উনি রেগে যেতেন, আবার কেউ যদি তাঁকে বোঝাত—উনি ভুল করেছেন—সঙ্গে সঙ্গে কানাইদা অনুশোচনা করতেন, ক্ষমাপ্রার্থী হতেন। যাঁরা তাঁর কাছের মানুষ ছিল—তারা জানত—কানাইদা মানুষ হিসেবে খানিকটা মাথা-গরম ধাতের, কিন্তু মনের দিক থেকে নরম, এবং হৃদয়বান। আর পরোপকারী।

আমরা প্রায়ই বলি—অমুক একটা ক্যারেকটার। এখানে ক্যারেকটার অর্থে বিশেষ একটা ধাঁচ বোঝায়। সব মানুষেরই নিজের এক ধাঁচ থাকে, কিন্তু কারও কারও মধ্যে সেটা স্পষ্ট ও বড় করে দেখা যায়। সেই হিসেবে কানাইদাও এক ক্যারেকটার। তাঁর ধাঁচ ছিল চোখে পড়ার মতন। কখনো উত্তেজিত, উগ্র, ক্ষুব্ধ, কখনো দুর্বল, স্নেহান্ধ, সহাস্য। এক এক সময় অত্যন্ত স্পষ্টভাষী, প্রায় দুর্মুখ—আবার অন্য সময়ে আশ্চর্যভাবে সৌজন্যপূর্ণ, সু-মুখ। তাঁর আচরণের তিক্ততা হয়ত কাউকে পীড়া দিয়েছে, আবার পরে নিজেই তিনি সেই তিক্ততা দূর করে দিয়েছেন। বেশির ভাগ সময় তাঁর নিজের পছন্দ ও ভাল লাগার ওপর অন্যে ভর করত। তখনই হত বিপদ। আবার কোনো কোনো ব্যাপারে তাঁর ধারণা এমনই দৃঢ় হয়ে থাকত যে কিছুতেই তা পালটানো যেত না।

সংসারে এক একজন থাকেন যাঁরা ধরেই নেন, তাঁরা অভিভাবকত্ব করার জন্যে এসেছেন। কানাইদাও ভাবতেন, তিনি তাঁর আশেপাশের লোকদের, বন্ধুজনের, অনুজদের অভিভাবক। এদের ভালমন্দ তিনি বেশি বোঝেন। কানাইদাকে এই বিশেষ মর্যাদাটি দিলে তিনি যে কী খুশি হতেন তা বলার নয়। না দিলে তাঁর অভিমান হত। মনে করতেন তাঁকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে। রেগে যেতেন। বিচ্ছেদ ঘটে যেত। এই ধরনের মানুষ এ-সংসারে বিরল নয়। বিশেষ করে আমাদের আগের যুগে হামেশাই এমন গুরুজন চোখে পড়ত।

কানাইদার পরিচয়ের জগৎ ছিল বিশাল। তাঁর বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা ছিল অপরিমিত। নানা মহলের লোক—সংবাদপত্রের ও সরকারী স্তরের মান্যগণ্য থেকে শুরু করে ডাক্তার এনজিনিয়ার রাজনৈতিক নেতা—কতজনের সঙ্গেই না তাঁর মেলামেশা ছিল। সাহিত্যিক মহলের সঙ্গেও কানাইদার ঘনিষ্ঠতা কম ছিল না। পুলিনবিহারী সেন, প্রমথনাথ বিশী, সৈয়দ মুজতবা আলি, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত—এঁরা ছিলেন কানাইদার বন্ধুজন। পরবর্তীকালের লেখকদের অধিকাংশই তাঁর পরিচিত ও বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। শিল্পীদের সঙ্গেও কানাইদার সম্পর্ক ছিল সৌহার্দ্যপূর্ণ।

কানাইদা একবার তাঁর সহকর্মী দুই বন্ধুকে নিয়ে ত্রিবেণী নামে একটি প্রকাশনা করেছিলেন। ভাল ভাল বইও কিছু ছেপেছিলেন। কিন্তু ব্যবসা করার ধাত ওঁদের ছিল না। কয়েক বছরের মধ্যেই 'ত্রিবেণী' উঠে যায়।

আমি ঠিক জানি না, তখনকার কংগ্রেস সোস্যালিস্টদের সঙ্গে কানাইদার কোনো যোগাযোগ ছিল কিনা। রামমনোহর লোহিয়া ছিলেন ওঁর পুরনো বন্ধু। কানাইদা নিজের মুখে আমাকে একবার একটা গল্প বলেছিলেন। তাতে মনে হয়, তিনি কারও কারও অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ছিলেন। নয়ত একসময়, যখন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ভয়াবহ—তখন একবার তাঁর হাত দিয়ে কলকাতার কোনো আত্মগোপনকারী নেতার কাছে টাকা পাঠানো সম্ভব ছিল না। কানাইদা নিজেই জানতেন না, তিনি কী বয়ে আনছেন সাধারণ একটা অ্যাটাচি কেসে। শেষ মুহূর্তে যখন জানলেন তখন তাঁর ভীষণ অবস্থা। দিল্লি থেকে কলকাতা পর্যন্ত দীর্ঘ পথ ট্রেনে কেমন করে এসেছিলেন তিনি নিজেই যেন জানেন না।

বিলাস বাহুল্যহীন এই মানুষটির মধ্যে ভাল লাগার মতন গুণের অভাব ছিল না। আবার তাঁর স্বভাবগত কিছু ত্রুটি অনেক সময় হয়ত নিতান্ত প্রিয়জনকেও ক্ষুণ্ণ করেছে। মানুষ দেবতা নয়। এবং ত্রুটিহীনও নয়। কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে হলে তাকে সমগ্রভাবেই গ্রহণ করতে হবে। নয়ত গ্রহণ করা চলে না।

ব্যক্তিগতভাবে আমি কানাইদার স্নেহ ও আশ্রয় পেয়েছি—এটা আমি সৌভাগ্য বলে মনে করি। অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ গল্পগুজব কমই হয়েছে। বা হত। আমি যখন তাঁর বাঙ্গুরের বাড়িতে থাকতাম তিনি কোনো কাজে নিজের বঙ্গুরের বাড়িতে গেলে কিছুক্ষণ গল্পগুজব হত। কিন্তু আমরা অফিস প্রসঙ্গ যতটা পারি বাদ দিয়ে কথা বলতাম। আর মজার কথা কানাইদা বাড়িতে বেশির ভাগ সময় আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতেন, অফিসে বলতেন 'আপনি', কদাচিৎ তাঁর মুখে 'তুমি' শোনা যেত।

শান্তিনিকেতনের ছাত্র, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাওয়া কেমিক্যাল এনজিনিয়ার, কেমন করে যে সংবাদপত্রের জগতে চলে এসেছিলেন আমি জানি না। জিজ্ঞেস করলে কপাল দেখাতেন।

কানাইদার শরীর স্বাস্থ্য খারাপ ছিল না কোনো কালেই। বয়েস তাঁকে হয়ত অত তাড়াতাড়ি ধরতে পারত না। অশোককুমার সরকার মশাই' অমন আকস্মিকভাবে চলে যাবার পর কানাইদা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। পারিবারিক সম্পর্ক ও আত্মীয়তা ছাড়াও অশোকবাবু ছিলেন যেন কানাইদার দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠজন, প্রিয়জন। অশোকবাবুর অভাবে তাঁর নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে গিয়েছিল। মন গিয়েছিল ভেঙে।

বেশি দিনের কথা নয়, কানাইদা বাঙ্গুরের বাড়িতে এসে উঠেছেন শুনে একদিন ফোনে কথা হল। গেলাম দেখা করতে। কানাইদার শরীর ভেঙেছে, কিন্তু চোখের ছানি কাটাবার কথা ছাড়া অন্য কোনো শারীরিক অসুস্থতার কথা বললেন না। অনেক রকম গল্প হল। এমনকী পাকা পেঁপে এবং পাকা বেলের মধ্যে কোনটা বেশি উপকারী, কলকাতার কোন বড় ডাক্তার কী বলেছেন কানাইদাকে—তার এক ফিরিস্তি দিলেন আমাকে। কোথায় দাঁত তোলানো উচিত তার পরামর্শ দিলেন। ঘরোয়া কথাবার্তা।

চলে আসার সময় বললেন, "আমি আজকাল বিকেল নাগাদ বাড়ি ফিরে আসি। সন্ধেবেলায় আমায় পাবে। পারলে বিভূতিবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এসো। বিভূতিবাবু তো আবার চোখে দেখতে পান না।"

যাব যাব করে মাস কয়েক পড়ে বিভূতিবাবুর সঙ্গে গেলাম দেখা করতে সকালের দিকে। উনি তখন অসুস্থ। দেখা হল। কথাবার্তা হল না। উনি আর অমলা বউদি যাচ্ছেন ডাক্তারের কাছে।

আমরা ফিরে এলাম।

সেই শেষ দেখা।

তখন আশঙ্কা হয়েছিল। কিন্তু কেমন করে বুঝব, কানাইদা জীবনের সমস্ত হিসেব নিকেশ শেষ করতে চলেছেন। ভেবেছিলাম, আবার একদিন দেখা হবে।

কিন্তু হল না ॥

দানব ও দেবতা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

[চার]

সুযোগ পেলেই বর্তমান থেকে অতীতে ছুটে যাওয়া মনের ধর্ম। মনের আর একটা ধর্ম হল অন্যের পরিস্থিতিতে নিজেকে কল্পনা করে হয় কষ্ট পাওয়া না হয় আনন্দ পাওয়া। '৪৫ সালে আমার যে বয়েস ছিল হিরোশিমার ছেলে রোশিটাকা কাওয়ামোতোরও সেই বয়েস ছিল। আমি যদি সেই সময় হিরোশিমায় থাকতুম তাহলে আমার কি হত! লন্ডনের কমানওয়েলথ কি মেকসিকোর মিনি সামিট বেরিয়ে যেত। পাকাপাকা জ্ঞানের কথা বলা আর আবোলতাবোল লেখা চিরতরে বন্ধ হত। দূরে বসে বন্যা দেখা, টিভির পর্দায় ভিয়েতনাম দেখা, বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার কাটাকাটি দেখা আর ডেকচেয়ারে আড় হয়ে চোখ বুজে দার্শনিকতা করা খুব সহজ।

৬ আগস্ট, ১৯৪৫ সালের সকালে হিরোশিমার স্কুলে কাওয়ামোতোকে প্রার্থনায় বসিয়ে সময়ের ময়দানে চরতে বেরিয়েছিলুম। চাডউইক থেকে ফেরমি, ওপেনহাইমার থেকে জেনারেল গ্রোভস। লস অ্যালামসের বোমা। কিশোর কাওয়ামোতোও জানত না বিজ্ঞানের জগতে কি হচ্ছে, পরাধীন ভারতের কিশোর আমিও জানতুম না বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে কি খেলা চলেছে। একদিকে চলেছে বিজ্ঞানীদের প্রতিযোগিতা। কোন দেশ আগে ভাঙ্গতে পারে পরমাণু। শুধু ভাঙ্গা নয়। একের পর এক লাইন করে ভেঙ্গে চলা। সেই শক্তি শান্তির কাজে লাগবে, কি যুদ্ধের কাজে লাগবে তা দেখার দরকার নেই। আর একদিকে মুখিয়ে আছেন জেনারেলরা। হিটলার তুরুপের তাস ফেলার আগেই আগ্রাসী জার্মানিকে স্তব্ধ করে দিতে হবে। এর মাঝে কিছু সচেতন পদার্থবিদ জাতির কর্ণধারদের দোরে দোরে নিয়তির মতো ঘুরছেন, বোঝাতে চাইছেন, পারমাণবিক গবেষণা যে পর্যন্ত এগিয়েছে, সেইখানেই ইতি টানা হোক।

জিলার্ড ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের দপ্তর থেকে। ওদিকে আর এক আণবিক বিজ্ঞানী নিল বোর অতি কষ্টে চার্চিল পর্যন্ত এগোলেন। নিল বোর ছিলেন ডেনমার্কের গর্ব। ড্যানিশরা বলতেন, আমাদের গর্বের বস্তু চারটি. এক, আমাদের নৌ-শিল্প, দুই, আমাদের ডেয়ারি, তিন, আমাদের হান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসন. চার, আমাদের নিল বোর। নিল্স বোর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করে বোঝাতে চেয়েছিলেন, পরমাণু গবেষণাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিজ্ঞানীদের একটা মিলনক্ষেত্র তৈরি হোক। রাশিয়া, আমেরিকা, ডান, বাঁ সব ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে একটা 'ফ্যামিলি অফ নেশনস' গড়ে উঠুক। বিজ্ঞানীর প্রস্তাবে রুজভেল্ট সায় দেননি। চার্চিল নীরবে প্রায় আধঘন্টা ধরে বোরের কথা শুনলেন। কোনও টুঁ শব্দ করলেন না, তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। নিল বোর অবাক। কি হল প্রাইমমিনিস্টারের!

পারমাণবিক কেক! ৬ নভেম্বর ১৯৪৬-এর একটি ঘরোয়া দৃশ্য। পরমাণু বোমার প্রভাব আমেরিকান মনের অনেক গভীরে ছড়িয়েছিল

চার্চিল তাঁর সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইসার চেরওয়েলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'What is he really talking about? Politics or physics?' কি বলছেন এই ড্যানিশ ভদ্রলোক ? পলিটিক্স না ফিজিক্স !

মানুষের যেমন ভাগ্য, জাতিরও সেই রকম ভাগ্য আছে। পৃথিবীর ভাগ্য। আমার সঙ্গে এক বদ্ধ উন্মাদের পরিচয় ছিল। যেদিন তার কোনও আহারই জুটতো না, আকাশের দিকে হাত তুলে, হা হা করে হাসতে হাসতে বলত, 'ভগবানের যেমন বরাত'! তার কাছেই শিখেছিলুম, ভগবানেরও বরাত আছে, তা না হলে শিব গড়তে কেন বানর হবে ! দেবতা গড়তে গিয়ে কেন দানব হবে ! মানুষের ইতিহাস মানুষ তৈরি করে, না ভাগ্য তৈরি করে বোঝা কঠিন। একটা গল্প মনে পড়ছে। ফ্রানসের সিংহাসনে তখন নেপোলিয়ান। একের পর এক দেশ জয় করে চলেছেন মহাবিক্রমে। ইংল্যান্ড এইবার হাতের মুঠোয় এলো বলে। মস্ত বড় বাধা খামখেয়ালী আবহাওয়া। পাল তোলা জাহাজের ভরসায় ইংল্যান্ডের কূলে ইচ্ছেমতো সৈন্য নামানো যাবে না। এক আমেরিকান আবিষ্কর্তা এক দিন এসে সম্রাটকে বললেন, আমি আপনাকে এক বহর বাষ্পীয় পোত তৈরি করে দিতে পারি যা পাল ছাড়াই আপনার বহরকে ইংল্যান্ডে নামিয়ে দেবে। আবহাওয়া কোনও বাধাই হবে না। সম্রাট নেপোলিয়ান অবাক হলেন, পাল ছাড়া জাহাজ। অসম্ভব ! কি বাজে বকছ ! নেপোলিয়ান ফুলটনকে বিদায় করে দিলেন। ইংল্যান্ডের ভাগ্য। ইংল্যান্ড বেঁচে গেল। নিজের অহঙ্কার সামান্য খাটো করে নেপোলিয়ান যদি ফুলটনের কথা শুনতেন তাহলে উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস অন্য ধারায় বইত।

ম্যানহাটান প্রোজেক্টের দায়িত্বে জেনারেল গ্রোভস না থাকলে আর রাশিয়ায় স্ট্যালিনের মতো ধুরন্ধর না থাকলে জাপান হয়তো বেঁচে যেত। গ্রোভস বোমার শক্তি পরীক্ষার জন্যে ছটফট করছেন। চিফ অফ স্টাফ জর্জ মার্শালকে গিয়ে বললেন, বোমা তো প্রায় হাতে এসে গেল, এইবার একটা পলিসি তো ঠিক করতে হয়। গ্রোভসের কাজকর্মে মার্শাল এতই তখন সন্তুষ্ট, প্রায় আদর করার মতোই উত্তর দিলেন, 'কান্ট ইউ সি টু অল দ্যাট ইওরসেল্ফ !' এ সব ব্যাপার তুমি নিজে ঠিক করতে পারছ না ! তোমার এত প্রেম ! তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছ !

কমিশান নামক একটা প্রহসন মানুষের জীবনের চিরকালের সঙ্গী। কিছু আমলা আর সাতজন বিজ্ঞানী নিয়ে একটা কমিটি হল। বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন, ফেরমি, কম্পটন, লরেন্স, ওপেনহাইমার। ফেরমি ছাড়া, অন্যান্যদের ওপর ম্যানহাটান প্রোজেক্টের কর্মীদের তেমন আস্থা ছিল না। অন্যান্যরা রাজনীতি আর মিলিটারির সঙ্গে যে কোনও মুহূর্তে রফা করে ফেলতে পারেন। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হ্যারল্ড সি উরেকে কমিটিতে রাখার প্রস্তাব কর্তৃপক্ষ নাকচ করে দিয়েছিলেন।

আর্থার এইচ কম্পটন ছিলেন বিজ্ঞানীদের প্যানেলে। তিনি পরে, সব ঘটে যাবার পর, সেই দুর্ভাগ্যজনক দিনগুলির স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেছিলেন, বোম মিটিং হয়েছিল, অনেকটা ফুল ফেলার মতো। সিদ্ধান্ত আগেই হয়ে গিয়েছিল, যেভাবেই হোক বোমা জাপানে ফেলা হবে। আর সেই সিদ্ধান্ত করেছিলেন প্রবল এক সামরিক অফিসার জেনারেল গ্রোভস। আমরা বিজ্ঞানীরা ছিলাম নিমিত্তের ভাগী। বোমা ফেলা হবে কি না, ফেলা উচিত কি না, সে প্রশ্ন একবারও আমাদের করা হয়নি। আমাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, বোমা কিভাবে ব্যবহার করা হবে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক, দলের কোন বিজ্ঞানীই নিজের থেকে, অথবা নিজেদেরকে অন্যদের মুখপাত্র ভেবে একবারও বললেন না, যুদ্ধের প্রয়োজনে বোমা ব্যবহার করা চলবে না। ওপেনহাইমার নিজে খুব চালাকি করলেন, তিনি শুধু টেকনিক্যাল প্রশ্নের টেকনিক্যাল জবাবই দিয়ে গেলেন, যেমন বোম ফেলার পর প্রথম চোটেই মৃতের সংখ্যা দাঁড়াবে বিশ হাজার।

জেনারেল লেসলি এল গ্রোভসের কোনও মর্মবেদনা ছিল না। তিনি পরে স্বভাবসিদ্ধ ঢংয়ে বলেছিলেন, বেসামরিক কোনও কমিটিতে আমার থাকাটা অশোভন হবে বলে আমার নাম ছিল না ঠিকই ; তবে সব সভাতেই আমি সারাক্ষণ উপস্থিত থাকতুম। বোমা ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে আসাটাই আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করতুম। কি বলছ, জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে আমাদের হাজার হাজার ছেলে রোজ মরছে, সেই সময় আমি চুপ করে বসে থাকতে পারি ! আমার একটা নৈতিক দায়িত্ব ছিল না ! আমি জানতুম, যে সব বিজ্ঞানী বোমা ফেলার বিপক্ষে সরব ছিলেন তাঁদের কারুর কোনো নিকট আত্মীয় যুদ্ধে ছিলেন না। সেই জন্যেই তাঁরা আহা, আহা করতে পেরেছিলেন।

শেষ মিটিং-এর পর যে ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছিল, সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন জেনারেল মার্শাল। কম্পটন কথায় কথায় প্রস্তাব দিলেন, বোমাটা দুম করে জাপানের ঘাড়ে না ফেলে, অন্য কোথাও পরীক্ষামূলকভাবে ফাটিয়ে জাপানকে ভয় দেখালেও তো কাজ হতে পারে। সবাই কোনও না কোনও যুক্তি দেখিয়ে কম্পটনের প্রস্তাব খারিজ করে দিলেন।

জেনারেল গ্রোভসেরই জয় হল। ইন্টেরিম কমিটির প্রস্তাব চলে গেল, ট্রুম্যানের কাছে,

(১) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাপানে বোমা ফেলতেই হবে।

(২) এমন জায়গায় ফেলতে হবে যাতে এক ঢিলে দু পাখি মরে। অর্থাৎ জনপদঘেরা সামরিক অবস্থান। এমন সব ঘরবাড়ি যা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

(৩) বোমা ফেলতে হবে আচমকা কোনও হুঁশিয়ারি না দিয়ে।

তৃতীয় প্রস্তাবটি নৌবাহিনীর পক্ষে যিনি কমিটিতে সদস্য হিসেবে ছিলেন, সেই র‍্যালফ এ বার্ডের এত খারাপ, এত অমানবিক লেগেছিল যে তৃতীয় প্রস্তাবটি থেকে তিনি তাঁর অনুমোদন তুলে নিয়েছিলেন। মৃদু হেসে হলেও একমাত্র প্রতিবাদ তিনিই জানিয়েছিলেন।

রাশিয়ানরা যখন ছলেবলে, কৌশলে, তাঁদের দেশের পলাতক বিজ্ঞানী কাপিটজাকে কেমব্রিজের ক্যাভেন্ডিশ লেবরেটারি থেকে দেশ দেখার নাম করে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখলে, আর ফিরতে দিল না, তখন বিষণ্ণ রাদারফোর্ড কাপিটজাকে একটা করুণ চিঠি লিখেছিলেন। কাপিটজার রাশিয়া যাবার কিছু দিন আগে রাদারফোর্ডের চেষ্টায় প্রচুর অর্থব্যয়ে নিউক্লিয়ার গবেষণার জন্য নতুন একটি ল্যাবরেটারির দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়েছিল। কাপিটজা বিখ্যাত ব্রিটিশ ভাস্কর এরিক গিলকে দিয়ে ল্যাবরেটারির ফলকে একটি কুমির উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। অবাক দর্শকসাধারণ প্রশ্ন করেছিলেন, বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান গবেষণার সঙ্গে কুমির কেন ? কাপিটজা বলেছিলেন, Well, mine is the crocodile of science. The crocodile cannot turn its head. Like science, it must always go forward with all devouring jaws. কাপিটজা রাদারফোর্ডের নাম রেখেছিলেন ক্রোকোডাইল। রাদারফোর্ড ছাড়া সকলেই তা জানতেন। প্রিয় কাপিটজার শোকে রাদারফোর্ড একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। লেবরেটারিটি খুলে পাঠিয়ে দিলেন রাশিয়ায়। কাপিটজা তখন তাঁর প্রিয় ক্রোকোডাইলকে সুন্দর একটি চিঠি লিখেছিলেন, 'শ্রদ্ধাভাজনেষু, আসলে আমরা স্রোতে ভাসমান বস্তুকণা। স্রোতটির নাম ভাগ্য। আমরা অনেক চেষ্টায় যা পারি, তা হল ভেসে থাকা আর একটু আধটু এধার, ওধারে সরে যাওয়া—স্রোতই আমাদের নিয়ন্তা।'

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় সম-সময়ে নোবেল বিজ্ঞানী জেমস ফ্র্যাংককে চেয়ারম্যান করে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলেন, যা ফ্র্যাংক-রিপোর্ট নামে বিখ্যাত। ওই কমিটিতে ছিলেন জিলার্ড ও বায়োকেমিস্ট ইউজিন রাভিনোভিচ। পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগে সমাজ ও রাজনীতিতে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে ওই রিপোর্টে তার বিস্তারিত উল্লেখ ছিল। মার্কিন সরকার ও সমরবাহিনী ওই রিপোর্ট স্পর্শ করলেন না। বোমা ফেলা হবে, অবিলম্বেই ফেলা হবে। কোনও দয়া-মায়া দেখানো হবে না। বায়োকেমিস্ট ইউজিন রাভিনোভিচকে দেড়পাতার মতো ছোট্ট একটা লেখা দিয়ে ফ্র্যাংক বলেছিলেন, আমাদের রিপোর্টটা লিখে ফেল। কিছু হোক না হোক সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে আমরা মানবজাতির পারমাণবিক ভবিষ্যতের প্রকৃত চিত্র তুলে দিয়ে যেতে চাই। শিকাগোর সেদিনের রাত ছিল ভ্যাপসা গরম। আকাশে ক্ষয়া চাঁদ। রাভিনোভিচ পথ হাঁটছেন। ব্যস্ত শহর। উন্মাদ জন ও যান স্রোত। রাতের ষড়যন্ত্র কেউ জানে না। যুদ্ধ অনেক দূরে। মিত্র শক্তি ছুটে চলেছে বার্লিনের দিকে। জাপানের দাই-নিপ্পনের স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন হতে চলেছে। হঠাৎ রাভিনোভিচের চোখের সামনেই যেন ঘটে গেল অলৌকিক ঘটনা। সামনের আকাশে আগুন ধরে গেল। বিশাল বিশাল বাড়ি জ্বলতে জ্বলতে ভেঙে পড়তে লাগল চারপাশে। গাছপালা সব হিল হিল করে প্রেত-শরীরের মতো

পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। স্তম্ভিত রাভিনোভিচ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলেন। ঘোর তখনও কাটেনি। সামথিং হ্যাভ টু বি ডান টু ওয়ার্ন হিউম্যানিটি। মানবজাতিকে সচেতন করার জন্য একটা কিছু বারতে হবে। আমার ঘুম এল না। সারা রাত বিছানায় পড়ে ছটফট না করে, ভোর হবার বহু আগেই আমি লিখতে বসে গেলাম। ফ্যাংক একটা খসড়া দিয়েছিলেন মাত্র, আমারটা ক্রমশই হয়ে উঠল দীর্ঘ। A REPORT TO THE SECRETARY OF WAR, JUNE 1945.

যা ঘটল আর ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা যেন স্পষ্ট হয়ে আছে এই রিপোর্টে। শুরুই হচ্ছে এইভাবে, The only reason to treat nuclear power differently from all other developments in the field of physics is the possibility of its use as a means of political pressure in peace and sudden destruction in war. সুদীর্ঘ রিপোর্ট সাত বিজ্ঞানী শেষ করছেন এই বলে, মার্কিন সরকার যদি অন্য সব দেশের আগে প্রথমেই যুদ্ধে আণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করতে চান তাহলে আমেরিকার জনসাধারণ ও বিশ্বের অন্যান্য সব দেশের জনমত গ্রহণ করুন। তাঁদের বলতে দিন জাপানে বোমা ফেলা উচিত কি অনুচিত! এই মর্মান্তিক ব্যাপারে তাঁদেরও একটা ভূমিকা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাক।

কত জল ঘোলা হল তবু থামানো গেল না বৃহৎ শক্তির হামলা। বিজ্ঞানের মতো সমরশক্তিও যেন বিজ্ঞানী কাপিটজার সেই কুমির। ঘাড় ঘোরাতে জানে না। ভয়াল মুখব্যাদন করে যে কুমির শুধু এগিয়েই চলে সামনে। কিশোর কাওয়ামোতো সে কথা জানত কি! ৬ আগস্ট, ১৯৪৫, সকাল আটটা পনেরোতেও সে জানত না, আটটা বেজে ষোল মিনিটে কি ঘটতে চলেছে তার জীবনে। সকাল আটটায় সে ক্লাসে ঢুকে প্রতিদিনের নিয়ম অনুসারে সম্রাটের ছবিকে নমস্কার করে নিজের ডেস্কে গিয়ে বসল। তার প্রিয় ডেস্ক। ডেস্ক আর চেয়ারের মাঝখানে বেশ কিছুটা জায়গা যাতে বিমান আক্রমণের সময় হামাগুড়ি দিয়ে আশ্রয় নেওয়া যায়। সকলের সঙ্গেই রয়েছে বুলেটপ্রুফ হেলমেট। হেলমেট বললে ভুল হবে, আসলে মায়ের তৈরি মোটা কাপড়ের ছুঁচলো টুপি। ছেলেরা ডেস্কে বসা মাত্রই বয়স্ক ছাত্ররা রোজ যেমন বলে, সেই রকমই বলল, চোখ বুজাও, ধ্যান করো। কাওয়ামোতো চোখ বুজিয়েছিল তবে ধ্যানে মন বসল না। সে ভাবতে লাগল, দাদারা আজ আবার মারবে না তো? দাদারা সুযোগ পেলেই কোনও না কোনো ছুতোয় ছোটদের খুব চড় চাপড় মারত। চোখ বুজিয়ে কাওয়ামোতো মুখের এমন একটা ভঙ্গি করার চেষ্টা করতে লাগল, যে-মুখ ভালো ছেলের, লক্ষ্মী ছেলের।

নির্দেশ দিয়েই বড়রা চলে গেল ক্লাসের বাইরে। ছোটরা চোখ বুজিয়ে ধ্যানের চেষ্টা করছে। ওদিকে তলপেটে আণবিক বোমা, 'থিনম্যান' নিয়ে 'এনোলা গে' ঢুকে পড়েছে হিরোশিমার আকাশে। পেছনেই আর একটি বিমান, 'ছোট আর্টিস্ট'। যার কাজ ছিল ছবি তোলা। প্রলয়ের ছবি।

কাওয়ামোতো হঠাৎ চোখ মেলে তাকালো। চোখ চলে গেল জানালার ধারে বসে থাকা ফুজিমোতোর দিকে। তার বাবা ছিলেন একজন ডাক্তার। হঠাৎ ফুজিমোতো বলে উঠল—আরে, ওই দ্যাখ একটা বি-২৯। অন্য ছেলেরা সবাই ধ্যান করছে। কেউই চোখ খুলল না। কাওয়ামোতোর বড় বেশি কৌতূহল। সে জানলার কাছে যাবার জন্যে চেয়ার ছেড়ে উঠল। জানলার দিকে এগোচ্ছে, এমন সময় আকাশে আলোর ঝিলিক। কোনও শব্দ নেই, শুধু বিদ্যুতের একটা ঝিলিক, আকাশ ফেঁড়ে ফেলল। বায়ুমণ্ডল যেন থরথর করে কাঁপছে। খারাপ হয়ে গেলে টেলিভিশানের পর্দা যেমন কাঁপে।

তারপর অচৈতন্য। কানে অস্পষ্ট বিদ্যালয়-সংগীত, হিরোশিমার সন্ধ্যার আকাশে সাদা বৃষ্টিধারা। ফোটা ফুলের পাপড়ির রঙ হালকা হয়ে আসছে। বসন্ত চলে যায়। তবু আমরা দাঁড়িয়ে আছি ঠিকই, কোমর বেঁধে। আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যের স্বপ্ন অমলিন। কাওয়ামোতো চেতনা হারাবার আগে তার বন্ধুর নাম ধরে ডেকে উঠল—ওটা। পালিশকরা শহুরে ছেলে। বুদ্ধিমান। তার নাক কাওয়ামোতোর মতো থ্যাবড়া নয়, খাড়া।

কাওয়ামোতোর যখন চেতনা এল, তখন সব জ্বলছে। সেই আগুনে পুড়ছে প্রিয় বন্ধু ওটা। কাওয়ামোতো ছুটে চলে এল খেলার মাঠে। কালো, ঘন ধোঁয়ায় চারপাশ আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে নীল আকাশের উঁকি। কাওয়ামোতো বিভ্রান্ত। জানে না কোন দিকে ছোটা নিরাপদ। কে যেন চিৎকার করে বলে উঠল, 'বাতাসের দিকে ছোট, বাতাসের দিকে ছোট।' সেই অবস্থাতেই কাওয়ামোতো এক মুঠো বালি তুলে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিল। বোঝা গেল বাতাসের গতি কোন দিকে। সর্বত্র আগুন আর আগুন। বাতাসে আগুন ধরে গেছে। সারা মাঠে ছড়িয়ে আছে মৃতদেহ। অনেকের তখনও প্রাণ আছে। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

হঠাৎ কাওয়ামোতো দেখতে পেল তার প্রধান শিক্ষককে। সারা দেহ পুড়ে এমনভাবে ঝলসে গেছে যে চেনাই যায় না। কাওয়ামোতো চিনতে পারল তাঁর কণ্ঠস্বরে। পরনে তাঁর কিছুই নেই, শুধু আন্ডারপ্যান্টটি লেগে আছে। সেই অবস্থাতেই তিনি একটা ঠেলা গাড়ি টেনে আনছেন। সেই গাড়িতে রয়েছে কাওয়ামোতোরই কয়েকজন সহপাঠী। প্রধান শিক্ষককে সাহায্যের জন্যে কাওয়ামোতো এগিয়ে গেল। কোথায় চলেছে জানা নেই। কিভাবেই বা এগোবে? নিমেষে একটা শহর একেবারে ধ্বংসস্তূপ। আগুন আর ছাই। মাঝে মাঝেই ঠেলাগাড়িটাকে দুপাশ থেকে তুলে ধরে পড়ে থাকা মৃতদেহ পার করাতে হচ্ছিল। যাদের তখনও প্রাণ ছিল তারা কাওয়ামোতো আর প্রধান শিক্ষকের পা চেপে ধরছিল। সাহায্যের জন্যে করুণ আকুতি।

হিরোসিমা : মধ্যাহ্ন আঁধারে মৃত্যুর স্তব্ধতা

অবশেষে তারা এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছল যেখানে আগুন নেই। একপাশে কয়েক টিন তেল গড়াগড়ি যাচ্ছিল। খানিকটা কাপড় সেই তেলে ভিজিয়ে দুজনে মিলে দগ্ধ ছাত্রদের গায়ে বোলাতে লাগল। এ ছাড়া আর কিছু মাথায় এল না। করার কিছু ছিলও না। রাস্তা-ঘাট-মাঠ সব তেতে উঠছে হুহু করে। আণবিক বোমা থেকে যে ভূ-উত্তাপ নির্গত হয়েছিল তার মাত্রা ছিল ৩০০০° সেন্টিগ্রেড বা ৫৪০০° ফারেনহাইট। এর অর্ধেক উত্তাপেই লোহা গলে যায়। 'আমাদের দুজনেরই আর কথা বলার ক্ষমতা ছিল না তখন। একটু জল। একটু জল কোথায় পাই! চোখের সামনেই ওই গাড়িতে আমার দুই সহপাঠী মারা গেল।' সেই তাণ্ডব থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া কাওয়ামোতো আজ প্রৌঢ়। সম্প্রতি হিরোশিমা পিস মেমোরিয়াল মিউজিয়ামের ডিরেক্টার নির্বাচিত হয়েছেন। সেদিন যাঁরা বেঁচে গিয়ে

আজও জীবিত আছেন আধুনিক জাপান তাঁদের বলেন 'হিবাকুশা'। শব্দটি তেমন গৌরবের নয়। প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে প্রশ্ন, সবাই যখন মারা গেল তুমি কেন বেঁচে? শব্দটির মধ্যে করুণা আছে, প্রত্যাখ্যান আছে। কাওয়ামোতো নিজেকে 'হিবাকুশা' বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পান, বেঁচে আছেন ভেবে লজ্জা পান। স্বপ্নে দেখতে পান তাঁর সহপাঠী ওটা ধীরে ধীরে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। রাতের ঘুম তাঁকে ত্যাগ করেছে।

দীর্ঘ ৪১ বছর পরেও প্রৌঢ়ের স্মৃতিতে হিরোশিমা আজও জ্বলছে। কিশোর কাওয়ামোতো টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে কিয়োবাশি নদীর দিকে। অসহনীয় উত্তাপে শরীরে ফোস্কা উঠছে। মাটিতে পা রাখা যাচ্ছে না। চারপাশে ছড়িয়ে আছে কালো, ঝলসানো মৃতদেহ। মৃত মায়ের স্তন কামড়ে রয়েছে জীবন্ত শিশু। মৃত মাকে ছোট ছোট হাতের ঘুসি মেরে জাগাবার চেষ্টা করছে অবুঝ শিশু। মিউকি ব্রিজের কাছে অন্ধের মতো টাল খাচ্ছে সহপাঠী কিমুরা। তার মুখটা পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। অস্পষ্ট স্বরে সে শুধু বলছে, 'আমি বাড়ি যাই। আমি বাড়ি যাই।' 'বাড়ি ফেরার কথা ভুলে যাও। বাড়ি আর নেই।' তবু সে নেশাগ্রস্তের মতো, আগুনের আকর্ষণে ছুটে চলা পতঙ্গের মতো সোজা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল অগ্নিকুণ্ডে। তার দেহাবশেষটুকুও আর পাওয়া গেল না পরে। সেদিন মানুষের আচার-আচরণ এই রকম ভূতগ্রস্তের মতোই হয়ে পড়েছিল। আগুনের উল্টোদিকে না ছুটে কাতারে কাতারে ছুটে গিয়ে ঝাঁপ মেরেছিল আণবিক চুল্লিতে।

কাওয়ামোতোর আজও স্পষ্ট মনে পড়ে কিভাবে সে দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে এসে পৌঁছেছিল মিউকি ব্রিজের কাছে। ধাপের পর ধাপ ভেঙ্গে টাল খেয়ে উল্টে পড়েছে নদীর কিনারে। তারই মাঝে এক ঢোঁক জলের আশায় পোড়া পোড়া উলঙ্গ মানুষের দল, মৃত, অর্ধমৃত, ঘোলা, কর্দমাক্ত জলে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। সেই দলে কাওয়ামোতোও ছিল। এক চুমুক জল মুখে নিয়েই ফেলে দিয়েছিল থুথু করে।

পরের দিন জাপানের প্রখ্যাত আণবিক বিজ্ঞানী ইয়োশিও নিশিনাকে পাঠান হল বিধ্বস্ত হিরোশিমায়। বিমানে গোলমাল দেখা দেওয়ায় সেদিন তিনি ফিরে এলেন। আগস্টের আট তারিখে নিশিনার বিমান যখন হিরোশিমার আকাশে এল, নিচের দিকে তাকিয়ে তিনি স্তম্ভিত। কোথায় গেল অত বড় একটা প্রাণচঞ্চল শহর! বিশাল এক ধ্বংসস্তূপ তখনও ভলভল করে ধোঁয়া ছাড়ছে। একটি মাত্র বোমা। উড়ে গেল বিশাল এক শহর। বিমান নামামাত্রই দৌড়ে এলেন বিমানক্ষেত্রের সামরিক অফিসার। তাঁর মুখের একটা পাশ পুড়ে ঝলসে গেছে। অপর পাশ অক্ষত। পোড়া দিকটা দেখিয়ে তিনি বললেন, 'শরীরের যে অংশ উন্মুক্ত সেই অংশ পুড়ে ঝলসে যাবে, যে অংশ সামান্য আচ্ছাদিত সেই অংশ পোড়ার হাত থেকে বাঁচবে। তার মানে বাঁচার উপায় আছে।' নিশিনার বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ শুরু হল। বোমা যেখানে ফেটেছে তার চারপাশে ৬৫০ গজের মধ্যে সমস্ত ছাদের টালি দশমিক ০০৪ ইঞ্চির মতো গলে গেছে। কি ভয়ঙ্কর উত্তাপ! যেখানে যেখানে কাঠের দেওয়াল তখনও দাঁড়িয়ে আছে সেখানে জায়গায় জায়গায় মানুষ অথবা অন্য বস্তুর ছাপ ধরে গেছে। প্রচণ্ড উত্তাপ আর সহস্র সূর্যের দীপ্তিতে চারপাশ ঝলসে গেছে শুধু সেই অংশটি ছাড়া, যে অংশ ছিল শরীর অথবা বস্তুর আড়ালে। এর থেকে নিশিনা হিসেব করতে পারলেন জমি থেকে কতটা উঁচুতে বোমাটি ফেটেছিল। বোমা বিস্ফোরণের ঠিক তলার জমি খুঁড়ে নিশিনা তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা করলেন। ঠিক চার মাস পরে তাঁর সারা শরীরে ফুটে উঠল ছাপকা ছাপকা দাগ। তেজস্ক্রিয়তার শিকার হলেন তিনি।

জেনারেল গ্রোভস এক সমাবেশে বেশ খোস মেজাজে বললেন, 'তেজস্ক্রিয়তা! আরে তেজস্ক্রিয়তায় মৃত্যু তো বড় মধুর। ভেরি প্লেজান্ট।' তাঁর ভাষণ শুনে লস আলামোসের বিজ্ঞানীদের রক্ত ফুটে উঠল। বলে কি! কয়েক দিন আগে তাঁদেরই এক তরুণ সহকর্মী ডাগনিয়ানের ডান হাতে র‍্যাডিয়েশান লেগেছিল। তিলে তিলে যন্ত্রণাকাতর মৃত্যুর ছবি চোখের সামনে। দেখতে দেখতে হাত ফুলে উঠল। অসাড়। অবশ। ভুল বকা। অসহ্য যন্ত্রণা! মাথার সব চুল ঝরে গেছে। রক্তের শ্বেতকণিকা হুহু করে বাড়ছে। চব্বিশ দিনের মধ্যে ডাগনিয়ান মারা গেলেন।

হিরোশিমা, নাগাসাকিতে যাঁরা সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন তাঁরা ভাগ্যবান। যাঁরা তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হলেন তাঁদের হল 'ভেরি প্লেজেন্ট' ডেথ। যেমন হল ডাগনিয়ানের। বিজ্ঞানের তো হৃদয় নেই। মৃত্যুর পেছন পেছন ক্যামেরা হাতে ছুটে এলেন চিত্রগুপ্তের দল, ইতিহাসের সন্ধানে। মৃত্যুকে ছবি করে বিজ্ঞানের আর্কাইভে রাখতে হবে ভবিষ্যতের জন্যে। হিরোশিমার মানুষ, নাগাসাকির মানুষ কিভাবে মরেছিল? রক্ত তুলে। গলে গিয়ে। ফেটে গিয়ে। ফুলে উঠে। চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। বুকের একপাশ গলে পড়ে গেছে। মুখ নেই প্রাণ আছে। সারা গায়ে দগদগে ফোস্কা। কিমোনোর ফুল আর নকশার ছাপ নগ্ন শরীরে। চুল ঝরে গেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেঁকে গেছে। আমেরিকান জেনারেল লেসলি গ্রোভসের 'মধুর মৃত্যু'।

জীব জগতে মানুষ হল নিষ্ঠুরতম প্রাণী। জাপানের বায়ুমণ্ডল তেজস্ক্রিয় আগুনে জ্বলছে। দুটি শহরে যখন মৃত্যুর স্তব্ধতা। নেমে এসেছে মধ্যাহ্ন আঁধার। নদীর জল যখন নরকের কাদার মতো ফুটছে। গলে গলে পড়ছে, ধাতু, ইট, কাঠ, পাথর। ঘন কালো মেঘে আকাশ অদৃশ্য। মানুষের হাতে খুলে এসেছে তারই শরীরের চামড়া কোটের মতো। তখন আমেরিকার মানুষ সাফল্যের উল্লাসে পথে পথে নৃত্য করছে। শ্যাম্পেনের বোতল খোলা হচ্ছে। লস আলামোসের আকাশে লক্ষ তারার ফুলঝুরি। প্রখ্যাত গাইয়ে বাজিয়ের দল পথপরিক্রমা করছে। উৎসব। শুধু উৎসব। ঐতিহাসিক পল বোয়ার সম্প্রতি একটি বই প্রকাশ করেছেন—By the Bombs Early Light. হিরোশিমায় প্রথম বোমাটি বিস্ফোরিত হবার বছর পাঁচেকের মধ্যে আমেরিকায় একটা আণবিক সংস্কৃতি দানা বেঁধে উঠল। জাতীয় অহঙ্কার উদ্ধত। আমেরিকাই একমাত্র দেশ যার প্রভূত অর্থবলে পৃথিবীর একমাত্র কারখানায় চব্বিশ ঘণ্টা বোমা তৈরির কাজে মশগুল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর দল। সারা দেশ বুঝে গেছে, বিশাল একটা কিছু ঘটাবার ক্ষমতা আমেরিকার আছে। আর এই বোমা হল জাতির পক্ষে কল্যাণকর। বড় বড় দোকানে আণবিক নিদর্শনসমূহ বিক্রি হতে লাগল। নিউ মেকসিকোর যে মরুভূমিতে পরীক্ষামূলক বোমাটি ফাটানো হয়েছিল, সেই মরুভূমির বালি উত্তাপে কাঁচের কণায় পরিণত হয়েছিল। সেই কাঁচের টুকরোয় তৈরি হয়েছিল কস্টিউম জুয়েলারি। কি তার চাহিদা! আবার এক লাস্যময়ী চিত্রাভিনেত্রীর বিশেষণ হল 'The Anatomic Bomb'। আবার কেক তৈরি হল আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর ব্যাঙের-ছাতা মেঘের আকারে। মাশরুম ক্লাউড অ্যাটমিক কেক। আমেরিকায় তখন 'অ্যাটমিক কালচার' ছাড়া আর বিশেষ কিছু পাত্তা পাচ্ছে না। দি নিউইয়র্ক টাইমসে জেমস রেস্টন লিখলেন, 'দশ হাজার মাইল দূরে বসে মানুষ সেই বিশাল বিস্ফোরণে প্রত্যক্ষ করলেন আমেরিকার ভবিষ্যৎ।' আনন্দ আর সাফল্যের উন্মাদনার পাশাপাশি আশঙ্কার ছবিও ফুটতে লাগল। দি ওয়াশিংটন পোস্ট সেই 'টেরিবল ফ্ল্যাশে' যে ভবিষ্যৎ দেখলেন, তা হল, বিশ্বে মানুষের আয়ুষ্কাল অপরিমেয় কমে গেল। ঐতিহাসিক বোয়ার লিখছেন, 'এই যে আণবিক সংস্কৃতি গড়ে উঠল তাতে একটি চেতনা হৃদস্পন্দনের মতো দপদপ করতে লাগল—গ্লোবাল অ্যানিহিলেশান—বিশ্বের অসতর্ক অবলুপ্তি।

হেরম্যান তাঁর মহাকাব্য, দি বম্ব দ্যাট ফেল অন অ্যামেরিকায় লিখলেন,

আমেরিকায় যখন বোমা পড়ল, পড়ল
জনগণের মাথায়।
হিরোশিমায় মানুষ গলে গিয়েছিল
আমেরিকার মানুষের শরীর গেল না।
কিন্তু যা গেল তা আরও সাংঘাতিক,
অতীত আর ভবিষ্যতের সঙ্গে মানুষের
সংযোগ ৷৷
পৃথিবীতে নতুন কিছু একটা ঘটল, যা ছিল
সে ভূমিতে আর পা রইল না মানুষের।
ভয়াল ভয়ঙ্কর বিশাল বিশাল এক
দিগন্তের হাতছানিতে সভ্যতা কোল
ছাড়া ৷৷
পৃথিবীর মাটি এক সময় কত কঠিন মনে
হত, মেন স্ট্রিট কোথায়!
কোথায় তার শানবাঁধানো শক্ত তেলা
ভূমি!
এ তো দেখি পায়ের তলায় থল থল
করছে বিশাল এক জেলি।
কাঁপছে, কুঁকড়ে যাচ্ছে, ছেড়ে ছেড়ে
যাচ্ছে,
What have we done, my country,
what have we done? (ক্রমশ)

আরও
উপায়ের
দিয়ে

বইখাতা নিয়ে তরুণ কিশোরের দল ডিঙি বেয়ে চলেছে হুগলি নদীতে। নৈহাটির ঘাট ছেড়ে হুগলির ঘাটে। স্কুল ছুটি হলে ফের ঘরে ফেরা নৌকোয়। হঠাৎ কেউ জলে পড়ে যায়। নৌকো ডোবে মাঝে মাঝে। ওরা যদি বা সাঁতরে উঠতে পারে বই-খাতা বাঁচাতে পারে না। এতে ইতি পড়ে অধ্যয়নে অনেক মেধাবী ছাত্রেরও।

এরকম একটা পরিস্থিতি দেখে মিটিং ডাকা হল স্কুলের গবরনিং বডির। সিদ্ধান্ত হল, পারাপারের বিপদে বইখাতা জলে গেলেও পড়ায় জলাঞ্জলি দিতে হবে না কারো। স্কুল কর্তৃপক্ষই বই দিয়ে সাহায্য করবেন তাদের।

হুগলি মহসিন কলেজের সঙ্গে যুক্ত তখনকার এই স্কুলটির ইতিহাসের পুরনো পাতা ঘাঁটলে এই তথ্যটি জানা যাবে। আরো জানা যাবে, সেদিনকার নৌকোয় পারাপার করা ছাত্রদের মধ্যে থাকতো কাঁটালপাড়ার চাটুজ্যে বাড়ির এক কিশোর, নাম বঙ্কিমচন্দ্র।

আজ নৈহাটিতে তাঁরই নামে কলেজ পর্যন্ত হয়েছে; কিন্তু সেদিন স্কুলও ছিল না। তাই হুগলিতে পাড়ি দেওয়া। ফলে ছাত্র ভিড় উপচে উঠতে থাকে হুগলির স্কুলে। নতুন শাখা অবধি খুলতে হয় শহরের প্রান্তে। তাতে বঙ্গের বিদ্যোৎসাহীদের অর্থানুদানও মেলে। এবং আশ্চর্য সংযোগ, এই শাখা বা ব্রাঞ্চ স্কুলেই পরবর্তীকালে কয়েক ক্রোশ পথ পায়দল মেরে এসে ভরতি হন বঙ্কিমচন্দ্রর পরবর্তী বঙ্গের আর এক 'উজ্জ্বল চাটুজ্যে 'চন্দ্র' শরৎচন্দ্র। তিনি অবশ্য পরে কাছাকাছিই এক আত্মীয় বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন। এবং বাধ্য হন পাঠ সাঙ্গ করে অন্যত্র যেতে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও পাঁচ মাইল হেঁটে পড়তে আসতে হোত বনগ্রামের বিদ্যালয়ে। এমনি কষ্ট, কৃচ্ছ্র-সাধনই গ্রামজীবনে পাঠের প্রধান সাধন। আগেও ছিল, আজও আছে তাই।

কথাটার প্রতিবাদের আশঙ্কা আছে। পরিসংখ্যানও পেশ হতে পারে। গ্রামাঞ্চলে গরিবদের জন্য কেবল নির্বেতন শিক্ষা নয়, বই-খাতা, স্লেট-পেনসিল, পোশাক, দুপুরের খাবার পর্যন্ত কিছু কিছু ব্যবস্থা হয়েছে। রাজ্য মধ্যে এখন প্রায় পঞ্চাশ হাজার প্রাথমিক স্কুল। মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক হাজার দশেক। আর এসবে পাঠরত যথাক্রমে আশি লক্ষ এবং পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছেলেমেয়ে। বিপুল আয়োজন। চতুর্দিকে শিক্ষসত্র খোলা। পশ্চিমবঙ্গে ছ' কোটির মতো মানুষ আর ছ'শ কোটি টাকার ওপর বছরে শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ। এর পরে আর বলার কী আছে?

আছে। চব্বিশপরগনার নৈহাটীতে কলেজ হলেও দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় আসুন। দেখবেন, ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা, পাথরপ্রতিমা, মন্দিরবাজারে কীরকম দুরন্ত নদীতে খেয়া দিয়ে আজও ছেলে-মেয়ে পড়তে আসে দূর গঞ্জ থেকে। আসে বাঘের জঙ্গল পেরিয়ে। এই তো ক'বছর আগে আমি বাসন্তীর এক স্কুলে গিয়ে দেখি স্কুল ছুটি। কারণ, তাদের একটি ছাত্র স্কুলের পথে বাঘের হাতে সেদিন প্রাণ দিয়েছে। এমনি ঘটনা ঘটে। কখনো খেয়ায় উঠতে গিয়ে টের পায় ওরা, পাশেই খাড়িতে ওৎ পেতে আছে মানুষ-খেকো কুমির। তবু ঝুঁকি নিয়ে কিছু মা-বাপ ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে পাঠান। গাঁয়ে স্কুল নেই। কিছু লোক এই অবস্থায় বসে যায় বয়ে যায়। কেউ-বা ক্ষেতির কাজে নামে, 'জন' খাটে। ক্ষেতমজুরি করে। ব্যস। এর সদুত্তর পরিসংখ্যানে নেই। কেবল একটি মোক্ষম প্রশ্নই পেশ করা যায় পরিসংখ্যানের সামনে। এতো অর্থ, এতো আয়োজন, এতো বিদ্যাপীঠ, তবু কেন শিক্ষায় পেছিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ? এ কেবল পেছিয়ে পড়া নয়, দ্রুত, সশব্দ পতন। ভাতায়। তা হলে বাকি কী রইল!

বলছি না, শিক্ষকের বা তাঁদের ভাতার দরকার নেই। কিন্তু কতো দরকার, কতো শিক্ষক, আছেন, আরো কতো চাই? না তার কোনো হিসাব নেই। হিসাবই নেই? হাঁ, তাই। কথাটা আমার নয়, রাজ্য সরকার নিয়োজিত শিক্ষা তদন্ত কমিটিই সখেদে বলেছেন এই কথা তাদের রিপোরটে। রাজ্যে কতো শিক্ষক, কতো, ছাত্র, কতো স্কুল তার কোন তথ্য না দিতে পেরেছেন শিক্ষা অধিকারের দফতর, না দিতে পেরেছেন কোনো জেলার স্কুল বোরড। আর টাকা-পয়সার হিসাব? সে তো নয়-ছয়ে ছয়লাপ। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। আগে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সারা ভারত

এই বাংলারই একটি গ্রাম্য স্কুল—'পাঠশালাটি দোকান ঘরে/ গুরুমশাই দোকান করে' — *ছবি : অজয় দে*

শিক্ষা-সারভে রিপোরটের দিক তাকাই। প্রাক্-স্বাধীনতাকালে ত্রিবাংকুর (বর্তমান কেরল) এবং বরোদা এই দুটি দেশীয় রাজ্য ছাড়া শিক্ষায় সবার আগে ছিল এই বঙ্গের স্থান। স্বাধীনতার পরে ধীরে ধীরে আমরা নেমে গেছি নিচে এবং সম্প্রতি দ্রুত পতনে ভারতের শিক্ষায় অনগ্রসর নয়টি রাজ্যের মধ্যে ঠেকেছে আমাদের অবস্থান। তাও অস্থির। বোধহয় আরও নামতে হবে।

এখানে কেন এমন উল্টোরথ সরস্বতীর? শহরের কিছু সুসজ্জিত স্কুল-কলেজ দেখে আমরা বিভ্রান্ত হই। কিন্তু গ্রামবাংলায় এখনো সেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর 'পালকির গান'-এর 'পাঠশালাটি দোকান ঘরে/গুরুমশাই দোকান করে।' পশ্চিমবঙ্গের ছ'কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় সাড়ে চার কোটির বাস এই গ্রামবাংলায়। আর রাজ্যের বাজেটে শিক্ষাখাতে ছয় শ কোটি টাকা বরাদ্দের যে বিবরণী, তাতেও মোহ সৃষ্টি হতে পারে। সেটাও দূর হবে যদি এ টাকার বিলি-বন্টনের খতিয়ানটা জানি। এই ছয় শ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় সাড়ে চারশ কোটি টাকাই বেরিয়ে যায় শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের বেতন

যোজনা কমিশন ও অষ্টম অর্থ-কমিশনের কাছে রাজ্যের শিক্ষা দফতর যে রিপোরট পেশ করেন তাতে বলা হয় এরাজ্যে মোট উনপঞ্চাশ হাজার প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। এর অর্ধেকের বেশি স্কুলের নিজস্ব ঘর নেই। অতএব অর্থ চাই ইত্যাদি।

অথচ চতুর্থ সর্বভারতীয় শিক্ষা সারভে কমিটি দেখেন, পশ্চিমবঙ্গে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় বিয়াল্লিশ হাজার ছয় শ উনষাটটি। তাহলে কাগুজে স্কুলই কি সাড়ে ছয় হাজার? এর পরেও অবশ্য রাজ্য শিক্ষাদফতরের হিসাবে আরও তিন হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা বলা হয়েছে। একথা সত্যি বলে ধরে নিলেও তো ফাঁক থেকে যায়। তিন হাজার স্কুলের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না।

যেগুলির অস্তিত্ব আছে তার হাল কী? বহুকাল আগে বিভূতিভূষণের স্মৃতি বিজড়িত একটি পাঠশালার সন্ধান করতে গিয়েছিলাম হুগলির সাগঞ্জ-কেওটায়। সেখানে একটি কাঁঠাল

গাছ ঘিরে এক ঢিবি দেখিয়ে সে আমলের কিছু ছাত্র বললেন, এই সেই স্কুল। এখানে এঁটেল মাটির শক্ত মেঝেতে গর্ত করে 'অ-আ-ক-খ' খোদাই থাকতো। ছাত্ররা তার মধ্য দিয়ে কঞ্চির কলম চালিয়ে লেখা মকশ করতো। সেটা ব্লাকবোরডের যুগ নয়। একালের সঙ্গে তার তুলনা হবে না বলে প্রবীণেরা তাকালেন আমার দিকে।

কিন্তু একালেও কি গাছতলায় স্কুল বসছে না? ঘর আছে? বসবার আসন আছে ছাত্রদের? আছে কি সব স্কুলে ব্লাকবোরড?

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-সারভে রিপোরট বলছে এরাজ্যে পনের হাজার স্কুলে ব্লাকবোরড নেই। 'নেই'-এর তালিকা দীর্ঘতর। যেমন ঘোষিত কাগজের স্কুলের অস্তিত্ব নেই, তেমনি যেগুলি আছে তার মধ্যে পঁয়ত্রিশ হাজার আট শ' চুরাশিটি স্কুলে নেই পায়খানা প্রস্রাবের জায়গা, বাইশ হাজার বিদ্যালয়ে নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা। পঁচিশ হাজার স্কুলের নেই খেলার মাঠ, ত্রিশ হাজারের নেই গ্রন্থাগার ইত্যাদি। কেবল নেই আর নেই। শিক্ষা সারভে রিপোরট আরও জানাচ্ছে—এই রাজ্যে আঠার শ ছিয়াশিটি স্কুল বসে উন্মুক্ত আকাশের নিচে, তিপ্পান্নটি বসে তাঁবুতে, ছয় হাজার নয় শ' বারটি বিদ্যালয় ঝুপরিতে বসে। সতের হাজার স্কুল আছে কাঁচাবাড়িতে।

আছে বলা মুশকিল। এই কাঁচা বাড়ির স্কুলগুলি প্রায় ফি বছরই ঝড়-বন্যায় লোপাট হয়। যেমন আটাত্তরে যেসব স্কুলের কাঁচা বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়েছে আজও তার সবগুলি নতুন করে তৈরি করা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যেই ফের ঝাপটা, এবারকার বন্যা। আবার গেল বহু কাঁচা বাড়ি। পাকা বাড়িগুলিও পড়ো-পড়ো। যেমন হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর থানার কানুপাট-এর একটি পাকা স্কুল বাড়ির দশা দেখে এলাম। এখানকার পল্লীমঙ্গল শিক্ষায়তনের পাকা বাড়িটির সর্বত্র জল ঝরছে। চার শ ছাত্রর মাথার উপরে বিপদের খাঁড়ার মতো জীর্ণ ছাত ঝুলছে। দীর্ঘ দিন ধরে এরা সরকারের কাছে বাড়ি মেরামতের টাকা চেয়েও পায়নি। এবার কিছু হলে আর সংস্কারে কুলোবে না, নব-নির্মাণ ছাড়া পথ নেই। সে সামর্থ্যও নেই ওদের। ফলে স্কুলটা অন্তিম দিন গুণছে। এমনি দশা প্রায় সর্বত্র।

ছবি. তারাপদ ব্যানার্জি

ব্যাপরটা অস্বীকার করতে পারছেন না রাজ্য সরকারও। শিক্ষাদফতরও বলছে, এখানে হাজার হাজার স্কুলবাড়ির ঘরই নেই। স্কুল বসছে লোকের বাড়ির দাওয়ায়, দোকানে, গাছতলায়, খোলা মাঠে। অতএব এসবের উন্নতি চাই, তাই চাই অর্থ। রাজ্য সরকার বাজেটের মোট পঁচিশ ভাগই বরাদ্দ করলেন শিক্ষাখাতে। কেন্দ্রের কাছেও চাইলেন টাকা। জেলায় জেলায় গঠিত হল স্কুল বোরড। প্রাথমিক শিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে বলে আলাদা বোরডও হল তার জন্য। টাকা যেতে লাগল জেলা বোরডে, এবং সেখান থেকে—কোথায়? রাজ্য সরকার বিনয়কুমার লাহিড়ীকে সভাপতি করে এক শিক্ষা তদন্ত কমিটি নিয়োগ করলেন সব দেখে শুনে রিপোর্ট দিতে। এ-বছর কয়েক মাস আগে সে রিপোরট জমা পড়েছে। তাজ্জব হতে হবে সে রিপোর্ট দেখলে। লাহিড়ী কমিটি প্রথমেই অভিযোগ করেছেন, শিক্ষা আধিকারিকের দফতর এবং জেলা স্কুলবোর্ডগুলি থেকে তিনি তেমন কোন সহযোগিতা পাননি, তথ্যও পাওয়া যায়নি কিছু তাদের কাছ থেকে। এতে কাজের খুব অসুবিধা হয়েছে। তবু যা তথ্য ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে সে ভয়াবহ। রিপোর্টে বলা হয়েছে বহু সংখ্যক স্কুলের শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা জমা পড়েনি বছরের পর বছর। এক খাতের টাকা অন্য খাতে খরচ করা হয়েছে। তপশিলি, উপজাতি ও গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য জামাকাপড়ের টাকা গায়েব হয়েছে। টিফিনের টাকা চুরি হচ্ছে। স্কুলবাড়ি তৈরির জন্য দেওয়া টাকায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বোরডের কর্মী প্রভৃতির বাড়ি তৈরি হয়েছে। শিক্ষক-ছাত্রর সঠিক হিসাব কোনো বোরডের কাছেই নেই। বহু ক্ষেত্রেই সংখ্যা বাড়িয়ে বিল করে টাকা নেওয়া ও ব্যক্তিগত পকেট পুরণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এবং কতোটা বেপরোয়াভাবে চুরি চলছে তার এক মারাত্মক ঘটনা শিক্ষামন্ত্রীর এলাকা গাইঘাটা থেকেই কিছু দিন আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় ফাঁস করে দেন এক প্রতিবেদক। এখানকার এক এল ডি ক্লারক এক বছর ধরে স্কুলের বেতনের বিলের সময় বাড়তি দু লক্ষ, এক হাজার চার শ' পঁয়ষট্টি টাকা চৌত্রিশ পয়সা বিল করে তা হাপিস করে দেয়। অথচ তদন্ত কমিটির নজরে আসার আগে পর্যন্ত তার নামে কোন অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। ব্যাপারটা দেখে বিস্মিত কমিটির প্রশ্ন, এটা হল কী করে? এক হাতে তো হতে পারে না!

লোয়ার ডিভিশন করনিক বিলে কারচুপি করলেও সেই বিল তো হেড অ্যাসিসট্যান্ট, বোরডের অ্যাকাউন্ট্যানট এবং ফিনানস অফিসারের হাত দিয়ে তাঁদের স্বাক্ষর যুক্ত হয়ে বেরোবে। তাঁরা কী করলেন?

যে রাজ্যে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছ'শ কোটি টাকা, সেখানেই

তদন্ত কমিটির পুরো রিপোরট দেখলে জেলায় জেলায় কী কাণ্ড হচ্ছে তার আরো ন্যক্কারজনক সব নজির মিলবে। এতে দেখা যাবে কোচবিহার, হুগলি, মুরশিদাবাদ এবং পশ্চিমদিনাজপুর বাদে অন্য কোনো জেলাবোরডই প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা নিয়ম মতো জমা দেননি। কোথাও কোথাও চার-পাঁচ-দশ বছর পর্যন্ত এই অনিয়ম চলছে। চব্বিশপরগনার চিত্র সব চাইতে খারাপ। এখানে বাইশ হাজার প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক গত আট-দশ বছর ধরে তাদের প্রভিডেন্ট ফানডের টাকার ওপর প্রাপ্য সুদ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। স্কুল-বোরড ও প্রভিডেন্টফাণ্ড অ্যাকাউনটে সাত কোটি টাকার মতো জমা দেয়নি ওরা।

কোনো জেলা বোর্ডই আপ-টু-ডেট করেনি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড অ্যাকাউন্ট। সব জেলা মিলিয়ে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের চোদ্দ কোটি টাকা বকেয়া।

এ তো বকেয়ার কথা। চুরির কথা দেখা যাক। জলপাইগুড়ি স্কুল বোর্ডে পল্লী অঞ্চলে শিক্ষাপ্রচারের জন্য একটি অডিও ভিশ্যুয়াল মোবাইল ইউনিট ভ্যান ছিল। পঁচাত্তর-এর সাত
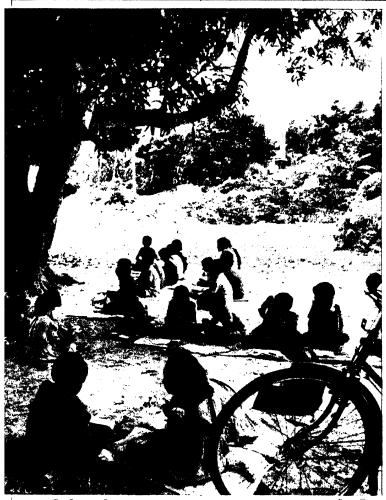
গাছতলায় শিক্ষাবিস্তারের অভিনব আয়োজন। *ছবি : রাজীব বসু*

জুন সেটি বিকল হয়। মেরামতের জন্য পাঠানো হয় ছয় জুলাই। এক কোম্পানির কাছে। কিন্তু দশ বছরেও সে ভ্যান আর ফেরত আসেনি। আরও মজার ব্যাপার, তদন্ত কমিটি দেখল ওই দশ বছরে ভ্যানটির জন্য কোন তাগিদও দেয়নি বোরড। ওটি 'গয়াং গচ্ছ' হয়েছে---তবে নিশ্চয়ই বিনা দক্ষিণায় নয়।

গ্রামে গরিব ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই দু বেলা খেতে পায় না। স্কুল করবে কি! তাই সরকার এদের জন্য 'মিড-ডে-মিল' চালু করেন। এই পরিকল্পনায় রুটি দেওয়ার নিয়ম ছাত্রদের। মোটা টাকা বরাদ্দ আছে এ বাবদে। 'বেকারি'র সঙ্গে টেণ্ডার ডেকে চুক্তি করতে হবে। কিন্তু দেখা গেল কোচবিহার স্কুল বোরড সেসব সরাসরি না করে কয়েকজন 'সারভিস বয়' নিয়োগ করেছে। তারাই বেকারির সঙ্গে 'ব্যবস্থা' করে রুটি দেয়। এদের মাইনেটা ওই অভুক্ত ছাত্রদের রুটির টাকা থেকেই যাচ্ছে। কে এর অনুমতি দিল? কেউ জিজ্ঞেস করছে না। কিন্তু তদন্তে ধরা পড়ল, বেকারি আর 'সারভিস বয়'দের মধ্যে জালিয়াতি। অনেক হাজার টাকার হিসাবেরও গরমিল। আশ্চর্য, বোরডের এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য নেই।

আবার নদীয়ায় দেখা গেল বোরড হঠাৎ শিক্ষা আধিকারিকের অনুমোদন ছাড়াই কয়েকটি গ্রাম-পঞ্চায়েতের হাতে উনিশ কোটি টাকা দিয়ে দিলেন। তারাই নাকি স্কুলে স্কুলে রুটি সরবরাহ করবে। কে তাদের এ অধিকার দিল? কোনো সংস্থাকে দিয়ে এসব করতে হলে আগে সরকারি অনুমোদন দরকার। বলা বাহুল্য অর্থ বিভাগ কখনই এ-ধরনের ব্যবস্থায় অনুমোদন দিতে পারে না। বোর্ডও দেখা গেল কোন কানুনের তোয়াক্কা না করে পঞ্চায়েতকে খাতির করল। আর পঞ্চায়েত কি করল? তারা রুটির জায়গায় দু'মুঠো করে মুড়ি দিতে লাগল গরিব বিদায়ের মতো। পরিমাণ যা-ই হোক এটাও বেআইনি। রুটির টাকায় মুড়ি বা অন্য কিছু দেওয়া চলে না। তবে দু'তরফে রাজনৈতিক দলীয় বোঝাপড়া থাকলে বোধহয় চলে। সেই জন্যই এরকম ঘটনা আরও ঘটে। চব্বিশপরগনার জেলা বোর্ড হঠাৎ চোদ্দ লাখ টাকা দিয়ে দিলেন জেলা পরিষদের হাতে। কেন? তারা নাকি জেলার স্কুল বাড়িগুলি সংস্কার করে দেবে। কিন্তু কটা বাড়ি সংস্কার করা হবে, কতটা হবে, কতো টাকা দরকার তার জন্য, কোথায় সেসব এসটিমেট! নিয়ম হল আগে কাজের এসটিমেট জমা দেওয়া, তার পরে যেমন যেমন কাজের রিপোরট হবে তেমন তেমন ধাপে ধাপে টাকা দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে সেসব কিছুই হয়নি। এসটিমেট, কাজের রিপোরট সব ছাড়াই একসঙ্গে গোটা টাকা জেলা বোর্ড দিয়ে দিলেন জেলা পরিষদকে। এটা সম্পূর্ণ বেআইনি। এবং বোরড নিজের থেকে অন্য কোনো এজেনসির মাধ্যমেও করাতে পারে না এ কাজ। অথচ পারছে নির্বিবাদে।

স্কুলবাড়ির কিন্তু সংস্কার হয় না। তদন্ত কমিটিই বলছে বিলডিং ডেপ্রিসিয়েশন ফানডের জন্য সরকারি টাকা স্কুলগুলি পায়নি। কোথাও কোথাও বোর্ডের লোকেদের বাড়ি তৈরি হয়েছে ওই টাকায়। এ-ঘটনা আছে পশ্চিমদিনাজপুরের বোরডে, বাঁকুড়ার বোরডে, মেদিনীপুরেও।

আবার নদীয়ায় ধরা পড়েছে, বহু স্কুলেই স্লেট-বই, খাতা, পোশাক না দিয়ে টাকাটা খরচা দেখানো হয়েছে। ছাত্রীদের স্কুলে টানার জন্য সরকার থেকে একটা হাজিরা বৃত্তি চালু করা হয়েছে। কিন্তু সে টাকাও তাদের দেওয়া হয়নি। কিছু টাকার এরকম যেমন হিসাব নেই, তেমনি বহু কোটি টাকা খরচ না করে হাতে রেখেছে বোরডগুলি বছরের পর বছর। ফেরতও দিচ্ছে না।

বোর্ড যেমন জেলার স্কুল, শিক্ষক, ছাত্রদের হিসাব রাখে না তেমনি ইচ্ছে মতো বাড়তি শিক্ষক নিয়োগও আটকায় না তাদের। এরকম হয়েছে নদীয়ায়, চব্বিশপরগনায়। হয়তো অন্যত্রও। এজন্য নিয়মমতো শিক্ষা অধিকারের কোন অনুমোদন নেওয়া হয়নি। আবার এই সব নিয়োগের অন্য রহস্যও আছে। নদীয়ার নৃসিংহগঞ্জ সার্কলে গিয়ে তদন্ত কমিটি দেখেন সেখানে নিযুক্ত শিক্ষকদের কোন জন্ম তারিখ, নিয়োগকাল, ইনক্রিমেন্ট ইত্যাদির কোন উল্লেখ নেই রেজিস্টারে। এই হাল দেখার জানার পর আর কী করে আশা করা যায়, বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়ে শিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়া যাবে!

আসলে রাজনীতির বলি হচ্ছে বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা, স্কুলগুলিকে করা হচ্ছে ক্যাডার তৈরির কারখানা। বামফ্রন্ট 'সহজপাঠ' তুলে দেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় জনপ্রতিরোধে; এখন সে কাজটা করছে কৌশলে। যেমন বছরের প্রথম ছ' মাসের মধ্যেও কোনো স্কুলে পৌঁছবে না সহজপাঠ। তার বদলে যাবে 'কিশলয়'। বছরের শেষ দিকে যখন সহজপাঠ যাবে স্কুলে, তখন পরীক্ষা সামনে। ওটা আর পড়ানোরই দরকার হবে না।

অনেক স্কুলেই ছাত্র-অভিভাবকদের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়েছি শিক্ষকরা বলে দিচ্ছেন, অভিভাবকরা যেন অমুকদিনের জনসভায় আসেন। অমুক তারিখ কলকাতায় জমায়েতে তাদের যেতে হবে, মিছিলে আসতে হবে। যেসব অভিভাবক না আসেন, তাঁদের ছেলেমেয়েদের

শিক্ষাসত্র ছড়ালেই কি শিক্ষা ছড়াবে ? ছবি . সুজিত ঘোষ

দুর্ভোগের একশেষ হয় স্কুলে।

আবার কোন স্কুল যদি দলীয় প্রভাবের বাইরে থাকে, ওদের খপ্পরে ধরা দিতে না চায় তবে শায়েস্তার অন্য পথ। স্কুল কখনো অনুমোদন পাবে না, বা পেলেও অনুদান মিলবে না শত ধরনা দিলেও। এই তো শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসের এলাকা গাইঘাটার ভদ্রডাঙা প্রাথমিক বিদ্যালয়। দশ বছর ধরে চলছে স্কুলটি। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দেড় শ। কিন্তু অনুমোদন পায়নি। ফলে পায় না কোনো অর্থ সাহায্যও। এর কারণ, গাঁয়ের লোক বলছে, স্কুলের পরিচালনায় কোন বামফ্রন্টি নেই। পাশের গ্রাম ইছাপুর মন্মথনাথ বালিকা বিদ্যালয়। উনিশ শ' বাহাত্তর সাল থেকে জুনিয়র হাইরূপে চলছে স্কুলটি। দশম শ্রেণী করার আবেদন জানানো হচ্ছে অনেককাল থেকে। কাছাকাছি বাইশা, কেনিয়া, গরিবপুর, মল্লিকপুর, বইগাছা, বেলিয়ানি, মেটেগাছি, গৈপুর প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রামের মধ্যেই কোন হাইস্কুল নেই মেয়েদের। এই ইছাপুরের স্কুলটি অনুমোদন পেলে অতগুলি গ্রামের মেয়েদের পড়াশুনোর হিল্লে হোত। কিন্তু ওই একই রাজনৈতিক কারণে অনুমোদন মিলছে না।

এপাশে রানাঘাট দু-নম্বর ব্লকে প্রীতিনগর-কুশুরিয়া রাজেন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়টিও তিয়াত্তর সাল থেকে অনুমোদনের দরবার চালিয়েও ব্যর্থ। কারণ, স্কুল পরিচালকদের বেশিই নাকি কংগ্রেস সমর্থক। এমনি অনুমোদন পাচ্ছে না রানাঘাট দু-নম্বর ব্লকের বারো বছর আগে স্থাপিত হরিনগর জুনিয়র হাইস্কুল, নারায়ণপাড়া জুনিয়র হাইস্কুল, সাধুরবাগান প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ-সব ছাত্রছাত্রীতে পরিপূর্ণ। কিন্তু অনুমোদন নেই। আবার এখানকার এক নমবর ব্লকের আলুনিয়া সারদাপল্লীতে উনিশ শ বাষট্টি সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুল অনুমোদিত হলেও দরমা-বাঁশের বেড়ায় চলছে। গৃহনির্মাণ অনুদান আজ পর্যন্ত মিলছে না। এবারকার জলঝড়ে দেখলাম, সেসব দরমা-বাঁশও পচে শেষ। এবার হয়ত স্কুল বসবে মুক্তাঙ্গনে। হাবড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের কিন্তু সব আছে, শুধু অনুমোদন নেই। পাচিল ঘেরা পাকাবাড়ি একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। বিজ্ঞানের ক্লাসের উপযোগী ল্যাবরেটরি পর্যন্ত রয়েছে। রয়েছেন প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষিকারা। তবু অনুমোদন মেলেনি ওই রাজনৈতিক কারণেই। আর তার পাশেই হালে বাম প্রভাবিত স্কুল হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত অনুমোদন প্রাপ্তি।

অর্থাৎ স্কুল নেই, যা আছে তাও রাজনীতি, দুর্নীতি কুশিক্ষার আখড়া। সুতরাং স্কুল ছড়ালেই কি শিক্ষা ছড়াবে ? কষ্ট করে না হয় পৌঁছনো গেল স্কুলে, কিন্তু কী শিখে ফিরবে তারা ? স্কুলগুলি যদি যথার্থ শিক্ষাসত্র হোত, না হয় কৃচ্ছ্র-সাধনও সার্থক হোত। আচার্য জগদীশচন্দ্রকে নাকি তার পিতা শৈশবে দূরের স্কুলে পাঠাতেন পড়তে। শিশু জগদীশ স্কুলে যেত এক জেলখাটা ডাকাতের পিঠে চেপে। সেই ডাকাত নাকি তাকে সারা পথ গল্প করতে করতে নিয়ে যেতো। লেখাপড়ার জন্য বাপও ছেলেকে এই ঝুঁকি নিয়ে পাঠাতেন। সৎ শিক্ষা হলে ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব।

পিতামহ ভীষ্ম দেহরক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন শুনে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, পুরীর ভিতর গিয়ে সকলকে নিয়ে এস, পিতামহের কাছে গিয়ে শেষ উপদেশ-আদেশ শুনে আসি। অর্জুন ফিরে আসতে দেরি করছেন দেখে ভীমকে পাঠালেন যুধিষ্ঠির, যাও তো, কেন দেরি হচ্ছে দেখে এস। ভীম খবর দিলেন, পুরনারীরাও যাবেন বলে শকট সজ্জা চলছে। একটু দেরি হচ্ছে তাই। যুধিষ্ঠির আদেশ করলেন, শকট নয়, পায়ে হেঁটে যেতে হবে। আমরা যাচ্ছি উপদেশ, শিক্ষা গ্রহণ করতে। এ সময় কৃচ্ছ্রতা চাই। 'পদ্ভ্যামেব গমিষ্যামি, গচ্ছামঃ বয়মেবহি।' নিজে আমি পদব্রজে যাবো, সবাইকেই আমদের তেমনি যেতে হবে।

শিক্ষাসত্রে কষ্ট করেও পৌঁছন যায় কিন্তু অশিক্ষার আখড়ায় শকটেও লাভ নেই। তাই বোধ হয়, যতো ছাত্র ভরতি হয় বছরের শুরুতে, দুধ, রুটি, জামা-প্যান্ট দিয়েও তাদের আটকে রাখা যায় না বছরের শেষ পর্যন্ত। ভর্তির সময়কার ছাত্র সংখ্যাই সরকার প্রচার করেন। রাজ্যশিক্ষা বিভাগই কিন্তু স্বীকার করছেন, গ্রামে একটা বিরাট সংখ্যাক ছাত্র মাঝপথেই স্কুল ছাড়ছে। এটাই স্বাভাবিক। কারণ এরাজ্যে এখন চলছে সরস্বতীর উল্টোরথ।

সক্রেটিস, বরাহ, ছেঁড়ান্যাতা এবং কোহিনুর

অরিন্দম চক্রবর্তী

"মানব সম্পদ উন্নয়ন" কথাটা শুনতে ভালো। কথাটা নিয়ে ভাবতে গেলে দুটি বিপরীতমুখী চিন্তার স্রোত শুরু হয়। একদিকে রামপ্রসাদের গানের কলি ভেসে আসে। মানুষ তো সত্যিই জমির মতো, ঠিকমতো আবাদ করলে দেবত্ব বা ব্রহ্মত্বের সোনা ফলতে পারে। আবার পতিত থাকলে আগাছা, কাঁটাঝোপ। ইংরিজিতে কৃষ্টি বা সংস্কৃতিবাচক শব্দটিরও মূল ভূমিকর্ষণের উপমায়। কিন্তু অন্যদিকে আধ্যাত্মিক, আদর্শবাদী অথবা লৌকিক অর্থে "শান্তিনিকেতনী" ভাবধারাকে বাস্তবের কড়া হাতুড়ি মেরে সিধে করে দেয় যে দৃষ্টিভঙ্গী : "মানুষ ও তার শ্রম একটা সম্পত্তি এবং অন্য সম্পত্তিসৃষ্টির উপায়মাত্র। তাকে কিভাবে কাজে লাগিয়ে সব থেকে বেশী "ফায়দা" বা লাভ ওঠানো যায় সেটাই দেখতে হবে" এ জাতীয় একটা নির্লজ্জ ঐহিকতাও কথাটির মধ্যে লুকিয়ে আছে।

মানে যাই হোক, কিছুকাল হল পৃথক শিক্ষামন্ত্রক উঠে গিয়ে আমাদের জাতীয় শিক্ষা দপ্তর প্রবেশ করেছে ওই নামধারী একটি বৃহত্তর কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের মধ্যে। ইতোমধ্যে বছর খানেক হল শুরু হয়েছে শিক্ষা নিয়ে নতুন করে নীতি নির্ধারণ এবং নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদির ব্যাপারে প্রদেশে প্রদেশে গ্রামে গ্রামে সাজো-সাজো রব। নতুন কিছু একটা হচ্ছে শুনলেই তিন দলে ভাগ হয়ে যায় মানুষ। স্তোতা, নিন্দুক এবং উদাসীন। কিন্তু এ ব্যাপারটায় তৃতীয় দলে থাকা মুশকিল। ভারতবর্ষ বিবিধের মাঝে মিলনের যত বড়ই মহান এবং মশলাদার খিচুড়ী হোক না কেন ; অরণ্য, প্রান্তর, পর্বত, সমুদ্রসৈকত, মরুভূমি ও নদীময়তার যতই বিচিত্র ভৌগোলিক সমাবেশ হোক না কেন এখানে, প্রাক-কৃষিযুগের শিকারী যাযাবর-সভ্যতা থেকে একবিংশ শতাব্দীর অগ্রিম অত্যাধুনিকতা পর্যন্ত ইতিহাসের সব কটি কাল যতই থরে থরে সাজানো থাক সমকালে—আমাদের জাতীয় শিক্ষার সমস্যাগুলোকে উদাসীন অনুৎসাহে আর উপেক্ষা করতে পারেন না কেউই। কেবলমাত্র পরমেশ্বর অথবা পরমাণু নিয়ে, জড়প্রকৃতি অথবা চিন্ময় অন্তরাকাশের দিকে চেয়ে বাঁচতে পারে না কোনো মানুষ। তাকে ঘাঁটতেই হবে অন্য মানুষকে, নিজেকে এবং সেই অন্য মানুষকে কেমনভাবে সে গঠন করতে অথবা গঠিত হতে
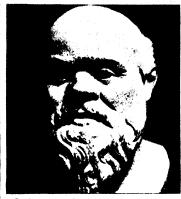
প্রাচীন শিক্ষাগুরু সক্রেটিস

দেখতে চায় সে বিষয়ে কম বেশী স্পষ্ট ধারণাও করতে হবে তাকে। মানুষকে যে গড়তে হয়, মাজতে হয়, ঢালতে হয় কোনো না কোনো ছাঁচে একথা সব দেশে সবকালে সবাই জানে। কিন্তু ভূগোল, ইতিহাস, ভাষা, ধর্ম, জীবনাদর্শ, রাজনীতি সমস্ত দিক থেকে ভারতবর্ষে এমন এক চিরন্তন মহামিশ্রণ হয়ে চলেছে যে নানান বিরুদ্ধ ধারণা, পরস্পর বিপরীত সমস্যার স্রোত আমাদের চিন্তাকে প্রায়ই অস্পষ্ট, আচরণকে লক্ষ্যহীন এবং অনুভবশক্তিকে ভোঁতা করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ, এ নিয়ে দুঃখ করেছেন ; বিরক্ত বোধ করেছেন ; সব ব্যাপারে একটা এসপার ওসপার করে, একটা "দাগ রেখে" যাবার পক্ষপাতী বিবেকানন্দ। আর এই বিভ্রান্তিকর অনেকান্ততাই শিক্ষার মতন এমন মারাত্মক জরুরী ব্যাপারেও আমাদের কেমন করে জানি না আস্তে আস্তে উদাসীন করে তুলছে। দেশের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ে লালবাতি জ্বলে

> **দেশের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ে লালবাতি জ্বলে যাচ্ছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পণ্ডিতরা পুঁথিপাঁথা বন্ধ করে ভাগাড়ের কাকশকুন অথবা রাস্তার ষাঁড়েদের মতন ঝগড়া-লড়াই এ নেমে পড়ছেন, লক্ষ লক্ষ টাকার শিক্ষামূলক যন্ত্রপাতি অযত্নে অদক্ষতায় নষ্ট হচ্ছে।**

যাচ্ছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পণ্ডিতরা পুঁথিপাঁথা বন্ধ করে ভাগাড়ের কাকশকুন অথবা রাস্তার ষাঁড়েদের মতন ঝগড়া-লড়াই-এ নেমে পড়ছেন, লক্ষ লক্ষ টাকার শিক্ষামূলক যন্ত্রপাতি অযত্নে অদক্ষতায় নষ্ট হচ্ছে, কুলকৌলীন্যের থেকেও বিষময় বর্ণভেদ স্কুলকৌলীন্যের চাপে হাজার হাজার শিশুর ভবিষ্যতের ওপর নৈরাশ্যের শীলমোহর বসে যাচ্ছে প্রথম বাল্যেই। তবু আমরা স্রোতে গা ভাসাচ্ছি, কোনো এক অদৃষ্ট কর্তৃপক্ষের ওপর আমারই ঘরের ছেলেমেয়ের মন তৈরী করার (অথবা না তৈরী করার) ভার ছেড়ে দিয়ে নির্বিকার নিরঞ্জন হবার চেষ্টা করছি।

পুরাণে বলছে দেবী দুর্গার জন্ম হয়েছিল নিরুপায় বিক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ দেবতাদের সম্মিলিত ক্রোধানল থেকে। আমরা কি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়েছি ? উদ্বিগ্ন হবার আছে এ দেশের শিক্ষা বিষয়ক অন্তত শ'খানেক বৃহৎ বৃহৎ মৌলিক সমস্যা নিয়ে। কয়েকটা উল্লেখ করছি—

শিক্ষা কতটা ইস্কুল বাড়ির ভেতরে হবে আর কতটা হবে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের মাধ্যমে ? কতটা জোর দেওয়া হবে বই, খাতা, বোর্ড, যন্ত্রপাতি, চার্ট, গ্লোবের ওপরে, আর কতটা মুখে মুখে ব্যক্তিগত সংস্পর্শ দিয়ে অথবা প্রকৃতির সান্নিধ্যে ?

প্রথম স্তর থেকেই সাক্ষরতা বেশী গুরুত্ব পাবে, নাকি শরীরে মনে চৌকস ও দৃঢ়, কুশল ও সামাজিক করে তোলার প্রয়াস প্রাধান্য পাবে ? কতটা বয়স পর্যন্ত সারা দেশে সবাই একরকম পাঠক্রম পড়বে ? যেখান থেকে পৃথকীকরণ শুরু হবে সেখানে শ্রেণীবিভাগ রুচিভেদ, মেধাভেদ, অর্থনৈতিক অবস্থা ভেদ, পারিবারিক পটভূমিভেদ, সামাজিক ভারসাম্য সংক্রান্ত উদ্দেশ্যভেদ—ইত্যাদি কোন কোন ভেদকে কতটা গুরুত্ব দিয়ে নির্ধারণ করা হবে ? চাকরী বা নিয়োগের সুযোগের সঙ্গে শিক্ষার সুযোগের সমতা কতখানি কিভাবে রাখা সম্ভব বা উচিত হবে ? উচ্চশিক্ষার গুণগত মান এবং উচ্চশিক্ষার সুযোগের সংখ্যাগত স্ফীতির দ্বন্দ্বে কোথায় সীমারেখাটা টানা হবে ? শিক্ষিতের শহরমুখীনতা কি করে দূর করা যাবে ? স্বনির্ভরতা ও অর্থোপার্জনের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা আর বৌদ্ধিক উৎকর্ষ ও প্রতিভা বিকাশের জন্য সুযোগ এর মধ্যে গুরুত্ব বণ্টনটা কেমন হবে ? একদিকে আপামরের উন্নতির সুযোগ অন্যদিকে

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার বাজারে মেধার কৌলীন্য রক্ষা—কি করে যুগপৎ সম্ভব হবে ? মস্তিষ্কের নর্দমা বেয়ে ছাত্রসমাজের ক্ষীরটুকু যে বিদেশে পাড়ি দিয়ে আর ফিরছে না তা রোধ করা যাবে কি করে ? পাঠক্রমের মধ্যে স্বজাতির প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার স্থান বেশী হবে না আধুনিক আন্তর্জাতিক অগ্রগমনের উৎসাহ বেশী সঞ্চারিত করা হবে ? আর আছে প্রায় সমাধানহীন ভাষাসমস্যা। গণমাধ্যমের প্রবল জনপ্রিয়তা এবং ব্যবসায়িক সাফল্যের সঙ্গে শিল্পরুচির শুদ্ধতা রক্ষার জনপ্রিয়তা এবং বিরোধ। ধর্মশিক্ষা আদৌ হবে কি না, হলে কোন ধরনের সর্বধর্মের ল সা গু গ সা গু করে তা নির্ধারিত হবে—এই সব অগুন্তি অত্যন্ত জরুরী ভাবার বিষয়। দৈনন্দিন জীবনে আজ যত বাব মা'রা ছেলেমেয়ে, মানুষ করেন যেসব শিক্ষকরা শিক্ষা দেন, যেসব ছাত্রেরা কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমত ভর্তি হবার জন্য, পরে পরীক্ষা কবে হবে জানার জন্য, তার পর ফলাফলের জন্য এবং অবশেষে মার্কশীট হাতে চাকরীর জন্য সারিবদ্ধ হয়ে অপেক্ষমান থাকে তারা সকলেই হাড়ে হাড়ে টের পায় এই সমস্ত সমস্যার কামড়। টের পায় গবেষক অথবা প্রাথমিক শিক্ষক, টের পায় সমানভাবে অল্পবুদ্ধি সিলেবাস ভারাক্রান্ত ছাত্রটি আর সিলেবাসের মামুলিত্বে বীতশ্রদ্ধ অগ্রসর অন্যমনস্ক মেধাবী ছেলেটি। টের পায় মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণা বাপের গলগ্রহ কন্যাসন্তান, তেমনি আবার টের পায় অত্যুচ্চ শিক্ষিতা অসুখী গৃহবধূ যার পি এইচ ডির হাই হিল বারংবার শ্বশুরালয়ের রান্নাঘরে হোঁচট খায়। এই সমস্যার গহন অরণ্যে সামান্য পথ কাটবার জন্য আমরা আগে থেকেই অসম্পূর্ণতা কবুল করে নিচের আলোচনাকে পাঁচটি প্রধান আদর্শ বিরোধের আকারে ভাগ করে নিচ্ছি।

১· পুস্তক ও প্রকৃতি

রবীন্দ্রনাথ, রাসেল, বিবেকানন্দ, গান্ধীজী, টলস্টয়—সকলে একবাক্যে কেতাবী শিক্ষাকে নিন্দে করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গল্পে গল্পে ছড়িয়ে আছে স্কুল পালানো প্রকৃতিমগ্ন মুক্তচিত্ত বালকের জয়গান, আর পুঁথি পেটে ঠাসা মৃত তোতাপাখীর অন্তিম দীর্ঘশ্বাস। বিবেকানন্দ চাঁছাছোলা ভাষায় পুঁথি পড়ার নিন্দে করে বলেছেন, "শিখেছ তো কচু পোড়া, খালি বাক্যি চচ্চড়ি।" (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পৃঃ ১২০)

রাসেল এক করুণ মধুর বাল্যস্মৃতিচারণে লিখেছেন :

"ছোটোবেলায়, মনে পড়ে আমাকে বইয়ে পড়তে হয়েছিল প্রখ্যাত প্রকৃতিবিজ্ঞানী বাফনের (BUFFON) লেখা কাঠবিড়ালীদের ইতিবৃত্ত। তাতে তিনি লিখেছেন কাঠবিড়ালীরা মাটিতে প্রায় কখনোই নেমে আসে না। আমি তার আগেই পর্যবেক্ষণ করে কাঠবিড়ালীদের বিষয়ে অনেক কিছুই জানতাম। বুঝলাম যে এই ব্যাপারে ওই মহাপুরুষ একদম গাঁজাখুরি লিখেছেন। কিন্তু আমার শিক্ষক কাঠবিড়ালী বিষয়ে কিছুই জানতেন না—কাজেই বাফনের কল্পনাবিলাসের বিরুদ্ধে

আধো আধো বুলিতে না বোঝা ভাষায়, 'আকাশের ছোট তারা মিট মিট জ্বলে' অথবা 'কালো ভেড়া, তোমার লোম কার জন্য রাখা' ? এই পদ্য বলবার জন্য অনেক চড় চাপড় খেয়ে তৈরী হচ্ছে ভারতের আগামী দিনের নাগরিকরা।

আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে আমি দাঁড় করাতে সাহস পেলাম না। শিক্ষকরা, অবশ্য, বইয়ে যা থাকে তা-ই অবধারিতভাবে বিশ্বাস করেন, কারণ তা সুবিধাজনক আর বই সঙ্গে করে ক্লাসঘরে নিয়ে আসা যায়..." (Does education do harm? Mortals & others, পৃঃ ৬৪)

গান্ধীজীও প্রথম অক্ষর শিক্ষার দুঃখময় বাল্যস্মৃতি উল্লেখ করে বলেছেন যে সাক্ষরতার দিকে অতটা জোর দেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু এত মহাপুরুষদের এত চিন্তা ও লেখনী ধারণ সত্ত্বেও হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে পুস্তকের চাপ। দশ বিশ বছরের ফারাকে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্যবইয়ে ঢুকে পড়ছে ক্রমবর্ধমান নতুন সংবাদসার-জ্ঞানভাণ্ডার। প্রতিটি বালক হয়ে উঠতে চাইছে 'সাধারণজ্ঞানের' কুইজ-মাস্টার। আধো আধো বুলিতে না বোঝা ভাষায়, "আকাশের ছোট তারা মিট মিট জ্বলে" অথবা "কালো ভেড়া, তোমার লোম কার জন্য রাখা ?" এই পদ্য বলবার জন্য অনেক চড় চাপড় খেয়ে তৈরী হচ্ছে ভারতের আগামী দিনের নাগরিকরা। ক'জন তাদের মধ্যে উৎসাহিত হচ্ছে জিজ্ঞাসা করে চিনে নিতে রাতের আকাশে সপ্তর্ষি, শিশুমার, কালপুরুষ ? অথবা লোম থেকে পশম তৈরী হবার ইতিবৃত্ত ?

কাগজে-কলমে-মুখে-বক্তৃতায় প্রকৃতিকেন্দ্রিক পুস্তককে গৌণ করা বিদ্যার কথা অনেক চালু হলেও কেন থামছে না এই পুঁথিকেন্দ্রিকতা ? সরকারী নীতিতেও কিন্তু (গান্ধীজীকে তাকে তুলে রেখে) সংখ্যাগতভাবে সাক্ষরতা বাড়িয়ে তোলার কথাই বারবার বলা হচ্ছে। কিন্তু নিছক সাক্ষরতা শুধু যে নিষ্ফল তা নয়, তা ক্ষতিকারকই হতে পারে। সামান্য সাক্ষর ব্যক্তির হাতে ক্লাসিকস পড়ে না, পড়ে উত্তেজক ইস্তাহার, চোখে পড়ে ভুল বানানের দেয়াললিখন, মাথায় গেঁথে যায় নোংরা পথসাহিত্য। খবরের কাগজও তার অপরিশীলিত চিত্তকে কতটা সমৃদ্ধ করে আর কতটা বিভ্রান্ত ও নিম্নগামী করে তা ভাববার বিষয়। তাই কি প্রাথমিক শিক্ষায়, কি বয়স্ক শিক্ষায় মৌখিকভাবে ইতিহাস, ভূগোল, মৌলিক বিজ্ঞান, মানস গণিত ইত্যাদি শেখানোর দিকে বেশী জোর দিয়ে অক্ষর পরিচয়ের প্রশ্ন পরে তোলাই ভাল। সাক্ষরতা এবং শিক্ষা কখনোই সমার্থক নয়, নিরক্ষরতাও কখনোই যথার্থ শিক্ষার প্রতিবন্ধক নয়। মৌখিক ও শ্রুতিপ্রধান শিক্ষায় মানুষের সঙ্গে মানুষের সজীব যোগাযোগও অনেক বেড়ে যায়। গরীব দেশের পক্ষেও এই স্বাভাবিক শিক্ষা কেতাবী শিক্ষার থেকে সহজে রূপায়ণযোগ্য।

নবীন ভারতের মহামন্ত্রদাতা রামমোহন রায়

২· সাধারণ-অসাধারণ

প্রশ্ন হবে, গোটা জাতিটাই যদি এরকম গ্রন্থবিমুখ প্রকৃতিপ্রবণ সহজিয়া থেকে যায়, আন্তর্জাতিক বিদ্যার দৌড়ে ভারতবর্ষ যে নিতান্তই অপাংক্তেয় হয়ে যাবে। সেখানেই উঠবে অধিকারীভেদের প্রশ্ন। কোনো সুস্থ বৈজ্ঞানিক সমাজে সকলের জন্য একরকম শিক্ষা হতে পারে না। প্রয়োজন হলে প্রাথমিক স্তর থেকেই বুদ্ধিজীবী এবং কর্মজীবীদের পৃথক করে দিতে হবে। যাঁরা হাঁ হাঁ করে উঠবেন—এমন মনুসংহিতাগন্ধী কথায় তাঁরা আপাতত এক মনীষীর উক্তি শুনুন—

"সাধারণ নরনারীদের কাছে আশা করা হবে যে (শিক্ষার ফলে) তারা হবে বাধ্য, শ্রমশীল, সময়ানুবর্ত্তী, চিন্তাবর্জিত এবং তৃপ্ত। ....তারা বেশী সময় কাটাবে খোলা হাওয়াতে, আর একান্ত যেটুকু না হলে নয় তার বেশী পুঁথিগত শিক্ষা তাদের দেওয়া হবে না। একই রকম পাইকারী অভ্যাসের মধ্য দিয়ে তাদের শেখানো হবে আদেশ মানতে। ....তারা শিখবে অন্য সকলে যা করছে তাই করতে। তাদের শিক্ষা হবে প্রধানত কায়িক....

অন্যদিকে সেই সমস্ত শিশুরা যারা শাসকশ্রেণীর সদস্য হবে বলে আগে থেকে (প্রজনন বিজ্ঞানের আধুনিকতম গবেষণার মাধ্যমে) নির্দিষ্ট হয়ে আছে, তাদের জন্যে থাকবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের শিক্ষা। অতি বাল্যকাল থেকে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত বিজ্ঞানের জ্ঞান তাদের মধ্যে ঢেলে দেওয়া হবে। তাদের হতে হবে তীক্ষ্ণ মেধাবী, আত্মপ্রত্যয়ী, সংযমী এবং অন্যের ওপর প্রভুত্ব করতে সক্ষম। এসব না শিখতে পারলে তার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে চরম শাস্তি। তা হল বাকী জীবনের জন্য তাকে সেই সব প্রাকৃতজনের সঙ্গে থাকতে হবে যারা বুদ্ধিতে তার থেকে বহু গুণে নীচু"—পড়ে মনে হতে পারে এ কোনো নতুন যুগের জাতিভেদসমর্থক মনুর লেখা। অথচ এটা হল বার্ট্রাণ্ড রাসেলের "Education in a

Scientific society" থেকে অনূদিত আদর্শ বৈজ্ঞানিক সমাজচিত্র।

এমন কড়া প্লেটো-গন্ধী বা ক্রীতদাস প্রথার মত জাতিভেদের কথা আমি বলছি না, কিন্তু শিক্ষার মধ্যে সাধারণ অসাধারণের তফাৎ সৃষ্টি করতেই হবে। এই অসাধারণতার সঙ্গে অবশ্যই আর্থিক সচ্ছলতার কোনো যোগ থাকবে না। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যে যাতে অগ্রসর বা বিশিষ্ট শিক্ষিতশ্রেণীর থেকে একটুও পিছিয়ে না থাকে তার জন্য চাকরীর সঙ্গে এই অসাধারণ শিক্ষার সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। সম্পর্ক থাকবে সম্মানের। বিশেষ বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের সম্মান অর্থ দিয়ে নয়,সামাজিক মান্যতা দিয়ে করতে হবে। কিন্তু যা যুগপ্রবাহ তাতে একটিও ইনক্রিমেন্ট হবে না, চাকরীর বা ঐশ্বর্যের কোনো সুবিধা নেই জেনেও কেউ কি এই অসাধারণ শিক্ষার জন্যে নিজেকে অথবা নিজের সন্তানকে প্রস্তুত করতে চাইবে? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা দেবো পঞ্চম বা শেষ সমস্যার আলোচনার সময়ে।

আপাতত প্রশ্ন হল এই সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষার ভেদরক্ষা, অধিকারী নির্বাচন, একদিকে সাধারণ শিক্ষার চাকরীগত মূল্য বজায় রাখা অন্যদিকে বিশিষ্ট শিক্ষার ক্রমোন্নতি ও গুণগত উৎকর্ষ বজায় রাখা—এ সবের ভার কে নেবে? সরকার? না সাধারণ মানুষ? না অন্য কোনো নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী সংস্থা? এই প্রশ্ন আমাদের এনে ফেলে শিক্ষাসংক্রান্ত তৃতীয় মূল প্রশ্নে।

৩· ব্যক্তি ও সংগঠন

আগে ভারতের শিক্ষা ছিল ব্যক্তিপ্রধান। রাজকীয় বা সরকারী বদান্যতা থাকতো কিন্তু পাঠক্রম বা পাঠনপদ্ধতি বিষয়ে রাজার বলার তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু সে তপোবন বা টোলের যুগ নিয়ে আপসোস করাটা কাজের কথা নয়। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধিতে, জীবনসংগ্রামের তীব্রতায় অপ্রতিহত অপ্রতিগ্রহী বিদ্যাবিক্রয়ে পরাঙ্মুখ থাকা শিক্ষকের পক্ষে অসম্ভব হওয়ায় সরকারী ও বেসরকারী সংগঠন পরিচালিত বিদ্যালয় হতেই হবে। কিন্তু তবু শিক্ষার মতো ব্যক্তিপ্রধান ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণভাবে একটা নৈর্ব্যক্তিক প্রতিষ্ঠানের হাতে ছেড়ে দেবার আগে ভাবতে হবে অনেক। হয়তো হাক্সলের "সাহসী নতুন জগৎ"-এর কল্পনা একটু বেশীমাত্রায় সাহসী। তবু পাইকারী শিক্ষার স্টীম রোলারের তলায় ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, স্বকীয়তা এবং স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে যেতে পারে। মাত্র কতকগুলো যান্ত্রিক অভ্যাসে ফেলে মানুষকে বৃহদ্‌যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসা রাশি রাশি একই আকারের একই স্বভাবের পিণ্ডে পরিণত করার ঝুঁকি থেকেই যায়।

তাই বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও অভিভাবক, বয়স্ক বন্ধুবান্ধব তথা আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীর কাছ থেকে যাতে ব্যক্তিমানুষ স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা পেতে পারে তার দিকে নজর রাখতে হবে। অভিভাবক সমাজের দায়িত্ব সব থেকে বেশী। যে শিশু পিতামাতার কাছ থেকে কিছু শিখতে পারে না, কেবল ইস্কুলে বা গৃহশিক্ষকের কাছে শেখে, তার মত দুর্ভাগ্য আর কার? ব্যক্তি বনাম সংগঠনের প্রাধান্যের প্রশ্ন একটা অন্যভাবেও শিক্ষার ব্যাপারে বর্তমানে জরুরী হয়ে উঠেছে। রাজনীতি তা সে লাল সবুজ হলদে গেরুয়া যেমনই হোক না কেন—তা ব্যক্তিকে ছোট করে। দলকে বড় করে।

ক্লাসে ঢুকলো কিছু বিক্ষুব্ধ দাবী আদায়কারী "জনগণেশ"। খেয়াল রাখতে হবে এদের মধ্যে কারা শাসকদলের গোষ্ঠীভুক্ত। তাদের নেতৃস্থানীয়দের পরীক্ষায় অপরের খাতা নকল করা বা বই খুলে বসা দেখলেও গণস্বার্থে চুপ থাকতে হবে।

একদিক থেকে যেমন পরিবার, জনপদ, জাতি, মানবসমাজ—ইত্যাদি সমগ্রের স্বার্থে ব্যক্তির স্বার্থ ত্যাগ করার তালিম শিক্ষার একটা অপরিহার্য অঙ্গ—অন্যদিকে তেমনি ভীড়ের বাইরে আলাদা করে ভাবতে শেখা, নিঃসঙ্গ নির্জনতায় আত্মসমীক্ষা, অন্য নিরপেক্ষ হয়ে নৈতিক ও বিদ্যাগত উৎকর্ষের প্রয়াসকরা এ সবও প্রতিটি মানুষকে শিখতে হয়। বস্তুত যে ভীড়ের মধ্যে বা দলের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে সে মানুষের সঙ্গে মিশেও আনন্দ পায় না বা আনন্দ দেয় না। আমাদের দেশে কয়েক দশক ধরে শিক্ষা জগতে ব্যক্তিবিলোপের এক দুর্বিপাক ঘনিয়ে এসেছে। সাধারণ ছাত্রকে কলেজে ঢুকেই বাধ্য হতে হয় কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলে নাম লেখাতে। আর এই সব "গণতান্ত্রিক" দলের রীতিনীতি মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রের থেকেও ভয়ানক। মতবিরোধের শাস্তি চরম, যদি না ভিন্নমতপোষণকারী দল ভেঙে নতুন দল গড়তে পারে। ছাত্র রাজনীতির তাণ্ডব, তা দমন করতে অকস্মাৎ পুলিশী তাণ্ডব, এসব থামতে না থামতে এসে গেল শিক্ষক রাজনীতির এক জঘন্যতর প্রবাহ। বিশ্ববিদ্যার তীর্থপ্রাঙ্গণ মহোজ্জ্বল করে বয়পুত্রসংঘ বসে গেলেন ব্যালট বাক্স আগলে। প্রচার এবং প্রতি প্রচার শুরু হল। গণিত বা দর্শন, সাহিত্য বা রসায়নের দুরূহ তত্ত্ব বোঝাতে বোঝাতে অধ্যাপক থেমে গেলেন। ক্লাসে ঢুকলো কিছু বিক্ষুব্ধ দাবী আদায়কারী "জনগণেশ"। খেয়াল রাখতে হবে এদের মধ্যে কারা শাসকদলের গোষ্ঠীভুক্ত। তাদের নেতৃস্থানীয়দের পরীক্ষায় অপরের খাতা নকল করা বা বই খুলে বসা দেখলেও গণস্বার্থে চুপ থাকতে হবে।আমার ব্যক্তিগত মত হল সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র বা শিক্ষকদের ইউনিয়ন গড়ার, মিছিল করার বা স্লোগান দেবার অধিকার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে দেওয়া। জানি, এতে অনেক বিতর্ক উঠবে। ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রদের এবং শিক্ষকদের রাজনৈতিক মত পোষণের স্বাধীনতা নিশ্চয়ই থাকবে আর সেই স্বাধীনতা হরণের জন্য নয় রক্ষা করার জন্যেই দরকার শিক্ষালয়ে আনুষ্ঠানিক রাজনীতি প্রবেশ নিষিদ্ধ করা। সাহস করে এ কথাটা জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তকরা বলতে বা লিখতে পারছেন না কেন জানি না। প্রতিটি নিরপেক্ষ শিক্ষকের অভিজ্ঞতা আছে কেমনভাবে এই ছাত্র রাজনীতির চাপের সামনে পড়ে অধ্যাপনার মান নামাতে হয়, সিলেবাস কমাতে হয়। পরীক্ষার প্রশ্ন প্রায় পূর্বে ঘোষণা করে দিতে হয়, পরীক্ষার হলে অকারণে নিগৃহীত হতে হয় এবং আকাট মূর্খ ছাত্রনেতাকে ভাল নম্বর দিতে অনুরুদ্ধ বা আদিষ্ট বা বাধ্য হতে হয়। অন্যদিকে ছাত্ররাও জানেন রাজনীতিমত্ত অধ্যাপক দিনের পর দিন ক্লাস নেন না। পরীক্ষার ফলপ্রকাশ স্থগিত রেখে দলবদ্ধ অধ্যাপকদের রাজনৈতিক কোন্দল চলে। "শিক্ষক সমাজকে রাজনীতিতে নামতেই হবে পেটের দায়ে!" এই শেষ যুক্তির জবাব কি দেবো? জমিয়ে রাখছি আবার শেষ অনুচ্ছেদের জন্যে।
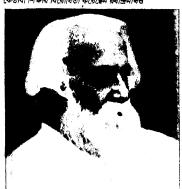
কেতাবী শিক্ষার বিরোধিতা করেছেন রবীন্দ্রনাথও

আপাতত অন্য একটি মৌলিক সমস্যার দিকে মুখ ফেরানো যাক। ভারতবর্ষের জাতীয় শিক্ষার মধ্যে জাতীয়তা বা ভারতীয়তার স্থান বর্তমানেই বা কতটুকু? কতখানিই বা ভবিষ্যতে হওয়া উচিত?

৪· ঐতিহ্য ও আধুনিকতা

এদেশে বিশ শতকের প্রথম ভাগে যখন ভারতের স্বাধীনতার জন্য অহিংস এবং সহিংস আন্দোলন চরমে উঠেছে তখন একজন প্রচারবিমুখ দার্শনিক (তৎকালীন হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যক্ষ) কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য একটি যুগান্তকারী প্রবন্ধ লেখেন তার নাম "Swaraj in ideas" বা "ভাবের রাজ্যে স্বাধীনতা"। (সুখের কথা যে দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর বেশী সময় ধরে অবজ্ঞাত থাকার পর এই প্রবন্ধটি নিয়ে দার্শনিক মহলে গত বছর থেকে হৈচৈ হচ্ছে। পুনে থেকে প্রকাশিত Indian Philosophical Quarterly গত বছর একটি বিশেষ সংখ্যায় এই প্রবন্ধটির পুনর্মূল্যায়ন করেছেন)। এই প্রবন্ধে অত্যন্ত গভীর বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার থেকে অনেক বেশী জরুরী হল

ভাবদাসা থেকে মুক্ত পাওয়া। একটি জাতি যখন অনিচ্ছার সঙ্গে অস্ত্র বা দৈহিক শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে তখন ভেতরে ভেতরে তার স্বাজাত্যবোধ বজায় থাকে (বরং যতদিন রাজনৈতিক পরাধীনতা ছিল ততদিন একটা প্রতিক্রিয়ামূলক স্বদেশ সচেতনতা আমাদের ছিল)। কিন্তু যখন একটা জাতি স্বেচ্ছায় অন্য একটি কৃষ্টিকে মহত্তর এবং বরণীয় বলে নিজের স্বকীয়তা ও ঐতিহ্যকে ভুলে গিয়ে ভাবগতভাবে আত্মসমর্পণ করে তখন যা হয় সেই জাতিগত কৈংকর্য অনেক বেশী সর্বনাশা। তাই আমরা দেখি মুসলমান শাসন কালেও কাশী বা নবদ্বীপে ভারতের নিজস্ব পরম্পরা পূর্ণ বেগে বহমানা। সহসা ইংরেজরা মুগ্ধ করেছেন বিদ্যাসাগরের মতন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে। রামমোহন যেচে সাহেবদের শিক্ষা প্রসারের সুখ্যাতি করছেন, বিদ্যাসাগর করছেন ভারতীয় দর্শনের নিন্দাবাদ, সাহেবরা এনে দিচ্ছেন আমাদের নবজাগরণ। এমনকি আমাদের যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেতে হবে এই প্রেরণার মূলেও আছে পরানুকরণ। ভারতের হিতকারী বন্ধুর অভিনয় করে শিক্ষা প্রসারের ভেতর দিয়ে সূক্ষ্মভাবে এ জাতিকে চিরতরে হীনমনা করে ফেলতে পারলে সৈন্যসামন্ত ছাড়াই বিজিত হবে এই দেশ।

সাহেবরা একথা জানতেন বলেই প্রথম থেকে কখনো প্রত্যক্ষ অপপ্রচার করে, কখনো সূক্ষ্মভাবে প্রাচ্য বিদ্যা উদ্ধারের নাম করে, ছদ্মভাবে তাকে বিকৃত করে আমাদের শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমাদের শিশুপাঠ্য ছড়া থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিরোমণি পর্যন্ত সব স্তরে গভীর ভাবে জুড়ে বসেছেন। আমরা টেরও পাইনি কখন আমাদের দু এক প্রজন্ম পূর্বেকার শিশুর বোধহীন প্রথম উচ্চারণ থেকে কেবলমাত্র অকারে বদ্ধ অপূর্ব দেববন্দনা

"খরতর বরশর হতদশবদন
খগচর নগধর ফণধরশয়ন।
জগদঘমপহর কমলজনয়ন
পরপদলয়কর ভবভয়শমন॥"—আমাদের অজান্তে নির্বাসিত হয়ে চিরবিস্মৃতিতে তলিয়ে যেতে বসেছে। তার স্থানে আজো "স্বাধীন" দেশের শিশু "চতুর" বা "smart" হবার আশায় দাঁতভাঙা পরিশ্রম করে বলে উঠছে

Pussy Cat, Pussy Cat
Where have you been?
I've been to London
To see the Queen.

রাষ্ট্রভাষা চালাবার চেষ্টা চলছে জাতীয় স্তরে, প্রতিটি প্রাদেশিক সরকার নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষার প্রসারের জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন—ভাষা নিয়ে দেশের নানা দিকে নানা ফাটল। কিন্তু মাঝখান থেকে জিতে যাচ্ছে আত্মিক দিক দিয়ে আজও আমাদের কাছে যা 'রাজভাষা' সেই ইংরিজি। "বীণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তে" বাগ্‌বাদিনীর বদলে শিশুর চিত্তে আপনাআপনি ইংল্যাণ্ডের রানী (অথবা লেডি ডায়না) অধিষ্ঠিতা হয়ে যাচ্ছেন।

ইংরেজ রাজত্বকালে যা অকল্পনীয় ছিল আজ

বিবেকানন্দ চাঁছাছোলা ভাষায় পুঁথি পড়ার নিন্দে করেছেন

তা ক্রমবর্ধমান। কিশোর কিশোরী যুবক যুবতীরা ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, প্রেমালাপ, আড্ডার ভাষা হিসেবে ব্যবহার করছে একরকমের লোচ্চা ইংরিজি। অন্যদিকে ভারতীয় ছাত্রের এই নিঃশর্ত কৃষ্টিগতভাবে নতজানু হওয়ার দৃশ্য উপভোগ করতে করতে আমাদের ভাবরাজ্যের বিদেশী প্রভুরা নিয়ম করেছেন যে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির শর্ত হিসেবে ইংরিজি ভাষাজ্ঞানের পরীক্ষা দিতে (Toefl) দিতে হবে সমস্ত ময়ূরপুচ্ছধারী কাককুলকে।

অবশ্যই, আন্তর্জাতিক সাহিত্য ও বিজ্ঞান জানার জন্য ইংরিজি শিখতে হবে আমাদের। শিখতে হবে ফরাসী, জার্মান, রাশিয়ান। কিন্তু ভাগ্যতাড়িত মাইকেলের মত ঠেকে শেখার আগেই ভাবতে হবে আমাদের নিজস্ব ভারতীয় রাস্তায়। ইংরিজিতে ভাবা বন্ধ করতেই হবে। আর সেজন্য সকলকে না হলেও অন্তত সমস্ত ভাষাশিক্ষক সাহিত্য ও ইতিহাস শিক্ষককে বাধ্যতামূলকভাবে জানতে হবে সংস্কৃত। বিবেকানন্দকে অন্তত পুরোহিততন্ত্রের সমর্থক তো কেউ বলবে না; তাঁর মতো কঠোর ভাষায় কুসংস্কার ও বামুনাইকে কশাঘাত করেছেন আর কে? কিন্তু তিনিই বারবার লিখেছেন:

গান্ধীজী চেয়েছিলেন মানসিক শিক্ষা

"আমি তোমাদিগকে বলিতেছি তোমাদের অবস্থা উন্নত করিবার একমাত্র উপায় সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করা।"

[ভারতে বিবেকানন্দ (১৩শ সংস্করণ, পৃঃ ৩২২]

তিনি তাঁর একান্ত শ্রদ্ধার পাত্র বুদ্ধদেবকেও দোষী করেছেন, "এমন কি এত বড় যে বুদ্ধ তিনিও সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার বন্ধ করিয়া দিয়া এক বিষম ভুল করিয়াছিলেন।"—(ঐ)

অনেকেই একথা শুনে এখন হাসবেন অথবা আঁতকে উঠবেন "সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা"? অথচ অধিকাংশ ভারতীয় ভাষার অধিকাংশ শব্দাবলী সংস্কৃতের যতটা কাছাকাছি ইংরিজির নিশ্চয়ই ততটা নয়। সেই সম্পূর্ণ বিজাতীয় ইংরিজি যদি আমরা চাপিয়ে দিতে পারি ভারতের ঐক্যের জন্যে সব প্রদেশের বালকদের ওপর—সংস্কৃতকে কেন পারবো না? যদি ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষার অক্ষুণ্ণ চর্চা অক্সফোর্ড কেমব্রিজের ছাত্রদের (ইস্কুল ও কলেজে) বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষায় বাধা না দিয়ে থাকে তা হলে ন্যায়ের ভাষা, গণিতের ভাষা, জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষা সংস্কৃতই বা কেন জাতীয় শিক্ষার বাহন হতে পারবে না তা বুঝি না। এ বিষয়ে অবশ্যই ইজ্রায়েলে মৃত হিব্রুর পুনরুত্থাপন স্মরণীয়। সংস্কৃত ভাষা তো তাও ভারতে মৃত ঘোষিত হলেও সারা বিশ্বে আজও খুবই জীবিত। এই আধুনিক যুগেই বর্তমান ভারতে কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আমি দেখেছি অল্পবয়স্ক কিশোর যুবককে সংস্কৃতে সিনেমার গল্প করতে, অনর্গল আড্ডা দিতে। কনফারেন্সে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের ভিন্ন ভাষা-ভাষী দার্শনিকদের দেখেছি স্বচ্ছন্দে, দেবভাষায় ভাববিনিময় করতে।

শুধু ভাষার প্রশ্ন নয় ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জীবনাদর্শের প্রশ্ন। আর তাই নিয়েই আমাদের এই প্রবন্ধের অন্তিম আলোচনা।

৫· হওয়া ও পাওয়া

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এক অনবদ্য নিষ্পক্ষপাত তুলনামূলক আলোচনার পর স্বামীজী মন্তব্য করেছেন—

"হিঁদুর সেই যে অন্তর্দৃষ্টি তা আগা-পাস্তলা সমস্ত কাজে। হিঁদু—ছেঁড়া ন্যাতা মুড়ে কোহিনুর রাখে; বিলাতি—সোনার বাক্সয় মাটির ঢেলা রাখে।"

স্বামীজী এই ছেঁড়া ন্যাতার নিন্দে যথেষ্ট করেছেন। কিন্তু বারবার সাবধান করেছেন বিলিতি সোনার বাক্সটি ধার করতে গিয়ে আমাদের নিজস্ব কোহিনুরটিকে ফেলে না দিই।

শিক্ষার বিষয়ে সমস্ত আলোচনাই ভাসা ভাসা এবং নিরর্থক হবে যতক্ষণ না আমরা স্পষ্টভাবে বুঝছি এবং বলতে পারছি যে আমাদের শিক্ষার পিছনে কি আদর্শ, কি মূল্যবোধ, কি লক্ষ্য কাজ করছে। আমরা কি গাড়িঘোড়া চড়ার জন্যেই লেখাপড়া করে যাবো চিরদিন। অথবা বড়জোর 'বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে' বলে যশের জন্য ডিগ্রী অর্জন করে যাবো?

সাধারণত মানুষ যা চায় তাকে

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চারটি বিকল্পে ভাগ করার রীতি আছে আমাদের দেশে। এ ক্ষেত্রেও অধিকারী ভেদ বা রুচিবৈচিত্র্যের জন্য জায়গা রাখতে হবে। সকলেই অর্থ, কাম, বা ধর্ম চাইবে না। কিন্তু আক্ষেপের সঙ্গে অথবা গৌরবের সঙ্গে সকলেই প্রায় স্বীকার করেন যে ভারতবর্ষ ঐতিহাসিকভাবে জাগতিক সুখ সমৃদ্ধির থেকে মোক্ষের দিকে বেশী ঝুঁকছে। আর তাই সমূহের থেকে ব্যক্তিকে নিয়ে, শরীর থেকে আত্মাকে নিয়ে, ভোগের থেকে ত্যাগ নিয়ে, কোনো কিছু পাওয়া থেকে হওয়া নিয়ে ভারতের বেশী মাথা ব্যথা। শিক্ষার দুরকম উদ্দেশ্যের কথাই প্রাচীনকাল থেকে পাশ্চাত্যেও শোনা গেছে—

রাসেল লিখেছেন—"Education has two purposes: on the one hand to form the mind, on the other hand to train the citizen. The Athenians concentrated on the former the Spartans on the latter. The Spartans won, but the Athenians were remembered."

(The Scientific Outlook, p 251)

ভারতের শিক্ষায় যদি ভারতীয়তা কিছুমাত্র রাখতে হয় তা হলে এই মুহূর্তে অধিকাংশ "শিক্ষিত" অভিভাবকদের মনে যে জঠরসর্বস্ব গাড়িবাড়ি পদোন্নতি কেন্দ্রিক জীবনাদর্শ বস্তুত দৃঢ়প্রোথিত হয়ে আছে তাকে উৎপাটিত করতেই হবে। বারবার ভারতের কুসংস্কার, ভারতের আলস্যপ্রবণতা, ভারতের নিম্নবর্গীয়দের ওপর অত্যাচারকে শাণিত বিদ্রূপ করবার পর স্বামীজি তাই লিখছেন তবুও "এখন বুঝতে পারছো তো এ রাক্ষসীর প্রাণপাখীটি কোথায়? ধর্মে। সেইটির নাশ কেউ করতে পারেনি বলেই জাতটা এত সয়ে এখনও বেঁচে আছে।" (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পৃঃ ২১)

একথা বললেই আজকের দিনে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধসন্ধানী তাত্ত্বিকেরা বলে উঠবেন—"আজ্ঞে, কোন্ ধর্মটার কথা বলছেন, ভারতে তো অনেক ধর্ম আছে?" অনেক ধর্ম একসঙ্গে থাকায় যে হানাহানি হয় তা কতটা ধর্মের জন্য আর কতটা অন্য রাজনীতিক কারণে তা বিচার্য, কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামি আজও ভারতের অন্তরে নেই। থাকলে স্বর্ণমন্দিরে অত বড় রক্তারক্তি, ইন্দিরা হত্যা ও তৎপরবর্তী প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও শত শত শিখ বদ্রীনারায়ণে হিন্দু মন্দিরে পূজা দিতে যেতো না, শত শত হিন্দু পীরের দরগায় সিন্নি মানতো না।

হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন এসবের ভেদ তো ব্যবহারিক জীবনে কোনোই ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করবে না কারণ এদের আচারব্যবহারে বড় রকমের তফাত নেই। জীবনের উদ্দেশ্য বিষয়েও সকলেই একজাতীয় নির্বাণেই বিশ্বাসী। খ্রীস্টান ও মুসলমানকে নিয়ে যে সমস্যা তাতে ওঁদের অসহিষ্ণুতাটুকু (অন্য ধর্মাবলম্বীরা নরকে যাবে ইত্যাদি বিশ্বাস) বাদ দিলে মনুর বলা

"অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরি না করা), শৌচ (বাহ্য ও অন্তরের শুচিতা), ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী
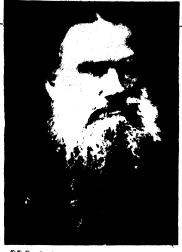
মনীষী লিও টলস্টয়

(বুদ্ধি), বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ"—এই দশ লক্ষণ ধর্ম অনায়াসেই ভারতীয় জাতীয় শিক্ষার ঘোষিত লক্ষ্য হতে পারে। এতে নাস্তিকেরও ধর্মহানি হবার সম্ভাবনা নেই।

আসল কথা যতদিন না কেবলমাত্র "পাওয়া" লক্ষ্য করে ছোটা বন্ধ হচ্ছে, অন্তত যাঁরা শিক্ষা দেবেন তাঁদের মধ্যে থেকে, যতদিন না সমাজ সম্মান দিতে শিখছে অকিঞ্চন শ্রান্তপন্থী নতুন যুগের বুনো রামনাথদের—ততদিন শত প্রযুক্তিবিদ্যা শিখিয়েও রোধ করা যাবে না হাক্সলের দুঃস্বপ্নদৃষ্ট মূল্যবোধহীন দেহমাত্রসার এক পাশবিক সভ্যতাকে। যে সভ্যতা থেকে শুধু শংকরাচার্য-নানক-কবীর-রামকৃষ্ণ বাদ পড়বেন না, বাদ পড়বেন রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়র তুলসীদাসও। আজ যে রামায়ণ মহাভারত শেখানো যাচ্ছে না আমাদের বালক বালিকাদের পড়ানো যাচ্ছে না রবীন্দ্র রচনাবলী, জানানো যাচ্ছে না গীতাতে কি আছে—তার কারণ ওসব না জেনেই তারা পাচ্ছে চারহাজারি চাকরি, গাড়ি, নারী, বাড়ি, ও সম্মান। গণমাধ্যম সিনেমা টেলিভিশন তাদেরই রুচিকে সেবা করার নাম করে তাদের পশুত্বকে উদবুদ্ধ করার সর্বাত্মক প্রয়াস করে যাচ্ছে। ফলে শিল্পে, সঙ্গীতে,

'শিক্ষকরা বইয়ে যা থাকে তাই-ই বিশ্বাস করেন'—রাসেল

সাহিত্যে, জীবনচর্যায় সাহেবদের সাহস, বলবীর্য স্বাজাত্যবোধ, আর রজোগুণ অনুকরণ করার আগে আগেই আমরা গিলে ফেলছি তাদের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, তাদের লক্ষ্যহীনতা, তাদের গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, বৃদ্ধ মাতাপিতার ওপর অবহেলা। আমাদের কোহিনুর জেনেশুনে ছুঁড়ে ফেলেছি রাস্তার ধারে। পশ্চিমের সোনার বাক্স আমরা এখনো পাইনি— (অনেক প্রাণপণ দৌড়ে একটা দুটো সোনার মেডেল বড় জোর পেয়েছি)—কিন্তু ওই বাক্সের লোভে কোহিনুরের জায়গায় আমাদের সেই পুরোনো ছেঁড়া ন্যাতাতেই সযত্নে মুড়ে গ্রহণ করেছি তাদের ভেতরকার মাটির ঢেলা।

তবু রবীন্দ্রনাথ আশা করেছেন—

"ভস্মাচ্ছন্ন মৌনীভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে; আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া পুত্রকন্যাগণকে কোটফ্রক পরাইয়া দিয়া বিদায় লইব তখনো সে শান্ত চিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া কহিবে: পিতামহ আমাদিগকে মন্ত্র দাও।

তিনি কহিবেন: ওঁ ইতি ব্রহ্ম

তিনি কহিবেন: ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

তিনি কহিবেন: আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ নবিভেতি কুতশ্চন

(রচনাবলী ১২শ খণ্ড, পৃঃ ১০২৬)

জাতীয় শিক্ষার সরকারী প্রস্তাবে মাঝে মাঝে এই আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের কথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু মূল জোরটি রয়েছে যন্ত্র বৈজ্ঞানিক উন্নতি এবং আধুনিকীকরণের দিকে, আর শিক্ষার সংখ্যাগত প্রসারের দিকে। সাধারণ শিক্ষার সংখ্যাগত প্রসার খুবই বাঞ্ছনীয়; কিন্তু যাকে অসাধারণ শিক্ষা বলতে চেয়েছি তার মর্যাদারক্ষার জন্য সংখ্যাসংকোচনই প্রয়োজন বলে মনে করি।

শেষ কথা হল লক্ষ্য স্থির করে নিতে হবে একই সঙ্গে প্রযুক্তিবিজ্ঞান শিক্ষায় পাশ্চাত্যের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আর প্রাচীন আধ্যাত্মিক পরম্পরার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা কতটা সম্ভব জানি না। কোনটাকে প্রথম গুরুত্ব দেবো তা ঠিক করে নিতেই হবে। কে কার বাধক হলে খর্বিত হবে? এখানে জন স্টুয়ার্ট মিলের আলোচিত সেই বিখ্যাত প্রাচীন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। আমরা "Socrates dissatisfied" হতে চাইব, না "Pig satisfied" হতে চাইব?

যদি জাগতিকভাবে তৃপ্ত হয়েও সক্রেটিস হওয়া আমাদের কপালে থাকে তা হলে তো ভালই। কিন্তু যদি আমরা আবার জোর গলায় বলতে পারি—যতই আমাকে ধনরত্ন দাও আমি কখনো ধর্মহীন শূকর হবো না, কখনো দেহকে মনে করব না "আমি", কখনো বিত্তের বিনিময়ে আমার মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দেবো না, তা হলেই, শুধু ভারত শিক্ষিত হবে না, এতদ্দেশপ্রসূত অগ্রজন্মাদের কাছ থেকে আবার স্ব স্ব চরিত্র শিক্ষা করবে "পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ ॥"

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা

ডঃ শান্তনু চক্রবর্তী

শিক্ষা, রাজনীতি ও পশ্চিমবঙ্গ

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

পরাধীন ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল স্পষ্টতই বিদেশী শাসকের স্বার্থে। শিক্ষার মাধ্যমে এ-দেশের মানুষকে উন্নত ও আধুনিক করে তোলার ব্যাপারে শ্বেতাঙ্গের দায়ভার (whiteman's burden)-এর কথা প্রকাশ্যে উচ্চারিত হলেও প্রকৃত পক্ষে প্রশাসনিক সুবিধার্থে শিক্ষাবিস্তার সংক্রান্ত মেকলের নীতিই ছিল সেদিনের শিক্ষাব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি। স্পষ্টতই এই সংকীর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শিক্ষাব্যবস্থাকে সুস্থ ও ব্যাপক সমাজ-পরিবর্তনের উপযুক্ত মাধ্যম রূপে ব্যবহারের সুযোগ ছিল নিতান্তই সামান্য। বস্তুত, শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে আত্মপ্রত্যয় ও মনুষ্যত্বের স্বাধীন বিকাশকে সুনিশ্চিত করার উপযুক্ত শর্তাদি থেকে বঞ্চিত ছিলেন পরাধীন ভারতবাসী। তথাপি আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে এই ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতবর্ষের বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলে ক্রমশই জাগরণের বজ্রধ্বনি শোনা যেতে থাকে। পরাধীন জীবনের ক্ষুদ্র জানালা দিয়ে শিক্ষার যে আলো এসে পৌঁছায় তারই ছোঁয়ায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে অসংখ্য প্রতিভাধর ব্যক্তির মনীষা। স্বাতন্ত্র্যকামী এই মনীষার প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয় ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদী চেতনা, যার অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা দেয় ইংরেজ

শিক্ষার দরজা বন্ধ। কবে খুলবে ? ছবি : অশোক চক্রবর্তী

ছবি : অলক মিত্র

শাসকের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম। অন্য দিকে যাঁরা বিশেষ কোনও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না অর্থাৎ যাঁরা ছিলেন সমাজের সাধারণ মানুষ, তাঁরাও ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষার দ্বারা উপকৃত হন। অধিগত শিক্ষার মাধ্যমে বিরাট কোনও কাণ্ড ঘটানো অবশ্যই এঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু সনাতনী ভারতীয় ঐতিহ্যে লালিত হওয়ায় এবং শিক্ষার সাযুজ্যে স্বদেশে নিরন্তর মনীষার উদ্বোধন ঘটতে দেখে তাঁদের মনে শিক্ষা সম্পর্কে এক বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব গড়ে ওঠে। এই কারণে, অর্থাৎ এক বিশেষ মূল্যবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ায়, এঁদের মধ্যে যে যতটুকু শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন সেটুকু গ্রহণ করতে গিয়ে এঁরা কখনই ফাঁকি বা চালাকির আশ্রয় নেননি। ফলত নিজ নিজ পঠিতব্য বিষয় সম্পর্কে একটা ন্যূনতম জ্ঞানের ভিত্তি এঁরা তৈরী করে নিতে পেরেছিলেন যার প্রভাবে ব্যবহারিক জীবনে এঁদের প্রতি পদক্ষেপে হোঁচট খেতে হয়নি। এর অর্থ এই নয় যে, ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণ ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে আত্মবিকাশের সুযোগ পেয়েছিলেন। ইংরেজ সরকার স্বীয় শাসনের সুরক্ষার্থে শিক্ষার মাধ্যমে এক অনুগত এলিট শ্রেণী তৈরী করতে চেয়েছিলেন। স্বভাবতই তাঁরা শিক্ষাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন বিত্তশালীর বিশেষাধিকার রূপে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে, বিশেষ করে বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে, শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়েছিল। বস্তুত, এইটিই হল ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার ফলাফল পর্যালোচনা করলে যে সত্যটি প্রকট হয়ে ওঠে তা হল এই যে, ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার আনুকূল্যে উদ্ভূত ভারতীয় এলিট গোষ্ঠী যতই অগ্রণী হতে থাকেন ততই তাঁদের মধ্যে দেখা দেয় তথাকথিত আনুগত্যের বন্ধন ছিঁড়ে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রবণতা যার চূড়ান্ত পরিণামে অনিবার্য হয়ে ওঠে ইংরেজ শাসনের অবসান।

আজকের দিনে শিক্ষাসংক্রান্ত কোনও সদর্থক আলোচনায় এই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার প্রাসঙ্গিকতা নিতান্ত সামান্য নয়। কারণ পরাধীন ভারতবর্ষে শিক্ষার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে শিক্ষার স্বরূপ সম্পর্কে যে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় তা এইরকম। প্রথমত, শিক্ষার নিজস্ব শক্তি এতই অপরিসীম যে পরাধীনতার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সে জাতীয় জীবনের গতিপথে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু শিক্ষার এই শক্তিকে অটুট রাখার জন্য চাই উপযুক্ত মূল্যবোধের বাতাবরণ। শিক্ষাকে জ্ঞানান্বেষণের মহৎ আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করতে না পারলে, শিক্ষা সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি দেখা না দিলে এবং জ্ঞানী-গুণী উপযুক্ত সম্মান ও সমাদর থেকে বঞ্চিত হলে এই মূল্যবোধ গড়ে উঠতে পারে না এবং সেক্ষেত্রে শিক্ষার ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশ্য এই মূল্যবোধ আপনাআপনি গজিয়ে ওঠে না, এর জন্য প্রয়োজন হয় উপযুক্ত নেতৃত্বের। পরাধীন ভারতবর্ষে এই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বরেণ্য মনীষীবর্গ। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ রাজনীতিকারেরা এই নেতৃত্ব তুলে নেন নিজেদের হাতে। কিন্তু স্বাধীনতার উন্মুক্ত আবহাওয়ায় সর্বশ্রেণীর মানুষের স্বার্থে শিক্ষার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করে তাকে সমাজোন্নয়নের বৃহত্তর লক্ষ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করার কাজে এই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রথম থেকেই নিদারুণ ব্যর্থতার পরিচয় দিতে থাকেন। বস্তুত, সমাজ তথা শিক্ষা নিয়ে গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তা করার আগ্রহ ও অবকাশ তাঁদের ছিল না। শাসনক্ষমতার স্বাদ পেয়ে তাঁরা সকলেই ক্ষমতার রাজনীতির সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েন এবং নির্বাচনী যুদ্ধে জয়লাভ করে নিজেদের শাসনাধিকার অব্যাহত রাখাই তাঁদের মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভোটদাতাদের সামনে সাফল্যের স্ফীত পরিসংখ্যান নিয়মিত পেশ করার তাগিদে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই শিক্ষাক্ষেত্রেও সুষ্ঠু ও সামগ্রিক পরিকল্পনা ছাড়াই অর্থব্যয় শুরু হয়, যার কল্যাণে শিক্ষার আনুষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক স্তরে দেখা দেয় ক্রমবর্ধমান তৎপরতা। ফলস্বরূপ দেশে অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং উচ্চ শিক্ষারত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যায় বিস্ফোরণ ঘটে। কিন্তু সংবিধান প্রবর্তনের দশ বছরের মধ্যে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক-শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন সংক্রান্ত সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি অবহেলিত হয় এবং ১৯৭১ সনে দেশবাসীর প্রায় ৭১ শতাংশ ও ১৯৮১ সনে প্রায় ৬৪ শতাংশ ভারতবাসী নিরক্ষর থেকে যায়। অন্যদিকে শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে এক বলিষ্ঠ নির্দেশনীতির অভাবে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রী এই উভয় পক্ষই এক প্রাণহীন, আনন্দহীন যান্ত্রিকতার শিকার হতে থাকেন। একই সঙ্গে সার্থক শিক্ষার অনুকূল মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে যে শূন্যতা দেখা দেয় তা প্রবল উৎসাহে পূরণ করতে থাকে রাজনীতি।

ভারতবর্ষের এক অঙ্গরাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গেও এই একই চিত্র দেখা যেতে থাকে। তবে যত দিন বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন এ রাজ্যের কর্ণধার ততদিন পর্যন্ত তাঁর সুদক্ষ ও বিচক্ষণ নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাজগতের স্বাতন্ত্র্য ও পবিত্রতায় কোনও গুরুতর আঘাত আসেনি। কংগ্রেস রাজ্যদলের নেতা হিসাবে বিধানচন্দ্রের রাজনীতিতে অবশ্যই ছিল প্রাথমিক অঙ্গীকার। তথাপি শিক্ষার স্বতন্ত্র মূল্যবোধ রক্ষার দায়িত্ব বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। বস্তুত, তিনি তো কেবলমাত্র এক প্রখ্যাত চিকিৎসক ও প্রথম সারির রাজনীতিকারই ছিলেন না, তিনি একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদও ছিলেন। স্বভাবতই শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতির সর্বাত্মক অনুপ্রবেশ তিনি অনুমোদন করেননি। ফলত তাঁর আমলে বিদ্যায়তন প্রকৃত পক্ষেই ছিল বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র, ছাত্র-রাজনীতি সংযম ও শৃঙ্খলার সীমারেখা অতিক্রম করে যায়নি, রাজনীতির আকর্ষণে শিক্ষকেরা তাঁদের মূল কর্তব্য বিস্মৃত হননি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি রাজনীতির নিয়মে নিয়ন্ত্রিত না হয়ে চলত নিজস্ব অ্যাকাডেমিক নিয়মানুসারে। কিন্তু বিধানচন্দ্রের জীবনাবসানের পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাজগতে দুর্যোগের আভাস দেখা দিতে থাকে এবং সত্তরের দশকের প্রারম্ভ থেকে এ রাজ্যে শুরু হয় শিক্ষায় সর্বনাশা অবক্ষয়ের যুগ। ১৯৬৬ সনের গোড়ার দিকে রাজ্য জুড়ে যে স্বতঃস্ফূর্ত সরকারবিরোধী আন্দোলন হয় তাতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল যুব ও ছাত্রশক্তির। স্বভাবতই এর পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী রাজনীতি ছাত্রশক্তির ব্যাপক রাজনৈতিক ব্যবহারে খুবই তৎপর হয়ে ওঠে এবং এর অপ্রতিরোধ্য প্রভাব গিয়ে পড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর।

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও আজ রাজনীতির কোলাহল এসে পৌঁছেছে — ছবি : অলক মিত্র

দ্বিতীয় পর্বে নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বিধ্বংসী উদ্যোগ শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে বিভ্রান্তি, বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তা নিয়ে আসে। তৃতীয় পর্ব শুরু হয় ১৯৭২ সনে যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে এ রাজ্যের কংগ্রেস দল ছাত্রশক্তিকে জঙ্গী রাজনীতিতে উৎসাহিত করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পবিত্রতায় চরম আঘাত হানেন। এইভাবে প্রায় দশ বছর ধরে ক্রমান্বয়ে রাজনীতির অতি-সক্রিয়তায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্র রূপান্তরিত হয় নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার হট্টমেলায়। এই পরিস্থিতিতে ১৯৭৭ সনে এ রাজ্যে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন বামফ্রন্ট এবং তাঁদের নেতৃত্বে গত দশ বছর ধরে পরিচালিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা।

এই দশ বছরে বামফ্রন্ট শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন সেগুলি বিশ্লেষণ করলে শিক্ষা সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সহজেই শনাক্ত করা যায়। প্রথমত, রাজ্য বাজেটের প্রায় এক-চতুর্থাংশ তাঁরা বরাদ্দ করেছেন শিক্ষাখাতে। অর্থাৎ সমাজজীবনে শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্ব বর্তমান সরকারের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। দ্বিতীয়ত, বামফ্রন্টের শাসনকালে দশ হাজারের বেশী নতুন প্রাথমিক স্কুল খোলা হয়েছে, প্রায় আঠাশ হাজার নতুন প্রাথমিক শিক্ষকের পদ তৈরী করা হয়েছে এবং বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা আশি লক্ষের বেশী। একই সঙ্গে প্রায় আড়াই হাজার নতুন সেকেণ্ডারি স্কুল স্থাপিত হয়েছে এবং সেকেন্ডারি স্তরে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বেড়েছে প্রায় আঠারো লক্ষ। উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনে পঞ্চাশটি নতুন কলেজ, একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই খোলা হয়েছে অনগ্রসর গ্রামাঞ্চলে। তৃতীয়ত, বামফ্রন্টের উদ্যোগে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক হয়েছে এ রাজ্যে। এই তথ্যমালা অবশ্যই প্রমাণ করে যে, গ্রামাঞ্চলে ও দরিদ্রশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে বামফ্রন্ট সবিশেষ আগ্রহী। চতুর্থত, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনহারে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজশিক্ষকদের জন্য যে উচ্চ হারে বেতনক্রম প্রবর্তিত হয়েছিল বর্তমান সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে তা অব্যাহত আছে। কলেজ স্তর পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষপ্রতিষ্ঠানের যাবতীয় আর্থিক দায়দায়িত্ব সরকারের। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পাচ্ছেন উদার সরকারী অনুদান। সরকারী কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট মহার্ঘভাতার সুযোগ পাচ্ছেন সর্বশ্রেণীর শিক্ষক। এক কথায়, স্বল্প বেতনের কারণে উপযুক্ত সামাজিক মর্যাদার অভাব সম্পর্কিত শিক্ষকদের দীর্ঘ দিনের ক্ষোভ এখন প্রশমিত। পঞ্চমত, বামফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলির অভিযোগ ছিল এই যে, শিক্ষার পরিচালন ব্যবস্থায় কায়েমী স্বার্থের অবাধ প্রভুত্ব দীর্ঘ দিন ধরে এ রাজ্যে শিক্ষার সর্বনাশ ঘটিয়েছে। স্বভাবতই শাসনক্ষমতা লাভ করে তাঁরা মনোযোগ দেন শিক্ষা-পরিচালন ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণে এবং তাঁরা দাবি করেন যে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীর সংগঠনে মুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব সুরক্ষিত।

এই গণতন্ত্রীকরণের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে নিঃসন্দেহে বিতর্কের অবকাশ আছে। তবে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করার আগে যে ব্যাপারটি নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হয় তা হল এই যে গত দশ বছরে বামফ্রন্টের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে আনুষ্ঠানিক ও আয়তনগত বিচারে শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা দিয়েছে। বস্তুত, এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার অগ্রগতি সংক্রান্ত সরকারী পরিসংখ্যানের পৃথুল অবয়ব আপাতদৃষ্টিতে বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক। কিন্তু শুধুমাত্র আয়তনগত বিস্তৃতি শিক্ষার প্রগতি বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না। শিক্ষার সাফল্য বিচারের শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড হল তার গুণগত অগ্রগতি। কাজেই প্রশ্ন ওঠে যে বামফ্রন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন পশ্চিমবঙ্গে গত দশ বছরে শিক্ষাব্যবস্থায় কোনও গুণগত পরিবর্তন দেখা দিয়েছে কি না অর্থাৎ সারা দেশ জুড়ে যখন উপযুক্ত মূল্যবোধের অভাবে এবং নির্বোধ যান্ত্রিকতার নিষ্পেষণে শিক্ষা হয়ে উঠেছে এক আদর্শহীন ও আনন্দহীন আনুষ্ঠানিক আচার তখন বামফ্রন্টের সঠিক নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ এ বিষয়ে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছে কি না। সরকারী পরিসংখ্যানে অথবা রাজনৈতিক ভাষণে অবশ্যই এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ বিষয়ে সঠিক উত্তর পেতে হলে আমাদের জানতে হবে যে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের যাবতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অবস্থাটা কী, সেখানে কী পরিবেশে কেমন করে চলছে দৈনন্দিন পঠন-পাঠনের কাজ। দুর্ভাগ্যক্রমে, এ বিষয়ে অভিজ্ঞতার ঝুলি উজাড় করলে যে তিক্ত সিদ্ধান্তটি বেরিয়ে আসে তা হল এই যে, পশ্চিমবঙ্গে গত দশ বছরে শিক্ষায় সামান্যতম গুণগত পরিবর্তনও ঘটেনি এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতই এ রাজ্যেও শিক্ষার অধোগতি ক্রমবর্ধমান।

রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির দৈনন্দিন কাজকর্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সর্বস্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই আজ কতকগুলি সাধারণ সমস্যার সম্মুখীন, আবার প্রত্যেক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই কতকগুলি নিজস্ব বিশেষ সমস্যা আছে। সাধারণ সমস্যার পর্যায়ে পড়ে নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ, আন্তরিকতা ও কর্তব্যপরায়ণতার গুরুতর অভাব, বিদ্যাচর্চার অনুকূল পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ প্রবর্তনে কর্তৃপক্ষের চরম ব্যর্থতা এবং সর্বোপরি শিক্ষার উচ্চতর আদর্শ সম্পর্কে ছাত্র ও শিক্ষক সকলের মনেই যথোপযুক্ত চেতনার অভাব। বস্তুত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির বাইরের চেহারাতেই শিক্ষার বর্তমান দুরবস্থার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। বিদ্যায়তনগুলিতে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে, পরিচ্ছন্নতার চিহ্নমাত্র নেই। দেওয়ালগুলিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কিত অসংখ্য দেওয়াললিখন ও পোস্টারের ছড়াছড়ি দেখে যে কোনও নবাগন্তুকই বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রকে রাজনীতি চর্চার কেন্দ্র বলে ভুল করতে পারেন। ক্লাসরুমগুলি শ্রীহীন এবং সেখানে পঠন-পাঠনের জন্য প্রয়োজনীয় শান্ত পরিবেশ প্রায়শই বিঘ্নিত হয় কারণে-অকারণে কলেজের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের স্লোগান ও বক্তৃতার কলরবে। এ বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভবত এক বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকীর্ণ প্রাঙ্গণ নিয়মিত ব্যবহৃত হয় কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের রাজনৈতিক জমায়েত ও বক্তৃতার জন্য সংরক্ষিত এলাকা রূপে যার ফলে পার্শ্ববর্তী আশুতোষ ভবনে স্নাতকোত্তর ক্লাসগুলি চালানো দুষ্কর হয়ে পড়ে। এইভাবে যদি শিক্ষাকেন্দ্রের পবিত্রতা প্রতি মুহূর্তে বিঘ্নিত হয়, যদি নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও শৃঙ্খলার আবহাওয়া ফিরে না আসে, যদি শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রকৃতার্থে শিক্ষাব্রতী হয়ে উঠতে না পারেন, যদি ছাত্রছাত্রীরা অ্যাকাডেমিক আদর্শ ও নিয়মাবলীর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব মেনে নিতে না পারেন, তা হলে প্রভূত অর্থব্যয় করেও এ রাজ্যে শিক্ষার কোনও উন্নতি ঘটানো সম্ভব নয়।

এই সরল সত্যটি উপলব্ধি করে বামফ্রন্টের সচেষ্ট হওয়া উচিত ছিল এই সমস্যার মোকাবিলায়। বস্তুত শাসকদলের সক্রিয় উদ্যোগ ও সজাগ দৃষ্টি ছাড়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কী করে সম্ভব তা বোঝার জন্য নরেন্দ্রপুর ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের মত কয়েকটি বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্রটি বিবেচনা করা যেতে পারে। নরেন্দ্রপুর ও সেন্ট জেভিয়ার্সের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ শিক্ষা সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। সেখানে স্লোগান নেই, পোস্টার নেই, মিছিল নেই, অকারণ কোলাহল নেই। সেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রী উভয় পক্ষই এক আন্তরিক কর্মযজ্ঞের শামিল। সেখানে ক্লাসগুলি নিয়মিত হয়, পরীক্ষা নিয়মিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেদের দৃষ্টান্ত দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী ও শৃঙ্খলানুরাগী করে তোলার চেষ্টা করেন। অথচ এই সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরা তো স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রে ভূষিত নন, তাঁরা এ রাজ্যের শিক্ষকসমাজ ও ছাত্রসমাজেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তথাপি এখানে শিক্ষার পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে এই কারণে যে কর্তৃপক্ষের দৃঢ়তায় এখানে বিদ্যাঙ্গনে রাজনীতির অনিয়ন্ত্রিত অনুপ্রবেশ ঘটেনি যার ফলে শিক্ষার স্বার্থে এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মপালন ও শৃঙ্খলারক্ষার ব্যাপারটিতে অগ্রাধিকার দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, এখানকার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরা অরাজনৈতিক প্রাণী। অবশ্যই তাঁদের নিজস্ব রাজনৈতিক বিশ্বাস আছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সবল নেতৃত্বে ও সতর্কতায় এই রাজনৈতিক বিশ্বাস অতি-সক্রিয় হয়ে বিদ্যাচর্চা ও শিক্ষা-পরিচালন ব্যবস্থার প্রাত্যহিক কর্মধারায় বাধার সৃষ্টি করে না। এখানে কর্তৃপক্ষ শক্ত হতে

পারেন কারণ তাঁদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃত সাংবিধানিক স্বাতন্ত্র্য তাঁদের অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখে এবং শক্তিশালী হতে সাহায্য করে। কিন্তু অন্যত্র অবস্থাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেখানে শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ রাজনৈতিক মেরুকরণে এতই মগ্ন এবং নিজ নিজ রাজনৈতিক মতাদর্শকে শিক্ষাদর্শের উর্ধ্বে স্থান দিতে এতই অভ্যস্ত যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যে কোনও অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে কর্তৃপক্ষ তাঁদের ঐক্যবদ্ধ সমর্থন ও সহায়তা থেকে সততই বঞ্চিত হন। এর ফলে শিক্ষার বিশুদ্ধ স্বার্থে কোনও সাহসী পদক্ষেপই কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব হয় না। এইভাবে এক অসহায় পরিবেশে কাজ করতে করতে কর্তৃপক্ষ দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত গা ভাসান গতানুগতিকতার গড্ডলিকা প্রবাহে। এই কারণেই পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থায় আজ মূল্যবোধের সংকট তীব্র হয়ে উঠেছে। শিক্ষার আনুষ্ঠানিক কর্মগতি অবশ্যই সচল আছে, কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ আজ ভূলুণ্ঠিত। অর্থাৎ, নিরপেক্ষ বিচারে একথা অস্বীকার করা যায় না যে রাজনীতি ও শিক্ষার অবৈধ অন্বয়ে ষাটের দশকের শেষ ভাগ থেকে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল আজও তাকে সমূলে উৎপাটিত করা সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় শাসক দল হিসাবে বামফ্রন্ট তাঁদের গুরুদায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। বস্তুত, বামফ্রন্ট উদ্যোগী না হলে এই সংকট মোচন সম্ভব নয়। কারণ বামফ্রন্ট যদি তাঁদের অনুগত ছাত্র ও শিক্ষক সংগঠনগুলিকে এই প্রত্যয়ে আস্থাশীল করে তুলতে পারেন যে শিক্ষাকেন্দ্র রাজনৈতিক তৎপরতার উপযুক্ত ক্ষেত্র নয় এবং বিশুদ্ধ অ্যাকাডেমিক অনুশাসনের প্রতিই শিক্ষক ও ছাত্রের প্রাথমিক অঙ্গীকার, তা হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের পক্ষে দলমতনির্বিশেষে সকলকে নিয়মের কঠোর শাসনে রেখে বিশৃঙ্খলার নির্ভীক মোকাবিলা সম্ভব। কিন্তু এই কাজের প্রাথমিক শর্ত হল ব্যবহারিক রাজনীতির উন্মত্ত কোলাহল থেকে শিক্ষাজগৎকে দূরে সরিয়ে রাখা।

দুভার্গক্রমে শিক্ষাকে সক্রিয় রাজনীতির আবর্ত থেকে মুক্ত করার কোনও চেষ্টা বামফ্রন্ট করেননি, বরং শিক্ষাকে তাঁরা স্পষ্টতই ব্যবহার করেছেন রাজনৈতিক স্বার্থে। বস্তুত, গত দশ বছরে শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণের ঘোষিত লক্ষ্য সামনে রেখে বামফ্রন্ট শিক্ষার পরিচালন-ব্যবস্থায় যে সব উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে শিক্ষার গুণগত উন্নতি অপেক্ষা শিক্ষাক্ষেত্রে দ্রুত দলীয় প্রভাব বিস্তারই তাঁদের কাছে অধিকতর জরুরি কাজ বলে বিবেচিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে গণতন্ত্রীকরণের আদর্শ রূপায়ণে যে মূল নীতির ওপর নির্ভর করা হয়েছে তা হল 'আমাদের লোক' এবং 'আমাদের লোক নয়' এই ভিত্তিতে এক বিচিত্র দ্বিমেরুতার নীতি। অতঃপর পার্টির প্রতি বিশ্বস্ত আনুগত্যের ভিত্তিতে এই 'আমাদের লোক'-দের চিহ্নিত করে তাঁদের মধ্যে শিক্ষার নানা দায়িত্বভার বণ্টন করা হয়েছে। কিন্তু 'আমাদের লোক' যে অনিবার্যভাবেই শিক্ষার প্রকৃত আদর্শে অনুরক্ত হবেন এমন কোনও প্রাকৃতিক নিয়ম নেই। দ্বিতীয়ত, নিঃশর্ত রাজনৈতিক আনুগত্যই যদি 'আমাদের লোক' বিচারের মানদণ্ড হয় তা হলে শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন দৃশ্যত অনুপযুক্ত ব্যক্তিবর্গও এই 'আমাদের লোক'-এর গোষ্ঠীভুক্ত হতে পারেন অথবা নিছক স্বার্থান্বেষীরা অক্লেশে, রাজনৈতিক রঙ বদল করে দলে ভিড়ে যেতে পারেন। তৃতীয়ত, 'আমাদের লোক নয়' এই বিবেচনায় প্রত্যাখ্যাত গোষ্ঠীর মধ্যে অবশ্যই থাকতে পারেন অনেক যথার্থ শিক্ষাব্রতী যাঁদের প্রখর বুদ্ধি ও প্রকৃত শিক্ষানুরাগ শিক্ষার উন্নতি সাধনে বিশিষ্ট

স্কুলে কেন পুলিস ? শিশুদের এই বিস্মিত জিজ্ঞাসার উত্তর অনেক গভীরে — *ছবি : রাজীব বসু*

অবদান রাখতে পারে, কিন্তু যাঁদের অকৃত্রিম অ্যাকাডেমিক মন দলীয় রাজনীতির শিবিরে আশ্রয় গ্রহণে স্বভাবতই বিমুখ। এঁরা উপেক্ষিত হওয়ায় শুধু যে এ রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাই নয়, রাজনৈতিক দিক থেকেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বামফ্রন্ট। কারণ এঁদের বিচ্ছিন্ন করার ফলে বামফ্রন্ট শিক্ষিত শ্রেণীর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশের ইতিবাচক সমর্থন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং যেহেতু এই গুরুত্বপূর্ণ অংশের সম্মিলিত প্রভাব নিতান্ত সামান্য নয় সে কারণে শহরাঞ্চলে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে বামফ্রন্টের রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়েছে।

অবশ্য প্রকৃত বিচারে শিক্ষার উন্নতির কোনও সদর্থক প্রকল্পের সঙ্গে দলীয় রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধি সংক্রান্ত লক্ষ্যেরও কোনও সম্পর্ক নেই এবং থাকা উচিত নয়। কিন্তু শাসনক্ষমতায় আসার পর থেকেই বামফ্রন্ট শুধু যে এই সম্পর্ক বিষয়ে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন তাই নয়, এই সম্পর্ককে সুনিবিড় ও শক্তিশালী করে তুলতে বিশেষ তৎপরতাও দেখিয়েছেন। বস্তুত এ রাজ্যে শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন আনার ব্যাপারে বামফ্রন্টের বর্তমান ব্যর্থতার মূল কারণ এখানেই নিহিত। অন্যভাবে বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে বামফ্রন্ট যে একটা পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও কর্মচঞ্চল আবহাওয়া নিয়ে আসতে পারেননি তার জন্য মূলত দায়ী তাঁদের ভ্রান্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ ধরে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই বামফ্রন্ট দলীয় শক্তিবৃদ্ধির ব্যাপারে সবিশেষ মনোযোগী হয়েছেন। নিরপেক্ষ বিচারে এ কাজ অন্যায় বা অনৈতিক নয়। কারণ সংসদীয় গণতন্ত্রে যেহেতু ভোটই হল চূড়ান্ত নিয়ামক সেহেতু সব শাসকদলই ভবিষ্যৎ নির্বাচনে নিজেদের সাফল্য সুনিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধিতে সচেষ্ট হন। কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে যদি সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বীকৃত মূল্যবোধকে উপেক্ষা করা হয় তা হলে লক্ষ্য ও উপায়ের পারস্পরিক বিরোধিতায় গৃহীত যাবতীয় কর্মোদ্যোগেরই সাফল্য ব্যাহত হতে বাধ্য। মনে রাখা দরকার যে বিরোধী স্বার্থের সমন্বয় ও পারস্পরিক সমঝোতাই হল সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল্যবোধের মূল উপাদান। স্বভাবতই সংসদীয় গণতন্ত্রে শাসকদল প্রভাব ও সমর্থন বৃদ্ধির জন্য সমাজের সর্বস্তরে অতি দ্রুত দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা করেন না। বিরোধী শক্তিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করে এবং সর্ববিধ প্রশাসনিক উদ্যোগকে কঠোরভাবে নিরপেক্ষ রেখে কেবলমাত্র নিজেদের নীতি ও কর্মধারার জনকল্যাণমূলক উৎকর্ষের খতিয়ান বার বার জনসমক্ষে পেশ করে তাঁরা দলীয় শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করেন।

দুভার্গক্রমে সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে কর্মরত থেকেও বামফ্রন্ট অন্তত শিক্ষাক্ষেত্রে এই সংসদীয় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অনুসরণে আগ্রহ দেখাননি। প্রলেতারীয় বিপ্লবান্তে শ্রমজীবী

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার হাল খুবই শোচনীয় — *ছবি : দিলীপ ব্যানার্জী*

একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে যেভাবে অগ্রণী কমিউনিস্ট পার্টি শিক্ষার মত এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শাখায় মুখ্য নিয়ামকের ভূমিকা গ্রহণ করে প্রায় সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বামফ্রন্ট দ্রুত প্রাধান্য বিস্তার করতে চেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে। কিন্তু যেহেতু বামফ্রন্টের নির্বাচনী জয় কোনও প্রকার বিপ্লবের সূচনা করেনি অর্থাৎ যেহেতু প্রলেতারীয় বিপ্লবের সমস্ত মূল্যবোধই প্রকৃত পক্ষে অনুপস্থিত সেহেতু বামফ্রন্টের শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রাধান্য কোনও সচেতন ও বলিষ্ঠ মতাদর্শগত বিশ্বস্ততা অবলম্বন করে গড়ে ওঠেনি, এই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেকাংশেই সুবিধাভোগীদের তরল আনুগত্যের ভিত্তিতে। এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে বামফ্রন্টের অনুগামীদের বৃহদাংশের পক্ষে শিক্ষার প্রকৃত উন্নতিকল্পে এক ব্যাপক কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়া সম্ভব হয়নি। কারণ এর জন্য যে স্বচ্ছ দৃষ্টি, কল্পনাশক্তি, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও দক্ষতার প্রয়োজন তা তাঁদের আছে এমন কোনও প্রমাণ তাঁরা দিতে পারেননি। অন্য দিকে সম্ভবত মতাদর্শ-নিরপেক্ষ ব্যাপক সমর্থনের বালির বাঁধ যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়ার আশঙ্কায় বামফ্রন্টের পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা ও শাসনের মাধ্যমে এই অনুগামীদের যোগ্য করে তুলে তাঁদের পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষায় একটা অর্থবহ পরিবর্তন আনার কাজে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব হয়নি।

বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে এই দৃঢ় নেতৃত্বের অভাবে তাঁদের অনুগত শিক্ষক সংগঠনগুলিও তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেননি। এই সংগঠনগুলির শক্তি ও প্রভাব নিতান্ত সামান্য নয় এবং এঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অস্বীকার করে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষায় কোনও উন্নতি সাধনের পরিকল্পনা নিরর্থক। কিন্তু এইসব সংগঠনের বার্ষিক প্রতিবেদনগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রশ্নে এবং বামফ্রন্টের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে তাঁরা সততই সোচ্চার, কিন্তু কীভাবে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাকে পরিচ্ছন্ন ও প্রাণময় করে তোলা যায় সে বিষয়ে তাঁরা ততটা আগ্রহী নন। অথচ শিক্ষার প্রতি স্তরে আজ নানা ধরনের শিক্ষাগত সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন। বামফ্রন্ট তাঁদের শাসনকালে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ বিস্তৃত করেছেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি আজও গতানুগতিকতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারেনি। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক স্তরের শিশু শিক্ষার্থীর কাছে কী করে শিক্ষাকে মনের আনন্দের এক নিশ্চিত উপাদান করে তোলা যায় সে বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায় উদ্ভাবন এবং যথোপযুক্ত আন্তরিকতা ও উদ্যমের বিশেষ প্রয়োজন আছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বহুধাবিভক্ত ও ভারী সিলেবাসের বোঝা তরুণ বিদ্যার্থীদের কাছে এক গুরুতর সমস্যা হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞানশিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের মনে যথার্থ বিজ্ঞানচেতনা না জাগিয়ে তাদের শুধুমাত্র মুখস্থপ্রবণ করে তুলছে। কাজেই এই বিষয়টিরও পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অসংখ্য ছুটির ভিড়ে যে সামান্য সময় পাওয়া যায় তা দিয়ে নির্ধারিত সিলেবাসের উপযুক্ত মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এর ফলে এই স্তরের ছাত্রছাত্রীরা ক্রমশই প্রশ্নোত্তর প্রস্তুতির ওপর নির্ভর করে কার্যত শিক্ষাচর্চার খিড়কিতে আশ্রয় নিচ্ছেন যার জন্য তাঁদের জ্ঞানের কোনও ভিত্তি তৈরী হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে গড়ে প্রায় নব্বই শতাংশ ছাত্রছাত্রী বর্তমানে মাতৃভাষায় পাঠাভ্যাসে অভ্যস্ত, অথচ তাঁদের উপযোগী মাতৃভাষায় লিখিত উচ্চ মানের পাঠ্যপুস্তকের নিদারুণ অভাব। ফলত উচ্চ শিক্ষার মান দ্রুত নেমে যাচ্ছে। তৃতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উচ্চতর গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ নেই এবং গবেষণার মানও নিম্নমুখী। সর্বোপরি সর্বস্তরের শিক্ষকদের মধ্যেই যথোচিত কর্তব্যপরায়ণতার অভাব আজ পশ্চিমবঙ্গে এক বাস্তব ঘটনা।

স্বল্প পরিসরে মাত্র কয়েকটি সমস্যার উল্লেখ করা হল, যদিও এই ধরনের সমস্যা অসংখ্য। বস্তুত, এইসব সমস্যা যতই বাড়ছে ততই সর্বস্তরের শিক্ষায় দেখা দিচ্ছে এক নিষ্প্রাণ যান্ত্রিকতা যার চাপে আজ এ রাজ্যের সমস্ত শিক্ষার্থীই নিরুদ্যম ও হতাশাগ্রস্ত। এই যান্ত্রিকতা ও গতানুগতিকতার জগদ্দল পাথর অপসারিত করে শিক্ষার প্রাণময় ও আনন্দময় গতি সচল রাখার জন্য বিপুল অর্থব্যয়ের প্রয়োজন নেই, এর জন্য চাই শুধু সঠিক নেতৃত্ব, সুচিন্তিত ও বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা এবং ছাত্র ও শিক্ষকদের শিক্ষার আদর্শে উৎসর্গীকৃত হওয়ার মত মানসিকতা। কিন্তু কেবলমাত্র প্রশাসনিক পর্যায়ে এবং বামফ্রন্টের একক প্রচেষ্টায় এ কাজ সম্ভব নয়। এই মহৎ কাজের জন্য দলমতনির্বিশেষে সমস্ত শিক্ষাবিদদের ঐক্যবদ্ধ করে তাঁদের সম্মিলিত বিচারবুদ্ধি ও সক্রিয় সহযোগিতার ওপর নির্ভর করা দরকার। অর্থাৎ, শিক্ষার ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট রাজনীতি-নিরপেক্ষ নেতৃত্ব ও কর্মসূচিতে বিশ্বাসী না হলে এ রাজ্যের শিক্ষায় বর্তমান সংকটের নিরসন সম্ভব নয়। এই প্রস্তাবে বামফ্রন্টের প্রবক্তারা আপত্তি তুলতে পারেন এই যুক্তিতে যে এই রাজনীতি-নিরপেক্ষ নেতৃত্ব তাঁদের বিপ্লবী লক্ষ্যের বিরোধী। এর উত্তরে বলা যায় যে বামফ্রন্ট যখন সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বরণ করে নিয়ে সাময়িকভাবে তাঁদের বিপ্লবী পন্থায় আপস মেনে নিয়েছেন তখন এ রাজ্যের শিক্ষার দুর্দশা ঘোচাতে এই আপসের পরিধিকে আর একটু বিস্তৃত করলে নতুন করে আর কোনও বিচ্যুতি ঘটবে না বলেই আশা করা যায়। পক্ষান্তরে এই আপস ও সমন্বয়ের পথ ধরে তাঁরা যদি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থায় একটা গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারেন তাহলে সমগ্র দেশের সামনে তাঁরা ইতিবাচক সাফল্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবেন। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক স্বার্থে অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই বামফ্রন্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ আপস মেনে নিয়েছেন। অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য তাঁরা বেসরকারী উদ্যোগের সহযোগিতা স্বীকার করে নিয়েছেন, যা তাঁদের মূল আদর্শের বিরোধী। স্বভাবতই তাই প্রশ্ন ওঠে যে, অর্থনীতির স্বার্থে বামফ্রন্টের পক্ষে যে পদক্ষেপ সম্ভব হয়েছে শিক্ষার স্বার্থে সেই রাজনীতি-নিরপেক্ষ পদক্ষেপ সম্ভব হবে না কেন। (শেষ)

কেন এই সমুদ্রপরিমাণ নিরক্ষরতা

রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য

দেশ স্বাধীন হবার পর নিরক্ষরতা দূরীকরণে একের পর এক প্রকল্প প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও কেন আজ আমাদের দেশের বিপুল নিরক্ষরতা পৃথিবীর সব দেশকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। শিক্ষায় এই অধঃপতনের আসল কারণ কি ?

পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের অনেক দিনের। বহু বিষয়েই সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার নয়। কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যেই বোধ করি চিরকালের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেয়ে গেছি। আমাদের মতো বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর পৃথিবীর কোনো দেশে এখন আর নেই।

পনেরো বছর উত্তীর্ণ নিরক্ষর মানুষ এখন আমাদের দেশে সাড়ে চব্বিশ কোটি। পৃথিবীর প্রতি চারজন নিরক্ষরের মধ্যে বর্তমানে একজন ভারতীয়। তুলনামূলক বিচার করে দেখা যাচ্ছে আগামী দশ বছরের মধ্যেই পৃথিবীর প্রতি তিনজন নিরক্ষরের একজন হবো আমরা। তারপরেও এই আন্তর্জাতিক বিজয়-অভিযান অব্যাহত থাকবে। আমাদের দেশের কাজকর্মের ধারা দেখে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক হিসেব কষে দেখেছে দু' হাজার সালে পনেরো থেকে উনিশ বছর বয়সের পৃথিবীর প্রতি দুজন নিরক্ষরের একজন হবেন ভারতসন্তান। এই গতিতে অগ্রসর হয়ে অদ্বিতীয় হওয়ার দিনও একদিন স্বাভাবিকভাবেই আসবে।

১৯৫০ থেকে ১৯৭০ এই সময়ে সমস্ত পৃথিবীতে নিরক্ষরতার তিন রকম চিত্র ছিল। গ্রিনল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, জার্মানি, নেদারল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, ইংলণ্ড এবং জাপান—এ-সব দেশে সাক্ষরতার হার ছিল ৯৭ থেকে ৯৯ ভাগ। তাই ও-সব দেশে তখন আদমসুমারির প্রশ্নপত্রে ওরা সাক্ষরতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদই তুলে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে অ্যাঙ্গোলা, আইভরি কোস্ট, আপার ভোল্টা, নাইগার, সাউথ ওয়েস্ট আফ্রিকা ইত্যাদি দেশে তখনো নিরক্ষরতা ৯৫ থেকে ৯৯ ভাগ। তাই সে-সব দেশেও সম্পূর্ণ উল্টো কারণে, অর্থাৎ নিরক্ষরতা স্বাভাবিক ধরে নিয়ে একই প্রক্রিয়া

শতকরা ৯ ভাগ স্কুলের বাড়ি নেই—[illegible] গাছতলায়

ছবি : তারাপদ ব্যানার্জি

১৯৫১—৮১ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার চিত্র

	১৯৫১ রাজ্য/অঞ্চল	হার	১৯৭১ রাজ্য/অঞ্চল	হার	১৯৮১ রাজ্য/অঞ্চল	হার
প্রথম	কেরল	৪০·৭	চণ্ডীগড়	৬১·৫৬	কেরল	৭০·৪২
দ্বিতীয়	দিল্লি	৩৮·৪	কেরল	৬০·৪২	চণ্ডীগড়	৬৪·৭৯
তৃতীয়	আন্দামান ও নিকোবর	২৫·৮	দিল্লি	৫৬·৬১	দিল্লি	৬১·৫৪
চতুর্থ	পশ্চিমবঙ্গ	২৪·০	পণ্ডিচেরি	৪৬·০২	মিজোরাম	৫৯·৮৮
পঞ্চম	গুজরাট	২৩·০	গোয়া দমন দিউ	৪৪·৭৫	গোয়া দমন দিউ	৫৬·৬৬
ষষ্ঠ	গোয়া দমন দিউ	২২·৯	লাক্ষাদ্বীপ	৪৩·৬৬	পণ্ডিচেরী	৫৫·৮৫
সপ্তম	মহারাষ্ট্র	২০·৯	আন্দামান ও নিকোবর	৪৩·৫৯	লাক্ষাদ্বীপ	৫৫·০৭
অষ্টম	তামিলনাড়ু	২০·৮	তামিলনাড়ু	৩৯·৪৬	আন্দামান ও নিকোবর	৫১·৫৬
নবম	মহীশূর	১৯·৩	মহারাষ্ট্র	৩৯·১৮	মহারাষ্ট্র	৪৭·১৮
দশম	আসাম	১৮·৩	গুজরাট	৩৫·৭৯	তামিলনাড়ু	৪৬·৭৬
একাদশ	ওড়িশা	১৫·৮	পঞ্জাব	৩৩·৬৭	গুজরাট	৪৩·৭০
দ্বাদশ	পঞ্জাব	১৫·২	পশ্চিমবঙ্গ	৩৩·২০	নাগাল্যাণ্ড	৪২·৫৭
ত্রয়োদশ					হিমাচলপ্রদেশ	৪২·৪৮
চতুর্দশ					ত্রিপুরা	৪২·১২
পঞ্চদশ					মণিপুর	৪১·৩৫
ষোড়শ					পশ্চিমবঙ্গ	৪০·৯৪

চালানো হয়েছে। মাঝখানে তখন ছিল মালয়েশিয়া, কিউবা, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, বার্মা, বাংলাদেশ, চীন, ভারত, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি বহু দেশ। যেখানে এক-তৃতীয়াংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ সাক্ষরতা। এই ত্রিদলীয় অবস্থানে গত পনেরো বছরে বেশ বড় রকমের ফাটল ধরেছে। মাঝের দলের বেশ বড় একটা অংশ উপরের দিকে দ্রুত পায়ে যাত্রা করেছে। চীন, শ্রীলঙ্কা, বার্মা, কিউবা প্রভৃতি দেশ এখন উপরের স্তরকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে। সব থেকে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটিয়েছে তানজানিয়া। ১৯৬১ সালে প্রায় ৮০ বছরের বৈদেশিক শাসন থেকে তানজানিয়া যখন মুক্ত হয় তখন সেদেশে মাত্র পাঁচটি মেয়ে হায়ার কেমব্রিজ পাস করেছিল। জুলিয়াস নায়েরেরের নেতৃত্বে তারপর মাত্র দশ বছরের চেষ্টায় সে দেশও সাক্ষরতার উপরের স্তরকে ছুঁয়ে ফেলেছে। অন্যদিকে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল প্রমুখ কয়েকটি দেশ ক্রমশ থিতিয়ে যাচ্ছে নিচের স্তরে মিলবার জন্যে। পৃথিবীর আটানব্বুইটি নিরক্ষরতা-প্রবণ দেশ সম্পর্কে সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে ভারত থেকে মাত্র আঠাশটি দেশে নিরক্ষরতার হার বর্তমানে বেশি।

ভারতের মধ্যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা হয়েছে আরও সরেস। দেশ যখন স্বাধীন হল তার পরবর্তী জনগণনায় (১৯৫১) সাক্ষরতায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল ভারতবর্ষে চতুর্থ। বর্তমানে আমরা আছি ষোড়শ স্থানে। দিল্লি কেরালা দূরে থাক। গোয়া মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যের সঙ্গেও এখন আমাদের আর কোনো তুলনাই চলে না। কিন্তু একসময় (১৯৫১) এরা আমাদের থেকে ছিল অনেক পিছিয়ে। বর্তমানে এটুকুই অহংকার করা যেতে পারে যে জনশিক্ষায় বিহার, অন্ধ্র বা রাজস্থানের থেকে আমরা সামান্য এগিয়ে। এক সময় (১৯০০—১৯২০) শিক্ষা-দীক্ষায় আমরা এশিয়াতে আমাদের তুলনা খুঁজে পেতাম না। আমাদের জ্ঞানজগতের উচ্চতম স্তরটি তখন নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে য়ুরোপে ধাওয়া করতো : কারণ বিশ্বের উচ্চতম স্তরকে তখন আমরা স্পর্শ করেছিলাম। আজ আমাদের অশিক্ষা এশিয়ার নিম্নতম স্তরকেও ছাড়িয়ে গেছে। ১৯৮১ সালের হিসেবে মালদা জেলায় মেয়েদের মধ্যে শতকরা ১৪ জন মাত্র সাক্ষর, মুর্শিদাবাদে ১৭, পুরুলিয়ায় ১৩। এই হার নারী-শিক্ষার বিষয়ে পৃথিবীতে সব থেকে বেশি পিছিয়ে থাকা আফ্রিকা ও আরব রাষ্ট্রসমূহের গড় হারের সমান। এমনকি কিছুক্ষেত্রে আরও পেছনে। ১৯৭০ সালেই ১৫ বছরের উপরের মেয়েদের সাক্ষরতার হার ছিল আরবে ১৪·৩ শতাংশ, আফ্রিকায় ১৬·৩ শতাংশ। তারপর গত বছরসমূহে সেখানে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের সব থেকে পিছিয়ে থাকা জেলাসমূহ এখন আফ্রিকার বা আরবের দুর্বলতম এলাকাগুলোর সঙ্গেই শুধু তুলনীয়। অন্যদিকে পৃথিবীর সবল অংশের সঙ্গে যদি তুলনায় বসি তবে দেখবো শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে নিরক্ষরের সংখ্যা য়ুরোপ, অস্ট্রেলিয়া এবং উত্তর আমেরিকা এই তিনটি মহাদেশের নিরক্ষরদের সম্মিলিত সংখ্যার থেকেও বেশি। ১৯৭০ সালে এই তিনটি মহাদেশে ১৫ বয়স উত্তীর্ণ নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ২৫ লক্ষ। ১৯৭১ সালের আদমসুমারী বিশ্লেষণ করে ১৯৭০ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১৫-উর্ধ্ব নিরক্ষর পাচ্ছি ২ কোটি ৩০ লক্ষের কাছাকাছি। এ-রকম তুলনামূলক আলোচনায় আরও নাটকীয় ঘটনা পাওয়া যাবে। ১৯৭০ সালে উত্তর আমেরিকায় ১৫ + নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল ২৪ লক্ষ ৫০ হাজার। অর্থাৎ ঐ সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা এই দুটি জেলাতেই নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল ঐ মহাদেশের থেকেও বেশি।

এ শতাব্দীর প্রথম দিকে শিক্ষাখাতে দেশের ব্যয়ের ২৫ শতাংশ এসেছে দেশের মানুষদের দান থেকে। তখন সরকারের তোয়াক্কা না রেখেই স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় গড়েছেন দেশের সাধারণ মানুষ।

কি করে আমরা এ-রকম একটা অবস্থায় এলাম ? দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কি করলেন আমাদের মহামান্য দেশনেতারা ? ধুরন্ধর আমলার দল ? এতো বক্তৃতা, বাজেট, নিরক্ষরতা তাড়ানোর জন্য এতো সব হুংকার, কমিশন, কি হল সব মিলে ? 'নিরক্ষরতা ভারতের পাপ, ভারতের লজ্জা' গান্ধীজীর এই উক্তি, রবীন্দ্রনাথের কবিতার আহ্বান, নানা প্রবন্ধের নির্দেশ, প্রতি বছর সংবাদপত্রে নিরক্ষরতা-বিষয়ক উদ্বেগজনক সব সংবাদ, এ-সবই ব্যর্থ হলো ?

দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় আমাদের দেশে সাক্ষরতা ছিল ১৬·৬ ভাগ (১৯৫১)। স্বাধীনতার বিশ বছর আগে ১৯৩১ সালে আমাদের দেশে সাক্ষর ছিলেন মাত্র ৮ ভাগ মানুষ। ৩১ থেকে ৫১ এ-সময়ে যে ৮·৬ ভাগ সাক্ষরতা বেড়েছে তা সংখ্যায় সামান্য হলেও তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আছে। কারণ ১৮৯১ থেকে ১৯৩১—এই চল্লিশ বছরে বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ২ ভাগ মাত্র। চল্লিশ বছরে ২ ভাগ বৃদ্ধির পর কুড়ি বছরে আট ভাগ বৃদ্ধি অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। ঐ বৃদ্ধির পেছনে শিল্প ও ব্যবসার সম্প্রসারণ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান, স্বদেশ-চেতনার বিস্তার ইত্যাদি নানা কারণ আছে। তবে সব থেকে বেশি আছে দেশের মানুষদের উদ্যোগ ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দানের প্রভাব। এ শতাব্দীর প্রথম দিকে শিক্ষাখাতে দেশের ব্যয়ের ২৫ শতাংশ এসেছে দেশের মানুষদের দান থেকে। এ হার এখন অকল্পনীয়। এখন শিক্ষাব্যয়ের শতকরা ৩ ভাগ মাত্র সাধারণ মানুষের পকেট থেকে আসে। তখন স্কুল,

কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় গড়েছেন সাধারণ মানুষ। শুধু কলকাতা বোম্বাই শহরে নয়, সুদূর গ্রামাঞ্চলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়েছেন দেশবাসীরা, সরকারের তোয়াক্কা না করেই। এভাবেই শিক্ষার প্রসার হয়েছে, অশিক্ষা দূর হয়েছে। ইংরেজ শাসকরা এদেশে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার চায়নি, সাক্ষরতার প্রসারও চায়নি। শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর কোনো সাম্রাজ্যবাদী দেশই তার অধিকৃত দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর কোনো বড় উদ্যোগ নেয়নি। না নেওয়ার অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণই আছে। অন্য দেশের জনহিতার্থে কেউ সাম্রাজ্য স্থাপন করে না। তাই স্বাধীন হওয়ার আগে আমাদের ওই ১৬ শতাংশ সাক্ষরতার প্রধান কৃতিত্ব সাধারণ মানুষের, ইংরেজ সরকারের নয়।

খুবই দুঃখের কথা যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও শিক্ষাখাতে সরকারের উদ্যোগ প্রয়োজন অনুসারে সংগঠিত হলো না। বাজেট দেখে যদি মতলব বোঝা যায় তবে দেখা যাবে প্রথম পরিকল্পনা বাদ দিয়ে সরকারি ব্যয় অন্য পরিকল্পনায় ক্রমাগত নিম্নমুখী হলো। প্রথম পরিকল্পনায় শিক্ষা বরাদ্দ ৭·২ শতাংশ থেকে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এসে দাঁড়ালো ২·৬ শতাংশে। এই আনুপাতিক খরচের নিম্ন গতির মধ্যেও সাক্ষরতার বিষয়টি প্রথম পঁচিশ বছর প্রায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো। কার সাধ্য প্রথম বছর সমূহের বাজেট, সরকারি কার্যক্রম, পরিকল্পনা ইত্যাদি দেখে অনুমান করে যে এ দেশ চুরাশি ভাগ নিরক্ষর নিয়ে স্বাধীন হয়েছে। কোনোরকম একটা শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রণীত হলো কিন্তু তাতে বয়স্কশিক্ষার কোনো আলাদা বিভাগের সংস্থান রাখা হলো না। বয়স্ক শিক্ষার কর্মীদল, বিশেষজ্ঞ, সে কাজের ডিরেক্টরেট এ-সব ভালো করে সংগঠিত করে তোলার কথা ভাবাই হল না। সমস্ত কাজের এক সীমান্তে সোশাল এডুকেশানের বৃত্তের মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার বিষয়টা দীনহীনভাবে ঝুলে রইল। এবং ঐ সোশাল এডুকেশনের সাড়ে বত্রিশভাজা কাজকর্মের খাতে প্রথম পাঁচটা পরিকল্পনায় যে টাকা বরাদ্দ হল তা সাংস্কৃতিক কাজকর্ম করার জন্য শিক্ষাখাতে যা ব্যয় তারও প্রায় অর্ধেক। প্রথম পরিকল্পনায় সমাজশিক্ষাখাতে ব্যয় ধরা হল মোট শিক্ষাবরাদ্দের ২·৬ শতাংশ, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১·৫ শতাংশ, তৃতীয় পরিকল্পনায় ১ শতাংশ, চতুর্থ পরিকল্পনায় ০·৫৭ শতাংশ, পঞ্চমে ধারা অনুসারে এই বরাদ্দের অদৃশ্য হয়ে যাবার কথা, কিন্তু ধারা খণ্ডিত হয়ে কোনো কারণে বরাদ্দ হল ১·৪ শতাংশ। ষষ্ঠ পরিকল্পনার কথায় আমরা পরে আসছি। অন্যদিকে প্রথম থেকে পঞ্চম পরিকল্পনায় সমাজশিক্ষা খাতে ঐ উপহাসতুল্য বরাদ্দ দিয়ে কি মহৎ কর্ম সাধিত হল খুঁজলে দেখবো এই টাকা থেকেই দিল্লিতে ন্যাশনাল সেন্টার ফর ফাণ্ডামেন্টাল এডুকেশন, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি ইনস্টিটিউট গড়ে উঠলো। এ ছাড়াও ঐ দিল্লিতেই পাব্লিক লাইব্রেরি তৈরি হলো। নানা লোকজন চাকরি পেলেন, আরও বড় বড় দালান-কোঠা বানানো হল ইন্দোরে, নাগপুরে। দেশ-বিদেশে নানা প্রতিনিধি দল ঘুরে এলেন, স্বাধীন ভারতে প্রথম ত্রিশ বছর এ-ভাবেই কেটে গেল।

নতুন শিক্ষানীতিতে প্রতি নিরক্ষর পিছু সর্বোচ্চ খরচ মাত্র ২৫ টাকা।

এ-সময়ে সাক্ষরতা বাড়লো প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের ফলে। প্রসার অর্থাৎ স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধি। গত ৩৫ বছরে সব রকমের শিক্ষায়তনের সংখ্যা দেশে ২ লক্ষ ৩০ হাজার থেকে বেড়ে ৬ লক্ষ ৯০ হাজারে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে প্রাইমারি স্কুল ৫ লক্ষ ৪ হাজার। অবশ্য আজও সেই প্রসারিত স্কুলসমূহের ষাট ভাগেই কোনো পানীয় জলের সংস্থান নেই, চল্লিশ ভাগেরই ব্ল্যাকবোর্ড নেই, বাড়ি পাকা নয়। নয় ভাগ স্কুলের কোনো রকম বাড়িই নেই। সে-সব স্কুল গাছতলায় বসে। সত্তর ভাগের কোনো লাইব্রেরি নেই, চুয়ান্ন ভাগের খেলার মাঠ নেই। পঁয়ত্রিশ ভাগ স্কুলে আছেন একজন মাত্র মাস্টার। তিনি একই সঙ্গে তিন/ চারটি ক্লাস নেন। এবং এতো ঘটনা সত্ত্বেও সরকার প্রাথমিক শিক্ষায় বরাদ্দ টাকার নব্বুই শতাংশেরই বেশি খরচ করেছেন এবং করছেন শুধু শিক্ষকদের মাইনে এবং প্রশাসনিক খরচ বাবদ। শিক্ষার উপকরণ, পরিবেশ ও সহায়তার জন্য টাকা থাকছেই না। এর ফল যা হবার তাই হয়েছে। এদেশে যে এক শ' জন ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে নাম লেখান তার মধ্যে ২৩ জন মাত্র অষ্টম শ্রেণীতে পৌঁছন। বাকিরা মাঝপথে বসে পড়েন এবং চতুর্থ শ্রেণীর আগে যাঁরা বসেছেন তাঁরা আবার দু-পাঁচ বছর পরেই নিরক্ষর হয়ে পড়েন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পরিষদের এক সমীক্ষায় এ-কথা প্রমাণিত হয়েছে। এ-ভাবে নানা প্রক্রিয়ায় দেশে শিক্ষা সংস্কার হবার পর এবং ১৫ বছরের উপরে নিরক্ষরের সংখ্যা ১৭ কোটি ৩৭ লক্ষ (১৯৫১) থেকে ২৩ কোটিতে (১৯৭১) পৌঁছনোর পর কেন্দ্রীয় সরকার নিরক্ষরতার বিষয়ে প্রথম নড়েচড়ে বসলেন।

পশ্চিমবঙ্গে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২৪০টি কেন্দ্র চলছে। এখানে কেন্দ্র থেকে পর পর দু'বছর যে টাকা এল তাতে কর্মীদের মাইনে দেবার পর বই-খাতা পেন্সিলের জন্য এক পয়সাও বাঁচে না।

৫ এপ্রিল ১৯৭৭ জনতা সরকারের শিক্ষামন্ত্রী প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র সংসদে বললেন যে, বয়স্ক শিক্ষার বিষয়ে তাঁর সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবেন। সে সঙ্গে আজকাল যা কখনো ঘটে না এ ক্ষেত্রে তেমন একটা ঘটনাও ঘটলো। দলমতনির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক দলনেতারা এই কাজের প্রতি পূর্ণ হৃদয়ের সমর্থন জানালেন এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এত মধ্যে আন্তর্জাতিক স্তরে নিরক্ষরতা সম্পর্কিত ধারণার কিছু বিকাশ ঘটে গেছে। শুধু নিজের নামটুকু লিখতে পারলেই যথেষ্ট হলো না। চাই কার্যকরী সাক্ষরতা : লিখতে, পড়তে, অঙ্ক কষতে পারার কাজ-চালানো গোছের ক্ষমতা। সে-সঙ্গে জীবনক্ষেত্রে কূপমণ্ডূক হয়ে থাকলে হবে না। চাই প্রগতির উপযুক্ত সচেতনতা এবং জীবন পরিবর্তনের জন্য কর্মক্ষমতারও বিকাশ। কারণ দেশে-বিদেশে নানা সমীক্ষায় দেখা গেছে যে নিরক্ষর জনগণ সমস্ত প্রগতিমূলক কাজকর্ম থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখেন। তাঁদের আত্মনিযুক্তি ঘটাবার জন্যেই তাই সাক্ষরতা, সচেতনতা ও সক্ষমতার ত্রিমাত্রিক একটা নতুন তাত্ত্বিক বিন্যাস ঘটানো হল এবং আমাদের তৎকালীন ন্যাশনাল এডাল্ট এডুকেশন প্রোগ্রাম সংক্ষেপে এন এ ই পি কার্যক্রমের পরিকল্পনাকারেরাও তার একটা প্রয়োগবিধি রচনা

পরিকল্পনা সমূহে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ : কোটি টাকায়

	প্রথম পরিকল্পনা	দ্বিতীয় পরিকল্পনা	তৃতীয় পরিকল্পনা	চতুর্থ পরিকল্পনা	পঞ্চম পরিকল্পনা	ষষ্ঠ পরিকল্পনা
প্রাথমিক শিক্ষা	৮৫	৮৭	২০৯	২৩৯	৪১০	৯০০
মাধ্যমিক শিক্ষা	২০	৪৮	৮৮	১৪০	২৫০	৩০০
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা	১৪	৪৫	৮২	১৯৫	২৯২	২৬৫
সমাজ শিক্ষা	৪	৪	৬	৪·৫	১৮	২০০
অন্যান্য প্রোগ্রাম	১০	২০	২৩	৮৯·৫	১২২	৯০
কারিগরি শিক্ষা	২৩	৪৮	১৪২	১০৬	১৫৬	১৫০
সাংস্কৃতিক কর্মসূচী	—	৪	১০	১২	৩৭	৫০
	১৫৬	২৫৬	৫৬০	৭৮৬	১২৮৫	১৯৫৫

করে ফেললেন।

১৫ থেকে ৩৫—এ-বয়সের মানুষদের শ্রমশীলতা সব থেকে বেশি তাই ঠিক করা হল ঐ বয়োবৃত্তের সে-কালীন নিরক্ষর দশ কোটি মানুষকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে সাক্ষর করে তোলা হবে। রাজ্যে রাজ্যে রিসোর্স সেন্টার গড়ে তোলা হল। ঠিক হল এরা প্রয়োজনীয় বইপত্র উপকরণ প্রস্তুত করবেন, উপযুক্ত পদ্ধতি গড়ে তুলবেন, কর্মীদের ট্রেনিং দেবেন। প্রয়োজনে গবেষণা এবং অনুসন্ধানমূলক সমীক্ষাও করবেন। রাজ্যস্তর থেকে জেলাস্তর পর্যন্ত কর্মী নিয়োগ, পরিচালন ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার কাঠামো গড়ে তোলা হল। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীমতী মাধুরী শা গবেষণা করে দেখেছিলেন যে নতুন পড়ুয়াদের সাক্ষরতার মান একটা বিশেষ উঁচু পর্যায়ে পর্যন্ত তুলে না দিলে তাঁরা ২৪০ দিনের মধ্যে আবার পরিপূর্ণ নিরক্ষর হয়ে পড়েন। তাই ৭৮ সালে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার পরে পরেই সাক্ষরতার কার্যক্রমের বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্যে মহারাষ্ট্রের জে পি নায়েকের সভাপতিত্বে এক কমিটি গঠন করা হল। সেই কমিটি '৭৯ সালের এপ্রিলে এক প্রাথমিক রিপোর্ট বের করে পরবর্তী কার্যক্রমের একটা কাঠামো ঠিক করে দিলেন। এন এ ই পি বা জাতীয় বয়স্ক শিক্ষাসূচীর নানা দুর্বলতা হয় তো ছিল। কিন্তু এদেশে সাক্ষরতার বিষয়ে এই প্রথম উদ্যোগ।

প্ল্যান কষা হয়েছিল ১৯৮৪ সালের মধ্যে দশ কোটি লোককে সাক্ষর করা হবে। কার্যত কত লোক ঐ সময়ের মধ্যে শিখেছে সে-বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। তবে দশ কোটির এক-চতুর্থাংশও হয়নি এ-ব্যাপারে সবাই একমত। সরকার হিসেব দিচ্ছেন '৮৫ সালের মার্চ পর্যন্ত এই কার্যক্রমে শুধুমাত্র ভর্তি করা গেছিল ২ কোটি ৩ লক্ষ মানুষকে। এই ভর্তি হওয়া লোকেদের সকলেও আবার বেশি দিন কেন্দ্রে টেকে না। ড্রপ-আউট হয় প্রচুর। জ্যোতির্ময় বসু রায়চৌধুরী সুন্দরবনের কুলপিতে ড্রপ-আউট পেয়েছেন শতকরা ২৪ ভাগ। বাগনানে সমীক্ষা করে সমরকুমার চট্টোপাধ্যায় পেয়েছেন ২৭ ভাগ। সরকারি রিপোর্টে ৫০ ভাগ ড্রপ আউটের কথাও আছে। পাঠকেন্দ্র পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে বা ৯০ ভাগ পড়ুয়া আসছেন না এ-রকমও ঘটনা দেখা গেছে। মনে হয় না এ-প্রকল্পে এক কোটির বেশি লোক সাক্ষরতার নতুন সীমা পার হয়েছে।

কেন হল না? কেন একটা বড় প্রকল্প মাত্র এক-দশমাংশ সফল? 'চ্যালেঞ্জ অব এডুকেশন'-এ কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই এ-বিষয়ে কিছু কারণ দেখিয়েছেন। বলেছেন মটিভেশান নেই, নিরক্ষর লোকদের ভালো করে বোঝানো হয়নি। তারপর বলেছেন 'ডেভেলাপমেন্টাল' এজেন্সিগুলো সহায়তা করেনি। উন্নয়নের সমস্ত এজেন্সিই হচ্ছে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর। যথা ডি আর ডি এ, সিডিউল কাস্ট ও ট্রাইবাল ডেভেলাপমেন্ট বিভাগ, কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প বিভাগ ইত্যাদি। এরা কী মহৎ উদ্দেশ্যে সহায়তা করেনি সে সংবাদ ঐ পুস্তিকায় নেই। এ-ছাড়াও ঐ পুস্তিকায় সরকার বলছেন দুর্বমূলস্তরের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তা কম ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম সচিব শ্রী পি কে পট্টনায়ক গত ডিসেম্বরে ত্রিবান্দ্রামে জাকির হোসেন স্মৃতি বক্তৃতায় অন্য কিছু কারণের কথাও বলেছেন। ইনি বলেন, পরিবেশগত সহায়তা ছিল না; যাঁদের জন্য এই পাঠক্রম তাঁদের প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকছিল; কার্যকর সাক্ষরতা এবং সাক্ষরতার পরবর্তী প্রোগ্রামও কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি; যাঁরা পড়াবেন এবং তত্ত্বাবধান করবেন তাঁদের অক্ষমতা ও অনীহা; ইত্যাদি। এ-সব কৈফিয়তে যতটা সত্যি আছে ততোধিক সত্যি কথা ঢেকে রাখার কেরামতি আছে। সরকারি চশমা ছেড়ে সাদা চোখে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে প্রোগ্রামটিকে হত্যা করা হয়েছে। এই হত্যাকর্মের প্রক্রিয়া অভিমন্যু বধ বা দিনের আলোয় আদিবাসীদের ডাইনি মারার মতো। নানা রথী মহারথী মিলে ঘিরে ধরে প্রোগ্রামটিকে মেরে ফেলা হয়েছে সকলের চোখের সামনে।

অর্থ বরাদ্দ দেখলেই হত্যা-প্রক্রিয়ার সূচনা বোঝা যায়। ১৯৭৮ সালে ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রকাশিত এন এ ই পি-র প্রোগ্রাম আউটলাইনে অনেক হিসেব-টিসেব করে ধরা হল এ-কাজে পড়ুয়া প্রতি খরচ হবে ৭০ টাকা। সরকারের এই হিসেব অনুসারে দশ কোটি নিরক্ষরের জন্যে প্রাথমিক প্রয়োজন সাত শো কোটি টাকা। সাক্ষরতার পরবর্তী কার্যক্রমের খরচ বাদ দিয়ে এ টাকা প্রয়োজন। কিন্তু আমরা একটু আগেই দেখেছি ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এ-খাতে বরাদ্দ হয়েছে মাত্র দুশো কোটি টাকা। অর্থাৎ সরকার প্ল্যান করলেন, লোকসভায় মন্ত্রীরা বক্তৃতা দিলেন, দলমত নির্বিশেষে সবাই সহায়তার প্রতিশ্রুতিও দিলেন কিন্তু তারপরেই প্রোগ্রামের প্রয়োজনের তিন ভাগের একভাগ টাকাও বরাদ্দ করলেন না। ফলে টাকার অভাবে আড়াই কোটি লোককেও ভর্তি করা গেল না। আবার এখানেও কাহিনী শেষ নয়। ঐ দু'শ' কোটি টাকাও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার নানা গোঁজামিল পাকিয়ে খরচ করতে পারলো না। প্রায় সত্তর কোটি টাকা খরচ করার ব্যবস্থা করা গেল না। অনেকে টাকা পয়সা পেয়েও ফাইলের দড়ি-দড়া খুলে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চালুই করতে পারলেন না। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ৮০-৮১ সালে কেন্দ্র থেকে ৭২ লক্ষ টাকা পেয়ে খরচ করলো মাত্র ৩৭ লক্ষ। ৮১-৮২তে দেড় কোটি পেয়ে খরচ করলে ৫৪ লক্ষ, ৮২-৮৩ সালে ৭৬ লক্ষ টাকা পেয়ে খরচ করলো ৬০ লক্ষ টাকা। আবার কোথাও কেন্দ্রের টাকা এসে পৌঁছলোও না। পশ্চিমবঙ্গে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২৪০টি কেন্দ্র চলছে। এখানে কেন্দ্র থেকে পর পর দু বছর যে টাকা এলো তাতে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মাইনে দেবার পর বই-খাতা-পেন্সিলের জন্যে এক পয়সাও বাঁচে না। আমেদাবাদের সর্দার প্যাটেল ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের শ্রীঅতুল শর্মা এবং অন্য দুজন গবেষক গুজরাটে তাঁদের সমীক্ষায় দেখেছেন ১৯ ভাগ প্রশিক্ষক সেখানে ঠিকমত সাম্মানিক পাচ্ছেন না। অর্থাৎ সব মিলে সব দিকে চূড়ান্ত রকমের শিথিলতা, অপদার্থতা ও বিশৃঙ্খলা। পশ্চিমবঙ্গে হাল আমলে শিক্ষার জন্যে সরকার প্রচুর খরচ বাড়িয়েছেন। শিক্ষায় এখন

ভোটনির্ভর রাজনৈতিক পরিবেশে ক্লাস চলা-না-চলা

পৃথিবীর আটানব্বুইটি নিরক্ষরতা-প্রবণ দেশ সম্পর্কে সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে ভারত থেকে মাত্র আঠাশটি দেশে নিরক্ষরতার হার বেশি।

কেরল ছাড়া ভারতে অন্য কোনো রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের হারে টাকা খরচ করে না। কিন্তু সাক্ষরতা প্রকল্প বা গরিব মানুষের শিক্ষা এখানে এই বামপন্থী আমলেও সমান অবহেলিত থাকলো। কেন্দ্রীয় সরকার ৮০-৮১ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের ১৪টি জেলার জন্যে অ্যাডাল্ট এডুকেশন অফিসারের পদ বরাদ্দ করেছেন, আজও সে-সব পদে লোক নিযুক্ত হয়নি। জেলাস্তরে বয়স্কশিক্ষার কাজ দেখার কোনো লোক নেই। কোথাও কাজ দেখছেন জেলার সোশাল এডুকেশন অফিসার কোথাও ইন্সপেক্টর অব স্কুলস। ওদের না আছে সময় না আছে সাম্প্রতিক ট্রেনিং। ৮৪-তে শুধু পশ্চিমবঙ্গে ঊনষাটটি বয়স্কশিক্ষা সংশ্লিষ্ট পদ খালি ছিল। যেখানে কর্মী বাহিনীই তৈরি হয়নি সেখানে কি প্রক্রিয়ায় কাজ হবে?

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এ-কাজের দায়িত্ব পেলেন মঞ্জুরি কমিশনের নতুন নীতি অনুসারে। ১৯৭৭ সালে মঞ্জুরি কমিশন সিদ্ধান্ত করলেন—'বিশ্ববিদ্যালয় পদ্ধতিকে যদি সমাজের মধ্যে উপযুক্তভাবে ক্রিয়াশীল করে তুলতে হয় তবে লোকহিতকে (এক্সটেনশন) তৃতীয় দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং গবেষণা ও শিক্ষণের সঙ্গে তাকে সমান গুরুত্বে দ্রুত গড়ে তুলতে হবে।' সেইমতো ১৯৮১তে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যেরা মিলিত হয়ে ঐ সমস্ত দলের রাজনৈতিক নেতাদের মতোই এই সিদ্ধান্তে পূর্ণ সমর্থন জানালেন। ফলে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডাল্ট, কন্টিনিউয়িং এডুকেশন ও এক্সটেনশন বিভাগ গড়ে তোলার কোনো বড় বাধা অন্তত বাইরে থাকলো না। শুরু হল বিশ্ববিদ্যালয় সিস্টেমে সাক্ষরতা ও লোকহিতের কাজকর্ম।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নেমে দেখা গেল বিশ্ববিদ্যাতীর্থের সব দুর্দান্ত পণ্ডিতের কুঞ্চিত নাসিকা ভেদ করা অতীব দুরূহ। যে এলিট সমাজ শুধুমাত্র জ্ঞানজগতের অতি কূট বিষয় নিয়ে রোমন্থন করেন সেখানে তুচ্ছ 'অ আ ক খ' শেখানোর আহ্বান অপমানকর প্রস্তাব হয়ে দাঁড়ালো। উত্তরের পাহাড় থেকে দক্ষিণের সমুদ্র পর্যন্ত হাতগুনতি দু-একটা বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিয়ে তাই মঞ্জুরি কমিশনের ঐ প্রস্তাব হেলায় পড়ে রইলো। কমিশন লক্ষ্য স্থির করেছেন ১৯৯০ সালের মধ্যে ভারতের ১৪৬ বিশ্ববিদ্যালয় ও পাঁচ হাজার কলেজে এই বিভাগ চালু করবেন বলে। আজ পর্যন্ত মাত্র ৭৪টি বিশ্ববিদ্যালয় ও এক হাজার কলেজে প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই শুধু কাগজ-কলমে কাজ চলছে। মাঠে-ঘাটে সাক্ষরতার মূল কার্যক্রমের হাঙ্গামায় না গিয়ে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যেই নানা রকমের শর্ট কোর্স খুলে বসেছেন। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়েই এই কাজের অনুরোধ এসেছিল। কাজ শুরু করেছেন দশটির মধ্যে মাত্র চারটি বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সাক্ষরতার বিষয়ে ভারতে সব থেকে দ্রুত লয়ে পশ্চাদগামী রাজ্য। এবং সমাজ-সচেতনতার গর্ব এ রাজ্যের পণ্ডিতদের বোধ করি ভারতবর্ষের মধ্যে সব থেকে বেশি।

ব্যাপারে সরকার, আমলা এবং দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষক—কারও চাড় নেই

একটা কথা খুবই স্পষ্ট, যেহেতু সাক্ষরতা কার্যক্রমের কোনো ভোটমূল্য এখনো নিরূপিত হয়নি, অর্থাৎ যেহেতু সাক্ষরতার উদ্যোগ বাড়লে যাঁদের জন্য সাক্ষরতা সেই গরিবের ভোট পাওয়ার সম্ভাবনা এখনো বাড়ছে না সেই জন্যে এই তীব্র ভোটনির্ভর রাজনৈতিক পরিবেশে এ-কাজে সরকার, আমলা এবং দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষক কারও চাড় নেই। টলস্টয় বলেছিলেন—'The strength of the government lies in the peoples ignorence and the Government knows this and will therefore always oppose true enlightenment. It is time we realise that fact. And it is undesirable to let the government, while it is spreading darkness, pretend to be busy with the enlightenment of the people.' কথাটি খুবই রূঢ় এবং প্রয়োজনীয়ও। জারের আমলের কুশাসন হয়তো এই রূঢ়তার পেছনে ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও যখন এই কথাগুলো 'শিক্ষাসংস্কার' প্রবন্ধে উদ্ধৃত করেন এবং আমাদেরও যখন দু-তিন-ধাপ চিন্তার পরেই এই কথাগুলো আজও বার বার মনে করতে হয় তখন ভাবতে বোধ করি বাধ্যই হই যে 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলিতেছে।'

খুব বাড়িয়ে বললে ইংরেজ আমল থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের শিক্ষানীতিকে টেনেটুনে কল্যাণমূলক কাজ পর্যন্ত বলা যেতে পারে। এবং যিনি এই কথা বলবেন তাঁকে দু চোখ বন্ধ করে অনেক যুক্তি ও তথ্যের দিকে বধির থেকে এ-কথা বলতে হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে (এবং টলস্টয়ের কাছেও) সমাজে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শুধু কল্যাণমূলক নয়। শ্রীনিকেতনে শিল্পভাণ্ডার উদবোধন বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আমি প্রথম থেকেই এই কথা মনে রেখেছি যে, পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করার চেষ্টা কৃত্রিম, তাতে বর্তমানকে দয়া করে ভাবীকালকে নিঃস্ব করা হয়। আপনাকে আপন হতে পূর্ণ করবার উৎস মরুভূমিতেও পাওয়া যায়, সেই উৎস কখনো শুষ্ক হয় না।'— কী সেই উৎস? সেপ্টেম্বর ২০, ১৯৩০, মস্কো থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—'আমাদের সকল সমস্যার (সমাধানের) সবচেয়ে বড় রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা।'

এ চিন্তায় শিক্ষা শুধুমাত্র বহিরাগত কল্যাণ নয়, শিক্ষাই বিকাশ। শিক্ষাই উন্নয়ন। শিক্ষা সম্পর্কে এই উক্তি বিশ্বজুড়ে সবাই পড়ুন বা না

পড়ুন বিগত বিশ-পঁচিশ বছর ধরে চীন, কিউবা, তানজানিয়া প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক দেশই হোক বা শ্রীলঙ্কার মতো গণতান্ত্রিক দেশই হোক সর্বত্র এ পথই হয়েছে শিক্ষা এবং উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্কের পথ। তবে আমাদের দেশ এর ব্যতিক্রম। সাতকাণ্ড রামায়ণের পরেও এখানে 'চ্যালেঞ্জ অব এডুকেশন'-এ রাজীব সরকার বলছেন—'দারিদ্র্য এবং নিরক্ষরতার মধ্যবর্তী কোনো সম্পর্ক এখনো নির্ণীত হয়নি।' বলছেন—'এমন কোনো প্রমাণ নেই যার উপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে সাক্ষরতার কার্যক্রম চালু হলে পরনির্ভর বিপুল জনসমষ্টি স্বতশ্চালিত 'ইঞ্জিন অফ ডেভেলপমেন্ট'-এ রূপান্তরিত হবে। রবীন্দ্রনাথের কথায় আবার ফিরে আসতে হয়। একসময় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন দেশ মানে মাটি নয়, মানুষ। সেই মানুষদের নিরক্ষর, অচেতন ও পরনির্ভর রেখে ৫০ কোটি পাষাণভার নিয়ে কি অভিনব প্রক্রিয়ায় যে এই তাত্ত্বিকেরা দেশে একবিংশ শতাব্দীর সুদিন আনবেন সে ওঁরাই জানেন। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এমনটি কোথাও ঘটেছে বলে শুনিনি।

যে দেশে সাড়ে চব্বিশ কোটি শ্রমশক্তি সম্পন্ন মানুষের ষাট ভাগই নিরক্ষর, শুধু সর্বব্যাপ্ত অশিক্ষার জন্য যে দেশে পৃথিবীর চারজন কুষ্ঠরোগীর একজন বাস করেন, যেখানে অজ্ঞতাপ্রসূত ভীতির জন্যে জন্মনিরোধক ব্যবস্থাসমূহ পঁয়ষট্টি শতাংশ মহিলা বর্জন করেন, যে দেশে জমি এবং জলবায়ুর সহায়তা পৃথিবীর উৎকৃষ্টতম কিন্তু আধুনিক জ্ঞানবুদ্ধির অভাবে উৎপাদন প্রায় নিকৃষ্টতম। (১৯৮০ সালে এক হেক্টর জমিতে গড়ে চীনে চাল হয়েছে ৪১৬৩ কিলোগ্রাম, জাপানে ৫১২৮ কিলোগ্রাম, ভারতে ২০৪৯ কিলোগ্রাম) শ্রমিকের বস্তিতে বস্তিতে গ্রামের আনাচে-কানাচে যেখানে অনাচার, রোগ-শোক, কুসংস্কার কু-অভ্যাস একেবারে উপচে পড়ছে, যে দেশে মানুষের নিজের অজ্ঞতাই তার প্রগতির পক্ষে সবথেকে বড় প্রতিবন্ধক সেখানে কী যুক্তিতে যে সরকার ও-সব কথা বলেন তা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য।

খুব সম্প্রতি আবার এক নতুন উদ্যোগ শুরু হয়েছে। নরসিনহা রাও মহাশয় গত ১৯ ডিসেম্বর (১৯৮৫) সংসদে বক্তৃতা দিয়ে নিরক্ষরতা উচ্ছেদের জন্য এক 'মাস প্রোগ্রাম' শুরু করেছেন। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমেই দেশে নতুন শিক্ষানীতি প্রযুক্ত হল। কে বা কারা নাকি গবেষণা করে দেখেছেন পুরনো 'মাস-কাম-সিলেকটিভ' প্রোগ্রামে কাজ হচ্ছে না। দু' বছর আগে অনেক 'কেউ-বা-কারা'রা অবশ্য দেখেছিলেন যে খুব ভালো কাজ হচ্ছে। এখন অন্য রকম দেখছেন। কি আর করা যাবে! এ অবস্থায় ঠিক হয়েছে এখন থেকে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা স্বেচ্ছাশ্রমে নিরক্ষরতার অপনোদন করবেন। সেই সূত্রে মন্ত্রীদের এবং আমলাদের কাজ অনেক বেড়ে গেছে। তাঁরা এখন দিন রাত সর্বত্র শুধু আবেদন পাঠাচ্ছেন, সকাল-সন্ধ্যা দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের

চলতি শিক্ষানীতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ ছবি: অলক মিত্র

'মেসেজ' লিখছেন। প্রশ্ন জাগে, হঠাৎ এ-রকম শুভেচ্ছার উদয় হল কেন?

গত দু' বছর আমলাদের মাইনে বাদ দিয়ে প্রতি নিরক্ষর পিছু বাৎসরিক খরচ পড়েছে ১১৬ টাকা। সেই সূত্রে দশ কোটি নিরক্ষরের জন্যে সপ্তম যোজনার উপরে ১২০০ কোটি টাকার একটা চাপ ছিল। নতুন 'মাস প্রোগ্রাম'-এ প্রতি নিরক্ষর পিছু সর্বোচ্চ খরচ মাত্র ২৫ টাকা, দশ কোটি লোকের জন্যে ২৫০ কোটি। সে জন্যেই এই প্রোগ্রাম। টলস্টয় ভুল বলেননি। ■

বিশেষ প্রবন্ধ

মাস্টারমশাই

শঙ্খ চৌধুরী

নন্দলাল বসুকে শান্তিনিকেতনের সবাই ডাকতেন মাস্টারমশাই বলে।

শান্তিনিকেতনে আসার আগে শুনতাম জায়গাটা না-কি বোলপুরে, ঠাকুরবাড়ি ঘেষা ছেলেদের মস্ত আড্ডা। তখনকার শিল্পী মহল দু-দলে ভাগ করা ছিল।—ডায়কটমির বাংলা কি দ্বিধা? দ্বিধারা? এটার জের আজ পর্যন্ত চলে আসছে। শিল্প আদর্শ নিয়ে রামরাবণের যুদ্ধ। সম্পর্কটা ঠিক অহি নকুলের বলা যায়। তখন সরকারী আর্ট ইস্কুলের ভেতরেই এটা ছিল। দুটি বিভাগ—ফাইন আর্টস বা ললিতকলা, যেখানে চিরাচরিত প্রথায় পোট্রেট। স্টিল লাইফ, ল্যান্ডস্কেপ শেখানো হতো—এখনও হয়—যত্ন করে। একটা অনমনীয় অ্যাকাডেমিক কাজ, যার দেমাক ছিল সাহেবী। কাজ যত্ন করে শেখানো হতো। অন্য বিভাগটির নাম ইন্ডিয়ান পেনটিং, ভারতীয় চিত্রকলা বিভাগ। হেভেল অবনীন্দ্রনাথ থেকে অনেকেই খুব একটা ভারতীয় অভিমান নিয়ে কাজ শিখিয়েছেন। এরই ধারা অনুসরণ করে জোড়াসাঁকোয় বিচিত্রা ক্লাব আর তারপর ওরিয়েন্টাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা, পরে সমবায় ম্যানসানে 'ওরিয়েন্টাল' পদ্ধতিতে আঁকা শেখার ক্লাশ হল।

'ওরিয়েন্টাল সোসাইটির' আন্দোলন তো আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অঙ্গ ছিল। স্বদেশপ্রীতি, স্বদেশী সংস্কৃতির ওপর দৃষ্টিনিক্ষেপ—সবই এরই অঙ্গ। যাঁরা এই আন্দোলনের পেছনে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা, রদেনস্টাইন, ওকাকুরা এবং আনন্দ কুমারস্বামীর নাম সবাই জানেন। এই স্বদেশীয়ানার অভিমান মাস্টারমশাইয়ের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে।

মাস্টারমশাইয়ের—নন্দলাল বসুর কথা শুরু করতে গিয়ে—কেবলই অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি। কিন্তু তাছাড়া বোধহয় উপায় নেই। ওঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কলাভবনের শিক্ষাপদ্ধতি। পিছন ফিরে যখন তাকাই তখন মনে হয়, তিনি শান্তিনিকেতনে গুরু-শিষ্য পরম্পরার আশ্রমিক আদর্শ-ধারা ললিতকলার ক্ষেত্রে চালু করতে পেরেছিলেন। এখন ভেবে দেখতে গেলে মনে হয়, তাঁর নেতৃত্বে যেন এক সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। একে অন্যের দেখাশুনা করা, অসুখ হলে সেবাশুশ্রূষা করা, কোনও ছেলের টাকা সময়মতো না এলে তাকে দায়মুক্ত করা, বা তাদের শ্রীনিকেতনে চামড়ার কাজ করার ব্যবস্থা করে টাকা পাওয়ানোর ব্যবস্থা করা। মাস্টারমশাই খেয়াল করে সব করতেন।

একসকারসান-ট্যুর—আমাদের সময়ের

আত্মপ্রতিকৃতি

কলাভবনের সবচেয়ে বড় উৎসব বা ইভেন্ট ছিল। এই ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে নতুন ধরনের শিল্পকলা শেখানোর ধারণা গড়ে উঠেছিল। এক্সপেরিমেন্ট হিসাবে দেখতে গেলেও, মনে রাখতে হবে তখনও গোঁড়া ভাবাপন্ন মানুষ শান্তিনিকেতন থেকে মুছে যায়নি।

আমাদের সময় কলেজ বা স্কুলে যে নাটক হতো তা হয় সবটাই ছেলেদের নিয়ে লেখা। না হয় মেয়েদের। আমরা যখন "শেষরক্ষা" করি তখন ছেলেই মেয়ে সেজেছিল। কাজেই ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে শান্তিনিকেতনের আশেপাশে বা বাইরে বেড়াতে যাওয়া আর তাঁবুতে রাত কাটানো—সবাইয়ের পক্ষে করার সাহস হতো না।

কলাভবনে—মাস্টারমশাইয়ের পরিচালনাগুণে, ছেলেমেয়েদের সম্পর্কের মধ্যে স্বাভাবিক এবং পরিচ্ছন্ন আবহ তৈরী হয়েছিল। অন্যদের পক্ষে তা সম্ভব হতো না। শুনেছিলাম

নারকেল বাগান : ১৯৪৬

আগে না কি গুরুদেব এমনিধারা ক্লাসে বসিয়ে না শিখিয়ে, বেড়াতে বেড়াতে গল্পের ছলে পড়ানোর পক্ষপাতী ছিলেন। ললিতকলার ক্ষেত্রে এটা শুধু কলাভবনেই হতো আমাদের সময়। মাস্টারমশাইয়ের এসব বিষয় কোনও ত্রুটি কখনো হয়নি।

আমাদের সময় সে বিষয় একটা সুবিধাও ছিল। নন্দলালই ছিলেন মাস্টারমশাই। অন্য সব শিক্ষকরা ওঁরই ছাত্র। ওঁরই আদর্শে মানুষ। কাজেই তখনকার পড়াশুনো কাজকর্ম, শেখানোর পদ্ধতি বেশ নিবদ্ধ, ঘন। নিরিবিলিতেই হতো। আপিস বলতে ওঁর এক টাইপ করার সহায়ক ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে হিসাবও রাখতেন। পরীক্ষাও ছিল না। আর তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। কে কী রকম ছবি আঁকছে, কেমন মশগুল হয়ে কাজ করে যাচ্ছে, সেই ছিল দেখার বা বলার জিনিস।

আমাদের সময় শিল্পকলার শিক্ষাপদ্ধতি অন্যরকমের ছিল। নিজের পরিশ্রম, অধ্যবসায় আর নিষ্ঠায় মাস্টারমশাইয়ের স্নেহ আকর্ষণ করতে হত। তখন আমরা নন্দলালকেই একমাত্র মাস্টারমশাই বলে জানতাম। তখন দুটো নাম ছাত্ররা শ্রদ্ধাভরে মনে রাখত। এক গুরুদেব আর এক মাস্টারমশাই।

শান্তিনিকেতনে সবাই আসত মাস্টারমশাইয়ের সান্নিধ্য পাবার জন্য। বাঁধা ধরা কোনও নিয়মকানুন ছিল না। কার ভাগে কত বছর থাকার সুযোগ হবে, কাকে কি করতে হবে, সবই মাস্টারমশাই ঠিক করতেন। পরীক্ষা পাশ করা বলে কিছু ছিল না। তবে ডিপ্লোমা বলে একটা কিছু ছিল। ছেলেমেয়েদের লক্ষ্য ছিল মাস্টারমশাই আশীর্বাদী বিল্বপত্র-সার্টিফিকেট—আর তাতেই যে যার কাজকর্ম পেয়ে যেতো। অসুবিধা হতো না।

কলাভবনে এক "নন্দন" মিউজিয়াম আর কয়েকজন শিক্ষকের স্টুডিও ছাড়া আর কোনও পাকা বাড়ি ছিল না। ছেলেরা সবাই মাটির ঘরে থাকত। আঁকার জায়গা ওদের ঘরেই ছিল। এক একটা স্টুডিওতে চার পাঁচ জন করে বসার জায়গা হতো—শিক্ষকরা ঘুরে ঘুরে সবাইয়ের কাজ দেখতেন।

সবাই যেন গুরুগৃহে বসেই কাজ শিখত তা নয়। মাস্টারমশাইয়ের সংসারের অংশ হয়ে যেতো। ক্লাসের কাজ ছাড়াও, ছাত্রদের নানারকম সুখ দুঃখের দায়দায়িত্ব নিজে স্বেচ্ছায় বহন করতেন। কলাভবন, তার বইপত্তর, কাজের সুবিধা, জিনিস কেনাকাটা, বাগান থেকে বাড়ি করা পর্যন্ত সবই নিজে দেখাশুনো করতেন।

ছাত্রদের জন্যে আলাদা পরিবেশ তৈরী হয়েছিল। সেটা যেন গুরুদেবের আগেকার সাদাসিধে আদর্শ অনেকখানিই বিলক্ষণ টিকিয়ে রেখেছিল। পিকনিক বা এক্সকার্সস শুধু দেশ দেখা বা ফূর্তি করার জন্যই নয়। সবাই একসঙ্গে কম খরচে যাওয়া, নিজের মালপত্তর বওয়া, রান্না করা, বাজার করা, তাঁবুতে থাকা আর বাইরে গিয়ে স্কেচ করা। সবটাই শিক্ষার অঙ্গ। এতে নতুন পুরনো, সিনিয়র জুনিয়রের পার্থক্য হতো না। একধরনের কমিউন, কমিউনিটি লাইফ, অভ্যাস করা। একে অন্যের কাজ দেখে উৎসাহ পাবার সুযোগ। ওঁর মতে, মানুষ হয়ে দাঁড়াতে না পারলে আর্টিস্ট হওয়া যায় না।

মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে প্রথম দেখাটা বেশ মনে পড়ে। আঁকা শিখতে চাই শুনে বললেন প্রথমেই, ভর্তি হবার কোনও বাধা নেই। হ্যাঁ হে কি করবে তা আগে ঠিক কর। আর্টিস্ট হতে চাও, না চাকরি করতে চাও। চাকরি করতে হলে আমি যা বলব, সবই করতে হবে। এর মধ্যে ভাল লাগা না-লাগার স্থান নেই। আর্টিস্ট হতে চাইলে মন মত কাজ করে যেতে পারবে। ভাল না লাগলে দু এক বছরের মধ্যেই পালাবে।

কলাভবনে আগে অনেক কিছুই শেখার সুযোগ সুবিধা ছিল না, যা এখন আছে। যেমন একদিকে ছাপাই ছবি বিভাগে এখন শেখানো হয় এচিং লিথোগ্রাফ, আবার অন্যদিকে পাথরকাটা বা মূর্তি ঢালাইয়ের কাজ। আমরা মহা উৎসাহে বিদেশ থেকে নানা তাক লাগানো টেকনিক শেখানোর ব্যবস্থা করলাম। ভাস্কর্য চিত্রকলা আলাদা বিশেষ বিভাগ। শুধু স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তর— বি এ, এম এ, পি এইচ ডি, ডিগ্রিই নয়, ছাত্রছাত্রীরা এসব বিষয় "বিশেষজ্ঞ" হবার সুযোগই পেল। ইদানীং মনে হয় যে মাস্টারী করতে গেলে এতো অতিপক্ক বিশেষজ্ঞতার প্রায়শ দরকার নেই। মুশকিল হল, যারা আর্টের মাস্টার হবে ইস্কুলে কলেজে, ইদানীং তারাও আর্টিস্ট হতে চায়। ভাস্কর্যে পাথর কাটায় ওস্তাদ, ঢালাইয়ে পণ্ডিত। দরকার কি? আজ মনে হয় মাস্টারমশাই কলাভবনে উদ্ভাবিত "সব কাজে হাত লাগাই মোরা" পদ্ধতিটাই শ্রেয়।

১৯৩৫ নাগাদ শান্তিনিকেতনে দু দুটো বেশ স্বতন্ত্র ছাত্রগোষ্ঠী যোগ হয়। একে তো কলেজে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী কোর্স পড়ানো যখন চালু হল, শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন ধরনের ছাত্র এসে ভর্তি হত। এরা পুরনো আশ্রমবাসীদের থেকে একটু অন্যরকম মনোভাবের। একটু আলদা আলাদা থাকতো।

৩০শের দশকেই আইন অমান্য আন্দোলনের পর আবার একদল গান্ধীবাদী ছাত্র, বিশেষ করে কলাভবনে এবং বিদ্যাভবনে আসে। তারা ডিগ্রী বিরোধী এবং কলেজে ভর্তি হয়েও ডিপ্লোমা কোর্স নিয়ে পড়তো। আর বেশিরভাগই আলাদা খাবার ব্যবস্থা করতো।

তখনকার উদার শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে আমাদের সঙ্গেও কয়েকজন কলেজের ছেলে কলাভবনে বা দুপুরবেলা ক্লাস করতে যেতো। এরমধ্যেও মাস্টারমশাইকে দেখা যেতো অবিচল। সবাইকে নিয়ে কাজ করে চলেছেন। কলাভবনে যদিও

প্রকৃতি ও মানুষ : ১৯৩৮

নামেমাত্র একটা ডিপ্লোমা ছিল, তবে সবই মাস্টারমশাইয়ের মত অনুযায়ী হতো। ছাত্ররা কলেজের মতো দু-চার বছর ইন্টারমিডিয়েট বা বি এ পরে চলে যেতো না। তাই সবাইয়ের সঙ্গে আত্মীয়র মতো যোগাযোগ হয়ে যেতো।

এই কলেজের শেষ মাটির হোস্টেল-বীথিকা—আমাদের সময়েই ভেঙ্গে যায়—আর নতুন রূপ পাকা বাড়ির হোস্টেল হয়ে যায়। মাটির মানুষ মাস্টারমশাইয়ের কাছে কাজ শেখা আর মাটির ঘরে খড়ের চালায় থাকায় একটা রোমান্টিসিজম ছিল। কলাভবনের ছাত্রদের কিন্তু এক সম্পূর্ণ এলাকা এবং আলাদা জীবন ছিল। তখনও আশ্রম কথাটার একটা পৃথক তাৎপর্য ছিল। কলাভবনের ছাত্রদের

নারী : ১৯৩১

জীবনে আশ্রমের সাদাসিধে থাকার ধরন, খাওয়া পরা, আবার সর্বোপরি মাস্টারমশাইয়ের আদর্শনিষ্ঠা গভীর রেখাপাত করত। কলাভবনের ছাত্রদের আলাদা রান্নাঘর ছিল যেখানকার সবকিছু ছেলেরা নিজেরাই দেখাশুনো করতো। তারই একটি ঘরে বাগ গুহার ছবি নকল করা হয় আর সেখানেই নানান দেওয়াল চিত্রের প্লাস্টারে রঙ লাগানো হয়। তখন আশ্রম আজকের মতো ক্যামপাস বনে যায়নি।

শান্তিনিকেতনের অত্যন্ত সাদামাটা জীবনের মধ্যেও দু তিন জনেই কঠোর আদর্শবাদের তপস্যার মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন এবং আধুনিক কলা পদ্ধতির বিপুল প্লাবনের বিরুদ্ধে আদর্শের বাঁধ বেঁধে তাকে সাধারণত্বের অপবাদ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত করে এসেছেন।

প্রাচীন শিল্পকলার আলোচনায় শিল্পসাধনা কথাটার উল্লেখ দেখেছি। শিল্পসাধক বা শিল্পী আখ্যান একমাত্র নন্দলালের ক্ষেত্রেই বোধহয় খাটে। কলকাতা থাকার সময় ভগিনী নিবেদিতা, ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রভাব ওঁকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল। ওদিকে ছিলেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ এবং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ।

শান্তিনিকেতনে শিল্পশিক্ষা আরম্ভ হয় অসিত হালদার এবং সুরেন করকে নিয়ে। কিন্তু তার প্রাণসঞ্চার হল নন্দলালের হাতে।

রবীন্দ্রসঙ্গীত যেমন সঙ্গীত শিক্ষার থেকেও আশ্রমের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে স্থান পেয়েছিল, কোনও অনুষ্ঠানেই এই গানকে বাদ দেওয়া সম্ভব হত না, তেমনি নন্দলালের স্পর্শ ছাড়া আশ্রমের নাটক, মন্দিরের আলপনা বা শ্রীনিকেতনের

সাঁওতালি ফসল-কাটা উৎসব : ১৯৫০

কারুশিল্পের উৎকর্ষ সম্ভব হতো না। শান্তিনিকেতন যে সাংস্কৃতিক আবহের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল, আজ বোঝা যায় তার অনেকখানিই নন্দলালের নিষ্ঠার জন্য গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির ছাত্ররা যেমন কলকাতায় থেকেও চারিদিকের আবহাওয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পুরাণ ইতিহাসের জগতে বাস করতেন এবং ছবিতে এসবের রূপ দেওয়াই ওঁদের সাধনার লক্ষ্য ছিল, নন্দলালের জন্যে কলাভবনে তা ছিল না।

নন্দলালের শান্তিনিকেতনে আসাটা আশ্রমের পক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ব্রহ্মচর্য আশ্রমের নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করা, শহরের ছেলেদের খোলা মাঠে বেড়িয়ে নাক চোখ মুখ খুলে জ্ঞান সংগ্রহ করা, গাছতলায় আসন বিছিয়ে শিক্ষকদের কাছে পড়াশুনো করা, সকালের বৈতালিক ও মন্দিরের উপাসনায় যোগদান, খুবই সাদাসিধে জীবনের আদর্শ বজায় রেখে চলা, এই নিয়ে তখনকার শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাত্রজীবন। এসবের প্রভাব মাস্টারমশাইয়ের জীবন এবং শিল্পকর্মের ওপরও পড়েছিল। মন্দির মাটির বাড়ি মিলিয়ে অন্যরকম জীবনযাপন। আর আমবাগান। আমাদের সময় পর্যন্ত এর কিছুটা অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু তার মাহাত্ম্য ক্রমেই প্রাণহীন হয়ে অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে টিকে থাকার ব্যাপারটার সূত্রপাত তখন থেকেই শুরু। গুরুদেবের বয়স বাড়ার সঙ্গেই ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে এল।

শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপদ্ধতি তখনও কিন্তু ক্লাসের মধ্যেই শেষ হতো না। গানে, নাচে নাটকে, মঞ্চসজ্জায়, আলপনায়, ছবি আঁকা আর মূর্তি গড়ায় আর শিক্ষকদের নিবিড় সান্নিধ্যে ছাত্ররা নতুন অভিনব আদর্শে মানুষ হতো। পরীক্ষা পাশ করা বা চাকুরির যোগ্য হওয়া এই শিক্ষাদানের আদর্শ ছিল না।

চোখে দেখার আনন্দ এবং সহজ সৌন্দর্যবোধ অন্যদের মধ্যে সঞ্চারিত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন নন্দলাল। আশ্রমিকদের মধ্যে নন্দনবোধ ও রুচির আবহ তৈরী করার আয়োজন করেছিলেন মাস্টারমশাই আদর্শে স্থির থেকে নিষ্ঠা সহকারে কাজ করে। নন্দলাল কলাভবনের ছাত্রদের ছবি আঁকা শেখাতে এলেও, ওঁর সৌন্দর্যবোধের প্রভাব ছবির কাগজ ছাড়িয়ে সুদূরে বিস্তারিত হল। তিনি শান্তিনিকেতনে আসার অনেক আগেই এদেশে

কলাভবনে মাস্টারমশাইয়ের শিক্ষাপদ্ধতি আধুনিক এবং আদর্শস্থানীয় বলে আমার মনে হচ্ছে। ছেলেদের ক্ষমতা এবং প্রয়োজন বুঝে কাজ করতে দিতেন তিনি। উনি বলতেন, আমি ট্যালেন্টে বিশ্বাস করি না। নিষ্ঠা আর শ্রদ্ধা আমার কাছে বেশি বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়।

শিক্ষার সঙ্গে শিল্পবোধ ও রুচির সংযোগসেতু ভেঙ্গে গিয়েছিল। রসগ্রহণের শক্তি সাধারণের মধ্যে থেকে, বিশেষত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত অল্পশিক্ষিতের মধ্যে থেকে লোপ পেয়ে গিয়েছিল। এমন কি জ্ঞানীগুণীরা নন্দলালের প্রচেষ্টাকে শৌখিন প্রভাব বলে ধরে নিয়ে বেশ সন্দেহের চোখে দেখতেন। ভরসার কথা গুরুদেবের সমর্থন তিনি পেয়েছিলেন।

ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি যে বেদ পুরাণের পুঁথিতে নিবদ্ধ নয়, এর প্রকাশ যে অজন্তা, বাগ গুহায় বা মোগল রাজপুত ছবিতে মূর্ত, সংস্কৃতির এই নতুন সংজ্ঞা আশ্রমবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে মাস্টারমশাইয়ের চেষ্টায়। পরে নানা প্রদেশের ছাত্ররা এই চেতনা নিয়ে দেশে ফিরে গেলে মাস্টারমশাইয়ের বোধের বিস্তারিত ব্যাপ্তি ঘটে অখণ্ড ভারতে।

নন্দলালের ছবি আঁকা শেখানোর শুরু জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ক্লাবে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের নিয়ে। তারপর তিনি চাকরি পেলেন ওরিয়েন্টাল সোসাইটির ইস্কুলে। সেখান থেকে শান্তিনিকেতনে যাতায়াত। তারপর পাকাপাকিভাবে থেকেই গেলেন। এ আসাটা চাকরি করতে আসা নয়। শান্তিনিকেতনে থাকতেই এলেন।

মাস্টারমশাই জড়িয়ে পড়লেন শান্তিনিকেতন গড়ার কাজে। রবীন্দ্রনাথের সাধের শ্যামলী বাড়িটা যখন হল, সেখানে কলাভবনের ছাত্ররা দল বেঁধে কাজে নেমে পড়ল মাস্টারমশাইয়ের নেতৃত্বে। দেওয়ালে মাটি দিয়ে বীরভূমের পোড়ামাটির মতো বড় রিলিফ করা হল।

এই মুহূর্তে, যখন আপনি এটা পড়ছেন... আপনার মুখের একান্ত প্রয়োজনীয় ত্বক-কোমলকারক আর্দ্রতা হারিয়ে যাচ্ছে।

এর প্রতিকারের কি ব্যবস্থা করছেন আপনি ?

যদি বলেন, কিছুই না ... তাহলে বুঝবো, হয় আপনি জানেন না—যে আর্দ্রতা হল আপনার ত্বককোষের একান্ত প্রয়োজনীয়, জীবনদানকারী অংশ যা ত্বক কোমল ও মোলায়েম রাখতে সাহায্য করে। নয়তো—আপনার রঙরূপ শুষ্ক, প্রাণহীন বা ক্লান্ত দেখালে আপনার কিছু যায় আসে না !

যতদিন আপনার কৈশোর আছে, আপনার ত্বকের হারানো আর্দ্রতা চট্ করে ফিরে আসে। তাই অল্প-বয়সী ত্বক কোমল আর নমনীয় থাকে। তবে কৈশোর পেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের আর্দ্রতা যত তাড়াতাড়ি হারিয়ে যায়, তত তাড়াতাড়ি ফিরে আসে না ... আর, ঠিক এই সময়েই এমন একটা কিছু দরকার, যা আপনার ত্বকের আর্দ্রতা ঠিকমত রেখে সেটিকে নরম আর কোমল বানায়।

আপনার দরকার ল্যাক্‌মে ম্যাক্সিমাম ময়েশ্চারাইজিং লোশন। এ হল জল আর কিছু বিশিষ্ট কোমলকারক পদার্থের এক সূক্ষ্ম সংমিশ্রণ যা সত্যিসত্যিই মৃদুভাবে আপনার ত্বকের গভীরের কোষে পৌঁছে তাতে আর্দ্রতা আর পুষ্টি ফিরিয়ে আনে। আপনার ত্বক কোমল ও মোলায়েম রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া, এটি যেমন হালকা তেমনি তেলাভাব-রহিত ... মেখেছেন বলে মনেই হবে না। অথচ আপনার ত্বকে সদাই জাগবে এক তরতাজা অনুভূতি !

ল্যাক্‌মে ম্যাক্সিমাম ময়েশ্চারাইজিং লোশনে এক অনন্য স্বয়ং-নিয়ন্ত্রক গুণ আছে যা তার শোষণ মাত্রা—ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজন অনুসারে কম-বেশী করে। অর্থাৎ, আপনার মুখের বেশী শুষ্ক অংশগুলিতে বেশী ক'রে কাজ করে। যেমন, চোখ ও ঠোঁটের চারপাশের অংশগুলিকে বেশী করে শোষণ করতে দেয়। আবার তেলা অংশগুলিকে, যেমন—নাক ও থুতনী, কম শোষণ করতে দেয়। কাজেই আপনার ত্বক যে ধরণেরই হোক না কেন ... শুষ্ক বা তেলা, স্বাভাবিক বা সমন্বয়—ল্যাক্‌মে ম্যাক্সিমাম ময়েশ্চারাইজিং লোশন আপনার জন্যে সুন্দরভাবে কাজ করে।

ল্যাক্‌মে ম্যাক্সিমাম ময়েশ্চারাইজিং লোশন—কোমল সুন্দর ত্বকের জন্যে !

রূপ ঝলমল, অন্তর খুশি-উচ্ছল করতে ল্যাক্‌মে !

Rediffusion/L/5226 d BN

মাস্টারমশাই হাত লাগিয়ে একটা ফলক করলেন। কিংকরদা দুটো বিরাটকায় দ্বারপাল গড়লেন। সেগুলো পোড়ানো হল ঘটা করে। এখন শ্যামলীর দরজায় আলকাতরার পোঁছে এগুলো কোথায় লুপ্ত হয়ে গেছে।

তারপরে হল মাটির কালো বাড়ি। ছাত্রদের হোস্টেল। কালোবাড়িতে মাস্টারমশাই একটা নতুন মাধ্যম পরীক্ষা করলেন সবাইকে সঙ্গে করে। গোবর, আলকাতরা আর মাটি মিলিয়ে গড়া হল রিলিফগুলো। এখন সেটা তখনকার কলাভবনের ঐ এক শেষ নিদর্শন—মাটির বাড়ির আর মাটির কাজের। আশ্রমের সাদাসিধে জীবন কালক্রমে অন্য অংশ থেকে মুছে গেল। তখনও কলাভবনেই একমাত্র কয়েকটা মাটির বাড়ি টিকে রইল। এগুলো যেন লুপ্ত আদর্শের প্রতীক রূপে মাস্টারমশাই টিকিয়ে রাখলেন জেদ করে, বিশ্বভারতীর নির্মাণ এবং সংরক্ষণ বিভাগের আপত্তি উপেক্ষা করে।

তিনি কলাভবনের ছাত্রদের শিখিয়েছিলেন বৈতালিক এবং মন্দিরে নিয়মিত যেতে। আশ্রমের সব উৎসবে যোগদান করতে। দৈনন্দিন আশ্রমিক জীবন থেকে দূরে না থাকতে। তাঁরই দৃষ্টান্তে ছাত্ররা এসব অনুষ্ঠানে যোগদান বা সাহায্য

গ্রাম্য কুটির

করা নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করতে শিখেছিল।

কলাভবনে মাস্টারমশাইয়ের শিক্ষাপদ্ধতি আধুনিক এবং আদর্শস্থানীয় বলে আমার ইদানীং মনে হচ্ছে। ছেলেদের ক্ষমতা এবং প্রয়োজন বুঝে কাজ করতে দিতেন তিনি। তাঁর শিক্ষাদানের বিশেষত্বই ছিল, ছাত্রদের নিজস্ব ঢঙে কাজ করে যাবার জন্য উৎসাহ দেওয়া। উনি বলতেন, আমি ট্যালেন্টে বিশ্বাস করি না। নিষ্ঠা আর শ্রদ্ধা আমার কাছে বেশি বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। ওঁর মতে শিল্পশিক্ষা শুধু ছবি আঁকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ছাত্রদের নানান অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েও যেতে হবে। কলাভবনের রান্নাঘরের দায়িত্ব প্রত্যেকেরই ওপরে পড়তো। আর ছিল সবাই মিলে কাজ করা। পিকনিকে গেলে গাছপালার মধ্যে দিয়ে যাওয়া। তখন নিজেদের কুটনো কুটে রান্নায় হাত লাগাতে হতো। বাজার করতে হতো। এছাড়া দল বেঁধে স্কেচ করে গান গাইতে গাইতে ফিরে আসা। এছাড়া ভ্রমণ। বছরের শেষে সবাই মিলে নিজেরাই মোটঘাট জিনিসপত্তর বয়ে টিকিট কেটে তৃতীয় শ্রেণীতে ওঠা। গন্তব্যে পৌঁছে হৈ হৈ করে ক্যাম্প করা, বাজার, রান্না, পাল্লা দিয়ে স্কেচ করার আনন্দ অনুভূতি অনুভব করাই এক অভিজ্ঞতা।

এসব খুব সহজে করতেন মাস্টারমশাই। কাজটা যে অতো সহজ নয়, তা শিক্ষক হিসাবে বহু বছর পর বরোদায় উপলব্ধির সুযোগ হয়েছিল আমার। কলাভবনের কোনও ছাত্র বা চাকর অসুস্থ হলে, মাস্টারমশাইয়ের তত্ত্বাবধানে ছাত্রদের ওদের সেবা করার কাজে লাগতে হতো। ৪৩-র মন্বন্তরের সময় কলকাতায় আগত গ্রামের দুর্গতদের জন্য মুষ্টিভিক্ষা এবং ত্রাণসামগ্রী ও চাঁদা তুলেছিলেন ছাত্রদের নিয়ে।

শেখানোর ব্যাপারে ওঁর খুব নিজস্ব পন্থা ছিল। প্রথম বছরে এসেই নিজের মনের মতো ছবি আঁকা দিয়ে শুরু করা যে কি জিনিস, যাঁরা সেকালের আর্ট স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত তাঁরা বুঝতে পারবেন। উনি আর্ট স্কুলের ছেলেদের খুব একটা পছন্দ করতেন না। ওঁর মতে, যারা আর্ট স্কুল থেকে পড়ে আসে তাদের মন থেকে আর্ট স্কুলের ছাপ মেজে ঘষে তুলতে সময় লাগে। আর বলতেন, আমি গ্র্যাজুয়েটদের বড় ভয় পাই। ওরা কেমন যেন তর্ক করে আর জেঠা হয়ে যায়।

কলাভবনে এমনই সামনে ফুল রেখে রঙ দিয়ে আঁকা (স্টিল লাইফ পর্যায়ের কাজ) একেবারেই নিষিদ্ধ জিনিস ছিল। ফুল ছেঁড়াটাই মাস্টারমশাই পছন্দ করতেন না। ওতো বই দেখে নোট লেখার মতো হয়ে যায়। তাছাড়া স্টাডিতো স্টাডিই থাকে। স্টাডি আর ছবির যে কতো প্রভেদ সেসব তত্ত্ব নিয়ে অনেক আলোচনা হতো।

মাস্টারমশাইয়ের ছবি আঁকা কোনও বিশেষ জিনিস বা গাছপালাকে ভালো লাগা থেকেই শুরু হতো। তবে বলতেন, চোখে দেখা, বা পরখ করা থেকেই মনে ছাপ পড়ে। যখন সেই মনের ছাপ ছবিতে প্রকাশ পায় তখন সেই হচ্ছে আসল ছবি। তবে একথাও ঠিক যে প্রকাশ করার ক্ষমতা আয়ত্ত করার জন্য হাত তৈরী করতে হয়। যেভাবে মনে এল সেভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা সকলের থাকে না। সেই অনুভব যারা কবিতায় বা ভাষায় প্রকাশ করতে পারে তারাই আসল কবি বা সাহিত্যিক।

এদিক দিয়ে তিনি ওরিয়েন্টাল সোসাইটির আদর্শ মানতেন। ওঁর মতে, প্রাচ্যের সব দেশেরই শিল্পকলা ধ্যানমগ্ন মনের নিদর্শন। সেই জন্যেই আমাদের প্রাচীন ছবি বা মূর্তির আদর্শ গ্রীসের মূর্তির থেকেও উঁচুস্তরের।

নিজের কাজ করার সম্বন্ধে একবার কথা উঠল। বললেন, ধর একটা শাল গাছ দেখে আমার খুব ভাল লাগল। মনে নাড়া দিল। আমি এই শাল গাছ দেখার আনন্দের স্পন্দনটা জিইয়ে রাখতে চেষ্টা করি। অনেকে হয়তো তখুনি একটা কাগজ পেনসিল দিয়ে এঁকে ফেলল। অমনি মনে করল যেন একটা ছবি বা ছবির বিষয় সংগ্রহ করা হয়ে গেল।

আমার প্রতিক্রিয়া কিন্তু অন্য ধরনের। আমি

কুঞ্জবনে রাধিকা
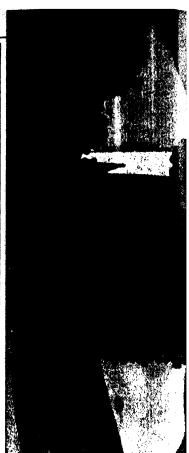
প্রথম দর্শনের ছাপটা বাক্সে চট করে ভরে রাখার চেষ্টা করি। সেটা আমার নোট হতে পারে। সেটা যখনই দেখব তখন আমার ঐ গাছটার কথা মনে পড়বে। আর যখনই আরেকটা শাল গাছ দেখব, সেখানেও ঐ প্রথম গাছটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখব কোনটা পছন্দ। একই গাছ যে কেমন সকাল সন্ধ্যায়, চাঁদনী রাতে, আর ভোরের প্রথম আলোয় কত যে রূপ বদলায়, সব দেখতে দেখতে মন ভরপুর হয়ে যাবে। তারপর একদিন সময় আসবে যখন ভূতের মতো শাল গাছটা ঘাড়ে চেপে বসবে। মনের মতো এঁকে যতক্ষণ কাগজের ওপর মনের ভাবটা প্রকাশ না করতে পারব ততক্ষণ নিস্তার নেই।

অর্থাৎ বাস্তবতা বা দেখার আনন্দ সব ছবির মূলেই থাকবে, কিন্তু সেটার রূপ প্রকাশ করার চেষ্টায় একবার রঙ তুলি দিয়ে আঁকলে কি তার যথেষ্ট সম্মান দেওয়া হল, না সেটা ভাল লাগার সঠিক নিদর্শন হল?

একথা ভক্তিভরে শুনে তখনকার মতো মাথা নেড়ে গেছি, কিন্তু সবটা সে সময় বোধগম্য হতো, তা বলা যায় না।

মাস্টারমশাই একদিন বললেন, গুরুদেব নিজে কবিতা লেখা শেখানোর জন্য ক্লাস খোলেননি। কিন্তু আমি ছবি আঁকার জন্য ক্লাস খুলে বিপদে পড়েছি। একি শেখান যায়। ওঁর মতে, যারা কাজ শিখতে চায়, তাদের বিপথে যাবার থেকে

বাঁচানোই শিল্পশিক্ষকের কাজ।

যে ছেলে খালি ঘুরে বেড়ায়, যদি সত্যি একদিন সে ভাল ছবি এঁকে দেখায়, অর্থাৎ এমন ছবি যা দেখে বলা যায় সে নিজের পথ খুঁজে পেয়েছে, আমি তাকে নানান ভাবে যাচাই করে নেব। দেখব সেটা ওর রাস্তা না অন্য লোকের কাজের প্রভাবে এঁকে ফেলেছে। সোজা পথ থেকে বাঁকা পথে নিয়ে গিয়ে দেখব, আবার সে রাস্তা খুঁজে পায় কি না।

বোধহয় এইসব পরীক্ষা পাশ করে, ওঁর পুরোপুরি আস্থার পাত্র হতে পেরেছিলেন বিনোদদা আর কিংকরদা (বিনোদবিহারী এবং রামকিংকর)। যার জন্যে ওঁদের কাজ ভিন্ন ধরনের হওয়া সত্ত্বেও ওঁদের শিক্ষক এবং সহকর্মী

আশ্রম : ১৯৩৪

অভিমন্যু বধ (অংশত)

হিসাবে কাছে রাখতে চেয়েছেন। সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। কিন্তু সে ভাবও কাটিয়ে উঠেছেন। শেষ বয়সে অবশ্য এ অবস্থার ভাঙনের নানা নিদর্শন পাওয়া যায়।

কিন্তু এখন পর্যন্ত শিল্প আদর্শ, শিক্ষা পদ্ধতি এবং নিজস্ব শৈলী গড়ে তোলার ক্ষমতার অমন আর একটা দৃষ্টান্ত দেখা গেল না। চীনা ভবন বা কলাভবন বা লাইব্রেরির দেওয়ালচিত্র যা উনি করে গেছেন তার জন্যে কোনও প্রতিদানের কথা মনে ঠাঁই দেননি। ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে ছিলেন। এ নিয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে ওঁর বিরোধ ছিল।

মাস্টারমশাই সম্বন্ধে সব কথা গুছিয়ে বলতে পারলাম না। তবে ওঁর শিল্প ব্যক্তিত্বের স্কেচ হিসাবেই এ লেখা দেখা হোক। পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি আঁকুন আমাদের জবানবন্দী নিয়ে অন্য কেউ, যিনি যোগ্য আরও।

বয়সের পড়ন্ত বেলায় আমার মনে হয়, হয়তো সুকৃতি ছিল কোনও যার জন্যে ওঁর সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলাম।

আমাদের সময় শান্তিনিকেতনে এবং বিশেষ করে কলাভবনে দাখিল হওয়াটা বেশ কঠিন ছিল। শান্তিনিকেতনে আসা আমার নিজের এবং আমার পরিবারের সকলেরই পক্ষে, একটা বিশেষ ঘটনা। আমার ছবি আঁকার শখ আর চেষ্টা বহু দিন থেকে চলছিল। রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় গিয়েছিলেন তখন একবার। 'তোরগে' বলে একটা জাহাজে ছিলেন। তখন আমি আমার আঁকা নানান ছবির জোড়াতালি নিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করি।

ম্যাট্রিক পাশ করে কেমনভাবে যেন চলে আসি। সেই মাস্টারমশাইয়ের কাছে গেলাম। বিনোদদা কিংকরদার সঙ্গে পরিচয় হল। ঘটনাচক্র। না হলে জীবনটা হয়তো অন্যরকম হতো।

আরেক রকম।

ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে আপাতত কোনও ভবিষ্যৎ নেই
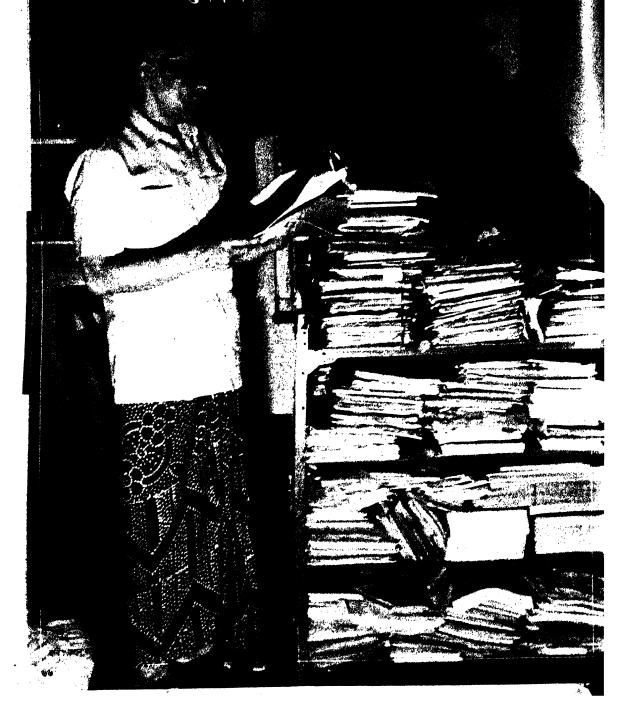
ক লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এখন প্রায় অচল। উপাচার্য ও নানা স্তরের কর্মচারী ও শিক্ষকদের সঙ্গে চলেছে লাগাতার সংগ্রাম। অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ, ধর্মঘট, ঘেরাও। এক ধরনের ঘিনঘিনে ব্যাধিতে বিশ্ববিদ্যালয় আজ ক্লিষ্ট। এই ব্যাধির শিকড় আজ কোথায় গেছে। বলতে পারেন অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য। তাঁর পক্ষে তিনি একাই লড়ছেন অনমনীয়।

প্রশ্ন : অধ্যাপক ভট্টাচার্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন যে অচলাবস্থা চলছে এ কথা আপনি উপাচার্য হিসাবে স্বীকার করেন কি ?

উত্তর : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন যে অচলাবস্থা চলছে সেটা সর্বজন স্বীকৃত। আমি যদি তা স্বীকার না করি তবে সকলের কাছে হাসির খোরাক হব। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। গত তিন বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অবস্থাটা চলছিল তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ অর্থাৎ পড়াশুনা বা গবেষণার মাঝে মাঝে ব্যাঘাত হলেও তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি। সুতরাং সেটা সামগ্রিক অচলাবস্থা ছিল না। তবে এ বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যা শুরু হয়েছে সেটাকে সামগ্রিক অচলাবস্থাই বলা যায়। বেশিরভাগ কাজেরই সিদ্ধান্ত নিতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি কমিটির মারফৎ, ওই কমিটিগুলির বৈঠকই বসছে না। অনেক সিদ্ধান্তই এ জন্য আটকে আছে। এই অবস্থাটার কথা অস্বীকার করি কী করে ?

প্রশ্ন : এই অচলাবস্থা কাটাতে আপনি কি উদ্যোগ নিয়েছেন বা নিজে থেকে কি দায়িত্ব পালন করেছেন ?

উত্তর : আমার দিক থেকে উদ্যোগ নিয়ে যদি কিছু করা যেত তবে আমার আপত্তির কিছুই ছিল না। গত তিন চার মাস ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অবস্থাটা চলছে সেটা তো সবাই জানেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের একটি অংশ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁদের দাবি-দাওয়া না মিটলে প্রতিদিন তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ও আমার অফিসে বিক্ষোভ দেখাবেন; বিক্ষোভ দেখাবেন আমার উপস্থিতির বিরুদ্ধেও। গত সেপ্টেম্বর থেকে এই বিক্ষোভ তাঁরা দেখিয়েও আসছেন। এই বিক্ষোভ এখন ভাঙ্গ-চুর। মারধোর এবং সন্ত্রাসের পর্যায়ে পৌঁচেছে। সবাইকে হুকুম করে চলেছেন যে তাঁদের হুকুম মেনেই চলতে হবে। কেন্দ্রীয় কার্যালয় সহ সর্বত্র ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছেন। এই অবস্থার অবসান হতে পারে একমাত্র রাজনৈতিকভাবে। বিক্ষোভকারী কর্মীদের নেতৃত্ব যে রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন বা আনুগত্য আছে বলে দাবি করেন তাঁরাই পারেন এ কাজ থেকে ওই কর্মীদের নিবৃত্ত করতে। আমি যেটুকু পারি তা করেছি। আমার উপরে যিনি আছেন সেই আচার্যকে জানিয়েছি। যতদূর মনে হয়, তিনি ব্যাপারটি নিয়ে বিভিন্ন স্তরে কথা বলেছেন। আমি নিজে কোনও রাজনৈতিক নেতা নই বা কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমার সম্পর্কও নেই, তাই রাজনৈতিক এই সমস্যার সমাধান করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

প্রশ্ন : পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক নির্মল বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে যে চার দফা প্রস্তাব দিয়েছিলেন আপনি তা গ্রহণ করছেন না কেন ?

উত্তর : অধ্যাপক নির্মল বসু বর্তমানে রাজ্যের যিনি শিক্ষামন্ত্রী তিনি চার দফা প্রস্তাব দেননি। দিয়েছিলেন

আলিপুর জেলের ক্যাম্পাসে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে যাওয়ার কথা। তাতে প্রাথমিক পর্যায়ের বিল্ডিং করতেই খরচ হবে ৪ কোটি টাকা। পুরো বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে তুলে নিয়ে যেতে খরচ হবে ১০০ কোটি টাকা। তাই এখন শুনছি আলিপুর জেল বা প্রেসিডেন্সী জেল অন্যত্র সরাবার কোন সরকারী পরিকল্পনা নেই। কারণ সেটাও তো আর্থিক সমস্যা।

তিন দফা প্রস্তাব। আমার দিক থেকে একটি ছাড়া আর কোনওটাই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। সেটি হল, উপাচার্যের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে। নির্মলবাবু বলেছিলেন, উপাচার্যের বিশেষ ক্ষমতা বলে অর্থাৎ ৯/৬ ধারা প্রয়োগ করার জন্য সিন্ডিকেটের একটা কমিটি করার কথা। আমি এই প্রস্তাবে রাজিও হয়েছিলাম। বলেছিলাম, যেহেতু এই বিষয়েব সঙ্গে একটা আইনগত প্রশ্ন জড়িয়ে আছে তাই সরকারের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাবের ব্যাপারটি লিখিতভাবে জানানো হোক। তা তাঁরা করেননি। বেসরকারিভাবে শুনেছি, সেটা তাঁরা লিখে দেবেন না। এদিকে, কাগজে এ ব্যাপারে বিবৃতি কিন্তু তাঁরা দিচ্ছেন। কাগজে দিতে পারছেন কিন্তু আমার কাছে লিখে দিতে যে কি আপত্তি সেটাই বুঝতে পারছি না। অন্তত বেসরকারিভাবেই লিখে দিতেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটি হল, কর্মীরা সপ্তাহে একদিন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখাবেন। এভাবে কোথাও কোনও বিশ্ববিদ্যালয় চলে কিনা আমার জানা নেই। এই প্রস্তাব আমার কাছে কখনই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। আর কর্মীরা নিজেরাই সেটা মানছেন না। তৃতীয় প্রস্তাবটি এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না।

প্রশ্ন : অনেক ক্ষেত্রেই আপনি আপনার বিশেষ ক্ষমতা অর্থাৎ ৯/৬ ধারা প্রয়োগ করে সেনেট সিন্ডিকেটকে এড়িয়ে গিয়ে স্বৈরাচারিতার মনোভাব দেখাননি কি ?

উত্তর : ৯/৬ ধারার প্রয়োগ নিয়ে অনেকবার অনেক কথা উঠেছে আমিও বহুবার এ নিয়ে বলেছি আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁরাও ব্যাপারটি জানেন যে ৯/৬ ধারার প্রয়োগ মানেই উপাচার্যের খামখেয়ালীপনা বা স্বেচ্ছাচারিতা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজের শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি কাজ ৯/৬ ধারা প্রয়োগ করেই যে করতে হয় সেটা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীরা ভালোভাবেই জানেন। যেমন, পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা। কোনও পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে যদি সিন্ডিকেট, সিনেট ডাকার প্রয়োজন হয় তবে আবার দু-তিন মাস দেরি হয়ে যায়। ছাত্রদের দিকে নজর রেখেই এ ক্ষেত্রে ৯/৬ ধারা প্রয়োগ করে তাড়াতাড়ি ফল প্রকাশ করতে হয়। আবার যেমন কতকগুলি কলেজ সম্প্রতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কাজ শুরু করতে চেয়ে আবেদন করেছিল। তাদের ছাত্ররা প্রস্তুত, শিক্ষকরাও প্রস্তুত। তাড়াতাড়ি অনুমোদন না দিলে ছাত্রদের অসুবিধা। সে ক্ষেত্রে ৯/৬ ধারা প্রয়োগ করে ৮-১০টি কলেজকে আমাদের অধীনে কাজ চালানোর অনুমতি দিয়ে দিয়েছি। তাই, বলা দরকার যে ৯/৬ ধারার প্রয়োগ সম্বন্ধে যা প্রচার চালানো হয় তা যথার্থ নয়।

যেমন ধরুন এই আপনারা আসার আগেই আমার কাছে বি ই কলেজের একদল ছাত্র এসেছিল। সম্প্রতি তাদের কলেজে পরীক্ষায় সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করার একটা প্রস্তাব আমার কাছে এসেছে। আজই সকালে ওই কলেজের অধ্যক্ষ আমায় ফোন করে বলসেন ব্যাপারটি তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে। আবার ছাত্ররা এসে তখন বলেছে আমি যেন এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা নিয়ে সিদ্ধান্ত না নি। তখন আমি যদি কোনও সিদ্ধান্ত নি, যদি ওই প্রস্তাব অনুমোদন বা খারিজ করি দুটোই ৯/৬ ধারায় করতে হবে। সিনেট, সিন্ডিকেট, আন্ডার গ্রাজুয়েট কাউন্সিল ঘুরে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে দুই তিন বছর দেরি হয়ে যেতে পারে। তাই ৯/৬ ধারার

প্রয়োগটা জরুরি। রাজনীতি যাঁরা করেন তাঁরা মনে করেন যে, সিন্ডিকেট হল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ। অর্থাৎ সিন্ডিকেটের অনুমোদন না পেলে কিছুই নাকি করা যাবে না। এটা কিন্তু ঠিক নয়। সিন্ডিকেটের ক্ষমতা কী সেটা কিন্তু নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া আছে। একইভাবে প্রতিটি কমিটিরই কী কী কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে তা পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া আছে। এর বাইরে যেসব কাজ সেটা কে করবেন সে নিয়ে আইনে কিছু বলা নেই। উপাচার্যকে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ হিসাবে সেসব কাজ করতে হয়। যেমন বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত ব্যাপারে বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমা যে করা হয় সেগুলি কে করবেন সে সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে কিছুই বলা নেই। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ হিসাবে উপাচার্য তা করতে পারেন। এতে সিনেট সিন্ডিকেটের মতামত নেওয়া বা তাদের এড়িয়ে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। অনেকে বলছেন, এটা আমি নাকি করছি ৯/৬ ধারায়, মোটেই তা নয়। শেষ কথা হচ্ছে যে, ৯/৬ ধারার প্রয়োগ যদি সংশ্লিষ্ট কমিটি অনুমোদন না করেন, তাহলে সেটা আচার্যের কাছে যাবার কথা, শেষ সিদ্ধান্তের জন্যে। বর্তমান সিন্ডিকেটের অধিকাংশ সেটা করেন না কেন?

প্রশ্ন : আপনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হবার আগে ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। অর্থাৎ বামফ্রন্টের আপনি যে আস্থাভাজন সে ব্যাপারেও সন্দেহ থাকতে পারে না। উপাচার্য নির্বাচনের সময়ে আপনি বামপন্থী প্যানেলেই ছিলেন। কিন্তু সেই বামফ্রন্ট সরকার ও তার সমর্থকদের সঙ্গে আপনার বর্তমান সম্পর্কের কারণ কি মত-বিরোধ, ব্যক্তিগত সংঘাত না কি অন্য কিছু?

উত্তর : আমি ত্রিপুরা বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে ছিলাম বলে যেটা প্রশ্ন করেছেন সেটা ঠিক নয়। তবে দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিশ্চয়ই ছিলাম। ত্রিপুরায় যাবার কথা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন পে-কমিটিতে আমি ছিলাম। সেখানে আমার ভূমিকা ছিল বিশেষজ্ঞের। ইউনিভারসিটি নিয়ে বেশ কয়েকটি কমিটি বিশেষ করে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে এঁরা যে কমিটি করেছিলেন তাতে আমি ছিলাম। আসামে জনতা প্রশাসনের সময় পে-কমিটির সদস্য ছিলাম। এগুলি সবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিশ্চয়ই, পদ নয়। তবে যে কথাটা বলছেন যে, বামফ্রন্টের কিছুটা আস্থাভাজন ছিলাম সেটা ভুল নয়। আর সে জন্যই তাঁদের বিভিন্ন কাজে আমায় তাঁরা নিয়ে ছিলেন। অনেকে যেটা মনে করে থাকেন যে, উপাচার্য নিযুক্ত হওয়ার সময় আমি বামপন্থী প্যানেলে ছিলাম সেটা কিন্তু ঠিক নয়। যে তিনজন বামপন্থী প্যানেলে ছিলেন তাঁর মধ্যে আমি ছিলাম না। বস্তুত আমার পিছনে কোনও রাজনৈতিক সমর্থনও ছিল না। কিন্তু বামফ্রন্টের বিভিন্ন কমিটিতে যে আমি ছিলাম সেটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত রিপোর্টের কোনও ব্যাপার নেই। এটাকে বলতে পারেন নীতিগত প্রশ্নে বিরোধ। বরাবরই যাঁরা শিক্ষা পরিচালনার ব্যাপারে বামফ্রন্টের নীতির সমর্থন করতেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে তার অপপ্রয়োগ দেখে তাঁরা অনেকেই এখন বামফ্রন্টকে সমর্থন থেকে সরে এসেছেন। নীতিগত প্রশ্নে আমিও সেই সরে আসাদের

> কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন প্রশাসনিক, লেখাপড়া বা গবেষণার বিভিন্ন কাজ টাকা পয়সার অভাবে যেভাবে চলা উচিত সেভাবে চলছে না রাজ্য সরকার যে টাকা দেন তা বেতন দিতেই শেষ হয়ে যায়। মঞ্জুরি কমিশন যে স্বল্প টাকা দেন তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিকীকরণের কাজ কিছুতেই সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গেলে এই টাকাটা সহজেই পাওয়া যাবে। দেখা যাচ্ছে আধুনিক কৃৎকৌশলের অভাবের জন্যই ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে অনেক সময় ক্ষোভ জন্ম নিচ্ছে। অনেক সময় তা আন্দোলনের রূপ নেয়।

দলে।

প্রশ্ন : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্প্রতি আপনি একটি সাক্ষাৎকারে 'সিক ইন্ডাস্ট্রির' সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেন?

উত্তর : পশ্চিমবঙ্গে বেশিরভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠানই আধুনিক কৃৎকৌশল ও সর্বাধুনিক পরিচালন ব্যবস্থার অভাবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। মহারাষ্ট্র, গুজরাত ইত্যাদি রাজ্যের শিল্পগুলি আধুনিক কৃৎকৌশল আয়ত্ত করে সর্বোপরি আধুনিক পরিচালন ব্যবস্থার প্রভাবে প্রচুর এগিয়ে গিয়েছে। এ রাজ্যে কাজ হচ্ছে সেই পুরানো যন্ত্রপাতি দিয়ে। আছে পুরানো পরিচালন ব্যবস্থা। আধুনিক পরিচালন ব্যবস্থা ও কৃৎকৌশল আনার মত মূলধনও নেই পশ্চিমবঙ্গের। একইভাবে পুরানো পরিচালন ব্যবস্থা ও পুরানো যন্ত্রপাতির পরিবর্তন না ঘটাতে পেরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও আজ 'সিক ইন্ডাস্ট্রির' মতই অবস্থা। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এগোতে পারছে না এই জন্যই। মূলধনের যথেষ্ট অভাব থাকাতেও একে আধুনিক করা যাচ্ছে না। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম একটি সিক ইন্ডাস্ট্রি পাট শিল্পকে চাঙা করে তুলতে কেন্দ্র যে ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন সেরকম কিছু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে করা না হলে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে না। ভরসার মধ্যে এই যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের অধিকাংশই জানেন যে, বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কীভাবে পড়াশুনা চলছে। তাঁরাও বোঝেন যে, আধুনিক উপকরণ এবং পরিচালনার অভাবেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই হাল।

প্রশ্ন : বাম ও অবাম এই দুই মতবাদের ঝগড়াতেই কি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অবস্থা?

উত্তর : না। কেন না বাম বলতে যা বোঝায়, পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা বামপন্থী বলে নিজেদের দাবি করেন, তাঁরা এখন বহুভাগে বিভক্ত। যে বামপন্থীরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কব্জায় আনতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি করেছেন তাঁদের এ রাজ্যের অনেক বামপন্থীরাই সমর্থন করেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থাটা হল, কোনও একটি দল তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করছেন আর অন্যরা তা মানতে চাইছে না। এই না মানার দলে যেমন অ-বামপন্থীরা আছেন, তেমনি অনেক বামপন্থীও আছেন। এমন কি এমন অনেক বামপন্থী সমর্থক আছেন যাঁরা বামফ্রন্টকে নির্বাচনে ভোটও দেন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বামফ্রন্টের এই নীতি তাঁরা সমর্থন করেন না। এমন অনেক শিক্ষকও আছেন যাঁরা প্রকাশ্যভাবে বামফ্রন্ট সমর্থক কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁরা বামফ্রন্টের ঘোর বিরোধী।

প্রশ্ন : প্রাক্তন উপাচার্য রমেন পোদ্দার যখন ৯/৬ ধারায় বিশেষ ক্ষমতাবলে বিভিন্ন আদেশ দিয়েছিলেন তখন এত হৈ-চৈ হয়নি। আপনার বেলা প্রশ্ন উঠছে কেন?

উত্তর : হয়তো সেটা এই কারণে যে রমেনবাবু বর্তমান বিক্ষোভকারীদের স্বার্থের হানিকর কিছু করেননি। ওই বিশেষ আইন বলে তিনি যা কিছু করেছেন তা হয়তো তাঁদেরই উপকারেও লেগেছে। তাই কোনও বিরোধ বাধেনি। কিন্তু আমি তো আর তা পারি না!

প্রশ্ন : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা এখন

পড়াশুনা থেকে রাজনীতিতেই বেশি জড়িয়ে পড়েছেন বলে অনেকের অভিযোগ। এই অবস্থার পরিবর্তন কীভাবে সম্ভব ?

উত্তর : এই অভিযোগ মোটেই ঠিক নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৯০ ভাগ শিক্ষক এই অবস্থাতেও নিজেদের লেখাপড়া, পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। তবে, যাঁরা শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের বাধ্য হয়েই কিছু কিছু রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯০ শতাংশ শিক্ষকই কিন্তু দলীয় মতামতের ধার ধারেন না, প্রতিটি বিষয়েরই তাঁরা ইস্যু টু ইস্যু বিচার করেন।

প্রশ্ন : এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষকেরা রাজনৈতিকভাবে পুরোপুরি দুটি দলে পোলারাইজড। এতে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে বলে কি আপনি মনে করেন ?

উত্তর : বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থেকে হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এলে এই রাজনৈতিক পোলারাইজেশন সম্বন্ধে লোকের একটা ভুল ধারণা হতেই পারে। কিন্তু সৌভাগ্যের ব্যাপার পরিস্থিতির অতটা অবনতি এখনও হয়নি। ছাত্র বা শিক্ষকেরা প্রতিটি ব্যাপারেই বিচার করেন সেটা কী ইস্যু সেই হিসাবে। তাঁদের প্রাথমিক লক্ষ্য থাকে নিজেদের লেখাপড়া ও গবেষণার উপরে। সুতরাং সম্পর্ক খারাপের প্রশ্ন নেই।

প্রশ্ন : আপনি যখন উপাচার্যের কার্য ভার নেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিশ্চয়ই কিছু নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আপনার মাথায় ছিল। সেগুলির কোনওটা বাস্তবে রূপায়িত করতে পেরেছেন কি ?

উত্তর : প্রথমত নির্বাচিত যে হব এ ব্যাপারটাই আগে থাকতে ঠিক ছিল না, কেন না আমার পিছনে সরকারের সমর্থন ছিল না। ফলে আগে থেকেই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব ছিল না। তবে, বহুদিন ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত বলে সমস্যাগুলি কী এবং কী কী করা উচিত, সে বিষয়ে কিছু ধারণা ছিল। কিন্তু সার্বিক উন্নয়নের কথা ভাবিনি। ১২৫ বছরের বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন রাতারাতি করা তো সম্ভব নয়! ২৫ থেকে ৩০ বছর সময় লাগবে। তবে, স্বল্পকালীন কিছু সমস্যা নিয়ে নিশ্চয়ই চিন্তা-ভাবনা করেছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা কার্যকরও হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দুটি মূল সমস্যা বর্তমানে রয়েছে সে দুটি হল পরিচালন ব্যবস্থা ও রিসোর্স-এর। এ'দুটিই দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা। এ ব্যাপারে পরিকল্পনা করেও লাভ নেই। শুধু শুধু ঢাকঢোল পিটিয়ে লাভ কি ? যেমন ধরুন, আলিপুর জেলের ক্যাম্পাসে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে যাওয়া হবে বলে শুনেছিলাম। ভাল কথা। বিভিন্ন বিভাগ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় কাজের অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ের বিল্ডিং বাবদই ৪ কোটি টাকা খরচ লাগছে। পুরো বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে তুলে নিয়ে যেতে খরচ তো ১০০ কোটি টাকারও বেশী লাগবে। এত টাকা কোথা থেকে আসবে ? এখন আবার শুনতে পাচ্ছি, আলিপুর জেল বা প্রেসিডেন্সী জেল অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন সরকারী পরিকল্পনা এখনও নেই। সেটাও প্রধানত আর্থিক সমস্যা। সুতরাং এই মুহূর্তে গোটা আলিপুর ক্যাম্পাস নিয়ে ভেবে লাভ কি!

আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে একটা সমস্যা আছে। সেটা তো ১০/১৫ বছরের পুরানো ব্যাপার। বর্তমান অচলাবস্থার সঙ্গে তার

কর্মীদের একটি অংশ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁদের দাবি-দাওয়া না মিটলে প্রতিদিন তাঁরা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ও আমার অফিসে বিক্ষোভ দেখাবেন। সবাইকে হুকুম করে চলেছেন, তাঁদের হুকুম মেনেই চলতে হবে। তাঁরা সর্বত্র ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছেন। বিক্ষোভকারীদের নেতৃত্ব যে রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য আছে বলে দাবি করেন, তাঁরাই পারেন এ কাজ থেকে ওই কর্মীদের নিবৃত্ত করতে। আমি রাজনৈতিক নেতা নই বা কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমার সম্পর্কও নেই, তাই রাজনৈতিক এই সমস্যা সমাধান আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কোনওরকম সম্পর্ক নেই। এটা পরিচালন ব্যবস্থার গলদ। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা ব্যাপারটার সঙ্গে ওয়াকিবহাল। অন্য গণ্ডগোলে এই সমস্যা ফুটে বের হতে পারছে না, চাপা পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এবার একটি বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়াতে এত গণ্ডগোল সত্ত্বেও বি কম পার্ট ওয়ান এবং পাস পরীক্ষার ফল মোটামুটি সময় মত বের হয়েছে। স্নাতোকত্তর শ্রেণীর ফল প্রকাশের সমস্যা নিয়েই ভাবা হয়েছে কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তা চাপা পড়ে গিয়েছে। স্নাতকোত্তরে কয়েকটি বিষয়ে সময় মত ফল প্রকাশের একটা প্রধান সমস্যা হলো বিরাট সংখ্যক বহিরাগত পরীক্ষার্থীর বোঝা। কীভাবে তাঁদের জায়গা দেওয়া হবে, কীভাবে এত খাতা দেখা হবে সেটা ছিল একটা বড় সমস্যা। এই বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষার ব্যবস্থা করে তাঁদের সংখ্যাটা ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এনে দাঁড় করিয়েছি।

প্রশ্ন : এ ব্যাপারে বাধা পাননি ?

উত্তর : হ্যাঁ। কিন্তু ঠেলাঠেলি করে করিয়েছি। এ ছাড়া উপায় কি ? আন্ডার গ্রাজুয়েট স্তরে ভাষা শিক্ষা নিয়ে একটা সমস্যা আছে,এ ব্যাপারে কিছু একটা করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আন্ডার গ্রাজুয়েট কাউন্সিল দু বছর ধরে তা চেপে বসে আছেন। তাঁদের বোধ হয় ধারণা, এই সমস্যার সমাধান হলে পাছে উপাচার্যের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে যায়। আসলে নিরুপদ্রবে করা গেলে অনেক কিছুই ভাবা যেত, সফলভাবে করা যেত।

প্রশ্ন : অধ্যাপক রমেন পোদ্দারের হাত থেকে আপনি কার্যভার নেওয়ার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতির না অবনতি হয়েছে বলে আপনি মনে করেন ?

উত্তর : বর্তমানে বিক্ষোভ, হৈ-চৈ, ধর্মঘট ইত্যাদি যা চলছে তাতে বলা যায় আমি কার্যভার নেওয়ার পর অবস্থার অবনতিই হয়েছে, কারণ রমেনবাবুর সময় তো ওসব কিছু হত না। তবে রমেনবাবুর আমলে অন্যায় কিছু হলে তার বিরুদ্ধে বলার কেউ ছিলেন না, কারণ প্রতিবাদ করলেই ব্যবস্থা নেওয়া হত। রমেনবাবু সিন্ডিকেট সিনেটের সমর্থন পেয়ে একতরফা শাসন চালিয়ে গেছেন। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল প্রায় এক নায়কতন্ত্র। সেদিক দিয়ে বিচার করলে আমার আমলে শিক্ষক, ছাত্র, মাথা তুলে দাঁড়িয়ে মত প্রকাশ করতে পারেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার যে ঐতিহ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল সেটা আবার ফিরে এসেছে।

প্রশ্ন : বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে যে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে আপনি প্রতিদিন লড়াই করে চলেছেন তার জন্য অসাধারণ মানসিক ক্ষমতার প্রয়োজন। সেটা আপনি কীভাবে অর্জন করলেন ?

উত্তর : অনেকেই আমাকে মাঝে মধ্যে এই প্রশ্নটা করে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বকীয়তা, স্বাধিকার বজায় রাখার জন্য অগণিত ছাত্র, শিক্ষক, কর্মী যেভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন ও এই কাজে আমার ভূমিকার যেভাবে সমর্থন জানাচ্ছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে অসংখ্য বিদ্যোৎসাহী যেভাবে আমাকে উৎসাহিত করছেন সেটাই আমাকে শক্তি যুগিয়েছে। যখনই ভাবি আর বুঝি পারব না তখনই ওই সব ছাত্র, শিক্ষকদের মুখগুলি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যা আমাকে আবার নতুন উদ্যমে কাজ করার শক্তি যোগায়।

প্রশ্ন : এমতাবস্থায় আপনি কি কখনও পদত্যাগ করার কথা ভেবেছেন ?

উত্তর : বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানত পড়াশুনা ও গবেষণার জন্য। শিক্ষকদের দায়িত্ব পড়াশুনা করানো আর ছাত্রদের দায়িত্ব পড়াশুনা করা। আনুসঙ্গিক কাজ চালান কর্মীরা। পড়াশোনার ব্যাপারে ছাত্ররা যেহেতু স্বল্পকালের জন্যে আসে, এবং শিক্ষকেরা দীর্ঘকাল দায়িত্বে থাকেন, আমার মতে, শিক্ষকেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যতক্ষণ শিক্ষকেরা আমায় সমর্থন জানাবেন, ততক্ষণ পদত্যাগের কথা ভাববো না। আর আমাকে নিয়োগ করেছেন আচার্য। তাঁর আস্থা না হারালে পদত্যাগের কথাই আসে না। গায়ের জোরে পদত্যাগ করানোর কথা কেউ যদি ভেবে থাকেন তাহলে সেটা ভুল করছেন।

প্রশ্ন : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো পরিবেশ সৃষ্টির মূল প্রতিবন্ধক কি ?

উত্তর : বর্তমানে দলীয় রাজনীতিই মূল প্রতিবন্ধক। কোনও কাজের জন্য কোনও একটি বিশেষ দলের মুখোজ্জ্বল হচ্ছে কি না বা তাদের কর্তৃত্ব কায়েম হচ্ছে কি না সেটা যদি বিচার্য হয় তাহলে যা হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটাই হয়েছে। এখানে কোনও একটি রাজনৈতিক দল মরীয়াভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে কীভাবে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের হুকুম চালানো যায়। সেখানে তাদের ভালো-মন্দ বাছ বিচার নেই। আরেকটি ব্যাপারও সমানভাবে উল্লেখযোগ্য। তা হল, কায়েমী স্বার্থের জন্যও কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা যাচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে বহু দিনকার পুরানো অভ্যাসকেই কায়েমী স্বার্থ হিসাবে বোঝাতে চাইছি। এটা সেই পরিচালন ব্যবস্থার ত্রুটি। এ ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতির প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও অবস্থাটা অনেক ক্ষেত্রে নতুন কিছু ভাবার পরিপন্থী।

প্রশ্ন : অনেকে বলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন যা অবস্থা তাতে সামরিক প্রশাসক না হলে কাজ চালানো অসম্ভব। আপনার অভিমত ?

উত্তর : লেখাপড়া জিনিসটা মানসিক ব্যাপার। ড্রিল করে অর্থাৎ জোর করে ঢুকিয়ে দেবার জিনিস নয়। তাই সামরিক প্রশাসক এনে কোনও লাভ হবে বলে মনে হয় না। এমন কিছু করা দরকার যাতে ওই প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন এমন একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চলছে যেখানে প্রায় সব ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ভোটের দিকে তাকিয়ে। এ ক্ষেত্রে কাজের পরিবেশ থাকে না। লেখাপড়াই যেখানে মূল কাজ সেখানে সব কিছু ভোট নির্ভর হবে কেন সেটাই আমার প্রশ্ন। সাধারণত যে কোনও সিদ্ধান্তই সবার পরামর্শ নিয়ে করা নিশ্চয়ই উচিত। সেটা অন্য ব্যাপার। এখানে যে কোনও কমিটিতেই যে কোনও ব্যাপার তোলা হোক না কেন সেটা ঠিক না ভুল কিংবা ভালো কি মন্দ এভাবে সিদ্ধান্ত হয় না। কোনও একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলকে সামনে রেখে ভোটের পার্থক্যের উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এভাবে চলা সত্যিই খুব অসুবিধে।

প্রশ্ন : মাঝে মাঝেই আচার্য, শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন মনে হয় আপনি নিরুপদ্রবে কাজ করতে পারবেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার বিক্ষোভ, চেঁচামেচি, সব কাজ বন্ধ। এটার কারণ কি ?

উত্তর : দলীয় রাজনীতির ব্যাপারটা বিশ্ববিদ্যালয়ে গোড়া থেকেই আছে। চট করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্তর্হিত হবেও মনে হয় না। যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়কে এখন রাজনৈতিক কব্জায় আনার চেষ্টা করছেন তাঁরা তো কখনই সে কাজ থেকে নিশ্চেষ্ট হবেন না। নিজেদের স্বার্থ কায়েম করতে এ ধরনের কাজ তাঁরা করতেই থাকবেন। দেশের কোনও রাজনৈতিক দলকেই কিন্তু এ ক্ষেত্রে ধোয়া তুলসিপাতা বলা যায় না।

তেমনি অনেক বামপন্থীও আছেন। এমন কি এমন অনেক বামপন্থী সমর্থক আছেন যাঁরা বামফ্রন্টকে নির্বাচনে ভোটও দেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বামফ্রন্টের এই নীতি তাঁরা সমর্থন করেন না।

প্রশ্ন : কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হলে কি এই অচলাবস্থা মিটতে পারে বলে আপনার ধারণা ?

উত্তর : বর্তমানের এই অচলাবস্থা বলতে যা বলেছি তা বোধ হয় মিটবে। বামপন্থী কর্মীরা গত তিন বছর ধরে যে কাজ করে যাচ্ছেন তাতে সিনেট বা সিন্ডিকেটের তরফ থেকে কখনও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। উচ্চতম দুই কমিটি কোনও ব্যবস্থা নেবে না জেনেই কিছু কর্মী বে-আইনী কাজ-কর্মে সাহস পেয়েছেন। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হলে এ ব্যাপারে কিছু পরিবর্তন হবেই। তখন তো সিনেট বা সিন্ডিকেটের এই কমিটি থাকবে না। ফলে যাঁরা এখন এই অশালীন কাজ করছেন তাঁরা কিছুতেই তা করতে আর ভরসা পাবেন না। ফলে এই অবস্থা কাটবে। তবে, বিক্ষোভ একেবারে নির্মূল না হলেও কমবে।

কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হলে টাকা পয়সার অভাবটাও কিছুটা মিটবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন প্রশাসনিক, লেখাপড়া বা গবেষণার বিভিন্ন কাজ টাকা পয়সার অভাবে যেভাবে চলা উচিত সেভাবে চলছে না। রাজ্য সরকার যে টাকা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেন তা বেতন দিতেই শেষ হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন যে স্বল্প টাকা দেন তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিকী করণের কাজ কিছুতেই সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গেলে ওই টাকাটা সহজেই পাওয়া যাবে। দেখা যাচ্ছে আধুনিক কৃৎকৌশলের অভাবের জনাই ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে অনেক সময় ক্ষোভ জন্ম নিচ্ছে। অনেক সময় তা আন্দোলনের রূপ নেয়।

প্রশ্ন : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট কাটাতে আপনার ব্যক্তিগত কোনও ফর্মুলা আছে কি ?

উত্তর : সেরকম কোনও ফর্মুলা-টর্মুলা নেই।

প্রশ্ন : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থার ফলে সব থেকে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত তাঁরা হলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী। অনিশ্চয়তার মধ্যে তাঁরা কাটাচ্ছেন প্রতিটি দিন। ক্ষতি হচ্ছে গবেষকদেরও। এই মুহূর্তে ওই ছাত্র এবং গবেষকদের জন্য আশার বাণী শোনাবেন কি ?

উত্তর : গত সেপ্টেম্বর মাসের আগে যা চলছিল সেটা ছিল শুধু উপর তলার ব্যাপার। এই তিন মাসে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে কাজকর্মের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। সে জন্য এই মুহূর্তে সত্যিই কোনও আশার বাণী শোনানো যাচ্ছে না। আশার বাণী শোনাবেন রাজনৈতিক নেতারা, যাঁরা এই অবস্থা তৈরি করেছেন অথবা অন্য রাজনৈতিক নেতারা যাঁরা এই অবস্থা কাটাতে সাহায্য করতে পারেন। তাঁরাই একমাত্র ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও গবেষকদের আশার আলো দেখাতে পারেন।

দেবদূত ঘোষঠাকুর

ছবি : অশোক চক্রবর্তী

বিশ্ববিদ্যালয়ের লয়

সমর মুখোপাধ্যায়

১৮৫৭ সালের ৪ জানুয়ারি। প্রতিষ্ঠা হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। তবে প্রতিষ্ঠা হলেও শুরুতে এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল কেবলমাত্র পরীক্ষা নেওয়ায় মাধ্যম। আসল পড়াশোনা শুরু হয় ১৯০৪ সাল থেকে। শুরু থেকেই বহুদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বাড়ি ছিল না। অফিসের কাজকর্ম চলতো মেডিকেল কলেজ থেকে, আর ক্লাশ হতো প্রেসিডেন্সী কলেজে। সেনেট হাউস তৈরি হয় ১৮৭৩ সালে। তবে নিজের বাড়ি থাকুক আর না থাকুক, শুরু থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব, সারা বঙ্গে তো বটেই, ছিল সারা দেশ জুড়ে। এরাজ্যের তখন এটাই ছিল একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। এন্ট্রান্স থেকে শুরু করে (পরবর্তী কালে যা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা রূপে গণ্য হয়) স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত সমস্ত পরীক্ষা নেওয়ার একমাত্র অধিকর্তা ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এর তত্ত্বাবধানে মোট ২৮৮ জন পরীক্ষার্থী প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসেছিলেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রধান স্থান ছিল। প্রাক স্বাধীনতা যুগের প্রায় প্রতিটি আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যক্ষভাবে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু থেকে শুরু করে, রবীন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ সকলেই যুক্ত ছিলেন কোন না কোনভাবে। রাজনীতি আর আন্দোলন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে নতুন কিছু নয়। মহাভারতের বিভিন্ন পর্বের মত বার বার বিশ্ববিদ্যালয়েও এসেছে রাজনৈতিক পর্ব। দেশ স্বাধীনতা পাওয়ার আগে পর্যন্ত, ব্যক্তিগত বা দলগত রাজনীতির বিশেষ স্থান এখানে ছিল না। যা আন্দোলন হতো, তা সবটাই স্বাধীনতাকেন্দ্রিক। তার পরবর্তী কালে আস্তে আস্তে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থেকে শুরু করে পরিণত হতে লাগলো রাজনৈতিক আখড়ায়। যে আশা যে উন্মাদনায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক করা হয়েছিল "অ্যাডভান্সমেন্ট অফ লার্নিং" তা আস্তে আস্তে রূপ নিয়েছে "অ্যাডভান্সমেন্ট অফ পলিটিক্স-এ"। অনেক আগেকার কথা বাদ দিলেও, গত কুড়ি বছরে এই বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক রণক্ষেত্র। বর্তমান পর্যায়ে এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী, অফিসার, মায় উপাচার্য পর্যন্ত কেউই রাজনীতির বাইরে নন। এক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ ঢোকা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। পুলিশের পদক্ষেপ হলে মনে করা হতো যে বিশ্ববিদ্যালয় কলুষিত হল, আর এখন সেই মনোভাব সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাদা আর উর্দিপরা পুলিশের ভীড় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সবসময়। সব পুলিশ যোগ করে ধরলে বিশ্ববিদ্যালয় যেন একটি ছোটখাট থানা। ছাত্র শিক্ষক কর্মচারী এমন কি সাংবাদিকরা পর্যন্ত কোথায় যাচ্ছেন, কি করছেন, কার সঙ্গে কথা বলছেন ইত্যাদি সবকিছুর ওপরই পুলিশের সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি। শুধু তাই নয়, রাজনীতির চেহারা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছবি : দেবীপ্রসাদ সিংহ

ছাত্র-রাজনীতি, অধ্যাপক-রাজনীতি আর কর্মী রাজনীতির ঝড়ে বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডভণ্ড। ছবি : অশোক চক্রবর্তী

বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কদর্য রূপ নিয়েছে যেখানে স্বয়ং উপাচার্যকে, কি বাইরে কি বিশ্ববিদ্যালয়ে, সবসময় সঙ্গে রাখতে হয় সশস্ত্র দেহরক্ষী। রাজ্য সরকারও চান না যে উপাচার্য এই দেহরক্ষী ছাড়াই চলাফেরা করুন। কার্যত প্রাণের দায়ে উপাচার্য এই দেহরক্ষী নিয়ে চলাফেরা করতে বাধ্য। যদিও পুলিশ এবং দেহরক্ষীর সামনেই সাম্প্রতিককালে উপাচার্যকে নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হতে হয়েছে একাধিকবার।

রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় সবসময়ই হয়েছে। সব সরকারেরই লক্ষ্য, কিভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। তবে রাজনৈতিক মুনাফা লোটার চেষ্টার সঙ্গে প্রশাসনিক এবং শিক্ষাগত অযোগ্যতা যদি কর্মচারিদের থাকে তাহলে প্রতিষ্ঠানের নাভিশ্বাস উঠতে বাধ্য এবং বর্তমানে তাই হয়েছে। রাজনৈতিক অনুপ্রবেশের মাধ্যমে অযোগ্যরাই আজ প্রায় বিভিন্ন শাখার কর্তা। ফলে দলবাজি চূড়ান্ত আকার নিয়েছে, অপরদিকে নীতিবোধ নেই। ফলে সত্তর দশক থেকে শুরু করে এই আশির দশকের প্রায় শেষ ভাগ পর্যন্ত দলবাজির নগ্নপ্রভাবে রাজনীতির স্বরূপটাই পাল্টে গিয়েছে।

১৯৬৬ সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলগত রাজনীতির দাপটে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠার শুরু বলা যায়। তখন কংগ্রেস সরকার এরাজ্যে। শুরু হল খাদ্য আন্দোলন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর 'ভাতের বদলে কাঁচকলা খাও' বিবৃতি ইন্ধন যোগালো আন্দোলনে। বামপন্থী ছাত্রসমাজ তথা কংগ্রেস বিরোধী দলগুলি এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ঝাঁপিয়ে পড়লো কংগ্রেস সরকার বিরোধী আন্দোলনে। পুলিশের লাঠি কাঁদানে গ্যাস থেকে শুরু করে গুলি পর্যন্ত চলেছে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। খাদ্য আন্দোলন স্থিমিত হয়ে গেলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু আন্দোলনের তথা রাজনীতির উচ্চফলনশীল বীজ থেকেই গেল। তার কয়েক মাস পরে এল ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচন। রাজ্যের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার কংগ্রেসকে হারিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হল। আনন্দ আর বিজয়োল্লাসের মূল কেন্দ্র হয়ে উঠলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। চারিদিকে কেবল লাল আর লাল, লাল পতাকা আর লাল বাতিতে ভরে গেল বিশ্ববিদ্যালয় আর তার সংলগ্ন এলাকা। তারপর থেকে দীর্ঘদিন চললো মিটিং মিছিল আর সমাবেশ বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে। তবে একটা কথা ঠিক এসব উন্মাদনা কিছুটা স্থিমিত হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা আর গবেষণার কাজ স্বাভাবিকভাবে হয়েছে। আজও সেই সময়কার বহু ছাত্র-ছাত্রীর এই মত। তবে রাজনৈতিক যেসব নেতৃবৃন্দ যুক্তফ্রন্ট সরকারের হাত ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি করতে ঢোকার সুযোগ পেলেন, তাঁরা কিন্তু একে পাকাপাকিভাবে রাজনীতির কাজে লাগাবার শপথ নিলেন তখনই। তারপর যতবারই সরকার বদল হোক, দেখা গেল ১৯৬৭ সালের সেইসব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন দল আর রাজনীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখতে চেয়েছেন এখানে। আর সেই চেষ্টার কোন ঘাটতি আজ প্রায় কুড়ি বছর পরেও নেই।

নতুন যুক্ত ফ্রন্ট কিছুদিন রাজত্ব চালাবার পরই শরিকী সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে প্রকট হয়ে পড়লো তাদের অভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব। যেহেতু ক্ষেত্র অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল, তাই বিভিন্ন দল এই বিশ্ববিদ্যালয়কে মঞ্চ করে প্রচার আন্দোলন শুরু করলেন। একে অপরের বিরুদ্ধে কুৎসা, অভিযোগ তুলে রাজনীতির চেহারা পাল্টে দিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা ও অন্যান্য কাজ ব্যাহত হতে লাগলো। এর কারণ, ছাত্র শিক্ষক কর্মচারীরা প্রায় সকলেই কোন না কোনভাবে এই রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থক। অবশ্যম্ভাবী কারণ হিসাবে শুরু হয়ে গেল পরীক্ষা বিভ্রাট। বিপন্ন হয়ে পড়তে লাগলো হাজার হাজার সাধারণ ছাত্রছাত্রী।

অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র হতে হতে এক সময় প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হল। ১৯৬৯ সালে আবার নির্বাচনে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ও রাজনীতির আখড়া হয়ে উঠলো পুরোদমে। এইসময় রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায় শুরু হল। শুরু হল নকশাল আন্দোলন। সি পি এম দল ভেঙ্গেই নকশালপন্থীদের সংগঠন সি পি আই (এম এল)। দুটি দলই পূর্ণ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে। দুপক্ষই বলতে লাগলো, 'তারাই সঠিক'। আর এই সংঘর্ষের কেন্দ্রস্থল হল আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তার সঙ্গে নকশালপন্থীদের নতুন শ্লোগান "বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হোক।" স্বাভাবিকভাবে একটি ত্রাসের ভাব দেখা গেল সারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে। ক্লাশ হয় না, ছাত্ররা আসে না, যারা আসে তারা রাজনীতি করতে আসে, শিক্ষকরাও তাই। পরীক্ষা তছনছ করা হল, খাতা প্রশ্নপত্র ছিঁড়ে দিয়ে। সমস্ত পরীক্ষা বন্ধ হয়ে গেল, ভেঙ্গে পড়লো প্রশাসন।

তখনকার প্রশাসনের করুণ অবস্থা বুঝিয়ে বলার জন্য কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা দরকার। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাস। তখনকার বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়ন 'নবীন বরণ' উৎসবের জন্য ছাত্র ইউনিয়নের তহবিল থেকে ছয় হাজার টাকা নিল। নকশালপন্থী ছাত্ররা এর প্রতিবাদ করলো। তারা দাবি করলো ওই যুক্তফ্রন্ট সরকার সমর্থক ছাত্র ইউনিয়নকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তাদের কাছ থেকে এই ছয় হাজার টাকা ফেরত নিতে হবে। তারা ঘেরাও করলো উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেনকে ৫ মার্চ তারিখে। ঘেরাও চললো একটানা ১৬ ঘণ্টা। সন্ধ্যার পর তাঁকে যুক্তফ্রন্ট সমর্থক বাইরের কিছু লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রের সঙ্গে এসে মুক্ত করলো বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি আর মারপিটের পর। উপাচার্য পুলিশের কোন সাহায্য নিতে চাননি। এদিনের ঘটনার জন্য ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে নকশালপন্থীরা আবার উপাচার্যকে ঘেরাও করল। ঘেরাওকারীদের দাবি, ছাত্র ইউনিয়নের তহবিল থেকে ছাত্র ইউনিয়নের ছয় হাজার টাকা নেওয়ার ঘটনাকে উপাচার্যের নিন্দা করতে হবে। উপাচার্য ১৪ মার্চ বিভিন্ন ছাত্র ইউনিয়নের একটি বৈঠক ডাকার ঘোষণা করলেন, নকশালপন্থীদের এই আন্দোলনের মূল বিষয়টিকে নস্যাৎ করে দিতে। ঘেরাও কিন্তু তখনও চলছে। যুক্তফ্রন্ট সমর্থকরা উপাচার্যকে ঘেরাও মুক্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। তারপর দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। সি পি এম-এর সমর্থকদের দেখা গেল গলায় লাল রুমাল বেঁধে আর হাতে লাঠি নিয়ে দলে দলে দ্বারভাঙ্গা ভবনে ঢুকতে, উপাচার্যের ঘরের মধ্যেই তাদের সঙ্গে ঘেরাওকারীদের সংঘর্ষ বাধে। নকশালপন্থীরা মার খেয়ে হটে যেতে বাধ্য হল। সেই সময় নকশালপন্থীদের দুর্গ বলে পরিচিত হিন্দু হোস্টেলে যেতেও তাদের বাধা দেওয়া হয়। প্যারীচরণ সরকার লেনে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হল। বোমা পড়ল, গুলি চললো। ছাত্র নয় এমন একজন সি পি এম সমর্থক খুন হল। সি পি এম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শোকসভা ডাকলো। যুক্তফ্রন্ট সরকারের নয়জন মন্ত্রি শোকসভায় হাজির হয়ে নকশালপন্থীদের পুরোপুরি জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ধ্বংস করার ডাক দিলেন। তাঁরা বললেন এর জন্য প্রয়োজন বোধে রাইফেলও দেওয়া হবে।

এই সভার পরে স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজনা অনেক বাড়লো। সি পি এম বিভিন্ন যায়গায় সশস্ত্র অবস্থায় নকশালপন্থীদের খুঁজে বেড়াতে লাগলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত ক্লাস বন্ধ হয়ে গেল। পরীক্ষা স্থগিত করে দেওয়া হল। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একমাত্র রাজনীতিতে যুযুধান দুই পক্ষ ছাড়া আর সবাই আসা বন্ধ করে দিলেন প্রাণভয়ে। এরপর আর একদিনের ঘটনা। উপাচার্য সত্যেন সেন তাঁর ঘরে বসে আছেন। এমন সময় জনা পঞ্চাশ নকশালপন্থী ছেলে তাঁর ঘরে ঢুকলো, অনেকেই সশস্ত্র। উপাচার্যের ঘরে তখন বসে অম্লান দত্ত, মহেশ্বর দাশ, মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, গোপাল ব্যানার্জি, অনিল সরকার প্রমুখ। নকশালপন্থীদের এক ছাত্রনেতা উপাচার্যের ঘরে সোফার ওপর দাঁড়িয়ে 'রেড বুক' পড়ে উপাচার্যকে পাপমুক্ত করতে শুরু করলেন। কারণ তাদের ঘোষণামত উপাচার্যের আয়ু আর কিছুক্ষণ মাত্র। এই সময় তাঁর সহযোগী কয়েকজনের সহায়তায় উপাচার্য ডঃ সেন তাঁর লাগোয়া বাথরুমের একটি দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে কার্যত বাধ্য হয়েছিলেন। তারপর দীর্ঘক্ষণ তাঁকে বাথরুম থেকে বার হতে না দেখে ছাত্ররা দরজা ভাঙে। তারপর সব বুঝতে পারে। এরপর ওই ঘরে উপস্থিতদের নিগ্রহের কথা আর না বললেও চলবে।

এই সময় নকশালপন্থী "বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস" করার আন্দোলনের ফলে পড়াশোনার সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। পরীক্ষার দরখাস্ত ফর্ম পুড়িয়ে দেওয়া হল একদিন। বিপদ বুঝে পরীক্ষা দফতর সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল বিধান সরণীতে বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটি ছোট বাড়িতে। ওখানেই তিনতলার ওপর পরীক্ষার ডেপুটি কনট্রোলার আক্রান্ত হলেন, উপস্থিতবুদ্ধিতে

কোনরকমে তিনি পালিয়ে বেঁচেছিলেন।

এই ঘটনাগুলি থেকেই বোঝা যায় প্রশাসন তথা সাধারণ ছাত্রসমাজের করুণ অবস্থা। পরীক্ষা বন্ধ, ক্লাস বন্ধ, ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারেকাছে যেতে পারছে না। অপরদিকে রাজনীতির ধ্বজাধারী সৈন্যরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সর্বত্র, ধর্ষিত হচ্ছে বিদ্যালক্ষ্মী। কিন্তু তাতে তাদের বিন্দুমাত্র দুঃখ বেদনা বা অনুশোচনা নেই। নিজের ইচ্ছানুযায়ী পাওয়ার দাবিতে তারা অটল।

নকশালপন্থীদের এই 'আন্দোলন' চলেছিল ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত। তারপর শুরু হল কংগ্রেস রাজত্ব। শুরু হয়ে গেল রাজনীতির এই আখড়ায় কংগ্রেসী ছেলেদের দাপট। তবে এদের কাজকর্ম কিছুটা অন্যরকম ছিল। তারা শুরু করলো, তাদের ইচ্ছামত সময় এবং জায়গায় পরীক্ষা নেওয়ার দাবি। বহুবার তাদের এসব দাবি কর্তৃপক্ষকে মেনে নিতে হয় গোলমালের ভয়ে। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায়, এই সময়ের পরীক্ষার মানের কথা। কোন গার্ড নেই, নিজেদের পছন্দমত কেন্দ্রে ছাত্ররা যতক্ষণ ইচ্ছা সময় নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছে। কর্তৃপক্ষ খোলাখুলিভাবে এর বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদ করতেও সাহস পাননি।

এই সময়কার একটি ঘটনার উল্লেখ না করলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তখন কংগ্রেসী রাজত্ব। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের এক প্রতিনিধিদল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম দেখতে এলেন। সেদিন ছিল পয়লা বৈশাখ। বিশ্ববিদ্যালয়েব ছুটি। বৈঠক বসলো বিধানচন্দ্র রায় বেসিক মেডিসিন ভবনে। মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত সেই বৈঠকে। হঠাৎ একটি বিষয় নিয়ে উপাচার্যের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা দিল। শুরু হল বচসা; কথা কাটাকাটি। অশালীন ব্যবহার আর অপমানকর কথাবার্তা বললেন তিনি উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেনকে। প্রবীণ শিক্ষাবিদ ডঃ সেন অত্যন্ত মনোঃকষ্ট পেয়ে ওই বৈঠক থেকে কিছু পরে চলে যান। এবং ওইদিনই তিনি প্রথম হৃদরোগে আক্রান্ত হন। পরবর্তীকালে ডঃ সেন এক প্রবন্ধে স্বীকার করেছিলেন যে কংগ্রেস রাজত্বের পাঁচ বছরে সিদ্ধার্থ রায় তাঁকে কোন সহযোগিতা করেননি।

তবে ওই কংগ্রেস আমলে "জরুরি ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর" বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা অনেক পাল্টে যায়। জরুরি অবস্থার কুফল সম্বন্ধে অনেক কথা বলা গেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার ক্ষেত্রে কার্যত তা আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছিল। পরীক্ষাগুলি তখন থেকে স্বাভাবিকভাবে হতে শুরু করে, ক্লাশগুলিও হতে থাকে নিয়মমাফিক। কংগ্রেস সরকার জরুরি ব্যবস্থা চালু করায় কংগ্রেসীরা তো বটেই, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ থেকে সাময়িকভাবে হলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তি পায়।

১৯৭৭ সালের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক কার্যকলাপের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। আট দলের বামফ্রন্ট সরকার বিপুল ভোটে ক্ষমতাসীন হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মসনদে আবার কায়েম হন। একদিকে জরুরি অবস্থার ফলভোগ, অপরদিকে নির্বাচনে বামফ্রন্টের কাছে দারুণভাবে হেরে গিয়ে কংগ্রেসের আর মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা অন্তত তখন ছিল না। ফলে শিক্ষায় গণতন্ত্রীকরণ এবং "স্বাভাবিক অবস্থা" ফিরিয়ে আনার নামে বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনৈতিক আখড়া তৈরি করার কাজ জোরদার করলো বামফ্রন্ট। ছাত্র শিক্ষক, কর্মচারী সব ফ্রন্টেই চললো রাজনীতিকরণের কর্মযজ্ঞ। কার্যত জরুরি অবস্থার সময় থেকেই স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষা নেওয়া এবং ক্লাশ হওয়া শুরু হয়েছিল। বামফ্রন্ট এই সুযোগকে বেশি করে কাজে লাগালো। তারা প্রচার করতে লাগলো বিগত কয়েক বছরের শিক্ষাক্ষেত্রে যে 'কালা দিন' ছিল তা এখন আর নেই। সাধারণ মানুষও মনে করলো শিক্ষার পরিবেশ গত কয়েক বছরের তুলনায় পাল্টে গিয়েছে। আসলে বামফ্রন্ট

রাজনীতির ধ্বজাধারী সৈন্যদের দাপটে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যালক্ষ্মী ধর্ষিতা ছবি : দিলীপ ব্যানার্জী

রাজনীতি শুরু করলো সম্পূর্ণ অন্য কায়দায়। বামফ্রন্ট বলা ভুল, আসলে এ রাজনীতি সি পি এম-এর। তারা ছাত্র ইউনিয়ন থেকে অন্য শরিকদের তাড়ালো; কর্মচারীদের সমিতি ভাগ করে নতুন সমিতি গঠন করলো আর পাইয়ে দেবার রাজনীতিতে শিক্ষকদের এক বড় অংশকেও তাদের সমর্থক হিসাবে প্রমাণ করতে সমর্থ হল। যদিও শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অবস্থাটা পরে পাল্টে যায়।

কার্যত এইসময় থেকেই শুরু হয় সি পি এম-এর কৌশল। চাকরি দেওয়া, প্রোমোশনের টোপ দিয়ে নিজেদের দলে আনা, ছাত্রদের বছরের পর বছর নির্দিষ্ট বরাদ্দের বাইরে বহু টাকা দেওয়া, টাকা পয়সার কোনরকম হিসাব না দেওয়া, যেসব কর্মী বা অধ্যাপককে পছন্দ নয়, তাদের বিরুদ্ধে নানারকম গোলমাল করে অতিষ্ঠ করা, মনোনীত বা নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের দলের ব[...] পছন্দমত না হওয়া অধ্যাপকদের প্রোমোশন না দেওয়া ইত্যাদি বহু কাজ এই রাজত্বেই হয়েছে। বামফ্রন্টের দ্বিতীয় পর্যায়ের রাজত্বে এই একই ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ চলেছে। বরং তা আরও জোরদার হয়েছে রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরগুলিতে রাজনৈতিক কার্যকলাপ যাই হোক না কেন, সাম্প্রতিক কয়েক বছরে যেভাবে সেইসব কাজকর্ম অত্যন্ত কৌশলে করা হয়েছে, যেভাবে সমস্ত কিছু নিজেদের সম্পূর্ণ করায়ত্ত করা হয়েছে বা হচ্ছে তা এককথায় নজিরবিহীন।

কংগ্রেস রাজত্বে নিয়োগ করা উপাচার্যকে সরিয়ে নতুন উপাচার্য আনা হল। ইতিমধ্যে সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধিগ্রহণ করে যতদিন না নির্বাচিত সিনেট সিন্ডিকেট তৈরি হয় ততদিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনের জন্য গঠন করলেন পরিচালন কাউন্সিল। বর্তমান উপাচার্য ডঃ সন্তোষ ভট্টাচার্যও সরকারের আস্থাভাজন হিসাবে এই কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। তারপর বিধানসভায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন আইন পাশ করা হল ১৯৭৯ সালে। শুধু আইন নয়, নতুন অর্ডিনান্স ও স্ট্যাট্যুটও তৈরি করা হল একই সঙ্গে। তবে ১৯৭৯ সালের এই নতুন আইন তৈরি হলেও তা কার্যকর হল ১৯৮১ সালে। এই আইনই হল সি পি এম-এর বিশ্ববিদ্যালয়কে পুরোপুরি রাজনৈতিক কব্জায় রাখার প্রধান চাবিকাঠি। এমন কায়দায় এই আইন তৈরি করা হয়েছে যেখানে উপাচার্যই সর্বেসর্বা। সিনেট সিন্ডিকেটে প্রাধান্য থেকে শুরু করে উপাচার্য পর্যন্ত যাতে তাদের বশে থাকেন তার সব ব্যবস্থাই এই আইনে

সম্পূর্ণ। সিনেটে সংখ্যাধিক্যের জোরে নিজেদের পছন্দের লোককে যদি উপাচার্য পদে বসানো যায়, তাহলেই নিশ্চিন্ত। তা করতে পারলে রাজনীতির অন্তর্নিহিত স্রোত অন্যভাবে বইবে। আর নিজেদের ক্ষমতা কায়েম রাখার জন্য থাকবে বড় আদরের এই আইন। ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বাহ্যিক কোন গোলমাল হয়নি বলে বলা হচ্ছে। তার কারণ নতুন আইন পাশ হলেও তা ১৯৮১ সালের আগে কার্যকর হয়নি। ১৯৮১ সালে নতুন ওই আইন অনুযায়ী প্রথম উপাচার্য হিসাবে মনোনীত হন আগেকার উপাচার্যই। ঠিক হয় ১৯৭৯ সাল থেকে এই নিয়োগ কার্যকর ধরে চার বছর তাঁর মেয়াদ থাকবে। অর্থাৎ আবার ১৯৮৩ সালে নির্বাচিত সিনেটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন নতুন উপাচার্য।

কি আছে ওই আইনে? বিরাট এই আইনের প্রায় প্রতিটি অধ্যায়েই উপাচার্যকে সর্বময় কর্তা করা হয়েছে, এক কথায় বলা যায়, তিনি যা চাইবেন তাই হবে। কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। উপাচার্যের ক্ষমতায় বলা হয়েছে: রেজিস্ট্রার আইনগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনের কেবলমাত্র রিটার্নিং অফিসার হিসাবে কাজ করবেন। কিন্তু এই নির্বাচন সম্পর্কে সমস্ত নির্দেশ দেওয়ার মালিক একমাত্র উপাচার্য। নির্বাচন সম্পর্কে কোনরকম অসুবিধা বা গোলমাল দেখা দিলে বিশ্ববিদ্যালয় স্ট্যাট্যুটের ৭১(জে) অনুযায়ী উপাচার্য যা নির্দেশ দেবেন তাই হবে চূড়ান্ত। আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী তিনিই প্রিন্সিপাল একজিকিউটিভ ও অ্যাকাডেমিক অফিসার। আইনের সঙ্গে সঙ্গে স্ট্যাট্যুট ও অর্ডিনান্সেও উপাচার্যকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যেমন অফিসারদের ডিউটি দেওয়া, বদলি করা, অর্ডিন্যান্স দেওয়া ক্ষমতা অনুযায়ী ছয়মাসের জন্য অফিসারদের অস্থায়ী নিয়োগপত্রও উপাচার্য দিতে পারবেন। তবে রেজিস্ট্রার এবং দুজন সহ-উপাচার্য সম্পর্কে উপাচার্যের এই ক্ষমতা নেই। কারণ এঁদের সম্বন্ধে আইনে আলাদা করে নির্দেশ দেওয়া আছে।

সিনেট, সিন্ডিকেট ও ফ্যাকাল্টি কাউন্সিলের বৈঠক ডাকার একমাত্র ক্ষমতা উপাচার্যকে দেওয়া হয়েছে। আইনে এর জন্য ৯(১) এবং ৯(২) ধারা সংযোজন করা হয়েছে। আইন, স্ট্যাট্যুট এবং অর্ডিনান্স অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় যাতে নিয়মমাফিক চলে তার জন্য প্রয়োজন হলে উপাচার্য যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। তার জন্য ৯(৩) ধারা রাখা হয়েছে। ৯(৪) ধারায় বলা হয়েছে যে উপাচার্য শিক্ষক, অফিসার এবং কর্মচারীদের যে কোন বিষয়ে সুপারভাইজ করতে পারবেন। যদি উদ্ভূত কোন সমস্যা নিয়ে ট্রাইব্যুনালে না যাওয়া হয় তাহলে উপাচার্যের কাছে সে সম্পর্কে আপীল করতে হবে ৯(৪)II ধারা অনুযায়ী। এছাড়া সিনেট সিন্ডিকেট ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল বা অন্য কোন বডিকে না জানিয়ে অথচ তাদের হয়ে কোন কিছু কাজ করার জন্য উপাচার্যকে ৯(৬) ধারায় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এসবই বিশেষ ক্ষমতা অনুযায়ী আইনে রাখা হয়েছে।

সিনেট গঠনে উপাচার্যের মাধ্যমে রাজ্য সরকার যেসব ক্ষমতা নিজেদের হাতে রেখেছেন এককথায় তা অভূতপূর্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৯ বছরের ইতিহাসে এমনটি আর আগে ঘটেনি। গণতন্ত্রীকরণের নামে ট্রেড ইউনিয়ন, প্রাথমিক শিক্ষক, কৃষক সভা থেকে দুজন করে এবং তিনজন মাধ্যমিক শিক্ষককে উপাচার্য মনোনীত করে সিনেট সদস্য করবেন। এছাড়া, আচার্য-রাজ্যপালের মনোনীত সদস্য হিসাবে আগে দশজন থাকতেন। নতুন আইনে তা কমিয়ে করা হল পাঁচজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট নটি স্নাতকোত্তর ফ্যাকাল্টি কাউন্সিলের প্রতিটিতে উপাচার্য দশজনকে অধ্যাপক মনোনীত করবেন। কলা ও বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টি ছাড়া কৃষি ও আইনের মত ছোট ছোট ফ্যাকাল্টিতে কমবেশি ১৫ জন করে সদস্য থাকেন। এর মধ্যে যদি দশজন উপাচার্যের পছন্দের লোক থাকেন তাহলে উপাচার্য সেই ফ্যাকাল্টিতে কতটা ক্ষমতাসম্পন্ন হতে পারেন তা সহজেই বোঝা যায়। এই দশজন ছাড়াও আরও তিনজনকে উপাচার্য মনোনীত করবেন বিশেষজ্ঞ হিসাবে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের মত স্নাতক পর্যায়েও প্রায় একইরকম ব্যবস্থা। যেমন মেডিসিন শাখায় বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের ৭ জন অধ্যক্ষকে উপাচার্য মনোনয়ন করবেন। এই শাখায় মোট সদস্য সংখ্যা ২৩।

এইরকম ক্ষমতা উপাচার্যকে সমগ্র আইনে বহু জায়গায় দেওয়া হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ে করতে পারেন না এমন কোন কাজ কার্যত নেই। যতই নির্বাচিত সিনেট, সিন্ডিকেট বা ফ্যাকাল্টি কাউন্সিলের কথা বলা হোক। ৮৬র সেপ্টেম্বর মাস থেকে উপাচার্য একটানা সিনেট, সিন্ডিকেট বা অন্য কোন ফ্যাকাল্টির বৈঠক ডাকেননি, তখন কোন পক্ষই এ সম্পর্কে কিছুই করতে পারেননি। ১৯৮৬ অক্টোবর পর্যন্ত একবারও সিনেটের সাধারণ বৈঠক ডাকা হয়নি। একবার মাত্র বিশেষ বৈঠক ডাকা হয়েছিল, তা নেলসন ম্যান্ডেলাকে বিশেষ সম্মান জানানোর জন্য।

আসলে রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে উপাচার্যকেন্দ্রিক এমন একটা আইন তৈরি করেছেন যেখানে উপাচার্যই সর্বময় কর্তা। আর এটা করেছেন সবকিছু বুঝেই। উপাচার্য যদি নিজেদের পছন্দের লোককে করা যায় তাহলে আইন মোতাবেক রাজনৈতিক কাজকর্ম করার কোন বাধা আর থাকে না। আর ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত তাই হয়েছে। কেউ কোন কথা বলার ছিল না। একদিকে কর্মচারী ও ছাত্র ইউনিয়নের সমর্থন, অপরদিকে নতুন আইনের রক্ষাকবচ, দুই মিলে রাজ্যসরকার যে কোন কাজ উপাচার্যকে দিয়ে করিয়েছেন বা উপাচার্যই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে করেছেন। অপরদিকে বিরোধী পক্ষ প্রায় নখ-দন্তহীন। ফলে তাঁরা যে প্রতিবাদটুকু করেছেন বা করতে পেরেছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন দেখিয়ে তা ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া

দেয়াল লিখনের কলঙ্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সারা অঙ্গে
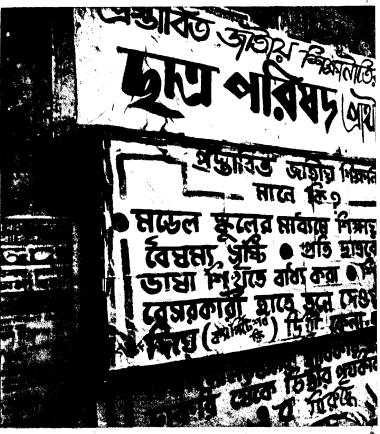
হয়েছে। বাইরে থেকে সাধারণ লোকের কিন্তু এসব বোঝার উপায় ছিল না।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক চিত্রটি অদ্ভুতভাবে পাল্টে গেল ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসের সিনেটের বৈঠক থেকে। ওই বছর "আইন অনুযায়ী" সিনেটের নির্বাচন হয়েছে, সিনেটের বৈঠক বসলো ১৯৮৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে চার বছরের জন্য নতুন উপাচার্য নির্বাচন করতে। সিনেটে বামফ্রন্টই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমরা যারা ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম, তারা সকলেই ভেবেছিলাম, এত বিপুল যখন গরিষ্ঠতা তখন বামফ্রন্ট সরকারের পছন্দের লোকই উপাচার্য হবেন। যিনি উপাচার্য হবেন বলে ঠিক করেছেন সরকার, তিনি খুব নিশ্চিন্ত মনেই সিনেটের বৈঠক ডাকলেন। আইন অনুসারে সিনেটের সদস্যরা ভোটের মাধ্যমে তিনজন সদস্যের একটি প্যানেল তৈরি করে আচার্য-রাজ্যপালের কাছে পাঠাবেন। তিনি তাঁর পছন্দ অনুযায়ী ওই প্যানেল থেকে একজনকে উপাচার্য পদে নিয়োগ করবেন। সিনেটের ভোটে কিন্তু দেখা গেল রাজ্য সরকারের পছন্দের লোক সর্বোচ্চ ভোট পাননি। যাইহোক, তৎকালীন আচার্য-রাজ্যপাল ওই প্যানেল থেকে এমন একজনকে উপাচার্য পদে নিয়োগ করে ঘোষণা করলেন যিনি একসময় সি পি এম-এর আস্থাভাজন থাকলেও এখন আর পছন্দের লোক নন। শুরু হয়ে গেল গণতন্ত্ররক্ষার নামে আন্দোলন আর বিক্ষোভ। সি পি এম-এর বক্তব্য

থানা নয়—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আচার্য-রাজ্যপাল রাজ্য সরকারের পরামর্শমত এবং কথামত নির্দিষ্ট ব্যক্তিকেই উপাচার্য পদে নিয়োগ করবেন। অপর দিকে আচার্য-রাজ্যপাল এই বিতর্কের জবাবে বলেন, উপাচার্য নিয়োগের জন্য আইনে যে-ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হয়েছে, তা মেনেই উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছে। আচার্য যাঁকে উপাচার্য নিয়োগ করলেন, তিনি একসময় অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ছাত্রজীবনেও বামপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন করেছেন। পরবর্তী কালে কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হওয়ার পর, সি পি এম-এর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁকে নিয়োগ করাতেই সি

ছবি : দিলীপ ব্যানার্জী

পি এম ফেটে পড়লো বিক্ষোভ আন্দোলনে। কেন? আসলে আইন তৈরি করে উপাচার্যকে রাজ্যসরকার যে সর্বময় কর্তা করে ক্ষমতা দিয়েছিলেন, তা নতুন উপাচার্যের হাতে পড়লে রাজনৈতিকভাবে তাঁদের দারুণ ক্ষতি হবে। একদিকে যেমন নতুন উপাচার্য আইন মেনেই যা ইচ্ছা তাই করতে পারবেন, অপরদিকে সব জেনে শুনেও রাজ্যসরকারকে চুপচাপ থাকতে হবে। এটা মেনে নিলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকারের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণও চলে যাবে। তাই এটা মেনে নেওয়া যায় না।

এই সময়কার অপর একটি রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ করতেই হয়। ১৯৮৩ সাল নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিজনেস ম্যানেজমেন্টের কিছু সি পি এম সমর্থক ছাত্র একজন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে উপাচার্যের কাছে একটি চিঠি দিল। ওই চিঠির মূল বক্তব্য হল, এই অধ্যাপক অত্যন্ত কড়া, এবং তাঁর পড়ানোর ধরন উচ্চস্তরের। তাই তাঁকে বোঝা ছাত্রদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তাই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হোক। আসলে বিষয়টি অন্যরকম। এই কৃতী অধ্যাপক তাঁর ছাত্রজীবনে এমন একটি রাজনৈতিক চিন্তাধারারসমর্থক ছিলেন যে রাজনীতিকে সি পি এম সমর্থন করে না। তাই তাঁর পড়ানো অত্যন্ত শক্ত এই ধুয়া তুলে তাঁকে সরাবার চেষ্টা হল। এর জন্য কেবলমাত্র ওই সেকশনের ছাত্রছাত্রীরা নির্দিষ্ট ওই অধ্যাপকের ক্লাস বয়কট করাও শুরু করেছিল, তবে শেষ পর্যন্ত অবশ্য খবরের কাগজে লেখালেখির ফলে তা সম্ভব হয়নি। মূলত এই কারণেই কর্মী আন্দোলনের ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকের এই অচলাবস্থা। ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত যে উপাচার্য ক্ষমতাসীন ছিলেন তিনি আইন মেনেই এমন কিছু কাজকর্ম করেছেন যা সাধারণভাবে মেনে নেওয়া শক্ত। যেমন আচার্য-রাজ্যপাল কর্তৃক নতুন উপাচার্যর নাম ঘোষণা করার পর তিনি উপাচার্যের বিশেষ ক্ষমতা ৯(৬) ধারা অনুযায়ী জনা পঁচিশকে অস্থায়ীভাবে নিয়োগপত্র দিলেন। (এঁদের মধ্যে পরবর্তীকালে বরখাস্ত পাঁচকর্মীও ছিলেন)। অথচ এই নিয়োগের বিষয়টি কিন্তু পরবর্তী সিন্ডিকেটের কর্মসূচির বিষয়ভুক্ত করা ছিল। কিন্তু নতুন রাজত্বে সিন্ডিকেটের বৈঠক বসার অপেক্ষা করতে তিনি পারেননি। অপর একটি ঘটনায় দেখা যায়, রাজ্যসরকারের একটি নির্দেশ অনুসারে অস্থায়ী নিয়োগ করার কথা ছিল। কিন্তু সেটা না মেনে ৪৭ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীকে স্থায়ীপদে নিয়োগ করা হয়েছে। এরকম নজির বহু পাওয়া যাবে।

১৯৮৪ সালের পয়লা জানুয়ারি নতুন উপাচার্য কার্যভার নেওয়ার পর থেকেই বিক্ষোভ আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম প্রায় অচল হতে শুরু করলো। যে রাজ্যপাল রাজ্যসরকারের পরামর্শ না মেনে অন্যকে উপাচার্য নিয়োগ করেছিলেন তাঁকে রাজনৈতিক চাপ দিয়ে এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এরাজ্য ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু উপাচার্য তো আছেন। তাঁর বিরুদ্ধে সবরকম আন্দোলন চলছে।

আন্দোলনের নামে এখন নানান অশালীন আচরণও করা হচ্ছে। আর এই আন্দোলন এখন এমন অবস্থায় পৌঁচেছে যে উপাচার্য স্বয়ং গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারছেন না। তাঁকে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বরখাস্ত করা পাঁচ কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে না আসতে পারলে তাঁকে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে দেওয়া হবে না, রাজ্যসরকারেরও এতে প্রচ্ছন্ন মদত রয়েছে। তাই বিভিন্ন মহলের প্রতিবাদ ওঠা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতির সামান্য পরিবর্তনও হয়নি। রাজ্য সরকার এই আন্দোলনের মাধ্যমে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে চায় উপাচার্যের পদত্যাগ। কারণ তিনি বহুক্ষেত্রেই রাজ্যসরকারের তথা সি পি এম-এর বিরোধিতা করছেন। বহুক্ষেত্রে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ীই তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন। আর এই জায়গাতেই হচ্ছে শাসকদলের 'গণতন্ত্র বিপন্ন' বলে ডাক দেওয়া হচ্ছে।

যাই হোক, রাজ্যসরকার তথা সি পি এম বনাম উপাচার্য যে রেষারেষি শুরু হয়েছে তাতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অবস্থা চরমে উঠেছে। বহু পরীক্ষা সময়ে হতে পারছে না, তারিখ পিছানো হচ্ছে, রেজাল্ট বার হওয়া অনিশ্চিত, বিভিন্ন পরীক্ষায় কোন গার্ড থাকছে না, ফলে অবাধ টোকাটুকি হচ্ছে, বহু অধ্যাপক নানান দোহাই দিয়ে ক্লাস নিচ্ছেন না, নানান গোলমালে নিয়মিত ক্লাসও হতে পারছে না। তাছাড়া গত কয়েক বছর ধরে স্নাতক পর্যায়ের ডিগ্রী ডিপ্লোমা দেওয়াও বন্ধ হয়ে রয়েছে। কিন্তু এসব ব্যাপারে রাজ্যসরকার বা সি পি এম কিংবা উপাচার্য কারও খুব বিশেষ আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না।

চার বছর অন্তর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী সিনেট সিন্ডিকেট ও ফ্যাকাল্টি কাউন্সিলের নির্বাচন করতে হয়। ১৯৮৭ সালের

বোমাবাজি, অবরোধ, বিক্ষোভের চাপে বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত অচল ছবি : অলক মিত্র

সবচেয়ে বড় আপত্তি আর অসন্তোষ। রাজ্যসরকার ইতিমধ্যে তাঁদেরই তৈরি করা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সংশোধনের প্রস্তাব তুলেছেন। বিধানসভায় গৃহীত এই সংশোধনী বিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে আচার্য-রাজ্যপালের বর্তমান ক্ষমতা লাঘব করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ রাজ্যসরকার চাইছেন, উপাচার্য নিয়োগের ব্যাপারে আচার্য হিসাবে রাজ্যপালের যেন করণীয় কিছু না থাকে। এই বিল বর্তমানে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। একটা বিষয় এখানে বলে নেওয়া ভাল। সেটা হল, সি পি এম-এর অনুগত উপাচার্য তাঁর রাজত্বকালে সি পি এম-এর তৈরি করা আইন অনুযায়ী বহুবার তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন। তখন কিন্তু সামান্য প্রতিবাদও সরকারি বা দলীয় তরফে ওঠেনি। কিন্তু ওই সব ক্ষমতাই যখন 'অপছন্দের উপাচার্য' ব্যবহার করছেন তখন ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে নতুন সিনেটের বৈঠক বসার কথা। এর মধ্যেই নির্বাচনপর্ব শেষ করতে হবে। নির্বাচনপর্ব আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হলেও তা শেষ হতে পারছে না। আসলে শেষ হতে দেওয়া হচ্ছে না। তার কারণ বিধানসভা নির্বাচনের আগে সি পি এম চাইছে না বর্তমান উপাচার্যের তত্ত্বাবধানে এই নির্বাচন হোক। তার কারণ যদি সি পি এম এই নির্বাচনে ভাল ফল না করে বা হেরে যায় তাহলে তাদের বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিতে চরম বিপদের মুখোমুখি হতে হবে। তার কারণ সিনেট বা সিন্ডিকেটে যদি সি পি এম-এর গরিষ্ঠতা না থাকে তাহলে যে বিশ্ববিদ্যালয় আইন তারাই তৈরি করেছে তা দিয়েই তাদের সর্বনাশ হওয়ার সমূহ আশংকা। হেরে যাওয়ার কারণ যে সি পি এম-এর একেবারে নেই তাও জোর দিয়ে বলা যায় না। তার কারণ অধ্যাপকদের মধ্যে এখনই সি পি এম গরিষ্ঠতা দারুণভাবে হ্রাস পেয়েছে। কর্মচারীদেরও একটা বড় অংশ তাদের বিরোধী। তার ওপর বামফ্রন্টের বিভিন্ন শরিক দলের বেশ কিছু অধ্যাপক সাধ্যমত বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিতে সি পি এম-এর কাজের বিরোধিতা করার জন্য একজোট হয়েছেন। যদিও এই জোটের কথা তাঁরা কেউই মুখে স্বীকার করেন না। এইসব কারণেই সি পি এম-এর ইচ্ছা নয় যে সিনেট নির্বাচন হোক। সিনেট নির্বাচনের রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট কেন্দ্রে ভোটার তালিকা ৩ অক্টোবর প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। তা হয়নি। পরবর্তীকালে উপাচার্য তিনবার আলাদা করে ভোটার তালিকা প্রকাশ করার নির্দেশ দিলেও নভেম্বর মাস পর্যন্ত তা হয়নি। সিনেট নির্বাচন যদি সময় মত না করা যায়, তাহলে কি হবে তা বিশ্ববিদ্যালয় আইনে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া নেই। সি পিএম চাইছে নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন না করতে দিয়ে হয় বর্তমান সিনেট সিন্ডিকেটের মেয়াদ রাজ্যসরকারের নির্দেশ অনুসারে বাড়িয়ে দিতে অথবা সিনেট সিন্ডিকেট ভেঙে দিয়ে নিজেদের পছন্দমত লোকদের নিয়ে একটি পরিচালন কাউন্সিল গঠন করতে। বিধানসভা নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর অবস্থা বুঝে বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করলেই চলবে। ইতিমধ্যে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় আসা বন্ধ করেছেন, কিংবা তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় আসা বন্ধ করা হয়েছে। উপাচার্য বলেছেন, অভব্য ব্যবহার আর বিক্ষোভ আন্দোলন করবে না বামপন্থী ইউনিয়ন তাঁকে লিখিতভাবে আশ্বাস না দিলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন না। এর ফলে দুটি নতুন বিষয় দাঁড়িয়েছে। একদিকে উপাচার্য না আসায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ-আন্দোলন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে এই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষভাবে গোলমাল নেই। আবার উপাচার্য দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে না আসায় সি পি এম 'বিভিন্ন দাবিতে' বিক্ষোভ, মিছিল ইত্যাদি করতে পারছেন না। কারণ নেতাদের মতে ছায়ার বিরুদ্ধে তো আর লড়াই করা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি এখনও ঠিক এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সত্তর দশকের শুরু পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়কেই মনে করা হত এক পবিত্রভূমি। পুলিশের প্রবেশ ছিল নিসিদ্ধ। কোন কোন সময়ে বিশেষ নির্দেশে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকলে বিক্ষোভে ফেটে পড়তো ছাত্র ও কর্মচারীরা। এমন বহু নজির আছে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ ঢোকার প্রতিবাদে সি পি এম সর্বতোভাবে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। বর্তমানে কিন্তু ব্যাপারটি সম্পূর্ণ উল্টো। সি পি এম এর নির্দেশেই বিরাট এক পুলিশ বাহিনী সর্বদা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোতায়েন। যখন কোন বিক্ষোভ নেই, উপাচার্য আসছেন না, ক্লাস বন্ধ তখনও পুলিশ বাহিনী কড়া প্রহরায়। কে আসছেন, কেন আসছেন, কোথায় যাচ্ছেন প্রতিটি পদক্ষেপে গোয়েন্দা পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি। এইসবের মধ্যে দিয়েই সুপ্রাচীন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটি দিন কাটছে। কতকটা যান্ত্রিকভাবে। সকলেই ভাবছেন, রাজনীতির রাহু থেকে কবে মুক্তি পাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়!

ইলেকট্রনিক্‌স : কর্ণাটকে

সমরজিৎ কর

ভারতীয় ইলেকট্রনিক্‌স শিল্পে কর্ণাটক এখন শিরোনাম। দেশের ৩৫ শতাংশ ইলেকট্রনিক্‌স যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জামের উৎপাদন এখন কর্ণাটকে। পেশাগত ইলেকট্রনিক্‌সের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ৯০ শতাংশ। এই একটি রাজ্যেই যে পরিমাণ ইলেকট্রনিক্‌স যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জাম তৈরি হচ্ছে তার মূল্য প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। এ কাজে এগিয়ে এসেছে দেশের বেশ কয়েকটি সরকারী সংস্থা। যেমন, ভারত ইলেকট্রনিক্‌স লিমিটেড এবং ইনডিয়ান টেলিফোন ইনডাসট্রিজ। এগিয়ে এসেছে কয়েকটি প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান— ব্রিটিশ ফিজিকাল ল্যাবোরেটরি (ইনডিয়া) বা সংক্ষেপে বি পি এল (ইনডিয়া), ভিরপো, প্রভৃতি। ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কর্ণাটক স্টেট ইলেকট্রনিক্‌স করপোরেশন লিমিটেড (কেয়নিকস)। তাদের এখন বহুমুখী উদ্যোগ। নানা রকম ইলেকট্রনিক্‌স যন্ত্রপাতি এবং সাজ সরঞ্জাম উৎপাদনে তারা হাত দিয়েছে। উৎসাহ যোগাচ্ছে বেসরকারী উদ্যোগ গড়ে তোলার ব্যাপারে। হাত বাড়িয়েছে কারিগরি অভিজ্ঞতা এবং বিপণনের সুযোগ যোগাতে। ইতিমধ্যে বাঙ্গালোরের অদূরে একটি শহরও গড়ে তুলেছে তারা। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ইলেকট্রনিক্‌স সিটি'। সেখানে গেলে দেখতে পাবেন, এক দিকে কাজ করছে বড় এবং মাঝারি প্রতিষ্ঠান। আর তাদের পাশাপাশি ছোট ছোট ব্যক্তি ভিত্তিক উদ্যোগ। এরা তৈরি করছে ছোট ছোট যন্ত্রাংশ। যাদের ক্রেতা বড় এবং মাঝারি কারবারী। শিল্পক্ষেত্রে এ ধরনের সহযোগিতা এ দেশে একটি বড় রকমের যে নজির তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সম্প্রতি বাঙ্গালোরে ভারত ইলেকট্রনিকস
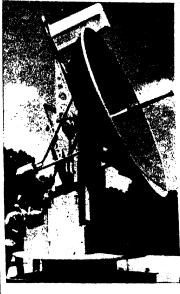
মালটিমেট রেডার

লিমিটেডের কার্যালয়ে জনৈক প্রযুক্তিবিদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। পেশাগত ইলেকট্রনিক্‌স যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জাম উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশে এই প্রতিষ্ঠানটির আর কোন জুড়ি নেই। এই সব যন্ত্রপাতির মধ্যে পড়ছে রেডার, বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা, টেলিভিশন এবং বেতার সম্প্রচারমূলক সরঞ্জাম। বাঙ্গালোরে এখন তাদের তিনটি উৎপাদন কেন্দ্র। তাদের আরও তিনটি উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে গাজিয়াবাদ, পুনে এবং মসলিপটনম-এ। হরিয়ানার পাঁচকুলা, উত্তর প্রদেশের গাড়োয়াল এবং মহারাষ্ট্রের তালোজায় তৈরি হচ্ছে তিনটি নতুন কেন্দ্র। ভদ্রলোক বললেন, পাঁচকুলা এবং গাড়োয়ালে তৈরি হবে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিকস যন্ত্র এবং তালোজায় 'টেলিভিশন গ্লাস সেল।

একদিকে সম্প্রসারণের কাজ চলছে যেমন, সেই সঙ্গে ভারত ইলেকট্রনিকস তাঁদের বাঙ্গালোরের কমপ্লেকসটিকে আরও বহুমুখী উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলছেন। এই কমপ্লেকসটিতে রয়েছে মোট ষোলটি কারখানা— কিছুটা ছড়িয়ে ; এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। মহাকাশ প্রকল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরির জন্যে তৈরি হয়েছে পৃথক একটি বিভাগ— স্পেস ইলেকট্রনিকস ডিভিসন। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার চাহিদা মেটানর জন্যেই এই উদ্যোগ। এখানকার কমপ্লেকসে উৎপাদন শুরু হয়েছিল ১৯৫৪ সালে, গুটিকয় কর্মী নিয়ে। স্ত্রী এবং পুরুষ মিলিয়ে এখন মোট কর্মী সংখ্যা ১৪০০০।

গাজিয়াবাদের কারখানাতে উৎপাদন শুরু হয় ১৯৭৪ সালে, একই ভাবে। সেখানকার কর্মীসংখ্যা এখন ৩০০০। সেখানে এখন উৎপাদন হচ্ছে স্থিতিশীল এবং যানবাহী রেডার, ট্রপোস্ক্যাটার, লাইন-অভ-শাইট মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন সংক্রান্ত যন্ত্রাবলী, ভেরি হাই এবং আলট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সি কমিউনিকেশন যন্ত্রাবলী, মালটিপ্লেকসিং এবং ভয়েস ফ্রিকোয়েন্সি টেলিগ্রাফির সরঞ্জাম, রেলের নিরাপত্তামূলক সরঞ্জাম, রেডার, টেলি এবং কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগের বিভিন্ন যন্ত্র এবং সরঞ্জাম। পুনের উৎপাদন শুরু হয়েছে ১৯৮০ সালে। সেখানে তৈরি হচ্ছে ইমেজ কনভারটার টিউব, ম্যাগনেসিয়াম ম্যাঙ্গানিজ-ডাইঅকসাইড বৈদ্যুতিক কোষ প্রভৃতি। অন্ধ্র প্রদেশের মসলিপটনমের কারখানায় তৈরি হচ্ছে চিকিৎসা, শিক্ষা, শিল্প এবং সার্ভে বা ভূপরিমাপক যন্ত্রাবলী। বলা বাহুল্য, ভারত ইলেকট্রনিকস যে সব যন্ত্র এবং সরঞ্জাম উৎপাদন করছে তাদের বেশির ভাগই 'প্রোফেশনাল' বা পেশাগত সামগ্রী। সামরিক শিল্প, সরকারী এবং বেসরকারী পরিচালন ব্যবস্থায় অপরিহার্য যাদের ভূমিকা। প্রশ্ন : পেশাগত ইলেকট্রনিকস যন্ত্রপাতি

ভারত ইলেকট্রনিকসের তৈরি এই বাইনোক্যুলারের সাহায্যে রাতের অন্ধকারে শত্রু সন্ধান করেন আমাদের প্রহরারত জওয়ানরা

বলতে কি বোঝায় ?

উত্তর : যে সব ইলেকট্রনিকস যন্ত্রপাতি বিভিন্ন পেশায় কাজে লাগে তাদেরই বলা হয় পেশাগত যন্ত্রপাতি।

উদাহরণ হিসেবে ডাক এবং তার বিভাগের কথাই ধরুন। গত দুই দশকে দেশে টেলিফোনের চাহিদা বেড়েছে। টেলিফোন ব্যবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। আঞ্চলিক, অন্তর্দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক। এক সময় শুধু তারের মাধ্যমেই চালান হত টেলিফোনের কাজ। পরে তারের বদলে 'কেবল' চালু হয়। এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বেতার ব্যবস্থা। এ ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময় মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। চ্যানেল অনুযায়ী সেই মাইক্রোওয়েভের কম্পাঙ্কও হয় ভিন্নতর। এখন একই সঙ্গে মেটাতে হয় কয়েক শ' থেকে শুরু করে কয়েক হাজার গ্রাহকের চাহিদা। এর জন্যে প্রয়োজন হয় স্বনিয়ন্ত্রিত ইলেকট্রনিকস যন্ত্রপাতি। দেশের ব্যাপক অঞ্চলে বসান হয়েছে রেডিও অ্যান্টেনা। হয়ত কলকাতা থেকে দিল্লিতে কারোর সঙ্গে কথা বলতে চান। এক্ষেত্রে আপনার টেলিফোনে ডায়াল করার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লির টেলিগ্রাহক বেতার সংকেতের সাহায্যে সংযুক্ত হবে। এই সংযুক্তি স্থল ভাগে বসান রিলে স্টেশনগুলির মাধ্যমে হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে মুহূর্তে আপনি ডায়েল করলেন, আপনার সংকেত সরাসরি চলে যাবে কৃত্রিম উপগ্রহে। কৃত্রিম উপগ্রহের গ্রাহক যন্ত্র সেই সংকেত ধরে পাঠিয়ে দেবে দিল্লির বেতার গ্রাহক যন্ত্রে। তারপর তারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেবে দিল্লির গ্রাহকের টেলিফোন যন্ত্রে। যে ধরনের ইলেকট্রনিকস যন্ত্রের সাহায্যে এই কাজটি করা হয় তাকে বলে পেশাগত যন্ত্র। দেশের চাহিদা মেটানর জন্যে এ ধরনের ইলেকট্রনিকস যন্ত্র তৈরি করছে এখন। এর জন্যে আমাদের বিদেশের উপর আর নির্ভর করতে হচ্ছে না। ডাক এবং তার বিভাগের জন্যে তারা এমন রেডিও রিলে যন্ত্র তৈরি করেছে যার চ্যানেল সংখ্যা ১২০। আমাদের ডাক এবং তার বিভাগের বহু জটিল ইলেকট্রনিকস যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জাম এখন উৎপাদিত হচ্ছে ভারত ইলেকট্রনিকসের কারখানায়।

ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি গ্রাহক এবং প্রেরক যন্ত্র এখন এ দেশেই তৈরি হচ্ছে

১৯৬৩-তে হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা কমিটি চেয়েছিলেন ভারতকে ইলেকট্রনিকস যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হতেই হবে। অধ্যাপক ভাবার সেই আকাঙ্ক্ষাকে সার্থক রূপ দিয়ে চলেছে ভারত ইলেকট্রনিকস্।

প্রতিরক্ষার জন্যে টেলিযোগাযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করছে আমাদের সৈনিকরা। বাস করছে কাশ্মীরের লাডাক, লে এবং অরুণাচলের লোহিত এলাকায়। বরফ আচ্ছাদিত পার্বত্য অঞ্চল। বহু অঞ্চলে তার টাঙিয়ে টেলিযোগাযোগের প্রশ্নই ওঠে না। ছাউনি থেকে দূরে গোপন কোন ঘাঁটিতে বসে, ছোট ছোট দলে রয়েছেন আমাদের জওয়ানরা। মূল ঘাঁটির সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রেখে চলতে হয় তাঁদের। এর জন্য দরকার যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য বেতার গ্রাহক এবং প্রেরক যন্ত্র। দরকার নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎকোষ, যা অতিরিক্ত শীত, বর্ষা এবং তুষারাবৃত পরিবেশে কাজ করতে পারে, নিয়মিত বার্তা আদান প্রদানে সমর্থ হয় শত্রুপক্ষকে এড়িয়ে। শান্তি এবং যুদ্ধকালীন অবস্থায় মাটি থেকে উড়ন্ত বিমানের সঙ্গে টেলিযোগাযোগের প্রয়োজন হয় আমাদের সামরিক বিভাগের। শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করার সময় দরকার বিশেষ টেলিব্যবস্থা। এই সব ইলেকট্রনিকস যন্ত্রপাতির অনেক কিছুই এখন উৎপাদন করছে ভারত ইলেকট্রনিকস। যেমন, স্থিতিশীল এবং বহনযোগ্য ট্রপোস্ক্যাটার কমিউনিকেশন টারমিনালস, ৯৬০টি চ্যানেল পর্যন্ত রেডিও রিলে সিস্টেম, ২ গিগা হার্টজ কম্পাঙ্কের অ্যানালগ রেডিও প্রভৃতি।

জাহাজের বহনক্ষমতা বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ান হচ্ছে গতি। তাই জাহাজের নিরাপত্তার জন্যেও প্রয়োজন হচ্ছে এখন নানা রকম ইলেকট্রনিকস যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম। এই সব যন্ত্রপাতির মধ্যে অন্যতম বিভিন্ন ধরনের রেডার। নিকট এবং দূরপাল্লার, উভয়ই। এই সব রেডারের সাহায্যে নেভিগেটররা নিকট এবং দূরবর্তী অঞ্চলের ছবি দেখে নিরাপদ পথ ধরে চলেন। এড়িয়ে চলেন ডুবন্ত পাহাড়, অন্যান্য জাহাজ এবং জলযান, ভাসমান 'বয়া', প্রভৃতি, সংঘর্ষের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই রেডারের জন্যে এক সময় বিদেশের উপর আমাদের নির্ভর করতে হত। এখন ভারত ইলেকট্রনিকসই এসব উৎপাদন করছে, নিজেদের নকশামত ভারতীয় কুশলীদের সাহায্যে। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে তাঁরা উদ্ভাবন করেছেন নতুন ধরনের ট্র্যানজিসটার চালিত 'X' ব্যান্ডের নৌ-পরিচালন রেডার ব্যবস্থা। এমন ধরনের রেডার যার সাহায্যে ভাসমান কাঠ, ক্ষুদ্রাকার নৌকা, 'সীগাল' বা সামুদ্রিক চিলের ঝাঁক সহজেই দেখা যায়। ডুবো জাহাজের যন্ত্রপাতিও তৈরি করছে তারা।

দেখলাম রাতের অন্ধকারে যাতে শত্রুর উপর আমাদের স্থলবাহিনীর সৈনিক এবং কমান্ডাররা নজর রাখতে পারেন, তার জন্যে তৈরি হচ্ছে বিশেষ ধরনের বাইনোক্যুলার। ভারত ইলেকট্রনিকসের জনৈক কুশলী বললেন, এই

বাইনোক্যুলার আগে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হত। এখন তাঁরাই তৈরি করছেন। আকাশ নক্ষত্রখচিত থাকলে এর সাহায্যে আশপাশের অঞ্চল এবং শত্রুর অবস্থান সহজেই জানা যায়। ছবি স্পষ্ট করার জন্যে এতে বিশেষ একটি ব্যবস্থাও রয়েছে। এ ধরনের বাইনোক্যুলারে দরকার হয় ১·৫ ভোল্টের দুটি পেন্সিল টর্চের ব্যাটারি। তবে পুনরায় চার্জ করা যায় এমন ধরনের মারকারি ব্যাটারিও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সেনাবাহিনীর জন্যে দরকার দ্রুত তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা। এর জন্যে তৈরি হচ্ছে ইনটিগ্রেটেড কম্যুনিকেশন সিসটেম। এ ধরনের ব্যবস্থার সাহায্যে দ্রুত কণ্ঠস্বর আদান-প্রদান, তথ্যাদি বিনিময়, টেলিগ্রাফি এবং লেখা ও ছবি পাঠান সম্ভব হচ্ছে এখন। তারা তৈরি করছে স্বনিয়ন্ত্রিত ইলেকট্রনিকস সুইচ E 97। এই সব সুইচ আধুনিক টেলিফোন ব্যবস্থাতেও কাজে লাগান হয়।

গত দুই দশকে এ দেশে বসান হয়েছে অনেকগুলি বেতার এবং টেলিভিশন কেন্দ্র। এই সব কেন্দ্রের চাহিদা মেটানর কাজেও এগিয়ে এসেছে ভারত ইলেকট্রনিকস। তাঁরা তৈরি করছে ১০০ কিলোওয়াট পাওয়ারের মিডিয়াম ওয়েভ ব্রডকাস্টিং ট্র্যানসমিটার। সেই সঙ্গে তৈরি করছে আনুষঙ্গিক আরো অনেক যন্ত্রপাতি— কনট্রোল কনসোলস, অ্যান্টেনা টিউনিং ইউনিটস, একই সঙ্গে যাতে পাশাপাশি একাধিক চ্যানেলে প্রোগ্রাম আদান প্রদান করা যায় তার ব্যবস্থাবলী। অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ৩ কিলোওয়াটের FM ব্রডকাস্টিং ট্র্যানসমিটার, কনসোল টেপরেকর্ডার, ঘোষক এবং সুইচিং-এর কনসোল, প্রোগ্রাম অ্যামপ্লিফায়ার, মনিটরিং -এর যন্ত্রাবলী প্রভৃতি।

বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপনের কাজটিও ছিল একটি বড় রকমের চ্যালেঞ্জ। বিদেশের উপর নির্ভর না করে এ কাজেও দায়িত্ব দেওয়া হয় এই প্রতিষ্ঠানটিকে। তারাই তৈরি করেছে এর জন্যে প্রয়োজনীয় বেশির ভাগ ইলেকট্রনিকস যন্ত্রপাতি— যেমন ১০ ওয়াট, ১০০ ওয়াট এবং ১ কিলোওয়াটের ট্র্যানসমিটার, স্টুডিওর বাইরে গাড়ির সাহায্যে খেলাধুলা বা অন্য কোন অনুষ্ঠান সরাসরি স্টুডিওতে রিলে করার ব্যবস্থা, উপগ্রহ থেকে সম্প্রচারিত প্রোগ্রাম ধরার টারমিনাল। এ ছাড়াও টেলিভিশন স্টুডিওর জন্যে তারা তৈরি করেছে রঙিন ক্যামেরার ইলেকট্রনিকস যন্ত্রপাতি, ফিল্ম স্ক্যানার, ভিডিও সুইচার, প্রোগ্রামের বিভিন্ন আঙ্গিকের মধ্যে সমন্বয় রেখে সেই প্রোগ্রাম প্রচার করার মত যন্ত্রপাতি, ছবি এবং ছবির সম্প্রচার ও বেতার তরঙ্গ মনিটারের ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য, খুব স্বল্প সময়ে এ দেশে একটির পর একটি যে টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপিত হল তার বড় রকমের কৃতিত্ব ভারত ইলেকট্রনিকসের উপরই বর্তিয়েছে।

আধুনিক প্রযুক্তি এখন ইলেকট্রনিকস ভিত্তিক। চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে টারবাইনের নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন সামগ্রীর পরিমাণ এবং মান বজায় রাখা, জল ঝড় কুয়াশার স্বরূপ উদ্ঘাটন এবং পূর্বাভাস যোগান, বিমান চলাচল ব্যবস্থা নিরাপদ করা, রেল এবং বিমান যাত্রীদের আসন সংরক্ষণ, পাঠাগার ছাত্রছাত্রী এবং অফিস-কাছারির ফোটো কপি, এমন হাজারো ব্যাপারে ইলেকট্রনিকসের চল বেড়েছে বিস্তর। এর সবই পড়ে পেশাগত উদ্যোগের মধ্যে।

ভারত ইলেকট্রনিকস যোগাচ্ছে এখন টেলিভিশন পিকচার টিউব, লিকুয়িড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে, একস্-রে টিউব, সিলিকন সিগন্যাল ডিভাইস, মহাকাশ এবং ভূপৃষ্ঠে ব্যবহার উপযোগী

এই রেডার জাহাজীরা ব্যবহার করছেন

সৌর কোষ, সেরামিক ক্যাপাসিটরস, প্লাজমা ডিসপ্লে ডিভাইস, ঘড়ির জন্যে কোয়ার্টজ ক্রিস্ট্যাল, ক্রিস্টাল ফিলটার, ইনফ্রা-রেড ইমেজ কনভারটার টিউব, সারজিকাল মাইক্রোস্কোপ, চিনি শিল্পের জন্যে জলীয় দ্রবণে চিনির মাত্রা পরিমাপ করার যন্ত্র— 'হোয়াইট লাইট স্যাকারিমিটার', অতিবেগুনী রশ্মির বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র, আরো অজস্র যন্ত্রপাতি। প্রতিরক্ষা, কলকারখানা, আবহাওয়া দপ্তর, টেলিব্যবস্থা, নৌ এবং বিমান পরিচালনা থেকে শুরু করে গবেষণাগার, কলকারখানার একটি বড় রকমের চাহিদা মেটাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৩ সালে

অটোমেটিক ইলেকট্রনিকস সুইচ

হোমী জাহাঙ্গীর ভাবা কমিটি চেয়েছিলেন ভারতকে ইলেকট্রনিকস যন্ত্রপাতির ব্যাপারে আত্মনির্ভর হতেই হবে, নইলে সম্ভাব্য আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগতি সম্ভব নয়। অধ্যাপক ভাবার সেই আকাঙ্ক্ষাকে সার্থক রূপ দিয়ে চলেছে ভারত ইলেকট্রনিকস, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যদিও বাধা বিস্তর। অসম্পূর্ণতার ফাঁক এখনো প্রশস্ত। পরবর্তী সংখ্যায় কর্ণাটকের আরো দুটি প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গে আলোচনার সময় এই সমস্যাটি যে কত প্রকট সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাতের চেষ্টা করা যাবে।

বাকমিনস্টার-ফুলারিন

বাকমিনস্টারফুলারিন। নামটা অদ্ভুত শোনাতে পারে, কারণ এই নাম একটি নতুন এবং অদ্ভুত অণুর, যার আণবিক সংকেত, C_{60}। ব্রিটেন এবং আমেরিকার রসায়নবিদদের যৌথ প্রচেষ্টায় তৈরী হয়েছে এই অণু। কঠিন গ্র্যাফাইটকে প্রথমে তীব্র লেসার-স্পন্দন দিয়ে বাষ্পীভূত করে, সেই বাষ্পকে প্রসারণের মাধ্যমে শীতল করা হল। সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যারি ক্রটো এবং হাউসটনের রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের রিক স্মলে এই প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত কার্বনচূর্ণ বিশ্লেষণ করে দেখতে পেলেন কিছু কিছু কার্বন পরমাণু, প্রথমে যেগুলি মৌচাকের খোপের মত ষড়ভুজাকারে বিন্যস্ত হয়েছিল, পরে পঞ্চভুজাকার হয়ে, তারপর বেঁকে পরস্পর জুড়ে গিয়ে একটা চমৎকার গোলকের মত আকৃতি পেয়েছে। ঐ গোলকাকৃতি অণুর কার্বন পরমাণুর সংখ্যা ষাট। C_{60} সুষম পঞ্চভুজ দিয়ে তৈরী একটি ফাঁপা গোলক। এই নতুন অণুটি শুধু আকৃতিতে নয়, চরিত্রের দিক দিয়েও অভিনব। কম তাপমাত্রায় এটি উত্তম তড়িৎ-পরিবাহক হয়ে উঠতে পারে। ফ্লোরিনের সঙ্গে এর বিক্রিয়ায় পাওয়া যাবে একটি নতুন যৌগ, $C_{60}F_{60}$। এর অতুলনীয় পিচ্ছিলকারী ধর্মের জন্য বিজ্ঞানীরা একে বলছেন 'সুপার লুব্রিক্যান্ট'। ইউরেনিয়াম অত্যন্ত ক্ষয়কারী হওয়ার ফলে একে নিয়ে কাজ করা একটি সমস্যা। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, ঐ ফাঁপা অণুর মধ্যে ইউরেনিয়ামকে বন্দী করে নিলে ভবিষ্যতে এই অসুবিধা দূর হবে। ষড়ভুজাকার কাঠামো পরস্পর জুড়ে তৈরী গোলকের মধ্যে একটা অ-সাধারণ স্থায়িত্ব আসে—এই গঠনগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছিলেন আমেরিকান ইঞ্জিনীয়ার-উদ্ভাবক বাকমিনস্টার ফুলার। এবং এই নীতি অনুসরণ করেই তিনি তৈরী করেছিলেন তাঁর নামে বিখ্যাত হয়ে থাকা গোলকাকৃতি গম্বুজ, 'জিওডেসিক ডোম'গুলিকে। এই নতুন অণুর আকৃতির সঙ্গে ফুলারের স্থাপত্যের অদ্ভুত সাদৃশ্য এর নামের সঙ্গে তাঁর নাম জুড়ে দিয়েছে।
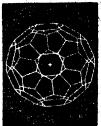
বাকমিনস্টার ফুলারিন : কম্পিউটার প্রদর্শিত গঠনসংকেত

বাকমিনস্টার ফুলার উদ্ভাবিত স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন—গোলকাকৃতি গম্বুজ

কাঁকড়া-রহস্য

'স্যান্ড-বাবলার'—একটি বিশেষ প্রজাতির কাঁকড়া। অস্ট্রেলিয়ার ক্রান্তীয় অঞ্চলে এদের দেখা মেলে। মাত্র আধ ইঞ্চি চওড়া এই কাঁকড়াটি প্রায় সব সময়েই বেলাভূমিতে জলের বাইরে কাটায়। সম্প্রতি নিউ সাউথ ওয়েলস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র ডেভিড মেইটল্যান্ড এই কাঁকড়াসংক্রান্ত একটি শতাব্দীপ্রাচীন ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। এদের পায়ে চাকতির মত আকৃতির কিছু পর্দা আছে (ছবিতে গোল দাগ দিয়ে চিহ্নিত)। এতদিন বিজ্ঞানীরা মনে করতেন এগুলি এদের শ্রবণযন্ত্র। এই পর্দাগুলির নাম দেওয়া হয়েছিল টিম্‌পানা (Tympana)। কিন্তু, মেইটলান্ড প্রমাণ করলেন এগুলি আসলে শ্বাসযন্ত্র।

মেইটলান্ড এই পর্দাগুলিকে একটি নির্বিষ রঙ দিয়ে ঢেকে দিয়ে দেখলেন কাঁকড়াটির অক্সিজেন খরচের মাত্রা কমে গেছে শতকরা ষাট ভাগ। এর উপর রঙের আরো একটা স্তর চাপাতেই কাঁকড়াটির সম্পূর্ণ শ্বাসরোধ হয়ে গেল। কানের সঙ্গে সাদৃশ্য হেতুই ঐ পর্দার নাম রাখা হয়েছিল টিম্‌পানা (যেমন, কানের পর্দা—টিম্প্যানিক মেমব্রেন)। এই নামটিও কি এবার বদলানো হবে?

'স্যান্ড-বাবলার'—অস্ট্রেলিয়ার কাঁকড়া

কঙ্কাল-ব্যবসা

ভারত থেকে কঙ্কাল রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমেরিকার চিকিৎসা-জগতে কঙ্কালের আকাল দেখা দিয়েছে। ছাত্রদের ব্যবহারের ত্রুটিতে কঙ্কালগুলি প্রায়ই জোড় খুলে গিয়ে অব্যবহার্য হয়ে পড়ে, এবং পাঁচশ ডলার দামের কঙ্কালগুলিকে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তরই বদলাতে হয়। এই চিত্র আমেরিকার শিক্ষা জগতের সর্ব স্তরে। দন্ত-চিকিৎসার ছাত্রদের কাছেও নাকি ভারতীয় কঙ্কাল খুবই আদরনীয়। কেউ কেউ প্লাস্টিকের তৈরি বিকল্প কঙ্কালের কথা ভেবেছেন। কিন্তু ব্যবহারকারীরা বলেছেন সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যগুলি প্লাস্টিকের করোটিতে দেখা যায় না।

সুতরাং উপায়? 'এই লক্ষ লক্ষ ডলারের প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাজারটি শূন্য পড়ে আছে, এই খবরটি যখন তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির কাছে পৌঁছাবে, তখন অবস্থার পরিবর্তন হতে সময় লাগবে না'—মন্তব্য করেছেন এক বিশেষজ্ঞ।

মহাকাশ-জঞ্জাল

চাঁদকে বাদ দিয়ে প্রায় ৫৬০০টি বস্তু এখন বিভিন্ন কক্ষপথে পৃথিবীকে পরিক্রমণ করছে। এবং শুধু তাই নয়, প্রতি বছরই এর সংখ্যা গড়ে তিনশ থেকে পাঁচশ করে বাড়বে। অকেজো এবং কেজো দুই রকমের কৃত্রিম উপগ্রহেরই ক্রমবর্ধমান সংখ্যা ভবিষ্যৎ মহাকাশ-অভিযানের সামনে একটা বিরাট সমস্যার আকারে দেখা দিয়েছে। স্পেসশাট্‌ল, মহাকাশচারী, মহাকাশযানের বাইরে বেরিয়ে এসে কর্মরত বিজ্ঞানী, প্রত্যেকের পক্ষেই এই অবস্থা ঘোর আশঙ্কাজনক। বিশেষ করে বড় আকারের মহাকাশ-স্টেশনগুলি, যাদের গতিবেগ সেকেন্ডে ১৬ মাইল, এই মহাকাশ-জঞ্জালগুলির লক্ষ্যভেদের বস্তু হয়ে উঠতে পারে অনায়াসে। এবং এই রকম একটি সংঘর্ষের শেষে মহাকাশচারীরা যানে-প্রাণে বিনষ্ট এবং জঞ্জালের ভাণ্ডারের নবতম সংযোজন হয়ে উঠতে পারেন।

রূপদর্শীর ঝাঁকিদর্শন

দুখিনী মাতা পশ্চিমবঙ্গের চিঠি, প্রিয়কে

প্রিয়রঞ্জন বাপাজীবনেষু,

তুমি সেইদিন যখন হাওড়া ইস্টিশানে দিল্লি হইতে নামিয়া ভারি মালার চাপে পিষ্ট হইয়া যাইতেছিলে, তখন একদিকে আশংকায় আমার বুকের ধুকপুকানি যেমন বাড়িয়া যাইতেছিল, তেমনি আবার গর্বে আমার বুক ফুলিয়াও উঠিতেছিল। আশংকা কেন, আনন্দ কেন, তাহা বিশদ করিয়া বলিতেছি। আশংকা এই কারণে, ওই কুইন্টাল কুইন্টাল মালার ওজন তোমার ওই কচি ঘাড়ে ধরিয়া রাখিতে পারিবে তো? যখন দেখিলাম, তুমি হেলায় সেই মালার গন্ধমাদনের ভার তোমার ঘাড়ে তুলিয়া লইলে, তোমার সোজা ঘাড় একটুও ত্যাড়া হইল না, তখন আমার বুকের কাঁপুনি ধীরে ধীরে কমিয়া গেল। মনে মনে বাবা তারকনাথকে ডাকিতেছিলাম, বাবা তারকনাথ, তুমি আমার প্রিয় বাপাজীবনকে, আমাদের জীবনের জীবনকে শক্তি দাও, তুমি যেমন ভক্তদের টন টন মালা গলায় পরিয়া অনড় হইয়া থাকো, আমার প্রিয় বাপাজীবনও যেন সেই রকমই মালার বোঝা গলায় ধরিয়া ঘাড়ে গর্দানে অক্ষত থাকিতে পারে। আমার প্রিয় বাপাজীবন হাওড়া ইস্টিশান হইতে ভক্তমুক্ত হইয়া ভালোয় ভালোয় আমার কোলে ফিরিয়া আসিলে, আমি আগামী শ্রাবণী পূর্ণিমায় ভি আই পি গাড়ি হইতে তোমার দরজায় নামিয়া দুই ঘট জল বাঁকে ঝুলাইয়া সন্ধ্যা রায়ের স্টাইলে 'বোম্ বোম্ তারক বোম' বলিতে বলিতে তোমার মাথায় জল ঢালিয়া আসিব। বাবা তারকনাথ, আমার প্রিয় বাপাজীবন এখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হইয়াছে। তুমি যদি এখন তার কাছে কোনও বর চাও তো আমার কাছে আসিও, লজ্জা করিয়ো না, আমি সুপারিস করিয়া দিলে প্রিয় বাপাজীবন সে কথা ঠেলিতে পারিবে না। বাবা আমার মানত পূর্ণ করিয়াছেন। বাপা প্রিয়, তুমি যখন কংগ্রেসী ভক্তদের হাত হইতে ছাড়া পাইয়া অক্ষত দেহে আমার দুয়ারে আসিয়া সত্যই হাজির হইলে, 'মা কোথায়, মা' বলিয়া পুকারিয়া উঠিলে, আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া সুধামাখা আধো আধো স্বরে বলিয়া উঠিলে, 'চোখের জল মোছ মা, আর কেঁদ না', তখন আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম। প্রিয় বাপ আমার, দুখিনী পশ্চিমবঙ্গ মায়ের এই অনুরোধটি রেখো বাপাজীবন, আর এদিক ওদিক করিয়ো না। রাজীবের পদে তোমার মতি অচঞ্চল রাখিয়ো। এখন তিন পোয়া মন্ত্রী হইলে, রাজীবের পদে মতি যদি আর ঠাঁই নাড়া না করো তবে একদিন পূর্ণ মন্ত্রীও হইবে।

বাপাজীবন, সেদিন আনন্দের চোটে আসল কথাটাই জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। হাঁ বাছা, মন্ত্রী তো হইলে, হউক না তাহা তিন পোয়া মন্ত্রী, কেন্দ্রের মন্ত্রীর ইজ্জতই আলাদা, তা হাঁ বাপ, তোমার বুলেট প্রুফ জামা হইয়াছে তো? লোকের নামের সহিত মিঞা যোগ করিলে যেমন একবাক্যে এক বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত লোককে বুঝায় (জাতীয় সংহতির স্বার্থে সম্প্রদায়টির নাম করা গেল না। পাঠক পাঠিকাকে উহা বুঝিয়া লইতে হইবে) তেমনই নামের সহিত মন্ত্রী কথাটি যুক্ত থাকিলেই, তা আধখানা মন্ত্রীই হউক আর তিন পোয়া মন্ত্রীই হউক আর পূর্ণ মন্ত্রীই হউক, বুঝিতে হইবে যে তিনি ভি ভি আই পি তালিকাভুক্ত লোক। বাপা প্রিয়, তুমি ভি ভি আই পি-র তালিকায় উঠিয়াছ, ইহাতে তোমার দুখিনী পশ্চিমবঙ্গ মায়ের প্রাণ যেমন আহলাদে আটখানা হইয়াছে, তেমনই বাপা, মনে রাখিয়ো তোমার বিপদও বাড়িয়া গেল। এতদিন তোমার কংগ্রেস ভক্তরাই তোমার হাত পা ছিড়িবার চেষ্টা করিয়াছে, এবার বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদী প্রভৃতি বাদী ও বিবাদীগণ তোমার নাম হিট লিস্টে তুলিবে। তুমি এ পর্যন্ত যে বাঁচিয়া গিয়াছ, তাহা কেবল পাঁচু ঠাকুরের দয়ায়। পাঁচু ঠাকুরের দয়া থাকিলে কোনও ছেলেকেই পেঁচোয় ধরিতে পারে না। তোমার উপর পাঁচু ঠাকুরের অপার কৃপা আছে, তুমি পাঁচু ঠাকুরের প্রিয় বলিয়াই তোমার নাম প্রিয়রঞ্জন হইয়াছে।

বাপা প্রিয়রঞ্জন, তুমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হইয়া মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ফিরিয়া আসিলে। ইহাতে আমার যৎপরোনাস্তি আহ্লাদ হইয়াছে। মায়ের প্রাণে এই আহ্লাদ হইবার মানে যে কী, তাহা তুমি হয়ত বুঝিতে পারিতেছ। সকলে পারে না। তুমি বুঝিয়াছ তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। ভাল। এইবার একটা কষ্টের কথাও তোমাকে বলি। তুমি তো বাপা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হইয়া ফিরিয়া আসিলে। ওরে, আমার সুব্রতকে কোথায় রাখিয়া আসিলি? সে যে আমার দামাল ছেলে। সে যে আমার কোল জোড়া ধন। বাপা প্রিয়, সে যে তোমার লক্ষণ ভাই ছিল। আজ সে কোথায়? কতদিন তাহার মুখে মা মা ডাক শুনি নাই। সকলেই বলিত প্রিয় সুব্রত এ যুগের যেন রাম লক্ষণ। তা তোমার সেই লক্ষণ ভাই কোথায় ডুব দিল বাপা? সে কেন তোমার সঙ্গে আসিল না? খবরের পাতায় একদিন তাহার মুখে খই ছুটিত। সে কি তবে বিবাগী হইয়া গেল? নাকি তাহাকে পেঁচোয় পাইল? বাপা, তুমি রাজীবের রাতুল চরণে ঠাঁই পাইয়াছ। তোমার কারণে আর আমার ভয় নাই। তোমার একটা হিল্লে হইল, তোমার দেশ সেবা সার্থক হইল, ঠিক আছে। কিন্তু তোমার লক্ষণ ভাই তোমার পাশে নাই কেন? বাপা, আমার মায়ের প্রাণ, এদিকেও কাটে আবার ওদিকেও কাটে। এ যে কী ঝকমারি তাহা মা যে না হইয়াছে সে বুঝিবে না। বাপা, তুমি এখন মন্ত্রী হইয়াছ, তোমার এখন অনেক মান। দিল্লিতে তোমার এখন কত দহরম মহরম। তুমি কি পার না, চেষ্টা চরিত্র করিয়া তোমার তিন পোয়া গদির পাশে সুব্রতর জন্য অন্তত ছোট্ট একটা বেবি চেয়ারের ব্যবস্থা করিতে? তাহা হইলে রাম লক্ষণের ছবিটা বড়ই খোলতাই হইত। আহা এই ছবিটা দেখিব বলিয়া এত খোঁয়ার সহিয়াও আজ পর্যন্ত টিকিয়া আছি। আমার এ সাধ প্রিয় বাপাজীবন, তুমি কি পূর্ণ করিতে পার না?

একটা কথা বলি বাপা, তুমি অন্যের কথায় কান ভারি করিয়ো না। সুব্রত তোমাকে ছাড়িয়া সতীন কাঁটাদের আখড়ায় ভিড়ে নাই। আর কেউ সুব্রতকে না চিনুক, আমি তো তাহাকে চিনি। তাহার মনের ভাবও আমি বিলক্ষণ জানি। ও মাথাতেই যা বাড়িয়াছে, কিন্তু ওর বুদ্ধি সুদ্ধি এখনও শিশুর মতোই সরল। তোমাব মতো অত পাকা বুদ্ধি উহার নাই। দেখ নাই, ইন্দিরা কাদায় পড়িলে তুমি কেমন কৌশলে সেখান হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলে, কিন্তু সুব্রতর অত সূক্ষ্ম বুদ্ধি ছিল না, তাই কোনদিনই সে ইন্দিরার আঁচল ছাড়িতে পারে নাই। দুধের বাচ্চার মতো ইন্দিরার সঙ্গে শেষ দিন পর্যন্ত লাগিয়া ছিল। ইন্দিরার আমল শেষ হইয়া যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের আমল শুরু হইল, তুমি তো পাকা ট্রাপিজ খেলোয়াড়ের মতো ইন্দিরার ডান্ডি ছাড়িয়া রাজীবের ডান্ডিটি টুক করিয়া চাপিয়া ধরিলে। সুব্রতর অতটা মোবিলিটি নাই। তাই সে ট্রাপিজের বিদ্যা রপ্ত করিতে পারে নাই। সে কিছুদিন প্যারালাল বারের কসরৎ চালাইয়া গেল। এক হাত তোমাদের কাঁধে রাখিয়া আর এক হাত সতীন কাঁটাদের কাঁধে রাখিয়া কয়েকদিন সামনে পিছনে ডিগবাজি মারিল। তাহার পরে কোথায় যে গেল, তাহার কোনও পাত্তাই নাই। কোলের ছেলে সুব্রতকে আবার আমার কোলে ফিরাইয়া দাও। তোমাদের দুখিনী পশ্চিমবঙ্গ মায়ের তোমাদের কাছে শুধু এই মিনতি। চিরজীবী হও। চির গদিজীবী হও। তোমাদের মায়ের এই আশির্বাদ। ইতি তোমাদের জনম দুখিনী জননী পশ্চিমবঙ্গ।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

ক্ষুদ্র বৃহৎ, এক ও ঐক্য

এক জাতীয় সামুদ্রিক কীটাণু থেকে যেমন প্রবালের উৎপত্তি তেমনি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র দল উপদল তথা গোষ্ঠীর বুকের পাঁজর দিয়ে নির্মিত হয়ে আসছে লিটল ম্যাগাজিন। দধীচির অস্থি থেকে কত মেগাটনের বজ্র তৈরি হয়েছিল তা আজ জানবার উপায় নেই, তবে ছাপা কাগজ দিয়ে যদি কোন মিনিয়েচার বজ্র নির্মাণ সম্ভব হয় তা যে লিটল ম্যাগাজিন তাতে সন্দেহ নেই। অন্তত তার উত্তপ্ত অনুপ্রাণিত উদ্যোক্তাদের কল্পনা ও বিশ্বাসমতে নিশ্চয়ই। নতুন চিন্তা ভাবনা ও রীতি-নীতি আদর্শের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরকে ঠাসা এই তরুণ তুর্কীদের মুখপত্র এক হিসেবে সাহিত্যঘটিত বিদ্রোহের বীজতলা। এর উদার ক্ষেত্রফলেই সম্ভব হয়েছে অধিকাংশ প্রথম দ্বিতীয় কি তৃতীয় সারির প্রতিষ্ঠিত লেখকদের আবির্ভাব। অর্থাৎ বৃহৎ বাণিজ্যিক পত্রিকায় সরাসরি জন্মেছেন এমন দিকপাল কমই আছেন। অতীত খুঁজলে দেখা যাবে প্রায় সকলেরই হাতেখড়ি, নিদেন পক্ষে প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এই প্রায় নামগোত্রহীন ক্ষীণায়ু ছোট পত্রিকায়। কিন্তু শুধু ছোট হলেই এবং গল্প হলেই যেমন ছোটগল্প হয় না তেমনি আকারে এবং প্রকারে ছোট হলেই তাকে লিটল ম্যাগাজিন বলা যায় না। এক বিশেষ চরিত্র, এক স্বতন্ত্র, মেজাজ মর্জি মতাদর্শ ভিন্ন প্রকৃত লিটল ম্যাগাজিন হয়ে ওঠে না। ছত্রাকতুল্য এই ভুঁইফোঁড় সাহিত্যচর্চার মরসুম শুরু হয়েছিল চল্লিশের দশক থেকে। পঞ্চাশ ষাট সত্তর এই তিন দশকে বলতে গেলে তার সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধিই ঘটেছে। তারপর এসে গেল ছাপার জগতে যুগান্তর। অফসেট এবং ফটোটাইপ সেটিং হ্যান্ডপ্রেসকে ম্লান এবং সেকেলে করে দিতে বসেছে। পত্র-পত্রিকার বাণিজ্যমুখী চটক সাদামাটা দিন আনি দিন খাই সঙ্গতির কাগজগুলিকে অচ্ছুৎ করে দিয়েছে। উত্তরোত্তর ছাপাছাপি ব্যয়বহুল হয়ে ওঠায় এইসব শখের পত্রিকার কলেবর উত্তরোত্তর শীর্ণ থেকে শীর্ণতর এবং মূল্যস্ফীতি ঘটে চলেছে। সেই সঙ্গে পৃষ্ঠপোষক পাঠকের দলও ক্রমশ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে শুরু করেছে। ফলে ব্যক্তিগত পকেটনির্ভর হয়ে বাঁচার দিন ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে। লিটল ম্যাগাজিনের দুর্দিন এখন উভয় অর্থেই। অনেকেরই প্রায় নাভিশ্বাস উঠেছে। সেই সঙ্গে চরিত্রও ভ্রষ্ট হতে শুরু করেছে। কিছু ছোট পত্রিকা স্পষ্টতই এখন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানিক পত্রিকার গাত্রলগ্ন মই ছাড়া কিছু নয়। লক্ষ্য যেনতেন প্রকারে মঞ্চারোহণ। তবু সুখের বিষয় আদর্শনিষ্ঠ অটল চরিত্রের কিছু লিটল ম্যাগাজিন এখনও তাদের ধর্মযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। লিটল ম্যাগাজিনের সংখ্যা বর্তমানে কত এই পশ্চিমবঙ্গে ? সঠিক বলা দুষ্কর। এই বাংলায় এবং সন্নিহিত প্রদেশের বঙ্গভাষী পত্রিকার রেজেস্ট্রি কৃত সংখ্যা সম্ভবত বারো শ'র কাছাকাছি হবে।

ছবি : মণীষ চ্যাটার্জী

যদি কোনও মিনিয়েচার বজ্র নির্মাণ সম্ভব হয় তা যে লিটল ম্যাগাজিন তাতে সন্দেহ নেই। অন্তত তার উত্তপ্ত অনুপ্রাণিত উদ্যোক্তাদের কল্পনা ও বিশ্বাসমতে নিশ্চয়ই। নতুন চিন্তা-ভাবনা ও রীতি-নীতি আদর্শের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরকে ঠাসা এই তরুণ তুর্কীদের এক হিসেবে সাহিত্যঘটিত বিদ্রোহের বীজতলা। এর উদার ক্ষেত্রফলেই সম্ভব হয়েছে অধিকাংশ প্রথম দ্বিতীয় কি তৃতীয় সারির প্রতিষ্ঠিত লেখকদের আবির্ভাব।

গত বিরাশী সালে প্রথম এই বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার পত্র-পত্রিকাগুলিকে এক মানসিক সূত্রে বাঁধার চেষ্টা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে কলকাতায় একটি সমিতির জন্ম হয়েছিল সেদিন, যার নাম, লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক সমিতি। পারস্পরিক আলাপ আলোচনা ও সাহায্যের ভিত্তিতে ভুলভ্রান্তি ও সমস্যাবলী দূরীকরণের চেষ্টাই এর লক্ষ্য। উদ্দেশ্য, উপযুক্ত পরামর্শের দ্বারা এই শখের প্রকাশনাগুলিকে অভিজ্ঞ ও যথাযথ পথে চালিত করা। এই উদ্দেশ্যে নিয়মিত আলোচনাচক্র ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে থাকেন এঁরা। কেবল কলকাতায় বসে নয়, জেলায় জেলায়, মফস্বলে ঘুরে ঘুরেও। বইমেলায় তাঁদের প্রচার ও বিক্রীর ব্যবস্থা, সেমিনার ইত্যাদিও তার কার্যক্রমের অঙ্গ হয়েছে।

১৯৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী শ্রীপ্রভাস ফদিকার সমিতি আনিত দশ দফা দাবিকে সুবিবেচনা করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। এর ফলে সরকারী বিজ্ঞাপন বন্টনের অসাম্য অনেকটাই দূর হয়েছে। শারদীয় সংখ্যায় অধিক সংখ্যক পত্রিকা এখন বিজ্ঞাপন পাচ্ছে। এছাড়া ডাকমাশুল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে তাঁদের আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি। বেসরকারী বিজ্ঞাপনদাতাদের আয়করের আংশিক ছাড়ের জন্যও সমিতির প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে। রেজিস্ট্রিকরণের গড়িমসি বিলম্ব দূর করার ব্যবস্থাও হয়েছে। তবে সুলভ মূল্যে ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকাকে ছাপার কাগজ যোগানোর প্রস্তাবটি অবশ্য সরকারের বর্তমান আর্থিক অবস্থায় কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না।

সম্প্রতি এই সমিতি তাঁদের বার্ষিক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন জোড়াসাঁকো রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির প্রদর্শনী কক্ষে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও ৮-১১ নভেম্বর এই চারদিনের প্রদর্শনীতে যথেষ্ট জনসমাগম হয়েছিল। হয়েছিল কবি সম্মেলন এবং মনোজ্ঞ আলোচনা সভা। ক্ষুদ্র পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দ ছাড়াও বেশ কয়েকজন খ্যাতকীর্তি ব্যক্তি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। পূজাসংখ্যা রবীন্দ্রসংখ্যা এবং বিশেষ সংখ্যার সমাবেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অনেক দুর্লভ ও প্রয়াত পত্র-পত্রিকার প্রচ্ছদচিত্রের সংগ্রহ। ধানবাদ, ত্রিপুরা, এলাহাবাদ, লামডিং, গুয়াহাটি, ওড়িশা প্রভৃতি অঞ্চলের পত্রিকাও এতে অংশ গ্রহণ করেছিল। সমিতির বর্তমান সম্পাদক নবকুমার শীল আশাবাদী মানুষ। তিনি জানালেন প্রায় ২৫০ জন সম্পাদক বর্তমানে সমিতির সভ্য হয়েছেন। কলকাতার তুলনায় মফস্বল পত্রিকাগুলিই এ ব্যাপারে বোধহয় বেশী আগ্রহী। বার্ষিক দশ টাকা চাঁদাটা কিছু নয়, আসল কথা আন্তরিক ঐক্যবোধ ও প্রীতিবোধের বিশ্বাস। অদূর ভবিষ্যতে এই সমিতি আরও সক্রিয় এবং ব্যাপকভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠবে এ বিশ্বাস নবকুমারবাবুর আছে।

সংক্রান্ত সংবাদ

পশ্চিম জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে ৩৮শ বইমেলা হয়ে গেল ১-৬ অক্টোবর '৮৬। প্রায় আশিটি দেশ থেকে সাড়ে ছ' হাজার প্রকাশক এই মেলায় যোগ দেন। এই মেলার বৈশিষ্ট্য : প্রতি বছর মেলা কর্তৃপক্ষ কোন একটি বিষয় বা অঞ্চলকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসেন— দর্শকদের দৃষ্টি বিশেষ করে আকর্ষণ করার জন্য। এবারের বিষয় ছিল ভারত— শিরোনাম 'পরম্পরার পরিবর্তনে ভারত'। ইতিপূর্বে দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকার মত মহাদেশ স্থান পেলেও এই প্রথম একটি দেশ এ রকম প্রাধান্য পেল। এখানে ভারত থেকে আশিটিরও বেশী প্রকাশক অংশ গ্রহণ করেন। ভারতের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিকগুলি সাহিত্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। দুটি পৃথক উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী এই উদ্দেশ্যে করা হয়। 'ভারতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত' শীর্ষক প্রদর্শনীতে প্রায় পাঁচ হাজার গ্রন্থ এবং 'ভারত

সম্পর্কীয় গ্রন্থ' প্রদর্শনীতে আরো হাজার দুয়েক গ্রন্থ স্থান পেয়েছিল। এই উপলক্ষে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল— 'একটি প্রাচীন ইউরোপীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকরাশির মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত ভারতবর্ষের রূপ'।

এই উপলক্ষে আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগিতায় ক্যালকাটা পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুক সেলার্স গিল্ড একটি প্রদর্শনী করে। বিষয় : 'দুশো বছরের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন'।

প্রসঙ্গত, গত তিন বছর ধরে এই সময়ে আনন্দ পাবলিশার্স একক প্রচেষ্টায় লন্ডন শহরে বাংলা বই মেলার ব্যবস্থা করে আসছেন। এ বছরও তাঁরা ফ্রাঙ্কফুর্ট মেলার পর লন্ডনে হাজির হন।

॥ ২ ॥

লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে যে নতুন করে চিন্তা ভাবনা ভালোবাসার সূত্রপাত হয়েছে তার এক উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেল। অনিলকুমার দত্ত নিজে শিল্পী, চিত্রশিল্পী। 'শিল্প ও সাহিত্য'ও আসলে পত্রিকা, ক্ষুদ্র পত্রিকা। কিন্তু শিল্পী শিল্পের জন্য পৃষ্ঠপোষক হলে, লিটল ম্যাগাজিন লিটল ম্যাগাজিনের গুণগ্রাহী হলে সমুদ্রবন্ধনে সেই রামায়ণী কাঠবেড়ালীর অনুরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায়। দশম বর্ষীয় 'শিল্প ও সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক অনিলকুমার দত্ত তিন বছর যাবৎ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে লিটল ম্যাগাজিনের শ্রেষ্ঠ গল্পকার, প্রাবন্ধিক, কবি, প্রচ্ছদশিল্পী এবং সম্পাদককে পুরস্কার দিয়ে আসছেন। প্রতিটি পুরস্কারের অর্থমূল্য এক হাজার টাকা। নির্বাচিত বিচারকমণ্ডলীর বিচারে এই শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকায় পুনর্বার মুদ্রিত হয়। এই অভিনব উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

চীনা কবি ও সাহিত্যিক

পররাষ্ট্র দপ্তরের অন্তর্বর্তী ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ পরিষদের উদ্যোগে গত ৬ নভেম্বর বিকেল পাঁচটায় ভারতীয় ভাষা পরিষদ ভবনে দুই চীনা কবি ও সাহিত্যিকের সঙ্গে এক প্রীতিসাক্ষাৎকারের আয়োজন হয়েছিল। উভয় দেশের সাহিত্য সংস্কৃতির এই পারস্পরিক ভাব বিনিময় স্বল্পকালীন এবং সংক্ষিপ্ত হলেও উপভোগ্য হয়েছিল। 'বাঙ্গালোর কলকাতা দিল্লী ছুঁয়ে তাঁদের এই আমন্ত্রিত সফর এতই স্বল্পমেয়াদী যে তা কতখানি কার্যকর হল আমরা জানি না।

কলকাতার এই এক বিকেলের অনুষ্ঠানে এ অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চিত্রিতা দেবী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সহ কিছু নির্বাচিত নাগরিক সুধীজন। সভা পরিচালনা করেন ভারতীয় ভাষা পরিষদের সভাপতি (অধ্যক্ষ) ডঃ পাণ্ডুরঙ্গ রাও। তিন চীনা প্রতিনিধির মধ্যে লিউ জিন আসতে পারেননি। উপস্থিত হয়েছিলেন প্রবীণ সাহিত্যিক জিয়ান খিয়ান আই ও তরুণ কবি ইয়াঙ মু। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে তাঁরা জানান সম্প্রতিকালে চীনে সাহিত্য বিষয়ক বিধিনিষেধ কড়াকড়ি হ্রাস পেয়েছে। এখন সাহিত্যিকরা স্বাধীনতাই ভোগ করছেন। সংবিধান বিরোধী না হলে লেখকের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসে কোন প্রকার সরকারী হস্তক্ষেপ ঘটে না। তাঁরা ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী। দুই প্রাচ্য ও প্রাচীন প্রতিবেশী জীবনধারা ও সাহিত্য সম্পর্কে উভয় দেশের কৌতূহল থাকাটাই স্বাভাবিক। সুদূর অতীতেও চীনা পর্যটক ও ঐতিহাসিক ভারতে এসেছেন একাধিকবার। অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে ভারতের তরফ থেকেও। হিমালয় ও চীনের প্রাচীর এবং দুরূহ বর্ণমালা শেষ পর্যন্ত বাধার সৃষ্টি করেনি। কেবল বাণিজ্য সূত্রেই নয় বৌদ্ধধর্মের হার্দ্য প্রভাবেও এই দুই উপমহাদেশ অন্তরঙ্গ হয়েছে। শুধু মাঝে মধ্যে ক্ষণকালীন বিচ্ছেদ-বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে যুদ্ধপর্বগুলি। পরিষদের তরফে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় চীনা ভাষায় আমন্ত্রিত লেখকদ্বয়ের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ ও আলোচনা করেন। ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসার উত্তরে ডঃ রাও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দান করেন।

সমকালীন চীনা লেখকদের মধ্যে জিয়ান খিয়ান আই কেবল উল্লেখযোগ্যই নন, এই আশীতে এসেও রীতিমত সক্রিয় রয়েছেন। জন্ম ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে। নব্য সংস্কৃতি আন্দোলনে প্রভাবিত জিয়ান ১৯২৬ সালে 'মর্নিং' সংবাদপত্রের সাহিত্য ক্রোড়পত্র 'কবিতা' প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন আরও দুজন কবির সাহচর্যে। আসলে ঔপন্যাসিক এবং গল্পকার হিসেবে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি এবং প্রসিদ্ধি হলেও অনেক শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকের মতই তাঁর প্রাথমিক খসড়া হয়েছিল কবিতাচর্চার ভেতর দিয়েই। শৈশব ও জন্ম-শহরের স্মৃতি তাঁকে এখনো আবিষ্ট করে তোলে। দেশজ লেখক, আঞ্চলিক লেখক বলতে সদর্থে যা বোঝায় তিনি তাই। তাঁর গল্পের কাহিনী অধিকাংশই সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে। তাঁর উপন্যাসগুলি জীবন্ত হয়ে আছে আঞ্চলিক দেশকালের বর্ণে গন্ধে, অনুপুঙ্খ বর্ণনায়। তাঁর কিছু বই ইংরেজী, ফরাসী, রাশিয়ান ও জাপানী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর গল্প উপন্যাসের গ্রন্থাবলীর মধ্যে মিস্ট ইন দি মর্নিং, রিটার্ন টু দি হোমল্যান্ড, ওয়াইন শপ, স্টোরি অব সল্ট বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যুদ্ধকালীন জাপানী প্রতিরোধ পর্বে তিনি গুইঝাউ বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা বিভাগে এবং গুইয়াং টিচার্স কলেজের চীনা অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে চায়না ফেডারেশন অব লিটারারি অ্যান্ড আর্ট সার্কলস-এর পরিচালক, সদস্য চীনা লেখক পরিষদের উপদেষ্টা, গুইঝাউ ফেডারেশন অব লিটারেরি আর্ট সার্কলের এবং চাইনীজ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের উক্ত শাখার সভাপতি।

কবি ইয়াং মু তুলনায় বয়সে তরুণ হলেও জীবনটা তাঁর কর্মবহুল এবং বৈচিত্র্যমণ্ডিত। সিচান প্রদেশের কিউ কাউন্টিতে ১৯৪৪ সালে জন্ম। প্রথমে দক্ষিণ চীনে বসবাস ও শিক্ষকতা করতেন। ষাটের দশকে চলে যান জিয়ানজিয়াং, এবং উত্তর চীনে বসবাস শুরু করেন। সত্তরের দশক থেকে একের পর এক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে। গ্রীন স্টার, দি রিভাইভড সী, ওয়াইল্ড রোজ, ফ্লাওয়ারিং শ্রাব, সানসেট অ্যান্ড মী, স্ট্রং উইন্ড, সোল অব দি ফ্রন্টিয়ার প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। কবিতার জন্য তিনি অন্তত দশটার বেশী পুরস্কার পেয়েছেন আজ পর্যন্ত। তাঁর আই অ্যাম এ ইয়ং ম্যান ১৯৭৯-৮০ সালে তরুণ ও মধ্যবয়স্কদের জন্য জাতীয় পুরস্কার এবং দি রিভাইভড সী তিরাশী-চুরাশী সালের শ্রেষ্ঠ আধুনিক কাব্যগ্রন্থ হিসেবে ন্যাশনাল প্রাইজ পেয়েছেন। মু বর্তমানে 'গ্রীন উইন্ড' কবিতা পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। তাঁর বই ইংরেজী ফরাসী ও ইটালিয়ান ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। ■

প্রাচীরের বাইরে
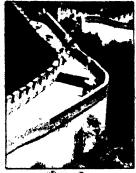
দুই প্রাচ্য ও প্রাচীন প্রতিবেশী জীবনধারা ও সাহিত্য সম্পর্কে ভারত ও চীন—উভয় দেশের কৌতূহল থাকাটাই স্বাভাবিক। সুদূর অতীতেও চীনা পর্যটক ও ঐতিহাসিক ভারতে এসেছেন একাধিকবার। অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে ভারতের তরফ থেকেও। হিমালয় ও চীনের প্রাচীর এবং দুরূহ বর্ণমালা শেষ পর্যন্ত বাধার সৃষ্টি করেনি। কেবল বাণিজ্য সূত্রেই নয় বৌদ্ধধর্মের হার্দ্য প্রভাবেও এই দুই উপমহাদেশ অন্তরঙ্গ হয়েছে।

পূর্ব-পশ্চিম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যৌবন-৩১

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মামুন আকাশের দিকে তাকালেন কয়েকবার। রাস্তার বাতিগুলি জ্বালানো হয়নি, কোনো বাড়ির একচিলতে আলোও এসে পড়েনি পথে, চতুর্দিক আবছায়া অন্ধকার। কিন্তু আকাশে একটা বড়সড় চাঁদ উঠেছে, শত শত ঝরনা ধারার মতন নেমে আসছে জ্যোৎস্না। আকাশে কেউ ব্ল্যাক আউট করতে পারেনি।

সারাদিন ধরেই বারবার গুজব ছড়াচ্ছে, আজ বোমা বর্ষণ হবে। লাহোর ফ্রন্টে তুমুল আক্রমণের মোকাবিলা করবার জন্য পাকিস্তানী বিমানবাহিনীর সব কটা প্লেনই চলে গেছে ওদিকে, ঢাকা শহর রক্ষার জন্য একটাও রেখে যায়নি, এই সুযোগে আজ কলাইকুণ্ডা থেকে উড়ে এসে ভারতীয় বোমারু বিমান ঢাকা আক্রমণ করবে। সন্ধে থেকে বেশ কয়েকবার প্যানিক সৃষ্টি হয়েছে, লোকেরা বাড়ির জানলা-দরজা জোরে বন্ধ করলেও বোমার শব্দ বলে ভুল হয়। ভারতীয় বিমানগুলি নাকি খুব ছোট ছোট, ওগুলোর নাম ন্যাট, বাদুড়ের মতন নিঃশব্দে উড়ে আসতে পারে।

এ গুজবের কোনো ভিত্তি নেই, তবু একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পূর্ব পাকিস্তানেও ফ্রন্ট খুলে ভারত এই যুদ্ধটা সর্বত্র ছড়িয়ে দেবে, মামুনের তা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু কাশ্মীর ছেড়ে লাহোরে তো ভারত আক্রমণ করেছে ঠিকই। এবারে এদিকেও অতর্কিতে এসে পড়তে পারে। ভারতের কি মতলোব তা হলে পাকিস্তানকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া?

অফিসের কাজের চাপ সাঙ্ঘাতিক, তবু মামুন হঠাৎ এক সময় রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন একা। শুধু তাঁর সেক্রেটারি ইমতিয়াজকে বলে এসেছেন যে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফিরবেন, কোথায় যাচ্ছেন তা বলেননি। এখন পৌনে আটটা বাজে। প্রত্যেকদিন রাত সাড়ে বারোটা-একটা পর্যন্ত যুদ্ধের শেষতম খবর দিয়ে পাতা ছাড়তে হয়, পর পর কয়েক রাত মামুন বাড়ি ফেরেননি, অফিসে নিজের ঘরেই একটা ইজি চেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে নিচ্ছেন কয়েক ঘণ্টা। আজ কাজ করতে করতে এক সময় তাঁর অসহ্য লাগছিল, তাঁর মনে হলো মাথায় একটু ঠাণ্ডা বাতাস লাগানো দরকার। তা ছাড়া মামুন নিজের মনকে বোঝালেন, শুধু রিপোর্টারদের মুখ থেকেই তিনি খবর পাচ্ছেন, কিন্তু সম্পাদক হিসেবে তাঁর নিজের চোখেও একবার শহরের অবস্থাটা দেখে আসা উচিত। গাড়ি নেননি, তিনি পায়ে হেঁটে বেরিয়েছেন। যদি সত্যিই প্লেন থেকে বোমা পড়ে, তা হলে বাড়িতে বসে থেকেও কি নিস্তার পাওয়া যাবে?

অফিসে তাঁর মালিকের সঙ্গে রোজ রোজ তর্ক বাঁধছে, এ কাজ মামুন আর কতদিন করতে পারবেন তাতে সন্দেহ আছে। তবে, খবরের কাগজের কাজের একটা নেশা আছে, বিশেষত যুদ্ধ-বিগ্রহের মতন বড় ধরনের খবরের সময় কাজ ছাড়ার প্রশ্ন ওঠে না।

কাশ্মীরে সংঘর্ষ শুরু হবার পরদিনই হোসেন সাহেব মামুনকে তাঁর চেম্বারে ডাকিয়ে টেবিল চাপড়িয়ে বলেছিলেন, দ্যাখলেন, দ্যাখলেন, আমি তখনই কইছিলাম না? আপনেরা ম্যাডাম ফতিমা জিন্নারে সাপোর্ট করলেন! আমাগো চৌদ্দ পুরুষের ভাইগ্য যে ফতিমা জিন্না জেতে নাই। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইজ যদি মাইয়া মানুষ হইত, তাইলে আর রক্ষা আছিল? মাইয়া-মানুষে এই যুদ্ধ চালাইতে পারতো? জবরদস্ত জেনারাল আইয়ুব খান আছে বইলাই তো ইণ্ডিয়া এখনো পাকিস্তানরে ডরায়! আপনেরা তখন ফতিমা জিন্নার নামে নাচতে আছিলেন।

মামুন নম্রভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে ফতেমা জিন্না জয়ী হলে হয়তো এ যুদ্ধই হতো না। ফতেমা জিন্না প্রেসিডেন্ট হলে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, গণতান্ত্রিক সরকার এলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই কাশ্মীর-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা যেত। কিন্তু কে শোনে কার কথা! হোসেন সাহেব টেবিল চাপড়েই নিজের মতটা প্রতিষ্ঠা করতে চান। তাঁর কাছে যুদ্ধ মানে যেন দুই দেশের শীর্ষ পদাধিকারীর দৈহিক লড়াই! ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ছোট্ট খাট্টো মানুষ, আর আইয়ুব খান লম্বা চওড়া পুরুষ সুতরাং এই যুদ্ধে পাকিস্তান জিতবেই। হোসেন সাহেব হাত দিয়ে দেখিয়ে দেন, কী ভাবে আইয়ুব খান ঐ চড়ুই পাখির মতন লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে বাঁ হাতের মুঠোয় পিষে মেরে ফেলবেন।

সংবাদ পরিবেশনা ও সম্পাদকীয় নিয়েও হোসেন সাহেবের সঙ্গে মামুনের মতভেদ হচ্ছে পদে পদে। হোসেন সাহেব ইণ্ডিয়ার বদলে হিন্দুস্থান

নামটির ওপর জোর দিতে চান। লোকে মুখে মুখে পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের লড়াই বলে বটে, কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী পাশের রাষ্ট্রটির নাম ইণ্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত। কাগজেকলমে হিন্দুস্থান নামে কোনো দেশের অস্তিত্ব নেই, সুতরাং সাংবাদিকতার এথিক্‌স অনুযায়ী ইণ্ডিয়া বা ভারতই লেখা উচিত। হোসেন সাহেব সে যুক্তি বুঝবেন না। তাঁর মতে, ইণ্ডিয়া মানেই হিন্দু সাম্রাজ্যবাদ।

গতকালের সম্পাদকীয় নিয়েও মত বিরোধ তুঙ্গে উঠেছিল। হোটেলওয়ালা হোসেন সাহেব এখন সম্পাদকীয় পলিসিও ডিকটেট করতে চান! কয়েকদিন আগে আদমজী জুট মিলে একটা হাঙ্গামা হয়ে গেছে, পুলিস সেখানকার শ্রমিকদের ওপর গুলি চালিয়েছে। এই খবরে অনেকেই শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। বড় বড় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলি ঐ জুট মিল এলাকা থেকেই শুরু হয়। মোনেম খাঁ এবং তার চ্যালারা এখন একটা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা লাগিয়ে দেবার সুযোগ খুঁজতে পারে, যাতে পশ্চিম রণাঙ্গনে পাকিস্তানী যুদ্ধের দুর্বলতা এদিকে চাপা পড়ে যায়। মামুন সেই বিষয়েই লিখেছিলেন সম্পাদকীয়। ছাপতে দেবার আগেই সেই সম্পাদকীয় পড়ে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে হোসেন সাহেব বলেছিলেন, এদিকে এত বড় একটা যুদ্ধ চলতাছে, আর আপনে ল্যাখলেন এই রকম একটা তুচ্ছ বিষয়ে? আপনার কি মাথা খারাপ হইছে, এডিটর সাহেব?

মামুন বলেছিলেন, এটা মোটেই তুচ্ছ বিষয় নয়! এখন কোনোরকম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়াতে দেওয়া উচিত নয় আমাদের নিজেদের স্বার্থে। আসল লড়াইয়ের জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে না?

টেবিল থেকে সেদিনের "ইত্তেফাক" কাগজটা তুলে নিয়ে মামুন আরও বলেছিলেন, এই দেখুন, আজকের "ইত্তেফাক"-এও সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে, "রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিরোধ যতই মর্মান্তিক হোক, তা যেন বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পুনরাবৃত্তি না ঘটায়।"

হোসেন সাহেব তাঁর কাগজের সঙ্গে অন্য কোনো কাগজের তুলনা পছন্দ করেন না। তাঁর মতে, "দিন কাল"ই বাংলার শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র। তিনি তাঁর দাড়ি চেপে ধরে রাগের সঙ্গে বললেন, ঐ মানিক মিঞার চোথা কাগজে কী ল্যাখছে তা আমার জানার দরকার নাই! মনে রাখবেন, "দিন-কাল" আওয়ামী লীগের মাউথ পীস না! আমাগো মতামত স্বাধীন। এই যুদ্ধে হিন্দুস্থানরে আমরা ক্র্যাশ কইরা দিমু! আপনে সেই রকম গরম গরম ল্যাখেন।

মামুন এবারে আলতাফের দিকে ফিরে কঠোরভাবে বলেছিলেন, তোমার চাচাকে জিজ্ঞেস করো, আমি এখনও এই কাগজের সম্পাদক আছি কিনা। যতক্ষণ আমি তা থাকবো, ততক্ষণ আমার লেখার ওপরে কেউ কলম চালাতে পারবে না। আরও একটা কথা ওঁকে বলে দাও, খবরের কাগজে মিথ্যা মিথ্যা গরম গরম কথা লিখে একটা দেশকে ক্র্যাশ করে দেবার ক্ষমতাও আমার নাই, সেই রকম কোনো ইচ্ছাও নাই।

আলতাফ তার চাচাকে খুব ভালোই চিনে গেছে। মামুন ভাই যতক্ষণ শান্ত থাকেন ততক্ষণই হোসেন চাচা পেয়ে বসেন আর নানারকম হুংকার দেন। মামুন একবার পদত্যাগের কথা তুলতেই উনি চুপসে যান। এই অফিসের অধিকাংশ ছেলেছোকরাই মামুনের ভক্ত, মামুন কাজ ছেড়ে দিলে তারাও সদলবলে চলে যাবে, কাগজ বন্ধ হয়ে যাবে।

আলতাফ সহাস্যে বললো, আরে না, না, মামুন ভাই, আমার চাচা বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি ঠিকই বোঝেন যে ওরকম কিছু সম্ভব না। উনি শুধু মাঝে মাঝে আপনারে একটু চ্যাতাইয়া দিতে চান, যাতে আপনে ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে আর একটু গরম গরম অ্যাটাকিং লেখেন!

রাস্তায় বেরিয়েও মামুনের মাথায় এই সব কথাই ঘুরছে। তিনি কিছুক্ষণ অফিসের বিষয় ভুলে থাকতে চান। তিনি সিগারেট ধরিয়ে, এক খিলি পান খাওয়ার কথা ভাবলেন।

অন্ধকার হলেও রাস্তা একেবারে নির্জন নয়। মোড়ে মোড়ে মানুষের জটলা। অনেকেই তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। এমন ধপধপে চাঁদের আলোয় বোমারু বিমান এসে পড়লেও ওপর থেকে ঢাকা শহরটি স্পষ্ট চিনতে পারবে।

বড় দোকানপাট সব বন্ধ থাকলেও দু-একটা পান বিড়ির দোকান গোপনে বিক্রি বাটা চালাচ্ছে। একটা ছোটখাটো জটলার মধ্যে গান ধরেছে

একজন ভিখিরি জাতীয় মানুষ। এরা সিনেমা হলের সামনে ভিক্ষে করে। ব্ল্যাক আউটের জন্য রোজগার বন্ধ। মামুন গানটা শুনলো মন দিয়ে।

আল্লা যদি করে ভাই লাহোরে যাইব
হুথায় শিখের সাথে জেহাদ করিব।
জিতিলে হইব গাজী মরিলে শহীদ
জানের বদলে জিন্দা রহিবে তৌহিদ।

গানটা শুনে মামুনের ঠোঁটে হাসি এলো। এটা অনেককাল আগেকার একটা ছড়া, খুব শৈশবে মামুন তাঁর পিতামহের মুখে শুনেছিলেন। সেই ছড়াতেই সুর দিয়ে এই লোকটি এখন বেশ বুদ্ধি করে কাজে লাগিয়েছে তো।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মামুন লোকজনের কথাবার্তাও শুনলেন কিছু কিছু। অধিকাংশই গুজব-চর্চা। দুটো গুজব নতুন শুনলেন মামুন। রেডিওতে নাকি বলেছে যে একজন মান্যগণ্য মৌলবী স্বপ্ন দেখেছেন, স্বয়ং রসুলুল্লাহ যুদ্ধের পোশাকে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার সওয়ার হয়েছেন। মৌলবী জিজ্ঞেস করলো, হুজুর সওয়ারে কায়েজাত, কোথায় তশরীফ নিয়ে যাচ্ছেন। হুজুর উত্তর দিলেন, পাকিস্তানে জেহাদ ঘোষণা করা হয়েছে, ওদের রক্ষার জন্যই যেতে হচ্ছে আমাকে।

আর একটি, যুদ্ধে পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্য আশমান থেকে নেমে আসছেন অসংখ্য ফেরেস্তা। তাঁদের লম্বা দাড়ি ও সবুজ পোশাক। ইণ্ডিয়ার সৈন্যরাই এর সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। হিন্দুস্থানী সোলজাররা ধরা পড়বার পর ক্যাম্পে এসে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছে, আমাদের যে সবুজ পোশাকধারী সৈনিকরা গ্রেফতার করলো, তারা কোথায়?

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠলো, ভাই-বেরাদরেরা শুনেছো, লাহোরে আসল লড়াইডা লড়ত্যাছে কারা? আমাগো ইস্ট পাকিস্তানী ব্যাটেলিয়ান! আমাগো বাঙ্গালী সোলজারদের সামনেই ইণ্ডিয়ানরা দাঁড়াইতে পারতেছে না, পিছু হাঁটতেছে।

আর একজন বললো, তা তো বোঝলাম, কিন্তু বাংগালী ব্যাটেলিয়ান রইলো লাহোরে, আর ইদিকে ইণ্ডিয়ান আর্মি যদি যশোর দিয়া ঢুইক্যা পড়ে, তাইলে তাগো সাথে লড়াই দিবে কেডা? ইদিকে যে বেবাক ফাঁকা!

মামুন আবার হাঁটতে শুরু করলেন। একটা পান খেয়ে চাঙ্গা বোধ করছেন। অনেকদিন তিনি এরকম একলা একলা ঘুরে বেড়াননি সন্ধের পর। তিনি আজ নিজের চোখে দেখলেন, নিজের কানে শুনলেন, ঢাকা শহরের মানুষ এই যুদ্ধে অসহায় বোধ করছে, পশ্চিম পাকিস্তানী প্রতিরক্ষার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। এখন রসুলুল্লার ও ফেরেস্তাদের ওপর তাদের ভরসা। কাশ্মীর নিয়ে কারুর বিশেষ মাথা ব্যথা দেখা গেল না।

মামুন কোনো গন্তব্য ঠিক করে পথে বেরোননি। তবু তিনি একটি বাড়ির সামনে এসে থামলেন। পকেট থেকে সরু টর্চ জ্বেলে দেখলেন, সদর দরজা বন্ধ। একটু ইতস্তত করে তিনি টর্চের উল্টো দিক দিয়ে দরজায় ঠকঠক করে ঠুকলেন কয়েকবার।

একটু পরে হাতে একটি কুপি নিয়ে অল্প বয়সী একটি মেয়ে দরজার এক পাল্লা খুলে মামুনের দিকে তাকিয়ে রইলো।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, বাবুল বাসায় আছে না?

মেয়েটি বললো, জী না, বাসায় নাই।

মেয়েটি দরজা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিল, মামুন এক হাত দিয়ে ঠেলে তাকে রুখলেন। ভেতরে এসে ভর্ৎসনার সুরে বললেন, তুই কে রে, ছেমরী, আমারে চেনোস না?

শালোয়ার-কামিজ পরা কিশোরী মেয়েটি বললো, জী না। আপা গ্যাট বন্ধ রাখতে কইছেন।

—তোর আপা কোথায়? তারে গিয়া ক যে মামুন মামা আইছে।

—আপা গোসলখানায়।

—ঠিক আছে, আমি উপরে গিয়া বসতাছি।

সিঁড়ি দিয়ে মামুন চলে এলেন দোতলায়। এই সময় বাবুল কোথায় গেল? আলতাফের ছোট ভাই হলেও বাবুল চৌধুরী 'দিন-কাল' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছে। মামুনের অনুরোধেও সে কিছু লিখতে চায় না। আগে সে নিউজ রুমে আড্ডা দিতে যেত সন্ধের দিকে, এখন তাও যায় না, তা হলে কোথায় যায় সে?

ওদের বাচ্চাটি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে, নইলে তার সাড়া পাওয়া যেত। মঞ্জুর ছেলেকে মামুন এত ভালোবাসেন যে কয়েকদিন না দেখলে তাঁর মন ছটফট করে। যুদ্ধের ডামাডোলে বেশ কিছুদিন তিনি এ বাড়িতে আসতে পারেন নি। বসবার ঘর পেরিয়ে মামুন শয়নকক্ষে এসে উঁকি দিলেন। সুখু মিঞা সত্যিই ঘুমিয়ে আছে। মামুন কাছে এসে আলতো করে তার কপালে একটা চুম্বন দিলেন, তাকে জাগালেন না।

মঞ্জু গা ধুয়ে আসুক, ততক্ষণ তিনি অপেক্ষা করবেন। বসবার ঘরে ফিরে এসে তিনি আর একটি সিগারেট ধরালেন। ইদানীং তাঁর সিগারেট খাওয়া বেড়ে গেছে। রাত জাগতে গেলে সিগারেট বেশি খেতেই হয়। অফিসে ফিরে গিয়ে আজও অনেক রাত জাগতে হবে। আর যদি ইণ্ডিয়ান বোমারু বিমান আসে…অনেকের ধারণা ওরা এলে আসবে মাঝরাত্তিরের পর…যাক, মামুন এখন ওসব নিয়ে চিন্তা করতে চান না।

ঢাকা শহরে খুব ধরপাকড় চলছে। গ্রেফতার হয়েছেন আওয়ামী লীগের অনেক নেতা। এঁরা যে দেশপ্রেমিক তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে? যুদ্ধের সময় কোনো দেশপ্রেমিক কি অন্য দেশের সমর্থক হতে পারে? গভর্নর মোনেম খাঁ হিন্দু ছেলেছোকরাদের যে আটক করছেন, তাতে অবশ্য বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় আমেরিকা তার নিজের দেশের মধ্যে জাপানী বংশোদ্ভূতদের আটক করে রাখেনি? পল্টন-বাবুল-আলতাফদের দু-একজন হিন্দু বন্ধু আটক হয়েছে, সেজন্য তারা খুব উত্তেজিত, কিন্তু আপৎকালে এরকম কিছু কিছু ঘটনা তো ঘটবেই।
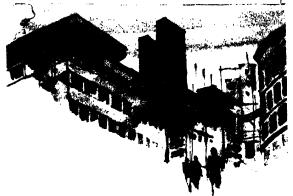
বাবুল হঠাৎ ধরা-টরা পড়ে যাবে না তো? এই ছেলেটি বড় গভীর-সঞ্চারী, মামুন ওকে ঠিক বুঝতে পারেন না। তাঁর অতি স্নেহের, অতি আদরের মঞ্জুর স্বামী এই বাবুল। মামুনের নিজের পুত্র সন্তান নেই, তিনি বাবুলকে নিজের ছেলের মতন দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাবুল তাঁকে এড়িয়ে এড়িয়ে যায়। বাবুল বলে, সে এখন কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নেই, সে আওয়ামী লীগে নেই, ন্যাপের সঙ্গেও নেই তা সত্যি। ফতেমা জিন্না হেরে যাবার পরে তো সব রকম রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপও আবার বন্ধ হয়ে গেছে। তবু, বাবুল যেন গোপনে গোপনে কিছু একটা করছে। সে প্রায়ই একা একা গ্রামে গ্রামে ঘুরতে যায় কেন? ছেলেটার নিজের নাম প্রচারের চেষ্টা নেই, রোজগার বাড়াবারও ধান্দা নেই, তবে সে কী চায়?

বাথরুমে মঞ্জু গায়ে জল ঢালছে সেই শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। মেয়েটার তিনবেলা স্নানের বাতিক। তার হৃদয়ের মতনই তার শরীরটাও সব সময় ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন। এই মেয়েটার কথা ভাবলেই মামুনের মনটা দ্রব হয়ে আসে। এই মেয়েটা কোনো বড় রকমের দুঃখ পেলে মামুন তা কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না। পর পর দু' বছরে মঞ্জুর বাবা ও মা দু'জনেই মারা গেছেন, এখন মামুনই তো ওর অভিভাবক। বড় আপা মৃত্যুকালে মামুনের হাত জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, তুই মেয়েটারে দেখিস!

রাস্তায় একটা হুড়োহুড়ির শব্দ, কিছু লোক ছোটাছুটি করছে। মামুন জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন। আবার কিছু একটা গুজব। ও হরি, ওয়াটার ওয়ার্কসের শব্দ। প্রত্যেকদিনই এই শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু আজ

ঐ শব্দকেই লোকে বোমারু বিমানের শব্দ বলে ভুল করেছে। অবশ্য আজ নিস্তব্ধতাও অনেক বেশি।

আকাশে কী শান্ত, সুমধুর জ্যোৎস্না। এর মধ্যেও আততায়ী এসে শত শত মানুষ খুন করার জন্য বোমা নিক্ষেপ করতে পারে? কিন্তু মানুষ তো মরছে। এই মুহূর্তে ছাম্ব-আগনুরে পাকিস্তানী স্যাবার জেট আর ভারতীয় ভ্যামপায়ার অগ্নিবর্ষণ করছে, ইছোগিল খালের এপাশে-ওপাশে গর্জন করছে রাইফেল।

মামুনের হঠাৎ মুসাফিরের কথা মনে পড়লো। রহস্যময় পুরুষ। তাঁকে নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়েছে পরিচিত মহলে। লোকটা সত্যিকারের কী মহাপুরুষ, না জালিয়াৎ? বিশ্ব মানবতাবাদী, না গুপ্তচর? কাশ্মীর উপলক্ষ করে এই সময়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ যে শুরু হবে, তা উনি আগে থেকে কী করে জানলেন? মামুন তো কল্পনাও করতে পারেননি, ইণ্ডিয়ার অনেক পত্র-পত্রিকাতেও এই আকস্মিকতায় বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। তবে উনি কী করে জানলেন? স্বপ্ন দেখেছেন?

এর মধ্যে আরও দু-তিনবার মুসাফিরের সঙ্গে দেখা হয়েছে মামুনের। প্রত্যেকবারই উনি ওঁর ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধির প্রখরতায় মুগ্ধ না হয়ে পারেননি। অবশ্য ম্যাজেশিয়ানরাও চকিতে মানুষকে মুগ্ধ করে দিতে পারে। মামুন একদিন অফিস আসার পথে দেখেছিলেন, গ্যাণ্ডেরিয়ার মোড়ে উনি একা দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁর চেহারার জন্য ওঁকে ভিড়ের মধ্যেও আলাদা ভাবে চোখে পড়ে। দীর্ঘ, সমুন্নত দেহ, সাদা কুর্তা-পাজামা পরা, চোখে কালো চশমা। ঐ চশমা তিনি কক্ষনো চোখ থেকে খোলেন না। অথচ অন্ধও তো নন, একা একাই চলাফেরা করেন।

মামুন গাড়ি থামিয়ে তাঁকে তুলে নিতে চেয়েছিলেন। তিনি রাজি হননি। মৃদু হেসে বলেছিলেন, এখন যাবো না, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নানারকম মানুষ দেখছি। বেশ লাগছে।

যেন মুসাফির অন্য গ্রহের অধিবাসী। তিনি মানুষ দেখতে এসেছেন। কথার সুরটি ছিল সেই রকম। মামুনের মজা লেগেছিল। লোকটিকে দিয়ে কিছু লেখাতে পারলে ভালো হতো।

কিন্তু তা আর হলো না। পরশুদিন মুসাফিরও গ্রেফতার হয়েছেন। তার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। মুসলমান হলেও ঐ মুসাফির ইণ্ডিয়ান সিটিজেন, এই যুদ্ধের সময় অন্য দেশের সিটিজেনদের আলাদা করে এক জায়গায় আটকে রাখাই তো স্বাভাবিক, সব দেশই তাই করে।

প্রথম দিনের আড্ডায় মামুন যাঁদের মুসাফিরের বন্ধু হিসেবে দেখেছিলেন, তারা এখন সবাই মুসাফিরের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করছেন। মামুন কবি জসিমুদ্দিনের কাছে খবর করেছিলেন, কবিও অনেকটা এড়িয়ে গিয়ে বললেন, পার্টিশানের আগে ওনার সাথে পরিচয় ছিল, তারপর অনেকদিন খবর রাখি না, এখন ওনার মতবাদ কী হয়েছে না হয়েছে তা আমি কী করে বলবো! কেউ কেউ বললো, লোকটা আসলে হিন্দু, বিশেষ একটা মতলোবে এই সময়ে ঢাকায় এসেছিল। নিশ্চয়ই ইণ্ডিয়ার স্পাই। মামুনের এতটা বিশ্বাস হয় না। স্পাইয়ের চাকরির জন্য এতটা বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া স্পাই হলে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ লাগার সম্ভাবনার কথা সে আগেই বলে দেবে কেন?

মুসাফির আরও একটা কথা বলেছিলেন, যা ভাবলেও এখনও মামুনের হাসি আসে। মামুনের ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবনের মাঝখানে নাকি একটি সুন্দরী নারী এসে ছায়া ফেলবে। মামুন দাড়িতে হাত বুলোলেন, অর্ধেকের বেশি পেকে গেছে। মাথার পিছনে ইন্দ্রলুপ্ত। চশমা না পরলেই একেবারে অন্ধ। বয়েস তাঁর খুব বেশি হয়নি, কিন্তু অকাল বার্ধক্য এসে গেছে, এই সময় কোন সুন্দরী নারী স্বেচ্ছায় আসবে তাঁর জীবনে! আকাশ কুসুম ছাড়া আর কিছু পাওয়ার আশা নেই এ জীবনে।

রাস্তায় আবার গোলমাল, একটা ধাতব ঘর্ঘর শব্দ। দুটো সাঁজোয়া গাড়ি বেরিয়েছে। তা হলে সব কটা ট্যাঙ্ক পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হয়নি, কয়েকটা রয়ে গেছে? ঢাকাবাসীদের মনোবল বাড়াবার জন্য সেগুলো রাস্তায় বার করা হয়েছে, ভারতীয় বিমান এলে এই দু-চারখানা ট্যাঙ্কই তাদের মোকাবিলা করবে! পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলি রোজ বড় বড় ব্যানার হেডলাইনে যুদ্ধের উত্তেজনা ছড়াচ্ছে, এখানে একটা কিছু না ঘটলে আর ইজ্জত থাকে না।

মামন জানলা বন্ধ করে দিতেই অন্য দিক থেকে একটা আলোর শিখা দেখতে পেলেন। পাছে মঞ্জু হঠাৎ তাঁকে দেখে ভয় পেয়ে না যায় তাই তিনি আগে থেকেই সহাস্যে বললেন, কেমন আছিস রে, মঞ্জু? আমার বিলকিসবানুর খবর কী?

একটা বড় মোম হাতে নিয়ে এগিয়ে এলো মঞ্জু। সদ্য স্নান করে সে একটা গোলাপি রঙের শাড়ি পরেছে, এক রাশ চুল পিঠের ওপর ফেলা। সে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছে, বাতাস নিয়ে আসছে তার শরীরের সুগন্ধ। তার সারল্যমাখা দু' চোখে এখন অদ্ভুত বিস্ময়, যেন সে মামুনকে চিনতে পারছে না।

খুব কাছে এসে মঞ্জু থমকে দাঁড়ালো। একদৃষ্টে চেয়ে রইলো, কোনো কথা বললো না।

মামুন মঞ্জুর এক হাত ধরে বললেন, কী হয়েছে তোর? ভয় পেয়েছিস নাকি? ভয় কী?

মঞ্জু খুব আস্তে আস্তে প্রায় ফিসফিসানির মতন গলায় জিজ্ঞেস করলো, মামুনমামা, উনি কোথায়? উনি আসেন নি?

মামুন বললো, বাবুলের খোঁজেই তো আসলাম। তাকে বাসায় দেখছি না। সে গেছে কোথায়, তোকে কিছু বলে যায়নি?

মঞ্জু দু'দিকে মাথা নেড়ে বললো, না।

মামুন বললেন, আচ্ছা পাগল ছেলে তো! এমন দিনে বউকে একা বাসায় রেখে কেউ বাইরে থাকে? তবে তুই চিন্তা করিস না, রাস্তায় অনেক মানুষজন, সে এসে পড়বে।

মোমবাতিটা খুব যত্ন করে একটা টেবিলের ওপর আটকালো মঞ্জু। তারপর হঠাৎ পেছন ফিরে মামুনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে হু-হু করে কাঁদতে লাগলো। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, মামুনমামা, আমার কী হবে? উনি আমার সাথে আর ভালো করে কথা কন না, আমারে আর ভালোবাসেন না!

কত বাচ্চা বয়েস থেকে দেখছেন এই মেয়েটিকে, মামুন এর কষ্ট সইতে পারেন না। বাবুলের ওপর তাঁর বেশ রাগ হলো, কিসের এত আড্ডা সে ছেলের যে এমন বউয়ের কথা ভুলে যায়? মঞ্জুর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মামুন সাবান, পারফিউম ও শরীরের একটা আলাদা সুগন্ধ পেলেন, তিনি ভুলে গেলেন যুদ্ধের কথা, ভুলে গেলেন অফিসের কথা। কোমল সুরে তিনি বলতে লাগলেন, তুই কিছু চিন্তা করিস না, মা, সে এসে পড়বে। সে বুঝদার ছেলে, সে কোথাও যাবে না।

মঞ্জু একবার মুখ তুলে জল-ছলছল দু' চোখে বললো, মামুনমামা, উনি কোথায় যান বলেন তো? আমি বুঝে গেছি, উনি আমারে আর ভালোবাসেন না। তাইলে আমি কী নিয়া বাঁচবো।

মামুন মঞ্জুর মুখখানা আবার নিজের বুকে চেপে ধরলেন। বিদ্যুতের মতন একটা চিন্তা তাঁর মন ছুঁয়ে গেল। বাবুল ইদানীং খবরের কাগজের অফিসে যায় না, প্রত্যক্ষ রাজনীতিও করে না, বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়, তা হলে কি সে অন্য কোনো মেয়ের পাল্লায় পড়েছে? সে অত্যন্ত রূপবান যুবক, ঢাকা শহরের অনেক যুবতীই তাকে আকৃষ্ট করতে চাইতে পারে। হাইসোসাইটিতে এরকম কিছু কিছু রমণী দেখেছেন তিনি, যাদের কোনো হায়াসরম নেই, বিবাহিত পুরুষদের দিকে তারা যখন তখন ঢলে পড়ে। নব্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে এরকম একটা ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ তৈরি হয়েছে, যারা পশ্চিম পাকিস্তানীদের বাড়িতে ডেকে পার্টি দেয়, ঘরের বউ-ঝিদের বাইরে বার করে, বাবুল কি সেরকম কোথায় গিয়ে জুটলো? তিনি মনে মনে তৎক্ষণাৎ শপথ করলেন, যেভাবেই হোক, বাবুলকে তিনি ফিরিয়ে আনবেনই!

মামুন মঞ্জুর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, দুর পাগল, সে তোরে ভালোবাসবে না, এ কি হতে পারে? বাবুল, আমাদের হীরার টুকরা! সে একটু বেশি আড্ডা দিতে ভালোবাসে এই যা! তোর কোনো ভয় নাই রে, মঞ্জু, সে আজ যতক্ষণ না আসে, আমি থাকবো এখানে। কী, তা হলে হলো তো? আর ভয় নাই তো? একটু চা খাওয়াবি?

চায়ের প্রস্তাবে মঞ্জু নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো মামুনের বুক থেকে। কিন্তু মামুনের চায়ের জন্য তেমন ব্যস্ততা নেই। মেয়েটা ভয় পেয়েছে, তাকে সান্ত্বনা দেওয়াটাই অনেক বেশি জরুরি, তিনি মঞ্জুকে সম্পূর্ণভাবে বুকে জড়িয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন।

(ক্রমশ)

ছবি : অনুপ রায়

গর্ভধারিণী

সমরেশ মজুমদার

দরজা খুলতেই কাঁটার চাবুকের আঘাত। টলতে টলতে সামলে নিল আনন্দ। যতটা সম্ভব মুখচোখ থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে নেওয়া সত্ত্বেও শরীরে হিম-অনুভূতি। ঝড়টা বইছে এখনও। বরফের কুচিগুলো আর তীরের মত ছিটকে আসছে না এই যা। দরজা ভেজিয়ে আনন্দ সোজা হয়ে দাঁড়াল। এখন অন্তত সকাল দশটা। অথচ অন্ধকার পাতলা হয়ে ঝুলে আছে তাপল্যাঙের ওপরে। আকাশের রঙের বর্ণনা করা অসম্ভব। চরাচর দেখা যাচ্ছে কিন্তু সাদা তুষারের গায়ে যে ছায়া পড়েছে তাতে মনে হচ্ছে অন্য কোন গ্রহে চলে এসেছে ওরা। এখন তাপল্যাঙ বরফে মোড়া। যেদিকে তাকাও শুধু বরফ আর বরফ।

তিন রাত দুদিন ব্লিজার্ড বইছে। ব্লিজার্ড শব্দটার সঙ্গে বই-এ পরিচয় ছিল। য়ুরোপ আমেরিকায় তুষার ঝড়ে পথ হারানো বা মৃত্যুমুখে পড়া মানুষের গল্প অনেক পড়েছে সে। ব্লিজার্ড শব্দটার মধ্যে একটা রোমান্টিক ভাবনা সে আরোপ করে নিয়েছিল। কিন্তু গত তিন রাতের প্রতি মুহূর্তের আতঙ্কে সেসব শিকেয় উঠেছে। মনে হয়েছে যে কোন সময় আস্তানাটা উড়ে যাবে। কাঠের দেওয়ালে অনবরত বরফের কুচি নেকড়ের নখের আওয়াজ তুলেছে। ঠাণ্ডা নেমে গেছে এতটা যে আগুন জ্বালিয়েও মনে হয়েছে ওতে হাত ডোবালে ফোস্কা পড়বে না। প্রাকৃতিক প্রয়োজনগুলোও চাপা পড়ে গিয়েছিল। দরজা খোলার সাহস হয়নি। নিরুপায় হলে বাইরের জানলার নিচে বসতে হয়েছে। এবং এইখানে, এই সময়ে তার এবং সুদীপের সঙ্গে জয়িতা বা মেয়েটির কোন পার্থক্য ছিল না।

কাল সারারাত ঝড়ের দাপট ছিল মারাত্মক। মনে হচ্ছিল পৃথিবীর সব বাতাস যেন একত্রিত হয়েছে। আর এভারেস্ট যেন আচমকা গলে এগিয়ে আসছে। কাল সারারাত ঘুম আসেনি কারো। এমন কি সুদীপেরও। ওর চেতনা এখন অনেক স্পষ্ট। মেয়েটি বিশ্বাস করে রোলেনদের গ্রাম থেকে চেয়ে আনা পর্বতশৃঙ্গের পবিত্র জলের কণা ওর কপালে মাখিয়ে দেওয়ায় এই পরিবর্তন। কিন্তু লা-ছিরিঙের মুখে সে শুনেছে গুহা থেকে নামিয়ে আনার সময় সুদীপ পা পিছলে অনেকটা পড়ে গিয়েছিল। নরম বরফে শরীর পড়ায় তেমন আঘাত লাগেনি। কিন্তু পড়ার পর আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিল। আনন্দ ছিল অনেকটা আগে। চিৎকার শুনে পিছিয়ে গিয়ে দেখেছিল সুদীপ উঠে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। তখনও ওর মুখে মৃত্যুভয় সেঁটে আছে। আনন্দর প্রশ্নের উত্তরে মাথা নেড়েছিল সে। ওই আঘাত থেকে ওর চেতনা ফিরে এসেছে কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না অবশ্য। এখনও সুদীপ কথা বলে না। কিন্তু অন্যরা কথা বললে আগ্রহ নিয়ে শোনে। এটা কম স্বস্তির নয়।

দরজাটা দ্বিতীয়বার খুলল। জয়িতার গলা শোনা গেল, 'উঃ, বাবা।'

আনন্দ কথা বলতে গিয়ে আবিষ্কার করল তার দাঁতে দাঁতে শব্দ হচ্ছে। যেন ঠাণ্ডায় স্বরনালী বিকল হয়ে গেছে। জয়িতা বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর ইশারা করে দৌড়াবার চেষ্টা করল সামনে। কিন্তু হাঁটু অবধি জমে থাকা নরম বরফে দৌড়ানো যে অসম্ভব ব্যাপার তা আবিষ্কার করে অসহায় চোখে তাকাল সে। আনন্দ সাবধানী পায়ে ওর পাশে দাঁড়াল। হাওয়ার দাপটে শরীর সোজা রাখা প্রায় অসম্ভব। সে জয়িতার হাত ধরল।

কয়েক পা এগোতে ওরা একটা ঘরের ছাদকে বরফের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে দেখল। আশেপাশে ঘর নেই। ভাঙ্গচুর হওয়া ছাদটি কোত্থেকে উড়ে এসেছে বোধগম্য হচ্ছিল না। গ্রামের ভেতর ঢোকার পর মনে হল কেউ যেন দুরমুশ করে দিয়েছে চৌদিক। অথচ কোন মানুষের শব্দ নেই। নবনির্মিত যৌথগৃহের প্রথমটির দরজা বন্ধ। আনন্দ দরজায় শব্দ করে যখন কোন সাড়া পেল না তখন চিৎকার করতে লাগল হাওয়ার দাপট ছাড়িয়ে।

দরজাটা খুলতে সময় লাগল। যে যুবকটি দরজা খুলেছিল সে তাদের দেখে যেন হতবাক। চটপট ভেতরে ঢুকে নিজেদের সামলে নেওয়ার আগেই অনেকগুলো গলা থেকে বিস্ময়সূচক শব্দ উচ্চারিত হল। তারপর একসঙ্গে অনেকেই কথা বলে উঠল। অন্তত জনা কুড়ি ছেলেমেয়ে বৃদ্ধ মাচার ওপরে স্তূপের মত বসেছিল। তারা আনন্দদের দেখে বিস্মিত এবং আনন্দিত। নিচে আগুন জ্বলছে। জঙ্গল থেকে কেটে এনে সঞ্চয় করে রাখা কাঠ এখন ওদের উত্তাপ দিচ্ছে। যুবকটি ওদের আগুনের কাছে নিয়ে

আসার বেশ কিছুক্ষণ পরে দেহে সাড় এল। জীবনে প্রথমবার আনন্দ অনুভব করল শরীরে রক্ত চলাচল করার অনুভূতি কি রকম। দাঁতের কাঁপুনি থামেনি কিন্তু এখন অনেক কম। আনন্দ যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'পালদেমরা কোথায় ?'

যুবকটি মাথা নাড়ল, 'আমরা জানি না। বরফঝড় শুরু হওয়ার পর আমরা ক'জন এখানে এসেছি।' একজন বৃদ্ধ চিৎকার করে বলল, 'তোমরা এই ঘর বানিয়ে দিয়েছ বলে আমরা বেঁচে গেলাম। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।'

জয়িতা এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। জ্বলন্ত কাঠের মধ্যে শরীর নিয়ে গিয়েছিল সে। সেই অবস্থায় মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এই ঝড় কখন থামবে ?'

বৃদ্ধ উত্তর দিল, 'জানিনা। এবার সবই অদ্ভুত। আমি জ্ঞান হবার পর এমন মারাত্মক ঝড় দেখিনি। এত বরফ ঝড়ের সঙ্গে কখনও পড়েনি।'

আনন্দ যুবকটির দিকে তাকাল। এরা এখানে কি খাচ্ছে তা জিজ্ঞাসা করা বাহুল্যমাত্র। যৌথগৃহের সব আয়োজন শেষ করার সময় পাওয়া যায়নি। ঝড়টা এসে পড়েছে আচমকা। কিন্তু তার আগে দেখা দরকার গ্রামের সমস্ত মানুষ নিরাপদ কিনা। সে জয়িতাকে বলল, 'যতই ঝড় উঠুক একবার গ্রামটা ঘুরে আসা উচিত। মনে হয় কেউ কেউ বিপদে পড়তে পারে। তুই বরং এখানে থাক। ওদের ভাবতে দে আমরা ওদের সঙ্গে আসছি। কোন আপত্তি আছে ?'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'বেঁচে গেলাম। ওই ঠাণ্ডায় আমি আবার বের হলে বেঁচে থাকতাম না।'

আনন্দ যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'কাহুন কোথায় ?'

যুবক বলল, 'মন্দিরে। মন্দিরে ঝড় ঢোকে না।'

আনন্দর মনে হল শেষ তিনটে শব্দ খুব স্বাভাবিক গলায় বলা হল না। কাহুনের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার ব্যাপারে এই যুবকের নিশ্চয়ই আপত্তি আছে। কিন্তু এখনই সে ওকে প্রশ্রয় দিল না। সে চিৎকার করে বলল, 'আপনারা যারা এখানে এসেছেন তাঁরা ঝড়ের হাত থেকে বেঁচে গেছেন। কিন্তু গ্রামের অন্য মানুষেরা কি অবস্থায় আছেন তা আমাদের দেখা কর্তব্য। আপনাদের মধ্যে যেসব যুবক শক্ত এবং সমর্থ তাঁরা আমার সঙ্গে আসুন।'

গুঞ্জন উঠল। আনন্দর চোখ তিন-চারজন যুবকের ওপর ছিল। তারা ইতস্তত করছে। মাচার ওপর গুড়িসুড়ি মেরে বসেছিল, প্রস্তাবটা শোনামাত্র সামান্য নড়ল। যে বৃদ্ধ আগ বাড়িয়ে কথা বলছিল সে বলল, 'কি হল, কেউ মাচা থেকে নামছে না যে ? বাইরের মানুষরা ঘর থেকে ঝড়ে বের হতে পেরেছে আর আমাদের হাত পা কি শরীরে ঢুকে গেল! কি হল !'

আর একটি বৃদ্ধার গলা শোনা গেল, 'সবাই ঠিকই আছে। নইলে এই ঝড়ে তারাও আশ্রয়ের খোঁজে আসত।'

আনন্দ জবাব দিল, 'আপনি হয়তো ঠিক বলছেন মা, কিন্তু তবু আমাদের নিজের চোখে দেখে আসা উচিত।'

সম্ভবত মা শব্দটি কানে যাওয়ায় বৃদ্ধার গলার স্বর পাল্টে গেল, 'তা ঠিক, ঠিক। এই ছেলেরা, তোরা এখানে বসে আরাম করছিস, একটুও লজ্জা করছে না ? তোদের বয়সী ছেলেমেয়েগুলো বাইরে বেরিয়ে আমাদের জন্যে কষ্ট করছে আর তোরা—, নাম, নাম।' বৃদ্ধার ঝাঁঝালো গলায় কাজ হল। তিন যুবক কোনরকমে শরীর মুড়ে নেমে এল, এবং আসাটা যে নিতান্তই অনিচ্ছায় তা বোঝা যাচ্ছিল ওদের মুখের চেহারায়। আনন্দ ব্যাপারটাকে পাত্তা দিল না। দরজা খুলে সে এবং চারজন যুবক বেরিয়ে এল। যে যুবকটি প্রথম দরজা খুলেছিল সে এখন তার পাশে, পেছনে তিনজন। সোঁ সোঁ করে হাওয়া চলছে। বাতাসে যে আবার গুঁড়ি গুঁড়ি তুষার মিশছে তা কয়েক পা হাঁটতেই বোঝা গেল। শরীর সাদা হয়ে যাচ্ছে।

প্রথম যে ঘরটিকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখল সেটার সামনে দাঁড়াল ওরা। সঙ্গী যুবকটি নাম ধরে চিৎকার করে ডাকছে। কিন্তু সেই চিৎকার বেশী দূর পৌঁছানোর কথা নয় হাওয়ার দাপটে। কাঠের স্তূপ কোনমতে সরিয়ে ভেতরে পা রাখতেই ওরা চমকে উঠল। একটি শরীর চিৎ হয়ে পড়ে আছে। অনড়। মুখে চমৎকার শান্তি। যুবকটি দুহাতে তাকে ধাক্কা দিয়ে হাঁউমাউ করে উঠল। মধ্যবয়স্কা মহিলাটির ভাবান্তর হওয়ার কথা নয়। আনন্দ যুবকটিকে টেনে তুলল। এই মাজাভাঙ্গা ঘরে আর কোন মানুষ নেই। বোঝাই যাচ্ছে কাঠ চাপা পড়ে প্রৌঢ়া মারা গিয়েছেন। ওর পেটের ওপর থেকে এখন স্তূপটাকে সরিয়ে নেওয়ার কোন মানে হয় না।

কিন্তু ব্যাপারটা অন্য তিন যুবকের মধ্যে আচমকা পরিবর্তন আনল। এই দুর্যোগ মৃত্যুর কারণ হয়েছে জানার পর যেন তাদের সঙ্কোচ দূর হল। যতটা সম্ভব চটপট পায়ে তারা পরের ঘরে আঘাত করল। ভেতর থেকে সাড়া মিলল, 'কে ?' যুবকটি বলল, 'তোমাদের যদি এখানে থাকতে অসুবিধে হয় তাহলে নতুন ঘরে চলে যাও, সেখানে আরামে থাকতে পারবে।'

খানিক পরে এই ঝড়ের মধ্যে এক চমকপ্রদ দৃশ্যের অবতারণা হল। দলে দলে ছেলেবুড়ো ছুটছে মাথা নিচু করে যৌথগৃহের দিকে। যেক'টি যৌথগৃহ এই গ্রামে বানানো হয়েছিল তা সম্ভবত এতক্ষণে ভরে উঠেছে। যাওয়ার আগে সবাই অবাক চোখে আনন্দকে দেখছিল। পালদেমের ঘরের সামনে এসে আনন্দ চিৎকার করল। এই সময় সে আবিষ্কার করল বিপরীত আবহাওয়া প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নেবার পর সহনীয় স্তরে পৌঁছে যায়। এখনও অবশ্য ঠাণ্ডা লাগছে, ঝড়ে কষ্ট হচ্ছে কিন্তু সেই কাঁপুনিটা নেই। ভেতর থেকে পালদেমের গলা পাওয়া গেল, 'কে, কে ডাকে ?'

'দরজা খোল, আমি আনন্দ।' আনন্দ এবার আঘাত করল।

দরজা খুলল পালদেমের বউ। আনন্দকে দেখে সে চমকে উঠল। তারপর তাড়াতাড়ি তাকে ঘরে ঢুকতে দিল। ভেতরে আসামাত্র বউটি হাঁউমাউ করে কিছু বলতে লাগল। পালদেম যে নেশায় চুর হয়ে বসে আছে তা বুঝতে অসুবিধে হল না। ঘরে আগুন নেই। বউটিও মদ খেয়েছে। বাচ্চাটা কুঁকড়ে একপাশে পড়ে আছে ছেঁড়া জামাকাপড় জড়িয়ে। একটা জীর্ণ কম্বল তার শরীরের ওপর চাপানো। আনন্দ এক মুহূর্ত চিন্তা করল। তারপর দুহাতে বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিল। ওর ভারী শরীর কিন্তু ঠাণ্ডায় যে কাতর তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। এই সময় যুবকদের একজন এসে পৌঁছাতেই আনন্দ তাকে বলল, 'এর মাকে নিয়ে এস যেখান থেকে তোমরা এসেছ।' তারপর মাথা নিচু করে দৌড়াতে লাগল ঝড়ের তাণ্ডব বাঁচিয়ে। বাচ্চাটা ককিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর, আনন্দ ছুটন্ত অবস্থায় আবিষ্কার করল, দুটো কচি হাত তাকে আঁকড়ে ধরেছে। আর মানুষের শরীরের উত্তাপ আনন্দকে এই মুহূর্তে উত্তপ্ত করল। এই আরামের কোন বিকল্প নেই। পথ

বেশী দূরের নয় কিন্তু আনন্দর কাছে যেন ফুরাতেই চাইছিল না।

ভেতরে ঢোকামাত্র জয়িতা এগিয়ে এল। আনন্দ কোনরকমে ওর হাতে বাচ্চাটাকে তুলে দিয়ে বলতে পারল, 'একে বাঁচা'। প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে জয়িতা বাচ্চাটাকে আগুনের পাশে রাখল। ঠাণ্ডায় নীল হয়ে গেছে ঠোঁট। মুখ নীরক্ত। সে উত্তাপ ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছিল পরম মমতায়। এখন বৃদ্ধারা তার আশেপাশে। তাঁরা নির্দেশ দিচ্ছিল কি করা উচিত এক্ষেত্রে। আনন্দ দম নিল। ঘর গিজ গিজ করছে। মাচা নয়, এখন মাটিতেও মানুষ। অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে দুধারে। সঞ্চিত কাঠ নিয়ে আসছে কেউ কেউ। এখন বেহিসাবী খরচ করা ঠিক নয়। কিন্তু কথাটা বলার সময়ও এটা নয়। এই সময় যুবকরা বাচ্চাটির মাকে নিয়ে এল। একনাগাড়ে কেঁদে চলেছে সে। এখনও তার হাবভাবে নেশার প্রতিক্রিয়া আছে। আনন্দ আবার বেরিয়ে এল। এবং আসতেই পালদেমকে দেখতে পেল। পালদেমের পা টলছে এবং সেটা যে ঝড়ের দাপটে নয় তা বোঝাই যাচ্ছে। আনন্দকে দেখামাত্র পালদেম বলল, 'আমার বাচ্চা-বউকে চুরি করে নিয়ে গেছে, মার শালাকে, মার।'

সঙ্গে সঙ্গে রক্ত উঠে গেল মাথায়। আনন্দ হাত তুলল। সঙ্গে সঙ্গে পালদেমের শরীরটা বরফের ওপর আছড়ে পড়ল। যে-যুবকটি পালদেমের বউকে নিয়ে গিয়েছিল যৌথগৃহে সে বেরিয়ে এসেছিল এই সময়। পালদেমের অভিযোগ তার কানে পৌঁছেছিল। তাই ওর পড়ে যাওয়া দেখেও হাসি সামলাতে পারল না সে। বরফের ওপর পড়ে গিয়ে এখন পালদেম টানটান হয়ে শুয়ে আছে। আনন্দ যুবকটিকে বলল, 'ওকে টেনে ভেতরে নিয়ে যাও। এখানে পড়ে থাকলে জমে যাবে।' যুবকটি চটপটে পায়ে কাছে গিয়ে পালদেমের হাত ধরে শরীরটাকে টেনে নিয়ে গেল। তাপল্যাঙের বেশীর ভাগ মানুষ যৌথগৃহে আশ্রয় নিয়েছে। যাদের ঘর মজবুত তারা সেখানেই থেকে গেছে। মৃত্যুর সংখ্যা আপাতত চার। অবশ্য ঝড় থামলে সঠিক বোঝা যাবে। শেষ যাকে আবিষ্কার করল তাকে আশা করেনি কেউ। নিজের ঘরের খুব কাছাকাছি জমে থাকা বরফে মুখ গুঁজে শরীরটা পড়েছিল। আবিষ্কৃত হওয়ার পর চেঁচামেচি করে সবাই ধরাধরি করে তাকে তুলে নিয়ে এল। প্রায় লোহার মত শক্ত হয়ে গেছে পালার দেহ। আনন্দ দেখল, মৃত্যু সংবাদ পাওয়ামাত্র তামাম তাপল্যাঙ চোখের জল ফেলছে। কেউ কেউ গলা খুলে কাঁদছে। যৌথগৃহের মহিলারা সুর করে একটানা কাঁদতে আরম্ভ করল। পালা এই গ্রামের প্রধান। অন্যতম বয়স্ক ব্যক্তি। জরা তাকে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল মানুষটাকে সবাই পালার সম্মান দিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে ঝড় শুরু হওয়ার পর যখন তার ঘরে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল তখন পালা আশ্রয়ের খোঁজে বাইরে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। তার শরীরের ওপর তুষার জমে ওঠায় চট করে কারো নজরে পড়েনি।

যৌথগৃহের আগুন এখন অত্যন্ত দুর্লভ বস্তু। সবাই তার চৌদিকে ভিড় করছে। কিন্তু আনন্দ ঢোকামাত্র কেউ কেউ তাকে আগুনের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিল। নিজেকে কোনরকমে সেখানে নিয়ে গিয়ে চোখ বন্ধ করে বুক ভরে বাতাস নিতে লাগল সে। মনে হচ্ছিল শরীরে একফোঁটা শক্তি অবশিষ্ট নেই। তার নাক দিয়ে অসাড়ে জল পড়ছিল। মুখের খোলা জায়গাগুলোতে কোন সাড় নেই। এই যৌথগৃহে এখন কান্না এবং শিশুদের চিৎকার সমানে চলছে। এই সময় একটা হাত আনন্দর কাঁধে উঠে এল। আনন্দ তাকাচ্ছিল না। আগুনের গনগনে তাপ সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে দিতে উন্মুখ ছিল সে। হাতের মালিকের গলা শুনতে পেল সে, 'তোমরা যা করলে তার তুলনা নেই। প্রত্যেক বছর শীত শুরু হবার ঝড়ে অন্তত জনা সাতেক বুড়োবুড়ি মরে যায়। তোমরা আমাদের বাঁচালে। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন।'

এবার আনন্দ চোখ তুলল। ভেনা। পালদেমের জামাই। এই ভেনাই সেদিন অসহযোগিতা করেছিল। তাপল্যাঙের সচ্ছল মানুষের সঙ্গে এক হয়ে আপত্তি তুলেছিল। কিন্তু ভেনা কেন যৌথগৃহে। ধরেই নেওয়া যায় ভেনার ঘরবাড়ি অনেক মজবুত। কিন্তু আনন্দ কোন কথা বলল না। আসলে কিছু বলার মত শক্তি সে খুঁজে পাচ্ছিল না। এত তীব্র ঠাণ্ডা এবং হাওয়ার ধার সে কোনদিন কল্পনাতেও আনেনি। পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে এই প্রকৃতি অচেনা। এবং যা অচেনা তাই অবাস্তব নয়। কলকাতার ঠাণ্ডায় যারা 'দারুণ শীত' বলে অভ্যস্ত তাদের কাছে এই আবহাওয়ায় মৃত্যু স্বচ্ছন্দে উপস্থিত হতে পারে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আর এক ধরনের সুখ চুঁইয়ে আসছিল আনন্দর মনে, সে অন্তত গ্রামের লোকগুলোকে আপাতত একটা নিরাপদ জায়গায় নিয়ে আসতে পেরেছে।

এখন দুপুর। হাওয়া কমেছে। তুষার মাখা ঠাণ্ডা বাতাস গুনগুনিয়ে ফিরছে। এই চেহারা দেখলে কে বলবে যে গত তিন রাতে কি ঘটেছিল! এখন বরফ পড়ছে না। জয়িতা শেষ পর্যন্ত পালদেমের বাচ্চাটাকে স্বাভাবিক নিঃশ্বাসে ঘুমাতে দেখল। পালদেম আর তার বউ এখনও মড়ার মত পড়ে আছে। এই যৌথগৃহের অনেকেই মদ খেয়েছে। বস্তুত শীতের হাত থেকে বাঁচার সহজতম হাতিয়ার এদের কাছে মদ। যে বাচ্চাগুলো ঘ্যানর ঘ্যানর করছে তাদের যে খিদে লেগেছে তা বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, মায়েরা প্রায় নির্বিকার। বৃদ্ধারা পালার শোকে কেঁদে চলেছে এখনও। এই কান্না চলবে যতক্ষণ পালার শরীর মাটির ওপরে থাকবে। জয়িতা আনন্দকে খুঁজল। আনন্দ বসে আছে যে ভঙ্গিতে তা দেখে আপাতত ওকে না ডাকার সিদ্ধান্ত নিল সে। তারপর তিন জন যুবকসঙ্গীকে নিয়ে বাইরে বের হল। চমৎকার হলদে রোদ নেতিয়ে আছে বরফের ওপরে। আকাশে ফাঁক গলিয়ে সূর্য আপাতত এটুকুই তাপল্যাঙকে দিতে পারছে। এ এক অপরূপ দৃশ্য। সমস্ত পাহাড় আর তার গায়ের বরফগুলো হলুদে মাখামাখি এখন। আর এসব দেখার মুহূর্তে জয়িতার কল্যাণের কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর একটা মোচড়, টপটপ করে জল ঝরতে লাগল গাল বেয়ে। এই কান্নার একটুও প্রস্তুতি ছিল না। এই সময় হালকা হিম-বাতাস বয়ে যেতেই দুটো গাল জুড়িয়ে গেল। ফেটে যাওয়া চামড়ায় একটা নরম আরাম ছড়িয়ে পড়ল। এবং সেটা টের পেতেই বুক নিংড়ে নিঃশ্বাস বের হল।

বাকী যৌথগৃহগুলোয় মানুষ উপচে পড়ছে। লা-ছিরিঙ একা তাদের দেখাশোনা করছে। জয়িতাকে দেখতে পেয়ে সে লাল দাঁত বের করে হাসল, 'আরও তিনটে এই রকম বাড়ি তৈরি করলে ভাল হত।'

জয়িতা বলল, 'আমাদের তো ধারণাই ছিল না। তোমার দেখা পেয়ে ভাল হয়েছে। আমরা যেসব চাল ডাল কিনে রেখেছিলাম সেগুলো বের করে রান্নার ব্যবস্থা কর! সন্ধ্যের আগেই প্রত্যেককে খাবার দিয়ে দাও।'

লা-ছিরিঙ মাথা নাড়ল, 'আমি এই কথাই ভাবছিলাম।'

হাওয়া বন্ধ হতে অনেকেই বেরিয়েছে যৌথগৃহ ছেড়ে। জয়িতা লক্ষ করল যে মানুষই তার সামনে পড়ছে সে-ই খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে মাথা নামিয়ে তাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে। যারা ঘর ছেড়ে বের হয়নি এবার তাদের খোঁজ নেওয়া শুরু হল। বৃদ্ধরা বলছে আজ রাত্রে আরও ভারী বরফ পড়বে। অতএব এখন থেকেই সাবধান হওয়া উচিত। কিন্তু যারা ঘরে রয়ে গেছে তারা জানে আপাতত কোন বিপদ নেই। তাদের উনুনে আগুন পড়েছে। স্পষ্টত এখন গ্রামে দুটো শ্রেণীর অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে। এটা হতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু জোর করে এক করার চেষ্টা বোকামির নামান্তর হবে। সে প্রত্যেক দরজায় গিয়ে বলে এল যদি কোন অসুবিধে হয় তাহলে বিনা দ্বিধায় যেন সবাই যৌথগৃহে চলে যায়।

এই সময় কাহুনকে দেখতে পেল সে। শিষ্যদের পেছনে নিয়ে তিনি মন্দির থেকে নেমে আসছেন। তাঁকে দেখে সবাই জড়ো হল। কাহুন ঘোষণা করলেন পালার অন্ত্যেষ্টি কাজ আগামীকাল হবে। তারপর তিনি তাকালেন জয়িতার দিকে। এক মুহূর্ত যেন চিন্তা করলেন। তাঁর শক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি চাও? নিজেদের জীবন বিপন্ন করে এই গ্রামের মানুষদের সাহায্য করছ কেন?'

জয়িতা বলল, 'এই গ্রামের মানুষরা আমাদের আশ্রয় দিয়েছে। আশ্রয়দাতারা আমাদের বন্ধু।'

'খুব ভাল উত্তর। কিন্তু তোমাদের জন্যে পুলিস এসেছিল এই গ্রামে। আমিও জীবনে পুলিস এই প্রথম দেখলাম। শুনেছি তারা একবার আসলে বার বার আসে। আবার এলে কি হবে?' কাহুনের মুখে হাসি।

এবার লা-ছিরিঙ জবাব দিল। তার গলায় যেন ঝাঁঝ মেশানো, 'এবার এলে আমরা সবাই লড়াই করব। আমাদের এই পাহাড়ে বাইরের পুলিস কি করতে পারে! এরা না থাকলে আজ আমরা কোথায় যেতাম বলতে পারেন?'

জয়িতা মাথা নাড়ল। তারপর এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কাহুন, আপনি ঈশ্বরের সেবক। সত্যি কথা বলছি, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ

নেই। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব মানুষের সঙ্গে। এই গ্রামের মানুষরা যদি মানুষের মত বাঁচার পথ খুঁজে পায় তাহলে আমাদের বন্ধুত্ব মূল্যবান হবে। আপনার ঈশ্বর কি চান না যে এরা মানুষের মত বেঁচে থাকুক?'

কাহুন মাথা নাড়লেন। কি যেন বিড় বিড় করে বললেন। বোঝা গেল তিনি জয়িতার কথার অর্থ ধরতে পারছেন না। যাওয়ার আগে বললেন, 'মৃতদের নিয়ে এস মন্দিরে। ওদের জন্যে প্রার্থনা করতে হবে।'

শুধু চাল এবং ডালের ঘ্যাঁট যে মানুষের কাছে উপাদেয় আগে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। জয়িতার গলা দিয়ে বস্তুটাকে নামাতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু ক্ষুধা এমন জিনিস যে শরীরকে বাধ্য করে একটু রসের লালা নিঃসরণ করাতে যা খাদ্যদ্রব্যটিকে পেটে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। অথচ চারপাশের মানুষ গোগ্রাসে খেয়ে যাচ্ছে। সেই সম্মিলিত শব্দ শুনতে শুনতে জয়িতার মনে হল এই মানুষগুলো পৃথিবীর অনেক লোভনীয় খাবারের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। যারা বছরে এক-আধবার চালের স্বাদ পায় তাদের কাছে এই খাবার অমৃত। আসলে আরও পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই মানুষের মনে অসন্তোষের বীজ বোনে।

আনন্দ এখন সহজ। কিন্তু সামান্য কাশি হয়েছে ওর এর মধ্যেই। জয়িতা ওকে বলল, 'তুই আজ এখান থেকে বের হস না। আমি একবার আস্তানা থেকে তোর বিছানা আর ট্যাবলেট এনে দেব।'

'ট্যাবলেট কি হবে?' আনন্দ হাসল।

'বলা যায় না, এ যা ঠাণ্ডা কি থেকে কি হয়ে যায়।' জয়িতার আবার কল্যাণের মুখ মনে পড়ল। ওর পাঠানো ওষুধের ঝোলায় ঠাণ্ডা থেকে তৈরি জ্বর এবং কাশির ওষুধ ছিল। আনন্দ বলল, 'ঠিক আছে। অনেকক্ষণ সুদীপের খবর পাইনি। ওরা কিছু খেল কিনা তাও জানি না। কাউকে পাঠালে ভাল হয়।'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'দরকার নেই। আস্তানায় যা আছে তাই দিয়ে মেয়েটা খাবার বানিয়ে নিতে পারবে। এখন কি কি কাজ বাকী আছে চিন্তা কর।'

আনন্দ চারপাশে তাকিয়ে নিল। তারপর বলল, 'লোকগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করতে হবে। একটাতে বাচ্চা আর মেয়েরা থাকবে। আর একটায় বুড়োবুড়ি। জোয়ানরা আলাদা। মেয়েদের একটা দল তৈরি করে তাদের ওপর রান্না আর সেবাশুশ্রূষার ভার দে। বুড়োবুড়িদের আপাতত কোন কাজ করতে হবে না। আজ আর সম্ভব হবে না, কাল থেকে ছেলেদের নিয়ে কাজে বের হতে হবে আমাদের।'

লা-ছিরিঙ পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে বাংলা বোঝে না। জয়িতারা কথা বলছিল বাংলায়। অতএব সে উদ্বিগ্ন মুখে শুনছিল সব। শেষ হতে বলল, 'তিনটে মুরগী মারা গিয়েছে। একটা ছাগল খুব চোট পেয়েছে। যে মেয়েটা তোমাদের সঙ্গে আছে তার ঘরে ওদের নিয়ে গিয়েছি। মুশকিল হল বরফ পড়ার পর ওদের খবর পাওয়া যাচ্ছে না। কি করা যায় বল তো?'

জয়িতা কিছু বলতে যাচ্ছিল। আনন্দ তাকে বাধা দিল, 'লা-ছিরিঙ, ওই জীবগুলো এই গ্রামের সম্পত্তি। ওদের সংখ্যা বাড়লে এই গ্রামের উপকার হবে। অতএব ওদের বাঁচিয়ে রাখা তোমাদের কর্তব্য। কিভাবে সেটা করবে তা তোমরাই ঠিক করবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা তোমাদের বলব এটা ঠিক নয়।'

লা-ছিরিঙ হাসল, 'আজ আমি ওদের ভাতডাল সেদ্ধ খেতে দিয়েছি।'

'না। তুমি অন্যায় করেছ।' আনন্দ রেগে গেল, 'তুমি অন্যায় করেছ। মানুষের জন্যে খাবার ব্যবস্থা করা যেখানে কষ্টকর ব্যাপার সেই খাবার ওদের দেওয়া উচিত হয়নি। তুমি এখনই কিছু ছেলেকে পাঠিয়ে দাও জঙ্গলে। ছাগলরা যেমন পাতা খায় তা যেন সন্ধের আগেই ওরা কেটে নিয়ে আসে। আর ঘরে ঘরে খোঁজ নিয়ে দ্যাখো মকাই-এর নষ্ট হয়ে দানা কার কাছে কত আছে। সেগুলো মুরগীদের জন্যে রাখ।'

লা-ছিরিঙ মাথা নেড়ে বেরিয়ে যেতে জয়িতা বলল, 'ওর ওপর ছেড়ে দিয়েও তো নিজে না বলে পারলি না। একটু আগে কাহুনের সঙ্গে কথা হল। আজ লোকটার হাবভাব ঠিক মনে হল না।'

চমকে উঠল আনন্দ, 'কেন? কি বলেছে কাহুন?'

'প্রশ্ন করছিল। কেন এসব করছি আমরা? পুলিসের দায় কে বইবে? এই সব।'

'লোকটাকে খাবার দেওয়া হয়েছে?'

'জানিনা।'

'না দেওয়া হলে তুই নিজে দিয়ে আয়। এখনই ওকে চটানো ঠিক হবে না। এদের জন্ম মৃত্যু ওই লোকটার সঙ্গে বাঁধা হয়ে আছে। এতবড় একটা দুর্যোগের পর বোধহয় কাহুন আশা করেছিল গ্রামবাসীরা ওর কাছে প্রার্থনার জন্যে যাবে। আমার ভুলও হতে পারে, কি জানি।' শেষ দিকে অন্যমনস্ক দেখাল আনন্দকে।

জয়িতা আর সময় নষ্ট করল না। একটা পাত্রে খাবার নিয়ে সে মন্দিরের দিকে রওনা হল। ধাপে ধাপে ওপরে উঠে সে দেখতে পেল শিষ্যরা মন্দিরের চত্বরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে একই খাবার খাচ্ছে। অর্থাৎ এখানেও খাবার পৌঁছে গেছে। জয়িতা ফিরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই কাহুন বেরিয়ে এলেন শূন্য পাত্র হাতে। এবং তখনই তিনি জয়িতাকে দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে জয়িতার মাথায় মতলবটা খেলে গেল। সে ধীর পায়ে কাহুনের সামনে গিয়ে পাত্রটা এগিয়ে ধরল। এক পাত্র শেষ করার পরও যে কাহুনের তৃপ্তি আসেনি তা বোঝা গেল তিনি যে তৎপরতায় জয়িতার হাত থেকে পাত্রটি নিলেন তা দেখে। খেতে খেতে কাহুন মাথা নাড়লেন, 'আমাকে একথা বলতেই হবে যে তোমরা গ্রামের মানুষদের উপকার করছ। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।'

জয়িতা বলল, 'আজ সবাইকে খাবার দেওয়া হচ্ছে। কাল ঠিক হয়েছে, যারা গ্রামের মানুষের জন্যে পরিশ্রম করবে তাদেরই খাবার দেওয়া হবে।'

'পরিশ্রম!' কাহুনের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল, 'কেন, পরিশ্রমের কথা উঠছে কেন?'

'যারা কাজ করবে না তাদের খাওয়ানো হবে না, তাই।'

'কাজ বলতে কি বোঝ তোমরা?'

'যা করলে গ্রামের মানুষের উপকার হবে, তাই।'

এবার কাহুনের মুখে হাসি ফুটল, 'তাই বল। আমি যে প্রতিনিয়ত ভগবানের কাছে গ্রামের মানুষের জন্যে প্রার্থনা করে যাচ্ছি সেটাও তো একটা কাজ। গ্রামের মানুষের উপকারের জন্যেই করা।'

জয়িতা বলতে যাচ্ছিল যে-উপকার চোখে দেখা যায় না, অনুভব করা যায় না তাকে স্বীকার করা যাচ্ছে না। কিন্তু আনন্দর পরামর্শ মনে রেখে সে চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। পাত্রটি শেষ করে ফিরিয়ে দিয়ে কাহুন মালা জপতে জপতে ফিরে গেলেন ভেতরে। এঁটো হাত ধোওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

আস্তানায় ঢোকার আগেই চমকে উঠল জয়িতা। তীব্র গন্ধটা নাকে লাগছিল। দরজা খুলে ভেতরে পা দিতেই সে হতবাক হয়ে গেল। মেয়েটি হাসছে। মাঝে মাঝে হাততালি দিচ্ছে। সুদীপ উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সেই চেষ্টার সময়েই বোঝা যাচ্ছিল ও প্রকৃতস্থ নয়। সুদীপ এমনিতেই আপাতত সুস্থ নয়। কিন্তু এই ভঙ্গি সেই ছবিটা থেকে ভিন্ন। চিলের মত ছোঁ মেরে মাটিতে পড়ে থাকা গ্লাসটা যে ক্ষিপ্রতায় সে তুলে নিল তা অনেকদিন সুদীপের কাছ থেকে আশা করেনি কেউ। দু ঢোক গলায় নিয়ে মেয়েটার হাতে গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সুদীপ। তারপর চিৎকার করে বলল, 'আঃ।'

জয়িতা যে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তা দুজনের কারোর লক্ষ্যে নেই। দুবার টলে সুদীপ হাঁটু মুড়ে আবার বসে পড়ল মাটিতে। তার মাথা এবার মেয়েটার পাশে এলিয়ে পড়তে সে সযত্নে তাকে তুলে নিল কোলে। তারপর ঝুঁকে পড়ে উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'ভাল লাগছে? তোমার ভাল লাগছে?'

'খু-উ-ব। খু-উ-ব।' চোখ বন্ধ করে শব্দ দুটো বিভিন্ন স্বরে উচ্চারণ করে মাথা নাড়ল সুদীপ। জয়িতা আরও অবাক। এখন সুদীপের কথা বুঝতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না। মেয়েটা সুদীপের কপালে হাত বোলাচ্ছে। কিন্তু এই দুর্যোগের মধ্যে ও মদ পেল কোথায়? বোঝাই যাচ্ছে মেয়েটি জোগাড় করে এনেছে। তীব্র মদ সুদীপের চেতনা মুছে দিয়েছিল। সেই মদই কি আবার চেতনা ফিরিয়ে আনছে? বিষে বিষক্ষয়! এই সময় মেয়েটি ঝুঁকে পড়ল। তারপর ধীরে ধীরে ঠোঁট চেপে ধরল সুদীপের কপালে। হঠাৎ জয়িতা আবিষ্কার করল তার শরীরে রক্ত সচল হয়েছে। আচমকা অস্বস্তি হচ্ছে তার। সুদীপ পড়ে রয়েছে স্থির হয়ে। মেয়েটি মুখ তুলল। আলতো হাত বোলালো সুদীপের গালে। তারপর ধীরে ধীরে ঠোঁট ছোঁয়াল সুদীপের বন্ধ চোখের পাতায়। প্রথমে বাম তার পরে ডান। সুদীপ নড়ছে না। কোন
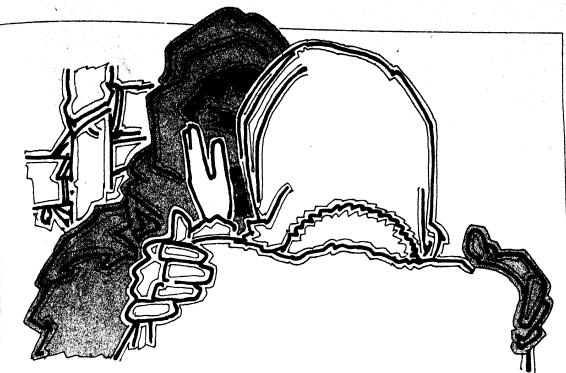
প্রতিক্রিয়া নেই। মুখ তুলে মেয়েটি সুদীপের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর খিলখিলিয়ে হাসল। সেই হাসির ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছিল তারও বেশ নেশা হয়েছে।

জয়িতা নড়তে সাহস পাচ্ছিল না। এই দৃশ্যকে অশ্লীল বলা যায় না। অথচ এতকাল যা অবশ্যম্ভাবী বলে সে আশংকা করেছিল তা চোখের সামনে দেখে স্থবির হয়ে পড়েছিল। সেইসঙ্গে তার মনে দ্বিতীয় একটা ইচ্ছে জন্ম নিল। সুদীপ সাড়া দিক, মেয়েটি যে কামনার আগুন জ্বালতে চাইছে তাতে উদ্দীপ্ত হোক। এবং তা হলেই ও স্বাভাবিক সুদীপে ফিরে আসবে। মেয়েটির বোধহয় দেখা শেষ হল। তার মাথা আবার ঝুঁকে পড়ল সুদীপের ওপরে। খুব যত্নে সে নিজের ঠোঁট দুটো ছোঁয়ালো সুদীপের ঠোঁটে। প্রথমে আলতো। তারপর নিচের ঠোঁট বোলালো। ওর সাপের মত জিভ দেখতে পেল জয়িতা। এবং এই প্রক্রিয়ার পর সে প্রচণ্ড শক্তিতে চেপে ধরল ঠোঁট সুদীপের ঠোঁটে। যেন সুদীপের ঠোঁট কামড়ে তুলে নিতে চায় এমন মনে হচ্ছিল তার ভঙ্গিতে।

এবং তখনই ঝটপট করে উঠে বসল সুদীপ। দুহাতে নিজের ঠোঁট ঢাকল। মুখ থেকে উচ্চারিত হল, 'আঃ।' শোনামাত্র মেয়েটি আবার খিলখিলিয়ে হাসল। হেসে মদের গ্লাস তুলে ধরল। সুদীপ সেদিকে একবার তাকাল। তারপর ঢকঢক করে তরল পদার্থটি গলায় চালান করে দিয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল, 'হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট ?' ঠিক এতটার জন্যে প্রস্তুত ছিল না জয়িতা। সুদীপের চেতনা ফিরছে বোঝা যাচ্ছিল কিন্তু ও যে অত স্পষ্ট ইংরেজী বলতে পারবে এবং সেই একই ভঙ্গিতে তা বিশ্বাসে ছিল না। ওর এত আনন্দ হচ্ছিল যে ছুটে গিয়ে সুদীপকে জড়িয়ে ধরতে পারলে তৃপ্তি পেত। সুদীপ সুস্থ হওয়া মানে জীবনটাকে সচল দেখা।

মেয়েটা সুদীপের ইংরেজী বুঝতে পারল না। কিন্তু ওই প্রশ্ন উচ্চারণ করার ধরন হয়তো অনুমান করতে পারল। সে চোখ বন্ধ করে নিজের মুখটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে দুটো ঠোঁট তুলে ধরল। সুদীপ এক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'গুড।' তারপর দায়সারা গোছের একটা চুমু খেয়ে উঠে দাঁড়াল, 'দ্যাটস এনাফ।' কিন্তু দাঁড়ানো মাত্র তার শরীর টলতে লাগল। নিজের মনে সুদীপ বিড়বিড় করল, 'যাঃ শালা। আই অ্যাম ড্রাঙ্ক। শী ওয়ান্টস টু স্লিপ উইথ মি ! শ্যুড আই ? কৃতজ্ঞতা বলেও তো একটা জিনিস আছে। লুক, আই হ্যাভ নেভার স্লেপ্ট বিফোর। আমি যে শোব কিন্তু আমার বন্ধুরা কি বলবে ? আনন্দ, কল্যাণ— !' হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সুদীপ। মাটিতে বসে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মেয়েটি এমন হতভম্ব হয়ে গেল যে তার মুখ থেকে সমস্ত বাসনার চিত্র উধাও হয়ে গেল। দূর থেকেই সে সুদীপের পায়ের ওপর একটা হাত আলতো করে রাখল। জয়িতার মনে হল ওই হাতের যে স্পর্শ তা যে কোন মায়ের হতে পারত।

বাইরে বেরিয়ে এসে স্বস্তি পেল জয়িতা। যাক, সুদীপ এখন সুস্থ হয়েছে। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে ওই মেয়েটির সঙ্গে সুদীপ কাল নয় পরশু শারীরিক সম্পর্কে আসবে। এটা ন্যায় না অন্যায় সে জানে না। মেয়েটি যে দিনের পর দিন সুদীপের সেবা করে গেছে তা সবাই দেখতে পেয়েছে। সুদীপও সেটা জানে। নইলে বলত না কৃতজ্ঞতা বলে একটা জিনিস আছে। হঠাৎ মাথার ভেতর সব গোলমাল হয়ে গেল জয়িতার। সটান ফিরে এল আস্তানায়। শব্দ করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে চিৎকার করে উঠল, 'কি অবলার মত কাঁদছিস ! তোর লজ্জা করছে না ?' মুখ তুলে তাকাল সুদীপ। তার মুখে হাসি ফুটল। তারপর অদ্ভুত গলায় বলল, 'এই যে জোয়ান অফ আর্ক এসে গেছে ! নাকি লক্ষ্মী বাঈ ! আমি কাঁদছি তো কার কি ! তুই তো একটা মরুভূমি। এক ফোঁটা জল নেই যে কাঁদবি। তাকাচ্ছিস কি ! তুই কাঁদতে পারিস ?'

জয়িতা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল, 'আমি মরুভূমি !'

'নোস ?' টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সুদীপ, 'তাহলে দাঁড়া। দেখি তোকে।'

কোনরকমে এগিয়ে এল সুদীপ। তারপর জয়িতার মুখের দিকে ঝুঁকে সোজা হয়ে হাসল। একটা হাত তুলে আঙুল দিয়ে জয়িতার চিবুক থেকে কিছু তুলে নিয়ে চোখের সামনে ধরল, 'এটা কিরে ? ভাত ! তুই এখানে এসে জংলী হয়ে গেছিস জয়। খেয়ে দেয়ে মুখ ধুতে হয় ভুলে গেছিস। আমাকে তোর খুব ঘেন্না দিতে ইচ্ছে করছে, না ?'

'বাংলাটা ঠিক করে বল। মরুভূমি দেখলি ?'

মাথা নাড়ল সুদীপ। তারপর বলল, 'তোর দুটো হাত আমার গালে রাখবি জয় ?'

নাড়া খেল জয়িতা। তারপর ধীরে ধীরে সে দুটো হাতে সুদীপের মুখ ধরল। পবিত্র আলো ফুটে উঠল সুদীপের মুখে, 'আঃ। জন্মদিনে এত আরাম কখনও পাইনি রে।'

ক্রমশ

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

TOPAZ

Concept-MI-9197 B

তিন টুকরো গল্প

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

ঘুষ

গোবিন্দর পিছনে যে গোয়েন্দা লেগেছে তা বুঝতে তার কয়েকদিন সময় লাগল। আসলে লোকটাকে বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখে প্রথমে তাকে গোয়েন্দা বলে সন্দেহই হয়নি। লোকটির চেহারা বেশ শক্তপোক্ত, রুক্ষ, রাগী-রাগী, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, দাড়ি প্রায়ই কামানো থাকে না, পরনে সাধারণ জামা আর প্যান্ট। সে আড়ে আড়ে বাড়ির ওপর নজর রাখে, চোখাচোখি হলে চোখ সরিয়ে নেয়, তবে পালায় না।

প্রথমে গোবিন্দর সন্দেহ হল, লোকটা তার বউয়ের গুপ্ত প্রণয়ী বা জার। তাই সে একদিন খুব সাহস সঞ্চয় করে বউ শাশ্বতীকে ডেকে বলল, লোকটা কে?

শাশ্বতী মেদ কমানোর জন্য ব্যায়াম করছে, নাচ শিখছে। সুফলও ফলেছে। আজকাল তাকে বেশ ছুকরি-ছুকরি লাগে। প্লাক করা ভ্রূ ওপরে তুলে চরম বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, কোন লোকটা গো?

ওই যে, ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায়ই ওকে আনাচে কানাচে দেখি, ও তোমার ইয়ে টিয়ে নয় তো!

শাশ্বতী জানালায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ফটকের পাশে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখে তার স্টেপ কাট করা চুল ঝামরে বলল, কক্ষনো নয়। ও মা, এসব আবার কী কথা তোমার মুখে! লোকটাকে তো আমি চিনিই না।

এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া শুরু হল। সেই ঝগড়া চলল তিন দিন। তার পর মান অভিমান, কান্নাকাটি। শাশ্বতী অবশেষে বলল সে একমাত্র তার ব্যায়াম-শিক্ষক জগুদা ছাড়া আর কোনও লোককেই তার যোগ্য প্রণয়ী বলে মনে করে না।

এ কথা শুনে গোবিন্দ একটু নিশ্চিন্ত হল বটে, কিন্তু সন্দেহ গিয়ে পড়ল বড় মেয়ে পিয়ালীর ওপর। লোকটা পিয়ালীর প্রেমিক নয় তো!

কথাটা একদিন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তুলতেই পিয়ালী গম্ভীর মুখ করে বলল, হাবুলদা ছাড়া আমার জীবনে আর কোনও—

গোবিন্দ খানিকটা স্বস্তি বোধ করল বটে, কিন্তু লোকটা তাহলে কে এই প্রশ্নটা কেরোসিনের গন্ধের মতো চারপাশের বাতাসে লেগেই রইল।

তবে কি গোয়েন্দা? বলতে কি গোবিন্দের ওপর গোয়েন্দাদের নজর পড়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। গোবিন্দ যে ইদানীং শাঁসালো হয়ে উঠছে তা বহু চেষ্টা করেও গোপন রাখা যাচ্ছে না।

গোবিন্দ শুরু করেছিল একেবারে শুরু থেকে অর্থাৎ "কিছু না" থেকে। তারপর ধীরে ধীরে তার উন্নতি ঘটেছে এবং এখনও ঘটেই চলেছে। একবার উন্নতি শুরু হলে তাকে ঠেকায় কার সাধ্য। কিন্তু গোবিন্দ বোকা নয়। সে তার উন্নতিকে যথেষ্ট সাবধানে এবং বিস্তর চেষ্টায় গোপন রাখে। সে তার নতুন জামায় তালি লাগিয়ে নেয়। ছেঁড়া জুতো পরে, পুরোনো ছাতা ব্যবহার করে, দুদিন পর পর দাড়ি কামায় ইত্যাদি। সে তার বাড়িটাকে ইচ্ছে করেই সম্পূর্ণ করেনি, একটু শ্রীছাঁদহীন করে রেখেছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্কে তার আট দশটা লকার আছে, বাড়িতে মাটির নিচে আছে গুপ্ত কুঠুরী। কিন্তু সেগুলিতে সামানাই সোনাদানা আছে তার। তার যত টাকা সবই নানা কারবারে উৎপাদনে, ঋণপত্রে লগ্নী করা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, গোবিন্দ যখন খুব গরিব ছিল তখন সে দেখেছে যে দারিদ্র্য জিনিসটাকে কিছুতেই ঢাকাচাপা দিয়ে রাখা যায় না। নানা ফাঁক ফোঁকর দিয়ে দারিদ্র্য প্রকাশ হয়ে পড়েই এবং পাঁচজনকে জানান দেয় যে, এই লোকটা আসলে গরিব। মাছ দিয়ে শাক ঢাকছে। আবার সম্পদ জিনিসটাও ঠিক তাই যতই চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা যাক না কেন, নানা ফাঁক ফোঁকর দিয়ে সম্পদ উঁকি মারবেই এবং পাঁচজনকে জানান দেবে যে, এই লোকটা আসলে শাঁসালো। শাক দিয়ে মাছ ঢাকছে।

গোবিন্দের বউ লোক-দেখানো গয়না পরে না বটে, কিন্তু তাঁর বাঁ হাতের অনামিকায় যে হীরের আংটিটা আছে তার দাম ত্রিশ হাজার টাকা। তার ব্যায়ামের শিক্ষক আর নাচের গুরু মাসে পাঁচশো টাকা করে নেয়। বিউটি পারলারেও নিশ্চয়ই মোটা খরচ হয়, তার রেট গোবিন্দও অবশ্য জানে না। সে নিজে তালি দেওয়া জামা আর তাপ্পি দেওয়া জুতো পরলেও তার ছেলেমেয়েরা বাজারের সেরা জামা জুতো পরে, সেরা স্কুলে পড়তে যায় এবং প্রত্যেকের আবার প্রতিটি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা গৃহশিক্ষক বা শিক্ষিকা আছেন, যাঁরা কেউ পাঁচশো টাকার কম নেন না। ষাট সত্তর টাকা থেকে দেড়শো টাকা কিলোগ্রামের মাছ তারা ফেলে ছড়িয়ে প্রতিদিন খায়। এসব কি আর গোপন থাকে?

সম্পদ হল নতুন-প্রেমে-পড়া কিশোরীর মতো, সারাক্ষণ ফাঁক ফোঁকর দিয়ে উঁকি ঝুঁকি দেয়। আর তখন ওই গোয়েন্দাটার সঙ্গে কি আর চোখাচোখি হয় না তার?

লোকটা যে গোবিন্দের ওপর নজর রাখছে তা সে গোপনও করছে না তেমন। এবং লোকটা তার সম্বন্ধে কী ভাবছে তা আন্দাজ করতেই গোবিন্দর ভীষণ লজ্জা হয়। ভয় তো আছেই।

গোবিন্দ যতই গরিব সেজে থাকুক তার হাতঘড়িটার দাম চার হাজার টাকা। সেদিন বেরোবার সময় গোবিন্দ লক্ষ্য করল, লোকটা ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে আড়চোখে তার ঘড়িটাকে নজর করছে। গোবিন্দর বুকটা কেঁপে উঠল। সে তাড়াতাড়ি ঘড়িটা কানের কাছে তুলে একটু ঝাঁকিয়ে শোনার ভান করে স্বগতোক্তি করল, এঃ, বন্ধ হয়ে গেছে। হবে না! আশি টাকার সস্তা ঘড়ি আর কদ্দিন চলবে।

শাশ্বতী যথেষ্টই সুন্দরী। ইদানীং ব্যায়াম করে আর নেচে আরও সুন্দরী হয়েছে। খঞ্জনা পাখির মতো শরীর। রাস্তায় বেরোলে পাঁচজনে তাকায় এবং তারিয়ে তারিয়ে দেখে। কিন্তু নির্লজ্জ গোয়েন্দাটা শাশ্বতীকে না দেখে বাঁ হাতের একরত্তি হীরের আংটিটার দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকে।

বাজারে গিয়ে মাছ বা অসময়ের দামী ফুলকপি কিনতে গিয়ে গোবিন্দ প্রায়ই টের পায় গোয়েন্দাটা তার ঘাড়ে শ্বাসফেলার মতো দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটা সি বি আই না ইনকাম ট্যাক্স না অ্যান্টি করাপশান না আর কিছু তা বুঝতে পারছে না গোবিন্দ। কিন্তু অবস্থাটা যে চলতে দেওয়া যায় না তা সে বেশ বুঝতে পারছে। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার।

গোবিন্দ তক্কে তক্কে রইল। আর একদিন শীতের রাতে গলির মধ্যে লোকটাকে একা পেয়ে গেল। লোকটা একটু আনমনা ছিল সেদিন। আকাশের চাঁদ দেখছিল।

গোবিন্দ খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে বিগলিত গলায় ডাকল, স্যার ?

অ্যাঁ ?

আপনি কি ঘুষ খান ?

লোকটা একেবারে আঁতকে উঠে গোবিন্দর দিকে বাক্যহারা হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল।

কী বললেন ?

গোবিন্দ হাসিটাকে বিগলিত করে করে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, আজ্ঞে জিজ্ঞেস করছিলুম আপনি কি ঘুষ খান ?

লোকটা একথা শুনে নববধূর মতো মাথা নত করে ফেলল লজ্জায়। তারপর অতিশয় লাজুক হাসি হাসতে হাসতে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে প্রায় ফুলশয্যার রাতের নববধূর মতোই ফিসফিস করে বলল, খাই।

আজ্ঞে এখন কি খাবেন ?

লোকটা লজ্জায় চোখ পর্যন্ত তুলতে পারল না। তবে খুবই অনুরাগে ভরা গলায় বলল, পেলেই খাই। কেউ তো দেয় না স্যার।

গোবিন্দ তৈরিই ছিল। পকেটে হাত ভরে দশ টাকার একখানা নোট বের করে লোকটার লাজুক হাতে ধরিয়ে একেবারে আদর করে মুঠি পাকিয়ে দিল।

লোকটা নববধূর মতোই প্রথম পুরুষস্পর্শের লজ্জাতেই যেন চট করে হাতটা টেনে নিয়ে প্যান্টের পকেটে পুরল। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, এর অবশ্য তেমন দরকার ছিল না স্যার।

গোবিন্দ গাঢ় স্বরে বলল, দুনিয়াটা টিকে আছে তো এই পরস্পরকে দেখার মধ্যেই। আপনি আমাকে দেখবেন, আমি আপনাকে।

বড় ভাল কথা স্যার, বাড়ি গিয়ে খাতায় টুকে রাখব। মহাপুরুষদের বাণী নোট করে রাখা আমার একটা হবি স্যার।

ঠাট্টা করছেন স্যার ? মহাপুরুষ আর হতে পারলুম কই ? আমি তো কাপুরুষ। রেটটা বোধ হয় একটু কম হয়ে গেল স্যার। গরিব মানুষ আমি, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তার ওপর আপনিই তো শুধু নন, আপনার ওপরওলা সাহেবরা আছেন, তার ওপর কর্তারা আছেন, তার ওপর খোদ কর্তারা আছেন, তাঁদেরও খুশি করতে হবে। তা কটা বাজে বলতে পারেন স্যার ? ঘড়িটা কখন থেকে বন্ধ হয়ে আছে।

আজ্ঞে এই দশটা। আপনার সব কথাই আমি খাতায় টুকে রাখব স্যার। একসঙ্গে এত ভাল ভাল কথা বহুকাল শুনিনি।

আর ঠাণ্ডা লাগাবেন না। রাতও হয়েছে। শীতের রাতে খাবার বড় তাড়াতাড়ি জুড়োয়।

লোকটা বিরহের দৃষ্টিতে একবার গোবিন্দর দিকে চেয়ে চলে গেল।

দুদিন পর ফের দেখা। রাতের গলিতে। এবার লোকটাই ডাকল, স্যার।

গোবিন্দ একটু থমকে বিগলিত হাস্যে মুখ ভরিয়ে ফেলে বলল, ভাল আছেন তো স্যার ?

আপনার আশীর্ব্বাদে চলে যাচ্ছে। বলছিলুম কি, আমি কিন্তু ঘুষ খাই স্যার। এখন পেলেও খাই—

গোবিন্দ খুব বিজ্ঞের মতো হাসল। প্রথম দিন থেকে সে রেটটা কম রেখে দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছে, মাঝে মাঝে দশটা টাকা দিতে এমন কিছু গায়ে লাগে না। একশ টাকা হলে লাগত। ফের দশটা টাকা লোকটার লাজুক মুঠির মধ্যে ভরে দিয়ে সে বলল, আরে তাতে কি, খাওয়াই তো দুনিয়ার সব। এই যে বাড়ি ফিরে গিয়ে মোটা চালের ঠাণ্ডা ভাত আর জলের মতো একটু ডাল, কালো মতো একটা ছেঁচকি কয়েক ফোঁটা চোখের জল মিশিয়ে গিলব স্যার, তার মধ্যেও একটা সূক্ষ্ম আনন্দ আছে।

একথাটা যা বলেছেন, আর কোনও শালার মহাপুরুষ বলতে পারেননি। ডট পেনটার রিফিল ফুরিয়ে না গেলে আজই গিয়ে লিখে ফেলতাম।

লোকটাকে নিজের পকেটের দামী ডট পেনটা উদারভাবে দিয়ে গোবিন্দ একটু হাসল, বলল, কিসব ছাতামাথা বলি, তবু যদি লিখে রাখবার ইচ্ছে হয় স্যার তো লিখবেন। তবে রিপোর্টটা একটু গরিবের দিকে টেনে লিখবেন স্যার। আপনার ডট পেনের রিফিল আমি কখনও ফুরোতে দেবো না।

লোকটা চলে গেল। দু চার দিন পর আবার এল।

স্যার।

স্যার।

কী যে নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন স্যার, আর ছাড়তে পারছি না। কিসের নেশা স্যার ?

আজ্ঞে ঘুষের. ঘুষ না খেলে কেমন যেন শরীরটা ঘুষঘুষ করে। আইঢাই করে, হাই ওঠে, ঘুম পায়, দুঃস্বপ্ন দেখা দেয়, কী নেই কী নেই মনে হয়। ওফ, জবর নেশা বটে। তিন দিন হল ঘুষ খাইনি স্যার, দেখুন কেমন দড়ি পাকিয়ে গেছি।

আহা। আগে বলতে হয়। এই যে—বলে ফের দশটা টাকা তার কুণ্ঠিত মুঠিতে ভরে দেয় গোবিন্দ। তারপর বলে, আচ্ছা আপনি কি সি বি আই ?

আজ্ঞে না।

তবে কি ইনকাম ট্যাক্স ?

আজ্ঞে না।

অ্যান্টি করাপশানই তাহলে ?

আজ্ঞে না।

তাহলে আপনি কোন ডিপার্টমেন্টের ?

তোফাজ্জেলের কারখানায় বিড়ি বাঁধার কাজ করি স্যার। বড় ছেলেটা লায়েক হয়েছে। তার একটা চাকরির জন্যই ঘোরাঘুরি করছিলুম স্যার আপনার কাছেপিঠে। কিন্তু ওফ, ছেলের চাকরির চেয়েও বড় জিনিস আপনি দিয়েছেন স্যার আমাকে। কী নেশা : কী নেশা ! একদিন ঘুষ না খেলেই হাত নিসপিস করে, নাক সুড়সুড় করে. মাথা ভোঁ ভোঁ করে। ঘুষের মতো জিনিস হয় না।

অ্যাঁ। বলে গোবিন্দ হাঁ করে চেয়ে রইল। তারপর রাগ করে বলল, আরে মশাই, আপনি তো মহা ইয়ে দেখছি, এঃ, আমি আপনাকে ইয়ে মনে করে এতগুলো টাকা গচ্চা দিলুম।

লোকটা সবেগে মাথা নেড়ে বলল, গচ্চা নয় স্যার, লোকশিক্ষা। ঘুষ কাকে বলে কখনও জানতুম না স্যার, আপনার দয়ায় জানলুম। এও জানলুম, ঘুষ ছাড়া মানুষের জীবনটাই আলুনি, বিস্বাদ। কি করে যে এত কাল ঘুষ না খেয়ে বেঁচে ছিলুম তাই ভাবি আর অবাক হই। ঘুষটা বন্ধ করবেন না স্যার, মরে যাবো।

গোবিন্দ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, তা বলে-

রাগ করবেন না স্যার। আপনার ভুল হয়নি। ঘুষ জিনিসটায় আমাদের সকলেরই জন্মগত অধিকার। কিন্তু পায় কয়জন ? আপনার দয়ায় এই আমি পেয়েছি।

তা বলে তোমাকে ঘুষ দিতে যাবো কেন হ্যা !

লোকটা চোখ নামিয়ে নববধূর মতো লাজুক গলায় বলল, সব খবরই নিয়েছি স্যার। হীরের আংটি, চার হাজার টাকা দামের ঘড়ি,পাঁচশো টাকার মাস্টার—

গোবিন্দ লোকটার কাঁধে হাত রেখে হাসলো। বলল, ঠাট্টা করছিলুম, কিছু মনে করবেন না। মাঝে মাঝে আসবেন। পরস্পরকে আমরা না দেখলে কে আর দেখবে।

আজই খাতায় টুকে ফেলব স্যার।

॥ ২ ॥

ক্ষুধা ও জাতীয় সংহতি

ক্ষুধা কথাটার মানে ব্যাকরণ বইতে আছে "খাইবার ইচ্ছা"। চারুবাক মানেটা জানে। আর এও জানে এত বড় ভুল মানে আর হয় না। অন্তত তার ক্ষেত্রে তো বটেই। চারুবাকের খিদে পায়, গনগনে খিদে পায়, কিন্তু কখনও ওই "খাইবার ইচ্ছা"হয় না। পৃথিবীতে এত রকমের খাবার, তার কোনওটাই তার কখনও মুখে তুলতে ইচ্ছে করে না। খাওয়ার কথা ভাবলেই সে ভয়ে শিউরে ওঠে। খাওয়ার সময় ঘনিয়ে এলেই তার মন খারাপ হয়ে যেতে থাকে। খাবার মুখে তোলা, চিবোনো এবং তা গিলে ফেলা পৃথিবীতে তার কাছে সবচেয়ে অনভিপ্রেত এবং শ্রমসাধ্য কাজ। পেটে খিদে নিয়েই দিব্যি দিন কাটিয়ে দিতে পারে সে। দিনের পর দিন।

শিশুকালে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে তার মাকে হিমসিম খেতে হয়েছে। বুকের দুধ বা ফিডিং বটলের চুষি মুখে নিত না বলে তাকে থাপ্পড় মেরে বা চিমটি কেটে কাঁদিয়ে নিয়ে ঝিনুক দিয়ে গেলানো হত। প্রায়ই সেই দুধ উগরে দিত সে।

বড় হয়ে চারুবাক যে বেঁচে আছে এটাই অনেকের কাছে বিস্ময়। তার বউ শীলার কাছেও। শীলা চারুবাকের এই অরুচি দেখে দেখে পাগল হওয়ার উপক্রম। তাকে খাওয়াবেই এই জেদবশে সে হাজার রকমের রান্না শিখেছে, রেঁধেছে, কিন্তু চারুবাক এমনভাবে নাক কুঁচকে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে যে অনেকবার আত্মঘাতী হওয়ার ইচ্ছে হয়েছে শীলার।

কেন খাবে না, কেন খাও না তুমি ? কিভাবে বেঁচে থাকবে তবে ?

শীলার এই আর্ত প্রশ্নের সামনে খুবই সংকুচিত হয়ে চারুবাক বলে, বেঁচে তো আছি। রোগা হলেও দিব্যি চলে ফিরে বেড়াচ্ছি তো।

কিন্তু আমি যে এত যত্ন করে রাঁধি, এত আদর করে বেড়ে দিই ?

তা বটে, কিন্তু পৃথিবীর কোনও খাবারই আমার রোচে না।

শীলা রাগে, ক্ষোভে, হতাশায় অসহায়ের মতো কাঁদতে থাকে। চারুবাক নির্বাক হয়ে বিষণ্ণ বদনে বসে থাকে।

চারুবাক ফ্রিজ পছন্দ করে না। বাড়ির মধ্যে দুটি ঘরে সে পারতপক্ষে ঢোকে না—রান্নাঘর আর খাওয়ার ঘর। সে সব্জী বা মাছের বাজারে যেতে খুবই অনিচ্ছা প্রকাশ করে। সে মিষ্টির দোকান, রেস্টুরেন্ট দেখলে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

একদিন দুদিন পর নিতান্তই বেঁচে থাকার জন্য কিছু না কিছু খেতেই হয় চারুবাককে। সেই সময়টা তাঁর মুখে ফুটে ওঠে ভয়, ক্রোধ, অসহায়তা। ডাক্তাররা তার এই অরুচির কারণ খুঁজতে গিয়ে হার মেনেছেন। স্বাস্থ্যকর জায়গায় যাওয়া বা হাওয়া বদল গেছে বৃথা। চারুবাকের খিদে পায় শুধু "খাইবার ইচ্ছা" কখনোই হয় না।

একটা সেমিনারে দিল্লি যাচ্ছিল চারুবাক। ট্রেনে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ। গিন্নি, ছেলে, মেয়ে, শালাশালীর বাহিনী নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। বেশ ধমক চমক করে কথা বলেন, আত্মবিশ্বাস প্রবল। লব্ধপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক চারুবাককে পেটে আঙুলের খোঁচা মেরে তিনি অম্লানবদনে বললেন, আমি এদের নিয়ে বেরিয়েছি জাতীয় সংহতি জিনিসটা বোঝানোর জন্য। ঘুরবে, ফিরবে, মিশবে, দেখবে, শিখবে, তবে না সংহতির বোধটা আসবে।

চারুবাক বলল, তা বটে।

চারুবাকের পেটে দ্বিতীয় খোঁচাটা মেরে ভদ্রলোক বললেন, জাতীয় সংহতি জিনিসটা অত সহজ নয় মশাই। এই যে খালিস্তান নিয়ে লড়ালড়ি গোর্খাল্যান্ড নিয়ে ধানাইপানাই কেন জানেন ?

আজ্ঞে না।

খুব সোজা মশাই, খুব সোজা, ভারতীয় হিসেবে তারা নিজেদের আইডেনটিফাই করতে পারছে না যে। এত বড় একটা দেশ, এতগুলো ভাষা, এত ধর্ম, আইডেনটিফাই করা কি সোজা ? মানুষ দিশেহারা হয়ে যায় না ? এই যে আমরা এক পরিবারের এতগুলো লোক একসঙ্গে চলেছি এই আমরাই মাঝে মাঝে আইডেনটিটি হারিয়ে ফেলি। তাই আমি—

এই সময়ে ভদ্রলোকের স্ত্রী একটা কাঁসার রেকাবিতে এক গোছা লুচি আর আলুর ছেঁচকি ভদ্রলোককে এগিয়ে দেওয়াতে কথায় বাধা পড়ল।খাবার দেখে চারুবাকও তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ঘুমের ভান করতে লাগল।

তবে লোকটা খাওয়া সেরে আরও কিছুক্ষণ জাতীয় সংহতির কথা বলে আপার বাংকে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালবেলায় বাংক থেকে নেমে লুঙ্গির কষি আঁটতে আঁটতে চারুবাকের দিকে চেয়ে বলল, হ্যাঁ যে কথাটা হচ্ছিল। ভারতীয় হিসেবে আমাদের আইডেনটিটি কী মশাই ?

অ্যাঁ ! আইডেনটিটিটা কী ? আমি যে ইন্ডিয়ান, ইন্ডিয়ানরা যে এক পরিবারের লোক তা আমি ফিল করব কীভাবে ?

চারুবাকের ট্রেনে ভাল ঘুম হয় না। মেজাজ শরীর দুই-ই বিগড়ে আছে কোনওরকমে দেঁতো হাসি হেসে বলল, প্রবলেম, দারুণ প্রবলেম।

নো প্রবলেম। জাতীয় সংহতি গড়ে তুলতে হলে কী করা উচিত জানেন ? করা উচিত—

বলতে বলতে ভদ্রলোক স্ত্রীর দিকে হাত বাড়ালেন। তাঁর স্ত্রী তাড়াতাড়ি একটা লাল রঙের টুথব্রাস বের করে পেস্ট লাগিয়ে স্বামী হাতে ধরিয়ে দিলেন, ভদ্রলোক সবেগে দাঁতে ব্রাশ চালাতে চালাতে বললেন, একটা ফ্যামিলি গড়ে তোলা উচিত। আর ফ্যামিলি গড়ে তুলতে হলে—

বাকি কথাটা পেস্টের পিচ্ছল ফেনায় চাপা পড়ে গেল। ভদ্রলোক বেসিন থেকে মুখ ধুয়ে এসে ব্রাশটা স্ত্রীর হাতে দিয়ে তোয়ালেয় মুখ মুছতে মুছতে বললেন, হ্যাঁ ফ্যামিলি গড়ে তুলতে হলে—

কথাটা ভাল শুনতে পেল না চারুবাক। কারণ সে সবিস্ময়ে দেখল ভদ্রলোকের স্ত্রী লাল টুথ ব্রাশটা হাতে নিয়ে তাতে ফের পেস্ট লাগিয়ে দাঁত ব্রাস করতে করতে বাথরুমের দিকে চলে গেলেন।

চারুবাক একটা শব্দ করল, ওয়াক—

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, ওয়ার্ক দিয়ে কিছু হবে না মশাই। জাতীয় সংহতি গড়ে না উঠলে ওয়ার্ক এগোবে কি করে ? দেশপ্রেম বলে কিছু আছে এখন ভারতবর্ষে ? কেউ কারও জন্য ফিল করছে ?

চারুবাক ফের একটা ওয়াক তুলতে গিয়েও চেপে রইল জোর করে। তার কপালে ঘাম জমে উঠছিল।

ভদ্রমহিলা ফিরে এসে সেই ব্রাশটায় ফের আর এক দফা টুথপেস্ট লাগিয়ে বড় মেয়েকে বললেন তাড়াতাড়ি যা, বেসিনের জল ফুরিয়ে যাবে।

মেয়েটা অম্লানবদনে ব্রাশটা মুখে পুরে উঠে গেল। চারুবাক শব্দ করল ওয়াক ওয়াক—

ভদ্রলোক তার পেটে আঙুলের একটা খোঁচা দিয়ে বললেন, আপনার দুঃখটা আমি বুঝি মশাই, দেশে কাজকর্ম কিছুই হচ্ছে না। কিন্তু কথা হল কাজটা কার জন্য ? দেশ ? কোনটা আমার দেশ ?বর্ধমান না পশ্চিমবঙ্গ না পূর্বাঞ্চল না ভারতবর্ষ ? সাধারণ মানুষরা যে ভারতবর্ষ কাকে বলে তাই জানে না। এমন কি অনেকেই জানে না যে, দেশে এখন ব্রিটিশ রুল নেই, অনেকেই জানে না যে....

বড় মেয়ে ফিরে এসে ব্রাশটা তার মায়ের হাতে ফেরত দিল।

চারুবাক সম্মোহিতের মতো চেয়ে দেখল, ভদ্রমহিলা ফের সেই ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে ছেলের হাতে দিলেন। ছেলে ব্রাশ মুখে দিয়ে উঠে গেল।

চারুবাক একটা দুর্বোধ্য গর-র-র-র শব্দ করল।

সরকার ? ভদ্রলোক তার পেটে আর একটা খোঁচা দিয়ে ধমকে উঠলেন। তারপর হাঃ হাঃ করে হেসে বললেন, সরকার হল এক বোবা কালা অন্ধ প্রতিষ্ঠান। কে কোথায় ধুঁকছে, কে কোথায় খাবি খাচ্ছে, কে দুধে ভাতে আছে, কে মরল কে পড়ল কোনও খবরই সে রাখে না, বুঝলেন মশাই ? এই যে আমি আপনি এই যে আমরা—এই আমরা সবাই বেঁচে আছি যেযে-যার নিজের দায়িত্বে। সরকার পারবে না মশাই, সরকারের বাপও পারবে না জাতীয় সংহতি গড়ে তুলতে। আসলে—

ছেলেটা ফিরে এল। লাল টকটকে সেই ব্রাশে আবার পেস্ট লাগানো হল। এবার গেল ছোট মেয়ে।

চারুবাক খকখক করে কাশতে লাগল। পেটের মধ্যে কী যেন পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে, গোঁতলানি দিচ্ছে।

চারুবাকের পেটে আর একটা খোঁচা মেরে ভদ্রলোক বললেন, আমরা প্রত্যেকেই যে যার নিজের দায়িত্বে বেঁচে আছি। জানি আমাদের দেখবার কেউ নেই। আর সেই জন্যই আমরা যে যার নিজের ঘর গোছাতে লেগে যাই। আপনি বাঁচলে চাচার নাম। তবে কিনা—

চারুবাক মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখল, সেই লাল ব্রাশে ফের পেস্ট লাগানো হয়েছে এবং ভদ্রলোকের বড় শালা ব্রাশটা নিয়ে বাথরুমের দিকে গেল।

চারুবাক ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বাক্যহারা, বোধহীন হয়ে যেতে লাগল, তার মাথা ভোঁ ভোঁ করতে লাগল।

ভদ্রলোক তার কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলে উঠলেন, আর সেই জন্যই এখন ভারতবর্ষে গড়ে উঠছে ক্ল্যান, লোকাল পার্টি, ধর্মগোষ্ঠী। যেন ছোট ছোট সব ফ্যামিলি, হ্যাঁ, ফ্যামিলি, আর সেই সব ফ্যামিলিতে ফ্যামিলিতে গড়ে উঠছে–

বড় শালা ফিরে এল। সেই লাল টকটকে ব্রাশটা নিয়ে এবার গেল ছোটো শালা।

চারুবাক অজ্ঞান হয়ে যাবে কিনা বুঝতে পারছিল না। সে অবশ হাতে নিজের নাড়ী দেখতে লাগল। নাড়ী চলছে, তবে অতি ক্ষীণ।

ফ্যামিলি ! বুঝলেন ? ফ্যামিলি ! এই ফ্যামিলি ফিলিংটাকে যদি আরও বড় করে দেন যদি ফ্যামিলির মধ্যে গোটা ভারতবর্ষকে টেনে আনতে পারেন যদি—

ছোটো শালা ফিরে এল। চারুবাক আর পারল না। অস্ফুট গলায় সে বলার চেষ্টা করল ব্রাশ....ব্রাশ....

ভদ্রলোক থমকে গেলেন, ব্রাশ ? আরে আরে নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, টুথ ব্রাশ আনেননি তো ? তাতে কী হয়েছে ? আমাদেরটাই নিন না। নিজেকে আমাদের ফ্যামিলির একজন বলে ভাবুন। আরে এইভাবেই তো ফ্যামিলি ফিলিং বাড়ে, এই ভাবেই তো,....ওগো ও খেদীর মা, দাও দাও ব্রাশে একটু পেস্ট লাগিয়ে দাও—

ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে চারুবাকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন এখনও বেসিনে জল আছে। তাড়াতাড়ি চলে যান, এর পর আর....

সম্মোহিতের মতো উঠে দাঁড়াল চারুবাক। নিজের নয়, যেন অন্য কারও ইচ্ছাশক্তিতে চালিত হচ্ছে সে। কী হচ্ছে তা সে বুঝতে পারছে না। তার গা ঘিন ঘিন করছে, পেটের মধ্যে উথালপাথাল, গলায় আটকে রয়েছে বমি।

টলতে টলতে চারুবাক বেসিনের কাছে এল। আয়নায় ওটা তো তারই মুখ ! হ্যাঁ, তারই। তবু মুখটা যেন প্রাত্যহিক নয়। অন্যরকম।

লাল ব্রাশটা সমেত হাত উঠে এল মুখের কাছে। চারুবাক সভয়ে চোখ বন্ধ করল।

তারপর অবধারিত টের পেল, দাঁতের সঙ্গে ব্রাশের সংঘর্ষের সেই চির পরিচিত শব্দ। কুড়কুড় কুড়কুড় ঘুসঘুস, ঘ্যাস ঘ্যাস....

মুখ ধুয়ে ফিরে এল চারুবাক। আশ্চর্য তার ঘেন্নাপিত্তি গেল কোথায় ? কেননা যেন ফুরফুরে লাগছে নিজেকে ! জ্বর সেরে গেলে যেমনটা হয় তেমনই যেন ! লাল ব্রাশটা সহর্ষে ওপরের দিকে তুলে ধরলেন ভদ্রলোক। তারপর চেঁচিয়ে বললেন আর কারও লাগবে দাদা ! দয়া করে বলবেন। বী ওয়ান অফ আওয়ার ফ্যামিলি, বী এ গুড সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া, লজ্জা করবেন না....

একটার পর একটা কুণ্ঠিত হাত এগিয়ে আসতে লাগল একে একে।

একটা স্টেশন এসে গেছে। প্ল্যাটফর্মে পুরী তরকারী, সিঙ্গাড়া কচৌড়ী বিক্রি হচ্ছে।

চারুবাক হাঘরের মতো খাবার কিনে গোগ্রাসে খেতে লাগল। তার অরুচি সেরে গেছে।

॥ ৩ ॥

বাজি ও কুকুর

বাজির শব্দে কুকুরটা ভয় পেয়ে খাটের তলায় ঢুকেছে। আর সেখান থেকেই পরিত্রাহি আর্তনাদ করে যাচ্ছে। একটানা একঘেয়ে, স্নায়ুবিদারক। ডিউক খুবই ভাল জাতের অ্যালসেশিয়ান কুকুর। কখনও কাঁদে না বা ডাক ছেড়ে চেঁচায় না। ধমক শোনে, আদর সোহাগ বোঝে। কিন্তু কালীপুজোর দিন তার সব শিক্ষাদীক্ষা জলাঞ্জলি দিয়ে সে রাস্তার কুকুরের মতোই চেঁচায়।

রণেন অনেকবার চেষ্টা করেছেন ডিউককে ঠাণ্ডা করতে অন্তত চুপ করিয়ে রাখতে। পারেননি। এখন কুকুরের চিৎকারে তাঁর স্নায়ু বিকল হওয়ার জোগাড়।

ডিউকের সঙ্গে রণেনের তেমন মাখামাখি নেই। গৃহপালিত পশুপাখি তাঁর পছন্দ নয়। ছেলেবেলায় আদরের কুকুর, বেড়াল, ও পাখির মৃত্যু কয়েকবার দেখেছেন, পোষা খরগোশ তাঁর কোলেই মরে গিয়েছিল। সেই থেকে তিনি আর পশুপাখি পোষেননি।

ডিউককে কোন এক কুকুর-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিনে এনেছিল তাঁর ছেলে লুকু। এনেছিল তাঁর জন্যই। বছর দেড়েক আগে রণেনের স্ত্রী রত্নাবতী আকস্মিকভাবে মারা যান। রণেন যে খুব ভেঙে পড়েছিলেন তা নয়। তবে একটু চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। লুকু ধরে নিয়েছিল, তিনি পত্নীশোকে ভেঙে পড়েছেন। নানাভাবে রত্নাবতীর শূন্য স্থান পূরণের একটা অক্ষম চেষ্টা লুকু করেছে। কাজটা সে ছেলে বলেই করেছে।

কিন্তু ফলটা ভাল হয়নি। রত্নাবতী মারা যাওয়ার পর তাঁকে পুরী এবং ভুবনেশ্বর ঘুরিয়ে এনেছিল লুকু এবং তার জন্য নিজের বউ সুমিতার কাছে যথেষ্ট কটু কথা শুনেছে। আদিখ্যেতা আজকালকার মেয়েরা পছন্দ করে না। তার ওপর এই কুকুর। লুকুর ধারণা, কুকুরটা সঙ্গী হিসেবে থাকলে রণেনের মনটা একটু ভাল থাকবে, বিদেহী পত্নীপ্রেম হয়তো বা কুকুরকে কেন্দ্র করে একটা আশ্রয় পেয়ে যাবে। পায়নি, বলাই বাহুল্য, কারণ রণেনের পত্নীপ্রেম ছিল না। সারমেয় প্রেমও তাঁর দরকার নেই। তবু লুকু পাছে দুঃখ পায় সেই ভেবে তিনি প্রথম প্রথম জোর করে কুকুরটাকে একটু একটু লাই দিতেন। তারপর সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে পড়েন। আসলে বুড়ো বয়সে একটাই অভাব থাকে। কথা বলার লোক থাকে না। আর বুকে এক গাদা কথা জমে থাকে কাউকে বলবার জন্য। যেমন ছিল তাঁর নাতি জয়। কিছু বুঝত না, কিন্তু শুনত। বলতও অজস্র। ঠিক যেমন বন্ধুরা হয় আর কি।

একদিন লুকুকে তিনি বলে ফেলেছিলেন, জয়টা যদি কাছে থাকত তবে বেশ হত।

লুকু অবাক হয়ে বলল, সেটা কী করে সম্ভব?

রণেন জানেন, সম্ভব নয়। তাঁর একমাত্র নাতি জয়কে বছরখানেক হল নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। ওরকম নামী স্কুলে যে ভর্তি করা গেছে সেইটাই লোকে সৌভাগ্য বলে মানবে। সুতরাং তাকে আর কাছে পাওয়ার আশা করা বৃথা। তবে স্কুল বন্ধ থাকলে আসে। এখন যেমন এসেছে। তবে সেই আগের জয় আর নেই। এক বছরের মধ্যেই কেমন একটু সাবালক এবং ভারিক্কি হয়েছে। দাদু-দাদু এখনও করে বটে, কিন্তু কেমন যেন একটু কেজো মানুষ হয়ে গেছে, সেই নেই-আঁকড়ে আবদারে ভাবটা আর নেই।

ঘাড়ে দীর্ঘদিনের স্পণ্ডেলাইটিসের ব্যথা। তবু নিচু হয়ে চৌকির তলায় কুকুরটাকে দেখবার চেষ্টা করছিলেন রণেন। গলা তুলে কেঁ-উ কেঁ-উ করে ডাকছে। সন্ধে থেকে ডাকছে বলে গলাটা কি একটু ভাঙা ভাঙা?

বাড়িতে রণেন আর রান্নাবান্নার লোকটি ছাড়া কেউ নেই। শমিতাদের বাড়ি বাগবাজারে বিরাট করে কালীপুজো হয়। অনেক টাকার বাজি পোড়ে, গোটাকয়েক পাঁটা বলি হয়। ওরা আজ ওখানেই থাকবে। তবে লুকু ফিরে আসতে পারে। সেরকমই বলে গেছে।

শিবু। শিবু। আবার ডাকলেন রণেন। এ পর্যন্ত বহুবার ডেকেছেন। শিবু ফ্ল্যাটে বা আশেপাশে নেই। রান্নাঘর খোলা পড়ে আছে, বাতি জ্বলছে। পনেরো ষোলো বছরের ছেলেকে আজকের রাতের অন্যমনস্কতার জন্য দোষ দেওয়া যায় না। দশতলার ছাদে বাজি পোড়ানো হচ্ছে, একতলায় পুজো। তারই কোথাও গিয়ে সেঁটে আছে। ডাল ভাত তরকারি ঝোল সব ওবেলাই রেঁধে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। রাতে শুধু গরম করে দেবে। রণেন রাত দশটা সাড়ে দশটার আগে খান না। সুতরাং শিবু নিশ্চিন্ত।

রণেনের ফ্ল্যাটটা বেশ বড়ই। দেড়হাজার স্কোয়ার ফুট। সস্তাগণ্ডার সময়েও সোয়া লাখ দাম পড়েছিল। এখন হেসে খেলে ছ-সাত লাখ টাকা। রত্নাবতীর নামেই করেছিলেন। এখনও তাঁর নামেই আছে। এই ফ্ল্যাটে রণেনের নিজস্ব একখানা ঘর আছে। সবচেয়ে ছোটো ঘরখানাই তিনি বেছে নিয়েছেন। সেই ঘরে জিনিসপত্র বলতে গেলে কিছুই নেই। খরচ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনকেও সঙ্কুচিত করে ফেলেছেন তিনি। জামাকাপড়ের ওয়ার্ডরোব একসময়ে উপচে পড়ত। আজকাল একজোড়া হাওয়াই আর একজোড়া বেরোনোর চপ্পল। বারোটা লাইটার ছিল। সিগারেট ছেড়েছেন তিন বছর আগে। এখন একটাও লাইটার নেই। বক্স খাটটা ছেলেকে দিয়ে একখানা সাধারণ চৌকি পেতে নিয়েছেন ঘরে। আর একখানা ইজিচেয়ার। ছোট্ট একটা টেবিল। রণেনের বিষয় সম্পত্তি বলতে এইটুকুই। তবে বইপত্র কিছু আছে, কিছু সাময়িক পত্রিকা। এগুলোই তার অবসরের সঙ্গী।

কাচের শার্সি সবই বন্ধ। তবু বীভৎস লাগাতার বাজির শব্দ ঠেকানো যাচ্ছে না। এরকম ছেদহীনভাবে বাজি পোড়াতে হলে কত টাকা খরচ হতে পারে তা রণেন ভেবে পান না। তার ওপর এই শব্দ সহ্য করার জন্য শক্ত নার্ভও চাই। বাজির শব্দের সঙ্গে ডিউকের চিৎকার রণেনকে যেন খান খান করে ভেঙে ফেলছে।

অন্য সব ঘরের দরজা বন্ধ এবং চাবি দেওয়া। কেন কে জানে, ওরা কোথাও বেরোলে ঘরগুলো সব বন্ধ করে রেখে যায়। শুধু বসার ঘর আর রান্নাঘর খোলা থাকে। রণেনের অন্য কোনও ঘরে গিয়ে আত্মরক্ষা করার উপায় নেই, বসার ঘর ছাড়া। কিন্তু বসার ঘরটা গিয়ে শেষ হয়েছে গ্রীল দেওয়া বারান্দায়। সেখানে কোনও কাচের শার্সি নেই। এই সাঙ্ঘাতিক, প্রাণঘাতী বাজির শব্দ সেখানে আটকানো যাবে না। আর তিনি গেলে ডিউকও তাঁকে অনুসরণ করবেই।

অসহায়ভাবে রণেন ইজিচেয়ারে বসে একটা ম্যাগাজিন খুলে অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভিতরটা এমন কাঁপছে, এত অস্থির লাগছে যে, উঠে পড়তে হল।

ঘাড়ের ব্যথা নিয়েই আবার নিচু হলেন, ডিউক! ডিউক!

ডিউক ফিরে তাকাল এবং বলল, কী বলছ?

রণেন ছিটকে পড়লেন মেঝেয়। মাথাটা ঝিমঝিম করল। আজকাল বুড়ো বয়সে কি ভীমরতি ধরল! না কি স্বপ্ন দেখছেন?

বাঁ কনুইতে একটু চোট পেলেন। তবে তেমন কিছু নয়। ফের উঠলেন রণেন। সভয়ে নিচু হয়ে ডিউকের দিকে চাইলেন। ডিউক দু থাবার মধ্যে মাথা রেখে কেঁ-উ কেঁ-উ করে কাঁদছে।

ডিউক!

তখন থেকে কেন যে ডাকছো! আমি বেরোবো না। যাও।

বুকটা ধক করে উঠেই যেন কয়েক সেকেন্ডের জন্য থেমে গেল। তবে ফের চলল। ধড়াস ধড়াস করে। একটু শ্বাসকষ্টও হতে লাগল রণেনের।

সাবধানে আবার ডাকলেন, ডিউক!

তখন থেকে কেন যে ফ্যাচ ফ্যাচ করছ! কী চাও বলো তো!

অবিশ্বাস্য। সম্পূর্ণ ভৌতিক! অলৌকিক! তবু রণেন এবার নিজেকে শক্ত রাখলেন। কাঁপা গলায় বললেন, তুই কি কথা বলতে পারিস?

পারি। তবে এখন কাঁদছি। কাঁদতে দাও।

কাঁদছিস কেন?

আমার পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ছে।

পূর্বজন্ম? ওরকম কিছু সত্যিই আছে নাকি?

আছে। না থাকলে মনে পড়বে কেন?

পূর্বজন্মে তুই কী ছিলি? কুকুরই তো!

না। তবে কুকুরের অধম। বারোটা ছেলেপুলে ছিল। না খেয়ে খেয়ে, রোগে ভুগে চোখের সামনে মরেছে। দুটোকে চোর বলে পিটিয়ে মারে। একজন জেল খাটত। সে বেঁচে আছে কিনা জানি না। রাস্তার কুকুরের মতো এঁটো-কাঁটা খুঁটে খেতুম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতুম, কুকুরের মতোই যদি বেঁচে আছি তবে কুকুরই করলে না কেন? সেই প্রার্থনা ভগবান বোধহয় শুনেছেন। বাজির শব্দে মাথাটা কেমন টলমল করছিল, হঠাৎ সব মনে পড়ল।

এ জন্মে তোর কেমন লাগছে?

সুখে আছি, বেশ সুখে। আগের জন্মের চেয়ে ঢের ভাল মাংসের সুরুয়া খাই, গমের খিচুড়ি, সাত তলায় বাস, সুখের বাকি কী? শুনলুম তোমার ছেলে আমাকে সাতশ টাকায় কিনেছে! শুনে ভারী আনন্দ হল। আমার এত দাম হবে ভাবিনি কখনো।

চুপ, চুপ। অত টাকায় তোকে কেনা হয়েছে তা খবর্দার বলিসনি। তাহলে লুকুকে তার বউ বকবে।

জানি। লুকু কমিয়ে বলেছে। সত্তর টাকা। তাইতেও বাপান্ত হচ্ছে। কিন্তু যার জন্য কেনা হল সে তো পাত্তা দিচ্ছে না।

রাগ করিস না ডিউক। আমি কি জানতুম যে—

তোমার বউয়ের অভাব আমি মাদী কুকুর হয়েও পূরণ করতে পারব না বাপু, তা ঠিক।

তুই মাদী নাকি?

তাও জানো না! আচ্ছা লোক বাপু!

তোর নাম যে ডিউক।

সে যদি তোমরা নাম দাও তাতে আমার কী করার আছে?

আগের জন্মে মদ্দা ছিলি?

না, মাদীই। বললুম না রাস্তার কুকুরের মতো জীবন ছিল। বারোটা বাচ্চা হল বারোটা পুরুষের দোষে। তারা কেউ আমার স্বামী ছিল না। আমি তো বেওয়ারিশ, বেশ্যার অধম।

খুব কষ্ট ছিল তোর।

এখনও আছে। বড় কষ্ট। এখন যাও ইজিচেয়ারে বসে থাকো গে। আমি একটু কাঁদি।

কাঁদ ডিউক।

রণেন ইজিচেয়ারে এসে বসলেন। একাই একটু হাসলেন তিনি। খুশিই লাগছে মনটা। কথা বলার মতো একজনকে পাওয়া গেল এত দিনে। সময়টা কেটে যাবে।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

ফুটবল স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর

বিকাশ মুখোপাধ্যায়

আঠারো শ' অষ্ট-আশিতে আই· এফ· এ তৈরি হলেও আই· এফ· এ শীল্ড টুর্নামেন্ট শুরু হয় আঠারো শ' তিরানব্বইতে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে মোট দু হাজার টাকা চাঁদা তুলে এই শীল্ড তৈরি হয়েছিল। প্রথমবার শীল্ড জেতে রয়াল আইরিশ রাইফেল। কোনও ভারতীয় দলের শীল্ড জয় করতে লেগে যায় আরও আঠরো বছর, উনিশ শ' এগারো সালে মোহনবাগান এই ট্রফি জেতে। স্বাধীনতার আগে অবধি তারপর মহামেডান, ইস্ট বেঙ্গল, এরিয়ানস এবং ই· বি· রেলওয়ে ভারতীয় দল হিসাবে শীল্ড জেতে। কিন্তু এখন থেকে পঁচাত্তর বছর আগে সেই প্রথম বারের জয়, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ভাষায় 'পলাশীর প্রতিশোধ' ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করে। "সাহেবদের হারাতে হবে" এই ইচ্ছা নিয়ে সেদিন ময়দানে হাজির হয়েছিল হাজার হাজার মানুষ। সম্রাজের সর্ব শ্রেণীর মানুষেরই মন ছিল সেদিন মাঠের দিকে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত তৎকালীন যুগের প্রথিতযশা সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণসভায় হাজির হতে ভুলে যান বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বরা, স্মরণসভা মুলতুবী হয়ে যায়। সৌভ্রাতৃত্বের নিদর্শন হিসাবে হিন্দুভাইদের জয়ে গর্বিত হাজার হাজার মুসলমান মাটির ওপর আনন্দে গড়াগড়ি খান। অভিনয় মঞ্চ থেকে শাবাশ জানান নটনাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

সাহেবী কাগজ 'দ্য টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া' ম্যাচ রিপোর্ট করে 'রাউট অব দ্য কিংস সোলজারস্ ইন বুটস এন্ড সুজ বাই বেয়ারফুটেড বেঙ্গলি ল্যাডস' শিরোনামে। 'দ্য বেঙ্গলি' পত্রিকায় কবিতায় লেখা হয় বিশেষ সম্পাদকীয় "আ ভিক্টরি গ্রান্ড টু বিহোল্ড/ সিরিন এন্ড নোবেল ব্রাইট এন্ড বোল্ড।' 'মানসী'তে 'এলিজি' লেখেন করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবাসীতে লেখা হয় 'আমরা খুশি কিন্তু বিস্মিত নই।' প্রসিদ্ধ হারমোনিয়ম কোম্পানি 'হ্মন্ড এন্ড চ্যাট' পুরো দুমাসের জন্যে দশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট ঘোষণা করে। স্ট্যান্ডার্ড সাইকেল কোম্পানী বিজয়ীদলের হাফটোন ফটো ছাপে দু লক্ষর বেশি, এবং সেগুলো বিনামূল্যে বিতরিত হয়। সে এক সর্বস্তরের গণজাগরণ, এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা।

পোস্টগায়ের যতীন চক্কোত্তি মশায় বেরিয়েছিলেন আগের দিন। তালতলায় তাঁর বেয়াই বাড়ি। এমনিতে বেয়াইবাড়িতে আসেন কালেভদ্রে এবং আগে কখনও রাত্রিবাস করেন নি। ছেলের শ্বশুরবাড়িতে এক রাতের জন্যেও

১৯১১-র শিল্ড জয়ী মোহনবাগান দল। (বাঁদিক থেকে দাঁড়িয়ে) রাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নীলমাধব ভট্টাচার্য, হীরালাল মুখার্জী, মনমোহন মুখার্জী, সুধীর চ্যাটার্জী, এ সুকুল ; (বাঁদিক থেকে বসে) যতীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীশচন্দ্র সরকার, অভিলাষ ঘোষ, বিজয়দাস ভাদুড়ী এবং শিবদাস ভাদুড়ী।

[illegible] সে যুগে ভাবা যেত না। তবু যতীন চক্কোত্তি মশায় সব নিষেধের কথা ভুলে আটাশে জুলাই-এর বিকালে তালতলায়। বেয়াই পান্নালাল বাঁড়ুজ্জে শশব্যস্ত, এত খুশি হলেন যে কি করবেন ঠিক পান না। আধ ঘণ্টা পর যতীনবাবু তাকিয়া ঠেস দিয়ে গড়গড়ায় টান দিতে দিতে আসার কারণ ব্যক্ত করলেন। পান্নালাল শুনে বেজায় খুশি, সাধারণত মোহনবাগানের খেলা থাকলেই তাঁর মাঠে যাওয়া অভ্যাস, আর সেবারে অর্থাৎ উনিশ শ এগারোর আই· এফ· এ শীল্ডের মোহনবাগানের সব খেলাগুলোতেই তিনি মাঠে হাজির ছিলেন মোট

দেশি-বিদেশি সংবাদের ভিত্তিতে পি সি এল-এর কার্টুন

পাঁচদিন। কি খেলছেন সেবার ভাদুড়ি ভাইরা—শিবদাস এবং বিজয়দাস। প্রায় প্রতি খেলায় গোল করেছেন তাঁরা। ফার্স্ট রাউন্ডে ছিল সেন্ট জেভিয়ার্সের সঙ্গে খেলা, শিবদাস ভাদুড়ি করলেন দু গোল, অভিলাষ ঘোষ একটা, বিরুদ্ধে কোন গোল হয়নি। দ্বিতীয় রাউন্ডে রেঞ্জার্স হারল ২-১ গোলে, একটা শিবদাস দিলেন অন্যটা বিজয়দাস। পরের খেলায় এক গোলে হারল রাইফেল বিগ্রেড, বিজয়দাস গোলদাতা। মিডল সেক্সের সঙ্গে সেমিফাইনাল, প্রথম দিন ১-১ ড্র, সেদিন অবশ্য গোলদাতা বি রায়। পরের দিন ৩-১, একটা গোল শিবদাসের, বাকী দুটি হাবুল সরকার এবং রায়ের। যতীন চক্কোত্তি মশায় ফাইনাল খেলা দেখতে এসেছেন শুনে পান্নালাল সবিস্তারে আগের খেলাগুলোর গল্প করলেন। ফাইনাল খেলা যাদের সঙ্গে সেই ইস্ট ইয়র্ক দলের খেলাগুলোর ফলাফল এক লহমায় বলে নিলেন, ইস্ট ইয়র্ক খেলছে দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে। প্রথম খেলায় রয়েল স্টকসের সঙ্গে ড্র করার পর দ্বিতীয়দিন হারায় ৩-২ গোলে। পরের খেলায় 'মুসলিম'কে একেবারে ৭-১ গোল। সেমি ফাইনালে হারিয়েছে জবরদস্ত ক্যালকাটাকে এক গোলে। যতীনবাবু জানালেন, এমনিতে খেলা দেখেন ক্বচিৎ কদাচিৎ কিন্তু সারা বর্ধমান, হুগলী হাওড়া এ খেলা দেখবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে। তাঁর গ্রামের দু চারজন বলেছে, 'এমন একটা জিনিস হচ্ছে চক্কোত্তিমশায়, আপনি দেখে এসে আমাদের গল্প করেন। সব গাঁয়ের দু চারজন যাচ্ছে।' তাদের কথা শুনে খানিকটা দোনোমোনো করে তারপর চলে এসেছেন। এখন এখানে এসে যা শুনছেন, তাতে বুঝছেন এ জিনিস না দেখলে মান থাকত না। একটু গলা নীচু করে তারপর পান্নালালের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'সাহেবদের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ, খুব জমবে, কি বলেন! এরা পারবে তো?' 'চলুন কাল খেয়ে দেয়েই বেরিয়ে পড়তে হবে। স্মিথ কোম্পানীর চেয়ারে বসার বন্দোবস্ত আছে আমার, সে জায়গাটা আপনাকে দোব, অন্যটার ব্যবস্থা করতে লোক পাঠাচ্ছি।' উত্তর দিলেন পান্নালাল।

যতীন চক্কোত্তিমশায়ের না হয় তালতলায় বেয়াইবাড়ি ছিল, কিন্তু সেই রাজসূয় যজ্ঞ দেখতে সারা বাংলা জুড়ে যে সাজসাজ রব পড়ে গিয়েছিল তাদের তো সকলের কলকাতায় থাকার জায়গা ছিল না। দিন বুঝেই হাওড়া বর্ধমানের মধ্যে স্পেশ্যাল ট্রেন চালিয়েছিল রেল কোমপানী, তাতে তিল ধারণের স্থান ছিল না। বাংলার বাইরে থেকেও লোক এসেছিল অনেক। 'দ্য ইংলিশম্যানে' এর প্রতিবেদনে পাটনা ও আসাম থেকে আসা লোকের কথা লেখা আছে। মাঠে লোক এসেছিল কাতারে কাতারে। 'ব্রিটিশ নিউজ এজেন্সি'র মতে লোক হয়েছিল কম পক্ষে, আশী হাজার, তাদের কথামত 'অল দ্য বেঙ্গলিস টার্নড আপ অন দ্য ময়দান।' ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান-এর হিসাবও তাই। 'রয়টার লন্ডন'-এর হিসাবে পঞ্চাশ হাজারের মত। আজ পঁচাত্তর বছর পরেও অবশ্য বলে দেওয়া যায় এই সংখ্যা সঠিক হতে পারে না। মোহনবাগান-ইস্টইয়র্ক ম্যাচের রেফারি পুলার সাহেব জানিয়েছিলেন উপস্থিতি বিশ হাজারের মত। এ অনুমান কিছুটা কমই। হাতের কাছে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সেই ম্যাচ বিবরণী আছে একটু দেখে নেওয়া যেতে পারে।

'চক্ষুস্থির হয়ে গেল ভিড়ের বহর দেখে। মাঠের সবুজ ছেয়ে গিয়েছে চলন্ত কালো কালো মাথায়। তার উপরেও চারিদিক থেকে ব্যাগ্রভাবে ছুটে আসছে কাতারে কাতারে মানুষ তারা আসছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে যেন বিরাট জনতা জঠরের মধ্যে। এমন মাঠব্যাপী আশ্চর্য জনতা জীবনে আর কোনদিন দেখিনি। দিশেহারা হয়ে তার মধ্যে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেললুম।'

অধিনায়ক শিবদাস ভাদুড়ী

সেই উনিশ শ' এগারোয় খেলার মাঠে গ্যালারি বলতে তেমন কিছু ছিল না। কয়েক শ' চেয়ার ভাড়া দিত 'বি এইচ স্মিথ এন্ড কোং'। সেগুলোতে গণ্যমান্যরা টিকিট কেটে বসতেন। ক্যালকাটা, ইত্যাদি নামী দলগুলোর সদস্যের জন্যেও কিছু চেয়ারের বন্দোবস্ত থাকত। বাকীরা খেলা দেখতেন যে যেমন পারতেন, কেউ ঘোড়ার গাড়ির মাথায়, ভাড়া করা অথবা বাড়ি থেকে আনা টুলের মাথায়। মাঠে উপস্থিত সকলেই যে খেলা দেখতে পারতেন এমন নয়। পঞ্চাশ-ষাট মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে, উঁচুতে দাঁড়িয়ে কোন রকমে খেলা দেখতে পাওয়া লোকের কাছে প্রতি মিনিটে খেলার সংবাদ নিতেন অনেকেই। ঠিকমত না দেখতে পাওয়ার জন্যে ভিড়ের চাপে বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিবেদনগুলোর মধ্যেও ছিল যথেষ্ট গরমিল। সে প্রসঙ্গে যথাসময় আসা যাবে। খেলা আরম্ভের সময় ছিল বিকাল পাঁচটা পনেরো মিনিটে। তখনকার পাঁচটা পনরো অর্থাৎ একালের ঘড়িতে চারটে পঁয়তাল্লিশ। তখন 'বেঙ্গলটাইম' চালু ছিল যেটা এখন বাংলাদেশে চলে। উনিশ শ' এগারোর উনত্রিশে জুলাই ছিল শনিবার তবুও সেদিন অফিস আদালত ছিল একদম ফাঁকা, দুপুর এগারোটার মধ্যেই মাঠে দশহাজার লোক। কলকাতা সেই প্রথম ফুটবল জ্বরে আক্রান্ত হল। হাইকোর্ট আর স্ট্র্যান্ড রোডের সামনে দিয়ে শুধু মানুষ আর মানুষ। গাড়ি ঘোড়া বন্ধ। বর্ধমান থেকে স্পেশ্যাল ট্রেন ছাড়াও রায়গঞ্জ এবং কাছের বরাহনগর থেকে চালু ছিল স্টীমার সার্ভিস।

পান্নালালবাবু বেয়াইমশাইয়ের জন্যে দু টাকার ভাড়া চেয়ারের দাম দিয়েছিলেন দশ টাকা। এমনিতে চেয়ারের দাম উঠেছিল পনরো টাকা। কলকাতায় সেই প্রথম খেলার টিকিট ব্ল্যাক হওয়া। আই· এফ· এ পেয়েছিল অবশ্য ছ হাজার ন' শ' চোদ্দ টাকা। শুধু চেয়ারের ভাড়া, বাকিদের পয়সা লাগেনি।

মাঠের বাইরে বিক্রি হচ্ছিল আলুর দম, এক পয়সায় একটা আলু। মাঠে লাগানো হয়েছিল টেলিফোন যা থেকে প্রতি মুহূর্তে খেলার ফল বলে দেওয়া হচ্ছিল। তাছাড়া ওড়ানো হচ্ছিল ঘুড়ি রেজাল্ট লিখে।

পাঁচটার কিছু পরে শত সহস্র কণ্ঠের গর্জন, শিবদাস ভাদুড়ি দলবল নিয়ে মাঠে নামলেন। অভিনন্দন পাচ্ছিলেন তাঁরা আরও অনেক আগে থেকেই। গাড়ি করে যখন দলবল নিয়ে আসছিলেন শিবদাস, জায়গায় জায়গায় জনতা গাড়ি থামিয়ে জয়ধ্বনি দিচ্ছিল। যা হোক ইস্ট ইয়র্কের ক্যাপ্টেন সার্জেন্ট জ্যাকসন যখন মাঠে নামলেন তখন সব চেয়ে বেশি আওয়াজ আসে ফোর্ট উইলিয়মের দিক থেকে, সেখানে দাঁড়িয়েছিল মিলিটারিরা।

খেলা শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই মোহনবাগান ইস্ট ইয়র্কের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ইস্ট ইয়র্কও পাল্টা আক্রমণ করতে থাকে। সে এক অতুলনীয় ফুটবল!

সেই প্রথম তিন হাফ ব্যাক (নাকি উইথড্রয়াল ফরোয়ার্ড?) খেলানো হয়েছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার গণেন মল্লিকের প্রতিবেদন অনুযায়ী মোহনবাগান গোল শোধ করার পর ইস্ট ইয়র্ক একজন ফরোয়ার্ডকে নীচে নামায়। আর শিবদাস ভাদুড়ি ও বিজয়দাস অনবরত 'ইন্টারচেঞ্জ' করে খেলে যাচ্ছিলেন। হেমেন্দ্রকুমারের লেখায়: 'সবচেয়ে মরিয়ার মত খেলতে লাগলেন অদ্বিতীয় ফরোয়ার্ড শিবদাস ভাদুড়ি। শিবদাস ভুলে গেলেন, তিনি হচ্ছেন লেফট-লাইনের খেলোয়াড়, সারামাঠ তিনি চষে বেড়াতে লাগলেন। যেদিকে বল সে দিকেই তিনি—শিবদাস যেন একাই এক শ'। কার সাধ্য তাঁর কাছ থেকে বল কাড়ে।'

সেদিনের সেই খেলা ছিল প্রকৃত অর্থে 'ক্যাপ্টেনস ম্যাচ'। ইস্ট ইয়র্কের পক্ষে সেদিন ভেল্কি দেখান অধিনায়ক জ্যাকসন। ইস্ট ইয়র্কের পক্ষের সেদিনের গোলটিও তাঁর করা। গোলটি হয় অবশ্য খেলার গতির বিরুদ্ধে। হ্যান্ডবলের জন্যে পাওয়া ফ্রিকিক থেকে গোল করেন জ্যাকসন (দ্য বল রকেটেড্ ইনটু দ্য নেট'। অমৃতবাজারে অবশ্য গোলদাতা হিসাবে হেউডের

বিজয়দাস ভাদুড়ী

কথা বলা আছে।) সে ম্যাচে ফাউলের জন্য কোন ফ্রিকিক দেওয়া হয়নি। কারণ মোট পঞ্চাশ মিনিটের খেলায় কোন ফাউল হয়নি [প্রতিবেদন: দ্য ইংলিশম্যান]। গোলটি হওয়া পর্যন্ত দম ধরে বসেছিল সাহেবেরা। এবং তারপর 'দুর্জয় আনন্দে ক্ষেপে গেল তারা। সে কি চীৎকার, কি উন্মাদনা, কি লম্ফঝম্ফ। আকাশে কেবল টুপি আর ছড়িই উড়ল না, তারা আবার উড়িয়ে দিলে দু-একটা পায়রাও। যেন রসাতলে যেতে যেতে বেঁচে গেল ইংরেজ রাজত্ব।"

তারপর হাফটাইম। হাফ টাইমে গোরা মিলিটারিদের মুখোশ নৃত্য। কাগজের শীল্ড ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাঙালী মুখের সামনে আনন্দে নেচেছিল তারা। কিন্তু সে আনন্দ ছিল ক্ষণস্থায়ী। [এইখানে একটা কথা বলার আছে, উনিশ শ' পঁয়ষট্টির আটই আগস্ট স্টেটসমানে প্রকাশিত রমেশ ঘোষালের রচনায় আছে ইস্ট ইয়র্ক গোল দেয় দ্বিতীয়ার্ধে। সেই ম্যাচের রেফারি পুলারের লেখার মধ্যে এই প্রতিবেদনের সমর্থন মেলে। কিন্তু হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং প্রিমিয়ার পাবলিসিটির ম্যাচ বিবরণীতে প্রথমার্ধের কথা বলা আছে।]

যা হোক প্রথমে গোল খায় মোহনবাগান এবং তারপর 'কন্ট্রোল্ড ক্লাসিক ফুটবল ইন দেয়ার সার্চ ফর এন এনস্যারিং গোল' দিয়ে মোহনবাগান 'প্লেড লাইক ডেমন্স'। যার ফলপরিণতি: শিবদাস ভাদুড়ির গোল [অমৃতবাজার পত্রিকা ৩১ জুলাই, ১৯১১ অনুযায়ী গোলদাতা বিজয়দাস ভাদুড়ি] এবং তারপর মাঠে তো 'কর্ণপটবিদারক রোমাঞ্চকর সুদীর্ঘ আনন্দগর্জন' আর বাইরে তখন আশপাশের গাছগুলো থেকে 'ঝুপঝুপ্ করে মানুষ বৃষ্টি হচ্ছে'। গাছে উঠে খেলা দেখা মানুষেরা ভুলে গিয়েছিলেন যে হাততালি দিলেই পড়ে যেতে পারেন।

গোল শোধের পর মাঠে শুধু একটাই নাম মোহনবাগান। খেলা শেষ হবার মিনিট কয়েক আগে অভিলাষ ঘোষ দ্বিতীয় গোল করেন। [মিনিট কয়েক লিখতে হচ্ছে এই কারণে বিভিন্ন ম্যাচ বিবরণীতে দশ থেকে দুমিনিটের কথা বলা আছে, শুধু তাই নয় প্রিমিয়ার পাবলিসিটির বইতে 'রেনন' জানিয়েছেন দ্বিতীয় গোলটিও শিবদাসের করা]

আর দ্বিতীয় গোলের পর ইংরেজদের পক্ষে ভয়াবহ আবার

পি সি এল-এর কার্টুন

সেই একটানা বিজয় গর্জন—'গো-ও-ও -ও-ও- ও-ও- ও-ও- ও-ল।' বিপুল জনতার সেই উল্লাসধ্বনি গঙ্গা পার হয়ে আরো কত দূর ভেসে গিয়েছিল। শ্বেতাঙ্গ দর্শকদের মহলে থমথম করছে সমাধির স্তব্ধতা।'

খেলা তো শেষ হল, মাঠের সেই মহামেলাই শেষ কথা ছিল না। দিনের পর দিন উৎসব চলতে লাগল এখানে ওখানে। খেলোয়াড়রা পেলেন বীরের সংবর্ধনা, এবং শেষে ক্লান্ত খেলোয়াড়দের হয়ে নোটিশ জারী করলেন মোহনবাগান সম্পাদক—আর সংবর্ধনা দেওয়া হবে না।

ঐ ঐতিহাসিক খেলার বিভিন্ন প্রতিবেদন পড়ে পঁচাত্তর বছর পরে কিন্তু 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' ঘোষণা করতে হবে সেই ম্যাচের রেফারি পুলারকে—শিবদাস বা জ্যাকসন সাহেব যত ভালই খেলুন না কেন। সেই ইংরেজ রাজত্বে একেবারে নিরপেক্ষ খেলিয়েছিলেন তিনি। মোহনবাগান প্রথম গোল খাওয়ার পর পরই তাদের পেনাল্টি বক্সের মধ্যে সেন্টার হাফ রাজেন সেনের হাতে বল লাগে, মাঠের ভেতরে ও বাইরের দাবী সত্ত্বেও বেনিফিট অব ডাউট-এ 'পেনাল্টি' দেননি তিনি। পেনাল্টি দিলে সেই ঐতিহাসিক শীল্ড ফাইনালের পঁচাত্তর বছর বাদে সম্ভবত এই নিবন্ধ রচনার প্রয়োজন হত না। আর যতীন চক্কোত্তি মশাই, তাঁর উত্তরপুরুষদের দেখার জন্যে সেদিনের মাঠের ভিড়ে ছিঁড়ে যাওয়া পাঞ্জাবি আর একপাটি জুতো যত্ন করে রেখে যেতেন না। অন্য পাটিটি খুলে গিয়েছিল অবশ্য মাঠেই, দুই বেয়াইয়ের কেউই যা খোঁজার চেষ্টাই করেন নি।

[তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করেছেন শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

বাড়ির কাজের লোক ও আমরা

শ্রীমতী

বিয়ের আগে আমার হবু স্বামী আমাকে একটা কিছু দিতে চেয়েছিলেন, বলেছিলাম সময় সুযোগ মতন চেয়ে নেবো। অনেকটা সেই সেকেলে বর চাওয়ার মতন আর কি। বিয়ের পরেই চেয়ে বসলাম সেই অত্যাবশ্যক জিনিসটা, সেটি কোন জড়বস্তু নয়! খাঁটি সচল অর্থাৎ একজন ভাল বিশ্বাসী কাজের লোক। দিনে দিনে কাজের লোকের অভাব আর তাদের বায়নাক্কা যেন বেড়েই চলেছে। আজকাল ওদের ইউনিয়ন হয়েছে। দলের নেত্রীর (বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই) পরামর্শ অথবা আদেশ অনুযায়ী চলছে সকলে। যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ, খাওয়া-দাওয়া, পুজোর শাড়ি, শীতের বস্ত্র দিয়েও ওদের মন পাওয়া যাচ্ছে না। একি কোন দীর্ঘদিনের অবহেলার পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ অথবা ক্ষোভ?

সেই কথা বলছিলাম কয়েকজন খেটে-খাওয়া (বাড়িতে কাজ করা) মহিলার সঙ্গে। ওদেরই একজন মীরা দাস উত্তর কলকাতার একটি পাড়ায় পাঁচ'ছ বাড়ি কাজ করেন। বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঘর ঝাড়-পোঁচ, টুকটাক বাজার করা, রেশন তোলা, সময় বিশেষে কেরোসিন তেলের লাইন দেওয়া—সব কাজই করতে হয় ওঁকে। কুড়িয়ে বাড়িয়ে মাসে সাকুল্যে শ'তিন চারেক টাকা হয়। স্বামী অনেকদিনই রাজরোগে গত হয়েছেন। তিনটে বাচ্চাকে নিয়ে দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছেন মীরা।

কাপড় কাচতে কাচতেই বলে চললেন একটানা কলের গানের মতন: "আর কত পারা যায় বলুন। আমরাও তো মানুষ।"

পূর্ববঙ্গে ক্ষেত খামার সমেত মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থ ঘরেরই বউ ছিলেন কল্পনাদিদি। ভাগ্যের ফেরে হয়ে গেলেন উদ্বাস্তু। সেই থেকে একটানা দীর্ঘ দশ-পনেরো বছর ধরে চলছে বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার করার কাজ। ছোট ছোট মেয়েরাও পাঁচ বাড়ি কাজ করে বেড়াচ্ছে। নিজের খাওয়া পরার খরচের সঙ্গে মাইনের টাকা দিয়ে টুকটাক এটা ওটা গড়ে রাখছেন! মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে তো। বাচ্চার ঠাণ্ডা লাগবে অতএব ভাল জ্যাকেট

ছোট মেয়েরাও পাঁচবাড়ির কাজ করে — ছবি: শিপ্রা দাস

পরাও, চটি পরতে হবে সবসময়, ঠাণ্ডা মেঝেতে পা রাখবে না—কত না আদেশ উপদেশ তথা যত্ন নিই আমরা অথচ ওই বয়েসি একটি ছেলে বা মেয়ে পাতলা ছেঁড়া জামা গায়ে আমার বাচ্চাকে খাটের ওপর বসিয়ে ঘর মুচছে—এ দৃশ্য আমাদের তেমন পীড়া দেয়কি! এমন বৈষম্য বোধ হয় আর কোনও দেশে নেই। আমরাও যেন ধরেই নিয়েছি, ওদের শীত নেই, গরম নেই, শরীর নেই, অসুখ বিসুখ নেই, আনন্দ নেই, দুঃখও বোধহয় নেই বা থাকতে পারে না। ওরা যেন শুধুই আমাদের অসুবিধে দূর করতেই এসেছে। ওদের মা বাবা কাজ করেছে, এবারে ওরা করবে, পরে ওদের ছেলেরা করবে—এ যেন 'চলছে, চলবে' গোছের।

কিছুটা শিক্ষার আলো, বোধের আলো ওদের মধ্যেও জেগেছে তাই ওরাও আজকাল ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে চায়। কিন্তু সত্যিই যদি এত দুর্মূল্য হয়ে পড়ে ওরা তাহলে আমাদের কী হবে? কেমন করে চলবে আমাদের সংসার? দীর্ঘদিন অবহেলা, লাঞ্ছনা গঞ্জনার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে আজ ওরাও খানিকটা সচেতন হয়ে উঠেছে। আমরাই বা কি করবো? এই মাগ্যিগণ্ডার বাজারে নিজেদের খরচ চালিয়ে আমরাই বা কতটুকু দিতে পারি ওদের। বাসি রুটি-চচ্চড়ির পরিণাম বোধ হয় এমনি করেই বিপাকে ফেলবে আমাদের। ওরাও হয়ে উঠবে ডুমুরের ফুল। তার চেয়ে পাড়ায় পাড়ায় কমিশনাররা (মিউনিসিপ্যালিটি অথবা কর্পোরেশন) যদি ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটু সচেতন হন। একটা কাজের লোকের তালিকা করেন, মাস মাইনে (কাজ অনুযায়ী) বেঁধে দেন তাহলে আমাদের খুঁজেও বেড়াতে হয় না। বিশ্বাসী কিনা সে বিষয়েও নিঃসন্দেহ থাকতে পারি। কারণ নাম এনট্রি করানো মানেই ফটো সমেত সমস্ত রেকর্ড থাকবে। ওদেরও সম্ভ্রম রক্ষা করে কিছু করা যায় কিনা ভেবে দেখতে দোষ কি! ■

লোকজন ডেকে আনতে যাচ্ছিলি বুঝি ?
কিট, হেলোয়াজ ... যাস না !

উষ্ণ কুণ্ডে বদমাস এসেছে !
রাজা দাদাকে ওই লোকটা মারছে !
ছেড়ে দাও ওকে !
ভাগ্ এখান থেকে !
!

বাচ্চাদের গায়ে হাত তুললি ?
রাজা তো ব্ল্যাক-বেল্ট কারাটে ...

বদমাস !

তীর ছোড় !
ছুঁড়ছি !
7/28

আরে, এ কী !

বন্দুক পেয়ে গেছি !
এটাকে খতম করে দে !
!
!
ক্রমশ

জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা

তুষারকান্তি সান্যাল

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন/ বদরুদ্দীন উমর/ চিরায়ত প্রকাশন/ কল/১৫·০০

'ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে শ্রেণী স্বার্থ, সাম্প্রদায়িক স্বার্থ এবং আঞ্চলিক স্বার্থের দ্বন্দ্বের একমাত্র সমাধান সম্ভব ছিল সমাজতান্ত্রিক পথে। একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে। কিন্তু ভারতের শ্রমিক ও কৃষকদের অনেক শ্রেণী সংগ্রাম সত্ত্বেও, সেই সংগ্রামকে সঠিক পথে পরিচালনা করা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে সম্ভব হয়নি।'

উপরোক্ত মন্তব্যটি করেছেন বদরুদ্দীন উমর তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ 'ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন'-এ। তিনি এই গ্রন্থে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারাগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই বিশ্লেষণে "ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে শ্রেণী, আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক—এই তিন দ্বন্দ্ব কিভাবে ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে নানা সংঘাতের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব কিভাবে অপর দুই দ্বন্দ্বকে নিজের অধীনস্থ করার পরিণতিতে ভারত সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত হয়েছে" তারই ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করা হয়েছে।

বর্তমান সময়ের ভারত যখন সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ প্রমুখ ঐক্য ও সংহতি বিনষ্টকারী প্রবণতায় অস্থির, যখন চিন্তাশীল মানুষ দেশের ঐক্য ও সংহতি, অখণ্ডতা রক্ষার উপায় সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল, সেই সময় বদরুদ্দীন উমরের গ্রন্থটি আমাদের চিন্তার খোরাক যোগায় সন্দেহ নেই।

দিল্লিতে সর্বধর্মের ব্যক্তিদের শান্তি মিছিল

অবশ্য একথা বলে রাখা প্রয়োজন যে তাঁর সব মত সম্পর্কেই যে একমত হওয়া যাবে এমন নয়।

স্বাধীনতা লাভের আটত্রিশ বছর পরেও কেন এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যাতে ভারতের অখণ্ডতা, সংহতি তথা সামগ্রিকভাবে অস্তিত্ব রক্ষাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এইসব ঘটনার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, অন্তঃর্তদন্ত প্রয়োজন বই কি! একদিকে দেখি আসামের বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলনসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রাবল্য, আর একদিকে দেখি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিকতাবাদের পুনরুত্থান। এছাড়াও রয়েছে মুষ্টিমেয় শিখ উগ্রপন্থীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। এদের খালিস্তানি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শুধুমাত্র পঞ্জাবে অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে তাই নয়, এটা ভারতের ঐক্য, অখণ্ডতা ও সংহতির পক্ষে এক বড় বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ছাড়াও রয়েছে উচ্চবর্ণ ও অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে জাতপাতের লড়াই। অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়নের স্বার্থে শিক্ষা ও কর্মে সংরক্ষণের রক্ষাকবচের যে ব্যবস্থা আমাদের সংবিধানে [১৫ (৪), ১৬ (৪)] রয়েছে, এমনকি তারও বিরুদ্ধে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী লড়াই যার সর্বশেষ নগ্নরূপ আমরা দেখি গুজরাতের সংরক্ষণ বিরোধীদের তাণ্ডবে। এর সঙ্গে রয়েছে শ্রমিক, কৃষক ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের বাঁচার সংগ্রাম।

এই হতাশাজনক পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিশ্লেষণের অংশ বিশেষ প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় উল্লেখ করা যেতে পারে—

'বহুর মধ্যে আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলা ভারতবর্ষের স্বভাব নহে, সে এককে পাইতে চায় বলিয়া বাহুল্যকে একের মধ্যে সংযত করাই ভারতের সাধনা।...তাহার ইতিহাস তাহার পক্ষকে যতই অসাধ্যরূপে বাধা সঙ্কুল করিয়া তুলুক না, তাহার প্রতিভা নিজের শক্তিতে এই পর্বত প্রমাণ বিঘ্নব্যূহ ভেদ করিয়াই বাহির হইয়া যাইবে—যত বড় সমস্যা তত বড়ই তাহার তপস্যা হইবে।' (রবীন্দ্র রচনাবলী। বিশ্বভারতী। ১৩৫১। অষ্টাদশ খণ্ড। পৃঃ ৪৫০-৪৫১)।

সুতরাং এটা আশা করা যায় যে, ভাষা, ধর্মগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে ভারত তার আপন তপস্যায় জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষায় সমর্থ হবে।

এবারে আমরা উমরের কয়েকটি বক্তব্য পর্যালোচনা করব। ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে শ্রেণী স্বার্থ, সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ইত্যাদির দ্বন্দ্বের সমাধানের ক্ষেত্রে উমর এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সমাজতান্ত্রিক পথে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে এর সমাধান সম্ভব ছিল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখি বর্তমান ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ইতিহাসের এই পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব-এর কথা অনেকটাই তাত্ত্বিক হয়ে দাঁড়ায় না কি?

আর একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, বর্তমান ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রশাসন প্রত্যক্ষভাবে কোনও বিশেষ ধর্মকে অধিকতর সুযোগ সুবিধা দিতে পারে না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুসারে মোট জনসংখ্যার ৮২·৭২% ভাগ হল হিন্দু, ১১·২১% ভাগ মুসলমান, ২·৬% ভাগ খ্রীস্টান, ১·৮৯% শিখ ইত্যাদি ধর্মাবলম্বী। এটা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মসম্প্রদায়ের স্বার্থে শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত নয়। ধর্মনিরেপেক্ষতা বজায় রাখার দায়িত্ব যেমন দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলের

(গণতান্ত্রিক রীতি অনুসারে সেই দলই শাসন ক্ষমতায় থাকে) তেমনি সংখ্যালঘু অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলেরও এ বিষয়ে দায়িত্ব আছে।

এই প্রসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের 'জাতিগত সমস্যা'র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সোভিয়েট দেশে 'জাতিগত' সমস্যা ও 'সংখ্যালঘু' সমস্যা সমাধানের জন্য যেমন বিভিন্ন জাতিগত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অঞ্চলগুলির যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারও স্বীকৃত হয়েছে। সব কিছুর উপরে রয়েছে কঠোর শৃঙ্খলাসম্পন্ন এককেন্দ্রিক সাম্যবাদী দল। বাস্তবক্ষেত্রে এই দলই যে কোনও বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতার বড় প্রতিষেধক। সাম্যবাদী ব্যবস্থায় ধর্মের স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে তাত্ত্বিক। সেখানেও রয়েছে সাম্যবাদী দলের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশের সুযোগ সীমাবদ্ধ।

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে শ্রেণী স্বার্থের প্রতিনিধিদের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে উমর বঙ্কিমচন্দ্রের কথা উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজপ্রীতি সম্পর্কে তিনি যে বক্তব্য (পৃষ্ঠা ২১-২৩) রেখেছেন, সেটা কিন্তু একপেশে হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে "বঙ্গদেশের কৃষক" এই পর্যায়ের আলোচনায় একটি অংশে আমরা দেখতে পাই কৃষিজীবীর দুর্দশায় ব্যথিত প্রাণ বঙ্কিমচন্দ্রকে। এই বিষয়ে ইংরাজদের সরাসরি দায়ী করতেও তিনি পশ্চাৎপদ নন, যখন দেখি তিনি বলছেন, 'আর তুমি ইংরাজ বাহাদুর ...তুমি বল দেখি যে, তোমা হইতে এই হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তের কী উপকার হইয়াছে। আমি বলি, অণুমাত্র না, কণামাত্র না।

তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না।' (বঙ্কিম রচনাবলী। সাহিত্য সংসদ। ১৩৮০। ২য় খণ্ড। পৃঃ ২৮৮-৮৯)। আর একটা কথা। জাতীয় আন্দোলনে লেখক যেমন মুসলীম লীগের সাম্প্রদায়িকতাকে দায়ী করেছেন, ঠিক প্রায় একই পর্যায়ে কংগ্রেস এবং তার নেতৃবৃন্দকেও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার ধারক ও পৃষ্ঠপোষক হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। কংগ্রেসের অন্যতম অগ্রগণ্য নেতা মহাত্মা গান্ধী সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট কি না, সেটা পাঠকের বিবেচ্য। তবে এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর উক্তির বাংলা মমার্থ উল্লেখ করা যেতে পারে—"আমার কাছে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য একান্তভাবে কাম্য কারণ অন্য বিষয় ছেড়ে দিলেও, স্বরাজ লাভের জন্য এটা প্রয়োজনীয়"। ('কম্যুনাল ইউনিটি'—গ্রন্থ, পৃঃ ২২৯-৩০)।

কংগ্রেসের আর এক অগ্রগণ্য নেতা জওহরলাল নেহরুও সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে ছিলেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক উক্তির বাংলা তর্জমা উল্লেখ করা হ'ল—"কংগ্রেস ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক সংস্থার উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল বিস্তর ফারাক। স্বাধীনতার প্রশ্নে এই সব সংস্থা নিজ নিজ গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায় ছিল বেশী আগ্রহী। কিন্তু কংগ্রেস, একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংস্থা হিসেবে অন্যসব স্বার্থ উপেক্ষা করে কেবলমাত্র ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নকেই প্রধান বলে ভেবেছে।" (জওহরলাল নেহরু। ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া। ১৯৪৬। পৃঃ ৪৭১-৭২)।

স্বাধীনতা আন্দোলনে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে কংগ্রেসের একজন অগ্রগণ্য নেতা হিসেবে নেহরুর এই উক্তি তাৎপর্যময়। স্বাধীন ভারতে নেহরু-উত্তর যুগে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে যিনি সদাই প্রয়াসী ছিলেন সেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এ ব্যাপারে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহরুর আদর্শের দ্বারা। ভাগ্যের এক নিদারুণ পরিহাস এই যে, সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বলি হলেন এ যুগের অন্যতম রাষ্ট্রনেত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। মুষ্টিমেয় উগ্র শিখ সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা শুধুমাত্র শ্রীমতী গান্ধীকেই হত্যা করেনি। তারা আজ ভারতের ঐক্য, সংহতি ও অখণ্ডতাকে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে এনে দাঁড় করিয়েছে।

সুতরাং সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও আঞ্চলিকতার মূল উৎসে সন্ধান করে তাকে চিরতরে উৎপাটিত করতে হবে। জরুরী ভিত্তিতে দলমত নির্বিশেষে জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে এ কাজ করা দরকার। এছাড়া জাতীয় ঐক্য রক্ষার আর কোনও পথ নেই। বদরুদ্দীন উমরের সব বক্তব্যের সঙ্গে একমত না হয়েও বলা যায় যে, তাঁর গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তিনি জাতীয় ঐক্যের, অখণ্ডতার বিঘ্নস্বরূপ যে কয়টি বিপদের কথা বলেছেন, আগামী দিনে ব্যাপক অনুসন্ধানের মাধ্যমে পূর্বোক্ত ছাড়াও আরও অন্য সম্ভাব্য বিপদগুলিকে চিহ্নিত করে তাদেরকেও সমূলে উৎপাটিত করার দায়িত্ব নিতে হবে বর্তমান প্রজন্মের সমগ্র ভারতবাসীকেই।

তিন রকম

বিজিতকুমার দত্ত

অগ্নি সংকেত/
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়/
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ/
কল-৯/ ১৫·০০

আক্রান্ত/
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়/
দে'জ পাবলিশিং
কল-৭৩/ ১৫·০০

রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্র/
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ/
দে'জ পাবলিশিং
কল-৭৩/ ১৫·০০

ঔপন্যাসিকের লেখার বিষয় প্রধানত সমকালীন জীবন। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের সত্তর দশকের সমাজজীবনকে

'অগ্নিসংকেত' উপন্যাসে পরিস্ফুট করেছেন। বলা বাহুল্য স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকে সমাজের নানা জটজটিলতা অপসারণে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন দেশের রাজনীতিবিদ্‌রা। রাজনীতির সার্বভৌম প্রভাব এখন আমরা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি।

রাজনীতি দেশের উন্নতির মানদণ্ড। দেশবাসীর চিত্তে আশা জাগানো তার ধর্ম। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় দেখেছেন সমকালীন রাজনীতি ধর্মচ্যুত। রাজনীতির চোরাপথে সমাজজীবনের সার্বিক অবক্ষয় কতকগুলি দৃশ্য ও ঘটনার সাহায্যে সঞ্জীব উদ্‌ঘাটিত করেছেন। কখনও কৌতুক, কখনও ব্যঙ্গ তাঁর লেখায় ফুটে ওঠে। মাঝে মাঝে বিপুল অবক্ষয়ের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জীব উদ্যোগী হন মূল্যবোধের উদ্ধারে।

সঞ্জীব লক্ষ করেছেন মানুষের লোভের আগ্রাসী রূপ আর এই লোভের পরিণাম হচ্ছে পাপ। পাপের ভরাডুবি থেকে উদ্ধার তখনই সম্ভব যখন বিশ্ববিনাশক অগ্নিদেবতার আবির্ভাব ঘটবে। একদা তথাকথিত বিপ্লবী সুললিত সেনের মনকে যমরাজ পাঠিয়েছিলেন নিতান্তই ছাপোষা মধ্যবিত্ত শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেহে। সুললিত সেন এবং শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেঁধে গেল। শ্যামল নিদারুণ দারিদ্র্য আর মর্মান্তিক পরিবেশে ক্ষোভে, রাগে ফেটে পড়তে চাইল। তেল-নুন-লকড়ির সমস্যায় জর্জরিত শ্যামল মুক্তির সন্ধানে যত এগিয়ে যেতে লাগল ততই সে সমাজের নগ্ন কুৎসিত জীবনটাকে আবিষ্কার করতে পারছিল। গান্ধীজীর রাজনীতিতে যে কঠোর জীবনযাপনের আদর্শের ইঙ্গিত ছিল সে নীতি বিসর্জন দিয়ে রাজনীতিবিদ্‌রাই হয়ে উঠেছেন শোষক এবং শাসক।

অতএব ইংরেজ শাসক

যেমন করে বেকার সৃষ্টি করেছিল, গুপ্তচর বৃত্তিতে এগিয়ে গিয়েছিল, হ্যাভস এবং হ্যাভ-নটস শ্রেণীর বিভাগ করেছিল, সমকালীন রাজনীতিবিদদের স্বার্থপরতাও সেই দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। মস্তান পোষা, অপসংস্কৃতি, গণধর্ষণ, খুন, রাজনৈতিক হত্যা, দালাল লাগিয়ে ধর্মঘট করানো, নারীকে পণ্য রূপে ব্যবহার বিস্তৃত হতে লাগল। অন্যদিকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় সমাজ উন্নয়নের যন্ত্রগুলির বিকলাঙ্গ রূপ সঞ্জীব একের পর এক দৃশ্যের অবতারণা করে আমাদের দেখিয়েছেন। দুধের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের করুণ অবস্থা, লোড শেডিং-এর অন্ধকারময় কলকাতা, হাসপাতালের দুরবস্থা, কন্যা বিক্রয় করে বাপের সংসার চালানো, দুর্বল রাজনীতিবিদের প্রবল রাজনীতিবিদের হাতে মার খাওয়া সমাজে বিস্তৃতি লাভ করছে। একদা শ্যামল খুন হল মস্তানদের আঘাতে। আর এই শ্যামলই অগ্নিদেবতা হয়ে সমস্ত পাপবিনাশে এগিয়ে যেতে লাগল।

সঞ্জীব সমকালীন কলকাতার জীবনের যে নৈরাশ্যব্যঞ্জক চিত্র এঁকেছেন তাতে আমরা চমকে উঠি সত্য কথা কিন্তু একটু পরে ভাবতে থাকি রাজনীতির এই চোরাপথ যেমন বাস্তব তেমনি আপাত এই বাস্তবের চেহারাটাই কলকাতা নয়। সুললিত সেন আর শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বন্দ্ব আরও গভীরে। সেখানে যে সংগ্রাম তার রূপ ক্ষুরধার। যত দূর বুঝি এই নৈরাশ্যে সঞ্জীব অভিভূত। তিনি নিজেও কিছুটা উত্তেজিত। এই উত্তেজনা ছড়িয়ে আছে তাঁর বইটিতে। বলা বাহুল্য উত্তেজনা সঞ্জীবের সৃষ্টিকর্মকে কখনও গ্রাস করতে উদ্যত হয়।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'আক্রান্ত' উপন্যাসিকার নায়ক রবি সর্বজ্ঞ ছাপোষা বাঙালী মধ্যবিত্ত। একদা সর্বজ্ঞের বাপ মদের ব্যবসায় ফেঁপে ফুলে উঠেছিল। কিন্তু অতি লোভে তাঁতি নষ্ট। সর্বজ্ঞ পরিবার প্রায় সর্বস্বান্ত হল। রবি পিতৃহীন হয়ে দেখতে পেল দাদা মহীতোষ সম্পত্তি ভাগবাঁটোয়ারা করে তাকে দুখানা ঘর দিয়ে ঠেলে দিলে বাড়ির পেছনের দিকে। সর্বজ্ঞ প্রতিবাদ করতে পারলে না। অথচ সর্বজ্ঞের বিষয় আসক্তি ছিল। কিন্তু আসক্তি আর বুদ্ধি খাটিয়ে সম্পত্তি ও বিত্ত অর্জন আর এক ব্যাপার।

তরুণ বয়সে কলেজের সহপাঠী সুন্দরী রেশমী রবিকে প্রেম নিবেদন করলেও রবি সেই প্রেমে সাড়া দিতে পারে নি। মহীতোষের চাকর রাখাল মহীতোষের গুদাম থেকে মদের বোতল পাচার করতে বলায় রবি শিউরে উঠেছিল। বেশবাসেও রবি আধুনিক ছিল না। লাটুবাবুর কাছে রবির বেশ কিছু টাকা পাওনা। আদায় করবার কায়দা কিন্তু তার জানা নেই। রবি সর্বজ্ঞ কখনও অ্যাটাক করতে জানে না, সর্বদাই সে ডিফেন্সের খেলোয়াড়। ডিফেন্সিভ খেলতে খেলতে সর্বজ্ঞ নিজের গোলের মধ্যেই ঢুকে যাচ্ছে। রবি সর্বজ্ঞ নিজেও জানে সে ডিফেন্সের খেলোয়াড়। সেই কারণে অ্যাটাকিং খেলোয়াড় দেখলেই সে সমীহ করে চলে। মধ্যবিত্তের সৌজন্য, ভীরুতা এবং সচ্চরিত্র হবার লালসা রবিকে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছিল। রবির এই জীবনটাকে রবি নিজেই ধিক্কার দেয়। তার এক সস্তা বোতাম আঁটা শান্তিতে শয়ান,

অন্য সত্তা কিন্তু আরব বেদুইন হতে চায়। এ দুয়ের টানাপোড়েনে রবি ক্ষতবিক্ষত। এহেন রবি লাটুবাবুর কাছ থেকে প্রস্তাব পেল যদি সে লাটুবাবুর মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করে দিতে পারে তবে দুহাজার টাকা নগদ সে পাবে। রবি এবারে নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধেই লড়াই করতে চাইলে। সে ধনী, কীর্তিমান রুদ্রাক্ষকে ছলে বলে অ্যাটাক করল। তার জীবনে শেষ পর্যন্ত সাফল্যও এল। লাটুবাবুর কন্যা রবিকেই পছন্দ করল।

মানুষের জীবনের এই ডিফেনসিভ এবং অ্যাটাকিং স্বভাব না থাকলে চরম দুর্গতি। এই ছোট উপন্যাসটিতে শীর্ষেন্দু তা কৌতুকের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। প্রেমের ফাঁদে রবির নিরুত্তাপ মনোভাব, অথবা মহীতোষের আগ্রাসী লোভের মুখে রবির নীরবতার দৃশ্যগুলি উপভোগ্য। অমেরুদণ্ডী রবি সর্বজ্ঞ তিনবার ডিভোর্স করা লীনার কাছ থেকে যে ভাবে ডিভোর্সের করুণ-মধুর কাহিনীগুলি বার করে এনেছে তাতে সর্বজ্ঞের মেরুদণ্ড যে মাঝে মাঝে সোজা হয়ে দাঁড়াতে জানে তার চমৎকার চিত্ররূপ শীর্ষেন্দুর বর্ণনায় লভ্য। লীনার এবং রুদ্রাক্ষের জীবনকাহিনীতে আধুনিক সমাজের অবক্ষয়ের চিত্রও সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। শীর্ষেন্দু মধ্যবিত্তের দ্বিধার কথা বলেছেন। মিথ্যার সঙ্গে আপোস করতে না পেরে সৎ মানুষ যে কি পরিমাণে তলিয়ে যায় সেকথাও শীর্ষেন্দুর লেখায় উদ্ভাসিত

হয়। পরিশেষে এই কমেডির সুখময় পরিণাম আমাদের নিশ্চিন্ত করে, আমাদের মুখে চোখে স্মিত হাসি দেখা দেয়। কেবল তান্ত্রিকঘটিত ঘটনাটিতে কিঞ্চিৎ অতিকথন দোষ ঘটেছে বলে মনে হয়। শীর্ষেন্দু সমাজের অসঙ্গতির দিকটি দেখিয়ে দিয়েছেন। কোথাও লেখকের জীবনদৃষ্টি তিক্ত নয়, প্রাণাবেগে এই কাহিনী উজ্জ্বল।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্র' গ্রন্থের নামে ইতিহাসের স্পর্শ আছে। সভ্যতার উন্মেষকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই রাজা-মন্ত্রীর খেলা চলছে। এই উপন্যাসের এক চরিত্র মোহিনীমোহন ভারতবর্ষ পুনরাবিষ্কার করতে চেয়েছে ভাবনায় ও কর্মে। স্বদেশী যুগ থেকে তিনি জনহিতার্থী কাজে নেমে পড়েছিলেন। কৃষিপ্রকল্পরচনায় তাঁর উৎসাহের অভাব নেই। কিন্তু রাজা-মন্ত্রীর খেলায় তিনি যেন হেরে যাচ্ছেন। মাৎস্যন্যায় সেই আদিকাল থেকে চলে আসছে। ইতিহাসবিদ এমন কি আদর্শবাদী মানুষ পর্যন্ত এক কাল্পনিক ইউটোপিয়ান স্বপ্ন দেখে আসছেন। সেই স্বপ্নকেই তাঁরা প্রকৃত ভারতবর্ষ বলে প্রচার করেছেন। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু আর অবারিত মাঠের কথা গ্রামবাংলার প্রসঙ্গে বারে বারে বলা হয়েছে। কিন্তু মোহিনীমোহন অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছেন এর কোনোটাই সত্য নয়।

অস্বাস্থ্যকর জীবন পরচর্চায় মুখর, খুনোখুনিতে তৎপর এবং মামলামকদ্দমা পরিপূর্ণ গ্রামের কোনো পরিবর্তনই ঘটে নি। কেবল চণ্ডীমণ্ডপের পরিবর্তে এসেছে পঞ্চায়েতী শাসনব্যবস্থা আর রাজা-মন্ত্রীর পরিবর্তে দেখা দিয়েছে নির্বাচন, এম· পি· এবং এম· এল· এ·।

এককালে জমিদার মোসাহেব পরিবৃত হয়ে প্রচণ্ড দম্ভে শাসন করত আর দেশের অগণিত মানুষ শাক পাতা খেয়ে দিন কাটাত। সিরাজ বলেননি তবে তাঁর বই পড়ে বুঝতে পারি শাকান্নভোজী গ্রামবাসীর জীবনে এর বেশি এখনও কিছু জোটে নি।

আর এম· এল· এ· এবং মন্ত্রীরা তো মোসাহেব পরিবৃত হয়েই থাকতে চান। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের দুরবস্থার কথা বলতে গিয়ে চন্দ্রনাথবাবুর মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন ইউরোপ থেকে আমদানি করা পলিটিক্সই এর জন্যে দায়ী।

সিরাজ এই পলিটিক্সের সঙ্কীর্ণতার দিকটি উদ্ঘাটিত করেছেন। সিরাজ বোধ করি মোহিনীমোহনের মতোই নব আবিষ্কৃত ভারতবর্ষের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছেন।

পূর্ব ভারতীয় সঙ্গীত

প্রণয়কুমার কুণ্ডু

মিউজিক অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়া / সুকুমার রায় / ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ / কল-১২/ ১১০·০০

সাম্প্রতিককালে সঙ্গীত ও নৃত্য বিষয়ে অনেক মূল্যবান গবেষণার দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবেও অনেকে সঙ্গীতের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন। ভাতখণ্ডে, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, অমিয়নাথ সান্যাল, রাজ্যেশ্বর মিত্র প্রমুখ অনেকের গবেষণালব্ধ সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থের সঙ্গে আমরা পরিচিত। সুকুমার রায়ের আলোচ্য গ্রন্থটি তারই উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই গ্রন্থে শব্দসূচী, পরিশিষ্ট ছাড়া ভূমিকা সমেত মোট ৯টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় বৌদ্ধ গানের নিদর্শন হিসেবে চর্যাগীতি এবং পদাবলী কীর্তন, দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় প্রাচীন বাংলা গান: শ্যামাসঙ্গীত ও যাত্রাগান। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে রাগ সঙ্গীতের ইতিবৃত্ত, সেই সূত্রেই এসেছে ঠুংরী ও টপ্পার প্রসঙ্গ। চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলা লোকসঙ্গীতের আলোচনা। পঞ্চম অধ্যায়ে পৌঁছে লেখক মধ্যযুগের ওড়িয়া, অসমীয়া ও মণিপুরী গানের আলোচনা করেছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়টি নিবেদিত হয়েছে 'রিদমের' বিশ্লেষণ। অতঃপর সপ্তম থেকে নবম অধ্যায়ে আধুনিক কালের পূর্বাঞ্চলীয় গীতধারার আলোচনা। সেই সূত্রেই পুরো একটি অধ্যায় (সপ্তম) রবীন্দ্রসঙ্গীতের জন্য এবং পরবর্তী অধ্যায়টি রবীন্দ্র-পরবর্তী গীতিকারদের জন্য নিবেদিত। সব শেষে, নবম অধ্যায়ে, প্রসঙ্গত আধুনিক ওড়িয়া, অসমীয়া ও মণিপুরী গানের আলোচনা করা হয়েছে। এই ভাবেই লেখক ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সঙ্গীতের রূপরেখাটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

পূর্বাঞ্চলীয় সঙ্গীতের রূপরেখাটি তুলে ধরতে গিয়ে লেখক প্রত্যেক ধারার ঐতিহাসিক ইতিবৃত্তটি যেমন বিবৃত করেছেন, অন্যদিকে তেমনি তার আঙ্গিক ও প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসনীয়। এবং সমগ্র আলোচনায় লেখক যথেষ্ট মুনশিয়ানা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। লেখকের অনেক পর্যবেক্ষণ আমাদের ভাবিয়ে তোলে, সঙ্গীত সম্পর্কে গভীরতর চিন্তার সুযোগ করে দেয়।

অবিশ্যি, এমন একটি গ্রন্থ পড়তে পড়তে কিছু মৌলিক প্রশ্ন জাগতে পারে। যেমন, গ্রন্থটির বিষয়-বিন্যাস ও প্রতিপাদ্যের কথা মনে রেখে প্রশ্ন তোলা যায় 'দি প্রিলিউড'-এর উপযোগিতা সম্পর্কে। সমগ্র আলোচনার এই কি উপযুক্ত 'প্রিলিউড'? তেমনি, ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত 'রিদমের' প্রসঙ্গটি খাপছাড়া বলে মনে হয় না কি? অন্তত, পূর্বাপরতা সূত্রে তাই মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হবে, গ্রন্থটির নামকরণে যদিচ ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সঙ্গীতের কথা বলা হয়েছে, কার্যত তা হয়ে দাঁড়িয়েছে একপেশে, বাংলা গানই আলোচনার সিংহভাগ কেড়ে নিয়েছে। ফলত, সমগ্র আলোচনাটি অব্যবহিতভাবে ভারসাম্য হারিয়েছে। সর্বোপরি এমন গ্রন্থে, যেখানে পূর্বাঞ্চলীয় গানের বিভিন্ন ধারার আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে বাংলা ওড়িয়া, অসমীয়া ও মণিপুরী গানের একটি তুলনামূলক আলোচনা প্রত্যাশিত ছিল। তথাপি, সুকুমার রায়ের গবেষণামূলক সঙ্গীত-সম্পর্কিত এই গ্রন্থ আমাদের সাঙ্গীতিক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে। ■

চি ত্র ক লা

মীড় গমক মূর্ছনা

রেসোনেন্স দলটির প্রদর্শনী এবার বাদল ধারায়, আকাদমি অফ ফাইন আর্টসের আলোর অব্যবস্থায় অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত। এঁদের দুজন থাকেন দিল্লিতে। একজন বদলি হয়েছেন ভাগলপুরে। একজনই কলকাতার বাসিন্দা এখন। তিনি আবার অসুস্থ। সুতরাং শ্রীমতী পার্বতী দাস অংশগ্রহণ করতে পারেননি। দিল্লি এবং ভাগলপুর থেকে ওঁরা ছবি টেনে এনেছেন বিক্রি হবে না জেনেও। আকাদমিতে ওঁদের ঘর অন্ধকার। বিকল্প আলোর ব্যবস্থা না থাকায় ওঁরা ক্ষুব্ধ। অথচ তন্তুজ আলো পেয়েছে। ওঁদের প্রশ্ন, তাহলে আকাদমি অফ ফাইন আর্টস থিয়েটার, বায়স্কোপ, শাড়ি বস্ত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা মাথায় রেখে কি তৈরী করেছিলেন অতুল বসু? মধ্যবিত্ত শিল্পী ওঁরা। হাজার ছয়েক টাকা জলে যাওয়ায় ওঁরা ক্ষুব্ধ। আলোর অভাবে ২৯শে সেপ্টেম্বর বন্ধ রাখতে হল পুরোটা।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু আর্ট কলেজে থাকতেই ক্ষমতাবান বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন। দলীয় প্রদর্শনীতে তাঁর খ্যাতি ক্ষুণ্ণ হয়নি। এবার ছবি দেখে মনে হল যে পত্রিকা এবং পুস্তক সজ্জার সচিত্রকরণ করেন বলে সেই ছাপ পড়েছে ছবিতে। "পার্টি" ছবিতে ককটেল পার্টির আড্ডা গল্পের ঢুলুঢুলু পরিবেশে বাড়ির বাচ্চা মেয়েটিকে দেখা যায় জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে। তেমনি "পাড়াপড়শী"রা আলিসায় জানালায় ছাদে ভীড় করে পাশের বাড়ির দুটি ছেলেমেয়ের গোপন চুম্বন দৃশ্য দেখার জন্য। অঙ্কন ভাল। রূপারোপ ব্যঙ্গচিত্রধর্মী। গল্প বলার প্রবণতা ছবিগুলোকে নষ্ট করেছে। বসের কল্পদৃষ্টি বা দামিয়েরের তীর্যক কল্পনা নেই। এসবের বোধবুদ্ধি হঠাৎ মাথায় গজায় না। চাই অভিনিবেশ।

স্বপন বিশ্বাস দিল্লি আর্ট কলেজের অধ্যাপক। এঁর অঙ্কনের উপস্থাপনা, ভূমি বিভাজন বিস্তার, কালো সাদার বন্টন, কালোর মধ্যে ধূসর ছায়, তুলির চাপের মজা মন্দ লাগেনি। আর্চবিশপ ম্যাকারিয়সের মুখ, মাঠের মধ্যে বসে থাকা একটা লোক, মুখোশপরা কেউ কেউ, তিনটে যুবকের হেঁটে যাওয়ার বিচিত্র ছায়া নিয়ে অদ্ভুত ধরনের চিত্রকল্প রচনা করেছেন। অভিনবত্ব আছে তাঁর কাজে।

প্রসূনকান্তি ভট্টাচার্যের ছবি

প্রসূনকান্তি ভট্টাচার্য মেটে গুঁড়ো রঙ দিয়ে ক্যানভাসের ওপর কাজ করেছেন। কখনো অ্যাক্রলিক সহযোগে। এসব তাঁর আগেকার তেলরঙের স্বকপোলকল্পনার তুলনায় কিঞ্চিৎ ন্যূন। প্যাগো প্যাগো, তাহিতি দূর প্রশান্ত মহাসাগরীয় এসব ছবিতে প্রসূন সূর্যকরোজ্জ্বল গগ্যাঁ এবং রুসোর বিষুবীয় জঙ্গলী জগতে ঘুরে ফিরছেন। একটি ছবিতে অকস্মাৎ ভাগলপুরের আশপাশের মানুষ এবং বিহারী পাহাড়ী নিসর্গ এসেছে। সেখানে প্রসূনকে দেখা গেল নিজের চেহারায়। সকলের ছবি আন্তরিক।

সন্দীপ সরকার

রে ক র্ড

বসন্তের প্রার্থনা : শীতের উত্তর

॥ দুই ॥

আকাশবাণীতে এখন মাসের প্রথম রবিবার, বিভিন্ন শাখায় পরিচিত ব্যক্তিত্ব নিজেদের পছন্দ করা গান বাজিয়ে শোনান "গানের ভুবন" অনুষ্ঠানে। মজার ব্যাপার হচ্ছে প্রত্যেকে এমনকি শিল্পীরাও যে গানগুলি বাজাচ্ছেন সেগুলি কয়েক দশক আগেকার গান। অর্থাৎ প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন সমৃদ্ধ অতীতকে। এই বছর নতুন রেকর্ডের পাশাপাশি পুরোন গানের সংকলনগুলি বাজালেই সেই সত্য আরও প্রকট হবে।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ১৯৪৩ সালে সুবোধ পুরকায়স্থের লেখা ও কমল দাশগুপ্তের সুরে রেকর্ড করেছিলেন "সেদিন নিশীথে বরিষণ শেষে", চল্লিশ বছর পার হয়েও কেউ সুরের আবেদন অস্বীকার করতে পারবেন না। "বাতায়নে" "নিরজনে" শব্দগুলি হয়ত এখন ব্যবহৃত হয় না কিন্তু সঞ্চারীর সুর এখনও অভিনব। ১৯৪৮ সালে হীরেন বসুর কথা ও অনুপম ঘটকের সুরে গেয়েছিলেন "প্রিয়ার প্রেমের লিপি" এবং "শুকনো শাখার পাতা ঝরে যায়" দরবারি কানাড়া ভেঙে। আধুনিক বাংলা গান প্রচুর কিন্তু সঞ্চারীতে "পদ্মপত্রে নখরেখা পত্রলেখার ছলে/ আমার বেদনা হায় লিখি কুতুহলে/ সে শুধু নখরাঘাত হৃদয় কমলে/ বেদনায় ম্লান হয়ে থাকা" লেখা এবং সুর অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। "শুকনো শাখার পাতা ঝরে যায়" পঞ্জাবী হীর সম্ভবত প্রথম বাংলা গানে এল। হিন্দী আনারকলি ছবি: "হায় বাদসবা" অনেক পরের ঘটনা— খুব সহজ সরল অথচ অন্তর্ভেদী— যা আজও উদাহরণ।

পরেশ ধরের কথা ও সুরে ১৯৫৩ সালের "জোয়ারের গান"। আসামের "ও মোর মলুয়ারে" গানে অনুপ্রাণিত গান। কিন্তু কখনই সুরানুবাদ নয়। আমরা এখন প্রদেশান্তরে বা বিদেশের গানে অনুপ্রাণিত হলেও কথা ও সুর মেলাতে পারি না। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত "আমি ঝড়ের কাছে রেখে" কাউকে মনে করিয়ে দিতে হবে না, কারণ বাংলা গানের জগতে সলিল চৌধুরী নিজেই ঝড়ের ঠিকানা। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত "আমায় প্রশ্ন করে" গানে "আমার চতুর্পাশে সব কিছু যায় আসে/ আমি শুধু তুষারিত গতিহীন ধারা" এই জাতীয় লাইন বাংলা গানে আসেনি। সুরের চমকের কথা বাদ দিলাম। প্রদেশান্তরের আর একটি সার্থক গান ১৯৭০ সালে "দোল দোল দোল" গানের ছন্দ সুর

সবটাই আমাদের কাছে অজানিত। ১৯৯৬ সালেও যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "ভুল নেই"-এর মত গান, সুর করেছিলেন পরবর্তীকালে সেই রকম গান আর হয়েছে কি? ১৯৬৩ সালে নচিকেতা ঘোষের সুরে গেয়েছিলেন "কোন নতুন কিছু কথা" গানটির ছক বিদেশী ওয়ালজ কিন্তু বাংলা গানে কোথাও অনাত্মীয় মনে হয়নি, এটাই রূপান্তরের আদর্শ। পাশাপাশি এই বছর শ্রাবন্তী মজুমদারের গান শুনলেই আমাদের সাঙ্গীতিক প্রগতি ধরা পড়বেই।

উৎপলা সেনের পুরনো গানের সংকলনে আছে— সুধীরলাল চক্রবর্তী, নির্মল ভট্টাচার্য, সলিল চৌধুরী, রবিন চট্টোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও অভিজিৎ-এর সুরের গান। উৎপলা সেনের চল্লিশের দশক এবং পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মনে হয় কাননদেবীর গান শুনছি। প্রতিটি গানই হিট। নির্মল ভট্টাচার্যের সুরে "রাতের কবিতা শেষ করে দাও" গানে আবার দরবারি কানাড়া কিন্তু বাংলা গানের মেজাজ অক্ষুণ্ণ রেখে। "প্রান্তরের গান" এখনও শুনলে মনটা মনে হয় প্রহান্তরে চলে গেছে। বিমান ঘোষের সুর করা "শুকতারা গো নিওনা বিদায়" এবং "সকরুণ বীণা বাজোয়ো না" শুনে মন খারাপ হয় এই ভেবে যে বিমান ঘোষ কেন বেশি সুর করেননি। সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুর শুনে মনে হয় সত্যিই "ময়ূরপঙ্খী ভেসে যায়।" একটি অসাধারণ কম্পোজিশন 'তুমি যে ভালবেসে ছিলে'। হয়ত যে সময় গানটি রেকর্ড হয়েছিল, তখন-পরীক্ষা ততটা সাফল্য পায়নি—গানটি এখনও নিঃসন্দেহে আধুনিক।

শারদ অর্ঘে শ্যামল মিত্রের ক্যাসেট প্রকাশিত পুরোন ফিল্মের গান নিয়ে। শ্যামল মিত্রের পুরোনো গান মনে করিয়ে দিতে পারে আমরা কতটা হারিয়েছি। ফিল্মের গানের আবেদন সরাসরি। সেখানে দৃশ্যের সঙ্গে গান মনে গেঁথে যায়। অনেক ছবিই গানের সূত্রে মনে পড়ে। রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সবকটি সুরই এই সহজিয়া ধর্মে দীক্ষিত। একই সুরকার "সাগরিকা" "আকাশপ্রদীপ" "কমললতায়" ভিন্ন ধরনের সুর করেন। প্রত্যেকটি গান এখনও সকলে গুন গুন করবে। খুব বেশি প্রচার পায়নি, কিন্তু "দ্বীপের নাম টিয়ারং" ছবির "আমি চাঁদেরই সাম্পান যদি পাই" গানে প্রণব রায়ের কথা চমকে দেবে। হঠাৎই নতুন জাতের কথা ও সুর পেড়ে শ্যামল

উৎপলা সেন

মিত্র নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। "বালুচরী" ছবিতে সুরকার রাজেন সরকার নিজেকেই ভেঙেছেন। নচিকেতা ঘোষের সুর দেওয়া "পুতুল নেবে" গানের জন্য এখনও আকাশবাণীতে অনুরোধ আসে। "অন্তরাল" ছবিতে সুধীন দাশগুপ্তের সব সুর এখনও ভাল লাগে না, ঠিক তেমনিভাবে শ্যামল মিত্রের নিজের সুর দেওয়া "দেয়ানেয়া" ছবির গান এখনও চলে, কিন্তু অনেক পরের ছবি হলেও "আনন্দ আশ্রম" ইতিমধ্যেই হারিয়ে গেছে।

গতবারও তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় পুরনো গানের সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। এবারের সংকলন পরবর্তী পর্যায়ের গান নিয়ে। সম্ভবত অনল চট্টোপাধ্যায়ের সুরে "মধুমতী যায় বয়ে যায়" অনেক আগের রেকর্ড। অন্য গানের সঙ্গে মেজাজের তফাৎ হয়ে যায়। অভিজিৎ-এর সুরে "যদি প্রশ্ন করো" গানটি ভাল লাগলেও "তোলপাড় তোলপাড় মনের কথা" কথার সঙ্গে সুর মিলছে কি? ইন্দুবালায় রেকর্ডের গান "ওরে মাঝি তরী হেথায়" গানটি আবার তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় রেকর্ড করেছেন। গানটি যে কেউ সুর শুনেই বলে দিতে পারবেন পুরোন দিনের গান, "জঙ্গলে ঝড় এল" গানটি শুনেই বলবেন একালের গান। কিছু কিছু গান সময় পেরোতে পারে না, কিছু গান সমকালীন হয়েও সমকাল পেরিয়ে যায়। এই সংকলনে পর পর চারটি গান প্রায় একই মেজাজের তার মধ্যে একটি গান বোধ হয় তৃতীয়বার প্রকাশিত হল। কোই পরোয়া নেই—কারণ শিল্পী সগর্বে ঘোষণা করতে পারেন "বদনাম হবে জেনেও ভাল বেসেছিলাম।"

বনশ্রী সেনগুপ্তও একটি গানের সংকলন প্রকাশ করেছেন। বনশ্রী সেনগুপ্ত হয়তো পঁচিশ বছর গাইছেন, কিন্তু সবচেয়ে ভাল লাগে তারও আগের গান। রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে "আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ" ও "চাঁদের এত আলো" বনশ্রী সেনগুপ্ত আবার গেয়েছিলেন কিন্তু সুরের আবেদন এত সুদূর প্রসারী যে সব সময়েই ভাল লাগে। জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কথা ও সুরে "আমার অঙ্গে জ্বলে রংমশাল" এবং শ্যামল ঘোষের কথা ও প্রবীর মজুমদারের সুরে "আজ বিকেলের ডাকে তোমার" দুটি গান সম্ভবত প্রথম প্রকাশ হয়েছিল ১৯৭৬ সালে।

জোর দিয়েই বলা যায় কথা ও সুরের জন্য এই গান ১৯৯৬ সালেও মুগ্ধ করবে। রবীন্দ্র জৈনের সুরে গানটি, বা সুধীন দাশগুপ্তের সুরে দু'একটি গান আবারও শুনতে হবে। যেমন রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে "পরেছি চাঁপা ডুরে শাড়ি" এখনও শুনতে ইচ্ছে করে। সলিল চৌধুরীর অন্য গানের মত "একবার দুইবার" দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সুধীন দাশগুপ্তের সুরে "ছিঃ ছি ছি একী কাণ্ড করেছি" গানের মেজাজটি আলিবাবার গানের মত যা এখনও ভাল লাগে। "হীরা ফেলে কাঁচ" গানটির ছকে আরও গান আছে, সুধীন দাশগুপ্তের নিজেরই সুরে "স্বর্ণ ঝরা সূর্য রঙে" বা সলিল চৌধুরীর "থিতাং থিতাং বোলে" এক এক সময় একটি প্যাটার্ন খুব চালু হয়। "হীরা ফেলে কাঁচ" গানের ইনটারলিউডে "চিও চিও চি" গানের সুর উকি দিয়ে যায়। ইতিমধ্যে কয়ারও জনপ্রিয়। বাংলা পুরনো গানের সুরের মত কথার আবেদনগুলি ফুরোতে চায় না। এ বছর হৈমন্তী শুক্লার "সুখের দিনগুলি দূরে" লেখা প্রণব রায়ের। "স্মৃতির সুরভি" বা "ধূপের" তুলনা বহুল ব্যবহৃত, কিন্তু সবকিছু মিলে নিটোল মেজাজ। অনিল ভট্টাচার্যের ক্ষণস্থায়ী ধূপের চিত্রকল্প সমস্ত গানটাতে জড়িয়ে থাকে। কিন্তু এখনকার

বনশ্রী সেনগুপ্ত

গানের রাজ হঠাৎ হঠাৎ "ফুলদানী" আক্রমণ করে না। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, হৈমন্তী শুক্লার জন্য লিখেছেন "যে তুমি শ্যামের বাঁশি বাজাও" গানটি সম্পূর্ণ পুরুষের পারসপেকটিভে লেখা। সর্বত্র ভাল বাসা। "এ তো বড় রঙ্গ যাদু"র অনুপ্রেরণায় "মেঘ কালো আঁধার কালো" প্রচণ্ড জনসমাদর পেল। সঙ্গে সঙ্গে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় পরীক্ষার তুলনামূলক আলোচনার পথ বেছে নিলেন—এবং পঁচিশ বছরেও সেই ছক পাল্টাতে পারলেন না। ক্রমশ এমন জায়গায় পৌঁছলেন যে এবারে শিবাজী চট্টোপাধ্যায়ের গানে লিখলেন "ফুলের জন্য ফাগুন ধন্য না ফাগুনের জন্য ধন্য ফুল"—এইভাবে নদী না কূল, জাতীয় যমজ শব্দ দিয়ে গান রচনা। এইরকম চলতে থাকলে হয়তো একদিন লেখা হবে "ঘুড়ির জন্য সুতো না সুতোর জন্য ঘুড়ি/মুড়ির জন্য চাল না চালের জন্য মুড়ি/ছুঁড়ির জন্য ছোঁড়া না ছোঁড়ার জন্য ছুঁড়ি।" গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার প্রেমের গান লিখতেন, কিন্তু শচীনদেব বর্মনের গানের জন্য তাঁর আলাদা কলম থাকতো। সব গানই হিট। শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন হাজারিকার গানের জন্য ইতিহাস ভূগোল খুলে রাখেন আর কিশোর কুমারের গানের জন্য বর্ণপরিচয় বা শিশুপাঠ্য ছড়া। তিনি অবশ্য স্বপ্না চক্রবর্তীর "আমার ঘরে টিভি আছে" গানটিতে সার্থক। লোকগীতি এখন অনেক সময় কৌতুক গীতির পরিপূরক।

এক এক সময় এক ধরনের সঙ্গীতানুষঙ্গের প্যাটার্ন-প্রভাব বিস্তার করে। সুধীরলাল চক্রবর্তীর সুরে উৎপলা সেনের গানের অর্কেস্ট্রা শুনলে কমল দাশগুপ্তের ছবির কথা মনে আসবেই। যদিও "যদি ভাল না লাগে তো দিও না মন" গানের প্রিলিউড অংশ আজও অনেকের ভাবনার খোরাক। নির্মল ভট্টাচার্যের সুরে হারমোনিয়াম কিংবা অর্গান অনেক সময় বিরক্তিকর। কিন্তু গান সেখানে কান ফেরাতে দেয় না। "প্রিয়ার প্রেমের লিপি" গানের তবলা সহযোগিতায় এখন নিশ্চয়ই কেউ উৎসাহী হবেন না কিংবা "এখনই নয় নাই বা গেলে" গানের প্রিলিউডে অবান্তর গীটারের সংযোজনও। পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ান এক সময় খুব জনপ্রিয়। সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুরে "ঝিকমিক জোনাকীর দীপ জ্বলে" বা "মহুয়া বনে পাপিয়া" গানে অ্যাকর্ডিয়ানে কাউন্টার পয়েন্ট হাস্যকর। একই সময়ে অভিজিৎ-এর

সুরে "এত মেঘ এত আলো" গানের যন্ত্রানুষঙ্গ বিস্ময়কর। অ্যাকর্ডিয়ানের জায়গায় পরবর্তী সময়ে সিনথিসাইজার অনেক সময় বিপত্তি ঘটিয়েছে। কমল দাশগুপ্তের প্যাটার্নের পরে এল সলিল চৌধুরীর প্যাটার্ন। অন্য যন্ত্রীরা এই ধরন নিয়ে হিমশিম খেলেন। "আমায় প্রশ্ন করে" গানটির প্রিলিউড বিদেশী সিম্ফনীতে শোনা যাবে। কিন্তু সকলেই সলিল চৌধুরী নন। ফলে ঐ ধরনের সঙ্গীত রচনা করতে গিয়ে অনেকেই বিপদে পড়েছেন। যদি "প্রান্তরের গান" পরে রেকর্ড হত তবে সলিল চৌধুরী নিশ্চিতভাবেই যন্ত্রবিন্যাস বদলাতেন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে যন্ত্রদঙ্গল গানকে বিপর্যস্ত করত, সেই যথেচ্ছ যন্ত্র ব্যবহার অনেক কমেছে। অজয় চক্রবর্তীর রাগপ্রধান গানের অ্যারেঞ্জমেন্ট অনেক ভ্রান্ত ধারণাকে ভেঙে দেবে। সবরকম যন্ত্রের নিপুণ ব্যবহার। পরিমিত অথচ অব্যর্থ। এক জায়গায় গানের কথায় বাঁশি আছে বলেই বাঁশি বেজে ওঠেনি। অথচ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কোকিলের কথায় কোকিলের ডাক বা শ্রাবন্তী মজুমদারের গানে শিশুর কথায় হাস্যকরভাবে শিশুর কান্না এসেছে আক্ষরিক ব্যাখ্যা হয়ে। সলিল চৌধুরী যেমন বিদেশী সুরকে আত্মস্থ করেছেন তেমনি চেনা লোক সঙ্গীতের সুরকে তার সীমা ছাড়িয়েছেন। উৎপলেন্দু চৌধুরীও সেটা ধরেছেন যদিও তাঁর গানে অনেক সময় বাঁশি গানের ব্যালান্সকে ক্ষুণ্ণ করে। যান্ত্রিক প্রয়োগও একালের প্লাসপয়েন্ট। সন্ধ্যা মুখার্জির একটি গানে "ডাক" এবং হৈমন্তী শুক্লার গানে "দিনগুলি" শব্দে রিভাইব্রেশন যন্ত্রের থেকেও বেশি কার্যকর। অন্যদিকে শ্রাবন্তী মজুমদার "ইকো" দিয়ে গানকে ভরাট করতে চেয়েছেন—ফল হয়েছে উল্টো, কোন গানের কথা স্পষ্ট নয়। যে গানটিতে "ইকো" কম সেটিই প্রাণদায়ী "যদি সুন্দর একখান মুখ পাইতাম" পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় একটা নতুন সাবজেক্ট নিয়ে লিখতে পারেন, প্রতিভার গোড়ায় জল্য চালচিত্র না প্রতিভার ত্রুটি সংশোধনের জন্য চালচিত্র?

কালের সঙ্গে সঙ্গে হাসির ধরনও বদলায়েছে। ভাবতে অবাক লাগে দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল যখন অসাধারণ ব্যঙ্গগীতি সৃষ্টি করেছেন, তখন বাজার মাত করেছে নবদ্বীপ হালদার বা রঞ্জিত রায়ের নিছক কৌতুকগীতি—যদিও তা নিপুণ। বিমল গুপ্ত বা ক্ষিতীশ বসুর গানে অন্য মেজাজ। কিন্তু কমিকগান বা স্কেচ পুনঃ প্রকাশিত হয় না, তাৎক্ষণিকেই এর সমাপ্তি। প্যারডি রজনীকান্ত নজরুল সকলেই করেছেন। একালের প্যারডি শুধু হিন্দী গানের চটুল সামাজিক বিশ্লেষণী অনুবাদ। এ ক্ষেত্রে জনপ্রিয় গানটাই মূলধন হয়ে দাঁড়ায়, ব্যঙ্গটা রেস্তরাঁ-র বিলে সরকারি ট্যাক্সের সংযোজন মাত্র। সুভাষ সাহা ও দীপা সাহা কতকগুলি স্কেচ উপহার দিয়েছেন। বিশেষ করে ভাল লাগে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের রচনাগুলি। কারণ তাতে সাহিত্যগুণ আছে। কিন্তু শিল্পী তানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভুলতে পারেননি। কিছু কিছু শিল্প আছে যাকে অনুকরণ করা যায়, অতিক্রম করা যায় না। কিন্তু বছরের সেরা কৌতুক পরিবেশন করেছেন এইচ এম ভি নিজেরাই। ক্যাসেটের উপরে বিধিসম্মত সতর্কীকরণ "জাল ক্যাসেটে আপনার রেকর্ডার খারাপ হয়ে যেতে পারে।"—সাবিনা ইয়াসমিনের ক্যাসেট অনেক চেষ্টা করেও এক ইঞ্চি নড়ানো গেলো না। প্রমাণিত হল জাল ক্যাসেট তবু বাজে, হয়তো প্রমাণ করতে চেয়েছেন কোন ক্যাসেট না বাজালেই রেকর্ডার ভাল থাকে। কিন্তু কিছু এইচ এম ভির আগমার্কা ক্যাসেট একেবারেই বাজে না। এরপরেও বোঝার উপর শাকের আঁটি, মিণ্টু দাশগুপ্তের নামাঙ্কিত ক্যাসেট বাজিয়ে আদ্যন্ত ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কীর্তন শোনা গেল। মাসটা সেপ্টেম্বর তবুও এপ্রিলফুল হতে হল। এটাই উপরি পাওনা বা এইচ এম ভি বোনাস।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

সং গী ত

রেডিও সঙ্গীত সম্মেলন

কোলকাতা বেতারকেন্দ্র আয়োজিত এবারের 'রেডিও সঙ্গীত সম্মেলন'এ অংশগ্রহণ করেছিলেন বঙ্গের দুই প্রখ্যাত শিল্পী—যন্ত্রে সান্তুরবাদক পণ্ডিত শিবকুমার শর্মা এবং কণ্ঠসঙ্গীতে প্রভা আত্রে। প্রথমে সান্তুরে পুরিয়া কল্যাণ রাগ পরিবেশিত হয়। শিল্পীর বাদনশৈলীর সুপরিচিত পরিকল্পন ও প্যাটার্নের বুদ্ধিদীপ্ত পুনর্বিন্যাসই ছিল এই অনুষ্ঠানের বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়। পরিবেশনরীতির পরিবর্তিত আঙ্গিক বিশেষভাবে অনুভূত হয় জোড় ও [illegible] পর্যায়ে। সুসংবদ্ধ [illegible] ঝংকৃতি শিল্পীর স্বকীয় ঢঙে [illegible] রসোত্তীর্ণ পরিবেশনা। তারসপ্তকের মৃদুস্পর্শী রূপায়ণভঙ্গী বিস্তার পর্বটিকে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তোলে। রূপক ও ত্রিতালে নিবদ্ধ গৎকারিতে লয়কারির শিল্পকর্ম বিন্যস্ত হয়েছে একটু পরিবর্তিত আঙ্গিকে। স্বতঃস্ফূর্ত আবেদনসমৃদ্ধ এই পর্যায়টি লয়বিন্যাসের সুনির্দিষ্ট পারম্পর্যে ও সুরের বৈচিত্র্যে যথার্থই রসোত্তীর্ণ। লড়ন্ত ও ঝালা অংশে তাঁর বড়জের একটানা প্রয়োগের সঙ্গে অন্যান্য স্বরসংগতির সুচিন্তিত ব্যবহারে ও তাদের সাবলীল বিচরণে বিচিত্র প্যাটার্ন উদ্ভাবনের অভিনবত্ব লক্ষণীয়। শিল্পীর সঙ্গে অত্যন্ত আকর্ষণীয় তবলা সহযোগিতা করেছেন সাকাৎ আহ্‌মেদ খাঁ। পরবর্তী শিল্পী প্রভা আত্রে মধুকোশ রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন। বিস্তারাংশে রাগরূপের বিভিন্ন সম্ভাবনাগুলিকে পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করা হয়নি। প্রধানত স্থায়ীস্বরাশ্রয়ী এই বঢ়াত পর্বটিতে চিন্তাধারার বিশেষ অভিনবত্ব না থাকলেও শিল্পীর ভরাট সুরঋদ্ধ কণ্ঠস্বর এবং মসৃণ কণ্ঠপ্রক্ষেপণভঙ্গী এই অংশটিকে

শিবকুমার শর্মা

আকর্ষণীয় করে তোলে। বন্দেজ পরিবেশনের বিশিষ্ট রসাত্মক ভঙ্গিটিও মনোগ্রাহী; তবে, সম্ভবত তারসপ্তকে কণ্ঠপ্রক্ষেপণের অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিলম্বিত একতাল গানে তিনি অন্তরা পরিবেশন করেননি। 'মানে না মানে না', অনবদ্য এই ত্রিতাল বন্দেজটিতে তানের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার ও নিটোল দানা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে তিনি একটি প্রথাধর্মী পীলু দাদরা গেয়ে শোনান। শিল্পীর সঙ্গে তবলা ও হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেন মোহন মুংগ্রে ও রঘুনাথ নাকোড়।

বিনতা মৈত্র

খেয়া

রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মোৎসব উপলক্ষে ফেডারেশন হল সোসাইটি যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন এ-বছর, তারই একটি শোনার সুযোগ হল সম্প্রতি। নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক এই রবীন্দ্র সংগীতানুষ্ঠানে 'রূপ-রম্য-বীণা' পরিবেশন করলেন রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থ অবলম্বনে গীতিআলেখ্য—'খেয়া' অর্থাৎ খেয়া

সলিল মিত্র

কাব্যগ্রন্থের সামগ্রিক ভাবধারার সঙ্গে মিলিয়ে এক নির্বাচিত রবীন্দ্রসংগীত গুচ্ছ। খেয়া কাব্যগ্রন্থে কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত রয়েছে কবিতার আধারে, তারই মাত্র তিনটি এই গীতিআলেখ্যতে পাওয়া গেল, বাকীগুলিও অনায়াসে স্থান পেতে পারত। এই তিনটি গান ছাড়া পরিবেশিত অন্যান্য গানগুলির নির্বাচন সম্পর্কে অবশ্য সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই, গানগুলি মূল বিষয়ের সঙ্গে মোটামুটি সম্পৃক্ত বলা চলে। সংগীতাংশে প্রথমেই মনে আসে বেহালা যন্ত্রানুষঙ্গী হিসেবে সুপরিচিত সলিল মিত্রের নাম। 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' গভীর কণ্ঠে গেয়ে অবাক করেছেন। আর অন্যান্য গানগুলির সঙ্গে তাঁর সুনিপুণ বেহালা-সহযোগিতা তো ছিলই। গোপাল পাত্রের 'গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে' আবেদন রেখেছে, কিন্তু কণ্ঠে ট্রেমেলো কিংবা খাদের দিকে কণ্ঠস্বরে কৃত্রিমতা নজর এড়িয়ে যাওয়ার নয়। অভিজিৎ চক্রবর্তীর গান পরিচ্ছন্ন।

অপর্ণা ঘোষ, সুচন্দ্রা বসু কিংবা গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও পরিচ্ছন্ন গাইলেন তবে মাইক্রোফোনকে সঠিক ব্যবহার করতে পারলে তাঁদের গান উজ্জ্বলতর হত। কণ্ঠটি সুন্দর সুনন্দিতা চৌধুরীর, গায়নভঙ্গিটিও স্বাভাবিক। আর গ্রন্থনাপাঠেও তিনি উল্লেখ্য।

সম্মেলক গানগুলির চেহারা বিশেষ সুখপ্রদ নয় এক 'আমার প্রাণে গভীর গোপন' ছাড়া। কোন গানে যথার্থ কণ্ঠ-সম্মিলন ঘটেনি, কোন গানে আবার সবাই সমান ভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং আরও অনুশীলনের প্রয়োজন ছিল সম্মেলক গানগুলির ক্ষেত্রে। আর একটি কথার উল্লেখ করা দরকার যে তালবাদ্যে সহযোগীর দুর্বলতায় বেশ কিছু গান কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত। এ ব্যাপারে আগেই সতর্ক ও যত্নবান হওয়া উচিত ছিল। গ্রন্থনাপাঠে সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সুচন্দ্রা বসু যথাযথ। গ্রন্থনা ও পরিচালনা সুচন্দ্রা বসুর।

স্বপন সোম

নাটক

চোরের আস্তানা হয় পীরের মাজার

ফিরদৌসি মজুমদার (ডাইনে)

আকাদেমিতে "পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়"-এর দুটি অভিনয় হওয়ার আগেই, ঢাকা থিয়েটারের নাটকটির অভিনয় অনুষ্ঠান সংখ্যা বিরানব্বুই। স্বভাবতই থিয়েটার ওয়ার্কশপ যখন তাঁদের দুই দশক পূর্তি উপলক্ষে আমন্ত্রণ জানালেন, তখন তাঁরা সফলতম প্রযোজনা বেছে নিয়েছিলেন। (প্রথম অভিনয় ১৯৭৬) শামসুল হকের এই কাব্যনাট্য "পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়" কেন সফলতা পেল, সেটা ভাবলেই বাংলাদেশের থিয়েটার সম্পর্কে একটা ধারণা করা যাবে। ভাষার জন্য আন্দোলন পৃথিবীতে নতুন। যাঁরা ভাষা নিয়ে আন্দোলন করেন নিশ্চিতভাবেই তাঁদের প্রস্তুতি এবং ভাবনা অন্যরকম। সম্পূর্ণ জীবন থেকে নেওয়া। আমাদের এখানে কাব্যনাটকের বিষয় সবসময় মহাভারত, পৌরাণিক আখ্যান, জাতক অথবা মনের গভীরে আলোড়ন, দ্বিতীয় সত্তার প্রকাশ। সমস্যা, সংগ্রামের কথা, আটপৌরে ভাষা নিয়েও যে কাব্য নাটক রচনা করা যায় সেটা এপারে চিন্তায় আসে না। এই ভাবনাগুলির ভূমি প্রস্তুত ছিল বলেই বাংলাদেশে কাব্যনাটক কোন সাধারণ দর্শকের কাছে ভীতিজনক দুরন্ত রচনা করে না। "পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়" মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা এবং মুক্তিযুদ্ধের কিছু পরেই প্রযোজিত। অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রতিটি অন্তর যখন উদ্বেল—তখনই এই নাটক। এ প্রান্তেও এরকম অজস্র উদাহরণ আছে।

বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপ বদলে যায় আভিজাত্য ও গোত্র ভেদে। মাতব্বর বোঝায় "কও দেখি, বিপদ কোথায় নাই ? কোন কামে নাই ? আর সকল কামের চেয়ে বড় হইল দেশ রক্ষা করা। এ তোমার এমন না যে হাল দিয়া জমি চাষ করা। অথবা খালুই দিয়া ইচা মাছ ধরা। দেশরক্ষা করা হইল পানি না নাড়ায়া পানির উপরে ঠিক রাখা নিজ ছায়া।" এই মাতব্বর যখন গ্রামবাসীদের জেরায় বেহাল তখন স্বগতোক্তিতে বলে "এই হইল এক অসুবিধা। সাধারণ লোক নিয়া তিতা হয় জান। খেপলে আগুন দিয়া পোড়ায় সেগুন। কোন চিন্তা বিবেচনা নাই। কিনারায় ফাল পাড়ে। অথচ গহীন গাঙে যারে হাল ধইরা যাইতে হয়। সেখানে যে আলামৎ হয় তার কোন বোঝাসোজা নাই।" এই মাতব্বর মেয়ের সামনে দিশাহারা "চুপকর, চুপকর যমুনায় বানে ভাসা হালের বলদ ক্যান আছিল বা আশা/কোথায় কিস্যান এক মাথা চাড়া দিয়া ভয়ঙ্কর। আমার ছায়ার পরে বড় এক ছায়া ফেইলাছে। আমার বেবাক বুদ্ধি ভোকাট্যা ভাইসা যাইতাছে। চৈতের ঘুড্ডির মতো পাথারের মাথার উপরে/যদিও এখনো সুতা হাতের ভিতরে নাই নাই আর কিছু নাই।" মাতব্বরের মেয়ে বিপর্যয়ের পর আল্লার নামে সন্দিহান। "মানুষের অধিকার নাই আর সোয়াল করার। তবে আছে নাম নিয়া তিনবার। আমারে পাঠান তিনি পাপের রাস্তায়। পরে পাপ হাজারে হাজারে। মানুষ নিশ্চিন্তে করে, সাক্ষী নাম তো সেই আল্লার।" আবার চরম রাত্রি সম্পর্কে মাতব্বরের মেয়ে বলে "মিলিটারি এ বাড়িতে আইসাছিলেন/ এর মধ্যে কোন ভুল নাই। কোন সন্দ নাই/ নিজেই তিনি বাইস আইসাছিলেন। যেমন মানুষ গেলে পথে চিহ্ন থাকে। আছে চিহ্ন আছে। যেমন বানের শেষে পাড়ে চিহ্ন থাকে। আছে চিহ্ন আছে। যেমন মারীর শেষে গায়ে চিহ্ন থাকে। আছে চিহ্ন আছে। যেমন হিমের শেষে ডালে চিহ্ন থাকে। আছে চিহ্ন আছে অধৈর্য গ্রামবাসীরা বলে "অতো কাকুতি মিনতি ক্যান ?/ তোতোবোতো ক্যান ? দ্যাখা যদি তিনি নাই দিতে চান। হাতে ধইরা না, পায়ে ধইর‍্যা না। ঘাড়ে ধইর‍্যাই আন। অতো প্যাচাল। অতো ভ্যাজাল। অতো প্যানর প্যানর ক্যান।"

নাটক থেকে এত উদ্ধৃতি দেওয়ার কারণ এখানে নাট্যকর্মীরা বুঝতে পারেন, কিভাবে আটপৌরে কথাও কাব্য হয়ে ওঠে। এই কাব্যনাট্যের ভাষা কখনই পরীক্ষার্থীকে বিপাকে ফেলে না। অথচ এত ভাল নাটক পেয়েও "ঢাকার থিয়েটার" কিছুই করতে পারেননি। জনসমাদৃত হওয়ার কারণ আগেই বলেছি। কোরাসে তাল মিলিয়ে ছড়ার ছন্দে কথা বলা, এদেশের এখন কিছু কিছু কম্পিটিশনের নাটকে দেখা যায়। ক্রমাগত একই রীতি অনুসরণ করা হয়। মাতব্বরের ভূমিকায় আবদুল্লাহ আলমামুন আদ্যন্ত একই সুরে কথা বলেন—এক সময় মনে হয় পাঁচালী পড়া হচ্ছে। প্রথমার্ধ এই পুনরাবৃত্তির জন্য সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। দ্বিতীয়ার্ধে মাতব্বরের মেয়ের ভূমিকায় ফেরদৌসী রহমান মঞ্চে আসেন এবং দর্শককে সচকিত করে তোলেন —অগ্রহায়ণে বৈশাখী ঝড়ের মতন। অভিনয় জিনিসটা যে কত জরুরী সেটা আরও একবার প্রমাণিত হল। একজন নির্যাতিতা সমর্পিতা অথবা সময়ের কাছে বলিদত্ত কন্যা—কখনই তার তেজ কমে না। ফেরদৌসী বলে চলেন "এমা পাকঘর সুনসান। হঠাৎ আছাড় দিয়া আসমানে দেখা দিল চাঁদ/ এক ফালি কদুর লাখান।" এই প্রচণ্ড অভিনয়ে দর্শক সমব্যথী হয়, মৃত্যুর পর যখন দেহ নিয়ে যায় তখন চরিত্রের সঙ্গে দর্শকও নীরবে গেয়ে ওঠে "সোনার পুতলীখানি যায় ভাইস্যা যায়"। এইরকম চরিত্রের সঙ্গে একহয়ে যান পীর সাহেবের ভূমিকায় আবদুল কাদের। গানগুলি প্রচলিত লোকগীতি। "মায়ারুল আলাম মবুজ বেশ ভাল গান করেন কিন্তু প্রতিবার গান ধরার সময় স্কেল নিয়ে বিপত্তি ঘটান। খুব ভাল লাগে আবদুল কাদেরের গান।

শেষ অংশে ব্যালে ফর্মটি হয়তো সময় বাড়িয়েছে, সুষমা বাড়িয়েছে কি ? মনে হয় ঢাকায় মহিলা সমিতির মঞ্চের পরিসর ছোট। একসঙ্গে এত লোক ; কিন্তু কম্পোজিশন এমন যে একের পিছনে আর একজন ঢাকা পড়ে যায়—এবং অনেক জায়গা থাকা সত্ত্বেও একজায়গায় জড়ো হয়। আলোর কাজ খুব সাধারণ, আলাদা ভাবে নাট্য মুহূর্ত সৃষ্টি করতে পারে না। একইভাবে আবহ রচনাও আলাদা দায়িত্ব নিতে পারে না। দুটি নাটকেই অনেক জায়গায় দেখা গেল মঞ্চের উপর শব্দ হলে আলো জ্বলে, অথবা নেপথ্যে আবহ থামলে কথা আরম্ভ হয় অর্থাৎ নির্দিষ্ট 'কিউ' না পেলে কাজ হয় না—বহু ক্ষেত্রে এই নির্দেশ অনভিপ্রেত। বাংলাদেশের থিয়েটার আন্দোলনের বয়স কম তবু বাংলাদেশের গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সদস্যদল একশ পাঁচটি। এছাড়া আছে রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত "থিয়েটার" নামে একটি সুন্দর পত্রিকা। মৌলিক নাটকেও তাঁদের মূলধন সমৃদ্ধ। এর সঙ্গে আছে কয়েকজন আমাদের অবাক করার মত শক্তিশালী শিল্পী—যার জন্য সমৃদ্ধতর ভাবনায় নতুন থিয়েটারের "পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়"।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

নটী বিনোদিনী

রামকৃষ্ণদেবের তিরোভাব শতবার্ষিকীকে মাথায় রেখে অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন 'সুরজম' গোষ্ঠী। বহু বিজ্ঞাপনশোভিত সুমুদ্রিত স্মারকগ্রন্থটি দেখে বোঝা গেল না গোষ্ঠীটি কি গ্রুপ থিয়েটার,না সাংস্কৃতিক সংস্থা। পরে অবশ্য

প্রযোজনা দেখে বোঝা গেল যে থিয়েটারের সঙ্গে খুব বেশি যোগাযোগ এঁদের নেই। তবে ভক্তি আছে এটা স্বীকার করতেই হবে। এই বিশেষ উপলক্ষে রামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদধন্যা 'নটী বিনোদিনী'র জীবন নিয়ে 'নটী বিনোদিনী' নাটকটি মঞ্চস্থ করে তাঁরা ভক্তজনের সাধুবাদ পেয়েছেন নিশ্চয়ই।

শ্রীদেবকুমার নির্দেশিত এই নাটকে আধুনিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। অন্তত আলো এবং সেট-এর ক্ষেত্রে। তবে আবহে একটা সিনথেসাইজার দৈবত ঢুকে পড়েছিল। অবশ্য সেকালে সিনথেসাইজার ছিল না তাই, থাকলে কি আর ব্যবহার হত না। সেট পরিবর্তনের সময় প্রায়ান্ধকারে শিফটাররা যখন মঞ্চে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তখন সিনথেসাইজার আর বেহালার ছিল অবাধ যুগলবন্দীর রাজত্ব। মোট তেরো জন অভিনেতা অভিনেত্রীর মধ্যে তিনজন অভিনয়টা ভালোই জানেন এবং অভিনয়ের সুযোগটা পূর্ণমাত্রায় নিয়েছেন। এঁরা হলেন বিনোদিনীর ভূমিকায় কমলা গুপ্তা, গান্নার ভূমিকায় কেকা চৌধুরী ও অমৃতলালের ভূমিকায় সুধীরঞ্জন দাশগুপ্ত। রাখালের ভূমিকায় বলাই দত্ত গান গেয়েছেন বেশ ভালো। ইলা দে-র বিনোদিনী আড়ষ্ট এবং বেসুরে গান গেয়েছেন। গিরিশ ঘোষের ভূমিকায় সুশীলকুমার পালিতকে খুব ভালো মানিয়ে ছিল।

মানিয়ে ছিল রামকৃষ্ণের ভূমিকায় কিশোরীমোহন দে-কেও। কিন্তু সর্বক্ষণ একটা খ্যাপাটে ভাব যে কেন তিনি তৈরি করে রেখেছিলেন কে জানে। রামকৃষ্ণদেব ঐরকম ছিলেন নাকি! অত বড়লোক গুর্মুখ রায়ের কি একটাই জরির জামা। অসঙ্গতি আরো অনেক ছিল। তবে প্রেক্ষাগৃহে খুব বেশি ভক্তজন ছিলেন না। কারণ অভিনয় চলাকালীন একটি দৃশ্যে রামকৃষ্ণদেব যখন প্রেক্ষাগৃহের প্রথম সারিতে এসে বসলেন এবং বিনোদিনীর অভিনয় এবং গান শুনে রি-অ্যাক্ট করছিলেন, দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন তখন হলে হুল্লোড় পড়ে যাচ্ছিল। প্রযোজনাগত কুশলতা ও অভিনয় উৎকর্ষের দিকে গোষ্ঠীটিকে অনেক সময় দিতে হবে।

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

সান্ত্বনা চৌধুরী

চট্টোপাধ্যায়। অর্জুনের গান আশিস ভট্টাচার্য গেয়েছেন অত্যন্ত দৃপ্ত কণ্ঠে। যোগাযোগে বিপ্রদাস চরিত্র অমন ব্যক্তিত্বহীন কেন? মধুসূদন চরিত্রটি খল নায়কের পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়াতে এই অংশটি বিধ্বস্ত হয়েছে। শেষ কথার অংশে অচিরার ভূমিকায় সান্ত্বনা চৌধুরীর অভিনয় স্মরণীয়। চরিত্রটি তাঁর অভিনয়ের গুণে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। 'সবলা'র নৃত্যরূপ ব্যর্থ অনুকরণ। অন্য একদল নৃত্য শিল্পীর কাজ ড্রিলের পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

সম্মেলক নৃত্যে ও গীতে অনুশীলনের অভাব প্রকট। আর নৃত্যে অনন্যা চট্টোপাধ্যায়ের পাশে ইন্দ্রা গুপ্তের মতো নৃত্যশিল্পী বড়ই বেমানান। সব মিলিয়ে উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রস্তুতির কোনো সামঞ্জস্য ছিল না, এখানেই প্রযোজনার ব্যর্থতা।

সুভাষ চৌধুরী

বি বি ধ

নহি সামান্যা নারী

সম্প্রতি শিশির মঞ্চে মাঙ্গলিক সংস্থা তাঁদের পঞ্চম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করেছিলেন তার মধ্যে ছিল অদিতি সেনগুপ্তর একক রবীন্দ্রসংগীত ও 'নহি সামান্যা নারী' শীর্ষক একটি প্রযোজনা।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় অদিতি সেনগুপ্তর একক কণ্ঠে একগুচ্ছ রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে। অদিতি সেনগুপ্ত নবীনা নন। তাঁর গান সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। বিরতির পর শুরু হল 'নহি সামান্যা নারী' শীর্ষক অনুষ্ঠান। প্রযোজনা সম্পর্কে সম্পাদিকার বক্তব্য: 'আমরা রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য ও নাটক থেকে কিছু কিছু অংশ তুলে ধরেছি যার মধ্যে রয়েছে কিছু অসামান্যা নারী চরিত্রের উন্মেষ। এই অসামান্যা নারীদের চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এরা স্ত্রী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। ...এখানে যে নারী চরিত্রগুলি সংকলিত হয়েছে তাঁদের চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় গতানুগতিকতার প্রবাহ থেকে কিছু ব্যতিক্রম'।

এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য, যোগাযোগ, শেষ কথা-র অংশ পরিবেশিত হয়। একটা নতুন কিছু করার তাগিদে এই সংকলনে যতখানি নিষ্ঠা ছিল ততখানি প্রস্তুতি ছিল না। গানগুলি অধিকাংশই সুপ্রযুক্ত হয়নি। সম্পাদনায় পরিমিতির অভাব ছিল। তবু মানতেই হবে সাধু প্রচেষ্টা। এরই মধ্যে যাঁদের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন নৃত্যনাট্যে সুরূপা চরিত্রে নৃত্যশিল্পী অনন্যা

অনন্যা চট্টোপাধ্যায়

শেষ নাহি যে

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের সওয়া শত বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করলেন একদা 'বারবধূ' খ্যাত চতুর্মুখ সংস্থাও। রবীন্দ্রনাথের জন্য তাঁরা দুপুর একটা থেকে প্রতাপ মঞ্চ বরাদ্দ করেছিলেন।

দুটোর কয়েক মিনিট আগে তবলা বাঁধার আওয়াজ পাওয়া গেল। দুটোয় শুরু। প্রথম শিল্পী বন্দনা সিংহ। রবীন্দ্রসংগীতের নির্বাচন সম্পর্কে কেন যে শিল্পীরা এত উদাসীন থাকেন! এত অজস্র গান, অথচ—পর পর চারটে পূজা পর্যায়ের গান গেয়েই বোধ হয় শ্রীমতী সিংহের মনে হল প্রেম পর্যায় বাদ পড়ে যাচ্ছে। তার দুটো গান করে, স্বদেশ পর্যায়ের গান দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হল। এরকম অযত্নচয়িত গানের গুচ্ছ নিয়েই অনেকে গাইতে বসছেন। হয়তো এ প্রসঙ্গের উল্লেখ করাটাও বাতুলতা মনে হবে ক্রমে ক্রমে। শ্রীমতী সিংহের কণ্ঠটি তারসপ্তকে অধিক তীক্ষ্ণ শুনিয়েছে সেদিন। দু-একটি উচ্চারণও কানে লাগে। কিছু অন্যমনস্কও মনে হয়েছে তাঁকে। প্রদীপ সেনগুপ্তের কবিতা পাঠ সম্পর্কে এখনো কিছু লেখবার সময় আসেনি আরো বেশ কিছুদিন তাঁকে নিরন্তর অনুশীলনের মধ্যে থাকতে হবে। এরপরের শিল্পী শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীতের নির্বাচনের দিকে একঝলক তাকানো যেতে পারে। ওগো তোমার চক্ষু দিয়ে—প্রেম, যেতে যেতে—পূজা (উপপর্যায়: দুঃখ), তোমার কটিতটের—গীতোৎসব, কার মিলন চাও—পূজা (উপপর্যায়: বিবিধ), বাধা দিলেপূজা (উপপর্যায়: আত্মবোধন), নিশি না পোহাতে—প্রেম, কে যেতেছিস্—প্রেম ও প্রকৃতি (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ১২৮৮ সালের স্বপ্নময়ী নাটকে ব্যবহৃত গান)। এই ছিল নির্বাচন। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন!

সুমিতা প্রধান

শেষ অনুষ্ঠান ছিল কথকের। এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কী সম্পর্ক কে জানে! জয়পুরের কুন্দনলাল গাঙ্গানির শিষ্যা সুমিতা প্রধান নৃত্যে অত্যন্ত পারদর্শিনী। অভিনয় অংশও বেশ ভাল। তেহাই, পরণ, টুকরা প্রভৃতি বিশিষ্ট আঙ্গিকের কাজ প্রশংসনীয়। চতুর্মুখ সংস্থা এরকম একটা খাপছাড়া অনুষ্ঠান কেন যে করলেন! তাঁরা তো রবীন্দ্রনাথের একটা নাটকই করতে পারতেন। কেতকী দত্তের মতো শিল্পী যখন তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন! তাতেই যথার্থ শ্রদ্ধা জানানো হত।

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

সারা বাংলা জুড়ে ছোটগল্পের এক বিশাল প্রতিযোগিতা

যুগ্ম উদ্যোক্তা
ক্যালকাটা কেমিক্যাল ও যুগান্তর

প্রতি মাসে দুটি পুরস্কার
১ম ৫০০০ টাকা
২য় ২০০০ টাকা
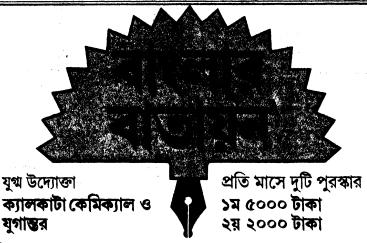
যুগ্মজয়ন্তীর মিলনোৎসব

১৯৮৬—পাঠক মনোরঞ্জনের এক সুবর্ণ অধ্যায় শেষ করে যুগান্তর পা রাখল পঞ্চাশের কোঠায়। সেই সঙ্গে আরেকটি বিখ্যাত স্বদেশী প্রতিষ্ঠান ক্যালকাটা কেমিক্যাল প্রবেশ করল তার মূল্যবান সেবার ঐতিহ্যপূর্ণ সত্তর বছরে।

যুগ্মজয়ন্তীর এই মিলনোৎসবকে স্মরণীয় করবার জন্য আরম্ভ হচ্ছে এক ছোটগল্প প্রতিযোগিতা—'বাংলার বাতায়ন'।

পটভূমিভিত্তিক এই প্রতিযোগিতা চলবে সতেরো মাস ধরে। পশ্চিমবঙ্গের ষোলটি জেলা ও সবশেষে কলকাতা শহর—এই হবে এক এক মাসের গল্পের পটভূমি। অতএব, গল্পের মধ্যে সেই বিশেষ জেলার ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক বা লৌকিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হওয়া দরকার।

প্রথম পর্যায়ের পটভূমি বর্ধমান।
পরবর্তী পর্যায়ের জন্য নীচের তালিকাটি দেখুন।

পটভূমি	গল্প পৌঁছবার শেষ তারিখ	পুস্তিকা প্রকাশনার তারিখ
বর্ধমান	১৫ অক্টোবর '৮৬	১ ডিসেম্বর '৮৬
নদীয়া	১ নভেম্বর '৮৬	১ জানুয়ারী '৮৭
কুচবিহার	১ ডিসেম্বর '৮৬	১ ফেব্রুয়ারী '৮৭
মেদিনীপুর	১ জানুয়ারী '৮৭	১ মার্চ '৮৭
দার্জিলিং	১ ফেব্রুয়ারী '৮৭	১ এপ্রিল '৮৭
হুগলী	১ মার্চ '৮৭	১ মে '৮৭
মুর্শিদাবাদ	১ এপ্রিল '৮৭	১ জুন '৮৭
দঃ ২৪ পরগণা.	১ মে '৮৭	১ জুলাই '৮৭
জলপাইগুড়ি	১ জুন '৮৭	১ আগস্ট '৮৭
বীরভূম	১ জুলাই '৮৭	১ সেপ্টেম্বর '৮৭
উঃ ২৪ পরগণা	১ আগস্ট '৮৭	১ অক্টোবর '৮৭
বাঁকুড়া	১ সেপ্টেম্বর '৮৭	১ নভেম্বর '৮৭
পঃ দিনাজপুর	১ অক্টোবর '৮৭	১ ডিসেম্বর '৮৭
হাওড়া	১ নভেম্বর '৮৭	১ জানুয়ারী '৮৮
পুরুলিয়া	১ ডিসেম্বর '৮৭	১ ফেব্রুয়ারী '৮৮
মালদহ	১ জানুয়ারী '৮৮	১ মার্চ '৮৮
কলকাতা	১ ফেব্রুয়ারী '৮৮	১ এপ্রিল '৮৮

- দেশ বিদেশের যে কেউ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। প্রতিযোগিতার কোন প্রবেশমূল্য নেই।
- গল্পটি মৌলিক, অপ্রকাশিত ও চার হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া চাই। সাদা কাগজে স্পষ্টাক্ষরে লিখুন—কাগজের দুদিকে লিখবেন না।
- তিনজন বিশিষ্ট বিচারক গল্পগুলির মূল্যায়ণ করবেন। তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। মনোনীত বা অমনোনীত, কোন গল্পই ফেরৎ পাঠানো হবে না।
- প্রতি পর্যায়ে দুটি পুরস্কার—১ম ও ২য়। পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্পগুলির প্রকাশনা স্বত্ব ক্যালকাটা কেমিক্যাল ও যুগান্তর-এর। অন্যান্য গণমাধ্যমে ব্যবহারিক স্বত্ব লেখকেরই থাকবে।
- পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্পগুলি নিয়ে সতেরোটি আলাদা পুস্তিকা উদ্যোক্তাদের খরচে ছাপা হবে। প্রতি মাসের প্রথম তারিখে যুগান্তর-এর সঙ্গে বিনামূল্যে পাওয়া যাবে ষোল পাতার এই পুস্তিকা। বর্ধমান সংখ্যা প্রকাশিত হবে ১ ডিসেম্বর।

পটভূমি: বর্ধমান—এই পর্যায়ের গল্প পৌঁছবার শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর। গল্পের সঙ্গে নিজের নাম ঠিকানা পাঠাতে ভুলবেন না। খামের ওপর কি লিখবেন তা নীচে দেওয়া হল।
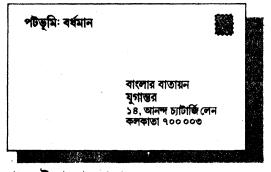
আসুন, কলমে কলমে খুলে যাক এই বাংলার বাতায়ন।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল ৭০বর্ষ ও যুগান্তর ৫০বর্ষ

ত

তাও কি হয়। বিষ্ণু দে ৩৩, ৪৪
তাক লাগাতে ওস্তাদ এই ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানরা। মতি নন্দী বি ১৯৭৮
তাকে চেনা যেন এক কঠিন মানসযাত্রা—বিষ্ণু দে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৪৭, ৪৪
তাঁকে চোখে দেখেছিলুম। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ৩৮, ৪৭
তাঁকে নিয়ে গল্প। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী শা ১৯৭৭
তাকেও দেখালে তুমি। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ৪৪, ৫২
তাজ দর্শন। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮, ২০
তাজমহল ২৮, ২০
তাজমহল। বারীন্দ্রনাথ দাশ ৩৩, ৩৩
তাজমহল ১৯৭৫। পূর্ণেন্দু পত্রী ৪২, ৫০

'তাজাকলম' অনু
চড়ুইয়ের সঙ্গে লড়াই ২৯, ১৩, ২৭ জা ১৯৬২—২৯, ১৪, ৩ ফে ১৯৬২
তাজিকস্তান *দেখুন* সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র—তাজিকস্তান
তাজের যাত্রী। সুনীল রায় ৩৬, ১২
তাণ্ডব। রাজ্যেশ্বর মিত্র ৪৬, ৩৮
তান-উন-সান ৪২, ৪৪
তান ওয়েন
সাম্প্রতিক চীন সাহিত্য ২৭, ২৭ (সা) ৭ মে ১৯৬০ : ৮১-৮৫, স
তানসেন, মিঞা ২৫, ৩৬-২৫, ৪৯
তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন। দীপক ২৭, ৭
তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন। বৃহন্নলা ৩২, ১১
তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন। রাজ্যেশ্বর মিত্র ৩৪, ৮
তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন *দেখুন* সঙ্গীত সম্মেলন
তান্ত্রিক। মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ৫০, ৫০
তাপ ২৫, ৩৪ ; ৪২, ২০ ; ৫০, ৪ ; সা ১৯৮১
তাপ। আরতি দাস শা ১৯৮৩
তাপ। নিখিল সরকার ৩০, ২৬
তাপ। বিমল কর ৪৪, ১২
তাপবিদ্যুৎ—উৎপাদন পদ্ধতি ৫০, ১৬
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, চন্দ্রপুরা ৩৫, ৩৬

তাপ বিদ্যুৎ শিল্পে সর্বাধুনিক পদ্ধতি। প্রবীর বসু ৫০, ১৬
তাপ সংযোজন চুল্লী ৪৫, ২৫
তাপস
কৃষ্ণমূর্তি ২৩, ৫, ৩ ডি ১৯৫৫ : ৩৭৭-৩৮১, স
তাপস গঙ্গোপাধ্যায়
গঙ্গাসাগর ৪৫, ১৫, ১১ ফে ১৯৭৮ : ৩৭-৩৯, স
ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব ৪০, ৩৯, ২৮ জু ১৯৭৩—৪২, ৫, ৩০ ন ১৯৭৪ (অনিয়মিতভাবে)
মেয়েরাও এগিয়ে চলেছে বি ১৯৭৫ : ৯৮-১০৪, স
তাপস বসু
অজগর ৪৯, ২১, ২৭ মা ১৯৮২ : ১৯, ক
তাপস মুখোপাধ্যায়
সিকিম ৪৩, ১৪, ৩১ জা ১৯৭৬ : ৪৫-৪৮, স
তাপস সেন
যথাযথ না যুগান্তকারী ৪৪, ৪২, ১৩ আ ১৯৭৭ : ৫৭-৬০, স
তামসী। অজিত দত্ত শা ১৯৬৯
তামসী। আরতি দাশ ২২, ৪০
তামাক ৩৩, ১০
তামাম শুদ। অজিত দত্ত শা ১৯৭১

তামিল গল্পে বাঙালী মনীষী। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ৪২, ৩৯
তামিল জাতি ২৩, ২৯
তামিল সাহিত্য ৪২, ৩৯ ; ৪৯, ১৮ ; সা ১৯৭৯
তামিলনাড়ু—বিবরণ ও ভ্রমণ ২৩, ২৯ ; ২৯, ৩১
তামিলদের কথা। নিখিল মৈত্র ও সুনীল জানা ২৩, ২৯
তাম্বুলবিলাস। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬, ২৬
তার চেয়ে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৩২, ১৭
তার চেয়ে। প্রতিমা সেনগুপ্ত ৩৬, ২৩
তার চোখে অশ্রু। অতীন্দ্র মজুমদার ২৪, ৪৪
তার জ্বালায়। নিমাই চট্টোপাধ্যায় ৩৯, ৩৩
তার বাবা ও মা। আলোক সরকার সা ১৯৭৮
তার মতো বলো। গৌতম গুহ ৫০, ৫০
তার স্বপ্ন। মানস রায়চৌধুরী ৪৩, ২৭
তারকজীবন লাহিড়ীর আত্মদর্শন। অভ্র রায় ৩৬, ২৯
তারকমোহন দাস
পরিবেশদূষণ ও প্রাকৃতিক প্রতিরোধ সা ১৯৮১ : ৯৩-১০০, স
তারকার অপমৃত্যু। সুশীল রায় শা ১৯৮০
তারকার জন্ম। সূত্রধার বি ১৯৭২
তারণকুমার বিশ্বাস
গুরুশিষ্য সংবাদ : অবনীন্দ্রনাথ ও শৈলেন্দ্রনাথ ৪২, ৫১, ১৮ অ ১৯৭৫ : ৯৩৩-৯৩৪, স
প্রাচীন পোড়ামাটির দুর্গামূর্তি ৪৬, ৪৮, ৬ অ ১৯৭৯ : ১৫, স
মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা যুগান্তরে রূপান্তর ৪৭, ৪৬, ১৩ সে ১৯৮০ : ১৩-১৬, স
মামমুজানের ঘোড়া ৪৯, ১৮, ৬ মা ১৯৮২ : ১৮-১৯, স
হীরকজয়ন্তী বর্ষে ভারত কলাভবন ৪৭, ৯, ২৯ ডি ১৯৭৯ : ৫৫-৫৯, স
তারপর। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২৭, ২০
তারপর একদিন। বিমল মিত্র ৩৩, ১৬
তারা। রত্নেশ্বর হাজরা ৩৩, ৩
তারা ও আঁখি। ভিক্টর হুগো ২২, ৩৭
তারা জহর
অমরনাথের ডাক ২৯, ৩৬, ৭ জু ১৯৬২ : ১০৩৫-১০৩৬, স
তারা দুজন। প্রফুল্ল গুপ্ত ৩০, ৩৬
তারা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯, ২৫
তারা লেখা। পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল ৫০, ৩০
তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
তমসো পরস্তাৎ ৪১, ২৬, ২৭ এ ১৯৭৪ : ৯৯৩-৯৯৯, গ
প্রান্তিক ৪০, ২৬, ২৮ এ ১৯৭৩:১৩১৯-১৩২৩, গ
ব্যাক্কোর চেয়ার ৩৯, ২৭, ৬ মে ১৯৭২ : ২৫-৩০, গ
তারাপদ আচার্য
আত্মপ্রতিকৃতি ৩৮, ৩৫, ৩ জু ১৯৭১ : ৯৬৯, ক
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
নবজীবনের প্রান্তে ৩৯, ৮, ২৫ ডি ১৯৭১ : ৭৪৮
তারাপদ ভট্টাচার্য
হাসপাতাল ২৮, ১৫, ১১ ফে ১৯৬০ : ১৪৩, ক
তারাপদ মুখোপাধ্যায়
ওরিয়েন্টাল স্কুল ৩৪, ১৭, ২৫ ফে ১৯৬৭—৩৪, ১৮, ৪ মা ১৯৬৭, স
বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ চেতনা ৩০, ২৮ (সা), ১১ মে ১৯৬৩ : ২২৫-২৩৪
বাংলা কবিতার প্রাচীনতম ইংরেজী অনুবাদ ৩৬, ১২, ১৮ জা ১৯৬৯ : ১৩৭৩-১৩৭৬

লণ্ডনের চিঠি ৩১, ৬, ১৪ ডি ১৯৬৩—৩৪, ১১, ১৪ জা ১৯৬৭, স
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিতে বিরামচিহ্ন ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব ৩৫, ৩৫, ২৯ জুন ১৯৬৮ : ১০২৩-১০২৫
তারাপদ রায়
অতিথি ৪৩, ৪০, ৩১ জু ১৯৭৬ : ১২, ক
অন্ধ অন্ধকার ঘর কালো টুপী অথবা ভারতীয় আইন ও অশ্লীলতা ৩৫, ২৮ (সা) ১১ মে ১৯৬৮ : ২৭৯-২৮৬
অহংকার শা ১৯৭৪ : ২২৯, ক
আগেকার কথা ৪৪, ৩১, ২৮ মে ১৯৭৭ : ১৩, ক
আত্মীয় ২৭, ৪৮, ৮ অ ১৯৬০ : ৬৫৬, ক
আমাদের মতো নয় ৪২, ২৪, ১২ এ ১৯৭৫ : ৭৮৩, ক
আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে ৪৬, ৩২, ৯ জুন ১৯৭৯ : ৩৯, ক
আমার শত্রুদের দেখলে ৩৯, ৩৭, ১৫ জু ১৯৭২ : ১১৭৯, ক
উনি কে ৪১, ৩৯, ২৭ জু ১৯৭৪ : ৯৭৬, ক
এইভাবে উনিশশো বাহাত্তর ৪০, ৯, ৩০ ডি ১৯৭২ : ৮৫১, ক
একজন আধা-কবি ৪০, ৩০, ২৬ মে ১৯৭৩ : ৩৫৩, ক
একটি আদ্যোপান্ত দুর্ঘটনা ৪২, ২৬, ২৬ এ ১৯৭৫ : ৯৪৩-৯৪৫, গ
একটি পারিবারিক দুঃখ ৪৫, ৪৬, ১৬ সে ১৯৭৮ : ১৫, ক
একদিন ৩১, ৪৮, ৩ অ ১৯৬৪ : ৮২৪, ক
একুশতলা বাড়ির কার্নিশে ৩৭, ২১, ২১ মা ১৯৭০ : ৭৪১, ক
একেকদিন ৩২, ১৮, ৬ মা ১৯৬৫ : ৪২৮, ক
এখনো ভোলা গেল না ৩৩, ৪০, ৬ আ ১৯৬৬ : ১৯, ক
কদম-কদম কদম-কদম ৩৫, ১১, ১৩ জা ১৯৬৮ : ১০৪৮, ক
কবিসম্মেলন ৪৩, ২৫, ১৭ এ ১৯৭৬ : ৮৩০, ক
কবির দোষ শা ১৯৭৭ : ৭৯, ক
কম বয়সে যীশুখৃষ্ট শা ১৯৭১ : ৬১, ক
কাণ্ডজ্ঞান ৪৯, ৩৫, ৩ জু ১৯৮২—৫১, ১, ৫ ন ১৯৮৩, রস
খিদিরপুরে তিনজন সারেং ৩১, ২, ১৬ ন ১৯৬৩ : ১৪০, ক
গান লেখা হল না ৩৫, ৩৪, ১৫ জুন ১৯৬৮ : ৮৫০, ক
ঘরে এলো ৩২, ২৪, ১৭ এ ১৯৬৫ : ১০৩২, ক
ঘরে ফিরছে মানুষ ৩৯, ১৮, ৪ মা ১৯৭২ : ৪৪০, ক
ঘুঘুকাহিনী ৩১, ৩৯, ১ আ ১৯৬৪ : ১৩২১-১৩২৬, রস
চতুরঙ্গ সা ১৯৬৯ : ৪৮৯-৪৯১, রস

চমৎকার ৪৫, ১৩, ২৮ জা ১৯৭৮ : ৩৯, ক
চমৎকার লাগে শা ১৯৭৬ : ২৭৮, ক
চমৎকার সংবাদ ৪৯, ৫, ৫ ডি ১৯৮১ : ৩১, ক
চোখে মুখে জিবে ৪১, ২৯, ১৮ মে ১৯৭৪ : ১৭৪, ক
ছন্দছাড়া ৩১, ৫০, ২৪ অ ১৯৬৪ : ১০২৪, ক
ছয়মাস পর সাদা পাতা ৩৬, ১০, ৪ জা ১৯৬৯ : ১১০৫, ক
জীবনের জটিলতা ও সরলতা শা ১৯৮১ : ২৮, ক

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য

যাত্রা থিয়েটার সিনেমা ইত্যাদির অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য যে জনসংযোগ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যেহেতু যাত্রার অনুষ্ঠান খোলা মেলা স্থানে হয়ে থাকে তাই দর্শককুলের সঙ্গে শিল্পীর সংযোগ বা কম্যুনিকেশন সেখানে সরাসরি অতএব অধিকতম জোরদার। তবে এও তো যাত্রার পরিবর্তিত রূপ। যাত্রা কথাটির অর্থ মূলত গমন। দলবদ্ধ গমন বা মিছিল ইত্যাদি বোঝাতে এ কথাটির ব্যবহার সুপ্রাচীন। শোভাযাত্রা শবযাত্রা অতি পরিচিত শব্দ। আদিবাসী সাঁওতাল-মুণ্ডাদের মধ্যে উৎসব কালে নৃত্যগীতপূর্বক গ্রাম প্রদক্ষিণ করার যে রীতি আজও বর্তমান তা তথাকথিত উচ্চবর্ণের মধ্যেও বিরাজ করত কিছুদিন পূর্বেও। তারও নাম ছিল যাত্রা। এটি প্রাগৈতিহাসিক ধারা। একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সকলকে সামিল করার জন্য এই যাত্রার সার্থকতা অবিসংবাদিত।

অর্ধসহস্র বর্ষপূর্বে সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে, যদিও ধর্মের মিষ্টান্তরণের আড়ালে, এই যাত্রার বৈপ্লবিক ব্যবহার দেখি নবদ্বীপের পথে। কৃষ্ণনাম মুখে পেশল গৌরাঙ্গ ব্রাহ্মণ যুবা চলেছেন সর্বাগ্রে। আর তাঁর অনুগমন করছেন আচণ্ডাল জনসাধারণ। জাতি এবং জাতভেদের বেড়াকে উপড়ে ফেলে। ক্রমে এই আন্দোলন নবদ্বীপের সীমানা অতিক্রম করে বৃহত্তর বঙ্গভূম তথা ওড়িশায় পরিব্যাপ্তি লাভ করে। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সমাজকে একসূত্রে বেঁধে দিয়ে। প্রাক্ বৈষ্ণব জীবনে সদা প্রতিবাদ মুখর বৈয়াকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল এই শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম—যাত্রা। তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা যাকে বলতেন—নগর সংকীর্তন বা কৃষ্ণযাত্রা।

উনিশ শ পাঁচ সালে [illegible] তরবারী বঙ্গ বিভাগে উদ্যত হলে রবীন্দ্রনাথের মত 'অরাজনৈতিক' ব্যক্তিত্বও নেমে পড়েন পথে। রাখী হাতে নিয়ে। প্রতিটি বঙ্গবাসীর মনে সহোদর ভাব জাগ্রত করতে গান ধরেন বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল/ পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান। তাঁর রাখী আন্দোলন সারা বাংলায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী চেতনা জাগ্রত করতে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল।

তেমনই আর একটি ঘটনা লবণ সত্যাগ্রহ—ডাণ্ডি অভিযান। ভারতবাসীর লবণ তৈরির অধিকারের দাবিতে গান্ধীজির পদযাত্রা। লবণ কতটা উৎপন্ন হল সেটি বিচার্য ছিল না। লক্ষ্যও নয়। আসল উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে একটি আন্দোলনের সামিল করা। আর গান্ধীজি সে ব্যাপারে যে সফল হয়েছিলেন তাতে সন্দেহের কারণ নেই। সারা ভারত সেই সময় পদযাত্রায় উত্তাল হয়ে উঠেছিল।

এবারের পদযাত্রার উদ্দেশ্যও একটি বিশেষ চেতনা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। এই বিশেষ চেতনাটির নাম রবীন্দ্রচেতনা। প্রথমেই প্রশ্ন আসে বঙ্গবাসী কি রবীন্দ্রচেতনাবিহীন? হঠাৎ আজ তাঁকে নিয়ে এই হৈ চৈ কেন? সঙ্গত প্রশ্ন। কিন্তু একটু আত্মবীক্ষণ করলেই ধরা পড়ে আমাদেরই আশেপাশে যাঁরা আছেন তাঁদের একটি বিরাট অংশ রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গেও পরিচিত নন। এই প্রসঙ্গে আমার ভূতপূর্ব অধ্যাপক অরুণ মুখোপাধ্যায় কথিত একটি ঘটনা উল্লেখ্য। অরুণবাবুর গৃহের কাজের মেয়েটির প্রশ্ন, এই দাড়িওলা দাদুটার ছবি পাড়ার বেশ কয়েকটি বাড়িতে কেন? তবে কি এই দাদুটা সবারই কেউ হয়? খোদ কলকাতা শহরেই এই অবস্থা, তাও বঙ্গভাষার অধ্যাপকের গৃহেই। তবে অন্যত্র কা কথা! মনে পড়ছে আরেকটি ঘটনা। একবার আমি এবং আমার সহকর্মী আলোকময় ঘোষ (দেশ সম্পাদকের পুত্র) পাঁশকুড়ার পথে একটি বালক গায়কের সাক্ষাৎ পাই। সে ছিল ভিক্ষাজীবী। তার কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে চমৎকৃত হয়েছিলাম। তাকে ডেকে একথা সে কথার পর জিজ্ঞেস করেছিলাম সে রবি ঠাকুরকে চেনে কিনা। আরও চমৎকার তার ইতিবাচক উত্তর। তখন প্রশ্ন করি, 'রবি ঠাকুর কি করে'? বালকটির জবাব, 'খড়্গপুর লাইনে মুড়ি বেচে'। সে যে গানটি গেয়েছিল তা সিনেমার কল্যাণে জনপ্রিয় হয়েছিল। তাই সেটি শিখতে পেরেছিল।

আমাদের বর্তমান বঙ্গ-সাহিত্য সংস্কৃতির শোণিত যাঁর কল্যাণে এখনও প্রবহমান তাঁর নিকট ঋণ পরিশোধের সংকল্প নিয়ে তাঁরি একশত পঁচিশ বৎসরেও যদি না নাম প্রচারের বন্দোবস্ত করা যায় তবে সমস্ত পৃথিবীর চক্ষে বঙ্গবাসী এবং বঙ্গভাষী খণ্ডিত বৃত্ত বলে বিবেচিত হবে। অতএব নবদ্বীপ থেকে ওড়িশা পর্যন্ত যেমন কৃষ্ণনাম প্রচার হয়েছিল পদযাত্রার মাধ্যমে তেমনই প্রচারের সংকল্প রবীন্দ্রনামের। এ নাম সংকীর্তনের ক্ষেত্র হবে প্রথম পর্যায়ে কবিগুরুর জন্মস্থান জোড়াসাঁকো থেকে কর্মস্থান শান্তিনিকেতন পর্যন্ত। ১৯৮৬-র নভেম্বর, ত্রিরিশে জোড়াসাঁকো থেকে শুরু হয়ে পদযাত্রী নাম প্রচারকরা শান্তিনিকেতনে গিয়ে পৌঁছুবেন ডিসেম্বরের ছ তারিখে। পথে শোভাযাত্রা বিভিন্ন উপমিছিলে পরিপুষ্টি লাভ করে কল্লোলিনী হবে বলাই বাহুল্য। বিশ্বতীর্থ বিশ্বভারতীতে এই নাম প্রচারকদের অভ্যর্থনা করবেন সেখানকার উপাচার্য নিমাই সাধন বসু।

দ্বৈপায়ন রচিত মহাভারত প্রসঙ্গে মধুকবির মন্তব্য, "চন্দ্রচূড় জটাজালে আছিলা যেমতি জাহ্নবী"। মহর্ষি দ্বৈপায়ণ তাকে সংস্কৃত হ্রদে তেমনি সংরক্ষিত করেছিলেন।

ফলশ্রুতি—তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও এ মন্তব্য প্রযোজ্য। যদিও রবীন্দ্রকাব্য বঙ্গভাষায় বিরচিত যদিও তিনি ধূলামন্দির গড়তে চেয়েছেন বারংবার, জ্ঞানমার্গ পরিহার করে কর্মমার্গ, প্রেমমার্গে বিচরণ স্পৃহা প্রকাশ করেছেন অত্রতত্র, সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন মানুষের অধিকারে যাদের বঞ্চিত করা হয়েছে, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান, বলে তবু কোনও বিচিত্র কারণে তিনি সাধারণ্য থেকে সযত্নে বিশ্লিষ্ট। এমনকি রবীন্দ্র সাহিত্য সরোবরের তীরবর্তী নন এমন কোনও ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত হয়ে এক গণ্ডূষ পানাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে ছুৎমার্গীদের সত্রাস আর্তনাদ গেল গেল বলে।

অপরদিকে সাধারণের কাছে রাবীন্দ্রিক কথাটা অনেক সময়েই কিঞ্চিৎ কৌতুককর। নানান রসকাহিনীর জন্ম রাবীন্দ্রিক ব্যক্তিদের বাচন-চলন ভঙ্গীকে ঘিরে। অথচ প্রকৃত রাবীন্দ্রিক তেজোদ্দীপ্ত ব্যক্তিত্ব। যেমন ছিলেন স্বয়ং বিশ্বকবি।

এই দুই পাড়ের মধ্যে যে ব্যবধান, যে কম্যুনিকেশন গ্যাপ সেটিকে বিলোপ করা প্রয়োজন। তাই প্রয়োজন হচ্ছে একটি সেতুর। দুই তীর থেকেই সেই সেতুর কাজকে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে। এক পাড়ের ভার তদারক করছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। অপরদিকে থেকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন উপাচার্য নিমাই সাধন বসু। সেতুটি দৃঢ় হবে সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রচেতনা গড়ে তোলা এবং রবীন্দ্র ভাবনার প্রসার আরও একটি কারণে প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে সুস্থ সংস্কৃতির দ্বারা যুব মানসকে নিষিক্ত করা। যুব মানসের ক্ষুধা বড় প্রবল। সে হাতের কাছে যা পায় তাই গ্রহণ করে বাছবিচার না করেই। সেই সুযোগে অপসংস্কৃতির বেসাতি সাজিয়ে গুছিয়ে হাজির রাখে স্বার্থান্বেষীরা। ফলে যুব সমাজ সেই ক্লেদের পথে পা রাখতে বাধ্য হয়। আর অধঃপাতের পিচ্ছিলতার আরাম বেয়ে যুব সমাজ হাজির হয় ধ্বংসের দ্বারে। সুতরাং সুস্থ সংস্কৃতির প্রসার কর্মে এক হাতে সম্মার্জনী এবং অপর হস্তে কর্ণিক ধারণ প্রয়োজন। অন্যথায়

শুধুমাত্র সুস্থ সংস্কৃতির উপস্থাপনা অরণ্যে রোদন মাত্র হবে। শয়তানের হাতছানি ঈশ্বরের আলিঙ্গনের চেয়েও বেশি মোহময়।

রবীন্দ্র সংস্কৃতির প্রচারে যুব সমাজ হাতের নাগালের মধ্যেই পাবে পুষ্টিকর মানসিক খাদ্য। অপরদিকে অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালান হবে তাকে রুখতে। আর একবার রবীন্দ্ররসে মন পূর্ণ হলে সাধ্য কি সেখানে ছিদ্র খুঁজে পায় শনি।

যুব কল্যাণ মন্ত্রী সুভাষ বাবুর ভাষায়, এতগুলি উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এবারের পদযাত্রা। যে সমাজ একদিন রবীন্দ্রনাথের মত মণীষির জন্ম দিয়েছিল সে সমাজের কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। তবু যদি সেই ভারতদর্শীর চিন্তাধারা আমরা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারি তবে সেটাই হবে আমাদের পরমপ্রাপ্তি। আর কবিও তো তাই চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরি লোক।

আমি তোমাদেরই লোক

কেন রবীন্দ্রনাথ, কোন রবীন্দ্রনাথ

'দেশের যে অতি ক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি-বিদ্যা-ধন-মান, সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের সঙ্গে পঁচানব্বই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমরা এক দেশে আছি। অথচ আমাদের এক দেশ নয়...'

—রবীন্দ্রনাথ

সৌমিত্র লাহিড়ী

যুগন্ধর স্রষ্টা কবি রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্ম বার্ষিকী চলছে। স্বভাবতই গুরুদেবের প্রতিভার মূল্যায়ন পুনর্মূল্যায়ন এ বছর নতুন মাত্রা পাবে। অন্তত প্রত্যাশা সে রকমই। কিন্তু সত্যিই কি নতুন মাত্রা পাবে? নাকি সেই একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নতুন ভঙ্গিমায় উচ্চারণ করে সব দায় দায়িত্ব সম্পন্ন করা হবে?

রবীন্দ্র উত্তরকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিষ্ণু দে গভীর বেদনা আর হৃদয়-যন্ত্রণায় দীর্ণ হয়ে লিখেছিলেন : :

> 'তুমি কি কেবল-ই স্মৃতি, শুধু এক
> উপলক্ষ্যে, কবি?
> হরেক উৎসবে হৈ হৈ
> মঞ্চে মঞ্চে কেবল-ই কি ছবি?
> তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ
> আর বাইশে শ্রাবণ?
> কালবৈশাখীর তীব্র অতৃপ্ত প্রতিভা,
> বাদলের প্রবল প্লাবন
> সবই শুধু বৎসরান্তে একদিনেই নির্গত
> নিঃশেষ?

এই প্রশ্ন কবির শতবার্ষিকী পূর্তি উৎসবে ছিল, আজও আছে। যারা সেই ১৯৬১ সালের প্রবল রবীন্দ্র তর্পণের দিনগুলির খবর রাখেন, তারা সকলেই জানেন ঘটা করে আমরা সকলে মিলে অঙ্গীকার করেছিলাম, কবির মহৎ উত্তরাধিকার সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে, রবীন্দ্রনাথকে জনগণের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। শতবার্ষিকীর পর নয় নয় করেও পঁচিশটি মূল্যবান বছর কেটে গেছে। অতিক্রান্ত এই সময়ে আমরা রবীন্দ্রনাথকে জনগণের কাছে কতটা পৌঁছে দিতে পেরেছি? আজও কি সেই একই অঙ্গীকার পুনর্ধ্বনিত হবে?

প্রসঙ্গত প্রশ্ন ওঠে কেন রবীন্দ্রনাথ এবং কোন রবীন্দ্রনাথ? নতুন প্রশ্ন আর নতুন জিজ্ঞাসায় দীর্ণ হওয়াই রবীন্দ্র-উত্তরাধিকার। আশি বছরের দীর্ঘ জীবনে এই মহৎ উত্তরাধিকার তিনি সৃষ্টি করে গেছেন। বস্তুত সমকালের এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই প্রায় ছিল না যা রবীন্দ্র দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। সৃষ্টিশীল প্রতিভার সচেতন বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসার উজ্জ্বল ফসলগুলিই তার স্বাক্ষর বহন করে।

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের উজ্জ্বল প্রভাত থেকে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বিংশ শতাব্দীর প্রথম চারটি দশক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কবি জীবন। প্রায় ৬৫ বছরের সৃষ্টিশীল কলম নতুন নতুন সৃষ্টির চমকে বাংলা ভাষাভাষী পাঠক সমাজকে বারে বারে বিস্মিত এবং আবেগে আপ্লুত করেছে। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেই শোনা গিয়েছিল আমাদের পরাধীন জাতির ভাষা।

মহৎ প্রতিভা মাত্রই যুগ ও কালের প্রতীক হয়ে ওঠেন। সমকাল অতিক্রমণের ইঙ্গিত যত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয় প্রতিভার স্থায়ীত্ব জনমানসেও তত গভীর ও দৃঢ় হয়ে ওঠে। শেকড় বাকড় ছড়িয়ে যায় বলেই সমগ্র সত্তা নিয়ে সে আপন অস্তিত্ব কালান্তরে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। রবীন্দ্রনাথের বিবেকী কণ্ঠ সমকালের প্রতিটি ঘটনায় সোচ্চার হয়ে উঠেছিল।

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি- দর্শন থেকে শুরু করে রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজতত্ত্ব- বিজ্ঞান— এমন একটি ক্ষেত্রও ছিল না যেখানে রবীন্দ্রপ্রতিভার অবাধ গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ ভারতবাসীর ওপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বর্বর অমানবিকতা রবীন্দ্রমানসে ক্রোধ, ধিক্কার আর ঘৃণার সঞ্চার করেছিল। তাই তাঁর সৃষ্টিসত্তার স্বাধীনতার সংগ্রামে বৌদ্ধিক প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। বন্দীমুক্তি, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সপক্ষে বারে বারে তাঁকে প্রকাশ্য ধিক্কার জানাতে দেখা গেছে। জাতির পক্ষ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিটি

আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাভিযানের বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ় প্রতিবাদ কে ভুলতে পারবে ? কে ভুলতে পারবে হিজলী জেলে বন্দী হত্যার নিন্দায় তাঁর কঠোরতম ভাষা ? বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য তাঁর সক্রিয় উদ্যোগ কেউ কখনও বিস্মৃত হতে পারেন ? পুঁজিবাদের সংকট এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তের মুখে দাঁড়িয়ে কবি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন 'শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস'। বলেছিলেন "ঐক্যতত্ত্ব সম্পর্কে আমার কথা ভুল বোঝবার আশঙ্কা আছে। একাকার হওয়া, এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্ত্র্য লোপ করে, তারাই সর্বজাতির ঐক্য লোপ করে। ইমপিরিয়ালিজম্ হচ্ছে অজগর সাপের ঐক্যনীতি। গিলে খাওয়াকেই যে এক করা বলে প্রচার করে। মানুষ যেখানে স্বতন্ত্র সেখানে তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করলে তবেই মানুষ যেখানে এক সেখানে [illegible]ব সত্য ঐক্য পাওয়া যায়। সেদিনকার মহাযুদ্ধের পর য়ুরোপ যখন শান্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল, তখন থেকে সেখানে কেবলই ছোট ছোট জাতির স্বাতন্ত্র্যের দাবি প্রবল হয়ে উঠেছে। যদি আজ রবযুগের আরম্ভ হয়ে থাকে তাহলে এই যুগে অতিকায় ঐশ্বর্য অতিকায় সাম্রাজ্য, সংঘবন্ধনের সমস্ত অনিশ্চয়তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যাবে। সত্যকার স্বাতন্ত্র্যের উপর সত্যকার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হবে'। (কালান্তর)। লক্ষ এ যুদ্ধের রণ হুংকারে আতংকিত মানব সভ্যতা এই নিখুঁত বিশ্লেষণ ক্ষণিকের জন্যেও বিস্মৃত হতে পারে ? যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল ভূমিকা আন্তর্জাতিক বিবেকী বুদ্ধিজীবীদেরও অনুপ্রাণিত করেছিল। আজীবন তিনি শান্তির শাশ্বতবাণীর নিষ্ঠাবান প্রচারকের ভূমিকায় ছিলেন। ফ্যাসীবাদের অমানবিকতার বিরুদ্ধে রোঁলাবারবুস প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনি যে সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন সেই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস অবিস্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথের মহৎ সৃষ্টিশীল প্রতিভা বারে বারে নতুন প্রশ্ন, নতুন জিজ্ঞাসায় উদগ্রীব হয়েছে। যতই পরিণত হয়েছেন, চিন্তা-চেতনা-সৃষ্টিকর্ম চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, ততই তিনি নিজেকে বদলে বদলে সাধারণ মানুষের আরও কাছাকাছি চলে এসেছেন। বিশেষত জীবন সায়াহ্নে, তাঁর শেষ পর্বের কাব্যে এবং অন্যান্য সৃষ্টি কর্মে, নিজেকে ভেঙ্গে মুচড়ে নতুন আদলে প্রতিভাত করার যে আকাঙ্ক্ষা তা বেশ স্পষ্ট এবং ইঙ্গিতবাহী।

পরাধীন ভারতেই কবি-স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ গ্রাম গ্রামান্তরে শিক্ষার আলোক বর্তিকা পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন সর্বব্যাপ্ত শিক্ষার সুযোগ ছাড়া হাতি কখনও মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না। অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে আলোয় বিধৌত পৃথিবীতে সমগ্র জাতিকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে ছিলেন। শুধু তত্ত্বকথা বা উপদেশবাণী নয়, সক্রিয় উদ্যোগে নিজের চিন্তার বাস্তব রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে স্থাপন করেছিলেন মুক্তচিন্তার প্রাঙ্গণ শান্তিনিকেতন।

প্রাতস্মরণীয়রাও প্রতিদিন নিশ্চয় স্মরণে আসেন না। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে তাঁদের শিক্ষা ও আদর্শ

যাত্রাপথ
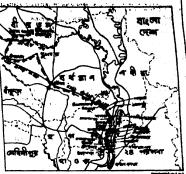
উত্তরকালকে অনুরণিত করে। সার্বভৌম কবি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই। ১২৫তম জন্ম বার্ষিকীর বিশেষ 'উপলক্ষ' যখন আমাদের সামনে উপস্থিত, তখন আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করতেই হবে। আমরা কি রবীন্দ্র উত্তরাধিকারে যোগ্য হয়েছি ?

রবীন্দ্র-উত্তরাধিকার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণেও অনাবশ্যক জঞ্জাল ও জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, একদল বুদ্ধিজীবী, শ্রেণী প্রশ্রয়ের সুযোগে পাদপ্রদীপের আলোয় যারা দীপ্যমান, রবীন্দ্রনাথের মহৎ উত্তরাধিকারকে আড়াল করে রবীন্দ্র পূজায় নিজেদের শক্তি ও প্রতিভার অপব্যবহার করছেন। তাঁদের গবেষণায় মানুষের সপক্ষে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব বিষয়। তাঁরা খুঁজছেন জোতিষী রবীন্দ্রনাথকে। তাঁরা খুঁজছেন হস্তরেখাবিদ, হোমিওপ্যাথ রবীন্দ্রনাথকে। তাঁরা খুঁজছেন পরলোকতত্ত্ববাদী প্ল্যানচেটে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথকে। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রপূজায় তারা এতই স্পর্শকাতর যে সেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার নেই, যেন রবীন্দ্রনাথ কতিপয় বুদ্ধিজীবীর নিজস্ব সম্পত্তি, গবেষক ছাড়া অন্য কেউ রবীন্দ্রচর্চায় ব্যাপৃত হতে পারবেন না। তাঁরা প্রাচীন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মত অভিসাপের খড়্গ নিয়ে বসে আছেন : রবীন্দ্র সাহিত্য প্রাঙ্গণে ব্রাত্যজনের প্রবেশ দেখলেই কুৎসিত নগ্নতায় তারা উন্মত্ত হয়ে ওঠেন।

অথচ এটা গণঅংশ গ্রহণের যুগ। অগণিত মানুষের অংশগ্রহণে, নতুন নতুন বিচারের মানদণ্ডে রবীন্দ্রপ্রতিভার মূল্যায়ন-পুনর্মূল্যায়নের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করা প্রয়োজন। এই কাজে ব্রতী হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার।

এ মহান পদযাত্রার দুই কর্ণধার যুব কল্যাণ মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী এবং বিশ্বভারতীর উপাচার্য নিমাইসাধন বসু

সাধারণভাবে মহৎ প্রতিভার সৃষ্টি সম্ভার জনগনের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য কোন বিশেষ উপলক্ষ (যেমন শতবর্ষ) অবলম্বন করা হয়। কিন্তু রাজ্য সরকার কোন উপলক্ষ ছাড়াই, বাজারে রবীন্দ্র সাহিত্য দুর্লভ না হয়ে গেলেও, সস্তায় ব্যাপকতায় ব্যাপকভাবে রবীন্দ্র রচনাবলী জনগণের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে সুদৃশ্য এবং নিপুণ সম্পাদনা ও মুদ্রণ সৌকর্যে ঈর্ষণীয় নেই রচনাবলীর বেশ কয়েকটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

এ বছর ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর বিশেষ উপলক্ষে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর বর্ষব্যাপী ঠাসবুনন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রাজ্য সরকারের মুখপত্র পশ্চিমবঙ্গ, ওয়েস্টবেঙ্গলসহ বিভিন্ন ভাষার সাপ্তাহিকগুলির রবীন্দ্রসংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। তত্ত্ব, তথ্য ও বিশিষ্ট লেখকদের মূল্যবান রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র 'যুব মানস' রবীন্দ্রসংখ্যা প্রবল আলোড়নসৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সবচেয়ে অভিনব এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিটিও গ্রহণ করেছেন ক্রীড়া ও যুব কল্যাণমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। রবীন্দ্র প্রতিভার বিচ্ছুরণে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অবগাহনের সুযোগ দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান জোড়াসাঁকো থেকে কর্মস্থান শান্তিনিকেতন পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ১৯০ কিমি পথ 'রবীন্দ্র পথ পরিক্রমার' আয়োজন করেছেন। ৩০শে নভেম্বর সকালে মহর্ষি ভবন থেকে যাত্রা শুরু করে পায়ে পায়ে হাজার হাজার মানুষ এগিয়ে যাবেন শান্তিনিকেতনের দিকে। 'চলো যাই শান্তিনিকেতন' বলে হুট করে চলে যাওয়া নয়, অগণিত মানুষের মনে রবীন্দ্র উত্তরাধিকারের সম্পদ বহন করতে করতে যাওয়া। আমাদের দুর্ভাগ্য, রবীন্দ্রনাথের দেশের মানুষ হয়েও আমরা সকলে রবীন্দ্রনাথের দেশের মানুষ নই। কবির ভাষায় 'আমরা এক দেশে আছি। অথচ আমাদের এক দেশ নয়'। 'জ্ঞানে-বিজ্ঞানে চেতনার নীলে আমরা রাবীন্দ্রিক' কিন্তু সকলে নয়। লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর মানুষের কাছে আজও রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র দাড়িওয়ালা এক বুড়ো যাকে ঘটা করে মাঝে মাঝে পুজো করা হয়, শহরের বাবুরা ফুরফুরে ধুতি-পাঞ্জাবী দুলিয়ে ভাষণ দিয়ে যান যার অনেক শব্দই তাদের মাথার ছ ফুট ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। এইসব অজ্ঞানতার অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা

মানুষের সামনেও রবীন্দ্র উত্তরাধিকারের মর্মবাণী প্রচার করতে করতে যাবে ঐতিহাসিক পদযাত্রার অংশীদাররা। পদযাত্রীরা দক্ষিণেশ্বর, শ্রীরামপুর, মগরা, মেমারি, বর্ধমান, গুসকরা, হয়ে বোলপুরে যাবেন। সেখান থেকে যাবেন শান্তিনিকেতন। তাদের স্বাগত জানাবেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ নিমাইসাধন বসু। পদযাত্রার সঙ্গে থাকবে নানাবর্ণে ও চিত্রে উজ্জ্বল কতকগুলি ট্যাবলো। গানে-বাজনায়-আবৃত্তিতে মুখরিত ট্যাবলোগুলো শুধু দৃষ্টিনন্দন হৃদয়গ্রাহী আর মনোজ্ঞই হবে না, হবে রবীন্দ্র উত্তরাধিকারের অন্যতম প্রচারক। সমগ্র কর্মসূচির যে মূল সুর তার সঙ্গে সংগতি রেখেই যুব কল্যাণমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী এর নাম দিয়েছেন 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক আমি তোমাদেরই লোক' কর্মসূচি। একটু দীর্ঘ শিরোনাম হলেও এর তাৎপর্য অপরিসীম। রবীন্দ্র পথ পরিক্রমা থেকেও ধ্বনি উঠবে 'নিরক্ষরকে সাক্ষর করে সামাজিক ঋণ শোধ করো।' বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে জন্মস্থান থেকে কর্মস্থান পদযাত্রার তাৎপর্য হয়ত যথার্থভাবে ধরা যাবে না। ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগ হঠাৎ করে জন্মস্থান থেকে কর্মস্থান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বললে ভুল বলা হবে। আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য ও গণতান্ত্রিক চেতনা এবং গৌরব সৃষ্টি করতে যে-সব মনীষী ও বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ অবদান রেখেছেন তাঁদের স্মরণ করার জন্য ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তর ধারাবাহিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ বছরই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিবসে চুরুলিয়ায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। আসানসোল থেকে চুরুলিয়া পর্যন্ত পথ পরিক্রমার কর্মসূচিতে হাজার হাজার যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাত্রি গভীর হয়ে গেলেও সেই ১লা জুনের পদযাত্রার কর্মসূচিতে যে অবিস্মরণীয় উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। নজরুল মেলার পরই ছিল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে যুব সমাবেশ। সেই সমাবেশ থেকেই বীরসিংহ গ্রাম সহ সমগ্র ঘাটাল ব্লক থেকে নিরক্ষরতা দূর করার আহ্বান জানানোর কথা ছিল। কিন্তু সেই সমাবেশ আকস্মিক বন্যার ফলে হতে পারেনি। তবে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য সমীক্ষা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এক বছরের মধ্যে ঘাটাল ব্লক নিরক্ষরতা মুক্ত করার অভিযান সফল হলে একালের যুব সমাজ এক অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী হবেন।

বর্তমানের যুব সমাজ সম্পর্কে অনেকেই উষ্মা প্রকাশ করেন। তাদের আচার আচরণ ভাব ভঙ্গী প্রাচীনদের বিব্রত করে। কেউ কেউ জেনারেশন গ্যাপের তত্ত্ব প্রচার করে দায়িত্ব স্খালন করেন, কেউবা তিরস্কার করে নিজেদের ক্ষোভ জানান। কিন্তু আমরা কি একবারও অনুভব করার চেষ্টা করে দেখি, কেন এমন হলো। সম্ভবত অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, যুব সমাজের ক্রোধ ক্ষোভ জ্বালা যন্ত্রণা যেমন আছে তেমনি আছে ঐতিহ্যহীনতার এক নিদারুণ সংকট। অতীতের গণতান্ত্রিক মানবীয় ঐতিহ্য তাদের সামনে যথার্থভাবে তুলে ধরার উপযুক্ত সুযোগ না থাকায় যুব মানসে এক ধরনের শেকড়হীন ভাসমানতা লক্ষ্য করা যাবে। দেশ জাতি সমাজ সভ্যতা সম্পর্কে গর্ববোধ না থাকলে, দেশপ্রেম অনুপ্রাণিত না করলে যুব সমাজ সমগ্র সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে না। সেই অভাব দূর করতেই আমাদের জাতীয় গৌরব সৃষ্টি করতে যারা অগ্রগামী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাদের স্মরণ করা তাৎপর্যপূর্ণ।

এ বছর ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম বার্ষিকীতে রাজ্য জুড়ে সেই আয়োজন করেছে ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগ। এ বছরের ব্লক স্তর থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত সমস্ত যুব উৎসব অনুষ্ঠানকে রবীন্দ্র উৎসবে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই জেলায় জেলায় ব্লকে ও পৌরস্তরে রবীন্দ্র উৎসব অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। এই সব উৎসবে অন্যূন ৩০টি বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কয়েক লক্ষ ছাত্রছাত্রীরা সরাসরি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। এই বিপুল কর্মকাণ্ড জনমানসে, বিশেষত যুব সমাজের মধ্যে এক নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে যথেষ্ট সাহায্য করবে এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। রবীন্দ্র উৎসব, নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সামাজিক ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকার ঘোষণা এবং সর্বোপরি জন্মস্থান থেকে কর্মস্থান পর্যন্ত পথ পরিক্রমা কর্মসূচি রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ মানুষের আরও কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় নতুন গতিবেগ সঞ্চার করবে। রবীন্দ্র উত্তরাধিকারে সকলের অধিকার এই কথা বলাও বোধ হয় তখন প্রকৃত অর্থে সার্থক হবে।
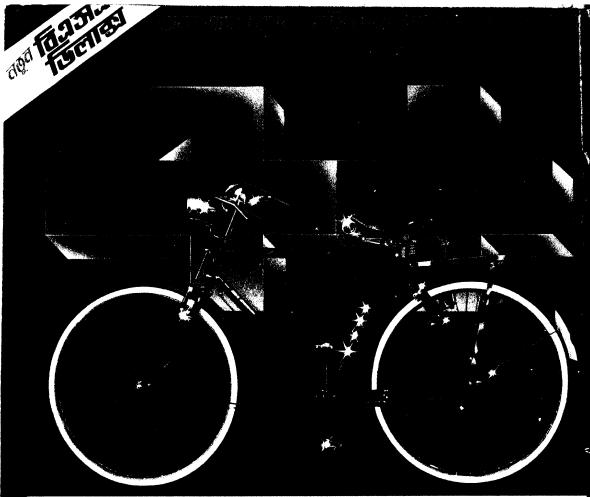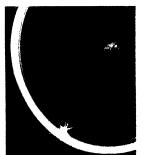
হিজলী রাজবন্দী হত্যার প্রতিবাদে মনুমেন্টের পাদদেশে রবীন্দ্রনাথ

অন্য সব ডাই একত্র হলেও,
গোদরেজের আপনা-থেকে-ছড়িয়ে-পড়া
হেয়ার ডাই ব্যবহারকারীর
সংখ্যাই বেশী!
৩টি বিশেষ কারণে ঃ
১
গোদরেজের আপনা-থেকে-ছড়িয়ে-পড়া হেয়ার ডাই চুলে আনে স্বাভাবিক রঙরূপ। এর ভেতরে এক কণ্ডিশানারও আছে, যা চুল নরম আর আয়ত্বের মধ্যে রাখে। আসলে, আপনি না বললে কেউ জানতেও পারবে না।
২
অন্য হেয়ার ডাইয়ের সঙ্গে তফাৎ হল, গোদরেজের আপনা-থেকে-ছড়িয়ে-পড়া হেয়ার ডাই ব্যবহার করা সহজ আর সুবিধেজনক। হ্যাঁ, চুল শ্যাম্পু করার মতই সহজ।
৩
গোদরেজের আপনা-থেকে-ছড়িয়ে-পড়া হেয়ার ডাইয়ের কোয়ালিটি সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন, কারণ আপনার চুল আর চামড়া রক্ষার জন্যে এটি বিশিষ্ট ফর্মূলায় তৈরী হয়েছে। সম্পূর্ণ সুরক্ষা—তাই দিয়ে হয় গোদরেজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা!
Godrej
SELF-SPREADING
PERMANENT
HAIR DYE
Godrej
SELF-SPREADING
PERMANENT
HAIR DYE
গোদরেজ® আপনা-থেকে-ছড়িয়ে-পড়া
পার্মানেন্ট হেয়ার ডাই
পাওয়া যায় ২টি স্বাভাবিক রঙে :
কালো ও গাঢ় খয়েরী।

৬ ডিসেম্বর ১৯৮৬ পাঁচ টাকা

জ্যোতি বসু

ব্যানার্জি □ আশিস রায় □

সমন চট্টোপাধ্যায়

জ্যোতি বসু □

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

“আমার স্বামী ডাক্তারের পরামর্শে নিয়মিত কেয়ো-কার্পিন হেয়ার ভাইটালাইজার ব্যবহার করছেন।

“আমি কেয়ো-কার্পিন হেয়ার ভাইটালাইজার* ব্যবহারে অভিভূত। এতে সত্যিই চমৎকার কাজ দেয়। ডাক্তার আমার স্বামীকে বলেছিলেন, কেয়ো-কার্পিন হেয়ার ভাইটালাইজার অনেক গবেষণার পর অভিনব বৈজ্ঞানিক ফরমুলায় তৈরী। এর মধ্যে আছে প্রয়োজনীয় সবরকম প্রোটিন, কো-এনজাইম এবং ভিটামিন। ফলে চুলের গোড়া শক্ত হয়, খুস্কিও প্রতিরোধ করে।

আমিও দেখছি, ঠিক তাই, আমারও চুলের যত্নে এর ব্যবহার আশ্চর্যরকম কাজ দিচ্ছে।”

এবারে এই রিসার্চ রিপোর্টটি পড়ে দেখুন :

“৬৬·৬৬% ক্ষেত্রে চমৎকার এবং ৩৩·৩৩% ক্ষেত্রে বেশ ভালো ফল পাওয়া গেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই খুস্কি পড়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে এবং প্রায় সর্বক্ষেত্রেই চুল পড়া প্রায় রোধ হয়েছে···অতএব বলা যেতে পারে কেয়ো-কার্পিন হেয়ার ভাইটালাইজার এক্ষেত্রে পুরোপুরি সাফল্য লাভ করেছে।”

ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট ১১৮ ২২৩ (১৯৮৪)
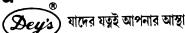
“আমিও ব্যবহার করি কারণ এতে ওর চুল পড়া পুরোপুরি বন্ধ হয়েছে।”

Dey's® যাদের যত্নই আপনার আস্থা

*এটি কোন প্রসাধন সামগ্রী নয়।

CLARION C DMHV 2

কমপ্লান® –সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

B84 GLC 68 Ben

দেশ

২০ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩ □ ৬ ডিসেম্বর ১৯৮৬ □ ৫৪ বর্ষ ৬ সংখ্যা

প্র চ্ছ দ নি ব ন্ধ

সা ক্ষা ৎ কা র

প ত্রা ব লী

শি ল্প ক লা

বি জ্ঞা ন

এ ই দে শ এ ই বি শ্ব

গ ল্প

অ নু বা দ গ ল্প

প্র কৃ তি

ধা রা বা হি ক র চ না

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

ক বি তা

ব্য ঙ্গ কৌ তু ক

অ ঙ্গ না

খে লা

প্র চ্ছ দ

বিকাশ ভট্টাচার্য

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক
৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ২০ পয়সা পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা

১৯

একদা বিরোধীপক্ষের শান্তীমধ্যমণি রথী ; আজ প্রশাসনের সংযত সারথি। দিক্ বদল ঘটেছে, দলবদল নয়, দৃষ্টিবদল নয়। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে আদর্শে অবিচল, কিংবদন্তীতুল্য কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু। তিনি সি· পি· এম-এর সিম্বল, বামফ্রন্টের ব্যাঙ্ক, বর্তমান বঙ্গের ভবিষ্যত। সারা ভারতে বোধহয় তিনিই একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী যিনি রাজ্যের স্বার্থে দিল্লির সঙ্গে তর্জনী উঁচিয়ে তর্ক করতে পারেন। উচ্চবিত্তের ঐতিহ্য, বিদেশের উচ্চশিক্ষা এবং একটি উগ্র আন্তর্জাতিক আদর্শের দীক্ষা সত্ত্বেও ব্যক্তি-সত্তায় মানুষটি ধুতি-পাঞ্জাবি পরা সুভদ্র বাঙালিত্বের প্রতীক। ছিন্ন শরীর এক অঙ্গরাজ্যে তাঁর অবস্থান, তবু সর্বভারতীয় রাজনীতিক

মঞ্চের আলোক প্রক্ষেপণে তিনি উজ্জ্বল। তাঁকে নিয়ে ঔৎসুক্য আজ বহির্বিশ্বেও। কিন্তু যতো তিনি বিখ্যাত, ততো বিতর্কিতও। পার্টিতে, প্রশাসনে, দেশে, বিদেশে, শ্রমিক, শিল্পপতি, মধ্যবিত্ত সাধারণের মধ্যে একই জ্যোতি বসুর ভিন্ন ভিন্ন মূল্যায়ন। তাঁর তুলনায় বয়ঃপ্রবীণ, বড় তত্ত্বজ্ঞ বলিষ্ঠ সংগঠক ও সংগ্রামী সহযাত্রীদের পিছনে ফেলে তিনি পুরোভাগে আসতে সমর্থ হলেন, অনন্য হলেন, আর সেই আসনে তাঁর স্থিতির আয়ুষ্কালই বা কী আবার কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে কেমন তাঁর সম্পর্ক, তাকে কতোটা গুরুত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী, সে সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক আলোচনা এবারকার প্রচ্ছদ-নিবন্ধমালায়।

৬০

নারীর রূপ-বিলাসের জন্য একদা আহুতি দিতে হয়েছে হাজার হাজার সুন্দর পাখির প্রাণ। ফ্যাশান বদলায় তাই নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখ থেকে বেঁচে গিয়েছে এক আশ্চর্য পাখির প্রজাতি। নাম হামিং বার্ড। ইনচি মাপের সোনালি শরীরের এই পাখিকে ব্রোচের মতো গেঁথে পথে বেরোতেন ইয়োরোপের রূপসীরা। জ্যান্ত নয়, মেরে ট্যান করে পরতেন। মধুপায়ী, মিষ্টি শিস দিয়ে নীল আকাশে ওড়ে, শূন্যেই রচে মিলন-বাসর। তাদের সোনালি কাহিনী —'হামিং বার্ড'।

৩৮

জ্যোতি বসু মানুষটি কেমন ? তাঁর রাজনৈতিক আর ব্যক্তিগত জীবন-দর্শন কি অভিন্ন ? তিনি কি বিশ্বাসী সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রণে ? এক অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারে তার অনেক অজানা খবর চয়ন করে এসেছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

৭৭

বঙ্গ সংস্কৃতির চিরায়ত লোক-শিল্প সম্পদ আজও লালিত হচ্ছে গ্রামবাংলার অনাহারক্লিষ্ট শিল্পীদের পর্ণকুটিরে। তেমনি এক শিল্পী-পল্লী মেদিনীপুরের খড়ুই। মন্দির-মসজিদ পেরিয়ে পোড়ো রাজবাড়ির আঙিনা দিয়ে মেঠো পথের ছায়াবীথি ধরে লেখক আমাদের নিয়ে যান শঙ্খবণিক পাড়ায় যেখানে উইয়ের ঢিবি থেকে নিমেষে দাঁড়িয়ে উঠছে হাতি, ঘোড়া, হরিণ বা সুভদ্রা, বলরাম, জগন্নাথ।

৯৮

যার সগর্ব শিরোনাম 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ', সেই পৃথিবী-প্রখ্যাত সোভিয়েত সারকাস দিল্লি বম্বের পর কলকাতাও জয় করে গেল ক'দিন আগে। অর্ধশত-সদস্য-শিল্পীর শতাধিক অবিস্মরণীয় খেলার নির্যাস নিয়ে রচিত এই লেখা। সঙ্গে এদের প্রশিক্ষণের গোপন কথা।

প্রকাশিত হল

পূর্ণিমা ঠাকুরের

রান্না শেখার স্বর্ণখনি

ঠাকুরবাড়ির রান্না

দাম ১২·০০

গান যেমন একাকী গায়কের নয়, রান্নাও নয় তেমনই শুধু সুপকারের। রান্না তখনই সার্থক, যখন তা অন্যের রসনায় তোলে পরিতৃপ্তির কল্লোল। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী নিজে যে রন্ধনপটীয়সী ছিলেন তা নয়, কিন্তু ভালো রান্নার সমঝদার ছিলেন। দেশে বা বিদেশে যখনই কোনও স্বাদু রান্না খেয়েছেন, তখনই জিজ্ঞাসা করে লিখে রেখেছেন তার প্রস্তুতপ্রণালী। এভাবেই একটি খাতা ভরে জমে ওঠে তাঁর সারা জীবনের অমূল্য সংগ্রহ। খাতাটি পরে তিনি উপহার দিয়ে যান পূর্ণিমা ঠাকুরকে। ইন্দিরা দেবীর সংগৃহীত সেই রান্নার খাতা থেকেই এ-গ্রন্থের অধিকাংশ রন্ধনপ্রণালী আহৃত। অধিকাংশ, কিন্তু সব নয়। লেখিকার মা নলিনী দেবী নিজে খুব ভালো রাঁধতেন। তিনি ছিলেন ঠাকুরবাড়িরই মেয়ে। তাঁর কাছেও বহু রান্না শিখেছেন পূর্ণিমা ঠাকুর। সেইসব রান্না ও নিজের সংগ্রহ-করা বৈচিত্র্যময় বেশ কিছু রান্নাও এই বইতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তিনি। সব মিলিয়ে 'ঠাকুরবাড়ির রান্না' এক সোনার খনি।

প্রচ্ছদ : নির্মলেন্দু মণ্ডল।

প্রকাশিত হয়েছে

সাধনা মুখোপাধ্যায়ের

দুঃসাহসিক গার্হস্থ্য কবিতার সংগ্রহ

ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর রবীন্দ্রসঙ্গীত

দাম ১০·০০

'ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর রবীন্দ্রসঙ্গীত' সাধনা মুখোপাধ্যায়ের লেখা দুঃসাহসিক কিছু কবিতার সংকলন। প্রত্যেকের জীবনের খুঁটিনাটি নানান বিষয়—যা নিয়ে এ-যাবৎ কখনও কবিতা লেখা হয়নি সেইসব বিষয়—নিয়ে গার্হস্থ্য কবিতার এক চমক-জাগানো সংগ্রহ। প্রাতঃকৃত্য, মেনোপজ থেকে শুরু করে রাত্তিরের নটে গাছ মুড়িয়ে যা, তনুবৃন্তের রহস্য, তুতো সম্পর্কের ভাইবোন, এমন-কি রংঝারি হিংসুক ননদিনী, দেওর, অবিবাহিত ভাসুর, কর্তা, গিন্নি, অন্তঃসত্ত্বা বউ, বেকার যুবক—কেউই বাদ যায়নি এই কবিতাগুচ্ছে। তদুপরি রয়েছে রান্নার একসপেরিমেন্ট, এক মেয়ের কান্না, যুবতী, উদ্ভিন্ন বক্ষ-মুকুলের বার্তা সঠিক মৌমাছির কাছে পৌঁছে যাওয়া, বন্ধ্যা রমণীর আকুলতা, নারী বলতে যারা সুড়ঙ্গ বোঝে সেইসব পুরুষের প্রসঙ্গও। সব-ছাপিয়ে রয়েছে আপাতসুখী এক ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর কথা, ভুলে-যাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের অশ্রু যাঁর বুকে। যাঁরাই বাংলা পড়তে পারেন, তাঁদের কারও কাছেই এই কবিতাগুলির এক ছত্রও দুর্বোধ্য মনে হবে না। এ-গ্রন্থের আবেদন সর্বজনীন।

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন।

রমাপদ চৌধুরীর

ছ-ছটি অসাধারণ উপন্যাস একসঙ্গে

উপন্যাস সমগ্র ১

দাম ৫০·০০

দুই মলাটের মধ্যে রমাপদ চৌধুরীর ছ-ছটি আলোড়ন-তোলা উপন্যাস। এতে রয়েছে 'খারিজ'-এর মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিময় উপন্যাস, 'ছাদ'-এর মতো মানবিক কাহিনী, আছে 'লজ্জা', যা নিয়ে ছবি করার শেষ বাসনা ছিল ঋত্বিক ঘটকের। আছে 'বীজ', যা অভিভূত করেছে সর্বস্তরের পাঠকদের। আরও আছে 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে' ও 'পরাজিত সম্রাট', যার একটিতে চিরে-চিরে দেখানো হয়েছে ব্যক্তিহৃদয়, অন্যটিতে সমাজের বিবসন চিত্রপট।

রমাপদ চৌধুরীর

যাবতীয় ছোট-বড় গল্পের সংকলন

গল্প-সমগ্র

দাম ৫০·০০

সতেরোয় শুরু, পঁচিশে প্রতিষ্ঠা, তিরিশের আগেই বিখ্যাত রমাপদ চৌধুরী বাংলা ছোটগল্পে একাই এক আন্দোলন। উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো নানা স্বাদের গল্পগুলিতে বারবার এনেছেন নতুন ভাবরীতি, বিচিত্র আঙ্গিক। তাঁর যাবতীয় গল্পের এই সংগ্রহ আসলে দুই মলাটের মধ্যে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে থাকা চার দশকের বাঙালী জীবনের নিটোল প্রতিবিম্ব।

পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত

সমরেশ মজুমদারের

চলচ্চিত্রে রূপায়িত উপন্যাস

দৌড়

দাম ১০·০০

ঘোড়দৌড়ের মাঠ, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান গণিকার ফ্ল্যাট, উঁচু মহলের নীচু জীবনযাত্রা, আধুনিক প্রেম-প্রেম খেলা আর এর পাশাপাশি লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য মধ্যবিত্ত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-হতাশা-যন্ত্রণা-ভরা দৌড়ের এক অনুপম ছবি এই উপন্যাসে।

প্রকাশিত হচ্ছে

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

অবিস্মরণীয় গল্পের সংগ্রহ

গল্পমালা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আবার পাওয়া যাচ্ছে

বিমল করের

কালজয়ী উপন্যাস

পূর্ণ অপূর্ণ

দাম ৩০·০০

ছোটনাগপুরের এক লোকালয়হীন প্রান্তরে, নির্জন গুরুডিয়ার অন্ধ আশ্রমকে ঘিরে তিনজন মানুষের জীবনপ্রবাহ নিয়ে রচিত এই উপন্যাস বিমল করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। দীর্ঘকাল অমুদ্রিত থাকার পর নতুন করে আবার পাওয়া যাচ্ছে 'পূর্ণ অপূর্ণ'।

পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত

বিমল করের

গা-ছমছম কিশোর-উপন্যাস

কাপালিকরা এখনও আছে

দাম ১২·০০

এ-যুগেও কাপালিক রয়েছে, যে কিনা প্রেতাত্মা নামায়, তাদের দিয়ে ঘণ্টা বাজায়, মৃত মানুষের হাতের ছাপ হাজির করে। এমনই এক ভয়ংকর কাপালিকের পাল্লায় পড়েছিল দুই কিশোর। কিকিরা নামের এক রহস্যময় ম্যাজিসিয়ান কীভাবে হাতেনাতে ধরে ফেললেন সেই কাপালিকের যাবতীয় কীর্তিকলাপ, তাই নিয়েই এই উত্তেজনামুখর উপন্যাস।

ষষ্ঠ মুদ্রণ প্রকাশিত

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

বুদ্ধিদীপ্ত মজার গল্প

টেনিদা ও ভুতুড়ে কামরা

দাম ১০·০০

বেগুন না খাবার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কীভাবে ভেঙে যায় গরম বেগুনির সামনে, কীভাবে যোগাড় করা যায় চাঁদা, ছেলেকে ধরতে গিয়ে কীভাবে বাবা হয়ে যান ছেলে-ধরা, চুল কাটার ভয়ে পালিয়ে বেড়ালেও কীভাবে ভাগ্যে জোটে কদম-ছাঁট—এমনতর বিস্তর মজাদার গল্প নিয়ে এই বই।

নাটকের বই

বুদ্ধদেব বসুর
তপস্বী ও তরঙ্গিণী
দাম ৮·০০

বিমল করের
ঘুঘু দাম ৬·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
প্রাণের প্রহরী
দাম ১০·০০

শৈলেন ঘোষের
অরুণ বরুণ কিরণমালা দাম ৮·০০

সুনির্মল বসুর
শহুরে মামা ও কানাকড়ি দাম ৮·০০

তারাপদ রায়ের
ডোডো-তাতাই পালাকাহিনী
দাম ১০·০০

রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন

দেশ পত্রিকার ১লা নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন' (দ্রঃ দেশ পৃঃ ৫৩-৫৬) প্রবন্ধটিতে লেখকের একটি মন্তব্য সঠিক ও সমীচীন মনে হল না। লেখাটিকে অবশ্য প্রবন্ধ বলা যায় না, ক্ষিতিমোহন সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি মূল্যবান পত্রের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য সহযোগে সংকলন মাত্র। পত্রটির একটি ফটোকপি সংকলনের অনুপ্রব হিসাবে থাকলে সংকলক শ্রীসুনীল দাস ও পত্রিকা সম্পাদক উভয়েই পাঠকমণ্ডলীর আরও ধন্যবাদভাজন হতেন। পত্রিকার ৫৬ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলামে শ্রীদাস বলেছেন—(ক্ষিতিমোহনের আশ্রমে যোগদানের) 'দুবছরের মধ্যেই প্রকাশিত হল কবীর (১৯১০)। আর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অনুপ্রাণিত হয়ে ক্ষিতিমোহন সংগৃহীত বাণী অবলম্বনে সম্পাদনা করলেন—ওয়ান হানড্রেড পোয়েমস্ অব্ কবীর (১৯১৪)।" ক্ষিতিমোহন সেনের 'অনুবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে' কবি ইংরেজিতে কবীরের বাণী অনুবাদ করেছিলেন—কথাটি যথার্থ নয়। মূল প্রয়োজন বা 'অনুপ্রেরণা' ছিল অন্যত্র। সে প্রয়োজন ঘটেছিল প্রথমত—'To save the saint from Mr Ezra Pound'. প্রসঙ্গক্রমে বলতে হচ্ছে—ইংরেজ কবি Mr Drinkwater একসময় ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে একটার পর একটা নাটক লিখে চলেছিলেন, আর তাই শ' (G. B. S) তাঁর 'সেন্ট জোন' নাটকটি লিখবার কারণ হিসেবে বলেছিলেন—'To save the maid from Mr Drinkwater'. এখানেও অনুরূপ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই উপযুক্ত মন্তব্যটি করতে হল। সন্ত কবীরের দোঁহাগুলির প্রতি রবীন্দ্রনাথের কী গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল, যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পড়াশুনা করেন, তাঁদের কাছে একথা অজানা নয়। সেই দোঁহাগুলি হঠাৎ এজরা পাউন্ড কালীমোহন ঘোষের সহায়তায় অনুবাদ করতে শুরু করেন। হিন্দি ভাষায় পাউন্ডের বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছিল না, জ্ঞান ছিল না ভারতীয় ও সূফী চিন্তাধারাতেও। সুতরাং তর্জমা যে কি পর্যায়ের হবে ধারণা করা কঠিন নয়। এই তর্জমার প্রথম (এবং শেষও বটে) কিস্তিরূপে ১৯১৩ সালের জুন সংখ্যা 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকায় দশটি দোঁহার ইংরেজি অনুবাদ Certain Poems of Kabir নামে প্রকাশিত হয়। কালীমোহন ঘোষের কাছে রবীন্দ্রনাথ পূর্বাহ্নেই এই পরিকল্পনার সংবাদ পান এবং নমুনাও দেখে থাকবেন কিছু। তাঁর প্রিয় দোঁহাগুলির ওই প্রকার প্রকাশ্য ধর্ষণে অস্পৃহ থাকা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্বভাবতই অসম্ভব ছিল। সুতরাং বিরাট কাজের চাপ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে কবীরের দোঁহার অনুবাদের ভার নিজের হাতে তুলে নিতে হল। এবং অজিত চক্রবর্তী কৃত কবীরের দোঁহার ইংরেজি অনুবাদের একটি আদি খসড়া খাতা আনিয়ে সেটার ভিত্তিতেই কবি তর্জমা শুরু করেন। এই কাজে সহায়তা করতে তিনি শ্রীমতী আনডার হিলকে সঙ্গে নিলেন। সকলেই দেখেছেন 'One hundred Poems of Kabir' গ্রন্থের টাইটেল পেজেই 'Assisted by Evelyn Underhill' এই স্বীকৃতি রয়েছে। বইটি প্রথমে ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৯১৪) এবং পরে ম্যাকমিলান কোম্পানি কর্তৃক (১৯১৫) প্রকাশিত হয়। সুতরাং নেহাতই ক্ষিতিমোহন সেনের অনুবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে কবি কবীরের দোঁহাবলী অনুবাদ শুরু করেন—শ্রীদাসের এ মন্তব্য যথার্থ নয়।

এ-প্রসঙ্গে শ্রীমতী আনডারহিলের লেখা—উক্ত গ্রন্থের Introduction-এর সামান্য অংশের উদ্ধৃতি, একই সঙ্গে অপর কারণটি জানতেও সহায়ক হবে। তিনি বলেছেন—'This version of Kabir's songs is chiefly work of Rabindranath Tagore, the trend of whose mystical genius makes him--as all who read these poems will see--a peculiarly sympathetic interpreter of Kabir's vision and thought. It has been based upon the printed Hindi text with Bengali translation of Mr Kshitimohan Sen's... We have also had before us a manuscript English translation of 116 songs made by Mr. Ajit Kumar Chakravarty from Mr. Kshiti Mohan Sen's text, and a prose essay upon Kabir from the same hand. From these we have derived a great assistance.'

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির (১৯১৩, নভেম্বর) পর কিছু ঈর্ষাদষ্ট সমালোচক কবির কাব্য ছেড়ে কবিকে নিয়ে পড়লেন। বললেন 'এই রবীন্দ্রনাথ আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল এবং তজ্জন্য তাঁহার রচনায় যথার্থ প্রাচ্য গৌরব পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁর এই সম্মান ও সমাদর যথোচিত নয়।' এমনও কেউ বললেন—'ক্রীশ্চান ক্যাথলিক ধর্মের বহুকথিত বাণীই কবি প্রকাশ করেছেন গীতাঞ্জলিতে।' এ-সমস্ত ভুল ধারণা অপক্ষেপের জন্যই অপরোক্ষ প্রয়োজন হয়েছিল কবীরের দোঁহার ইংরেজি অনুবাদ এবং 'সাধনা' বক্তৃতামালা। এতে প্রকাশ করা গেল যে ভারতের চিরন্তনী চিন্তাধারাই রূপায়িত হয়েছে গীতাঞ্জলিতে। পাশ্চাত্য চিন্তালোকে উদ্ভূত হবার বহুপূর্বেই এসব চিন্তাধারা ভারতে প্রবাহিত ছিল। এ সম্পর্কে উৎসাহী পাঠক One hundred Poem-এর U. E কৃত Introduction, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কৃত রবীন্দ্রজীবনী (২য় খণ্ড) এবং সৌরীন্দ্র মিত্রের 'খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে' গ্রন্থগুলি পড়লেই দেখবেন—কোন প্রয়োজনে বা প্রেরণায়, কবীরের দোঁহাগুলির অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ 'প্রৈতিযুক্তঃ' হয়েছিলেন।

অজিতকুমার চক্রবর্তী
গরিফা-৭৪৩১৬৬

ক্ষুদ্রশিল্প কোথায় দাঁড়াবে ?

আপনার পত্রিকায় ক্ষুদ্রশিল্প সম্পর্কিত অশোক সেনগুপ্তর লেখা প্রবন্ধের (২০ সেপ্টেম্বর) পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বক্তব্য আছে। তার আগে অবশ্যই অশোকবাবুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাঁর অসাধারণ সময়োপযোগী লেখাটির জন্য।

প্রথমেই একটা কথা বলে রাখা দরকার। এই চিঠির বক্তব্য নিছকই ব্যক্তিগত মতামত নয়। ক্ষুদ্রশিল্প তৈরির জন্য দিনের পর দিন, বছরের পর বছর বিভিন্ন সরকারি বা আধা-সরকারি সংস্থার দরজায় দরজায় ঘুরেছি। আমার মনে হয়েছে, এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম। উদ্যোগীদের সহযোগিতার ব্যাপারে মুষ্টিমেয় কিছু কর্মী ছাড়া যেন কারোরই কোনও দায়িত্ব নেই! কেমন যেন সব দায়সারা গোছের উত্তর—এখানে নয় ওখানে যান, আজ নয় কাল আসুন। একবার নেতাজী সুভাষ রোডে একটি সরকারি সংস্থায় ক্রমাগত অসহযোগিতা পাওয়ার পর বলেছিলাম, 'দেশ' পত্রিকায় (আগে প্রকাশিত একটি ক্রোড়পত্রে) কিন্তু আপনারা লিখেছেন উদ্যোগীদের এ ধরনের সাহায্য করেন। উত্তরে কর্মীটি বলেছিলেন, এসব পত্রিকার কথা পত্রিকাতেই থাক। ব্যাঙ্কগুলিরও প্রায় একই অবস্থা। ব্যাঙ্কে গেলে মনে হয় যেন ভিক্ষে চাইতে যাচ্ছি। কিছু ক্ষেত্রে ব্রাঞ্চ ম্যানেজাররা তো উদ্যোগীদের সঙ্গে দেখাই করতে চান না। সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গীদের কথাবার্তা শুনে মনে হয়, কথা বলে উদ্যোগীদের তাঁরা কৃতার্থ করছেন। অথচ সম্ভাবনাময় উদ্যোগীদের বাছাই করে এনে টাকা দেওয়ার দায়িত্ব ব্যাঙ্কেরই। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক প্রশাসকরা এসব কথা ভুলে যান। 'উদ্যোগী'র সংজ্ঞাটাই সম্ভবত তাঁদের কাছে ধোঁয়াটে। দীর্ঘসূত্রিতা বা লাল ফিতার বাঁধনের সমস্যাগুলি তো আছেই। অশোকবাবুর প্রশ্নের উত্তরে সরকারি প্রশাসকরা বলেছেন, ক্ষুদ্রশিল্পে এই রাজ্যের স্থান সবচেয়ে উপরে। আমার বক্তব্য, এই সংখ্যায় বিশেষ একটা হেঁয়ালি লুকিয়ে আছে। বহু শিল্পোদ্যোগী নাম কা ওয়াস্তে স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ সার্ভিস ইন্সটিট্যুট স্বীকৃত তাঁদের ক্ষুদ্র শিল্পগুলি টিকিয়ে রেখেছেন। এগুলির দৌলতে তাঁরা বিক্রয় কর মকুব, বিভিন্ন ছাড়ের সুযোগ পান। কাঁচামালের 'কোটা'ও থাকে তাঁদের জন্য। যেমন, অ্যালুমিনিয়ামের একজন প্রস্তুতকারক কাঁচামালের জন্য 'ইণ্ডাল' থেকে সুবিধা পান; বাতি তৈরির কারখানায় ইণ্ডিয়ান অয়েল গ্যাস সিলিণ্ডার সরবরাহ করে। এগুলি তাঁরা তাঁদের অন্যান্য কারখানার কাজে

প্রকাশিত হল

পূর্ণিমা ঠাকুরের

রান্না শেখার স্বর্ণখনি

ঠাকুরবাড়ির রান্না

দাম ১২·০০

গান যেমন একাকী গায়কের নয়, রান্নাও নয় তেমনই শুধু সুপকারের। রান্না তখনই সার্থক, যখন তা অন্যের রসনায় তোলে পরিতৃপ্তির কল্লোল।
ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী নিজে যে রন্ধনপটীয়সী ছিলেন তা নয়, কিন্তু ভালো রান্নার সমঝদার ছিলেন। দেশে বা বিদেশে যখনই কোনও স্বাদু রান্না খেয়েছেন, তখনই জিজ্ঞাসা করে লিখে রেখেছেন তার প্রস্তুতপ্রণালী। এভাবেই একটি খাতা ভরে জমে ওঠে তাঁর সারা জীবনের অমূল্য সংগ্রহ।
খাতাটি পরে তিনি উপহার দিয়ে যান পূর্ণিমা ঠাকুরকে। ইন্দিরা দেবীর সংগৃহীত সেই রান্নার খাতা থেকেই এ-গ্রন্থের অধিকাংশ রন্ধনপ্রণালী আহৃত। অধিকাংশ, কিন্তু সব নয়। লেখিকার মা নলিনী দেবী নিজে খুব ভালো রাঁধতেন। তিনি ছিলেন ঠাকুরবাড়িরই মেয়ে। তাঁর কাছেও বহু রান্না শিখেছেন পূর্ণিমা ঠাকুর। সেইসব রান্না ও নিজের সংগ্রহ-করা বৈচিত্র্যময় বেশ কিছু রান্নাও এই বইতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তিনি। সব মিলিয়ে 'ঠাকুরবাড়ির রান্না' এক সোনার খনি।
প্রচ্ছদ : নির্মলেন্দু মণ্ডল।

প্রকাশিত হয়েছে

সাধনা মুখোপাধ্যায়ের

দুঃসাহসিক গার্হস্থ্য কবিতার সংগ্রহ

ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর রবীন্দ্রসঙ্গীত

দাম ১০·০০

'ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর রবীন্দ্রসঙ্গীত' সাধনা মুখোপাধ্যায়ের লেখা দুঃসাহসিক কিছু কবিতার সংকলন। প্রত্যেকের জীবনের খুঁটিনাটি নানান বিষয়—যা নিয়ে এ-যাবৎ কখনও কবিতা লেখা হয়নি সেইসব বিষয়—নিয়ে গার্হস্থ্য কবিতার এক চমক-জাগানো সংগ্রহ। প্রাতঃকৃত্য, মেনোপজ থেকে শুরু করে রাত্তিরের নটে গাছ মুড়িয়ে যা, তনুবৃন্তের রহস্য, তুতো সম্পর্কের ভাইবোন, এমন-কি রংঝারি হিংসুক ননদিনী, দেওর, অবিবাহিত ভাসুর, কর্তা, গিন্নি, অন্তঃসত্ত্বা বউ, বেকার যুবক—কেউই বাদ যায়নি এই কবিতাগুচ্ছে। তদুপরি রয়েছে রান্নার এক্সপেরিমেন্ট, এক মেয়ের কান্না, যুবতী, উদ্ভিন্ন বক্ষ-মুকুলের বার্তা সঠিক মৌমাছির কাছে পৌঁছে যাওয়া, বন্ধ্যা রমণীর আকুলতা, নারী বলতে যারা সুড়ঙ্গ বোঝে সেইসব পুরুষের প্রসঙ্গও। সব-ছাপিয়ে রয়েছে আপাতসুখী এক ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর কথা, ভুলে-যাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের অশ্রু যাঁর বুকে। যাঁরাই বাংলা পড়তে পারেন, তাঁদের কারও কাছেই এই কবিতাগুলির এক ছত্রও দুর্বোধ্য মনে হবে না। এ-গ্রন্থের আবেদন সর্বজনীন।
প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন।

রমাপদ চৌধুরীর

ছ-ছটি অসাধারণ উপন্যাস একসঙ্গে

উপন্যাস সমগ্র ১

দাম ৫০·০০

দুই মলাটের মধ্যে রমাপদ চৌধুরীর ছ-ছটি আলোড়ন-তোলা উপন্যাস। এতে রয়েছে 'খারিজ'-এর মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিময় উপন্যাস, 'হৃদয়'-এর মতো মানবিক কাহিনী, আছে 'লজ্জা', যা নিয়ে ছবি করার শেষ বাসনা ছিল ঋত্বিক ঘটকের। আছে 'বীজ', যা অভিভূত করেছে সর্বস্তরের পাঠকদের। আরও আছে 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে' ও 'পরাজিত সম্রাট', যার একটিতে চিরে-চিরে দেখানো হয়েছে ব্যক্তিহৃদয়, অন্যটিতে সমাজের বিবসন চিত্রপট।

রমাপদ চৌধুরীর

যাবতীয় ছোট-বড় গল্পের সংকলন

গল্প-সমগ্র

দাম ৫০·০০

সতেরোয় শুরু, পঁচিশে প্রতিষ্ঠা, তিরিশের আগেই বিখ্যাত রমাপদ চৌধুরী বাংলা ছোটগল্পে একাই এক আন্দোলন। উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো নানা স্বাদের গল্পগুলিতে বারবার এনেছেন নতুন ভাষারীতি, বিচিত্র আঙ্গিক। তাঁর যাবতীয় গল্পের এই সংগ্রহ আসলে দুই মলাটের মধ্যে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে থাকা চার দশকের বাঙালী জীবনের নিটোল প্রতিবিম্ব।

পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত

সমরেশ মজুমদারের

চলচ্চিত্রে রূপায়িত উপন্যাস

দৌড়

দাম ১০·০০

ঘোড়দৌড়ের মাঠ, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান গণিকার ফ্ল্যাট, উঁচু মহলের নীচু জীবনযাত্রা, আধুনিক প্রেম-প্রেম খেলা আর এর পাশাপাশি লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য মধ্যবিত্ত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-হতাশা-যন্ত্রণা-ভরা দৌড়ের এক অনুপম ছবি এই উপন্যাসে।

প্রকাশিত হচ্ছে

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

অবিস্মরণীয় গল্পের সংগ্রহ

গল্পমালা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আবার পাওয়া যাচ্ছে

বিমল করের

কালজয়ী উপন্যাস

পূর্ণ অপূর্ণ

দাম ৩০·০০

ছোটনাগপুরের এক লোকালয়হীন প্রান্তরে, নির্জন গুরুডিয়ার অন্ধ আশ্রমকে ঘিরে তিনজন মানুষের জীবনপ্রবাহ নিয়ে রচিত এই উপন্যাস বিমল করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। দীর্ঘকাল অমুদ্রিত থাকার পর নতুন করে আবার পাওয়া যাচ্ছে 'পূর্ণ অপূর্ণ'।

পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত

বিমল করের

গা-ছমছম কিশোর-উপন্যাস

কাপালিকরা এখনও আছে

দাম ১২·০০

এ-যুগেও কাপালিক রয়েছে, যে কিনা প্রেতাত্মা নামায়, তাদের দিয়ে ঘণ্টা বাজায়, মৃত মানুষের হাতের ছাপ হাজির করে। এমনই এক ভয়ংকর কাপালিকের পাল্লায় পড়েছিল দুই কিশোর। কিকিরা নামের এক রহস্যময় ম্যাজিসিয়ান কীভাবে হাতেনাতে ধরে ফেললেন সেই কাপালিকের যাবতীয় কীর্তিকলাপ, তাই নিয়েই এই উত্তেজনামুখর উপন্যাস।

ষষ্ঠ মুদ্রণ প্রকাশিত

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

বুদ্ধিদীপ্ত মজার গল্প

টেনিদা ও ভুতুড়ে কামরা

দাম ১০·০০

বেগুন না খাবার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কীভাবে ভেঙে যায় গরম বেগুনির সামনে, কীভাবে যোগাড় করা যায় চাঁদা, ছেলেকে ধরতে গিয়ে কীভাবে বাবা হয়ে যান ছেলে-ধরা, চুল কাটার ভয়ে পালিয়ে বেড়ালেও কীভাবে ভাগ্যে জোটে কদম-ছাঁট—এমনতর বিস্তর মজাদার গল্প নিয়ে এই বই।

নাটকের বই

বুদ্ধদেব বসুর
তপস্বী ও তরঙ্গিণী
দাম ৮·০০

বিমল করের
ঘুঘু দাম ৬·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
প্রাণের প্রহরী
দাম ১০·০০

শৈলেন ঘোষের
অরুণ বরুণ কিরণমালা দাম ৮·০০

সুনির্মল বসুর
শহুরে মামা ও কানাকড়ি দাম ৮·০০

তারাপদ রায়ের
ডোডো-তাতাই পালাকাহিনী
দাম ১০·০০

রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন

দেশ পত্রিকার ১লা নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন' (দ্রঃ দেশ পৃঃ ৫৩-৫৬) প্রবন্ধটিতে লেখকের একটি মন্তব্য সঠিক ও সমীচীন মনে হল না। লেখাটিকে অবশ্য প্রবন্ধ বলা যায় না, ক্ষিতিমোহন সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি মূল্যবান পত্রের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য সহযোগে সংকলন মাত্র। পত্রটির একটি ফটোকপি সংকলনের অনুপ্রব হিসাবে থাকলে সংকলক শ্রীসুনীল দাস ও পত্রিকা সম্পাদক উভয়েই পাঠকমণ্ডলীর আরও ধন্যবাদভাজন হতেন। পত্রিকার ৫৬ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলামে শ্রীদাস বলেছেন—(ক্ষিতিমোহনের আশ্রমে যোগদানের) 'দুবছরের মধ্যেই প্রকাশিত হল কবীর (১৯১০)। আর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অনুপ্রাণিত হয়ে ক্ষিতিমোহন সংগৃহীত বাণী অবলম্বনে সম্পাদনা করলেন—ওয়ান হানড্রেড পোয়েমস্ অব্ কবীর (১৯১৪)।" ক্ষিতিমোহন সেনের 'অনুবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে' কবি ইংরেজিতে কবীরের বাণী অনুবাদ করেছিলেন—কথাটি যথার্থ নয়। মূল প্রয়োজন বা 'অনুপ্রেরণা' ছিল অন্যত্র। সে প্রয়োজন ঘটেছিল প্রথমত—'To save the saint from Mr Ezra Pound'. প্রসঙ্গক্রমে বলতে হচ্ছে—ইংরেজ কবি Mr Drinkwater একসময় ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে একটার পর একটা নাটক লিখে চলেছিলেন, আর তাই শ' (G. B. S) তাঁর 'সেন্ট জোন' নাটকটি লিখবার কারণ হিসেবে বলেছিলেন—'To save the maid from Mr Drinkwater'. এখানেও অনুরূপ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই উপযুক্ত মন্তব্যটি করতে হল। সন্ত কবীরের দোঁহাগুলির প্রতি রবীন্দ্রনাথের কী গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল, যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পড়াশুনা করেন, তাঁদের কাছে একথা অজানা নয়। সেই দোঁহাগুলি হঠাৎ এজরা পাউন্ড কালীমোহন ঘোষের সহায়তায় অনুবাদ করতে শুরু করেন। হিন্দি ভাষায় পাউন্ডের বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছিল না, জ্ঞান ছিল না ভারতীয় ও সুফী চিন্তাধারাতেও। সুতরাং তর্জমা যে কি পর্যায়ের হবে ধারণা করা কঠিন নয়। এই তর্জমার প্রথম (এবং শেষও বটে) কিস্তিরূপে ১৯১৩ সালের জুন সংখ্যা 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকায় দশটি দোঁহার ইংরেজি অনুবাদ Certain Poems of Kabir নামে প্রকাশিত হয়। কালীমোহন ঘোষের কাছে রবীন্দ্রনাথ পূর্বাহ্নেই এই পরিকল্পনার সংবাদ পান এবং নমুনাও দেখে থাকবেন কিছু। তাঁর প্রিয় দোঁহাগুলির ওই প্রকার প্রকাশ্য ধর্ষণে অস্পৃহ থাকা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্বভাবতই অসম্ভব ছিল। সুতরাং বিরাট কাজের চাপ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে কবীরের দোঁহার অনুবাদের ভার নিজের হাতে তুলে নিতে হল। এবং অজিত চক্রবর্তী কৃত কবীরের দোঁহার ইংরেজি অনুবাদের একটি আদি খসড়া খাতা আনিয়ে সেটার ভিত্তিতেই কবি তর্জমা শুরু করেন। এই কাজে সহায়তা করতে তিনি শ্রীমতী আনডার হিলকে সঙ্গে নিলেন। সকলেই দেখেছেন 'One hundred Poems of Kabir' গ্রন্থের টাইটেল পেজেই 'Assisted by Evelyn Underhill' এই স্বীকৃতি রয়েছে। বইটি প্রথমে ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৯১৪) এবং পরে ম্যাকমিলান কোম্পানি কর্তৃক (১৯১৫) প্রকাশিত হয়। সুতরাং নেহাতই ক্ষিতিমোহন সেনের অনুবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে কবি কবীরের দোঁহাবলী অনুবাদ শুরু করেন—শ্রীদাসের এ মন্তব্য যথার্থ নয়।

এ-প্রসঙ্গে শ্রীমতী আনডারহিলের লেখা—উক্ত গ্রন্থের Introduction-এর সামান্য অংশের উদ্ধৃতি, একই সঙ্গে অপর কারণটি জানতেও সহায়ক হবে। তিনি বলেছেন—'This version of Kabir's songs is chiefly work of Rabindranath Tagore, the trend of whose mystical genius makes him--as all who read these poems will see--a peculiarly sympathetic interpreter of Kabir's vision and thought. It has been based upon the printed Hindi text with Bengali translation of Mr Kshitimohan Sen's... We have also had before us a manuscript English translation of 116 songs made by Mr. Ajit Kumar Chakravarty from Mr. Kshiti Mohan Sen's text, and a prose essay upon Kabir from the same hand. From these we have derived a great assistance.'

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির (১৯১৩, নভেম্বর) পর কিছু ঈর্ষাদষ্ট সমালোচক কবির কাব্য ছেড়ে কবিকে নিয়ে পড়লেন। বললেন 'এই রবীন্দ্রনাথ আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল এবং তজ্জন্য তাঁহার রচনায় যথার্থ প্রাচ্য গৌরব পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁর এই সম্মান ও সমাদর যথোচিত নয়।' এমনও কেউ বললেন—'ক্রীশ্চান ক্যাথলিক ধর্মের বহুকথিত বাণীই কবি প্রকাশ করেছেন গীতাঞ্জলিতে।' এ-সমস্ত ভুল ধারণা অপক্ষেপের জন্যই অপরোক্ষ প্রয়োজন হয়েছিল কবীরের দোঁহার ইংরেজি অনুবাদ এবং 'সাধনা' বক্তৃতামালা। এতে প্রকাশ করা গেল যে ভারতের চিরন্তনী চিন্তাধারাই রূপায়িত হয়েছে গীতাঞ্জলিতে। পাশ্চাত্য চিন্তালোকে উদ্ভূত হবার বহুপূর্বেই এসব চিন্তাধারা ভারতে প্রবাহিত ছিল। এ সম্পর্কে উৎসাহী পাঠক One hundred Poem-এর U. E কৃত Introduction, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কৃত রবীন্দ্রজীবনী (২য় খণ্ড) এবং সৌরীন্দ্র মিত্রের 'খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে' গ্রন্থগুলি পড়লেই দেখবেন—কোন প্রয়োজনে বা প্রেরণায়, কবীরের দোঁহাগুলির অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ 'প্রেতিযুক্তঃ' হয়েছিলেন।

অজিতকুমার চক্রবর্তী

গরিফা-৭৪৩১৬৬

ক্ষুদ্রশিল্প কোথায় দাঁড়াবে ?

আপনার পত্রিকায় ক্ষুদ্রশিল্প সম্পর্কিত অশোক সেনগুপ্তর লেখা প্রবন্ধের (২০ সেপ্টেম্বর) পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বক্তব্য আছে। তার আগে অবশ্যই অশোকবাবুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাঁর অসাধারণ সময়োপযোগী লেখাটির জন্য।

প্রথমেই একটা কথা বলে রাখা দরকার। এই চিঠির বক্তব্য নিছকই ব্যক্তিগত মতামত নয়। ক্ষুদ্রশিল্প তৈরির জন্য দিনের পর দিন, বছরের পর বছর বিভিন্ন সরকারি বা আধা-সরকারি সংস্থার দরজায় দরজায় ঘুরেছি। আমার মনে হয়েছে, এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম। উদ্যোগীদের সহযোগিতার ব্যাপারে মুষ্টিমেয় কিছু কর্মী ছাড়া যেন কারোরই কোনও দায়িত্ব নেই! কেমন যেন সব দায়সারা গোছের উত্তর—এখানে নয় ওখানে যান, আজ নয় কাল আসুন। একবার নেতাজী সুভাষ রোডে একটি সরকারি সংস্থায় ক্রমাগত অসহযোগিতা পাওয়ার পর বলেছিলাম, 'দেশ' পত্রিকায় (আগে প্রকাশিত একটি ক্রোড়পত্রে) কিন্তু আপনারা লিখেছেন উদ্যোগীদের এ ধরনের সাহায্য করেন। উত্তরে কর্মীটি বলেছিলেন, এসব পত্রিকার কথা পত্রিকাতেই থাক। ব্যাঙ্কগুলিরও প্রায় একই অবস্থা। ব্যাঙ্কে গেলে মনে হয় যেন ভিক্ষে চাইতে যাচ্ছি। কিছু ক্ষেত্রে ব্রাঞ্চ ম্যানেজাররা তো উদ্যোগীদের সঙ্গে দেখাই করতে চান না। সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গীদের কথাবার্তা শুনে মনে হয়, কথা বলে উদ্যোগীদের তাঁরা কৃতার্থ করছেন। অথচ সম্ভাবনাময় উদ্যোগীদের বাছাই করে এনে টাকা দেওয়ার দায়িত্ব ব্যাঙ্কেরই। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক প্রশাসকরা এসব কথা ভুলে যান। 'উদ্যোগী'র সংজ্ঞাটাই সম্ভবত তাঁদের কাছে ধোঁয়াটে। দীর্ঘসূত্রিতা বা লাল ফিতার বাঁধনের সমস্যাগুলি তো আছেই। অশোকবাবুর প্রশ্নের উত্তরে সরকারি প্রশাসকরা বলেছেন, ক্ষুদ্রশিল্পে এই রাজ্যের স্থান সবচেয়ে উপরে। আমার বক্তব্য, এই সংখ্যায় বিশেষ একটা হেঁয়ালি লুকিয়ে আছে। বহু শিল্পোদ্যোগী নাম কা ওয়াস্তে স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ সার্ভিস ইন্সটিট্যুট স্বীকৃত তাঁদের ক্ষুদ্র শিল্পগুলি টিকিয়ে রেখেছেন। এগুলির দৌলতে তাঁরা বিক্রয় কর মকুব, বিভিন্ন ছাড়ের সুযোগ পান। কাঁচামালের 'কোটা'ও থাকে তাঁদের জন্য। যেমন, অ্যালুমিনিয়ামের একজন প্রস্তুতকারক কাঁচামালের জন্য 'ইণ্ডাল' থেকে সুবিধা পান; বাতি তৈরির কারখানায় ইণ্ডিয়ান অয়েল গ্যাস সিলিণ্ডার সরবরাহ করে। এগুলি তাঁরা তাঁদের অন্যান্য কারখানার কাজে

লাগান। অভিজ্ঞতার নির্যাস দিয়ে বলতে পারি, রুগ্ন শিল্প হল একটা 'স্যাবোটেজ'। ইচ্ছে করে কিছু ক্ষেত্রে সরকারি প্রশাসকদের প্রচ্ছন্ন মদতে সরকারি তহবিলকে বঞ্চিত করার জন্য ক্ষুদ্রশিল্পকে রুগ্ন করে দেওয়া হয়। রুগ্নশিল্প বহু আছে, রুগ্ন শিল্পোদ্যোগী দেখা যায় কি? আমলা বা মন্ত্রীরা যদি চ্যালেঞ্জ করেন, আমি তথ্য দিয়ে বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে দেবো।

শ্রমসমস্যার জন্য আমাদের মত উদ্যোগীরা নানাভাবে মার খাচ্ছেন। সন্তোষপুরে নিজের পাড়ায় একটা ছোট কারখানা শুরু করেছি। আরও কম দরে দমদমে 'শেড' পেয়েছিলাম। যেতে ভরসা পাইনি। সব জায়গাতেই পাড়ার মাস্তান বা পুলিসকে টাকা দিতে হয়। না দিলে কারখানায় ভাঙচুর হবে। শ্রমিকদের তারা উস্কাবে। আর পাঁচটা শ্রমিক এক হলেই কারখানায় ইউনিয়ন তৈরি হবে। দিল্লির ওকলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে গিয়েছি। সেখানে তো এরকম ঝাণ্ডাবাজি নেই। কিন্তু এখানে যেন সমস্যাটা বেড়েই চলেছে।

লক্ষ্মীপুজোর দিন আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পাতায় একটি আলোড়ন জাগানো খবর বার হয়েছিল। বেলেঘাটায় একটি ছোট বাঙালি ব্যবসায়ী মাস্তানদের দাবিমত পুজোর টাকা দিতে না পারায় তাঁকে পাড়াছাড়া হতে হল। পুলিস এবং রাজনৈতিক নেতাদের কাছে জানিয়েও তিনি সুফল পাননি। তাহলে কিসের ভরসায় বাঙালী এত কাঠখড় পুড়িয়ে ব্যবসায় নামবে? কে দেবে তাঁদের নিরাপত্তার আশ্বাস? বছরের পর বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে ক্ষুদ্রশিল্পের এক উদ্যোগী যদি কর্মী অসন্তোষ বা প্রতিকূল আঞ্চলিক পরিস্থিতির চাপে সঙ্কটে পড়েন তবে কেন রাজনৈতিক দাদারা বা পুলিস তাঁদের (উদ্যোগীদের) সাহায্য করবেন না? 'ইজম' আর 'কমিটমেন্ট'-এর দোহাই দিয়ে নেতারা তো এতদিন কাটিয়ে আসলেন। এবার তাঁরা একটু চেয়ে দেখুন। বাস্তব পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করুন। মাস্তানদের আর ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হতে দেবেন না। এই রাজ্যে তাহলে কোনওদিন 'সানরাইজ ইণ্ডাস্ট্রিজ'-এর কিশলয় মহীরুহে পরিণত হবে না। বাঙালী ব্যবসা পারে না, খালি চাকরি খোঁজে; বাঙালী কোনও কাজের নয়,—এসব নেতিবাচক কথাগুলিকে দূর করার দায়িত্ব আমাদের সকলেরই।

তুষার দাস
কলকাতা-৭০০ ০৭৫

মাদার টেরিজা

'দেশ' এর ১৮ই অক্টোবর ১৯৮৬ সংখ্যায় কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর 'ম্যাসিডোনিয়ায় কবিতা-সন্ধ্যা' পড়ছিলাম। এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালাম। কবি লিখেছেন-- "...কাছেই দেখি ওখরিড হ্রদের এক জায়গায় জলের উপর সরলরেখায় অনেকগুলো সাদা সাদা বল ভাসছে।...একজন জানালো যে এই বলগুলোই আলবেনিয়ার সীমারেখা। এই সেই আলবেনিয়া, যেখানে পৃথিবীর অন্য যে-কোন মানুষের প্রবেশ নিষেধ। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল তরুণ মার্কিন কবি মার্ক নেসডর। সে বললো, সুনীল, তুমি যদি মনের ভুলে ঐ সীমান্ত পেরিয়ে যাও, তাহলেই গুলি খেয়ে মরবে! আমি বললুম, তোমার সে ভয় থাকতে পারে, আমার নেই। আমি দুহাত তুলে বলবো, আমি মাদার টেরিজার কলকাতা থেকে এসেছি।..."

লেখাটুকু পড়ে আবেগে আপ্লুত হলাম। বাড়ীর সবাইকে ডেকে ডেকে শোনাতে লাগলাম। অদ্ভুত এক আনন্দে ভরে গেলো মন। এমন সময় ক্লাস

বনবিহারী দাশের আশ্চর্য 'প্রথম ভাগ' "পড়তে লিখতে শিখলাম"র ('পুথিপত্র', ১০) পর, অনন্য-রচনা "চুরাশিটি নতুন গল্প" বেরোচ্ছে। "সুধী শ্রীযুক্ত দাশ তাঁর কোনো লেখাতেই দুধে জল মেশাননি। সকলকে তিনি মহার্ঘ ক্ষীরই পরিবেশন করেছেন।" ডক্টর জগন্নাথ চক্রবর্তী, ডি-লিট্।

সেজেন পড়ুয়া তাই প্রশ্ন করে বসলো, রবীন্দ্রনাথও তো নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন তবে তোমাদের সুনীলবাবু তাঁর নাম বললেন না কেন ? তবে কী মাদার টেরিজা রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশি বিখ্যাত ? রবীন্দ্রনাথের লেখায় কোথায় যেন পড়েছিলাম—'ছোটদের ছোট বলে অবহেলা করতে নেই।'
খুব খুশি হবো যদি 'দেশ'-এর কোন সংখ্যায় [অবশ্যই আগে যদি না করা হয়ে থাকে] মাদার টেরেসা প্রচ্ছদ নিবন্ধের বিষয় হয়ে আসেন।

বিলোরা চৌধুরী
ঢাকা, বাংলাদেশ

'ইষ্ট-কুটুম'

২৭ সেপ্টেম্বর '৮৬-র দেশ পত্রিকায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পূর্ব-পশ্চিম উপন্যাসটিতে (পৃষ্ঠা ৩৩) একটি পাখীর পরিচয় দেওয়া আছে। পাখীটিকে "ইষ্ট-কুটুম" পাখী বলে বলা হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় সেটি ঠিক নয়। যে পরিচয়টি দেওয়া হয়েছে (লম্বা লেজওয়ালা ইট রঙের পাখী) সেটি হাঁড়িচাচা পাখী বলে মনে করি। ইষ্ট-কুটুম পাখী বলতে আমরা বাংলায় তাকে বেশী ব্যবহার করি "বেনে বউ" পাখী বলে। পাখীটির কেন এই নাম সে বিষয়েও একটি বড়ই করুণ কাহিনী প্রচলিত আছে যা আমরা অনেকেই ছেলেবেলা থেকে মা-দিদিমাদের কাছে শুনেছি।
এই চিঠি আমি যেখানে বসে লিখছি তার ঠিক সামনেই একটি পাকুরগাছ আছে। এই মুহূর্তে ইষ্ট-কুটুম পাখীটি তার উজ্জ্বল হলদে পিঠ, কালো মাথা, আর হলদে ল্যাজে কালো ফোঁটা নিয়ে সমানে এই "ইষ্ট-কুটুম" ডাকটি ডেকে চলেছে। বর্ষার আরম্ভে এই পাখীটি আমাদের বাড়ির চারিদিকে যে বড় বড় গাছ আছে তাতে ভোরবেলা থেকে বেলা ১২/১টা অব্দি ঘন পাতার আড়ালে থেকে ডেকে চলেছে রোজই। সে যখন ডাকে তার গলার ওঠানামা দেখতে ভারী ভাল লাগে। এটিকে ইংরেজীতে Black headed Oriole বলে। "ঝোপের ওপর একটা লম্বাটে ধরনের পাখী....ওটা কী পাখী" বলাতে মনে হয় ঐ ঝোপের মধ্যে ইষ্ট-কুটুম পাখীটিও ছিল এবং সে তার প্রিয় ডাকটিও ডেকে ছিল কিন্তু তাকে দেখা যায়নি, যার জন্য এই বিভ্রান্তি ঘটেছে।
প্রসঙ্গত বলি, অতি সম্প্রতি আমাদের একটি নতুন কুটুম লাভ হয়েছে। আমাদের জেষ্ঠ্যপুত্রের গত সপ্তাহে বিবাহ হয়েছে। লেখকের উক্তি (তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের মাধ্যমে) সত্য বলে মনে করছি। "আমার ঠাকুমা বলতেন....সেদিন বাড়ীতে অতিথি আসে।" আমিও ছেলেবেলা থেকে এই কথাটি শুনে আসছি আর কখনও কখনও যে মিলে যায়নি তা বলতে পারি না।

লক্ষ্মী সেনগুপ্ত
কলিকাতা-৪৩

সন্ত্রাসবাদ

২৫ অক্টোবরের 'দেশ'-এ সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে সবকটি লেখা পড়েই ভাল লাগল। বিশেষত শ্রীরাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'সন্ত্রাসবাদ' লেখাটি পড়ে সবচেয়ে খুশী হয়েছি।
রচনাটি থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পেলাম। এছাড়াও পয়েন্টভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে লেখক সন্ত্রাসবাদের স্বরূপ বুঝিয়েছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রবন্ধটি থেকে স্বাধীনতার পূর্বের ও আজকের সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে একটি পরিপূর্ণ ধারণা পেলাম।
স্বাধীনতার পূর্বে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করা ছিল যে-কোনো বিপ্লবীরই পবিত্র কর্তব্য। তাই বুঝি ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তির হাতে বোমা না দেখে শিল্পী রামকিংকর বিস্মিত হয়েছিলেন। ১৮৯৭ সালে শিবাজী উৎসবে স্বয়ং বালগঙ্গাধর তিলকই বলেছিলেন "শিবাজী কর্তৃক আফজল খাঁর হত্যা মোটেই অন্যায় কাজ নয়, এমনকি দেশরক্ষা ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে হত্যা বা সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম করা নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমেরই পরিচায়ক।"
কিন্তু বর্তমান কালে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা ভিন্ন। আজ যখন ভারতের দিকে দিকে বিচ্ছিন্নতাবাদের নগ্ন পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে ও তার হাতে হাত মিলিয়ে এসেছে সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম তখন এই রচনাটি যথোপযুক্ত হয়েছে।
প্রবন্ধটি পড়ে তাই বলা যায় অবিলম্বে এই ধরনের কার্যকলাপ স্তব্ধ করা প্রয়োজন, আর প্রয়োজন এই সমস্ত অপরাধীদের যোগ্য শাস্তি।

প্রদীপ্ত বাগচী
শেওড়াফুলি
হুগলী

বিধ্বস্ত সানতোরিনি

২০ সেপ্টেম্বর '৮৬-র দেশে শ্রীসমরজিৎ করের 'বিধ্বস্ত সানতোরিনি' প্রবন্ধে গ্রীক উপকথার উল্লেখে সামান্য অসঙ্গতি রয়েছে। জাসোন ও আর্গোনটস দুই নাবিকের নাম নয়। গ্রীকবীর জাসোনকে আইওলকাসের সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে তাঁর পিতৃব্য পেলিয়াস মন্ত্রপূত স্বর্ণমেষচর্ম আনার কঠিন শর্ত আরোপ করেন। জাসোনের অভিযানতরণীর নাম 'আর্গো' এবং জাসোনের সঙ্গী হন পঞ্চাশ জন অভিযাত্রী, যাঁরা আর্গোনটস নামে খ্যাত হন। আর্গোনটসদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রীকবীর হারকিউলিস ও থেসিয়াস, ক্যাস্টার ও পোলাক্স নামক যমজ ভ্রাতৃদ্বয়।

চিন্ময় সরকার
কাটিহার, বিহার

রেকর্ড প্রসঙ্গে

প্রয়াত দেবব্রত বিশ্বাসের জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের বিবরণ পড়লাম। 'তাঁর জন্মদিন' শীর্ষক লেখায় শ্রীস্বপন সোম ঠিকই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে 'দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ' প্রয়াত শিল্পীর এই গানটি রেকর্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এবিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ হিসাবে আমি জানাতে চাই যে, 'হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানির' ক্যাসেট নাম্বার 1724-0012 তে side two তে এটিই প্রথম গান, এই ক্যাসেটটি বিশ্বভারতীর সহযোগিতায় প্রকাশিত। আমি উপরোক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজক 'কালমৃগয়া' গোষ্ঠীকে অনুরোধ করবো, ভবিষ্যতে কোনো শিল্পীর গান অপ্রকাশিত ঘোষণার আগে তাঁরা যেন যথাযথ খোঁজখবর করেন।

শিবপ্রসাদ দত্তমজুমদার
গিরিডি, বিহার

কেন্দ্রীয় দূরদর্শন ও আঞ্চলিক অনুষ্ঠানের অবনতি

শ্রীযুক্ত অজিত পাঁজা কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী হয়েছেন সেজন্য তাঁকে বিলম্বিত অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর দফতর সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্নও তুলতে চাই। তিনি বাঙালী বলেই যে তাঁর কাছে আমাদের বিশেষ কিছু দাবি আছে তা নয়, তবে তিনি বাংলা পড়তে পারবেন বলেই এই পত্রিকার সম্পাদকীয়তে এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

দফতরের ভার নেবার পর শ্রীযুক্ত অজিত পাঁজা আকাশবাণী ও দূরদর্শনের অনুষ্ঠানের মান উন্নয়নের ব্যাপারে সচেতন হয়েছেন এবং সে বিষয়ে সংসদে ও পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন। কিন্তু একটি প্রধান প্রশ্ন সম্পর্কে তাঁর কোনো মন্তব্য আমাদের চোখে পড়েনি। সেই প্রশ্নটি হলো কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান এবং আঞ্চলিক অনুষ্ঠানের সম্পর্ক বিষয়ে। আকাশবাণীর ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি বিশেষ দেখা দেয়নি। আকাশবাণীর কেন্দ্রগুলিতে আঞ্চলিক ভাষার গুরুত্ব হ্রাস হয়নি। কিন্তু দূরদর্শনের সম্প্রচার সময়ের সিংহভাগ কেন জুড়ে থাকবে কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান? দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ তাদের নিজস্ব ভাষার অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে কেন কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান দেখতে বাধ্য হবে? প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী আঞ্চলিক সংস্কৃতির উন্নতি চান সমানভাবে। একথা তিনি বারবার বলেছেন, অর্থাৎ এটাই কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি। কিন্তু দূরদর্শনের কেন্দ্রীয় হিন্দী ও হিন্দী অনুষ্ঠানগুলি যদি অধিকাংশ সময় খেয়ে ফেলে তাহলে আঞ্চলিক সংস্কৃতিগুলি সুযোগ পাবে কী করে? কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের এই গুরুত্বের জন্য বড় বড় বিজ্ঞাপনদাতারা সর্বভারতে প্রদর্শনযোগ্য হিন্দী ও ইংরিজি অনুষ্ঠানেই টাকা ঢালছে, তার ফলে আঞ্চলিক ভাষার অনুষ্ঠানগুলি দেখলেই মনে হয় সেগুলি ভুগছে রক্তাল্পতার কঠিন অসুখে।

আমরা হিন্দী-বিরোধী নই, কিন্তু কলকাতা দূরদর্শন খুললেই যদি অধিকাংশ সময় হিন্দী অনুষ্ঠান দেখতে হয়, তাহলে বিরক্তি জাগা কি অস্বাভাবিক? এমন কথাও অনেকের মনে হতে পারে যে, আমাদের নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের বাংলার বদলে সরাসরি হিন্দী সংস্কৃতিতে দীক্ষা দেওয়া হচ্ছে। বাংলা অনুষ্ঠানও দেখতে ইচ্ছে করে না, কারণ সেগুলি প্রায় সবই দুর্বল, বোকা-বোকা, অকিঞ্চিৎকর, বোঝাই যায় কোনো রকমে জোড়াতালি দিয়ে তৈরি করা। বাংলার জন্য একেই তো কম সময়, তবু তাও যেন ভরাট করার অনেক বাধা, নইলে পুরোনো বাজে নাটকও বারবার দেখানো হয় কেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে? অনুষ্ঠানের দুর্বলতার জন্য জবাবদিহির দায় নেই কারু। অজিতবাবু কি এসব বৃত্তান্ত জানেন? শুনেছি, তামিলনাড়ুতে কেন্দ্রীয় হিন্দী অনুষ্ঠান যখন তখন বন্ধ করে দিয়ে জোর করে আঞ্চলিক ভাষার অনুষ্ঠান চালানো হয়। বাঙালীদের ধৈর্য শক্তির ওপর আর কতখানি চাপ দেওয়া হবে?

দূরদর্শনে নানা রকম দুর্নীতির কথাও আজকাল প্রকাশ্যেই শোনা যায়। ধারাবাহিক চিত্র নির্মাণের ধূম পড়ে গেছে, পিছনে আছে বিজ্ঞাপনদাতারা। ঝুড়ি ঝুড়ি এইসব ধারাবাহিকের প্রস্তাবের মধ্য থেকে উপযুক্তগুলি বাছাই করার জন্য যে ব্যবস্থা রয়েছে, তা নিশ্চিত ত্রুটিপূর্ণ। দ্রুত অনুমোদন পাবার জন্য নাকি অবৈধ টাকা খরচ করতে হয় কিংবা পার্টির লোকদের ধরাধরি করতে হয়। মন্ত্রী মহোদয় এইসব খবর রাখেন কি? দূরদর্শনে যে পুরনো ফিল্‌ম দেখানো হয় প্রতি সপ্তাহে, তা নিয়ে অবশ্যই কোনো র‍্যাকেট আছে। টাকা-পয়সা লেনদেনের সম্ভাবনা মোটেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বেছে বেছে এত নিম্ন মানের বাংলা সিনেমা দেখানো হয়, যা দেখলে ভবিষ্যতে আর কোনো বাংলা সিনেমা দেখার ইচ্ছেই চলে যায়। ঐসব বাংলা ফিল্‌ম শুরু হলে অল্প বয়েসী ছেলে মেয়েদের দূরদর্শনের সামনে দড়ি দিয়েও বেঁধে রাখা যায় না। বাংলা ফিলমের প্রতি তাদের এই অনীহার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। সুতরাং যিনি বা যাঁরা এইসব বাংলা ফিল্‌ম নির্বাচন করছেন, তাঁর বা তাঁদের নিশ্চয়ই অন্য স্বার্থ আছে, বাংলা ফিলমের উন্নতির কোনো চিন্তা নেই।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ শুধু কেন্দ্রের অনুষ্ঠানের মান উন্নতির প্রতিই নজর না দিয়ে আঞ্চলিক ভাষার অনুষ্ঠানগুলির কেন এবং কতখানি অধঃপতন হয়েছে সেদিকেও মনোযোগ দিন। নইলে বিরক্ত ও উত্যক্ত দর্শক-শ্রোতারা যদি একদিন দল বেঁধে আঞ্চলিক দূরদর্শন কেন্দ্রগুলি ভাঙচুর করতে চায়, তখন তাদের খুব দোষ দেওয়া যাবে না!

বিশ্বাসে দুর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়!

আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র!

নিয়মিত কোলগেট ব্যবহার সারা পরিবারকে দেয় সুস্থসবল দাঁত
আর তাজা নির্মল নিশ্বাস। এর থেকেই তো আসে আত্মবিশ্বাস!
আর কোলগেটের তাজা মিণ্টি স্বাদ কার না পছন্দ!

প্রতিবার দাঁত মাজার সময়ে কোলগেটের বিশিষ্ট
ফর্মূলা কীভাবে কাজ করে দেখুন।

দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা
খাবারের টুকরো থেকেই নিশ্বাসের গন্ধ
আর দাঁত ক্ষয়ের শুরু।

কোলগেটের অজস্র সক্রিয় ফেনা
দাঁতের ফাঁকে ঢুকে এই ক্ষয়ক্ষতিকারী
খাবারের কণাগুলো বার করে আনে,
রোগজীবানু হ'তে দেয় না।

ফলে দাঁত থাকে সুস্থসবল,
নিশ্বাস হয় ঝরঝরে তাজা।

প্রতিদিন নিয়মিত কোলগেট দিয়ে দাঁত
মাজতে ভুলবেন না। সম্ভব হ'লে প্রতিবার খাবার পর।
নিশ্বাসে দুর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়!
আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র।

কি তাজা মিণ্টি স্বাদ!

আপনাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্ষিতিমোহন সেনকে লেখা : ১৯০৮-১৯৪০

॥ পত্র ৩১ ॥

ও

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

ক্ষিতিমোহনবাবু, এতদিন লণ্ডনের হোটেলে ছিলুম এখন মানুষের মাঝখানে এসে পড়েছি। সকলের চেয়ে আমার এইটে আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে আমি এদের থেকে দূরে না—এবং আমার জীবন এদের পক্ষেও অনাবশ্যক নয়। মিসরে নীল নদীর উপরকার আকাশে ধীরে ধীরে যে মেঘ জমছিল সেই মেঘ সুদূর বাংলাদেশের ধানের ক্ষেতেও গিয়ে, বৃষ্টি দিয়ে আসে আমাদের মনের আকাশেও বর্ষণের লীলা সেই রকম। কোন্ পদ্মার ধারে জনশূন্য বালুচরের আলোকে ও অন্ধকারে কত কর্ম্মহীন দিনে ও রাত্রে বাঙালী যুবকের মনে যে আনন্দসঞ্চয় ঘনীভূত হয়ে উঠেছিলো এখানকার সমুদ্রপারেও তার কোনো প্রয়োজন আছে একথা আমি এমন স্পষ্ট করে মনে করতে পারতুম না। মানুষ বাইরের দিকে এতই দূরে ছড়িয়ে আছে অথচ ভিতরের দিকে এতই নিবিড়ভাবে পরস্পর নিকটে আকৃষ্ট—সেখানে সেই সনাতন মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে জাতিবর্ণ ভাষার ব্যবধান এমনি তুচ্ছ হয়ে যায় যে কেবল সেই অনুভূতিটি লাভ করবার জন্যে বহু কষ্টে বহু দূরে আসাও সার্থক। মানুষের আনন্দযজ্ঞে বিচ্ছেদের পাত্রেই মিলনসুধা পান করবার ব্যবস্থা ভগবান করে দিয়েছেন। তিনি নিকট থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে আমাদের দর্শন দেন আবার দূর থেকে নিকটে ফিরিয়ে এনে আমাদের ধরা দেন এমনি করে বিচ্ছেদ মিলনের তালে তালে সমে ও ফাঁকে তাঁর আনন্দসঙ্গীত চলচে। পরিচিত অবস্থার মধ্যে গভীরভাবে এবং অপরিচিত অবস্থার মধ্যে প্রবলভাবে যেন সেই আনন্দের বিচিত্রতা গ্রহণ করতে পারি আমি তাঁর কাছে এই প্রার্থনা করে বেরিয়েছি। বোলপুরের প্রান্তর এবং এই লন্ডনের জনতাকে তিনি আমার চিত্তের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন করে মিলিয়ে দিন এই আমার কামনা। ইতি ২০ জুন ১৯১২

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ পত্র ৩২ ॥

ও

প্রীতিনমস্কার নিবেদন—

ক্ষিতিমোহনবাবু, কাল রাত্রে এখানকার কবি Yeats-এর সঙ্গে একত্রে আহার করেছি। তিনি আমার কবিতার কতকগুলি গদ্য তর্জ্জমা কাল পড়লেন। খুব সুন্দর করে সুর করে তিনি পড়লেন। আমার নিজের ইংরেজির উপর আমার কিছুমাত্র ভরসা ছিল না—তিনি বল্লেন, যদি কেউ বলে এ লেখাকে কেউ আরো improve করতে পারে তাহলে সে সাহিত্যের কিছুই জানে না। এঁদের এগুলো এত অতিশয় মাত্রায় ভাল লেগেছে যে, আমি সেটাকে ঠিকমত গ্রহণ করতে পারচিনে। আমার মনে হচ্চে যেখান থেকে কিছু প্রত্যাশা করা যায় না সেখান থেকে সামান্য কিছু পেলেই সেটাকে অত্যন্ত আশ্চর্য্য বলে বোধ হয় এঁদের সেই দশা হয়েছে। যাই হোক্ আমার এই গদ্য তর্জ্জমাগুলো Yeats নিজে edit করে একটা introduction লিখে ছাপাবার ব্যবস্থা করবেন। আমার চিরকেলে স্বভাব অনুসারে এতে আমি খুসিও হচ্চি আবার অবসাদও অনুভব করচি। এখানে এসে আমার আবার এই নিজের দিকে তাকানো, নিজের জিনিষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা আমার এক একসময় এত অরুচিকর ঠেকচে যে আমার জর্ম্মনিতে পালাতে ইচ্ছা করচে। আবার একএকবার ভাবচি আমার অন্তর্যামী হয় ত এই জন্যেই এই বয়সে আমাকে এই দেশে টেনে এনেছেন—এই সমস্ত সাহিত্য এবং শিল্পই এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের মিলনের যথার্থ সেতু—এর মধ্যে থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে আমার রচনার

মধ্যে যেটা যথার্থ ভাল সেটাকে অসঙ্কোচে স্বীকার করাই যথার্থ নম্রতা—যা তাঁর ভাল লেগেছে তাই তিনি সকলকে ভাল লাগাবেন—এই জন্যই তিনি তাঁর পূজার-পদ্মের দ্বারা সকল মানুষের মন হরণ করেন। আমার মনে হচ্চে এরা যে আমাকে প্রশংসা করচে এতে তিনিই আপনার খুসি প্রকাশ করচেন—তিনি যে কিভাবে খুসি হয়েছেন সেই কথাটিই আমাকে জানাবার জন্যে তিনি পূর্ব্ব দেশ থেকে আমাকে পশ্চিমে এনে ফেলেচেন। তাঁর প্রসাদকে ত প্রমত্ত হয়ে গ্রহণ করা চলে না, সেইজন্যে মাথা ধূলায় নত করে পুরস্কার শিরোধার্য্য কববার চেষ্টায় প্রবৃত্ত আছি। ইতি ১৪ই আষাঢ় ১৩১৯ [১৯১২]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ পত্র ৩৩ ॥

ওঁ

508 W. High Street
Urbana, Illinois
U. S. A.

সশ্রদ্ধ নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

ক্ষিতিমোহনবাবু, আপনাদের চিঠি আমি প্রত্যেকবারেই পাই বলে মনে করি অতএব চিঠি লিখতে পারেননি বলে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করবেন না। কিছুদিন থেকে আমিই কেবল এই দুঃখ পাচ্চি যে আপনাদের প্রতি আমার যা দেয় তা পূর্ণ পরিমাণে জুগিয়ে উঠতে পারচিনে। সমুদ্রের দুই তীরের দাবী সমান রক্ষা করতে পারি এমন সব্যসাচী আমি নই। তা ছাড়া এক এক সময় মনের ভিতরটাতে ক্লান্তি আসে—মনকে তখন বুঝিয়ে ওঠা দায় হয়—খ্যাতি, প্রতিপত্তি দেশহিত লোকহিত যা কিছু তার কাছে ধরি না কেন সমস্তই সে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়। Times-এর সমালোচনা, Yeats-এর ভূমিকা, সভা-সমিতিতে সংবর্দ্ধনা যে আমার ভাল লাগেনি এ কথা বলা মিথ্যা—অথচ তারই ভিতরের থেকে বিষম একটা বেদনা হৃৎপিণ্ডটাকে চেপে চেপে ধরে—তাকে আজ পর্য্যন্ত তাড়াতে পারচিনে। সে একটা রিক্ততার প্রার্থনা—একেবারে ফাঁকা, একেবারে অকিঞ্চনতা, একেবারে সমস্ত তুড়ি মেরে বেরিয়ে চলে আসা, একেবারে শেষ তলায় গিয়ে তলিয়ে যাওয়া—এ না হলে যেন আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে এমনি আমার মনে হয়।

3.1.1913

ওঁ 508 W. High Street
Urbana. Illinois
U.S.A.

সশ্রদ্ধ নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—
ক্ষিতিমোহনবাবু, আপনাদের চিঠি আমি প্রত্যেক বারেই পাই বলে মনে করি অতএব চিঠি লিখতে পারেন নি বলে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করবেন না। কিছুদিন থেকে আমিই কেবল এই দুঃখ পাচ্চি যে আপনাদের প্রতি আমার যা দেয় তা পূর্ণপরিমাণে জুগিয়ে উঠতে পারচিনে। সমুদ্রের দুই তীরের দাবী সমান রক্ষা করতে পারি এমন সব্যসাচী আমি নই। তা ছাড়া এক এক সময় মনের ভিতরে ক্লান্তি আসে—মনকে তখন বুঝিয়ে ওঠা দায় হয়—খ্যাতি প্রতিপত্তি দেশহিত লোকহিত যা কিছু তার কাছে ধরি না কেন সমস্তই সে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়। Times এর সমালোচনা, Yeats এর ভূমিকা, সভাসমিতিতে সংবর্দ্ধনা যে আমার ভাল লাগেনি এ কথা বলা মিথ্যা—অথচ তারই ভিতরের থেকে বিষম একটা বেদনা হৃৎপিণ্ডটাকে

এখানে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা সম্বন্ধে আপনি যা কিছু জানতে চেয়েছেন তা আমি শিকাগোতে গিয়ে খবর নিয়ে আপনাকে জানাব। আমার বিশ্বাস এখানে জীবিকার সংস্থান করে অধ্যয়ন করা আপনার পক্ষে কঠিন হবে না। শিকাগোর হোমিওপ্যাথি বিদ্যালয়ই বোধ হয় এখানকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শিকাগোতে আমার নিমন্ত্রণ আছে। সেখানকার অনেক কৃতী ও যশস্বী লোকের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সম্ভাবনা আছে হয় ত আপনার পথ কতকটা সহজ করে দিতে পারি। এ সম্বন্ধে যথাসময়ে আপনাকে লিখব।

আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী ছাত্রচালনা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথাই মনে উদয় হয়—সকলের চেয়ে এই কথাটাই বারবার মনে লাগে যে ছেলেরা যেন বিদ্যা পায় না, জীবন পায়—অর্থাৎ তারা যেন আপনার সমগ্রতার দ্বারা বিশ্বকে আপনরূপে অধিকার করবার পথে অগ্রসর হয়—এদেশের সঙ্গে আমাদের ঐখানে তফাৎ আছে—এরা অখণ্ডতা জিনিষটাকে সহজে বুঝতেই পারে না—সমস্তের মধ্যে নিজের ধারণা এবং নিজের মধ্যে সমস্তের ধারণা এইটে আমাদের একটা সম্পদ। এই সম্পদ আমাদের দেশের প্রত্যেক ছেলেই যেন নিজের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করবার সাধনা করে—কেন না আমাদের হাত দিয়ে এই জিনিষটাই ভারতবর্ষ পৃথিবীকে দান করবার সংকল্প করেছে—সেইজন্যে আমাদের দানসামগ্রী বিদ্যার চেয়েও বড় এবং আমাদের যজ্ঞক্ষেত্র কলেজের চেয়েও প্রশস্ত—এই জন্যে আমি ইস্কুল মাস্টারকে ছুটি দিতে চাই। ইতি ১৯ পৌষ ১৩১৯ [১৯১৩]

আপনাদে[র]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকু[র]

॥ পত্র ৩৪ ॥

ওঁ

C/O Messers Thomas Cook & So[n]
Ludgate Circus Londo[n]
২৪ বৈশাখ ১৩২[০]

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

অনেকদিন থেকে আপনার চিঠির প্রত্যাশা করছিলুম—পেয়ে আনন্দিত হলুম। আপনি পূর্ব্বেই খবর পেয়েছেন আপনার জন্যে আমেরিকায় আমি আসন প্রস্তুত করে রেখে দিয়েছি। Dr. Woods এবং Mrs Moody দুজনেই আপনাকে অভ্যর্থনা করে নিতে সম্মত হয়েছেন। কিন্তু আমি বিদ্যালয়ে ফেরা পর্য্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। সে দিন দূরবর্তী নয়। ডাক্তার Woods বলছিলেন তিনি হয় ত আপনাকে সঙ্গে করে য়ুরোপে ইটালি প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করবেন এরকম অসম্ভব নয়। আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছি সেটা আপনার পক্ষে অপ্রীতিকর হবে না। Mrs Moody-র সঙ্গে যখন থাকবেন তখনও হয় ত নানা দেশে ভ্রমণ আপনার ঘটবে। আপনি যে ভেষজশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে ইচ্ছা করেছেন বস্টন এবং শিকাগো উভয় স্থানেই তার খুব ভাল ব্যবস্থা আছে—এঁরা আপনাকে সে সম্বন্ধে আনুকূল্য করবেন।

এদেশের প্রাচ্যতত্ত্ববিৎরা যে সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্র খুব তলিয়ে জেনেছেন তা নয়। তাঁরা বিদ্যাটাকে ব্যবহার করবার কতকগুলো কল বানিয়ে রেখেছেন—সেই কলের থেকে তাঁরা মাল তৈরি করেন। এই জন্যে আপনাদের কাছ থেকে তাঁরা যে প্রাণের জিনিষ পাবেন সে তাঁরা কোনো শব্দকোষ এবং ব্যাকরণ থেকে পাবেন না একথা আমি অধ্যাপককে বলে রেখেছি। তিনি সেই জিনিষটাকেই চান এবং আপনার সঙ্গে যোগে সেই জিনিষটার তিনি সদ্ব্যবহার করতেও পারবেন। এখানকার যাঁরা শাস্ত্রজ্ঞ তাঁরা সাধক নন, সেইটেতে যে অভাব ঘটে সেই অভাব আপনি পূরণ করে দেবেন। এই কথা চিন্তা

শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসবে রবীন্দ্রনাথ, পাশে ক্ষিতিমোহন

করে দেখবেন আমার মত লোকও উপনিষদের দুই চারটে শ্লোক অবলম্বন করে আপন মনের মত যে ব্যাখ্যা করেছে সেও এই ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র অধ্যাপকের কাছে অত্যন্ত হৃদ্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। অথচ উপনিষদের অমৃত ভাণ্ডারের বাইরে দাঁড়িয়ে মহাজনের চলাচলের রাস্তা থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে টুক্‌রো টাক্‌রা যা পেয়েছি তাই নিয়েই আমার কারবার।

আমার বোধ হয় আগামী পূজার ছুটির সময়ে আপনাকে যাত্রা করে বেরতে হবে। ইতি মধ্যে আপনি কতকটা প্রস্তুত হয়ে নিতে পারবেন। পুঁথিপত্র যা পারেন সঙ্গে আনবার চেষ্টা করবেন। পাণিনি, ব্যাকরণ শিক্ষার কিছু আয়োজন যদি সংগ্রহ করে আনেন সেটা কাজে লাগবে। এদের কাছে বেদান্তশাস্ত্রের ভক্তিতত্ত্বসম্মত ব্যাখ্যা উপস্থিত করা খুব দরকার হবে। মোট কথা ভারতবর্ষকে যে এরা অত্যন্ত অসম্পূর্ণভাবে জানে সেইটেকে কাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা চাই। ভারতবর্ষের মুখ থেকে এরা কিছু কিছু জ্ঞানের কথা শুনেছে কিন্তু রসের কথা একেবারেই শোনেনি সেইটে এদের যতটা সম্ভব দান করে যাবেন। সে জন্য সময় অনেকটা অনুকূল হয়েছে—রসধারাবর্ষণের জন্যে এরা যেন আজকাল আকাশের দিকে চঞ্চু বিস্তার করবার উপক্রম করচে এই সময়ে ভাবের আসর জমানো আপনার পক্ষে শক্ত হবে না। আমার ইচ্ছা ছিল কিছুদিন আপনাকে যদি কিছুদিন ইংলণ্ডের রসতত্ত্বসন্ধায়ী দলের মধ্যে ভিড়িয়ে দিতে পারি কিন্তু এখানে সুযোগ ঘটিয়ে তোলা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। হয় ত এর পরে কোনো একদিন সুবিধা হতেও পারে।

*Mrs. Moody*র একটা বড় রকমের মিষ্টান্নের ব্যবসায় আছে। সেই ব্যবসায়ে শিক্ষালাভের জন্য আমি সরোজকে ডেকেছিলুম। কিন্তু সরোজের অভিভাবক এরকম কাজে তাকে হয় ত এখানে পাঠাতে রাজি না হতেও পারেন। যদি না হন তা হলে অন্নদা কি এই সুযোগ গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন? কাজটি নিতান্ত অবজ্ঞার যোগ্য নয় সে কথা মনে রাখবেন। যদি অন্নদার পক্ষে এই ভার গ্রহণ সম্ভবপর হয় তাহলে জুন মাসের মধ্যেই তাঁর এখানে আসা দরকার হবে। কেননা জুনে *Mrs. Moody* এদেশে আস্‌বেন। তাঁর হাতে আমি অন্নদাকে সমর্পণ করে দিলে নিশ্চিন্ত হতে পারব।

বৈশাখের তত্ত্ববোধিনীতে তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে আপনি যে প্রবন্ধ লিখেছেন সেটি আমার কাছে খুব মিষ্ট লেগেছে।

ছুটির সময়ে আমার এ পত্র ভারতবর্ষে পৌঁছবে—তখন কি এ আপনার সন্ধান পাবে? [১৯১৩]

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনশ্চ, আলোচনা করে দেখা গেল *Mrs. Moody*র মোদক ব্যবসায়ের কাজে হয় দেবল কিংবা কালীমোহনকে নিযুক্ত করে দেওয়াই সঙ্গত এবং সহজসাধ্য, অতএব এ সম্বন্ধে অন্নদাকে আর কিছু বলবেন না।

॥ পত্র ৩৫ ॥

ও

16, MORE'S GARDEN
CHEYNE WALK, S. W.

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

আমেরিকায় আপনার পথ করবার চেষ্টা করছিলুম এবং সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু আমি আমেরিকার যে পরিচয় পেয়েছি তাতে সেখানে আপনাকে পাঠাতে আমার উৎসাহ হয় না। তাই এখানেও চেষ্টা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। কাল রোটেনস্টাইনের সঙ্গে অনেক আলোচনা হল তিনি বলছেন ইংলণ্ডে আপনাকে আনাবার জন্যে তাঁরা উদ্যোগ করবেন এবং তাঁর বিশ্বাস কাজটা কঠিন হবে না। এ সম্বন্ধে শীঘ্রই একটা সভা ডাকবার কথা হচ্চে। মধ্যযুগের ভারতীয় mysticদের সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য আছে সমস্ত আপনাকে সংগ্রহ করে আনতে হবে। দাদু কবীর মীরাবাই জ্ঞানদাস প্রভৃতি সাধকদের রচনাবলী যথাসম্ভব সংগ্রহ করবেন। এ ছাড়া আমাদের বাংলা বাউলদের গানও যতটা পারেন কুড়িয়ে নিয়ে আসবেন। ভারতবর্ষের হৃদয়ের পরিচয়টা এদের পক্ষে দরকার। এখানে Evelyn Underhill প্রভৃতি কোনো একজন রসজ্ঞ লোকের সহযোগে এই জিনিষগুলি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করবার আয়োজন করতে হবে। আমি যে কেবল ইংরেজের উপকার করবার জন্যেই এ প্রস্তাব করচি তা নয়—এখানকার সদর দরজার ভিতর দিয়ে না গেলে আমাদের দেশের পরিচয় আমাদের দেশে প্রবেশ করতে পারবে না। আমাদের দেশ আমাদের লোকের কাছে অনাদৃত হয়ে আছে সেইটেই আমাদের সকলের চেয়ে অকল্যাণ। এই জন্যেই আমি আপনাকে ইংলণ্ডে আনাতে চাই। আমেরিকায় গেলে এ কাজটি হবে না—কেননা আমেরিকার কোনো উদ্যোগকে য়ুরোপ তেমন খাতির করে না। আমাদের দ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে যা কিছু গ্রন্থ আছে তাও আনবেন। এ ছাড়া চৈতন্যের জীবনী ও বৈষ্ণব কবিদের কবিতাও ভুলবেন না। বোধ করি আমি এখানে থাকতে থাকতেই আপনাকে আনাতে পারব। [১৯১৩]

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র পরিচিত

॥ পত্র ৩১ ॥

লণ্ডনের হোটেলে : ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে শারীরিক অসুস্থতার জন্য রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা স্থগিত রেখে পদ্মা তীরে শিলাইদহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এখানে বসে তিনি স্বরচিত কবিতার ইংরেজী অনুবাদে মন দেন। পরের বছর ২৪ মে ১৯১২ তারিখে কবি নাগপুর মেলে কলকাতা ত্যাগ করলেন। উদ্দেশ্য বিলাত যাত্রা।

২৬ তারিখে পৌছলেন বোম্বাই। উঠলেন ওয়াটসন হোটেলে। এবারের বিলাত যাত্রার সঙ্গী ছিলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী ও সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা। ২৭ মে বিকেলে সিটি অব গ্লাসগো নামে জাহাজ ছাড়লো। মার্শাই, হয়ে জাহাজ লন্ডন পৌছল ১৬ জুন। টমাস কুক কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় তাঁরা প্রথমে উঠলেন ব্লুমসবেরি হোটেলে। পর দিন হ্যাম্পস্টেড হীথে রোদেনস্টাইনের বাসায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে তুলে দিলেন গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি। রোদেনস্টাইন তাঁর বাড়ির কাছে একটি প্রাইভেট হোটেলে (৩ ভিলাজ অন হীথ) কবির থাকার ব্যবস্থা করে দেন। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। ব্লুমসবেরি ফেরার পথে টিউব ট্রেনে গীতাঞ্জলি ও গার্ডেনারের ইংরেজী তর্জমার পাণ্ডুলিপি সমেত ব্যাগটি ট্রেন থেকে নামার সময় ফেলে যান রথীন্দ্রনাথ।

পরের দিন রোদেনস্টাইনের বাড়িতে পাণ্ডুলিপিটির খোঁজ পড়ে। ভাগ্যক্রমে টিউব রেলের লস্ট প্রপারটি অফিস থেকে হারিয়ে যাওয়া গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি সমেত ব্যাগটি পাওয়া যায়।

॥ পত্র ৩২ ॥

কালরাত্রে : রোদেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যিক মহলে পরিচিত করাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর বাড়িটিই ছিল অবশ্য নবীন প্রবীণ সাহিত্যিকদের মিলনক্ষেত্র। ৩০শে জুন ১৯১২ তারিখের সন্ধ্যায় রোদেনস্টাইনের বাড়িতে কবি ইয়েটস-এর উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ইংরেজী তর্জমা পাঠের আয়োজন করা হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন আর্নেস্ট রীজ, মেসফিল্ড, কুমারী মে সিনক্লেয়ার, ঈভলিন আণ্ডারাইল, চার্লস ট্রেভেলিয়ান, এলিস মেনেল, এজরা পাউন্ড, হেনরি নেভিনসন, ফক্স স্ট্রাংওয়েজ ও এন্ড্রুজ। এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানে ইয়েটস গীতাঞ্জলির কবিতা পাঠ করে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন।

ইয়েটস : উইলিয়ম বাটলার ইয়েটস (১৮৬৫-১৯৩৯) প্রখ্যাত আইরিশ কবি ও নাট্যকার। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে নোবেল প্রাইজ পান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর The Gardener কাব্যটি তাঁর নামে উৎসর্গ করেন।

ছাপাবার ব্যবস্থা : লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটি ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ মুদ্রণ এবং প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন কবি ইয়েটস। উল্লেখ্য তিনি গীতাঞ্জলির ভূমিকাও লিখেছিলেন। এবং রোদেনস্টাইন পেনসিল স্কেচ দিয়ে পুস্তকটি অলংকৃত করেন।

॥ পত্র ৩৩ ॥

১৯১২-র ১৯ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ লণ্ডন থেকে আমেরিকা যাত্রা করেন। পত্রটি আমেরিকা থেকে লেখা।

Times-এর সমালোচনা : The Times Literary Supplement: এই কাগজ গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে লেখে : And in reading these poems one feels, not that they are the curiosities of an alien mind, but they are prophetic of the poetry that might be written in England if our poets could attain to the same harmony of emotion and idea. That divorce of religion and philosophy which prevails among us is a sign of our failure in both...As we read his pieces we seem to be reading the Psalms of David of our own time...Some perhaps will refuse to fall under the spell of this Indian poet because this philosophy is not theirs. If it seems to us fantastic and alien, before we despire it we should ask ourselves the question: What is our philosophy? We are very restless in thoughts, but we have none that poets can express.

সভাসমিতিতে সংবর্ধনা : ৮ জুলাই ১৯১২ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম সংবর্ধনা জানায় ইউনিয়ন অফ ইস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট ক্লাব। এরপর ১০ জুলাই ট্রোকাডেরো হোটেলে রবীন্দ্রনাথ সংবর্ধিত হন লণ্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে। আমেরিকায় ইলিনয় স্টেটের আর্বানায় বাসকালীন ইউনিটেরিয়ানদের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ ৬টি ইংরেজী ভাষণ দেন।

হোমিওপ্যাথি শিক্ষা : আশ্রম যখন ছোট সে-সময় কোন বেতনভুক ডাক্তার শান্তিনিকেতনে ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ নিজে হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিক চিকিৎসা করতেন। সঙ্গে থাকতেন ক্ষিতিমোহন। চব্বিশ ঘন্টা দেখাশোনার কাজে দুইজন সেবককর্মী হাসপাতালেই রোগীদের সঙ্গে থাকতেন। হোমিওপ্যাথি শিক্ষার জন্য ক্ষিতিমোহনের বিদেশ যাওয়ার কথা ওঠে। কথাটা তুলেছিলেন তিনি নিজেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কার্যকরী হয়নি।

॥ পত্র ৩৪ ॥

Dr. Woods : Professor James Hushton Woods. রবীন্দ্রনাথকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানিয়ে কয়েকটি বক্তৃতার আয়োজন করেন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় সম্পর্কে *Atlantic Monthly* পত্রে তিনি তিনটি প্রবন্ধ লেখেন

Mrs. Moody : Mrs. Vanghar Moody. রবীন্দ্রনাথ এই ধনী বিধবার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে : শিকাগোর মিসেস মুডির উদ্যান-ভবনে বিশ্বের নানা দেশ থেকে আসা তরুণ লেখকবৃন্দ, চিত্রকর সকলেই আশ্রয় পেয়েছেন। পেয়েছেন নিজেদের কাজের সুযোগ।

সরোজ : সরোজরঞ্জন চৌধুরী
অন্নদা : অন্নদাচরণ রায় বর্ধন
দেবল : মহারাষ্ট্রীয় ভাস্কর নারায়ণ কাশীনাথ দেবল
কালীমোহন : কালীমোহন ঘোষ

॥ পত্র ৩৫ ॥

Evelyn Underhill : রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজীতে কবীর অনুবাদে সাহায্য করেছিলেন।

সংকলক : সুনীল দাস

ছবি : শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের সৌজন্যে

জ্যোতি বসুর রাজনীতি

শিবদাস ব্যানার্জি

জ্যোতি বসু পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী । কম্যুনিস্ট পার্টি আর জ্যোতি বসু অবিচ্ছেদ্য । মানুষ জ্যোতি বসুর প্রতি জনগণের অসীম শ্রদ্ধা । দল মানুষের বিচারবুদ্ধি গ্রাস করে ফেলে । জ্যোতি বসুর ক্ষেত্রে হয়েছে উল্টো । জ্যোতি বসু পার্টিকে গ্রাস করে মানবিক গুণসমূহ আরোপ করেছেন, সংযত করেছেন, লালকে ততটা লাল হতে দেননি । কম্যুনিজমে এনেছেন বাঙালী-বাতাস ।

প্রায় দুই দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী পক্ষের মুখ্য প্রবক্তা, এবং ন' বছরের বেশী সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকার পর, সি পি এম নেতা, জ্যোতি বসু এখন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একটি প্রথম সারির নাম। খানিকটা হয়ত বিতর্কিত-ও। কিন্তু, এ কথা আজ অনস্বীকার্য যে কালক্রমে তিনি তাঁর নিজের দলের নেতৃত্বের স্তরে এমন একটা জায়গা করে নিয়েছেন, যেখানে, অনেক ক্ষেত্রেই, তাঁর কথা বা মতামত-ই হয়ে পড়ছে সি পি এম-এর কথা বা মতামত। বিভিন্ন ইস্যু এবং পরিস্থিতিতে।

ত্রিশ দশকে তিনি ইংলন্ডে গিয়েছিলেন ব্যারিস্টারি পড়তে। নামকরা ডাক্তার বাবার অবশ্যি ইচ্ছাটা ছিল অন্য। যাই হোক, সেখানে গিয়ে-ই, তিনি জড়িয়ে পড়েন তৎকালীন ইন্ডিয়া লীগের কর্মসূচীর সঙ্গে। তারপর, তাঁদের-ই উদ্যোগে গড়ে ওঠে ভারতীয় ছাত্রদের লন্ডন মজলিস। জ্যোতিবাবু-ই হন তার প্রথম সম্পাদক। তাঁর নিজের কথায়-ই, "চাঁদা সংগ্রহ ছিল আমাদের প্রধান কাজ"।

কিন্তু, আবার, এরই মধ্যে তিনি পরিচিত হয়ে পড়েন তৎকালীন বাঘা বাঘা সব বৃটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির নেতাদের সঙ্গে। যেমন, হ্যারি পলিট, রজনীপাম দত্ত, বেন ব্র্যাডলে প্রমুখ। ইন্ডিয়া লীগ এবং ভারতীয় ছাত্রদের সংগঠন গড়তে ওই পার্টি যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। ১৯৪০ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন। এদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ। এবং, ব্রিটেনের কম্যুনিস্ট নেতাদের উপদেশ মেনে নিয়ে জ্যোতিবাবু আন্ডারগ্রাউন্ডে না গিয়েও আন্ডারগ্রাউন্ড নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা হল তাঁর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সেই থেকে তিনি, যাকে বলে, আর পেছনে ফিরে তাকাননি। হয়ত অবসরও মেলেনি। দলের বিভিন্ন ফ্রন্টে, বিশেষ করে শ্রমিক ফ্রন্টে, কাজ করার পর স্বাধীনতার পর তিনি নির্বাচিত হলেন বিধানসভার সদস্য। সেই সঙ্গে বিকশিত হয়ে চললো তাঁর বাগ্মিতা, যদিও অনেকের চোখেই তিনি "হাফ-সেনটেন্সে" মনোভাব প্রকাশে অভ্যস্ত। ক্রমে তিনি শাসকদলের চোখেও হয়ে পড়লেন সম্মানার্হ। অবশ্যি, তখনকার জমানা বা রাজনৈতিক বাতাবরণটাই ছিল অন্যরকম। রাজনীতিতে লিবারেলিজম্ তখনও অতীতের কথা হয়ে ওঠেনি। সেই অর্থে, যদি এটা বলা হয় যে এই রাজ্যের কংগ্রেস রাজনীতিতে লিবারেলিজম গত হয়েছে, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, তবে একদিন হয়ত এ-ও বলতে হবে যে জ্যোতিবাবুর অবর্তমানে তাঁর দল সি পি এম-এরও লিবারেলিজম্-এর মারাত্মক ঘাটতি ঘটবে। একেবারে চলে না গেলেও। ডাঃ রায়ের মতই জ্যোতি বাবুও কোনও সমস্যা বা পরিস্থিতিতে রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে দেখতে অভ্যস্ত, দলের মধ্যে মাঝে মাঝেই এই নিয়ে চাপা ক্ষোভ উঠলেও।

১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে যখন এই ধুতি পাঞ্জাবি পরা, বেঁটে-খাটো বাঙালি ভদ্রলোক পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গদিতে বসেন, সেই সময়কার তুলনায় এতদিনে তাঁর ব্যক্তিত্ব, প্রভাব, প্রতিপত্তি আশ্চর্যজনকভাবে বেড়ে গেছে। এখন তিনি এমন এক অবস্থানে নিজেকে নিয়ে যেতে পেরেছেন, যেখানে একাধারে তিনি শিল্পপতিদের আস্থাভাজন, এবং সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র জনগণও ভাবে তিনি একজন বন্ধু। শিল্পপতিদের আস্থার কারণ, জ্যোতি বসুর সরকার, ঠিক ষাট দশকের মত, শিল্প বিরোধে খোলাখুলিভাবে এক বা অন্যপক্ষ সমর্থনে নেমে পড়ে না। একদিকে যেমন, কট্টর সি পি এম-এর পক্ষেও, তিনি নেতৃত্ব দিলেন, শিল্পে যৌথ প্রকল্প গড়ে তোলার ব্যাপারে, অন্যদিকে মধ্যবিত্ত চাষীদের বিরাগভাজনতার সম্ভাবনার কথা না ভেবেই কার্যকরী করলেন অপারেশন বর্গা। দোসর হলেন, তাঁরই সমবয়সী, বিনয় চৌধুরী। ভূমি সংস্কার মন্ত্রী।

মূল নীতির দিক থেকে যে তাঁর সরকার, পূর্বের কংগ্রেস জমানা থেকে খুব বেশী একটা এগিয়ে গেছেন এই সব ব্যাপারে তা মোটেই নয়। বর্গাদার বা ক্ষেতমজুরদের ন্যূনতম মজুরি, বা পঞ্চায়েত সংস্থা স্থাপন এবং বিকাশ সম্পর্কিত আইন কোনওটাই জ্যোতি বসু সরকারের করা নয়। তাঁর সরকার কংগ্রেসেরই করা আইন কার্যকরী করার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিলেন। যেমন, দীর্ঘ ১৪/১৫ বছর পর ১৯৭৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচন সেরে ফেললেন। এবং তার ফলশ্রুতি এখন ভোগ করছেন শাসক বামফ্রন্ট এবং বিরোধী কংগ্রেস, দুপক্ষই। এইসব কর্মসূচীকে ভিত্তিস্তর করে ফ্রন্ট বা সি পি এম গ্রামে গ্রামে শিকড় গেঁড়ে বসে গেল। জনগণের সামনে দাঁড়াতে পারলো বন্ধুর চেহারায়। এটা ত অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই সব কর্মসূচী রূপায়ণের মধ্য দিয়েই গ্রামের দরিদ্র, নিরক্ষর, কিন্তু বুদ্ধিমান জনগণ বুঝতে পারল, তাদের অধিকার কোন বিষয়ে কতটুকু, বা তারা নিজেরাই নিজেদের কোন কোন কাজকর্মের দায়িত্ব পাওয়ার অধিকারী। অর্থাৎ, পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে তাঁদের সচেতনতা গেল বেড়ে। এবং এটাই হয়ত হয়ে চলেছে ১৯৮৭ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে সি পি এম নেতৃত্বে গড়া বামফ্রন্টের প্রধান রাজনৈতিক মূলধন। নানা ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা

দমদম বিমানবন্দরে ইন্দিরাজীর সঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার উপ-মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। সময়: ১৯৬৭

সত্ত্বেও।

যে সামগ্রিক পরিস্থিতিতে জ্যোতিবাবু পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় ফিরে এসেছিলেন, সেখানে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি এবং বাতাবরণ ফিরিয়ে নিয়ে আসাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ। এবং বিভিন্ন ব্যাপারে এই করতে গিয়ে উপকৃতদের কিছুটা যে বদহজম হয়নি তাও বলা যাবে না। যেমন, যার যা দায়িত্ব বা কাজ তা সুষ্ঠুভাবে এবং সময়মত সমাধা করার ইচ্ছাটাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে লুপ্তপ্রায়। সেদিক থেকে জ্যোতিবাবু, মনে হবে, নিতান্তই একলা। এর ফলে সরকারি, বেসরকারি দুধরনের কাজই ব্যাহত, বিলম্বিত হচ্ছে। একেবারে না হওয়ার মত পরিস্থিতি না এলেও। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই জ্যোতিবাবু বিভিন্ন মঞ্চ থেকে সরকারি কর্মচারি থেকে শুরু করে তাঁর দলের লোকদেরও একটাই উপদেশ বা আদেশ দিয়ে আসছেন। আপনারা নম্র হন। জনগণকে বুঝতে দিন আপনারা তাদের বন্ধু, সহায়ক। শাসনকর্তা নয়। কিন্তু, তার সুফল খুব একটা গভীরতা বা ব্যাপ্তি পায়নি। জ্যোতিবাবুর নিজের এই নিয়ে কোনও ক্ষোভ, দুঃখ বা অনুশোচনা আছে কিনা জানা নেই। হয়ত জানাও যাবে না কোনওদিন। কারণ, দেখা গেছে, তিনি নিজে কিছু বলতে ইচ্ছা না থাকলে, তাঁর মনের কথা বের করা প্রায় অসম্ভব। তাঁর নিজের দলের সবাইকারও এবিষয়ে অভিজ্ঞতা এক।

চারিদিকের যতরকমের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংগঠনিক সমস্যা, সব কিছুতেই তাঁর মনোযোগ দিতে হয়। অথচ, এসব কিছুর মোকাবিলা করেও তিনি থাকতে পারছেন, একদিক থেকে বলা চলে, সম্পূর্ণ নির্বিকার। যেন, তিনি সব কিছুর মধ্যে জড়িয়ে থেকেও, থাকছেন বাইরে। হয়ত মনের এই তরতাজা ভাব, ৭৪ বছর বয়সে এবং একবার একধরনের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েও, জিইয়ে রাখার জন্যই তিনি মাঝে মাঝেই দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ান। সকাল ৯-৩০ মিঃ পার্টি অফিসে যাওয়া থেকে শুরু করে, বিকেল ৫টা পর্যন্ত সচিবালয়ে একটানা কাজ এবং নানা ধরনের, নানা বিষয়ে আলোচনা সেরেও, তিনি নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারেন দূরে। কোথাও দলীয় বা সরকারি বৈঠক বা সভায় বক্তৃতা দিতে। তাঁর সাম্প্রতিক অসুস্থতার পর এধরনের দৈনিক একটানা রুটিন চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নাকি তাঁর নিজের মন্তব্য হল, সচিবালয় থেকে বেরিয়ে মিটিং, মিছিলে যোগ দিতে পারলেই তাঁর দৈহিক এবং মানসিক মূলধন ফিরে পান। তাঁর একজন একান্ত গুণগ্রাহীর প্রাসঙ্গিক বক্তব্য হল, জ্যোতিবাবু অতি সহজেই খুব বড় বড় সমস্যা নিয়েব্যস্ততারপরবর্তী পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মনকে সেই সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারেন। হয়ত অনুশীলন করেই এই ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। কিন্তু জ্যোতিবাবুর পক্ষে এ অতি সাধারণ ব্যাপার। আর, ক্ষমতার বলেই, অতিবড় কঠিন সমস্যাও তাঁকে পরাস্ত, পর্যুদস্ত করতে পারে না। এসব কিছুর পরও তাঁর চেহারা, মুখের ভাব বা কথাবার্তার ধরনধারণ থাকে অপরিবর্তিত।

হয়ত তাঁর রাজনৈতিক জীবনে একবারই তাঁকে দেখে বা তাঁর কথা শুনে কারও মনে থাকতে পারে, তিনি উদ্বিগ্ন, হয়ত উদ্‌ভ্রান্তও। বছরটা ছিল ১৯৬৪। ভারতবর্ষের কম্যুনিস্ট আন্দোলনে বিরাট ফাটলের বছর। এক দল ভেঙ্গে হল দুই। ঠিক সেই স্তরে, তাঁর দলেরও অনেকের মনে হয়েছিল, কোন রাজনৈতিক রাস্তায় তিনি নামবেন, জ্যোতিবাবু স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না বলে তাঁকে মনে হচ্ছে মধ্যপন্থী হিসেবে। কিন্তু সেই অবস্থা বেশী দিন তিনি নিজেই চলতে দেননি। যোগ দিলেন সি পি এম-এই। গেলেন সেই দলের তেনালি সম্মেলনে। সম্মেলন সেরে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দের নির্দেশমত জ্যোতিবাবুকে বাদ দিয়ে, আর সব নেতৃস্থানীয় সবাইকেই আটক করা হল। হয়ত এটা ছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর এক কূট চাল। যদি এই করে, নতুন দলের মধ্যে আরও একটা বিভেদের, অবিশ্বাসের মনোভাব সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু কেন তাঁকেও অন্যদের সঙ্গে আটক করা হল না, তাই নিয়ে জ্যোতিবাবু পড়লেন বিরাট এক মানসিক সমস্যা দ্বন্দ্ব, হয়ত বিভ্রান্তির মধ্যেও। এই নিয়ে তাঁর নিজের দলের নেতাদের সঙ্গেও ভুলবোঝাবুঝি সন্দেহের মনোভাব গড়ে উঠবে না ত ? এই মনের অবস্থা নিয়েই তিনি চলে গেলেন সোজা দিল্লি রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করলেন এক স্মারকলিপি সি পি এম নেতাদের "অকারণে" আটক করার

জ্যোতিবাবুর দলগত এবং জনসমর্থনের ক্ষেত্রভূমির সঙ্গে অন্য কারুর তুলনাই চলে না। হয়ত এই নিয়ে অন্য সবাইকার মনের সুপ্ততলে খানিকটা ঈর্ষা ভাবও আছে। কিন্তু কিছু করার নেই। এক বিশেষ পরিস্থিতি এবং একান্ত বাস্তববোধই জ্যোতিবাবুকে এমন অবস্থানে এনে ফেলেছে যেখানে তাঁর বক্তব্যকেই করে তুলতে হচ্ছে দলের নীতি।

বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে। এবং, আটকদের মুক্তি দাবী করে।

সেই অন্তর্দলীয় অবস্থা থেকেও জ্যোতিবাবু কালক্রমে সরে এসেছেন অনেক পথ। বছরের হিসাবে, কেরলের সি পি এম মুখ্যমন্ত্রী ই এম এস নাম্বুদিরিপাদের রেকর্ডও ভেঙ্গেছেন। দলের শীর্ষ এবং বর্ষীয়ান নেতাদের মধ্যে। তুলনামূলক ভাবে জ্যোতিবাবুর দলগত এবং জনসমর্থনের ক্ষেত্রভূমির সঙ্গে অন্য কারও তুলনাই চলে না। হয়ত এই নিয়ে অন্য সবাইকার মনের সুপ্ততলে খানিকটা ঈর্ষাভাবও থেকে থাকতে পারে। কিন্তু কিছু করার নেই। এক বিশেষ পরিস্থিতি এবং একান্ত বাস্তববোধই জ্যোতিবাবুকে এই অবস্থানে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। যেখানে, তাঁর বক্তব্যকেই করে তুলতে হচ্ছে দলের নীতি। বস্তুত, পশ্চিমবঙ্গকে বাদ দিলে, দলের আর বাকী থাকে কি?

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক, প্রমোদ দাশগুপ্তের মৃত্যুর পর জ্যোতিবাবুর নেতৃত্বের দায়িত্ব অনেক বেশী গুরুভার এবং জটিল হয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় স্তরের নেতৃত্বের ওপর পড়েছে তার প্রভাব অবধারিত ভাবে। একটা সময় ছিল, যখন প্রমোদবাবু জীবিত ছিলেন, তখন জ্যোতিবাবু সাংগঠনিক দিক নিয়ে খুব বেশী একটা মাথা ঘামাতেন না। এককথায় বলা চলে এই সংগঠন এবং প্রশাসনের সমান্তরাল দায়িত্ব নিয়ে বিধানচন্দ্র রায় এবং অতুল্য ঘোষের মধ্যে যে অলিখিত এবং কোনও পারস্পরিক আলোচনা ছাড়াই এক ধরনের পরস্পরের ওপর নির্ভরতার এবং একের অপরের দায়িত্বে হস্তক্ষেপ না করার রীতির প্রবর্তন ঘটেছিল, প্রমোদবাবু এবং জ্যোতিবাবুর পারস্পরিক সম্পর্কটাও ব্যবহারিক অর্থে শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল একই ধরনের। হয়ত শেষোক্ত ক্ষেত্রে, কম্যুনিস্ট রীতিনীতি অনুসারেই, পাল্লাটা যৎসামান্য ভারি ছিল প্রমোদবাবুর পক্ষেই। এবং সেটা খানিকটা বোঝা গিয়েছিল, ১৯৮২-র নির্বাচনের পর সি পি এম-এর কতজন এবং কোন নীতি অনুসারে মন্ত্রী হবেন, সেই সিদ্ধান্ত থেকে। প্রমোদবাবুর ইচ্ছা মতই জ্যোতিবাবুকে প্রতিটি জেলা থেকে একাধিক সি পি এম মন্ত্রী হিসেবে নিতে হয়েছিল। যার নীট ফল দাঁড়ায় ৪৪ জনের একটি মন্ত্রিসভা। যে সদস্যদের প্রশাসনিক বিষয়ে সচেতনতা অনেক ক্ষেত্রেই ছিল না বললেই চলে। যাঁদের উদ্দেশ্যই ছিল দলীয় স্বার্থকে বড় করে দেখা। কালক্রমে এঁদের অনেকেই নির্ভর করতে শুরু করে দিলেন বুরোক্রাটদের ওপর। সাংগঠনিক এবং অন্য অনেক কাজ সেরে, ফাইল পড়ারই সময় নেই ত, সিদ্ধান্ত নেবেন কি? ফল দাঁড়াল এই যে তাঁদের সব কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার বা দায়িত্ব বর্তালো মুখ্যমন্ত্রীর ওপর। কিন্তু, এই জগদ্দল পাথরও জ্যোতিবাবুর কর্মক্ষমতার বা বিচক্ষণতার কোনও হানি ঘটাতে পারেনি। রাজ্যের অনেক সৌভাগ্যই বলতে হবে।

এমন পরিস্থিতিতে জ্যোতিবাবুর পক্ষে নিজের বিচারমত কাজকর্ম গতিশীল রাখার চেষ্টা করা ছাড়া আর কোনও দ্বিতীয় পন্থা নেই। জ্যোতিবাবু তাই করছেন। যদি অভিযোগ ওঠে তাঁর সরকার গতিশীলতা হারিয়ে ফেলছে, তার কারণটাও থাকবে এই একই পরিস্থিতি। দলের এবং সরকারের একজনের ওপর এই নির্ভরতা বেশীদিন চলতে পারে না। চলতে দেওয়াও উচিত নয়। কিন্তু, অন্য উপায়টা কি?

সি পি এম রাজ্য কমিটির পক্ষেও একই অবস্থা। জ্যোতিবাবুকে বাদ দিয়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ত বটেই এমনকি ছোটখাটো সিদ্ধান্তও নেওয়ার উপায় নেই। রাজ্য কমিটি সম্পাদক, সরোজ মুখার্জি বৃদ্ধ এবং স্বাস্থ্যের কারণে জ্যোতিবাবুর তুলনায় অনেক কম কর্মক্ষম। মধ্য সারির বা বয়সের নেতাদের টেনে ওপরে তোলার চেষ্টা চলেছে, বেশ কয়েক বছর ধরে। তাঁদেরও যে উচ্চাশা নেই তা নয়। কিন্তু, তাঁরা দেখতে পারছেন, জ্যোতিবাবু বা সরোজবাবুর মত কোনও বর্ষীয়ান, বিচক্ষণ নেতার ছত্রছায়ার আড়ালে থেকেই দলের মধ্যে ওই দুজনের মত সর্বগ্রাহ্য না

সচিবালয় থেকে বেরিয়ে মিটিং, মিছিলে যোগ দিতে পারলেই জ্যোতিবাবু তাঁর দৈহিক এবং মানসিক মূলধন ফিরে পান। ছবি : তপন দাশ

জ্যোতিবাবুর ব্যক্তিগত ইমেজই কি বামফ্রন্টের ভোট-বৈতরণী পারের একমাত্র অস্ত্র ! ছবি : এম. এল. কেম্ব

হলেও, বহুগ্রাহ্য হয়ে ওঠার চেষ্টা করার সুবিধা অনেক। সেটাই তাঁরা করে চলেছেন। মধ্যিখান থেকে জ্যোতিবাবুর ওপর সাংগঠনিক কাজকর্মের বা চিন্তাভাবনার দায়িত্ব অনেক গুণ বেড়ে গেছে। এ থেকে তাঁর রেহাই নেই। এ বলা মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে সি পি এম-এর পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতিবাবুর সমকক্ষ কাউকে পাওয়া খুবই দুষ্কর। চোখেই পড়বে না।

এই নেতাকে সামনে ধরেই সি পি এম এবং বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে নামতে চলেছে। জনগণের বা ভোটারের চোখে জ্যোতিবাবুর ব্যক্তিগত বিশ্বাসভাজনতাই হবে ফ্রন্টের অন্যতম প্রধান মূলধন। জ্যোতিবাবু নিজে, অবশ্যি, নেতার ব্যক্তিগত "ইমেজ" বা চ্যারিসমা"-তে বিশ্বাসবান নন। তিনি বলেন, আমি বুঝি দলীয় নীতি, প্রোগ্রাম। এবং কাজ। নির্বাচনী বাস্তবটা হয়ত হয়ে দাঁড়াবে, এই দুই বক্তব্যের মাঝামাঝি একটা কিছু। জ্যোতিবাবুকে আলাদা করে, বামফ্রন্টের পক্ষে, এমনকি সি পি এম-এর পক্ষেও, তাঁদের যে সমর্থনের সুসংহতি দেখা গেছে, সেটা ধরে রাখা সম্ভব?

জ্যোতিবাবুর দিক থেকে আরও একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক প্রশ্ন বিচার্য। আদর্শগতভাবে জ্যোতিবাবুর সি পি এম, তথা ফ্রন্টের আর সব বাম দলগুলিই ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র কায়েম করায় বিশ্বাসী। অবশ্যি, এই একই বিশ্বাস, ব্যবহারিক কারণে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন রূপে কার্যকরী করার প্রয়াস দেখা গেছে। সি পি এম বিশ্বাস করে, ভারতবর্ষে রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব এখনও মূলত রয়ে গেছে ধনতন্ত্র এবং অনেকটা সামন্ততন্ত্রেরও পূজারী। এবং এরই মধ্যে চলেছে সংসদীয় গণতন্ত্রের একধরনের বিকাশ। সুতরাং, আদর্শগতভাবে, সি পি এম এই ধারার উৎখাত চেয়ে এসেছে। কিন্তু, মজার কথা হল, কাগজেপত্রে, দলীয় দলিল দস্তাবেজে মূল রাজনৈতিক লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি বাঁচিয়েও জ্যোতিবাবুর দল বর্তমান সীমিত রাষ্ট্রক্ষমতাকেই, যার অংশ হিসেবে একটি অঙ্গরাজ্য সরকারের ক্ষমতা আরও অনেক বেশী কম, গ্রহণ করে মূল আদর্শগত এবং রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই বিশ্বাসে যে এই সীমিত ক্ষমতার গণ্ডির মধ্য থেকেও জনগণের কিছু কিছু উপকার করা সম্ভব, তাদের কিছু কিছু রিলিফ দেওয়া সম্ভব, এই নীতিগত ছকের মধ্যেই ফেলা হয়েছে তাঁর শিল্পে যৌথ উদ্যোগের সাম্প্রতিক উদ্যোগ।

এটা একটা নতুন ধরনের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা। যার নজির খুব কমই মেলে। সুতরাং, এই পরীক্ষা নিরীক্ষার এবং কর্মসূচীর বাস্তব এবং অন্তিম ফলশ্রুতিটাই বা কি দাঁড়াবে, ঠিক এখনই বলা শক্ত। কিছু বাম মতবাদ অবশ্যি বলে, জ্যোতিবাবুর এই এক্সপেরিমেন্ট সোনার পাথরবাটী তৈরীর প্রচেষ্টার শামিল। এবং, এই বোধ থেকেই একসময় গড়ে উঠেছিল নকশালী রাজনীতি, যার পথ ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের। কিন্তু, তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। মোটামুটি বাম পক্ষের সবাই এটা বুঝেছেন যে পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পরিস্থিতিতে, যেখা[...] রাষ্ট্রের অস্ত্রবল ক্রমেই বেড়ে চলেছে, সেখা[...] সশস্ত্র বিপ্লব করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চি[...] বাতুলতা। যদি না, সুযোগ মেলে যুদ্ধকালী[...] পরিস্থিতির। যেমন, মিলেছিল ভিয়েতনামে[...] সেদিক থেকে জ্যোতিবাবুর রাজনৈতিক রাস্তা [...] ভুল তা বলা যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষণী[...] যে এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রক্ষমতার ব্যবহার কর[...] গিয়ে, দলীয় স্তরে দেখা দিচ্ছে নানা ভুলত্রুটি[...] দলের লোকের মানসিকতা বদলে যাচ্ছে[...] বুরোক্রাটিক মনোভাব বাড়ছে। হয়ত কোন[...] কোনও ক্ষেত্রে এই সিস্টেমের মধ্যে থেকে কা[...] করতে গিয়ে এই সিস্টেমের দোষ ভ্রষ্টাচার ত[...] দলে সংক্রমিত হচ্ছে। নেতৃত্বের সচেতন চে[...] থাকা সত্ত্বেও এর সবটা বন্ধ করা যাচ্ছে না। ত[...] অন্যতম প্রধান কারণ হয়ত, দল অল্পদিনে যত ব[...] হয়েছে, তার শিক্ষণব্যবস্থা ততটা ব্যাপক ক[...] সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, ভাল মন্দ প্রত্যে[...] সমাজেরই অঙ্গ। সি পি এম-ই বা এ থেকে [...] বাঁচিয়ে থাকবে কি করে। কিন্তু, দেখা যাচ্ছে, এ[...] সিস্টেমের অঙ্গ হতে গিয়ে এই মন্দের অং[...] উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলেছে। জ্যোতিবা[...] সামনের চ্যালেঞ্জটা সেই হিসেবে হয়ে দাঁড়া[...] অনেক অনেক গুণ বড়, জটিল। সুতরাং, ধন[...] এবং সংসদীয় গণতন্ত্রকে মেনে নিয়ে, তা[...] ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে এগি[...] চলার, জ্যোতিবাবুদের এই এক্সপেরিমেন্ট [...] পর্যন্ত ভারতবর্ষে, এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও কো[...] গিয়ে দাঁড়াবে, বা দাঁড়াতে পারে, সে প্রশ্নের উ[...] দেবে ভবিষ্যৎ।

জ্যোতি বসু'র পরে কি হবে !

আশিস ঘোষ

দীর্ঘদিন বিরোধী নেতা এবং এক দশক মুখ্যমন্ত্রী থাকার সুবাদে বিভিন্ন সাময়িক পত্রের সর্বভারতীয় ওপিনিয়ন পোল বা জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের গণভোটে জ্যোতি বসু গোটা দেশের দুই কি তিন নম্বর জনপ্রিয় নেতা । তাই, তাঁর পরে কে আসবেন এবং কি হবে—স্বভাবতই কৌতূহল এ দু'টি জিজ্ঞাসা ঘিরেই ।

জ্যোতি বসুর পরে কে? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে প্রশ্নটা উঠছেই। রাজ্যের বৃহত্তম কমিউনিস্ট পার্টি সি পি এমেরই বা কী হবে? জ্যোতিবাবুর পরে কে ধরবেন রাজ্য পার্টির হাল? রাজনৈতিক মহলে বেশ কিছুদিন ধরেই শুরু হয়েছে ভাবনাচিন্তা, তর্কবিতর্ক। রাজনীতিতে শেষ পর্যন্ত কী হবে তা কখনই খুব জোর দিয়ে বলা যায় না। আগামী এক দশকে দেশের পরিস্থিতিই বা কী দাঁড়াবে কে বলতে পারে? তবু মোটামুটি স্থির একটা বাতাবরণ বজায় থাকবে ধরে নিয়েই এক ধরনের স্পেকুলেশন চালু হয়ে গিয়েছে। শুধু জ্যোতিবাবুই নন, দলের গোটা পলিটব্যুরোতেই প্রবীণ, অতি-প্রবীণেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। একই প্রশ্ন সেখানেও।

দীর্ঘদিন বিরোধী নেতা এবং এক দশক মুখ্যমন্ত্রী থাকার পর জ্যোতিবাবু এ মুহূর্তে বাংলার রাজনীতির প্রবাদপুরুষ। ব্যক্তিত্বে, ওজনে তাঁর কাছাকাছি আসার মতো নেতা তাঁর নিজের দলে কিংবা বিরোধী দলে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। দিল্লির ধারাবাহিক আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জ্যোতিবাবু টিকিয়ে রেখেছেন তাঁর সরকার। যা স্থায়ী এবং দু দফায় ক্ষমতায় থাকার পরও যে সরকার তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফিরে আসবে বলে সকলে ধরেই নিয়েছেন। স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে ডাঃ বিধান রায়ের সমকক্ষ হতে পারেন, একমাত্র তিনিই। বিভিন্ন সাময়িকপত্রের সর্বভারতীয় ওপিনিয়ন পোল বা জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের গণভোটে জ্যোতিবাবু গোটা দেশের দুই কি তিন নম্বর জনপ্রিয় নেতা। তাই, তাঁর পরে কে আসবেন এবং কী হবে—স্বভাবতই কৌতূহল এ দুটি জিজ্ঞাসা ঘিরেই।

প্রমোদ দাশগুপ্তের মৃত্যুর আগেও উঠেছিল একই প্রশ্ন। ১৯৬১ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত দীর্ঘ একুশ বছর প্রমোদবাবুই ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক। স্বভাবতই তাঁর পরে কে আসবেন দলের রাজ্য কমিটির নেতৃত্বে সে নিয়েও ছিল সংশয়। দু দুটো ভাঙনের পরও সি পি এমকে শুধু বাঁচিয়ে রাখাই নয়, তাকে আরও বড় করে তোলার মূলে প্রমোদবাবুর সংগঠনী ক্ষমতা ছিল প্রশ্নাতীত। তাঁর মৃত্যুর পর দল সেরকম সুসংহত সুশৃঙ্খল মজবুত থাকবে কি না এ প্রশ্ন যেমন প্রমোদবাবুর মৃত্যুর আগেও ছিল, মৃত্যুর পরও সে প্রশ্ন থেমে নেই।

প্রমোদবাবুর পর পার্টিতে জ্যোতিবাবুর ভূমিকা ক্রমশই আরও আরও বড় হয়ে উঠেছে। অত্যন্ত বিতর্কিত শিল্পনীতি, যার প্রবক্তা জ্যোতিবাবুই, অক্লেশে পার্টির অনুমোদন পেয়ে যায়। বিরোধিতা আসে নামমাত্র। এমনকি, ব্যক্তিপুজোর অমার্ক্সীয় পথেও ইদানীং স্লোগান উঠছে পার্টির মধ্য থেকে জ্যোতিবাবুর নামে—'নববাংলার নব রূপকার জ্যোতি বসু লাল সেলাম।' বুঝতে অসুবিধা হয় না, এখনও ভোট পাবার জন্য বামফ্রন্টের সব থেকে বড় অস্ত্র জ্যোতিবাবুই, যাঁর নামের টানে সভায় ভিড় হয়,

ভোট পড়ে। পার্টিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন তিনিই।

পার্টির সামনে যে একটা জেনারেশন-গ্যাপ আসছে তা নিয়ে সি পি এম নিজেরাই চিন্তিত। জীবিতাবস্থায় প্রমোদবাবু নিজেই এই সমস্যা বুঝে বেশ কয়েকজন তরুণ নেতাকে তুলে এনেছিলেন সামনের সারিতে। ইতিমধ্যেই সেই তরুণেরা দলের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত। এখন তরুণতরদেরও তুলে আনা হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে পরের নেতৃত্ব।

বাস্তবে, এই ভাবনাটা বেশি করে শুরু হয়েছিল সত্তর দশকের গোড়ায়। '৭০ থেকে '৭৩ সালের মধ্যে পর পর মারা যান পার্টির চারজন প্রবীণ নেতা। বিভিন্ন ফ্রন্টের নেতৃত্বে ছিলেন এঁরা।

ফলে হঠাৎই তৈরি হয় শূন্যতা। পার্টির আবদুল হালিম, নিরঞ্জন সেন, কৃষক ফ্রন্টের হরেকৃষ্ণ কোঙার ও কর্মচারী ফ্রন্টের কে জি বসু মাত্র বছর চারেকের ব্যবধানে মারা যান। সে সময়ও একই কথা উঠেছিল দলের মধ্যেও। কিছু পরে অকাল মৃত্যু হয় ছাত্র-যুব আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠক দীনেশ মজুমদারের। বিচ্যুতির জন্য পার্টি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় হরিনারায়ণ অধিকারীর মতো সংগঠককে।

ফলে একটা বড় মাপের শূন্যতা কাটিয়ে ওঠবার তোড়জোড় শুরু হয়। তখন থেকেই নজর পড়ে তরুণতরদের উপর। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের গতানুগতিক মন্থর উত্তরণের প্রক্রিয়ার বদলে এবার তরুণদের জন্য তা ত্বরান্বিত করা হয়। মূল উদ্যোগ অবশ্যই ছিল রাজ্য সম্পাদক প্রমোদবাবুর। তার পরের এক দশকে দলের একেবারে সামনে উঠে এসেছেন বিমান বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অনিল বিশ্বাস, শ্যামল চক্রবর্তী, সুভাষ চক্রবর্তী, শ্যামলী গুপ্তরা। বিমানবাবু, বুদ্ধদেববাবু কিংবা অনিলবাবু এখন শুধু যে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তাই নয়, এঁরা তিনজন এখন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যও। ছাত্র-যুব ফ্রন্টের নেতৃত্ব থেকে এঁরা এসেছেন। এবং মাত্র এক দশকের মধ্যেই এই নবীন নেতারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন দলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে। বিমানবাবু ছাত্র-যুব ও শিক্ষা ফ্রন্টের দায়িত্বে। বুদ্ধদেববাবু দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটিতে রয়েছেন। অনিলবাবু দলের মুখপত্র 'গণশক্তি'র সম্পাদক।

এই তরুণ নেতাদের পরের জেনারেশনও তৈরি করা হচ্ছে একসঙ্গে। ছাত্র ও যুব ফ্রন্টের রবীন দেব, সমীর পতিতুণ্ড, বরেন বসু, গৌতম দেব, মানব মুখার্জি, বাদশা আলম, অমর ভট্টাচার্য প্রমুখ তরুণতর নেতারাও ইতিমধ্যেই রাজ্যস্তরে পরিচিত। এঁদেরই কাউকে কাউকে সাতাশির নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। রাজ্য বিধানসভাতেও পরবর্তী জেনারেশন তৈরি করা এর উদ্দেশ্য।

এ মুহূর্তে দলের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের বয়স বিচার করলে দেখা যায়, দশজনের মধ্যে সাত জনেরই বয়স ৬৫-র উপরে। পঞ্চাশের নিচে মাত্র তিনজন। দলের রাজ্য সম্পাদক সরোজ মুখার্জির বয়স ৭৪ বছর। বিনয় চৌধুরী সরোজবাবুরই সমবয়সী। জ্যোতিবাবুর বয়স ৭৩ বছর। শৈলেন দাশগুপ্তের ৬৭ বছর। প্রবীণতম হলেন আবদুল্লাহ রসুল—৮২ বছর। শান্তিময় ঘোষ ৭৪ ও মনোরঞ্জন রায় ৭৩ বছরের বৃদ্ধ। স্বাভাবিকভাবেই শারীরিক অস্বাস্থ্য এঁদের অনেকেরই। এছাড়া বাকি তিনজন—বিমানবাবুর ৪৬, বুদ্ধদেববাবু ও অনিলবাবুর ৪২ বছর বয়স।

সি পি এমের পার্টি কর্মসূচীর ১১২ নম্বর ধারা অনুযায়ী সি পি এম তার জন্মলগ্ন থেকেই সংসদীয় ব্যবস্থার শরিক। এই কর্মসূচীতে "জনগণের আশু সমস্যাবলী প্রশমন করতে পারে এবং এইভাবে গণ-আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে পারে এমন একটি অতিক্রান্তিকালীন সরকার" গঠনের কথা

অনিল সরকার, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিমান বসু—পরবর্তীকালের রাজ্য নেতৃত্ব এঁদের মধ্যে কার হাতে সুরক্ষিত থাকবে ।
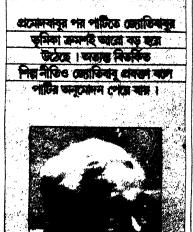
বলা আছে। একটি অঙ্গরাজ্যে ব্যালটের মাধ্যমে শাসনক্ষমতায় আসা, সি পি এমের মতে, রণকৌশল বা ট্যাকটিক্স মাত্র। রণনীতি বা স্ট্রাটেজি নয়। অর্থাৎ, কেবল নির্বাচনে এবং সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় অংশ নেওয়াই সি পি এমের একমাত্র লক্ষ্য নয়। আসল উদ্দেশ্য হল, "বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্র ও সরকারের অপসারণের আবশ্যকতা সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা।" সেজন্যই সংসদকে ব্যবহার করবেন তাঁরা। সুতরাং, কর্মসূচী অনুসারে, নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও সরকার গঠন তাঁদের পাকাপাকি কোনও নীতি নয়, অস্থায়ী একটি ব্যবস্থামাত্র।

সংসদীয় ব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে গত এক দশক রাইটার্সের গদিতে বজায় থাকার পর পার্টির বিপ্লবী চরিত্রে ঘুণ ধরেছে—এ হেন অভিযোগ এখন দলের ভিতর থেকেই উঠছে। মতাদর্শগত পার্থক্যও বহু সময় বেরিয়ে পড়ছে বাইরে। এখানে-ওখানে ছোটখাট ভাঙন, সে লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলাতেও ফাটল ধরার লক্ষণ প্রকট। আয়তনে বড় হবার যেসব সমস্যা অরোধ্য, তাও এখনকার সি পি এমের সর্বাঙ্গে। পার্টি ক্যাডারদের গুণগত মানও সর্বত্র বজায় রাখা যাচ্ছে না।

আগামী পাঁচ বছরে, মহাকরণে তৃতীয়বার ফিরে এলে, দলের অভ্যন্তরীণ চেহারা কী দাঁড়াবে তা এখনই বলা মুশকিল। এ নিয়ে তাঁদের নেতৃত্বের উঁচুমহলও চিন্তিত। যেভাবে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে জাতীয় পরিস্থিতি, তাতে আগামী দশ কি পনেরো বছরে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক শক্তিবিন্যাসই বা কোন জায়গায় এসে পৌঁছাবে বলা কঠিন তাও। তবুও, এ পর্যন্ত যা অবস্থা তাতে সংসদীয় কাঠামোর বাইরে চলে এসে সংসদ-বহির্ভূত পথ সি পি এম ধরবে, তার লক্ষণ নেই। বরং ভোটের মাধ্যমে এমন কি দিল্লি দখল পর্যন্ত করে ফেলার কথাই তাঁদের মুখে। তাই এটুকু বলা যায়, সি পি এম আপাতত হাঁটবে ভোটের পথেই।

এরই প্রেক্ষাপটে বড় হয়ে ওঠে সরকারের নেতৃত্বের প্রশ্নটি। দীর্ঘদিন ধরে জ্যোতিবাবুর একচ্ছত্র প্রভাব যেমন প্রশাসন, তেমনই পার্টিতে রয়েছে সর্বস্বীকৃত। একমাত্র তাঁরই ছায়া ক্রমশ দীর্ঘায়িত হচ্ছে রাজ্য পার্টি থেকে পলিটব্যুরো পর্যন্ত। যদি শূন্যতার কথাই ওঠে, নিঃসন্দেহে বাইশ বছরের এই কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে তা হবে সব থেকে ব্যাপক ও গভীর।

এখানেই পাল্টা যুক্তি দিয়ে বলেন সি পি এম. নেতারা— দলের থেকে ব্যক্তি বড় নন। নেতৃত্বও শূন্য থাকে না কখনও। মুজফ্ফর আহমদ মারা গিয়েছেন, প্রমোদ দাশগুপ্ত মারা গিয়েছেন। তবু পার্টি রয়েছে। তেমনই জ্যোতিবাবুর পরেও আসবেন কেউ। ইতিহাসের এক একটা মুহূর্তে এক একজন উঠে আসেন তাঁর সমকাল, তাঁর প্রজন্মকে ছাপিয়ে। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে সব থেকে জোরালো আলোটা পড়ে তাঁরই মুখের উপর। তবু তিনি মারা গেলে, থেমে যায় না কিছু। প্রমোদবাবু মারা যাবার পর সরোজবাবুকে বেছে নিতে বেশি দেরি হয়নি তো।

তবু জল্পনা-কল্পনা থামে না। কমিউনিস্ট পার্টিতে উত্তরাধিকারী রেখে যাওয়ার ব্যাপার কিচ্ছু নেই বলা হলেও, পার্টিরই নানা স্তরে এ নিয়ে নানা কথা। এখন সব থেকে চালু থিওরি হল, জ্যোতিবাবুর পরে তাঁর জায়গায় আসছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় বুদ্ধদেববাবু ছিলেন তথ্য দফতরের দায়িত্বে। '৮২ সালে, দ্বিতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠনের সময় ছিলেন না তিনি। কাশীপুর কেন্দ্রে তিনি পরাজিত হন। তার পরের বছরগুলিতে বুদ্ধদেববাবু ছিলেন পার্টির দায়িত্বেই। সাধারণভাবে এখন জ্যোতিবাবুর অনুপস্থিতিতে মন্ত্রিসভার কাজকর্ম দেখাশুনো করেন বিনয়বাবু। তিনিই এই মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় ব্যক্তি, জ্যোতিবাবুর পরেই। তবু বয়স হয়েছে তাঁর। জ্যোতিবাবুর চেয়েও তিনি বয়সে বড়। তাই তাঁকে এই বয়েসে আর ভারি দায়িত্ব দেওয়া সমুচিত নয়, পার্টির মধ্যে এই অভিমতও রয়েছে। তার থেকে বরং বয়সে তরুণ কাউকেই বসতে দেওয়া হোক জ্যোতিবাবুর জায়গায়, চালু এ মতটাও। সে কারণেই কাশীপুরের অনিশ্চয়তা ছেড়ে বুদ্ধদেববাবুকে এবার দাঁড় করানো হচ্ছে নিরাপদ যাদবপুরে। এমনকি, জিতে এলে তিনি পরবর্তী মন্ত্রিসভাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ দফতর পাচ্ছেন, এতেও কোনও সন্দেহ নেই। এক কথায়, জ্যোতিবাবু বেঁচে থাকতেই হাতেকলমে তৈরি করা হবে তাঁকে। যাতে হঠাৎ কোনও কিছু ঘটলে তিনি সহজেই সামাল দিতে পারেন।

বিনয় চৌধুরীর বয়স বড় বাধা ! ছবি : রাজীব বসু

ঠিক একইভাবে সরোজবাবুর জায়গায় উত্তরসূরী হিসেবে ইতিমধ্যেই নাম উঠছে বিমান বসুর। সরোজবাবুর পরে শৈলেন দাশগুপ্ত কিংবা প্রবীণতর আর যেসব নেতা রয়েছেন তাঁদেরও রাজ্য সম্পাদকের জায়গায় আনা হবে না, শোনা যাচ্ছে এ ধরনের কথাও। সেক্ষেত্রে ৪৬ বছর বয়সী বিমানবাবুকেই তুলে আনা হতে পারে দলের সর্বোচ্চ পদটিতে। ৭৮' সালে সম্পাদকমণ্ডলীতে এসেছেন তিনি। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্টের দায়িত্ব ইতিমধ্যেই তাঁর হাতে।

আসলে বুদ্ধদেববাবু, বিমানবাবুরা পারবেন কি না সে প্রশ্ন এখনই তোলার অর্থ হয় না। জ্যোতিবাবুর এখন কোনও বিকল্প নেই এটা ধরে নিলেও ভাবতে হবেই তাঁর পরে কে—এ কথাটাও। একই সঙ্গে, জ্যোতিবাবুর পরবর্তী সি পি এমের অবস্থা নিয়েও চিন্তা বা দুশ্চিন্তা চলবেই। কেননা, ওজনে-আয়তনে বা গুরুত্বে এ রাজ্যে সি পি এম, সরকারেই থাকুক বা বিরোধী দলে, আরও বেশ কিছুদিন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে থাকছেই। ■
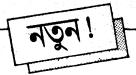
মাথাধরা সারানোর জন্য প্রকৃতির ভেষজ গুণে ভরা

প্যান্থর পেইন বাম

এর অপূর্ব ভেষজ গুণ
চটপট কাজ করে।
দ্রুত আরাম দেয়।

জগদালে গ্রুপের
একটি উৎপাদন
ওষুধের দুনিয়ায় ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে একটি নির্ভরযোগ্য নাম

CLARION/JG/8846/BEN

ইংরেজদের চোখে জ্যোতি বসু

আশিস রায়

ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে ইংরেজদের ধারণা একটা বিশেষ বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ। এই বৃত্তে রয়েছেন মহাত্মা গান্ধী এবং নেহরু পরিবার অর্থাৎ জওহরলাল, ইন্দিরা এবং রাজীব। কারণটা হল, ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকায় ভারত সম্পর্কিত প্রচার খুব সীমাবদ্ধ। আর তার জন্য দায়ী ভারতই। স্বাধীন ভারতের প্রচার মাধ্যম নেহরু গোষ্ঠীর বাইরে কোন রাজনৈতিক নেতার ভাবমূর্তি তুলে ধরেনি বিদেশে। গান্ধীজীর ব্যাপারটা আলাদা। বিদেশিরাই তাঁর সম্পর্কে চিরকাল উৎসুক।

এই পটভূমিতে 'ইংরেজদের চোখে জ্যোতি বসু কেমন'— কথাটার আলোচনায় পরিধি ছোট হয়ে আসে। তবু অল্প কিছু লোকের মধ্যে হলেও তাঁর পরিচিতিটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখন, এই 'কিছু লোক' কারা? কিছু শিক্ষাবিদ, পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করতে চান এমন কয়েকজন শিল্পপতি, কতিপয় বামপন্থী রাজনীতিক এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা এঁদের মধ্যে রয়েছেন।

সবাই জানেন, একদা জ্যোতিবাবু এখানে আইন পড়তে আসেন এবং পরে এখানেই আইন ব্যবসায়ও যোগ দেন। সে চার দশকেরও আগেকার কথা। ভারতে কমিউনিস্টরা যে সময় দারুণ নিপীড়নের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় জ্যোতিবাবুর বিলেত যাওয়া নিয়ে কিছু কিছু কমিউনিস্ট নেতা এখনও তাঁর সমালোচনা করে থাকেন। অর্থাৎ তাঁদের অভিযোগটার মানে হল, ভারতে কমিউনিস্টদের কষ্টের জীবন থেকে সরে গিয়ে এক বিলাসী জীবনযাপন করতে বিলেত গেলেন তিনি।

আমি বলব অভিযোগটা অসার। বিপ্লবীদের কৃচ্ছ্রসাধনের পরিবেশ থেকে দূরে চলে গেলেও জ্যোতি বসু কোনো আয়েসের জীবনযাপন করেননি লন্ডনে। সেটা বরং করেছেন অনেক কংগ্রেসওয়ালা। অনেক কংগ্রেস-অনুগামী যেমন ব্রিটিশ আভিজাত্যের সঙ্গে গা-ঘেঁষে চলতে চাইতেন, সে চেষ্টা করেননি তিনি। আসলে পরবর্তীকালে ভারতে তিনি যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তার জন্য তিনি এখানে থেকেই নিজেকে তৈরি করছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা-দাবিকে এখানে যাঁরা তুলে ধরছিলেন তাঁদের পুরোধা প্রতিষ্ঠান 'ইণ্ডিয়ান মজলিস'-এর সঙ্গে ছিল তাঁর সক্রিয় সংযোগ। এখানে তাঁর সম্পর্ক ঘটে গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে। এবং গ্রেট ব্রিটেনের বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা রজনী পাম দত্তর প্রভাবও এখানেই পড়ে তাঁর ওপর।

সন্দেহ নেই, লন্ডনের প্রবাসজীবনে বেশ কিছু ভালো সংস্থা জ্যোতিবাবুর ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। আর সেই জন্যেই বোধহয় কলকাতা ছাড়া আর যদি কোথাও তিনি ঘরোয়া পরিবেশ বোধ করেন সে এই ইংল্যান্ড। ঘুরে ঘুরে এখানেই তিনি প্রতি বছর জুলাই-আগস্টে আসেন বিশ্রাম নিতে, চাঙ্গা হতে—বন্ধু এবং কমরেডদের সঙ্গলাভ করেন। মাঝে মাঝে চলে যান কোনো দূরপ্রান্তের রম্যস্থানে, যেখানে সত্যিই তিনি ভাবনামুক্ত সময় কাটাতে পারেন গা-এলিয়ে।

কাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন এখানে জ্যোতিবাবু, তাঁরাই বা কী ভাবেন ওঁর সম্পর্কে? সমাজের বিভিন্ন ধারার লোকজনের সংস্পর্শে আসতে হয় তাঁকে এখানে। এঁদের মধ্যে ভারতের হাই কমিশনার, ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ এবং ব্রিটিশ ও ভারতীয় ব্যবসায়ীমহল থেকে শুরু করে সি পি আই (এম)-এর প্রতি অনুগত এখানকার ইনডিয়ান ওয়ারকারস অ্যাসোসিয়েশন-এর সদস্যরাও আছেন। প্রথম ওঁর সান্নিধ্যে আসবার সময় অনেকেই ধরে নেন, লোকটা নিশ্চয় একগুঁয়ে উগ্রচণ্ডী। পরেই একজন বিবেকী, মধুরভাষী, মার্জিত রুচির মানুষকে আবিষ্কার করে মুগ্ধ হয়ে যান।

ব্রিটেনের কম্যুনিস্ট মহলে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ছবি : তপন দাস

কিছুকাল আগে পর্যন্ত জ্যোতিবাবু যখন লন্ডনে আসতেন ভারতীয় হাইকমিশন তাঁর খবর নিতো না। আর ইদানীং তিনি এলেই তাদের কোনো পদস্থ পুরুষ হাজির তাঁকে স্বাগত জানাতে। যতো দিন জ্যোতিবাবু থাকবেন, তাঁর জন্য বরাদ্দ করা থাকে লিমুজীন গাড়ি এবং এই মান্য অতিথিকে ভোজসভায় আপ্যায়ন করেন হাই কমিশনার। মনে রাখতে হবে, এই হাই কমিশনার, তা যিনিই হোন, আসলে কিন্তু এই পদে কংগ্রেস দলের রাজনৈতিক নিয়োগ পেয়েই আসেন।

উনিশ শ' চুরাশিতে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু লন্ডনে আসেন সেটা ছিল তাঁর সরকারি সফর। সেবারকার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ এবং অনাবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ী সংস্থাগুলিকে পশ্চিমবঙ্গে অর্থ বিনিয়োগ অথবা বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াতে উৎসাহী করা। একজন মারকৃসবাদী হিসাবে এই সব ব্যক্তিগত বেসরকারি বহুজাতিক ব্যবসায়ী সংস্থাগুলির কাছে এজন্য অনুরোধ জানানোটা তাঁর পক্ষে খুব স্বস্তিকর ছিল না। তবু তিনি তা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে। এবং ব্যাপারটা তাই অন্যদের কাছেও খারাপ লাগেনি।

লন্ডনের একটি বড়লোকদের ক্লাবে এমনি এক অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনতে হাজির ছিল ইউনি লিভার, রেকিট কোলম্যান, ক্লোরাইড ইউকে-র মতো বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ও ব্রিটিশ ব্যাঙ্কগুলির প্রতিনিধিবর্গ। আর ছিলেন বিখ্যাত ভারতীয় ব্যবসায়ী স্বরাজ পল। সেদিন তাঁদের সবারই মনে ধরেছিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কথা।

তিনি বলেছিলেন—আপনারা যদি ভারতে অর্থ বিনিয়োগ করেন, একজন ভারতীয় হিসাবে তাতে আমি খুশি হবো। আর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আরো বেশি খুশি হবো যদি আপনারা অর্থ বিনিয়োগ করেন পশ্চিমবঙ্গে। তিনি শ্রোতাদের আশ্বস্ত করেছিলেন রাজ্য সরকারের সব রকম সহযোগিতার ব্যাপারে শিল্পে শান্তিরক্ষার এবং নির্বিঘ্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের। সকলের ভালো লাগে তাঁর কথা। হলদিয়ার কয়েকটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে এর সুফলও মেলে।

কিন্তু মজার ব্যাপার, মারকসবাদী হল বাস্তববাদী। এই তত্ত্বটা নিয়ে একটা বিতর্ক সৃষ্টি হয় গত বছর জ্যোতিবাবুর অক্সফোরড বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায়। চরম বামপন্থীরা জ্যোতিবাবুর বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকে, অশোভন আচরণেও বাধে না তাদের। এই 'সাদা' তরুণদের সমর্থন দেখা গেল নকশালবাড়ির আন্দোলনের প্রতি। এমনকি নকশালপন্থীদের পরিকল্পিতভাবে খুন করার অভিযোগও তারা

আনে জ্যোতিবাবু আর তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে। তাদের আরও অভিযোগ, জ্যোতিবাবু শিল্পে শান্তিরক্ষার প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে নিজেকে বিক্রি করে দিচ্ছেন শিল্পপতিদের কাছে।

এর ক'দিন পর ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আলোচনাতেও তিনি হতাশ করেন বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের। জোরালোভাবে তথ্যের ভিত্তিতে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে অক্ষম হন তাঁর বক্তব্য। বোধ হয় তৈরি হয়েও আসেননি। কতকগুলি ছোটখাটো কাজ ছাড়া তাঁর সরকারের সাফল্যের কোন উজ্জ্বল চিত্র পরিসংখ্যান দিয়ে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। কেন্দ্রের সমালোচনায় তাঁর যুক্তিগুলোও ছিল অগোছালো। দক্ষিণপন্থীরা খুশি হয় দেশের ও বিদেশের শিল্পপতিদের সঙ্গে জ্যোতিবাবুর সমন্বয় ও সম্প্রীতি রেখে চলার প্রতিশ্রুতিতে। কিন্তু কিছুটা হতাশ করে তাঁর এখানকার দীর্ঘ কালের বামপন্থী সমর্থকদের।

জ্যোতিবাবুর ক্যামব্রিজ আলোচনাচক্র আশানুরূপ না হওয়ার জন্য আমি তাঁকে দোষ দিই না। কারণ ভারতীয় রাজনীতিকদের স্বদেশে কখনো এ ধরনের প্রশ্নবাণের মুখোমুখি বড়ো একটা হতে হয় না। সাংবাদিকরা ছাড়া বেশি লোক তাঁদের প্রশ্ন করতেই পারে না। আর তাঁদেরও এমন চাপ থাকে যে অপ্রিয় প্রশ্ন তোলা তাঁদেরও কল্পনার বাইরে।

তবে প্রশ্ন থেকে যায়, ওঁর সরকারি সচিবরা বা দল কী করেন? যাঁরা কিছুটা খবর-টবর রাখেন তাঁদের সামনে হাজির হওয়ার আগে সম্ভাব্য সব রকম প্রশ্ন সম্পর্কে ওঁকে তৈরি করে দেওয়া তাঁদের কর্তব্য। নিজেও তিনি যাতে শেষ মুহূর্তে সব কিছু ঝালাই করে নিতে পারেন তার জন্য বাইরে বেরনোর সময় ফাইলপত্তর সঙ্গে দেওয়া উচিত। ব্যস্ত রাজনীতিকের পক্ষে সব সময় নিজেই হোমওয়ারক করে নেওয়া সম্ভব নয়। ইউরোপের, কি পশ্চিমে কি পুবে, কোনো নেতাই নিজেকে পুরো তৈরি না করে বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা ঘেরাও হতে প্রস্তুত নন।

রাজনীতিতে জ্যোতি বসুর তুলনায় রাজীব গান্ধী অপরিণত। তাঁকেও বিদেশ সফরের আগে তাঁর উপদেষ্টারা 'পাখিপড়া' করে তৈরি করে দেন। পশ্চিমের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ধরনের উচ্চ স্তরের তর্ক-আলোচনা-প্রশ্ন তোলা হতে পারে তার তুলনায় সাংবাদিক সম্মেলন কিছুই নয়। তবু তার সামনে হাজির হতেও কোন তথ্যের বা প্রস্তুতির ফাঁক রাখা হয় না প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে। ফলে রাজীব গান্ধীর ন্যায় সাধারণ রাজনীতিকও চমৎকার দাগ কাটতে পারেন এখানে।

ক্যামব্রিজের ঘটনা আরও আছে। প্রথা অনুযায়ী সেন্টার ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ-এর তরফ থেকেই বক্তাকে আমন্ত্রণ জানানোর কথা। কিন্তু জ্যোতিবাবুর ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। উদ্যোগটা নেয় লন্ডনে বসবাসকারী তাঁর কিছু বন্ধু। সেন্টারের ডিরেক্টর বেশ কিছু দিন সাড়া দেননি তাতে। শুনেছি ওই সেন্টারের জনৈক ভারতীয় গবেষক, ডিরেক্টরকে মনে করিয়েও দেন একবার জ্যোতিবাবু প্রসঙ্গ। তবু ওঁকে আমন্ত্রণের মতো উৎসাহ তাঁর দেখা গেল না। বরং উল্টে তিনি নাকি বেশ রুক্ষ ভাষায় বলেন, 'ইংলন্ডে এসে সেমিনারে বক্তৃতা করার চাইতে তাঁর পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে যতো রকম সমস্যা রয়েছে তার পিছনে সময় দেওয়া উচিত নয় কি?' শেষ পর্যন্ত এক 'আমন্ত্রণ পত্র' বের হয় তাঁর হাত থেকে। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে অপমানকর মনে হবে। আর এই আমন্ত্রণ কালটা হল জুলাই—ছুটির সময়। ক্যামব্রিজের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা সেমিনারের উপযুক্ত সময় নয়। ফলে সেমিনারে হাজিরার সংখ্যা হল কর-গোনা। আর বেশির ভাগই কাছাকাছি যে সব ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও গবেষক ছিলেন তাঁরা। যুক্তরাজ্যে যাঁরা জ্যোতিবাবুর প্রচার-সংগঠক তাঁদের উপর ভরসা রাখা ঠিক হয়নি তাঁর। জ্যোতিবাবু এবং তাঁর দলের প্রতি অনুগত যে অল্প কিছু লোক ব্রিটেনে আছে এবং যাঁরা তাঁর এখানকার সফর ও কর্মসূচী ঠিক করে থাকেন তাঁরা এখানকার অনেক কিছুর গুরুত্বই বুঝে উঠতে পারেন না। আর উপযুক্ত লোকদের বা জায়গার সঙ্গে সংযোগ রক্ষার যোগ্যও তাঁরা নন। ওঁরা জ্যোতিবাবুদের বন্ধু হতে পারেন, নিষ্ঠাবানও হয়তো; কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হলে ঠিক লোককে দিয়েই ঠিক কাজ করানো দরকার। যাঁরা তা পারেন তাঁদের এ ভার দিলে ভালো করতেন তিনি, না হলে সুনাম, মর্যাদা ঠিক ঠিক রক্ষা করা যায় না।

অবশ্য এবারকার সফরে ব্যবস্থাদি কিছুটা ভালো হয়েছে। সেটা হয়েছে ডঃ বিপ্লব দাশগুপ্তের জন্য। ডঃ দাশগুপ্ত এখন কলকাতা থাকলেও একদা ছিলেন সাসেকস বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানকার ধাত বুঝে ছক তৈরি করেছেন তিনি। এ সময়েও অবশ্য গরমের ছুটি চলছিল। তবু লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস-এর এই সেমিনারে বেশ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশ ঘটে এবং জ্যোতিবাবুও তাঁর কথাবার্তায় হতাশ করেননি এবার কাউকে। এই আলোচনাসভার প্রধান মুভার সাউথ ইস্ট এশিয়ার এল এস ই ফ্যাকালটির অধ্যক্ষ ডঃ টম নসিটারও সপ্রশংস হলেন অনুষ্ঠানের ফলশ্রুতিতে।

অক্সফোরড, ক্যামব্রিজ এবং লন্ডনের শিক্ষাবিদগণ জ্যোতিবাবুর মধ্যে একটা আকর্ষণীয় কিছুর সন্ধান পেয়েছেন। তার মধ্যে সব চাইতে লক্ষণীয় তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা। বিদেশে কথাবার্তার সময় তিনি কেন্দ্রের সমালোচনার ব্যাপারে যথেষ্ট সংযত ও সতর্ক। শ্রোতারা বুঝতে পারেন, বাইরে বেরিয়ে ঘরের নোঙরা কাপড় কাচা তাঁর রুচি-বিরোধী। কেন্দ্রীয় সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ তিনি করেননি তা নয়, তবে তা সংযত ও মার্জিত ভাষায়।

জ্যোতিবাবুর আর একটি উল্লেখ্য এবং প্রশংসনীয় দিক হোল ভারতের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে তিনি জোরালো প্রবক্তা হিসাবে দেখা দেন। তিনি বার বার এ কথা বলেছেন যে তিনি এবং তাঁর দল বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে লড়তে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েও কাজ করতে প্রস্তুত। তখন পর্যন্ত গোরখাল্যান্ড নিয়ে রাজীবের সঙ্গে কোন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি। কংগ্রেস দলের যে প্রচার অভিযান এবং দুঃখের কথা, যে প্রচারের ঢাক ভারত সরকারের হাত দিয়েই পেটানো হয় তাতে ভারতের বামপন্থী দলগুলির ভূমিকা সম্পর্কে পশ্চিমে অনেক ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়ে আছে। প্রচার হয়েছে, বামপন্থীরা হল দেশের শত্রু—পঞ্চম বাহিনী, কংগ্রেসবিদ্বেষই তাদের উপজীব্য এবং তাদের কোন ব্যাপারেই বিশ্বস্ততা নেই। লন্ডনে অনাবাসী ভারতীয়দের সামনে সাধারণ সমাবেশে জ্যোতিবাবুর প্রদত্ত ভাষণগুলি এই ধারণা দূর করার পক্ষে খুব কাজে লেগেছে। তা ছাড়া পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ আন্দোলনের নেতা এবং বিশ্বের শান্তি আন্দোলনের বিশিষ্ট প্রবক্তা ব্রুচ কেন্ট-এর সঙ্গে আলোচনায় জ্যোতিবাবু বেশ যোগ্য রাজনীতিক চিন্তাবিদরূপে প্রতিভাত হয়েছেন। পরমাণু অস্ত্র সব অবস্থাতেই নিষিদ্ধকরণ সম্ভব নয় বলে যাঁরা মনে করেন কেন্ট তাঁদের দলে নন। তবু জ্যোতিবাবুর বক্তব্যের প্রতিবাদ তিনি করেননি। জ্যোতিবাবু বলেছেন, একটা বিকাশশীল দেশে নিরস্ত্রীকরণটা তেমন জরুরি প্রশ্ন নয়। সেই বিচারে ভারতের পক্ষে এ নিয়ে বেশি মাথা না ঘামালেও চলে। তা ছাড়া সি পি আই (এম) নেতা এও বলেন যে, বৈরী মনোভাবাপন্ন প্রতিবেশীদের জন্য ভারতকে, সামরিক দিক থেকে বেশি টাকা ব্যয় হলেও, তৈরি থাকা দরকার। মিঃ কেন্ট এ কথার প্রতিবাদ করেননি।

সম্প্রতি, গত দু বছর ধরে লন্ডনে জ্যোতিবাবুর আর এক নতুন ভূমিকা দেখা যাচ্ছে। এখানে সাংস্কৃতিক উৎসবে ভারতীয় নাচ-গান-অভিনয়ের অনুষ্ঠানকে তিনি উৎসাহিত করছেন। উনিশ শ পঁচাশি সালে এই বাৎসরিক অনুষ্ঠানে 'বঙ্গোৎসব'-এর উদ্বোধন করে জ্যোতিবাবু ইয়োরোপীয় শ্রোতা-দর্শকদের সামনে যে ভাষণ দেন তা ছিল চমৎকার, সরস, সুন্দর এবং উপভোগ্য। বঙ্গীয় শিল্পের বর্তমান রূপটি নতুন করে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এখানে।

সংক্ষেপে বলা যায় কমরেড বসু সি পি জি বি অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি মহলে বেশ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এখনো। সি পি জি বি দল হিসাবে মস্কোর অনুগত এবং সি পি এম-এর চাইতে সি পি আই-র সঙ্গেই এদের ঘনিষ্ঠতা। তাতে জ্যোতিবাবুর প্রতি এঁদের শ্রদ্ধা কমেনি। এঁদের শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে জ্যোতিবাবু পরিচিত হলেও তেমন উৎসাহবোধ করেন নি। কারণ এঁদের 'পছন্দ' নেহরুদের প্রতি। সে যাই হোক, ব্যবসায়ী শিল্পপতি থেকে শ্রমিক পর্যন্ত যাঁরাই জ্যোতিবাবুর কাছে এসেছেন, বলেছেন, 'চমৎকার মানুষ।' এক ধাপ এগিয়ে স্বরাজ পালের অভিমত—'দারুণ দক্ষ ব্যক্তিত্ব।'

গত পঞ্চাশ বছর ধরে কমিউনিজমের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা সবার সম্ভ্রম জাগায়। সবাই স্বীকার করেন, পেছন থেকে তাঁর দলকে বঙ্গের রাজনীতির পাদপ্রদীপে তুলে এনেছেন তিনি এবং গত এক দশক তাঁর নেতৃত্বে মহাকরণে এই শক্তির সিংহাসনে যে ভাবে তিনি রয়েছেন তাতে হয়ত আগামী দশ বছরও এই অবস্থা থাকবে। ■

জ্যোতি বসু : সর্বভারতীয় দৃষ্টিতে

সুমন চট্টোপাধ্যায়

"To be a legend in one's own lifetime is an honour extended only to very few. Jyoti Basu belongs to this category." এই মন্তব্য কংগ্রেস(এস) দলের সাধারণ সম্পাদক কে পি উন্নিকৃষ্ণনের।

লোকদলের সহ-সভাপতি হেমবতীনন্দন বহুগুণা এগিয়ে যান আরো এক ধাপ। তাঁর ভাষায়, "To my mind Jyoti Basu is the best political specimen available in the country."

উন্নিকৃষ্ণন কিংবা বহুগুণার এই মন্তব্যে কি অতিশয়োক্তি আছে? হয় তো আছে। হয় তো নেই। আছে কি নেই, সেই বিতর্ক নিরর্থক। যে কথা প্রাসঙ্গিক এবং অবশ্যই দিনের আলোর মতো সত্য তা হল, একটি অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হলেও জ্যোতিবাবু সর্বভারতীয় স্তরে শ্রদ্ধা ও সম্মানের প্রায় নির্বিকল্প আসন অলঙ্কৃত করে আছেন। যাঁরা তাঁকে পছন্দ করেন, যাঁরা তাঁকে ঈর্ষা করেন, যাঁরা তাঁর রাজনৈতিক মত ও পথের শরিক, যাঁরা নন, তাঁদের সকলের কাছেই।

একদিক থেকে দেখতে গেলে ব্যাপারটা সত্যিই বিস্ময়কর। জ্যোতিবাবু সুবক্তা নন, সুপণ্ডিত নন। ই এম এস নামবুদিরিপাদ বা বি টি রণদিভে যে অর্থে তাত্ত্বিক মার্কসবাদী নেতা, জ্যোতিবাবু তাও নন। তাঁর অসংখ্য কমরেডের মতো কঠিন আত্মত্যাগ যা প্রচণ্ড কৃচ্ছ্রসাধনের বন্ধুর পথ ধরেও জ্যোতিবাবু আজ এত উপরে উঠে আসেননি। তার চেয়েও বড় কথা, প্রায় গোড়া থেকেই দলের কেন্দ্রীয় কমিটি বা পলিটব্যুরোর সদস্য হলেও জ্যোতিবাবুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বারবার সীমাবদ্ধ থেকেছে পশ্চিমবঙ্গে। সর্বভারতীয় রাজনীতি বলতে যা বোঝা যায়, জ্যোতিবাবু প্রায় কখনও তা করেননি, তবু কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, এ দেশের সর্বত্র, জ্যোতিবাবুর নাম শুনলেই যে-কোনও রাজনৈতিক দলের যে-কোনও নেতা যে-কোনও প্রদেশের সরকারী কর্মচারী এমন কি সচেতন পথচারীও শ্রদ্ধায় সম্মানে মাথা নত করেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, শত্রুর রক্তপিপাসায় উন্মাদ ধর্মান্ধ শিখ যুবকও জ্যোতিবাবুর নাম শুনলেই কপালে হাত ঠেকিয়ে জানায় সসম্ভ্রম কুর্নিশ। বাংলা গানের মতো কী যেন এক জাদু আছে এই জ্যোতি বসু নামে। জ্যোতিবাবু ভাল হতে পারেন, মন্দ হতে পারেন, ঠিক হতে পারেন, ভুল হতে পারেন, কিন্তু তিনি স্বতন্ত্র।

একথা ঠিক কমিউনিস্ট হলেও জ্যোতিবাবু সেই শ্রেণীর নেতৃবর্গের একজন, একদা ইংরেজ

জ্যোতিবাবু ভাল হতে পারেন, মন্দ হতে পারেন, ঠিক হতে পারেন, ভুল হতে পারেন, কিন্তু তিনি স্বতন্ত্র। ছবি : তারাপদ ব্যানার্জী

উপনিবেশে এই ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ যাদের বরাবর শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখেছেন। অর্থাৎ হ্যারি পালিত অথবা রজনী পাম দত্তের শিষ্য হলেও কিংবা ধোপদুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবি পরলেও জ্যোতিবাবু উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান এবং বিলেত ফেরত। বহুগুণার কথায়, "He is a queer combination of east and west." এই পারিবারিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত প্রেক্ষাপট জ্যোতিবাবুকে একদিকে যেমন দলের ভিতরে প্রায় প্রথম থেকেই প্রথম সারিতে আসন পেতে সাহায্য করেছে, অন্যদিকে সর্বভারতীয় স্তরে তিনি জায়গা পেয়েছেন অক্সফোর্ড কেমব্রিজ ফেরত পশ্চিমী আলোকপ্রাপ্ত "Ruling Elite"-এর মধ্যে। রাজনৈতিক বলে সমকক্ষ না হলেও দিল্লির সমগোত্রীয় প্রতিপক্ষের সঙ্গে তিনি তাই একই অবস্থানে দাঁড়িয়ে, একই ভাষায় লড়াই করে যেতে পেরেছেন। আজকের ভারতবর্ষে জ্যোতিবাবু বোধ হয় একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী যিনি তর্জনী তুলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সমানে সমানে তর্ক করতে পারেন। হতে পারে, এটা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর স্টাইল। ফরওয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক চিত্ত বসুর কথায়, "সকলের সঙ্গে এমন কি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও এমন কাটা কাটা, চাঁছাছোলা কথা বলতে জ্যোতিবাবুর মতো আর কেউ পারেন না। এবং এটা সাধারণ মানুষকে দারুণভাবে আকর্ষণ করে।" কিন্তু এই স্টাইলের পিছনে কাজ করে এক ধরনের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, যার উৎসে আবার অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে রয়েছে জ্যোতিবাবুর এই সম্ভ্রান্ত "Elitist" প্রেক্ষাপট।

বিলেতে লেখাপড়ার সুবাদে জ্যোতিবাবু ছিলেন ফিরোজ-ইন্দিরা গান্ধীর বন্ধু। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ভাবে বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে থাকলেও ব্যক্তিগত স্তরে শেষ দিন পর্যন্ত ইন্দিরার সঙ্গে জ্যোতি বসুর নিবিড় সখ্য ছিল। ওয়াকিবহাল, প্রবীণ এবং উচ্চপদস্থ এক বাঙালী আই এ এস অফিসার বললেন, "আমি জানি এমন কি পারিবারিক অনেক ব্যাপারেও ইন্দিরা জ্যোতিবাবুর সঙ্গে নিয়মিত পরামর্শ করতেন। ভাল করে লক্ষ করে দেখবেন, রাজনৈতিক বিরোধ যা-ই থাক, এঁরা দুজনে কিন্তু পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে কোনওদিন ব্যক্তিগত আক্রমণ করেননি।" অনেকটা উত্তরাধিকার সূত্রে, জ্যোতিবাবু সম্পর্কে সেই শ্রদ্ধা পোষণ করেন ইন্দিরা-তনয় রাজীবও। তরুণ প্রধানমন্ত্রীর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ভাষায় : বাইরে যা-ই বলুন না কেন, ভিতরে ভিতরে জ্যোতিবাবু সম্পর্কে দারুণ শ্রদ্ধা আছে রাজীবের। ব্যক্তিগত আলোচনায় একাধিকবার রাজীব আমাকে বলেছেন, "There is none like Jyoti Basu. He is a class by himself." ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউনসিলের বৈঠকে, কিংবা কলকাতার রাজভবনের কেন্দ্র-রাজ্য বৈঠকে যে "ইয়ং ম্যান"-কে রীতিমত ধমক দেন জ্যোতিবাবু, তাঁকে কি তিনি স্নেহ করেন না ? আলবাৎ করেন। জ্যোতিবাবুকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন, তাঁরা সকলেই স্বীকার করেন, তাঁর বাইরের কঠিন আস্তরণের ভিতরে রয়েছে

আদর্শগত ও সাংগঠনিক লড়াইয়ে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলন দু-টুকরো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এসব কোনও কিছু জ্যোতি বসুর উপর কোনও প্রভাব ফেলেনি। বরাবর তিনি তাঁর আদর্শে থেকেছেন অবিচল।
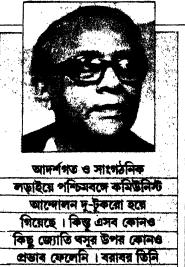
কোমল, স্নেহপ্রবণ একটি মন। রাজনীতি সেই স্নেহবর্ষণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। হয় তো তাই, সকালে বিকেলে তাঁকে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেওয়ার হুমকি দেন যে বরকত সাহেব, তাঁর সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব আছে জ্যোতিবাবুর। হয় তো তাই, সুব্রত মুখার্জি তাঁর স্নেহের পাত্র।

প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা করেন বলে নয়, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে সাধারণ মানুষের চোখে জ্যোতিবাবু শ্রদ্ধার পাত্র অন্য কারণে। কী সেই কারণ ?

সংসদে অসম গণ পরিষদের নেতা দীনেশ গোস্বামী বললেন, "In Indian politics today, people have changed their commitment so often that a person who steadfastly adheres to a principle and does not make compromises for the sake of power commands respect not only from his supporters or detractors but also from people at large. That is why Jyoti Basu, though he has not come out of Bengal, primarily commands a lot of respect in the political circles all over India. Even if he is a political adversary, you know where he stands. That is why he has an all-India projection." প্রায় একই কথা একটু অন্য সুরে বেঁধে ডি এম কে নেতা গোপালস্বামী বলেন, "সাধারণভাবে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলন নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। আদর্শগত ও সাংগঠনিক লড়াই হয়েছে। দু টুকরো হয়ে গেছে কমিউনিস্ট দল। কিন্তু এসব কোনও কিছু জ্যোতি বসুর উপর কোনও প্রভাব ফেলেনি। বরাবর তিনি তাঁর আদর্শে থেকেছেন অবিচল। এবং সেই আদর্শনিষ্ঠাই তাঁকে সারা দেশে এনে দিয়েছে জনপ্রিয়তা।" আর বহুগুণার ভাষায় "Here is a person who will never budge an inch from his principle. আমি নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে-কথা জানি। আমি যখন ইন্দিরা-কংগ্রেস থেকে এবং লোকসভার সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়ে গাড়োয়ালে নির্বাচন লড়ছিলাম, তখন জ্যোতিবাবু আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

ইন্দিরা গান্ধীর সেটা পছন্দ হয়নি। তিনি জ্যোতিবাবুকে বলেছিলেন, আপনারা বহুগুণাকে

জ্যোতিবাবুকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন, তাঁরা সকলেই স্বীকার করেন, তাঁর বাইরের কঠিন আস্তরণের ভিতরে রয়েছে কোমল

সমর্থন করছেন কেন? জবাবে জ্যোতিবাবু বলেছিলেন, সমর্থন করার কিছু নেই, বহুগুণা ভাল কাজ করেছেন, আমি তাই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছি। তা ছাড়া গাড়োয়ালে আমার নিজের তো ভোট নেই। থাকলে অবশ্য আমি বহুগুণাকে ভোট দিতাম। মাঝে মাঝে মনে হয়, দেশের সব মুখ্যমন্ত্রীই যদি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এই ভাষায় কথা বলতে পারত।"

অনেকে মনে করেন, কমিউনিস্ট দলে জ্যোতিবাবুর উত্থান একটি "ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা"। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রবীণ সি পি আই নেতার কথায়: জ্যোতিবাবু খুব বেশি হলে মাঝারি মাপের একজন কমিউনিস্ট নেতা। আমাদের যৌবনে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই জ্যোতিবাবুর মতো নেতা অনেক ছিলেন—ভবানী সেন, মুজফ্ফর আমেদ, সোমনাথ লাহিড়ি, আবদুল্লা রসুল, বিশ্বনাথ মুখার্জি কিংবা নিরঞ্জন সেন। কিন্তু নানা ঘটনাচক্রে জ্যোতিবাবু সকলকে পিছনে ফেলে সামনে এসে গিয়েছেন। ১৯৭১-এ যদি "আস্ত বামগোষ্ঠী" ভুল না করত, আমি লিখে দিতে পারি, তা হলে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস আজ অন্যরকম হত। কিন্তু তা হয়নি। এবং এইভাবে ইতিহাস জায়গা করে দিয়েছে—মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও তার নেতা জ্যোতিবাবুকে।

কী হলে কী হতে পারত ইতিহাস তার তোয়াক্কা করে না। বাস্তবে কী হয়েছে, ইতিহাসে সেটাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ঘটনা জ্যোতিবাবুকে সাহায্য করেছে কি না সেই তর্ক তাই সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। তবে একেবারে গোড়া থেকে, সেই ১৯৪৬ সাল থেকে এদেশের মানুষ জ্যোতিবাবুকে চিনেছেন এক

স্নেহপ্রবণ একটি মন

বাম রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু: ছেষট্টি সালে অন্যান্য বামপন্থী নেতাদের সঙ্গে

প্রতিবাদী কণ্ঠ ও ব্যক্তিত্ব হিসেবে। সেই নির্বাচনে তাবড় তাবড় কমিউনিস্ট নেতা পরাজিত হলেও রেল শ্রমিকদের জন্য সংরক্ষিত আসনে হুমায়ুন কবীরকে হারিয়ে জ্যোতিবাবু প্রথম বিধানসভায় এসেছিলেন। সেই থেকে গত একচল্লিশ বছরে সেই অবস্থান থেকে সত্যিই তো তিনি সরে আসেননি। উন্নিকৃষ্ণণ তাই বলেন, "He exposed the misdeeds of the government and mirrored the aspirations of the people and particularly the working class in the floor of the assembly. It was a new voice that was heard. It was not the thundering oratory or mellifluous eloquence that Bengal was used to. And that was more important. His eloquence had content of a different kind, one which stood for basic transformation of the society, and change in property relations." সি পি আই নেতা ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত বলেন, "আমি বলব, বিধানসভায় বিরোধী নেতা হিসেবে জ্যোতি বসুর অবদান প্রশাসক জ্যোতিবাবুর চেয়ে অনেক বেশি। দারুণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে তখন তাঁকে লড়াই করতে হয়েছে।" জনতা দলের সভাপতি চন্দ্রশেখর বলেন, "জ্যোতিবাবুর রাজনীতি বরাবরই আমাকে আকর্ষণ করেছে। উনি বরাবরই দুর্বল, নিপীড়িত ও দরিদ্রদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, যদিও তিনি নিজে কিন্তু সেই শ্রেণীর লোক যা বাঙালী ভদ্রলোক সমাজ বলে পরিচিত।" আর তাঁর কট্টর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বরকত সাহেব বলেন, "এদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের সংবিধানে বিরোধিতা শব্দটির সংযোজন জ্যোতিবাবুর অবদান। স্বাধীনতা পাওয়ার আনন্দে গোটা দেশ যখন আনন্দে আত্মহারা, সর্বত্র কংগ্রেসের একচেটিয়া আধিপত্য, তখন সেই স্রোতে গা না ভাসিয়ে বিপরীত দিকে দাঁড় বেয়েছেন জ্যোতিবাবু। এবং এমন একটা সময়ে যখন মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু বেঁচে, শুধু বেঁচে নন, প্রত্যেকেই "মিথ"। তাঁদের পায়ের তলায় লুটিয়ে না পড়ে, জ্যোতিবাবু তখন মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়েছেন। প্রশাসক জ্যোতিবাবু, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু অপদার্থ। কিন্তু বিরোধী নেতা জ্যোতিবাবু এক এবং অদ্বিতীয়।"

প্রায় এক নিঃশ্বাসে বরকত সাহেব আরও বলেন, "অ্যাণ্ড জ্যোতিবাবু ইজ এ গ্রেট অ্যাজিটেশনিস্ট। কী করে সাধারণ মানুষকে প্রতিবাদী আন্দোলনে শামিল করতে হয়, এবং সেই আন্দোলনকে কীভাবে পরিচালনা করতে হয়, সেটা জ্যোতিবাবুর মতো আর কেউ পারেন কিনা সন্দেহ।" চিত্ত বসুর ভাষায়, "তিনি অনায়াসে, অবলীলায় তাঁর নেতৃত্ব স্থাপন করতে পারেন। জ্যোতিবাবু যদি কোনও আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকেন তাহলে তিনিই যে তার নেতা হবেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে এই ব্যাপারটা আমার বারবার চোখে পড়েছে—খাদ্য আন্দোলনে, ট্রাম-ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ আন্দোলনে, জরুরী অবস্থার সময়ে। পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েই জ্যোতিবাবু বেশী করে ভারতবাসীর কাছে পরিচিত হয়েছেন।"

সেই নেতৃত্ব কি স্বৈরাচারী? বহুগুণা বললেন, "না, আদৌ নয়। প্রমোদ দাশগুপ্তর জীবিত অবস্থায় জ্যোতিবাবু তাঁর সঙ্গে যেভাবে জুটি বেঁধেছিলেন, তার তুলনা মেলা ভার। আমার দীর্ঘদিনের রাজনীতিক অভিজ্ঞতা থেকে জানি, এ বড় কঠিন কাজ। It requires a lot of imagination and good heartedness to work with a person who is your equal and may be in some respects placed higher than you in

the organisation. Promode Dasgupta may have been the man behind the show, but the front face was that of Jyoti Babu. In many other cases I have seen that front face getting sulky and vain. But not in the case of Jyoti Basu. More I saw him, more I was convinced, here was a person who always keeps his party and country above himself... জম্মু-কাশ্মীরের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ ফারুক আবদুল্লার কথায়, "ব্যক্তি বা দলের স্বার্থের উপরেও কী করে দেশের স্বার্থকে রাখতে হয়, সে তো আমি জ্যোতি বসুর মতো বিরোধী নেতার কাছ থেকেই শিখেছি।"

জ্যোতিবাবুর এই নেতৃত্বগুণের জন্য বামফ্রন্টের সকলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গ শাসন করতে পারছেন বলে সর্বভারতীয় নেতাদের সকলের বিশ্বাস, অসপ নেতা দীনেশ গোস্বামী মনে করেন, "সকলকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি প্রগতিশীল রাজ্য এতদিন ধরে একটানা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ কাজ নয়।" আর এস পি-র সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব চৌধুরি বললেন, "জ্যোতি বসু সি পি এম-এর অন্যতম নেতা হলেও যেটা তাঁর কাজের ও চিন্তার বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়েছে তা হল, দেশের বৃহত্তর বামপন্থী আন্দোলনের সব কয়টি প্রবণতা এবং ধারার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলার চেষ্টা। গত তিন চার দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী রাজনীতিতে সেজন্য তাঁর সঙ্গে মিলিয়ে চলতে আর এস পি দলের তরফ থেকে আমাদের সামনে কখনও কোনও দুস্তর বাধা খাড়া হয়নি। এবং এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, প্রয়াত প্রমোদ দাশগুপ্তর পরে এবং তাঁকে ধরে জ্যোতিবাবুকে পশ্চিমবঙ্গের ঐক্যবদ্ধ বামফ্রন্ট আন্দোলনের প্রধান স্থপতি বলা যায়। অবশ্য সব বামপন্থী দলের নেতারাই এ ব্যাপারে তাঁদের যথাযথ ভূমিকা পালন করছেন। কিন্তু তাঁদের সকলকে একটি সুষ্ঠু নেতৃত্ব ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করার কাজে জ্যোতিবাবুর ভূমিকা অনস্বীকার্য"

তবে সকলকে ছাড়িয়ে যান বহুগুণা, তিনি বলেন, "শুধু বামপন্থীদের কেন, জনতা পার্টি কেন্দ্রের ক্ষমতায় আসার পর জ্যোতিবাবু ওই দলকে পশ্চিমবঙ্গে সঙ্গে নিয়ে চলতে চেয়েছিলেন। মোট আসনের উনপঞ্চাশ শতাংশ দিতে চেয়েছিলেন জনতা পার্টিকে। তাঁর নিজের ইচ্ছে তো ছিলই। এমন কি দলকেও রাজি করিয়েছিলেন। কিন্তু মিথ্যে অহংকার আর তীব্র কমিউনিস্টবিরোধী মনোভাব থাকার জন্য জনতা নেতারা জ্যোতিবাবুর সেই বাড়িয়ে দেওয়া হাতে হাত মেলাননি। তার ফলও অবশ্য তাঁরা হাতেনাতে পেয়েছিলেন। পরের বিধানসভা নির্বাচনেই পশ্চিমবঙ্গে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছিল জনতা পার্টি। এই হলেন জ্যোতিবাবু। বিচক্ষণ, সহানুভূতিশীল। ধীরে চলেন, দৃঢ় পদক্ষেপে চলেন, কিন্তু একলা চলেন না। একলা চলার নীতিতে বিশ্বাসও করেন না। অবশ্য তার মানে এই নয়, তিনি একলা চলতে জানেন না। প্রথমে তিনিই সাহায্যের হাত বাড়াবেন। কেউ যদি গ্রহণ করেন ভাল। যদি না করেন কুছ পরোয়া নেই।"

এদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের সংবিধানে বিরোধিতা শব্দটির সংযোজন জ্যোতিবাবুর অবদান ছবি : অলক মিত্র

বহুগুণা বলে চলেন, "পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতিবাবু বামফ্রন্ট সরকার নামক যে-রথটি চালাচ্ছেন, তাতে লাগানো আছে অনেক ঘোড়া, ঘোড়াদের জাত আলাদা, চরিত্র আলাদা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সবাইকে ঠিক রাস্তায় চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। প্রধানত তাঁর নেতৃত্বগুণে অটুট আছে বামফ্রন্টের ঘর। এবং এটা তিনি এমন একটা সময়ে সম্ভব করেছেন যখন অনেক রাজ্যে এমন কি একদলীয় শাসনও ভেঙে পড়ছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি এদেশে যতগুলি রাজ্য সরকার আছে তার মধ্যে বামফ্রন্ট সরকারই সর্বোত্তম। He sets an example of a new developing pattern for the whole country."

শুধু যোগ্য নেতা নন, বরকত সাহেব ছাড়া অন্য সকলেই মনে করেন, জ্যোতিবাবু দক্ষ প্রশাসক; সবিস্ময় মন্তব্য করেন উন্নিকৃষ্ণণ, "দক্ষ প্রশাসক তো বটেই। কতখানি দক্ষ তা মালুম হয়, পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলে। দেশ বিভাগের ফলে এ দেশের যে কয়েকটি রাজ্য সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ তাদের মধ্যে অন্যতম। একদিকে ছিল চল্লিশ লাখ শরণার্থীর চাপ, অন্যদিকে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট। স্বাধীনতার সময়ে ভারতের সব রাজ্যের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু আয় ছিল সবচেয়ে বেশী। সেই গৌরবের স্থান নামতে নামতে ১৯৭১ সালে দশমে এসে দাঁড়িয়েছিল। সাক্ষরতায় যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল দ্বিতীয়, প্রায় একই সময়ের মধ্যে তা নেমে এসে দাঁড়ায় সপ্তমে। খরা ও ক্ষয়ের মুখে পড়ে কলকাতা বন্দর কিংবা পাট, চা বা ইনজিনিয়ারিং শিল্প। প্রতিকূল বাতাবরণে শিল্পপতিরা মূলধন অন্যত্র চালান করতে শুরু করেন। একদিকে গভীর সংকটে পড়ে পশ্চিমবঙ্গ, অন্যদিকে গল্পের সেই তিন বাঁদরের মতো তা উপভোগ করতে থাকে কেন্দ্রীয় সরকার।"

উন্নিকৃষ্ণণ বলে চলেন, "It is this state which Jyoti Basu inherited. Even by ordinary standards, it was a Herculean task for any one. More so, it was a near impossible task with an insensitive and unhelpful centre. However it goes to the credit of Jyoti Basu that he has been able to prevent a social explosion in a state with a high degree of politicisation, impoverishment and degradation. It goes to his credit that he understood the objective conditions of the state as well as of the nation, as a whole and made a distinct contribution in understanding and

using the parliamentary path while not giving up the basic struggle as decisively intervening to give justice for the peasantry and landless rural poor inspite of limitations imposed by free India's constitution and political system and also particular compulsions of parliamentary and electoral politics."

"বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কাঠামোয়" কাজ করতে গিয়ে নীতির প্রশ্নে জ্যোতিবাবু হয়তো সমঝোতা করেছেন। অন্তত কঠোর মার্কসবাদীরা তাই বলে থাকেন। তাঁরা অভিযোগ করে থাকেন, একচেটিয়া পুঁজিপতি কিংবা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে জ্যোতিবাবু মার্কসবাদের পথ থেকে সরে এসেছেন। কিন্তু নীতির প্রশ্নে জ্যোতিবাবু সমঝোতা করেছেন, একথা মেনে নিয়েও বলা যায়, তার পিছনে কাজ করেছে একদিকে কেন্দ্রের অসহযোগী মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যকে বাঁচানোর দুর্মর আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে তাঁর ব্যবহারিক বাস্তববোধ।

বহুগুণা বললেন, "রাজ্যের উন্নতির জন্য জ্যোতিবাবু কতটা উদ্‌গ্রীব তা আমার চেয়ে ভাল কে জানে? আমি যখন কেন্দ্রে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ছিলাম তখন নানা ব্যাপারে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে আমার বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে—হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস প্রকল্প, বেঙ্গল কেমিক্যাল অধিগ্রহণ, পশ্চিমবঙ্গের সরকারী উদ্যোগগুলিতে ডিরেক্টর নিয়োগ ইত্যাদি। সর্বদা দেখেছি জ্যোতিবাবু যেসব প্রস্তাব এনেছেন তার প্রত্যেকটি ন্যায্য এবং যুক্তিসঙ্গত। সেই জন্যই অন্য অনেক জায়গা থেকে বিরোধিতা এলেও তাঁর সব প্রস্তাব আমি মেনে নিয়েছিলাম। আরও দেখেছি আপনি যদি সহযোগিতার হাত বাড়ান তবে তার প্রতিদান দিতে জ্যোতিবাবু অসাধ্য সাধন করতে পারেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল অধিগ্রহণ করার আগে আমি জ্যোতিবাবুকে বলেছিলাম, কেন্দ্র প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব নেবে। কিন্তু আপনাকে দেখতে হবে ওই প্রতিষ্ঠানে যেন কোনও ট্রেড ইউনিয়নগত গণ্ডগোল না হয়। জ্যোতিবাবু নিজে সেই দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁর কথাতেই বেঙ্গল কেমিক্যালের শ্রমিক কর্মচারীরা বলেছিলেন অন্তত দুবছর তাঁরা সব ধরনের আন্দোলন থেকে নিজেদের নিরস্ত রাখবেন। আজ আমাদের তরুণ প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গকে অনেক টাকা দিয়েছেন বলে ঢাকঢোল পেটাচ্ছেন। কিন্তু কার টাকা দিয়েছেন তিনি? নিজের টাকা? রাজ্যকে প্রয়োজনে সাহায্য করাই তো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব।"

জ্যোতিবাবুকে যাঁরা চেনেন, তাঁরা সকলেই স্বীকার করেন, এই প্রখর বাস্তববোধই নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর সাফল্যের অন্যতম কারণ। ত্রিদিব চৌধুরি ও চিত্ত বসু দুজনেই বলেছেন, এই রকম প্রখর বুদ্ধি, সাধারণ জ্ঞান, ও বাস্তুমুখিনতা তাঁরা খুব কম নেতার মধ্যেই দেখেছেন। দীনেশ গোস্বামী বলেছেন, "জ্যোতিবাবুর বাস্তব বুদ্ধির জন্যই আজ পশ্চিমবঙ্গে আবার ফিরে এসেছে শিল্প বিকাশের অনুকূল পরিস্থিতি।" আর গীতা মুখার্জি বলেন, "শুধু প্রশাসনের ক্ষেত্রে নয়, জ্যোতিবাবুর সঙ্গে রাজনীতি করতে গিয়েও বারে বারে আমি তাঁর বাস্তববুদ্ধির পরিচয় পেয়েছি।" তার উদাহরণ দিতে একটি ছোটো অথচ মজার ঘটনার উল্লেখ করলেন গীতা দেবী।

তিনি বললেন, "সেটা ১৯৫২ সাল। তমলুক কেন্দ্রের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন অজয় মুখার্জি ও বিশ্বনাথ মুখার্জি। প্রচার সবে শুরু হয়েছে এমন সময় একদিন অজয়বাবু এসে বললেন, তোমাদের দল তো আচ্ছা দায়িত্বজ্ঞানহীন। একজন প্রার্থী খাড়া করে দিয়ে চলে গেল, অথচ তাকে জেতানোর কোনও চেষ্টাই কেউ করছে না। কথাটা আমার মনে লাগল, কলকাতায় জ্যোতিবাবুকে আমি সেকথা জানালাম। তিনি তখন দলের সম্পাদক। আমার কথা শুনে জ্যোতিবাবু বললেন, কাল আবার আসবেন কথা বলব। পরের দিন আবার গেলাম। জ্যোতিবাবু বললেন, দেখুন আপনার কথা শোনার পর ব্যাপারটা আমি খুব ভাল করে ভেবে দেখেছি। ভেবে মনে হয়েছে, আপনাকেই বিশ্বনাথবাবুর হয়ে প্রচারে নামতে হবে। যেতে হবে তমলুকে। জ্যোতিবাবুর কথা শুনে দারুণ রাগ হল আমার। ভাবলাম, আমি কেন? স্বামী-ভাসুরে লড়াই হচ্ছে, তার মধ্যে আমাকে টেনে আনা কেন? দলে কি আর কোনও লোক নেই? আমার সেই আপত্তির কথা জানালাম জ্যোতিবাবুকে। জ্যোতিবাবু তবুও অবিচল। বললেন, আপনি যদি না যান আমাকে "ম্যানডেট" দিতে হবে। কেন যেতে বলছি, আজ আপনাকে সেকথা বলব না। পরে একদিন বলব। কেন সেদিন জ্যোতিবাবু আমাকে পারিবারিক লড়াইয়ে অংশ নিতে বলেছিলেন, আজ আমি তা ভালই বুঝি। সেই নির্বাচনে বিশ্বনাথবাবু হেরেছিলেন মাত্র আড়াই হাজার ভোটে। তখনকার দিনে, বিশেষ করে অজয়বাবুর মতো প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে এটা কোনও ব্যবধানই ছিল না। এমনই কমনসেন্সওয়ালা লোক জ্যোতিবাবু।"

এই প্রখর বাস্তববোধ, ইংরেজিতে যাকে বলে "প্র্যাগমাটিজম", জ্যোতিবাবু দলের স্বার্থে, রাজ্যের স্বার্থে কাজে লাগিয়ে যাচ্ছেন অনবরত। ফলে সি পি এম আন্দোলনমুখী চরিত্র হারিয়ে ভবিষ্যতে ঘোরতর বিপদের মুখে পড়বে কিনা সে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার এটা জায়গা নয়, সেই সময়ও এখনও আসেনি। তবে এই মুহূর্তে এবং আরও কিছুকাল সি পি এম এই বাস্তববোধের ফসল তুলবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এর পাশাপাশি দেশের সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও ইসুতেই তাঁর মতামত আছে। সুস্পষ্ট এবং সুচিন্তিত। এই সব অভিমতের মধ্য দিয়েই জ্যোতিবাবু দূরের মানুষ হয়েও অনায়াসে পৌঁছে যান দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের কাছে। এই কথাটা বোধ হয় এই মুহূর্তে কংগ্রেসী-অ-কংগ্রেসী কোনও মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্রেই খাটে না।

যেমন ধরা যাক পঞ্জাব সমস্যার প্রসঙ্গ। সংসদে অকালি দলের নেতা বলবন্ত সিং রামুওয়ালিয়ার সঙ্গে কথা হয়। "শিখ মনস্তত্ত্বের কথা মাথায় রেখে জ্যোতিবাবু বারবার পঞ্জাব সমস্যা সম্পর্কে তাঁর বলিষ্ঠ মতামত রেখেছেন। তাছাড়া নভেম্বরের দাঙ্গায় কলকাতায় তাঁর সরকার যে ভূমিকা পালন করেছিলেন পঞ্জাবের প্রতিটি মানুষ তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। তাঁরা মনে করেন, এদেশে অন্তত একজন মুখ্যমন্ত্রী আছেন যিনি ধর্মনিরপেক্ষ এবং দক্ষ প্রশাসক।"

এই সব সর্বভারতীয় বিষয়গুলির মধ্যে আবার যে ইসুতে জ্যোতিবাবু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হয়েছেন, তা হল কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস। চিত্ত বসু মনে করেন সাম্প্রতিক কালে কোনও মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্র-বিরোধিতায় জ্যোতিবাবুর মতো এত বেশি সোচ্চার হননি। বস্তুত এইভাবে তিনি দেশের বিরোধী রাজনীতিতে সংযোজন করেছেন নতুন মাত্রা আর বিরোধী রাজনীতিবিদদের হাতে তুলে দিয়েছেন মোক্ষম শ্লোগান।

বিজয়ওয়াড়া, দিল্লি, শ্রীনগর এবং কলকাতায় অকংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলগুলির কনক্লেভে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন জ্যোতি বসু। সেই সব সম্মেলনে যেসব যৌথ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তার ওপরেও ছিল জ্যোতিবাবুর ব্যক্তিগত প্রভাব। বহুগুণা বললেন, "In conclaves, Jyoti Basu was always one for unanimity and in hammering points of discords, he had the ablest contribution." উন্নিকৃষ্ণণের ভাষায়, "He did it quite differently from the rest--DMK or the Akalis which had chauvinist undertones." এমনই প্রভাব ছিল জ্যোতিবাবুর, এমনই অকাট্য ছিল তাঁর যুক্তি যে শেষ পর্যন্ত ডি এম কে বা অকালি নেতারাও তাঁর কথায় সায় দিয়েছিলেন।

অতএব আজকের ভারতবর্ষে, বিশেষ করে রাজনৈতিক মহলে জ্যোতিবাবুর যে ভাবমূর্তি তা একজন বিরোধী নেতা হিসেবে, যিনি আয়ারাম গয়ারামদের বাজারে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান থেকে একবিন্দু সরে আসেননি, গদীর লোভে আদর্শের প্রশ্নে করেননি সমঝোতা, এবং তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠটিকে বরাবর রেখেছেন সোচ্চার। তবু সবটুকু কৃতিত্ব বোধ হয় জ্যোতিবাবুর একার নয়। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের যে প্রগতিশীল ও বামপন্থী ঐতিহ্য, রাজ্যের বাইরে সেটাই প্রতিফলিত হয়েছে জ্যোতিবাবুর মধ্য দিয়ে। পশ্চিমবঙ্গে প্রাদেশিকতা নেই, সাম্প্রদায়িকতা নেই। নেই, তার কারণ দীর্ঘ ঐতিহাসিক ঐতিহ্য। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জ্যোতিবাবু সেই ঐতিহ্যের প্রতীক। তাঁর কর্মস্থল যদি হিন্দি বলয়ে হত এই দুর্লভ সম্মান তাহলে তিনি পেতেন কি?

প্রশ্ন আছে আরও একটি। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যদি এত সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি না হত, এবং জ্যোতিবাবু যদি সেই শক্তির নেতা না হতেন তাহলে তাঁর এই ভাবমূর্তি হত কি? দলের ভিতরে ব্যক্তির ভূমিকা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু ব্যক্তির চেয়ে দল যে অনেক বড় তাতে বোধ হয় সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।
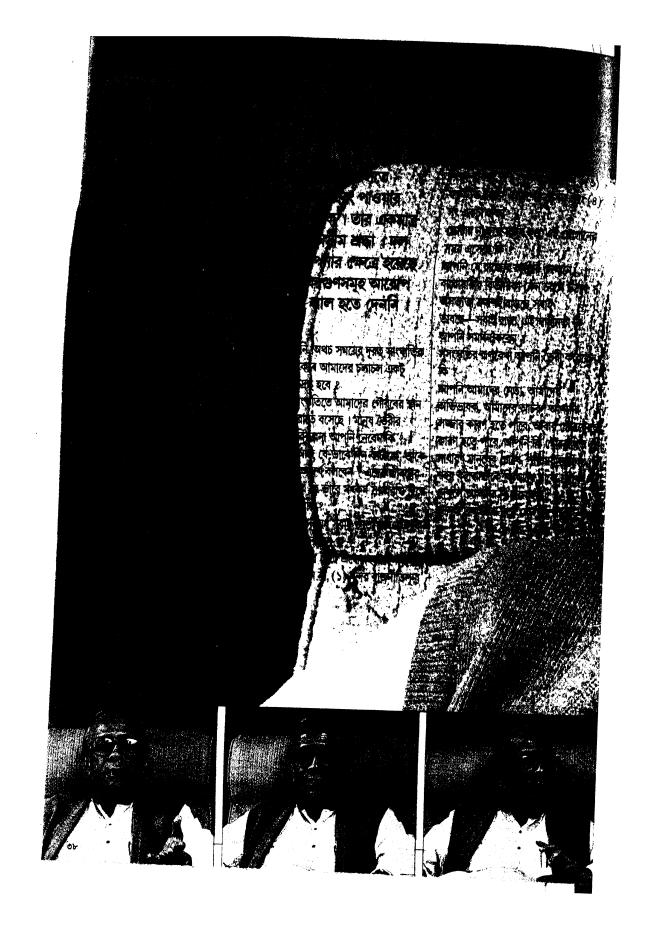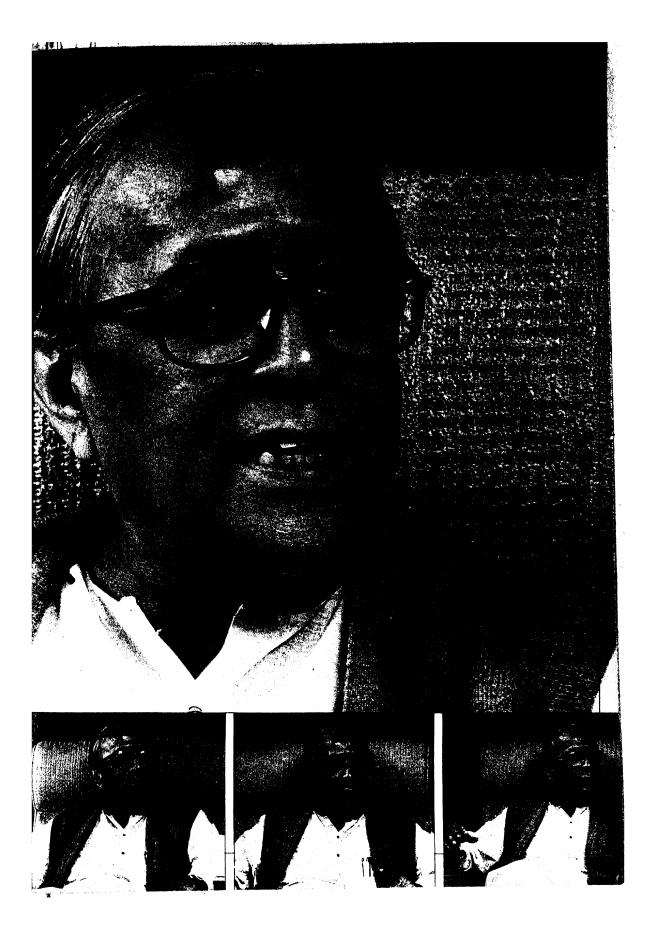
"ঠোঁটদুটি মোর হাসিমাখা যেন পাকা টুকটুকে চেরীফল, অন্তর মম খুশি-উচ্ছল সদ্যফোটা শতদল!"
ল্যাক্মে লিপস্টিক।
সবচেয়ে বেশী রকমের রঙের সম্ভার !
মেট্যালিক্স, গ্লীমারস্ আর এক ধরনের বিশিষ্ট 'ন্যাচারাল'!
আরো মোলায়েম — মসৃণ, আর সবচেয়ে সমান গ্লস।
রূপ ঝলমল, অন্তর খুশি-উচ্ছল করতে Lakmé

সর্বভারতীয় কি বিশ্বপ্রচারের একটা দিক থাকলে কেমন হয় ? খেলোয়াড়রা খেলতে যান, সাহিত্য কি সীমাবদ্ধই হয়ে থাকছে না, অনুবাদ আর প্রচারের অভাবে ?

সাহিত্য সম্পর্কে আপনার কি ভাবনা ?

হিন্দি টিভি আর কমার্শিয়াল আমাদের কালচার কুরে খাচ্ছে, সব ব্যাপারেই আমরা কেন্দ্রের পরাধীন, অথচ প্রতিবেশী বাংলাদেশে কেমন পরিচ্ছন্ন একটা বাঙালী কালচার প্রকাশ পাচ্ছে । এই সব দেখলে মনে হয় না কি, স্বাধীন স্বতন্ত্র একটা পশ্চিমবাংলার জন্যে আন্দোলন শুরু করা যেতে পারে !

সংস্কৃতি, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য সবই যদি ব্যবসাদারদেব হাতে চলে যায় তাহলে আগামী দশ বছরে আমাদের কি অবস্থা হবে ! বম্বে ছবির নায়ক হবে আমাদের প্রাণপুরুষ । হিউমার, উইট, লিটারেচার, ল্যাঙ্গোয়েজ সবই হয়ে যাবে সিনেমার পর্দামার্কা । আপনার কি মত ?

আমাদের কমার্শিয়াল যাত্রা, কমার্শিয়াল বাউলগান সম্পর্কে আপনার মতামত কি ? ব্যবসা থেকে আমাদের সংস্কৃতিকে কি ভাবে বের করে আনা যায় ?

রবীন্দ্রনাথকে যদি আমরা মেনে থাকি, তাহলে আপনাকে আরও কঠোর হতে হবে । সংস্কৃতির নোংরা আস্তাবল পরিষ্কার করতে হবে ।

বাঙালী দু'জনকে চেনে বিধান রায় আর জ্যোতি বসু । মার্কস, লেনিন, রাশিয়া, চীন প্রভৃতি বিদেশী বস্তু আর আমাদের নাচাতে পারে না, স্বদেশী জ্যোতিবাবুর কাছে আমরা চাই—সুস্থ সমাজ, সামাজিক শৃঙ্খলা, অনুসরণ করার মতো আদর্শ আর পরিবেশ । কবে পাব ?

সব চেয়ে বড় অপসংস্কৃতি হল দুর্নীতি, চুরি, পয়সা দিয়ে আইন কেনা, পয়সা দিয়ে নাগরিক সুখ-সুবিধে গ্রাস করা । এই অপসংস্কৃতি কবে আপনি কঠোর হাতে দমন করবেন ?

সামাজিক দিক থেকে দেখুন, কি লজ্জার কথা, অস্পৃশ্যতা এখনও আছে, এখনও তপশিলী জাতি, উপজাতি তাদের ওপর আক্রমণ হয়, আর এর কারণ রয়েছে, আমাদের মধ্যে, আমরা যেভাবে চিন্তা করি, কেন্দ্রীয় সরকার যে পথটা বেছে নিয়ে আমাদের চালাতে চাইছেন তাতে আমাদের উপকার হবে না, অপকারই হবে । সেটা সঠিক পথ নয়, মুষ্টিমেয়র উপকার হবে, বৃহতের অপকার । এর ফলেই যুব সমাজ আজ এত বিভ্রান্ত । তাদের সামনে ভবিষ্যৎ কোথায় । ওদের তো দোষ দিয়ে লাভ নেই । ভেবেছিল একরকম, হচ্ছে আর একরকম ।

বসু : আপনার প্রশ্নগুলো যেভাবে আছে যেমন সাহিত্যের দিকটা বা পরের দিকের অন্য প্রসঙ্গ, এর উত্তর দিতে গেলে অনেক সময় লাগবে । আপনি যদি ঠিক ওই ভাবেই চান তা হলে আমি বরং কাল পরশু লিখে পাঠাই ।

সঞ্জীব : না, তাতে আমাদের ঠিক মন ভরবে না । আমরা বরং একটু অন্যভাবে নতুন করে শুরু করি । আমাদের ওই রাজনীতি, অর্থনীতি, হ্যানাত্যানা এই সব কচকচি, যা অনেক হয়ে গেছে তার মধ্যে না গিয়ে, বর্তমানে যে মর‍্যাল অ্যান্ড স্পিরিচ্যুয়াল ক্রাইসিসের শিকার হয়েছি আমরা, সেই সম্পর্কে একটু প্রাণখোলা আলোচনা করা যাক । একথা তো আপনি স্বীকার করবেন, আমরা পারিবারিক শাসন, সামাজিক শাসন, প্রশাসনের শাসন কোনও কিছুই আর তেমন মানছি না মানবো না । সব ভ্যালুজ ভেঙে পড়েছে । মহাপুরুষের পথ নির্দেশ অকেজো । অতীতে আপনি বা আমি এমনটি দেখিনি কখনও ।

বসু : মহাপুরুষকে এখনও অনেকে মানে । এখন বরং আগের চেয়ে অনেক বেশি মহাপুরুষ হয়েছে । পৃথিবীময় মহাপুরুষ ।

সঞ্জীব : আমি সেই মাশরুম মহাপুরুষদের কথা বলছি না ।

বসু : না, আসল ব্যাপারটা কি, স্বাধীনতার পর আমাদের সামাজিক অবস্থা বা ব্যবস্থা যা হবার কথা ছিল, অর্থনীতির বিকাশ যা হওয়া উচিত ছিল, সেটা না হওয়াতে শাসকগোষ্ঠী যে পথটা বেছে নিয়েছেন, সেটা হল ধনতন্ত্রের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, আবার সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপোস করছেন, এইভাবে যদি চলতে থাকে তা হলে অর্থনীতি এমন একটা জায়গায় যাবে বা গিয়েছে, সেই অবস্থায় সাধারণের দারিদ্র্য আমরা কোনওদিন দূর করতে পারব না, বেকার সমস্যার সমাধান কোনওমতেই সম্ভব হবে না । তারপর টাকার দাম কমছে, ক্রয়ক্ষমতা কমছে, শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে, এই যে অদ্ভুত একটা পরিস্থিতি ভারতবর্ষে হয়ে গেল, এর জন্যে আমরা তো কেউ প্রস্তুত ছিলাম না । স্বাধীন হবার পর এরকম হবে কেন ? ভালো যে একেবারে হয়নি তা নয় । আমরা আত্মনির্ভরশীল হয়েছি, ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প বেড়েছে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা হয়েছে । যা হয়েছে তা যথেষ্ট নয়, এভাবে আর হবে না, কারণ সামাজিক আর অর্থনৈতিক দিকটা আমরা আলাদাভাবে কখনও বিচার করে দেখিনি । অনেক আগেই যা করা উচিত ছিল । সামাজিক দিক থেকে দেখুন, কি লজ্জার কথা, অস্পৃশ্যতা এখনও আছে, এখনও তপশিলী জাতি, উপজাতি তাদের ওপর আক্রমণ হয়, আর এর কারণ রয়েছে আমাদের মধ্যে, আমরা যেভাবে চিন্তা করি, কেন্দ্রীয় সরকার যে পথটা বেছে নিয়ে আমাদের চালাতে চাইছেন তাতে আমাদের উপকার হবে না, অপকারই হবে । সেটা সঠিক পথ নয়, মুষ্টিমেয়র উপকার হবে, বৃহতের অপকার । এর ফলেই যুবসমাজ আজ এত বিভ্রান্ত । তাদের সামনে ভবিষ্যৎ কোথায় ! ওদের তো দোষ দিয়ে লাভ নেই । ভেবেছিল একরকম, হচ্ছে আর একরকম । শিক্ষার ব্যাপারে দেখছেন কি অবস্থা ! কে ভেবেছিল, স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও শতকরা বাট ভাগ নিরক্ষর থাকবে । কল্পনা করা যায় ! এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে দুর্নীতি । এই যে আপনার প্রশ্নে আছে দুর্নীতি, এটা ঠিকই । ধনতান্ত্রিক

আমরা রবীন্দ্রনাথের একশো পঁচিশতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সারা বছরের কর্মসূচীতে স্কুল, কলেজের ছেলে-মেয়েদের নানা সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানে টেনে আনার চেষ্টা করছি। লেখা, গান, আবৃত্তি, অভিনয়। সুস্থ সংস্কৃতিতে তরুণ-তরুণীদের অঙ্গীকরণের আয়োজন। তবে হ্যাঁ ওই যে আপনি আপনার প্রশ্নের শেষের দিকে কমার্শিয়াল যাত্রার কথা বলেছেন, ঠিকই, তবে এও আমি দেখেছি, কমার্শিয়াল যাত্রা নয়, সুস্থ সংস্কৃতিমূলক পালা, বিশ বাইশ হাজার গ্রামবাসী সারা রাত ধরে শুনছে, আমিও হয়তো বসে আছি তাদের সঙ্গে। আমাদের দুর্ভাগ্য হল এই, আইন করে তো আর অপসংস্কৃতি বন্ধ করা যাবে না, যায়ও না।

আর সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গেছে। এর জন্যে রাজনৈতিক দলেরা দায়ী, সরকাররা দায়ী। এর দিকে তো কেউ নজরও দেয়নি। এখন এটা একটা ঘটনা। ওপরতলা যদি দুর্নীতিতে ছেয়ে যায়, তলার মানুষকে আমরা কি করে উদ্ধার করব। সমস্ত সমাজের মধ্যে এটা ছড়িয়ে গেছে। মর্‍্যালিটির দিক থেকে এটা একটা ভয়ঙ্কর আঘাত। অস্বীকার করার কোনও উপায় আমি দেখছি না।

সঞ্জীব : এর জন্যে কি কিছু করা হচ্ছে?

বসু : করা হয়েছে। করা তো শুধু বক্তৃতা দিলে হবে না। আমাদের কত মনীষী কত বক্তৃতাই তো দিয়ে গেলেন, ভালো হও, মানুষ হও, অনেক কিছু বলে গেলেন, ওতে কিছু দিন হয়তো হতে পারে, শেষ অবধি কিছু হয় না। মূলত কিছু হয় না, কারণ অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গেই মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে আছে, সেই অর্থনৈতিক প্রত্যাশা পূর্ণ না হলে মহাপুরুষের বাণী কি বক্তৃতায় কি হবে! ধর্মের কথা শুনিয়েই বা কি হবে! পরিবর্তন আনতে হবে অর্থনীতির দিক থেকে, যা বক্তৃতায় হবে না, ধর্মের কথা শুনিয়ে হবে না, মহাপুরুষের বাণীতে হবে না।

সঞ্জীব : আচ্ছা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, আপনাদের দলীয় সংগঠন বেশ বড় এবং জোরদার, সেই সংগঠনকে কোনওভাবে কাজে লাগানো যায়। যেমন হই-হই করে বারোয়ারী পুজো, গলায় গামছা দিয়ে চাঁদা আদায়, সারা রাত হিন্দি সিনেমার গানের জলসা, প্রচুর অর্থের প্রবল অপচয় না করে, গঠনমূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করা। স্বাধীনতার আগে স্বদেশী আমলে যেমন হত, নাইট স্কুল করা, নিরক্ষরদের শিক্ষিত করার চেষ্টা করা, ব্যায়াম সমিতি করা। হয়তো খুবই অ্যামেচারিশ ছিল ; তবু একটা বাঁধন। গঠনমূলক কিছু।

বসু : যায় ; এবং আমরা করছি। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে তো তেমন কিছু করা যাচ্ছে না। আমাদের ক্রীড়া সংস্কৃতি বিভাগ নানা সময়, বিভিন্ন ধরনের আয়োজন করছে। আমরা রবীন্দ্রনাথের একশো পঁচিশতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সারা বছরের কর্মসূচীতে স্কুল, কলেজের ছেলে-মেয়েদের নানা সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানে টেনে আনার চেষ্টা করছি। লেখা, গান, আবৃত্তি, অভিনয়। সুস্থ সংস্কৃতিতে তরুণ-তরুণীদের অঙ্গীকরণের আয়োজন। তবে হ্যাঁ ওই যে আপনি আপনার প্রশ্নের শেষের দিকে কমার্শিয়াল যাত্রার কথা বলেছেন, ঠিকই, তবে এও আমি দেখেছি, কমার্শিয়াল যাত্রা নয়, সুস্থ সংস্কৃতিমূলক পালা, বিশ বাইশ হাজার গ্রামবাসী সারা রাত ধরে শুনছে, আমিও হয়তো বসে আছি তাদের সঙ্গে। আমাদের দুর্ভাগ্য হল এই, আইন করে তো আর অপসংস্কৃতি বন্ধ করা যাবে না, যায়ও না। এটাকে আটকাতে হলে আমাদের এমন কিছু পরিবেশন করতে হবে যা প্রগতিশীল, সুস্থ সংস্কৃতিমূলক, শুধু তাই নয় মানুষকে আনন্দ দেবার ক্ষমতাও থাকা চাই। শুধু রাজনীতির কচকচি নয়। রাজনীতির কথা বললেই সাহিত্য হয় না, সংস্কৃতি হয় না। ওই স্রোত রুখতে হলে আইন নয় চাই পাল্টা পরিবেশন, যে পরিবেশনার উপাদানে আনন্দ থাকবে, রুচি থাকবে, সাহিত্য থাকবে। শুধু রাজনীতির কিছু কথা বলে দায়সারা করলে চলবে না।

সঞ্জীব : দেখুন দক্ষিণ ভারতে টেলিভিশানে দিবারাত্র হিন্দি অনুষ্ঠান ঢুকতে পারেনি, আর আমাদের এখানে যখনই খুলবেন তখনই শুনবেন, 'মতলব, মতলব'। এর হাত থেকে কোনওভাবে আমাদের বাঁচানো যায় কি?

বসু : এটাও শুনুন, আমরা, কাগজে-টাগজেও বেরিয়েছে, আমাদের কথা। বহুদিন ধরে আমরা টেলিভিশানের কার্য-পদ্ধতি, অনুষ্ঠান সূচীর বিরোধিতা করে আসছি। আমরা বলছি, এটা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে কেন্দ্রের একটা যন্ত্র। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচার-যন্ত্র। আর ওদের পার্টির জন্যে এটা করে ; কিন্তু এটা তো ঠিক না। আমাদের দেশে আমরা চেয়েছি বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে ঐক্য। সব নিয়ে ভারত। সব নিয়ে আমরা ভারতীয়। তার প্রতিফলন একেবারেই হচ্ছে না।

সঞ্জীব : একেবারেই হচ্ছে না!

বসু : একেবারেই হচ্ছে না। এবং একটা কথা আপনি বলেছেন, আপনার কোয়েশ্চেনিয়ারে আছে, খানিকটা ঠিকও, বাঙলাদেশের টি ভি প্রোগ্রাম, সব সময় না দেখলেও, মাঝে মাঝে দেখে আমার মনে হয়েছে, ভারি সুন্দর প্রোগ্রাম। বেশ সুন্দর।

সঞ্জীব : সংস্কৃতির সুন্দর সুস্থ একটা চেহারা ফুটে উঠছে।

বসু : এই যে একটা সেকেন্ড চ্যানেল হবে বলছে, আমরা দাবি করছি আমাদের তা হলে সেকেন্ড চ্যানেলটা দাও। আমাদের হাতে দাও। আমাদের কর্মসূচী করতে দাও। আমাদের ওরা জিজ্ঞেসই করে না। এই যে সব হয়-টয়, আপনি দেখেন, এর সঙ্গে আমাদের কোনও যোগ নেই। দেখতেও ইচ্ছে করে না। আমাদের নিজেদের তো অনেক কিছুই বলার থাকে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আরও কত কি, অথচ আমাদের কিছু জিজ্ঞেসই করে না।

সঞ্জীব : আচ্ছা, আপনাদের নিয়ন্ত্রণে কিছু সিনেমা-হল আছে কি?

বসু : না, আমাদের নিয়ন্ত্রণে ঠিক নেই, তবে আমরা করার চেষ্টা করছি। আমাদের বাংলা ছবি খুব নাম করেছে অথচ বকস অফিস নেই, সেইসব ছবি যাতে হাউস পায়, যাতে আমরা সাধারণ মানুষকে দেখাতে পারি, তার জন্যে আমরা যৌথ উদ্যোগে কিছু করার চেষ্টা করছি। তবে সময় লাগবে। আমার নিজের ধারণা আরও একটু আগে করতে পারলে ভালো হত।

সঞ্জীব : বাগবাজারের গিরীশ মঞ্চকে যথোচিত কাজে লাগান যাবে তো? অন্য কোনও ভাবে, পূর্ণতর রূপে।

বসু : হ্যাঁ, আমরা তো শহরের বিভিন্ন প্রান্তে এই রকম আরও কয়েকটি মঞ্চ করেছি এবং করব। উত্তরে গিরীশ মঞ্চ। দক্ষিণেও একটি হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে মধুসূদন মঞ্চ।

সঞ্জীব : গিরীশ মঞ্চে সিনেমা দেখানো যাবে? ভালো ছবি, যা হাউস পায় না?

বসু : যাবে। তবে দেখেছেন তো, অ্যাকোমোডেশান অনেক কম। তা ছাড়া কিছু টেকনিক্যাল ডিফিকালটিজও আছে। তবে আমরা ভাবছি বা ভেবেছি, যে সব অসুবিধে আছে সেগুলো ঠিক করে আমরা শুরু করে দেবো। হয়তো বক্স অফিস হবে না। তবে ভালো ছবি যাঁরা দেখতে চান তাঁরা সুযোগ পাবেন, যেমন আমাদের নন্দন হয়েছে। সেখানে আমরা পুরনো দিনের নতুন দিনের অনেক ছবি দেখিয়েছি। এবং মানুষ একেবারে ভরে গেছে। মানে অবাক হবার মতো ভিড়।

সঞ্জীব : আচ্ছা, ইংরেজ আমলে আমরা যেমন বলতুম না, ইংরেজ আমাদের ঘাড়ে চেপে বসে আছে, এখনও সেইরকম আমরা বলব দিল্লী আমাদের ঘাড়ে চেপে বসে আছে। হাত পা বাঁধা।
বসু : এঁদের তো আমি আর ইংরেজের সঙ্গে তুলনা করতে পারি না। আমাদেরই দেশের লোক ওঁরা। [হেসে] ; কিন্তু আমরা যেটা বলি, আপনি সাহিত্যিক, আপনি সেসব জানেন কি না জানি না, আমরা বলি কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক, এটা একেবারেই ঠিক নয়। ভারতবর্ষে যে ব্যবস্থা হওয়া উচিত, যেমন কেন্দ্রের কি ক্ষমতা, রাজ্যের কি ক্ষমতা, আমরা একটা পুস্তিকা বার করেছি। এই ক্ষমতা চিহ্নিত হওয়া উচিত। ইন্দিরা গান্ধী কমিশন বসিয়েছিলেন, সারকারিয়া কমিশন। বাধ্য হয়ে বসিয়েছিলেন। আমরা যা বলেছি, তা না হলে, ওই দিল্লীতে বসে সমস্ত কেন্দ্রীভূত করে যদি কাজ করো তাহলে ভারতবর্ষ দুর্বল হয়ে যাবে। শুধু সৈন্যসামন্ত দিয়ে, পুলিশবাহিনী দিয়ে ভারতকে শক্তিশালী করা যাবে না। এইটা আমাদের মত ; এবং মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে। তা ছাড়া আর একটা প্রশ্ন আজ উঠেছে, আগে তো সবই কংগ্রেস দলের সরকার ছিল, এখন তো তা নয়, এখন ধরুন ন'টা রাজ্য বোধহয় অকংগ্রেসী। তাদেরও কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করতে দিতে হবে। তাদের নিজস্ব কর্মসূচী রূপায়ণের পথ করে দিতে হবে। সে জন্যে ক্ষমতার দরকার, অধিকার দরকার। এইটা ওদের পছন্দ না। ওরা সমস্ত কিছু কেন্দ্রীভূত করতে চাইছে। যে জন্যে মাঝে মাঝেই চেষ্টা হয় হিন্দী চাপানোর। আমরা বলি ভারতবর্ষে তো এটা হতে পারে না, হিন্দী একটা ভাষা যেমন, তেমনি অন্য অনেক ভাষা আছে। অগ্রসর ভাষা।
সঞ্জীব : দক্ষিণের পথ ধরে আমরা বাঁচতে পারি না ?
বসু : না না, ওরা আবার অনেক সময় একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলে। এটাও তো ঠিক আমি বাঙালী হতে পারি কিন্তু আমি ভারতবাসী তো ! আমাদের যুবসম্প্রদায় অনেক সময় ভুলে যাচ্ছে যে আমরা ভারতবাসী। এই টানাপোড়েন যদি চলে আর প্রত্যেকেই যদি নিজের নিজের কথা ভাবতে থাকে আমি যে ভাষায় কথা বলি, সে-ই আমার লোক কেবল তারই কথা আমি ভাববো, তাহলে ভারতবর্ষ তো কোনওদিনই এগোতে পারবে না। বড় হতে পারবে না। বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য মানেই হচ্ছে, বিভিন্নতা যেটা আছে সেটা মেনে নিতে হবে, তাদের ভাষা, তাদের সংস্কৃতি, তাদের জীবনযাত্রা, তাদের যা কিছু ভালো আছে মেনে নিতে হবে, মেনে নিয়ে, সেটা তো ভারতবর্ষেরই একটা অংশ, বাইরের তো কিছু নয়, ওরা সেটা মানে না, মানে না বলেই, মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব ফতোয়া জারি করে উদ্ভট সব পরিকল্পনা, জোর করে হিন্দি চালু করা। জোর করে কি কিছু চালু করা যায়। ওরা যে ওই কতগুলো স্কুল চালু করার কথা বলেছেন, পয়সা খরচ করে, নবোদয় স্কুল। আমাদের সঙ্গে মতের মিল হচ্ছে না। কেন ? ওঁরা বলছেন ওই স্কুলের পড়াবার মাধ্যম হবে ইংরেজী অথবা হিন্দী। কেন হিন্দী ! আমাদের ছেলেমেয়েরা হিন্দীতে পড়বে কেন। হিন্দীর তারা কি জানে ? আমাদের ভাষা তো বাঙলা। হিন্দী তো কমপালসারি। সেইজন্যে ওঁদের মন্ত্রীদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে, আমরা রাজীব গান্ধীকে বলেছি, এটা হতে পারে না। কখনই হতে পারে না। তুমি ইংরেজি করো। ইংরেজীকে আমরা রেখেছি, কমপালসারি, রাখতে বাধ্য হয়েছি

ছবি : অলক মিত্র

আমাদের কত মনীষী কত বক্তৃতাই তো দিয়ে গেলেন, ভালো হও, মানুষ হও, অনেক কিছু বলে গেলেন, ওতে কিছু দিন হয়তো হতে পারে, শেষ অবধি কিছু হয় না। মূলত কিছু হয় না, কারণ অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে আছে, সেই অর্থনৈতিক প্রত্যাশা পূর্ণ না হলে মহাপুরুষের বাণী কি বক্তৃতায় কি হবে! ধর্মের কথা শুনিয়েই বা কি হবে! পরিবর্তন আনতে হবে অর্থনীতির দিক থেকে, যা বক্তৃতায় হবে না, ধর্মের কথা শুনিয়ে হবে না, মহাপুরুষের বাণীতে হবে না।

আমরা ভারতবর্ষব্যাপী সব জায়গায়, আমরাও রেখেছি, ছেলেমেয়েরা ইংরেজি পড়ছে, তার সঙ্গে বাঙলা পড়ছে, বাঙলা মাধ্যম, বাঙলায় পড়ছে, তা তুমি জোর করে হিন্দী চাপাতে চাইছ কেন? না, এতে না কি ন্যাশন্যাল ইন্টিগ্রেশন হবে। কি করে হবে? ঠিক উল্টোটা হবে।

সঞ্জীব : আপনাকে আমি এইবার একটা উদ্ভট প্রশ্ন করি। মনে করুন আমি আপনার সন্তান। আপনি আমাকে কি উপদেশ দেবেন! কি হও বলবেন?

বসু : [হেসে] কি হও বলবো! বলবো, মানুষ হও। এর নানা অর্থ হতে পারে, যেমন নিজে ভালো হতে হবে। দশজনের কথা চিন্তা করতে হবে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আত্মকেন্দ্রিক হলে চলবে না। দেশের কথা ভাবতে হবে। শুধু আমি আছি, আমার পরিবার আছে তা নয়, দেশ বলে একটা জিনিস আছে।

সঞ্জীব : এটাও তো এক ধরনের আধ্যাত্মিকতা?

বসু : সে যদি আপনি আধ্যাত্মিকতা বলেন তো আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতা তো বটেই। স্পিরিচ্যুয়ালিজম বলতে পারেন। যেটাকে ইংরেজিতে স্পিরিচ্যুয়ালিজম আপলিফ্‌টমেন্ট বলে, সেটা তো নিশ্চয় দরকার।

সঞ্জীব : এই ব্যাপারে সারা ভারতবর্ষে খুব একটা চেষ্টা নেই।

বসু : সেটা কি করবেন? সেটা ধরুন দু'ভাবে হতে পারে। একটা ধরুন, যাঁরা ধর্মীয় মানুষ তাঁরা ধর্মের দিক থেকে মানুষকে বলছেন, উপদেশ দিচ্ছেন। আমরা বলছি, শুধু ধর্মের কথায় মানুষকে ভালো হও বললে, মানুষ ভালো হবে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা একটু বদলাতে, একটু পালটাতে না পারলে সব উপদেশ ভেসে যাবে।

সঞ্জীব : তার মানে সৎসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থ, সৎ জীবন দর্শনের প্রয়োজন।

বসু : এই গুলোর সঙ্গে, আমি বলছি, স্কুলে কি হচ্ছে, পাড়ায় কি হচ্ছে, বাড়িতে কি হচ্ছে, আপনার কিছু আশা আছে কি না, ভবিষ্যতের জন্যে। আমাদের যুবসম্প্রদায়ের অবস্থাটা কি, তারা তো কোনো আশাই পাচ্ছে না। তাদের কি হবে! আমরা তো লেখাপড়া করছি, তারপর! তারপর কি হবে? এই আশাটাও তো সৃষ্টি করতে হবে। আশার পরিবেশ। অর্থনীতিটা আমাদের বদলাতে হবে। এই অর্থনীতিতে আমাদের চলবে না, যেখানে মুষ্টিমেয়ের জন্যে অর্থনীতি। এটাতে এই দুরবস্থার দিকেই আমরা যাব।

সঞ্জীব : এর থেকে মুক্তির কোনো আশা আছে?

বসু : তা থাকবে না কেন? তার জন্যেই তো আমরা লড়াই করছি, তবে পশ্চিমবাংলায়, আমরা যারা বামপন্থী, আমরা যদি ভারতের আরও অনেক জায়গায় সেই শক্তি অর্জন করতে না পারি, তাহলে শুধু মাত্র একটা জায়গায় কি করে সেই পরিবর্তন আনবো? বড় রকমের একটা পরিবর্তন চাই, সে আপনি বিপ্লব বলুন, আর যা-ই বলুন।

সঞ্জীব : সেটা করতে হলে তো, চলো দিল্লি বলতে হয়?

বসু : না না, চলো দিল্লী তো আছেই। দিল্লী না গেলে আপনি করবেনটা কি। ওইখানে বসেই তো প্ল্যানিং করছে, পরিকল্পনা হচ্ছে।

সঞ্জীব : আমাদের টাকার একটা বড় ভাগ তো ওইখানেই চলে যাচ্ছে।

বসু : সে তো যাচ্ছেই। অবিচারও হচ্ছে। রাজনীতিগত ভাবে অবিচার হচ্ছে। আবার শুধু রাজনীতিগত ভাবে নয়, ওদেরও যেখানে সরকার আছে, সেখানেও হচ্ছে। ওদের মানুষের ওপর বিশ্বাস নেই, এটাই আমার ধারণা।

সঞ্জীব : আচ্ছা, এখানে, আপনাদের দুটো টার্মসে বেকার সমস্যার কি সামান্য কিছুও সমাধান হয়েছে?

বসু : না না, কি করে হবে? এখানে একটা প্রচার হয়, আপনারা এখানে সরকারে আছেন, বেকার সমস্যার কি করলেন?

সঞ্জীব : না, না, আপনারা আছেন বলে নয়, এটা তো আমাদের অনেক দিনের সমস্যা। সমাধানের পথে ধীরে ধীরে এগোচ্ছি, না পেছোচ্ছি?

বসু : এখানে একটা যা হয়েছে, তা হল গ্রামে মানুষের জন্যে আমরা কিছু করতে পেরেছি। কর্ম সংস্থান করতে পেরেছি, যখন ওদের ওই কৃষিকাজ ফুরিয়ে যায়, তখন ওই তিন চার মাস সময়, ওরা খেতে পেত না, অর্ধাহারে থাকত ওই সময়টায় আমরা কৃষির বিকল্প কিছু কাজের সুযোগ করে দিতে পেরেছি। মানুষের মনে এখন একটা আশা জেগেছে। মানুষ এখন মাথা উঁচু করে চলতে পারছে। সে ক্ষেতমজুর হোক, গরীব মানুষ হোক, সে উপজাতি হোক। এটা কোনও কালে ছিল না। মাথা নীচু করে থাকতে হত, জমিদার, জোতদারদের কাছে। এখন সেটা নেই।

সঞ্জীব : কিন্তু শহর আর শহরতলির মানুষ বোধহয় একটু বিপদে পড়ে আছে।

বসু : শহরে একটু মুশকিল, কেন জানেন, শিল্প যদি না হয়, শিল্পে তো আমাদের প্রথম স্থান ছিল, যখন স্বাধীন হই আমরা। এখন আমরা নেমে গেছি।

সঞ্জীব : আপনি তো বড় শিল্পপতিদের আহ্বান জানিয়েছেন, তার ফলে কিছু হবে কি?

বসু : হচ্ছে। এইটারই তো অভাব ছিল।

সঞ্জীব : বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছু হবে তো।

বসু : হ্যাঁ, হবে। অনেকটা হবে। অনেকটা হবে। তবে সব বেকার-সমস্যার সমাধান তো করতে পারব না। এই ক্যাপিটালিস্ট পরিকল্পনা থাকলে তা করাও যায় না। তবে এরই মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি যা করছি, তাতে আশার আলো খানিকটা জেগেছে। ছেলেমেয়েরা হয় তো চাকরি পাবে।

সঞ্জীব : আচ্ছা ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনটা কি মাঝে মাঝে একটু উগ্র হয়ে যায়?

বসু : মাঝে-মাঝে একটু উগ্র হয়ে যায় কারণ সবাই তো আর সমান হয় না। তবে আমাদের এখানে যা হচ্ছে তা বম্বের তুলনায় কিছুই নয়।

সঞ্জীব : কিন্তু কিছু কিছু কলকারখানা বোধ হয় নতুন করে আবার বন্ধ হচ্ছে?

বসু : না না সে শ্রমিকদের কারণে নয়।

সঞ্জীব : বরানগরে বড় একটা জুট মিলে হালফিল লক আউট হয়েছে।

বসু : না না সে শ্রমিকদের জন্যে নয়। সে মালিকরা করছে।

সঞ্জীব : কিছু করা যাবে না?

বসু : কি করে যাবে? ও তো প্রাইভেট সেক্‌টার। যে কারণে আমরা সেন্টারকে বলেছিলুম, চটকলগুলো পাঁচটা কি ছটা পরিবারের হাতে থাকবে কেন? ওগুলো আপনারা নিয়ে নিন। এর ওপর শ্রমিক আছে নির্ভর করে, এর ওপর কৃষক আছে নির্ভর করে। দশ বারো লাখ পরিবার। সে হল না। ওঁরা বললেন, না আমরা

ওদেরই, যারা ব্যক্তিগত মালিকানা করে তাদেরই পয়সা দেবো।
সঞ্জীব : ওদেরই হুইমসে চলবে।
বসু : হ্যাঁ, ওদেরই হুইমসে চলবে। এই জন্যেই তো দিল্লী যাওয়া দরকার। তা না হলে এই পরিকল্পনাগুলো করবে কে? আমরা তারই মধ্যে থেকে, ওই আওতার মধ্যে থেকে, সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, আমরা যতটা পারি, আগের তুলনায় আমরা মানুষের উপকার করবার চেষ্টা করছি। যা আমরা পেরেছি, কুটিরশিল্প পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, আমাদের এখানে এসব একেবারে ধ্বংসে হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা অতটা করতে পারিনি।
সঞ্জীব : এক সময় আমাদের হ্যাণ্ডিক্র্যাফটসের অনেক একসপোর্ট ছিল। এখনও সে লেভেলটা আছে?
বসু : হ্যাণ্ডিক্র্যাফটস আমাদেরও আছে, প্রাইভেট সেক্টারেও আছে। আমাদের হ্যাণ্ডিক্র্যাফটস আর ওই যে তাঁতশিল্প খুব প্রসপারাস, খুব উন্নতি হয়েছে। খুব উন্নতি।
সঞ্জীব : আর স্মলস্কেল?
বসু : স্মলস্কেলের খুব উন্নতি হয়েছে।
সঞ্জীব : আর ইণ্ডাসট্রিয়াল স্টেট। যা ছিল?
বসু : যা ছিল আছে। আমরা নতুনও কিছু করেছি। বেশ সাড়া পাচ্ছি।
সঞ্জীব : একটা দৃশ্য খুব দৃষ্টিকটু লাগে, মেডিকেল কলেজটা দিনের পর দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। বাড়িটার চেহারা। রঙচটা, ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। আমাদের প্রায় সব হাসপাতাল আর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বড় করুণ অবস্থা। এর কিছু করা যায়!

বসু : জানি তো। একটা কথা কি জানেন, সেখানেও ডাক্তার, নার্স, কর্মী এঁদের যৌথ প্রচেষ্টা যদি না হয়, সরকার শুধুমাত্র অর্ডার দিয়ে তো কিছু করাতে পারে না। ওখানে অনেক দুর্বলতাই আমাদের থেকে গেছে।

সঞ্জীব : জনচিকিৎসার জন্যে কিছুই কি তা হলে করা যায় না?
বসু : করা মানে, আমাদের দুটো দিক আছে, যেমন ওদের বোঝানো, আমাদের পথে টেনে আনা, সাধারণ মানুষের উপকার কি করে করতে পারে, সেটা বোঝানো, চেতনা আর কি, এইটা বাড়ানো, আর একটা হচ্ছে কিছু জোরও দরকার। যে কাজ করে না, কিছু করে না, তার ওপর একটু তদারকি। যাতে করে তার ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু শুধু জোর করেও তো হবে না। কারণ ওর মধ্যে অনেক রকম আছেন, যাঁরা মানে হসপিট্যাল চালান।

সঞ্জীব : আচ্ছা, আর একটা জিনিস লক্ষ করেছেন, যেসব কাজে পয়সা হয় তো লাগে না, একটু ডিউটিফুল হলেই হয়, সে সব কাজও আজকাল হতে চায় না। কেমন যেন একটা অবহেলার ভাব এসে গেছে। যেমন ধরুন মিউনিসিপ্যাল এলাকায়। যার রাস্তাঘাট ঝাঁট দেবার কথা, সে আর ঝাড়ু নিয়ে বেরোয় না, জঞ্জাল পড়েই থাকে, কেউ তুলে নিয়ে যায় না।

বসু : হ্যাঁ, সে খানিকটা হয়। সবটাই যে ঠিকভাবে হচ্ছে, এমন কথা আমি বলি না। এইটাকেই আমি বলি মনিটারিং-এর অভাব। আপনি যেটাকে বলছেন, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ল্যাপসেস। প্রতিনিয়ত মনিটারিং দরকার।

সঞ্জীব : আপনাদের সংগঠন তো বেশ শক্তিশালী। কেন্দ্রে কেন্দ্রে ক্যাডার আর নেতারা রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে কেন্দ্রের। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সুষ্ঠু মনিটারিং কি সম্ভব?

বসু : আমাদের একটা পদ্ধতি আছে। আমাদের পার্টি তো আর ছোট নেই এখন। অনেক বড় হয়েছে। সেই জন্যে যোগাযোগের একটু অসুবিধাও হয়। কিন্তু আমরা একটা পদ্ধতি ঠিক করে নিয়েছি, যাতে যোগাযোগটা ঠিক থাকে। একটা পর্যালোচনা হয়। আমাদের জেলা কমিটি আছে, স্থানীয় কমিটি আছে। একেবারে তলে গ্রামে গ্রামে আমাদের ইউনিট আছে। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগাযোগ আছে। কোথাও কোনও দুর্বলতা থাকলে আমরা দূর করার চেষ্টা করি।

সঞ্জীব : তবে প্রশাসনিক দুর্বলতা পুরোপুরি দূর করার অসুবিধে আছে। তাই না? ভেস্টেড ইন্টারেস্ট ঢুকে আছে।
বসু : হ্যাঁ, মুশকিল আছে। আমি আপনাকে পার্টির কথা বললুম। প্রশাসনে অনেক দুর্বলতা আছে। কিন্তু পঞ্চায়েতে আমাদের অনেক লাভ হয়েছে, একথা আমি বলতে পারি। সতের বছর কোনো পঞ্চায়েত ছিল না, কংগ্রেস আমলে কোনো পঞ্চায়েত ছিল না।

সঞ্জীব : আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, সেখানে একটা ডেডলক তৈরি হয়েছে, লগজ্যামও বলা যায়, কিন্তু অন্যান্য স্কুল কলেজ বেশ ভালই চলছে, তাই না? শিক্ষা মনে হয় ভালোই এগোচ্ছে!
বসু : শিক্ষা মোটামুটি আগের থেকে অনেক ভালো হয়েছে, অনেক সুবিধে হয়েছে। ছেলে-মেয়েদের অনেক সুবিধে হয়ে গেছে। বারো ক্লাস অবধি অবৈতনিক করে দিয়েছি আমরা। আর স্কুলে কিছু বইও আমরা বিনামূল্যে দিচ্ছি। একটা আশা হয়েছে, শিক্ষাটা এখন আরও ব্যাপকতর হয়েছে।
সঞ্জীব : একটা অসুবিধে হয়েছে, কমারশিয়ালিজম আমাদের সংস্কৃতির ভালো ভালো দিক একেবারে নষ্ট করে দিচ্ছে। আপনি গান ভালবাসেন। গানের ওপর আপনার সুন্দর বক্তৃতা আমি শুনেছি। দু মাত্রার ঘাসকাটা তালের গান আমাদের মার্গ সঙ্গীতের ভূমি নষ্ট করে দিচ্ছে। আমাদের আর্ট কলেজে আর সে-প্রাণ নেই।
বসু : গান তেমন বুঝি না, তবে শুনতে ভাল লাগে। গানটান তো এখানে বেশ ভালই হচ্ছে। ওই যে উড়িষ্যার এক নৃত্যশিল্পী আমার কাছে এসেছিলেন। সল্ট লেকে জমি দিয়েছি। বেশ ভালোই শেখাচ্ছেন।
সঞ্জীব : ভালো একজন ক্লাসিক্যাল শিল্পীর নাম বলুন। পশ্চিমবাঙলার।
বসু : সে আমি পারবো না। অন্য প্রদেশের মতো এখানে হয়তো তেমন চর্চা নেই। ক্লাসিক্যাল গানের জোর হয়তো কমছে।
সঞ্জীব : সাহিত্যেও মনে হয় কমারশিয়ালিজম ঢুকে গেছে! সাহিত্য কি আগের মতো হচ্ছে। আমাদের পুজো-সাহিত্য?
বসু : আ, সেইটাই তো দুঃখের বিষয়।
সঞ্জীব : কি করা যায়?
বসু : সে তো আপনারাই আছেন, আপনারাই সব করবেন।

আমাদের একটা পদ্ধতি আছে। আমাদের পার্টি তো আর ছোট নেই এখন। অনেক বড় হয়েছে। সেই জন্যে যোগাযোগের একটু অসুবিধাও হয়। কিন্তু আমরা একটা পদ্ধতি ঠিক করে নিয়েছি, যাতে যোগাযোগটা ঠিক থাকে। একটা পর্যালোচনা হয়। আমাদের জেলা কমিটি আছে, স্থানীয় কমিটি আছে। একেবারে তলে গ্রামে গ্রামে আমাদের ইউনিট আছে। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগাযোগ আছে। কোথাও কোথাও দুর্বলতা থাকলে আমরা দূর করার চেষ্টা করি।

না, না, এ আমি বন্ধ করতে পারি ! বলবে, একে কম্যুনিস্ট, তার ওপর বারোয়ারী পুজো বন্ধ করে দিলে । সর্বনাশ হয়ে যাবে । বরানগর থেকে আমি যখন প্রথম নির্বাচনে নামলাম, তখন দেখি প্রচার হচ্ছে যে ইনি যদি জেতেন, তা হলে ওই লক্ষ্মীপুজো সব বন্ধ হয়ে যাবে ।—দেখেছেন তো, এই বন্যাবাদলার বছরে কত টাকা সব তুলেছে । আপনারাই তো চাঁদা দেন । অবশ্য আমাকে কিছু দিয়ে যায়, এটা ঠিকই । এই সব বন্ধ করতে হলে একা রাজনৈতিক দলের পক্ষে সম্ভব নয় ।

সঞ্জীব : মহা সমস্যা । সিরিয়াস লেখা বিক্রি হয় না । যে বই বিক্রি হবে না, তার প্রকাশক পাওয়া যাবে না । সাহিত্যে মানুষ এখন এন্টারটেনমেন্ট খুঁজছে ।

বসু : মানুষের উচিত, কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ, সেইটা বোঝা । দৃষ্টিটা, দৃষ্টিভঙ্গীটা যদি অন্য রকম হয়ে যায়—

সঞ্জীব : আমোদধর্মী ?

বসু : ঠিক । তা হলে মুশকিল হয় । যেমন চলচ্চিত্র, আমাদের এইসব, অন্য রকম একটা টেস্ট ক্রিয়েট করে দিচ্ছে । মানুষের রুচি বদলে দিচ্ছে ।

সঞ্জীব : এই চলচ্চিত্র কালচার থেকে পশ্চিম বাংলাকে রক্ষা করা যায় ?

বসু : কি করে যাবে ! পশ্চিম বাংলাকে ভারত থেকে আলাদা করা যাবে কি করে । তার ওপর এই অর্থনৈতিক অবস্থা ।

সঞ্জীব : সকালবেলা স্বাধীন ভারতের এক যুবক বাড়ির বারান্দায় মুখে টুথব্রাশ, পায়চারি করছে, আর তার টেপে তারস্বরে চলছে জিলে লে, জিলে লে । আপনার আমার ছাত্রজীবনে ভাবা যেত ?

বসু : ওই যেমন পুজোর সময় গান হয় আপনাদের !

সঞ্জীব : শক্তি আর সময়ের এই অপচয় দুঃখজনক । সময় সময় বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে করে ।

বসু : আপনারা সহ্য করেন কেন । আপনারা লেখেন না কেন এসব জিনিস ।

সঞ্জীব : লিখে তো কিছু হচ্ছে না ।

বসু : নাঃ, পাড়ার লোকেরাও তো কিছু বলবে । তাদের এত ভয় করলে চলবে কেন ? ভয় ।

সঞ্জীব : আপনার ওপর অভিমান, আপনি থাকতে, দেশ জুড়ে বারোয়ারীর এই বাড়াবাড়ি কেন বন্ধ হবে না !

বসু : না না, এ আমি বন্ধ করতে পারি ! বলবে, একে কম্যুনিস্ট, তার ওপর বারোয়ারী পুজো বন্ধ করে দিলে । সর্বনাশ হয়ে যাবে । বরানগর থেকে আমি যখন প্রথম নির্বাচনে নামলাম, তখন দেখি প্রচার হচ্ছে যে ইনি যদি জেতেন, তা হলে ওই লক্ষ্মীপুজো সব বন্ধ হয়ে যাবে ।

সঞ্জীব : যুগ বদলে গেছে । এখন আর ওই প্রচারে মানুষ টলবে না ।

বসু : তবু রায়ট হয়ে যাবে । দেখেছেন তো, এই বন্যাবাদলার বছরে কত টাকা সব তুলেছে । আপনারাই তো চাঁদা দেন । অবশ্য আমাকে কিছু দিয়ে যায়, এটা ঠিকই । এই সব বন্ধ করতে হলে একা রাজনৈতিক দলের পক্ষে সম্ভব নয় । সরকারী আদেশেও হবে না । রাজনৈতিক দল, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সাধারণ মানুষ, সব এক হয়ে করতে হবে । সাহিত্যিকেরও ভূমিকা আছে । লিখতে হবে ।

সঞ্জীব : ব্যাঙ্গালোর, কেরালা প্রভৃতি শহরে মানুষ নিজেরাই নিজেদের এলাকা পরিষ্কার করে, আর আমরা ! একটা চেতনা···

বসু : পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের চেতনা খুবই কম । যেখানে সেখানে যা খুশি করা । এই জন্যেই টেলিভিশান দরকার, কোনও দিন দেখেছেন টেলিভিশানে এই সব করেছে, কোনও দিন রেডিওতে কিছু শুনেছেন ! আমি চিঠি পর্যন্ত লিখেছি । মাসমিডিয়া এই প্রয়োজনীয় চেতনা সহজেই জাগাতে পারে ; কিন্তু, কই, কোথায় !

সঞ্জীব : রাস্তাঘাট বন্ধ করে বাজার বসা, গাড়ি রাখা, হাজার হাজার মানুষকে অসুবিধে সহ্য করতে বাধ্য করা, এক ধরনের ছিনছিনে অত্যাচার । কিছু কি করা যায়, ফর রিলিফ ?

বসু : এ কিছু বোঝাতে হবে, কিছু অন্য ব্যবস্থা করতে হবে । এই দুটো মিলিয়ে একটা সমাধান, বুঝলেন না ।

সঞ্জীব : ভেস্টেড ইন্টারেস্টের অনেক পকেট তৈরি হয়েছে । এখন বলুন এই নানা অসুখের আরোগ্যে আমরা কি করতে পারি ?

বসু : দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার । সবচেয়ে বড় কাজ আপনারাই করতে পারেন । লিখে মানুষকে সহজেই প্রভাবিত করতে পারেন । এই যে প্রশ্নোত্তর, এইটাই লিখতে পারেন । টাকাপয়সার কথা না ভেবে লিখুন না । আপনারা তো খুব ভালো ভাবেই মানুষকে প্রভাবান্বিত করতে পারেন । এ তো খুব সহজ কথা । এই তো আমরা বুঝতে পারি ।

সঞ্জীব : সংস্কৃতির ব্যাপারে আপনার ভাবনা ?

বসু : অপসংস্কৃতির কথা আমরা বলি, সেটাকে আইন করে বন্ধ করা, আইন করে কখনও কখনও হতে পারে ; কিন্তু আইন করে বন্ধ করা যায় না । আপনাদের, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে যেটাকে আমরা সুষ্ঠু সংস্কৃতি বলি, তা পরিবেশন করতে হবে তো ! আমি দেখেছি সুষ্ঠু সংস্কৃতির অনুষ্ঠানে হাজার হাজার লোক এসেছে, এটা নয় যে হাউস খালি পড়ে আছে । তবে হ্যাঁ, রাজনীতির বক্তৃতা বা প্রচার নয়, ভালো জিনিস দিতে হবে । সাহিত্য রাজনীতির প্রচার বা বক্তৃতা নয় । আমাদের লেখক শিল্পীসঙ্ঘ আছে, তবে এলাকায় এলাকায় নতুন সংগঠন যদি গড়ে ওঠে আমরা সাহায্য করব । এসব স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয় না । মানুষকে জড়ো করতে হয় । সংগঠনের মধ্যে আনতে হয় ।

সঞ্জীব : এই দীর্ঘ পথ চলায় আপনার নিশ্চয় একটা জীবনদর্শন তৈরি হয়েছে ?

বসু : না না, আপনি তো জানেন আমি কি ? কি চিন্তা আমি করি মানুষের জন্যে । কাদের জন্যে আমি করি ।

সঞ্জীব : না না, এই রাইটার্সের বাইরে পার্টি অফিসের বাইরে আপনি যখন একা, সেই নির্জনে কি সংগীত ভেসে আসে ?

বসু : কি আর আসবে ! এই একই । দুয়ের মধ্যে তো কোনও পার্থক্য নেই । আমি রাইটার্সে যে কাজের জন্য আসি, যে কর্মসূচী পালন করাতে চাই আমি, যে ভাবনা, বাইরে গেলে তো আমার আলাদা কোনও জীবন নেই ।

সঞ্জীব : একই ভাবনা একই সুরে জীবন বাঁধা ।

বসু : হ্যাঁ, একই সুর । একই জীবনভাবনা ।

সঞ্জীব : অবসরে সামান্য সাহিত্যচর্চার অবকাশ হয় আপনার ।

বসু : তা হয় ।

সঞ্জীব : কি পড়েন ? ইংরেজি সাহিত্য ।

বসু : বিলেত, আমেরিকা থেকে যা আসে পড়ি, তবে ভাল কিছু লেখা হচ্ছে না আজকাল ।

সঞ্জীব : বাঙলা ?

বসু : পড়ি । পুজোর সময় যেসব বইটই আসে পড়ি । সময় আমার কম । তবুও পড়ি । সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করি ।

সঞ্জীব : দেশ পড়েন ? মাঝে মাঝে ?

বসু : মাঝে মাঝে পড়ি । প্রতি সপ্তাহে পড়ি বললে ভুল হবে ।

সঞ্জীব : কেমন হচ্ছে ?

বসু : দেশ তো অনেক নাম করেছে । যদিও আমাদের বিরুদ্ধে অনেক লিখেছে । লিখিয়েছে ।

সঞ্জীব : দেশ লিখিয়েছে ?

বসু : হ্যাঁ হ্যাঁ মানে এমন গল্প লেখাল বা এমন একটা কিছু লেখাল, নভেল…

সঞ্জীব : লেখানো হবে কেন , লেখক লেখেন নিজের মতো করে । লেখা হয়ে আসে ।

বসু : না তাঁরা হয়তো বুঝলেন এইটাই লিখতে হবে, যেখানে এমন কতকগুলো জিনিস থাকে যেগুলো সত্যও না বিকৃত কিছু, অর্থাৎ আমাদের অন্য চোখে দেখানোর চেষ্টা ।

সঞ্জীব : ধারণাটা ঠিক নয় । দেশ সাহিত্য পত্রিকা । তার নিজস্ব একটা রুচি, সংস্কৃতি আছে । প্রতিষ্ঠিত লেখকরা যা লেখেন তা এডিট করা হয় না, সেটা একটা অভদ্রতা, আনএথিক্যাল । আমরা লেখাই না, তাঁরা লেখেন তাঁর দায়িত্বে আমরা ছাপি । ফ্রি ফোরাম ।

বসু : ফ্রি ফোরাম থাকবেই, আর সেটা থাকাই বাঞ্ছনীয় ।

সঞ্জীব : আচ্ছা, আপনি যখন বামপন্থী সাহিত্য বললেন, তখন ঠিক কি বোঝাতে চান ।

বসু : না বামপন্থী সাহিত্য বলে কিছু নেই, প্রগতিশীল সাহিত্য আছে ।

সঞ্জীব : প্রগতিশীল মানে ?

বসু : প্রগতিশীল মানে, পুরোপুরি যদি জানতে চান, আমরা আপনাকে লিখে পাঠিয়ে দোব ।

সঞ্জীব : না না, আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই ।

বসু : প্রগতিশীল মানে লোকে একটা কিছু পড়ে, পড়াশোনা করে, একটা লেখা পড়ে মনটা মানে সেটা আরও উঁচু পর্যায়ে যাবে, তার একটা তার একটা—আমি ভাষায় ঠিক কুলোতে পারছি না, কোনও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী তার থাকবে না ।

সঞ্জীব : একটা উদার ভাব তার মধ্যে তৈরি হবে ।

বসু : হ্যাঁ, একটা উদার ভাব, ঠিক বলেছেন । এইরকম মানুষের প্রতি ভালবাসা, বিভিন্ন দিক থেকে তার মধ্যে জাগ্রত হবে ।

সঞ্জীব : অনেকটা সেই উপনিষদের সুর, মানে সঙ্কীর্ণতা থেকে উদারতায় মুক্তি । আপনার মনের মতো প্রগতিশীল সাহিত্য কি হচ্ছে ? আপনি কি সেরকম কিছু পাচ্ছেন ?

বসু : আজকাল আমি খুব দেখি বলে মনে হয় না ।

সঞ্জীব : হচ্ছে না কেন ?

বসু : জানি না, কেন ! কত রকম বিষয় আছে । যেগুলো নিয়ে লেখা যায় সে সাধারণের বিষয়, সমাজের বিষয়, সমাজে কত রকম কি হচ্ছে, তার থেকে কত কি ফুটিয়ে তোলা যায়, আমাদের দ্বারা তো এসব হবে না, সেসব আপনাদের দ্বারা হবে । আপনারা করুন সে ।

সঞ্জীব : আচ্ছা সরকারী ফিল্ম সম্পর্কে আপনি বলছিলেন এভাবে হয় না ।

বসু : না, আমরা দিয়েছি অনেককে, কিছু প্রাইজট্রাইজ পেয়েছে, পুরস্কার পেয়েছে, এটাও আমি দেখেছি, কিন্তু আমি যেটা বলি, যখন আমি সেই ছবি করার জন্যে টাকা দিলাম, কিছু অর্থ সাহায্য করলাম, তখন আমি তো তাকে বলে দিতে পারি না, নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এনে যে, এইটে প্রতিফলিত করো, তাহলে সে ডাইরেক্টার বা কোনও কেউ রাজিই বা হবে কেন, বা এটা হবেই বা কেন ; কিন্তু করবার পর আমরা দেখি, কতকগুলো বেশ ভালই হয়েছে, আবার কিছু আছে যে ঠিক হয় না, বা হল না, সফল হয়নি ।

সঞ্জীব : সৎসাহিত্যের সফল একটা ফর্ম সেই টলস্টয় শেখভ থেকে আজও সারা বিশ্বে অনুসৃত হচ্ছে, প্রগতিশীল সাহিত্য তার বাইরে চলে গেলে তো সাহিত্য-গুণ-ভ্রষ্ট হবে । প্রগতিশীলের লেবেল লাগিয়ে তো জাতে তোলা যাবে না ?

বসু : আমি বিশ্বাস করি না যে অর্ডার দিয়ে কোনও সাহিত্য হতে পারে । আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি এই যে এতক্ষণ এত কথা হল, যে সাহিত্যের প্রতিফলনটা মানুষের মধ্যে এইভাবে হবে তার মনটা উদার হবে, উঁচু পর্যায়ে যাবে, দশজনের কথা সে চিন্তা করবে, সঙ্কীর্ণতার মধ্যে থাকবে না, এর বেশি তো আর কিছু বলার নেই, তারপর যাঁরা সৃষ্টি করেন, তাঁরা এটা দেখবেন ।

সঞ্জীব : আচ্ছা বর্তমানের এই যানবাহন সমস্যা সমাধানের জন্যে আপনি কিছু করবেন বলেছিলেন । অসহনীয় অবস্থার মধ্যে দিয়ে জনজীবন চলেছে, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়া একটা আতঙ্ক । বলেছিলেন প্রাইভেট কিছু ব্যবস্থা চালু করবেন ।

বসু : প্রাইভেট কি ?

সঞ্জীব : মানে স্টেট সিসটেমের পাশাপাশি প্যারালাল একটা সিসটেম ।

বসু : না না, ট্রান্সপোর্ট কোথায় করবেন ? কলকাতা তো এতকুটু হয়ে গেছে । এখানে এখন শুনুন শুনুন, ডবল বাস চলছে । তিন চার বছর আগে যা চলত তার ডবল । এখন একটার পেছনে প্রায় আর একটা যাচ্ছে ; তবুও লোকের অসুবিধে হচ্ছে ; কারণ কলকাতা তো বম্বের মতো দিল্লির মতো বাইরের দিকে আর বড় হয়নি, সেই জন্যে এরই মধ্যে এত মানুষ এত ট্রান্সপোর্ট, এত বাস, ট্রাম, সব মিলে আর ওই আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রোর কাজ হচ্ছে, সি এম ডি এ-র কাজ হচ্ছে, এইসব মিলে এই দুরবস্থা দূর করতে সময় লাগবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, সেইজন্যে বাইরের দিকে আমরা চেষ্টা করছি, নতুন কতগুলো কেন্দ্র আমরা খুলেছি, শিল্প, এইসব করার জন্যে, সেখানে মানুষ থাকবে, এখান থেকে গিয়ে শিল্প করবে, তা না

সঞ্জীব : একটা পরিকল্পনা ছিল শহরে লরি ঢুকবে না ।

বসু : টার্মিনাল ; হ্যাঁ সে স্কিম একটা আছে ।

সঞ্জীব : প্র্যাকটিক্যাল ?

বসু : হ্যাঁ, প্র্যাকটিক্যাল । খুব প্র্যাকটিক্যাল । তা না হলে সব লরি তো শহরে ঢুকবে । ওই যে ওরা দাবি করছে, সব গোলমাল করছে ওদের দাবি কি, শহরে ঢুকতে দিতে হবে, যখন তখন ঢুকতে দিতে হবে ।

সঞ্জীব : আপনি অ্যালাউ করবেন ?

বসু : তা কখনও হয় নাকি ? ঠিক আছে । অনেকক্ষণ বললাম । আর কি ? এটা কি, করবেন কি ? এইসব দিয়ে ? অনেক ছবিও তুললেন । আপনার পরিকল্পনাটা কি ?

সঞ্জীব : একান্ত একটি সাক্ষাৎকার । রাজনীতিক নয় মানুষ জ্যোতি বসু, চিন্তাবিদ জ্যোতি বসুর সঙ্গে জীবনের একটি ঘণ্টা । আপনাকে ধন্যবাদ ।

বসু : ঠিক আছে ।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ছবি : বিবেক দাস

ট্রান্সপোর্ট কোথায় করবেন ? কলকাতা তো এতটুকু হয়ে গেছে । এখানে এখন শুনুন, ডবল বাস চলছে । তিন চার বছর আগে যা চলত তার ডবল । এখন একটার পেছনে প্রায় আর একটা যাচ্ছে ; তবুও লোকের অসুবিধে হচ্ছে । কারণ কলকাতা তো বম্বের মতো দিল্লির মতো বাইরের দিকে আর বড় হয়নি, সেই জন্যে এরই মধ্যে এত মানুষ, এত ট্রানসপোর্ট, এত বাস, ট্রাম, সব মিলে আর ওই আণ্ডারগ্রাউণ্ড মেট্রোর কাজ হচ্ছে, সি এম ডি এ-র কাজ হচ্ছে, এই সব মিলে এই দুরবস্থা দূর করতে সময় লাগবে ।

বৈ দে শি কী

বিদেশনীতিই ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে পর্যটক করেছে

অরুণ বাগচী

প্রধানমন্ত্রী নাকি বলেছেন, তাঁর সাম্প্রতিকতম এশিয়া সফরের পর আর তিনি কিছুদিন বিদেশ ভ্রমণে যাবেন না। দেশের ভিতরে এত সমস্যা, কোণে কোণে অসন্তোষ, পঞ্জাবে হিংসার আগুন জ্বলছে তো জ্বলছেই, দার্জিলিঙে গোর্খাল্যান্ড দাবি নিয়ে উষ্ণ ঝড়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অস্থিরতা— সব মিলিয়ে অভ্যন্তরীণ চিত্রটা ঝলমলে নয় মোটেই। এদিকে এই কাণ্ড, অন্যদিকে বেহালা না বাজান, সঙ্গীসাথী নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হই হই করে বিদেশে গিয়ে ফুলের তোড়া আদায় করতে ব্যস্ত, এ ধরনের একটা সমালোচনা কেউ কেউ করে থাকবেন। তারই জের ধরে প্রধানমন্ত্রীর বোধকরি ওই আশ্বাসদান।

বলা বাহুল্য, রাজীব গান্ধীর ভ্রমণ নিয়ে এবং সেই বাবদ কত খরচা হচ্ছে তা নিয়ে দুর্ভাবনা যেমন অর্থহীন, আর কিছুকাল বাইরে যাব না ওই আশ্বাস দেবারও তেমনই কোনও মানে হয় না। প্রথমত, দেশের প্রধানমন্ত্রীর সফরের অর্থ বেড়াতে যাওয়া নয়। তাহলে না হয় বলা যেত, বছরে দুহপ্তা ছুটি নিয়ে ক্লান্তিদূর করবার জন্য তিনি সপরিবারে কোথাও, পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে তাঁর ইচ্ছে, ছুটি কাটাতে যান। যেমন নেহরু পৌষ উৎসবে যোগ দেবার জন্য আসতেন শান্তিনিকেতনে। বলতেন, আমার ক্ষয়ে যাওয়া ব্যাটারিগুলোকে আবার চার্জ করে নিতে এসেছি। শান্তিনিকেতনে মনের বিশ্রাম তিনি ঠিকই পেতেন, তবে সেই অর্থে ছুটি কি হত? আচার্য হিসাবে কত কাজ করতে হত, কত মানুষের সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে হত। দ্বিতীয়ত, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নেহরু এবং ইন্দিরা গান্ধীকেও বার বার বিদেশে যেতে হয়েছে। বলতে গেলে তাঁরা যে ধারা প্রবর্তন করে গেছেন, আজ রাজীবকেও সেই পথে চলতে হচ্ছে। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে, এশীয় দেশ হিসাবে, ভারতকে যে ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে তাতে বিদেশ যেতেই হয়। তদুপরি রাজীব গান্ধী ক্ষমতায় আসবার পর একবিংশ শতাব্দীর হাতছানিতে তাঁর বিদেশ গমনের মাত্রাটা বেড়েছে একথা ঠিক। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসতে হয়েছে তার ফলেই কি প্রয়োজন ঘটেনি অধিক সফরের? নির্জোট আন্দোলনের নেতৃত্ব উত্তরাধিকার সূত্রেই প্রাপ্ত। ওই ভূমিকা ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বার বার পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছুটিয়ে ছেড়েছে। মহাশক্তিধর সোভিয়েত ইউনিয়নের

মরিশিয়াস প্রধানমন্ত্রী শ্রীঅনিরুদ্ধ জগন্নাথ কর্তৃক রাজীবকে সংবর্ধনা

সঙ্গে ভারতের বিশেষ সম্পর্ক বর্তমান। দায়িত্ব সম্পূর্ণ কাঁধে চাপবার আগে এই বিষয়ে রাজীবের সম্যক ধারণা ছিল কি না সে বিষয়ে সংশয় আছে। শোনা যায়, তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকে যাওয়া নীতি পছন্দ করতেন না। কিন্তু পরবর্তীকালে এই মনোভাব বদলেছে। এই সেদিনও তিনি নিউজিল্যান্ডের রাজধানী অকল্যান্ডে বসে ঘোষণা করেছেন : গত ত্রিশ বছর ধরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। সেটা বদলাবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। বিশেষত ওই সম্পর্ক তো বাধা দিচ্ছে না পৃথিবীর যে কোনও দেশের সঙ্গে মিত্রতা পাতাতে।

একই সূত্র ধরে বলা চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা। ওই দেশটির সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট ভাল সম্পর্ক, কিন্তু তত গভীর সে সম্পর্ক নয় যতখানি সোভিয়েত ইউনিয়নের বেলায়। প্রধানমন্ত্রী হবার পর রাজীব গান্ধী স্থির করেন এই ব্যাপারে তাঁর মা যে প্রয়াস শুরু করেছিলেন সেটি অব্যাহত রাখা। দরকার হলে আরও এগিয়ে যাওয়া। গত বছর

লণ্ডনের মেয়র রাজীবকে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন

সেই সূত্রেই তিনি যান যুক্তরাষ্ট্র সফরে। সেই সফর যে অনেকগুলি বিষয়ে খুবই সফল হয়েছিল তা সবারই জানা। কিন্তু এও জানা যে, যত চেষ্টাই যিনি করুন, ভারত যতক্ষণ তার কিঞ্চিৎ সোভিয়েত-ঘেঁষা নীতি ত্যাগ না করছে, ততক্ষণ আমেরিকা তার পাকিস্তান-ঘেঁষা নীতি ছাড়বে না। আর এই দুটি বাধা যতদিন রয়েছে, ততদিন ইন্দো-মার্কিন সম্পর্ক এখন যা তার চেয়ে বিশেষ উন্নত হয়তো হবে না। কিন্তু আজকের দুনিয়ায় আমেরিকাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলা এমন কি সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষেও সম্ভব নয়, ভারত তো দূরস্থান। যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নকে একেবারে বাদ দিয়ে কোনও বিদেশনীতি গড়ে তোলাও চলে না। ভারতের পক্ষে তো নয়ই। অতএব এই দুটি দেশের কারণেও রাজীব গান্ধীকে থেকে থেকেই পরিব্রাজকের পোশাক পরতে হবে।

আফ্রিকার কথাটাও ধরতে হবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির মানচিত্র কত বদলে গেছে একের পর এক আফ্রিকার উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করার পর। শুধু যে বিদেশী শাসকদের দেওয়া নাম পালটেছে তা নয়, চেহারা চরিত্র দৃষ্টিভঙ্গি এসবও বিস্তর পালটেছে। যা পালটায়নি তা হল অর্থনৈতিক শোষণের চিত্রটা। বহু সাম্রাজ্যবাদী দেশের গূঢ় মতলব ছিল, উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দিয়ে সেখানকার অর্থনীতিকে পরিচালনা করা, তার উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা। তার বাজার দখলে রাখা। বুদ্ধির খেলা একেই বলে। প্রশাসনিক দায়িত্ব রইল না। পুলিস সেনাবাহিনীর এ সমস্ত পুষবার খর্চা রইল না। ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতা সংগ্রামের মোকাবিলা করার প্রয়োজন রইল না। রইল হাতে মাল বেচে মুনাফা করার বাজার। এর চেয়ে চমৎকার ব্যবস্থা আর কী হতে পারে? বলা বাহুল্য, এই চক্রবৃদ্ধির হিসাব শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকেনি। সব ক্ষেত্রে টেকেনি। কারণ, আফ্রিকার নেতৃত্বে চেতনা সঞ্চারিত হয়েছে। কারণ, আফ্রিকার বাইরে কিছু কিছু রাষ্ট্র যে ভূমিকা নিয়েছে তা নব্য-ঔপনিবেশকতাবাদের বিরুদ্ধে কঠোর আঘাত হেনেছে। ভারতের সহৃদয় পরামর্শ, আপন ক্ষেত্রে তার মর্যাদাময় ও স্বাধীন নীতি, সবই বিশেষ স্মরণীয়। কিন্তু এই ভূমিকা এমন যে তা দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ঘরের কোণায় বসে থাকতে দেবে না। তাঁকে বাইরে টেনে আনবে।

আফ্রিকার নানা দেশের নেতাদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ভারত গড়ে তুলেছে দীর্ঘকাল থেকে। সব ভারত সরকারই এ বিষয়ে একই নীতি অনুসরণ করেছেন। এবং ভারতের যে বিশিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ, তার বিচারে নীতিটা নির্ভুল। আফ্রিকার মানুষ নিজেদের মধ্যে যত খুশি কাটাকাটি করুক, মারামারি করুক, বিশ্ববিবেক কখনই কণ্টকমুক্ত হবে না যতদিন না আফ্রিকা পূর্ণ অর্থে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হতে পারে। আফ্রিকার আদিম অরণ্যভূমি থেকেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষ একদা বেরিয়ে এসেছিল আপন ভূখণ্ডের সংকীর্ণতা থেকে, ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বময়। আধুনিক সভ্যতার আলোক আফ্রিকাকে বর্জন করে উদ্ভাসিত করেছে এশিয়া, ইয়োরোপ ও পরবর্তীকালে আমেরিকাকে। সেই সভ্যতার সমিধ হতে হয়েছে আফ্রিকাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। কাজেই আফ্রিকার কাছে ঋণ আছে বাকি দুনিয়ার, যে ঋণ আজও শোধ হয়নি। অনেকেই অভিযোগ করেন, দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে ভারতের এত হই চই করবার কী আছে। এই অভিযোগ কতটা অসার এবং অজ্ঞানতাপ্রসূত তা বলে বোঝান যাবে না। স্বাধীনতার পর থেকেই ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রোঘাতক বর্ণবিদ্বেষী সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার। এই সরকার আফ্রিকার কৃষ্ণসমাজের প্রতি যত অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার হয়েছে, এখনও হচ্ছে তারই জীবন্ত প্রতীক। তার সঙ্গে সহযোগিতার প্রশ্নই ওঠে না। বরং আমরা গর্ব করে বলতে পারি, একদা ভারতের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরই ছিল একমাত্র বিবেক নির্ঘোষ। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণান্ধ সরকারের বিরুদ্ধে আর কারও গলা তখন শুনতে পাওয়া যেত না। আজ ছবিটা কতটা পালটেছে। আজ প্রিটোরিয়া সরকার যে প্রায় একঘরে হয়ে পড়েছে সেজন্য ভারতের কৃতিত্ব কিছু কম নয়। যত আস্ফালনই করুন পিটার বোথা, তিনি দেওয়ালের লিখন ঠিকই দেখতে পাচ্ছেন। কালো মানুষের মাথার ওপর সিংহাসন পেতে বসে আরামে দিন কাটানো, সেটা যে আর দীর্ঘকাল ধরে চলবে না, সেটা না বোঝার মতো মূর্খ তিনি নন। কিন্তু তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন যাতে শ্বেতপ্রভুত্ব যতকাল সম্ভব দীর্ঘায়িত করা যায়। সংখ্যাগুরু কৃষ্ণাঙ্গদের হাতে ক্ষমতা চলে যাবার অর্থ যে সেই প্রভুত্বের অবলুপ্তি তা তিনি জানেন। তাই তিনি ইতিহাসের প্রপাতকে ঠেকাবার চেষ্টা করছেন।

যাই হোক, শুধু আফ্রিকা কেন, ভারতের সুস্পষ্ট বিদেশনীতি তার প্রধানমন্ত্রীদের মাঝে মাঝেই গৃহছাড়া করবে। ভারতের সমালোচকরা যতই বলুন যে সর্বব্যাপারে মোড়লি করতে যাওয়া, পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যায় নাকগলানো, প্রত্যেককে লেকচার দেওয়া ভারতের স্বভাবে পরিণত হয়েছে, একটা কথা অস্বীকার করা যাবে না যে ভারতের মধ্যস্থতা এবং মতামত অনেকেই গ্রহণ করেন। সর্বদা ভারত নিজে থেকে 'কর্তামি' করতে গেছে এটা আদৌ সত্য কথা নয়। তাছাড়া অকারণে ভারত নিজস্ব স্টাইল ছাড়বে কেন? জওহরলাল যখন নীতি ও আদর্শের দিকে বেশী ঝোঁক দিতেন, তখন তথাকথিত বিশেষজ্ঞরা দেশে বিদেশে বলতেন 'that Kashmiri Pundit' পাক্কা মৃণালভোজী, স্বপ্নলোকে বাস করেন, বাস্তব কূটনীতি কী তা জানেন না ইত্যাদি। আবার ইন্দিরা গান্ধীর বেলা শোনা যেত এই মহিলা বড়ই 'স্বৈরতন্ত্রী', নীতিটিতির ধার ধারেন না, কেবল প্রতিপক্ষকে 'ল্যাং' মারতে চান ইত্যাদি। রাজীব গান্ধী এখন তাঁর দাদুর উচ্চদৃষ্টি এবং মায়ের বাস্তব চিন্তাভাবনার সমন্বয় ঘটাতে চাইছেন। তাঁর বিরুদ্ধে বড্ড বেশি বিদেশ ভ্রমণের যে অভিযোগ উঠছে, সেগুলি যথেষ্ট যুক্তিনিষ্ঠ নয়। তাঁদের সৌভাগ্যক্রমে বা আমাদের দুর্ভাগ্যবশত লালবাহাদুর শাস্ত্রী বা মোরারজি দেশাই কেউই স্বপদে দীর্ঘস্থায়ী হননি। ফলে তাঁদের বিদেশভ্রমণ

নিয়ে কলরব করার অবকাশও সমালোচকরা পাননি।

আর একটা কথাও আছে। আগের তুলনায় রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রশাসন-প্রধানদের বিদেশ ভ্রমণ অনেক পরিমাণে বেড়ে গেছে। তার একটা বড় কারণ বিমানসেবার সুযোগ। এক সপ্তাহের মধ্যে চারটি দেশ ঘুরে এলেন রাজীব গান্ধী। এই জেট যুগেই এটা সম্ভব। আগে কি পারা যেত? সে সময় স্বভূমি ছাড়বার আগে প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টাররা উইল করে না যান, বেশ যত্ন নিয়েই পরিবর্ত ব্যবস্থাদি গুছিয়ে রেখে যেতেন। কারণ দেশে ফিরে আসতে কতদিন লেগে যাবে কে জানে! তখন প্রতিদিনের কাজকর্মের জন্য বিদেশের দূতাবাসগুলির উপর নির্ভরতা ছিল অনেক বেশী। নির্ভরতা এখনও আছে, কিন্তু আগের মতো নেই। এখন ছুট বলতে এই রাজধানী যাচ্ছে অন্য রাজধানীতে। দিল্লিতে প্রতি সপ্তাহে কতজন বিদেশী রাষ্ট্রনায়ক আসেন, সেই হিসাব দেখুন। ব্যতিক্রমও অবশ্যই আছে। যেমন মহামান্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট। নিজের দেশ ছেড়ে চট করে তিনি কোথাও যান না। পর্বতই মহম্মদের কাছে আসে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বড় কর্তারা দীর্ঘকাল দেশের বাইরে যেতেন না। বুলগানিন-ক্রুশ্চেভ যখন বাইরে যেতে শুরু করলেন সেটার অভিনবত্ব সবাইকে চমকিত করেছিল। ক্রুশ্চেভের বর্ণময় ব্যক্তিত্ব দুনিয়াময় প্রভাব বিস্তার করার আগেই কিন্তু ওই চমক বহুজনের অভিজ্ঞতাকে স্পর্শ করে গিয়েছিল। এখন মিখাইল গোর্বাচেভ যেভাবে বিদেশ যাচ্ছেন সেটাও লক্ষ্য করবার। এবং যে দেশেই তিনি গেছেন, সেখানেই তাঁর দেশের ভাবছবিকে উজ্জ্বল করেছেন। এই যে ভারত পরিদর্শনে তিনি আসছেন, এর প্রচারগত সবটুকু সুফলই লাভ করবে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এদেশে তো বটেই, এই অঞ্চলের বহু দেশেও প্রতিক্রিয়া হবে লক্ষণীয়। কাজেই ব্যক্তিগত ভ্রমণের বিশেষ মূল্য আছে বইকি!

একটা কথা এই প্রসঙ্গে ওঠে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই যে জেট বিমানে করে দ্রুত যাতায়াতের ব্যবস্থা এটা কূটনীতির পক্ষে খুব স্বাস্থ্যপ্রদ ঘটনা নয়। কোনও বিষয় তলিয়ে দেখার সময় কেউ পাচ্ছেন না, নিচ্ছেন না। ফলে বহু সমস্যা নিয়ে ওপর ওপর আলোচনা হয়, মূল গিঁটগুলো খোলে না। যাকে বলে 'জেট ল্যাগ', তার প্রভাবে সহজাত বুদ্ধির শতকরা একশত ভাগ প্রয়োগ আর কূটনীতিবিদরা করে উঠতে পারছেন না। আগে জাহাজে চেপে সময় নিয়ে তাঁরা ঘুরতেন। ফলে স্থিরমস্তিষ্কে সব কিছু খতিয়ে দেখার সময় মিলত।

এই থিয়োরির পিছনে কিছু সত্য আছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। একালের রাজনীতিকদের চেয়ে আগেকার রাজনীতিকরা খুব উচ্চস্তরের মানুষ ছিলেন তা যেমন সত্য নয়, তেমনই তাঁদের সিদ্ধান্ত বা দুই দেশের মধ্যে সমস্যা মেটাবার জন্য তাঁদের যুক্তি পরামর্শ যে খুব উঁচুদরের হত তাও সত্য নয়। মাত্র ত্রিশ বছরের ব্যবধানে দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ না হলে বাধল কী করে? জেম

রাজীব গান্ধীর পূর্ব দেশ পর্যটন

প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সপ্তাহব্যাপী বিদেশ সফর শুরু হয়েছিল ইন্দোনেশিয়া দিয়ে, শেষ হল থাইল্যান্ডে। মাঝখানে নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া। সর্বত্রই তিনি উষ্ণ সম্বর্ধনা পেয়েছেন, এবং সেটা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। ভারতের একটা বিশেষ মর্যাদা তো আছেই, সে দেশের প্রধানমন্ত্রী পদাধিকার বলেই সমাদৃত হবেন। কিন্তু সেটাই সব নয়। ব্যক্তি হিসাবে রাজীব সর্বত্রই এক সম্মানের সিংহাসন নিজের জন্য রচনা করে নিয়েছেন। দুই বছর আগে আকস্মিক ভাবে, ভাগ্যের নির্মম আঘাতের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে, তাঁকে বিরাট এক দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়েছিল। ঐতিহ্যের বোঝা তো ছিলই, আপন অভিরুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী বৈদেশিক রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি স্বকীয় শৈলী তদুপরি তিনি রচনা করে নিয়েছেন। ভারতের বন্ধুত্ব দেশ অসংখ্য, বন্ধুদেশ অনেক, যথার্থ আপন দেশও কম নয়। সবার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক উন্নত করার চেষ্টা তিনি অক্লান্তভাবে করে যাচ্ছেন। যেমন প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধীর শাসনের শেষ পর্বে যে শীতলতার ও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল সেটা দূর করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছেন রাজীব। সফলও হয়েছেন অনেকটা। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে, এমনকি পাকিস্তানের সঙ্গেও, বিশেষভাবে খুশী হবার মতো একটা সমঝোতার সৃষ্টি হয়েছিল। বিদেশী কিছু রাষ্ট্রের প্ররোচনায় শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সমঝোতা আবার খানিকটা নষ্ট হয়েছে। পঞ্জাব নিয়ে বেশ তিক্ততা ইদানীং গড়ে উঠেছে ইসলামাবাদ এবং নয়াদিল্লির মধ্যে। প্যান-অ্যাম বিমান হাইজ্যাকিং যখন হল, তখনই এটা জানাজানি হয়ে গেছে। পঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদীদের ইন্ধন জোগান হচ্ছে, এটা ভারতের কাছে পাকিস্তানী সরকার। কিন্তু এখনও তারা তা প্রত্যাখ্যান করছে।

যাই হোক, রাজীব গান্ধীর সাম্প্রতিকতম সফর উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে প্রধানমন্ত্রী গেছেন পূর্বদিকের চারটি দেশে। নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ল্যাঙ্গে এবং রাজীব যে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন যৌথভাবে, তাতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টই বলেছেন, ইউরোপ বা আমেরিকার দিকে তাকিয়ে থাকার অভ্যাস আমাদের ত্যাগ করতে হবে। যে সব ক্ষেত্রে আমরা নিজেরাই পরস্পরের চাহিদা মেটাতে পারব, সেখানে কেন আমরা তৃতীয় পক্ষের দ্বারস্থ হব? সবাই জানেন, ব্যক্তিগত স্তরে সম্পর্ক স্থাপন করা ছাড়াও এবার ভ্রমণে রাজীবের উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা। এইসব দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঘাটতি বেড়ে যাচ্ছে। এটা মোটেই বাঞ্ছনীয় ব্যাপার নয়। এক অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গেই বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ তিনশ কোটি টাকার ওপর। এই অবস্থাটা দূর হওয়া দরকার। এজন্য চাই ভারতীয় পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি। সেই সুযোগ অবশ্যই আছে। নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ল্যাঙ্গে একাধিকবার ভারতের প্রযুক্তিবিদ্যাকে যথেষ্ট আধুনিক বলে প্রশংসা করেছেন। ভারতীয় শিল্পপতি এবং প্রযুক্তিবিদরা নিজে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে, [illegible] ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের ক্ষেত্রে যে পরিচিতির সৃষ্টি করে নিয়েছেন, তার [illegible] পরিমণ্ডলে লাভ করতে পারছে না সেটা খতিয়ে দেখা দরকার। রাজীব গান্ধীর উদ্যোগ এবং উদ্যম যে তাঁকে পূর্বমুখী করেছে সেটা নিঃসন্দেহে আশার কথা।

রূপদর্শীর ঝাঁকিদর্শন

আমাদের সীমিত ক্ষমতায়

হ্যালো, হ্যালো, ফায়ার ব্রিগেড ? ইয়েস, ফায়ার ব্রিগেড। শিগ্গির আসুন, আগুন লেগেছে।

আগুন লেগেছে ? স্যর, আগুন লেগেছে।

ফায়ার ব্রিগেডের চিফ অফিসার জ্যোতিরাম বামপতি : আগুন লেগেছে ? কোথায় ?

হ্যালো, কোথায় আগুন লেগেছে ?

দার্জিলিং ম্যানসনে। আপনারা তাড়াতাড়ি আসুন। আগুন ছড়িয়ে পড়ছে।

চিফ জ্যোতিরাম বামপতি : এত কী বকবক করছ, অপ্যারেটর ? লাইন ছেড়ে দাও।

স্যর, দার্জিলিং ম্যানসনে আগুন লেগেছে। বলছে আগুন ছড়িয়ে পড়ছে।

চিফ জ্যোতিরাম বামপতি : ওহে, শুনছ তোমরা, দার্জিলিং ম্যানসনে আগুন লেগেছে। আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। অতঃ কিম্ ?

প্রধান কার্যনির্বাহী অফিসার, সদা প্রভুর মনরাখি : এ বিষয়ে তাহলে চটপট একটা অ্যাকশান নিতে হয়। কি বলেন স্যর ?

চিফ জ্যোতিরাম বামপতি : ঠিক এই কথাটাই আমি ভাবতে যাচ্ছিলাম। আচ্ছা, অ্যাকশনটা ওয়র ফুটিংয়েই নিলে ভাল হয় না ?

ডেপুটি কন্ট্রোলার অফ অপারেশন, নিম খাশা তৈলমর্দন : অবশ্যই স্যর, অ্যাকশনটা ওয়র ফুটিংয়েই নিতে হবে স্যর। কিন্তু তার আগে স্যর জেনে নেওয়া দরকার আগুনটা কোন্ তলায় ধরেছে ?

চিফ জ্যোতিরাম বামপতি : অবশ্যই সেটা জেনে নেওয়া দরকার। ওহে, কোন্ তলায় আগুন লেগেছে ?

প্রধান কার্যনির্বাহী অফিসার সদা প্রভুর মনরাখি : ওহে কোন্ তলায় আগুন লেগেছে ?

ডেপুটি কন্ট্রোলার অফ অপারেশন, নিম খাশা তৈলমর্দন : ওহে, অপারেটার, কোন্ তলায় আগুন লেগেছে, সেটা বলবে তো ? গবেট কোথাকার ?

হ্যালো দার্জিলিং ম্যানসন, হ্যালো দার্জিলিং ম্যানসন ? হ্যালো, হাঁ দার্জিলিং ম্যানসন ? কী বললেন, আপনি দার্জিলিং ম্যানসন্ নন ? তবে আপনি কে ? আপনি কোত্থেকে বলছেন ? সেটা বলবেন তো ? গবেট কোথাকার ? আহা বলছি তো, এটা ফায়ার ব্রিগেড। হাঁ হাঁ মশাই, এটাই ফায়ার ব্রিগেড। যত্ত ঝামেলা। অ্যাঁ হাঁ, আপনি উত্তর পুঁটিয়ারি বল্লাল সেন কলোনি থেকে বলছেন ? কী সাংঘাতিক কলোনি ওই পাড়ের ? তা শুনে আমার কী হবে ? আপনি দয়া করে লাইনটা ছেড়ে দিন। আমাদের তাড়া আছে। দার্জিলিং ম্যানসনে আগুন লেগেছে। আমরা এখন তার পিছনে [illegible] ছুটছি [illegible]। [illegible] স্যর, ছাড়ছে না।

প্রধান কার্যনির্বাহী অফিসার, সদা প্রভুর মনরাখি : ছাড়ছে না মানে ? ইয়ার্কি হচ্ছে নাকি ? বলে দাও, দিস্ ইজ ফায়ার সার্ভিস। এর কাজে বাধা দেওয়া মানে আগুন নিয়ে খেলা।

ডেপুটি কন্ট্রোলার অফ অপারেশন, নিম খাশা তৈলমর্দন : ইয়েস, ঠিকই বলেছেন [illegible] স্যর। এসেনশিয়াল সার্ভিসের কর্তব্য কর্মে বাধা সৃষ্টি করার জন্য ওকে বকে দাও।

আরে মশাই ছাড়ুন তো, আচ্ছা জ্বালা, ফায়ার ব্রিগেডের কাজে বাধা দিয়ে আপনি যে আইন ভাঙছেন, সেটা বুঝেছেন কী ? অত্যাবশ্যক সার্ভিস এটা। কী বললেন, আপনার ওখানেও আগুন লেগেছে ? বাহ্ ভালই হয়েছে, এবার আপনি দয়া করে ছাড়ুন তো লাইনটা। দার্জিলিং ম্যানসনকে ধরি। আহ্, আচ্ছা নাছোড় তো, স্যর ও ছাড়বে না, বলছে ওদের কলোনিতেও আগুন লেগেছে। ওখানে এক্ষুনি যেতে হবে।

চিফ জ্যোতিরাম বামপতি : ওখানেও আগুন লেগেছে ?

হাঁ স্যর...

প্রধান কার্যনির্বাহী অফিসার : তোমাকে কথা বলতে কে বলেছে ? তুমি দার্জিলিং ম্যানসনকে ধর।

ডেপুটি কন্ট্রোলার অফ অপারেশন, নিম খাশা তৈলমর্দন : স্যর, দার্জিলিং ম্যানসনেও আগুন লেগেছে, আবার উত্তর পুঁটিয়ারি বল্লাল সেন কলোনিতেও আগুন লেগেছে। দেখা যাচ্ছে, উভয় ক্ষেত্রে আগুন লাগাটাই কমন সমস্যা।

চিফ জ্যোতিরাম বামপতি : যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত। অতঃ কিম্ ?

প্রধান কার্যনির্বাহী অফিসার, সদা প্রভুর মনরাখি : এই সমস্যা দুটোকে এক সঙ্গে ট্যাকল করা হবে, না ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ নীতিটাই আমরা আঁকড়ে থাকব, সেই ডিসিশনটা আগে নিয়ে ফেলতে হবে স্যর। ইট ইজ অ্যান ইম্পর্ট্যান্ট ম্যাটার।

ডেপুটি কন্ট্রোলার অফ অপারেশন, নিম খাশা তৈলমর্দন : স্যর আপাত দৃষ্টিতে সমস্যাটা যতটা সহজ মনে হচ্ছে, আসলে কিন্তু সমস্যাটা ততটা সহজ নয়। সমস্যাটাকে টেকনিক্যাল দিক থেকে বিচার করতে হবে।

চিফ জ্যোতিরাম বামপতি : [illegible] হবে।

হ্যালো হ্যালো, [illegible]। [illegible] ব্রিগেড। আমি দার্জিলিং [illegible] বলছি।

স্যর স্যর, দার্জিলিং [illegible]।

ডি সি ও নিম খাশা তৈলমর্দন : হাঁ, দার্জিলিং ম্যানসন ? [illegible] টেকনিক্যাল [illegible] বিচার করতে হবে।

হ্যালো, আমরা [illegible] শিগ্গির আসুন, আমি দার্জিলিং ম্যানসন থেকে বলছি। [illegible]

স্যর, বলছে দার্জিলিং ম্যানসনে [illegible] আগুন।

চিফ জ্যোতিরাম বামপতি : ওয়র ফুটিংয়েই কাজ শুরু করতে হবে। ঠিক ?

প্রধান কার্যনির্বাহী অফিসার : স্যর ইউ আর রাইট, আপনি যা বলবেন, আমরা সেই মতো কাজ করব।

ডি সি ও নিম খাশা তৈলমর্দন : সার্টেনলি স্যর, আপনি যা বলবেন, আমরা সার্টেনলি সেই মতো কাজ করব। তবে আমাদের প্রায়োরিটিটা কোন্ নীতিতে ঠিক করব, সেইটাই হল প্রশ্ন। অন্যান্য জরুরি টেকনিক্যাল সমস্যাগুলোর স্বরূপটা যে কী, সেটাও আমাদের নির্ধারণ করে ফেলতে হবে। তাই নয় কী ?

চিফ জ্যোতিরাম বামপতি : সে তো অতি অবশ্য।

প্র কা নি অ সদা প্রভুর মনরাখি : ওহে অপারেটর, দার্জিলিং ম্যানসনকে জিজ্ঞাসা কর তো, আগুনটা এখন ঠিক কোন্ পজিশনে আছে ?

ডি সি ও নিম খাশা তৈলমর্দন : আর আগুনটার গতি কোন দিকে ? মানে উঁচু থেকে নিচে নামছে ? না নিচু থেকে উঁচুতে উঠছে ? ডাইনে থেকে বাঁয়ে যাচ্ছে, নাকি বাঁ থেকে ডাইনে যাচ্ছে ?

চিফ জ্যোতিরাম বামপতি : আর হাঁ, আর এটাও জানিয়ে দিয়ো যে, আমরা আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দার্জিলিং ম্যানসনের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে নিলাম।

হ্যালো, হাঁ হাঁ আগুন লেগেছে, তাতো জানি। কিন্তু আগুনটা এখন কোন পজিশনে আছে ? আরে বৃথা সময় নষ্ট করছেন কেন, যা জিজ্ঞাসা করছি, তার জবাবটা চটপট দিয়ে ফেললেই তো আমরাও পটাপট কাজ শুরু করতে পারি। আরে মশাই, অত উতলা হচ্ছেন কেন ? আপনাদের ব্যাপারটা যে কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছি আমরা, তা জানেন ? হাঁ, ঠিক শুনে রাখুন, আমরা সীমিত নিরাপত্তার [illegible] ক্ষমতার মধ্যে আমরা আপনাদের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। স্যর চিফ এ কথা বলেছেন। অ্যাঁ, কী বললেন, আপনাদের ওখানে আগুন লেগেছে। তা আমার কথা শুনে আপনার কী মনে হল, আমি [illegible] নিয়েছি, আপনাদের ওখানে [illegible] হচ্ছে ? হ্যালো, দার্জিলিং ম্যানসন, [illegible] — কী বললেন, আপনি দার্জিলিং ম্যানসন নন, [illegible] অনুগ্রহ করে [illegible] ছেড়ে দিন, [illegible] আমাকে পুলিশের [illegible] দিতে হবে।

বিতৃষ্ণা

মৃদুলা গর্গ

দেড়টা বাজে। বেলা দেড়টা। সূর্য একেবারে মাথার উপরে। রোদের প্রচণ্ড তাপে খা-খা রাস্তা। ধারে কাছে একটা গাছও নেই যে একটুখানি হাল্কা ছায়ার চাদর টেনে দেয়।

মোটর বাইকের হ্যান্ডেল দুটো হাত দিয়ে ধরে দিনেশ বিনা কারণেই রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে। হেলমেটের নিচটা প্রায় গনগনে উনুনের মত গরম হয়ে ওঠায় সেটাকে খুলে সিটের উপর রেখে দিয়েছে। এখন খোলা আকাশের নিচে তার মাথায় চড়া রোদের চাবুক পড়ছে। মাথা আর চুল থেকে ঘাম গড়িয়ে শার্টের কলারটা সপসপে। ভিজে শার্টটা পিঠের সঙ্গে লেপটে রয়েছে। হাত পা সব ঘামে চিটচিটে। আগুনের হলকায় ধাঁধানো চোখ দুটোর মধ্যে যেন লাল-কমলার ঘূর্ণিঝড় উঠেছে।

এমনি সময়ে যে কোন লোকেরই বাড়ির কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। রোদ আর বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্যই তো লোকে ঘর বাঁধে। চারদিকে চারটে দেওয়াল আর মাথার উপরে এক ফালি ছাত।

এই সামনেই তো দিনেশের বাড়ি। রাস্তার ঠিক ওপারেই। মোটর বাইকটাকে ঠেলে মাত্র দু চার পা এগিয়ে যেতে হবে। উঠোন পেরিয়ে গোটা কুড়ি সিঁড়ি বেয়ে উঠে শুধু সামনের দরজাটুকু ধাক্কা দেওয়ার ওয়াস্তা। তার পরেই সে পৌঁছে যাবে বাড়ির ভেতরে। সব সুদ্ধ দু মিনিটও লাগার কথা নয়।

দিনেশ আর একবার হাতে বাঁধা ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখল। হ্যাঁ দেড়টাই বাজে। বাড়ি ফেরার এই-ই ঠিক সময়। শালিনী এখন নিশ্চয়ই খেতে বসেছে। আর একটু দেরি করলেই সে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বে। কলিং বেল বাজলে এসে দরজা খুলে দেবে ঠিকই কিন্তু তার সেই সময়কার মুখের ভাব দিনেশের পক্ষে অসহ্য শক্ত।

শালিনী দরজা খুলতে ধীর পায়ে এগিয়ে আসবে। সেই চির পরিচিত আওয়াজ। তার চলার গতি চিরদিন একই রকমের। সে এসে দরজার ছিটকিনিটা খট করে নামিয়ে আবার ঠিক তেমনি ভাবে ফিরে চলে যাবে। দরজাটা দিনেশকেই বাইরে থেকে ঠেলে খুলে নিতে হবে। ভেতরে ঢুকে, ফিরে-চলে-যাওয়া শালিনীর পিঠের এক ঝলক শুধু সে দেখতে পাবে। তার মুখ নয়। আর একবার খট্ করে একটা শব্দ হবে, ওর ঘরের দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবার শব্দ। দিনেশ রয়ে যাবে

বাইরের এই ঘরটায়, যেটাকে তারা ড্রইং-কাম-ডাইনিং হিসাবে ব্যবহার করে। খাবার টেবিলে সুন্দর করে সাজানো খাবার ব্যবস্থা করা থাকবে। একটি মাঝারি মাপের থালা, তার উপরে দুটি বাটি আর একটি চামচ। পাশে রাখা গেলাস। ট্রের উপরে ঢাকা দেওয়া ডাল ও তরকারির দুটি পাত্র, দুটি ছোট হাতা আর রুমালে মোড়া চারখানি রুটি। দিনেশ এবার ধীরে-সুস্থে হাত মুখ ধুয়ে নিতে পারে। পেছনে বেসিনের পাশে ফর্সা তোয়ালে টাঙানো থাকবে। ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা জলের বোতল আর দই বার করে নিয়ে এবারে সে খেয়ে নিতে পারে। ইচ্ছে করলে রান্নাঘরে গিয়ে ডাল তরকারি গরম করেও নিতে পারে। গ্যাসের উনুনের ঠিক পাশটাতেই দেশলাইয়ের বাক্স রাখা থাকবে। আর একটা ধোওয়া-মাজা, ঝকঝকে কড়াই। অভিযোগ করার কোন অবকাশ নেই।

খাবার পর দিনেশ তার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তে পারে। বিছানার পাশেই ছোট কৌটোয় এলাচ মৌরি রাখা থাকবে। চিবোতে চিবোতে গড়িয়ে নিতে পারে। তবে ইচ্ছা না হলে শোবার কোন বাধ্যবাধকতাও নেই।

দিনেশের উপর কোন কিছু নিয়েই কোন রকম জোর করার কেউ নেই। ঠিক পাঁচটার সময় শালিনী ঘুম থেকে উঠবে আর চা তৈরি করে টেবিলের উপর রেখে দেবে। নিজের পেয়ালা হাতে নিয়ে শালিনী জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াবে আর বাইরের দিকে চেয়ে থাকবে। দিনেশ জানে যে সে-ও যদি নিজের চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে জানলার ধারে ওর পাশটিতে গিয়ে দাঁড়ায় তাহলে শালিনী সঙ্গে সঙ্গেই বসার ঘরে ফিরে আসবে আর যে কোন একটা পত্রিকা খুলে বসে পড়বে।

নিজেরই বাড়িতে নিজের সময় কাটানো কি ভীষণ কঠিন! চারটে বাজতে না বাজতেই দিনেশ বাইরে বেরোবার পরিকল্পনা করতে থাকে। কিন্তু পাঁচটার আগে বেরোতে হলে আবার দরজা বন্ধ করার জন্য শালিনীকেই ডাকতে হয়। ডাকার পর যতই অপেক্ষা করুক না কেন, সে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়ার আগে কিছুতেই শালিনী দরজা বন্ধ করতে আসে না। তার চেয়ে বরং এ-পাশ-ও-পাশ করতে করতে পাঁচটা অবধি কোন মতে কাটিয়ে দেওয়া সোজা!

হ্যাঁ, সত্যিই দেড়টা বেজে গেছে। এবারে বাড়ি ফেরা উচিত। দিনেশও জানে যে দুপুরে খাবার পর শালিনীর ঘুমোনো অভ্যাস। ঘুমের ব্যাঘাত ঘটলেই তার মাথা ধরে আর সেই মাথাধরা আবার কখনও কখনও তিন চার দিনের আগে সারে না। সে তাই চায় না যে তার দেরি করে বাড়ি ফেরার দরুন শালিনীর মাথা ধরুক।

এখন বাড়ি ঢুকলে হয়ত শালিনীকে খাবার টেবিলেই দেখতে পাবে। তাহলে আর বেল বাজাবার দরকার হবে না। দরজাটা খাবার টেবিলের ঠিক সামনেই। খেতে বসার সময় শালিনী কখনও দরজায় ছিটকিনি লাগায় না। দরজাটা শুধু ভেজানো থাকে, অনায়াসে একটু ঠেলেই ভেতরে ঢোকা যায়। শালিনী এ সময় টেবিলে বসে থাকবে। তার ঠিক সামনেই দিনেশেরও খাবার ব্যবস্থা করা থাকবে। সেই নিত্য নৈমিত্তিক একটি থালা, একটি গেলাস, একটি চামচ, দুটি বাটি। ঢাকা দেওয়া তরকারির পাত্র আর রুমালে মোড়া রুটি। ঠাণ্ডা, নিষ্প্রাণ কর্তব্যের পরাকাষ্ঠা!

যখনই দিনেশ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকুক না কেন, শালিনী কখনও মুখ তুলে তার দিকে চেয়ে দেখে না! চুপচাপ একমনে খেতেই থাকে। আচ্ছা, ও কি করে বুঝতে পারে যে যে-লোকটি দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকছে সে একমাত্র দিনেশ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না? প্রতি দিনই তো সে একটা না একটা নতুন ভাবে দরজাটা ঠেলে ঢোকার চেষ্টা করে। শুধু এই আশা নিয়ে যে,যদি সে একবার চমকে উঠে মাথা তোলে আর শুধু একটি বার তার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখে। আর তখন—আচ্ছা, এমনটি কি হতে পারে না যে এত বছর পরে ওর দিকে চেয়ে দেখার পর....শালিনী আবার ওকে নতুন করে চিনতে

পারবে ?

কতবারই তো দিনেশ বলতে চেয়েছে "শালিনী ! শালিনী ! এবার তো আমি রিটায়ার করেছি। এখন আমার কোন কাজ নেই। তোমার মনে পড়ে, আগে তুমি আমায় কতবার বলেছ যে আমার নাকি কিছু বলার, কিছু শোনার অবসর নেই। আপিস থেকে ফিরি তাও ফাইলের বোঝা নিয়ে। সারাটা সময় শুধু কাজ নিয়েই ডুবে থাকি। কিন্তু আজ আমার অখণ্ড অবসর। এখন তো আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা বসে কথা বলতে পারি। তুমি তো জানো, শালিনী, আমি নিছক অভ্যাসের বশেই রোজ সকালে বাইরে যাই। তুমি বারণ করলে একেবারেই বেরোব না।" এ রকম আরো কত কথাই তো সে বলতে চায়। কিন্তু বলার মত সুযোগ আর আসে না।

রোজই যখন সে হাত মুখ ধুয়ে শালিনীর সামনের চেয়ারটায় বসে, তখন এক দৃষ্টে পরিবেশনে ব্যস্ত মালিনীর দিকে চেয়ে থাকে। যদি সে ভুল করেও একটি বার মুখ তুলে তাকায় তাহলেই নিজের কথা বলে ফেলা যায়। কিন্তু শালিনীর দৃষ্টি শুধু থালার উপরে নিবদ্ধ থাকে। খাওয়া শেষ হতেই এঁটো বাসনপত্রগুলো তুলে নিয়ে সে উঠে পড়ে। আশ্চর্য, কখনও ভুল করেও সে কোন বাসন টেবিলে ফেলে যায় না ! কখনও চেয়ে দেখে না দিনেশের খাওয়া হয়েছে কিনা, না কি সে এখনও খাচ্ছে। টেবিলেই বসে আছে না টেবিল ছেড়ে উঠে পড়েছে । দিনেশ সামনে থাকলে পরে শালিনীর মুখ আর মুখ থাকে না—নিছক পিঠে পরিণত হয় ! নিজের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে থাকা লোকের সঙ্গে কথা বলাটা দুঃসাহসের কাজ বৈকি ! সে দুঃসাহস দিনেশের নেই।

তাও সে একদিন খেতে খেতে সাহস করে 'শালিনী !' বলে ডেকে উঠেছিল। কিন্তু সে ডাকে শালিনীর মুখের এতটুকুও পরিবর্তন ঘটে নি। তার আঙুলগুলো এতটুকুও কেঁপে ওঠে নি, তেমনি ভাবে রুটি ছিঁড়ে টুকরো করতে ব্যস্ত থাকল। 'শালিনী !' এবারে সে আরো জোরে ডেকে উঠেছিল। কিন্তু শালিনী একই ভাবে খেতে লাগল, কোন জবাব দিল না। 'শালিনী, আমার তোমায় কিছু বলার ছিল' নিস্তব্ধতার একটি খাদ দিনেশ লাফিয়ে পেরোবার চেষ্টা করেছিল। শালিনী মুখ তোলে নি। তার হাতও থামে নি।

দিনেশ তখন চুপ করে শোনার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। হয়ত তার কথা শালিনী ঠিকই শুনতে পেয়েছে, হয়তো বা এই নীরবতার মধ্যে দিয়েই তাকে জানাতে চাইছে—'হ্যাঁ, বলো। আমি শুনছি।' কিন্তু না ! সেই নির্ভেজাল নীরবতায় কোন সাড়ার আভাসমাত্র ছিল না। নিষ্প্রাণ, নিথর নিস্তব্ধতা !

'তুমি কিছু বলছ না কেন ?' শেষ পর্যন্ত দিনেশ না চেঁচিয়ে পারে নি।

'কথা তোমার বলার ছিল, আমার নয় !' শালিনী মৃদু গলায় জবাব দিয়েছিল। তারপর আবার সেই অখণ্ড নীরবতা। শব্দের সেই ছোট্ট ঢিলটুকু নিস্তব্ধতার সমুদ্রে এতটুকুও তরঙ্গ না তুলে টুপ করে ডুবে গেল। শালিনীর চোখ ঠিক আগের মতই ভাবলেশহীন। চোখ দুটো তেমনি নীচের দিকে আবদ্ধ। তার চাপা, বন্ধ ঠোঁট দুটো এত কম সময়ের জন্য খুলেছিল যে দিনেশ বুঝতে পারে নি সত্যিই শালিনী কোন কথা বলেছিল না এটা তারই চোখের বা মনের ভুল। ততক্ষণে দিনেশের সাহস ফুরিয়ে এসেছিল। সামনে নীরবতার অতল খাদ। সেটাকে লাফিয়ে অতিক্রম করার মত তার মনের জোর কই ! নইলে কত কথাই তো তার বলার ছিল।

সে তো জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিল—"শালিনী, আজ থেকে কুড়ি বছর আগে তোমার আমাকে কত কথাই না বলার ছিল—তার কী হল ? কোথায় হারিয়ে গেল সে সব কথা ? আমায় না বলতেই সব কথা এমন করে ফুরিয়ে গেল কি করে ? তখন আমি ব্যস্ত ছিলাম, ভারি ব্যস্ত। তখন তুমি আমায় একবার জিজ্ঞাসা করেছিলে—আমার সঙ্গে ঘণ্টা খানেক বসে কথা বলারও কি তোমার সময় নেই ?' উত্তরে আমি বলেছিলাম—'কথা বলার সময় তাদেরই থাকে, যাদের কোন কাজ নেই। তুমি যদি ঠিক করে মন বসিয়ে ঘর সংসার চালাতে তাহলে তোমারও বক বক করার সময় থাকত না'....কিন্তু তুমি এ কথা কেন বোঝো না, শালিনী, যে তখন সত্যিই আমার সময় ছিল না। আজ আছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অবস্থারও পরিবর্তন হয়। সেই অবস্থার সঙ্গে নিজেকেও মানিয়ে নিতে হয়। ভেবে দেখো, বাড়িতে আমরা দুটি মাত্র প্রাণী। আমাদের একমাত্র ছেলে বহুদিন আমেরিকাবাসী হয়ে গেছে তার ফেরার প্রশ্নই ওঠে না। এখন তোমার বা আমার যা কিছু বলার, পরস্পরকেই বলতে হবে। এ রকম নিস্তব্ধতার মধ্যে জীবনটা কাটবে কেমন করে ?"

তারপরেও দিনেশ কতবারই ভেবেছে নিজের কথাটা বলার আর একবার চেষ্টা করা যাক। এ কথা তার রোজই মনে হয়। বার বার সে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে এই কথা না বলা নিস্তব্ধতাটুকু কোনমতে একবার ভেঙে ফেলতে পারলেই সব আবার ঠিক হয়ে যাবে। কথা না বলে বলে কথা বলার অভ্যাসটুকুই শুধু চলে গেছে তাদের। ব্যাস। আর কিছু নয়। আর কিছুই হয় নি দুজনের মধ্যে। কিন্তু শালিনী....

গতকাল দুপুরে বাড়ি ফেরার সময় দিনেশ দরজার বাইরে থেকে ভেতরে হাসির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। হঠাৎ চমকে উঠেছিল সে। তবে কি ভুল করে অন্য কারো বাড়ির দরজায় এসে পড়েছে ? দরজার উপরে লাগানো নেমপ্লেটটা আরেক বার পড়ে দেখল। হ্যাঁ, এ তো

তার নিজেরই বাড়ি। তবে ? ভেতরে তাহলে কে ? দুটি মেয়েলি গলার হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে । কাদের ? একটি তো শালিনীর, অন্যটি ? যাক গে, অন্য গলা যারই হোক, একটি নিশ্চয়ই শালিনীর। অধীর আগ্রহে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল দিনেশ। সামনে সোফায় মঙ্গলা বসে। শালিনীর ছোট বোন মঙ্গলা। তার পাশে শালিনী। দু জনেই হো হো করে প্রাণ খুলে হাসছে। এদের হাসির আওয়াজ হঠাৎ থেমে গিয়ে সেই চিরপুরাতন নিস্তব্ধতা যাতে নতুন করে আবার গ্রাস না করতে পারে তাই দিনেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠল—"আরে মঙ্গলা, তুমি ! কেমন আছ বলো ? কতদিন পরে এলে, বল তো। বোসো, বোসো। তারপর, খবর সব ভাল তো ? সুরেশ কেমন আছে ? বাচ্চারা ? মাধবীর ডাক্তার হয়ে বেরোতে আর ক বছর বাকি ? হ্যাঁ,

ভাল কথা, নতুন সিনেমা কিছু দেখলে নাকি ?"

দিনেশ একটার পর একটা প্রশ্ন করে চলেছিল, মঙ্গলা মাঝে মাঝে তার দু একটার জবাব দিচ্ছিল। শালিনী এতক্ষণ চুপ করে পাশে বসে ছিল। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল। একটু ইতস্তত করে মঙ্গলাও তার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

'আরে, কোথায় চললে ?' দিনেশ বলে উঠেছিল, 'বোসো, বোসো। দুপুরের খাবার খেয়ে যাও। তৈরিই আছে।'

মঙ্গলা একটু সঙ্কুচিত হয়ে বলে উঠেছিল, 'কিন্তু আমার তো খাওয়া হয়ে গেছে জামাইবাবু' 'ওঃ খাওয়া হয়ে গেছে। তা ভাল! ভালই করেছ। আমার ফিরতে যা দেরি হল! সে যাক, টেবিলে আমার সঙ্গে বোসো একটু। চা কফি কিছু খাও অন্তত। কোনটা খাবে বল তো ?' 'না কিছু না। আমরা তো কফিও...' 'আয় মঙ্গলা, এ ঘরে এসে বোস' শালিনী এবার বলে উঠল। তার পরেই নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল। তার পেছন পেছন মঙ্গলাও গিয়ে তার ঘরে ঢুকল।

দিনেশ একাই রয়ে গেল ঘরে। সেই সুন্দর, সুসজ্জিত আরামদায়ক বৈঠকখানায়, যেখানে খাবার টেবিলে সুন্দর করে তার খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েছে—পুষ্টিকর, সুস্বাদু আর মাপ মাফিক।

দিনেশের মনে হয়েছিল তরকারির পাত্রটা তুলে দেওয়ালের গায়ে ছুঁড়ে মারে, ডালের পাত্রটা মেজেতে আছড়ে ফেলে আর চিৎকার করে বলে ওঠে—'তরকারিতে চুল পড়েছে, ডালে কাঁকর ভর্তি।' শালিনীর এই সুচারু, সুপরিকল্পিত সুষ্ঠু গৃহিণীপনার গর্ব চূর্ণ হোক। শব্দ শুনে শালিনী যখন তার ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসবে তখন দিনেশ লাফিয়ে তার সামনে দাঁড়াবে আর তার কাঁধ চেপে ধরে (হ্যাঁ, শারীরিক শক্তি এখনও তার শালিনীর তুলনায় অনেকটাই বেশি) সে চিৎকার করে না ওঠা পর্যন্ত তাকে ঝাঁকাতেই থাকবে। "বলো, বলো" দিনেশ তখন তাকে বলবে, "যা হোক কিছু বলো। চুপ করে থাকলে আমি তোমায় মেরে ফেলব।" তখন নিশ্চয়ই শালিনী কথা বলতে বাধ্য হবে।

দিনেশ ডাল আর তরকারির পাত্র দুটি হাতে তুলে নিয়ে....আবার সে দুটোকে টেবিলেই রেখে দিল। যে জীবনে কখনও কোন রকম অসভ্য আচরণ করেনি তার পক্ষে আজও নতুন করে কিছু করা সম্ভব হল না। শুধু পরিবেশন করা খাবার টেবিলে ফেলে রেখে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

সে তো কালকের কথা। আজ ভর দুপুরে শার্টের হাতায় বারবার ঘাম মুছতে মুছতে দিনেশ ভাবতে লাগল, যদি সত্যিই কাল সে ঐ রকম কিছু করতে পারত তাহলে কী হত ? শালিনী কি.... ? শালিনীর দু চোখ ভরা সেই বিতৃষ্ণার মুখোমুখি হোত সে কেমন করে ? সে বিতৃষ্ণা কি তার সারা, অস্তিত্বে শ্লেষ্মার মত লেপটে যেত না ?

শুধু একদিন তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য দিনেশ খেতে খেতে বলে উঠেছিল—'ডালে কাঁকর রয়েছে।' শালিনী কোন কথা বলে নি। শুধু উঠে দাঁড়িয়ে ডালের পাত্রটা আর বাটি ভরা ডাল তুলে নিয়ে গিয়ে সবটা ডাস্টবিনে ঢেলে দিয়ে এসেছিল। দিনেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল—'ফেলে দিলে কেন ? খাওয়া কি আর যেত না ?' শালিনী কথার জবাব দেয় নি; কিন্তু হাবভাবে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছিল যে ডালে কাঁকর থাকার প্রশ্নই ওঠে না। মুখে কিছু না বললেও তার দিকে চেয়ে দিনেশের মুখেও আর কথা সরে নি।

উঃ আর তো এই রোদে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। দিনেশ আবার শার্টের হাতায় মাথার ঘাম মুছে নিজের বাড়ির দিকে চেয়ে দেখল। কাল দুপুরে সেই যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল তার পরে আর সে বাড়ি ঢোকেনি। অর্ধেক রাত ক্লাবে আর বাকি রাতটা পার্কে বসেই কাটিয়ে দিয়েছিল। এবার আর না ফিরে উপায় নেই। হঠাৎ মনে হল তার বাড়ির জানলার পর্দাটা যেন একটু নড়ে উঠল। পর্দাটা আধখানা টেনে সরিয়ে দিতে দিতে কে যেন হঠাৎ থেমে গেল। বোধহয় একটা হাত এখনও পর্দাটা ধরে রয়েছে। পর্দার পেছনে শালিনী। জানলার বাইরে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই চেয়ে আছে। যদি এখন সে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকে পেছন থেকে ওর কাঁধটা চেপে ধরে ? জোরকরেই যদি ওকে বুকে টেনে নেয় ? না হয় ওর পিঠের দিকে চেয়েই কথা বলে ? হ্যাঁ, এটাই হয়ত দিনেশের এতদিনের একমাত্র ভুল—শালিনীর চোখে চোখ রেখে কথা বলার চেষ্টা করা। সেই চোখের মাঝে নিজের হারিয়ে যাওয়া অস্তিত্ব নতুন করে খোঁজার চেষ্টা করা। আর সেই দুটি চোখের বিতৃষ্ণার নিষ্ঠুর আঘাতে মূক হয়ে যাওয়া! আজ সে তার বক্তব্য বলে তবে ছাড়বে। তারপর জোর করেই শালিনীর মুখ নিজের দিকে ফিরিয়ে নেবে। হয়ত ওর কথা শোনার পরে শালিনী.....! দিনেশের মন হঠাৎ একটা চাপা উত্তেজনায় চনমনে হয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি মোটর বাইকটা ঠেলে বাড়ির পথে পা বাড়াল।

খাওয়া শেষ করে শালিনী জানলার ধারে এসে দাঁড়িয়েছিল। পর্দাটা কেমন করে এক পাশ সরে গেছে, সেটাকে পুরোপুরি টেনে দিয়ে, দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে এবারে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেই হয়। বাইরের দিকে আর তাকানো যায় না। উঃ কী ভীষণ চড়া রোদ্দুর। কত বছর হয়ে গেছে সে একবারও বাইরে রোদে বেরোয় নি। দরকারই পড়ে না বাইরে যাবার। যদি ওকে কেউ এখন জিজ্ঞাসা করে, 'রোদের তাৎপর্য কি ?' ও সটান জবাব দেবে 'মাথা ধরা!' মিছিমিছি কেউ যে কি করে রোদের মধ্যে বেরোতে পারে শালিনী ভেবেই পায় না।

এমন সময় হঠাৎ শালিনী দেখতে পেল ওদের বাড়ির সামনেই একটা লোক মোটর বাইকের উপর হাত রেখে এই চড়া রোদের মধ্যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কেমন যেন অসহায়ের মত। হয়ত মোটরবাইকটাই বিগড়ে গেছে। বেচারা! এত রোদে বেশিক্ষণ এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে হয়ত মাথা ঘুরেই পড়ে যাবে। দেখে মনে হয় খুব ঘামছে লোকটা। পকেট থেকে রুমাল বের করারও ধৈর্য নেই, বার বার শার্টের হাতায় ঘাম মুছছে।

কিন্তু এরকম ভাবে দাঁড়িয়ে থেকেই বা লাভ কি ? মোটরবাইকটাকে তো টেনে নিয়ে যেতেই হবে! গ্যারেজ খুব একটা কাছে নাই হোক, এমন কিছু দূরেও নয়। এমনি করে রোদের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলে তো লু লেগে যাবার পুরো সম্ভাবনা। কলেজে পড়ার সময় শালিনী একজন মজুরকে ঠিক এমনি রোদ্দুরে মাথা ঘুরে পড়ে যেতে দেখেছিল। মাটিতে পড়ে কেমন ছটফট করছিল লোকটা। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। পরে লোকজনদের বলতে শুনেছিল যে সময়মত একটু জল পেলে হয়ত লোকটা বেঁচেই যেত! এ কথাটা তখন অবশ্য কারো মাথায় আসে নি। এখানেও তো আশে পাশে কোথাও জল নেই। কে জানে হয়ত তেষ্টার জন্যই লোকটির বাইক চালানোর ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। ও কি তবে নেমে গিয়ে লোকটিকে এক গেলাস জল দিয়ে আসবে ? ক্ষতি কি ? শালিনী ফ্রিজ খুলে ঠাণ্ডা জলের বোতল বের করে গেলাসে ঢেলে নিল। তারপর জানলার ধারে গিয়ে আর একবার বাইরে উঁকি মেরে দেখল। হ্যাঁ, লোকটি এখনও তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। আর বার বার ওদের বাড়ির দিকে তাকাচ্ছে। কেন ? চেনা পরিচিত কেউ নয় তো ? কে এই লোকটা ? কে হতে পারে ?

শালিনী দেখল মোটরবাইকটা ঠেলতে ঠেলতে লোকটা ওদেরই উঠোনের দিকে এগিয়ে আসছে। এতক্ষণে ওর চেহারাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আরে এ তো....! শালিনীর চোখের দরজা দুটো এক পলকে বন্ধ হয়ে গেল। শরীরটা শিথিল হয়ে এল। উদাসীন হাতে জানলার পর্দা টেনে, দরজার ছিটকিনিটা খোলা রেখে সে এবার নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালো। যাবার পথে টেবিলে রাখা ঠাণ্ডা জলের বোতলটা তুলে নিয়ে আবার ফ্রিজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। যার দরকার সে যেন নিজেই বার করে নেয় !

আকুল হাতে দরজা ঠেলে দিনেশ ঘরে ঢুকলো। দেখতে পেল চলে যাওয়া শালিনীর পিঠের এক ঝলক। নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছিল সে। আবার সেই পরিচিত খট করে শব্দ। তার সরে যাওয়া পিঠের পেছনে দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। সুন্দর সাজানো ঘরে দিনেশ আবার সেই একা !

অনুবাদ : স্বপ্না দত্ত

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

মৃদুলা গর্গ

জন্ম ২৫ অক্টোবর ১৯৩৮। অর্থনীতিতে এম এ। হিন্দীতে উপন্যাস, গল্প ও নাটক রচনা করেন। বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের নিয়মিত লেখিকা। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এবং জার্মান, চেক ও রাশিয়ান ভাষায় তাঁর ছোটগল্প অনূদিত হয়েছে। মধ্যপ্রদেশ সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার পেয়েছেন। প্রেম

সৌন্দর্য পরিচর্যায় কৃতী মহিলা

শ্রীমতী

নারী কথাটার সঙ্গে কেমন যেন একটা সৌন্দর্যের সুবাস ভেসে আসে। পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার, কেশসজ্জা, অঙ্গসজ্জা, দেহসৌষ্ঠব—এসব কিছুই যেন বিশেষ করে মেয়েদের জন্যই। আমাদের মধ্যবিত্ত সংসারের মেয়েদের মানসিকতার কিন্তু তেমন পরিবর্তন বোধ হয় হয়নি। বিয়ে হয়ে গেলেই যেন সব হয়ে গেল। অনেক বিবাহিতা শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়েরই বক্তব্য হল, 'দুর, বিয়ে তো হয়ে গেছে, আর সেজে কি হবে!' সাজ বলতে কিন্তু সময় বিশেষে স্নো, পাউডার, কাজল, টিপ পরাই বলে না। সুন্দর সুঠাম দেহসৌন্দর্য, ত্বক-পরিচর্যা, কেশ-পরিচর্যা, রোজকার খাদ্য-তালিকা নির্ধারণ সব কিছুই সৌন্দর্য তালিকায় পড়ে।

হোটেল ওবেরয় গ্র্যাণ্ডের 'সিলহোটে বারবার শপ অ্যান্ড বিউটি সেলুন'-এর ম্যানেজার স্বাতী মিত্রর সঙ্গে মহিলাদের (বিশেষত বাঙালী) সৌন্দর্য সমস্যা নিয়ে কথা বলছিলাম। সংরক্ষণশীল সংসার থেকে নিজেই নিজের দায়িত্বে মাত্র আঠারো বছর বয়সে মিত্র পরিবারের বধূ হয়ে আসেন। স্বামীর অনুপ্রেরণাতেই বোম্বেতে বিউটিশিয়ান কোর্স করেন এবং চাকরিও করেন বোম্বের এক পার্লারে বেশ কিছু দিন। সেখান থেকেই আমেরিকার 'এমিলি স্কুল অফ বিউটি' থেকে একটা সার্টিফিকেট কোর্স করেন। গ্র্যান্ডে এসেছেন তাও আজ প্রায় বছর ছয়েক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, এত লাইন থাকতে হঠাৎ এই লাইনে এলেন কেন? সপ্রতিভ, ধারালো চেহারার স্বাতী স্পষ্ট গলায় বললেন, 'সাজসজ্জা তো মেয়েদেরই আর আমি চিরদিনই সৌন্দর্যপ্রিয়। তবে ঐ হঠাৎ একদিন কাজল পাউডার লাগিয়ে পাগলের মতন সাজ নয়। বিউটিকে জানতে হবে, সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। অনুসন্ধান করতে হবে অন্তরের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে। কেন জানি না ব্যাপারটা আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করেছিল। আর বলা বাহুল্য, আমাদের আর পাঁচটা বাঙালি পরিবারের মতন বাপের বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি থেকে বাধা এসেছিল অনেক। কিন্তু আমার স্বামীর পূর্ণ সমর্থন ছিল আর সেটাই আমার আজকের পরিচিতির অনেকখানি।'

বিগত কয়েক বছর থেকে দেখছি কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় বেশ কিছু বিউটি পার্লার গজিয়েছে। চুল ড্রেস করা, আই ব্রাও প্লাকিং, ফেসিয়াল—এ সব যেন বেশ প্রভাব বিস্তার করছে। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? রিসেপশন টেবিলে বসে থাকা অনিতার সঙ্গে একটা দরকারি কথা বলে নিয়ে আবার ফিরে এলেন আমার সামনে।

'দেখুন, আমি মনে করি বিউটি পার্লার সব সময় অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর হওয়া দরকার। আর এর জন্য থিওরেটিকাল আর প্র্যাকটিকাল জ্ঞান থাকা দরকার। কারণ ডায়েট চার্ট, যোগ ব্যায়াম, চেহারার সঙ্গে মানানসই করে কেশবিন্যাস অথবা ত্বক পরিচর্যা—এ সব কিছুই অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত; রুচিশীল হওয়া দরকার। এই তো দেখুন না এখানেও তো কত চাইনিজ মেয়ে আছেন যাঁরা পাস করা নন, কিন্তু তাঁরা অত্যন্ত অভিজ্ঞ। ছোট থেকে কাঁচি ছুরির কাজ করছেন। তবুও এঁদের সময় বিশেষে শিক্ষণ দেওয়া হয়। আমাদের সমাজে মেয়ে বিউটি পার্লারে কাজ করবে

স্বাতী মিত্র

ছবি : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

এটাই যেন বেমানান। কিন্তু যে কোন কাজে আত্মসম্মান বজায় রেখে, কাজকে ভালবেসে এগিয়ে এলে তবেই নারী মুক্তি ইত্যাদি কথাগুলো বাস্তবায়িত হবে।' দুজনেই একসঙ্গে প্রায় বলে ফেললাম 'অর্থনৈতিক স্বাধীনতা মেয়েদের একান্ত দরকার।' চারদিকের সৌন্দর্যকে দেখতে দেখতে ভাবছিলাম আমাদের সরকার যদি বিউটিশিয়ান কোর্সের ওপর কোন স্কুল চালু করেন তাহলে অনেক মেয়েই এই পেশায় আসতে পারবেন আর বিজ্ঞানসম্মতভাবে ধরেও রাখতে পারবেন আমাদের লাবণ্যের ঐতিহ্যকে।

হামিংবার্ড

অমরেন্দ্রনাথ গুহ

ছোট্ট সুন্দর এই পাখিটির ক্ষুদে ডানার আন্দোলনে যে গুঞ্জনধ্বনি ওঠে, তা থেকেই হয়েছে এই পাখিটির নামকরণ : হামিংবার্ড। ইউরোপ-আমেরিকার মহিলাদের পোশাকে ঝলমলে রঙের এই পাখিটি একসময় সমাদর পেতে শুরু করেছিল—অবশ্যই নিজের প্রাণের বিনিময়ে। অথচ মধুভুক এই প্রাণীটি ফুলের পরাগমিলনের ভিতর দিয়ে অবিরত প্রকৃতির চাহিদা মিটিয়ে চলেছে। ক্ষুদ্রতম এই পাখিটির জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে এই নিবন্ধে।

উনিশ শতাব্দীতে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকাতে মহিলাদের মধ্যে হঠাৎ এক ফ্যাসনের প্রচলন হল জামার উপরে ছোট সুন্দর, ঝলমলে, একরকম পালক সমেত ট্যান করা পাখি ব্রোচের মত এঁটে রাখা। এই ফ্যাসনটা ছিল রুচি, বিত্ত ও ঐশ্বর্যের পরিচায়ক। এতে এই গোষ্ঠীর হাজার হাজার পাখি নিধন হতে লাগল। যেমন "ফ্যাসন" অনেকটা হুজুগ আশ্রয়ী এবং কোন ফ্যাসনই বেশি দিন স্থায়ী হয় না, সাজ পোশাকের অন্য ফ্যাসন আসার সঙ্গে সঙ্গে এই হুজুগও চলে গেল। সেটা খুবই সৌভাগ্যের কথা তা না হলে অন্যান্য অনেক বন্যপ্রাণীর মত এই গোষ্ঠীর পাখিও পৃথিবী থেকে আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। এই পাখির বৈশিষ্ট্য হল যে এদের কোন কোন প্রজাতি আয়তনে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট পাখি এবং এত ঝলমলে রং যে হঠাৎ দেখলে গহনা বলে ভ্রম হবে।

হামিংবার্ডের কথা বলছিলাম। পাখিগুলি আয়তনে ছোট হলে হবে কি এদের প্রজাতির কিন্তু অন্ত নেই। দক্ষিণ আমেরিকার উষ্ণাঞ্চলে ও অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে আছে এদের ৩১৯টি প্রজাতি। এদের মধ্যে আয়তনে যে প্রজাতি সব চেয়ে ছোট, কিউবার "মক্ষিকা হামিংবার্ড" আয়তনে মাত্র এক ইঞ্চির মত। অর্থাৎ একটি গুবরে পোকা বা গঙ্গাফড়িং-এর আয়তনের চেয়েও ছোট। আর এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে অ্যান্ডেস অঞ্চলে "পাটাগোন জিগস"। এদের আয়তন প্রায় আট ইঞ্চি। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেকটাই হচ্ছে "ল্যাজ"। সব প্রজাতির হামিংবার্ডই মধু পিয়াসী। ঘুরে ঘুরে ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ায়। ফুলের মধুই এদের প্রধান খাদ্য। তবে অনেক সময় ফুলের পাপড়িতে ছোট পোকা বসে থাকলে তাও খায়। অনেকের ধারণা আমাদের দেশের মধুপায়ী বংশের মৌচুসি বা মৌটুসি। (কোথাও বা একে বলে দুর্গা-টুনটুনী), ইংরেজিতে এই বংশের সব প্রজাতিকেই বলে "সানবার্ড", এরাও বুঝি "হামিংবার্ডে"র সমগোত্রীয় কারণ, এরাও ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ায়। এই ধারণাটা ভ্রান্ত।"হামিংবার্ড" একেবারেই ভিন্নবংশীয় পাখি। বরং এদের খুব ঘনিষ্ঠ সমগোত্রীয় পাখি "সুইফট্‌স"। এর খানিকটা সাদৃশ্য মেলে আমাদের দেশের অপাদ বংশের (অ্যাপোডিফরমিস) বাতাসি পাখির সঙ্গে। এই সব বংশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পা দুটি নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় কাজেই লুপ্ত প্রায়।

হামিংবার্ডের শরীর ও ডানা প্রায় "সুইফটের" মতই হ্রস্ব, অপরদিকে সমস্ত শরীর উড়বার পক্ষে অনুকূল, লম্বা লম্বা পালকে আবৃত তাই এই বংশের পাখি বলতে গেলে মুখ্যত গগনবিহারী। আকারে আয়তনে ছোট হলেও এরা অত্যন্ত প্রাণচঞ্চল। দেহের গড়ন এমন যে সব কিছুই ফুলের মধু খাবার পক্ষে সহায়ক। কি করে যে ফুল থেকে মধু খায় সে এক বিস্ময়। এরা অনেক রকম ফুল থেকে মধু চুষে খায়। আর এই ভাবে ফুলে ফুলে মধু খেতে খেতে পরাগ সংযোগ করে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন দক্ষিণ আমেরিকার

মধুখাবার সময় এরা কখনো ফুলের উপর বসে না। অতি দ্রুত পাখা ঝাপটে একই জায়গায় ভেসে থাকে

অনেক প্রজাতির ফুলকে এভাবে পরাগ সংযোজনের জন্য নিজেদের চটকদার রঙে সেজে হামিংবার্ডকে আকর্ষণ করবার উপযোগী করে তুলতে হয়েছে। এসব দেখে আশ্চর্য হতে হয় প্রকৃতিতে কিভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগত নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। এরকম "মিথোজীবিতা" বা "সিমবায়োসিস" যদি মানুষের মধ্যে থাকতো তবে আজ জীবন অনেক সহজ ও সুন্দর হত।

নিখুঁতভাবে ফুল থেকে মধু খাবার পক্ষে এদের লম্বা চঞ্চু বা ঠোঁট বিশেষভাবে বিবর্তিত, আর তেমনি সহায়ক এদের লম্বা জিহ্বা। কোন কোন প্রজাতির জিহ্বা সরু এবং নলাকার যাতে ফুলের উপর না বসে উড়ন্ত অবস্থাতেই জিব প্রসারিত করে মধু চুষে খেতে পারে। আবার কোন কোন প্রজাতির জিবের ডগা ব্রাশের মত খরখরে এতে ফুলের মধু, পরাগ ও ফুলের উপরে ছোট ছোট কীট পতঙ্গ থাকলে সহজেই তুলে নিতে পারে। আগেই বলা হয়েছে এদের পায়ের গড়ন শাখাশ্রয়ী পাখিদের মত নয় বরং পা দুটি লুপ্ত প্রায়। মধু খাবার সময় কখনও ফুলের উপর বসে না। ফুলের কাছে এসে এত দ্রুত পাখনা ঝাপটাতে থাকে যে তা প্রায় মানুষের দৃষ্টি শক্তির অগোচরেই হয়ে যায়। ছোট প্রজাতির হামিংবার্ড সেকেণ্ডে অন্তত ৭০ বার ডানা ঝাপটায় আর অপেক্ষাকৃত বড় প্রজাতির পাখি সেকেণ্ডে ২০ থেকে ২৫ বার। মধু খাবার সময় ডানার দ্রুত উপরে নীচে ঝাপটানিতে এরা শূন্যে ভারসাম্য রক্ষা করে নির্বিঘ্নে মধু আহরণ করে চলে। উড়বার সময় অবিশ্যি ডানার ঝাপটানির কৌশল পরিবর্তন করে। এমন সমান্তরালভাবে ঝাপটায়, এতে গতি সঞ্চয় করতে পারে। কোথাও না বসে ক্রমাগত ডানা ঝাপটাতে এদের প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয় তাই প্রতি পনর কুড়ি মিনিট পরই এদের খাবার প্রয়োজন হয়। এই ক্রমাগত দ্রুত ডানার ঝাপটানিতে ভোমরার মত একটা অস্পষ্ট বোঁ বোঁ শব্দ হতে থাকে তাই নাম "হামিংবার্ড"। এরা সাধারণত বনাঞ্চলেই থাকে তবে কোন কোন প্রজাতি উন্মুক্ত অঞ্চলেও থাকতে অভ্যস্ত।

মস, লাইকেন, মাকড়সার জাল দিয়ে সাজানো বাসায় মা ও সন্তান

হামিংবার্ডের পা দুটি নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় কাজে লুপ্তপ্রায় । এদিক দিয়ে এদের মিল আছে আমাদের দেশের বাতাসী পাখির সঙ্গে

আবার কোন কোন প্রজাতি থাকে খুব উঁচু পাহাড়ী অঞ্চলে। এদের মধ্যে অনেক প্রজাতিই পরিযায়ী। এরা পরিযায়ী হয়ে উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ কানাডা ও আলাস্কা প্রভৃতি অঞ্চলে যায়। লালগলা (রুবি থ্রোটেড) হামিংবার্ড বোধ হয় সবচেয়ে পরিযায়ী দক্ষ। আয়তনে ছোট হলে হবে কি মেক্সিকো উপসাগর ধরে কোথাও না থেমে পূর্ব উত্তর আমেরিকাতে প্রায় ৯৫০ কিলোমিটার দূরে পাড়ি জমায়। এ আর এক বিস্ময়, যে পাখির ১৫/২০ মিনিট পরপর খাবার প্রয়োজন হয় সেই পাখি কি করে না খেয়ে এক নাগাড়ে ৯৫০ কিঃ মিঃ দূরে পাড়ি জমায়। দেখা গিয়েছে যে এই বংশের "রুফাস হামিংবার্ড" প্রজাতি উত্তর পশ্চিম আলাস্কা থেকে শীতের সময় প্রশান্ত মহাসাগরের কোলঘেষে রকিমাউন্টেন পর্বতশ্রেণী ১২,০০০ ফুট উঁচু দিয়ে মেক্সিকোতে পাড়ি জমায়। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমার আগে এরা শরীরের ওজনের দ্বিগুণ চর্বি জমিয়ে নেয়। কারণ উড়বার সময় তো আর কোথাও নামবে না বিশ্রাম নেবে না বা খাবার খাবে না—যাকে বলে "ননস্টপ ফ্লাইট"। একমাত্র বৃষ্টির সময়ে এরা প্রায় নির্জীব ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে। অনেকটা সরীসৃপের হিমশয়ানের মত। দীর্ঘ বর্ষার সময় এই ভাবে নির্জীব থেকে ভালো দিনের জন্য শক্তি সঞ্চয় করে। প্রায় সব পাখিই স্নান করতে ভালোবাসে। এরা কিন্তু বলতে গেলে স্নান এড়িয়েই চলে শুধু মাঝে মাঝে গাছের পাতাতে যে জলের ফোঁটা লেগে থাকে তা দিয়ে ডানা ঘষে পরিষ্কার করে নেয়। এই হল এদের স্নান। এরা দল বেঁধে থাকা পছন্দ করে না। স্বভাবতই একলাষেঁড়ে। খাদ্যের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে খুব ঝগড়া বিবাদ করে। এদের পুরুষ শরিকগুলি সবসময় স্বল্প কয়েক বর্গমিটার জায়গা ঝগড়াঝাঁটি করে নিজের দখলে রাখতে চেষ্টা করে। কেবলমাত্র নিজ প্রজাতি নয়, এমনকি অন্য প্রজাতি বা গণের পাখিদেরও এই অধিকৃত সাম্রাজ্যে আসা পছন্দ করে না। এলে তেড়ে গিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করে দূর করে দেয়।

হামিংবার্ড যদিও আকারে আয়তনে খুব ছোট, দেখতে সুন্দর, সুদক্ষ শিল্পীর তুলির বর্ণসম্ভারে সমৃদ্ধ কিন্তু এদের প্রণয় অভিসার নিতান্ত আনাড়ীর মত ও অপরিচ্ছন্ন। পুরুষ পাখি হঠাৎ কোথা থেকে এসে ঝুপ করে স্ত্রী পাখির সামনে বারবার ঘুরতে আরম্ভ করে। যতক্ষণ না দয়িতার মনোরঞ্জন হয়। দেখা যায় অনেক প্রজাতির পাখি দয়িতার মনোরঞ্জন করবার জন্য পাখা মেলে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে। কোন কোন পাখি আবার সুন্দর শিস্ দিয়ে অথবা ডাক দিয়ে দয়িতাকে জিতে নিতে চেষ্টা করে। আবার কোন কোন প্রজাতির মিলন প্রয়াসী পুরুষ পাখি অনেকটা সুন্দর সুন্দর বাসা বানায় যদি স্ত্রী পাখির সেই বাসা পছন্দ হয় তবে সেটাতে ঢুকবে মিলনের জন্য। আবার কোন কোন গোষ্ঠীর স্ত্রী এবং পুরুষ পাখির যুগ্ম প্রচেষ্টায় বাসা বাঁধা হয়। কিন্তু এই গোষ্ঠীর পুরুষ পাখি সে রকম কিছুই করে না। কেবলমাত্র সুন্দর, চকচকে রঙের বিচ্ছুরণ আর সুন্দর পালকের বর্ণ সম্ভার দিয়ে দয়িতার মনোহরণ করে। কোন কোন প্রজাতির পুরুষ পাখি নিজের ঝুঁটির বাহার বা জুলফি, দাড়ি বা ল্যাজের পালকের রঙের চাকচিক্য দিয়ে যদি দয়িতার মন জয় করতে পারে তবে নিঃসীম নীল গগনে উড়ন্ত অবস্থাতে মিলন হতে বাধা নেই। কিন্তু আশ্চর্য এমন অকৃতজ্ঞ সঙ্গী কিন্তু বড় একটা দেখা যায় না। মিলনের পরে পুরুষ পাখি আর কোন দায়িত্বই পালন করে না। এবার বাসা বাঁধা, ডিমে তা দেয়া, বাচ্চার জন্য খাবার যোগাড় করা ইত্যাদি সবই স্ত্রী পাখির দায়িত্ব। এসব ব্যাপারে আর কোন যৌথ ভূমিকা নেই। স্ত্রী পাখিটি এবার নিজের পছন্দ মত ছোট চায়ের পেয়ালার আকারের অথবা গম্বুজ আকৃতির গাছের দুই ডালের মাঝে বা ঝুলে পড়া ডালে বা লতাগুল্মের সাথে আটকে ঝোলান বাসা বাঁধে গাছের আঁশ, শুকনো সরু লতাগুল্ম, শ্যাওলা, শুকনো পুষ্পল ছত্রাক, মাকড়সার জাল ইত্যাদি দিয়ে খুব শক্ত করে। দেখা গিয়েছে এই সব অতিসামান্য মাল মসলা দিয়ে খুব দক্ষ শিল্পীর হাতে আঁকা ছবির মত নানাভাবে বাসা বেঁধেছে। আয়তনের তুলনায় বেশ বড় আকারের একবারে দুটি করে সাদা রঙের ডিম দেয়। প্রায় চৌদ্দ দিন ডিমে তা দেয়। ডিম থেকে বাচ্চা বেরোবার পরও অন্তত দুই থেকে চার সপ্তাহ মায়ের তত্ত্বাবধানেই থাকে। এই সময়টাতে মা বাইরে থেকে বেশ পেট ভরে মধু ও কীট পতঙ্গ খেয়ে এসে নিজের পাকস্থলী থেকে খাদ্য উপড়ে বাচ্চার পাকস্থলীতে চালান করে দেয় যতদিন না বাচ্চা নিজে ফুলে ফুলে মধু আহরণ করতে শেখে। এই সময়টা এদের পক্ষে খুবই সংকটজনক ও সমস্যাপূর্ণ। যদি কোন কারণে মা প্রচুর পরিমাণে খাবার সংগ্রহ করতে না পারে তবে নিজেই বা খাবে কি আর বাচ্চাকেই বা খাওয়াবে কি! প্রকৃতি বড় নির্দয়া তার কাছে দুর্বলের স্থান নেই।

হামিংবার্ডের যদিও ৩১৯টি প্রজাতি আছে তবুও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এদের খুব বেশি তফাত নেই। কতগুলি প্রজাতি যা সাধারণত দেখা যায় তার মধ্যে সোর্ড বিলড, ইউটোনেরা অ্যাকুইলা—এদের ঠোঁট বেশ লম্বা এবং নীচের দিকে বাঁকানো। তাছাড়া স্টেফেনপিকিসস—লম্বা, সরু, সবুজ বা বেগুনী ঝুঁটির জন্য প্রসিদ্ধ। হেলিয়াকটেন করনুটা প্রজাতির সবজে লাল ঝুঁটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, অক্সিপোগন গুয়েরিনাইর সাদা কালো ঝুঁটি, লোফরনিসের গলার দুপাশে খাড়া পাখার মত বিস্তৃত জুলফি স্ব স্ব প্রজাতির স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। ■

দিবানিদ্রা

জয় গোস্বামী

হিংসের গাছ....তোমার তলায়
একশো টাকার....নোট পেতে আজ
ঘুমোচ্ছি আর....ধনরত্নের
টুং টাং টুং....মিষ্টি আওয়াজ
শুনতে পাচ্ছি....গল্পের গরু
আমার সামনে....চ'রে বেড়াচ্ছে
গাছেও উঠছে....কল্পতরুর
ডাল থেকে তার....বাঁট দোলাচ্ছে
টুপ টাপ টুপ....গাছ থেকে পড়ে
সন্দেশ ফল....সন্দেশ পাতা
একশো টাকার....নোট পেতে আমি
ঘুমোচ্ছি আর....স্বপ্নে উড়ছে
ফুটো ফুটো সব....গর্ত গর্ত
কাঁথা কম্বল....কম্বল কাঁথা....

শেষ কথা

রবীন সুর

এই বাড়িটা মনে থাকবে, পুরনো পলেস্তারা।
দেয়াল ছুঁয়ে উদয়াস্ত কৃষ্ণরাধা ঢঙে
আবহমান মিথুনমায়া আমার পাশে তুমি ;
মনে পড়ছে, সিঁড়িটা ছিল এবড়ো খেবড়ো, ট্যারা—
রতিরঙ্গ তুঙ্গে গেলে কেবল পদশব্দে
অবাঞ্ছিত কেউ-না-কেউ আসতো উপযেচে।

শরীর তখন শরীরে নেই, দিব্য উত্তরণ—
উরু দুখানি ইংরেজিতে ভি আকারের, খোলা :
জাদুকাঠির আদিম খোঁচা, আহ্লাদের নারী।
মেছোর চোখে ঢেউ জলেতে পায়রাচাঁদা ভাসে,
শরীরে কোনো আঁশ ছিল না উদোম, এলোচুলে
মেঘের ফাঁকে জ্যোৎস্না যেন ফলের কিঞ্জল !

এখন হাওয়া ঋতু বদলে অন্যদিকে যাওয়া—
নতুন বাসা নতুন গাছে খড়কুটোতে বাঁধা ;
ঘাপটি-মারা কমাণ্ডোর তৎপরতা জানি।
কতো রকম ভয় রয়েছে লোভমেশানো নেশা,
আমি তো ভবি ভোলার নয়, ছাড়ি না কণা দাবী,
শরীরতীক্ষ্ণ অস্ত্র আছে হাইজ্যাকিঙ-এ পটু।

বেতলা ১৯৮৫

কমল চক্রবর্তী

জামির রং-এর পাখি, গাইড বলতে পারে এত স্মৃতি কেন
কেন সঙ্গে লাগেজ আনিনি
জোড়া খাট, মদের প্রেরণা
হয়ত রাতে প্রতিদিনই খোলা পড়ে থাকে রাঙা-হাত
জয় পাহাড়ীর মেলা
কারও কাছে রাত বললে কোন দিশা নয়, শুধু খেলা
একেকটা গাজন শেষ করে ভুল পথভ্রম
ছায়া নেই
গাইড বলতে পারে যে লুকিয়ে খেলাচ্ছে সে কি মায়া না যক্ষিণী

শুধু ভ্রম
জলের পাথর-নাচ
দশ আঙুলে নিম, শাল, মহুয়া, কুসুম
গাইড আজ বলবে না কিছুই
কোন কোন বেলা অবসানে কেন নদী নেই
শুধু ঝরে অধরা শিমুল।

নমো হে নির্জনতা

সোফিওর রহমান

প্রায় অস্পষ্ট উচ্চারণ, গুটিয়ে নিই নিজেকে, নীরবতার উৎকোচ
অন্তর্লোকের সঙ্গীতে শাসন ঝরনা। ক্রমে সমস্ত আকাশ জুড়ে
নেমে আসে শ্মশান শালীনতা, শেষ আগুনের মতো নির্বাক
দর্শক আমি। পরিপার্শ্বের জানালাগুলি উন্মুক্ত হয়—রাতের আকাশ ;
অথচ ঘিরে আছে শহর মাতাল কোলাহল, প্রগলভ উচ্চারণ।
কাকে কতটুকু দেখি ? কার কথা শুনি ? নিজের ভিতর জাগ্রত পুরুষ
ঘুমন্ত বীজের আত্মকেশর ছুঁয়ে বলে ওঠে 'নমো হে নির্জনতা...
মুগ্ধ স্নানের জল ডাক দেয়, দূরে সরে কাছে এসো, আরো পাশে।
দেওয়ালবন্দী শুচিতায় পোড়াও তাসের ও-সংসার। নির্জনতা
পালিত দয়িতার আঁচলে প্রিয় হাওয়ায় ঘন হয়, শব্দ রশ্মি ছড়িয়ে
তীক্ষ্ণ করে অনুভূতি—টের পাই, আমার আর লবণার সন্তান
বড় হয়ে উঠছে শান্তিপ্রিয় পাঁজর ঘিরে, এইখানে চারাগাছ
মহীরুহ হবে, এই গম্ভীর স্তব্ধ নিমগ্ন সমর্পণের প্রতিবিম্বে।

কুলবাগানের পরী

বিমল কর

গোনা গুনতি দুটো কুলগাছ। জায়গার নাম অথচ কুলবাগান।

চায়ের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে সাহানাবাবু বলল, "নামে কী আসে যায়, মাস্টার। আমার নাম সূর্য সাহানা। লোকে বলে সুজ্জু সাহানা। আমি আকাশের না সূর্য, না চাঁদ। কুলবাগানের সুজ্জি মুদি।"

আমি বললাম, "না না তা নয়। ভাবছিলাম, একসময়ে হয়ত এখানে অনেক কুল ঝোপ ছিল।"

"ভাবলেই কী হয় মাস্টার! নাম হল, মন্দোদরী। মন্দোদরীর উদর যদি মন্দ হবে, তবে বলুন হে, ইন্দ্রজিতের মতন বেটা জন্মাবে ক্যানে?" বলে সাহানা যেন আমাকে নিয়ে তামাশা করার মতন করে হেসে উঠল। তারপর বলল, "এখানে তো তবু দুটো কুলগাছ চোখে পাচ্ছেন।"

সাহানার কথাবার্তা ওই রকম। তার অনেক কথাই আমি ধরতে পারি না। ভাষায় নিজেদের দিকের মিলমিশ, টানটোন। আমাকে শহুরে পেয়ে কথাগুলোকে যতটা পারে সহজ করে বলে। শহুরে করে।

"নিন, চা খান।"

সাহানার দোকানের চায়ের গ্লাস কালিপড়া লণ্ঠনের কাচের মতন দেখতে। চায়ের কষে কালো, না রঙটাই ওই রকম বোঝা যায় না। গ্লাসগুলোকে বোতল বললেও বলা যায়, এমনই বিঘতখানেক লম্বা।

সন্ধেবেলায় সাহানার কাছে এসে বসলে সে চায়ের গ্লাস, বিড়ির বাণ্ডিল এগিয়ে দেয় আমাকে। খাতির দেখায়, গল্পগুজব করে।

এখন অবশ্য সাহানার দোকান বন্ধ। বেচাকেনার পালা ফুরিয়েছে। সামনের দিকের ঝাঁপ ফেলা। আলকাতরা মাখানো টিনের ঝাঁপ। এ-পাশে দোকান ঘরের বাঁ দিকে তেরপল গোছের কাপড়ের মোটা পরদা পড়ে গেছে। তার পাশে এক ফালি জায়গায় বেঞ্চির মতন সরু এক তক্তপোশে আমরা বসে। পাঁচ সাত পা পেছনে দরজা। ওপারে সাহানার অন্দরমহল।

ধীরে সুস্থে চায়ে চুমুক দিলাম। ক'দিন আগে আগুনের মতন গরম চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে জিব পুড়ে গিয়েছিল।

বাইরের দিকে তাকালাম। অন্ধকার। কাঁচা রাস্তার ওপারে এক জোড়া কুলঝোপ। পাতাটাতা চোখে পড়ে না তেমন, অন্ধকার জড়িয়ে কালো হয়ে আছে। কাছাকাছি এক ডুমুরগাছ। কিছু বুনো ঝোপঝাড়। হিমভেজা মাটি গাছপালার
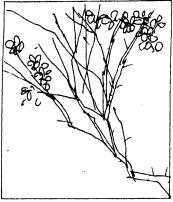
ফিকে গন্ধ উঠতে শুরু করেছে। কার্তিক শেষ। বাইরে হিম, কুয়াশা। শীত-ছোঁয়ানো বাতাস।

হঠাৎ আমার কালকের কথা মনে পড়ল। বললাম, "কাল রাত্তিরে এদিকে চেঁচামেচি শুনলাম। হয়েছিল কী?"

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সাহানা যেন একটু খেয়াল করল। বলল, "পরী মরির ঝগড়া। ওদের গলা চড়লে ও গাঁয়েও শোনা যায়। আপনি তো কাছেই থাকেন।"

পরী মরি কথাটা কানে শুনতে আমার ভুল হল। আমি শুনলাম পড়ি মড়ি ঝগড়া। না বুঝে বললাম, "পড়িমড়ি ঝগড়া মানে জোর ঝগড়া?"

সাহানাবাবু হেসে উঠল। তার হাসির ধরনটা খোলামেলা, মজা পাওয়া ঢঙের, কিন্তু নাটুকে। বলল, "না হে মাস্টার। পরী আর মরি। পরী জানেন না? পাখা-লাগানো মেয়েছেলে। নীল পরী, লাল পরী। ফেয়ারি। আমি ইংরিজি পড়েছি মাস্টার। অষ্টম শ্রেণী। ক্লাস এইট্। তারপর ফচকে ছোঁড়া হয়ে ভেগে পড়লাম। শশী হাজরার দলের সাথে ঘুরতাম। চা পান তেল জুতো বয়েছি বাবুদের, আবার শালা দু চার লাইনের পার্টও গেয়েছি আসরে দাঁড়িয়ে।" হাসতে হাসতে সাহানার গলা ধরে যাচ্ছিল। হাসি থামিয়ে কাশল বার কয়েক। গ্লাস উঠিয়ে চুমুক দিল চায়ে।

নিজেই আবার বলল, "পরী! বুঝেছেন মাস্টার?"

বুঝেছি!" আমি হাসলাম।

"কী বুঝেছেন?"

"পরী বলে একটা মেয়ে..."

"দেখেছেন পরীকে?"

"ক'জন মেয়েকে তো দেখি। কে পরী কেমন করে বলব?"

যেন আমাকে খুঁটিয়ে দেখতে চাইল সাহানা। হাসি হাসি মুখে চেয়ে থাকল কয়েক পলক। বলল, "দেখেছেন। নাম জানেন না। একটা মেয়েকে দেখেননি? লম্বা রোগা। হাড় হাড় চেহারা। গায়ের রঙ...রঙ ওই আপনার সাদা সিমের মতন। চোখা নাক। পাতা কেটে চুল বাঁধে। পরীকে পেছন থেকে দেখলে মাস্টার মেয়েছেলে মনে হবে না।" সাহানা বিড়ির বাণ্ডিল আলগা করে একটা বিড়ি বেছে নিল।

বর্ণনা শুনে মনে হল মেয়েটিকে আমি দেখেছি। গায়ের পাশে না হলেও কাছাকাছি থাকে। টিনের চালা দেওয়া বাড়ি, সামনে এক ভাঙা টিউবওয়েল, কলকে ফুলের ঝোপ, পচা বাঁশের বেড়া—সেই বাড়ির কাছেই না দেখেছি!

"ওই টিনের চালার বাড়ি?" আমি বললাম চা খেতে খেতে।

"ধরেছেন ঠিক। পেছনে বৈঁচি বন।"

"দেখলে খুবই রোগা মনে হয়। রঙ ফরসা।"

"ওকে ফরসা বলে না, মাস্টার। ওই যে সাদা রঙ গায়ের—সাদা সিমের মতন—ওটা হল গর্ভের দোষ। শুনি জন্মকাল থেকেই ওই। আমি তো ওর জন্ম দেখিনি। কোন বাপের মেয়ে, কোন মায়ের গর্ভ থেকে এসেছে তাও জানি না। পরীর বয়েস কত আন্দাজ করতে পারেন?"

"না। আঠারো বিশ হবে।"

সাহানা আবার হেসে উঠল। এমন করে হাসল যেন আমার জ্ঞানের বহর দেখছিল। হাসতে হাসতে বিড়ি ধরাল। বলল, "শুকনো মেয়েছেলের বয়েস আর বাঁজা বউয়ের মুচ্ছো বোঝা যায় না হে মাস্টার। পরীর বয়স কমপক্ষে পঁচিশ।"

আমি কিছু বললাম না। হতে পারে পরীর বয়েস পঁচিশ। আমার এ ব্যাপারে কোনো চোখ নেই। চা খেতে খেতে একটা বিড়ি ধরালাম।

"পরী তো হল, মরি কে?"

"ওর বোন।"

"বোন!"

"যমজ বোন। পরী আগে মরি পরে। শুনেছি আধ এক ঘন্টার আগে পরে। পরী আগে, মরি পরে।"

সাহানার বিড়ি আসে রানীগঞ্জ বাজার থেকে। একটু বেশী কড়া। গলায় লাগছিল। বললাম, "মরি নাম কেন? পরীর সঙ্গে মিল রাখতে?"

মাথা নেড়ে সাহানা বলল, "না মাস্টার। ঠিক কথা তো জানি না; তবে শুনেছি পরী জন্মানোর পর মরি নাকি মরতে মরতে জন্মেছিল। জন্মানোর পরও এই যাই সেই যাই। ভুগিয়েছিল ওদের মাকে বেশ কয়েক মাস, সেই থেকেই 'মরি'।"

"ও!"

"দেখেছেন মরিকে ? পরীর উলটো। পুরো নয়, আট দশ আনা। মরি ফরসা নয়, ময়লা। ও রোগা কাঠি, এ হল ছিপছিপে। এখন খানিক গায়ে ধরেছে। মুখের ছাঁদ পরীর মতন নয়, তবে থুতনির দিকে মিল আছে। ঘাড় পিঠও একরকম। তবে মরির আগায় পাছায় মাংস আছে।' বলে সাহানা চোখ ছোট করে হাসতে লাগল।

মরিকেও তাহলে আমি দেখেছি। একই বাড়ির কাছে।

একটা ব্যাপারে আমার খটকা লাগছিল। যমজরা একই রকমের দেখতে হয় শুনেছি। দেখেছিও দু এক জনকে। এরা—পরী আর মরি দেখতে খানিকটা দু রকম হল কেন ?

"যমজ দু রকম হয় ?" আমি বললাম।

সাহানা চায়ের গ্লাস প্রায় শেষ করে এনেছিল। বলল, "হয়। না হলে দেখছি কেন ? যমজ আমি দেখেছি মাস্টার। এক ছেলে এক মেয়ে হয়ে এল—চোখে দেখেছি। আর এক যমজ দেখেছি—আমাদের পঞ্চু চট্টরাজের দলে ছিল, তারা দুটোই ছেলে, কিন্তু দুটোই দেখতে একে

অন্যের চেয়ে আলাদা। আমাদের দলে তাদের নাম ছিল বাঁয়া তবলা। একটা ছিল লম্বু, আর একটা বাঁটু। তবু বাঁয়া তবলা নামটাই বেশি চলত।"

চা শেষ করে আমি বললাম, "ওদের সঙ্গে থাকে কে ?" কথাটা এই জন্যে বললাম যে, পরী মরির বাড়ির দিকে আমি কোনো পুরুষমানুষ বা বয়স্কা মেয়ে দেখিনি।

গলায় কেমন কৌতুকের শব্দ করে সাহানা বলল, "সঙ্গে কেউ থাকে না, ওরা দুটিতে থাকে। কেন হে মাস্টার ?"

সাহানার মজার তলায় একটা মামুলি রসিকতা ছিল। আমি কিছু বললাম না। হাসলাম একটু।

সাহানা পুরো গ্লাস চা খেয়ে ঢেঁকুর তুলল। বিড়ি ফুরিয়েছিল আগেই। চুপ করেই থাকল সামান্য। হাত কয়েক তফাতে একটা লম্ফ জ্বলছে। তার কাঁচ প্রায় খয়েরি, শীষ লেগে একপাশ কালচে।

সাহানার অন্দরমহল থেকে সাড়াশব্দ বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে না। ওই মহল আমার সামান্য চেনা। দিন দুই পাত পেড়ে খেয়েছি। সাহানা নেমন্তন্ন করে খাইয়েছে।

অন্দরমহলে থাকে সাহানার স্ত্রী। আর দোকানে কাজ করা দুটি লোক। একটির সামান্য বয়েস হয়েছে, অন্যটি ছেলেছোকরা। ছেলেটি নাকি সাহানাবাবুর স্ত্রীর বাপের বাড়ির দেশের লোক। দোকানের কাজ ঘরের কাজ দুইই করে সে। নাম গোপাল। আর সামান্য বয়স্ক লোকটির নাম তুলসীচরণ। তুলসীর কাজ দোকানে। লোকটি জিরজিরে ধরনের। গলায় কণ্ঠি। কানদুটো ছোট ছোট।

সাহানাবাবুর স্ত্রীকে আমি দেখেছি। গায়েগতরে যথেষ্ট। পটুয়াদের আঁকা ছবির মতন গোলগাল। মুখখানি গোল। হাত-পা ফোলা ফোলা। সাহানাগিন্নীকে ভালমানুষ ভালমানুষ দেখায়। চোখ দুটি বড়। নাকে নাকছাবি। হাতে শাঁখা। গলায় রুপোর হার। নামটিও বেশ, তারামণি।

সাহানাবাবুর অন্দরমহল বলতে এই। তারপর সাফসুফ। বাচ্চাকাচ্চা নেই।

শীত শীত বাতাস আসছিল। কুলঝোপের তলায় যেন জোনাকি উড়ল কয়েকটা। আজ কুয়াশা বেশি।

সাহানা আবার একটা বিড়ি ধরাল। বলল, "তোমার এখানে কতদিন হল মাস্টার ?" বলেই যেন জিব কাটল।" অপরাধ হয়ে গেল মাস্টার। তুমি বলে ফেললাম।"

আমি হেসে বললাম, "অপরাধের কী ! বয়েসে আপনি বড়।"

সাহানা এই প্রথম আমাকে 'তুমি' বলল না, মাঝে মাঝে বলে ফেলে। বলেই হেসে ওঠে। আমি সাহানাকে বলেছি, আপনি আমায় 'তুমি' বলবেন। বলতে চায় হয়ত, সঙ্কোচে পারে না। মনে হয় আর কিছুদিন পরে পারবে।

"কত দিন হল ?" সাহানা আবার বলল।

"হপ্তা তিন।"

"তিন হপ্তায় পরীকে, পরী মরিকে চেনা হল না ?" সাহানার চোখে কৌতুক।

"না।" আমি মাথা নাড়লাম। "আমার আর কতটা দৌড়। হয় নিজের ডেরায় না হয় আপনার কাছে।"

ঘাড় হেলিয়ে সাহানা বলল, "তা ঠিক।"

এখানে আমার সপ্তাহ তিন হল। এর আগে ছিলাম গঙ্গাপুর পোস্ট অফিসে। সেটা ছিল মাঝারি ডাকঘর। মাথার ওপর বড় পোস্টমাস্টারবাবু ছিলেন। আমি ছিলাম মনি অর্ডার আর রেজিস্ট্রি চিঠিতে। বদলি হয়ে এখানে এসেছি হঠাৎ। এখানকার ডাকঘর ছোট, সাব পোস্ট অফিস। পুরোপুরি তাও হয়ত নয়। নতুন হয়েছে। যিনি ছিলেন এখানে তিনি অসুখে মরমর হওয়ায় ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে গেছেন।

আমার ডেরা আর ডাকঘর একই সঙ্গে। টিনের চালা দেওয়া এক বাড়ি। তার বাইরের খানিকটা অংশ অফিস। ভেতরের দিকটা আমার থাকার জায়গা। ছোট ডাকঘর, কাজকর্ম সামান্য। ফণী পিয়ন এখানকার লোক। থাকে এই গ্রামেই। ফণী আমার গার্জেনের মতন। লোকটা বেশি কথা বলে, কিন্তু ভাল লোক।

ফণীর দৌলতে অনাদি বলে একটা ছোঁড়াকে পাওয়া গেছে। সে আমার ঘরদোর দেখা থেকে রান্নাবান্নার ব্যবস্থাটা সামলায়। পয়সাকড়ি মারে কিন্তু চালিয়ে দেয় সংসার। অনাদি সকালে আসে, সন্ধ্যের আগে চলে যায়। বেটা সর্বক্ষণ আমার রেডিয়োটা বাজায়। ব্যাটারির শ্রাদ্ধ করে।

সাহানা বলল, "পরী মরির গল্প একদিন শোনাব মাস্টার। তার আগে একবার চোখে দেখে নিন।"

আমি হেসে বললাম, "চোখে না দেখলে গল্প শোনা যাবে না ?"

"তা যাবে। কিন্তু পোক্ত হবে না।" বলে সাহানা মুখ ঘুরিয়ে কান পেতে যেন অন্দরমহলের সাড়াশব্দ আঁচ করার চেষ্টা করল। ক'মুহূর্ত পরে মুখ ফিরিয়ে বলল, "আমার পরিবারটি ক'দিন বড় নরম হয়ে আছে গো ?" বলে চোখ টিপে সাহানা হেসে উঠল। ঠাট্টা তামাশার সময় সাহানার ভাষা আর বলার ঢঙ পালটে যায়।

আমি হেসে বললাম, "সে তো ভাল কথা ! দিদি নরম থাকলেই আপনার ভাল।"

"আহা ! কথাটা বুঝলেন না মাস্টার। এ নরম সে-নরম নয়।" বলে সাহানা মুখচোখের ভাবে বুঝিয়ে দিল তার পরিবারের এখন বিরাগের পর্ব চলছে। বলল, "মুখে উনি চুপ হয়ে আছেন, ভেতরে গরম গো ?"

"কেন ?"

"অমন হয় ! মেয়েছেলের স্বভাব। উপরে বালির বাঁধ, নিচে ছুঁড়ি তিন হাত...।"

আমি জোরে হেসে উঠলাম। "দিদি এখন ছুঁড়ি নয় !"

"এখন নয়, তখন ছিল।" বলে সাহানা একটু চুপ করে থাকল, বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল সামান্য। মুখ সামান্য মোলায়েম হয়ে গেল, মেটে আলোয় মনে হল, সাহানার গাল যেন আরও তামাটে হয়ে গেছে। ভাঙা গলায় বলল, "মাস্টার, ও যখন ছুঁড়ি ছিল তখন আমি আসরে গাইতাম। নটবর। পালাও লিখতাম। সুজ্যি মুদি হইনি। পালা শুনে মন মজেছিল তারামণির। নল দময়ন্তী পালা ! আহা, নলরাজার কী বচন গো !"

সাহানার কথা শেষ হল না, অন্দরমহলের দরজা খুলে গোপাল এল।

সাহানা যেন বুঝতেই পেরেছিল, বলল, "কোথায় পড়েছে ? রসুইঘরে ? না ভেতরে ?"

"ঘরে।"

"চল, যাই।" বলে সাহানা উঠে দাঁড়াল, "বসুন মাস্টার, তারামণি নয়ন মুদেছেন, খুলে আসি।"

সাহানা চলে গেল।

আমি বসে থাকলাম। তারামণি, মানে সাহানাবাবুর স্ত্রীর মূর্ছা হয়েছে। শুনেছি, মাঝে মাঝেই হয়। দু চার দিন অন্তরও হয়—আবার বিশ পঁচিশ দিন তফাতেও হয়। ব্যাপারটা একরকম স্বাভাবিক ও অভ্যাসের মধ্যে এসে গেছে। এ নিয়ে কোনো উদ্বেগ বোধ করে না কেউ আর।

অন্যমনস্কভাবে বিড়ি ধরিয়ে বাইরের দিকেই তাকিয়ে থাকলাম। কুয়াশা আজ যেন বড় বেশি। হিম কী গাছপাতা বাতাস ভিজিয়ে দিল এরই মধ্যে ? হতে পারে। আজ সকালে আমার বাড়ির বাইরের সরু কাঁচা উঠোন বৃষ্টি হয়ে যাবার মতন ভিজে ছিল। শীত পড়ে গেল এখানে। কাল থেকে এ-ভাবে আর বেরুনো যাবে না সন্ধেবেলায়, চাদর নিয়ে বেরুতে হবে। আজ চাদর নিইনি, ভেতরে একটা মোটা সুতির গেঞ্জি পরে বেরিয়েছি।

মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকালাম। দরজার পাট ভেজানো। সাহানা মূর্ছা ভাঙাতে ব্যস্ত হয়ত।

সাহানাবাবু মানুষটিকে আমার বড় পছন্দ হয়েছে। মুদি বলতে যা বোঝায় চট করে তেমন নয়। তেল ডাল নুন নিয়ে বসে থাকলেও নুনে জরেনি। মেজাজ আছে। একেবারে জোয়ান না হলেও সাহানাবাবুর বয়েস বেশীও নয়। বছর চল্লিশ। হাড় শক্ত চেহারা। গায়ের রঙ তামাটে। মুখের ছাঁদ চৌকোনো, থুতনি সরু। চোখ দুটি লালচে ধরনের। মুখের একটা পাশের খানিকটা জায়গা কালচে।

মানুষটির জীবনকথা আমার কিছু শোনা হয়ে গেছে। কোন এক মুষলে গাঁয়ের ছেলে। জমি-জিরেত ছিল বাপের। খাওয়া পরার অভাব ঘটেনি কোনোদিন। ছেলেবেলায় দেড় ক্রোশ দূরের মণ্ডলবাবার বড় স্কুলে পড়েছে। মা মারা যাবার পর বাপ আর একটা বিয়ে করে। সেই নতুন মা নাকি ডাকিনী যোগিনীকেও হার মানায় এমন গলা আর স্বভাব। সাহানা তখন থেকেই ফচকে ফাজিল হয়ে ঘুরে বেড়াত যত্রতত্র। তাড়ি বিড়ির অভ্যেস করে ফেলল চোদ্দ পনেরোতেই। শেষে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাত্রার দলে ঢুকে পড়ল।

এ কলকাতার যাত্রা নয়। এখনকার যাত্রাও নয়। মফস্বলের গেঁয়ো যাত্রা। ছোট ছোট মফস্বল শহর আর গ্রামে এমন যাত্রা অনেক ছিল ওদিকে। এক শশী হাজরার দলে বছর দুই কাটিয়ে সূর্য-সাহানা লায়েক হয়ে গেল। তারপর এখানে

ওখানে। মাস্টার আমি তিন লম্বর সাজ বনে গেলুম। দুলু বিশ্বাস আমাকে চড় চাপড় লাথি মেরে মেরে অ্যাক্টর করে তুলল। শালা গুরু আমার কসরত কী জানেন, শালা নিজে এক চামচে গাওয়া ঘি খেত, গোলমরিচ আর আদাকুচি দিয়ে, খেয়ে আমাকে বলত—চাট শুয়োরের বাচ্চা—গলা সাফ হবে। সাহানার এই সব গল্প শুনতে শুনতে আমি হেসে মরেছি।

বিশ ঘাটের জল খাচ্ছে যখন সাহানা—তখন সহদেব ঘোষ বলে এক অধিকারী,উখড়োর লোক, সাহানাকে দিয়ে এক পালা লেখাল। সহদেব মুখে কিছু বলত, সাহানা লিখত, আবার সাহানা নিজেও তার বিদ্যে জাহির করত। সহদেব ছিল বি এ কবিরত্ন। কোন কবিরত্ন কে জানে—তবে সজ্জন, সুশীল। নিরামিষ খেত, বিড়ি মদ ছুঁত না, ভাড়া' করা মেয়েছেলেদের বলত, মা বোন।

সহদেব ঘোষের দৌলতে সাহানা দু তিনটে পালা লিখে ফেলল। দুটো পালা লেগে গেল। তার মধ্যে সর্পযজ্ঞ পালা এমন জমে গেল যে গাঁয়ে গাঁয়ে শুধু 'সর্পযজ্ঞ' পালাই গাইতে হয়েছে।

সাহানার শেষ পালা নল দময়ন্তী উপাখ্যান নিয়ে লেখা। তখন আর সহদেব কবিরত্ন বেঁচে নেই। মফস্বলের গ্রাম্য যাত্রা আর তেমন কাটছে না। কলকাতার দল গ্রামের মধ্যে সেঁদিয়ে যাচ্ছে। সাহানা যাত্রা ছেড়ে দিল। তারামণিকে ভাগিয়ে নিয়ে ঘুরল এখান ওখান। তীর্থ দেখাল। খাটলো, খুঁটলো শেষে এই জায়গায় এসে ছোট্ট এক দোকান খুলে বসল। সেই দোকানই আজ সুজ্যি মুদির দোকান।

সাহানা বলে, "এখনও মাঝে মধ্যে মনে হয়, একটা পালা লিখি মাস্টার। কিন্তু কী হবে গো লিখে? সুজ্যি মুদির মুদিখানাই ভাল। পালা লিখে কোন কাজে আসবে!"

পরের বিদ্যে বোঝার মতন বিদ্বান আমি নই। পোস্ট অফিসের সামান্য কেরানী। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারি, সাহানার মণ্ডলবাবার স্কুলের বিদ্যে যাই হোক সে অনেক কিছু জানে। রামায়ণ মহাভারত থেকে হুট হাট উপাখ্যান বলে, তুলনা দেয়, আমার বিদ্যে পরখ করার জন্যে বেয়াড়া প্রশ্ন শুধোয়, কবিতা করে কিছু আওড়ায় কখনো কখনো, আমাকে নিয়ে মজা করে। মানুষটা যে সত্যি সত্যি সুজ্যি মুদি তার বেশি কিছু নয় তা আমার মনে হয় না। বরং উল্টোটাই মনে হয়। ও যেন দায়ে পড়ে আজ সুজ্যি মুদি।

সাহানা ফিরে এল। যেমনভাবে গিয়েছিল সেইভাবেই। মুখে উদ্বেগ দুশ্চিন্তার চিহ্ন নেই। ফিরে এসে একটা বিড়ি টেনে নিয়ে ধরাল।

আমি বললাম, "দিদির ফিট কেটেছে?"

"হ্যাঁ, কেটে গেছে।"

"আমার এক পিসির ফিট হত। দাঁত লেগে যেত, কষ গড়াত মুখের পাশ দিয়ে। হাত পা বেঁকে যেত। ফিট কাটার পর দুর্বল হয়ে পড়ত।"

সাহানা হেসে বলল, "এর এসব কিছু হয় না। চোখ মুদে ধড় ছড়িয়ে শুয়ে থাকে। হাত মুঠো। পাঁচ সাত মিনিট ওইভাবে পড়ে থাকে। তারপর মুর্ছো কাটলে যে কে সেই। গতজন্মের গুণ গো মাস্টার!" বলে জোরে হেসে উঠল।

আমি বললাম, "এর কোনো ওষুধ নেই, না?"

"ডাক্তার কোবরেজরা বলে নেই। তবে আমি একটা ওষুধ জানি। বেশিক্ষণ পড়ে থাকলে নাকে গুঁজে দি। বড় ভাল ওষুধ মাস্টার। আমাদের নারায়ণ গড়াই, দুর্গা অপেরায় বেয়ালা বাজাত তার কাছে শিখেছিলাম। গোলমরিচের গুঁড়ো কর্পূরের গুঁড়ো মিশিয়ে নস্যির মতন করে রেখে দিয়েছি। নাকে শুঁকিয়ে এক রত্তি গুঁজে দি। উনি চক্ষু মেলে উঠে পড়েন।" সাহানা হাসছিল।

একটু বসে থেকে আমি বললাম, "উঠি তাহলে!"

"আসুন। ঠাণ্ডা পড়ছে। কাল থেকে চাদর নেবেন।"

উঠে পড়লাম। বিড়ি ধরাতে ধরাতে বললাম, "দিদিকে বলবেন, আমি বাড়িতে হোমিওপ্যাথি শিখি। আমি ওঁকে ওষুধ দেব।"

সাহানা যেন মজা পেল। নাটুকে হাসি হেসে বলল, "মন চাইলে দেবেন। তবে কি মাস্টার, সব রোগের ওষুধ হয় না।"

॥ দুই ॥

কার্তিক ফুরিয়েছিল কবেই, অগ্রহায়ণও ফুরিয়ে গেল। শীত পড়ে গিয়েছে। বিকেল মরার আগেই শনশনে হাওয়া বয়, সাঁঝ-সন্ধে থেকে কাঁপিয়ে শীত ধরে। এই দিকটা এই রকমই। আধ জঙ্গলা, গাছপালায় ভরা, শক্ত মাটি, রুক্ষু রুক্ষু রঙ। এখানে যেন নিম কাঁঠালের শেষ নেই, আম জাম কম, আর পলাশ বন। কাঁটা গোলাপের ঝোপঝাড় সর্বত্র, বনতুলসীর জঙ্গল। অল্প স্বল্প বৈঁচি বন। ওরই এখানে ওখানে ধানের ক্ষেত, কড়াই ক্ষেত, এক আধটা ডোবা পুকুর। তফাতে দু একটা ছোট কয়লা কুঠি। নদী রয়েছে দু ক্রোশ দূরে।

শীত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হিম যেন সারা রাত মিহি বৃষ্টির মতন নিঃশব্দে ঝরে যায়, সকালে মাঠঘাট গাছপালা শুকনো থাকে না। মেঠো ইঁদুরগুলো পর্যন্ত হিমভেজা মাঠ দিয়ে ভাল করে ছুটতে পারে না যেন। আমার তাই মনে হয়। অজস্র পাখি এসে গিয়েছে শীতের মরসুমে।

নতুন শীতে ঠাণ্ডা লেগে আমার জ্বর হয়েছিল। সন্ধেবেলায় বেরুতে পারিনি। সাহানার কাছে যাওয়া হয়নি কয়েকদিন। গত পরশু সাহানা এসেছিল। ছিল অনেকক্ষণ। বলল, "তোমার দিদি বলেছে জ্বরজ্বালা বেশি হলে আমাদের ওখানে গিয়ে থাকতে। মাথায় জলপটি দেবে, সাবু বার্লির পথ্য দেবে এগিয়ে। যাবে নাকি মাস্টার?"

সাহানা এখন আমাকে আর আপনি বলে না, তুমিই বলে। মাঝে মাঝে আবার রসিকতা করে শালাবাবু বলে ডাকে।

জ্বর আমার সামান্য বেশিই হয়েছিল; এখন কম। গা-ছোঁয়া। সর্দিকাশিতে গলা ভেঙ্গে আছে এখনও। দু চার দিনের মধ্যে সেরে যাবে।

আজ শীতটা আরও বেশী লাগছিল। কাল পাতলা মেঘ ছিল আকাশে, মেঘলা নয়, ঘোলাটে হয়েছিল সারা দিন। আজ মেঘ কেটে গেছে। শীত বেড়েছে।

সন্ধেবেলায় নিজের ঘরে শুয়ে পাতা-ছেঁড়া একটা বই পড়ছিলাম। লণ্ঠনটা মাথার কাছাকাছি। এমন সময় বাইরে শেকল নড়ে উঠল দরজার।

উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখি সাহানা। হাতে পুঁটলির মতন কী যেন।

ভেতরে এসে সাহানা বলল, "তোমার দিদি প্রসাদ পাঠিয়েছে, মাস্টার। আজ বৃহস্পতিবার।"

তারামণি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপুজো করে। কলা, বাতাসা, বেসমের নাড়ু, মাঝে মাঝে শশার কুচি। প্রসাদটা ও-বাড়িতেই খাওয়া হয়। আজ এ বাড়িতে পাঠিয়েছে দিদি।

ঘরে এসে পুঁটলিটা এক পাশে রাখল সাহানা। বলল, "প্রসাদ নামমাত্র। ওর মধ্যে তোমার জন্য দু চারখানা লুচি আছে। মাটির ভাঁড়ে কলাপাতা রেখে লুচি তরকারি দিয়েছে, রাত্রে খেয়ে নিও।"

বসল সাহানা। একটি মাত্র কাজ চালানো চেয়ার। পায়াগুলো বাছুরের ঠ্যাঙের মতন।

বসেই বিড়ি ধরাল সাহানা। "কেমন আছ শালাবাবু?"

"ভাল। কাশিটাও কমে গেছে।"

"তুমি তো ডাকঘরও কামাই দিলে না গো?"

"না। কতটুকু আর কাজ!"

সাহানা মাথা নাড়ল। যেন তারিফ করল।

একটু থেমে সাহানা বলল, "মাস্টার, তোমার ডাকঘরে পরী এসেছিল?"

পরী! মনে পড়ল, কাল বেলার দিকে ওই মেয়েটি এসেছিল। এক জোড়া পোস্টকার্ড কিনল।

বললাম, "হ্যাঁ, এসেছিল। পোস্টকার্ড কিনতে।"

"দেখলে পরীকে?"

"সে আমি আগেই দেখেছি। আপনি বলার পর তাকে চিনতে আমার কষ্ট হয়নি। বলেছি আপনাকে।"

সাহানা যেন অন্যমনস্কভাবে কথাটা শুনল, বলল, বলেছিলে বটে!... পরী মাঝে এখানে ছিল না। আট দশ দিন।"

"কোথায় গিয়েছিল?"

"বায়না খাটতে।"

"বায়না খাটতে?"

সাহানা শব্দ করে বিড়ির ধোঁয়া ওড়াল। উড়িয়ে ফেলে দিল টুকরোটা দরজার দিকে। বলল, "পরীরানী আমাদের লালু ঘাঁটির দলে পালা গায় মাস্টার। যাত্রা করে। গাঁ-গ্রামের যাত্রা। বাইরে থেকে লোক এসেও ডেকে নিয়ে যায়। এ গাঁয়ের, ও গাঁয়ের দলের লোক আসে। কোথাও এক দু রাত, কোথাও তিন রাত। কাছাকাছি গান হলে রাতে গান সেরে সকালে সাইকেলের পেছনে বসে ফিরে আসে। দূরে হলে দেরি হয় ফিরতে।"

পরীকে আমি গতকাল পোস্ট অফিসে দেখেছি। আগে দেখেছি ওদের বাড়ির কাছে, কিংবা পথে। সাহানা বলে দেবার পর বুঝেছি কে পরী, আর কে মরি। পরীকে দেখতে সত্যিই হাড়সার। এত রোগা যে মনে হয়, হাড়গুলোই যেন আছে ওর, মেদ মাংস বলে কিছু নেই।

গায়ের রঙ সত্যিই অস্বাভাবিক। এমনটি দেখা যায় কিনা জানি না। সাহানা যে বলে সাদা সিমের মতন রঙ গায়ের, তা ঠিকই। এমন অদ্ভুত সাদা আমি অন্তত দেখিনি। তবে আমার মনে হয়েছে, সাদা সিমের মতন গায়ের রঙ না বলে বলা উচিত থোড়ের রঙ। থোড়ের গা ছাড়ালে যেমন সাদা রঙ দেখা যায় সেই রকম।

পরীর মুখের ছাঁদটি মন্দ নয়। নাক লম্বা, থুতনি সরু, গালে আঁচিল। গলা লম্বা। পাতা কেটে চুল বাঁধে।

গায়ের রঙ যদি অমন অস্বাভাবিক না হত, হয়ত পরীকে আলাদা করে নজরে পড়ত না। বরং মরির মেয়েলি গা-গতর খানিকটা নজরে পড়ার মতন।

আমি বললাম, "বাইরে গেলে থাকে কোথায় ?"

সাহানা হেসে বলল, "তোমার কী কথা হে মাস্টার ! থাকে কোথায়—? আরে গরুকে মাঠে ছাড়লে খায় কী ? ঘাস ! থাকার ব্যবস্থা ওদের হয়ে যায় হে ! দলের সঙ্গে দু একটা মেয়ে তো থাকেই, রাত কাটানোর জন্য ঠাঁই পেয়ে যায়।"

"এবার কোথায় গিয়েছিল ?"

"গোষ্টপুর, তেলেটি, নিশাদল...ওদিকে তোমার গঙ্গাচটি কোলিয়ারির ভেতরের গাঁয়ে আমবনা, হরিণদীঘি...এই সব। ও তুমি বুঝবে না।...পর পর দু তিন রাত পালা গেয়ে একদিন বাদ, আবার পালা। ফিরে এসে আর কি যাওয়া যায় ! তারপর তিন দলের গান। একেবারে সেরে ফিরল।"

আমার খানিকটা অবাক লাগছিল। সাহানা দেখি, পরীর সবরকম খবরই রাখে।

বললাম, "আপনি তো আমায় পরীর গল্প বললেন না ?" বলে আমি হেসে বললাম, "বলেছিলেন, ওকে আগে দেখি, তারপর বলবেন।"

সাহানা একটু যেন মাথা দোলালে। দেখল আমাকে। আজ সাহানা গায়ে একটা চাদর চাপিয়েছে। মোটা চাদর। খদ্দরের। খয়েরী রঙ কালো দেখাচ্ছিল। ওর চোখের পাতা একটু ফোলা। অবেলায় ঘুমোলে যেমন হয়।

প্রথম প্রথম আমার সন্দেহ হত, সাহানা কি নেশা করে ? চোখদুটি বড় লাল দেখায় সাহানার।

"এককালে করেছি মাস্টার ! তাড়ি, ধেনো, পচাই, মহুয়া, দু-এক টান গাঁজা—সবই করেছি। এখন ভোলানাথ। ভাঙ ছাড়া কিছু খাই না। তারামণি সিদ্ধির গুলি করে দেয়। বাটা সিদ্ধি গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে গুলির মতন গোল গোল করে, ঘিয়ে ভেজে দেয়। সন্ধেবেলায় দু'গুলি খাই। তাতেই খিদে হয়, ঘুম হয়, পরিবারের আদর হয়।" বলতে বলতে সাহানা হাসে।

বললাম, "আপনার কী ঠাণ্ডা লেগেছে ?"

সাহানা অবাক গলায় বলল, "না। কেন ?"

"চোখ ফোলা ফোলা দেখাচ্ছে।"

"না মাস্টার। বেস্পতিবারে বিকেল বিকেল দোকান বন্ধ করি। তোমার দিদি লক্ষ্মী নিয়ে মাতে। আর আমি একটু গড়াই। এক আধদিন চোখ লেগে যায়। একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

"ভাঙের গুলি খেয়েছেন ?" আমি হেসে বললাম।

"ও কি আর বাদ যায় ?"

"তাহলে পরীর গল্পটা শুনি ?"

সাহানা আমার দিকে ক' পলক তাকিয়ে থেকে বলল, "গল্প না হয় শুনলে। তারপর ?"

আমি কিছু বুঝলাম না।

সাহানা বলল, "মাস্টার, তুমি ওকে রাখবে ?"

রাখব ! মানে ? আমি কেমন থতমত খেয়ে গেলাম। পরীকে আমি রাখব ? বলে কী সাহানা ?

সাহানা আমার দিকে তাকিয়ে থাকল অল্পক্ষণ। যেন নজর করে বুঝে নিল আমাকে। তারপর অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকল সামান্য। শেষে বলল, "তোমায় তবে সত্যি কথাটা বলি মাস্টার। দিদি তোমার লক্ষ্মীপুজোর পাঁচালি আওড়াচ্ছে ঠাকুরঘরে। আমি নিজের ঘরে শুয়ে। অবেলায় আঁধার ধরেছে, গো ! শুয়ে থাকতে থাকতে চটকা লেগে গেল।...কখন দেখি পরী এসেছে। তোমায় বলব কী মাস্টার, পরীর চেহারা দেখে আমার বুক বেজে উঠল। যেন তার কোন্ শালা সোয়ামীকে চিতেয় উঠিয়ে এসেছে। নোঙরা ছেঁড়াখোড়া শাড়ি, মাটিতে লুটোচ্ছে, গায়ে আড়াল নেই, কষ্টে আতার মতন শুকনো বুক, হাড় জেগে আছে। মাথার চুলগুলো রুক্ষু, ছড়ানো।...আমি মাস্টার, হাঁ করে তাকিয়ে আছি। ভাবছি ছুঁড়ির হল কী ?"

সাহানা চুপ। যেন চটকায় দেখা পরীর চেহারাটা তার চোখে ভাসছে এখনও। কেমন একটু অস্থির, উদভ্রান্ত হয়ে সাহানা আবার বলল, "আমি মাস্টার—শুধতে যাচ্ছিলাম—তোর হল কী ?...শুধতে হল না গো ! ছুঁড়ি আমার পায়ের গোড়ায় ধপ করে বসে পড়ে, পা সাঁটিয়ে ধরল। বলল, 'বাপ গো আমায় বাঁচা। আমি মরছি।' বলে ছুঁড়ির কান্না কী গো, কুকুরের মতন পায়ে মাথা ঘষতে লাগল। পা ছাড়াতে গিয়ে দেখি, হারামজাদী কাশতে কাশতে রক্ত তুলে ফেলেছে। পায়ে আমার রক্ত।"

আমি চুপ। সাহানার মুখ দেখে মনে হল, এখনও যেন পরী তার পা জড়িয়ে রয়েছে।

আমি বললাম, "ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছিলেন !"

সাহানা দু মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "ঠিক ঘুম নয়, ঘোর। তন্দ্রা।"

"ওই একই হল।"

"কাল পরী তোমার কাছে এসেছিল মাস্টার। বলল। সাঁঝের গোড়ায় আমার কাছে গিয়েছিল তেল হলুদ পিয়াজ কিনতে। চিঠি লিখেছিল, বলল—ঠিকানাটা দেখে দাও ঠাকুর।"

"কার ঠিকানা ? আপনার পরী লেখাপড়া জানে ?"

"আকবক আঁচড়াতে পারে। গোটা গোটা অক্ষর পড়তে জানে। ঠিকানা লেখার সময় ভয় পায়। পাছে তোমাদের ডাকঘর পড়তে না পারে।"

কাকে লিখেছিল চিঠি ?"

"নাম জেনে তুমি বুঝবে না গো ! কথা কি জানো, খাটাতে লোক পাওয়া যায় ! টাকা দেবার লোক পাওয়া যায় না। ছুঁড়ি এর ওর ডাকে পালা গাইতে যায়। এই ঠাণ্ডায়, ছেঁড়া আসরে পালা গেয়ে রাত পিছু বিশ পঁচিশ টাকা। বেশি হলে তিরিশ। এই টাকা সব সময় পুরো পায় না। দশ পনেরো পায়। বাকিটা পড়ে থাকে। দেব দিচ্ছি করে ভোগায়। দায়ে পড়লে দেয়...।"

"ও !" আমি বুঝতে পারলাম। পরীর টাকা পড়ে আছে কোথাও, তার দরুন চিঠি লিখেছে।

সাহানা পকেট থেকে বিড়ি বার করে আমায় দিতে গেল। আমি নিলাম না। এখনও কাশি রয়েছে।

বিড়ি ধরিয়ে সাহানা বলল, "মাস্টার, আমার চোখ লাল, তবে কি না এই চোখের তলায় আমার দৃষ্টি আছে। আমি আগিয়ে দেখতে পারি। পরীকে কাল দেখে আমার মনে হল, ও মরবে।"

আমার কাশি এসেছিল। ঠাণ্ডাটা যেন বেড়েই চলেছে। আজ রাত্রে শীত বেশ বাড়বে। উত্তরের কনকনে হাওয়া আলগা জানলায় এসে ঠকঠক শব্দ করছিল।

"মরবে কেন ?" আমি বললাম।

সাহানা বিড়ি টানা থামিয়ে বলল, "মরণ যে মানুষকে ধরে মাস্টার।"

ধাঁধাটা আমার মাথায় এল না। বললাম, "সে তো বড় কথা। পরীকে ধরবে কেন ? ওর কি মরণ ধরার বয়েস হয়েছে ?"

সাহানা বলল, "তুমি কিছু জান না শালাবাবু ! তোমার দিদি বলে—তুমি হলে ভাল ভদ্দর ছেলে। আমি বলি, তুমি হলে ঘেঁটু। মুখ খারাপ আর না করলাম।" বলে পর পর দুটো টান মেরে সাহানা বলল, "শোনো মাস্টার, মরণ দু'রকম। এক মরণে মানুষ চিতেয় ওঠে। আর এক মরণ কী জানো ? তারে বলে কলি। সে শালা তোমার ছেঁদা খুঁজছে। কোথাও একটু ফাঁক পেল তো ঢুকে পড়ল। নলরাজকে যেমন করে ধরেছিল জান তো ?"

"শুনেছি।" বললাম বটে শুনেছি, কিন্তু ভাল করে জানা ছিল না।

"তা হলে পরীকেও ধরেছে।...তুমি ওকে রাখো হে।"

"রাখব মানে ?"

"তোমার ঘরে রাখো," সাহানা বলল," তোমার ঘরের সব কাজ করবে হে !...তুমি জাত পাত মানো ?"

"না।"

"তবে আর কথা কিসের ! উ তোমার সাত সকালে আসবে মাস্টার। ঘরদোর ঝাঁটপাট করবে, রান্না সারবে, ধোয়া কাচা করবে, ঘর আগলাবে। সাঁঝবেলায় চলে যাবে।"

সাহানার কথাটা আমি বুঝতে পারলাম। বললাম,"ঘরের কাজের জন্যে রাখতে বলছেন ?"

"আশ্চয্যি কথা তোমার ! তোমায় কি সিংহাসন পেতে রাখতে বলছি !"

আমি হেসে ফেললাম। "সিংহাসন কই যে রাখব ! কিন্তু আমার এখানে অনাদি আছে।"

"উ শালাকে তাড়াও। ওটি চোর, বজ্জাত। শালা গরুহাটে গিয়ে জুয়া খেলে। সেদিন নেশা করে পাছায় গুঁতো খেয়েছে। হারামজাদা!"

অনাদিকে আমারও আর পছন্দ হচ্ছে না। ফাঁকিবাজ, চোর। নেশাটেশা যে করে তাও বুঝতে পারি। আমার রেডিওটার দফারফা করে রেখেছে। চালচলনও পালটে গেছে এক দেড় মাসে। বেটা কোত্থেকে ঘাড় চাঁচিয়ে চুল কেটেছে, বাহার করে চুল নিয়ে, গলায় একটা মোটা কালো সুতো পরেছে, সুতোয় তাবিজের মতন কী একটা বাঁধা। মাঝে মাঝে আমার ভয় হয়। ডাকঘরের টাকা পয়সা যদিও বড় ডাকঘরে জমা দিয়ে আসে ফণী, তবু কখন কী করে বসে অনাদি কে জানে!

আমি বললাম, "ফণী আমাকে দিয়েছে ওকে..."

"ফণীর পরোয়া তুমি করো না। ওর বাপও তোমার কিছু করতে পারবে না। ও আমার বশ হে!" বলে ইশারায় সাহানা যা বোঝাল তাতে মনে হল, সুজ্যি মুদির দোকানে ফণীর বাকি বকেয়া পড়ে থাকে বরাবরই।

আমি বুঝতে পারছিলাম না, পরীর জন্য সাহানার এত দরদ উঠেছে কেন?

শীত ধরেছিল আবার। চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে বললাম, "বাসায় আমি একা থাকি। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত একটা মেয়েছেলে থাকবে, লোকে কিছু বলবে না?"

সাহানা যেন আমার বোধবুদ্ধির বহর বুঝে নিল। বলল, "ওদের কেউ কিছু বলে না। বলাবলি কাদের করে মাস্টার? জাতপাতের লোকদের। ভদ্দরদের। উদের কী বলবে হে! পরী যায় যাত্রায় খাটতে, মরি যায় কোলিয়ারির ছোট হাসপাতালে আয়াগিরি করতে। গুমুত ঘেঁটে কানি কেচে টাকা পয়সা নিয়ে ফিরে আসে। গতর না খাটালে পেট চলবে কেমন করে!"

"ও! মরি আয়ার কাজ করে?"

"করে বটে। জানো হে মাস্টার, মরির কোনো বাঁধা ধরা মাস নেই। ছানা বিয়োবার মাস থাকে না। তবু মরির কামাই যায়। আর পরীর এই তিন চার মাস। তাও মাসে পাঁচ সাতটা দিন। কামাই মরির বেশি।"

আমি চুপ করে থাকলাম। অনাদিকে আমার পছন্দ নয়, কিন্তু পরীকে রাখা কি ঠিক হবে। ওই তো চেহারা। ভেতরে কোনো অসুখ বিসুখও থাকতে পারে। চেহারা দেখলে তেমন মনে হয়। সাধারণ খাটাখাটুনিও ঠিকমতন করতে পারবে কী না কে জানে!

সাহানা বলল, "পরীকে তুমি রাখো, মাস্টার। আমি বলছি।"

দোনামোনা করে বললাম, "ও কী পারবে?"

"বলো কী তুমি! একটা লোকের বাড়ি আগলাতে পারবে না! ওর হাড় দেখে ওকে বুঝো না শালাবাবু! হাড়ে খেলা আছে গো!" বলে সাহানা একটু হাসল। বলল, "আসরে যখন গাইতে নামে হে, দমখানি বোঝা যায়!"

আমি হেসে বললাম, "আপনি দেখেছেন গাইতে?"

মাথা হেলিয়ে সাহানা বলল, দেখেছে।

"তা হলে ঠিক?" সাহানা বলল।

"একটু ভেবে দেখব না?"

"ভাবার কিছু নাই। তুমি আমার কথায় রাখছ হে ... সকালে এক আধখানা বাসী রুটি খাবে, দুপুরে চাট্টি ভাত ডাল। ও একটু চা খেতে ভালবাসে। তোমার হলে খাবে একটু।"

"মাইনে?"

"সে পরে কথা হবে। আগে ছুঁড়ি বাঁচুক, তারপর অন্য কথা।"

সাহানা যেন এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

॥ তিন ॥

পরী মেয়েটার কাজকর্ম ভাল। অনাদি বোধহয় লুটেপুটে খেত। পরীকে দেখি সামলে সুমলে চলে। যখন তখন হাত পাতে না। গুছিয়ে ফেলেছে বেশ। সত্যিই সাত সকালে ছেঁড়াফাটা করকরে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে আসে। সদরে শেকল নাড়ে। ঘুম চোখে উঠে দরজা খুলে দিই। আবার শুয়ে পড়ি লেপের তলায়।

শীতও পড়েছে। পৌষের হাওয়ায় গাছপালা পর্যন্ত রুক্ষ কাঠ হয়ে গেল যেন। যতক্ষণ রোদ ততক্ষণ আরাম। দুপুরের পর থেকেই গায়ে কাঁটা দেয়। আর বিকেল ফুরোলো তো হাত পা ঠাণ্ডা, গায়ের চামড়া কেটে দেয় শীতের হাওয়া। সন্ধের পর মালসায় কাঠ কয়লার আগুন নিয়ে বসতে হয়।

এমন কনকনে হাড় কাঁপানো দিনেও পরী ঘরদোরের কাজকর্ম, মোছামুছি, ধুতি জামা কাচা, রান্নাবান্না সবই করে যাচ্ছে। সন্ধের আগে চা খাইয়ে চলে যায়, রাতের খাবার রেখে যায় গুছিয়ে। যাবার আগে বলে যায়, একটা কেরোসিন স্টোভ কিনতে। স্টোভ থাকলে কষ্ট হত না। স্টোভ জ্বালিয়ে গরম করে নিতে পারতাম।

সাহানার দোকানে স্টোভ নেই। বলেছে, রানিগঞ্জ থেকে আনিয়ে দেবে।

পরী মেয়েটাকে আমার খারাপ লাগছিল না। নিজের মতন কাজ করে, নয়ত বসে থাকে রোদে। দু'একদিন দেখেছি সেলাই করছে নিজের শাড়ি জামা। একদিন কি দুদিন শুনি নিজের মনেই গান গাইছে, গলা নামিয়ে, খেয়াল করেনি বোধ হয়। গানের একটু কানে গিয়েছিল। 'ধীরে ধীরে ধীরে, তটিনী হৃদয় নীরে...'। নিশ্চয় কোনো যাত্রার গান।

পরী আমাকে মাস্টারবাবু বলে ডাকত। কথায় আপনি আজ্ঞের বহরটা ছিল অদ্ভুত। কখনো আপনি থাকত, কখনো থাকত না।

কথাবার্তা আমিও বিশেষ বলতাম না। বলার কীই বা ছিল। পরীর বোন মরি এসেছিল একদিন। দেখে গেল বোধহয়।

শীতের দাপটে সন্ধেবেলায় সাহানার কাছে যাওয়া হত না রোজ। তবে যেতাম।

সাহানা ঠাট্টা করে বলত, "কেমন ছুঁড়ি দিয়েছি হে মাস্টার! মনে ধরছে তো?

হেসে বলতাম, "মনে কেন ধরবে। কাজে ধরছে।"

"উ এর মাঝে একদিন রাধানগরের দিকে গান গাইতে গিয়েছিল, জান?"

"না। কবে?"

"তোমার নজরে কিছুই পড়ে না হে।"

সত্যিই আমার নজরে পড়েনি। তবে হ্যাঁ গত পরশু না তরশু দিন বিকেল হতেই চলে গিয়েছিল কাজকর্ম সেরে, পরের দিন সকালে সামান্য দেরী হয়েছিল আসতে। আমি অতটা লক্ষ করিনি।

সাহানা বলল, "শোনো মাস্টার, তুমি ছুঁড়িকে বলে দেবে, গাছেরও খাবে তলারও কুড়োবে, এ চলবে না। উ যদি রাতে খাটতে চায় খাটুক, দিনে রাতে খাটা চলবে না।"

আমি খানিকটা অবাক হয়ে বললাম, "মানে, ওকে তাড়িয়ে দেব বলছেন?"

"নিশ্চয়ই দেবে।" সাহানা যেন রুক্ষ হয়ে

বলল, শালীকে মরণে ধরেছে ; বাপ বলে পায়ে ধরবে, নিষেধও মানবে না।"

সাহানা একটা কথা আমার কাছে স্পষ্ট করে বলছে না। পরীকে মরণে ধরেছে এই কথাটা কত বারই না বলল, কিন্তু কিসের মরণ তা বলল না। জিজ্ঞেস করলে এড়িয়ে যায়।

আমি বললাম, "পরীকে আপনি দিয়েছেন। আপনি ওকে বারণ করবেন। ও যদি আমার কাজ সেরে বাড়ি গিয়ে কোথাও যায়—আমি জানব কেমন করে? আর বলবই বা কী?"

সাহানা বলল, "আমি বলেছি হে! বলেছি, তুই আমার চোখে ধুলো দিতে পারবি না। আর যাবি তো তোর কপালে মন্দ হবে।" বলে সাহানা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর নিশ্বাস ফেলে বলল, "উঃ বোধহয় মরবে মাস্টার! অনর্থক কান্নাকাটি করল হারামজাদী।"

সাহানা বলেছিল বলেই আমার যেন নজর একটু বেশি করে পড়ল পরীর ওপর। ওকে লক্ষ করতাম। বিকেলের দিকে যেদিন তাড়াতাড়ি কাজ সেরে চলে যেত—ওকে নজর করতাম। সকালে দেরী করে এলে ভাল করে লক্ষ করতাম ওকে। আমার চোখে স্পষ্ট করে কিছু ধরা পড়ত না।

একটা জিনিস আমার নজরে পড়ত। প্রায় দিন দুপুরে দেখতাম, স্নান খাওয়া দাওয়া সেরে বাসন ধুয়ে, মাটির দালানে ছেঁড়া মাদুর পেতে ও শুয়ে থাকত। কোনো কোনো দিন পা ছড়িয়ে বা চুল ছড়িয়ে বসে থাকত। মনে হত আলস্য ভাঙছে শীতের রোদে। কিন্তু এমন অলস উদাস চেহারা আর ভঙ্গি, এমনই চুপচাপ যে আমার মনে হত, পরী যেন কোনো ঘোরের মধ্যে বসে থাকে দুপুরের রোদে। শীতও তো কমে এল।

সাহানাও অবাক মানুষ। পরী যে এখনও লুকিয়ে চুরিয়ে এক আধ দিন যাত্রায় খাটতে যায়, কাছাকাছি জায়গায়, এ-খবর তার কানে আসে। আর প্রতিবারই আমায় খবরটা জানিয়ে পরীকে গালমন্দ করে। প্রতিবারই বলে, হারামজাদীকে লাথি মেরে তাড়াও মাস্টার। উ শালী মরবে।

আমি বলি, আপনি তাড়ান। মুখে বলেন, তাড়ান না কেন?

সাহানা ঠিকমতন জবাব দিতে পারে না। বলে, গালিগালাজ করি হে, কিন্তু ছুঁড়ি কেঁদে ভাসায় গো! এমন করে কাঁদে মাস্টার, যেন শালী সাবিত্রীর পার্ট করছে। আর আমি শালা যমরাজ।

আমি হেসে ফেলে বলি, সত্যবান কে?

তোমায় বাড়ির চাকরিটা হে! উটি যেন ওর প্রাণ।

শীতের পালা ফুরিয়ে এল। বসন্তর হাওয়া মিশেছে শীতের বাতাসে। গাছপালা আর রুক্ষু লাগে না চোখে।

এমন সময় পরী দিন দুই এল না। মরি এসে বলে গেল, পরীর গা গতরে ব্যথা আর জ্বর। আমি চার পুরিয়া হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিলাম।

দু তিনটে দিন নিজেই কোনো রকমে চালিয়ে নিলাম। সাহানার বাড়ি থেকে দিদি বাটি করে এটা ওটা পাঠাল গোপালকে দিয়ে। সাহানা বলল, দুটো দিন একটু কষ্ট করে চালিয়ে নাও হে। নয়ত এ-বাড়িতে দু মুঠো খেয়ে যেও।

চার দিনের মাথায় সাহানা এল রাত্রের দিকে। ডাকল, "মাস্টার?"

সদর খুলে দিতেই সাহানা বলল, "করছিলে কী?"

"খেতে বসব ভাবছিলাম।"

"পরে খেও। চলো এখন।"

"কোথায়?"

"পরীর বাড়ি।"

"পরীর বাড়ি?"

"চলো হে! ... ছুঁড়ি বুঝি মরল!"

মরল! আমি চমকে উঠলাম। মরার মতন কী হয়েছে পরীর।

"হয়েছে কী?"

"চলো, দেখবে।"

গায়ে জামা চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তালা দিলাম সদরে।

পথে আমার মনে হল, হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্সটা সঙ্গে নিলেই হত।

আজ বাইরে জ্যোৎস্না রয়েছে। কাল কি পরশু পূর্ণিমা হবে। চাঁদের আলো পরিষ্কার। শীত মরেছে। ফাল্গুনের গোড়া। মিহি কুয়াশা হয়ত আছে মাঠেঘাটে জড়ানো।

এ দিককার ঘর বাড়ি কম। দু একটি আলো জ্বলছে কোথাও টিমটিম করে। বাতাসে বনতুলসীর গন্ধ। জামতলার গা দিয়ে কাঁচা রাস্তা। সাহানা কোনো কথা বলছিল না।

বঁইচি বাগানের পাশে পরীদের বাড়ি। টিনের চাল, বেড়াভাঙা চৌহদ্দি, ঘরের সামনে কলকে ফুলের গাছ, আশেপাশে ঝোপ।

খোয়া পেটানো কাঁচা রাস্তার মতন এক ফালি বারান্দা। দরজা ভেজানো ছিল। সাহানা দরজা ঠেলল। খুলে গেল।

ঘরের মধ্যে ভুসিওঠা ছোট লণ্ঠন। আলো যেন না থাকার মতন। জানলা খোলা। চাঁদের আলো এসেছে সামান্য।

ঘরের একপাশে এক সরু তক্তপোশ। নোংরা বিছানা। ঘরের চারদিকেই ছেঁড়া ময়লা কত কী জমে আছে। কিসের এক গন্ধ উঠছিল। বিশ্রী গন্ধ।

পরী বিছানায় পড়ে আছে। আড়াআড়ি। তার মাথার তলায় বালিশ নেই। হাত-পা এলানো। চোখ বন্ধ।

সাহানা বলল, "দেখো তো মরে গেল কিনা!"

সাহানা লণ্ঠনটা তুলে এনে বিছানার সামনে দাঁড়াল।

পরীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, সে মরেনি। তবে নেশা করেছে। তার চোখের পাতা ভারি, গাল ভারি, ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে। গায়ে জামা নেই। পরনের শাড়ি যেন মাটিতেই বেশিটা পড়ে আছে। পেট দেখা যাচ্ছিল। পায়ের গোছ যেন কাঠির মতন। পা দুটো ফাঁক করা।

পরী আজ কোথায় যাচ্ছিল কে জানে। তার মাথার কাছে পাউডারের কৌটো, কাজললতা, প্লাস্টিকের ফুল, ক্লিপ, চুল বাঁধার গুছি, কাঁটা পড়ে আছে। হাতের পাশে একজোড়া পালক, টিয়াপাখির বোধ হয়। ওর গলায় রয়েছে সাদা পুঁতির মালা।

ওর দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা মুশকিল। আমি সরে এলাম। বললাম, "মরেনি।"

"ছুঁড়ির হুঁশ নেই।"

"নেশা করেছে।"

"তা বুঝি। কিন্তু শালীর বিছানার পাশে ফলিডল পড়ে আছে হে!"

"আমার তো নেশা বলেই মনে হয়। গন্ধ ছুটছে।"

"ছুঁড়ি বাঁচবে তো হে!"

"মরবে কেন?"

সাহানা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "উ তো মরেছে। তোমার চোখ নাই মাস্টার।"

"মরি কোথায়?"

"আয়ার কাজে গেছে। রাতে আসবে কিনা—কে জানে!"

"চলুন।"

বাইরে এসে সাহানা দরজা ভেজিয়ে দিল।

ফেরার পথে সাহানা বলল, "দেখো মাস্টার, নলরাজ সোনার হাঁস ধরতে গিয়েছিল নিজের বস্ত্র দিয়ে। হাঁস উড়ে গেল। বস্ত্রও গেল। এ হল কলির খেলা। মরণের খেলা।... ওই শালী ছুঁড়িকে আমি হাজার বার বলেছি, তুই বেজাত বেজন্মা, তোর যে মাসি তোদের এনেছিল এখানে সে ছিল নাচনি। মাগী ঝুমুর দলে নাচত। মাগী মরে গেল। বেশ হল। তুই ছুঁড়ি কাজেকর্মে থাক। মরির সাথে যা। তা উ শালীর লোভ হল পালা গেয়ে বেড়াবে। গু মুত কানি কাচবে না।...যা পালা গাইতে, আসরে নাচতে। একবার ছুঁড়ি মরতে মরতে বাঁচলি। শিক্ষা হল না। আবার শালী মরলি!... সে এবার শালা কোন্ রাজপুত্তুর তোকে সামলাতে আসবে! পেটে লিয়ে ঘোর ছুঁড়ি।"

কিছুটা পথ আমি কোনো কথা বললাম না। সাহানা যেন পথ ঠাওর না করেই চলছিল।

শেষে আমি বললাম, "ওর মেলামেশা কার সঙ্গে ছিল, আপনি জানেন?"

সাহানা কোনো জবাব দিল না প্রথমে। পরে বলল, "না। ছুঁড়ি বলেছিল, নিশাদল গাঁয়ের বলরাম হাজরার সঙ্গে। বলরামের সাথে উ লখীন্দর বেহুলার পালা গাইত। বলরাম মরেছে হে! আলপথে পা কেটে বিষ লেগেছিল। ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মারা গেল।"

চমকে উঠে বললাম, "কবে?"

"বেশি দিন নয়। বলে সাহানা যেন নিজেকে সামলাতে পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে বিড়ি ধরাবার চেষ্টা করল।

বিড়ি ধরিয়ে বলল, "ও ছুঁড়ি বাঁচবে না মাস্টার। মরণ ধরলে কে বাঁচে! শালীর পিরীত ধরেছিল। এবার বুঝ! সোনার হাঁস ধরতে সাধ করেছিল ছুঁড়ি। হাঁস গেল, তোর বস্ত্র গেল। এবার তুই দেখ, এ-জগৎ কত সুখ ধরে।"

সাহানা দেখি আকাশের দিকে মুখ করে কী দেখছে! জ্যোৎস্না চাঁদ, কোনো পরী, না ভগবান কে জানে।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

শেষ

দানব ও দেবতা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

[পাঁচ]

পঁয়তাল্লিশ আর ছিয়াশি সময়ের নদীতে ঘটনার অনেক জল বয়ে গেছে। যুদ্ধ থেমেছে। বৃহৎ শক্তি ইওরোপ ভাগ করেছে। ভাঙা শহর ঝকমকে হয়েছে। জীবনের মূল্যবোধ পাল্টেছে। গরম যুদ্ধ থেমে ঘিনঘিনে ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়েছে। কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কিউবা, কম্বোডিয়া, সুয়েজ, ইরাক, ইরান, আফগানিস্থান, নিকারাগুয়া, আর্জেন্টিনা, লড়াই আর থামে না। এখানে, ওখানে, সেখানে বিশ্ব শক্তির মল্লযুদ্ধ। হালে পানি না পেলেই পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগের হুমকি। পঁয়তাল্লিশে হিরোশিমা, নাগাসাকি ওড়াবার প্রাক্কালে এই আশঙ্কাই করা হয়েছিল।

বোমার ব্ল্যাকমেল নাগাসাকি থেকেই শুরু হয়েছে। নাগাসাকিতে 'ফ্যাট ম্যান' ফেলার পরই, বিমান থেকে ফেলা হল তিনটি পরিমাপ যন্ত্র। প্রতিটি যন্ত্রে বাঁধা একটি হাতে লেখা চিঠি। কয়েকজন পরমাণু বিজ্ঞানীর মাথা থেকে বেরিয়েছিল এই ফন্দি। বোমারু বিমানের পেছনেই থাকত অনুসরণকারী বিমান। সেই বিমানে যে বিজ্ঞানীরা ছিলেন তাঁরা দ্রুত একটি চিঠি লিখে ফেললেন জাপানের বিজ্ঞানী সাগানেকে। জাপানও পরমাণু গবেষণায় কিছু কমতি ছিল না। টোকিওতে কাজ করছিল গোপন একটি সাইক্লোট্রন যন্ত্র। ডিরেকটার ছিলেন য়োশিয়ো নিশিনা। নিশিনাকে বলা হত জাপানের ওপেনহাইমার। জাপান বোমা তৈরি করতে পারেনি দুটো কারণে। আমেরিকার মিলিটারি বিজ্ঞানীদের যে-ভাবে কবজা করতে পেরেছিলেন, জাপানের মিলিটারি সে-ভাবে পারেননি। জাপানের বিজ্ঞানীরা মিলিটারির হাতে মারাত্মক অস্ত্রটি সহজে তুলে দিতে নারাজ ছিলেন। দ্বিতীয় কারণ, জাপানী গবেষণায় একটা ত্রুটি ছিল। তাঁরা হাই-এনারজি নিউট্রন দিয়ে অ্যাটম ভাঙার চেষ্টা করছিলেন। দরকার ছিল লো-এনারজির। এ যেন অনেকটা সেই রকমের ব্যাপার, শত্রু সৈন্য দিনের পর দিন দুর্গের দুর্ভেদ্য গোপন আস্তানাটি শক্তিশালী কামানের গোলায় ভাঙতে ব্যর্থ হয়ে যখন হতাশ, তখন কে যেন পরামর্শ দিলেন, পিংপং বল মেরে দেখ তো কি হয়। তা ছাড়া জাপানের অর্থসঙ্গতিও তেমন প্রচুর ছিল না। দু বিলিয়ান ডলার মুখের কথা নয়।

ওয়ার লর্ডদের সঙ্গে বিজ্ঞানীদের এই তফাৎ। দেশ নেতারা তরোয়াল-এর ভাষায় কথা বলেন। বিজ্ঞানীরা বলেন মানবিকতার ভাষায়। অনুসরণকারী বিমানের বিজ্ঞানীরা বিমানে ওঠার আগে বসে বসে বীয়ার খাচ্ছিলেন, হঠাৎ মনে হল, জাপানকে যদি বাঁচান যায়। বাঁচতে হলে আত্মসমর্পণ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন চিঠি :

অধ্যাপক আর সাগানে,

হইতে : আপনার আমেরিকায় থাকাকালীন তিন সহকর্মী বিজ্ঞানী।

আপনার কাছে এই চিঠি আমাদের ব্যক্তিগত আবেদন। পরমাণু বিজ্ঞানী হিসাবে আপনি আপনার দেশের সামরিক কর্তৃপক্ষকে আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিন, নয়তো সমূহ বিপদ। বুঝতেই পারছেন এই জাতীয় বোমা আরও ফেলা হলে জাপানের আর কিছুই থাকবে না।

কয়েক বছর ধরেই আপনি জানেন প্রচুর অর্থ থাকলেই পরমাণু বোমা তৈরি করা যায়। আপনি এখন দেখছেন আমাদের কারখানা আছে, যে কারখানায় বোমা তৈরি হচ্ছে। এখন সেই কারখানায় দিন রাত কাজ হচ্ছে আর সেই উৎপাদনের পুরোটাই পড়বে আপনাদের ঘাড়ে।

গত তিন সপ্তাহে, প্রথম বোমাটি আমরা ফাটিয়েছি আমেরিকার মরুভূমিতে, দ্বিতীয়টি ফেটেছে হিরোশিমায়, তৃতীয়টি এই চিঠি সমেত নামছে নাগাসাকিতে। আজ প্রাতে।

আমাদের অনুরোধ, কর্তৃপক্ষকে বোঝান। বন্ধ করুন ধ্বংস ও লোকক্ষয়। এই যুদ্ধ চললে আপনারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। বিজ্ঞানী হিসেবে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি, এমন সুন্দর একটা আবিষ্কার মানুষ মারার কাজে লাগান হচ্ছে বলে। আমরা নিরাপায় হয়ে আপনাকে জানাতে চাই, আত্মসমর্পণ না করলে জাপান নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

তিনটে চিঠির একটা নাগাসাকিতে বোমা ফেলার পরের দিন জাপানের ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স ডিভিসনের হাতে পড়ল। সেই চিঠি বেশ কয়েক দিন পরে বিজ্ঞানী সাগানের কাছে পৌঁছল। চিঠির ফলেই জাপান আত্মসমর্পণ করল কি না জানা গেল না, তবে এ কথা সবাই জানত, অন্তত আমেরিকার ম্যানহাটান প্রোজেক্টের সকলে জানতেন আমেরিকার হাতে সেই সময় আর একটিও বোমা ছিল না। বোমা বৃষ্টির ভয় দেখান হয়েছিল।

'৪৫ সালে যুদ্ধ পুরোপুরি থেমে যাবার পর অনেকে বলেছিলেন, দুটো শহর ধ্বংস হল ঠিকই, দু' লক্ষ নিরীহ জাপানীর মৃত্যুও দুঃখজনক ; কিন্তু বোমাই নিয়ে এল শান্তি। পরমাণু বোমাই হল শান্তির দূত। হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে মৃতের সংখ্যা দু লক্ষ ; কিন্তু বেঁচে গেল দশ গুণ মানুষ। বোমা না ফেললে আমেরিকাকে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের সঙ্গে লড়ে যেতে হত গতানুগতিক পদ্ধতিতে। '৪৫এ জাপান একেবারে মরীয়া। দশ লক্ষ সৈন্য আর তিন কোটি জাপানী নাগরিক আমৃত্যু লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

যদিও অসফল হয়েছিলেন, জিলার্ড তাঁর যুক্তি-বুদ্ধিতে শান দিয়ে নেমেছিলেন মানবপ্রজাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে

ওকিনাওয়া, আর আয়োজিমাতে জাপানী সৈনিক আর কামিকাজে পাইলটরা দেখিয়ে দিয়েছিলেন, বুশিদো স্পিরিট কাকে বলে। সামনাসামনি প্রথাগত লড়াই হলে কমপক্ষে দশ লক্ষ মার্কিন সৈনিকের মৃত্যু হত। মৃত্যু হত ততোধিক জাপানী যোদ্ধার। 'জাপানিজ ব্লাডি ওয়েল ডিসার্ভড হিরোশিমা' বলে বোমাটি ছাড়া হল আর সান্ত্বনা খোঁজা হল বেঁচে যাওয়ার কাল্পনিক সংখ্যা বের করে। অভিজ্ঞরা জানতেন, হিরোশিমায় বোমা ফেলা হয়েছিল রাশিয়াকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য, আর জাপান যুদ্ধ থামিয়েছিলেন হিরোশিমা নাগাসাকির আতঙ্কে নয়। বরং বোমা তাঁদের অহঙ্কারে ইন্ধন জুগিয়েছিল। তেঁড়েফুঁড়ে উঠেছিল জাতীয় অভিমান। হারব না, বরং মরব। জাপান আত্মসমর্পণ করলেন রাশিয়ার চালে। হিরোশিমায় বোমা পড়ার পরে আর নাগাসাকিতে পড়ার আগে ৮ আগস্ট স্ট্যালিন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। যার যা ধান্দা। জাপান, কমিউনিস্ট রাশিয়ার খপ্পরে পড়ার চেয়ে আমেরিকার আশ্রয়ে যাওয়াটাই পছন্দ করলেন।

প্রচুর অর্থ, প্রচুর গম, প্রচুর কাউবয়, অস্ফুট আনুনাসিক ইংরেজি উচ্চারণ, ঢাউস মোটর গাড়ি, বেসবল, চিউয়িংগাম, হলিউড, টেকসাস, কলম্বাস, রেড ইন্ডিয়ান, এই রকম একটা পরিচয় থেকে রাতারাতি আমেরিকা হয়ে দাঁড়াল পৃথিবীর সুপ্রীম পাওয়ার। পরমাণু শক্তির অধিকারী নিউক্লিয়ার পাওয়ার। প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়া। যুদ্ধ থামল। ইওরোপ ভাগবাঁটোয়ারা হল। আমেরিকার পরমাণু কারখানা বন্ধ হল না। ন্যাশন্যাল হিরো ওপেনহাইমার লস অ্যালামসের ডিরেক্টারের পদে ইস্তফা দিয়ে অধ্যাপনায় ফিরে গেলেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে একে একে আর সব সেরা বিজ্ঞানীরাও বিদায় নিলেন। জমজমাট প্রাণচঞ্চল পরমাণু কেন্দ্র লস অ্যালামসের চেহারা হয়ে দাঁড়ালো ভূতুড়ে। তবু জেনারেল গ্রোভস দমলেন না। আমেরিকার সামনে লাল আতঙ্ক। আমেরিকার চেতনায় পৃথিবীর এক নম্বর শক্তি থেকে পড়ে যাবার আশঙ্কা। আমেরিকা কেন, বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে ঢুকে পড়েছে পারমাণবিক সংস্কৃতি। আমেরিকার মিলিটারি পুলিস জার্মানিতে বিজ্ঞানী ধরতে ছুটলেন। আদর্শবাদী মার্কিনীরা প্রতিবাদ জানালেন। কর্তৃপক্ষ যুক্তি দিলেন, আমরা বগলদাবা না করলে, রাশিয়া নিয়ে পালাবে।

মজার মজার সব পাগলামি শুরু হয়ে গেল। যেমন ব্রেমেন থেকে পরমাণু বিজ্ঞানী বলে মিলিটারি পুলিস একজনকে তুলে নিয়ে এলেন। তাঁর হাত-পা ছোঁড়া প্রতিবাদে কেউ কর্ণপাত করল না। আমেরিকায় এনে দপ্তরে ফেলে জিজ্ঞাসাবাদ চলল দিনের পর দিন। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে তাঁর কতটা জ্ঞান জানা দরকার। অমন একগুঁয়ে বিজ্ঞানী খুব কম দেখা যায়। জার্মানির আরও অনেক বিজ্ঞানী ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় কেমন বশ্যতা স্বীকার করেছেন, এরকম তো কেউ করেননি। যতই তাঁকে প্রশ্ন করা হয় ততই তিনি বলতে থাকেন, পরমাণু বিজ্ঞানের 'প'-ও আমি জানি না। আমার জ্ঞান ওই খবরের কাগজ পড়ে যতটা হয় ততটা। বিশ্বাস করুন, আমি পরমাণু বিজ্ঞানী নই, আসলে আমি একজন দর্জি। যাঁরা জেরা করছিলেন তাঁদের একজনের মাথায় হঠাৎ বুদ্ধি খেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জোগাড় করে আনলেন ছুঁচ সুতো। নাও দেখাও তোমার কেরামতি। সকলকে হতবাক করে সেই ধরে-আনা বিজ্ঞানী তাঁর পাহারাদারদের জামা আর ট্রাউজারের ওপর সেলাইয়ের কাজ দেখালেন। অনেক কচলাকচলির পর ভুলটা অবশেষে ধরা পড়ল। ভদ্রলোকের নাম হাইনরিখ জোর্ডান। জোর্ডান পদবীটিই হল কাল। মিলিটারি পুলিসরা ধরতে চেয়েছিলেন পাসকুয়াল জোর্ডানকে। একজন বিখ্যাত পদার্থবিদ। ম্যাকস বর্ণের ছাত্র। হাইনরিখ জোর্ডানকে মানে মানে ছেড়ে দেওয়া হল।

নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে গিয়ে আমেরিকান মিলিটারি আর একটি মারাত্মক ভুল করে বসলেন। হিটলার বই পুড়িয়েছিলেন, মেজর

পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর একটি সুন্দর সাজানো শহর : নাগাসাকি, ৯ আগস্ট, ১৯৪৬

ও.হার্ন অধিকৃত জাপানে, অধ্যাপক নিশিনার সাইক্লোট্রন যন্ত্র দুটি পাঁচ দিন পাঁচ রাত্তের নাগাড় চেষ্টায় সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলেন।

বোমা যাঁরা তৈরী করলেন, সেই বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা চেয়েছিলেন, যুদ্ধ থেমেছে, ধ্বংসের নমুনা পৃথিবীর মানুষ দেখেছে। পরমাণু বিজ্ঞান আর পরমাণু মারণাস্ত্র তৈরির কাজে লাগাতে দেওয়া হবে না। বিজ্ঞানোন্নত দেশের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হোক সব গোপনীয়তা। তাঁরা চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন ওপেনহাইমারের ওপর, কেন আমেরিকা রাশিয়ার সঙ্গে বসছে না। ওপেনহাইমার কেবলই বলেন, পেশেন্‌স, পেশেন্‌স। ধৈর্য ধরো। এখনই নৌকো দুলিও না।

শেষে দেখা গেল চক্রান্ত অতীব গভীর। কংগ্রেসম্যান অ্যান্ড্রু মে কে দিয়ে সমর দপ্তর, জেনারেল গ্রোভসের পরিচালনায় একটি বিল পাশ করাতে চলেছেন, যার ফলে, সমস্ত নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে মিলিটারির হাতে। সিকিউরিটি ঘেরা পারমাণবিক উৎপাদন কেন্দ্রে বসে স্লেভ ফিজিসিস্টরা পরমাণু অস্ত্র বানাবেন, আর সেই অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে বিশ্বের ওপর প্রভুত্ব করবে আমেরিকা। রুজভেল্ট, ট্রুম্যান ফেরৎ সেই একরোখা বিজ্ঞানী জিলার্ড এবারও এগিয়ে এলেন, অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি অফ ওয়ার কেনেথ
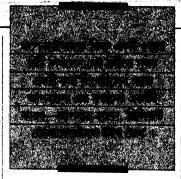
রয়াল, জেনারেল গ্রোভস, অ্যান্ড্রু মে, বিজ্ঞানী ভানেভার বুশ আর জেমস কোনান্টের চক্রান্ত ভাঙতে। সেনেটার জনসন ছিলেন বিলটির উত্থাপক। জিলার্ড জনমত তৈরি করে ফেললেন। চাপে পড়ে মে-জনসন বিল এল হিয়ারিং-এ। জিলার্ড ঝাড়া একঘণ্টা চল্লিশ মিনিট একাই লড়ে গেলেন। মে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেলেন জিলার্ডকে অপদস্থ আর বিভ্রান্ত করতে। এমন একটা ভাব দেখালেন, যেন কে জিলার্ড! যাঁর নামই উচ্চারণ করা যায় না। মে সর্বক্ষণ জিলার্ডকে মিস্টার সাইল্যান্ড বলে সম্বোধন করে গেলেন। তাঁকে ধাঁতালেন। দাবড়ালেন। হেয় করলেন। জিলার্ড বড় কড়া ধাতের মানুষ ছিলেন। সহজে উত্তেজিত করা শক্ত ছিল। তিনি ফাঁদে পা দিলেন না। ধীরে ধীরে তাঁর যুক্তির জালে আচ্ছন্ন করে ফেললেন সকলকে। প্রথম চোটের লড়াই জিতে গেলেন জিলার্ড। সামরিক নিয়ন্ত্রণ থেকে যেভাবেই হোক জনগণের হাতে নিয়ে আসতে হবে পরমাণু বিভাজনের অসীম শক্তিকে।

লম্বা লম্বা চুল নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানীরা রাতারাতি দেবতার পর্যায়ে চলে গেলেন। মহাদেব ওপেনহাইমার। এইবার তাঁর নীলকণ্ঠ হবার পালা। প্রশংসার পাশাপাশি ধিক্কার। জীববিজ্ঞানী ডক্টর থিওডর হাউস্কা ওপেনহাইমারকে তিক্ত একটি খোলা চিঠি লিখলেন। সেই চিঠিতে সুন্দর একটি কথা লিখেছিলেন, আজ আপনাদের এত সম্মানের একটিই কারণ, আপনারা হলেন, 'ব্রিলিয়েন্ট কোলাবোরেটারস উইথ ডেথ'। মৃত্যুর সঙ্গে সুন্দর হাত মেলাতে পারলেন বলেই আজ আপনারা মহান।

অনেক আন্দোলন, লেখালিখি, সভা সমিতি করেও কিছু হল না। আমেরিকা '৪৬ সালের জুলাই মাসে বিকিনি অ্যাটলে পরীক্ষামূলকভাবে আবার একটা বোমা ফাটালেন। এই বিস্ফোরণের পর মানুষের আণবিক আতঙ্ক কমে এল। হিরোশিমার পর টাইম পত্রিকা একটি শিশুর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন। তাকে কথায় কথায় প্রশ্ন করা হয়েছিল, তুমি কি চাও ? শিশুটি

একটি কথাই বলেছিল, 'বাঁচতে'। বিকিনি অ্যাটলের পর, করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসন্ধানকারীরা জনমত সংগ্রহ-অভিযানে বেরিয়ে অবাক। আতঙ্ক একেবারে থিতিয়ে গিয়েছে বললেও ভুল হবে না। প্রশ্নের উত্তরে একজন বললেন, 'আমি কেন, সব মানুষই জীবনকে মেনে নিতে বাধ্য। যখন যেমন তখন তেমন। যেমন ধরুন ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় যদি আমাকে সারা জীবন বসবাস করতে হত, তাহলে প্রতি রাতে ভূমিকম্পের ভয় নিয়ে বিছানায় শুতে যাবার কি কোনও মানে হত।' আর একজন বলেছিলেন, 'যা আমার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বাইরে তার জন্য ভেবে মরি কেন! সরকার অবশ্যই কোনও ব্যবস্থা নেবেন।' আইনস্টাইন একদিন হাঁটতে হাঁটতে তাঁর সহকারী তরুণ গণিতজ্ঞ আর্নস্ট স্ট্রসকে বললেন, 'হ্যাঁ আমাদের সময়কে এখন রাজনীতি আর গণিতের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। তবে আমার কাছে গণিতই হল সব, অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতি সাময়িক। গণিত চিরকালের।'

পশ্চিমের বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন রাশিয়া হয়তো পারমাণবিক নিয়ন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আমেরিকার জনগণের পাশে এগিয়ে আসবেন। ওপেনহাইমারের সহযোগিতায় একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল বিবেচনার জন্য। '৪৬ সালের ২৪ জুলাই আন্দ্রে গ্রমিকো সরাসরি বাতিল করে দিলেন বিজ্ঞানীদের প্রস্তাব। দুই রাষ্ট্র মুখোমুখি। গরম লড়াই শেষ হল, তো শুরু হল ঠাণ্ডা লড়াই। রাজনীতিতে পরমাণু অস্ত্রের ব্ল্যাক মেলিং। বহুকাল পরে পুবের বিশাল কারাগার রাশিয়া থেকে ভেসে এল, বন্দী বিজ্ঞানী কাপিটজার কণ্ঠস্বর। রাদারফোর্ডের সেই প্রিয় ছাত্র। যাঁকে কায়দা করে রাশিয়ায় আমন্ত্রণ জানিয়ে খাঁচার কুলুপ আটকে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমের বন্ধু বিজ্ঞানীদের কাপিটজা লিখলেন— 'হায়, কি দুর্ভাগ্য আমাদের অ্যাটমিক এনার্জি বলতে অ্যাটম বম্ব ভাবার অর্থ হল ইলেকট্রিসিটি বলতে ইলেকট্রিক চেয়ার ভাবা।'

এই উক্তির ফলে কাপিটজার জীবনে নেমে এল ঘোর দুর্বিপাক। বিজ্ঞানের জগৎ থেকে তিনি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দশ বছর পরে জানা গেল তাঁর অন্তর্ধান-রহস্য। একদল আমেরিকান বৈজ্ঞানিক রাশিয়া গিয়েছিলেন। তাঁরা কানাঘুষো শুনে এলেন, স্ট্যালিন কাপিটজাকে বন্দী করে রেখেছেন। তাঁর অপরাধ, স্ট্যালিনের নির্দেশ মত পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদনে রাজী না হওয়া। শুধু কাপিটজা কেন আরও অনেক বিজ্ঞানীকে স্ট্যালিন সশ্রম বন্দীশিবিরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওই একই অপরাধে।

'৪৭এর বসন্তে দেখা গেল, বিজ্ঞানীদের বিশ্বজোড়া বিদ্রোহ মিইয়ে এসেছে। সবাই আবার মাথা নিচু করে ফিরে এসেছেন নিজের নিজের জায়গায়। রাষ্ট্রেরহাতে নিজেদের সঁপে দিয়েছেন। জেনারেল গ্রোভস হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'আমি জানতুম, এই রকমই ঘটবে। ছ মাসের যথেচ্ছ স্বাধীনতার পর সব পা'ই সুড়সুড় করতে লাগল। ফিরে এলেন সরকারী গবেষণায়। এমন উত্তেজনা কি ছেড়ে থাকা যায়!'

'৪৯এর আগস্টে ফাটল রাশিয়ার বোমা।

সেই থেকে শুরু হয়েছে হিসেব, কার স্টকে কত বোমা। আমেরিকা আর একা নয়। বিশাল বিশাল দেশের সব জালাতেই এখন দানবের বাসা। আমেরিকার সান্ত্বনা, তার ভাঁড়ারে আছে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পারমাণবিক অস্ত্র। নিক্সন ভারি সুন্দর বলেছেন, বোমা আর এখন শুধুই বোমা নয়। বোমা এখন 'ডিপ্লোমাটিক' স্টিক'। এই 'ডিপ্লোম্যাটিক স্টিক' ব্যবহার করে ফল পাওয়া গিয়েছিল কোরিয়ায়। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারকে কোরিয়ার যুদ্ধ প্রায় পাগল করে ছেড়েছিল। চলেছে তো চলেছেই। দু বছর ধরে উভয় পক্ষে কথাই চলেছে, বিরতির নাম নেই। পানমুনজমে বৈঠক চলেছে ওদিকে হাজার হাজার মানুষ মরে ভূত হয়ে যাচ্ছে। শেষে সিদ্ধান্ত হল মাটির লড়াই যতই বাড়ানো যাক যুদ্ধ থামবে না। এ গেরো খোলার একমাত্র রাস্তা পারমাণবিক অস্ত্র। আইজেনহাওয়ারের মনে সামান্য দ্বিধা ছিল। আমেরিকা এশিয়ায় একবার বোমা ব্যবহার করেছিল, আবার সেই এশিয়াতেই বোমা। নিকসনের মাথাতেও ওই চিন্তা ঘুরছিল। জন ফস্টার ডালাসকে তখন ভার দেওয়া হল। কৃষ্ণ মেনন সেই সময় ইউনাইটেড নেশানসে ভারতের রাষ্ট্রদূত। মেননের সঙ্গে চীন আর রাশিয়ার খুব মাখামাখি সম্পর্ক। নিকসনের কথায় who loved to talk to people a great blah blah blah. ডালাস মেননকে বললেন, 'কোরিয়ার ব্যাপারে আমরা খুব আগ্রহী। প্রেসিডেন্টের ধৈর্য ক্রমশই কমছে। আর বেশি বাড়াবাড়ি হলে আমরা পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগে বাধ্য হব।' রাশিয়া সরে দাঁড়াল। ক্লান্ত চীন থমকে গেল। পরমাণু বোমা হয়ে দাঁড়াল সবচেয়ে বড় 'ডিপ্লোম্যাটিক স্টিক'।

'৫৬ সালে সুয়েজ সমস্যাতেও আমেরিকা পারমাণবিক চালে কিস্তি মাত করেছিল। ক্রুশ্চেভ আমেরিকাকে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন, আসুন আমরা সমবেতভাবে ক্যানাল থেকে ইংরেজ আর ফরাসীদের হটাই। আইজেনহাওয়ার জানালেন, এ প্রস্তাব রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব। দে আর মাই অ্যালিজ। ক্রুশ্চেভ বুঝলেন, সুয়েজ-সমস্যা নামক শক্ত মটরদানাটি নিজেকেই চিবোতে হবে। ঘোষণা করলেন, রাশিয়া একাই যুদ্ধে নামছে। ঘোষণা শুনে বিশ্ব শক্তির রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

সেই সময় আইজেনহাওয়ার যা করলেন তার কোনো তুলনা নেই। ন্যাটোর কম্যান্ডার অল গ্রুয়েন্থারকে বললেন একটা প্রেস কনফারেন্স ডাকো। সেখানে গ্রুয়েন্থার ঘোষণা করলেন, ক্রুশ্চেভ যদি বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে রকেট আক্রমণ করেন তাহলে যেমন রাতের পর অবধারিতভাবে দিন আসে, ঠিক সেই রকম মস্কোও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

জালা থেকে দানব বের করার ভীতি বার্লিন সমস্যাতেও বেশ কাজ দিয়েছিল।

'৫৯ সালে সোভিয়েট ভয় দেখালেন বার্লিন পূর্ব জার্মানির শাসনভুক্ত হবে। তার মানে বার্লিনে, আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও ফরাসী দেশের প্রবেশাধিকার থাকবে না। আইজেনহাওয়ার বললেন চার-শক্তির চুক্তি এই ভাবে ভাঙা যায় না। ডাকলেন প্রেস কনফারেন্স। অতুলনীয় আইজেনহাওয়ার। শক্ত ধুরন্ধর মানুষ। ভিয়েতনামে আমেরিকা যখন নাস্তানাবুদ, সেই সময় জনসন আক্ষেপ করেছিলেন আজ যদি আইজেনহাওয়ার থাকতেন, 'The Russians feared Ike. They did not fear me'।

সেই প্রেস কনফারেন্সে আইক বকেই চলেছেন, বকেই চলেছেন। সবাই ভাবছেন মরেছে। প্রেসিডেন্ট বোধহয় পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। আইকের এইটাই ছিল কায়দা। বকতে বকতে টুক করে পৌঁছে যেতেন আসল বক্তব্যে। তিনি হঠাৎ বললেন, নতুন বাজেটে পেন্টাগনের গ্রাউন্ড ফোর্স ৫০ হাজারের মতো কমে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রেস-বক্স থেকে প্রশ্ন, এই বার্লিন সমস্যার মুখে প্রেসিডেন্ট কি বাজেট সংশোধনের কথা ভাবছেন! পঞ্চাশ হাজার সৈন্য কমানোর বদলে বাড়াতে হবে না তো!

আইক নিরুদ্বিগ্ন গলায় বললেন, 'ইওরোপে আমরা কোনওমতেই স্থলযুদ্ধের ভেতর আর যাবো না। তা ছাড়া বার্লিনে কয়েক হাজার বেশি আমেরিকান সৈন্য, কি কয়েক ডিভিসান পাঠিয়েই বা লাভ কি। আর যাই হোক ওখানে, ইস্ট জার্মানিতে পাঁচ লাখ সোভিয়েট আর ইস্ট জার্মান বাহিনী রয়েছে, কাছাকাছি রয়েছে আরও ১৭৫ ডিভিসান সোভিয়েট বাহিনী।' তখন প্রশ্ন হল, 'তবে কি আপনি পরমাণু অস্ত্রের কথা ভাবছেন?'

আইজেনহাওয়ার নিজের মনেই বলতে লাগলেন, 'পরমাণু যুদ্ধ! কোনও মানে হয় পারমাণবিক যুদ্ধের। নৃশংস, ভয়াবহ, কাণ্ডজ্ঞানহীন সংহার।' সবাই ভাবলেন, আইক পরমাণু যুদ্ধের ঘোরতর বিরোধী। হিরোশিমার স্মৃতি ব্যাঙ্কোর ভূতের মতো চোখের সামনে ঘুরছে। সবশেষে আবার সেই পরমাণু প্রশ্ন। আইজেনহাওয়ার ছোট্ট একটি মন্তব্য করে কনফারেন্স শেষ করলেন, 'আমেরিকা নিজের অঙ্গীকার সম্পর্কে অতি সচেতন। স্বাধিকার সংরক্ষণের জন্য নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য যা করলে ভালো হয় আমরা তাই করব।' চার দিন পরেই সেনেট সাব কমিটির সামনে এয়ার চিফ অফ স্টাফ ঘোষণা করলেন, 'বার্লিন সঙ্কট যে কোনও মুহূর্তে আমাদের যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে পারে আর সে যুদ্ধ হবে নিউক্লিয়ার ওয়ার।' এই হুমকিতে রাশিয়া সরে গেল।

মোন্টানার ২৩ হাজার স্কোয়ার মাইলের একটি কৃষি খামারে, যব, গম আর ভূট্টার চারা লকলক করছে। চাঁদের আলোর ঢেউ খেলছে। প্রকৃতির সবুজ হাত মোলায়েম হয়ে আছে। কত শান্তি! এই সবুজের আড়ালে ওঁত পেতে বসে আছে দুশো মাইনিউটম্যান। ম্যান টু, ম্যান থ্রি, দু ধরনের মিসাইল। এই তিন নম্বর মানুষ ঘন্টায় ১৫ হাজার মাইল উড়তে পারে। একটি মাত্র সঙ্কেত, আধ ঘন্টারও কম সময়ে সাতশো মাইল উচ্চতার ওপর দিয়ে উড়ে, মেরু টপকে সোজা গিয়ে পড়বে সোভিয়েট রাশিয়ার লক্ষ্যবস্তুর ওপর।

ক্রমশ

আপনার মতই বাছাই-পছন্দ করে, আমাদের প্রতিটি প্লেট উঠেছে গড়ে!

সেলাম ষ্টেনলেস

আজই নিন! কারণ, ষ্টেনলেস ষ্টীল তৈরীর ব্যাপারে, আমাদের মত যত্ন কেইবা করে!

Sista's - SSP.558.86 BEN

খড়ুইয়ের গালা-পুতুল

কিন্নর রায়
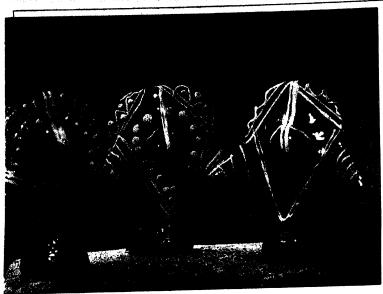
শঙ্খবণিক শিল্পীদের অসাধারণ শিল্পকীর্তি—গালার পুতুল

পুতুলের ঘর, গেরস্থালি

মেদিনীপুরের পটাশপুর থানার খড়ুইয়ে যে ৮/১০ ঘর শঙ্খবণিক শিল্পী আছেন, তাঁরা প্রচণ্ড অভাব আর অনটনের মুখোমুখি, দেয়ালে পিঠ দিয়ে লড়াই করতে করতে এখনও তৈরি করেন গালার পুতুল। খড়ুই গ্রামের এই পুতুল বিক্রি করতে আসেন ওঁরা পঁচেটের রাস-মেলায়। যে রাস-উৎসব চলে বেশ কয়েকদিন ধরে। আরও চলে যান কামহা কাঁহা মুলুকে। উড়িষ্যার বারিপদায়, রথের মেলায়। সেখানে ভারি চাহিদা এই পুতুলের।

যে ক'ঘর শঙ্খবণিক শিল্পী আছেন এখানে তাঁরা শাঁখ থেকে অত্যন্ত আদিম পদ্ধতিতে তৈরি করেন শাঁখা ও শাখের আংটি। পাথরের শিলে ঘষে ঘষে সেই আংটিকে আকার দিতে দিতে মাথার ঘাম নদী হয়ে নেমে আসে পায়ে। তবু পয়সা খুবই সামান্য। একটা আংটি, নকশা টকশা করার পরও দু-টাকা। পাইকার কেনে আরও শস্তায়। তার ফলে ঋণ এবং বঞ্চনা হয় আরও গাঢ়।

খড়্গপুর থেকে বাসে এগরা। ভাড়া ৫ টাকা ২০ পয়সা। তারপর এগরা থেকে আবার বাস। নামতে হবে খড়ুই বাজারে। ৬০ পয়সা নেবে কণ্ডাক্টার। এবং সেখান থেকে ক্রমান্বয়ে হেঁটে যাওয়া—মন্দির, মসজিদ, বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত স্কুল, ভাঙাচোরা রাজবাড়ি, গ্রাম ও বর্ষার কাদামাখা পথ পেরিয়ে।

রথের আগে এই শঙ্খবণিক পাড়ায় বৃন্দাবন চন্দের বাড়ি পুতুল তৈরির সাজ সাজ, কাজ কারবার। উইঢিবি ভেঙে এনে, তা ভাঙা হাঁড়ি বা কড়ার ভেতর ফেলে ভিজিয়ে দেয়া হয় জলে। ২/৩ বার জল বদলে বদলে নরম করা হয় মাটি। লালচে মাটি থেকে চটকে চটকে কারিগর বের করে আনেন কাঁকর। স্থানীয় মানুষজনের ভাষায় যার নাম খাঁচি। তারপর সেই নরম মাটি আঙুলের কারিকুরি আর শিল্পীর মস্তিষ্কের বিন্যাসে হয়ে ওঠে পুতুল, হাতি, ঘোড়া, হরিণ, কুকুর, জগন্নাথ-বলরাম, সুভদ্রা, আংঠা গোপাল (নাড়ু গোপাল), গণেশ, ঘোড়ার পিঠে সওয়ার—এইসব। প্রত্যেকটা পুতুল আকার এবং গঠন বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে একেবারে পুরোপুরি ফোক ফর্মের। স্থানীয় শিল্পের কারুকৃতির ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। যা আপন চেহারায় সকলের থেকে স্বতন্ত্রও বটে।

তিন আঙুল চার আঙুল উচ্চতা থেকে শুরু করে এই সব পুতুলেরা হয়ে ওঠে বড় জোর এক বিঘৎ মাপের। নইলে রং করতে অসুবিধে—এমন স্বীকারোক্তি জনৈক শিল্পীর। তাঁর মুখ থেকেই জানা যায় পঁচেটের রাজবাড়িতে শীতে যে রাসের মেলা, তাতে বিক্রি হয় যতটা, তার থেকে অনেক বেশি বিক্রি বারিপদার রথে। সোজা রথের দিন থেকে ২২ দিনের মেলা। পেটি বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া পুতুল চেঁছেমুছে কিনে নিয়ে যান মানুষজন। টিনের ট্রাঙ্ক ভর্তি মাল যায় ট্রেনে। তাছাড়া স্থানীয় মেলায়, এগরা, পটাশপুরে দুর্গাপুজোর সময় কিছু টুকটাক বিক্রি —সে তেমন কিছু নয়। পৌষ সংক্রান্তিতে সরশঙ্কার মেলায়ও থেকে যায় কিছু খেলনা-চাহিদা।

উইঢিপির মাটিতে তৈরি কাঁচা পুতুল, খেলনা রোদে শুকিয়ে পুড়িয়ে নেওয়া হয় ঢিমে আঁচে। কাঠ জ্বালিয়ে ভাত রান্নার পর যে কাঠকয়লা, তার ওপর রাখা রোদে শুকনো পুতুল। তার ওপর ছাই। তার ওপর আবার পুতুল। আর এর ওপরে আগুনের ঢাকা। এভাবে শক্ত করা হয় খেলনার শরীর।

যাঁরা তৈরি করেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি মাটি থেকে ঘোড়া গড়তে সময় লাগে ১০ মিনিট, গণেশ তৈরি করতে ১৫ মিনিট। মেয়েরা, বাচ্চারা, তিন আঙুল, চার আঙুল উচ্চতার ছোট পুতুল তৈরি করে। এর শরীরে, গঠনে, কোথাও তেমন কোনো জটিলতা নেই। বড় পুতুল (যা এক বিগত মাপ পর্যন্তই হয়) গড়েন পাকা পুরুষ কারিগর। বড় পুতুল রঙ করার দায়িত্বও তাঁদের।

রং ও বাহার

মাটির পুতুল আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে ফেলার পর তার ওপর ফুটিয়ে তোলা হয় রঙিন কারুচিত্র। কাঁচা বাঁশের ছোট টুকরো দিয়ে তৈরি হয় একরকম হ্যান্ডেল যা দিয়ে পুতুল ধরে আগুনে গরম করা হয়। স্থানীয় ভাষায় তার নাম কামড়া। রঙিন গালা গরম করে করে লাগিয়ে দেওয়া হয় তার গায়ে প্রলেপ হিসেবে। পাতলা আস্তরে রঙিন হয়ে ওঠে খেলনা পুতুল। লাল, হলুদ, সবুজ—মূলত এই হচ্ছে ব্যবহারের রঙ। গালার খণ্ডও আসে এই রঙের। ইদানীং কালো গালার ব্যবহার বাড়ছে। কারণ কালো গালা সস্তা। আগে কালো শুধুমাত্র ব্যবহার করা হত পুতুলের পেডেস্টাল রঙ করতে।

বৃন্দাবন চন্দের পরিবারের সবাই এই কাজ করেন। তাল পাতা, নারকেল পাতার পেটিতে ন্যাকড়া জড়ানো অবস্থায় রাখা থাকে পুতুল। খরিদ্দার এলে মেলে ধরা হয় তাদের সামনে।

রূপায়ণের পথে ক্ষুদে শিল্পীর রঙিন কল্পনা

ইদানীং দাম ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী। ৮/১০ টাকা সেরের গালা দাঁড়িয়েছে ১০০ টাকা কিলোতে। সেই অনুযায়ী পুতুলের দাম পাচ্ছেন না কারিগররা ফলে অভাব, নিত্য অনটন। একটা পুতুল আট আনা বারো আনা থেকে বড়জোর সাড়ে তিন/চার টাকা। কত আর বাড়ানো যায় দাম।

এঁদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারা যায় ২ বছর পর্যন্ত ঠিক থাকে রং। তারপর তার জেল্লা ক্রমেই কমে আসে।

পুতুলের গায়ে গরম রঙিন গালা রঙ হয়ে বসে যাওয়ার পর, তার ওপর সরু সরু গালার সুতোয় বুনে দেওয়া হয় আশ্চর্য সব নকশা। কারিগর বড় নিশ্চিন্তে করে যান এ কারুকার্য। আগুনের তাতে তৈরি করে নেওয়া এই গালার সুতোর নাম গুনা। তার ডিজাইন অলঙ্কার হয়ে ফুটে ওঠে খেলনা, পুতুলের সমস্ত শরীরে। যে বাঁশের ফাঁপা চোঙায় ফুঁ দিয়ে দিয়ে উসকে তোলা হয় কাঠকয়লার ঢিমে আগুন, যা গরম করবে গালা, সেই চোঙার নাম স্থানীয় ভাষায় লোন্সি।

আশ্চর্য নকশার পুতুল

কেমন আছেন কারিগরেরা

খড়ুইয়ের পুতুল-কারিগররা দুঃখের বারোমাস্যায় কাটিয়ে দিচ্ছেন আবহমান। হাতের কাজে পেট ভরে না। যে সামান্য জমি, তার ফসলে কুলোয় না। অসুখ, অপুষ্টি, অনাহার এখানে আবহমান, অবশ্যম্ভাবী।

বৃন্দাবন চন্দরা যে চার ভাই শাঁখা এবং পুতুলের কাজ করেন, তাঁদের সন্তান-সন্ততি অনেকগুলি। বউরা সকলেই প্রায় রক্তহীনতার স্বীকার বছর-বিয়োনি অভ্যাসের দরুন ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যও পুঁয়ে পাওয়া, এঁড়ে লাগার মতো। বড় পেট। সরু হাত পা। পরিবার-পরিকল্পনার পঞ্চরঙ্গী প্রোগ্রাম এ ভূখণ্ডকে ছুঁতে পারে না।

এঁদের মূল খাবার ভাত এবং ভুজা (মুড়ি)। বৃন্দাবন চন্দদের মা মোক্ষদা দেবী এখনও বেঁচে। বয়েস বলতে গিয়ে পাড়ায় কোনো বৃক্ষের পতন বা নদীতে বান আসার হিসেব দেন। মস্তিষ্কে কিছু টালমাটাল ভাব থাকলেও কথা ও স্মৃতির বিন্যাসে কখনও কখনও হয়ে ওঠেন কোনো প্রাচীন কথকঠাকুর।

মৃত্যুই কি এই কারুকার্যময় শিল্পের পরিণতি ?

তিনি ভগবানের নামে নাম রেখেছেন তাঁর নাতিদের। সুধাকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, —আরও কি কি সব। মৃত্যুসময় ভগবানের নাম মনে না এলেও, নাতিদের নাম ধরে ডাকা যাবে—এই তাঁর পরিকল্পনা।

একসময় মোক্ষদা দেবী ও তাঁর স্বামী তৈরি করতেন পুতুল। রঙ দিতেন। এখন আর পেরে ওঠেন না। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ। মাঝে মাঝে স্মৃতিতে ভেসে ওঠা মৃত পুত্র, নাতি, কন্যা তাঁর সামনে হাজির হয়। ফলে ফোঁপানি, কান্না এবং নিজের ভাগ্যকে দোষী করা।

মাকে ঘরের কাজে সাহায্য করার জন্যে স্কুল ছেড়ে দিতে হয় শেফালিকে। ক্লাস ফোরের পর আর এগোনো যায়নি। আবার ভাই হবে, মা পারছে না। তাই শেফালি আর স্কুলে যাবে না। শেফালি ভাল রান্না করে। তার পাত্র খোঁজা চলছে।

ক্লাস সেভেনের ঝুমরি (স্কুলের নাম ঝুমকা) ভাই সামলায়। পুতুল তৈরি করে। গালার রঙিন বিন্যাসে ফুটিয়ে তোলে আশ্চর্য সব নকশা। তার ফরসা গালে অনাহার, অপুষ্টি লেগে থাকে। জীবন, জন্মমৃত্যু, যৌনতা—এখানে অনেক সহজভাবে জীবনের সঙ্গে মিশে আছে। খুব ছোট বয়েসেই ওরা খুলে ফেলে অনেক রহস্যের জট, গেরো।

সারা দিনমান কাটিয়ে, সন্ধ্যের আগে পুতুল-পাড়া থেকে ফিরে আসবার পথে শেফালি নামে যে বালিকা আমাদের বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত এগিয়ে দেয়, তার কথা থেকেও জানতে পারা যায় এখানকার নিত্য-অভাব চিত্র। কোনো অনুদান, সাহায্য না পেয়ে দিনের পর দিন চেষ্টা করে চলেছেন এই কারিগরেরা। একি বৃত্তির প্রতি সামন্ততান্ত্রিক আনুগত্য ? না কি ভালোবেসে ফেলা নিজের অতীতকে ?

যতই যা হোক না কেন, গালার পুতুলের শিল্পীরা কিন্তু ক্রমশই ক্ষয়িষ্ণু স্পিসিসে পরিণত হচ্ছেন। হয়ত আগামী দশ, বিশ বছরের মধ্যে অর্থনৈতিক সঙ্কট তাঁদের পরিণত করবে মিউজিয়াম-পিস, গবেষণার সামগ্রীতে।

ছবি : দীপক ভট্টাচার্য

ইলেকট্রনিক্‌স : কর্ণাটকে

সমরজিৎ কর

ই. সি. জি প্রস্তুতি

জেরক্স যন্ত্রের জন্য ড্রামের উপর সেলেনিয়ামের আস্তরণ লাগানো হচ্ছে

রঙীন টেলিভিশনের যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা : বি পি এল ইণ্ডিয়া

॥ দুই ॥

গত দুই দশকে ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ঘটেছে অভূতপূর্ব বিবর্তন। বিপ্লবও কি নয়?

বিবর্তন সংখ্যাগত। ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জাম যে কত রকম হতে পারে তা যেন কল্পনাও করা যায় না। সেই সঙ্গে তাদের আয়তন হচ্ছে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর। বাড়ছে দ্রুত কাজ করার ক্ষমতা। একই সঙ্গে নানারকম কাজ। আগের তুলনায় তাদের দামও কমছে। আরো কমবে।

আর বিপ্লব? ইলেকট্রনিক্সের জগতে অকল্পনীয় এক বিপ্লব ঘটিয়েছে 'ইনটিগ্রেটেড মাইক্রোইলেকট্রনিক সারকিট'। তারই কল্যাণে এখন তৈরী হচ্ছে কতরকম যন্ত্রপাতি। মানুষের চাঁদের বুকে পদার্পণ, মহাকাশযানের সাহায্যে গ্রহানুসন্ধান, সুদূর নক্ষত্রজগৎ-এর উপর পর্যবেক্ষণ থেকে শুরু করে বিমান চালনা, শিল্পোৎপাদনে উৎকর্ষ সাধন, মুদ্রণ শিল্প, ক্যামেরা, খুদে হাতঘড়ি, চিকিৎসার যন্ত্রপাতি—সর্বত্রই এখন কমপিউটার এবং মাইক্রোপ্রোসেসর। কমপিউটার এবং মাইক্রোপ্রোসেসর মানেই ইনটিগ্রেটেড মাইক্রোইলেকট্রনিক সারকিটের ব্যবহার। বলা বাহুল্য, অতি আধুনিক এই প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং কুশলীদের ভূমিকা যে যথেষ্ট প্রশংসনীয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। উদাহরণ হিসেবে এখানে বাঙ্গালোরের দুটি প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করলাম—ব্রিটিশ ফিজিকাল ল্যাবরেটারি-ইণ্ডিয়া লিমিটেড এবং ভিপরো (Wipro)।

ইউ· কে-র ব্রিটিশ ফিজিকাল ল্যাবরেটারির সহযোগিতায় ১৯৬৩ সালে মুষ্টিমেয় কিছু কিছু ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কাজে হাত দিয়েছিল ব্রিটিশ ফিজিকাল ল্যাবরেটারি– ইনডিয়া লিঃ। প্রতিষ্ঠাতা টি· পি· গোপালন নামবিয়ার। তাদের প্রথম কারখানাটি বসে পালঘাট-এ। ১৯৬৫ সালে সেখানে প্রথম বাণিজ্যিক উৎপাদন। উৎপাদন বলতে মুখ্যত সূক্ষ্ম পরিমাপে সক্ষম নিশ্ছিদ্র আধারে তৈরী বিভিন্ন রকমের 'প্যানে[illegible] [illegible]টার'।

"দেশের প্রতির[illegible] [illegible]ভাগের চাহিদা মেটানর জন্যই গোড়া[illegible] প্যানেল মিটার নিয়েই আমরা কাজ শুরু ক[illegible]ছিলাম। এ সব যন্ত্রপাতির জন্যে বিদেশের উপরই নির্ভর করতে হত বেশি। প্রতিরক্ষা দপ্তরকে সরবরাহের জন্যে আমরা কাজ শুরু করি। বলতে পারেন এ ব্যাপারে এখনো আমরা প্রধান সরবরাহকারী।" বাঙ্গালোরে এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বললেন 'বি পি এল'-এর জনৈক কুশলী।

১৯৬৫-র পর এই প্রতিষ্ঠান দেশের চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে গড়ে তুললেন নিজস্ব উদ্ভাবন ব্যবস্থা। সেইসঙ্গে গবেষণাও চলল। আধুনিক ইলেকট্রনিক্স এবং তার সম্ভাব্য অগ্রগতির কথা ভেবে দ্রুত প্রসারণের দিকে হাত দিলেন তাঁরা। এ কাজে যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দরকার সেটাও তাঁরা বঝতে পেরেছিলেন। তাই কালবিলম্ব না করে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে তাঁরা হাত বাড়ালেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নেতৃস্থানীয় ইলেকট্রন প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্যে। লক্ষ্য প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং সহযোগিতা আহরণ। এ কাজে যাঁদের তাঁরা সাহায্য নিলেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছে জাপানের ফুকুদা, পশ্চিম জার্মানির সীমেন্স, ইউ·কে-র প্লেসেন্সার, জাপানের নিহন কোহ্‌দেন এবং সানিও। তাঁদের সহযোগিতায় এবং ভারতীয় বিজ্ঞানী, এঞ্জিনিয়ার এবং কুশলীদের পারদর্শিতায় এই প্রতিষ্ঠান মাত্র দশ বছরের মধ্যেই এ দেশে বিশিষ্ট এক ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতির শিল্পোদ্যোগ হিসাবে চিহ্নিত হল।

এখন শুধু আর 'বি পি এল' নয়, 'বি পি এল গোষ্ঠী'। এই গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে ব্রিটিশ ফিজিকাল ল্যাবোরেটারিজ-ইনডিয়া লিমিটেড, বি পি এল সিসটেমস্ অ্যাণ্ড প্রজেক্টস লিমিটেড, বি পি এল ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড, ইলেকট্রনিক রিসার্চ প্রাইভেট লিমিটেড এবং বি পি এল ইনভেস্টমেণ্টস অ্যাণ্ড ফিনান্স কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৭৫ সাল থেকে শুরু হয়েছে এই গোষ্ঠীর কাজ। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং উৎপাদনের ব্যাপারে যথেষ্ট সরকারী বাধানিষেধ অতিক্রম করে দেশের ইলেকট্রনিক্স শিল্পকে প্রসারিত করে চলেছেন এই গোষ্ঠী—পালঘাট এবং বাঙ্গালোরে।

জনৈক কুশলী বললেন, আমাদের উৎপাদনের তালিকা ক্রমেই দীর্ঘতর হচ্ছে। এবং শুনে খুশি হবেন, কয়েকটি ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান ভারতে প্রথম। যেমন ধরুন প্যানেল মিটারস। এ ধরনের যন্ত্রপাতির প্রধান গ্রাহক প্রতিরক্ষা দপ্তর। অত্যন্ত উঁচুমানের এ সব যন্ত্রপাতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান এখনো অগ্রণীর ভূমিকা নিয়ে রেখেছে। এদেশে ইনটিগ্রেটেড সারকিট (IC) যুক্ত ৪০০ কিলোভোল্ট অ্যাম্পেয়ার-এর পাওয়ার লাইন কমিউনিকেশন সিস্টেম এই প্রতিষ্ঠানই প্রথম উৎপাদন করে। ভারতের প্রায় সব কটি বিদ্যুৎ-পর্ষদই এখন ব্যবহার করছেন আমাদের তৈরী এই সিস্টেম। আরো অনেক ব্যাপারেই প্রথম আমরা।

বি পি এল অনেক ব্যাপারেই প্রথম। এ দেশে এই প্রতিষ্ঠানটিই প্রথম তৈরী করেন মাইক্রোপ্রোসেসর ভিত্তিক ইলেকট্রনিক প্রাইভেট অটোমেটিক একসচেঞ্জ—ইলেকট্রনিক PAX বা EPAX.। এই ধরনের এক্সচেঞ্জের সাহায্যে সারা দেশে কণ্ঠস্বর এবং প্রয়োজনীয় ডেটা আদানপ্রদান করছেন ভারতের তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য এ দেশে এই প্রতিষ্ঠানই সর্বপ্রথম মাইক্রোপ্রোসেসর চালিত প্রাইভেট অটোমেটিক ব্রাঞ্চ এক্সচেঞ্জ তৈরি করেছেন। এ ব্যাপারে এ দেশে আরো অনেকে উদ্যোগী হয়েছেন, সন্দেহ নেই। তবে তাঁদের সবারই উদ্যোগ এখনো পর্যন্ত নক্শার মধ্যেই থেমে গেছে, বাণিজ্যিক উৎপাদন বলতে যা বোঝায় এখনো তা শুরু করেননি। বি পি এল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বসিয়েছেন এ পর্যন্ত বড় আকারে মোট ১০০টি এক্সচেঞ্জ—P20.। এ ধরনের এক একটি এক্সচেঞ্জ মোট ২৩৭টি আভ্যন্তরিক লাইন এবং ৬৪টি ট্রাঙ্ক লাইন একই সঙ্গে চালু রাখতে পারে। এ ছাড়াও কয়েকটি ছোট এক্সচেঞ্জ বসিয়েছেন—P3.। এগুলি একই

অডিও অ্যাসেমব্লি লাইন : বি পি এল ইণ্ডিয়া

সঙ্গে ২৯টি আভ্যন্তরিক লাইন এবং ১০টি ট্রাঙ্ক লাইন সচল রাখতে সক্ষম।

এক সময় ইউ· কে-র গেস্টেনার কোম্পানির কাছ থেকে কিনতে হত ইলেকট্রনিক স্টেনসিল কাটার যন্ত্র। সে যন্ত্র এখন বি পি এল-ই তৈরী করছে এদেশে। এ ক্ষেত্রেও এই প্রতিষ্ঠান প্রথম এবং এখনো পর্যন্ত এ দেশের একমাত্র উৎপাদনকারী। মূল্যবান একটি সংযোজন 'পোলারাইজড্ টেলিগ্রাফ রিলে' ব্যবস্থা, টেলিফোন এবং টেলেক্স একসচেঞ্জের ক্ষেত্রে যা অপরিহার্য। একমাত্র 'বি পি এল'ই দেশীয় কুশলী এবং এঞ্জিনিয়ারদের সাহায্যে এই রিলে ব্যবস্থা উৎপাদন করছেন। চাহিদাও প্রচুর। গুরুত্বপূর্ণ এই যন্ত্রের জন্যে কয়েক বছর আগেও আমাদের বিদেশের উপর নির্ভর করতে হত—বিশেষ করে ভারতীয় টেলিফোন শিল্পকে তো বটেই। এখন ভারতীয় টেলিফোন শিল্পই এ সব সামগ্রীর একমাত্র ক্রেতা।

গত কয়েক বছরে অফিস, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী এবং বেসরকারী কার্যালয়, পাঠাগার, এমন কি সাধারণ মানুষের প্রয়োজনেও দলিল বা লেখাপত্র কপি করার যন্ত্রের চল বেড়েছে প্রচুর। আরো বাড়ছে। চলতি কথায় এই যন্ত্রকে বলা হয় ফোটোকপিং বা জেরক্স যন্ত্র। গোড়ায় এ যন্ত্রে ব্যবহার করা হত রাসায়নিক প্রলেপ মাখান বিশেষ ধরনের কাগজ। এখন সাধারণ কাগজই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই যন্ত্রের প্রাণ বলতে বোঝায় এক ধরনের 'ড্রাম', যার গায়ে থাকে সেলেনিয়ামের প্রলেপ। প্রযুক্তির দিক থেকে এই প্রলেপ লাগানর কাজটি খুবই জটিল। এ দেশের অন্যান্য কোম্পানি তাঁদের 'প্লেন পেপার কপিয়ার'-এর জন্যে এখনো এই সেলেনিয়াম ড্রাম আমদানি করে থাকে বিদেশ থেকে। একমাত্র ব্যতিক্রম 'বি পি এল'। ভারতে তাঁরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাঁরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সামগ্রীটি এ দেশেই উৎপাদন করছেন। উৎকর্ষের দিক দিয়ে যা বিদেশের নামকরা উৎপাদকদের সমতুল্য।

চিকিৎসার প্রয়োজনীয় আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রেও দেশকে আত্মনির্ভর করার কাজে এগিয়ে এসেছে বি পি এল। হৃদ্ এবং রক্তসংবহনজনিত রোগ নির্ণয় এবং ওই ধরনের রোগীর বিভিন্ন উপসর্গ সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ এবং তাদের বিশ্লেষণের জন্যে তাঁদের উদ্যোগে এখন এদেশেই তৈরী হচ্ছে উচ্চ কর্মক্ষম ইলেক্ট্রোকারডিওগ্রাফ, ডেফাইব্রিলেটার, মনিটার এবং অসুস্থ ব্যক্তির পর্যায়ক্রমিক অবস্থার উপর নজর রাখার যন্ত্রপাতি।

প্রশ্ন : টেলিভিশন এবং ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডারের ব্যাপারে কি করছেন আপনারা?

উত্তর : এ ক্ষেত্রে বি পি এল একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট টি ভি তো অনেক দিন ধরেই আমরা উৎপাদন করছি। এ ছাড়া ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার, স্টিরিও ক্যাসেট রেকর্ডার, প্লেয়ার এ সবও রয়েছে। জাপানের সানিও সংস্থার সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠান যে রঙীন টেলিভিশন উৎপাদন করছে এ দেশে তার স্থানও এখন পুরোভাগে। এ দেশে 'ফ্ল্যাট স্কোয়ার টিউব' রঙীন টি ভি আমরাই প্রথম উৎপাদন করছি।

প্রযুক্তিগত উদ্যোগ এবং উপযুক্ত গবেষণার অভাবে ভারতে এখনো বহু গুরুত্বপূর্ণ ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ তৈরি করা সম্ভবপর হয়নি। বিদেশ যদি এ-সব রপ্তানি বন্ধ করে, সে ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিকস্ শিল্পই বন্ধ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে এখুনি তৎপর হওয়া দরকার।

শুধু উৎপাদনই নয়, উদ্ভাবনার দিকেও যথেষ্ট নজর দিয়েছেন বি পি এল। তাঁদের প্রতি তিন জন কর্মীর একজনই এখন গ্র্যাজুয়েট এঞ্জিনিয়ার। বিশ্ববিদ্যালয় এবং আই আই টি-র সাহায্যে উদ্ভাবনা এবং গবেষণারও ব্যবস্থা করেছেন তাঁরা। প্লাস্টিকের সাজসরঞ্জাম, প্রিন্টেড সারকিট বোর্ড (PCB) থেকে শুরু করে আরও নানা রকম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ নিজেদের বিশেষজ্ঞদের চেষ্টাতেই তাঁরা এখন উৎপাদন করছেন। প্লাস্টিক ক্যাবিনেট, প্লাস্টিক লাইনিং এবং বিভিন্ন প্যানেল তৈরির জন্যে তাঁরা বাঙ্গালোরে একটি স্বতন্ত্র কারখানাই তৈরি করেছেন। অফিস অটোমেশনের জন্যে তৈরি করছেন মাইক্রোকমপিউটার, ওয়ার্ড প্রসেসর, পুশ বাটন টেলিফোন প্রভৃতি। বলা চলে, গত দশ বছরে পেশাগত এবং সাধারণের ব্যবহার্য ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি উৎপাদনের ব্যাপারে বি পি এল ভারতে অনেক ক্ষেত্রেই এখন পথিকৃৎ। গুণগত দিক থেকে তাঁদের উৎপাদন আন্তর্জাতিক মানের সমতুল্য যদি বলা হয়, হয়ত তা অত্যুক্তি হবে না।

বাঙ্গালোরের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান 'উইপরো'র কমপিউটার ডিভিশনের অপারেশনস কনট্রোলার ডঃ শ্রীধর মিট্টারের সঙ্গে পরিচয় হল। দেখলাম, কমপিউটার শিল্পের ব্যাপারে ডঃ মিট্টার খুবই আশাবাদী। তিনি বললেন, শুধু যন্ত্রপাতিই নয়, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির মত ভারতেও কাজের ধারা দ্রুত পালটাচ্ছে, মিঃ কর। বলতে পারেন, এখন আমরা কমপিউটার যুগে বাস করছি। আর ইলেকট্রনিকসের প্রায় যাবতীয় যন্ত্র বা সরঞ্জাম মানেই তো কমপিউটার। আমাদের লক্ষ্য প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনে পৃথিবীর অন্যত্র যে ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির চল হয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব এ দেশেও তা ব্যাপক ভাবে চালু করা। এর জন্যে আমাদের গবেষণা বিভাগটি যতটা সম্ভব 'আপ টু ডেট' রাখার চেষ্টা করছি আমরা।

মাইক্রোকমপিউটারের ক্ষেত্রে উইপরোর ভূমিকা এখন অগ্রণী। বলা বাহুল্য, এ ধরনের কমপিউটারের চল দিন দিন বাড়ছে। ব্যাঙ্কের

রঙীন টেলিভিশনের অ্যাসেমব্লি লাইন : বি পি এল ইণ্ডিয়া
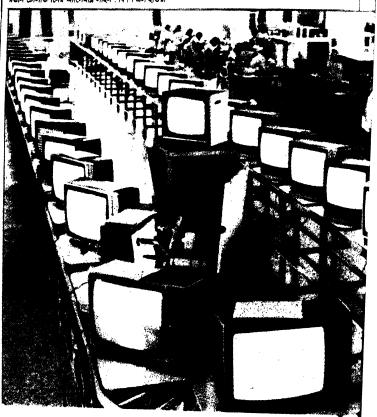
কথাই ধরুন। আগের তুলনায় প্রতিটি ব্যাঙ্কের গ্রাহক সংখ্যা যেমন বেড়েছে, সেই সঙ্গে বেড়েছে ব্যাঙ্কের কাজকর্মেও জটিলতা। কত রকমেরই না অ্যাকাউন্ট? সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট, ওভার ড্র্যাফ্‌ট অ্যাকাউন্ট। সুদের ক্ষেত্রে হয়েছে রকম ভেদ। একই ব্যাঙ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রে কেউ টাকা রাখলেন। এক কেন্দ্রের টাকা অপর কেন্দ্রে স্থানান্তর করতে হবে। ডেবিট ব্যালান্স, ক্রেডিট ব্যালান্স, গ্রাহকের অ্যাকাউন্টের নিয়মিত হিসাব রাখা—কতরকমের কাজ। প্রচলিত পদ্ধতিতে এত কাজ যেমন সময় সাপেক্ষ, তেমনি ভুলচুক হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে বেশী। তাই ইদানীং এই সব কাজের জন্যে কমপিউটারের চল হচ্ছে। বিদেশে অনেক আগেই হয়েছে। এখন ভারতেও হচ্ছে। কেউ কেউ ভাবেন, কমপিউটার বসলে কর্মসংস্থান কমবে, হয়ত বেকারের সংখ্যা বাড়বে। কিন্তু সে কথা যে সত্য নয়, পৃথিবীর বহু দেশেই এখন তা প্রমাণিত। বরং এখন দেখা যাচ্ছে কমপিউটারের সাহায্যে ব্যাঙ্কের অনেক জটিল হিসেবনিকেশ এবং কাগজপত্র রাখার কাজ ত্রুটিহীন ভাবে দ্রুত সম্পন্ন করা যায়। অনেক কম সময়ে এবং কম কায়িক পরিশ্রমে। এতে গ্রাহকরা হন লাভবান। তাতে ব্যবসাও বাড়ে। এবং যেটা সব চেয়ে বড় কথা, কমপিউটার ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর কর্মীদের কাজের ধারাও পাল্টাবে অনেকটা। উন্মুক্ত হবে নতুন ধরনের কাজকর্ম।

'এমচেক' প্রভৃতির জন্য অ্যাসেম্বলি লাইন

অতএব বেকার বাড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এই সমস্যার মোকাবিলায় যেটা দরকার সেটা পরিচালকদের অর্থবহ পরিকল্পনা, দূরদর্শিতা এবং পরিচালনা। সেই সঙ্গে তাঁদের সৃজনশীল মানসিকতারও পরিচয় দিতে হবে।

আশার কথা, "উইপ্রো" এখন যে ধরনের মাইক্রোকমপিউটার উৎপাদনে হাত দিয়েছেন ব্যাঙ্কিং-এর ব্যাপারে তাদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যেমন ধরুন তাঁদের BANKER-II কমপিউটার। বিশেষ এই কমপিউটারের সাহায্যে স্বল্প সময়ে কোন গ্রাহকের বিভিন্ন ধরনের অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত নানা রকম তথ্য সংগ্রহ করা চলে।

তাঁদের অনুরূপ আর একটি কমপিউটরের নাম WIBAR বৈদেশিক মুদ্রার হিসেব, একই ব্যাঙ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে লেনদেন, তাৎক্ষণিকভাবে আমানতের হিসেব, বিনিময় মূল্য, কমিশন, প্রভৃতি নির্ণয়ের জন্যে তাঁদের তৈরি WIFEX কমপিউটারের কাজকর্ম ইতিমধ্যে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছে। WIPROZ-650 অত্যন্ত ক্ষমতা সম্পন্ন কমপিউটার। বৈজ্ঞানিক এবং বাণিজ্যিক তথ্যাবলী সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের এই কমপিউটারের এখন খুবই নাম। ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসারও তৈরী করছেন তাঁরা। ঘরবাড়ি, সেতু, খেলার মাঠ, নানা রকম যন্ত্রপাতির নক্‌শা তৈরির জন্যেও কমপিউটারের দরকার হয়। তাই এ ধরনের কমপিউটার উৎপাদনেও হাত দিয়েছেন 'উইপ্রো'র প্রযুক্তিবিদ্‌ এবং কুশলীরা।

যে কথা আগেই বলেছি, ইলেকট্রনিক্স শিল্পে ভারত যে দ্রুত এগিয়ে এসেছে বাঙ্গালোরের 'বি পি এল', 'বেল' এবং 'উইপ্রো' তার দৃষ্টান্ত। কিন্তু তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রী দেখার পর যে প্রশ্ন প্রথম জাগে তা হল: এ দেশে ইলেকট্রনিক্স শিল্প দ্রুত সম্প্রসারিত হলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এ দেশ পুরোপুরি পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশের উপর নির্ভর করে। যেমন, ধরুন 'বি পি এল'-এর রঙীন টি ভি। এই টি ভি গুণগত মানের দিক থেকে খুবই উন্নত সন্দেহ নেই। দাম দশ হাজার টাকার মত। শুনলাম, এই টি ভির অন্যান্য অনেক সরঞ্জাম ভারতেই তৈরী হয়। কিন্তু তার আসল প্রাণ, টিউব, তা সরবরাহ করেন জাপানের 'সানিও' সংস্থা। আর এই টিউবটিরই দাম প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। অর্থাৎ এই টি ভির জন্যে ভারতকে বেশ মোটা অঙ্কের বিদেশী মুদ্রা খরচ করতে হয়, সেই সঙ্গে থাকতে হয় পরনির্ভর হয়ে। ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতির প্রাণ 'চিপ' বা সিলিকনের উপর তৈরি মাইক্রোসারকিট। গত দশ বছরে 'চিপ' প্রযুক্তির ব্যাপারে প্রচণ্ড বিপ্লব ঘটে গেছে। তৈরী হয়েছে নানা রকম ট্রানজিস্টার; যেমন, মেটাল অকসাইড সেমি-কনডাকটার ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিস্টার (MOSFET), তৈরি হয়েছে ট্রানজিস্টার-ট্রানজিস্টারলজিক (TTL), চার্জ-কাপল্‌ ডিভাইস (CCD) প্রভৃতি। সাম্প্রতিক প্রজন্মের কমপিউটার, মাইক্রোপ্রোসেসার প্রভৃতি যাদের ভূমিকা প্রধান। ভারতে এসব তৈরি করা এখনো সম্ভব হয়নি। প্রযুক্তিগত উদ্যোগ এবং উপযুক্ত গবেষণার অভাবে। বিদেশ যদি এ-সব রপ্তানি বন্ধ করে, সে ক্ষেত্রে আমাদের ইলেকট্রনিক্স শিল্পই বন্ধ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে এখুনি তৎপর হওয়া দরকার। নইলে, ইলেকট্রনিক্স শিল্পে ভারতকে সবসময়ই যে পিছিয়ে থাকতে হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রেমা

গর্ভধারিণী

সমরেশ মজুমদার

শীত এখন তুঙ্গে। পায়ের তলায় বরফের শরীর কাঠ। আস্তানার ছাদে তো বটেই, মাঝে মাঝে সিঁড়ির প্রথম ধাপেও বরফ উঠে আসে। ঝড় বা বৃষ্টির দেখা নেই অনেকদিন। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া যখন বয়ে যায় তখন বরফের শরীরে আঁচড় পড়ে।

কিন্তু একটা পবিত্র রোদ তাপল্যাঙের ওপর মশারি টানিয়ে রাখে। শিশুরা সেই রোদে তুষার-বল নিয়ে খেলা করে, অশক্ত মানুষেরা আর একটা বছরের আশা নিয়ে সেই রোদে শরীর ডুবিয়ে বসে থাকে চুপচাপ। এই সব মানুষের অঙ্গে শীতবস্ত্র বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে কোন তুলনাই চলে না য়ুরোপ আমেরিকার নির্বান্ধব কোন গ্রাম্য মানুষেরও। অথচ এরা বেশ আছে, অন্তত শীতের কষ্ট প্রবল একথা কেউ মুখ ফুটে বোঝায় না।

আনন্দ সুদীপ এবং জয়িতা এতদিনে একটা নিয়মের মধ্যে আনতে পেরেছে তাপল্যাঙের মানুষকে। আরাম পেতে গেলে পরিশ্রম করতে হবে। ব্যক্তিগত সুখের জন্যে যে একক পরিশ্রম তা কখনই ফলপ্রসূ হতে পারেনা এ সত্য তারা ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করেছে। যৌথ গৃহের সংখ্যা এখন বেড়েছে। মেয়ে শিশু এবং বয়স্ক মানুষেরা অনেক নিরাপদ বোধ করছে এখন। এমন কি সবল পুরুষেরা অনেক বেশী সহজ। শীতের সময় যখন একটা দিন কাটাতেই আর একটা দিনের শীতল নিঃশ্বাস গায়ে কনকনানি তোলে তখন এই যৌথগৃহে পরিবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা। বরফ গললে যদি প্রাণ চায় তাহলে যে যার গৃহে ফিরে যাবে। নিজস্ব সংসারের টান যে বড় গভীরে তা বোঝা যায় এখন এই শীতের সময়েও মেয়েপুরুষেরা নিজেদের ঘর রোজ ঠিকঠাক করে আসে। নিজস্ব ঘরের এই বাঁধন ছিন্ন করতে পারলে ব্যক্তিগত স্বার্থের গণ্ডীটাকে দূর করা যেত। কিন্তু আনন্দ প্রথম থেকেই এত বড় আঘাতটা করতে চাইল না। এক শীতে অনেকটাই হল, আর এক শীত এলে এই তলানিটুকু দূর হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু এটা ঠিক মানুষগুলো এর মধ্যে বুঝতে পেরেছে এভাবে কেউ জন্মাবধি নিশ্চিন্তে থাকেনি। কারো বাচ্চার অসুখ হলে অন্যের মা যে স্নেহের হাত বাড়ায়, সকাল সন্ধ্যে পেট ভরাবার খাবার আসে যৌথ রান্না হয়ে, প্রবল শীতেও গায়ে উত্তাপ লাগে—এ তো স্বপ্নের মতো ব্যাপার কারো কারো কাছে।

কিন্তু সম্পন্ন নয় মানুষের সঙ্গে অন্তত দশটি পরিবার মেলেনি। তারা তুষার ঝড়ের সময় থেকেই আলাদা, মজবুত ঘরের দরজা খুলে যৌথগৃহের জোয়ারে গা মেশায়নি। এদের সবাই যে খুব আরামে আছে তা নয়, কিন্তু নিজেদের আলাদা দেখাবার একটা অহঙ্কারে ভুগছে। নিজস্ব মুরগী, ছাগল এবং সঞ্চিত শস্য নিয়ে কোনরকমে থেকে যাওয়া। এদের বিরক্ত করতে চায়নি আনন্দ। কিন্তু গ্রামের মানুষ এর মধ্যেই টের পেয়ে গেছে ওরা আলাদা। বহু যুগ একসঙ্গে থেকেও এতদিন এই বোধের শিকার হয়নি ওরা। এখন অর্থনৈতিক শ্রেণী বৈষম্যের ফসল হিসেবে দুটো জাত চিহ্নিত হল। সংঘাত শুরু হয়নি কিন্তু কথাবার্তায় খোঁচা দেবার প্রবণতা এসেছে। যৌথ রান্নাঘরের দায়িত্ব জয়িতার। যুবতী মেয়েদের নিয়ে সকাল থেকে তার কাজ শুরু হয়ে যায়। খচ্চরওয়ালাদের কাছ থেকে কেনা খাদ্যসামগ্রী এখন শেষের দিকে। সুদীপের টাকা যা এখনও রয়ে গেছে তা কাজে লাগানো যাচ্ছে না। এই বরফ ডিঙিয়ে খচ্চরওয়ালারা আসবে না। আজ অবধি বরফের সময় কেউ ওয়ালংচুঙ কিংবা চ্যাঙথাপুতে কখনও যাওয়ার চেষ্টা করেনি। প্রাথমিক ইতস্ততা কাটানোর পর যে যার ঘরে জমানো শস্য এনে দিয়েছে যৌথরান্নাগৃহে। যুবতী মেয়েরা এখানে বসে রান্না করে আর গল্প বানায়। জয়িতা লক্ষ করছিল অবিবাহিতা যুবতী মেয়ের সংখ্যা এখানে খুবই কম। বিবাহিতারা গল্প করে আর হাসে। আর সেই হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাদের হাসি আরও বেড়ে যায়। নিমকিত নামের যুবতীটি বলল, 'ইনামিত বলছে ওর স্বামীর চেহারাটা ঠিক কিরকম তা এখন ভুলে গেছিল ও। কাল এই ঠাণ্ডার মধ্যেও ঝরনার ধারে গিয়ে সেটা আবার জেনে এসেছে।' কথাটা শেষ হওয়া মাত্র সম্মিলিত হাসির ঝড় উঠল। ইনামিত নামের মেয়েটি একটুও লজ্জা পেল না। তার সন্তান সব সময় পিঠেই বাঁধা থাকে। জয়িতা তার দিকে অবাক হয়ে তাকাচ্ছে দেখে সে বলল, 'আমি বাবা মাঝে মাঝে চাই। যদি তোমরা বন্ধ করতে বল তাহলে ভাণ্ডারঘরেই ফিরে যাব।'

জয়িতা কোন মন্তব্য করল না। কলকাতায় থাকলে হয়তো তার জিভে

প্রতিবাদে ফুটতো। পুরুষের শরীর ছাড়া নারীর আর কিছুতেই শান্তি পাওয়া সম্ভব নয় এটা ভাবতেই তার মনে ঘৃণা ফণা তুলত। কিন্তু এই না-সুন্দর, না-সচ্ছলা মেয়েটির মুখে যে অহঙ্কারের আরাম সেটাকেই বা এখন অস্বীকার করে কি করে?

নিমকিত বলল, 'তুমি বিয়ে করবে না? অমন সুন্দর দুটো পুরুষ তোমার সঙ্গে থাকে, ওদের তো মারপিটও লাগে না। ওদের মধ্যে কার সঙ্গে তোমার চলছে?' প্রশ্নটা শেষ হওয়া মাত্র আবার হাসির ঝড় উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে মুখে রক্তের চলাফেরা টের পেল জয়িতা। সে কোনরকমে বলতে পারল, 'তোমরা যা ভাবছ তা নয়। আমরা বন্ধু।' নিমকিত বলল, 'বন্ধু! ছেলেতে মেয়েতে বন্ধুত্ব হয় কখনও শুনিনি বাবা। ওরা তোমার সঙ্গে শুতে চায় না?'

জয়িতা রাগ করতে পারল না। এদের প্রশ্নের মধ্যে সারল্য স্পষ্ট। সে নিজেকে নিচে টেনে আনল যেন, 'আমরা এই নিয়ে কখনও ভাবিনি।'

ইনামিত বলল, 'এখন তো সব সোজা হয়ে গিয়েছে। তোমাদের যে বন্ধুর মাথা খারাপ হয়েছিল মদ খেয়ে সে তো একটা জাহান পেয়ে গেছে। তাহলে থাকল শুধু বড়াসাথী। ওর মত ভাল মানুষটাকেই তুমি মায়ালু বানিয়ে নাও। মেয়ে হয়ে জন্মেছ আর পুরুষের স্বাদ নেবে না?'

জয়িতা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, 'তার জন্যে তো অনেক সময় পড়ে আছে। আগে আমরা সবাই একটু ভালভাবে বাঁচি তারপর।'

'ভালভাবে বাঁচা! তা আর এ জীবনে হবে না। তোমরা এসেছিলে বলে এখন দুবেলা খেতে পাচ্ছি।'

'কেন হবে না? সবাই মিলে কাজ করব, ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্যে যা যা প্রয়োজন তা যোগাড় করব। এবার বরফ গললেই এমন সব জিনিস তৈরী করতে হবে যা শহরে নিয়ে গেলে লোকে বেশী দাম দিয়ে কিনতে বাধ্য হবে। সেই টাকা দিয়ে জামাকাপড় খাবার ওষুধ কিনে নিয়ে আসা হবে। আমাদের সব সময় ভাবতে হবে এই গ্রামের সবাই এক পরিবারের।' জয়িতা কথা শেষ করতেই নিমকিত বলল, 'এসব কথা তো কেউ বলেনি। দেখা যাক, তোমরা রাস্তা দেখাচ্ছ, রাস্তাটা যদি ঠিক হয় তাহলে মন্দ কি!'

এই সময় একটা বাচ্চা মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে উত্তেজিত গলায় খবর দিল একটা ইয়াকের বাচ্চা হয়েছে। আর বাচ্চাটা মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সবাই ছুটতে লাগল কাহুনের মন্দিরের দিকে। নিমকিত ধরে নিয়ে এল জয়িতাকে। ভিড় জমে গেছে সেখানে। এরই মধ্যে কাহুনের শিষ্যরা বিশাল বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শুরু করেছে। সদ্যজাত ইয়াক শিশুটি এখনও পা সোজা করতে পারছে না। তার শরীর পরিষ্কার করছে মা চেটেচেটে। এই ভীড়, যন্ত্রের আওয়াজে বিন্দুমাত্র ভীত নয় সে। বরং এই গ্রামের মানুষের জন্যে একটা শুভকাজ সে করতে পেরেছে বলে হয়তো আন্দাজও করতে পেরেছে। জয়িতার অন্তত ওর ভাবভঙ্গীতে তাই মনে হল। হঠাৎ একটা গলা চিৎকার করে উঠল, 'এই যে এতদিন পরে একটা মেয়ে ইয়াক জন্মাল, কেন জন্মাল কেউ জানো?' জয়িতা ছেলেটাকে চিনতে পারল। তুষারঝড়ের সময় খুব পরিশ্রম করেছিল ছেলেটা। ব্যবহার বেশ ভাল। আনন্দ বলে এই রকম ছেলে কয়েকটা পেলে আর চিন্তা নেই। ওর নাম সাওদের।

সাওদেরের কথার জবাব কেউ দিতে পারল না। সে আবার গলা তুলল, 'ইয়াকের বংশ তো এই গ্রাম থেকে লোপ পেয়েই যাচ্ছিল। এবার আমাদের নতুন সাথীরা এসেছে বলেই ভগবান মুখ তুলল।'

একসঙ্গে সবকটা দৃষ্টি পড়ল জয়িতার ওপরে। সবাই খুশিতে গুঞ্জন শুরু করল। কাহুন বললেন, 'আমি জানতাম এবার মেয়ে বাচ্চা হবে। ভগবান আমাকে প্রায়ই স্বপ্ন দেখাচ্ছিলেন।'

গুঞ্জনটা থামল। বিপরীত দুটো বক্তব্যের কোনটে সত্য তা নিয়ে ফাঁপরে পড়ল যেন সবাই। জয়িতা ধীরে ধীরে নিচে নেমে এল। এ সবই সংস্কার। মেয়ে-ইয়াকের জন্ম হওয়া প্রাকৃতিক ব্যাপার, এ তথ্য এদের বোঝানো মুশকিল। আর তাই কাহুনরা চিরকাল বহালতবিয়তে বেঁচে থাকেন।

আনন্দ এখন গ্রামে নেই। ভোরেই ও বেরিয়ে গেছে পালদেম লা-ছিরিঙদের সঙ্গে নিয়ে। খানিকটা নিচে চমৎকার জ্বালানী কাঠ ছড়ানো আছে। সেগুলো কেটে কেটে আনা দরকার। কাঠের সঞ্চয়ে টান পড়েছে। সুদীপের ওপর দায়িত্ব ছিল মুরগী ছাগলগুলোর জন্যে বড়সড় একটা খাঁচা
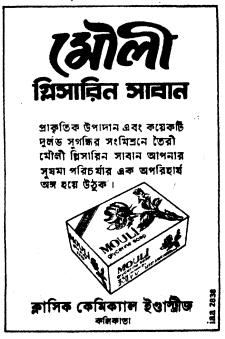
তৈরী করার। কয়েকটা ছেলে বরফ সরিয়ে মাটিতে খুঁটি পুঁতছে। তাদের জিজ্ঞাসা করে জয়িতা জানতে পারল সুদীপ একটু আগে একজনকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে। বুনো চমরির একটা ঝাঁক নাকি এসেছে এদিকে। যদি দু তিনটেকে মারতে পারে তাহলে সারা গ্রামের মানুষের পেটে মাংস পড়বে। ব্যাপারটা জয়িতার কাছে হঠকারিতার সমান মনে হল। চেতনা স্বচ্ছ হওয়ার পর সুদীপ আরও বেপরোয়া হয়ে গিয়েছে। বন্য জন্তুগুলোকে না মেরে বুদ্ধি খাটিয়ে যদি ধরতে চেষ্টা করত তাহলে আখেরে বেশী কাজ দিত। জয়িতা আস্তানায় ফিরে দরজা বন্ধ দেখল। সেই মেয়েটিও নেই। সুদীপের আহ্বান। আজকাল সব সময় সুদীপের সঙ্গে লেপ্টে থাকে ও। প্রথম দিকে যৌথ রান্নায় হাত লাগাতে গিয়েছিল মেয়েটি। কিন্তু গ্রামের অন্য মেয়েরা তাকে প্রায় স্পষ্টঃ বলেছে ওখানে অনেক লোক, মেয়েটির সাহায্যের দরকার নেই। এখন বস্তুত গ্রামের অন্য মেয়েদের থেকে তাকে সব সময় আলাদা থাকতে হয়। এবং এজন্যে যেন ওর কোন আক্ষেপও নেই। সুদীপ যে কাজ করছে সেই কাজের সঙ্গী হচ্ছে সে আগবাড়িয়ে। সুদীপ ওকে ঠিক ভালবাসে কিনা বোঝা যায় না। যে গলায় কথা বলে তাতে আর যাই থাক ভালবাসা থাকে না। কিন্তু মেয়েটির ব্যবহারে কোন অস্পষ্টতা নেই। কাল রাত্রে সুদীপ আনন্দকে বলেছিল, 'আশা করি তোরা আমাকে ভুল বুঝছিস না। এ গ্রামের নিয়ম হল কোন নারীকে কেউ গর্ভবতী করলে তাকে স্ত্রীর সম্মান দিতেই হয়। এ জিন্দগীতে শালা আমার বিয়ে করার ধান্দা নেই। অতএব ঠিক আছি। মেয়েটার একটা শেল্টার দরকার, দিয়ে যাচ্ছি।'

জয়িতা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। এবং তখনই রামানন্দ রায়ের কথা মনে পড়ল ওর। বাবা কেমন আছে এখন? বাবার কি ওর জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে? নাকি ওরা জেনে গেছে জয়িতা বেঁচে নেই। তাই বা হবে কেন? কল্যাণের মৃতদেহ পাওয়ার পর পুলিস নিশ্চয়ই খবরের কাগজে কৃতিত্বের কথা বলেছে। কল্যাণের ভাইরা নিশ্চয়ই একটা লোকদেখানো শ্রাদ্ধ করেছে। আর যে পুলিসবাহিনী এখানে এসে শূন্য হাতে ফিরে গেছে তারা তিনজনের অস্তিত্বের কথা জানিয়েছে। আর তাই জেনে রামানন্দ রায়ের কষ্ট কি খুব বেড়ে গেছে! ওর হঠাৎ মনে হল মদ খাওয়া পার্টিতে যাওয়া বা অন্য রমণীতে আসক্তি প্রকাশের নামে যে ফার্টিলাইজারের স্রোতে রামানন্দ রায় গা ভাসিয়েছিলেন সেটার পাশাপাশি আর একটা ভালবাসার কাঙালও বেঁচে ছিল। যেচে পরা মুখোশটা এত সেঁটে বসেছিল যে সেটা টেনে খোলা আর সম্ভব হয়নি। কি জানি হয়তো ভুল, এসব ধারণাই বেঠিক। হয়তো এর মধ্যে চলে যাওয়া সময়টা ভরিয়ে দিয়েছে মনের খাদগুলো। তবু একবার রামানন্দ রায় যখন মধ্যরাতে মাতাল হয়ে একাকী বসে থাকেন তখন সামনে আচমকা গিয়ে দাঁড়িয়ে ওঁর মুখখানা দেখতে বড় ইচ্ছে করে। এসব মাথার মধ্যে পাক খেতেই ওর হাসি পেল। সে একনাগাড়ে রামানন্দ রায়কে ভেবে চলেছে। অথচ সীতা রায়, তার মা? কল্যাণের একটা কথা মনে পড়ল, 'জানিস, আজকালকার মায়েরা না ঠিক মায়েদের মতন নয়। বলতে পারিস দিদির মত। ব্যবহারে চেহারায়। মা মা অনুভূতিটা যদি না আসে তো আর কি করা যাবে?' জয়িতা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কেন, তোর মা?'

'আমার মায়ের কেসটা আলাদা। অভাবের সঙ্গে লড়তে লড়তে ভদ্রমহিলাকে প্রায়ই বাড়িতে দলবদল করতে হয়। আর সেই কারণেই সন্তানদের শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত হন।' কল্যাণের এই বক্তব্য কতটা সত্যি ছিল তা সে-ই জানত কিন্তু সীতা রায়কে স্মরণ করে আজ জয়িতার মনে হল এখন পাশে থাকলে সে ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব তৈরী করার চেষ্টা করত। মানুষ বারংবার কেন্দ্রচ্যুত হয়, ঘরবদল করে যে আত্মিক অভাবের তাড়নায় সেটাকে বুঝতে চেষ্টা করত সে। এই কয়মাস, সময়ের হিসেবে কিছুই নয়, কিন্তু জয়িতার মনে হল অনেক দরজা তার কাছে খুলে গেছে।

জয়িতা পাশের পাহাড়ে চোখ রাখল। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল রোলেনদের গ্রামে অনেকদিন যাওয়া হয়নি। আনন্দ অবশ্য এখনই ওখানে কোন উদ্যোগ নিতে রাজী নয়। রোলেনদের অর্থনৈতিক অবস্থা অবশ্যই তাপল্যাঙের মানুষের চেয়ে ভাল। একসঙ্গে দু জায়গায় পরিশ্রম করা তিনটি মানুষের পক্ষে অসম্ভব। বরং সত্যি যদি তাপল্যাঙের চেহারা ওরা ফেরাতে পারে তাহলে রোলেনদের গ্রামের যারা নিঃস্ব মানুষ তারা নিজে থেকেই আকর্ষণ বোধ করবে। অন্তত একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত না রাখতে পারলে ওদের

কাছে এগিয়ে যাওয়া অর্থহীন। জয়িতা ভগবানের পবিত্র জল উদ্ধার করে দিয়েছিল শুধু এই কারণেই সম্পর্কটা এখন সহজ হয়েছে। কিন্তু কাজ শুরু করতে চাইলে সংঘাত হবে না তা কে বলতে পারে।

তবু জয়িতা পা বাড়াল। ওর মনে হল রোলেনদের গ্রামটায় একবার যাওয়া উচিত। এতে আর যাই হোক সম্পর্কটা ঠিক থাকবে। পায়ের তলার বরফ এখন শক্ত ইঁট। সাবধানে না হাঁটলে পিছলে পড়তে হবে। এই সময় সে সাওদেরকে দেখতে পেল। দ্রুতগতিতে পাশে এসে সাওদের জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ওভাবে চলে এলে কেন? আমি কি কিছু খারাপ কথা

বলেছি ?'

'একটা ইয়াকের বাচ্চা হওয়ার সঙ্গে কোন মানুষের সম্পর্ক থাকতে পারে না।'

'বাঃ, তাহলে যে কাহুনও বলল, ভগবান ওঁকে স্বপ্ন দিয়েছেন। তার বেলা ?'

'সেই স্বপ্ন তো উনি ছাড়া কেউ দ্যাখেননি ?'

'তার মানে তুমি বলছ কাহুন সত্যি কথা বলেননি ?'

'হয়তো তিনি যেটা বিশ্বাস করেন সেইটেই বলেছেন।'

'তুমি কোথায় যাচ্ছ এখন ?'

'রোলেনদের গ্রামের দিকে যাব ভাবছি।'

সাওদের এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব ?'

জয়িতা সম্মতি দিল। সঙ্গে কেউ থাকলে বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে সুবিধে হয়। বলা যায় না, যেখানে বরফ জমেনি সেখানে পা ফেলতে দুর্ঘটনা ঘটা বিচিত্র নয়। কিছুক্ষণ হাঁটার পর জয়িতা বলল, 'তুমি একা ওই গ্রামে কখনও গিয়েছ সাওদের ?'

'লুকিয়ে লুকিয়ে গ্রামের পাশে গিয়েছি, ঢুকিনি। আমাদের মধ্যে মারপিট তো লেগেই ছিল এতদিন। কিন্তু তুমি যেভাবে হাঁটছ তাতে ওখান থেকে আজ রাত্রে ফিরে আসতে পারবে না। জোরে হাঁট, জোরে।'

সাওদের গতি বাড়াতে জয়িতা চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে বাব্বা, অত জোরে আমি পারব না।'

'কেন ? এইভাবে পা ফেল।' সাওদের দেখিয়ে দিল শরীর কেমন রাখতে হবে।

জয়িতা অনুকরণ করতে চেষ্টা করল। গতি বাড়ছে কিন্তু অনভ্যাস তার পতন অনিবার্য করে তুলল। সে যখন হুমড়ি খেয়ে বরফের ওপর পড়ছে তখন ক্ষিপ্র হাতে সাওদের তাকে জড়িয়ে ধরল। বুকের ভেতর তখন হাতুড়ি পেটার শব্দ, নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হওয়ার আগেই সাওদেরের শরীরের বিদঘুটে গন্ধ টের পেল। এবং তার পরেই মনে হল যতটা সময় ধরে রাখা উচিত তার থেকে অনেক বেশী সময় এবং শক্তি ব্যয় করছে সাওদের। সেই অবস্থায় মুখ তুলল জয়িতা। সাওদেরের কিশোর কিশোর মুখে যেন হোলি শুরু হয়ে গিয়েছে। নিঃশ্বাস ভারী। প্রবল অস্বস্তি নিয়ে জয়িতা বলল, 'ছেড়ে দাও সাওদের।'

'নাঃ, আর একটু, আর একটু থাকো।' সাওদেরের গলার স্বর জড়ানো।

'মানে ?' জয়িতার গলা থেকে শব্দটা ছিটকে এল।

এবার হাত শিথিল হল সাওদেরের, বিহ্বল দেখাল ওকে। তারপর বলল, 'তুমি কি নরম !'

হতভম্ব হয়ে গেল জয়িতা, 'আমি নরম ? নরম মানে ?'

সাওদের সরল হাসল, 'তোমাকে বাইরে থেকে দেখলে খুব শক্ত মনে হত, কিন্তু আজ বুঝলাম তা ঠিক নয়।' এখন দূরত্ব এক হাতের। মাথায় ওরা প্রায় সমান সমান। জয়িতা অবাক। সাওদেরের বয়স বোঝা মুশকিল। দাড়ি এদের সবার বের হয় না। ঠোঁটের ওপর হালকা গোঁফের রেখা। একমাথা চুল আর চমৎকার চামড়ার জন্যে বয়সটাও বোঝা দুস্কর হয়। তাছাড়া সব সময় ওর দিকে তাকালে যে ইংরেজী শব্দটা মনে পড়ে সেটা হল 'ইনোসেন্ট'। যা বয়স্ক মানুষেরা কিছুতেই পেতে পারে না। কিন্তু ওর দিকে তাকাতেই আচমকা কম্পন এল জয়িতার শরীরে। সে নরম। তার শরীরে এখন শীতের ভারী পোশাক। যে কথা কখনও আনন্দ বা সুদীপের মাথায় আসেনি সেই কথা কি বেমালুম উচ্চারণ করল সাওদের। অথচ নিজেকে তার মোটেই নরম ভাবতে ইচ্ছে করছিল না। হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল জয়িতা। আর হাসিটা যেহেতু শহুরে তাই সাওদের বুঝতে পারছিল না কি করা যায়। হাসি থামিয়ে জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি বুঝি গ্রামের মেয়েদের জড়িয়ে ধরে পরীক্ষা কর কে নরম আর কে শক্ত ?'

'দূর ! গ্রামে আমার বয়সী মেয়েই নেই যে তাকে জড়িয়ে ধরব। বড় মেয়েরা আমাকে জড়িয়ে ধরতে চায় কিন্তু আমার ওদের মোটেই ভাল লাগে না।' সরল গলায় জানাল সাওদের।

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ। ওরা সব কেমন বড় বড়। অবশ্য রোলেনদের গ্রামে একটা আমার বয়সী মেয়ে আছে।'

'আচ্ছা ? তাই তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাইছ ?'

'না, তা ঠিক নয়। কিন্তু মেয়েটার মুখ খুব খারাপ। অত সুন্দর দেখতে অথচ এমন গালাগাল দেয় যে কি বলব। একবার ওই ঝরনার পাশে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

'তখন ওকে জড়িয়ে ধরেছিলে ?'

'উঃ, তুমি বুঝতে পারছ না। চেয়ে আছি দেখে মেয়েটা চিৎকার করল, মেয়ে দ্যাখোনি কোনদিন যে চোখ বড় করেছ ? ক্ষেতি আছে কতখানি। রোজ রোজ শেলরুটি খাওয়াতে পারবে ? এই সব বলে চলে গেল। আমার তো ওসব কিছু নেই তাই আর ওর কথা ভাবি না।' সাওদেরকে মোটেই দুঃখিত দেখাচ্ছিল না। জয়িতা আবার হাঁটা শুরু করেছিল। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সাওদের চাপা শিস দিচ্ছিল। আর গতি বাড়াচ্ছে না সাওদের। ক্রমশ ওরা চুপচাপ ঝরনার পাশে চলে এল। এরমধ্যে কখন ঝরনা জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। এক ফোঁটা জল নেই কোথাও। এবং তখনই নিচে গুলির শব্দ পেল জয়িতা। শব্দটা প্রতিধ্বনিত হতে লাগল পাহাড়ে পাহাড়ে। সে সচকিত হল। সুদীপ। ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগল জয়িতার। নিরীহ চমরী মারার জন্যে বন্দুকের গুলি খরচ করার কোন মানে হয় না। আওয়াজটা খুব দূরের নয়। সঙ্গে সঙ্গে মত পাল্টালো সে। সাওদের কান খাড়া করেছিল। ওর মুখের রেখাগুলো এখন অস্বাভাবিক। শব্দটা শোনার পর থেকেই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'আওয়াজটা কোত্থেকে এসেছে তা কি তুমি বুঝতে পারছ সাওদের ?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল সাওদের। জয়িতা বলল, 'ওখানে আমাকে তুমি নিয়ে যেতে পারবে ?'

'রোলেনদের গ্রামে যাবে না ?'

'না। আগে দেখে আসি কি হচ্ছে ওখানে।'

সাওদের বলল, 'এপাশ দিয়ে গেলে অনেক সময় লাগবে। এসো, আমার হাত ধরো, ঝরনা পার হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব আমরা।' সাওদেরের বাড়ানো হাত ধরল জয়িতা। স্পর্শ পাওয়ামাত্র কেঁপে উঠল জয়িতা। তার মনে হল সাওদের হয়তো আবার ভাবতে শুরু করেছে জয়িতা কি নরম ! কিন্তু ওর হাতের স্পর্শে বা ব্যবহারে সেসব কিছুই দেখতে পেল না জয়িতা। অত্যন্ত সতর্ক হয়ে বরফ পরীক্ষা করে করে ওকে নিয়ে ঝরনা পেরিয়ে এল সাওদের। ওপারে পৌঁছে ঢালু পথ সামান্যই হাঁটা। রোলেনদের গ্রামের ঠিক উল্টো পথ এইটে। গাছপালাগুলো বরফে ঢাকা। কোথাও কোন শব্দ নেই। অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল, হঠাৎ সাওদের তার হাত চেপে ধরল। মুহূর্তেই তাকে অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল। নিঃশব্দে সে দূরের একটা বরফের চাঁই দেখিয়ে দিল। প্রথমে ঠাহর করতে পারেনি জয়িতা। তারপর নজরে এল লম্বা একটা লোমশ লেজ অনেকটা আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে বরফের ওপর নেতিয়ে রয়েছে। শরীর দেখা যাচ্ছে না। সাদার ওপর কালো ছোপ ছোপ লেজ বরফের গায়ে যেন মিশে আছে। ঠোঁটে আঙুল চেপে কথা বলতে নিষেধ করে পেছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল সাওদের। কিন্তু জয়িতার মনে হল জন্তুটাকে না দেখে ফিরে যাওয়া বোকামি হবে। প্রায় মিনিট পাঁচেক সে সাওদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করল। এই সময় লেজটা একবারের জন্যেও জায়গা বদল করল না।

সময় সম্ভবত সাওদেরের সাহস ফিরিয়ে দিল। সে গোল করে অনেকটা জায়গা হেঁটে ঠিক উল্টো দিকে পৌঁছে গেল জয়িতাকে নিয়ে। এবং তখনই জন্তুটাকে স্পষ্ট দেখতে পেল ওরা। লম্বায় অন্তত ফুট সাতেক হবে। বরফের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। এবং তার বুকের পাশ দিয়ে রক্তের ধারা বেরিয়ে থমকে দাঁড়াচ্ছে। শরীরে সামান্য কাঁপুনি নেই। স্নো-লেপার্ড ? জয়িতা চমকে উঠল। সত্যি যদি স্নো-লেপার্ড হয় তাহলে এতো প্রায় রূপকথার প্রাণী। হিমালয়ের চৌদ্দ পনের হাজার ফুট উঁচুতে এদের অবস্থান কিন্তু বিশেষজ্ঞরা সাম্প্রতিক কালে এদের খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছেন। জয়িতা একমুঠো বরফ ছুঁড়ল। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া হল না। সাওদের দুহাতে মুখ ঢেকে চিৎকার করল। জিম করবেটের বইতে জয়িতা জেনেছে আহত চিতার কাছে পৌঁছানো অত্যন্ত বিপজ্জনক। সে আর এগোতে সাহস পাচ্ছিল না। কিন্তু মৃতবৎ পড়ে থাকতে দেখে সাওদের সাহস পেয়ে গেছে এখন। নিষেধ না শুনে এগিয়ে যাচ্ছিল পায়ে পায়ে। তারপর কাছাকাছি হয়ে চিৎকার করল, 'মরে গেছে, মরে গেছে।'

জয়িতা এবার ছুটে গেল। সত্যি এটা স্নো-লেপার্ড। এবং বেশ বড়সড়। সারা শরীরে মেরুভালুকের মত পুরু লোম এবং থাবাতেও লোমের গদি

আছে যাতে বরফের ওপর সহজে হাঁটতে পারে। সাদাটে চামড়ার কালো ছোপ এদের লুকিয়ে থাকতে নিশ্চয়ই সাহায্য করে। জয়িতা পড়েছিল পৃথিবীতে ঠিক এই সময় কতগুলো স্নো-লেপার্ড আছে আর হিসেব নেওয়া সম্ভব হয়নি। একটা বিশেষজ্ঞ দল রাশিয়ার বরফাচ্ছাদিত পাহাড়ে চারটে শীত কাটিয়েও একটি স্নো-লেপার্ডের দর্শন পায়নি। এই জন্তু সাধারণ বাঘ কিংবা চিতা নয় তা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। এর মৃত্যু হয়েছে সামান্য আগে। এখন আসার পথে রক্ত ঝরিয়ে এসেছে ও। জয়িতার বুঝতে অসুবিধে হল না সুদীপ কার উদ্দেশ্যে গুলি খরচ করেছে। এই বিরলজাতের প্রাণীটিকে মারা সুদীপের উচিত হয়েছে কিনা এ নিয়ে তর্ক করা যেতে পারে। কিন্তু তার আগেই সাওদের লেপার্ডটিকে ধরে টানতে লাগল। কিন্তু ওর একার পক্ষে ওজন অনেক বেশী। জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'কি করতে চাইছ ওটাকে নিয়ে?'

'উঃ, তুমি বুঝতে পারছ না। এই এলাকাটা রোলেনদের। ওরা যদি এটাকে দ্যাখে তাহলে কিছুতেই আমাদের নিয়ে যেতে দেবে না। তুমি হাত লাগাও, তাড়াতাড়ি ঝরনার ওপারে নিয়ে যাব।'

সাওদেরকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

'কি করবে এটাকে নিয়ে?'

'কি আর করব? খাব। এরকম বাঘের কথা শুধু শুনেই এসেছি। তোমরা আসার পর ইয়াকের মেয়ে বাচ্চা হচ্ছে, সাদা বাঘ এসে মরে পড়ে থাকছে। ধরো ধরো।'

ঠিক সেই সময় অত্যন্ত সাবধানে সুদীপ নিচের জঙ্গল সরিয়ে বেরিয়ে এল রক্তচিহ্ন ধরে। জয়িতাকে লেপার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে হতভম্ব। জয়িতা চেঁচিয়ে বলল, 'কনগ্রাচুলেশন, পৃথিবীর রেয়ার একটা প্রাণীকে তুই মারতে পেরেছিস।'

'রেয়ার প্রাণী? ওটা তো বাঘ! মরে গেছে?' সুদীপ দৌড়ে ওপরে উঠে এল।

'এর নাম স্নো-লেপার্ড!'

সুদীপ কাঁধ নাচাল। ততক্ষণে মেয়েটি আর একটি ছেলে ওপরে উঠে এল। সুদীপ বলল, 'খুব ভুগিয়েছে লেপার্ডটা। চমরী খুঁজতে বনে ঢুকেছিলাম পেয়ে গেলাম এটাকে। গুলি খেয়ে এতটা ছুটে আসবে ভাবিনি। একেবারে হার্টে লেগেছে। শক্তি আছে বটে। কিন্তু তোরা এখানে?'

'পৃথিবীর সমস্ত চিড়িয়াখানায় এই প্রাণীর সংখ্যা মাত্র তিনশো।'

'তাতে আমার কিছু এসে যাচ্ছে না। আর একটু সময় পেলে ওটাই আমাকে এতক্ষণে আরাম করে খেত। ফালতু সেন্টিমেন্ট ছাড়।' সুদীপ ওদের ইঙ্গিত করল। সাওদের তো তৈরী হয়েই ছিল। বাকী দুজন হাত লাগাতে লেপার্ডটাকে নড়ানো সম্ভব হল। টানতে টানতে ওরা ওকে ঝরনার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। সুদীপ হাসল, 'তোর চামচেটাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস?'

'চামচে?'

সুদীপ সাওদেরকে দেখাল।

'চামচে বলছিস কেন?'

'তোকে দেখলে ওর মুখ কেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে লক্ষ করেছিস?'

জয়িতা দাঁড়াল না। তার মেজাজ খিচড়ে যাচ্ছিল। সম্প্রতি সুদীপের কথাবার্তায় সামান্য সৌজন্য থাকছে না। সুদীপ দৌড়ে এসে ওর কাঁধে হাত রেখে থামাল, 'তুই এত ক্ষেপা হয়ে গেলি কেন?'

'ছেড়ে দে আমাকে!' এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়াল জয়িতা।

'তুই শালা খুব কাঠখোট্টা।' পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সুদীপ বলল।

সঙ্গে সঙ্গে কাঁপুনিটা ফিরে এল। সুদীপ বলছে কাঠখোট্টা অথচ একটু আগেই সে শুনেছে, 'তুমি কি নরম!' কোনটে সত্যি?

হঠাৎ সুদীপ বলল, 'শোন, মালপত্র কমে আসছে। আনন্দ বলছে চ্যাঙথাপু থেকে কিনে আনা দরকার। আমি নিজে যাব বলেছি। তোর জন্যে কিছু আনতে হবে?'

'তুই তাপল্যাঙের বাইরে যাবি?' অজান্তে প্রশ্নটা মুখ থেকে বের হল।

'হ্যাঁ। তার পরেই হো হো করে হেসে উঠল সুদীপ, 'তুই কল্যাণের কেসটা ভাবছিস? আমি শালা কখনও মরব না। তাছাড়া চ্যাঙথাপুতে পুলিস ফাঁড়ি নেই।'

জয়িতা কোন কথা না বলে নীরবে হাঁটছিল। সুদীপ বলল, 'মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে সোজা কলকাতায় চলে যাই। একবার দেখে আসি সেখানকার মানুষগুলো কে কেমন আছে!'

'কে কেমন আছে সেকথা জানতে যেতে হবে কেন? পুরু চামড়ার নখদন্তহীন চোখের পর্দা ছেঁড়া আত্মসম্মানহীন কয়েক লক্ষ বাঙালী গর্তে মুখ লুকিয়ে এ ওকে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে। আমরা কি করেছিলাম তা অর্থহীন ওদের কাছে। আর এই যে আমরা তাপল্যাঙে যেজন্যে পড়ে আছি তা জানতে পারলে পেছনে একটা ধান্দা খুঁজবে। রগরগে মশলা না পেলে আমাদের কথা শুনতেও চাইবে না। ওদের দেখার জন্যে কষ্ট করার কি দরকার!' জয়িতা ক্লান্ত গলায় বলল।

হঠাৎ সুদীপ বলল, 'জয়ী।'

জয়িতা তাকাল। সুদীপ হাসল, 'তোকে অনেকদিন বাদে এই নামে ডাকলাম।'

'কি বলছিলি?'

'ধর, আমরা যা চাইছি সব হল। তাপল্যাঙের মানুষদের নির্দিষ্ট আয় হল। কো-অপারেটিভ ডেয়ারি, ফার্ম এবং অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে মানসিক সুস্থিতিও এল। তখন আমরা কোথায় যাব?'

'কোথায় যাব মানে? এখানেই থাকব। এদের সঙ্গে।'

সুদীপ মাথা নাড়ল। কিন্তু কোন কথা বলল না। ওরা গ্রামে ফিরে আসছিল। এর মধ্যে খবর পৌঁছেছে। দলে দলে লোক ছুটছে স্নো-লেপার্ডটাকে নিয়ে আসার জন্য। এবং তখনই জয়িতা আনন্দদের দেখতে পেল। দশবারোজন লোক কাঠের বোঝা বরফের ওপর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। আনন্দ একটু ঝুঁকে হাঁটছে। জয়িতার মনে হল এই কয় মাসে আনন্দ যেন অনেক বয়স্ক হয়ে গিয়েছে। ওর শরীরেও ভাঙন এসেছে। সে চমকে সুদীপের দিকে তাকাল। এবং মনে হল সুদীপের চেহারায় সেই জেল্লা নেই। নিজেকে অনেকদিন দ্যাখেনি জয়িতা। সে এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছিল তার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবার কোন কারণ নেই। আনন্দর দিকে তাকিয়ে হঠাৎই বুকের মধ্যে একটা ছটফটানি টের পেল জয়িতা।

সে ছুটে এগিয়ে এল। আনন্দ হাসল, 'গ্রেট ডিসকভারি। কাঠ তো ছিলই, এই অঞ্চলে প্রচুর বড় এলাচের গাছ আছে। বরফ গললে বড় এলাচ সাপ্লাই দেওয়া যাবে। আর নীচের দিকে বেতের বন দেখতে পেলাম। এত ওপরে বেত, ভাবা যায় না। পালদেম বলছে গ্রামের অনেকেই বেতের কাজ জানে। ব্যাপারটা অর্গানাইজ করতে হবে।'

'তুই ভাল আছিস আনন্দ?' জয়িতা প্রশ্নটা করে ফেলল।

'কেন? আমাকে খারাপ দেখাচ্ছে?' আনন্দ অবাক হল।

'না, ঠিক আছে।'

'তোদের মাথায় কখন কি ঢোকে কে জানে! আর হ্যাঁ, চমরীদের একটা দল এসেছে এদিকে। পায়ের ছাপ দেখলাম। জ্যান্ত ধরব বলে ফাঁদ পেতে এলাম। রান্না হয়ে গেছে?'

'আমি দেখছি।' জয়িতার মনে পড়ল তার কাজটার শেষ না দেখেই বেরিয়ে পড়েছিল। এই সময় আনন্দর নজরে পড়ল। সে চিৎকার করে সুদীপকে ডাকল, 'কিরে, এখনও খাঁচাগুলো তৈরী করিসনি?'

সুদীপ জবাব দিল, 'আমি একটু শিকারে গিয়েছিলাম।'

'শিকার? তোকে কে শিকারে যেতে বলেছিল! পশু মারার চেয়ে পশু বাঁচানোই তো জরুরী। আমরা যদি নিজেদের কাজগুলো না করি—।'

বিরক্তিতে আনন্দ মুখ ফেরাল। জয়িতা আশংকা করছিল সুদীপ হয়তো একটা কড়া জবাব দেবে। কিন্তু সুদীপ কিছুই করল না। চুপচাপ চলে গেল খাঁচার কাছে। ব্যাপারটা অভিনব লাগল জয়িতার। আনন্দ ততক্ষণে চলে গেছে যৌথগৃহের দিকে। জয়িতার খাবারের ব্যবস্থা দেখার আগে সুদীপের কাছে গিয়ে বলল, 'তুই হঠাৎ এত ভাল হয়ে গেলি কি করে রে?'

সুদীপ বলল, 'ফোট! ন্যাতানো কথা বলিস না।'

কথাটা খুব বিশ্রী লাগল জয়িতার। হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হল সুদীপ কখনও তাকে বলেনি সে ভিজে কথা বলে! সেকি তাই বলছে। এবং তখনই সেই তিনটে শব্দ কানের মধ্যে প্রতিধ্বনি তুলল, 'তুমি কি নরম।'

[ক্রমশ]

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

পূর্ব-পশ্চিম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যৌবন-৩২

দুপুর থেকে রাত নটা পর্যন্ত কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউস যাদের ঘর বাড়ি, তারা আজ সন্ধেবেলাতেই স্থানচ্যুত। তারা বেশ ক্ষুব্ধ, এখন তারা কোথায় যাবে? এই কফি হাউসের বেশ কয়েকটা টেবিল জুড়ে বসে নবীন কবি ও গল্পকারদের দল, লিটল ম্যাগাজিনের উদ্ধত, রাগী লেখকবৃন্দ, এরা কলেজ জীবন শেষ করেছে, অনেকেই কোনো চাকরি বাকরি পায়নি, বাড়ি ফেরার কোনো তাড়া নেই তাদের। সাতজনের টেবিলে তিন কাপ কফির অর্ডার দিয়ে ভাগ করে নিয়ে সময় কাটায় দু' ঘণ্টা, তারপর বেয়ারা এসে গজ গজ করলে আরও দু' কাপের অর্ডার দেয়। একজন সিগারেট ধরিয়ে অর্ধেকটা টানতে না টানতেই হাত বাড়িয়ে দেয় আর একজন, আরও একজন বলে, লাস্ট সুখটানটা দিস! এদের দু'একজন টিউশানি করে কিছু টাকা রোজগার করে, যেদিন টিউশানির মাইনে পেয়ে কফি হাউসে আসে, সেদিন বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে চোখে চোখে কথা হয়ে যায়, বড় দলটার মধ্যে তৈরি হয়ে যায় একটা ছোট দল, কফি হাউস ছেড়ে তারা চলে যায় খালাসিটোলায় দেশি মদের আড্ডায়। সেসব দিনে বাড়ি ফিরতে ফিরতে পেরিয়ে যায় মধ্যরাত।

ব্ল্যাক আউট শুরু হয়েছে, সন্ধেবেলা সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। মিশমিশে অন্ধকার রাস্তাঘাটের কলকাতাকে সম্পূর্ণ অচেনা মনে হয়। রাতের কলকাতার প্রধান অলঙ্কারই তো আলো। বম্বে-দিল্লির থেকেও কলকাতায় আলো বেশি, এই শহর অনেক রাত পর্যন্ত জাগ্রত থাকে। বিজ্ঞাপনের রঙীন বাতিগুলি জ্বলে সারা রাত। সেই কলকাতা সন্ধেবেলাতেই ডুবে আছে নিথর অন্ধকারে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ব্ল্যাক আউটের স্মৃতি এই প্রজন্মের অনেকেরই নেই। যে সব তরুণেরা এই শহরটিকে পাগলের মতন ভালোবাসে, তাদের এই অন্ধকার সহ্য হচ্ছে না।

কফি হাউস থেকে বেরিয়ে অবিনাশ, পরীক্ষিৎ, হেমন্ত, বরুণ, সুবিমলরা এসে দাঁড়ালো প্রেসিডেন্সি কলেজের উল্টোদিকে। সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে, আর কোথাও যাবার জায়গা নেই বলেই এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। একটা অর্থহীন যুদ্ধ এবং অনভিপ্রেত অন্ধকারের প্রতি ওরা প্রতিবাদ জানাতে চায়।

মানিকদার স্টাডি সার্কলের সদস্য তপনও ইদানীং এই নব্য সাহিত্যিকের দলে ভিড়েছে। তপন কবিতা লেখে। স্টাডি সার্কলে সে একদিন তার কবিতা পড়ে শুনিয়ে খুব লজ্জা পেয়েছিল। সুকান্ত ভট্টাচার্যর বন্ধু মানিকদা শুধু বিস্মিত নয়, রীতিমত আহত হয়েছিলেন সেই সব কবিতা শুনে। গরিবের ছেলে তপন, রিফিউজি কলোনিতে জ্যাঠামশাইয়ের সংসারে থাকে, তবু সে লিখলো প্যানপেনে প্রেমের কবিতা? দেশের যা অবস্থা, এই কি প্রেমের কবিতা লেখার সময়? অন্য কয়েকজন সদস্যও বিদ্রূপ করেছিল তপনকে।

মানিকদার স্টাডি সার্কল সে ছাড়েনি, কিন্তু কফি হাউসের এই আড্ডাটাতেও তার নেশা ধরে গেছে। দেশ, সমাজ, মা-বাবা, কবিতা, মদ, নারী ইত্যাদি বিষয়ে এরা এমন তাচ্ছিল্যের সুরে কথা বলে যে তপন চমকে চমকে ওঠে। এরা পূর্ব-নির্ধারিত কোনো নীতির পরোয়া করে না, সব কিছু নিজেরা যাচাই করে নিতে চায়। এরা ধর্ম, দেশপ্রেম, কংগ্রেস গভর্নমেন্ট, আমেরিকান পলিসিকে অবজ্ঞা করে, আবার চীন-রাশিয়া বা মার্কসবাদকেও অমোঘ, অকাট্য বলে মানে না। তপনের কাছে এসব নতুন অভিজ্ঞতা।

অবিনাশ বললো, চল, কলেজ স্কোয়ারে গিয়ে বসি।

আজ সন্ধেবেলা পাওয়া যাবে কি যাবে না এই ঝুঁকি না নিয়ে দুপুরবেলাতেই কয়েক বোতল বীয়ার খেয়ে এসেছে হেমন্ত। তার মেজাজ বেশ ফুরফুরে। সে বললো, কেউ আমার একটা হাত ধরো ভাই, আমি বোমা খেয়ে মরতে রাজি আছি, কিন্তু অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পা ভাঙতে রাজি নই। শালারা রাস্তাগুলো যা করে রেখেছে না।

অবিনাশ বললো, এ বছর আর রাস্তা সারাবে না। যুদ্ধের জন্য বর্ডারের দিকে নাকি নতুন নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে, শহরের রাস্তা সারাবার টাকা নেই।

হেমন্ত বললো, আরে বর্ডারের রাস্তা তো বানাবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট।

শহরের রাস্তা সারাবে করপোরেশন। যুদ্ধের সঙ্গে করপোরেশনের কী সম্পর্ক।

সুবিমল অবজ্ঞার সুরে বললো, সব কিছুর সঙ্গেই সব কিছুর সম্পর্ক থাকে।

হেমন্ত তার কাঁধে এক চাপড় মেরে বললো, তার মানে ; এটা তুই কী বললি ? সব কিছুর সঙ্গে সব কিছুর সম্পর্ক থাকে, এর মানে কী ?

সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর বদলে সুবিমল বললো, ও, কোনো মানে নেই বুঝি ? তা হলে ভুল বলেছি।

পরীক্ষিৎ বললো, না, সুবিমল, তুই ভুল বলিসনি। সব কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক তো থাকেই। যেমন তেলের সঙ্গে জলের একটা সম্পর্ক আছে।

অবিনাশ বললো, আগুনের সঙ্গে খিদের যেমন একটা সম্পর্ক আছে।

মাঝে মাঝে গাড়ির হেড লাইটের আলো পড়ছে ওদের গায়ে। যানবাহন পুরোপুরি বন্ধ হয়নি, হেডলাইটে কালো রঙ করাও হয়নি। সেই আলোতে ওরা দেখলো রাস্তার উল্টোদিকের ট্রাম স্টপে দাঁড়িয়ে আছে অদিতি। একা।

অবিনাশ নিজের বুকে চাপড় মেরে বিরাট দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

অদিতি আর গায়ত্রী, এই দু'জন এ বছর কফি হাউসের বিশ্ব সুন্দরী। গায়ত্রী ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের ছাত্রী, আর অদিতি কেমিস্ট্রিতে রিসার্চ করে। গায়ত্রী ফর্সা, মুখের গড়ন অতি ধারালো, সে ভালো ডিবেট করে। অদিতির গায়ের রং মাজা মাজা, বেশ লম্বা এবং গম্ভীর। গায়ত্রী এবং অদিতির মধ্যে কে বেশী সুন্দর তা নিয়ে কফি হাউসে মতভেদ এবং স্পষ্ট দুটি দল আছে। কিন্তু গায়ত্রী বা অদিতি কেউই এই কবি-লেখকদের পাত্তা দেয় না, ওদের দু'জনের আলাদা, নির্দিষ্ট টেবিল ও নির্দিষ্ট বন্ধু আছে। এরা আলাপ করতে গিয়েও পাত্তা পায়নি। এই লেখকদের দলটি নারী বর্জিত, আধো-চেনা এক-আধজন বন্ধুর স্ত্রী বা কারুর মামাতো-মাসতুতো বোন ক্বচিৎ কখনো আসে, সাহিত্য যশোপ্রার্থিনী দু'একটি মেয়ে কখনো কখনো ওদের টেবিলে বসে, কিন্তু বিকেল শেষ হতে না হতেই চঞ্চল হয়ে ওঠে, সন্ধের পর তাদের বাইরে থাকার অনুমতি নেই। অবিনাশের মতে, যে সব গুড়ি-গুড়ি টাইপ মেয়ে বিকেলবেলা বাড়ি ফিরে যায়, তারা কবিতা-গল্প লিখতে পারবে না কোনোদিন। হেমন্ত একদিন মন্তব্য করেছিল, সাংস্কৃতিক মেয়েদের বুক প্লেন হয় কেন ? পরীক্ষিৎকে কোনো মেয়ে কবিতা পড়তে দিলে সে ফেলে দেয় টেবিলের নিচে।

হেডলাইটের আলোয় অদিতিকে দেখাচ্ছে রাজেন্দ্রাণীর মতন। এই সব নারী কবিদের প্রেরণা হতে পারে, কিন্তু এরা কবিতা পড়ে না, কবিদের গ্রাহ্য করে না।

অবিনাশ বললো, ও অন্ধকারের মধ্যে একা একা কী করে বাড়ি ফিরবে ? ওর সেই পাইলট বন্ধুটা আজ আসেনি।

হেমন্ত বললো, তুই ওকে বাড়ি পৌঁছে দিবি নাকি ? দ্যাখ না চেষ্টা করে।

অবিনাশ বললো, আমার ইচ্ছে করছে ওর সঙ্গে এক ট্রামে চেপে খানিকটা যাই।

—যা না।

—ও যদি রাগ রাগ চোখে আমার দিকে তাকায়, তা হলে যে খুব খারাপ লাগবে। ঐ মুখখানাতে বিরক্তি মানায় না।

সুবিমল বললো, অদিতি যদি আজ আমাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ বসতো পার্কে, তারপর আমরা সবাই মিলে ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারতুম।

হেমন্ত বললো, প্রস্তাবটা দিয়ে দেখবি নাকি ?

আর একবার আলো পড়লো অদিতির মুখে। যেন একটা অন্ধকার মঞ্চে সে একলা দাঁড়িয়ে আছে। তার দৃষ্টিতে কোনো চাঞ্চল্য নেই, বাড়ি ফেরার জন্য কোনো দেহরক্ষীর প্রয়োজন নেই তার। এই মেয়ে কেন কবিতা লেখে না, কেন কবিতা ভালোবাসে না ? কেমিস্ট্রিতে কী রস পায় ?

অবিনাশরা কেউই দ্বিধা কাটিয়ে রাস্তা পার হয়ে অদিতির কাছে গেল না। একটা ট্রাম এলো, অদিতি উঠে পড়লো।

অবিনাশ আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, অদিতি যদি আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ বসতো, তাহলে পৃথিবীর একটা উপকার হতো। হয়তো আজ রাত্তিরে আমি একটা ক্লাসিক স্ট্যাণ্ডার্ডের কবিতা লিখে ফেলতুম।

সুবিমল বললো, ভাগ্যিস পাকিস্তান যুদ্ধটা বাধিয়েছিল, তাই অন্ধকারের মধ্যে অদিতিকে দেখা গেল খানিকক্ষণ। অন্ধকারের ব্যাকগ্রাউণ্ডে ওকে কী রকম মানিয়েছিল বল !

অবিনাশ বললো, চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য, ...

হেমন্ত বললো, পাকিস্তানী বোমারুগুলো অকর্মার ধাড়ী। এত দেরি করছে কেন ? এর মধ্যে দু' চারটে বোমা ফেলে গেলেই তো পারতো। মনে কর, ঠিক পাঁচ মিনিট আগে যদি এখানে একটা বোমা পড়তো, কী ফার্স্টক্লাস হতো। সবাই ছোটাছুটি করছে, সেই সময় আমি অদিতির হাত ধরে বলতুম, কোনো ভয় নেই, আমি তোমাকে শেলটারে নিয়ে যাচ্ছি।

অবিনাশ বললো, মাইরি আর কি, তোকে চান্স দিতুম আর কি।

সুবিমল বললো, রোজই শুনছি পাকিস্তানী প্লেন আসবে আসবে, এ আর ভালো লাগছে না। এলেই তো পারে। কলকাতার ওপর গোটা কতক বোমা ফেলে যাক না।

হেমন্ত বললো, কলকাতার এখন কিছু বোমা খাওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। কিছু ভাঙচুর হলে শহরটা নতুনভাবে তৈরি হবে।

সুবিমল বললো, কোথায় কোথায় বোমা পড়া উচিত বল তো ?

—ডেফিনিটলি বড়বাজারে। ওখানে অন্তত ডজনখানেক বেশ বড় সাইজের বোমা ফেলে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের ঘুঘুর বাসা ভেঙে দেওয়া দরকার। আর রাইটার্স বিল্ডিং-ডালহাউসিতেও ডজনখানেক। আর গোটাকতক চিৎপুরে।

—চিৎপুরের ওপর আবার তোর এত রাগ হলো কেন ? সাউথ ক্যালকাটাটা বুঝি বেঁচে যাবে !

এত অন্ধকারেও কলেজ স্কোয়ার সম্পূর্ণ নির্জন নয়। ফুচকা আলুকাবলিওয়ালারাও তাদের ব্যবসা বন্ধ করেনি। আকাশে ঝাঁক ঝাঁক মেঘ। তার আড়ালে একটা বড় আকারের চাঁদ দেখা যাচ্ছে দু' একবার, কিন্তু মেঘের জন্য জ্যোৎস্না ফোটেনি। ওরা বসে পড়লো এক কোণে, ঘাসের ওপর। একজন কেউ বললো, একটা চাওয়ালা কাছাকাছি আছে কি না দ্যাখ না।

পরীক্ষিৎ বললো, দেখি একটা পাঁইট ফাঁইট জোগাড় করা যায় কি না।

তপন আগাগোড়া চুপ করে আছে। ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের মতন এতবড় একটা ব্যাপার নিয়ে অবিনাশ হেমন্তরা ঠাট্টা তামাশা করে যাচ্ছে আগাগোড়া, এতেই সে হতবাক। ওপার বাংলার স্মৃতি তার এখনো টাটকা। সে যেন কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে, তাদের গ্রামের রাস্তাতেও যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। যুদ্ধটা কি ভারত-পাকিস্তানের, না শেষ পর্যন্ত আবার হিন্দু-মুসলমানের ?

সে চুপি চুপি হেমন্তকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এই যুদ্ধের ওপর কোনো কবিতা লিখেছেন ?

অন্যরাও তার প্রশ্ন শুনে চমকে উঠেছে, তারা হেসে উঠলো হা-হা করে। হেমন্ত হুংকার দিয়ে বললো, কী ? এই বোকা···, হারামী, গাণ্ডুর বাচ্চাদের যুদ্ধ নিয়ে কবিতা ? এই খোঁচাখুঁচিতে আপনার আমার কী যায় আসে মশাই ? কাশ্মীর নিয়ে দিল্লি-করাচী লড়ালড়ি করছে, তার জন্য আমরা কেন সাফার করবো ? কাশ্মীরটা ওদের দিয়ে দেওয়া হবে নাই-বা কেন ? মোছলমানদের দেশ, মোছলমানরা পাবে। সোজা কথা। কাশ্মীর যদি না-ই দিতে চান, তা হলে শুয়ারের বাচ্চারা ফটি সেভেনে পার্টিশান করতে রাজি হলি কেন ?

সুবিমল বললো, পাখতুন নেতা সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফফার খান কাল কী স্টেটমেন্ট দিয়েছেন দেখেছিস ? পাকিস্তান সৃষ্টির প্রস্তাবটাই মেনে নেওয়া উচিত হয়নি, ভারতকে এখন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে।

অবিনাশ লম্বা পা ছড়িয়ে আধো-কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ে বললো, ওসব পুরোনো কথা ছাড়। পাকিস্তান যখন হয়েই গেছে, আঠেরো বছর বয়েস এখন দেশটার, পাকিস্তান এখন একটা রিয়েলিটি, তাকে তার যা প্রাপ্য তা তো দিতেই হবে। কাশ্মীরে গণভোট করলে দেখা যাবে, ওরা সবাই পাকিস্তানে যেতে চায়।

সুবিমল বললো, তবু যাই বলিস, আমি কাশ্মীর ছাড়ার পক্ষপাতী নই। এমন সুন্দর একটা জায়গা পাকিস্তান চাইলেই দিতে হবে, এ কী মামাবাড়ির আবদার।

তপন বলে উঠলো, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানীরা যে পূর্ব পাকিস্তানকে সব

দিক থেকে বঞ্চিত করছে ? আমি নিজে দেখেছি।

অবিনাশ বললো, আপনি মশাই নিজেকে এখনো ইস্ট পাকিস্তানী মনে করেন তাই না ? ওখানে শুনেছি এখন উর্দু মিশিয়ে বাংলা লেখা হচ্ছে। সংস্কৃত তৎসম শব্দগুলো সব খুঁটে খুঁটে বাদ দিয়ে সেখানে আরবী-ফার্সী শব্দ ঢোকাচ্ছে ?

তপন বললো, মোটেই না। নাজামুদ্দিনের ভাই সাহাবুদ্দীন সেরকম ফতোয়া দিয়েছিল, চেষ্টা করেছিল খুব, কিন্তু বাঙালী লেখকরা তা মেনে নেয়নি কেউ।

কী জানি ওখানকার বইপত্তর তো পাই না।

পরীক্ষিৎ ফিরে এলো একটুবাদে। সে অনেক চেষ্টা করেও বাংলা মদের পাঁইট জোগাড় করতে পারেনি, তার বদলে নিয়ে এসেছে খানিকটা গাঁজা। হেমন্তর কাঁধের ঝোলা থেকে একটা পত্রিকা বার করে নিয়ে সে ঘাসের ওপর বিছিয়ে দিল, তারপর দেশলাই কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তামাক বার করতে লাগলো সিগারেট থেকে।

অবিনাশ জিজ্ঞেস করলো, কোথায় পেলি রে, গাঁজা ?

—রিকশাওয়ালাদের কাছ থেকে। শালা কী দাম বেড়েছে রে। ছোট পুরিয়া, যেগুলোর দাম ছিল আট আনা, সেই পুরিয়াই দু' টাকা চার আনা নিল। গাঁজাও কি যুদ্ধের কাজে লাগে নাকি ?

—আলবাৎ লাগে। এই যুদ্ধটাই তো গাঁজাখোরদের যুদ্ধ। পাকিস্তানী বোমারু পাইলটগুলো গাঁজায় দম দিয়ে একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে আছে, নইলে ব্যাটারা আসছে না কেন ? বোমা ফেলার কাজটা চুকিয়ে দিলেই পারে।

সুবিমল বললো, কে বলেছে ওরা কলকাতায় বোমা ফেলতে আসবে ? এদিকে ওরা ফ্রন্ট খুলবে, ওরা এত বোকা নাকি ? ততখানি হিম্মতও কি ওদের আছে ?

—ওরা যে লাহোর আক্রমণের বদলা নেবে শুনছি ? এখানকার খবরের কাগজগুলো তো খুব চ্যাঁচাচ্ছে। তা ছাড়া ক্যালকাটা বম্বিং হবার চান্স না থাকলে শুধু শুধু এখানে ব্ল্যাক আউট করতে গেল কেন ?

—এসব হচ্ছে যুদ্ধের টেমপো তোলা। সোলজাররা যত না যুদ্ধ করে তার চেয়ে খবরের কাগজওয়ালারা অনেক বেশি যুদ্ধ চালায়। রোজ আট কলম ব্যানার হেড লাইন। কাগজের বিক্রি বাড়ে। আর গভর্নমেন্ট থেকেও চায় সাধারণ লোকের মধ্যে একটা কৃত্রিম দেশাত্মবোধ চাগিয়ে তুলতে। দেশের অন্য সব সমস্যা তা হলে চাপা পড়ে যাবে।

পরীক্ষিৎ-এর এই সব কথাবার্তা পছন্দ হয় না। যুদ্ধ টুদ্ধ নিয়ে তার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। সে এক ধমক দিয়ে বললো, কী ভ্যাড় ভ্যাড় করছিস তখন থেকে। চুপ মার তো।

তামাকের বদলে গাঁজা ভরে পরীক্ষিৎ সিগারেটটির আগের গড়ন প্রায় ফিরিয়ে এনেছে। নিজে সাজলেও প্রথমে সে নিজে ধরায় না, সে সম্মানটা সে দিল হেমন্তকে। হেমন্ত লম্বা দুটি টান দিয়ে সেটি চালান করে দিল অবিনাশকে, কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তপনকে বললো, আপনি বুঝি যুদ্ধ নিয়েও কবিতা লেখেন ?

তপন একটু কেঁপে উঠলো। সে সত্যিই দুটি কবিতা লিখে ফেলেছে। মানিকদাদের স্টাডি সার্কলে সে ঐ কবিতা পাঠ করতে পারবে না, ভেবেছিল এই আড্ডায় শোনাবে। কিন্তু হেমন্তর গলার আওয়াজে কৌতুকের সুর টের পেয়ে সে তাড়াতাড়ি বললো, না, না, যুদ্ধ নিয়ে নয়, আমি আমার গ্রাম নিয়ে দু' একটা লিখেছি, এই সময় আবার খুব মনে পড়ছে।

—নস্টালজিয়া ? মুখস্থ আছে তো, শোনান।

পরীক্ষিৎ সঙ্গে সঙ্গে বললো, না, না, এই অন্ধকারের মধ্যে কবিতা-টবিতা চলবে না।

হেমন্ত বললো, জিনিসটা ফার্স্টক্লাস, আর একটা বানা তো পরীক্ষিৎ।

অবিনাশ জিজ্ঞেস করলো, মনে কর আমাদের এখানে অদিতি এসে বসেছে। ওর সামনে আমরা কী কথা বলতুম ?

পরীক্ষিৎ বললো, তুই যে ঐ মেয়েটার জন্য হেদিয়ে মরলি রে। ওর পাইলট প্রেমিক জানতে পারলে তোকে খোলাই দেবে।

—ঐ পাইলটটা কি যুদ্ধে গেছে ? প্লেন ক্র্যাশ করে পাকিস্তানে যদি ওয়ার প্রিজনার হয়ে থাকে, বেশ হয়।

সুবিমল বললো, সে গুড়ে বালি। ও ছেলেটা আছে সিভিল

অ্যাভিয়েশানে।
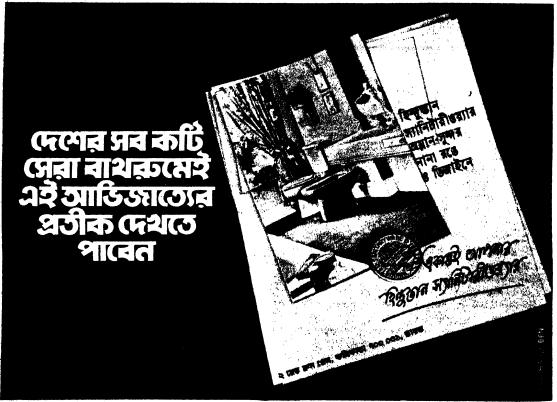
হেমন্ত হেসে উঠে বললো, অবিনাশ কিছু ছেলেটাকে মারতে চায়নি, দেখলি ? শুধু মাত্র ওয়ার প্রিজনার হবার অভিশাপ দিয়েছে। আরে এ যুদ্ধ আর কতদিন, ওয়ার প্রিজনার হলে তো সে ফিরে আসবে। তখন তোকে প্যাঁদাবে।

তপন জিজ্ঞেস করলো, এই যুদ্ধ কি শিগগির থামবে ?

হেমন্ত বললো, বেশিদিন চলতেই পারে না। দু' সাইডেরই তো খেলনাগুলো ফুরিয়ে যাবে ক'দিনের মধ্যেই।

সুবিমল বললো, ইণ্ডিয়া কী ট্যাকটিক্স নিয়েছে বুঝতে পারছিস না ? ওয়াই বি চ্যবন আর জেনারাল চৌধুরী চায় যুদ্ধটাকে যতদূর সম্ভব প্রোলং করতে। যাতে পাকিস্তানের দম ফুরিয়ে যায়। আমেরিকা তো দু' পক্ষকেই আর্মস সাপ্লাই বন্ধ করে দিয়েছে। রাশিয়া তবু ইণ্ডিয়াকে কিছু কিছু দিয়ে যাবে। ইণ্ডিয়া নিজেও এখন টেন পারসেন্ট আর্মস বানায়। পাকিস্তানের তো নিজস্ব বলতে কিছুই নেই, ওরা কতদিন আর চালাতে পারবে ?

হেমন্ত বললো, চীন দেবে। চীন এখন ওদের দিকে হেলেছে। চীন যদি এই সুযোগে সিকিম বা আসামের দিকে ইণ্ডিয়াকে আর একবার খোঁচাখুঁচি করে, তা হলে ইণ্ডিয়া বিপদে পড়ে যাবে।

সুবিমল বললো, চীন এখন ইণ্ডিয়াকে অ্যাটাক করতে পারে না। ওসব খবরের কাগজের রটনা। তা ছাড়া চীন পাকিস্তানকে কী অস্ত্র দেবে, ওদের কী স্যাবার জেট আছে, না মিগ আছে ?

পরীক্ষিৎ রাগত স্বরে বললো, আবার ! আবার তোরা ঐ সব ফালতু কথা শুরু করলি। এই, মোছলমানটা গেল কোথায় রে ? তিন চারদিন ওকে দেখিনি।

অবিনাশ বললো, রশীদ ? কোথায় যেন বাইরে যাবে শুনেছিলুম।

সুবিমল বললো, কাল আমি দুপুরে ওকে একবার দেখেছি এসপ্লানেডে।

অবিনাশ বললো, তা হলে কফি হাউসে এলো না কেন ? তোরা তো কেউ রাজি হলি না, রশীদ সঙ্গে থাকলে আজ আমি নির্ঘাৎ অদিতির কাছে গিয়ে কথা বলতুম।

—তুই এখনো সেই মেয়েটার কথা ভেবে যাচ্ছিস ? সে এতক্ষণ বাড়িতে পৌঁছে, কাপড়-টাপড় বদলে...পুরোনো হয়ে গেছে।

হেমন্ত বললো, অদিতি নামের মেয়ের সঙ্গে অবিনাশ নামের কোনো ছেলের কক্ষণো ভাব হতেই পারে না। আমার মতন তিন অক্ষরের নাম চাই। আজ অদিতি বাই চান্স এখানে এলে ওকেও গাঁজা খাওয়াতুম। ভেবে দ্যাখ, ওর বুকের কাছ দিয়ে ধোঁয়া গড়িয়ে যেত, দেবী সরস্বতীর হাতে পদ্মফুল !

পরীক্ষিৎ চমকে গিয়ে বললো, অ্যাঁ, কী বললি ?

হেমন্ত ভালো করে চাইতে পারছে না, কষ্ট করে চোখ বড় বড় করে বললো, কী বলেছি, ভুল কিছু বলেছি ?

—সরস্বতী কোথায় পেলি ? পদ্মফুলই বা কোথায় পেলি গাঁজার ধোঁয়াটা পদ্মফুল হয়ে গেল ?

—হোক না, ক্ষতি কি ? তবে, সরস্বতীর বদলে গায়ত্রী এলেও আমি কম খুশী হতুম না। গায়ত্রীও চমৎকার,কীরকম টিকোলো নাক, ঠিক যেন ডবল গুঁজিয়া !

—বদলে মানে ? সরস্বতীর বদলে মানেটা কী ?

পরীক্ষিৎ আর হেমন্ত দু'জনেরই নেশা ধরে গেছে, অন্যরা হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগলো। হেমন্ত অদিতি নামটা ভুলে গেছে, তার বদলে সে বলছে সরস্বতী এবং জোর দিয়ে বলতে চাইছে, সরস্বতীর বদলে গায়ত্রীরই আজ আসা উচিত ছিল, কারণ গায়ত্রীর নাকের সঙ্গে অন্য কোনো মেয়ের নাকের কোনো তুলনাই হয় না !

তপন উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি এবার চলি। আমাকে অনেক দূর যেতে হবে।

সুবিমল বললো, হ্যাঁ, দমদম, অনেক দূর, শ্যামবাজার থেকে বাস পাবেন ?

তপন বললো, বাস না পেলে হেঁটে যাবো। আমার অভ্যেস আছে !

হেমন্ত বললো, গ্রামের ছেলে, হাঁটার অভ্যেস আছে। নস্টালজিক কবিতা বানাতে বানাতে...যশোর রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে...বর্ডার পার হয়ে একেবারে সরাইল পর্যন্ত...তা ভাই অতদূরে যাবেন, দু'একটা টান দিয়ে গেলে হতো না ?

পরীক্ষিৎ তপনের হাত চেপে ধরে হুকুমের সুরে বললো, হ্যাঁ, দুটো টান দিয়ে যাও ! শুধু মুখে [illegible] যেতে নেই।

খালি পেটে হাঁটতে কষ্ট হবে !

তপন কোনোদিন গাঁজা খায়নি। সে দ্বিধা করতে লাগলো। মানিকদা জানতে পারলে কী বলবেন ? একদিন তিনি বলেছিলেন, আধুনিক কবি-সাহিত্যিকরা অবক্ষয়ী মানসিকতার শিকার ! সে হাত ছাড়িয়ে নিল খানিকটা জোর করেই।

এক সময় এদের আড্ডার দল ভাঙলো। অবিনাশ বললো, আমি একবার রশীদের কাছে যাবো। ছেলেটা স্পাই স্পাই বলে ধরা পড়ে গেল কিনা তার একটা খোঁজ নেওয়া দরকার।

পরীক্ষিৎ বললো, চল আমিও যাবো তোর সঙ্গে।

রশীদ থাকে পার্ক সার্কাসের কাছে একা একটা ঘর ভাড়া নিয়ে। তার বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন সবাই থাকে পাকিস্তানে। সাত-আট বছর আগে সে কলকাতায় বেড়াতে এসে আর ফিরে যায়নি। তার যেতে ইচ্ছে করে না।

রাত বাড়ার পর রাস্তাঘাট জনশূন্য হয়ে এসেছে। পার্ক সার্কাসের দিকটা একেবারে ফাঁকা। মেঘ সরে যাওয়ায় অন্ধকার একটু ফিকে হয়ে এসেছে। সমস্ত বাড়ির দরজা, জানলা বন্ধ। রশীদ থাকে রাস্তার ধারে দোতলার একটা ঘরে। অবিনাশ আর পরীক্ষিৎ ছোট ছোট ইঁট কুড়িয়ে ওর জানলায় ছুঁড়ে মারতে লাগলো।

একটুবাদে জানলা খুলে রশীদ জিজ্ঞেস করলো, কে ?

অবিনাশ বললো, নিচের গেট খুলে দে !

নিচে এসে রশীদ এক গাল হেসে বললো, তোরা এত রাতে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস ? ভয়-ডর নেই ?

অবিনাশ বললো, ভয়ের কী আছে ? দাঙ্গা কিংবা কারফিউ তো না, শুধু ব্ল্যাক আউট !

রশীদ বললো, তোরা জানিস না কী সব কারবার হচ্ছে। এরকম ফাঁকা রাস্তায় লোকজন দেখলে পাবলিক তাদের ছত্রীবাহিনী বলে পেটাচ্ছে। আমাদের কী হয়েছিল শুনিসনি ? খুব জোর বরাতে বেঁচে গেছি। আয়, ওপরে আয় !

ঘরে কোনো খাট নেই, মেঝের ওপর তোশক পাতা আর চারদিকে অসংখ্য বই ও পত্র-পত্রিকা। এক পাশে একটি স্পিরিট স্টোভ, একটা সসপ্যান, দু'চারখানা কাপ-প্লেট। এই নিয়ে রশীদের সংসার। রশীদের কাছে পৌনে এক বোতল হুইস্কি আছে, সেটা দেখে পরীক্ষিৎ যেন ধড়ে প্রাণ পেল। গেলাস মাত্র একটিই, তার থেকেই চুমুক দেবে তিন জন।

রশীদ শোনালো তার অভিজ্ঞতা। শক্তি-সুনীল-শরৎদের সঙ্গে ও গিয়েছিল ঝাড়গ্রাম ছাড়িয়ে বেলপাহাড়ী নামে একটা জায়গায়। কাছেই কলাইকুণ্ডায় এয়ারফোর্সের বেস। ওখানে পাকিস্তানী ছত্রীবাহিনী যে-কোনো সময় নামবে এই গুজবে সবাই সন্ত্রস্ত। অচেনা লোক দেখলেই সন্দেহ। ওরা এসব খেয়াল করেনি, ফাঁকা মাঠে বসে মহুয়া খেতে খেতে গান গাইছিল, হঠাৎ এক বিশাল জনতা ওদের ঘিরে ধরে। ছত্রীবাহিনীর লোকেরা ফাঁকা মাঠে বসে গান গাইছে কিনা সে প্রশ্ন কারুর মনে এলো না, হিংস্র জনতা শেষ পর্যন্ত হয়তো ওদের লীনচ করে ফেলতো, মাঝখানে দু'এক জনের হস্তক্ষেপে ওদের কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হলো থানায় !

অবিনাশ ভুরু তুলে বললো, কী সর্বনাশ, রশীদ, তুই-ও ওদের সঙ্গে গিয়েছিলি কোন আক্কেলে ? তুই যে সত্যিই পাকিস্তানী ! ওরা যদি তোর প্যান্টুল খুলে মিলিয়ে দেখতো ?

রশীদ বললো, শরৎদা আমার নাম করে দিল রতন চৌধুরী। আমাকে ওরা কিছু বলার আগে শরৎদা নিজের প্যান্টের বোতাম খুলে...

তিনজনে হাসতে লাগলো তুমুল মজায়। যেন এটা কোনো বিপদের গল্পই নয়। যেন পুরো যুদ্ধটাই একটা হাস্য কৌতুকের ব্যাপার।

পরীক্ষিৎ এক সময় পকেট থেকে অবশিষ্ট গাঁজার পুরিয়াটা বার করে বললো, আমি আজ রাত্তিরে আর বাড়ি ফিরছি না। রশীদ, আমি তোর এখানেই থাকবো।

ছবি : অনুপ রায়

(ক্রমশ)

প্রতিবাদী সাহিত্য

ওলে সোইঙ্কা

বাক্যের স্বাধীনতাই মানুষের সবচেয়ে বড় স্বাধীনতা এই কারণে যে মানুষ কী ভাবে বেঁচে থাকে সেটা বড় কথা নয়, সে কী ভাবে বাঁচতে চায় সেটাই বড় কথা। আর এইজন্যেই সে পশুজীবনের এক মাত্রা ওপরে তার অবস্থান। এই স্বাধীনতার অধিকার থেকেই কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে বঞ্চিত করে রাখার চেষ্টা চলছে আফ্রিকায়। আর এই অধিকার অর্জনের জন্যে সে দেশের লেখকরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। প্রতিদিনের সব রকমের নির্যাতন বরণ করে নিচ্ছেন তাঁদের জীবনে।

বোবার শত্তুর নেই বলে একটা কথা আছে। কিন্তু সাংবাদিক বা লেখকরা কেউ বোবা নন। বোবামির অর্থ তাঁদের কাছে বোকামি। লেখা তাঁদের অনেকেরই কাছে জীবিকার চেয়ে বড়, লেখা তাঁদের জীবন। লেখা সেই গভীর অর্থে তাঁদের বাঁচার উপায়, সামষ্টিক দৃষ্টিতে বাঁচাবার উপায়ও বটে। তবে লেখার ইতিহাসে 'মা লিখ' এই আপ্ত বাক্যটিও যুক্ত হয়ে গেছে একদিন। কথাটা সর্বজনের জন্যে না হলেও কারো-কারো জন্যে অবশ্যই। আর সেই কথা অমান্য করার ফলেই লেখকদের নানাবিধ নির্যাতন ভোগ করতে হচ্ছে স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে। অন্তত সম্প্রতি আফ্রিকার কৃষ্ণকায়দের জীবনে যে এর ফলে দুর্গতির অন্ত নেই সে-কথা বলা যায়।

সম্প্রতি পূর্ব আফ্রিকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখক, কেনিয়ার ন্গুগি ওয়া থিয়াংগো পশ্চিম আফ্রিকার আর এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য লেখক ওলে সোইঙ্কার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন যে, এটা নিশ্চয়ই ভাল ব্যাপার যে, আফ্রিকার বৌদ্ধিক সৃষ্টি স্বীকৃত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে আফ্রিকার অনেক লেখক ও বুদ্ধিজীবী যাঁরা ওলে সোইংকার ঐতিহ্যের অনুগামী তাঁরা এই মুহূর্তে কারাগারে আবদ্ধ রয়েছেন।

অর্থাৎ এই পুরস্কার আফ্রিকাবাসী লেখক সমাজের কাছে তিক্ত উপহারের মত। ন্গুগি এবং ওলে দুজনেই ভিন্ন কারণে এবং ভিন্ন সময়ে হলেও দেশের জেলখানায় কাটিয়েছেন। উপন্যাস নাটক ও ছোটদের জন্যে লেখা কুড়িটি গ্রন্থের রচয়িতা ন্গুগি বলতে গেলে ১৯৭৮ সালের গোটাটাই জেলের ভেতর কাটিয়েছেন। তাঁর কারাবাসের কারণ ছিল ইংল্যান্ডে প্রকাশিত 'পেটালস অব ব্লাড' নামক উপন্যাসটি। এই উপন্যাসে কেনিয়ার ঔপনিবেশোত্তর রাজনীতি অর্থনীতির অভিজাত মানুষদের দেখানো হয়েছে সাধারণ মানুষের শোষণকারী হিসেবে। জেল থেকে বেরিয়ে ন্গুগি নাইরোবীর উত্তরবর্তী লিমরু শহরের এক নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালনায় তাঁর উদ্যম নিয়োগ করেছিলেন। ১৯৮২ সালে সরকার নাট্যদলটিকে নিষিদ্ধ করেন। কারণ, এঁরা রাজনৈতিক নাটক মঞ্চস্থ করে চলেছিলেন। গ্রেপ্তারের ভয়ে ন্গুগি স্বভূমি ত্যাগ করলেন। বর্তমানে ৪৮ বৎসর বয়স্ক এই লেখক তাঁর স্ত্রী ও ছটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে লিমরুতে বাস করছেন।

তদ্দেশীয় প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে জানতে চাওয়ায় ওয়াশিংটনস্থ কেনিয়ান এমব্যাসির কাউনসেলর গ্রীন এইচ ও জোশিয়া বলেন যে, ন্গুগি এবং অন্যান্য কেনিয়ার বুদ্ধিজীবী যাঁরা স্বেচ্ছা নির্বাসনে রয়েছেন তাঁরা যখনই কেনিয়ায় ফিরে আসবেন, সেখানে স্বাগতই হবেন।

কিন্তু গত জুলাইতেই এক কেনিয়ান সাংবাদিক যখন তাঁর স্বেচ্ছা প্রবাস থেকে স্বদেশে ফিরে গিয়েছিলেন, তাঁর অভিজ্ঞতা কিন্তু কোনক্রমেই মধুর হয়নি। শেষ পর্যন্ত তাঁর কেনিয়ার নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে তাঁকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে।

গোটা আফ্রিকাই এখন কারারুদ্ধ লেখকে ভরা। সোমালিয়ায় কবি আবদুল্লা তারাওয়ে নির্দিষ্ট অভিযোগ কিংবা বিচার ছাড়াই ১৯৮২ সাল থেকে আটক আছেন। উগান্ডায় 'দি সিটিজেন' সংবাদপত্রের সম্পাদক অ্যান্টনি শেকওয়েআমা গত অক্টোবরে ধৃত এবং দেশদ্রোহিতার দরুন অভিযুক্ত হয়েছেন।

ইথিওপিয়ায় আর এক হতভাগ্য সাংবাদিক, মার্থা কুমসা ১৯৮০ সাল থেকে বিনা বিচারে এবং অভিযোগে আটক হয়ে আছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায়, কৃষ্ণাঙ্গ পরিচালিত সংবাদ সংস্থা ভেরিটাস নিউজ-এর দুই সাংবাদিকের কপালেও একই বিড়ম্বনা জুটেছে। গত জুনের মাঝামাঝি থেকে তিনি নির্বিচারে বন্দী আছেন। ন্গুগির মতে লেখকদের ক্ষেত্রে মানবিক অধিকার সংক্রান্ত পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে, বিশেষ করে কেনিয়ায়। এক পার্টিতে ককটেল ন্যাপকিনে কারারুদ্ধ কেনিয়ান লেখক ও সাংবাদিকদের নামের তালিকা লিখে দিতে দিতে নিউইয়র্ক টাইমস সার্ভিসের প্রতিনিধিকে তিনি বললেন, "It's not safari land, it's not 'Out of Africa'."

কেনিয়া সাংবাদিক সঙ্ঘের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ওতিয়েনো ম্যাক ওনিয়াঙ্গো ১৯৮২ সাল থেকে নির্বিচারে অবরুদ্ধ। আর এক সাংবাদিক ওয়াহোমা মুতাহি-ও গত অক্টোবর থেকে। সাংবাদিক মেইনা ওয়া কিনিয়াত্তি-র অবশ্য ১৯৮২ সালে ছ বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল গণবিক্ষোভকারী সাহিত্য মজুত রাখার অপরাধে।

তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই। যদিও কেনিয়ান এমব্যাসীর সেই পূর্বোক্ত ভদ্রলোক অবশ্য এই অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। যদিও আমরা জানি, যা রটেছে তার শুধু কিছু নয়, অনেক বেশীই বটে—এটাই ঘটনা। দেশান্তরে প্রকাশিত 'কেনিয়া নিউজ'-এর একটি সাম্প্রতিক সংখ্যায় ৩৯ জন কেনিয়াবাসীর নাম ছাপা হয়েছে। এ বছরই যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে রাজদ্রোহী বইপত্র সংরক্ষণ ও প্রকাশনের অভিযোগে।

বর্ণবিদ্বেষের এই অন্ধ অসহিষ্ণুতা ও নিপীড়ন যতই বাড়তে থাকবে, ততই তাদের অন্তঃসার শূন্যতা ও দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়তে থাকবে।

আজকের দিনে এই গোঁড়ামি, এই মানবিক কুসংস্কার এবং অহঙ্কার শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকবে না। কালোছায়া দেখে আঁতকে ওঠার দিন খুব দূরে নয়। প্রতিবাদী সাহিত্যের মধ্য দিয়ে একটা অদৃশ্য মানবের জন্ম হতে শুরু করেছে, অধিকারবোধ জেগে উঠছে ধীরে ধীরে। বিচিত্র এই আজকের বিজ্ঞানচেতন, বিশ্বসমাজ, যার একদিকে চলেছে কৃষ্ণভজনা অন্যদিকে কৃষ্ণবিতাড়ন ও বিভাজন। এই শ্বেতচর্মরোগের কন্ডূয়ন আর কতদিন চলবে?

সংক্রান্ত সংবাদ

শিশু তথা কিশোর সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের সর্বপ্রকার উন্নতি বিধানের কর্মসূচী নিয়ে দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর আগে শিশু সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয় (১৩৫১ সন)। প্রতিভাশালী শিশু সাহিত্যিকদের সম্মান প্রদর্শন এবং দুঃস্থ শিশু সাহিত্যিকদের সাহায্যদান এই পরিষদ নিয়মিতভাবে করে থাকে। এদেরই উদ্যোগে নিখিল বঙ্গ শিশু সাহিত্য সম্মেলন হয়ে থাকে। দু'দিনব্যাপী (১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর ৮৬) পঞ্চবিংশ নিখিল বঙ্গ শিশু সাহিত্য সম্মেলন হয়ে গেল মৌলালীর রাজ্য যুব কেন্দ্র অডিটোরিয়াম-এ। দু'টি অধিবেশনের নির্বাচিত সভাপতিই আসতে পারেন নি। প্রথম অধিবেশনের সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র-র অনুপস্থিতিতে পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী এবং দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি অমিতাভ চৌধুরীর অনুপস্থিতিতে ধীরেন্দ্রলাল ধর যথাক্রমে দু'টি অধিবেশনের

সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বৃষ্টি-বাদলার জন্য সভার উপস্থিতি ছিল স্বল্প।
শৈল চক্রবর্তী তাঁর আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং সেখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা বলেন। শিশু সাহিত্যে রূপকথার স্থান সম্পর্কে বলেন গৌরী ধর্মপাল। পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রমুখ শিশু সাহিত্যিকদের কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পদক প্রদান করা হয়। পদক ও পদকপ্রাপ্তদের নাম —

(১) ভুবনেশ্বরী পদক : প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৯০) এবং মঞ্জিল সেন (১৩৯১) ; (২) ফটিক স্মৃতি পদক : সলিল লাহিড়ী (১৩৯১-৯২) ; (৩) ধূর্জটি-বারীন স্মৃতি পদক : শ্যামলকান্তি দাশ (১৩৯২) ; (৪) শিশু সাহিত্য সংসদ পুরস্কার : ভবানীপ্রসাদ মজুমদার (লেখার জন্য) এবং অমল চক্রবর্তী (ছবির জন্য) (১৩৯১-৯২) ; (৫) এ কে সরকার পুরস্কার : অমিত চক্রবর্তী (১৩৯২) , (৬) নীপা মিত্র স্মৃতি পুরস্কার : সুরজিৎ রায় (১৩৯১-৯২) ; (৭) অমৃত-কমল পুরস্কার : শৈবাল চক্রবর্তী (গদ্যে) এবং শৈলেনকুমার দত্ত (পদ্যে) (১৯৮৫) (৮) আনন্দবিচিত্রা পুরস্কার : ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য (১৩৯২)।

পুরস্কার-প্রাপকরা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন যে শিশু-সাহিত্যের জন্য তাঁরা সাধনা করে যাবেন।
উদ্বোধনী সঙ্গীতে ছিলেন উপেন্দ্র মল্লিক। দ্বিতীয় অধিবেশনে মল্লিক মহাশয় স্বরচিত কয়েকটি হাসির ছড়া শুনিয়ে শ্রোতাদের তারিফ কুড়িয়ে নেন।

মূষিক ও মানুষ

এই সমালোচককে কয়েক মাস আগে লেখা একটি চিঠিতে গুন্টার গ্রাস জানিয়েছিলেন, "আমার সাম্প্রতিকতম উপন্যাস 'ডি র‍্যেটিন' (নারী ইঁদুর) প্রকাশিত হয়েছে এবং বইটিকে কেন্দ্র করে বিতর্কের ঘূর্ণিঝড় উঠেছে।" এ মন্তব্য আমায় বিস্মিত করেনি কারণ বিতর্কের পুরুষ ও স্রষ্টা গ্রাস-এর সাহিত্য কখনোই মোলায়েম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টির জন্য নয়। তবে এবার বাদপ্রতিবাদ উঠেছিল চরমে যেহেতু অন্যান্য সব আংশিক বিষয়কে উপেক্ষা করে ঔপন্যাসিক 'নারীইঁদুর'-এ মানবসমাজের সামগ্রিক সম্ভাব্য ধ্বংসের পরিণতি এঁকেছেন এবং তা-ও আবার মানুষ ও মূষিকের ভিতর এক অভাবনীয় কথোপকথনের মধ্য দিয়ে।
ইঁদুরের বক্তব্য হল, "মানুষ, তোমার বিনাশ অনিবার্য কারণ অপেক্ষমান ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হবার জন্য যে সাহসের প্রয়োজন তা তুমি হারিয়েছ, তুমি ভীরু, তোমার ইতিহাস সমাপ্ত।" আর মানুষ-বক্তা যতই এই অভিযোগের শিকল কাটিয়ে উঠতে চাইছে ততই সে জড়ো করছে বিনাশের দৃষ্টান্ত এবং ততই সে এগিয়ে যাচ্ছে অবলুপ্তির দিকে। মারণাস্ত্রের সম্ভারের উৎপাদক মানুষ, প্রকৃতির হন্তারক মানুষ, সীমাহীন শোষণ ও বৈষম্যের জনক মানুষ জেনেশুনেই রচনা করছে তার সর্বব্যাপী সমাধি।
যে মুহূর্তে গ্রাস তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে এই উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ ম্যাক্স মুলার ভবনে সে-সন্ধ্যায় পাঠ করতে শুরু করলেন তখনই মনে হচ্ছিল তিনি তাঁর লেখায় কোন ভাবসর্বস্ব অতিশয়োক্তি করেননি। উপন্যাসটির প্রথম কয়েকটি কথা, "আমি বড়দিনে একটি নারী ইঁদুর চেয়েছিলাম···আমার ইচ্ছার পূরণ ঘটল··· বড়দিনের গাছের তলায় একটি নারী ইঁদুর আমায় অবাক করল।" ক্রমশ তার আপাতশান্তি হারিয়ে ব্যাপ্ত হতে থাকে এবং ক্ষুদ্র উপকারই হয়ে ওঠে নির্মম বিচারক। শুধু শেষে পঠিত কবিতাটি, যা কি না উপন্যাসেরই অবিভাজ্য অঙ্গ, এই ঘোরকৃষ্ণ পরিবেশেও এক বিষণ্ণ গম্ভীর লিরিক মাত্রার সংযোজন করে, প্রাণিত করে এক শ্রোতাকে প্রশ্ন করতে, "আশা, আপনার বিশ্বদৃষ্টিতে আশার কি কোন স্থান নেই ?" সঙ্গে সঙ্গে নিক্ষিপ্ত হয় তীক্ষ্ণ উত্তর, "আশা পণ্য মাত্র, সরবরাহ করে পুরোহিত ও রাজনীতিবিদ. আমি আশার ব্যবসা করি না এবং আশা না করেও কাজ করে যাই অনেকটা সিসিফাসের মত।"
গুন্টার গ্রাসের এই নির্ভীক উত্তর ভালো লাগে এবং বিচলিত করে বিশেষ করে যে পরিবহে কুসুমিত মতামতের ম্লান সৌরভ অত্যধিক। 'দ্য টিনড্রাম' ছবিটির প্রদর্শনের আগেও গ্রাস অনুরূপ প্রত্যাশিত স্বরে বলেছিলেন, "আমার উপন্যাস এবং এই ছবি দেখাতে চেয়েছে যে, নাৎসীবাদ সহসা কোন এক দুঃস্বপ্নের মত আমাদের আঘাত করেনি। প্রস্তুতি নিয়েই সে এসেছিল এবং জার্মানিরাই তার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।" গ্রাস-এর মুখেই জানলাম যে আন্দ্রে ভাইদা একসময়ে এই কালজয়ী উপন্যাসটির চিত্ররূপ দিতে চেয়েছিলেন, পারেননি কারণ লৌহ আবরণে আবদ্ধ কর্তৃপক্ষ তাঁকে অনুমতি দেয়নি। অবশ্য তাতে দুঃখিত হবার কিছু নেই কেন না ভোলকার স্লোনডর্ফ উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে গ্রাসেরই ভাষায় "নিজের ইমেজসৃষ্টির মধ্য দিয়ে যে এপিক ছবি" তৈরি করেছেন তা এক কথায় অদ্বিতীয়। শত সংঘাতসহ ইউরোপের একটি জটিল, ক্ষুব্ধ পর্ব এখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে এবং সব কটি অনুভূতিই যেন সন্নিবিষ্ট হয়েছে ক্ষুদে নায়ক অস্কারের মর্মভেদী চাহনি আর ড্রামের আওয়াজে। 'পথের পাঁচালি'-র পিসীর মত এই নায়কের নির্বাচন এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। ম্যাক্স মুলার ভবনে ১৫ ও ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এই দুই সভায় শ্রোতা ও দর্শক উপচে পড়েছিল। বিশ্বখ্যাত ঔপন্যাসিককে এত কাছে পাবার সুযোগটি কলকাতা হারাতে চায়নি। অনেকেই ঠায় দাঁড়িয়ে গ্রাসের উপন্যাস পাঠ শুনেছেন, ভাষার দূরত্ব তাদের বিভ্রান্ত করেনি, এবং পরে নানান প্রশ্ন নিক্ষেপ করেছেন লেখকের দিকে। পশ্চিম জার্মানির সবুজ দলের ভূমিকা থেকে শুরু করে ভারতের দুর্নীতি কিভাবে দূর করা যায়, সব কিছুর জবাবই যেন তিনি দেবেন। যথেষ্ট ধৈর্য সহকারে তিনি ঔৎসুক্য মিটিয়েছিলেন এবং মাঝে মধ্যে তির্যক মন্তব্য করতে ভোলেননি। যথা, "আমাদের সবুজেরা আসলে তোমাদের গান্ধীর অনুগামী, তোমাদের চেয়েও হয়ত-বা বেশী" বা "দুর্নীতি কি পশ্চিম জার্মানিতে নেই ?"
তীক্ষ্ণ-ক্ষিপ্র সংলাপ নেহাতই বহিরঙ্গ। এ দুটি সন্ধ্যায় আসলে কলকাতার মানুষ সেই গ্রাসকেই পেয়েছিলেন যিনি বালজাকের মত একটি উপন্যাসে বিক্ষুব্ধ ইতিহাসকে করধৃত করার অপার ক্ষমতা রাখেন এবং যাঁর কবিতার অন্তরঙ্গ অক্ষরে সার্বিক বিয়োগান্ত বিলুপ্তির কোনো বেদনা ব্যক্ত হয়ে ওঠে, "আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম আমায় বিদায় নিতে হবে, কাছে দূরের সব কিছু থেকে বিদায় নিতে হবে।" গ্রন্থ

যে মুহূর্তে গ্রাস তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে 'নারীইঁদুর' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ ম্যাক্সমুলার ভবনে সে-সন্ধ্যায় পাঠ করতে শুরু করলেন তখনই মনে হচ্ছিল তিনি তাঁর লেখায় কোন ভাবসর্বস্ব অতিশয়োক্তি করেননি। উপন্যাসটির প্রথম কয়েকটি কথা, "আমি বড়দিনে একটি নারীইঁদুর চেয়েছিলাম–আমার ইচ্ছার পূরণ ঘটল–বড়দিনের গাছের তলায় একটি নারীইঁদুর আমায় অবাক করল।" ক্রমশ তার আপাতশান্তি হারিয়ে ব্যাপ্ত হতে থাকে এবং ক্ষুদ্র উপকারই হয়ে ওঠে নির্মম বিচারক।

ইনি এলকো প্রসাধনে বিশ্বাসী

Distributors: Murshidabad — V. V. K. Midnapur — Mohima Distributors. Nabadweep — Mamta Cosmetics. Naihati — C. Ganguly. Purulia Town — P. D. Mall. Ranaghat — Bose Distributors. Serampore — A. B. Udyug. Sonarpur — Urmila. North 24 Parganas — H. B. Singh. South 24 Parganas — P. Bhattac harjee — Mitra Trading.

খতম করে দে !
এক গুলিতেই খতম করব !
!
এক ... দুই ...

হেলোয়াজ আর কিট পাথর-বসানো তীর ছুঁড়েছে
উঃ !

বন্দুকটা !
সরে যা !

বদমাস !
ডায়ানাও ব্ল্যাক-বেল্ট কারাটে
!

জানোয়ার !
!!

বাচ্চাদের গায়ে আর হাত দিবি ?
উঃ !
৪/4

!
দড়াম
ক্রমশ ●৮

বি নো দ ন

সোভিয়েত সার্কাস ও দুটি সন্ধ্যা

শারীরিক কলা-কৌশল যে কত অনায়াসে শুধুমাত্র কসরত প্রদর্শনের সীমানা ছাড়িয়ে নান্দনিক লীলাবিন্যাসের সূক্ষ্ম কারুকার্যে ভরে ওঠে তা প্রত্যক্ষ করা গেল সোভিয়েত সার্কাসের মঞ্চে। সোভিয়েত কলাকুশলীরা যে অসামান্য ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা নিয়ে দর্শকদের মোহাবিষ্ট করে রেখে গেলেন, তার রেশ এখনো মিলিয়ে যায়নি।

প্রথম সন্ধ্যা ॥ ৯ নভেম্বর, রবিবার ॥ সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়েছিল সন্ধ্যা ছটায়। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্স ও অনামিকা কলা সঙ্গম যৌথভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এঁদের যুগ্ম উদ্যোগেই পৃথিবীপ্রখ্যাত সোভিয়েত সার্কাস এবার ভারতে পদার্পণ করেছেন। দিল্লি ও বোম্বে জয় করা হয়ে গেছে। এবার কলকাতা। লিটল রাসেল স্ট্রীটের এক নামী হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলন। বেসমেন্টের বড় ঘরটায় যখন পা রেখেছি, ঘড়ির দুটো কাঁটা তখন সবে তৈরি করেছে লম্বালম্বিভাবে একটা সরলরেখা। তবু ঢুকেই মনে হল, বেশ দেরি। না, অনুষ্ঠান শুরু হয়নি।

কিন্তু বিশাল টেবিলের দু-পাশের চেয়ারে উপচে পড়েছে অপেক্ষমান সাংবাদিক। চেনা গলায় সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন সুভাষ রায়। একটা চেয়ারও জুটিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে বিশাল ফোল্ডারে একগুচ্ছ কাগজপত্র। চারপাশে চোখ বুলোতেই আরও বহু চেনা সাংবাদিকের মুখ। ক্যামেরা হাতে উৎসুক চিত্রগ্রাহীর দল। বোঝা গেল, বড় ধরনের একটি ঘটনা ঘটতে চলেছে কলকাতায়। তারই খোঁজে এত মানুষ।

দোভাষী ইংরেজীতে তর্জমা করে দিলেন, টিম ম্যানেজার বি এম জ্যাৎস রুশ ভাষায় তাঁর বক্তব্য রাখলেন। ভাষণ শেষে পরিচয় করিয়ে দিলেন

সার্কাসের বিভিন্ন শিল্পীদের সঙ্গে। তাঁর ভাষণের শেষে উপস্থিত সাংবাদিকরা কিছু-কিছু প্রশ্নও রাখলেন। সে-সব জিজ্ঞাসার উত্তর থেকে মোটামুটি একটা পুরো ছবি পাওয়া গেল।

এবারের সফররত সার্কাস দলের সদস্য-সংখ্যা ৪৮। এঁদের মধ্যে ৪৩ জন কসরত দেখালেন। সোভিয়েত সার্কাস যখন মস্কোতে হয়, তখন শিল্পী থাকেন ৬০ থেকে ৭০ জন। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিভিন্ন প্রদেশে সার্কাস-শিল্পের প্রশিক্ষণের জন্য স্কুল রয়েছে তিনটি। এর মধ্যে মস্কোর স্কুলই সব থেকে প্রাচীন। তিন জায়গাতেই শিক্ষাক্রম এক ধাঁচের। দু-বছর ধরে চলে দেহকে সব খেলার

উপযোগী রমণীয় করার ও পটুতা অর্জনের বনিয়াদী প্রশিক্ষণ-পর্ব। পরের দু-বছর চলে সুপ্ত প্রতিভা বা বিশেষ প্রবণতা অনুযায়ী আলাদাভা শিক্ষাদান। চার বছর পরে ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। এখন তাঁরা জীবজন্তু নিয়েও খেলা দেখান, কিন্তু এবারের সফরে জীবজন্তু আনেননি। আবহাওয়ার অতিরিক্ত তারতম্যই এ কারণ। এবারের খেলা মুখ্যত হবে অ্যাক্রোবেটিক।

কথা চলছিল। এক সময় ফিসফিস করে পাশে বসা সুন্দরী তরুণীকে প্রশ্ন করলাম, তুমি কী কোনও কাগজের রিপোর্টার, নাকি সার্কাস দলের সঙ্গে এসেছ? মেয়েটি দেখলাম, অল্প অল্প ইংরেজী জানে। চোখের নীল তারায়

ছবি : সুবীর চ্যাটার্জি

লাস্য ফুটিয়ে জবাব দিল, 'আমি এই দলে ম্যাজিক দেখাই।' 'ম্যাজিক? তুমি ম্যাজিক জানো? সোভিয়েত দেশে এখন সব থেকে বড় জাদুকর কে বলো তো?'
ম্যাজিক সম্পর্কে আমার আলাদা দুর্বলতা। তাই পরপর একগাদা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম। মেয়েটি সপ্রতিভভাবে পিছনের সারিতে বসা ঝকঝকে চেহারার এক তরুণের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'আমার স্বামী। আমি আর ও একসঙ্গেই ম্যাজিক দেখাই।' তাড়াতাড়ি হাতের কাগজপত্রে চোখ বুলিয়ে নিতে যাই। তাই তো, এ-দলে দুজন জাদুকরও তো রয়েছেন! এলেনা ভয়মান ও র‍্যাফেল জিটাসভিলি। শুধু তাই নয়, 'আগুনের কবিতা' নামে এঁদের একটি খেলা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হিসেবে পেয়েছে গ্রাঁ প্রী ও সোনার মেডেল। আর কী ছাড়তে আছে! উঠে গিয়ে আলাপ করলাম র‍্যাফেলের সঙ্গে।

র‍্যাফেল পকেট থেকে একটা বেগুনি রুমাল বার করে বাঁ হাতের মুঠোয় ভরল। হাত খুলল। রুমাল বেমালুম অদৃশ্য। নিখুঁত হাত। খেলাটি আগেও দেখেছি। কিন্তু এমন পরিচ্ছন্নভাবে দেখাতে দেখিনি। সম্মেলনের পর পাশের ঘরে ছিল চা-চক্র। লাইনে দাঁড়িয়েছি। নিজে থেকেই হঠাৎ এগিয়ে এল র‍্যাফেল। হাতে তাসের প্যাকেট। 'তাস নাও।' নিলাম। 'দাও!' দিলাম। প্যাকেটটি সাফল করে বাঁ হাতে রাখল র‍্যাফেল। সামান্য উঁচুতে ডান হাত। এক মিনিট শান্ত অপেক্ষা। হঠাৎ প্যাকেট ভেঙে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি তাস এগিয়ে এল আমার দিকে। সেই পছন্দ-করা তাস। দুর্ধর্ষ। এই খেলাটি একেবারে নতুন। প্রত্যাশা বাড়ল। দেখা যাক মঞ্চে কী হয়। বিশেষত, যে-সার্কাসকে অনেকেই আখ্যাত করেছেন 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' হিসেবে।

দ্বিতীয় সন্ধ্যা ॥ নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম। ১৪ নভেম্বর ॥

নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম যখন তৈরি হয়, তখন কী ভেবে যে প্রেস এনক্লোজারটিকে ভি আই পি এনক্লোজারের সম্পূর্ণ উল্টোদিকে রাখা হয়েছিল কে জানে! আর্টিস্টদের মুখ দেখতে পাবেন না সাংবাদিকরা, হয়তো এটাই ছিল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মুখ দেখে যাতে ভালোমন্দ বলতে না পারেন। অথবা, এমনও ভাবা হতে পারে, সাংবাদিক মাত্রেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টির অধিকারী। সিটটি বেখাপ্পা জায়গায়, তার উপর

নাদজেদা জাবোকটিনা

আশেপাশে, প্রেস-এনক্লোজার জুড়ে, কোথাও চেনা মুখ নেই। কোলের শিশু, ভিন-প্রদেশী মানুষ—এরা কী সবাই সাংবাদিক? কে জানে!
মৃদু বাজনা শুরু হয়েছিল অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময়ের মিনিট পাঁচ আগে। বাজনা ক্রমশ উচ্চকিত হল। ঠিক যখন সাড়ে ছটা, দু-হাতে দু-দেশের পতাকা নিয়ে মঞ্চ আলো করে এসে দাঁড়ালেন দুই শিল্পী। পিছনে বাকীরা। অ্যাক্রোবেটিক ভল্টের খেলা দিয়ে শুরু হল সোভিয়েত সার্কাসের প্রথম নিবেদন। মহিলারা যেন স্বর্গের পরী, পুরুষরা দেবদূত। আর কী সব ঝলমলে পোশাক! চোখ জুড়িয়ে যায়।
চোখ জুড়িয়ে যায়, নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখতে হয়—এই হল সোভিয়েত সার্কাসের খেলা সম্পর্কে প্রথম ও শেষ কথা। আশ্চর্য এদের পটুতা, অসামান্য ভারসাম্য। দুজন করে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তাদের সম্মিলিত হাতে লাফ দিয়ে এসে দাঁড়াচ্ছেন তৃতীয়জন। মাটিতে, টেবিলে। দুটো টেবিলের দূরত্ব ক্রমশ বাড়ানো হল। পরীদের মতোই উড়ে জায়গা বদল করলেন দুই রমণী।
অ্যাক্রোবেটিক ভল্ট শেষ হতেই মাইকে প্রথমে রুশ ভাষায়, পরে ভেঙে-ভেঙে বলা বাংলায় ও শেষে ইংরেজিতে ভেসে উঠল সাদর সম্ভাষণ। নমস্কার মাননীয় বন্ধুরা, ভালবাসার টানে এসেছি আমরা, এসেছি শান্তি, বন্ধুতা ও আনন্দের জন্য।
এরিয়াল জিমনাসিয়াম ছিল পরের খেলা। শাদা সিল্কের ওপর কমলা ও সোনালি কাজ-করা পোশাক পরে নাজেদদা কাপুসটিনা শূন্যে যখন দোল খেতে লাগলেন, কখনো হাত ছেড়ে, কখনো দোলনা ফেলে তারের উপর শরীর ঝুলিয়ে, কখনো-বা লাট খেয়ে সারা প্রেক্ষাগৃহ

বিস্ময়ে-রোমাঞ্চে ফেটে পড়েছে। সিঙ্গল ট্রাপিজের খেলা হলেও যথেষ্ট শিহরন-জাগানো।
ঢুকলেন ড্যান্স-জাগলার ভলাদিমির কুলাকভ। মঞ্চ ছেড়ে খোলা আঙিনায় এসে শোনালেন জুতোর তলায় রাখা বাজনা। আর সাইকেলের চাকার মতো পাঁচটি গোল বেড় দিয়ে দেখালেন নানা ধরনের কৌতূহলকর জাগলিং।
মঞ্চ একটু অন্ধকার হয়ে এল। আর সেই আধো-অন্ধকার মঞ্চে ঢুকলেন জাদুকর-দম্পতি। প্রথমে র‍্যাফেল। তাঁর হাতে জলন্ত ফুলঝুরি। একটি ছিল, দুটি হল, দুটি চারটি। পিছনে এলেনা ভয়মান, হাতে দুটি মশাল। একটি নিবলেই অন্যটি জ্বলে উঠছে। কোথা থেকে বেরুল আগুন-জ্বলা পাত্র। চাপা দিতেই ফুল। আবার জ্বলল আগুন। ফের চাপা দেওয়া

দর্শক গ্যালারির শেষ প্রান্ত থেকে একজন ছুঁড়ে দিচ্ছে টুপি, অন্যজন সরাসরি মাথায় গ্রহণ করছে সেই টুপি। এমন বিস্তর কাণ্ডকারখানা। সরস, পটুত্বময়।
ব্যালেন্সের খেলা দেখালেন এক পুরুষ ও এক রমণী। 'দি ভিকলুকস'। চমৎকার খেলা। এটির রেশ ফুরোবার আগেই আরেক বিস্ময়-বালিকা নাদজেদা জাবোকটিনা এলেন হুলাহুপের খেলা নিয়ে। সারা শরীরের উপর কী অদ্ভুত নিয়ন্ত্রণ। পাঁচ-পাঁচটি রিংকে সারা শরীরে সমান দূরত্বে ছড়িয়ে ঘোরাচ্ছেন। নৃত্যপর অবস্থাতেই একটি একটি করে ফেলে দিচ্ছেন দূরে, একটি একটি করে তুলে নিচ্ছেন দেহে। এটি যেমন অন্যতম আকর্ষণ, তেমনই আরেকটি একক খেলা তামারা পুজানভের 'অ্যান্টিপোড'। মস্কো স্টেট সার্কাস ও

অ্যাক্রোবেটিক ভল্ট

হল। এবার বেরুল লাল রুমাল। লাল রুমাল থেকে আরও তিনটি রুমাল। আলাদা আলাদা, বিশাল চার রঙের চারটি রুমাল। চোখের পলকে রুমালগুলোতে গিঁট পড়ল। চারটিই জুড়ে গেল পরপর। এরপর 'ড্যান্সিং কেন'। দুটি জাদুদণ্ড নিয়ে দুজনের অলৌকিক কাণ্ডকারখানা।
ম্যাজিকের পরপরই নতুন উল্লাস। দুই বিদূষক নেমে এলেন দর্শক-গ্যালারি থেকে।
আলেকজাণ্ডার ডায়মন্ড ও জুরি এরমাকেনকভ।এঁরা একাধারে জাদুকর, ভাঁড়, জিমন্যাস্ট। মোট ছ-বার আসেন এঁরা দেড় ঘণ্টার প্রদর্শনীতে। ছ-বার হয়তো এই অনুষ্ঠানের পক্ষে একটু বেশিই। তবু এঁদের নৈপুণ্য প্রশ্নাতীত। এ সিগারেট খাচ্ছে, ওর মুখে ধোঁয়া। এ জল খাচ্ছে, ওর মুখে ফোয়ারা।

ভ্যারাইটি আর্ট স্কুল থেকে ১৯৮৩ সালে স্নাতক হয়েছেন পুজানভ। আন্তর্জাতিক সার্কাস প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী হয়ে খেতাবও পেয়েছেন এরই মধ্যে। পুজানভ দেখালেন শুধু পায়ের নিয়ন্ত্রণে বলের খেলা। বিশাল রডের উপর পাঁচটি থাক। ডানদিক বাঁদিক করে রাখা। একেবারে শীর্ষে একটি ঝুড়ি। পা দিয়ে রডটিকে ধরে রাখলেন পুজানভ, তারপর বলটিকে এ-থাক থেকে ও-থাকে নিয়ে গিয়ে পাঠালেন একেবারে শেষের ঝুড়িতে। এটিও স্মরণীয় খেলা।
আরও বহু অ্যাক্রোবেটিক খেলা দেখা গেল। ভি এরমাকভ-এর পরিচালনায় একটি লাঠির উপর ডিগবাজির কসরত দেখালেন আনা স্টুডেনভা। অ্যাক্রোবেটিক 'কার্নিভাল' ও ডিগবাজির দর্শনীয়

কসরতে ভরা। জুরি পোপভের নেতৃত্বে স্প্রিং-আঁটা জালের উপর ডিগবাজির খেলাও দুর্ধর্ষ। শুধু দেখা গেল না, তাতিয়ানা ডায়াকোভস্কির 'ডায়াবোলো গেম'। তিনি বোধ হয় অসুস্থ। এমনিতেই মাত্র বারটি বৈচিত্র্য। তার থেকেও যদি বাদ যায়, মন খারাপ লাগবেই।

খেলা শেষ হল আটটা পাঁচে। বেরুতে গিয়ে মনে হল, যা দেখলাম, তুলনাহীন। কিন্তু বড্ডই যেন কম। কানায় কানায় ভরা, তবু পাত্রটি বেশ ছোট।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

রে ক র্ড

চোরাবালি ও বহতা নদী

আধুনিক বাংলা গান যাঁর আশায় থাকে দিনবদলের জন্য সেই সলিল চৌধুরীর গান মাত্রই পুজো বোনাস, তবে আগের উপহারের রকমফের। অরুন্ধতী হোমচৌধুরী গেয়েছেন খুব ভাল, বহু পুরোন গানের রূপান্তর নতুনভাবে ভাল লাগায়। "স্মরণ নদীর পাড়ে" গানটির চলন পূর্বপরিচিত—কিন্তু শব্দচয়ন, ছন্দের কারিগরি আবার নতুন করে পরিচয় করায়। ওয়ালজ ছন্দে "মন মাতাল সাঁঝ সকাল" সুরের চলনটি অবশ্য সলিল চৌধুরির কাছে নতুন, বাংলা গানে নয়। "কেন ঘুম আসে না"

অরুন্ধতী হোমচৌধুরী

গানের প্রিলিউড অংশটি অভিনব—তার পরেই সুরের গঠনটি পুনরাবৃত্তি। "আর বুঝিতে পারি না" গানের চলন ছন্দবিভাগ কিছুদিন আগেই ব্যাপিকা বিদায় ছবিতে "এই বাগানে ফুল তোলা মানা" গানে পাওয়া যায়। প্রতিটি গান অরুন্ধতী হোমচৌধুরী গেয়েছেন স্বাভাবিক নৈপুণ্যে। সম্পূর্ণভাবেই সুরের বাঁকগুলি ঠিকমত ব্যবহার করেছেন। "এলরে, এল" এলোমেলো গানের ইন্টারলিউড, কাউন্টার পয়েন্ট যেন বহু "পূর্ব স্মৃতি সম হেরি ওকে।" প্রতিটি স্রষ্টার একটা প্যাটার্ন থাকে, ঘরানা থাকে—এই প্রক্রিয়াকে কিন্তু তা বলা যাবে না। স্পষ্টত-ই ঘরের ফার্নিচার জায়গা বদল করে নতুন করে ঘর সাজানোর মত। "তুমি যদি নদী হতে" গানটি মনে হবে প্রেমের গান। শেষ পংক্তিতে এসে "মরণ বরণ করে ধন্য হতাম, আমি শহীদ হতাম" একটি নাটকীয় মোড় নেয়। কথার দিক দিয়ে এই ধরনের গান ছিল "শ্যামল বরণী ওগো কন্যা"। "রিম ঝিমঝিম" অবশ্য সলিল চৌধুরীর হাতে নতুন কিন্তু "চলে যে যায় দিন" সম্পূর্ণ দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সংস্করণ।

এবারের গানে "দুস্তর পারাবার," "গীত হীনা," "প্রাণবীণা," "ছেঁড়া পান," "ভাঙাহাল" শব্দগুলি অনেক পুরোন গান মনে করিয়ে দেয়। আবার "তাথৈ ছন্দে" কিংবা দহনের সঙ্গে মিল দিয়ে "কহন" শব্দের অন্ত্যমিল আচমকা জানিয়ে দেয় সলিল চৌধুরীই সেই গীতিকার ও সুরকার যিনি এখনও হাল ধরতে জানেন—গুণ টেনে নৌকা নিয়ে যেতে হয় না।

ছন্দ ও সুরের বৈচিত্র্যের জন্য রাহুল দেব বর্মণের সর্বভারতীয় স্বীকৃতি। এবারে একটি ক্যাসেটে তিনি ও আশা ভোঁসলে আটটি গান গেয়েছেন। "ফিরে এলাম" গানের প্রিলিউডে একটি ছন্দ গানে আর একরকম, অথচ অবলীলায় তা মিশে গেছে। দ্বৈত কণ্ঠে গানের যে চলন, সেটা রাহুল দেবের ঘরানার। লোকগীতির আঙ্গিকে আশা ভোঁসলে গেয়েছেন "খুব চেনা চেনা মুখ খানি তোমার"। গানটির প্রথমে সংলাপ জরুরি নয়, শুধু একটু ফিল্মের আমেজ আনে। সুরের চলনটি কিন্তু "ঝুমকা গিরারে" গানটিকে মনে করিয়ে দেয়। উপসংহারে "মনে পড়েছে তোমায় দেখেছি কোথায় আমার স্বপনে"—একটি নাটকীয় বাঁক, সুরে সুচিন্তিত নয়। আশা ভোঁসলে দাপটে গেয়েছেন "বাঁশি শুনে কি ঘরে থাকা যায়।" চমক লাগে রাহুল দেববর্মণের গানে। "নদীর পাড়ে উঠছে ধোয়া" গানটির শিকড় শাস্ত্রীয় সংগীতে, কিন্তু বিচিত্রভাবে তাকে গাওয়া হয়েছে। অপূর্ব ছন্দ বিভাজন—নানারকম স্টাইল এসে মিশছে, আবার স্বভূমিতে প্রত্যাবর্তন। যদিও প্রিলিউডে ও এক জায়গায় বর্ষার আক্ষরিক শব্দকল্প অহেতুক—তবু গানটি নিজের গুণেই মনে রাখবার মত। "না ডেকো না" অথবা "বঁধুয়া রিমঝিম শ্রাবণে" গানদুটি ভাল না লাগার কারণ গানের কথা। স্বপন চক্রবর্তীর কথায় "একটু থেকে যাও", "কেন শুধু পিছে ডাক" "বকুল মালা রেখেছি গাঁথিয়া" এইসব শব্দ বা বর্ষায় "পিউ কাঁহা" শুনতে শুনতে এখন প্রেমিকেরও ক্লান্তি লাগে। রাহুল দেব বর্মনের "শোন এই তো সময়" বিদেশী সুর থেকে আহৃত। কিন্তু শুধুই সুরে কথা বসানো। এইখানেই সলিল চৌধুরীর সাথে রাহুল দেববর্মণের তফাৎ। সলিল চৌধুরী আর্কিটেক্ট ; রাহুল দেববর্মণ ভাল ইনটিরিয়র ডেকরেটর।

মান্না দে একখানি ক্যাসেটে দশখানি গান গেয়েছেন। কণ্ঠের ওজস্বিতা অনেকটা কমে এসেছে। কিন্তু সুরকার প্রভাস দে এবং সুপর্ণকান্তি ঘোষ এমনভাবে সুর করেছেন যেন পুরোন গানের মেজাজ ফিরে আসে। "মিষ্টি একটা গন্ধ রয়েছে" গানে একটি রোমান্টিক মেজাজ। "এলোমেলো করে ছড়ানো ছিল যা" স্বর বিন্যাসেই ছবি হয়ে ওঠে। কথা ও সুরের এই বিবাহিত সম্পর্ক বাংলা গানের প্রাণভোমরা। ইদানীং বাংলা গানে "ফুলদানি" শব্দটি প্রায়শই ব্যবহৃত। সুপর্ণকান্তি ঘোষের সুর দেওয়া "যদি প্রশ্ন করি" গানটিও বাংলা গানে তুলনামূলক আলোচনার বিভাগে পড়ে। মান্না দে মেজাজে গেয়েছেন, যদিও মন্দ্রসপ্তকে একটু অস্বস্তি আছে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথা ও সুপর্ণকান্তি ঘোষের সুর কোনটিই "অনেক কথা বলেও তবু" গানটির একঘেয়েমি কাটাতে পারে না। এই ধরনের কথার একঘেয়েমি জহর দের কথায় এবং প্রভাস দের সুরে "সে কি ভোলা যায়" গানেও আছে। সুপর্ণকান্তি ঘোষ দুই চার ছন্দে "আমি সারারাত শুধু যে কেঁদেছি" গানটিকে প্রাণবন্ত করেছেন।

মান্না দে

সুপর্ণকান্তি ঘোষ প্রতিটি গানের অন্তরার শেষ লাইনে রাগমিশ্রণ ঘটিয়ে একটি সুন্দর মোচড় আনেন। যেটা সবচেয়ে কার্যকরী হয়েছে দীপঙ্কর ঘোষের কথায় "সোনালী রঙ মেঘে" গানে। মান্না দের গাওয়া গানে সবচেয়ে ভাল লাগে প্রণব রায়ের কথার ও প্রভাস দের সুরে "এত ভালবেসে তবু মিটিলো না সাধ", দেশরাগ ভিত্তিক এই গানে পুরোন মান্না দেকে মনে আসবেই। ওয়ালজ ছন্দে "এই আছি বেশ, শুরুতেই হোক শেষ" গানে সুপর্ণকান্তি ঘোষের সুরের থেকেও তাঁর সুরে আর একটি গান "আমার চোখে বর্ষা বুকে ঝড়" বেশি বাঙালীর মেজাজের কাছাকাছি—মান্না দে এই সব গানে অনন্য। "এই জীবনের বেশিটাই দুঃখ" গানে প্রভাস দের সুরে "সেই তো আবার ফিরে এলে" গানের ছায়া আছে—কিন্তু শ্যামল গুপ্তের কথা এই গানটিকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। "যদি ক্ষণ তরে বিরহের দহনে/আনে মিলনের অমৃত লাবণ্য/জানি সে গান আমার হবে ধন্য" এমনভাবে সুর করা হয়েছে, যা গান শেষ হওয়ার পরে রেশ রাখে।

উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পেয়ে অনেকে সমৃদ্ধ হন। কেউ সঞ্চিত মূলধন ব্যবহার করতে না পেরে বিপত্তি ডেকে আনেন। অমিতকুমার দ্বিতীয় গোত্রের। শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় তিনি সুর দিয়ে গেয়েছেন কিন্তু কোন গানই ছাপ ফেলে না। কণ্ঠের ঐশ্বর্যে তিনি সমৃদ্ধ। কিন্তু "বৃষ্টি বৃষ্টি" গানে সুরের যথেচ্ছাচার। নানারকম সুর মিশে, মূল উৎস থেকে অনেকখানি দূরে সরে যায়। "কেন সে যে সকাল বিকেল পাগল করে" বাঙালীকে শুনতে হয়। এতবড় দুর্ভাগ্য আর হতে পারে না। নানারকম বিকৃত কণ্ঠস্বরে 'কাছে পেলে ঝামেলা" লাইনটি শ্রোতার পক্ষে সত্যি হয়ে ওঠে। সকলেই বলেন "ও বাবা বাঁচারে আমায়"- এর সঙ্গে আছে শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শৌখীন মজদুরী গানের কথায় অনর্থক ২৫শে বৈশাখ ২২শে শ্রাবণ জুড়ে দিয়ে আধুনিক হওয়ার চেষ্টা, "কেউবা হোক গান্ধী সুভাষ, কেউ বা হোক 'রবীন্দ্রনাথ" বলে প্রগতিবাদী হওয়ার প্রবণতা। কথা সুর কখনই মেলে না,

তাই স্থায়ী হয় না। "আকাশে তাকালাম মাটিতে তাকালাম" শুধু পরীক্ষাই হয়ে থাকে। অনুপ ঘোষাল গেয়েছেন নাটকের গান। গানগুলি কোনভাবেই নাটকীয় হয়ে ওঠে না, একমাত্র "ওঠানামা প্রেমের তুফানে" কথা ও ক্লারিওনেটের জন্য কিছুটা স্মৃতি আনে। দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি গান আছে, সেগুলি নাটকের পরিবেশও গড়তে পারেনি। দ্বিজেন্দ্রগীতির বৈচিত্র্যই সেখানে অনুপস্থিত। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কথা ও কৃষ্ণচন্দ্র দের সুরে "সীতা" নাটকের গান "অন্ধকারে অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে" গানটির শেষ অন্তরা "কোথায় সীতা কোথায় সীতা" অংশ ছাড়া সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথের "যখন তুমি বাঁধছিলে তার গান" থেকে নেওয়া, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র দের গায়কী শুনে চেনা দুষ্কর। অনুপ ঘোষালের গানে রবীন্দ্রসংগীতই ধরা পড়ল। গান ছবিকে মনে রাখতে সাহায্য করে, এ কথাটা আবারও মনে করিয়ে দিলেন ভি বালসারা। এখনকার ছবির সুরকাররা হয়ত একবার আত্ম বিশ্লেষণ করবেন। বালসারা বাজিয়েছেন ইউনিভক্স, অ্যাকর্ডিয়ন, মেলোডিকা, পিয়ানো এবং একটি গানে হারমোনিয়াম। ফিল্মের গানের শর্তই হল সহজ হলেই জনপ্রিয় হয়।

অথচ নচিকেতা ঘোষের সুরে "বন্ধু" ছবির গান "মৌ বনে আজ মৌ জমেছে" মোটেই সহজ না; অথচ আজ এতদিন বাদেও রোমাঞ্চিত হই। "ভুল সবই ভুল" (সুর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়) গানটি ইউনিভক্সের বদলে অন্য যন্ত্র নিলেই ভাল হত। তেমনি রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে "এ শুধু গানের দিন" অ্যাকর্ডিয়ান ছাড়া ভাবাই যায় না। "নীল আকাশের নিচে" ছবিটি এখন অনেকেরই মনে নেই, মৃণাল সেন নিজেও বোধ হয় তাঁর চলচ্চিত্র কর্মের ওই পর্বটি ভুলতে চান। মৃণাল সেনের পরবর্তীকালের দিগ্বিজয়ী ছবির কোনটিতেই গানের স্থান প্রায় নেই

ভি বালসারা

বললেই চলে। কিন্তু "ও নদীরে" গানটি কেউ ভোলেনি, অনেকদিন ভুলবে না। ভি বালসারার মেলোডিকায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ নেই, তবুও আকর্ষণ করে, অনেক চুনকামের পরেও ঘরের বসুধারার চিহ্নটি যেমন ধরা দেয়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গানটির ইনটারলিউডে অদ্ভুত ভাবে যন্ত্রের পরীক্ষা করেছিলেন, বালসারার রেকর্ডে বোধ হয় সেই সব যন্ত্র সমাবেশ করা হয়নি।

গ্রামোফন কোম্পানীর শারদ অর্ঘ্যে এবার একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস গল্পপাঠ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিখ্যাত ঘনাদার গল্প শেখর চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় রেকর্ড হয়েছে। স্বাভাবিক পদ্ধতিতে অভিনয় এবং শেখর চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যরূপ অনেক শ্রুতিনাটক প্রযোজককে পথ দেখাবে। ভাষ্যকার এবং শিশির চরিত্রে প্রেমাংশু বসুর সুন্দর ঘরোয়া ভঙ্গিতে "উমম্" "ইরা" ইত্যাদির প্রয়োগ একটি সুন্দর কথকের চরিত্র প্রতিষ্ঠিত করে। সঙ্গে সঙ্গে শেখর চট্টোপাধ্যায়ের "ঘনাদা"তেও কোন বাড়াবাড়ি নেই। নাটকীয় না হয়েও নাটকের রস সঞ্চার করতে সাহায্য করে। ব্যতিক্রম বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, তাঁর চরিত্রে নাটক করা ছাড়া উপায় থাকে না। ক্যাসেটে লক্ষণীয় শব্দগ্রহণ। খুব পরিমিত ব্যবহার।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

স ং গী ত

তাল-লয়-ছন্দ

সঙ্গীতে তাল-ছন্দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত। তাল-লয়ের নির্দিষ্ট নিয়ম ও সময়ের মধ্যে আবদ্ধ সঙ্গীত সহজেই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সঙ্গীতে তালের সার্থকতা সম্পর্কে ধারণাটি যুগে যুগে বিবর্তিত হয়ে চলেছে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মধ্যযুগে যেমন লয়ের প্রাধান্য লক্ষ করা গিয়েছে, পরবর্তীকালে আবার তা অনেকাংশে অবহেলিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে লয় সম্পর্কিত চিন্তাধারার পুনর্বিকাশ দেখতে পাই। এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞ অলিভিয়ের মেসিয়াঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তাল-লয়ের ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে ম্যাক্সমুলার ভবন ও সঙ্গীত রিসার্চ একাদমির যৌথ প্রচেষ্টায় আয়োজিত তিন দিনব্যাপী আলোচনা সভা (১১, ১২ ও ১৩ই সেপ্টেম্বর) ও দুটি সান্ধ্য অনুষ্ঠানে (১১ ও ১২ই সেপ্টেম্বর)। জি ডি বিড়লা সভাগারে অনুষ্ঠিত প্রথম দিনে ছিল সান্ধ্য অধিবেশনে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের আয়োজন। দ্বিতীয় সান্ধ্য অধিবেশনে হয় ভারতীয় সঙ্গীতে লয়ের ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন। বিষয়টির তাৎপর্যের সম্যক উপলব্ধির জন্য অনুষ্ঠানসূচী সাজানো হয়। ফলে শেষাংশটি রাত দশটার পরে শুরু হওয়ায় অনেকের পক্ষেই তা শোনা সম্ভব হয়নি। প্রথমে পরিবেশিত হয়েছে নাগাড়া, পাখোয়াজ ও তবলাবাদনের স্বতন্ত্র রীতি। শিল্পীরা হলেন যথাক্রমে রশিদ খাঁ ওয়ারসি, রাজা ছত্রপতি সিং এবং শঙ্কর ঘোষ। মূলত লোকসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত একটি বাদ্যযন্ত্রকে বিচিত্র ছন্দসৌষ্ঠবে কতখানি ধ্রুপদী ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ করে তোলা যায়, তারই সুন্দর নিদর্শন রেখেছেন রশিদ খাঁ ওয়ারসি তাঁর নিবেদিত ত্রিতালে নিবদ্ধ নাগাড়া লহরায়। কাশুউ-সিং ঘরানার অনুসরণকারী পাখোয়াজ শিল্পী রাজা ছত্রপতি সিং-এর ধামারে নিবদ্ধ লহরার বিশেষ আকর্ষণ ছিল সুদৃঢ় ধ্রুপদী আবেদন ও নান্দনিক মাধুর্য। সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী শংকর ঘোষ-এর ঝাঁপতালে তবলাবাদনের অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়েছিল তাঁর স্বকীয় শৈলীর বলিষ্ঠতায় ও লয়বিভাজনের নিপুণ দক্ষতায়। এঁদের সঙ্গে সারেঙ্গীতে সহযোগিতা করেন রামনাথ মিশ্র।

এরপর সংস্কৃত নাটক পরিবেশনের প্রাচীন প্রথানুসারী অনুষ্ঠান 'কুড়িয়ত্তম' রূপায়িত করেন মাৰ্গী কুড়িয়ত্ত কলাই। ভাবাভিনয় ও কথাকলির আঙ্গিকে এই পরিবেশনটির উপজীব্য বিষয় ছিল রাবণ আর অনতিক্রমণীয় কৈলাস পর্বতের নাটকীয় সংঘাত। ঐতিহ্যবাহী এই সুপ্রাচীন শৈলীটির প্রধান সম্পদ অভিনয়ের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা। অনুষ্ঠান পরিকল্পনা একটু সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংবদ্ধ হলে তা' আরো বেশি উপভোগ্য হোত। ব্রজরাখাল দাস পরিবেশন করেছেন আটমাত্রা বিশিষ্ট কীর্তনাঙ্গ দাসপ্যারী তালে একক খোলবাদন। সূক্ষ্ম লয়কারীতে তাঁর বিশিষ্ট বাদনভঙ্গী বাংলা সংস্কৃতির একান্ত নিজস্বতাকে উজ্জ্বল করে তোলে, সমগ্র অনুষ্ঠানটি ছিল অত্যন্ত মনোগ্রাহী। আরেকটি সমগোত্রীয় অনুষ্ঠান ছিল স্বপন দাসের ত্রিতালে নিবদ্ধ ঢাক বাদন।

শংকর ঘোষ পরিচালিত 'মিউজিক অব ড্রামস'

পরবর্তী নিবেদন আসামের 'অঙ্কিয় নাট' মূলত লোকসংস্কৃতি থেকে সংগৃহীত হয়েছে। খোল ও করতাল বাদকদের বিভিন্ন রকম সাংগঠনিক প্রস্তুতি ও তাদের সমবেত উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি চিত্তাকর্ষক হলেও এক্ষেত্রে লয়বিহারের বৈচিত্র্য অপেক্ষাকৃত সীমিত। তাছাড়া উপস্থাপনরীতি আরো একটু সুগ্রথিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। কর্ণাটিকী বাদ্যযন্ত্র, মৃদঙ্গম, ঘটম, কাঞ্জিরা এবং কোনাক্কল-এর (তালের বিভিন্ন জাতির মৌখিক বিন্যাস) সমবেত পরিবেশনা 'তালবাদ্য কাছেরি' ছিল আর একটি উল্লেখ্য অনুষ্ঠান। অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন টি· কে· মূর্তি, টি· এইচ বিনায়করাও এবং জি হরিশংকর। সর্বশেষ অনুষ্ঠান ছিল শঙ্কর ঘোষ পরিচালিত 'মিউজিক অব দা ড্রামস্'। পরিকল্পনার অভিনবত্ব ও

রচনার উৎকর্ষের দিক থেকে এই অনুষ্ঠানটি সমবেত বাদ্যের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি নতুন ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। 'দা গাল্যান্ডি' এবং 'দা ডিভাইন' শীর্ষক দু'টি পরিবেশনার প্রধান আকর্ষণ ছিল দুরূহ লয়বিন্যাস। ত্রিতাল ও রূপক তালাশ্রয়ী প্রথম ও দ্বিতীয় রচনাটিতে একযোগে সমান্তরাল বিশিষ্ট বিভিন্ন লয় পরিবেশনের মাধ্যমে লয়ের 'হারমনি' সৃষ্টির সার্থক প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। তবলা তরঙ্গ ও জলতরঙ্গের যুগপৎ ব্যবহারে সৃষ্ট সুরবিন্যাস অনুষ্ঠানটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। শিল্পী তালিকা বিন্যাসে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি ও সুদক্ষ ব্যবস্থাপনায় সান্ধ্য অনুষ্ঠানটি সর্বতোভাবে উপভোগ্য হয়েছিল।

বিনতা মৈত্র

ফিরে এল তার হারানো প্রেমিকা এবং একটি বন্ধু যে তাকে পার্টনার করে নিল ব্যবসায়।

মহুয়া রায়চৌধুরীর মৃত্যু ছবিটির এবং আমাদেরও ক্ষতি করেছে। তাঁকে পূর্ণ চরিত্রে না পেয়ে আমরা হতাশ হয়েছি। অনিল চট্টোপাধ্যায় এবং মাধবী চক্রবর্তী চমৎকার। দেবশ্রী রায়, চিরঞ্জীত (অভিব্যক্তিহীন), বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, শকুন্তলা বড়ুয়া ছবিতে আছেন। রুমা গুহঠাকুরতাকে ভাল লাগে। নবীন নায়ক প্রসেনজিত যদি এই ধরনের অবিশ্বাস্য চরিত্রে বেশী কাজ করেন তাহলে তাঁর পায়ের তলার মাটি শক্ত হবে কি করে! ক্যাবারে, চলন্ত স্টিমারে বোম্বাই কায়দায় মারামারি, গণিকার নাটক, মায়ের আত্মহত্যা করার চেষ্টা—সবই ছবিতে আছে।

অমিত রায়

চ ল চ্চি ত্র

মধুময়

একই সঙ্গে বিবেকবান এবং বিপথগামী যুবককে নায়ক করতে বাংলা ছবির পরিচালকরা স্বস্তি পান এই ভেবে যে, ছবিটি দর্শক নেবে। কারণ জম্পেস নাটকের সঙ্গে চোখাচোখা সংলাপ রাখা যায় হৃদয়বিদ্ধ করতে, কারণে অকারণে চোখের জল ফেলানো যায়। এখন রুমালের সংখ্যার ওপর বাংলা ছবির সাফল্য নির্ভর করে। দর্শক যদি দুই-এর বেশী রুমাল নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে ঢোকেন তাহলে সেই ছবিকে মারে কার সাধ্য।

মহুয়া রায়চৌধুরী

কিন্তু ফর্মুলা মানেই যে সাফল্যের সিঁড়ি নয় এ তথ্য অনেকবার প্রমাণিত হয়েছে। সম্প্রতি এ নিয়ে এক আলোচনায় জানা যায়, নায়ক যদি দোতলা থেকে লাফ দিয়ে নিচে নেমে দশ জন ভিলেনকে মারেন তাহলে দর্শক হাততালি দেবে কিন্তু পাঁচতলা থেকে লাফালে নাকি নাক কোঁচকাবে। অর্থাৎ অবিশ্বাস্য-বিশ্বাস্য চিত্রনাট্যে থাকতে হবে, অবিশ্বাস্য-অবিশ্বাস্য নয়। টালিগঞ্জে এই শ্রেণীর চিত্রনির্মাতারা দিনরাত এই সব পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছেন। জহর বিশ্বাসের 'মধুময়' সেই ঘরানার ফসল।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম কাহিনীকার হিসেবে আছে। ছবি দেখলেই বোঝা যায়, সেই কাহিনীর হাল চিত্রনাট্যের গুণে কি হয়েছে। আবার চিত্রনাট্য করেছেন পার্থপ্রতিম চৌধুরী। একদা সৎ ভাল ছবির পরিচালক যে আজ কতটা দিশেহারা তাও প্রমাণিত।

বেকার মধুময় বাবার পেন্সনের টাকায় বেঁচে থাকতে না চেয়ে রোজগারের পথ হিসেবে বেছে নিল ছিনতাইকে। বিবেকবান সে, কোন ট্রেনিং ছাড়াই তাই ওই কাজে সিদ্ধহস্ত হলেও মাঝে মাঝে অনুগ্রহ দেখাত দর্শকদের সহানুভূতি পাওয়ার জন্যে। ট্রেন ডাকাতি করতে গিয়ে সে ধরা পড়ল। কিন্তু কেস টিকল না। অনুতপ্ত মধুময়ের জীবনে এক সময়

ন় ত্য

মণিপুরী নৃত্যের স্মরণীয় অনুষ্ঠান

দৃষ্টিনন্দন বর্ণবহুল পোশাক, নানা সূক্ষ্মভাব ব্যঞ্জনা এবং সঙ্গীত-সাযুজ্যে ছন্দিত লাস্য ও তাণ্ডব দেহভঙ্গিমায় বিধৃত নৃত্যবিন্যাস—সব মিলিয়ে মণিপুরী নৃত্যের একটি স্মরণীয় অনুষ্ঠান দেখা গেল গত ১৪ সেপ্টেম্বর বিড়লা একাডেমি মঞ্চে। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন কলকাতার মণিপুরী নর্তনালয় এবং অংশ গ্রহণ করেছিলেন নর্তনালয়ের দুই শিল্পী মঞ্জরী দেবী ও লতাসনা দেবী। দু'জনের শরীরে ছিল সেই বিনম্র যৌবনশ্রী, যা মণিপুরী নৃত্যের ধ্রুপদী সুষমা বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। লতাসনা ইম্ফলের মহিলা, মণিপুরী নৃত্য তাঁর দেহে-রক্তে মিশে আছে ছেলেবেলা থেকেই। মঞ্জরী দেবী নৃত্যচর্চা করছেন গত দু'তিন বছর, জন্মসূত্রে ফরাসী, কিন্তু তাঁর নৃত্যকলার প্রকরণ নৈপুণ্যে ও ভারতীয় ভাব-বৈভবে কোন অপূর্ণতা ছিল না।

দু'জনে চারটি করে একক নৃত্যপদ পরিবেশন করেন যার কোরিওগ্রাফি ও সঙ্গীত রচনা করেছিলেন গুরু বিপিন সিং। সমবেত থেকে একক নৃত্যের বিবর্তনে মণিপুরী অন্যান্য ধ্রুপদী নৃত্যগুলির মতই যে এক স্বতন্ত্র নান্দনিক আবেদন অর্জন করেছে এই অনুষ্ঠানে তার চূড়ান্ত পরিচয় ছিল। মঞ্জরী নেচেছিলেন মায়বী জগোই। রাধানর্তন, খণ্ডিতা ও ননীচোরি। প্রথম পদটিতে প্রাক-বৈষ্ণব যুগের উপজাতীয় নৃত্যের এক অতি পরিশীলিত রূপ ছড়িয়ে পড়ে মঞ্চ জুড়ে সাবলীল, অথচ সংযত আবেগের চারু নৃত্যচারণায়। রাধানর্তনের লাস্যময় দেহ চারণায় ছিল নানা ভঙ্গী বৈচিত্র্যের সাঙ্গীতিক সুষমা। খণ্ডিতা নায়িকা অভিনয় পদটি ছিল জয়দেবের অষ্টপদী 'যাহি মাধব, যাহি কেশব'-এর রূপায়ণ। নৃত্যভঙ্গীতে নিখুঁত চিত্রকল্প সৃষ্টি হলেও মুখের ভাব-ব্যঞ্জনায় বৈচিত্র্য ও সূক্ষ্মতার অভাব ধরা পড়ে। কিন্তু ননীচোরিতে এই ত্রুটি ছিল না। এই পদটি তিনি একাত্ম হয়ে নেচে ছিলেন। অভিনয়ে, দেহভাষার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাধর্মী প্রয়োগে, ভাবপ্রকাশে এবং সর্বোপরি পরিমার্জিত লাবণ্যময় নৃত্যগুণে এই পদটি ছিল তাঁর সর্বাঙ্গসুন্দর অনুষ্ঠান।

লতাসনার নাচে লাস্যের অভাব ছিল না কিন্তু তাণ্ডবপ্রধান নৃত্যভঙ্গীতে তাঁর নৈপুণ্য ছিল বেশি। তিনি লোংছল, অচোংবী, অরৈবী প্রভৃতি দুরূহ এবং অ্যাক্রোব্যাটিক ভঙ্গী অতি অনায়াসে সুষ্ঠু নৃত্যলীলায় পরিবেশন করতে পারেন। যেমন দেখা গেল তাঁর সমাপ্তি পদ বাজীকর খেল-এ।

মৃদু উদ্ধত কৃষ্ণ নর্তনেও কৃষ্ণের বিচিত্র ভাব ও ভঙ্গীর রূপায়ণে তাণ্ডবের দুই উপাদান কুণ্ঠন ও চোলনে তাঁর অনন্য পারদর্শিতা লক্ষ্য করা গেল। প্রবন্ধ নর্তনের সূচনায় সাবলীলতার সামান্য অভাব ছিল কিন্তু ক্রমশ তিনি নানা লাস্য ভঙ্গীতে মঞ্চচারণায় হাত ও পায়ের সূক্ষ্ম কারু কাজে রূপায়িত করলেন কয়েকটি জটিল বৈচিত্র্যময় সাঙ্গীতিক রচনা। শৃঙ্গার ভাবের অনঙ্গাক্ষপ-এ আকুলতা, আর্তি, বিরহ, যন্ত্রণা প্রভৃতির সূক্ষ্ম ভাব মূর্ত হয়ে উঠল মুখ-চোখের অভিব্যক্তিতে, হাত ও আঙুলের সুচারু ভঙ্গীতে এবং দেহলীলার সুস্পষ্ট চিত্রকল্পে। সমস্ত অনুষ্ঠানটির সাঙ্গীতিক সহযোগিতা করেছিলেন অতসী চট্টোপাধ্যায়, খোকন সেনগুপ্ত, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুশান্ত দাস। কিন্তু কণ্ঠসঙ্গীতে সব পদের সঙ্গে সমান উৎকর্ষ ছিল না। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিলেন দর্শনা ঝাভেরী ও কলাবতী দেবী।

মনসিজ মজুমদার

পদক পাওয়ার তঞ্চকতায়

তপন ঘোষ

খেলা চরিত্রগঠনে সহায়তা করে। এমন গম্ভীর আপ্ত বাক্যে আর মন টলে না। যদি বলেন কেন টলে না? প্রাণ খুলেই তাহলে জানাই, তঞ্চক স্পোর্টস-জগতের হাবভাব দেখে ওসব ভারী কথা বড়ই পানসে, বোদা লাগে। সম্প্রতি এশিয়াডে ভারতীয়দের ভূমিকার তদন্ত করতে গিয়ে ভারতীয় ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন প্রেসিডেন্ট বিদ্যাচরণ শুকুল স্তম্ভিত হয়েছেন। ভারতীয় প্রতিনিধিরা নির্বাচনী ট্রায়ালে যে ফল করে, তার মধ্যে নাকি বিস্তর ভেজাল আছে। মাদক দ্রব্যের সহায়তায় নাকি ট্রায়ালে সরেস ফল দেখিয়ে উতরে যায়। দেশে ডোপ টেস্টের ব্যবস্থা নেই। ব্যবস্থা থাকলে এই ধোঁকাবাজি ধরা পড়ত। বিদেশে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় এই কারসাজি সম্ভব হয় না। ওখানে যে ডোপ টেস্টের ব্যবস্থা রয়েছে। এই গর্হিত ফন্দি ধরা পড়বেই। এবার সোল এশিয়াডে পদকপ্রাপ্ত তিনজন ভারতীয়ের বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ প্রমাণিত সত্য। অগত্যা দেশের মাথা হেঁট। শুকুল অতঃপর কড়া ব্যবস্থা নিতে নিয়ম চালু করছেন যাতে ঘরোয়া প্রতিটি নামী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামার আগে ডোপ টেস্টের আওতায় প্রতিযোগীকে আসতেই হয়। বিস্ময়কর ব্যাপার, এদেশে এখনও ডোপ টেস্ট ল্যাবরেটরি নেই। পাশের দেশ পাকিস্তানে এখন সর্বাধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। এতকাল আমাদের খেলোয়াড়রা যথার্থ সাধু হিসাবেই ক্রীড়াকর্তাদের নজরে ভেসেছে। গত এশিয়াডের সময় পদক পাওয়া ভারতীয়দের নিয়ে বাইরের দেশের হেরে যাওয়া অ্যাথলীটরা প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ধামাচাপা দেওয়া হয় অভিযোগগুলি। এবার এশিয়াডে আমরা অনেক ইভেন্টে পদকহীন, পরন্তু 'ডোপড' অপবাদ নিয়েও ফিরেছি।

বিদ্যাচরণ 'ডোপ' দোষীকে খুঁজে বার করার জন্য যথেষ্ট আগ্রহী। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, গবেষণাগার না থাকলেও প্রতিযোগীর প্রস্রাব পরীক্ষা করে ডোপ যাচাইয়ের পুরনো পদ্ধতিটাই নয় চালু করে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

চোখে ধুলো দেওয়া এই ভারতীয় প্রতিযোগীদের সোল এশিয়াডের হাস্যকর ভূমিকার ক'টি উদাহরণ তুলে ধরা যাক। এদের যে সকলেই ডোপড ছিলেন এমন দোষ কেউ দিতে পারবেন না। তবে দৃষ্টিকটু লেগেছে দেশে একরকম ফল করে ওরা সোল যাওয়ার টিকিট আদায় করে নেয়, সোলে ধরা পড়ার ভয়ে সেই ক্ষমতাবর্দ্ধক কিছু না করায় মন্দ ফল করে।

চীফ দ্য মিশন মাট্টু বলেছেন—আমাদের ছেলেমেয়েদের এশিয়াড ভূমিকায় প্রায় লজ্জায় মাথা কাটা যাওয়ার অবস্থা।

পোল ভল্টার বিজয় পাল সিংয়ের উল্লম্ফন দিয়েই শুরু করা যাক। পোল হাতে একরকম সে সার্কাসের ভাঁড়ে পরিণত হয়েছিল। ওই ইভেন্টে প্রথম স্থানাধিকারী ৫·৪০ মিটার টপকে যায়। বিজয় পাল নাকি দেশে হামেশাই ৫·০ মিটার লাফায়। ওখানে বহু পাঁয়তাড়া কষে বার কয়েক বারের কাছে গিয়ে বিজয় পা হড়কেছে, পোল ফসকেছে। ঘাবড়ে একশা অবস্থা। কখনও দৌড়-এ পা মিলছে না, কখনও-বা পোলই হাত থেকে খসে পড়ে যায়। লজ্জায় উপস্থিত সাংবাদিকদের মাথা কাটা যাওয়ার অবস্থা।

আর এক জাম্পার রাজিন্দর সিংও যথেষ্ট চুনকালি মাখিয়েছেন নিজের এবং দেশের ইজ্জতকে। রাজিন্দর ট্রিপল জাম্পে মাত্র ১৫ মিটার পেরিয়েছেন। জয়ীর লাফ ১৭·০১ মিটার। অনুমান করতে পারেন সোল যাওয়ার জন্য এইসব প্রতিযোগী নির্বাচকদের চোখে কতটা ধোঁকা দিয়েছেন।

জেভলিন ইভেন্টে বি· ডি· মণ্ডল ও গোপাল সিংয়েরও করুণ অবস্থা। ওঁরা পেয়েছেন দশম ও একাদশ স্থান। বিজয়ী যেখানে ৭৫ মিটার ছুঁড়ছে সেখানে আমাদের ভারত চ্যাম্পিয়নরা ৬৩ আর ৬২ মিটারের চেয়ে কিছু বেশী দূরত্বে। হাতুড়ি ছোঁড়ায় রাধেশ্যামও পিছিয়ে আসার খেলায় ঠিক মদত দিয়েছেন। যেখানে সোনা জিততে ৬৯ মিটার ছোঁড়া প্রয়োজন র‍্যাধেশ্যাম নিজের কুল ও মান রাখতে হাতুড়ি পাঠিয়েছে মাত্র ৫৭ মিটারের একটু বেশি দূরত্বে। লোহার বল নিক্ষেপকারী দুই সিং বলবিন্দর ও বাহাদুরের কেউই বাহাদুরিয়ানা দেখায়নি। বরং মেয়েরাও এই ইভেন্টে ওদের ছোট করে দেয়। মেয়েদের এশীয় রেকর্ড ১৭·৭৭-এর পাশে ওরা মাত্র ১৭·৩১ মিটার ছুঁড়েই ফুরিয়ে গেছে।

মেয়েদের দিকে তাকানো যাক। উষাকে উপহার দেওয়া নিয়ে বালসাম্মা ভালমন্দ নানা কটাক্ষ করছে। দেশে ফিরে উষার গাড়ি পাওয়া উচিত কি অনুচিত সে নিয়েও বালসাম্মা ফুট কেটেছে। এমন কি উপহারের কম-বেশি নিয়েও তার বিরাট আপত্তি। ওর দায়িত্বে ছিল চার শো মিটার হার্ডলসে দেশকে রূপো দেওয়া। কোথায় - রেকর্ড, কে দেবে মেডেল? চার আর পাঁচ নম্বর হার্ডলের মাথায় বালসাম্মা হোঁচট খায়। রিলে রেসেও বালসাম্মার কাছে দারুণ কিছু আশা করা হয়েছিল। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সে কিন্তু জ্বলে উঠতে পারেনি। একই অবস্থা আশা আগরওয়ালেরও। সিওল যাবার আগে চারদিকে ভনভনানি—আশা বিরাট কিছু করবেই। ম্যারাথনে আশা শুধু অর্ধেক পথ পৌঁছতে না পৌঁছতেই দেশবাসী সব প্রত্যাশা খুইয়ে ফেলে। সুমন রাওয়াত সম্পর্কে বাজি ধরা ছিল, ১৫০০ মিটারে সোনা জিতছেই। সুমন ব্রোঞ্জ পায় তিন হাজার মিটারে, তাও ফটো ফিনিশে।

একইরকম দিল্লি এশিয়াডের

উষা ছাড়া কোন মহিলাই কেন এশিয়াডে দেশের মান বাড়াতে পারলেন না?

ছবি : নিখিল ভট্টাচার্য

সোনার অ্যাথলীট চাঁদরাম সোল-এ গিয়ে কাঁসা পায়। এর আগে ২০ কিমি হাঁটার পদ্ধতি নিয়েও নানান কথা উঠেছিল।

দেশের মাঠে যারা নিজেদের দক্ষতায় আপাতদৃষ্টিতে বাঘ সিংহ মারে তারা বিদেশে গিয়ে এমন তলিয়ে যায় যে আমাদের খেলোয়াড়দের মান ঠিক করাই মুশকিল।

ডোপ-এর আশ্রয় শুধু অ্যাথলীটরা নিচ্ছে এমন নয়। এ রোগ কলকাতার ফুটবলকেও অনেকদিন হল কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। সত্তরের দশকে প্রায়ই দেখা যেত বড় ম্যাচে বয়সী প্লেয়ার বড় প্লেয়ারের মত খেলে অথচ সাধারণ ম্যাচে খেলে নিতান্ত সাধারণের ভূমিকায়! ময়দানে ঠাট্টা মশ্‌করা চলত—এ হচ্ছে ডোপিং-এর কিক্। দশ বছর আগে ভিন্ রাজ্য থেকে খেলতে আসা এক বড় ক্লাবের প্লেয়ারের এক হঠাৎ অভিজ্ঞতার কথাই জানাই। বড় ম্যাচের আগে কোচ আদর করে তাকে ভিটামিন বলে পিল্ গিলিয়ে দেয়। খেলতে খেলতে আনকোরা অভিজ্ঞতায় প্লেয়ারটির মনে হয়েছে, তার গায়ে আজ হাজার হাতির বল। টিম জিতেছে, সফল কোচ এসে প্রায় থুতনি নেড়ে জিজ্ঞেস করে—কী হে, তুমি খেললে না তোমার পিল খেলল? প্লেয়ারটি থ। পরক্ষণেই কোচ তাকে আবার আর একটি পিল দিয়ে বলে—এটা খেয়ে নাও, ভিটামিন, রাত্রে ভাল ঘুম হবে। বছর কয়েক চলার পর মাঠ থেকে বেরিয়ে এসে প্লেয়ারটি আমায় ওই স্বীকারোক্তি দেয়। আরও বলে—এর পরেও আমরা ডোপ্‌ড হওয়ার জন্য পিল খেয়েছি। সারা ময়দানে এ রোগ ছড়িয়ে গেছে। বালতি বালতি ইলেকট্রাল জলে গুলে তাতে ডোপের ট্যাবলেট মেশানো হচ্ছে, ছেলেরা খাচ্ছে, খেলছে, চাঙ্গা চাঙ্গা দারুণ ফূর্তির ভাব, তারপরেই হঠাৎ ঝিমিয়ে যাচ্ছে, ফোঁপরা হয়ে যাচ্ছে আসলে।

ধিক্কারে মন ভরে গেছে ফুটবলারটির। আরও কথা হল, দক্ষতার দাঁড়িপাল্লায় ব্যাপারটা চাপিয়েই।

অনর্গল স্বীকারোক্তি পেলাম—ময়দানে আমরা বাঘ-সিংহ হয়ে খেলেছি, কিন্তু বাইরে গিয়েই ইঁদুর বনেছি। এর একটাই কারণ ওই ট্যাবলেট বা বটিকার ভরসায় দারুণ দাপটে ময়দানে খেলেছি। বাইরে গেলে বড়ি অচল। পরীক্ষা করলে ধরা পড়ার ভয়। কোচ আর সাহস করেননি। খেলার ফলও খারাপ হয়েছে। ফুটবলারটি ওর বাজি ধরে বলে, কলকাতার মাঠে বড় ক্লাবের ফুটবলার খোলাখুলি কথা বলুক, সব ফাঁস হবে কোন্ ম্যাচ জেতার ফলে কতটা ভেজাল আছে।

আত্মগতভাবেই বলেছি—ফুটবলারদের এমন ইহকাল-পরকাল ঝরঝরে করার পিছনে গোড়ায় অবদান কাদের। অবশ্যই কোচ। অপরাধের প্রয়োগ গিনিপিগ হিসাবে কচিকাঁচা ফুটবলারদের উপরই হয়। ফুটবলার সেয়ানা হয়ে যায়, খেলতে পারলে পয়সা পাবে, সুতরাং গর্হিত পথে যেতে তার আপত্তি নেই। কোচ-প্লেয়ারে সেইখানেই সন্ধি। কোচ এইভাবে সুনামের বাঘ-সিংহের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। ট্রফি পাচ্ছে ক্লাব, কর্তৃপক্ষ কেন এসব নিয়ে হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙতে যাবে!

উষা ডোপ করে মেডেল পাচ্ছে, এমন অভিযোগও ওর এশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীরা করতে ছাড়েনি। উষার কোচ নাম্বিয়ার আরও উঁচু জায়গার ভেজাল কারবার নিয়ে চিন্তিত। ইউরোপ আমেরিকার অ্যাথলীটরা স্টেরয়েড, ব্লাড ট্রান্সফিউস করে ছেলেমেয়েদের মেডেল পাওয়াচ্ছে—এটাই নাম্বিয়ারের দৃঢ় ধারণা। এসব কারসাজি আমাদের অকিঞ্চিৎকর বৈজ্ঞানিক পরিবেশে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। নাম্বিয়ারের এ নিয়েও দুঃখ হচ্ছে। ওঁর মতে এমন অপকর্ম করতে গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনাই সব চেয়ে বেশী। এ ধরনের দুষ্কর্মের দ্বারা মেডেল জয়ের হিড়িক পড়ে গেছে।

ক্রীড়াক্ষেত্রে সফল হতে, এসব তঞ্চকতাই যদি আধুনিক খেলার উপায় অবলম্বন হয় তা হলে আমাদের কোচ ও খেলোয়াড়রা সেই সহজ পথে চলতে গিয়ে দক্ষতার মাধ্যমকে বিষাক্ত করে ফেলছে। ব্যাপারটা এতদিন পরে, সরকার বা ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের গোচরে এসেছে জেনে অবাক হচ্ছি। এ নিয়ে বহু আগেই ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন ছিল। ■

ছেচল্লিশ বছর বাদে

শিবরামকৃষ্ণন আর আজাহারউদ্দিনের মধ্যে প্রায় গলায় গলায় ভাব। বেশির ভাগ সময় ওরা একসঙ্গে থাকে, বিদেশ সফরে একই ঘর বেছে নেয় ইত্যাদি ইত্যাদি। গত অস্ট্রেলিয়া সফরের পর আর টেস্ট খেলেনি শিবরাম। ইংল্যান্ডে ওকে নিয়ে যাওয়া হয়নি যেহেতু দেড় বছর যাবৎ খুব বাজে বল করছে! পাশাপাশি, খারাপ ফর্মে থাকা সত্ত্বেও আজাহার টিম থেকে বাদ পড়েনি। এদিক দিয়ে ও সৌভাগ্যবান। তবু এই চরম দুঃসময়ের মধ্যেই এমন কিছু শিবরামের ভাগ্যে জুটেছে যা ওর প্রিয় বন্ধু পায়নি। এবং যার জন্য শুধু আজাহার কেন, কপিলও হিংসে করবেন শিবরামকে। পুরস্কার-টুরস্কার জাতীয় কোনও ব্যাপারই নয়। নিছক কতগুলো প্রশংসাসূচক লাইন : সীমিত ওভারের ক্রিকেট নিঃসন্দেহে ফাস্ট ও মিডিয়াম ফাস্ট বোলারদের জন্য। গুডলেংথের সামান্য আগে বল ফেলে যারা রান বেঁধে রাখতে পারে। এ জাতীয় ক্রিকেট স্লো লেগ স্পিনারদের মৃত্যুর ঘণ্টা বাজিয়ে রেখেছে। এবং এখানেই লক্ষ্মণ শিবরামকৃষ্ণনের কৃতিত্ব, পঁচাশির গোড়ায় (ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব ক্রিকেটে) সিডনি ও মেলবোর্নে বিশ্বের সেরা ব্যাটিং শক্তির বিরুদ্ধে ও পুরো দশ ওভার বল করেছে, উইকেট নিয়েছে এবং ব্যাটসম্যানকে বেঁধে রেখেছে! লেগ স্পিন বোলিং-এর দুর্দান্ত প্রদর্শন! এরকম প্রশংসা শিবরাম আরও অনেকের কাছেই শুনেছে কিন্তু এক্ষেত্রে তার গুরুত্বই আলাদা যেহেতু বক্তার নাম—ডন ব্র্যাডম্যান।

ছেচল্লিশ বছর আগে উইজডেনের ক্রিকেটারস অ্যালমানাকের জন্য একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন স্যার ডন। তারপর এই এ বছর। (সম্ভবত এই শেষ।) অতি সম্প্রতি ক্রিকেটের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সবরকম সম্পর্ক তিনি ছিন্ন করেছেন। রিপোর্টাররা হামলে পড়েছিল কিছু কথা শোনা ও সম্ভব হলে সাক্ষাৎকার পাওয়ার জন্য। ডন রাজি হননি। অবসর নেবার পর থেকেই তিনি নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন প্রচারমাধ্যম থেকে যথাসম্ভব দূরে। গত পঁচিশ বছর কোনও ইন্টার-ভিউ দেননি। এমনকি অংশ নিতে রাজি হননি কোনও ফটো ফিচারে। আর তাই ব্র্যাডম্যান সম্পর্কে কৌতূহল থেকেই গেছে। বেড়ে গেছে তাঁর মন্তব্যের ওজন ও ধার। বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমরা জানতে চেয়েছি বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান এ ব্যাপারে কি ভাবছেন, কী বলছেন? কিন্তু জানা হয়নি। যেহেতু ব্র্যাডম্যান জানতে দেননি।

দীর্ঘদিন বাদে উইজডেনে লিখিত এই প্রবন্ধটিতে ব্র্যাডম্যান মুখ খুলেছেন। আলোচনা করেছেন বিতর্কিত একটি বিষয় নিয়ে। এবং ঠিক যেন ব্র্যাডম্যানেরই মতো করে—শানিত, ঋজু গদ্যে। অংশবিশেষ তুলে দিলাম : পঁচাশিতে এই এক প্রশ্নের সামনে আমাকে যে কতবার পড়তে হয়েছে—লয়েডের টিমকে কী আমি সর্বকালের সেরা বলে মানি? তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছি, হ্যাঁ ফিল্ডিং-এর দিক দিয়ে যদি বলেন, এর চেয়ে ভাল দল আমি দেখিনি। কিন্তু ব্যাটিং, বোলিং বা ফিল্ডিং যতই ভাল হোক না কেন, ফাস্ট বোলারদের ওপর এই টিম এত বেশি নির্ভরশীল যে স্লো, টার্নিং উইকেটে কিছুটা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এ ধরনের পিচে ওদের ব্যাটসম্যানরাও কতকটা দ্বিধাগ্রস্ত। সিডনিতে যা প্রমাণ হয়েছে, হল্যান্ড ও বেনেট এখানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্যাটিং-কে তছনছ করে দিয়ে সহজেই অস্ট্রেলিয়াকে ম্যাচ জিতিয়েছে। বেনেট বা হল্যান্ডের দক্ষতা সম্পর্কে কোনও কটাক্ষ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যাঁরা ক্রিকেটবোদ্ধা তাঁরা তো অবশ্যই মানবেন এরা কোনমতেই ওরিলি বা গ্রিমেটের সমকক্ষ নয়।

আমার কাছে এই তথ্যগুলো একদমই উপেক্ষণীয় নয়। বরং বিচারকে নিখুঁত করতে সাহায্য করে। অস্ট্রেলিয়ার এই জয় আমার ধারণাকেই প্রতিষ্ঠিত করছে, আটচল্লিশ সালে যে দল নিয়ে ইংল্যান্ড সফরে এসেছিলাম সেটিই ক্রিকেট ইতিহাসের সর্বোত্তম দল। হ্যাঁ, লয়েডের টিম অবশ্যই খুব পিছিয়ে নেই। গায়ে গায়ে আছে ১৯২০-২১-য়ে আর্মস্ট্রং-এর টিমও। সঙ্গে রাখছি ডার্লিং-এর ১৯০২-এর দলের কথাও। ক্রিকেটের ইতিহাস যেটুকু পড়েছি, তাতে আমার বিশ্বাস, ডার্লিং-এর টিম আগে বলা তিনটি দলের সঙ্গে সমানে টেক্কা দিতে পারবে।

সেরা বিশেষজ্ঞ

অন্য একটা কি ব্যাপারে কথা হতে হতে হঠাৎ এই প্রসঙ্গটা উঠল, ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আমাদের দেশে সেরা কে? যেন কোর্টে রায় দিচ্ছেন এরকম একটা দৃঢ় ও নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে রবি শাস্ত্রী উচ্চারণ করলেন, টাইগার পতৌদি। জানা গেল, শাস্ত্রী ক্রিকেট সম্পর্কে কেবল দুজনের লেখা মনোযোগ সহকারে পড়েন। একজন পতৌদি, অন্যজন লেন হাটন। ভারতের ভবিষ্যৎ ক্রিকেট অধিনায়ক আরও বললেন, "উসকা (পতৌদি) কপি পড় লেও,'বাস কাফি। বাকি সবকো ফেক দো।"

পতৌদির ক্রিকেটপ্রজ্ঞা সম্বন্ধে একইরকম শ্রদ্ধাশীল কপিলদেব। পতৌদি বহুবার সমালোচনা করেছেন কপিলের অধিনায়কত্বর, বলেছেন নেতা হবার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ওর নেই। তবু কপিল চটেননি। বরং পতৌদির সঙ্গে একান্তে কথা বলে জেনে নেবার চেষ্টা করেছেন কোথায় তাঁর ভুল হচ্ছে। সুনীল গাওস্কর কি বলেন এ ব্যাপারে? টেস্টে প্রায় দশ হাজার রান করে ফেলা অসাধারণ ব্যক্তিত্বও কপিল-রবির সঙ্গে একমত—পতৌদিই সেরা। তবে গাওস্কর সমান গুরুত্ব দেন জয়সীমার পর্যবেক্ষণকেও।
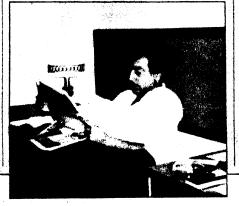
টি ভি থেকে মাঠে

ওলাফ থোন টি ভি-তে বসে দেখেছিল ডেনমার্কের কাছে তার দেশকে ০—২ হারতে। মেক্সিকো বিশ্বকাপের ওই গ্রুপ লিগ ম্যাচের তিন মাস বাদে কোপেনহ্যাগেনে অনুষ্ঠিত প্রীতি আন্তর্জাতিকে শোধ তুলেছে জার্মানি। ডেনমার্ককে ২—০ হারিয়ে। এবং তা সম্ভব হয়েছে ওলাফেরই জন্য। কুড়ি বছর

বয়সী এই স্ট্রাইকার দুর্দান্ত খেলে নিজে একটি গোল করেছে আর একটি করিয়েছে মিডফিল্ডার অ্যালফসকে দিয়ে। ডেনরা বিশ্বকাপে চোখধাঁধানো ফুটবল খেলেছিল। নিজের ঘরের মাঠে কিন্তু একদম সুবিধে করতে পারেনি।

এবার বয়কট

উইলিস-বথাম-গাওয়ারদের পর এবার বয়কট। বয়কটও বই লিখছেন। সম্প্রতি ইয়র্কশায়ার তাঁকে এক রকম টিম থেকে তাড়িয়েই দিয়েছে তবু জিওফ বয়কটের অন্তত আর্থিক দিক দিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার প্রয়োজন নেই। ইয়র্কশায়ারের সঙ্গে চুক্তি হলে যা পেতেন, বই লেখার জন্য আগাম হিসেবেই পেয়েছেন তার দশগুণ টাকা। বয়কট বই লিখছেন শুনে অনেকেই কিন্তু শঙ্কিত। ওকে বিশ্বাস নেই। কি না কী গোপন কথা লিখে বসে!

গৌতম ভট্টাচার্য
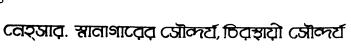
প্রসঙ্গ রামায়ণ

সুধীরকুমার করণ

প্রসঙ্গ রামায়ণ/
হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়/
শশধর প্রকাশনী/
কল-২৫/২৫·০০

আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণ সম্পর্কে নানা বিতর্কের ঝড় এখনও শান্ত হয়নি। সাধারণভাবে পুরাণ-বিশ্বাসী পাঠকের কাছে কোন ঝড়ই ঝড় নয়, কিন্তু বিতর্ক-বিশ্বাসী অনেক মানুষকে এই ঝড় প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে। তাই নতুন করে রামায়ণের গভীরে প্রবেশ করার জন্য অনেকেই নতুন উদ্যমে সচেষ্ট। যাঁরা রামায়ণের উৎস আবিষ্কারের জন্য উৎসুক, তাঁদের যাত্রাপথ অবশ্যই দুর্গম। পুরাণ, ইতিহাস, নৃবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যাঁর অবিসংবাদিত অধিকার—কেবলমাত্র তিনিই এই দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে পড়তে পারেন। লোকবিশ্বাসের দুস্তর সমুদ্র অতিক্রম করার যোগ্যতাও তাঁর থাকা চাই। আপাতত কোন জটিল তত্ত্ব ব্যাখ্যার মধ্যে প্রবেশ না করে এ কথা স্থির সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণযোগ্য যে রামায়ণের উৎস সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কোন কৌতূহল নেই। রামায়ণ, ইতিহাস কিংবা রূপক কিংবা 'নেচারমিথ' কিংবা অন্যকিছু—এই ধরনের প্রশ্নের কোন সমাধানই রামায়ণবিশ্বাসী মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ কয়েক হাজার বছর ধরে রামকাহিনী শুধু ভারতীয় জনমানসে নয়, বহির্ভারতেও—বিশেষ করে এশিয়ার বিভিন্ন ভূখণ্ডে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। বস্তুত রামায়ণকে শুধু এক মহাকাব্যরূপেই গ্রহণ করা হয় না, ভারতীয় সংস্কৃতি ও আদর্শের এক মহৎ রূপায়ণ বলেই মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে রামায়ণের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে মানসিক সংযোগ তার গভীরতার তল নির্দেশ করা যায় না। রামকাহিনী এবং রাম সম্পর্কিত জনশ্রুতি যে খুবই প্রাচীন এ বিষয়ে বেশী মতভেদ নেই। সেই কাহিনী ও জনশ্রুতিকে অবলম্বন করে অনেক অনেক আখ্যান রচিত হয়েছে। এ বিষয়ে বাল্মীকিই অগ্রগণ্য। রামকাহিনী অবলম্বনে যাঁরা পুরাণ কাব্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি রচনা করেছেন, তাঁরা পুরোপুরি বাল্মীকির রামায়ণের অনুবর্তী সে কথাও বলা যায় না।
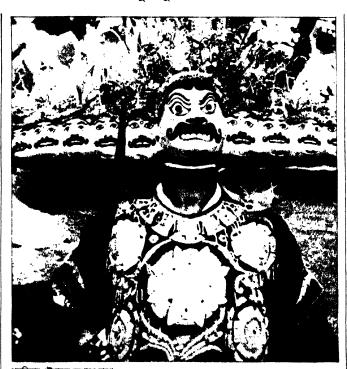
পুরুলিয়ার ছৌনাচের মুখোশে রাবণ

লক্ষ্য করা যায়—অদ্ভুত রামায়ণ, যোগবাশিষ্ট রামায়ণ কিংবা কালিদাস, ভবভূতি ভর্তৃহরিও রামকাহিনীর হেরফের ঘটিয়েছেন। তুলসীদাস, কৃত্তিবাসও সম্পূর্ণরূপে বাল্মীকির অনুগমন করেননি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শ্যামীয় রামায়ণ রামকিয়েন, মালয়ের হিকায়ৎ সে রি রাম, যবদ্বীপের কাকাবিন এবং রামকিদুং প্রভৃতি গ্রন্থের রামকাহিনীও বাল্মীকি-রামায়ণের সঙ্গে সর্বাংশে একাত্ম নয়। রামকাহিনী শুধু যে শ্যাম-কম্বুজ-সুবর্ণ দ্বীপের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করেছিল, তা নয়, চীনদেশ এবং চীনা তুর্কিস্তান থেকেও রামায়ণের সন্ধান পাওয়া গেছে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি চৈনিক রামায়ণের সংবাদ প্রথম প্রকাশ করেন। মোটের উপর রামকাহিনীর মতো এমন সর্বব্যাপক কাহিনী পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। রামায়ণের সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম-সংস্কার সংস্কৃতি প্রভৃতি এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে আধুনিক কাব্য বা উপন্যাস বিচারের মানদণ্ডে তার বিচার করা চলে না। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উক্তি অবশ্যই স্মরণযোগ্য। বলেছেন—"রামায়ণ-মহাভারতের যে সমালোচনা তাহা অন্য সমালোচনার আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র। রামের চরিত্র উচ্চ কি নীচ, লক্ষ্মণের চরিত্র আমার ভালো লাগে কি মন্দ লাগে এই আলোচনাই যথেষ্ট নয়। শুদ্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছে।" 'প্রসঙ্গ রামায়ণ' গ্রন্থের রচনার সময় ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের এই অভিমতকে অবশ্যই গ্রহণ করে রামায়ণ বিচারে ব্রতী হয়েছেন। তা বলে এ কথা বলা যাবে না যে যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে কেবলমাত্র ভাবাবেগকেই তিনি রামায়ণ বিচারের মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করেছেন। বরং এ কথা বলাই যুক্তিযুক্ত যে, রামায়ণ বিচারের দৃষ্টিভঙ্গীতে রামায়ণের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাশীলতা যেমন বর্তমান তেমনি যুক্তিগ্রাহ্য পাণ্ডিত্যেরও অভাব নেই। প্রকৃতপক্ষে রামায়ণ সম্পর্কিত বিতর্কই তাঁকে নতুন করে রামায়ণ-চিন্তার দিকে আকর্ষণ করে। সংগৃহীত তথ্যগুলি বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি যে সব মন্তব্য করেছেন, তা আমাদের মানসিক কুয়াশাকে অনেকখানি বিদূরিত করতে সক্ষম।

আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত 'প্রসঙ্গ রামায়ণের' মধ্যে নানা প্রশ্নের নানা বিতর্কের উত্তর দিয়েছেন লেখক। রামায়ণের সাহিত্যিক উৎকর্ষ সম্পর্কে তাঁর চিন্তা এবং রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্র সম্পর্কে তাঁর আলোকপাত লেখকের কবি-মানসিকতার সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ঘটায়। 'প্রাথমিক কথায়', রামায়ণ ও মহাভারত এই দুটি কাব্য সম্পর্কে তাঁর অভিমত বিশেষ ভাবেই আমাদের আকর্ষণ করে। তাঁর মতে, দুটি কাব্যই বৈদিকযুগের পরিবেশে রচিত—যখন হিন্দু ষড়দর্শনেরও আবির্ভাব ঘটেনি এবং বৌদ্ধ কিংবা জৈন দর্শনেরও আবির্ভাব ঘটেনি। এ বিষয়ে তাঁর যুক্তিগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রামায়ণের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—বৃদ্ধ্যানৈবেং বিধায় চরন্তং সুনাস্তিকং ধর্মপথাদপেতম। যথা হি

চোরঃ স তথা হি
বুদ্ধস্তথাগতং
নাস্তিকমত্রবিদ্ধি ॥ এর মধ্যে বুদ্ধ এবং তথাগত এই দুটি শব্দের উপস্থিতির কথা বলে পণ্ডিতেরা রামায়ণকে বুদ্ধ পরবর্তী কালের রচনা বলে মনে করেন। ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় শ্লোকটির নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, "বুদ্ধ শব্দটি কর্মবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে। অনুরূপভাবে তথাগত অর্থে সেই পথেরই পথিক ধরতে হবে।" শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় সি ডি বৈদ্যের উক্তি উদ্ধৃত করে এও জানিয়েছেন যে শ্লোকটি মূল রামায়ণে পাওয়া যায়নি—অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত। তবু আবার দৃঢ়ভাবেই এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, যে শ্লোকটি মূল রামায়ণে যদি থাকেও তা হলেও শ্লোকটির মধ্যে বুদ্ধ এবং তথাগত শব্দ দুটির অর্থ সম্পূর্ণরূপে পৃথক এবং তা কোনক্রমেই গৌতমবুদ্ধ সম্পর্কিত নয়। বস্তুত তিনি ম্যাকডোনেলের অনেক অভিমতকেই গ্রহণ করেছেন। রামায়ণ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ম্যাকডোনেল লক্ষ্য করেছিলেন, রামায়ণে পাটলীপুত্রের নাম উল্লেখিত হয়নি, যদিও রাম তাঁর যাত্রাপথের মধ্যে কৌশম্বী, কান্যকুব্জ, কাম্পিল্যর কথা উল্লেখ করেছেন। অনুমান করা হয়, রামায়ণ রচনাকালে পাটলীপুত্রের প্রতিষ্ঠাই হয়নি। হয়ে থাকলে বাল্মীকি অবশ্যই তার উল্লেখ করতেন।

কিথ্-এর অভিমতকে গ্রহণ করে লেখক রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডকে মূল রামায়ণের অঙ্গীভূত বলে মনে করেননি এবং ওয়েবার কথিত যুক্তিগুলির খণ্ডন করেছেন তৎপরতার সঙ্গেই।

রামায়ণ প্রসঙ্গে আর একটি প্রবল বিতর্কের এখনও অবসান ঘটেনি।

ভারততত্ত্ববিৎ ওয়েবার এবং কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় পণ্ডিত মনে করেন যে গ্রীকমহাকাব্য ইলিয়াডের ট্রয়যুদ্ধের কাহিনী অনুসরণ করেই রামায়ণ রচিত হয়েছিল। আর্থার ম্যাকডোনেল অবশ্য ওয়েবারকে সমর্থন করেননি। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ইলিয়াড ও রামায়ণের প্রকৃতিগত বিভেদের সূত্র ধরে রামায়ণে গ্রীক প্রভাবের অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে 'প্রসঙ্গ রামায়ণ' নিঃসন্দেহে রামায়ণ চর্চার ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান সংযোজন। রামায়ণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে গ্রন্থটি আরো একটি বিশেষ কারণে ভালো লাগবে যে এর মধ্যে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন অনমনীয় মনোভাব ব্যক্ত হয়নি।

অনুবাদ

তাপস মুখোপাধ্যায়

মৃচ্ছকটিক/
উৎপল ভট্টাচার্য/
মডার্ন কলাম/
কল-৯/১৫.০০

পীকস্কিল/
হাওয়ার্ড ফাস্ট/
(অনু) অনীশ দেব/
মডার্ন কলাম/
কল-৯/১২.০০

নাটকের প্রকারভেদ অনুসারে 'মৃচ্ছকটিক' হল প্রকরণ এবং এই প্রকরণটি শূদ্রকের রচনা বলে মনে করা হয়। কিন্তু শূদ্রক কে ছিলেন এই বিষয়ে মতভেদ আছে এবং তা সকলেরই জানা আছে। আবার শূদ্রক ভারতের কোন অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন কিংবা মৃচ্ছকটিকের রচনাকালও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ভাসের 'চারুদত্ত' নাটকের সঙ্গে মৃচ্ছকটিকের অনেক মিল লক্ষ্য করা যায়। শ্রদ্ধেয়া সুকুমারী ভট্টাচার্য অনুমান করেছেন 'ভাসের নাটকটিকে সম্ভবত শূদ্রক মূলরূপে ব্যবহার করেন।' কিন্তু মৃচ্ছকটিক নাটক হিসাবে যে অনন্য তা ধরা পড়ে যখন নাটকের দ্বিতীয়ার্ধে তা ঘটনার বিন্যাস ও চরিত্র রূপায়ণের জটিলতা ও সার্থকতার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। 'মৃচ্ছকটিকে'র অনুবাদ দেশী ও বিদেশী ভাষাতে অনেকবার হয়েছে। নাটকীয়তার বিচারে 'মৃচ্ছকটিক' সত্য সত্যই এমন বিরল গুণের অধিকারী বলেই বারংবার অনুবাদের জন্য অনুবাদকেরা এই নাটকের শরণাপন্ন হয়েছেন। প্রায় দেড় হাজার বছরের আনুমানিক দূরত্বে স্থাপিত নাটকটির কাহিনী রূপান্তর ঘটিয়ে তাকে উপন্যাসের রূপ দিয়েছেন উৎপল ভট্টাচার্য। এই প্রয়াস অভিনব বলেই আশঙ্কা ছিল যে মূল নাটকের অনুবাদ ও কাহিনী রূপান্তর সার্থক হবে কি না? কিন্তু উৎপল ভট্টাচার্য মূল নাটকের স্পন্দনটিকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। এর জন্য বৃহৎ পাঠকমণ্ডলীর সাধুবাদ তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য। মূল নাটকের মধ্যে যে যুগ, সমাজ, রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি নানা বিষয় ছিল, বর্তমান যুগ ও সময় এবং সমাজের সঙ্গে তার অনেকটারই মিল নেই। 'মৃচ্ছকটিকের' কাহিনী বা 'বস্তু' লোকায়ত বলে সুকুমারী ভট্টাচার্য অনুমান করেছেন। তাঁর মন্তব্য যথার্থ। তাই 'মৃচ্ছকটিক' প্রকরণ রচনায় 'বৃহৎকথা' এবং 'কথাসরিৎসাগরের' অন্তর্গত অনেক কাহিনী এবং ঘটনার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।' 'মৃচ্ছকটিক' প্রকরণ রচনায় ভরত ও বিশ্বনাথের মন্তব্য বিশেষ মনে রাখা প্রয়োজন। তাঁরা দুজনেই বলেছেন যে 'কাহিনী কবিকল্পিত হবে' এবং বিশ্বনাথ তার পরেও বললেন কাহিনী লৌকিক' হবে। তাই নায়ক এই কাহিনীতে রাজপদে নেই, বণিক চারুদত্ত দুঃস্থ হলেও উন্নতচরিত্র এবং ধার্মিক। 'মৃচ্ছকটিকের' ভাষার বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। উৎপল ভট্টাচার্য সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে 'মৃচ্ছকটিক' (মাটির খেলনা গাড়ি) নাটকটিকে রূপান্তরিত করার সময় চরিত্রগুলির মুখের ভাষাকে চরিত্রের ধর্ম অনুযায়ী বজায় রেখেছেন।

বৃত্তির দিক দিয়ে বণিক, বিট, চেট, শ্রেষ্ঠীকায়স্থ, সংবাহক, শ্রমণ, জুয়াড়ি, চণ্ডাল সকলেই এই নাটকে ও উপন্যাসে উপস্থিত। মূল নাটক ও রূপান্তরিত কাহিনী বিন্যাসের সময় উৎপল ভট্টাচার্য তৎকালীন বর্ণবিভাজনে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ, চণ্ডাল এই চারটি শ্রেণীকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়েছেন। নানা প্রাসঙ্গিক বস্তুর ও পার্শ্বচরিত্রের ব্যবহার মূল নাটক ও বর্তমান কাহিনী রূপান্তরে ক্ষুণ্ণ করা হয়নি। নানা সাব প্লট এবং মূলকাহিনী বস্তুর মধ্যে যে রূপকের অনুষঙ্গ বারংবার
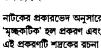
ফিরে এসেছে তা হল 'তাড়া করা'। আর একটি হল 'আশ্রয় প্রার্থনা'। নাটকের এই বিশিষ্ট লক্ষণ দুটি উপন্যাসের বর্তমান রূপেও খুঁজে পাওয়া যায়। কবিত্বের নিদর্শন মূল নাটকে অনেক আছে। উৎপল ভট্টাচার্য বসন্তসেনাকে সংস্থানকের (শকারের) তাড়া করার দৃশ্যটি কাহিনী রূপান্তরসাধনের সময় এর অন্তরালবর্তী নাটকীয়তাকে তাঁর লেখার মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'মৃচ্ছকটিক' (মাটির খেলনা গাড়ি) নাটকের বিচিত্র সুর তার ঘটনাবহুলতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। সমাজ ও মানব জীবনের সার্থক ছবি 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে পাওয়া যায়। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের কাহিনী রূপান্তরের সময় উৎপল ভট্টাচার্য একথা ভোলেননি। 'মৃচ্ছকটিক' গ্রন্থের প্রচ্ছদপট দক্ষতার সঙ্গে সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় অলঙ্কৃত করেছেন। 'প্রিন্টার্স ডেভিলের' উপদ্রব ক্লাসিক মর্যাদায় অভিষিক্ত এই প্রাচীন কাহিনীর নবীন রূপান্তরে খুব একটা বাধার সৃষ্টি করেনি। কাহিনীর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে 'মৃচ্ছকটিকের' বক্তব্য ও জনপ্রিয়তা নতুনভাবে তার মর্যাদাকে তুলে ধরেছে। উৎপল ভট্টাচার্যের কাছে এইজন্যই প্রত্যাশা অনাদরে দীর্ণ সংস্কৃত ভাষার আরো কিছু সম্পদকে বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে তিনি তা নিয়ে আসবেন।

'পীকস্কিল' হাওয়ার্ড ফাস্টের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত।

'পীকস্কিলের' অনুবাদক অনীশ দেব ধন্যবাদের পাত্র কারণ তিনি হাওয়ার্ড ফাস্টের লেখার গভীরতাকে এবং তার বক্তব্যকে অনুবাদের মধ্যে অবশ্যই তুলে ধরতে পেরেছেন। হাওয়ার্ড ফাস্ট তাঁর 'স্পার্টাকাস' উপন্যাসের ভূমিকাতে বাংলা ভাষা ও বাঙালী পাঠকদের অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন, 'যখন আমি এই বই লিখি আমি আশা করেছিলাম এর যথার্থ মর্ম নিপীড়িত মানুষ মাত্রই উপলব্ধি করবে, পীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের সব সংগ্রামই যে বৃহত্তর ব্যাপক এক সংগ্রামের অঙ্গ এই বোধ জাগিয়ে তুলতে কিছুটা অন্তত সাহায্য করবে।" (স্পার্টাকাস বাংলা অনুবাদের ভূমিকা—সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়)। 'পীকস্কিলের' অনুবাদক অনীশ দেব তাঁর অনুবাদের কঠিনতম দায়িত্বটুকু অতিক্রম করেছেন সাবলীলভাবেই। ইতিহাসের বাস্তবতার মধ্যে পীকস্কিলকে ঘিরে যে ঘটনা পর পর ঘটেছিল তা মৃত ইতিহাসের জমানো তথ্যপুঞ্জ নয়, বরং 'ডকুমেন্টারী এভিডেন্স' হিসাবে পীকস্কিল তৎকালীন শাসকশ্রেণী আমেরিকাতে যে চণ্ডনীতির সূত্রপাত করেছিল তার থেকে ফ্যাসিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা নয়। পীকস্কিলে অত্যাচারীর কৃপাণ নেমে এসেছিল ভীমবেগে—একটি অনুষ্ঠানের জন্য সমবেত মানুষের উপর। পল রোবসনের সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণে ইচ্ছুকদের 'রাষ্ট্রদ্রোহী', 'বিশ্বাসঘাতক' এই ধরনের শাস্তি পেতে হয়েছে। অনুবাদক অনীশ দেব তাঁর প্রাক কথনে জানিয়েছেন: "পরে এ জাতীয় আরো বহু ঘটনা ঘটেছে। শুরু হয়ে গেছে মার্কিন ফ্যাসিবাদের ক্রমবিকাশের ধারা। এই 'ধারা'র উৎস ও চরিত্র বিচারের মূল চাবি 'পীকস্কিল'। সেইজন্যেই 'পীকস্কিল' এতো গুরুত্বপূর্ণ।"

এই প্রসঙ্গে"মার্কিন ফ্যাসীবাদের প্রথম প্রকাশ্য প্রদর্শনী হাওয়ার্ড ফাস্ট এই রকম একটি মন্তব্য করেছেন। পীকস্কিলের মাত্র আটদিনের বিবরণী হাওয়ার্ড ফাস্টের বইতে পাওয়া যায়। যার মধ্য দিয়ে ফ্যাসীবাদের নগ্ন চেহারা পরিষ্কারভাবেই ফুটে উঠেছে। একদা গোড়া নীতিনিষ্ঠ হাওয়ার্ড ফাস্টের লেখনীতে পীকস্কিলকে ঘিরে জনসমুদ্রে যে জোয়ার লেগেছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লেখক দিয়েছেন। বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে এমনই আটটি ছবি যা সেই যুগ ও সময়ের দলিল। হিরোসিমাতে বোমা ফেলার সময় চল্লিশ বছর পরেও এই পৃথিবীর মানুষের কাছে 'যুদ্ধ' শব্দের আতঙ্ক মন থেকে এখনও মুছে যায় নি। অত্যাচারী মানুষের পতন হবে—মানুষের মধ্যেকার শুভবোধ জয়ী হবে এই আশা পোষণ করা অন্যায় হবে কি? 'পীকস্কিল' আমেরিকার ছোট শহর—বৃহৎ নগীরর কৌলীন্য থেকে বঞ্চিত। এখানে একটি গণসঙ্গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন ও প্রস্তুতিপর্বকে পণ্ড করতে যে নারকীয় তাণ্ডব চলেছিল বর্তমান অনূদিত গ্রন্থটি সেই ঘটনাপঞ্জীর দলিল। সত্যের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পীকস্কিলের সূত্রপাত ;—কিন্তু নাটকীয়তা থেকে তা বঞ্চিত নয়। হাওয়ার্ড ফাস্ট বলেছেন, "...আমার যতো আগ্রহ সত্যিকারের ছবিটা তুলে ধরাতেই—আবারও বলি, আমার পর্যবেক্ষণ ও তথ্যের চৌহদ্দির মধ্য থেকেই।" তথ্যভিত্তিক এবং ঘটনাবহুল 'পীকস্কিল' অনুবাদে অনীশ দেবের প্রয়াস উল্লেখযোগ্য। 'পীকস্কিলের' প্রকাশকও সুমুদ্রিত এই গ্রন্থ দুটির জন্য ধন্যবাদের অধিকারী।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কবিতা-সমগ্র
অক্ষয়কুমার বড়াল
কাব্য-চয়নিকা
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত **সায়ম্**
প্রতিটি পনের টাকা
মোহিতলাল মজুমদার
সাহিত্য-কথা :
জীবন-জিজ্ঞাসা
বাংলা কবিতার ছন্দ
রবি-প্রদক্ষিণ
প্রতিটি পঁচিশ টাকা
ডঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ : **মার্ক্সবাদ**
লাডউইন ও দত্ত : **স্ট্যালিন**
রামপদ মুখোপাধ্যায় **আলেখ্য**
অমলা দেবী : **সমাপ্তি**
প্রতিটি দশ টাকা
দে বুক স্টোর
১৩ বংকিম চাটারজি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭৩

[illegible]-এর
আমাদেরও কিছু করবার আছে
সমাজ-সৌধের ভিত্তিমূলে শতমুখ সুড়ঙ্গ কেটে নিঃশব্দে প্রবেশ করেছে অন্যায়, দুর্নীতি আর পাপাচার। আমরা অন্তরে বাহিরে অন্ধ সেজে ধৃতরাষ্ট্রের মত বসে আছি সেই জীর্ণ প্রাসাদের অভ্যন্তরে। এ যেন ভাগ্যকে অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নিয়ে নিয়তির প্রবাহে নিশ্চেষ্ট অনিবার্য আত্মসমর্পণ।
কিন্তু "আমাদেরও কিছু করবার আছে" এই বাক্যটি মন্ত্রের মত ধ্বনিত হয়েছে এই সর্বব্যাপী অবক্ষয়ের মুহূর্তে ১৫৲
রূপা অ্যান্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

বেরুল : সেরা উপন্যাস
বিমল মিত্রের
এর নাম সংসার ১৫
কথা ছিল ১২ **বিবাহিতা** ১০
প্রফুল্ল রায়ের
হঠাৎ বসন্ত
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মনোরমা ১৮
উজ্জ্বল ● সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

নেতাজী সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য নেতাজীর বিরুদ্ধে আজও কি ষড়যন্ত্র চলছে। শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিককে মদ্যপ সাজিয়ে কি ভাবে তাঁর চরিত্রহননের পরিকল্পনা! কাদের ষড়যন্ত্রে তিনি আত্মপ্রকাশ করতে পারছেন না? নেতাজীর জীবন-রহস্যের এক অবিশ্বাস্য কাহিনী।

অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তীর
শৌলমারীর সাধু কি নেতাজী ?
মূল্য ১৫৲
নাথ ব্রাদার্স, শৈব্যা, দে বুক স্টোর, কলেজ স্ট্রীট

রণাঙ্গনে। গোপাল সামন্ত।
বিশ্বযুদ্ধের এই বহু প্রশংসিত উপন্যাসটি পুনর্মুদ্রিত।
দাম পঁচিশ টাকা।

আলো অন্ধকার। গোপাল সামন্ত।
প্রকাশিত হল। এ এক আশ্চর্য উপন্যাস। পাঠক প্রশ্ন করবেন, এই গোপাল সামন্ত কোথায় ছিলেন এতদিন
দাম কুড়ি টাকা।

ছোটদের রবীন্দ্রনাথ।
দীনেশ মুখোপাধ্যায়।
এক আশ্চর্য লেখা। রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে, সই করা আশীর্বাদপ্রাপ্ত বই **দাম বার টাকা।**

নীল সবুজ ও মহানগর গোপাল সামন্ত।
এক আশ্চর্য গঠনের কিশোরপাঠ্য উপন্যাস। পঁয়ত্রিশটা ছোট গল্পে ধরা আছে গ্রাম থেকে, নীল সবুজ থেকে, নগরের বিবর্তন। দাম কুড়ি টাকা।

স্বকাল পুরুষ। আনন্দ বাগচী।
প্রথম কাব্যোপন্যাস বঙ্গসাহিত্যে। আশ্চর্য ছন্দজ্ঞানের পরিচয় এতে আছে। আছে জীবনবোধ। বইটি হারিয়ে গিয়েছিল বলা চলে। আনন্দ বাগচী তা সানন্দে প্রকাশিত হতে দিচ্ছেন। এবই কালজয়ী হবে আশা করা যায়। শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। দাম বার টাকা।

সুনন্দ প্রকাশনী। ৬১ কাঁকুলিয়া রোড। কলকাতা-২৯। 'সুনন্দা প্রকাশনী' এক ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠান। কোন কুরুচিপূর্ণ লেখার স্থান এতে নেই। সব নতুন প্রতিভার সম্মান দেওয়া হবে। ইংরাজি এবং বাংলা অনুবাদেও। ক্রেতারা কিছুতেই ঠকবেন না। সব লাভই যাবে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে।

কিশোর পাঠ্য

স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

বারোটি কিশোর ক্লাসিক/
শেখর বসু/
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ/
কল-৯/২০.০০

অ্যালিস থেকে অ্যালিসিয়া/
অরুণোদয় ভট্টাচার্য/
উদয় প্রকাশন/
কল-৭৩/১০.০০

ছোটদের উপযোগী করে লেখা দুখানি বই-ই বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ। ভাষান্তরের সমস্যা ও কিশোর মনের উপযোগী হয়ে ওঠা—এই কঠিন দুই শর্তের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিকদ্বয়কে নিশ্চিতভাবে এগোতে হয়েছে। তাঁদের নিষ্ঠিত ও সাহসী প্রয়াস কম প্রশংসনীয় নয়। তবে গ্রন্থ-পরিকল্পনা দুটির মধ্যে কিছু পার্থক্যও আছে। 'বারোটি কিশোর ক্লাসিক' নামটি লক্ষ করলে বিষয়বস্তু কি হতে পারে, আভাস পাওয়া যায়।—বিশ্ববিখ্যাত ক্লাসিক গ্রন্থগুলির মধ্য থেকে নির্বাচিত উজ্জ্বল কয়েকটি রচনার মূল মেজাজ ও রস পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়েছেন লেখক। 'দি স্টোরি অব ডন কুইক্সোট' [মিগুয়েল সারভানতিস], 'রবিনসন ক্রুসো' [ডঃ ডানিয়েল ডিফো], 'গালিভার'স ট্রাভেলস' [জোনাথান সুইফট], 'সুইস ফ্যামিলি রবিনসন' [যোহান রুডলফ উইস], 'দি হাঞ্চব্যাক অব নোতরদাম' [ভিক্টর উগো], 'দি থ্রি মাস্কেটিয়ার্স' [আলেকজাঁদর দ্যুমা],

'আংকল টম'স কেবিন' [হ্যারিয়েট বিচার স্টৌ], 'হাইডি' [যোহানা স্প্রাই], '২০,০০০ লিগস আন্ডার দি সি' [জুলে ভের্ন] ও 'দি হাউন্ড অব বাস্কারভিলস' [স্যার আর্থার কোনান ডয়েল]—গ্রন্থভুক্ত বিভিন্ন স্বাদের দ্বাদশ কাহিনীর যথাক্রম। ছোটবেলায় যেসব বই আনন্দের খোরাক ছিল— সেগুলি নতুন করে অনুবাদিত হচ্ছে—এতে ক্লাসিক সাহিত্যের দেশকালনিরপেক্ষ আবেদনের জঙ্গমতাই প্রমাণিত হল। সুখের কথা, একালের কিশোর-কিশোরীরাও এই পরিতৃপ্তির অংশভোগী হচ্ছে। এসব বইয়ের ভাষান্তরিতকরণেরও একটা যে সঠিক লক্ষ্য থাকবে 'কিশোর ক্লাসিক' প্রসঙ্গে সে সম্বন্ধে সুন্দর বক্তব্য রেখেছেন শ্রী শেখর বসু: "বিদেশী সাহিত্যের বর্ণোজ্জ্বল বিশাল জগতের সামান্য পরিচয় দেবার ক্ষুদ্র চেষ্টা করেছি এই বইতে। বাংলাভাষী কিশোর-কিশোরীরা যদি এই বইটি পড়ে মূল গ্রন্থ [মূল রচনা যেখানে ইংরেজিতে নয়, সেখানে প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ভরযোগ্য ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে] পড়তে উৎসাহিত হয়, আমার পরিশ্রম সার্থক হবে মনে করি।" বিশ্বসাহিত্যের মণিমুক্তার প্রতি অল্পবয়সীদের আগ্রহী করে তোলার আয়োজন ধন্যবাদার্হ। উপভোগের মাধ্যমে মুক্তচিন্তাও তো এইভাবেই সংক্রমিত হয়। অনুবাদ প্রসঙ্গে মন্তব্য, বারোটি গল্পের বিষয়বস্তু ও মূল সৌন্দর্য, গ্রন্থগুলির পূর্বেকার অনুবাদ-সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য আলোচনায় এসেছে এবং সর্বোপরি শুরু করেছেন উপন্যাসের চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে।—প্রতিটি কাহিনীর পরেই লেখক-পরিচিতি ভাল লাগে। 'দি হ্যাঞ্চব্যাক অব নোতরদাম'—আলোড়নকারী বইটিকে কিশোর উপযোগী করতে গিয়ে একটু বেশি কলমছাঁটা হয়ে গেল নাকি? প্রচ্ছদ, মুদ্রণ মন্তব্যনিরপেক্ষ। গ্রন্থটিতে মাঝে মাঝে চিত্র-অলঙ্করণ দৃষ্টি রঞ্জন। 'বারোটি কিশোর-ক্লাসিক' তার পাঠকদের খুশী করবে। দ্বিতীয় বই 'অ্যালিস থেকে অ্যালিসিয়া' রূপকথানির্ভর। মুখে মুখে প্রচলিত নয়, সাহিত্যস্রষ্টারা রূপকথার কাঠামোয় যে গভীর অর্থময়, প্রতীকী গল্প সৃষ্টি করেন, সেই সাহিত্যিক-রূপকথার সংকলন; 'লুইস ক্যারোলের' 'অ্যালিসেস অ্যাডভেঞ্চার ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড'—'স্বপ্নরাজ্যে অ্যালিস', 'মেরী ডি মরগ্যানের' 'দি হেয়ার ট্রি'—'চুল গাছের কাহিনী' এবং 'চার্লস ডিকেন্সের' 'দি ম্যাজিক ফিশ বোন'—'অলৌকিক মাছের কাঁটা' নামে অনুবাদ সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয়টিতে মূল গল্পের ছোট ছোট কবিতা অবশ্য বর্জন করা হয়েছে; অনুবাদকের সে স্বাধীনতা আছেই। গল্প নির্বাচন প্রসঙ্গে ভূমিকায় বলা হয়েছে: "...এই কথা মনে রেখেই নির্বাচিত করেছি যাতে একই সঙ্গে আশ্চর্যজনক ও মজাদার কল্পনার এক রামধনু জগত বইয়ের পাতা থেকে কল্পনাপ্রবণ শিশু পাঠক

বীরেন্দ্র দত্তের দুটি গ্রন্থ
নির্জন দর্পণ (উপন্যাস) ২৫.০০
একালের এক শিক্ষিত স্পর্শকাতর যুবতীর জটিলতম মনস্তাত্ত্বিক প্রেমের জীবননিষ্ঠ রুদ্ধশ্বাস কাহিনী
শান্তিপর্ব (গল্প গ্রন্থ) ১২.০০
লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠগল্প 'শান্তিপর্ব'-সহ মোট দশটি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের এক সার্থক গল্পসংকলন
পুস্তক বিপণি। ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

পাঠিকাদের মনে নিবিড় স্থান নেয়।" লেখকের উক্তি অনুসারে ছোটদের সুকুমার অনুভূতিপ্রবণতার দিকটি বইয়ে জোর পেয়েছে, বলাই বাহুল্য।

অনুবাদের ভাষাটি মনোরম ; ঝরঝরে সুমিষ্ট লেখার টানে গল্প তিনটি উপভোগ্য। প্রত্যেক গল্পের রচয়িতার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রচনা পরিচিতিতে উপকৃত হবে নবীন পড়ুয়ারা।

অভিযান-কাহিনী

রঞ্জন ভাদুড়ী

দুঃসাহসিক অভিযান/ সাধনা মুখোপাধ্যায়/ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ/ কল-৯/১৫.০০

একেবারে হাঁটি-হাঁটি পা-পা থেকে মানবসভ্যতা আজ যে টগবগিয়ে ছুটছে, পৃথিবী ধ্বংস না হলে যে-ছুট কখনও দমছুট হবার নয়, তার রসদ ও শক্তি জুগিয়েছে অসমসাহসী কিছু মানুষের একের পর এক ধারাবাহিক দুঃসাহসিক অভিযান। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি। শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাঙ্ক্ষার দুঃসাহস।' পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি অভিযানেরই চালিকাশক্তি এই ত্রিমাত্রিক দুঃসাহস। দুর্জ্ঞেয় দুরধিগম্য জলেস্থলে পাহাড়ে পর্বতে জঙ্গলে সমুদ্রে মরু-মেরু অঞ্চলে মানুষ যুগে যুগে অভিযান চালিয়েছে প্রধানত কয়েকটি কারণে—এক, দিগ্বিজয় : দুই, বাণিজ্যবিস্তার ; তিন, ধর্মপ্রচার ; চার, আবিষ্কার ; এবং পাঁচ, নিছক পর্যটন-পিয়াস। এ-ছাড়া অজানার হাতছানিতে ঘর ছেড়ে বেরিয়েও কত মানুষ কত অভিযানে শামিল হয়েছে। সব অভিযানই গোটা মানবসমাজকে করেছে উপকৃত। আবিষ্কৃত হয়েছে নতুন নতুন দেশ-মহাদেশ, মানুষ সেখানে বন কেটে বসত বানিয়েছে, গড়ে তুলেছে নতুন সভ্যতা। এইসব কখনও দুরন্ত কখনও তুরন্ত বেশ কিছু অভিযানের রোমাঞ্চকর গল্প শুনিয়েছেন সাধনা মুখোপাধ্যায় তাঁর 'দুঃসাহসিক অভিযান' বইখানিতে। ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণের যৌগপত্য তাঁর রচনাকে করেছে সমৃদ্ধ। মোট একত্রিশটি অভিযানের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন লেখিকা। 'আদিকালের অভিযান' শীর্ষক প্রথম রচনায় তিনি অল্প কথায় একেবারে প্রথম যুগের বিভিন্ন অভিযানের কার্যকারণের সংক্ষিপ্ত ঘনবদ্ধ কাহিনী শুনিয়েছেন। সেইসব বিক্ষিপ্ত অভিযানের পিছনে প্রথমে ছিল মানুষের বেঁচে থাকবার তাগিদ, তারপর নিজের এলাকা বাড়ানোর উদগ্র আকাঙ্ক্ষা, তারও পরে 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' মনোভাব। ৮৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ফোনেসিয়ানরা সুদূর ভূমধ্যসাগর অঞ্চল থেকে জাহাজে পাড়ি দিয়ে ভারতের সঙ্গেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। আদিকালের অভিযান শেষ করে লেখিকা পর-পর আরও ত্রিশটি অভিযান-কাহিনী শুনিয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের অভিযান, হিউয়েন সাঙের অভিযান, অতীশ দীপঙ্করের তিব্বত অভিযান, মার্কো পোলোর অভিযান, ভাস্কো-ডা-গামার অভিযান, ম্যাগেলান ও ড্রেকের পৃথিবী পরিক্রমা, নীল নদের উৎস সন্ধানে, আমেরিকা আবিষ্কার, ডেভিড লিভিংস্টোন ও আফ্রিকা অভিযান, কলোম্বাসের অভিযান, মেরু অভিযান, কুমেরু অভিযান ও ক্যাপ্টেন স্কট প্রভৃতি অধ্যায়। বই শেষ হয়েছে এভারেস্ট অভিযানের কাহিনী শুনিয়ে। এই বইয়ের বিষয়বস্তুতে লেখিকা সবিশেষ ব্যুৎপন্না। তাঁর ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিও বেশ সাবলীল। তবে তথ্য ও সন-তারিখ যেহেতু প্রচুর, তাই লেখাগুলো মাঝে মধ্যে পাঠ্যপুস্তকধর্মী বিবরণের মতো হয়ে গেছে। একটু গল্পের মেজাজ থাকলে ভাল হত। যাই হোক, বইখানা ভিতু ও 'ভেতো'দের পড়া দরকার, কারণ অভিযান মাত্রেই রোমাঞ্চকর। তার ধারাবর্ণনা শুনলে অবশ্যই মনে-প্রাণে সাহসের সঞ্চার হবে। প্রকাশনা সুন্দর, পাতায় পাতায় ম্যাপ আর ছবি—কৌতূহলী মনের খোরাক জোগায়।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ ওয়াই. ডি. এজেন্সিজ, ১১৩-বি, মনোহরদাস কাটরা (চতুর্থ তল); কলকাতা-৭০০ ০০৭। শ্রী-টেক্স কম্পানি ৩০, পি. টি. পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট (দ্বিতল) খ্যাংরাপট্টি, কলকাতা-৭০০ ০০৭।

ত

Desh weekly 6 December 1986. Reg. No. WB CC 184 74. MH. By South 681

১৩ ডিসেম্বর ১৯৮৬ পাঁচ টা

গিন্নী বলেন
চায়ের সঙ্গে চলবে নাকি মারী?
কর্তা বলেন লিলি হলে
জমবে সেটা ভারি।
কেমন মজা কুড়মুড় মুড়
ক্রীমক্র্যাকারে জেলি
দারুণ মজা সন্দেহ নেই
হলে সেটা লিলি।
এসে গেছে লিলি বিস্কুট
টাটকা তাজা
দারুণ মজা
লিলি বিস্কিট
LILY
BISCUITS
LB-6/91

২০

আ[illegible]
[illegible] ক্রমশ চলেছেন [illegible] । কলকাতার [illegible] সুতানুটিতে নোঙর ফেললেন, নামলেন । উদ্‌যাপিত হল বড়দিন-এর উৎসব । অর্থাৎ কলকাতার পত্তনের সঙ্গে বড়দিন বিজড়িত, স্মরিত ভগবান যীশু । খ্রীষ্টের প্রেমধর্ম, মানবতার বাণীর সঙ্গে বিরোধ ঘটেনি স্থানীয় ধর্ম-সংস্কৃতির । কিন্তু একদা যেমন বণিকের মানদণ্ড রাত পোহাতেই রাজদণ্ডরূপে দেখা দিল তেমনি এক সময় যাজকের ক্রুশদণ্ডও ওই দুই শক্তির স্বার্থ সংযোগের প্রতীক যোগচিহ্ন রূপে প্রতিভাত হল । যুগপৎ

চলতে লাগল বিদেশাগত সওদাগরের শোষণ, শাসকের নিপীড়ন আর যাজকের ধর্মান্তরণ । ত্রিশক্তির বিরুদ্ধে ক্রমে দেখা দেয় বিক্ষোভ এবং কখনো বিদ্রোহ । আজ মানদণ্ড, রাজদণ্ড অপসারিত । ক্রুশ দণ্ড আছে । আছে তার আশ্রয়ে সেবাকেন্দ্র, শিক্ষাসত্র, গির্জা এবং বহুধাবিস্তৃত মিশনারী-কর্মকাণ্ড । প্রতিষ্ঠানিক ধর্মকর্মে পশ্চিমী দুনিয়ার যখন ভাটার টান, এখানে তখন চলছে জোয়ার আনার চেষ্টা । আর সে চেষ্টার মধ্যে একটা আবিল স্রোতও কি লক্ষণীয় ? ধর্মপ্রচারক কি ধর্মান্তরণ-প্ররোচকের ভূমিকা বাইবেল-এর মোড়কে কি বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রচারপত্র ? এসব নিয়েই আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ প্রচ্ছদ নিবন্ধ মালায় ।

৫১

এবার বিজ্ঞানের কোনো শাখাতেই কেউ এককভাবে নোবেল পুরস্কার পাননি । সবকটিই বহুজাতিক সদস্যের যৌথ প্রয়াসের প্রাপ্তি । কোনোটির অংশভাগী দু'জন, কোনটির তিনজনও । কে কী এঁরা উপহার দিলেন আগামী দিনের জন্য মানব-সভ্যতার ভাণ্ডারে ? কেউ দিলেন জরা-বার্ধক্যের মূল্য রহস্য উদঘাটন করে একে প্রতিরোধ করার পন্থা, কেউ দিলেন সূক্ষ্মতম বস্তু বিশ্লেষণের যন্ত্র, কারো অবদান বিশ্বব্যাপী রাসায়নিক বিক্রিয়ার অনেক অজ্ঞাত তথ্য । পুরস্কৃত বিজ্ঞানী আর তাদের আবিষ্কার নিয়ে আলোচনা ।

৩৩

মিশনারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আদর্শ কী, কী ফলশ্রুতি, তাঁর দীর্ঘ কলেজীয় জীবন, ব্যক্তিজীবন' এসব নিয়েই সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের রেকটর ফাদার অ্যালবার্ট হুয়ার্টের এক সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকার ।

৫৭

রঘুরাজপুর । ওড়িশার নারকেল তরুছায়ে ছড়ানো একটি রঙবাহার পল্লী । পল্লীটি ছুঁয়ে চলেছে ভাগবী নদী । মিশেছে পুরীর সাগরে । চলার পথে নিয়ত বয়ে নেয় একটি বার্তা—ছোট্ট গ্রামের এক শিল্প সাধনার বার্তা।সেই গ্রামের প্রতিটি পর্ণকুটিরই পটচিত্রের এক-একটি আশ্চর্য চিত্রশালা । সারা দিন রঙ-তুলি, সন্ধ্যায় নাচ-গান এই নিয়ে সে গাঁয়ের জীবন । তাদের শিল্পই সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা থেকে নিয়ে আসে পুরস্কার ।

৯৭

রোমের সেই অমর সমাধিতীর । কুসুমের পাড়ে ঘেরা শ্বেত মর্মরের আচ্ছাদনের তলায় সেখানে শায়িত শেলী আর কীটস । এক বাঙালি কবির দুখানি কবিতার বই বন্দ্য হল সেখানে ফুলের মতো সমর্পিত হয়ে । করলেন কবির রোম সফররত সুহৃদ । তার সবিস্তার বর্ণনা ।

একটি সশ্রদ্ধ প্রকাশন

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

সারা জীবনের সুনির্বাচিত ফসল

গল্পমালা

দাম ৫০·০০

আবু সয়ীদ আইয়ুব যাঁর গল্পকে স্থান দেন বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পের পর্যায়ে, সন্তোষকুমার ঘোষ যাঁকে বসান মপাসাঁ, ও হেনরি, শেখভ ও রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ আসনে, সেই নরেন্দ্রনাথ মিত্র চার দশকব্যাপী সৃষ্টিকালে, প্রায় চার শ গল্প লিখেছেন। তার অধিকাংশই এখন গ্রন্থাকারে দুষ্প্রাপ্য। অথচ নিত্য তাঁর বিভিন্ন গল্পের খোঁজ করেন গবেষক বা চিত্রপরিচালক কিংবা অনুরাগী পাঠক। নিরন্তর সেই চাহিদার কথা ভেবেই নরেন্দ্রনাথের ছোট-বড়-মাঝারি মাপের পঞ্চাশটি অবিস্মরণীয় গল্প নিয়ে প্রকাশিত হল এই সশ্রদ্ধ সংগ্রহ — 'গল্পমালা'।
বিভিন্ন দশকে নরেন্দ্রনাথের গল্পের যে-দিকবদল, মনোভঙ্গির যে-ধারাবাহিকতা তা যাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ রেখেই এ-সংগ্রহের নানা ধরনের বিচিত্র স্বাদের গল্পাবলী নির্বাচিত।
শুরুতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে লেখকের আত্মবিশ্লেষণধর্মী কৌতূহলকর রচনা—'গল্প লেখার গল্প'। অন্তর্ভুক্ত গল্পমালার সাময়িকপত্রে প্রকাশকাল উল্লিখিত পরিশিষ্টে।
সব দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের গর্ব করার মতো লেখকের প্রতিনিধিত্বমূলক গল্প-সংকলন, 'গল্পমালা'।
প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন।

অম্লান দত্তের

যুক্তিসিদ্ধ আলোচনা

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ

দাম ১২·০০

দুই জীবনের অভিজ্ঞতা প্রবাহিত ভিন্ন দুই খাতে, কর্মের ধারায় দু-জন দু-জগতের, চারিত্র্য ও কণ্ঠস্বর স্বতন্ত্র, তবু কোথাও যেন সাদৃশ্যে, কোথাও-বা পরিপূরকতায় দুজনেরই চিন্তা ও কর্ম আমাদের পরম সম্পদ।
একজনের অনুষঙ্গে—অহিংসা, অন্যজনের বাণীতে সেই শব্দটি আনন্দ। এখানে তাঁদের পার্থক্য, আবার এখানেই তাঁদের মিল।
গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ—এ-যুগের দুই প্রধান ব্যক্তিত্বের কোথায় মিল আর কতটুকু মিল, কোথায় পার্থক্য আর কী-পরিমাণ পার্থক্য, তাই নিয়েই সজীব, যুক্তিশীল, গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এ-গ্রন্থে। দীর্ঘ এই নিবন্ধটি ছাড়াও শিক্ষা, জাতীয় সংহতি, বাংলার নবজাগরণ, রামমোহন, গান্ধী, মানবেন্দ্রনাথ রায়, সংসদীয় গণতন্ত্র প্রভৃতি বিষয়েও কয়েকটি আলোচনা। বলা বাহুল্য, প্রচলিত মতের পুনরাবৃত্তির জন্য কলম ধরেননি অম্লান দত্ত।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ : গণযুগ ও গণতন্ত্র ৬·০০ প্রগতির পথ ৬·০০ ব্যক্তি যুক্তি সমাজ ৬·০০ কমলা বক্তৃতা ও অন্যান্য ভাষণ ১০·০০ The Third Movement 10.00.
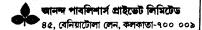
পঞ্চম মুদ্রণ

মতি নন্দীর

চলচ্চিত্রায়িত উপন্যাস

কোনি

দাম ৮·০০

কোনি নয় নিতান্তই সাঁতার-নিয়ে লেখা এক উপন্যাস, যার প্রধান আকর্ষণ বিষয়-বৈচিত্র্যে। নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের সাধ ও অপূর্ণতা, সংকল্প ও লক্ষ্য-পূরণের প্রখর প্রতীকী ও সেইসঙ্গে জীবন্ত চলচ্ছবি বারবার খেলার জগৎভিত্তিক যে রচনায় তুলে ধরেন মতি নন্দী, 'কোনি' সেই মিছিলেই অনন্য এক সংযোজন।

তৃতীয় মুদ্রণ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

মজাদার কিশোরোপন্যাস

হেতমগড়ের গুপ্তধন

দাম ১০·০০

চোর আর দারোগা, বাঘ আর বাঁদর, ভূত আর মানুষ—এ-উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র এমনই যে, কোনটি ছেড়ে কোনটির কথা আগে বলার, তা ভেবে কূল পাওয়া যাবে না। আর এরা সব্বাই মিলে যে-মজাদার কাণ্ডকারখানা বাধিয়েছে, তাও বস্তুতই তুলনারহিত করে তুলেছে এই লেখাটিকে।

প্রকাশিত হয়েছে

দিব্যেন্দু পালিত-এর

নতুন কবিতার বই

নির্বাসন, নয় নির্বাচন

দাম ১০·০০

গল্প-উপন্যাসে তাঁর অসাধারণত্ব সাম্প্রতিক সাহিত্যে সচল আলোচনার বিষয় হলেও, রুচিশীল পাঠকের মনে দিব্যেন্দু পালিত-এর কবিতার আকর্ষণও সমানভাবে সক্রিয়। এমনও ভাবা যেতে পারে যে, তাঁর কবিতায় অন্তঃশীল শক্তি ও ব্যক্তিত্বই তাঁর গদ্যের অন্যতম প্রেরণা।
আশ্চর্য নাগরিক মননে সমৃদ্ধ, শব্দ, ছন্দ ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে চমকপ্রদ এবং একেবারেই নিজস্বতায় দীপ্ত ও সমসাময়িক, তাঁর এই পঞ্চম কবিতা-সংকলনে দিব্যেন্দু পালিত পৌঁছে গেছেন এক নতুনতর উত্তরণে—ধর্ম ও স্নায়ুর যুদ্ধে বিক্ষত যেখানে শ্লেষ বেঁকে থাকে একান্ত উচ্চারণে, শতরান পূর্ণের দৌড়ে পরেই এসে যায় ফেরার বৃত্তান্ত, বিষাদ নির্মিত হয় জলের শূন্যতায়, কিংবা একলা নৌকার দৃশ্যে।
এসব কবিতার অন্তর্গূঢ় রহস্য ও স্মৃতির সঞ্চরণ তন্ময়তায় মর্মভেদী, কখনো-বা মৃত্যু-ভাবনায় চকিত। অনেকগুলি কবিতায় এসে গেছে আন্তর্জাতিক ভ্রাম্যমাণ কিছু অনুভব—কবি ও কবিতার পারস্পারিক অন্বয় রচনায় যা অনন্য। 'নির্বাসন, নয় নির্বাচন' আধুনিক বাংলা কবিতায় নতুন মাত্রা যুক্ত করল।

সত্যজিৎ রায়ের

অনুবাদের আদলে নতুন সৃষ্টি

তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম

দাম ১৬·০০

শুধু তো ঘোড়ার ডিম নয়, তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম। আবোলতাবোল-এর শেষ কবিতায়, সুকুমার রায়েরও শেষ রচনায়, আজগুবি দুনিয়ার মেজাজকে এই একটি পঙ্‌ক্তিতে যত সংক্ষেপে ধরা হয়েছে, তার থেকে কম কথায় আর ধরা যেত না। সেই আজগুবি দুনিয়ারই বিশেষেরা দুই স্রষ্টার সৃষ্টিকে সামনে রেখে নতুন রসের রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন সত্যজিৎ রায়। মুখ্যত দুই খেয়ালরসিক লুইস ক্যারল ও এডওয়ার্ড লিয়রের বেয়াড়া ও সৃষ্টিছাড়া, নিয়মহীন ও হিসাবহারা জগৎকে নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তিতে সুকুমার রায়ের উত্তরাধিকারেরই অন্তর্গত করে তুলেছেন তিনি।
তোড়ায় বাঁধা এসব লেখা যতখানি লিয়রের, ক্যারলের বা হিলেয়ার বেলোকের (তাঁরও রচনা এই বইতে), ততখানিই সত্যজিৎ রায়ের। অনুবাদের আদলে এ এক অনন্য অনুসৃষ্টি।
আটটি ছড়া, একটি গদ্য-রচনা ও আঠাশটি লিমেরিক-এর মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের অনন্য স্বাক্ষর যেমন প্রধান আকর্ষণ, তেমনই অন্যতম আকর্ষণ মূল ছবিতে ভরিয়ে তোলা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা।

প্রকাশিত হয়েছে

পূর্ণিমা ঠাকুরের

রান্নাশেখার স্বর্ণখনি

ঠাকুরবাড়ির রান্না

দাম ১২·০০

গান যেমন একাকী গায়কের নয়, রান্নাও নয় তেমনই শুধু সূপকারের। রান্না তখনই সার্থক, যখন তা অন্যের রসনায় তোলে পরিতৃপ্তির কল্লোল।
ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী নিজে যে রন্ধনপটীয়সী ছিলেন তা নয়, কিন্তু ভালো রান্নার সমঝদার ছিলেন। দেশে বা বিদেশে যখনই কোনও স্বাদু রান্না খেয়েছেন, তখনই জিজ্ঞাসা করে লিখে রেখেছেন তার প্রস্তুতপ্রণালী। এভাবেই একটি খাতা ভরে জমে ওঠে তাঁর সারা জীবনের অমূল্য সংগ্রহ।
খাতাটি পরে তিনি উপহার দিয়ে যান পূর্ণিমা ঠাকুরকে। ইন্দিরা দেবীর সংগৃহীত সেই রান্নার খাতা থেকেই এ-গ্রন্থের অধিকাংশ রন্ধনপ্রণালী আহৃত। অধিকাংশ, কিন্তু সব নয়। লেখিকার মা নলিনী দেবী নিজে খুব ভালো রাঁধতেন। তিনি ছিলেন ঠাকুরবাড়িরই মেয়ে। তাঁর কাছেও বহু রান্না শিখেছেন পূর্ণিমা ঠাকুর। সেইসব রান্না ও নিজের সংগ্রহ-করা বৈচিত্র্যময় বেশ কিছু রান্নাও এই বইতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তিনি। সব মিলিয়ে 'ঠাকুরবাড়ির রান্না' এক সোনার খনি। প্রচ্ছদ : নির্মলেন্দু মণ্ডল।

প্রকাশিত হচ্ছে

ডাক্তার নলিনীরঞ্জন কোনার-এর

চিকিৎসক-জীবনের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা

আমার ডাক্তারী ॥ ২য় খণ্ড

রাম ও কৃষ্ণ প্রসঙ্গক্রমে

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীবিমলকৃষ্ণ মতিলাল "নরচন্দ্রমা রাম ও পুরুষোত্তম কৃষ্ণ" বিষয়ে যে মনোজ্ঞ আলোচনা শুরু করেছেন তার মধ্যে রাম ও কৃষ্ণ সম্পর্কে আমার নিজের করা কিছু আলোচনা, যা প্রথমে প্রবন্ধাকারে দেশ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল ও পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে, তার উল্লেখ করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। "অনেক প্রধান প্রধান বিষয়ে অধ্যাপক রুদ্রের সঙ্গে আমার মতৈক্য আছে" বলে নিয়ে আমার কোনো কোনো সিদ্ধান্তকে "মেনে নেওয়া যায় না বা যেগুলি খুব যুক্তিগ্রাহ্য হয়নি" এই মত প্রকাশ করে তিনি আরও লিখেছেন "মতদ্বৈত থাকলেও, দৃষ্টিকোণের পার্থক্য থাকলেও এ বিষয়ের আলোচনা হওয়া উচিত।

যুক্তি ও প্রতিযুক্তির অবতারণা প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রাণ। কাজেই কলহে পর্যবসিত না হওয়া পর্যন্ত আলোচনা ও সমালোচনা সভ্য সমাজের অঙ্গ হিসাবেই গৃহীত।" বলাই বাহুল্য, লেখকের এই শেষোক্ত বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত হওয়ার কোনো অবকাশই নেই, কলহের তো প্রশ্নই ওঠে না। তিনি বলেছেন তাঁর ও আমার দৃষ্টিভঙ্গী বা আলোচনার ধারা আলাদা। আলাদা হওয়াটাই তো জিজ্ঞাসু মনের পাঠকের পক্ষে উপকারী।

কিন্তু আমার যেসব বক্তব্য তাঁর কাছে যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়নি "তার শুধু দু-একটা উদাহরণই দেব" এই কথা বলে তিনি যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন (২৬শে জুলাই, ১৯৮৬ সংখ্যার দেশ পত্রিকায়) তাতে তিনি আমার বক্তব্য বলে এমন কিছু উপস্থাপিত করেছেন যা মোটেই আমার বক্তব্য নয়। কর্ণপর্বে প্রতিজ্ঞা রক্ষার নাম করে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে হত্যা করতে উদ্যত হলে কৃষ্ণ তাঁকে যেইসব যুক্তি দিয়ে নিবৃত্ত করেন তার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, "অর্জুনের পক্ষে যুধিষ্ঠিরকে হত্যা করা রূপ কার্যের দ্বারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা হত। কাজেই অর্জুনের পক্ষে যুধিষ্ঠিরকে হত্যা করা উচিত ছিল। এই হল যুক্তি। এবং এই সরল যুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন বলেই কৃষ্ণ হলেন 'কপটশিরোমণি' ও 'মিথ্যাপরায়ণ'। অন্তত অধ্যাপক রুদ্র এইরকম একটা যুক্তি দিয়ে অভিযোগ এনেছেন...।" আমি অত্যন্ত বিস্মিত হচ্ছি যে অধ্যাপক মতিলাল এই প্রকার একটি অতিসরল —naive—যুক্তি আমার উপর আরোপ করেছেন। আমার 'ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দুমন' বইটির ১২১ থেকে ১২৫ পর্যন্ত পৃষ্ঠায় এই ঘটনাটির বিস্তৃত আলোচনা করেছি। তার কোথাও ঐ অবস্থায় অর্জুনের যুধিষ্ঠিরকে হত্যা করা উচিত ছিল এরকম মতের আভাসটুকুও নেই।

বস্তুত আমার সমগ্র গ্রন্থের কোথাও কোনো বিষয়েই কার কি করা কর্তব্য ছিল সে বিষয়ে আমার নিজস্ব কোনো বক্তব্য রাখিনি। আমার আগাগোড়া প্রচেষ্টাই ছিল দেখানো যে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারায় প্রভাবিত হিন্দুমনে ন্যায় – অন্যায়ের ধারণাটা, ভালমন্দের ধারণাটা, উচিত-অনুচিতের ধারণাটা অন্তর্দ্বন্দ্বে বিভক্ত ও জর্জরিত। কৃষ্ণকে দেবাদিদেব বলে মনে করাটা যে ভারতীয় মনের এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ এই তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা আমি করেছি কৃষ্ণ সংক্রান্ত আমার দুইটি প্রবন্ধে। কৃষ্ণকে 'কপটশিরোমণি' ও 'মিথ্যাপরায়ণ' বলে প্রতিপন্ন করতে আমি অবশ্যই শ্রীমতিলাল কথিত "সরল যুক্তির" আশ্রয় নিইনি, অনেক সূক্ষ্ম ও অনেক বিস্তৃত আলোচনা করেছি, অনেক অনেক উদাহরণ দিয়েছি। শ্রীমতিলাল এ যাবৎ এমন কিছুই লেখেননি যার দ্বারা আমার কোনো বক্তব্যই খণ্ডিত হয়। যুক্তিগ্রাহ্য নয় বলে যে বক্তব্যের তিনি বিশদ সমালোচনা করেছেন তা আমার বক্তব্যই নয়। আমার অনেক কথার মধ্যে একটি ছিল এই: "দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণের মতানুসারে ভীষ্ম দ্রোণ এবং অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য বিনাশে অধর্ম তো নেই-ই বরং তা ধর্মসঙ্গত। এবং এই প্রসঙ্গে অহিংসার কথাও ওঠে না। অপরদিকে যুধিষ্ঠিরকে বধ করা হোত অন্যায়, কেননা তাতে অহিংসা ধর্ম ভঙ্গ করা হোত।" আমার এই বাক্যের মধ্যে অসঙ্গতি প্রদর্শন করা হয়েছে মাত্র। যুধিষ্ঠিরকে বধ করা উচিত কি অনুচিত, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতিদের বধ ন্যায় কি অন্যায় সেই বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। প্রসঙ্গত তিনি লেখেন "যুদ্ধে শত্রুকে বধ করা আর পরম মিত্র আত্মীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যুদ্ধক্ষেত্রে নয় ঘরের ভেতরেই হত্যা করার মধ্যে কোন পার্থক্য কেন অধ্যাপক রুদ্র দেখতে পেলেন না?" যুদ্ধে যাদের শত্রু বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে তাঁরাও তো সকলেই ছিলেন পাণ্ডবদের নিকট আত্মীয়, এবং ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ অনেকে পরম মিত্রও বটে।

'যুদ্ধক্ষেত্র' প্রসঙ্গে বলতে হয়, পরমমিত্রদের যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর স্থানে সাজানোর কাজটাও তো আগাগোড়াই শ্রীকৃষ্ণের।

শ্রীমতিলাল আমার বক্তব্য বলে যা লিখেছেন তাতে পাঠকের মনে হতে পারে, কল্যাণ বা হিতের ধারণা নির্বিশেষে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাই বুঝি আমার মতে উচিত কাজ। খুবই পরিতাপের বিষয় যে উনি আমার বক্তব্যকে এভাবে ভুল বুঝবেন ও ভুলভাবে পেশ করবেন। আমি নিজেই যে এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর কতদূর বিরোধিতা করেছি তা কি করে তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল? বাধ্য হয়ে আমাকে আমার গ্রন্থের সত্যধর্ম শীর্ষক পরিচ্ছেদ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিতে হচ্ছে। উক্ত বইয়ের ৫৯—৬১ পৃষ্ঠায় আমি লিখেছি:

"সত্যকে যে জাতীয় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাতে কি আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের ধর্মীয় চিন্তায় একটা ভারসাম্যের অভাব সৃষ্টি করা হয়নি?"

"শ্রীরামচন্দ্র বনে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন কৌশল্যা লক্ষ্মণ ও ভরতের সর্ববিধ আজ্ঞা, অনুরোধ ও যুক্তি উপেক্ষা করে। তাঁর বনে যাওয়ার ফলে দশরথ শোকে দগ্ধ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন, কৌশল্যা হলেন জীবন্মৃতা। অযোধ্যাবাসিগণ হলেন অনাথ, সীতাকে পেতে হল চূড়ান্ত নিগ্রহ, লক্ষ্মণের পত্নী হলেন উপেক্ষিতা।"

"সত্যের নামে সীতার উপর, উর্মিলার উপর, কৌশল্যার উপর, হরিশ্চন্দ্রের উপর, শৈব্যার উপর, ওঘবতীর উপর কি পরিমাণ injusticeই না করা হয়েছে!"

আমার এইসব বক্তব্যের পরেও কি কেউ মনে করতে পারেন যে আমার মতে একবার যে কথা বলা হয়েছে তা যতই অকল্যাণকর হোক না কেন সে কাজ করতেই হবে? এই দৃষ্টিভঙ্গীকে আমি শ্রীরামচন্দ্রের ক্ষেত্রেও গগনচুম্বী অহংবোধ ও গোঁয়ার্তুমি বলে নিন্দা করেছি।

অঙ্গীকার রক্ষার অর্থে সত্যরক্ষার সঙ্গে অন্য ধর্মের, বিশেষ করে কল্যাণধর্মের, সংঘাতের কথা আমি নিজেই আমার বিভিন্ন প্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। কিন্তু কল্যাণধর্মকে প্রেয় গণনা করে কোন কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দিয়ে সত্যধর্ম, ক্ষত্রধর্ম প্রভৃতি ধর্মকে পদে পদে লঙ্ঘন করিয়েছিলেন একথা যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে বলে মনে করি না। আমার নিজের কথা থাক।

মহাভারতের অভ্যন্তরেই গান্ধারীর মুখ দিয়ে, বলরামের মুখ দিয়ে, উতঙ্কমুনির মুখ দিয়ে কৃষ্ণের যে সমালোচনা করা হয়েছে তার কোন জবাব তিনি নিজেই দিতে পারেননি। ১৬ই অগাস্টের দেশ-এ প্রকাশিত প্রবন্ধে শ্রীমতিলাল লেখেন, "কাজেই আমি অধ্যাপক অশোক রুদ্রের মতো সব ব্যাখ্যাকেই অপব্যাখ্যা বলতে পারি না।" সব ব্যাখ্যাকেই অপব্যাখ্যা তো আমিও কোথাও বলিনি। অধ্যাপক মতিলাল আমার লেখার মধ্যে এই কথা কোথায় পেলেন?

অশোক রুদ্র
শান্তিনিকেতন

শ্রীরামকৃষ্ণ

'দেশ' ১৬ আগস্ট '৮৬ সংখ্যায় শ্রীপীযূষকান্তি রায়ের শ্রীরামকৃষ্ণের ফোটো নিয়ে লেখাটি প্রসঙ্গে জানাই, ঠাকুরের কানের অবস্থানের বৈশিষ্ট্য যেমন তাঁর ফোটো থেকে প্রকাশিত, তেমনি ফোটোগুলি লক্ষ করলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাখাল মহারাজ) কথিত তাঁর 'আজানুলম্বিত' বাহুরও প্রমাণ পাওয়া যায়। নিবন্ধে এ দিকটি নিয়ে আলোচনা হয়নি।

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত কোটটি দেখার সৌভাগ্য আমারও হয়েছে। তার হাতার দৈর্ঘ্য দেখে স্বাভাবিক মনে হয়। অথচ স্টুডিওতে দণ্ডায়মান ছবিটিতে সেটি ঠাকুরের হাতের মাপে ছোট দেখাচ্ছে। আমার মনে হয়েছে, একজন ৫'-৯" দীর্ঘ মানুষের হাত স্বাভাবিক হলে কোটের সঙ্গে মানানসই হয়। অর্থাৎ ঠাকুরের হাতটি নিশ্চয়

অস্বাভাবিক লম্বা ছিল। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দক্ষিণেশ্বরে গৃহীত উপবিষ্ট ভঙ্গির ছবিটি যদি লক্ষ করা যায়, দেখা যাবে—ঠাকুরের দুই কনুই উরুর উপর রক্ষিত। সাধারণ মানুষকে এমন করতে হলে একেবারে কুঁজো ও বিসদৃশ ভাবে বসতে হবে, না হয়ত তা সম্ভবই হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু শিরদাঁড়াকে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে রেখেই এভাবে বসেছেন। এ থেকেও প্রমাণিত হয় তিনি দীর্ঘতর বাহুর অধিকারী ছিলেন।

নিবন্ধটির এক স্থানে লেখা হয়েছে, 'শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুরে (হুগলি) তাঁর বাড়ির ঢেঁকিশালে।' কিন্তু কবে? তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মমাস ও বারটি (ফাল্গুন ও বুধ) সর্বজন স্বীকৃত। এ যাবৎ পরমহংসদেবের তিনটি কোষ্ঠীর সন্ধান মিলেছে। একটি নারায়ণ জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় কৃত। শোনা যায় পরবর্তীকালে এটি বেলুড় মঠেই প্রস্তুত। কোষ্ঠীটি অনুসারে ঠাকুরের জন্ম ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন, বুধবার ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি ভোর ৪টেয় শুক্লা দ্বিতীয়ায়। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ ভট্ট মহাশয়ের ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত কোষ্ঠী অনুসারে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম ১২৩৯ সালের ১০ই ফাল্গুন (বুধবার), ইংরাজী ১৮৩৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি। লগ্নে রবি, চন্দ্র ও বুধের যোগ (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৪র্থ ভাগ ২৩ খণ্ড দ্রষ্টব্য)। ঠাকুরের শেষ অসুখের সময় শ্রীযুক্ত অম্বিকা আচার্য মহাশয়কে দিয়ে প্রথম নির্মিত কোষ্ঠী অনুসারে পরমহংসদেবের জন্ম ১২৪১ সালের ১০ই ফাল্গুন (বুধবার), শুক্লা দ্বিতীয়া, পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র। দেখা যাচ্ছে—জন্মমাস ও বার সকলের মতানুসারে একই, প্রশ্ন হল—সাল ও তারিখ কোনটা সঠিক। এ বিষয়ে প্রমাণাদি সহ কেউ আলোচনা করলে মতভেদ দূর হয়।

অনুপ ঘোষাল
জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ

প্রতিকৃতি

দেশ পত্রিকায় (২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬) চিঠিপত্র বিভাগে 'সুচিত্রা মিত্র'র সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে শ্রীমিলন মুখোপাধ্যায় (বোম্বে) লিখিত চিঠি পড়লাম। তিনি চিঠির শেষের দিকে লিখেছেন যে, দেশ-এর প্রচ্ছদে শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রর ছবিটি (১৯ জুলাই, ১৯৮৬) নামীদামী শিল্পী বিকাশবাবুর আঁকা। দেখে, বড়ই ধন্দয় পড়েছি। ছবির ন্যাকের নীচে ছায়া অবধি বেশ পরিষ্কার আর একটু নীচে নামতেই শিল্পী সব হঠাৎ ধোঁয়াটে করলেন কেন। বোঝা ভার। স্যুররিয়ালিজম্-এর 'গন্ধ' লাগাবার উদগ্র বাসনায়? এই প্রসঙ্গে আমি দু-একটি কথা না বলে পারছি না। বলি, মিলনবাবু হঠাৎ এ উক্তি করলেন কেন? তিনি কি বিকাশবাবুর আঁকা এই প্রথম দেখলেন? দেশ পত্রিকার প্রচ্ছদে বিকাশ ভট্টাচার্যের ঐ ধরনের আঁকা অনেক আগেও প্রকাশিত হয়েছে। যেমন—প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতি (১ ডিসেম্বর ১৯৮৪) শ্রীমতী মিত্রের ছবির মতই নাকের নীচের দিকে হঠাৎ আবছা বা ধোঁয়াটে। দেশের প্রচ্ছদে পরে আরও দেখা যায় তাঁরই আঁকা ফিদা হুসেন' (১৭ মে ১৯৮৬) তাতে ছবির মাথার কিছু অংশ, দুই গাল, দাড়ির কিছু অংশ এবং দেহবিহীন হাতের আঙুল হঠাৎ ধোঁয়াটে না করে শিল্পী বিদ্যুৎগতিতে সব ছেড়ে দিয়েছেন। বিকাশবাবু মুখ্যত অনুভূতির শিল্পী। তিনি অনেক সময় প্রতিকৃতির চোখ-মুখ আঁকার বেলায় এমন কিছু একটা করে থাকেন যেমন—চোখ আছে তার মণি নেই, দেহ আছে তার মুখ নেই (ছবি অঞ্জলি ১৯৮২), কখনও ঠোঁটের আভাস (ধোঁয়াটে) থাকে মাত্র। তাঁর অভিব্যক্তিতে এমন অস্বাভাবিকতা থাকে যা আমাদের ভাবতে হয়। জাগিয়ে তোলে আমাদের

অনুভূতি। বিকাশবাবুর ছবিকে নিয়ে অনেক সময় অনেকে অনেক কথা বলেন। কেউ বলেন 'রোমান্টিক' আবার কেউ বলেন 'সুররিয়ালিস্ট'-এর প্রভাব। কিন্তু বিকাশবাবু কল্পনাবিলাসী নন, আবার সুররিয়ালিস্টও নন। তিনি মনে করেন 'ছবি হবে স্বপ্নের রূপচ্ছবি'। হুবহু ফটোগ্রাফিক অর্থে নয়। অন্তর্যামী অর্থে। কারণ ফটোগ্রাফিক ছবি যে ভাষা বলতে পারে না তার চেয়ে অনেক বেশী বলতে পারে শিল্পকলা। শিল্পকলার মূল কথাই হচ্ছে অনেক অসংলগ্ন গৌণ উপকরণ ফেলে দিয়ে মূল জিনিসটি বাছাই করা। যা মুখ্য তা ফুটিয়ে তোলা। পোর্ট্রেটে সর্বদা মানুষের চেহারার স্পষ্টতা বা হুবহু সাদৃশ্যকরণ থাকবে এমন কোন কথা নয়। মানুষটির মধ্যে আসল মানুষটিকে দেখবার ও দেখাবার চেষ্টায় শিল্পকৃত্য। শিল্পী তার কাজে অনেক কিছু বর্জন করে। বর্জন করতে করতে যা থাকে সেটাই শিল্পকলা, সেটাই আর্ট।

এছাড়া সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ও (২৩ আগস্ট ১৯৮৬) দেশের প্রচ্ছদে Vision-এ চারশিল্পী সোমনাথ হোড়, গণেশ পাইন, যোগেন চৌধুরী ও বিকাশ ভট্টাচার্যের প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছেন। মিলনবাবু হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এই চারশিল্পীর মিলন ঘটাতে ইনিও তাই বিশেষ করে আলোচ্য শিল্পী বিকাশবাবুর মুখের নীচে হঠাৎ ধোঁয়া দিয়েই বিকাশ করেছেন।

আশুতোষ মণ্ডল
চাঁচল, মালদহ।

'হুঙ্কার'

৮ নভেম্বর ১৯৮৬ সংখ্যার দেশ-এ ক্ষিতিমোহন সেনকে লিখিত রবীন্দ্র-পত্রাবলীর 'পত্র পরিচিতি' অংশে একটি তথ্যপ্রমাদ চোখে পড়ল। পত্র ৮ সংক্রান্ত পরিচিতিতে এক জায়গায় (পৃঃ ২৯) লেখা হয়েছে, "হীরালাল—হীরালাল সেন। শিক্ষক। 'হুঙ্কার' পত্রিকার সম্পাদক।" 'হুঙ্কার' হীরালাল সেন (সেনগুপ্ত) সম্পাদিত কোনো পত্রিকা নয়, এটি আসলে হীরালাল রচিত এবং ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত একটি ক্ষুদ্রকায় ২৪ পৃষ্ঠার কবিতা পুস্তক। হীরালাল রবীন্দ্রনাথকে কিছু না জানিয়েই কবির নামে বইটি উৎসর্গ করেন। এই উৎসর্গের পরিণাম কবির পক্ষে যথেষ্ট বিড়ম্বনার কারণ হয়ে ওঠে। বইটির জন্যে হীরালাল রাজদ্রোহের অপরাধে খুলনার ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হন। এবং কবির নাম বইটিতে জড়িত থাকায় তাঁকে সাক্ষীরূপে খুলনা আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। হীরালালের ছ' মাসের জেল হয়। হীরালাল খুলনা জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। কিন্তু ঐ বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনে শিক্ষক রূপে নিয়ে আসেন। কিন্তু সরকারের কোপদৃষ্টি-কারণে ১৯১১ সালে কবি তাঁর জমিদারিতে হীরালালকে কাজ দিয়ে পাঠিয়ে দেন। সেখানেই হীরালাল আমৃত্যু নিযুক্ত থাকেন।

আমার এই সব তথ্য বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ, রবীন্দ্র-জীবনী, ২য় খণ্ড এবং ১৩৮৫ দেশ সাহিত্য সংখ্যা থেকে গৃহীত। 'হুঙ্কার'-এর হদিশ না পাওয়াতে বইটিকে চোখে দেখিনি।

আদিত্য ওহদেদার
বাঁশদ্রোণি-৭৪৩৫০১

রবীন্দ্রনাথের চিঠি

গত ১লা নভেম্বরের দেশ পত্রিকাতে আমার পিতৃদেবকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি ছাপানোর উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে একটি ভুল তথ্যের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমার পিতৃদেবের জন্মদিন বাংলা ১৬ই অগ্রহায়ণ, ইংরেজী ২রা ডিসেম্বর। ৩০শে নভেম্বর নয়। জন্মদিনের বাংলা তারিখটিও দিলে ভাল হোতো।

অমিতা সেন
শান্তিনিকেতন

বইয়ের দর, বইয়ের দাম এবং পাঠকের দম

'দেশ' পত্রিকার ৪ঠা অক্টোবর ১৯৮৬ সংখ্যায় গ্রন্থলোক বিভাগে শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র মৈত্র 'Rupanjali : In Memory of O. C. Ganguly' নামক সম্পাদিত বইটির আলোচনা করেছেন। আলোচনা শেষে তিনি একটি অনুযোগ উল্লেখ করেছেন, ভারত গভর্নমেন্টের উদার দানের দ্বারা এই বই প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও এর আকাশ ছোঁয়া দাম করা হয়েছে ৭০০ টাকা। বহু ব্যক্তির কাছেই এই স্মরণ উৎসবের ফসলটি, তার দামের জন্য উৎসুক সংগ্রহের বাধা হয়ে থাকবে। ইতিপূর্বে আরও কিছু কিছু বইয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বইয়ের দাম নিয়ে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এই পত্রিকাতেই অনুযোগ করেছেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত এই পণ্ডিতগণের কাছে যে যে বইগুলিকে অতিরিক্ত দামের মনে হয়েছে, সেগুলিতে নিশ্চয়ই অতিরিক্ত দাম বসানো হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আমার দু'চার কথা নিবেদন করার আছে। অনেক বই-এর দাম নানা কারণে বাড়ে। শুধু ছাপা বাঁধাই ছাড়াও বইয়ের পেছনে লেখকের পরিশ্রম, তথ্য জোগাড়ে অর্থব্যয়, নানা প্রমাণের ফটোচিত্র প্রভৃতি সংগ্রহ ও মুদ্রণে এই দাম বাড়তে পারে। তবে সে বাড়তি দামেরও তো একটা সীমা থাকবে। আজকাল বহু

বইয়ের মুদ্রণে যথেষ্ট সরকারী সহায়তা পাওয়া সত্ত্বেও একশ্রেণীর পুস্তক ব্যবসায়ীর অহেতুক দাম বাড়াবার প্রবণতা, অনেক মূল্যবান বইকে যথার্থ পাঠকের নাগালের বাইরে রেখে দিচ্ছে। এসব বই যে সব পাঠাগার কেনে বা কিনবেই, এমন মাথার দিব্যি তাদের কেউ দেয়নি। ফলে যাঁরা আগ্রহী তাঁরা অনেকেই ব্যক্তিগত আগ্রহে এসব বই কেনেন। কিন্তু দাম যদি আকাশছোঁয়া হয়, তবে কীভাবে কিনবেন ? তাছাড়া প্রত্যেক লেখকের প্রত্যেকটি বইয়ের আসল উদ্দেশ্য হল এর অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে প্রকাশ করা ও ছড়িয়ে দেওয়া। দামের জন্যই যদি সে কাজটি বাধা হয়, তবে বই প্রকাশের দরকার কী। একশ্রেণীর প্রকাশকের অতিরিক্ত লোভ আজ আমাদের ব্যক্তিগত বই সংগ্রহ ও বই পড়ায় বাদ সাধছে, এটা খুবই দুঃখের। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিষয়টি ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

রঘুনন্দন গুপ্ত,
কাঁথি, মেদিনীপুর।

ছন্দশিল্পী সুকুমার রায়

১ নভেম্বর সংখ্যায় অমল পাল প্রবোধচন্দ্র সেনের প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধের একটি মন্তব্য সম্পর্কে প্রশ্ন রেখেছেন। বেঁচে থাকলে তিনি হয়তো প্রশ্নটির জবাব দিতেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনি আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছেন।

অমলবাবুর জিজ্ঞাস্য, সুকুমার রায়ের 'কানে খাটো বংশীধর' ছড়াটিতে যখন 'বংশীধর' শব্দটি চারমাত্রা ধরতে হচ্ছে, তখন এটি মিশ্রবৃত্তে (অক্ষরবৃত্তে) রচিত ধরা হবে না কেন ? তার জবাব ওই প্রবন্ধেই সুকুমার রায়ের অপর দু' একটি ছড়ার আলোচনা প্রসঙ্গে প্রবোধচন্দ্র দিয়েছেন। সুকুমার রায় লিখেছেন,
(১) বক কহে
কচ্ছপে—'বাহবা কি ফুর্তি ! অতি খাসা আমাদের **বকচ্ছপ** মূর্তি।'
এবং (২) আয় তোর মুণ্ডুটা দেখি, আয় দেখি **ফুটোস্কোপ** দিয়ে।
উভয়ক্ষেত্রেই প্রবোধচন্দ্র দেখিয়েছেন, 'ছন্দের গতিবেগে (চিহ্নিত 'বকচ্ছপ' এবং 'ফুটোস্কোপ' শব্দ দুটি) আমাদের উচ্চারণে স্বতই একটু সংকুচিত হয়ে পূর্বগামী চতুর্মাত্রিক পর্বের সমতা লাভ করে। এরকম ধ্বনিসংকোচ সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম হলেও দুর্লভ নয়।' 'কানে খাটো বংশীধর' ছড়াটিতে 'বংশীধর' শব্দটি ছাড়া কোথাও আর কোনো যুক্তবর্ণ ব্যবহৃত হয়নি। তার ফলে চতুষ্কল-পর্বিক কলাবৃত্তের (মাত্রাবৃত্তের) চাল ফুটে উঠেছে। 'বংশীধর' শব্দটি (সমগ্র ছড়ায় তিনবার ব্যবহৃত) সামান্য সংকুচিত উচ্চারণে চারমাত্রার সমতা লাভ করেছে। চতুষ্কল পর্বিক কলাবৃত্ত যে সুকুমার রায় বেশি পছন্দ করতেন প্রবোধচন্দ্র সে সম্পর্কেও প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। অবশ্য, কোনো পাঠক যদি এই চতুষ্কল কলাবৃত্তের চাল অগ্রাহ্য করে ছড়াটি মিশ্রবৃত্ত-পয়ারে পড়তে চান, পড়তে পারেন। ছান্দসিকদের তরফ থেকে আপত্তির কারণ দেখছি না।

নীলরতন সেন
কল্যাণী

উর্দু আকাদেমির হালচিত্র

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ "দেশ" পত্রিকায় "সাহিত্য" নিবন্ধে "উর্দু আকাদেমি প্রসঙ্গে" পশ্চিমবঙ্গ উর্দু আকাদেমির বিশিষ্ট সভ্য এস আর কাপুরের দেওয়া তথ্যে যে প্রতিবেদন বেরিয়েছে সেই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলবার আছে।

উর্দুভাষী লোক সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ নয় আরো অনেক বেশি, আমার মনে হয় সংখ্যাটি প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি।

প্রতিবেদক লিখেছেন, "উর্দু আকাদেমির যাবতীয় ব্যয় ভারত সরকার বহন করেন, তবে এটি একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা। সরকার এর কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করেন না। পদাধিকার বলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সভাপতি এবং শিক্ষামন্ত্রী সহ সভাপতি (অথবা তাঁদের মনোনীত ব্যক্তি) হবেন—এটাই বিধি।

...সম্পাদক পদে আছেন মহম্মদ ফকিরুদ্দীন। শেষোক্ত ব্যক্তি একজন সরকারী অফিসার, কারণ এটাও সরকারী বিধি।"

আরো যেটুকু বলবার, সমস্ত কার্যকরী সমিতির সদস্যবৃন্দই মনোনীত, নির্বাচিত নয়। স্বভাবতই এই পরিচালকবৃন্দ এমন কি কাজ করতে পারে

যা সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হতে পারে ?

প্রতিবেদক আরো লিখেছেন, "কথা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন যে উর্দু আকাদেমি ভারতের অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে—উত্তর প্রদেশ, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক এবং জম্মু ও কাশ্মীরে আছে। তবে সেগুলো সরকারী নিয়ন্ত্রণে থাকায় তাদের কাজকর্ম সেরকম উল্লেখ করার মত নয়।" তবে কি পশ্চিমবঙ্গ উর্দু আকাদেমি সরকার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ? যার পরিচালকবর্গ সরকার মনোনীত, চলে সরকারী টাকায়—প্রতিবেদনে, কিভাবে, কতখানি সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিস্তারিত আলোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হতো। অন্য রাজ্যের উর্দু আকাদেমির কাজের তুলনামূলক খতিয়ান দিয়ে মন্তব্য করলেই ভালো হতো যে তাদের কাজকর্ম সে-রকম উল্লেখ করার মত কিছু নয়। প্রতিবেদকের কাছে উর্দু আকাদেমির বিশিষ্ট সভ্য যে তথ্যটি দিলেন না, সেটি হল অন্যান্য রাজ্যে উর্দু আকাদেমি সরকারী অনুদান কত টাকা পায়। বিহার, উত্তর প্রদেশ, দিল্লী প্রভৃতি রাজ্যে উর্দু আকাদেমির বছরে পঁচিশ লক্ষ থেকে চল্লিশ, পয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়ে থাকে সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উর্দু আকাদেমিকে প্রতি বছরে অনুদান দিয়ে থাকেন ছয় থেকে সাত লক্ষ টাকা। ঐ টাকায় বাড়িভাড়া কর্মচারীদের বেতনাদি দিয়ে এবং অফিস পরিচালনা করে যে সামান্য টাকা অবশিষ্ট থাকে তা থেকে ভাষা বা সাহিত্যের সেবা করা সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গ উর্দু আকাদেমির সবচেয়ে বড় খবর, সে অর্থ সঙ্কটে ভুগছে প্রতিবেদনে কোথাও সে কথাটি উল্লেখ করা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মনোনীত বিশিষ্ট সভ্য আকাদেমি সম্বন্ধে জানাতে গিয়ে কোথাও তার ইঙ্গিতও দেননি। যে সকল পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে ওগুলো এক সময় পশ্চিমবঙ্গ উর্দু আকাদেমি থেকে দেওয়া হোত। বর্তমানের নয়, পশ্চিমবঙ্গ উর্দু আকাদেমির অতীতের গৌরব। প্রকৃত তথ্য হল আর্থিক অনটনের জন্য বিগত দু' বছর হল আকাদেমি পুরস্কার প্রদান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। শুধু পুরস্কার বিতরণই নয়—আরো বহুবিধ কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে।

বাদল কর

পূর্ব পুটিয়ারী, ২৪ পরগনা

রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী বিষয়

২৭ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী নিয়ে কিছু মতামত পড়লাম। আমি সৌভাগ্যবশত ১৯৩৭ সনে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। স্বয়ং কবিগুরুর কাছে মাসাধিক কাল গান শেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। একক সঙ্গীত অনুষ্ঠানে আমার গান দেবার সময় কবিগুরু বললেন—"তোমাকে আমি ক্লাসিকালের উপরে একটা গান দেব।" তখন আমি সদ্য 'গীতশ্রী' উপাধি পেয়েছি—সেটা উনি জানতেন। অধীর আগ্রহে অপেক্ষার পর আমি পেলাম 'ছায়ানটের' ওপর 'গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা' গানটি। আমার পরিষ্কার মনে পড়ে প্রতিটি মীড় গমক ইত্যাদির প্রতি তাঁর কত সজাগ দৃষ্টি, এবং ক্রমাগত আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গেয়ে শিখিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি কথার উপর তাঁর দৃষ্টিও সজাগ। যেমন—'আর কি কখন কবে এমন সন্ধ্যা হবে' এই সন্ধ্যা কথাটি কি করে উচ্চারণ করতে হয় তাও শুনিয়ে দিয়েছিলেন। সঙ্গীত সম্মিলনীতে গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে উচ্চাঙ্গ এবং অনাদি দস্তিদারের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখতাম। শিক্ষকেরা জানতেন—রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে হলে গায়ক-গায়িকার ক্লাসিকাল বেস্ প্রয়োজন। কবিগুরু বা অনাদিবাবু আমাদের কোনো গায়কীই শেখাননি—পরিষ্কার উচ্চারণ এবং শুদ্ধ সুর। আরো অনেক আগে আমার দিদি 'সঙ্গীত সংঘ'তে গান শিখতেন। উৎসবের সময় রবীন্দ্রনাথ নিজে এসে গান শেখাতেন। দিদি যা গাইতেন তখনও, আজকালকার যা গায়কী তা খুঁজে পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কলকাতায় সৃষ্ট হল রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষায়তন। তখন থেকে বইতে শুরু করল রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কীর হাওয়া। উচ্চাঙ্গসঙ্গীত, কীর্তন, আধুনিক, বাউল সঙ্গীতের গায়ক-গায়িকারা যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতও গাইতেন—তাঁরা বঞ্চিত হলেন রেডিও-রেকর্ডে গাইতে। রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের পর্যায়ে যেসব গান আছে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর ভ্রাতারা—যেভাবে গেয়েছেন আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। সেসব গান কে গাইছেন এখন! কল্পনা করুন বড়-বড় কন্‌ফারেন্সে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বাঙালী ওস্তাদেরা রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ, ধামার, টপ্পা অঙ্গের গানগুলি পাখোয়াজ, মৃদঙ্গর সঙ্গে দাপটে গেয়ে সভা জমিয়ে দিচ্ছেন—কেমন লাগবে? অনেকের আপত্তি হারমোনিয়াম তবলার সহযোগে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া ঠিক নয়। কবিগুরু জীবিতকালে কখনও তো বারণ করেননি? বিশ্বব্যাপী রবীন্দ্রসঙ্গীত ছড়িয়ে আছে শহরে- গ্রামে- গঞ্জে—তানপুরা এস্রাজ সবাই পাবে কোথায়? হারমোনিয়ামের সহযোগে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া হচ্ছে—এ যন্ত্রটি যে সকলের নাগালের মধ্যে। অধুনা রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়কীর ব্যাধি ছাড়িয়ে যারা উদাত্ত কণ্ঠে সুর তাল বাণী ও ভাব শুদ্ধ রেখে গান করেন—তাঁদের রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে দিলে ক্ষতি কি? শেষ কথা দিয়ে শেষ করি—যে গায়কী গুরুদেব প্রচলন করে যাননি—এ জিনিস-এর এমনভাবে প্রচলন হল কি করে!

ইভা দত্ত
কলকাতা-৫৩

অপারেশন কক্ষের পরিবেশ

৪ অক্টোবর দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'ঘরে বাইরে' অংশে 'শ্রীমতী'র লেখা ফ্লোরেন্স ডে সেন্টার আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করলাম। লেখার সঙ্গে প্রকাশিত চিত্রটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুধাবন করলে আঁতকে উঠতে হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের সভ্যতাকে একবিংশ শতাব্দীর দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, অথচ সেই অনাগত শতাব্দীর সমস্ত সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেও ফ্লোরেন্স ডে সেন্টার ঊনবিংশ শতাব্দীতে পড়ে আছে। মুদ্রিত চিত্রটি অবশ্যই একটি অপারেশন কক্ষের; একজন রোগিণী অপারেশন টেবিলে নিম্নাঙ্গের অপারেশনের জন্য এমন এক বিশেষ অবস্থানে শায়িত (Lithotomy position) যে মনে হয় শল্যচিকিৎসক রোগিণীর জনন অঙ্গের কোনো ছোটোখাটো অপারেশনে ব্যস্ত। লেখিকার বিবরণ পড়েও মনে হয় সাধারণত জননসংক্রান্ত ছোটোখাটো অপারেশনই ওখানে হয়। কিন্তু অপারেশন যতো ছোটোই হোক শল্যচিকিৎসায় নির্জীবাণুকরণ (Sterilization) বলে ব্যাপার আছে। যেটা এই অপারেশনের সময় একদমই মানা হয়নি। যে অসঙ্গতিগুলো বড়ো প্রকটভাবে চোখে পড়ছে সেগুলো হলো—
(১) রোগিণী যে পোশাকে বাড়ী থেকে এসেছেন সেই পোশাকেই তাঁকে টেবিলে শোয়ানো হয়েছে। অর্থাৎ রোগিণী যদি বেহালার বাসিন্দা হন, তিনি বেহালার ই কোলাই (E. Coli) শ্যামবাজারের অপারেশন কক্ষে রেখে গেলেন। এতে বাইরের জীবাণু তো অপারেশন কক্ষে ঢুকেছেই

তার সঙ্গে রোগিণীর নিজেরও বিপদ আছে। শল্যচিকিৎসকের কোনো যন্ত্রপাতি যদি রোগিণীর পোশাকের একটু স্পর্শ পায় তাহলেই সেই সর্বনাশের শুরু। অনেক সময়ই চিকিৎসকের মনোযোগ থাকে অপারেশন অঙ্গের উপর। আর একই হাতে পর পর অনেক যন্ত্র ক্রমান্বয়ে ব্যবহার করতে হয়। এরকম যন্ত্র পরিবর্তনের সময় যে কোনো একটি যন্ত্র চিকিৎসকের অজান্তে রোগিণীর পোশাকের ছোঁয়াচ পেতেই পারে। তাঁর পোশাকে ধনুষ্টংকারের জীবাণু থাকতে পারে এবং তা সেই ছোঁয়া যন্ত্রমাধ্যমে গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে প্রাণসংশয় করতে পারে।

(২) রোগিণীর বাঁপাশে মুখোশ-টুপি পরিহিতা একজনকে দেখা যায়, তিনিও একই অপরাধে অপরাধী। তাঁর অঙ্গে কোন অপারেশন কক্ষের উপযুক্ত পোশাক নেই। চিকিৎসকের এটা অনুমোদন করা উচিত হয়নি। তাঁর টুপিটিও স্বস্থানে নেই। যিনি অনুষ্ঠানের সবচেয়ে কাছে আছেন তাঁর চুলের অর্ধাংশ টুপীর বাইরে। যে কোনো সময় ওর একগাছি চুল তো অপারেশন অঙ্গে পড়তে পারে।

(৩) রোগিণীর পাশে আরও চারটি হাত দেখা যায়, যেগুলো একেবারেই নগ্ন। অর্থাৎ অপারেশন কক্ষের যে পোশাক আছে তা তাঁরা ব্যবহার করছেন না। পরোক্ষভাবে সাহায্য করলেও সমস্ত কর্মীরই উচিত ঐ কক্ষের বিশেষ পোশাক ব্যবহার করা।

এসব থেকে একটা কথাই মনে হয়—যা অপারেশন কক্ষের ন্যূনতম আঙ্গিক, তা এখানে মেনে চলা হচ্ছে না। 'ফ্লোরেন্স ডে সেন্টার' বিদেশ থেকে নামী দামী যন্ত্রপাতি পাচ্ছেন এটা সুখের বিষয়। কিন্তু যদি সেসব যন্ত্রপাতি এরকম অশুদ্ধ পরিবেশে ব্যবহার করা হয় তাহলে একটা সাধারণ নার্সিং হোমের সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়? কোলকাতার অলিতে-গলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা এরকম অনেকই নার্সিং হোম আছে, যেখানকার অপারেশন কক্ষের চিত্রটা সমতুল্য। এবং তাঁরাও অল্প পয়সায় হাজার হাজার গর্ভপাত ও বন্ধ্যাকরণ অপারেশন করছেন, তেমনই হাজার হাজার লোকের সর্বনাশও করছেন।

অপারেশন কক্ষের পরিবেশের উপর রোগীর অপারেশন-পরবর্তী অবস্থা (Post operative stage) অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 'ফ্লোরেন্স ডে সেন্টার' মহিলাপরিচালিত সংস্থা, সুতরাং মহিলারা তো ওখানে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেনই। তাই আমার মনে হয় ফ্লোরেন্সকে অন্যান্য নার্সিং হোমের থেকে আলাদা চেহারা দেওয়ার জন্য আরও একটু নজর দেওয়া প্রয়োজন, নইলে তাঁরা রোগীর হিতের চেয়ে বিপরীতই করবেন।

আশা গ্রেওয়াল
অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অভ মেডিক্যাল সায়েন্স, নয়াদিল্লী-১১০ ০২৯

বামাঞ্চল

শারদীয় 'দেশ' ১৩৯৩-এ কালকূটের 'পণ্যভূমে পুণ্যস্নান' নামক উপন্যাসটি পড়তে গিয়ে একটি ভুল মন্তব্য চোখে পড়ল। লেখক লিখছেন, "বাঁ কাঁধে আঁচল মানেই, অবাঙালি পরিচয়টা স্পষ্ট। বাঙালি স্ত্রীলোকদের আটপৌরেই হোক, আর বাইরে বেরোবার সাজে শাড়ির পরিপাটিই হোক, আঁচল উঠবে ডাইনের কাঁধে।" কিন্তু আসলে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ বিপরীত। অবাঙালি ধরনে সামনে আঁচল দিয়ে শাড়ি পরলে আঁচল আসবে ডান কাঁধে। আর বাঙালি সজ্জায় আটপৌরে এবং পোশাকী উভয় রীতিতেই আঁচল থাকে বাঁ কাঁধে। এই অতি পরিচিত সাধারণ দৃশ্যটি লেখক কিভাবে ভুল ব্যাখ্যা করলেন বুঝতে পারছি না।

দেবযানী গুপ্ত
কলকাতা-৯২

হিমালয়ের পার্বতী

৪ অক্টোবর, ১৯৮৬ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর 'হিমালয়ের পার্বতী' শীর্ষক পৌরাণিক তথ্যে ঋদ্ধ নিবন্ধটি পড়ে উপকৃত হয়েছি। এ-সম্বন্ধে কয়েকটি জিজ্ঞাসা আছে। প্রথমত, নিবন্ধকার লিখেছেন, "যোগীদের প্রণব ব+অ+ম-বম্"। দেবীভাগবতে 'ওঁ'কে অর্ধ-তৃতীয়মাত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। "অকারো ভগবান্ ব্রহ্মাপ্যুকারঃ স্যাদ্ধরিঃ স্বয়ম্। ম-কারো ভগবান্ রুদ্রোঽপ্যর্ধমাত্রা (ঁ) মহেশ্বরী॥" অর্থাৎ অ-কার ব্রহ্মা, উ-কার হরি, ম-কার রুদ্র ও চন্দ্রবিন্দু মহেশ্বরীকে নির্দেশ করে। যোগীদের প্রণব, যতদূর জানি, উ+অ+ম্—এই তিন বর্ণ নিয়ে গঠিত।

ব+অ+ম্=বম্— এই বর্ণবিভাজন সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। দ্বিতীয়ত, লেখক বলেছেন যে মহালয়াতেই দেবীপক্ষের সূচনা। এ-ধারণাও শাস্ত্রসম্মত নয়। মহালয়া সৌর আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষ বা অমাবস্যাকে নির্দেশ করে। দেবীপক্ষের শুরু মহালয়ার পরে। সে-দিক দিয়ে দেখতে গেলে মহালয়া-তিথিতে দেবীর আবাহন ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, যা' আজকাল স্বীকৃত, শাস্ত্রবিহিত নয়।

তপোব্রত সান্যাল
হলদিয়া

ভ্রম সংশোধন

১লা নভেম্বর 'ক্ষিতিমোহন সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী'র এক নম্বর পত্র পরিচিতিতে 'রবীন্দ্রনাথকে লেখা অজিতকুমার চক্রবর্তীর চিঠি'র স্থলে 'অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি' পড়তে হবে।

দেশ

নর ও বানর

লোকরহস্যে বঙ্কিম বলেছিলেন, 'পণ্ডিতেরা বলেন যে, কালক্রমে পশুদিগের অবয়বের উৎকর্ষ জন্মিতে থাকে ; এক অবয়বের পশু ক্রমে অন্য উৎকৃষ্টতর পশুর আকার প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের ভরসা আছে যে, মনুষ্য-পশুও কালপ্রভাবে লাঙ্গুলাদি বিশিষ্ট হইয়া ক্রমে বানর হইয়া উঠিবে।'

বঙ্কিমের এই ভবিষ্যদ্বাণী এত দ্রুত অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে কয়েক দশক আগেও ভাবা যায়নি। মহাভারতের এই অরণ্যপর্বে অধিকাংশ মনুষ্যপশু ঘাসাচারী ভূচর হলেও বৃক্ষচারীদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়। রাজনীতির শাখায় শাখায়, সরকারী-আধাসরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ডালে ডালে তাদের সলম্ফ বিচরণ, সদম্ভ ভ্রূকুটি এখন নিত্য দ্রষ্টব্য। বিবর্তনের অনিবার্য নিয়মে তাদের শুধু লেজ গজিয়েছে তাই নয়, লেজ মোটাও হয়েছে, তাদের কন্দর্পকান্তি রূপে রুপিয়ার জেল্লা লেগেছে। তারা এখন উঁচু ডালের আখের গোছানো সফল ব্যক্তিত্ব। ফলত একদিন যে ভূচারী চতুষ্পদের পিঠে পা রেখে তাদের উর্ধ্বারোহণ পর্ব শুরু হয়েছিল সেকথা অক্লেশে ভুলে যাবার সময় এসেছে। মাটির স্মৃতি, দেশের কথা কবেই বিস্মরণের তলদেশে চলে গেছে। আদর্শ এখন ব্যক্তিগত এবং দলগত উদ্দেশ্যসিদ্ধির অছিলায় পরিণত হয়েছে। দেশ ডুবুক, গ্রাম শহর রসাতলে যাক তাদের এখন কিছুই আসে যায় না। নরের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার এখন বানরে অর্পিত, নরমুণ্ড এখন তাদেরই হাতে।

হাঁড়ির হাল বুঝতে একটি ভাতই যথেষ্ট। একটি রাজ্যের হাল-চিত্র দেখার জন্যে চতুর্দিক হাতড়ে মরার দরকার নেই, একজোড়া শহরই তার পর্যাপ্ত প্রমাণ। পশ্চিমবাংলার বর্তমান অবস্থা যে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে হাওড়া ও কলকাতার জনজীবনই তার সাক্ষ্য দেবে। এক সেতুতে বাঁধা এই যুগল শহরের জীবনযাত্রায় অনেকখানি ফারাক ছিল একদিন। তখন দুয়োরানী সুয়োরানীর কাহিনী মনে পড়ত। একজনের ভাগ্য মহানগরীর, অন্যজনের নিছক শহরের। তখন গঙ্গার ওপার এপারের দিকে তাকিয়ে হয়তো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলত। কিন্তু আজ আর সেদিন নেই। আদরের পাটরানীর মত একদাকালের ভারতবর্ষের এবং পরবর্তী কালের বঙ্গদেশের গর্বের রাজধানী কলকাতার সেই রূপের ঐশ্বর্য আজ নেই। দুটি শহরই এখন অন্তর্জলী যাত্রার শেষ দশায়, তাদের গঙ্গাপ্রাপ্তির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ। এই সর্বজনীন ব্যঙ্গের দেশ বঙ্গাল প্রদেশের যা-ইচ্ছে-তাইয়ের শহর কলকাতা নগরী যদি মানুষের পিঁজরেপোল, তাহলে নদীর পশ্চিমকূলের শহরটি মানুষের ভাগাড়। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের মধ্য দিয়ে এখনো সেখানে মনুষ্য জীবন বহমান একথা মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়। আশ্চর্যের বিষয় এখনো সেখানে সভাসমিতি হয়, লাউড স্পীকার গর্জায়, পুজোপার্বণে ঢাক বাজে। চতুর্দিকে আর আবর্জনার নরক, ধুলোধোঁয়ার আঁধি, রাস্তাগুলো খানাখন্দে দুর্গম, বর্ষার বিষাক্ত বানভাসিতে ঘরবাড়ি খাটাল একাকার, কল নির্জল, এলাকা নিষ্প্রদীপ, টেলিফোন বিকল। মাঠ ঘাট পার্ক লোপাট, ফাঁকফোকর নিশ্চিহ্ন, কেবলই অবৈধভাবে গাঁথনির পর গাঁথনি উঠছে, মওকা বুঝে মকান মাথা তুলছে, ধূর্ত ভিনদেশী কারবারীদের ঢালাও অনুপ্রবেশ ঘটছে। মস্তান কালোয়াতি, কালোয়ার আর কালোবাজার জাল বিছিয়ে চলেছে। পুরসভার ভাবান্তর নেই, কাগজে কলমে তাঁরা দ্রুতগামী, ব্যস্ত। নিরুপায় জনমনুষ্যের আবেদন নিবেদন ক্ষোভ বিক্ষোভ কর্তৃপক্ষের উঁচু কানে পৌঁছায় না। শুধু সেই হতভাগ্য নাগরিকদের নির্বাচনী ব্যালট আর প্রদেয় করের কড়াক্রান্তি ইস্তক উসুল হয়। তামাম দেশ কীভাবে চলছে কেউ জানে না, কারা চালাচ্ছে তাও। শুধু কোটি কোটি টাকার প্রকল্পের ঢক্কা নিনাদ থেকে থেকে শোনা যায়। দেশের কাজ দশের কাজ এখন শুধু কথার কথা, আদর্শ ফাঁকা আওয়াজ। মুদ্রার মাদকে প্রতিটি চেয়ার আচ্ছন্ন, কোথাও কাজ হয় না। সমাজবিরোধীর হাতে মারণাস্ত্র তুলে দিচ্ছে মানুষখেকো রাজনীতি। তবু দেশ চলছে, থেমে নেই। অচল টাকার মত হাত বদল হতে হতে আরও কিছুদিন চলবে। তারপর সেই চরম মুহূর্ত আসবে। যখন তার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হবে, হৃৎপিণ্ড চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে যাবে। তার হয়ত খুব বিলম্ব নেই। দুর্বলে সবলা নাড়ীর মত, দেশের মুমূর্ষু দেহে রাজনীতির দবদবানি তারই পূর্বাভাস। কিন্তু সে যখন হবে তখন হবে। তার আগে পর্যন্ত নরকর্ণধাররা নিশ্চিন্ত। গলায় মুক্তোর মালা পরে উর্ধ্বলোক থেকে তারা শেষ খেলা খেলে যাচ্ছে। শিক্ষাকে গোরস্থান বানিয়ে, শাসনযন্ত্রকে শোষণযন্ত্রে পরিণত করে, হাসপাতাল পরিবহণ ইত্যাকার জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে রূপান্তরিত করে তাদের তন্ত্রাচার চালিয়ে যাচ্ছে।

এ ব্যাপারে আমাদের মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। শুধু বঙ্কিমের অনুকরণে বলতে ইচ্ছে করে, 'হে লায়েক ভ্রাতাগণ, অত কামড়াকামড়ি করিয়া খাইও না, তাড়াতাড়ি ফুরাইয়া যাইবে। চাটিয়া চাটিয়া খাও, তাহা হইলে এই দেশ অনেকদিন ভোগ করিতে পারিবে।'

আপনাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্ষিতিমোহন সেনকে লেখা : ১৯০৮-১৯৪০

॥ টুকরো চিঠি ॥

ক্ষিতিবাবু

বেদে বাক্যের যে স্তব আছে পেলে আমার কাজে লাগবে।

রবীন্দ্রনাথ

॥ পত্র ৩৬ ॥

ওঁ

শিলাইদা

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

এখানে আপনার আসা কঠিন হইবে না। যদি দিনক্ষণের খবর যথাসময়ে পাই তবে কুষ্টিয়া হইতে আপনাকে গোরাই পার করিয়া একখানা টমটম রথে চড়াইয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শিলাইদহে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারি। রথটা জীর্ণ এবং পথটাও কাঁচা—সুতরাং কিঞ্চিৎ দৈহিক আন্দোলনের আশঙ্কা আছে—তাহাতে যদি আপনার মন বিচলিত না হয় তবে এই উপায়ই প্রশস্ত। নতুবা কুষ্টিয়ার ঘাট হইতে এখানে বরাবর নৌকাযোগে আসিতে চার-পাঁচ ঘণ্টা লাগিতে পারে। আর যদি অশ্বারোহণে আপনার কোনো বাধা না থাকে তবে তাহার ব্যবস্থা করাও সহজ। ইতি ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩২০ [১৯১৩]

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যদি আকস্মিক কোনো কারণে আমাকে ইতিপূর্বেই কলিকাতায় যাইতে হয় তবে আপনি সংবাদ পাইবেন।

ক্ষিতিবাবু

বেদে বাক্যের যে স্তব আছে

পেলে আমার কাজে লাগবে।

রবীন্দ্রনাথ

ওঁ

[illegible]

Education Commission [illegible]

[illegible]

কাজে লাগানো যায় । আপনিও যত শীঘ্র পারেন এসে জগদীশের উদ্বেগ দূর করবেন । ইতি শুক্রবার । [১৯১৭]

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ পত্র ৪০ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

কিছুদিন হইতে আবার শান্তিনিকেতনে আশ্রয় লইয়াছি ।
পিয়ার্সনকে চীন হইতে ইংলণ্ডে পাঠানো হইয়াছে সে খবর পাইলাম ।
বোধহয় ইংলণ্ডে তাঁহার বিচার হইবে । সম্ভবত সেখানকার বিচারে
তাঁহার গুরুদণ্ড ঘটিবে না । তিনি যে বই ছাপাইয়াছেন অপরাধ
তাহারই মধ্যে । ইংলণ্ডে তাঁহার সুহৃদ ও সহায়ের অভাব
নাই—পরিত্রাণ পাইবেন এইরূপ সকলে আশা করিতেছেন । তবে,
অন্ততঃ যুদ্ধনিবৃত্তিকাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে তাঁহার আসা সম্ভবপর হইবে
না । পরেও কি হয় নিশ্চিত বলা যায় না ।
এণ্ডরুজকে পত্র লিখিবার জন্য চেষ্টা করিবেন না, আপনার প্রতি
তাঁহার যথেষ্ট করুণা আছে । ইতি ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ [১৯১৮]

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র পরিচিতি

॥ টুকরো চিঠি ॥

বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ নানান প্রশ্নের উত্তর চেয়েছেন ক্ষিতিমোহনের কাছে । এটি তারই একটি ।

॥ পত্র ৩৬ ॥

এখানে আপনার আসা : রবীন্দ্রনাথের অতিথি হয়ে ক্ষিতিমোহন সস্ত্রীক শিলাইদহে গিয়েছিলেন । সঙ্গে ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ । তাঁরা শিলাইদহে ছিলেন সপ্তাহাধিক কাল । রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে এবং ব্যবস্থাপনায় ক্ষিতিমোহন সাধক কবি গগন হরকরার সন্ধানে প্রবৃত্ত হন । দুর্ভাগ্য, গগনের সঙ্গে ক্ষিতিমোহনের দেখা হয়নি । মাত্র কিছুদিন আগেই তাঁর মৃত্যু হয় । গগনের বিখ্যাত বাউল গান—'আমি কোথায় পাব তারে ।/আমার মনের মানুষ যে রে' রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় ছিল । নিজেও এই গান গেয়েছেন, অন্যের কণ্ঠেও গানটি তুলে দিয়েছেন ।

॥ পত্র ৩৭ ॥

সন্তোষ : সন্তোষচন্দ্র মজুমদার
জগদানন্দ : জগদানন্দ রায়
কালীমোহন : কালীমোহন ঘোষ
পণ্ডিতমহাশয় : তিনজন অধ্যাপককে রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিতমশাই সম্বোধন করতেন । ১ । শিবধন বিদ্যার্ণব ২ । বিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রী ৩ । ভীমরাও শাস্ত্রী । এই পত্র লেখার আগেই বিদ্যার্ণব আশ্রম ত্যাগ করেন ।
মহারাজ : নাটোরের মহারাজা রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সাহিত্যিক সম্পাদক জগদীন্দ্রনারায়ণ রায় ছিলেন নামকরা পাখোয়াজি । রবীন্দ্রনাথ পরিচালিত প্রায় সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জগদীন্দ্রনারায়ণ যোগ দিয়েছেন । রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে টাউন হলে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভায় লিখিত ভাষণ পাঠ করেছিলেন মহারাজা নিজে । মহারাজার ক্রিকেট টিম ও তাঁর খেলার সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় গল্প লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে ।
ব্রাহ্ম সমাজ আপিস : কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরি ও অফিস রবিবারে পূর্ণদিবস ও শনিবার অর্ধদিবস বন্ধ থাকত ।

॥ টুকরো চিঠি ॥

ক্ষিতিমোহনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিরকুট ।

॥ পত্র ৩৯ ॥

জগদীশ : জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) । পদার্থবিদ্ ও জীববিজ্ঞানী । ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে অধ্যাপনার কাজ থেকে অবসর গ্রহণের পর 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা (৩০-১১-১৯১৭) করেন । উল্লেখ্য এই দিনটি ছিল জগদীশচন্দ্রের জন্মদিন । পত্রে এই বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । অনুষ্ঠানে বেদ মন্ত্র পাঠ করেন ক্ষিতিমোহন সেন এবং অনুষ্ঠান উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ নতুন গান রচনা করেন : 'মাতৃমন্দির পুণ্য-অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল' ।
Education commission : বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার পর কয়েকদিন কলকাতায় থেকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে যান । কারণ শিক্ষা সংস্কারের জন্য যে কমিশন কলকাতায় এসেছিল তাঁদেরও শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের কথা ছিল । কমিশনের সভাপতি স্যার মাইকেল স্যাডলার প্রমুখ কয়েকজন সদস্য শান্তিনিকেতনে পরিদর্শনের জন্য আসেন । ইংল্যাণ্ডের লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলার স্যাডলার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করেন । Calcutta University Commission 1917-19 রিপোর্টে এই আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে ।
পণ্ডিতজী : পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী

॥ পত্র ৪০ ॥

পিয়ার্সন : উইলিয়ম উইনস্টানলি পিয়ার্সন (১৮৮১-১৯২৩) । ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন লণ্ডনে পিয়ার্সন একদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান । কিন্তু দেখা হয়নি । সেদিন সন্ধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' সম্বন্ধে সুকুমার রায়ের একটি বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা হয় । পিয়ার্সন নির্দিষ্ট সময়ে সভাস্থলে হাজির হয়ে সুকুমার রায়ের সঙ্গে পরিচিত হন । সুকুমার রায় পিয়ার্সনকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন । কবির সঙ্গে আলাপ করে পিয়ার্সন মুগ্ধ হন । এ সময়ে মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকার প্যাসিভ রেসিস্টান্স আন্দোলন কার্যাবলীর সঙ্গে পিয়ার্সন যুক্ত হয়ে পড়েন । এণ্ডরুজের সঙ্গে তিনিও দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়ার সংকল্প করেন । মহামতি গোখলে উভয়কে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাবার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন । আফ্রিকা থেকে ফিরে এণ্ডরুজ ও পিয়ার্সন আশ্রমের কাজে যোগ দেন । ১৯১৮ ১২ মে সংবাদ আসে পিকিং-এ ইংরেজ পুলিশ বন্দী করেছে পিয়ার্সনকে । পত্রে রবীন্দ্রনাথ এ ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন । গত দেড় বৎসর যাবৎ পিয়ার্সন জাপানে ও চীনে ছিলেন । ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে জাপান থেকে পিয়ার্সনের একটি বই প্রকাশিত হয় । ভারত সরকার উক্ত বইটি বাজেয়াপ্ত করে । ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটে । ইটালির আল্‌পস পাহাড়ে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে তিনি আহত হন । হাসপাতালে মৃত্যুকালে তাঁর শেষবাণী ছিল 'ভারতবর্ষ, আমার ভারতবর্ষ' ।
এণ্ডরুজ : চার্লস ফিয়ার এণ্ড্রুজ (১৮৭১-১৯৪০) । রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বন্ধু ও শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, রাজনৈতিক পরাধীনতা থেকে ভারতবাসীর মুক্তি সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করেন ।

সংকলক : সুনীল দাস

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ক্রুশদণ্ড

কিশলয় ঠাকুর

রাতে ঘরে ফিরে তর্কভূষণ শুনলেন, ঠাকুরের শয়নারতি হয়নি। কারণ? পুত্র ভূদেবের কথা, ওসব আর সে করতে পারবে না। পৌত্তলিকতায় আর বিশ্বাস নেই তার।

ব্যথা পেলেও পুত্রের প্রতি এজন্য কোনো কঠোর বাক্য ব্যবহার করলেন না পিতা। শুধু বললেন, সময়ে বিশ্বাস ফিরে পাবে।

ততোদিনে ভূদেবের সহপাঠী মধুসূদন এবং হিন্দু কলেজের আরো কিছু ছাত্র খ্রীষ্টান হয়েছেন। ভূদেবও হবেন বলে শোনা যাচ্ছে। এমন সময় লালবাজারের পথে ভূদেব একদিন দেখেন এক পাদ্রি সাহেব বেশ লোক জমিয়ে বক্তৃতা করছে—তোমাদের রাম কীরূপ? তার স্ত্রীকে রাক্ষস নিয়ে গেল। তাকে রক্ষা করতে গিয়ে আহত হল এক বৃদ্ধ পক্ষী। আর সেই আহত পক্ষীটাকেই কিনা সীতাহরণকারী ভেবে মারতে

পরিত্রাতা খ্রীষ্ট

উদ্বাস্তু যোশেফ, মেরি ও ঈশ্বরপুত্র শিল্পী : যামিনী রায়

গেল রাম! তা হলে দেখ, উপকারী বন্ধুকেই যে চিনতে পারে না সে কী করে পাপাত্মা-পুণ্যাত্মা চিনবে?

তর্কভূষণমশায়ের সেই পুত্র ভূদেব—ভূদেব মুখোপাধ্যায় ভিড় ঠেলে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, কী বলছ সাহেব? তোমাদের যীশুকে যখন লটকে দিলে, তখন সে, 'পিতা, আমাকে ছাড়লে কেন!'—বলে কেঁদে ফেলে। সে কী করে পিতাকে বলে অন্যকে উদ্ধার করবে?

বলা বাহুল্য পাদ্রিসাহেব আর স্থানত্যাগে কালক্ষেপের ঝুঁকি নেননি।

অর্থাৎ সময়ে পুত্র বিশ্বাস ফিরে পাবে একথা বুঝতে ভুল করেননি সেদিন তর্কভূষণ। ভুল করছিলেন ওই পাদ্রিরা। তাই শ্রীরামপুরের মিশনারিরা হিন্দুদের সামনে ধাতব ক্রুশ তুলে বলতেন,—দেখ, তোমাদের ঠাকুর মাটির, কাঠের বা পাথরের, পড়লেই ভাঙবে। আর আমাদের ক্রুশ ভাঙে না।

তাঁরা হয়তো ভাবেননি তখন, ক্রুশ না ভাঙলেও ভুল ভাঙে। আর বড়ো বেশি দক্ষিণা গুণতে হয় সে-ভুলের প্রায়শ্চিত্তে। এবং পরে 'পঞ্চগোরা স্মরেম্নিত্যম্' বলে শ্রীরামপুরের যে মিশনারীদের বাঙালি বরণ করেছিল, তাদের বিরোধিতাও করতে হয় সেই বাঙালিকেই। প্রথম দিকে ইস্ট ইনডিয়া কোমপানির পছন্দ হয়নি এদের কাজ-কর্ম। সূচনায় তারা তাদের এখানকার 'নেটিভ সারভেনটদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য' চ্যাপলেইন নিয়োগ করে। আইন করে দেয়, দেশ থেকে এদেশে যে জাহাজগুলি আসবে তাদের প্রতিটি জাহাজে একজন করে চ্যাপলেইন আমদানি করা চাই। এরা ঠিক মিশনারি নয় এবং কোমপানির কর্মীদের বাইরে এরা ধর্মপ্রচার করবে না বলে ঠিক হয়। একথা অবশ্য রক্ষা করা হয়নি। চ্যাপলেইনরা রবিবার আর ছুটির দিন বাইবেল পড়ে শোনাতো। দেখা গেল ইয়োরোপীয়রা বড়ো কেউ এসব ধর্মকথা শুনতে যায় না। তারা ছুটি কাটায় নানারকম আমোদ-ফুর্তি-মেয়েবাজি করে। চ্যাপলেইনদের তখন কাজ হল এদেশীয়দের বাইবেল শোনানো।

এসময় একদল চাইছিল, পাদ্রিরা এসে এখানে ব্যাপকভাবে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করে 'এদেশীয়দের আত্মার উন্নতি' ঘটাক। এর বিরোধী একদলের
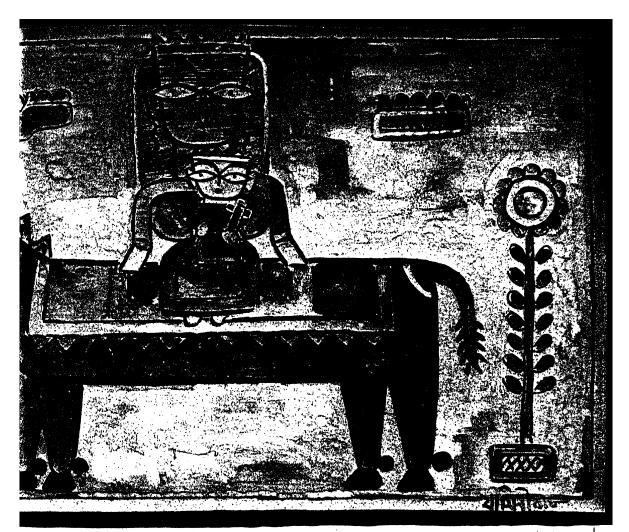
বক্তব্য—'দে নিড ফারস্ট টু ক্রিশ্চিয়ানাইজ দেমসেলভস।'

তবু মিশনারিরা আসতে থাকে। ইস্ট ইনডিয়া কোমপানি এটা প্রথমে পছন্দ করেনি বলে ওরা আস্তানা করে কলকাতার ইংরেজদের আস্তানার বাইরে শ্রীরামপুরে। ইস্ট ইনডিয়া কোম্পানির ওদের প্রতি বিরূপ মনোভাবের কারণ ছিল। কোম্পানি এসেছে ব্যবসা করতে। কিন্তু মিশনারিরা তাদের প্রচারে হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মকে আক্রমণ করে বিগড়ে দিচ্ছিল স্থানীয় লোকদের। ফলে নির্বিশেষে রাগটা পড়ে সাহেবদের ওপর। এতে ব্যবসার ক্ষতি। কোম্পানির হিসাবটাও যে ভুল ছিল না, ব্রিটিশ শাসকরাও পরে তা বারে বারে বুঝেছে। ভেলোরের সিপাহী বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সদস্যরা বলেন, স্থানীয়দের ধর্মের ওপর মিশনারিদের আক্রমণের জন্যই ওই ঘটনা ঘটেছে।

আরও ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল শ্রীরামপুরের মিশনারিরা। সহনশীল হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করতে করতে ওরা এমন বেপরোয়া হয়ে

◀ নিজের জীবন দিয়ে যীশু শান্তির সিংহাসন পেতে দিয়েছিলেন

নখের উপরের উজ্জ্বলতা দিল মোরে রূপ ঝলমল, অন্তর মম খুশি উচ্ছল সদ্যফোটা শতদল!"
ল্যাকমে নেল কালার। এ হল সবচেয়ে বেশী বিক্রীর নেল কালার —
যার সম্ভারে আছে সবচেয়ে বেশী রকমের রঙ! পার্ল আর মেটালিক
ফিনিশের সবচেয়ে কেতাদুরস্ত হালফ্যাশানের রঙ এনেছে — সবার আগে!
ল্যাকমে-তে যদি আপনার মনের মত রঙ না পান, জানবেন,
আর কোথাও পাবেন না!
রূপ ঝলমল, অন্তর খুশি-উচ্ছল করতে Lakmé
Lakmé
NAIL PE

ওঠে যে মুসলমানদের ওপরও আক্রমণে উদ্যত হয়। এক প্রচারপত্রে হজরত মহম্মদের উক্তিগুলিকে 'আজগুবি আর অসত্যে ভরা' বলে মন্তব্য করে কোরান সম্পর্কে বলা হয়—এটা অন্যসব বই থেকে চুরি করা। এতে যে প্রচন্ড মুসলিম বিক্ষোভ শুরু হয় লরড মিন্টো হস্তক্ষেপ করে ওই প্রচারপত্র নিষিদ্ধ করে অনেক ফৈজত করে তা সামাল দেন।

তবু মিশনারিদের পক্ষে ওকালতির লোকেরও অভাব ছিল না। আঠার শ সালে উইলিয়ম কেরি শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমে কেবল প্রচার নয়, ধর্মান্তিরণও চলতে থাকে। গোড়ায় এসব কাজের জন্য কোনো সরকারি অনুমোদন ছিল না। এদেশে গ্রান্ট সাহেব, মিশনারিদের অনুমোদনের জন্য তদ্বির করতে থাকেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উইলবারফোরস বলেন, খ্রীষ্টধর্ম প্রচারই একমাত্র উপায়, যা দিয়ে আমরা ভারতে আমাদের শাসনের ভিত শক্ত করতে পারবো। একই কথা মিশনারি মারশম্যানের। ভারতে ইংরেজ সরকারের যদি যথার্থ কোনো বন্ধু থাকে তাহলে তারা হল আমাদের দ্বারা ধর্মান্তরিতরা। এরকম এক ভূমিকায় এখানে পাদ্রিদের অধিকার—লাইসেন্স প্রাপ্তি। সে আঠার শ' তেরো সাল। পরের বছরই কলকাতার প্রথম আরচবিশপ টি, এফ মিডলটনের আগমন।

খ্রীষ্টধর্মপ্রচার, গির্জা নির্মাণ, ধর্মান্তরণ এসব অবশ্য অনেক আগে থেকেই চলছিল এখানে। যেমন ষোড়শ শতকে একহাতে ক্রুশ আরেক হাতে তরোয়াল নিয়ে বঙ্গে জেসুইটদের প্রবেশ। উপকূল বরাবর ক্যাথলিকরা তাদের উত্তরপুরুষ। আবার লর্ড ক্লাইভের আমলে এখানে আসেন প্রথম প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারি জ্যাকেরিয়া কিয়ের নানভারর। তিনি গির্জাও করেন। তারও আগে সতের শ নয় সালে হয় প্রোটেস্ট্যান্টদের সেনট অ্যানির চার্চ। ধর্মান্তরণও চলে। তবে ব্রিটিশ মিশনারিরা সরাসরি বলপ্রয়োগে যায়নি এজন্য। তারা নিল ভিন্ন পথ, ভিন্ন কৌশল। বিত্ত দিয়ে, বৃত্তি দিয়ে, বক্তৃতায়, বই-প্রচারপত্রে হিন্দুধর্মের মূলে আঘাত দিয়ে, আক্রমণ করে খ্রীষ্টানধর্ম আরোপের অভিযান চলল। আক্রমণটা প্রধানত হিন্দুধর্মের উপর চললেও মাঝে-মধ্যে মুসলমানদেরও বাদ দেওয়া হোত না। যেমন আঠার শ' সাতাশ সালে চুঁচুড়ার এল, এম, এস মিশনারি মানডি খ্রীষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্মের তুলনা করে একখানি বই বার করে। তাতে সে বলে, হিন্দুর দেবতা হল ধূর্ত, নেশাখোর, হেন অপরাধ নেই যা তারা করে না। তাদের শাস্ত্র যুক্তিছাড়া, মিথ্যেয় ভরা।

মান্ডি সাহেব হজরত মহম্মদের প্রচারিত ধর্মকেও ছাড়ল না। বলল—ওর ধর্মে নৈতিক অপরাধের প্রবণতা সর্বত্র। তবে সর্বোত্তম কি ?—খ্রীষ্টধর্ম, এ ধর্মে আছে পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা।

এখন এসব জ্ঞানের কথা এদেশীয়দের মগজে গুঁজে দেওয়ার জন্য ওরা কিছু ইস্কুল খুলতে উদ্যোগী হয়। আর সেখানে পাঠ দেওয়ার উপযোগী কিছু বই ছাপানোর দিকে পড়ল মনোযোগ। অতএব চাই ছাপাখানা ও তাতে কিছুপ্রচারপত্র ছাপিয়ে, ছড়িয়ে তৈরি হবে অনুকূল আবহাওয়া। আর প্রথমটা বাংলার মাধ্যমে টান দিয়ে, এনে ফেলতে হবে একেবারে ইংরেজিতে। তখন শুধু ধর্মান্তরণও সহজ হবে না, ইংরেজ শাসনের প্রতি তাদের করা যাবে অনুগত। এই দুটি দিক বিবেচনা করেই আঠারো শ' পঁয়ত্রিশ সালে সরকারিভাবে এখানে ইংরেজি শিক্ষার নীতি অনুমোদিত হয়। ডাফ সাহেবের এসময়ে তাঁর কলকাতার অভিজ্ঞতার কথা ব্যাখ্যা করে বলেন, ইংরেজি শিক্ষা ভারতীয়দের ব্রিটিশ ক্রাউনের প্রতি অনুগত করবে। মেকলে তাঁর দাদাকে লেখেন—ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত কোনো হিন্দু নিজ ধর্মে আর আস্থা রাখতে পারবে না। এবং এটা চালিয়ে যেতে পারলে ত্রিশ বছর পরে একজনও মূর্তিপূজক অবশিষ্ট থাকবে না বঙ্গদেশে।

অতএব আর কালবিলম্ব না করে স্কুল খুলে দিলেন ডাফ সাহেব। ফ্রি স্কুল। মাইনে লাগবে না। গরিব হলে বইও মিলবে বিনা পয়সায়। বই ছাপা শুরু হয়েছে তার আগেই অবশ্য শ্রীরামপুরের ছাপাখানায়। স্কুল অনেক আগেই খুলে দিয়েছিলেন কেরি সাহেব মদনাবাটিতে। স্কুলগুলিতে অবশ্য পাঠ্য ছিল বাইবেল। আর যেসব বাংলা পত্রপুস্তক পড়ানো হোত—তা কেমন ? একটি নমুনা :

'ইংরেজদের সাহস দেখ। একজন ইংরেজ পর্বতের পার্শ্বে বসিয়া পাখি শিকার করিতেছিল। এমন সময় তাহার মাথার উপর পর্বতের চূড়ায় এক সিংহ গর্জন করিয়া উঠিল। সিংহ দেখিয়া শিকারী তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।... যদি বাঙালী হইত সিংহের গর্জন শুনিয়া মূর্চ্ছা যাইত। আর সিংহেরও সেদিন ষোড়শোপচারে ভোজন হইত।'—জ্যোতিরিঙ্গন। মে, ১৮৭৩।

এরকম অনেক বই, পত্র-পত্রিকা, প্রচারপত্র ওরা বার করে যার মধ্যে একটা জাতি এবং তার ধর্মকে পর্যন্ত হেনস্থা করতে সাহস পায়। রাজধর্ম তখন তাদের অনুকূল। চারদিকে চলল ইংরেজি স্কুল গড়া, গির্জা প্রতিষ্ঠা, মিশনারি কর্মকেন্দ্রের প্রসার। লেখা-পড়া, জামা-কাপড়, চাকরি-বাকরি সব সহজলভ্য হল ওদের আশ্রয়ে গেলে। ফলে ইংরেজি স্কুল আর গির্জামুখো হল জনস্রোত। নিষ্ঠাবান হিন্দুও স্কুল খুললে একজন অন্তত সাহেব রাখতেন স্কুলের আকর্ষণ বাড়াতে। যেমন বাঙালি হলেই বিশুদ্ধ বাংলা জানে না সবাই, তেমনি সাহেব হলেই বা বাইবেলখানা হাতে রাখলেই কেউ ইংরেজি জানবে বা ধর্মধ্বজী হবে এমন কথা নেই। কিন্তু সেদিন সাহেব হলেই সর্বজ্ঞ ভাবত তারা, সম্ভ্রমবোধ হোত বাঙালিরও। কিছু কিছু অসৎ, আকাট সাহেবও বেশ আসন পেতে থাকে তখন। অবস্থাটার একটু আভাস মিলবে রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত-এ। তিনি ইংরেজি শিখবার জন্য বউবাজারে শম্ভু মাস্টারের স্কুলে ভর্তি হন। 'শম্ভুমাস্টার অতি অল্পই ইংরেজি জানিতেন। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন ও তাঁহার নাসিকার উপর দীর্ঘ তিলক কাটিতেন। তিনি অপরাহ্নে স্কুলে আসিয়া পড়াইতেন। পূর্বাহ্নে গ্রিফসাহেব আসিয়া পড়াইতেন। গ্রিফ সাহেব শম্ভু মাস্টার অপেক্ষাও ইংরেজি অল্প জানিতেন। কিন্তু তাহা বলিলে কি হয় ? একটি লালমুখ থাকিলে যেমন স্কুলের গুমর বাড়ে এমন আর কিছুতেই নহে।'

কিন্তু এই গুমরের বাড়াবাড়িতে কিছু দিনের মধ্যেই আঘাত এলো। মিশনারি, খ্রীষ্টান সাহেবদের সব কাজের লক্ষ্যই ছিল অন্য ধর্মকে হেনস্থা করা, স্বধর্ম প্রচার ও ধর্মান্তরণ। এ কেবল ঘোষিত মিশনারির নয়, সাধারণ বৃত্তিজীবী, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক সবারই এক অভিযান। ভারতের অন্যত্রও এটাই চলছিল। যেমন ভ্যালেনটাইন বলে এক ডাক্তার আঠার শ' ছেষট্টিতে বারাণসী থেকে জয়পুর যান সেখানকার রানীর চিকিৎসা করতে। চিকিৎসায় সুফল পাওয়ায় রাজা রাম সিং তাঁকে অনুরোধ করেন সেখানে থেকে যেতে। ডাক্তার শর্ত দিলেন, যদি গির্জা করা, আর প্রকাশ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে তিনি থাকবেন। তা-ই হল।

বঙ্গে যে ডাফ সাহেব শিক্ষাপ্রসারের মহান ব্রত ঘোষণা করে রামমোহনের সহায়তা পেলেন, তিনিই তাঁর নির্বেতন স্কুলকে শেষ পর্যন্ত পরিণত করেন খ্রীষ্টান গড়ার কারখানায়। ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশনে ছাত্রদের ধরে ধরে ধর্মান্তর করা, এমনকি অপ্রাপ্ত বয়স্কদের পর্যন্ত ডাফ সাহেবের

শুধুই কি প্রচার এবং ধর্মান্তরণ ? ছবি : শিপ্রা দাস

বাড়িতে আটকে রেখে খ্রীষ্টান করার অভিযান যখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল তখন তার বিরুদ্ধে কলম ধরলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'তত্ত্ববোধিনী'-তে তিনি দেশের কোথায় কতো হিন্দুকে জোর করে বা দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে খ্রীষ্টান করা হচ্ছে নাম ধাম সহ তার তালিকা প্রকাশ করতে থাকেন। তিনি আহ্বান জানালেন, পাদ্রিদের মতো হিন্দুদেরও অবৈতনিক স্কুল খুলতে হবে, সবাই এগিয়ে আসুন। বঙ্গদেশে সেদিন হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার সমস্যাটা কতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তা বোঝা যায় যখন দেখি দেবেন্দ্রনাথ কেবল আবেদন জানিয়ে ক্ষান্ত হননি, ব্রাহ্ম হয়েও তিনি রক্ষণশীল রাধাকান্ত দেবের সঙ্গেও হাত মেলান। মুসলমানরা আগেই মিশনারি স্কুলে ধর্মান্তরণ দেখে মিলিতভাবে

আর্মেনিয়ান গির্জা। কলকাতায় প্রাচীন গির্জাগুলির একটি

প্রতিবাদ জানায়, সরে আসে ওদের সংস্রব থেকে। এবার হিন্দুরাও যেভাবে সংঘবদ্ধ হল তা দেখে শ্রীরামপুরের মিশনারিদের পত্রিকা 'ফ্রেন্ডস অব ইনডিয়া' উদ্বেগ প্রকাশ করে। আঠার শ' পঁয়তাল্লিশের চার ডিসেম্বর দেখছি তারা হিন্দুদের এই সমবেত হওয়া এই দেশের পক্ষে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষণীয় ঘটনা বলছে। নজর তারা রাখুন। কিন্তু সংগঠন এগিয়েই চলল।

এই উদ্যোগে ব্রাহ্ম দেবেন্দ্রনাথ যেমন হাত মেলালেন রক্ষণশীল রাধাকান্ত দেব-এর সঙ্গে, তেমনি হাত মেলালেন তাঁদের সঙ্গে প্রগতিশীল রামগোপাল ঘোষ প্রমুখও। আঠারো শ' ছেচল্লিশের এক মারচ প্রতিষ্ঠিত হল অবৈতনিক হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়। মতিলাল শীল ইতিমধ্যেই নিজে লক্ষাধিক টাকা দিয়ে চালু করে দেন নির্বেতন স্কুল। আবার সভা বসল আঠারো শ' সাতচল্লিশের উনিশ সেপ্টেম্বর গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে। সভাপতি রাধাকান্ত দেব। দেবেন্দ্রনাথ, আশুতোষ দেব, রমানাথ ঠাকুর প্রমুখ উপস্থিত। সভায় সিদ্ধান্ত হয় মিশনারিদের স্কুলে আর ছেলেদের কেউ পাঠাবেন না। গঠিত হল হিন্দু সোসাইটি। এরপর আরও গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ হয় আঠারো শ' একান্নর পঁচিশ মে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে। এখানেও সভাপতি রাধাকান্ত। এখানে শতাধিক শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিতের সম্মতি অনুসারে সিদ্ধান্ত হয়, প্রলোভন-প্ররোচনায় এবং বাধ্যবাধকতায় যারা ধর্মান্তরিত হয়েছে তাদের হিন্দুধর্মে পুনরায় গ্রহণ করা হবে। এখান থেকেই সৃষ্টি হয় পতিতোদ্ধার সভা। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে এ এক বিপ্লবাত্মক ঘটনা বলা যায়। মিশনারিদের ফ্রেন্ডস অব ইণ্ডিয়ার পাঁচ জুনের সংখ্যায় সেমিনারির ওই সমাবেশকে লক্ষণীয় এক মস্ত বড় ঘটনা বলে মন্তব্য করা হয়।

এই বোধহয় প্রথম শিক্ষার নামে, সেবার নামে খ্রীষ্টানদের ধর্মান্তরণ অভিযান বাধা পেল। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন—'সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার স্রোত ব্যাহত হইল। একেবারে মিশনারিদের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।'

সত্যিই এবার উল্টো হাওয়া বইতে শুরু করে। ভূদেব বলেছেন—'এতদিন খ্রীষ্টধর্মই এদেশের ধর্মের প্রতি আক্রমণ করিয়া ইহার দোষ প্রদর্শন করিতেছিল। ...এই অবধি নব্যেরা খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আক্রমণ আরম্ভ করিলেন।'

একথা স্বীকার করতে হবে সেই দুর্যোগের দিনে সমাজকে স্বমর্যাদায় সুস্থিত, সমৃদ্ধ করতে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন তার পুরোভাগে। মেরি কারপেন্টারকে ঘিরে কলকাতায় যখন খুব হই-চই, ব্রাহ্মসভায়ও তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হচ্ছে, স্বাজাত্যভিমানে দেবেন্দ্রনাথ তখন দূরে। মেরি কারপেনটার নিজে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহ প্রকাশ করলে দেবেন্দ্রনাথ কলকাতা ছেড়ে কুষ্টিয়া চলে যান। এই ঘটনার উল্লেখ করে রাজনারায়ণ লিখেছেন—এ ব্যাপারে তিনি কেশব সেনের সম্পূর্ণ বিপরীত। সাহেবদের সঙ্গ থেকে সর্বদা নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। তা না হলে বা চাইলে অতি সহজেই দেবেন্দ্রনাথ মহারাজা বা কে সি এস আই হতে পারতেন।

কিন্তু জাতির মহর্ষি জাতির মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে তা চাননি। উন্নত শির এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে তাই দেখি তখনকার দিনে কৃষ্ণনগর কলেজের বিখ্যাত অধ্যক্ষ লব সাহেব লিখেছেন—'দ্য প্রাউড ওল্ডম্যান ডাজ নট কনডিসেন্ড টু অ্যাকসেপ্ট দ্য প্রেইজ অব ইয়োরোপিয়ান্স।'

তা হলেও এখানকার আদর্শ ব্যক্তিরা যতো চেষ্টাই করুন ইংরেজ রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় মিশনারিদের অর্থবলের সঙ্গে প্রতিযোগিতাটা ছিল অসম। এই সময়েই কলকাতার বাইরে মিশনারিদের আটান্নটি ছেলেদের স্কুল এবং বাইশটি মেয়েদের স্কুল চলছিল। অবশ্য হিন্দু সমাজের আন্দোলনে ওই সব স্কুল থেকে অনেকেই তাদের ছেলে-মেয়েদের তুলে নেয়। আর মিশনারিরাও প্রচারে পরধর্ম আক্রমণের ব্যাপারে সংযত না হলেও অনেক সতর্ক হয়। অনেক রকম লোভেও অনেকে খ্রীষ্টান হতে চাইত। সব চাহিদা যে মিশনারিরা পূরণ করতে পারতো তা নয়, কিন্তু গুজব ছড়াতো খুব। শ্রীরামপুর মিশনের ওয়ারড সাহেব লিখেছেন, একদিন একটি লোক সেখানে এসে খ্রীষ্টান হতে চায়। তার এই আগ্রহের কারণ প্রকাশ করতে বলায় সে বলে, সে শুনেছে, খ্রীষ্টান হলে হাজার টাকা নগদ আর এক মেমসাহেব বউ পাওয়া যাবে।

এখানে বলা দরকার এমন একটা অবস্থা হয়েছিল যে খ্রীষ্টান হলে 'মেমসাহেব' বউ পাওয়া তো দূরের কথা, স্বদেশের ঘুঁটেকুড়োনীও জুটতো না অনেক সময়। বিবাহিতরা খ্রীষ্টান হলে বউই 'মেলেচ্ছো' স্বামীকে ত্যাগ করেছে এমন ঘটনাও আছে। ওয়ারড লিখেছেন তাদের মিশনে ধর্মান্তরিত ভাগবত নামে এক ব্যক্তিকে তার স্ত্রী ও বাড়ির সবাই তাড়িয়ে দেয়। মিশনের পরামর্শে সে এক দলিল রেজিস্ট্রি করে যাতে সে ঘোষণা করে যে, পত্নী হিন্দু থাকলেও তার আপত্তি নেই এবং ধর্মপত্নী হিসাবেই সব অধিকার পাবে। সেই দলিল নিয়ে সে যখন নিজের বাড়ি যায়, তার স্ত্রী ওই কাগজ ছিঁড়ে ফেলে থানকাপড় দেখিয়ে বলে, তার স্বামী মরেছে, সে বিধবার জীবন যাপন করবে।

বিয়ে করা বৈষয়িক বিগড়ে যেতো, এর ওপর অবিবাহিতদের জন্য বউ যোগাড় করা যে কতো হাঙ্গামার তা সহজেই বোঝা যায়। বউ-সংকটের কথা মারশম্যানও বলেছেন। অর্থাৎ বিব্রত হচ্ছিল মিশনারিরাও। তবে হাল ছাড়েনি। স্কুল, গির্জা, সেবাকেন্দ্র পরিচালনা, পত্র-পুস্তক প্রকাশ ইত্যাদি চলতে থাকে। আঠারো শ সালে প্রথম বাংলা বই ওঁরা বার করেন নাম—মঙ্গলসমাচার মতিউর রচিত। আঠার শ পাঁচ সালে বের হয় 'খ্রীষ্টধর্ম বিবরণামৃতম্'। অবশ্য এর-ও আগে পোরতুগিজ মানোয়েল দোম আন্তনিওর কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ, এবং আরও আগে ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথালিক সংবাদ বের হয়। বাংলা দৃষ্টান্ত যুক্ত হালেদের ইংরেজি ভিত্তিক ব্যাকরণ, মারশম্যান সম্পাদিত সমাচারদর্পণ বা দিগদর্শনের উল্লেখ করা যায়। তবে ব্যাকরণ ছাড়া অন্যান্য সব প্রকাশনেরই উদ্দেশ্য খ্রীষ্টধর্ম প্রচার। অন্য ধর্মকে নস্যাৎ করা হয়েছে বইগুলিতে। এমন কি বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস বলে চিহ্নিত আঠারো শ বাহান্নতে প্রকাশিত হানা ক্যাথেরিন ম্যলেন্স বিরচিত 'ফুলমনি ও করুণার বিবরণ' বইখানিতেও শেষ পর্যন্ত বক্তব্য পৌত্তলিক হিন্দুদের মুক্তির একমাত্র উপায় হল খ্রীষ্টান হওয়া। মিশনারি মুদ্রাযন্ত্র অন্য কোনো মহৎ কাজে কখনো ব্যাপৃত থাকেনি। বাংলা ভাষায় ছাপা ব্যবস্থা ছাড়া ভাষার কোনো উন্নতি তাদের হাতে ঘটেনি। পনের শ' পঞ্চান্নতে কোচবিহার রাজ নরনারায়ণের লেখা পড়লে বোঝা যায় কতো আগে বাংলা গদ্য কতো সুন্দর ছিল। দুর্ভাগ্য, তা মুদ্রিত নয়। মুসলমান যুগে ফারশীর চাপে ঢাকা পড়ে বাংলা ভাষা। মিশনারিরা বরং এক উদ্ভট বাংলা চালু করে। সে বাংলায় প্রচার যে সুবিধা হয়নি, তা সাহেবরাও স্বীকার করেছে।

তবে ক্রমে ওরা কিছু ভালো পাঠ্য বই বার করে। কিছু ভালো আদর্শ শিক্ষব্রতীও যোগ দেয় স্কুলে, কলেজে। তাদের প্রভাবে, বা গুণে আকৃষ্ট হয়ে কেউ কেউ খ্রীষ্টান হলেও, ব্যক্তিগতভাবে তারা ধর্ম-গোত্রর বাইরে আনতে পেরেছিলেন নিজেদের। আজও তাঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। ডেভিড হেয়ার তাঁদের অন্যতম। হেয়ার সাহেব পড়াতেন স্কুল সোসাইটির স্কুলে। কিন্তু লোকে বলত হেয়ার সাহেবের স্কুল। রাজনারায়ণ বসু এখানে পড়েছেন। এদের প্রকাশিত রিডারগুলিকে তিনি উত্তম পুস্তিকা বলেছেন। আত্মচরিতে তিনি হেয়ার সাহেবের প্রশংসা করে বলেছেন, বাঙালিদের গায়ে ময়লা থাকতো বলে হেয়ার সাহেব স্কুলের ফটকে বেত আর তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন মাঝে মাঝে। তোয়ালে দিয়ে ছাত্রদের গা ঘষে দিতেন। বেশি ময়লা বেরোলে বেত্রাঘাত হোত। তবে এ জন্য সেই ছাত্রের প্রাপ্তিযোগও হোত একটি সাবান। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, পড়ে বাড়ি ফিরতে কোনো ছাত্রর দেরি হলে হেয়ার সাহেব তাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতেন। কেউ অসুস্থ থাকলে খোঁজ নিতে বাড়ি যেতেন তাঁর। এখানেই রাজনারায়ণের সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন প্যারীচরণ সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, মধুসূদন প্রমুখ। এঁদের মধ্যে মধু এবং জ্ঞানেন্দ্র খ্রীষ্টান হন। হয় তো হেয়ারের প্রভাব। তবু হেয়ার স্মরণীয় হয়ে আছেন।

আবার খ্রীষ্টান হয়েই সবাই যে হিন্দুবিদ্বেষী হয়েছেন তাও নয়। যেমন মাইকেল। রাজনারায়ণকে তিনি নিজেই বলেছেন, ঘিষে থাকতে হয় ওদের সঙ্গে তাই আছি। মনটা আমার হিন্দুই রয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বলতেন, আমি হলাম ব্রাহ্মণ-খ্রীষ্টান। ইংরেজ সরকারের সহায়কও হননি ওরা সবাই। যেমন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, একাধারে তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অপরপক্ষে বৈদান্তিক। দেশের জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তিনি কারাবরণ পর্যন্ত করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মিশনারিরা সত্যিই অনেক জিনিস বুঝতে ভুল করেছে, অনেক আশা তাদের পূরণ হয়নি। তাদের অর্থ ব্যয় উদ্যম কমেনি বরং শতগুণ বেড়েছে, কিন্তু সমাজের সাধারণ শরীর থেকে যেন আজ তারা বিচ্ছিন্ন, প্রত্যন্ত প্রদেশে এখন তাদের আনাগোনা, আস্তানা।

কলকাতায় মিশনারিদের যে স্কুল-কলেজগুলি এখন আছে সেগুলিকে আর খ্রীষ্টান করার কারখানা বলা যাবে না। বরং বলা চলে মানুষ গড়ার কেন্দ্র। সুশৃঙ্খল ওই সব শিক্ষায়তন থেকে উজ্জ্বল ছেলেরা বেরোচ্ছে খ্রীষ্টান না হয়েও। ভরতি হতে গেলে 'ধর্মে বিশ্বাস'-এর একটি স্বীকৃতিপত্রে স্বাক্ষর করতে হয় বটে, তবে খ্রীষ্ট হিন্দু-কোনো ধর্মবিশেষের কথা নেই। আগের মতো সেখানে প্রার্থনা সংগীতে
'পরম ধরম করহ আশ্রয় অগতির গতি যীশু দয়াময়'-ইত্যাদি অবশ্য গেয় নয়।

কিছুকাল আগে গণতান্ত্রিক খ্রীষ্টীয় সমিতি কলকাতার মিশনারি স্কুলগুলি থেকে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ কৃতী খ্রীষ্টান ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করার জন্য বিভিন্ন স্কুলে যায় নাম সংগ্রহ করতে। সমিতির সভাপতি দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলেন, অতো কৃতী ছাত্র-ছাত্রী প্রতি বছর বেরোচ্ছে ওসব স্কুল থেকে কিন্তু খ্রীষ্টান ছেলে-মেয়ে কোনো স্কুলে একদম নেই, কোথাও কোথাও বা পেলাম একটি বা দুটি। তার ক্ষোভ, এরকম স্কুল রেখে মিশনের লাভ কী! লাভ লোকসান জানি না, তবে এটা ঠিক ওসব স্কুল শুধু খ্রীষ্টান ছাত্র নিয়ে চালাতে গেলে তার আজকের ঔজ্জ্বল্য হারাতে বাধ্য আর যদি অখ্রীষ্টানকে খ্রীষ্টান বানাবার চেষ্টা হয়, অন্তত কলকাতার মতো আলোকিত এলাকায় তাহলে হয়তো স্কুল কেন, উৎখাত হয়ে যাবে মিশনগুলিই।

তারা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও লোককে উসকে দিচ্ছে বলে জেলা শাসকের দফতরে খবর আসে। এদিকে কিছু দিনের মধ্যেই রাজ্য গোয়েন্দা দফতর যে তথ্য পায় তাতে অভিযোগ, বাঁকুড়া সহ চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর ও নদীয়ায় মিশনারিরা তথাকথিত উন্নয়নের নামে দেশের স্বার্থবিরোধী কাজ করছে। সরকার তখন ভবানীশঙ্কর নিয়োগীকে চেয়ারম্যান করে এক কমিশন গঠন করে তার ওপর এ নিয়ে তদন্ত ও সুপারিশের ভার দেন. নিয়োগী কমিশনের রিপোরটে অভিযোগগুলি স্বীকৃত হয়। এর ভিত্তিতে কমিশন বলেন, এ রাজ্যে মিশনারির সংখ্যা অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধি পেয়েছে। ধর্মান্তরণের লক্ষ্য নিয়ে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত।
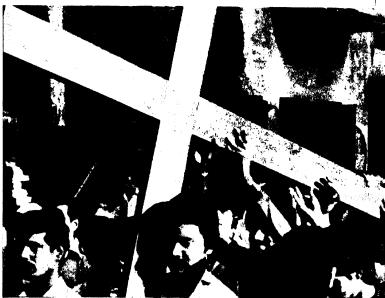
মূল ভারতীয় জনস্রোতে মিশনারীদের প্রভাব এখন একটি বিবেচনাযোগ্য বিষয়   ছবি : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন ওদের যা কিছু সব হতে পারছে শহর থেকে দূরে দূরে, অবহেলিত, অনালোকিত, অসতর্ক এলাকায়। এবং সেখানকার কার্যকলাপ সব যে খুব বাঞ্ছিত তা নয়। বরং কিছু কাজ জাতীয় স্বার্থে বিপজ্জনকও মনে হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের লাগোয়া বিহার, মেঘালয় অরুণাচলে এদের কার্যকলাপ নিয়ে অনেক কথা উঠেছে। কিছু দিন আগে অরুণাচলের স্পীকার টি এল রাজকুমার কলকাতায় বলেন, মিশনারিরা সেখানে রাজ্যের শান্তি বিপন্ন করে তুলেছে। ওরা ষড়যন্ত্রকারী। মধ্যপ্রদেশ সরকার তো কিছু দিন আগে বেশ কয়েকজন পাদ্রির ওপর বহিষ্কার আদেশ জারি করেন বাধ্য হয়ে। প্রশ্নটা পশ্চিমবঙ্গেও মাঝে মাঝে উঠছে। উনিশ শ' আটাত্তরে বাঁকুড়া জেলায় দেখা যায় মিশনারিরা গ্রামের গরিবদের তত্ত্বতালাস নেবার জন্য যে প্রশ্নপত্র বিলি করছে তাতে জেলার সব রকম খবরই চাইছে তারা। এমন কি তারা চায় এলাকাভিত্তিক পুঙ্খানুপুঙ্খ মানচিত্র। তাছাড়া

সরকার এই রিপোরট পেয়ে কিছু হই-চই করেছিলেন কিন্তু তারপর কী কারণে আর এগোননি। অথচ বামফ্রন্ট নেতারা মাঝে মাঝেই বলেন, ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের পিছনে মিশনারীদের মদত আছে। দারজিলিঙের জি এন এল এফ-এর আন্দোলনের পিছনেও বিদেশি তথাকথিত মিশনারিদের যোগাযোগের অভিযোগ উঠেছে। বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান সরোজ মুখোপাধ্যায়ও সম্প্রতি ওই কথা তোলেন। শোনা যাচ্ছে সুবাস ঘিসিং-এর অফিসের সঙ্গে জনৈক ফাদার যুক্ত। উল্লেখ্য, গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের অনেকেই মিশনারী স্কুলের ফসল। এসব অভিযোগ নিশ্চয়ই উড়িয়ে দেওয়া যায় না যখন আমরা দেখি সি আই এ প্রধান উইলিয়ম কোলবি বলেন, পাদ্রিদের মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যাওয়ার কৌশল তারা বাদ দিতে রাজি নয়!

উনিশ শ সাতাত্তরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লোকসভায় যে রিপোর্ট পেশ করেন তাতে দেখা যায় তুলনামূলকভাবে পশ্চিমবঙ্গের মতো ছোট

সেন্ট জন চার্চ এবং সংলগ্ন কবরস্থল
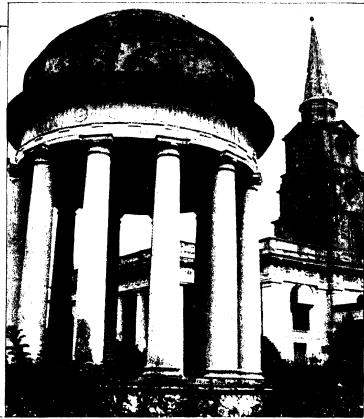
ছবি : তারাপদ বানার্জী

রাজ্যেই বিদেশী মিশনারির সংখ্যা বেশি হয়েছে। তাঁর রিপোরটে বিদেশী মিশনারি রাজস্থানে সাতাশ জন, পঞ্জাবে আটত্রিশ, জম্মু-কাশ্মীরে আটত্রিশ আর পশ্চিমবঙ্গে সাড়ে তিনশ'। এ রাজ্যে এখন মিশনারিদের স্কুল ছাড়াও সতেরটি অনাথ আশ্রম, চারটি বৃদ্ধ নিবাস, নয়টি হাসপাতাল সাতাশিটি ঔষধালয়, বারোটি বেবি ক্রেস এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য আছে আট'টি আশ্রমকেন্দ্র। এ ছাড়া আছে সারা ভারতে ছড়ানো মাদার টেরেসার মিশনারিজ অব চ্যারেটির প্রধান কেন্দ্র। এরা অনেক সেবামূলক কাজ করছে, অর্থও ব্যয় করছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সন্দেহটা এদের অন্য কাজের জন্য থেকেই যাচ্ছে। সারা ভারতে এখন এগারো হাজার ক্যাথলিক পাদ্রি রয়েছে। ভ্যাটিকানই এদের নিয়োগকর্তা, বদলি, পদোন্নতি বা পদ খারিজ সব তাদের হাতে। এক কথায় একটি বাইরের ধর্মীয় রাষ্ট্রের দ্বারা তারা নিয়ন্ত্রিত। ভ্যাটিকান রাজনীতি-মুক্ত নয়। বারে বারে তাদের জড়িয়ে পড়তে দেখা গিয়েছে রাজনীতিতে। ভারতে, স্বাধীনতার এত বছর পরেও ওই ভ্যাটিকাননিয়ন্ত্রিত বিদেশী পাদরিদের আমাদের অবহেলিতদের উদ্ধার, আত্মার মুক্তি ইত্যাদি কর্মে দিনপাত না করে দেশে ফিরে যেতে বলা কর্তব্য। এসব কথা বলছি যখন দেখি বিশ্ব চারচ পরিষদ ও আন্তর্জাতিক মিশনারি কাউনসিল যুগ্মভাবে ক্রিশ্চিয়ানিটি অ্যান্ড এশিয়ান রেভল্যুশন বইয়ে বলে : খ্রীষ্টধর্ম এশিয়াবাসীর স্বদেশের প্রতি বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।'

প্রসঙ্গত ডেট্রয়েট-এ স্বামী বিবেকানন্দর একটি বক্তৃতা মনে পড়ে। 'কী জন্যে তোমরা লোকেদের শিক্ষা দাও, জামা-কাপড় দাও, অর্থ দাও? আমাদের দেশে এসে আমার পূর্ব পুরুষদের ধর্ম এবং সব কিছুকে অভিশাপ-গালি দেবার জন্য'।

মনে রাখতে হবে মাদার টেরেসাকে তাঁর মিশনারিজ অব চ্যারিটিতে যোগ দিতে ভ্যাটিকানের সম্মতি নিতে হয়েছে। এবং এই প্রতিষ্ঠানও সাংবিধানিকভাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। তাই জনতা সরকারের আমলে যখন লোকসভায় ধর্মান্তরণ বিরোধী বিল আসে তখন যে মিশনারিরা তাকে বাধা দিতে দিল্লি যায়, মাদার টেরেসা ছিলেন তার পুরোভাগে। মাদার বলেছিলেন, মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবেন না। উত্তরে মোরারজি জানান—মিশনারিজ অব চ্যারিটি, আপনি যার সঙ্গে যুক্ত সেটি ও অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠান যখন স্বার্থ ছাড়া কাজ করে তখনই তাদের সেবা হতে পারে সর্বোত্তম। ধর্ম পরিবর্তন ও সেবা এক সঙ্গে চলতে পারে না। সেবার মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য না থাকলেই ধর্মের সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

কিন্তু মিশনারিদের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হচ্ছে না। আগেও হয়নি, আজও না। এই কারণেই বোধ হয় গান্ধীবাদী জে সি কুমারাপ্পা বলেছিলেন পশ্চিমী মিলিটারির চারটি শাখা—আরমি, নেভি, এয়ারফোরস ও চারচ।

ওদের স্যালভেশন আরমিও—এক ধরনের আরমি। মহাত্মা গান্ধী তাঁর 'হরিজন' পত্রিকায় (১২-৬-৩৭) বলেছিলেন আরমির ক্ষেত্রে (স্যালভেশন আরমি) যা, কম বেশি সব খ্রীষ্টান মিশনারির ক্ষেত্রেই তা সত্য। তাদের সমাজসেবা প্রকৃত সমাজসেবা নয়।

গান্ধীজী আরও বলেন, ক্ষমতা থাকলে আমি আইন করে ধর্মান্তরকরণ বন্ধ করে দিতাম।

মহাত্মাজী সে সুযোগ পাননি। বন্ধ হয়নি ধর্মান্তরণও। বিশেষ করে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় মিশনারি তৎপরতা বোধ হয় আগের চাইতে বেড়েছে। ইয়োরোপ আমেরিকায় ধর্মীয় সংগঠনের প্রতি আনুগত্যের মেজাজ হারিয়ে ফেলছে লোক। গির্জায় হাজিরা দিয়ে ছুটির দিনটার অপব্যয় করতে চায় না অনেকেই। বাইবেলের অনেক উপকথাকেই অনেকে মনে করছে আজগুবি। বারট্রান্ড রাসেলের মতো লোকের মুখে উচ্চারিত হয়—'পৃথিবীর নৈতিক উন্নয়নের প্রধান শত্রু চার্চগুলির দ্বারা সংগঠিত খ্রীষ্টধর্ম'। তাই মিশনারীদের প্রচার ক্ষেত্র এখন অনুন্নত কৃষ্ণ-অঞ্চল। পোপ দ্বিতীয় জন পলের গত বছরের ভারত ভ্রমণ তার অন্যতম কারণ বলে অনেকে মনে করেন। পশ্চিমবঙ্গেও তিনি ক'দিন কাটিয়ে গেলেন। এ রাজ্যের চার লক্ষাধিক খ্রীষ্টানের সঙ্গে ধর্ম নিরপেক্ষ উদার হিন্দুরাও তাঁকে স্বাগত জানিয়েছে। তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কালীঘাটের পুরোহিতও। এতে প্রমাণ হয় পশ্চিমবঙ্গের মানুষ খ্রীষ্টধর্মের বিরোধী নয়। খ্রীষ্টানদের সঙ্গেও নেই কোনো দ্বন্দ্ব। তাদের ধন্ধ কেবল ধর্মের আড়ালে বিদেশি মিশনারিদের ভূমিকা নিয়ে।

সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক হিসাবে এদের আবির্ভাব। আজকের বিচ্ছিন্নতাবাদের উসকানিদাতা হিসাবে এদের ভূমিকা রয়েছে বলে গোয়েন্দা দফতরের সন্দেহ। তাই মাঝখানে যতো মহৎ কাজ এদের দ্বারা হয়েছে বা এখনো হচ্ছে কিছু কিছু তাতেও কালিমা লাগতে পারে এক শ্রেণীর বিদেশী মিশনারির ক্রিয়াকলাপে। যা করার এখানকার খ্রীষ্টানরাই করুন। বাইরের অভিভাবকত্বটা আর বাঞ্ছিত নয় আমাদের কাছে, বোধ হয় স্থানীয় খ্রীষ্টানদের কাছেও। বিদেশী মিশনারিদের হাতের বাইবেল আর বিভ্রান্ত করতে পারে না অনেককেই। এদের সম্পর্কে আফ্রিকার নেতা জোমো কেনিয়াট্টার একটি অসাধারণ উক্তি আছে। —'ইয়োরোপীয়রা যখন এলো, তাদের হাতে ছিল বাইবেল আর আমাদের ছিল ভূমি। তারা বলল, এ হল পরমপিতার গ্রন্থ। আমাদের বলল— ধ্যান করো। ধ্যানের পরে আমরা যখন চোখ খুললাম, দেখি ভূমি গেছে তাদের হাতে, আমাদের হাতে বাইবেল'।

ব্যাপারটা ঠিক আমাদের দেশে ইয়োরোপীয় বণিকদের হাতের মানদণ্ড রাত পোহাতেই রাজদণ্ড হওয়ার মতো। এই দুই দণ্ডের মাঝখানে 'ক্রুশদণ্ড' যোগচিহ্নের মতো মাঝে মাঝে মনে হয়।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

খৃস্টান সম্প্রদায় ও জাতীয় সংহতি

তুষার সান্যাল

শীতের সোনালী রোদের সকালে আর ছুটির আমেজে 'মুমূর্ষু নগরী' কলকাতা দারুণ প্রাণ-চঞ্চল ও উচ্ছল হয়ে ওঠে বড়দিনের সাড়ায়। চৌরঙ্গী পাড়ার আলোর রোশনাই বা নিউ মার্কেটের মরসুমী ফুলের বাহার আর গীর্জার ঘনঘন ঘন্টা ধ্বনি। কেকের গন্ধ কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে আনে আনন্দের জোয়ার। শুধু পশ্চিমবঙ্গ কেন, সারা ভারতের আনাচে কানাচে জাতিধর্ম নির্বিশেষে ঐক্য ও সংহতির যে সহাবস্থানে অভ্যস্ত মানুষ—যারা খৃস্টান না হয়েও এই আনন্দ যজ্ঞের অংশীদার হয়।

এই আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে কোথায় যেন একটা বিষাদের কালো মেঘ উঁকি দিয়ে যায়। সমকালীন জীবনের কিছু কিছু ঘটনা জাতীয় জীবনের ঐকতানে কোথায় যেন ছন্দ পতন ঘটায়। সম্প্রতিকালের এমনই কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী ও দেশীয় ঐক্য বিনষ্টকারী ঘটনার আশঙ্কায়

ছবি : শিপ্রা দাস
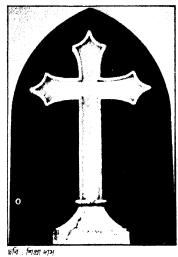
উদ্বেগের কারণ হয়েছে, যা আমাদের মনে টানাপোড়েনের সৃষ্টি করেছে। বিদেশী খৃস্টান ধর্মপ্রচারকদের একাংশ নাকি এই সব কর্মে নিজেদের সংযুক্ত করে তাঁদের ধর্ম ও সমাজসেবামূলক কাজের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে মসীলিপ্ত করছেন। জনমনে হচ্ছে অসন্তোষের সৃষ্টি।

অতি সম্প্রতিকালে এ সম্পর্কে যে অভিযোগ এসেছে সেটি এসেছে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান সরোজ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। খুবই আশ্চর্যের কথা ধর্মীয় নেতারা জড়িয়ে পড়ছেন রাজনৈতিক বিতর্কে।

শ্রীসরোজ মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন যে, দার্জিলিঙে 'গোর্খাল্যান্ড' আন্দোলনে এক শ্রেণীর বিদেশী ধর্মপ্রচারক বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিভিন্নভাবে মদত দিয়ে চলেছেন। তাঁর মতে, এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গের পক্ষেই বিপদের কারণ নয়, ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতার পক্ষেও এ এক বড়

গীর্জায় প্রথানুগ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যে ভাবগম্ভীর ছবি ফুটে ওঠে তাতে কালিমালেপনের উপক্রমণিকা রচনা হচ্ছে কোথাও কোথাও। ভারতে মিশনারীদের কিছু কিছু কার্যকলাপ হীন অপবাদের জন্ম দিচ্ছে। ছবি : তারাপদ ব্যানার্জি
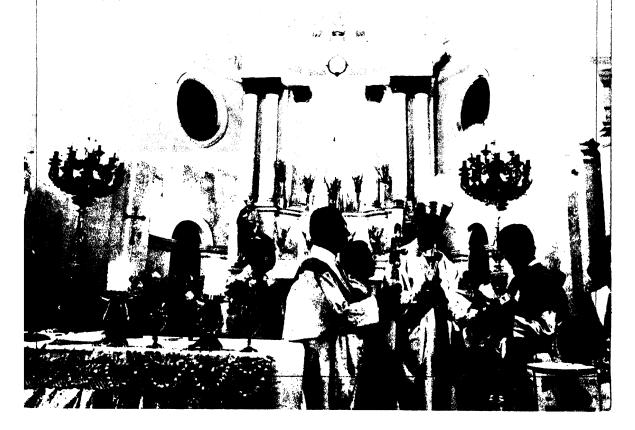
বিপদ। এর আগেও এমনতর অভিযোগের কথা শোনা গেছে। ১৯৮০ সালের ২০শে আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রাজ্যের মন্ত্রী শ্রীশম্ভু মন্ডি জানিয়েছেন যে, কয়েকটি বিদেশী ধর্মপ্রচারক ও সেবামূলক সংস্থাকে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম ও বর্ধমানের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় কাজকর্ম করা থেকে নিবৃত্ত হতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। যেসব সংস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, মাদার টেরেসার 'মিশনারিজ অফ চ্যারিটি', লিটল সিস্টার্স অফ দি পুওর, কেয়ার, অক্সফাম, সলভেশন আর্মি, অ্যাসেমব্লি অফ গড চার্চ প্রভৃতি সংস্থা। এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, এঁরা নাকি ঝাড়খন্ড আন্দোলনে ইন্ধন জুগিয়েছেন এবং আদিবাসীদের সরকারি বিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী করে তুলছেন।

ঐ সময় ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যেও উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার সম্মতি মেলে। পরবর্তী কালে, ১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে অবশ্য উপরোক্ত সংস্থাগুলির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় এবং আদিবাসী এলাকা ছাড়া অন্যান্য স্থানে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়।

ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারও অনুরূপ অভিযোগ করে বলেছেন যে, উগ্রপন্থী 'টি এন ভি'কেও বিদেশী ধর্মপ্রচারকরা বিভিন্নভাবে উৎসাহ জোগাচ্ছে। ত্রিপুরার অখন্ডতা, তথা সারা ভারতের ঐক্যের স্বার্থে এই সব শক্তিকে নিষিদ্ধ করার দাবী জানানো হয়েছে।

বিদেশী ধর্মপ্রচারকদের জাতীয়তাবিরোধী কাজের অন্যতর অভিযোগের আর একটি হল, বিহারের ছোট নাগপুরের আদিবাসীদের রাষ্ট্রবিরোধী কাজে উস্কানী দেওয়া। সরকারের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের প্ররোচিত ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী কাজের অভিযোগে বেলজিয়ান ধর্মপ্রচারক ফাদার উইলি এন দ্য কারকহোভকে ভারত ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের পক্ষ থেকে উপরোক্ত আদেশ প্রত্যাহারের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়। কিন্তু সম্প্রতি এক খবরে জানা গেছে যে, কারকহোভকে ফিরিয়ে আনার আদেশ দেবার কোনও পরিকল্পনা ভারত সরকারের নেই।

এমনই আর একটি অভিযোগ, উঠেছে, মধ্য প্রদেশের ছত্তিশগড় এলাকায় কর্মরত কয়েকজন বিদেশী ধর্মপ্রচারক সম্পর্কে। আদিবাসীদের অবৈধভাবে ধর্মান্তরিত করা ও রাষ্ট্রবিরোধী কাজের অভিযোগে ছয়জন বিদেশী ধর্মপ্রচারককে এদেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

এছাড়াও নাগাল্যান্ড, মিজোরামসহ ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে সব বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সক্রিয়ভাবে ভারতের ঐক্য ও অখন্ডতাকে নিয়ত বিঘ্নিত করছে, অভিযোগ উঠেছে এর পিছনেও এই সব বিদেশী খৃস্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা রয়েছে। ভারতকে খন্ডিত ও বিচ্ছিন্ন করার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের এঁরাও নাকি শরিক। এর জন্য নাকি ব্যয়িত হয় বিরাট অঙ্কের

সেন্ট জেমস চার্চ ছবি : সুবীর চ্যাটার্জী

বৈদেশিক মুদ্রা। এই অভিযোগের সমর্থন মেলে 'ক্যাথলিক ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া'র জনৈক প্রাক্তন সভাপতির মন্তব্যে। তিনি নাকি বলেছেন, এদেশের খৃস্টান চার্চ বিদেশ থেকে প্রভূত পরিমাণে অর্থ পেয়ে থাকে। বৈদেশিক সাহায্য মানেই বৈদেশিক প্রভাব বিস্তার ও হস্তক্ষেপ। তাঁর অভিমত এই যে, এ সম্পর্কে যদি দেশবাসীর কোনও আপত্তি ওঠে, সেটাকে তো কোনও মতেই অযৌক্তিক বলা যাবে না। অন্যায়কে তো অন্যায় বলতেই হবে।

বিদেশী ধর্মপ্রচারকদের রাষ্ট্রবিরোধী কাজের অভিযোগ সম্পর্কে কলকাতায় বসবাসকারী কয়েকজন বিশিষ্ট খৃস্টানের সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া হয়েছে। কলকাতার বিশপ হেনরী ডিসুজার অভিমত হল রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য সব সময়েই হয়ত একটা উপলক্ষ্য খোঁজেন। বিদেশী ধর্মপ্রচারকরা রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত আছেন বলে তাঁর জানা নেই। অনুরূপ অভিমত পাওয়া গেল জোড়া গির্জার (সেন্ট জেমস চার্চ) প্রধান ফাদার বি ম্যানুয়েলের কাছ থেকেও। তিনি জানালেন যে, যদিও ধর্ম প্রচার করা তাঁদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য, তবুও সমকালীন ঘটনা সম্পর্কে তাঁরা উদাসীন থাকেন না। তাই শিখ উগ্রপন্থী সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান, গোর্খাল্যান্ডকে কেন্দ্র করে দার্জিলিঙে হানাহানি বন্ধে কিংবা পরিবহণ

সেভেন্থ ডে অ্যাডভেন্টিস্ট মিশন ছবি : সুবীর চ্যাটার্জি
ধর্মঘটের সময় সাধারণের দুর্দশা সত্বর মোচনের জন্য তাঁরা গীর্জায় নির্দ্ধারিত উপাসনার অন্তে, বিশেষ উপাসনায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানান। মাদার টেরেসার সঙ্গে যোগাযোগে জানা গেছে, বিদেশী ধর্মপ্রচারকদের রাষ্ট্রবিরোধী কাজকর্মের কথা তাঁর জানা নেই। এমনতর ঘটনা ঘটলে, আইন মোতাবেক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হলে, তাতে আপত্তির কারণ থাকে না।

তবে এ সম্পর্কে 'অল ইন্ডিয়া খ্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি'র সভাপতি শ্রীঅরুণ বিশ্বাসের অভিমত হলো, বিদেশী ধর্মপ্রচারক ও সংস্থা সমূহের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আমরা আশা করব যে, ভারতে বসবাসকারী আনুমানিক যে ১৯৯০ জন বিদেশী ধর্মপ্রচারক রয়েছেন তাঁরা এদেশে যিশুর প্রেম, ভালবাসা ও মানবতার বাণী প্রচার করুন। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সহনশীলতা ও সহমর্মীতার পরিবেশ গড়ে তুলুন এবং দরিদ্র ও সহায়সম্বলহীন মানুষদের এমন সাহায্য করুন যাতে তাঁরা অসহায়তা ও নির্ভরশীলতার পরিবর্তে স্বনির্ভর হতে পারেন, আর্ত ও পীড়িত ও মানুষের সেবা করুন স্বচ্ছন্দে তবে তাঁরা এ বিষয়ে সব সময় সতর্ক থাকবেন যাতে ভারতের ঐক্য, সংহতি ও স্বাধীনতা তাঁদের কোনও কাজের দ্বারা যেন বিঘ্নিত না হয়।

অপর যে বিষয়টি সম্পর্কে অভিযোগ উঠছে, যেটি জাতীয় জীবনের স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত করছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, সেটি হল—একশ্রেণীর খৃস্টান ধর্মাবলম্বীর ধর্মান্তকরণ সম্পর্কে অতি উৎসাহ। এমন কি কোনও কোনও ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মান্তকরণের অভিযোগও উঠছে।

এই ধরনের ঘটনার অধিকাংশগুলিই হচ্ছে দরিদ্র ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে। অতীত দিনের কথায় আমরা জানি যে ১৮২৪ সালেই রামমোহন রায় বলেছেন যে, তৎকালীন খৃস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিতরা ছিলেন পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষ। ১৮২৯ সালের এক খবরে জানি যে, লন্ডন মিশনের পিয়ার্সনও স্বীকার করেছেন যে, ঐ পর্যায়ের ধর্মান্তরিতরা ছিলেন নিম্ন ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ যাঁদেরকে নাকি বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধার প্রলোভনে প্রলুব্ধ করা হয়েছে। নতুন ধর্মান্তরিতদের চাকুরি ও বাসস্থানের সংস্থানের সমস্যা ছিল ধর্মপ্রচারকদের অন্যতম বিবেচ্য। এদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে একটা সময়ে সমস্যাটা জটিল আকার ধারণ করে। কেরী ও ওয়ার্ডের বক্তব্যে আমরা এর সমর্থন পাই।

সম্প্রতিকালে এরই ভিন্নরূপ দেখি বলপূর্বক ধর্মান্তকরণের ঘটনা সমূহে। এমন একটি খবর হল, দিল্লীর সন্নিকটস্থ আনন্দ আশ্রম কুষ্ঠ সেবাকেন্দ্রের কিছু কুষ্ঠ রোগীকে (হিন্দু ও মুসলমান) বলপূর্বক খৃস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। এমনই আর একটি ঘটনার খবর জানা যায় মধ্যপ্রদেশের রায়গড় জেলায়। এই স্থানে ১৫৫ আদিবাসীকে নাকি বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। ফলে এর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগড় অঞ্চলের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় অবৈধভাবে ধর্মান্তরিত করার অভিযোগে পাঁচজন বিদেশী ধর্মপ্রচারককে ভারত ত্যাগের আদেশ দেওয়া হয়েছে ১৯৮৫ সালের অক্টোবর মাসে। ত্রিপুরায় ধর্মান্তকরণের যে খবর আমরা পাই তাতে জানতে পারি যে, সম্প্রতি সেখানে ১০২৩ জন উপজাতিসহ একজন বাঙালীকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। এটা খুব আশ্চর্যের যে, ত্রিপুরায় মার্ক্সবাদী সরকারের ক্ষমতাসীন থাকার কালেই ধর্মান্তকরণের ঘটনা ঘটছে। ত্রিপুরা সরকার অবশ্য এই ধর্মান্তকরণ ঘটনার পিছনে ওখানকার ব্যাপটিস্ট খৃস্টান ইউনিয়নের উদ্যোগ রয়েছে বলে অভিযোগও করেছেন। এই ধর্মান্তকরণ কাজের সঙ্গে সঙ্গে নাকি উপরোক্ত সংস্থা রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সমূহের সহযোগে রাজ্যে অস্থিরতা সৃষ্টিতে নিযুক্ত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ত্রিপুরার খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ১৯৫১ সালে যেটা ছিল ৫,২৬২ সেটা ১৯৭১ সালে হয়েছে ১৫,৭১৩ এবং ১৯৮১ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৪,২৯২ জন।

কিন্তু অর্থনৈতিক প্রলোভন ও অন্যান্য সুবিধা দেখিয়ে কোনও আনুগত্য চিরস্থায়ী করা যে যায় না, সেটা তো এদেশে খৃস্টান ধর্মের প্রসারের ইতিহাস থেকেই জানা যায়। তাই যেখানে যেখানে এই সুবিধা আর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, সেখানে হয়ত দেখা যাচ্ছে খৃস্ট ধর্মাবলম্বীরা আবার অন্য ধর্মে ফিরে যাচ্ছেন। এমন কয়েকটা ঘটনার একটি হল তামিলনাড়ুতে, যেখানে ৩২জন খৃস্টান নিজের ধর্ম ত্যাগ করে আবার হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছেন। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলায় নয়টি গ্রামের ২০৩টি পরিবার নাকি এমনভাবেই খৃস্টান ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার নয়াগ্রাম থানার আদিবাসী খৃস্টান পাদ্রি মকর টুডু আবার হিন্দু ধর্মে ফিরে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে ফিরে এসেছেন তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং আরও ২১ জন। এ ছাড়াও, অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে মুক্তি পাবার জন্য এক বিরাট সংখ্যক খৃস্টান ধর্মাবলম্বী নিজেদের নাম 'অনুন্নত শ্রেণী'র তালিকাভুক্ত করছেন।

ধর্মান্তকরণের যেসব ঘটনা ঘটছে সেগুলি কি এদেশের খৃস্টানদের মোট সংখ্যাকে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করছে!

এর উত্তর জানবার আগে এই অবসরে এদেশের খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। একটু পিছিয়ে গিয়ে আমরা দেখছি, ১৭৯৩ সাল থেকে ১৮০২ সাল পর্যন্ত খৃস্টানদের সংখ্যা হল ২৭ জন যেটা বেড়ে ১৮৩৩-৪২ সালের মধ্যে হয়েছে ১০৪৫এ। এবার বর্তমান সময়ে চলে আসি। ১৯৮১ সালের যে হিসাব আমরা পাচ্ছি তাতে দেখি বর্তমানে খৃস্টানদের সংখ্যা সারা ভারতে ১৬,১৬৫,৪৪৭ যেটা সারা ভারতে মোট জনসংখ্যার ২·৪৩ ভাগ। আর পশ্চিমবঙ্গে খৃস্টানের সংখ্যা হল চার লক্ষ। এঁদের বেশীর ভাগই ক্যাথলিক, সংখ্যায় দু লক্ষ ত্রিশ হাজার। বাকীরা প্রোটেস্টস্ট্যান্ট। আর মহানগরী কলকাতায় ছড়িয়ে আছেন ৭৬,৫৬৩ জন ক্যাথলিক। ১৯৮১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতের মোট জনসংখ্যা হল ৬৮৫,১৮৪,৬৯২। এর মধ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা হল মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮২·৬৪ ভাগ, মুসলমানদের সংখ্যা হল শতকরা ১১·৩৫, শিখদের শতকরা ১·৯৬, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা শতকরা ০·৭১ ভাগ এবং জৈনদের সংখ্যা হল শতকরা ০·৪৮ ভাগ।

এবার আমরা মূল আলোচনায় ফিরে আসি। ধর্মান্তকরণের প্রয়াসের সঙ্গে খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের মোট সংখ্যার প্রতি যদি দৃষ্টি দিই, তবে কোনও সন্তোষজনক উত্তর কিন্তু আমরা পাই না। খৃস্টান ধর্মপ্রচারকদের ব্যাপক ধর্মান্তকরণের কোনও প্রয়াসের ছবি জনগণনার রিপোর্ট থেকে ফুটে ওঠে না। ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে ভারতে মোট হিন্দু জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ২৪·১৫ শতাংশ। এই দশ বছরে মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ৩০·৫৯ শতাংশ আর সেখানে খৃস্টান জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার হল মাত্র ১৬·৭৭ শতাংশ। অপেক্ষাকৃত কম হারে খৃস্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দেশের মোট খৃস্টান অনুপাতে কমে গেছে। ১৯৭১ সালে এই অনুপাত যেখানে ছিল ২·৫৯ শতাংশ সেখানে ১৯৮১ সালে সেটা হয়েছে ২·৪৩ শতাংশ। এ ব্যাপারে সব রাজ্যের চেহারা অবশ্য একরকম নয়। এই দশ বছরে নাগাল্যান্ডে খৃস্টান জনসংখ্যা বেড়েছে ৮০ শতাংশের বেশী আর সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার যেখানে প্রথম খৃস্টধর্মের প্রচার করেছিলেন সেই গোয়াতে এদের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার হল ১৭ শতাংশের কম।

খ্রীষ্টান মিশনারীরা বহু অনুন্নত, অবহেলিত সমাজের মানুষকে প্রকৃতই উন্নতির পথে নিয়ে এসেছেন — ছবি : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

এ ছাড়াও অন্য যেসব রাজ্যে খৃস্টান জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি আমরা লক্ষ করি সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল আসাম শতকরা ৪ ভাগ।

কেরল	,,	২১·০৫ ,,
মণিপুর	,,	২৬·০৩ ,,
মেঘালয়	,,	৪৬·৯৮ ,,

নাগাল্যান্ড	,,	৬৬·৭৬ ,,
তামিলনাড়ু	,,	৫·৭৫ ,,
পশ্চিমবঙ্গ	,,	০·৫৭ ,,
আনন্দামান ও নিকোবর	,,	২৬·৩৫ ,,
অরুণাচল প্রদেশ	,,	০·৭৯ ,,
গোয়া, দমন, দিউ	,,	৩১·৭৭ ,,
পন্ডিচেরী	,,	৮·৭৬ ,,

সুতরাং ধর্মান্তরিত করার যে অভিযোগ উঠেছে, কয়েকটি ক্ষেত্রে সেগুলি ঘটনা হলেও, সামগ্রিকভাবে খৃষ্টান জনসংখ্যার উপর তার একটা খুব বেশী প্রভাব পড়েছে বলে মনে করার কারণ নেই।

এই বিষয়টি সম্পর্কে মতামত সংগ্রহের একটি পর্যায়ে কলকাতার আর্চবিশপ হেনরী ডিসুজার অভিমত জানা যায়। তাঁর বক্তব্যের মূল কথা হল এ দেশের খৃষ্টান সমাজ বর্তমানে বলপূর্বক ধর্মান্ত করণের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়। তবে খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকরা যে-হেতু সমাজের দুঃস্থ, দরিদ্র, অবহেলিত মানুষ, আদিবাসী এদের নিকট সান্নিধ্য থেকে তাঁদের সুখ-দুঃখের সাথী হন, তাই হয়ত কেউ কেউ আপন আগ্রহে স্বেচ্ছায় খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। মাদার টেরেসা বলপূর্বক ধর্মান্তকরণের প্রবল বিরোধী, তবে তাঁর মত হল যে কোনও ব্যক্তিরই স্বাধীনভাবে, স্বেচ্ছায় যে কোনও ধর্ম গ্রহণের অধিকার আছে।

কলকাতার 'বিশপ হাউসের' কর্মী উড়িষ্যার সুন্দরগড় জেলার আদিবাসী শ্রীআর খুজি, বাঙ্গালোরের এডউইন ফ্রান্সিস, মগরাহাটের অ্যান্টনি মণ্ডল কিংবা উত্তর প্রদেশের হিন্দু দারোয়ান, যাকেই জিজ্ঞাসা করা গিয়েছে, উত্তর মিলেছে যে, বলপূর্বক ধর্মান্তকরণের কোনও ঘটনার কথা তাঁরা শোনেননি। অনুরূপ অভিমত পাওয়া গেছে এস ডি এ মিশনের শ্রী ও শ্রীমতী গায়েনের কাছ থেকে এবং সেন্ট জেমস চার্চের ফাদার বি ম্যানুয়েলের কাছ থেকেও। তবে এঁদের প্রত্যেকের কথার মমার্থ হল যিশুর প্রেম ও ভালবাসা, মানবতা ও সেবার বাণী যদি কাউকে আকৃষ্ট করে থাকে, তবে তাতে তো আপত্তি হবার কথা নয়।

আর একটি নেতিবাচক ঘটনা যেটি জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে বলে অভিযোগ, সেটি হল কিছু নেতৃস্থানীয় খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকদের বেআইনিভাবে এদেশ থেকে খৃষ্টান সন্নাসীনির বেশে বিদেশে মেয়ে চালান করা। কেরলের কিছু গরীব, দুঃস্থ খৃষ্টান পরিবারের অল্প বয়সী মেয়েদের ইতালি, স্পেন, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশে বেআইনিভাবে চালান করে কিছু ধর্মপ্রচারক নাকি বিধিবহির্ভূতভাবে অর্থ উপার্জন করছেন। একটি বিদেশী চক্রের যোগ সাজসে এই সব দুঃস্থ অসহায় মেয়েদেরকে ঐ সব দেশে অতি নিম্ন পর্যায়ের কাজে নিযুক্ত করে হীন জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হয়েছে। এ থেকে মুক্তি পাবার জন্য ইতিমধ্যেই বেশ কিছু মেয়ে আবার দেশে ফিরে এসেছেন।

এই ধরনের ঘটনা খুব ব্যাপক না হলেও খৃষ্টান সমাজের উপর যে এ ঘটনা কলঙ্ক লেপন করে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখানে উল্লেখ্য যে, কেরলের চার্চ কর্তৃপক্ষ এই ধরনের ঘটনার নিন্দা করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আনুষ্ঠানিক পদ থেকে অপসারিত করে শাস্তি দিয়েছেন।

অপর যে বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি হল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চার্চের মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তনের ঢেউ, আর তার ফলে দেশে দেশে এর প্রভাবে নতুন চিন্তা ধারার উন্মেষ এবং কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের আভাস। অতীতের মতই চার্চ রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের আবর্তে পড়েছে। 'লিবারেশন থিওলজি'র প্রবক্তারা চার্চের বিরোধীতায় সোচ্চার।

আমাদের দেশেও খৃষ্টানদের মধ্যে, বিশেষ করে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে লিবারেশন থিওলজি'র ভারতীয় করণের পরিচয় পাই যখন দেখি যন্ত্রচালিত ট্রলারের বিরুদ্ধে কেরলের সংগ্রামী মৎস্যজীবির পাশে রয়েছেন সেখানকার চার্চ। তাই আমরা দেখি বিহার মধ্যপ্রদেশ কিংবা পশ্চিমবঙ্গের অনুন্নত শ্রেণীর মানুষ এবং আদিবাসীরা যখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, জমির মালিকের অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেন, তখন তাঁদের পাশে রয়েছেন চার্চ। শুধু মাত্র এই নয়। এমন কি চার্চের জমির মালিকানা বিষয় সম্পত্তি এবং তার ব্যবহারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাধারণ পুরোহিতদের মধ্যেও প্রশ্ন উঠছে। এ ছাড়াও চার্চের অভ্যন্তরেও পুরোহিতদের কৌমার্যের জীবন সম্পর্কে ভাত্তিকান থেকে যখন নির্দেশ আসে, বিক্ষোভ দেখা দেয় তাকে ঘিরেও।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খৃষ্টান সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ রাখতে তাই হয়ত পোপকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘন ঘন ঘুরতে হয়। পোপের ভারত আগমনের উদ্দেশ্যও ছিল হয়ত এই কারণের জন্যই। অতি সম্প্রতি তাঁর বাংলাদেশ ভ্রমণও এই জন্যই। এরই সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হয়ত প্রয়োজন হয় ক্যান্টাররেবীর আর্চবিশপেরও ভারত ভ্রমণের। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে ধর্মীয় গুরুদের যোগসূত্র সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করার প্রয়োজনও এই জন্যই।

এই পর্যন্ত আমরা এ দেশের খৃষ্টান সম্প্রদায়ের এক অংশের নেতিবাচক কাজ-কর্মের আলোচনা করেছি, এ ছাড়াও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদের দেশে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের যে পরিবর্তন ও টানাপোড়েন চলছে, তারও গতি প্রকৃতি অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি।

নেতিবাচক যে সব বিষয়গুলির উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যই যে, এগুলির সঙ্গে শুধু ধর্মীয় ব্যাপার নয়, রাজনৈতিক

সান্তাক্লজ : খ্রীষ্টান ঐতিহ্যের একটি উজ্জ্বল আকর্ষণীয় প্রতিমূর্তি ছবি : দেবীপ্রসাদ সিংহ

কার্যকারণের যোগ দেখা যায় যেটা সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশের স্বাধীনতা, ঐক্য ও অখণ্ডতার সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীরূপে যুক্ত। এই কারণেই এই সব অভিযোগ শুধু মাত্র খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের বিচলিত করে তাই নয়, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দেশপ্রেমী প্রতিটি ভারতবাসীকেই এই সব অভিযোগ চঞ্চল ও বিচলিত করে তুলেছে।

তবে আমাদের এটা সদাই মনে রাখতে হবে যে, প্রশ্নটা শুধু মাত্র বিদেশী ধর্ম-প্রচারকদের একাংশের নেতিবাচক কাজ কর্ম নিয়েই নয়, জাতীয় স্বার্থ বিপন্নকারী যে কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা সম্পর্কেই আমাদের সজাগ ও সতর্ক থাকার প্রয়োজন আছে। বিদেশী শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত দেশীয় পথভ্রষ্ট উগ্রপন্থী, সন্ত্রাসবাদী, গুপ্তচর চক্রও আমাদের জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার পক্ষে কম বিপদের কারণ বা কম বিঘ্নকারী নয়। সমগ্র ব্যাপারটা এই পরিপ্রেক্ষিতেই পর্যালোচনা ও বিচার করতে হবে। অন্ধ ভাবাবেগের কোনও স্থান নেই ওখানে।

আমাদের প্রত্যেককেই এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে, কোনও বিদেশী শক্তি কিংবা চক্রান্তই যেন ভারতের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও ঐক্যে কোনরূপ ফাটল ধরাতে না পারে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বহু ধর্ম, বহু ভাষাভাষি এই ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষের প্রতিটি ধর্মের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। খৃষ্টান ধর্মও এর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, জনসেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্মের মতই খৃষ্টান ধর্মেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

এ কথা হয়ত অস্বীকার করা যায় না যে, জাতীয় চেতনার উন্মেষের প্রথম থেকেই এ দেশের খৃষ্টানরা দু'ধরনের আনুগত্যের টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত ছিলেন। একটা মুখ ছিল বিদেশী শাসকদের দিকে ফেরানো। এই বিদেশী শাসকরা ছিল তাঁদের সমধর্মী। সদ্য ধর্মান্তরিত খৃষ্টানদের বোঝান হয়েছিল যে, এই সমধর্মী বিদেশী শাসকদের অনুগ্রহই তাঁদের যথার্থ মুক্তির সম্বল। খৃষ্টান আনুগত্যের দ্বিতীয় ধারাটি ছিল এ দেশেরই অভিমুখী।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে এ দেশে খৃষ্টান ধর্ম-প্রচারকদের আগমণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন মানব জাতিকে যেন যিশুর আলোকিত পথে নিয়ে যাওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা প্রথমে এ দেশের উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের দিকে মন দেন। তাঁদের সেই চেষ্টা বেশী দূর এগোয়নি। কেন না, এই সব উচ্চবর্ণের হিন্দুদের একটা অংশ ধর্মান্তরিত হওয়ার পর ধর্ম-প্রচারকদের আশা অনুযায়ী নিজের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যকে বিস্মৃত হলেন না! বরং আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ পেয়ে তাঁদের মনের দুয়ার খুলে যাওয়ায় তাঁরা সেই ঐতিহ্য সম্পর্কে নতুন করে আগ্রহী হলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে বিদেশগামী হয়েও শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরে আসেন, বাংলা ভাষায় বলতে গেলে মহাকাব্য রচনা করেন এবং বাংলা সাহিত্যকে এক

বিশপ হাউসে কলকাতার বিশপ ছবি : রাজীব বসু

দৃঢ় ভিত্তি ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করার সূচনা করেন। কিন্তু খৃষ্ট ধর্মের ভারতীয় করণের প্রাথমিক পর্বে যদি কারও নাম উল্লেখ করতে হয়, তবে সেটা লালবিহারী দে এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের। লালবিহারী দে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার পর শুধু যে ভারতের নিজস্ব চার্চের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাই নয়, নিম্ন জাতের হিন্দুদের উপর উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি ছিলেন মুখর, হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের সমর্থনে বক্তব্য রেখেছেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হয়েছেন সোচ্চার। ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় ওরফে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণের প্রথম পর্বে ছিলেন প্রোটেস্টান্ট, পরে রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বী হন। তিনি এক অভিমত পোষণ করেছেন যে, এ দেশে রোমান ক্যাথলিক মত হিন্দু ধর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিলে যাবে। ব্রহ্মবান্ধব সম্পাদিত 'সন্ধ্যা' পত্রিকা জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম মুখপত্র হিসাবে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছেন।

দেশদ্রোহের অভিযোগে ব্রহ্মবান্ধব গ্রেপ্তার হন। মামলা চলাকালীন তিনি ১৯০৭ সালের ২৭ শে অক্টোবর পরলোকগমন করেন। জাতীয় কংগ্রেস তথা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও এইভাবে আমরা দেখি খৃষ্টান সম্প্রদায়ের একটা

বলপূর্বক ধর্মান্তিরকরণের প্রবল বিরোধী মাদার টেরেসা ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছাতেই বিশ্বাস করেন ছবি : রাজীব বসু
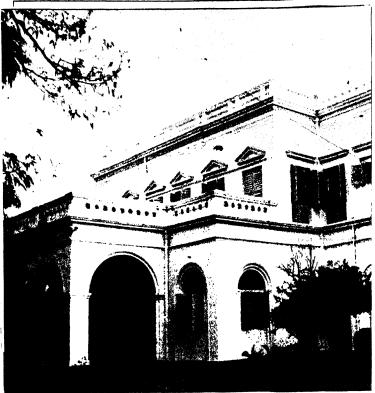
কলকাতায় আর্চবিশপের বাড়ী ছবি : তপন দাস

বড় অংশ নিজেদেরকে সংযুক্ত করেছেন এবং প্রভুত ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করেছেন।

অথচ আদিপর্বের খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকরা তাঁদের নিজেদের স্বার্থেই এ দেশে শিক্ষা প্রসারের বিভিন্ন কর্মসূচী ও জনহিতকর বিভিন্ন কাজ-কর্মের সূচনা করেন। শিক্ষা প্রসারের কর্ম সূচীর অংশ হিসেবে এ দেশে বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপন করে শুধুমাত্র খৃষ্টান মতাবলম্বী বালক বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন তাই নয়, অন্য ধর্মের মানুষের কাছেও এইভাবেই শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত হয়েছিলো। ক্রমান্বয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার সঙ্গে এ দেশের লোকের পরিচয় ঘটে, ফলে এক নতুন বাতাবরণ এক নব-জাগরণের সূচনা হয়। অতীতের ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই, বর্তমান সময়ের খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকরাও তাঁদের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিক্ষার মান শৃঙ্খলা প্রভৃতি বিষয়ে আদর্শ স্থানীয় পর্যায়ে রাখার চেষ্টা করেন। কলকাতার এমন কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সেন্ট জেভিয়ার্স, সেন্ট টমাস, লামার্টিনিয়ার, লরেটো, ডন বসকো প্রভৃতি।

এ ছাড়াও খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকরা বিভিন্ন জনহিতকর এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে দুঃস্থ, আর্ত, পীড়িতের সেবায় সেগুলিকে নিযুক্ত করেছেন। জনহিতকর এবং সেবামূলক কর্মকাণ্ডের আদিপর্বে আমরা দেখি উইলিয়াম কেরীর উদ্যোগে ১৮২০ সালের ১৪ ই সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'এগ্রিকালচারাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া'র, কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি হাসপাতাল, ১৮১৯ সালে শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সঞ্চয় ব্যাঙ্ক, কাগজ প্রস্তুত করার জন্য স্থাপিত হয়েছে বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালিত একটি কাগজের কল।

বর্তমান সময়ে জনহিতকর এবং সেবামূলক কাজের জন্য খৃষ্টান সম্প্রদায় কর্তৃক যে সব প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মিশনারিস অফ চ্যারিটি। এই প্রতিষ্ঠান সারা ভারতে প্রায় ৬০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে আর্ত ও পীড়িতের সেবায় নিযুক্ত। এ ছাড়াও অন্য দেশে রয়েছে আরও ২৮টি কেন্দ্র। কুষ্ঠ রোগীদের জন্য রয়েছে ৬৭টি কুষ্ঠ কেন্দ্র, গরীব ছেলে-মেয়েদের জন্য ৮১টি স্কুল, ২৮টি অনাথ আশ্রম। মুমূর্ষুদের জন্য রয়েছে ৩২টি চিকিৎসাকেন্দ্র আর আছে ২৮টি পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র।

আর যে সব জনহিতকর এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল লুথারান ওয়ার্ল্ড সার্ভিস, অ্যাসেমব্লি অফ গড চার্চ, সলভেশন আর্মি, সিরিয়ান অর্থডক্স চার্চ, মারথোমা চার্চ প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আদিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণীর মানুষকে সরকার বিরোধী কাজকর্মে উৎসাহিত ও বিচ্ছিন্নতাবাদে উস্কানী দেওয়ার অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সব প্রতিষ্ঠানের উপর ১৯৮০ সালে কতকগুলি বিধিনিষেধ আরোপ করেন। ১৯৮৪ সালে অবশ্য এই সব বিধিনিষেধ অনেকাংশেই শিথীল করা হয়েছে। আদিবাসী এলাকায় কাজ কর্ম করা থেকে এই সব প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবশ্য নিবৃত্ত করা হয়েছে। খরা ও বন্যাত্রাণে সাহায্য করার জন্য এই সব প্রতিষ্ঠানকে আবার আহ্বান জানানো হয়েছে।

খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকদের অপর এক উল্লেখযোগ্য কাজ হল ইংরেজি ও বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে। শ্রীরামপুরের ধর্ম-প্রচারকদের উদ্যোগেই বাংলায় প্রথম মাসিক পত্রিকা 'দিগদর্শন' প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে। জে সি মার্শম্যান ছিলেন এর সম্পাদক এবং এটি স্থায়ী হয়েছিল তিন বৎসর। সংবাদ সাপ্তাহিক প্রকাশনাতেও শ্রীরামপুরের ধর্ম-প্রচারক গণ অগ্রণী। এদের উদ্যোগেই ১৮১৮ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয় 'সমাচার দর্পণ' এবং এটি প্রতি শনিবার শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এর সম্পাদকও ছিলেন মার্শম্যান।

একালে খৃষ্ট ধর্ম-প্রচারকরা যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেন তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত 'হেরাল্ড' পত্রিকা এবং বাংলা ভাষায় প্রকাশিত 'নবায়ণ' প্রভৃতি। ধর্মীয় প্রচার পুস্তিকা প্রকাশের কাজ কর্মও রয়েছে।

এ ছাড়াও খৃষ্টান সম্প্রদায় হয়ত আরও বিভিন্ন ধরনের সমাজ সেবামূলক কাজ কর্মে নিযুক্ত আছেন। সেগুলির আলোচনা বর্তমান পর্যায়ে নিস্প্রয়োজন। এতক্ষণ খৃষ্টান সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে এঁদের ধর্ম-প্রচারকদের বিভিন্ন ইতিবাচক কাজ কর্মের সংক্ষিপ্ত এক পর্যালোচনা করা হল। এই আলোচনা থেকে এই সম্প্রদায়ের আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবস্থানের এক পরিচয় পাওয়া গেল।

সুতরাং আমরা এই কথাই বলতে চাই যে, খৃষ্টান ধর্ম প্রচারক তথা সমগ্র খৃষ্টান সম্প্রদায়, অন্য সব বিতর্কিত বিষয় বাদ দিলেও এ দেশের শিক্ষা, জনসেবা, সংবাদপত্র প্রকাশনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দীর্ঘদিন থেকে পালন করে জনগণের কাছে এক বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, অতীত ও বর্তমানের মত আগামী দিনেও তাঁরা সেটি অব্যাহত রাখবেন, আমরা এটাই আশা করব। যে কয়েকটি নেতিবাচক দিক সম্পর্কে অভিযোগ উঠেছে, ভবিষ্যতের প্রয়োজনে এখনই তার নিরসন প্রয়োজন। অন্যথায়, সামগ্রিকভাবে এই সম্প্রদায় সম্পর্কেই হয়ত বিরূপ ধারণা জনমনে গভীরভাবে প্রোথিত হবে যেটা কখনই কাম্য নয়।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বহু ধর্ম, বহু ভাষা, বিবিধ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সম্পন্ন ভারতের দীর্ঘ দিনের যে ঐতিহ্য তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব অন্য ধর্ম ও অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষেরও।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এবারকার 'বড়দিনে' আমাদের সমবেত অঙ্গীকার এই হোক যে, আমরা যে কোনও মূল্যে ভারতের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা, ঐক্য অটুট রাখবো আর ভারতকে রিক্ত, খণ্ডিত করার বিদেশী ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেবো। ■

শিক্ষার কোনও ধর্ম নেই, জাত নেই

ফাদার অ্যালবার্ট হুয়ার্ট—সৌম্যদর্শন, স্বাস্থ্যবান এক [illegible] যুবক । [illegible] প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ কলেজ সেন্ট জেভিয়ার্সের সর্বময় কর্তা—রেক্টর । আসন্ন শীতের [illegible] বিকেলে তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছিলাম বেশ কিছুক্ষণ ; সামনে প্রশস্ত সবুজ মাঠে ক্রিকেট খেলছে স্কুল-কলেজের ছাত্ররা । ফাদার মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনছেন, ভাবছেন, উত্তর দিচ্ছেন । মুখে লেগে রয়েছে [illegible] হাসি ।

ছবি : তপন দাস

দেশ : ফাদার, প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ। কলকাতা শুধু নয়, ভারতের এক নামকরা কলেজের ব্যস্ত সর্বাধ্যক্ষ হয়েও আমাকে কিছু সময় দিচ্ছেন—এ আমাদের পরম সৌভাগ্য।

ফাদার হুয়ার্ট : দেশ পত্রিকার সঙ্গে মিলিত হতে পেরে আমিও আনন্দিত। এই পত্রিকার সঙ্গে অনেক ফাদারেরই যোগাযোগ ছিল—ফাদার দাতিয়েন একসময় এই পত্রিকায় সিরিয়াল লিখেছিলেন। বাংলাদেশে এই পত্রিকার স্থান কোথায় তাও আমি জানি।

দেশ : ফাদার, ভারতে 'শিক্ষা'র শুরু প্রাচীনকালে ; মিশনারী শিক্ষার বয়সও কম হলো না। ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর মিশন থেকে আজ অবধি এই যে মিশনারী শিক্ষা চলছে ভারতে—এ সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য জানতে চাই।

ফাদার : দেখো, পৃথিবীর সব দেশে, সে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী দেশই হোক কিংবা অন্য কোন দেশই হোক, যেখানে যেখানে মিশনারী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঘটেছে, বিশেষত ভারতে এর প্রভাব গভীরভাবে পড়েছে। আমরা যাঁরা খ্রীষ্টান তাঁদের কাছে মিশনারী শিক্ষা হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগের একটি সুন্দর মাধ্যম। আমাদের স্বপ্ন ছিল যে শিক্ষার মাধ্যমেই আমরা ভারতীয় জনগণ, বিশেষত অনুন্নত লোকেদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গড়ে তুলবো। খ্রীষ্ট ধর্ম শুধু গ্রীক, রোমান অথবা ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকবে এ তো হতে পারে না—ভারতীয় সংস্কৃতি ও মানসিকতার সঙ্গেও এর যোগাযোগ থাকবে। সেদিক দিয়ে যে যোগাযোগ আমরা এতদিন ধরে মিশনারী শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে তুলতে পেরেছি তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

দেশ : কোন্ কোন্ মিশনারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভারতে এখন ভাল কাজ করছে বলে আপনার মনে হয় ?

ফাদার : 'অনেক, অনেক আছে। দেখো, কোন একটি বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম তো করা যায় না, ঠিকও নয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনেক ভালো ভালো মিশনারী কলেজ ছড়িয়ে আছে।

দেশ : ফাদার, আপনি একটি মিশনারী কলেজের প্রধান। এই কলেজটি আমাদের উপহার দিয়েছে ভারতের বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে, যথার্থ 'ভারতীয়'-কে। ক'জনের নাম করবো ? আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু থেকে শুরু করে এখনকার পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকেও। ভারতীয় কলেজ নয়, মিশনারী কলেজ হয়েও এই 'ভারতীয়'-দের সৃষ্টিতে আপনার কলেজের ভূমিকা কি যথার্থ গৌরবজনক নয় ?

ফাদার : হ্যাঁ, অবশ্যই। সেন্ট জেভিয়ার্সকে নিয়ে আমরা তো গর্বিতই। গর্বিত হবার মতো এর অবদান, তাই না ? বাংলার শিক্ষিত যুবসমাজ গঠনে এবং তোমার ভাষায় 'ভারতীয়' সৃষ্টিতে এই কলেজের ভূমিকা খুবই উল্লেখ্য। বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির কোন ক্ষেত্রে এই কলেজ নিজেদের জড়িত করেনি বলো ? তবে আমরা কৃতজ্ঞও, আমরা যা দিয়েছি, এই বাংলা থেকে পেয়েছিও তার কম নয়। এ সম্বন্ধে আমরা সচেতন। সকলের মিলিত অবদানেই গড়ে উঠেছে আজকের সেন্ট জেভিয়ার্স।

দেশ : ভাল বললাম, এবার একটু মন্দ বলি, ফাদার।

সেন্ট জেভিয়ার্সকে নিয়ে আমরা তো গর্বিতই। গর্বিত হবার মতো এর অবদান, তাই না ? বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির কোন ক্ষেত্রে এই কলেজ নিজেদের জড়িত করেনি বলো ? তবে আমরা কৃতজ্ঞও, আমরা যা দিয়েছি, এই বাংলা থেকে পেয়েছিও তার কম নয়। এ সম্বন্ধে আমরা সচেতন।

আমার এক বন্ধুর কাছে শুনছিলাম পূর্বভারতের কোন কোন রাজ্যে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য, ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরকরণের জন্য মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাজে লাগানো হচ্ছে। অভিযোগটা কি সত্যি ?

ফাদার : মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ধর্মান্তরকরণের কাজে লাগানো হচ্ছে ? আমার মনে হয় সম্পূর্ণ হাস্যকর অভিযোগ। বহুদিন আগে হলেও হতে পারে। কিন্তু এখন ? হলে খুব দুঃখজনক হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ধর্মান্তরকরণের কাজে লাগানোই বা হবে কেন ? শিক্ষাকে লাগানো হবে বন্ধুত্বের কাজে, ভাবের আদান-প্রদানের কাজে। ধর্মান্তরকরণের যন্ত্র হওয়া শিক্ষার কাজ নয়। শিক্ষার কোন ধর্ম নেই, জাত নেই।

দেশ : এবার একটু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে যাই, আমাকে যদি বলা হয় আফ্রিকায় গিয়ে পড়াও, আমি রাজী হবো না। ভারতটা আপনাদের কাছে, ইয়োরোপীয়ানদের কাছে তো আফ্রিকাই। তা ভারতে, এই প্রবাসে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন কেন ?

ফাদার : সে অনেকদিনের কথা। আমি বেলজিয়ামের লোক। বেলজিয়ামের মিশনারী কর্মীদের কর্মক্ষেত্র ছিল তিন জায়গায়—বেলজিয়ামে, আফ্রিকার জাইরের একাংশে এবং এই বাংলাদেশে। ১২৫ বছর বা তার বেশি সময় ধরেই বেলজিয়ামের মিশনারীরা এখানে আসছেন এবং তুমি জানো কি না জানি না, যত বিদেশী 'ফাদার' এখানে এসেছেন অধিকাংশই কিন্তু বেলজিয়ান। সুতরাং মিশনারী কর্মক্ষেত্রে নিজেকে জড়িত করে কলকাতা,বাংলায় আসতে চাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। এই কর্মক্ষেত্রে আমি নিজেকে যুক্ত করেছি খুবই অল্প বয়সে—মাত্র আঠারোতে। এবং এ ব্যাপারে যিনি আমার গুরু, সেই ফাদার জোহানসের (Johanns) কথা একটু বলি—ইনি একদা সেন্ট জেভিয়ার্সেও ছিলেন। ইনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ এবং অসাধারণ দার্শনিক—জার্মান এবং ভারতীয় দার্শনিকতায় ছিল এঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য-ধর্ম এবং সংস্কৃতিতে ছিলেন দারুণ উৎসাহী। এঁরই শিক্ষকতায় আমরা বেলজিয়ামে একটি ছোট্ট শিক্ষা-কেন্দ্রে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে পড়াশুনো করেছিলাম। ভারত সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত উৎসাহও ছিল খুব, সেই সময় ১৯৪৩ অথবা '৪৫ সালে ভারতে হচ্ছে স্বাধীনতার জন্য 'ন্যাশনাল মুভমেন্ট'। সব মিলিয়ে বেলজিয়ামে থাকা অথবা জাইরে যাওয়ার চেয়ে ভারতে আসাতেই আমি উৎসাহিত হয়েছিলাম বেশি।

দেশ : আপনি কি শিক্ষক হিসাবেই এখানে এলেন ?

ফাদার : আমি মূলত এসেছিলাম মিশনারী কর্মী হিসেবে, যদিও শিক্ষণ বিষয়ে আমার ধারণা ছিল। আমি এখানে আসার আগেই অক্সফোর্ডে ডিগ্রি নিয়েছি, পলিটিক্যাল সায়েন্স, সংস্কৃত, ইতিহাস এবং ভারতীয় দর্শনেও আমার ডিগ্রি ছিল এবং ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন সেখানে আমার শিক্ষক। তবে শিক্ষক হিসেবেই তো এখানে আসিনি—চার্চে যেতে পারতাম, সোসাল ওয়ার্কেও। এমনকি, এখনও যদি আমাকে বলা হয় চার্চে যাও অথবা গ্রামে—আমাকে যেতে হবে।

দেশ : এখানে এসেই কি সেন্ট জেভিয়ার্সের সঙ্গে যুক্ত হলেন ?

ফাদার : না, ১৯৫৩ সালে এখানে এলাম, এসে ছ'মাস ভালো করে বাংলা শিখলাম। তারপর গেলাম

কার্শিয়ং—সেখানে থিয়োলজিক্যাল কলেজে শিক্ষা নিলাম কয়েক বছর। তারপর যোগ দিলাম সেন্ট জেভিয়ার্সে ১৯৫৯ সালে এবং তখন থেকে এখানেই।

দেশ : ফাদার, যদি অনুমতি করেন তো আমার সুখস্মৃতিতে ধরা একটি ছোট্ট ঘটনার কথা এখানে বলতে চাই। বেশ কয়েক বছর আগেকার ঘটনা, আমার পরীক্ষার সিট পড়েছিল এই কলেজেরই দোতলায়। প্রশ্ন শক্ত লেগেছিল বলেই হয়তো, খুব জলতেষ্টা পেয়েছে। দেখি, যে জল দেয়, সে নেই। আমার রাগই হলো, মুখে হয়তো সেটা ফুটেও ছিল। সঙ্গে সঙ্গে একজন ফাদার এগিয়ে এলেন, বললেন, 'জল চাই', বলে নিজেই গ্লাশে করে জল এনে দিলেন। লজ্জায় আমার—। তখন মনে হয়েছিল শিক্ষাব্রতী হলে এরকমই হওয়া উচিত। নিরহঙ্কার, ছাত্রদরদী। ফাদার, এই সব শিক্ষকরা কি এখনও আছেন ?

ফাদার : (হেসে) হয়তো আমি-ই ছিলাম। আমি তো ১৭ বছর ধরে এই কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল ছিলাম। আমি হতে পারি না সেই ফাদার ? তবে শুধু ফাদারই হবে কেন, অনেক হিন্দু, মুসলিম টিচারও আছেন, যাঁরা সত্যিই ভাল, খুব ভাল।

দেশ : আপনি এতদিনের শিক্ষক। একজন শিক্ষকের দৃষ্টিতে নতুন 'মডেল স্কুল' শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে আপনার প্রতিক্রিয়া কি ?

ফাদার : এই শিক্ষাব্যবস্থার আইডিয়া খুব ভাল। আমারও মনে হয় ভারতে দুই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত—কিছু কিছু শিক্ষালয় থাকবে যেখানে ভাল শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে মেধাবী ছাত্রদের জন্য, অন্যগুলিতে শুধু নিরক্ষরতা দূর করার ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু বিপদ হচ্ছে এর ফলে দুটো সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হবে ; একদল ভাল চাকরি পাবে অন্য দল পাবে না। এ বিষয়ে আমাদের অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে। বৈষম্য যাতে না হয় তাও দেখতে হবে। ভাল ছেলে, মেধাবী ছেলে যাঁরা অর্থের জন্য দামী স্কুলে পড়তে পারে না তাদের জন্য ভাল শিক্ষার ব্যবস্থা করাও তো জরুরি। মোট কথা, এই শিক্ষাব্যবস্থা তখনই ভাল হবে যখন তা সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষাজগতকে উপকৃত করবে। আইডিয়া ভাল, রূপায়ণটা ভাল হওয়াই জরুরি।

দেশ : পশ্চিমবাংলার শিক্ষা পরিস্থিতি কেমন চলছে ?

ফাদার : কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্যই ভাল। যেমন—পরীক্ষাগ্রহণ করার ক্ষেত্রে। '৬০-এর শেষের দিকে অথবা '৭০-এর প্রথম দিকে ভালভাবে পরীক্ষাগ্রহণ একেবারেই অসম্ভব ছিল। কিন্তু এখন ছাত্ররা 'সভ্য' উপায়ে পরীক্ষা দিতে আগ্রহী। এটা অবশ্য উন্নতির লক্ষণ। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিস্থিতি খারাপও। যেমন—সর্বভারতীয় পরীক্ষায় আমরা পিছিয়ে পড়েছি, আই আই টি পরীক্ষা বা সরকারী সর্বোচ্চ পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রদের তালিকায় পশ্চিমবাংলার ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা খুব কম।

দেশ : একটা কথা ফাদার, পরীক্ষাগ্রহণ ভালোভাবে হলেই কি শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে বলা যায় ? উন্নত ধরনের পড়াশুনোর সুযোগ, গবেষণার সুযোগ এসব কি পাওয়া যাচ্ছে ?

ফাদার : আমারও মনে হয় না, গবেষণার মান খুব উন্নত হয়েছে, পড়াশুনোর বিস্তৃত সুযোগ তৈরী হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার ছাত্রদের মান ভালই

আমারও মনে হয় না, গবেষণার মান খুব উন্নত হয়েছে, পড়াশুনোর বিস্তৃত সুযোগ তৈরী হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার ছাত্রদের মান ভালই তবু উন্নতির কথা বলতে হলে খুব একটা হয়েছে বলা যাবে না

তবু উন্নতির কথা বলতে হলে খুব একটা হয়েছে বলা যাবে না। তোমাকে উদাহরণ দিয়ে বলি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোসিওলজি বিভাগের কথা, এটা এখানে পোস্ট-গ্রাজুয়েট লেবেলে কয়েক বছর মাত্র পড়ানো শুরু হয়েছে—অথচ এ ক্ষেত্রে বিশ্বে পড়াশুনো অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা সমস্যা, টেনশন—এই সব কারণে হয়তো সব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রসরতার পরিচয় দিতে পারেনি।

দেশ : ফাদার, কলকাতায় আমরা বড় বড় ঝকমকে স্কুল, কলেজ দেখি। অথচ গ্রামের অনেক স্কুলে ব্ল্যাকবোর্ড পর্যন্ত নেই।

ফাদার : হ্যাঁ, এটা দুঃখজনক সমস্যা। অনেক গ্রামেই এমনকি শহরের স্কুলেও এ সমস্যা আছে। আমি, আমরা এ-বিষয়ে সচেতন। আমাদের ছেলেরা চেষ্টা করছে, গ্রামে গিয়ে স্কুল তৈরিও করে দিচ্ছে। তুমি হয়তো ফাদার বেকারের নাম শুনেছো। ফাদারের নেতৃত্বে 'ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম'-এ ছেলেরা গ্রামে গিয়ে সোস্যাল ওয়ার্ক করছে এবং শুধু ব্ল্যাকবোর্ড নেই যে তা নয়, অনেক জায়গায় স্কুল আছে, ক্লাস হয় না। খাতায় হয় কিন্তু বাস্তবে হয় না।

দেশ : কেন হয় না ?

ফাদার : (হেসে) দ্যাটস্ এ প্রবলেম।

দেশ : আমাদের ছাত্র যুবকদের মধ্যে এখন সর্বনাশাভাবে ড্রাগসের নেশা বাড়ছে। ফাদার, এর থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি ?

ফাদার : এটা একটা গুরুতর বিষয়। এখন এটা বিরাট সমস্যা হয়েও দাঁড়িয়েছে। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি—এখানে ছাত্রদের মধ্যে এই সমস্যা ভারতের অন্য জায়গার তুলনায় অনেক কম। এর মোকাবিলায় আমরা চেষ্টা করছি, ছাত্ররা সেমিনার করছে, অডিও ভিস্যুয়াল শো করছে, এর কুফল সম্বন্ধে ছাত্রদের সজাগ করছে। আমি এখনও বিশ্বাস করি বাংলার ছেলেদের নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বিরাট। তারা চেষ্টা করলে এটা প্রতিরোধ করতে পারে।

তবে সমস্যা পুলিসের। যাঁরা ড্রাগে আসক্ত হয় তাঁরা খুব ভাল সেলসম্যানও। শুনেছি, একজন ড্রাগে আসক্তকে বলা হয় তুমি যদি চারজনকে বিক্রি করে দিতে পারো তোমারটা তাহলে ফ্রিতে পাবে। এটা বিরাট লোভের ব্যাপার। যে 'দ্রব্য' বিক্রি করলে এত ভাল 'কমিশন' মেলে সেখানে পুলিসের সমস্যা তো বিরাট হবেই।

তবু ছাত্ররা চেষ্টা করছে আসক্তদের ফিরিয়ে আনতে, এদের পাশে দাঁড়াতে। আমি নিজে দেখেছি—এরা যদি ফিরে আসে, তাহলে স্বাভাবিক জীবনযাপনই করে। তাই সবাই মিলে চেষ্টা করলে এর প্রতিরোধও হয়, মুক্তিও মেলে।

দেশ : ফাদার, আমাদের এখানে নিরক্ষরতা ভয়াবহ। কলেজের ছাত্রদের তো বলা যেতে পারে, বছরে ছুটিছাটায় তোমরা কয়েকজন নিরক্ষরকে স্বাক্ষর করবে ?

ফাদার : আমি আগেই বলেছি ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিমে ছেলেরা গ্রামে গিয়ে সোস্যাল ওয়ার্ক করছে, শিক্ষা দিচ্ছে শিশুদের, সন্ধ্যায় বয়স্কদের। তুমি যেটা বলছো, প্রস্তাবটা ভালো, কিন্তু আমরা কিছু 'কমপালসারি'

চালাক চতুর কন্যেরা সব পাবেই পাবে প্লাস
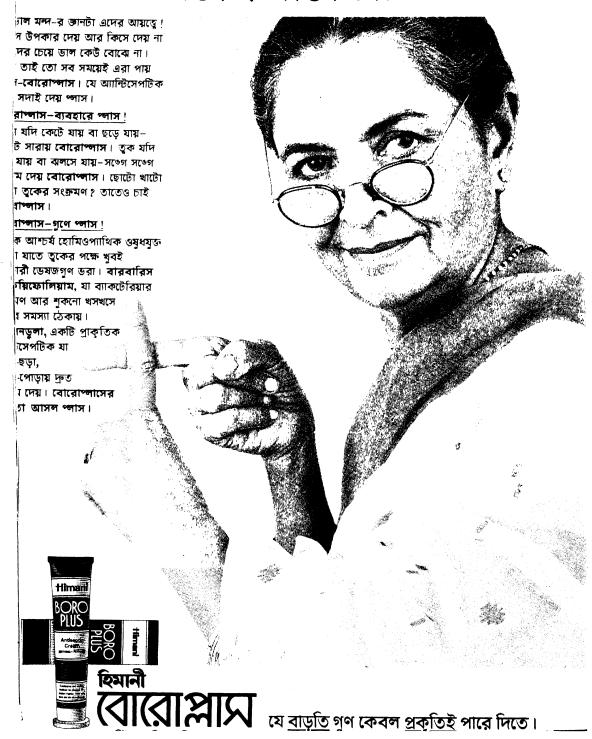
করতে পারি না। সামাজিক কাজে জোর করে কিছু করানো যায় না, করলেই সেটা খারাপ হয়। যেমন, এন, সি, সি-র বেলায় হয়েছিল, জোর করাতে, আমার মতে 'মুভমেন্টটাই ডেসট্রয়েড' হয়েছিল। স্বতঃস্ফূর্তভাবে যারা আসে তারাই কাজ করে। কিছু ছেলে সেভাবেই কাজ করছে। সুতরাং নিরক্ষরতা দূর করতে আমরাও কম চেষ্টা করছি না।

দেশ : ফাদার, আপনার প্রিয় বই কি ?

ফাদার : (হাসতে হাসতে) অবশ্যই বাইবেল।

দেশ : না, না, আমি একটা ক্লাসিক লিটারেচারের কথা জানতে চাইছি।

ফাদার : তাহলে বলতেই হয় টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পিস'-এর কথা। এ গ্রেট বুক। আমার খুব প্রিয়।

দেশ : আপনি কি বাংলা পত্র-পত্রিকা দেখেন ?

ফাদার : আমি মাঝে মাঝে দেশ পত্রিকা পড়ি, আনন্দবাজারও। তবে চেষ্টা করছি প্রত্যেকদিন কিছু কিছু বাংলা পড়ার।

দেশ : রবীন্দ্রনাথ পড়েননি ?

ফাদার : অনেক পড়েছি। বেলজিয়ামে থাকাকালীনই ফ্রেঞ্চ ভাষায় পড়েছি গীতাঞ্জলির অনুবাদ। একজন বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ সাহিত্যিকের অনুবাদে। এখানে এসে পড়েছি বাংলায়। রবীন্দ্রনাথ পড়বো না এ হতে পারে ?

দেশ : ফাদার, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের শিক্ষক সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এই স্কুলের পক্ষে—

ফাদার : অবশ্যই। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের পক্ষে বিরাট গৌরবের কথা। (হাসতে হাসতে) তবে সমালোচনাও করেছিলেন, তুমি সবটাই প্রশংসা বলো না। হ্যাঁ, একজন ফাদারের তিনি খুব প্রশংসা করেছিলেন—

দেশ : স্পেনীয় ফাদার ডি' পেনেরান্ডার—

ফাদার : ইয়েস, তিনি একদিন ক্লাসে এসে বলেছিলেন, 'টাগোর, তোমার কি শরীর ভালো নাই ?' এই স্নেহবোধ রবীন্দ্রনাথকে খুবই অভিভূত করেছিল।

দেশ : ফাদার, একটা কথা ভাবলে অবাক হই, খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বে এত প্রচলিত, এই ধর্ম করুণার ধর্ম, প্রেমের ধর্ম, কিন্তু ইওরোপেই হয়েছে দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ। এখনও হানাহানি কম নয়। এটা কেন হচ্ছে ? প্রেমের ধর্ম কি তবে তলোয়ারের ধর্ম, সোর্ডের ধর্ম হয়ে গেছে ?

ফাদার : আমি মনে করি খ্রীষ্টধর্ম প্রেমের ধর্ম, কিন্তু এই ধর্মকে অন্যায় কাজে লাগিয়ে আমরাই পাপী হচ্ছি। ধর্ম তো আর যুদ্ধ করতে, হিংসা করতে, রক্তক্ষয় করতে শেখায় না। এটা খুবই অন্যায়, অন্যায়···। এর বেশি আর কি বলবো ?

দেশ : ফাদার, আপনি ধর্মে খ্রীশ্চিয়ান, কিন্তু মর্মে শিক্ষাব্রতী। তার চেয়েও বড় কথা, আপনি একজন মানবতাবাদী। এই যে ধর্মে ধর্মে ভেদাভেদ আজ শিক্ষাজগতকেও কলুষিত করছে, এ সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয় ?

ফাদার : খুবই দুঃখের কথা। তবে সুখের কথা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে এটা প্রবেশ করেনি। এখানে হিন্দু স্কলার, মুসলিম স্কলার, পণ্ডিত ফাদাররা যেমন ফাদার ফাঁলো, আঁতোয়ান—এঁরা সবাই সমবেত হয়ে নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় করেছেন, একে অন্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেন্ট জেভিয়ার্স চিরকালই ধর্ম নয়, স্কলারদের মিলনস্থল হিসেবেই কাজ করেছে এবং করবে। এই যে সংস্কৃত পণ্ডিত, আরবীক পণ্ডিত এঁদের মধ্যে ক্রমাগত যোগাযোগ, 'ডায়ালগ', স্বীকৃতি এসবই পারে ধর্মের হাত থেকে শিক্ষাকে বাঁচাতে।

কলকাতাই তো আমার সব—এই শহরে আমার শিকড় গাঁথা। আমার বন্ধুবান্ধব, ছাত্রছাত্রী, সহকর্মী—সবই তো এখানে। যাবো কোথায় ? বাংলার সংস্কৃতি, কলকাতার সংস্কৃতি সব কিছুর সঙ্গেই আমার মনের মিল।

দেশ : আপনার ব্যাপক এবং বিস্তৃত শিক্ষা-জীবন। আগেকার ছাত্রদের সঙ্গে এখনকার ছাত্রদের কোন মৌলিক তফাৎ দেখছেন কি ?

ফাদার : খুবই বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখছি—মানসিকতায়। আগেকার ছেলেদের তুলনায় এখনকার ছেলেরা 'সোসালি লেস কমিটেড', 'মোর কেরিয়ার মাইণ্ডেড'। ধর দু-দশক আগেকার ছেলেরাও—

দেশ : ফাদার, আমরা বাদ ?

ফাদার : (হাসতে হাসতে) না, আরলি সেভেন্টিস-এর ছেলেরাও অনেক সমাজ সচেতন ছিল, আমি বলবো।

দেশ : আপনার কলেজে কো-এডুকেশনও তো চালু হয়েছে—

ফাদার : কো-এড চালু হওয়ায় ভালই হয়েছে। শিক্ষার মান, বিশেষত আর্টস বিভাগে এখন অনেক বেটার। ভাল ভাল মেয়েরা আসছে—ওরা খুব সেনসিবল, কো-অপারেটিভ। (হেসে) আর একটা জিনিসও হয়েছে মেয়েরা আসার পরে। প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই নতুন ছেলে-মেয়েরা এলে 'ওয়েলকাম ফাংসান' চালু হয়েছে। এটা ভাল নয় বলতে চাও ?

দেশ : ফাদার, শুনেছি আপনার ছাত্রদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ খুব ভাল।

ফাদার : হ্যাঁ, ভাল তো বটেই—ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক তো ভাল হওয়াই উচিত। ভাইস-প্রিন্সিপাল থাকাকালীন আমাকে ছাত্রদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখতে হতো। এখনও আমি রাখি। তুমি দেখছো ছাত্ররা আমার কাছে সরাসরি আসছে—কোনও বাধা নেই। এই ছাত্ররাই তো সব। কত পুরনো ছাত্র আজ নাম করেছে, বিশিষ্ট হয়েছে—আমার আনন্দিত ও খুশি হওয়ারই কথা তো !

দেশ : ফাদার, শিক্ষার 'মিশন' নিয়ে অনেকদিন এখানে কাটালেন। কোনদিন কি ইচ্ছে হয় না এসব ছেড়েছুড়ে দেশে ফিরে যেতে ?

ফাদার : না, কখনোই নয়। প্রথম যখন মিশনারী কাজ নিয়ে এদেশে আসি, সেই ১৯৫৩ সালে তখন থেকে ১৯৭০ সাল অবধি আমি বেলজিয়ামে যাই নি। পরে ১৯৭০, ১৯৭৭ এবং ১৯৮৪ সালে—এই তিনবার বেলজিয়াম যাই—তবে সবই কিন্তু বেড়াতে, ছুটি কাটাতে। বেশিদিন থাকলে হাঁফিয়ে উঠি, কলকাতার জন্য মন কেমন করে। কলকাতাই তো আমার সব—এই শহরে আমার শিকড় গাঁথা। আমার বন্ধুবান্ধব, ছাত্রছাত্রী, সহকর্মী—সবই তো এখানে। যাবো কোথায় ? বাংলার সংস্কৃতি, কলকাতার সংস্কৃতি সব কিছুর সঙ্গেই আমার মনের মিল। এই প্রাণের যোগ, ভালবাসা কোথায় পাবো ?

দেশ : ছাত্রদের উদ্দেশে কিছু বলবেন—

ফাদার : তারা ভালো হোক, ভারতের নানা সামাজিক সমস্যায় নিজেদের নিয়োজিত করুক—শিক্ষাকে কাজে লাগাক এটাই চাইব।

দেশ : ফাদার, এই সাক্ষাৎকার নিয়ে—অনেকক্ষণ একজন প্রাজ্ঞ শিক্ষকের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়ে আমি খুব খুশি। আবার ধন্যবাদ।

ফাদার : ধন্যবাদ, দেশকে, তোমাকেও।

তানাজী সেনগুপ্ত

ছবি : তপন দাস

"প্যা রাডক্স" শব্দের বাংলো আমার ঠিক জানা নেই। খ্রীষ্টধর্মে কিন্তু প্যারাডকসের শেষ নেই। খ্রীষ্টের জন্ম-বৃত্তান্তে এই আশ্চর্য বৈপরীত্যের আকর। ইংরেজি গীতগ্রন্থের ২৯ সংখ্যক গীতে বৈপরীত্যের পাশাপাশি সমাবেশ ঘটিয়েছেন জনৈক কবি। আমি সাদামাটা বাংলায় একটা তর্জমা দিলাম :

স্বর্গের মহান ঈশ্বর
নেমে এলেন এই ধূলার ধরণীতে।
মা তাঁর কুমারী
নিষ্পাপ তাঁর জন্ম।

শাশ্বত সনাতন পিতা
একা শুধু তাঁরই জনক।
সিংহাসনে আরোহী শাসক
জাবনার গামলায় নিশ্চিত নিদ্রিত।

জনৈকা কুমারীর বক্ষে শিশুরূপে তাঁর শয্যা পাতা
অথচ বিরাজমান মহাকাশে পিতার পার্শ্বে।

তাঁর সম্মুখে দেবদূত ভয়ে অধোবদন
অথচ জোসেফ অভয়ে দণ্ডায়মান তাঁর পাশে।

বিস্ময়কর মন্ত্রণাদাতা, অসীম ক্ষমতাধর,
পিতার নিজস্ব প্রতিমূর্তি, তাঁর আলোকের বিভূতি-ছটা,
এখন দুর্বল, অসহায়, মাপে এই এতটুকু।
পরমাশ্চর্য! এসবের সূত্র অনির্দেশ
সময়ের চেয়ে প্রাচীন হলেও, এখন বয়সে দু একদিন।

সকলের স্রষ্টা তিনি
অথচ মৃন্ময় তাঁর শরীর।

মানব এখন পেল দেবদূতের প্রণাম,
ঈশ্বর মানুষরূপে করলেন জন্মগ্রহণ।

ঈশ্বরে প্রলীন আনন্দস্বরূপ বাক
তীব্রতম যন্ত্রণাভোগের জন্য মানবরূপধারী।

যিনি আছেন, তিনি ছিলেন
এবং থাকবেন শাশ্বতকাল,
কিন্তু যা তিনি ছিলেন না,
তা হলেন
তোমার এবং আমার জন্য।

বড়দিনে খ্রীষ্টবিশ্বাসী এই আপাত বিপরীত-ধর্মী রহস্যের ধ্যান করেন। সমস্ত কিছু কেমন অসম্ভব অবিশ্বাস্য মনে হয়। সাধারণভাবে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা যাক। ঈশ্বর যে স্বর্গে থাকেন! এই মর্ত্য ধূলায় কিভাবে নেমে আসবেন তিনি? তখন কি স্বর্গ শূন্য পড়ে থাকে? অবশ্যই না। তিনি স্বর্গে থাকেন অথচ পৃথিবীতে নেমে আসেন? আবার অসীম যিনি, তিনি কেমন করে অসহায় শিশুর সসীম রূপ গ্রহণ করেন? অনেকে নিশ্চয় বলবেন, ঈশ্বর সবকিছুতেই আছেন, সুতরাং নবজাতক শিশুমাত্রের মধ্যেও তিনি থাকবেন, সে

খ্রীষ্টধর্ম বলে ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। প্রেমই তাঁর স্বভাব। প্রেম একটি ভাব বা অবস্থান নয়। প্রেম সক্রিয়। বহমান। তিনি প্রেম স্বরূপ। এ কথার অর্থ দাঁড়ায় তিনি ভালবাসেন।

আর বিচিত্র কি? কিন্তু একজন খ্রীষ্টান, খ্রীষ্টের মানবরূপ গ্রহণকে আদৌ এভাবে দেখেন না। ঈশ্বর সব কিছুর মধ্যে আছেন, কিন্তু সব কিছুর যোগফল ঈশ্বর নন। খ্রীষ্টানদের কাছে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চেয়ে ঈশ্বর বড়। তাঁর সৃজনীশক্তি এসবের মধ্যে বিরাজ করলেও, তিনি নিজে এসবের অতীত, তুরীয়, অচিন্ত্য বৃহৎ। এই তুরীয় ঈশ্বরই বেথলেহেমে শিশুর রূপ ধারণ করলেন। ঈশ্বরের অধিবিদ্যক রূপ সত্যি কেমন কেউ তো আর জানে না। লক্ষণ দেখে মানুষ অনুমান করে শুধু। মানুষ কি, জীবনের অর্থই বা কি, আত্মা এবং দেহের সম্পর্ক কি এসব বিষয়গুলি সম্বন্ধে মানুষ ধারণা তৈরী করতে পারে শুধু।

খ্রীষ্টধর্ম বলে, ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। প্রেমই তাঁর স্বভাব। প্রেম একটি ভাব বা অবস্থান নয়। প্রেম সক্রিয়। বহমান। তিনি প্রেমস্বরূপ, এ কথার তাহলে অর্থ দাঁড়ায় তিনি ভালবাসেন। তখন প্রশ্ন ওঠে, কাকে? সুতরাং কালচিহ্নিত এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হবার পূর্বে যে মহাকাল, শাশ্বত অনাদি অনন্ত সময়, তখন থেকেই তিনি ভালবাসেন। তখন কে তাঁর ভালবাসার পাত্র ছিলেন? খ্রীষ্টানদের মতে, তাঁর ব্যক্তিত্বের সংহত ঐক্যের মধ্যে যেন বা পার্থক্যের ইঙ্গিত মেলে। ঈশ্বরের মধ্যেই প্রেমের উৎসধারা রয়েছে। এই

ঈশ্বরের উজ্জ্বল প্রতিভাস — *ছবি : শিপ্রা দাস*

প্রেম পিতার ভালবাসার মতো। এই প্রেমের ইচ্ছারূপে স্বপ্রকাশ ঘটে। শাসন এবং নির্দেশের মধ্যে এই প্রেমের অভিব্যক্তি ঘটে। আদর্শ পুত্রের মতো এই প্রেম গ্রহণ করার মতো এক আধার রয়েছে ঈশ্বরের নিভৃত সত্তার মধ্যেই। সক্রিয় প্রেমের আদানের প্রতিক্রিয়ায় প্রেম প্রদান করার পাত্র এক যেন বা রয়েছে তাঁরই ভেতরে। এই আদর্শ পুত্র, পিতার ইচ্ছা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, কার্যকরীভাবে, রূপায়িত করেন, ক্রীতদাসের মতো নয়, কিন্তু স্বেচ্ছায়। কারণ তাঁর ইচ্ছা এবং পিতার ইচ্ছার মধ্যে কোনও ভেদ নেই। সুতরাং প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের সত্তার মধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রেমের দান প্রতিদান, নির্দেশ এবং বাধ্যতা, যা চিন্তায় বিভাজ্য, কিন্তু সত্তায় অভিন্ন, অচিন্ত্য ভেদ এবং অভেদ। মনের চিন্তা দেহের সাহায্যে বাস্তবে মানুষ যেমন রূপ দেয়, এও যেন খানিকটা তেমনই। দেহ ও মনের ভেদ কল্পনা করা গেলেও, আসলে তো একসঙ্গে গাঁথা। যেন এ সি কারেন্টের মতো বিদ্যুতের যাওয়া আসা, যা থেকে আমরা শক্তি এবং আলো পাই। ঈশ্বরের মধ্যেও প্রেমের চলাচল হয় এবং প্রেমই তাঁর স্বরূপ। তাই খ্রীষ্টকে বলা হয়, ঈশ্বরের বাক (লগোস)। তাঁর কণ্ঠস্বর যেন তিনি। ঈশ্বরের প্রেমের অভিব্যক্তি। এই শব্দ-ঈশ্বর পৃথিবীতে তাঁর কাজের প্রতিমূর্তি হিসাবে এলেন এই মর্ত্য-ধূলায়। বেথলেহেমের গোয়ালঘরে ঈশ্বরের বাক মানবরূপ গ্রহণ করলেন মেরির কোলে।

ভক্ত খ্রীষ্টানের কাছে, ঈশ্বর, প্রেমই যাঁর স্বরূপ, এই দুধের শিশুর মধ্যে সমুদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন। মহাকাশের সিংহাসনের গৌরব আঁকড়ে না ধরে থেকে, সেই প্রেমই, নেমে আসেন মাটির ধূলায়। ভূমিষ্ঠ হন। মানুষের জীবনের অংশীদার হতে অবতরণ করেন। সেই সঙ্গে মানুষকে নিজের দৈবী সত্তার এবং জীবনের শরিক হবার সুযোগ অবারিত করে দেন। যখন তাঁর আগমন ঘটে তখন বেজে ওঠে না তূর্য। শোনা যায় না ঢক্কানিনাদ। কোথাও কোন সাড়ম্বর অনুষ্ঠান হয় না। অগ্রদূত সম্মুখে এগিয়ে এসে, সামনেওয়ালাকে তফাৎ যেতে বলে না। দুজন সাধারণ পুরুষ নারী, আদমসুমারির সময় নিজের শহরে, সরাইখানায় চটিতে, জায়গা পাচ্ছেন না। শেষে গুহামুখ আস্তাবলে এক সরাইখানার মালিকের দয়ায় আশ্রয় পেলেন তাঁরা। সেই আস্তাবলে জন্ম নিলেন যীশু। এরচেয়ে অনাড়ম্বর আর কি হতে পারে? এই ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের স্বভাবের একটি দিক উদ্ঘাটিত হয়। তিনি আমাদের স্তরে নেমে আসেন। তাঁকে ঘিরে রচিত হয় না রাজকুমারের উপযুক্ত অধিকার বা সুরক্ষার কোনও প্রাচীর। তিনি আমাদের দুঃখ কষ্টের ভাগ নেন। ব্যক্তিগত কোনও দেহরক্ষী দল তাঁকে প্রহরা দেয় না। তিনি আমাদের মতো জীবনযাপন করার জন্য সমস্তরকম ঝুঁকি নেন, যেন বা সারিতে দাঁড়িয়ে নিজের পালার জন্য অপেক্ষা করেন। শেষে উদ্বাস্তুর মতো জায়গা না পেয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই তাঁর জোটে আস্তাবলে। এসব ঘটনা ঘটে, কারণ তিনি তো পেতে আসেননি, দিতে এসেছেন। মানুষের সেবা পাবার

জন্য নয়, সেবা করার জন্য তাঁর আগমন। তিনি যখন আসেন তখন গুপ্ত জহরতের মতো অপ্রকাশ্যে থাকেন। তাঁকে তখন খুঁজে বার করে নিতে হয়। অথচ তিনি দৃশ্যমান তখনও, কিন্তু এমনই নীরব অবহেলার মধ্যে এমনভাবে অজ্ঞাতবাস করেন বলে, কি খুঁজছেন সেটা জানা না-থাকলে, জহুরীও সেই জহরৎ কস্মিনকালে খুঁজে পাবেন না।

এখন যদি এসব জেনে শুনে সেই শিশুটিকে দেখি, উপলব্ধি করি ঈশ্বরের জ্যোতি তাঁর মধ্যে উদ্ভাসিত, তাহলে আমরা কি লক্ষ্য করব? দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত এই সংসারে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করতে হলে কি লক্ষণ দেখে মেলাব? বেথলেহেমে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের বিশেষত্ব কি? তাহলে কি বলব না যে তা সনির্বন্ধ দীনতা? অন্যের দৃষ্টি জোর করে আদায় না করার জন্য বিনয়ের বাতাবরণ? দ্বিতীয়ত, দীনহীন রূপে তিনি আমাদের একজন হয়ে তাঁর দিব্য স্বভাব আমাদের সঙ্গে ভাগ করতে চাইলেন। বিনয়ের এই পরাকাষ্ঠা আমরা আর কোথায় দেখেছি? বিনয়ই এখানে জাজ্বল্যমান। তাই সেবা পাবার চেয়ে সেবা করার জন্যে, প্রাপ্তির চেয়ে দানের জন্য, নিজের চেয়ে অন্যের স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপত্তার জন্য, ব্যগ্র আগ্রহের প্রকাশ ঘটে। এই সব লক্ষণ দেখলে, বুঝতে হবে, ঈশ্বরের স্বরূপ সেখানে উদ্ঘাটিত। এইভাবে খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের উজ্জ্বল প্রতিভাস, এমন কি বেথলেহেমের শিশুটির মধ্যেও লক্ষণীয়। যদিচ দুধের শিশু, নির্বাক এবং নিশ্চল, তথাপি তাঁরই মধ্যে নররূপে বিদ্যমান সর্বমহান অস্তিত্ব সেই শক্তি যিনি বিশ্বজগতকে ধরে রাখেন। ঈশ্বরের শাশ্বত প্রেমের ক্ষমতার এ কেমন মহান আত্মপ্রকাশ।

কিন্তু একথার এখানেও ইতি নয়।

(২)

যীশুর জন্মকাহিনীর বিবরণে মা মেরির একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। লুক তাঁর 'সুসমাচারে' লিখেছেন, দেবদূত গাব্রিয়েল ন্যাজারাথ শহরে মেরির সঙ্গে দেখা করলেন। তখন মেরি নিতান্ত কুমারী কন্যা। রাজা দাউদের বাড়ির জোসেফ নামে একজনের বাগদত্তা। দেবদূত মেরিকে বললেন, শুভমস্তু! অনুগৃহিতা, কল্যাণ হোক, প্রভু তোমার সহায়। এই অদ্ভুত সম্ভাষণ শুনে মেরি বিচলিত হলেন। দেবদূত বললেন, ভয় পেয় না, ঈশ্বরের বরে তুমি ছেলের মুখ দেখবে। তাঁর নাম রেখ যীশু। মেরি বললেন, সে কি! আমি যে কুমারী। দেবদূত বললেন, পবিত্র আত্মার অধিষ্ঠানে পরমেশ্বরের শক্তিতে তুমি হবে পরিবৃতা। তোমার কোলে যে পুণ্যশ্লোক শিশুর জন্ম হবে তাঁকে সকলে ভগবানের পুত্র বলে ডাকবে। মেরি বললেন, আমি প্রভুর দাসী, তবে তাই হোক।

ভক্তির পরাকাষ্ঠা! খ্রীষ্টানরা তাই মেরিকে "পরম অনুগৃহিতা" বলেন। এর বহুকাল পরে ভীড়ের মধ্যে থেকে একটি নারীকণ্ঠ বলে উঠেছিল, সৌভাগ্যবতী সেই নারী যিনি আপনার গর্ভধারিণী, স্তন্যদাত্রী। যীশু ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, সৌভাগ্য তাঁদেরই যাঁরা ঈশ্বরের কথা শুনে কাজ করেন। মেরি সৌভাগ্যবতী শুধু যীশুর মা বলেই নন, কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ শুনে পালন করেছিলেন, সেই জন্যেও। যীশুর মা হিসাবে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন, কারণ ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন ভক্তিমতী। বাড়ির শান্ত পরিবেশে, আরাধনা অর্চনার আবহে, তিনি লালিত পালিত হন। ইহুদী ধর্মীয় ঐতিহ্যের নির্যাসের সুবাস ছিল তাঁর স্বভাবে। "ধ্যানস্থ হও, অবধান কর আমি ঈশ্বর (Be still and know that I am God) গীতসংহিতা বা সামসের কবির উক্তিই ছিল যেন তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। হঠাৎ করে একটা আশ্চর্য কিছু ঘটেনি। অলৌকিক কিছু ঘটে যাওয়ার পেছনে দীর্ঘ প্রস্তুতি আছে। মথি এবং লুক তাঁদের সুসমাচারে যীশুর পুরো বংশলতিকা তুলে দিয়েছেন। তার থেকে বোঝা যায়, ভক্ত-কুলতিলক তিনি। রাজা দাউদের বাড়ির ছেলে হয়ে না হলে কেন জন্ম হবে তাঁর? মোজেস এবং নবীদের দিয়ে বহু শতাব্দী ধরে এরজন্যে ভগবৎ প্রশিক্ষণ চলেছিল। সমগ্র ইস্রায়েলের সামান্য একটি অংশে কিন্তু ভগবৎ ভক্তিকে জীবনের সারসত্য বলে বুঝেছিল। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের ভূখণ্ডের মিলনভূমিতে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, সেই মহা মাহেন্দ্রক্ষণের প্রস্তুতি চলেছিল। মেরি সেই ভক্তিরসধারার পরমা অভিব্যক্তি। সেই ঐতিহ্যে জীবনের ঈশ্বরমুখিনতা চরম সত্য বলে ধরে নেওয়া হতো। দিন আনি দিন খাইতে সন্তুষ্ট থাকতে শেখানো হতো। ঈশ্বরকে ভক্তি এবং মানুষকে ভালবাসা আদর্শ বলে ধরা হতো। মেরির মধ্যে সেই পরম্পরার পরম প্রকাশ। আদেশ যখন হয়েছে, তখন যায় যদি জীবন মান, তাতেও আপত্তি নেই।

ভীড়ের মধ্য থেকে একটি নারীকণ্ঠ বলে উঠেছিল, সৌভাগ্যবতী সেই নারী যিনি আপনার গর্ভধারিণী, স্তন্যদাত্রী। সৌভাগ্য তাঁদেরই যাঁরা ঈশ্বরের কথা শুনে কাজ করেন।

মেরির ভক্তি যদি মুদ্রার এক পিঠ হয় তাহলে যোসেফের বাধ্যতা হলো অন্য পিঠ। তিনিও ঈশ্বরের কথা রেখেছিলেন।

মথি লিখেছেন, মেরির সঙ্গে জোসেফের বাগদানের পর দেখা গেল মিলনের আগেই তিনি সন্তানসম্ভবা—পবিত্র আত্মার পরিবৃতে। তাঁর হবু বর জোসেফ মানুষটি ছিলেন সৎ। সকলের সামনে যাতে মেরিকে লজ্জায় না পড়তে হয় সেই জন্যে গোপনে বিয়েটা ভেঙ্গে দেবেন বলে ভেবেছিলেন। তিনি এটা স্থির করার পর, রাত্রে স্বপ্নে এক দেবদূত তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, দাউদ কুলোদ্ভব জোসেফ, মেরিকে ঘরে বরণ করে নিতে ভয় পেও না, কারণ পবিত্র আত্মার প্রভাবেই তিনি জননী হতে চলেছেন। ফুটফুটে ছেলে হবে তাঁর। তুমি তাঁর নাম রেখো যীশু, কারণ তিনি আপনজনদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।

জোসেফ লোক লজ্জার হাত থেকে মেরিকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। তাই গোপনে বিয়েটা ভেঙ্গে দেবেন বলে ভেবেছিলেন। আগে যদি তাঁর মনে সন্দেহের ছায়াপাত ঘটে থাকে, তবু পরে কিন্তু ঈশ্বরের আদেশে তাঁর মনের দ্বিধা ঘুচে গেল। তা মেনে নিতে পরে বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটেনি তাঁর।

বড়দিনে যীশুর জন্মের এই দিকটার বিষয় খ্রীষ্টানরা ধ্যান করেন। তাঁরাও চান পৃথিবীর হৈ হট্টগোলের মধ্যে নীরবে নিভৃতে ঈশ্বরের অশ্রুত কণ্ঠ শুনতে। তখনই পবিত্র আত্মা আমাদের জানাতে পারেন কোনটি অলীক এবং কোনটি অলৌকিক দৈববাণী। তাহলেই ঈশ্বর আমাদের বিশেষ নির্দেশ দিতে পারেন, দায়িত্ব দিতে পারেন। চরম নৈরাশ্যে মর্মন্তুদ বিষাদে পুত্রের ক্রুশতলে ঐ দাঁড়িয়ে আছেন মেরি, কিন্তু তখনও ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অচলা ভক্তি টলেনি, বিচলিত হলেও আস্থা হারাননি। আস্থাশীল ধর্মভীরু মানুষদের ওপরই উদ্ধারকার্যের বাকিটুকুর দায়িত্ব ন্যস্ত করেন ঈশ্বর।

(৩)

জন্মকাহিনীর আরেকটি দিক দিয়ে এ লেখা শেষ করব। লেখক মথি। হেরোদ রাজার আমলে জুডিয়ার বেথলেহেমে যীশুর জন্মের কিছুদিন বাদে, প্রাচ্যদেশের কয়েকজন জ্যোতিষী পণ্ডিত জেরুসালেমে এসে হেরোদের সঙ্গে দেখা করে বললেন, ইহুদিদের রাজা কোথায় জন্মেছেন? আমরা তাঁর তারাটি উঠতে দেখেছি। তাঁর চরণবন্দনা করার জন্যে আমরা এসেছি।

এসব শুনে রাজা হেরোদ বিচলিত। জেরুসালেমের সবাই উত্তেজিত। তখন হেরোদ ইহুদি জাতির মোহন্ত এবং শাস্ত্রীদের ডেকে জানতে চাইলেন, খ্রীষ্টর কোথায় জন্মাবার কথা যেন? তাঁরা বললেন, জুডিয়ার বেথলেহেমে। নবী বলেছেন,

জুডিয়ার বেথলেহেম,
প্রদেশের অন্য শহর
থেকে তুমি আদৌ ছোট নও।

কারণ তোমার মধ্যে থেকে
আসবেন সেই নেতা,
তিনি ইস্রায়েলীদের শাসন করবেন।

হেরোদ একান্তে জ্যোতিষীদের কাছে জানলেন কবে তাঁরা তারাটি প্রথম দেখেন। তারপর তাঁদের বেথলেহেমে পাঠাবার আগে বললেন, আপনারা গিয়ে শিশুটিকে খুব করে খুঁজুন। আমাকে একটা খবর দেবেন। তাঁকে আমি গিয়ে প্রণাম করব। রাজার কাছে একথা শুনে তাঁরা রওনা হয়ে গেলেন। তাঁরা আগে যে তারাটি দেখেছিলেন,

সেই তারাটি তাঁদের পথ দেখিয়ে চলল। শিশুটি যেখানে ছিলেন তারাটি এসে সেখানে থামল। ঘরে ঢুকে তাঁরা শিশুটিকে তাঁর মা মেরির কোলে দেখলেন। গড় হয়ে তাঁরা তাঁকে প্রণাম করে, নিজেদের রত্নপেটি খুলে তাঁকে উপহার দিলেন, সোনা, ধূপধুনো এবং আতর। তাঁরা হেরোদের কাছে না ফিরে যাবার স্বপ্নাদেশ পেয়ে অন্য পথে দেশে ফিরে গেলেন।

পণ্ডিতরা ফিরে যাবার পর দেবদূত জোসেফকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, ওঠ, মা আর তাঁর শিশুটিকে সঙ্গে নিয়ে মিশরে পালাও। কারণ শিশুটিকে মেরে ফেলার জন্য হেরোদ তাঁর খোঁজ করবে। জোসেফ জেগে উঠে সেই রাতেই শিশু আর তার মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশর দেশে রওনা হয়ে গেলেন। হেরোদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত মিশরেই থেকে গেলেন তাঁরা।

এদিকে হেরোদ যখন বুঝলেন জ্যোতিষীরা তাঁকে ঠকিয়েছেন, তখন তিনি ভীষণ রেগে গেলেন। জ্যোতিষীদের কাছ থেকে যে সময়ের কথা জেনে নিয়েছিলেন, সেই সময়ের হিসাব করে, দু বছর বয়স পর্যন্ত যত ছেলে বেথলেহেমে এবং আশেপাশে ছিল, তাদের সকলকে মেরে ফেলার আদেশ দিলেন।

বড়দিনের সময় খ্রীষ্টানরা গির্জায় উপাসনায়, বাড়ির মধ্যে এবং বাড়ির বাইরে আনন্দ করার সময়, জ্যোতিষীদের আগমন, উপহার দেওয়া এবং নিষ্পাপ শিশু হত্যার তাৎপর্য ধ্যান করেন। তখন আনন্দের মধ্যেও খ্রীষ্টের অমানুষিক যন্ত্রণা এবং ক্রুশের ছায়া পড়ে।

এই কাহিনীগুলির টীকাভাষ্যে ধর্মতত্ত্ববিদ উইলিয়াম বার্কলে বলেছেন, "যীশুর দোলনার কাছে জ্যোতিষীদের আসা কিংবদন্তী বলেই শুধু ধরে নেবার যথেষ্ট যুক্তি কি আছে? প্রাচীন পৃথিবীতে এমন ঘটনা ঘটা একেবারে অসম্ভব ছিল না।"

মথির বৃত্তান্ত সম্বন্ধে একটু খুঁটিয়ে ভাবা যাক। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোদোতাস, যাঁর লেখাগুলি ৫ম খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রচিত, দেশ বিদেশ পরিক্রমা করেছিলেন প্রচুর। তিনি বলেছেন 'মেজাই' নামে পারস্যদেশীয় জ্যোতিষী সম্প্রদায় জাতিতে মিদীয় হতেন। পারসিক রাজাদের গুরু হতেন তাঁরা। পুণ্যশ্লোক এবং প্রাজ্ঞ হিসাবে এঁরা প্রখ্যাত হতেন। তাঁরা বিচলিত মানুষকে সদুপোদেশ দিতেন, স্বপ্নের ব্যাখ্যায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত, চিকিৎসা এবং ভাগ্যগণনাও করতেন। পরে মেজাই শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় বুজরুখ। কিন্তু বাবিলন এবং পারস্য দেশের মেজাইরা ছিলেন পুণ্যবান এবং সৎ।

মেজাই সম্প্রদায়ের জ্যোতিষীরা দেশে আকাশের নক্ষত্র দেখতে গিয়ে কি দেখেছিলেন আমরা জানি না। জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতরা বলেন ১১-২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ভেতর নক্ষত্রলোকে কিছু অদ্ভুত ঘটনা, গ্রহ নক্ষত্রের সমাবেশ নাকি ঘটেছিল। আমরা সে সময়ের সাহিত্য থেকে জানতে পারি যে প্রাচীন পরিজ্ঞাত পৃথিবীতে এক মহা পরাক্রান্ত ধরনের রাজার জন্ম হবে বলে জনমনে আশা জেগেছিল। রোমক কবি ভার্জিল

মাতা মেরী ও যীশু ছবি : শিপ্রা দাস

হেরোদের অনুচর কর্তৃক নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা। শিল্পী : গিয়োত্তো

সম্রাট সিজার অগাস্টের উদ্দেশে স্তুতিবাচক কবিতা লেখার সময় সেই সুভাষিতবলী বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়েছেন। আরও দুজন রোমক লেখক সেই একই শতাব্দীর শেষভাগে জানিয়েছেন যে, প্রাচ্যে জুডিয়া প্রদেশে এমন এক রাজা জন্মাবেন যিনি পৃথিবীর রাজচক্রবর্তী হবেন, এ ধারণা লোকমনে দৃঢ়রূপে গেড়ে বসেছিল। ইহুদিরা বিশ্বাস করত, তাঁদের মুক্তিদাতা (মেসায়া) আসবেন। হয়তো মেজাইরা প্রচলিত এই ধারণার কথা জানতেন। তাই তাঁরা নতুন তারা উঠতে দেখে সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে থাকতে পারেনও বা। সুতরাং ইহুদীদের রাজধানী জেরুসালামে তাঁরা এসে হাজির হলে বিচিত্রই বা কি ?

মথি কাহিনীটি খুব সংক্ষেপে বলেছেন। ঘটনার আরও জটিলতা ছিল নিশ্চয়। তবে মথির বর্ণনা অবিশ্বাস্য মনে হয় না। হেরোদ যখন জানলেন যে তাঁর পরিবারের প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্ম হয়েছে তখন তিনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন, সেটা অন্যসূত্র থেকে তাঁর স্বভাবের বিষয় যতটুকু জানা যায়, তার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। সেসময় তিনি বৃদ্ধ। তিনি মোটামুটি সুশাসক ছিলেন। লোকে বলত, মহামতি হেরোদ। কিন্তু মনটি ছিল তাঁর সন্দেহবাতিকগ্রস্থ। চারিদিকে ষড়যন্ত্রের ছায়া দেখতেন তিনি। অকারণ সন্দেহ করে তিনি তাঁর স্ত্রী, মা এবং তিন ছেলেকে মেরে ফেলেছিলেন। সুতরাং সমাজে সম্মানিত মেজাইরা যখন তাঁর কাছে জুডিয়ায় নতুন রাজার জন্মানোর কথা জানতে চাইলেন, তখন সেই শিশুটিকে খুন করার জন্য তিনি যে উঠে পড়ে লাগবেন, সেটাই তো স্বাভাবিক। হেরোদের সঙ্গে দেখা হবার পর মেজাইরা তাঁর চরিত্রের দুর্বল দিকগুলো বুঝতে পেরেছিলেন নিশ্চয়। অন্যপথে দেশে ফেরার জন্য স্বপ্নের প্রয়োজন তাঁদের নাও হতে পারে। তেমনি স্বপ্নাদেশ ব্যতীত জোসেফের মনে ভয় ঢুকে যাওয়াও বিচিত্র নয়। ঘটনা পরম্পরায় শিশুটির নিরাপত্তার জন্যেই একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারেন তিনি।

মথি জন্ম বৃত্তান্তটি নিজের মতো করে সাজিয়েছেন। স্বপ্ন এবং দৈবাদেশ সম্বন্ধে এসব কথা ভারতবর্ষের মতো দেশে মানুষ হেসে উড়িয়ে দেন না। যদিও এখন যন্ত্রতন্ত্রে অগ্রসর দেশগুলিতে এসবের বিষয়ে অবিশ্বাস প্রবল। তাঁরা এগুলিকে কুসংস্কারের পর্যায়ে ফেলেন। মথির সমসাময়িক লেখক এবং পাঠক কিন্তু স্বপ্নাদেশকে স্বাভাবিক ঘটনা বলেই মানতেন। জ্যোতিষীদের খবরটা নিয়ে ফিরে আসার জন্য হেরোদের সনির্বন্ধ অনুরোধের সঙ্গে তাঁর সন্দেহপ্রবণ এবং খুনে মনোবৃত্তি বেশ খাপ খেয়ে যায়। তাঁর হাবভাব দেখে হয়তো প্রাজ্ঞ জ্যোতিষীদের কিছুই আর বুঝতে বাকি ছিল না।

জ্যোতিষীরা যে উপহার এনেছিলেন সেগুলিও গল্পের উপাদান। সোনা এবং ধূপধুনো তখনকার দিনে রাজকীয় উপঢৌকন। বাইবেলে নবী আইজায়ার গ্রন্থে এই উপহার দুটি জেরুসালেমের জায়ন (Zion) পাহাড়কে দেওয়ার উল্লেখ আছে। পাহাড়টি জেরুসালেমের প্রতীক এবং নবী জায়নকে রানীরূপে কল্পনা করেছেন। আরব উপদ্বীপের উপজাতিরা সেখানে এসে এই দুইটি জিনিস নজরানা হিসাবে রানীকে দিত। মৃত ব্যক্তির গায়ে আতর মাখিয়ে তাকে কবর দেওয়া হতো। মথি সম্ভবত উপহারগুলির প্রতীকী তাৎপর্য মনে রেখেই বৃত্তান্তটি রচনা করেছেন। তিনি জানতেন খ্রীষ্টকে মানবমুক্তির জন্য যন্ত্রণাভোগ করতে হবে। জ্যোতিষীরা অবশ্য এসব জানতেন না। প্রকৃত ঘটনা এবং এসব খুঁটিনাটি একই ওজনে দেখার জরুরী প্রয়োজন নেই। গল্প বলার সময় লোকে রঙদার খুঁটিনাটি যোগ করে। আমরা যদিও পড়ার সময় সোনাকে ভাবি রাজাকে দেবার উপহার সামগ্রী। ধূপধুনোকে দেখি, ঈশ্বরের পুরোহিতকে মন্দিরে ব্যবহার করার জন্য দেওয়ার জিনিস হিসাবে। আর আতরকে মনে করি, 'ঈশ্বরের বলিদানের মেষকে' মাখাবার জন্যে দেওয়া। খ্রীষ্টানরা খ্রীষ্টকে বলির দৈবী-মেষশাবকরূপে কল্পনা করে থাকেন। পাঠক পাঠিকা, নিশ্চয়ই ক্রুশ কাঁধে মেষের প্রতীকী ছবি দেখে থাকবেন। খ্রীষ্টানরা মনে করেন যে খ্রীস্টের অবিকল্প আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়ে পশুবলি নরবলির প্রথা চিরতরে রহিত হল।

আকাশে নতুন তারা উদিত হবার ঘটনা বলার ধরনটা দেখে বোঝা যায় যে জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যোতিষী সম্বন্ধে লেখকের জ্ঞান সামান্যই। মেজাই সম্প্রদায়ের জ্যোতিষীরা নতুন তারার উদয় দেখে রাজকুমারের জন্ম হয়েছে বলে অনুমান করলেন। লোকপরম্পরায় তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে জুডিয়া তাঁর জন্মস্থান হবে বোধ হয় তাঁরা তাঁকে দেখে উপহার দিয়ে দেশে ফিরে গেলেন। তারাটি ওঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার ঘটনাটিকে আমরা বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে ধরি না। কিংবদন্তী কিংবদন্তীই। ঐতিহাসিক তথ্যকে ঘিরে কিংবদন্তী রচিত হয়। কথক বা লেখক খুঁটিনাটি মনের রঙে ছুপিয়ে নেন। ঘটনাটির রূপরেখা কিংবদন্তীর খোলস ছাড়িয়ে তুলে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। পরবর্তীকালে কল্পনার আরেকটু বিস্তার করে বলা হল, জ্যোতিষীদের সংখ্যা ছিল তিন। একজন ভারতীয়ও এঁদের মধ্যে নাকি ছিলেন। তাঁরা রাজা ছিলেন। কিংবদন্তী তো এইভাবেই বাড়ে।

মিশরে প্রবাসের ঘটনা অসম্ভব নয়। মিশরে সেই সময় ইস্রায়েলীদের বড় একটা উপনিবেশ ছিল। হেরোদের কোপ থেকে বাঁচার জন্যে লোকে ফেরারী হতো সেখানে।

যীশুর জন্ম সাল সঠিক জানা নেই। রাজা হেরোদের মৃত্যু হয় ৪ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে। এর কিছু পরেই জুডিয়া প্রদেশে ফিরে আসার মতো পরিবেশ তৈরী হল। লুক মিশর প্রবাসের ঘটনাটা বাদ দিয়েছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, যীশু ন্যাজারথে মানুষ হয়েছিলেন। এইখানে মেরীকে নিয়ে জোসেফ থাকতেন। বেথলেহেমে এসেছিলেন এঁরা রোম সাম্রাজ্যের আদমসুমারির জন্য। মথি লুকের সঙ্গে একমত হননি। মিশরে পলাতক হবার ঘটনা তিনি অন্যসূত্রে সংগ্রহ করেছিলেন।

বড়দিনের আনন্দোৎসবে ভক্তজন কিন্তু মনে মনে যীশুর জন্মের এই সব গূঢ় তাৎপর্যের কথা ধ্যান করেন।

কলকাতার বড়দিন

আশিসকুমার মণ্ডল

ভারতীয় উপমহাদেশের বৈচিত্র্য কেবল তার প্রাকৃতিক ভূগোলেই সীমিত নয়। বৈচিত্র্যের সমান প্রতিফলন রয়েছে নানা জাতিগোষ্ঠীর মানুষ, তাদের ভাষা, পোশাক খাদ্যাভ্যাস, আচরিত ধর্ম, রীতি নীতির মধ্যেও। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ এখানে বাস করেন বলেই এই দেশ নানা ধর্মের মিলনভূমি।

এখানেই সনাতন হিন্দু ধর্মের উদ্ভব এবং বিকাশ। বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ধর্মেরও জন্ম এদেশেরই মাটিতে। আবার খ্রিষ্ট ধর্ম, জোরোআস্টার এবং ইসলাম ধর্ম ভারতের বাইরে থেকে এদেশে এসেছে। বাইরে থেকে এলেও এসব ধর্ম বহু শতাব্দী ধরে এদেশে স্থায়ীভাবে থাকার ফলে, এখানকার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে সেগুলি নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে। জাতীয় জীবনের বৈচিত্র্য এসবের জন্যেই বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সব ধর্ম এবং সম্প্রদায়গুলি দেশের ভাবধারা, সামাজিক এবং ধর্মীয় রীতিনীতি, কলা এবং স্থাপত্য শিল্পকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধে সাধারণ্যে সেই কারণে ঔৎসুক্য থাকাই তো স্বাভাবিক। এই সম্প্রদায়গুলির আচার আচরণ, ধ্যান, ধারণা, প্রত্যয় সম্বন্ধে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জিজ্ঞাসা তাই প্রবল। এদের ভিন্ন ভিন্ন উৎসবের তাৎপর্য কি, কি ভাবেই বা সেগুলি পালিত হয়, তাঁরা অবশ্যই জানতে চাইবেন।

আমাদের জাতীয় পঞ্জিকায় বৎসরের পর বৎসর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসবের কথা উল্লেখ থাকে। কোনও কোনও পার্বণ অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় ছুটির দিন বলে ঘোষিত হয়। সংখ্যালঘুদের উৎসব সম্বন্ধে সাধারণ অজ্ঞতা অপরিসীম হলেও কৌতূহলের কিন্তু অভাব নেই। কৌতূহলের মধ্যে প্রতিফলিত হয় পরধর্ম সম্বন্ধে শ্রদ্ধা এবং সহিষ্ণুতা। নৃতাত্ত্বিক স্পৃহা।

বক্ষ্যমান নিবন্ধে এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে তথা কলকাতায় খ্রিষ্টধর্মের বিকাশ, প্রসার ও বর্তমান অবস্থার একটা মোটামুটি চেহারা তুলে ধরা হয়েছে। বড়দিন প্রভু যীশু খৃষ্টের জন্মদিন। এখানে তা কিভাবে পালিত হয় সে সম্বন্ধে একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে শেষাংশে।

গোড়াতেই কয়েকটি ব্যবহৃত শব্দ সম্বন্ধে একটু ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে 'গির্জা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে গির্জাঘর অর্থে, "মণ্ডলী" কোনও গির্জার সঙ্গে যুক্ত উপাসকগোষ্ঠীর অর্থে এবং "সম্প্রদায়" খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন উপদলের অর্থে।

কলকাতায় বড়দিন সম্বন্ধে লিখতে গেলে প্রথমে ভারত উপমহাদেশে খ্রিষ্টধর্মের আগমন ও প্রসার সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া দিতে হয়। প্রচলিত ধারণা হল, খ্রিষ্টধর্ম পর্তুগিজ ও

সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল : কলকাতায় বড়দিন উদযাপনের প্রধান পীঠস্থান — ছবি : শিপ্রা দাস

ইংরাজদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই এই দেশে প্রবেশ করেছে।

প্রকৃত ইতিহাস কিন্তু অন্যরকম। কেরলের মালাবারী খ্রিষ্টানদের মধ্যে একটি কিংবদন্তী চালু আছে, ৫২ খ্রিষ্টাব্দে যীশুখ্রিষ্টের সাক্ষাৎ শিষ্যদের দ্বাদশ অন্তরঙ্গদের অন্যতম থোমা না-কি (Thomas) খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করতে মালাবারে আসেন। তাঁর প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে কিছু স্থানীয় মানুষ খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। এঁদের নিয়েই গঠিত হয় ভারতের প্রথম খ্রিষ্টীয় মণ্ডলী। এ যদি কিংবদন্তী হয় তবুও ঐতিহাসিক তথ্যাদি থেকে জানা যায় যে প্রথম শতাব্দীতে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে (বর্তমান পাকিস্তানে) প্রাচীন তক্ষশীলা অঞ্চলে যীশুর শিষ্য থোমা খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করেন। তার ফলে গণ্ডোফার্নিস নামক পহ্লব রাজা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। লোকশ্রুতি থোমা ব্যতীত যীশুর অন্য একজন সাক্ষাৎ শিষ্য, বারথলমিউ (Bartholomew) বোম্বাইয়ের কাছে কইলান বা কল্যাণ বন্দরে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করেন।

ঐতিহাসিকরা অবশ্য থোমা ও বারথলমিউর ভারতে ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে পুরোপুরি নিশ্চিত না হলেও একথা অস্বীকার করেন না যে, সম্ভবত প্রথম শতাব্দী থেকে মালাবারীরা খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের সংস্পর্শে আসেন। সে সময় ভারতীয়দের মধ্যে খ্রিষ্টমণ্ডলী গড়ে ওঠা অসম্ভব না হলেও তার কোনও অকাট্য প্রমাণ নেই। চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই মালাবারে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিন্তু যথেষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য আছে। এই সূত্রেই জানা গেছে চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে কোনার থোমা নামক এক ব্যবসায়ীর নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক পারসিক এবং সিরীয় খ্রিষ্টান স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে কেরলের ক্রানগানোর অঞ্চলে আসেন। এঁরা সঙ্গে করে আনেন মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মীয় বিশ্বাস, বিশেষ করে সিরিয়ার খ্রিষ্টধর্মের ভাবধারা, ভাষা ও আচার অনুষ্ঠানগুলি। নবাগতদের জন্য ভারতীয় খ্রীষ্টমণ্ডলী গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। এর ফলেই সিরিয়ার খ্রিষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে ভারতীয় খ্রিষ্টমণ্ডলীর ধর্মীয় যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই যোগাযোগ এখনো অটুট রয়েছে। সেই কারণেই কেরলের আদিমণ্ডলীকে বলা হয় "সিরিয়ান অর্থোডক্স চার্চ" বা "যেকোবাইট চার্চ"। সংক্ষেপে এই হল ভারতে খ্রিষ্টধর্ম অনুপ্রবেশের কাহিনী।

ভারতে খ্রীষ্টধর্ম দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় মধ্যযুগে। চীন দেশে যাওয়ার পথে বেশ কয়েকজন রোমান ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারক সন্ন্যাসী দক্ষিণ ভারতে অল্প বিস্তর সময় অতিবাহিত করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ডমিনিকান সন্ন্যাসী জরডান ক্যাটালানি। জরডান ও তাঁর চারজন সন্ন্যাসী সঙ্গী ১৩২১ খৃঃ পশ্চিম ভারতের থানা নামক স্থানে ধর্ম প্রচার শুরু করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই জরডান ছাড়া অন্য সন্ন্যাসীদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। এই ঘটনার পর জরডান দক্ষিণ ভারতে চলে যান। তিনি কেরলের কুইলান (Quilon) শহরে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৩২৯ খৃঃ কুইলানকে একটি রোমান ক্যাথলিক ধর্মপ্রদেশ (Diocese) রূপে চিহ্নিত করা হয়। এইভাবে স্থাপিত হয় ভারতের রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলী। মধ্যযুগের এই রোমান ক্যাথলিকমণ্ডলী কিন্তু স্থায়ী হয়নি। অচিরে তার বিলুপ্তি ঘটেছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ১৪৯৮এ ভাস্কো-ডা-গামার নেতৃত্বে পর্তুগিজ বণিকগোষ্ঠী মালাবার উপকূলে এসে হাজির হন। ক্রমে তাঁরা নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সঙ্গে স্থাপিত হয় রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলীর স্থায়ী সংগঠন। ধর্মবিস্তার চলে। অবশ্য ধর্মপ্রচারের গতি বৃদ্ধি পায় ১৫৪২এ জেসুইট সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ভারতে আগমনের পর থেকেই। বিশেষত সাধু ফ্রানসিস জেভিয়ারের পর থেকে সবকিছু সুপরিকল্পিতভাবে এগুতে থাকে। জেসুইটদের সংঘবদ্ধ চেষ্টার ফলেই ভারতবর্ষে রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হয় শক্ত ভিতের ওপর। বঙ্গদেশেও রোমান ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের সূত্রপাত হয় পর্তুগিজ আগমনকে কেন্দ্র করেই। ১৫৭৬এ পর্তুগিজ ব্যবসায়ী দ্বারা স্থাপিত হুগলি শহরে জেসুইট সন্ন্যাসীরা আসেন খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের জন্যে। রোমান ক্যাথলিক সন্ত অগাস্টিন প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসী সংঘও ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে বাংলায় এসে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে ব্যান্ডেলের সুপরিচিত গির্জা, যা আজও জাতিধর্ম নির্বিশেষে ঈশ্বর ভক্তদের আকর্ষণ করে। ব্যান্ডেলের গির্জাটি বঙ্গের রোমান ক্যাথলিকদের প্রতিষ্ঠিত প্রথম উপাসনালয়।

প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টধর্মের ভারতে অনুপ্রবেশ ঘটে ওলন্দাজ, দিনেমার ও ইংরাজ বণিকদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে। তবে ১৭০৬ থেকে সুপরিকল্পিত ধর্মপ্রচার ও খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করার প্রয়াস শুরু হয় দক্ষিণ ভারতে আধুনিক তামিলনাড়ুর ট্রানকুবার শহরে। এই কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বারথলমিউ জিগেনবাল্গ।

এদিকে, পূর্ব ভারতে, বিশেষ করে কলকাতায়, ইংরেজদের আগমনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্থানীয় অ্যাংগলিকান (বা ইংলণ্ডীয়) সম্প্রদায়ের স্থাপনের ইতিহাস। লর্ড ক্লাইভের আমন্ত্রণ ক্রমে প্রথম মিশনারী জন জ্যাকারাইয়া কিরন্যানডার দক্ষিণ ভারত থেকে ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় উপস্থিত হন। নিজের খরচে, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তিনি ওল্ড মিশন চার্চ স্থাপন করেন। এটিই হল কলকাতার প্রথম প্রটেস্ট্যান্ট গির্জা। মিশন রো-তে অবস্থিত এই গির্জার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় ১৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে। উপাসনার জন্য উপাসনালয় তৈরী সম্পূর্ণ হয় ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে। আজও এই গির্জা উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ইংরাজদের উপাসনার জন্য বর্তমান লালদীঘির কাছে কোনও এক জায়গায় ১৭০৬ খ্রিষ্টাব্দে একটি গির্জা নির্মিত হয়। সেই গির্জাটির নাম সেন্ট অ্যান্স চার্চ। এই গির্জার অস্তিত্ব আজ নেই। ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে সুবে বাংলার নবাব সিরাজের কলকাতা আক্রমণের সময় এই গির্জাটি সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস হয়। পরে ১৭৬০এ আর একটি গির্জা নির্মাণ করা হয়—সেন্ট জনস্ চ্যাপেল। কিন্তু এটিও কালের নিয়মে ধসে গেছে।

কলকাতার ইংরাজদের উপাসনার জন্য আরও একটি উপাসনালয় স্থাপনের প্রচেষ্টা চলে ১৭৭২ থেকে। নির্মিত হয় রাজভবনের কাছে সেন্ট জনস চার্চ। ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত এই গির্জাটি তখনকার দিনে অ্যাংগলিকান মণ্ডলীর ক্যাথিড্রাল রূপে ব্যবহৃত হত। ইতিহাসে জানা যায় যে এই গির্জা স্থাপনের প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করা হয় চাঁদা তুলে এবং লটারি করে। জমি দান করেন মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব।

কলকাতার অ্যাংগলিকান মণ্ডলীর আর একটি গির্জা হল সেন্ট পল্‌স্ ক্যাথিড্রাল। এর স্থাপত্য শিল্প ও সৌন্দর্য কলকাতাবাসীর গৌরব। সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল "বড়লাটের গির্জা" বলেই পরিচিত। ১৮১৪ থেকেই এই গির্জাটি স্থাপনের প্রচেষ্টা শুরু হয় কলকাতার প্রথম বিশপ টমাস মিডলটন-এর আগমনের পর থেকেই। তবে এর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেন কলকাতার পঞ্চম বিশপ ডানিয়েল উইলসন। তিনি নিজের অর্থে, চেষ্টায় ও অন্যান্যদের সাহায্যে এই গির্জাটি নির্মাণ করেন অক্লান্ত পরিশ্রমে। এই গির্জার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে। উপাসনার জন্য ব্যবহার শুরু হয় ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। এখন সেন্ট পলসের চারপাশের যে প্রাকৃতিক শোভা মানুষকে আকৃষ্ট করে তা অবশ্যি অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগের দৃশ্যের মতো আদৌ নয়। এমন কি এ কথাও জানা যায় যে ওয়ারেন হেস্টিংস নাকি হাতির পিঠে চেপে এই অঞ্চলে বাঘ শিকার করতেন।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিন্তু প্রথম দিকে ধর্মপ্রচারের বিরোধিতা করেছে। কিন্তু স্বদেশের জনমতের চাপে ১৮১৩তে কোম্পানির এলাকায় বিলিতী মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের অনুমতি দেওয়া হয়। ফলে বিভিন্ন খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচারকরা কলকাতা ও তার আশেপাশে ধর্মবিস্তার করতে শুরু করেন। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে এই ধর্মপ্রচারের গতি বৃদ্ধি পায়। কারণ তখন থেকেই অন্যান্য দেশের মিশনারীদের ও কোম্পানির এলাকায় কাজ করার অনুমতি ও সুযোগ পান।

এই প্রসঙ্গে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারী উইলিয়াম কেরীকে বাদ দেওয়া যায় না। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি যখন কলকাতায় আসেন, তখন লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলায় তাঁর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনে ব্যস্ত। কোম্পানির এলাকায় কাজ করার অনুমতি না পাওয়ায় কেরী মালদহ অঞ্চলে কয়েক বৎসর কাজ করেন। পরে ১৮০০-তে শ্রীরামপুর এসে নবাগত ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের সঙ্গে ধর্মপ্রচারের কাজ আরম্ভ করেন। শ্রীরামপুর থেকে মিশনারীরা কলকাতার লালবাজার অঞ্চলে ধর্মপ্রচার করতে আসতেন। তাঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় ১৮০৯এ একটি গির্জা স্থাপিত হয়। এই গির্জাই বর্তমানে "কেরী ব্যাপটিস্ট চার্চ" নামে পরিচিত। কলকাতায় ব্যাপটিস্টদের আরও সাতটি গির্জা রয়েছে। সেগুলিতে বিভিন্ন ভাষায় রবিবারের উপাসনা হয়।

কলকাতায় প্রটেস্টান্ট গোষ্ঠীভুক্ত আরো অনেক সম্প্রদায় আছে। যেমন স্কটিশ চার্চভুক্ত মণ্ডলী সমূহ, কনগ্রিগেসনালিস্ট, মেথোডিস্ট (ইংল্যান্ডের); অ্যাসেম্বলী অফ গড, সেভেনথ-ডে-অ্যাডভেন্টিস্ট, পেনটিকসটাল ও আমেরিকার স্যালভেসন আর্মি ইত্যাদি। এদের মধ্যে প্রথম তিনটিকে নিয়ে অ্যাংলিকান মণ্ডলী একত্রিত হয়েছে। এইভাবে গঠিত হয়েছে উত্তর ভারতীয় মণ্ডলী। বর্তমানে এই নতুন সম্প্রদায়ের অধীনে কলকাতায় ২৪টি গির্জা আছে। এই সকল গির্জায় প্রতি রবিবার বিভিন্ন ভাষায় উপাসনা হয়।

বিংশ শতাব্দিতে যে সমস্ত মিশনারী সংস্থা কলকাতায় এসেছে তাদের মধ্যে অ্যাসেম্বলি অফ গড মিশনের নাম উল্লেখযোগ্য। এদের কাজ শুরু হয় ১৯৬০এ। কিন্তু খুবই অল্পদিনের মধ্যেই বৃহত্তর কলকাতায় এদের আটটি গির্জা স্থাপিত হয়। বর্তমানে এদের সভাসংখ্যা চার হাজারের কাছাকাছি। এছাড়া একমাত্র এই সম্প্রদায়ই কলকাতায় একটি আধুনিক হাসপাতাল ও চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছে।

কলকাতায় রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রথম উপাসনালয় (চ্যাপেল) স্থাপিত হয় ১৭০০-এ। গির্জা কিন্তু নির্মিত হয় ১৭৯৭-এ। এই গির্জাটি "ক্যাথিড্রল অফ দি মোস্ট হোলি রোজারী" নামে পরিচিত। এছাড়াও আরো সতেরটি রোমান ক্যাথলিক গির্জা কলকাতায় আছে। ১৯৮৫'র এক সমীক্ষায় জানা যায় এই গির্জাগুলিতে প্রায় ৫৬ হাজারেরও বেশি খ্রিষ্টভক্তরা বিভিন্ন ভাষায় উপাসনা করে।

জনসেবার ক্ষেত্রে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের অবদান ও ভূমিকা সুপরিচিত। সাতাশটি স্কুল ও বহুবিধ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ধনী দরিদ্র সকলের সেবায় ব্রতী আছেন এঁরা। দুঃস্থদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে মাদার টেরেসা সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের মধ্যে আরমানিরা ব্যবসাসূত্রে কলকাতা পত্তনের বহু পূর্বে, ১৬২৬ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গে আগমন করেন। এঁরাও যথারীতি সঙ্গে নিয়ে আসেন তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস। কলকাতা শহরে এঁদের একমাত্র গির্জা স্থাপিত হয় ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে। আজও ব্রেবোর্ন রোডে অবস্থিত এই গির্জায় মাসে তিন রবিবার উপাসনা হয়। কালের গতিতে কলকাতার আরমানিদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। কিন্তু এখনও তাঁদের অস্তিত্ব পুরোপুরি লোপ পায়নি। যদিও এঁদের সংখ্যা কম, খেলাধুলোর জগতে এঁদের অবদান কিন্তু যথেষ্ট। এঁদের পরিচালিত একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "আর্মেনিয়ান কলেজ" এখনও এই সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও ঐতিহ্য বজায় রেখেছে।

গ্রীকরাও ব্যবসা সূত্রে কলকাতায় আসেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন গ্রীক অরথোডক্স ধর্মীয় বিশ্বাস। গ্রীকদের উপাসনার জন্য ১৭৮১তে স্থাপিত হয় একটি গির্জা—অবশ্য বর্তমানে এটি উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হয় না। ১৯২৬এ কালীঘাটের কাছে আরও একটি গির্জা স্থাপন করা হয়। কিন্তু কলকাতা শহর থেকে গ্রীক সম্প্রদায়ের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে এই গির্জাতেও উপাসনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে গ্রীকদের শেষ পুরোহিত কলকাতা ছেড়ে চলে যান।

বড়দিনের উপাসনা ছবি : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

কেরলের সিরিয়ান অরথোডক্স মণ্ডলীর কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। কলকাতায় এঁদের শাখা আছে। জীবিকা অর্জনের তাগিদে যে সমস্ত দক্ষিণ ভারতীয় সিরীয় খ্রিষ্টান স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস করেন, তাঁদের নিয়েই গঠিত হয়েছে এই সম্প্রদায়। এঁরা তিনটি মণ্ডলীতে বিভক্ত। এঁদের একমাত্র গির্জাঘর ওয়েসলির স্মিথ লেনে অবস্থিত। এই সম্প্রদায়ের সভ্য-সংখ্যা দুই হাজারেরও বেশি।

১৮৮৯তে কেরলের সিরীয়ান সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক ভক্ত, মণ্ডলী সংস্কারের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে নতুন এক সম্প্রদায় গঠন করে, যার নাম হয় মার থোমা চার্চ। ১৯৬৭তে আহিরিপুকুর রোডে এই সম্প্রদায়ের একমাত্র গির্জা স্থাপিত হয়। বর্তমানে এই গির্জার অধীনে বেশ কয়েকটি মণ্ডলী আছে। কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় এঁরা উপাসনা করেন। এঁদের সভ্যসংখ্যা দুই হাজারের কাছাকাছি। মার থোমা চার্চ পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয় আহিরিপুকুর অঞ্চলের বস্তিগুলিতে সেবার কাজ করে।

যে সকল সম্প্রদায়ের নাম করা হয়েছে, তারা ছাড়াও, আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায় কলকাতায় আছে। স্থানাভাবে তাদের সম্বন্ধে বিশদভাবে লেখা সম্ভব হল না।

সংক্ষেপে এই হল কলকাতার খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের চিত্র। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ের শাখা-প্রশাখা এই শহরে আছে। বর্তমানে কলকাতায় সাতান্নটি গির্জায় বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি তামিল, তেলুগু নেপালী, মিজো, নাগা, খাসিয়া, মালায়ালাম ও আরমানি ভাষায় রবিবারের উপাসনা হয়। রবিবারের উপাসনা ছাড়াও বাইবেল শিক্ষা, বড়দের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা, পারিবারিক প্রার্থনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ভক্তগণ তাঁদের ধর্ম পালন করেন।

সারা ভারতে খ্রিষ্টানদের সঠিক সংখ্যা জানা নেই। ১৯৭২এর আদম সুমারী থেকে জানা যায় যে তখন ভারতে খ্রিষ্টানদের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ২·৬০ ভাগ (১·৪ কোটির কিছু বেশি)। ডেভিড বি· ব্যারেটের অনুমানে বর্তমানে ভারতবর্ষে খ্রিষ্টানদের সংখ্যা ৩ কোটির মত। অর্থাৎ ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার চার শতাংশ। সারা ভারতে খ্রিষ্টানদের জনসংখ্যা যাই হোক না কেন, কলকাতায় খ্রিষ্টানদের সংখ্যা আনুমানিক এক লক্ষ থেকে দেড় লক্ষের মধ্যে। মোট জনসংখ্যার তুলনায় যদিও এই সংখ্যা খুবই নগণ্য তথাপি কলকাতার সমাজ জীবনে, বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং জনকল্যাণমূলক কার্যে, খ্রিষ্টানদের অবদান অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষা জগতে দেখা যায় যে প্রায় ছয়টি মহাবিদ্যালয়, মাধ্যমিক এবং উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে চৌত্রিশটি

বিদ্যালয় এবং অনেক কারিগরী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে খ্রিষ্টান সম্প্রদায় কলকাতাবাসীর অক্লান্ত সেবা করে আসছেন। একথা বললে ভুল হবে না, বর্তমানে খ্রিষ্টানদের পরিচালিত ইংরাজি স্কুল-কলেজে শিক্ষা লাভের চাহিদা, যোগানোর তুলনায় অনেক বেশি। এছাড়া হাসপাতাল, সেবাকেন্দ্র, খাদ্য-বস্ত্র বিতরণ সংস্থা, অনাথাশ্রম, কুষ্ঠরোগীদের সেবাকেন্দ্র, মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য বাসস্থান, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা ব্যবস্থা, ছাত্রাবাস, কর্মরত মহিলাদের আবাস, খেলাধুলোর সংস্থার মধ্যে দিয়ে খ্রিষ্টান সম্প্রদায় কলকাতার জনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। নানা দিক দিয়ে তাঁরা কলকাতার সমাজ জীবনে ছাপ রাখতে পেরেছেন।

ভারতবর্ষে তথা কলকাতায় খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও তাদের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খ্রিষ্টানদের বিশেষ আনন্দোৎসব, বড়দিন পালনের চিত্র তুলে ধরা হবে পরবর্তি পর্যায়।

দুই

কলকাতার বড়দিন সম্বন্ধে লিখতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার কথা। ১৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নক যখন হুগলী থেকে হিজলীর (বর্তমান মেদিনীপুরের কন্টাই) দিকে যাবার পথে সুতানুটি গ্রামে বড়দিন উৎসব পালনের জন্য যাত্রা স্থগিত রাখেন। এখানে ছুটির মেজাজে তিনি প্রায় এক মাসেরও অধিক সময় অতিবাহিত করেন। এই ঘটনা থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সুতানুটিতে বড়দিন পালন ও কলকাতা স্থাপনের মধ্যে সম্ভবত এক গভীর যোগসূত্র আছে। এমনও হতে পারে যে বড়দিনের বন্ধে সুতানুটিতে থাকার সময় জোব চার্নকের জায়গাটি খুব পছন্দ হয়। কয়েক বৎসর পরে প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় সুতানুটি ও পাশের অন্যদুটি গ্রাম নিয়ে কলকাতার পত্তন হয়। সুতরাং কলকাতার জন্মের শুভক্ষণের সঙ্গে বড়দিনের সম্পর্ক গভীর। সন্দেহ কি ভারতবর্ষের অন্যান্য মহানগরের তুলনায় কলকাতায় বড়দিনের জাঁকজমক বেশি হবে। বড়দিন পালনের জৌলুসের আরেকটি কারণ ১৯১১ পর্যন্ত কলকাতা ছিল ভারতবর্ষের রাজধানী। সুতরাং বৃটিশ প্রভাবে বড়দিন মহা ধুমধামে পালনের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত হবার পরও বড়দিনের সময় বড়লাট সভাসদ রাজা নবাব সঙ্গে করে আসতেন কলকাতায়। তখনও কলকাতার সাহেব পাড়ায় দোকান বাজার হোটেল রঙিন আলোতে-অলঙ্কারে সাজানো হতো। গড় থেকে তোপধ্বনি হতো এবং বন্দরে বেজে উঠতো জাহাজের ভেঁপু ২৪শে ডিসেম্বরের রাত বারোটায়। গির্জায় গির্জায় মন্দ্রিত ঘন্টাধ্বনির সঙ্গে মিলতো সমুদ্রের গাম্ভীর্য নিয়ে অর্গানের ধ্বনি। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আবেগপূর্ণ গানে মানবপুত্রের শিশুরূপে জন্মগ্রহণের মাহেন্দ্রক্ষণকে স্মরণ করা হতো। ইংরাজি নতুন বছর পর্যন্ত খানাপিনা, শিল্পকলা প্রদর্শনী, পোলো, ক্রিকেট, রেস, কার্নিভাল মিলে সে এক এলাহি উৎসব। তার ঢেউ এসে লাগতো কলকাতার সব কোণে। এখনও সেই মূল ঐতিহ্য বজায় রেখেছে কলকাতা। খ্রিষ্ট মণ্ডলীর সব গির্জাই বড়দিনের উৎসব উদযাপন করে। অবশ্য সকল খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায় ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিন পালন করে না। আরমানিরা যেমন বড়দিনের বদলে ৬ই জানুয়ারি এপিফেনি উৎসব (খ্রিষ্টের কাছে ঐদিন ভিন জাতির জ্যোতিষী পণ্ডিতরা আকাশে তারা দেখে এসেছিলেন) পালন করে। বেহালার অক্সফোর্ড মিশন বড়দিন এবং এপিফেনি দুইই মহোৎসব হিসাবে পালন করে।

কলকাতায় বড়দিনের উৎসব এখন সর্বজনীন রূপ নিয়েছে। বড়দিন বয়ে আনে আশা, আনন্দ এবং শান্তির বার্তা। ভক্তজন কিন্তু এইদিন গভীর লজ্জায় স্মরণ করেন খ্রিষ্টের পদাঙ্ক অনুসরণে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁদের কাছে বড়দিন তাই আত্মসমীক্ষা এবং পরিতাপের দিনও। কবিগুরুর ভাষায় খ্রিষ্টের জন্ম ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, আধ্যাত্মিক।

অধ্যাত্ম আলোচনায় নাইবা গেলাম। বড়দিন ধর্ম এবং প্রত্যয় নির্বিশেষে মানুষের একটি আন্তর্জাতিক উৎসব। শোনা যায় নাস্তিক লেনিন সাহেবও মহানন্দে বড়দিন পালন করতেন।

কলকাতায় বড়দিনের আন্তর্জাতিক চেহারা সাহেব পাড়ায় বজায় আছে আজও। শো উইন্ডোতে বলগা হরিণ, স্লেজ গাড়ি, তুলার তৈরি তুষার এবং সান্টা ক্লজ দিয়ে সাজানো হয়। বিলাতী হোটেলে আর ধনীদের ক্লাবে এখনও খানাপিনার বহর তেমনি প্রবল ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে। মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তদের বাড়িতে কেক খাওয়া, ক্রিসমাস-ট্রি দিয়ে ঘর সাজানোর

প্রাচীন সেক্রেড হার্ট চার্চ *ছবি : শিপ্রা দাস*

রেওয়াজ বেড়েছে। এখন ক্রিসমাস কার্ড পাঠিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় সকলেই করেন।

বড়দিনের সর্বজনীন রূপ নেওয়ার পিছনে বেতার এবং ইদানীং দূরদর্শনের অনুষ্ঠানের ভূমিকা রয়েছে। এই দুই জনমাধ্যম খ্রিষ্টের জন্মকে কেন্দ্র করে বড়দিনের বাণী পৌঁছে দেয় ঘরে ঘরে। কলকাতাবাসী বড়দিনের ছুটি উপভোগের জন্য অনেকেই সপরিবারে চিড়িয়াখানা বোটানিক্যাল পার্ক স্ট্রিট ঘোরেন।

খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী ছাড়া কিছু কিছু ভিন্ন ধর্মী প্রতিষ্ঠানও ধর্মসভার আয়োজন করেন। বড়দিন পালন করেন তাঁরাও। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রতি বৎসর গভীর ভক্তি সহকারে বড়দিন উদ্‌যাপন করেন। কবিগুরুর আমল থেকে শান্তিনিকেতনেও বড়দিন পালন করার রেওয়াজ চলে আসছে।

কলকাতায় বহু ভাষাভাষী নানা সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রিষ্টধর্মী আছেন। বড়দিনের সঙ্গে যুক্ত অনুষ্ঠানগুলিরও রকমফের আছে, একটা মিলও আছে। এঁদের কাছে বড়দিনের একপিঠ পারিবারিক, অন্যপিঠ মাঙ্গলিক।

ঠিক পূজার পর থেকেই বড়দিনের কেনাকাটা শুরু হয়ে যায়। গৃহকর্তা গিন্নীকে নিয়ে জামা কাপড় জুতো কেনেন পরিবারের সকলের জন্য। কাজের লোকও বাদ পড়ে না। মেয়ের বায়না আছে। ছেলে করেছে প্যান্টের কাপড় পেয়ে মুখ ভার। ঘন ঘন আপিল, সালিশী, গৃহিণীর চোখের জল। কর্তার দুশ্চিন্তা। কেকের মশলা কিনে রোদে শুকতে দেওয়া হয়। দিন যত এগিয়ে আসে, ঘর সাফাই ততো বাড়ে। রেস্ত থাকলে কলি ফেরানো হয় ঘরের। কাগজের শিকলি কেটে সাজানো হয় ঘর। বিত্তবানদের টার্কি আর গরীব ঘরে মুরগির খোঁজ পড়ে। ঝাউ গাছ দিয়ে ক্রিসমাস ট্রি তৈরি হয়। আত্মীয় বন্ধুদের ক্রিসমাস কার্ড পাঠিয়ে শুভেচ্ছা জানানোই রীতি—"শিশু প্রভু, যীশু প্রভুর নামে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সুখে থেকো।" বাড়িঘর সাজানোর ব্যাপারে ছোটদের ভূমিকাটাই প্রধান হয়। কাগজ কেটে, বেলুন ফুলিয়ে, মোমবাতি কিনে জায়গা মতো লাগিয়ে আয়োজন চলতে থাকে ডিসেম্বরের গোড়া থেকে। আর যাদের পরীক্ষা নেই তারা গির্জায় গিয়ে যীশুর আগমনী সংকীর্তনের দলে (ক্যারল পার্টিতে) নিয়মিত গলা সাধে। বড়দিন শুধু গির্জায় পালিত হলেই তো আর হল না। তার আগের রাতে নিজের গির্জার সভ্যদের বাড়ি গিয়ে যীশুর আগমনী গাইতে হবে না ? রঙীন কাগজের শিকলি আর ক্রিসমাস ট্রির সঙ্গে সঙ্গে গোশালা তৈরি করার রেওয়াজ আছে কোনও কোনও পরিবারে। অনেকটা ঝুলনের সময় যেমন হয়। গরু ছাগলের মধ্যে মা মেরীর কোলে যীশু, তাঁর পালক পিতা জোসেফ, দেবদূত পরিবৃত হয়ে থাকেন। গোশালা থাক, বা নাই থাক, যীশুর জন্মের মাহেন্দ্রক্ষণ ঘোষণা করেছিল যে তারা, তার প্রতীক ঘরে এবং অনেকে ঘরের বাইরে টাঙান।

যেসব পাড়ায় খ্রিস্টানদের সংখ্যা বেশি, যেমন ইন্টালি, ক্রিক রো, বেকবাগানের বস্তি,

কামারডাঙ্গা, রিপন স্ট্রিট, এলিঅট রোড সেখানে পাড়ার ছেলে ছোকরার দল সকল সম্প্রদায়ের মানুষের চাঁদায়, রাস্তা সাজায় কাগজের পতাকা এবং টুনি বালব দিয়ে। পয়সা বেশি থাকলে আলোকসজ্জার বাহার বাড়ে।

মণ্ডলীগুলিতেও তেমনি বড়দিনের কিছু আগে থেকে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। গির্জাঘর মেরামত, চুনকাম চলে। শুরু হয়ে যায় বড়দিনের গান লেখা, সুর দেওয়া, পুরনো গান ঝালাইয়ের মহড়া। শাস্ত্রপাঠের সঙ্গে যীশুর জন্মবৃত্তান্তের মূকাভিনয় যেসব গির্জায় হয় (বেহালাবাসী বড়দিনের আগেপিছু ট্যাবলো দেখতে আসেন বড়িশার অকস্ফোর্ড মিশনের গির্জায়) সেখানে রিহারসাল চলে। ঝাউয়ের ডাল বা কৃত্রিম পাইন গাছ ঘিরে গির্জাও আলোকমালায় সাজানো হয়।

বড়দিনের আগের রাতে শহরের কোনও কোনও গির্জায় বিশেষ উপাসনা হয়। ক্রিসমাস ট্রি উপহারে সজ্জিত করে ছেলেমেয়েদের পুরস্কার দেওয়া হয়। তরুণ-তরুণী ছেলেমেয়েরা যীশুর আগমনী ক্যারল গান গাইতে বেরোয় দল বেঁধে। পূর্ববঙ্গের মানুষ খোল সহযোগে ভাওয়াইয়া ভাটিয়ালির সুরে ওঁদের স্বরচিত খ্রিস্ট আগমণী গান করেন। নদীয়ার লোকের গানে কীর্তনের সুর ঢুকে পড়ে। ইংরাজি ক্যারলের বিপরীত মেরুতে বাংলা সুরের গান। হালফিল তরুণ গান লেখকদের সুরে ফিলমি সুর যে না ঢুকছে তা নয়।

মধ্যরাতের উৎসবের নানা ঐতিহ্য থাকলেও ২৫শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালীন উপাসনায় নতুন জামাকাপড় জুতো পরে সব গির্জাতেই উপাসকরা ভীড় করে আসেন। প্রভুর ভোজ—রুটি এবং দ্রাক্ষারস তাঁর শরীর এবং রক্তের প্রতীক—পরিবেশিত হয় মানবমুক্তির জন্য তাঁর অবিকল্প আত্মোৎসর্গ স্মরণ করে। গাওয়া হয় তাঁর জন্মোৎসবের গান। পুরোহিত সময়োপযোগী উপদেশ দিয়ে সকলকে এই জন্মের তাৎপর্য বুঝিয়ে দেন। অন্যধর্মাবলম্বী ভক্তজন বড়দিনের উপাসনায় যোগ দেন।

উপাসনার পর করমর্দন, নমস্কার, কোলাকুলি এবং পদধূলি গ্রহণের ধুম পড়ে যায়। কোনও কোনও গির্জায় উপাসনার পর সকলে মিলে চা কেক খান। কোথাও আবার সম্মিলিত প্রীতিভোজের রেওয়াজও আছে। দরিদ্র অনাথদের বস্ত্র বিতরণ এবং খাদ্য পরিবেশন করা হয়। হাসপাতালে রোগীদের কাছে ফল ফুল পৌঁছনো হয় কোথাও কোথাও। গির্জা চলে সদস্যদের দানে। উৎসবে চাঁদা দেন সকলে মুক্ত হস্তে।

তারপর বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়া। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারে বড়দিনের সময় মদ খাওয়ার চল নেই সাধারণভাবে। কিন্তু ব্যতিক্রম যাঁরা, তাঁদের এ বিষয়ে আপত্তি নেই। এমনি খাওয়াটা—কেক পেস্ট্রি, সাহেবী। রেওয়াজ হল ঘরে কেক বানিয়ে বেকারীতে গিয়ে সেঁকে আনা। এতে খরচ অনেক কম হয়। ষাট এক শ' কেজি কেক। কারণ আত্মীয়, পড়শী, বন্ধু আসেন। ঘরে বানানো কেকের মশলা, ডিম, ফল ভাল হয়।

যীশুর জন্মদিনে সুসজ্জিত গীর্জাগৃহ

ছবি : অশোক চক্রবর্তী

এছাড়া দুপুরে চলে পোলাউ বিরিয়ানী মোরগা মোশলাম মোগলাই। যীশু হাজার হোক পশ্চিম এশিয়ার মানুষ। আখরোট, বাদাম, কিসমিস, চকলেট অনেক ঘরেই আপ্যায়নের জন্য মজুত থাকে। তার সঙ্গে পিঠে পায়েস। খ্রিষ্ট মানুষটি আন্তর্জাতিক, সুতরাং পারিবারিক খাওয়ার বৈচিত্র্য ঘটে। হাঁসের বিন্দালু বা কর্তা যদি সাহেব বেশি হন টার্কি রোস্ট চলে। খাওয়ায় পরিবার ভেদে বৈচিত্র্যও প্রচুর।

কিন্তু এহ বাহ্য। কলকাতার খ্রিষ্টধর্মী মাত্রই যে যেমনভাবে বড়দিন পালন করুক, খান না যা খুশি ভোজ্যপেয়, তাঁদের মনে পড়ে যায় দু'হাজার বছর ধরে প্রচারিত খ্রিষ্ট মণ্ডলীর বাণীর ঐতিহ্য—শুভায় ভবতু, কল্যাণ হোক, তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরপুত্র যীশু জন্মেছেন, মানুষের রূপ ধরেছেন তিনি। তোমাদের হৃদয়ে তাঁর আসন পেতে দাও। কবিগুরুর ভাষায় বলতে হয় :

তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছ নীচে,
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।

গ্রন্থপঞ্জী

1. David B. Barrett ed. World Christian. Encyclopedia Nirobi : 1982
2. Calcutta Directory of Christian Workers. Calcutta. 1972
3. J. J. A. Campos. History of the Portuguese in Bengal. Patna. 1979
4. The Catholic Directory of India. 1984. New Delhi. 1985
5. P. Detienne. Christian Directory of West Bengal. Calcutta 1971
6. Directory of the Archdiocese of Calcutta. Calcutta. 1985
7. M. E. Gibbs. The Anglican Church in India. 1600—1970. New Delhi. 1972
8. C. B. Firth. An Introduction to Indian. Church History. Revised Edition. Madras. 1976
9. H. P. Liddon. Chrismastide in St. Paul's. London. 1898
10. J. Richter. A History of Missions in India. London. 1908
11. K. P. Sengupta. The Christian Missonaries in Bengal. 1793—1833 Calcutta. 1971
12. P. Thomas. Christians and Christianity in India and Pakistan. London. 1954

শেষ

জরায়ু ক্যানসার এখন রোধ করা যায়! কিভাবে—পড়ুন:

যাবতীয় ক্যানসারের মধ্যে জরায়ু-র মুখে (সার্ভিক্স) ক্যানসার—পুরোপুরি রোধ করার সম্ভাবনাটা অতি উজ্জ্বল। এক দ্রুত অথচ সহজ প্যাপ্ পরীক্ষার দ্বারাই ধরা পড়ে—'ক্যানসারের দিকে ঝোঁক'···আজ্ঞে হ্যাঁ, ক্যানসারের কবলে পড়ার বহু বছর আগেই! অতএব, অনেক আগে থেকেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নিলে ক্যানসার প্রতিরোধ করা যায়।

প্যাপ্ পরীক্ষা সহজও যেমন—যন্ত্রনারহিতও তেমন! শুধু তুলো দিয়ে চট্‌পট্ ভেতরটি মুছে দেওয়া, ব্যস্!

সময়মত রোধ না করলে পরে কিন্তু নানান বিপজ্জনক নতুন লক্ষণ দেখা দিতে পারে—যেমন অনিয়মিত রক্তস্রাব অথবা যোনিদ্বার থেকে জলীয় পদার্থ বেরোনো, মাসিকের সময় বেশী রক্তস্রাব আর রজোনিবৃত্তি (মেনোপজ)-র পরেও রক্তস্রাব।

এসব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে অতি সহজ পথটি ধরুন না! বছরে অন্ততঃ একটি বার প্যাপ্ পরীক্ষা করান না! কোনো যোগ্য স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে অথবা ইণ্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটির যেকোনো পরীক্ষা কেন্দ্রে (ডিটেকশন সেন্টারে) চলে আসুন!

এখন, ক্যানসার-বীমা!

ইণ্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটি প্রবর্তন করলো ভারতের একমাত্র বীমা পলিসি, যা ক্যানসার রোগ ধরা বা তার চিকিৎসা বাবদ যাবতীয় খরচ যোগায়।সামান্য কিছু টাকা দিন আর আপনি ও আপনার স্ত্রী/স্বামী দুজনেই ৪০,০০০ টাকার আওতায় থাকুন! আরো জিগ্যাসা থাকলে ফোন করুন বা লিখুন।

দেখা করার জন্যে ফোন করুন:

- বম্বে-২০২৯৯৪১/৪২,৪১২৫২৩৮
- দিল্লী-৬১৭৬২৮ • কলকাতা-২৬৪৭৬৪/২৬৭৯০৬

ইণ্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটি

ন্যাশনাল হেডকোয়ার্টার্স: লেডি রতন টাটা মেডিক্যাল অ্যাণ্ড রিসার্চ সেন্টার, এম. কার্ভে রোড, কুপারেজ, বম্বে ৪০০০২১।

তাড়াতাড়ি ধরা মানে তাড়াতাড়ি সারা।

daCunha/ICS/13/86

বিজ্ঞানে নোবেল : ১৯৮৬

সমরজিৎ কর

গের্ড বিনিং ও হাইনরিখ রোহরের-এর তৈরি স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোস্কোপ
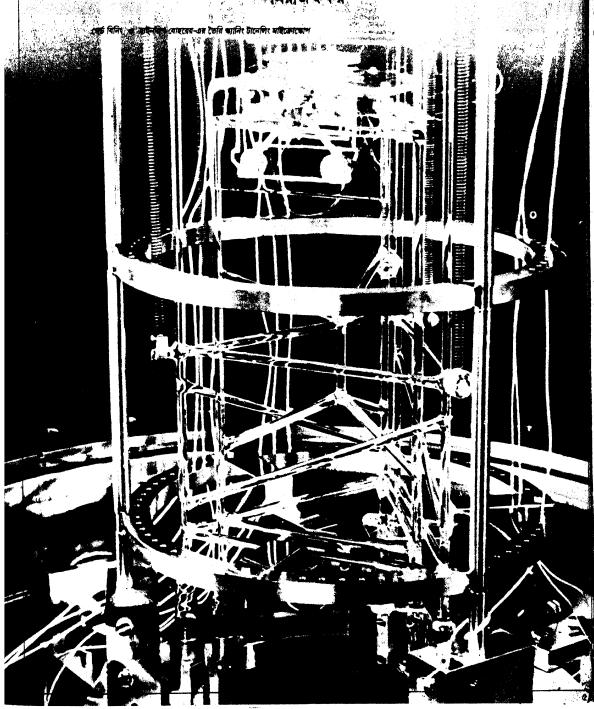
এ বছর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন পশ্চিম জার্মানির অধ্যাপক এরনস্ট রুসকা ও গের্ড বিনিং এবং সুইজারল্যান্ডের হাইনরিশ বোহ্‌রের। রসায়ন বিভাগেও পুরস্কার পেয়েছেন তিনজন—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাড্‌লে হারশবাক, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইয়াং সে লী এবং টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন পোলানি। চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে বৃত হলেন রোমের ন্যাশনাল কাউন্সিল অভ সায়েন্টিফিক রিসার্চের সেলুলার বায়োলজি বিভাগের ডিরেক্টার শ্রীমতী রিতা লেভি-মনতালকিনি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসির নাশভিলস্থিত ভ্যানডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অভ মেডিসিনের ডঃ স্ট্যানলি কোহেন। এ বছর নোবেল পুরস্কারের আর্থিক মূল্য ছিল ২,৯০,০০০ মার্কিন ডলার। পদার্থবিজ্ঞানে এই অর্থের অর্ধেক পেয়েছেন অধ্যাপক রুসকা, অবশিষ্ট অর্ধেক সমান দুইভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে বিনিং এবং বোহ্‌রেরকে।

পুরস্কার ঘোষণার প্রাক্কালে সুইডিশ রয়্যাল আকাডেমি থেকে বলা হয়েছে : "রুসকার কৃতিত্ব ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার। বিংশ শতাব্দীতে এটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। তাঁর এই আবিষ্কার ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে বিপ্লব ঘটিয়েছে। এর জন্যেই তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হল। আর বিনিং এবং বোহ্‌রেরকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হল তাঁদের সাম্প্রতিক আবিষ্কার 'স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোস্কোপের' জন্যে। বিশেষ ধরনের এই অণুবীক্ষণের সাহায্যে এখন যে কোন বস্তুর প্রতিটি পরমাণু পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। 'রিঅ্যাকশন ডাইনামিক্স'-এর উপর অসামান্য গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবে এ বছর তিন বিজ্ঞানীকে রসায়নে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল।"

চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দিয়ে থাকেন সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট। তাঁদের বক্তব্য : "ডঃ লেভি-মনতালকিনি এবং ডঃ কোহেন বিশেষ একশ্রেণীর প্রোটিন যৌগ আবিষ্কার করেছেন। জন্মমুহূর্ত থেকে শুরু করে মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত এই যৌগ নিয়ন্ত্রণ করে শরীরের কোষকলার বৃদ্ধি। সংক্ষেপে এই প্রোটিন যৌগগুলিকে বলা হয় 'গ্রোথ ফ্যাকটরস'। তাঁদের আবিষ্কার, শরীরে বার্ধক্যজনিত অবক্ষয় যা জরা, পেশীর দুর্বলতা, রক্তক্ষরণ রোধে বিলম্ব, ক্যানসার, জন্মগতত্রুটি, প্রভৃতির রহস্য উদ্ঘাটনে যথেষ্ট সাহায্য করবে। তাঁদের গবেষণার সুদূরপ্রসারী দিকটির কথা বিবেচনা করে ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের নোবেল ফাউণ্ডেশন ১৯৮৬ সালের নোবেল পুরস্কার দিয়ে তাঁদের সম্মানিত করেছেন।"

১০ ডিসেম্বর নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তক বার্নার্ড নোবেলের মৃত্যুদিবস। প্রথা অনুযায়ী গত ১০ ডিসেম্বর স্টকহোমে অনুষ্ঠিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রাপকদের হাতে এ বছরের নোবেল পুরস্কার অর্পণ করা হল।

পদার্থবিজ্ঞানে

প্রসঙ্গ অণুবীক্ষণ যন্ত্র। বলা বাহুল্য, অণুবীক্ষণ যন্ত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে ঘটিয়েছে একটি যুগান্তকারী উত্তরণ। আয়তনের ক্ষুদ্রতার দরুন স্থূল চোখে যা ছিল অদৃশ্য, ব্যাকটেরিয়া, বিভিন্ন জীবাণু, উদ্ভিদ এবং প্রাণী-কোষ, সূক্ষ্ম বস্তু কণা প্রভৃতি। বিশেষ এই যন্ত্রের উদ্ভাবনা তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটনে সাহায্য করেছে। পরে এই যন্ত্রের সংস্কার করা হয়েছে অনেক। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বস্তুকণা, জীব-কোষ আরও বিস্তৃতভাবে দেখার সুযোগও বেড়েছে। তবু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, এ ধরনের যন্ত্রের ক্ষমতা যথেষ্ট সীমিত।

যেমন ধরুন, কোন জীব-কোষের প্রতিবিম্ব বিবর্ধিত করে তার দুটি অংশ স্পষ্ট অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করতে চান। এক্ষেত্রে ওই প্রতিবিম্বে সেই অংশে দুটির মধ্যে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখা দরকার। বিজ্ঞানীরা এই দূরত্বটিকে বলে থাকেন

রুসকার কৃতিত্ব ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার। বিংশ শতাব্দীতে এটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। তাঁর এই আবিষ্কার ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে বিপ্লব ঘটিয়েছে।

'রেজোলিউসন' (resolution)। মুশকিল হল, প্রচলিত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় 'আলো'। ওই অংশদুটির পারস্পরিক দূরত্ব আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চেয়ে কম হলে তাদের পৃথক ভাবে দেখা সম্ভব হয় না। তখন মনে হয় তারা পরস্পর যেন একসঙ্গে লেপ্টে রয়েছে। প্রচলিত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যমান আলোর মাধ্যমে দেখলে এই দূরত্ব দাঁড়ায় ৪০০০ অ্যাংস্ট্রমের মত। অ্যাংস্ট্রম আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য মাপার একক, যেমন ওজন মাপার একক গ্রাম। ১ অ্যাংস্ট্রম সমান $১০^{-৮}$ সেন্টিমিটার। অতএব বলাই বাহুল্য সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের 'রেজোলিউসন' ক্ষমতা কম।

এই অসুবিধেটি দূর করার ব্যাপারে বিরাট এক বিপ্লব নিয়ে এল ইলেকট্রন রশ্মি। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, সাধারণ আলোর পরিবর্তে ইলেকট্রন রশ্মি ব্যবহার করলেও বস্তুর বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করা যায়। এ ক্ষেত্রে সাধারণ লেন্সের বদলে ব্যবহার করা যেতে পারে 'ম্যাগনেটিক কয়েল' বা চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী কয়েল। দেখা যায় 'বৈদ্যুতিকক্ষেত্র' বা 'ইলেকট্রিক ফিল্ড'ও লেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সাধারণ আলোর মত ইলেকট্রন কণা যে কোন বিন্দুতে আপতিত করে ম্যাগনেটিক কয়েলের (অথবা ম্যাগনেটিক লেন্সও বলা চলে) সাহায্যে বিবর্ধিত করা যায় ওই বিন্দু। সাধারণ আলোয় বিবর্ধিত প্রতিবিম্বের মত এই প্রতিবিম্ব প্রতিপ্রভ পর্দা (fluorescent screen) অথবা ফোটোগ্রাফিক প্লেটে ধরাও সম্ভব। এটাও দেখা গেল, প্রচলিত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে একাধিক লেন্স লাগিয়ে যেমন বিবর্ধন ক্ষমতা বাড়ান যায়, ঠিক তেমনি এ ক্ষেত্রেও একাধিক ম্যাগনেটিক লেন্সের সাহায্যে ইলেকট্রন রশ্মির মাধ্যমে তোলা বস্তুর প্রতিবিম্ব বহুগুণ বিবর্ধিত করা সম্ভব। শেষোক্ত এই বিষয়টি নিয়ে গুটিকয় বিজ্ঞানী গবেষণা শুরু করেছিলেন বার্লিনের টেকনিকাল ইউনিভার্সিটিতে, ১৯২০র দশকে। এরনস্ট রুসকা তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

রুসকা তখন তরুণ এবং ছাত্র। শিক্ষক ম্যাক্স নল-এর সঙ্গে চৌম্বক লেন্স উদ্ভাবনার ব্যাপারে শুরু করেন গবেষণার কাজ। ওই সময় তিনি কয়েকটি চৌম্বক-লেন্স তৈরি করতে সমর্থ হন। যাদের 'ফোকাল লেংথ' ছিল খুবই স্বল্প। এই সাফল্য তাঁকে খুবই আশান্বিত করে তুলেছিল। কারণ লেন্সের 'ফোকাল লেংথ' যত কম হয়, বিবর্ধন ক্ষমতাও তত বাড়ে। সাধারণ লেন্সের মত পরপর দুটি 'ম্যাগনেটিক লেন্স' ব্যবহার করে স্বল্পকালের মধ্যে তিনি একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করতেও সমর্থ হন। এই যন্ত্রটির বিবর্ধন ক্ষমতা ছিল পনেরগুণ। এরপর তিনি শুরু করেন বিশদ পরীক্ষানিরীক্ষার কাজ। আর তারই ফলশ্রুতি ঘটল ১৯৩৩ সালে। আধুনিক অর্থে ওই বছর এরনস্ট তৈরি করলেন পৃথিবীর প্রথম ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ। যার বিবর্ধন ক্ষমতা দাঁড়াল সাধারণ আলোক-অণুবীক্ষণ যন্ত্রের চেয়ে অনেকগুণ বেশি।

এরনস্টের জীবনে এই উদ্ভাবনা একটি বড় রকমের ঘটনা। বাণিজ্যিক দিক থেকে এই উদ্ভাবনা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা বুঝতে পারলেন জার্মানির সিমেনস কোম্পানি। কালবিলম্ব না করে তাঁরা তাঁকে তাঁদের প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্যে আহ্বান জানালেন। আহ্বানে সাড়াও দিলেন তরুণ এরনস্ট। এখানে এসে প্রচুর সুযোগ সুবিধে পেলেন তিনি। তাঁর তত্ত্বাবধানে ১৯৩৯ সালে সিমেন্‌স ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বাজারে ছাড়লেন প্রথম প্রজন্মের ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় রকমের ঘটনা। এর পর অবশ্য ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের বহু উন্নতি ঘটেছে। সেইসঙ্গে বেড়েছে তার 'রেজোলিউসন' ক্ষমতা। এই যন্ত্রের সাহায্যে এখন ১ অ্যাংস্ট্রমেরও কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট কণার বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব তোলা সম্ভব হচ্ছে।

এরনস্ট রুসকা যে ধরনের যন্ত্রের উদ্ভাবনা করেন তাকে বলা হয় 'ট্রান্সমিশন মাইক্রোস্কোপ'। এক্ষেত্রে যে বস্তুটি পরীক্ষা করতে হয় সেটিকে নিতে হয় একটি 'স্লাইস' বা অত্যন্ত পাতলা টুকরোর মত। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যেমন আলো নিক্ষেপ করা হয় পরীক্ষার সামগ্রীর উপর, এ ক্ষেত্রে আলোর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় ইলেকট্রন রশ্মি। আরও নানা রকম ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ অবশ্য তৈরি হয়েছে। যাদের মধ্যে অন্যতম 'স্ক্যানিং ইলেকট্রন

মাইক্রোস্কোপ'। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা-সামগ্রীর উপর নিক্ষেপ করা হয় সূক্ষ্ম ইলেকট্রন রশ্মি। পরীক্ষা সামগ্রীর উপর নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর সেখান থেকে তখন নির্গত হয় 'পরোক্ষ ইলেকট্রন রশ্মি' বা 'সেকেন্ডারি ইলেকট্রনস'। একটি গ্রাহক যন্ত্রে এই ইলেকট্রন (ইলেকট্রনের প্রবাহ মানে বিদ্যুৎ প্রবাহ) সংগ্রহ করে সৃষ্টি করা হয় প্রতিবিম্ব। একটি ছবির বিভিন্ন অংশ পরপর জুড়ে টেলিভিশনের পর্দায় যেভাবে ছবিটির পূর্ণাঙ্গ চেহারা ফুটে ওঠে, এ ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঘটে সেই রকম। এ ধরনের মাইক্রোস্কোপে তোলা ছবির প্রতিটি অংশ আরও স্পষ্ট এবং গভীরতর হয়, সেইসঙ্গে থাকে ত্রিমাত্রিক চরিত্র। এ ধরনের যন্ত্রের 'রেজোলিউসন' ক্ষমতা ট্রানসমিশন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের চেয়ে কম। তবে উভয় যন্ত্র পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষেত্রে 'আধুনিকতম সংযোজন 'স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোস্কোপ।' অন্যান্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তুলনায় বিশেষ এই যন্ত্রের কার্যপ্রণালী কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। এই যন্ত্রের কার্যপ্রণালী কতকটা অন্ধদের 'ব্রেইল-রিডিং'-এর মত। শেষোক্ত ক্ষেত্রে পুরু কাগজের উপর উঁচুনিচু সংকেতের সাহায্যে গ্রথিত করা হয় বর্ণমালা। সেই বর্ণমালার স্পর্শ উপলব্ধি করা হয় আঙুলের স্পর্শে। একজন দৃষ্টিহীন তার আঙুলের স্পর্শে সেই বর্ণমালার অর্থ বুঝে নিতে পারেন। স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোস্কোপের ক্ষেত্রেও কাজে লাগান হয় এই একই পদ্ধতি। যে কোন বস্তুর উপরিতল স্থূল দৃষ্টিতে যত মসৃণই মনে হোক না, আনুবীক্ষণিক অর্থে সেই তলের উপর থাকে কল্পনাতীত রকমের সূক্ষ্ম উঁচুনিচু বৈশিষ্ট্য। এর জন্যে সেই উঁচুনিচু অংশ উপলব্ধি করার জন্যে দরকার অতি সূক্ষ্ম একটি ব্যবস্থা। যাকে ইংরেজিতে বলা হয় স্টাইলাস (stylus)। যার ধরনটা হয় সূচের সূক্ষ্ম ডগার মত। স্টাইলাসের ডগা যদি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়, অল্প সময়ে সেটি নষ্ট হয়ে যায়। আবার কম সূক্ষ্ম হলে বস্তুর তলের সূক্ষ্ম উঁচুনিচু অংশ উপলব্ধি করা শক্ত হয়ে ওঠে। এসব কথা বিবেচনা করে ঠিক করা হয়, স্টাইলাসের ডগা সূক্ষ্মভাবেই তৈরি করা হবে এবং বস্তুর তলের সংস্পর্শে যাতে না আসে সেদিকে দেখতে হবে। ঠিক হল, যতটা সম্ভব 'স্টাইলাস' থাকবে বস্তুর তলের নিকটতম অঞ্চলে। ওই অবস্থায় বস্তুর তল এবং স্টাইলাসের ডগার মধ্যে স্থাপন করা হবে বিশেষ মাত্রার তড়িৎ বিভেদ (voltage difference)। ওই অবস্থায় বস্তুর তল এবং স্টাইলাসের ডগার মধ্যে প্রবাহিত হবে বিদ্যুৎ। সেই প্রবাহই সৃষ্টি করবে তলের বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব। বলাবাহুল্য, তলের যে স্থানটি অপেক্ষাকৃত উঁচু স্টাইলাস সেখানে উপস্থিত হলে বিদ্যুৎপ্রবাহের মাত্রা দাঁড়াবে একরকম, তলের যে স্থানটি অপেক্ষাকৃত নিচু, সেখানে ভিন্নতর হবে বিদ্যুৎ প্রবাহের মাত্রা। বিদ্যুৎ প্রবাহের এই তারতম্যই ফুটিয়ে তুলবে বস্তুর তলের প্রতিবিম্ব, যে দৃশ্যমান আলোর মাত্রা ফুটিয়ে তোলে সাদা-কালো ছবি। দৃষ্টিহীনের আঙুল যেমন

রিতা লেভি-মনতালচিনি

একটি মাত্র ডিম্বকোষ ক্রমান্বয়ে বিভাজিত হয়ে সৃষ্টি করে বিভিন্ন কোষকলা। ধীরে ধীরে বিকশিত হয় প্রাণীর অবয়ব। মজার ব্যাপার হল, একটি নির্দিষ্ট আকৃতি বা আয়তন লাভ করার পর এই বৃদ্ধি বন্ধ হয়। দেহের কোষকলার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে এক শ্রেণীর যৌগ—গ্রোথ ফ্যাকটর।

অধ্যাপক ডাডলে হারশবাক

'ব্রেইল'-এর উপর সঞ্চারিত হয়ে পাঠগ্রহণ করে, ঠিক তেমনি 'স্টাইলাস' এক্ষেত্রে তলের উপর বিচরণ করে প্রতিটি অংশের ছবি তুলতে সাহায্য করবে। এই বিচরণের জন্যে 'সার্ভো' পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

গোড়ায় এই পদ্ধতি উদ্ভাবনার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ব্যুরো অব স্ট্যান্ডার্ডের পদার্থবিজ্ঞানী রাসেল ইয়ং। তিনি স্টাইলাসের ডগা এবং পরীক্ষা সামগ্রীর তলের মধ্যে ২০০ অ্যাংস্ট্রমের মত দূরত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হন। গের্ড বিনিং এবং হাইনরিশ রোহ্‌রের সুইজারল্যান্ডের জুরিখে আই বি এম রিসার্চ ল্যাবোরেটরিতে এই সমস্যাটি নিয়ে যুগপৎ গবেষণা করেন এবং স্টাইলাস থেকে তলের দূরত্ব ২ অ্যাংস্ট্রমের মধ্যে বজায় রাখতে সমর্থ হন। এই কৃতিত্বের দরুনই তাঁদের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। তাঁদের আবিষ্কার সেমিকনডাকটার ফিজিক্স, মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্স প্রভৃতিতে ব্যবহৃত সূক্ষ্ম বস্তু সামগ্রীর পর্যবেক্ষণে সাহায্য করবে। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অনুঘটকের তল কিভাবে সাহায্য করে, ডি এন এ অণুর আরও সূক্ষ্মতম প্রতিবিম্ব তৈরি এমন আরও অনেক ব্যাপারেও সাহায্য করবে।

এরনস্ট রুসকার জন্ম ২৫ ডিসেম্বর, ১৯০৬। শিক্ষা প্রথমে মিউনিখের টেকনিকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে, পরে বার্লিনের টেকনিকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৩৩ সালে বার্লিন থেকে তিনি ডকটরেট হন। যোগ দেন সিমেনস এজি-তে। ১৯৫৫ সাল থেকে তিনি ফ্রিট্‌জ-হেবার-ইনসটিটিউটের ইনসটিটিউট অব ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপির ডিরেকটার। ১৯৫৯ সালে ইলেকট্রন অপটিকস এবং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপির অধ্যাপক।

গের্ড বিনিং-এর জন্ম ২০ জুলাই ১৯৪৭। ফ্র্যাংকফুর্টে। ১৯৭৮-এ ফ্র্যাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি· এইচ· ডি। হাইনরিখ রোহ্‌রের-এর জন্ম ৬ জুন, ১৯৩৩, সুইজারল্যান্ডের বাকস-এ। ১৯৬০ সালে সুইস ফেডারেল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে পি-এইচ-ডি। গের্ড এবং হাইনরিশ ১৯৬৩ থেকে জুরিখের আই বি এম রিসার্চ ল্যাবোরেটরির সঙ্গে জড়িত রয়েছেন।

রসায়নে

রসায়নে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা প্রসঙ্গে সুইডিস রয়াল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস মন্তব্য করেন : " 'রিঅ্যাকশান ডাইনামিকস' বা রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবিষয়ক তাঁদের তত্ত্বাবলীর গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই অধ্যাপক ডাডলে হারশবাক, অধ্যাপক ইয়াং সে লী এবং অধ্যাপক জন পোলানিকে পুরস্কৃত করা হল। তাঁদের আবিষ্কার এই মুহূর্তে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যে খুব কাজে লাগবে, সেকথা অবশ্য বলা যায় না। তবে একথা বলা যায়, প্রকৃতিতে রয়েছে অজস্র মৌলিক পদার্থ। তাদের পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে কিভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়া চলে এই তিন বিজ্ঞানীর আবিষ্কার সে ব্যাপারে নতুন

আলোক যোগাতে সমর্থ হবে ; জানা যাবে রাসায়নিক বিক্রিয়ার অনেক অজ্ঞাত কারণ, নিয়ন্ত্রণ করা যাবে বহু বিক্রিয়া।"

অনেকেই জানেন, গ্যাস এবং তরল বস্তুর অণুপরমাণু সব সময় থাকে গতিশীল অবস্থায়, তাদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে চলে সংঘর্ষ। অণুগুলি পরস্পর সংস্পর্শে এলে ঘটে দুটি ঘটনা। এক, তাদের পরস্পরের মধ্যে পরমাণুর বিনিময় ঘটতে পারে। দুই, একই অণুর পারমাণবিক সজ্জায় ঘটতে পারে পরিবর্তন। এর ফলে, সৃষ্ট হয় নতুন অণু। যাদের রসায়নবিদ্‌রা বলে থাকেন 'প্রোডাক্ট মলিকিউলস' বা বিক্রিয়ার দরুন সৃষ্ট অণু। এই ঘটনাকেই বলে রাসায়নিক বিক্রিয়া। কিভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, কিভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার পরিমাপ করা হয়, এ সব ব্যাপারে বিবরণ যোগায় রসায়নের যে ক্ষেত্রটি সেই ক্ষেত্রটিকেই বলা হয়ে থাকে 'কেমিকাল রিঅ্যাকশন কাইনেটিকস'। গত কয়েক দশকে এই ক্ষেত্রটির যথেষ্ট বিস্তার ঘটেছে, বিশেষ করে পরীক্ষাগত পদ্ধতির ব্যাপারে। বস্তুত যে সব রাসায়নিক বিক্রিয়া অতি দ্রুত সংঘটিত হয় তাদের উপর উল্লেখযোগ্য গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৬৭ সালে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল তিন বিজ্ঞানীকে—এম· আইগেন, আর· জি· ডব্লু নরিস এবং জি· পোর্টার। তবু অনেক ক্ষেত্রেই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অণুর বিভিন্ন ভূমিকা সম্পর্কে বহু মৌলিক রহস্য এখনো অনাবৃতই থেকে গেছে।

এ-দিক থেকে দেখতে গেলে হারশবাক এবং লী'র পদ্ধতি খুবই অভিনব। এই পদ্ধতিতে প্রথমে পৃথকভাবে নেওয়া হয় বিভিন্ন গ্যাসীয় অণু। পরে এক একটি বস্তুর গ্যাসীয় অণু রশ্মির মত প্রবাহিত করা হয় বায়ুশূন্য আধারের ভেতর। রশ্মির মত সঞ্চারিত বিভিন্ন পদার্থের গ্যাসীয় অণু ওই আধারের ভেতর পারস্পরিক সংঘর্ষে কিভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে থাকে সে সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য জুগিয়েছেন হারশবাক এবং লী। পক্ষান্তরে পোলানি তৈরি করেছেন 'কেমিলুমিনিসেন্স' বা রাসায়নিক প্রতিপ্রভা তৈরির নতুন একটি পদ্ধতি। বিক্রিয়ার সময় কোন কোন ক্ষেত্রে অণু থেকে নির্গত হয় অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণ অবলোহিত রশ্মি। উদাহরণস্বরূপ হাইড্রোজেন পরমাণু এবং ক্লোরিন অণুর কথা ধরা যেতে পারে। তাদের পারস্পরিক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নির্গত হয় উত্তাপ শক্তি। সৃষ্ট হয় হাইড্রোজেন ক্লোরাইড। বর্ণালী বিশ্লেষণ পরীক্ষায় দেখা গেছে তাপত্যাগী এই বিক্রিয়ার গোড়ার দিকে বেশির ভাগ শক্তি কম্পনরত হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অণুর মধ্যে আবদ্ধ থাকে।

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস থেকে বলা হয়েছে, এই আবিষ্কার 'কেমিকাল লেজার' তৈরির সহায়ক। তাপ-পারমাণবিক সংযোজনের সময় হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস সংযোজিত হয়ে সৃষ্টি করে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস এবং উত্তাপ শক্তি। হারশবাক, লী এবং পোলানির গবেষণা এ ধরনের বিক্রিয়া সম্পর্কেও জোগাতে সমর্থ হবে অনেক নতুন তথ্য। কোন কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় অত্যন্ত কম সময়ে—এক পিকো সেকেন্ডের ভেতর। ওই সময় বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী অণু এবং বিক্রিয়ার দরুন সৃষ্ট অণুর ছবি তুলতেও সাহায্য করেছে তাঁদের পদ্ধতি। এর ফলে বিভিন্ন ওষুধপত্র, কীটনাশক, এবং ডি-এন-এ-র মত অতিকায় অণুর নতুন রাসায়নিক চরিত্রও জানা যাবে। জানা যাবে বায়ুমণ্ডলে যে সব রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়, বিশেষ করে ওজন স্তরে দূষণের দরুন, তারও রহস্য। অর্থাৎ এই ত্রয়ী বিজ্ঞানীর আবিষ্কার বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার অজ্ঞাত রহস্যাবলী উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ডাডলে রবার্ট হারশবাক-এর জন্ম ১৮ জুন, ১৯৩২, ক্যালিফোর্নিয়ার সান হোসে শহরে। ১৯৫৮ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি। ১৯৬৩ থেকে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি রসায়নের অধ্যাপক হিসেবে জড়িত রয়েছেন। ইয়াং সে লী'র জন্ম ২০ নভেম্বর, ১৯৩৬। ১৯৬৫ সালে বার্কলেস্থিত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি। ১৯৭৪ থেকে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক। জন চার্লস পোলানির জন্ম ২৩ জানুয়ারি, ১৯২৯। ইংলন্ডের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫২ সালে পি-এইচ-ডি। ১৯৬২ থেকে টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে

বিগত দুই দশক ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জীব-রাসায়নিকরা বিশেষ এক শ্রেণীর জীব-রাসায়নিক যৌগ নিয়ে গবেষণা করে আসছেন, যাদের সাধারণ ভাবে বলা হয়ে থাকে 'গ্রোথ ফ্যাক্টরস'। স্ত্রী এবং পুরুষ জনন কোষের মিলনে সৃষ্ট হয় ডিম্ব-কোষ। মিলনের অব্যবহিত পর সেই ডিম্বকোষ বিভাজিত হতে শুরু করে। সৃষ্টি করে কত রকমেরই না কোষকলা। ডিম্বকোষ থেকে ধীরে ধীরে বিকশিত হয় প্রাণীর অবয়ব। সেই অবয়ব বৃদ্ধি পেতে পেতে সৃষ্ট হয় পূর্ণাঙ্গ একটি প্রাণী—হাঁস মুরগি ইঁদুর বানর এবং মানুষ। মজার ব্যাপার হল, দৈহিক এই বৃদ্ধির একটি সীমাও থাকে। একটি নির্দিষ্ট আয়তন বা আকৃতি লাভ করার পর বৃদ্ধি বন্ধ হয়।

বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন, দেহের কোষকলার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে এক শ্রেণীর যৌগ—গ্রোথ ফ্যাক্টরস, কোষকলার অভ্যন্তরেই যাদের উৎপাদন ঘটে। বিভাজন ঘটিয়ে কোন কোষকলার কখন বৃদ্ধি করতে হবে, কতটা বৃদ্ধি করতে হবে, এই গ্রোথ ফ্যাক্টরগুলিই তা নিয়ন্ত্রণ করে। নোবেল কমিটি বলেছেন, "কোষ বৃদ্ধি-নিয়ন্ত্রণকারী" দুটি যৌগ আবিষ্কারের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বছর নোবেল পুরস্কার পেলেন রিতা লেভি-মনতালকিনি এবং স্ট্যানলি কোহেন। মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁদের এই অবদান যথেষ্ট সুদূরপ্রসারী হবে বলেই তাঁদের বিশ্বাস।

অধ্যাপক কোহেনের জন্ম ব্রুকলিন-এ, ১৯২৩ সালে। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জীবরসায়নে পি-এইচ-ডি। ১৯৫৯ সাল থেকে তিনি ভ্যানডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। ডঃ লেভি-মনতালকিনির জন্ম ইটালির তুরিন-এ, ১৯০৯ সালে। ১৯৩৬ সালে সেখান থেকে তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানে ডিগ্রি লাভ করেন। কয়েক বছর পর ১৯৪০-এর দশকের শেষে গবেষণার জন্যে তিনি চলে আসেন সেন্ট লুই-তে। ১৯৬৯ সালে তাঁকে রোমের ল্যাবোরেটরি অব সেল বায়োলজির ডিরেক্টারের পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি যুগপৎ মার্কিন এবং ইটালির নাগরিক।

১৯৫০-এর দশকে কোহেন এবং লেভি-মনতালকিনি পরস্পর সহযোগী হয়ে কাজ করেন। তাঁদের গবেষণা পরবর্তীকালে একাধিক 'গ্রোথ ফ্যাকটর' আবিষ্কার এবং কোষকলার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা জানার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। বহু গবেষক বুঝতে পেরেছেন, ক্যানসার সৃষ্টির পেছনেও কাজ করে 'গ্রোথ ফ্যাকটর'।

উদাহরণ হিসেবে ক্যানসারের কথাই ধরুন। ১৯৭০-এর দশকে আবিষ্কৃত হয় বিশেষ এক ধরনের 'জিন' নাম 'অনকোজিন'। স্বাভাবিক অবস্থায় 'অনকোজিন' শরীরে 'গ্রোথ ফ্যাকটর' হিসেবে কাজ করে। অস্বাভাবিক হলে তারাই আবার সৃষ্টি করে ক্যানসার। খাদ্য থেকে বিকিরণ সুপ্ত 'অনকোজিন'-কে জাগরিত করে। জোগায় ক্যানসার সৃষ্টির ক্ষমতা। কিভাবে এমনটি ঘটে সেটা অবশ্য এখনো জানা যায়নি। কোহেন এবং লেভি-মনতালকিনির গবেষণা বিশেষ এক ধরনের হরমোনের সাহায্যে ক্যানসার নিরাময়মূলক উদ্যোগ সার্থক করে তুলেছে। হরমোনটির নাম ইনটারলিউকিন-২। এর জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউটের গবেষকরা ক্যানসার রোগীর শরীর থেকে প্রথমে সংগ্রহ করে নেন রক্তের শ্বেত কণিকা। পরে ওই শ্বেতকণিকাগুলির সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটান ইন্টারলিউকিন-২-এর। অতঃপর শ্বেতকণিকাগুলি রোগীর শরীরে ইঞ্জেকশনের সাহায্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কোষগুলি রোগীর শরীরে ঢুকে বিভাজিত হতে থাকে এবং ফুসফুস, মলাশয়, কিডনি এবং ত্বকের ক্যানসারদুষ্ট কোষ ধ্বংস করে বলে মনে হয়। ব্যাপারটা এখনো পর্যন্ত অবশ্য পরীক্ষার পর্যায়ে রয়েছে।

১৯৫২ সালে লেভি-মনতালকিনি আবিষ্কার করেন স্নায়ুকোষের গ্রোথ ফ্যাকটর। এই আবিষ্কারই তাঁকে এনে দিল নোবেল পুরস্কার। কোহেন গোড়ার দিকে তাঁর সঙ্গে স্নায়ুকোষের 'গ্রোথ ফ্যাকটর' নিয়েই গবেষণা করেন। পরে স্বতন্ত্রভাবে আবিষ্কার করেন আরও একটি 'গ্রোথ ফ্যাকটার' নাম, 'এপিডারম্যাল গ্রোথ ফ্যাকটার'। এই বস্তুটি ত্বক এবং চোখের বহিরাংশের কোষকলার বৃদ্ধির ব্যাপারে সাহায্য করে। নোবেল কমিটি মনে করেন, তাঁর আবিষ্কার শল্য চিকিৎসা এবং আগুনে পোড়ার দরুন ক্ষতিগ্রস্ত ত্বক এবং কর্নিয়া সারিয়ে তুলতে সাহায্য করবে। এর জন্যেই নোবেল পুরস্কার দিয়ে অধ্যাপক কোহেনকে সম্মানিত করা হল। প্রেম

বৈ দে শি কী

গোর্বাচেভের যে ভাষণ চীনের দিকে তাকিয়ে

অরুণ বাগচী

সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনা মহাকাশচারীদের প্রশিক্ষণ দেবে এই ধরনের একটা গুঞ্জন কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে। গুরুত্ব দিয়ে এই খবরটা বহু কাগজে ছাপাও হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য জানেন যে এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল করার জন্য সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সচিব মিখাইল গোর্বাচেভ যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন চীনা মহাকাশচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়াটা তারই অঙ্গীভূত। 'ভলাডিভোস্টক স্পিচ' বলে উল্লিখিত গোর্বাচেভের বক্তৃতা এই প্রয়াসের স্বরূপটা উদ্ঘাটিত করে দেয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মিখাইল গোর্বাচেভ যে কতখানি প্রভাব এর মধ্যেই বিস্তার করতে পেরেছেন নানাভাবে তার আভাস মিলছে। এই বছর তাঁর দেওয়া বহু বক্তৃতাই রাজনীতি পর্যবেক্ষকরা গভীরতর বিশ্লেষণের বিষয় বলে গ্রহণ করেছেন।

২৮জুলাই তারিখে ভলাডিভোস্টকে ভাষণ দিতে গিয়ে গোর্বাচেভ 'এশীয় প্রতিবেশী ও মিত্র' দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের কথা বিশেষভাবে বলেন। বলা বাহুল্য চীন এই প্রসঙ্গে আসবেই। চীনের সঙ্গে কিছু বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মত পার্থক্য আছে তা স্বীকার করে নিয়েও গোর্বাচেভ বলেন যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উভয় দেশেরই স্বার্থ অভিন্ন।

চীনের সরকার পরিষ্কার বলেছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর রাজনৈতিক সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে বাধা তিনটে (Three Obstacles)—সবাই জানেন সর্ব বিষয়ে সংখ্যা দিয়ে কথা বলা চীনাদের দুর্বলতা। প্রথম বাধা : ভিয়েতনামের কামপুচিয়া দখল করে রাখা এবং সে ব্যাপারে ভিয়েতনামকে সোভিয়েত সমর্থন। দ্বিতীয় বাধা : সোভিয়েত সৈন্য পাঠিয়ে কার্যত আফগানিস্থান দখল করে রাখা। তৃতীয় বাধা : চীন-সোভিয়েত সীমান্তে এবং চীন-মঙ্গোলীয় সীমান্তে বিপুল সংখ্যক সোভিয়েত সৈন্য রাখা। এর মধ্যে অন্তত দুটি ক্ষেত্রে মিখাইল গোর্বাচেভ নরম ভাব দেখিয়েছেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আফগানিস্থান থেকে কিছু সোভিয়েত সৈন্য সরান হবে, এবং প্রতিশ্রুতিমত সেই কাজটি তিনি করেছেন। মঙ্গোলীয় সীমান্ত থেকেও সোভিয়েত সৈন্যসংখ্যা কমান হয়েছে, এবং চীনের কাছে তিনি প্রস্তাবও রেখেছেন যে যৌথভাবে আলোচনা করে সোভিয়েত স্থলসেনা এবং চীনা স্থলসেনা দুটোই সমানহারে কমান হবে। কামপুচিয়ার ব্যাপারে অবশ্য গোর্বাচেভ রুশসরকারী নীতি একটুও বদলাবে এমন আভাস দেননি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেং শিয়াও-পিঙ পরিচালিত চীন যে আমেরিকার দিকে অনেকখানি ঘেঁষে গেছে এবং পশ্চিমা দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক সংযোগ বাড়াচ্ছে এটা সোভিয়েত ইউনিয়নের মনঃপূত হতে পারে না। এজন্যই চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার চেষ্টা। যোগাযোগ এবং প্রযুক্তিগত সম্পর্ককে উন্নত করার অর্থ পরোক্ষভাবে শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা। অন্ততপক্ষে সীমান্তবর্তী এলাকায় বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ এর ফলে ঘটবেই। সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়া সম্ভব। এমনকি কনসুলেট খোলাও হতে পারে, যার ফলে বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে কূটনীতির ক্ষেত্রেও সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বাড়বে। যদিও, বলাই বাহুল্য, গোর্বাচেভের ভলাডিভোস্টক বক্তৃতার আগেই যোগাযোগ, প্রযুক্তি ও ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বাড়াবার প্রস্তাব কার্যকর ছিল। গোর্বাচেভ ওই দিকে ঝোঁক অনেকখানি বাড়িয়ে দিলেন, এটা ঠিক।

চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যে সীমান্তবিরোধ, যা নিয়ে ১৯৬৯ সালে রক্তক্ষয়ী ও প্রাণবিনাশী সংঘর্ষ ঘটেছিল দুই দেশের মধ্যে, সেক্ষেত্রেও চীন সরকারকে আলোচনায় আগ্রহী করতে চান গোর্বাচেভ। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে সীমান্ত নিয়ে আলোচনা চলেছে। অফলপ্রসূ আলোচনা পরিত্যক্তও হয়েছে। সেই ১৯৬৯ সালে শুরু হয়ে সংঘর্ষ মাঝে মাঝেই ঘটে থাকে। এবছর জুলাই মাসেও সশস্ত্র সংঘর্ষে একজন চীনা সৈন্য মারা গেছে। যাইহোক, সীমান্তরেখা নির্ণয়ের ব্যাপারেও চীনাদের কিছুটা নরম মনোভাব দেখাতে রাজী হয়েছেন গোর্বাচেভ। আমুর নদী বা উসুরি নদী বরাবর সীমান্ত রেখা টানার ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন বলেছে যে নদীর মাঝ বরাবর, মূল স্রোত ধরে, ওই রেখা নির্দিষ্ট হবে। এই ছাড়ে চীন সরকারের খুশি হবার কথা। কারণ আন্তর্জাতিক আইনানুযায়ী নদীর 'সেন্ট্রাল চ্যানেল' বরাবর সীমান্ত রেখা চলবে, চীনাদের এই যুক্তি এতকাল সোভিয়েত ইউনিয়ন অগ্রাহ্য করে এসেছে। আসলে উসুরি নদীর মাঝেকার দ্বীপগুলি কোন দেশের ভাগে পড়া উচিত তাই নিয়েই দুই দেশের মধ্যে সীমান্তবিরোধের সূচনা।

মিখাইল গোর্বাচেভের প্রস্তাবাদি চীনের সরকারী মহলে তুমুল সাড়া জাগাবে, এই ধরনের আশা যাঁদের ছিল তাঁরা নির্ঘাৎ হতাশ হয়েছেন। চীনের এক নম্বর নেতা দেং শিয়াও-পিঙ অবশ্য একথা বলেছেন যে 'ভলাডিভোস্টক বক্তৃতা'য় কিছু পরিষ্কার ও গঠনমূলক কথা আছে। সেই সঙ্গে আবার এটাও জুড়ে দিয়েছেন যে চীন-সোভিয়েত সম্পর্ককে স্বাভাবিক করার ব্যাপারে খুব বড় কোনও পদক্ষেপ কিন্তু গোর্বাচেভ নেননি। ওই 'তিনটি বাধা' দূর হয়নি। অগাস্টের ৫ তারিখে এবং সেপ্টেম্বরের ৩ তারিখে জাপান থেকে আসা রাজনীতিবিদ দলের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে ওই মন্তব্য করেন দেং। একই সমালোচনা ধ্বনিত হয়েছে উ জুকিয়ান অর্থাৎ চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কণ্ঠে। উ স্পষ্টই বলেছেন যে কামপুচিয়া থেকে ভিয়েতনামী সৈন্য সরবে কি সরবে না, সে বিষয়ে একদম মুখ খোলেননি গোর্বাচেভ। অথচ তাঁর সরকারের কাছে ওটা

হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কামপুচিয়ার ব্যাপারে সোভিয়েত সরকারের মনোভাব বেজিংকে বিরক্ত করেছে অন্য আর একটি কারণে। সবাই জানেন যে হানয়ের ওপর মস্কোর প্রভাব খুবই বেশী। তাদের মধ্যে দীর্ঘ বন্ধুতার সম্পর্ক। আর বেজিং এবং হানয়ের মধ্যে বরাবরই সম্পর্ক শীতল। ভিয়েতনাম সরকারের অভিযোগ, যখন হানয়ের কমিউনিস্ট সরকার দক্ষিণ ভিয়েতনামী সাইগন কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে নিযুক্ত, যখন আকারে ও শক্তিতে অকিঞ্চিৎকর উত্তর ভিয়েতনাম প্রবল প্রতাপান্বিত মার্কিন সরকারের সঙ্গে পঞ্জা লড়ছে শুধু মনের শক্তিতে এবং আদর্শের জোরে, তখন আর এক কমিউনিস্ট মহাশক্তি চীন তাকে আন্তরিক সাহায্য দিতে এগিয়ে আসেনি। অস্ত্রাদি ও খাদ্যসরবরাহ নিয়মিত এসেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে। স্থলপথে আসা সেই সহায়তা কখনও কখনও চীন সরকার সীমান্তে আটক রেখেছে নানা বাহানায়। আমেরিকার সঙ্গে চীনের যখন সমঝোতা হল, পৃথিবী চমকে গেছে, ভিয়েতনামীরা ছাড়া। ভিয়েতনাম সহজে চমকায় না। ১৯৭৯ সালে চীন ও ভিয়েতনামে সংঘর্ষ বেধে গিয়েছিল। তখন ভিয়েতনাম সরকারের এক উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তি বর্তমান প্রতিবেদককে বলেছিলেন, 'এটা আর এমন নতুন ঘটনা কী! প্রত্যেক শতাব্দীতেই অন্তত একবার চীনাদের সঙ্গে আমাদের লড়তে হয়েছে। বরাবরই চীন আক্রমণকারী। বরাবর জিতেছি আমরাই।' সে যাই হোক, সোভিয়েত সরকার কামপুচিয়ার ওপর থেকে ভিয়েতনামের হাত সরাবার চেষ্টা করছে না বলে চীনারা খুব বিরক্ত। তদুপরি চীন-ভিয়েতনাম সম্পর্ক উন্নত করার অনেকখানি দায় গোর্বাচেভ চাপিয়ে দিয়েছেন চীনেরই ওপর। সোভিয়েত নেতা আহ্বান জানিয়েছেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে সেখানকার পরিস্থিতির উন্নতিসাধনের জন্য, আশিয়ান দেশগুলির সঙ্গে ইন্দোচীনের দেশগুলির সম্পর্ক নিকটতর করবার জন্য, পারস্পরিক সমঝোতা বাড়ানর জন্য। চীনের মতে এটা হল ইন্দোচীন সম্বন্ধে ভিয়েতনামের নীতিকেই সমর্থন জানান। এতে চীন খুশি হতে পারে না। সেই কারণে ইন্দোচীন দেশগুলির বিদেশ মন্ত্রীদের বৈঠকের শেষে যে ইস্তাহার প্রকাশিত হয় ১৮ অগাস্ট, তাতে ভিয়েতনাম বলে যে চীনের সঙ্গে 'যে কোনও স্তরে, যে কোনও জায়গায়' ('at any level and anywhere whatsoever') আলোচনায় বসতে তারা প্রস্তুত, কিন্তু চীন তা সরাসরি নাকচ করে দেয়। গোর্বাচেভের বক্তব্যের উপর নির্ভরশীল ভিয়েতনামের প্রস্তাব চীনের আদৌ পছন্দ হয়নি। চীন-ভিয়েতনাম সম্পর্কের অবনতির জন্য চীন নিজেকে দায়ী বলেও মনে করে না, আর ওই সম্পর্কের উন্নতিবিধানে তাকেই সচেষ্ট হতে হবে তাও স্বীকার করে না। সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরোক্ষভাবে টেনে আনাও চীনের উদ্দেশ্য। জনৈক মার্কিন সাংবাদিককে দেং-শিয়াও-পিঙ বলেন: "সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি (কামপুচিয়া থেকে) ভিয়েতনামী সেনাদের সরে আসার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে, তবে চীন-সোভিয়েত সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলা সহজ হবে। একটা প্রধান বাধা দূর হবে।...আর এই সমস্যা দূর হলে আমি গোর্বাচেভের সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়ে যাব।" দেং-এর এই বক্তব্যের উপর খুব জোর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ সার্বভৌম সোভিয়েত নেতা গোর্বাচেভের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনার কথা এই প্রথম দেং বললেন।

চীন-সোভিয়েত বা চীন-মঙ্গোলীয় সীমান্তে সেনাহ্রাসের যে প্রস্তাব গোর্বাচেভ দিয়েছেন সে সম্পর্কে চীননেতারা এখন পর্যন্ত মুখ খোলেননি। যদিও দুটো বিষয়েই চীনাদের আগ্রহ রুশদের চেয়ে এক তিল কম নয়। দেং-শিয়াও-পিঙকে একজন জিজ্ঞেস করেন—সোভিয়েত সরকার এখন মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে বৈঠক করছেন ও-রাজ্য থেকে ৭৫,০০০ সোভিয়েত সৈন্য সরিয়ে নেবার ব্যাপারে। আপনি কি এতে খুশি নন? শুনে একটু হাসেন দেং। বলেন (৩ সেপ্টেম্বর তারিখে): "আরে, রুশ সৈন্যরা তো চলে যাচ্ছে। কিন্তু সামরিক ঘাঁটি বা সাজসরঞ্জাম (military bases and facilities) তো যেমন তেমনই থাকছে। দরকার হলে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই সোভিয়েত সেনারা ফিরে এসে ফের কায়েম হয়ে বসবে। তাই নয় কী?" যাই হোক, মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে আগের চেয়ে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার দিকে মন দিয়েছে চীন, আর তাতে সাড়া দিচ্ছে মঙ্গোলিয়া। বলা বাহুল্য, মস্কোর অনুমোদন ছাড়া এটা কিছুতেই সম্ভব হত না। এবং সত্যিই যদি চীন-সোভিয়েত সম্পর্ক আগের চেয়ে ভাল না হত, তাহলেও এটা ঘটত না। বেজিং একজন বিদেশ দফতরের উপমন্ত্রীকে মঙ্গোলিয়া পাঠায় (কনসাল পর্যায়ে) কূটনৈতিক চুক্তির জন্য। ১৯৪৯ সালে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হবার পর এই প্রথমবার 'কনসুলা'র চুক্তি হল। তাছাড়াও গত'বিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও মঙ্গোলিয়া এই তিনটি দেশ একসঙ্গে এক রেল বৈঠকে বসল এই বছর।

নদীর কেন্দ্রীয় লাইন বরাবর সীমান্তরেখা টানার ব্যাপারে মস্কোর যে প্রস্তাব তাতেও কোনও হর্ষ প্রকাশ করেনি বেজিং। বরং ৩ সেপ্টেম্বর জাপানী সংসদীয় দলের সঙ্গে আলাপ আলোচনার সময় দেং-শিয়াও-পিঙ বলেন—তাহলে সোভিয়েত নেতারা এতদিনে স্বীকার করেছেন যে দুদেশের মধ্যে যে বিরোধ তা সীমান্তগত, আদর্শের বিরোধ ঠিক নয়। দেং অবশ্য একথাও বলেন যে সোভিয়েত নেতাদের এই মনোভাব সীমান্তবিরোধ সংক্রান্ত আলোচনাকে সফল হতে সাহায্য করবে। গোর্বাচেভ বলেছেন যে, যে-কোনও সময় যে-কোনও নেতৃত্ব-স্তরে আলোচনা শুরু করা যায়। আসলে আলোচনা তো এক হিসেবে শুরু হয়েই গেছে। আমুর নদীর জল ব্যবহার ও ভাগাভাগি নিয়ে কথাবার্তা তো হচ্ছে। কিন্তু শুধু আলোচনা করে লাভ কী, যদি না সোভিয়েত পক্ষ যথার্থ আন্তরিকতা দেখায়, সমস্যা মেটাতে যে সে সত্যিই আগ্রহী তার নিঃসংশয় প্রমাণ দেয়?

নিরাপত্তা এবং অস্ত্রহ্রাস প্রসঙ্গে গোর্বাচেভের প্রস্তাবেও চীনারা নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারছেন। মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ইয়োরোপ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে মার্কিন-সোভিয়েত যৌথ প্রয়াসের কথা বলা হচ্ছে। গোর্বাচেভ বলছেন এস এস-২০ ক্ষেপণাস্ত্র ইয়োরোপে যা আছে তা নষ্ট করে ফেলা হবে। কিন্তু এশিয়ার ব্যাপারে সোভিয়েত নেতা'রা চুপ কেন? দেং এই বিষয়ে নিজে মুখ খোলেননি। কিন্তু এশিয়া থেকে ক্ষেপণাস্ত্র তুলে নিয়ে যাবার কথা না বলায় চীনা সরকার যে অসন্তুষ্ট সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। চীনের স্পষ্ট মতামত হল—এশিয়াতে যত ক্ষেপণাস্ত্র এবং পরমাণু-অস্ত্র আছে তা অবিলম্বে কমাতে হবে। ধীরে ধীরে সরিয়ে নিতে হবে। নইলে এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তির আবহ রচিত হতে পারে না। [গোর্বাচেভ একটা প্রস্তাব দিয়েছেন যে হেলসিঙ্কি (শান্তি) সম্মেলনের মতো একটা প্যাসিফিক ওসান কনফারেন্স ডাকা উচিত: ওই প্রসঙ্গেই চীনের ওই প্রতিক্রিয়া]।

যাই হোক, ইদানীং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন, এই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক যে ভাল হচ্ছে তার প্রমাণ বিস্তর। আই ভি আরখিপভ, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী তিনি, মার্চে ডেলিগেশন নিয়ে বেজিং গিয়েছিলেন। সম্প্রতি চীনে গিয়ে তিনি আবার একমাস কাটিয়ে এলেন। সরকারী ভাষ্য হল, তিনি আকুপাংচার চিকিৎসা করাতে গেছেন। সেটা হয়তো অসত্য নয়। কিন্তু ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভেনেছে। ওই একমাসের মধ্যে আরখিপভ তিন জন চীনা উপ-প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন, সেটা হিনসুয়ারই খবর। ১২ জুলাই চীনের দূর পশ্চিম সীমান্তে দুই দেশের রক্ষীদের মধ্যে যে গুলি বিনিময় ঘটে (যার ফলে নিহত এক চীনা সীমান্তরক্ষী) সেটা নিয়েও ওঁরা আলোচনা করেছেন। সেপ্টেম্বরে নিকোলাই তালিজিন, হবু পলিটব্যুরো সদস্য এবং যোজনা দফতরের মন্ত্রী, চীনে গেলেন সরকারী সফরে। অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ান যায় কি না আলোচনা সেটা নিয়েই। স্মর্তব্য যে, ১৯৮৫র অগাস্ট মাসে চীনা উপ-প্রধানমন্ত্রী ইয়াও ইলি সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়েছিলেন একই বিষয়ে আলাপ আলোচনার জন্য। অর্থাৎ দুই দেশের মধ্যে সংলাপ চালু আছে ঠিকই। অক্টোবর-নভেম্বরে আবার সরকারী বৈঠক বসেছে। তবে আমেরিকা বা পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের বর্তমানে যে হার্দ্য সম্পর্ক, সেটাকে উপেক্ষা করতে পারেন না চীনা নেতৃত্ব। ৩০ জুলাই তা বেজিং থেকে দাবি জানান হয়েছে আফগানিস্থান থেকে সব সোভিয়েত সৈন্যকে সরে যেতে হবে এবং খুব দ্রুত তা করতে হবে। আর চীনা বিদেশমন্ত্রী উ জুকিয়েন পরিষ্কার বলে দিয়েছেন—ভিয়েতনামসহ 'তিনটি বাধা' যদি সরেও যায়, তাহালেও চীন-সোভিয়েত সম্পর্ক আবার সেই পঞ্চাশের দশকের সময়কার পর্যায়ে ফিরে যাবে না, কিছুতেই। চীন তার স্বাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ কূটনীতি অবাধে ও নির্ভয়ে চালিয়ে যাবে। ■
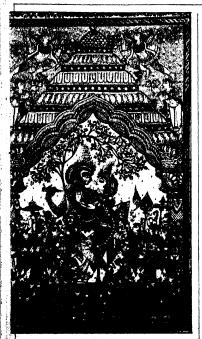
সাগর খুব বেশি দূরে নয়। নিশুত রাতে দমকা হাওয়ার টানে রঘুরাজপুরে শোনা যায় সমুদ্রগর্জন। গ্রামের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে যে শীর্ণ স্রোতধারা, তা মিশেছে ক্রোশটাক দূরে সেই সমুদ্রেই। ভাঁটার টানে নদীর জল হয়ে ওঠে নোনতা। স্রোতসম্বল নদীর বুকে জেগে থাকা সফেদ মিহি বালির চরে মাঝেমধ্যে জমে থাকে উজানে ভেসে আসা সামুদ্রিক লতাগুল্ম আর ঝিনুকের স্তূপ। গ্রাম থেকে নদীর ধার বরাবর পায়ে চলা পথ এমনিতে বড় নির্জন। হাটবারে সেখানেই পাঁচ গ্রামের ভিড়। গ্রাম পেরিয়ে পথ মিলেছে নদীর সেতু বরাবর রেললাইনে। ভাগবী নদীর সেতুর ঠিক প্রান্তটিতে ছোট স্টেশন জনকদেইপুর। লাইন পেরিয়ে খানিক এগোলে রাস্তা ঠেকেছে চন্দনপুরের হাটের সওদার ভিড়ে। চন্দনপুর হাটের মুখোমুখি হাইওয়ে। এপথে তীর্থযাত্রীদের আসাযাওয়ার বিরাম নেই। যাত্রীভর্তি কত বাস ছুটে চলে দক্ষিণে। চন্দনপুর থেকে এ রাস্তা ধরে দুকদম এগোলেই দক্ষিণে ধানক্ষেত, নারকোল বাগিচার মাথা ছাড়িয়ে চোখে পড়বে জগন্নাথ মন্দিরের চূড়োয় ওড়া ধ্বজা। তীর্থশহর পুরী চন্দনপুর থেকে বাসরাস্তায় মাত্র আট কিলোমিটার পথ।

একদিকে যেমন রঘুরাজপুরের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া ভাগবী নদী গিয়ে লীন হয়েছে পুরীর সমুদ্রে, তেমনি অন্যদিকে গ্রামের পথও গিয়ে মিলেছে ঐ সমুদ্রশহরে। ভাগবীতে চলে জোয়ার ভাঁটার আসা-যাওয়া, পাশাপাশি গ্রামের লোকজনও প্রায় নিত্য যাওয়া-আসা করে পুরীতে। গ্রামের পসরা বিকোয় শহরের বাজারে।

পুরী পটচিত্রে রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তি ▲

▼ *গিরিগোবর্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণ। রঘুরাজপুরের পটচিত্র*

রামের অনুগত দুই বানর যোদ্ধা ▼

▲ লঙ্কাপুরীতে বন্দী হনুমান : রামায়ণ

ব্যাপারীরা ফিরে আসে লাভের কড়ি গুণে আর সঙ্গে শহরের অভিজ্ঞতা নিয়ে।

বর্ণচোরা গ্রাম রঘুরাজপুর। নারকোল বাগিচার ঘেরাটোপের আড়ালে এখানে রঙ-রূপের নিত্য আয়োজন। আটপৌরে গ্রামজীবন, তবু মহারাণাদের পাড়ায় ঘরের চৌকাঠ পেরোলেই এ এক রঙীন জগৎ। বারোমাসই এপাড়ায় ঘরে ঘরে চলে পটগড়া বা চিত্রণের বিবিধ পর্ব।

প্রতিটি কুটিরই যেন এক-একটা চিত্রশালা। গৃহস্থালির দৈনন্দিনতা, মলিনতাকে আড়াল করে থাকে শিল্পের অঢেল সম্ভার। এক একটা চিত্রশালায় দেওয়াল জুড়ে মুখোশের সার ঘরের আলো-আঁধারিতে মায়াবী রূপ নেয়। তারই মধ্যে মেঝেতে ছড়িয়ে থাকে রঙগোলা পাত্র, বাঁশের দানিতে গোঁজা কত তুলি। মাথার ওপরে সিকে থেকে ঝোলে গুটিয়ে রাখা,তৈরী পটের বাণ্ডিল। ঘরে আলো যতটুকু আসে তাও ফাঁকফোকর গলে। কোণে কোণে বহুদিনের অন্ধকার যেন জমে থাকে। তাই গ্রীষ্মের দাবদাহে শিল্পীরা ঘর ছেড়ে ছবি আঁকার সরঞ্জাম গুছিয়ে বেছে নেয় কোন গাছতলার নিরালা ছায়াটুকু কিংবা গ্রামের রাধামোহন মন্দিরের চত্বর। গুরুবারে চিত্রশালার চৌকাঠ ভরে যায় লক্ষ্মীর পদচিহ্নে। দেওয়ালে

পটচিত্রে শ্রীকৃষ্ণ
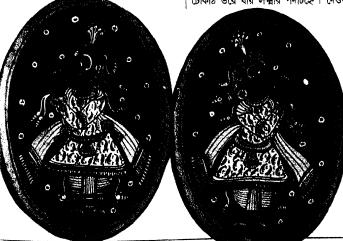
ওঠে ধানের ছড়া, উঠোন জুড়ে পড়ে আল্পনা।

বর্ষাটুকু ঘরের চালের আড়ালে ভালোয় ভালোয় কাটিয়ে দিতে পারলে আশ্বিনের পুজোর পর থেকে সারা শীতকাল চিত্রকরদের পাড়ায় প্রতিটি উঠোন জুড়ে লেগে যায় কারিগরদের ব্যস্ততা। খড়িমাটির আস্তরণ দেওয়া পটের ওপর রেখা টেনে ফুটিয়ে তোলা হয় নকশা। পরে পটের ওপর রঙ লাগতেই স্পষ্ট হয় কাহিনীর সূত্রটুকু। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ থেকে দেবদেবীদের লীলা, ইতিকথা নির্ভর করে তৈরী হয় রকমারি পট আর তার বহুবর্ণ চিত্ররূপ।

তৈরী পটচিত্রের ঝুলি কাঁধে নিয়ে শিল্পীরা যান পুরীর বাজারে। পুরুষানুক্রমে এই পথ ধরেই তাদের রুজিরোজগারের তাগিদে আসা-যাওয়া। জগন্নাথ মন্দির থেকে যে প্রশস্ত 'বড়দাণ্ড' রাজপথ গুণ্ডিচামন্দির পর্যন্ত বিস্তৃত, তারই দুধারে মনোহারী দোকানের সারি। পটচিত্রের কারিগরদের বড় মহাজন হল পুরীর হস্তশিল্পের বড় দোকানদারেরা। আগাম কথামত তারা পট নেয়, দাদন দেয়। কোন মেলার সময় কিংবা কোন তিথি উপলক্ষে যাত্রীর ভিড় যখন বাড়ে, শিল্পীরা আস্তানা গাড়ে বড়দাণ্ড পথের ধারে। বিকিকিনি চলে। পড়ন্ত বিকেলে অনেকে পট সাজিয়ে বসে যায় স্বর্গদ্বারের কাছে সাগরবেলায়।

এক সময় পটশিল্পের ভাল বাজার ছিল এই পুরীতে। তীর্থযাত্রীর দল এককালে দর্শন সেরে ফেরার পথে কিনে নিয়ে যেত টুকিটাকি নিদর্শন। অন্যান্য হস্তশিল্পের সঙ্গে দেবদেবীর পট, বিশেষ করে জগন্নাথ মন্দিরের ত্রিমূর্তির পট কেনার আকর্ষণ ছিল বেশি। ছাপাই ছবি প্রচলনের আগের কথা এসব। তখন পুণ্যার্থীদের জন্য নিয়মিত প্রচুর পটের চাহিদা মেটাতে হত এই চিত্রকরদের। নানা জায়গার যাত্রীদের পট কেনার

প্রাচীন পুঁথিচিত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিনীরা। দেউলটি ওড়িয়া লিপি সাজিয়ে প্রস্তুত। (পুরীর রঘুনন্দন লাইব্রেরীর সৌজন্যে)

সুবাদে পুরীর পটচিত্র পরিচিত হয়েছিল দেশের অন্যান্য অংশেও। এভাবে তীর্থশহর পুরীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল পটচিত্রকরদের রুজি রোজগার এবং তার পাশাপাশি ছিল শিল্পের উপযুক্ত পরিবেশ। পরে ছাপাই ছবি প্রবর্তনের এবং প্রচলনের ফলে পটশিল্পের টিকে থাকাই দায় হয়েছিল।

ভালো পটচিত্র গড়তে কমপক্ষে লাগে কয়েকপুরু কাপড়ের ক্যানভাস। শিল্পীরা অনেক সময় নিয়ে হাতে তৈরি রঙ দিয়ে সেই জমিতে সনাতনী ধারায় ফুটিয়ে তোলেন দৃশ্যাবলী। এভাবে পট তৈরী করতে যা খরচ পড়ে, সামান্যতম মজুরীর লাভটুকু পেয়ে বিক্রি করলেও মেশিনে ছাপা বা লিথোছাপাই পটচিত্রের ছবির তুলনায় তার দাম পড়ে অনেক বেশী। নকল পট বা ছাপাই ছবি তাই প্রকৃত সমঝদারির অভাবে একসময় ছেয়ে গিয়েছিল বাজারে। সেই শুরু, একালেও সেই ছাপা ছবির রমরমা একইভাবে অব্যাহত। একারণে বিংশশতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই পুরীর পটচিত্রীদের সামনে দেখা দিয়েছিল পটশিল্প এবং শিল্পীদের বেঁচে থাকার বড় কঠিন সমস্যা।

পটচিত্রশিল্প পুরীর চিত্রকরগোষ্ঠীর একান্ত নিজস্ব জাত পেশা। শুধু পেশা নয়, সৃষ্টির নেশাটিও লক্ষ করা যায় গুণী শিল্পীদের হাতের কারুকাজে। শুধু বিষয়বৈচিত্র্যই নয়, নান্দনিক দিক থেকেও সেসব পটচিত্র অনপম সৃষ্টি।

পুরী শহরের চৌহদ্দির বাইরে এ জেলার পটচিত্রকরদের সবচেয়ে বড় বসতি ভার্গবী নদীর তীরে রঘুরাজপুর গ্রামে। পুরী শহরেও কয়েকঘর পটচিত্রী আছেন। বারবাটি জগ মন্দিরের কাছে হরচণ্ডীসাই, বালিসাহি এবং স্বর্গদ্বার থেকে মন্দির আসাযাওয়ার পথের ধারে কেউ কেউ পাকাপাকিভাবে দোকান সাজিয়ে বসেছেন।

পুরীর জগন্নাথমন্দিরে বিগ্রহ সেবার ভার রয়েছে ছত্রিশটি কাজের জন্য পারদর্শী সেবাদাসের

মহিষাসুরমর্দিনী

দলের ওপর। এরমধ্যে মহারাণা পদবীধারী সেবকরা সবাই কারিগর গোষ্ঠীভুক্ত। মহারাণা পদবীধারীদের মধ্যেও কুলগত বৃত্তির ধরন অনুযায়ী ভাগ আছে। পাথুরিয়া মহারাণারা হ'ল মন্দির স্থপতি ও পাথরখোদাইকার ভাস্কর, কর্মকারের বৃত্তিধারীরা কামার মহারাণা। এভাবে কাঁসার কারিগর বা কংসারি মহারাণা, রূপকার মহারাণা, করতি মহারাণা, সিপুটি মহারাণা, কাচরা মহারাণা এবং চিত্রকর মহারাণাদের প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট বৃত্তি। জগন্নাথমন্দিরের সেবায় নিযুক্ত সব বৃত্তির মহারাণাদেরই মন্দিরে আগে সেবার সুযোগ ছিল বংশানুক্রমে। মন্দিরে সংরক্ষিত কয়েক শতাব্দী আগেকার 'মাদলা পাঞ্জী' বা দিন নির্ঘণ্টতেও দেখা যায় বহু যুগ ধরে চিত্রকরেরা পুরী মন্দিরের সেবক হিসেবে আছেন। তাদের কাজ নির্দিষ্ট ছিল প্রধানত বিগ্রহের অঙ্গরাগ করা। প্রায় বারো বছর অন্তর যে নবকলেবর উৎসব হয়, সেসময় নতুন বিগ্রহের রূপদান করার যাবতীয় কাজের দায়িত্ব পড়তো চিত্রকর মহারাণাগোষ্ঠীর প্রধান শিল্পীর ওপর। প্রাচীন প্রথা মেনে রথযাত্রার সময় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার তিনটি রথকে রঙ করা, রথের চারদিকে বিভিন্ন নক্‌শা এবং বিভিন্ন মূর্তি দিয়ে সাজানোর কাজ এখনও চিত্রকরের দলই করে।

অন্যান্য সেবকদের মতো চিত্রকরদেরও মন্দিরে নিযুক্ত করেন 'পাটযোষী মহাপাত্র' উপাধিধারী মন্দিরে কর্মী নিয়োগকারী।
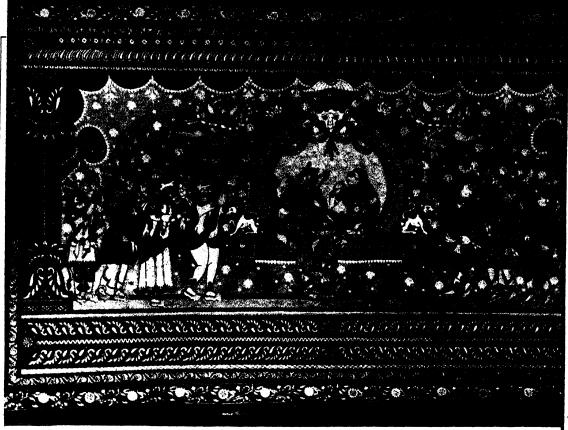
শ্রীরামের সিংহাসনলাভ । পুরী পটচিত্র

দেবসেবার উদ্দেশ্য নিয়ে আসা চিত্রকরদের পাটযোষী মহাপাত্র বাছাইয়ের পরে নির্দিষ্ট দিনে মন্দিরে আসতে বলেন। এরপর সেবকরা মন্দিরে গর্ভগৃহে 'সারিবন্ধা' অনুষ্ঠানে পূজার শেষে নিজেকে উৎসর্গ করে বিগ্রহের কাছে। 'সারিবন্ধা' না হওয়া পর্যন্ত জগন্নাথমন্দিরে সেবক হবার অধিকার সাধারণত কেউ পায় না।

পুরীর চিত্রকরদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী বা 'বাড়হ' আছে। মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম বা সুভদ্রার সেবার দায়িত্ব পড়ে বংশপরম্পরায়। কে কোন দেবতার সেবায় নিযুক্ত, সেই অধিকার অনুযায়ী চিত্রকরদের মধ্যে তিন বিগ্রহের নামে তিনটি শ্রেণী আছে। চিত্রকররা নিজেদের সামাজিক পরিচয় দেবার সময় নিজের 'বাড়হ' বা শ্রেণীর নাম উল্লেখ করেন। তবে তিনটি 'বাড়হ'র মধ্যে বিবাহসম্পর্ক স্থাপনে কোন বাধা থাকে না।

রঘুরাজপুরের মহারাণাপল্লীর শিল্প ইতিহাস রয়ে গেছে বয়স্কদের সযত্ন স্মৃতি আর বংশপরম্পরা শুনে আসা কাহিনীতে। পূর্বসূরীদের হাতের কাজ শিল্পীদের ঘরে আঁতিপাতি করে খুঁজলেও আর মিলবে না। তবে প্রাচীন নমস্য শিল্পীদের হাতের কাজের দু চারটে নমুনা এখনও মিলিয়ে যায়নি পুরীর মঠমন্দিরের দেওয়াল থেকে। ইংরেজ আমলের শেষদিকে হাতেগড়া পটচিত্রের বাজার হয়ে পড়েছিল অসম্ভব মন্দা। তাই শুধু বেঁচে থাকবার তাগিদে সেসময় মামুলী কাগজ কয়েকপুরু সেঁটে তাতে রঙ ধরিয়ে জলদি হাতের টানে রঙ, পরে রঞ্জন বার্নিশ চাপিয়ে শিল্পীদের ছুটতে হত বাজারে। অভাবের তাড়নায় অনেক শিল্পী সে যুগে জাতব্যবসা ছেড়ে অর্থ উপার্জনের অন্য রাস্তায় পা বাড়িয়েছিলেন। অনেকে হয়েছিলেন দেশান্তরী। আবার কেউ যে হাতে রঙ তুলির সূক্ষ্ম কারুকাজ করতেন, সেই হাতেই তুলে নিলেন ইমারত কলি করার বুরুশ। রাজমিস্ত্রী, কাঠের কাজ, দোকানদারি এমনকি যাত্রার দল ও পেশাদার নাচিয়েদেরও সঙ্গী হল বহুজন।

একালে দেশবিদেশের সমঝদারেরা ছুটে আসে রঘুরাজপুরে পটচিত্রের খোঁজে। প্রায়ই দেখা যায় চন্দনপুর থেকে রঘুরাজপুরের পথে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে চলেছে পর্যটকদের গাড়ি। বিদেশী পর্যটককরাও মাঝেমধ্যে চলে আসেন ভাগবীতীরে নারকোল গাছের ছায়ায় লালিত এই গ্রামটিতে। সমঝদারজন রঘুরাজপুরে পা দিয়েই খোঁজ করে প্রবীণ শিল্পী জগন্নাথ মহাপাত্রের ঘরের ঠিকানা। সমকালীন ওড়িশী পটশিল্পীদের মধ্যে জগন্নাথ মহাপাত্র শীর্ষস্থানীয়। হৃতগৌরব ফিরিয়ে এনে পুরীর পটচিত্রকে আবার নতুন উদ্যমে ঘরে ঘরে শুরু করাতে জগন্নাথবাবুর অবদান যে অনেকখানি একথা শিল্পীরাও স্বীকার করেন।

রঘুরাজপুরের বাসিন্দারা গর্বের সঙ্গে তাঁদের গ্রামের পরিচয় দেন। কেন না, জগন্নাথ মহাপাত্রের নামডাক শুধু পুরী ভুবনেশ্বর বা ওড়িশাতেই নয়। সারা ভারতে সেরা কারুশিল্পীদের তিনি একজন একথা স্বীকৃত। ১৯৭৫ সালে এই পটচিত্রের শিল্পী হিসেবেই তিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিলেন। বিদেশেও তিনি গিয়েছেন ভারতীয় ঐতিহ্যগত শিল্পকলা সম্বন্ধে প্রদর্শনীতে যোগ দিতে। জগন্নাথ মহাপাত্রের আর এক যশস্বী পড়শী কেলুচরণ মহাপাত্রের জন্মও এই মহারাণাপাড়ায়। ওড়িশী নাচের গুরু কেলুচরণ মহাপাত্র শৈশব কাটিয়েছেন পটশিল্পের পরিবেশে। এ গ্রামের সে আমলের আরো অনেকের মত কেলুচরণবাবুও বালক বয়সে আকৃষ্ট হয়েছিলেন পুরীর নট এবং দেবদাসী বা মাহারীদের নাচেগানে। কম বয়সেই 'গোতিপুয়া' বা বালক নটের দলে যোগ দিয়ে নাচে তালিম পেয়েছিলেন তিনি সেরা গুরুদের কাছে।

রঘুরাজপুরে পটচিত্রকরদের পাড়ায় চিত্রশিল্পের পাশাপাশি নাচ গান অভিনয়েরও পালা চলে। পটচিত্রকর জগন্নাথ মহাপাত্র কিশোর বয়সে পুরীর মোহনসুন্দর দেবগোস্বামীর রাসলীলার নাচের দলে ছিলেন কিছুদিন। গুরু মোহনসুন্দরের রাসলীলার পালার দল ছিল পুরোপুরি পেশাদার। পালার বায়না আসতো অনেক দূরের থেকেও। শৈশব পেরোতে না পেরোতেই ওস্তাদ পটচিত্রকর বনমালী মহাপাত্রর একমাত্র পুত্র জগন্নাথকে উপার্জনের আশায় ঘর ছাড়তে হয়েছিল। মহাজনের কাছে ঋণের দায়ে হঠাৎ একদিন নিলাম হয়ে যায় পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি। গ্রামের অন্য সব শিল্পীদের মত

কিশোর জগন্নাথের বাবা বনমালী মহাপাত্রও শেষদিকে গড়তেন শুধু নানা বেশের জগন্নাথপট। পরিবারের সবাই মিলে দিনরাত পরিশ্রম করে যে কটা পট তৈরী হত, পুরীতে বেচতে পারলেও তাতে মজুরীটুকু পুরোপুরি উঠতো না। এহেন সংকটসময়ে কিশোরবয়সী জগন্নাথ রাসলীলার পেশাদার পালাগানের দলে ঢুকে বাঁচিয়ে ছিলেন তাঁদের সংসার। চৈত্রমাসে পুরীজেলার অনেক গ্রামে 'সাহীযাত্রা'র মুখোশ নাচের আসর বসে । সেখানে ডাক পড়তো কিশোর নট জগন্নাথের।

চার দশক আগেকার কথা। জগন্নাথ মহাপাত্র তখন যুবক। রঘুরাজপুরে সে সময়ে প্রায় পঁচিশঘর শিল্পীর জীবনে শুধু হতাশার সঙ্গে দিনগুজরান চলছে। শিল্পীঘরের লোকজনদের বিশেষ কায়িক শ্রমে অভ্যাস থাকে না। তাই শিল্পের সরঞ্জাম শিকেয় তুলে রেখে যারা শ্রমিকের কাজে গিয়েছিল দূরে, তাদের অনেকেই কাজ ছেড়ে বিধ্বস্ত অবস্থায় ফিরে এসেছে ঘরে। ঠিক সেই সময়েই শুরু হল আর এক উদ্যোগ।

১৯৫২ সালে সম্বলপুর জেলার বড়পল্লীর এক মিশনারী সেবাপ্রতিষ্ঠান 'আমেরিকান ফ্রেণ্ডস্ সার্ভিস কমিটি'র পরিচালক ফিলিপ জেলির ইচ্ছা ছিল পুরীতেও তাঁদের কাজকর্ম প্রসারিত করার। ফিলিপ জেলির স্ত্রী হেলিনা এসময় সমুদ্রের আকর্ষণে কয়েকদিনের জন্য পুরী বেড়াতে এলেন। পুরীতে হেলিনা বিস্মিত হলেন ওড়িশী পট দেখে। যোগাযোগ করলেন শিল্পীদের সঙ্গে। রঘুরাজপুরে এসে শিল্পীদের কাজ দেখলেন, শুনলেন সমস্যার কথা। ভালভাবে পরিচিত হতে কিছুদিন কাটলো। হেলিনা চাইলেন দেশে বিদেশে প্রচার হোক পটশিল্পের। তারপর শুরু হল আর এক অধ্যায়।

হেলিনা জেলি চিত্রকরদের বাছাই করা পট নিয়ে প্রদর্শনী করেছিলেন প্রথমে পুরী, পরে ওড়িশার অন্যত্র এবং কলকাতায়। ১৯৫৪ সালে পুরীতে হস্তশিল্প কেন্দ্র গড়ে ওঠার পেছনেও হেলিনার উদ্যোগ ছিল। সঙ্গে যোগ হয়েছিল সরকারী সহায়তা। স্বাধীনতার প্রায় এক দশক পরে পুরীর ঐতিহ্যমণ্ডিত পটশিল্প এভাবে ক্রমশ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেতে শুরু করে। দেশে বিদেশে ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের প্রদর্শনী এবং দোকানে পটচিত্র হয়ে দাঁড়ায় সমঝদারদের আকর্ষণ।

পঞ্চাশের দশকে যে গ্রামে কুড়ি পঁচিশঘর পটচিত্র শিল্পী নিরাশায় দিনগুজরান করতেন, সেখানে এখন কাজের আবহাওয়া ফিরে এসেছে। শিল্পীদের সংখ্যাও সেসময়ের তুলনায় আজ প্রায় দ্বিগুণ। হেলিনার পৃষ্ঠপোষকতায় যে সব শিল্পী মরিয়া হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা শুধু পথপ্রদর্শক বলেই নয়, দক্ষতার বিচারে খ্যাতিমান হয়েছেন। ১৯৬৫তে জগন্নাথ মহাপাত্রের পুরস্কারপ্রাপ্তি পুরীশৈলীর পটচিত্র শিল্পীদের কাছে বড় ঘটনা। জগন্নাথবাবুর বিশ্বাস—এই পুরস্কার শুধু তাঁর নয়, উৎসাহ যুগিয়েছিল সেই প্রজন্মের সব শিল্পীকে।

১৯৬৯ সালে মস্কোয় আয়োজিত ভারতীয় হস্তশিল্পের প্রদর্শনীতে যোগদান করেছিলেন জগন্নাথবাবুই। পরে তাঁর এক ছাত্র শরৎকুমার সাহু এধরনের সরকারী প্রদর্শনীতে অংশ নিতে যান লণ্ডনে। রঘুরাজপুরের বেশ কয়েকজন শিল্পীর ঘরে জমা রয়েছে নানা জায়গায় শিল্পপ্রদর্শনীতে কৃতিত্বের অভিজ্ঞানপত্র। ১৯৮২ সালে জাতীয় স্তরে হস্তশিল্পের সেরা সম্মান পেয়েছেন পটচিত্রকর বনমালী মহাপাত্র। সব মিলিয়ে রঘুরাজপুরের পটশিল্পে এখন সাফল্যের জোয়ার বইছে।

রঘুরাজপুরের মহারাণা বংশীয় শিল্পীরা পুরী শৈলীর পটচিত্রকর বলে পরিচিত। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা যায় যে এঁদের মধ্যে কয়েক ঘর ওড়িষার অন্যান্য অঞ্চল থেকে কয়েক পুরুষ আগে ভাগ্যসন্ধানে চলে এসেছিলেন রঘুরাজপুরে। শিল্পী জগন্নাথ মহাপাত্রর পূর্বপুরুষেরও আদিতে বাস ছিল জঙ্গল আর পাহাড় ঘেরা কেওনঝাড় জেলার ধামড়া গ্রামে। পাঁচ পুরুষ আগে ধামড়া থেকে চলে আসার আগে পর্যন্ত ঐ মহাপাত্র পরিবারের সঙ্গে শিল্পকলার তেমন কোন যোগ ছিল না বলে ওঁরা শুনেছেন।

পুরীজেলার মধ্যে পটচিত্রকরদের বাস বেশি রঘুরাজপুরে আর পুরী শহরের চিত্রকরসাহী, দণ্ডসাহী এবং আরো দু একটা মহল্লায়। পুরী ছাড়াও ওড়িষার অন্যত্র পটচিত্রকরদের বড় গ্রাম বা পাড়া রয়েছে গঞ্জাম জেলার পারলাখেমণ্ডি, জয়পুর এবং মথুরা গ্রামগুলোতে। ঢেংকানল টাউনের কাছে দীনবন্ধুপুর, মানপুর, রাজাআটগা, সুবর্ণপুর গ্রামের পটচিত্রের সঙ্গে পুরীশৈলীর বিষয়বস্তু প্রায় একই, সামান্য কিছু অমিল আছে অঙ্কনশৈলীতে। কেওনঝাড়গড় শহরের প্রাচীন জগন্নাথমন্দির এবং রাজবাড়ি সংলগ্ন পাড়ায় কয়েকঘর পটচিত্রকর এখনও পটচিত্র গড়েন। সর্বত্রই শিল্পীদের কাজে দুটি স্বতন্ত্র ধারা পাশাপাশি প্রবহমান, দেখা যায়।

রঘুরাজপুর এবং পুরীর সব শিল্পীই সাবেকী পদ্ধতি মেনে পটের জন্য জমি গড়েন। রঙ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও প্রাচীন পদ্ধতি প্রাধান্য পায়। পটচিত্রের জমি তৈরিতে চাই সুতীর কাপড়। মন্দিরে বা অন্যত্র পুজোর কাজে লাগবে এমন পটের জন্য চাই নতুন কোরা কাপড়। অন্য ক্ষেত্রে পুরোনো ব্যবহার করা কাপড়েই কাজ করা হয় বেশী। তেঁতুল বিচি গুঁড়িয়ে তৈরী আঠার সঙ্গে খড়িপাথরে গুঁড়ো গুলে তিন চার টুকরো কাপড়ে মাখিয়ে কাপড়গুলো একটা অন্যর ওপর জুড়ে দেওয়া হয়। জোড়া কাপড় শুকোলে শুরু হয় দ্বিতীয় পর্ব। এবার শুকিয়ে কুঁচকে যাওয়া কাপড়ের পট প্রশস্ত শিল বা 'বগড়া' পাথরের ফেলে নোড়া জাতীয় 'মুগুনি' পাথর ঘসে মসৃণ ও একপ্রস্ত পালিশ করা হয় পটের উভয় দিকে। একদিকে পটের জমি তৈরী যখন চলে, পাশাপাশি চলে রঙ তৈরীর কাজ। সনাতন পদ্ধতিতে রঙ তৈরী সময়সাপেক্ষ কাজ। বাজারে পয়সা ফেললেই তৈরী রঙ পাওয়া যায়। কিন্তু সেসব শিল্পীদের না-পসন্দ। সাবেকী নিয়মে তাই পাথর, মাটি, খনিজ বা লতাপাতা থেকে রঙ তৈরী করে নেন শিল্পীরা। বয়স্ক শিল্পীদের স্মরণ আছে ইংরাজ আমলে ভার্গবী বা কাঞ্চী নদীর মোহনায় সওদাগরদের জাহাজ এসে নোঙর করতো। ব্যাপারী বেনিয়াদের দল জাহাজ থেকে ছোটছোট পানসিতে উজান বয়ে এসে উঠতো দুদিকের গ্রামে। দূরদেশ থেকে তারা নিয়ে আসতো নানান পসরা। থাকতো সরেস দামী পাথুরে রঙও। একালে চন্দনপুরের বাজার থেকে শিল্পীদের আনতে হয় 'রঙটাউ' বা গেরিপাথর, হিঙ্গুল, হরিতাল, শঙ্খচূর্ণ এবং আরো কয়েক ধরনের রঙ পাথর। পাথুরে রঙ ভিজিয়ে শিলে দীর্ঘসময় বারবার ঘষে এক একটা রঙ শেষে বাটা চন্দনের থেকেও বহুগুণ বেশি মিহি করতে বেশ কিছুদিন কেটে যায়। এসব ছাড়া কাজল কালো রঙ তৈরী হয় ভুসোকালি থেকে, দুধসাদা বর্ণ আসে শঙ্খচূর্ণ ফুটিয়ে। পটচিত্রে ব্যবহারের সময় রঙের সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ বেলের আঠা বা অন্য ধরনের আঠা মেশান শিল্পীরা। পরে রঙ লাগাতে সূক্ষ্ম থেকে মোটা বিভিন্ন মাপের তুলি শিল্পীরা তৈরী করে নেন মেঠো ইঁদুরের কোমল লোম থেকে। কেয়াগাছের মূল থেকেও এগ্রামের শিল্পীরা এককালে তুলি তৈরী করে নিতেন।

তৈরী পটের জমিতে প্রথমে হাল্কা রঙে পটচিত্রের ফ্রেমটুকু এঁকে নেওয়া হয়, একই সঙ্গে মূর্তিরচনার কাজও চলে রেখাচিত্রে। পরে জায়গামত প্রয়োজনীয় রঙ ফেলে ভরাটের কাজ। ওড়িশী পটচিত্রের চারদিকে টানা মোটা ফ্রেম জুড়ে থাকে ফুলপাতা ও নানা ধরনের নকশা।

সেকালের মত এখনও পুরী পটচিত্রের প্রিয় বিষয় জগন্নাথ মন্দিরের ত্রিমূর্তি এবং কৃষ্ণলীলা। বিভিন্ন তিথি এবং উৎসবে জগন্নাথমন্দিরের বিগ্রহের বেশ এবং সাজের পরিবর্তন হয়। পটচিত্রে ত্রিমূর্তির যেসব বেশ দেখা যায় তার মধ্যে রঙের প্রয়োগও সঠিক হতে হয়। বাঁকাচূড়া বেশে বিগ্রহের কেশ থাকে কুঞ্চিত, থিয়া কেয়া বেশে মূর্তির সাজ হয় কেয়া ফুল দিয়ে, এছাড়াও আছে গজ উদ্ধারণ বেশ, পদ্মবেশ, রাজ-রাজেশ্বর বেশ, রাজা বেশ, রাধাদামোদর বেশ, কালীয়দমন বেশ, বাণভোজি বেশ, সোনা বেশ, কৃষ্ণবলরাম এবং গজানন বেশ।

কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পটে কৃষ্ণের জন্ম, পুতনা বধের কাহিনীচিত্রের চেয়ে শিল্পীদের আকর্ষণ বেশী ননীচোরা গোপাল, রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন ও বিহারের নানা দৃশ্য, কালীয়দমন, গিরিগোবর্ধন-ধারী কৃষ্ণ, গোপিনীদের বস্ত্রহরণ ও অন্যান্য ক্রীড়া, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে কৃষ্ণ জাতীয় পটচিত্র রচনায়। পটচিত্রের বিষয়বস্তু বিচিত্র, এবং বেশিরভাগই হিন্দু পুরাণ ও নানা ধর্মীয় কাহিনীর চিত্ররূপ। প্রাকৃতিক দৃশ্য, ফুলপাখি, ঘরবাড়ির আলাদা বা এককভাবে চিত্রণ প্রায় অনুপস্থিত হলেও পটচিত্রের মধ্যে চিত্ররচনাকে ব্যঞ্জনাময় করতে পরিপার্শ্বে এসব ছবি যথেষ্ট দেখা যায়। প্রধান সব হিন্দু দেবদেবী বা তাঁদের লীলাকথার ছবিই এককভাবে পটচিত্রে আছে। রামায়ণ মহাভারতের আকর্ষণীয় অংশ নিয়ে অসংখ্য পট দেখা যায়। অযোধ্যার সিংহাসনে আসীন রাম, বামে সীতা, সঙ্গী ভরত ও হনুমানও আছে।

রঘুরাজপুরের পুতুল শিল্প

দুপাশে চামর বাজনরত দাসদাসী, পাত্রমিত্র, লোকলস্কর। সব মিলিয়ে রাজসভার পরিবেশে একটা সময় থমকে আছে। হরধনুভঙ্গ, রাম রাবণের লড়াই, আগুন সাক্ষী রেখে রাম ও গুহকের মিলন, সেতুবন্ধন, বনবাসী ত্রয়ী, গণ্ডিবদ্ধ সীতার কাছে ভিক্ষাপাত্রধারী ছদ্মবেশী রাবণ, লবকুশ, রাক্ষসনগরী লঙ্কায় হনুমান—এসবই পটচিত্রকরদের কাছে আকর্ষণীয় বিষয়।

কন্দর্পরথ পটে পাঁচটি নারীশরীর মিলে রথের রূপ নিয়েছে কামকুঞ্জর বা নরনারীকুঞ্জ পটে নয়টি নারী শরীর মিলে হাতির আকার। অর্ধনারীশ্বর বা রথযাত্রা পটে শিল্পীদের মুনশিয়ানা দেখার মত।

সেকালের পটে দৃশ্য থাকতো মোটামুটি একটাই। এযুগে যোগ হয়েছে নতুন রীতি। যে কোন দেবদেবীর লীলাকথা, রামায়ণ, মহাভারতের উপাখ্যানের বাছাই করা ধারাবাহিক দৃশ্যরূপ একই পটে পাওয়া যায় একালের শিল্পীদের কাজে। যেমন কৃষ্ণলীলার পূর্ণাঙ্গ পটচিত্রে পটের কেন্দ্রভাগে সবচেয়ে বেশি এলাকা জুড়ে থাকে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। প্রধান মূর্তি ঘিরে চতুর্দিকে ছোটখাটো খোপ বা বৃত্তের নকশাদার পরিধি বা ফ্রেমের মধ্যে থাকে কৃষ্ণের জন্ম থেকে আমৃত্যু প্রধান সব ঘটনার একটি করে দৃশ্যরূপ। এধরনের পটচিত্রে বোঝা যায় দৃশ্যের বিন্যাসের ক্ষেত্রে শিল্পীদের কল্পনা বেশকিছুটা নতুনত্বের দিকে ঝুঁকেছে। আখ্যানভিত্তিক ছবিতে ধারাবাহিকতা, দৃশ্যান্তরের এমন সুষ্ঠু প্রয়োগ পটচিত্রের পাশাপাশি তসরচিত্রে এবং তালপাতা চিত্রণেও যোগ হয়েছে।

আশ্চর্যের কথা পুরীর সমাজ ও ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে চৈতন্যদেবের যে বিরাট প্রভাব পড়েছিল একালের পটচিত্রে তার তেমন কোন স্থান নেই। অন্যদিকে পুরীর গজপতি রাজাদের কীর্তি ও ইতিহাসের কিছু পটচিত্রে জায়গা পেয়েছে। এরকমই একটি কাহিনী যা 'কাঞ্চীকাবেরী যাত্রা' বা 'কাঞ্চীবিজয়' নামে ওড়িশায় যুগে যুগে কাব্য সাহিত্য ও শিল্পে স্থান পেয়েছে। ওড়িশী শিল্পীদের কাছে পুরীর রাজা পুরুষোত্তমদেবের কাঞ্চী রাজ্য বিজয়ের কাহিনী যথেষ্ট প্রিয় বিষয়। তাই সেই উপাখ্যানের দৃশ্যাবলী দেখা যায় প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তিচিত্র এবং পটচিত্রে।

কাঞ্চীকাবেরী কাব্যের মূলচরিত্র রাজা পুরুষোত্তমদেব এক ঐতিহাসিক চরিত্র। জানা যায় তাঁর রাজত্বের কাল ছিল ১৪৬৭ থেকে ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৪৮৯ সালে তিনি সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করে কাঞ্চীর রাজাকে পরাজিত করে তাঁর কন্যা রূপাম্বিকাকে হরণ করে আনেন। ঐতিহাসিক সত্যের পাশাপাশি কাব্যের রূপকারদের হাতে এ কাহিনী হয়েছে ভক্তি ও প্রেমরসে দ্রাব এবং নাটকীয়। কাঞ্চীকাবেরী গাথার দৃশ্যচিত্র পুরীর মূল দেউলের নাটমন্দিরের দেওয়ালে কোন প্রাচীনকালে আঁকা হয়েছিল, যা আজও রয়েছে কিছুটা পরিবর্তিতরূপে।

পুরীর গঙ্গামাতা মঠে ঢুকলে মঠের বৈঠকখানার দিকে তাকিয়ে অবাক না হয়ে উপায় নেই। ঘরের চার দেওয়াল, মাথার ওপরের ছাদ সর্বত্র ছবি আর অলঙ্করণে সমৃদ্ধ। জগন্নাথের ত্রিমূর্তি ছাড়াও দেওয়াল-জোড়া বিশাল ভিত্তিচিত্রের এক একটিতে রয়েছে বালকৃষ্ণ, জঙ্গলে শিশুকৃষ্ণ ও তপস্যারত মুনি, নৃসিংহ অবতার, গোবর্ধন ও গোধন ও গোপী সঙ্গে কৃষ্ণ, রামচন্দ্রের অভিষেক, ঘোড়সওয়ার সেনানী। মঠের মোহন্তদের ছবি ও একটানা অলঙ্করণের আকর্ষণীয় কারুকাজ। গঙ্গামাতা মঠের সব ছবিই প্রাচীন, তাই কয়েক জায়গায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে কিন্তু সব ছবিতেই ওড়িশী রীতিটুকু স্পষ্ট।

এধরনের আরো আকর্ষণীয় ভিত্তিচিত্র রয়েছে বড় ওড়িয়া মঠে। বড় ওড়িয়া মঠের প্রতিষ্ঠাতা জগন্নাথ দাস রাজা প্রতাপরুদ্রদেব এবং চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। বড় ওড়িয়া মঠের ছবির সংখ্যা অনেক। ত্রিমূর্তির ছবি ছাড়া রয়েছে কৃষ্ণের রাসলীলা, বৈষ্ণবদের নামগান, মোহন্তদের চিত্র, নৃসিংহ অবতার, গোপীদের বস্ত্রহরণ দৃশ্য, সমুদ্র মন্থনে দেবাসুরের দল আরো বহুকিছু।

নন্দনতাত্ত্বিক এম শেঠ এক প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন যে ঐ দুই মঠেই ভিত্তিচিত্র অঙ্কনের কাজে শুকনো দেওয়ালে গোলা রঙ লাগানো হয়েছিল। শিল্পশৈলীর বিচারে দুই মঠের ভিত্তিচিত্রই সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীতে করা। এরমধ্যে বড় ওড়িয়া মঠের কয়েকটি ছবিতে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশের শিল্পের এবং গঙ্গামাতা মঠে যথাক্রমে মুঘল ও রাজপুতশৈলীর উপাদান রয়েছে। ও. সি গাঙ্গুলীসহ অনেক শিল্পতাত্ত্বিকেরই ধারণামত ওড়িশার মঠে মন্দিরে ভিত্তিচিত্রের ধারা প্রাচীন ঐতিহাসিক কালে বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত

গুহাচিত্রেরই উত্তরসূরী। ওড়িষার কেওনঝাড় জেলার সীতাবিনজি গুহায় দ্বাদশ শতাব্দীতে অঙ্কিত যে রাজকীয় শোভাযাত্রার দৃশ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, বহু ঐতিহাসিকের মতে তা ওড়িশী পটচিত্রেরই আদি নিদর্শন।

পটচিত্রের শিল্পীরা নতুন কিছু করার উৎসাহে পট্ট কাপড়ের ব্যবহারকে নতুন আঙ্গিক রচনার কাজে লাগিয়েছেন। এখন আর এক ধরনের পট আঁকা হচ্ছে ঘন বুনোটের তসর, গরদ বা রেশমী জমিতে। এ ধরনের পটে কয়েকপ্রস্ত কাপড়

আপন চিত্রশালায় যশস্বী শিল্পী জগন্নাথ মহাপাত্র

সাঁটার প্রয়োজন নেই। একটুকরো রেশমী কাপড় যোগাড় হলেই শিল্পীরা বসে যান কাঠের ফ্রেমে কাপড় টানটান করে এঁটে রঙতুলি বাগিয়ে। ছবির বিষয়বস্তু ও শৈলী হুবহু পটচিত্রের মত। শুধু রঙটুকু ছাড়া। সাবেকী প্রথায় তৈরি জলরঙ রেশমের জমিতে ধরে না। তাই শিল্পীরা ব্যবহার করেন আধুনিক 'ফ্যাব্রিক' রঙ এবং তার প্রয়োজনীয় রাসায়নিক মাধ্যম। রেশমী কাপড়ের পট দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখার উপযোগী করে ওপর নীচে কাঠের দণ্ডে মোড়া থাকে। ঘর সাজানোর উপকরণ বলে এর চাহিদাও বেশ।

পুরীর জগন্নাথমন্দিরের প্রধান ফটক অরুণ স্তম্ভের থেকে দুপা এগোলেই রঘুনন্দন লাইব্রেরী। এখানেই রক্ষিত আছে এমন কিছু প্রাচীন পুঁথিচিত্র এবং পুঁথির চিত্রিত কাঠের মলাট যা ওড়িশী শিল্প ইতিহাসের অমূল্য উপাদান। এমনই এক প্রাচীন তালপাতার পুঁথি—'উষা পরিণয়', যা স্মরণীয় প্রাচীন সাহিত্যকীর্তি বলেই নয়, পুঁথিটির কয়টি পাতায় রয়েছে ঐ কাহিনীরই চিত্রমালা। শিল্প-ঐতিহাসিক চার্লস ফাবরির অনুমান যে অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে কোন এক সময়ে পুঁথিটি রচিত। রুদ্ধকক্ষে একাকিনী এক কাতরা নারী লুটিয়ে পড়েছে পালঙ্কে, অন্যদিকে সারিবদ্ধ নারীমূর্তি। ডোরাকাটা চাপা কুর্তা ও পায়জামা জাতীয় পোশাক পরিহিত সেনা; সুসজ্জিত হস্তীবাহিনী, অরণ্যে নানা পশুপাখি এবং নক্‌শাদার অলঙ্করণ। পাঁচটি পরপর তালপাতায় এসব চিত্রিত রয়েছে।

অলঙ্কৃত সব পুঁথির পাতা প্রায় সমান চওড়া, পাশাপাশি লাগানো এবং একসঙ্গে জোড়া থাকতো সুতোর বাঁধনে। তালপাতার ওপর নরুন বা ঐ ধরনের কোন ছুঁচলো ধাতব ফলা দিয়ে আঁচড় কেটে প্রতিটি ছবি রেখাচিত্রের আদল পেত। পরে আঁচড়টানা তালপাতায় ভুসোকালি বা কোন গাঢ় কষ ঘষে দিলেই পাতার সব ছবি পরিষ্কার ফুটে উঠতো। 'উষা পরিণয়' পুঁথিতে কাহিনীর কুশীলবদের পোশাক মুঘল, উত্তরভারতীয় বা পশ্চিমভারতীয়দের মত। পরনে আচকান ও চুড়িদার পায়জামা। কেবল মেয়েদের বুকে কাঁচুলি বা বক্ষ আবরণীর পরিবর্তে পরনের শাড়িটিই ঊর্ধ্বাঙ্গে জড়ানো।

দ্বিতীয় পুঁথিচিত্রটিতে আছে মোট সাতটি তালপাতা। সব মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি। মধ্যে বংশীধারী কৃষ্ণের ত্রিভঙ্গ মূর্তি এবং তার দুপাশে তিন জন করে সেবাদাসী দাঁড়িয়ে। দেবদাসীদের কারো হাতে চামর, পাখা, শিঙা, দর্পণ ইত্যাদি মাঙ্গলিক সামগ্রী। কৃষ্ণ এবং দুপাশে দুই ব্যজনধারী নারীর ওপরে খিলানের কাজ ক্রমশ শিল্পসম্মত দেবদেউলের আকৃতি নিয়েছে। দেউলের পুরোটাই জুড়ে আছে ওড়িয়া লিপি। পরপর পংক্তিগুলি শৈল্পিকভাবে সাজানো। লিপিগুলি সব মিলে নিয়েছে মন্দিরের আকার। এমনকি দুপাশের দুটো থামও ওড়িয়া লিপি সাজিয়ে তৈরী। মন্দিরের সিংহাসনে সামান্য অলঙ্করণ রয়েছে। এছাড়া চূড়ার দুদিকে দুজোড়া ময়ূরের মধ্যে উপরের জোড়াটির ছবি অসম্পূর্ণ। এই পুঁথিচিত্রের বিশেষত্ব এতে দুটি রঙের প্রয়োগ আছে। গাঢ় নীল ছাড়া জায়গাবিশেষে লালের টান পড়েছে। এ পুঁথির ইতিহাস বা কাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে চিত্রে নারীদের বেশভূষায় আছে ঘাঘরা কিংবা শাড়ি, ঊর্ধ্বাঙ্গে আবরণ পুরোদস্তুর রয়েছে। মাথায় সবার ঘোমটা টানা কিংবা ওড়না জড়ানো। চুলে লম্বা বিনুনী, প্রত্যেকেরই নাকে বড় নোলক। সব মিলিয়ে মনে হয় এ ছবি প্রাচীন ওড়িষার রমনীদেরই প্রতিরূপ।

রঘুনন্দন লাইব্রেরীর আর এক পুঁথিচিত্রে আছে পাঁচটি পাতা। বয়সের ভারে তা জীর্ণ। ছবিতে আগের মত একই প্রথায় সারিসারি ওড়িশী লিপি সাজিয়ে গড়া চূড়াযুক্ত দেউল ও থাম। মধ্যে বংশীধারী কৃষ্ণের মুখোমুখি রাধা। অপরদিকে এক সখী, হাতে তার আরশি ধরা। পট পুরোপুরি একরঙা এবং এটি ওড়িশী কলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই পটে রাধার পোশাক ঢোলা ঘাঘরা বা শাড়ি, ঊর্ধ্বাঙ্গ ঢাকা। কিন্তু পাশে সখীটির পোশাকে রয়েছে একমাত্র একটি শাড়ি, যা পেঁচিয়ে উঠে এসেছে অনাবৃত বুকের কাছে। একই সংগ্রহশালায় রাখা আছে হাতে তৈরী কাগজে নবনারীকুঞ্জ বা নয়টি নারী মিলে হাতীর আকৃতি নিয়েছে এমন এক পট। পটটি অর্বাচীনকালে বৃথা রঙের প্রলেপ দিয়ে নষ্ট করা হয়েছে।

ওড়িশার প্রাচীন পুঁথিচিত্রের কিছু সংগ্রহ রয়েছে ভুবনেশ্বর যাদুঘরেও। প্রাচীন দেবদাসীদের নৃত্যপদ্ধতি, যা একসময় জগন্নাথমন্দির এবং পুরীর অন্যান্য মন্দিরেও দেবদাসীদের নিয়মিত নাচের তালিম দিতে লেখা হয়েছিল তার পুঁথি আছে ঐ যাদুঘরে। পুঁথিটি ওড়িয়া লিপিতে। সঙ্গে আছে নারীপুরুষের বিভিন্ন নৃত্যভঙ্গিমা, মুদ্রা এবং অভিনয়কলার সচিত্র বিবরণ বেশ কিছু পাতা জুড়ে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা রঘুনাথ সিংহের রচনা সংস্কৃত অভিনয় দর্পণ পুঁথিটিতেও একই ধরনের ছবি রয়েছে, যা শিল্পের নান্দনিক দিক থেকে এবং ওড়িষী পটের শিল্প-ইতিহাস ধারার বিচারে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

রঘুরাজপুরে শুধু পটশিল্পী মহারানারাই নয়, আছে অন্যান্য কয়েকটি জাতির লোকও। গ্রহবিপ্র বা দৈবজ্ঞ গণক ব্রাহ্মণ, তন্তী বা তাঁতী, খণ্ডায়েত, স্বর্ণকার, ময়রা ও গো-রক্ষক—এসব জাতির থেকে কিছুটা তফাতে বাস করে শিয়ড়-রা। এককালে শিয়ড়দের কাজ ছিল গ্রামে তাল খেজুরের গাছ কাটাই ও রসের কারবার। এরা পটশিল্পীদের যোগান দেয় বাছাইকরা তালপাতা। মহারানারা সঠিক গাছ চেনেন। তাঁরা জানেন—তাল গাছে স্ত্রী পুরুষ ভেদ আছে। শুধুমাত্র স্ত্রী গাছের নিখুঁত পাতা থেকেই পুঁথি তৈরি করা হয়। পুঁথির জন্য পাতা কিছুদিন আগে থেকে ভিজিয়ে রেখে মাপমতো টুকরো করে নেওয়া হয়। পাতাগুলো পাশাপাশি রেখে সুতো দিয়ে বাঁধাই করে শিল্পীরা তুলে নেন লোহার সূক্ষ্ম ফলাওয়ালা 'লিখন'। নরম পাতায় আঁচড়ে ছবি ফুটিয়ে তোলারও নানা বিধি ও কৌশল জানেন কিছু শিল্পী। রঘুরাজপুরে পুঁথিচিত্রের ভাল কাজ এখনও হয়। দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখার উপযুক্ত করে তৈরি পুঁথিচিত্রে এখন লাল, সবুজ, কালো তিন রঙের ব্যবহার বেশি। পুঁথিচিত্রেও বৈচিত্র্য বেড়েছে। তৈরি হচ্ছে দুই স্তরের ছবি সহ তালপাতার পট।

পুরীর মন্দির-গবেষক পণ্ডিত সদাশিব রথশর্মার সংগ্রহে অষ্টাদশ শতাব্দীর এক ওড়িয়া চিত্রিত রামায়ণের পুঁথি আছে। এ পুঁথিও তালপাতার ওপর, ছবি ওড়িশী শিল্পীর। কিন্তু পাত্রপাত্রীর পোশাকের মধ্যে ওড়িশী প্রভাব নেই বললেই চলে।

ওড়িশী প্রাচীন চিত্রকলায় এ ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ দেখে পশ্চিম বা উত্তর ভারতীয় এবং মুঘল বা জৈন শিল্পের প্রভাবের সম্ভাবনা অমূলক নয়। ওড়িশায় গজপতি রাজবংশের সমাপ্তিকাল এবং মারাঠা আক্রমণের সময়ে বহিরাগত সংস্কৃতির বিনিময় হওয়া সম্ভব। অন্যভাবেও বিশ্লেষণ করা যায় যে পৌরাণিক বা মহাকাব্যের কিছু চরিত্রকে ক্রমশ উত্তর বা পশ্চিম ভারতীয় বলে একদা চিহ্নিত ও চিত্রিত করাটাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওড়িশার শিল্পীসমাজে।

পুরীর অধিপতি চোড়গঙ্গা রাজবংশের দরবারে মুঘল প্রভাব যে পড়েছিল তার একটি সাংস্কৃতিক নমুনা তাশখেলা। 'আইন-ই-আকবরী'-তে রয়েছে যে মুঘল সম্রাটের দরবারে এক ধরনের তাশখেলার প্রচলন ছিল যাতে একশো চুয়াল্লিশ তাশের দরকার হত। প্রতিটি তাশ শিল্পীদের দিয়ে চিত্রিত করা হত। যার ফলে মুঘল মিনিয়েচার চিত্রকলার আর এক অনুপম নিদর্শন এই তাশ। মুঘল তাশে থাকতো বারোটি সুট এবং প্রতিটি সুটে তাশের সংখ্যা বারো। প্রত্যেক সুটের সর্বোচ্চ মানের তাশ হল রাজা আর তারপরে স্থান উজিরের। বাকি দশটা তাশে দশ থেকে ক্রমশ একমানের বা টেক্কা তাশ পর্যন্ত প্রতিটি তার নির্দিষ্ট সমসংখ্যক প্রতীকযুক্ত। মুঘল তাশে বাদশা আকবরের প্রতীকযুক্ত সবচেয়ে বেশি মানের তাশ হল অশ্বপতি। এর পর মান অনুসারে দ্বিতীয়স্থানে থাকে গজপতি, যা উড়িষ্যার রাজাকে বোঝাতো। তৃতীয়টি নরপতি। এভাবে বাকিগুলি ক্রমানুসারে হল—গড়পতি, দলপতি, নৌপতি, স্ত্রীপতি, সুরপতি, অসুরপতি, বনপতি এবং সবশেষে অহিপতি বা ড্রাগন প্রতীকযুক্ত মঙ্গোলীয় রাজাকে বোঝাতো।

আকবরের পরবর্তী সময়ে পুরীর গজপতি রাজাদের দরবারেও মুঘল তাশের মত অথচ সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে এক খেলা চালু হয়েছিল। এই তাশের অলঙ্করণ সম্ভবত স্থানীয় শিল্পীদের দিয়েই করানো হত। পুরী দরবারের তাশ বিভিন্ন যুগে একাধিক রীতিতে খেলা হত। তবে এর প্রধান খেলাটি ছিল দশাবতার তাশের। ভগবান বিষ্ণুর দশটি রূপ বা দশাবতারের কাহিনী নির্ভর এই তাশের প্রতিটিতে প্রতিটি অবতারের রঙীন ছবি বা তার প্রতীকযুক্ত খেলার নিয়ম যুগে যুগে বদলেছে, কিন্তু তাশের বুকে শিল্পকর্ম প্রতিক্ষেত্রেই সুনিপুণ।

পুরীশৈলীর তাশশিল্পীদের তৈরি আর এক ধরনের তাশের চাহিদাও দেশেবিদেশে যথেষ্ট। এর নাম—বন্ধতাশ। বন্ধতাশের খেলা দেশীয় পদ্ধতিতেই চলে, তবে এক্ষেত্রে তাশের ছবি সবই নরনারীর সংগমচিত্র। শিল্পীরা বলেন—তাশে মিথুনমূর্তি বা কামকলার চিত্র সংযোজন নতুন নয়। বংশপরম্পরা তাঁরা এই বন্ধচিত্র শিখে এসেছেন। শিল্পী জগন্নাথ মহাপাত্রর ব্যাখ্যায় 'এ হল বন্ধসার বা বন্ধচিত্র। বন্ধ কথাটি এসেছে কৃষ্ণের লীলা থেকে। শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদের সঙ্গে চৌষট্টি বন্ধতে ক্রীড়া করেছিলেন। এই চিত্রও সেই ক্রীড়া অনুসারে বিভিন্ন মিলনের ভঙ্গীতে থাকে। বন্ধচিত্র প্রাচীন শিল্পপুঁথির কঠোর নির্দেশ
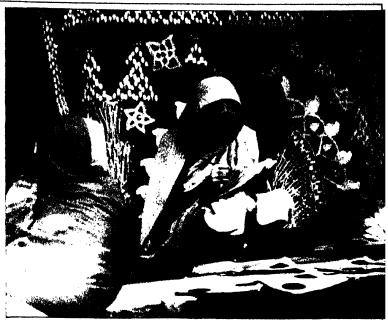
রঘুরাজপুরে মহারাণা পল্লীতে মামুলি পটের চিত্রণ

মেনেই চিত্রিত করা হয় আজও।'

ওড়িশার বহু প্রাচীন মন্দিরে মিথুন ভাস্কর্য আছে। পুরীর কাছাকাছি কোনার্কের সূর্যমন্দির ছাড়াও পুরীর মূল জগন্নাথ মন্দির বা বড়দেউলের বিভিন্ন স্থানে মিথুনমূর্তি যথেষ্ট সংখ্যক রয়েছে। একসময় অশ্লীলতার দায়ে চুন বালির আস্তরণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল জগন্নাথ মন্দিরের বহু মিথুনমূর্তি। সাম্প্রতিককালের ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে সেই পলেস্তারা খসিয়ে কিছু দুর্লভ মূর্তি উদ্ধার করা গেছে। পুরীর মন্দির স্থপতিদের উত্তরসূরী শিল্পী ভাস্কর এবং মহারাণাদের দৃঢ় বিশ্বাস—যে কোন বড় মন্দিরেই মিথুনমূর্তি খোদাই করতে হয় চূড়া বা খিলানের আশেপাশে। কেননা মিথুনমূর্তি থাকলে সে জায়গায় বাজ পড়ে না। তাই দেউলকে

নতুন রীতিতে গড়া তাশের আকারে গোল পটচিত্র। দ্বাররক্ষকের উত্তরভারতীয় পোশাক লক্ষ্য করার মত

বজ্রনিরোধক করার প্রয়োজন।

রঘুরাজপুরে এক বয়স্ক শিল্পীর ঘরে রাখা আছে প্রাচীন এক পুঁথির নকল। সড়জাতের রাজা উপেন্দ্র ভঞ্জের রচনা চৌষট্টিটি ওড়িয়া শ্লোকে রয়েছে চৌষট্টি প্রকারের আসন বা মিথুনভঙ্গীর সচিত্র অনুপুঙ্খ বিবরণী। এ ধরনের প্রাচীন পুঁথি যাতে শিল্পের সচিত্র নির্দেশ রয়েছে, আছে পুরীজেলার কিছু পটশিল্পীর ঘরে।

লোকশিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পীরা পূর্বসূরীদের কাছে হাতেনাতে দেখে ও শুনে শেখেন। লোকশিল্পীদের কাছে শিল্প সবসময় জীবিকা নাও হতে পারে। তবে কৃষিভিত্তিক সমাজই আদিতে লোকশিল্পের পৃষ্ঠপোষক। দরবারী শিল্পের চরিত্র এর থেকে কিছুটা আলাদা।

শিল্পের চর্চা, শিক্ষা বা শিল্পরীতি ক্রমশ ধরাবাঁধা লিখিত নিয়মে বাঁধা পড়ে, যার ফলে অনেকসময় আলাদা ঘরানা বা শৈলীর উদ্ভব ঘটে। রাজা বদলায়। যুগ পালটে যায়। দরবারী কাল অতিক্রান্ত। পটচিত্রকরদের রুজি যোগায় এখন তীর্থযাত্রীর দল, দেশ বিদেশের পর্যটক কিংবা সরকারী অনুদান। গত কয়েক দশকের মধ্যেই রঘুরাজপুর এবং পুরীর পটচিত্রকরদের ঘরে আবার শুরু হয়েছে কাজ, নতুন উৎসাহে। যোগ হয়েছে নতুন মাধ্যম ও কিছুটা নতুন ধারা। কিন্তু বিষয়বস্তু, আর রীতি এখনও বহু শতাব্দীর পুরনো খাতেই বয়ে চলেছে। সেই স্রোতে টান শুধু বেড়েছে। শিল্পীদের ঘরে মেয়েপুরুষ মিলে যখন হেলাফেলার টানেটোনে গড়ে পুতুল বা দু দশ আনার পট, তখন সেই ধ্রুপদী শিল্পে মার্জিত হাতের তুলিতেই ঝলসে ওঠে সুন্দরের আর এক রূপ—লোকচিত্রের আদল।

ছবি : সোমনাথ চক্রবর্তী, অঞ্জন খান, ডি. ভট্টাচার্য প্রেস

মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে…

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্ল্যাটফর্মে নেমে পায়চারি করতে করতে দু'হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙতেই
ঠেঙো ধুতি ও ফতুয়া পরা, ছাতা-বগলে একজন শালিক শালিক চেহারার
লোক
থমকে জিজ্ঞেস করলো,
কে গো, আমাদের ফটিক নয় ?
বাজপাখির মতন এক সুবিশাল হাস্য দিয়ে তাকে চুপসে দিলুম
সে পালাবার পথ পায় না, তো তো করে নেমে গেল রেল লাইনে
প্রচণ্ড রোদে ধোঁয়া বেরুতে লাগলো তার গা থেকে, সে কর্পূর হয়ে গেল
দিগন্তে…

একটু বাদে ট্রেন ছাড়বার পরেই এক সবুজ ঢেউয়ের মতন বিস্মরণ
ঝাপটা মারে আমার কপালে
জানলার পাশে দুটো উড়ন্ত ফিঙে চোখ মেরে বলে যায়, দুয়ো, দুয়ো
আমি কি তবে ফটিক, কিংবা তার যমজ, এতক্ষণে আলপথ ধরে
ঠেঙো ধুতি ও ময়লা ফতুয়া, ছাতা-বগলে শালিক লোকটার পাশাপাশি
হেঁটে যেতে যেতে
কোথায়…কোন গ্রামে…ফটিক কি এতদিন নিরুদ্দেশ ছিল
পালিয়ে ছিল দারোগা-মহাজনের গুঁতোয়, সুফল আনতে গিয়েছিল শহরে
সে ফিরেছে বলে শাঁখ বাজবে, চোখের জল দিয়ে ধোয়ানো হবে তার
পা
একটি অকাল-বৈধব্যমাখা স্ত্রীলোক ছাই ছাই চোখ মেলে বলবে,
হেথায় তো তোমায় কেউ জোর করে ধরে আনেনিকো
কেন এলে ?
আঁশবঁটির মতন ধারালো তার উদাসীনতা, টিয়া পাখির মতন তীক্ষ্ণ
ট্যাঁ ট্যাঁ করছে দু'একটি বাচ্চা…

অকাল বৃষ্টিতে পচে গেছে ধানের গোছ, পূর্ণিমার চাঁদের গায়ে কাদা
কালভার্টের পাশে তাড়া তাড়া নির্বাচনী ইস্তাহার সেঁতিয়ে পড়ে আছে
বাঁধ ভাঙা নোনা জলে ঘুরপাক খাচ্ছে ফটিকের ছেঁড়া চটি
এই অনন্তের টুকরো দৃশ্যের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মহাবিশ্ব
একটি নবীন তৃণের ডগা মাথা তুলে বললো, ফিরিয়ে দাও ফটিককে
তার নিজের জায়গায়
নইলে সব কিছু মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে…

গাছ, লতাগুল্ম

মৃণাল দত্ত

জলসিঞ্চন করেছিলে ঐ গাছের শিকড়ে
যত্নে ধুয়ে দিয়েছিলে অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ, ধুলো, সব মলিনতা
প্রসন্ন হাতের ছোঁয়া মনে রেখেছিল ঐ লতাগুল্মগুলি
জড়িয়ে রেখেছে তাই টান-বাঁধনে-বেঁধে ।
তোমার দুঃখের দিনে নিভৃতে থেকেছে ওরা অধোমুখ
নুয়ে প'ড়ে বিষণ্ণতা প্রকাশ করেছে ।

ডুব

মেঘনা· আর· পাই

ডুব-সাঁতার দিয়েছি এখানে
কোলাহল পার হয়ে
ছোঁব কোনো গহন আঁধার, হে আমার অন্ধকার
তুমি কি ফুলের মত লোভনীয় ?
পৃথিবীর দুর্ভিক্ষে এখন
জজ্বার বিনষ্ট রোম খেতে চাও ?

আমার অজস্র স্বপ্ন
দিনে দিনে পড়ে গেছে খুলে
বৃষ্টিতে ভিজেছে ঘুম,
বৃষ্টিতে এসেছে ঘরে অ্যাসফল্টের গন্ধ, তাপ
হ্যারিকেন নিবিয়ে বালুতে
হেঁটে যাচ্ছে স্বাস্থ্যবান জেলেদের যুবা
তার মুখ গোলাপের মত যেন মাঠে দুলছে
তার দেহ আগুনের মত যেন মনে জ্বলছে
তার ঘ্রাণ আমাকে জালের মত ঘিরে রাখছে
তার ওই আবরণ বরফ গলার মত
গলে পড়ছে তাপে ।

হে আঁধার, ভেঙে যাচ্ছে বুক
আমাকে উলঙ্গ ক'রে
রেখে এসো জেলেদের ঘরে ।

শুধুমাত্র তোপধ্বনির লোভে ?

ঈশিতা ভাদুড়ী

সারা রাত নিরলস যুদ্ধের শেষেও
খসড়া কিছুমাত্র বদল হয় না যদি,
তবে কেন রাতভোর
রক্ত মাখে অসংখ্যেয় তরবারি ?

কেন এই অসামান্য ভুলভ্রান্তি
করে যুদ্ধজিতের দল ?

কোনো পিশাচ-সুলভ উল্লাসে ?

অথবা, শুধুমাত্র একটি বিজয়পতাকা, আর,
কিছু তোপধ্বনির লোভে ?

দূর থেকে তোমার নিকট

শামসুর রাহমান

পথঘাট ভিজে জাব, ট্যাক্সির ওয়াইপার মাথা
নাড়ে মাতালের মতো । দূর থেকে তোমার নিকট
পুনরায় এসে গেছি, যেমন নাগর
জড়িয়ে ফুলের মালা হাতে
সেজেগুজে আসে রূপাজীবার কোঠায়,
যদিও তোমার সঙ্গে কোনোকালে হয়নি দীঘল সোহবত ।

সেবার তো নিঃস্ব হয়ে, বলা যায়, প্রত্যাবর্তনের
সুর গুনগুনিয়ে করেছিলাম প্রস্থান
সুফীর ঔদাস্যে ভরপুর
বিদ্যুল্লতা স্মরণ করিয়ে
দেয় বারবার : স্মৃতি বৃষ্টির ছাটের মতো লাগে
চোখে মুখে, ক্ষয়ে যায় বয়সের ভার ।

কলকাতা হঠাৎ তুমি রাত এগারোটা পঁয়ত্রিশে
গড়িয়াহাটের ব্রিজে বললে কানে কানে,
'এতদিন পর কেন এলে ?
আমি তো কবেই মুছে ফেলেছি তোমার
চুম্বনের বাসী দাগ আর
আলিঙ্গন ছায়া বই তো নয় ;
দ্যাখো, দ্যাখো, আমার চোখের নিচে কী গভীর কালি ।
মাইরি, এ মধ্যবয়সের গোধূলিতে
কী পেলে গঙ্গার ধারে, বিকেলের চৌরঙ্গির ভিড়ে ?
তোমার হৃদয়ে যারা পা ঝুলিয়ে বসে আছে তারা—
অনেকেই কবিতার গ্রীবায়, উরুতে, নাভিমূলে
স্বাক্ষর রাখার লোভে রঙচটা কাঠের টেবিলে,
হাতের সকল তাস ফেলে খেলে যাচ্ছে ক্রমাগত—
তোমাকে প্রকৃত কতটুকু মনে রাখে ?'

পরিচয় গাঢ়, কিন্তু চিনতে পারি না । শুনে ফেলি
মধ্যরাতে স্বপ্নের ঈষৎ উল্কি-আঁকা
কলকাতার কণ্ঠে মদির হেঁয়ালি,
যেন তার গলার ভেতর
থেকে এক কামবিদ্ধা বিড়ালিনী কিছু ধ্বনি
মসৃণ উগরে দিচ্ছে । বুঝি
আমার সত্তার গহনতা
থেকে উঠে-আসা বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা
এবং মেঘনার তীব্র ঘ্রাণ,
বনদোয়েলের শিস, কলাপাতা, শাপলার হুটোপুটি তার
ক্ষয়াটে বর্তুল ফোমে-গড়া স্তনে ভিন্ন শিহরন
জাগালো আবার ।
কলকাতার বুকের ভেতর কলকল,
কলকাতার বিষণ্ণ ধূসরতায় নীলপদ্ম ফোটে দিনভর, রাতভর ।

ক'দিনই বা আছি ? এখন তো পা রাখার জায়গা নেই
তোমার হৃদয়ে ;
জানি আমি প্রেমিকের স্বীকৃতি পাবো না কোনোদিন ।
এবার চুম্বন কিংবা আলিঙ্গন নয়
তোমার মুখের লালা-ভেজা সপসপে
গহ্বর আমাকে গিলে ফেলার আগেই
স্বৈরিণী জেনেও
তোমার কপালে আমি পরিয়ে সোহাগে
স্খলিত প্রহরে শ্বেত চন্দনের টিপ
সফেদ রুমাল নেড়ে নেড়ে
চলে যাবো চুপচাপ ঘরমুখো বেগানা পুরুষ !

শুধু মুখের রেখা

অজয় নাগ

রঙ চিরে বেরিয়ে আসে হঠাৎ—আমি কিছুটা দূরে
এবং অপ্রস্তুত—নাম মনে করতে পারি না—
চেহারাটা আবছা ওধারে—শুধু মুখ সামনে

আধো ঘুম-ভাঙা মেঘ আমাকে মেদুর করে—আর কিছু নয় ।
আমি এগিয়ে যাই—রেলিং-এর অহংকার ভিতরে যেতে
দেয় না কিংবা আমার হিসাবি বোধ হবেও বা । তবু
মনে হয়—সেই চোখের ভাষা—ঠোঁটের কোণে
প্রত্যয়ের নীল যেন খুব চেনা—মাঝখানে কী করে
যেন চিত্রার অসতর্ক জল চলকে বাকি ইতিহাস
মুছে দিয়েছে ॥

মানুষ মানুষ ব'লে

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

হৃদয়ঘটিত ওকে খেতে পারো, স্যাঁতসেঁতে পিশাচ ।

মানুষ মানুষ ব'লে আমরা উঠেছি ঘুমভাঙা ;
খেতে পারো, খেতে না-ও পারো তার ভাঙা দিগ্বিদিক ।

যেদিক নির্জন আর মেয়েছেলে, কাতর নিখিল—
গাছ-হয়ে-দাঁড়ানো ঐ মরদের, আদিঅন্তহীন নিশ্বাসের ।

ওখানে বাঘের গন্ধ, মানুষ যেভাবে যায় ম'রে ;
ওদিক এখনো খিলখিল ।

মরদ ঝরছে ; আর মেয়েমানুষ, উপচে অনেকদূর গেলো
মানুষের খোঁজে ।

রূপদর্শীর ঝাঁকিদর্শন

নেতাজী মাতাজী পার্টি (প্রাঃ লিঃ)

নেতাজী মাতাজী পার্টি (প্রাঃ লিঃ) ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র এর রকমসকম দেখে দেশের জাবড় জাবড় রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরও গালে মাছি ঢুকে যাবার অবস্থা হয়েছে।

আই মাস্ট অ্যাডমিট, প্রধান রাজনৈতিক ভাষ্যকার শ্রীমান ভাঁড়ুরাম কলমপতি পাইপে টান মেরে বললেন, নেতাজী মাতাজী পার্টি (প্রাঃ লিঃ) আমার প্রেডিকশনকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। আমি ভেবেছিলাম, এই পার্টি হিট্ হবে। কিন্তু সেটা যে সুপারহিট হবে, এ আমিও বুঝতে পারিনি।

আপনি বলছেন, দ্বিতীয় রাজনৈতিক ভাষ্যকার শ্রীমান চামচা লাল চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, নেতাজী মাতাজী পার্টি (প্রাঃ লিঃ) যে সুপারহিট হবে, আপনি সেটা বুঝতে পারেননি। কেন পারেননি, সেটা জানাবেন কি?

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : এটা আমি জানতাম যে, স্টার সিসটেমের দাম এখনও আমাদের দেশের পাবলিক দেয়, মানে এখনও দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখনকার বক্স অফিসে যে তা এত পপুলার হবে, এবং এত তাড়াতাড়ি, সেটা বুঝতে আমার দেরি হয়েছিল।

চামচা লাল : আমার মনে হয়, দেশে আজ যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে···

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : দেখুন, যখন নেতাজী মাতাজী পার্টি (প্রাঃ লিঃ) এসে গিয়েছে, তখন আর ও সব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও মানেই হয় না।

চামচা লাল : মানে হয় না? কেন?

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : এই জন্য যে এই সব সমস্যার সমাধান এখন নেতাজী মাতাজী পার্টি (প্রাঃ লিঃ) করে দেবে। তাহলে আর এসব নিয়ে ফালতু ভেবে কী লাভ?

চামচা লাল : এক হিসেবে আপনি ঠিকই বলছেন। কিন্তু···

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : দেখুন, সেদিন আমি টিভি দেখতে দেখতে এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিলাম। অনেক ভাবাভাবির পর আমার কী মনে হল জানেন?

চামচা লাল : আজ্ঞে না।

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : আন্দাজও করতে পারছেন না?

চামচা লাল : আজ্ঞে না।

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : আমি জানতাম।

চামচা লাল : জানতেন? কী, মানে কোনটা জানতেন?

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : সবটাই জানতাম।

চামচা লাল : আজ্ঞে?

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : হ্যাঁ। আপনি যে, ব্যাপারটা আন্দাজও করতে পারবেন না, এটা আমি জানতাম। রাজনৈতিক ভাষ্য কি আর আজ থেকে লিখছি? মুখ দেখেই আমরা ধরে ফেলতে পারি, আর পেটে কী আছে? হ্যাঁ, কী যেন বলতে শুরু করছিলাম?

চামচা লাল : দাঁড়ান, মনে করি। সব গুলিয়ে গেল কিনা! হ্যাঁ, মনে পড়েছে। টিভি দেখতে দেখতে আপনি কী ভাবাভাবি করছিলেন। তাই না?

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : পলিটিক্যাল করেসপণ্ডেণ্টদের ভাবাভাবি করা একটা অবশ্য কর্তব্য। দিনরাত্তিরই তো আমরা, বলতে গেলে ভাবনার মধ্যেই আছি। ভাবছি তো ভাবছিই। লিখছি তো লিখছিই। ভাবতে ভাবতে লিখছি। লিখতে লিখতে ভাবছি। খেতে খেতে ভাবছি। ভাবতে ভাবতে খাচ্ছি। খাচ্ছি ভাবছি লিখছি। খাচ্ছি না, লিখছি না, ভাবছি। ভাবনার যে কত রকম ফের আছে, তার কি কোনও ইয়ত্তা আছে মশাই?

চামচা লাল : কী এত ভাবেন?

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : অ্যাহ্ হ্যাহ্! সেইটেই হল লাখ টাকার প্রশ্ন।

চামচা লাল : তা সেদিন কী ভাবছিলেন, মানে ওই যেদিন টিভি দেখছিলেন?

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : টিভি তো রোজই দেখি। আর ভাবনাচিন্তা, সেও তো সব সময়েই করছি। আপনি কী জানতে চান?

চামচা লাল : আমি বোধ হয় আপনাকে ঠিক

বোঝাতে পারছিনে। ওই যে, আপনি বললেন না, টিভি দেখতে দেখতে আপনি এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন, সেই ব্যাপারটা বলুন?

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : কোন্ ব্যাপারটা নিয়ে···

চামচা লাল : আমার মনে হয়, আপনি বোধ হয় নেতাজী মাতাজী···
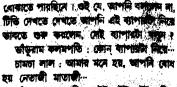
ভাঁড়ুরাম কলমপতি : রাইট রাইট রাইট। ঠিক ধরেছেন। নেতাজী মাতাজী পার্টি (প্রাঃ লিঃ)। এই আশ্চর্য ব্যাপারটা নিয়েই আমি সেদিন ভাবতে বসেছিলাম। যতই ভাবি ততই আশ্চর্য হয়ে যাই। আচ্ছা বলতে পারেন, নেতাজী মাতাজী পার্টি (প্রাঃ লিঃ)-এর এই ফেনোমেনাল সাফল্যের কারণ কী? পারেন বলতে?

চামচা লাল : না। বলতে পারব না। কারণ, আমি না, ব্যাপারটা নিয়ে তেমন ভাবিইনি।

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : আরে, এটা আপনার মনে হয়নি যে, নেতাজী মাতাজী পার্টি (প্রাঃ লিঃ) হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরে প্রথম পলিটিক্যাল পার্টি। তাজ্জব!

চামচা লাল : এই না হলে স্যার পলিটিক্যাল রাইটিং-এ দেশজোড়া নাম হয় আপনার? আপনাকে সবাই গুরু বলে মানে? কী দেখার চোখ! ওয়াণ্ডারফুল!

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : প্রাইভেট সেক্টরে প্রথম পলিটিক্যাল পার্টির এত জনপ্রিয় হবার সমস্যাও আছে। সেটা ভুলে যাবেন না।

চামচা লাল : অ্যাঁ! কী বললেন সমস্যা? নেতাজী মাতাজী পার্টির সমস্যা? পার্টি হতে না হতেই সমস্যায় পতিত হল?

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : না না, এখনই তা বলা যায় না। অর্থাৎ সমস্যায় যে পড়েছে, সে কথা এখনই বলা ঠিক নয়। সেটা ওভার রিঅ্যাকশন হবে। কিন্তু আমরা হলাম তুখোড় রাজনৈতিক ভাষ্যকার। আমাদের সব রকম অবস্থার জন্য তৈরি থাকা ভাল। এই সব নিয়েই তো ভাবছিলাম সেদিন।

চামচা লাল : কী সমস্যা হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : সমস্যা কী একটা? এই দেখুন, এই নেতাজী মাতাজী পার্টি (প্রাঃ লিঃ)-এর সমস্যার কথাই ধরুন। এটা হল ভারতের প্রাইভেট সেক্টরের প্রথম পলিটিক্যাল পার্টি। এটাই তার জনপ্রিয়তার কারণ। আবার এটাই তার সমস্যার কারণ। কি বুঝলেন?

চামচা লাল : আজ্ঞে তেমন কিছু নয়। সবই যদি আমরা বুঝে ফেলব স্যার, তো আপনারা আছেন কেন?

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : হ্যাঁ, সবই যদি আপনারা বুঝে ফেলবেন, তো আমরা আছি কেন? রাইট। তবে এখন সমস্যার কারণটা বলি। এটা সমস্যার কারণও বলতে পারেন, তবে আমাদের পলিটিক্যাল জার্গন অনুসারে এটাকে 'সম্ভাব্য সমস্যার আপাত কারণ'-ই বলা ভাল। তাহলে সব দিক টাইট থাকে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। প্রাইভেট সেক্টরে প্রথম পলিটিক্যাল পার্টি বলেই

নেতাজী মাতাজী পার্টি (প্রাঃ লিঃ) এতটা বক্স অফিস হিট করতে পেরেছে। তার মানে, আমাদের প্রাইম মিনিস্টারের প্রাইভেটাইজেশনের নীতি খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নীতির জনপ্রিয়তা স্বভাবতই নেতাজী মাতাজী পার্টি (প্রাঃ লিঃ) ভাল চোখে দেখবে না। এটাকেই আমি নবজাতক নেতাজী মাতাজী পার্টি (প্রাঃ লিঃ)-এর পক্ষে সম্ভাব্য সমস্যার আপাত কারণ বলতে চাইছি। ক্লিয়ার?

চামচা লাল : এতক্ষণে ব্যাপারটা জলবৎ তরল হয়ে গেল স্যার।

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : তবে আমার প্রেডিকশান হচ্ছে, এই সব আপাত সমস্যার সম্ভাব্য কারণ...

চামচা লাল : কথাটা বোধ হয় স্যার, সম্ভাব্য সমস্যার আপাত কারণ হবে।

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : রাইট রাইট রাইট। থ্যাংক ইউ।

চামচা লাল : আচ্ছা স্যার, আপনি এই পার্টি, অর্থাৎ নেতাজী মাতাজী পার্টি (প্রাঃ লিঃ) সম্পর্কে এতটা উৎসাহিত বোধ করছেন কেন? জানতে পারি কি?

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : নো কোয়েশ্চেন অফ উৎসাহ। আমি বলছি, একদিন নেতাজী মাতাজী পার্টি (প্রাঃ লিঃ) ক্যান্টার করে দেবে। একদিকে নেতাজী, আরেকদিকে মাতাজী। এ রকম কম্বিনেশন সহজে হয়! আবার ম্যানেজিং ডাইরেক্টারদের দেখুন। সেখানেও কী অপূর্ব যোগাযোগ। বসু মুখার্জি হম দর্দ অ্যাসোসিয়েটস্। একজন নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র, তো অন্যজন মাতাজীর পোষ্যপুত্র। এ যেন তুলা রাশিতে বুধ ও শুক্রের সহাবস্থান।

চামচা লাল : স্যার, মনে হচ্ছে, আমরা যেন এতদিন এই রকম একটা পার্টিরই প্রতীক্ষায় ছিলাম।

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : বিলক্ষণ। আমি সেই কথাই তো বলতে চাইছি। ভারতের এই প্রাইভেট সেকটরের প্রথম পলিটিক্যাল পার্টির জন্য দেশের আপামর জনগণ এতদিন অপেক্ষা করেছিল।

চামচা লাল : আপনি বলছেন যে, এই পার্টি দেশের সব সমস্যার সমাধান করে দেবে।

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : দেশের সমস্যা সমাধানের জন্য আমি একটুও উদ্বিগ্ন নই। তার সমাধান তো হবেই। হবেই নয়, টু টেল ইউ প্রিসাইজলি, ধরে নেওয়াই ভাল যে, সে সবের যা হবার হয়েই রয়েছে। সামান্য একটু খিচ না থাকলে, দেশের লোক এতদিনে কবেই তার বেনিফিট পেয়ে যেত।

চামচা লাল : খিচ্? কিসের খিচ্ স্যার?

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : এই পাওয়ারে এসে ওঠা। কিস্‌সা কুর্সিকে উঠনে কা।

চামচা লাল : ওহ্ এই! আমি আরও ভাবছি, কী না কী!

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : কিছু না, কিছু না। এটা একেবারেই তুচ্ছ একটা ব্যাপার। ও নিয়ে আপনাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। নেতাজী মাতাজী পার্টি (প্রাঃ লিঃ) যেদিন চাইবে,

সেইদিনই জনগণ ওঁদের পাওয়ারে বসিয়ে দেবেন। এটা কোনও সমস্যাই নয়।

চামচা লাল : তবে অন্য সমস্যাও আছে নাকি?

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : আছে, তবে সেটা ইনটারন্যাল। নাথিং টু ডু উইথ্ পাবলিক।

চামচা লাল : ইনটারন্যাল সমস্যা? যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ইনটারন্যাল সমস্যা কার না থাকে। আদর্শের মিল থাকলে, সে সমস্যা মিটে যায়।

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : রাইট রাইট রাইট। আদর্শ যেখানে এক, সেখানে আর গোল কিসের? নেতাজী মাতাজী পার্টি (প্রাঃ লিঃ)-র সম্ভাব্য আদর্শ আপাত দৃষ্টিতে এক। যেটুকু খোঁচ খাঁচ আছে, সেটুকু কী ভাবে চেঁচে পুঁছে ফেলা যায়, তার জন্য নেতাজীর ওয়ারিশ আর মাতাজীর ওয়ারিশের মধ্যে বেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আলাপ আলোচনা চলেছে। আপাতগ্রাহ্য কোনও অমিল অথবা গরমিল এখন পর্যন্ত চোখে পড়ছে না। তবে উভয় ওয়ারিশের ঘনিষ্ঠ সূত্রে একটা খিচ বা হিচের কথা শোনা গিয়েছে।

চামচা লাল : ঘনিষ্ঠ সূত্রে খিচ! বলছেন কী স্যার? কিন্তু কিছু তো বোঝা যায় না।

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : আরে ওটা তো ইনটারন্যাল খিচ। আর তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইন্ ফ্যাক্ট ওটা খিচ কিনা, সে কথা ঘনিষ্ঠ সূত্রও নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারেনি।

চামচা লাল : ব্যাপারটা কি জানতে পারি স্যার?

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : গুরুত্বপূর্ণও নয় যখন, তখন আর বলতে বাধা কী? সমস্যাটা আদৌ পলিটিক্যাল নয়, বরং বলা উচিত সমস্যাটা সার্জিক্যাল।

চামচা লাল : কী বলছেন, সার্জিক্যাল? মানে অস্ত্রোপচার? মানে অপারেশন?

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : আর এটা যে ঠিক সার্জারির কেস, সেটাও ঘনিষ্ঠ সূত্র নিশ্চয় করে বলতে পারছে না তো! হয়তো শেষ পর্যন্ত সার্জারির দরকার নাও হতে পারে। ঘনিষ্ঠ সূত্র কিছু বলতে পারছে না দেখে বিকল্পসূত্রকে ট্যাপ করেছিলাম, সেখানেও দেখলাম কিছু জানে না, তখন বাধ্য হয়েই বিকল্প সূত্রের শরণাপন্ন হতে হল। এই সূত্র দেখলাম, প্রবলেমটা সম্পর্কে অবহিত। তাতেই জেনে গেলাম, সার্জেনের পরামর্শ নেওয়া হতে পারে। অথবা হচ্ছে। অথবা হয়ে গিয়েছে। তবে মাইনর অপারেশন।

চামচা লাল : স্যার, কেসটা কী?

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : নেতাজীর আদর্শ আর মাতাজীর আদর্শ এক সঙ্গে জোড়ার কিছু ব্যাপার রয়ে গিয়েছে তো। চিন্তার কিছু নেই। একটা ছিল পিওর নেতাজীর আদর্শ, আর একটা ছিল মাতাজীর আদর্শ, দুটোই এত পিওর যে কোনও কিছু বাদ দিতে না পারলেই ভাল হত।

চামচা লাল : সে তো অবশ্য স্যার। দুটো আদর্শের তো কিছুই বাদ দেওয়া যায় না।

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : ঠিকই তো। উভয় আদর্শের যাঁরা অছি, তাঁরা তো যথেষ্ট সৌহার্দ্যমূলক পরিবেশে এ পর্যন্ত সাতশ পঁয়ত্রিশটা সেমিনার, ইনার মিটিং, লো লেভেল ডেলিগেট কনফারেন্স, ক্লোজডোর হাই লেভেল মিটিং, ইত্যাক গোটা কয়েক সামিটও সেরে ফেলেছেন। সকলেই এ বিষয়ে একমত, দুটো আদর্শই এমন পিওর যে, কোনটা থেকেই কিছু বাদ দেওয়া যায় না। আবার পিওর হিসাবে ট্রিট করলে আদর্শ দুটোই থাকে। কিন্তু একটা পলিটিক্যাল পার্টি, হোক না তা প্রাইভেট সেক্টরে, কিন্তু তার তো আর দু সেট পিওর আদর্শ থাকতে পারে না। একটা পলিটিক্যাল পার্টির আদর্শ একটাই রাখতে হবে, এ বিষয়েও সকলে একমত, তাহলে উপায় কী? আরও একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, খানিকটা কমপ্লিকেশন আর কি। এটা অতি ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গিয়েছে। সেটা হচ্ছে আদর্শের ফিমেল মেল প্রশ্ন স্বভাবতই এসে পড়ছে। দুটো নেতাজী বা দুটো মাতাজীকে জোড়ার সমস্যাটা এক ধরনের, সেটা বরং লেস কমপ্লিকেটেড্। কিন্তু এখানে জুড়তে হবে নেতাজীর সঙ্গে মাতাজীর। অর্থাৎ আদর্শের হরমোনও অ্যাড্‌জাস্ট করতে হবে সুনিপুণ দক্ষতায়। হরমোন আবার বড় সেন্সেটিভ। হরমোনে গোঁজামিল চলে না। গাইনোকোলজিক্যাল প্রবলেমগুলোকে তাই একেবারে ইগনোর করাও যাবে না।

চামচা লাল : আপনি একে তেমন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলছেন না। এটা যদি গুরুত্বপূর্ণ না হয়, তবে স্যার, গুরুত্ব আর কাকে বলে?

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : আরে আমি কি আর বলছি? বলছে তো ওদের ঘনিষ্ঠ সূত্র।

চামচা লাল : তাহলে দাঁড়াল কী?

ভাঁড়ুরাম কলমপতি : ঘনিষ্ঠ সূত্রের মতে, কেসটা আপাতত গাইনি আর সার্জনের হাতে আছে।

ছবি : দেবাশিস দেব

গাবু বেঁচে আছে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

একেক সময় এমন হয়, আস্তে চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন গুণদাপ্রসাদ, যখন কারুর কিছু করার থাকে না। গঙ্গার ধারে গিয়ে দাঁড়ালে-এ বয়সে এমন কথা মানুষের মাথায় আসা স্বাভাবিক, বিশেষ করে হাতে যদি একটা ছড়ি থাকে এবং সমবয়সী সঙ্গী থাকেন। তাছাড়া সুনসান নিরিবিলি জায়গা, গাছপালা, আকন্দঝাড়, একটু নিচে অথৈ জল—যা বইছে অথবা বইছে না, তাকিয়ে কথা শুনছে বলে ভুল হয়। মানুষ যেমন জলের দিকে তাকায়, জলও মানুষের দিকে তাকায় হয়তো।

গুণদাপ্রসাদ রেলের গার্ড ছিলেন। রিটায়ার করেছেন। প্রমথনাথ এখনও করেননি। শ্যামাসুন্দরী বিদ্যাপীঠে দেখতে দেখতে তিরিশ বছর কেটে গেল। মাস্টারি ভঙ্গীতে উদাত্ত গলায় বললেন, আসলে সব কাগুজে বাঘ। পেপার টাইগার্স!

কী? গুণদাপ্রসাদ আনমনা হয়ে পড়েছিলেন। কাদের কথা বলছ?

পুলিসের।

পুলিসেরও কিছু করার থাকে না অনেক সময়। গুণদাপ্রসাদ শান্তভাবে আগের সুরে বললেন। এমন একেকটা বিচ্ছিরি সময় আসে, যখন আইনকানুন অকেজো হয়ে যায়। চোখ রাঙিয়ে বেটন চালিয়ে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটিয়ে, এমন কী গুলি ছুঁড়েও সিচুয়েশান কন্ট্রোলে আনা যায় না। একটু থেমে ফের শ্বাসের সঙ্গে বললেন, আমি দেখেছি। লক্ষ্মীপুর জংশনে একবার—

তুমি মবের কথা বলছ! প্রমথনাথ ছাতিম গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে গেলেন। কিন্তু তখন সব কোথায়? ওই যে জায়গাটা দেখছ, ওখানে বডি। আর এই গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দুই সেপাই। উইথ আর্মস।

তুমি দেখেছ?

হুঁউ। স্কুলে ছুটির পর এখান দিয়ে শর্টকাট করা চিরদিনের অভ্যাস।

শুনলাম টিপটিপ করে বিষ্টি পড়ছিল।

পড়ছিল। সাইক্লোনিক ওয়েদার ছিল। সবই ঠিক। কিন্তু তখন ফ্লাড কোথায়? ফ্লাড তো এল পরদিন ভোরবেলা।

গুণদাপ্রসাদ পা বাড়িয়ে বললেন, কিছু বোঝা যায় না।

একটু দূরে এই নিচু বাঁধ-রাস্তার ভাঙন। ভাঙনে দু'খানা সবুজ বাঁশ লম্বালম্বি শুয়ে সাঁকো হয়েছে। দুই প্রবীণ ঝুঁকি নিলেন না। ঘুরলেন। পশ্চিমের লাল মেঘের ছটায় পুবের গঙ্গা রক্তগঙ্গা

হয়ে গেল হঠাৎ। শিমুল গাছটার ঝাঁকড়া লম্বাটে ডালে কয়েকটা শকুন পুরনো ভাস্কর্যের মতো স্থির। দূরের আশ্রমে মাইকে খোলকত্তালের শব্দ, ভক্তিগীতির ছেঁড়া কলি, একবার এগিয়ে একবার পিছিয়ে আবহমণ্ডলে মিস্টিসিজম ছড়াচ্ছে, মুঠো মুঠো রহস্যমিশ্রিত ভক্তি অথবা ভক্তিমিশ্রিত রহস্য—রক্তগঙ্গার ভয়াল শাক্ত রূপ ধীরে ঘষা খেতে খেতে ভৈরবী হতে হতে কানা বোষ্টুমী হয়ে গেল। ঘাটের মাথায় চায়ের দোকান অব্দি দুই বন্ধু চুপ। শেষে গুণদাপ্রসাদই বললেন, একটু চা খাই এসো।

প্রমথনাথের একটু-আধটু শুচিবাই আছে। সেটা স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি বলে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু একটু আগের আলোচনা তাঁকে ভেতর-ভেতর এখনও ব্যাডমিন্টন খেলাচ্ছে। শাট্‌লকক একবার তাঁর কোর্টে, একবার গুণদাপ্রসাদের। অগত্যা অনিচ্ছা-অনিচ্ছা করে বসলেন। জানেন, এই প্রাক্তন রেলওয়ে গার্ড এক গেলাস চা না খেয়ে উঠবেন না। তাঁর সঙ্গে খেলা অসমাপ্ত রেখে যাওয়া ঠিক নয়। বললেন, আমি কিন্তু মাটির ভাঁড়ে।

ঘাটে ভিড়টা সন্ধ্যার মুখে বেড়ে যাওয়ার নিয়ম। এদিক-ওদিক থেকে, এমন কী ওপার থেকেও মানুষজন এসে জোটে। কাজে এবং অকাজে। বেশির ভাগ নবীন যুবক। শ্যাম্পু করা চুল, পরনে জিনস পর্যন্ত, অজস্র হাতে ক্যাসেট প্লেয়ার ও ট্রানজিস্টার এবং ধ্বনি-প্রতিযোগিতায় বুড়োহাবড়ারা তিষ্ঠোতে পারে না। তবু মানিয়ে নিতে হয়। পাটের মরসুম। হাজি মেহেরুদ্দিন আড়ত থেকে ভেতর পকেট ভারি করে বেরিয়ে প্রমথনাথকে দেখে আদাব দিলেন।

প্রমথনাথ খুশি হয়ে বললেন, এই যে!

মেহেরুদ্দিন গুণদাপ্রসাদকে চিনতে পেরে তাঁকেও আদাব দিয়ে বললেন, আরেব্বাস! বড়বাবু কবে এলেন? থাকছেন তো কিছুদিন?

জবাব প্রমথনাথই দিলেন। গুনুবাবুকে আর আমরা যেতে দিচ্ছিনে। সিগন্যালের তার কেটে দিয়েছি। রেল গাড়ি কাঁটালিয়াঘাট রোডে আটকে রইল। আর সিগন্যালটি ডাউন হচ্ছে না।

হাজি মেহেরুদ্দিন কিছু না বুঝেই খুব হেসে বললেন, খুব ভাল। খুবই ভাল।

কাঁটালিয়াঘাটের রায়চৌধুরী ভাইদের মধ্যে শুধু বড়বাবু গুণদাপ্রসাদই টিকে আছেন। মেজবাবু অন্নদাপ্রসাদ হৃদরোগে কলকাতায় গত। সেজবাবু মোক্ষদাপ্রসাদ এই গঙ্গায় চান করতে তলিয়ে যান। ছোটবাবু রণদাপ্রসাদ ক্যান্সারে। চিরকুমার গুণদাপ্রসাদের বুকের ভেতর তিনটে শুকনো ক্ষত। এইসব ক্ষত থাকলে মানুষ নির্লিপ্ত এবং দার্শনিক হতে বাধ্য। প্রমথনাথ বুঝতে পারেন।

মেহেরুদ্দিন পাছে সেই ক্ষতে খুঁচিয়ে দেন, সাবধানী প্রমথনাথ দ্রুত বললেন, এই একজন প্রত্যক্ষদর্শী, গুনু! হাজিসায়েব, তুমি ওকে বলো, ঠিক কী হয়েছিল ছাতিমতলায়!

কিসের? মেহেরুদ্দিন প্রশ্নটা করেই সেকেণ্ডে বুঝলেন। গম্ভীর হয়ে গেলেন। আস্তে বললেন, হুঁ—গাবু!

গুণদাপ্রসাদ শুধু তাকালেন। মাছের চোখ। প্রমথনাথ বললেন, বলো হাজিসায়েব! দু-দুজন আর্মড কনস্টেবল ছিল কিনা? তাদের চোখের সামনে থেকে বডি উঠে গিয়েছিল কি না?

মেহেরুদ্দিন চারপাশটা দেখে নিলেন। ঘটনার পর থেকে সন্ধ্যার মুখে ভিড়টা ইদানীং কম। যুবকদের আনাগোনাও কমেছে। প্রথম কয়েকটা দিন বিকেল যেতে না যেতে খাঁ খাঁ অবস্থা ছিল ঘাটের। ক্যাসেট প্লেয়ার/ট্রানজিস্টার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখানে-ওখানে রাগী মারকুটে চেহারার খাকি পোশাক-পরা সেপাই, হাতে-হাতে মাস্কেট। এখন তারা নেই। আবার আগের অবস্থা ফিরে আসছে দিনে-দিনে। তাছাড়া পাটের গাঁট এসে জমছে পাহাড় হয়ে। জুট কর্পোরেশন হাওয়া চাগিয়ে দিয়েছে। মেহেরুদ্দিন চাপা স্বরে বললেন, আমার সন্দ আছে মাস্টারবাবু।

কিসের?

মরা মানুষ কি কখনও জিয়ন্ত হয়? হয় না। হাজিসায়েব একটু হাসলেন। তবে কথায় আছে

'কাঁটলেঘাটের মরা' !

প্রমথনাথ চার্জ করলেন, ওসব বোগাস ! বডি গেল কোথায় ? গঙ্গার উজোন-ভাঁটি তন্নতন্ন মোটরবোট নিয়ে খুঁজেছে।

মেহেরুদ্দিন তিন-তিনবার সউদি আরবে গেছেন। সেই যাওয়াকে তিনি বলেন, 'ফেলাই' করা। নিজেই রসিয়ে-ফেনিয়ে বর্ণনা করেন, কীভাবে শেষবার ভিসার মেয়াদ ফুরুলেও ছ-সাতটা মাস সে-দেশে ছিলেন। সউদি পুলিস খোঁজে এলে কীভাবে পাহাড়ে কন্দরে লুকিয়ে

থাকতেন, সেটা দারুণ অ্যাডভেঞ্চার। শেষে বলেন, আমার 'এজেং' বড় চালাক। এজেন্ট চালাক না হলে আজকাল মক্কেল জুটবে না। তেমনি চাপাস্বরে বললেন, কাল ভাঙা বাঁধের জন্যে এস এল এ বাবুর কাছে ডেপুটেশান-এ গিয়েছিলাম। শুনলাম এনকুয়েরি রেপোর্টে লিখে দিয়েছে, ফেলাড। কিন্তু তখন ফেলাড কোথায় বলুন?

উত্তেজিত প্রমথনাথ বললেন, সেটাই তো বোঝাচ্ছিলাম তোমাদের গুনুবাবুকে। তখন ফ্লাড কোথায়? তবে এনকোয়ারি কমিশনের কথা বললে, সে-রিপোর্টের কথা আমিও শুনেছি। লিখেছে : 'ডিউ টু দা সাইক্লোনিক ওয়েদার অ্যান্ড ফ্লাড, দি প্রেস অফ অকারেন্স ওয়াজ ওয়াশ্ড্ অ্যাওয়ে অ্যাণ্ড দি বডি কুড নট বি ট্রেসড্ এট্সেট্রা এট্সেট্রা'।

এই সংলাপ গুণদাপ্রসাদের উদ্দেশে। কিন্তু তিনি মাছের চোখে তাকিয়ে গেলাসে চুমুক দিচ্ছেন। এও খুব বিস্ময়কর দৃশ্য কাঁটালিয়াঘাটে, সামান্য মানুষ জগনের চায়ের দোকানে রায়চৌধুরীদের বড়বাবুর চা-খাওয়া। জমিদার বংশ। ব্রাহ্মণ। তবে এটা রেলওয়েরই নিঃশব্দ বিপ্লব বলা চলে। গুণদাপ্রসাদ নিরুত্তর দেখে বিরক্ত প্রমথনাথ হাজিসায়েবের দিকে ঘুরলেন। কিছুদিন আগেও প্রসঙ্গটি নিয়ে মুখখোলা যেত না। শুধু দেয়াল নয়, বাতাসেরও কানের অস্তিত্ব সাব্যস্ত হয়েছিল। প্রমথনাথ খাপ্পা হয়ে বললেন, ডেডবডি—বুকে বুলেটের ছ্যাঁদা, উঠে পায়ে হেঁটে চলে গেল আর দুই আর্মড সেপাই তাকিয়ে রইল!

জগন মুখ খুলল এবার। সেও একজন ভোটার। ভোটার লিস্টে নাম থাকলে সব ব্যাপারে মুখ খোলা যায়। বলল, গুস খাইলে খাইতেও পারে ওনারা। তবে অনেক কিছু ঘটে, বাইখ্যা দ্যাওন যায় না। (যা-য়-না দীর্ঘ ধ্বনিযুক্ত)।

মেহেরুদ্দিন শুকনা হাসলেন। ঠিক, ঠিক রে বাবা! খোদাতালার দুনিয়ায় সব কিছু সহজে বোঝা যায় না।

জগন অনায়াসে বলল, এট্টু আগে একজন আইছিল—নাম কমু না, কইল কী, গাবুরে দ্যাখছে।

প্রমথনাথ মাটির ভাঁড়টা জুতোর তলায় মড়মড় শব্দে গুঁড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পকেটে হাত ভরতে গিয়ে দেখলেন, গুণদাপ্রসাদ এক টাকার নোট গুঁজে দিচ্ছেন জগনের হাতে। আধুলি ফেরত নিয়ে ছড়িটি তুলে পা বাড়ালেন। মেহেরুদ্দিন বসে রইলেন। ভাগ্নে আরিফ মোটরসাইকেল রেখে ঘাটের মাথায় দাঁড়িয়ে একজনের সঙ্গে কথা বলছে। ব্যাকসিটে বসে বাড়ি ফিরবেন হাজিসায়েব। ভেতর পকেটে কয়েক শো নোটের বাণ্ডিল। দিনে-দিনে কেমন সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, ভালয়-মন্দয় দলাপাকানো। তফাত করা যায় না। শুধু ছমছমানি।

ঘাট থেকে কয়েকপা হাঁটলে চৌমাথা। সোজা এগোলে রেলস্টেশন। বাঁয়ে গেলে এঁকে-বেঁকে পিচের সড়ক কাটোয়া পৌঁছে দেবে। ডাইনে গেলে বাজার পেরিয়ে পুরনো গঞ্জ, নতুন বাড়ি, রঙবেরঙের তাসের মতো। তাসের উপমা মাথায় আসে স্কুলশিক্ষকের। অনভূতির তীব্রতা থাকলে এমন ঘটে। বর্তমানের ভেতর অতীত এসে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে। তাসের ঘর ভেঙে যায়।

গুনু! প্রমথনাথ ডাকলেন।

গুণদাপ্রসাদ শুধু হুঁ বললেন। বাঁধের ওপর ভ্রমণে দুজনেই এখন আস্তে হাঁটছিলেন না। ওদিকটায় বাঁধ সত্ত্বেও প্রকৃতি নৈকষ্য কুলীন। ঝোপঝাড়, গাছপালা, শ্মশান, গঙ্গা—প্রচণ্ড প্রকৃতি। গাবুর ব্যাপারটা সেই প্রকৃতিকে রহস্যে ছমছমিয়ে রেখেছে—দুসপ্তা পরেও। ছাতিম গাছটাও জৈবতা পেয়েছে। সারা শরীরে চোখ। গুণদাপ্রসাদের, তার ওপর, ভূতপ্রেতে খুব বিশ্বাস। রেলের গার্ড ছিলেন। পাল্লা দিয়ে সাদা কাপড়পরা মূর্তি দৌড়তে দেখেছেন। রাতটা ছিল জ্যোৎস্নার। এ জিনিস কাউকে বোঝানো যায় না।

প্রমথনাথ বললেন, তাহলেই বোঝো।

কী?

গাবুর ব্যাপারটা। গাবুকে কে সদ্য দেখেছে কোথায়, জগন বলল। অতএব এবারে দুয়ে দুয়ে যোগ দাও।

সব সময় যোগে মেলে না হে।

প্রমথনাথ গ্রাহ্য করলেন না।...হাজিসায়েব বলল মড়া কখনও জ্যান্ত হয়? একজ্যাক্টলি। সত্যিকার মড়া কখনও জ্যান্ত হয় না। হি ওয়াজ উণ্ডেড, নট ডেড। গাবুর কথা বলছি।

গুণদাপ্রসাদ আস্তে বললেন, অংশু বলছিল, পয়েন্টব্ল্যাংক রেঞ্জে গুলি।

অংশু দেখেছিল নাকি? প্রমথনাথ খিকখিক করে হাসলেন।...বরাবর দেখেছি, একটা কিছু ঘটলে ডজন ডজন আইউইটনেসের অভাব হয় না। যাই হোক, অংশুকে সাবধান করে দিও।

গুণদাপ্রসাদ আনমনে বললেন, গাবুকে আমার মনে পড়ে। ছুটি ছাটায় এসে দেখেছি। প্রণাম করে গেছে। লাজুক, নম্র ছেলে ছিল—দিস ইজ মাই ইম্প্রেশান!

'মাই' শব্দটার ওপর একটু জোর পড়েছিল। প্রমথনাথ বললেন, তুমি বলতে গেলে বরাবর আউটসাইডার। আমাদের ইম্প্রেশান উল্টো। না—তাকে মাস্তান বা সমাজবিরোধী বললে অন্যায় হবে। হি ওয়াজ এ ফাইটার! বলবে, আমি তাহলে প্রশংসা করছি কি? ফাইটার হলেই প্রশংসার যোগ্য, আমি একথা মনে করি না। ফাইটটা কিসের, সেটা আগে বিচার করতে হয়। মহাভারত-রামায়ণ-ইতিহাস সর্বত্র দেখ, অসংখ্য ফাইটার। দুর্যোধনও ফাইটার, অর্জুনও ফাইটার। রাম এবং রাবণ—সুলতান মামুদ এবং শিবাজী...যাই হোক, কিসের সঙ্গে কী—গাবু বুঝত না ফাইটটা কার বিরুদ্ধে এবং কেন।

কাগজে দেখেছি পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে নকশাল নিহত।

প্রমথনাথ প্রচণ্ড হাসির চাপে লম্বাটে শরীর সামলাতে মোটাসোটা গুণদাপ্রসাদের কাঁধ আঁকড়ে ধরলেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, সেই তো বলছিলাম তোমাকে। আজকাল সবই 'পেপারে' দাঁড়িয়েছে। মানে কাগুজে হয়ে গেছে। কাগুজে নকশাল, কাগুজে পুলিস, কাগুজে বাঘ, কাগুজে বাঁধ—হ্যাঁ, ওই বাঁধ নিয়ে কী কেলেঙ্কারি হয়েছিল জানো? কাগুজে মাপ দশ কিলোমিটার ইনটু পাঁচ মিটার ইনটু তিন মিটার। হেঁটে তো এলে। কী মনে হল? পাঁচ মিটার চওড়া, তিন মিটার উঁচু? ভাই গুনু, পুরো দেশটা কাগুজে হয়ে গেছে। তুমি আছ কোথা?

গুণদাপ্রসাদ চুপচাপ হাঁটতে থাকলেন। বাজার ছাড়িয়ে বিদ্যুতের খুঁটি গেছে ভেতর দিকটায়, জালের মতো ছড়ানো মাথার ওপর সুসংবদ্ধ তার। বাজারের দিকটায় রাস্তায় আলো, তারপর সন্ধ্যার ধূসরতা ফুঁড়ে এখানে-ওখানে চৌকো হলুদ আলোর ফালি—ঘরের জানালায়, কোনো রোয়াকেও। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। শেষ আশ্বিনের মিষ্টি হিম আর হঠাৎ শিউলির ঝাঁঝালো গন্ধ। আকাশে কিছু নক্ষত্রের গায়ে গা ঘষে যাওয়ার মতো বুনোহাঁসের ঝাঁক চলে গেল। গুণদাপ্রসাদ ছুটিতে এসে গঙ্গার বাঁওরে বন্দুক নিয়ে হাঁস মারতে যেতেন। আজকাল হাঁস বসে না খবর নিয়েছেন। তাছাড়া বন্দুক ছিনতাই হওয়ার ভয় আছে। বকুলতলায় দাঁড়িয়ে বললেন, চলি!

প্রমথনাথের আরও বলার কথা ছিল। শ্বাস ছেড়ে বললেন, এস। পরে কথা হবে'খন। আমার আবার টিউশনি আছে। যাই, দেখি।...

মেহেরুদ্দিন হাজি একটি কিংবদন্তীসিদ্ধ বাক্য আওড়েছিলেন, 'কাঁটালেঘাটের মড়া' (মুসলিমরা মরা বলেন), প্রমথনাথ বলেছিলেন, ওসব বোগাস! সেটা তর্কের ঝাঁঝ। নিজের সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত করতে চাইলে মানুষ চোখ বুজে হাত চালাবেই। অবশ্য ওই প্রবচনটির ধার ক্ষয়ে-ক্ষয়ে নেতিয়েও গেছে। বিশ বছর আগেও তল্লাটে কোথাও কেউ কাঁটলেঘাট যাচ্ছি বললেই তার মুচকি হাসি পাওনা হত, তা যতই বাবুগিরি করে বলা হোক না 'কাঁটালিয়াঘাট' যাচ্ছি'! শ্মশানটার জন্য এই খ্যাতি-অখ্যাতি। বস্তুত পাড়াকুঁদুলিদের মুখে ওটি ছিল প্রথাসিদ্ধ গাল, হাজিসায়েবের বাক্যটি। সেই উদ্ধারণপুরের পর গঙ্গার উজানে কাঁটালিয়াঘাট দ্বিতীয় মহাশ্মশান, ইদানীং যেখানে এক সাধুবাবার বিশাল আশ্রম। প্রহরে-প্রহরে মাইকে খোল-কত্তাল, ভক্তিগীতির ছেঁড়াখোঁড়া একটু কলি গাঙেয় বাতাস এপার-ওপার কতদূর টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু এই মিস্টিক ও কোমল ভক্তির বীজ পুঁতেছিলেন পুব থেকে আসা উদ্বাস্তুরা। নইলে ঘোর শাক্ত মাটি, মহাশ্মশান, ভৈরব-ভৈরবী, ত্রিশূল, মড়ার খুলি, কারণবারি, জটা ও হুঙ্কার, হাড়িকাঠ ও খাঁড়া; তাই রক্তে ও মৃত্যুতে ভয়াল কাঁটালিয়াঘাটে জীবন্মৃত্যুর মাঝের সীমারেখাটি টুঁড়ে পাওয়া যেত না। তিরিশ বছর আগেও ছিল লুপলাইনের হল্ট মাত্র। তার পর স্টেশন হল। প্ল্যাটফর্ম হল। সেই প্ল্যাটফর্ম উঁচুও হল। শেষেওভারব্রিজপর্যন্ত। বিদ্যুৎ প্রবাহ চালু করে গেলেন স্বয়ং বিদ্যুৎমন্ত্রী। নিছক ঘাট অর্থাৎ

শ্মশান থেকে গঙ্গা, গঙ্গা থেকে রীতিমতো টাউনশিপ। এখন কাঁটালিয়াঘাট যাচ্ছি বললে ভালরকম একটা যাওয়াই বোঝায়। তার ফলে সেই রহস্যময় ঘটনাটিও আর ঘটে না, মড়ারা এসে জ্যান্ত হয়ে ট্যাঙস ট্যাঙস করে হেঁটে যায় না। এও প্রবাদ ছিল, 'কাঁটলেঘাটে কে মড়া কে জ্যান্ত, বুঝা কঠিন।' সব প্রবাদ পুরনো শিলালিপির মতো ক্ষয়ে দুষ্পাঠ্য হয়ে গেছে। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের কিছু আগে রাধাপ্রসাদ রায়চৌধুরী জ্ঞাতিদের সঙ্গে লড়ে ফতুর হয়ে কাঁটালিয়াঘাটের পুরনো কাছারি বাড়িটাকেই জমিদার বাড়িতে রূপ দেন। ততকিছু ঝকমকে রূপ নয়, নেহাৎ দোতালা বাড়ি—শেষ ছাদটাও দেখে যেতে সময় পাননি। কপালীতলায় জ্ঞাতিরা আগাগোড়া হেসে অস্থির। চার যোয়ান ছেলের বড় ও মেজ চাকুরে। সেজ ও ছোট মাটি নিয়ে লড়তেন। সেজটি ছিলেন মারকুট্টে ভিলেন। তাঁকে সামলাতে বড় গুণদাপ্রসাদকে মাঝে মাঝে আসতে হত। লোকের মতে, মাটির মানুষ বড়বাবু। অথচ রেলের গার্ড হলে মানুষের সঙ্গে মাটির সম্পর্ক নষ্ট হয়। শরীরে রেলগাড়ির মতো চাকা গজায়। একই যুক্তিতে বড়বাবু সেজকে বলতেন, 'ছেড়ে দে' এবং চাষীদের সঙ্গে রফা করতেন। 'রফা করতে করতে কোথায় ঠেকছি, লক্ষ করেছ?' সেজ মোক্ষদাপ্রসাদ বলতেন। বড়বাবু চলে গেলে সেজবাবু আবার মাটিতে থাবা হাঁকড়াতেন। কাঁটালিয়াঘাটে তখনও জ্যান্ত-মড়ার সীমারেখাটি 'বুঝা কঠিন ছিল।' মোক্ষদাপ্রসাদকে টেনে নিলেন গঙ্গা, মোক্ষ দিলেন হয়তো, কিন্তু আসল গণ্ডগোলটা অন্যখানে। কাঁটালিয়াঘাটে মাটি ভাল করে না আঁকড়ে ধরলেই বিপদ। জ্যান্ত-মড়ার সীমারেখাটি নিমেষে তছনছ হয়ে যায়। ফলে মোক্ষদাপ্রসাদ কিছুকাল দেখা দিতেন শেষরাতের ফিকে জ্যোৎস্নায় গমক্ষেতের কোনো বুড়ো চাষীকে, যে তার পাকা ফসল পাহারা দিতে ক্ষেতের শিয়রে কুঁড়ে বেঁধেছিল। কাঁটালিয়াঘাটে বিদ্যুৎ আসার পর ভূতের দৌরাত্ম্য কমেছে।

গুণদাপ্রসাদের আসা সাত দিন হয়ে গেল। মন কিছুতেই বসছে না। শরীরে চাকা ঘুরছে, সারাক্ষণ রাতের মালগাড়ির শব্দ, মাঝে মাঝে সামনের দিক থেকে ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ হুইসল। একটু পরে বোঝেন, আশ্রমের মাইক, এবং কামরূপ এক্সপ্রেস পাস করে যাচ্ছে, খই ফোটার শব্দটা বাঁকের মুখে মিলিয়ে গেল।

বড়বাবু, কবে আসা হল? গুণদাপ্রসাদ এ দিকটায় এলেই প্রণাম পান। এ দিকটায় চাষাভুষো ক্ষেতমজুর মৎস্যজীবী মানুষজন। বিদ্যুৎ এতটা আসেনি। বন্যার পর ত্রাণ ব্যবস্থা দেখতে আসা মন্ত্রীমশাইকে নাকি স্থানীয় বিদ্যুৎবাবু কৈফিয়ৎ দেন, 'উই আর অ'ফুল্লি সরি স্যার! নো ডিম্যাণ্ড স্যার! নোবডি অ্যাপ্লায়েড স্যার!' প্রমথনাথ মুড়ে থাকলে ক্যারিকেচারে পাকা। তাঁর সেই ক্যারিকেচার অনুসারে, মন্ত্রীমশাই স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকে জিগ্যেস করেন, এখানকার কুটিরশিল্প কী? জনপ্রতিনিধি মুচকি হেসে এবং আস্তে বলেন, 'বোমা'! রাষ্ট্রীয় গাম্ভীর্য চিড় খায় এবং মন্ত্রীমশাই শুষ্ক হাস্যে বলেন, 'দেয়ার ওয়াজ এ রিপোর্ট অ্যাবাউট নকশাল অ্যাকটিভিটিজ।' জনপ্রতিনিধি আরও আস্তে বলেন, 'পরে বলব 'খন।' তার পর নাকি জিপের দিকে যেতে যেতে কথোপকথনের বাকি অংশ:

সামবডি ওয়াজ কিলড্ ইন এ কনফ্লিক্ট উইথ দা পোলিস?'

'হ্যাঁ। গাবু।'

'কে সে?'

'ছিল একজন। আসলে—'

'এস পির রিপোর্টে দেখলাম হি ওয়াজ এ নকশাল অ্যাণ্ড হ্যাড বিন ক্রিয়েটিং টেরর অ্যামং দা পিপল্।'

'বলছি। চলুন।'...

কাঁটালিয়াঘাটের এই লেজের অংশটাই পুরনো এবং বাঁওরের কাছাকাছি বলে মাটিটা নিচু। জল ও মাটি থেকে যারা সরাসরি খাদ্য সংগ্রহ করে, তারা জল ও মাটির ঘনিষ্ঠ হয়ে ঘর বাঁধবেই। বাঁওরের সঙ্গে হাউলির বিলের প্রাগৈতিহাসিক নাড়ির বাঁধন বাঁধা। বাঁওরে মাছ না পেলে হাউলি বুক পেতে ছিল। শুধু মাছ কেন, হেঞ্চা-কলমি-সুসনি শাক, গুগলি-কাঁকড়া-ঝিনুক, পানিফল পদ্ম-শালুক থরে বিথরে সাজানো। ক'বছর সরকারি ফিশারি হয়ে হাউলির দরজা বন্ধ। ওটা একটা গবেষণা-প্রকল্পের রূপায়ণ। তবে বাঁওরটা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি পেয়েছে। তার চেয়ারম্যান স্থানীয় জনপ্রতিনিধি। তাই বলে খ্যাদোড় বাউরি তার সদস্য হতে আইনে বাধা আছে। সে মৎস্যজীবী নয়। হেতু কুনাইও নয়! বড়বাবুকে অপ্রত্যাশিত দেখে দুজনেই উঠে এল। পোনাম বড়বাবু! পোনাম বড়বাবু! তারপর প্রবীণ বাউরি মানুষটি বাঁওরের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে বলল, আর হাঁস আসে না বড়বাবু!

গুণদাপ্রসাদ হাসলেন। হাঁস কি হবে? বন্দুক এনেছি?

খ্যাদোড় অপ্রস্তুত। হেতুচরণ বলল, 'ভরম' সহজে ঘোচে না মানুষের। বড়বাবুকে দেখলেই কাঁধে বন্দুকটি দেখি। সেও হাসতে লাগল। হাতে সুতোর তকলি। বাঁওরে জাল ফেলতে দেবে না, মাগঙ্গা আছেন। তিনি গভরমেন্টের।

গুণদাপ্রসাদ বললেন, গাবু মারা পড়ল!

আচমকা এই বাক্যটি বড়বাবুর বন্দুক ছোঁড়ার পুরনো আওয়াজ। তখন আওয়াজটি শুনলেই কেউ-না-কেউ ছুটে বেরিয়ে যেত বাঁওরের দিকে। বড়বাবু হাঁস মেরেছেন। একটা-দুটো ছিটকে গিয়ে পানার ভেতর কী শোলার ঝাড়ে যদি লুকিয়ে থাকে, পাখনায় বা ঠোঁটে ক্ষত। তাঁর গুলিবিদ্ধ হাঁস কুড়োনোর জন্য মঘা ছিল বাঁধা। মঘা হালমানা। 'রাজবাড়িতে' তিন পুরুষের লোক। অবশ্য এটাই গুণদাপ্রসাদের মতে, 'হিস্টোরিক্যাল জোক'—জমিদার বাড়ি মানেই রাজবাড়ি, তা সে নেহাৎ ক্ষয়াখর্বুটে দোতালা কী একতালাই হোক।

হেতু ও খ্যাদোড় মুখ তাকাতাকি করে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেছে। গুণদাপ্রসাদ ছড়িটি বগলে গুঁজে পাঞ্জাবির পকেট থেকে নস্যির কৌটো বের করলেন। নাকে নস্যি গুঁজে রুমালে নাক মুছলেন। তখন খ্যাদোড় আস্তে বলল, কেউ মরতে চাইলে পরে তাকে ধনন্তরিও বাঁচাতে পারে না, বড়বাবু!

কেন? গাবু মরতে চাইবে কেন?

খ্যাদোড় জবাব খুঁজে পেল না। হেতু তকলিতে একটা পাক খাইয়ে বলল, গাবুকে মারে কে?

গুণদাপ্রসাদ বললেন, ছাতিমতলায় পড়ে ছিল। পুলিস পাহারা দিচ্ছিল।

দিলে কী হবে?

খ্যাদোড় একটু চটে গিয়ে বলল, হ্যাঁলি, ছাড়ো দিকিনি! কাঁটলেঘাটে চিরটাকাল খালি হ্যাঁলি। শুনে শুনে কান পচে গেল।

হেতু হাঁসল।... তুমি বলছো হ্যাঁলি, কতলোকের কাছে হ্যাঁলি না! সত্যি।

গুণদাপ্রসাদ বললেন, সত্যিটা কী? 'কী'-এর ওপর খুব জোর দিলেন।

গাবুকে মারতে পারেনি দারোগাবাবু!

তাহলে লাসটা পড়ে ছিল কার?

গাবুরই। আবার কার?

খ্যাদোড় এত চটে গেল যে ধপাস করে গাব গাছটার তলায় ভিজে মাটিতে থেবড়ে বসে পড়ল। দিন দশেক আগেও এখানে জল ছিল। খটখটে রোদ্দুরে মাটিটা শক্ত হয়েছে। এমন কী পচা ঘাসের গোড়া থেকে কচি আঁকুরও মুখ বাড়িয়েছে। আর দশটা দিন পরে সব আগের মতো সবুজে ছয়লাপ হয়ে যাবে। গুণদাপ্রসাদও একটু বিরক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু না হেসে পারলেন না খ্যাদোড়ের অবস্থা দেখে। বললেন, হ্যাঁ রে! বুঝলাম না হয় কাঁটলেঘাটে কোনো-কোনো মড়া জ্যান্ত হয়! গাবুও কি জ্যান্ত হয়ে হেঁটে চলে গেল?

তাই তো যেয়েছে! হেতুচরণ শক্তমুখে বলল। থানায় যেয়ে খবর করুন। জানতে পারবেন।

পুলিসরা বাধা দেয়নি?

দিয়েছিল। বন্দুকও ছুঁড়েছিল গুলি ফস্কে গেলে কী করবে? -

খ্যাদোড়ের মনে হল, একটা রফা করা উচিত। গলা ঝেড়ে বলল, আসলে সেই সাঁজবেলা থেকেই সাইকোলোং। টিপটিপিয়ে বিষ্টি। খুব হাওয়া ছিল, বড়বাবু! দেবেন গো, আমাদের দেবেন চৌকিদার! বাড়ি থেকে কেটলি নিয়ে পুলিসদের জন্যে চা আনতে যেয়েছিল। দারোগাবাবু তখন থানায় ফিরে ফোং পাঠিয়েছেন হাসপাতালে। অ্যামবুলেং আসবে। ডোম আসবে। বোডি তুলবে। নিয়ে যেয়ে মশাই, কাটাকুটি করবে-টরবে—মানে, যা-যা সব আইনে করে।

গুণদাপ্রসাদ বললেন, তারপর?

খ্যাদোড় মুখে ঐতিহ্যগত রহস্য এনে গলার ভেতর বলল, গাবুর মাকে আপনি দেখেছেন!

হুঁ, দেখেছি।

কালীতলায় হাটবারে ভর হত। মাথায় জটা ছিল।

জানি, জানি।

মায়ের মোন, বড়বাবু! মরে যাক কী বেঁচে থাক, মা। কিনা বলুন আপনি?

তা তো বটেই!

ছেলের বোডি বুকে তুলে কাঁদতে কাঁদতে মা যখন চলে যায়, তখন—দম ছেড়ে খ্যাদোড় বলল, তখন হাতের বন্দুক হাতেই থাকে বড়বাবু! মানুষের কিছু করার থাকে না। দেবেনের কাছে শুনেছি, পুলিস দুজন 'এংকুরির' সামনে মুখ খুলতেই পারেনি। খালি ফ্যালফেলিয়ে তাকায় আর টসটসিয়ে জল পড়ে—এমন অবস্থা। শেষে সাসপেং।'

ঠিক এমন কিছুই গুণদাপ্রসাদ বোঝাতে চেয়েছিলেন প্রমথনাথকে। খ্যাদোড়ের মুখে তার সায় পেয়ে খুশি হলেন। বললেন, হ্যাঁ—এমন হয়। আমি দেখেছি।

হেতুচরণ নড়ে উঠল। লম্বা নিঃশব্দ হেসে বলে উঠল, তাইলে দাঁড়ালটা কী? হরেদরে এক।

খ্যাদোড় বলল, কক্ষনো এক লয়। তুমি অন্যকথা বলছিলে বড়বাবুকে।

গুণদাপ্রসাদ তর্ক দেখে বললেন, ছেড়ে দাও। ঠিক যে-সুরে বলতেন তার ভাই গৌয়ারগোবিন্দ মানুষ মোক্ষদাপ্রসাদকে। পা বাড়িয়ে মনে মনে বললেন, সায়েন্স কতটুকু জানে? সে তুমি চাঁদেই যাও, আর মঙ্গলগ্রহেই যাও। ওই গাছটা দেখতে পাচ্ছ? একবিন্দু বীজ থেকে অত বড় গাছ। এক্সপ্লেন করো, দেখি। কোথায় ছিল, কীভাবে এল?

বাঁধের দিকে যাচ্ছেন দেখে হেতুচরণ চেঁচিয়ে বলল, পারবেন না বড়বাবু! বাঁশ আছে বাঁশ। ভাঙ্গা বাঁধ।

হুঁ, সেই বাঁশের সাঁকো। মনে পড়ায় গুণদাপ্রসাদ সোজা বাঁওরের দিকে হাঁটতে থাকলেন। কিছুতেই মন বসছে না। কীভাবে কাটাবেন কাঁটালিঘাটে? শরীরে গতি নিলে এই ভুলটা হয়। যেন আর থামতে হবে না। থামলেও, ভেবেছিলেন, কাঁটালিঘাট তো আছে। গঙ্গা, বাঁওর, বন্দুক, প্রকৃতি। এক সপ্তাহেই টের পাচ্ছেন, প্রকৃতিও মানুষের চরম সান্ত্বনা নয়, চূড়ান্ত ঠাঁই নয়— অন্তত যতক্ষণ বেঁচে আছেন। মরলে অবশ্য আলাদা কথা।

বাঁওরের গাঢ় হলুদ বর্ণের জলের সামনে পৌঁছে মনে হল, না— মরার পরও এক ধরনের জীবন আছে। প্রেতজীবন। সেই জীবনে তিনি কী করবেন? ভাবলেই বুকে হাতুড়ির ঘা। জ্যোৎস্নারাতে মালগাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটা হতভাগিনী শ্বেতবসনাকে মনে পড়ে।...

বিকেলে গুণদাপ্রসাদ ভাবলেন স্টেশনে যাবেন। রসময় ধাড়া কাঁটালিয়াঘাট রোডে বদলি হয়ে এসেছেন, এ একটা দারুণ আবিষ্কার। সাহেবগঞ্জ, মোতিহারি, হাথিয়াগড় জংশনের দিনগুলো মনে পড়ে যায়। পারাপারের ঘাটের কাছে চৌমাথায় এসে পড়ে গেলেন ওতপেতে থাকা প্রমথনাথের পাল্লায়। প্রমথনাথ হাসলেন।... ওয়েটিং ফর ইউ। চলো, ছাতিমতলায় যাই। অংক কষে বুঝিয়ে দেব।

নাঃ। গুণদাপ্রসাদ বাঁকা মুখে বললেন। ছেড়ে দাও।

সব কিছু ছাড়া যায় না হে গুণু! হাম কমলিকো ছোড় দিয়া, লেকিন কমলি হামকো নেহি ছোড়া।

অগত্যা গুণদাপ্রসাদ বললেন, যাবে তো চলো বরং স্টেশনে যাই। আমার এক কলিগ আছে।

চলো! প্রমথনাথ পা বাড়ালেন। স্টেশন রোডের দুধারে শিরীষ, অর্জুন, অশত্থ, বটের সার। এই রাস্তাটুকু সায়েবরা পাকা করেছিল। একটা রেশমকুঠি ছিল গঙ্গার ধারে। সেটাই গরজ। এখন সেখানে হাটতলা। গঙ্গার পাড়ে পুরনো কালীমন্দির মেরামত করা হয়েছিল কাত্যায়নী অর্থাৎ গাবুর মায়ের শরীরে দেবীর অনুপ্রবেশের পর। কায়েতবাড়ির বিধবা। শ্যামলা রঙ, ছিপছিপে, কালো চুলে রাতারাতি কয়েকটা জটা। ভরের সময় প্রশ্ন করলে আমূল সঠিক উত্তর দিতেন। গাবু হাফপেন্টুল পরে জিলিপি খেতে খেতে হাটে ঘুরত। প্রমথনাথই তাকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সেই গাবু! ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন স্কুল শিক্ষক।

প্রাক্তন রেলওয়ে গার্ড এতক্ষণে হেসে ফেললেন। ইঞ্জিনের হঠাৎ-ফোঁস মনে পড়ায়।

কী হল? হাসছ যে গুণু?

এমনি।

প্রমথনাথ গম্ভীর হয়ে বললেন, রিউমার বেড়ে যাচ্ছে। একটু আগে হাজারিলালজির আড়তে শুনলাম, গাবুকে ওপারে তারাতলায় দেখেছে কে। শুধু দেখা নয়, মিটিং করছে বলেছে। লালজি সিরিয়াস লোক।

কিসের মিটিং?

তা বোঝা গেল না। গাবুকে তো আমি ভাই কখনও মিটিং-ফিটিং করতে দেখিনি। পার্টি-ফার্টি করতেও দেখিনি। মাঝেমাঝে দেখা হত। প্রণাম করত। বলতাম, ফাইনাল একজামিনেশানটা দিলিনে কেন বাবা? আফটার অল, একটা ডিগ্রি না থাকলে চাকরি-বাকরি— মানে, এমনিতেই ঘরে-ঘরে এম-এ পাস করে— তো গাবু...

গুণদাপ্রসাদ ছড়ির ডগায় রাস্তার মাঝখান থেকে ইটের টুকরোটা ঠেলে ফেলে দিলেন। হঠাৎ মুচকি হেসে বললেন, কাতুকে তুমি বলতে কাতুরানী! একটা পদ্যও লিখেছিলে মনে পড়ছে।

প্রমথনাথ গালে থাপ্পড় খাওয়ার মতো চমকে উঠেছিলেন। তারপর মুখ উঁচু করে হা হা শুষ্কহাস্য হাসলেন।...তুমি ব্যাচেলার লোক। তোমার আবার এসবও আছে নাকি? রিসেন্ট অ্যাটাক?

না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

প্রমথনাথ জনহীন রাস্তায় গাঢ় স্বরে বললেন, যৌবনের ধর্ম। তবে তুমি যতটা ভেবেছ বা ভেবেছিলে, অত কিছু নয়। কাতুকে নিয়ে পদ্য লেখা বা স্বপ্ন দেখার লোক কাঁটালিয়াঘাটে অনেক ছিল। গরিব ভদ্রলোকের বউ যৌবনে বিধবা হলে অনেক কিছু ঘটবার সম্ভাবনাও থাকে। সবাই তো তোমার মতো ব্রহ্মচারী নয়।

সরি! আই ডিডন্‌ট্‌ মিন দ্যাট, প্রমথ।

প্রথমনাথ বাল্যবন্ধুর কাঁধে ভালবাসার হাত রেখে বললেন, না, না। আমি রাগ করিনি। জাস্ট্‌ একটা রিয়্যালিটির কথা বলছি— এ ক্রুড রিয়্যালিটি। কাতুকে সেটা কেন করতে হয়েছিল। অতএব কাতুও একজন ফাইটার ছিল। তুমি বলবে, দেবীর ভর। আর আমি বলব, সেটাই তার ফাইট। একটা জিনিস দুদিক থেকে দেখা আর কী!

কথা ঘুরিয়ে দিলেন গুণদাপ্রসাদ। ...তুমি বলছিলে গাবুর ব্যাপারটা অংক কষে বুঝিয়ে দেবে!

প্রমথনাথ সতর্কভাবে চার পাশটা দেখে নিয়ে বললেন, ওই কালীমন্দির। গোবর্ধন চন্দ্রমশাই মন্দিরের নামে ছাতিমতলার উল্টোদিকে— কাল জায়গাটা তুমি আশা করি লক্ষ্য করেছ, খানিকটা ধানক্ষেত, খানিকটা জঙ্গল হয়ে আছে— সামান্যই জঙ্গল অবশ্য।

করেছি। গুণদাপ্রসাদ আগ্রহে বললেন। চন্দ্রমশাই জমি দিয়েছিলেন নাকি?

হুঁ!

তারপর?

একলপ্তে সাত বিঘে পাঁচ কাঠা জমি। কাতু যতদিন বেঁচে ছিল, ততদিন একে-ওকে দিয়ে সাত বিঘে চষিয়েছিল। বাকিটুকু পারেনি। হঠাৎ মারা গেল। তারপর গাবু ভোগদখল করত। পুজোআচ্চায় যা লাগে, রেগুলার দিত। মায়ের পুজোরি কাতুই বহাল করে গিয়েছিল— তুমি চিনবে, মোহনের ছেলে জিতেশকে। গাবু তো কায়েত— বামুন নয়।

বুঝলাম। বামুন-কায়েতে বিবাদ!

হাত তুলে নাড়তে নাড়তে প্রমথনাথ বললেন, নো, নৌ। জিতেশ গাবুর রান্না পর্যন্ত করে দিত।

তাহলে চন্দ্রমশাইয়ের ছেলেদের সঙ্গে?

এগেইন ইউ মিসড্‌ দা টার্গেট। স্কুল শিক্ষক চোখে ঝিলিক তুলে হাসলেন। চাষ জমির বর্গা করত মুসলমানপাড়ার সোলেমান। তার নাম বর্গাদার বলে রেকর্ড হয়েছিল। না— বিবাদ তার সঙ্গেও নয়।

তবে কার সঙ্গে?

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবে। ফিসফিস করে বললেন। অনেক রথীমহারথী জড়িত। এইটটি টুতে বারোয়ারি পুজো কমিটি হল। ব্যস, সেই সূত্রপাত। গাবু রেকর্ড বের করে আনল। সিক্সটির রিভাইজড্‌ সেট্‌লমেন্ট রেকর্ড। তাতে শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবী'র নাম। সবাই হতবাক।

কিন্তু সম্পত্তি তো দেবোত্তর!

কাতু ধূর্ত মেয়ে ছিল। প্রথমনাথ হাসতে থাকলেন। তাছাড়া তখন তার দাপট বলো দাপট, ইনফ্লুয়েন্স বলো ইনফ্লুয়েন্স— প্রচুর। প্রচুর! দম নিয়ে বললেন, এখন একটাই রাস্তা খোলা ছিল। চন্দ্রমশাইয়ের উইল নিয়ে মামলা লড়া। তবে তাতেও সুবিধে হত কি না আই ভেরি মাচ ডাউট। গাবুকে যদি বা হটানো যেত, সোলেমান? সে বর্গাদার। শুধু তাই নয়, সে গাবুর চেলা বলতেও পারো। হিন্দু-মুসলিম রায়ট বাধতেও পারত। অতএব মেক গাবু এ নকশাল অ্যান্ড স্ম্যাশ হিম।

গুণদাপ্রসাদ আস্তে বললেন, মফস্বল গ্রামগঞ্জে আজকাল দেখছি বড্ড জটিল অবস্থা।

সে সর্বত্রই। কোথায় নয়? আসলে, হিস্টোরিক্যাল পার্সপেক্‌টিভ থেকে বলছি,

মানুষের সমাজের ভেতর পচ ধরলেই জটি—

কিন্তু গাবু গুলি খেয়েও চলে যায় কী করে ? দুজন আর্মড কনস্টেবল ছিল।

প্রমথনাথের আর হাসির ইচ্ছা নেই। বললেন, তোমাদের বাড়িতে তো টি ভি আছে ? দিল্লি, বাংলাদেশ ক্লিয়ার আসে।

টিভির কথা কেন ? গুণদাপ্রসাদ অবাক হয়ে গেলেন। খ্যাদোড় ঠিকই বলছিল। কাঁটালিয়াঘাটে হেঁয়ালি চিরাচরিত।

প্রমথনাথ অন্যমনস্কভাবে বললেন, আমার জামাইবাবাজি সম্প্রতি একটা ছোট্ট টিভি দিয়ে গেছে। আমার তত আগ্রহ নেই। তবে মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে। দেখি। হিরোকে গুলি করেছে। পড়ে গেছে। ভিলেন ভাবল, দিয়েছি ব্যাটাকে খতম করে। ভেবে যেই কাছে না আসা, হিরো এক লাফে তাকে কাত করে দিল। মানেটা বুঝলে তো ? গুলি লাগেনি। ভান করে পড়ে ছিল।

প্ল্যাটফর্মে উঠে গুণদাপ্রসাদ ফের বললেন, দুজন আর্মড কনস্টেবল ছিল !

থাকলে কী হবে ? হঠাৎ চটে গেলেন স্কুল শিক্ষক। সাইক্লোনিক ওয়েদার। ছাতিমগাছের নর্থ ইস্টে বডি। সেদিক থেকে সাইক্লোন, বৃষ্টির ছাঁট। লজিক্যালি বলা চলে সেপাইরা ছাতিমগাছের সাউথ-ওয়েস্টে চলে এসেছিল। সেই ফাঁকে গাবু কেটে পড়ে। ইজি সলিউশান !

গুণদাপ্রসাদ ভাবলেন খ্যাদোড়ের বৃত্তান্তটি বলবেন। বললেন না। প্রমথনাথ গাঁজা বলে উড়িয়ে দেবেন। তিনি তো তাঁর মতো কোনো জ্যোৎস্নারাতে নির্জন প্রান্তরে মালগাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ুনো শ্বেতবসনা নারীকে দেখেননি।...

কয়েকটা দিন একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব, বাস্তব-অবাস্তবের গুলিয়ে যাওয়া, বারবার জ্যোৎস্নারাতের ভূতটি চোখে পড়া— গুণদাপ্রসাদ নিজের এই বিপন্নতার দিকে অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকেন। মোক্ষদাপ্রসাদের বউ রমলার দুই মেয়ে। বড়টি পাত্রস্থ হয়েছে বরানগরে, তার জেঠুর চেষ্টায়, ফলে রমলা বড়ভাসুরের প্রতি কৃতজ্ঞ। দোতালার একটা ঘর ছেড়ে দিয়ে সেবাযত্ন করছেন। ছোট মেয়ে সোমার ক্লাস নাইন চলছে। ফেল করে-করে নাইনে ঠেকে গেছে। একটু রগচটা স্বভাব। বাবার অনেকটাই পেয়েছে যেন। নিচের তলাটা রণদাপ্রসাদের ভাগে পড়েছিল। তার বউ সুমিতা 'নিউট্রিশান সেন্টারে' দুধ-মাইলো বিলিয়ে মাসে শ'খানেক টাকা পায়। দুই ছেলে অংশু ও রঞ্জু, এক মেয়ে দীপা। অংশু কলেজে এক বছর পড়েছিল। রঞ্জু এখন ক্লাস সিক্সে। দীপা হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে উঠোনে তুলকালাম বাধায়। সুখের কথা, দুই জায়ে খুব মিলমিশ আছে। ছেলেমেয়েরা দুই বিধবার ঘরেই কাড়াকাড়ি করে খায়। সুমিতার সকালে ডিউটি। ততক্ষণ দীপা রমলার জিম্মায়। বেশ ভাল লাগে গুণদাপ্রসাদের। মোক্ষদাপ্রসাদের ভিলেনি কীর্তি শেষ দশ বিঘেয় বর্গাদারের নামে রেকর্ড ঠেকানো। নইলে ঝামেলা হত। লাঙল যার, জমি তার, সেটা উচিত কথা— গুণদাপ্রসাদের হিসাবে। কিন্তু এতগুলো দ্বিপদ প্রাণীর অবস্থা শোচনীয় হত। রমলা তাঁর দেবরের জমির তদারক করেন। মধা হালসানা বুড়ো হয়েছে। তার ছেলে রতনের খেতাব মাহিন্দার। একজোড়া বলদ রেখে গেছেন মোক্ষদাপ্রসাদ। রমলার চেষ্টায় এই সব কৃষি ব্যবস্থা টিকে আছে। কলকাতাবাসী প্রয়াত মেজভাসুরের ছেলেমেয়েরা কৃষি বোঝে না। জেঠুর মতোই মাটি চেনে না। তাই মাটির ভাগ নিতে আসে না। কাকারা বেঁচে থাকার সময় কালীপুজো দেখতে আসত। কাঁটালিয়াঘাটে সাতখানা কালী প্রতিমা ছিল তখন। দুর্গাপুজো খান দুই। তবে শাক্ত মাটিতে কালীপুজোর ধূমটাই বেশি। অতীতে নরবলির কথা শোনা যায়। এখন পাঁঠাবলির রেওয়াজও কমিয়ে দিচ্ছে পূর্ববঙ্গীয় মিস্টিক ভক্তির প্রভাব। তবে বিধ্বস্ত রেশমকুঠির বুকে গজিয়ে ওঠা হাটতলার শিয়রে সুপ্রাচীন কালীমন্দির, ক'বছর থেকে যা নিয়ে বিরোধ, এখনও প্রচুর পাঁঠার রক্ত না দেখলে জেগে ওঠে না। বড় বেশি রক্ত, তাই যেন বড় বেশি বিরোধ— গুণদাপ্রসাদের ধারণা হয়েছে এতদিনে। ওই পুরনো দেবী-ভাস্কর্য বিসর্জনের নয়। বিসর্জিত হয় একটি পশুরক্তচিহ্নিত ঘট, যা প্রতীক, কাত্যায়নী জটার ওপর যেটি ধারণ করে গঙ্গার বুকে জলে নামত এবং প্রতীকসহ ডুব দিত। উঠত প্রতীকহীন সিক্ত জটা নিয়ে নাকি আধ ঘন্টা পরে। আ-ধ-ঘ-ন্টা ! গুণদাপ্রসাদ শুনে অবাক। প্রমথনাথের মতে,প্র্যাকটিস। তুমি প্র্যাকটিস করো, তুমিও পারবে। যোগবল ? দ্যাটস রাইট, গুণু ! ওটা আদতে এক ধরনের এক্সারসাইজ। প্রমথনাথ বড় জ্বালাচ্ছেন দেখে গুণদাপ্রসাদ এড়িয়ে চলতে শুরু করেছেন ক্রমশ। বাড়িতে বলা আছে, 'বেরিয়েছেন।'

তবে সত্যিই বেরোন। টো টো করে ঘোরেন। শর্টকাটে রেল কোয়ার্টারে রসময়ের কাছে, সেখান থেকে মাঠ ঘুরে বাঁওরে, কোনো সময় কাত্যায়নীর নামে রেকর্ডকরা ধান ক্ষেতের ভেতর দিয়ে সেই ছাতিমতলায়। বাঁধের নিচের সমতল একটুকরো জায়গায় ঝোপঝাড় ফের চিকন হয়েছে। পলির দাগ ধুয়ে গেছে বৃষ্টিতে। কালকাসুন্দে, আকন্দ, কুঁচফল, নাটাকাঁটা, শেয়াকুলের ভেতর হিজল, জাম, জারুল, ভাড়ুলের উঁচু-উঁচু উদ্ভব। সায়ন্টিস্ট ! এক্সপ্লেন করো।

আদাব বড়বাবু !

গুণদাপ্রসাদ পিছু ফিরে দেখতে পেলেন মাঝখানে সিঁথি একরাশ চুল, কয়রা চোখ, তামাটে গড়নের যোয়ান। পরনে লুঙ্গি, হাফহাতা হাওয়াই শার্ট, খালি পা। একটা হাতে গামছায় কী একটা জড়ানো। তার পেছনে সমবয়সী, হাঁটু অব্দি গুটোনো ফুলপ্যান্ট, জংলি ছাপমারা স্পোর্টিং গেঞ্জি, চুলে কেতা আরও একজন। সে বলল, নমস্কার বড়বাবু। বেড়াতে বেরিয়েছেন !

প্রথম জন হাসল। আমার নাম মাতো, বড়বাবু।

দ্বিতীয় জন বলল, সোলেমানের ছেলে, বড়বাবু। আমাকে অবশ্য চিনবেন। আমি সেই কালো। সেজবাবুর বডিগার্ড ছিলাম।

গুণদাপ্রসাদের বুকের ভেতর হাতুড়ি পড়তে লাগল। মনে পড়ছে, মোক্ষদাপ্রসাদের সঙ্গে এই রকম সব ছেলে ঘুরত। মোক্ষদাপ্রসাদ বলত, বডিগার্ড ছাড়া আজকাল চলে না। গুণদাপ্রসাদ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

মাতো বলল, আপনি থাকলে এসব হত না, বড়বাবু। বাপজি আপনার কথা খুব বলে। বলে, কাঁটালঘাটের মালিক ছিলেন বড়বাবুরা। বলে, আপনার বন্দুকের টিপ ছিল। পাখি উড়িয়ে দিয়ে তবে গুলি করতেন।

কালো চোখে একটা ইশারা করে বলল, দেখা না একবার বড়বাবুকে। মালটা কেমন বলতে পারবেন।

মাতো কাছে এসে গামছায় জড়ানো জিনিসটা বের করলে গুণদাপ্রসাদ চমকে উঠলেন। একটা লম্বাটে দিশি পিস্তল। দ্রুত বললেন, ভাল। কিন্তু এ দিয়ে কী করবে তোমরা !

কালু হাসল। যাই করি, মালটা কেমন দেখলেন বড়বাবু ?

ভাল।

মাতো ও কালো বাঁধের ভাঙ্গা অংশটার দিকে পা বাড়ালে গুণদাপ্রসাদ কাঁপা-কাঁপা গলায় ডাকলেন, শোনো, শোনো।

দুজনে ঘুরে দাঁড়াল। চারের দশকে রমাপ্রসাদ যখন কাঁটালিয়াঘাটে আসেন, তখনও এ দিকটায় জঙ্গল। বাঘ ছিল। সেই রকম, বাঘের মতো ঘুরে দাঁড়ালো, চনমনে চাউনি। বাঘগুলো মানুষ হয়ে ফিরে এসেছে। আবার বাস্তব-অবাস্তবে জড়িয়েমড়িয়ে যাচ্ছে। গুণদাপ্রসাদ মাথা ঠিক রেখে একটু হাসলেন।... গাবুর ব্যাপারটা কী হয়েছিল হে ?

কালো নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে বলল, গাবুদার কী হবে ? দারোগাবাবু তাড়িয়ে এনে ওকে ওইখানটাতে গুলি করেছিল। করুক না। এক গাবু যাবে, আরেক গাবু আসবে।

বর্গাদার সোলেমানের ছেলে মাতো বলল, তাই বলে ওই জমির ধান ষষ্ঠীবাবুদের ভোগে লাগবে না। গাবুদা বলেছিল, আমি না থাকলে আমার অংশ বিলিয়ে দিও। তাতে বাপজির আপত্তি নাই, বড়বাবু !

ওরা চলে গেলে গুণদাপ্রসাদ গুম হয়ে পা বাড়ালেন। মাটির এত ঝামেলা। কিছু বোঝা যায় না। একবার মনে হচ্ছে, কাত্যায়নী কেন নিজের নাম রেকর্ড করিয়েছিল—করিয়েই নিজের ছেলের মৃত্যুর কারণ হল, আমার মনে হচ্ছে, এসব কিছু ঘটত না—যদি তিনি সাহস করে ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে ঝিরঝিরে বৃষ্টির রাতে ...

জোরে মাথা দোলালেন গুণদাপ্রসাদ। না, না। তাহলেও ভুল হত। দেবীর প্রাপ্য, দেবীর চয়েস—তাঁর মতো নিছক মানুষ গ্রহণ করে ভীষণ বিপদে পড়ে যেতেন। এদিকে কেলেঙ্কারির একশেষ হত। রমাপ্রসাদের জ্ঞাতিদের সঙ্গে যোগ দিতেন কাতুর বাবা প্রভাকর ঘোষ। কাঁটালিয়াঘাটে তখন দুর্ধর্ষ মানুষ বলতে

ঘোষবাবুই ছিলেন। রমাপ্রসাদের পাশে না দাঁড়ালে এই মাটিটুকুও চলে যেত অন্যের হাতে। তাছাড়া মাতাল মানুষ। তেমনি গোঁয়ার। মেয়ের পাত্র ঠিক করাই ছিল। অন্য কিছু হলে সহ্য করতেন বলে মনে হয় না। …

দুপুরে দোতালায় খাটে শুয়ে ভাতঘুমের রেশটা হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। তাহলে কী জ্যোৎস্না রাতে মালগাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটা শ্বেতবসনা কাত্যায়নীকেই দেখেছিলেন? বুকটা হু হু করে উঠল। বুঝতে এত দেরি হয়ে গেল!

জেঠু, ঘুমোলেন নাকি?

সোমাকে দেখে গুণদাপ্রসাদ বললেন, না রে! আয়। বোস এখানে।

সোমা বলল, জেঠু জানেন কী হয়েছে?

কী রে?

গাবুদাকে বেলডাঙার হাটে মিটিং করতে দেখেছে। নাকুদা দিব্যি করে বলল, গাবুদা! মুখে দাড়ি গজালে কী হবে? গলার স্বর?

গুণদাপ্রসাদ হাসবার চেষ্টা করে বললেন, খুব রিউমার ছড়াচ্ছে তাহলে।

সোমা সিরিয়াস হয়ে বলল, রিউমার নয়। তারাতলায় পোস্টার পর্যন্ত পড়েছে। অঞ্জলি স্বচক্ষে দেখে এসেছে। পোস্টারে বড়-বড় লেটারে লেখা আছে, গাবুদা সামনের রোববার মিটিং করতে আসবে। খুব হিড়িক পড়ে গেছে—অঞ্জলি বলল।

গাবু দেখছি তোদের হিরো ছিল, না।

সোমা রাঙা হয়ে ভ্যাট বলে বেরিয়ে গেল। গুণদাপ্রসাদ উঠে বসে নস্যি নিলেন। আজকাল এই হয়েছে; হিন্দি ফিল্মের ইমপ্যাক্ট। অবশ্য প্রমথনাথের মতে, গাবু মস্তান বা সমাজবিরোধী ছিল না। ফাইটারই ছিল। তবে শেষে বুঝেছেন ফাইটটা দেবোত্তর সম্পত্তি। কেননা গাবু অর্জুন না দুর্যোধন, সেটা সাব্যস্ত করতে পারছেন না প্রমথনাথ। ফের বাস্তব-অবাস্তবে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেল। খ্যাদোড় বলছিল, কেউ মরতে চাইলে ধন্বন্তরিও তাকে বাঁচাতে পারে না। এও গোলমেলে ব্যাপার। গাবু মরতে চেয়েছিল কেন? আসলে হয়তো ব্যাপারটা যে-যার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে। কিন্তু কাতুর ছেলে 'লেজেন্ডারি ফিগার' হয়ে উঠছে কেন? 'কেন'র চোটে প্রাক্তন রেলওয়ে গার্ড উত্যক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত করে ফেললেন, এখানে থাকবেন না। কলকাতায় অন্নদাপ্রসাদের ছেলেদের কাছে গিয়ে থাকবেন। চেতনা-অবচেতনার এই সংঘর্ষ আর সহ্য হচ্ছে না। …

'জনগণ তৈরি থাকুন! চাষীভাইরা তৈরি থাকুন! কাঁটালিয়ার মাঠে ফসল পাকার সময় আমাদের সবার প্রিয় গাবুদা এসে যাবে।'

গুণদাপ্রসাদ থমকে দাঁড়িয়ে লাল হরফে ছাপানো পোস্টারটি পড়ছিলেন। মুখে ধীরে ধীরে উত্তেজনা ফুটে উঠল। পা বাড়ালেন বাজারের দিকে। আবার পোস্টার চোখে পড়ল। ডাইনে বাঁয়ে শ্রেণীবদ্ধ পোস্টার—একটার পর একটা। মহাশ্মশানের দিক থেকে আশ্রমের মাইকে মিস্টিসিজম এগিয়ে পিছিয়ে পোস্টারগুলিকে স্পর্শ করছে। পোস্টারগুলি সুপ্রাচীন শাক্তপ্রতীকে রূপ নিতে নিতে জটা, রক্ত, মড়ার খুলি, কারণবারি, কাত্যায়নীর ভৈরবী চেহারা হয়ে উঠেছিল। ঝাপসা করে দিচ্ছে মিস্টিক ভক্তি-বাষ্প। কালীপুজোর আর দুদিন বাকি। কালীপুজোটা দেখেই চলে যাবেন গুণদাপ্রসাদ। কলকাতায় চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন। জবাবের জন্য অপেক্ষা শুধু। কারুর কাঁধে তো গিয়ে ভর দেবেন না, স্পষ্ট সে কথাও জানিয়ে দিয়েছেন। এমন সময়ে ওই পোস্টারগুলি ডাইনে বাঁয়ে সার বেঁধে তাঁকে অনুসরণ করছে। ক্রমশ উত্তেজনা বাড়ছে।

এই যে গুনু! প্রমথনাথ তৈরি ছিলেন কোথাও। আচমকা ঝাঁপিয়ে এলেন। চোখে কেমন পাগলাটে হাসি। চাপা স্বরে বললেন, দেখছ কাণ্ডখানা?

গুণদাপ্রসাদ ফোঁস করে উঠলেন। কাণ্ড কিসের? এটাই তো হয়।

কী হয়?

কারচুপি। প্রাক্তন রেলওয়ে গার্ড রাগী মুখে বললেন। লোক-খেপানো চাতুরী! মিথ্যাকে সত্যি করা!

স্কুল শিক্ষক তাঁর একটি দীর্ঘ বন্ধুবৎসল হাত ওর কাঁধে রাখলেন।…নো নো। ফ্যাক্ট। ক্রুড রিয়্যালিটি। আমি তোমাকে বরাবর বলেছি, গাবু বেঁচে আছে।

কাঁধের হাত কোমল করল গুণদাপ্রসাদকে। আস্তে বললেন, তুমি ইতিহাস-ইতিহাস করো। জানো না মরা মানুষের নাম ভাঙিয়ে জ্যান্ত মানুষেরা কী করে?

করুক। মোটিভটা বুঝতে হবে, তাতে ভাল না খারাপ হবে! অবশ্য গাবুর ব্যাপারটা ব্যতিক্রম। এ রেয়ার কেস।

উত্তেজনা এ বয়সে মানুষকে সহজে ক্লান্ত করে। গুণদাপ্রসাদ চা খেয়ে বেরিয়েছেন। তবু আর একবার চা দরকার মনে হল। বললেন, এস, চা খাই।

জগনের দোকানের দিকে পা বাড়িয়ে প্রমথনাথ একটু হেসে বললেন, পোস্টার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিস অ্যালার্ট হয়ে গেছে। এম এল এ জিপে চেপে দেখতে এসেছিলেন। গুলি খাওয়া বাঘের মতো চলে গেছেন। তবে দিস মাচ আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ গুনু, পোস্টার কেউ ছিঁড়বে না। কারণ সবাই এটাকে তোমার অ্যাঙ্গল থেকে দেখছে। জোক ভাবছে। কিন্তু আমি জানি, এটা জোক নয়। লেট দা হার্ভেস্টিং সিজন কাম! স্বচক্ষেই দেখবে।

অগত্যা করুণ হাসলেন গুণদাপ্রসাদ।…গাবুকে?

ইয়েস—গাবুকে। খুব দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করলেন প্রবীণ, ঢ্যাঙা, ধুতিপাঞ্জাবিপরা স্কুল শিক্ষক।

চায়ের গেলাস এগিয়ে চাঅলা জগন ফিক করে হাসল। কি মাস্টারমশাই? আমি কি কইছিলাম?

ঘাটের মুখে আজ জমাট ভিড়। পাটের পাহাড়। ক্যাসেট প্লেয়ার, ট্রানজিস্টারের চিৎকারে কান পাতা যায় না। প্রমথনাথ মাটির ভাঁড়ে ঝটপট চা শুষে নিয়ে জুতোর তলায় স্বাস্থ্যবিধির কারণেই ভাঁড়টিকে মড়মড়িয়ে ভাঙলেন। গুণদাপ্রসাদের দেরি হচ্ছে। তাঁকে টেনে ওঠালেন। গুণদাপ্রসাদকে জোর করেই বাঁধে নিয়ে গিয়ে তুললেন।

ভয়াল ও জৈব ছাতিম গাছটির কাছে গিয়ে প্রমথনাথ বললেন, ছড়িটা দাও। হিসেব বুঝিয়ে দিচ্ছি।

ছড়িটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিতে হল। গুণদাপ্রসাদ ছাতিম গাছের কাছে দাঁড়িয়ে দেখলেন, প্রমথনাথ নিচের মাটিতে ছড়ির দাগ টানছেন। এইখানে গাবু পড়ে ছিল। কেমন তো? এবার তুমি গাছটার পেছনে যাও। আহা, যাও না! ওকে! তোমার মুখ উল্টোদিকে। দেখতে পাচ্ছ আমি কী করছি? পাচ্ছ না? আমি এই ঝোপগুলোর ভেতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে গিয়ে গঙ্গায় পড়লাম। ব্যস্‌! এবারে তুমি এদিকে মুখ ফেরালে। দেখলে কেউ নেই। অতএব ধাঁধায় ভোগো। চাকরি যাবে দেখে গপ্প রটাও। চোখ থেকে টসটস করে জল ফেলো। বলো, 'একটা মেয়েছেলে এসে বডি তুলে নিয়ে গেল। তার গায়ে বন্দুকের গুলি বেঁধেনি।' কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনে যেহেতু 'ভূত' টার্মটা নেই, তার ডেফিনিশনও নেই; সেইহেতু কমিশন তোমাকে/তোমাদের দুজনকে সাসপেন্ড এবং মেন্টাল হসপিটালে পাঠানোর রেকমেন্ড করুন। ধরাধরি করে শেষ পর্যন্ত বদলিতে রফা হোক। কী? বুঝতে পারছ। ক্লিয়ার?

গুণদাপ্রসাদ নিচের মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা প্রমথনাথের পেছনে, ঠিক জলের ধারে নুয়েপড়া হিজল-জাম-জারুলের আড়ালে ঘন ছায়ার ভেতর একটা আবছায়ার নড়াচড়া দেখছিলেন। শরীর শক্ত হয়ে গিয়েছিল। জ্যোৎস্না রাতে মালগাড়ির সঙ্গে সমান্তরালে ধাবিত শ্বেতবসনা কাত্যায়নী—হ্যাঁ, কাত্যায়নী ছাড়া আর কে হতে পারে, অবশেষে এই সন্ধ্যায় আবার এসে দাঁড়াল কী? গুণদাপ্রসাদ মাটিতে দাঁড়িয়ে, অতএব সেও মাটিতে দাঁড়িয়ে—সমান্তরালে। ব্যবধান রেখে চলা ওর স্বভাব ছিল।

প্রমথনাথকে অবাক করে প্রাক্তন রেলওয়ে গার্ড ভিজে মাটিতে নেমে ঝোপঝাড় ঠেলে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। শ্রেণীবদ্ধ, ঝুঁকেপড়া, জলে শেকড়বাকড় মরিয়া হয়ে আঁকড়ানো গাছপালার আড়াল দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে তাঁরই ভাইঝি সোমা! এখানে কী করছিল? এমন করে পালিয়ে গেল কেন?

প্রমথনাথ ডাকছিলেন। গুণদাপ্রসাদ দ্রুত ফিরে এলেন। প্রমথনাথ বললেন, কী ব্যাপার?

কিছু না।

স্কুল শিক্ষক আগের কথায় ফিরে এলেন। তাহলে এবার বুঝলে তো গাবু বেঁচে আছে?

আছে। প্রাক্তন রেলওয়ে গার্ড অতি কষ্টে শব্দটা উচ্চারণ করলেন। আসলে একেকটা সময় এমন হয়, যখন কারুর কিছু করার থাকে না। …
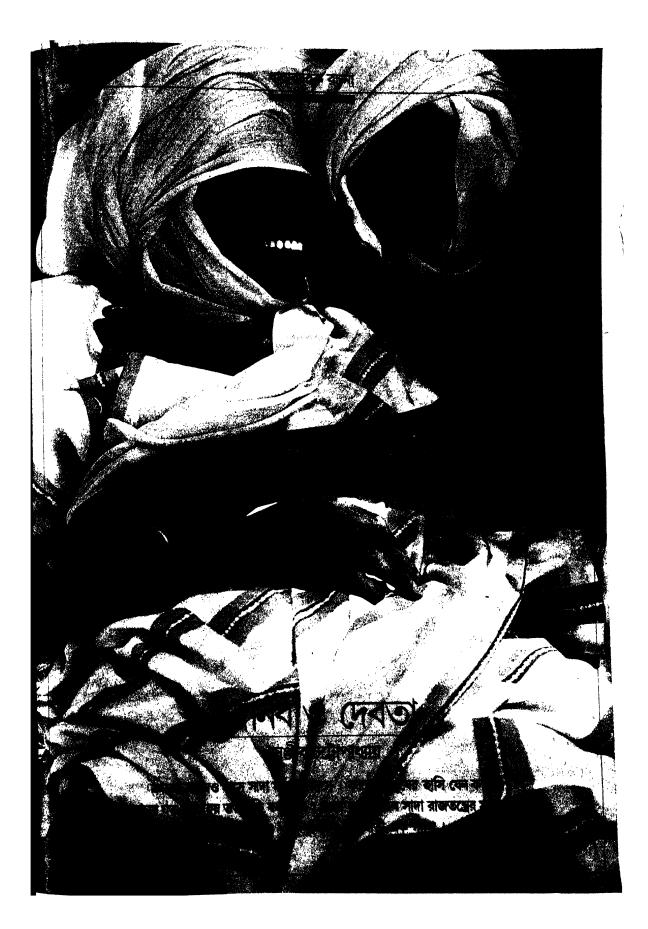
ছবি: সুব্রত চৌধুরী

দেবতা
সাদা রাজতন্ত্রের

ীতে শুষ্ক
ত্বক কোথা?

ণ্ডস্ কোল্ড ক্রীম, সৌন্দর্য্য তেল ও ত্বক
কামল করে এমন সব উপাদানে ভরপুর থাকে
লই, এটি কনকনে শীতেও আপনার ত্বককে
খে কোমল থেকে কোমলতর।

স্, শুধু একটুখানি পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীম মাখুন···
খ, ঘাড়ে, হাতে, যেখানেই শীতের জন্যে
ণ্ডস-এর সরক্ষার প্রয়োজন মনে করবেন,

থাকুন হাসতে হাসতে···কোমল থেকে কোমলতর,
কোমলতম ত্বক নিয়ে সাথে।

পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীম

শীতে পরিচর্য্যার বাড়তি পুষ্টিতে ভরপুর

[ছয়]

আর এক পরমাণু বোমা মানুষের ঘৃণা। মানুষের প্রতি মানুষের বিদ্বেষ। পরমাণু বোমা একবারে, একলপ্তে মারে। বর্ণবিদ্বেষ মারে ধীরে ধীরে তিলে তিলে। নিয়তই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সাদা চামড়ার হাতে মরছে কালো মানুষ। তাদের হাতে মারা হচ্ছে, তাদের ভাতে মারা হচ্ছে। কে যেন প্রশ্ন করেছিলেন, পৃথিবীটা মানবের না দানবের! ভূপেন হাজারিকার সেই গানটা মনে পড়ছে, মানুষ মানুষকে জীবিকা করে, মানুষ মানুষকে পণ্য করে। সাদা মানুষের হাতে বন্দুক এক সর্বনেশে বস্তু। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ যখন হই হই করে আফ্রিকার বুকে গিয়ে চেপে বসল, সেই ১৮৯৮ সালে অ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ লেখক হিলেয়ার বেলক সুন্দর একটি ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছিলেন। কবিতার দৃশ্যকল্পটি ছিল এইরকম, এক ইংরেজ ভাগ্যান্বেষী একদল মারমুখী আফ্রিকাবাসীর সামনা-সামনি হয়ে ভাবছে : Whatever happens, we have got/The Maxim gun and they have not.

হিরাম ম্যাকসিম ছিলেন এক আমেরিকান ভদ্রলোক। হিরামের ভাই হাডসান ছিলেন বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন টর্পেডোর বারুদ। তার নাম দিয়েছিলেন ম্যাকসিমাইট। এই ম্যাকসিমাইট ইওরোপের বিভিন্ন সাম্রাজ্যের ভাগ্য ফিরিয়ে ছিল। সাম্রাজ্য বিস্তারের হাতিয়ার হয়েছিল।

বর্ণবিদ্বেষের পীঠস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন দক্ষিণ আফ্রিকা। এক কোটি দশ লক্ষ মানুষের একটি সুন্দর ভূখণ্ড। প্রকৃতির দানে ভরপুর। এর মধ্যে পঁচিশ লক্ষ হল সাদা মানুষ। এই জনসংখ্যার পাঁচের তিন অংশের ভাষা হল আফ্রিকান, আর বাকি দু'ভাগের ভাষা হল ইংরেজি। দশ লক্ষ মানুষ হল বর্ণসঙ্কর। সাদা আর কালোর মিশ্রণ। বাকি সব খাঁটি কালো আফ্রিকান আদিবাসী আফ্রিকার বিচারে জোহানেসবার্গ বিশাল এক শহর। সাত লক্ষ মানুষের বসবাস। সুন্দর, ঝকঝকে অত্যাধুনিক শহর। কিছু হাঘরে বস্তিবাসীও অবশ্য আছে। ধীরে ধীরে বহে চলেছে উমজিমুকলু নদী। দু'পাশে ভেঙে পড়া মানুষের কান্না শুনতে শুনতে ও নদীরে!

আকাশের চাঁদ একদিন একটি পোকাকে ধরে বললে, তুমি তো বেশ উড়তে পারো, আমার একটা কাজ করে দেবে? ছোট্ট কাজ। তুমি তোমার ছোট্ট ডানা মেলে উড়ে যাও। কোথায় যাবে? ওই যে দেখছ একটা দেশ। ওই দেশের নাম, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুমি ওইখানে উড়ে যাও। ওখানে গিয়ে দেখবে, অনেক মানুষ বড় যন্ত্রণায় আছে। তাদের গায়ের রঙ কালো। তুমি ওদের গিয়ে বলো, চাঁদ তোমাদের একটা বার্তা পাঠিয়েছে। কি বার্তা? ভালো করে শোনো। তুমি বলবে, 'আমি যেমন মরে যাই, আবার মরে গিয়েও বেঁচে থাকি, ওরাও যেন সেইরকম, মরে যাক ক্ষতি নেই, কিন্তু আমার মতো যেন মরে গিয়েও বেঁচে থাকে।' পোকা বললে, আচ্ছা। সে বার্তা নিয়ে চলেছে। হঠাৎ পথে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এক খরগোসের। খরগোস জিজ্ঞেস করলে, 'পোকা ভাই, কোথায় চলেছ, কি কাজে, অমন হন্তদন্ত হয়ে?' পোকা খরগোসকে সব কথা বললে। 'আমি চাঁদের বার্তাবাহী।' খরগোস বললে, 'তুমি তো জোরে হাঁটতেই পারো না। তুমি এইখানে থাকো। আমি যাচ্ছি, আমি গিয়ে বলে আসছি।' পোকাকে ফেলে খরগোস দৌড়ল। খরগোস গিয়ে বলল, 'ভাইসব শোনো চাঁদ বার্তা পাঠিয়েছে তোমাদের। চাঁদ বলেছে, চাঁদ যেমন মরে যায়, আর মৃত্যুর পর তার আর কিছুই থাকে না, তোমরাও তেমনি মরে যাও, মরে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাও।' এই উল্টো কথাটি বলে খরগোস সোজা ফিরে গেল চাঁদের কাছে। সে যা বলে এসেছে চাঁদকে শোনাল। চাঁদ বললে, 'সে কি, আমি যা বলিনি, তুমি তা-ই বলে এলে। তোমার তো ভারি দুঃসাহস। এই কথা বলে চাঁদ ভীষণ রেগে গিয়ে হাতের কাছে এক টুকরো কাঠ ছিল; সেই কাঠ দিয়ে মারলে খরগোসের নাকে। সেই দিন থেকে খরগোসের নাক তাই দু'ফালা।

দক্ষিণ আফ্রিকার লোক-কাহিনী মানুষকে মৃত্যুঞ্জয়ী হবার প্রেরণা যোগায়। চাঁদ যখন আকাশ আলো করে নেই, তখনও চাঁদ আছে। সে চাঁদ কালো চাঁদ। চাঁদ মরেও বেঁচে থাকে, আফ্রিকার কালো মানুষ, তুমিও বাঁচ। খরগোস, সাদা খরগোস যদি চাঁদের নামে মৃত্যুর মিথ্যা বার্তা নিয়ে আসে, মেরে তার নাক ফালা করে দাও।

আগে আমরা রেল কম্পানি সম্পর্কে রসিকতা করতাম। যাত্রী এসে স্টেশান মাস্টারকে জিজ্ঞেস করছেন, 'মশাই বারোটার ট্রেন কটায় ছাড়বে?' অথবা সেই গল্প, এক যাত্রী ঠিক সময়ে ট্রেন এসেছে দেখে গার্ড সায়েবের গোঁপে চুমু খেয়ে বললেন, 'হোয়াট এ পাংচুয়ালিটি?' গার্ড সায়েব আমতা আমতা করে বললেন, 'বাবুজী, এ আজকা ট্রেন নেহি, কালকা। রানিং টোয়েন্টিফোর আওয়ার্স লেট।' আমাদের বিমানও সময় সময় এই খেলাই দেখায়। সুচিত্রাদির সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে আমাকে একটি গানের কয়েক কলি শুনিয়ে ছিলেন, 'কোন খেলা যে খেলবে কখন, ভাবি বসে সেই কথাটাই।' আমার কানে লেগে আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, সৃষ্টিকর্তাকে, পরমেশ্বরকে উদ্দেশ করে। 'সিসটেম'-ই এখন ঈশ্বর। কোন

খেলা যে খেলবে কখন!

অণু, পরমাণু, বর্ণবিদ্বেষ, সাউথ আফ্রিকা, লিভিংস্টোন, নিউ ইম্পিরিলিয়াজম, এসব তো মৌচাকে মধুর মতো। রাতারাতির ব্যাপার নয়। কোনওটা অর্ধ-শতাব্দীর সাধনা কোনওটা শতাব্দীরও প্রাচীন। সামান্য ব্যাপার, একটা লোক কলকাতা থেকে দিল্লি যাবে, সেও যেন নাকের জলে চোখের জলে অবস্থা। লেখার মতো কাহিনী। না, লিখবো বলেই এয়ারলাইন্স রশদ যোগালেন। তা ভালই করেছেন। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে।

বিশ্বরঞ্জনবাবু আমার হাতে বিমানের টিকিটটি তুলে দিয়ে বলেছিলেন, দিল্লি যাবার মর্নিং ফ্লাইট এক মিনিটও দেরি করে না। অনেক সময় আগেই উড়ে চলে যায়। সিক্স ফিফটিন তো সিক্স ফিফটিন। সেই শুনে দিনের আলো ফোটার আগেই ঘুম থেকে উঠে, সোজা দমদম। সবে ভোর হচ্ছে। আকাশে মুক্তো রঙের আলো। মন খুবই বিষণ্ণ। প্রায় মেরে-ধরে পাঠানো হচ্ছে। কোথাও যাওয়া মানেই জীবনের অভ্যস্ত রুটিন একেবারে এলোমেলো। অভ্যাসের বাইরে যাওয়া অনেকটা মরে যাবার মতো। আমার মনে আছে চীন যে বছর বললেন মানসে প্রথম কয়েকজনকে যেতে দেওয়া হবে তখন আনন্দবাজারের শ্রদ্ধেয় সম্পাদকের মনে হল আমাকে পাঠালে হাল্কা শরীরে যা হয় একটা করে আসতে পারবো। আমার সহকর্মী বন্ধু সুদেব রায় চৌধুরী দৌড়-ঝাঁপ করে, পাসপোর্ট-ফর্ম এনে, উপর-মহলের সই-সাবুদ করিয়ে পাসপোর্ট অফিসে জমা দিয়ে এল। আমার লেখক-বন্ধু প্রখ্যাত সমরেশ মজুমদার পাসপোর্টের 'ডেলিভারি উইদাউট টিয়ার্স' সম্ভব করলেন। ওদিকে আইনের জট যতো খুলতে থাকে, আমার মুখও তত শুকোতে থাকে। একগাদা ভ্রমণ-কাহিনী আষ্টে-পৃষ্ঠে পড়ে আমার বদ্ধমূল ধারণা হল, আমি আর ফিরছি না। সত্যজিৎ রায় মহাশয়ের কৈলাসে কেলেঙ্কারির মতো একটা কিছু হবে। লিপুলেখ পেরোবো আর হুহু বাতাসে হড়কে সোজা তুষার-সমাধি। বড়লোকদের উইল করার মতো অনেক কিছু থাকে। আমার কিছু কলম আছে, সেই কলমগুলোই মনে মনে উইল করে, কাকে কাকে দেওয়া যায় ঠিক করে ফেললুম। আমার হিতাকাঙ্ক্ষীরা আনন্দে লাফাচ্ছেন, তোমার কি ভাগ্য। উঃ কতকাল পরে মানসের পথ খুলল, আর সেই পথে তুমি ভাগ্যবান। আর আমার মনে কেটল্ ড্রাম সহ কীর্তন চলেছে, হাসি মুখে ফাঁসি বরণ করেছে।

শেষ পর্যন্ত মানসে যাবার পারমিসান মিলল না। পাসপোর্টটা রয়ে গেল স্ট্যাটাস সিম্বল। বছরের পর বছর যায় পাসপোর্টের পরমায়ু কমতে থাকে। সেকালের বড় মানুষের দোনলা বন্দুকের মতো। ছেলেবেলায় যে পথের ধারে আমার বাড়ি ছিল সেই পথ ধরে মানুষকে থানায় যেতে হত। ডিসেম্বর মাস এলেই সারা দিন জানালার ধারে বসে থাকতুম! একের পর এক বড়লোক চলেছেন, থানায়। কাঁধে বন্দুক। এক নলা, দো'নলা। লাইসেন্স রিনিউ করাতে। বছরে

বেল্ পলিনেট নন্-স্লিপ ব্রা (মূল্য ২৬.৫০)

ত্বকে বাতাস পৌঁছতে পারে বলে বছর ভর আরাম মেলে বেশী

'বিমল পলিনেট দিয়ে তৈরি বেল্ ব্রেসিয়ার আপনার ত্বক গ্রীষ্মে যেমন ঠান্ডা রাখে তেমনি শীতে রাখে উষ্ণ আর স্বচ্ছন্দ। কাপের নীচে এবং কাঁধে ব্যবহৃত সেরা মানের 'লাইক্রা' টেপ আপনার শরীর দৃঢ় স্বাচ্ছন্দ্যে ঘিরে রাখে। স্লিপ করে নেমে যাওয়া বা ওপরে উঠে যাওয়ার ভয় থাকে না। বহুবার ধোওয়ার পরেও শক্ত আর ফ্যাশন দুরস্ত দেখায়। 'আইলেট স্টিচিং' আর ফিনিশিং, সহজেই আটকায় এমন শক্তপোক্ত হুকটি পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিসের গুণমানের ওপর নজর—এসবের জন্যই আজ বেল্ আপনার মত সজাগ আধুনিকা মহিলাদের প্রথম পছন্দ হয়ে উঠেছে।

এবার ব্রা কিনলে বেল্ পলিনেট নন্-স্লিপ কিনুন। দেখুন দেখতে এবং পরতে কি চমৎকার লাগে।

বেল-এর আরও যে সব নন্ স্লিপ ব্রা আছে:

কটন—কটন টেপ	১১.৫০
কটন—লাইক্রা টেপ	১৭.৫০
কটন-ফোম—লাইক্রা টেপ	২২.৫০
*২×২ রুবিয়া—কটন টেপ	১৫.০০
*২×২ রুবিয়া—লাইক্রা টেপ	২২.৫০
বিমল পলি-রুবিয়া—লাইক্রা টেপ	২১.৫০
বিমল পলি-রুবিয়া-ফোম—লাইক্রা টেপ	২৬.০০

* লাল, কালো, গোলাপী ও গায়ের রঙে পাওয়া যায়

belle

পলিনেট নন্-স্লিপ ব্রা

বেল্ ওয়্যারস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৫৪বি সুবারবান স্কুল রোড
কলিকাতা ৭০০ ০২৫। ফোনঃ ৪৮-৩৭০৮

Contract-BW-40-86A3

ব্যবসায়িক অনুসন্ধানের জন্য উপরের ঠিকানায় লিখুন

অনুমোদিত ডিলারঃ

কলিকাতাঃ রূপা, এফ/২৮, নিউমার্কেট; বৈজনানাথ শ্রীলাল এন্ড কোঃ, বড়বাজার; রহমান রিজ্‌নেবল স্টোরস্, ট্রেজার আইল্যান্ড, গ্লোব সিনেমার বিপরীত দিকে; এস, এন, বাজপাই, ধর্মতলা স্ট্রীট; এইচ এন্ড আর বণিক স্টোরস্, বালিগঞ্জ ফ্যান্সি মার্কেট; আদি চট্টেশ্বরী, ৯১ রাসবিহারী এভিন্যু; আড্ডি এন্ড কোঃ, ৭৪ কলেজ স্ট্রীট; অরবী, হাতিবাগান; শিল্পশ্রী, শ্যামবাজার; কুন্ডু পোষাকালয়, বেহালা; নিউ ন্যাশানাল স্টোরস, ফুলবাগান; যশোদা বস্ত্রালয়, গোরাবাজার; র‍্যাঙ্ক ওয়ান, বরানগর; ভারত লক্ষ্মী, বেলঘরিয়া; শ্রীগুরু বস্ত্রালয়, বারাসত; জনকল্যান সোসাইটি, বসিরহাট; অরবিন্দ স্টোরস্, হাবড়া; পদ্মাবতী ব্লাউস সেন্টার, নৈহাটী; শ্যামলী, হাসানাবাদ; বসাক ব্রাদার্স, শ্রীমার্কেট, হাওড়া; তপন স্টোরস্, চন্দননগর; রত্নালয়, চুঁচুড়া; দাস ব্রাদার্স রেডিমেড, শ্রীরামপুর; বৈশাখী, বর্ধমান; সুকন্যা, সিউড়ি; পঞ্জাব ক্লথ স্টোরস্, কাঁথি; স্টাইলো, টাউনশিপ, হলদিয়া; লিবার্টী ড্রেস মিউজিয়াম, তমলুক; মৌমিতা, রাণাঘাট; পম্পা, চাকদা; ব্লাউজ মিউজিয়াম, চন্ডীদাস মার্কেট, দুর্গাপুর; জনতা স্টোরস্, স্টেশন রোড, দুর্গাপুর; ব্লাউজ মিউজিয়াম, হকারমার্কেট, খড়গপুর; ফকির চাঁদ জানা, মেদিনীপুর; রীণা ড্রেসেস, শিলিগুড়ি।

একবারই ওই বন্দুক বেরতো দিবালোকে। আমার কাছে ওই দুটো তিনটে দিন ছিল উৎসবের মতো। এখনকার ভিন্টেজ কার র‍্যালির মতো বন্দুকের শোভাযাত্রা। এখন আর দেখা যায় না। সোস্যালিজমে জমিদার গেছে। ভুঁড়িদার বেড়েছে। বাঘমারা বন্দুকের বদলে মানুষ মারা কল এখন ছেলে ছোকরার ট্যাঁকে ট্যাঁকে। তার আবার আদুরে নাম হয়েছে, চেম্বার।

আমার পাসপোর্টটার সেই হালই হয়েছিল। মেয়াদ প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। এবারেও উদ্ধার কর্তা হলেন, আমার বন্ধু সুদেব। যে সব বাধায় পানাপুকুরের ধারে আমার অভ্যস্ত জীবন অবিচল থাকতে পারত সেসব বাধা সরাবার জন্যে আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরা এবার কোমর বেঁধে নেমে পড়েছিলেন। ভিটে ছাড়া তোমাকে করবই। সেই চণ্ডীর শ্লোকে আছে, দেবীকে দেবতারা নানা আয়ুধে ভূষিত করছেন। কেউ দিচ্ছেন খড়্গ, কেউ পাঞ্চজন্য শঙ্খ, চক্র, শূল। আমারও সেই অবস্থা, পি আই বি দিলেন নমিনেশান, সাগরদা দিলেন পারমিশান, সুদেব দিলেন পাসপোর্ট, অভীকবাবু দিলেন ফরেন একসচেঞ্জ, বিভূতিবাবু সারা দিন রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এক-ঠ্যাঙে খাড়া থেকে অবশেষে অ্যামেরিকান একসপ্রেস থেকে এনে দিলেন ট্র্যাভলার্স চেকে ডলার। অরূপবাবু দিলেন মনোবল। শেষ পর্যন্ত আমি দশভুজ বাবা দুর্গা।

আমার তো ঘোড়ার ডিম কিছুই ছিল না। কেবল জনে জনে জিজ্ঞেস করি, হ্যাঁ, মশাই লন্ডনে ক ডিগ্রি সেলসিয়াস ! সেলসিয়াস, ফেলসিয়াস ভুলে একটু সাজ-পোশাকের ব্যবস্থা করুন, বললেন অরূপবাবু। ঘ্যান ঘ্যান না করে গরম কাপড়ের গলাবন্ধ একটা মন্ত্রীকোট। ওসবের মধ্যে না গিয়ে আমার সহকর্মী বন্ধু রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শে একটা উইন্ডচিটার কিনলাম। সেই দিশী বায়ু-ঠেকান-পরিধেয় হিথ্রোতে আমাকে কিরকম ইনসাল্ট করেছিল, সে গল্প পরে।

সদ্য বিদেশ প্রত্যাগত সুদেব আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, আমার মতো বিশাল এক প্যাঁটরা নিয়ে বিদেশ যেও না। ট্র্যাভ্‌ললাইট। আমার জামাইবাবুর পরামর্শে, তাঁরই দেওয়া বিশাল এক জগদ্দল নিয়ে গিয়ে আমি যা ফাঁপরে পড়েছিলুম ! সুদেব ফ্রানসে একটা সুন্দর হাল্কা এয়ারব্যাগ কিনেছিলেন, সেই ব্যাগটা আমাকে এনে দিলেন। তবুও বাজার ঢুঁড়ে আমি একটা ব্যাগ কিনলুম। সে ব্যাগ আবার তিন কিস্তির ছোট গল্পের মতো। প্রথম কিস্তির পর দুটো ক্রমশ। ফাস্টনার টানলে দ্বিতীয়, তৃতীয়। তলায় আবার চারটে চাকা। ওই ব্যাগও আমাকে বিপদে ফেলেছিল। অনেকটা দড়ি বাঁধা কালীঘাটের পাঁঠার মতো তার ব্যবহার। টানলে, সে ঘাড় কাত করে উল্টো টান মারতে থাকে। কি-রে আয়। তুই বলির পাঁঠা নোস, আমার সাড়ে চারশো টাকা দামের গুড়গুড়ে চাকা লাগানো ব্যাগ। উইন্ডচিটারের চিটিং ব্যাগের বিটিং, কখনও কখনও বাইটিং, সে গল্প আমি যথা সময়ে বলব।

যা আমাকে মুগ্ধ করেছে, তা হল আমার সহকর্মীদের সহযোগিতা আর ওপর-অলাদের ভালবাসা। যাবার কয়েক দিন আগে অভীকবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'ফরেন একসচেঞ্জ কত নিয়ে যাচ্ছেন ?'

'ওই যে নিয়ম অনুসারে যা দেয়, পাঁচশো ডলার।'

'তার মানে ? পাঁচশো ডলারে হবে ? টুপি উল্টে ভিক্ষে করবেন না কি ? আপনি আরও বেশি পাবেন।'

তাঁর শেষ মুহূর্তের ব্যবস্থায় শেষ পর্যন্ত আটশো, না সাড়ে আটশো ডলার পেলাম। পাঁচশো ডলার নিয়ে গেলে সত্যিই আমাকে গান গেয়ে ভিক্ষে করতে হত। অরূপবাবু বললেন, 'আমি আমার টেলারকে ডেকে পাঠাচ্ছি, দু'দিনে দু'প্রস্থ স্যুট বানিয়ে দেবে। সাগরদাকে যেই বললুম, নাকে কেঁদে, আমার পূজোর লেখা। তিনি বললেন, 'অনেক সময় আছে। ইউ আর টু গো, ইউ মাস্ট গো।' অরূপবাবু বললেন, 'আপনার জন্যে আনন্দলোকের একটা ফর্মা ধরে রাখা হবে।'

বিদেশ যাওয়াকে উপলক্ষ করে এই সব শ্রদ্ধেয় মানুষের যে ভালবাসা পেলাম, তা আকাপুলকোর অ্যাটলান্টিকের উত্তাল ঢেউকে হার মানায়। আর বাড়ির লোক আমার স্বভাব জানে। তারা বলেছিল, এবার যদি না যাও, তোমাকে ওই বিদেশ-বাসের ক'দিন আমরা বাড়ি ঢুকতে দোব না।

আমার সেই তিন কিস্তি ব্যাগ সমেত কাক ভোরে গাড়ি এয়ারপোর্টের সামনে ফেলে দিয়ে হাত নেড়ে চলে গেল। আমি ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের কাউন্টারের সামনে, জয় মা বলে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ব্যাগ জমা করে বোর্ডিং-পাস নিয়ে চলে আসার সময় হঠাৎ চোখে পড়ল, ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি দিয়ে লেখা, এগারোটা পনের।

'হ্যাঁ মশাই, ওটা কি ? এগারোটা পনের ?'

ভদ্রলোক তাঁর নিথর গাম্ভীর্য এতটুকু আলগা না করে বললেন, 'ছটা পনের-র ফ্লাইট আজ এগারোটা পনের মিনিটে ছাড়বে।'

'সে কি ? এখন তো সবে পাঁচটা পনের। এতক্ষণ আমি কি করব ?'

ভদ্রলোক বলতে পারতেন, 'ভ্যারেণ্ডা ভাজবেন।' তা না বলে, বললেন, 'বাড়ি যদি কাছে হয় তো ঘুরে আসুন, সাড়ে দশটা নাগাদ এলেই হবে।'

সেই বোর্ডিং-পাশটা বুক পকেটে নিয়ে বিমানবন্দরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। প্রথমেই বাধা। ওদিকে দিল্লিতে, শ্যামলদা, সাংবাদিক শ্যামল চক্রবর্তী অসম্ভব রেগে আছেন। রেগে থাকারই কথা। আমার যাওয়া উচিত ছিল আরও তিন দিন আগে। এই তিন দিন তিনি আমার হয়ে নানা জায়গায় প্রক্সি দিয়ে চলেছেন। প্রেস কনফারেন্সে, প্রেস ইনফরমেশান ব্যুরোতে। আজ বেলা বারোটায় আবার একটা প্রেস-কনফারেনস আছে। তা ছাড়া আমার এখনও মেক্সিকো যাবার ভিসা করানো হয়নি। মেকসিক্যান এমব্যাসিতে গিয়ে ভিসা করাতে হবে। শ্যামলদা একা কত দিক সামলাবেন।

বাইরে বেরিয়ে ভাবছি, এখন কি করা [illegible]! আমার সংস্কার বলছে, বাধা যখন পড়েছে [illegible] আর যাবার দরকার নেই। ফিরে চলো [illegible] ঘরে ; কিন্তু মালপত্র সমেত আমার [illegible] যে এয়ারলাইনসের জিম্মায়। বোকার [illegible] দাঁড়িয়ে আছি। ইতিমধ্যে কত লোক কত দিকে চলে যাচ্ছে। প্লেন উঠছে, নামছে। বিমানবন্দর ক্রমশই ব্যস্ত হয়ে উঠছে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। কি করা যায় ভাবছি, এমন সময় দেখি, বেমক্কা একটা জায়গায় পার্ক করে রাখা একটা গাড়ি ঘিরে বন্দর-কর্মীদের খুব জটলা। পুলিসও এসে পড়েছে। গুটি গুটি এগিয়ে গেলাম। সর্বনাশ, এই গাড়িটা করেই তো আমি এসেছিলাম। চালক গেল কোথায় গাড়ি লক করে ! কেউ বলছেন, টেনে নিয়ে যাও। কেউ বলছেন, চাকার হাওয়া খুলে দাও। কে একজন ছুটে গিয়ে বিশাল একটা স্টিকার নিয়ে এলেন, তাতে ছাপার অক্ষরে বড় বড় করে লেখা, ইউ হ্যাভ পার্কড ইন এ রং

প্রেস। স্টিকারটা সামনের উইন্ড স্ক্রিনে লাগাতে হবে। সমস্যা, স্টিকার আছে, আঠা নেই। আঠার খোঁজে আর একজন দৌড়লেন। ফিরে এলেন, প্লাস্টিকের গেলাসে এক গেলাস জল নিয়ে। স্টিকারটা যিনি এতক্ষণ দু'হাত দিয়ে উইন্ড স্ক্রিনে চেপে ধরে রেখেছিলেন, তিনি জলটা ঢক ঢক করে খেয়ে ফেললেন। তখন আর একজন পরামর্শ দিলেন, এক কাপ চা নিয়ে এস। চায়ে ভিজিয়ে লাগাও। যিনি জল এনেছিলেন, তিনি বিশুদ্ধ বাঙলায় বললেন, 'হ্যাঁ, ওটাও মায়ের ভোগে যাবে।'

সম্মানজনক দূরত্বে দাঁড়িয়ে, আমি এই সব দেখছি, আর মনে মনে লজ্জায় মরে যাচ্ছি। ছি ছি এ যেন পাবলিক-প্রেসে বড় বাইরে করে ফেলা। এমন সময় একটা ট্যাক্সি এসে ঘ্যাঁচ করে কিছুটা দূরে দাঁড়াল। পেছনের দরজা খুলে বেরিয়ে এল প্ল্যাস্টার করা একটা পা। ক্রমশ

ছবি : দেবাশিস দেব

নাট্যকারের জীবন নাট্য

গল্পের মত, নাটকের মত এই জীবন ছিল নম্রতায় ভদ্রতায় পরিশীলিত। জীবনব্যাপী মৃত্যুকে বহন করেও এক অপরাজিত মানুষ নিজের ঠোঁটের স্মিত হাসিটিকে বিদায় দেননি চরম মুহূর্তেও। মাত্র চুয়াল্লিশ বছরের পরমায়ু নিয়েও অ্যান্টন চেখভ অমর হয়ে থেকে গেলেন রাশিয়ার সন্ধিলগ্নের সাহিত্য জগৎ আলোকিত করে। ঈশ্বর তাঁকে অসামান্য কৌতুক ক্ষমতার অধিকার দিয়েছিলেন। চোখের জলকে হাসির ছটায় রূপান্তরিত করার ক্ষমতাই যুগিয়েছে তাঁর অপরাজিত জীবনীশক্তি।

চেখভ আবার যেন নতুন করে ফিরে এলেন আমাদের চোখের সামনে। জীবন থেকেই কেবল সাহিত্য জন্মায় না, সাহিত্য থেকেও মানুষের পুনর্জন্ম হয়। নিজের সাহিত্যের ছোঁয়ায় সাহিত্যিক বেঁচে ওঠেন নতুন জীবনে। হেনরি ট্রয়টের লেখা অ্যান্টন চেখভের জীবনী গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মাইকেল হেনরী হেইম।
ট্রয়ট এই অবিস্মরণীয় স্বল্পায়ু মানুষটিকে অনায়াসে তুলে এনেছেন দুটি প্রায় সমান্তরাল ক্ষেত্র থেকে। ব্যক্তি মানুষটির জীবনের ঘটমান পারিপার্শ্বিক এবং শিল্পী মানুষটির সৃষ্ট সাহিত্যের নির্ভুল বিন্যাস থেকে এই সমীকরণ একই সঙ্গে ট্রয়টের সত্যান্বেষী রসচেতনার ফল। একই মুদ্রার উভয় প্রান্তকে মুহুর্মুহু ঘুরিয়ে দেখানোর মত চেখভের ভেতর এবং বাহিরের যোগসূত্রটিকে জীবন্ত ও উপভোগ্য করে তুলেছেন জীবনীকার।
অ্যানটন চেখভের জীবনী তাঁর নিজের লেখা নাটকের মতই। উভয় ক্ষেত্রেই আবহ দৃশ্যপট রাশিয়ার গ্রামদেশাঞ্চলের। চরিত্রগুলি স্বপ্নালু আর একঘেয়েমি ক্লান্ত বুদ্ধিজীবীর মিশ্ররূপ। হেনরি ট্রয়টের অন্যান্য জীবনীর উপজীব্য পুশকিন গোগোল টলস্টয় ও ডস্টয়ভস্কির জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে চেখভের পার্থক্য এইখানে যে তা ছিল বিশ শতকের দুর্মেজাজী এবং সন্দিগ্ধ, বিষাদাক্রান্ত এক বিশেষ সময়ের ও সমাজের। এই ঝোঁক, এই ভাবাবেগ চেখভের অসংখ্য ছোট গল্প, শ্রেষ্ঠ নাট্যকর্ম (The Seagull, Uncle Vanya, Three Sisters, The Cherry Orchard), এবং বিশেষ করে তাঁর পত্রাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ১৯০৪ সালে যক্ষ্মা রোগে মারা যাবার কিছু আগে তিনি তাঁর স্ত্রীকে লিখেছিলেন, 'জীবন কী তুমি জিজ্ঞেস করেছ। এটা ঠিক গাজর কী জানতে চাওয়ার মত প্রশ্ন। গাজর হচ্ছে গাজর, এর বেশী কিছু জানবার নেই'।
চেখভ কখনই জ্ঞানী তাপস কিংবা মরমিয়াবাদীর ভূমিকা নিতে চাননি। টলস্টয় এবং ডস্টয়ভস্কির নির্বেদ তাঁর কাম্য ছিল না। জীবন নামক যুদ্ধকে তিনি হাড়ে হাড়ে চিনেছিলেন। কঠিন সত্যকে স্বীকার করাই ভাল, তাকে অকারণে মহিমান্বিত করে লাভ নেই। তিনি ভাল করেই জানতেন তাঁর ঠাকুর্দা ছিলেন চাষী মানুষ, আর তাঁর বাবা একজন অযোগ্য মুদী এবং ধর্মোন্মাদ ব্যক্তি যিনি জীবনের অধিকাংশ সময়ই ব্যয় করেছেন প্রার্থনায় আর ধর্ম প্রচারে আর ছটি শিশু সন্তানকে অকৃপণ হাতে উত্তমমধ্যম দেওয়ার কাজে। তাঁদের পরিবারটি বাস করত ট্যাগানরগ নামে এক ছোট বন্দরে। আজও সমুদ্র তীরবর্তী এই জায়গাটি ছিল একটি বধির শহর। চেখভ শিশুরা একটু কর্মক্ষম হবার সঙ্গে সঙ্গেই নিরুত্তাপ অস্বাস্থ্যকর দোকানের ঘানিতে তাদের জুতে দেওয়া হয়েছিল। ছুটির দিনেও রেহাই ছিল না। রবিবার গুলোয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা গির্জার মধ্যে দাঁড়িয়ে কাটাতে হয়েছে। এই নিরানন্দ অবরুদ্ধ দিনগুলোর কথা স্মরণ করে পরবর্তী কালে তিনি লিখেছিলেন, 'when I was a child I had no childhood'।
তাঁর এই বঞ্চিত জীবনের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ঈশ্বর তাঁকে অসামান্য কৌতুক ক্ষমতার অধিকার দিয়েছিলেন। চোখের জলকে হাসির ছটায় রূপান্তরিত করার ক্ষমতাই যুগিয়েছে তাঁর অপরাজিত জীবনীশক্তি। নিরন্তর রুক্ষ নির্মম অভিজ্ঞতার মধ্যেও এই হাস্যরসই বর্মের কাজ করেছে। লেখক এবং চিকিৎসক এই দুই কর্মজীবনের মধ্যে সমতা আনার কাজেও লেগেছে। ওষুধের জগৎটা তাঁর সংবেদনশীল স্বভাবের সঙ্গে মানিয়ে গিয়েছিল। এবং এটাই ছিল তাঁর সংসারের হাল ধরার কাজে বৈঠা স্বরূপ। মদ্যপ এবং নিঃস্ব হয়ে যাওয়ায় বাবা তখন অকর্মণ্য, সংসারের গুরু দায়িত্ব তাঁর কাঁধেই ন্যস্ত। নিজের সংসার শুরু না করার পক্ষে এটাও ছিল তাঁর একটা কারণ। লেখার প্রতি তীব্র আকর্ষণও ছিল হয়তো আর একটি বাস্তব কারণ। কলম আর কাগজই যাঁর হয়ে উঠেছিল অস্তিত্বের কেন্দ্রস্থল, নারী আর তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কতখানি গুরুত্ব পেতে পারে?
লেখা চেখভের কাছে জল-ভাতের মত সহজ হয়ে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। যে কোন বিষয়ে দ্রুত গতিতে তাৎক্ষণিক লেখা তিনি লিখতে পারতেন। ফলে সম্পাদকদের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অপরিহার্য লেখক। কিন্তু ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত, তিনি বেনামে যখন কৌতুক কাহিনীগুলি লিখে চলেছিলেন, এই নেপথ্যবাসী লেখকের দিকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। এমন কি স্বনামে তাঁর প্রথম নাটকটি মঞ্চস্থ হবার পর সমালোচকরা তীব্র বিরূপ আলোচনাই করেছিলেন। কিন্তু ১৮৮৮ সালে তাঁর গল্প The Steppe প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই হাওয়া ঘুরে গেল। টলস্টয় আর গোগোলের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করলেন সমালোচকরা। ছোট গল্পে অসামান্য ও অবিস্মরণীয় অ্যান্টন পাবলোভিচ চেখভ (১৮৬০—১৯০৪) সঙ্গত কারণেই ফরাসী গল্পের জাদুকর মোপাসাঁর সঙ্গে তুলিত হয়েছেন। নাটকেও তিনি বিনাটকীকরণের সূত্রপাত করেছিলেন কাহিনীবৃত্তের সরলগতি প্রযুক্তির ওপরে চারিত্রিক ও পারিপার্শ্বিক অনুপুঙ্খ বিন্যাসকে স্থান দিয়ে। জীবনের চরম নাটকীয় উপাদানকে প্রচ্ছন্নভাষী মন্তব্যে তাৎপর্যমণ্ডিত করে ধরে দিয়েছেন অনিবার্য স্বাভাবিক সংলাপের মধ্য দিয়ে। যাকে নাটকের ভাষায় বলা যায় 'Unheroic hero' তার পথিকৃৎও তিনি। সঞ্চরমান আলোছায়ার মধ্যে কখনো উচ্চরোল হাসিকে বিদীর্ণ করেছেন বেদনার্তির মধ্যে, স্মিতহাস্যের ফলশ্রুতি ঘটেছে চোখের জলে, কৌতুককথার মধ্যে মিশে থেকেছে বিপজ্জনক কাচের টুকরোর মত বিদ্রূপ, বক্রোক্তি। কি লেখক, কি চিকিৎসক, উভয় জীবনেই চেখভ ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন দারিদ্র্যপীড়িত অশিক্ষিত মানুষের দরদী শুভার্থী।
অন্তরে-বাহিরে এবং হাতে-কলমে এমন নিরন্তর যুদ্ধমান, পর-শুশ্রূষাকারী, বুদ্ধিদীপ্ত কথকের দুর্লভ সাক্ষাৎকারের কথা গোর্কীর লেখায় এবং আরও অনেকের চিঠিতে বাস্তবিত হয়ে আছে। তাঁর জীবনের আর একটি করুণ রমণীয় অধ্যায় দুটি নারীর বিপরীত আখ্যানে এবং মর্মস্পর্শী মৃত্যুর নিঃশব্দ চারণে স্পর্শকাতর ও নাটকীয় হয়ে আছে। এই জীবনীতে ট্রয়টের প্রামাণিক নিপুণতা ও পরিমিতিবোধ ঈর্ষণীয়।

বহুপ্রত্যাশিত একটি মূল্যবান গ্রন্থ

ভারতবর্ষের গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাস, হিন্দুর রাজবৃত্ত অনুপুঙ্খ লিপিবদ্ধ করার মত ঐতিহাসিক গবেষণাকর্ম কখনো হয়নি। কাব্যে সাহিত্যে লোকশ্রুতি কিংবদন্তী এবং জীবনাশ্রয়ী খণ্ড রচনায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে তার বিলুপ্ত ইতিহাসের অপ্রতুল

উপাদান, অপরিশ্রুত ঘটনাচূর্ণ। আমাদের আত্মবিস্মৃতির পিছনে ক্ষণজীবী কৌতূহল, দূরদৃষ্টি, সত্যনিষ্ঠা ও জাতীয় ঐক্যবোধের অভাব, পারস্পরিক ঈর্ষাঘটিত ঔদাসীন্য—ইত্যাকার অনেক কারণ বর্তমান। ফলে বিদেশীর গবেষণা ও বিবরণ অনেক সময়ই আমাদের আত্মজিজ্ঞাসার অনুপ্রেরণা এবং পুঁজি। ফলে বিচারে এবং তথ্য উপস্থাপনে বিকৃতি যেমন এসেছে তেমনি কখনো কখনো নিরপেক্ষ সংবেদনশীলতার সংযুক্তিও ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'-এর উইলিয়াম জোন্স এবং ভারতবন্ধু কর্নেল টডের অবদান অবিস্মরণযোগ্য। টড সাহেব দীর্ঘ শ্রম ও অধ্যবসায়ী অন্বেষায় রাজস্থানের রাজকাহিনী পুনরুদ্ধার ও লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই বিশাল গ্রন্থটি একদিকে যেমন রাজপুত জাতির বংশ পরম্পরা আদ্যন্ত ইতিহাস, তেমনি এই রাজভূমির গিরি-অরণ্য-মরু প্রান্তরের ভৌগোলিক বিবরণ, দুর্গাবলীর অবস্থান, আঞ্চলিক ধর্মসংস্কৃতির বিবর্তনের রহস্য, লোককথা এবং প্রত্নতাত্ত্বিক বিচারে বহুমূল্যবান দলিল বিশেষ। শুধু তাই নয়, বহু নাটকীয় ঘটনার ঘনঘটা এবং বিচিত্রবীর্য চরিত্রের সমাবেশে রাজস্থান কাহিনী উপন্যাসের মতই গতিশীল এবং রম্য হয়ে উঠেছে। জাতীয় চরিত্র গঠনে এর মূল্য অপরিসীম মনে করে বসুমতী সাহিত্য মন্দির, একদা এই অতিকায় গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছিলেন, নামমাত্র মূল্যে। তখন বইটির রীতিমত চাহিদা হয়েছিল পাঠক সমাজে। কিন্তু বহু ব্যয়সাধ্য এই গ্রন্থের সম্ভবত পাঁচটির বেশী সংস্করণ তাঁরা প্রকাশ করতে পারেননি। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অতি আদর্শনিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। লোকহিতার্থে তিনি বসুমতী গ্রন্থমালার সুলভ সংস্করণ প্রকাশনা শুরু করেছিলেন। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে তৎকর্তৃক রাজস্থান গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর প্রায় সতের বছর পরে পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তদবধি গ্রন্থটি সম্ভবত আর মুদ্রিত হয়নি। এখানে উল্লেখ্য বসুমতী সংস্করণের পূর্বে শোভাবাজার রাজবাটি ও বরাট প্রেস থেকে রাজস্থানের দুটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু দাম অনেক বেশী হওয়ায় সর্বসাধারণের হাতে পৌঁছায়নি।

বর্তমানে অপ্রাপ্য এই বইটি সরকারী অথবা বেসরকারী উদ্যোগে ছাপা হলে জাতির একটি বিলুপ্তপ্রায় সম্পদই শুধু রক্ষিত হত তাই নয়, প্রকাশক সম্ভবত বাণিজ্যিক সাফল্য ও শ্রদ্ধা অর্জনও করতেন। তবে প্রকাশের আগে পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণ কৃত বঙ্গানুবাদটিকে পরিমার্জিত করে যুগোপযোগী আধুনিক করে নেওয়া প্রয়োজন।

সংক্রান্ত সংবাদ

গত ২৪ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত সর্বভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের তেত্রিশতম অধিবেশন হয়ে গেল সল্ট লেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। উদ্যোক্তা এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা। দেশ-বিদেশের বহু সম্মানিত অতিথি এসে সল্ট লেকের নির্জনতাকে পরিবর্তিত করেছিলেন প্রায় উৎসবে। ২৩ তারিখ থেকেই আটটি সরকারি বাস এবং এশিয়াটিক সোসাইটির গাড়িগুলি ক্রমান্বয়ে সল্ট লেক- হাওড়া-পার্ক স্ট্রিট চক্রাকারে ঘুরছিল। অতিথিদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল ক্রীড়াঙ্গন-সংলগ্ন বিয়াল্লিশটি ছোট-বড় কক্ষে।

বিদ্বৎ পারিষদের আসর বসবার পূর্বে যে পারস্পরিক শুভেচ্ছা-বিনিময়, সাধারণ কথা, ব্যক্তিগত আলাপ-পরিচয় চলছিল, সে সব কিছুই এক বিশেষ এবং মহিমময় রূপ নিল, যখন বিদ্বান মানুষদের প্রবন্ধ পড়া শুরু হল। বেদ, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের তত্ত্বাবধানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পর্যন্ত বাইশটি বিভাগে গম্ভীর এবং প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ পড়া হল। সবই ভাল, তবে যে কয়েকটি ঘরে চট-কাপড়ের ব্যবধানে নূতন বিভাগ তৈরি হয়েছে, সেখানে কোন উচ্চ কণ্ঠের প্রাবন্ধিক কাঠিন্য, চটের অন্তরালবর্তিনী কোন বিদুষী মহিলার প্রবন্ধ-পাঠ আরও মৃদুতর করে দিয়েছিল। কিংবা রিলিজিয়নের ঘরে বসে (রিলিজিয়ানের কিছুই না শুনে) ফিলসফির প্রবন্ধগুলি শুনতে হয়েছে। অবশ্য এত বড় বিরাট ব্যবস্থার মধ্যে ত্রুটি কিছু থাকবেই। প্রায় তিনদিন ধরে যে সব প্রবন্ধ পড়া হল তার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য ছিল অনেক, কিন্তু সমস্ত বিষয় নিয়ে হাজারো পণ্ডিতদের প্রশ্নোত্তরের এমন আলোচনা-চক্র তৈরি হয়েছিল তাতে বার বারই জাতীয় সংহতি কথাটা মনে পড়েছে। জার্মানী, ফ্রান্স, মেক্সিকো এবং বাংলাদেশ থেকে যেসব বিদেশী ভারত পথিক এসেছিলেন তাঁরা অনেকেই প্রাচ্যবিদ্যার মৌলিক গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত। বিশেষত ভারতবর্ষের মধ্যেই মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, তামিলনাড়ু প্রভৃতি জায়গা থেকে যেসব পণ্ডিত এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে মত-বিনিময় করে বোঝা গেল পশ্চিমবঙ্গে প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা আরও গভীরতর হওয়া দরকার। মহামান্য জ্যোতি বসু তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে এই গবেষণার ওপরে জোর দিলেন বটে কিন্তু তিনি নিশ্চয় জানেন প্রাচ্যবিদ্যার পঠন-পাঠনের মূলোচ্ছেদ হয়ে গেছে মাধ্যমিকের পাঠক্রমেই। সেখানে শুধু গবেষণার ওপর জোর দিয়ে ছিন্নমূল বৃক্ষের শুষ্কপত্রে বক্তৃতার উষ্ণ জলনিষেক করে লাভ কি! সারা দিনের প্রবন্ধ-পাঠ ও শ্রবণের যদি কোন ক্লান্তি আসে, তার জন্য সন্ধ্যাবেলায় আনন্দ-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। প্রথম দিন সংস্কৃত নাটক 'অভিজ্ঞান- শকুন্তল'-এর অভিনয় করালেন সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ। শেষের দিন 'শ্যামা'। মাঝে ছিল নৃত্য এবং সেতার-বাদনের ব্যবস্থা। খাওয়া-দাওয়া ছিল সম্পূর্ণ নিরামিষ। মৎস্যপ্রিয় বাঙালী পণ্ডিতদের তাতে কিছু রসহানি ঘটলেও বৃহত্তর স্বার্থে এই সাত্ত্বিক আহার মন্দ হয়নি একটুও। চা-কফির ব্যবস্থা ছিল পর্যাপ্ত। প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের সমারোহ উজ্জ্বলতর করার জন্য পুস্তক-বিক্রেতারা বিপণী সাজিয়েছিলেন ওপরতলায় আর সংস্কৃত-সংস্কৃতি সংগ্রাম সমিতি একটি ছোট্ট তবু বর্ণাঢ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল প্রাচ্য-বিদ্যার বিষয় নিয়েই। সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট ভি আই সুব্রহ্মনিয়াম এবং সেক্রেটারি এস ডি যোশী সম্মেলন সফল করার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মকর্তা এবং কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন, তবে একথা বলা যায় সোসাইটির কর্মীরা এই সম্মেলনের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তা ভুলে যাবার নয়। সব কিছু মিলে সম্মেলনের শত দূষণ নিন্দারোপণ ধুয়ে মুছে গিয়ে যা থাকল, তা হল তেত্রিশতম প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন হয়ে গেছে। স্থান ছিল পশ্চিমবঙ্গ এবং উদ্যোক্তা ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা।

এশিয়াটিক সোসাইটির সলতে পাকানোর যুগে প্রাচুর্যের হয়তো অভাব ছিল কিন্তু অবিচল নিষ্ঠা, নিঃস্বার্থ শ্রম ও সাধারণ অভাব ঘটেনি। তারপর যুগ-যুগান্তর চলে চলে গেছে, চলে গেছেন বিদেশীরাও। আর্থিক অসাচ্ছল্য ও সমষ্টিগত যত্নের অভাবে এশিয়াটিক সোসাইটির ক্রমে নাভিশ্বাস উঠেছিল। ডুবতে বসেছিল এই সাংস্কৃতিক মহাকেন্দ্রটি। আবার সরকারী উদ্যোগে তার সুদিন ফিরেছে। প্রদীপে এখন সলতের অভাব নেই, অভাব নেই তেলেরও। কিন্তু পিলসুজের তলায় অন্ধকার ক্রমশ বড় হচ্ছে।

গর্ভধারিণী

সমরেশ মজুমদার

দুবার বরফ গলে গেল কিন্তু সেই অদৃশ্য জন্তুটির অস্তিত্ব চাক্ষুষ হল না। যাকে এরা দানো বলে, যাকে ইয়েতি বলে ওদের মনে হয়েছিল। গেল গ্রীষ্মে পাহাড়টার যতদূর যাওয়া সম্ভব বন্দুক হাতে ঘুরেছে সুদীপ। ইয়েতি তো দূরের কথা আর একটাও স্নো-লেপার্ড চোখে পড়েনি। দ্বিতীয়বার বরফ গলবার আগে যে পর্যাপ্ত সময় পাওয়া গিয়েছিল তা চমৎকার কাজে লাগানো গিয়েছে। দুবছরে তাপল্যান্ডের চেহারা ব্যাপক পালটে গিয়েছে।

বৃষ্টি এখানে সারা বছর হয়। কোথাও জল দাঁড়ায় না। শীতের প্রকোপ এত বেশী যে সমতলের সব শস্য এখানে ফলতে পারে না। কিন্তু আনন্দ এদের নিজস্ব ফসল ছাড়াও বাড়তি কিছুর জন্যে ধাপে ধাপে পাহাড় কাটিয়েছে। এই গ্রীষ্মে কিছুই লাগানো হয়নি সেখানে। কারণ অনবরত আগাছা বের হচ্ছিল নবীন মাটি থেকে। সেগুলো তুলে ফেলা, মাটিটাকে সহজ করার কাজ চলেছে এতকাল। ডুগুডুগু এবং গুড্ডুকের চাষ হয়েছে প্রচুর পরিমাণে। সেগুলো রোদে শুকিয়ে জমিয়ে রাখা হয়েছে বরফের সময়ের জন্যে। আর ব্যাপক ফলন হয়েছে ভুট্টার। দানাগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে পিষলে চমৎকার আটা হয়। গম হবে কি হবে না এমন একটা অনিশ্চয়তা রয়েছে। আনন্দ চাইছে সামনের গ্রীষ্মে পরীক্ষা করতে।

জমির পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। পরিশ্রম, উৎসাহ এবং পরিকল্পনা যদি জোরদার হয় তাহলে সারা বছর আর অভুক্ত থাকতে হয় না এই বিশ্বাস এসে যাওয়ায় ব্যক্তিগত সীমানা নিয়ে তিনজন ছাড়া আর কেউ জেদ ধরে থাকেনি। অবস্থাপন্ন সেই তিনজন বস্তুত এখন একঘরে। আনন্দরা ঠিক এইটে চায়নি। কিন্তু স্বার্থবিরোধী ভূমিকায় কাউকে দেখলেই মানুষের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবেই আসে। যদিও ওই তিনজন সমস্ত গ্রামের বিরোধী কোন ভূমিকা নেয়নি। যেভাবে তারা প্রতিবছর তাদের জমিতে চাষ করে এবারও তাই করেছে। সমস্ত গ্রামের মত মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়নি। আমার জমি এবং তোমার পরিশ্রম মানে ফসলের আধাআধি, এই নীতি তাদের পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। আনন্দ গ্রামের সবাইকে অনুরোধ করেছিল যারা সঙ্গী হচ্ছে না তাদের যেন কেউ বিরক্ত না করে। কারো মনে তাই দেখে যদি আলাদা হবার প্রবণতা এসেও থাকে ফসলের পর তা দূর হয়ে গেল। দেখা গেল জমির ফলন সম্মিলিত উদ্যোগে অনেক ব্যাপক। সুদীপ কিংবা জয়িতা আশাই করতে পারেনি এত সহজে সাধারণ মানুষ একত্রিত হবে। আনন্দর উদ্যোগ, পরিশ্রম এবং এদের জন্যে নিজেকে নিয়োগ করার চেষ্টা ক্রমশ তাকে প্রায় কাহুনের সমগোত্রীয় করে ফেলেছে বলে ধারণা হচ্ছিল। আনন্দ যে কাজই করতে বলল তা করলে ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে ফলে বিশ্বাস আরও বেড়ে যাচ্ছিল। কাহুনের সঙ্গে পার্থক্য একটাই ওরা আনন্দকে ভয় করে না, এড়িয়ে চলে না। জয়িতা ঠাট্টা করেছিল, ক্ষমতা যেহেতু মানুষের চরিত্রবদল করে সেইহেতু নিজেকে প্রায় দেবদূতের ভূমিকায় নিয়ে যাওয়ার নেশা আনন্দকে পেয়ে বসেছে। এবং সেখান থেকেই আর একজন মিনি ডিক্টেটারের জন্ম নেওয়া বিচিত্র নয়। তার বক্তব্য ছিল, প্রতিটি স্তরে নিজেরা এগিয়ে না গিয়ে গ্রামের ছেলেমেয়েদেরই নেতৃত্ব নিয়ে কাজ শেষ করতে দেওয়া উচিত।

আনন্দ কোন জবাব দেয়নি, হেসেছিল। জয়িতাও ভাল করে উত্তরটা জানত। এই গ্রামের ব্যাপক মানুষের মধ্যে নেতৃত্ব নেওয়ার ক্ষমতা বা ইচ্ছা একেবারেই নেই। এদের মানসিক গঠনও সেই পর্যায়ের নয়। এমনকি পালদেম, লা-ছিড়িঙ কিংবা সাওদের পর্যন্ত চটজলদি সিদ্ধান্ত নেওয়ার মানসিকতা রাখে না। কয়েকজনের উৎসাহ আছে প্রচুর কিন্তু হুকুমটা অন্যের মুখ থেকে শুনতে চায় এরা।

তাপল্যাণ্ডে এখন গৃহপালিত পশু এবং প্রাণীর সংখ্যা বেড়েছে। মুশকিল হল আধুনিক জীবনের কোন সুবিধে এখনই এখানে পাওয়া সম্ভব নয়। মুরগী চাষের জন্যে বিদ্যুতের দরকার এবং এখানে তা আকাশকুসুম চিন্তা বলেই মা-মুরগীদের ওপর ডিমে তা দেওয়ার আদ্যিকালের নিয়মটার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ফলে উৎপাদন যতটা বাড়া উচিত ছিল ততটা বাড়েনি। কিন্তু উপযুক্ত সংরক্ষণ সংখ্যাকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করেছে। গত গ্রীষ্মে দশটা গরু কেনা হয়েছিল ওয়ালাঙ চুঙ থেকে। কয়েকটা চমরীর বাচ্চাকে জঙ্গল থেকে ধরে ভাল পোষ মানানো হয়েছে। সম্প্রতি তিনটে বাচ্চা হয়েছে। ফলে অত্যন্ত অসুস্থ বা দুর্বল শিশুরা কিছু দুধ পাচ্ছে। আর

এইসব ব্যাপার গ্রামের তাবৎ মানুষের মনে একটা বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়া এনেছে। নতুন জমি আমাদের পেটে খাবার দেবে, মুরগীর ডিম প্রত্যেকের শরীরে শক্তি দেবে এবং আমার শিশু দুধ পাচ্ছে যে কারণে সেই কারণটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে—এমত ধারণা প্রত্যেকের। সেইসঙ্গে এই গ্রামটা আমাদের, এই মাটি আমাদের এবং আমরা সবাই ঠিকঠাক খেয়ে আছি যেহেতু বাইরের তিনটি মানুষ আমাদের একত্রিত হতে শিখিয়েছে।

গত গ্রীষ্মে আশে পাশে যতটা দূর যাওয়া সম্ভব ততটা দূর গিয়ে বড় এলাচ সংগ্রহ করে আনিয়েছে আনন্দ। এই বস্তুটাকে কোন গুরুত্ব দেয়নি তাপল্যাঙের মানুষ এতকাল। প্রস্তাব শুনে ওরা খুব বিস্মিত হয়েছিল। যখন জানল বড় এলাচ সমতলে ভাল দামে বিক্রি হয় তখনও চাড় আসেনি কারো। কিন্তু তারা যখন বুঝতে পারল খচ্চরওয়ালার কাছ থেকে এখানে যেমন জিনিসপত্র কেনা হয় ঠিক তেমনি ওই জিনিস সমতলের মানুষের কাছে বিক্রি করা যায় তখন উৎসাহ বেড়ে গেল। খচ্চরওয়ালারা গত গ্রীষ্মেও এসেছে। তাপল্যাঙের এই পরিবর্তনে তারা আরও চমকিত। গত বছরও অর্থের বিনিময়ে জিনিসপত্র কিনেছে পালদেমরা। পরিকল্পনা কাজে লাগাতে বেশ কিছু আবশ্যকীয় জিনিস পালদেমদের মারফত জানিয়ে খচ্চরওয়ালাদের দিয়ে আনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এবং সেইসঙ্গে এই তথ্যটি পাওয়া গিয়েছে, চ্যাঙথাপু, ফালুট, সান্দাকফু ছাড়িয়ে মানেভঞ্জন পর্যন্ত খবর ছড়িয়েছে—কয়েকজন ডাকাত এই গ্রামে দেদার টাকা ছড়িয়ে লুকিয়ে রয়েছে। গতবার পুলিসের সঙ্গে এখানকার লোকজন যুদ্ধ করেছে বলে একটা শঙ্কা চালু হয়েছে যে পুলিস তার বদলা নেবে।

মজার ব্যাপার, খবরটা পালদেমদের আদৌ বিচলিত করেনি। বরং তারা খচ্চরওয়ালাদের সঙ্গে রসিকতা করেছিল, 'পুলিসদের বলে দিও এবার যখন আসবে তখন জানিয়ে আসে, চোরের মত আসাটা ভাল কথা নয়।'

ব্যাপারটা আনন্দর কাছে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছিল। ইদানীং তাপল্যাঙের মানুষজন এত বেশী আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে যে তাদের সম্পর্কে কোন আড়াল রাখতে চাইছে না। গত গ্রীষ্মেও ওরা তিনজন খচ্চরওয়ালাদের সামনে বের হয়নি। কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে গ্রামবাসীরা খচ্চরওয়ালাদের গ্রামটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল। এখন যৌথগৃহের সংখ্যা বেড়েছে। যারা অসুস্থ তাদের জন্যে আলাদা ঘর তৈরী হয়েছে। যখন বরফ নেই, ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা কম তখন যে যার নিজের ঘরে চলে যায়। সেই ঘরগুলোর চেহারাও পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু খচ্চরওয়ালারা লুব্ধদৃষ্টিতে এদের খামার এবং মুরগীর খাঁচাগুলো দেখেছে। সেই মুহূর্তে বাধা দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না কিন্তু এই খবর যে পাহাড়ে পাহাড়ে বিস্তৃত হবে এ বিষয়ে ওরা নিঃসন্দেহ হয়েছিল।

শরীর এবং সামর্থানুযায়ী কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কাজের জন্যে নির্দিষ্ট মানুষ দায়ী থাকবে। তার কাজ ভাল হলে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যাপারটা তাপল্যাঙের মানুষের কাছে নতুন। ফলে প্রত্যেকেই সচেষ্ট নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করতে। চাষের মাটিতে যারা আটমাস কাজ করছে তারা জঙ্গল থেকে কাঠ আনা ছাড়া অন্য কোন কাজ করবে না। বাকী সময়টা তাদের পুরো বিশ্রাম। মুরগী এবং গরুর প্রতিপালনের জন্যে দুটো দল নির্দিষ্ট হয়েছে। গ্রামের সমস্ত বাড়িঘর রক্ষণাবেক্ষণের এবং নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একটা দলকে। গ্রামের বৃদ্ধাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অসুস্থদের দেখাশোনা করার জন্যে। নিজেকে প্রয়োজনীয় আবিষ্কারের পর মানুষগুলোর উদ্যম বেড়ে যাচ্ছে। যৌথ রান্না এখন হচ্ছে না। বরফের সময় অথবা প্রাকৃতিক দুযোর্গ ছাড়া তিন চারটি পরিবার একত্রিত হয়ে খাবারের ব্যবস্থা করেছে। মেয়েদের ব্যাপারে সমস্ত কর্তৃত্ব জয়িতার। বিনা ওষুধে ফার্স্ট এইড দেওয়া বা অসুস্থকে প্রাথমিক আরাম দেওয়ার প্রক্রিয়াগুলো সে মেয়েদের রপ্ত করাতে পেরেছে। জঙ্গল থেকে বেত কেটে এনে জলে ভিজিয়ে নরম করে এখানকার মেয়েরা নিজস্ব কায়দায় যে ঝুড়ি বানাতে পারত জয়িতা ভেবে ভেবে তার কিছুটা উন্নতি করতে পেরেছে। এক ধরনের বেঁটে মোটা গাছের গুঁড়ি কেটে সমান করে তাই দিয়ে টেবিল তৈরী করার একটা কায়দা বের করতে পেরেছে সে। তাপল্যাঙের মানুষ এই প্রথম টেবিল ব্যবহার করতে শিখল। বেতের জিনিস এবং এই টেবিল সমতলে পাঠাতে পারলে অর্থ আসবেই বলে তার ধারণা।

তিনটি পরিবার এবং একটি মানুষ এই ব্যাপক কর্মকাণ্ড থেকে নিস্পৃহ হয়ে রয়েছে। কাহুনকে নিয়ে এদের দুশ্চিন্তা ছিল। গত গ্রীষ্মের শেষদিকে আরও তিনটি গ্রামের কাহুনরা জমায়েত হয়েছিল এই মন্দিরে। দুদিন ধরে তাদের পুজো চলেছিল। সুদীপের ধারণা ওটা মন্ত্রণা সভা। তৃতীয় দিনে কাহুনের আহ্বানে গ্রামের সব মানুষ জমায়েত হয়েছিল মন্দির প্রাঙ্গণে। সেইসময় কাহুনের এক শিষ্য এসে জানিয়েছিল ওই জমায়েতে যেহেতু এরা তিনজন বাইরের মানুষ এবং তাদের ধর্মদর্শ নিয়ে সন্দেহ আছে তাই ওরা যেন উপস্থিত না হয়। সুদীপ খুব খেপে গিয়েছিল কথাটা শোনামাত্র। কিন্তু আনন্দ তাকে বাধা দিয়েছিল। এখনও পর্যন্ত গ্রামের মানুষ তাদের বিদেশী বলে মনে করে। কাহুনের নির্দেশ তারা জেনেছে কিন্তু কেউ এর প্রতিবাদ করেনি। অতএব এখনই মাথা গরম করে এগিয়ে গেলে বোকামি হবে। শিষ্যটি আরও জানিয়েছিল, যদি তারা কাহুনের কাছে গিয়ে দীক্ষিত হয় তাহলেই ওই সভায় উপস্থিত থাকতে পারে। সুদীপ বলেছিল, 'এ শালা শ্রুড পলিটিসিয়ান। এতকাল চুপচাপ থেকেছে এখন একটা ধান্দা বের করে আমাদের টুপি পরাতে চায়।'

জয়িতা বলেছিল, 'গেলে কেমন হয়?'

সুদীপ মাথা নেড়েছিল, 'ইম্পসিবল! ধর্মটর্মে আমার কোন বিশ্বাস নেই। জন্মেছি হিন্দুর ছেলে হয়ে, শালা আজ পর্যন্ত কোন ধর্মটা করলাম? এসব বুজরুকিতে আমি নেই।'

আনন্দ বলেছিল, 'কথাটা সত্যি কিন্তু মিথ্যেও। আমরা মন্দিরে যাই না, পুজোপার্বণে ফূর্তি করি, হিন্দুধর্মের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু মুশকিল হল কেউ মারা গেলে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে মুখাগ্নি করি। ওখানে কেন যে হিন্দু হয়ে যাই!'

সুদীপ চকিতে মুখ ফিরিয়েছিল, 'তোর এও মনে আছে নিশ্চয়ই আমি মায়ের শ্রাদ্ধ করিনি, মাথার চুল কামাইনি। ওসবে আমি বিশ্বাস করি না। মুখাগ্নি করেছিলাম কারণ মৃতদেহ চিরকাল বাঁচিয়ে রাখা যায় না। দাহ করাটাই সবচেয়ে বেশী সায়েন্টিফিক।'

'দাহ করা আর মুখাগ্নি করা এক নয়। থাক সেকথা। এটা ঠিক আমরা, এখনকার ছেলে মেয়েরা আর বিশেষ কোন ধর্ম-বোধে বিশ্বাসী নই। অন্তত হিন্দুরা তো নয়ই। একটি ক্রিশ্চান কিংবা মুসলমান ছেলেকে যে নিয়মের খাতে শৈশব থেকে এগিয়ে যেতে হয় তা আমাদের জন্যে করা হয়নি। বোধহয় সেই কারণে রাজনীতি আমাদের সহজেই অধিকার করে।' আনন্দ বলেছিল।

জয়িতা বলেছিল, 'আমি কিন্তু এক্ষেত্রে এসব বলছি না। আমি এই গ্রামের মানুষের আস্থা পুরোপুরি পেতে চাই। এখনও পর্যন্ত আমরা বিদেশী, এটা আমার ভাল লাগে না। ধর্ম ব্যাপারে তোদের সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু এখানে আমি একটা সমঝোতা চাই।'

'কিসের সমঝোতা?' সুদীপ চোখ ছোট করেছিল।

'আমি কাহুনের কাছে দীক্ষা নিচ্ছি। চমকে যাস না। ধরে নে এটা একটা ছলনা। জন্মইস্তক যে উত্তরাধিকার সূত্রে আরোপিত ধর্মটাকেই জানল না তার কোন আগ্রহ নেই নতুন নতুন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবার। কিন্তু এই ব্যাপারটা আমাদের একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। নাথিং ইজ আনফেয়ার।' আস্তানার ভেতর ঢুকে গিয়েছিল জয়িতা। তারপর প্যান্ট পালটে তাপল্যাঙের মেয়েদের পোশাক পরে বেরিয়ে এসেছিল। এই পোশাকটা সে ইদানীং প্রায়ই শখ করে পরে। দীর্ঘকাল চুলে হাত না পড়ায়, শহুরে বাতাস শরীরে না লাগায় তার চেহারায় ওই পোশাক পরলে একটা পাহাড়ি আদল এসে যায়। শিষ্যটির সঙ্গে যখন জয়িতা চলে গেল তখন সুদীপ আর একটা সত্য আবিষ্কার করল। সে ধর্মান্ধ নয়। কোন গোঁড়ামি নেই তার। নিজেকে হিন্দু বলে কোন গর্ব করার কারণও খুঁজে পায় না। কিন্তু জয়িতার এই ধর্মবদল করতে যাওয়াটা তার খারাপ লাগছে। কেন? ব্যাপারটা ধরা পড়তেই নিজেকে গালাগাল দিয়ে সে বলে উঠেছিল, 'মানুষের আচরণ অনেক সময় এত ক্রেজি হয়ে যায়!'

আনন্দ কথাটা শুনে মুখ ফিরিয়েছিল, কিন্তু মুখে কিছু বলেনি।

এক বরফের আগে ওরা এখানে এসেছিল। তারপর টানা একটা গ্রীষ্ম এবং দ্বিতীয় বরফের সময় শেষ হল। এইরকম ধর্মসভার আয়োজন কখনও করেনি কাহুন। অন্য গ্রামের কাহুনদেরও দেখা যায়নি। আনন্দদেরও প্রয়োজন পড়েনি ওদের প্রার্থনা বা সভায় যাওয়ার। জয়িতা সাহস দেখাল। কিন্তু তবু আনন্দর মনে অস্বস্তি থেকে গিয়েছিল।
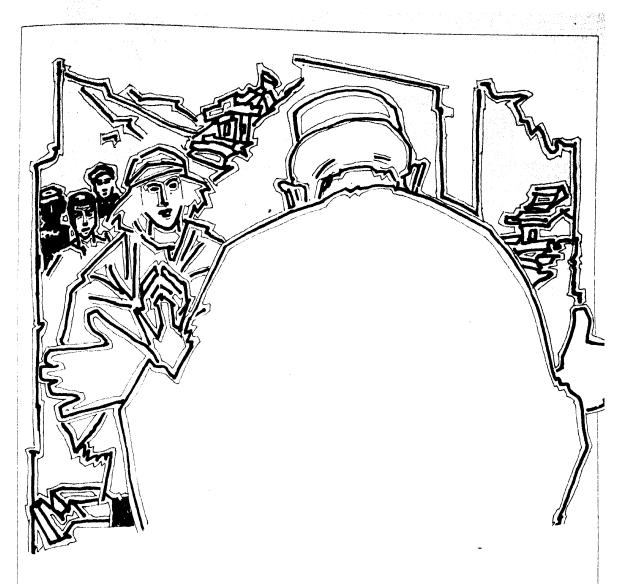
আর কেউ নয় শুধু জয়িতা কাহুনের কাছে দীক্ষা নিতে এসেছে দেখে কাহুন তো বটেই গ্রামসুদ্ধ সবাই অবাক হয়েছিল। এবং সেইসঙ্গে খুশী। সাওদের তো ওকে দেখামাত্র ছুটে এসেছিল। এসে বলেছিল 'তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।' গ্রামের অন্য যুবতীরা ওকে ঘিরে হইচই করে উঠেছিল। সে যখন কাহুনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন কাহুন বলেছিলেন, 'তুমি কি আমাদের মানুষ হতে এসেছ ?'

জয়িতা হেসে বলেছিল, 'আমি, আমরা আপনাদেরই মানুষ। এতদিন একসঙ্গে আছি এবং আমাদের ব্যবহারে নিশ্চয়ই সেটা প্রমাণিত হয়। কিন্তু আপনি যখন চাইছেন তখনই আমি দীক্ষা নিতে পারি।'

কাহুন বললেন, 'রক্ত, ধর্ম এবং মাটি এক না হলে মানুষ অনাত্মীয় থাকে। তোমার সঙ্গীরা কি তোমার সঙ্গে একমত নয় ?' মুখে জবাব না দিয়ে জয়িতা মাথা নেড়ে না বলেছিল।

কাহুন তাঁর দুই সঙ্গীর সঙ্গে বাক্যবিনিময় করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি আগে কখনও দীক্ষা নিয়েছ ?'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'আমাদের ওসব কিছু করতে হয় না। আমি সেই অর্থে খ্রিস্টান, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ কিংবা হিন্দু নই। অতএব আপনি স্বচ্ছন্দে দীক্ষিত করতে পারেন।'

'সেকি ? তুমি কখনও ধর্মাচরণ করনি ?' কাহুন যেন খুব অবাক হলেন। জয়িতা মাথা নাড়তে আবার প্রশ্ন ছিটকে এল, 'জন্মাবার পর তোমাদের কাহুন তোমার কানে ঈশ্বরমন্ত্র শুনিয়ে যাননি ?'

'না।'

কাহুনের মুখে এবার হাসি ফুটল। কিন্তু অন্য দুইজন কাহুন তাকে কিছু বলতে তিনি মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, 'তোমার আগ্রহ আমাদের খুশী করেছে। কিন্তু দীক্ষা নেবার মত উপযুক্ত হয়েছ কিনা তা আমাদের জানা দরকার। তাছাড়া তোমার শরীর এবং আত্মা এখনও ঈশ্বরের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত। আগামী গ্রীষ্ম পর্যন্ত তুমি প্রত্যহ একটি করে ফুল আমার কাছে দিয়ে যাবে। আমি তোমার নাম করে ভগবানের কাছে নিবেদন করব।'

চেষ্টা করে নিজেকে সংবরণ করল জয়িতা। সুদীপ এখানে থাকলে কেসটা জমতো। কিন্তু তার এই বিনীত ভঙ্গী দেখে কাহুন লোকটার চেহারাই যেন পালটে যাচ্ছে। ক্ষমতা মানুষকে চিরকালই অন্য চেহারা দেয়। সে সম্মতি জানাতে সমস্ত গ্রামবাসী একটা খুশীর ধ্বনি উচ্চারণ

করল। কাহুন হাত তুলে তাদের শান্ত হতে বলে আদেশ দিলেন এই অবস্থায় জয়িতা এখানে থাকতে পারে। তবে তাকে আজ থেকে সবাই দ্রিমিত বলে ডাকতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র দ্রিমিত দ্রিমিত উচ্চারিত হল। মজা লাগছিল জয়িতার। অ্যাপ্রেন্টিস থাকাকালীন নামকরণ হয়ে গেল! কিন্তু সে লক্ষ্য করল চেনা মুখগুলোয় কেমন একটা নরম ছাপ এসেছে। ওরা যখন তাকে দেখছে তখন সেই দূরত্বটা যেন নেই।

পর্ব চুকলে কাহুন কিছুক্ষণ তাঁর নিজস্ব ভাষায় মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। শিষ্যরা বাজনা বাজাল। গ্রামের বৃদ্ধরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। বেশ একটা ধর্মধর্ম ভাল ফুটে উঠল। জয়িতার মনে হল হিন্দু-বৌদ্ধ পদ্ধতির একটা শঙ্কর রূপ এই উপাসনা।

এসব চুকে যাওয়ার পর কাহুন কথা শুরু করলেন, 'ভগবান আমাদের পাঠিয়েছেন এই মাটিতে। তিনি আমাদের জন্যে মাটি দিয়েছেন, গাছ দিয়েছেন। আমাদের সহ্যশক্তি বাড়াবার জন্যে যেমন বরফ এবং বৃষ্টি দিয়েছেন তেমন রোদও তাঁর সৃষ্টি। যুগ যুগান্তর থেকে আমরা এইভাবেই আছি তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে। ওই যে পাহাড় যার মাথায় প্রতিদিন ঈশ্বরের পায়ের চিহ্ন পড়ে সে আমাদের আড়াল করে থাকে কারণ ওই পাহাড়ের ওপারে রয়েছে অনন্ত বরফ এবং ঠাণ্ডা হাওয়া। কিন্তু আমরাই হলাম ভগবানের প্রথম সন্তান।' এই কথাটা বলামাত্র পিছনে বসে থাকা দুজন অন্য গ্রামের কাহুন কিছু বললেন চাপা গলায়। সেদিকে একবার তাকিয়ে তাপল্যাঙের কাহুন তড়িঘড়ি বললেন, 'এই আমরা কারা? আমরা বলতে আমি পাহাড়ের সমস্ত মানুষকেই বোঝাচ্ছি যারা বরফে কষ্ট পায়, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে যারা বেঁচে থাকে।' বলে আবার অন্য কাহুনদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন দুবার।

'আমাদের উচিত আমাদের মত বেঁচে থাকা। ইয়াক যদি মুরগীর মত বাঁচতে চায় তাহলে কি সেটা তাকে মানায়? মানায় না। অনেকদিন হল আমাদের গ্রামে চারজন বিদেশী এসেছিল। এরা, তোমরা একটু আগেই শুনলে ভগবানের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। এই মানুষরা নিজেদের স্বার্থে তোমাদের সাহায্য করছে। কিন্তু এদের সাহায্য আমরা কদিন নেব? এরা কেউ ভগবানের সন্তান নয়। আমাদের ধর্ম, আমাদের রক্ত আমাদের মাটির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই!' এই অবধি বলে কাহুন চুপ করলেন। জয়িতা চমকে উঠেছিল। এতদিন চুপচাপ থেকে আজ এমন কি কারণ ঘটল যাতে কাহুন প্রকাশ্যে তাদের বিরোধিতায় নামলেন? কিন্তু গ্রামবাসীরা চুপচাপ কেন? পালদেম, লা-ছিরিঙ, সাওদের? ঠিক এইসময় একটি কণ্ঠ ভেসে এল, 'দ্রিমিত!' সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা চিৎকার করল, 'দ্রিমিত, দ্রিমিত, দ্রিমিত।'

'হ্যাঁ দ্রিমিত। কিন্তু মনে রাখতে হবে দ্রিমিত এখনও পরীক্ষিত হয়নি। এই অবস্থায় আমার বন্ধুরা, এই দুই কাহুন আমার কাছে এসেছেন। আমাদের গ্রামে যেসব কাণ্ড হচ্ছে তার খবর ওঁদের গ্রামেও পৌঁছেছে। এই যে আমরা সাময়িক খেতে পাচ্ছি, বরফে গতবার কম কষ্ট পেয়েছি তা ওদের গ্রামের সরল মানুষদের প্রলুব্ধ করছে। কিন্তু আমরা জানি হাতের পাঁচটা আঙুল সমান হয় না। আজ খিদের তাগিদে কিংবা নতুন একটা ঝোঁকে তাপল্যাঙের মানুষেরা একসঙ্গে বিদেশীদের নির্দেশে কাজ করছে। কিন্তু আগামী কালই যে একটা পরিবারের মনে হবে না ও আমার চেয়ে বেশী পাচ্ছে, যার জমি নেই সে আমার জমি থেকে পেট ভরাচ্ছে তা কে বলতে পারে? আর তখন নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে যাবে। আর তাছাড়া এই বিদেশীরা বেশীদিন আমাদের মধ্যে থাকবে না, তখন কি হবে? আমরা জানি একজন বিদেশী এর মধ্যেই মারা গিয়েছে পুলিসের গুলিতে। পুলিস একবার এখানে এসেছিল এদের খোঁজে। আমার কাহুনবন্ধুরা বলছেন পাহাড়ে পাহাড়ে বিচিত্রসব মানুষ আসাযাওয়া করছে এদের খবর নেবার জন্যে। সেবার পাশের গ্রামের মানুষ পুলিসকে নাজেহাল করে অন্যায় করেছে। তখন ওরা তৈরী হয়ে আসেনি। কিন্তু আবার যদি পুলিস এই গ্রামে আসে তাহলে বিদেশীদের নিস্তার নেই। শুধু তাই নয়, তারা তোমাদেরও ছেড়ে দেবে না।'

জয়িতা আর পারল না। সে এক পা এগিয়ে যেতেই কাহুন তাকালেন। জয়িতা গ্রামবাসীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে চিৎকার করল, 'কাহুন যা বলছেন সেটা তাঁর বিশ্বাসে সত্যি। কিন্তু একটা কথা জেনো, পুলিস এখানে এলে আমরা এমন কিছু করব না যাতে তোমাদের ক্ষতি হবে। ধর্ম, রক্ত এবং মাটির কথা উনি বলছেন। কিন্তু ভালবাসার কথা তো উনি বলেননি! আমাদের যে বন্ধু পুলিসের গুলিতে মারা গিয়েছে সে তো দিব্যি বেঁচে থাকত আমাদের মত যদি তোমাদের ভালবেসে দার্জিলিং থেকে ওষুধ না আনতে যেত। আমাকে এই গ্রামের প্রতিটি মা বোন বন্ধু বলেছে যে আমরা আসার আগে তারা ভাবতে পারত না এইভাবে বাঁচতে পারা যায়। যে পরিশ্রম এবং কষ্ট তোমরা করেছ তার মূল্য সবে পেতে শুরু করেছ। পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যার লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখের খাবার কেড়ে নিয়ে কয়েকটা পরিবার আনন্দ করে থাকে। কিন্তু আমি এখনও বিশ্বাস করি যে কাহুন তাদের দলে পড়েন না। তাঁর বন্ধুরা বিচলিত হয়ে ছুটে এসে অনুরোধ করায় তিনি এইসব কথা বলছেন। আমরা এতদিন এখানে রয়েছি কিন্তু কখনও কাহুনকে অসম্মান করিনি। আমরা এও বলিনি তাঁর ইয়াকের দুধ সবাইকে দিতে হবে। কারণ তিনি শুধু তোমাদের ধর্ম এবং ঈশ্বর নিয়েই এতকাল ছিলেন। মনে হয়, অন্য দুজন কাহুনের অন্য ক্ষমতা আছে। গ্রামের লোকরা যদি তাদের বিরুদ্ধে যায় সেই ভয়ে ওঁরা ছুটে এসেছেন। তাপল্যাঙের সহায়সম্বলহীন মানুষ যেমন সুস্থভাবে বাঁচবে ঠিক তেমনি সমস্ত পাহাড়ি গ্রাম, সমতলের নিঃস্বমানুষের সেই একই ভাবে বাঁচবার অধিকার আছে। বিরোধিতা করে নয়, কাহুনরা যদি সহযোগিতা করেন তাহলে তাঁরাই উপকৃত হবেন। আর হ্যাঁ, আমরা আপনাদের কছে আশ্রয় পেয়েছিলাম। আপনাদের গ্রামের সামাজিক আইনের মর্যাদা আমরা সবসময় মেনে চলেছি। চলব। এবং বাধ্য না হলে কেউ এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাব না। কখনও না। আমরা একই সঙ্গে থাকব। একজন বাইরের লোক চিরকালই বিদেশী থাকতে পারে না।'

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার আরম্ভ হল। চিৎকার উল্লাসের। সেই সঙ্গে দ্রিমিত দ্রিমিত ডাক। উল্লসিত মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে তাপল্যাঙের কাহুন বসে পড়লে অন্য গ্রামের কাহুন দুজন উঠে দাঁড়ালেন। তাঁদের অত্যন্ত অপমানিত এবং ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছিল। উত্তেজিত ভঙ্গীতে তাঁরা কিছু কথা তাপল্যাঙের কাহুনকে বলে সদলবলে চলে গেলেন দুভাগ হওয়া জনতার মধ্যে দিয়ে। জয়িতা দেখল এর কোন প্রতিক্রিয়া হল না সাধারণ মানুষের মধ্যে। শুধু যে তিনটে পরিবার জনতা থেকে আলাদা হয়ে কাহুনের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল তারা ভীত হল। এবং উল্লাসের সুযোগে কখন যে তারা জনতার সঙ্গে মিশে গেল তা বোঝা গেল না। এইসময় সাওদের ছুটে এল জয়িতার সামনে। তার হাতে সদ্য ছেঁড়া একটা ফুল। হাসি হাসি মুখে সেটি এগিয়ে ধরল সে, 'দ্রিমিত, নাও।' ফুলটা নিয়েছিল জয়িতা। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়েছিল কাহুনের সামনে। সসম্ভ্রমে বলেছিল, 'আমার হয়ে ভগবানকে দিয়ে দেবেন কাহুন।'

বিধ্বস্ত মানুষটার মুখে প্রচণ্ড বিস্ময়। যেন তাঁর হিসাব মিলছিল না। তিনি কাঁপা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

দুবার বরফ গলে গেল। একটি পুরো গ্রীষ্ম যেমন এই গ্রামের অনেক পরিবর্তন এনেছে তেমনি সম্পর্কেরও। আস্তানার আয়তন বেড়েছে। একটির বদলে তিনটি ঘর তৈরী হয়েছে। কথা ছিল খাওয়াদাওয়া একসঙ্গে হবে এবং ওরা তিনজন তিনটি ঘরে থাকবে। মেয়েটির স্বভাবতই জয়িতার সঙ্গে থাকার কথা। কিন্তু প্রথম রাত্রেই সে বিদ্রোহ করে বসল। সুদীপকে ছেড়ে সে কিছুতেই থাকবে না। আনন্দ এবং জয়িতার কাছে ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু ঠেকলেও তার ওসব কিছুই মনে হচ্ছে না। সে মুখের ওপর পালদেম, লা-ছিরিঙ এবং সাওদেরকে বলল, 'আমাকে কেউ কখনও ভালবাসেনি। আমিও কাউকে ভালবাসিনি। কিন্তু এই মানুষটাকে আমি যখন ভালবেসে মুখে কথা ফিরিয়ে দিয়েছি তখন কেন ওকে ছেড়ে থাকব? ও আমার মনের মত মানুষ, ওর সঙ্গে না থাকতে দিলে আমি মরে যাব। ব্যাস।'

জয়িতার মনে হয়েছিল পাঁচ বছরের মেয়ে চকোলেট আবদারে গলায় কথা বলছে এবং এর উত্তর হল ঠাস করে নরম গালে চড় কসানো। কিন্তু পালদেম অন্যকথা বলল। সে জিজ্ঞাসা করল সুদীপকে, 'এই মেয়েটার কপাল সত্যি খারাপ। ও তোমার সঙ্গে থাকতে চাইছে, তুমি কি করবে?'

সুদীপ কাঁধ নাচিয়েছিল। তারপর বাংলায় বলেছিল, 'আমি শালগ্রাম শিলা. শোওয়াবসা যার সকলি সমান তারে নিয়ে রাসলীলা। বহুৎ ধুর হয়ে

গেছি এখন।'

জয়িতা অবাক হয়ে গিয়েছিল। সুদীপের মত শাণিত ছেলে এসব কি বলছে! কিন্তু তখন আনন্দ জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ওরা একসঙ্গে থাকবে, এতে তোমাদের আপত্তি নেই?'

পালদেম বলেছিল, 'এখন তোমরা আমাদের বন্ধু। ও তো তোমাদের তিনজনের সঙ্গে এখানে এতকাল ছিলই। তবে যদি ও মা হয় তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'সর্বনাশ হবে কেন?' জয়িতা প্রশ্নটা করেছিল, 'ওরা বিয়ে করবে তখন।'

'আজ পর্যন্ত আমাদের গ্রামের কোন মেয়ের বাইরের লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়নি।'

পালদেমের কথাটা শুনে সুদীপ বলেছিল, 'স্টে টুগেদার, নো বিয়ে, নো বাচ্চা। গুড। কিন্তু ব্রাদার, এতদিনেও যদি আমরা বিদেশী তাহলে আর জবাব নেই।' কথাগুলোকে বাংলা-ইংরেজি মিশিয়ে বলায় পালদেমরা বুঝতে পারেনি। কিন্তু সুদীপের কথায় যে ঝাঁঝ ছিল তা টের পাওয়া গেল। এবং সেই থেকে মেয়েটি সুদীপের ঘরে। জয়িতা লক্ষ্য করছিল মেয়েটি মোটা হচ্ছে। মুখচোখে একটা লালিত্য ফুটছে। এত পরিশ্রম করে এত কম খেয়েও এইরকম উন্নতি হয় কি করে সে জানে না। এবং আলাদা থাকার ফলে ওর ব্যবহারেও পরিবর্তন এসেছে। যেন নিজেরটা আলাদা করে ভাবার প্রবণতা এসেছে। অথচ সুদীপের কোন বিকার নেই। সে যেমন ছিল তেমনি আছে। আর এই ব্যাপারটা নিয়ে কেন কেউ জানে না, ওরা কোন কথা তোলে না আর।

ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছিল না সুদীপের। এখনও ঘরে অন্ধকার পাতলা হয়ে ঝুলে রয়েছে। একটা বাসী গন্ধ পাক খাচ্ছে। একটু আগে মেয়েটাকে উঠে যেতে দেখেছে সে। সে যে দেখছে তা অবশ্য বুঝতে দেয়নি। বুঝলেই কথা বলত মেয়েটা। বড্ড কথা বলে। ওকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কেন সে জোর করে সুদীপের সঙ্গে থাকছে তাহলে যে উত্তর দেবে তাতে অনায়াসে একটা রাত কাটিয়ে দেওয়া যায়। ও এত বিশ্বস্ত এবং সবসময় এমন আঠার মত লেগে থাকে যে মাঝে মাঝে বিরক্তি আসে, বলেওছে কিন্তু কমলী ছাড়বার পাত্র নয়।

আরও খানিকটা সময় আলসেমির পর সুদীপ উঠল। এখন এখানে মোটামুটি একটা বাথরুম-টয়লেটের ব্যবস্থা করে নেওয়া হয়েছে। বাইরের ঘোলাটে আকাশ দেখে ওর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সারাটা দিন আজ সন্ধে সন্ধে হয়ে থাকবে। সুদীপের প্রায়ই মনে হয় একটা জেনারেটার আনলে কেমন হয়? শিলিগুড়ি থেকে বস্তুটা কিনে যদি কোনমতে এখানে আনা যেত তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান হত। কিন্তু জেনারেটারের রসদ এখানে নিয়মিত পাওয়ার কথা ভাবাই যায় না। কথাটা শুনলে জয়িতা ঠাট্টা করত। জয়িতার কথা মনে হতেই ও অন্যমনস্ক হল। আজকাল জয়িতা আর মোটেই প্যান্ট পরে না। বস্তুত ওদের জামাপ্যান্টগুলো দুর্দশার শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। নতুন সার্ট প্যান্ট অবিলম্বে কেনা দরকার। জয়িতা এখানকার পোশাকে লা-ছিরিঙ আর সাওদেরদের সঙ্গেই বেশীক্ষণ সময় কাটায়। আগের মত আর সুদীপের সঙ্গে আড্ডা মারতে পারে না। সুদীপ বুঝতে পারে না সে তাকে ঘৃণা করে কিনা। মেয়েটির সঙ্গে একত্রে থাকা যদি অপছন্দের ছিল তাহলে স্বচ্ছন্দে বলে দিতে পারত।

পরিষ্কার হয়ে বাইরে পা বাড়াল ও। খানিকটা হাঁটতেই আনন্দকে দেখতে পেল। পাশে জয়িতা। সামনে অন্তত জনাদশেক ছেলেমেয়ে। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে পালদেম। সুদীপের খিদে পাচ্ছিল। এখন এখানে তিনবার খাবার হয়। চা সিগারেট বা জলখাবারের অভ্যেস অনেক দিন দূর হয়ে গেছে। প্রথম দুটো ছাড়া জীবন কাটানোর কথা একসময় কল্পনা করা যেত না অথচ এখন স্বচ্ছন্দে সেটা মেনে নিচ্ছে সে। একেই হয়তো বলে অভ্যেসের দাসত্ব করা।

আনন্দ সুদীপকে দেখে হাসল, 'আমরা রেডি।'

সুদীপ দেখল গোটা সাতেক এলাচের বোঝা তৈরী হয়েছে। মুরগী অন্তত পঞ্চাশটা। বেতের ঝাঁকায় ডিম। এই বোঝা নিয়ে মানুষজন তৈরী। ওরা যাবে সুকিয়াপোকরি বাজারে। চ্যাঙথাপু কিংবা ওয়ালাংচুঙে এলাচ বিক্রী হবে না। সেটা ফালুট সান্দাকফুতেও বিকোবে না। সুকিয়াপোকরির বাজার বেশ বড়। নানা জায়গার ব্যাপারীরা আসে সেখানে। সওদা নিয়ে যেতে হবে সেখানে। প্রতি সপ্তাহে এলাচ কেনার মত পাইকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। মুরগী, ডিম কেনার লোকের অভাব কখনও হবে না। পালদেমকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছে আনন্দ। গ্রামের প্রতিটি মানুষ উত্তেজিত। এই প্রথম তাপল্যাঙ থেকে কোন জিনিস বাইরে বিক্রির জন্যে যাচ্ছে। এইসব বিক্রি হলে যে টাকা আসবে তা ভেবে সবাই রোমাঞ্চিত।

হঠাৎ সুদীপ ঘোষণা করল, 'আমি পালদেমের সঙ্গে যাব।'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'ইম্পসিবল। তুই চ্যাঙথাপুতে পৌঁছানোমাত্র খবর চাউর হয়ে যাবে। পুলিস তোকে ধরলে এদের ছেড়ে দেবে না। ব্যস, সারা জীবনের মত পরিকল্পনা ডকে উঠবে।'

সুদীপ স্পষ্টত বিরক্ত হল, 'দূর! এইভাবে এখানে বন্দী হয়ে থাকা যায়? পাইকাররা এদের ঠকাবে। এরা সভ্য মানুষের হালচাল কিছুই জানেনা। সবাই লুটেপুটে নেবে।'

'প্রথমবার নিতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞতা মানুষকে অভিজ্ঞ করে। এর পরের বার ওরা যখন যাবে তখন আর ভুলের পুনরাবৃত্তি করবে না।' আনন্দ ঠাণ্ডা গলায় বলল।

এতক্ষণ পালদেম চুপচাপ শুনছিল। এবার সে সুদীপকে বলল, 'তুমি সঙ্গে যেতে চাইছ কেন?'

সুদীপ মাথা নাড়ল, 'আর বলে লাভ কি হবে। যাও ঠকে এসো। ঠকে শেখো।'

পালদেম হাসল, 'ঠকলে ক্ষতি নেই যদি তা থেকে কিছু শেখা যায়। মুশকিল হল এই এলাচের দাম কত তা তো আমরা জানি না, তোমরাও না। ওরা যা বলবে তাই মানতে হবে।'

সুদীপ হকচকিয়ে গেল। জয়িতা তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। পালদেমের কথাটা মিথ্যে নয়। সে সত্যি জানে না এলাচ কি দরে বিক্রি হয়! এমনকি ডিম অথবা মুরগীর বিক্রয়মূল্য তার জানা নেই। কিন্তু সে এগুলো যে শহরে কায়দায় জেনে নিতে পারে তা পালদেম পারবে না। কিন্তু কথাটা বলল না সে। কারণ তাহলে বলতে হয়, পালদেম, তোমাদের চেয়ে আমরা শহরের মানুষরা অনেক বেশী ধূর্ত।

মালপত্র মাথায় চাপানো হল। বাঁশের দুপ্রান্তে ঝুলিয়ে নেওয়া হল। এই সপ্তাহে বিক্রির টাকায় কোন জিনিস কিনবে না এরা। যেতে আসতে অন্তত দিন পাঁচেক সময় ব্যয় হবে। এবং পরের সপ্তাহের জন্যে খদ্দের তৈরী করে আসবে এরা। তখন ফেরার সময় গ্রামের মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা হবে। পুলিস কিংবা সাধারণ মানুষ যদি তাদের কথা জিজ্ঞাসা করে তাহলে বলবে অনেককাল আগেই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য হলেও হতে পারে কারণ খচ্চরওয়ালারা পর্যন্ত ওদের দেখতে পায়নি। সুদীপের খুব ইচ্ছে করছিল পালদেমকে সিগারেট এবং চা পাতার জন্যে টাকা দিতে। কিন্তু কিছু কেনা এ যাত্রায় হবে না, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যেতে চাইল না সে। তাছাড়া ওরা চা পাতা এবং সিগারেট কিনতে দোকানে গেলে সন্দেহ বাড়বেই।

সম্মিলিত আনন্দধ্বনির মধ্যে পালদেমরা যাত্রা শুরু করল। গ্রামের বাইরে দীর্ঘপথ পাড়ি দিচ্ছে এরা। এই গ্রামের ইতিহাসে কখনও হয়নি। তাপল্যাঙের মানুষরা এখনও শঙ্কা এবং খুশীতে দুলছে। ওরা সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল। গ্রামের শেষপ্রান্তে এইসময় কয়েকটা মানুষকে দেখা গেল। এরা একটু থমকে দাঁড়িয়ে আবার চলা শুরু করল। রোলেন এবং তার গ্রামের চারজন এই যাত্রা দেখতে এসেছে। জয়িতা এগিয়ে গেল রোলেনদের কাছে।

সুদীপ এবং আনন্দ দুটো দৃশ্য দেখছিল। পালদেমরা যাচ্ছে এবং জয়িতা রোলেনদের সঙ্গে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গীতে হেসে হেসে কথা বলছে। সুদীপের অস্বস্তি হচ্ছিল। সেইসময় শেষবারের মত হাত তুলে পালদেমরা পাহাড়ের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

তাপল্যাঙের সমস্ত মানুষকে স্বনির্ভর করতে প্রথম দলটি বাণিজ্যে বের হল। [ক্রমশ]

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

পূর্ব-পশ্চিম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যৌবন-৩৩

টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর কাছে সন্ধেবেলা একলা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন প্রতাপ। সিগারেট টানছেন আপন মনে, চোখের দৃষ্টি ভাসা ভাসা। এক এক সময় মানুষ কোনো একটা জায়গায় যাওয়ার কার্য-কারণ ভুলে যায়, নিজেই যায় কিন্তু নিজেকেই প্রশ্ন করে, কেন এলাম? সেই সময় তার মুখের চেহারাও হয় অন্যরকম।

আদালত থেকে প্রতাপ কিছু জরুরি কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন, বাড়ি ফেরারই কথা ছিল, হঠাৎ কেন যেন তাঁর ভাবান্তর হলো, আর্দালির হাতে ফাইল পত্তর দিয়ে বললেন, কাল সকালে এগুলো আমার বাড়িতে নিয়ে আসিস। তারপর তিনি চড়ে বসেছিলেন একটি বিপরীতমুখী বাসে। দু'বার যানবাহন বদল করে প্রতাপ এ পর্যন্ত এসেছেন। কিন্তু কেন এসেছেন?

উত্তরটা প্রতাপ জানেন। কিন্তু নিজের কাছেও সেটা স্বীকার করতে চান না। অনেক রকম মানসিক প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত একটা টানেই প্রতাপকে হঠাৎ এতদূর আসতে হয়েছে এবং সেই প্রক্রিয়া বেশ জটিল।

সাদা রঙের প্যান্ট শার্টের ওপর প্রতাপ একটা পাতলা নীল সোয়েটার পরে আছেন, পায়ে শু-মোজা। অন্যদিন প্রতাপ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফিরে এই সব বদলে, স্নান সেরে, লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরার জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকেন। তাঁর মাথাটি কদম ফুলের মতন, মাতৃশ্রাদ্ধের পর এখনো ভালো করে চুল গজায়নি। বয়েস হয়ে গেলে চুল গজাতে দেরি লাগে।

দেওঘরে মায়ের মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই প্রতাপ আর একটি নিদারুণ মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিলেন। মৃত্যু নয়, আত্মহত্যা, দিল্লিতে সুলেখা শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে, নিজের রূপ নিজে নষ্ট করে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে।

সে সংবাদে প্রতাপ দারুণ আঘাত পেলেও তার প্রতিক্রিয়া যেন খুব গভীরে প্রবেশ করেনি। মায়ের মৃত্যুতে প্রতাপ তখন খুবই আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন। তখন দিল্লিতে গিয়ে ত্রিদিবের পাশে দাঁড়ানোও সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। কী কারণে, কিসের দুঃখে, কোন্ যন্ত্রণায় সুলেখা এমন একটা সাঙ্ঘাতিক সিদ্ধান্ত নিল তাও তিনি জানেন না।

মাসখানেক আগে ত্রিদিব এসেছিলেন কলকাতায়, তাঁর সঙ্গেও কথা হলো না ভালো করে। প্রতাপ আশঙ্কা করেছিলেন ত্রিদিবের মতন সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ এত বড় আঘাত সামলাতে পারবেন না, ভেঙে পড়বেন একেবারে। কিন্তু ত্রিদিবকে দেখে প্রতাপ একেবারে অবাক। এ যেন একজন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত মানুষ, সেই লাজুক, ধীর স্থির ভাবটি একেবারেই নেই। কাটা কাটা পরিষ্কার কথা, শোকের সামান্য চিহ্নও নেই মুখের ভাবে, ভুরু দুটি কোঁচকানো, যেন সুলেখা এ রকম একটা নাটকীয় কাজ করে ফেলায় তিনি অত্যন্ত বিরক্ত।

সুলেখার সেই চরম দিনের ঘটনা নিয়ে কোনো আলোচনাই করলেন না ত্রিদিব, তিনি কলকাতায় এসেছিলেন একটা অদ্ভুত প্রস্তাব নিয়ে। তালতলার বাড়িটি তিনি বিক্রি করে দিতে চান, প্রতাপ কিনে নিতে রাজি থাকলে তিনি যে-কোনো দামে দিয়ে দিতে রাজি, এমনকি প্রতাপ পুরো টাকা এখন দিতে না পারলেও চলবে। ত্রিদিব লন্ডনে একটা চাকরি পেয়েছেন, আগে থেকেই অফার ছিল, এখন সেখানে যাওয়ার সব বন্দোবস্ত পাকা করতেই তিনি যেন খুব ব্যস্ত।

স্বপ্নেও বিলাসিতা করে প্রতাপ বাড়ি কেনার কথা ভাবতে পারেন না। সরকার তাঁকে এমন মাইনে দেন না যাতে সংসার খরচ চালাবার পরও কিছু সাশ্রয় করা যাবে। দুই ছেলে-মেয়ের পড়ার খরচ, তুতুলের ডাক্তারি পড়ার খরচ, এই সবে প্রতাপ একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছেন। আগেকার চক্ষুলজ্জা আর নেই, সুপ্রীতি গয়না বিক্রির প্রস্তাব দিলে তিনি এখন আর অরাজি হন না। তবে, সুপ্রীতির গয়নাই বা আর ক'খানা অবশিষ্ট আছে? বিমানবিহারীর কাছেও প্রতাপের অনেক ঋণ জমে গেছে।

খুব তাড়াহুড়ো করে, প্রায় জলের দরেই বাড়িটি এক মাড়োয়ারির কাছে বিক্রি করে দিলেন ত্রিদিব। তারপর সেই টাকার কিছু অংশ তিনি দিতে চাইলেন তাঁর দুই বোনকে। সে কথা শোনা মাত্র প্রতাপ বললেন, এ প্রশ্নই ওঠে না। বাড়ির মালিক একা আপনি, আপনার বাবা আপনার নামে উইল করে দিয়ে গিয়েছিলেন, আপনার বোনদের কোনো রকম লিগ্যাল রাইট নেই....

প্রতাপের কথা মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ত্রিদিব বলেছিলেন, আপনি আমাকে ল দেখাচ্ছেন কেন, টাকাটা তো আপনাকে দিচ্ছি না, দিচ্ছি আমার বোনেদের।

মমতাও সে টাকা প্রত্যাখ্যান করলেন। মমতা খুব ভালো ভাবেই জানেন, এখন তাঁর হাতে পাঁচ-দশ হাজার টাকা এলেও তা সংসারের কত প্রয়োজনে লাগবে, কিন্তু পাছে অভাবের তাড়নায় লোভের একটা নগ্ন রূপ বেরিয়ে পড়ে এবং পরে তার জন্য আত্মগ্লানিতে ভুগতে হয়, সেই জন্যই তিনি তাড়াতাড়ি না বলে দিলেন। তাঁর বোন বিনতারও সেই এক কথা। বিনতার স্বামী সুকেশের বদলির চাকরি, এখন ওরা রয়েছে কোচিন শহরে, তাদের অবস্থাও ভালো। ত্রিদিবের চিঠি পেয়ে বিনতা জানালো যে দিদি যা ঠিক করবে সে তাই-ই মেনে নেবে, তার স্বামীও প্রতাপদার সঙ্গে একমত যে ঐ বাড়ির ওপর তাদের কোনো দাবি নেই।

ত্রিদিব যেন বেশ ক্ষুণ্ণ হলেন বোনেদের এই ব্যবহারে। মমতাদের বাড়িতে তাঁর একদিন খেতে আসার কথা, সেদিন এলেন না। দু'দিন পরে এলেন, গম্ভীর হয়ে রইলেন আগাগোড়া। সুপ্রীতি সুলেখার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি এড়িয়ে গেলেন, 'কী জানি কী হয়েছিল' বলে! এক সময় তিনি শুধু প্রতাপকে বলেছিলেন, আমার বন্ধু শাজাহানকে পুলিসে আটকে রেখেছে জানেন তো? পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ তো মিটে গেছে, এখনও ওদের ছাড়ে না কেন? আপনি একটু দেখুন না, চেষ্টা চরিত্র করে শাজাহানকে ছাড়াতে পারেন কি না!

প্রতাপ শুকনো ভাবে হেসে বলেছিলেন, আমি সামান্য সাব জজ। আমার কী ক্ষমতা আছে? ওসব তো স্টেট গভর্নমেন্ট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ব্যাপার!

ত্রিদিব দেওয়ালের উঁচুর দিকে চোখ তুলে বলেছিলেন, যাওয়ার আগে শাজাহানের সঙ্গে দেখা হলো না!

ত্রিদিব সব সম্পর্ক চুকিয়ে চলেই গেলেন শেষ পর্যন্ত। বিলেতের গ্লাসগো শহর থেকে সংক্ষিপ্ত দু'লাইনের পৌঁছ-সংবাদ পাঠিয়েছেন।

প্রবাসী ত্রিদিবের সেই চিঠিখানা হাতে নেবার পরেই প্রতাপের চোখে প্রথম ভেসে উঠলো ছবিটা। প্রজ্বলন্ত সুলেখা, ঘরের মধ্যে নয়, বাড়ির ছাদে, সেই বাড়ি যেন কুতুব মিনার সংলগ্ন, চার পাশে ইতিহাসের সাক্ষ্য, অন্ধকার আকাশের নিচে সুলেখা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, তার সর্বাঙ্গে লকলকে আগুনের শিখা। রূপের আগুন নয়, সত্যিকারের আগুন, যা মায়া দয়াহীন, যা তীব্র যন্ত্রণা দিয়ে শরীরের মাংস-মজ্জা পোড়ায়! কেন সুলেখা চলে গেল অমনভাবে, কার ওপর অভিমানে? এইটুকু জেনেছেন প্রতাপ যে সুলেখার অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য ত্রিদিবকে পুলিসের হাঙ্গামায় পড়তে হয়নি, সুলেখা নিজের হাতে আত্মহত্যার স্বীকারোক্তি লিখে গিয়েছিল, সে কারুকে দায়ী করেনি।

ঐ ছবিটা কল্পনা করেই প্রতাপের বুকটা মুচড়ে মুচড়ে উঠেছিল। অসহ্য এক ব্যথা, ঠিক যেন শরীরিক, বুকের ব্যথা। যেন সহ্য করা যাবে না। সুলেখা সত্যিই চলে গেল, আর তার সঙ্গে কোনো দিন দেখা হবে না? সুলেখার সঙ্গে তাঁর প্রেম-ভালোবাসা ছিল না। আবার শুধু আত্মীয়তাও নয়, একটা অন্য সম্পর্ক, চোখে চোখে কিছু একটা কথা, কোনোদিন সুলেখার শরীর ছুঁতে হয়নি প্রতাপকে, তবু সুলেখা ঠিকই জানতো! তালতলার বাড়িতে এখন অন্য লোক থাকে। ত্রিদিব তাড়াহুড়ো করে চলে গেল ইংল্যান্ডে, সুলেখার সব চিহ্নও কি মুছে গেল তা হলে?

কয়েকটা দিন সুলেখার স্মৃতিতে বিভোর হয়ে রইলেন প্রতাপ। সুলেখার দু'একটা টুকরো কথা, নিষ্কলুষ হাসি, তার যত্নময় হাত, এই সব কিছুই যেন এখনো জীবন্ত। সুলেখা দিল্লিতে ছিল, অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি, তবু প্রতাপ কোনো অভাব বোধ করেননি, এ পৃথিবীর কোনো একটা প্রান্তে সুলেখার থাকাটাই যথেষ্ট ছিল। এই পৃথিবী তাকে সহ্য করতে পারলো না? গড়-মানুষের চেয়ে যারা অনেক উঁচুতে, যাদের রূপ-গুণ-ব্যবহার অন্য অনেকের চেয়ে অনেক বেশি মনোমুগ্ধকর, তাদেরই কেন অকালে চলে যেতে হয়? যেমন তাঁর ছেলে পিকলু? রাস্তায় ঘাটে অনেক ছেলেকেই তো দেখেন প্রতাপ, কিন্তু পিকলুর মতন অমন নম্র, ভদ্র, প্রতিভার দীপ্তিতে উজ্জ্বল একজনকেও তো মনে হয় না। নিজের ছেলে বলেই কি তিনি বাড়িয়ে ভাবছেন? পিকলুকে সবাই ভালোবাসতো, এখনো তো কেউ কেউ পিকলুর নাম উঠলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তাঁর ছোট ছেলে বাবলুও তো

পিকলুর তুলনায় কিছুই না। সামান্য জলে ডুবে ওরকম একটা প্রাণ নষ্ট হয়ে গেল, প্রকৃতির কি কোনো যুক্তিবোধ নেই?

সুলেখার মৃত্যুর তিন মাস বাদে সুলেখার শোকে এমন আহত হলেন প্রতাপ, তা যেন মাতৃশোকের চেয়েও বেশি। মায়ের জন্য নয়, মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মালখানগরের বাড়ি, প্রতাপের বাল্য-কৈশোর-যৌবনের বহু স্মৃতির সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়ে গেল। সেইজন্যই প্রতাপ যেন বেশি মোহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। মায়ের যথেষ্ট বয়েস হয়েছিল, মা চলে যাবেন, এজন্য কি প্রতাপ মনে মনে কিছুটা তৈরি হয়ে ছিলেন না? বিশেষত আগেরবার ওস্তাদজীর পাগলামি আর মায়ের স্তব্ধ, জড় ভাব দেখেই কি তাঁর মনে হয়নি যে আর বেশিদিনদেরি নেই? আর দু'চার বছর বাঁচলেও মা কি আর আনন্দ পেতেন, প্রতাপই বা কী দিতে পারতেন মাকে? মৃত্যুর আগে মা যে একবার মালখানগরে নিয়ে যাবার জন্য ছেলের কাছে কাকুতি মিনতি করেছিলেন, তখন প্রতাপ নিজের অসহায় অবস্থার জন্যই কষ্ট পেয়েছিলেন বেশি।

বাড়িতে, আদালতে, বাথরুমে, ঘুমের আগে, ঘুমের মধ্যেও কয়েকদিন প্রতাপ সুলেখার স্মৃতিতে কাতর হয়ে কাটালেন। সত্যিকারের দুঃখ তিনি নিবেদন করলেন সুলেখাকে। তারপর সুলেখার বদলে অন্য একটা মুখের ছবি এসে পড়লো।

এ যে কী এক বিচিত্র রসায়ন! কোন স্মৃতি যে অন্য কাকে কোথা থেকে টেনে আনে, তা কিছুতেই বোঝা যায় না। ডার্ক রুমে একটি নেগেটিভ প্রসেস করতে গিয়ে যেন সেখানে ফুটে উঠলো অন্য একটি ছবি।

সুলেখার কথা ভাবতে ভাবতে প্রতাপের হঠাৎ একদিন মনে পড়লো বুলার কথা।

বুলাও কি সুলেখার মতন চলে গেছে পৃথিবী ছেড়ে? কিংবা সে কোথায় কী ভাবে আছে? এই চিন্তা প্রতাপকে উদ্বেলিত করে তুললো। এবারে দেওঘর গিয়ে প্রতাপ বুলার খোঁজ করেননি, সে প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু বুলা দেওঘরে থাকলে কি মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে একবারও আসতো না? না, তা হতেই পারে না। তাছাড়া অত ব্যস্ততার মধ্যেও বুলার নাম একবার প্রতাপের কানে এসেছিল। বুলাকে কে যেন ডাকতে গিয়েও ফিরে এসেছে।

সুলেখার মতন বুলার সঙ্গেও যদি তার দেখা না হয়? কী ভাবে যেন বুলা সম্পর্কে প্রতাপের মনের মধ্যে একটা দায়িত্ববোধ রয়ে গেছে। যদিও এ কথাটা মমতাকে বলা যায় না। কিসের দায়িত্ব, বাস্তবিক ব্যাপারে কিছুই না তো!

বুলার শ্বশুরবাড়ি টালিগঞ্জে। বুলার দেওর সত্যেন বেশ একজন কেউ কেটা হয়েছে, কাগজে টাগজে মাঝে মাঝে তার নাম দেখা যায়। ক্যালকাটা ক্লাব, রোটারি ক্লাব, মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে দান এই সব ব্যাপারে সে যুক্ত। বুলার শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা প্রতাপ জানতেন না। কিন্তু টেলিফোন গাইড খুললেই তো যে কেউ সত্যেনের ঠিকানা পেতে পারে!

প্রতাপ কি বুলার সঙ্গে দেখা করার জন্য এতদূর এসেছেন? যে কেউ এই প্রশ্ন করুক, প্রতাপ দৃঢ় স্বরে উত্তর দেবেন, কক্ষণো না! নিজে থেকে, বিনা আমন্ত্রণে সত্যেনের মতন ঐ স্কাউনড্রেলটার বাড়িতে যাবেন তিনি। প্রতাপ মজুমদারের ব্যক্তিত্বের এখনও অত অধঃপতন হয়নি!

মনকে চোখ ঠারার জন্য প্রতাপ আর একটা কানও তৈরি রেখেছেন। দিন তিনেক আগে প্রতাপ খবর পেয়েছেন যে তাঁর মেজোমামা খুব অসুস্থ। ইনি প্রতাপের আপন মামা নন, তাঁর সৎ মায়ের ভাই, অর্থাৎ কানুর মামা। এই ভন্তু মামা অর্থাৎ জলধি বোসের সঙ্গে প্রতাপের কোনোকালেই ঘনিষ্ঠতা ছিল না, ইনি কানুকে নিজের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, এঁর ব্যাঁকা ব্যাঁকা কথা বলার ধরনটা প্রতাপ এককালে খুবই অপছন্দ করতেন। কিন্তু বয়েস হলে মানুষ হয়তো কিছুটা বদলায়। প্রতাপের মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ইনি দেখা করতে এসেছিলেন এবং সুহাসিনীর নাম করে অশ্রু বর্ষণ করেছেন। প্রতাপের মাকে তিনি নাকি নিজের বোনের মতনই দেখতেন, যদিও দেশ বিভাগের পর এতগুলি বছরে তিনি প্রতাপদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখেননি, ছেলে-মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন করা ছাড়া। কুম্ভীরাশ্রু হোক আর যাই-ই হোক, তবু বয়স্ক মানুষটি এসেছিলেন তো সুহাসিনীর শ্রাদ্ধে। তাঁর দুই ছেলে রাস্তা তৈরির কন্ট্রাকটরি করে এর মধ্যে বেশ ধনবান হয়েছে, জলধি বোস গাড়ি কিনেছেন, প্রতাপের সঙ্গে তিনি পুরোপুরি সম্পর্ক ছেদ করতেও তো পারতেন। এখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ভদ্রতার

বিনিময়ে প্রতাপের একবার দেখতে যাওয়া উচিত। অবশ্য, জলধি বোসের বাড়ি টালিগঞ্জের দিকে না হলে কি প্রতাপের মনে এই কর্তব্যবোধ জাগতো?

কিন্তু টালিগঞ্জ পর্যন্ত চলে এসেও প্রতাপের এখন এই সন্ধেবেলা একজন ব্যাধিগ্রস্ত বৃদ্ধের বিছানার পাশে গিয়ে বসতে একটুও ইচ্ছে করছে না। তিনি বেকার ছেলে ছোকরাদের মতন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একটার পর একটা সিগারেট টেনে যাচ্ছেন। ঘনিয়ে এসেছে সন্ধে, শীতের প্রাক্কালে সমস্ত বাড়ির উনুনের ধোঁয়া ওপরে উড়ে যেতে চায় না, ঝুলে থাকে জমাট বেঁধে, রাস্তার আলোগুলো ফ্যাকাসে মনে হয়। এখানে রাস্তা বেশ সরু। তারই মধ্য দিয়ে ট্রাম, বাস, ঘোড়ার গাড়ি, রিকশা জড়ামড়ি করে শ্লথগতিতে চলেছে। বেশ কয়েকদিন বৃষ্টি হয়নি তবু এখানে সেখানে কাদা, সব মিলিয়ে বিশৃঙ্খল, নোংরা নোংরা ভাব। এই জায়গাটায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কোনো দৃশ্য উপভোগ করার উপযোগী নয়। প্রতাপ অবশ্য পথের কোনো চলন্ত দৃশ্যই দেখছেন না।

বুলা কেমন আছে, এইটুকুই শুধু জানতে চান প্রতাপ, আর কিছু না। কিন্তু হুট করে বুলার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সত্যেনকে তিনি কিছুতেই পছন্দ করতে পারেননি, সত্যেনও তা জানে। ও বাড়ির আর কেউ প্রতাপকে চিনবে না। প্রতাপ কী করে মুখ ফুটে বলবেন, আমি বুলার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি!

ভন্তু মামা অসুস্থ, কিন্তু তিনি কি মৃত্যুশয্যায়? তা না হলে আর তাঁকে দেখতে যাওয়া নিয়ে আদিখ্যেতা করার কী আছে? উনি মারা টারা গেলে ওঁর শ্রাদ্ধ বাসরে উপস্থিত হলেই প্রতাপের কর্তব্য সারা হবে। এখন ভন্তু মামাকে খুশী করার কোনো দায় নেই প্রতাপের।

প্রতাপ ফিরে যাবার চিন্তা করেও ফিরতে পারলেন না, ধরা পড়ে গেলেন। একটা সাইকেল রিকশা থেমে গেল তাঁর অদূরে, একটি তরুণ দম্পতি তার থেকে নেমে এগিয়ে এলো তাঁর দিকে। যুবকটি ডেকে উঠলো, প্রতাপদা! তারপর দু'জনেই নিচু হয়ে প্রণাম-করলো প্রতাপের পায়ে হাত দিয়ে। প্রতাপ তাদের একেবারেই চিনতে পারলেন না।

যুবকটি বললো, প্রতাপদা, তুমি এখানে? এই আমার বউ জয়ন্তী, তুমি তো ওকে দেখোনি, আমাদের বিয়েতে তুমি আসতে পারোনি, কিন্তু বড়দি এসেছিল তুতুলকে নিয়ে। তারপর তো আর কোনো যোগাযোগই নেই।

প্রতাপ অনেকটা আন্দাজে বুঝলেন যে এই যুবকটি তাঁর এক বৈমাত্রেয় মামাতো ভাই। খুব ছোট বয়েসে দেখেছেন নিশ্চয়ই। পনেরো-কুড়ি বৎসরের ব্যবধানে সেই সব বাল্যকালের মুখ আর চেনা যায় না। প্রতাপ আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে উদাসীন, সুতরাং তাদের চেহারা ও নামও নিজের স্মৃতিতে জায়গা জুড়ে রাখেননি।

প্রতাপ এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছেন, তার উত্তর দেওয়াও সহজ নয়। এই যুবকটিকে মামাতো ভাই হিসেবে নিশ্চিত জানলে অনায়াসে বলা যেত যে, তোমাদের বাড়িতে যাবার জন্যই তো এখানে এসেছি। কিন্তু সে রকম উত্তর দিলে মিথ্যে বলা হতো। প্রতাপের মনের মধ্যে সত্য-মিথ্যের বিভাজন রেখা অতি স্পষ্ট। ভন্তু মামার কথা আংশিক মনে রেখে এ পর্যন্ত এলেও একটু আগেই প্রতাপ তাঁর বাড়িতে আজ যাবেন না ঠিক করেছিলেন।

আর দু'একটি কথার পর প্রতাপ বুঝতে পারলেন, এই ছেলেটি ভন্তু মামার বড় ভাই, অর্থাৎ তাঁর নন্তুমামার সন্তান। এর নাম অনিরুদ্ধ। সে

তাদের বাড়িতে প্রতাপকে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। প্রতাপ তবুও বললেন না, তিনি ওদের বাড়িতে যাওয়ার কথা ভেবেই এতদূর এসেছেন!

অনিরুদ্ধের স্ত্রী জয়ন্তী বললো, দাদা, আমার বিয়ের আগে আমাকে আপনার ছেলে বাড়িতে এসে পড়াতো। অসীম মজুমদার, অঙ্কের খুব ভালো ছাত্র, আমার দাদার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তেন, তখন তো জানতাম না....

প্রতাপ চমকে উঠলেন। অসীম মজুমদার...তার মানে পিকলু। হ্যাঁ, হাত খরচ চালাবার জন্য পিকলু দু'এক জায়গা টিউশনি করতো বটে। এই মেয়েটিকে পড়াতো পিকলু? এই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তিনি যেন পিকলুর খানিকটা যোগসূত্র পেয়ে গেলেন। এই মেয়েটির স্মৃতিতে পিকলু রয়ে গেছে।

অনিরুদ্ধর কথা শুনে প্রতাপ দোনামনা করছিলেন, জয়ন্তীর কথা শুনে তিনি রাজি হয়ে গেলেন, বললেন, চলো, তোমাদের বাড়ি তাহলে ঘুরেই আসা যাক। তোমাদের এই নতুন বাড়ি তো আমি দেখিনি!

আর একটা সাইকেল রিকশা ডাকা হলো। ট্রাম-ডিপো থেকে বেশ দূরে অনিরুদ্ধদের বাড়ি, একেবারে রিফিউজি কলোনির মধ্যে। আশেপাশে অনেকগুলি টিনের চালার ঘর, তার মধ্যে এই একটা তিনতলা পাকা বাড়ি। প্রতাপের এই মামারা আগে থাকতেন ভাড়া বাড়িতে, বছর তিনচারেক হলো এই নতুন বাড়ি হয়েছে। এই জবরদখল রিফিউজি কলোনিতে নন্তু মামা, ভন্তু মামারা কী করে যেন নিজেদের জন্য খানিকটা জমি দখল করে রেখেছিলেন।

এ বাড়িতে এখনও একান্নবর্তী পরিবার। নন্তু মামা মারা গেছেন, তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়েরা রয়েছেন এ বাড়িতেই, ভন্তু মামার দু'ছেলে টাকা রোজগার করছে চার হাতে, গিট্টু নামে আরও একজন মামা আছেন এ বাড়িতে, যিনি প্রতাপের প্রায় সমবয়েসী, তিনি বিয়ে করেননি। প্রতাপের মনে পড়লো, এই গিট্টুমামার বেশ মাথার দোষ আছে, প্রায়ই এঁর কোমর থেকে ধুতি খুলে যেত, একটা অস্বাভাবিক বড় পুরুষাঙ্গ দেখার স্মৃতি প্রতাপের এতদিন পরেও মনে পড়ে গেল। গিট্টু মামা এখন প্যান্ট পরেন, অগেকার দিনের সাহেব শ্রমিকদের মতন শোলডার স্ট্র্যাপ দিয়ে সেই প্যান্ট টেনে রাখা হয়েছে।

সবাই মিলে বেশ খাতির যত্ন করতে লাগলো প্রতাপকে। মধ্য বয়স্ক পুরুষ হলেও প্রতাপের এটা তো মামার বাড়ি। এ বাড়িতে বাঙাল রীতিনীতি সবই পুরোপুরি চলছে। মহিলারা নির্ভেজাল বাঙাল কথা বলেন, ঘর-দোর অগোছালো, বসবার ঘরের মেঝেতে মুড়ি ছড়িয়ে আছে, কথাবার্তার অধিকাংশই অমুক কেমন আছে আর তমুক এখন কোথায়!

ভন্তুমামা তেমন কিছুই অসুস্থ নন, মাত্র দু'সপ্তাহ আগে একটা হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন দিব্যি হাঁটাচলা করছেন এবং মাঝে মাঝে গড়গড়ায় তামাক টানছেন। গ্রামের বয়স্ক পুরুষদেরও প্রতাপ কখনো অসুখ নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে দেখেননি। এই অবস্থায় ভন্তু মামাকে একজন অসুস্থ মানুষ হিসেবে দেখতে আসা খুব লজ্জার ব্যাপার হতো।

ইচ্ছের বিরুদ্ধেও প্রতাপকে গুটি তিনেক সন্দেশ খেতে হলো মামীদের উপরোধে। এর পর চায়ের প্রস্তাব শুনে তিনি আরও শঙ্কিত বোধ করলেন। যে বাড়িতে অনেক লোক, সে বাড়িতে সাধারণত চা বেশ বিস্বাদ হয়। পেয়ালা-পিরিচ ঠিক মতন ধোওয়া থাকে না। কিন্তু জয়ন্তী নামের মেয়েটি একটি পাতলা, পরিচ্ছন্ন কাপে বেশ সুন্দর সৌরভময় চা এনে তাঁকে চমকে দিল। জয়ন্তীকে কাছে বসিয়ে তিনি তার বাপের বাড়ির গল্প শুনতে লাগলেন। জয়ন্তীর বাপের বাড়ি স্কটিশ চার্চ কলেজের কাছেই, গোয়াবাগানে, পিকলু তাকে পড়াতে যেত সপ্তাহে তিনদিন সন্ধেবেলা...।

এক সময় ভন্তুমামা জিজ্ঞেস করলেন, খোকন, তুমি বাড়ি টাড়ি করেছো নাকি কোথাও?

প্রতাপ মাথা নেড়ে বললো, আজ্ঞে না।

ভন্তুমামা গড়গড়ার নল ঠোঁটে দিয়ে বললেন, জমি কিনে রেখেছিস? জমির যা দাম বাড়ছে দিন দিন।

প্রতাপ বললো, না, জমিও কিনিনি কোথাও। বাড়ি করার কথা ভাবিনি কখনো।

—বাড়ি না হয় পরে হবে, কিন্তু জমি কিছুটা রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। তোরা রিফিউজি কার্ড করেছিস না? এই রকম কোনো রিফিউজি এরিয়ায় যদি অন্তত পাঁচ-দশ কাঠা জমিও রেখে দিতিস, দ্যাখ না, আমাদের এ বাড়ির জন্য এক আধলাও জমির দাম দিতে হয় নাই!...

হঠাৎ দপ্ করে প্রতাপের মাথায় জ্বলে উঠলো রাগ। ভন্তুমামার এই ধরনের কথার জন্যই প্রতাপ তাঁকে কোনোদিন পছন্দ করতে পারেননি। মালখানগরের মজুমদার বংশের ছেলে প্রতাপ মজুমদার সামান্য ভিখিরির মতন অন্যের জমি দখল করবেন? রিফিউজি কার্ড, কিসের রিফিউজি কার্ড? প্রতাপরা তো রিফিউজি নন, পূর্ববঙ্গে বাড়ি ছিল ঠিকই, সে বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে তাও ঠিক, কিন্তু পার্টিশানের আগে থেকেই তিনি কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে থেকেছেন, এখনও সেইভাবেই থাকেন, সরকারের কাছ থেকে তিনি এক পয়সা সাহায্য প্রত্যাশী নন।

জুতোর শব্দ করে প্রতাপ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি এবার যাবো!

ভন্তুমামা বললেন, হ্যাঁ তা তো যাবেই, অনেক দূরের পথ, এসেছিস বড় খুশী হয়েছি। আবার আসিস। আমি যা বললাম, মনে রাখিস। নিজের নামে একটা জমি, বুঝলা না, ইন্ডিয়ায় এক টুকরো জমি করে না রাখলে সিটিজেনশীপ রাইট ঠিক মতন জন্মায় না। ওরে মালু, ভুতো, পুনি তোরা প্রতাপদাদাকে গোটা বাড়িটা একবার ঘুরিয়ে দেখিয়ে দে। একটু দেখে যা খোকন, কেমন বাড়ি করিছি। দক্ষিণখোলা, প্রত্যেক ফ্লোরে মোজেইক....

রিফিউজি কার্ডের সুযোগ নিয়ে জবরদখল জমিতে এ রকম তিনতলা বাড়ি হাঁকানো, প্রতাপের ঘৃণা হতে লাগলো। কিন্তু উপায় নেই, ভদ্রতার চাপে মুখ বুজে থাকতেই হবে। প্রতাপকে একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে দেখতে হলো, অনিরুদ্ধ আর জয়ন্তী এমন কি ছাদেও নিয়ে এলো তাঁকে। প্রতাপের ছাদ দেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। তবু অনিরুদ্ধ বারবার বলতে লাগলো, আসুন না, ছাদটা দেখলে ভালো লাগবে।

ছাদের সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে গিট্টু মামা। মুখখানা নড়ছে, কী যেন চিবোচ্ছেন। মাথার চুল উস্কোখুস্কো, চোখে কৌতূহলের হাসি, প্যান্টের দু'পকেটে হাত ঢোকানো। প্রতাপকে দেখে তিনি বললেন, খোকন, আজ রাত্তিরে এখানেই থেকে যা না! খাওয়া-দাওয়া করবি, অনেকদিন তো আমাদের সাথে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করিস না, তারপর আমার সাথে শুয়ে থাকবি...

বাল্য স্মৃতি আবার ঝিলিক দিয়ে ওঠায় প্রতাপ প্রায় আঁতকে উঠে বললেন, না না, আমার এখানে থাকার উপায় নেই, আমাকে এক্ষুনি চলে যেতে হবে, দেরি হয়ে গেছে।

গিট্টুমামা থপ থপ্ করে ওদের পেছন পেছন ছাদে উঠে এলেন। বেশ প্রশস্ত ছাদ, এখানে আরও একটি ঘর তোলার কাজ শুরু হয়েছে, সরঞ্জামগুলি এক পাশে স্তূপ করে রাখা।

অনিরুদ্ধ আর জয়ন্তী প্রতাপকে নিয়ে এলো কার্নিসের ধারে। জয়ন্তী একদিকে হাত তুলে বললো, এই দিকটা খুব সুন্দর, একেবারে ফাঁকা, এদিকে একটা খাল আছে।

অনিরুদ্ধ বললো, এই দিকটা পুরোপুরিই ছিল একজন মুসলমানের সম্পত্তি, বুঝলে প্রতাপদা। ভদ্রলোক ধনী ছিলেন খুব, এ দিকটায় নাকি বাগান ছিল, প্রায় দুশোটা ফ্যামিলি এখানে সেটল্ করেছে। ঐ যে বাড়িটা দেখছেন, একটু ডান দিকে তাকান, ঐ যে রেডিওর এরিয়ালওয়ালা বাড়ি, ঐটা ছিল সেই মুসলমানের বসত বাড়ি।

প্রতাপ জয়ন্তীর কথা মতন ফাঁকা দিকটার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন, এক ঝলকের জন্য বাড়িটার দিকে মুখ ফেরালেন।

অনিরুদ্ধ বললো, নারায়ণগঞ্জের এক ভদ্রলোক ঐ বাড়িটা এক্সচেঞ্জ করে পেয়েছেন। ভদ্রলোকের নাম সত্যেন রায়, বেশ নাম করা লোক।

প্রতাপের শরীরে কথাটায় বিদ্যুৎ শিহরন হলো। ঐ সেই বাড়ি! ঠিকানা দেখে বোঝা যায় কি যে এই দুটি বাড়ি এত কাছাকাছি হবে। সত্যেনদের বাড়িটার পেছন দিক দেখা যাচ্ছে, বেশি দূর নয়, দোতলার কয়েকটি ঘরে আলো জ্বলছে, কয়েকটি ঘর অন্ধকার। ওর কোনো একটি ঘরে বুলা থাকে। এখনো আছে বুলা? তাকে দেখা যাবে না।

গিট্টুমামা কী যেন বলছেন বিড়বিড় করে, প্রতাপের সেদিকে কান নেই। তিনি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন দূরের বাড়িটার দিকে। মাঝখানে কিছুক্ষণ বুলার কথা ভুলে গিয়েছিলেন, এখন বুলার কথা ভাবতেই সুলেখার কথা মনে পড়লো। তারপর দুটি মুখ মিলে মিসে এক হয়ে গেল। *(ক্রমশ)*

ছবি : অনুপ রায়

ভালোবাসা, ভালো-বাসা

শ্রীমতী

ঠিক আজকের এই মুহূর্তে যদি আমাদের জিজ্ঞেস করা হয়, কি ধরনের পাত্র তোমার পছন্দ ? অথবা কি ধরনের ভাল-লাগা মানুষকে তুমি নিজের ভালবাসার একান্ত আপনজন করে নিতে পারবে ? আমাদের মধ্যে শতকরা আশিজন মেয়েই বলব, পাত্র মোটামুটি চলনসই হোক কিন্তু সর্বপ্রথম দরকার একটি ভালো-বাসার। অনেক অনেক সমস্যার মধ্যে এই আবাসন ব্যাপারটা বোধ হয় আমাদের জীবনে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্যাটা যেন হঠাৎই ভীষণভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বছর দশেক হল আবাসনের ব্যাপারে আমাদের আকাঙ্ক্ষার যেন শেষ নেই। বছর পাঁচেক হল মহানগরীর বুকে একখানা টু-রুম ফ্ল্যাটের অধিকারী হলে তিনি সবার ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ান। আগে ছিল মহানগরীর আশেপাশে বাড়ি খোঁজা। এখন এই পরিধি ক্রমাগত বাড়তে শুরু করেছে। মধ্যমগ্রাম, বারাসাত, বসিরহাট থেকে শুরু করে সুভাষনগর, বারুইপুর অথবা রিষড়া কোন্নগরেও জমির দর আকাশছোঁয়া। আর কলকাতার লবণ হ্রদ অথবা বেহালা অঞ্চলে তো এক ছটাক জমি লাখ টাকার শামিল।

মোট কথা সব মিলিয়ে আমাদের মধ্যবিত্ত ছা-পোষা মানুষের জীবন দিন দিন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। স্বামী, স্ত্রী উভয়েই কর্মজগতে নেমে পড়েছেন। যে যার উপযুক্ত, অনুপযুক্ত সব রকম কাজে আমাদের ঘরের বাইরে আসতে হচ্ছে। খানিকটা সুখের মুখ নিজে আর সংসারের পাঁচটা লোককে দেখাবার জনাই আমাদের এইভাবে রাতদিন চরকির মতন ঘুরতে হচ্ছে। সারাদিন ক্লান্তির পর যদি ঘরে এসে একটু হাত-পা মেলতে না পারি তাহলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বোধ হয় আমাদের মন। আর বলা বাহুল্য, সমস্ত রাগ আর গাত্রদাহ গিয়ে পড়ে ঐ একটা মানুষের ওপর। 'বিয়ের আগে কত মিষ্টি মিষ্টি কথা, তোমাকে রানী করে রাখবো, হেসে হেসে ভেসে ভেসে কাটিয়ে দেবো ইত্যাদি ইত্যাদি।' ক্রমে দেখা গেল ভালবাসার বিয়ের স্বাদ ভালো-বাসার অভাবে দিনে দিনে মরচে ধরে যায়। লাজুক, শান্ত প্রেমিকা চার দেওয়ালের ছোট্ট খোলের ভেতর, দু-পাঁচ ঘর ভাড়াটের কমন ছাদে দাঁড়িয়ে এক চিলতে আকাশের দিকে তাকিয়ে মেজাজ কখন যে রুদ্রমূর্তি ধরে জানতেই পারে না উদয় অস্ত পরিশ্রম করা প্রেমিক স্বামী। একটা বা দুটো ঘর, এক চিলতে রান্নাঘর একটু বসবার-খাবার ঘর—এক, দুই করে বছরের পর বছর পায়ে পায়ে ঘুরতে ঘুরতে দম বন্ধ হয়ে আসে, হাঁফ ধরে যায় জীবনে। তবু যখন দেখি, আমারই কোন পরিচিত কেউ একটা মাত্র ঘর ভাড়া করার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে তখন নিজেকে সাময়িক হলেও ভাগ্যবানই মনে হয়।

একটা ছোট্ট বাড়ি, সামনে ছোট্ট একফালি বাগান, দরজায় একটা জুঁই অথবা মাধবীলতা—এ যেন আমাদের মেয়েদের অন্তরের সাধ। স্বামীর ভালোবাসার ছোঁয়া লেগে থাকবে এখানে ওখানে। এ সব এখন স্বপ্ন দেখার মতন ধোঁয়াশা। এখন প্রেমে পড়ে যাওয়াটাও একটা মামুলি ঘটনা, আর বিয়ে করবো এরকম মনস্থ করলেই হবু দম্পতি

ছোট্ট একটি নীড়ের স্বপ্ন… ছবি : শিপ্রা দাশ

উঠে-পড়ে লেগে যাও বাসা-র সন্ধানে। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে দালাল, মস্তান কাউকেই বাদ দিই না আমরা। শহরের বুকে একখানা বাড়ি ভাড়া পাওয়া গিয়েছে শুনলে আনন্দে আত্মহারা হই আমরা। তার জন্যে আগাম, সেলামি কিছুতেই দমে থাকার পাত্র নই। ভাড়াটে বাড়ির গিন্নির বান্ধবী যদি ভালো বাড়ি পেয়ে উঠে যায় তাহলে তো কতরি ওষ্ঠাগত প্রাণ। বাড়ির সমস্যাটা যেন দিন দিন মহামারীর মতন ছড়িয়ে পড়ছে। অনেক সুন্দর মনের ওপর পলির প্রলেপ দিনে দিনে জমে যাচ্ছে শুধুমাত্র একটি ভালো-বাসার জন্যে। আবাসন সমস্যা সমাধানে বর্তমানে আমাদের সরকার সচেষ্ট হয়েছেন। তবু বলবো মধ্যবিত্ত দশটা-পাঁচটা করা মানুষদের কথা ভেবে আরো কিছু সরকারি ফ্ল্যাট অথবা বেসরকারি উদ্যোক্তারা [যাঁরা আবাসন প্রকল্পে অগ্রসর হয়েছেন] যদি একটু সুলভে ফ্ল্যাট বাড়ির ব্যবস্থা করে দেন তাহলে আমাদের একটা বড় প্রধান সমস্যার সমাধান হয়।

একটা ভালো-বাসা পেলে একটা সুখী গৃহকোণ তৈরি হবে, একটু স্বচ্ছন্দে থাকতে পারলে বোধ হয় নতুন করে ভালোবাসতেও শিখবো আমরা।

এবারে কী হবে ?
লোকটা কে ?

জেনে কী হবে !চল্, পালাই !

!
!

বাপ্‌স !
বাবারে !
৪/১১

খটাস
আপাতত এই যথেষ্ট !
!!

ওরা···ওরা রাজাকে গুলি করতে চেয়েছিল !
কিট আর হেলোয়াজ তীর ছুঁড়ে রাজাকে বাঁচায় !

এইভাবে, বাবা !
ওরে বাবা, আর নয় !
তারপর তো ডায়ানা-কাকিমার কারাটের লাথি খেয়ে ওরা কুপোকাত !

খুব সময়ে এসে পড়েছ !
একেবারে সময়মতো !
নিজেরাই তো দিব্যি চালাচ্ছিলে !
ক্রমশঃ

দেখে এলাম

অদ্রিকা দেবশর্মা

রোমের এক শান্ত, সমাহিত সমাধিস্থলে শুয়ে আছেন পৃথিবীবিখ্যাত দুই কবি—শেলি এবং কীট্‌স । চারিদিকে অজস্র ফুলে ভরা গাছ ; দরদী প্রকৃতির স্নিগ্ধ পরশ । সেখানে কবিতার বই ও ফুলহাতে লেখিকা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে এলেন ।

'পিরামিডে' স্টেশনে নামার আগেই বিপত্তি। পাতাল রেল 'মেট্রো' ঝটিতে ইলেকট্রিকে ছোটে, ঝটিতে থেমে যাত্রী উদ্গীরণ করেই পরক্ষণেই নিঃশব্দে অন্তর্ধান করে।

নির্দিষ্ট স্টেশনে থামতেই দরজার কাছেই দণ্ডায়মান কর্তা, কন্যা দুটিকে দু হাতে ধরে ঝাঁ করে নেমে গেলেন। তার পরেই স্থানীয় জনাদশেক যাত্রী নামতে নামতেই আমার ঠিক নাকের ডগায় কাঁচের দরজাটা সট করে জুড়ে গেল। বুঝলাম, আমাকে নামতে হবে পরবর্তী এক অজানা স্টপে। শিক্ষা হল যে বিদেশে এসে 'আপ পহেলে' এই লখনউ ভদ্রতা চলে না। কাষ্ঠ হাসি হেসে হাত নাড়লাম স্তম্ভিত পিতা-পুত্রীর মুখের সামনে। বিদ্যুৎ ঝলকের মত মনে খেলে গেল কতকগুলো চিন্তা—(ক) ভাষা জানি না (খ) হোটেলের নাম জানি, কিন্তু ঠিকানা জানি না (গ) ব্যাগে চশমা, রুমাল, চিরুনি, আয়না—একটি ধারালো ছোরা ইত্যাদি অনেক জরুরী জিনিস আছে। কিন্তু ইটালীয় একটি 'লিরা'ও সঙ্গে নেই (ঘ) রোমের কোন ম্যাপও কাছে নেই। পঞ্চম পয়েন্ট ভাবার আগেই দেখি সামনের অনড় কাঁচের দেয়ালটা আবার কোন 'চিচিং ফাঁক' মন্ত্রে খুলে গেছে। দু পাশে কয়েকটি সহাস্য মুখ হাত নেড়ে ইঙ্গিত করছে নেমে যেতে। খাঁচা খোলা পাওয়া পাখির মত ঝটপট উড়ে নেমে পড়লাম। ছোট মেয়ে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলো। চলমান ট্রেনের কাঁচের ভেতর থেকে দরদী সহযাত্রীরা হাত নাড়ল। ওরা 'এমার্জেন্সী' বোতাম টিপে আক্ষরিক অর্থে 'অবোলা' নারীকে 'রেসক্যু' না করলে কি হত ভেবে ততক্ষণে বেশ শীত শীত করতে শুরু হয়েছিল।

আমরা দেশ থেকে বেরোবার আগেই মনঃস্থির করে গিয়েছিলাম রোমে গেলে তার 'প্রোটেস্টাণ্ট সেমেট্রি'তে গিয়ে শেলী আর কীট্‌সের সমাধি দেখতেই হবে। এ বিষয়ে উৎসাহদাতা ছিলেন আমাদের পরম শুভার্থী বাংলা সাহিত্যের এক বিখ্যাত কবি। তিনি তাঁর নিজের দুখানা কবিতার বই আমাদের দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন যে বই দুখানা শেলী এবং কীট্‌স্ তাঁর দুই কাব্যগুরুর সমাধিতে ফুলের মত উৎসর্গ করে আসতে। সেই অভিযানে যাবার শুরুতেই 'পিরামিডে' স্টেশনে এই বিপত্তি।

চেস্টিউস-পিরামিডের পাশের এক নির্জন শান্ত রাস্তা দিয়ে যখন প্রোটেস্টাণ্ট সেমেট্রিতে ঢুকলাম ; বাইরে তখনও প্রখর রোদ। রোমের স্থানীয় সময় সাড়ে পাঁচটা। কিন্তু যেই উঁচু গেট দেওয়া মোটা পাথরের প্রাচীরটা পেরোলাম সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা অতীতের গোধূলির আবছায়া আমাদের ঘিরে ধরলো। প্রাচীন ঘন সবুজ মহীরুহে ঘেরা ঘন ঘাস আর লতায় ঢাকা প্রাচীন সমাধিভূমি।

ধাপে ধাপে উঁচুতে উঠে গেছে জমিটা প্রবেশপথ থেকে। আর তার সর্বত্র ছড়ানো অজস্র নাম, অজস্র প্রতিকৃতি, ভাস্কর্য ও স্মরণচিহ্ন। বিগত প্রিয়জনদের প্রতি তাদের

এখানে শেষ শয্যায় শায়িত কীটস্

ভালবাসার জনের আকৃতি যেন মর্মস্পর্শী হয়ে দর্শকের মনকে স্পর্শ করে। হিন্দুদের শ্মশান-শূন্যতার বৈরাগ্য ; খ্রীস্টানের কবরখানা মর্ত ভালবাসার প্রস্তরীভূত রূপ।

প্রায় প্রতিটি কবরই শ্বেতপাথরে গড়া, ইটালীর বিখ্যাত শ্বেতপাথর। কোন সমাধির উপরে পাথরে গড়া জলপাত্র জলে ভরা, কোথাও পাথরের ফলদানে পাথরেই গড়া শ্বেতশুভ্র আঙুরের গুচ্ছ। কোথাও প্রভুর সমাধির পাশে প্রভুভক্ত কুকুরটিও যেন প্রস্তরীভূত হয়ে তন্ময় ভঙ্গীতে থাবার ওপর মাথা রেখে অপেক্ষারত, যেমন প্রভুর জীবৎকালে সে প্রতীক্ষা করত। কোথাও অপূর্ব সুন্দরী বিশদবসনা যুবতী উপাধানে মাথা রেখে শুয়ে আছে—হাতে ফুলের গুচ্ছ। হঠাৎ দেখলে চমকে উঠতে হয়। সর্বত্রই যেন মানুষের 'যেতে নাহি দিব' এই মর্মচ্ছেদী ক্রন্দন পাথরে পাথরে মূর্ত হয়ে আছে। সেই মিশরের পিরামিডের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মৃত প্রিয়জনের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রদর্শনের পদ্ধতিতে খুব কিছু একটা তফাত ঘটেনি।

সমাধিভূমি পরিচ্ছন্ন। কিন্তু অতি যত্নের ঘটা কোথাও নেই। সবুজ দীঘল ঘাসে সব সমাধির ভিত্তিভূমি ঢেকে আছে। চারিদিকে ছড়ানো অজস্র ফুলে ভরা গাছ। প্রকৃতির নিজের হাতের পুষ্পাঞ্জলি। প্রবেশপথের পাশেই সাদা পাথরে কালো অক্ষরে নির্দেশ চিহ্ন দিয়ে দেখানো আছে—P. B. Shelly সোজা সামনে ও Jhon Keats সোজা বাঁ হাতে।

শেলীর সমাধি

প্রথমেই সোজা ধাপে ধাপে উঠে সমাধিভূমির প্রায় সীমান্তে Pyramid of Caius Caestius-এর ছোট্ট একটা পাথরের পিরামিড। তারই পায়ের কাছে শেলীর কবর। পাশাপাশি দুটি কবর। শেলী ও তাঁর একান্ত বান্ধব ট্রেলনি—মৃত্যুর পরপারেও পাশাপাশি আছেন। শেলীর জলমগ্ন দেহ দাহ করা হয়েছিল ইটালীর সমুদ্রতটে।

শেলীর শেষ শয্যার উপরে উৎকীর্ণ আছে এই লিপিটি—P. B. Shelly.

"Nothing of him doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and strange."

এডওয়ার্ড জে, ট্রেলনির মৃত্যু ঘটে ১৩ অগস্ট ১৮৮১তে অষ্টাশি বছর বয়সে। তাঁর কবরে লেখা আছে—"These are two friends whose liues were undivided, so let their Memory be"....

আমরা পরিকল্পনামত আধফোটা লাল গোলাপ আর কবিতার বইখানা দিয়ে ভারতীয় মতে প্রণাম করে বিদায় নিলাম।

এর পরে কিছুটা নেমে এসে বাঁ দিকে কীটসের সমাধি। মস্ত একটা মার্বলের চৌকো পাথরে কীটসের পরিচিত মূর্তি—পাশের একটি দেওয়ালের সঙ্গে সংলগ্ন। সামনে পাশাপাশি দুটি কবর। একটিতে ছিন্ন তার একটি গ্রীক বীণা। অন্যটিতে একটি তুলি ও প্যালেট উৎকীর্ণ। প্রথমটিতে বিশ্রামরত কীটস ও অপরটি তাঁরই একান্ত সুহৃদ আর্টিস্ট বন্ধু সেভার্ন। রাজরোগ যক্ষ্মায় আক্রান্ত কীট্‌সকে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য যেতে বলা হয়েছিল ইটালীতে। কিন্তু ইটালীর তপ্ত রৌদ্রও তাঁকে আরাম দিতে পারেনি। রোগযন্ত্রণার সঙ্গে মিশেছিল প্রিয়বিচ্ছেদবেদনা। শেষে তাঁর অভিমানকাতর আত্মাও মিশে গেছে রোমেরই বাতাসে। যে গৃহে কীটসের রোগশয্যায় শেষ দিনগুলো কেটেছে সে বাড়িটি এখনও অটুটভাবে বিরাজমান। বিখ্যাত স্প্যানিশ স্টেপ্‌স্-এর নীচে ডান হাতে লাল পাথরের একটি তিনতলা বাড়ী। সাদা পাথরে যেখানে পরিচিতি খোদাই করা আছে। একটা লাইব্রেরি এবং মিউজিয়ামও আছে—যা তখন বন্ধ থাকার জন্যে আমাদের দেখা হয়নি।

অভিমানী কবি কীট্‌স বিক্ষুব্ধ চিত্তেই পৃথিবীর শেষ দিনগুলো কাটিয়েছিলেন। "মাৎসর্য বিষদংশন কামড়ে'রে অনুক্ষণ"—সমালোচকদের সম্বন্ধে লেখকের এই অভিযোগ দেশকালপাত্র ভেদে চিরন্তন সত্য। তাই তাঁর কবরের উপর কোন নাম লেখা নেই। কেবল লেখা আছে—"This grame contains all that was mortal of a young English Poet, who on his deathbed in this bitterness of his heart at the malicious power of his enimier disired these word to be eugrauen on his tombstone:'Here lies one whose name was written in water."

24 Feb, 1821.

এর থেকে সহজেই বোঝা যাবে মৃত্যুমুখীন কবির বেদনার পরিমাণ। তাই অসম্পূর্ণ কাব্যজীবনের প্রতীক ছিন্ন তার বীণা। কবির বন্ধু যোসেফ সেভার্ন দীর্ঘজীবী ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল পঁচাশি বছর বয়সে—৩ অগস্ট, ১৮৮৭।

দ্বিতীয় কবিতার বইখানা ও ফুলগুলি উৎসর্গ করে হাঁটু মুড়ে অনেকক্ষণ বসেছিলাম শান্ত এই সমাধিভূমিতে। এখন আর কোন অশান্ত হৃদয়ের পার্থিব চাঞ্চল্য এখানে নেই। এখানে কেবল দরদী প্রকৃতির স্নিগ্ধ পরশ। আমাদের জীবন সংগ্রামের তপ্ত স্নায়ুগুলোও যেন ক্রমে শীতল-শান্ত হয়ে আসে।

ফেরার পরে অপর এক বিপত্তি। প্রায় গেটের কাছে পৌঁছেছি। দেখি এক প্রৌঢ় ব্যক্তি বই দুখানা কুড়িয়ে নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছেন। সম্ভবত তিনি ভেবে থাকবেন আমরা ভুলে ফেলে গেছি। তিনি আবার নির্ভেজাল ইটালীয়। অন্য কোন ভাষা তাঁর মগজে পৌঁছবে না। অগত্যা সেমেট্রির অপিসে গিয়ে ডাহা জার্মান ভাষার সহায়তায় আমাদের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হল—তাঁরা ফর্ম দিলেন বই দুখানা স্থানীয় লাইব্রেরিতেদান করবার কথা লিখে দেবার জন্য। বইগুলিতে লেখা হল—'বিদেশী এক অনুরাগী কবির শ্রদ্ধার্ঘ'।

শেষে আর একবার শেষ দৃষ্টিক্ষেপ করে অতীত থেকে আবার বর্তমানে ফিরে এলাম। প্রাচীরের বাইরে বিংশ শতকের উত্তপ্ত কর্মচঞ্চল রোম। ■

তেনজিং পরিবারের এভারেস্ট

শিশির ঘোষ

পর্বতারোহণে তেনজিং নোরগের উজ্জ্বলতা তাঁর আশেপাশের পর্বতারোহীদেরও বেশ কিছুটা ম্যাড়মেড়ে করে দিয়েছিল। প্রায় সব স্পোর্টসেই কিছু কিছু খ্যাতিমানের জন্য অন্যরা বেশ কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে দিন কাটিয়েছেন। যেমন, একসময় নিষ্প্রভ ছিলেন ধ্যানচাঁদের পাশে রূপ সিং। আবার সেই বিশাল ছটাকে ম্লান করে কেউ কেউ নিজেকে প্রকাশ করেছেন, হয়ত কিছুটা মৃদুভাবে, আপন দক্ষতায়। পর্বতারোহণে ঠিক এমনই এক ব্যক্তিত্ব, নাওয়াং গোমবু। জাতিতে শেরপা, ধর্মে বৌদ্ধ এবং আদতে তিব্বতীয়। বহু বছর আগে এই শেরপা জাত তিব্বত থেকে সু-উচ্চ হিমালয়ের নানান বাধা টপকে নেপালের থোল খুমবু, নামচে বাজার বা থিয়াং বোচে, পাঙ বোচে হয়ে দার্জিলিঙে এসে ডেরা বেঁধেছিল নিছক পেটের তাগিদে। পেশা কালক্রমে হয়ে দাঁড়ায় উচ্চতর পর্বতে মাল বহন এবং কখনও পর্বত অভিযানে আগ্রহী অভিযাত্রীদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হওয়া।

যদিও অতীতে বহু গৌরবময় ভূমিকায় পর্বতারোহণে সাফল্য এনে দেওয়া কিংবা নিঃস্বার্থভাবে হেলায় জীবন বিলিয়ে শেরপারা তামাম দুনিয়ার মানুষের নজর কেড়েছিল, কিন্তু এই শেরপা জাতকে প্রকৃত অর্থে কৌলীন্য এনে দিয়েছিলেন, তেনজিং নোরগে, ১৯৫৩ সালে প্রথম সফল ব্রিটিশ এভারেস্ট অভিযানে নিউজিল্যাণ্ডবাসী এডমণ্ড হিলারীর সঙ্গী হিসাবে বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত-শিখর মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় উঠে।

সেই ঐতিহাসিক আরোহণ এবং ইতিহাস সৃষ্টির নায়ক তেনজিং নোরগের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নাওয়াং গোমবুও ওই অভিযানে তেনজিংয়ের সঙ্গী ছিলেন। কিশোর গোমবুকে দেখে পোড় খাওয়া অভিযাত্রী ব্রিটিশ অভিযানের নেতা, কর্নেল জন হান্ট চমকে উঠেছিলেন এই ভেবে, 'এই দুধের শিশুকে কোন আক্কেলে তেনজিং এভারেস্টে মাল বহার জন্য নিয়ে এল ?' মাত্র কদিন পরেই অবশ্য গোমবুর অসাধারণ কাজকর্ম দেখে কর্নেল হান্ট মুগ্ধ হয়ে পড়েন। ওই অভিযানে গোমবু এভারেস্টের সাউথ কল-এ (২৬,০০০ ফুট) অভিযাত্রীদের মাল ঠিকঠাক পৌঁছে দিয়েছিলেন। কৃতিত্বের পুরস্কারও পেয়েছিলেন অল্প কিছুদিন পরেই। ১৯৫৪ সালে স্থাপিত হল ভারতের প্রথম পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, দার্জিলিঙে। প্রথম দফায় কিছু শেরপাকে পাঠানো হল সুইজারল্যান্ডে, পর্বতারোহণের আদ্যোপান্তের তালিম নিতে। সুইজারল্যাণ্ড থেকে ফিরে গোমবু কাজ পেলেন মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে, মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্ট্রাকটরের। শুরু হল তাঁর গৌরবময় কর্মজীবন। এই দীর্ঘ সময়ে গোমবু ভারতের কয়েক হাজার ছেলেমেয়ের মনে পর্বতারোহণের বীজ বুনেছেন। আজ প্রায় কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে। তাঁর সেই একমাথা কাল চুলের হদিশ নেই, মাথা ভর্তি টাক কয়েক গাছা চুল দিয়ে কোনরকমে ঢাকার প্রয়াস চালাচ্ছেন। শরীরটাকে আধার করেছে নানান ব্যাধি। তাঁর নিজের কথাতেই, 'আইস এক্স হাতে র‍্যাটিং প্রেসিয়ারে দেখা গোমবু স্যারকে খুব শীঘ্র হয়ত ওয়াকিং স্টিক হাতে দার্জিলিঙের রাস্তায় হাঁটতে দেখবে।' সম্প্রতি কলকাতা এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া দপ্তরের ঘোষিত 'তেনজিং নোরগে অ্যাওয়ার্ড' নিতে।

ইতিহাস সৃষ্টির নায়ক তেনজিং নোরগে

ধন্যবাদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে, ধন্যবাদ ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীকে। ভারতীয় পর্বতারোহণের এক সেরা কর্মীর হাতে তুলে দিলেন বিশ্ব পর্বতারোহণের এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নামাঙ্কিত খেতাব। তেনজিংয়ের মত এভারেস্টের ব্যাপারে গোমবুও কিছুটা নাছোড়বান্দা ছিলেন। পর্বতারোহী তৈরির দায়িত্বের ফাঁকে ফাঁকে ছুটে গিয়েছেন বারেবারে এভারেস্ট, নন্দাদেবীতে। দুরূহ নন্দাদেবীর প্রথম ভারতীয় আরোহী হিসাবে নিজেকে চিহ্নিত করেছেন। ১৯৬৫-র সফল ভারতীয় এভারেস্ট অভিযানের আগের দুটি অভিযানেরই (১৯৬০ এবং ১৯৬২) সদস্য ছিলেন। দুটি অভিযানেই তাঁর অসাধারণ দক্ষতা এবং সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ভয়ঙ্কর তুষার ঝঞ্ঝার মধ্যেও অন্য দুই ভারতীয় অভিযাত্রীর সঙ্গে ২৭,৯০০ ফুট উচ্চতায় বাহাত্তর ঘন্টা পড়ে থেকেছেন ভাল আবহাওয়ার আশায়, ভারতবর্ষের জন্য গৌরব আনতে। শিখর আরোহণের গ্ল্যামার উপেক্ষা করে ছুটে গিয়েছেন বিপদগ্রস্ত শেরপা ভাইদের উদ্ধারে (নন্দাদেবী, ১৯৬৪)। এক কথায় তেনজিংয়ের মন্ত্রশিষ্য নাওয়াং গোমবু, পর্বতারোহণে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলেন।

গোমবুর সাড়া-জাগানো কার্যকলাপ তাঁকে সারা বিশ্বে পরিচিত করেছিল। আমন্ত্রণ এসেছিল ১৯৬৩ সালের আমেরিকান এভারেস্ট অভিযানে যোগ দেওয়ার। প্রথম আমেরিকান এভারেস্ট আরোহী বিগ জিম্-এর (জিম হুইটেকার, ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি লম্বা) সঙ্গী হয়ে এভারেস্টে উঠেছিলেন, লিটল গোমবু (৫ ফুট ২ ইঞ্চি মাত্র)। এভারেস্ট আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার দিয়েছিলেন নানান খেতাব, হয়েছিল কর্মস্থলে পদোন্নতি (ডেপুটি ডাইরেকটর অফ ফিল্ড ট্রেনিং)। পদোন্নতি বা আন্তর্জাতিক মর্যাদা কিন্তু গোমবুর অভিযাত্রী মনকে দমাতে বা ভারতভূমির জন্য কর্তব্য পালনে নিরাশ করেনি। ১৯৬৫-র এভারেস্ট অভিযানের দল নির্বাচনী ট্রায়াল হিসাবেই অংশ নিয়েছিলেন ১৯৬৪-র নন্দাদেবী অভিযানে। পরের বছর ক্যাপ্টেন চীমাকে সঙ্গী করে ভারতকে এনে দিয়েছিলেন এভারেস্ট বিজয়ের গৌরব। বর্তমানে গোমবু মাউন্টেনিয়ারিং ইন্‌স্টিটিউটের ডাইরেক্টর অফ ফিল্ড ট্রেনিং।

তেনজিং নোরগে অ্যাওয়ার্ড পাওয়া অপর জন, দোরজি লাটুও জন্মসূত্রে শেরপা, আদি নিবাস তিব্বত, ধর্মে বৌদ্ধ এবং কর্মসূত্রে ওই হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্‌স্টিটিউটের সিনিয়র ইন্‌সট্রাকটর। দোরজি লাটু ১৯৮৪ সালে ভারতীয় এভারেস্ট অভিযানের সদস্য হিসাবে এভারেস্টে উঠেছেন। এক হিসাবে লাটুর এভারেস্ট আরোহণও ঐতিহাসিক গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর এই অভিযাত্রার সঙ্গী ছিলেন প্রথম ভারতীয় মহিলা এভারেস্ট আরোহিণী, বাচেন্দ্রীপাল। তেনজিং নোরগের বড় আদরের 'লোটো' (তেনজিংয়ের বেসরকারি একান্ত সচিব) হয়ত বড় শিখর আরোহণের সুবাদে খুব একটা আলোড়ন তোলেননি কিন্তু স্বভাব-শিক্ষক লাটু দোরজি তাঁর নন্দাদেবী অভিযানেও কিন্তু ভারতীয় মহিলাদের শিখর আরোহণে সাহায্য করেছিলেন। পুরস্কার পেয়ে দুজনেই খুব খুশি। লাটুর মতে 'বর্তমানে গোমবুর চেয়ে যোগ্য আর কেউ আছে বলে মনে করি না। আর এভরেস্টের জন্যই হয়ত আমাকেও সম্মান জানানো হল। তবে, পর্বতারোহণ প্রসার এবং উন্নতি উদ্দেশ্য হলে ভবিষ্যতে তরুণদের কথা যেন ভাবা হয়।'

স্বভাবগতভাবে গোমবু স্বল্পভাষী, কাজেই বেশি জবাব আসছিল লাটুর কাছ থেকে। পশ্চিমবঙ্গের পর্বতারোহণ নিয়ে কথা শুরু হতেই লাটু বলে উঠলেন, "যদিও নন্দাঘুন্টি থেকে ধরলে পঁচিশ বছর পেরিয়ে এসেছি, তবুও বলব, আমাদের পর্বতারোহণ কিছুটা অগোছালোভাবে এগোচ্ছে। সব কিছু ঠিক মত চালাতে হলে আই এম এফ প্যাটার্নে রাজ্য স্তরে একটা সংস্থা থাকা দরকার। শুনেছি, সরকার নাকি সে ব্যাপারে উদ্যোগ নিচ্ছেন।

"আসলে, আমাদের ছেলেরা ট্রেনিং-এর সুযোগ পায় খুবই সামান্য। পর্বত শিখরগুলো এত দূরে যে, ইচ্ছে থাকলেও চটজলদি প্র্যাকটিস করতে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। অথচ, যথার্থ ট্রেনিং, ঠিকঠিক সরঞ্জাম এবং স্থিতধী মানসিকতা ছাড়া পর্বতারোহণের মত ডেঞ্জারাস স্পোর্টসে বড় কিছু করা সম্ভব নয়। আমাদের সুযোগ-সুবিধা খুবই অপ্রতুল। মিউনিখে দেখেছি, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সঙ্গে ইনডোরে বিভিন্ন মান এবং মাত্রার (ভয়াবহতার দিকে লক্ষ্য রেখে চিহ্নিত) কৃত্রিম ক্লাইমবিং ওয়াল। আরোহণে-ইচ্ছুক অভিযাত্রী কিংবা সাধারণ উৎসাহী তার আরোহণের মাত্রা জানালে দোকানদার সমস্ত পর্বতারোহণ সরঞ্জাম একটা ব্যাগে ভরে দিয়ে দেয়। আমরাও এভাবে কৃত্রিম ক্লাইমবিং ওয়াল কলকাতার বিভিন্ন অংশে তৈরি করে নিতে পারি। শুনেছি, সরকারি উদ্যোগে সল্ট লেক স্টেডিয়ামে কৃত্রিম পাহাড় তৈরির পরিকল্পনা হচ্ছে। তার কি প্রয়োজন, তাতে খরচ অনেক বেশি পড়বে। পাহাড়ের প্রাকৃতিক গঠনের সব কিছু কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করতে খরচ বাড়বে এবং তা যথার্থ বিকল্প হয়ত হবে না। কম খরচে প্র্যাকটিস দেওয়ার অন্য ব্যবস্থা করে নেওয়া যেতে পারে। স্টেডিয়াম অথবা অন্য কোনও বাড়ির স্থায়ী দেওয়ালের গায়ে আরও সিমেন্ট জমিয়ে এবং পা রাখার জন্য দেওয়ালের ওপর ছোট ছোট পাথর বসিয়ে ক্লাইমবিং ওয়াল তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে। সিমেন্ট কম বেশি করে ঢালের ডিগ্রির রকমফের করে নিতে পারা চলে। সারা বছর প্র্যাকটিসের জন্য এই কৃত্রিম ক্লাইমবিং ওয়াল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ছেলে মেয়েদের জন্য।

"ইকুইপমেন্টের প্রশ্নে আমাদের ছেলেমেয়েদের দুরবস্থা দেখলে কষ্ট পাই। ১৯৮৪ সালে এভারেস্ট অভিযানের আগে দু-একটি সর্বভারতীয় ক্লাইমবিং ক্যাম্পের ছেলেমেয়েদের নিজের নিজের ক্লাইমবিং ইকুইপমেন্ট নিয়ে ক্যাম্পে যোগ দিতে বলা হয়েছিল। বহু ছেলেমেয়ে যথেষ্ট দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও সরঞ্জামের জন্য ভাল ফল করতে পারেনি। বহু অভিযান বেহাল হয়ে পড়ে এই নিম্ন মানের সাজ সরঞ্জামের জন্য।

"সরকারি উদ্যোগে ইকুইপমেন্ট যোগাড় করা খুব একটা কষ্টকর নয়। বিদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় প্রচুর ছাড় দিয়ে পর্বতারোহণ সরঞ্জাম বিক্রি করে। সব সরঞ্জামই অত্যন্ত আদরের এবং সর্বাধুনিক বলে গণ্য হবে। সেইজন্য সরকারি উদ্যোগে কিছু সরঞ্জাম আমদানির ব্যাপারে যত্ন নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।"

হঠাৎ স্বল্পভাষী গোমবু মুখ খুললেন, "পর্বতারোহণের ব্যাপারে আমাদের ছেলেমেয়েদের নজর কিন্তু অত্যন্ত নীচে নামছে। ষাট বা সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গে কিংবা ভারতবর্ষে বেশ কিছু ভাল ভাল এক্সপিডিশন হয়েছিল। এখন দেখি, নতুন কিছু বা ভাল কোনও পিক্-এ যাওয়ার তেমন ঝোঁক নেই। একই পিক্-এ ঝাঁকে ঝাঁকে এক্সপিডিশন হচ্ছে। এমন কি আঠারো উনিশ হাজার ফুটের ভার্জিন পিক-এ সাফল্য লাভ করেই পর্বতারোহীরা গুলি ফোলাচ্ছে। অথচ, উচ্চতাই হিমালয়ের আসল চ্যালেঞ্জ এবং উচ্চতার জন্যই সারা পৃথিবীর পর্বতারোহীদের কাছে হিমালয়ের শৃঙ্গগুলির এত কদর।"

এই প্রসঙ্গে দোরজি লাটুরও কিঞ্চিৎ উষ্মা লক্ষ করলাম। তাঁর ভাষায়, "কেদার ডোম বা থেলু কোটেশ্বরে দলে দলে পর্বতারোহীরা কেন যায় বুঝে পাই না। কি আছে ওই দুটি পিক-এ! সতর্কভাবে বরফের উপর হেঁটে যাওয়া ছাড়া ওই দুটি শৃঙ্গের চূড়ায় পৌঁছনোর জন্য আর কোনও কৌশল বা দক্ষতার প্রয়োজন আছে কি? আমার নিজের কথাই ধর না কেন। অক্সিজেনের নল নাকে পুরে এভারেস্ট চড়া আমার কাছে নিতান্ত সাদামাটা ব্যাপার বলেই মনে হয়েছে। শারীরিক সুস্থতা এবং মানসিক ভারসাম্য বজায় রেখে মাইলের পর মাইল হেঁটে যাওয়াই ওখানে প্রয়োজন। কিন্তু নন্দাদেবী, নন্দাদেবী ইস্ট বা চোমালহারী শৃঙ্গে পৌঁছতে, আমার প্রাণশক্তি প্রায় নিঙড়ে নিয়েছিল হিমালয়। সামান্য প্রতিবন্ধকতা না থাকলে পাহাড় চড়ায় আনন্দ কি! আর আনন্দ না পেলে সেরকম কোন ব্যাপারে আমরা টাইম এবং এনার্জি নষ্ট করবই বা কেন? এটা তো আমাদের ছেলেমেয়েদের পেশা নয়, যে কোন উপায়ে বা যে কোন কৌশল বা চালাকীর দ্বারা তাই করতে হবে? দুঃখ পাই যখন শুনি আমাদেরই ছাত্ররা অকালে হিমালয়ে হারিয়ে যায়। হয়ত, যথার্থ প্রস্তুতি বা শিক্ষা নিয়ে তারা বড়

পাহাড়গুলিতে অভিযান করতে যায় না। অবশ্য অভিযোগ কাদের সম্বন্ধেই বা করব! ১৯৮৫-র সামরিক বাহিনীর এভারেস্ট অভিযানে কি হল? পাঁচ পাঁচটা প্রাণ চলে গেল। অথচ, প্রস্তুতির কোনও ত্রুটি ছিল না। সমস্ত সামরিক বিভাগ থেকে ছেঁকে বাছা হয়েছিল পঁচিশজন বাছা অভিযাত্রী আর তাদের সাপোর্ট ক্লাইমবার হিসাবে ছিল, আরও জনা পঁচিশেক অভিযাত্রী। পুরো অভিযানটাই বেহাল হয়ে পড়ল। আসলে পরিচালন ব্যবস্থাটাই নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। কোথায় যেন সামঞ্জস্যের অভাব ঘটেছিল।"

বিনা অক্সিজেনে উচ্চতর পর্বতারোহণ সম্বন্ধে গোমবুর মন্তব্য, "নিঃসন্দেহে এটা মানুষের অতিমানবীয় প্রচেষ্টা এবং অসাধারণ দক্ষতার প্রমাণ। তবে আধুনিক পর্বতারোহণে এটা কিছুটা পেশাদারী চটক। হিমালয়ের সব কটি নামী এবং উচ্চতম শৃঙ্গগুলি ইতিমধ্যেই আরোহিত। কাজেই চমক এবং চটক আনতে এখন নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে বিদেশী পর্বতারোহীদের মধ্যে। ভয়ঙ্কর এবং অতিমানবীয় প্রচেষ্টায় একে অপরকে, এক জাত অন্য জাতকে টেক্কা মারতে চাইছে। আমাদের দেশে কিছু শেরপা-ইনসট্রাক্টর বা শেরপা এবং গাড়োয়াল, কুমায়ুন এবং হিমাচলের অধিবাসী ছাড়া পর্বতারোহণ কারোই পেশা নয়। কাজেই, ওই অসম প্রতিযোগিতায় আমাদের মেতে ওঠার কি প্রয়োজন? যথার্থ প্রস্তুতি ছাড়া ওই প্রচেষ্টায় মেতে উঠলে বিপদ ডেকে আনা হবে।"

গোমবু এই পৃথিবীর প্রথম পর্বতারোহী যিনি দুবার এভারেস্টের চূড়ায় উঠেছিলেন। তাঁর এই রেকর্ড এক যুগেরও বেশি কাল ভাঙা যায়নি। নিজের এভারেস্ট ডাবল সম্পর্কে গোমবুকে প্রশ্ন করেছিলাম—একবার এভারেস্ট আরোহণ করেই তিনি ইতিহাসে স্থান পেয়েছিলেন বা বাস্তব জীবনে সু-সময়ের হদিশ পেয়েছিলেন, তাহলে ওই ভয়ঙ্কর ঝুঁকি দ্বিতীয়বার তিনি নিয়েছিলেন কেন? একটুও চিন্তা না করেই গোমবু জবাব দেন, "প্রথমবার এভারেস্ট গিয়েছিলাম সম্পূর্ণভাবে নিজের জন্যে। আর দ্বিতীয়বার যাই আমার দেশের জন্যে, ভারতবর্ষের জন্যে। আমেরিকানরা যখন ডাকে তখন ভেবেছিলাম এভারেস্ট চড়ে নিজের গৌরব এবং সম্মান বাড়াব, আসবে সম্মান এবং সুসময়। দ্বিতীয়বার ১৯৬৫ সালে ভারতীয় এভারেস্ট অভিযানের সঙ্গী হয়েছিলাম এই ভেবে যে, দেশের গৌরবের জন্য কিছু করা আমার নৈতিক কর্তব্য। চোমোলুঙমাকে ধন্যবাদ, আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছিলেন।

"অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন, বেসামরিক বা বেসরকারি প্রচেষ্টায় এভারেস্ট বা কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান বা আরোহণ সম্ভব কিনা? আমার জবাব, কেন সম্ভব নয়। প্রথম প্রয়োজন টাকার। সেটা মেটাতে পারলে বাকিগুলো করে নেওয়া খুব একটা অসম্ভব নয়। অভিযাত্রীদের চাই যথার্থ ট্রেনিং, শারীরিক পটুতা, মানসিক সবলতা এবং সর্বোপরি আন্তরিকতা। ওই সমস্ত বড় শিখরগুলির জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি মেটানোর জন্য কয়েক বছরের নিবিড় পরিকল্পনা দরকার। তারপর সেই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য চাই অর্থ এবং সত্যিকারের পর্বতারোহী মনোভাব। তোমরা, পশ্চিমবাঙলার ছেলেমেয়েরা বড় কিছুর কথা ভাবছ না কেন? আই অ্যাম সিওর, ইউ ক্যান ডু ইট। তবে এর জন্য একটা দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা দরকার। হ্যাপাজার্ড ভাবে এগোলে চলবে না। স্তরে স্তরে, ধাপে ধাপে নিজেদের উচ্চতর আরোহণের জন্য তৈরি করতে হবে। কোনও পর্বতে সাফল্য বা অসাফল্য কোনও ব্যাপার নয়, সেই অভিযান থেকে কতটা শিক্ষা লাভ হল, সেটাই লক্ষ্য রাখতে হবে। সাফল্যে তারিফ জোটে ঠিকই কিন্তু ব্যর্থতার জন্য কোন ফাইন দিতে হয় না কাজেই মিথ্যা বলার কি দরকার বুঝি না। পুরো ব্যাপারটা ঠিকমত উপলব্ধি করতে হবে, কেন পাহাড়ে যাই এবং তার থেকে আমি কি পাই। একটু খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে অ্যামেচার পর্বতারোহীদের কাছে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভালবাসার। তাহলে ভালবাসায় মিথ্যার স্থান কোথায়?"

গোমবুর কথার খেই ধরে লাটু বলতে শুরু করলেন, "প্রপার ট্রেনিং এবং ডিভোশন মানুষকে কত বড় কাজ করতে এগিয়ে দেয়, তার প্রমাণ প্রথম ভারতীয় মহিলা এভারেস্ট আরোহিণী, বাচেন্দ্রীপাল। এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছনোর আগে ও মাত্র একুশ হাজার তিনশ' ফুট উচ্চতায় উঠেছিল। তবে ওর শারীরিক পটুতা ছিল অসাধারণ, আর ছিল দৃঢ় প্রত্যয়। ট্রেনিং এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের (এভারেস্টের অনুযায়ী প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে) সঙ্গে অভ্যস্ত করতে ১৯৮৪-র অভিযানের আগে ছ'টি ক্যাম্প করা হয়েছিল। ট্রেনিংয়ের প্রশ্নে আমার প্রচুর দায়িত্ব ছিল। দীর্ঘকাল প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করার জন্য ওই বিষয়ে যথার্থ সাহায্য করা আমার পক্ষে সম্ভব এবং এ বিষয়ে যে কোন অভিযাত্রী বা সংস্থাকে সাহায্য করতে আমি সবসময়েই রাজী।"

গোমবু হাসতে হাসতে বললেন, "একটা ব্যাপার কিন্তু সকলের নজর এড়িয়ে গিয়েছে। প্রথম বছরের 'তেনজিং নোরগে অ্যাওয়ার্ডটা' তেনজিং নোরগের পরিবারেই চলে গেল। আমি তেনজিংয়ের ভাগনে। আর লাটুর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অত্যন্ত মধুর, আমরা শালা-ভগ্নীপতি। তেনজিংকে অমর করতে পশ্চিমবঙ্গবাসী সম্মান জানালো তাঁর পরিবারকে। আমরা জানাচ্ছি, আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।"প্রেম

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পুরস্কার হাতে লাটু দোরজি এবং নাওয়াং গোমবু ছবি: রাজীব বসু

সাইনি ফিল্মে ?

সোল থেকে ফেরার পর অতি সম্প্রতি ফিল্মে নামার অফার পেয়েছেন সাইনি আব্রাহাম। অফারটি

দিয়েছেন এক মালয়ালাম ছবির পরিচালক। সাইনির বাবা জানিয়েছেন, চিত্রনাট্য পড়ে যদি তাঁর পছন্দ হয় তাহলেই মেয়েকে ছবি করতে দেবেন। তবে অ্যাথলেটিকস জীবন ক্ষতিগ্রস্ত করে ছবির কাজ কিছুতেই নয়। সম্ভাব্য এই ফিল্মটির গল্প এক অ্যাথলিট ও তার কোচকে নিয়ে।
এদিকে বাস্তব জীবনে নিজের কোচ না থাকায় সাইনি রীতিমতো সমস্যায় পড়ে গেছে। গত ছ' মাস শ্রীরাম সিং তাকে কোচ করেছেন বটে কিন্তু যেভাবে আলাদা করে নাম্বিয়ার সময় দেন উষাকে বা কুট্টি বালসাম্মাকে, সেই মনোযোগটা শ্রীরামের কাছ থেকে সাইনি পায় না। সাইনিকে প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন কোচ জেবাম্পিয়া। সাইনি চায়, তাঁর সাহায্য পেতে। কিন্তু তাও সম্ভব হচ্ছে না। যেহেতু এফ সি আই-এর অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার সাইনিকে চাকুরিসূত্রে থাকতে হয় ত্রিবান্দ্রম আর গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী জেবাম্পিয়া থাকেন কোট্টায়মে।

ইংরেজের মুখে

ইংরেজের মুখে আর্জেন্টিনীয়র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। ভাবাই যায় না। গ্যারি লিনেকার কিন্তু তাই করেছেন। দারুণ প্রশংসা করেছেন দিয়েগো মারাদোনার। লিনেকার মেক্সিকো বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা। সপ্তাহ দুয়েক আগে উত্তর আয়ার্ল্যান্ডের বিপক্ষে তাঁর একটি দুর্দান্ত গোল দেখে ব্রিটিশ সাংবাদিকরা লিখেছেন, লিনেকার এখন বিশ্বসেরাদের অন্যতম।
অত্যন্ত বিনয়ী এবং ভদ্র, পঁচিশ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার কিন্তু মানতে চান না। লিনেকার বলেছেন, "দয়া করে বিশ্বসেরাদের মধ্যে আমাকে ধরবেন না। সেরা একজনই—মারাদোনা। আমি বড়জোর গোল করতাম [illegible] কিছু [illegible] মারাদোনার মতো [illegible] দুর্দান্ত নই। ও যা করে তাই করতে পারে। [illegible] ডিফেন্ডারদের কাটিয়ে গোল করার ক্ষমতা আমার নেই। মারাদোনা যা অনায়াসে করতে পারে। ও সেরা এবং ওর ধারেকাছেও কেউ নেই। দৃশ্যটা ঠিক এরকম। অন্তত আমার কাছে।"

আজ কেন এই অবস্থা

সোল এশিয়ান গেমসে ভারত ছিল তৃতীয় স্থানে আর বিশ্বকাপ হকিতে একেবারে সবার নিচে। চ্যাম্পিয়নস কাপ ট্রফিতে যোগ দেবার যোগ্যতাই তারা অর্জন করতে পারেনি।

ধ্যানচাঁদের সময় যে ইউরোপীয়রা ভারতীয় হকির মধ্যে প্রাচ্যের রহস্যময়তা দেখতে পেত তারাই আজ রহস্যটুকু হরণ করে ভারতকে ধুলোয় বসিয়ে দিয়েছে। কেউ বলেন, ভারত কোনদিনই আহামরি কিছু হকি খেলত না। অন্য দেশগুলো তখন সবে হকি ধরেছে বলে তারা খেলত আরও খারাপ। এবং তাই ভারতের প্রকৃত অবস্থাটা চোখে পড়ত না।

ভারতের হকি মান যে ক্রমশ তলানিতে ঠেকছে প্রাক্তন অলিম্পিয়ান গুরুবক্স সিং এতে দুঃখিত কিন্তু একেবারেই বিস্মিত নন। গুরুবক্সের বক্তব্য, এমনটাই

হবার কথা। কেন হবার কথা তা তিনি চমৎকার বিশ্লেষণ করলেন।
"দুটি কৃত্রিম সারফেস আছে গোটা ভারতে। একটি দিল্লির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে অন্যটি পাতিয়ালায় (এর মধ্যে পাতিয়ালারটি প্রায় অচল)। পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া বা পশ্চিম জার্মানিতে এই টার্ফ আছে প্রায় পঞ্চাশটি। কি অদ্ভুত বৈপরীত্য। সেখানে স্কুল পর্যায় থেকে ছেলেরা কৃত্রিম সারফেসে খেলার টেকনিক রপ্ত করছে আর এখানে জাতীয় দলে নির্বাচিত হবার পর প্রথম সুযোগ মেলে অ্যাস্ট্রোটার্ফে খেলার। কোনদিন যে এই সারফেসে খেলেইনি তাকে ওই কদিনের অনুশীলনে খেলার স্বাভাবিক ছাঁচকে ভাঙাভাঙি করতে হয়। বেশির ভাগ খেলোয়াড়ই তা পারে না।"
গুরুবক্স জানালেন, ৭৬-এ মন্ট্রিয়েল অলিম্পিক চলার সময় একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেয়েছিল স্বাভাবিক ঘাসের মাঠে প্রকৃত খেলার সময়টুকু হচ্ছে ঠিক তিরিশ মিনিট। বাকি সময় হয় বল মাঠের বাইরে নয়তো 'ডেড' অবস্থায় থাকে। পাশাপাশি কৃত্রিম সারফেসে খেলার প্রকৃত সময় আরও আঠার মিনিট বেশি—আটচল্লিশ মিনিট। ফলে এ ধরনের মাঠে খেলতে হলে বেশি স্ট্যামিনা ও দুর্দান্ত ফিজিক্যাল ফিটনেস থাকা দরকার, যাতে ইউরোপিয়ানরা বরাবরই এগিয়ে।
গুরুবক্সের কথা থেকে যা বোঝা গেল, কৃত্রিম সারফেসে খেলার অনভিজ্ঞতাই এই বিপর্যয়ের মূল কারণ। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক, বর্তমানের প্রশিক্ষক বললেন, দেখুন এখন শতকরা নব্বই ভাগ আক্রমণ হয় লম্বা হিট বা ওভারহেড স্কুপে। সেখানে আমাদের ছেলেরা ডিফেন্সে ফাঁক সৃষ্টি করে খুচখাচ এদিক ওদিক পুশ করে। লম্বা হিটের খেলা এখানে আমরা খেলতে শিখিনি, আর শিখবই বা কি করে? স্বাভাবিক ঘাসের মাঠ তো অসমান। সেখানে লম্বা হিটের খেলা চলে না।"
আধ ঘন্টার এই সাক্ষাৎকারে আরও কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া গেল। যেমন অ্যাস্ট্রোটার্ফ সারফেস আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। এখন বড় টুর্নামেন্ট খেলা হয় পলিগ্রাস নয়তো সুপারটার্ফে। অথচ ভারতে যে দুটি কৃত্রিম ঘাসের মাঠ আছে, দুটিই অ্যাস্ট্রোটার্ফ। যে মাঠ প্রকৃতিগতভাবে পলিগ্রাস বা সুপারটার্ফের চেয়ে আলাদা।
গুরুবক্স বলেন, "ইউরোপীয়দের কাছ থেকে আমাদের হকি শেখার কোনও প্রয়োজন নেই। আমাদের কি দরকার জানেন? কৃত্রিম সারফেসে নিজেদের হকিটা খেলতে শেখা।"

গৌতম ভট্টাচার্য

মারাদোনা-প্রহরী

এই নামটা মনে করতে পারেন, লোথার ম্যাথিয়াস? এত শিগগির অবশ্য ভুলে যাবার কথা নয় জার্মান এই ফুটবলারটিকে।
অন্য সব ম্যাচগুলোর মতো মারাদোনা একাই খেলবেন, যথেচ্ছভাবে তছনছ করে দেবেন জার্মানদের—এত সব আগে ধরে নিয়ে আমরা বিশ্বকাপ ফাইনালের দিন টি ভি-র সামনে বসেছিলাম। যা দেখা গেল তা হচ্ছে বিরক্তিকর এই ম্যাথিয়াস লোকটা সারাক্ষণ গায়ে গায়ে থেকে এবং ভয়ঙ্কর সব রক্তিট্যাকল করে মারাদোনাকে মারাদোনাই হতে দিল না। গতি হেরফের করার অসম্ভব ক্ষমতায় বিশ্বের অন্যান্য ডিফেন্ডারদের ফাঁকি দিয়েছিলেন মারাদোনা। কিন্তু ম্যাথিয়াসকে পারলেন না। যেহেতু ম্যাথিয়াসও প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন। শুনলে অবাক হবেন এই ম্যাথিয়াস কিন্তু আসলে ডিফেন্ডার নন নির্ভেজাল স্ট্রাইকার। বুন্দেশলিগাতে (জার্মানির জাতীয় ফুটবল লিগ) আই এফ সি কোলন গোলের জন্য মারাত্মকভাবে নির্ভর করত তাঁর ওপর।
দুবছর আগে জাতীয় দলে এসেছেন ম্যাথিয়াস। একটু দেরিই হয়েছে, কেন না বয়েস এখন বত্রিশ। ফিজিক্যাল ফিটনেস অবশ্য এতই ভাল রেখেছেন যে আগামী বিশ্বকাপও খেলার আশা রাখেন। এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন ছত্রিশটা। ম্যাথিয়াসের আদর্শ ফুটবলার পল ব্রাইটনার। বলেন, "আমি ব্রাইটনারের মত হতে চাই। ব্রাইটনার যখন জার্সির হাতা গুটিয়ে মাঠে দাঁড়াতেন একটা শিহরন খেলে যেত দলের বাকিদের মধ্যে।

চি ত্র ক লা

ধ্যাননিমগ্ন নিসর্গ

সম্প্রতি অ্যাকাডেমি অভ ফাইন আর্টসে প্রদর্শিত হল সত্যেন ঘোষালের তৈলচিত্র যার বিষয় প্রকৃতি। প্রবীণ এই শিল্পী অতি নিষ্ঠার সঙ্গে গত কয়েক বছর ধরেই রূপময় প্রকৃতির বিচিত্র চিত্রকল্প রচনা করছেন বিমূর্ত শৈলীতে। প্রকৃতি বিষয়ে তাঁর চিত্রকলার এটি পঞ্চম প্রদর্শনী।

প্রকৃতির যে রূপকে শিল্পী পটে দৃশ্যায়িত করার চেষ্টা করেন তার চরিত্র অভ্যন্তরীণ, আত্মস্থ, চিন্ময় এবং এক অরূপ সত্তায় প্রোজ্জ্বল। তাই তাঁর চিত্রমালার সাধারণ নাম ধ্যানী প্রকৃতি। রূপাতীত নিরাবয়ব প্রকৃতি-সত্তাকে রূপ ও রূপবন্ধে ধরার জন্যে শিল্পীকে বিমূর্ত রচনাশৈলীর ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। কিন্তু সাধারণত বিমূর্ত চিত্রকলা বলতে যা মনে আসে—অতি আধুনিক পাশ্চাত্য নিদর্শনসহ—সেই রকম বিমূর্ত ছবি শিল্পী আঁকেন না। রঙ, তুলির আঁচড় সাদৃশ্যহীন অবয়ব আর পটের জমি নিয়ে সুপরিকল্পিত বা প্রেরণাতাড়িত তাৎক্ষণিক খেলায় রচিত বিমূর্ত চিত্রকল্প এই সব ছবিতে নেই। অতি মনোজ্ঞ প্রকরণগত নৈপুণ্য, অতি পরিশীলিত, সূক্ষ্ম বর্ণপ্রয়োগ এবং প্রাকৃতিক অবয়বের বর্ণ ও আকৃতিগত অনন্ত বৈচিত্র্য সম্পর্কে শিল্পীর গভীর মনন এবং মিস্টিক ও কল্পনাধর্মী অনুভবের পরিচয় আছে প্রদর্শিত ছবির অনেকগুলিতে। প্রতিটি চিত্রকল্প গড়ে উঠেছে এমন সব ত্রিমাত্রিক অবয়ব নিয়ে যাদের মধ্যে লক্ষণীয় সাদৃশ্য আছে নানা প্রাকৃতিক বস্তুর। শুক্তি, উপল, প্রবাল, বহুবর্ণ রত্ন বা রত্নাভ পাথর, শিলীভূত জলজ উদ্ভিদ বা প্রাণী, বহুরন্ধ্র স্পনজ প্রভৃতি এই সব চিত্রকল্পের প্রধান উপাদান।

কয়েকটিতে আছে অন্ধকার গুহায় সুবিন্যস্ত রত্নপ্রভ পাথর, পাথরের টুকরো, নানা রঙের রত্নখচিত উজ্জ্বল বড় বড় ফুলের মত, ছত্রাক বা ভ্রূণসহ গর্ভকোরকের মত অবয়ব এবং অসংখ্য ছিদ্রময় ছোট বড় স্তূপাকৃতি বস্তুর ছবি।

কিন্তু দৃশ্যময় নিসর্গ বা নিসর্গবস্তুর কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকলেও অধিকাংশ চিত্রকল্পে এক অপার্থিব, দৃশ্যাতীত প্রাণসত্তার ব্যঞ্জনাই প্রবল, যা দর্শককে প্রথমে এক স্নিগ্ধ দৃষ্টিনন্দন আবেদনে আকৃষ্ট করে বটে, কিন্তু ক্রমেই সঙ্গীতের মত দর্শকের বোধ, চেতনা ও কল্পনাশক্তিকে প্রসারিত করে এবং আবিষ্ট করে এক বিশুদ্ধ

ধ্যাননিমগ্ন

নান্দনিক অভিজ্ঞতায়। এমন নয় যে ছবিতে ছবিতে এই অভিজ্ঞতার তারতম্য ঘটে না বা সব ছবির সামনে দাঁড়িয়েই প্রাথমিক ইন্দ্রিয়বেদ্য অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যায়। দু-একটি ছবিতে মানুষের মুখের সাদৃশ্যযুক্ত (এক ও পাঁচ নং) অবয়বগুলি কেবল এক অলৌকিক অনুভূতি জাগায়।

শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলিতে (চার, দশ, এগার, দুই, বার, সাত, নয়, সতেরো এবং তিন নং ছবি) শিল্পী তাঁর ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছেছেন মূলত আশ্চর্য বর্ণবিন্যাস ও বর্ণপ্রলেপের নৈপুণ্যে। সূক্ষ্মতায়, বিন্যাসে, উজ্জ্বল নরম, গাঢ় হালকা নানা মিশ্র, হৃদয়বেদ্য রঙের ছায় বৈচিত্র্যে সাদৃশ্যধর্মী অবয়বের কঠিন বাস্তবতা ও ত্রিমাত্রিক ঘনত্বের প্রাখর্য হ্রাস পেয়েছে। বর্ণপ্রলেপের বিশেষ প্রকরণে শিল্পী এমন সূচারু ঘন বুনট রচনা করেন যে চিত্রকল্পের আবহে এক বিমূর্ত দৃশ্যাতীতের ব্যঞ্জনা এসে যায়। কিন্তু তাঁর ছবিতে মিস্টিক অভিব্যক্তির প্রধান উৎস এক অপার্থিব দ্যুতিময় অবয়বের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা যা প্রতি পটের দৃষ্টিকেন্দ্র জুড়ে থাকে।

কোথাও তার প্রধান রঙ আরক্ত কমলা (তিন) কোথায় হরিদ্রাভ (দশ) কোথাও আলো বিচ্ছুরিত তুষার শুভ্র (নয়), কোথাও বৈদূর্য মণির মত (দুই) স্বচ্ছ নীল।

মনসিজ মজুমদার

সং গী ত

অক্সফোর্ড মিশনের অর্কেস্ট্রা

বেহালার অক্সফোর্ড মিশনের ছেলেদের বাক, বেটোফেন বাজাতে দেখলে আমার বুক আনন্দে ভরে ওঠে। মনে হয় বলি কিপলিং সাহেব, আপনি ভুল লিখেছিলেন—"East is East and West is West and the twain shall never meet." রাজা সিংয়ের ভায়োলিন, তরুণ মণ্ডলের চেলো, স্যামুয়েল মণ্ডলের ভিয়োলা, ও অনন্ত মাখালের কন্ডাকটিংয়ের মাধ্যমে, আরো অনেক অক্সফোরড মিশনের তরুণ যুবকের হাতে বাকের জগৎ বেঁচে থাকবে এই শহরে। সেটাই বাঞ্ছনীয়। আজকাল কলকাতায় কালেভদ্রে বড় অর্কেস্ট্রা আসে। ভাল চেম্বার-অর্কেস্ট্রা, বা স্ট্রিং কোয়ারটেট আসা তো প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। ইয়োরোপিয়ান ক্লাসিকাল মিউজিকের রেকর্ডও প্রায় নেই। কলকাতার নিজস্ব অর্কেস্ট্রা, যাকে আমরা ছোটবেলা থেকে 'ক্যালকাটা সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা' বলে জানি তা ভেঙে গিয়েছে। সেদিন (২২ অগাস্ট) সান্ড্রে হলে (Sandre Hall) অক্সফোর্ড মিশনের তিন অর্কেস্ট্রার সন্ধান পেয়ে তাই আমার মন ভরে উঠেছিল উৎসাহে। এই মিশনের অর্কেস্ট্রার কনডাকটার অনন্ত মাখাল ও অর্কেস্ট্রার সদস্যরা সাদামাটা বাঙালি। কিন্তু বিদেশী সঙ্গীতের আসল মণি-মাণিক্যের সন্ধান তাঁরা রাখেন। এবং আশা করা যায় একদিন তাঁরা এই শহরকেই একটি পুরোপুরি সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা উপহার দেবেন। একটি চেম্বার অর্কেস্ট্রা।

এই অর্কেস্ট্রা তৈরির পিছনে ফাদার থিওডোর ম্যাথিসান তাঁর জীবনের প্রায় চল্লিশ বছর দান করেছেন। সেদিন তিনি সান্ড্রে হলে উপস্থিত থাকতে পারেননি। থাকলে তপন মণ্ডলের চেলো বাজানো তাঁর ভালই লাগত। তপনের চেলোর মধ্যে এক নিজস্ব, নিটোল আওয়াজ তার নিপুণ টেকনিকের পরিচয় দিল। মনে পড়ে গেল যে ম্যাথিসান নিজে ভাল চেলো বাদক। বাকের আরিওসাতে তাঁর চেলো বাজানো মনে লেগে থাকবে। তপন ছাড়া স্যামুয়েল মণ্ডলের ভিয়োলা (মোরটজারট ও সুবারটের প্রিয় বাদ্যযন্ত্র) এবং রাজা সিংয়ের বেহালা সেদিনের কনসার্ট মাতিয়ে রেখেছিল।

অনন্ত মাখাল সেদিনের প্রোগ্রাম তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন। প্রথমে অক্সফোর্ড মিশনের ছোটরা অর্থাৎ জুনিয়ার অক্সফোর্ড মিশন অর্কেস্ট্রা বাজাল হ্যানডেলের কিছু সুন্দর কিন্তু হালকা কাজ। তারপর এল আসল অক্সফোর্ড মিশন অর্কেস্ট্রা এবং তাতে ছিল বাক, সুবারট ও টেলেমানের রচনা। বিরতির পরে কন্ডাকটার নিজে এলেন অর্কেস্ট্রাতে। তৈরি হল একটি ছোট্ট চেম্বার-অর্কেস্ট্রা এবং বেজে উঠল হায়ডেন, মোরটজারটের

সেরানেড যাকে হালকা চালের মজলিসি বাজনা বলা যেতে পারে। এই ধরনের বাজনা ঠিকভাবে পরিবেশন করা কিন্তু খুব সোজা নয়। আমার মনে হয় কয়েক বছরের মধ্যে এরা বেশ ভাল ভাবেই তৈরি হয়ে যাবে।

কিশোর চট্টোপাধ্যায়

নবীন কয়েকজন

রবীন্দ্রসংগীত জগতে সংগীতশিল্পী হিসেবে কমবেশি পরিচিত কয়েকজন নবীন-নবীনার গাওয়া গানের সম্ভারে 'খোয়াই' সাজিয়েছিলেন এক রবীন্দ্রসংগীত সন্ধ্যা ভারতীয় ভাষা পরিষদ মঞ্চে। প্রারম্ভিক পর্বে নবীন

রমা মন্ডল

শিল্পী এবং অনুষ্ঠানের জন্য দেয় কর সংক্রান্ত কিছু কথাবার্তা ছিল সংস্থা-পক্ষে সুভাষ রায়ের স্বল্প ভাষণে।

সংগীতানুষ্ঠানের প্রথম শিল্পী দেবাশিস রায়। ক্রমোন্নতির ছাপ তাঁর সমগ্র অনুষ্ঠানে। 'তুমি এপার ওপার কর' কিংবা 'সেই তো আমি চাই'-এর তুলনায় ধ্রুপদাঙ্গ 'দাঁড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে' গানে তিনি স্বচ্ছন্দতর। তাঁর 'তারো তারো হরি'-ও সুগীত। তবে গান-নির্বাচনে তাঁকে হতে হবে আরও সতর্ক। যেমন সেদিন বাদ দেওয়া যেতে পারত 'কি ধ্বনি বাজে'। সূক্ষ্ম সাংগীতিক অলংকরণ সমৃদ্ধ এই গানটি সুবিচার পায়নি তাঁর কণ্ঠে।

পূজা পর্যায়ের চারটি সুচয়িত গানের দীপ্ত সুরেলা পরিবেশন: রমা মণ্ডলের অনুষ্ঠান সম্পর্কে এই কথাটিই বলতে হয়।

ভাস্বতী মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে একটা ঔজ্জ্বল্য আছে। তাঁর 'আজি গোধূলি লগনে' কিংবা 'সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি' যথাযথ আবেদন রাখল। তবে 'আমার না বলা বাণীর' গানে একটু আড়ে গাওয়ার প্রবণতা ছিল যা তাঁর আগের কোন অনুষ্ঠানে লক্ষ্য করা যায়নি।

কণ্ঠের আওয়াজটি শ্রবণসুখকর সুব্রত সেনগুপ্তের। সেই কণ্ঠগুণে আর পরিচ্ছন্ন পরিবেশনে 'বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে' কিংবা 'কে উঠে ডাকি' উল্লেখযোগ্যতা পায়। কিন্তু 'অধরা মাধুরী ধরেছি' গানে স্থায়ীতে গাইলেন '...সুদুর রাতের পাখি/গাহে সুদুর রাতের গান'। সঠিক গীতরূপটি হল: 'সুদুর প্রাতের পাখি/গাহে সুদুর রাতের গান'। আর যদি সঠিক গেয়েও থাকেন তাহলে বুঝতে হবে উচ্চারণে ত্রুটি আছে। অর্থাৎ বলছেন 'প্রাতের', শোনাচ্ছে 'রাতের'।

অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূলধন তাঁর সাবলীল সজীব গায়নভঙ্গী। কিন্তু সেদিন যেন বড় তাড়াহুড়ো করে গাইলেন চারটি গান, তাছাড়া তারসপ্তকেও একটু অস্বাচ্ছন্দ্য ছিল। পরিচ্ছন্নরূপে এল তাঁর 'তব প্রেম সুধারসে' গানটি। 'আমি তোমার সঙ্গে' গানে হসন্তযোগে উচ্চারণ করলেন 'ফাল্গুনের', স্বরলিপি অনুযায়ী উচ্চারণটি হবে ও-কারান্ত।

সেদিন যন্ত্রানুষঙ্গে ছিলেন বিপ্লব মণ্ডল, রামগোপাল পাইন, আশিস দাস, অংশুভ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পঞ্চানন বড়াল।

সম্প্রতি এক জলসায়

প্রবেশপত্রের সঙ্গী ছিল অশুদ্ধ বাংলায়—ভুল বানানে জর্জরিত একটি হস্তলিখিত আমন্ত্রণমূলক চিঠি, তা দেখেই আগাম অনুমান করা গিয়েছিল 'স্বাগতম মিউজিক্যাল' গ্রুপের অনুষ্ঠানের মান সম্পর্কে। মিথ্যে হয় নি অনুমান। ইদানীং পাড়ায়-পাড়ায় সচরাচর যেসব জলসা হয়ে থাকে তারই অনুরূপ একটি বিচিত্রানুষ্ঠান দেখা-শোনার সুযোগ ঘটল যুবকেন্দ্রে।

আগেকার দিনে পাড়ার জলসায় বাংলা গানের স্বনামধন্য শিল্পীরা অংশ নিতেন আর বাংলা আধুনিক গানও তখন যথেষ্ট সম্পন্ন ছিল। ইদানীং পাড়ার জলসার চরিত্র বদলেছে। এখন নকল গায়ক-গায়িকার যুগ। কিশোরকুমার-অমিতকুমার- মান্না দে- রফি কিংবা লতা-আশার অক্ষম অনুকরণে সিদ্ধ অমুককুমার, মাস্টার অমুক কিংবা মিস্ তমুক বর্তমানে অধিকাংশ পাড়ার জলসার 'শিল্পী'। এই অনুষ্ঠানেও বাবলু সরকার, মুন্নাপ্রসাদ, মিলন রায়, দিব্যেন্দু দত্ত, রীতা সিনহা কিংবা রতন বিশ্বাস খ্যাতনামা শিল্পীদের অক্ষম অনুকরণেই ব্যস্ত ছিলেন আর সঙ্গে অবশ্যই ছিল কর্ণপীড়ক যন্ত্রনিনাদ।

ক্যাসিও যন্ত্রটি তো বারবার ভুল করে সেদিন গীত সাম্প্রতিকালের বাংলা আধুনিক-সিনেমার গানকে বেসুরো সঙ্গ দিয়ে গেল। উপস্থিত শ্রোতারা অবশ্য বেশ উপভোগ করলেন এইসব নকল করে গাওয়া গান। জয়ন্ত বোস গিটারবাদনের অনুষ্ঠানে 'এই করেছ ভাল' রবীন্দ্রসংগীতটি বাজানোর পরই শুরু করলেন বাংলা সিনেমার অতি চটুল অঙ্গের গান 'আছে গৌর নিতাই নদীয়াতে'। তবে ভাল বলার মত দু-একটি অনুষ্ঠানও ছিল সেদিন। মরুভূমিতে মরুদ্যানের দেখা মিলেছিল পিয়াল ভট্টাচার্যের সপ্রাণ পরিশীলিত কবিতাপাঠে। মানিক মজুমদারের মূকাভিনয় প্রশংসনীয়। ভাল লাগল ছোটদের লোকনৃত্য। সন্দীপ মোহান্তের কবিতাপাঠে আন্তরিকতা লক্ষ্যণীয় তবে উচ্চারণে যত্ন নিতে হবে তাঁকে। প্রথম পর্বের এই-সব নানান কাণ্ড-কারখানার পর দ্বিতীয়ার্ধে রবীন্দ্রসংগীত অবলম্বনে নৃত্যগীতি আলেখ্য 'ঋতুরঙ্গ'। ঘোষিত হল অবশ্য 'চতুরঙ্গ' এবং এই ভুল পরে শুধরানো হয়নি। প্রযোজনাটিও অতি সাধারণ। একমাত্র উল্লেখ্য পিয়াল ভট্টাচার্যের গ্রন্থনা ও 'হিমের রাতে'-র সখী একক নৃত্যটি।

শেষে বলাই বাহুল্য যে এই অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাগতম মিউজিক্যাল গ্রুপকে স্বাগত জানানো গেল না।

স্বপন সোম

যন্ত্রসঙ্গীতের প্রভাতী আসর

ঝঙ্কার সঙ্গীতচক্র আয়োজিত ৫ অক্টোবরের প্রভাতী অনুষ্ঠানে নিখিল ঘোষ ও তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবান দুই পুত্র ধ্রুবজ্যোতি ও নয়ন ঘোষ তাঁদের সাঙ্গীতিক পরম্পরার একটি সুন্দর নিদর্শন রেখেছেন। স্বতন্ত্র ও সমবেত অনুষ্ঠান পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে এই তিন শিল্পী তাঁদের নিজ নিজ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রথম শিল্পী ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ সারেঙ্গীতে কোমল আশাবরী রাগ বাজিয়ে শোনান। গায়কী অঙ্গে পরিবেশিত বিলম্বিত একতালের বিস্তারাংশটি ছিল অপূর্ব সুরঋদ্ধ ও সুগভীর আবেদনসমৃদ্ধ। এই তরুণ শিল্পীর অনুভূতির আশ্চর্য সূক্ষ্মতা

নিখিল ঘোষ

রাগের বিশিষ্ট ভাবরূপটিকে সহজেই সুপ্রতিষ্ঠিত করে। একই সঙ্গে স্বরসঙ্গতির বুদ্ধিদীপ্ত প্যাটার্নের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগে তাঁর উদ্ভাবনীশক্তির বৈচিত্র্যও প্রস্ফুটিত হয়েছে। ঝাঁপতাল ও ত্রিতালে নিবদ্ধ পরবর্তী গৎ দুটিতে পরিবেশিত হয় বিচিত্র লয়কারী ও প্রথাধর্মী বোলবিন্যাস। তবে সারেঙ্গীর স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে যে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে শিল্পী অতি দ্রুত তানকারি ও ঝালা পরিবেশন করেন, তাতে তাঁর উৎকর্ষ ও ক্ষমতার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে। অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও বলিষ্ঠ তবলা সহযোগিতা করেছেন নয়ন ঘোষ। এঁরা দুজনেই তাঁদের সাঙ্গীতিক পরিবারের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

পরবর্তী নিবেদন ছিল তবলায় পিতাপুত্রের যুগলবন্দী অনুষ্ঠান; নিখিল ঘোষ ও নয়ন ঘোষ, এই শিল্পীদ্বয়ের সঙ্গে সারেঙ্গী ও হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেন ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ ও জোগলেকর। শ্রীনিখিল ঘোষ তবলার বিভিন্ন শৈলী ও আঙ্গিকের বিরাট রচনাসম্ভারের একজন সুপরিচিত সংগ্রাহক। তারই কিছু নির্বাচিত অংশ পরিবেশিত হয়েছে এই দিনের ত্রিতালভিত্তিক

ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ

লহরায়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো তাঁর গুরু আমীর হুসেন খাঁ ও ফররুকাবাদ ঘরানার কিছু প্রথাসিদ্ধ রচনা। এছাড়া সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে তিনি পঞ্জাব ও দিল্লী ঘরানার কিছু বিশিষ্ট আঙ্গিকেরও উপস্থাপনা করেছেন। সহশিল্পী নয়ন ঘোষের তবলাবাদন ছিল এই অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ। তাঁর অসাধারণ প্রকরণ নৈপুণ্যে অপেক্ষাকৃত বড় পরিধিযুক্ত তবলাতেও তিনি সুমধুর ও ভরাট ধ্বনি উৎপাদন করেছেন। পরিবেশনশৈলীর সার্বিক সৌন্দর্য, সাবলীলতা ও বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গীর বিচারে এই তরুণবাদক নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম।

বিনতা মৈত্র

ক্যা সে ট

লোকগীতি সম্ভার

পুজো মানেই নতুন জামা-জুতো আর রেকর্ড। এখন অবশ্য রেকর্ডের জায়গা নিয়েছে ক্যাসেট। রেকর্ডও প্রকাশিত হয়, তবে তুলনায় কম। তাছাড়া রেকর্ডিং কোম্পানি আর সেই এইচ এম ভি-কলম্বিয়া-হিন্দুস্থান-মেগাফোন-এ সীমাবদ্ধ নয়, ইদানীং নিত্য নতুন কোম্পানির দেখা মিলছে। যেমন 'সাগরিকা'। এবারের শারদীয়ায় তাঁদের নিবেদন লোকগীতির তিনটি ক্যাসেট। শিল্পীত্রয় : অমর পাল, উষা মঙ্গেশকর ও মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

অমর পালের ক্যাসেটটিই যে সর্বোত্তম এমত পূর্বধারণা অক্ষুণ্ণ থাকে ক্যাসেট তিনটি শোনার পর। বহুদিনের অভিজ্ঞ ও নির্ভেজাল লোকগীতি শিল্পী অমর পাল। বিভিন্ন লোকগীতি কখনই তার স্বাতন্ত্র্য, তার আঞ্চলিকতা হারায় না শ্রীপালের পরিবেশনে। আর তাঁর কণ্ঠটিও তো সোনা। ইদানীংকার শহুরে লোকগীতির হুজুগে তাঁর গাওয়া লোকগীতি অকৃত্রিম ও একমেবাদ্বিতীয়ম্। তাঁর গান সম্পর্কে এসব কথা যে নিছক কথাই নয় তা আবার হৃদয়ঙ্গম করা যায় ক্যাসেটটি শুনলে। 'বন্ধু কই রইলারে' শীর্ষক ক্যাসেটটিতে স্থান পেয়েছে বারটি লোকগীতি। সবচেয়ে ভাল লাগে 'ধলেশ্বরী নদীরে' (রচনা : পরেশ সাহা) গানটি। প্রাণবন্ধুর প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকা একটি মেয়ে তার মনের দুঃখ জানাচ্ছে নদীকে : এই নিয়েই গানটি। মেয়েটির ব্যাকুলিত হৃদয়ের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া যায় অমর পালের সহৃদয় পরিবেশনে। সব গান শোনার পরও গানটির রেশ ফুরোতে চায় না। 'বন্ধু যাইও যাইওরে' গানটি শুনতে-শুনতে চকিতে মনে উঁকি দিয়ে যায় শচীন দেববর্মনের কিছু বাংলা আধুনিক গান। লোকগীতিকে কি চমৎকার ব্যবহার করেছিলেন শচীনদেব বাংলা আধুনিক গানে সে কথাই মনে হয়। 'প্রভাতকালে' প্রচলিত সুরের গান। এই ধরনের সুরে অন্য গান শ্রীপালের কণ্ঠে আগেই শোনা গেছে। 'দেখেছি রূপসাগরে' গানটিও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ এই গানের সঙ্গে একাধিক রবীন্দ্রসঙ্গীতের মিল সুরের দিক দিয়ে লক্ষণীয়। অবশ্য এমন কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না যে এই গানটি ভেঙেই রবীন্দ্রনাথ 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি' বা এই ধরনের অন্যান্য গান রচনা করেছিলেন। উপরোক্ত গানগুলিতে এবং বাকী গানগুলিতেও অমর পাল তাঁর কণ্ঠের বিশিষ্ট, অনন্য আবেদন নিয়ে উপস্থিত। যন্ত্রানুষঙ্গেও বণিজ্যিকতার ছোঁয়া নেই। সুতরাং ক্যাসেটটি যে সংগ্রহযোগ্য-সেকথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

অমর পালের ক্যাসেট কভার

উষা মঙ্গেশকর মূলত আধুনিক গানের শিল্পী। 'সুন্দইরা নায়ের মাঝি' নামাঙ্কিত তাঁর লোকগীতি-ক্যাসেটটির অধিকাংশ গান সুর, যন্ত্রানুষঙ্গ, গায়নভঙ্গী সব মিলিয়ে ইদানীংকার বাজার চলতি শহুরে লোকগীতির চরিত্রটিকে শনাক্ত করে। শুধু প্রাচীন দুটি রচনা ('রাইত তুই যারে' ও 'বহুদিনকার পিরীত') কিছুটা আবেদন রাখে। 'সুজন বন্ধুরে' শিরোনামাঙ্কিত মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যাসেটটিতেও শহুরে লোকগীতিরই প্রাধান্য। সুরে-তালবাদ্য প্রয়োগে সেই 'কমার্শিয়াল টাচ'। তারই মধ্যে ভাল লাগে লালন ফকিরের 'মানুষ হইয়া জনম নিলাম'। বাকী গানগুলির অধিকাংশের গীতিকার সুরকার মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং।

স্বপন সোম

না ট ক

স্ত্রীর পত্র

মনস্ক নাট্যচর্চাতে কলকাতার বাইরের নাট্যদলগুলি পিছিয়ে নেই। এবছর অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবর্ষে রবীন্দ্র নাটক করার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। সমর্থ দলের ক্ষেত্রে তা শুভ কিন্তু অসমর্থ দলের ক্ষেত্রে তা অশুভ। প্রযোজনার গুণগত মানের কথা মনে রেখেই এ প্রসঙ্গের উল্লেখ করলাম। সম্প্রতি গিরিশ মঞ্চে বহরমপুরের ঋত্বিক নাট্যগোষ্ঠীর অভিনয় অনুষ্ঠান দেখে রবীন্দ্র নাটকের ক্ষেত্রে দলটি অনধিকারী এমন বিবৃতি প্রচার করা যাবে না। বরং কোনো কোনো জায়গায় এঁদের নিষ্ঠা অনেক মাঝারি মাপের দলকেও লজ্জা দেবে।

রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটির নাট্যরূপ দিয়েছেন গৌতম রায়চৌধুরী। নির্দেশনাও তাঁর। নাট্যরূপ খুব দীর্ঘপ্রলম্বী। একথা ঠিক যে রবীন্দ্র প্রযোজনায় সংলাপ একটা বড় ভূমিকা আদায় করে নেবেই এবং ঠিক এই জায়গাটাতেই নাট্যরূপকারের ফাঁদে পড়ে যাবার খুব সম্ভাবনা থাকে এবং ঋত্বিক-এর 'স্ত্রীর পত্র'-এর ক্ষেত্রেও অবধারিতভাবে তাই ঘটেছে। রবীন্দ্র সংলাপকে পুরো মূল্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে অভিনয় ক্ষমতার প্রয়োজন তেমন ক্ষমতাবান অভিনেতা অভিনেত্রী ঋত্বিক গোষ্ঠীর নেই। তবে নিষ্ঠার অভাব ছিল না যে এটা অনুভব করা গেছে, তার জোরে এঁরা অনেকটাই এগিয়েছেন। নাট্যরূপের ক্ষেত্রে প্রধান আপত্তির ব্যাপার ঘটে গেছে। ঘটক এবং ঐ বিবেকরূপী বাউলের ক্ষেত্রে। মৃণালকে কিন্তু বড় সযত্নে এঁকেছেন নাট্যকার। মৃণাল-এর ভূমিকাভিনেত্রী লিপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে কখনো কখনো তা ঈষৎ ভার হয়ে দাঁড়িয়েছে তবু তিনি খুবই চেষ্টা করেছেন। তাঁর সংলাপ উচ্চারণের মধ্যে ঈষৎ আঞ্চলিক প্রভাব ছিল। এদিকটা সংশোধন করতে পারলে চরিত্রটি সমতা পাবে। দুলাল দত্তের কমলেশ প্রথম দিকে কেমন যেন ছাড়া ছাড়া ছিল। কিছুতেই যেন তিনি চরিত্রটির মধ্যে ঢুকতে পারছিলেন না। শেষ দিকে অবশ্য এই ভাবটা সরে গিয়েছিল। সুশান্ত নন্দীর দাদা এতই আণ্ডার অ্যাকটিং করেছেন যে তিনি মদের দোকানে মারামারি করে এসেছেন তা বিশ্বাস করা শক্ত হচ্ছিল। শ্যামলিমা সরকারের বড়বৌ একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। গানের প্রয়োগ সর্বত্র প্রশ্নাতীত নয়। কোনো কোনো জায়গায় গান না গাইয়ে আবহে বাজালে যেত। তাতে ভালই হত কেননা বেসুরো গান শুনতে হত না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে মৃণালের চরিত্রাভিনেত্রী লিপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গান নিয়ে আরো অনেকখানি অনুশীলন করতে হবে। দেবাশিস দাশগুপ্তর আবহ রচনা প্রথানুগ কিন্তু নাট্যকে গতি দিয়েছে। খুব ভালো লাগে 'আহা কী করুণা' গানটির সুচিন্তিত প্রয়োগ।।

মঞ্চটি বড় যত্নে সাজিয়েছিলেন কুন্দন বিশ্বাস। মঞ্চটিকে বিভিন্ন জোন-এ ভাগ করে নেওয়াটিও বেশ ভালো হয়েছে। ডিটেলের দিকেও তাঁর নজর ছিল। কিশোর মাহাতো ও শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোক পরিকল্পনা নাট্যানুগ। কিন্তু শব্দ প্রক্ষেপণের ব্যাপারে অবশ্য নানাবিধ সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

হৃদিরঞ্জন

সার্থকনামা হওয়া খুব মুশকিলের ব্যাপার। কলামন্দির বেসমেন্টে "হৃদিরঞ্জন" তাঁদের পাঁচমিশালী অনুষ্ঠান করলেন। হয়তো হরেকরকম করতে গিয়ে অনুষ্ঠান নিটোল হয় না। তাই কিছু অংশ হৃদয় ছুঁয়েও হৃদিরঞ্জন করে না। প্রথমেই ছিল তৃপ্তি মিত্রকে অভিনন্দন অভিনন্দনের উত্তরে তৃপ্তি মিত্র নবান্ন, ছেঁড়া তার, চার অধ্যায়, রক্তকরবী এবং রাজা নাটকের অংশ বিশেষ পড়ে শোনালেন। ছেঁড়াতার বা চার অধ্যায়ের অংশে শিল্পীর বিস্তৃতি ধরা পড়ে। কোন মেরুই তাঁর কাছে দুরধিগম্য নয়।

অনুষ্ঠানের মূল অংশ ছিল সুরজিৎ ঘোষের সংকলন ও বিন্যাসে "জল দাও।" এরকম অনুষ্ঠান শোনার জন্য দর্শকদেরও একটা প্রস্তুতি চাই। কিন্তু অনুষ্ঠানের আগেই একক সঙ্গীতে গৌতম মিত্রের দীর্ঘ অনুষ্ঠান (সব গান আমার শোনা হয়নি) সেই প্রস্তুতি পর্বকে ব্যাহত করে। এইখানেই আয়োজকদের পরিকল্পনার ব্যর্থতা। অনেকটা একসঙ্গে অনেকের জন্মজয়ন্তী পালনের মত হয়ে যায়। কারও সৃষ্টির প্রতিই সুবিচার হয় না। সুরজিৎ ঘোষের ভাবনায় অভিনবত্ব ছিল। মোহিনী আড়ালের পিছনে সুরজিৎ সত্তাকে আবিষ্কার করা। রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা শুধু অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কাব্য নয়। সেই ভাবনার সূত্রে তিনি দক্ষিণ ভারতের কুমারণ আসান, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাস, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্রের রচনাকে সংকলন করেছেন। কিন্তু ভাবনা এক জিনিস—ভাবনার শরীর পাওয়া আর এক জিনিস। এই প্রযোজনার পরিচালনা উমা বসুর। নৃত্যে যখন সকলে চিত্রবৎ থাকেন তখন ভাল লাগে, নৃত্য আরম্ভ হলেই নানারকম অস্বস্তি ধরা পড়ে। পোশাকের ধরনও কি সুনির্বাচিত?

তৃপ্তি মিত্র

পাঞ্জাবি পাজামা পরিহিত সূত্রধার ঢোকায় যে আধুনিকত্ব—সেটা সব জায়গায় থাকে না। গান অনেক সময় যন্ত্রণা। নাচ অনেক সময় প্রচলিত ধারাকে অস্বীকার করতে গিয়ে খামখেয়ালি, কয়েকটি গানের সুর ভাল, কিন্তু কবিতার সুরারোপের প্রাথমিক শর্তই হল কাব্য এবং সুরকে মিলতে হবে। বহু জায়গায় গণনাট্যের ছকে সুর করতে গিয়ে কথা অস্পষ্ট। প্রথমে চণ্ডালিকা অংশে "জল দাও, আমায়, জল দাও" সুরটি থিম মিউজিক হিসাবে ভাল লাগে। পরে সলিল চৌধুরীর "ও আলোর পথ যাত্রী"র সুর অনেক জায়গায় অহেতুক। বেসমেন্টের সামান্য পরিসরে পিছনে আপার ডায়াস, সামনে গাইয়ের দল, বাকি কয়েক ফুটের মধ্যে শিল্পীদের নাচ। প্রযোজনা সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান থাকলে এই ধরনের পরিকল্পনা করা যায় না। ফলে এই সত্যই প্রমাণিত হয় "প্রতিভা থাকলেও গৃহিণীপণা ছিল না।" এবং এই বেসামাল সংসারকে সামাল দিতে আলোক সম্পাতে জয় সেনকে হিমশিম খেতে হয়।

মধ্যিখানে চর

কাগজে মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন বেরোয় "দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির অভিনন্দন গ্রহণ করুন।" সংস্থার প্রযোজনা (অবশ্যই অকালপক্ক নয়) এতই পরিণত, যে তার বয়স যে মাত্র দুবছর সেটা ভাবাই যায় না। অন্যদিকে কারও পঁচিশ বছর পূর্তির বিজ্ঞাপন দেখে মনে হয়, সে কি, এতদিন হয়ে গেল! উল্লেখযোগ্য কাজ কিছুই মনে আসে না।

'শপথ' সংস্থার দশ বছর পূর্ণ হল। দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁরা তিন দিন আকাদমি ও শিশির মঞ্চে একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন করেন। নিজেরা ছাড়াও বাংলাদেশ, কোচবিহার দুর্গাপুর ও হাওড়ার কয়েকটি সংস্থাকে দিয়ে অভিনয় করান। দশ বছরে সম্ভবত এটাই সবচেয়ে উজ্জ্বল কাজ। হঠাৎই হিট থেকে সেমিফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনার মতন।

'শপথ'-এর প্রয়াস অভিনন্দনীয়,তাঁরা কলকাতার বাইরের দলকে পরিচিত করাতে চেয়েছিলেন। দর্শককে অন্য আস্বাদ দিতে চেয়েছিলেন। কার্যত ফল হল উল্টো। ছানার সন্দেশের বদলে সয়াবিনের সন্দেশ। প্রথম দিন দুর্গাপুরের স্মারক প্রযোজনা ফ্রিডম ফাইটারের কথাই ধরা যাক। যে কোন সার্থক চলচ্চিত্র কিংবা মঞ্চ প্রযোজনা যেমন যাত্রার মঞ্চে অদ্ভুত অবয়ব নিয়ে হাজির হয়, নাট্যকার নির্দেশক গোপাল দাস সেই পথই নিয়েছেন। নাটকের রচনাকাল জানা নেই; কিন্তু সেটা যে 'অগ্নিতাহার', সেটা আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না। প্রথম থেকে প্রোটোটাইপ মাস্তান, ভাঁড় পুলিস, ভিলেন নেতা সব বাঁধা ছকে চলে আসে। একটি ছোট মেয়ে নয়না চৌধুরী বেশ সপ্রতিভ। সপ্রতিভ বলেই তাঁকে দিয়ে অনেক কথা বলানো হয় যার অনেকখানিই অপ্রয়োজনীয়; যে ফ্রিডম ফাইটারকে সবাই খোঁজ করছে, তাঁর আইডেনটিটি হিসাবে বলা হয় অনর্গল ইংরেজি বলেন। সেই বিবেক সরকার এক ঘণ্টার নাটকে অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সংলাপে ইংরেজি শব্দ বলেন মাত্র দুটি। তবুও দুষ্কৃতকারীরা খুঁজে পায়—না পেলে টর্চারের সিনে কায়দা করা যায় না। হিন্দী সিনেমায় হিরো ভিলেন দুদলই 'ঝাড়পিট' করে, বাংলা নাটকে ভিলেন মার দেয়। হিরোরা পড়ে পড়ে মার খায়, বিপ্লবী নাটকের মহিমায় গান্ধীবাদের প্রচার।

দ্বিতীয় নাটক 'আয়োজক সংস্থা' প্রযোজিত 'বোধ'। নাট্যকার নির্দেশক সুরকার শ্যামল ভট্টাচার্যর 'বোধ' নাটকটি তো ছক পাল্টানো হয়। তবে খেলাটা ক্রিকেটই—কোথাও টাফ উইকেট কোথাও ম্যাটিং উইকেট। এই নাটকে শ্যামল ভট্টাচার্যের অভিনয় ও সংলাপ প্রথম থেকে টেনে নিয়ে যায়;সেই ইউনিয়ন আন্দোলনে গম্ভীর কথায়।গন্তব্য একই। কেউ মেন লাইন, কেউ কেউ কর্ড লাইনে যায়। গানও একটি ফরমুলা আশ্রয় করে এগোয়। গানের কথা কোন ক্রমে শব্দ জুড়ে অন্ত্যমিল দেওয়া। সুব্রত ভট্টাচার্য নতুন জীবনের প্রতীক, কিন্তু তিনি কোনদিন মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলতে পারবেন বলে মনে হয় না। হাত দুটি শরীরের সঙ্গে সেঁটে থাকে। রত্না বিশ্বাস বহুকষ্টে সংলাপ বলেন। মাস্তান শুধু সংলাপে পৈশাচিক হবেন কিনা সন্দেহে মেক আপে বীভৎস করা হয়। কাহিনী চিত্রের আগে নানারকম বিজ্ঞাপন চিত্র থাকে যা না দেখলেও মূলছবির পাওনা আটকায় না। এখানে সেই রকম শেষের পরেও শেষতর একটি অহেতুক দৃশ্য আছে।

দ্বিতীয় দিনের নাটক বাংলাদেশের 'সিরাজদ্দৌলা' নাট্যদলের 'ক্ষুদিরামের মা'। তাঁরা নির্বাচন করেছেন এখানকার শ্যামল ভট্টাচার্যের নাটক। বাংলা দেশের নাটকে যে নতুন আস্বাদ আনে তার বদলে এই পুনরাবৃত্তির নাটক প্রথম থেকেই ক্লান্ত করে। সময়ের হিসেব না রেখেই ক্ষণে ক্ষণে ফ্ল্যাশব্যাক। এক সময় বলা হয় ক্ষুদিরামের বয়স তখন পাঁচ বছর। তার পরেই পিছনে একটি তিনচার মাস বয়েসের শিশুর কান্না শোনা যায়। বাংলাদেশের এই নাট্যদল ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। চল্লিশ পার করে এখন তারা স্থাণু। চল্লিশ বছর আগে এখানে পাড়ার থিয়েটারে যেরকম অভিনয় ধারার প্রচলন ছিল—সেই রকম। মনে হয় ওঁরা এখনও কদর্থে যাত্রাভিনয়ে বিশ্বাসী। আজাদ খাঁনের অভিনয় দেখে মনে হয়, তিনি যাত্রা দলে ফিমেল পার্ট করেন।

জসিমউদ্দীন-এর অভিনয় যাত্রার বীর নায়ক যেমন দম নিয়ে একে একে পর্দা চড়াতে থাকে সেই রকম। নির্দেশক আবদুল হাই দুর্বার বা সাইবুদ্দিন বারির অভিনয় চল্লিশের দশকে অফিস ক্লাবের জমিদার ও নায়েবের মত। নাট্যকার শ্যামল ভট্টাচার্য প্রাকৃতিক বেগ নিয়ে প্রাগৈতিহাসিক রসিকতা করতে ভালোবাসেন। আগের দিন 'বোধ' এবং এই নাটকে একই কায়দার রকমফের দেখা গেল। বাংলাদেশের 'সিরাজদ্দৌলা' নাট্যদল প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন যা কিছু বাংলাদেশের সেটাই পদ্মার ইলিশ ভেবে লালায়িত হওয়ার কারণ নেই। পদ্মার ইলিশ বলে অনেক সময় চিষ্কার ইলিশও চালান হয়। তবুও শিশির মঞ্চের সেইদিন প্রেক্ষাগৃহ ফাঁকা দেখে একটি প্রশ্ন জাগে। কিছুদিন আগে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন বলে যে সংস্থা গড়ে উঠেছিল তাঁরা কি কি কাজ করেন? অতিথিদের সঙ্গে মিলিত হওয়া কি তাঁদের অথবা কলকাতার থিয়েটার দলের কর্মসূচীর মধ্যে পড়ে না? আর একদিন কোচবিহারের ইন্দ্রায়ুধ ও হাওড়ার অন্বেষণ সংস্থার অভিনয় দেখার সুযোগ আমার হয়নি।

দেবাশিস দাশগুপ্ত প্রেম

বাংলার মাটি বাংলার নুন

গৌতম নিয়োগী

দি সল্ট ইনডাসট্রি অভ বেঙ্গল/
বলাই বারুই/
কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোং/
কল-১২/৮০.০০

আজকাল বিজ্ঞান-সম্মত, নিরপেক্ষ এবং বস্তুবাদী ইতিহাসচর্চায়, সঙ্গত কারণেই, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ইতিহাস-ই ইতিহাসের পাঠ্য-সূচীর অন্তর্গত এমন পুরানো ধারণা বাতিল হয়ে গেছে। রাজনৈতিক ইতিহাসকে বাদ দিয়ে শুধু অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপর অত্যধিক ঝোঁক যদিও এর ফলে ফ্যাশানে রূপান্তরিত হয়ে গেছে তবু তাতেও অনেক ত্রুটি ধরা পড়েছে। তুলনামূলকভাবে আরো কম আলোচিত হলেও যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে সামাজিক ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক ইতিহাস। বস্তুতপক্ষে শুধু রাজ-রাজড়াদের কাহিনী, যুদ্ধ বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা জানলেই কোনো দেশের ইতিহাস যে জানা যায় না, তা আজকাল ছাত্রছাত্রীদেরও বলে দিতে হয় না। কারণ এর মূল উপজীব্য বা ফোকাস থাকে শাসকশ্রেণীর উপরে। যে-কোন দেশের, যে-কোন যুগের ইতিহাস জানার জরুরী শর্ত ঐ সময়কার টোটাল হিস্ট্রি বা সামগ্রিক ইতিহাস—যেখানে সেই যুগের সেই দেশের জনগণের ভাষা. সাহিত্য, সংগীত, সংস্কৃতি, শিল্প, চিন্তা-চেতনা, সমাজ-জীবন, অর্থনীতি, সামাজিক সম্পর্ক সমস্তই ইতিহাসের অতি-অবশ্য পাঠ্য। এই ধরনের ইতিহাসবোধ সারা বিশ্বেই নতুন, তবে পাশ্চাত্যে শুরু হয়েছে কয়েক দশক

আগে এবং সৌভাগ্যবশত আমাদের দেশেও আজকাল ইতিহাসচর্চার বৈচিত্র্য এবং ব্যাপ্তি চোখে পড়ার মতো। যেমন চোখে পড়ার মতো সমাজের উপর থেকে ইতিহাসের ফিকে দৃষ্টি দেওয়ার গজদন্তমিনারী কেতাবী আলোচনার পরিবর্তে নিচের দিকের থেকে উপরে তাকানোর নতুনধর্মী গবেষণা এবং ফলে বহু শাখা-প্রশাখার পরিবর্তে শিকড়ের নানা অজানা দিকে আলোকপাত। বলাই বারুইয়ের তথ্য-সমৃদ্ধ গ্রন্থখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস বা বলা ভালো বাঙালির ইতিহাসে এমনই নব্য-ইতিহাসচর্চার উদাহরণ। কেন, সে-বিষয়ে একটু বলা প্রয়োজন। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার'ইতিহাস জানবো—তা, সে প্রায়-পলাশী যুগই হোক আর উত্তর-পলাশী যুগই হোক—অথচ ঐ সময় বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর বাঙালির ইতিহাস কেমন তা জানবো না এই স্ববিরোধী কাজ আর যাই হোক ইতিহাসচর্চা নয়। অথচ, দেখুন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকেরা কিংবা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা আমাদের সে-দিকেই নিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা শিখেছিলাম শুধু মাত্র মুরশিদ কুলি খাঁ, সুজাউদ্দিন, সরফরাজ খাঁ থেকে আলিবর্দীর মৃত্যু (১৭৫৬) পর্যন্ত ইতিহাস—তাঁরা কে কবে এলেন, কিভাবে দেশ শাসন করলেন, রাজস্ব আদায় কিভাবে করতেন, কবে মরলেন ইত্যাদি। অন্যদিকে জেনেছিলাম কিভাবে ইংরেজ কোম্পানী এলো, ব্যবসা শুরু করলো, বাড়ালো, বাণিজ্য বিস্তারের তাৎপর্য এবং শেষ পর্যন্ত সিরাজের সঙ্গে বিবাদ। সিরাজউদদৌলার সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে কতো আবেগপ্রবণ লেখা—দুই পক্ষের। তারপর মীর জাফর - মীর কাশিম হয়ে ধীরে ধীরে 'স্বাধীন' (?) নবাবীর অবসান এবং ক্লাইভের দেওয়ানী লাভের (১৭৬৫) পর দ্বৈত শাসনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা। এবং এর ক্রমবিস্তারে ওয়ারেন হেস্টিংস, কর্ণওয়ালিস, শোর, ওয়েলেসলীর কার্যকলাপ। এর বাঙালির ইতিহাস কই? কোথায় অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্র ও সমাজের চেহারার পূর্ণ ছবি, সামাজিক কাঠামো এবং সম্পর্কের কথা, কোথায় অর্থনৈতিক টানা-পোড়েন এবং ঘাত-প্রতিঘাত, কোথায় সাহিত্য, শিল্প, সংগীত বা লোক সংস্কৃতি? মিল, চার্লস স্টুয়ার্ট, হিল, কে ফরেস্ট, উইলসন, ভিনসেন্ট স্মিথ, ভেরেলস্ট, ওডওয়েল, স্মার্টস থেকে শুরু করে রমেশচন্দ্র মজুমদার, যদুনাথ সরকার, কালীকিংকর দত্ত, আবদুল করিম, নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, হক, ব্রিজেন গুপ্ত, সিরাজুদ্দিন, অ্যাসকলি, অতুল রায়, পার্সিভাল স্পিয়ার সবাই একই গোত্রের এদিক-ওদিক। এইসবের বাইরে বাঙালীর অর্থনৈতিক জীবনকে ইতিহাসের আলোচনার সামনে নিয়ে এলেন নবেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ (১৯৫৬, ৬২), অমলেশ ত্রিপাঠী (১৯৫৬), বিনয় চৌধুরী (১৯৬৬), হরিরঞ্জন ঘোষাল (১৯৬৬), সুশীল চৌধুরী (১৯৭৫) প্রমুখ। সামাজিক বা সাংস্কৃতিক না হলেও নতুন দৃষ্টিকোণ নিয়ে এলেন রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সুপ্রকাশ রায়, রণজিৎ গুহ।

কাজের ব্যাপ্তি গেল অনেক বেড়ে। এপার ওপার দু' বাংলাতেই। শুরু হয়ে গেল অষ্টাদশ শতকের সামাজিক স্তর বিন্যাস ও রাষ্ট্র কাঠামোর

আলোচনা, সামাজিক সম্পর্ক বিচার, বাংলার অর্থনীতির বিভিন্ন অংশকে আলাদা বিশ্লেষণ ; কাপড়, নুন, রেশম ইত্যাদি নানা শিল্পে নিযুক্ত বাঙালিদের জীবন কথা নিয়ে গবেষণা, এমন কি জেলা-ওয়ারী ঐতিহাসিক বিবর্তনের কাজ। মার্কসবাদী এবং অ-মার্কসবাদী উভয় শ্রেণীর ঐতিহাসিকদের এই বিশাল কর্ম পরিধিতে হাত দিলেন সিরাজুল ইসলাম, রত্নলেখা রায়, রঞ্জিত সেন, অদিতি নাগচৌধুরী, দেবেন্দ্রবিজয় মিত্র, গৌতম ভদ্র, পিটার মারশাল, ব্রেয়ার কিং, ফেল্ডব্যাক, ইন্দ্রাণী রায়, আরউইন, স্তোয়ার্জ, চিবেরভ, আবদুল করিম, রঞ্জন গুপ্ত, গর্ডন এবং আরো অনেকে। বলাই বারুই নিজ কৃতিত্বে এই সারিতে নিজের নাম যুক্ত করলেন।

বাংলার লবণশিল্প অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসে এক অনালোচিত দিক। অধুনালুপ্ত 'ইতিহাস' পত্রিকার ৫ বর্ষ ৩ সংখ্যায় (পৃ ১৮০—৯৩) এ নিয়ে লেখেন বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী রণজিৎ গুহ আর অল্প-বিস্তর আলোচনা করেছিলেন নবেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, হরিরঞ্জন ঘোষাল, মাজহারুল হক এবং পিটার মারশাল। এই প্রথম এ-বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণামূলক অথচ সহজবোধ্য কাজ হলো। লেখককে অসংখ্য ধন্যবাদ। কারণ অষ্টাদশ শতকের বাঙালি বলতে গেলে বাঙালি তাঁতী বা কৃষকদের মতো 'মলঙ্গী'রাও ছিলো বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বাংলার মাটি বাংলার জল খেয়ে মানুষ এই শ্রেণীর বাঙালিরা কিভাবে কোম্পানীর শাসন ও ইংল্যাণ্ডের অর্থনীতির স্বার্থে বলি প্রদত্ত হলো এবং একদল লোভী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কিভাবে ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোর সুযোগে লবণ-শিল্প ধ্বংস করলো তার বিস্তারিত ইতিহাস জানার অবশ্যই প্রয়োজন ছিলো। রমেশচন্দ্র দত্ত বা নরেন্দ্র ছাত্রজীবনে পড়ে যা জেনেছিলাম এবং পড়েছিলাম নবেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বা প্রাইসের 'মেদিনীপুর' তাতে মন তৃপ্ত হয়নি, বরং রণজিৎ গুহর লেখা পড়ে আরো অনুসন্ধিৎসা বেড়েছিলো। অমিয়কুমার বাগচী উনিশ শতকের অবশিল্পায়ন (Deindustrialisation) নিয়ে লেখার জের হিসেবে আঠার শতককে ধরলে বলাই বারুইয়ের বই বিশেষ সহায়ক মনে হয়। বইটির একটি সাব-টাইটেল আছে যা তাৎপর্য পূর্ণ : 'ব্রিটিশ একচেটিয়া অধিকার এবং ভারতীয় শিল্পের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক'। এই উপজীব্য ন'টি অধ্যায়ে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক।

লেখক তথ্য সংগ্রহ করেছেন প্রধানত প্রাথমিক আকর বা সরকারী মহাফেজখানায় সংরক্ষিত অপ্রকাশিত নথি থেকে। ফলে প্রভূত পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে। পরিসংখ্যানের জন্য প্রভূত পরিমাণ সারণী এবং কিছু মানচিত্র ও সঙ্গত কারণে ব্যবহার করেছেন লেখক। ভালো লাগে যে কোম্পানীর একচেটিয়া শুরুর আগে ওপরে লবণ শিল্প কেমন অর্থাৎ কাদের হাতে উৎপাদন ব্যবস্থা, তার দাম কেমন, এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষদের কথা, সাধারণ মানুষদের উপর প্রতিক্রিয়া, একচেটিয়া কারবারের উত্থান, দেশীয়-শিল্পের ধ্বংস, চোরাই-চালান, জমিদার ও দেশীয় বণিকদের ভূমিকা নূতন-পুরাতন পদ্ধতির সংঘর্ষের ফল সমস্তই আলোচনা করেছেন। লেখক মেদিনীপুর নিয়ে প্রধানত কাজ করেছেন, যদিও ২৪ পরগনা, নোয়াখালি-যশোর এবং চট্টগ্রাম জেলার লবণ কেন্দ্রগুলিও দেখিয়েছেন। লেখকের সুলিখিত বইতে নদীয়ার লবণ-কর্মীদের কথা নেই কেন ? রাধামাধব সাহা এ-বিষয়ে তথ্য দিয়েছিলেন 'বেঙ্গল পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট' পত্রিকায় (১৯৬৪, সংখ্যা ৮৩, পৃ ২৫—৩১)। মলঙ্গীরা অনেক ক্ষেত্রেই ছিলো একই সঙ্গে চাষী এবং মলঙ্গী এবং অনেক সময় তারা জমিদারদের এলাকা ছেড়ে (যেমন মেদিনীপুরের সঙ্গে, ১৭৮২তে হয়েছিলো) অন্য এলাকায় চলে যেত। এই বাস্তুত্যাগ বা এক জায়গা থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার ব্যাপারে লেখক কিছু বললে ভালো হত। তবে বইটির গুণগত উৎকর্ষের বিচারে এসব ছোট ত্রুটি কিছুই নয়।

দেশকালের পটভূমি

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

দেশকাল : সাহিত্য / নিখিলকুমার নন্দী / নবপত্র প্রকাশন / কল-৯ / ২০.০০

এগারোটি প্রবন্ধ নিয়ে এই বই 'দেশকাল : সাহিত্য'। বইটির দুটো ভাগ। প্রথম ভাগ : 'দেশ-দেশান্তর'। দ্বিতীয় ভাগ : 'বাঙলা ও বাঙালী'। প্রথম ভাগে আছে তিনটি প্রবন্ধ। তাদের বিষয় : মার্কস ও রবীন্দ্রনাথ, লেনিনের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে চিন্তা, রাসেল ও রবীন্দ্রনাথ।

মার্কস ও রবীন্দ্রনাথ দুজনে দুটি প্রশ্নমালার উত্তর দিয়েছিলেন। এই দুই 'স্বীকারোক্তি'-র ভিত্তিতে উভয়ের একটি তুলনামূলক আলোচনা। উভয়েই যেহেতু মানবমঙ্গল চান, সুতরাং মতামতে কিছুটা মিল থাকতে পারে। সেই মিলগুলিকে খুঁজেছেন লেখক। অবশ্য বোঝাই যায়, এ সব মিল সত্ত্বেও তাঁদের ব্যক্তিত্বের ও চিন্তাভঙ্গির পার্থক্য যথেষ্ট। লেনিনের শিল্প-চিন্তা বিষয়ে বাংলায় এর আগে একাধিক লেখা বেরিয়েছে। লেনিনের কথাবার্তা শুনে আশঙ্কা হয় হাল আমলের অনেক মার্কসিস্ট তাঁকে অ-মার্কসিস্ট বলবেন। 'টলস্টয় রুশ বিপ্লবের দর্পণ'— এটি লেনিনের উক্তি। গোর্কির 'নীচের মহল' দেখার পর বহুদিন থিয়েটার দেখা বন্ধ রেখেছিলেন— 'অযথা নাটুকেপনা'য় বিরক্ত হয়ে। শেকভের 'আংকল ভানিয়া' দেখতে গিয়ে 'বাড়াবাড়ি শুরু হতেই' অঙ্কের মাঝখানেই তিনি উঠে পড়েন। এদিকে গ্রুপ থিয়েটারের মঞ্চেও আমরা কত নাটুকেপনা ও বাড়াবাড়ি করি— আজও। 'Everyone is free to write and say whatever he likes, without any restrictions.'— লেনিনের এই কথা আজও আমাদের আশা জাগায়।

দ্বিতীয় ভাগ, 'বাঙলা ও বাঙালী'র আলোচ্য— প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অবনীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ। সরোজকুমার ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পর্কে দুটি করে প্রবন্ধ। ১৯৫৬-তে বিহার সাহিত্য ভবন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল সরোজকুমারের শ্রেষ্ঠ গল্প। তার ভূমিকা লিখেছিলেন নিখিলবাবু। সেই লেখাটি এখানে সংকলিত। আলোচনা শেষ করেছেন লেখক এইভাবে : 'তাঁর বিশিষ্ট প্রাণমনঃশক্তির মূলে আবহমান বাঙলার আকাশ ও মাটি অবিরাম রসসঞ্চার করে সাফল্য থেকে সমধিক সাফল্যে তাঁকে ক্রমাগত পৌঁছে দিয়েছে।' অন্য প্রবন্ধটিতে আলোচিত হয়েছে ময়ূরাক্ষী-গৃহকপোতী সোমলতা নিয়ে ট্রিলজি 'নতুন ফসল'। লেখক এটিকে বলেছেন— 'লোকায়ত জীবনের অসাধারণ' আলেখ্য। রাঢ়ের চাষীজীবন ও বৈষ্ণবজীবন এত ভালভাবে আর কারো সাহিত্যে আসেনি। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করে বৈষ্ণবসমাজ ছিল 'রোমানসের···আশ্রয়স্থল'। সরোজকুমারে তা 'সত্যচিত্র', গ্রামের চাষী মানুষরে সংলাপ রচনাতেও সরোজকুমারের কৃতিত্ব বেশি। শ্রীকুমারবাবুর এই মত নিখিলবাবু পুরো সমর্থন করেছেন। সরোজকুমার এখন অনেকটা বিস্মৃত হলেও জীবৎকালে কিছুটা স্বীকৃতি পেয়েছেন। কিন্তু সঞ্জয় ভট্টাচার্য কোনো সময়ই তেমন স্বীকৃতি পান নি। তাঁর কবিতা ও উপন্যাস নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন নিখিলবাবু। কবিতার আলোয় উপন্যাসকে এবং উপন্যাসের আলোয় কবিতাকে দেখেছেন। উভয় শাখার বিস্ময়কর মিল তাঁর চোখে পড়েছে। এক যেন অপরের বিস্তার, পরিপূরক। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের শিল্পীমানসকে বোঝার পক্ষে লেখাটি গুরুত্বপূর্ণ।

তবে নিখিলবাবুর শত্রু তিনি নিজে। তাঁর বলবার কথা আছে। কিন্তু সে-বক্তব্য নিজেই তিনি আবছা করে ফেলেন— বাগ্‌বিস্তার, উদ্ধৃতিবাহুল্য ও আবেগ-উচ্ছ্বাসে।

একটি অসঙ্গতি চোখে পড়লো। মার্কস-দম্পতির সন্তানদের সম্পর্কে এক জায়গায় নিখিলবাবু বলেছেন, 'তাঁদের চারটি সন্তানের অকালমৃত্যু ঘটে অর্থাভাবে।' (পৃ ৭)। ঠিক পরের পাতায় ইংরেজি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে : 'Of their six children, only three survived to grow to grow up, and of the three, two in later life committed suicide.' (পৃ ৮)। এই অসঙ্গতির দিকে আগামী সংস্করণে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

এক ঘড়া গল্পের মোহর

রতনতনু ঘাটী

ফুড়ুৎ গুড়গুড়ি/ *ননীগোপাল চক্রবর্তী/ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ/ কল-৯/ ১০.০০*

পদ্মদীঘির ডাইনি/ রমেশ দাস/ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ/ কল-৯/৮.০০

নোট থেকে নোটনদা/

সুনীতি মুখোপাধ্যায়/
কল্পনা প্রকাশনী/
কল-৯/৮·০০

ছোটদের বই বড়রাও পড়তে ভীষণ ভালবাসেন। কেন না, ছোটদের যেমন মুখর ছেলেবেলা থাকে, বড়দেরও তেমনি হারিয়ে যাওয়া ছেলেবেলা থাকে। ছোটরা যেমন রূপকথা, ভূতের গল্প বা আজগুবি সব মজার গল্প পড়তে পড়তে তল খুঁজে পায় না, বড়রাও তেমনি ছোটদের বই পড়তে পড়তে সুদূর ছেলেবেলায় হারিয়ে যান ইচ্ছে করেই। আমার এরকম সদ্যপড়া তিনটি বই 'ফুড়ুৎ গুড়গুড়ি', 'পদ্মদীঘির ডাইনী' এবং 'নোট থেকে নোটনদা'। প্রথম বইটি ছোটদের গল্পের সংগ্রহ, দ্বিতীয়টি ছোটদের উপন্যাস এবং তৃতীয়টি হাসির উপন্যাস—বলাই বাহুল্য, এটিও ছোটদের জন্যে লেখা।

ক'জন ছোট্ট ছেলে বঁড়শী নিয়ে মাছ ধরছিল।

বেহ্মদত্যিদের আসতে দেখে বঁড়শী ফেলে রেখে তারা দিল চোঁচা দৌড়। তাদের ফেলে যাওয়া বঁড়শীকে কি বলে—বঁড়শী না ফরশী, এই নিয়ে লাগল তিন বেহ্মদত্যির তুমুল ঝগড়া। তিনজনই একজন জেলেকে মধ্যস্থ মানল বটে—সবাই বলল, তার কথাই ঠিক বলতে হবে জেলেকে, না হলে জেলের মুণ্ডুটা চিবিয়ে খাবে। জেলে দেখল যে কোন একজনের কথা ঠিক বললে অন্য দুজন বেহ্মদত্যি তাকে মেরে ফেলবে। তাই জেলে বুদ্ধি খাটিয়ে বেহ্মদত্যিদের বলল, 'সামনের ঐ চূর্নী নদীতে তোমরা তিনজনেই একসঙ্গে ডুব দাও।

যে সবচেয়ে পরে উঠবে তার উত্তরই বুঝতে হবে ঠিক'। এভাবে জেলেটি ডুবিয়ে মারল তিন বেহ্মদত্যিকে। এই গল্পটি কিন্তু ফুড়ুৎ গুড়গুড়ির সংগ্রহ করা। ফুড়ুৎ গুড়গুড়ি কে? সে এক গল্প বলিয়ের নাম।

ফুড়ুৎ গুড়গুড়ি—এ আবার কেমন নাম! সে আর এক মজার গল্প! সোনা ডাঙার মাঠে সোনার বরণ ধান ফলত। আর সেই ধান খেতে আসত ঝাঁক ঝাঁক ভুরুই পাখি। চাষীরা জ্বালাতন হয়ে গোটা মাঠ জুড়ে পেতে রাখল এক বিরাট জাল। সোনার বরণ ধান খেতে এসে জালে আটকা পড়ল প্রচুর ভুরুই পাখি। সেই মাঠে থাকত এক অন্ধ ইঁদুর। ভুরুই পাখিরা ধান নিয়ে গিয়ে জমা করে রাখতো অন্ধ ইঁদুরের গর্তে।

সেই ধান খেয়ে বেঁচে থাকতো ইঁদুরটি। তাই ভুরুই পাখিদের মহা বিপদ দেখে ইঁদুরটি কুট করে কেটে দিল জাল। আর সেই ফুটো দিয়ে একটার পর একটা ভুরুই পাখি ফড়ুৎ ফড়ুৎ করে উড়ে যেতে লাগল। এই পর্যন্ত বলে ঘুমিয়ে পড়ত গল্পবলিয়ে। আসলে গল্প বলিয়ের গল্প যেতো ফুরিয়ে, নাক ডাকতো গুড় গুড় করে। সেই থেকে গল্প বলিয়ের নাম বদলে নতুন নাম হলো ফুড়ুৎ গুড়গুড়ি।

ননীগোপাল চক্রবর্তীর এই রকম ভীষণ মজার মজার চৌদ্দটি গল্পের সংগ্রহ 'ফুড়ুৎ গুড়গুড়ি'। ছোটদের পড়তে দারুণ ভাল লাগবে।

ননীগোপাল চক্রবর্তী কুশলী হাতে খুব সুন্দর গল্পগুলি লিখেছেন। বইটি ছোটদের মন কেড়ে নেবে। তার সঙ্গে আছে দেবাশিস দেবের আঁকা মজাদার সব ছবি। দেবাশিস দেব খুব সুন্দর প্রচ্ছদ এঁকেছেন বইটির।

পদ্মদীঘির ডাইনী' রমেশ দাসের লেখা ছোটদের উপন্যাস। মল্লপুরের রাজা ছোট্ট রাজপুত্র অভিজিতকে নিয়ে নিবিড় বনে গেলেন শিকার করতে। সঙ্গে মোসাহেব হাসিয়ে পণ্ডিত, অনেক লোক লস্কর, ঘোড়া। ছোট্ট রাজকুমার লাল ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে গিয়ে বনে গেল হারিয়ে। কোথা থেকে এল এক শেয়াল, রাজাকে বলল, 'দেখুন মহারাজ, ঐ ঈশান কোণ ঘেঁষে দূরে অনেক দূরে যে ছোট্ট একটি তারার মতো আলো মিটিমিটি করে জ্বলছে নিভছে, ঠিক ঐ ছোট্ট আলোটিকে লক্ষ্য করে আপনারা এগিয়ে গেলে দেখতে পাবেন এক পদ্মদীঘির পাড়ে প্রকাণ্ড এক ঘুমন্ত রাজপ্রাসাদ রয়েছে। ওখানে সবাই কালঘুমে ঘুমিয়ে আছে। ঐ রাজপ্রাসাদে সোনার পালঙ্কে মখমলের নরম বিছানায়

ঘুমিয়ে আছে ছোট্ট রাজকুমারী। তাকে পুত্রবধূ করে ঘরে নিয়ে যান মহারাজ। সবাই সুখী হবেন।' এক ডাইনী রানীর দানবীয় খেলায় পদ্মদীঘির রাজপ্রাসাদের সবাই পাথর হয়ে গিয়েছিল। মনের দুঃখে বুড়ো রাজাও গিয়েছিলেন মারা। এরপর শুরু হল রাজকন্যা উদ্ধারের ভয় ছমছম কাহিনী। একদিকে চলল ময়না, টুটুল, বুটুল, বুলবুল আর ঠোঁটকাটা ট্যানটার ছোট্ট রাজপুত্রকে খুঁজে বের করার মজার সব কাণ্ডকারখানা। আর অন্যদিকে মল্লপুরের রাজা এবং অন্য সবাই পদ্মদীঘির রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে গিয়ে পাথর হয়ে গেলেন ডাইনী রানীর মায়ায়। সব শেষে ঝটপট বাবাজীর পরামর্শে এবং ট্যানটার চেষ্টায় ডাইনী পুড়ে মারা গেল, পাথর হয়ে যাওয়া সবাই পেল প্রাণ ফিরে। রাজকন্যা চম্পাবতীর সঙ্গে বিয়ে হল রাজপুত্র অভিজিতের। একটু সাদামাটা কাহিনী হলেও রমেশ দাস নিপুণভাবে ছোট ছোট চরিত্রগুলিকে ছোটদের মনের মত করে এঁকেছেন। কোথাও কহিনীর বাঁধন আল্‌গা হয়ে পড়েনি। বরং ঘটনার রোমাঞ্চে ক্ষুদে পাঠকের মন কেড়ে নেবে বইটি।

এক গুলবাজ নোটনদা এবং তার দুই সঙ্গী মেসো ও ঘণ্টের নানা রকমের আজগুবি কাণ্ডকারখানায় ভরা সুনীতি মুখোপাধ্যায়ের এই হাসির উপন্যাস 'নোট থেকে নোটনদা'। গুলবাজ নোটনদা বনপাশে তার মামার বাড়িতে থাকার সময় কি কি সব অবাক করা কাজ করেছিলেন কথায় কথায় তারই উদাহরণ দিতেন। হাজারিবাগের জঙ্গলে বাঘের অত্যাচার বন্ধ করতে এক সাহেব নোটনদাকে নিয়ে গিয়েছিল। নোটনদা মাংসের চারপাশে নস্যি ছড়িয়ে রেখে বাঘকে হাঁচিয়ে দুর্বল করে পিস্তলের গুলিতে মেরেছিলেন। তেনজিং নোরগের এভারেস্ট অভিযানে অক্সিজেন গ্যাস বানাবার কাজ করেছিলেন। শেষে জীবিকার জন্যে হাত দেখার ব্যবসা ফেঁদে ধরা পড়ে নোটনদা পুলিশের খপ্পরে পড়লেন। বইটিতে প্রাণ খোলা হাসির খোরাক বড় কম। গল্পও তেমন দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। শুধু টি· টি এম পি অর্থাৎ টেনে টুনে মাধ্যমিক পাস নোটনদার ইংরেজী জ্ঞানের বহরটি বেশ মজার। যখন তিনি 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা'র ইংরেজী করেন 'ওয়েলথ-প্যাডি ফ্লাওয়ার ফুল আওয়ার দিস ওয়ার্লড'-পড়তে তখন বেশ মজা লাগে।

ত

তোমার উদ্দেশে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৩৩, ৪৯
তোমার চোখে। ফিরোজ চৌধুরী ৪৮, ২১
তোমার চোখের জল। দিব্যেন্দু পালিত ৪৫, ৭
তোমার ছায়ায় এসে। শিবেন মজুমদার ৪২, ৪৮
তোমার জন্য হে আমার প্রেম। জাক প্রেভের ৩২, ৪৭
তোমার জন্যই। উৎপলকুমার ঘোষ ৪৭, ৯
তোমার জন্যই আরো একবার। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ৪৬, ৪৬
তোমার ঠোঁটের এক ফোঁটা। সুব্রত রুদ্র ৪৩, ২৩
তোমার তর্জনী। জীবিতেশ চক্রবর্তী ৪৫, ৫১
তোমার তুলনা তুমি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শা ১৯৮১
তোমার নামে। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৬, ২৪
তোমার পা। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৪৩, ১
তোমার পায়ের শব্দ। সুব্রত রুদ্র ৫০, ২২
তোমার প্রেম। সুশীলকুমার গুপ্ত ২৫, ২২
তোমার বাসা কোথায়। তারাপদ রায় ৩৩, ৫০
তোমার বুকের ঈশ্বর। স্বদেশরঞ্জন দত্ত ৪০, ১৪
তোমার ভালবাসা। দিব্যেন্দু পালিত ২৫, ২৫
তোমার ভিতরে যাব। শক্তিপদ ব্রহ্মচারী ৪১, ২৩
তোমার ভোরের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। কবিরুল ইসলাম ৩৯, ২৩
তোমার মরা মুখ। আনন্দ বাগচী ৩৬, ৮
তোমার মাতৃভাষা। অসিত গুপ্ত ৩৪, ৪৫
তোমার মুখ। মনুজেশ মিত্র ৩২, ২১
তোমার মুখের দিকে। মানস রায়চৌধুরী ৩৪, ১৫
তোমার মূর্তি। অরুণ মিত্র ৪৭, ৪৩
তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে। নাগরিক ২৩, ৪০
তোমার সহিষ্ণু চোখ। বিজয়া মুখোপাধ্যায় ৩৭, ২
তোমার স্পর্শের চমৎকার। রাজলক্ষ্মী দেবী শা ১৯৭৮
তোমার স্ফটিক ঘাড়ে। আনন্দ ঘোষ হাজরা ৫০, ৩২
তোমারি তুলনা তুমি। গৌরকিশোর ঘোষ বি ১৯৭০
তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ ৩১, ৩২, ১৩ জুন ১৯৬৪ : ৫৭৪-৫৭৫, স
তোমারি বিরহ সয়ে প্রাণ। কবিতা সিংহ শা ১৯৭০।
তোমিও মিজোকামি
জাপান থেকে রবীন্দ্রতীর্থে ৪০, ২৩, ৭ এ ১৯৭৩ : ৯৩৩-৯৩৫, স
ত্যক্ত গ্রহ। রমা ঘোষ ৪৯, ৫০
ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা। নির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত ২৪, ২০
ত্যাগোদ্যোগ ৩০, ৪৪, ৩১ আ ১৯৬৩ : ৪২৭
ত্রয়ী কোয়াসার কি সম্ভব। সমরজিৎ কর ৪৯, ৮
ত্রয়ী স্তোত্র। অমিয় চক্রবর্তী ৪০, ১
ত্রান লে জুয়ান ৩০, ৪৪
ত্রাস, আতঙ্ক ও গণতন্ত্র ৪৮, ২৭, ২৫ জু ১৯৮১ : ৭, সম্পা
ত্রিকাল ভামিনী। আনন্দ বাগচী শা ১৯৫৪
ত্রিকোণী প্রেমের গল্প। শিবশম্ভু পাল ২৪, ২৫
ত্রিগুণা সেন
জাতীয়তাবোধ ও ভারতে কারিগরি বিজ্ঞানের প্রসার ৩১, ২৭ (সা) ৯ মে ১৯৬৪ : ৮৭-৯৩
ত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
অতিরঞ্জন ২১, ৩৬, ১০ জু ১৯৫৪ : ৭৩০-৭৩২, রম্য
ত্রিতাপ। উর্ধেন্দু দাশ ৪৬, ২০
ত্রিতাল। শঙ্খ ঘোষ ৪৪, ২৯
ত্রিদিব চৌধুরী
সালাজারের জেলে উনিশ মাস ২৪, ৩৫, ২৯ জুন ১৯৫৭—২৫, ৩০, ২৪ মে ১৯৫৮
ত্রিদিব চৌধুরী—স্মৃতিকথা ২৪, ২৫-২৫, ৩০
ত্রিদিবরঞ্জন মালাকার
ঘরে ফিরলে ৩৯, ৩৬, ৮ জু ১৯৭২ : ১০৫৭, ক
তৃতীয় ভুবন ৩২, ৩৩, ১৯ জুন ১৯৬৫ : ৭০৮, ক
নদীর সঙ্গে ৪০, ৪৭, ২২ সে ১৯৭৩ : ৬৮৮, ক
যাবার বেলায় ৩১, ৩২, ১৩ জুন ১৯৬৪ : ৫৭৬,ক
রতন মাঝির বাংলাদেশ ৩৯, ১০, ৮ জা ১৯৭২ : ১০২১, ক
সন্দেহ ৩১, ৩৮, ২৫ জু ১৯৬৪ : ১২৪৫, ক
ত্রিধারা। অমিয় চক্রবর্তী ৩৬, ১
ত্রিধারা। সমরেশ বসু ২৩, ৩৬-২৪, ২৬
ত্রিনয়ন। সন্তোষকুমার ঘোষ ৩৪, ১-৩৪, ৩
ত্রিনিদাদ—টব্যাগো। নাসিতা দত্ত ৫০, ৪৬
ত্রিনিদাদ—টব্যাগো—বিবরণ ও ভ্রমণ ৫০, ৪৬
ত্রিনেত্র। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৩১, ৪১
ত্রিপদী। বিষ্ণু দে শা ১৯৬০
ত্রিপাদ। সিদ্ধেশ্বর সেন শা ১৯৮২
ত্রিপুরা—ইতিহাস ৩৭, ১৪
ত্রিপুরা বসু
লোকায়ত শিল্প : পুতুল ৪৫, ১৭, ২৫, ফে ১৯৭৮ : ৩৬-৩৮, স
ত্রিপুরা—বিবরণ ও ভ্রমণ ৪৬, ৫০
ত্রিপুরায়। দিনেশ দাস শা ১৯৮০
ত্রিপুরায় গণহত্যা ৪৭, ৩৪, ২১ জুন ১৯৮০ : ৯, সম্পা
ত্রিপুরার লোকনৃত্য ও লোকসংস্কৃতি। কল্যাণব্রত চক্রবর্তী ৩২, ২৮
ত্রিবর্ণ। বনফুল ২৯, ১৫-২৯, ৫১
ত্রিবেণী সংহার। শক্তিপদ ব্রহ্মচারী ৪২, ৪২
ত্রিবেণীর সেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও তাঁর প্রতিকৃতি। নারায়ণ দত্ত ৪৫, ১৫
ত্রিভাষা সূত্র ৩৪, ২৮, ১৩ মে ১৯৬৭ : ২২১
ত্রিমূর্তি। সৈয়দ মুজতবা আলী শা ১৯৫৮
ত্রিযামা। মণীন্দ্র গুপ্ত ৩৭, ৪৯
ত্রিলোকেশ মুখোপাধ্যায়
নতুন দিগন্তের জাম্বুরী ২৩, ২১, ২৪ মা ১৯৫৬ : ৫৯৩-৫৯৫,স
ত্রিলোচন কলমচি *দেখুন* আনন্দ বাগচী
ত্রিলোচন নন্দীর নামে ছড়া। বিমল কর ২৮, ২৩
ত্রিশঙ্কু *দেখুন* শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়
ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ৩৭, ৪৩ ; ৩৯, ১৫
ত্রৈলোক্য মহারাজের অপ্রকাশিত চিঠি। আনন্দ রায় ৩৯, ১৫

থ

থর্নডাইক, ডেম সিবিল ৪০, ৩৪
থাইল্যাণ্ড—বিবরণ ও ভ্রমণ ৩৭, ৪
থাইল্যাণ্ডের সভ্যতা সংস্কৃতি। সবিতা ঘোষ ৩৭, ৪
থাকে থেকে যায়। উত্তম দাশ ৫০, ১৫
থাকো, যেও না। প্রান্তিক বসু ৪২, ৪
থামতে থামতে। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ৪৬, ৩-৪৬, ৫
থামব না। বনফুল ৩০, ৭
থামুন। পীযূষ রাউত ৪৩, ৭
থামো, সুন্দর মুহূর্ত, তুমি। শান্তিকুমার ঘোষ ৩৬, ১৪
থার্ড পার্সন। প্রতিমা সেনগুপ্ত ৩৮, ৪৬
থালি পাহাড় বা লিউ পান পর্বত। মাও ৎসে তুং ২৫, ১৩
থিক কোয়াং ডাক ৩০, ৩৯
থিমাইয়া, কে এস ৩৩, ৯
থিয়েটার ১৯৭৭। দেবাশিস দাশগুপ্ত ৪৫, ১৩
থিয়েটার ১৯৭৮। দেবাশিস দাশগুপ্ত ৪৬, ২৪
থিয়েটার ১৯৮০। দেবাশিস দাশগুপ্ত ৪৮, ২১
থিয়েটারি। অরবিন্দ গুহ ৩০, ৮
থিয়েটারী থিয়েটার : অঙ্গনমঞ্চ। বাদল সরকার বি ১৯৭১
থিয়েটারে খুন। জি কে চেস্টারটন ২৮, ৪৯
থিয়েটারে মুখোস। বাদল সরকার শা ১৯৭৮
থিয়েটারের চোখে যাত্রা, যাত্রার চোখে থিয়েটার। প্রবোধবন্ধু অধিকারী শা ১৯৭৬
থিয়েটারের মেয়ে। আন্তন চেকভ ২৮, ৪৩
থুলুকাই। কণা বসুমিত্র ৪৫, ৮
থেমে আছে। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ৪৮, ৩২
থেরো, পল ৪১, ৪
থ্রি মাইল আইল্যাণ্ড এখন বিতর্কিত প্রশ্ন। সমরজিৎ কর ৪৭, ৩১

দ

দংশন। বিমল কর শা ১৯৭৩
দংশন। বিমল দত্ত ২২, ২৯
দক্ষিণ আফ্রিকা, বর্ণবিদ্বেষ ২৭, ২৫
দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতীয় বিদ্বেষ ২২, ৪২
দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বিদ্বেষের সূচনা। সুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় ২২, ৪২
দক্ষিণ খোলা বাড়ি। সমীর রায়চৌধুরী ৪১, ২
দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের দিওয়ালী পুতুল। তপন কর ৫০, ৫২
দক্ষিণ পূর্বাচলের পথে। মানসী দাশগুপ্ত ৪৮, ১৪
দক্ষিণ ভারত—বিবরণ ও ভ্রমণ ২২,১৮-২২, ২০ ; ২৬, ৩৪ ; শা ১৯৭২
দক্ষিণ ভারতে কয়েকদিন। খগেন দে সরকার ২২, ১৮-২২, ২০
দক্ষিণ মেরু ২৫, ১২ ; ৩৬, ৪৬ ; ৪৭, ৯ ; ৫০, ২৭
দক্ষিণমেরু—অভিযান ৫০, ৩
দক্ষিণমেরুর ইতিকথা। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ২৫, ১২
দক্ষিণ রাঢ়ের তুষু পর্বের ঐতিহাসিক পটভূমি। মানিকলাল সিংহ ৩২, ৩৪
দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ। নবনীতা দেবসেন শা ১৯৭৯
দক্ষিণায়ন। ফণিভূষণ আচার্য ২৪, ২৭
দক্ষিণায়ন। ভবতোষ দত্ত ২৬, ৩৪
দক্ষিণারঞ্জন বসু
বৃত্তান্ত ২৫, ২৬, ২৬ এ ১৯৫৮ : ৯০৪, ক
দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার ২৯, ২৪
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ২৪, ২৩
দক্ষিণী চলচ্চিত্র। তপন দাশ ৫০, ৪৪
দক্ষিণী শিল্পীদের ওপর নন্দলালের প্রভাব। সুশীল মুখোপাধ্যায় বি ১৯৮২
দক্ষিণের বারান্দা। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ২৭, ৪৪-২৮, ১৩
দখল। প্রলয় সেন ৪৭, ১৯
দগ্ধ মরিচঝাঁপির অঙ্গার ৪৬, ৩২, ৯ জুন ১৯৭৯ : ১১, সম্পা
দড়ি ধরে ওঠো। বিজয়া মুখোপাধ্যায় ৪২, ১৪
দণ্ডক শবরী। নারায়ণ সান্যাল ২৯, ৩৪-৩০, ৪
দণ্ডকারণ্য। পান্নালাল দাশগুপ্ত ৪৬, ৩০
দণ্ডকারণ্য। সলিল ঘোষ ২৩, ৩৫
দণ্ডকারণ্য—উদ্বাস্তু শিবির ২৭, ১৪-২৭, ১৫

বিএসএ ডিলাক্স

ফর্ক লক—অধিক নিরাপত্তার জন্যে

অ্যাক্রিলিক পেণ্ট—বহুদিন ঝকঝকে থাকার জন্যে

সাদা সাইডওয়াল টায়ার—দারুণভাবে আকর্ষণীয়

রিফ্লেক্টর প্যাড্‌ল—রাতে নিরাপদে চলাচলের জন্যে

নিজেই দেখে নিন :

এখন বি এস এ ডিলাক্স-এ যে ৪টি অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা অন্য আর কোনো সাইকেলেই খুঁজে পাবেন না।

১। নতুন ফর্ক লক
সাইকেল লক করার এক একেবারে নতুন উপায়।

২। দেখতে ঝলমলে উজ্জ্বল ক'রে তোলার জন্যে অ্যাক্রিলিক পেণ্ট।

৩। তকতকে মসৃণ সাদা সাইড-ওয়াল টায়ার

৪। রাতে নিরাপদে সফর করার জন্যে অনুপম রিফ্লেক্টর প্যাড্‌ল

তার সঙ্গে
- ক্রোমপ্লেটেড স্পোক্‌স
- ব্রুক স্যাড্‌ল
- ডানলপ টায়ার ও রিম
- উন্নত এক ব্রেকিং সিস্টেম

BSA Deluxe

২০ ডিসেম্বর ১৯৮৬ পাঁচ টা

দেশ

সংগীত

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় □ নীলাক্ষ

বিজয় চক্রবর্তী □ বিমান ঘোষ

আশীষ চট্টোপাধ্যায়

আমজাদ আলি

চট্টোপাধ্যায়

সারদা

বাড়ন্ত
ছেলেমেয়েদের চাই কমপ্লান
একমাত্র কমপ্লান-এই
আছে এদের প্রতিদিনের
একান্ত প্রয়োজনীয়
২৩-টি খাদ্যগুণ
সাধারণতঃ ছেলেমেয়েরা ১৫ বা ১৬ বছর বয়সের মধ্যে প্রায় সবদিক থেকেই পুরোপুরি ভাবে বেড়ে ওঠে।
তাই এদের এই সময়ে দরকার এমন পুষ্টি, যা সরাসরি সুস্থ-সবল শরীর গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।
এই কারণেই আপনার ছেলেমেয়েদের আজ থেকেই কমপ্লান খাওয়ানো শুরু করুন। কমপ্লান-এ আছে প্রোটিনের সেরা মিল্ক প্রোটিন (২০%)।
এছাড়া আছে আরো ২২-টি খাদ্যগুণ। কমপ্লান পাবেন চমৎকার সব স্বাদ-গন্ধে।
Glaxo
Complan
COMPLETE PLANNED FOOD
23
সুপরিকল্পিত মাত্রায়
২৩-টি প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ
প্রোটিন রিবোফ্লাভিন
ফ্যাট নিকোটিনামাইড
কার্বোহাইড্রেট ক্যালসিয়াম
ক্যালসিয়াম প্যান্টোথিনেট
ফসফরাস কোলিন
সোডিয়াম পাইরিডক্সিন (বি৬)
ভিটামিন বি১২
পটাসিয়াম ফলিক অ্যাসিড
আয়রন ভিটামিন সি
আয়োডিন ভিটামিন ডি
ভিটামিন এ ভিটামিন ই
ভিটামিন বি১ ভিটামিন কে১
দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই।
কমপ্লান® -সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার
B84 GrC 120 B

সূচীপত্র

দেশ

২০ ডিসেম্বর ১৯৮৬ □ ৪ পৌষ ১৩৯৩ □ ৫৪ বর্ষ ৮ সংখ্যা

প্র চ্ছ দ

বিকাশ ভট্টাচার্য

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক
৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ২০ পয়সা পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা

২১

প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার সমতুল যে সাধনাটি একদা কল্প-স্বর্গের উচ্চকোটি স্পর্শ করে তা সঙ্গীত। তখনই উচ্চারিত হতে পেরেছিল—ছন্দোয়ং সঙ্গীতোয়ম্— এ জীবন ছন্দময় এ প্রাণ গান। অধ্যাত্ম সাধকের উপলব্ধি আত্মগত ; সঙ্গীত সাধকের সিদ্ধি ব্যক্তি-বৃত্ত অতিক্রান্ত। অজস্রকে সে আপ্লুত করে সাধন সুধারসে। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় প্রবাহিত সুরের সেই সুরধুনী। কিন্তু মাঝে মাঝে কি আবিল হচ্ছে সেই ধারা ? কণ্ঠসঙ্গীতকে পেছনে ফেলে প্রবলতর হয়ে উঠছে কি বয়ঃকনিষ্ঠ যন্ত্রসঙ্গীত ? এসব নিয়ে সবিস্তার ভাবনা এবারকার প্রচ্ছদ

নিবন্ধে। এই লেখ-গুচ্ছের অন্যতম, এক কালের বিখ্যাত সঙ্গীতরসবেত্তা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর পুরনো ফাইল থেকে উদ্ধার করা এক দীর্ঘ, দুর্লভ রচনা। বিশিষ্ট শিল্পী এবং সাংবাদিক বিজয় চক্রবর্তী একটি লেখায় তাঁর শিল্পী-হৃদয়কে সাংবাদিকের নির্দয় বিচারের মুখে দাঁড় করিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের হাল-হকিকত। সঙ্গীত-লোকের সুখ্যাত ব্যক্তিত্ব বিমান ঘোষ আলোচনা-সূত্রে স্মৃতির অ্যালবাম থেকে তুলে ধরেছেন সেকাল-একালের স্মরণীয় সঙ্গীত সম্মেলনগুলিকে। তাছাড়া আছে যন্ত্রসঙ্গীত সম্পর্কে নীলাক্ষ গুপ্তর অনবদ্য পর্যালোচনা আর আশীষ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গত প্রসঙ্গ।

৪৫

সঙ্গীতের সকল ধারা ছাপিয়ে যন্ত্রসঙ্গীত আজ জগৎ-জয়ের অভিযানে। বরমাল্য জয়ীদের কারো হাতে সেতার, কারো সরোদ। তেমনি এক মাল্যবান সরোদিয়া ওস্তাদ আমজাদ আলি খান। কোন অভীষ্টের দিকে এগিয়ে চলেছেন এই শ্রুতিনন্দন, নয়নমোহন নবীন শিল্পী, তার সব নিগূঢ় রহস্য চয়ন করে এনেছেন সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় শিল্পীর সঙ্গে সুদীর্ঘ হৃদয়-সংবাদী সাক্ষাৎকারে। সঙ্গে তাঁর মহান শিল্পী-পিতার অমর কথা।

১৫

শ্রীশ্রী সারদা মা, ভগিনী নিবেদিতার ভাষায়— নারীর আদর্শ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী। শতরূপা এই ঈশ্বরীর স্বরূপ অনুধাবনই প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার এই রচনার্ঘ্য।

১২১

আমাদের বইয়ের জগৎকে বটতলা থেকে বিশ্বমঞ্চে নিয়ে এসেছে মুদ্রাযন্ত্রের বিপ্লব। মুদ্রণ-সৌকর্যে, বিষয় বৈভবে, অলংকরণে আধুনিক সাহিত্যের সকল শাখা-প্রশাখায় এখন বহুবর্ণময় পুষ্পবিকাশ। বটতলায় আজ হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের ঘটা। খাঁটি-নকল যাচাই করে ক্রেতা-পাঠকের সহায়তার জন্য মূল্যায়নের নিয়মিত কাজটি করে যাচ্ছে 'গ্রন্থলোক' বিভাগ।

১৯

রূপদর্শী তাঁর ঝাঁকি-দর্শনের এক-একটি ঝটকায় সমাজের এক-একটি পটচিত্র খুলে দিচ্ছেন পাঠককুলের সামনে। পালানোর পথ নেই। কলমের শাণিত খোঁচায় এ এক আশ্চর্য চক্ষুরুন্মীলন। ব্যঙ্গচিত্রে ভূয়োদর্শন যেন। এবারে মিঠুনের জ্যোতিভিশন দর্শন আর রাহুলের দম মারো দম।

প্রকাশিত হল

বহুদর্শী প্রয়াত চিকিৎসক

নলিনীরঞ্জন কোনার-এর

অমূল্য স্মৃতিপঞ্জী

আমার ডাক্তারী ॥ ২য় খণ্ড

দাম ১[illegible]·০০

স্মৃতিকথা মাত্রেই কোনও না কোনও দিক থেকে আকর্ষণীয়। তদুপরি, তা যদি হয় ডাক্তার নলিনীরঞ্জন কোনার-এর মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকের, তাহলে তার আকর্ষণ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। কেননা, প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারের অভিজ্ঞতার পরিধির অন্তর্ভুক্ত হন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। তাঁর চোখের সামনে উন্মোচিত হয় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বহু অজানা দিক, জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন মানুষের বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গি। আরও বড় কথা, পরবর্তী প্রজন্মের তরুণ চিকিৎসকরাও খ্যাতকীর্তি পূর্বসূরীর এ-জাতীয় স্মৃতিপঞ্জী থেকে নানাভাবে উপকৃত হবার সুযোগ পান। মানুষের অজস্র রোগের অসংখ্য উপসর্গ, চিকিৎসার ধরন, বিভিন্ন সংকটময় পরিস্থিতি ও তার সমাধান সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়।

তাঁর বহুবর্ণ চিকিৎসক জীবনের বেশ কিছু কৌতূহলকর অভিজ্ঞতার বিবরণ নিয়ে ডাঃ কোনার এর আগে লিখেছেন 'আমার ডাক্তারী'। সেই মূল্যবান গ্রন্থেরই দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হল। এ-পর্বেও অনুরূপ কিছু বিবরণ। আশা করা যায়, এই খণ্ডটিও পূর্ববৎ সমাদৃত হবে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র
গল্পমালা

প্রকাশিত হয়েছে

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

সারা জীবনের সুনির্বাচিত

গল্পমালা

দাম ৫০·০০

আর সমাদর অর্জন যাঁর গল্পকে স্থান দেয় বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পের পর্যায়ে, সন্তোষকুমার ঘোষ যাঁকে বসান মপাসাঁ, ও হেনরি, শেখভ ও রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ আসনে, সেই নরেন্দ্রনাথ মিত্র চার দশকব্যাপী সৃষ্টিকালে প্রায় চারশো গল্প লিখেছেন। তার অধিকাংশই এখন গ্রন্থাকারে দুষ্প্রাপ্য। অথচ নিত্যই তাঁর বিভিন্ন গল্পের খোঁজ করেন গবেষক বা চিত্রপরিচালক কিংবা অনুরাগী পাঠক। নিরন্তর সেই চাহিদার কথা ভেবেই নরেন্দ্রনাথের ছোট বড় মাঝারি মাপের পঞ্চাশটি অবিস্মরণীয় গল্প নিয়ে প্রকাশিত হল এই সমৃদ্ধ সংগ্রহ — 'গল্পমালা'।

বিভিন্ন দশকে নরেন্দ্রনাথের গল্পের যে দিকবদল, মনোভঙ্গির যে ধারাবাহিকতা তা যাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ রেখেই এ সংগ্রহের নানা ধরনের বিচিত্র স্বাদের গল্পগুলি নির্বাচিত।

গ্রন্থশেষে সংযোজিত হয়েছে লেখকের আত্মবিশ্লেষণধর্মী একটি রচনা 'গল্প লেখার গল্প'। অন্তর্ভুক্ত গল্পমালার সাময়িকপত্রে প্রকাশকাল উল্লিখিত পরিশিষ্টে।

সব দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের গর্ব করবার মতো লেখকের প্রতিনিধিত্বমূলক গল্প-সংকলন, 'গল্পমালা'।

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

সন্তোষকুমার ঘোষের

রবীন্দ্র-ছোট-গল্প নিয়ে সৃষ্টিধর্মী আলোচনা গ্রন্থ

রবির কর

দাম ৮·০০

এ-গ্রন্থের আলোচক এমন এক ব্যক্তিত্ব, রবীন্দ্রনাথের সমগ্রতায় যার বিস্ময়কর বিহার, বিশ্বসাহিত্য যাঁর নখদর্পণে,

এবং —সর্বোপরি—বাংলা ছোটগল্প যাঁর স্মরণীয় সত্তারই প্রধান, উজ্জ্বল এক অংশ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে বাংলা ছোটগল্প বিষয়ে অসামান্য কিছু ভাষণ দেন সন্তোষকুমার। সেই বক্তৃতামালাকেই এ-গ্রন্থে নতুন বিন্যাসে সাজিয়ে দিয়েছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প নিয়ে সেইসব কথাই উচ্চারণ করেছেন। যা কিনা আজও 'না বলা বাণী'। দেখাতে চেয়েছেন, কোন গল্প কী হয়েছে, আর কী কী হতে পারত। জানাতে চেয়েছেন কোথায় রবীন্দ্রনাথ আধুনিকদেরও আধুনিক। কীভাবে গান ও কবিতাতেও মিশেছে তাঁর গল্প।

নতুন, স্পষ্ট, সাহসী ও অন্তরঙ্গ এই আলোচনার শেষে উপরি-পাওনার মতো যোগ করেছেন তিন-তিনটি আধুনিক গল্প, যা কিনা রবীন্দ্রনাথেরই এক গল্পের বীজে বোনা নতুন ফসল।

প্রকাশিত হচ্ছে

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

দুটি অসামান্য গ্রন্থের আনন্দ-মুদ্রণ

শকুন্তলা ॥ নালক

সপ্তম মুদ্রণ

বুদ্ধদেব গুহর

জনাদৃত উপন্যাস

কোয়েলের কাছে

দাম ১২·০০

অরণ্যে অনন্য যে-বুদ্ধদেব গুহ, তাঁরই জাদুকরী কলমের বহুবন্দিত উপন্যাস 'কোয়েলের

কাছে'। প্রকৃতিই এখানে প্রধান চরিত্র। তবু মারিয়ানার প্রেম, সুমিতাবৌদির কামনা, লালতির সোহাগ, জগদীশ পাণ্ডের হিংস্রতা, ঘোষদার কৃত্রিমতা আর যশোয়ন্তের আদিমতাও, কোয়েল নদীর মতোই, কৌতূহলকর, প্রাণবান এক প্রবাহ।

ষষ্ঠ মুদ্রণ

বুদ্ধদেব গুহর

তীব্র গভীর উপন্যাস

একটু উষ্ণতার জন্যে

দাম ১৫·০০

আধুনিক এক বিবাহিত লেখক,—যার সৃষ্টিসত্তা খুঁজে বেড়াত সর্ব-অর্থে এক নারীকে, প্রকৃত ও সম্পূর্ণ এক মেয়েকে—সেই লেখক ও

তার এক অনুরাগিণী পাঠিকাকে নিয়ে তীব্র, গভীর, প্রেমের এবং একই সঙ্গে তীক্ষ্ণ, প্রখর মানসিক দ্বন্দ্বের এক বিরলস্বাদ উপন্যাস।

চতুর্থ মুদ্রণ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

ছোটদের ভূতের গল্প

পাঁচমুণ্ডির আসর

দাম ১০·০০

ভূত থাক আর নাই থাক, ভূত সত্যি হোক বা মিথ্যে, ভূতের গল্পের চিরকালীন আলাদা একটা আকর্ষণ। 'পাঁচমুণ্ডির আসর'-এর অবিশ্বাস্য ও রোমাঞ্চকর নানান কীর্তিকাহিনীর নায়ক ভূতেরা সেই আকর্ষণেরই খোরাক যোগাবে।

তৃতীয় মুদ্রণ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

গায়ে-কাঁটা-তোলা উপন্যাস

কবন্ধ বিগ্রহের কাহিনী

দাম ১২·০০

দুই কিশোরের সামনে চুরি হচ্ছিল এক মন্দিরের মুণ্ডহীন সোনার বিগ্রহ। কৌতূহলী কিশোরজুটি অনুসরণ করতে গিয়ে বন্দী হল। এমন-কি ধুরন্ধর গোয়েন্দা পারিজাত বক্সীকেও আটকে রেখেছিল মূর্তিচোরের দল। শেষ পর্যন্ত কীভাবে ধরা পড়ল পুরো দল, তাই নিয়েই এই রোমহর্ষক উপন্যাস।

৩৩০০ কপি নিঃশেষ

তারাপদ রায়ের

জমজমাট আড্ডার বই

কাণ্ডজ্ঞান

দাম ২৫·০০

প্রথমেই কবুল করা ভাল, যাঁদের কাণ্ডজ্ঞান খুব প্রবল, এ-বই তাদের জন্য নয়। এ-বই শুধু তাঁদেরই জন্য যাঁরা প্রাণ খুলে হাসতে চান, অথচ হাসতে ভুলে গেছেন; দিলদরিয়া মজলিশী বন্ধু চান, অথচ আড্ডার ঠিকানা জানেন না।

এ-বইতে খুঁজে পাবেন তাঁরা সেই বৈঠকী আড্ডার ঠিকানা। এ-আড্ডায় বসলে ওঠা যায় না, বেশিক্ষণ থাকা যায় না বামগরুড়ের ছানা হয়ে। হাসতে-হাসতে অজান্তেই মন ভাল হয়ে যায়।

হবেই, কেননা, এ-বইতে তারাপদ রায় তৈরি করেছেন দারুণ জমাটি আড্ডার ফুরফুরে এক পরিবেশ। নিজের অভিজ্ঞতার সূত্রে শুনিয়েছেন চেনা-অচেনা, দিশি-বিদেশী অজস্র রস গল্প। চোর, ডাকাত, লোডশেডিং, ছারপোকা, চশমা, দরজি, টেলিফোন, মাতাল, ভিখিরি, বই, স্বপ্ন—এমনতর অজস্র বিষয় নিয়ে অফুরন্ত স্টক যেন উজাড় করে দিয়েছেন। পাতায় পাতায় অহিভূষণের কার্টুন।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

শাদা মানুষ কালো মানুষ

১৫ নভেম্বর দেশ পত্রিকায় শাদা মানুষ কালো মানুষের দ্বন্দ্ব নিয়ে তিনটি উপভোগ্য নিবন্ধ পড়লাম। এ চিঠি কোনো বিতর্কের অবতারণা নয়, ঈষৎ সংযোজন মাত্র। নবনীতা দেবসেন এবং ধ্রুব গুপ্তের বিষয় কালোমানুষদের সাহিত্য। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয় দাসপ্রথা, আর্থসামাজিক বঞ্চনা ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে অবলম্বন করলেও শেষপর্যন্ত কালো মানুষদের 'প্রতিবাদী সাহিত্যে'র কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে। তাতে আপত্তি কী, সাহিত্যকেও যখন 'সমাজদর্পণ' বলা হয়ে থাকে? এঁরা তিনজনই বাঙালি। সে কারণে আশা ছিল, কেউ-না-কেউ রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' কবিতাটি উল্লেখ করবেন। এ আশা বাঙালি ভাবাবেগজনিত নয়, প্রাসঙ্গিক। খুবই প্রাসঙ্গিক। গান্ধীজীও উল্লেখ্য হতে পারতেন।

'কালো মানুষ' এবং আফ্রিকা বিষয়ে যে কোনো আলোচনায় (আমার তো মনে হয় যে-কোনো বিষয়েরই আলোচনায়) সেটির ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত জরুরী। রাঘব লিখেছেন 'খ্রিস্টের জন্মের পঞ্চম শতক আগে ঐতিহাসিক হেরোডোটাস তাঁদের (কৃষ্ণাঙ্গদের) বর্ণনা করেছেন এইভাবে: কালো ও কোঁকড়াচুল।' খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে লেখাই সঠিক হত। তাঁর জন্ম খ্রিঃ পূঃ ৪৮০ থেকে ৪৯০-এর মধ্যে, মৃত্যু খ্রিঃ পূঃ ৪২৫ সালে। 'ইতিহাসের জনক' নামে খ্যাত এই মানুষটিকে 'মিথ্যার জনক'ও বলা হয়। তবে তিনি তাঁর 'হিস্তোরিয়া' কেতাবে শুধু উত্তর আফ্রিকার লিবিয়া, মিশর এবং দক্ষিণে ইথিওপিয়ার কথাই লিখেছেন। তখন 'আফ্রিকা' কথাটির উদ্ভবই হয়নি। ইথিওপিয়ার মানুষদের তিনি 'বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা, সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে দীর্ঘজীবী' বলেছেন, কিন্তু 'তাঁরা কালো ও কোঁকড়াচুলো,' এই বর্ণনাটি দিয়েছেন 'ভারতীয়'দের বর্ণনা প্রসঙ্গে। লিখেছেন, ইথিওপিয়ার লোকেরা ভারতীয়দের মতোই কালো ও কোঁকড়াচুলো। ভারত ও ভারতীয়দের সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা যেমন উদ্ভট, তেমনি হাস্যকর। সেকথা এখানে অবান্তর। 'ইথিওপিয়া' বলত স্থানীয় লোকেরা এবং সেই সূত্রে গ্রিক ও রোমানরা। দেশটিকে আরবরা বলত 'আবিসিনাহ'—যা থেকে ইউরোপীয় উচ্চারণে 'আবিসিনিয়া' হয়। প্রাক-ইসলামি যুগেই ওখানকার অধিবাসীদের আরবরা বলত 'হাবশি।' শব্দটি আবিসিনাহ জাত। আদি খ্রিস্টীয় যুগেই গ্রিক-রোমান সংসর্গে হাবশিদের একটা বড় অংশ, বিশেষ করে শাসকরা খ্রিস্টান হন। কিন্তু রেড সির দুইপারে দুই দেশ আরব ও আবিসিনিয়ার মধ্যে যোগাযোগ প্রাকখ্রিস্টীয় যুগ থেকে। আরবে দাসপ্রথা খুব প্রাচীন। আরবরাই ওই যোগাযোগের সূত্রে 'কালো আফ্রিকার' একেবারে ভেতরে ঢুকতে পেরেছিল, যেখানে পৌঁছতে ইউরোপীয়দের প্রায় হাজার বছরের বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

প্রাক-ইসলামি যুগ কেন, প্রাক-খ্রিস্টীয় যুগেই আরবরা আফ্রিকার গভীরে ঢুকে জন্তু ধরার মতো কালোমানুষদের ধরে নিয়ে এসে স্বদেশে-বিদেশে বিক্রি করেছে। আবার হাবশি খ্রিস্টান শাসকদের সঙ্গে আরবদের লড়াই কম হয় নি। কোরানে হাতি সম্পর্কিত একটি অধ্যায় (সুরা ফিল। ফিল মানে হাতি, যা থেকে ভারতে 'পিলখানা অর্থাৎ হাতিশালা কথাটির উদ্ভব মুসলিম শাসকদের সূত্রে) আছে। ওতে এক হাবশি রাজার হাতিবাহিনী নিয়ে মক্কা আক্রমণের উল্লেখ আছে। কিন্তু বেশি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, আরব্য দাসপ্রথার সঙ্গে ইউরোপীয় দাসপ্রথার ফারাক আকাশ-পাতাল। আরব দাসব্যবসায়ী কৃষ্ণাঙ্গদের ধরে এনে যে-আরবকে বিক্রি করেছে, কৃষ্ণাঙ্গ দাস কিন্তু সেই আরব মালিকের পরিবারের একজন হয়ে গেছে। প্রাক-ইসলামি আরবেও এই কৃষ্ণাঙ্গ দাসরা মালিকের জামাইও হতে পেরেছে। অভিজাতদের সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছে। আরব শাসন ব্যবস্থার ট্রাইবাল গড়ন সত্ত্বেও বহু কৃষ্ণাঙ্গ সেই শাসন ব্যবস্থার শরিকও হয়েছে। প্রথানুসারে ক্ষেত্রবিশেষে অর্জিত ও সঞ্চিত বেতনের বিনিময়ে কিংবা কোনো কৃতিত্ব দেখিয়ে মুক্ত মানুষ হতে পেরেছে। ইসলামি যুগে তো এই পুরনো প্রথা আরও সম্প্রসারিত হয়েছিল।

পয়গম্বরের আমলে প্রার্থনার ডাক দিতেন যিনি (আজানঘোষক মুয়াজ্জিন), সেই বেলাল ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ দাস। কৃষ্ণাঙ্গ বরাবর সুকণ্ঠ, এ তার এক নজির। রাবেয়া নামে প্রখ্যাত মরমী সাধিকা ছিলেন হাবশি মেয়ে। দূরের কথা কি এই বাংলায় পনের শতকের শেষ নাগাদ ৭ বছর পরপর ৪ জন হাবশি সুলতান রাজত্ব করেছেন (১৪৮৬-১৪৯৩)। প্রথম হাবশি সুলতান বারবাক ছিলেন প্রাক্তন এক দাস—বান্দা (দিল্লির দাসবংশীয় সুলতানরা অবশ্য কৃষ্ণাঙ্গ ছিলেন না)। যাই হোক, বিষয়টি বিশাল নিবন্ধযোগ্য। আরবদের হাত করেই পোর্তুগিজরা আফ্রিকার ভেতরে হানা দিতে পেরেছিল। প্রকৃত সন তারিখ নির্ণয় করার সমস্যা আছে (রাঘব বলেছেন ১৪ শতকে)। তবে একথা ঠিক, ইউরোপীয়রা পালের জাহাজে তথাকথিত 'অভিযান' এবং 'আবিষ্কার'-এর ছলে লুণ্ঠনের জন্য এদিকে-সেদিকে পাড়ি জমানোর সময় থেকেই আরবদের একচেটিয়া দাস-ব্যবসাতে ভাগ বসিয়েছিল। ধ্রুব গুপ্ত সঠিক আভাস দিয়েছেন, আরবি শব্দ কাফির (মূল অর্থ নাস্তিক) থেকে পোর্তুগিজ Caffre এবং শব্দটি ইউরোপে যায়। অবাচীন, লাতিন ভাষায় 'আফ্রিকানোস' আছে। এ থেকে বোঝা যায় বিশাল ভূখণ্ডটির 'আফ্রিকা' নাম কীভাবে হল।

হেরোদোতাসের যুগে 'আফ্রিকা' শব্দই ছিল না। শব্দটি অবাচীনই। আরও উল্লেখ্য বিষয়, ভূমধ্য সাগরের দক্ষিণ ও পূর্বতীরবর্তী মুসলিম দেশগুলিতে ফর্সা মানুষরা, যাঁদের গায়ের রঙের সঙ্গে ইউরোপীয়দের গায়ের রঙের মোটামুটি মিল, কৃষ্ণাঙ্গদের ঘৃণা করেননি এবং করেন না। ক্রমশ বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে এসব দেশে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষরা জনজীবনে মিশে গেছেন। শুধু ওসব দেশে নয়, পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম সমাজেও একই অবস্থা। এদিকে বিশেষ করে আলজিরিয়া, লিবিয়া, মরোক্কো, তিউনিসিয়া, মিশর, সউদি আরবে অসংখ্য কালো-ফর্সা পুরু ঠোঁট কোঁকড়াচুলো মিশ্রণ চোখে পড়বে। সাদাতকে স্মরণ করা যায়। ধ্রুব গুপ্ত আরব-সাহিত্যে কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ আছে কি না জানেন না স্বীকার করেছেন। নেই। আরব আফ্রিকা যোগাযোগ প্রাচীন। তাই বিশ্বপর্যটক ইবনে বতুতার উল্লেখে বিভ্রান্তি ঘটে। ইবনে বতুতা সাহারাতেও (আরবিতে 'সাহারা' মানে মরুভূমি) ঘুরেছেন। ধ্রুববাবু আফ্রিকার ভেতরে অভিযানকারী, যেমন লিভিংস্টোন, স্পেক, স্ট্যানলি, বার্টন প্রমুখের বিবরণ খুঁটিয়ে দেখতে পারেন। খ্রিস্টান মিশনারিদের ব্যর্থতা সম্পর্কে কেউকেউ ঠাট্টা করে বলতেন, নিগ্রোরা বহুবিবাহে অভ্যস্ত। তাই ইসলাম তাদের সহজে বাগে পেয়েছে। এই 'নিগ্রো' শব্দটির মূলে আছে লাতিন 'নিগার', মানে হল 'কালো।' মুসলিম আরবরা এঁদের 'কাফির' বললেও কদাচ 'কালো' বলে আলাদা করেনি, এও লক্ষ্য করার ঘটনা। আরবিতে 'আসোয়াদ' এবং 'সিয়া' মানে কালো। ফার্সি বা আরবিতে 'বান্দা-ই-আসোয়াদ' কথাটির খুব কদাচিৎ প্রাচীন প্রয়োগ দেখা যায়। কোনো আরবের গায়ের রঙ একটু চাপা হলে তাকে 'সউদ' নাম দেওয়া হয়। বাংলার 'কালুর' মতো আর কী। তাই বলে ছি ঘেন্নার বালাই নেই। কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ ইসলামি সমাজে নেই। ওটা ইউরোপীয় পেশীরই দম্ভজাত। ইউরোপীয়রা দেশে-দেশে হানা দিয়ে লুণ্ঠন এবং উপনিবেশ- ব্যবস্থা পত্তনের কালে আফ্রিকা সম্পর্কে ইউরোপে আজব গালগল্প রটতে থাকে। 'ভুডু' তার একটি প্রতীক। বিজ্ঞাপিকা, অ্যাডভেঞ্চার, গোয়েন্দাকাহিনী এসবের থিম হয়ে ওঠে আফ্রিকা।

বাংলা কিশোর পাঠ্য কাহিনীতেও তার প্রতিফলন পড়ে স্বভাবত। হলিউডের দৌলতেও আফ্রিকা রহস্য-রোমাঞ্চের দেশে পরিণত হয়। তার প্রচণ্ড মার মার কাটি-কাটি বাজার ছিল। এখনও নেই, তা নয়। রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা'-কে তার প্রতিবাদ বলা চলে। তিন প্রবন্ধকারই সাহিত্যের ওপর সাংবাদিকসুলভ দ্রুততায় জোর দেওয়ায় কৃষ্ণাঙ্গদের নিজেদের ভেতরকার বাস্তব দ্বন্দ্বগুলি চাপা পড়ে গেছে। তাই প্রবল অতৃপ্তি থেকে যায়। মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গদের সমস্যা/

দ্বন্দ্ব একরকম, আবার আফ্রিকার দেশগুলিতে কৃষ্ণাঙ্গদের দ্বন্দ্ব বা সমস্যা অন্যরকম। দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ায় শাদা ও কালোর দ্বন্দ্ব মুখোমুখি এবং তা অস্তিত্বরক্ষাসংক্রান্ত। কিন্তু অন্যত্র দ্বন্দ্ব স্বৈরাচারী শাসন বনাম গণতন্ত্রের। কোথাও শোষণ ও দারিদ্র্যের সমস্যা। এসবের আলাদা-আলাদা চেহারা আছে। শুধু 'প্রতিবাদী সাহিত্য' নিয়ে বসলে কৃষ্ণাঙ্গ বাস্তবতার প্রধান ও উল্লেখ্য বিষয়গুলি চাপা পড়ে যায়। বিভিন্ন কৃষ্ণাঙ্গ নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধও চাপা পড়ে। শেষে আর একটা প্রসঙ্গ উল্লেখ করি। ইউরোপীয়দের এই একটা স্বভাব লক্ষ্য করা যায়। উপনিবেশগুলিতে তারা যেখানেই কোথাও কোনো পুরনো সভ্যতা 'আবিষ্কার' করেছে, তা বাইরের লোকেদের বলে বাদ দিয়েছে। যেমন বুগাণ্ডায় কৃষ্ণাঙ্গদের নরখাদক বলতেও বাধে নি। 'ক্যানিবালিজম' বলে কিছু থাকলে তা একদা ইউরোপেও থাকতে বাধা, এটা মনে পড়ে না কারুর। মনে পড়ে না যে, প্রাচীন মিশর সভ্যতা বা এশিয়া মাইনরের হিত্তিদের (হিটাইট) কাছে লোহা সরবরাহ করত 'রহস্যময় আফ্রিকার' কৃষ্ণাঙ্গরাই। রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করি : 'হায় ছায়াবৃতা/ কালো ঘোমটার নীচে/ অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ/ উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে/—' এ পর্যন্ত আদিমানবের প্রাচীনতম অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে আফ্রিকাতেই।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
কলকাতা-১৯

ফেস্টিভ্যালের ডিরেক্টর

৩০ আগস্ট সংখ্যায় 'মুক্তচিন্তা' বিভাগে পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'ফেস্টিভ্যালের ডিরেক্টর' শীর্ষক রচনাটি পড়া গেল। আলোচনাটি, দেশ পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েও, যে কোনভাবেই সুস্থ রুচির প্রতিফলন নয়, তা যথেষ্ট দুঃখজনক। লেখক নিজে যেহেতু একজন চিত্র-পরিচালক, সেহেতু মত ও পথের পার্থক্য থাকলেও, অন্য পরিচালকদের বিষয়ে ন্যূনতম সৌজন্য এবং সহিষ্ণুতা আশা করা খুব অতিরিক্ত কিছু নয়। লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয়টি, ঐ 'আর্ট ফিল্ম' আর 'কমার্শিয়াল ফিল্ম' শিবিরের বালী সুগ্রীব ঝগড়া তো প্রায় মান্ধাতার আমলের। ১৯৫৫ সালে 'পথের পাঁচালি'র আবির্ভাব বা তারও আগে সত্যজিৎ চিদানন্দদের ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন থেকে যে বিতর্কের শুরু, তারই সাম্প্রতিকতম প্রকাশ পার্থপ্রতিমের রচনাটি। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় যে, সেই প্রাচীন বিতর্কে কোন নতুন মাত্রা সংযোজনে লেখক বিন্দুমাত্র আগ্রহী নন। কথা হল যে, বাংলা তথা ভারতীয় ছবির ক্ষেত্রে 'ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি' বা 'পথের পাঁচালি' যে নতুন ধারা সৃষ্টিতে উদ্যোগী হয়েছিল, সচেষ্ট হয়েছিল প্রচলিত, খয়া-খর্বুটে জীবন এবং শিল্পবোধহীন চলচ্চিত্র ব্যবসার বিপরীত পথে হাঁটিতে, তাকে স্বভাবতই সনাতন বাণিজ্য-পন্থীরা কখনো তেমন সহ্য করতে পারেননি। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা আপন পুঁজির নিরাপত্তার স্বার্থে, বা নিজেদের বেলুন-অস্তিত্ব বজায় রাখার আপ্রাণ তাগিদে নতুন রীতির চলচ্চিত্রকে চিরকালই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে এসেছেন। এবং, নতুন পন্থীরাও আপন বুদ্ধিবৃত্তির উন্নাসিকতায়, সরাসরি অগ্রাহ্য করেছেন পুরনো পন্থীদের। ফলে, প্রথম থেকেই, কোন সুস্থ সদর্থক বিতর্কের সূত্রপাত না হয়ে সম্পূর্ণ আবহাওয়াটাই গেছে বিষিয়ে—যা শেষ পর্যন্ত জন্ম দিয়েছে পার্থপ্রতিমের অসহিষ্ণু রচনাটির। লেখক সার্ত্রের একটি উদ্ধৃতি-সহযোগে রচনাটি শুরু করেছেন, যার প্রতিপাদ্য বিষয়টি হল 'শুদ্ধতা' জিনিসটা কেবল ফকির বা সন্ন্যাসিদের একটি অনুৎপাদক অবলম্বন বিশেষ। রচনার শুরুতেই যে লেখক (পরিচালকও বটেন!) জানিয়ে দেন তিনি জীবন বা শিল্পে শুদ্ধতার প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী নন, তাঁর সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে কোন যৌক্তিক আলোচনাই চলে না। কিন্তু পাঠক হিসেবে একটি শুদ্ধতম সাংস্কৃতিক পত্রিকার পৃষ্ঠা নোংরা করার যথেচ্ছাচার যে মেনেও নেওয়া যায় না! নতুন প্রজন্মের চলচ্চিত্রকারদের সাহেব মুখাপেক্ষিতা বিষয়ে যে-লেখক অহেতুক অজস্র শব্দ খরচ করেছেন, সেই লেখকই যখন নিজের বক্তব্য (?) প্রমাণার্থে একজন মহান সাহেব-শিল্পীকে নিয়ে টানাটানি করেন, তখন তা খুব হাস্যকর বলে মনে হয়। বস্তুত, সার্ত্রের কোন নাটকের

একটি বিচ্ছিন্ন সংলাপ উদ্ধৃত হলেই কিন্তু এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, জীবন বা শিল্পে শুদ্ধতার কোন ভূমিকা নেই। সার্ত্রের রচনা-বিষয়ে যাঁরা কমবেশি একটুও অবহিত, তাঁরা সকলেই জানেন যে সাহিত্য-শিল্পে সার্ত্রের মত বিশুদ্ধবাদীর সংখ্যা পৃথিবীতে প্রায় অঙ্গুলিগণ্য। আর, সার্ত্রে যে বিশুদ্ধতা অর্থে শুচিবাইকে বোঝাননি, তা খুব সহজবোধ্য। শিল্পের বিশুদ্ধতা তো প্রকৃত অর্থে একটা বিশুদ্ধ শিল্প 'হয়ে ওঠা'। যে অর্থে 'ওয়ার অ্যান্ড পিস', 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' বিশুদ্ধ শিল্প, সেই একই অর্থে রঁদার 'চুম্বন', সার্ত্রের 'ক্রাইম প্যাসোনেল' সত্যজিতের 'পথের পাঁচালি' বা উৎপলেন্দুর 'ময়না তদন্ত' ও বিশুদ্ধ শিল্প। তাই আলোচনার শুরুতেই উদ্ধৃতিটির প্রাসঙ্গিকতা বোধগম্য হয় না। কি বলতে চান পার্থবাবু—শুদ্ধ শিল্প, শুদ্ধ চলচ্চিত্র ধারণাটি সোনার পাথরবাটি ? নাকি তিনি, শুদ্ধ ছবি অর্থে বোঝেন, সার্ত্রের শিক্ষকতায়, তিল-তুলসী ছড়ানো ছবি ! নতুন পরিচালকেরা তা বোঝেন না। শুদ্ধতা তাঁদের কাছে 'কিছু না-করার অজুহাত' নয়, শুদ্ধতাই তাঁদের কাজের অবলম্বন, কেবল শুদ্ধতাতেই তাঁরা উৎসর্গীকৃত।

লেখক নতুন ছবি-নির্মাতাদের 'ফেস্টিভ্যালের ডিরেক্টর' বলে ব্যঙ্গ করেছেন। তাঁরা, লেখকের মতে ছবি করেন দেশী বিদেশী চলচ্চিত্রোৎসবের দিকে তাকিয়ে। তাঁদের 'বিদেশে মুক্তি', 'বিদেশের দূরদর্শনে প্রদর্শন' বিষয়ে উৎসাহকেও লেখক বিদ্রূপ করেছেন। কিন্তু, এসব ভড়ং যে আর পাবলিকে খায় না ! দেশপ্রেমের টুপিটা জনগণ আর মাথায় রাখতে রাজি নয়। তাই ছবির ক্ষেত্রে, একজন দেশপ্রেমিকের 'যদুবংশ' একজন অ-দেশপ্রেমিকের (নাকি দেশদ্রোহী নার্গিস দেবী সত্যজিৎ-কে যেমন বলেছিলেন।) 'ময়না তদন্ত' বা 'পার'-এর কাছে খড়কুটোর মত উড়ে যায়—ঐ দেশের মানুষের কাছেই। আর এ-কথাও তো অনস্বীকার্য যে, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে ভারতীয় ছবির, ভারত নামের দেশটির জয়-ঘোষণা করছে তো এইসব তরুণ তুর্কীদের ছবিগুলিই। আরো বলা যায়, চলচ্চিত্র তো প্রকৃতপক্ষে একটি আন্তর্জাতিক মাধ্যম, সুতরাং ছবি যদি পৃথিবীর নানা দেশে প্রদর্শিত, পুরস্কৃত হয়, তা তো ছবি-নির্মাতাদের সাফল্যেই বিষয়, লেখকের তাতে জ্বালা কেন ?

'জনসাধারণ্যে মুক্তি-পাওয়া' বা চ্যাপলিন-কথিত 'গ্রেটার পিপল মিট করা' ব্যাপারটিতে যে এই সব ছবি-নির্মাতারা আগ্রহী নন, তা কিসে প্রমাণিত হয় ? তাঁদের ছবি 'মুক্তি' পায় না বা পেলেও 'বক্স' পায় না এতে যে আলোচ্য লেখকের মতো পরিচালকদেরও কিছু 'অবদান' আছে, তা কি অস্বীকার্য ? বাজার-চলতি ছবিগুলি দর্শককে যেভাবে আফিমগ্রস্ত করে রেখেছে বা প্রদর্শন-ব্যবস্থাটি যে-ভাবে ফিল্ম 'বেওয়াসি'দের' কুক্ষিগত, সেই অচলায়তন ভাঙ্গা তো খুব সহজসাধ্য নয়। কিন্তু ঐসব তথাকথিত প্রমোদচিত্রের পলায়নী-প্রবৃত্তি এবং স্বপ্নিল জগতের প্রতি ক্ষত-বিক্ষত দর্শক যে আর আগের মতো ততো উৎসাহী নয়, তা আমরা সাম্প্রতিককালে 'আক্রোশ', 'চোখ' বা 'পার' ইত্যাদি ছবির প্রতি দর্শকানুকূল্যেই টের পেয়েছি। পাথর যে ভাঙছে, ঝড় যে আসছে—এই আশঙ্কাতেই বোধ হয় পার্থপ্রতিম সন্ত্রস্ত। 'ভারী চশমা'অথবা হালকা দাড়ি', 'কিছু টেকো অথবা দেড়েল'-দের 'স্বরূপ উদ্ঘাটন' এবং 'প্রতিভা বিশ্লেষণ'-এর জন্যেই নাকি

পার্থপ্রতিমের 'এই লেখালেখি'। ভারী চশমা পরেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, হালকা দাড়ি আছে গৌতম ঘোষের, বুদ্ধদেবের টাকও আছে, আর উৎপলেন্দু চক্রবর্তী দাড়ি রাখেন। বিশেষণগুলি খুব স্পষ্ট। সুতরাং বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না আক্রমণটা কত ব্যক্তিগত! বুদ্ধদেব-গৌতম বা উৎপলেন্দুরা ভগবান নন, তাঁরা সমালোচিত হতেই পারেন, তাঁদের চিত্রকর্ম বিষয়ে নানা প্রশ্ন তোলা যায়। কিন্তু পার্থপ্রতিম সেদিকে একটুও কলম নির্দেশ করেননি। বোধ হয় তা তাঁর সাধ বা সাধ্যের বাইরে। কিন্তু একজন চিত্র-নির্মাতা, যাঁর ছবি লোকে দেখেছে, যাঁর রচনা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে, অর্থাৎ যিনি প্রমাণিতভাবেই সংস্কৃতি জগতের একজন স্বীকৃত ব্যক্তিত্ব, তাঁর কলমে যখন ঐসব কুরুচিকর শব্দ ভর করে তখন চকিতে ঝুলির বেড়ালটা যে লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়!

পার্থপ্রতিম নতুন পরিচালকদের 'প্রতিভা বিশ্লেষণে' সচেষ্ট হয়েছেন মোটামুটি এভাবে : ১। এঁরা চলচ্চিত্র বিষয়ে কিস্‌সু জানেন না ; ২। তাঁরা কেবল আউড-ডোর বা ফ্ল্যাট বাড়িতেই ছবি করেন, ইউনিটের কাউকেই গিল্ড-এর নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক দেন না ; ৩। বাড়ির ছেলে-মেয়ে-বৌই এঁদের ছবির মূল শিল্পী ; ৪। এঁরা তেলমর্দনে সিদ্ধহস্ত ; ৫। এঁরা সাহিত্যিকদের গল্প চুরি করেন ; ৬। এঁরা কাজ হাঁসিল হয়ে গেলে বিশ্ব-বিশ্রুত পরিচালককেও ত্যাগ করতে পারেন—ইত্যাদি প্রভৃতি। এ-সবই তো যুক্তি-বুদ্ধির ধার-না-ধারা ঝগড়ার বিষয়। তা অগ্রাহ্য করাই বাঞ্ছনীয়, তবু এটুকু বলতেই হয় : ১। এঁদের কাজেই এঁদের পরিচয়। ২। তাঁদের কোন পেটমোটা প্রযোজক-পরিচালক নেই যে স্টুডিও ভাড়া নিয়ে স্টার নামিয়ে ছবি করতে পারেন আর সারা পৃথিবীর নতুন ছবি-আন্দোলনে এই মুহূর্তে স্টুডিও প্রথার কৃত্রিমতা বর্জিতও। 'পথের পাঁচালি' তো প্রায় আদ্যোপান্ত আউটডোর ছবি, সে-বিষয়ে লেখক নীরব কেন? নতুন পরিচালকেরা ইউনিটের কর্মীদের ঠিকঠাক পারিশ্রমিক না দিয়ে নিজেরা বাড়ি-গাড়ি করেছেন, এ-তথ্য অবশ্যই চমকপ্রদ। ৩। বাড়ির মেয়ে-বৌ যদি শিল্পী হন, তাঁকে ছবিতে নিতে আপত্তি কোথায়? মৃণাল সেন যদি 'একদিন প্রতিদিন' বা 'খণ্ডহর'-এ গীতা সেনকে না নিতেন, তাহলে কি আমরা ঐরকম এক জাত শিল্পীকে পেতাম? ৪। অস্তিত্ব রক্ষায় সাহিত্যিক, প্রযোজক, পরিবেশক, স্টার বা জনগণের তেলমর্দনে নতুন ছবি-নির্মাতারা এখনো ততো দক্ষ হননি বলেই তো তাঁদের এই হাঁড়ির হাল! এন এফ ডি সি বা পশ্চিমবঙ্গ

সরকার যদি ছবি করার জন্য পার্থপ্রতিমদের টাকা না যোগান, তো কী করা যাবে ! ৫। 'অন্ধগলি' বিষয়ে গল্পকারের কোনরূপ বিরূপ মন্তব্য শোনা যায়নি— অথচ লেখক গল্প চুরির ব্যাপারে 'অন্ধগলি'-র প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রেখেছেন। সিনেমা যে সাহিত্যের দাস নয়, তা যে একেবারেই এক স্বতন্ত্র, মৌলিক শিল্প মাধ্যম, তা কোন্ কালে রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন ; সমরেশ বসু, দিব্যেন্দু পালিত (যাঁদের মূল গল্পকে যথাক্রমে অতিক্রম করে গেলেও, যাঁরা 'পার' বা 'গৃহযুদ্ধ'-কে সার্থক চলচ্চিত্র বলেছেন।)

জানেন— তা যে পার্থপ্রতিম জানবেন না, এতে আর আশ্চর্যের কী ! না কি এ-ও এক ধরনের তৈলমর্দন— প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের, যাঁদের বিখ্যাত গল্প ছাড়া পার্থপ্রতিমেরা ছবি করতে পারেন না ? উৎপলেন্দুর সত্যজিৎ-বিষয়ক তথ্যচিত্রটি নির্মাণের কারণেই (লেখক নিশ্চয়ই শ্যাম বেনেগালের কথা বলেননি, ততটা দুঃসাহস তাঁর নেই !) যে সত্যজিতের দীর্ঘ অসুস্থতা, তার সত্যতা বিষয়ে যা বলার তা সত্যজিৎ-ই বলতে পারেন। কিন্তু তাঁর প্রগতিশীল চিন্তার কারণেই যে তিনি উৎপলেন্দুর মত একজন অবচীন সিনেমাকারকে ঐ অশেষ প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, তা তাঁর দাড়ি দেখে নয়, প্রতিভা দেখেই।

সব মিলিয়ে এটুকুই বলা যায়, যখন প্রচলিত ধারার বিপরীত এক বোধ এবং সৃষ্টি দুর্বার এবং অনিবার্য হয়ে উঠছে, তখন কায়েমী স্বার্থরক্ষায় পার্থপ্রতিমের এই বিভ্রান্তিকর রচনাটি পাঠ করা এক দুঃখজনক অভিজ্ঞতা—যা পরিচালক বা লেখক হিসেবেই কেবল নয়, তিনি যে মানুষ হিসেবেও যথেষ্ট অশুদ্ধতায় বিশ্বাসী তা রচনাটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

গৌতম ঘোষদস্তিদার

রহড়া, ২৪ পরগনা

প্রয়াত কানাইলাল স্মরণে

২৯ নভেম্বরের দেশ পত্রিকায় কানাইলাল স্মরণ মর্মস্পর্শ করল। কানাইবাবুর অকস্মাৎ প্রয়াণ, তাঁর বন্ধুবান্ধব আত্মীয় ও পরিচিত মানুষের নিকট একটি দুঃখের সংবাদ। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁকে জানার যে-সুযোগ পেয়েছিলাম তা খুবই সামান্য। তবু মনে হয়েছিল "মা ব্রুয়াৎ অপ্রিয়ম্ সত্যং" এ নীতিবাক্য তিনি মানতেন না। মানুষ ও সমাজের দু'একটি ব্যাপারে তাঁর অভিমত ছিল যেমন সুস্পষ্ট তেমনি সত্য। বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতনকে তিনি ভালবাসতেন। গত বৎসর শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে দিল্লীর এক হোটেলে তাঁকে দেখেছিলাম। তিনি সহজ সরল মানুষ ছিলেন, গুণ বা

প্রতিভার মূল্য দিতেন । তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি ।

এস. এ. মামুদ
কলকাতা

॥ ২ ॥

দেশ পত্রিকার ২৯-১১-৮৬ সংখ্যা পড়ে মনের মত কত স্মৃতি উদ্বেল হয়ে উঠছে । কানাইবাবু দুঃখ করে বলেছিলেন আমার কাছে অশোকবাবুর মৃত্যুর পর—'দেখলেন কেমন না বলে মেন্ সুইচটা অফ্ করে দিল ।' সেই থেকেই কানাইবাবুও অফ হয়ে গিয়েছিলেন । আই. ই. এন. এস-এ কদাচিৎ আসতেন । আসলেও সেই উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পেতাম না । আসলে অশোকবাবু এবং কানাইবাবু রক্তের সম্বন্ধেই তো শুধু আত্মীয় ছিলেন না, ওঁদের মানসিকতাও ছিল এক—সেকথা আপনি তো জানেনই —সোজা কথা সোজা বলতেন, অপ্রিয় হলেও, এমনই শক্তি ওঁদেরই ছিল । আমরা যারা নিরাপত্তার অভাবে ভুগি তারা প্রায়ই এসব গুণগুলোকে দোষ ভাবি—বলি tact lessness কিন্তু finesse যে চটুল চতুরতা নয়, সত্যি কথা শক্ত করে বলা যে সুঠাম চরিত্রের একটা অংশ বিশেষ এমন কথা স্বীকার করার মতন সাহসই বা কজনের ? এখন অনেক ছোট ছোট কথা মনে পড়ছে । প্লেনে চড়লে যতক্ষণ না ল্যাণ্ডিং-এর জন্য প্লেনের চাকা খোলার আওয়াজ হবে, উনি আতঙ্কিত হয়ে থাকতেন । বার বার জিজ্ঞাসা করতেন—'ও মশাই, চাকাটা কি খুললো না ভুঁড়ির উপরই ল্যাণ্ডিং করবে ?' আমরা হাসতাম । কিন্তু সেই লোকটাই কি অবলীলাক্রমে পরমশান্তির মহাকাশে ল্যাণ্ডিং করলেন । ওঁর আত্মার মঙ্গল কামনা করছি ।

বাসুদেব রায়
স্টেটসম্যান হাউস
কলকাতা-১

রবীন্দ্রনাথ-পুলিনবিহারী পত্রাবলী

গত শারদীয়া সংখ্যা দেশ-এ আমার সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথ-পুলিনবিহারী সেন পত্রাবলীর পত্র-পরিচিতি-তে ১৪ সংখ্যক পত্রের টীকায় একটি গুরুতর মুদ্রণপ্রমাদ ঘটে গেছে । সেই জন্যই এই চিঠি ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্রে লিখেছিলেন : *'সকালবেলা' বিশুদ্ধ পাঠ ।* এর টীকায় আমি লিখেছিলাম : *'সকল বেলা কাটিয়া গেল' পাণ্ডুলিপি থেকে শুরু করে ইণ্ডিয়ান প্রেসের পুনর্মুদ্রণ [১৯২১] পর্যন্ত এই পাঠই আছে । এর পরে পাঠান্তর ঘটে, এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথও সেটি সমর্থন করছেন ।* কিন্তু উদ্ধৃতিটি ছাপা হয়েছে : *'সকালবেলা কাটিয়া গেল'*— ফলে সমস্ত প্রসঙ্গটি ভিন্ন অর্থ লাভ করেছে ।

প্রকৃতপক্ষে 'সকাল বেলা' পাঠটি কেবলমাত্র মানসী-র আষাঢ় ১৩৩৮ বিশ্বভারতী সংস্করণেই আছে, একই বছরে প্রকাশিত পৌষ ১৩৩৮-এর প্রথম সংস্করণ সঞ্চয়িতা-য় পাঠটি হল 'সকল বেলা'—সুতরাং 'সকাল বেলা' পাঠ অবশ্যই মুদ্রণপ্রমাদ । পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে লিখেছিলেন : 'সারাটা দিন গেল ত চলে', পরে এটি কেটে লেখেন : 'সকল বেলা কাটিয়া গেল' । এর থেকে বোঝা যায়, এই পাঠটিই রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষিত ছিল । সেক্ষেত্রে পুলিনবিহারীর পত্রের উত্তরে 'সকালবেলা' পাঠটি সমর্থন করতে গিয়ে তিনি কিছুটা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছিলেন । এই নিয়ে নিশ্চয়ই পরে তাঁর সঙ্গে পুলিনবিহারীর কোনো মৌখিক আলোচনা হয়েছিল, ফলে রবীন্দ্র-রচনাবলীতে শুদ্ধ পাঠ 'সকল বেলা'ই গৃহীত হয়েছে ।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ এই মুদ্রণপ্রমাদের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ।

প্রশান্তকুমার পাল
শান্তিনিকেতন

ফেরদৌসী মজুমদার, রহমান নন

দেশ-এর ৮ নভেম্বরের সংখ্যায় বাংলাদেশের 'থিয়েটার' নাট্যগোষ্ঠীর 'এখনও ক্রীতদাস' (মিশিন্দা পাতার রস)

নাটকের প্রধান নারী চরিত্রের (কান্দুনী) নাম ফেরদৌসী রহমান নয় (যাঁর ছবি ছাপা হয়েছে), তিনি ফেরদৌসী মজুমদার । ফেরদৌসী রহমান গায়ক আব্বাসউদ্দিনের কন্যা ।

দাউদ হায়দার
কলকাতা-১৯

বড়দিন

কলকাতায় বড়দিন এসে গেল। আর তেমন শীত পড়ে না। রাজা-মহারাজা, সায়েব-সুবোরা নেই। বড়দিনের সে জলুসও নেই। দার্জিলিং থেকে কমলালেবু আর কলকাতার বাজারে মিষ্টি রং ছড়াতে আসে না। উত্তরের পাহাড়ী রাজ্যে শিল্পের কল্যাণে রস হয়ে বোতল হয়ে যায়। সমতলে নেমে এসে উড়ে চলে যায় রাজধানী আর উদীয়মান শহরের দিকে, যেখানে ধনজন আলোক অলঙ্কারের স্বাধীনোত্তর জোয়ার বইছে। কলকাতার চেহারা এখন পড়তি উকিলের চাপকানের মতো। বড়দিনের হুল্লোড় এখন সেই সব মহলেই সীমাবদ্ধ যাঁরা নাচ-গান আর খানাপিনার জন্যে দুহাতে দেদার ওড়াতে পারেন। যীশুর ত্যাগ, আত্ম নিবেদন, মানবতা, ঈশ্বরমুখিনতা, ক্রুশবিদ্ধ হওয়া, উপদেশ, আদেশ, মানুষের যন্ত্র-সভ্যতার চাপে থিওলজির শূন্য প্রান্তরে একা মানবের মতো হাত তুলে টাল খেয়ে খেয়ে ঘুরছে। গির্জার বিশাল সৌধচূড়া যে চরণ ছুঁতে চায়, সেই শান্ত সুন্দর ঈশ্বর মানুষের মাতামাতি দেখে বিমূঢ়। প্রেয়ারে জমায়েত হন পঞ্চাশ জন। বোতল বগলে নাচতে নামেন হাজারজন। যত যুদ্ধ পশ্চিমী দুনিয়ায়। দুটো বিশ্বযুদ্ধ পার করে, সর্বগ্রাসী তৃতীয় আর একটি বিপর্যয় এগিয়ে আনার জন্যে বৃহৎ শক্তির পারমাণবিক তোড়জোড় বেড়েই চলেছে। আমেরিকার স্টার ওয়ার, রাশিয়ার হুমকি, তরুণ স্বাধীন দেশের পরমাণু বোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বিশ্বের সর্বত্র বৃহৎ শক্তির খোঁচাখুঁচি, প্রভৃতি কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হয়, নিৎসের কথাই ঠিক, ঈশ্বর মারা গেছেন। কি খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী, কি হিন্দু ধর্মাবলম্বী পরমার্থের পথ ভুলে, অর্থ আর অনর্থের পথেই ছুটছে। পশ্চিমের যীশু, প্রাচ্যের বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, মার্টিন লুথার, মহাত্মা গান্ধী নিউক্লিয়ার যুগে পুজোর পট্টবস্ত্রের মতো। ঈশ্বর এখন আমেরিকা আর রাশিয়া। বিশ্বের দুই স্তম্ভ-শক্তি। হয় একে অনুসরণ করো, না হয় ওকে অনুসরণ করো। মন্দির নয়, মসজিদ নয় ঈশ্বর এখন ক্যাম্পে বসবাস করছেন। আমেরিকান ক্যাম্প, রাশিয়ান ক্যাম্প। এই ক্যাম্পে ভজনা করলে, ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম, চারটে কাম্যর মধ্যে ধর্ম আর মোক্ষ হয় তো মিলবে না, মিলবে অর্থ আর কাম। ঋণ পাওয়া যাবে, যেমন আমেরিকার টাকায় মেকসিকো ভাসছে। সমর সম্ভার পাওয়া যাবে, যেমন পাচ্ছে ইরান, পাকিস্তান। যীশু একালে ইনটেলেকচুয়াল সিম্বল। বুদ্ধিজীবীরা সাহিত্যে, সিনেমায়, মানুষের যন্ত্রণা বঞ্চনা বোঝাতে গিয়ে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন। শ্রীচৈতন্যের উত্তোলিত বাহু প্রেম স্নিগ্ধ মূর্তি আমাদের দেয়ালে, ক্যালেন্ডারে, তবু বধ হত্যা, ভ্রাতা নিধন, কমরেড খুন, হরিজন হত্যা, নারী নির্যাতন। পরমাণু বোমা, শক্তিজোট, খণ্ডসঙ্ঘর্ষ, এই সব আপদের সঙ্গে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে আতঙ্কের আর এক ভাইরাস—টেররিজম, সন্ত্রাসবাদ। এ কার কৌশল জানা নেই, তবে দেশে দেশে আর দেশের ভেতরে নিজেদের মধ্যে লাগাতার একটা যুদ্ধ, ধর্ম বিদ্বেষ আর রাজনৈতিক অস্থিরতা চলতেই থাকবে। তৃতীয় বিশ্বের নিয়তি কোন অদৃশ্য হাতে, আমরা জানি। যেমন জানি আমাদের দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদের মূলে কার হাত! জানা থাকলেও কিছু করার নেই। আমরা গর্ব করি, তৃতীয় বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র আমরা, কিন্তু আমাদের নির্বাচনের পিছনে শিক্ষিত মানুষের বুদ্ধিমান বিচারশক্তি কাজ করে কি! এক একটা সমস্যা, অসন্তোষ, আন্দোলন তৈরি হয়, তৈরি করা হয়, আর দল বিশেষ সেইটিকে মুঠোয় ধরে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। ওদিকে খালিস্থান। নিরীহ মানুষ মরছে। এ যেন রাজনীতির দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে নরবলি। পশ্চিমবাংলায় গোর্খাল্যাণ্ড। পৃথিবী অস্থির, প্রতিবেশী পাকিস্তান অস্থির, ভারত ছিল শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধ, গান্ধীর প্রেম ভূমি, সে প্রেম এখন রাজনীতির কুমীরের গ্রাসে। আমাদের গর্ব করার মতো আর কিছু রইল না। বিভিন্নতা আর বিচ্ছিন্নতাকে দাবার ঘুঁটি করে কথায় কথায় নিরীহ মানুষ মারব এই চাল চেলে কিস্তিমাতের চেষ্টা চলছে। ঈশ্বর পরিত্যক্ত এই ভূখণ্ডে কি পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে ঈশ্বর আর খবর রাখেন না, রাখে শয়তান। জার্মান লেখক গুন্টার গ্রাস বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, মেদিনীপুর জলে ভাসছে আর কলকাতায় লাখ লাখ টাকার বারোয়ারী ফুর্তি চলেছে। সেইরকম পাঞ্জাব, শ্রীলঙ্কা, উত্তরবঙ্গ যেখানে যা হোক, বড়দিনে যীশু ভুলে উচ্চমার্গের নাচা-গানা ক্যাবারে বোতল সবই চলবে মহল্লা বিশেষে। দামী রেস্তোরাঁ আলোর মালা পরবে। কাঁচের জানালায় সান্টাক্লস বিদ্যুতায়িত হয়ে সাইকেল চালাবে। তবে ফুটপাথের শিশু হাত পাতলে তার মোজা থেকে কোনও উপহার বেরোবে না। মানবিকতা মানুষ থেকে উবে গেছে। তার জন্যে আন্তর্জাতিক সংস্থা হয়েছে ইউনাইটেড নেশানস, ইউনিসেফ। ইরাকে ইরানে বছরের পর বছর যুদ্ধ চলবে। নিকারাগুয়ায় মার্কিন মুঠো ছোরা চালাবে। আফগানিস্থানে পাঞ্জার লড়াই। আর ভারতের শস্যভাণ্ডার পঞ্চনদের দেশে, গুরু গোবিন্দ, গুরু নানকের আদর্শের অপব্যবহার। যাদের প্রচারপত্র বলে, ঘৃণার অপর নাম হিন্দু। যীশু জানতেন, মঙ্গলকামী মুক্তি সন্ধানীর পুরস্কার—একটি ক্রুশ ও চারটে গজাল পেরেক।

এঁর হাসি সুরক্ষিত রয়েছে
সিবাকা ফ্লোরাইড
এই ফ্লোরাইড সংরক্ষণ দিয়েছে
Cibaca Fluoride toothpaste
দাঁতকে জীবনভর সঙ্গী ক'রে
নিতে হ'লে, দন্তছিদ্রের সংরক্ষণ করুন
আর, সিবাকা ফ্লোরাইড-এর ফ্লোরাইডই দেয়
ঐ অপরিহার্য সংরক্ষণ। কারণ, মুখের ভেতরের
ক্ষতিকর অ্যাসিড যখন দাঁতের তলার ভাগকে ঘিরে ফেলে, তখন
এই ফ্লোবাইড, দাঁতের এনামেলের সঙ্গে মিশে গিয়ে দন্তছিদ্র হওয়া রোধ
করে—আর, ফলে, প্রাথমিক অবস্থাতেই দন্তক্ষয় হওয়াও রোধ হয়।
তাই সিবাকা ফ্লোরাইড দিয়ে, দন্তছিদ্র হওয়া বন্ধ করুন, দন্তক্ষয় রোধ করুন।
দাঁতে নব জীবনের সাড়া
সিবাকা* ফ্লোরাইড
টুথপেস্ট
ভারতের সর্বপ্রথম ও প্রভাবশালী ফ্লোরাইড টুথপেস্ট

শ্রীশ্রীমা সারদা

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অতিক্রান্ত। ১৮৫৩ খৃস্টাব্দে ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের অঙ্গনে একদা যে শিশুকন্যার আবির্ভাব, আজ তার মধুর স্নিগ্ধ সৌরভে পূর্ণ দিগ্‌দিগন্ত। আশ্চর্য এবং অনেকটা যেন অলৌকিক। কারণ শ্রীশ্রীমা সারদার জীবন সহজ, সরল ; ঘটনার বৈচিত্র্য বা আড়ম্বর প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ যদি বলি আজ সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি ধীরে ধীরে তাঁর প্রতি নিবদ্ধ, তা হলে অতিশয়োক্তি হবে বলে মনে হয় না। তাঁর দেহত্যাগের পর ১৩৩১ সালে প্রবাসীর বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রচিত একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ নিবন্ধে তিনি একটি বিশেষ মূল্যবান কথা লেখেন : 'হয়তো (শ্রীশ্রীমার) একাধিক জীবনচরিত লিখিত হইবে। তাহার মধ্যে একটি এমন হওয়া উচিত যাহাতে সরল ও অবিমিশ্রভাবে কেবল তাঁহার চরিত ও উক্তি থাকিবে, কোনপ্রকার ব্যাখ্যা, টীকা-টিপ্পনী, ভাষ্য থাকিবে না—রামকৃষ্ণ ও সারদামণিকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে বুঝিবার সুযোগ পাওয়া আবশ্যক।' ইতিমধ্যেই তাঁর প্রামাণিক জীবনী, ছোটবড় নানা জীবনী ও প্রবন্ধে তাঁর সমগ্র জীবন বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী : আত্মকথা' নামক পুস্তকে কেবল তাঁর উক্তিগুলিই সংগৃহীত। সম্প্রতি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীসহ প্রকাশিত 'শতরূপে সারদা'য় নানাভাবে তাঁর জীবনীর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। স্বতই মনে হয়, আর কিছু লিখবার অবকাশ বা আবশ্যকতা আছে কী ? তথাপি এখনও স্বাধীনভাবে 'নিজ নিজ জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে', তাঁর জীবনের তাৎপর্য বোঝবার চেষ্টা চলছে এবং চলবে। কোনদিন তাঁর চরিত্রের সম্পূর্ণ রহস্যের উন্মোচন ঘটবে কিনা এবং কেই বা তা সঠিক অবধারণা করবে জানা নেই।

প্রারম্ভেই একটা কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। জীবিতকালে অনেকের অসামান্য ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ তাঁর চারপাশের নরনারীকে আকৃষ্ট করে ; কিন্তু এই পৃথিবীরূপ রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অথবা কিছুকাল পরে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। যে সব অসামান্য গুণ, ঘটনা বা অলৌকিক কাজের দ্বারা কোন পুরুষ বা নারীর জনসমাজে খ্যাতিলাভ, শ্রীশ্রীমার জীবনে তার ব্যতিক্রম। আধুনিক শিক্ষার অর্থে তিনি অজ্ঞ, বৃহত্তর বিশ্বের সঙ্গে পরিচয়হীন ; বক্তৃতা, আন্দোলন বা সমাজসেবায় কোন ভূমিকা তাঁর ছিল না, যার ফলে সংবাদপত্রে তাঁর নাম প্রচারিত হতে পারে। প্রচারের মাধ্যমেও অনেক সময়ে কাউকে জনসমাজে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। বহু অতিরঞ্জন কাহিনী, অসাধারণ ঘটনার সমাবেশ, অভিনব উপায়ে প্রচারের প্রয়োগ—ফলে চারিদিকে একটা সাড়া পড়ে। বর্তমান যুগের তুলনায় অনেক কম হলেও প্রোপাগাণ্ডা ও পাবলিসিটির ক্ষমতা বা মহিমা চিরকালই ছিল। শ্রীশ্রীমা যেহেতু সর্বদা অবগুণ্ঠিতা ছিলেন, লজ্জা ও শালীনতাবোধ ছিল অতিশয়, সে কারণ যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সঙ্ঘের তিনি অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন, তার কর্তৃপক্ষ সঙ্কোচবশত কখনই লোকসমাজে তাঁকে পরিচিত করবার প্রয়াস করেননি, এমনকি প্রথম দিকে অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর ছবি পর্যন্ত দেখবার সুযোগ পেত না। অথচ আশ্চর্য ১৯৫৩ খৃস্টাব্দে তাঁর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে কর্তব্যবোধে মঠ ও মিশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাধারণের মধ্যে, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে প্রবল সাড়া দেখা যায়। ভারতের সর্বত্র বিপুল উৎসাহের সঙ্গে উৎসব অনুষ্ঠান প্রত্যাশাকে বহুদূর অতিক্রম করে এবং তখন থেকেই তাঁর নামে বিভিন্ন সঙ্ঘ, সমিতি গড়ে ওঠে, যার উদ্দেশ্য দৈনন্দিন জীবনে তাঁর চরিত্র অনুসরণের সঙ্গে লোককল্যাণকর কার্যের সূচনা। স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি স্মরণীয়—'মা ঠাকরুন কী বস্তু বুঝতে পারনি, ক্রমে পারবে'। অর্থাৎ ক্রমশ প্রকাশ্য। তাই এখন চলছে।

শ্রীশ্রীমার বাল্যলীলার একটি বিশেষ ঘটনার কথাই স্মরণ হয়। মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে এক অভাবনীয় ও পরমাশ্চর্য ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে [illegible]

গুরুত্ব উপলব্ধি করার বয়স তখন তাঁর হয়নি। সাত বৎসর বয়সে তাঁর পিতৃগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন ঘটলে বালিকা সারদা তাঁর পা ধুয়ে দিয়ে বাতাস করেছিলেন। তাঁর এই স্বামীসেবা উপস্থিত সকলের হাস্য উদ্রেক করে। অতঃপর চোদ্দ বৎসর বয়সে কামারপুকুরে গমন এবং প্রথম স্বামী সকাশে বাস। শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দময় উপস্থিতি তাঁর হৃদয়ে যে দিব্য আনন্দের সৃষ্টি করে তা স্মরণ করে পরবর্তীকালে তাঁর উক্তি : 'হৃদয়ের মধ্যে আনন্দের পূর্ণ ঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে—ঐকাল হইতে সর্বদা ঐরূপ অনুভব করিতাম।' অনন্ত আনন্দ সম্পদের অধিকারিণী হয়ে তিনি ফিরে এলেন পিত্রালয়ে।

উপনিষদ বলছেন, 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি অর্থাৎ আনন্দেই এই জীবজগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়। তাই এই আনন্দের সন্ধানেই মানুষ ব্যাকুল হয়ে ঘুরে বেড়ায়
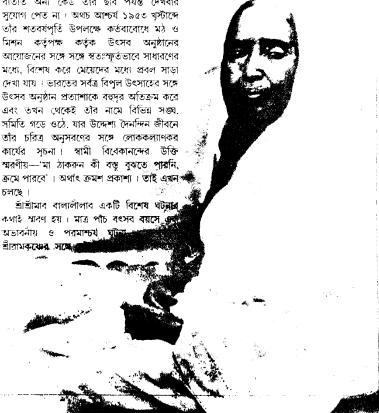
নিরন্তন, শুধু জানা নেই কোথায় তার সন্ধান মিলবে। তাই বহির্জগতের রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শকে যতদূর সম্ভব পার্থিব ভোগাবস্তু সহায়ে উপভোগ করার জন্য দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে বেড়ানো। শ্রীশ্রীমা কিশোরী বয়সেই সেই আনন্দের সন্ধান পেয়ে গেলেন নিজ অন্তরে আর তাতেই মগ্ন হয়ে রইলেন।

তাঁর জীবনের অন্যতম বিশেষ ঘটনা, যখন তরুণী সারদা সাধারণ মেয়ের মতোই হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা, শ্রদ্ধা, আবেগ ও সেই সঙ্গে উদ্বেগ নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হলেন। একটু স্পষ্ট করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সারদার মধ্যে দেবী ও মানবী উভয় সত্তার প্রকাশ ছিল, যেমন অবতার বা লোকোত্তর জীবনে দেখা যায়। ভক্তের কাছেই অবতার, সুতরাং শ্রীশ্রীমার দেবীভাবের পরিচয় অনেকেই পেয়েছেন জগদ্ধাত্রী বা কালীরূপ ইত্যাদি দিব্য দর্শনের মাধ্যমে। দেবীভাবে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। কেবল সেই ভাবটি স্বীকার করে মন্দিরে অথবা ঠাকুরঘরে নিত্য নানা উপচারে পূজায় তৃপ্ত হলে প্রাত্যহিক জীবনে তাঁকে অনুসরণ করার দায় থাকে না। কিন্তু যারা তাঁকে আদর্শ বা ধ্রুবতারা করে পথ চলতে চায়, তাদের পক্ষে তাঁর মানবীভাবের উপর গুরুত্ব প্রদান প্রয়োজন।

সারদা যখন পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হন তখন তাঁর যৌবনকাল। অপর সাধারণ মেয়ের মতোই স্বামীর প্রতি ছিল প্রগাঢ় ভালবাসা এবং কাছে থেকে তাঁর সেবা করার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা। অবশ্য সেই সঙ্গে ছিল উদ্বেগ ও সংশয়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে গ্রহণ করবেন কিনা। শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাকে গ্রহণ করলেন সাদরে। বাসের ব্যবস্থা হল যথাযথ। তিনি অসুস্থ থাকায় চিকিৎসা এবং আহারের সুব্যবস্থারও ত্রুটি হল না। পরে শ্রীরামকৃষ্ণের মনে হয় সারদা যদি পত্নীত্বের দাবী জানিয়ে তাঁকে সংসার জীবনে নিয়ে যেতে চান! সকলেই জানেন, সেই প্রশ্নের উত্তরে সারদার দ্বিধাহীন, স্পষ্ট, দৃঢ় উক্তি—না, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে ইষ্টপথে সাহায্য করতে এসেছেন। এর অর্থ কিন্তু ধর্মানুষ্ঠানে স্বামীকে সাহায্য করা নয়, যা সহধর্মিণীর কাজ বলে ভাবতে গণ্য হত; পরন্তু ত্যাগের জীবন গ্রহণ।

দেবীভাবে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত

বৈদিকযুগে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সন্ন্যাসজীবন গ্রহণের অভিলাষ ও দুই পত্নীর মধ্যে সম্পদ বণ্টনের প্রস্তাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মৈত্রেয়ী যখন জানলেন, যে অমৃতত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষায় তাঁর স্বামীর গৃহত্যাগের সঙ্কল্প, সম্পদের দ্বারা তা লাভ করা যাবে না, তখনই তাঁর বিখ্যাত উক্তি: যে বিত্তের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হবে না, তা নিয়ে আমি কী করব? উপনিষদ তাঁর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে নিরুত্তর থাকলেও ব্রহ্মবাদিনীরূপে খ্যাতিলাভের মধ্যেই তা নিহিত।

বৈদিকযুগে বহু ব্রহ্মবাদিনীর মধ্যে মৈত্রেয়ীর সঙ্গে আর যাঁর নাম উক্ত হয় তিনি হলেন গার্গী, ব্রহ্মর্ষি জনকের সভায় যিনি তর্কযুদ্ধে যাজ্ঞবল্ক্যকে আহ্বান করেন। এ স্থলে পুনরায় স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি স্মরণ করি, 'তাঁকে (শ্রীশ্রীমাকে) অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।' বিস্মিত চিত্তে ভাবি, সারদার প্রকৃত স্বরূপ তাহলে কী? কিন্তু বেদ উপনিষদ অধ্যয়ন করা দূরে থাক, সারদার মোটামুটি অক্ষর পরিচয় ছিল মাত্র।

অতঃপর ষোড়শীপূজা তাঁর জীবনে এক অনন্যসাধারণ ঘটনা। ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ষোড়শীরূপে পূজা করেন। সে যুগে মেয়েরাই স্বামীর সেবা অথবা পূজায় আত্মনিবেদন করত। কোন কোন ক্ষেত্রে পত্নী সংসারে মর্যাদালাভ করলেও দেবী জ্ঞানে পূজা লাভের কথা কে শুনেছে! আবার পূজক হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মতো এক মহাপুরুষ, যাঁর ভগবদ উপাসনা ও দিব্য উন্মাদনার কথা তখনই লোকসমাজে বেশ প্রচলিত। আশ্চর্য, সর্বপ্রকার সাধনার অন্তে শ্রীরামকৃষ্ণ যেন এরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। গভীর নিশীথে পূজা শেষে শ্রীসারদারই চরণে সমর্পণ করলেন সাধনার ফল, জপের মালা। প্রার্থনা করলেন সর্বশক্তির অধীশ্বরী ত্রিপুরাসুন্দরী যেন সারদার শরীর মনকে পবিত্র করে, তাঁর শরীরে আবির্ভূত হয়ে সর্বকল্যাণ সাধন করেন। অভাবনীয় সেই ঘটনা চিরস্মরণীয় হয়ে রইল ইতিহাসে। সে সময়ে যাঁরা ঘটনাটি জেনেছিলেন, তাঁরা হয়তো স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেন—এও বোধ হয় শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক খেয়াল! বিস্ময়কর হল, অতিশয় লজ্জাশীলা সারদা প্রথমাবধি ধীর স্থির সমাহিতভাবে সে পূজা গ্রহণ করেন। তারপর নীরবে ফিরে গেলেন নিজের ক্ষুদ্র নহবত কক্ষে। পরদিন থেকে শুরু হল যথারীতি দৈনন্দিন সাংসারিক কাজ। জগদ্বরেণ্য স্বামীর পূজা লাভ করেও উত্তরকালে তিনি কোনদিন বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাস বা ভাবের আতিশয্য প্রকাশ করেননি। বরং জিজ্ঞাসিত হলে অতিশয় নিরভিমানের সঙ্গে ঘটনাটি উল্লেখ করতেন মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগ পর্যন্ত শ্রীশ্রীমা একাগ্রচিত্তে তাঁরই সেবায় নিযুক্ত ছিলেন—সেই ক্ষুদ্র নহবত ঘরে, পরবর্তীকালে শ্যামপুকুরে ও অবশেষে কাশীপুরে। নহবতেই শুরু হয়েছিল ভক্তসেবা। বিন্দুমাত্র বিরক্তিবোধ না করে হাসিমুখে তিনি রান্না করেছেন ভক্তদের জন্য নিজ সন্তানবোধে অথচ তখন কতই বা তাঁর বয়স! আর সেই ঘরখানিতেই কত আয়োজন! সাদরে স্থান দিয়েছেন ভক্তমহিলাদের, গোপালের মা, গোলাপ মা, যোগীন মা, লক্ষ্মীদিদি সকলেই উপভোগ করেছেন তাঁর সাদর স্নেহ, যত্ন, সেবা ও মমতা।

তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাও ছিল আশ্চর্য। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বলা যায়, এই সেবার মধ্যে তাঁর কোন প্রত্যাশা ছিল না শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। তখনকার সমাজে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী মেয়েরা প্রতিদান না পেলেও স্বামী সেবাই জীবনের চরম কাম্য মনে করে জীবন উৎসর্গ করত। কিন্তু প্রতিদান না পেলেও তার আকাঙ্ক্ষা থেকে যেত। শ্রীশ্রীমার জীবনে তার ব্যতিক্রম। তাঁর শুদ্ধ নির্মল চিত্ত সর্বদা সেবা ও ভালবাসা দিতেই উন্মুখ। এ কি ঐশী শক্তির প্রকাশ? শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে অবস্থানকালে একান্ত অনুগত শিষ্যের মতোই তাঁর পদতলে বসে সাধনা ও জ্ঞান আহরণ করেছেন। গীতার উক্তি— 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্, তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।' যথার্থ শিষ্যের মধ্যে তার তিনটি গুণই ছিল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম শিষ্যা, তাঁর বিশাল অধ্যাত্ম সম্পদের উত্তরাধিকারিণী। উত্তরকালে সেই অর্জিত সম্পদ তিনি অকৃপণ চিত্তে বিতরণ করেছেন নরনারী নির্বিশেষে।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর কিছুকাল তাঁকে বিশেষ অভাব অনটনের মধ্যে বাস করতে হয় এবং জনসমাজের অগোচরেই ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্যগণ ও অন্তরঙ্গ ভক্তগোষ্ঠী ব্যতীত বাইরের লোক তাঁর সম্পর্কে অবহিত ছিল না। ধীরে ধীরে কিন্তু ঐশী শক্তির জাগরণ ঘটছিল।

উত্তর জীবনে তাঁর মধ্যে আমরা দুটি ভাবের চরম বিকাশ দেখতে পাই। প্রথম তাঁর অপূর্ব মাতৃত্বের মহিমা। কন্যা ও জায়ার ভূমিকা পালনের পর, মাতা ও সুনিপুণ গৃহিণীরূপেও তাঁর ভূমিকা অনবদ্য।

শ্রীশ্রীমা নিজে বলেছেন, শ্রীঠাকুর তাঁকে রেখে গেছেন মাতৃভাব প্রচারের জন্য। যাঁরা তাঁর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরা সেই অপূর্ব স্নেহের আস্বাদলাভ করেন। সকলেরই দৃঢ় ধারণা ছিল তিনি নিজের মা। যিনি 'সৎ ও অসৎ উভয়ের মা', তাঁর মধ্যে ধর্ম, জাতি বা শ্রেণীগত কোন পার্থক্য ও ভেদাভেদ থাকবার কথা নয়, ছিলও না। তাঁর উদার মাতৃস্নেহ নির্বিচারে যে কাছে এসেছে তাকেই আশ্রয় দিতে সদা উন্মুখ।

মনে করলে ভুল হবে তাঁর মাতৃহৃদয় কেবল স্নেহ বাৎসল্যে পরিপূর্ণ ছিল। প্রয়োজনে সন্তানের কল্যাণ কামনায় ছিল কঠোরতাও। আর কদাপি ছিল না কোন আড়ম্বর বা জাগতিক উচ্ছ্বাস। ধন্য তাঁরা, যাঁরা শ্রীশ্রীমার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শলাভ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, প্রকৃতই তাঁরা আস্বাদন করেছেন দুধ কী বস্তু। যাঁরা তাঁকে দেখেননি, সেই পরবর্তীকালের অগণিত নরনারীর জন্য রইল পরম আশ্বাস—'মনে ভাববে, আর কেউ না থাক, আমার একজন "মা" আছে।' আর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন আগামীকালের মেয়েদের জন্য, কেমন করে সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি হয়ে অনন্ত ধৈর্য, ক্ষমা ও ভালবাসার সঙ্গে সংসারে সকলের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে হয়, কেমন করে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করে সংসারের সকল কর্তব্য পালন করা যায়। তিনি যখন বলেন, 'আমার শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে', তখন তা কেবল তাঁর মুখের কথা নয়, অন্তরের কথা বলেই বিশ্বাস করি। সেইসঙ্গে মনে হয় আমজাদকে সযত্নে স্নেহপূর্বক পরিবেশন করে অস্পৃশ্যতা বর্জনের ইঙ্গিতও কী রেখে গেলেন না? আরও মনে পড়ে, সেই আচারনিষ্ঠ যুগে ব্রাহ্মণকন্যা এবং স্বয়ং সংরক্ষণশীলা হয়েও নিবেদিতাকে স্বগৃহে স্থান দেন! নিবেদিতা লিখছেন, একজন বিদেশীর সঙ্গে একই গৃহে বসবাস গোপালের মার আশী বছরের সংস্কারে বিশেষ আঘাত লেগেছিল। অবশ্য পরে তিনি সে ভাবটি জয় করেন। শ্রীশ্রীমার মনে কিন্তু বিন্দুমাত্র দ্বন্দ্ব হয়নি। সাদরে তিনি অভ্যর্থনা করেছিলেন স্বামীজীর অন্য বিদেশিনী শিষ্যাদের। স্বামীজী লিখছেন, 'শ্রীমা এখানে আছেন। য়ুরোপীয়ান ও আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ভাবিতে পার, মা তাহাদের সহিত একসঙ্গে আহার করিয়াছেন!' এই সঙ্গে স্মরণীয়, নিবেদিতা বাগবাজার অঞ্চলে সকলের অশেষ প্রীতি ও ভালবাসা লাভ করলেও অন্তঃপুরিকাগণ কিন্তু সযত্নে পরিহার করতেন তাঁর স্পর্শ!

অতঃপর তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমিকার কথা অবতারণা করতে চাই। বহুপূর্বে যখন তিনি সম্পূর্ণভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত, সেই ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কোন গুরুভ্রাতাকে লিখিত এক পত্রে যে বিষয়ে উল্লেখ করেন, 'মা ঠাকরুণ কী বস্তু বুঝতে পারনি, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।' এর দ্বারা বোঝা যায় তাঁর যথার্থ স্বরূপ বা আগমনের তাৎপর্য তখন পর্যন্ত স্বামীজী ছাড়া অন্য কেউ উপলব্ধি করেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের অবশ্য তার পূর্বেই ঘোষণা, 'ও সারদা-সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে। এ জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধিমতী। ও কি যে সে! ও আমার শক্তি।' পূর্বেই বলেছি লৌকিকবিদ্যা বলতে কেবল অক্ষর পরিচয় ও

সকলেরই দৃঢ় ধারণা ছিল তিনি নিজের মা। যিনি 'সৎ ও অসৎ উভয়ের মা', তাঁর মধ্যে ধর্ম, জাতি বা শ্রেণীগত কোন পার্থক্য ও ভেদাভেদ থাকবার কথা নয়, ছিলও না।

সামান্য পড়তে পারতেন। অতএব যে বিদ্যা তিনি বিতরণ করেছেন তা অবশ্যই লৌকিক নয়, পরাবিদ্যা। এই সঙ্গে উল্লেখ্য, আধুনিক শিক্ষার মূল্যায়ন করে বিবাহের পরেও তিনি রাধুকে স্কুলে পড়তে পাঠান। শিক্ষার প্রতি এমনই ছিল তাঁর উৎসাহ ও অনুরাগ। স্বামীজীর কথায় আসা যাক। গার্গী ও মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনীরূপে খ্যাত। মৈত্রেয়ীর মতোই তাঁর অমৃতত্বলাভের সাধনায় আত্মনিয়োগ ও তৎপ্রাপ্তি এবং সংসারে গৃহকোণে অবস্থান করেই। গার্গীর মতো দৃপ্ত কণ্ঠে কোন সভায় তর্কযুদ্ধে কাউকে তিনি আহ্বান করেননি। বস্তুত জনসমাজে পরিচিতি লাভের মতো বিশেষ ভূমিকা তাঁর ছিল না। অন্তঃপুরের মধ্যেই তো সারা জীবন কাটিয়ে গেলেন! কিন্তু যে কোন সমস্যার সমাধানে বা যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে তাঁকে বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত করতে দেখা যায়নি। আমেরিকা যাত্রার পূর্বে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল স্বামী বিবেকানন্দের। অবশেষে তিনি শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। অনুমান করা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সন্তানকে বিদেশযাত্রায় আশীর্বাদ দিতে মাতৃহৃদয় বিচলিত হয় কিন্তু অনুমতি দিতে দ্বিধা করেননি। স্বামীজী লিখছেন, '...তিনি এক আশীর্বাদ দিলেন, অমনি হুপ করে পগার পার' (নিজেকে মহাবীরের পূজার সঙ্গে তুলনা করে)। অদ্বৈত সাধনার স্থান মায়াবতী আশ্রমে একটি ঘরে শ্রীঠাকুরের পূজার সামান্য ব্যবস্থাদি দেখে স্বামীজী বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করেন। পরে একজন দ্বৈত অদ্বৈতের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে শ্রীমাকে লিখলে উত্তরে তিনি স্পষ্ট জবাব দেন, 'আমাদের গুরু যিনি তিনি তো অদ্বৈত, তোমরা যখন সেই গুরুর শিষ্য তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী।'

প্রচলিত সন্ন্যাসজীবনে জনহিতায় জীবন উৎসর্গের যে-নবভাব বা আদর্শ স্বামীজী প্রবর্তন করেন, তৎকালীন সমাজে তার নিন্দা, সমালোচনা ও প্রতিকূলতা ছিল প্রচুর। শ্রীশ্রীমা কিন্তু প্রথমাবধি এই নূতন ভাবাদর্শ অনুমোদন বা সমর্থন করা নয়, সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। তাঁর কথা, 'নরেন হল ঠাকুরের যন্ত্র। তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) ছেলেদের ও ভক্তদের দিয়ে তাঁর কাজ করাবেন বলে, জগতের কল্যাণ করবেন বলে নরেনকে দিয়ে এসব লেখাচ্ছেন।'

যে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ আজ বিশ্বের সর্বত্র পরিচিত ও সমাদৃত, তার সুপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর কী আকুল প্রার্থনা ঠাকুরের কাছে? সঙ্ঘ স্থাপনের মূল উদ্দেশ্যটি তাঁর সহজ, সরল ভাষার মধ্যেই প্রকৃত মূর্ত হয়ে উঠেছে। ত্যাগী সন্তানদের কঠোর তপস্যা ও অনাহারে ঘুরে বেড়ানোয় তাঁর মাতৃহৃদয় বিচলিত বোধ করে। আর তাদের জীবনের উদ্দেশ্য যে অন্য! 'আমার প্রার্থনা তোমার নামে যারা বেরুবে, তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব তোমাকে, আর তোমার ভাব উপদেশ নিয়ে একত্র থাকবে। আর এই সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে। এই জন্যই তো তোমার আসা।' এই সরল অথচ সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যে সঙ্ঘের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ প্রতিফলিত। বোঝা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তি সঙ্ঘ স্থাপন ও তার সম্প্রসারণে অগ্রণী। এ বিষয়ে তাঁর অবদান সংক্ষেপে উল্লেখ করি। সে যুগের বহু বৈরাগ্যবান, বিদ্বান যুবক তাঁরই নিকট দীক্ষা গ্রহণান্তে সঙ্ঘে যোগ দেন। দৃঢ়তার সঙ্গে

"মনে ভাববে, আর কেউ না থাক, আমার একজন 'মা' আছে"

তিনি তাঁদের সন্ন্যাসজীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি কিন্তু তাঁদের প্রকৃত মা ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁরই দীক্ষিত সন্তানদের মধ্যে চারজন বিরাট রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষপদে বৃত হন এবং বিশাল অধ্যাত্ম জীবন ও কর্মযজ্ঞের সুবৃহৎ দায়িত্ব পরিচালনা করেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় স্বামীজীর পরিকল্পিত মেয়েদের মঠ যা 'শ্রীসারদামঠ' নামে অভিহিত, তার প্রথম অধ্যক্ষার পদ অলঙ্কৃত করেন শ্রীশ্রীমারই এক দীক্ষিত সন্তান। জগতের ইতিহাসে এটি অভিনব। এ কেবল গুরুপত্নীরূপে গতানুগতিক দীক্ষা দান নয়।

সঙ্ঘের স্কুল, হাসপাতাল, বিভিন্ন ত্রাণকার্য, অফিসের কাজ ইত্যাদি বিষয়ে কেউ সমালোচনা করায় শ্রীমার দৃঢ় ও স্পষ্ট নির্দেশ, 'ঠাকুর যেমন চালাচ্ছেন তেমনি চলবে, মঠ এমনিভাবেই চলবে। এতে যারা পারবে না তারা চলে যাবে।' অথচ যে কোন সাধুর সঙ্ঘ ত্যাগে তাঁর মাতৃহৃদয় কতই না কাতর ও বিচলিত! সেই সঙ্গে ছিল সাধুর আদর্শজীবনের প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কাশীতে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত সেবাশ্রম পরিদর্শনে তিনি বিশেষ আনন্দ সহকারে প্রশংসা ও দানস্বরূপ কিছু অর্থ প্রেরণ করেন।

পুরুষ ও নারী উভয় মিলে সমাজ। অতএব দেশ ও সমাজের সর্ববিধ মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন উভয়ের উন্নতি। স্বামীজীর তাই ইচ্ছা ছিল শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে মেয়েদের জন্য অনুরূপ একটি মঠ স্থাপন। তাঁর সে শুভ বাসনা পূর্ণ হওয়া সময়সাপেক্ষ ছিল যেহেতু তখনকার সমাজ ছিল প্রতিকূল। তথাপি ঐ কাজের শুভ সূচনাস্বরূপ নিবেদিতার দ্বারা স্বামীজী একটি স্কুল খোলেন বাগবাজারে এবং তাঁর অনুরোধে শ্রীশ্রীমা স্বয়ং তার উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। প্রথমাবধি বিভিন্ন সময়ে স্কুলে পদার্পণ করে তিনি নিবেদিতা, ক্রিস্টিন ও সুধীরাকে সাহায্য ও উৎসাহ দেন।

একজন স্ত্রীভক্ত বলছেন, 'আমার পাঁচটি মেয়ে মা, বে দিতে পারিনি, বড়ই ভাবনায় আছি।'

অবলীলাক্রমে মার উত্তর, 'বে দিতে না পার, এত ভাবনা করে কী হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দিও, লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে।' আরেকজন বললেন, 'এখন ছেলে পাওয়া কঠিন, অনেক ছেলে এখন বে করতেই চায় না।'

মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'ছেলেদের এখন জ্ঞান হচ্ছে, সংসার যে অনিত্য তা তারা বুঝতে পারছে। সংসারে যত লিপ্ত না হওয়া যায় ততই ভাল।' বাংলা ১৩১৮ সালে (ইংরেজী ১৯১২) এ উক্তি মেয়েদের সম্বন্ধে কী কল্পনাতীত নয়? শ্রীগৌরীমার আশ্রম প্রতিষ্ঠায় শ্রীমার কত আশীর্বাদ ও উৎসাহ প্রদান! তাঁরই আশীর্বাদধন্য এক ব্রাহ্মণ কন্যার ডাফ্রিন হাসপাতালে নার্সিং ট্রেনিং গ্রহণের ব্যাপারে তিনি সহজেই সম্মতি দেন। প্রস্তাবটি শুনে বিরক্তি সহকারে গোলাপ-মা মন্তব্য করেন, 'হিন্দু ঘরের বামুনের মেয়ে হাসপাতালে ছত্রিশ জাতের সেবা করবে—সে আবার কী গো? এর পর ওর হাতে আমরা খাব কী করে। যত সব অনাসৃষ্টি!' শ্রীমা শান্তস্বরে বলেন, 'সেকি গোলাপ, ও ফিরে এসে যে আমাদেরই করবে।' শ্রীমার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়। তাঁর দীক্ষিত কন্যাটি ঐ বিদ্যা অর্জনান্তে উপযুক্ত সেবিকারূপে শ্রীশ্রীমা এবং যথাক্রমে গোলাপ-মা ও যোগীন-মার সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। সর্বক্ষেত্রেই ছিল এইরূপ উদার দৃষ্টিভঙ্গী।

তাঁর উপদেশও ছিল অতি সহজ, সরল। নিজে কঠোর সাধন ভজন করলেও সাধারণ লোকের জন্যে তাঁর সহজ উপদেশ—'সাধন মানে—তাঁর পাদপদ্ম সর্বদা মনে রেখে তাঁর চিন্তাতে মনকে ডুবিয়ে রাখা।' তত্ত্বজ্ঞান লাভ সম্বন্ধে তাঁর কী সুন্দর নির্দেশ! 'যেমন ফুল নাড়তে চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎতত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। ...যারা পরমার্থ খুব চিন্তা করে, তাদের মন খুব সূক্ষ্ম, শুদ্ধ হয়ে যায়। সেই মন যা ধরে সেটাকে খুব আঁকড়ে ধরে।' আর তাঁর শেষ উপদেশটি তো সকলেরই জানা যা অদ্বৈত বেদান্তের শেষ কথা। 'যদি শান্তি পেতে চাও, মা, কারও দোষ দেখ না।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে ব্যথিত হৃদয়ে ক্ষোভের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'দিকে দিকে নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস।' বর্তমানে পৃথিবীর অবস্থা আরও ভয়াবহ। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি মারাত্মক অস্ত্র প্রতিযোগিতায় উন্মত্ত; পৃথিবী ধ্বংসের প্রস্তুতি চলছে। অসহায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন। কে শোনাবে শান্তির বাণী? বিখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবির মতে, মানবজাতির অস্তিত্ব আজ সংকটপূর্ণ। এ সময়ে একমাত্র ভারতের অস্তিত্ববাদই পারে তাকে রক্ষা করতে। যুগে যুগে মহামানবরূপ আধারে ভারত সেই শান্তির উৎস অমৃতত্ব বা মৃতসঞ্জীবনী সুধা আহরণ ও সঞ্চয় করেছে। বিতরণের ভারও তারই উপরে।

বিজ্ঞানের অবদান কখনই অবহেলার নয়। একমাত্র বিজ্ঞানের মাধ্যমে দেশের আর্থিক ও সর্ববিধ উন্নতির সম্ভাবনা। যদিও দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আমাদের দেশে এখনও লক্ষ লক্ষ নরনারী বিজ্ঞানের কোনপ্রকার সুযোগ সুবিধা পায়নি এবং অশিক্ষা, দারিদ্র্য, অজ্ঞান, কুসংস্কার প্রবলভাবে বিদ্যমান। মহাকাশযাত্রা বিজ্ঞানীর নিকট অবশ্যই অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রেরণাদায়ক। কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর সাধারণ দরিদ্র নরনারীর তাতে কী আসে যায়? বিজ্ঞানকে মানবজাতির মঙ্গলকামনায় নিয়োজিত করবে কে? তার অপব্যবহারের ফলে ধ্বংসের হাত থেকেই বা কে রক্ষা করবে?

অবতাররূপে শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও বিতর্কিত। তবে জগতের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ, যথা—রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট ও শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত। ভারতে অবতারবাদ যাঁরা মানেন, তাঁরা জানেন অবতারের সঙ্গে তাঁর শক্তির আগমন ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁকে তাঁর শক্তি বলে অভিহিত করেছেন সেই শক্তির ভূমিকা এবার অধিক সক্রিয়। তাঁর মধ্যে দেখি, সীতার অপার সহিষ্ণুতা, বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করে যিনি মহা দুঃখের জীবনযাপন করে গেছেন—নিত্য শুদ্ধস্বভাবা। দেখতে পাই শ্রীরাধার দেহবোধরহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপার ভালবাসা—'তৎসুখে সুখিত্বম।' যশোধরার মতো তিনি একান্তভাবে স্বামীর আদর্শের অনুবর্তিনী। বিষ্ণু-প্রিয়ার মতোই নীরব মহাসাধিকা।

অবতারের আবির্ভাব যুগ প্রয়োজনে। বৃহত্তর জগতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ক্রমশ নিকটতর। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পরস্পরের উপর প্রভাবও বিস্তৃত। ধর্ম বা অধ্যাত্মবাদকে ভারত চিরকাল সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে এসেছে। এখন তার সামনে দুটি অবরোধ। প্রথম, ধর্মে বিভেদ। যা এক প্রকার চিরন্তন—ফল মনুষ্যত্বের অবনতি। আরেকটি প্রবল বাধা বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতি মানুষের সর্ববিধ জাগতিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম—ফল ধর্মে অনীহা। মনে হয়, বিশেষ করে বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা এই যুগ্ম আদর্শের অতীব প্রয়োজন ছিল। এই আদর্শ সঙ্ঘাতের যুগে চারিদিকে প্রবল উন্মাদনার মধ্যে মানবজাতি দিশেহারা। পাশ্চাত্যের মোহময় জড়বাদী সভ্যতায় বিভ্রান্ত।

দেশকাল অতিক্রম করে ভাবী যুগের নরনারীর জীবনে অনুপ্রেরণা বহন করবার মত শাশ্বত আদর্শ একমাত্র লোকোত্তর জীবনেই দেখা যায়। সেই সনাতন ভাবধারা, জীবনের মূল সুর যার চরিত্র অবলম্বন করে অভিব্যক্ত হয়, ভারত তাকেই স্বীকৃতি দেয় সাদরে। আজ ভারতের নারীর অন্তঃপুরের বন্ধনদশার মোচন ঘটেছে; পুরাতন জীবনে প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়, কাম্যও নয়। এখন সমন্বয়ের যুগ। কেবল ধর্মে নয়, নবীন পুরাতন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য— জীবনের সবক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন। এ যুগে পারিপার্শ্বিক ঘটনার আবর্তের পরিপ্রেক্ষিতে এমন একটি আদর্শ চরিত্রের প্রয়োজন ছিল যিনি ধীর, স্থির, আত্মসমাহিত, সকলের প্রতি করুণা ও ভালবাসায় পূর্ণ। একাধারে বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি, শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসিনী, আবার শ্রেষ্ঠ গৃহিণী ও জননী, গুরু ও শিষ্যা, তিনি হলেন শ্রীমা সারদা।

'আমার সবসময় মনে হয়েছে তিনি যেন ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী, কিন্তু তিনি কী ভারতের প্রাচীন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি অথবা কোন নূতন আদর্শের অগ্রদূত?' নিবেদিতার এই উক্তির উত্তরে নিশ্চিত বলা যায় শ্রীসারদার মধ্যে উভয় আদর্শই নিহিত। প্রাচীন ভারতের যা কিছু শুভ, মঙ্গলকর, তার মৌনমাধুর্য, ঈশ্বর আত্মসমর্পণ তাঁর জীবনে পূর্ণ প্রতিফলিত, তার সকল মর্যাদা সুরক্ষিত, আবার নবীন ভারতের আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা, তার স্বাতন্ত্র্যবোধ, স্বাধীনতাপ্রিয়তা সবই তিনি গ্রহণ করেছেন সাগ্রহে।

শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ সম্বন্ধে তিনি শেষ বাণী কিনা তা অপেক্ষা রাখে তাঁর জীবন ও চরিত্র গভীরভাবে অনুধাবন ও অনুশীলনের। আপাতত দেখছি, কেবল ভারতের সর্বত্র নয়, বিদেশেও অনেকে তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী এবং ক্রমশই তার বিস্তার ঘটছে। পূর্ণ পরিচয় নির্ণয়ের ভার মহাকালের হাতে।

শেষ

ব্যঙ্গকৌতুক

রূপদর্শীর ঝাঁকিদর্শন

জ্যোতি ভিশনের প্রথম ছবি

অবশেষে সুপার স্টার মিঠুন চক্রবর্তী, রাজেশ খান্না এবং শত্রুঘ্ন সিংহ পশ্চিমবঙ্গে এসে জ্যোতি ভিশনের টেকনিক দেখে গেলেন। দমদম বিমানঘাটিতে সাংবাদিকদের কাছে মিঠুন নাকি বলেছেন, এই প্রথম ক্লোজ থেকে আমি জ্যোতি ভিশন দেখলাম। জ্যোতি ভিশনের কোনও তুলনা আমি অন্তত এ পর্যন্ত দেখিনি। মিঠুনের সঙ্গেই ছিলেন রাজেশ খান্না, আশা ভোঁশলে এবং রাহুল দেববর্মণ। দেখা গেল জ্যোতি ভিশনের দর্শন তাঁদেরও মোহমুগ্ধ করে ফেলেছে।

রাহুল দেববর্মণকে উপস্থিত সাংবাদিকরা ছেঁকে ধরতেই তিনি তাড়াতাড়ি 'দম মারো দম, মিট যায়ে হম', বলেই বিমান ঘাটির সিকিউরিটি-র মধ্যে ঢুকে পড়লেন। আশা ভোঁশলেকেও তিনি টেনে নেবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু সেই সময়েই একজন পাবলিক তাড়াহুড়ো করে রাহুলের পর পরই সিকিউরিটি-র মধ্যে ঢুকে পড়ায় আশা দলছুট হয়ে পড়লেন। অমনি সাংবাদিকরা তাঁকে ছেঁকে ধরলেন।

সাংবাদিক : আচ্ছা আশাদি ভাই, পশ্চিমবঙ্গ আপনার কেমন লাগল ?

আশাজী : বহোৎ বড়িয়া।

সাংবাদিক : সব থেকে কী আপনার ভাল লাগল, আশাদি ?

আশাজী : সোব থেকে বালো লেগেছে জ্যোতি ভিশন। আয়াসা কভি নেহি দেখা।

আশাজী একটু ফাঁক পেয়েই সিকিউরিটির দরজা দিয়ে সুট করে গলে গেলেন।

সাংবাদিক : রাজেশজী, নমস্তে।

রাজেশজী : নমস্তে।

সাংবাদিক : জ্যোতি ভিশন দেখে আপনার ফিলিংস কী হল ?

রাজেশ : আগর উয়ো আওরত হোতি তো মায় উনকি লাভ মে ফাঁস যাতা থা।

সাংবাদিক : বাহওয়া বাহওয়া, ক্যায়া বোলিস গুরু।

বিমানবন্দরের সংবাদদাতা : আচ্ছা রাজেশজী, ক্যান ইউ টেল মি, এই জ্যোতি ভিশন জিনিসটা কী ?

রাজেশজী : মিঠুনজী সে শুন লিজিয়ে। মিঠুনজীর সোংগেই তো জ্যায়াদা ভালবাসা হোলো।

সাংবাদিক : মিঠুনজী, গুরু, আপনিই বাংলার নতুন গুরু, আপনি রাইটার্স বিল্ডিংসকে ইজ্জৎ দিয়েছেন, আপনি ছাড়া আমাদের গতি নেই। জ্যোতি ভিশন জিনিসটা কী ?

মিঠুনজী : জ্যোতি ভিশন হচ্ছে ফিল্ম তৈরির একটা টেকনিক। আমার সীমিত ফিল্মি অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, জ্যোতি ভিশন একটা রিভলিউশনারি প্রকৌশল, আই মিন, টেকনিক : পশ্চিমবঙ্গ এখন লিড করবে দাদা।

চিত্র সাংবাদিক : অল্প কথায় বুঝিয়ে দিন তো গুরু, কেন আপনি এই প্রকৌশল, আই মিন, টেকনিককে রিভলিউশনারি বলছেন ?

সিনেমার কন্সেপ্টটাই জ্যোতি ভিশনে ভেঙে তচনচ করে দেওয়া হয়েছে। এই টেকনিকে সিনেমা তুললে, সেটা যখন আপনি দেখবেন, আপনার মনেই হবে না, আপনি কাল্পনিক কিছু দেখছেন। আপনার মনে হবে, আপনি জ্যোতি ভিশনে যা দেখছেন, যা শুনছেন, সে সবই সত্যি। টেকনিক্যাল কচকচি বাদ দিয়ে বললে মোদ্দা কথাটা এই দাঁড়ায়। ও কে, বাই—

এঁরা কলকাতা থেকে যেতে না যেতেই এলেন শত্রুঘ্ন সিংহ। তিনি খোলাখুলিই বললেন, হাঁ, জ্যোতি ভিশন পদ্ধতিতে প্রথম ফিল্মটি পশ্চিমবঙ্গের ফিনান্সেই তৈরি হচ্ছে।

সাংবাদিক : তৈরি হচ্ছে মানে ?

তৈরি হচ্ছে মানে, ইট ইজ আন্ডার প্রোডাকশন। মানে স্ক্রিপ্টের প্রথম খসড়া তৈরি হচ্ছে।

কে চিত্রনাট্য লিখছেন ?

সাম ওয়ান ফ্রম ওয়েস্টবেঙ্গল। সাম ওয়ান ফ্রম ভেরি ভেরি টপ। বাস আর না। এটা টপ সিক্রেট।

সাংবাদিক : কী টাইটেল হবে ?

শত্রুঘ্ন সিংহ : ওই বিশ্বস্ত সূত্রকে জিজ্ঞাসা করুন। উনি ওদের খুবই ঘনিষ্ঠ মহলের লোক।

বিঃ সূঃ : সবটা বলতে পারব না। কিছু কিছু পারব। টাইটেলের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন ? আপাতত ছবির নাম রাখা হয়েছে, মেরে পুকার। পরে অবশ্য হম খুন দেঙ্গে-ও হতে পারে।

মেরে পুকার ? হম খুন দেঙ্গে ? তার মানে ছবি হবে হিন্দিতে।

কাহিনীটা নাটশেলে বলবেন, দয়া করে ?

কাহিনীটা এইরকম। এক ছোট ভূস্বামীর একমাত্র মেয়ে, পরমা সুন্দরী, যেমন রূপ তেমন গানের গলা।

আশাজী প্লে-ব্যাক করবেন, না ?

হ্যাঁ। শুনুন। নাম দুর্জয়ালিং।

মেয়েটা কোন দেশী ?

যে কোনও দেশেরই হতে পারে। হিন্দি ভার্সনে সবই মানিয়ে যাবে।

নামটা যেন কার কথা মনে করিয়ে দেয় না ? দুর্জয়ালিং, ঠিক দার্জিলিঙ-এর মতো শোনায়, না ?

হতে পারে। শুনুন। মেয়েটা আপন মনে হেসে খেলে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় তার দিকে কুদৃষ্টিতে তাকাল এক ভিলেন।

মানে শত্রু। পাহাড়ের ভিলেন তো ?

ধরে নিন তাই। এখন শুনুন। সেই ভিলেন বলল, এ মেয়ে আমার চাই।

এতে দিল্লির কোনও ক্যারেক্টার থাকবে না ?

থাকবে না মানে ? তারই [illegible] মেইন রোল। দিল্লি সে আয়া হুয়া [illegible] মেয়ের বাবার সঙ্গে দুশমনি করবে, বেইমানি করবে। সে তো মুখে মেয়ের বাপের সামনে মিঠি মিঠি হাসবে, আর তলে তলে শত্রুকে মদত দেবে।

এ রোলটা কে করবে, রাজেশজী ?

ঠিক ধরেছেন। ফাটিয়ে দেবে দেখবেন।

হ্যাঁ, তারপর ?

তারপর মেয়েটাকে আর রক্ষা করার কোনও উপায় নেই, মেয়েটা যখন তারস্বরে মুঝে বাঁচাও মুঝে বাঁচাও করে চেল্লাতে শুরু করেছে।

তখন মিঠুনজী হই হই করে লাফিয়ে পড়েই ঢিসুম ঢিসুম।

আরে না না, ভিলেন যখন মেয়েটাকে নাস্তানাবুদ করছে আর দিল্লি সে আয়া হুয়া দোস্ত যখন মিচকে মিচকে হাসছে, তখন তো পুরা গান চলবে মেয়েটার মুখে।

ঠিক ঠিক, আশাজী আছেন, রাহুলজী আছেন, এটা ভুলেই গিয়েছিলাম। অন্তত দু'খান গান হবে, তারপর

মিঠুনজীর প্রবেশ আর সঙ্গে সঙ্গেই ঢিসুম ঢিসুম। ভিলেন একেবারে ফ্ল্যাট। দিল্লি সে আয়া হুয়া দোস্তও পগার পার। মিঠুনজী বিজয় গর্বে ফিরে এসে ভূস্বামীর হাতে তাঁর মেয়েকে ফিরিয়ে দেবেন। সমাপ্ত। দি এন্ড।

এই ছবিটা জ্যোতি ভিশন পদ্ধতিতে দেখালে মনে হবে বাস্তব ঘটনা। যা দেখছি, যা শুনছি, সব সত্যি ?

ঠিক তাই। তাই আপনার মনে হবে। এটাই জ্যোতি ভিশনের বিউটি।

তাহলে হিরোইন কে হচ্ছেন ? দুর্জয়ালিং-এর ভূমিকায় কে আসছেন ?

ওঁরা তো বলে গেলেন, পরের বার হেমা মালিনীকে নিয়ে আসবেন। দেখা যাক ?

ছবি : দেবাশিস দেব

আপনার মতই বিশেষ যতনে আমাদের প্রতিটি ডিশ্ বানানো নিখুঁত ধরনে !

সেলাম ষ্টেনলেস

আজই নিন! কারণ, ষ্টেনলেস ষ্টীল তৈরীর ব্যাপারে, আমাদের মত যত্ন কেইবা করে।

Sista's - SSP.559.86 BEN

সঙ্গীত-স্মৃতি :যে সব শ্রেষ্ঠ ওস্তাদের গান-বাজনা শুনেছি

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কোনও একটি শিল্প সম্পর্কে ধারণা ও অভিজ্ঞতাকে আর একটি শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করতে যাওয়ার মধ্যে একটা স্বাভাবিক অস্বস্তি তো আছেই। তার ওপর সঙ্গীতে শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ শিল্পী কাদের বলা যায়, শুধু কথা দিয়ে তাঁদের স্বরূপ বর্ণনা করাও একটা কঠিন বাস্তব সমস্যা। সুতরাং যে সব বড় ওস্তাদের গান-বাজনা শুনেছি, সেই অভিজ্ঞতার স্মৃতি লিপিবদ্ধ করতে গেলে প্রথমেই বলা উচিত, মহৎ বা বড় শিল্পী বলতে কি বোঝায়। সাধারণভাবে বলা চলে, কোনও মহৎ ব্যক্তির তথা শিল্পীর এমন একটি দুর্লভ ক্ষমতা বা উৎকর্ষ-গুণ থাকে যা সাধারণ মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ ও অভিভূত করে দেয়। এই ক্ষমতা প্রতিভার শামিল যা শ্রোতাদের মনের ওপর ইন্দ্রজাল বিস্তার করে। এই রকম মন্ত্রমুগ্ধ করার রহস্যকে পুরোপুরি বিশ্লেষণ করে দেখানো যায় না। তবু মোটামুটিভাবে বোধ হয় বলা যায়, এই প্রভাব-প্রক্রিয়ার উপকরণ হল— কল্পনার ব্যাপ্তি বা প্রসার, অনুভূতির গভীরতা এবং সক্রিয় মননশক্তির প্রয়োগে এমন একটা উঁচু স্তরে বা মানে পৌঁছানো যা গুণী শিল্পীর গূঢ় উপলব্ধিকে মূর্ত করে তোলে, তাকে প্রত্যক্ষ বাস্তবরূপ দান করে। এই শ্রেষ্ঠত্বের মান তো গজকাঠি দিয়ে মাপা যায় না। তবে একথা অবশ্যই বলা চলে যে মহৎ শিল্পের ধর্মই হচ্ছে, তার কৃতিত্বকর্মকে অনন্য রূপে উপস্থাপিত করে তাকে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র বস্তুতে পরিণত করে দেয়।

শিল্পকর্মের মধ্যে ব্যক্তিত্বের অনুপ্রবেশ, অর্থাৎ গায়ন-বাদনের ওপর শিল্পীসত্তার প্রভাব (এবং উলটো দিক থেকেও), মহৎ শিল্পের সঙ্গে মহৎ শিল্পীকে সমাত্মক করে তোলে। মনে হয়, একজন বড় শিল্পী তাঁর কর্মজীবনে নিজস্ব শিল্পকাজের সমগ্র ইতিহাসটুকু তুলে ধরেন এবং সেই অগ্রগতির বা বিবর্তনের ধারাকে বহন করে চলেন ও পরবর্তী স্তরে পৌঁছে দেন। পাশ্চাত্য দেশের মতো ভারতে অন্তত সুরকার ও সুরশিল্পীর মধ্যে পার্থক্য নেই। সুতরাং উপরের মন্তব্যগুলিকে একত্র বিবেচনা করাই সঙ্গত হবে। রবীন্দ্রনাথের গলায় যদিও স্বরগ্রামের চমৎকার প্রসার লক্ষ করা যেত এবং ভারতীয় সঙ্গীতের সব রকম 'টাইপ'-এর সঙ্গেই তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ছিল—তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি তিনি ভালোভাবেই জানতেন ও বুঝতেন, তবু কেউই তাঁকে মস্ত বড় গায়ক বলে দাবি করবেন না। অথচ বিষয় বিচারে, বাস্তবে তাঁকে মহৎ শিল্পী বলতেই হবে, যদি মহৎ শিল্পী কেউ হন। অবশ্য ভারতে যে ঐতিহ্য চলে আসছে, তাতে গায়ন-বাদনের মধ্যেই সুর-রচনার স্থিতি ও প্রকাশ বলে বিবেচনা করা হয়। তবে এখন এই প্রসঙ্গে বলতে পারি যে, ত্যাগরাজ, দীক্ষিতার, শ্যাম শাস্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ, একাধারে দুইই—অনেকটা সমানুপাতে সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী।

এক সময়ে কবির চেয়ে গায়করূপেই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ও প্রসিদ্ধি ছিল বেশি। সেই উদ্দীপনাময় স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রনাথ যখনই মঞ্চে এসে হাজির হতেন, তখনই শ্রোতার দল তারস্বরে 'রবিবাবুর গান চাই—রবিবাবুর গান—' বলে তুমুল কোলাহল সৃষ্টি করত। একবার কলকাতা য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের পুরানো হল-ঘরে ইনায়ত খাঁ (যিনি পরে 'মিস্টিক' বা মরমিয়া হয়ে যান) কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য ক্ষমতার প্রমাণ দেখাচ্ছিলেন। শুধু বাইশটি শ্রুতি নয়, আরও কিছু বেশি, তাঁর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হতে লাগল। কিন্তু শ্রোতারা ওস্তাদের কণ্ঠস্বরের এই সূক্ষ্ম কেরামতি আর শুনতে চাইল না। মঞ্চে বসেছিলেন রবিবাবু। তারা এখন তাঁর গান শোনার জন্য চেঁচামেচি শুরু করে দিল। কবি তখন ঐখানে বসে বসেই সেই প্রসিদ্ধ গানটি রচনা করে নিয়ে গাইলেন, "তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী।" তাঁর অপূর্ব গানের গলা মাধুর্যে আর স্বরবিস্তারে গাম্ভীর্যের অভাবটুকু পুষিয়ে নিল। শুধু একবার তার সপ্তকে শুদ্ধ গান্ধারে তাঁর কণ্ঠস্বর একটু কেঁপেছিল, সামান্য বিচ্যুতি ঘটেছিল, মনে হয়। তাঁর কণ্ঠস্বরে যেমন অনেক গুণ ছিল, তেমনি কিছু কিছু ত্রুটিও ছিল। তাঁর লয়জ্ঞান একেবারে নিখুঁত ছিল না এবং পাকাপোক্তভাবে বেশি দিন তাঁর তালিম নেওয়া

আলাউদ্দিন খাঁ শিল্পের পবিত্রতায় মগ্ন এক নিভৃত শিল্পী

হয়নি। তবু আমার ধারণা তিনি এক মহান শিল্পী। কারণ তাঁর গলায় কথারাই গান গেয়ে উঠত আর স্বরগুলি কথায় প্রত্যক্ষ মূর্তি পেত। ভারতীয় রাগসঙ্গীতের সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতিতে মানুষের যে সব বিচিত্র অনুভূতি, সূক্ষ্ম মেজাজ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে ধরে রেখে নরনারীর মানসিক অবস্থার পলাতক মুহূর্তগুলিকে পরিস্ফুট করতে পেরেছিলেন। আরও বড় কথা, ভারতীয় সঙ্গীতে তিনি নতুন প্রাণসঞ্চার করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের কথা এসে যায়। অবশ্য বড় সঙ্গীতশাস্ত্রীদের মধ্যেই তাঁর আসন। মূলত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিক্ষা ও ব্যাখ্যার জন্য তাঁর সুররচনা হলেও, সেতার বাদনে তাঁর দক্ষতা এবং কণ্ঠস্বরও নিম্নস্তরের ছিল না।

যাই হোক, আমাদের দেশে একটি সাধারণ ও সুস্থ ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে বড় ওস্তাদরা 'ক্ল্যাসিকাল' বা মার্গসঙ্গীতের ঐতিহ্য পরম্পরাকে মেনে চলেন। এখন ঐ প্রতিষ্ঠিত রীতির কতটুকু মাত্রা লঙ্ঘন অনুমোদন করা যেতে পারে, তা নির্ণয় করার জন্য যেহেতু কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নেই, সেহেতু যে সব ওস্তাদ শিল্পী আপনার ব্যক্তিস্বরূপের অর্থাৎ নিজস্ব শিল্প প্রকাশের তাগিদেই সামান্য ব্যতিক্রম করেও আবার ঘরানা রীতিতেই ফিরে আসেন এবং মোটের ওপর সেই গায়ন-পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেন, তাঁদেরই প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা সঙ্গত হবে। এই স্বীকৃত পরিধীর মধ্যে গত পঞ্চাশ বছরে আমার সঙ্গীত চেতনা আর চার দশক ধরে সঙ্গীত সম্পর্কে আমার বোধশক্তি ও অভিজ্ঞতা গড়ে উঠেছে। ভারতের, বেশির ভাগ উত্তর ভারতের যতো স্বীকৃত বড় ওস্তাদ আছেন, তাঁদের এবং কিছু কিছু দক্ষিণী ওস্তাদেরও গান-বাজনা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।...

প্রথমে কণ্ঠশিল্পীদের কথাই ধরি। এঁদের মধ্যে যাঁরা সেরা আলাপিয়া তাঁরা এসেছিলেন জাকারুদ্দিন, আলাবন্দে খাঁ ও নাসিরউদ্দিন খাঁদের ঘর থেকে। জাকারুদ্দিনকে আমি একবারই শুনেছি। তাঁর ভাই আলাবন্দে খাঁ আর ভাইপো নাসিরউদ্দিন খাঁ-ই ছিলেন আমাদের কালে আলাপিয়াদের শীর্ষস্থানীয়। তাঁদের স্বর ছিল একেবারে শুদ্ধ, রাগবিস্তার নিখুঁত, রীতিসম্মত। তাঁদের কণ্ঠস্বর ছিল অতিমাত্রায় নমনীয়, রাগরূপ শুদ্ধভাবে গঠিত। দরবারের আবহাওয়া তাঁরা নিজেরাই তৈরি করে নিতে জানতেন। তাঁদের সংগীত ছিল মহাসাগর তুল্য, আমরা যারা তার তীরে থাকতাম দাঁড়িয়ে তারা অজান্তেই সেদিকে আকৃষ্ট হতাম। আরও গভীর ও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর আমরা শুনেছি, যেমন বিষ্ণু দিগম্বর, অঘোর চক্রবর্তী, ম'হিম মুখার্জির কণ্ঠ। কিন্তু নিছক ঐশ্বর্য আর ব্যাপ্তিতে এই সব আলাপিয়াদের সমকক্ষ আধুনিক ভারতবর্ষে আর কেউ নেই। যখনই এ রকম অভিযোগ শুনি যে ভারতীয় সংগীতে কণ্ঠসাধনার শিক্ষা নেই, তখন ওঁদের কথাই মনে পড়ে। কেবল এঁদের থেকেই বোঝা যায় কথাটা কতো অসার। একমাত্র রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ছিলেন আলাপে এঁদের সমকক্ষ, আর তাঁর
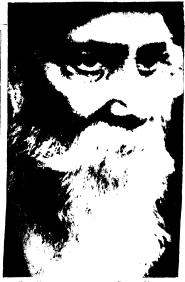
ভারতীয় সঙ্গীতে নতুন প্রাণসঞ্চার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ

ভাইপো জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামী ছিলেন গমকে। আমি যতোটা শুনেছি তাতে এই শেষোক্ত ব্যক্তির খাদের দিকে সঞ্চরণই ছিল সবার সেরা। এঁরা কিন্তু মূলত ছিলেন ধ্রুপদিয়া। আলাবন্দে খাঁর ডাগর বাণীতে আলাপের রীতি সাংগীতিক মহলে আজও রূপকথা সদৃশ।

আমার কাছে ধ্রুপদের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণী রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী আর বিশ্বনাথ রাও। আমাদের কলেজ জীবনে ধ্রুপদের ঝাণ্ডা এঁরাই উঁচু করে তুলে ধরেছিলেন। ধ্রুপদ অন্যদের কাছেও শুনেছি, কিন্তু কেবল এই দু-জনকেই আমি সত্যিকারের ধ্রুপদীয়া হিসেবে স্মরণ করতে চাই। ধ্রুপদ বলতে যে ওজন আর মর্যাদার ধারণা মনে আসে, সেটা আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, গোয়ালিয়র ঘরানায় সব সময় ঠিক মেলে না। এদেশে ধ্রুপদী রচনার বোধ হয় সর্বাধিক সংগ্রহ ছিল গোঁসাইজীর কাছে। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অতি চমৎকার আর

সঙ্গীতের জগতে বিষ্ণু দিগম্বর ছিলেন যোগীর মতো

লয়জ্ঞান অতিশয় উন্নত। শুধু কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্যে কৃতিত্ব প্রদর্শন তিনি কখনো করতেন না, বরং রাগের ও রচনার মর্মবস্তুর ওপরই ছিল তাঁর বিশেষ মনোযোগ। উচ্চারণ সব সময় তাঁর শুদ্ধ ছিল না ; বিষ্ণু দিগম্বর বা নাসিরউদ্দিন বা ফৈয়াজ খাঁর মতো আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বও তাঁর ছিল না। কারণ তিনি ছিলেন নিতান্তই লাজুক প্রকৃতির মানুষ। অপরপক্ষে তাঁর প্রতিপক্ষ বিশ্বনাথ রাও-এর চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তাঁর গলা শ্রুতিমধুর ছিল না, প্রায়ই তিনি বেসুরো হতেন, নিজেকে জাহির করায় তাঁর একটা ঝোঁক ছিল। কিন্তু তবু নিজের রাজ্যে তাঁর একটা ঐশী অধিকার ছিল বলে মনে হতো। তাঁর কৃতিত্ব ছিল চমকপ্রদ, তাঁর লয়কারী বিস্ময়কর। পঞ্চমকে বর্জিত রেখে শুদ্ধ ধৈবত লাগিয়ে তাঁর বসন্ত রাগ পরিবেশন আর সেই সঙ্গে নগেন মুখুজ্যের পাখোয়াজ সংগতে অতি জটিল বোলের নকশা ফুটিয়ে তোলা—এ জিনিস আমার পক্ষে ভোলা কঠিন। সেটা ছিল চূড়ান্ত নাটকীয় আর উত্তেজক। যদিও গোঁসাইজী আর বিশ্বনাথ রাও-এর রীতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, তবু এক জায়গায় তাঁরা ছিলেন এক, উভয়েই ধ্রুপদের শ্রেষ্ঠ গুণী। বিশ্বনাথ রাও সম্ভবত ধ্রুপদের চেয়ে ধামারেই আরো সার্থক, কিন্তু তাঁর ধামার মথুরার চন্দন চৌবে বা আগ্রা ঘরানার ফৈয়াজ খাঁর ধরনের ছিল না। চন্দন চৌবের চাঁচর হোলি অসাধারণ। এই সব সেরা গুণীরাও আর নেই, আর তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছেন শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজ বাজিয়ের দল। তাঁদের শিষ্যরা যা গাইছেন তার ধরনটা অনেক হালকা। মুরারি গুপ্ত, কেশব মিত্র, দুর্লভ ভটচাজ্যি, নগেন মুখুজ্যে, তারকবাবু বা নাটোরের মহারাজ—এঁদের নাম আজকাল কেবল আগের প্রজন্মের স্মৃতি। ঠিক তেমনি টিকমগড়ের হরচরণ লাল আর কুদাও সিং। কেবল একজনই আছেন সত্যিকার গুণী পাখোয়াজি, পণ্ডিত সখা রাম, কিন্তু তিনিও একজন বড়ো বীণকার বা বড়ো ধ্রুপদিয়ার সঙ্গে আর সংগত করার সুযোগ পাচ্ছেন না।

এখন আমি বড়ো খেয়ালিয়াদের কথায় নেমে আসি। আমি বলছি "নেমে আসি", কেন না আমাদের পরিবারে খেয়ালকে মনে করা হতো জাতে এক ধাপ নিচে, ধ্রুপদের পরে ; ধ্রুপদই ছিল কণ্ঠসংগীতের সমাজে ব্রাহ্মণ। আমার বয়ঃকনিষ্ঠ পাঠকদের বলে দেওয়া উচিত যে খেয়ালে তাদের কান অভ্যস্ত, কিন্তু খেয়াল গানকে এই সেদিন পর্যন্তও ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের পরাকাষ্ঠা মনে করা হতো না। এ-কথার মধ্যে অসম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্য নেই। খেয়াল আজকাল ক্ল্যাসিক্যাল রীতির সমার্থক হয়ে উঠেছে, কিন্তু এটা হয়েছে আমার জীবনের শেষের দিকে। কলকাতাতেই আমার ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের হাতেখড়ি, কলকাতাই তখন ছিল ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের পীঠস্থান, এখানকার জলসায় খেয়ালিয়ারা সব সময়েই আসতেন ধ্রুপদিয়াদের পরে। তখন খেয়ালিয়াদের সংখ্যাও ছিল কম। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন লছমী মিশ্র। শিব এবং পশুপতি মিশ্র আসেন পরে। ধ্রুপদ আমরা শুনতাম প্রকাশ্যে, খেয়াল ও টপ্পা শুনতাম ঘরোয়া

◂ আকাশবাণী-র সৌজন্যে

আসরে। গহরজানকে অবশ্য শুনেছি। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তাঁকে মনে করতেন ভারতবর্ষে মেয়েদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ খেয়াল ও ঠুংরি গাইয়ে, কিন্তু একবার ছাড়া প্রত্যেক বারই তাঁর গান আমি শুনেছি গোপনে। অবশ্যই আমি তাঁকে খেয়ালের শ্রেষ্ঠ গুণীদের মধ্যে স্থান দেব। আমার স্পষ্ট মনে আছে একবারকার কথা; সে সময় তিনি আড়ানায় গাইলেন একটা ধ্রুপদ, তারপর গাইলেন একটা সারদা, তৃতীয়বার গাইলেন একটা খেয়াল। তারপর থেকে দেশের সেরা কোনো শিল্পীও যদি আড়ানায় গান করেন, আমার পক্ষে মনঃসংযোগ করা কঠিন হয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল বিশাল, তা থেকে যেন স্ফুলিঙ্গ ছড়াতো। তাঁর পর মেয়েদের মধ্যে আরও চমৎকার খেয়াল গাইয়ে এসেছেন, কিন্তু তাঁদের শ্রেষ্ঠ গুণী বললে সত্যের অপলাপ হবে। তাঁদের যথেষ্ট যোগ্যতা ছিল, জানাশোনাও ছিল প্রচুর, গায়নভঙ্গিও সুন্দর। কিন্তু গহরজান মাঝে মধ্যে খেয়ালের যে উচ্চ মান তৈরি করতেন, এঁরা সর্বদাই থাকতেন তা থেকে খানিকটা নিচুতে।

অতুলনীয় সেই দু-জন, গহরজান আর জোহরাবাঈ। জোহরাবাঈকে রেকর্ডের মারফৎ-ই প্রধানত জেনেছি। এঁরা ছাড়া আল্লাদিয়া খাঁ, কেরামৎ খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ আর আবদুল করিম খাঁ—এঁরাও ছিলেন খেয়ালে শ্রেষ্ঠ গুণীদের দলে। কালে খাঁ-কে শুনেছি দু-বার, সেটা তাঁর গানের সেরা নিদর্শন ছিল না। এঁদের প্রত্যেকেরই ছিল নিজ নিজ ক্ষেত্র, যেমন আল্লাদিয়া খাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল তানে, কেরামৎ খাঁ-র ছিল আস্থায়ীতে, ফৈয়াজ খাঁ-র ছিল বাঁটোয়ারায়, আবদুল করিম খাঁ-র ছিল বিস্তারে। অবশ্য প্রত্যেকেরই ছিল হিন্দুস্থানী সংগীতের গোটা এলাকার মধ্যে অবাধ গতি। ফৈয়াজ ধামার, ঠুংরি আর গজলেও সমান কৃতিত্ব দেখাতে পারতেন। আর আবদুল করিম খাঁর ঠুংরি—তার কথা কে না জানে? মোটের ওপর ওই সব মহারথীদের দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, নাট্যগুণান্বিত আর ধ্যানমুখী। ফৈয়াজ খাঁ আসরে এসে বসলেই শ্রোতাদের সঙ্গে তাঁর একটা বোঝাপড়া তৈরি হয়ে যেত। গোড়ার দিকে তিনি গানের ওপর যেন বাজপাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়তেন। পরের দিকে তিনি রাগের আবাহন করতেন আলাপের মারফৎ। তাঁর তানগুলিও চরিত্রে ও চলনে বদলে গিয়েছিল। আগে আগে তিনি দৈবাৎ একটা স্বরের ওপর দাঁড়াতেন, আগ্রা ঘরানার বিশিষ্ট খটকাকে নিয়ে দৈবাৎই তিনি তান বিস্তারের লোভ সংবরণ করতেন। কিন্তু আর একটু পরিণত বয়সে তিনি তানগুলোকে যথাযথ অবকাশ দিয়েই সাজিয়ে ধরতেন। আবদুল করিম খাঁ আমাদের আমন্ত্রণ জানাতেন সংগীতের পবিত্র মন্দিরে প্রবেশের জন্যে, সে মন্দিরে তিনিই প্রধান পুরোহিত। এক দিক থেকে দেখলে, তিনি ঠিক শাস্ত্রপন্থী গাইয়ে ছিলেন না। অনেক সময় তিনি একটা গান পুরোও গাইতেন না। তাঁর আস্থায়ী সব সময় রাগের গঠন মেনে চলত না, প্রায়ই তিনি অপ্রত্যাশিত সব স্বরবিন্যাস তৈরি করতেন। তাঁর গঠনশৈলীর ধারণাও কম পরিণত ছিল গোয়ালিয়ার বা পুনা ঘরানার তুলনায়, যাঁদের মধ্যে ধরা যায় রাজা ভাইয়া, শঙ্কর পণ্ডিত, রামকৃষ্ণ ভাজে, অথবা ভাস্কর রাও, বালাজি বোয়া বা একনাথ পণ্ডিতের বিভিন্ন শিষ্যের দল। কিন্তু আবদুল করিম খাঁ আসরে থাকলে কে কার পরোয়া করে! এই অশাস্ত্রীয় লোকটি ছিল একটি প্রতিভা। রহমৎ খাঁর কাছে যা শেখবার তিনি শিখে নিয়েছিলেন, খেয়ালের দিয়েছিলেন নবজন্ম। আজকালকার সর্বোৎকৃষ্ট খেয়াল শিল্পীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন তাঁর শিষ্য অথবা শিষ্যের শিষ্য। তিনি একটা নতুন স্টাইলের সৃষ্টি

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে মনে করতেন গহরজান ভারতবর্ষে মেয়েদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ঠুংরী ও খেয়াল গাইয়ে

করেছেন, ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে করেছেন নতুন শক্তি সঞ্চার।

এতক্ষণ আমি ইচ্ছে করেই প্রয়াত বিষ্ণু দিগম্বরের কথা উহ্য রেখেছি। তার কারণ, আমি যখন তাঁর গান শুনি তখন তিনি সংগীতের সীমানা পার হয়ে গেছেন। কিন্তু তিনি যে একজন মহা গুণী এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। একবার—বছর পঁচিশেক আগে হবে—বিষ্ণু দিগম্বরের গাওয়া ভজন শুনে শুনে ক্লান্ত হয়ে তাঁর গৃহস্বামীর কাছে ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলাম যদি তাঁর গলায় খেয়াল শুনতে পাই। গৃহস্বামী প্রয়াত ভূপেন ঘোষ আমাকে তাঁর বাড়িতে খুব সকালবেলায় আসতে আমন্ত্রণ জানালেন। পাঁচটা নাগাদ পৌঁছলাম; আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে বিষ্ণু দিগম্বরের কণ্ঠে শুনলাম ভৈরব, প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে। একে ঠিক গান বলে না, সাধারণ অর্থে এটা ঠিক গায়নক্রিয়াও নয়। হয়তো এ কোনো প্রার্থনা; কিন্তু এরই নাম সংগীত, সত্যি কথা বলতে বিশুদ্ধ সংগীত। তখনই ঠিকমতো বোঝা গেল কত বড়ো গুণী শিল্পী তিনি। স্বরের বর্ণাঢ্যতায়, লালিত্যে, গভীরতায় ও ব্যাপ্তিতে এর চেয়ে চমৎকার কণ্ঠ ভারতবর্ষে আর তৈরি হয়েছে বলে মনে করি না। তাঁর মনঃসংযোগ ছিল যোগীর মতো।

মাইক্রোফোন, রামধুন আর ফিলমি গান দেখা দেওয়ার আগের যুগে এঁরাই ছিলেন সেরা কণ্ঠশিল্পী। পাছে আমাকে কেউ ভুল বোঝে সেই জন্যে জীবিতদের কথা উল্লেখ করব না। কিন্তু এঁদের ভেতর অন্তত চার জন আছেন যাঁদের জন্যে আমি মাইলের পর মাইল হাঁটতে রাজি আছি। ওঁরা হলেন রজব আলি, মুস্তাক হুসেন, কেশর বাঈ ও রতনজনকার। গঠন পারিপাট্যের ধারণা তাঁদের নিখুঁত, স্থাপত্যগুণে সেরা স্থপতির মতো। বড়ে গুলাম আলির গান আমি শুনেছি প্রধানত রেকর্ড ও মাইক্রোফোন মারফৎ, কাজেই

তাঁর মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কোনো দৃঢ় মত নেই। তিনি হলেন এমন শিল্পী যাঁর কণ্ঠে পঞ্জাবের দুটি সাংগীতিক ধারা সুন্দরভাবে মিশে গেছে।

ওয়াজিদ আলি খাঁ স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন মেটিয়াবুরুজে। জায়গাটা কলকাতার খুব কাছেই। তবু আমাদের কালে প্রথম শ্রেণীর ঠুংরি গাইয়ের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। আলি বক্‌স্ তখন মারা গেছেন, তাছাড়া তিনি ছিলেন খেয়ালিয়া। তবে আমরা যখন কলেজের ছাত্র সে সময় ঠুংরির একটা গোটা ঘরানার ভিত তৈরি হয়ে উঠছিল হ্যারিসন রোডে একটা বাড়ির চারতলার একটা ঘরে। সেখানে গণপৎ রাও (ভাইয়া সাহেব) নিয়ে এলেন মৈজুদ্দিন খাঁকে। (আমার এক বন্ধু ডাঃ অমিয় সান্যাল, একটা উল্লেখযোগ্য বাংলা বই-এ এই ঘরানার গোড়ার দিকের কথা কিছু লিখে গেছেন)। মৈজুদ্দিন খাঁ ছিল এক অখ্যাত গায়ক। তার ঘরানা কী কেউ জানে না। লোকে কানাকানি করে যে তার কোনো তালিম ছিল না। সত্যি কথা বলতে কী, আমি নিশ্চিত জানি যে দুটো কাছাকাছি রাগকে সে আলাদা করে চিনতে পারত না। কিন্তু গণপৎ রাও ব' মির্জা সাহেবকে হার্মোনিয়ামে রেখে সে যখন ঠুংরি ধরত, অন্য কোনো কিছুরই দরকার হত না। শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদীয়া খেয়ালিয়ারাও তার গান মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতেন। আমার মতে, ভারতবর্ষে তার মতো ঠুংরি গাইয়ে আর জন্মায়নি। মৈজুদ্দিন যখন একটা সাধারণ ভৈরবী নিয়ে গান করত তখন আমি গহরজানের চোখেও জল দেখেছি, যদিও সে খুব একটা কাঁদুনে স্বভাবের ছিল না। তাছাড়া মালকা জান, শ্যামলাল ক্ষেত্রী, রাজাবাবু, গিরিজাবাবু, আরো অনেকের চোখে জল দেখেছি। অনেক দিন পরে একদিন সকালে ফৈয়াজ খাঁ দেড় ঘণ্টা ধরে গাইলেন, 'বাজু বন্দ খুল খুল যায়', দু হাজার শ্রোতাকে তিনি ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন। পদক আর পুরস্কার তাঁর কাছে যখন আসত তখন ধারাবর্ষণ হত। তবু ঐ একই গানের অভিব্যক্তি মৈজুদ্দিনের কণ্ঠে ছিল পেলবতায় ও প্রকাশভঙ্গিতে আরও উচ্চাঙ্গের আর সেই সঙ্গে ছিল তার চমক সৃষ্টির গুণ, যেটা ঠুংরির প্রাণ। মৈজুদ্দিন সম্পর্কে বলতে বা লিখতে গেলে সংযত বা কেতাবি ভাষা ব্যবহার করাই কঠিন হয়। এই প্রতিভাধরটির কোনো গুরু নেই, কোনো শিষ্যও সে রেখে যায়নি এক গিরিজাবাবুকে বাদ দিলে। ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়ে সে উল্কার মতো মিলিয়ে গেল। থেকে গেল শুধু কয়েকটা রেকর্ড, কিন্তু হায়! তাদের আর পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে না। এর পর অনেক প্রথম শ্রেণীর ঠুংরি গাইয়ের গান শুনেছি, কিন্তু কাউকেই আমি শ্রেষ্ঠ গুণী বলব না। এই বংশ গৌরবহীন অশিক্ষিত লোকটি এক দিক দিয়ে হিন্দুস্থানী সংগীতের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে গেল, সেই দিকটি হল ঠুংরি। সে-ই ঠুংরির মর্যাদা বাড়িয়েছে, তার কাঠামো রচনা করেছে, তাকে গৌরবমণ্ডিত করেছে।

এই প্রসঙ্গে একজন টপ্পা গাইয়ের নামও উল্লেখ করা অসঙ্গত হবে না যিনি ছিলেন একমাত্র শিল্পী যাঁকে মহাগুণী বলতে পারি। ইনি হলেন

আবদুল করিম খাঁ আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন সঙ্গীতের মন্দিরে

রমজান খাঁ, শোরি কা টপ্পায় ছিল তাঁর বিশেষত্ব। আমি যখন তাঁর গান শুনি তখন তিনি অতিবৃদ্ধ, তাছাড়া তখন তিনি নেশার খপ্পরে পড়েছেন। নিজেকে তিনি এমন অবস্থায় দাঁড় করিয়েছিলেন যে কেবলমাত্র মেজাজ হলে তবেই গাইতেন। কী করে তাঁকে উসকিয়ে দিতে হয় আমরা কয়েকজনই মাত্র জানতাম।

এখন শিল্পীদের কথায় আসি। আমার আক্ষেপ এই আমি রামপুরের গুণীশ্রেষ্ঠ উজীর খাঁ আর বীণা শেষাম্মার বাজনা শোনার সুযোগ গ্রহণ করিনি, যদিও সে সুযোগ অযাচিতভাবে আমার কাছে এসেছিল। তবে একটা ক্ষতিপূরণ

আল্লাদিয়া খাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল তানে

পেয়েছিলাম। ১৯১৪ সালে আমি এক মহান্ দক্ষিণী বীণাবাদিকার বাজনা শুনেছিলাম। (ইনি কি বীণা ধনম্, বালা সরস্বতীর ঠাকুরমা?) আমার বয়স তখন কম, কর্ণাটিকি সংগীত বোঝবার অবস্থায় ছিলাম না, কিন্তু এর একটা ছাপ আজও রয়ে গেছে। বৃদ্ধা মহিলার অঙ্গুলি সঞ্চালন ছিল একেবারে নিখুঁত; আর তাঁর মধ্যে এমন একটা সম্ভ্রান্ত মেজাজ লক্ষ করেছিলাম যেটা অন্যদের মধ্যে প্রায়ই দেখি না। তাঁর রাগের ঐশ্বর্যের কথা লোকের মুখে মুখে ফিরত। কিন্তু আমি তো আর বিচারক ছিলাম না! সংগমেশ্বর শাস্ত্রীর (পীঠাপুরম্) মধ্যেও প্রতিভার ছাপ ছিল, কিন্তু তাঁর সংগীতক্রিয়া অসমান ছিল। উত্তর ভারতের কয়েকজন মাত্র প্রথম শ্রেণীর বীণাবাদক, যাঁদের বাজনার কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, তাঁরা হলেন মুরাদ আলি খাঁ, সাদিক আলি খাঁ ও দবির খাঁ। এই শেষোক্ত দু-জন, সুখের বিষয়, আজও আমাদের মধ্যে বেঁচে আছেন এবং তাঁরাই রামপুরের সেনিয়া ঘরানার শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের প্রতিনিধি। গত কয়েক দশকে সরোদে বেশ কয়েকজনকে দেখা গেছে যাঁরা শ্রেষ্ঠ গুণী—একথা অবিসংবাদিত। রামপুরের ফিদা হোসেন, কলকাতার করামৎ হোসেন খাঁ, মাইহারের আলাউদ্দিন খাঁ ও গোয়ালিয়রের হাফিজ আলি খাঁ—এঁরা দুনিয়ার যে কোন অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ যন্ত্রশিল্পী হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্য। যন্ত্রটা সেই একই, কিন্তু প্রত্যেকেরই ছিল নিজস্ব স্টাইল। ফিদা হোসেন খাঁ ও করামাৎ হোসেন খাঁ তাঁদের ব্যক্তিত্ব দিয়ে শ্রোতাদের অভিভূত করে ফেলতেন, তারা তাঁদের সংগীতের কাছে সম্ভ্রমে মাথা নত করত। ইদানীং আলাউদ্দিন খাঁ সেই সব শিল্পীদের একজন হয়ে উঠেছেন যাঁদের শিল্পকর্ম অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে যুক্ত। আমার আজও মনে পড়ে একটা সন্ধ্যার কথা যখন রামপুরের বিরাট ওস্তাদ উজীর খাঁ-র কাছে কঠোর সাগরেদির কাল সমাপ্ত করার পর তিনি আমাদের সামনে আবির্ভূত হলেন। এ দেশে হিন্দুস্থানী সংগীতের প্রাচীন ধারায় সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু তিনি। (আর একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক রতনজনকার, কিন্তু তিনি শিক্ষা পদ্ধতির দিক দিয়ে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক)। আলাউদ্দিন খাঁর বাজনার মধ্যে এমন একটা বিনয়ের সুর আছে যেটা শ্রোতাদের মধ্যে অজ্ঞাতে সঞ্চারিত হয়ে যায়। কায়িকভাবে তিনি দরবারেরই লোক, দরবারি বাজিয়ে হতে তিনি অবশ্যই পারেন, কিন্তু আসলে তিনি এক নিভৃত শিল্পী যিনি শিল্পের পবিত্রতায় মগ্ন। অপরপক্ষে ফিদা হোসেন ও করামৎ হোসেন সম্পূর্ণভাবে দরবারি বাজিয়ে, তাঁদের গুণ রজোগুণ, আলাউদ্দিনের হল সত্ত্ব গুণ। এক বছর ডিসেম্বরের শেষ দিনটির কথা মনে পড়ে, আমরা একটু পুরনোর অনুধ্যান করতে চেয়েছিলাম। সেই রাতে হাফিজ আলি ও করমাৎ খাঁ দু-জনেই বাজিয়েছিলেন। দু-জনেই চমৎকার ফর্মে ছিলেন, কিন্তু ভোরের দিকে দুটোর সময় করমাৎ খাঁ একটা বিরল রাগ (কুসুম) বাজাতে শুরু করলেন, পরে জেনেছিলাম এটা তাঁর ঘরানার একটা বিশেষত্ব। শুনতে শুনতে সম্পূর্ণ চেতনা হারিয়ে ফেললাম।

জীবনে এ আমার একটা ঋদ্ধতম অভিজ্ঞতা। তিনি (এবং তাঁর ভাই প্রখ্যাত ব্যাঞ্জোবাদক ককুব খাঁ) সাধারণত বাজাতেন অতি দ্রুত লয়ে। গয়ার একচক্ষু তবলিয়া দর্শন সিং ছিলেন তাঁর প্রিয় সংগতিয়া। করমাৎ খাঁ অত্যন্ত দ্রুতলয়ে একটা ধুন বাজাচ্ছিলেন, দর্শন সিং তাঁর সঙ্গে সংগত করতে করতে তবলার ওপরই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন, আমি সেই নাটকীয় ও করুণ ঘটনার সাক্ষী। আমার কথা বলতে গেলে, করমাৎ খাঁর রচনা ও গৎ আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী, যদিও শুনেছি ফিদা হোসেনের রচনা ও গৎ ছিল আরও উন্নত। মা যেমন তার সন্তানকে নাচায় এই সব মহাগুণীরা তাঁদের যন্ত্রকে সেইভাবে ব্যবহার করতেন। ভারতবর্ষের মস্ত গৌরব যে আজও আমাদের মধ্যে কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর সরোদিয়া হাজির আছেন। তাঁরা বয়সে তরুণ, তাঁদের সম্ভাবনাও প্রচুর। আমাকে যদি ভবিষ্যদ্বাণী করতে অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে বলব, কয়েকটা শর্ত পূরণ হলে, আলাউদ্দিনের পুত্র আলি আকবর নিজের অধিকারেই একজন মহাগুণী হয়ে উঠবেন। আলাউদ্দিনের বহুমুখী প্রতিভার আর একটি প্রমাণ হল, তাঁর জামাতা রবিশঙ্করকে তিনি একজন চমৎকার সেতারিয়া করে গড়ে তুলেছেন। আলাউদ্দিনের নিজের মত হল, তাঁর কন্যার বাজনা জামাতার চেয়েও ভালো, কিন্তু সেটাই তো স্বাভাবিক।

সেতারিয়াদের মধ্যে আমি কেবল ইমদাদ খাঁ ও তাঁর পুত্র ইনায়েৎ খাঁকে মহত্তের কোঠায় ফেলব। ইমদাদ খাঁ তাঁর ছোট্ট সেতারে ঝড় তুলতেন। আমি সুর বাহারে আড়াই ঘণ্টা ধরে তাঁর পুরিয়া রাগে বাজনা শুনেছি, তার প্রতিটি টুকরো আমার কাছে মনে হয়েছিল নতুন। ইনায়েৎ খাঁ সম্ভবত আরও উজ্জ্বল। বেনারসের বীরু মিশ্র বা আবিদ হোসেনের সংগতের সঙ্গে (না কি বিপক্ষে ?) তাঁর বাজনার কথা কে ভুলতে পারবে ? ইনায়েৎ খাঁর তানের ব্যাপ্তি ছিল অফুরন্ত। তেহাই-এর মুখে তাঁর পুরো এক ডজন কায়দা আমি গুণে দেখেছি। তাঁর পুত্র বিলায়েৎ খাঁ ভারতের গৌরব। তার বাবা যখন মারা যান তখন তার বয়স ছিল অল্প, কিন্তু বাবা যা জানতেন সে তা প্রায় পুরোপুরি শিখে নিয়েছিল। রবিশঙ্করের মধ্যে আছে কল্পনার বিরাট সম্পদ। সাম্প্রতিককালের মধ্যে আমি যা শুনেছি তাতে তার স্বরগুচ্ছই সবচেয়ে স্পষ্ট, সবচেয়ে জীবন্ত। আলি আকবর খাঁ, বিলায়েত খাঁ আর রবিশঙ্কর এই তিন জন থাকতে ভারতবর্ষে আমাদের যন্ত্র সংগীতের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভয় পাবার কিছু নেই। তাঁরা সকলেই এক অর্থে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অনুরাগী, কিন্তু ভিতটা একেবারে সুদৃঢ়। তবু এই বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকবে যদি দু-জন গুণী সারেংগিয়ার কথা উল্লেখ না করি। এঁরা হলেন মম্মন খাঁ ও বুন্দু খাঁ। মম্মন খাঁ একটা বিশেষ ধরনের সারেংগি বাজাতেন। বুন্দু খাঁ এঁদের সবার সেরা। খেয়াল ও ঠুংরির জন্যে সবচেয়ে নিখুঁত যন্ত্র সারেংগি, আর বুন্দু খাঁ ছিলেন সবচেয়ে নিখুঁত সারেংগিয়া। তাঁর হাতে সমস্ত সেরা বন্দেশগুলিই

ফৈয়াজ খাঁ রাগের আবাহন করতেন আলাপের মারফৎ

জীবন্ত হয়ে উঠত। সারেংগিকে তিনি একটা স্বাধীন যন্ত্রে পরিণত করেন। খলিফা বদল খাঁও এককালে সেরা সারেংগিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁর পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি বাজানো ছেড়ে দেন। তাঁর দুটি রেকর্ডের কাহিনী সত্যিই করুণ।

আগেই আমি শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজিদের কথা উল্লেখ করেছি। তবলিয়াদের সম্পর্কে কিছু বলার যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু সংগতের এই গুণপনার অন্তরালে উঁকিঝুঁকি দেওয়ার আমি চেষ্টা করেছি, বুঝেছি যে তবলাবাদকের কাজ হলো সংগীতসাধকের সংগতকে অনুসরণ করা। এদিক থেকে দেখলে লখনৌ-এর আবিদ হোসেন ছিলেন আমি যাঁদের বাজনা শুনেছি তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণী। এঁকে আমরা বলতাম খলিফা। বিচক্ষণ বাজিয়ে অনেকেই আছেন, হয়তো কেউ কেউ এঁর চেয়েও বিচক্ষণ। কিন্তু নিছক দখলের কথা ভাবলে তাঁর মতো আর কেউ ছিলেন না। বীরু মিশ্র, কণ্ঠে মহারাজ, আনোখেলাল, হাবিব, কেরামৎ, হীরু গাঙ্গুলি—এমন অনেক তবলিয়াই আমাকে চমৎকৃত করেছে। কিন্তু তাঁদের শ্রেষ্ঠ গুণী বলা যাবে কি-না মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। রামপুরের আহমদজান থিরাকুয়াই একমাত্র জীবিত শিল্পী যিনি আমার গভীরতম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। তিনি হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি তাঁর ইন্দ্রজাল প্রভাবে তবলাকে একটা স্বাধীন ভূমিকায় টেনে তুলেছেন।

অবশেষে, কর্ণাটক সংগীতের অন্তত তিনজন শ্রেষ্ঠ গুণী আছেন যাঁদের আমি শিল্পীদের সর্বোচ্চ সারিতে বসাতে চাই। গভীর অনুতাপের বিষয় এই যে, আমি তাঁদের সম্পর্কে কিছু লিখতে পারছি না। কর্ণাটকি সংগীতের সঙ্গে আমার পরিচয় অতিশয় সীমাবদ্ধ, তাই নিজের মতামত প্রকাশ করতে চাই না। কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞের কথাও এখানে স্মরণ করলে ভালো হতো, যথা ভাতখণ্ডে, রতনজনকার ও ব্রজেন্দ্রকিশোর। হিন্দুস্থানী সংগীতের আরো কিছু কণ্ঠশিল্পী ও যন্ত্রশিল্পী আছেন যাঁদের কথা লেখা যেত, না লেখার জন্যে তাঁদের কাছে মার্জনা চাইছি। (বেহালাবাদক ও বাঁশিওয়ালাদের কথা আমি ইচ্ছে করেই উহ্য রেখেছি)। যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে এই খসড়া ইতিমধ্যেই দীর্ঘ হয়ে পড়েছে, কাজেই শুধু একটা ধারণা দেবার চেষ্টা হিসেবে কিছু মন্তব্য লিখেই আলোচনায় ছেদ টানছি। আমাদের জীবিত ওস্তাদদের সংগীতক্রিয়া ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোনো রাজকীয় মহিমা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তাঁদের পরিবেশনা আমি পছন্দ করি, তার প্রশংসাও করি। তাঁদের সংগীত আমাকে উত্তেজিত করে। কিন্তু মনের নিস্তব্ধ গভীরতায় তাকে লালন করা যায় না। বড়ে গুলাম আলি, হীরাবাঈ, মঙ্গুবাঈ, বিলায়েত হোসেন, গাঙ্গুবাঈ, লক্ষ্মীবাঈ, ওঙ্কারনাথ, দলীপ বেদি, পালুসকর, আমীর খাঁ, নিসার এবং আরো অনেকে আছেন মহারাষ্ট্রে, বোম্বাই-এ বেনারসে ও জলন্ধরে—এদের কাজকর্মে কে না চমৎকৃত ? নিছক কারুকৌশলের দিক থেকে পুনার কণ্ঠশিল্পীরা তো চরম। তাঁরা চমৎকার শিল্পীও বটেন, কিন্তু তাঁদের কি মহৎ গুণী বলা যাবে ? আমার নিজের কাছে মহত্বকে বিচারের কিছু মাপকাঠি আছে ; তাঁরা কি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ? আমি ঠিক জানি না। আমি নিশ্চিত যে আমার এই ধারণা একজন বয়োবৃদ্ধের বিগত সুদিনের প্রতি মমতাজনিত আকর্ষণমাত্র নয়। ভারতীয় সংগীতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি বিশ্বাস রাখি, আধুনিক শিল্পীদের সম্পর্কেও আমার আস্থা আছে। সেই সঙ্গে কিন্তু আমি পুনর্বার বলছি যে, তাঁদের গান-বাজনা শুনে আসার পর তাঁরা আর আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন না। কয়েকটা সংক্ষিপ্ত মুহূর্তের পর তাঁদের সংগীত আমাকে আর ভুলতে দেয় না যে আমি একজন অর্থনীতির অধ্যাপক। ■

ধূর্জটিপ্রসাদের পুরানো লেখার ফাইলের মধ্যে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ পাওয়া যায়। এটি ১৯৫৫ সালে অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত 'রেডিও সঙ্গীত সম্মেলনের' উদ্বোধন উপলক্ষে লেখা হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি তাঁর বহুশ্রুত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত। তবু যে সব কথা তিনি লিখেছেন সেগুলি স্মৃতিনির্ভর হলেও তখনও তাঁর স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়নি। সেদিনের অনেক উদীয়মান শিল্পীদের কথা তিনি এখানে বলেছেন, তবে সংক্ষেপে। কারণ তখনও তাঁরা বর্তমানের বড় ওস্তাদ হয়ে ওঠেননি।

ধূর্জটিপ্রসাদের কোনও কোনও মন্তব্যের সঙ্গে মতের গরমিল হতে পারে। এটা স্বাভাবিক। শিল্প ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতামত বা ধারণায় তারতম্য ঘটেই থাকে। তবু একজন প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞ ও সমজদারের অভিজ্ঞতা ও বক্তব্য আজকের রসগ্রাহী পাঠকদের কাছে কিছু মূল্যবান হতে পারে। এই ভেবে তাঁর ইংরেজি লেখাটির বাংলা অনুবাদ করে দিলাম।

অনুবাদক—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

যন্ত্রসঙ্গীতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

নীলাক্ষ গুপ্ত

আজকাল একবিংশ শতাব্দীর জন্য প্রস্তুতি আর আমাদের দেশকে এই যুগে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা রাজনৈতিক মহলে খুব শোনা বা পড়া যাচ্ছে। আসছে শতাব্দীতে আমাদের পুরনো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কি অবস্থায় থাকবে তা নিয়েও সরকারি মহল ভাবছেন।

এই ভাবনার এক ফল হল দিল্লীতে 'আপনা উৎসব' নামে অনুষ্ঠানটি। এর অংশ হিসাবে দুই বাগানে 'সঙ্গীতবাগ' আর 'নৃত্যবাগ' নামে দুটি কার্যক্রম হয়েছিল। এই কার্যক্রমে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী আর নৃত্যশিল্পী তিন দিন ধরে এই বাগানগুলিতে থাকলেন, গাইলেন, বাজালেন, নাচলেন, শিষ্যদের শেখালেন জনতার সামনে। তাঁরা জনতার সঙ্গে মিলে মিশে উচ্চাঙ্গ শিল্পকলা বোঝালেন আর জনতার প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার জবাব দিলেন। এর ফলে জনসাধারণের সঙ্গে উচ্চাঙ্গ শিল্পের ঘনিষ্টতা নিশ্চয় বাড়ল। আবার এক জায়গায় কয়েক দিন থেকে শিল্পীদের মধ্যে ভাব-চিন্তার আদান-প্রদানও নিশ্চয় বাড়ল।

আমার বর্তমান চিন্তা হচ্ছে এই যে উচ্চাঙ্গ যন্ত্রসঙ্গীতের অবস্থা ২১ শতাব্দীতে কি দাঁড়াবে। অর্থাৎ সরকারি বে-সরকারি চেষ্টায় জনসাধারণের উচ্চাঙ্গ যন্ত্রসঙ্গীত প্রীতি যদি বেড়ে যায় তা হলে পনের বছর পরে তাঁরা কাদের বাজনা শুনবেন?

এ প্রশ্নের মোকাবিলা করার আগে অবশ্য দেখতে হবে বর্তমানে যন্ত্রসঙ্গীতের অবস্থা কী। এও দেখতে হবে সে অবস্থা আগের অবস্থার তুলনায় কোন স্তরের। আবার এ অবস্থা কিভাবে হল আর কারা কারা কিভাবে সেই অবস্থা তৈরী করল তাও দেখতে হবে। অতীতের বিশ্লেষণ না করলে বর্তমানকে বোঝা যায় না। আবার বর্তমানকে বিশ্লেষণ করলেই ভবিষ্যৎকে জানার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই শুরু করছি অতীতকে দিয়েই। মোগল আমলে কণ্ঠসঙ্গীতই ছিল শ্রেষ্ঠ। বীনকার, রবাবী ইত্যাদি ছিলেন কিন্তু তাঁদের স্থান ছিল ধ্রুপদীয়াদের নিচে। খেয়ালের উৎপত্তির বিষয়ে যে কাহিনী আছে তাও তাই প্রমাণ করে। বীনকার ঘরানার অর্থাৎ তানসেনের কন্যার বংশের নিয়ামৎ খাঁ গায়কদের তুলনায় নিজেকে উপেক্ষিত মনে করে এরকম এক গায়ন রীতি সৃষ্টি করেন যা শেষ পর্যন্ত ধ্রুপদকে অস্তাচলে পাঠিয়ে দেয়। পরবর্তী যুগে খেয়ালীয়ারা যন্ত্রশিল্পীদের তুলনায় জনপ্রিয় বা আদরণীয় ছিলেন। যদিও রাজা-নবাবদের দরবারে ধ্রুপদী বা ধ্রুপদী যন্ত্রশিল্পীরা বেশি সম্মান পেয়ে থেকেছেন জায়গা বিশেষে। যেমন রামপুরে সব রকম শিল্পীই ছিলেন কিন্তু প্রধান ওস্তাদ সব সময় একজন বীনকার ছিলেন।

পরে আলাদিয়া খাঁ আর আরো পরে ফৈয়জ খাঁকে প্রধান সভাশিল্পী হিসাবে আমরা পাচ্ছি কোলাপুর ও বরোদায়।

এই সময় আমরা কোথাও কোন সেতার বা সরোদবাদককে প্রধান সভাবাদক হিসাবে পাচ্ছি

পণ্ডিত রবিশঙ্কর — *ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ* — *ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ* — *ছবি : অবিনাশ পাসরিচা*

ওস্তাদ বিসমিল্লা খাঁ *ছবি : অবিনাশ পাসরিচা*

না একমাত্র জয়পুর ছাড়া। জয়পুরে তানসেনের পুত্রবংশের এক অংশ সেতার বাদক হিসাবে বহু যুগ ধরে আধিপত্য করে এসেছেন। একমাত্র এই ক্ষেত্র ছাড়া সেতার কোন দরবারে তেমন একটা উঁচু স্থান পায়নি।

১৯২০-র পর আমরা হাফিজ আলীকে পাচ্ছি গোয়ালিয়রে, এনায়েৎ খাঁকে গৌরীপুরে আর আলাউদ্দীন খাঁকে মাইহারে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অবশ্য গোয়ালিয়র ছাড়া অন্য দরবারগুলির তেমন মান ছিল না ; রামপুর, বরোদা, ইন্দোর, জয়পুর ইত্যাদির মত বড় বড় সঙ্গীত-দরবার তখন ভেঙে গিয়েছে বা ভাঙার মুখে।

এই সময় সেতার-সরোদ রাজা নবাব জমিদারের দৃষ্টিভঙ্গিতে উচ্চাঙ্গের বাদ্য হিসাবে স্বীকৃতি পেলেও খেয়াল গায়কদের আধিপত্য চলতেই থাকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে। ফৈয়াজ খাঁর যুগে, ওঙ্কারনাথের যুগে বা এমনকি বড়ে গুলাম আলীর যুগেও খেয়াল গায়ক ছিল রাজা। হাফিজ আলীর সরোদ লোকে নিশ্চয় শুনতো। আলাউদ্দীন খাঁ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যখন অবশেষে এলেন তখন তাঁর বাজনাও লোকে শুনতো। কিন্তু জলসার প্রধান আকর্ষণ থাকতেন খেয়াল গায়করা।

পরে গুলাম আলীর যুগে আলী আকবর, বিলায়ৎ খাঁ, রবিশঙ্কর রীতিমত উৎকৃষ্ট বাজনা বাজিয়েছেন কিন্তু প্রধান আকর্ষণ তখনো বড়ে গুলাম।

বড়ে গুলামের প্রথম স্ট্রোকের পর থেকেই শুরু হল সেতার-সরোদের আধিপত্য। আর আজ সেতার-সরোদই আমাদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রধান বাদ্যযন্ত্র। খালি তাই নয়, ১৯৬০ সাল নাগাদ এই সেতার-সরোদ সঙ্গীত কণ্ঠসঙ্গীত অর্থাৎ খেয়ালের জনপ্রিয়তাকে ডিঙিয়ে বহু দূর চলে গেল। বড়েগুলামের শেষ পর্যায়ের উঠতি গায়ক ভীমসেন যোশী আর আমীর খাঁ উৎকৃষ্ট শিল্পী হলেও তাঁরা সর্বভারতীয় এবং পরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নাম, যশ বা দক্ষিণার দিক দিয়ে ঠিক রবিশঙ্কর, আলী আকবর বা বিলায়ৎ খাঁর প্রতিষ্ঠা পাননি।

এর কারণ একাধিক। বলা যেতে পারে আমীর খাঁর শৈলী একটু বেশি বিদগ্ধ হওয়ায় সাধারণ শ্রোতার কাছে তা একটু শুষ্ক ঠেকত। কিন্তু ভীমসেনের বিষয়ে ঠিক এক কথা বলা যায় না। আসল কথা, সেই সময় সেতার-সরোদ শৈলীতে একটা সামগ্রিক উন্নতির জোয়ার আসে যার গুণে তা তখনকার খেয়ালের চেয়ে অনেক ব্যাপক, বৈচিত্র্যপূর্ণ আর আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই ব্যাপক উন্নতিই আজকের সেতার-সরোদ বাদনের মান হয়ে দাঁড়িয়েছে আর সেই উন্নতি কি আর কিভাবে হল তার আলোচনাতে এবার যাচ্ছি।

আজকালের সেতার বাজের সঙ্গে প্রাচীন সেতার বাজের অনেক পার্থক্য। জয়পুরের সেনীরাই প্রাচীন সেতার বাজ সৃষ্টি করেন। এই বাজ অতি সরল ছিল। মধ্যলয় ত্রিতালে বাঁধা এই বাজে সরল রাগ বিস্তার, তান-তোড়া আর শেষে জোড় অঙ্গের কাজ হত। একে বলা হত পছাও বাজ বা মসীদখানি বাজ। এই বাজের স্রষ্টা সেতারী মসীদ খাঁ ছিলেন। সেই কারণেই এই নাম। গতের আগে আলাপ বাজত না বা পরে দ্রুত গৎ বাজত না। ঝালার কোন বালাই ছিল না কারণ জয়পুরীদের পাঁচ তারের সেতারে চিকারী তার ছিল না। পরে শিষ্য গুলাম রেজার জন্য মসীদ খাঁ তারানার ঢঙে দ্রুত ত্রিতাল গৎ-তোড়া সৃষ্টি করেন। রেজা যমুনার পূর্ব দিকে বসবাস করেন আর এই বাজের প্রচার করেন সেই জন্যে এই কায়দাকে 'পূর্বীবাজ' বা 'রেজাখানি বাজ' বলা হত। এই বাজ তারানার অনুকরণে হওয়ায় এর প্রধান নিবেদন ছিল বোলের কাজ আর বোল অঙ্গের তান তোড়া। এর শেষেও পূর্বোক্ত কারণে ঝালা বাজত না।

জয়পুরী সেনীরা কিন্তু দ্রুত গৎ বাজাতেন না। সাবেকি ওস্তাদরা শিষ্যদের 'খাস' জিনিস দিতেন না। সেই কারণেই হয়ত মসীদ খাঁ শিষ্যের গুণপনা দেখে তার জন্য এক বিশেষ বাজ বানিয়ে দেন। কিন্তু নিজের ঘরের লোককে তা শেখাননি বা নিজে বাজাননি।

তারপর সুরবাহার যন্ত্রের আর্বিভাব হল। বীনকার ঘরানার ওস্তাদ ওমরাও খাঁর এক সেতারী শিষ্য বীনের আলাপ শিখতে চাইলে ওস্তাদ তাকে বোঝান যে সেতারে এ জিনিস বাজান যাবে না। আবার বীণাও তিনি অনাত্মীয়কে শেখাতে পারবেন না। শিষ্যটির নাম ছিল গুলাম মহম্মদ। তিনি মন্দ্র খরজ-পঞ্চমের তার, চিকারি আর তরফ যুক্ত সেতারের এক বৃহৎ সংস্করণ তৈরী করলেন যাতে বীনের সব কাজ ভালভাবে বাজান যায়। এই যন্ত্রে তিনি ওমরাও খাঁর কাছ থেকে আলাপের তালিম পান। এই যন্ত্রই সুরবাহার নামে খ্যাত হয়।

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় *ছবি : অবিনাশ পাসরিচা*

এই ঘটনার পর সেতারেও চিকারী আর তরফ দেখা যায়। কে বা কারা সেতারের এই সংস্কার করেন সে বিষয় কিছু জানা যায় না। তবে যুক্তি বলে, হয় গুলাম মহম্মদ বা তাঁর ছেলে সাজ্জাদ মহম্মদ এই কাজটি করেন। কারণ তাঁরা সুরবাহারের মধ্যে দিয়ে চিকারী আর তরফের গুণের পরিচয় পেয়ে গিয়েছেন। আবার যুক্তি এও বলে যে সম্ভবত যে কারিগর সুরবাহার বানিয়েছিল সেই সেতারে চিকারী আর তরফ যোগ করেছিল কারণ কেবল সেই এই কাজ জানত। জয়পুরীরা কিন্তু পাঁচতারের সেতার বাজিয়ে চলেন সাবেকী ঢঙে। তাঁদের শেষ শিষ্যদের একজন—ওস্তাদ বরকৎউল্লা খাঁ—বিংশ শতাব্দীতেও পাঁচতারের সেতার বাজাতেন।

এই প্রাচীন ঢঙ অবলুপ্ত হল ইমদাদ খাঁর আবির্ভাবে। ইমদাদ খাঁ সেতার-সুরবাহার বাজে সেতারের মত হওয়ায় এতে এর আওয়াজ আর স্বাভাবিক স্ফূর্তি আরও খুলে গেল।

ইমদাদ আলাপ বাজাতেন সুরবাহারে আর তারপর গৎ বাজাতেন সেতারে। কাজেই তিনিই আজকের আলাপ, বিলম্বিত গৎ, দ্রুত গৎ, সিলসিলার প্রবর্তক সেতারের ক্ষেত্রে। সেতার শৈলী ইমদাদের হাতে অনেক বৃহৎ হল। চিকারির সদ্ব্যবহার করে তিনি ঝালার কাজ দ্রুত অংশে বহুল প্রয়োগ করলেন। ঝালার নানা কায়দা আর নানা রকমের ঝালাও তিনি সৃষ্টি করলেন। সেতার সুরবাহারে সুপরিকল্পিত ও নিয়মবদ্ধ ঝালা এক বিশেষ অঙ্গ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেল।

জয়পুরী গৎ-তোড়ায় গৎ আর বিস্তারঙ্গীয় তানই প্রধান বাদ্যবস্তু ছিল। ইমদাদ আলাপের দ্বাদশটি অঙ্গ পারম্পর্য (সিলসিলা) সহকারে গতে প্রয়োগ করেন। খেয়ালের সকল প্রকার তান, গেল। ইমদাদ পুত্র এনায়েৎ খাঁ পিতা-সৃষ্ট বাজ আরও সমৃদ্ধ করলেন নিজের প্রতিভায়। ঠুংরী অঙ্গও তিনিই আনলেন সেতার শৈলীর মধ্যে। কিন্তু সেতারে তিনি আওচার ও গৎই বাজাতেন—আলাপ বাজাতেন সুরবাহারে।

সরোদের ক্ষেত্রে আলাপ প্রথম পর্যায়েই এসে পড়েছিল। এর কারণ ছিল সরোদের আদি ওস্তাদদের প্রতি তানসেন পুত্র বংশের রবাবীদের আর কন্যা বংশের বীনকারদের আনুকূল্য।

সরোদ সৃষ্টি হয় যখন আফগানিস্তান থেকে আগত সামরিক পাঠানরা তাদের কাবুলি রবাবে লোহার পটরী, ধাতুর তার ও চিকারী সংযোগ করে। প্রধানত তিনটি পরিবার সরোদ বাদন তাদের পেশা হিসাবে বেছে নেয়। এই পরিবারগুলির আদি সরোদ বাদক ছিলেন গুলাম আলী, নিয়ামৎউল্লা ও এনায়েৎ আলী।

ওস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ
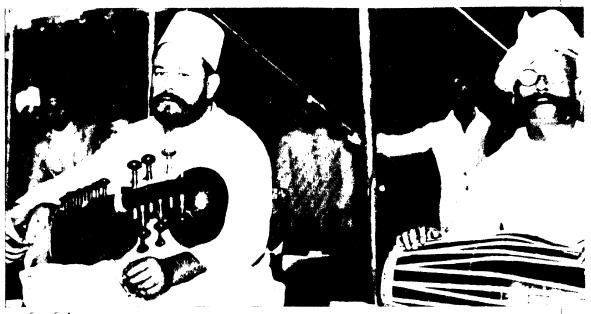
সামগ্রিক পরিবর্তন আনলেন। গুলাম-সাজ্জাদের সুরবাহার বীণার ঢঙ আর শৈলীতে বাজত। বীণার কায়দায় তিন আঙুলে তিনটি মিজরাব পরা হত (আজও মুস্তাক আলী খাঁ এই কায়দায় সুরবাহার বাজান)। বীণার মত তিন-চার পর্দার মীড় তাতে বাজত। দ্রুত, গমক, খেয়াল ঢঙের তান-তোড়া তাতে নিষিদ্ধ ছিল।

কিন্তু যন্ত্রটি এমনই যে এতে সাত পর্দার মীড় আরামে বাজান যায়। ইমদাদ খাঁ এই লম্বা মীড়গুলি আর আরও অনেক খেয়াল অঙ্গের সূক্ষ্ম কারুকার্য সুরবাহারে আমদানি করলেন। দ্রুত গমক, গমক তান, খেয়ালের ত্রিসপ্তকব্যাপী তান সবই তিনি নিয়ে এলেন এই যন্ত্রে। তিন আঙুল ও তিন মিজরাবের শৈলী দ্রুত স্বরপ্রগতির প্রতিকূল হওয়ায় তিনি সুরবাহারে সেতারের এক মিজরাব আর পুরো ডান হাতের খুলি-মুদি প্রণালী ব্যবহার করলেন। যন্ত্রটি আকৃতি ও গঠনে বীণার চেয়ে তবলা-পাখোয়াজের নানা রকম বোল, টুকরা আর তেহাই ইমদাদ সেতারের বিলম্বিত গতে প্রয়োগ করলেন। প্রধানত বোল অঙ্গের দ্রুত গতেও বোলতানের সঙ্গে সপট তান আর মিবখন্ডী তানের প্রয়োগ করলেন। সব মিলিয়ে সেতারের বাজ এমন একটা জিনিস হয়ে দাঁড়াল যে তাকে আর গৌণ যন্ত্র বলে উড়িয়ে দেওয়া গেল না। একমাত্র অবশিষ্ট কয়েকজন জয়পুরী আর তাঁদের সাগরেদ ছাড়া সব সেতারবাদকই ইমদাদখানি কায়দায় বাজাতে বা বাজানর চেষ্টা করলেন। তখনকার সঙ্গীতজ্ঞ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখে গিয়েছেন, "এমদাদ খাঁ নিজেই ঘর সৃষ্টি করে গিয়েছেন—এখন সারা ভারতে এমদাদী চালই চলছে' (সুর ও সঙ্গতি পৃঃ ৩৩)। এইভাবে সেতার বাদন শৈলীর প্রগতি হল একজন ওস্তাদের গুণে।

আলাপ কিন্তু সুরবাহার শৈলীরই অন্তর্ভুক্ত রয়ে

গুলাম আলীর পেশাদারি জীবন শুরু হয় রেবা দরবারে। সেখানে তিনি রবাবী ঘরানার জাফর খাঁ ও পেয়ার খাঁর তালিম পান। তারপর তিনি ফরাক্কাবাদ দরবারে যান। সেখানে পেয়ার খাঁও কিছুদিন ছিলেন। তারপর তিনি গোয়ালিয়রে বসবাস শুরু করেন আর এখানেই তাঁর ঘরানার পত্তন হয়। তাঁর ঘরানাকে তাই গোয়ালিয়র সরোদ ঘরানাও বলা হয়।

নিয়ামৎউল্লার সঙ্গীত জীবন শুরু হয় লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের দরবারে। সেখানে ছিলেন রবাবী ঘরানার বাসৎ খাঁ ও জাফর খাঁ (সুরশৃঙ্গার যন্ত্রের আবিষ্কারক)। সেখানে তিনি তাঁদের তালিম না পেলেও তাঁদের বাজনা শুনে লাভবান হয়েছিলেন। বাসৎ খাঁর তালিম তিনি পেয়েছিলেন মেটিয়াবুরুজে। সেখানে ওয়াজেদ আলী শাহ নির্বাসিত হলে তাঁর সঙ্গীতকারেরাও তাঁর সঙ্গে চলে আসেন। এখানে জাফর খাঁর

পৌত্র কাসিম আলীর তালিমও পান নিয়ামৎউল্লা।

এনায়েৎ আলীর পিতা হুসেন আলী কাবুলি রবাব বাজালেও নাকি রবাবী সুরশৃঙ্গার বাদক পেয়ার খাঁর কিছু তালিম পান।

এনায়েৎ আলী প্রথমে পিতার তালিম পান। তারপর রবাবী ঘরানার কাসিম আলীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় আর তাঁর তালিমও তিনি পান। তিনি কাসিমের অনুরোধে ভাওয়াল রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সভায় যোগ দেন। সেখানেই তিনি শেষ জীবন কাটান। রাজার উদযোগে তিনি ইংল্যাণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়ার হীরক উৎসবের অনুষ্ঠানে বাজান।

নিয়ামৎউল্লার ঘরানাকে নিয়ামৎউল্লা সরোদ ঘরানা বলা হয়। গুলাম আলীর ঘরানাকে গুলাম আলী সরোদ ঘরানা বা গোয়ালিয়র সরোদ ঘরানা বলা হয়। এ ঘরানার বর্তমান ধারক-বাহক হাফিজ আলীর পুত্র আমজাদ আলী খাঁ। এনায়েৎ আলীর ঘরানাকে শাজাহানপুর ঘরানা বলা হয়।

গোলাম আলীর বাদন শৈলীর বিষয় এই টুকুই জানা যায় যে তিনি নাকি প্রধানত গৎ-তোড়া বাদক ছিলেন। তাঁর প্রথম পুত্র হুসেন খাঁ সুরবাহার বাদক আর বীনকার ঘরানার তালিমপ্রাপ্ত গুলাম মহম্মদের তালিম পান। তিনি আলাপ বাদনে দক্ষ ছিলেন আর সুরচয়ন নামে এক যন্ত্রও বাজাতেন। এই যন্ত্র সরোদের মত দেখতে ছিল কিন্তু চামড়ার খোলের জায়গায় এটির সেতারের মত কাঠের তবলি ছিল আর সুরবাহারের মত পেতলের ঘাট ছিল।

দ্বিতীয় পুত্র মুরাদ আলী প্রথমে গুলাম মহম্মদ আর পরে বীনকার আমীর খাঁর তালিম পান। এঁর আলাপেরও বিশেষ নাম ছিল। তৃতীয় পুত্র নান্নে খাঁ পিতার তালিমেই নাকি তৈরী হয়েছিলেন।

হুসেন খাঁর পুত্র আসগর আলী পিতার তালিম ছাড়া বীনকার রহিম খাঁর তালিম পান। তিনি দ্বারভাঙ্গায় বহু কাল ছিলেন। তাঁর অসাধারণ মসৃণ সুরেলা হাতে সরোদ নাকি বাঁশীর মত শোনাত।

মুরাদ আলী নিঃসন্তান হওয়ায় আবদুল্লা খাঁকে পোষ্যপুত্র নেন। এই আবদুল্লা খাঁর পুত্রই ছিলেন মহম্মদ আমীর খাঁ যিনি বাংলা দেশে বহু শিষ্য তৈরী করে এখানে সরোদবাদনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। রাধিকামোহন মৈত্র, তিমিরবরণ ইত্যাদি এঁর কাছেই সরোদ বাজাতে শেখেন।

নান্নে খাঁর পুত্র হাফিজ আলী তাঁর পিতা মুরাদ আলী ও আসগর আলীর কাছে তালিম পান। তার পর বৃন্দাবনের ধ্রুপদী চুখালাল ও গণেশীলাল চৌবে ও বীনকার ঘরানার ওয়াজীর খাঁর কাছে তালিম পান। সুরশৃঙ্গার রবাবের ঢঙের আলাপ, তার পরণ (যা তিনি পাখাওয়াজের সঙ্গে বাজাতেন) আর উচ্চাঙ্গের আওচার, গৎ-তোড়া, তানকারী আর দ্রুত ঝালার জন্য তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশকের শ্রেষ্ঠ সরোদ বাদক হয়েছিলেন।

নিয়ামৎউল্লার দুই পুত্র প্রধানত তাঁর তালিমেই কৃতী সরোদ বাদক হন। এঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ

ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ

আসাদউল্লা কৌকব, কলকাতার কৌকব খাঁ বা কুকুব খাঁ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি সুরবাহারী সাজ্জাদ মহম্মদের তালিমও পেয়েছিলেন পিতার সঙ্গে মেটিয়াবুরুজে থাকার সময়। তিনি জীবনের শেষ আট বছর কলকাতায় ছিলেন আর বহু বাঙালীকে তালিম দিয়েছিলেন।

নিয়ামৎউল্লার প্রথম পুত্র কেরামৎউল্লাও গুণী সরোদী ছিলেন। ইনিও কৌকবের মৃত্যুর পর কলকাতায় বাস করেন জীবনের শেষ পনের বছরের বেশির ভাগ। কেরামৎ-পুত্র ইস্তিয়াক পিতার তালিম বিশেষ না পাওয়ায় কৌকব ও কেরামতের শিষ্য কালিদাস পালের তালিমে সরোদী হন। তিনি দিল্লি বেতারকেন্দ্রে নিযুক্ত ছিলেন।

কৌকবের প্রধান শিষ্য ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ বসু। ইনি, স্বর্গীয় রাধিকামোহন মৈত্রের মতে ঝাঁপতাল, ধামার ইত্যাদি তালে গৎ-তোড়া বাজাতেন যা তখনকার দিনের সরোদবাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ শোনা যেত না। এর থেকে কৌকব-কেরামতের শৈলীর খানিক আভাস পাওয়া যায়।

ধীরেন্দ্রনাথের শিষ্য শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়ের বাজনা থেকেও এই বাজের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। কৌকবের তিনখানা রেকর্ড নাকি আছে বা ছিল যাতে তিনি ব্যাঞ্জো যন্ত্রে গৎ-তোড়া বাজিয়েছেন।

মুস্তাক আলি খাঁ — আকাশবাণী-র সৌজন্যে

শাজাহানপুর ঘরানা শেষ পর্যায়ে নিয়ামৎউল্লা ঘরানার মধ্যে মিশে যায়। এনায়েৎ আলীর পুত্র সফায়েৎ খাঁ তাঁর তালিমেই দক্ষ সরোদী হন। নিয়ামৎউল্লার কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হওয়ায় দুই ঘরানার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন হয় যদিও তিনি শ্বশুরের তালিম একেবারেই পাননি বা নেননি। সফায়েৎ পুত্র সাখাওয়াৎ পিতার তালিমের পর নিয়ামৎ পুত্র কৌকবের তালিম পাওয়ায় এই দুই ঘরানা শেষে এক হয়ে যায়।

নিয়ামতের পর কিন্তু সব চেয়ে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন তাঁর ভ্রাতা হুসেন আলীর পুত্র ফিদা হুসেন। ইনি রামপুরে ছিলেন আর বীনকার আমীর খাঁর তালিম পেয়েছিলেন। সুরশৃঙ্গার অঙ্গের আলাপ-জোড় এবং সাবেকী গৎ-তোড়া দুইয়েতেই নাকি ইনি অতি দক্ষ ছিলেন। তাঁর হাতও নাকি ছিল অতি সুরেলা ও মিষ্টি।

অবশ্য সাখাওয়াৎ খাঁও যথেষ্ট প্রসিদ্ধ ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি লক্ষ্ণৌ মারিস কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

কৌকভ পুত্র ওয়ালিউল্লা সেতারী ছিলেন। তাঁর পুত্র নুরউল্লা খাঁর কার্যকলাপের বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না তবে তাঁর দুই সরোদী পুত্র বর্তমান। এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মুক্তিয়ার আহমদ দিল্লীর সঙ্গীত কলা কেন্দ্রে নিযুক্ত আছেন। তাঁর বয়স পঞ্চাশ বছর। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম গুলাম আহমদ। সখাওয়াৎ খাঁর দুই পুত্র প্রবীণ সরোদীয়া ওমর খাঁ (৮৪) আর সেতারী ইলিয়াস খাঁ।

সরোদ বাদনের ক্ষেত্রে দুজন গুণীর বড় ভূমিকা ছিল যাঁরা এই তিন ঘরানার অন্তর্ভুক্ত নন। প্রথম জন ছিলেন আহমেদ আলী। এঁর পিতা আবিদ আলী খাঁ রামপুরে সুরশৃঙ্গার বাদক বাহাদুর হুসেনের কাছে তারানা ঢঙের সরোদ বাদন শিখেছিলেন। বাহাদুর হুসেন রবাবী জফর খাঁ, পেয়ার খাঁ ও বাসৎ খাঁর ভাগিনেয় ছিলেন আর প্রথম দুই গুণীর তালিমে অসাধারণ শিল্পী হয়েছিলেন। কথিত আছে রামপুরে তাঁর সুরশৃঙ্গারের আলাপের পর বীনকার আমীর খাঁ বীণা ধরতে চাইতেন না—ধ্রুপদ গাইতেন।

এই আহমেদ আলী মুক্তাগাছার জমিদারের সভাবাদক ছিলেন আর তাঁদের দমদমের বাড়িতে থাকতেন। ইনিও সরোদে তারানা ঢঙের বাজনা বাজাতেন। বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখে গিয়েছেন যে আহমেদ আলী যখন তারানা বাজাতেন শ্রোতাদের মনে হত যেন তিনি উৎকৃষ্ট কণ্ঠসঙ্গীত গাইছেন।

দ্বিতীয়জন এঁরই শিষ্য আলাউদ্দিন খাঁ। ইনি পিতা সাদু খাঁর কাছে কিছু দিন সেতার শিখেছিলেন। পরে গোপাল চক্রবর্তীর কাছে কণ্ঠসঙ্গীত, হাবু দত্তের কাছে ক্ল্যারিওনেট আর জনৈক লোবো সাহেবের কাছে বেহালা শেখার পর আহমেদ আলীর কাছেই প্রথম সরোদ ধরেন। আলাউদ্দীন খাঁর জীবনের বিষয় এ রাজ্যের সবাইর যথেষ্ট জানা আছে মনে করে তাঁর তালিমের খুঁটিনাটির মধ্যে আর গেলাম না। এইটুকু খালি বলে রাখতে চাই যে তিনি আহমেদ আলীর কাছে প্রায় কিছুই পাননি। যখন আহমেদ আলী বাড়ির বাইরে যেতেন তখন আলাউদ্দীন খাঁ

ওস্তাদের সরোদটি নিয়ে ওস্তাদের কাছে শোনা বাজনা বাজাতে চেষ্টা করতেন। আগে এ যন্ত্রে তালিম না থাকায় তাঁকে হস্তপ্রণালীর উন্নত দিকটি নিজের চেষ্টাতেই তৈরী করে নিতে হয়েছিল। আহমেদ আলী তাঁকে প্রাথমিক হস্তসাধন প্রণালীর বেশি কিছু দিয়েছিলেন বলে জানা যায় না।

এর থেকেই বোঝা যায় আলাউদ্দীনের জন্মগত প্রতিভা বা মেধা কি মানের ছিল। তিনি রামপুরে ওয়াজীর খাঁর কাছে প্রথমে আলাপ, রাগবিদ্যা ইত্যাদির তালিম পান। ওস্তাদের জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর পর যে 'খাস' তালিম ওয়াজীর খাঁ আলাউদ্দীন খাঁকে মাইহার থেকে ডেকে এনে দেন তা ছিল সুরশৃঙ্গারে রাগ-আলাপ, তারপরণ ও ধ্রুপদ। কাজেই তাঁর সরোদের বাজ তাঁকে প্রায় নিজের মেধা ও শ্রুতি-স্মৃতি থেকে তৈরী করে নিতে হয়েছিল। এই জন্য তাঁর সঙ্গীতের এক নিজস্ব এবং স্বকীয় চরিত্র রয়েছিল।

এই কাজের বিষয়ে কিছু আলোচনার প্রয়োজন কারণ বর্তমানের অন্যতম প্রধান সেতার-সরোদ বাদকেরা এই বাজের ভিত্তিতে তাদের শৈলী তৈরী করেছেন। এমন কি যাঁরা আলাউদ্দীন খাঁর কাছে শেখেননি বা অন্য নাম-করা ঘরানার ধারক বা শিষ্য তাঁদের উপরেও আলাউদ্দীন খাঁ আর তাঁর দুই প্রধান শিষ্য—পুত্র আলী আকবর ও জামাতা রবিশঙ্করের—প্রভাব প্রবল।

প্রথমে সরোদ বাজের কথাই ধরা যাক। সেতারে যেমন মসীদখানী গৎ ছিল, তেমন সরোদেও মধ্য বিলম্বিত ত্রিতাল গৎ ছিল। গুলাম আলী ঘরানার মহম্মদ আমীর খাঁ রাধিকামোহন মৈত্রকে সেই গৎকারী শিখিয়েছিলেন। রাধিকামোহন অতি বড় সহকারে সেই বাজের শুদ্ধতা রক্ষা করে গিয়েছিলেন। তাঁর বিলম্বিত গৎকারীকে প্রামাণ্য ধরলে দেখা যায় যে গুলাম আলী বা গোয়ালিয়র ঘরানার বিলম্বিত গৎকারী মসীদখানী গৎকারীর চেয়ে জটিল হলেও [illegible] সরল বোলের মাধ্যমে রাগ বিস্তার [illegible] তান তোড়াই পরিবেশন করত।

আবার প্রাচীন তিন ঘরানার সরোদবাদকেরা প্রধানত আলাপ ও দ্রুত বা মধ্যলয় ত্রিতাল গৎই বাজাতেন। যেমন হাফিজ আলী খাঁ, ১৯৩০-১৯৫০ পর্বের প্রধান ও সর্বপরিচিত সরোদীয়া, আলাপ ও তারপরণ বাজাতেন সুরশৃঙ্গার-রবাব ঢঙে আর পরে সাধারণত মধ্যলয় বা দ্রুত ত্রিতাল গৎই বাজাতেন। এই সময় প্রথম অংশের প্রধান আর এক সরোদীয়া আহমেদ আলী দ্রুত গৎই বাজাতেন কারণ তিনি তারানা ঢঙের বাদক ছিলেন এবং তারানা বিলম্বিত লয়ে সাধারণত হয় না। কাজেই বিলম্বিত গৎ প্রাচীন সরোদ ঢঙের অন্তর্ভুক্ত হলেও বিংশ শতাব্দীর প্রধান সরোদ বাদকেরা তার উপর বিশেষ জোর দিতেন না।

আলাউদ্দীনের হাত হাফিজ আলী খাঁর মত মিষ্টি ছিল না। তাঁর টিপও (অন্তত তাঁর রেকর্ড ও টেপ শুনে যতটুকু বোঝা যায়) তেমন ছিল না। তিনি জীবনের অর্ধেক শিক্ষায় এবং বাকি অর্ধেকের বৃহত্তম অংশ শিক্ষাদানে সঁপে দেওয়ায় তাঁর নাম-যশও হাফিজ আলীর মত হয়নি।

ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ *ছবি : সুধীর চ্যাটার্জী*

রায়চৌধুরী মহাশয়কে বলেছিলেন—"দাদা এত শিখেছেন যে তিনি সঙ্গীতের জ্ঞানসমুদ্র হয়ে গিয়েছেন। তিনি সঙ্গীতের জন্য যে অসম্ভব কষ্ট সয়েছেন আর ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাও সাধারণ বোধশক্তির ঊর্ধ্বে। অনেক অন্তর্দৃষ্টি লাগে ওঁর সিদ্ধি, ওঁর মন ওঁর মেধা বুঝতে।"

ঐ আলাউদ্দীন খাঁ-ই সেতার-সরোদ বাদনের বর্তমান কাঠামো ও সিলসিলা তৈরী করে দিয়ে গিয়েছেন। প্রথমে আলাপ, জোড় ও ঝালা, তারপর বিলম্বিত ত্রিতাল গৎ, তারপর বিলম্বিত গতের মধ্যলয় অংশে লড়ির কাজ ও সাথ-সঙ্গত এবং শেষে দ্রুত গৎ, তান-তোড়া ও ঝালা।

আবার সরোদের ক্ষেত্রে তাঁরই হাতে বিলম্বিত গতে জটিল রাগবিস্তার, উন্নত মানের নিয়মবদ্ধ ছন্দের কাজ ও লয়কারী এবং শেষ অংশে

ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ *ছবি সুধীর চ্যাটার্জী*

বেশির ভাগ উত্তর জীবন মাইহারে কাটিয়ে তিনি যখন পুত্র আলী আকবর বা জামাতা রবিশঙ্করকে নিয়ে কনফারেন্সে বসাতে আরম্ভ করলেন তখন লোকের খেয়াল হল তিনি কত বড় শিল্পী। কিন্তু তখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন হাতও তেমন ভাল চলে না সব সময়। নিজের বিষয়েও তাঁর এরকম এক ধারণা ছিল যা পৃথিবীর কোন শিল্পীরই পোষণ করার মত মনুষ্যত্ব বা [illegible] ছিল না বা নেই। তিনি বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়কে বলেছিলেন—"আমি তো সঙ্গীতের কুলি। আমার হাত দুটি চাকর। ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ হচ্ছে শিল্পী। তাঁর হাত দিয়ে পৃথিবীর নব সুর বের হয়। তাঁর সঙ্গীত আমাকে কাঁদায়। তিনি ভগবানের প্রচুর আশীর্বাদ পেয়েছেন।" হাফিজ আলী কিন্তু তা মনে করতেন না। তিনি

সাথ-সঙ্গত, লড়ি ও তারপরণ ঢঙের [illegible] সুপরিকল্পিত কাঠামোর মধ্যে উৎপন্ন হল। [illegible] সুরবাহার সেতারের ক্ষেত্রে ইমদাদ খাঁ যা করেছিলেন, আলাউদ্দীন সরোদের ক্ষেত্রে তাই করলেন বৈদগ্ধ্য আর জটিল, উচ্চমানের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।

আবার আমরা দেখেছি সেতার বাদক ইমদাদ খাঁর হাতে অনেক এগিয়ে গিয়েও আলাপের ব্যাপারে আটকে গণ্ডির মধ্যে রয়ে গিয়েছিল। আলাউদ্দীন খাঁ রবিশঙ্করকে কন্যা অন্নপূর্ণার সঙ্গে সুরবাহারে তালিম দিলেন আবার সেতারেও আলাপ বাজাতে উৎসাহ দিলেন। ফলে রবিশঙ্করকে এমন এক সেতারের পরিকল্পনা করতে হল যাতে আলাপের সময় সুরবাহার-বীনের মত খাদের কাজ করা যাবে

আলাউদ্দিন সঙ্গীত সমাজ আয়োজিত যন্ত্র সঙ্গীতানুষ্ঠানে চতুরলাল, রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ এবং আলি আকবর খাঁ

আবার গৎ অংশে দ্রুত তান-তোড়া ইত্যাদি সব করা যাবে। তবে সেতারে আলাপ আর গৎ-তোড়া রবিশঙ্করের আগে কেউ বাজায়নি এও ঠিক নয়। অর্থাৎ এ নিয়ে আলাউদ্দীন খাঁ বা রবিশঙ্কর ছাড়াও অন্তত দুজন চিন্তা করেছিলেন। তথ্যটি রবিশঙ্করের 'রাগ অনুরাগ' গ্রন্থেই পাওয়া যায়। এতে তিনি জানিয়েছেন যে দ্বারভাঙার রামেশ্বর পাঠক (সেতারী বলরাম পাঠকের জ্যাঠা) আর ইউসুফ আলী খাঁ (এঁর ঘরানা বা পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত) নিচু স্কেলের বৃহৎ সেতারে আলাপ, জোড়, বিলম্বিত গৎ ও দ্রুত গৎ বাজাতেন। রামেশ্বরের উত্তরসূরী বলরামের বাজনা শুনে বোঝা যায় যে সেই বাজ সম্ভবত অনেক সংকীর্ণ ও সরল ধরনের ছিল। ইউসুফ আলীর বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়। রবিশঙ্কর শুনেছেন—উনিই ভাল বলতে পারবেন।

যা হক নিজের জন্য উপযুক্ত সেতার নির্মাণের ক্ষেত্রে এই পূর্বসূরীদের সেতার নিশ্চয় রবিশঙ্কর ও তাঁর কারিগরকে সাহায্য করেছিল। C Major স্কেলের নিচে বাঁধলে সেতারের আওয়াজ ভাল খোলে না—জয়পুরীদের সেতার সম্ভবত আরও উঁচু স্কেলের ছিল আয়তন ও দৈর্ঘে ছোট হওয়ার দরুন। কাজেই কারিগরকে এমনি সেতার বানাতে হল যা C Major-এ বাজবে, যাতে একটি মন্দ্র পঞ্চম ও একটি মন্দ্র ষড়জের তার থাকবে আর জোয়ারি এমন হবে যে তার এত আঁট হবে না যে লম্বা মীড়-গমক বাজাতে অসুবিধা হয়। জয়পুরীদের বাজে মীড় ও গমকের অভাব বা বর্জন এই কারণেই ছিল যে তাঁদের সেতার উঁচু পর্দার আর সে কারণে অতি আঁট তারযুক্ত ছিল। তাই তাঁদের বাজ সেনী হওয়া সত্ত্বেও আলাপবিহীন ছিল।

রবিশঙ্কর ঢঙের যন্ত্রটি এখনকার দুই প্রধান কায়দার সেতারের একটি এবং সম্ভবত এটিই আজ প্রামাণ্য মডেল।

এই সেতারে দুটি মোটা খাদের তারের জায়গা করার জন্য সাবেকি সেতারের একটি জুড়ির তার ও একটি চিকারির তার বাদ পড়েছে। তান-তোড়া, ঝালা ইত্যাদি বাজানোর সময় খাদের তারে মেজরাব লেগে এগুলি বেজে ওঠে আর এই জন্য ভারি ঝংকার উঠে মূল কাজ ডুবিয়ে দিতে পারে। এই অসুবিধা অতিক্রম করার জন্য সেতারের দণ্ডে খাদের তারগুলি আঁকশিতে আটকে দেওয়া হয়। রবিশঙ্কর আবার এই তারগুলিতে আঁকশিতে লাগানোর পর গান্ধার-পঞ্চম অথবা এই ধরনের দুই স্বরে বেঁধে দিয়ে থাকেন আর বিশেষ অংশে কর্ডের ভাব আনার জন্য ব্যবহার করেন।

এইভাবে, দেখা যাচ্ছে, আলাউদ্দীন খাঁ ও তাঁর উত্তরসূরীদের হাতে সেতার ও সরোদ এমন দুই যন্ত্রে পরিণত হল যাতে তন্ত্রকারীর সব শৈলী,

রাধিকামোহন মৈত্র আকাশবাণী-র সৌজন্যে

বীন-রবাব সুরশৃঙ্গার সুরবাহারের আলাপ তারপরণ থেকে আরম্ভ করে উচ্চাঙ্গের বিলম্বিত গৎ, দ্রুত গৎ, তান-তোড়া, সাথ-সঙ্গত, ঝালা সবই বাজে। নিজে তালবাদ্য বিশারদ হওয়ায় তবলা-পাখাওয়াজের ছন্দ, বোল, পরণ, গৎ, টুকরা, তেহাই, চক্রদার তেহাই, উপজ সবই অতি সুসমৃদ্ধভাবে তাঁর বাজের অন্তর্ভুক্ত করলেন আলাউদ্দীন।

আওয়াজের দিক থেকে আদি যন্ত্রগুলির চেয়ে অনেক সুখশ্রাব্য ও জোরদার হওয়ায় আর সেগুলির তুলনায় অনেক সহজবাদ্য হওয়ায়, সেতার-সরোদই উত্তর ভারতের প্রধান উচ্চাঙ্গ তন্ত্রযন্ত্র হয়ে দাঁড়াল। আর যখন তাতে আদি যন্ত্রগুলির সব কাজ, সব অঙ্গই বাজান যায় তখন সেটা হওয়াই স্বাভাবিক।

সেতার-সরোদ এ যুগের প্রধান বাদ্যযন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রধানত তিন শিল্পীর কলাকৌশলে—রবিশঙ্কর, আলী আকবর ও বিলায়েৎ খাঁ। বিলায়েৎ খাঁ আর রবিশঙ্করের দুই ঢঙের সেতার বেশির ভাগ শিল্পী ও শিক্ষার্থীরা বাজান। তাঁদের শৈলীই আজ দুই প্রধান সেতার বাদন শৈলী।

রবিশঙ্করের সেতারযন্ত্র সংস্কারের কথা আগে বলেছি, এখন বিলায়েৎ খাঁর সেতারের কথা বলি। বিলায়েৎ খাঁ-র সেতার C Sharp স্কেলের। এতে খাদের মোটা তার একেবারে নেই। জুড়ির তার কিন্তু একটিই এবং সেটা ও নায়কী অথবা প্রধান তারের মধ্যে বেশ খানিকটা ফাঁক—যাতে দ্রুত তানকারীর সময় জুড়ি বেশি না বাজে। দ্বিতীয় জুড়ি বর্জনের কারণও সেটাই। দুই চিকারীর আগে লাগান হয়েছে একটির জায়গায় দুটি উদারার পঞ্চমের তার—যার একটি বিলায়েৎ খাঁ উদারার গান্ধারে বাঁধেন।

কার্যত এই সেতারে সুরসৃষ্টি করার অথবা

পণ্ডিত কিষেণ মহারাজ এবং ওস্তাদ আমজাদ আলি খাঁ

ছবি : সুধীর চ্যাটার্জী

আঙুল দিয়ে বাজানর তার দুটি, জয়পুরীদের মতই। ইমদাদ এনায়েৎ যে সেতার বাজাতেন তাতে একটি খাদের পঞ্চম তারও থাকত যদিও তাঁদের রেকর্ডগুলিতে তাঁরা এই তারের উপর কোন সুরের কাজ করেননি। বিলায়েৎ খাঁ এই তার বাদ দিয়েছেন। তার জায়গায় পূর্বোক্ত গান্ধারে বাঁধা ঝংকারের তারটি তিনি লাগিয়েছেন।

আপাতদৃষ্টিতে বিলায়েৎ খাঁর সেতার দ্রুত-তান-তোড়া বাজানর যন্ত্র কারণ দ্রুত তান-তোড়া যাতে পরিষ্কার হয় সেই দিকে মন দিয়েই তিনি তাঁর যন্ত্রের তারগুলি সাজিয়েছেন। গান্ধার-পঞ্চম ও চিকারীর তার মিলে এই সেতারের ঝংকার ও ঝালার কাজে এক সুন্দর আমেজ আনে যার পিছনে আছে জুড়ির উদারার ষড়জ, পরেব তার দুটির গান্ধার-পঞ্চম আর চিকারী দুটির মুদারা ও তারার ষড়জের হারমোনির সম্পর্ক। কিন্তু এই সেতারের জোয়ারি ও তারের প্রসারণ এমনই যে এর নায়কী তারে লম্বা মীড়, মীড়যুক্ত তান ও গমক অতি ভালভাবে বাজান যায়। বলাই বাহুল্য বিলায়েৎ খাঁর বাজনায় লম্বা মীড়, মীড়-গমকযুক্ত 'গায়কী অঙ্গের' তান একহারা তানের মতই গুরুত্ব পায়।

বিলায়েৎ খাঁ খাদের তার ছাড়াই উৎকৃষ্ট আলাপ পরিবেষণ করেছেন। এর পিছনে একটা মৌলিক ব্যাপার লুকিয়ে আছে। মানুষের কণ্ঠস্বর উদারার ষড়জের নিচে যায় না কিন্তু আলাপের আদি এবং শ্রেষ্ঠ মাধ্যম কণ্ঠস্বর। কাজেই খাদের তার ছাড়াই যে বিলায়েৎ খাঁ উচ্চাঙ্গের আলাপ বাজাতে পারেন এতে আসলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

এবার আমরা বুঝতে চেষ্টা করব এই তিন শিল্পীর অবদান কি আর তাঁদের বাজনায় এমন কী আছে যার দরুন এঁদের হাতে যন্ত্রসঙ্গীত কণ্ঠসঙ্গীতকে আসনচ্যুত করেছে শ্রোতার দরবারে।

রবিশঙ্কর-বিলায়েৎ যেরকম তাঁদের যন্ত্র থেকে শুরু করে তাঁদের যন্ত্রের সাবেকি বাজের প্রচুর সংস্কার করেছেন, এখনকার শীর্ষতম সরোদবাদক আলী আকবর খাঁ তেমন কিছু করেননি। আগে তিনি সাবেকি প্রথা অনুযায়ী নিচু স্কেলে সরোদ বাঁধতেন, এখন উঁচু পর্দায়—সম্ভবত C Major-এ বাঁধেন। এতে যন্ত্রের আওয়াজে এক অভিনব জৌলুস এসেছে বটে কিন্তু যখন তিনি নিচু স্কেলে বাঁধতেন তখন তাঁর বাজনা কোন রকমেই কম সুখশ্রাব্য ছিল না।

তাঁর অবদান প্রধানত সুরসৃষ্টির দিকে। আলাপ, জোড় ও বিস্তার অংশে ইনি এক সূক্ষ্ম উচ্চ মানের চিন্তাধারা আনলেন। আলী আকবরের শ্রেষ্ঠ বাজনার সামনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সব হিসাবনিকাশ সব ছক-গন্ডি যেন হার মানে।

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

কখন পদবিস্তার বা স্বরপ্রগতি কোন মোড়ে বাঁক নেবে, কার পর কি আসবে কিছুই এক মুহূর্ত আগে বোঝা যায় না। এ গুণ রবিশঙ্কর, বিলায়েৎ বা আর কারু বাজনায় আমি অন্তত পাইনি। তাঁর তান-তোড়া সাবেকি বোল অঙ্গ প্রধান হলেও তারও বৈশিষ্ট্য এই অপ্রত্যাশিত স্বরপ্রগতি।

১৯৫০ থেকে ১৯৬০-এর মাঝামাঝি অবধি তিনি কড়া হিসাবের, ওজনদার বোল অঙ্গের দ্রুত তান-তোড়া বাজাতেন। এরপর থেকে এই অংশে তাঁর দক্ষতা ও অব্যর্থতা কমে আসতে থাকে। তাঁর দ্রুত বোলকারির তৈয়ারী কিন্তু কোন দিনই আলাউদ্দীন খাঁর স্তরে পৌঁছায়নি। বৃদ্ধ বয়সেও আলাউদ্দীনের 'ডিরি' তান অসম্ভব রকম তৈরী ছিল।

দ্রুত জোড় অংশ আলী আকবর রবাব-সুরশৃঙ্গার অঙ্গেই বাজিয়ে এসেছেন বরাবর এবং ঠোক, লড়লপেট, লড়ি, বিভিন্ন রকমের উল্টো ঝালা ও এমনকি সাবেকি কত্তার ঝালা তিনি দক্ষতার সঙ্গে বাজিয়েছেন।

তবে হস্তকৌশলের, বিশেষ করে ডান হাতের হস্তকৌশলের দিকে আলী আকবর অতি উচ্চ সঙ্গীতরসে মজে থাকার জন্যেই হোক বা যেকোন কারণেই হোক, বিশেষ মন দেননি। এই কারণে দ্রুত অংশে তাঁর সরোদের অনুবাদী তারগুলি এত বেশি বাজতে থাকতে যে মাঝে মাঝে মূল সুরের পঙক্তিটিই চাপা পড়ে যেত। তাঁর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাপারটাও বেড়ে চলল।

তিনি বিলম্বিত ত্রিতাল গতের বিস্তার এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যেখানে কাঠামোগত দিক, ভাবের দিক ও রসের দিক থেকে তা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তির স্তরে চলে গিয়েছিল। ছন্দেব কাজে সুর ও ছন্দের সঙ্গম এত নিখুঁত হত যে বলা মুশকিল হত সুরে ছন্দ সংযোজন হচ্ছে না ছন্দে সুর সংযোজন হচ্ছে।

আর এর মধ্যে ছিল এক অসাধারণ প্রাণবন্ততা।

যন্ত্রের প্রত্যেকটি আওয়াজের মধ্যে তিনি এক মর্মস্পর্শী ক্ষমতা জাগাতে পারেন। ধরুন, তরফের তারগুলির মধ্যে দিয়ে একবার নখ চালিয়ে, চিকারী ইত্যাদিতে একটা ঘা দিয়ে উদারার পঞ্চম আর মুদারার ঋষভ পরপর লাগালেন—তাতেই জলসা যেন কেঁপে উঠল। আর তাঁর মীড়-আশের শ্বাস আর সেগুলির মানুষের অন্তরের সঙ্গে ভাষাহীন ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা বিশ্লেষণের উর্ধ্বে। একবার তাঁর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : এই 'টোন' তিনি কি করে বার করেন, বাজাবার কোন কৌশল আছে কি?' তিনি খালি বলেছিলেন, 'এসব ভিতর থেকে আসে। ভেবে চিন্তে কিছু হয় না।' সত্যই আলী আকবর কোনদিন কিছু ভেবে-চিন্তে করেছেন বলে আমার মনে হয় না। তিনি হাফিজ আলী খাঁ যাকে 'তাসীর' বলতেন (অর্থাৎ ভগবানের আশীর্বাদ) তাই নিয়ে জন্মেছিলেন।

রবিশঙ্কর সেতারে বীনঅঙ্গের বাজ এবং দীর্ঘ প্রথাগত আলাপ-জোড়ের প্রবর্তক। বীনঅঙ্গের হলেও এই আলাপ বীনের আলাপ নয়। বীনের আলাপের শেষ চার অংশের সঙ্গে পাখাওয়াজ সঙ্গত হত। এই আলাপের খুঁটি-নাটি আলাউদ্দীন খাঁ প্রবর্তিত সেতারের বাজের পুরোপুরি উপযোগী নয় বলে এবং সেতারের সঙ্গেও পুরোপুরি খাপ খায় না বলে সম্পূর্ণভাবে তা অনুকরণ করা হয়নি।

খাদের তারে বীনঅঙ্গের কাজ তাঁর বাজের এক অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এক বিশেষ ছক অনুযায়ী এই কাজ ব্যবহার হয় বিলম্বিত, মধ্যবিলম্বিত ও মধ্যলয় জোড়ে। আলাপে খাদের কাজ বেশ মুক্তভাবেই ব্যবহার হয় স্থায়ী অংশের দ্বিতীয় পর্যায়ে। বীণার কায়দায় দুই-তিন পর্দার মীড় ও লপেটেই বাজান হয় এই তারগুলিতে।

নায়কী তারেও প্রধানত তিন-চার পর্দার মীড়ই বাজান রবিশঙ্কর। তাঁর আদি বাজে কৃন্তনের প্রাচুর্য ছিল---অতিপ্রয়োগ ছিল বললেও ভুল হয় না। তবে তা ক্রমে সংযত হয়ে ওঠে। আলাউদ্দীন খাঁর সুরশৃঙ্গার বাদনে বা তাঁর কন্যা অন্নপূর্ণা দেবীর সুরবাহার বাদনে যে অসাধারণ লম্বা মীড়, গমক ও মুড়কির ব্যবহার পাওয়া যায় তা রবিশঙ্কর তাঁর বাজের অন্তর্ভুক্ত করেননি। সরোদের লম্বা মীড়গুলিও তাঁর বাজে আসেনি।

মুস্তাক আলী খাঁ—যাঁর পিতা আশীক আলী খাঁ বরকৎউল্লা খাঁর তালিম পেয়েছিলেন (বরকতউল্লা জয়পুরী অমৃত সেনের শিষ্য ছিলেন) সম্ভবত রবিশঙ্করের আগে সেতারে আলাপ বাজিয়েছিলেন। এই আলাপ তাঁর কাকা ওয়ারস আলী খাঁর (বীনবাদক, বেনারস) তালিমের ফল। কিন্তু মুস্তাক আলী খাঁর আলাপ অতি সরল ও সংকীর্ণ ছকের ছিল এবং আছে। কাজেই রবিশঙ্করের আলাপ সেতারে পূর্ণাঙ্গ আলাপের প্রথম প্রবর্তন।

গৎ অংশে অতি বিস্তৃত ও সুসংবদ্ধ ছন্দের কাজ, লয়কারি ও তেহাই-এর ব্যবহার রবিশঙ্করের আরেক বৃহৎ অবদান সেতার বাদনের ক্ষেত্রে।

'ডোভার লেনে' নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তিম সঙ্গীতানুষ্ঠান ছবি : সুধীর চ্যাটার্জী

প্রবীণরা বলেন ইমদাদ-এনায়েতের লয়কারী-তেহাই ইত্যাদি রবিশঙ্করের তুলনায় অনেক সরল ছিল এবং তাঁরা বিশেষ কয়েকটি তৈরী লয়কারি ও তেহাই বাজাতেন।

গৎকারিতে আরেকটি জিনিস রবিশঙ্কর আমদানি করেছেন যাকে বলা যায় তাল সমৃদ্ধতা। আমাদের সঙ্গীতে তালাধ্যায় বৃহৎ। কিন্তু রবিশঙ্করের আগের সেতারীরা ত্রিতাল ছাড়া বিশেষ অন্য কোন তালে গৎ বাজাতেন না। সরোদেও হাফিজ আলী খাঁ ও আলাউদ্দীন খাঁর ধামার ছাড়া বিশেষ কোন ত্রিতাল ভিন্ন তাল বাজতো না। রবিশঙ্করের সঙ্গে এল রূপক, মত্ততাল, ঝাঁপতাল, চারতাল কি সওয়ারি, একতাল, আড়া চৌতাল, পঞ্চম সওয়ারি ও শিখর তাল। এতে ধ্রুপদের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় অবলুপ্ত ভারতীয় সঙ্গীতের এক সম্পদ পুনরুজ্জীবিত হল। এ কথাও এখানে ধর্তব্য যে খেয়ালেও প্রধানত একতাল, ঝুমরা ও ত্রিতাল চালু ছিল সে সময় এবং আজও আছে।

কেউ কেউ আলাপের খাদের অংশে ও লয়কারির পরিকল্পনায় রবিশঙ্করের কিছু কর্ণাটক

বিষ্ণু জি যোগ ছবি : সুধীর চ্যাটার্জী

সঙ্গীতের আমদানির কথাও বলেন।

সব চেয়ে বড় কথা, আলী আকবরের সঙ্গে সঙ্গে রবিশঙ্কর সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এমন এক উচ্চ মানের পরিকল্পনা, সাঙ্গীতিক চিন্তাধারা ও সামগ্রিক সুরসঙ্গতির জোয়ার আনেন যা পূর্বের ও সমসাময়িক সঙ্গীতের সকল অভাবই পুরণ করে। এই কারণেই তাঁদের সঙ্গীতই একালের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত হয়ে দাঁড়ায়। বড়ে গুলাম আলীর মৃত্যুর পর এমন কোন গায়ক পাওয়া যায় না যে এই জোয়ারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

বিলায়েৎ খাঁও এই জোয়ারের এক অংশ। তিনি তাঁর অসাধারণ তৈরী হাতে খেয়ালের তান, লম্বা মীড়, মুড়কি, কম্পন, জমজমা সব নিয়ে এলেন সেতার যন্ত্রে। আলাপ বিস্তার অংশে তাঁর মীড় আশের ঐশ্বর্য আর গৎ অংশে তাঁর তুলনাহীন তান-ঐশ্বর্য সেতারকে এমন এক জায়গায় নিয়ে গেল যার উর্ধ্বে বোধ হয় যাওয়া যায় না ক্রিয়াসিদ্ধ দিক থেকে।

এ কথা ঠিক যে পরিকল্পনা ও সুসংবদ্ধতার দিক দিয়ে তাঁর আলাপ কোনদিন আলী আকবর বা রবিশঙ্করের আলাপের সমতুল্য হতে পারেনি। তবে শ্রেষ্ঠাংশে তা যথেষ্ট সুখশ্রাব্য ও উচ্চাঙ্গের হয়েছে।

বাঁ হাতের মীড় টানার দক্ষতায় বিলায়েৎ খাঁ লম্বা তানও টেনে বাজিয়েছেন। এতে এই তানের প্রকৃতি খেয়ালের তানের মতই হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইভাবে দ্রুতগতির গমকতানও তিনি বাজিয়েছেন। এর উপরে বিদ্যুদগতির একহারা সপাট তান ও ছুটতান তো ছিলই। এই ধরনের তান, এত বিস্তৃতভাবে বিলায়েৎ খাঁর আগে কেউ বাজিয়েছেন বলে মনে হয় না।

ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী ও টপ্পার কাজ সেতারে এত কণ্ঠসুলভভাবে আর কেউ বিলায়েৎ খাঁর আগে বা পরে ফোটাতে পারেননি। তান অঙ্গে তাঁর সেতারে হঠাৎ গেয়ে ওঠেন আব্দুল করিম বা আব্দুল ওয়াহেদ খাঁ। কখনও আসেন রাজব

আসাদ আলি ছবি : সুধীর চ্যাটার্জী

আলী। আমীর খাঁ বা বড়ে গুলাম আলী তো থাকেনই।

নিজের বাজকে স্বতন্ত্র রাখার জন্যেই হোক আর যে কোন কারণেই হোক বিলায়েৎ খাঁ যেন ইচ্ছে করেই রবিশঙ্করের এলাকা এড়িয়ে গিয়েছেন। গৎ বাজান ত্রিতালেই। কয়েকটি বাঁধা ছন্দ ও সরল তেহাই ছাড়া ছন্দ-লয়কারির বিশেষ কিছু বাজান না। জোর দেন লম্বা মীড়ে, সূক্ষ্ম কণ্ঠসুলভ কারুকার্যে, খেয়াল-ঠুংরি অঙ্গে, লম্বা গমক তানে, মীড়খণ্ডি তানে, মীড়তানে ও দ্রুত তান-তোড়ায়। যেসব জিনিস রবিশঙ্কর বিশেষ বাজান না। কে জানে শত রেষারেষির পিছনে কোথায় কোন গোপন চুক্তি লুকিয়ে আছে কিনা দুই শিল্পীর মধ্যে।

বিলায়েৎ খাঁর উৎকর্ষ ছিল আর এক ঘরানাগত জিনিসে—স্পষ্ট, সুরেলা, চার-টোকার ঝালা। ঝালার যত প্রকার ও কায়দা তাঁর বাবা-ঠাকুর্দা তৈরী করে গিয়েছিলেন তার উপর আরও দু-চারটে যোগ করে দিয়েছেন বোধ হয় বিলায়েৎ খাঁ। এই পরিপ্রেক্ষিতে নানা রকম উল্টো ঝালার আমদানির কথা উল্লেখ করা যায়। উল্টো ঝালা আগে সরোদেরই জিনিস ছিল। রবিশঙ্করও তা বাজান না।

নিশাৎ খাঁ ছবি : সুধীর চ্যাটার্জী

সেতার-সরোদ সঙ্গীত এইভাবে সমৃদ্ধ হওয়ায় জলসায় আলী আকবর, রবিশঙ্কর ও বিলায়েৎ খাঁই হয়ে দাঁড়ালেন প্রধান আকর্ষণ। তাঁদের দক্ষিণাও হয়ে দাঁড়াল সর্বোচ্চ।

এঁদের পরে যাঁরা এলেন তাঁদের উপর স্বাভাবিক কারণেই এঁদের প্রভাব হল প্রবল। সেতারীদের মধ্যে এলেন নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, ইমরাৎ খাঁ, রইস খাঁ ও আব্দুল হালিম জাফর খাঁ। এ ছাড়া আরও অনেক শিল্পীও এলেন যাঁদের বাজনার মান বা শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা ঠিক প্রথম সারির অন্তর্ভুক্ত করার মতন নয়। সরোদে এলেন বাহাদুর খাঁ, আশিস খাঁ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ও সর্বকনিষ্ঠ আমজাদ আলী খাঁ।

সেতারীদের মধ্যে বড় শিল্পী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি রবিশঙ্কর-বিলায়েৎ-এর বাজ থেকে বাছাই করা জিনিস নিয়ে এবং তা অন্নপূর্ণা দেবীর সুরবাহার ও আলাউদ্দীন খাঁর সুরশৃঙ্গারের লম্বা মীড় ও রেশে ভরা বাজের সঙ্গে মিশিয়ে এক তৃতীয় সেতার বাজ তৈরী করেছিলেন যা আগের বাজগুলির মতই সুর, ভাব ও সাঙ্গীতিক চিন্তায় সমৃদ্ধ।

তাঁর শেষ গুরু আলী আকবরের অসাধারণ স্বরসঙ্গতি রচনা করার ক্ষমতার কিয়দংশ একমাত্র তিনিই খানিকটা পেয়েছিলেন। তাঁর বাজনাতেই আমরা সঙ্গীতের সব বিভাগে দক্ষতার এক সুন্দর নিদর্শন পেতাম। যেমন বিলায়েৎ খাঁর তান, ঝালা, লম্বা মীড়ের মজা রবিশঙ্করের বাজনায় নেই। আবার রবিশঙ্করের অব্যর্থ রাগবিদ্যা, আলাপের সুসংবদ্ধতা, বীন অঙ্গের গাম্ভীর্য, লয়কারী ও তালবৈচিত্র্য বিলায়েৎ খাঁর বাজনায় নেই। কিন্তু নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজনায় সব কিছুই ছিল। এর উপর অন্নপূর্ণা দেবীর রেশের জোয়ার ও আলী আকবরের কল্পনাবৈদগ্ধ্যের আভাস থাকায় তাঁর বাজনাই গত পাঁচ বছরে সবচেয়ে সুখশ্রাব্য সেতার সঙ্গীত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর অসুস্থতা ও অকালমৃত্যু সঙ্গীতের ভবিষ্যৎকে ভয়ঙ্কর আঘাত করে গিয়েছে কারণ তিনি চলে গেলেন এমন এক পর্যায়ে যখন তাঁর বাজনায় কল্পনাবৈদগ্ধ্য প্রসারিত হচ্ছিল।

ইমরাৎ খাঁ ও রইস খাঁ—বিলায়েৎ খাঁর ভ্রাতা ও ভাগিনেয়—নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেণীতে আসতে পারলেন না স্বকীয়তার অভাবে। তাঁদের ক্রিয়াসিদ্ধ দক্ষতা অসাধারণ হলেও এ কথা মানতেই হবে যে তাঁদের বাজ বিলায়েৎ খাঁর বাজেরই সামান্য পরিবর্তিত সংস্করণ। এই বাজের শ্রেষ্ঠ বাদক বাজের স্রষ্টা নিজেই।

আব্দুল হালিম জাফর খাঁ নিজের বাজের বিষয়ে নানা রকম প্রচার করেছেন কিন্তু তাঁর বাজনা শুনেই বোঝা যায় এই বাজ রবিশঙ্কর-বিলায়েতের বাজ মিশ্রণের এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা। হালিম জাফরের হাত ভাল রকম তৈরী কিন্তু সাঙ্গীতিক চিন্তাশক্তি একটু অনুন্নত ধরনের। এই কারণে তাঁর বাজকে অনেক সময় দুই মহারথীর বাজের একরকম ব্যঙ্গচিত্র বলে মনে হয়।

সরোদ জগতে প্রায় একই জিনিস দেখা যায় আলী আকবরের খুড়তুতো ভ্রাতা বাহাদুর খাঁর ক্ষেত্রে। বাহাদুর খাঁর হাতে মাধুর্য আছে কিন্তু আলী আকবরের প্রতিভা নিয়ে না জন্মিয়ে আলী আকবরকে অনুকরণ করার প্রচেষ্টায় তাঁর বাজনা প্রায় আলী আকবরের ব্যঙ্গ অনুকৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলী আকবরের বাজ একমাত্র আলী আকবরই বাজাতে পারন।

বাহাদুরের মত আলী আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র আশিস খাঁও প্রধানত পিতামহ আলাউদ্দীন খাঁর তালিমে তৈরী। কিন্তু যে কারণেই হোক তিনি তাঁর পিতা বা পিতামহের যোগ্য উত্তরসাধক হতে পারেননি। তাঁর বাজনার একমাত্র প্রশংসনীয় জিনিস তাঁর পিতামহের 'ডিরি' তানের কিছু কিছু নিদর্শন। কিন্তু সেগুলি বাজানর সময়ও তিনি বেশ কয়েকবার সুরচ্যুত হন।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত পেশাদার শিল্পী নন কিন্তু তাঁর গুরু রাধিকামোহনের বাজের সঙ্গে কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যোগ করে তিনি মহম্মদ আমীর খাঁর বাজের সংরক্ষণ করে চলেছেন। তিনি আজ একজন অতি সুখশ্রাব্য সরোদ বাদক।

আলী আকবর-রবিশঙ্করের পরে শ্রেষ্ঠ সরোদশিল্পী হচ্ছেন হাফিজ আলীর কনিষ্ঠ পুত্র আমজাদ আলী খাঁ। সরোদের ক্রিয়াসিদ্ধ দিক এঁর হাতে অনেক প্রসারিত হয়েছে। আমরা দেখেছি যে সেতার বাদন পদ্ধতির কত সংস্কার ও প্রসার হয়ে এসেছে ইমদাদ খাঁ, এনায়েৎ খাঁ, বিলায়েৎ খাঁ ও রবিশঙ্করের হাতে। সরোদের ক্ষেত্রে উন্নতি প্রধানত সুরসমৃদ্ধি, কাঠামোগত দিক ও স্বরসঙ্গতির সাঙ্গীতিক মানের দিক দিয়েই হয়ে এসেছিল আলাউদ্দীন, হাফিজ আলী ও আলী আকবরের মাধ্যমে। কিন্তু সেতারে কণ্ঠসঙ্গীতের বা বীনের জিনিস বাজানর মত যন্ত্রবিদ্যার দিক দিয়ে বড় ঘটনা সরোদের ক্ষেত্রে ঘটেনি। এই জিনিস ঘটালেন আমজাদ আলী।

সরোদে তান-তোড়া একাধিক তারের মাধ্যমে বাজাতে হয় বলে তা স্বাভাবিক কারণেই বোল অঙ্গ বা দক্ষিণ হস্ত প্রধান হয়ে এসেছে—বিশেষ করে দ্রুত ও অতি দ্রুত পর্যায়। অর্থাৎ, সরোদের দ্রুত তান-তোড়ার স্বরসমৃদ্ধির চেয়ে বোলসমৃদ্ধিই বেশি হয়ে এসেছে আদি কাল থেকে। সরোদ স্বরপ্রধান দ্রুত তান বা দ্রুত একহারা তানের ক্ষেত্রে সবসময়ই সেতারের থেকে অনেক পিছিয়ে থেকেছে।

অসাধারণ হস্তনৈপুণ্যের মাধ্যমে আমজাদ আলী এই ব্যাপারে সরোদকে সেতারের সমতুল্য করে তুলেছেন। তিনি যুবক অবস্থায় বিলায়েৎ খাঁর বিদ্যুদ্‌গতির একহারাতান অবলীলাক্রমে সরোদে বাজান।

বিলায়েৎ খাঁর মত কণ্ঠসঙ্গীতের বহুরকম তান তিনি সরোদে বাজান। গমকতান, ছুটতান, ঘষিৎ তান, জমজমা তান, সপটতান, সবই তাঁর সরোদে বাজে। তান চর্চা করে তিনি এখন খেয়ালঅঙ্গের এক উৎকৃষ্ট তনাইয়াৎ হয়ে গিয়েছেন। কোন সরোদ বাদকই এই জিনিস করতে পারেননি। সেতারেও করেছেন একমাত্র বিলায়েৎ খাঁ এবং একসময়কার রইস খাঁ।

আবার সরোদের সাবেকী বোলের অঙ্গকেও তিনি অবহেলা করেননি। বিলায়েৎ খাঁ যেরকম একহারা ও 'গায়কি অঙ্গের' তান নিয়ে চর্চা করায়

এনায়েৎ খাঁর অসাধারণ 'ডিরি' তান একেবারে বাজাননি, আমজাদ আলীর ক্ষেত্রে কিন্তু তেমন হয়নি। তাঁর বোল অঙ্গের কাজ তাঁর পূর্বপুরুষদের চেয়ে কোন অংশে কম তৈরী নয়। আলাউদ্দীনের সাংঘাতিক 'ডিরি' তান যদি আজ কোথাও শোনা যায় তা হলে তা এখানেই।

উপরন্তু আমজাদ আলী বোল-অঙ্গের দ্রুত তানের অংশবিশেষে তাঁর অব্যর্থ বামহস্তসিদ্ধি প্রয়োগ করে এই তানের সুরঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর কিছু বোল-অঙ্গের তানে স্বরপ্রগতিরও এক বড় ভূমিকা আছে।

এই সব তথ্য ওজন করলে বোঝা যায় তন্ত্রযন্ত্রের ক্ষেত্রে আমজাদ আলী আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ তান বাদক। এ ব্যাপারে ক্রিয়াসিদ্ধ দিক থেকে যন্ত্রসঙ্গীতের ইতিহাসে (যতটুকু আমরা জানি) ঠিক কোন নজির নেই।

সরোদের অতি দ্রুত ঝালা সাধারণত এক স্বরতাণ্ডব বিশেষ হয়ে দাঁড়ায় অনুবাদী তারের অবাঞ্ছিত আওয়াজে। সরোদ যন্ত্রটি এমন যে এতে এ ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়া খুবই শক্ত। আমজাদ আলী এ ক্ষেত্রেও প্রমাণ করে দিয়েছেন যে শক্ত হলেও তা অসম্ভব নয়। তিনি বিলায়েৎ খাঁর মতই পরিষ্কার, সুরসমৃদ্ধ ও দ্রুত ঝালা বাজান। সরোদে উল্টো ঝালাই বাজানো সোজা। আমজাদ আলী তাঁর পিতার আদর্শে সিধা ঝালার উৎকর্ষ সাধন করেছেন। সেতার-সরোদে যত রকম ঝালা বাজানো সম্ভব সবই তিনি বাজান অতি সুখশ্রাব্যভাবে।

রবিশঙ্কর-আলী আকবর যে তালসমৃদ্ধি এনেছিলেন যন্ত্রসঙ্গীতে, আমজাদ আলী তাও তাঁর বাজে নিয়ে এসেছেন। ত্রিতাল ও ধামার ছাড়া তিনি ঝাঁপতাল, রূপকতাল, দ্রুত একতাল সবেই গৎকারি বাজান অতি দক্ষ ভাবে। লয়কারি, ছন্দবিস্তার, তেহাই পরিবেশন সবেই তিনি সিদ্ধহস্ত। এক কথায় যন্ত্রসঙ্গীতে যুগ-যুগান্তর ধরে যে সম্ভার সঞ্চিত হয়েছে তার সবই তাঁর কাজে পাওয়া যায় সুনিবদ্ধভাবে।

আমরা তাঁর আগের শিল্পীদের ক্ষেত্রে দেখেছি একমাত্র নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে ছাড়া, তাঁরা সঙ্গীতের কিছু কিছু বিভাগ বেছে নিয়েছেন। উৎকর্ষ সাধনের জন্য। যিনি মীড়, তান ও ঝালাসিদ্ধ তিনি লয়কারি, ছন্দ ইত্যাদির দিকে তেমন মন দেননি। আবার যিনি আলাপ ও লয়কারির জন্য প্রসিদ্ধ তিনি লম্বা মীড় বা তান বা ঝালার দিকে তেমন মন দেননি। যিনি একহারা তানসিদ্ধ তিনি বোলঅঙ্গের অবহেলা করেছেন আবার যিনি বোলঅঙ্গের উৎকর্ষ সাধন করেছেন তিনি একহারা তান বিশেষ বাজান না।

এও দেখেছি যে যিনি রাগদার, ধ্রুপদ অঙ্গের শিল্পী তিনি খেয়াল অঙ্গে যান না। আবার যিনি রংদার খেয়াল অঙ্গের শিল্পী তিনি সেই শ্রেণীর রাগদার নন, ধ্রুপদ অঙ্গের দিকেও বিশেষ যান না।

রবিশঙ্কর, আলী আকবর ও বিলায়েৎ খাঁর ভিতর দিয়ে সঙ্গীত সম্পদকে ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধ্যে ভাগ করে রাখার ব্যাপারটা কমে আসতে থাকে। হ্যাঁ কমে আসতে থাকে, কিন্তু শেষ হয়ে যায় না। উপরোক্ত বিভাগকরণের উদাহরণগুলি তাঁদের ক্ষেত্রেও কম-বেশি খাটে।

আকাশবাণীর সঙ্গীতানুষ্ঠানে ভিজি যোগ, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, এটি কানন, সত্যজিৎ রায়, রবিশঙ্কর, মালবিকা কানন ও লক্ষ্মীশঙ্কর

বিসমিল্লা খাঁ

এই জিনিস একেবারে শেষ হয়ে আসে প্রথমে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অবশেষে আমজাদ আলীর পর্যায়ে। এ কথা ঠিক যে প্রথম তিনজনের তুলনায় শেষ দুজন সামান্য কম কিংবদন্তিতুল্য শিল্পী—রবিশঙ্কর বা বিলায়েৎ খাঁর শ্রেষ্ঠ বাজনায় এমন অদৃশ্য ও অবিশ্লেষণীয় কিছু আছে যা নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজনায় ছিল না। আবার আলী আকবরের শ্রেষ্ঠ বাজনায় এইরকম কিছু থাকত যা আমজাদ আলীর বাজনায় আমরা এখনও পাই না। অবশ্য এও বলতে হবে যে আলী আকবরের সেই আগের 'যাদু' রবিশঙ্কর বা বিলায়েৎ খাঁরও ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিল।

তবে এ কথা জোর গলায় বলা যায় যে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমজাদ আলীর যন্ত্রবিদ্যায় যে সর্ববিভাগীয় উৎকর্ষ দেখা যায় তা এঁদের পূর্বসূরীদের মধ্যে পাওয়া যায় না।

বিংশ শতাব্দীতে সেতার-সরোদ ছাড়া আর কয়েকটি যন্ত্র উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ক্ষেত্রে এসে পড়ে যেগুলি আগে ঠিক জলসার যন্ত্র ছিল না। এর

সুজাত খাঁ ছবি : সুবীর চ্যাটার্জী

মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় সানাইয়ের কথা। আর সানাইয়ের কথা মানেই এই ক্ষেত্রে বিসমিল্লা খাঁর কথা।
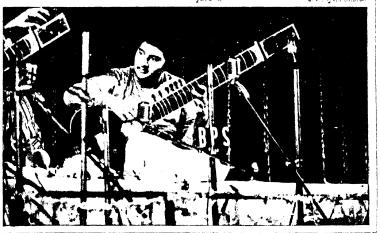
সানাই মোগল আমল থেকে প্রচলিত আছে। এতে প্রথমে ধুন, কাজরি, চইতি বাজত এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে রাগসঙ্গীতও বাজত। কিন্তু এর স্থান ছিল বাদশাহ-নবাব, রাজা-জমিদারদের বা মন্দিরের নহবৎখানায়। তা ছাড়া সানাই বাজত বিবাহে, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে। বিসমিল্লা খাঁ-ই কিরানা বা আব্দুল করিম ঢঙের বিলম্বিত খেয়ালঅঙ্গ, ডাগরবাণী আলাপ ও খেয়াল তারানা ঢঙের দ্রুত গৎ এই যন্ত্রে আমদানি করে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত মঞ্চে এর স্থান করে দেন। তবে বিসমিল্লার নিজস্ব বাজ ছাড়া সানাইয়ের কোন বিশিষ্ট বাজ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে স্থাপিত হয়নি। পরের সানাই বাদকেরা কেউ বিসমিল্লা খাঁর স্তরে পৌঁছতে পারেননি আর কম-বেশি তাঁর ঢঙেই বাজিয়ে থাকেন।

তার পরেই আসে বাঁশী অর্থাৎ আড় বাঁশীর কথা। বাঁশী অতি প্রাচীন যন্ত্র কিন্তু উত্তর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে এর বিশেষ কোন স্থান ছিল না। আলাউদ্দীন খাঁর তালিমপ্রাপ্ত পান্নালাল ঘোষ এই শতাব্দীর মধ্যভাগে আড় বাঁশী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আনেন। মন্দ্রসপ্তকের কাজ করার জন্য তিনি এক বৃহত্তম বাঁশীর প্রচলন করেন। এই বাঁশীই আজ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত মঞ্চে বাজে। পান্নালাল খেয়াল অঙ্গেই বিলম্বিত অংশ বাজাতেন। দ্রুত অংশে একহারা তান ও তারানা ঢঙের বোল পরিবেশিত হত। তাঁর শিষ্য দেবেন্দ্র মুর্দেশ্বর ও গৌর গোস্বামী এই ঢঙেই বাজান। বর্তমানের নামকরা শিল্পী হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া তন্ত্রকারী ও ধ্রুপদী ঢঙের আলাপ ও সেতার-সরোদের ঢঙের গৎকারি ও ঝালার তুল্য এক অংশ সংযোজন করে কৃতিত্বও দেখিয়েছেন।

সানাইয়ের মতই বাঁশীতেও কোন নিজস্ব বাজ এখনও তৈরী হয়নি।

এ ছাড়া আছে বেহালা, সারেঙ্গী ও এস্রাজ। বেহালা দক্ষিণ ভারতের উচ্চাঙ্গ যন্ত্রসঙ্গীতে বহুকাল আগেই এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। সেখানে বেহালা উত্তর ভারতীয় সারেঙ্গীর ভূমিকা নিয়েছে কণ্ঠসঙ্গীতের প্রথাগত সঙ্গতের যন্ত্র হিসাবে। উত্তর ভারতে এই যন্ত্রে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রবেশ আলাউদ্দীন খাঁর সঙ্গে। আলাউদ্দীন খাঁ শিক্ষাজীবনে প্রথম পর্যায়ে পাশ্চাত্য কায়দার বেহালাবাদন আয়ত্ত করেছিলেন এবং পরে এতে দক্ষ গৎ-তোড়া বাজাতেন। বৃদ্ধ বয়সে এই যন্ত্রেই তাঁর দক্ষতা ছিল সর্বাধিক।

তাঁর পরে আমরা পাচ্ছি বিষ্ণু গোবিন্দ যোগকে। ইনি খেয়াল অঙ্গের ও আধুনিক সেতার বাজের এক সীমিত সংস্করণে বাজিয়ে থাকেন। আরও কয়েকজন বেহালাবাদক ও তাঁর সমসাময়িক যেমন ডি কে দাতার ও গজানন রাও যোশী, যাঁরা প্রধানত খেয়াল ঢঙেই বাজানর চেষ্টা করেছেন। এঁদের মধ্যে যোগই শ্রেষ্ঠ।

যোগ ও আলী আকবর খাঁর শিষ্যা শিশিরকণা ধরচৌধুরী সরোদবাজ সংযোজন করে এই যন্ত্রের ভারতীয় মান বাড়িয়েছেন এবং তাঁর আলাপ, জোড়, ঝালা ও গমক তাঁকে আগের তিনজনের উর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছে।

এসব শিল্পীদের বাদন শৈলীর পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে বেহালার ক্ষেত্রেও কোন নিজস্ব বাজ গড়ে ওঠেনি উত্তর ভারতে। যন্ত্রের স্বকীয়তার দিকে নজর দিয়ে তার বিকাশ করার চেষ্টা একমাত্র আলাউদ্দীন খাঁই করে গিয়েছেন। তাঁর শেষ পর্যায়ের ছাত্র রবিন ঘোষের কাছে এই বাজের অনেক কিছু সংরক্ষিত আছে। ইনি প্রধানত শিক্ষক রয়ে যাওয়ায় এই বাজ বিশেষ প্রচলিত হয়নি।

সারেঙ্গী ও এস্রাজ প্রাচীনকাল থেকে প্রথাগত সঙ্গত যন্ত্র। এস্রাজবাদন আজ প্রায় অবলুপ্ত এবং দু-একজন মধ্যম শ্রেণীর শিল্পীই যন্ত্রটিতে একক বাদন করে এটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

সারেঙ্গীকে একক যন্ত্রের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন বোম্বাইয়ের রামনারায়ণ। এঁর হাত অতি দক্ষ, মধুর ও তৈরী। তবে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রথম সারিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মত সুসংবদ্ধতা এঁর বাজনায় পাওয়া যায়নি। তাঁর কোন উত্তরসূরীর আভাসও মেলেনি। কাজেই একক যন্ত্র হিসাবে এই যন্ত্রটির প্রতিষ্ঠা সমসাময়িক ও ব্যক্তিনির্ভর।

সন্তুর নামক এক কাশ্মিরী তন্ত্রযন্ত্রও হালে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে এসেছে শিবকুমার শর্মার প্রচেষ্টায় এবং ক্রমে ক্রমে বেশ জনপ্রিয় হয়ে এসেছে। বেশ কিছু সন্তুরবাদকও আজকাল দেখা যাচ্ছে। এতে দ্রুতগৎ এবং বোল অঙ্গের তান-তোড়া ও ঝালা ইত্যাদিই ভাল হয় তবে বাদকেরা কিছু আলাপ বিস্তারও কৌশলে বাজিয়ে থাকেন। এই যন্ত্রের প্রথম শ্রেণীর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেষণের ক্ষমতা নেই।

হাওয়াইয়ান গিটার নামক পাশ্চাত্য যন্ত্রটি, যাতে বেশ কিছুকাল ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক গান ইত্যাদি বাজান হয়ে এসেছে, আজ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ক্ষেত্রে এসে গিয়েছে আলী আকবরের ছাত্র ব্রীজভূষণ কাবরার মাধ্যমে। এখন বেশ কিছু শিল্পী এই যন্ত্র বাজান। বিচিত্র বীণার স্তরের সঙ্গীত এতে পরিবেষণ করা সম্ভব তবে এর আওয়াজ ঠিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের উপযোগী নয়।

আজ খালি নামজাদা দুজন বীণবাদক আছেন—জিয়া মহিউদ্দীন ডাগর আর আসাদ আলী খাঁ। আসাদ আলী ওস্তাদ সাদিক আলীর পুত্র এবং মহিউদ্দীন, জিয়াউদ্দীন খাঁর পুত্র।

শহীদ পরভেজ *ছবি : সুবীর চাটার্জী*

প্রাচীনপন্থীরা বলেন যে এঁরা সেতার সুরবাহার বাজ বীণায় মিশিয়ে বীণার শুদ্ধতা নষ্ট করে ফেলেছেন। আমরা এঁদের হাতেই প্রধানত বীণা শুনেছি বলে আমাদের কানে খুঁটিনাটি হয়ত ধরা পড়ে না—তবে দু-একটা ব্যাপার যে লক্ষ করি না তা নয়। যেমন এঁরা আদি বীনবাজের ঢঙে পাখাওয়াজের সঙ্গে তারপরণ বাজিয়ে বাজনা শেষ না করে ঝালা বাজিয়ে আলাপ শেষ করেন সেতার সরোদের মত। এরপর তাঁরা কোন ধ্রুপদী তালে নিবদ্ধ একটি গৎ বাজান।

বীণের বাজ ছিল সম্পূর্ণ অনিবদ্ধ—আলাপের শেষ অংশের সঙ্গে পাখাওয়াজ বাজত কিন্তু গৎ বা গৎ-মুখড়া বাজত না।

যেহেতু সেতার সরোদের অনিবদ্ধ অংশের পর নিবদ্ধ অংশ (অর্থাৎ গৎ) বাজে, এবং শ্রোতারা তাতে এখন অভ্যস্ত, বীণবাদকেরাও এই প্রথা অনুকরণ করছেন।

এও শুনে এবং পড়ে এসেছি যে আদি বীনবাজে তিন-চার পর্দার মীড় বাজান নিষিদ্ধ ছিল। এখন অন্তত আসাদ আলীকে দেখি এই নিয়ম ভাঙতে। বীণায় দ্রুত গমক তান ইত্যাদি বাজত না—কিন্তু আসাদ আলী প্রাক-ইমদাদ ঢঙের সেতার সুরবাহারের অনুকরণে এসব বাজান।

একেই বীণাবাদক গোটা দুই, তার উপর বীণার আর বিশেষ সমাদর নেই, কাজেই বীণাবাদকরা তাঁদের অস্তিত্বের খাতিরে এসব করতেই পারেন। বীণায় চার পর্দার বেশি মীড় বাজান শক্ত, দ্রুত তানও তাই। কেউ যদি এসব উশুল করতে পারে সেটা তার কৃতিত্ব, দোষ নয়।

উত্তর ভারতের যন্ত্রসঙ্গীতের বর্তমান অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। আমেরিকানিবাসী আলী আকবরের বাজনার অবনতি হতে হতে এখন এমন এক পর্যায়ে এসেছে যে তাঁর কাছ থেকে পুরানো মানের উৎকর্ষ আর আশা করা যায় না। তবুও আমাদের ভাগ্য যে তিনি কিছু আশাতীত জিনিস আমাদের কালেভদ্রে শুনিয়ে মনে করিয়ে দেন যে কোন স্তরের মহাশিল্পী তিনি ছিলেন। তাঁর বয়স এখন পঁয়ষট্টির ঘরে কাজেই তিনি হঠাৎ আবার আগের মত বাজাবেন তা নিশ্চয় দাবি করা উচিত নয়। তবে তাঁর বিষয়ে এটুকু বলতেই হয় যে তিনি বহু আগের থেকেই তাঁর শিল্পের অবহেলা করে আসছেন এবং এই কারণে গত দশ বছর ধরে তাঁর বাজনার ক্রমাগত অবনতি হয়ে এসেছে। আরো বড় কথা আলাউদ্দীন খাঁর মত সঙ্গীত ঋষির পুত্র হয়েও তিনি একটিও যোগ্য উত্তরসূরী গড়লেন না। তাঁর এত জন পুত্রের মধ্যে কেউই ভাল তালিম পেল না আর তাৎপর্যপূর্ণ শিল্পী কেউই হতে পারল না। জ্যেষ্ঠ পুত্র আশিস খাঁ যেটুকু বাজান তা পিতামহের তালিমে। তাও তিনি পিতা বা পিতামহের তুল্য শিল্পী হলেন না।

আলী আকবরের সমবয়সী হলেও রবিশঙ্কর নিজের বাজনার মান আজও সংরক্ষণ করে আছেন। দশ বছর আগের তেজ হয়ত তাঁর

বাজনায় নেই তা হলেও তিনি নিজ স্তরেই আছেন। এটা তাঁর বিরাট কৃতিত্ব। কিন্তু উত্তরসুরী তৈরি করার ব্যাপারে তিনি আলী আকবরেরই অনুকরণ করেছেন। এই কথা ঠিক যে তিনি বহু লোককে তালিম দিয়েছেন। তাঁদের তালিমের মধ্যম বা শেষ পর্যায় এবং তাঁদের মধ্যে কয়েকজন নিজসাধ্য অনুযায়ী ভালই বাজান। কিন্তু এখনও এমন কাউকে পেলাম না যে রবিশঙ্করের স্তরের সেতারবাদক হয়ে আলাউদ্দীন খাঁর ঘরানার সেতারবাজকে একবিংশ শতাব্দীতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবে।

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যুর পরেই ব্যাপারটা মনে দাগ কেটেছিল—হঠাৎ বোঝা গিয়েছিল এই ঘরানার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে গেল।

ব্যাপারটা বড়ই দুঃখের। বৃদ্ধ ওয়াজীর খাঁ নাকি আলাউদ্দীন খাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন যে তাঁর নাম যত দূর চন্দ্র-সূর্যের রশ্মি যায় ততদূর ছড়াবে। কার্যত প্রায় হয়েছেও তাই আলী আকবর রবিশঙ্করের মাধ্যমে। কিন্তু এই দুই শিল্পী শিক্ষার দায়িত্ব পালন না করায় এই ঘরানার উৎকর্ষ দুই প্রজন্মেই শেষ হতে চলল।

হালে বিলায়েত খাঁর বাজনার মানের অবনতি চমকপ্রদ হয়েছে। এত তৈরী একজন মহাশিল্পী কয়েক বছরের মধ্যে নিজ স্তরের প্রায় অর্ধভাগ নিচে নেমে গেলেন। শারীরিক কারণে দ্রুত তান তোড়া ও বেগবান ঝালা অসম্ভব হলেও বাজনার সুরসমৃদ্ধি নষ্ট হওয়ার কোন কারণ নেই। বিলায়েত খাঁর ক্ষেত্রে দুটি জিনিসই একসঙ্গে হয়েছে। এর উপর তিনি মঞ্চে গান গাওয়া এত বাড়িয়ে দিয়েছেন যে এখন তিনি আধা সেতার বাদক ও আধা গায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। মেধা ও আগের সাধনার বলে তিনি আজও প্রথম সারির শিল্পী রয়ে গেলেও কণ্ঠসঙ্গীতে তাঁর দক্ষতা মামুলি। কাজেই তাঁর বৈঠকে শ্রোতা আজ পান অর্ধেক সীমিত উৎকর্ষের প্রথম শ্রেণীর যন্ত্রসঙ্গীত ও অর্ধেক মামুলি মানের কণ্ঠসঙ্গীত।

তাঁর ভ্রাতা সেতার সুরবাহার বাদক ইমরাৎ হুসেন খাঁ তাঁর স্তরের শিল্পী না হলেও যথেষ্ট মেধাবী ও তৈরী শিল্পী। রবিশঙ্করের মত ইনিও নিজস্ব বাজনার মান অটুট রেখেছেন। তাঁর পুত্রদের মধ্যে দুজনকে তিনি সম্ভাবনাময় তরুণ শিল্পী তৈরি করেছেন এঁদের মধ্যে নিশাৎ খাঁ, সেতার বাজায় এবং ইরশাদ খাঁ সেতার ও সুরবাহার বাজায়। দুজনের মধ্যেই বোদ্ধারা যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখেন।

বিলায়েৎ খাঁর প্রথম পুত্রের মধ্যেও যথেষ্ট প্রতিভা ছিল কিন্তু তিনি মাঝ পথে সেতারবাদনে একনিষ্ঠতা হারিয়ে ফেলায় তাকে আর সম্ভাবনাময় শিল্পী বলা যায় না। হালে পিতার সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ায় তাঁর উন্নত পর্যায়ের তালিমের পিছনেও একটি বড় জিজ্ঞাসার চিহ্ন বসেছে। কনিষ্ঠ পুত্রকে নাকি বিলায়েত খাঁ ভাল ভাবে তালিম দিচ্ছেন।

কয়েক বছর আগের চাঞ্চল্যকর তরুণ শিল্পী সেতার বাদক বুধাদিত্য মুখোপাধ্যায় নাকি এখন বিলায়েৎ খাঁর কাছে তালিম নিচ্ছেন।

রইস খাঁ

ছবি : সুধীর চ্যাটার্জি

বিলায়েতখানি ঢঙের এই অসাধারণ তৈরি তরুণ সেতারবাদকের শিল্পের অগ্রগতি এক পর্যায়ে এসে আটকে গিয়েছিল। এখন বিলায়েৎ খাঁর কাছে উন্নত পর্যায়ের তালিম ভাল ভাবে পেলে তাঁর ইমদাদখানি ঘরানার একজন দক্ষ প্রতিনিধি হিসাবে এই ঘরের ঐতিহ্য একবিংশ শতাব্দীতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার ভাল সম্ভাবনা আছে। ইনি ছাড়া ওয়াহেদ খাঁর নাতি, শহীদ পরভেজ আছেন যিনি এই ঢঙে ভাল বাজান।

কাজেই ইমরৎ (একবিংশ শতাব্দীতে তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়বেন) বুধাদিত্য শহীদ পরভেজ নিশাৎ ও ইরশাদের মাধ্যমে [illegible] ভবিষ্যতে একবিংশ শতাব্দীতে বিরাজ করবে।

আর সেই শতাব্দীতে [illegible] মহত্বপূর্ণ শিল্পী হিসাবে থাকবেন সেই সময়ের প্রবীণ সরোদবাদক আমজাদ আলী খাঁ [illegible] আজ উন্নতির নতুন নতুন স্তরে উঠছেন।

বুধাদিত্য মুখোপাধ্যায়

ছবি : সুধীর চ্যাটার্জি

তিনি যদি তাঁর পুত্রদ্বয়কে ভাল তালিম দেন তাহলে তাদের মাধ্যমে গুলাম আলী বা গোয়ালিয়র ঘরানার বাজ একবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও পৌঁছে যেতে পারে।

মধ্যম শ্রেণীতে থাকবেন বেশ কিছু সেতার সরোদবাদক ও দু-একজন বিচিত্র বীণা বাদক। সারেঙ্গী বীণার বিষয় এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। ইমরাৎ পুত্র ইরশাদের মাধ্যমে অন্তত একটি উচ্চ মানের সুরবাহারও থাকবে। এছাড়া সম্ভবত যথেষ্ট সন্তুর ও হাওয়াইয়ান গিটার বাদক থাকবেন, কারণ এই যন্ত্রগুলি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য। সানাই বাঁশী ও বেহালার ক্ষেত্রেও তেমন সম্ভাবনাময় শিল্পী এখনও দেখা যাচ্ছে না যারা এখনকার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মান বজায় রাখবে।

সেতার-সরোদ সঙ্গীতের অতীত ও বর্তমান বিশ্লেষণ করে এই বোঝা গেল যে এই যন্ত্রের দুই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ঘরানারই ভবিষ্যৎ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল। বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী ও শিল্পসমৃদ্ধ আলাউদ্দীন ঘরানা এক শতাব্দীর মধ্যেই শেষ হতে চলেছে উন্নত স্তরে। তবে এখনও সময় ফুরিয়ে যায়নি। রবিশঙ্কর যদি তাঁর নানান ব্যস্ততার মধ্যে সেতারী তৈরি করার দিকে মন দেন—আমার বিশ্বাস আমাদের দেশে প্রতিভার অভাব নেই—তা হলে এই অসাধারণ বাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসা অসম্ভব হবে না। আলী আকবর স্থায়ীভাবে আমেরিকানিবাসী হয়ে যাওয়ায় তাঁর পক্ষে কিছু সম্ভব হবে বলে মনে করি না। যদি বর্তমান পরিস্থিতি না বদলায় তা হলে একবিংশ শতাব্দীতে উচ্চ স্তরে সেতারের ইমদাদখানী ঘরানা ও সরোদের গুলাম আলী ঘরানাই বহাল থাকবে। শেষ

এর মতই,
একই পরিধির মধ্যে
আপনার ফ্যানের গতি
কমানো-বাড়ানো
আপনার হাতেই—
একদম ঠিক।

রাইডার ফ্যান রেগুলেটর

নিখুঁত-নিবিড় গড়ন-কাজে সুনিপুণ।
আর সব ফ্যানেতেই লাগানো যায়।

ফ্যান ও এক্‌জস্ট ফ্যান, ডেসার্ট কুলার ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মোটর স্পীড কণ্ট্রোল। রাইডার রেগুলেটর যেকোনো ফ্যানে লাগানো তো যায়ই, সেইসঙ্গে কাজেও অতি চমৎকার। আঙুল দিয়ে নবটি সামান্য ঘুরিয়ে বা হেলিয়ে মনোমত পাখার গতি পেয়ে যাবেন, তাছাড়া, বিজলী খরচও ৪০% অবধি বাঁচানো। আপনারই হাতে।

আর সেইসঙ্গে রেগুলেটেরের আরো নির্ভরযোগ্য কাজ ও দীর্ঘকাল চলার ক্ষমতায় উপকৃত হবেন। আর এ সবেরই জন্যে রাইডার রেগুলেটর কি ভাবে আপনার সামনে হাজির হবে? এক নিখুঁত, নিবিড় ছোটখাট গড়নে, সুন্দর মুখের দর্শনে। কিংবা, আপনি যদি এর সুন্দর মুখটি আড়ালে আগলে রাখতে চান তো, আমাদের ফ্লাশ মডেলটি বেছে নিন আর শুধুমাত্র নবটিকেই দেখান।

যেদিকেই হোকনা কেন, চলবে আপনার অঙ্গুলি হেলনে।

Rider

এমন চমৎকার উপায়,
যা চমক জাগায়!

তবলা : সেকাল একাল

আশীষ চট্টোপাধ্যায়

মিয়া ও বিবি অর্থাৎ সুখী দম্পতি যে অন্তরঙ্গ সুরে কথোপকথন করে তাতে মাধুর্য থাকে, নিটোলত্ব থাকে, ছন্দ থাকে। এমন সুখময় ঘরে কেবল যে তারা নিজেরাই তৃপ্ত হয় তা নয়, অভ্যাগতও আনন্দ পায়। বাঁয়া ও ডাঁয়া যখন পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে এমন সুগম দাম্পত্যসুখে বাঁধা পড়ে তখনই তবলা সার্থকতা লাভ করে। কি লহরায়, কি সঙ্গতে সার্থকতা লাভের এটিই অপরিহার্য শর্ত।

একদা কথা প্রসঙ্গে উপমাটি ব্যবহার করেছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। এই যে প্রায়শ শোনা যায় অমুকের বাঁয়ার কাজ অসাধারণ, অমুকের আবার যত কারুকার্য ডাঁয়ায়, এর মানে এঁরা কেউই তবলাবাদক হিসেবে ষোল আনা সিদ্ধি লাভ করেননি।

জ্ঞানপ্রকাশের ব্যবহৃত উপমা এবং তার অভ্রান্ত-সংকেত চিরকালীন সত্য। এই সত্যটিকে ধ্রুব রেখেও তবলাবাদন রীতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে বাধ্য হয়েছে। প্রাচীন বোলবাণীগুলি অপরিবর্তিত আছে ঠিকই—এমন কিছু নতুন বোলেরও সৃষ্টি হয়নি যা সংখ্যা বা গুরুত্বের বিচারে উল্লেখযোগ্য। বদলেছে পরিবেশনার ঢং ও চরিত্র এবং প্রধানত সঙ্গতে।

ওস্তাদ আহমদজান থিরাকুয়া

পঁচিশ কি পঞ্চাশ বছর আগেকার তবলিয়া এবং হাল আমলের তবলিয়ার প্রস্তুতি, অভিজ্ঞতা মানসিকতা কোন একটি অব্যয় অনড় মানদণ্ডে বিচার করতে গেলে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাবে না। কারণ, সময়ের ব্যবধানে তবলা শিক্ষার পরিবেশ, সঙ্গীতানুষ্ঠানের আদল, তবলা সম্পর্কে সামাজিক ও তবলিয়ার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি আমূল বদলে গেছে। ফলে, তবলিয়ার মানসিকতা এবং. বাদনশৈলীও লক্ষণীয়রূপে ভিন্নতর হয়ে পড়েছে।

আগে হয়ত বা কিছু পরিমাণে, সঙ্গীতকলার প্রায় সবকটি শাখাপ্রশাখার মতো তবলাশিক্ষা ও চর্চার একটি বিশেষ নির্বাচিত কেন্দ্র ছিল—গুরুগৃহ। গুরুগৃহে বসবাস করে তাঁরই পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শিক্ষার্থীকে কঠোর নিয়মকানুন মেনে তাঁর অভীষ্টের পথে অগ্রসর হতে হতো। শিষ্যের একনিষ্ঠ সাধনা ও প্রতিভাস্ফুরণে পরিতৃপ্ত হয়ে আচার্য লোকসমক্ষে হাজির হবার অনুমতি দিলে তবেই শিষ্য স্বকীয় পরিচয়ে প্রতিষ্ঠালাভে ব্রতী হতেন। এমন কি, একাধিক গুরুর কাছে তালিম নেবার প্রথাও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল না। নিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘরানার জাতবদল হতো না। এর ফলে দুটি সুস্পষ্ট লক্ষণের দ্বারা যে-কোন তবলিয়ার গোত্রনির্ণয় সহজসাধ্য হতো : প্রথম তাঁর বাজনাই বলে দিত তিনি কোন্ ঘরানার বাজিয়ে। দ্বিতীয়, তাঁর হাতের কাজ জানিয়ে দিত কে তাঁর শিক্ষাগুরু।

প্রধানত অর্থনীতিক কারণে আচার্যালয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে শিক্ষাগ্রহণের রীতি কালক্রমে শিথিল হয়ে পড়ে। অন্তত পরিবারবহির্ভূত ছাত্রকে বিনা পারিশ্রমিকে অথবা সামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে স্বগৃহে আশ্রয় দিয়ে শিক্ষাকালে তার ভরণপোষণের দায়-দায়িত্ব নিয়ে গড়ে তোলা আর সম্ভব রইল না। এ কারণে ক্রমে ক্রমে গুরুগৃহের বাইরে নানা শিক্ষাকেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হতে থাকল। এই কেন্দ্রগুলির অবাধ অনর্গল দ্বারপথে উৎসুক শিক্ষার্থীর আনাগোনার বাধা গেল ঘুচে। ভাল হোক, মন্দ হোক, বাদনরীতিতে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল : ঘরানার প্রতি আনুগত্য শিথিল হল এবং কোন তবলিয়ার বাজনা শুনে তাঁর গুরুকে চিনে নেবার উপায় গেল প্রায় বন্ধ হয়ে। ঘরানার ঐতিহ্য আঁটসাঁট করে এখনও টিকিয়ে রেখেছেন কেবল সেই ঘরানাশ্রয়ী বংশোদ্ভূত শিল্পী। তাও সকলে নন। বংশবহির্ভূত তবলিয়ারা দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, ফারুখাবাদ, আজরাড়া, পঞ্জাব, বেনারস ঘরানা নিয়ে বাছবিচার করার প্রয়োজন মনে করেন না। যে যার সাধ্যমতো

আল্লারাখা — ছবি : সুধীর চ্যাটার্জী

কানাই দত্ত — আকাশবাণী-র সৌজন্যে

জাকির হোসেন ছবি সুবীর চ্যাটার্জী

কুমার বসু

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ আকাশবাণী-র সৌজন্যে

যত্রতত্র বিচরণ করেন এবং রুচিমাফিক মালমশলা সংগ্রহ করে আপন আপন ঝুলি ভরিয়ে নেন। ঘরানার এই মিশেল কখনও জগাখিচুড়ী শোনায় কখনও বা মনোরম সমন্বয়ের রূপ নেয়। বলা বাহুল্য, মিশ্রণের গুণাগুণ শিল্পীর প্রতিভা ও স্বীকরণশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

বললে অত্যুক্তি হবে না, সঙ্গতের ক্ষেত্রে তবলাবাদনরীতির একটি আদরণীয় পরিবর্তন ঘটেছে একালের বহু খ্যাতনামা গায়ক ও যন্ত্রবাদকের ঔদার্যগুণে। একদা মূল শিল্পী অর্থাৎ গায়ক বা সেতারী বা সরোদিয়া তবলিয়াকে আদৌ কোন প্রাধান্য দেবার প্রয়োজন বোধ করতেন না। সঙ্গত মানে শুধু ঠেকা দেওয়া। কোণঠাসা তবলিয়া আত্মগ্লানির ভারে যদি কখনও অসহনীয় পীড়াবোধ করতেন, তবে, আত্মলাঞ্ছনা লাঘবের উপায়স্বরূপ দ্বৈরথ যুদ্ধের পথ বেছে নিতেন। তবলায় ভারী ওজনদার চড়চাপড় মেরে এক ক্রুদ্ধ কোলাহলময় সংঘর্ষে নিজের জয়নিনাদ তুলতেন।

সঙ্গতিয়ার হাতে বোল-লয়-ছন্দ তেহাইয়ের নানা মজা সৃষ্টি হলে মূল শিল্পীর পরিবেশনাও যে সুখশ্রাব্যতার মানে উন্নীত হয় এই চেতনা অল্পে অল্পে প্রসার লাভ করে। এবং এর সুফলও দেখা দিতে থাকে। পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ, ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ, ওস্তাদ আমজাদ আলি খাঁ, পণ্ডিত ভীমসেন যোশী, বিরজু মহারাজ প্রমুখ প্রথিতযশা শিল্পীরা জাকির হোসেন, স্বপন চৌধুরী, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, সাফাত আমেদ খাঁ, রসিদ মুস্তাফা, সাবির খাঁ, গোবিন্দ বসু, কুমার বসু, সুখবিন্দার সিংয়ের মতো তরুণ তবলিয়াদের সঙ্গে নিয়ে বসতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। প্রতিভাবান নামী শিল্পীদের সঙ্গে বাজাবার সুযোগ পেয়ে তরুণ সঙ্গতিয়ারা আত্মোৎকর্ষসাধনে তৎপর হতে বাধ্য হচ্ছেন। তাল-লয়-ছন্দের বৈচিত্র্য, গতি ও পরিমিতির সমানুপাত, শব্দ নিষ্কাশনের মাধুর্য ইত্যাদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গুণ করায়ত্ত করার সংকল্পে আজকের তবলিয়া সতত সচেষ্ট। অবশ্য চড়চাপড় মেরে তবলা বাজাবার চেয়ে সূক্ষ্ম শাব্দিক অলঙ্করণ রচনার দিকে আর এক অতি বাস্তব কারণে ঝোঁক দেখা দিল—কারণটি হল মাইক্রোফোনের প্রবর্তন।

অনুষ্ঠানের আকৃতি-প্রকৃতির পরিবর্তনও তবলা বাদনরীতিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। অতীতে, এমন কি পঞ্চাশ বছর আগে পর্যন্ত অভিজাতদের আঙিনাতেই উচ্চমানের গানবাজনা অসূর্যম্পশ্যা হয়ে পড়ে ছিল। তখন ছোট আসরে কিন্তু তাবড়-তাবড় শিল্পী ও সমজদার শ্রোতার অতি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে তবলিয়াকে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে হতো। এতটুকু ত্রুটি বিচ্যুতি বেচাল হলে তৎক্ষণাৎ তীব্র কটু তিরস্কার। ফলে, একনিষ্ঠ তালিম ও দীর্ঘ রিয়াজের মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত এবং সতর্ক করে নেওয়া ভিন্ন উপায় ছিল না। গানবাজনা প্রকাশ্য গণআসরে সম্প্রসারিত হয়ে পড়ার ফলে শ্রোতৃসংখ্যার আধিক্য ঘটলেও তাৎক্ষণিক সমালোচনায় ঝলসে ওঠার মতো শ্রোতা বিরল হয়ে গেল। ফলে তালিম-রিয়াজের কাল দীর্ঘতর করে আত্মসংস্কৃত হবার প্রয়োজন আর অতটা অপরিহার্য রইল না। বরং চালাকির দ্বারা কিছু চটকদারি দেখিয়ে গণসমাবেশের বিরাট একটি অংশের কাছ থেকে হাততালি আদায় করার প্রবণতা বাড়তে থাকল। উপজ বা 'ইমপ্রোভাইজেসনের' ধুয়ো তুলে নানা কারসাজি দেখাবার কায়দা হাল আমলে এ কারণেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আবার বলি, কারোর কারোর হাতে কিছু কিছু ইমপ্রোভাইজেসন নিশ্চয়ই রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে – তবে কি, 'যে পারে সে আপনি পারে।' একবার এক মনোজ্ঞ সাক্ষাৎকারে পণ্ডিত রবিশঙ্কর ওস্তাদ আহমদজান থিরাকুয়াকে জিগ্যেস করেছিলেন, চলতি যুগের তবলিয়াদের কোনখানে কম আছে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় থিরাকুয়া বলেন, তালিম আওর রিয়াজ। প্রশ্নোত্তরে তিনি তাঁর পঁচিশ বছর ধরে গুরুর কাছে তালিম এবং দিনে ষোল ঘণ্টা অভ্যাসের কথা উল্লেখ করেন।

প্রসঙ্গত বলা যায় তবলার ব্যবহারিক উপযোগিতা স্বীকৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে চটকদারি দেখিয়ে ফায়দা তোলার মতলব আরো পুষ্টি লাভ করেছে। একদা বিশেষত বাংলাদেশে তবলাবাদন নিতান্তই নিন্দনীয় বিষয় ছিল। তবলা শিখে ভদ্রসন্তান উপার্জন করা তো দূরের কথা, সামাজিক সম্মান পর্যন্ত লাভ করতেন না। সে দুর্দিন বহুকাল ঘুচে গেছে। তবলা যেমন তার যথোচিত মর্যাদা আদায় করে নিয়েছে, তেমন পেশাদারী তবলিয়া তার উপার্জনের পথ সুগম করে নিয়েছেন। আর তবলাবাদনের কাঞ্চনকৌলীন্য প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মেই ব্যবসাদারি মনোবৃত্তি উদগ্র হতে থেকেছে। এরই ফলে সস্তায় বাজিমাৎ করার একটা ষড়যন্ত্র কারোর কারোর মাথায় দানা বেঁধে বসে।

মূষিক দৌড়ের উত্তেজনাময় ভাবসাম্যহীন

অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়   ছবি : তারাপদ ব্যানার্জি

কিষেণ মহারাজ

শামতাপ্রসাদ

অতি দ্রুত আধুনিক যুগে তবলা তার প্রাচীন ঐতিহ্যের নিগড় আলগা করে চলতে বাধ্য হয়েছে এবং হয়ত বা চলনে সময় সময় বিপথগামী হয়ে পড়েছে—এই পরিবর্তনে কতটা মন্দ হয়েছে, কতটা মঙ্গল তা চুলচেরা বিচার করার সামর্থ্য আমার নেই। তবে দু-একটা জিনিস সেকাল একালের আবহাওয়ার বিচারে বলা যেতে পারে। যেমন, লহরা বাজাবার চল কমে আসছে। লহরা বাজাবার ব্যাপারেও শৃঙ্খলক্রম মানা হয় না। যিনি যেটুকু পাকাভাবে হাতে তুলেছেন তিনি সেটুকুই বারবার দেখাতে অতিমাত্রায় আগ্রহী। অর্থাৎ কিনা সব রাস্তাই ঘুরে ফিরে সেই আমড়াতলার মোড়ে মিলতে চায়।

অনুসরণের চেয়ে অনুকরণপ্রীতিও বাড়ছে। এতে যথারীতি শিল্পী শিখছেনও কম, স্বকীয়তাও হারাচ্ছেন।

'তৈয়ার'-এর অর্থও অধুনা বদলে গেছে। আগে স্পষ্টতা ও সাফাই বা নিকাশ নিয়ে তবলিয়ার মাথাব্যথা ছিল। বর্তমানে 'তৈয়ার' মানে কে কত হাতে ঝড় তুলতে পারে—অর্থাৎ, গতিসর্বস্বতাই একটা সংস্কার হয়ে উঠছে।

পরিশেষে বাঙলায় তবলা চর্চা এবং বাঙালী তবলিয়াদের সম্পর্কে দু-চার কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি। প্রবন্ধটি যেহেতু বাঙলা ভাষাতে রচিত এবং বাংলারই এক প্রখ্যাত সাহিত্য-পত্রিকায় ঠাঁই পাচ্ছে, সেহেতু আমার বক্তব্যের একটা প্রাসঙ্গিকতাও আছে। বাংলায় তবলানুশীলনের প্রথম প্রসার ঘটান স্বর্গত মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। নিজের সন্তান হীরেন্দ্রকুমারকে ছাড়াও অভিজাত ঘরের বহু তরুণবয়স্ককে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিনা পারিশ্রমিকে তবলা শেখাতে উদ্যোগী হন। গঙ্গোপাধ্যায় পরিবার, বড়াল পরিবার (লালচাঁদ বড়াল), বসু পরিবার (অনাথনাথ বসু) প্রমুখ কলকাতার কয়েকটি বিশিষ্ট সঙ্গীতপ্রেমী পরিবারের উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় তবলাবাদনের চর্চা উত্তরোত্তর প্রসারিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে লক্ষ্ণৌর খলিফা আবেদ হোসেনের কাছে পাকাপোক্ত তালিম নিয়ে হীরেন্দ্রকুমার (হীরুবাবু) পিতার উত্তরাধিকার অনুযায়ী সার্থক শিষ্য গড়ার কাজে প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। অর্থ নয়, পুরস্কার নয়, কেবল অনুরাগের প্রেরণায় নিজের সাধনলব্ধ শিক্ষা বিস্তারের এমন নজির বাস্তবিক দুর্লভ। ঠিক একই পথের পথিক এই পরিবারের আর একজন অসাধারণ গুণী শিল্পী কৃষ্ণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (নাটুবাবু)। কি বাদক, কি শিক্ষক, এই দুই ভূমিকায় আত্মপ্রচার বিমুখ এই মানুষটির তুলনা নেই।

তবু তখনও কলকাতা তথা বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে বাঙালী তবলিয়ারা প্রায় অনাহূত হয়ে রইলেন। বহিরাগত তবলিয়ারাই দাপটে বিরাজ করতে লাগলেন। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ তবলা শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করার পর দৃশ্যপট ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে লাগল। জ্ঞানপ্রকাশের প্রধান আচার্য ফারুখাবাদ ঘরানার ওস্তাদ মসীত খাঁ। তবে তাঁর সাংগীতিক চিন্তাভাবনা, পরীক্ষানিরীক্ষা এমন বহুমুখী ও গভীর যে কোন বিষয়েই অনুদার অথবা রক্ষণশীল হওয়া ওঁর স্বভাবসম্মত হয়নি। সুতরাং বিভিন্ন ঘরানার গুণীজন যথা ফিরোজ খাঁ আজিম খাঁ, টনিবাবু (ওঁর প্রথম শিক্ষাগুরু), নবদ্বীপ ব্রজবাসী (খোল), বিপিন ঘোষের (পাখোয়াজ) কাছেও জীবনের নানা পর্যায়ে তালিম নেন। এই প্রাজ্ঞ উদার ও সুদক্ষ শিক্ষাগুরু আপন উৎসাহে বাংলার বহু তবলিয়াকে হাতে পিঠে গড়ে জাতে তুলে দিয়েছেন বললে অত্যুক্তি হবে না। আজ বাংলা কেন, সারাভারত, এমন কি আন্তর্জাতিক আসরেও জ্ঞানপ্রকাশের ছাত্ররা তবলিয়া হিসেবে আপন মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত। এঁদের তালিকায় সবাগ্রে নাম করতে হয় প্রয়াত কানাই দত্তর। আজও যাঁরা স্বমহিমায় উজ্জ্বল তাঁরা হলেন নিখিল ঘোষ, শ্যামল বসু, শঙ্কর ঘোষ, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ বসু প্রমুখ।

এখন প্রশ্ন হল, বাঙালী তবলিয়ারা যশ অর্থে বলীয়ান হয়ে উঠেছেন ঠিকই কিন্তু তাঁরা কি তবলা চর্চার মান আরো পরিশীলিত করে ভবিষ্যতের হাতে তুলে দিয়ে যেতে পারবেন? এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহের অবকাশ আছে। প্রথমত খ্যাতিমান এবং সম্পন্ন হয়ে ওঠার পর গুরুর সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ ক্রমান্বয়ে ক্ষীণ হতে শুরু করে। ভাষান্তরে অনুষ্ঠানের ডাকে সাড়া দিতে দিতে গুরুর কাছে গিয়ে নূতন কিছু সংগ্রহের অবকাশ যায় কমে। একই কারণে রিয়াজের ঘাটতি হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত নিজের প্রতিষ্ঠালাভের পর সার্থক শিষ্য ও উত্তরসূরী গড়ে তোলার কাজেও খুব অল্প তবলিয়াই মনোনিবেশ করছেন। সব ফাঁক ভরাট না হলে পুনর্মূষিকের দুর্ভাগ্য এড়ানো ভবিষ্যতে কঠিন হবে।

এই গোষ্ঠী বহির্ভূত আরও কয়েকজন সম্ভাবনাময় তরুণ শিল্পীর নিশ্চয়ই নামোল্লেখ করা যায় যেমন, সমীর চট্টোপাধ্যায়, বিমল রায়, অসিত পাল, অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ■

বিনোদন ১৯৮৬

বিশেষ আকর্ষণ

সারথির সারথি ☐ **মতি নন্দীর** দুর্দান্ত ক্রীড়া উপন্যাস। এক ফাইটার ফুটবলারের অসাধারণ আলেখ্য ; মাঠ এবং ব্যক্তিজীবনের সমস্যাকে যে ক্রমাগত ড্রিবল করে চলেছে খেলোয়াড়ী মানসিকতায়। ফুটবলারের এমন আধুনিক চিত্রায়ণ বাংলা উপন্যাসে প্রথম।

ব্রাজিল ☐ খেলাকে কেন্দ্র করে **দিব্যেন্দু পালিতের** একটি আকর্ষণীয় গল্প।

সেনচুরির অপেক্ষায় দেওধর ☐ একটি টেস্ট না খেললেও যার নামে ট্রফি চালু আছে—ভারতীয় ক্রিকেটের সেই ঋজু ব্যক্তিত্ব দেওধরের সঙ্গে **রূপক সাহার** দীর্ঘ আকর্ষণীয় সাক্ষাৎকার।

আধুনিক জীবনের সঙ্গে খেলার এক অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ। ময়দান থেকে হেঁসেল সর্বত্রই এখন এর যাতায়াত। সেই কথাটি স্মরণে রেখেই এবারে আমাদের নিবেদন—খেলা। সাহিত্যিক থেকে শুরু করে ক্রীড়া বিশেষজ্ঞ, খেলোয়াড় সকলের কলমেই এবার—খেলা। কোন একটি বিশেষ বিষয়ের উপর জোর নয়, বিষয়-বৈচিত্র্যই এবারের বিনোদনের বৈশিষ্ট্য। ফুটবল-ক্রিকেট থেকে পর্বতারোহণ—তাস-দাবা পর্যন্ত নানা বিষয়ের উপর বিশিষ্ট আলোচনা, সঙ্গে উপন্যাস, গল্প, রসরচনা এবং অন্তরঙ্গ আলোচনা। লেখায়-রেখায় এক জমজমাট সংগ্রহযোগ্য আয়োজন।

খাটে বসে খেলা ☐ একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক **সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের** অম্লমধুর রসরচনা।

আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ☐ ভারত তথা এশিয়ার সোনার মেয়ে **পি· টি· উষার** কলমে তাঁর জীবনে ট্র্যাক ও ট্র্যাকের বাইরে সম্মুখীন হওয়া বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বীদের একটি সজীব ও আকর্ষণীয় বিশ্লেষণ।

মাঠভর্তি দর্শকদের কথা মনে রেখে পাতাভর্তি ছবি।

বড়দিনে প্রকাশিত হবে।

এর সঙ্গে সরস এবং তথ্যে ভরপুর একগুচ্ছ রচনা।

লিখছেন—প্রদীপ ব্যানার্জী ☐ অজয় বসু ☐ পঙ্কজ রায় ☐ মানালি বেঙ্গসরকার ☐ আখতার আলী ☐ গুরবক্স সিং ☐ রীতা সেন ☐ চুনী গোস্বামী ☐ রাজু মুখোপাধ্যায় ☐ অরিজিৎ সেন ☐ শঙ্করলাল ভট্টাচার্য ☐ দুলেন্দ্র ভৌমিক ☐ মধুজিৎ মুখোপাধ্যায় ☐ শিশির ঘোষ ☐ বিকাশ মুখোপাধ্যায় ☐ মুকুতা মুখোপাধ্যায় ☐ রতন চক্রবর্তী ☐ প্রশান্ত ভট্টাচার্য ☐ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ শান্তনু ঘোষ ☐ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ গৌতম ভট্টাচার্য ☐ বিষেণ সিং বেদী এবং আরো অনেকে।

দাম : ২০·০০ টাকা রেজিঃ ডাকযোগে : ২৩·২০ টাকা

ওস্তাদ
আমজা
আলির স
একটি দি

রাত সাড়ে এগারো। দিল্লিতে শীতের বেশ আমেজ লেগেছে। ভাবছি ওস্তাদজী ঘুমিয়ে পড়লেন না কি! ফোন বাজছে তো বাজছেই। ওপাশে কেউ রিসিভার তুললেন। সরোদের মধুর টুংটাং। যিনি ধরেছিলেন, তিনি বললেন, ঠারিয়ে। পরক্ষণেই মৃদু, পরিশীলিত কণ্ঠস্বর—আমজাদ। কথা হল। সকাল আটটায় বড়া খাম্বা রোডে মডার্ন স্কুলে দেখা হবে।

দিল্লি কলকাতার মতো মরে যায়নি। বাড়ছে, বড় হচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে ততই ঝকঝকে হচ্ছে। তার ওপর ওই সময়ে গোর্বাচেভ আসছেন বলে, সাজাও সাজাও রব পড়ে গেছে। মডার্ন স্কুল বিশাল স্কুল। ঝকঝকে বাড়ি, তকতকে লন। মিউজিক হলে রিহার্শাল চলেছে, কনসার্টের। আমজাদ আলি খাঁ-র পরিচালনায়। ঘর ভর্তি ছেলেমেয়ে। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান উপচে পড়ছে বাইরে। একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন ওস্তাদ আমজাদ। গাঢ় রঙের সার্জের শেরোয়ানি আর পাঞ্জাবিতে রূপবানের রূপ আরও খুলেছে। এক পাশে আমাকে একটা ছোট চেয়ার দেওয়া হল। বসে বসে শুনতে লাগলাম ছোটদের কনসার্ট। ইউনিসেফের প্রতিষ্ঠা বর্ষের অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হবে এই জুনিয়ার কনসার্ট।

বসে আছি। শুনছি। চা খেয়েছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়লেন আমজাদ-সহধর্মিণী শুভলক্ষ্মী। লাল টকটকে শালোয়ার আর কামিজে সকাল রাঙা। সর্ব অর্থেই সহধর্মিণী। গৃহিণী, সখা ও সচিব। আমজাদ

পরে বলেছিলেন 'শিল্পীর জীবনে গৃহশান্তির ভীষণ প্রয়োজন। আমার জীবনে সেই শান্তি এনে দিয়েছেন আমার স্ত্রী।' শুভলক্ষ্মী এক সময় খুব ভালো নাচতেন। রুক্মিনী আরুণ্ডেলের শিষ্যা ছিলেন। শুভলক্ষ্মী পরে আমায় বলেছিলেন, 'আমজাদ ইজ এ হোপলেস হাজব্যান্ড, বাট অ্যাজ এ ম্যান হি হ্যাজ নো প্যারালাল।' অসীম ধৈর্য আমজাদের। সামান্য বাজাতে জানে এই রকম ছেলে মেয়েদের ইউনিসেফ কনসার্টের জন্যে তালিম দিয়ে চলেছেন তো চলেছেন। কোথাও ভুল হলে আবার শুরু করছেন শুরু থেকে। এক সময় বাইরে এলেন একটু বিশ্রামের জন্যে। এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন, বছর তিরিশ আগে। স্মৃতি ভেসে আসছে। ফিরোজ শা রোডের হাটমেন্ট থেকে বালক আমজাদ সাইকেল চালিয়ে স্কুলে আসছেন। কে তখন জানতো সেই আমজাদ, এই আমজাদ হবেন। শিল্পীর ইচ্ছে হল, স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে একটা ছবি তোলাবেন। আমাদের ফোটোগ্রাফার বিবেক দাস, তিনি আবার পা ভেঙে বসে আছেন। মবি ডিকের ক্যাপটেনের মতো, প্লাস্টার করা পা নিয়ে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে একের পর এক ছবি তুলতে লাগলেন।

সবুজ লন। চারপাশে সিজন ফ্লাওয়ারের চারা, তাজা হয়ে উঠেছে। বড় বড় গাছের ছায়া এইবার শুয়ে পড়তে চাইছে। শীতের সূর্য পশ্চিমে ঢলছে। আমজাদ বলছেন, আমি শুনছি, কনসার্ট হল থেকে আসছে মহলার শব্দ। পৃথিবী আর আগের মতো নেই। আমরা এখন জেট-যুগ, পারমাণবিক যুগে বাস করছি। শিল্পী, সাহিত্যিক, চিত্রকর কেউই আর রমাপ্রাসাদে বসে শুধুমাত্র শিল্পসাধনা করে বাঁচতে পারবে না। সকলকে সব কিছু করতে হবে। প্রতিযোগিতার দুনিয়া। আমি বাইরের জগতের প্রতি দিনের বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতার কথা তেমন ভাবি না। সে তো আছেই। প্রতিযোগিতা আমার ভেতরে। যেমন ওই একই রাগ মালকোষ কত রকম ভাবে পেশ করা যায়। দরবারীর শ্রী আরও কি ভাবে ফেরানো যায়। অনবরতই নিজের সঙ্গে নিজেরই প্রতিযোগিতা চলেছে। সঙ্গীতজগতের অন্যান্যদের কথা ভুলে যান। তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা নেই। প্রতিযোগিতা আমার মনের সঙ্গে, আঙুলের সঙ্গে। সব চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল মালকোষ, দরবারী, রাগ, রাগিণী। তাদের অনন্ত চাহিদা, অনন্ত দাবি। কাল রাতে যে ভাবে পরিবেশন করেছ, আজ রাতে আমার রূপ আরও ভালো দেখতে চাই।

বারো বছর বয়েস থেকে আমি বাজাচ্ছি। কলকাতার সেই সব আসরের স্মৃতি আজও আমার মনে আছে। এখনও সঙ্গীতপ্রেমীরা আমার বাজনা শুনছেন, ইয়ে ভগবান কি বড়ি কৃপা হায় জী। নতুন কথা আমি কি বলব, আমার চেষ্টা আমি ছাড়িনি, আমি আমার শিল্পের ব্যাপারে ভীষণ সিরিয়াস। সংগীতই আমার জীবন। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের মজা হল রাগ রাগিণী যখনই পরিবেশন করো, যতবারই করো, সব সময় নতুন। প্রতিবারই নতুন মালকোষ, নতুন দরবারী, নতুন দুর্গা।

সঞ্জীব : চলন এক, পর্দা এক, রাগরূপও এক। প্রতিবারই নতুন হয় কি ভাবে? তান, তোড়া, ঝালার গুণে!

আমজাদ : রাগ-রূপ, আরোহী, অবরোহী সবই এক, তফাৎ হয় কোয়ালিটির, তফাৎ হয় মুডের। সব সময় মুড পাল্টায়, কোয়ালিটি বদলে যায়। সংগীত তখনই সংগীত যখন তা সংগীত গুণান্বিত। মিউজিক ইজ দি নেম অফ কোয়ালিটি, নট গ্রামার, নট ঝালা, নট আলাপ নট তান। মিউজিক ইজ নট দি নেম কোয়ান্টিটি—কই ওস্তাদ মালকোষ ছয় ঘন্টা বাজায়া। ছ ঘণ্টায় কি করেছে! কোয়ালিটি কি করেছে! ফেকনেওয়ালি হ্যায় কি রাখনেওয়ালি। শুনকর ভুলনেওয়ালি হ্যায়, ইয়াদ রাখনেআলি হ্যায়। আমিও কলকাতার ফাংশানে একা এক রাত বাজিয়েছি; কারণ অনেকের ধারণা, ফ্যাশানও বলতে পারেন, যেতনা লম্বা বাজাওয়ে উতনে বড়া ওস্তাদ। সেই সময় এই রকম একটা হুজুগ উঠেছিল, আর আমারও বয়েস কম ছিল। যেতনা দের বাজাও উতনি বড়ে পণ্ডিত। এ যেন সাইকেল চালানো। চব্বিশ ঘণ্টা সাইকেল চালিয়েছে, আটচল্লিশ ঘণ্টা সাইকেল চালিয়েছে। গাইয়ে বাজিয়েদের জীবনে কত রকমের উৎপাত যে আসে! পাবলিক চাইছে। পাবলিক ভাল বাজনা চায়। হুজুগ তৈরি হয় অন্যভাবে। সংগীতজ্ঞরা নিজেদের অশান্তি অনেক সময় নিজেরাই মনে মনে তৈরি করে ফেলেন। অনেকের ধারণাই হয়ে গেল, বাজনার সময় যত বাড়াতে পারবেন মানুষ তত বেশি দিন তাঁকে মনে রাখবেন। The longer they play people will remember him even longer.

[আমজাদের হাসিটি ভারি সুন্দর। মিষ্টি প্রাণখোলা হাসিতে মাঠ ভরে গেল।]

সঞ্জীব : আপনার প্রিয় রাগ হল দরবারী?

আমজাদ : হ্যাঁ, দরবারী, মালকোষ, দুর্গা, বাগেশ্রী। জনতার যা প্রিয় রাগ, আমারও সেই রাগ প্রিয়। আমি তো জনতা থেকে আলাদা নই।

সঞ্জীব : আচ্ছা, রাগ, রাগিণীর এক একজনের কি এক এক মুড? যেমন দরবারী, বাগেশ্রী বিষণ্ণ, মালকোষ রুদ্র?

আমজাদ : রাগের কোনও মুড নেই। মুড হল তাঁর, যিনি বাজাচ্ছেন। মুড নির্ভর করে জীবনের টেম্পোর ওপর। আমি যখন দৌড়চ্ছি তখন আমার এক টেম্পো, আমি যখন বসে আছি চুপচাপ তখন আমার আর এক টেম্পো। একই মানুষের জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন মেজাজ। গতি পাল্টালে মেজাজও পাল্টে যাবে। শাস্ত্রে বলেছে বটে, এই রাগে বিষণ্ণতা ওই রাগে বীর রস, সেই রাগে চপলতা, বলে, তবে আমি মানতে রাজি নই। শাস্ত্রকার, জ্ঞানী, গুণী, ঋষি সন্ন্যাসী রাগরাগিণী সম্পর্কে অনেক মতামত প্রকাশ করে গেছেন। তাঁদের প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা। তবু আমি আমার নিজের মতে চলতে চাই। চলে আসছি। আর সেইটাই আমার রোগ। আমাকে নিয়ে অন্যের সমস্যাও। আমি মনে করি যে কোনও রাগ, যে কোনও সময় বাজানো যায়, তাতে যে কোনও মেজাজ আনা যায়। নির্ভর করছে বাজানোর ওপর।

সঞ্জীব : সকালের রাগ, সন্ধ্যার রাগ, রাত গভীরের রাগ, এ সব কি মানার দরকার আছে? না এক ধরনের গোঁড়ামি, এক ধরনের বাড়াবাড়ি।

আমজাদ : হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানতে হবে। বেসিকেলি আমি খুব ট্র্যাডিশনাল, পিওরিস্ট। আমি ভাবি, সোচ্চার ভাবনা, নিজের সঙ্গে তর্ক করি, তার মানে এই নয়, শাস্ত্র মানব না, যথেচ্ছাচার চালিয়ে যাবো। আমি প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে একটা চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছি কি ভাবে নিজেকে আরও, আরও, আরও উন্নত করা যায়। একটা রাগের ভেতর থেকে কত রকমের সম্ভাবনা বের করা যায়!

অনবরতই নিজের সঙ্গে নিজেরই প্রতিযোগিতা চলেছে। সঙ্গীতজগতের অন্যান্যদের কথা ভুলে যান। তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা নেই। প্রতিযোগিতা আমার মনের সঙ্গে, আঙুলের সঙ্গে। সব চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল মালকোষ, দরবারী, রাগ, রাগিণী। তাদের অনন্ত চাহিদা, অনন্ত দাবি। কাল রাতে যে ভাবে পরিবেশন করেছ, আজ রাতে আমার রূপ আরও ভালো দেখতে চাই। মজা হল, রাগ রাগিণী যখনই পরিবেশন করো, যতবারই করো, সব সময় নতুন। প্রতিবারই নতুন মালকোষ, নতুন দরবারী, নতুন দুর্গা।

আমার নিজের ভেতর যে সব ত্রুটি আছে, কি ভাবে সেই ত্রুটি দূর করা যায়।

সঞ্জীব : ওস্তাদজী, রাতের রাগ, দিনের রাগ, এই শ্রেণীবিভাগ যে কত সত্য, তার পরীক্ষা, অন্ধকার অডিটোরিয়ামে, যেখানে রাত কি দিন বোঝার উপায় নেই, সব একাকার, সেখানে সকালের অনুষ্ঠানে মধ্যরাতের রাগ পরিবেশন করা যাবে কি ?

আমজাদ : করা যাবে না কেন ? যাবে। তবে ব্রেক ফাস্টের সময় ডিনার, সকাল সাতটার সময় বিরিয়ানি ! সকালে দরবারী ও মুড নেহি আয়ে গা। উত্তর ভারতের মার্গ-সঙ্গীতে সময় আমরা মানি। যে সময়ের যে রাগ, সেই সময়ে না গাইলে ঠিক জমে না। তবে দক্ষিণ ভারত এই নিয়ম মানে না। যে কোনও সময় যে কোনও রাগ গাইতে পারে। গাওয়া যায়।

দূরে মাঠের পথে কে একজন হেঁটে চলেছেন। আমজাদ সায়েব মুকেশ, মুকেশ বলে ডেকে দ্রুত সেই দিকে এগিয়ে গেলেন। যেতে যেতে বললেন, বিকেল সাড়ে চারটের সময় বাড়িতে বসা যাবে। বড় সুন্দর বাড়ি। শিল্পীর সাধনার উপযুক্ত। পরের পর্যায় শুরু হল তাঁর বাড়িতে।

আমজাদ : *সময় ! সময় কি ভাবে পাল্টে যায়। দিন কেমন দিনে দিনে বদলে যাচ্ছে।* সঙ্গীতের জগতে, মার্গ সঙ্গীতের জগতে এখন এমন এমন কমিউনিটির ছেলেরা আসছে, যারা আগে ব্যবসা ছাড়া অন্য কিছু বুঝত না, যেমন মাড়োয়ারি কমিউনিটির ছেলেরা সরোদ শিখতে আসছে। হুজুগ নয়, শিখবো বলেই আসছে। নিষ্ঠার সাধনায় ফলও পাচ্ছে। মাড়োয়ারিরা এখন আর শুধু ব্যবসায় নয়, ইনকামট্যাক্সের অফিসার হচ্ছে, বড় কোম্পানির একজিকিউটিভ হচ্ছে, অধ্যাপক হচ্ছে। একেই বলে দিন-বদল। শিফ্ট। শিফটিং টাইম। সঙ্গীতের মোনোপলি, ব্যবসার মোনোপলি, মোনোপলির যুগ আর নেই। ব্যবসা মানে মাড়োয়ারি, ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক মানে ওস্তাদদের পরম্পরা, এই ধারাটা সময় ভেঙে দিচ্ছে। এই যে বসে রয়েছে আমার শাগরিদ, ইনকা নাম হ্যায় নিকারাস জালান। মাড়োয়ারি। আগে মাড়োয়ারি গান শুনতো, বাজনা শুনতো। এখন শেখার উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে আসছে। সময় কা পরিবর্তন।

সঞ্জীব : সাহিত্যের দিকে এখনও তেমন আসেনি।

আমজাদ : আ যায়েগা। এই জালান পরিবারে সঙ্গীত ঢুকেছে। অনেকেই শিখছে। শ্রদ্ধার সঙ্গে শিখছে। শো-পিস হিসেবে নয়। এ খুব ভালো লক্ষণ। সময় চলতে চলতে আজ ছিয়াশি সাল। সঙ্গীতের এটা পিক পিরিয়ড।

সঞ্জীব : পিক পিরিয়ড না পিরিয়ড অফ ডিক্লাইন।

আমজাদ : পিক টাইম। ইয়ঙ্গার জেনারেশান, উঠতি বয়সের ছেলেরা মার্গ সঙ্গীতের বিশাল ভক্ত হয়ে উঠছে। অসম্ভব শ্রদ্ধা। এমন আগে ছিল না। হুজুগ নয়। প্রকৃত ভালবাসা। পঁচিশ, তিরিশ বছর আগে যে ঢেউ এসেছিল তাতে হয়তো পশ্চিমী প্রভাব ছিল এই শ্রদ্ধার ভাব আন্তরিক। এই জেনারেশান নিজেদের নিজের দেশের মাটিতে খুঁজে পেয়েছে। এ দেশের উচ্চাঙ্গ সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছে। উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠানে তাদের সংখ্যা দেখলে আনন্দ হয়। আশা জাগে। বিটিলসদের প্রভাব, পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাব থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পেরেছে। দে হ্যাভ রিয়েলাইজড দেয়ার রুটস। গত বিশ বছর ধরে আমি

আমার প্রস্তাব, স্কুলে ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক, ক্ল্যাসিক্যাল ড্যান্স কমপালসরি করা হোক। এর মানে এই নয় যে সব ছেলেমেয়েই গাইয়ে বাজিয়ে আর নাচিয়ে হয়ে যাবে। এর উদ্দেশ্য হল জীবনের শুরুতেই দেশের ছেলেমেয়েদের ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত, নৃত্য, শিল্পকলা, সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করা। সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বড় হয়ে ওঠার সুযোগ করে দেওয়া।

নিজে শিশু, কিশোর, যুবক, স্কুলের ছাত্র, কলেজের ছাত্রদের ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের ভাবধারায় আকর্ষণের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমার মনে হয়েছে, এ আমার কর্তব্য, আমার ব্রত। কেউ আমাকে বলেনি। এর জন্যে কেউ আমাকে পারিশ্রমিকও দেয় না। তো ভগবান কি কিরপা হ্যায় কি আজ রেজাল্ট মিলা। আমার সেই চেষ্টার ফল আমি পেয়েছি। দেখা দেখি বহু প্রতিষ্ঠান, ছাত্রসংগঠন আজ এগিয়ে এসেছে। ইউনিসেফের চল্লিশতম প্রতিষ্ঠা দিবসে, ১১ ডিসেম্বর, বিশাল এক অনুষ্ঠান হবে। সেই অনুষ্ঠানের জন্যে প্রাণপণ খেটে আমি এক চিলড্রেন্স অর্কেস্ট্রা তৈরি করেছি। এই অর্কেস্ট্রার সব শিশু ও কিশোর আমি স্কুল থেকে নির্বাচন করেছি। একেবারে আনকোরা ছেলের দল। কোনও সঙ্গীতজ্ঞ পরিবারের ছেলে আমি নিইনি। শুধু দেখে নিয়েছি তারা গাইতে কি বাজাতে পারে কি না ! আপনি নিজেই দেখলেন, কেমন দল তৈরি হয়েছে। সরোদ, সেতার, ভায়োলিন, ড্রামার। একটি মেয়েকে দেখলেন, পশ্চিমী ফ্লুট বাজাচ্ছে। মৃদঙ্গম আছে। সে আজ আসেনি।

সঞ্জীব : মৃদঙ্গমে বাঙালী ?

আমজাদ : *না, দক্ষিণী। তবে এই দল তৈরি করতে গিয়ে আমার খুব দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হল।* মডার্ন স্কুলের বড়াখাম্বা শাখায় প্রায় তিন হাজার ছাত্র। তাদের মধ্যে অনেকেই গান গাইতে পারে, দিস সং, দ্যাট সং। কারণ গান গাওয়া কণ্ঠের ব্যাপার, ন্যাচারাল গিফ্‌ট। আর শিশুরা হল ব্লটিং পেপারের মতো। যা শোনে তা-ই গাইতে পারে : কিন্তু কোনও কিছু বাজাতে পারে মাত্র পাঁচজন। তাও সেতার। আমার দুই শিশুপুত্র ছাড়া সরোদিয়া নেই, সরোদ বড় কঠিন বাজনা। এই তরুণ বাদক খুঁজতে গিয়ে আর আমাদের বিভিন্ন স্কুলের অবস্থা দেখে আমার মনে হয়েছে আমাদের সরকারী পরিকল্পনার কোথাও একটা গলতি রয়ে গেছে। শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির যোগ থাকছে না। আর্ট অ্যান্ড কালচার সম্পর্কে অদ্ভুত একটা অবহেলার ভাব। কাগজে কলমে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক আর ড্যান্সের জন্যে। সে টাকায় কার কি হচ্ছে আমি জানি না। স্কুল লেভেলে কোনও কাজ হচ্ছে না। স্কুলে বিভিন্ন বিষয়ের জন্যে যেখানে ৫০ জন শিক্ষক সেখানে মিউজিক টিচার মাত্র একজন ; আর সেই একজনকে সবই শেখাতে হবে গিটার, সেতার, সরোদ, ভায়োলিন এমন কি ভোকাল। সম্ভব হলে তাঁকে নাচও শেখাতে হবে। তাঁকে হতে হবে জ্যাক অফ অল ট্রেড। ফলে শিক্ষার মান কি হবে সহজেই অনুমান করা যায়। চাকরি পাবার জন্যে মিউজিক টিচারকে সবই কিছু কিছু জানতে হয়। সে জানায় ছাত্র ছাত্রীর শিক্ষা কিছুই হয় না। তারা উৎসাহও পায় না শিখতে আসার। বড় করুণ অবস্থা। অনেক দিন ধরে সভা সমিতিতে বার বার আমি এই অবস্থার কথা বলছি। সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছি।

আমার প্রস্তাব, স্কুলে ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক ক্ল্যাসিক্যাল ড্যান্স কমপালসরি করা হোক। এর মানে এই নয় যে সব ছেলেমেয়েই গাইয়ে বাজিয়ে আর নাচিয়ে হয়ে যাবে। এর উদ্দেশ্য হল জীবনের শুরুতেই দেশের ছেলেমেয়েদের ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত, নৃত্য, শিল্পকলা, সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করা। সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বড় হয়ে ওঠার সুযোগ করে দেওয়া। অভিভাবকদের সে সময় নেই, সে অবস্থা নেই। এ

দায়িত্ব হল স্কুলের। অন্য শিক্ষার সঙ্গে স্কুলকে শেখাতে হবে কালচার। কালচার অন্যভাবে শেখানো যায় না। কালচারের পরিবেশে ছেলে-মেয়েদের শৈশব থেকেই রাখতে হয়। আর এই কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ। মাস্টার মশাইরা নিজের নিজের বিষয় শেখানো নিয়েই ব্যস্ত। এর বাইরে তাঁদের সময় কোথায় যে বলবেন, ছেলেদের শেখাবেন, সকালে ঘুম থেকে ওঠো। গুরুজনকে নমস্কার করো। ভগবানকে প্রণাম করো। আইসক্রিম বেশি খেয়ো না। শিক্ষা তো শুধু কেতাবী শিক্ষা নয়, সুস্থ, সুন্দর জীবনের জন্যে বড় ছোট অনেক কিছুই শেখার আছে। সুন্দর মন চাই, সুস্থ শরীর চাই। এ এমন এক সময়, যে শিক্ষকরা কমার্শিয়াল হতে বাধ্য। ছেলেদের ভবিষ্যৎ না ভেবে, নিজেদের ভবিষ্যৎ, কেরিয়ার নিয়েই মহা ব্যস্ত। একমাত্র ভাবনা, মাইনে কি করে বাড়বে। একসেপসান আছে, তবে সাধারণ চিত্রটা এই রকমই। ছেলেদের ওপর ভালবাসা নেই, বিশ্বাস নেই। দায়িত্ব নেই। খুবই দুঃখজনক পরিস্থিতি।

সঞ্জীব : আচার আচরণ, সহবত শেখাবার কোনও ব্যবস্থা নেই।

আমজাদ : হাঁ, সহবত। স্কুলে হিউম্যান বিহেভিয়ার শেখাবার কোনও ব্যবস্থা নেই। স্কুলে মিউজিক কমপালসারি করলে আর একটা ভালো হবে, যে সব ছেলে লেখাপড়ায় তেমন ভালো নয়, অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার যাদের কমজোরি তারা মিউজিসিয়ান হতে পারবে, ড্যানসার হতে পারবে। যারা লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট তাদের গান, বাজনার যে কোনও একটা শেখা থাকলে আরও ভালো। তারা গানের লাইনে যেতে পারবে, পেন্টার হতে পারবে। মোটকথা কিছু করতে পারল না বলে, ক্রিমিন্যাল হবার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে। ডাকাতি করে খেতে হবে না। হতাশায় ড্রাগ অ্যাডিকট হতে হবে না। বিকল্প একটা জীবিকার দরজা খুলে যাবে। বড় ওস্তাদ না-ই বা হল। সৎ নাগরিক তো হতে পারবে। সামনে একটা আশার আলো ফেলতে হবে। স্কুল সে-কাজ করছে না। স্কুল দেশের সংস্কৃতি তৈরি করতে পারছে না। ভবিষ্যৎ জীবিকার পথ খুলে দিতে বাধ হচ্ছে পদে পদে। আমাদের পরিকল্পনায় তেমন দরদ নেই। আর পড়া লেখাই তো দুনিয়ার সব নয়। অন্য আরও দিক আছে। আরও অনেক উপায়ে মানুষ বাঁচতে পারে। কোটি কোটি টাকা ঢেলে সরকার কল-কারখানা বসাচ্ছেন। কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে বেকার সমস্যা সমাধানে, কিন্তু কলাকারদের বেকারত্ব দূরীকরণের জন্যে কোনও পরিকল্পনাই নেই। তাদের চাকরি দেবার কোনও ব্যবস্থাই নেই। স্কুলে মিউজিক কম্পালসারি হলে বহু কলাকার চাকরি পাবেন। সঙ্গীতকারদের কি শোচনীয় অবস্থা আমার চোখে পড়ে। মিউজিক টিচার, ডান্স টিচার। কেউ আমার সহপাঠী, কেউ আমার বন্ধু। সাইকেলে চড়ে এ বাড়ি ওবাড়ি টিউশানি করে বেড়াচ্ছে। কষ্ট করে ওস্তাদের কাছে দিনের পর দিন গাইতে বা বাজাতে শিখে, শেষে এই সম্মান। বাড়িতে গেলে হেঁকে বলে, মাস্টার এসেছে। একটা সময় ছিল যখন মিউজিসিয়ানকে বলা হত গুরুজী, ওস্তাদজী, পণ্ডিতজী। গুরুজী ওস্তাদজী, পণ্ডিতজীকা জমানা থা। আব গুরুজী সে বনগায়ে মাস্টারজী। সাইকেল চেপে বেচারা মাস্টারমশাই বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন। কোনও শ্রদ্ধা নেই সম্মান নেই। যাকে শেখাতে গেছেন, সে হয়তো বেড়াতে গেছে। মাইনে কাটা যাবে মাস্টার মশাইয়ের। যা কিছু হবে সব এসে

এইবার এসেছে 'পার লেসনস'-এর যুগ। ধরুন, আজ একজন এসে আমার কাছে রাগ ইয়ামনের কিছুটা শিখলেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা আদায় করে নিলুম। এই হল আমেরিকান সিসটেম অফ লারনিং। কারুর ওপর কারুর কোনো বিশ্বাস নেই। ভারি মজার ব্যবসাদারী খেলা। গুরু চাইছেন শিষ্যকে এক লেসনসে বেশি দেবেন না, বেশি দিলে পরের লেসনসে আর আসবে না। শিষ্য চাইছে যতটা পারি আদায় করে নিই, তা হলে কাল আর টানতে হবে না। গুরু শিষ্যে দড়ি টানাটানির কসরত।

পড়বে মাস্টারমশাইয়ের ঘাড়ে। মাস্টারমশাইয়ের টাকা নিয়ে টানাটানি। কমারশিয়ালিজমের হাইটে উঠেছি আমরা। মাস্টারজী কমিউনিটির করুণ দশা। একটা সময় ছিল যখন গুরুপূর্ণিমার দিন শিক্ষার্থী শুদ্ধ বস্ত্র পরে গুরুকে প্রণামী আর দর্শনী দিয়ে শিষ্য হত। সে যুগ গেল। এরপর এল মাসমাইনের যুগ। গুরু আর গুরু রইল না হয়ে গেল চাকুরে, এমপ্লয়ী। এইবার এসেছে, 'পার লেসনস'-এর যুগ।

সঞ্জীব : পার লেসনস মানে ?

আমজাদ : ধরুন, আজ একজন এসে আমার কাছে রাগ ইয়ামনের কিছুটা শিখলেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা আদায় করে নিলুম। এই হল আমেরিকান সিসটেম অফ লারনিং। কারুর ওপর কারুর বিশ্বাস নেই। এই ভাবেই আমেরিকায় ভারতীয় রাগ সঙ্গীত শেখানো হয়। আমার বন্ধুদের মধ্যে যাঁদের যাঁদের আমেরিকায় স্কুল আছে, তাঁরা সকলেই এই পদ্ধতিতে চালিয়ে যাচ্ছেন। আমেরিকা আর ইওরোপে চলেছে পার লেসনস-এর শিক্ষা-পদ্ধতি। ভারি মজার ব্যবসাদারী খেলা। গুরু শিষ্যে দড়ি টানাটানির কসরত। গুরু চাইছেন শিষ্যকে এক লেসনসে বেশি দেবেন না, বেশি দিলে পরের লেসনসে আর আসবে না। শিষ্য চাইছে যতটা পারি আদায় করে নিই তাহলে কাল আর টানতে হবে না। গুরু ভাবছেন, যাক আজ যা দিয়েছি তার পয়সা তো আদায় করে নিয়েছি। আমাদের সমাজে, আমাদের সংস্কৃতিতে এর চেয়ে খারাপ আর কি ঘটতে পারে। আমরা এমন একটা জীবন-ধারা বেছে নিয়েছি যার মূল সুর হল পারস্পরিক অবিশ্বাস। টাকা, ব্যবসাদারী, দেনাপাওনা, সব মিলে আমাদের এই অবস্থায় এনে ফেলেছে। ওই যে মাস্টারজীদের কথা বলছিলাম। ছেলে বাপের সঙ্গে লন্ডনে বেড়াতে গেল। মাস্টারমশাইয়ের মাইনে কাটা গেল। কেন ? ছেলে ফূর্তি করবে, মাস্টারমশাই বেচারা না খেয়ে মরবে ! মানুষই নিজের নীচতা আর ব্যবসাবুদ্ধি দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিজেদের চূড়ান্ত অবিশ্বাসের মধ্যে এনে ফেলেছে। গুরু-শিষ্য সম্পর্কের বদলে, দেনা-লেনার সম্পর্ক। কয়েক ঘণ্টার রিলেশান।

সঞ্জীব : বাঙলার সেই প্রবাদ। ফেল কড়ি মাখো তেল।

আমজাদ : হাঁ। মাইনে কাটাকাটির ব্যাপার নেই। শেখানো মাত্রই টাকা ফেলে চলে যাও।

সঞ্জীব : এই ভাবে কি উচ্চাঙ্গ সংগীত শেখা যায় ! গুরুর কাছে নাড়া বেঁধে, পায়ের তলায় বসে, দিনের পর দিন সাধনা আর রেওয়াজ করে যা আয়ত্ত করার কথা, তা কি এইভাবে হবে ! আপনি কি এইভাবে শিখেছিলেন ?

আমজাদ : যে যুগের যেমন ধারা। সবই বদলে যায়। নতুন পদ্ধতিকে মেনে নিতে হয়। উপায় কি ? গুরু শিষ্য প্রথা থেকে এসে গেল স্কুল, কলেজ, সঙ্ঘ, সংগঠন। চালু হল ফি-সিসটেম। মাইনে দেবার প্রথা। এই প্রথাতেই গা ঢাকা দিয়েছিল, ভালো আর মন্দ। ভালোর দিকটা হারিয়ে গেল, বেরিয়ে এল মন্দ। এখন এমন দাঁড়িয়েছে, কারুর ওপর কারুর বিশ্বাস নেই। ছাত্র শিক্ষককে বিশ্বাস করে না। শিক্ষক বিশ্বাস করেন না ছাত্রকে। কলেজে শুরু হয়ে গেল ধর্না, ঘেরাও। ভাইস চ্যানসালার বেচারা কামরায় বসে আছেন ঘেরাও হয়ে। ভয়ে বেরোতে পারছেন না। ছাত্ররা ধরে জুতো পেটা করবে। এই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে আধুনিক মানুষের

জীবন। এই হল এ দেশের এখনকার পড়া লেখার চেহারা, সঙ্গীত শিক্ষায়তনেরও একই হাল। সেই গৌরব, সেই ঐতিহ্য, সেই নিয়মের বাঁধন আর নেই। সেখানে যা ঘটছে তা না ঘটলেই ভালো হয়। তবে গুরু শিষ্য পরম্পরা সঙ্গীত জগতে এখনও টিকিয়ে রাখা হয়েছে। পুরো সমাজকে তো আমি ঠিক করতে পারব না, আমি আমাকে ঠিক করতে পারি, ঠিক রাখতে পারি।

সঞ্জীব : তার মানে প্রকৃত ওস্তাদ হতে হলে, প্রাচীন গুরু-শিষ্য প্রথার মধ্যে আসতেই হবে। ঠিক তো?

আমজাদ : বিলকুল ঠিক। আমি নিজে গুরু-শিষ্য প্রথায় বিশ্বাসী। যে সঙ্গীতের জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে চায়, আমি তাকেই শিষ্য করি। তাকেই আমি শিখাই। আমার সমস্ত অর্জিত জ্ঞান বিদ্যা তার সাধ্যমত দেবার চেষ্টা করি। আমার নিজের কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। আমার পিতা, পিতামহের ধারাই আমি অনুসরণ করে চলেছি। আমার বাবা বলতেন, জ্ঞান নিজের কাছে ধরে রাখতে নেই, ভাগ করে নিতে হয়। আমার পিতা, আমার গুরু যেমন আমার হাতে তাঁদের বিদ্যা দিয়ে গেলেন, আমিও সেই রকম তুলে দিয়ে যাবো আমার উত্তরপুরুষের হাতে। আমি আমার জ্ঞান বিক্রি করব না। আমার পিতার ওই আদর্শই আমি অনুসরণ করে চলেছি। একজন, দু'জন প্রকৃতই যারা নিষ্ঠাবান, সংগীতে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে চায়, আমি তাদেরকেই নির্বাচন করে তালিম দিয়ে থাকি। আমি কখনও তাদের কাছে কোনও পারিশ্রমিক চাই না। এ আমার রীতি বিরুদ্ধ।

সঞ্জীব : যাদের মধ্যে ট্যালেন্ট দেখেন তাদেরই শেখান?

আমজাদ : ট্যালেন্ট একটা ফ্যাক্টার ; তবে ডেডিকেশান তার চেয়েও বড়। আমি ডিভোটেড ছাত্রদের বিনা পারিশ্রমিকে শেখাই। ছাত্রদের কাছ থেকে আমি টাকা গ্রহণ করি না।

সঞ্জীব : প্রতিভা ছাড়া কি কিছু হয়।

আমজাদ : হয়, সাধনায় হয়। আমি নিজে সাধনায় বিশ্বাসী। নিজেকে উৎসর্গ করতে পারলে সব হয়। আমি নিজে, আই পার্সোন্যালি বিলিভ ইন দি গড অলমাইটি। ঈশ্বরের কৃপায় সবই হয়। তব কৃপা হি...কেয়া হ্যায় ও শ্লোক

সঞ্জীব : তব কৃপা হি কেবলম্...

আমজাদ : খোদা, আল্লা, গড, কিরপা, বাস্, সব সম্ভব। আমি নিজে আমার পাশে ঈশ্বরের উপস্থিতি টের পাই।

সঞ্জীব : এই মন, এই সৎ গুণ আপনি আপনার পিতা পিতামহের কাছ থেকে পেয়েছেন। আর আপনার কাছ থেকে পেয়েছে আপনার দুই শিশুপুত্র।

আমজাদ : আমি তাঁদের আশীর্বাদ পেয়েছি। আর আমার ছেলেরা যে কালে জন্মেছে, বড় সাংঘাতিক কাল। মূল্যবোধ পাল্টেছে, হু হু করে ঘটছে সামাজিক পরিবর্তন। আমার কাল আর আমার ছেলেদের কালে আকাশ-পাতাল তফাৎ। ছেলেবেলায় আমাদের জীবন কত সহজ, সরল ছিল। যা পেয়েছি তাই পরেছি, যা জুটেছে তাই খেয়েছি। আমাদের সামনে আমাদের বাবা একটা আদর্শ, একটা মূল্যবোধ রাখতে পেরেছিলেন। আমরা যে শাসনে মানুষ হয়েছি আমার ছেলেরা সে শাসনের সঙ্গে পরিচিত নয়। আমার পিতাজীর কোনও ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ছিল না। যা পেতেন, সব খরচ করে ফেলতেন। সঞ্চয় কাকে বলে, একালের মানুষের মতো

যে সঙ্গীতের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে চায়, আমি তাকেই শিষ্য করি। তাকেই আমি শিখাই। আমার সমস্ত অর্জিত জ্ঞান, বিদ্যা তার সাধ্যমত দেবার চেষ্টা করি। আমার নিজের কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। আমার পিতা, পিতামহের ধারাই আমি অনুসরণ করে চলেছি। আমার বাবা বলতেন, জ্ঞান নিজের কাছে ধরে রাখতে নেই, ভাগ করে নিতে হয়। আমার পিতা, আমার গুরু যেমন আমার হাতে তাঁদের বিদ্যা দিয়ে গেলেন, আমিও সেই রকম তুলে দিয়ে যাবো আমার উত্তরপুরুষের হাতে।

জানতেন না। ভবিষ্যতের কথা একেবারেই ভাবতেন না। উপার্জনের সবটাই চলে যেত দানধ্যানে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দিতেন। দরিদ্রদের দিতেন। ছাত্রছাত্রীদের দিতেন। সেকালের প্রায় সব ওস্তাদদেরই এই ধরনের মন ছিল। আর একটা জিনিস ছিল, বিরল গুণ, তাঁরা যা পেতেন, যতটুকু পেতেন, তাইতেই মহা সন্তুষ্ট, মনে করতেন জীবনের সব পাওনা পাওয়া হয়ে গেছে।

সঞ্জীব : কন্টেন্টমেন্ট?

আমজাদ : হ্যাঁ, কন্টেন্টমেন্ট। একবার প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাবাকে মোগল গার্ডেনে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমিও সঙ্গে আছি। শুনছি দু'জনের কথা। রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাবাকে জিজ্ঞেস করছেন, 'খাঁ সাহেব! সব ঠিক হ্যায় তো? তকলিফ তো নেহি হ্যায়?' বাবা বললেন, 'না, সব ঠিক হ্যায়। আপকা কৃপা হ্যায়, ভগবানকা কৃপা হ্যায়। লেকিন রাগ দরবারী হিন্দুস্থানসে চলা যায়গা'

'ক্যায়সে?'

'হাম রাগ দরবারী, উস্তাদ ওয়াজির খাঁ সাব, হামারা গুরু থে, উনসে হাম পিওর দরবারী শিখা হ্যায়, লেকিন আজকে লোক, বহত কেয়াবলেস তরিকা সে দরবারীকা ইস্তামাল করতে হেঁ। আপ তো প্রেসিডেন্ট হ্যায়, আপ ইসমে কুছ করিয়ে নেহি তো রাগ দরবারী হিন্দুস্থানসে চলা যায়গা।'

প্রেসিডেন্ট বুঝতে পারছেন না, ওস্তাদজী কার কথা বলছেন। রাগ দরবারী কোন চিজ। প্রেসিডেন্ট বাবাকে আশ্বাস দিলেন,

'নেহি নেহি খাঁ সাহেব আপ ঘাবড়াইয়ে নেহি। হাম জরুর কুছ করেঙ্গে।'

আজ ইফ হি উইল পাস এ রেজলিউশান ইন দি পারলামেন্ট, যে দরবারী এই সি রহ চাহিয়ে, এই সি বাজানা চাহিয়ে।

তখন রাজেন্দ্রপ্রসাদ বললেন, 'অওর কুছ বলিয়ে।'

পিতাজী বললেন, 'অওর নেহি সব ঠিক হ্যায়, খুদাকা আশীর্বাদ হ্যায়। আদাব।'

বাড়ি ফিরে আসার সময় মনে হয়েছিল, পিতাজী প্রেসিডেন্টের কাছে কত কি চাইতে পারতেন, টাকা, জমিজায়গা, গাড়ি বাড়ি। তাঁর তো কিছুই ছিল না, কিচ্ছু না। সঙ্গীতেই তিনি মগ্ন ছিলেন। রাগ রাগিণীই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। যেমন ভালো গাইতে পারতেন, তেমনি ভাল বাজাতে পারতেন। সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন তিনি। এমন হয়েছে, পিতাজীর কাছে কেউ হয়তো এসেছেন অন্য কাজে। পিতাজী তাঁকে গান শোনাচ্ছেন। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি। দু ঘন্টা হয়ে গেছে। বেচারা চুপ করে বসে আছেন। কিছুই বলতে পারছেন না। গানের পর গান চলেছে। তখন আমি সাহস করে পিতাজীর কানে কানে বললাম, 'সাব, ইনকে ভি বাত তো শুন লিজিয়ে, কিস লিয়ে আয়ে।'

তখন পিতাজীর খেয়াল হল। গান বন্ধ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'হাঁ হাঁ বলিয়ে ভাই সাব কিস লিয়ে আঁয়ে?' তখন সেই ভদ্রলোক হয় তো বললেন, আমার ছেলে, কি মেয়ের বিয়ে। 'কার্ড দেনে আয়ি।'

সঞ্জীব : অসাধারণ। কি অপূর্ব চরিত্রের মানুষ ছিলেন তিনি। হাউ নাইস!

আমজাদ : এই হল যথার্থ শিল্পীর চরিত্র। সব সময় সংগীতের ভেতরে। বাইরে আসতে কষ্ট হত। এখনকার কালে মানুষ কাজের কথা ছাড়া, একটাও অন্য কথা বলতে চান না। বরং বলবেন, কাজের কথা

বলো। বলে চলে যাও। সময় নষ্ট কোরো না। আমার পিতাজী কোনও ব্যাঙ্ক ব্যালেনস রেখে যান নি।

সঞ্জীব : সময় সত্যিই কেমন যেন হয়ে গেছে। মন মেজাজ, ভাব ভাবনা সব যেন কেমন যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে। ফাস্টলাইফ...

আমজাদ : হ্যাঁ, দ্যাটস দি রাইট ওয়ার্ড, ফাস্টলাইফ।

সঞ্জীব : মনে আছে, পনের কুড়ি বছর আগে কলকাতার ক্ল্যাসিক্যাল ফাংশানের কি প্রাণ ছিল। তখন এত ভালো ভালো হল ছিল না, ওই ইউনিভারসিটি ইনস্টিট্যুট, সময় সময় স্টার কি রঙমহল, পরে মহাজাতি সদন, বড় বড় ওস্তাদ—কোথা দিয়ে, কি নেশায় রাত কেটে যেত ? সেই মেজাজটা যেন হারিয়ে গেছে ? সেই আমেজ আর নেই।

আমজাদ : হাঁ হাঁ, খুব মনে আছে, দোজ ওয়ার দি ডেজ। গ্লোরিয়াস ডেজ অফ ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক। আমি শুনেছি, হলে জায়গা নেই, সারা রাত ট্রাম লাইনে বসে লোক গান শুনছে। টিকিট কেনার জন্যে আগের রাতে ট্রাম লাইনে কাগজ বিছিয়ে শুয়েছে, সকালে লাইনে দাঁড়িয়েছে। সো দি টাইম হ্যাজ চেঞ্জড। আমার পিতাজীর কথা আজকাল কেবলই মনে পড়ে। কি অসাধারণ মানুষ ছিলেন তিনি। আমি তাঁর উত্তরপুরুষ। সঙ্গীতের যে সম্পদ তিনি আমার কাছে রেখে গেছেন, যে আশীর্বাদ, তার কাছে টাকাপয়সা, জুড়িগাড়ি, ধন দৌলত কিছুই লাগে না। এই উত্তরাধিকারই আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাঁর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে পথ চলেছি। তাঁর আশীর্বাদেই সেই কোন শৈশবেই আমি উপার্জনে নেমেছি। আমার পিতাজীর মতোই অর্থে আমার কোনও আসক্তি নেই। আমি প্রকৃত অর্থে শিল্পী হতে চাই। ভালো, ভালো, আরও ভালো হতে চাই। আমার পিতাজী বলতেন, সঙ্গীতে কোনও শেষ কথা নেই। কেউ দাবি করতে পারেন না, আমি গ্রেটেস্ট, সবসে বড়া। ইট ইজ দি টাইম, সময় বড়া বলবান।

সঞ্জীব : সময়ই হল সব চেয়ে বড় বিচারক। বেস্ট জাজ।

আমজাদ : ঠিক বিচারক নয়, আমি বলতে চাইছি, সাইক্‌ল অফ টাইম, প্যাসেজ অফ টাইম। আজ যাঁর সভায় পঞ্চাশ হাজার শ্রোতা, বিশ বছর পরে দেখা গেল, তাঁর আর সে আকর্ষণ নেই। তাঁর পাশে কেউ নেই। সেই পঞ্চাশ হাজার শ্রোতার আসরে অন্য কোনও শিল্পী তালি পাচ্ছেন। আজ আমি, কাল আর কেউ, পরের দিন আর কেউ। আসর খালি যায় না, যেতে পারে না। সময়ই বসায়, সময়ই তুলে ফেলে দেয়। সময় বড়া বলবান।

সঞ্জীব : উস্তাদজী, শৈশবের কথা মনে পড়ে ?

আমজাদ : পড়ে ? শৈশব কি ভোলা যায় ? বসে বসে ভাবি শৈশবের গোয়ালিয়ারের কথা। গোয়ালিয়ারেই আমার জন্ম। আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন গোয়ালিয়ারের মহারাজার কোর্ট-মিউজিসিয়ান। মহারাজা সিন্ধিয়ার সভা সংগীতকার। মাধবরাও সিন্ধিয়া এখন রেলমন্ত্রী। আমি ভাবি আর আমার মধ্যে অদ্ভুত একটা অনুভূতি আসে, গোয়ালিয়ারে তানসেন জন্মেছিলেন। তানসেনের পুণ্যভূমিতে আমার জন্ম। তানসেনের সমাধির কথা ভাবি। কি অবহেলায় পড়ে আছে। আমরা তানসেনের কথা বলি। সিনেমা হয়। সেই ছবি লোকে ভিড় করে দেখতে ছোটে ; অথচ সেই শ্রেষ্ঠ কলাকারের সমাধির কি শোচনীয় হাল ! সরকারকে কত বার বলেছি, আজও একটা উপযুক্ত স্মৃতিসৌধ তৈরি হল

পশ্চিমবাংলা, মহারাষ্ট্র আর দক্ষিণ ভারতে সংগীতের কত বড় ট্র্যাডিশান তৈরি হয়ে আছে ? সে কি আজকের ! ট্র্যাডিশান তো একদিনে তৈরি হয় না। গোয়ালিয়ারের মাটি মার্গ সঙ্গীতের প্রতিভা বিকাশের অনুকূল ছিল। কিন্তু রাজনীতি, আমাদের সরকারী প্ল্যানিং এক অদ্ভুত ব্যাপার। গোয়ালিয়ারকে সংস্কৃতির দিক থেকে একেবারে পিষে ফেলা হল। কোটি কোটি টাকা ঢেলে তৈরি হল ভূপাল। যার কোনো কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। সবই সেখানে ভাড়া করা।

না। গোয়ালিয়ার থেকে দিল্লি। এখন যেখানে কামানী হল, রবীন্দ্রভবন, ওইখানেই ছিল ফিরোজ শা হাটমেন্ট। ওইখানেই আমার ছাত্র জীবনের শুরু। আজ সকালে আমার স্কুল দেখিয়েছি। বড়াখাম্বা রোডে মডার্ন স্কুল। সাইকেলে চেপে স্কুলে আসতুম। সে ১৯৫৭ সালের কথা। ল্যান্ড অফ তানসেন থেকে দিল্লির ফিরোজ শা হাটমেন্টসে। কেন যে ওরা তানসেনের সুন্দর একটা স্মৃতি সমাধি করছে না ! সাজাহানকে আমরা সাড়ম্বরে আজও স্মরণ করি, তানসেন বিস্মৃত। কেন যে আমরা এই রকম !

সঞ্জীব : কত বছর বয়সে সরোদ শিখতে শুরু করলেন !

আমজাদ : পাঁচ কি ছ'বছর বয়েস থেকে শিক্ষার শুরু।

সঞ্জীব : প্রথম অনুষ্ঠান কত বছর বয়েসে ? শুনেছি খুব কম বয়সেই আসর করেছেন ?

আমজাদ : হ্যাঁ, দশ কি এগার বছর বয়সে আমি প্রথম বাজাই। সেই শুরু, আজও চলছে।

সঞ্জীব : কোন্ শহরে বাজিয়ে আপনি সবচেয়ে বেশি আনন্দ পান ? দিল্লি, কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ !

আমজাদ : কলকাতা। কলকাতার সঙ্গে আমার পরিচয় সেই ছেলেবেলা থেকে। তা ছাড়া কলকাতার মানুষ কত সমঝদার। ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিকের এমন কান আর কোন প্রদেশে আছে। শিল্পীকে সম্মান দিতে জানেন। শিল্পীর হাজার দফা, দু'হাজার দফা শোনার ধৈর্য রাখেন। মালকোষ যে ভাবে, যত ভাবেই হোক, কলকাতার শ্রোতার শোনার কান তৈরি। সব চেয়ে বেশি আসর তো কলকাতাতেই করেছি কলকাতার পর মহারাষ্ট্র। বোম্বাই নয়। পুনে, শোলাপুর, কোলাপুর, কর্ণাটক, হুবলী, ধারোয়ার। দক্ষিণ ভারতে বাজিয়েও আমি আনন্দ পাই। গত দশ বারো বছর দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে আমার যোগাযোগ বেড়ে গেছে।

সঞ্জীব : তার মানে এই তিন জায়গায় মার্গ সংগীতের একটা জমি তৈরি হয়েছে।

আমজাদ : হ্যাঁ, ট্র্যাডিশান। পশ্চিমবাংলা, মহারাষ্ট্র আর দক্ষিণ ভারতে সংগীতের কত বড় ট্র্যাডিশান তৈরি হয়ে আছে ? সে কি আজকের। আরও অনেক ঝকঝকে শহর তো আছে ; কিন্তু ট্র্যাডিশান তো একদিনে তৈরি হয় না। আরও অনেক নতুন শহর অনেক পুরনো শহরও আছে। অনেক লোকসংখ্যা, কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিকের ট্র্যাডিশান নেই। একটু আগে আমি গোয়ালিয়ারের কথা বলছিলুম। গোয়ালিয়ার এক সময় ছিল মার্গ সংগীতের পীঠস্থান। কত বড় বড় কলাকার সেখানে জন্মেছেন। আকবরের আমলে মিঞা তানসেন থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত। গোয়ালিয়ারের সঙ্গে তুলনা করা যায় অস্ট্রিয়ার। অস্ট্রিয়া আর জার্মানির আশপাশ অঞ্চলে কত ক্ল্যাসিক্যাল কমপোজার জন্মে গেছেন। বাখ, বেঠোভেন, ওয়াগনার, মোৎজার্ট। একে বলে মাটির গুণ। সেই গুণ গোয়ালিয়ারে ছিল। গোয়ালিয়ারের মাটি মার্গ সঙ্গীতের প্রতিভা বিকাশের অনুকূল ছিল। কিন্তু, রাজনীতি, আমাদের সরকারী প্ল্যানিং এক অদ্ভুত ব্যাপার। গোয়ালিয়ারকে সংস্কৃতির দিক থেকে একেবারে পিষে ফেলা হল। কোটি কোটি টাকা ঢেলে তৈরি হল ভূপাল। যার কোনো কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। সবই সেখানে ভাড়া করা। ভারত ভবনও তৈরি হল। ভাই যে-ভবনই বানাও, তার ভিতে সংস্কৃতির মাটি কোথায় ! উসকি নিচে জড় কেয়া হ্যায়, কুছ নহি। মাটি যদি ভাল না হয়, যতই গাছ বসাও, ফল কি হবে ? পয়সা বড় জিনিস। পয়সা আর পলিটিক্যাল

ইন্টারেস্টে নয়া ক্যাপিট্যাল ভূপাল তৈরি হয়ে গেল। আর গোয়ালিয়ার হয়ে গেল কাণা। সংস্কৃতির ওপর দিয়ে চালিয়ে দেওয়া হল বুলডোজার। রাজীবজীর কালচারাল ইন্টারেস্ট আছে। অনেক কিছু করছেন। দেখা যাক গোয়ালিয়ারের জন্যে কি করেন! তানসেনের স্মৃতি রক্ষার কি করেন! খুদা উন কি লম্বি উমর করে। অনেক কাজ করার আছে। অনেক কাজ করা উচিত ছিল, করা হয় নি। যেমন একটা কাজ অবশ্যই করা উচিত, বিখ্যাত কবি, লেখক, কলাকার, চিত্রকর, গাইয়ে, বাজিয়ে, নৃত্যশিল্পী, এঁদের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা। এঁরা যেখানে বসবাস করে গেছেন, সেখানে মেমোরিয়াল তৈরি করা। লোক যাবে, দেখবে, আমাদের মহান সংস্কৃতির ধারা অনুসরণ করবে।

সঞ্জীব: ওস্তাদজী সেকালের কলাকাররা খুব বড় খাইয়ে ছিলেন, খেতে ভালবাসতেন, গোলাম আলি খাঁ সাহেব, ফৈয়াজ খাঁ সায়েব। আপনিও কি ভোজন রসিক, আড্ডা রসিক?

আমজাদ: আমি নিজেকে খুব সিজনড করে নিয়েছি। যা পাই তাই খাই। এই নয়, যে এটা হলে চলবে না, ওটা হতেই হবে। সব ডিশেরই নিজস্ব স্বাদ আছে। বিরিয়ানী, কোর্মার এক স্বাদ, আবার লুচি, ভাজির আর এক স্বাদ। আমি নিজেকে একটা নিয়মে ফেলে দিয়েছি—আমার যা ইচ্ছে করে আমি তার উল্টোটা করি। আমাকে যা সব চেয়ে বেশি আকর্ষণ করে, আমি তার থেকে দূরে চলে যাই। আমি কোনও কিছুর দাস হতে চাই না। আমি বাঁচার জন্যে খাই, খাবার জন্যে বাঁচতে চাই না। আমার পূর্ব পুরুষ খেয়েই ফতুর। অদূরে এক মসজিদ থেকে সন্ধ্যার আজান ভেসে এল। ওস্তাদজী নীরব হলেন। ঠোঁটের কাছে চায়ের কাপ তুলেছিলেন। কাপ নামিয়ে রাখলেন। বললেন, এ বন্ধ হো যায়ে না, আপ কো জবাব দেতে হুঁ।

সঞ্জীব: আপনার কি মনে হচ্ছে, আপনার পিতাজী যেমন প্রেসিডেন্টকে বলেছিলেন রাগ দরবারী হিন্দুস্তানসে চলা যায়েগা, সেই রকম ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিকের পুরো ঐতিহ্যটাই কমার্শিয়ালিজমের ধাক্কায় দেশ ছেড়ে পালাবে না তো?

আমজাদ: হয় তো পালাবে না, তবে বাধা আসছে অনেক। পৃষ্ঠপোষণার অভাব হয় তো নেই, সরকার, বড় বড় বিজনেস হাউস প্রচুর সাহায্য দিচ্ছেন, তবু কোথায় যেন আটকাচ্ছে।

সঞ্জীব: শিক্ষার্থীদের ধৈর্য কমে গেছে। রাতারাতি ওস্তাদ হতে চায়, এটাই কি একটা কারণ!

আমজাদ: হাঁ, পেশেনস তো কমেছেই। কুইক রেজাল্ট চায়। কুইক রিটার্ন চায়। এখন গান বাজনার চেয়ে, নাচের দিকেই বেশি ঝুঁকছে। ভরতনাট্যম কথক। সে আবার কি রকম, গুরুজির ওপর চাপ, কত তাড়াতাড়ি গুরুজি শিষ্য, শিষ্যাকে স্টেজে নিয়ে যেতে পারেন! কি আশ্চর্য ব্যাপার!

সঞ্জীব: এখন তো আবার নাচ নাচের জন্যে নয়, ফিগারের জন্যে

আমজাদ: হাঁ, ঠিক বোলা। ঠিক বাত। ফিজিক্যাল একসারসাইজ, ফিগারকে লিয়ে। হ্যাঁ, একটু আগে যা বলছিলুম, কলাকারদের বাসস্থান সংরক্ষণ। লোপাট হয়ে যাবার আগেই সরকার অথবা প্রাইভেট হাউসের উচিত একটা কিছু করার। বড়ে গোলাম আলি সায়েব যে বাড়িতে থাকতেন, ফৈয়াজ খাঁ, ওঙ্কারনাথ, তারাপদ চক্রবর্তী, আমীর খাঁ সাহেব। আর হল, ক'জন

কোনো কলাকারই নিজেকে গ্রেটেস্ট বলতে পারেন না, সেই রকম সব কলাকারই নিজ নিজ ক্ষেত্রে গ্রেট। রাজা মহারাজার সভায় সব গুণীরই কদর ছিল। জনতার সভায় কদর পাবার শর্ত, জনতার মন ভরাতে হবে। বিচারের মাপকাঠিটা বড় বিপজ্জনক, জনতা যাকে গ্রহণ করবে সেই শিল্পী, তাঁরই বাজার, যাঁকে খারিজ করে দেবে তাঁর আর নিজস্ব সাধনা করা ছাড়া অন্য কোনো পথ থাকবে না, পরিচিতির, আত্মপ্রকাশের।

কলাকারের পরিচিতি পুস্তক আছে? যাঁরা লেখাতে পেরেছেন, পেরেছেন। যাঁরা প্রচারবিমুখ তাঁরা কি হারিয়ে যাবেন! একশো বছর পরে ইতিহাসটাই বিকৃত হয়ে যাবে। লোকে ভাববে, যাঁর নামে বই আছে তিনিই কলাকার বাকি যাঁদের কোনও প্রচার ছিল না, তাঁরা কেউ না। এ বড় সাংঘাতিক কথা। তদবির বাঁচবে, শিল্পী বাঁচবে না! কালচারাল মিনিস্ট্রির উচিত এক একবারে দশ দশ কলাকার ঠিক করে, তাঁদের সম্পর্কে বই লেখান। সঙ্গীতের যিনি যে শাখায় বিশেষজ্ঞ তাঁকে এক এক কলাকারের পেছনে পর্যবেক্ষণ আর অনুসন্ধানের কাজে জুড়ে দাও। আপনার দায়িত্ব বিসমিল্লা খাঁর, আপনার আলি আকবর। শিল্পীকে দিনের পর দিন দেখুন, জীবন অনুসন্ধান করুন, করে লিখুন। দেশে এত মিউজিকোলজিস্ট রয়েছেন, রিসার্চ স্কলার রয়েছেন, আর পরিকল্পনার অভাবে এত বড় একটা কাজ হবে না! সঙ্গীতের ইতিহাস অবহেলায় হারিয়ে যাবে! এক এক কলাকারের জিম্মাদারী এক এক স্কলারের হাতে দিয়ে দাও। এই সব শিল্পীদের জীবন, জীবন ভাবনা নিয়ে গবেষণা না করলে, কেমন করে জানা যাবে মার্গসঙ্গীতের বিবর্তন, সঙ্গীতসাধনার বিবর্তন। অতীতে কি ছিল, এখন কি হয়েছে। ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে! যাঁর প্রচার আছে তিনিই ইতিহাস হবেন আর যাঁর নেই তিনি ভেসে যাবেন, এ কেমন কথা! আমার জীবনদর্শন হল, লিভ অ্যান্ড লেট লিভ।

সঞ্জীব: ওস্তাদজী, আর যা ই হোক, একালে একটা ব্যাপার হয়েছে, মার্গ সংগীত রাজা মহারাজার জলসাঘর থেকে মুক্তি পেয়েছে। ক্লাস থেকে নেমে এসেছে মাসে। জনতার দরবারে আসন পেয়েছে। এটা একটা প্লাস পয়েন্ট।

আমজাদ: ভালো অবশ্যই হয়েছে, তবে সমস্যাও আছে। সব কালো মেঘেই যেমন সিলভার লাইনিং থাকে, সেই রকম সব রূপোলি মেঘেই থাকে ব্ল্যাক লাইনিং। আগেই বলেছি, কোনও কলাকারই নিজেকে গ্রেটেস্ট বলতে পারেন না, সেই রকম সব কলাকারই নিজ নিজ ক্ষেত্রে গ্রেট। রাজা মহারাজার সভায় সব গুণীরই কদর ছিল। জনতার সভায় কদর পাবার শর্ত, জনতার মন ভরাতে হবে। সব রুচিকে সন্তুষ্ট করতে হবে। বিচারের মাপকাঠিটা বড় বিপজ্জনক, জনতা যাকে গ্রহণ করবে সেই শিল্পী, তাঁরই বাজার, যাঁকে খারিজ করে দেবে তাঁর আর নিজস্ব সাধনা করা ছাড়া অন্য কোনও পথ থাকবে না, পরিচিতির, আত্মপ্রকাশের।

সঞ্জীব: তার মানে কমারশিয়াল হতে হবে। আগেকার মতো কে শুনলো, কে শুনলো না, গ্রাহ্য না করে, পাণ্ডিত্য প্রকাশ করলে চলবে না।

আমজাদ: কমারশিয়াল না হলেও মনে রাখতে হবে, আমি শোনাতে এসেছি। যাঁদের শোনাতে এসেছি তাঁরা যেন শোনেন। আসর পাণ্ডিত্য প্রকাশের জায়গা নয়। গ্রেটেস্ট হবার প্রয়োজন নেই, আর্টিস্ট হলেই হবে। হলে ফিফটি পারসেন্ট, টোয়েন্টি পারসেন্ট মানে আধাআধি না হলেও একের চার শ্রোতা হয়তো প্রথম এসেছেন। শিল্পীকে দেখতে হবে এই সব শ্রোতা যেন আবার আসেন। ইয়ে না হো কি ও উনকি জিন্দেগীকো আখরি পারফরমেনস হো। এমন না হয় যে শিল্পীর আসরে ধরে বেঁধে শ্রোতা আনতে হচ্ছে।

সঞ্জীব: তানকারি, লয়কারি, গিটকিরি সমেত সেকালের

মতো ভারি পরিবেশন অধিকাংশ শ্রোতাই হয় তো সহ্য করতে পারবেন না একালে।

আমজাদ : একালের আসরে যেটা প্রয়োজন তা হল সেনস অফ রিয়েলাইজেশান। কব খতম করে গা। দিস ইজ ভেরি ইমপরটেন্ট। শুরু তো করেছি, দেখতে হবে শ্রোতারা নিচ্ছেন কি না!

সঞ্জীব : সেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উক্তি, ওস্তাদ শুরু করেন কিন্তু শেষ করতে জানেন না।

আমজাদ : হাঁ, হাঁ দ্যাট ফেমাস আটারেন্স। ব্যালেনস থাকা চাই। আমার পিতাজী গুরু আমাকে বলতেন, রেওয়াজ করার জন্যে এক সংগীত। গ্রামারের প্রয়োজন শেখার জন্যে, গ্রামারের প্রয়োজন শেখানোর জন্যে। গ্রামার দিয়ে মানুষকে মুগ্ধ করা যায় না। আমার পিতাজী বলতেন যখন তুমি স্টেজে, তখন ভেবো না শ্রোতারা সব মূর্খ। কিছুই বোঝে না। বোকা। দ্বিতীয় কথা মনে রেখো, এক কনসার্টে সারা তালিম দেখাবার চেষ্টা কোরো না। উসি কনসার্টমে আপকো উতনা সারা তালিম মাত দেখা না। যা শিখেছো, সবই দেখাতে হবে এমন কোনও কথা নেই। তৃতীয় আর একটা কথা মনে রেখ, তুমি পরীক্ষা দেবার জন্যে বসোনি। এরপর, তোমাকে যে নির্দেশ দিচ্ছি। তা হল সবচেয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ। স্টেজে বসে শিল্পীকে যা তৈরি করতে হবে তা হল রাগের মেজাজ। সুরের মেজাজ। এর চেয়ে বড় আর কিছু নেই। 'ম্যয়' শুড মার্জ। 'আই', 'আই'। ফিনিশ দিস 'আই' ফার্স্ট।

সঞ্জীব : ইগো, ইগো

আমজাদ : ইগো কো মার্জ কর দোও উস মেলোডিকা অন্দর। রাগকে অন্দর। মুডকে অন্দর। উসমে ঘুস যাও।

সঞ্জীব : এ তো আমাদের ধর্মের কথা। সাধনার খুব উচ্চ মার্গের কথা।

আমজাদ : সঙ্গীত হাতের কাজ নয়, গলার কাজ নয় শুধু। অহংকে, রাগে, সুরে, মেজাজে মগ্ন করে, নিমজ্জিত করে, নিবেদন করে দাও নিজেকে। তখন আর নিজেব ধ্যানেই আসবে না, কি দেখাবো কি দেখাবো না, কি রেওয়াজ কার রেওয়াজ!

সঞ্জীব : সংগীতই ভগবান।

আমজাদ : সংগীতের পথেই ভগবানের কাছে পৌঁছনো যায়। এ এক যোগ, এক তপস্যা।

সঞ্জীব : এই মুহূর্তে আপনার শান্ত, সমাহিত, চেহারা, আপনার চোখ দেখে মনে হচ্ছে, আপনি উপলব্ধির একটা স্তরে পৌঁছেছেন, যে স্তরে ধর্ম মানুষকে পৌঁছে দিতে চায়। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, সংসারে থেকেও, সংসার থেকে আপনি অনেক দূরে।

আমজাদ : আমি ধার্মিক নই, আমি একজন সঙ্গীত সাধক মাত্র। তবে আমার জীবনে বেশ কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেছে, যে ঘটনায় আমার বিশ্বাস হয়েছে, ভগবান আছেন, খোদা আছেন।

সঞ্জীব : বলবেন, আপনার সেই অভিজ্ঞতার কথা?

আমজাদ : ভগবান আছেন, ঈশ্বর আছেন, অবশ্যই আছেন, আমরা সারেন্ডার করতে জানি না। আত্মসমর্পণের ক্ষমতা নেই। প্রখর বিশ্বাস নেই। আমরা ততটুকুই বিশ্বাস করি, যতটুকু না করলে নয়। যে বিশ্বাসে তিনি এসে আমাদের হাত ধরেন, সেই বিশ্বাস আমরা তৈরি করতে পারি না, চাই না। আমরা জানি, দুই আর দুয়ে চার। ভগবানের ইচ্ছা হলে দুই আর দুয়ে দশও হতে পারে। হান্ড্রেড ভি হো সেকতা

আমি খুব গোঁড়া পরিবারের ছেলে। আমার পিতাও খুব গোঁড়া ছিলেন। ভীষণ ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু ফ্যানাটিক ছিলেন না। ধর্মান্ধ ছিলেন না। আমি ধর্মান্ধদের মনে প্রাণে ঘৃণা করি। সব ধর্মেই বেশ কিছু ফ্যানাটিক আছেন। পিতা বলতেন আর আমিও বিশ্বাস করি, সব ধর্মের উদ্দেশ্যই হল, সৎ-সুন্দর মানুষ তৈরি। সব ধর্মের ঊর্ধ্বে আর একটি ধর্ম আছে, রিলিজান অফ হিউম্যানিটি। মানবধর্ম। ইনসানিয়াতকি মজব। আমার চেষ্টা হল সেই মজবে পৌঁছানো।

জিরো ভি হো সেকতা। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা এত ব্যক্তিগত এত গোপনীয় যে বাইরের কারুকে বলা চলে না। তবে আমি এখন জোর গলায় বলতে পারি, ঈশ্বরের হাতে, ঈশ্বরের পদতলে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করে দিতে পারলে, তিনি আমাদের সব দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। রক্ষা করেন। আপনি জানেন সঙ্গীতের জগতে, আর্টের জগতে কি ভীষণ পলিটিকস। এগোতে চায় ক'জন আর পেছন থেকে ল্যাং মারতে চায় ক'জন! কিন্তু শেষ কথাটা কি? যো ভগবান চাহেগা, যো খোদা চাহে গা ওহি হোগা। তবে জীবনের উদ্দেশ্য যেন পরিষ্কার হয়, নিষ্ঠার যেন অভাব না হয়। আমার যা লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যের দিকে এগোতে গিয়ে টলে না যাই। তাহলেই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো। অন্যকে টেনে ধরাই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয় তাহলে জীবন কোথায় গিয়ে পৌঁছবে বলা শক্ত। যাত্রা মাঝপথেই থেমে যাবে, জীবনের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মৃত্যুর পরেও যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না।

সঞ্জীব : আপনার এই সুন্দর জীবনদর্শনে, বিশ্বাসে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টানের ভেদাভেদ আছে বলে মনে হয় না!

আমজাদ : নেই। এই হল 'এসেন্স অফ লাইফ', প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে। রিলিজান, ফ্যানাটিসিজম, রিচুয়ালসের ঊর্ধ্বে চলে যেতে হবে। আমি খুব গোঁড়া পরিবারের ছেলে। আমার পিতাও খুব গোঁড়া ছিলেন। ভীষণ ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু ফ্যানাটিক ছিলেন না। ধর্মান্ধ ছিলেন না। আমি ধর্মান্ধদের মনে প্রাণে ঘৃণা করি। সব ধর্মেই বেশ কিছু ফ্যানাটিক আছেন। তিনি বলতেন আর আমিও বিশ্বাস করি, সব ধর্মের উদ্দেশ্যই হল, সৎ-সুন্দর মানুষ তৈরি। সব ধর্মের ঊর্ধ্বে আর একটি ধর্ম আছে, রিলিজান অফ হিউম্যানিটি। মানবধর্ম। ইনসানিয়াতকি মজব। আমার চেষ্টা হল সেই মজবে পৌঁছানো, ইনসানিয়াতকা মজব। এই হল আমার জীবনের উদ্দেশ্য। আমাদের লাইনে এমন অনেকে আছেন, যাঁরা চান, তাঁদের দরজাই খোলা থাক, অন্যের দরজা বন্ধ হয়ে যাক। বুঝতে পারলেন, এঁদের মতলব, যেইসি বিল্লি হোতি হ্যায়। বেড়ালের ওপর রিসার্চ করে জানা গেছে, বেড়াল চায় সকলের চোখ বন্ধ হয়ে যাক, শুধু বেড়ালের চোখ খোলা থাক। বেড়াল একাই খেয়ে যাবে। কিন্তু তা কি হতে পারে। ইট নেভার ক্যান হ্যাপন। যাঁরা এইরকম ভাবেন, তাঁদের মানসিকতাটা কি রকম! মজা তো এহি হ্যায় লিভ অ্যান্ড লেট লিভ। তুম ভি রহো, হাম ভি রহে।

সঞ্জীব : ওস্তাদজী আপনার জীবনের একটা দিনের কথা বলুন। সকাল থেকে রাত।

আমজাদ : পাঁচটায় উঠি। সামান্য যোগাসন করে, হাঁটতে বেরিয়ে যাই। দ্রুত ভ্রমণ। পাক্কা এক ঘণ্টা। আমাদের পরিবারে মোটা হয়ে যাবার প্রবণতা আছে। আমি তাই সাবধান। ফিরে এসে স্নান। নাস্তা। লাঞ্চের সময় পর্যন্ত রেওয়াজ। খাওয়া দাওয়ার পর সময় পেলে বিশ্রাম। বিকেলে ছেলে দু'জন স্কুল থেকে ফিরে এলে শেখাতে বসি। ছোটদের শেখাতে হলে ধৈর্য চাই। নারসারি ট্রেনিং-এর কায়দায় শেখাতে হয়। এত কম বয়েসে শেখাবার উদ্দেশ্য, ফান্ডামেন্টালটা ধরিয়ে দেওয়া। কি ভাবে জবাব দিতে হয়। টিভি দেখি, রেডিও শুনি। আগে খুব পার্টিতে যেতাম, এখন আর যাই না। আই হ্যাভ বিকাম ভেরি চুজি। সম্প্রতি আমি

লিখতে শুরু করেছি।

সঞ্জীব : নিজের জীবনী ?

আমজাদ : জীবন, সঙ্গীত সব মিলিয়ে মিশিয়ে, অনেকটা ডায়েরির ধরনে। প্রাচীন মানুষের মহানুভবতার কথা। গত দু'বছর ধরে লিখছি। মানুষের নোংরামির কথা এড়িয়ে চলি।

সঞ্জীব : ইংরেজিতে ?

আমজাদ : হ্যাঁ ইংরেজিতে।

সঞ্জীব : বই হয়ে বেরিয়েছে ?

আমজাদ : না না লিখেই চলেছি। শৈশবে গোয়ালিয়ারের কথা বলছিলাম। গোয়ালিয়ারের মহারাজা বলেছিলেন, আমজাদকে ফোর্টের স্কুলে ভর্তি করে দিন। পিতাজি বললেন, তাহলে তো আমার কাছ ছাড়া হয়ে যাবে, সরোদ শেখাবো কি করে ! গোয়ালিয়ারেই আমার গান আর তবলা-শিক্ষার শুরু। সিন্ধিয়া স্কুলের বোর্ডিং-এ থাকলে পিতাজির কাছে এই শিক্ষাটা আর হত না। মনে আছে, গোয়ালিয়ারে তখন অনেক বড় বড় লোক আসতেন। মার্শাল টিটো এসেছিলেন ক্রুশ্চেভ এসেছিলেন, হো চি মিন এসেছিলেন। বড় ডিগনিটারি কেউ এলেই পিতাজির ডাক পড়ত বাজাবার জন্যে। আর আমি হতাম তাঁর সাথসঙ্গী। আমাকে বসিয়ে দিতেন আসরে। গোয়ালিয়ার থেকে দিল্লি এসে ভর্তি হলাম মডার্ন স্কুলে। বড়াখাম্বা রোডের ব্র্যাঞ্চে। আজ সকালে দেখেছেন। ওই সময়টা আমার কঠিন পরীক্ষার সময় গেছে। ভোর চারটের সময় ওঠা। রেওয়াজ করা, স্কুলের হোম ওয়ার্ক করা, স্কুলে যাওয়া। ওই সময় আমার প্রোগ্রাম আসতে শুরু করেছে। বড় কারুর হাত ধরে আসরে গিয়ে বাজিয়ে আসা। এই চলেছে তখন। তবে একটা ব্যাপারে আমি খুব সচেতন ছিলাম। যত্রতত্র বাজাতে যেতুম না। মনের মত শহর মনের মত আসর না হলে, আমি না করে দিতুম। এখনও তাই। আমার বয়েস হল চল্লিশ। মিউজিক্যাল কেরিয়ার ধরে হিসেব করলে ষাট পেরিয়ে গেছে। কারণ আমি বাজাতে শুরু করেছি অনেক কম বয়েসে। অনেক আসর করেছি। অনেক বেশি আসর। যেই মনে হল বড় ঘনঘন অ্যাপিয়ারেনস হয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে সংযত করে ফেললুম নিজেকে। এখন দেখে শুনে মাঝে মধ্যে বাজাই। আমাকে অনেক চ্যারিটি বাজাতে হয়, কারণ কল্যাণমূলক অনুষ্ঠানে বাজানোটা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি। আমার ফি খুব বাড়িয়ে দিয়েছি ; যাতে অন্যান্য তরুণ শিল্পীরা আমার চেয়ে বেশী চান্স পায়। এর ফলে আমার আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে, তা হোক, পয়সাটাই সব নয়। আমার ফি বেশি হওয়ায় অর্গানাইজারবা তরুণ শিল্পীর কাছে যাবেন ; আমি তরুণদের সুযোগ করে দিতে চাই। আমার ফি বাড়াবার উদ্দেশ্য ওই একটাই। ফি নিয়ে আমি একটা অনুষ্ঠান করি তো চ্যারিটি বাজাই পঞ্চাশটা। গান বাজনা তো আর হীরা চাঁদি নয় যে, পঞ্চাশ হাজারে বেচবো, এক লাখে বেচবো। আমি এখন সেই দিনের জন্যে অপেক্ষা করছি, যেদিন আমাকে আর অন্যের অনুরোধে বাজাতে হবে না। পয়সার পরিবর্তে বাজাতে হবে না। আমার ইচ্ছে হলে আমি বাজিয়ে আসবো। খোদা করে অ্যায়সা টাইম আয়ে। কারণ একমাত্র ওই কণ্ডিশানেই একজন শিল্পী নিজেকে সবচেয়ে সুখী মনে করে। সংগীত হয় ফকিরের না হয় আমীরের। ওই গুণতি মুণতিতে সব মাটি হয়ে যায়। ঠিক মজা আসে না। করতে হয় বাঁচার

কলাকাররা সাধারণত একটু বেশী স্পর্শকাতর। আর আমাদের ধর্মে সব চেয়ে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে, মানুষের একটা গুণের ওপর, ধৈর্য। ছেলেবেলা থেকেই আমার পিতাজী আমার মধ্যে ওই গুণের বিকাশের জন্যে চেষ্টা করে এসেছেন। শব্‌রু। বেটা, শব্‌রু রহো, শব্‌রু। তিনি বলতেন, কারুর কাছ থেকে কোনো কিছু প্রত্যাশা কোরো না। প্রত্যাশাটা ছেড়ে দিলে হতাশা আসবে কি করে ! যার চাওয়া নেই, তার পাওয়া না পাওয়া সমান। এই জীবন দর্শন আমার বিশ্বাসে বদ্ধমূল হয়েছে।

জন্যে। কঠিন দিন। সমস্যার শেষ নেই। চরম প্রতিযোগিতা।

সঞ্জীব : রাজা মহারাজাদের আমলে এই সুযোগটা ছিল।

আমজাদ : রাজা মহারাজাদের আমলে একটা ব্যবস্থা বড় ভাল ছিল, তাঁরা সব লেভেলের মিউজিশিয়ানদের প্যাট্রনাইজ করতেন। এখন হয়েছে কি সকলের জন্যেই সমান কমপিটিশান।

সঞ্জীব : ওস্তাদজী, জীবনে কখনও দুঃখ পেয়েছেন ? আঘাত ?

আমজাদ : খুশী অওর দুঃখ, ইয়ে ইনসানকে বড়ে সাথী হ্যায়। দুঃখ আর সুখ এই তো জীবন। কলাকাররা সাধারণত একটু বেশী স্পর্শকাতর। আর আমাদের ধর্মে সব চেয়ে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে, মানুষের একটা গুণের ওপর, ধৈর্য। পেশেন্স। ছেলেবেলা থেকেই আমার পিতাজী আমার মধ্যে ওই গুণের বিকাশের জন্যে চেষ্টা করে এসেছেন। শব্‌রু। বেটা, শবরু রহো, শবরু। যো কুছ হো, যাই হোক না কেন, ভগবানে নিবেদন করো। ভগবানকে বলো, মানুষকে বোলো না। ভগবানের চেয়ে দোস্ত তো আর কেউ নেই। তিনি বলতেন, ডোন্ট একসপেক্ট এনি থিং ফ্রম এনি বডি। কারুর কাছ থেকে কোনো কিছু প্রত্যাশা কোরো না। দিস ইজ দি গ্রেটেস্ট পয়েন্ট, নট টু বি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ইন ইওর লাইফ। প্রত্যাশাটা ছেড়ে দিলে, হতাশা আসবে কি করে। যার চাওয়া নেই, তার পাওয়া না পাওয়া সমান। তা আমার জীবন, আমার যন্ত্রের মতোই, এই সুরে বেঁধে নিয়েছি। এই জীবন দর্শন আমার বিশ্বাসে বদ্ধমূল হয়েছে। হামে কিসিসে কোই শিকায়েত নেহি দুনিয়ামে। আমাকে যা দেবার তা খোদাই দিয়ে দেন। আর একটা কি, আমার কোনও রিঅ্যাকশ্যান নেই। আমাকে দেখলে কেউ বুঝতেই পারবে না, আমার দুঃখ হয়েছে, না সুখ হয়েছে। সেইটাই আমার ধৈর্য। আমাকে কেউ কোনোভাবেই উত্তেজিত করতে পারে না। আমার ইচ্ছে না হলে, আমার কোনোভাবের বহিঃপ্রকাশ হয় না।

সঞ্জীব : পুরোপুরি সেল্‌ফ কন্ট্রোল।

আমজাদ : সেকালের মানুষের ধৈর্য কম ছিল। দপ্ করে রেগে উঠতেন। আমার পিতাজি। দপ্ করে রেগে উঠতেন, আবে ইসকো নিকলো বহার। তাকে বের করে দিলেন, শেষে নিজেই বেরিয়ে গেলেন। আমারও রাগ হয়। ছেলেকে শেখাতে গিয়ে, ছাত্রদের শেখাতে গিয়ে। কিন্তু নিজেকে সংযত করতে জানি। তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। বুরা, বেতালা, বেসুরা। দে কুডন্ট স্ট্যান্ড। আমার বেসুরা শোনার আদত হো গিয়া। কারণ আমি জানি এ এখনও ছাত্র, বেচারা শিখছে। আজ পর্যন্ত এখনও আমি এইরকম। কাল কি হবে, আমি জানি না। হয় তো অন্য রকম হয়ে যাবো।

সঞ্জীব : আপনি কালকের কথা চিন্তা করেন না ?,

আমজাদ : নেহি। কাল যা হবে তা খোদা জানেন। খোদার মর্জি। হোতা হায় ওহি যো মঞ্জুরে খোদা। যা আমার ভালো তাই হবে। আমার জন্যে যা ভেবে রেখেছেন তাই হবে।

সঞ্জীব : ওস্তাদজী রাগ আর রাগিণীই তো আপনার সঙ্গী।

আমজাদ : হাঁ। ওর চেয়ে বড় আর কি আছে ?

সঞ্জীব : রাগ, রাগিণীদের নিয়ে আপনার নতুন কি পরিকল্পনা ? যা হয়ে আছে তা হয়েই আছে। আর কি

হতে পারে ?

আমজাদ : আমার এই যন্ত্র, বড় শক্ত যন্ত্র। পর্দা নেই কিছুই নেই। এর ওপর আঙুল রাখতে এখনও ভয় করে। কোথায় কি হয়ে যায়। তাই কেবলই রেওয়াজ করি। তবে রেওয়াজে কি হয় ! স্পার অফ দি মোমেন্টে যা হবে, তা ওই খোদার হাতে। তিনিই জানেন। সারা কুছ প্ল্যানিং সব উল্টা হো যাতা কভী কভী। পিতাজির সঙ্গে আমার যে রিস্তা ছিল, তা হল গুরুশিষ্যের। গুরু শিষ্‌কা রিস্তা। বাপ বেটে কা নেহি থা। প্রথম কারণ, এজ ডিফারেন্স। বয়েসের পার্থক্য। তিনি আমার গ্র্যান্ড ফাদার হতে পারতেন। ওই দেয়ালের দিকে তাকান, ছবির পর ছবি, আলাউদ্দিন খাঁ সাব, নাসিরুদ্দিন খাঁ সাব ডাগর, এনায়েৎ খাঁ সাব, আবদুল করিম খাঁ সাব, ফৈয়াজ খাঁ সাব, কেশরবাঈ, ওঁকারনাথজী, কণ্ঠে মহারাজ, থেরাকুয়া সাব, বড়ে গুলাম আলি, আমীর খাঁ সাব, মুস্তাক হুসেন খাঁ সাব, নিচে শম্ভু মহারাজ, বিরজু মহারাজের চাচা, এঁরা সবাই ছিলেন আমার পিতার সহযোগী। তা আমার সঙ্গে তাঁর বয়সের পার্থক্য ছিল অনেক। ইচ্ছে হলে আমাকে কাছে ডাকতেন, নয় তো দূরেই থাকতুম। নিজের ইচ্ছেয় তাঁর কাছে যাবার সাহস ছিল না। তো ইয়ে রিস্তা হামারা থা। যেমন স্নেহ ছিল, তেমনি শাসনও ছিল। রেওয়াজে, তালিমে ভুল হলে এমন ধমক দিতেন হাত থেকে যন্ত্র ছিটকে যেত। এমন ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। ভালো সঙ্গীতকার হয় তো একের পর এক আসবেন, কিন্তু মানুষের মতো মানুষের জন্ম সহজ নয়। আমার পিতাজির মানবিক-গুণ আমাকে ভীষণ প্রভাবিত করে গেছে। অসাধারণ গুণী মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর মত দয়ালু মানুষ খুব কমই দেখা যায়। সকলকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে যেতেন। তিনি তাঁর নিজের জগতেই থাকতেন। গুণগ্রাহী ছিলেন। আমাকে বলতেন, অন্যের ভাল দিকটা দেখার চেষ্টা করো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার খারাপ দিকটা বের করার কোনও প্রয়োজন নেই। তাতে তোমার লাভ হবে না কিছু। সব মানুষেরই কিছু না কিছু ত্রুটি থাকবেই। তোমার কাজ হবে তার ভালো দিকটা দেখা। তুমি সেই ভালো দেখার গুণটা অর্জন করো। তার ভালো দিকটা নিজের জীবনে গ্রহণ করার চেষ্টা করো। কোনও শিল্পীর হাজারটা দোষ থাকতে পারে, কিন্তু তার গুণও থাকবে। তুম সেই গুণের সন্ধান করো। তার কোন কোন গুণ মানুষকে আকর্ষণ করে, কোন গুণের জন্যে মানুষ বারে বারে তাকে শুনতে চায় ! এই জেনারেশানের যারা নয়া শিখনেআলি লোক, তারা কিন্তু সব সময় অন্যের খারাপ দিকটা দেখার জন্যেই ব্যস্ত। তাদের অবশ্য দোষ নেই, এই জিনিসই তো চলে আসছে বহু যুগ ধরে। এ এক ধরনের রোগ। দুরারোগ্য অসুখের মতো। নিজেদের সাধনা ছেড়ে, নিজেদের মহামূল্য সময়ের অপচয় করে কেবল পরচর্চা। ওই সময়টা যদি তারা রেওয়াজ নিয়ে থাকতো, তাহলে নিজেদের জীবনের কত উন্নতিই না করতে পারতো। তা নয় শুধু গল্প ইয়ারকি, পরের সমালোচনা। কে কি করছে, কে কি পরছে, কে কি খাচ্ছে পান করছে। আমি মনে করি না, এই করে তরুণ শিক্ষার্থীদের কিছু উপকার হচ্ছে।

সন্ধে গড়িয়ে রাতে ঢলে পড়েছে। মসজিদের আজান কখন থেমে গেছে। ওস্তাদজির দোতলা সাধন কুটীরটি বড় সুন্দর। দীর্ঘ, প্রশস্ত। দূরে দূরে বড় বড় কাঁচের জানলা। মেঝেতেই কার্পেটে বসার আয়োজন। দেয়ালে দেয়ালে সঙ্গীত গুণীর ছবি। ওস্তাজীর পেছনে হাফিজ আলি খাঁ সায়েবের বিশাল তৈল চিত্র। বিভিন্ন ধরনের ঘড়ি, দুপাশে—এপাশে, ওপাশে। সময় বড়া বলবান। ধূপ জ্বলছিল, নিবে গেছে। পড়ে আছে ছাই। চারপাশ নিস্তব্ধ। আলি সায়েবের কোলে সরোদ। যে সরোদে আঙুল রাখতে এখনও তাঁর ডর লাগে। কাঁধের এপাশ থেকে ওপাশে আড়াআড়ি ধূসর মলিদা। চোখ দুটি বিষণ্ণ। হঠাৎ আঙুল খেলতে লাগল বাজনায়। তিলক কামোদ। মিউজিক ইজ মুড। আজকের মুড যেন কান্নার। তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে—গোয়ালিয়ার থেকে যাত্রা শুরু, চল্লিশ বছরের পথ হেঁটে আজ যেখানে, সেখান থেকে যেতে হবে আরও দূরে ভালো, আরও ভালো, ভালোরও ভালো। এখন সাধনা শুধু সঙ্গীতের নয়, সাধনা নিখুঁত মানুষ হবার। আব্বা বলতেন, শবরু, শবরু, বেটা সবুর করো, তোমার কথা ঈশ্বরকে জানাও, ভগবানসে কহো, ইনসানসে মাত কহো।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ছবি : বিবেক দাস

ছবি : তপন দাস

সব মানুষেরই কিছু না কিছু ত্রুটি থাকবেই। তোমার কাজ হবে তার ভালো দিকটা দেখা। তুমি সেই ভালো দেখার গুণ অর্জন করো। তার ভালো দিকটা নিজের জীবনে গ্রহণ করার চেষ্টা করো। তার কোন কোন গুণ মানুষকে আকর্ষণ করে, কোন গুণের জন্যে মানুষ বারে বারে তাকে শুনতে চায়—তুমি সেই গুণের সন্ধান করো।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীতের হাল হকিকত

বিজয় চক্রবর্তী

উচ্চাঙ্গ সংগীতের সাধক শিল্পী, শ্রোতা সবার মনেই একটা প্রশ্ন আজ মাথা চাড়া দিচ্ছে : এর পিছনে লেগে থাকার কোনও মানে হয় না। অর্থ, সহজ-সাফল্য, নাম-যশ সবই এ পথে দুর্লভ। অথচ ফিলমি গানে এমন কি গীত-গজল-ভজনেও চিত্রটা ঠিক বিপরীত। সামান্য অধিকার জন্মালেই আধুনিকের আসরে স্থান পাওয়া, নিদেন একটা ক্যাসেট করার কৃতিত্ব তো হাতের মুঠোয়। রবীন্দ্রসংগীত বা লোকগীতিতেও ডাক পেতে, রেডিও-টি ভি-তে প্রোগ্রাম করতে তুলনায় কাঠখড় পোড়াতে হয় অনেক কম। যন্ত্রশিল্পীদের দেশে-বিদেশে যাওবা কিছু কদর মেলে উচ্চাঙ্গ কণ্ঠশিল্পীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অনেকটাই এভারেস্টে চড়ার মত। প্রচুর ব্যবস্থা, উদ্যোগ, অকল্পনীয় উদ্যম ও ধৈর্য ছাড়া সাফল্যের চূড়ায় পদার্পণ নেহাতই স্বপ্নাতীত প্রয়াস। ফিলমে এমন কি যাত্রাগানে, থিয়েটারেও সুরকারের সুযোগ লাভ করাও একজন নিষ্ঠাবান উচ্চাঙ্গ কণ্ঠশিল্পীর পক্ষে খুবই দুরূহ। পরীক্ষায় ভাল ফল করলেও অভিজ্ঞতার অভাব যেমন চাকরি লাভে বাধা (অথচ চাকরি না পেলে অভিজ্ঞতাই বা হবে কেমন করে!) তেমনি নিজগুণে বিখ্যাত হবার সৌভাগ্য অর্জন না করে থাকলে সুন্দর সুর করার স্বাভাবিক ক্ষমতা সত্ত্বেও তাঁকে গ্রহণযোগ্য মনে করার উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই সংগীত জগতে। নেহাৎ গলা তৈরির জন্য প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীর টিউশনি ছাড়া, কোনও সংগীত শিক্ষায়তনে ইতিমধ্যেই সুযোগ না পেয়ে থাকলে, উচ্চাঙ্গ সংগীত অনুশীলনকারীর দুঃখ করা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই করার থাকে না। একজন নামযশহীন সুগায়কের পক্ষে চলে এমন একটি গানের ইস্কুল খোলাও এ বাজারে সাধ্যাতীতই। ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ে একটা ক্ষুদ্র ব্যবসা বা শিল্প সংস্থা গড়াও এর চেয়ে সহজ কাজ। কারণ, কিছুটা জনবহুল সড়কে ইস্কুলের উপযুক্ত একটি স্থান সংগ্রহ করাই দুঃসাধ্য। অথচ উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পীদের বাজার ঠিক এমনটি ছিল না কিছু দিন আগেও। গানের ইস্কুল এখন বহু। সার্টিফিকেট দেবার বিশ্ববিদ্যালয় বা সংস্থারও এখন অভাব নেই, তাহলে শিল্পীর কদর নেই কেন! আসরগুলি আগের মত শ্রোতা টানতে ব্যর্থ কেন? এটা কি বাজারেরই দোষ না শিল্পীরাও এর জন্য দায়ী—চিত্রটা একটু খতিয়ে দেখা যাক।

এই শতাব্দীর মোচড়ে ধ্রুপদিয়াদের কৌলীন্য, প্রাধান্য কমে আসছিল। খেয়ালই তার বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য নিয়ে শ্রোতাদের কান টানছিল। তবে

পালুসকর এইচ এম ভি-র সৌজন্যে

ভারতের অন্য প্রদেশের তুলনায় বঙ্গদেশেই ধ্রুপদ এমন কি টপ্পার চর্চাও বেশিদিন নামমাত্র হলেও টিকে ছিল। যদুভট্টের পর অঘোর চক্রবর্তী, লালচাঁদ বড়াল, অনন্তলাল এবং দুইপুত্র রামপ্রসন্ন ও গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভাগায়ক গোপাল চক্রবর্তী, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, চন্দননগরের কালোবাবু প্রমুখরা সর্বভারতীয় নিরিখেই বিশিষ্ট কলাবন্তের স্বীকৃতি এবং প্রতিষ্ঠা পান। রাধিকাপ্রসাদের শিষ্য মহীন এবং মহীনের ছেলে ললিত মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ সান্যাল, সাতকড়ি মালাকার, নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীও ছিলেন বাস্তবে সুপ্রতিষ্ঠিত সংগীতশিল্পীই। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের মত সুকণ্ঠ গায়ক দুর্লভ। রাধিকাবাবুর তালিম ছিল

ওঙ্কারনাথ ঠাকুর এইচ এম ভি-র সৌজন্যে
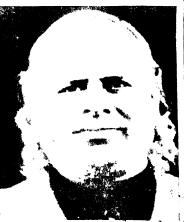
খেয়ালেও। তবে শিষ্য গিরিজাশংকর এ যুগের একটি বিশিষ্ট নাম। এঁর তালিম ছিল ধ্রুপদ খেয়াল এবং ঠুংরিতেও। শিক্ষক হিসাবেও গুরু রাধিকাপ্রসাদের মতই তিনিও ছিলেন কৃতবিদ্য। যামিনী গাঙ্গুলি, তারাপদ চক্রবর্তী, সুখেন্দু গোস্বামী, জ্ঞান ঘোষ, এ টি কানন, সুধীরলাল চক্রবর্তী, বীরেশ গুহ এমন কি একাধিক ছাত্রীকেও তিনি আসরের পাদপ্রদীপের সামনে হাজির করে দেন। গিরিজাশংকরের সাফল্যের মূলে ছিল বিষ্ণুপুরের রাধিকাপ্রসাদ, আলোয়ারের আল্লাবন্দে খানের পুত্র নাসিরুদ্দিন খান ডাগর, গোয়ালিয়র ঘরানার ইনায়েৎ হুসেন খান এবং গোয়ালিয়রের কলকাতা-নিবাসী ভাইসাহেব গণপৎ রাও-এর অকৃপণ তালিম। যন্ত্রে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে উস্তাদ আলাউদ্দিন খান যেমন বহু গুণী যন্ত্রী উপহার দিয়েছেন তেমনই গিরিজাশংকরও বাংলাকে তারাপদবাবু, যামিনীবাবুর মত শিল্পী-শিক্ষক উপহার দিয়ে পশ্চিমীদের কিছুটা পিছনে ফেলার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। যামিনীবাবু সে যুগের তা বড় গাওয়াইয়াদের শিষ্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সর্বভারতীয় এলাহাবাদ সংগীত সম্মেলনে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

বদল খান সাহেব যন্ত্র ও গান দুই বিষয়েই দক্ষ ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে হলেও তিনি কলকাতায় বসবাস শুরু করলে বহু ছাত্র তাঁর কাছে 'আসলি চিজ' পেয়েছিলেন। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় এঁরই শিষ্য। ভীষ্মবাবুর কণ্ঠ ছিল খুবই সুরেলা এবং অলংকারভূষিত। অবশ্য কারও কারও মতে (নারায়ণ চৌধুরীর সংগীত পরিক্রমা দ্রষ্টব্য) তাঁর গলা একটু তীক্ষ্ণ ও সরু বলে খেয়ালের গাম্ভীর্যপূর্ণ ঠাড়াও ভাব সৃষ্টির সহায়ক নয়। তবে তাঁর রাগপ্রধানগুলি অপূর্ব সৃষ্টি। সত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন ক্রমশ ভীষ্মবাবু আরও সিরিয়াস গায়ক হয়ে উঠছিলেন। এমনিতেই আসর জমাতে তাঁর জুড়ি ছিল না। লক্ষ্ণৌ-এ তাঁর গানই নাকি সম্মেলনের শ্রেষ্ঠ গান বলে স্বীকৃতি পেয়েছিল। অবশ্য এর পরই ভীষ্মদেব তাঁর গানে ছেদ টেনে পণ্ডিচেরি চলে যান। গম্ভীর এবং সুডোল কণ্ঠের মর্মস্পর্শী গায়ক ছিলেন তারাপদ চক্রবর্তী। নিরবচ্ছিন্ন তালিম পাওয়ার সৌভাগ্য তাঁর না ঘটলেও ভারতের সেরা গায়কদের গান আত্মস্থ করার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। খেয়াল, ঠুংরি দুটোই ভাল গাইতেন বাংলায় তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবেই বহির্বাংলায় তিনি উপেক্ষিত হয়েছেন। খেয়ালের আঙ্গিক, বাণী এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে চিন্ময় লাহিড়ীর দক্ষতা

ছিল অসাধারণ। তাঁর গানও তাঁর নিজস্ব ছকে গড়া। তানকারি, সরগমও অতুলনীয়। গলাটি আর একটু দরাজ হলে তাঁর প্রাপ্য হত আরও অনেক বড় মাপের। গান রচনায় এবং সুরদানেও তাঁর মৌলিকতা সারা ভারতেই স্বীকৃত। তাঁর কাছে কিছুদিনও তালিম পাননি বাংলায় এরকম শিল্পী খুবই কম। পরভিন সুলতানাকেও এর মধ্যে ধরছি কারণ তিনিও তালিম নিয়েছিলেন প্রধানত কলকাতাতেই।

সর্বভারতীয় চিত্রটি অবশ্য একটু পিছনে ফেলে এসেছি। ধ্রুপদী সংগীতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক পর্যায়টি হল আলাপ। বাংলার ধ্রুপদিয়ারা রাগদারির চাবিকাঠি এই আলাপকে অর্থাৎ বাণীবর্জিত রাগের পর্যায়ক্রমিক মরমিয়া প্রকাশকে কিছুটা উপেক্ষা করে এবং ধ্রুপদ-ধামারের গানাঙ্গকে কিছুটা প্রাধান্য দিয়ে নিজেদের কোণঠাসা করে ফেলেন। খেয়ালিয়াদের বাঢ়হতেও বিলম্বিতেই মজাটা ফলে সীমিত থেকে যায়। লয়কারি এবং বোলবাণীর দিকে তাঁরা বেশি নজর দেন। ফলে আলোয়ারের সভাগায়ক আল্লাবন্দে খান এবং তাঁর পুত্র নাসিরুদ্দিন খান ডাগর আলাপচারিতে সারা ভারতের শিরোপাটিই তাঁদের কাছে রাখেন। মথুরার স্বামী হরিদাসের শিষ্যঘর চৌবেরাও ধ্রুপদ গানে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম রাখেন। যন্ত্রে যেমনটি রেখেছিলেন সেনিয়া রবাবিয়া এবং বীণকাররা। নাসিরুদ্দিনের মত সঠিক শ্রুতিতে স্বরস্থাপন একালে কেউ শুনেছেন বলে শুনিনি। মইনুদ্দিন ডাগরের গানে পিতার মহত্ব কিছুটা ধরা পড়ত তবে অন্যান্য ডাগররাও সুরের সুস্থিতি দেখিয়ে তাঁদের শ্রদ্ধার আসরে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পেরেছেন।

কোলাপুরের সভাগায়ক আল্লাদিয়া খান ছিলেন সর্বাপেক্ষা কুশলী সংগীতজ্ঞ-শিক্ষক। এঁরই তালিম কেশরবাঈ কেরকার, মধুবাঈ (যাঁর মেয়ে কিশোরী আমনকর), মল্লিকার্জুন মনসুরের। এঁরা একাধিক রাগ মিশিয়ে গানে একটা দক্ষতাপূর্ণ কূটরূপ ফুটিয়ে তুলতে পারেন অনায়াসে। কেশরবাঈকে তাঁর আমলের শ্রেষ্ঠ মহিলা খেয়ালিয়া বলে আখ্যায়িত করা যায়। সুরূপা এই মহিলা নাকি একটু দেমাকিও ছিলেন। পানের দোকানেও তাঁর গান শোনা যাবে বলে রেডিওতে গাননি কোনওদিন। মধুবাঈয়ের তালিম ও গান ছিল খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু বাংলার তারাপদবাবুর মতই মহারাষ্ট্রের বাইরে তিনি তাঁর উপযুক্ত মর্যাদা পাননি। আল্লাদিয়ার বড় ছেলে মঞ্জী খান ছিলেন দুর্ধর্ষ গায়ক। কিন্তু অকালে মারা যান। মিঞা জান ছিলেন তাঁর সময়কার একজন সেরা গায়ক অন্তত ফৈয়াজ খান সে রকমই মনে করতেন। দেওয়াসের রজব আলি খান এবং সহস্বানের মুস্তাক হুসেন খানের কথা অবশ্যই বলা উচিত। কারণ পরবর্তীকালে অনেকের গানকেই এঁরা প্রভাবিত করেছেন। যেমন রজব আলির তানকারি এবং ওয়াহিদ খানের বাঢ়হত আমির খানের গায়কি গড়ে তোলায় সাহায্য করেছিল। মুস্তাকের রাগদারি এবং ত্রিসপ্তক তান বহু শ্রোতার কাছেই ছিল

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় আকাশবাণী-র সৌজন্যে

বড়ে গুলাম আলি ছবি : স্বপন চ্যাটার্জি

গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী

আদর্শলিপি। তারাপদবাবুও এঁর গানে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

মহিলা শিল্পীদের মধ্যে জোহরা জদ্দন শ্রীজান মালকাজান গহরপ্রভৃতি এবং অন্যান্য টপ্পাদার ও টপখেয়ালিরাও ধীরে ধীরে আসর থেকে সরে গেলেন। সংগীতাকাশ জুড়ে যে দুটি তারকা সারা ভারতে সাড়া জাগালেন তাঁরা হলেন কিরানা ঘরানার আবদুল করিম খান এবং আগ্রা-আত্রাউলির ফৈয়াজ খান। এঁদের দুজনের গায়কি দুই মেরুতে নিবদ্ধ। কে যে কার চাইতে বড় তার মীমাংসা হয়নি আজও, হবার প্রয়োজনও নেই। তবে সুরের মায়াজাল বিস্তারে গায়কির মহত্বে, ছন্দের সুষমায় দুজনই চিরস্থায়ী আসন করে নেন শ্রোতাদের মনে। দুজনই নিরঙ্কুশভাবে প্রভাবিত করলেন সারা ভারতের খেয়াল গায়কিকে। তবু এখানে শুধু এ কথাটি উল্লেখ করব যে, করিম খানের মৃত্যুর পর ফৈয়াজের স্বগতোক্তি ছিল : সুর মর গয়া। গোয়ালিয়রের কৃষ্ণরাও শংকর পণ্ডিত, পুনার বিনায়ক নারায়ণ পটবর্ধন ছাড়া ওংকারনাথ ঠাকুরও তাঁর গায়কির বলিষ্ঠতা ও কণ্ঠের ওজস্বিতার জন্য করিম-ফৈয়াজের পাশেই তাঁর স্থান করে নিলেন। সেকালে হীরাবাঈ ও রোশেনারাও (দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান চলে যান) যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখান। রোশেনারার ফুলঝুরি-তান ছিল একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। করিম খানের ছাত্র সোওয়াই গন্ধর্ব বেশি দিন বাঁচেননি। তবে তাঁরই শিষ্য-শিষ্যা ভীমসেন যোশী ও গঙ্গুবাঈ হাঙ্গল আজও আসর আলো করে আছেন।

যে তিনজন গায়কের কথা আমি এতক্ষণে বলিনি তাঁরা হলেন বড়ে গুলাম আলি খান, আমির খান ও ডি ভি পালুসকর। বড়ে গুলাম আলির কাকা কালে খান পাতিয়ালার একজন দিকপাল খেয়ালিয়া ছিলেন। কিন্তু আশিক আলির তানকর্তব ও নিজেদের ঘরের গানকে সম্পূর্ণ নিজস্ব ঢঙে ত্রিসপ্তক অকল্পনীয় দ্রুত কিন্তু পৃথক দানার তানমালায় সাজিয়ে অভূতপূর্ব সুরে রাগদারির মাহাত্ম্য বজায় রেখেই বড়ে গুলাম যখন আসরে গান তখন পূর্বসূরীরা অনেকটাই ম্লান, নিষ্প্রভ হয়ে পড়লেন। মধুর কণ্ঠে, স্বরপ্রয়োগের দক্ষতায় এবং ব্যাপ্তিতে এমন একটা রোমান্টিক রসাবেশ তিনি সৃষ্টি করলেন যা পরবর্তী শিল্পীদের গানের ধারাকে শুধু প্রভাবিতই করল না কিছুটা পরিবর্তনও নিয়ে এল গায়কিতে। ক্লাসিক্যালিজমের দোহাই দিয়ে কিছু সমালোচনাও যে শোনা গেল না এমন নয়, কিন্তু গুলাম আলিকে তাঁর যোগ্য আসন থেকে টলান গেল না।

ঠিক এর বিপরীতধর্মী গায়ক আমির খানের আবির্ভাবও এর পরেই। তিনি আবার সব রকম চাঞ্চল্য পরিহার করে বিস্তারে আলাপচারির সুস্থিত ভাবটিকেই কায়েম করলেন তাঁর গানে। ওজনদার গলায় গানের মজা এবং বাঢ়হতের মেজাজ তাঁর গানে একটা ধ্রুপদী তকমা এঁটে দিল। মিড়খণ্ডী তানও ছিল শোনার মত। ছন্দ-তালে উপেক্ষা এবং রাগরূপের আদল নিয়েও নানা কথা উঠল কিন্তু একথা বলতেই হবে

ভাল-মন্দ যাই হক, পরবর্তী শিল্পীরা প্রধানত এই দুই শিল্পীকে অনুসরণ করেই নিজেদের গায়কিকে তৈরি করতে লাগলেন। কারও গানের মূল্য বা মান বিচারই যেহেতু লেখার লক্ষ্য নয়, এখানে শুধু এটুকুই বলব যে বেশির ভাগ এখনকার শিল্পীই এই দুই শক্তিশালী গ্রহকেই প্রদক্ষিণ করে চলেছেন।

সুন্দর মার্জিত সুকণ্ঠ গায়ক পালুসকর। সুঠাম একটি রাগরূপ তাঁর গায়কিতে বিধৃত। পরিণতির পূর্বেই তিনিও প্রয়াত। সালামত নাজাকতের নাজাকত নেই, সালামতও পূর্বের দক্ষতা হারিয়েছেন। তবে তাঁর গানের নাটকীয়তা এবং তানকারিও ছায়াপাত ঘটিয়েছে একালের শিল্পীদের গানের শৈলীতে। ঠুংরির কথা বিস্তারিত ভাবে বলছি না। গজল গীত ভজনই এখন এর স্থান করে নিচ্ছে। ঠুংরির পৃথক তালিম এখনকার অনেক গায়কেরই নেই। মৈজুদ্দিনের গান সামনে বসে শুনেছেন এমন লোকের সংখ্যা আজ খুবই কম। রসুলন বাই, রোশেনারা, সিদ্ধেশ্বরী দেবী এবং আখতারি বাঈ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন। সিদ্ধেশ্বরী দেবী ঠুংরির তবিয়ত যতটা দেখাতেন অন্যদের গানে তার অভাব ছিল। আখতারি খুবই মনোজ্ঞ হলেও তুলনায় হাল্কা মেজাজের।

মোটা তুলির আঁচড়ে পশ্চাদপটটি তুলে ধরলাম। বলা কর্তব্য, এই আলোচনা, ঐতিহাসিক দলিল হওয়া দূরের কথা, দোষণীয় ভাবেই সংক্ষেপিত, খাপছাড়া, কালদুষ্টিতেও বিধ্বস্ত। এর লক্ষ্য একটাই—এখনকার গায়কদের কী নেই যার জন্য তাঁরা আগেকার শিল্পীদের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত, সেই সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হওয়া। যাই হক বর্তমানের চিত্রটি আগে শেষ করি, তারপর অমার্জনীয় অপরাধ হলেও সাংগীতিক সুস্থতার খাতিরে নিজের সীমিত ক্ষমতায় যতটা সম্ভব সেই বিশ্লেষণটিও তুলে ধরতে প্রয়াসী হব। কিন্তু এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে করতে হলে কিছু ঘরের কথা, হোম ট্রুথও বলা দরকার। এবং নির্ভয়ে সেটা করলে বিশ্লেষণও হয়ে পড়বে অনেকটাই অপ্রয়োজনীয়।

সারা ভারতেই এখন ভীমসেন যোশী একমাত্র উচ্চাঙ্গ কণ্ঠশিল্পী যিনি জনপ্রিয় অর্থাৎ যথেষ্ট শ্রোতা টানতে সক্ষম। তাঁর গানে আর কিছু না থাক, কণ্ঠস্বর যথেষ্ট মধুর না হক, গলাটি দরাজ, সঠিক আকারধ্বনিতে তাঁর গানের স্থিতি। দমভরা সুরবিস্তার, কিছু ভাল তানকারির সঙ্গে পূর্বসুরীদের মত প্রাণঢালা একটা আবেদনও আছে যা গুলাম আলি-আমির খানের মতই শ্রোতাকে সর্বাংশে আপ্লুত না করুক তার হৃদয়তন্ত্রীকে নিঃসন্দেহে ছুঁয়ে যায়, অনুরণিত করে। কুমার গন্ধর্ব ভাল গায়ক। কিন্তু অস্ত্রোপচারে তাঁর একটি ফুসফুস নেই। ভজন গানেই বিশেষ স্ফূর্তি। মল্লিকার্জুন মনসুর ব্যাকরণিক অর্থে যতটা মূল্যবান নান্দনিক বিচারে ততটা আকর্ষণীয় নন। নিবৃত্তিবুয়া সরনায়েক, নিসার হুসেন খান বার্ধক্যের কবলে। নিবৃত্তিবুয়া ঐতিহ্য অনুসারী গান করেন। তালের বৈচিত্র্য ছন্দের কাজও দেখার মত। আর

মল্লিকার্জুন মনসুর ছবি : সুবীর চ্যাটার্জি

বেগম আখতার ছবি : সুবীর চ্যাটার্জি

তারাপদ চক্রবর্তী আকাশবাণী-র সৌজন্যে

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ছবি : সুবীর চ্যাটার্জি

আমীর খাঁ

নিসার হুসেনের তারানার কথা শ্রোতারা মনে রাখবেন দীর্ঘকাল। যশরাজ খেয়াল গান নিজের খেয়ালেই, রাগদারির চাইতে ঝোঁকেন এফেক্টের দিকে। গুলাম মুস্তাফা তৈরি হলেও গায়কি গতানুগতিক। বাড়াবাড়ি করলে সুরও ছুটে যেতে চায়। বাংলায় সমরেশ চৌধুরীও গুলাম আলি-সালামতের ঢঙে তান করতে আগ্রহী। গলা দরাজ, তৈরিও প্রশংসনীয়। কিন্তু গুলাম মুস্তাফা প্রসঙ্গে যে কথা বলা হল সর্বাংশে না হক তার খানিকটা তাঁর সম্পর্কেও খাটে। তাঁর বিশেষ প্রতিশ্রুতি ছিল বা আছে বলেই এ কথা বলা। মানস চক্রবর্তী ভাল গান, গানও বেশ জমিয়েই অর্থাৎ গানের বৈঠকি দিকটি তাঁর যথেষ্ট করায়ত্ত। কিন্তু বিস্তার ও তানের স্বরস্ফুরণের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলব পিতার গলার স্ফূর্তি ও জোয়ারির খামতি সেখানেও। তবু বলব মোটামুটি ভাবে তাঁর গানে একটা পরিপূর্ণতার তৃপ্তি আছে। এটা খুবই বড় কথা।

গুলাম আলির অনুসারীদের প্রসঙ্গে বলব, জগদীশ প্রসাদ সুন্দর সুরে গান কিন্তু গান বড়ই

আজ আপনার কেয়ো-কার্পিন চুলে ফ্রেঞ্চ রোল বাঁধুন। খুব ফ্যাশনেবল দেখাবে!

শিখে নিন, কেয়ো-কার্পিন চুলে ফ্যাশনেবল দেখাতে হলে কি ভাবে বাঁধবেন

মাথার মাঝখানে ছোট্ট সিঁথি কেটে চুল পিছনের দিকে আঁচড়ে নিন।

সমস্ত চুল টেনে মাথার বাঁ ধারে নিয়ে যান। পিন দিয়ে বেশ করে আটকান যাতে চুল বাঁ ধারেই থাকে।

চুলের ডগাগুলি ভাল ভাবে মুড়ে সবচুলগুলি নিয়ে একটা রোল পাকান। রোলটি যেন পরিচ্ছন্ন হয়।

মাথার মাঝখানে সুন্দর করে পিন লাগিয়ে আটকান। চুল যেন বেরিয়ে না থাকে। সুন্দর দুটি ক্লিপ লাগান।

চুলের সর্বাঙ্গীন যত্নের জন্যে প্রতিদিন ব্যবহার করুন মৃদু সুরভিত কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল।

চুলের পুষ্টি যোগাবে। চুল থাকবে সুন্দর ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল—অথচ তেলমাখা চটচটে ভাব একেবারেই থাকবে না।

এবার আপনি খোঁপা বাঁধুন, বিনুনী করুন, চুল খুলে রাখুন, কিংবা, যা খুশী তাই করুন। আপনাকে ভারী সুন্দর লাগবে।

১০০ মি·লি· ও ৩০০ মি·লি· শিশিতে পাওয়া যায়।

কেয়ো-কার্পিন

সুগন্ধী হেয়ার অয়েল।
চুল চটচটে করে না।

সুস্থ চুল। সুন্দর চুল। কেয়ো-কার্পিন চুল।

যাদের যত্নই আপনার আস্থা

সাদামাটা। সেদিক থেকে অজয় চক্রবর্তী হয়ত আরও এগিয়ে যাবেন একথা বলা যায়। গলার স্ফূর্তি ও এবং তৈরির জন্য তিনি বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখেন। জনপ্রিয়তার অনেকগুলি গুণই তাঁর গানে বিদ্যমান। কিন্তু বাংলা গানের প্রতি ঝোঁকটা অর্থ ও প্রতিষ্ঠার পক্ষে যতটা উপযোগী খেয়ালের সুস্থিত গায়কির আদল রক্ষায় ততটাই ক্ষতিকর বলে মনে করি। তাছাড়া নিছক অনুসরণ নিজস্ব গায়কি গড়ে ওঠাতেও তো বাধা সৃষ্টি করে। প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় তো অনেকটা এগিয়েও আজ নিরস্ত। তবে প্রশংসা করব মুনাবর আলি খানকে। তাঁর মত পিতার তালিম এবং সহগান করার সুযোগ কেউ পাননি। তাঁর গানটি বরং সর্বাংশে অনুকরণ নয়। ঘরের জিনিসকেই নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী গান করেন। কিন্তু তাঁর গানের অবয়বটি আকারে-আয়তনে ছোট, যদিও, তাঁর কিছু অলংকরণ যথেষ্ট মনোগ্রাহী। পুত্র শ্যামল লাহিড়ীও পিতার সুযোগ্য অনুসারী। সৃষ্টিধর্মী পিতার অনুকৃতি প্রশংসনীয় হলেও নিজের গানের গণ্ডি নিজের হাতে বেঁধে দেবার মত। কতটা আসলের মত হল সেই প্রশ্নেই তার সার্থকতা সীমিত। এটা করতে পারার ক্ষমতা অর্জন প্রশংসনীয় হলেও নিজেকে সীমিত রাখার প্রশ্নে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। অরুণ ভাদুড়ি যেটুকু গান তাতে স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য প্রশংসিত হবেন। এখন, গানে মহত্ত্ব আনার দায়িত্ব তাঁর।

সংগীত রিসার্চ আকাদেমির কর্ণধার বিজয় কিচলু সদলে লন্ডনে ভারতোৎসবে উচ্চাঙ্গ সংগীত পেশ করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। বিজয়বাবু ও তাঁর ভাই রবি কিচলু আগ্রা-আত্রাউলির অনুসারী। কিন্তু তাঁরা শুনি শাগির্দ অর্থাৎ শুনে শিখেছেন। যেমন শিখেছেন কুমার মুখার্জিও। এঁদের সকলেই গান মোটামুটি ভালই। কুমারবাবুর গানে ফৈয়াজের মেজাজের আঁচ পাওয়া যায় অনেকটা। কিন্তু এত বড় একটি ঘরানার তালিমপ্রাপ্ত উপযুক্ত প্রতিনিধি শিল্পী নেই এটা খুবই দুঃখের কথা। সুনীল বসুর বয়স হয়েছে। দিলীপ বেদী আর গান করেন না। বিলায়েত হুসেনের পুত্র ইউনুস ফৈয়াজের সহগায়কের সুযোগ পেয়ে থাকলেও নিজের গায়কি অনুসরণে প্রয়াসী। কিন্তু সেক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছেন এ-কথাও বলা যায় না। লতাফতের আর যাই থাক গানের গলা নেই। কিছু অস্থায়ী-অন্তরার আধার এই মাত্র। শুনেছি

হীরাবাঈ বরোদেকর — ছবি : সুবীর চ্যাটার্জি

আমিনুদ্দিন ডাগর — আকাশবাণী-র সৌজন্যে

চিন্ময় লাহিড়ী — ছবি : সুবীর চ্যাটার্জি

কিশোরী আমনকর — ছবি : সুবীর চ্যাটার্জি

আন্তরিকভাবে পেশ করার সদিচ্ছায় সার্থক। কিন্তু গুলাম আলির জনপ্রিয়তা তাঁর নাগালের বাইরেই থাকতে বাধ্য। তবু ঘরের উত্তম আধার, বাহক হিসেবে পৃথক মূল্য দাবি করতে পারেন। অন্য ঘরে এই মানের আধার-বাহকও যে আজ অমিল।

আমির খানের অনুসারীদের মধ্যে অমরনাথের নাম করতে হয়। উষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত বাকড়ে, অলক চট্টোপাধ্যায়, সিং-বন্ধু ভ্রাতৃদ্বয়ের আকর্ষণও এই কারণেই সীমিত যে নকল কখনও আসলের মর্যাদা পাবে না। রাজন-সাজনের গানের ভঙ্গিটি সুন্দর হলেও তার সাংগীতিক মূল্য যেমন উচ্চগ্রামের নয় তেমনি একটি বিশেষ গায়কি ঢঙের মজাও তাতে মেলে না। দুজন মিলে জমিয়ে গাইতে পারার সুবিধেটা তাঁরা কাজে লাগাতে সক্ষম এই যা। তাও একজনই নিচে ভাল যেমন অপরজন ভাল উপরে। বিষ্ণুপুরী হলেও অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে আমির খানের ছাপ স্পষ্ট।

চিন্ময় লাহিড়ীর শিষ্য দীননাথ মিশ্র তাঁর গানে কিছুটা পাতিয়ালার কাজ মিশিয়ে দক্ষতার সঙ্গে

তরুণ রসিদ খান ভাল গাইছেন কিন্তু তিনিও নাকি আমির খানের মত বিস্তার এবং গুলাম আলির মত তানকারির প্রয়াস থেকে মুক্ত নন। ফলে এখনই বেশি কিছু বলার সময় আসেনি। আসলে ফৈয়াজের রিস্তেদার দত্তক-পুত্রসম সরাফৎ হুসেনই ছিলেন সর্বশেষ খেয়ালি যাঁর গানে ধ্রুপদ ধামারের তালিম ছিল। সবিস্তারে, স-ছন্দে, বোলবাণীসহ গাইবার ক্ষমতা ছিল। রাগদারি যাঁর গানে মজাদারির কাছে হোঁচট খেত না। দুবারা চিজ দেখাবার দুর্বলতা ছাড়া, অর্থাৎ কিছুটা পৌণঃপুনিকতার দোষ ছাড়া কণ্ঠ, লয়, মেজাজ সব দিক থেকেই তিনিই ছিলেন লাস্ট অব দ্য মোহিক্যানস। তবে শেষ মোহিক্যান বলে পূর্বের জায়ান্টদের তুলনায় খর্বাকৃতি। সত্যের খাতিরে সেটাও বলা ভাল।

মেয়েদের কথাটি আমি একটু পিছনে ফেলে এসেছি। বাংলার একালের মহিলা গায়িকাদের মধ্যে বিজনবালা ঘোষদস্তিদার, মীরা ব্যানার্জি, দীপালি নাগ, উমা দে, মালবিকা কানন, সন্ধ্যা মুখার্জি সর্বভারতীয় বিচারেই সুগায়িকা। বিজনবালা নেই, অনারাও নেই পাদপ্রদীপের

গঙ্গুবাঈ হাঙ্গল ছবি : সুবীর চ্যাটার্জি

সামনে। এখনকার শিল্পীর মধ্যে অপর্ণা চক্রবর্তী, আরতি বাগচী, শিপ্রা বসু, তনিমা ঠাকুর, পূর্ণিমা সেন, শান্তি মুখার্জি, মন্দিরা লাহিড়ী মোটামুটি বর্মা, প্রভা আপ্তে, শোভা গুরতু, পরভিন সুলতানার। কিন্তু কী বাংলার কী বাংলার বাইরের কোনও শিল্পী সম্পর্কেই আজ এমন আশা অবাস্তব

পরভীন সুলতানা ছবি : সুবীর চ্যাটার্জি

এ. টি. কানন ছবি : সুবীর চ্যাটার্জি

ভাল গাইলেও বড় মাপের গায়িকা নন। বাইরের যাঁরা ভাল গান বা গেয়েছেন তাঁদের মধ্যে নাম করব পদ্মাবতী শালিগ্রাম, সুনন্দা পট্টনায়ক, মানিক যে এঁরা জোহরা, গহর, মুসতারি বাঈ, কেশরবাঈ, মোতিবাঈ, রোশেনারার স্থান নেবেন। কিশোরী আমনকর একমাত্র গায়িকা যাঁর গানে কিছু বস্তু আছে! কিন্তু তিনিও এতই মুডি যে আল্লাদিয়া ঘরের প্রতিভূ হয়েও নিজের গানের রাগাবয়বকে নিজেই ক্ষতবিক্ষত করেন। পদ্মা তালওয়ালকরের নাকি ভবিষ্যৎ আছে। দেখা যাক।

নিসার হুসেন খাঁ

এবারে মূল কথায় আসি। আসলে ঘরানাদার গায়কির সীমাবদ্ধতার মধ্যেই সেদিনের গায়করা অপরিসীম সাধনার দ্বারা নিজেদের যেভাবে তৈরি করতেন, আজ সব সংগীতই হাতের মুঠোয় পেয়েও শিল্পীরা সেই দক্ষতা অর্জনে অক্ষম। খেয়ালিয়ারা আগের মত ধ্রুপদ-ধামারে তালিম পান না বলে তাঁদের গানে রাগদারি এবং ছন্দ-বোল প্রকরণের দিকটি থাকে দুর্বল। এর ফলে একঘেয়েমির জন্ম। নতুন শ্রোতা তৈরি হওয়া দূরে থাক, যাঁরা আসরে এসেছেন তাঁরাও উঠে পড়তেই আগ্রহী হন। না উঠলেও আবার শোনার আকর্ষণ বোধ করেন না। গলা ভাল বলে বা ভাল শিক্ষকের হাতে পড়ে বা নিজস্ব স্বাভাবিক দক্ষতায় অনেকে যথেষ্ট তৈরি হয়ে যাচ্ছেন কিন্তু গভীরতার অভাবে তাঁদের গানে শ্রোতারা পূর্বের মত চমকিত হচ্ছেন না, চমৎকৃত বোধ করছেন না। এক বা একাধিক ব্যক্তির গানের অনুসরণে গায়ক একটা উপরিভাগের সহজসাধ্য বিন্যাসে অভ্যস্ত হয়ে থাকলেও রাগদারির গভীর অতলে শ্রোতাকে তিনি ডুবিয়ে দিতে সক্ষম নন। কিছুটা সফল হয়ে থাকলেও এ ধরনের সহজিয়াপন্থী আজকের বেশির ভাগ শিল্পী। ফলে গায়কসত্তার মহিমান্বিত কোনও প্রকাশ আজ বিরল হয়ে পড়েছে। নিজস্ব চিন্তাশীলতা ও ঘরের চিন্তাধারা স্বকীয় ঢঙে, সুরের সঙ্গে ছন্দ-লয়-তানের বৈচিত্র্যময় পরিবেশনে (যাও এখন কমে গেছে) পূর্বে শিল্পীরা শ্রোতাদের যেভাবে নিজবশে আনতে পারতেন, তাঁদের সংগীতকর্মে যে প্রভাব সৃষ্টি হত, আজ নির্মম সত্য হিসাবে একথা বলাই ভাল যে সেটা নিতান্তই অমিল!

তবু পরিশেষে একটি কথা বলব। হীরুবাবু-জ্ঞানবাবু-কেশববাবু প্রমুখ তবলিয়ার শিক্ষাদানে বাংলার তবলিয়ারা যদি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেই প্রথম সারিতে নিজেদের স্থান করে নিতে পেরে থাকেন, তাহলে কিছু মারাঠিকে বাদ দিলে, যত বেশি সংখ্যক বাঙালি শিল্পী যত ভাল গান তেমনি এখনই অন্যত্র নেই, একথাও কবুল করব। তাঁরা আর একটু সচেষ্ট হলে সর্বভারতীয় মুকুটটিই অনায়াসে নিজেদের দখলে রাখতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাসী। স্বরস্থাপনায়, রাগদারির নিকাশে, তানকারির স্বচ্ছতার পূর্বসুরীদের মত একটা রসঘন পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশে প্রয়াসী হলেই তাঁরা যথাযোগ্য মর্যাদা পাবেন। বেদনা, উল্লাস, আর্তি সব কিছুকেই মূর্ত করে দিতে হবে তাঁদের রূপায়ণে। ঘরের তালিম নেওয়া পূর্বের অর্থে এখন সম্ভব নয়। কিন্তু ঘরে বসেই তো অনেকটা কাজ সারা যায়। চিন্তা ও কর্মে যদি সেই ব্যক্তি-মহিমায় আপনার গান উন্নীত হয়, আপনি যে ঘরেরই গায়ক হন তবেই আপনি পূর্বসুরীদের মহত্ত্বের চাবিকাঠির সন্ধান পাবেন। আপনিও নিতে পারবেন তাঁদের সংগীত-মঞ্চের জাদুকরের ভূমিকাটি। ■

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

কলকাতার মিউজিক কনফারেন্স: সেকাল ও একাল

বিমান ঘোষ

কলকাতা শহরে গান বাজনার একটা আলাদা ট্র্যাডিশান আছে। এত সমঝদার শ্রোতা আর কোনও শহরে নেই। শীত এলেই সেকালে বড় বড় আসরের আয়োজন হত। কলকাতার নামজাদা কিছু ধনী পরিবার ছিলেন সঙ্গীতের গুণগ্রাহী। সেকালে আর একালে অনেক তফাৎ। যুগ বদলেছে, রুচি পাল্টেছে, সে যুগের মহান শিল্পীরা প্রয়াত তবু কনফারেন্সের নাম শুনলে মন নেচে ওঠে।

এদেশে ধূমপায়ীদের জন্য আই টি সি ৪০টিরও বেশি ধরনের সিগারেট আর ধূমপানের তামাক তৈরি করে।

আই টি সি'র ইন্ডিয়া টোব্যাকো ডিভিশন নির্মাণ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে শিল্পকে নেতৃত্ব দেয়, এবং এই শিল্প থেকে আদায়ীকৃত শুল্কের ৫০%-এরও বেশি মেটায়

৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে পথিকৃতের ভূমিকা নিয়ে আই টি সি ভারতের সিগারেটশিল্পের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে। সে শিল্প আজ শুধু অন্তঃশুল্কে ১৪০০ কোটি টাকার বেশি জমা দিচ্ছে।

নেতৃত্বের মূলমন্ত্র—প্রযুক্তি

আই টি সি সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর। ১৯৮৮ [illegible] আগামী পাঁচ বছরে ৩০ কোটিরও বেশি টাকা আধুনিকতম যন্ত্রপাতি আর প্রক্রিয়া সংযোজনে ব্যয় করা হবে। উদ্দেশ্য দ্বিবিধ: ভারতীয় সিগারেটের উৎকর্ষ বাড়িয়ে সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে আসা, অথচ উৎপাদনের খরচকেও নিয়ন্ত্রণে রাখা।

আই টি সি'র সাধনার লক্ষ্যটি হল [illegible] জিনিস তৈরি করা যা ধূমপায়ীর স্বাদের [illegible] সাধ্যের মধ্যেই থাকবে।

সব রকমে সমাজের সেবায়

আই টি সি'র বিপণনের নেট[illegible] কাজে লাগিয়ে সরকার ৬ কোটি নিরোধ গর্ভনিরোধক বিক্রি করে। ১৯৮৮-৮৯'র মধ্যে আই টি সি এই বিক্রি বাড়ানোর জন্যে আরো ১ কোটি টাকা ব্যয় করবে।

আই টি সি'র টোব্যাকো ডিভিশন সারা দেশব্যাপী খেলাধুলার প্রযোজনা করেছে। এক দিবসীয় ক্রিকেট খেলায় উইলস ট্রফি এক দারুণ মর্যাদাপূর্ণ খেলা। দি উইলস বুকস অফ এক্সেলেন্স, যেমন, অলিম্পিকস, ক্রিকেট, টেনিস ও ফুটবল সংক্রান্ত বইগুলি সকলের উচ্চপ্রশংসা লাভ করেছে। খেলাধুলায় সাংবাদিকতার জন্য উইলস এওয়ার্ড ফর এক্সেলেন্স আই টি সি'র আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

শুধু শিল্প জগতে স্বীকৃত পথপ্রদর্শক নয়, দায়িত্বশীল সংস্থা হিসেবেও আই টি সি বিশেষ গর্ব অনুভব করে।

বিগত পাঁচ বছরে আই টি সি'র টোব্যাকো ডিভিশন দেশের অর্থভাণ্ডারে ২৪০০ কোটিরও বেশি টাকা জমা দিয়েছে।

এর পাঁচটি কারখানায় প্রায় ১০০০০ লোক কাজ করছে; ৪০টিরও বেশি সহায়ক ও অধীনস্থ শিল্পে আরো বহু লক্ষ লোক নিযুক্ত।

আই টি সি'র টোব্যাকো ডিভিশন দেশকে নানা ভাবে সেবা করছে—সরকারের পরিবার পরিকল্পনা প্রচেষ্টায় সাহায্য করা থেকে খেলাধুলা ও শিল্প-সংস্কৃতিতে অর্থসাহায্য করা পর্যন্ত।

I.T.C. Limited

প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী

দিকে দিকে আই টি সি'র উদ্যমের অগ্রগতি

কৃষিশিল্প: আই টি সি'র ইন্ডিয়ান লীফ টোব্যাকো ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন উন্নত জাতের তামাক উৎপাদনে সাহায্য করে, চাষীকে ফলনবৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

প্যাকেজিং ও প্রিন্টিং: আই টি সি'র প্যাকেজিং ও প্রিন্টিং ডিভিশন ১০০-রও বেশি শীর্ষসংস্থার দুরূহতম নির্দেশানুযায়ী নতুন ধরনের মুদ্রিত প্যাকেজিং তৈরি করে।

কাগজশিল্প: আই টি সি'র দ্বারা উপজাতি অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ভদ্রাচলম পেপারবোর্ডস, কারিগরী কৌশলকে আয়ত্ত করে উন্নততম উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণেও বি পি এল এক আদর্শ দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

পর্যটন: দেশের সবচেয়ে দ্রুতপ্রসারী হোটেলমালা আই টি সি'র হোটেল ডিভিশন, ওয়েলকামগ্রুপ, আন্তর্জাতিক মানের সেবা দিয়ে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা অর্জন করছে।

রপ্তানি, কুটির শিল্প: আই টি সি'র মার্কেটিং এবং একসপোর্টস ডিভিশন বিদেশী মুদ্রায় ৪ কোটি টাকা মূল্যের ১৫০টিরও বেশি ধরনের সামগ্রী বিদেশে বিক্রি করতে সাহায্য করছে।
শাহজাহানপুরে আই টি সি কার্পেট বয়নশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে সহায়তা করছে। ২৫০০ পরিবার বেশি রোজগার করছে, ভালোভাবে বাঁচছে।

সংগীত: সংগীত রিসার্চ একাডেমি ও আই টি সি সংগীত সম্মেলনগুলি ভারতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠায় এ সংস্থার অবদান।

আজ একবিংশ শতাব্দীর লক্ষ্যে অগ্রগামী আই টি সি নিজস্ব শক্তির ভাণ্ডার আর পরিচালন ক্ষমতার ওপর পূর্ণ আস্থাবান। পথ হবে অনেক কিন্তু মূল লক্ষ্য অনিবার্যভাবেই সেই এক—শ্রেষ্ঠত্বের সন্ধান। অতীতের মূল্যবোধ ও সঞ্চিত শক্তির উত্তরাধিকার নিঃসন্দেহে আগামী দিনের ওপর নিজস্ব স্বাক্ষর রাখবে।

পরিকল্পিত প্রগতির পেশাদারী পরিচালনা।
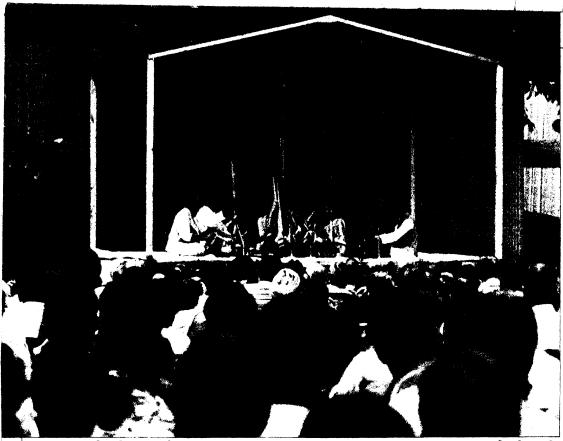
ভক্তি সঙ্গীত ফেস্টিভ্যালে কিশোরী আমনকর *ছবি : অবিনাশ পাসরিচা*

বিচিত্র শহর কলকাতা আরও বিচিত্র কলকাতাবাসী। সারা বছর মেতে আছে গানবাজনা, থিয়েটার, সাহিত্য, শিল্প আর সুকুমার ললিতকলার ঋদ্ধি নিয়ে। শতসহস্র প্রতিবন্ধকতা, অসুবিধা ও সমস্যাজর্জরিত অপূর্ণতা সত্ত্বেও এই মহানগরী চিরদিনই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। উৎসাহ আর উদ্দীপনার অন্ত নেই শহরবাসীদের। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক গোলযোগ একের পর এক দুর্ঘটনার দুর্দিনেও অব্যাহত থাকে গানবাজনার আসর, থিয়েটার যাত্রা, সাহিত্যসভা ও শিল্প প্রদর্শনী। অন্ধকারে নিমজ্জিত মৃত নগরী এই অপবাদ সত্ত্বেও কলকাতা আজও রয়েছে স্রোতস্বিনী সংস্কৃতির প্রবাহকে বুকে নিয়ে। দিনের পর দিন প্রতিকূল পরিবেশকে উপেক্ষা করবার মত এত প্রাণশক্তি, এত উদ্যম কোথা থেকে যে আহরণ করে এই পুরাতন, জীর্ণ শহরের অধিবাসীরা—চিন্তা করে যুক্তিসঙ্গত কারণ নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নয়। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রচার, প্রসার ও চর্চার ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্যও উপস্থাপিত হয়েছিল ধীরে ধীরে এই শহরেই সেকালের সুদূর অতীত থেকে। অন্যান্য প্রদেশের শিল্পীদের ধারণা কলকাতা চিরদিনই গানবাজনার তীর্থক্ষেত্র, সঙ্গীত জগতের মক্কা। কলকাতার শ্রোতাদের সামনে সঙ্গীত পরিবেশনা ছোট বড় যে কোন শিল্পীর কাছে শুধু স্বপ্ন নয়, যেন এক অগ্নিপরীক্ষা। উত্তীর্ণ হতে পারলে যশ, খ্যাতি ও প্রতিপত্তির শিখরে আরোহণের আর কোন অসুবিধা থাকে না। সেজন্য সেকালে এবং একালেও দেশ-বিদেশের ছোট বড় সব শিল্পী কলকাতার আসরে আমন্ত্রণের জন্য বিশেষ আগ্রহী সব সময়। তাঁরা জানেন যে এই অঞ্চলের শ্রোতারা রুচিবান ও গুণগ্রাহী। শিল্পীর প্রতিভার মূল্যায়নে ভুল হয় না তাদের সচরাচর। কলকাতাবাসী শ্রোতাদের নিষ্ঠা আছে, আন্তরিকতা আছে। গানবাজনা শোনা তাদের কাছে নিছক বিলাসিতা নয়। প্রকৃতই তারা গানবাজনা ভালবাসে, শিল্পীদের শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে—যোগ্য মর্যাদা পায় শিল্পীরা কলকাতার শ্রোতাদের কাছে।

কলকাতায় ও অবিভক্ত বাংলায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতচর্চার সূত্রপাত হয় সম্ভবত আঠারো শতকে। তার আগে এ অঞ্চলে গান বাজনার ঠিক কী অবস্থা ছিল তার বিস্তারিত বিবরণ প্রায় অজানাই রয়ে গেছে। ঘটনা যা কিছু শোনা যায় সবই প্রায় কিংবদন্তীর মত। 'তানসেন গাইলেন এমনি মল্লার রাজা গেলেন ভিজে'—এই রকম সব অবাস্তব কাহিনী ও কাল্পনিক ঘটনা শোনা যায় সুদূর অতীতের সঙ্গীত শিল্পীদের সম্বন্ধে। কিছু কিছু বিবরণ ও ইতিহাস পাওয়া যায় আঠারো শতকের শেষ থেকে। তার আগেকার সঙ্গীতজগৎ প্রায় সম্পূর্ণ অন্ধকারেই আবৃত। তবে বলা হয়ে থাকে যে এ অঞ্চলে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতচর্চার এক স্বর্ণযুগ ছিল উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শেষ পর্যন্ত। রাজা-মহারাজা, নবাব ও জমিদার সম্প্রদায় ছিলেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক। রাজদরবারেই শোনা যেতো শিল্পীদের অনুষ্ঠান। গুণী সম্মেলন হতো রাজসভায়, অন্য কোন সঙ্গীত সভায় নয়। সাধারণ শ্রোতারা সবসময় আমন্ত্রিত হতেন না সেই সব সঙ্গীতানুষ্ঠানে উপস্থিত হবার জন্য, সুতরাং জনসাধারণ বঞ্চিত ছিল সেকালে ভাল গানবাজনা স্বাধীনভাবে শোনার সুযোগ-সুবিধা থেকে। মুর্শিদাবাদ কাসিমবাজার, বিষ্ণুপুর, ত্রিপুরা, গৌরীপুর, পঞ্চকোট, বর্ধমান, কুচবিহার, পূর্ণিয়া, মহিষাদল প্রভৃতি রাজবাড়ির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সেকালের অধিকাংশ শিল্পী। তাঁদের ভরণপোষণ ও প্রতিপালনের দায়িত্বও ছিল রাজা-মহারাজা ও জমিদারবাবুদের। বাংলার বাইরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে প্রচলিত ছিল ওই একই ব্যবস্থা। পাতিয়ালা, রামপুর, গোয়ালিয়র, বরোদা, জয়পুর প্রভৃতি স্বশাসিত প্রত্যেক রাজ্যেই নিযুক্ত ছিলেন একাধিক সভাগায়ক বা সভাশিল্পী অর্থাৎ Courtmusician। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই প্রসঙ্গে যে সেকালের রাজা-মহারাজা নবাবসাহেব ও জমিদারবাবুরা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন নিছক খেয়ালখুশি, প্রমোদ বা বিলাসিতার জন্য নয়। তাঁরা সকলেই ছিলেন সৌখীন, সঙ্গীত প্রিয় এবং অনেকেই নিজেরাও ছিলেন গুণী। রাজ পরিবারেও সঙ্গীতচর্চার

প্রচলন ছিল। নিয়মিতভাবে সকাল-সন্ধ্যা সঙ্গীতশিক্ষা ও সঙ্গীতসাধনা করতেন বহু রাজা-মহারাজা-নবাব ও জমিদারবাবু নিজেরাই। তাঁরা নিজেরাই ছিলেন গুণী-জ্ঞানী সেজন্যই গুণীর সম্মান, জ্ঞানীর সমাদর পাওয়া যেতো তাঁদের কাছে। সেকালের সেই আদিযুগে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পরিচর্যার প্রতিপালন করেছিলেন ছোট বড় বিভিন্ন রাজ্যের শাসক গোষ্ঠী। ভারতীয় ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, সঞ্জীবন, চর্চা ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল নিশ্চয় এবং তাঁদের এই অতি প্রয়োজনীয় অবদানের কথা নিশ্চয় লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে।

কিন্তু দেশ, কাল, সমাজ ও সংস্কৃতির গতি চিরদিনই পরিবর্তনশীল। রাজ দরবারে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা ক্রমশ বিরল হয়ে উঠল, সম্ভবত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেই। রাজন্যবর্গের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যে সীমিত হয়ে গেল শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা। কিন্তু তার জন্য শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সাধনা ও প্রসার ব্যাহত হয়নি একটুও, ক্ষুণ্ণ হয়নি এতটুকুও সঙ্গীতসাধকের মান-মর্যাদা, কিছুমাত্র ত্রুটি হয়নি তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতার। অভিজাত পরিবার, ধনীদের গৃহে নতুন পরিবেশে নতুন উদ্যমে শুরু হল শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা ও প্রসার। কলকাতা শহরের বিভিন্ন স্থানে এবং কলকাতার বাইরে গড়ে উঠল পারিবারিক সঙ্গীতসভা, ঘরোয়া সঙ্গীত সভা। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে সংযোজিত হল আর এক নতুন অধ্যায়। অনেক মধ্যবিত্ত সঙ্গীতপ্রেমীও সঙ্গীতচর্চা করতেন নিজেদের বাড়ির বৈঠকখানায়। ধ্রুপদ ধামার খেয়াল ঠুংরী নানারকম বৈঠকী গানের আসর বসত বৈঠকখানা, ঠাকুরদালান, বাড়ির অঙ্গনেও। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে অনেক সময় চলতি ভাষায় বলা হত ওস্তাদি গান বা কালোয়াতি গান এবং কালোয়াতি গানের অনুরাগী সেকালে নিতান্ত অল্পসংখ্যক ছিলেন না কলকাতায় এবং কলকাতার বাইরে। এই সব ছোট ছোট সঙ্গীতসভা ঘরোয়া গানের আসরে কলাকার গানবাজনা করতেন প্রাণভরে, পরম তৃপ্তির সঙ্গে। শ্রোতাদের সঙ্গে সামনাসামনি সরাসরি যোগাযোগ, তাদের উচ্চকিত প্রশংসা, উচ্ছ্বাস উৎসাহিত করত, অনুপ্রাণিত করত কলাকারকে। ফলস্বরূপ তাঁদের সঙ্গীত পরিবেশনা হয়ে উঠত উচ্চ মানের। সারা ভারতবর্ষের প্রথিতযশা শিল্পীরা আমন্ত্রিত হতেন তাঁদের অনুষ্ঠানের জন্য এই সব ছোট ছোট পারিবারিক সঙ্গীতসভা ও ঘরোয়া বৈঠকে। উৎসাহী শ্রোতাদের কাছে তাঁদের সঙ্গীত পরিবেশনার জন্য তাঁরা এতই আগ্রহান্বিত হতেন যে অনেক সময় কোন কোন ওস্তাদ বা গুণিজন থেকে যেতেন কলকাতায় ও কলকাতার বাইরে, বাংলার অন্যান্য শহরে। স্থানীয় শিক্ষার্থী শিল্পীরা সুযোগ গ্রহণ করতেন সেই সব অভিজ্ঞ গুণিজনের কাছে সঙ্গীত শিক্ষার। এই সব কারণেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসার ধীর গতিতে হলেও বৃদ্ধি পায় ক্রমশ, কলকাতা শহরে ও সারা পূর্বাঞ্চলে। সেকালের

পণ্ডিত ভীমসেন যোশী — *ছবি : সুবীর চ্যাটার্জী*

সৌখিন, অভিজাত, ধনী পৃষ্ঠপোষক সকলেই ছিলেন সঙ্গীতানুরাগী এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিজেরাও সঙ্গীতচর্চা করতেন। কেউ কেউ ছিলেন এমনই প্রতিভাসম্পন্ন যে তাঁদের পরিবারভুক্ত গুণিজনের কাছে নিয়মিত শিক্ষা ও অনুশীলন করে যথাযোগ্য স্বীকৃতি ও সম্মান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন দেশের গুণী শিল্পী হিসাবে। প্রকৃত পক্ষে সৌখিন অভিজাত ধনী সঙ্গীতসেবকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন আদর্শবাদী। ভারতীয় সঙ্গীতের পরম্পরা রক্ষার দায়দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন অনেক ক্ষেত্রে বংশানুক্রমে। পারিবারিক সঙ্গীতসভা ঘরোয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হত সারা বছরের পূজাপার্বণ এবং অন্যান্য গৃহ উৎসবের অঙ্গ হিসাবে। গৃহে কলাকারের অবস্থান, তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল পরিবারের শখ, রুচি ও সামাজিক মর্যাদার পরিচায়ক। বিভিন্ন পরিবার ও গোষ্ঠীর মধ্যে কিছুটা প্রতিযোগিতার মনোভাবও পাওয়া যেত অনেক সময়, অবশ্য পরোক্ষভাবে।

পারিবারিক সঙ্গীতসভা ও ঘরোয়া বৈঠক অধিকাংশই অনুষ্ঠিত হত উত্তর কলকাতায়—কারণ সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত ধনীদের বাসগৃহ ছিল উত্তর ও মধ্য কলকাতায়। ভবানীপুরের কিছু অংশ ছাড়া দক্ষিণ কলকাতার বিরাট প্রান্তর ছিল পরিত্যক্ত, নাগরিকদের বসবাস সম্ভবত তখনও শুরু হয়নি কলকাতার দক্ষিণে। কিন্তু পারিবারিক সঙ্গীতসভা, ঘরোয়া বৈঠকের সংখ্যা কিছু কম ছিল না সেকালে এবং সব গুলির উল্লেখ করাও সম্ভব নয়। মোটামুটি বলা যেতে পারে যে কলকাতা শহরে অতীতের গান বাজনার প্রাণকেন্দ্র ছিল কাশিমবাজারের রাজবাড়ি, শোভাবাজারের রাজবাড়ি, সিমলার দেবদের বাড়ি, পাইকপাড়ার সিংহ সদন, পাথুরিয়াঘাটার ঘোষদের বাড়ি, মসজিদবাড়ি স্ট্রীটের গুহভবন, বাগবাজারের পশুপতি বসুর বাড়ি, গড়পারের নিবারণ দত্তর বাড়ি, বউবাজারে বড়ালদের ও মতিলালদের বাড়ি, পাথুরিয়াঘাটায় গোপীমোহন ঠাকুরের বাড়ি, সিঁদুরপটির মল্লিকবাড়ি, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, বিডন স্ট্রীটের কালী মিত্রদের বাড়ি, ডিক্সন লেনে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের বাড়ি, জোড়াবাগানে দেবীপ্রসন্ন ঘোষের বাড়ি, ওয়েলিংটনে নাহারদের বাড়ি, ভবানীপুরে রূপচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি প্রভৃতি আরও অনেক বিত্তবান সঙ্গীতপ্রেমিকদের আবাস স্থল। এ ছাড়া আরও অনেক ছোট ছোট আসর হত বসত স্থানীয় সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত রসিকদের বৈঠকখানায়। হ্যারিসন রোডে সঙ্গীতাচার্য গিরিজাশঙ্করের বাড়িতে অনেক সময় এসে উপস্থিত হতেন উত্তর ও পশ্চিম ভারতের দিকপাল শিল্পীরা। গিরিজাশঙ্করের খ্যাতি ও সুনাম ছিল দেশজোড়া। স্বনামধন্য হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলীর পিতা এটর্নী মন্মথনাথ গাঙ্গুলী নিজেও ছিলেন গুণী এবং গুণগ্রাহী। ওঁদের বাড়িতে বিখ্যাত তবলিয়া ওস্তাদ আবিদ হোসেন খাঁ, ওয়াজেদ হোসেন খাঁ এবং

আরও অনেক কৃতী শিল্পীর স্মরণীয় অনুষ্ঠান হয়েছে অনেকবার। ক্যানেল স্ট্রীটে অদ্রিনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে গোলাম আলী খাঁ সাহেব, বিলায়েৎ খাঁ, বেগম আখতার, ইমরাৎ হোসেন খাঁ এবং আরও অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও তরুণ শিল্পীদের অনুষ্ঠান শোনা যেত প্রায়ই। বাগবাজারে সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী অনাথনাথ বসুর গৃহেও ফিরোজ খাঁ প্রভৃতি গুণীদের তবলা ও ঠুংরী গানের অনুষ্ঠান হয়েছিল অনেকবার।

বিরাট হলঘর কিংবা বৈঠকখানা, প্রশস্ত ঠাকুর দালান অথবা গৃহের অভ্যন্তরে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে শ্রোতাদের সংখ্যা হত যথেষ্ট। সকলেই আমন্ত্রিত তবে রবাহূত ও অনাহূত সঙ্গীতরসিকরা যে এসে ভীড় করতেন না একথা বলা যায় না। এই সব জলসায় সাধারণ শ্রোতাদের প্রবেশাধিকার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠত না কারণ তখনও পর্যন্ত সাধারণ মানুষ ও জনগণের জীবনে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তারিত হয়নি। কিন্তু শহরের গানবাজনার অবস্থা, পরিস্থিতি ও পরিবেশ আবার পরিবর্তিত হল ধীরে ধীরে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা সঠিকতর হল দিন দিন, সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল বেশ কয়েকটি। ক্রমশ প্রসারিত হল শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সাধারণ স্তরের মানুষের জীবনে। শ্রোতাদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য পারিবারিক সঙ্গীতসভা কিংবা ঘরোয়া বৈঠক আর অনুকূল রইল না সুষ্ঠুভাবে সঙ্গীত পরিবেশনার পক্ষে। সৌখিন, ধনী উদ্যোক্তা সম্প্রদায় উপলব্ধি করলেন সঙ্গীতসভার জন্য প্রয়োজন বিস্তৃত সভাগৃহ উপযুক্ত রঙ্গালয়। কথায় বলে প্রয়োজনই হল সৃষ্টি ও আবিষ্কারের উৎস। বিপুল সংখ্যক শ্রোতাদের স্থান সঙ্কুলানের প্রয়োজনে শুরু হল শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অধিবেশন, সম্মেলন—কনফারেন্স শহরের বিভিন্ন রঙ্গালয়ে ও বিশেষভাবে নির্মিত বিস্তৃত মণ্ডপে, যাকে বলা হয়ে থাকে প্যাণ্ডেল। লক্ষণীয় এই যে সেকালের সেই সব মিউজিক কনফারেন্স বা সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্যোক্তারাও ছিলেন সৌখিন, অভিজাত সঙ্গীতপ্রেমিক সম্প্রদায়। শত শত হাজার হাজার শ্রোতাদের সামনে সপ্তাহব্যাপী গানবাজনা চলত সারা রাত্রি ধরে বিভিন্ন রঙ্গালয়ে, প্যাণ্ডেলে। নভেম্বর-ডিসেম্বরের কনকনে ঠাণ্ডা সত্ত্বেও দেহমনে উষ্ণতা নিয়ে শ্রোতারা স্বকর্ণে শুনতেন হিন্দুস্থানের দিকপালদের সঙ্গীত পরিবেশনা, স্বচক্ষে দেখতেন সঙ্গীতজগতের সেই সব প্রবাদশিল্পী খাঁসাহেব ও পণ্ডিতদের। অগণিত শ্রোতা আর একাধিক শিল্পী—অকল্পনীয় অসাধারণ সম্মেলন। সেকালের সেই সব সঙ্গীত সম্মেলন আজও সঞ্জীবিত করে রেখেছে সারা উপমহাদেশের মহান ঐতিহ্য, অমূল্য ঐশ্বর্য, জাতীয় সংস্কৃতির প্রতীক শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে আমাদের এই মহানগরীতে।

জনপ্রিয় সম্মেলন ও সার্থক অধিবেশনের কথা চিন্তা করলে প্রথমেই মনে পড়ে যায় অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স অর্থাৎ নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের কথা। পাথুরিয়াঘাটার ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের প্রচেষ্টায় শুরু হল কনফারেন্স। ঘোষ পরিবারের সভ্যদের উৎসাহ আর উদ্যমে সম্মেলনের প্রত্যেকটি অধিবেশন হত জমজমাট ও আকর্ষণীয়। বিরাট আয়োজন, অসাধারণ শিল্পী সমাবেশ আর পারিবারিক পরিবেশ। দূরদূরান্তর থেকে আগত বিখ্যাত গুণীদের সঙ্গে এই কনফারেন্সের যোগাযোগ ছিল অন্তরঙ্গ, সম্পর্ক ছিল নিবিড়—গুণিজন এবং ওস্তাদকুল সারা বছর ধরে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতেন কনফারেন্সের তারিখের জন্য, শুধু পেশাগত কারণে নয়। তাঁরা অবস্থান করতেন ঘোষ বাড়িতে দিনের পর দিন প্রায় নিজগৃহে অবস্থানের মত, তাঁদের পরিচর্যার ত্রুটি হত না কখনও—এমনই ছিল ভূপেনবাবুর শিল্পী আপ্যায়ন, আদর যত্ন ও আতিথেয়তা। স্থানীয় শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ সকলেই এগিয়ে আসতেন ভূপেনবাবুর সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্য—অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স যেন ছিল সারা কলকাতাবাসীর পারিবারিক কনফারেন্স।

পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ, রঙ্গালয়ের প্রতিটি আসনে উপবিষ্ট শ্রোতা—তিল ধারনের স্থান নেই। রঙ্গালয়ের বাইরে ফুটপাতে খবরের কাগজের আসনে বসে আছে শত শত গান-পাগল। ফুটপাথের ভীড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে উপচে পড়েছে ট্রামলাইনের ওপর। কনফারেন্সের উদ্যোক্তরা সঙ্গীতরসিক শ্রোতাদের আগ্রহ দেখে পরিস্থিতি বুঝে রঙ্গালয়ের বাইরে মাইক্রোফোনের স্পীকারের ব্যবস্থা রেখেছেন। ফুটপাতে, রাস্তায় পাশাপাশি বসে আছেন সাহিত্যিক, শিল্পী, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, ছাত্র, উচ্চমধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, সমাজের নানা স্তরের মহিলা পুরুষ, উপভোগ করছেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত রাতের পর রাত, শীতের রাত অসম্ভব ঠাণ্ডা, সারা অঙ্গ আচ্ছাদিত, খোলা আছে শুধু দুটি কান অপূর্ব সঙ্গীতের উত্তাপ গ্রহণের। কখনও কখনও শোনা যায় মৃদু আলোচনা, মন্তব্য, রসিকতা আর উচ্ছ্বাস। কিন্তু নীরব নিস্তব্ধ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, কোথাও নেই এতটুকুও বিশৃঙ্খলা। ভোর হয়ে যায় তখনও বসে আছে ট্রামলাইনের ওপর রাত জাগা গান-পাগলের দল—কোন ধর্মঘটের জন্য পথরোধ নয়, অপার্থিব সঙ্গীত শ্রবণের জন্য পথে অবস্থান। মনে পড়ে এক মহালয়ার ভোরের কথা। একটু দূরে চায়ের দোকানের রেডিও থেকে ভেসে আসছে বীরেন ভদ্রের চণ্ডীপাঠ আর পঙ্কজ মল্লিকের স্তব গান, রঙ্গালয়ের মাইক্রোফোনে বেজে চলেছে রবিশংকরের ভাটীয়ার—সঙ্গীত সম্মেলনের অধিবেশন তখনও শেষ হয়নি। ভোরের আলো, মহিষাসুরের প্রশস্তি আর সেতারে প্রভাতী রাগের ঝঙ্কার মিলেমিশে একাকার হয়ে সৃষ্টি করেছিল এক বিচিত্র পরিবেশ, শিহরন লাগা অমূল্য এক অভিজ্ঞতা।

কিন্তু ভাল মন্দ সব জিনিসেরই শেষ আছে, আগে কিংবা পরে। অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সের অন্যতম কর্মী ও অনুষ্ঠানের পরিচালক বিভূতি ঘোষের অকালমৃত্যু, প্রয়াত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের যোগ্যপুত্র মন্মথনাথের স্বাস্থ্য ভঙ্গ—ধীরে ধীরে বিরল হয়ে এল বাঙালীর গর্ব, কলকাতার ভূষণ অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সের অধিবেশন। চরম আঘাত পেলেন মন্মথনাথ তাঁর জীবদ্দশায় যখন তাঁর একমাত্র পুত্র পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল সব কিছুর মায়া কাটিয়ে। মন্মথবাবুও আজ নেই, অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সের সেই স্বপ্নের সকাল-সন্ধ্যা-রাত্রির অধিবেশন আর শোনা যাবে না কোনদিনও।

অলবেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স স্থাপিত হওয়ার কিছু কাল পরেই লালাবাবু নামে সমধিক পরিচিত দামোদর দাস খান্না প্রতিষ্ঠা করেন অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স অর্থাৎ অখিল ভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলন। লালাবাবু প্রথমে অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ভূপেনবাবুর সহকর্মী হিসাবে। লালাবাবু ছিলেন ক্ষমতাবান ব্যবসায়ী, অতি অল্প সময়ের মধ্যে অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল কলকাতা শহরের শ্রোতৃবর্গ এবং সারা দেশের সঙ্গীত শিল্পীদের ওপর। তবে লালাবাবু অনুষ্ঠানসূচী পরিকল্পনা করতেন ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সের অধিবেশন থেকে কিছুটা পার্থক্য সৃষ্টি করবার জন্য। ওস্তাদ বিসমিল্লা খাঁ সাহেব নিয়মিত আসতেন লালাবাবুর কনফারেন্সে, কখনও কখনও সানাই ও বেহালার যুগলবন্দী অনুষ্ঠানে শোনা যেত পণ্ডিত ভি জি যোগ এবং বিসমিল্লা খাঁ সাহেবকে। লালাবাবু একবার রঙ্গমঞ্চে একসঙ্গে বসিয়ে ছিলেন রসুলন বাঈ, সিদ্ধেশ্বরী দেবী, বড়ি মোতি বাঈ, যোগ সাহেব, বিসমিল্লা খাঁ সাহেবকে—সে এক অভিনব অনুষ্ঠান, শ্রোতারা খুবই মজা পেয়েছিলেন। পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, ডি ভি পালুস্কর, কেসরী বাঈ, মঘু বাঈ, ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ সাহেব, বিলায়েৎ খাঁ, আলী আকবর, রবিশঙ্কর, আহমদ আলী আমজাদ আলী, প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পীরা নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকতেন অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে। অনেক শিল্পীরা ছিলেন লালাবাবুর বিশেষ অনুগত এবং লালাবাবুর অনুমতি ছাড়া তাঁরা অন্য কোন অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন না। সম্মেলনের সব অধিবেশনে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ থাকত না সব সময় কারণ অনেক ব্যবসায়ী শ্রোতা যথেষ্ট প্রবেশ মূল্য দিয়ে আসন সংরক্ষিত করে রাখতেন কিন্তু শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ না থাকাতে তাঁরা উপস্থিত থাকতেন না সম্মেলনের সব অনুষ্ঠানে। নাচের অনুষ্ঠানে অবশ্য প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে যেত একেবারে। যাই হোক বেশ কিছুকাল লালাবাবুর কনফারেন্স চলেছিল সুষ্ঠুভাবে। কিন্তু কর্মীদের উৎসাহের অভাবে এবং ঐ কনফারেন্সের ওপর শ্রোতাদের প্রভাব হ্রাস পাওয়াতে কনফারেন্সের ব্যবস্থা করা আর সম্ভব হল না। অল বেঙ্গল এবং অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সের অধিবেশনের অভাব অনুভব করেছিলেন অনেক শ্রোতা ও অনেক শিল্পী বেশ কিছুদিন পর্যন্ত।

কিন্তু সঙ্গীত সম্মেলনের জনপ্রিয়তা ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে আশাতীতভাবে। এই জনপ্রিয়তা লক্ষ করে অনেক উৎসাহী ব্যবস্থাপক এবং কোন কোন শিল্পী এগিয়ে এলেন সঙ্গীত সম্মেলনের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে। তানসেন সঙ্গীত সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হল দুই শিল্পী শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও

কালিদাস সান্যালের যুগ্ম প্রচেষ্টায়। প্রতিষ্ঠাতা দুজনেই ছিলেন রাগসঙ্গীতের কলাকার এবং ওঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন ওস্তাদ দবীর খাঁ প্রমুখ অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী। পরবর্তী সময়ে কালিদাসবাবু নিজেই প্রতিষ্ঠা করলেন সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন সংস্থা সম্ভবত ১৯৫৪ সালে। তানসেন সঙ্গীত সংঘ ও সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল কলকাতার শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সমাজে। প্রায় প্রতি বছরই আকর্ষণীয় শিল্পী সমাবেশের ব্যবস্থা থাকত এই দুই সঙ্গীত সম্মেলনে এবং প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে যেত আগ্রহী শ্রোতাদের ভীড়ে। তানসেন সঙ্গীত সংঘের অধিবেশনে অনেক সময়ে আলোচনাচক্র ও বিতর্কসভার ব্যবস্থা করতেন শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মান উন্নয়নের জন্য। যত দূর মনে পড়ে সদারঙ্গের অধিবেশনে একবার চিত্রতারকা আশা পারেখ, ওয়াহিদা রহমান, হেমা মালিনী, পদ্মিনী রাগিণীর নৃত্যানুষ্ঠান বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল কলকাতা শহরে। অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও শৈলেনবাবু এবং কালিদাসবাবু আজও তৎপর রয়েছেন তানসেন ও সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের ব্যবস্থাপনায় রীতিমত কর্তৃত্বের সঙ্গে।

পার্ক ইউনিয়ান ক্লাব পরিচালিত পার্ক সার্কাস মিউজিক কনফারেন্সের রজতজয়ন্তী হয়ে গেল ১৯৮০ সালে। পার্ক ইউনিয়ন ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫১ সালে, সদস্যরা অধিকাংশ এসেছিলেন পূর্ববঙ্গ থেকে পার্কসার্কাস অঞ্চলে বসবাসের জন্য। নরেশ মুখোপাধ্যায় ও জে সি গুপ্ত ছিলেন বিশেষ উদ্যোগী এবং ক্লাবটি ছিল খেলাধূলা ও ব্যায়ামের জন্য। প্রতি বছর দীপাবলী উৎসব অর্থাৎ কালীপূজার সময় গানবাজনার ব্যবস্থা হত ক্লাবে। জগন্ময় মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন প্রভৃতি লঘু সঙ্গীতের শিল্পীরা আমন্ত্রিত হতেন এই উৎসবে অনুষ্ঠানের জন্য। যত দূর জানা আছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়ের ১৯৫৩ সাল থেকে শুরু হল পার্ক সার্কাস মিউজিক কনফারেন্স। শুরু হল পার্ক ইউনিয়ান ক্লাবের পরিচালনায়। সম্পাদক যতীন্দ্র সেন আইনজীবী, সেই প্রথম অধিবেশন থেকে আজ পর্যন্ত তিনি পরিচালনা করে এসেছেন পার্ক সার্কাস সঙ্গীত সম্মেলন অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে। পার্ক সার্কাস মিউজিক কনফারেন্স সম্বন্ধে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে আদর্শ ও নীতিমূলক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত এই প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গী। শ্রোতাদের অর্থ সামর্থ্য ও নবীন প্রতিভাদের সুযোগ দানের কথা চিন্তা করেই অধিবেশনের অনুষ্ঠানসূচী তৈরী করেন যতীনবাবু এবং তাঁর সহকর্মীরা। তুলনামূলকভাবে একথাও বলা যেতে পারে যে পার্ক সার্কাস সঙ্গীত সম্মেলনের বাৎসরিক অধিবেশন আজও যথেষ্ট আকর্ষণীয় শ্রোতা ও শিল্পীদের কাছে। সংযুক্তা পানিগ্রাহী, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, আমজাদ আলী খাঁ, ইমরৎ হোসেন খাঁ, মণিলাল নাগ, দীপক চট্টোপাধ্যায়, নারেন দর, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, সুব্রত রায়চৌধুরী, ব্রিজলাল, সুনন্দা পট্টনায়ক, পরভীন

মুস্তাক হোসেন খাঁ

সুলতানা আরও অনেক শিল্পী সমধিক সুপ্রসিদ্ধ হবার আগেই অনুষ্ঠান করেছেন পার্ক সার্কাস মিউজিক কনফারেন্সে। বিলায়েৎ খাঁ সাহেব, আলী আকবর, রবিশংকর, গোলাম আলী খাঁসাহেব, শরাফৎ হোসেন খাঁ, মনওয়ার আলী একাধিক বার অংশ গ্রহণ করেছেন পার্ক সার্কাস সঙ্গীত সম্মেলনের অধিবেশনে।

কলকাতা শহরে সেকাল ও একালের মিউজিক কনফারেন্সগুলির মধ্যে বালিগঞ্জের ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্স এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে আজও। অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সের রীতিনীতি অনুসরণ করে ডোভার লেন পাড়ার সৌখিন অভিজাত সঙ্গীতপ্রেমিক ছেলেরা উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে বছরের পর বছর ধরে সঙ্গীত সম্মেলনের

আমির খাঁ

ছবি : সুধীর চ্যাটার্জী

রসুলন বাঈ

...সৌজন্যে

অধিবেশনের ব্যবস্থা করে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। অর্থ, সামর্থ্য সবই আছে ডোভার লেনের কর্মীদের এবং সঙ্গতির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহারের কোন ত্রুটি হয় না কখনও। শিল্পীদের সম্মান, আদরযত্ন দেখা শোনার মধ্যেও কোন ত্রুটি থাকে না সচরাচর। গড়িয়াহাটা আর রাসবিহারী এভিনিউ মোড়ের কাছে সিংহী পার্কেই ছিল কনফারেন্সের স্থান। সম্প্রতি একটু অসুবিধা হয়ে গেছে সিংহী পার্কে। সেই জন্য গত দু' এক বছর কনফারেন্স হয়েছে সাদার্ন এভেনিউর চিত্তরঞ্জন পার্কে। স্থান পরিবর্তনের জন্য শ্রোতা সমাবেশের কোন অসুবিধা হয়নি। প্রতি বছরের কনফারেন্সে কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতের দিকপাল শিল্পীদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয় ভারতবর্ষের নানা অঞ্চল থেকে। স্থানীয় প্রতিশ্রুতিপূর্ণ তরুণ শিল্পী

এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদেরও শোনা যায় এই সঙ্গীত সম্মেলনে। উদ্বৃত্ত অর্থের সদব্যবহার করতেও কার্পণ্য নেই, প্রতি বছরই সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ইত্যাদি গঠনমূলক কাজের পরিকল্পনাকে রূপায়িত করে ডোভার লেনের নিষ্ঠাবান কর্মিবৃন্দ। এখনও অনেক আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান শুনতে পাওয়া যায় দক্ষিণ কলকাতার এই কনফারেন্সে। ভীমসেন যোশী, কিশোরী আমোনকার, বিলায়েৎ খাঁ, আলী আকবর, রবিশংকর, আমজাদ আলী, বেগম আখতার, বিরজু মহারাজ, নয়না দেবী, বড়ে গোলাম আলী খাঁসাহেব, আমীর খাঁ, সারফৎ হোসেন খাঁ, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, এ কানন, মালবিকা কানন প্রভৃতি গুণীরা সকলেই অনুষ্ঠান করেছেন এখানে। সারারাত্রিব্যাপী দীর্ঘ অনুষ্ঠান শোনার পরও শ্রোতারা শেষ শিল্পীকে ছাড়তে চায় না, অধিবেশন শেষ হতে হতে বেজে যায় সকাল আটটা। এই ডোভার লেনের মিউজিক কনফারেন্সই স্মরণ করিয়ে দেয় অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সের। গত বছরের মর্মান্তিক ঘটনা—বিদেশ সফরের পর নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম অনুষ্ঠান ডোভার লেনে ২৫শে জানুয়ারি। সাধারণত খুব যত্ন করে, আন্তরিকতার সঙ্গে চিরদিন অনুষ্ঠান করেছে নিখিল ডোভার লেনের কনফারেন্সে। এবারে খুব বেশী ক্ষণ বাজাতে পারল না অসুস্থতার জন্য। বাজনার শেষে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিল শ্রোতাদের কাছে। অনুষ্ঠানের ঠিক দুদিন পরে, ২৭শে জানুয়ারি আকস্মিক অবসান হল নিখিলের বহুমূল্য জীবনের। ডোভার লেনের কনফারেন্সেই নিখিল তার জীবনের শেষ অনুষ্ঠান করে চলে গেল পৃথিবী ছেড়ে চিরদিনের মত। মধ্য কলিকাতা সঙ্গীত সম্মেলনের কয়েকটি অধিবেশন বেশ সুনাম অর্জন করেছিল ষাট দশকে, আকর্ষণীয় শিল্পী সমাবেশ এবং সৎকার্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে। তরুণ সঙ্গীত সম্মেলনের সম্পাদক সনাতন মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন কৃতী ব্যবস্থাপক। তাঁরই ব্যবস্থাপনায় মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এক অভিনব সম্মেলন ১৯৬১ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে। আধুনিক বা অন্যান্য লঘুসঙ্গীতের সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছিল শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। স্থানীয় এবং অন্যান্য প্রদেশের প্রথিতযশা শিল্পীরা সকলেই অংশ গ্রহণ করেছিলেন সেই সম্মেলনে। উদ্দেশ্য ছিল বোধহয় অর্থ সংগ্রহ এবং সে উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল বেশ ভালভাবেই। ন্যাশানাল ডিফেন্স ফাণ্ডের জন্য সংগৃহীত হয়েছিল সাঁইত্রিশ হাজারের বেশী টাকা।

স্বদেশ সান্ন্যাল আর একজন উৎসাহী কর্মী—অনেক পরিশ্রম করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলন, সম্ভবত ষাট দশকের মাঝামাঝি। স্থানীয় তরুণ প্রতিভা এবং উত্তর ও পশ্চিম ভারতের প্রথিতযশা শিল্পীদের নিয়ে এখনও সম্মেলনের অধিবেশন হয়ে থাকে প্রতি বছর। পঁচিশ নম্বর ডিক্সন লেনের ঝঙ্কার মিউজিক সার্কল এক অসাধারণ প্রতিষ্ঠান ছিল শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুরাগীদের জন্য। কলকাতা শহরের অন্যতম গুণীদের সমাবেশে নানারকমের সঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হতো ঝঙ্কারে। রাধিকামোহন মৈত্র, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য জ্ঞানী-গুণীরা নানাভাবে সমৃদ্ধ করে রেখেছিলেন ঝঙ্কারকে। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ গুণীরা নিয়মিতভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন ঝঙ্কারে। এখন আর ঝঙ্কারের সে সুদিন নেই তবু সম্পাদক মুকুল চক্রবর্তী এখনও পর্যন্ত প্রচুর উৎসাহ নিয়ে ব্যবস্থা করে থাকেন সঙ্গীত সম্মেলনের। প্রতি বছর ঝঙ্কারের জন্য। কলকাতা সহরের কোন কোন সংস্থা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সম্মেলন করেন কোন এক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে। সুরেশ সঙ্গীত সংসদ এমনই এক সংস্থা যাঁরা সঙ্গীতে সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন দুঃস্থ সঙ্গীত শিল্পীদের সাহায্য এবং

সিদ্ধেশ্বরী দেবী *আকাশবাণী-র সৌজন্যে*

জাতীয় সংহতি সংরক্ষণের জন্য। সংসদের সম্পাদক কানাইলাল বসু একজন অক্লান্ত কর্মী। বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর স্মৃতিরক্ষা ছাড়া অন্য এক চিন্তাধারা নিয়ে সংসদের কর্মসূচী পরিকল্পনা করেন কানাইবাবু। ১৯৭০ সালে সংসদ আয়োজিত প্রথম সঙ্গীত সংহতি সম্মেলনে পূর্ব ভারতের সমস্ত রাজ্যের সঙ্গীত শিল্পী মিলে-মিশে অনুষ্ঠান করেছিলেন কলকাতায়। এ ছাড়া ওস্তাদ আমজাদ আলী প্রমুখ গুণীদের সহযোগিতায় কানাইবাবু অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানের দুস্থ শিল্পীদের শয্যার জন্য। মন্মথনাথ ঘোষ সংযুক্ত ছিলেন সুরেশ সঙ্গীত সংসদের সঙ্গে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

ইদানীং আয়োজিত মিউজিক কনফারেন্সের মধ্যে কলাসঙ্গম সংস্থার সঙ্গীত সম্মেলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটা নামী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন অবাঙালী সঙ্গীত প্রেমিক কলাসঙ্গমের পরিচালক। তাঁরা সকলেই সৌখীন এবং ব্যবস্থাপনার কাজে বিশেষ অভিজ্ঞ। বেশ কয়েক বছর ধরে কলাসঙ্গম সঙ্গীত সম্মেলনের ব্যবস্থা করছে কলকাতায় পরম কৃতিত্বের সঙ্গে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের খোলামেলা আবহাওয়ার অভাব থাকে কলাসঙ্গমের অনুষ্ঠানে তবে আকর্ষণীয় শিল্পী নির্বাচন ও নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা কলাসঙ্গমের বৈশিষ্ট্য। অনুষ্ঠান সূচী পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও কলাসঙ্গমের মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। পর পর দু বছরে 'ইমন সমারোহ' 'মালকোষ সমারোহ' কিছুটা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছিল নিশ্চয় রাগসঙ্গীত পরিবেশনার ক্ষেত্রে।

আরও মিউজিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে মাঝে মাঝে সেকালে এবং এ-কালে কিন্তু ঠিক নিয়মিতভাবে নয়। স্বনামধন্য রাইচাঁদ বড়াল কয়েকবার আয়োজন করেছিলেন মিউজিক কনফারেন্সের বিশিষ্ট শিল্পীদের সহযোগিতায় এবং খুবই সমাদৃত হয়েছিল রাইবাবুর প্রত্যেকটি কনফারেন্স। কিন্তু অন্যান্য কয়েকটি কনফারেন্স দু এক বছর পরেই বন্ধ হয়ে যায় পরিচালনার দুর্বলতা, আর্থিক অসঙ্গতি, উদ্যোক্তাদের নিষ্ঠার অভাব প্রভৃতি নানা কারণে।

ত্রিশ দশক থেকে সুরু করে আশী দশকের শেষ প্রান্তে এসে কলকাতার মিউজিক কনফারেন্সের অভিযান কি শেষ পর্যন্ত সমাপ্তির পথে? যুক্তিসঙ্গত কারণেই এই প্রশ্ন জেগেছে অনেক সঙ্গীতানুরাগী, শিল্পী ও সমালোচকদের মনে। বিগত পঞ্চাশ বছরের গান-বাজনার অবস্থা পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে যে সেকালের মিউজিক কনফারেন্সের রীতি-নীতি, ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও সঙ্গীত পরিবেশন ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। দেশ, সমাজ ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একালের মিউজিক কনফারেন্স যে ভিন্ন রূপ নিয়েছে এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সাধারণত মিউজিক কনফারেন্সের সফলতা নির্ভর করে ব্যবস্থাপক বা পরিচালক সম্প্রদায়, শিল্পী সম্প্রদায় ও শ্রোতা সম্প্রদায়ের ওপর। এই তিন সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতার অভাবেই বিপত্তি ও সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। সেকালে ব্যবস্থাপনার দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল সৌখিন, অভিজাত, ধনী সম্প্রদায়ের ওপর। ব্যবস্থাপকরা নিজেরা ছিলেন সঙ্গীতরসিক ও সঙ্গীতপ্রেমিক। ব্যক্তিগত স্বার্থ সুখ সুবিধা বিসর্জন দিয়েই তাঁরা পরিশ্রম করতেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারের জন্য। তাঁদের পুরস্কার ছিল আত্মতৃপ্তি, শিল্পী ও শ্রোতাদের কাছ থেকে পাওয়া প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা। শিল্পীরা তাঁদের সঙ্গীত, তাঁদের সাধনা, তাঁদের সৃষ্টি পরিবেশন করে পেতেন সার্থকতা, পারিশ্রমিকও পেতেন নিশ্চয়। জীবন ধারণের জন্য অর্থের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না কোন সময়ে কোন যুগেই। তবে অর্থের চেয়েও সেকালের শিল্পীরা অধিক মূল্য দিতেন প্রশংসা, সম্মান ও

স্বীকৃতির। লোভ নিশ্চয় ছিল—ওস্তাদ ও গুণী সম্প্রদায় মানুষ ত বটেই। তাঁদের লোভ ছিল, সুনাম, সম্মান ইজ্জতের প্রতি, অর্থের প্রতি নয়। সেকালে সাধকদের কাছে ছিল জীবনের প্রয়োজনে অর্থ, অর্থের প্রয়োজনে জীবন নয়। আর শ্রোতা সম্প্রদায়? তাঁরা ছিলেন প্রকৃতই গান-পাগল। ভাল গানবাজনা শোনবার জন্য তাঁরা ভুলে যেতেন স্নানাহারের কথা, গান শুনতে শুনতে সকাল সন্ধ্যা রাত্রি কোথা দিয়ে অতিবাহিত হয়ে যেতো বুঝতেই পারতেন না তাঁরা। তাঁদের আর্থিক সঙ্গতির প্রশ্ন ওঠেনি সেকালে কারণ কনফারেন্সের ব্যবস্থাপক আর শিল্পী সঙ্গীতের ব্যবস্থা করে গান-বাজনা শুনিয়ে চাইতেন স্বীকৃতি সে ক্ষেত্রে শ্রোতাদের সঙ্গে অর্থের লেন-দেনের প্রশ্ন ওঠেনি কোন দিনও। ব্যয়ের হিসাব নিশ্চয় রাখতেন ব্যবস্থাপক কিন্তু আয়ের কথা মনে আসেনি তাঁদের কখনও সেকালে। সামান্য মূল্যের প্রবেশপত্র, শিল্পীর পারিশ্রমিক অসম্ভব কিছু নয়, রঙ্গালয় বা মণ্ডপের জন্য স্বল্প ব্যয়। আলো সাজ-সজ্জা মাইক্রোফোনের ভাড়া নিতান্ত মামুলি। বিজ্ঞাপনের হারও ছিল যুক্তিসঙ্গত আর রাজস্ব বা প্রমোদ করের বালাই ছিল না সেকালের মিউজিক কনফারেন্সের যুগে।

মিউজিক কনফারেন্সের জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে একালের পরিচালক বা ব্যবস্থাপকের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়ে গেল অনেকখানি। কোন কোন ক্ষেত্রে মিউজিক কনফারেন্স পরিগণিত হল অর্থকরী ব্যবসা হিসাবে। বুদ্ধি বিবেচনা, পরিশ্রমের ত মূল্য আছে শুধু প্রশংসা আর বাহবা কুড়িয়ে লাভ কি! শিল্পীও সচেতন হলেন তাঁর প্রাপ্য সম্বন্ধে। শিল্পকে নিয়ে যদি কেউ ব্যবসা বাণিজ্য করে তাহলে তার লাভের সিংহভাগ ত শিল্পীরই প্রাপ্য। ধীরে ধীরে শিল্পীর পারিশ্রমিকের হার হলো আকাশচুম্বী। বেচারা শ্রোতা সে রইল যে তিমিরে সেই তিমিরেই। ধনী ব্যবসায়ী শ্রোতাদের অসুবিধা নেই তাঁরাই আসর জমাতে সুরু করলেন একালের কনফারেন্সে, কিছুটা বিলাসিতা আর কিছুটা সামাজিক পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। এদিকে আনুষঙ্গিক বা অন্যান্য খরচ যেমন বিজ্ঞাপন, প্রমোদকর, মঞ্চসজ্জা, আলো, মাইক্রোফোন সব খরচই বৃদ্ধি পেয়েছে অত্যধিক। সুতরাং প্রবেশপত্রের মূল্য বাড়াতেই হল। মধ্যবিত্ত শ্রোতা, গান-পাগলের দল যারা ফুটপাতে ট্রাম লাইনের ওপরে বসে গান-বাজনা শুনতো রাতের পর রাত ধরে তারা গেল হারিয়ে। একালের মিউজিক কনফারেন্সে তাঁদের দেখা পাওয়া যাবে না আর কোনদিনও। এখানকার শ্রোতা ভিন্ন জগতের লোক—গানবাজনা শোনার শখ আছে কিন্তু নেশা নেই তাঁদের। আজকের শিল্পীদের কাছে সঙ্গীত চর্চার নেশার চেয়ে পেশার মূল্য অনেক বেশী। সেকালের কনফারেন্সের উদ্যোক্তাদের নেশা ছিল সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করা। আর একালের কনফারেন্সের ব্যবস্থাপকদের দৃষ্টিভঙ্গী ও উদ্দেশ্য পেশাগত। সুতরাং এ কথা বললে ভুল বলা হবে না বোধ হয় যে নেশা আর পেশা হল সেকাল ও একালের মিউজিক কনফারেন্সের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য।

সংখ্যায় কিন্তু নিতান্ত কম নয় একালের মিউজিক কনফারেন্স। তবে এ যুগের বৈশিষ্ট্যের মত কোন ঠিকঠিকানা নেই একালের মিউজিক কনফারেন্সের। যুগের প্রভাবে ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাহিদা, প্রতি দিনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে মিউজিক কনফারেন্স ব্যবস্থাপনার। ব্যবসা-বাণিজ্য মহলে প্রতিপত্তি থাকলে কিছু বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় স্মারক পুস্তিকার জন্য। ইদানীং আবার বিজ্ঞাপনের বাজারেও মন্দা তবুও কোনরকমে কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে পারলে ব্যবস্থা করা যেতে পারে মিউজিক কনফারেন্সের, নামী প্রতাপশালী শিল্পী একজন কিংবা দু'জনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে তাঁদের পারিশ্রমিকের অঙ্ক হিসাব করে। আর বাকী শিল্পী সবই তরুণ, কনফারেন্সের ভবিষ্যৎ, শিল্পীদের ভবিষ্যৎ, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ সবই অনিশ্চিত। নানারকম একাডেমী, কলেজ, রিসার্চ ইনস্টিটিউট, খেতাব আর্থিক পুরস্কার অনুদান অনেক কিছুরই ব্যবস্থা হয়েছে একালে। কিন্তু কাজের মত কাজ কি হচ্ছে, কতজন শিল্পী তৈরী হচ্ছে এসব কথা বোঝা এবং বলা সময়সাপেক্ষ। দিকপাল শিল্পীরা তাঁদের পারিশ্রমিকের হার বাড়িয়ে যাচ্ছেন দিন দিন, রাজ্য সরকারের প্রমোদকর থেকে মুক্তি নেই—রবীন্দ্রসদন কলামন্দির মহাজাতি সদনের ভাড়াও অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় ক্রমশ ছোট বড় কোন সভাগৃহ পাওয়াই দুষ্কর। শিল্পীদের পারিশ্রমিকের হারের মতই দৈনিক পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞাপন অগ্নিমূল্য। একটা বিরাট নৈরাজ্য সারা গান-বাজনার জগৎ জুড়ে।

সঙ্গীতানুষ্ঠানে রাধিকামোহন মৈত্র ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ — ছবি : সুধীর চ্যাটার্জী

সঙ্গীতানুষ্ঠানে সরাফত হুসেন খাঁ, সাগিরুদ্দিন খাঁ এবং কেরামতউল্লা খাঁ — ছবি : সুধীর চ্যাটার্জী

সম্ভাবনা পূর্ণ কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষায় এখনও অসম্পূর্ণ। এই সব প্রতিভাদের নিয়েও মুশকিল। একালের গুরু ও ওস্তাদদের সময় কিংবা ধৈর্য কোথায়! শিক্ষাদানের জন্য নিষ্ঠা ও সততা ছিল সেকালের দিকপালদের। নিজের সন্তানের মত মনে করতেন তাঁরা শিষ-শিষ্যাদের। সে জন্যই তৈরি করতে পেরেছিলেন আজকের গুরু ও ওস্তাদদের। কিন্তু একালের তরুণ শিল্পীদের নিজেদের পথ ও ভবিষ্যৎ তৈরি করতে হয় নিজেদেরই। সে কারণেই একালের মিউজিক কনফারেন্সের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের। ব্যবস্থাপকরা আশা করেন শিল্পীরা নিজেরাই অর্থ সংগ্রহ করবেন নিজেদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। খুবই সঙ্কটজনক পরিস্থিতি, ভয়াবহ সমস্যা। মিউজিক

দেখতে দেখতে অনেকগুলো দিন, অনেক বছর কেটে গেল গান-বাজনা শুনতে শুনতে। জীবন তো একটাই তার অসংখ্য সকাল-সন্ধ্যা-রাত্রি কেটে গেছে গানের আসরে, প্রেক্ষাগৃহে, কনফারেন্স হলে আর প্যাণ্ডেলে। বহু মূল্য সময় ও সামর্থ্য ব্যয় হয়েছে নিশ্চয় বিনিময়ে কিন্তু পেয়েছি সঙ্গীত জগতের প্রবাদপুরুষদের মহামূল্য সঙ্গ, প্রাণ ভরে শুনেছি তাঁদের অলৌকিক সৃষ্টি আর আহরণ করেছি অমূল্য সম্পদ—বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আমার মত সাধারণ শ্রোতার এই তো অসামান্য সঞ্চয়। ফেলে-আসা দিনের মিউজিক কনফারেন্সের অধিবেশনগুলি আজও মনে পড়ে যায় বার বার স্বপ্নের মত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে সঙ্গীত সম্মেলন। প্রচণ্ড ভীড়। রঙ্গমঞ্চ আলো করে বসে আছেন

মইনুদ্দিন ডাগর আকাশবাণী-র সৌজন্যে

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, ত্রিপুরার মহারাজা আরও কত গণ্যমান্য অতিথি শ্রোতা। গিরিজাশঙ্কর প্রমুখ স্থানীয় দিকপাল সব সন্ত্রস্ত, উদগ্রীব হয়ে আছেন অপূর্ব কিছু শোনবার আশায়। সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমাবেশ। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেব গান করছেন রাগ জয়জয়ন্তী। প্রথম কয়েক মিনিট কিন্তু বোঝা যায়নি কী রাগ। অসহিষ্ণু হয়ে গিরিজাবাবুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কী রাগ। ক্ষিপ্ত হয়ে উত্তর দিলেন 'তোমারা ত সব তানসেন এক-একজন—একটু ধৈর্য ধরে শুনে নিজেই বোঝবার চেষ্টা করো'! ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, গুরু শঙ্কর নম্বুদ্রিকার অনুষ্ঠান শুনছি, কী দেখছি, কিছুই উপলব্ধি করতে পারিনি সেকালের সেই সেই অভূতপূর্ব মিউজিক কনফারেন্সে। পণ্ডিত রবিশঙ্কর আমার বন্ধু অমিয়কান্তি আরও কত কিশোর ও তরুণ প্রতিভা উপস্থিত ছিল সেনেট হলে, সে দিনের সেই ঐতিহাসিক মিউজিক কনফারেন্সে।

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিউটে আর একবার বিরাট আয়োজন। ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ সাহেব, পণ্ডিত ওংকারনাথ ঠাকুর, ওস্তাদ নাসিরুদ্দিন খাঁ ডাগর আরও কত গুণিজন। ওঁদের শুধু দর্শন পাওয়াই ভাগ্যের কথা। আব্দুল করিম খাঁ সাহেবের গান শুনতে শুনতে আমাদের জমিরুদ্দিন খাঁ সাহেব পাগলের মত হয়ে গেলেন। ভীষ্মদেব ভাবাবেগে স্তব্ধ, পাথর। সব শ্রোতার চোখে জল। অসাধারণ অপূর্ব এক অনুভূতি। পণ্ডিত ওংকার নাথ গান করলেন সিংহ বিক্রমে। আব্দুল করিম খাঁ সাহেবের এক মতবাদ সমন্ধে বক্রোক্তিও করলেন কিছুটা—প্রকৃত সাধনা ও রেওয়াজের গুণে উপযুক্ত শিল্পীর কণ্ঠ সাড়ে তিন সপ্তক পর্যন্ত যেতে পারে অনায়াসে। করিম খাঁ সাহেব বলেছিলেন তিন সপ্তকের বেশী চড়া স্বরে যাওয়া সম্ভব নয় সুরেলা কণ্ঠের পক্ষে। এরকম তর্ক-বিতর্ক, হই-হই, সেকালের কনফারেন্সের অঙ্গ ছিল ঘটনা হিসাবে। কিশোর শিল্পী কুমার গন্ধর্বের অনুষ্ঠানে একবার ভীষণ বাধা দিয়েছিলেন পণ্ডিত

কেরামতউল্লা খাঁ আকাশবাণী-র সৌজন্যে

দিলীপচাঁদ বেদী। কুমার গন্ধর্ব তখন আব্দুল করিম খাঁ ও অন্যান্য বর্ষীয়ান শিল্পীদের অনুকরণ করে তাঁদের জনপ্রিয় গানগুলি গেয়ে শোনাতেন। দিলীপ বেদীর প্রচণ্ড আপত্তি এই অনুকরণ অনুষ্ঠানের, বিশেষত দিকপাল শিল্পীদের অনুকরণ।

ইন্দিরা সিনেমাগৃহে ত্রয়ী যন্ত্রসঙ্গীতের আসরে তিনপুরুষের অনুষ্ঠান। মঞ্চে বসেছেন স্বরোদ নিয়ে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, পুত্র আলী আকবর, দৌহিত্র আশিস খাঁ। তবলা সঙ্গতে ছিলেন পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ এবং ওস্তাদ আল্লারাখা। প্রায় এক ঘণ্টা আলাপচারীর পর যখন গৎ শুরু হল তখন শ্রোতাদের মধ্যে একদল, তারিফ করতে শুরু করলেন আল্লারাকার সঙ্গতের, অন্য আরও অনেক শ্রোতা আবার বাহবা দিতে আরম্ভ করলেন পণ্ডিত শান্তা প্রসাদকে। গোলমাল বেশ একটা দলাদলির রূপ নিয়েছিল সে আসরে। অসন্তুষ্ট হয়ে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব অন্য একটি গৎ ধরলেন মধ্যলয়ে। দুই তবলিয়ার কেউই ঠিকমত 'সম' ধরতে পারলেন না বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও। মঞ্চের ওপর সামনেই বসেছিলেন পণ্ডিত রবিশংকর। উনি হাতে তাল দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন লয়ের চলন ও গৎ-এর সম ফাঁক। হই হই গণ্ডগোল। কনফারেন্সের অধিবেশন প্রায় ভেঙে যাবার উপক্রম। শেষ পর্যন্ত শান্তিপ্রিয় সঙ্গীতানুরাগী শ্রোতাদের বিশেষ অনুরোধে ত্রয়ী শিল্পী আবার শুরু করলেন তাঁদের অনুষ্ঠান। মধুর তবলাসঙ্গত করেছিলেন ওস্তাদ করামৎউল্লা খাঁ। অল ইণ্ডিয়া রেডিও রীলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আগেই, আলাপচারীর পর গোলমালের জন্য।

কুমার গন্ধর্ব ছবি : সুবীর চ্যাটার্জী

এমনই আরও কত ঘটনা, কত স্মরণীয় অনুষ্ঠান, শ্রীসিনেমা হলে, রংমহলে, শ্রীনিকেতনে, পূরবী সিনেমা হলে, প্যারাডাইস, রক্সি সিনেমা হলে দিনের পর দিন, রাতের পর রাতে। কিন্তু তার কোন ইতিহাস নেই, নেই কোন সাক্ষী। আজ আর জানা যাবে না, শোনা যাবে না অতীতের সেই সব রোমাঞ্চকর অনুভূতির কাহিনী, অলৌকিক অসাধারণ অনুষ্ঠানের বর্ণনা-বিবরণ।

সময় সুবিধা হলে আজও যাই একালের মিউজিক কনফারেন্সে। গানবাজনার নেশা আজও আচ্ছন্ন করে রেখেছে আমাকে। এতদিনের পুরানো অভ্যাস, এত সহজে ত্যাগ করা তো সম্ভব নয়! রবীন্দ্রসদন, কলামন্দির, মহাজাতি সদন, বড় বড় প্যাণ্ডেল—কত সাজসজ্জা মঞ্চের ওপর, কত আলোর বাহার—সব ব্যবস্থাই সুন্দর। সময়মত অনুষ্ঠান শুরু ও শেষ—সব আয়োজন একেবারে নিখুঁত যথাসম্ভব। তিন চার ঘণ্টায় বেশী সময় থাকে না সান্ধ্য অধিবেশনের জন্য। রাত্রি দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে হল ছাড়তে হয়। দুজন কিংবা তিনজন শিল্পীর অনুষ্ঠান। সেকালের মত রাত্রি এগারোটা বারোটা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে কদাচিৎ কখনও। সারা রাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠানের অধিবেশন হয় একটি কিংবা দুটি সারা কনফারেন্সে। শ্রোতাদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার সুবিধার জনাই তিন ঘণ্টার বেশী অধিবেশন হয় না সাধারণত। খুব ভীড় হলেও মাইকের ব্যবস্থা থাকে না সভাগৃহের বাইরে, পুলিসের হুকুম। নিয়ম কানুনে বাঁধা এই রকমই সব ব্যবস্থা একালের মিউজিক কনফারেন্স। ভীড় অবশ্য হয় না সেরকম আজকাল—সম্ভবত আকর্ষণীয় শিল্পীর অনুপস্থিতি কিংবা অন্যান্য কারণে। কথাবার্তা, আলোচনা, মন্তব্য, উচ্ছ্বাস কিংবা উচ্চকিত তারিফ—সবই নিষিদ্ধ একালে। সঙ্গীতসভায় হই হই করে প্রশংসা করা অশালীনতা, অসভ্যতা। অবশ্য হই হই করবার মত অনুষ্ঠান আর কোথায়! কদাচিৎ কখনও হয়ত শোনা যায় অসাধারণ অপূর্ব কিছু গান-বাজনা।

সেকালে মিউজিক কনফারেন্সে শ্রোতারা যেতেন আশা, আগ্রহ, উত্তেজনা নিয়ে। ফিরে আসতেন মনভরা তৃপ্তি নিয়ে। রাত্রে ঘুমের ঘোরেও যেন শোনা যেত কনফারেন্সের রাগ বিস্তার, ঠুংরীর কলি আর যন্ত্রসঙ্গীতের ঝঙ্কার। সেকালের শ্রোতা আজও কনফারেন্সে যায় বুকভরা আশা আগ্রহ নিয়ে, ফিরে আসে অসীম শূন্যতা আর অসহনীয় নৈরাশ্য নিয়ে।

পৃথিবীর গতি পরিবর্তনশীল। দিন-কাল-সময়-অবস্থার পরিবর্তন ত হবেই। ■

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্ষিতিমোহন সেনকে লেখা : ১৯০৮-১৯৪০

॥ পত্র ৪১ ॥

ওঁ

প্রীতি নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

দূরে আছি বলে নিকটে নেই এমন ভুল করবেন না। মাঝে মাঝে অবকাশমত স্মরণ করবেন।

মৈথিলী প্রসাদের বই পাঠাই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে আমার জবানী পত্র লিখবেন।

লঘু রামায়ণের প্রুফ পাঠাই। রমেশ পণ্ডিত মশায়কে দিয়ে দেখিয়ে ঠিক করে দেবেন। কিছু প্রুফ এলাহাবাদে পাঠানো কর্ত্তব্য। ওখানে যে রামায়ণ আছে একবার দেখবেন লঙ্কাকাণ্ডে দাগ দেওয়া আছে কিনা। না যদি থাকে তবে আপনাদের কাউকে লঙ্কাকাণ্ডের ভার নিতে হবে। কারণ ও কাজ যে আমার দ্বারা ঘটবে এমন শক্তি আমার ঘটে নেই। এইটুকুর জন্যে কাজ বন্ধ আছে শীঘ্র ওটা সেরে ফেল্লে আপদ চুকবে।

এখানকার সুরের কিছু আমেজ মাঠ পার হয়ে ওদিকে পৌঁচচ্ছে ত? [১৯১৪]

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ পত্র ৪২ ॥

ওঁ

সবিনয় নমস্কার নিবেদন

আশ্রমের জন্যে ডাক্তার মণিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম. বি. (বোধহয় নামটায় ভুল করি নি—কিন্তু স্পষ্ট মনে নেই) পর্শু মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় বোলপুরে পৌঁছবেন। লোক পাঠিয়ে তাঁকে আনবার ব্যবস্থা কোরো। বিনায়ক পণ্ডিত একজন সংস্কৃত শিক্ষক নিয়ে যাচ্ছেন তিনি নিজে ইংরেজি শিক্ষার বিনিময়ে ওখানে প্রায় বিনা বেতনে সংস্কৃত শেখাতে ইচ্ছুক। *Direct method*এ ছোট ছেলেদের সংস্কৃত শেখাতে পারলে উপকার হতে পারবে সন্দেহ নেই।

ক্ষিতিমোহনবাবুকে অনুনয়পূর্ব্বক জানিয়েছিলাম আমাকে প্রত্যহ বা একদিন অন্তর দুটি একটি করে অনুবাদযোগ্য বাউল বা হিন্দী গান পাঠালে বিশেষ উপকার হবে। কোনো সাড়া পাই নি। পিয়ার্সনকে বলেছিলুম তাঁকে আমার বিশেষ অনুরোধ জানাতে, বোধহয় তাও ব্যর্থ হয়েছে কেননা আজও কিছু পাওয়া যায়নি। তুমি একবার চেষ্টা করে দেখো—এবং তিনি যেগুলি পাঠাতে ইচ্ছা করেন আমার একাউন্টে তার মাশুল দিয়ে আমাকে যেন পাঠানো হয়। আমি এই কবিতাগুলি নিয়ে কোনো রকম অন্যায় ব্যবহার করব না—এর ইংরেজি অনুবাদগুলি ছাড়া মূলগুলি কোনো লোকের কাছে বা পত্রিকায় প্রকাশ করব না। তাঁর কাছে যেমন প্রচ্ছন্ন আছে আমার কাছে তেমনি প্রচ্ছন্নই থাকবে—এমনকি, তিনি যদি ইচ্ছা করেন, অনুবাদ হয়ে গেলে মূলগুলি তাঁর কাছে ফেরৎ দেব। ইতি রবিবার [১৯১৩]

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ পত্র ৪৩ ॥

ওঁ

সবিনয় নমস্কার নিবেদন

মেস সম্বন্ধে আদা বিভাগের টেলিগ্রাম পাইয়া আশঙ্কা করিতেছি একটা উত্তেজনা জন্মিয়াছে। ছেলেদের ভাল করিয়া বুঝাইয়া কাজ করিবে। হিসাব আজও তৈরি হইল না—আন্দাজে কাজ চলিতেছে এটা আমার ভাল লাগিতেছে না। সুধাকান্তের আন্দাজের উপরে নির্ভর করিতে পারা যায় কিনা জানি না—অথচ লোকসান বহন করিবার মত শক্তি আমাদের নাই। এ স্থলে তোমরা যথোচিত বিবেচনা করিয়া কাজ করিয়ো। যদি মনে কর হিসাব তৈরি হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য তবে তাহাই করিবে। কিন্তু ব্যবস্থা বিভাগের শৈথিল্য সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য।

গোরাকে বলিয়াছিলাম, *Clarke's Materia Medica* তিন ভল্যুম কাহারো হাত দিয়া এখানে পাঠাইতে। ক্ষিতিমোহনবাবু বা অনঙ্গর

হাত দিয়া সে পাঠায় নাই। তাহাতে বুঝিলাম সে ভুলিয়াছে। বেলার চিকিৎসার জন্য এই বইয়ের দরকার পড়িয়াছে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়ো।
চৈত্রমাস হইতে অনঙ্গকে তাহার বেতনের অর্দ্ধেক দিতে হইবে। কিন্তু যাহাতে তাহার কাছ হইতে বিদ্যালয়ের কাজ পাওয়া যায় তাহার চেষ্টা দেখিয়ো। কেবল কল কারখানার কাজ এখন ত যথেষ্ট নাই—অতএব অন্য পাঁচরকম কাজ তাহার কাছ হইতে লইতে হইবে।
বিদ্যালয়ে অসুখ বিসুখের পালা কমিতেছে আশা করি। কুয়ার জলের কিরূপ অবস্থা ? সেই কুয়া খুঁড়িবার যন্ত্রগুলি পাঠাইবার কি করা যায় ?
ইতি ১লা চৈত্র ১৩২৪ [১৯১৮]

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিনেন্দ্রনাথ ও কমলাদেবী

॥ পত্র ৪৪ ॥

ওঁ

বিনয় সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—
যখন ঠাণ্ডা পড়েচে তখন কিছুদিন দেরি করে ছুটি দেওয়াই ভাল। তাহলে ছেলেরা বাড়ি থেকে পেটভরে আম খেয়ে আসবার সময় পায়। বৈশাখের শেষে যদি ছুটি হয় তাহলে আষাঢ়ের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ছুটি চলে—ততদিনে বৃষ্টি পড়ে বেশ ঠাণ্ডা হবার সম্ভাবনা থাকে।
সিউড়িতে কলেরা হচ্চে শুনে উদ্বিগ্ন হলুম। পরীক্ষা দিয়ে ছেলেরা ভালোয় ভালোয় ফিরলে নিশ্চিন্ত হব।
আমাকে তোমরা কমলালেবু পাঠাবে এ আমি প্রত্যাশা করি নি। শান্তিনিকেতনে থেকে আমি গীতার উপদেশ পালন করবার সুযোগ পেয়েচি—ওখানে ফলের গাছ রোপণ করা পর্য্যন্ত আমাদের অধিকার—কিন্তু সেই অধিকার "মা ফলেষু কদাচন"—ওখানে বিদ্যালয় স্থাপন হওয়ার পর থেকে ফলের আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েচি।
এবারে বিদ্যালয়ে ইংরেজি ক্লাসের অত্যন্ত ক্ষতি হল। এ ক্ষতি পূরণ হবে না। যা কাঁচা রইল তা শেষ পর্য্যন্ত থেকে যাবে। একটা বিষয়ে বিশেষ মন দিয়ো—ভবিষ্যতে ক্লাস বসবার সময়টা যেন যথা নিয়মে আরম্ভ হয়—আমাদের শৈথিল্যবশত ঐ সময়টার অনেকটা বাদ পড়ে—তার প্রতিকার করা কর্ত্তব্য।
বিদ্যালয়ের পাকশালা বিভাগের নূতন কোনো ব্যবস্থা হয়েচে কি ? অর্থাৎ ছেলেরা অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে সকলে মিলে তার একটা ভার নিতে পেরেচে কি ? এ সম্বন্ধে আদ্য বিভাগের ছেলেদের মন প্রসন্ন হয়েচে ত ?
বড়দাদা উত্তরোত্তর সুস্থ হয়েচেন। জ্বর নেই কাশীও নেই—প্রতিদিন বল পাচ্চেন। ক্ষিতিমোহন বাবু কিছুকাল পূর্ব্বে *Lowes Dickenson* এর রচিত একখানি বই ক্ষিতিবাবুকে পড়তে দিয়েছিলুম—নাম ভুলে গেছি। যদি পড়ে থাকেন তবে এতদিনে পড়া হয়ে গেছে, যদি পড়া না হয়ে থাকে তাহলে বোধ হয় হবে না। বিচিত্রা সেই বইখানি চান। আমি ক্লান্ত আছি। ইতি ১৮ই চৈত্র ১৩২৪ [১৯১৮]

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ পত্র ৪৫ ॥

ওঁ

Brookside
Shillong

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—
এখানে আমরা আপনার অপেক্ষা করছিলুম। কিন্তু আপনি কেন আসতে পারলেন না তা বুঝতে পেরে ব্যথিত হলুম। পূর্ব্ববঙ্গের উপর রুদ্রহস্তের এত বড় প্রচণ্ড আঘাত লেগেচে, কবে যে আবার সে সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে তা ত ভেবে পাইনে। প্রকৃতির কোলে মানুষ এমন একান্ত বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করচে—একমুহূর্ত্তে যখন সে বিশ্বাস ভেঙে যায় তখন কোনো তরফ থেকে তার কৈফিয়ৎ খুঁজে পাওয়া যায় না। শিলঙ জায়গাটি আমার বেশ ভাল লেগেচে। কিন্তু তবু শান্তিনিকেতনের জন্যে আমার মনটা ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হয়ে উঠচে—মনে হচ্চে ছুটি বটে কিন্তু তবু সেখানে যেন আমার কাজ আছে। এই ইচ্ছার তাগিদ মনের উপর আঘাত করতে করতে একদিন হঠাৎ কখন বেরিয়ে পড়ব। ছুটিরও ত প্রায় অর্দ্ধেক মেয়াদ ফুরিয়ে গেল—গুরুমহাশয়ের চেহারা অনতিদূরে দেখা যাচ্চে। ইতি ৩রা কার্ত্তিক ১৩২৬ [১৯১৯]

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ পত্র ৪৬ ॥

My friend Mr. Kshitimohan Sen is the Principal of Shantiniketan Institution. I have full trust in him and know that he will be able to explain the ideals of our Ashram to those who wish to know.

Bombay — *Rabindranath Tagore*
april 28, 1920

পত্র পরিচিতি

॥ পত্র ৪১ ॥

পত্রটি ডাকে পাঠানো নয়। শান্তিনিকেতনের এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি হাতে হাতেই বিলি হয়েছে।
লঘু রামায়ণ : হিন্দি সাহিত্যে রামায়ণের এই সংস্করণটির স্থায়ী আসনের দাবি ছিল না। এখনো নেই।
সুরের কিছু আমেজ : শান্তিনিকেতনে দেহলি সংলগ্ন নতুন বাড়িতে ক্ষিতিমোহন সপরিবারে থাকতেন।

কবিকণ্ঠের গান স্পষ্ট এ বাড়িতে শোনা যেত। উল্লেখ্য, অধিকাংশ গানই নতুন। প্রহরের পর প্রহর গানে গানে পূর্ণ থাকতো রাত্রি। ক্ষিতিমোহনের দিনলিপিতে রবীন্দ্রনাথের সুরসৃষ্টি এবং বহু গানের জন্মের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ আছে। এ বিষয়ে ক্ষিতিমোহনকে রবীন্দ্রনাথ নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। শান্তিনিকেতনের দেহলি আর নতুন বাড়ি এ দুটির মাঝখানের সংকীর্ণ মাঠ পেরিয়ে সুরের আমেজ ঠিকমতই ক্ষিতিমোহনের কানে পৌঁছত।

॥ পত্র ৪২—৪৪ ॥

সর্বাধ্যক্ষকে লেখা

সর্বাধ্যক্ষের দপ্তরে প্রেরিত রবীন্দ্রনাথের এই তিনটি চিঠি ক্ষিতিমোহনের সংগ্রহে রক্ষিত ছিল। পত্রগুলিতে আশ্রম পরিচালনার বিষয়ে নানান নির্দেশ যেমন আছে তেমনি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়েছে। সেই সঙ্গে বাদ পড়েননি ক্ষিতিমোহনও।

বিদ্যালয়ের অধ্যাপক সভা সর্বাধ্যক্ষ পদের জন্য শিক্ষকদের মধ্য থেকে এক এক জনকে মনোনীত করতেন। এই সভার সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। এই অতিরিক্ত কাজের জন্য বাড়তি কোন টাকা-পয়সা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। শুধু তাই নয় এই দপ্তরে অতিরিক্ত কোন লোকও ছিল না। ফলে সর্বাধ্যক্ষ দপ্তরের কাগজপত্র রক্ষার স্থায়ী কোন বন্দোবস্তও ছিল না। ক্ষিতিমোহন কাজে যোগ দিয়ে প্রথমেই এই অভাববোধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন লিখেছেন : 'আশ্রমে এলাম। সবাই দেখি আমার হাতে আশ্রমের ভার তুলে দিলেন। খাটিতে কাতর নই। কিন্তু আমার হাতের লেখা অনেকের পক্ষে পড়া দুঃসাধ্য। অধ্যাপক সভায় ঠিক হল একজন কেরাণী দিতে হবে, কিন্তু টাকা কই? তার জন্য আলাদা বেতনও মিলবে না। তখন আশ্রমে পদে পদে কাঞ্চন-মূল্য চাইবার রেওয়াজ ছিল না, কিন্তু সবারই ঢের কাজ, কাজেই যখন কারও সাহায্য পাওয়া গেল না তখন গুরুদেব বললেন—'আমিই খেয়ে উঠে আপনার দপ্তরে আসব। আর বেলা বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত লেখার কাজ, কেরাণীর কাজ করে দিয়ে আসব।

'ওরে বাসরে! সে আবার কি কথা! কিন্তু কিছুতেই তাঁকে টলানো গেল না। পর দিন দেখি ঠিক সময় তিনি দপ্তরে এসে হাজির, কাজ দিতেই হল। কি নিপুণ তাঁর কাজ। সমস্ত বিধিবিধান মেনে তিনি কেরাণীর কর্তব্যই পালন করতেন। সব দিকেই তিনি অতুলনীয়।

'অবশেষে জ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বেচ্ছায় এই কার্যভার নিলেন। তখন গুরুদেবকে নিষ্কৃতি নিতে হল। তাতে জ্ঞানবাবুরও যে উপকার হয়েছিল, জামশেদপুরের কাজে তিনি তা টের পেয়েছিলেন। এই আশ্রমের ঘণ্টাধ্বনি দিয়ে যে বিভিন্ন কর্ম সময়ের সূচনা করা হয় তাঁর প্রবর্তক জ্ঞানবাবু।' এই তিনটি চিঠি প্রত্যক্ষভাবে ক্ষিতিমোহনকে লেখা না হলেও ক্ষিতিমোহন জড়িয়ে আছেন নানাভাবে। তা ছাড়া পারম্পর্য রক্ষার জন্য এই তিনটি চিঠি পর পর ছাপা হল।

॥ পত্র ৪২ ॥

ডাক্তার মণিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় : শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজে যোগ দেননি। পত্রটি ১৮ জুলাই ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন থেকে পোস্ট করা হয়। উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথ তখন লণ্ডনে ছিলেন। এ প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

পিয়ার্সন : উইলিয়ম উইনস্টানলি পিয়ার্সন (১৮৮১—১৯২৩) রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সুহৃদ। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল ওতপ্রোত। পূর্ব পরিচিতিতে বর্তমান অংশটি সংযোজন হিসেবে গণ্য করা যায়। পিয়ার্সনের ছাত্র সুনীলকুমার চক্রবর্তী পিয়ার্সন স্মৃতি গ্রন্থে পিয়ার্সনকে গ্রেপ্তারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। যে গ্রন্থটি লিখে পিয়ার্সন গ্রেপ্তার বরণ করেন সেই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু ভারতবর্ষের দারিদ্র্য। গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে তিনি জাপানকে অনুরোধ করে লিখেছেন—যদি স্বাধীনতার জন্য ভারতে কোনদিন বিপ্লব হয় তখন জাপান যেন ভারতের সংগ্রামে বাধা না দেয়। জাপান ও ভারতের মিলনে যে একটা বিরাট প্রাচ্য শক্তির সংগঠন হতে পারে সেইটেই ছিল তাঁর বক্তব্য। গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছিলেন পিয়ার্সনের বন্ধু ও শ্রীঅরবিন্দের সহচর পল রিশার।

॥ পত্র ৪৩ ॥

আদ্যবিভাগ : আশ্রম পরিচালনার কাজে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল। যেমন—শিশু, মধ্য এবং আদ্য। কুটীরগুলিকেও সেইভাবে আলাদা আলাদা করা হয়।

সুধাকান্ত : সুধাকান্ত রায়চৌধুরী (১৮৯৪—১৯৬৯) প্রায় পঞ্চাশ বছর বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনের নানান সেবায় জীবন কাটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কালের সহচর ও একান্ত সচিব ছিলেন। মাথায় টাক ছিল বলে রবীন্দ্রনাথ ডাকতেন বলডুইন বলে আবার শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে মাড়োয়ারি মহলে ঘুরতেন বলে কবি রসিকতা করে সুধেরিয়া নামেও ডাকতেন কখনও কখনও।

গোরা : গৌরগোপাল ঘোষ। অঙ্কের শিক্ষক। এক সময়ে ছাত্র পরিচালকও ছিলেন।

॥ পত্র ৪৪ ॥

পরীক্ষা দিয়ে : শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বরাবর প্রবেশিকা স্ট্যাণ্ডার্ড পর্যন্ত পড়ানো হয়েছে। সরকারী Recognition পেতে স্কুল বোর্ড এবং ডাইরেকটর অফ পাবলিক ইনসট্রাকসানের নির্দেশে ছাত্রদের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে হয়েছে। এই পরীক্ষা নির্দিষ্ট কোন কেন্দ্রে গ্রহণ করা হতো। আশ্রমের ছাত্রদের কখনও সিউড়ি বা চুঁচুড়া কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে হয়েছে। আশ্রম থেকে ভারপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক পরীক্ষার কয়টা দিন ছাত্রদের সঙ্গে কেন্দ্রে গিয়ে থেকেছেন।

পাকশালা : রান্না ও পরিবেশন ব্যবস্থায় বেতনভুক ঠাকুর ও ভৃত্যদের সাহায্যের জন্য পালা করে দুজন ছাত্র প্রতিনিধি রন্ধনশালায় উপস্থিত থাকতেন।

বড়দাদা : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০—১৯২৬)। সারা জীবন খুশীমত জ্ঞানচর্চা করেছেন। 'ভারতী' ও 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদকরূপে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হন। স্বদেশানুরাগ ছিল তীব্র তাঁর কিন্তু প্রকাশ্য সভাসমিতিতে যোগ দেওয়া পছন্দ করতেন না। কবি, গণিতজ্ঞ, দার্শনিক এবং বাংলায় শর্টহ্যাণ্ড ও স্বরলিপির উদ্ভাবকরূপে বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। হিন্দু মেলার তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির পদও তিনি অলংকৃত করেছেন। পিতার মৃত্যুর পর জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে শান্তিনিকেতনে নিচু বাংলায় বাস করতেন।

॥ পত্র ৪৫ ॥

পুজোর পর শিলং পাহাড়ে ব্রুক সাইড নামের একটি ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রায় তিন সপ্তাহ মত ছুটি কাটিয়েছিলেন। কবির সঙ্গে ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ, কমলা দেবী, রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী ও সাহায্যকারী হিসেবে সাধুচরণ। এই অবকাশ যাপনের আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন ক্ষিতিমোহন। কথা ছিল শান্তিনিকেতন থেকে ক্ষিতিমোহন প্রথমে কয়েকটা দিন তাঁর নিজের বাড়ি সোনারং গ্রামে কাটাবেন। সেখান থেকে সোজা তিনি শিলং গিয়ে দলের সঙ্গে যুক্ত হবেন। কিন্তু পূর্ব বঙ্গে এক ভয়াবহ ঝড়ে সে বছর বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়। এমন কি প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটে। এই কারণেই ক্ষিতিমোহন শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলং-এ মিলিত হতে পারেননি। ছুটির শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন গুয়াহাটিতে। আইন কলেজের অধ্যক্ষ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা জ্ঞানাভিরাম বড়ুয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় কবির। গুয়াহাটি থেকে কবি ট্রেনে লামডিং-এর পথে গিয়েছিলেন সিলেট এবং আগরতলা। সিলেটে রবীন্দ্রনাথ মণিপুরী নাচ দেখার সুযোগ পান। এর আগে রবীন্দ্রনাথ মণিপুরী নৃত্য দেখেছেন কিন্তু এমন পরিপূর্ণ নাচ দেখলেন এই প্রথম। নাচে, গানে, পোশাকের এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে। এখানেই রবীন্দ্রনাথ জেনে নিয়েছিলেন নৃত্যশিল্পীদের পরিচয়।

এই ঘটনার বহু পর রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে প্রভাতচন্দ্র শিলচর শহরের মণিপুর পট্টি থেকে একজন মণিপুরী নৃত্যশিল্পীকে সঙ্গে করে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। রাজকুমার সেনারিক সিং এবং মহিম সিং-এর সঙ্গে প্রভাতচন্দ্র কথা বলে স্থির করেন তাঁরা শান্তিনিকেতনে নৃত্যশিক্ষক হিসেবে যোগ দেবেন। প্রভাতচন্দ্র যাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের অদম্য আগ্রহে উদয়নের বারান্দায় আশ্রমের সকলকে তিনি নাচ দেখালেন।

॥ পত্র ৪৬ ॥

১৯২০ খ্রীস্টাব্দে গুজরাত সাহিত্য পরিষদের বর্ষ উৎসবে সভাপতিত্ব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতন থেকে সদলবলে এসে তিনি সবরমতী আশ্রমে গান্ধীজীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। দলে ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন, এনড্রুজ, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার এবং ছাত্র প্রমথনাথ বিশী।

আহমেদাবাদ কাথিয়াওয়াড় ভ্রমণ শেষ করে সকলে বোম্বাই ফিরে আসেন। কাউকে কিছু না বলে রবীন্দ্রনাথ একটা দিনের ছুটি নিয়ে পুনায় গিয়ে উপস্থিত। সেদিন তিলক-রবীন্দ্রনাথ দুই মহাপুরুষের মিলন হল [তারিখ শুক্লানবমী মঙ্গলবার ১০ বৈশাখ ১৩২৭]। পুনা থেকে ফিরে এসে বললেন, শান্তিনিকেতনে চললাম, এখনি সেখানে আমার যাওয়া দরকার। ক্ষিতিমোহনকে বলে গেলেন—'বোম্বাইতে আমার অসমাপ্ত কাজ আপনি শেষ করে তবে আশ্রমে ফিরবেন। তবে বলি, মহৎ একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, তিলকের সঙ্গে আলাপ হল। এবারে আপনি নিজে গিয়ে নিশ্চয়ই তিলকের সঙ্গে দেখা করবেন।'

এদিকে বহু প্রতিষ্ঠান এবং বোম্বাইয়ের সম্ভ্রান্ত নাগরিক অপেক্ষা করে আছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁরা দেখা করবেন। উল্লিখিত পত্রটি তিনি ক্ষিতিমোহনের হাতে দিয়ে গেলেন। বলে গেলেন, কাজ সমাধার ভার রইল তাঁরই উপর।

সংকলক : সুনীল দাস

ছবি : শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের সৌজন্যে

বিপুলতার কাছে

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

চলচ্চিত্ত মানুষেরা মন্দির বিগ্রহ খোঁজে প্রতি শনিবার,
মাথা নিচু করে বসে পড়ার আগেও
আড়চোখে চায়, অকারণ
হাই তোলে কুকুরের মতো। ওরা কেমন আতুর।
আমি একা যাই তাঁর কাছে
ছোট হয়ে বসতে চাই, দেখতে চাই
দীর্ঘকাল বাঁচা যাবে এই দৃঢ়বিশ্বাসে বিস্তৃত
শিরীষগাছের বিপুলতা।

'শিরীষ' না-বলে আমি কখনো কখনো তাঁকে 'শ্রীশ' বলে ডাকি।
তিনি চন্দ্রাতপ মেলে দেন
তিনি তাঁর গোড়ালি-ডোবানো ভিত ছুঁতে দেন
দেখান পায়ের শিরা কতদূর গেছে।
আমি যদি শুয়ে পড়ি আস্ত মোমবাতিটার মতো
দু-একটা ফুল তিনি ফেলে দেন আমার শরীরে।
বড়ো ও বিনম্র, তাঁকে দুহাতেও জড়াতে পারি না—
দুঃখ হয়। দেখি
শিরীষগাছের ডাল কীভাবে সমস্ত ছুঁয়ে থাকে
বিনা ঘোষণায়। দেখি, দীর্ঘায়ু নীরোগ
দেহ তাঁকে গম্ভীর করেছে।

শিরীষগাছের গায়ে ঠেস দিয়ে মনে হয় সাহস পেয়েছি।
ভ্রূক্ষেপ না করে তবে বাঁচা যায়,
দেখা যায় ক্ষুদ্র চরাচর
গতি ও ব্যস্ততা, প্রতিযোগ। দেখা যায়
সংসারের বোঝা টেনে কচ্ছপ চলেছে ধীরে ধীরে,
উঁচুতম বিন্দু খুঁজে তুলসীগাছে বসেছে ফড়িং ;
দেখা যায়
টেবিলের উল্টোদিকে, ডিমের ওপরে যেন, বসে আছে সুভগ মানুষ
বন্ধ চোখ,
করাতের মতো দাঁত,
কাচঘরে কুমিরসদৃশ তার কেবল অপেক্ষা করে থাকা।

দু-একটি লালচে ফুল ঝরে পড়ে কোলের ওপরে।
পিঁপড়ে ঝরে পড়ে। ভয় হয়।
আমি প্রশ্ন করি : শ্রীশ, শ্রীশবাবু, এত নির্বিকার থাকা ভালো ?
সতর্ক হবার কোনো প্রয়োজন নেই ?
তিনি ঈষৎ দোলেন,
আমি বুঝি,
শ্রীশ তো মানুষ নন, গাছ, তাই আত্মমগ্ন, ঘোর আস্থাবাদী।

প্রতিশোধ

দেবাশিস বসু

সহসা সেদিন নিয়েছি আমি প্রিয় প্রতিশোধ
আমার চোখ জ্বলে উঠেছিলো চোখের ভিতর
মন পেয়েছিলো নির্ভুল সাড়া

তারপর ঝরনার দিকে হালকা পায়ে...
খোলা চুলের মতন আছড়ে পড়ছে জল
আঙুলে ঠাণ্ডা খুনসুটি,
আঃ ! আরও হালকা তখন হৃদয়—শ্লেষ্মাজ্ঞানে তুচ্ছ ক'রে
তোমার মিনতি বাইশ মাইল সুদীর্ঘ চুম্বনে
মুখের ভিতরে আস্ত একটা রাজপথ খুলে দিয়েছিলো

দু'বুকের কথা কেন দু'যুগ জমিয়ে রেখেছিলে
কেন দেখিয়েছিলে অশ্রুশিল্পের কারুকাজ
আমার কী দোষ ? সমস্ত নির্মাণ তো ভেঙে
ফেলারই জন্যে। ঘুণের অমরতা নিয়ে, নিষ্পাপ
থাকার জন্যে নয়।

হ্যাঁ, আপাতত এ-ই আমার জয়, আমার ক্লান্তি, যতক্ষণ না
আবার আমার চোখ জ্বলে ওঠে চোখের ভিতর
মন সাড়া দেয়
ভেঙে দিতে চেয়ে কারো অশ্রুশিল্পে গড়া
নিজস্ব নির্মাণ।

ঘর

নীলা কর

একটা ঘর আছে অথচ সব ক'টি জানলা দরজা বন্ধ।
ও ঘরে কি আছে কেউ জানে না
দেওয়ালের রং কি কি রঙের টালি দিয়ে তার মেঝে মোড়া
কিংবা কোন মখমলের নরম গালিচা পাতা আছে কিনা জানে না
কেউ।

এমনও হতে পারে ওখানে ধুলো জমেছে পুরু
ঘরের আনাচে কানাচে হয়তো আরশোলার নীরব আনাগোনা—
কার্নিশে আছে ঘন ঝুলের সুচারু রেলিং
এমন কি চুনখসা দেওয়ালের গর্তে হয়তো
সরীসৃপের অবাধ আবাস
কিংবা শবেরা সব পাশাপাশি শুয়ে থাকে ওখানে
অতর্কিতে কেউ ঘরের তালা ভাঙতে গেলে অমনি সাইরেন ওঠে বেজে।

শুধু আছে একজন একজনই আছে
জ্যোৎস্নায় ধোয়া শরীরে সদ্য পাটভাঙা শাড়ির আঁচল ছুঁয়ে দিলেই
ঘরের দরজা জানলা সব যায় খুলে।

ফুলের বারণ

সুদেশরঞ্জন দত্ত

মালিককে বলেছি
আমার মাথার বাইরে অনেকগুলি বাড়তি চুল,
আর ভিতরে অনেক বাড়তি বুদ্ধি, যা
কোনো কাজে লাগে না ; শুধু, ভুল অহংকার, পরচর্চা
আর পরনিন্দায় আমার মাথা খাচ্ছে ;
ওদের একসঙ্গে ছেঁটে ফেলে দাও ;

দেখো, এই পরচর্চার সার-খাওয়া চুল আর বুদ্ধিগুলি
যেখানে সেখানে ফেলো না,
তাহলে ওই চুল থেকে যেখানে সেখানে
পরচর্চার আগাছা জন্মাবে ।
একে তো বাগান ভরে রয়েছে আগাছা ।

আমি জানি, বাগানে রয়েছে কিছু ফুল,
সারারাত গন্ধ পাই, জ্যোৎস্নার ভেলায় সে
আমার শিয়র ছুঁয়ে—সারারাত ঘরে
চুপচাপ পায়চারি করে ;
সারারাত বন্ধু হয়ে আমার শরীর ছুঁয়ে বসে থাকে
পুরনো অসুখগুলো খুঁটে খুঁটে তুলে নিয়ে যায়,
আমি সুস্থ হয়ে উঠি ; আমি ঠিক চিনতে পারি
জ্যোৎস্না হয়ে আমার শিয়রে হাত রাখে,
আমার শরীরে এসে আমার শরীর হয়ে যায় ।

অথচ বাগানে চোখ রাখো অনোরা—
করে তাও কাড়াকাড়ি, রেষারেষি এবং বাড়াবাড়ি ।
নইলে ফুলের সৌরভ — জ্যোৎস্নার ভেলায় আসবে
আশঙ্কায় আছি , আগাছার ভিড়ে— ভিড়ে যাওয়া ফুলের বারণ

হাতে হাত আর...

শুকতারা রায়

আমার বাড়ির সিঁড়িতে বাতি জ্বলে না ।
নবাগতকে অন্ধকার হাতড়ে উঠতে হয় ।
মন চাইলে দিই বাড়িয়ে নিজের হাত ।
তখন যায় সরে আঁধার, লাগে বাতাসে ঘোর,
হাতে হাত আর...
সময়ের কুয়াশা ঘেরা সিঁড়ি বেয়ে উঠি ।
সেই কবেকার ওঠা আর নামা ।
পথে দৈবাৎ কখনো আপন জন হাত
ধ'রে ফেলে ।
বন্ধুর পথে বন্ধুর ছোঁয়ায় চকমকি জ্বলে ।
যাদু কার্পেটে যাই আকাশের কাছে ।
গোলাপী বাতাস, উষ্ণ আলিঙ্গন,
আর অদ্ভুত চকমকি জ্বলে ।

মেয়েটি জানেই না

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

শুনশান বাঁশবনে এখন ঝিকিঝিকি আলো
ছুরির ফলার মত পাতাগুলি দোলাচলে আছে
মেয়েটির চুল বিস্রস্ত শরীর যন্ত্রণায় নীল
ছিন্নভিন্ন কৌমার্যের সহমরণে ঝাঁপ দিতে চায়
তার সরল মাধুর্যমাখা অস্তিত্ব ।

এলোমেলো বেশবাস, অবিন্যস্ত রক্তাক্ত শরীর
তবু সময় তো থেমে যায়নি
চরাচর এখনো বেশ বিন্যস্ত সবুজ

সাক্ষী থাকে শুধু মুগডালের দাঁড়কাক, উড়ন্ত ফড়িং
সারা গায়ে নতুন আঠাঝরা বাবলা
আর বাঁশবনের খেলুড়ে কাঠবেড়ালী

একটাও হিংস্র পশু দেখেনি সে, নির্ভয়ে এসেছিল এখানে
মেয়েটি জানেই না, ওরা কি নিখুঁত মানুষ সেজেছে
তার চোখের জলে ভেসে থাকে দেবভোগ্য বিশুদ্ধ বিস্ময়
শিথিল মুঠো থেকে
টুকরো টুকরো ঘাস, মাটি ঝরে পড়ে যায় ।

হেসাড়ির জঙ্গলে এক কুকুর

ব্রত চক্রবর্তী

স্বর্গারোহণে নয়, স্রেফ বিহার মুলুকে এসেছি ।
তবু ল্যাগবেগে কালো এক কুকুর
সর্বদাই পিছু-পিছু, কাছে কাছে আছে ।
আমি যুধিষ্ঠির নই, কবি, প্রতিষ্ঠানমুখী,
লোভী, মাংসলোলুপ, মিথ্যাবাদী বলে চেঁচাই,
তবু সেই না-ছোড় সারমেয় সঙ্গ ছাড়ে না ।
ও কালো ভুলভুলাইয়া, নীচু, শিসে ডেকে ওকে বলি :
জ্যোৎস্না, নদী, বনজ ব্যাকুল গন্ধ লুটে নিতে
এখানে এসেছি ; শোন, পিছু ছাড় :
তবু সে শোনে না ।
নুড়ি হয়ে নুড়ি-ঝামরানো নদীতে নেমে গিয়ে শুনি
ভৌ-উ-উ তীরে দাঁড়িয়ে ডাকছে
তবে কি সৌন্দর্যের দেহরক্ষী ও !
চাঁদ থেকে জ্যোৎস্নার ডিম নিতে গেলে বাধা দেবে ?
নদী থেকে স্রোতের শিহরণ নিতে গেলে বাধা দেবে ?
বৃক্ষ থেকে শুকতারা ফুল নিতে গেলে বাধা দেবে ?
কিন্তু লোভী, মাংসলোলুপ, মিথ্যাবাদী, তবু কবি আমি ।
অন্য কেউ কখনও পারেনি কিন্তু একমাত্র কবি পারে
অবাধে বিশ্বকে তার বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে, গন্ধ শুঁকে,
পুনর্বার স্বস্থানে ফেরাতে ।
ও কি জানে না সে কথা ?

বাড়ীর গিন্নীকে কে দেখবে!

সকালের জল খাবার, বাচ্চাদের স্কুলের জন্য তৈরী করা, স্বামীর দুপুরের খাবার,
বাজার-হাট, ঘর-বাড়ী গোছান, পরিবারের সকলের ঠিকভাবে দেখা শুনো করা...।
আমার দিনগুলো কাজে ঠাসা, সেই জন্য আমার চাই হরলিক্স।
হরলিক্সে আছে পুষ্টি—
যা আমাকে সারাদিন অফুরন্ত কাজের জন্য প্রচুর শক্তি এবং ক্ষমতা যোগায়।
এমনকি সারাদিন কাজের শেষে বিকেল বেলায় স্বচ্ছন্দে পরিবারের সকলের সাথে
আনন্দমুখর মুহুর্তগুলি উপভোগ করতে পারি।

গৃহিনীর জন্য শক্তি-পানীয়।

হরলিক্স ঘন দুধ, মল্টেড বার্লি আর সোনালী গমের দানার পুষ্টিগুণে ভরা একটি সুস্বাদু পানীয়।
১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে, পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি পরিবারে পুষ্টি যুগিয়ে আসছে।

পুষ্টি যোগাতে অদ্বিতীয়

HMM-9241BEN

বৈ দে শি কী

পূর্ব ইয়োরোপের পার্টি কংগ্রেস

অরুণ বাগচী

১৯৮৬ সালের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে ওয়ারশ (হ্বার্সৌ) চুক্তিভুক্ত চার চারটি পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশে পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে গেল। মার্চ মাসে হল চেকোশ্লোভাকিয়ায়, এপ্রিলে বুলগেরিয়া এবং পূর্ব জার্মানীতে, জুন-জুলাই মাসে পোল্যাণ্ডে। বিশেষজ্ঞরা জানেন যে বিভিন্ন দেশে এই সব কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে ভূমিকম্প বা জলোচ্ছ্বাস ঘটিয়ে দেবার মতো কিছু সাধারণত হয় না। বিংশ সোভিয়েত কংগ্রেস, যেখানে মৃত স্ট্যালিনের বুকের ওপর থেকে বহু সম্মান ও কৃতিত্বের দাবিপদক তুলে ফেলে দিয়েছিলেন নিকিতা খ্রুশ্চেভ, বলা বাহুল্য, সর্ব অর্থে ব্যতিক্রম ছিল। পরে নিকিতা নিজেই অসম্মানিত ও ক্ষমতাচ্যুত হয়ে দূরে সরে যান বটে, তবে সেই ২০তম কংগ্রেসের ধাক্কা এখনও সবাই সামলে উঠতে পারেনি। যাই হোক, এমনিতে পার্টি কংগ্রেস কী করে? কয়েক বছরের কাজকর্মের হিসেব নেয় এবং পরবর্তী কয়েক বছরের কার্যক্রম এবং নীতি স্থির করে। বিশদভাবে কোনও প্রস্তাব পেশ করা হয় না, যেটুকু হয় তাও তৎক্ষণাৎ জানা যায় না। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় কমিটিগুলি যে প্রস্তাব পাশ করে অথবা সরকার যে সমস্ত বিবৃতি দেয় তার মাধ্যমে কংগ্রেসে কী স্থির হয়েছিল তার মোটামুটি আভাস মেলে।

গোর্বাচেভ আসার ফলে সোভিয়েত নেতৃত্বে যে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়েছে তার অনুপ্রেরণা পূর্ব ইওরোপ কতটা নিতে পারে, পূর্ব ইওরোপের কম্যুনিস্ট দেশগুলির পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশন সম্পর্কে বাইরের দুনিয়ার কৌতূহল প্রচণ্ড।

তবু, ওই চার দেশের পার্টি কংগ্রেস নিয়ে বাইরের দুনিয়ায় বেশ কৌতূহল ছিল। তার কারণ প্রধানত দুটি। এক, ১৯৮৫র মার্চ মাসে ক্রেমলিনের ক্ষমতাশীর্ষে মিখাইল গোর্বাচেভের আবির্ভাব। দুই, এ বছর ফেব্রুয়ারি-মার্চে মস্কোয় ২৭তম সি পি এস ইউ কংগ্রেস অধিবেশন। গোর্বাচেভের ক্ষমতাপ্রাপ্তি বা ২৭তম মস্কো কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবাদি পূর্ব ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে সেদিকে খর নজর রেখে চলছেন বিশেষত পাশ্চাত্য দেশের বিশেষজ্ঞমহল। গোর্বাচেভ আসার ফলে সোভিয়েত নেতৃত্বে যে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়েছে তার অনুপ্রেরণা পূর্ব ইয়োরোপ কতটা নিতে পারে, অপরপক্ষে ক্ষেত্রবিশেষে বিক্ষুব্ধ পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের নবীন নেতার কাছে কী এবং কতটা আশা করে, তার কিছু প্রতিফলন কংগ্রেসগুলির কার্যসূচিতে দেখবার জন্য ঔৎসুক্য আদৌ অস্বাভাবিক নয়। অবশ্য বিশেষজ্ঞরা এ কথা জানতেন যে ব্রেজনেভ-অনুসৃত নীতি সম্পর্কে যে আপত্তিই গোর্বাচেভের থাক, তিনি পূর্ব ইয়োরোপে এতাবৎ সোভিয়েত সরকার যে নীতি চালু

ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলির অধিবেশনে স্বাক্ষর করছেন গোর্বাচেভ। পাশে রুশ প্রধানমন্ত্রী তিখোনভ

রেখেছে তাতে হেরফের ঘটাতে যাবেন না। ২৭তম সোভিয়েত পার্টি (সি পি এস ইউ) কংগ্রেসে সেক্রেটারি জেনারেল হিসাবে এই প্রথমবার অংশ নিতে গিয়ে গোর্বাচেভ মোটামুটি চেয়েছেন ইতিপূর্বেই সারা বছর ধরে আলোচিত নীতিগুলিকে সুস্পষ্টভাবে রূপ দিতে। ব্রেজনেভের দীর্ঘ শাসনকালের শেষ পর্বে জমে ওঠা হাজার সমস্যার জঞ্জাল তিনি নিশ্চয় ঝেড়ে ফেলতে চান, কিন্তু মূলত রীতিনীতির ক্ষেত্রে একটা পারম্পর্য ও প্রবহমানতা মেনে চলতেও তাঁর আগ্রহ আছে।

চারটি পূর্ব ইয়োরোপীয় পার্টি কংগ্রেসেও ওই প্রবহমানতা বজায় রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তদুপরি জোর দেওয়া হয়েছে অর্থনীতির ওপর। বৈঠকে আলোচনার বড় ভাগ সময় গেছে অর্থনৈতিক প্রস্তাবাদির বেলা। বিষয়টা সোভিয়েত নেতাদেরও মনঃপূত। ইয়োরোপে সি এম ই এ সহযোগীদের আরও কাছে টেনে নিয়ে তাদের সঙ্গে ব্যাপকতর অর্থনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে সোভিয়েত ইউনিয়ন, বিশেষভাবে আগ্রহী। দেখার ছিল যে আপন আপন দেশে গত কয়েক বছরে স্বাধীনভাবে যে সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশ নিয়েছে, তারা এখনও সেটা বজায় রাখতে সাহসী কি না। যেমন হাঙ্গেরীতে অর্থনৈতিক সংস্কার (Hungarian Reforms) বা পোল্যাণ্ডে ব্যক্তিগত (বেসরকারী) কৃষিপ্রকল্প ইত্যাদি নতুন জমানায় স্বীকৃত হবে কি না, তা নিয়ে কৌতূহল ছিল। বোঝাই যাচ্ছে যে এই সব ব্যবস্থা বদলাবার জন্য বর্তমান সোভিয়েত নেতৃত্ব চাপ দিচ্ছেন না। বিভিন্ন পার্টি কংগ্রেসগুলি সেই সংশয়, যদি কোথাও থেকে থাকে, দূর করে দিয়েছে। মোটামুটিভাবে পুরানো নীতিও থাকছে, নেতারাও থাকছেন। জোর দেওয়া হচ্ছে অধিকতর দক্ষতার উপর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার নব নব উদ্ভাবনের সুযোগ গ্রহণ করবার উপর।

রাজধানী প্রাহা শহরে চেকোশ্লোভাক কংগ্রেস চলেছে ২৪ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত। চেক নেতারা খোলাখুলিভাবে পর্যালোচনা করলেন গত পনেরো বছরের সাফল্য অসাফল্যের ইতিবৃত্ত। অর্থাৎ ১৯৭১এর চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেস পর্যন্ত। ওই কংগ্রেসে বেশ কড়া এবং গোঁড়া সমস্ত প্রস্তাব পাশ করা হয়েছিল। ঠিক আগেই ঘটে গেছে, যাকে বলে প্রাহার বসন্ত (Prague Spring), গভীর এবং উত্তেজনায় ভরপুর জনবিক্ষোভ। আত্মাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অভিমানী চেক মানুষের চিত্তের তুমুল আলোড়ন প্রকাশ্যে ধরা পড়েছে সেদিন। বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন পার্টির নেতারা। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায় সেজন্য বিব্রত ও ব্যস্ত হতে হয়েছে। যাই হোক, গত পনের বছরে ধীরে ধীরে পার্টির নীতি রূপায়ণে রক্ষণশীলতা এবং জবরদস্তির ভাব কমে এসেছে—এটাই নেতাদের দাবি। বক্তৃতা দিতে উঠে নেতারা স্বীকার করেছেন যে সাফল্য ঘটেছে নানা ক্ষেত্রে, তবু বহু সমস্যা রয়েও গেছে। আগামী পনের বছরের নীতি স্থির করার কথাও তাঁরা ভেবেছেন, গৃহীত প্রস্তাবে এ সবের

পূর্ব ইওরোপের চারটি দেশের পার্টি কংগ্রেসে প্রধানত জোর দেওয়া হয়েছে অর্থনীতির ওপর। বৈঠকে আলোচনার বড় ভাগ সময় গিয়েছে অর্থনৈতিক প্রস্তাবাদির বেলা। বিষয়টা সোভিয়েত নেতাদেরও মনঃপূত।

প্রতিফলন মেলে। হাজার বক্তৃতা করেও অবশ্য চেকোশ্লোভাক মানুষকে কিছুই মানানো যাবে না, যদি না জীবনযাত্রার মানকে ক্রমোন্নত রাখা সম্ভব হয়। যদি না অর্থনীতিকে বলশালী রাখা সম্ভব ঘটে। ১৯৮১ থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন আনা হচ্ছে তার কৃপণতা সাধারণ মানুষকে মোটেই সন্তুষ্ট করেনি। আরও ব্যাপক, আরও উদার ব্যবস্থা সরকারকে নিতে হবে এটাই সাধারণ মানুষের দাবি। পার্টি কংগ্রেসে এই দাবি নিয়েও শোনা যাচ্ছে পর্যালোচনা হয়েছে। তাছাড়া ১৯৬০ সালের ঢাউস এবং বেঢপ সংবিধান পাল্টে নতুন একটা কাঠামো গড়ার দিকে নজর দেওয়া হবে, এ কথাও পার্টি কংগ্রেসে উঠেছে।

ক্যাপিটালিস্ট দুনিয়ার সংবাদপত্রগুলি একটা ব্যাপারে খুব বেশী মনোযোগ দেয়নি। তা হল 'ম্যানেজমেণ্ট কাডার' সম্পর্কে চেক পার্টির চিন্তাভাবনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। এর কারণ সম্ভবত এই, পাশ্চাত্য পর্যবেক্ষকরা ধরেই নিয়েছেন যে এটা হল গোর্বাচেভ ঘোষিত নীতির অনুকরণমাত্র, এর পিছনে মৌলিক ধারণা তেমন কিছু নেই। যেমন ধরে নেওয়া হচ্ছে যে চার দেশের কংগ্রেসেই যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল সেটাও মোটামুটি অনুকরণ, অভিনবত্ব তেমন কিছু নেই। এই সব ধারণা একপেশে হতে বাধ্য। সোভিয়েত প্রভাবের মধ্যে থাকলেও, কমিউনিস্ট

হের হোনেকার

শাসিত রাজ্য হলেও এক এক দেশ এক এক রকমের। তারা দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে জাতীয় ভাবধারার দিক থেকে পৃথক এবং গভীর অহঙ্কারের সঙ্গে ওই পার্থক্য বজায় রাখতে আগ্রহী। কংগ্রেসে মঞ্চে দাঁড়িয়ে নেতারা যে বক্তৃতা দিয়েছেন তার মূল সুরে হয়তো সোভিয়েত পার্টির প্রথম সচিবের ভাষণের অনুরণন মিলবে, কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু স্বতন্ত্র হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অন্তত পোল বা চেকরা রুশদের সম্পর্কে হীনমন্যতা রোগে ভোগে না। ১৯৮৫ সালের শেষের দিকেই চেক কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করেছিল যে, 'ম্যানেজমেণ্ট ক্যাডার'দের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হবে। পার্টি কংগ্রেসেও বলা হয়েছে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন চাই, অনেক বেশী দক্ষ এবং কল্পনাক্ষম ব্যবস্থাপনা চাই, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রূপায়ণে সাহস চাই অনেক পরিমাণে। স্বীকার করতেই হবে যে পার্টির একেবারে নিচুতলায় বা মধ্যস্তরে কিছু বদল ঘটান সম্ভব হলেও নেতৃত্বের একেবারে মাথার দিকে উল্লেখ্য কোনও পরিবর্তন আসেনি। কেবলমাত্র পার্টি প্রিসিডিয়ামে (পলিটব্যুরোতে) তিনজন ক্যানডিডেট-মেম্বারকে ঢোকান হয়েছে। এই তিনজনের দুজন হলেন দুই অঞ্চলের প্রথম সচিব আর তৃতীয়জন হলেন 'পার্টি সেক্রেটারি ফর এগ্রিকালচার'। এই তিনজন আসায় ওপর মহলে প্রো-চেঞ্জার এবং নো-চেঞ্জারদের মধ্যে ভারসাম্যে হেরফের হল কি না এখুনি তা বলা সম্ভব হচ্ছে না।

এপ্রিলের ২ থেকে ৫ তারিখ পর্যন্ত হয়েছে বুলগেরিয়ার পার্টি কংগ্রেস। এখানেও আলোচনার ক্ষেত্রে ঝোঁক পড়েছে নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ, দলের ক্যাডারদের মধ্যে শৃঙ্খলাবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাদির পুনর্বিন্যাস প্রভৃতির ওপর। কোনও পরিকল্পনা জরুরী মনে হলে আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি নিয়েও অগ্রসর হয়ে যেতে উৎসাহিত করা হচ্ছে পরিচালকদের। যে সব অর্থনৈতিক সংস্কার এর আগেই ঘোষিত হয়েছিল, সেগুলিকে যথা শীঘ্র সম্ভব প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে। নেতৃত্বের কোনও স্তরেই তেমন পরিবর্তন ঘটান হয়নি, চেকোশ্লোভাকিয়ার মতো নিচুতলায় বা মাঝারি স্তরে তো নয়ই। এর একটা হেতু অবশ্য আছে। গত বছরের শেষে এবং এই বছরের গোড়াতেই ওই বদল ঘটে গেছে।

পূর্ব বার্লিনে পূর্ব জার্মান পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল এপ্রিল মাসের ১৭ থেকে ২১ তারিখে। এখানেও আলোচনার ক্ষেত্রে ঝোঁক বেশী পড়েছে অর্থনীতির সংস্কার ও বলিষ্ঠ প্রয়োগের ওপর। শিল্প ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকরা যতটা সমালোচনার সম্মুখীন হবেন বলে মনে হয়েছিল কার্যত তা ঘটেনি। চেক নেতা হুসাকের মতো পূর্ব জার্মান নেতা হের হোনেকার কাজকর্মের খতিয়ান পাঁচ বছরের সীমারেখা পেরিয়ে সেই ১৯৭১ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। পুরানো নেতৃত্বই পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন প্রশাসন ও পার্টি চালাবার জন্য। তিনজন আঞ্চলিক প্রথম সচিবকে পলিটব্যুরোর পূর্ণ সদস্য হিসাবে গ্রহণ

করা হয়েছে। নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রীও পূর্ণ সদস্যপদ পেলেন। এছাড়া বিশেষ কোনও পরিবর্তন নেতৃত্ব স্তরে ঘটেনি। পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করবার যে প্রসঙ্গ, সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তবে তা পূর্ণাঙ্গ কিছু নয়। একদা, বিশেষত সেই ১৯৮৪ সালে, এই বিষয়ে যতখানি আগ্রহ প্রকাশ্যে দেখান হত, অনেকদিনই আর তা হয় না। কাজেই খুব জোরের সঙ্গে আপত্তি দেখাবার প্রয়োজন সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফেও ঘটে না। সোভিয়েত নেতারা ভালই জানেন যে প্রসঙ্গটা বড়ই স্পর্শকাতর, বেশ গোলমেলে। কিছু না বললেও চলে না, অথচ সমালোচনা করলে জার্মানরা মোটেই খুশি হয় না, হের হোনেকার প্রভৃতিরাও চান না যে এ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে কোনও ভুল বোঝাবুঝি হোক।

পোলিশ পার্টি কংগ্রেস ২৯ জুন শুরু হয়ে সত্য। তার চেয়েও বড় কথা এই, সুবিধে হল পহেলা নম্বর পোল নেতা জারুজেলস্কির। তাঁর প্রতিবাদীরা বাদ পড়ল। ফলে দল আরও বেশী করে তাঁর কব্জায় চলে এলো। জারুজেলস্কি বা তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন এমন নেতারা আড়ালে পড়ে গেলেন। একটা ব্যাপার অবশ্য হতাশাব্যঞ্জক। অনেকেই—খাস পোল্যাণ্ডে এবং দেশের বাইরে—ধরে নিয়েছিলেন যে কংগ্রেসের আগে বা পরে রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তি পাবেন। যেহেতু জারুজেলস্কির হাত এবং গদি পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী মজবুত, সেহেতু এই উদারতটুকু দেখান তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল—হয়তো বা সমীচীনও হত। কিন্তু দু-চারজনকে মুক্ত করে দেওয়া ছাড়া আর কিছু তিনি করলেন না। অবশ্য প্রসঙ্গটাকে ধামাচাপা দিয়ে দেওয়া হল তা নয়। কংগ্রেস কিছু না দিয়েছে। সোভিয়েত নেতৃত্বের সর্বোচ্চ স্তরে পরিবর্তনের সঙ্গে এই মনোভাবের সম্পর্ক কতটা তা অবশ্যই আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে।

চারটি পার্টি কংগ্রেসের উপরই মিখাইল গোর্বাচেভের দীর্ঘ ছায়া বিস্তৃত ছিল এ কথা সত্য। তিনি সশরীরে উপস্থিত ছিলেন বার্লিন কংগ্রেসে এবং পোলিশ পার্টি কংগ্রেসে। এর ফলে পূর্ব জার্মানরা বা পোলরা যে বিশেষভাবে উৎফুল্ল সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই—অন্তত পার্টির নেতারা আহ্লাদিত তো বটেই। তবে বুলগেরিয়া বা চেকোশ্লোভাকিয়ায় গোর্বাচেভ যাননি বলে ওদেশ দুটির নেতাদের প্রতি তিনি বিরূপ একথা কেউ ভাবছেন না। প্রথমত, সব পার্টি কংগ্রেসে সোভিয়েত নেতার যাবার কথা নয়, যাওয়া সম্ভবও নয়। তাছাড়া অন্য দেশ দুটিতে গোর্বাচেভের উপস্থিতি কেন সেটা বোঝাও

প্রাগে ৮১'র পার্টি কংগ্রেসে চেক নেতা হুসাক ও রুশ নেতা ব্রেজনেভ

চলল ৩ জুলাই তারিখ পর্যন্ত। বিভিন্ন বক্তা জোর দিয়ে যে কথা বলতে চাইলেন তা হল অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা পেরিয়ে পার্টি আবার ঐক্যবদ্ধ, দেশের ওপর দলের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। মাঝ খানের টালমাটাল দশাটা কেটে গেছে। ওয়ারশ চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির মাঝে, সি এম ই এ গোষ্ঠীর সামনে আবার অসঙ্কোচে গিয়ে দাঁড়াতে পারে পোলিশ কমিউনিস্ট পার্টি। এই কংগ্রেসে অবশ্য নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বেশ পরিবর্তন ঘটেছে, যা অন্য তিনটি দেশের বেলা ঘটেনি। আগেকার সাতজন সদস্যকে পলিটব্যুরো থেকে ছেঁটে দেওয়া হয়েছে এবং নিয়ে আসা হয়েছে নতুন নয়জন নেতাকে। অর্থাৎ পলিটব্যুরোর সদস্য সংখ্যা ১৩ থেকে বাড়িয়ে করা হল ১৫, যার নয়জনই নতুন সদস্য। সচিব স্তরেও বেশ হেরফের ঘটান হয়েছে। এর ফলে কাজকর্মের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য কিছু বাড়ল তা করলেও, দলীয় নেতৃত্ব এই ব্যাপারে যাতে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সেই সম্ভাবনার পথ খুলেই রাখা হয়েছে।

বস্তুত চারটি পার্টি কংগ্রেসেই ওই একই চিন্তাধারা প্রকটিত। আলোচনা, বিতর্ক যা হয়েছে সবই নানা দিক থেকে সমস্যার স্বরূপ তুলে ধরার জন্য। দলীয় স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সমাধানের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। নেতাদের হাত কেউ বেঁধে দেয়নি। কী অর্থনীতির ক্ষেত্রে, কী প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে নেতারা স্বাধীনভাবে নির্দেশ দিতে পারবেন, সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। আর একটা প্রবণতাও পরিষ্কার। অতীত সিদ্ধান্ত, নীতি প্রভৃতির সমালোচনা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পার্টি কংগ্রেসগুলি বেশী উপযোগিতা দেখাতে চেয়েছে। নতুন নেতৃত্বের কাঠামো গড়ে দিয়ে তাদের হাতে কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্ব ছেড়ে সহজ। পোল্যাণ্ডে তিনি উপস্থিত থাকার ফলে জারুজেলস্কির প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে গেছে, আর সেটাই গোর্বাচেভ চেয়েছিলেন। পূর্ব বার্লিন গোর্বাচেভকে টেনেছে, তার কারণ ওই মঞ্চ তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছেন আন্তর্জাতিক প্রচারকার্যে। অস্ত্রসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং ইয়োরোপে নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে তাঁর প্রস্তাবকে বিশ্ববাসীর (বিশেষত আমেরিকার) কানের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার জন্য বার্লিনই উপযুক্ত উৎক্ষেপণ মঞ্চ বলে তাঁর ধারণা হয়েছে। কে বলবে সেই হিসাবে ভুল ছিল? আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করবার। কীভাবে পার্টি কংগ্রেস চলবে, কোন কোন বিষয়ের ওপর জোর দেবে, কী কী সিদ্ধান্ত নিতে হবে—সে বিষয়ে গোর্বাচেভ কিছুমাত্র লেকচার দেননি। তাঁর ভূমিকা ছিল নিখুঁত, তাঁর সংযম সমালোচনার ঊর্ধ্বে। দেশ

এই মুহূর্তে, যখন আপনি এটা পড়ছেন... আপনার মুখের একান্ত প্রয়োজনীয় ত্বক-কোমলকারক আর্দ্রতা হারিয়ে যাচ্ছে।

এর প্রতিকারের কি ব্যবস্থা করছেন আপনি?

যদি বলেন, কিছুই না ... তাহলে বুঝবো, হয় আপনি জানেন না—যে আর্দ্রতা হল আপনার ত্বককোষের একান্ত প্রয়োজনীয়, জীবনদানকারী অংশ যা ত্বক কোমল ও মোলায়েম রাখতে সাহায্য করে। নয়তো—আপনার রঙরূপ শুষ্ক, প্রাণহীন বা ক্লান্ত দেখালে আপনার কিছু যায় আসে না!

যতদিন আপনার কৈশোর আছে, আপনার ত্বকের হারানো আর্দ্রতা চট্ করে ফিরে আসে। তাই অল্প-বয়সী ত্বক কোমল আর নমনীয় থাকে। তবে কৈশোর পেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের আর্দ্রতা যত তাড়াতাড়ি হারিয়ে যায়, তত তাড়াতাড়ি ফিরে আসে না ... আর, ঠিক এই সময়েই এমন একটা কিছু দরকার, যা আপনার ত্বকের আর্দ্রতা ঠিকমত রেখে সেটিকে নরম আর কোমল বানায়।

আপনার দরকার ল্যাক্মে ম্যাক্সিমাম ময়েশ্চা-রাইজিং লোশন। এ হল জল আর কিছু বিশিষ্ট কোমলকারক পদার্থের এক সূক্ষ্ম সংমিশ্রণ যা সত্যিসত্যিই মৃদুভাবে আপনার ত্বকের গভীরের কোষে পৌঁছে তাতে আর্দ্রতা আর পুষ্টি ফিরিয়ে আনে। আপনার ত্বক কোমল ও মোলায়েম রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া, এটি যেমন হালকা তেমনি তেলাভাব-রহিত ... মেখেছেন বলে মনেই হবে না। অথচ আপনার ত্বকে সদাই জাগবে এক তরতাজা অনুভূতি!

ল্যাক্মে ম্যাক্সিমাম ময়েশ্চারাইজিং লোশনে এক অনন্য স্বয়ং-নিয়ন্ত্রক গুণ আছে যা তার শোষণ মাত্রা—ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজন অনুসারে কম-বেশী করে। অর্থাৎ, আপনার মুখের বেশী শুষ্ক অংশগুলিতে বেশী ক'রে কাজ করে। যেমন, চোখ ও ঠোঁটের চারপাশের অংশগুলিকে বেশী করে শোষণ করতে দেয়। আবার তেলা অংশগুলিকে, যেমন—নাক ও থুতনী, কম শোষণ করতে দেয়। কাজেই আপনার ত্বক যে ধরণেরই হোক না কেন ... শুষ্ক বা তেলা, স্বাভাবিক বা সমন্বয়—ল্যাক্মে ম্যাক্সিমাম ময়েশ্চারাইজিং লোশন আপনার জন্যে সুন্দরভাবে কাজ করে।

ল্যাক্মে ম্যাক্সিমাম ময়েশ্চারাইজিং লোশন—কোমল সুন্দর ত্বকের জন্যে!

রূপ ঝলমল, অন্তর খুশি-উচ্ছল করতে ল্যাক্মে!

Rediffusion/L/5226 d BN

হিন্দুস্থান মেসিন টুলস

সমরজিৎ কর

ভারতীয় এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে হিন্দুস্থান মেসিন টুলস লিমিটেড এখন শিরোনাম। সংক্ষিপ্ত নাম 'এইচ এম টি'। এ নাম এখন ভারতের সাধারণ মানুষেরও মুখে মুখে প্রচলিত। এই প্রচারের মূলে কাজ করেছে এই প্রতিষ্ঠানটির তৈরি ঘড়ি। এ দেশে এক সময় ঘড়ি বলতে বোঝাত সুইজারল্যান্ডের ঘড়ি। বিদেশী সেই ঘড়ির পরিবর্তে এখন বেশির ভাগ ভারতীয়র হাতেই 'এইচ এম টি'। শুধু গুণগত মানেই নয়, বাহ্যিক আকর্ষণের দিক থেকেও এই ঘড়ির কদর বেড়েছে, বাড়ছেও। শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও এখন ঘড়ি বলতে দাঁড়িয়েছে 'এইচ এম টি'। আর শুধু ভারতেই নয়, বিদেশী বাজারেও এই প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন ধরনের ঘড়ির চল বেড়েছে বিস্তর।

কিন্তু এহ বাহ্য। যন্ত্র তৈরির জন্যেও দরকার যন্ত্র। শেষোক্ত এই যন্ত্রগুলিকেই বলা হয় 'মেসিন টুলস'। সারা পৃথিবীতে এ ধরনের যন্ত্র
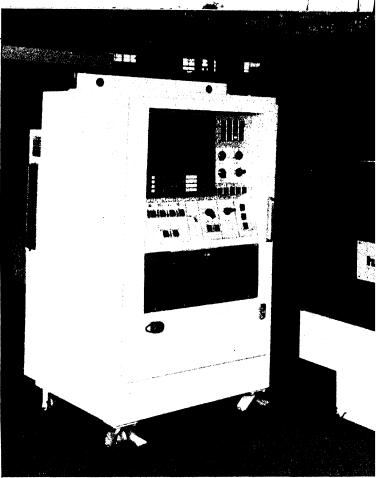
এইচ এম টি'র কমপিউটার চালিত তার কাটার এই যন্ত্রের আন্তর্জাতিক বাজারে এখন খুবই সুনাম

ঘড়ির বিভিন্ন অংশ স্থাপন করছেন এইচ এম টি-র কর্মীরা

উৎপাদনের ক্ষেত্রেও 'হিন্দুস্থান মেসিন টুলস' নামক ভারত সরকারের এই প্রতিষ্ঠানটি এখন অন্যতম বৃহৎ সংস্থা। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর একটি মাত্র ইউনিট নিয়ে তাঁরা শুরু করেছিলেন তাঁদের কারবার। বাঙ্গালোরের প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দূরে জলহাল্লিতে। এখন তাদের মোট উৎপাদন কেন্দ্রের সংখ্যা সতেরোয় এসে দাঁড়িয়েছে। এ সব কেন্দ্র বসেছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। বিদেশেও। তৈরি হয়েছে ১৩টি ঘড়ি উৎপাদনের কেন্দ্র। সেই সঙ্গে ১৮৬টি ছোট বড় সাহায্যকারী কারখানা বা অ্যানসিলিয়ারি ইউনিটস। দেশে ধাতু কাটার এবং ধাতব যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম তৈরির প্রায় ৫০ শতাংশ যন্ত্রপাতি 'এইচ এম টি'-ই উৎপাদন করছে। এ ছাড়া, অন্যান্য উৎপাদনের মধ্যে রয়েছে: ঘড়ি—৮৫ শতাংশ, ছাপার যন্ত্র—৮০ শতাংশ, ট্র্যাকটার—১৫ শতাংশে এবং বৈদ্যুতিক বাল্ব ২৫ শতাংশ।

সম্প্রতি জলহাল্লি থেকে ঘুরে এলাম। বাঙ্গালোর দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন বসতি। আধুনিক সজ্জায় নানান কারখানা। তার ভেতর দিয়ে গিয়েছে বোম্বে হাইওয়ে। মাঝে মাঝে চাষের জমি। গাছপালা। মোটরে আধ ঘন্টা লাগল। সেই সঙ্গে গিয়ে হাজির হলাম অনবদ্য এক পরিবেশে। এক পাশে মনোরম একটি প্রাকৃতিক হ্রদ। আর এক পাশে, বিভিন্ন গাছপালার ছায়াকীর্ণ চত্বর। চত্বরে ঢুকতেই চোখে পড়ল বিমান বন্দরের হ্যাঙ্গারের মত কয়েকটি বাড়ি।

শুনলাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই জায়গাটি ছিল ব্রিটিশ বিমানবাহিনীর একটি আড্ডা। তখন সামরিক বিমান রাখার জন্যেই এই হ্যাঙ্গারগুলি তৈরি হয়েছিল। এ ছাড়া, যুদ্ধবন্দীদের থাকার ব্যবস্থাও ছিল এখানে। যে সব ইটালিয় সৈনিক মিত্রপক্ষের হাতে বন্দী হত, এই জলহাল্লিতে এনে তাদের রেখে দেওয়া হত। ওই সময় এখানে যন্ত্রপাতি মেরামত এবং ছোটখাটো মেসিন টুলস তৈরিরও ব্যবস্থা হয়। সে সব কাজ চলত ব্রিটিশ এঞ্জিনিয়ারদের তত্ত্বাবধানে, এবং ব্রিটিশ স্বার্থে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই কারখানাটির সংস্কার করা হয়। তারপর থেকেই শুরু মেসিন টুলস উৎপাদনের বৃহৎ ব্যবস্থা। বলতে গেলে হিন্দুস্থান মেসিন টুলস লিমিটেডের পত্তন। সেটা ১৯৫৩।

এইচ এম টি'র জনৈক অফিসার বললেন, দেখুন, ভারতে মেসিন তৈরির যন্ত্রপাতির উৎপাদন কিন্তু শুরু হয়েছিল ১৮৯০-এর
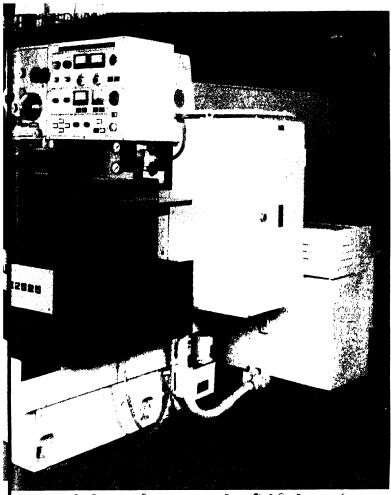
দশকেই। দেশে রেলওয়ে ওয়ার্কশপ এবং টেক্সটাইল শিল্প বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সব যন্ত্রপাতির চাহিদাও বাড়তে থাকে। প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে অস্ত্রশস্ত্র তৈরির প্রয়োজনে এই চাহিদা আরও বাড়তে থাকে। গোড়ায় কিছু কিছু যন্ত্রপাতি এ দেশে তৈরি হলেও, বিদেশী শাসকরা উন্নত ধরনের মেসিন টুলস ব্রিটেন অথবা অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করতেন। সে সব যন্ত্রপাতির মান ছিল ভারতে তৈরি যন্ত্রপাতির চেয়ে উন্নততর। বলতে কি, ১৯৪০-এর দশকেও এ দেশে মেসিন টুলসের উৎপাদন পরিমাণ এবং বৈচিত্র্যের দিক থেকে সীমিত ছিল। ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হল। গড়ে উঠতে লাগল নতুন নতুন কলকারখানা। তাদের চাহিদার জন্যে চাই বহুমুখী মেসিন টুলস। এমন ধরনের মেসিন টুলস যা শুধু আমাদের চাহিদাই মেটাবে তা নয়, যাদের মান হবে আন্তর্জাতিক মানের সমতুল্য। একথা মনে রেখেই ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার এখানে গড়ে তোলেন হিন্দুস্থান মেসিন টুলস লিমিটেড।

এটা যে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন উদ্যোগ তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে কোন যন্ত্রপাতি তৈরি করতে গেলেই দরকার ধাতব পাত। সেই পাত নিখুঁত পরিমাপে কাটতে হয়। এক এক কাজে দরকার এক এক মাপের পুরু পাত। প্রয়োজনে সমান দূরত্ব রেখে পাতে ছিদ্র করতে হয়। পাতের সঙ্গে পাত জোড়া দেওয়া, পাতের সাহায্যে নানা রকম যন্ত্রের অংশবিশেষ তৈরি, এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে এমন কত কাজ। এ সব কাজের জন্যেই তো দরকার মেসিন টুলস।

জলহালির ইউনিটগুলি ঘুরে দেখলাম। লেদযন্ত্রই যে কত রকম হতে পারে, চোখে না দেখলে যেন কল্পনাই করা যায় না। কোন কোন

...লোর কারখানায় তৈরি মেসিন টুলস-এর পরীক্ষার কাজ চলছে

এইচ এম টি'র তৈরি ফ্রন্ট লোডার কর্মব্যস্ত

এম· আর· নাইডু : চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এইচ-এম-টি

যন্ত্র চালান হয় শুধুমাত্র হাতে। ইদানীং কমপিউটারের সাহায্যেও এ ধরনের যন্ত্র চালানোর চল হয়েছে। এইচ এম টি এ ধরনের আধুনিকতম যন্ত্রপাতি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও উন্নত দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

সবচেয়ে ভাল লাগল এখানকার কর্মীদের জন্যে বিভিন্ন ব্যবস্থাবলী। কর্মীদের জন্যে তৈরি হয়েছে ১৫০০টি বাড়ি। প্রতিটি বাড়িতেই রয়েছে আধুনিক ব্যবস্থা। এ ছাড়া, তাঁদের ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্যে রয়েছে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। রয়েছে বাজার, সিনেমা হল, খেলার জন্যে স্টেডিয়াম, চিকিৎসা কেন্দ্র প্রভৃতি।

গোড়া থেকেই উৎপাদন সামগ্রীর বহুমুখী সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে আসছে এইচ এম টি। এ ব্যাপারে প্রচুর বিদেশী সহযোগিতাও গ্রহণ করেছে তারা।

ঘড়ির কথাই ধরা যাক। ১৯৬০-এর দশকের গোড়াতেও এ দেশের মানুষ বিদেশী ঘড়ির উপরই নির্ভর করত বেশি। কোন কোন প্রতিষ্ঠান এ দেশে ঘড়ি তৈরি করলেও, বিদেশী ঘড়ির উপর তাদের বেশি নজর ছিল। এ দেশে বেআইনী আমদানি ঘড়ির তখন ফলাও কারবার। এ দিকে নজর রেখেই আন্তর্জাতিক মানের ঘড়ি উৎপাদনে হাত দেয় এইচ এম টি। জাপানের 'সিটিজেন' সংস্থার সহযোগিতায়। উৎপাদন শুরু করার অল্প দিনের মধ্যেই তাদের ঘড়ি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাদের ঘড়ি তৈরির প্রধান দুটি কারখানা বাঙ্গালোরে। পরে শ্রীনগর এবং তুমকুরে গড়ে তোলা হয় আরো দুটি ঘড়ি উৎপাদনের কেন্দ্র। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের রানীবাগে আরও একটি কারখানা তৈরি হচ্ছে। এ ছাড়াও বাঙ্গালোরে তৈরি হয়েছে ঘড়ি বিষয়ক গবেষণার একটি কেন্দ্র। ইতিমধ্যে দম দেওয়া ঘড়ি থেকে তাঁরা হাত দিয়েছেন অটোমেটিক ঘড়ি তৈরিতে। এই ঘড়িও এখন খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এখন ইলেকট্রনিকস চালিত ঘড়িও উৎপাদন করছেন তাঁরা। বাজারে যার পরিচয় কোয়ার্টজ ঘড়ি। উল্লেখ্য, ১৯৬২ সালে এইচ এম টি উৎপাদন করেছিল মোট ১৫,০০০ ঘড়ি। সবই দম দেওয়া। এখন উৎপাদনের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে বছরে চল্লিশ লক্ষ। ১২০টি মডেল। দম দেওয়া, অটোমেটিক এবং কোয়ার্টজ।

পিনজোরে তৈরি হয়েছে এইচ এম টি'র ট্র্যাকটার তৈরির কারখানা। কারখানাটি উৎপাদন করছে ২৫, ৩৫ এবং ৫৮ অশ্বশক্তির ট্র্যাকটার, ভারতের আঞ্চলিক চাহিদা অনুযায়ী। আজমিরের মেসিন টুলস কারখানাটি এক সময় রুগ্ন হয়ে পড়ে। সেটির দায়িত্বভার নিল এইচ এম টি। তাদের তত্ত্বাবধানে সেখানে উৎপাদন শুরু হল নানা রকম যন্ত্রপাতি। যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর গ্রাইনডিং যন্ত্র। অল্প সময়ের মধ্যেই এই কারখানাটি এর ফলে তার রুগ্ন দশা থেকে মুক্তি পেয়েছে। বিদেশ থেকে নিয়ে আসছে প্রচুর অর্ডার।

দেশজুড়েই এখন সাফল্যের নজির। হায়দ্রাবাদে বসেছে যন্ত্রপাতির ধাতব অংশবিশেষ তৈরি থেকে শুরু করে বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি এবং বৈদ্যুতিক বাল্ব তৈরির কারখানা। কলামেস্বরিতে তৈরি হচ্ছে অফসেট প্রিন্টিং মেসিন। তাদের এই যন্ত্র বিদেশী-যন্ত্রের সমতুল্য। হায়দ্রাবাদের একটি ইউনিটে আধুনিক বল-বিয়ারিং তৈরির যন্ত্র উৎপাদন হচ্ছে। আউরঙ্গবাদে তৈরি হচ্ছে ডেয়ারির যন্ত্রপাতি। এ কাজে তাঁরা সহযোগিতা পাচ্ছেন পূর্ব জার্মানির ডেব ফোর্টস্রিট লান্ড মেসিনেল প্রতিষ্ঠান থেকে। দেশে তৈরি হয়েছে বেশ কয়েকটি দুধ এবং দুগ্ধজাত শিল্প। এ সব উদ্যোগে এখন এইচ এম টি'র তৈরি মাখন পৃথককারী যন্ত্র, প্লেট হিট একসচেঞ্জার, শীতলকারী যন্ত্র, জীবাণুদূরীকরণ যন্ত্র, মাখন তৈরি, বোতলে দুধ পোরার যন্ত্র প্রভৃতির এখন যথেষ্ট কদর। এক সময় এ সব যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হত। এখন 'এইচ এম টি'ই যোগাচ্ছে।

আগেই বলেছি, শুধু দেশের চাহিদা মেটানোই নয়, বিদেশেও এইচ এম টি'র যন্ত্রপাতির এখন যথেষ্ট কদর। বিদেশী বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে তৈরি হয়েছে ৩০টি কেন্দ্র ; তাদের বলা হয় এইচ এম টি (ইনটার ন্যাশনাল) লিমিটেড। এই সব কেন্দ্রের মাধ্যমে এখন তাদের মেসিন টুলস বিক্রি হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত দেশ, ইউ কে, কানাডা, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উন্নত দেশগুলিতে। এ ছাড়া, আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতেও এখন তাদের ফলাও কারবার। এ ছাড়াও কেনিয়া, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশে উপদেষ্টা হিসেবেও কাজ করছেন তাঁরা। তাঁদের সহযোগিতায় বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠছে মেসিন টুলস তৈরির কারখানা।

জলহালিতে বসে কথা বলছিলাম এইচ এম টি'র জনৈক অফিসারের সঙ্গে। কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এ দেশে বড় বড় শিল্পোদ্যোগের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা ছোট ছোট, বিশেষ করে ব্যক্তিগত উদ্যোগীদের ব্যাপারে তেমন আগ্রহী নন। অনেক ছোটখাটো যন্ত্র অথবা সাজসরঞ্জাম তৈরির ব্যাপারে এ দিকটি তো আপনারা দেখতে পারেন ?

ভদ্রলোক বললেন, এ দিকেও আমরা লক্ষ রেখেছি। এখানে কাজ করার পর অনেক কর্মী চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজেরাই নানান জিনিস তৈরিতে হাত দেন। তাঁদের সামগ্রী আমরা কিনে থাকি। অনেকে অবসর গ্রহণের পর নিজেদের চেষ্টায় গড়ে তোলেন কর্মশালা। তাঁদের আমরা সাহায্য করি। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এখন নিজস্ব কারখানার মালিক। এর ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ যেমন বেড়েছে, কুশলী কর্মীদের অভিজ্ঞতারও শরিক হচ্ছি আমরা।

১৯৫৩-৫৪ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি যখন চালু হয় তখন তার কর্মীসংখ্যা ছিল ১০০। এখন দেশ-বিদেশ মিলিয়ে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮,০০০-এ। আগামী পাঁচ বছরে এই সংখ্যা আরও বাড়বে। হরিয়ানা, কেরালা, রাজস্থান, জম্মু এবং কাশ্মীর, কর্ণাটকের টুমকুর এবং উত্তর প্রদেশের রানীবাগে নতুন কারখানা তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছেন তাঁরা। আসামেও। মেসিন টুলস-এর ক্ষেত্রে এইচ এম টি এখন একটি সাম্রাজ্য। ■

পূর্ব-পশ্চিম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যৌবন-৩৪

মেডিক্যাল কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাস থেকে কয়েকটা স্টপ আগে নেমে পড়লো তুতুল। জগুবাবুর বাজারের কাছে। এর আগে তুতুল কোনোদিন কোনো বাজারের মধ্যে ঢোকেনি, আজ সে ঢুকলো। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে তার বই খাতা, কলেজে যাবার তাড়া থাকায় কোনোদিনই সে চুল বাঁধে না, একটা হলদে রঙের শাড়ি পরা, পায়ে রবারের চটি। সে মুদি দোকান খুঁজতে লাগলো।

আতপ চাল একেবারেই পাওয়া যাচ্ছে না। বিধবা হবার পর সুপ্রীতি আর সেদ্ধ চাল খান না, তাই দু'তিন দিন ধরে তিনি দিনের বেলা ভাতের বদলে সাবু কিংবা চিঁড়ে ভিজিয়ে খাচ্ছেন। মমতা, তুতুল আর মুন্নিকে তিনি মাথার দিব্যি দিয়েছেন, এ কথা কিছুতেই যেন প্রতাপের কানে না যায়। সাবু-চিঁড়ে খেয়ে তিনি দিব্যি আছেন, কোনো অসুবিধে নেই, অম্বুবাচীর সময়েও তো তাঁকে ভাত ছাড়াই তিনদিন কাটাতে হয়।

বাড়ির পুরুষ দু'জন খেয়ালই করে না বাড়ির মেয়েরা কী খায় না খায়। অতীন নিজের খাবারটি পেলেই খুশী। প্রতাপও দু'বেলাই আলাদা খেতে বসেন। তাঁকে যা পরিবেশন করা হয়, বাড়ির অন্যরা তাই-ই খাবে, এটাই তিনি ধরে নিয়েছেন। চালের অনটনের কথা তিনি জানেন, সেইজন্যই দিনের বেলা ভাত আর রাত্তিরে রুটি চালু হয়েছে। প্রতাপের নতুন আর্দালি রওনক আলি তার হাওড়া জেলার গ্রামের বাড়ি থেকে কিছু চাল এনে দেবার প্রস্তাব জানিয়েছিল, প্রতাপ রাজি হননি। বাইরের জেলাগুলি থেকে কলকাতায় চাল আনা বে-আইনি, প্রতাপ তেমন কাজে প্রশ্রয় দিতে পারেন না। যদিও রুটিতে তাঁর রুচি নেই, রুটি খেলে মন ভরে না।

তুতুল জানে তার মা একেবারেই রুটি খেতে পারেন না। রাত্তিরবেলা দুটো একটা রুটি দাঁতে কাটেন বাধ্য হয়ে, তাও জলে ভিজিয়ে নরম করে; দিনের বেলা রুটি খাওয়ার চেয়ে চিঁড়ে মুড়ি সাবুও ভালো।

পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের উত্তেজনা শেষ হতে না হতেই খাদ্য-সমস্যা হিংস্র দাঁত আর রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়েছে সারা দেশের ওপর। এ বছর ফসল ভালো হয়নি। আগামী বছর খাদ্য সংকট আরও বাড়বে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপে যুদ্ধ বিরতি হলেও ভারতীয়দের ধারণা হয়েছে যে যুদ্ধে তারাই জিতেছে। জয়ের উন্মাদনায় চিৎকার করতে গিয়ে তারা দেখলো খালি পেটের জ্বালায় গলার জোর আসে না।

এই যুদ্ধে ব্রিটেন ও আমেরিকা পাকিস্তানের দিকে ঢলে ছিল বলে খবরের কাগজগুলিতে দিল্লির পার্লামেন্টে ঐ দুই দেশের প্রতি খুব উষ্মা প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু এখন আবার সভয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে, আমেরিকা গম পাঠাবে তো? পি এল-৪৮০ প্রকল্প চালু রাখবে তো? সোভিয়েত ইউনিয়ান ভারতকে অস্ত্র ও বন্ধুত্ব দিয়ে সাহায্য করলেও নিরন্ন ভারতীয়দের খাদ্য দিয়ে সাহায্য করার ক্ষমতা তাদের নেই। বিশ্বের বাজার থেকে তাদেরও গম কিনতে হয়।

প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী কলকাতার ময়দানে বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দিতে এসে সাম্প্রতিক দেশপ্রেমের উন্মাদনাকে কাজে লাগাবার জন্য বললেন, এখন প্রকৃত দেশপ্রেম হলো কম খাওয়া। প্রতি সোমবার দেশের সমস্ত মানুষের উপোস দেওয়া উচিত। অধিক খাদ্য ফলাতে হবে, সমস্ত পোড়ো, পতিত, অনাবাদী জমিতে ফসল ফলাতে হবে, এক ফসলী জমিকে দো ফসলী করতে হবে ইত্যাদি। এসব নিছক কথার কথা। দু'দশ বছরে এরকম উদ্যোগের ফল পাওয়া যায় না।

তুতুল জানে, তার মায়ের অ্যানিমিয়া আছে। তা ছাড়া লো প্রেসার। ইদানীং যখন তখন একটা তীব্র পেট ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েন সুপ্রীতি, অনেক পরীক্ষা টরিক্ষা করিয়েও সে ব্যথার কারণটা ঠিক ধরতে পারেনি তুতুল। গতকালই তাদের এক প্রোফেসর পেটের রোগ সম্পর্কে পড়াতে গিয়ে হঠাৎ তিক্ত ভাবে হেসে বলেছিলেন, আমি যে-সব বই দেখে তোমাদের পড়াচ্ছি, তোমরা যে-সব বই মুখস্ত করবে, তাতে কোথাও লেখা নেই যে মানুষ যখন অনিচ্ছায় অনাহারে ভোগে, খিদে আছে অথচ খাদ্য নেই, তখন তাদের কী কী রোগ হতে পারে! কোন্ ওষুধেই বা তাদের চিকিৎসা হবে। লালবাহাদুর তো বলে গেলেন সোমবার উপোস করতে, এদিকে গ্রামের বহু মানুষ সপ্তাহে দু'তিন দিনও পেট ভরে খেতে পায় না।

করতে পারছেন না। এই মেয়েটাই তো পিকলুর কথা ভেবে ভেবে দিন দিন শালিকের মতন রোগা হয়ে যাচ্ছিল, কোনো সাধ আহ্লাদ ছিল না, ওর চিকিৎসার জন্য প্রতাপ কত চেষ্টা করেছেন···সেই তুতুল হাসছে, জোর দিয়ে কথা বলছে!

খুব গোপনে একটা নিষিদ্ধ কথা বলার মতন তুতুল মায়ের কানে কানে বললো, মা, আজ আমি বাজারে গিয়েছিলাম চাল কিনতে।

সুপ্রীতি শোওয়া অবস্থা থেকে উঠে বসলেন। শুধু চোখ নয়, নিজের কানকেও এবার তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না। চোখ বড় বড় করে তিনি বললেন, তুই বাজারে গিয়েছিলি?

তুতুল বললো, হ্যাঁ। বাজারে বেশি দামে চাল বিক্রি হয়। কিন্তু সেখানেও আতপ চাল নেই। যেটুকু ছিল এক জজ সাহেব কিনে নিয়ে গেছেন। তোমার মতন অনেক বিধবাই নিশ্চয়ই আতপ চাল খায় শুধু। গভর্নমেন্ট তাদের কথা চিন্তা করছে না। গভর্নমেন্টের উচিত ছিল সব কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো যে এখন থেকে সব বিধবারাই আতপের বদলে সেদ্ধ চাল খেতে পারবে। তাতে কোনো দোষ নেই!

সুপ্রীতি বললেন, অনেকে তো ভাতের বদলে রুটি খেয়ে দিব্যি থাকতে পারে।

—তোমার মতন বাঙালরা যে ভাত না খেয়ে থাকতে পারে না। তারা বুঝি আতপ চালের অভাবে না খেয়ে মরে যাবে? আমার মাকে আমি কিছুতেই মরতে দেবো না!

সুপ্রীতির বুকের মধ্যে কুল কুল করে একটা সুখের ঝরনা বয়ে যেতে লাগলো। তুতুল ঘুমিয়ে পড়লেও অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর ঘুম এলো না। অঘ্রাণ মাস, একটু শিরশিরে ঠাণ্ডা পড়েছে। এক সময় উঠে সুপ্রীতি শিয়রের কাছের জানলাটা বন্ধ করে দিলেন। তুতুল শুয়ে আছে দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে। একই খাটে মা আর মেয়ে। আর কিছুদিন বাদেই মেয়ে ডাক্তার হবে, তার জন্য একটা আলাদা ঘর চাই।

তিনি একটা পাতলা চাদর বিছিয়ে দিলেন তুতুলের গায়ে।

পরদিন সকালে তুতুল অতীনকে ধরে বললো, এই বাবলু, তুই আমাকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটা বড় ছবি জোগাড় করে দিতে পারবি?

অতীন বললো, সে ছবি আমি কোথায় পাবো?

—তুই তো অনেক জায়গায় ঘোরাঘুরি করিস, একটু খোঁজ নিতে পারবি না? তোকে আমি পয়সা দিয়ে দেবো?

—হঠাৎ বিদ্যাসাগরের ছবি দিয়ে কী হবে?

—আমার ঘরে টাঙাবো। তোর মনে আছে, ইডেন গার্ডেনে আমরা একবার একটা খুব বড় মেলা দেখতে গিয়েছিলাম? সেখানে পিকলুদা বলেছিল, বাঙালি মেয়েদের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কত উপকার করেছিলেন অথচ মেয়েরা রামকৃষ্ণের ছবি ঘরে টাঙিয়ে পুজো করে। সত্যিই তো, বিদ্যাসাগরের জন্যই তো আমরা স্কুল কলেজে যেতে পারছি। কাল মনুসংহিতা পড়তে গিয়ে পিকলুদার ঐ কথাটা আবার মনে পড়ে গেল!

তুতুল সকালবেলা হঠাৎ বিদ্যাসাগরের ছবির কথা তোলায় অতীন যত না অবাক হয়েছে তার চেয়েও বেশি চমকে গেল তুতুলের মুখে পিকলুর নাম শুনে। দাদার মৃত্যুর পর সে একদিনও ফুলদির মুখে দাদার উল্লেখ মাত্র শোনেনি। এমন কি তুতুল কাছাকাছি থাকলে অন্যরা পিকলুর কথা আলোচনা করতে করতেও থেমে যায়। ফুলদির মুখ চোখও আজ অন্যরকম।

আচ্ছা দেখবো ছবি পাওয়া যায় কি না, এই বলে অতীন বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, তুতুল আবার তাকে জিজ্ঞেস করলো, এই, আজ তো ইউনিভারসিটি বন্ধ, তুই কোথায় যাচ্ছিস?

ইউনিভারসসিটি বন্ধ থাকলেই যে বাড়ি বসে থাকতে হবে, এ তো বড় অদ্ভুত কথা! অতীন হেসে বললো, যাচ্ছি আমার এক বন্ধুর বাড়িতে।

—কখন ফিরবি? শোন, আমি আজ খিচুড়ি রাঁধবো। তুই তাড়াতাড়ি ফিরবি কিন্তু, সবাই বসে খাবো একসঙ্গে। শোন বাবলু, তুই কয়েকটা ডিম এনে দিতে পারবি? মামা ডিম ভাজা খেতে ভালোবাসেন।

অতীন বললো, আমার যে আজ এক বন্ধুর বাড়িতে খাওয়ার কথা! আমি ডিম এনে দিয়ে যাচ্ছি!

অতীনের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তুতুল বললো, ও, তুই আজ খেতে আসবি না?

সঙ্গে সঙ্গে মত বদল করে অতীন বললো, ঠিক আছে, আমি ফিরে আসবো। একটা দেড়টার মধ্যে। বাবা তো দেড়টার আগে খায় না।

খাওয়ার টেবিলে নয়, বারান্দায় সতরঞ্চি ভাঁজ করে লম্বা আসন পাতা হয়েছে, যেন নেমন্তন্ন বাড়ি। তুতুল জোর করে তার মা, মাসিমা, মুন্নিকে বসিয়েছে, এমনকি অতীনও এসে গেছে। প্রতাপ লেখাপড়ার কাজ করছিলেন, দু'তিনবার ডাকাডাকির পর এসে বললেন, হ্যাঁ, শুনলাম তুতুল আজ সবাইকে খাওয়াচ্ছে। কী ব্যাপার রে, তুতুল? তোর রেজাল্ট বেরিয়ে গেল নাকি?

অনেকক্ষণ রান্নাঘরে কাটিয়েছে বলে তুতুলের মুখখানি লালচে এবং ঘামে চকচকে। চূর্ণ চুল পড়েছে কপালে। সে মুখ তুলে বললো, সে সব কিছু নয়, আজ আমি প্রথম খিচুড়ি রেঁধেছি।

প্রতাপ সকৌতুকে বললেন, ওরে বাবা, প্রথম দিনই আমার ওপর এক্সপেরিমেন্ট করবি? আগে তোর মা মামীদের ওপর পরীক্ষা করলে পারতি।

হাঁটু মুড়ে বসে প্রতাপ অতি গরম খিচুরিটি চামচে করে তুলে একটু মুখে দিলেন। তারপর আরও দু'চামচ। মুখের ভাব বদলে গেল, তিনি বললেন, নারে, খারাপ হয়নি তো, ভালোই তো হয়েছে, ঝাল একটু কম। একটা কাঁচা লঙ্কা এনে দে।

অন্যদের দিকে তাকালেন প্রতাপ। অনেকদিন এরকম এক সঙ্গে খেতে বসা হয়নি। মমতাও খেতে শুরু করেছেন, সুপ্রীতি এখনও হাত দেননি। মমতা বললেন, খারাপ হয়নি, কী বলছো? বেশ ভালো হয়েছে। খিচুড়িতে ঠিক স্বাদটা আনা সহজ নয়।

প্রতাপ বললেন, সত্যি ভালো হয়েছে, দিদি খেয়ে দ্যাখো। তোমার মেয়ের হাতের গুণ আছে।

সুপ্রীতি হেসে বললেন, পাগল মেয়ের যা কাণ্ড। এর মধ্যে পেঁয়াজ রয়েছে, এ খিচুড়ি কি আমি খেতে পারি?

প্রতাপ বললেন, হ্যাঁ, তাই তো পেঁয়াজ দিয়ে ফেলেছে। তুমি খাবে কী করে?

তুতুল বললো, মনুসংহিতায় কায়স্থবাড়ির বিধবাদের পেঁয়াজ খাওয়া নিয়ে কোনো নিষেধ তো নেই। ফল-মূল খেতে বলেছে, পেঁয়াজ তো একটা মূল, আলুরই মতন।

প্রতাপ চোখ গোল গোল করে হেসে উঠে বললেন, ওরে বাবা, একেবারে মনুসংহিতা! তুই পড়েছিস বুঝি?

তুতুল মাথা নেড়ে সপ্রতিভ ভাবে বললো হ্যাঁ, কালই পড়েছি!

প্রতাপ বললেন, তাহলে দিদি খেয়ে নাও! তোমার মেয়ে যখন মনুসংহিতা পড়ে বিধান দিয়েছে।

সুপ্রীতি বললেন, তা হলেই বা। প্রায় দশ বছর হয়ে গেল পেঁয়াজ খাইনি, এখন আমি পেঁয়াজের গন্ধই সইতে পারি না!

প্রতাপ বললেন, এঃ হে, আমরা খাবো, তুমি খাবে না? তুই এ কী করলি রে, তুতুল? তোর মা কী খাবে?

তুতুল বললো, আমি পেঁয়াজ ছাড়া খানিকটা আলাদা করে রেখেছি।

প্রতাপ বললো, বাঃ বাঃ, মেয়ের বুদ্ধি আছে। দিদি, এতক্ষণ ও তোমায় পরীক্ষা করছিল!

সুপ্রীতির খিচুড়ি বদলে দিল তুতুল। মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, খাও, মুখে দিয়ে দ্যাখো আগে।

সুপ্রীতি এক গ্রাস মুখে তুলতেই তুতুল সগর্বে বললো, মামা, এই খিচুড়ি আলো চাল নয়, সেদ্ধ চাল দিয়ে রেঁধেছে।

মমতা আর তুতুল মুখ চাওয়া চাওয়ি করে হাসলো। সেদ্ধ চালের ব্যাপারটা মমতা আগেই শুনেছেন সুপ্রীতির কাছে। মমতাও নিজেও কতবার অনুরোধ করেছেন সুপ্রীতিকে।

আলো চাল সেদ্ধ চালের তফাৎটা প্রতাপ ঠিক বুঝতে পারলেন না। তিনি কোনো মন্তব্য করলেন না। তুতুল তবু মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবলো, একটা নিঃশব্দ বিপ্লব হয়ে গেল। এর পর সে মাকে মাছ-মাংসও খাওয়াবে, তাঁর চিকিৎসার জন্য দরকার। রান্না মাছ মাংস যদি খাওয়ানো না যায়, তা হলে শার্ক লিভার অয়েল, প্রোটিনেক্স অন্তত····।

(ক্রমশ)

ছবি : অনুপ রায়

গর্ভধারিণী

সমরেশ মজুমদার

পাঁচ দিন নয়, ওরা ফিরে এল দিন আটেক বাদে। এল উত্তেজিত হয়ে। দলের বেশীর ভাগের উত্তেজনার কারণ নতুন নতুন জনপদ দর্শন। ফালুট পর্যন্ত ঠিক ছিল, তারপর যত ওরা নেমেছে তত বিস্মিত হয়েছে। সান্দাকফুর বাংলো বাড়ি, কালিয়াপোকরির বসতি দেখার পর সুকিয়াপোকরিতে গিয়ে তো একদম দিশেহারা। ডিমগুলো বিকেভঞ্জনে পৌঁছোনোর আগেই বিক্রী হয়ে গিয়েছিল।

একটা বিরাট দল পাহাড় দেখার জন্যে উঠছিল। তারাই কিনে নিয়েছে। সান্দাকফুতে মুরগীগুলো কিনেছিল কয়েকটা সাদা চামড়ার লোক। বুদ্ধি করে পালদেম চ্যাঙথাপু থেকে ওদের সম্ভাব্য দাম জেনে গিয়েছিল। বিদেশীদের কাছে তাই যেন অত্যন্ত সস্তা মনে হয়েছিল। সুকিয়াপোকরিতে এলাচ বিক্রী করতে অবশ্য ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল। সেই জন্যে তিন দিন দেরী হয়ে গেল। পরে জেনেছে এবারে ওরা জলের দরে এলাচ বিক্রী করেছে। কিন্তু পাইকার ঠিক করে এসেছে ওরা।

সুকিয়াপোকরি পর্যন্ত যেতে হবে না, কালিয়াপোকরি পর্যন্ত নামিয়ে দিলেই চলবে। ওখান থেকেই পাইকার চার চাকার গাড়ি করে নিচে নিয়ে যাবে। গ্রাম ছাড়ার আগে পালদেম ভাল করে টাকা চিনে গিয়েছিল। সে কুড়ি করে করে গুনে যা ঘোষণা করল তার যোগফল চারশো আশি টাকা।

সুদীপ মন্তব্য করল, 'যে যেমন পেরেছে এদের টুপি পরিয়েছে।'

আনন্দ হাত তুলে ওকে কথা বলতে নিষেধ করতেই সুদীপ খেপে গেল। সে বলল, 'দ্যাখ আনন্দ, দিনকে দিন তোর ধরন-ধারণ খোমেনির মত হয়ে যাচ্ছে। আমরা বন্ধু, তুই আমার ধর্মযাজক নস। আমি এতদিন কিছু বলিনি কিন্তু!'

'আমি ধর্মযাজক? আমাকে দেখে তাই মনে হয়?' আনন্দ বিস্মিত হল।

'এমন মুখ করে থাকিস যেন পৃথিবীর সব সমস্যা বুঝে গেছিস। জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হয়ে গিয়েছে। ওয়াইন আর উওম্যান তো দূরের কথা, জাস্ট একটা খিস্তি উচ্চারণ করা মহাপাপ। তুই ছাড়া এখানে যেন কোন প্রাণ জাগতো না! এরা তোকে আর জয়িতাকে অনেক আপন ভাবে কেন তা জানি না। তোর ভাণ এরা না বুঝতে পারলেও আমি বোকা নই।' সুদীপ হঠাৎ উত্তেজিত হল।

'ভান? কি ভান করি আমি?'

'পৃথিবীতে তোর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হল তাপল্যাঙের মানুষকে সুস্থভাবে বাঁচতে সাহায্য করা। আর সেটা ভাবতে গিয়ে তুই অন্য কিছু ভুলে যাস। এমন কি আমাকেও অপমান করিস।'

জয়িতা চুপচাপ শুনছিল, 'আনন্দরটা বুঝলাম, আমি কি ভান করি সুদীপ?'

সুদীপ জয়িতার দিকে তাকাল না, 'তুই শালা ছুপা রুস্তম! এদের মধ্যে এমনভাবে মিশে গেছিস যেন তোর বাপ-মা এখানেই জন্মেছিল। তাছাড়া ওই রোলেন লোকটার সঙ্গে এত ভাব কেন তোর? দেয়ার ইজ এ ধান্দা বিহাইন্ড দ্যাট। সেটা কি বুঝতে পারছি না। তোদের মনে রাখা উচিত আমরা চার জন এখানে লুকিয়ে থাকতে এসেছিলাম। এখানে থেকে যাওয়ার কোন পূর্ব পরিকল্পনা আমাদের ছিল না। গ্রামটাকে দেখার পর আমরা এদের সাহায্য করার কথা ভেবেছিলাম। এই দু'বছরে আমরা অনেক করেছি। এবার ওদের চরে খেতে দে। কিন্তু তোদের ভাবভঙ্গী দেখে মনেই হচ্ছে না কখনও এদের ছেড়ে যাবি। সেইটেই বিভ্রান্তির।'

আনন্দ বলল, 'সুদীপ, এ নিয়ে আলোচনা আমরা পরে করতে পারি। পালদেমের কাছ থেকে পুরো ঘটনাটা এখনও শোনা হয়নি। হ্যাঁ, পালদেম, বল। তোমাদের জিনিসগুলো বিক্রী করতে কি কি অসুবিধে হয়েছে?'

পালদেম এতক্ষণ সুদীপের দিকে তাকিয়েছিল। ওর চটজলদি উচ্চারণের বাঙলা মাথায় ঢুকছিল না তার। তবে সে বুঝতে পারছিল এদের মধ্যে ঝগড়া চলছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি খুব ঠকে গেছি? আসলে এত টাকা নিজেরা কখনও রোজগার করিনি তো, এর পরের বার এ রকম হবে না।'

পালদেমের এক সহযোগী হেসে বলল, 'আমরা যে বেতের দুটো ছোট ঝুড়িতে ডিম নিয়ে গিয়েছিলাম তাও বিক্রী হয়ে গিয়েছে। সবাই জিজ্ঞাসা করছিল ও রকম ঝুড়ি আরও আছে কিনা।'

আনন্দ জয়িতার দিকে খুশী মুখে তাকাল। জয়িতা বলল, 'বাঃ, তাহলে

যে আমরা প্রতি বছর ভাল ঝুড়ি সাপ্লাই দিতে পারি। আহা এই বেতশিল্পটা যদি ভাল চলা থাকত।'

'কথা শুনলে লিভার ড্যাই হয়ে যায়। যেন মোটামুটি জানতিস কলকাতায় থাকাকালে।' সুদীপ মন্তব্য করল। জয়িতার চোয়াল শক্ত হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'রাস্তায় তোমাদের আর কোন অসুবিধের সামনে পড়তে হয়নি পালদেম?'

কথা হচ্ছিল যৌথগৃহে বসে। প্রতিটি মানুষ ঠিকঠাক ফিরে এসেছে বলে গ্রামবাসীরা খুশীমুখে ভিড় করেছিল। পালদেম মাথা নাড়ল। চার পাশে একবার তাকাল। তারপর বলল, 'রাস্তায় বৃষ্টিতে ভিজতে হয়েছে। চট করে কেউ আমাদের থাকতে দেয়নি। নানান প্রশ্ন করেছে। তাপল্যাঙ নামটাই অনেকে শোনেনি। আমরা কেন এতদিন গ্রাম থেকে বের হইনি, গ্রামটা কি রকম, কি কি পাওয়া যায় এই সব কথা জানতে চেয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে বারবার গেলে ওদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক হয়ে যাওয়ার পর ওরাও এখানে আসতে চাইবে। তখনই হবে মুশকিল।'

'ভয় হচ্ছে কেন?'

'স্যাণ্ডাপ্থু কিংবা ওয়ালাংচুঙ্গের মানুষরা আমাদের মতন। কিন্তু নিচের মানুষদের হালচাল কেমন যেন। সবাই যেন সব সময় মতলব নিয়ে ঘোরাফেরা করে। আমাদের মদ আর মেয়েমানুষের আড্ডায় নিয়ে যেতে চাইছিল খুব। ছোকরারা প্রলোভিত হচ্ছিল কিন্তু আমি খুব সামলে রেখেছিলাম।'

পালদেমের কথা শেষ হওয়ামাত্র একটি নারীকণ্ঠ প্রশ্ন করল, 'মেয়েমানুষের আড্ডা? সেটা কি?'

পালদেম বলল, 'সেখানে মেয়েরা মুখে রঙ মেখে পয়সা নিয়ে অচেনা পুরুষের সঙ্গে শোয়।'

সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া ছিটকে উঠল। পয়সা নিয়ে অচেনা পুরুষের সঙ্গে শোওয়া মত জঘন্য ব্যাপার যে মেয়েরা করতে পারে তাদের সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা শুরু হল। কেউ একজন চিৎকার করল, 'সত্যি বলছ তো, তোমরা তাদের কাছে যাওনি?'

'আমাদের কাছে তো পয়সাই ছিল না। আর এই বিক্রীর টাকা তো খরচ করার জন্যে নয়।'

'যা হবার হয়েছে এর পর আর সেখানে যেতে হবে না।' কথাটা যে বলল তাকে চিনতে পারল সুদীপ। পালদেমের বউ। সে হাসল, 'আচ্ছা, আগুনে হাত দিলে পুড়ে ফোস্কা পড়ে তাই বলে কেউ আগুন জ্বালবে না? কি বল তোমরা?'

সঙ্গে সঙ্গে সবাই মাথা নাড়ল, ঠিক ঠিক। এর পরে পালদেম আসল প্রসঙ্গে এল। পথ চলতে চলতে যে গ্রামে ওরা থেমেছে, যে মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে তারা যখনই জেনেছে তারা উত্তরের পাহাড় থেকে এসেছে তখনই জানতে চেয়েছে সেই ডাকাতরা এখনও ওখানে আছে নাকি যাদের পুলিস ধরতে পারলে অনেক টাকা দেবে। যে ডাকাতরা নাকি একটা গ্রামে দু হাতে টাকা বিলিয়ে যাচ্ছে। সেই ডাকাতদের মধ্যে একটা মেয়ে আছে যাকে ভোগ করতে পারলে যে-কোন পুরুষ ভাগ্য মনে করবে। পালদেমরা সমানে জবাব দিয়ে গিয়েছিল, ডাকাতরা এসেছিল কিন্তু অনেকদিন আগে, যখন পুলিস হামলা করেছিল তখনই আরও উত্তরের বরফের পাহাড়ে ওরা পালিয়ে গিয়েছে। অনেকে কথাটা বিশ্বাস করেছে, বেশীর ভাগ সন্দেহের চোখে দেখিয়েছে। কিন্তু ওরা যে হঠাৎ গ্রাম থেকে জিনিসপত্র বিক্রী করতে কেন এল একে সবাই অবাক হয়েছে। ডাকাতরা থাকলে তাদের টাকা দিয়েই দোকানওয়ালাদের কাছ থেকে জিনিসপত্র কিনত। তারা নেই বলেই ওরা বাইরে পা বাড়িয়েছে। কেউ কেউ রসিকতা করেছে, টাকার স্বাদ বড় মারাত্মক। একবার পেয়ে গেলে আর রক্ষে নেই। না হলে যারা কোনকালে পাহাড় ছেড়ে বের হত না তারা জিনিসপত্র বিক্রী করতে আসে! দোকানওয়ালাদের সঙ্গে মনেভঞ্জনে দেখা হয়েছিল। তারা তো দেখেশুনে এবার এই গ্রীষ্মে তাদের দরকার পড়বে না তাপল্যাঙে জেনে খুব রেগে গিয়েছে। ওরাই সমস্ত জিনিসপত্র কিনে নেবে এখানে এসে, কষ্ট করে আসতে হবে না নিচে, এই রকম বলেছিল। কিন্তু তাতে নারাজ হওয়ায় ওরা খুব হতাশ হয়েছে। ফেরার পথে ওয়ালাংচুঙের লোকরা গল্প শুনেছে তাদের কাছে। তারাও ঠিক করেছে জিনিসপত্র নিয়ে নিচে যাবে বিক্রী করতে। সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনাটি সবশেষে বলল পালদেম। শেষ রাত্রে তাদের সবাইকে ধরে রেখেছিল ফুলিয়াপোকরির পুলিস। না, মারধোর করেনি। কিন্তু কোত্থেকে আসছে, কেন আসছে, কে তাদের আসতে বলেছে এইসব প্রশ্ন করেছে। এবং পুলিশ দেখে ভয় পেয়ে ওরা শেষ পর্যন্ত বলেছে ডাকাতরা ওদের যাওয়ার আগে শিখিয়ে দিয়েছে কিভাবে নতুন করে বাঁচতে হয়। এই যৌথগৃহ, যৌথরান্না, যৌথ রোজগার এ সবের হদিশ পেয়েছে ডাকাতদের কাছ থেকেই। ডাকাতদের ওরা কখনই ভয়ঙ্কর মানুষ মনে করেনি। বরং বেশ বন্ধু বলেই মনে হয়েছে। পুলিস ওদের অনেক প্রশ্ন করলেও ওরা কেউ বলেনি এই মুহূর্তে তাপল্যাঙে ডাকাতরা রয়েছে। পুলিস ছেড়ে দেবার আগে বলেছে যদি ওই ডাকাতরা আবার গ্রামে আসে তাহলে যে করেই হোক ধরে ফেলে যেন ওরা। তাহলে ওদেশের সরকার অনেক অনেক টাকা তাদের উপহার দেবে। সমস্ত পাহাড়ে পাহাড়ে এই ঘোষণা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু তাপল্যাঙ অনেক দূরে তাই খবরটা পৌঁছায়নি। পুলিস জিজ্ঞাসা করেছিল ডাকাতদের কাছে ভারী ভারী অস্ত্র আমরা দেখেছি কিনা। আমরা বলেছি সেসব কিছুই দেখিনি।'

সবাই চুপচাপ শুনছিল। পালদেম কথা শেষ করা মাত্র সুদীপ বলল, 'আমাদের নিয়ে তোমরা দেখছি দারুণ ঝামেলায় পড়েছ। এখন তোমরাই ঠিক কর আমরা এই গ্রামে থাকব কিনা। তোমরা চাইলে আমরা এক্ষুনি চলে যেতে পারি।'

পালদেম বলল, 'কিন্তু কোথায় যাবে তোমরা? পাহাড়ের যে কোন গ্রামে গেলেই লোকে তোমাদের চিনে ফেলবে।'

সুদীপ কাঁধ নাচাল, 'তাহলে সোজা ব্যাপারটা করে ফেল। আমাদের ধরিয়ে দিলে তোমরা প্রচুর টাকা পাবে।' হঠাৎ সাওদের উঠে দাঁড়াল, 'দ্রিমিত, তোমার বন্ধুকে বলে দাও আমরা বেইমান নই। বন্ধুর বন্ধুত্ব রাখতে জানি।'

সুদীপ সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিল, 'সাবাস। আমি এই চেয়েছিলাম।' বলে উঠে দাঁড়াল, 'নেপালের পুলিসের কথা জানি না কিন্তু ইণ্ডিয়ান পুলিস এত সরল হবে মনে করার কোন কারণ নেই। এখান থেকে পাথর ফেলে যাদের হটিয়ে দেওয়া হয়েছে তারা হাতের মুঠোয় গ্রামের লোকদের পেয়েও ছেড়ে দেবে এটা আমি ভাবতে পারছি না। ইম্পসিবল।'

'কিন্তু ছেড়ে যে দিয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছিস।' জয়িতা জবাব দিল।

'পাচ্ছি। আর সেইটেই সন্দেহজনক।' সুদীপ বাংলায় কথা বলছিল।

হঠাৎ আনন্দ চিৎকার করে উঠল, 'সুদীপ! সব কিছুর একটা সীমা আছে। নিজেকে ছোট করিস না।'

'কে কাকে ছোট করে! অঙ্কের হিসেবে গোঁজামিল আছে বলে দিলাম।' সুদীপ আর দাঁড়াল না। সাওদের ওর যাওয়া দেখল। তারপর বেশ জোরেই বলল, 'ওকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝেই মনে হয় ও ঠিক তোমাদের মত নয়। এখন ও রেগে গেল কেন?'

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'সবার মন মেজাজ সব সময় এক রকম থাকে না। যাহোক, প্রথম যাত্রায় বেশ ভাল কাজ হয়েছে আমাদের। চারশো আশি টাকা তোমরা রোজগার করেছ, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।'

পালদেম টাকাগুলো আনন্দের দিকে বাড়িয়ে দিল। আনন্দ দ্রুত মাথা নাড়ল, 'না। এই টাকা আমার কাছে থাকবে না। দু জন মানুষ নির্বাচন কর। তারা টাকার হিসাব রাখবে।'

পালদেম বলল, 'গ্রামের মানুষ বেশী হিসাব জানে না।'

আনন্দ লা ছিরিঙকে ডাকল, 'লা ছিরিঙ, তুমি দ্রিমিতের কাছে হিসেব শিখে নাও। এখন টাকাগুলো এমনভাবে রাখবে যাতে তুমি আর পালদেম দায়ী থাকো। মাটির নিচে পুঁতবে না। যাও, তোমরা এবার বিশ্রাম করো।'

সভা ভেঙে যাওয়ার পর জয়িতা বলল, 'তুই তো বেশ এদের সামনে আমাকে দ্রিমিত বলে ডাকতে শুরু করেছিস। আমারও না সবার মুখে দ্রিমিত দ্রিমিত শুনতে শুনতে মনে হচ্ছে কোনকালে কলেজে পড়িনি। তুই আর আলাদা করে জয়িতা বলে ডাকিস না।'

আনন্দ মুখ ঘুরিয়ে জয়িতার মুখ দেখল। ইদানীং ওই মুখে অন্য ধরনের লাবণ্য এসেছে। সেই শহুরে পালিশটা নেই। মুখ ফেটেফুটে একাকার কাণ্ড ঘটেছিল এক সময়। এখন একটা বুনো পাহাড়ি ছাপ পড়ে গেছে সর্বত্র। জয়িতার চুল বড় হয়েছে। কিন্তু বেদম রুক্ষ। এই চুল নিয়ে ও যদি গেলেও কলকাতার রাস্তায় পা বাড়াতো না। চেহারা তাদেরও কম পাল্টে যায়নি।

পোশাক জীর্ণ গালে দাড়ি বেরিয়েছে, আরও রোগা হয়ে গেছে সে। চেহারা খারাপ হয়েছে সুদীপেরও কিন্তু সবচেয়ে পরিবর্তন হয়েছে ওর মেজাজের। কোন কিছুকেই আর ভাল দ্যাখে না সুদীপ।

কথাটা তুলল আনন্দ। জয়িতা বলল, 'দেখতে দেখতে কেমন অচেনা হয়ে যাচ্ছে ও। সেই যে মদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল তার পর থেকেই এই অবস্থা। তুই ভাবতে পারিস, ও মাঝে মাঝে পাহাড়ে ঘোরাফেরা করে কেন?'

প্রশ্নটা শুনে অবাক হয়ে মাথা নাড়ল আনন্দ। জয়িতা বলল, 'সেই ভালুকছানাদের দেখতে। ওর ধারণা ওরা ওকে দেখলেই চিনতে পারবে। পাহাড়ে ছেড়ে দেবার পর ওরা বেঁচে আছে কি-না তারই ঠিক নেই, আর বেঁচে থাকলেও যে এত বছরে মনে রাখার কথা নয় এটাই উধাও হয়ে গেছে ওর মাথা থেকে। আমি বলছি আনন্দ, এজন্যে ওই মেয়েটাই দায়ী।'

'কি রকম?' আনন্দ হাসল, 'তোর ওই মেয়েটাকে প্রথম থেকেই পছন্দ হয় না।'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ হয় না। মেয়েটা এই গ্রামেই থাকে অথচ গ্রামের মানুষের কোন কাজে হাত মেলায় না। আজ সমস্ত গ্রাম একজোট হয়ে কাজ করছে, তুই কখনও দেখেছিস ওকে এগিয়ে আসতে! গ্রামের মানুষও ওকে পছন্দ করে না। শুধু সুদীপের সঙ্গে লেপ্টে থাকা ছাড়া অন্য কোন ধান্দা নেই ওর। শী ইজ স্পয়েলিং হিম।'

'ইম্পসিব্‌ল! সুদীপকে যতটা জানি তাতে বিশ্বাস করি, কোন মেয়ে ওকে নষ্ট করতে পারে না।'

'তুই ওই আনন্দেই থাক। মেয়েটার কখনই বাচ্চা হবে না। এখানকার সবাই একথা জানে।'

'তুই মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছিস জয়িতা।'

'কল মি দ্রিমিত।'

এবার আনন্দের মুখে কৌতুক ফুটল, 'তুই নামটাকে পছন্দ করছিস?'

'অফ কোর্স! আমি ভুলে যেতে চাই আমার নাম জয়িতা। রামানন্দ রায় সীতা রায় আমাকে পৃথিবীতে এনেছেন। অতীতের একটা জিনিস শুধু মনে রাখতে চাই এবং সেটা হল শিক্ষা। এদের সঙ্গে সারা জীবন এদের মত হয়ে থাকতে চাই আমি। সুদীপ যা করছে তা বাইরে থেকে আসা স্বেচ্ছাসেবকের মত। ত্রাণসামগ্রী ফুরিয়ে গেলেই চলে যাবে যেন। এখন আর আমি ওই ভূমিকায় থাকতে চাই না।' কথা বলতে বলতে জয়িতা আনন্দর সঙ্গে হাঁটছিল। ওরা এতক্ষণে আস্তানার কাছে চলে এসেছে। আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'যে কোন রেফারেন্সে তুই সুদীপকে টানছিস, হোয়াট ইউ থিংক অ্যাবাউট মি?'

জয়িতা বলল, 'তোকে অ্যাসেসমেন্ট করতে পারব না। ইট ইজ ইউ হু গেভ মি ইনসপিরেশন। এখানকার সমস্ত পরিকল্পনাই তোর মাথা থেকে বেরিয়েছে। গ্রামের মানুষ তোকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু আমাকে মনের কথা খুলে বলে।'

কথাটা শুনে আনন্দ অনেকদিন বাদে হো হো করে গলা খুলে হাসল। কিন্তু জয়িতার মনে হল হাসিটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। একটানা অনেকটা উঠে আসায় ওর বুকে হাঁপ ধরল। ক'দিন থেকে এটা প্রায়ই হচ্ছে। মাথা ঘুরছে, এক ধরনের অস্বস্তি বেশ কিছুদিন সেঁটে থাকে শরীরে।

আনন্দ আর কথা বলল না। মেয়েটা দাঁড়িয়েছিল সামনে। ওদের দেখে বলল, 'খাবার হয়ে গিয়েছে। খাবে তো চলে এস।' আনন্দ তাকে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। কনকনে জল মুখে কপালে দিতে জয়িতা যেন আরাম পেল। সে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। শরীরটা গোলাচ্ছে। সকাল থেকে কিছু পেটে না দেওয়ায় এ রকমটা হচ্ছে। লিভারটার কি অবস্থা কে জানে। আজকাল একটা ভয় তার খুব করে। ভাল এবং নিয়মিত খাবারের অভাবে তার কি প্রেসার কমে যাচ্ছে? নাহলে মাথা ঘোরে কেন? সে একবার মুখ ফিরিয়ে দেখল মেয়েটা তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। চোখাচোখি হতে সে ঘরের ভেতর চলে গেল।

দুটো পা সামনে ছড়িয়ে জয়িতা বসল। সামনের বরফচূড়ো থেকে একটা হিম বাতাস নেমে এল তখনই। খুব ভাল লাগল জয়িতার। সে নিজের পোশাক দেখল। এগুলো পাল্টানো দরকার। খুব বেশিদিন টিকবে না। সুদীপের কাছে যে অর্থ অবশিষ্ট আছে তাতে আর হাত দেওয়া হবে না বলে

ঠিক হয়েছে। এখন গ্রামগত উপার্জনে প্রত্যেককে বেঁচে থাকতে হবে। গ্রামের যে-কোন মেয়ে যা পোশাক পরে সে তাই পরবে। সে মুখ তুলে গ্রামটার দিকে তাকাল। এমনভাবে চেহারা পাল্টে যাবে তা কে ভেবেছিল। কলকাতা থেকে পালাবার সময়েও তাদের কল্পনায় ছিল না। পাথরের দেওয়ালে প্রাণশক্তি এতকাল আটকে ছিল। সবে ছিদ্রপথ পেয়েছে বাইরে বের হবার। এবং যে কোন তরল পদার্থের মত সেই ছিদ্র বড় করার চেষ্টায় ব্যস্ত সমস্ত গ্রাম। শুধু দেখতে হবে উৎসাহের আতিশয্য যেন সমস্ত কাজ ভণ্ডুল না করে দেয়। যে কোন সুপ্রাপ্তিই মনে আশংকা আনে। সুখের গন্ধ পাওয়ার মুহূর্তে গ্রামবৃদ্ধরা বলতে শুরু করেছে এসব যাদের জন্যে হল তারা যদি চলে যায় তাহলে কিছুদিন পরে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে গ্রামটা। মাঝখানে এই স্বাদ বদলের স্বাদ নতুন বিপদ ডেকে আনবে। হয়তো ঠিক, কিন্তু জয়িতা ভাবে ব্যাপারটা ফুটবল টিম কোচিং-এর মত হয়ে যাচ্ছে। তারা সূত্রপাত করতে পারে মাত্র, কিন্তু এগিয়ে যেতে হবে সাধারণ মানুষকেই। নেতৃত্ব নিতে হবে তাদেরই। নির্ভরতা এক্ষেত্রে কখনই কাম্য নয়। কিন্তু তাকে তো এই গ্রামেই থেকে যেতে হবে। একটা বাসযোগ্য পৃথিবী চেয়েছিল সে। এখন তো জয়িতা নেই, এখন সে দ্রিমিত। এই গ্রামটিকে ক্রমশ সেই জায়গায় পৌঁছে দেবে গ্রামবাসীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। রোলেনদের গ্রামেও এখন তাপল্যাঙের ছোঁয়াচে ভাব গেছে। সেখানেও যৌথগৃহ, যৌথ খামার তৈরীর চেষ্টা চলছে। কিন্তু এখানে অভাব এবং অসুখ এত প্রবল ছিল যে, বাধা আসেনি তেমন কিন্তু ওখানে সচ্ছল মানুষের সংখ্যা বেশী বলে প্রতিবন্ধকতা আসছে। কিন্তু গত বরফের সময় যে তাপল্যাঙের মানুষ কম কষ্ট পেয়েছে এটা ওরা লক্ষ করেছে। সেইটেই

ওদের যৌথগৃহ নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই সময় আনন্দ তাকে খেতে ডাকল।

সুদীপ যার নাম দিয়েছে খিচুড়ি তার স্বাদ এখন ওদের সয়ে গেছে। কিন্তু এখানে উনুনে থাকতে থাকতেই খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ওরা চার জন খাচ্ছে গোল হয়ে বসে। আনন্দ চটপট কিছু পেটে চালান করে দিয়ে বলল, 'জব্বর খিদে পেয়েছিল।'

সুদীপ ওর দিকে তাকাল। তারপর বাংলায় বলল, 'আমার মনে হচ্ছে এবার আমাদের কলকাতায় ফেরা দরকার। পুলিস সম্পর্কে আমরা হয়তো মিছিমিছি আতঙ্কিত হয়ে আছি। অ্যাদ্দিনে কলকাতায় অনেক খুন হয়েছে, অনেক ডাকাতি, এখন আর আমাদের জন্যে কেউ নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে বসে নেই। লেটস গো ব্যাক।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ একথা তোর মনে হচ্ছে কেন?'

'কলকাতা থেকে বেরুবার আগে তুই বলেছিলি কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে আবার আমরা ফিরে আসব। কথাটা নিশ্চয়ই তোর মনে আছে?' সুদীপের গলায় সামান্য ঝাঁঝ।

'আছে। কিন্তু বল, কি উদ্দেশ্যে আমরা কলকাতায় যাব। আরও কয়েকটা মন্ত্রী অথবা চোর খুন করে কিছু লাভ হবে না। ব্যক্তিহত্যা কখনই সাধারণ মানুষের উৎসাহ আনে না। তাছাড়া মধ্যবিত্ত বঙ্গবাসী কখনই আঙুল তুলবে না। ওরা রাজনীতি করে কিছু পাওয়ার লোভে এবং ব্যতিক্রম ছাড়া বেশীর ভাগই গর্তে মুখ গুঁজে থাকা পছন্দ করে। ভারতবর্ষে যদি কখনও বিপ্লব হয় তাহলে গ্রামে আগুন জ্বলবে প্রথমে। সেই আগুনে রোস্ট হয়ে শহরের মানুষের যদি চৈতন্য জাগে। আমরা ওখানে গিয়ে কিছুই করতে পারব না। বরং এখানে তিল তিল করে এই নবজাগরণ চলছে, আমাদের উচিত এর সঙ্গী হওয়া।' আনন্দ খুব সিরিয়াস গলায় বলল।

'এই জন্যেই এখানে থাকা উচিত নয়, এদের উচিত আমাদের হাত ধরে নয়, নিজেদের পায়ে নিজেরা যাতে দাঁড়াতে পারে তার চেষ্টা করা। নাহলে এরা কখনই স্বাবলম্বী হবে না। তাছাড়া, তোদের কথা আমি জানি না, বাট আই অ্যাম রিয়েলি টায়ার্ড।' সুদীপ একবার তার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসা মেয়েটির দিকে তাকাল। যেন ক্লান্তিটা উভয় অর্থে তা বুঝিয়ে দিল। আনন্দ প্রথমে কিছু বলল না। তারপর সবাই চুপচাপ দেখে বলল, 'নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা তোর আছে। তবে কিছু করার আগে তোর উচিত ভেবে দ্যাখা।'

সুদীপ কাঁধ নাচাল। জয়িতা দুটো দলা পেটে দেবার পর আর খেতে পারছিল না। সে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। কিন্তু ক্রমশ তার শরীরের অস্বস্তিটা বেড়ে যাচ্ছিল। শরীর গোলাচ্ছে, মোটেই খেতে ইচ্ছে করছে না। যে বিষয় নিয়ে সুদীপ প্রশ্ন তুলেছে সেটা তারও ভাবনায় এসেছিল কিন্তু যেভাবে সুদীপ সমাধান চাইছে তা মানতে সে নারাজ। কিন্তু এখন তার তর্ক করতে মোটেই ইচ্ছে করছে না। খাবার ছেড়ে দিয়ে সে উঠে পড়তেই সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল?' জয়িতা কোন জবাব না দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। ঠাণ্ডা বাতাস মুখে লাগতে সামান্য স্বস্তি হল কিন্তু পৃথিবীটা টলছে তার। হাত ধুয়ে মুখে জল দিতে দিতেই মনে হল গলার কাছে অস্বস্তি। সে বসে পড়তেই খাবার বেরিয়ে এল হুড় হুড় করে। শব্দ করে কয়েকবার বমি হল তার। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে সে হাঁপাচ্ছিল। মুখ হাঁ এবং চোখ বন্ধ। সে ওই অবস্থায় চোখের কোলে জলের অস্তিত্ব টের পেল। প্রচণ্ড ক্লান্ত লাগছে, একটু শুয়ে পড়লে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে বলে মনে হল তার। সে চোখ খুলতেই মেয়েটাকে দেখতে পেল। আস্তানার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মেয়েটা অবাক চোখে এদিকে চেয়ে আছে। ক্রমশ তার মুখে একটা আশ্চর্য আলো ফুটে উঠল। এক ঝটকায় সে ভেতরে চলে গেল। ও রকম কেন ও করল জয়িতা ঠাওর করতে পারল না। সে অবসন্ন শরীরটা টেনে তুলল তারপর জল ঢালতে লাগল বমি পরিষ্কার করতে।

মেয়েটার ছুটে আসার ভঙ্গী সুদীপকে অবাক করল। আনন্দ দেখল নিজের খাবারের সামনে বসে মেয়েটা হাসিমুখে খাবার পুরছে আর মাথা দুলিয়ে মজার ভঙ্গী করছে। সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'আই, তুমি অমন করছ কেন? কি হয়েছে?'

মেয়েটা সেইভাবেই জবাব দিল, 'ভাল খবর, খুব ভাল খবর!'

'ভাল খবর? বাইরে আবার কি ভাল খবর হল?' সুদীপের বিরক্তি বাড়ছিল। মেয়েটি আচমকা তার এঁটো মুখ সুদীপের কানের কাছে নিয়ে ফিসফিসিয়ে কিছু বলে খিল খিল করে হেসে উঠল। কি বলল সে আনন্দ ঠাওর করতে না পারলেও লক্ষ করল সুদীপ অবাক হয়ে গেছে। চকিতে সুদীপ আনন্দর দিকে তাকাল। তারপর সেই অবস্থায় উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজা খুলে সুদীপ দেখল জয়িতা তখনও মাথা নিচু করে জল ঢালছে। এর মধ্যেই ওর চেহারা অত্যন্ত বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঠোঁট কামড়াল। তারপর নিজের মনে উচ্চারণ করল, 'না। ইটস ইম্পসিবল। আমি বিশ্বাস করি না।'

সেই সময় দূরে চিৎকার শোনা গেল। একটা লোক ছুটতে ছুটতে ওপরের পাহাড় থেকে নেমে আসছে। তার কথা শুনতে গ্রামের লোকজন বেরিয়ে এল। লোকটি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে কিছু বলছিল। সুদীপ অবাক হয়ে এবার সেদিকে তাকাল। পুলিস নয়তো! এবার লোকগুলো আস্তানার দিকে ছুটে আসছে। লাছিরিঙ এবং পালদেম ওদের সঙ্গে রয়েছে। লাছিরিঙ সুদীপকে দেখতে পেয়ে বলল, 'বহুৎ মারপিট চলছে, তিন চার জন লোক ঠিক মরে যাবে।'

'কোথায়?' সুদীপের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। যাক, পুলিস নয়।

'পাশের গ্রামে।'

এই উত্তেজনা সম্ভবত জয়িতাকে আচমকা সুস্থ করে দিল। সে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে লাছিরিঙ?'

লাছিরিঙ বোঝাল পাশের গ্রামে কদিন থেকেই ঝামেলা চলছিল। আজ দস্তুরমত মারামারি শুরু হয়েছে। এর মধ্যে তিন চারজনের লাস পড়ে গেছে। ওই ছেলেটি গরু চরাতে পাশের গ্রামের কাছে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে ছুটে এসেছে। জয়িতা জিজ্ঞাসা করল, 'লড়াইটা কাদের সঙ্গে হচ্ছে?' এবার পালদেম জানাল, 'নিজেদের মধ্যে।'

এই সময় আনন্দ বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। খবরটা শোনামাত্র সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। এমন কি কারণ ঘটতে পারে যে একটা গ্রামের মানুষ নিজেদের মধ্যে মারামারি করবে! বরং গ্রামে গ্রামে রেষারেষি থাকায় এরা জোট বেঁধে থাকাটাই পছন্দ করে। সুদীপ বলল, 'ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই। তাপল্যাঙে কিছু হলে না হয় আমরা ভাবতাম।'

হঠাৎ জয়িতা ফোঁস করে উঠল, 'কেন, তাপল্যাঙের ভাল-মন্দের ইজারা নিয়েছিস নাকি তুই?'

সুদীপ হতভম্ব হল। জয়িতার সেই ক্লান্ত অবসন্ন ভঙ্গীটা নেই। মেয়েটির কাছে যে ইঙ্গিত সে পেয়েছিল তার কোন হদিশ পাচ্ছে না এখন। বরং জয়িতা যেন তাকে এদের সবার সামনে হেয় প্রতিপন্ন করতে মরীয়া হয়ে উঠেছে। কেন? সে কোনরকমে বলতে পারল, 'কি ভ্যানতারা করছিস।'

জয়িতা ওর কথায় কান দিল না। আনন্দর সামনে এগিয়ে এসে বলল, 'রোলেনদের গ্রামে নিশ্চয়ই কোন গোলমাল হয়েছে। ওরা আমাদের সাহায্য করেছিল এক সময় এটা ভুলে যাস না।'

সিদ্ধান্ত আগেই নিয়ে ফেলেছিস আনন্দ! সে ভেতরে ঢুকে রিভলবারটা তুলতে গিয়ে মাথা নাড়ল। এর কর্মক্ষমতা এখন কতটা সন্দেহ আছে। কিন্তু তবু সঙ্গে থাকলে ভরসা হয়।

রোলেনদের গ্রামের ধার বরাবর পৌঁছে দৃশ্যটা দেখতে পেল ওরা। তাপল্যাঙের অন্তত জনাবিশেক যুবক এসেছে ওদের সঙ্গে। পাহাড়ের একটা ঢালে দাঁড়িয়ে ওরা সমস্ত গ্রামটাকে দেখতে পাচ্ছিল। কয়েকটা বাড়িতে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। চারদিকে এখনও ছোটাছুটি চলছে। যে যৌথগৃহ রোলেনরা তাপল্যাঙের অনুসরণে বানিয়েছিল সেটি এখন মুখ থুবড়ে রয়েছে। এখনও টানা কাঁদছে কেউ কেউ। থমথমে হয়ে আছে পুরো গ্রামটা। এই মুহূর্তে অবশ্য কোনও মারামারি চোখে পড়ল না। আনন্দ অনেকটা নিজের মনেই বলল, 'ব্যাপারটা কি।'

সুদীপ বলল, 'যাই হোক না কেন, এটা ওদের সমস্যা আমি আবার বলছি।'

আনন্দ সুদীপের দিকে তাকাল। তার পর নিচু গলায় বলল, 'তুই এ রকম পাল্টে গেলি কি করে?'

'পাল্টে গেছি আমি?' সুদীপ হাসল, 'হয়তো। পরোপকার করার ঠেলায়।'

আনন্দ আর কথা বাড়াল না। আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ওরা কয়েকটি যুবককে দেখল, দূরে দাঁড়িয়ে আগুন দেখছে বেশ নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে। এছাড়া তাদের চোখের সামনে যে দৃশ্য সেখানে কোন মানুষের চলাফেরা নেই। জয়িতা বলল, 'আমাদের যাওয়া উচিত।'

আনন্দ বলল, 'তোরা এখানে অপেক্ষা কর। আমি যাচ্ছি। কিছু হলে আমি আত্মরক্ষা করতে পারব।'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'আমিও যাচ্ছি। ওরা আমাকে কিছু বলবে না। রোলেনকে খুঁজে বের করা দরকার।'

তাপল্যাঙের যুবকদের সঙ্গে সুদীপ ওপরেই রয়ে গেল। আনন্দ আর জয়িতা সাবধানে নিচে নামতে লাগল। নিজের শরীরের অস্বস্তিটাকে এখনও টের পাচ্ছিল জয়িতা। কিন্তু বাইরের উত্তেজনা সেটাকে অনেক দমিয়ে দিয়েছে। ওরা নিচে এসে দাঁড়াতেই যুবকরা ওদের দেখতে পেল। প্রথমে ভয় তারপর সন্দেহ ওদের চোখে ফুটে উঠল। নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করে দু-জন ছুটে চলে গেল আড়ালে। জয়িতা হাত তুলে চিৎকার করল, 'কি হয়েছে তোমাদের গ্রামে?'

খানিকটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদুটো কোন জবাব দিল না। জয়িতা আবার চিৎকার করল, 'আমরা তোমাদের বন্ধু। তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি।'

এবার দু-জন নিচু গলায় কথা বলল। তারপর ওরা এগিয়ে এল থমকে দাঁড়ানো আনন্দের সামনে। প্রথম লোকটি বলল, 'এখানে আজ কেউ চেঁচিয়ে কথা বলছে না। তোমরাও বলো না।'

এই রকম কথা শুনবে কল্পনা করেনি ওরা। আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

লোকটি বলল, 'এই গ্রামের কয়েকটা পরিবার চায়নি যৌথগৃহ হোক, তাপল্যাঙের মানুষদের মত আমরা একসঙ্গে চাষ করি, বাইরে জিনিসপত্র বিক্রী করে টাকা নিয়ে আসি। ওরা বাধা দিচ্ছিল খুব। আজ সকালে ওরা আমাদের একজনকে লুকিয়ে খুন করে। সেটা জানার পরে সমস্ত গ্রামের লোক ওদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেয়, ওদের তিন জনকে খুন করে বদলা নেওয়া হয়।' লোকটা নিশ্বাস ফেলল, 'এখন আর আমাদের সামনে কোন বাধা নেই।'

এই সময় দু-জন লোক ফিরে এল আরও কয়েকজনকে নিয়ে। তাদের মধ্যে একজনকে চিনতে পারল জয়িতা। রোলেনদের সঙ্গে এ তাপল্যাঙে ডাকাতি করতে গিয়েছিল। সে জয়িতাকে বলল, 'এই প্রথম আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করলাম। তোমরা কি তাই দেখতে এসেছ?'

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'না। আমরা জানতাম না কি হয়েছে এখানে। তাই ছুটে এসেছিলাম।'

লোকটা বলল, 'ও! আমাদের আর কোন ঝামেলা নেই।' অত্যন্ত নির্লিপ্ত দেখাচ্ছিল লোকটাকে। আনন্দ বুঝল ওরা চাইছে না কেউ নাক গলাক। গ্রাম থেকে, সরাসরি না বললেও, চলে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। ওর ভাল লাগল। প্রতিবন্ধক দূর করার জন্য এই রক্তপাত ওদের অনেক কাজে লাগবে। বলতে গেলে একত্রিত হবার প্রথম পদক্ষেপ এরা নিজেরাই অর্জন করল। ঠিকঠাক যদি এগিয়ে যেতে পারে তাহলে তাপল্যাঙের মানুষদের চেয়ে এরা অনেক বেশী স্বাবলম্বী এবং সংগঠিত হবে। আনন্দর মনে হল, তাপল্যাঙের যদি কিছু মানুষ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াত তাহলে ওদের অগ্নিপরীক্ষাটা সম্পন্ন হত। সে জয়িতাকে বলল, 'চল ফিরে যাই।' তারপর যুবকদের বলল, 'যদি কখনও কোন সাহায্যের দরকার হয় আমাদের বলো।'

যুবকরা ঘাড় নাড়ল। আনন্দ ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে দেখল জয়িতা ফিরছে না। সে শুনল জয়িতা জিজ্ঞাসা করছে, 'রোলেন কোথায়?'

প্রশ্নটা শোনামাত্র লোকগুলো মাথা নিচু করল। জয়িতার গলার স্বর এক পর্দা উঠল, 'কি হল, কথা বলছ না কেন?'

লোকটি, যে এতক্ষণ কথা বলছিল গম্ভীর গলায়, দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা শোনামাত্র হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। কান্নাটা সংক্রামিত হল তার সঙ্গীদের মধ্যে। ততক্ষণে গ্রামের আরও মানুষ ভিড় করেছে পেছনে। সম্মিলিত চাপা ক্রন্দনে ছেয়ে গেল গোটা চত্বর। জয়িতা পাথরের মত দাঁড়িয়েছিল। এমন অসাড় চেহারায় জয়িতাকে কখনও দ্যাখেনি আনন্দ। সে চাপা গলায় ডাকল, 'জয়িতা'!

জয়িতা মাথা নাড়ল, 'আমি দ্রিমিত,দ্রিমিত।'

আনন্দ মাথা নাড়ল। তারপর গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করল, 'রোলেন কোথায়?'

লোকগুলো দুটো ভাগ হয়ে গেল। একজন সেই রাস্তা দিয়ে ওদের নিয়ে এল গ্রামের মাঝখানে। পথ চলতে ওরা পোড়া গন্ধ পেয়েছে বারংবার। ছাই হয়ে যাওয়া বাড়ি নজরে এসেছে।

রোলেনকে চিনতে পারল আনন্দ। সুগঠিত শরীর নিয়ে সে শুয়ে আছে। চোখ বন্ধ। মাথার পাশ দিয়ে রক্ত ঝরে শুকিয়ে কালো হয়ে আছে। ওকে ঘিরে কয়েকজন গ্রামবৃদ্ধা হাঁটু গেড়ে বসে সমানে কেঁদে যাচ্ছেন। আনন্দ মাথা নিচু করে দাঁড়াল। যে লোকটি নিয়ে এসেছিল পথ দেখিয়ে সে বলল, 'কাল রাত্রে ওরা রোলেনকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল চুপিচুপি। আজ সকালে ওকে এই অবস্থায় পাই। রোলেন ওদের বারংবার অনুরোধ করেছে আমাদের সঙ্গে আসতে। সেই রাগে ওরা ওকে মেরেছে। ওর মৃতদেহ দেখে গ্রামের মানুষ খেপে গিয়ে—।' লোকটা আর কথা শেষ করল না।

যে কোন কাজ শুরু হয় কারো উদ্যম থেকেই। সেই উদ্যম যদি সে অন্যের মনে সঞ্চারিত করতে পারে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় তাহলেই সে সফল। আনন্দ হাঁটু গেড়ে বসে চোখ বন্ধ করল। যে কাজ তারা ভারতবর্ষের বিরাট প্রেক্ষাপটে করার কথা ভেবেছিল, যে কাজ তারা তাপল্যাঙের ছোট্ট পরিধিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে সেই ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে রোলেন নিজেকে শহীদ করল। চকিতেই তার মনে পড়ল রোলেন তো কখনই তার এবং সুদীপের সঙ্গে আলোচনা করতে আসেনি। তাকে তাপল্যাঙ গ্রামেও দেখা যেত না। তাহলে এই প্রেরণা সে কোত্থেকে পেল? আনন্দ উঠে দাঁড়িয়ে জয়িতার দিকে তাকাল। জয়িতা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রোলেনের মৃতমুখের দিকে। আনন্দ শিহরিত হল। জয়িতা যে কখন রমণী হয়ে গিয়েছে তা সে আগে লক্ষ করেনি। ওর ঠোঁট এখন থর থর করে কাঁপছে। এবং এই প্রথম আনন্দ জয়িতার দু চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়া দেখল।

আশ্চর্য গলায় জয়িতা বলল, 'আনন্দ, তুই ফিরে যা। আমি ওর শেষ কাজ পর্যন্ত থাকব।'

আনন্দ বলল, 'আমি ফিরে যাচ্ছি সবাইকে ডেকে আনতে। তাপল্যাঙ আর এই গ্রামের মানুষ এক হয়ে শেষ কাজ শুরু করবে।' [ক্রমশ]

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

কূটঘাত

মিহির মুখোপাধ্যায়

বিকেল থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। এখন রাত প্রায় দশটা। বৃষ্টির দাপট কমলেও টিপ টিপ সমানে চলছে। আকাশে থই থই মেঘ।

হাইওয়ের পাশে "মজুমদার মেডিক্যাল স্টোর্স"। জায়গাটা নির্জন। বেশ কিছু দূরে একটা সিনেমা হল। সেদিকে গায়ে গায়ে কিছু দোকান ঘরের আলো থাকলেও এদিকটা ফাঁকা অন্ধকার। হাইওয়ের দুপাশে ছোট ছোট প্লটে জমি বিক্রি হয়েছে। এদিক-ওদিক ছড়ানো-ছিটানো দুচারখানা বাড়ি উঠেছে। এই বৃষ্টির রাতে সেগুলি সব অন্ধকার। উল্টো দিকে টিনের চালার চায়ের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে রাত ন'টার পরেই।

মজুমদার মেডিক্যাল-এর মালিক সুখময় মজুমদার সারাদিনের হিসেব-পত্তর দেখছিল। সামনে ভাঁজ করা কাঠের দরজার পাল্লা খানিকটা খোলা। তারপর লোহার 'টানা-দরজা' (কোলাপসিবল-গেট) টেনে বন্ধ করে রাখা হয়েছে বটে, কিন্তু এখনো তালাবন্ধ হয়নি। হিসেব লেখার কাজ শেষ করে সুখময় নিজের হাতে তালাবন্ধ করবে। কাজের ছেলেটির নাম পিনু। সে বাড়ির ভেতর খেতে গেছে। রাতে দোকানে শোয়। দোকানের পেছনেই সুখময়ের সংসার। একটি ছেলে আর বউ। দুটি শোবারঘর, রান্নাঘর নিয়ে ছোট্ট একতলা বাড়ি। আজ বারো বছর ধরে এই দোকানটি চলছে। প্রথমে কিছুদিন বারাসতে বাড়িভাড়া করেছিল সুখময়।

বারাসতের ডাক্তার জীবনকৃষ্ণ হালদার সুখময়ের বাবা প্রভাত মজুমদারের ছাত্রজীবনের বন্ধু। দুজনে একসঙ্গে সে আমলের 'কারমাইকেল' মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়েছেন, পাশ করেছেন। তারপর প্রভাত মজুমদার গেলেন শিলিগুড়ির কাছে এক চা-বাগানে চাকরি নিয়ে। আর জীবনকৃষ্ণ হালদার বারাসতের পৈতৃক বাড়িতে এসে প্রাইভেট প্রাকটিশ শুরু করলেন।

বারো বছর আগে যেদিন প্রভাতের চিঠি নিয়ে সুখময় এসে দেখা করল, সেদিন বেশ অবাক হয়েছিলেন জীবনকৃষ্ণ। উত্তরবঙ্গের মেডিকেল কলেজের ছাত্র, বাইশ-তেইশ বছরের যুবক, পড়াশোনা ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। উগ্রপন্থীদের সঙ্গে গোপন সম্পর্কের সন্দেহে পুলিসের নজর পড়েছিল।

প্রভাত মজুমদারের প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য সোজাসুজি তার ছেলেকে গ্রেফতার করা হয়নি,

তবে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, বাড়িতে তল্লাসি চলেছে।

পনেরো-ষোল বছর আগে, উত্তরবঙ্গ তখন উগ্রপন্থীদের দাপটে অগ্নিগর্ভ। অনেক যুবক ঘর-ছাড়া, অনেক ছাত্র পড়াশোনার পাট চুকিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে। অনেকে ধরাপড়ে জেলে কিংবা থানা-হাজতে। এই অবস্থায় ছেলের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করে চিঠি দিয়েছিলেন প্রভাত মজুমদার। জীবন হালদারও বিনা দ্বিধায় বন্ধুপুত্রকে আশ্রয় দিলেন। ওষুধের ব্যবসার পরামর্শ দিয়েছেন। সস্তায় জমি যোগাড় করে দিয়ে বাড়ি তুলে গুছিয়ে বসতে সাহায্য করেছেন। দু বছর পরে বউ নিয়ে এসেছিল সুখময়। তারপর এই দশ বছরে শান্ত ভদ্র, অমায়িক, বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী ব্যবসায়ী সুখময় মজুমদার এখন একজন পরিপূর্ণ গৃহস্থ। সফল ব্যবসায়ীর জীবনে রাজনীতির কোন ভূমিকা নেই। রাজনীতির সঙ্গে এখন আর কোন সম্পর্ক নেই সুখময়ের।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল। কখনো জোরে, কখনো আস্তে। মধ্যে মধ্যে দমকা হাওয়া। সামনের রাস্তায় গাড়ির শব্দ হল। গাড়িটা থামল। তারপর বারাসাতের দিকে চলে গেল। সেদিকে কান দিল না সুখময়। সামনের যশোর রোডে হরদম গাড়ি চলছে। বাস, ট্রাক, ট্যাক্সি, প্রাইভেট, স্কুটার, মোপেড, মোটর-বাইক, কি নয়? সুতরাং সেদিকে খেয়াল করেনি সুখময়। আধমিনিট বাদে দরজায় খটখট শুনে মুখ তুলে তাকাল। লোহার দরজার বাইরে একটি উঠতি বয়সের যুবক।

পাতলা চেহারা, মুখে দাড়ি, জিজ্ঞেস করল, "পিনু আছে?"

"পিনু খেতে গেছে, আসবে এখুনি, কি দরকার?"

"পিনুর সঙ্গে দরকার ছিল।"

"ভেতরে এসে বসতে পারো।"

"না, আমি ঘুরে আসছি।" সরে গেল ছেলেটি।

মুখ চেনা মনে হলেও নাম জানে না সুখময়। আগে দু একবার হয়তো দেখেছে। ঠিক মনে করতে পারল না। আজকাল এই বয়সের ছেলেদের আলাদা করে সবসময় চিনে রাখা মুশকিল। সব একরকম মনে হয়। লম্বা চুল, মোটা জুলপি কিংবা লম্বা দাড়ি। দাড়ির ছাঁটকাটে কিছু রকমফের থাকলেও প্যান্ট, বুশশার্ট কিংবা গেঞ্জি, চপ্পলের রঙচঙ সব একরকম।

বরযাত্রী কিংবা শ্মশানযাত্রী—সব একরকম পোশাক, একরকম হাব-ভাব। একরকম হাঁকডাক, হইচই। কয়েক মিনিট বাদে পিনাকী এল।

"তোকে একটি ছেলে খুঁজছিল।"

"এখন, এই সময়! কে?"

"আমি ঠিক চিনি না, দ্যাখ তো বাইরে আছে বোধ হয়।"

সামনে একফালি রোয়াক। ছাদের খানিকটা অংশ এগিয়ে গেছে। সেজন্য বৃষ্টির মধ্যেও ওখানে মাথা বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায়। ছেলেটি বোধ হয় সেখানে সেই অন্ধকারে ওত পেতে ছিল।

পিনাকী দরজার বাইরে মুখ বাড়াতেই ডাকল, "এই যে পিনু, একটা কথা শুনে যা।"

"ও তুই।" সামান্য ইতি-উতি করে বেরিয়ে গেল পিনু।

সেদিকে আর তাকাল না সুখময়। এই সময় চড়বড় করে বড় বড় ফোঁটায় একপশলা বৃষ্টি শুরু হল। টঙ-টঙ করে দেয়াল ঘড়িতে দশটা বাজল। এবং পরক্ষণেই বাতি নিবে গেল। এই এক জ্বালা! যখন-তখন লোড-শেডিং। মুখে বিরক্তিসূচক শব্দ করল সুখময়। অন্ধকারেই নির্দিষ্ট জায়গা থেকে টর্চ বার করে নিল। তারপর দুটি বেশ বড় সাইজের মোমবাতি আর দেশলাই। দুপাশে দুটি মোমবাতি জ্বালিয়ে হিসেবের শেষ পাতায় চোখ নামাল সুখময়। আরো কয়েকমিনিট কাটল। বাইরে সমানে ঝিরঝির বৃষ্টি। ভেতরে মোমবাতির ম্লান আলো। পেছনে মস্ত ছায়া অল্প

অল্প নড়ছে।

আচমকা মুখের উপর টর্চের আলো। মুখ তুলল সুখময়। চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। হাত তুলে চোখ আড়াল করে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, "কে? কি চাই?"

"আমরা এসেছি, আপনাকে চাই।" পর মুহূর্তে টানা-দরজা' ঘস-ঘস করে দুদিকে আরো সরে গেল। পাশাপাশি দুটি যুবক ঢুকল।

টর্চের আলো নিবে যেতে লক্ষ করতে পারল সুখময়। একরকম পোশাক দুজনের। ঘন রঙের বুশশার্ট, কোমরের নিচে কালো প্যান্ট অন্ধকারে মিশে রয়েছে। দুজনেরই মুখে একরাশ গোঁফ-দাড়ি, ঝাঁকড়া চুল। একজন লম্বা ফর্সা, উঁচু নাক, জ্বলজ্বলে চোখ। মাথায় রুমাল বাঁধা।

আরেকজন মাঝারি হাইট, কিঞ্চিৎ স্থূল। শ্যামলা রঙ, মাথায় ব্যাটসম্যানের মত কপাল-ঢাকা কালো টুপি, চাপা নাক, চোখ দুটি অঙ্গার। এবং দুজনের হাতেই দুটি উদ্যত পিস্তল। দুপাশে সরে গিয়ে 'পজিশন' নিয়েছে। যন্ত্র দুটি খুব পরিচিত সুখময়ের। এককালে এসব নাড়াচাড়া করেছে সে। চোরাই চালানে আসা হাল্কা ছোট চীনে পিস্তল। হাতের মুঠোর মধ্যে ম্যাগাজিনে চারটি করে গুলি ধরে। এই মুহূর্তে সামান্য নড়াচড়া করলেই দুপাশ থেকে মোট আটটি গুলি এসে সুখময়কে ঝাঝরা করে দেবে। কাউন্টারের পেছনে টুলে বসেছিল সুখময়। সামনে মোমবাতি, হিসেবের কাগজপত্তর। হাতে 'ডট-পেন'।

নিজের অজান্তেই হাত দুটি মাথার উপরে উঠে গেল।

সোজাসুজি সামনে খোলা দরজা। সুতরাং রাস্তা থেকে যেকোন লোক এরকম অবস্থায় উর্ধ্ববাহু সুখময়কে দেখলেও দেখতে পারে, কিন্তু যুবক দুটিকে চোখে পড়বে না। সুখময়ের শরীরের উর্ধ্বাংশ পিস্তলের লক্ষ্য সীমার মধ্যে রয়েছে। বুকের নিচের অংশ কাউন্টারের আড়ালে।

আচমকা কাউন্টারের আড়ালে মেজেতে বসে পড়ে চটপট হামাগুড়ি দিয়ে পেছনের দরজার ওপাশে চলে যাবার কথা মনে এল এক পলকের জন্য। কিন্তু এই বয়সে সেই সাহস, সেই ক্ষিপ্রতার কিছুমাত্র আর অবশিষ্ট নেই সুখময়ের মধ্যে। দশ-বারো বছর আগে হলে হয়তো সম্ভব হত। এখন যদি পিনাকী ফিরে আসে আর ওদের মনোযোগ বিভ্রান্ত হয়, তা হলে—। কিন্তু এরা কারা? কি চায়? মনে হচ্ছে সাধারণ ডাকাত নয়। মফস্বল এলাকার ছোট একটা ওষুধের দোকান থেকে কটা টাকাইবা এরা পেতে পারে? বড় কোন মহাজনের গদি, ব্যাঙ্ক, কিংবা সোনা-রুপোর দোকান হলেও না হয় কথা ছিল।

তবে কি এরা তার পুরনো জীবনের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছে ?

যে জীবন ছেড়ে বারো বছর আগে চলে এসেছে সুখময়। যে অগ্নিময় দিনরাত্রির উত্তাপ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে এসে নিশ্চিন্ত আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিল। সেই সব দিনরাত্রির দুঃসাহসী সঙ্গীরা এতদিন পরে কি খুঁজে খুঁজে বারো বছরের ব্যবধান পেরিয়ে এসে হাজির হয়েছে ? এখন তারা কৈফিয়ত চাইবে ? জবাবদিহি করতে হবে ? কি জবাব দেবে সুখময় ? বাড়ির ভেতর মালা এখন কি করছে ?

পিনুকে খেতে দিয়ে নিশ্চয় টিভি দেখছিল। লোড-শেডিং-এর জন্য টিভি বন্ধ। এখন বোধ হয় লণ্ঠন জ্বেলে টুকি-টাকি কাজ সারছে। মালা কিছু টের পায়নি। এদিকে এখন আসারও কথা নয়। বিশেষ কোন কাজ না থাকলে দোকান ঘরে বড় একটা আসে না। সুখময়ও পছন্দ করে না। এখন এদিকে না আসাই ভাল। মালা আর বুবাই। ওরা কোন বিপদে পড়ুক, ওদের কোন ক্ষতি হোক চায় না সুখময়। এই বিপন্ন মুহূর্তে সে একাই থাকতে চায়। তার পাশে এখন কেউ নেই। মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-বান্ধব—কেউ না।

ভীত, সন্ত্রস্ত সুখময় মৃত্যুর মুখোমুখি একা, নিঃসঙ্গ। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে খাপছাড়া, কিছু চিন্তা-ভাবনা, স্মৃতি হুড়মুড় করে এল, চলে গেল। হাত দুটি মাথার উপর। কিন্তু ভয় পেলে চলবে না। ভয় একবার চেপে ধরলে ভাবনা-চিন্তা সব এলোমেলো হয়ে যাবে। মালা আর বুবাইর জন্যই ধৈর্য আর হারানো সাহসের বর্ম দিয়ে আত্মরক্ষা করতে হবে। সমস্ত শক্তি সংহত করে মরিয়ার মত কোনরকমে কয়েকটি শব্দের প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে পারল, "তোমরা কারা ? কি চাও ? আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না—"

"ঠিক বুঝতে পারছো না, সুখময় ?" দরজার সামনে তৃতীয় ব্যক্তি।

দরজা জুড়ে দীর্ঘ চেহারা। গায়ে 'রেন-কোট'। মাথার ফেল্ট-হ্যাট সামনের দিকে টেনে নামানোর জন্য কপাল পর্যন্ত ঢাকা। একরাশ দাড়ি-গোঁফের মধ্যে তীক্ষ্ণ নাকটি শুধু প্রকট। ভেতরে এসে পেছনের কাঠের পাল্লা টেনে বাইরের দিকটা আড়াল করে আবার বললেন আগন্তুক, "তোমার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করতে এসেছি।" খুব পরিচিত সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর। দ্বিতীয়বার চমকে উঠল সুখময়।

"একি ! সতুদা, আপনি !" আর কিছু বলতে পারল না। গলার কাছে কিছু একটা দলা পাকিয়ে গেছে। গা গুলোচ্ছে। মেরুদণ্ডের ভেতর সিরসিরানি শীত।

"হ্যাঁ, আমি সত্যবান রায়, তোমাদের পরিচিত 'সতুদা', বলতে পারো যমের মুখ থেকে ফিরে এসেছি, ফাঁসির দড়িকে ফাঁকি দিয়েছি।" বলতে বলতে টুপিটা খুলে কাউন্টারের উপর রাখলেন। খানিকটা তাচ্ছিল্যের হাসির সঙ্গে বললেন, "সেকালের সত্যবানের মত যমরাজের অনুগ্রহে নয়, কোন সাবিত্রীর সাহায্যও পাইনি, শুধু নিজেদের কৌশল আর সংগঠনের জোরে যমদূতদের ফাঁকি দিতে পেরেছি, আজ তিন বছর হল জেল থেকে পালিয়েছি, কেন কাগজে দ্যাখেনি ?"

মাথা নাড়ল সুখময়। না, সে দ্যাখেনি। ওখান থেকে পালিয়ে আসার পরে প্রথম চার-পাঁচ বছর উত্তরবঙ্গে উগ্রপন্থী আন্দোলনের খবরগুলি আগ্রহের সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তো। তারপর আগ্রহ ক্রমশ কমে আসে।

ওদিকে উগ্রপন্থী আন্দোলনেও ভাঁটা এসে গেল। সত্তরের দশক আর মুক্তির দশক হতে পারল না। আশির দশকে দেখা গেল নকশালবাড়ির আগুন নিবে গেছে। খবর কাগজেও আর তেমন কিছু বেরোয় না। 'হেডলাইন' হবার মত কোন খবর থাকে না। কদাচিৎ এক কোণে হয়তো কোন গ্রেফতার কিংবা সামান্য সংঘর্ষ অথবা কোন পলাতক বন্দীর সংবাদ ছাপা হয়। এরকম কোন টুকরো খবর হয়তো চোখে পড়েনি। এর মধ্যে তেত্রিশ মাসের নির্বাসনের পরে কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধী আবার বিপুল গৌরবে ফিরে এসেছেন। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট দ্বিতীয় দফায় রাইটার্স দখল করেছে। চীনপন্থী সংগ্রামী উগ্র মার্কসবাদীদের বাম-সরকার কঠোরভাবে মোকাবিলা করেছে। হঠকারী অতি-বাম আন্দোলনকে তারা সাফল্যের সঙ্গে দমিয়ে দিতে পেরেছে। চারু মজুমদারের মৃত্যুর পরে গোষ্ঠী দ্বন্দেব দীর্ণ, উপদলীয় কলহে বিভ্রান্ত যুবারাও সমবেত সংগ্রামী শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল।

আস্তে আস্তে আগুন নিবে যাচ্ছিল। এক একটা বছরের ব্যবধান বেড়েছে, আর অগ্নিকুণ্ড থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে ক্রমশ নিশ্চিন্ত বোধ করেছিল সুখময়।

বউ-ছেলে নিয়ে সুখের সংসার আর ব্যবসায়িক সাফল্যের মধ্যে ডুবেছিল।

কিন্তু ছাই-চাপা আগুন যে টিকে থাকতে পারে, সামান্য ছুতোয় আবার জ্বলে উঠতে পারে, সুখময়ের সুখের সংসার যে পুড়িয়ে দিতে পারে, সেরকম কোন সম্ভাবনার কথা ইদানীং আর মনে হয়নি। ওর মনের কথা যেন টেনে নিয়ে বললেন, সত্যবান, "তুমি কি ভেবেছিলে আমরা শেষ হয়ে গিয়েছি, আর কোন দিন ফিরে আসতে পারবো না ?"

কোন জবাব দিতে পারলো না সুখময়। বোবা চোখে তাকিয়ে রইল।

"আচ্ছা, এবার হাত নামাও, কলম আর কাগজপত্তর সব সরিয়ে রেখে হাত দুটি কাউন্টারের ওপর রাখো, বেশি নড়াচড়া করো না, বুঝতেই পারছো, আমার এই ইয়াং কমরেড দুটি যাকে বলে 'ক্র্যাক-শট' এবং তুমি ওদের ক্লোজ-রেঞ্জের মধ্যে রয়েছ।" বলতে বলতে কাচের 'পেপার-ওয়েট' দুটি সুখময়ের নাগালের বাইরে সরিয়ে রাখলেন সত্যবান। কলের পুতুলের মত নির্দেশ মান্য করল সুখময়। দুটি উদ্যত-ফণা গোখরো যেন লক্ষ্য রাখছে। সামান্যতম সুযোগেই ছোবল দিতে পারে।

"এবার তোমার বিরুদ্ধে পার্টির অভিযোগগুলি আমি বলছি, মন দিয়ে শোন।" একমুহূর্ত থামলেন সত্যবান। মনে মনে বোধ হয় কঠিন বক্তব্যটি গুছিয়ে নিলেন। তারপর ধীর গভীর গলায় শুরু করলেন, "তোমার কাছে পার্টির কিছু টাকা গচ্ছিত ছিল, প্রায় তেরো-চোদ্দ বছর আগের ঘটনা হলেও ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই, 'সাঙলি' চা-বাগানের ক্যাশ-ভ্যান লুঠ, আর বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের শিলিগুড়ি ব্রাঞ্চের ক্যাশ-লুঠ, এই দুটি অপারেশনের প্ল্যান-প্রোগ্রাম যারা করেছিল, তাদের মধ্যে তুমিও ছিলে, তবে আড়ালে ছিলে, সক্রিয় ভূমিকা তোমার ছিল না, আন্ডারগ্রাউন্ডে তোমাকে যেতে হয়নি, দলের স্বার্থেই তোমার মত কয়েকজনকে প্রকাশ্যে রাখা হয়েছিল, এসব কথা তোমাকে নতুন করে কিছু বলার নেই, শুধু অনেক বছর আগের কথা বলে মনে করিয়ে দিলুম।" সামান্য দম নিয়ে আবার বললেন, "ওই দুটি অপারেশন থেকে পাওয়া মোট এক লক্ষ বাইশ হাজার টাকা তোমার কাছে জমা রাখা হয়েছিল এবং তোমার উপর নির্দেশ ছিল, তিন মাস পরে পুলিসের তৎপরতা কিছুটা কমে গেলে, টুরিস্ট-সিজনের সময় ওই টাকাটা তুমি দার্জিলিঙের 'ড্রিম-ল্যান্ড' হোটেলের ম্যানেজার রতন নন্দীর কাছে পৌঁছে দেবে, কেমন ঠিক বলেছি কি না, বলো।" মাথা নেড়ে সায় দিল সুখময়। মুখ নিচু করে কয়েক মুহূর্ত কি ভাবলেন সত্যবান। তারপর মুখ তুলে থেমে থেমে বললেন, "খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, তুমি সেই নির্দেশ পালন করোনি, সুখময়।"

সুখময়ের গলা শুকিয়ে গেছে। কোনরকমে কিছু একটা বলার চেষ্টা করল।

"আহা, থামো।" হাত তুলে থামিয়ে দিলেন সত্যবান, "আমার সব কথা শেষ হবার পরে, তোমার যদি কিছু বলার থাকে বলতে পারবে, সেটুকু সুযোগ তোমাকে দেওয়া হবে।" সামান্য থেমে, "হাঁ যা বলছিলুম, সেই টাকা আর মৌখিক নির্দেশ তোমার কাছে পৌঁছে দেয় মনোতোষ, দুটি ব্রিফ-কেসের মধ্যে কিছু আজেবাজে কাগজের সঙ্গে একশো টাকা, পঞ্চাশ টাকা আর দশ টাকার নোটের বাণ্ডিলগুলি ছিল, কি মনে পড়ছে ?"

দম দেয়া পুতুলের মত আবার মাথা নেড়ে স্বীকার করল সুখময়।

"তোমার কাছে ব্রিফ-কেস দুটি পৌঁছে দেবার দু'দিন পরে মনোতোষ ধরা পড়ে, কোন সূত্রে পুলিস ওকে সন্দেহ করেছিল, আমরা জানতে পারিনি, সেই সময় তোমাকেও থানায় নিয়ে জেরা করা হয়, তোমাদের বাড়ি তল্লাসি হয়, কিন্তু ওরা ব্রিফ-কেস দুটির পাত্তা করতে পারেনি, তোমাকে পুলিস জেরা করেই ছেড়ে দেয়, তোমার বাবার প্রভাবে কাজ হয়েছিল, লোকাল এম-এল-এ তোমার বাবার বন্ধু, আমি তখন আন্ডার গ্রাউন্ডে, খুন আর ডাকাতির দায়ে পুলিস আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল, এসব পুরনো কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, 'ডিটেলে' কিছু বলার নেই, শুধু আমরা যে অনেক খবর জানতুম বা জানতে পেরেছিলুম, সেটুকু তোমাকে বোঝাবার জন্য কিছু কিছু মনে করিয়ে দিচ্ছি।" সামান্য থেমে কাউন্টারের উপর রাখা ডট-পেনটি তুলে নিয়ে লেখার প্যাডে হিজিবিজি দাগ দিতে দিতে কিছু ভেবে নিলেন

সত্যবান।

তারপর চোখ তুলে বললেন, "পুলিসের অমানুষিক অত্যাচারেও মুখ খোলেনি মনোতোষ, অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, ওর লাঙস্ এবং দুটো কিডনিই জখম হয়, তিনমাস পরে জেল হাসপাতালেই মারা যায়, এটাও তোমার জানা খবর, মনোতোষের মৃত্যুর পরে এক আমি ছাড়া সেই টাকার হদিশ জানার মত আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি রইল না।" এমন সময় টঙ করে দেয়াল-ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজল। সেদিকে মুখ তুলে তাকালেন সত্যবান। বাইরে ঝিরঝির বৃষ্টি। মোমবাতির আলোয় দেয়ালে ভূতুড়ে ছায়ার নড়াচড়া। সুখময়ের মাথার ভেতরটা কেমন এলোমেলো। টুকরো টুকরো ঘটনার স্মৃতি। আসছে, সরে যাচ্ছে। তালগোল পাকাচ্ছে। একটার সঙ্গে আর একটা জড়িয়ে যাচ্ছে। থানায় শেষবারের মত দেখা মনোতোষের বিপন্ন মুখটা ভেসে উঠল একবার। আবার গম্ভীর গলা কানে এল, "মনোতোষের গ্রেফতার এবং মৃত্যুর মধ্যে তিন মাসের ব্যবধান, ওই তিনমাসের ভেতর আরো একটি ঘটনা ঘটেছিল।" আবার শুরু করলেন সত্যবান, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষে খান-সেনাদের ফেলে যাওয়া কিছু অস্ত্র আমাদের হাতে এসেছিল, কুমিল্লার কমরেড রিয়াজুল এক হাজার রাউন্ড গুলি সমেত একটি 'এল-এম-জি' আর দুটি আর্মি রিভলবার নিয়ে আসছে বলে আমরা খবর পাই, তোমার কাছে জিনিসগুলি পৌঁছে দেবার নির্দেশ তাকে পাঠানো হয় ; নানা কারণে রিয়াজুলের এদেশে আসতে এক মাস দেরি হয়, এর মধ্যে মনোতোষ ধরা পড়ে যায়, আর তোমাকেও পুলিস সন্দেহ করতে শুরু করে, কিন্তু রিয়াজুলকে সাবধান করে দেবার সুযোগ আর পাওয়া যায়নি, তখন প্ল্যান পাল্টাবারও সময় ছিল না, আগের নির্দেশ মতই সে তোমার কাছে গিয়েছিল, আশ্চর্যের কথা, অস্ত্রগুলি তোমার কাছে পৌঁছে দেবার পরের দিন শেষ রাতে ফিরে যাবার পথে বর্ডারের খুব কাছেই পুলিসের সঙ্গে 'এনকাউন্টারে' রিয়াজুল আর অর্ধেন্দু মারা যায়, ওদের গাইড হিসেবে যে ছেলেটি সঙ্গে ছিল, সে পালিয়ে আসতে পারে, পুলিস তাকে 'ট্রেস' করতে পারেনি, তার নাম আমি বলবো না, ওর মুখেই আমরা রিয়াজুল আর অর্ধেন্দুর শহীদ হবার খবর পাই।" কয়েক মুহূর্ত থম মেরে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন সত্যবান।

সোজাসুজি আর তাকাতে পারল না সুখময়। চোখ নামাতে বাধ্য হল। ভেতরে ভেতরে ঘামছিল সে। বেশ গুমোট। তেরো-চোদ্দ বছর আগের এসব ঘটনাগুলি তার অজানা নয়।

"এই দুটি ঘটনায় পুলিসের সহজ সাফল্যে আমরা অবাক হয়েছিলুম, 'কি করে মনোতোষ আর রিয়াজুলকে ওরা 'স্পট' করতে পারলো, তখন বুঝতে পারিনি, মাস কয়েক পরে আমরা পুলিসের সোর্সটা ধরতে পেরেছিলুম, কিন্তু ততদিনে যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে, মুখ তোলো, আমার দিকে তাকাও সুখময়।"

ভয়ে ভয়ে তাকাল সুখময়। সারা মুখে ঘাম। কাউন্টারের উপর রাখা হাত দুটি কাঁপছিল।

"আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি, তোমার বাবার কম্পাউন্ডার নগেন দত্ত পুলিসের ইনফর্মার।"

"আ-আমি কিছু জা-জানতুম না, বিশ্বাস করুন—"

"চুপ করো।" চাপাগলায় সাপের মত হিস-হিস করে ধমক দিলেন সত্যবান, "আমার কথা এখনো শেষ হয়নি, আগে অভিযোগ শেষ হোক, তারপর তোমার কিছু বলার থাকলে বলবে।" সামান্য থেমে দম নিলেন, আবার শুরু করলেন, "এবার তৃতীয় অভিযোগ শোন, এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত বোঝাপড়া আছে, তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, আমি আন্ডার গ্রাউন্ড যাবার আগে তোমাকে বলেছিলুম সুনন্দাকে রায়গঞ্জে ওর পিসিমার বাড়ি পৌঁছে দিতে, তখন তাড়াহুড়োর মধ্যে কাছাকাছি আর কোন নিরাপদ জায়গার কথা আমার মনে আসেনি, কারণ সব দেশেই গোয়েন্দারা পলাতক বিপ্লবীদের পাত্তা করার জন্য তাদের স্ত্রী বা প্রেমিকাকে 'ফলো' করে, কখনো সোজাসুজি অ্যারেস্ট করে, কখনো জেরা করার ছুতোয় নানাভাবে নাজেহাল করে, ওরা এই নিয়মে এগোতে পারে ভেবেই আমি পালাবার আগে ওকে নিরাপদ কোন জায়গায় সরিয়ে দেবার কথা ভেবেছিলুম, তুমি জানতে সুনন্দার সঙ্গে আমার কি রকম সম্পর্ক ছিল, আমরা পরস্পরকে ভালবাসতুম, আমাদের মধ্যে কথা হয়েছিল, সময়-সুযোগ এলে আমাদের বিয়ে হবে, সেই জন্যই সুনন্দাকে শিলিগুড়ি থেকে সরিয়ে দেবার দরকার হয়েছিল, কি মনে পড়ছে সব ?"

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ সুখময়ের হাত-পা অবশ, বোধবুদ্ধি অসাড়।

"তুমি অত ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছ কেন, সুখময়, কঠিন সত্য ঘটনাগুলি মনে পড়ছে বুঝি, বহু বছর আগের সে সব ঘটনা তুমি বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলে, ভুলে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলে, খুব দুঃখের সঙ্গে সেগুলি মনে করিয়ে দিতে আমি বাধ্য হচ্ছি।"

কানের কাছে মশা বিনবিন করছে, পায়ে কামড়াচ্ছে কি না টের পাচ্ছে না সুখময়। ওর পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি। দরজার দুপাশে লক্ষ্যবিদ যুবা দুটি পাথরের পুতুলের মত স্থির। এই মুহূর্তে ওদের পা বেয়ে কাঁকড়া-বিছে উঠলেও বোধ হয় একচুলও নড়বে না। শুধু পেছনের দেয়ালে ওদের মস্ত ছায়া উদ্যত-ফণা গোখরোর মত অল্প অল্প দুলছে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সত্যবান রায়। সামনে কাউন্টারের উপর ফেল্টের টুপিটা। মধ্যে মধ্যে হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। মোমবাতির বিষণ্ণ হলুদ আলোয় কপাল, নাক চকচক করছিল।

লম্বা চুলে, ঘন দাড়িতে কিছু কিছু রুপোলি রেখা। সুখময়ের চেয়ে তিন-চার বছরের বড় সত্যবানের সেই সমৃদ্ধ স্বাস্থ্য আর নেই। বয়সের ছাপ পড়েছে। পলাতক জীবনের অনিয়ম, থানা-লকআপের অত্যাচার শরীর ভেঙে দিয়েছে। তথাপি কণ্ঠস্বর ম্লান হয়নি। দাঁড়াবার সেই ঋজু ভঙ্গিটি এখনো তেমনি আছে। ওইভাবে দাঁড়িয়ে গমগমে গলায় কি চমৎকার বক্তৃতা দিতেন। ছাত্র-জীবনে সুখময়ের মত অনেক উঠতি বয়সের যুবাই মুগ্ধ হয়ে যেত।

এই সময় কিছুটা অস্থির উত্তেজিত মনে হল। সেই চাপা উত্তেজনার অস্থিরতা হাতের আঙুলগুলর নড়াচড়ার মধ্যে বোঝা যাচ্ছিল। কথা বলতে বলতে কখনো টুপিটা এদিক-ওদিক সরিয়ে দিচ্ছেন, কখনো কাউন্টারে আঙুল ঠুকছেন।

"সুনন্দাকে গোপনে রায়গঞ্জের উকিলপাড়ায় ওর পিসিমার বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্য তোমাকে অনুরোধ করেছিলুম।" আবার শুরু করলেন সত্যবান, "আন্ডার গ্রাউন্ড থেকে তোমাকে খবর পাঠিয়েছিলুম, এটা ঠিক পার্টির নির্দেশ নয়, আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ বলতে পারো, সে কাজ তুমি ভালভাবেই করেছিলে, আমি দুবার রায়গঞ্জে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করেছিলুম, সাত-আট মাস ওখানে ছিল সুনন্দা, তারপর ওকে আরো দূরে সরিয়ে দেবার কথা ভাবলুম, হাওড়ার শিবপুরে ওর মামার বাড়ি, তোমাকে খবর পাঠালুম ওকে সেখানে পৌঁছে দেবার জন্য, এ দায়িত্বও তুমি নিখুঁতভাবে পালন করেছিলে, এর কিছুদিন পরেই মনোতোষ ধরা পড়ল, তারপর রিয়াজুল মারা গেল, কিছুদিন বাদে নগেন দত্তর ব্যাপারটা আমরা টের পেলুম, তোমার সম্পর্কেও আমরা সতর্ক হয়ে উঠেছিলুম, কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে—"

"বিশ্বাস করুন সতুদা, আমি কিছু জানতুম না, নগেনদা'র ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝতে পারিনি, বাবার বিশ্বাসী লোক, ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, আমাদের ঘরের লোকের মত, আমাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ—"

"চুপ করো, আমার কথা এখনো শেষ হয়নি, তাছাড়া আমি প্রশ্ন করলে তুমি জবাব দেবে, তার বাইরে একটি কথাও বলতে পারবে না।" সামান্য থেমে কাউন্টারে অস্থির আঙুল ঠুকে ঠুকে কি যেন ভেবে নিয়ে আবার বললেন সত্যবান, "মামার বাড়িতে সুনন্দা বোধ হয় বছর তিন, হ্যাঁ প্রায় চার বছর ছিল, তুমি সে সময় ওর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলে, কয়েকবার বোধ হয় ওর সঙ্গে দেখাও করেছিলে, এই সময় দিনহাটায় অসুস্থ দিদিকে দেখে ফেরার পথে সামান্য ভুলের জন্য আমি ধরা পড়ে যাই, কোথায়, কিভাবে ধরা পড়লুম, সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর, তারপর আর সুনন্দার কোন খবর পাইনি, তুমিও শিলিগুড়ি থেকে পালিয়ে গেলে, পার্টির সঙ্গে তোমার সব রকম যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গেল, কিংবা বলা যায়, তুমি ইচ্ছে করেই সমস্ত যোগাযোগের সূত্র নষ্ট করে দিলে, পার্টির কেউই আর তোমার কোন হদিশ পেল না।" সামান্য দম নিয়ে বললেন, "এদিকে খুনের দায়ে আমার ফাঁসির হুকুম হয়। হাইকোর্টের আপীলে ফাঁসি রদ হয়ে যাবজ্জীবন জেল হয়েছিল, এসব খবর কাগজে বেরিয়েছিল, তুমি জানো নিশ্চয়ই, এই মামলায় প্রায় তিন বছর গড়িয়ে যায়, আরো পাঁচ বছর বাদে আমি জেল থেকে পালাতে পারি, তা-ও আজ দু-বছর হয়ে গেল, অনেক চেষ্টা করেও পুলিস আমাকে আর ধরতে পারেনি, সেবার সামান্য ভুলের জন্য ধরা

পড়েছিলুম. এক ভুল আমি দুবার করি না, আজ পর্যন্ত কখনো করিনি. ভাঙা-চোরা যে-টুকু সংগঠন টিকে ছিল. তার সাহায্যেই পালাতে পেরেছিলুম। তারপর এই দু'বছরের কিছু বেশি সময় আমি চুপ করে বসে থাকিনি। সারা পশ্চিম বাংলা, বিহার, আসাম ঘুরেছি, বাংলাদেশেও গিয়েছি, পুরনো যোগাযোগগুলি আবার খুঁজে নিয়েছি, দলকে দাঁড় করাবার চেষ্টা এখনো চালিয়ে যাচ্ছি, তুমি হয়তো ভেবেছিলে, আমরা শেষ হয়ে গিয়েছি, শেষ যে হইনি তা তো দেখতেই পাচ্ছো। কিন্তু এতদিন তোমার পাত্তা করতে পারিনি, আর সুনন্দারও কোন খবর পাইনি, এর মধ্যে ওর বিধবা মা মারা গেছেন, ওর দুই দাদা সরকারি চাকুরে ছাপোষা গেরস্থ, তারা আর পুলিসের ভয়ে বোনের খোঁজখবর নেবার ঝুঁকি নিতে সাহস পায়নি ওর মামাবাড়ি থেকে যেটুকু খবর যোগাড় করতে পেরেছি, তা হল, আমার সঙ্গে জেলে দেখা করবার জন্য সুনন্দা চেষ্টা করেছিল, তাতে ওর মামারা ভয় পায়, আপত্তি করে, বকাবকি, ঝগড়াঝাটি এমন কি মারধর পর্যন্ত গড়ায়। শেষে সুনন্দা কাউকে কিছু না বলে মামাবাড়ি থেকে পালিয়ে যায়. কোথায় চলে যায় কেউ জানে না, মামারাও এমন ভীতু যে কোনওরকম খোঁজখবর নেবার সাহস পায়নি, আশ্চর্য ! বাইশ বছরের একটি জলজ্যান্ত মেয়ে আজ দশ বছর নিরুদ্দেশ, একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।" একটানা এতখানি বলে থামলেন সত্যবান। কাউন্টারে অস্থির আঙুল ঠুকে ঠুকে আবার বললেন, "সাত আট মাস আগে আমাদের বারাসাত ইউনিটের এক পুরনো কর্মী তোমাকে জীবন ডাক্তারের চেম্বারে দেখতে পায়। তোমার এই দোকান ও বাড়ির হদিশ জেনে নেয়, আমাদের নর্থ বেঙ্গল ইউনিটকে খবর দেয়। তারপর এই সাত মাস তোমাকে আমরা 'ওয়াচ' করেছি, আজ এসেছি শেষ বোঝাপড়ার জন্য, এবার আমার প্রথম প্রশ্ন, সেই অস্ত্রগুলি তুমি কি করেছ ?"

"মহানন্দার জলে ফেলে দিয়েছি।"

সুখময়ের সোজা জবাবে সামান্য থমকে গেলেন সত্যবান, আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কেন ফেলে দিলে ?"

সুখময়ের ছোট্ট জবাব, "পুলিসের ভয়ে।"

"পুলিশের ভয়ে, না নগেন দত্তর পরামর্শে ?"

"বিশ্বাস" করুন, নগেনদার সঙ্গে আমার কোন কথা হয়নি, তার সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ ছিল না।"

"তোমার কোন কথাই আজ আর আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না। সেই বিশ্বাসের মর্যাদা তুমি নিজেই নষ্ট করে দিয়েছ।" একবার কোন জবাব দিতে পারল না সুখময়। "শোন সুখময়, এবার আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন।" সত্যবানের চোয়াল শক্ত হল, দাঁতে দাঁত ঘষে সামান্য সামনে ঝুঁকে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "সেই টাকাটা কি করেছ, সেই এক লক্ষ বাইশ হাজার টাকা, পার্টির টাকা তোমার কাছে গচ্ছিত ছিল।"

"আ-আমার কাছে আছে।"

"কি করে থাকবে, তুমি আবার মিছে কথা বলছো, সুখময়।" দুঃখিতভাবে মাথা নাড়লেন সত্যবান। "আমরা জানি, তুমি সেই টাকায় এই জমি কিনেছ, বাড়ি তুলেছ, দোকান দিয়েছ, বিয়ে করে সংসারী হয়েছ, সেই টাকা আর কি করে থাকবে ?"

"আপনি বিশ্বাস করুন, যে টাকা আমি খরচ করেছি, ব্যবসায়ে লাগিয়েছি, গত আট-দশ বছরে তার দু'গুণ টাকা আমি লাভ করেছি, আপনাদের সব টাকা আমি ফিরিয়ে দেব।"

"এখুনি দিতে পারবে, এই মুহূর্তে ?" চোখ তুলে দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকালেন সত্যবান। এগারোটা বাজতে আর সাত-আট মিনিট বাকি। "আমাদের হাতে আর বেশি সময় নেই সুখময়।"

"ঘরে তো আমার অত টাকা নেই, বারাসতের ব্যাঙ্কে রয়েছে।"

"ব্যাঙ্কে কত টাকা আছে ?"

"পঁচাশি হাজারের কিছু বেশি।"

"তাতে তো কুলোচ্ছে না, বাকি টাকা কিভাবে দেবে ?"

"জীবনকাকার কাছে [illegible] তার কাছে আমার কিছু টাকা জমা রয়েছে, সেটা ফেরত চাইব, এই বাড়ির পেছনে আমার পাঁচ কাঠা জমি আছে, সেটা বেচে দেব, এখানে এখন জমির অনেক দাম, এই বাড়ি দোকান বন্ধক দেব, আমাকে সাতটা দিন সময় দিন।"

"সাতদিন সময় !" (এক চিলতে হাসি ফুটল সত্যবানের মুখে। ঘন গোঁফ-দাড়ির জন্য স্পষ্টভাবে বোঝা গেল না, কিন্তু কণ্ঠস্বরে টের পাওয়া গেল।) তা আর কি করে হবে, সুখময়, কাল সকালের আলো তুমি আর দেখবে না, অদাই তোমার শেষ রজনী।"

আতকে উঠল সুখময়। [illegible] একটা আর্তনাদ করে টুল থেকে টলে পড়ে যাচ্ছিল, পড়তে যেতে দিলেন না সত্যবান। [illegible] সামনে ঝাঁপিয়ে দুহাতে সুখময়ের [illegible] দাড়ি কাবিয়ে ধরলেন। তীব্রস্বরে [illegible] বললেন, "একটুও চেচাবে না, [illegible] ফেলব, যদি কিছুক্ষণ বেচে থাকতে চাও [illegible] চুপ করে থাকবে।"

সাঁড়াশির মত দশটা আঙুল গলায় বসে [illegible] বসেছে। দমবন্ধ হয়ে আসছে। গোঁ গোঁ শব্দ। দুই কি তিন সেকেন্ড। আস্তে আস্তে ছেড়ে দিলেন সত্যবান। দুহাতে কোনরকমে কাউন্টার আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল সুখময়। হাঁপাতে লাগল।

ওদিকে বাড়ির ভেতর বুবাইয়ের [illegible] পাশে বসে হাতপাখা নাড়ছিল মালা। ঘরের কোণে লণ্ঠন জ্বলছে। চারপাশে [illegible] ঝিনঝিন। হাতপাখা নাড়তে নাড়তে ঝিমুনি এসেছিল। মাঝে মাঝে ঢুলে পড়ছিল। হঠাৎ একটা আর্তনাদ শুনে [illegible] ভেঙে গেল। চিৎকারটা হঠাৎ [illegible]

[illegible]

বাড়িতে [illegible] সাড়ে দশটার আগে হিসেবপত্তর [illegible] দোকান বন্ধ করে ভেতরে আসতে পারে না। কিন্তু আজ এত দেরি হচ্ছে কেন ? সাড়ে দশটা কি বাজেনি ? এ ঘরে ঘড়ি নেই। মালার হাতঘড়িটা রয়েছে ড্রেসিং-টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে। কয়েক সেকেন্ড কান পেতে রইল। বাইরের ঘরে অস্পষ্ট গলা শোনা যাচ্ছে। একটা চাপা ধমকের মত শুনল। কি হচ্ছে ওখানে ? মনে হল, সুখময় এবং পিনাকী ছাড়াও অন্য কেউ ঢুকেছে দোকান ঘরে। মালা সাহসী মেয়ে, বেশ শক্ত ধাতের মেয়ে। কিন্তু এই মুহূর্তে কেমন ভয় করল। মাথার মধ্যে যেন এলার্ম-বেল বেজে উঠল। যদিও স্পষ্ট নয়, তথাপি বিপদের গন্ধ পেল মালা। বাইরে দোকানঘরে কিছু একটা ঘটছে। শোবারঘরের বাইরে গ্রিল-ঘেরা বারান্দা। তারপর ছোট্ট একফালি উঠোন। দোকানঘরের পেছনে ঢাকা-বারান্দার মত লম্বা একটা ঘর। একপাশে ওষুধের প্যাকিং-বাক্সগুলি সাজানো থাকে, অন্যপাশে সরু একটা তক্তাপোশে পিনাকীর সামান্য বিছানা। একটা দড়িতে ওর জামা-প্যান্ট গামছা ঝোলে। উঠোন পেরিয়ে ওই ঘরের ভেতর দিয়ে সামনের দোকানঘরে যেতে হয়।

ও ঘরে এখন যাবে মালা। কি হচ্ছে ওখানে দেখতে হবে। তার আগে বুবাইকে মশারি টাঙিয়ে দেয়া দরকার। বড্ডো মশা ! আস্তে আস্তে খাট থেকে নামল মালা। সামনে খোলা দরজা। তারপর অন্ধকার বারান্দা। তারপর বৃষ্টিভেজা উঠোন। টিপ টিপ বৃষ্টির শব্দ। আঁচলটা গুছিয়ে নেবার সময় লক্ষ হল, দরজার ঠিক বাইরে একটি ছায়ামূর্তি। লণ্ঠনের আলো সোজাসুজি ওখানে পড়েনি। সেজন্য ঠিক চেনা যাচ্ছে না।

"কে ওখানে ? পিনু না কি ?" গলা কেঁপে গেল। পরক্ষণেই একটি যুবক ঘরে ঢুকে পড়ল। মাথায় কালো নেপালী টুপি। ছোটখাটো পাতলা চেহারা, মঙ্গোলয়ান মুখ, হাতে ভোজালি। লণ্ঠনের আলোয় চকচক করে উঠল। চমকে দুপা পিছিয়ে গেল মালা। "কে, কে ?" বলে চেঁচিয়ে উঠতেই ধমক দিল যুবাটি, "চেঁচাবেন না, তাহলে আপনার ছেলেকে খতম করে দেব।"

লোকটা খাটের দিকে এক পা এগোতেই মালা বলে ছুটে এসে একরকম ছোঁ মেরে ছেলেকে বুকে তুলে নিল মালা। আচমকা ঘুম ভেঙে যেতে প্রাণপণে চেঁচিয়ে কান্না জুড়ে দিল বুবাই। বিরত যুবাটি আবার ধমক দিল, "ওর কান্না থামান, নইলে খুন করে ফেলব।" তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে ছেলেকে বুকের ভেতর আঁচলের আড়ালে ঢেকে দিল।

ওদিকে সেই মুহূর্তে সত্যবান জিজ্ঞেস করলেন, "ভেতরে বাচ্চার কান্না শুনছি, কার বাচ্চা ?"

"আমার ছেলে।" দুর্বল গলায় কোনরকমে বলতে পারল সুখময়।

"তোমার ছেলে ? কত বয়স ?"

"এই এক বছর হল।"

"ভেতরে আর কে আছে ?"

"ওই ছেলে, আর ওর মা।"

এই সময় ঢঙ-ঢঙ করে দেয়াল-ঘড়িতে এগারোটা বাজল। সেদিকে চোখ তুলে একবার দেখে নিয়ে নির্দেশ দিলেন সত্যবান, "কাটু, ওর

বউ-ছেলেকে এঘরে নিয়ে এস, থাপা ওখানেই পাহারা দিক।"

সত্যবানের ডানপাশে খানিকটা পেছনে দেয়াল ঘেষে 'কাটু' নামের ছেলেটি দাঁড়িয়েছিল। বেরালের মত নিঃশব্দে ভেতরে চলে গেল। এটা ঠিক চায়নি সুখময়। বউ-ছেলেকে ঘাতকদের সামনে নিয়ে আসায় আপত্তি ছিল।

মিনমিন করে বললো, "ওদের আবার আনছেন কেন, কি করতে চান?"

"কিছুই করতে চাই না, তুমি তো জান, বাচ্চা বা মেয়েদের উপর আমরা কোন হামলা করি না, আমাদের কথা শুনলে কোন ক্ষতি হবে না, তবে আমি ওদের চোখের সামনে রাখতে চাই, কারণ তোমার বউ যদি পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পাড়াপড়শীদের ডেকে আনে, তাহলে আমাদের অসুবিধে হতে পারে, অবশ্য আমাদের এক কমরেড থাপা ওখানে পাহারায় রয়েছে, আমরা এখানে ঢোকার আগেই দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকেছিল, তোমাদের কাজের ছেলেটি বেরিয়ে যেতেই 'মেন-সুইচ অফ' করে দিয়েছে। এটা লোড-শেডিং নয়।"

নিখুঁত কাজ এদের। এটা যে সাধারণ লোডশেডিং নয়, তা আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল। কিন্তু হিসেব নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এদিকে খেয়াল করেনি। তবে হামেশাই এরকম লোডশেডিং হচ্ছে। তাছাড়া গত কয়েক বছরের নিশ্চিন্ত জীবনে অভ্যস্ত সুখময় এরকম আচমকা হামলার সম্ভাবনা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতন ছিল না।

চার-পাঁচ মিনিট পরে ছেলে কোলে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকল মালা এবং স্তম্ভিত হয়ে গেল। ভয়ে বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। মোমবাতির আলোয় যেন ভূত দেখেছে। ওর ঠিক পেছনে পিস্তল হাতে কাটু, তার পেছনে ওদের নেপালী কমরেড বীরবাহাদুর থাপা। ওই পাতলা চেহারার ছোটখাটো ছেলেটি পাহাড়ে চড়তে ওস্তাদ। জলের পাইপ বেয়ে সান-শেড কিংবা কার্ণিশে পা রেখে টিকটিকির মত সাত-আট তলা স্বচ্ছন্দে উঠে যেতে পারে। এরকম একটা একতলা বাড়ির দেড়-মানুষ প্রমাণ উঁচু দেয়াল টপকে ভেতরে আসা তো মুড়ি চিবোনোর চেয়েও সহজ। রাত দশটার কিছু আগে দেয়াল টপকে ঢুকেছিল বীরবাহাদুর। তখন বৃষ্টি পড়ছিল, কখনো জোরে কখনো আস্তে। উঁকি দিয়ে দেখেছিল, রান্নাঘরে বসে দোকানের কাজের ছেলেটি খাচ্ছে। আর শোবার ঘরে বসে টি-ভি দেখছিল বাড়ির গিন্নি। খাটের উপর একটি বাচ্চা ঘুমুচ্ছে। সামনের দোকান ঘরে বসে ওদের 'টার্গেট' কিসব লেখালিখি করছিল। আর কোন লোক নেই বাড়িতে। সাবধানে খিড়কির দরজার খিলটা খুলে রেখেছিল। দরকার হলে চট করে চলে যেতে পারবে। তারপর পেনসিল-টর্চের সরু আলোয় পরপর উঁচু করে সাজানো প্যাকিং-বাক্সগুলির পাশে 'সুইচ-বোর্ড'টা দেখে নিয়ে ওখানেই ঘাপটি মেরে বসে ছিল।

কয়েক মিনিট বাদে ওর তিন-চার হাত তফাত দিয়ে দোকান ঘরের ভেতর গেল পিনু। ওদের কথা শুনতে পেল থাপা। পিনু বেরিয়ে যাবার পরে উঠে দাঁড়াল। এইসময় বৃষ্টিটা সামান্য জোর হল। দেয়াল-ঘড়িতে টঙ-টঙ করে দশটার ঘন্টাধ্বনি শেষ হতেই 'মেন-সুইচ' বন্ধ করে দিল। সামান্য খট-শব্দটি বৃষ্টির শব্দে চাপা পড়ে গেল। শুনতে পায়নি সুখময়। স্বাভাবিক নিয়মে লোডশেডিং ভেবেছিল। মালাও তাই মনে করে নিয়ম মত লণ্ঠন ধরিয়েছিল।

এখন মোমবাতির আলোয় সামনের মানুষটিকে দেখে চিনতে পারল মালা, সব বুঝতে পারল। তার ঠোঁট কাঁপছিল, চোখ ফেটে জল আসছে। এখুনি বুঝি কান্নায় ভেঙে পড়বে। ওদিকে প্রায় বজ্রাহত সত্যবান রায় কোনরকমে বলতে পারলেন, "একি! কি আশ্চর্য! সুনন্দা তুমি, তুমি এখানে?"

বহুকাল পরে নিজের আসল নামটি শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ল মালা। মুখ নিচু করে ফোঁপাতে লাগল।

"তুমি এখানে নাম পালটে মালা মজুমদার হয়েছো, সুখময়ের স্ত্রী হয়ে লুকিয়ে রয়েছ, এটা আমরা আন্দাজ করতে পারিনি, আসলে সুখময়ের দিকেই আমাদের লক্ষ্য ছিল, ওর স্ত্রী-পুত্র সম্পর্কে আমরা তেমন খোঁজখবর করিনি, তাছাড়া এখানকার ইউনিটের ছেলেরা তো আর সুনন্দা সেনকে চেনে না, বারো-তেরো বছর আগে যে কয়েকজন চিনতো, তাদের মধ্যে মনোতোষ, অর্ধেন্দু মারা গেছে, প্রবীর, জয়ন্ত এখনো জেলে। কথাগুলি কতকটা স্বগতোক্তির মতই বলে গেলেন সত্যবান।

"বিশ্বাস করো, সতুদা!" মুখ তুলে তাকাল মালা, (চোখের জলে দুই গাল ভেসে যাচ্ছে) "নিজের ইচ্ছেয় আমি বিয়ে করিনি, এই লোকটা আমাকে পুলিসের ভয় দেখিয়ে বিয়ে করতে বাধ্য করেছে।" একহাতে ছেলেকে বুকের কাছে ধরে রেখে, আরেক হাতে আঁচল তুলে চোখ মুছে ভাঙা ভাঙা গলায় বললো, "তুমি বিশ্বাস করবে না, জানি, কিন্তু আমার কোন উপায় ছিল না, শিবপুরে চলে আসার পরে তোমাদের খবর আমি নিয়মিত পেতুম না, দু'তিন মাস অন্তর এই মজুমদার এসে কিছু খবর দিয়ে যেত, তোমার একটা নোটবই আর চারখানি চিঠি আমার কাছে ছিল, সেগুলি আমি একটা প্যাকেট করে রেখেছিলুম, 'তুমি ফেরত চেয়েছ' বলে এই মজুমদার এসে সেই প্যাকেটটা হাতিয়ে নেয়, তার কয়েকদিন আগেই তুমি ধরা পড়েছিলে, আমি খবর পাইনি, শুধু শুনেছিলুম, তুমি দিনহাটায় তোমার দিদিকে দেখতে যাবে।" চোখের জল মুছে আবার বললো মালা, "তারপর তোমার 'আরেস্ট' হবার খবর শুনে আমি দিশেহারা হয়ে পড়লুম, কি করবো কোথায় যাবো, কিছুই বুঝতে পারছি না, তোমার সঙ্গে জেলখানায় গিয়ে দেখা করার কথা ভেবেছিলুম, কিন্তু কে আমাকে নিয়ে যাবে, কে আমাকে সাহায্য করবে, এই মজুমদার তখন মিথ্যে খবর দিয়ে, উলটো-পালটা কথা বলে আমাকে ভয় দেখাতে শুরু করেছে, এমন কি আমি ওর কথায় রাজী না হলে, ওই প্যাকেটটা পুলিসের হাতে তুলে দেবে বলেছিল, এদিকে তোমার ব্যাপার সব শুনে আমার মামারা ভয় পেয়েছিলেন, ছা-পোষা গেরস্থ তারা আর আমাকে তাদের কাছে রাখতে চাইলেন না, কিন্তু আমি তখন যাবো কোথায়, শিলিগুড়িতে ফিরে যাবার উপায় নেই, দাদা-বউদি আমার সঙ্গে থাকবে না, বউদি তো স্পষ্টই বলে দিয়েছিল, আমার মতো সাংঘাতিক মেয়ের সঙ্গে সে থাকবে না, পুলিসের হাঙ্গামা হবে, তার ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ আছে, স্বামীর সরকারি চাকরি আছে, তুমি তো জানতে, শুধু চোখের জল ফেলা ছাড়া আমার বিধবা মায়ের আর কিছু করার ছিল না, আমার জন্য ভেবে ভেবেই মা—" বলতে বলতে আরেকবার চোখ মুছল মালা, আবার বললো, "ওই অবস্থায় কাউকে কিছু না বলে, কাউকে আর ভয়-ভাবনার মধ্যে না রেখে, কারো কোন ক্ষতি না হয় ভেবে, এই মজুমদারের সঙ্গে গোপনে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলুম, ওইরকম অবস্থায়, আমি আর কি-ই বা করতে পারতুম, তুমিই বলো—" এইসময় বুবাই হঠাৎ কঁকিয়ে কেঁদে উঠল। তাড়াতাড়ি ওকে কাঁধের উপর কাত করে নিয়ে পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় মেরে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করল মালা। ততক্ষণে সুখময়ের দিকে চোখ ফিরিয়েছিল সত্যবান। সেই তীব্র দৃষ্টির সামনে আরো কুঁকড়ে গেল সুখময়। সামনে ঝুঁকে নিচুগলায় জিজ্ঞেস করলেন সত্যবান, "সেই প্যাকেটটা কোথায়?" ঠান্ডা চাপা গলার মধ্যে খুনের সঙ্কল্প শুনতে পেল সুখময়। হাত-পা হিম হয়ে গেল। বুকের ভেতর 'লাব-ডুপ' বন্ধ হবার উপক্রম। কাঁপা কাঁপা গলায় কোনরকমে বলতে পারল, "আ-আছে, আ-আমার কাছে আছে।"

"কোথায় রেখেছো, দাও।" হাত বাড়ালেন সত্যবান, "এখুনি দিতে হবে।"

ডান হাতটি এগিয়ে দিলেন। হয়তো আবার গলা টিপে ধরবেন। এক পা পিছিয়ে গেল সুখময়। আর পেছোবার জায়গা নেই। পেছনে দেয়াল-জোড়া ওষুধের আলমারি। বাঁ-দিকে দশ বারো ফুট দূরে ভেতরে যাবার দরজা। সেখানে 'কাটু' নামের ছেলেটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডাইনে বেরোবার জায়গা নেই। ওপাশে কয়েক হাত দূরে দেয়াল। দেয়াল পর্যন্ত আলমারি আর কাউন্টারের প্রান্ত। সেদিকে মাথার উপর দেয়াল-ঘড়ি। সত্যবানের কথার জবাবে আমতা আমতা করে বললো সুখময়, "বা-বাড়ির ভেতর আছে।"

"যাও, নিয়ে এসো, কাটু, ওর সঙ্গে যাও, কোনরকম চালাকি করলে খতম করে দেবে।"

সত্যবানের হুকুম শুনে চেঁচিয়ে উঠলো মালা, "না, না, ওরকম বলো না।"

পরক্ষণেই চাপা ধমক, "তুমি চুপ করো, একদম চেঁচাবে না।" শুনে বোবা হয়ে গেল। দরজার দিকে গুটিগুটি এগোল সুখময়। পেছনে পিস্তল হাতে কাটু। মোমবাতির ম্লান আলোয় দরজার ঠিক বাইরে চকচকে একটি নেপালী মুখ দেখে চমকে উঠল সুখময়। থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেই পিঠে পিস্তলের নল ঠেকল।

নিচু গলায় বললো, কাটু, "চলুন।" দরজার পাশে সরে গেল থাপা।

বেরিয়ে গেল সুখময়, পেছনে কাটু। ওদের

চলে যাবার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইলেন সত্যবান। তারপর মালাকে লক্ষ্য করে বললেন, "শোন সুনন্দা, তোমাকে কয়েকটা কথা বলছি।"

"তুমি আর ও নামে আমাকে ডেকো না, তোমার সুনন্দা মরে গেছে, আমি এখন মালা, মালা মজুমদার।"

কয়েক পলক ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বিষন্নভাবে মাথা নাড়লেন সত্যবান, "ঠিক আছে তাই হবে।" মুখ নিচু করে কিছু ভেবে নিয়ে আবার বললেন, "তুমি হয়তো জানো না, পার্টির কিছু অস্ত্র আর একলাখ বাইশ হাজার টাকা সুখময়ের কাছে জমা ছিল, ভয়ে হোক, লোভে হোক, সেই অস্ত্রগুলি ও নষ্ট করে ফেলে আর ওই টাকাটা নিয়ে শিলিগুড়ি থেকে এখানে পালিয়ে আসে।"

বিস্ময়ে বিহ্বল মালা শুধু বলতে পারলো, "বিশ্বাস করো, আমি এসব কিছুই জানি না।"

"আমাদেরও তাই মনে হয়েছে, ওর বাবা-মা কেউই হয়তো জানে না, তবে এর পেছনে ওর বাবার পুরনো কম্পাউন্ডার নগেন দত্তর হাত থাকতে পারে, হয়তো ওই টাকার ভাগও কিছু পেয়েছে, এটা অবশ্য আমাদের অনুমান, তবে এসব লোকের পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়' লোকটা পুলিসের 'টিকটিকি', আমরা যখন জানতে পারলুম, তখন খুব দেরি হয়ে গেছে, এদিকে আমি হঠাৎ ধরা পড়ে যাওয়ায় আর কিছু করার উপায় ছিল না।" অভিভূতের মত তাকিয়েছিল মালা। একটু দম নিয়ে আবার বললেন সত্যবান, "শোন সুনন্দা, মানে মালা, তোমাকে একটা কথা বলে রাখছি, আমাদের 'কেন্দ্রিয় কমিটি' যে খতম তালিকা অনুমোদন করেছেন, তার মধ্যে নগেন দত্ত আর সুখময় মজুমদারের নাম আছে, আজ আমরা সুখময়কে খতম করতেই এসেছিলুম, কিন্তু—"

"না, না, ও কথা বলো না।" হাহাকার করে উঠল মালা, "ওরকম কাজ করো না, সতুদা, তোমার পায়ে পড়ি, এই শিশুকে দ্যাখো—" ঘুমন্ত ছেলেকে সামনে ধরে বললো, "এই অবোধ শিশুকে তুমি পিতৃহীন করো না।"

"আস্তে কথা বলো, চেঁচিও না, আমাদের কাজ আমরা আজ শেষ করেই যেতুম, কিন্তু তুমি সব গোলমাল করে দিলে, তুমি যে এখানে এভাবে থাকতে পারো, আমি ভাবতে পারিনি, আমরা কেউই আন্দাজ করতে পারিনি, তুমি আর তোমার ছেলে হঠাৎ এসে সব ওলটপালট করে দিয়েছ, এখন আমাকে নতুন করে ভাবতে হবে—"

"তাই ভাবো, সতুদা, আমাদের কথা ভেবে ওকে ক্ষমা করে দাও, আর যাই করো, ওকে প্রাণে মেরো না, তোমার কাছে আমি ওর প্রাণ ভিক্ষা চাইছি।"

"ক্ষমা করা, কিংবা প্রাণভিক্ষা দেবার মালিক আমি একা নই।" বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লেন সত্যবান, "আমি ছাড়া কমিটিতে আরো আটজন মেম্বার আছেন, তাদের সমবেত মতামত আমাকে শুনতে হয়, আমাদের সবাইকে মেনে চলতে হয়, তবে একটা কথা বলতে পারি, যদি পার্টি-ফান্ডের সমস্ত টাকা সুখময় ফেরত দিতে পারে তাহলে হয়তো বেঁচে থাকার অধিকার ফিরে পাবে, অন্য কমরেডদের আমি বুঝিয়ে বলবো।"

"তাই বলো সতুদা, আমাদের কথা বলো, তোমার পায়ে পড়ি, এই নিষ্পাপ শিশুর কথা তোমার কমরেডদের বুঝিয়ে বলো।" কান্নার আবেগে মালার গলা কাঁপছিল।

"কিন্তু অতগুলি টাকা কি ফেরত দিতে পারবে সুখময়, পিস্তলের মুখে হয়তো অনেক মিথ্যে কথা বলবে, ওকে আর আমরা একবিন্দুও বিশ্বাস করি না, এই টাকা ফেরত দেবার দায়িত্ব নেবে কে?"

"আমি দায়িত্ব নিচ্ছি, সমস্ত টাকা আমি তোমাদের ফিরিয়ে দেব, তুমি তো জানো, আমি তোমার কাছে কোনদিন মিছে কথা বলিনি, তুমি তো আমাকে বরাবর বিশ্বাস করেছ।"

"তুমিই তো বললে, সেই সুনন্দা মরে গেছে।" সত্যবানের কথার মধ্যে ম্লান হাসির আভাস, "তুমি আজ অন্য নামে, অন্য পরিচয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছ, সেই পুরনো বিশ্বাসের মর্যাদা তুমি কতখানি রক্ষা করতে পারবে, বুঝতে পারছি না।"

"আমি পারবো সতুদা, তুমি আমাকে শেষবারের মত বিশ্বাস করো, শেষবারের মত সুযোগ দাও, আমি তোমাদের সব টাকা ফিরিয়ে দেব, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি।"

বলতে বলতে সামনে ঝুঁকল মালা। "থাক, পা ছুঁতে হবে না।" এক পা পেছোলেন সত্যবান। ওর মাথায় হাত দিতে গিয়ে সামলে নিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "সাতদিনের মধ্যে সব টাকা দিতে পারবে?"

"সাতদিন নয়, অন্তত পনেরোটা দিন সময় দাও, এইটুকু দয়া করো।"

"ঠিক আছে, তাই হবে, দু সপ্তাহ সময় পাবে, এর মধ্যে পুরো টাকাটা তুমি যেভাবে হোক যোগাড় করে রাখবে, কোথায়, কিভাবে টাকাটা পৌঁছে দিতে হবে, আমাদের লোক এসে তোমাকে জানিয়ে যাবে, তুমি সেইভাবে তৈরি থাকবে, তবে একটা কথা, সুখময় যেন কোনরকম চালাকি না করে, কাউকে কিছু না বলে, পুলিসকে কিছু না জানায়, তাহলে কিন্তু আমি আর ওকে বাঁচাতে পারবো না, তোমার সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, কথার খেলাপ যেন না হয়, মনে রেখো তোমার উপর সব নির্ভর—"

সত্যবানের কথা শেষ হবার আগেই ফিরে এল সুখময়। পেছনে ওর পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে কাটু নামের সেই সতর্ক ছেলেটি। বাদামী রঙের মোটা কাগজের একটি প্যাকেট সত্যবানের হাতে তুলে দিল সুখময়। প্যাকেট খুলে চারখানি চিঠি আর একখানি নোটবই বার করলেন সত্যবান। পনেরো বছর আগের পুরনো নোটবই। আর বারো থেকে চোদ্দ বছর আগে সুনন্দা সেনের কাছে লেখা সত্যবান রায়ের চারখানি চিঠি। দুটি মোমবাতিই তখন ছোট হয়ে এসেছে। দেয়ালের ছায়াগুলি আরো বড়, আরো ঘন হয়েছে। সত্যবানের বাঁদিকে দ্বিতীয় ছেলেটি পেছনের অন্ধকারে মিশে রয়েছে। মোমবাতির ম্লান আলোয় দেখা যাচ্ছে, ভীত, বিপর্যস্ত সুখময়ের ফ্যাকাশে মুখে অসহায় আতঙ্ক। মালার চোখেমুখে উদ্বেগের সঙ্গে ভয় আর ক্ষীণ ভরসার মেশামেশি। কাটুর মুখ পাথরের মত কঠিন, নির্বিকার। ওর পেছনে বাইরের অন্ধকারে কোথাও লুকিয়ে আছে ওদের নেপালি কমরেড থাপা। ঘন দাড়ি-গোঁফের জন্য সত্যবানের মুখের ভাব ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। শুধু খাঁড়ার মত নাক আর ফর্সা কপাল চকচক করছিল। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, কঠোর। নোটবই আর চিঠি চারখানি উলটেপালটে দেখলেন। নোটবইখানি পকেটে রেখে চিঠি চারখানি একে একে মোমবাতির আগুনে ধরিয়ে দিলেন। চোখ তুলে এক পলক মালার দিকে তাকালেন। মালার চোখে জল।

কয়েক মুহূর্তের জন্য সমস্ত ঘর উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কাগজ পোড়া গন্ধে ভরে গেল। সুখময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন সত্যবান, "সুখময়, তোমার প্রাণদণ্ড মুলতুবী রাখা হল, সুনন্দা মানে তোমার স্ত্রী মালার জন্য এবারের মত বেঁচে গেলে, যদি পনেরো দিনের মধ্যে সমস্ত টাকা ফিরিয়ে দিতে পারো, তবে জীবনের বাকি দিনগুলি ফিরে পাবে, কোনরকম চালাকির চেষ্টা করো না, কাউকে কিছু বলো না, পুলিসের সাহায্য চাইতে যেও না, তা হলে আর বাঁচবে না।"

টঙ করে দেয়াল-ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বাজল। সেদিকে একবার তাকালেন সত্যবান। আবার বললেন, "আমরা চলে যাবার পরে অন্তত দশ মিনিট তোমরা এই ঘর থেকে বেরোবে না, যেমন আছ, তেমনি চুপচাপ থাকবে।" তারপর ফেল্টের টুপিটা মাথায় দিলেন। কাটুকে লক্ষ্য করে বললেন, "কাটু, থাপাকে বলো আলো জ্বালিয়ে দিতে, হ্যাঁ একটা কথা বলা হয়নি।"

সুখময় আর মালার দিকে ফিরে তাকালেন, "তোমাদের কাজের ছেলেটিকে আমরা গাড়ির মধ্যে আটকে রেখেছি, ওকে এভাবে আটকে রাখার জন্য আমরা দুঃখিত, এখুনি ছেড়ে দিয়ে যাব, ওকে বারণ করে দিও, এসব কথা যেন কাউকে না বলে।" একটি মোমবাতি নিবে গেছে, আরেকটি নিবু-নিবু। প্রায় অন্ধকার ঘর থেকে তিনটি ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। পরক্ষণেই উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল। থাপা বোধহয় দেয়াল টপকে কিংবা খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাইরে একটা গাড়ির শব্দ হল। কাউন্টারে ঠেস দিয়ে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়েছিল সুখময়। গাড়িটা চলে যাবার শব্দ শুনে মুখ তুলে স্ত্রীর চোখের দিকে তাকাল।

মালার চোখে আর জল নেই। দুটি চোখ অঙ্গারের মত জ্বলছে। দৃষ্টিতে শুধু ঘৃণা। তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষ। সমস্ত শরীর গুলিয়ে বমি পেল সুখময়ের। দুই হাতে মুখ চাপা দিয়েও আটকাতে পারল না। হড়হড় করে খানিকটা বমি হয়ে গেল। সারা মুখে টক টক তেতো স্বাদ। দরজার দিকে এগোতে গিয়ে পারল না। অবসন্নের মত টলে ধুলো আর বমির মধ্যে বসে পড়ল। তারপর দুই হাতে মুখ ঢেকে অসহায়ের মত ফোঁপাতে লাগল।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

ওগো বধূ সুন্দরী

শ্রীমতী

অগ্রহায়ণ মাস মানেই বোধ হয় একটা বেশ খুশী খুশী রোদ ঝলমলে আনন্দের মাস। কয়েকটা মাস বন্ধ থাকার পর অগ্রহায়ণের শুরুতেই দিকে দিকে বেজে উঠছে সানাই। বিয়ের মরসুম লাগে এই সময়টায়।
আজকাল বিয়ে বাড়িতে কনের সাজ-সজ্জা আমরা অনেক পাল্টে ফেলেছি। হয়তো বা অবস্থার বিপাকে পড়েই। কিন্তু বিয়ের কনেকে নিয়েই হয় মুশকিল। কনেকে কে সাজাবে এই নিয়ে সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারে সমস্যা দেখা দেয়। ইদানীং কিছু সমস্যার সমাধান করছে বিউটি পার্লারগুলো। আপনি গিয়েও সেজে আসতে পারেন, সে ক্ষেত্রে খরচটা একটু কম। আর বাড়িতে এসে সাজিয়ে দেবার কনট্রাক্ট করলে মধ্যবিত্ত সংসারের বিয়ের আর পাঁচটা খরচ পেরিয়ে এসে কনের সাজের জন্য তত টাকা খরচ করা অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। কনেকে সাজাবার, বিশেষ করে মেক-আপ করার কয়েকটা প্রসাধন সামগ্রী আর তাদের ব্যবহার সম্বন্ধে অল্প কিছু জানাচ্ছি। বিয়ের আগে প্রসাধন সামগ্রীর একটা লিস্ট করে মোটামুটি গাত্রবর্ণের সঙ্গে মিলিয়ে কিনে নিন। লিস্টের প্রথমে রাখুন ডিপ ক্লিনজার [মিল্ক ক্রিম, লোশন যা খুশী], ফ্রেশনার, ময়শ্চারাইজার, ব্লেমিশ কভার আপ স্টিক, ফাউন্ডেসান, ফেস বা রুজ পাউডার, কমপ্যাক্ট, ব্লাশার/রুজ, আই স্যাডো [যদি প্রয়োজন বোধ করেন], আই লাইনার, মাস্কারা, আই-ব্রাউ পেনসিল, লিপস্টিক, লিপগ্লস, গ্লিমার। মেক-আপ শুরু করবার আগে তুলো দিয়ে ক্লিনজিং মিল্ক ভাল করে লাগান। এরপর ফ্রেশনার লাগাতে হবে। এ ক্ষেত্রে স্কিন টনিক বা স্কিন ফ্রেশনার লাগাতে হবে শুষ্ক ত্বকের জন্য, আর তৈলাক্ত ত্বকের জন্যে আসট্রিনজেন্ট লোশন। এবারে ময়শ্চারাইজার লাগান ভাল করে। এতে ত্বকের আর্দ্রতা বজায় থাকবে। ব্লেমিশ কভার আপ স্টিক আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে চোখের আশেপাশে বা যেখানে ভাঁজ বা খুঁত/দাগ থাকবে সেখানে লাগাবেন দাগগুলোকে আড়াল করার জন্য। ময়শ্চারাইজার লাগানোর দশ মিনিট বাদে মেক-আপ শুরু করুন।

কমপ্যাক্ট,
ফেস পাউডার বা লুজ পাউডার যে কোন একটি হালকাভাবে লাগাবেন। এতে মেক-আপের বেস মজবুত হয়। কম্প্যাক্ট লাগানোর জন্য শক্ত পাফ ব্যবহার করবেন। প্রথমে খুব কম পরিমাণে লাগাবেন। পরে অবস্থা বুঝে পরিমাণ সামান্য বাড়ানো যেতে পারে। ব্লাশার বা রুজ প্রায় একই ধরনের। সাধারণত দু'রকমে পাওয়া যায়—লিকুইড-ক্রিম ও পাউডার। ফাউন্ডেশন লাগানোর পর আঙুল দিয়ে লিকুইড-ক্রিম ব্লাশার/রুজ লাগাবেন কিন্তু ফেস পাউডার বা কম্প্যাক্ট লাগাবার আগে। দু-গালের উঁচু হাড়ের নিচে সামান্য পরিমাণে লাগিয়ে সতর্কভাবে ওপর দিকে ও কানের পাশে চুলের দিকে ছোট ছোট টানে ত্বকের স্বাভাবিক রঙের সঙ্গে মিলিয়ে দেবেন। চোখের নিচে কখনও লাগাবেন না।
মেক-আপের পর আই-ব্রাউ পেনসিল দিয়ে হালকা করে ভ্রূ ভেতর থেকে বাহির প্রান্ত পর্যন্ত এঁকে দিন। চোখের পাতায় প্রথমে লাগান আই শ্যাডো। ব্রাশে সামান্য আই-শ্যাডো লাগিয়ে চোখের ওপরের পাতায় লাগান। এবারে ব্রাশ দিয়ে চোখের ভেতর ও বাইরের কোণের দিকে টেনে রঙ ত্বকে মিশিয়ে দিন। এবারে সরু করে আইলাইনার লাগান। চোখের ওপরের পাতায় ভেতর থেকে শুরু করে বাইরের দিকে টানুন। নীচের পাতায় সরু করে লাগান। খেয়াল রাখবেন চোখের ভেতরে যেন না যায়। ইচ্ছে

করলে চোখের সৌন্দর্য বাড়াতে মাস্কারা লাগাতে পারেন। সাবধানে রোল স্পাইরাল অ্যাপ্লিকেটর দিয়ে লিকুইড মাস্কারা লাগাবেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। প্রথমে মাস্কারা লাগিয়ে মিনিট তিনেক রেখে একটু পাউডার চোখের পাতায় বুলিয়ে নিন। এবারে আবার লাগান মাস্কারা। চোখের পাতা হয়ে উঠবে ঘন কালো আর মোহময়। বাকি রইল লিপস্টিক। শাড়ির রঙের সঙ্গে ম্যাচ করে শেড লাগাতে পারেন। তবে বিয়ের দিন লালের যে কোন শেড ভাল দেখাবে।

লিপস্টিক লাগাবার আগে সামান্য ফাউন্ডেশন ঠোঁটে লাগিয়ে নিলে রঙ ফেটে বা পালটে যাবার ভয় থাকে না। এরপর হালকা চন্দন আর গাঢ় লাল কুমকুম লাগিয়ে বেনারসী আর স্বালঙ্কারে আপনি হয়ে উঠুন লাবণ্যময়ী, লাস্যময়ী, স্নিগ্ধ বধূটি।

তোমাদের এইভাবে রেখে এগিয়ে যাওয়াটা আমার উচিত হয়নি !

শান্ত জায়গা ! সেখানে এই দুটো গুণ্ডা কোত্থেকে এল ?
মানে…
চুপ কর

এই তোরা কোন্ জেল থেকে পালিয়েছিস ?
তোমাকে সে-কথা বলব কেন ?
বলব না ।

বোলো না । তবে যা তোমরা করেছ, তার জন্য আমি নিজেই তোমাকে খতম করব !
খতম করবে ?
মানে, খতম ?

দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমরা মায়িটানের জেলে ছিলাম !
সেখান থেকে পালাই ।

জেল থেকে পালিয়েছে বুঝলে কী করে ?
তা নইলে এখানে গা-ঢাকা দেবে কেন ?

এদের মায়িটান জেলে নিয়ে যাও । পুরস্কার পাবে ।
ঠিক আছে, নিয়ে যাব ।
8/14

সত্যি ওদের গুলি করে মারতে তুমি ?
আরে না, ওদের ভয় দেখাচ্ছিলুম ।
ক্রমশঃ১০

দানব ও দেবতা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

গাড়ি থেকে নেমে এল আমার বন্ধু দিলীপকুমার। বোম্বের দিলীপকুমার না হলেও কলকাতার ফেমাস ছেলে। স্বামী বিবেকানন্দ দেহে থাকলে এমন ছেলেকে দেখলে আনন্দে দু হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিতেন। সুন্দর সুঠাম চেহারা। বড় বড়, টানা টানা চোখ। সামান্য মায়োপিক। তাই চোখে উঠেছে কালো ফ্রেমের ভারি চশমা। সে আর কি করা যাবে! যে দেশে ঘিতে ঘি নেই, তেলে তেল নেই, শুধু আমাদের তেলানি আছে, সে দেশের যুবক রাতকানা হলেও কিছু করার নেই। দিলীপকে দেখে যে কোনও মেয়েরই মতিভ্রম হতে পারে। দিলীপের হয় না। ব্যাচেলার থাকার প্রতিজ্ঞা নিয়ে সমাজসেবায় নেমে পড়েছে। ধুতিপাঞ্জাবি ছাড়া পরে না। যে কোনও অবস্থাতেও মুখের হাসি মেলায় না। প্রাণখোলা হাহা হাসির জন্যে দিলীপ বিখ্যাত। 'অলওয়েজ অ্যাট ইওর সার্ভিস' হল দিলীপের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

দিলীপ আমাকে দেখতে পায়নি। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ট্যাকসির সামনের দিকে এসে ভাড়া মেটাতে ব্যস্ত। কথা ছিল দিলীপ আমার জন্যে আসার পথে একটা সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি দিলীপকে তুলে নিয়ে আসবো। আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে সাঁ সাঁ করে চলে এসেছি। দিলীপকে তোলার জন্যে ঘুরপথ আর ধরিনি। ভাড়া মিটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। দিলীপ যেন ভূত দেখেছে। 'এ কি আপনি? এখানে দাঁড়িয়ে? যাবেন না?' ঘাড়ে ঘাড়ে তিনটে প্রশ্ন করেই সেই বিখ্যাত হাহা হাসি।

'পাটা গেল কি করে?'

'অন্ধকারে খোলা ম্যানহোলে ঢুকে গিয়েছিল।' আবার সেই হাসি।

'দিলীপ, আমি বাড়ি যাবো।'

'বাড়ি যাবেন? কেন কিছু ফেলে এসেছেন? পাসপোর্ট, টিকিট?'

'সব ঠিক আছে। তবে এগারোটার আগে প্লেন উড়বে না। অতক্ষণ আমি কি করবো?'

দিলীপের সঙ্গে কথা বলছি, চোখ পড়ে আছে গাড়ি আর গাড়ি ঘিরে জটলার দিকে। একজন পুলিস এসে ততক্ষণে গাড়ির গায়ে হাত বোলাতে শুরু করেছে। একবার যদি জানতে পারে ওই গাড়িতে আমার শুভাগমন ঘটেছে তাহলে কি যে হবে! পালাতেও পারছি না, এগোতেও পারছি না সাহস করে। রাজধানীর বদলে শ্রীঘরে গিয়েই না বসে থাকতে হয়।

হঠাৎ আমাদের সামনে গুড়গুড় করে একটা স্কুটার এসে থামল। হেলমেটধারীকে আমি চিনতে পারলাম না। দিলীপ ভাঙা পা নিয়েই নেচে উঠল, 'আ গিয়া, আ গিয়া।'

ছেলেটি দিলীপের বন্ধু। বেলেঘাটা থেকে ছুটে এসেছে। দিলীপের আদেশে। অফিসটফিস কামাই করে। ইতিহাস রচনা করবে। সে আবার কি? ছবি তুলবে। বিভিন্ন পর্যায়ের। এয়ারপোর্টের সামনে আমরা। ভেতরের লাউঞ্জে আমরা। টারম্যাকের ওপর দিয়ে হেঁটে চলা। সিঁড়ি বেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে হাত নাড়তে নাড়তে বিমানে ওঠা। চিত্রতারকাদের বেলায় যেমন হয় আর কি! কোনও পত্রপত্রিকার প্রতিনিধি তুলবেন না, আমাদের সময় আমরাই ধরে রাখবো ফ্যামিলি অ্যালবামে। তারপর অনেক অনেক বছর পরে আত্মীয়স্বজনদের দেখাতে দেখাতে, চিবিয়ে চিবিয়ে আধো ইংরেজি আধো বাংলায় বলা হবে, হোয়েন আই ওয়াজ ইন মেরিকা উইথ পি এম, ইউ নো। তখন আমার একটা মোটা ঝুমকো সিপৎস কুকুরকা মাফিক ন্যাজ নিকালা।

অ্যামেচার আর প্রোফেসানালে এই তফাত! অ্যামেচারদের ক্যামেরার অ্যাঙ্গল আর ফোকাস ঠিক হতে হতে মুখের হাসি মিলিয়ে যায়, চোখ

দুটো বড় হতে হতে ছানাবড়া হয়ে যায়। মারো ভাই ফটাফট মারো। যা হয় হোক না, একটা কিছু। মাঝে মাঝে টেরিয়ে তাকাচ্ছি গাড়িটার দিকে। আইনও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ওখানে যাঁরা দাঁড়িয়ে, তাঁরা এখন গাড়িটার গায়ে হাত বোলাচ্ছেন। যেন আদর করছেন।

এই টেরাবার জন্যে, পরে যখন ছবির কপি পেলাম, তখন দেখি সব ছবিতেই আমার ট্যারা চোখ। তা মন্দ না। ছবি তোলার মনে হয় নেশা আছে। শেষ যেন আর হতে চায় না! দিলীপ, এ কি ভাই ক্ল্যাসিক্যাল গান! শুরু হলে আর শেষ হতে চায় না! না, চাইনিজ নুডলস! একবার মুখে ঢোকালে, বিশ বাইশ ফুট না ঢোকালে শেষ দেখা যায় না!

দিলীপ বললে, হয়ে এসেছে, পুরোটা একসপোজ না করলে আজই ডেভালাপ করতে দেবে কি করে! ক্যামেরাটা যে ধার করা।

হঠাৎ দেখি আমার সেই চালক বেশ খোশ মেজাজে এয়ারপোর্ট লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ির দিকে এগোচ্ছে। গাড়ির কাছে গিয়ে এমন একটা ভাব করলে, যেন স্বপ্ন দেখছে। খুব ক্যাচোরম্যাচোর শুরু হয়ে গেল। আমাকে এখনও দেখতে পায়নি। আমি দেখেও দেখছি না। শেষে মনে হল সে দু কানে হাত ছোঁয়ালো। তারপর দরজার লক খুলে উঠে বসল গাড়িতে। গাড়ি স্টার্ট করে আমার কাছাকাছি আসতেই, নাম ধরে ডাকলাম। ভূত দেখার মতো চমকে উঠল।

'এ কি, আপনি গেলেন না?'

'তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায়?'

'আমি তো ওই তিনতলায় ছিলাম। আপনাকে বাই বাই করে হাত নেড়ে তবেই তো নেমে এলাম। সত্যিই আপনি যাননি?'

'কি জানি! তুমি যখন বাই করে এলে তখন নিশ্চয় গেছি। এখন চলো বাড়ি যাবো।'

'আপনি লন্ডন যাবেন না?'

'পরে যাবো।'

গাড়ি চালাতে চালাতে আমার চালক বললে, 'আমি তা হলে কাকে হাত নাড়লুম। প্লেনটা উড়ে গেল।'

বেচারা বেশ ধাঁধায় পড়ে গেছে। সেই জট ছাড়াতে ছাড়াতেই বাড়ি এসে গেল। সবাই অবাক। 'কি হল ফিরে এলে?'

'প্লেন আপাতত প্লেনেই থাকবে। আবার দশটা সাড়ে দশটার সময় চেষ্টা করবো। এখন রান্না চাপাও।'

এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি আর পুলিস যেভাবে গাড়ি দেখছিল, আমি সেইভাবে বাড়ি দেখতে লাগলাম। নিজের বাড়িতে ফিরে আসার অনুভূতি কি সুন্দর! ঝট করে একবার ছাদে উঠে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম দূর আকাশের দিকে। আমার পোষা বেড়াল ঘোষালদের বাড়ির কার্নিশে বসে আছে থুপপি মেরে। বলগা বাঁশের আগায় লাল কাপড়ের ফালি বেঁধে, নাচিয়ে নাচিয়ে পায়রা ওড়াচ্ছে। দুটো সাবু গাছের ফাঁকে গঙ্গার জল চিকচিক করছে সকালের রোদে। আমি যে স্কুলে পড়তাম সেই স্কুলের মাঠের বিশাল অর্জুন গাছ, গত কয়েক দিন আগের বৃষ্টিতে ধুয়েমুছে, পাতায় রোদ পড়ে মনে হচ্ছে, ইস্পাতের পাতা। চারপাশে যা দেখছি সব আমার। আমার নিজস্ব। এই সব ছেড়ে কোথায় এখন যেতে হবে আমাকে, একটু পরে। সেখানে আমার গঙ্গা নেই, এক শো বছরের প্রাচীন কালীমন্দির নেই। জেলেপাড়া নেই। বাঁধানো বটতলা নেই। আমার কুকুরটা রোজ সকালে আমার সঙ্গে বাড়ির বাইরে বেরোয়। আমার পুষি রোজ আমার খাবার সময় হ্যাংলামো করে।

নেমে এলাম ছাদ থেকে। ভাগ্যিস, মরে গেলে মানুষ মরে যায় তাই, তা না হলে চির বিদায়ের মুহূর্তে ভেউ ভেউ করে কাঁদত। যাঁরা সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন তাঁদের মনের অবস্থাই বা কি হয়! কি হয়, আমি এখন বুঝতে পারছি। একেবারে যা-তা হয়ে যায়। যাক বরাতে ডাল ভাত মাপা ছিল, তাই জুটল। বাঙালী, বিশেষত সেকেলে বাঙালী হলে বেশ মজা। মনটা এমন তুলতুলে হয়! অনেক রকম সেন্টিমেন্ট, দুর্বলতা, ভয় ভীতি নিয়ে কখনও চোখের জল, মন কেমন, উৎফুল্ল আনন্দ।

আবার ঘনিয়ে এল বিদায়ের সময়। এবার ফিরাও মোরে বললেও, ফেরাবার নেই কেউ। দ্বিতীয় যাত্রায় বাড়তি সঙ্গী হল, আমার সেই শ্যালিকার সোয়েটারের শ্যালিকা। বললে, আমার পয়ে, এইবার প্লেন উড়ে যাবে। দল এত ভারি হল, আমার ভাই, মেয়ে, সব মিলিয়ে, ইচ্ছে করলে মিছিল করা যায়। ভিসিকে ঘেরাও করা যায়। গাড়ির পেট ফুলে যাবার মতো অবস্থা।

আবার এয়ারপোর্ট। সকালে ছাড়ার ব্যবস্থা ছিল ইন্টারন্যাশনাল থেকে। বেলায় সরে এসেছে ডোমাস্টিকে। সেখানে কাউন্টার আছে দিল্লি নেই। 'দিল্লি ফ্লাইট...।'

কথা শেষ করতে দিলেন না ভদ্রলোক, 'এনকোয়্যারিতে জিজ্ঞেস করুন।'

'এনকোয়্যারি দিল্লি?'

ভদ্রমহিলা ব্ল্যাকবোর্ড দেখিয়ে দিলেন। বোর্ডে লেখা, প্লেন উড়তে আরও দেরি হবে। একটা তিরিশ। বাজে সাড়ে দশ। এইবার কি হবে! আর তো ফেরা যায় না। ফিরে গেলে পাড়ার লোক নিন্দে করবে। আমার চেয়ে এয়ারলাইনসের অপমান বেশি হবে। সারা সকাল চেষ্টা করে একটা প্লেন ওড়াতে পারলে না। গাড়িটাকে ছেড়ে দিয়ে আমরা সব লাউঞ্জে বসে পড়লুম। কত কত দিকে প্লেন উড়ে যাচ্ছে। যাত্রীরা সব আসছেন, চেক ইন করাচ্ছেন। সিকিউরিটি চেকের ঘোষণা হচ্ছে। যে যার চলে যাচ্ছেন। আর আমার এমন বরাত! যাঁরা তুলে দিতে এসেছিলেন তাঁদের ধৈর্যে ফাটল ধরছে। এপাশ ওপাশ ঘোরাঘুরি করছেন। এইভাবে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর, ঠিক হল চা খাওয়া যাক।

ধারণা ছিল না, হাওয়াই চা কি বস্তু! হান্ডা একটা কাপে, নেংটি ইঁদুরের মতো কি একটা বুড়ে আছে। ন্যাজের বদলে লম্বা একটা সুতো বাঁধা। এর নাম টি ব্যাগ। সেই ব্যাগ থেকে যে নির্যাস বেরলো, তার স্বাদ বিলিতি জিভে। দিশি জিভে পানশে গরম জল। আর ওই পাঁচনের দাম যা, শুনে অক্কা পাবার অবস্থা। চা পানে মানুষ সবল হয়, আমি দুর্বল হয়ে পড়লুম। অনেক টাকা চোট হয়ে গেল। বৃদ্ধাদের যেমন জপের মালা, যুবতীদের সেই রকম সোয়েটার। আমার শ্যালিকা বুনতে বসে গেল। কুটুস কুটুস কাঁটা ঘুরছে। ঠাকুর বলতেন, যোগীর চোখ দেখলেই বোঝা যায়। পাখি যেন ডিমে তা দিতে বসেছে। সোয়েটার বোনাও এক ধরনের যোগ। এই যোগে বসলেই মানুষ পরিবেশের বাইরে চলে যায়। দিল্লি, বোম্বাই, কাবুল, কান্দাহার সব একাকার। সহনশীলতা, ধৈর্য, ক্ষমা আদরণীয় সমস্ত গুণ বেড়ে যায়। সোয়েটার বুনছে, আর মাঝে মাঝে ফ্যাল ফ্যাল করে চারপাশে তাকাচ্ছে। লাউঞ্জে লোক থই থই। স্বদেশী, বিদেশী। মাইকে ইংলিশ মিডিয়াম মহিলার দুর্বোধ্য ঘোষণা। আমাকে যাঁরা ওড়াতে এসেছিলেন তাঁদের মুখের চেহারা দেখে নিজেই লজ্জা পেয়ে যাচ্ছি। এই প্রথম বুঝলাম, প্রতীক্ষার রঙ কালো। যেমন রাগের রঙ লাল। এই প্রতীক্ষায় থেকে থেকে আফ্রিকার তামাম মানুষের রঙ কালো হয়ে গেছে। আমরা অতটা কালো নই; কারণ আমাদের প্রতীক্ষার পুরোটাই বিফলে যায়নি। কিছু না কিছু পেয়েছি। নিষ্ফল ভাগ্যান্বেষীরা বারে বারে এসেছে। শক, হুণদল, মোগল, পাঠান, সাদা চামড়া। মেরেছে, লুটেছে, পরাধীন করে রেখেছে। বোলতার মতো, ভিমরুলের মতো হুল চালিয়ে শুষেছে। তবু আমরা সরাতে পেরেছি। আফ্রিকা, বিশেষত দক্ষিণ আফ্রিকা আজও বুটের তলায়।

আর একবার এয়ারলাইনসের এনকোয়্যারিতে গেলাম। ভদ্রমহিলা জানালেন, কোনও খবর নেই। যা ছিল তাই আছে। খড়ির লেখা এগোয়নি, পেছয়নি, দেড়টাতেই খাড়া আছে। জিজ্ঞেস করলুম, 'কি হয়েছে?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, 'জেনে কি হবে?'

'জানতে ইচ্ছে করে, এই আর কি? জানার ইচ্ছে থেকেই তো জ্ঞান বাড়ে।'

'ওসব টেকনিক্যাল ব্যাপার আপনি বুঝবেন?'

ফিরে এলুম। যে চেয়ারে বসেছিলুম বেদখল হয়ে গেছে। ভীষণ গম্ভীর দর্শন এক ভদ্রলোক বসে আছেন। মনে হয় কোম্পানি একজিকিউটিভ। ওপরঅলার ধমক খেয়ে অথবা অধস্তনদের ধমকাবার জন্যে চলেছেন। বসা আর হল না। দিলীপ বললে, ক্ষিধে ক্ষিধে পাচ্ছে। আমার দলের সকলেই প্রায় অভুক্ত। কে জানতো এগারোটা পনেরও দেড়টার আগে উড়বে না। চা খেতে গিয়ে বেশ বড় রকমের একটা ধাক্কা খেয়ে আমরা বুদ্ধিমান হয়েছি। তদন্ত না করে কোথাও পাতা পেত না। দিলীপ দৌড়লো দোতলার রেস্তোরাঁয়। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল শুকনো মুখে। বললে, 'বসলুম। একটা মেনু পুরোটাই প্রায় পড়ে ছাগলছানার মতো লাফাতে লাফাতে নেমে এলুম।'

'চেয়ারে বসার জন্যে, মেনুটা পড়ার জন্যে পয়সা চাইলে না?'

'মনে হয় খেয়াল করে নি।'

'এখানে যা কিছু দেখছ, সবই কম্পানি অ্যাকাউন্টের সুরে বাঁধা। নিজের পয়সায় এখানে

...কিছু করে না। লাগে টাকা দেবে গৌরী ...। এ হল গৌরী সেনের কিংডাম।'

দিলীপ আর দলবল বাইরে চলে গেল, সস্তার খাবারের সন্ধানে। বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরেও এল পান চিবোতে চিবোতে। কথায় বলে ... পুরুষের সামনে ভাগ্যের দরজা ...। কে জানতো এই ওয়ার্লডেরও একটা ... ওয়ার্লড আছে। জেট এজের পাশে ... এজ। ওপাশে বিমান, এপাশে বয়েল গাড়ি। খুঁজে খুঁজে ওরা একটা ডার্ট চিপ প্রাইস হোটেল পেয়েছে। সেখানে ভাত আর পারশে মাছের ঝোল না ঝাল কি খেয়ে এল।

একটা তিরিশ বেজে গেল, তবু কোনও ঘোষণা নেই। আবার এনকোয়ারি কাউন্টারে। সেই একজন পরিচিতা মহিলা। বোর্ডে লেখা ছিল একটা তিরিশ। লেখা মুছে দেওয়া হয়েছে। কালো জমি করুণ চোখে তাকিয়ে আছে। যেটুকু আশা, ওই লেখার মধ্যে ধরা ছিল, তাও গেল।

'ব্যাপারটা কি ভাই? বেশ ঘোরালো মনে হচ্ছে?'

'ধরেছেন ঠিক, প্লেনের ডানার একটা অংশ খুলে পড়ে গেছে।'

শুনে মনে হল, আমারই ডানা ভেঙে গেছে। জিজ্ঞেস করলুম, 'কি হবে তা হলে?'

মহিলা, বেশ লম্বা, চওড়া সুন্দর এক যুবককে দেখিয়ে বললেন, 'এই তো ইঞ্জিনিয়ার দাঁড়িয়ে আছেন জিজ্ঞেস করুন।' প্লেন ওড়াবার ইঞ্জিনিয়ার চলে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, 'বোম্বে থেকে রিপ্লেসমেন্ট আনা হয়েছে, কিন্তু ফিট করা যাচ্ছে না। ডায়াগ্রাম মেলাতে পারছি না আমরা।'

'কি হবে তা হলে?'

'কি আবার হবে! বোম্বাই থেকে ইঞ্জিনিয়ার আসছেন। তিনি এলেই ডানায় তালি মারা হয়ে যাবে। হয়ে গেলেই ঘোষণা হবে। ঘোষণা হলেই গিয়ে বসে পড়বেন। পড়লেই উড়ে যাবে।'

'সেটা ক'টা নাগাদ হতে পারে?'

'ওই ইঞ্জিনিয়ার এসে ডায়াগ্রামটা মিলিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। ডোন্ট ওয়ারি। ডোন্ট ওয়ারি।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে তিনি চলে গেলেন। আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। দিলীপ হাসছে। এত দুঃখেও তার হাসি অমলিন। বললে, 'ভাববেন না। যা হয় একটা কিছু হবে। হয় দিল্লি, না হয় বাড়ি।' কথা শেষ করে এমন জোরে হেসে উঠল, এখানে পায়রা থাকলে, উড়ে যেত ফটাফট।

বাবা রে মারে করে তিনটে বেজে গেল। সকালের দিকে যাঁদের সাদা চোখ দেখেছিলাম, তাঁদের চোখ এখন রক্তিম। তার মানে পেটে ইনসপিরেসান পড়েছে। এখন তাঁরা বসে বসেই উড়তে পারবেন। আমাদেরই মহাবিপদ। একবার ওপরে যাই, একবার নিচে নেমে আসি। সময় আর সরতে চায় না। কি গেরো বাবা। ওদিকে দিল্লিতে, আমার প্রক্সি শ্যামলদাদা রেগে টং হচ্ছেন। আজ বেলা বারোটায় আমার পি আই এতে হাজির হবার কথা আইডেন্টিফিকেশনের জন্যে। বিমানের বারোটা বেজে গেলে আমি কি করব!

অতি কষ্টে সাড়ে চারটে বাজল। ইনফরমেশনের ব্ল্যাকবোর্ড ফাঁকা। কোনও ভবিষ্যদবাণী নেই। এয়ারপোর্ট পোস্টাফিসে ফোনের চাকা ঘোরাচ্ছি। অফিসে খবরটা জানানো দরকার। চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আঙুল ব্যথা হয়ে গেল। জানা উচিত ছিল যে-শহরে বাস, সে-শহরে ভাগ্যের চাকা উল্টো ঘোরে। দিলীপ হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এল, 'আরে, আপনি এখানে, দিল্লি ছেড়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়। ক্লোজড সার্কিট টিভির পর্দায় সত্যিই লেখা, ডেলহি, সিকিউরিটি চেক ফর ফ্লাইট নাম্বার টু নাইন থ্রি।

আমার দলের কে কোথায় ছড়িয়ে আছে জানি না। বিদায় নেওয়া হল না। সিকিউরিটির খাঁচা গলে সোজা বিমানে। দরজার পাশে খাড়া বিমান-বালিকাদের হাসি হাসি মুখ। এত কষ্টের পরও তাঁদের হাসতে হয়। এ যে হাসির চাকরি। আমরা যে যার আসনে বসে পড়লুম। যথারীতি নাকের ডগা দিয়ে ট্রে ঘুরে গেল। কানে তুলো গুঁজে, মুখে লজেন্স ফেললুম। আমার পাশের ভদ্রলোক এতই ক্লান্ত যে ঘুমিয়ে পড়লেন। রিমঝিম সেতার বাজছে। ভেতরে অসহ্য গরম। প্লেনের তলার দিকে চ্যাড় চ্যাড় করে একটা আওয়াজ হচ্ছে। ডানায় ওয়েল্ডিং মেশিন চলছে। একটা গরম ভাপ উঠে আসছে তলা থেকে ওপরে। বসে আছি তো বসেই আছি। দুটো লজেন্স কখন শেষ। বিমান-বালিকারাও সরে পড়েছেন। আমার পাশের ভদ্রলোক চোখ না খুলেই ঘুম জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'বেনারাস পেরিয়েছে?'

'বেনারাস! এখনও আমরা ড্যাঙাতেই মুখ থুবড়ে পড়ে আছি।'

'সে কি মশাই।'

তিনি চোখ খুলে, সোজা হয়ে বসলেন। তারপর একটা হুঙ্কার ছাড়লেন, 'উড়বে কি উড়বে না।'

এতক্ষণ সব রাগ চেপে বসেছিলেন। এই একটি কথায় ধৈর্যের বারুদে আগুন ধরে গেল। বিমানের নাকের দিকে জনৈক অফিসার এসে দাঁড়ালেন। ইংরেজি উপন্যাস হলে লেখা যেত, টল অ্যান্ড হ্যান্ডসাম। তিনি আকাশী ইংরেজিতে যা বললেন, তার অর্থ, আপনাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি। আর দেবো না। মা কালীর দিব্যি। ডানার জোড় আবার খুলে গেছে। বাপের ভাগ্যি ওড়ার পর মধ্যগগনে খোলেনি। প্লেন কম্যান্ড নিচ্ছে না। আপনারা বরং লাউঞ্জে ফিরে যান। ওড়ার মতো অবস্থায় এলে চিঠি লিখে জানাবো।

বিমান অবতরণের পর সবাই যেমন গম্ভীর চালে মাথা নিচু করে 'অ্যারাইভ্যাল-লাউঞ্জে' ফিরে আসে, আমরাও সেই রকম ফিরে এলাম। আমার কানে তখনও তুলো গোঁজা। পাশ থেকে দর্শনার্থী কেউ জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন ফ্লাইট এলো?'

বললাম, গ্রাউন্ড ফ্লাইট।'

ভদ্রলোক কি বুঝলেন, কে জানে! শুধু বললেন, 'আজকাল, কত রকম ফ্লাইট যে চালু হয়েছে!

এতক্ষণে ধৈর্যের বাঁধ সব ভেঙেছে। চেক-ইন কাউন্টারে ফাটাফাটি শুরু হয়ে গেছে। হয় ফ্লাইট ক্যানসেল করুন, নয় বিকেলের ফ্লাইটে জুড়ে দিন। চিৎকার, চেঁচামেচি, শেষে ফ্লাইট টু নাইন থ্রি ক্যানসেলড। সঙ্গে সঙ্গে পাশের আর এক কাউন্টারে মারামারির পটপরিবর্তন। যুদ্ধক্ষেত্র বাঁ থেকে ডানে সরে এল। কাল সকালের ফ্লাইটের জন্যে টিকিট পরিবর্তনের ব্যবস্থা। ছেলেবেলায় আমার এক বন্ধু মারামারির সময় বলতো, এবার আমি গাঁট চালাবো। তার গাঁট মানে, কনুই। তা ভদ্রবেশী, বিমানযাত্রীরা টিকিট নবীকরণের জন্যে পরস্পর পরস্পরকে গাঁট চালাতে লাগালেন। এ পাশে আর একদল যাত্রী, আর এক অফিসারকে চেপে ধরেছেন, রাতে থাকার ব্যবস্থা। তাঁদের জন্যে এয়ারপোর্ট হোটেলে বন্দোবস্ত হচ্ছে।

আমি গাঁটেও নেই, হোটেলেও নেই। একপাশে দাঁড়িয়ে মজা দেখছি, আর মনে মনে

ভাবছি, খুব হয়েছে। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই। অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড়। আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই।

দিলীপরা তিন তলার অবজারভেশান টাওয়ারে ছিল। নেমে এসেছে। এসেই হাহা করে এত জোরে, যাত্রার পতির কোলে সতীর ঢংয়ে হেসে উঠল, এয়ারপোর্ট, এয়ারলাইনস, সবই যেন লজ্জায় ক্ষণিকের তরে ম্লান হয়ে গেল। তার ওই সুন্দর স্বাস্থ্য আর অনিন্দ্য রূপ নিয়ে বাউলের ঢঙে গাইতে গাইতে এক পাক নেচে নিল।

ওড়া কি যায় সহজে
মাটির এমন টান
ও ভোলা মন, মন রে,
কে আবার মুখে একতারা
বাজাচ্ছেন—বুঁই। বুঁই।

(ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

বড় ক্লাবের কোচ হরিজন

অভিজিৎ রায়

দাদা, আপনারে আমরা ছাড়ব না। আপনি না কইলে এই বইলাম আপনার সিঁড়ির গোড়ায়। আজ থিইক্যা খাওন-দাওন ছাড়লাম। কোন প্রশ্ন নাই। আইতেই হইব আমাগো দলে·····

এই হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের তিন প্রধান ক্লাবের এক প্রধানের কর্মকর্তার মৌখিক চুক্তি। কোন এক প্রথিতযশা কোচের সঙ্গে। টাকার অঙ্ক কমকিছু নয় তা বলে—ধরুন, এক লাখ।

এই কর্মকর্তা যখন কোচকে অনুরোধ করতে এসেছেন ততদিনে দলবদল নামক আসরটি চুকে গেছে। তাঁর পকেটের সামর্থ্যমত তিনি একটি দলও গড়ে ফেলেছেন। সেই সময় খেয়ালও করেননি যে মাঝমাঠের খেলোয়াড় সংখ্যাই তাঁর দলে সাত। আরো মজার কথা হচ্ছে গোলকীপারের সংখ্যা আট। এহেন অবস্থায় খেলোয়াড় শিকার পর্ব চুকেবুকে গেছে। এখন একটি লেবেল আঁটা কোচকে এদের মাথার উপর চাপিয়ে দিতে পারলেই বারো মাসের জন্য নিশ্চিন্তি। হ্যাপা সামলাও মিঃ কোচ। ফেডারেশন কাপ বা লীগ থেকে এবার খেলে যাও খেলার পর খেলা টুর্নামেন্টের পর টুর্নামেন্ট। শুধু ট্রফি চাই। আর কিছু নয়। উনসত্তর মিনিট খারাপ, অগোছাল ভুল পাসের মেলা বসিয়ে দাও মাঠে কিন্তু ঐ জিনিসটি চাই—গোল। জিত। টুর্নামেন্ট।

এই হচ্ছে আমাদের আধুনিক ফুটবল। 'আধুনিক' শব্দটি সমাজের শাখাপ্রশাখায় বহুল ব্যবহৃত। সুতরাং ময়দানে এর আসতে অসুবিধে কোথায়? কাঠামোটি কিন্তু 'প্রাক ঐতিহাসিক'। কারণ বাইরের খোলসটি অপেশাদারী অথচ ভেতরের শাঁসটি পেশাদারী নামক শব্দের প্রয়োগে একটি বিকৃত চেহারার। মোট সংখ্যার খেলোয়াড়ের মাত্র এক শতাংশও পয়সা পান কিনা! এ নিয়ে বিতর্কের আসর বসতে পারে। এই এক শতাংশই খেলাধুলোর ন্যূনতম সুযোগটি পেয়ে থাকেন—বল, মাঠ, কোচ ইত্যাদি। বাকিরা অনুশীলন শেষে একটি করে রুগ্ন কলা ডিম এবং রুটির সমন্বয়ে তৈরী টিফিন নামক প্লেটের নির্মম রসিকতার মুখোমুখি হন। ক্যালরীর মূল্যে যা তিনশ পার হয় না, প্রয়োজনের আট ভাগের এক ভাগ। কতিপয় এমন পেশাদারী খেলোয়াড়েরা আবার টাকার ব্যাপারে কঠোর নিয়ম মানলেও দলের শৃঙ্খলার ব্যাপারে সবকিছু মানতে অপারগ। ক্লাব তাদের পেশাদারী কায়দায় মোকাবিলা করতেও ব্যর্থ হয়। সেখানে বাবা-বাছার ঢালাও প্রয়োগ দেখা যায়।

পি· কে'র মতে পরিকাঠামোটা যতদিন এমন থাকবে ততদিন সব ব্যাপারই এমন একটি ত্রিভঙ্গ মুরারি হয়ে থাকবে। পুরো ফুটবলটার প্রাণ-ভোমরার কৌটটি তিন বড় ক্লাবের দখলে। স্বাভাবিক কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। এতবড় লম্বা লীগে খেলা মাত্র দুটো। আবার ছোট ম্যাচগুলোতে ভয়ঙ্কর অসম লড়াই। যেমন তাদের ছোট ভাবলে চলবে না। তারাও তাদের সমস্ত প্রস্তুতিকে উজাড় করে দিয়ে মাঠে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে চায় ঐ তিন বড় দলেরই বিরুদ্ধে। কারণ যদি আলোকিত হয়ে ওঠা যায়। গ্যালারী ভরা দর্শকের মাঝে তো ঐ তিন দিনই খেলা। বাকি দিনগুলিতে রুটিন মানার খেলা। তাহলে বিষয়টা দাঁড়ালো এমন যে ছোট দলগুলো ঐ তিন বড়দলের বিরুদ্ধে গোল না খাওয়া পর্যন্ত প্রায় 'বিনা পণে ছাড়িব না সূচাগ্র মেদিনী' ঢংয়ে খেলা। মানে রক্ষণাত্মক। প্রধান দলের উদ্দেশ্য থাকে যেভাবে হোক গোল। যাতে লীগের পয়েন্টের ব্যারোমিটারের পারদ কোথাও যেন থমকে না যায়। তাই ছোট দলগুলোকেও উপেক্ষা করা যায় না। খেলা শুরুর প্রথম মিনিট পনের—গোল না হওয়া পর্যন্ত। কখনো কখনো ষাট-পঁয়ষট্টি মিনিটও অপেক্ষা করতে হয় গোল পাবার জন্য। সেক্ষেত্রে আবার দেখা যায় ছোট দলের ভাল খেলার চাইতে বড় দলের গোলমুখে ঝুড়ি ঝুড়ি ব্যর্থতাই দায়ী। বড় দলে একজন কোচের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কারণ এইসব দলে ময়দানের ভাল খেলোয়াড়েরা খেলে থাকেন। তাঁরা টাকার বিনিময়ে খেলেন। তাই তাঁদের মানসিকতাও থাকে ভিন্ন। আবার সেই দলেই নতুন মুখদেরও (হয়ত আগে ছোট দলে বিগত দু-তিন বছর তাঁর ভূমিকা ছিল ভাল) নিয়ে আসা হয়। এবার এই নতুন এবং পুরনো স্টারদের একটি সুরে বাঁধতে হলে একজন কোচকে তো অবশ্যই প্রয়োজন। যেখানে সবাই টাকার

জিতলে খেলোয়াড়দের কৃতিত্ব আর হারলে কোচের দোষ—অমল দত্ত কি এই কথাই ভাবছেন?

লেনদেনে বাঁধা সেখানে কোচও ভলান্টারি সার্ভিস দিতে পারেন না। তাই তিনিও টাকার বিনিময়েই আসেন।

কিসের প্রয়োজনে এই কোচকে রাখা? সকালে রুটিন মাফিক শরীরচর্চা তো একজন ট্রেনারকে দিয়েও তো হতে পারে—এই প্রশ্নের জবাবে পি কে বললেন, শুধু কি শরীরচর্চা করিয়েই একটা দলকে ধরে রাখা যায়? যেখানে ফুটবল একটা টিম গেম। আছে নানান সমস্যা। আগেই বলেছি ভিন্ন ভিন্ন মাপের মানসিকতা (ভারতীয় দলের ক্ষেত্রে সমস্যার আকার ও আয়তন আরো ব্যাপ্ত) সম্পন্ন খেলোয়াড়দের একটি টেম্পারমেন্টে বাঁধা। এক একজন খেলোয়াড়ের এক একরকম দুর্বলতা এক একরকম ত্রুটি। তাদের সেরা জিনিসটি বের করে নিয়ে আসা। সবচাইতে বড় কথা বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের এবং খেলার বিশ্লেষণ করে আমার দলের খেলোয়াড়দের সেইভাবে তৈরী করে মাঠে নামান। কাকে খেলাব? কাকে বসিয়ে বিশ্রাম দিয়ে পরের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে 'তুরুপের তাস' করব? এসব ছাড়াও দলকে শৃঙ্খলায় বেঁধে ফেলা এমন নানা অলিখিত বিষয়গুলোকেই তো কোচকে দেখতে হয়। ফুটবল বিষয়টিই এখন সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক এবং সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মতো। কোন অংশকেই গুরুত্ব কম দিলে পুরো দলটিই ধসে পড়বে। অমল দত্তের মতে কোচ মাস্ট। না হলে তো প্যাথলজিস্ট ছাড়া গ্রামে ডাক্তারের চিকিৎসা করবার মত। সব ব্যাপারটাই আন্দাজে ছাড়বার মত হবে। নিজ দলের এবং বিপক্ষ দলের বিশ্লেষণ নামক অঙ্কটি কে করবেন? লাখ লাখ টাকা ঢেলে দল তৈরী হচ্ছে। ফুটবল তো এখানেও ইন্ডাস্ট্রি। সুতরাং সব ইন্ডাস্ট্রির মত এখানেও টেনশান। টেনশানটি কে নেবেন? নিয়ে এসো ধরে একটি মধ্য-মানুষ। যাকে দিয়ে যাবতীয় কিছু করিয়ে নেওয়া যাবে। আর দশটা শিল্পের মত এরও চরিত্র 'রেজাল্ট-ওরিয়েন্টেড'। এবার ফল খারাপ হলেই উভয়সঙ্কট অবস্থা—একদিকে দর্শকদের তিরস্কার আর একদিকে কর্মকর্তাদের লাল চোখ। বিদেশে ফুটবলের ম্যানেজার-কোচ আর ট্রেনারের সংবদ্ধ কাল্পনিক ব্লু প্রিন্ট নিয়ে তৈরী আমাদের দেশের কোচের আসন। যেহেতু আমরা পুরো পেশাদারী নই তাই পয়সার অভাবে ওদের পুরো কাঠামো মিলিয়ে নিজেদের কাঠামোটিকেও গড়ে নিতে পারছি না। কোচ এখানে স্ট্র্যাটেজি তৈরী করছেন, মুভমেন্ট তৈরী করাচ্ছেন এবং দলকে খেলাচ্ছেন।

এখানেই শ্যাম থাপার আপত্তি। সাম্প্রতিক সময়ের খেলোয়াড় হয়ে এবং নিজে কোচ হয়ে ওনার বক্তব্য—মুভমেন্ট? বড় দলে মুভমেন্ট তৈরী, অসম্ভব। একটা ঠিক ঠিক মুভমেন্ট তৈরী করাতে যেখানে কম পক্ষে দুমাস সময়ের প্রয়োজন সেখানে একটা মুভমেন্ট তৈরী করাব কি করে? এখন তো দলের একজনের সঙ্গে আর একজনের পরিচিত হয়ে ওঠবার আগেই বেডিং বাঁধতে থাকে টুর্নামেন্টে খেলবার জন্য। আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় হয় না বড় দলে মুভমেন্ট শিখিয়ে মাঠে নামান যায়। সময় ছাড়া আরো কিছু জটিল সমস্যাও থাকে। খেলোয়াড়দের উপর ব্যক্তিগত প্রভাব, ফিটনেসে রাখা এসব বিষয়গুলোই কোচরা দেখে থাকেন বলে মনে করি। তাছাড়া লীগের সাতাশটি ম্যাচের ভেতর শতকরা নব্বইভাগ ম্যাচই তো অ্যাটাকিং ফুটবল। কুড়ির বেশি বয়সের

শ্যাম থাপা

ফুটবলারদের আর নতুন করে শেখাবই বা কি?

অরুণ ঘোষের মতে সতিাই এখানে কোচের ভূমিকা বড় দলে বেশ অস্বচ্ছ। দর্শকরা বই বা পত্র-পত্রিকা পড়ে কোচ সম্বন্ধে একটি ধারণা তৈরী করে রেখেছেন। আমরা কিন্তু সেইসব বিদেশী কোচদের মত সুযোগ সুবিধা পাই না যাতে করে আমরাও করে দেখাতে পারি। প্রথমত দল তৈরী করেন কর্মকর্তারা। পরে ডাকেন আমাদের। বিদেশে একটি দীর্ঘদিনের চুক্তি থাকে যাতে করে কোচের পক্ষে ঝাড়াই-বাছাই মাড়াই করে একটি দল তৈরী করে নিতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। তারপর দলটিকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অনেক দলের মুখোমুখি দাঁড় করাবার সুযোগ পান। সোজা কথায় পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একটি লম্বা সুযোগ থাকে। এখানে বৈচিত্র্যপূর্ণ একটি দলকে তুলে দেওয়া হয় কোচের হাতে। পুরো দলটির ত্রুটি-বিচ্যুতি সারিয়ে মাঠে নামাতে গেলে তো বছর পার। এখানে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে দলকে মেরামত করতে হয়। প্রায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আমাদের দায়িত্ব নিতে হয়। অবশ্য এ সব বিষয় জেনেই আমরা দায়িত্ব নিই। ভাল গুণের খেলোয়াড় না থাকলে কারো পক্ষেই কিছু করা সম্ভব নয়। আমার মনে পড়ে ১৯৭৪ এ 'এশিয়ান-ইয়ুথ' আমরা যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। আমি ছিলাম কোচ। আমার সফলতার কারণ হিসেবে বলতে পারি বেশ কিছু ভাল খেলোয়াড়ের সংগ্রহ। পরে এই দলেরই কমপক্ষে আটজন খেলোয়াড় ভারতীয় ফুটবলে স্টার খেলোয়াড় হয়েছে। তাই একথা স্বীকার করতেই হয় ভাল মানের বেশি কিছু খেলোয়াড় ছাড়া বিশ্বের কোন কোচই কিছুই করতে পারবেন না। একটি ভাল ফুটবলের আনুষঙ্গিক অনেক কিছু ভাল বিষয়ের প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গের পরম্পরায় মনে পড়ে যায় প্রয়াত তাত্ত্বিক কোচ বাসার মত মানুষও উত্তেজিত হয়ে

কোচের দায়িত্ব সম্বন্ধে পি· কে· সচেতন কিন্তু কতটা পালন করতে পারছেন তিনি?

বলে ফেলতেন "Frankly, I have never been fussy about systems. They are no guarantee for success. If I have eleven players fit technically sound, imaginative and capable of creativeness in the game each playing with his parter's mind, I shall win with any system.

দীর্ঘদিন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বেশ কিছু সংখ্যার খেলায় অংশ নিয়েছেন এবং খ্যাতনামা ভারতীয় সব কোচের কাছেই শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রসূন

শিবাজী ব্যানার্জী

ব্যানার্জী বলেন, "স্ট্রাটেজি চলে না। বছর দশেক নিজের মনোপ্রসূত ফুটবল খেলে যখন বড় দলের দলে নাম লেখাই তখন প্রায় নিজেরই অজান্তে একটি ঘরানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। স্বাভাবিকভাবেই তারপর কোচ কিছু শেখাতে চাইলেও রপ্ত করব কি ভাবে? মাঠে নেমে সেই নিজের পুরনো খেলাই এসে যায়। খেলে যাই। এ শুধু আমার ক্ষেত্রে নয়, আমাদের বড় দলের প্রায় সব খেলোয়াড়েরই এক সমস্যা। বা এক ধারা বলা যেতে পারে। বেসিক কিছু শেখবার মত মানসিকতাও থাকে না। যখন কোচ বা অভিভাবকের প্রয়োজন বোধ করি তখন আমরা অনাথ থাকি। কোচের কথা উঠলে আমি বলব কলকাতা মাঠে কিছু অচ্যুত ব্যানার্জীর মত কোচের প্রয়োজন। যাঁরা ফুটবলের গোড়াতেই ধরিয়ে দেবেন ত্রুটি বিচ্যুতি। বড়দলের কোচরা পারেন আমাদের টেকনিক্যাল দিক থেকে শুধরে দিতে। নতুন কিছু শেখাতে পারেন না। সম্প্রতি খেলে চলেছেন অভিজ্ঞ সুব্রত ভট্টাচার্যও সম্পূর্ণ সমর্থন করলেন প্রসূনের মতামতকে।

কলকাতা মাঠে যদি টুর্নামেন্ট জেতা দিয়ে সেরা কোচের বিচার হয় তবে শঙ্কর ব্যানার্জীকেই সেই শিরোপা দিতে হয়। ১৯৮১তে কর্মকর্তাদের অনুরোধে শঙ্কর ব্যানার্জী মোহনবাগানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং একের পর এক টুর্নামেন্ট জিতেও ছিলেন। এর থেকে কি প্রমাণিত হয় বড় দলে কেমন কোচের প্রয়োজন? কোচের কি কি যোগ্যতা থাকা দরকার দল চালনা করবার জন্য? সম্প্রতি মহঃ স্পোর্টিং দলের দায়িত্ব পেয়েছেন শিবাজী ব্যানার্জী। তিনিও কিন্তু বেশ কিছু ট্রফি ভরে দিয়েছেন দলের ঝুলিতে। শংকর ব্যানার্জির কাছে প্রসঙ্গটি তুলতে অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন, "একটা দল চালাতে একটা মাথার প্রয়োজন। যার কথা সকলেই মান্য করবে। যিনি খেলা সম্পর্কিত বিষয়গুলোও দেখবেন। যেহেতু ক্লাবের বেশির ভাগ পদই অবৈতনিক তাই কারো পক্ষেই বেশি সময় দেওয়া সম্ভব নয়। এদিকে সভ্যদের কাছ থেকেও বার্ষিক চাঁদা নেওয়া হচ্ছে। তাই তাদেরও একটা জোরালো দাবি থেকে যায়। সেই প্রয়োজন থেকেই যেন আমাদের কলকাতা মাঠের কোচের শুরু। কোচিং এখানে কোথায়? আমরা মুখে আধুনিক ফুটবল বললেও আমরা কি ফুটবল খেলি তা আমরাও জানি। দর্শকরাও জানেন। যাদের আমরা কোচ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকি তাদের এতটুকু ছোট না করে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলতে চাই—তারা তো অনেক আগেই কোচিং ডিগ্রী নিয়েছেন। তারপর আজ এই দ্রুত বিবর্তনের পৃথিবীতে যেখানে বিশেষজ্ঞদের এত গবেষণা এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে সেখানে তার ছোঁয়া কোথায় আমাদের ফুটবলে? আমরা ফুটবলে তো বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অধিবাসী। যেখানে বাস্তব প্রয়োগের ব্যাপার আছে সেখানে বই পড়ে ফুটবল ধরব কি ভাবে? ভারতীয় ফুটবল কি ৪-২-৪ বা ৪-৩-৩ প্রথার বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। প্রথমটি তো ১৯৫৮ সালের, আর পরেরটি ১৯৭০-এর এভারটন দলের লীগের খেলার কাঠামো। এসব তো আজ ফুটবল মিউজিয়ামের সম্পদ। যতই বলুন ভারতীয় কোচেরা ১৯৭০-এর বিশ্বকাপের ৪-৪-২ বা পরবর্তী আরো অনেক ছন্দের সঙ্গীতই তো শুনলাম না ভারতীয় ফুটবলারদের কাছ থেকে। 'লেবেরো' বা অন্যান্য তো সেই হিসেবে একদমই টাটকা। আমাদের কাছে স্বপ্ন। তাহলে দেখা যাচ্ছে এটাই একটা বিতর্কিত বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে কোচের প্রয়োজনীয়তা আছে কি নেই।

অমল দত্ত যখন ১৯৬৩-৬৪-৬৫ ইস্টবেঙ্গল দলকে কোচিং করতেন তখন শেষ বছরে নির্বাচনে জিতে এলেন জে. সি. গুহ। এসেই বলেছিলেন কোচ? কোচের আবার কি প্রয়োজন বড় দলে? স্বাভাবিকভাবেই অমল দত্তের চাকরী নাকচ হল। আবার ইস্টবেঙ্গলের ধারাবাহিক উজ্জ্বলতম দিনের কর্ণধার পি. কে কেও শুনতে হয়েছে তার আর প্রয়োজনীয়তা নেই দলে। পি. কে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পতাকার দড়িতে হাত দিয়ে হুমকি পেয়েছেন। মোহনবাগানের মেম্বারশিপ পাওয়া তার হয়ে ওঠেনি। কর্মকর্তাদের জটিল ভূমিকাও কোচদের নানাভাবে অপ্রস্তুতে ফেলেছে বারবার। এঁরা অধিকাংশই লাখ টাকার প্রাথমিক বিনিয়োগটি করে থাকেন বলেই ময়দানে ভারি গলার আওয়াজ পাওয়া যায় এঁদের। কিন্তু ফুটবল সম্বন্ধে সচেতনতা সর্তকতা এমনকি অভিজ্ঞতাও এত কম থাকে এঁদের যে কারণে ময়দান আরো জটিল থেকে জটিলতর হয়। এখানে চুক্তি অনুসারে পুরো টাকা পেয়েছেন এমন কোচ কেউ নেই। আবার এমন একজন কোচও খুঁজে পাওয়া যাবে না যাঁকে কোন না কোন কর্মকর্তার কাছে কখনো হেনস্থা হতে হয়নি। যদি প্রকৃতই ফুটবলকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে কোচেদের দিয়েই উন্নতি করাবার স্বপ্ন ভারতীয় ফুটবলের মাথারা ভেবে থাকেন তবে তাঁদের এও ভাবতে হবে কিভাবে ভাল কোচও তৈরী করা যায়। এত বড় একটা দেশে একটা আঙুলের কড়ে গুণে ফেলা যায় সব ভাল কোচদের (?) এন. আই. এস থেকে যাঁরা কোচিং পাস করেন তাঁরা আবার এমনই সব প্রত্যন্ত প্রদেশের খেলোয়াড় যাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতার ঝুলিই শূন্য। যদি বাইরে পাঠিয়ে কোচ তৈরী খরচ সাপেক্ষ হয় তবে বলব ফিফার সেই স্যান্ডুইচ পদ্ধতিটাই নেওয়া হোক। একসময় টোকিওতে সেন্টার করে এশীয় দেশগুলোর জন্য কোচ তৈরী করেছিলেন জার্মানির খ্যাতনামা কোচ ক্র্যামার। যাঁর ছাত্ররাই হচ্ছেন—পি. কে, চুনীরা। আমাদের এখানেও এত বড় বড় অট্টালিকা খেলায় তিলক মাথায় এঁটে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই বসান যায়—ব্রাজিল বা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কোচদের নিয়ে কোচ তৈরীর স্কুল। না হলে এই কতিপয় কোচদের ধারাবাহিক প্রাচীনপন্থাই আমাদের দেখে যেতে হবে। অবশ্যই খেলোয়াড় তৈরীর কারখানা খুলেই।

আর্জেন্টিনা জেতার পর মেনোত্তি বলেছিলেন "My talented and intelligent players put paid to the dictatorship of tactics and terror of systems.

সুতরাং আগে রসদ পরে রসুই।

বিশ্বকাপের ফাইনালে এবার হেরে গিয়ে বেকেনবাউয়ার বুক বাজিয়ে বলেছিলেন "I am extremely pleased and happy. বলবার কারণ জার্মানদলের ভাল খেলা। হেরেছেন কিন্তু তাতেও খুশি।

আমাদের ময়দানে আজ কোন কোচ বুক ফুলিয়ে এই কথা কি বলতে পারবেন বড় ম্যাচে ভাল খেলে হেরে যাবার পর। এমন দুটো মাথাওয়ালা কোচ দেখি না আমরা।

সত্যি বলতে কি কোচকে কিছু সজনের ডাঁটা আর সরষে দিয়ে আমরা সকলেই ডাইনিং টেবিলে জাফরান দেওয়া বিরিয়ানীর সৌরভ আশা করি। তাই বলতেই হয় হায় কোচ তোমার প্রয়োজনীয় মালমশলাটুকুর জোগান না দিতে পারি তোমার প্রাপ্য সম্মানটুকু আমরা কেউই দিলাম না—না দর্শক, না খেলোয়াড়, না কর্মকর্তা। তুমি এখনো ময়দানের হরিজন। সব আবর্জনা পরিষ্কার করলেও তুমি অস্পৃশ্য। **শেষ**

ফিরে আসার লড়াই

প্রায় এগার মাস হয়ে গেল সৈয়দ কিরমানি ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়েছেন। আর এক মাস হল বাদ পড়েছেন নিজের রাজ্য দল (কর্ণাটক) থেকে। কর্ণাটকের উইকেটরক্ষার দায়িত্ব বর্তমানে সদানন্দ বিশ্বনাথের হাতে।

মোটামুটিভাবে তাই ধরেই নেওয়া যাচ্ছে কিরমানির টেস্টজীবন শেষ। একথা মেনে নিতে যাঁর সবথেকে বেশি আপত্তি তাঁর নাম সৈয়দ কিরমানি। কিরমানি খুব প্রত্যয়ী ভঙ্গিতে বলেছেন, "এর আগেও দুবার আমাকে ভারতীয় দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। লড়াই করে আবার টিমে ঢুকেছিলাম। এবারও ফিরে

আসব।" কিরমানিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল বহুদিন তো খেললেন। এখন তরুণদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিন না? বেজায় চটে যান কিরমানি, ইদানীংকালে যাঁর মতো ভদ্র ক্রিকেটার আমরা আর দেখিনি। বলেন "বয়েসের সঙ্গে যোগ্যতার কি সম্পর্ক? আমি এখনও যোগ্য তাই বাদ পড়া নিয়ে প্রশ্ন তুলছি। আমি মনে করি আরও কিছুদিন চালাতে পারব। রিটায়ারমেন্টের সময় আসার আগেই যদি আমার ব্যাঙ্ক বলে, অবসর নিয়ে নাও, তাহলে ব্যাপারটা যেমন দাঁড়াবে, আমাকে ভারতীয় দল থেকে সরিয়ে রাখাটাও তাই।"

ওঁরা দশজন

গিনেস বুক অব রেকর্ডসে এ পর্যন্ত দশ ভারতীয় ক্রীড়াবিদ জায়গা পেয়েছেন। এই বইয়ের সর্বশেষ সংস্করণ অনুযায়ী এঁদের মধ্যে আটজন ক্রিকেটার, একজন হকি খেলোয়াড় ও আর একজন বিলিয়ার্ডসের। সুনীল গাওস্করের নাম থাকবে জানাই কথা। টাইগার পতৌদির কনিষ্ঠতম অধিনায়ক হিসাবে (২১ বছর ৭৭ দিন), রবি শাস্ত্রীর ওভারে সর্বোচ্চ সংখ্যক রান (৩৬), যজুর্বেন্দ্র সিং-এর এক টেস্টে সর্বাধিক ক্যাচ (৭), বাপু নাদকার্নির টানা সর্বাধিক সংখ্যক মেডেন ওভার (২১) বল করায়, সি এস নাইডুর এক ম্যাচে সব থেকে বেশি সংখ্যক ডেলিভারি (৯১৭, হোলকার-বোম্বাই, ১৯৪৫) করায়, অংশুমান গায়কোয়াড়ের মন্থরতম ডাবল সেঞ্চুরির অধিকারী হবার সুবাদে (১০ ঘণ্টা ৫২ মিনিট), সি কে নাইডুর প্রৌঢ়তম (৬৮) প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটার হিসাবে এবং গুল মহম্মদ ও বিজয় হাজারের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে চতুর্থ উইকেটে সর্বাধিক রানের (৫৭৭) পার্টনারশিপ রেকর্ড থাকায়। কপিলদেবেরও ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি রেকর্ড হয়ে গেছে। কোন রেকর্ডের জন্য তাঁর নাম এল, বলা নেই। লেসলি ক্লডিয়াসের নাম রয়েছে, হকিতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অলিম্পিক পদক জেতার জন্য (চারটি, তিনটি সোনা, একটি রুপো)। মাইকেল ফেরেরা জায়গা পেয়েছেন অপেশাদার বিলিয়ার্ডসে সর্বোচ্চ সংখ্যক ব্রেক পয়েন্ট (১,১৪৯) করার কৃতিত্বে।

এই তো সেদিন

গাড়ি থেকে নেমে মস্কোর লেনিন অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ঢুকে পড়লেন ওঁরা দুজন। বিশাল অথচ জনশূন্য এই স্টেডিয়ামের সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ারের মনে পড়ে যাচ্ছিল কুড়ি বছর আগের কথা। যখন কালো জার্সি, কালো প্যান্ট, কালো মোজায় সজ্জিত লেভ ইয়াসিনকে কিছুতেই হার মানানো যেত না। যখন অবলীলাক্রমে একের পর এক অবিশ্বাস্য গোল বাঁচাতেন। এমন অসাধারণ ছিল তাঁর ক্ষিপ্রতা ও প্রতিবর্তী ক্রিয়া, নাম হয়ে গেছিল কালো মাকড়শা। এ মুহূর্তে ইয়াসিন হাঁটছেন বেকেনবাওয়ারের কাঁধে ভর দিয়ে। হাতে লাঠি। বছর দুই আগে বুদাপেস্ট যাবার সময় গাড়িতেই সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস হয়েছিল। প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর ডান পাটি কেটে বাদ দিতে হয়। কি মর্মান্তিক! বিশ্বের সর্বকালের সেরা গোলকিপার আর জীবনে কখনও স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারবেন না।

বেকেনবাওয়ার যখন এত সব ভাবছিলেন, আবেগজড়িত কণ্ঠে ইয়াসিন বলে যাচ্ছিলেন, "১৯৭১-এ এ মাঠেই জীবনের শেষ ম্যাচ খেলেছিলাম। ডায়নামো মস্কোর সঙ্গে ওই ম্যাচে খেলেছিল ইউরোপিয়ান ইলেভেন। খেলার পর এক লাখ লোকের অভিনন্দনের মধ্যে ববি চার্লটন, ইউসেবিও, জার্ড মুলাররা আমাকে কাঁধে করে মাঠের বাইরে নিয়ে আসে। জানো ফ্রাঞ্জ, সেদিন কি রকম আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম! মনে হচ্ছিল, ফুটবল আর আমার জীবনে নেই। তাহলে এখন আমি কি করব? আর আমাকে দিয়ে কোন কাজটা হবে?" নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত ইয়াসিন আরও বলছিলেন, "ফ্রাঞ্জ, তুমি সত্যিই অসাধারণ ফুটবলার ছিলে। ছেষট্টির বিশ্বকাপের

সেমিফাইনালে আমাকে যে গোলটা দিয়েছিলে, মনে পড়ে? আমরা হেরে গেলাম ম্যাচটা ১—২।"

উত্তর দেবার মতো মনোযোগী বেকেনবাওয়ার ছিলেন না। বারবার পাশাপাশি বসিয়ে দেখছিলেন সেদিনের আর আজকের ইয়াসিনকে। ভাবছিলেন কি অসাধারণ ফুটবল জীবন! '৫৬তে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নজয়ী দলের সদস্য, '৬০ সালে ইউরোপিয়ান কাপজয়ী টিমের। এ ছাড়া, ১৯৫৮-৭০, টানা চারটি বিশ্বকাপে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। পেয়েছেন ইউরোপিয়ান ফুটবলার অব দ্য ইয়ার সম্মান, সোনার বল পুরস্কার এবং আরও কত, কত কিছু!

হাঁটতে হাঁটতে দু বন্ধুতে ঢুকে পড়লেন স্টেডিয়াম সংলগ্ন স্পোর্টস মিউজিয়ামে। এর পর কি হল বেকেনবাওয়ারের মুখ থেকে শোনা যাক: "বেশ কিছু বাচ্চা বাচ্চা ছেলে সেখানে ঘোরাফেরা করছিল। ইয়াসিনকে দেখেই সবাই থমকে গেল। কেউ অটোগ্রাফের খাতা, কেউ ছেঁড়া কাগজ, যে যা পারল নিয়ে হাজির হয়ে গেল। মুহূর্ত মধ্যে লেভের চারপাশে বিরাট জনতা, অটোগ্রাফ দিতে দিতে লেভ আমাকে দেখাল। বলল, 'একে চেন ও কিন্তু বিরাট ফুটবলার।' সবাই ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে ভাল করে দেখল বটে কিন্তু কেউই চিনল না। বেশ বুঝলাম, আজও লেভের জনপ্রিয়তা আমার চেয়ে দশ গুণ বেশি।"

ছাপ্পান্ন বছর বয়সী ইয়াসিনের গত দু বছরে দুবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। ডাক্তার বলেছেন, মদ, সিগারেট দুই-ই—বিশেষত সিগারেট একদম বন্ধ রাখতে। কিন্তু ইয়াসিন বারণ শুনছেন না, কেন, বেকেনবাওয়ার সবিস্ময়ে জানতে চাইলেন? লেভ বললেন, "আজ থেকে তো নয়, সেই আট বছর বয়েস থেকে সিগারেট ধরেছি। প্রতিটি ম্যাচের হাফ টাইমে পর্যন্ত সিগারেট খেয়েছি—লুকিয়ে বাথরুমে বসে। তাহলে আজ যখন জীবনের শেষ কয়েকটা ম্যাচ খেলছি, তখনই বা সিগারেট ছাড়ব কেন?"

গৌতম ভট্টাচার্য

অসমীয়া গল্পের গতিপ্রকৃতি

উড়িষ্যা এবং আসাম বাঙালীর দুই গাত্রলগ্ন প্রদেশ। অসমীয়া বর্ণমালার সঙ্গে বাংলা বর্ণমালার সাদৃশ্য যেমন প্রায় অক্ষরে অক্ষরে তেমনি ওড়িয়া বর্ণমালার দুর্বোধ্য ফারাক সত্ত্বেও উভয়ে সমভাষী। অথচ এত নৈকট্যও শেষ পর্যন্ত আমাদের পারস্পরিক অজ্ঞতা ও অপরিচয়কে অন্তত সাহিত্যের ক্ষেত্রে দূর করতে পারেনি।

জাতীয় সংহতি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একদিন আমরা 'আসাম উৎকল বঙ্গ'-কে শুধু এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণই করিনি, ধর্ম সাহিত্য সংস্কৃতির ত্রিমাত্রিক জীবনে এই ত্রিভূমিখণ্ডকে একাত্ম করেও নিতে পেরেছিলাম। বাঙালীর বিশ্বাসের মধ্যে, ভালোবাসার মধ্যে, নিরন্তর চলাচল এবং বসবাসের ভেতর দিয়ে যখন প্রায় এক নিঃশ্বাসে এক মৃত্তিকায় পরিণত হতে চলেছিল ঠিক তখনই প্রশাসনিক রাজনীতির অনুপ্রবেশে মানুষের ঐক্যান্তিক মূল্যবোধ বিপর্যস্ত হয়ে গেল। উড়িষ্যা এবং আসাম বাঙালীর দুই গাত্রলগ্ন প্রদেশ। অসমীয়া বর্ণমালার সঙ্গে বাংলা বর্ণমালার সাদৃশ্য যেমন অক্ষরে অক্ষরে, তেমনি ওড়িয়া বর্ণমালার দুর্বোধ্য ফারাক সত্ত্বেও উভয়ে সমভাষী। তাদের লেখ্যরূপকে ডিঙিয়ে শব্দরূপ মৌখিক সমতায় পৌঁছেছে। এত নৈকট্যও শেষ পর্যন্ত আমাদের অজ্ঞতাকে, পারস্পরিক অপরিচয়কে অন্তত সাহিত্যের ক্ষেত্রে দূর করতে পারেনি। এই পাশাপাশি সাহিত্যচর্চার আজ আমরা সামান্যই খবর রাখি। এক নজরে দেখলে, স্বাধীনতা উত্তর অসমীয়া গল্পের সামগ্রিক গতিধারাটি যদিও বাস্তববাদ ও পশ্চিমী নবচেতনার দ্বারা নির্দিষ্ট, তবু প্রাচীন-অবচীন, আদর্শ ও বাস্তবের সংঘাত এখনো বিদ্যমান। এই সংঘাতের ফলে অসমীয়া গল্পসাহিত্যে এক নতুন রোমান্টিক ধারণারই পুনরুজ্জীবন ঘটেছে বলে মনে হয়। জীবনের মৌল সমস্যাবলী এবং চলমান সংগ্রামের দিকেও তাঁদের লক্ষ্য ছিল। ছিল বলেই একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন অনিবার্য হয়েছে প্রেমের উপলব্ধির ক্ষেত্রে। ইতিপূর্বের ধ্যানধারণা, মধ্যযুগীয় সংস্কার ও ভক্তিমার্গ থেকে প্রেম সরে এল মনস্তত্ত্বে, মনোবিকলনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে। ফ্রয়েড লরেন্স মোরাভিয়া প্রমুখের রচনার ও চিন্তাধারার প্রভাব পড়ল অসমীয়া প্রেমের গল্পে। স্থানকালের খণ্ড পরিধির মধ্যে জীবনপ্রবাহের আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণ গল্পের প্রোফাইল বদলে দিল। তার আঙ্গিক বিবর্তন ঘটল।

কিন্তু আসামের জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে এই নব্যচেতনার, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের দ্বন্দ্ব থেকেই জন্ম হল রোমান্টিক রিয়্যালিজমের। 'আবাহন'-এর যুগটা যদি প্রধানত নান্দনিক অন্বেষণের যুগ হয়ে থাকে তাহলে 'রামধেনু'-র যুগটা অবশ্যই বাস্তবতা অনুসন্ধানের যুগ। 'আবাহন' যুগের অসমীয়া গল্প সাহিত্যে মোপাসাঁর প্রভাব অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। রোমান্টিক প্রেমের উচ্ছলতা, নরনারীর দ্বৈত জীবনের ভাবাবেগ ও দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে প্রচুর গল্প লেখা হয়েছে এইসময়। ব্যতিক্রমও ছিলেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন, যাঁরা বৈজ্ঞানিক বাস্তবতাকে স্থান দিয়েছিলেন তাঁদের গল্পে।

পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্নীতি, ভণ্ডামি ও অবিচার ক্রমশ বাড়তে থাকে। ফলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আবেগ-উচ্ছ্বাস ক্রমশ ফিকে হয়ে আসতে থাকে। রূঢ় বাস্তবে জীবনের এই মোহভঙ্গ এক শ্রেণীর লেখককে অন্যভাবে ভাবতে শেখালো। এর ফলে প্রচলিত বৃত্তের বাইরে ছোটগল্পের ব্যাপ্তি ঘটল ষাটের দশকে পৌঁছে। আসামে তৈল শোধনাগার আন্দোলন, রাজ্যভাষা আন্দোলন, ব্রহ্মপুত্রের দলং নির্মাণের আন্দোলন, চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ—ইত্যাকার ঘটনাসমূহ গভীরভাবে ছায়াপাত করল আর্থরাজনৈতিক-সামাজিক জীবনে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই সমাজবাদী চিন্তার বিকাশ ঘটতে থাকল পাশাপাশি। মার্কস থেকে মাও সে তুং পর্যন্ত চিন্তানায়ক রাষ্ট্রনায়কদের চিন্তা ও কর্মধারা তরুণ লেখকদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করল। গণসাহিত্যে দলিত পীড়িত শোষিতের প্রতি সহানুভূতি এবং পুঁজিবাদী শাসক, শাসনযন্ত্র ও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধ তীব্র হয়ে উঠল। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও মানসিক অস্থিরতা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। সাহিত্যে আবার ঐতিহ্য বিরোধ দেখা দিল এর ফলে।

ষাটের দশকে প্রতিবাদী লেখক হিসেবে প্রথমেই যাঁর নাম মনে আসে তিনি অরুণ গোস্বামী। ক্রোধ ঘৃণা বিদ্বেষের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সমাজবাদের চিন্তা বয়ে আনলো তাঁর গল্প। অরুণের পাশাপাশি দেখা দিলেন কুমুদ গোস্বামী, পোলেন বরকটকী, পূরবী তামুলি, ভগবান শর্মা, মীনাক্ষী চৌধুরী, হরেন্দ্রকুমার ভুঞা, গায়ত্রী কৌঁয়র, ভূপেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, যমুনা শর্মাচৌধুরী, ভূপেন শর্মা, মিনতি চৌধুরী প্রমুখ লেখক-লেখিকা। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্যান্যদের চিন্তাগত একটা মানসিক দূরত্ব থেকে গেলেও মোটামুটি ষাটের দশকে এঁরাই তরুণ নক্ষত্র। এই দশকের শেষ দিকে ১৯৬৯ নাগাদ সমাজবাদী চিন্তার আর এক জোয়ার অনুভব করা গেল। এর উদ্দীপন ঘটল নকশালবাড়ি আন্দোলন থেকে। স্বল্পকালের মধ্যে এই আন্দোলন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। এরই প্রতিক্রিয়ায় একঝাঁক তরুণ লেখক লেখিকার আবির্ভাব। সত্তরের দশকে প্রাচীনপন্থী মানবিক সম্পর্ক ও মূল্যবোধের প্রতি অবজ্ঞার পাশাপাশি গল্পে এল সামাজিক পরিবর্তনের জন্য বিপ্লবের আর বিদ্রোহের উপলব্ধি। উদয়াদিত্য ভরালী, দেবব্রত দাস, প্রণতি গোস্বামী, তোষেশ্বর চেতিয়া, আনন্দ গোস্বামী, রত্নেশ্বর মেধি, বিপুল খাটনিয়ার, অরূপা পটঙ্গীয়া, কমলা বরগোহাঁই, সত্যসুন্দর বরুয়া, ভূপেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, বিরিঞ্চিকুমার মেধি, ভুবনচন্দ্র কলিতা, শৈলেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রকুমার বরগোহাঞি, রবীন্দ্রচন্দ্র শর্মা, ভুবনমোহন মোহন্ত, জয়ন্ত বরপি, মদন শর্মা, জিতেন শর্মা, কৌস্তুভমণি শইকীয়া, হেমন্ত বর্মণ, বিজয়শংকর, রিজু হাজরিকা প্রমুখের রচনায় ব্যক্তিগত সমস্যাকে সামাজিক সমস্যা ও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার পটভূমিতেই বিচার্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

ষাট এবং সত্তরের দশকের গল্পকারদের মধ্যে বিশিষ্ট অরুণ গোস্বামী, পোলেন বরকটকী, কুমুদ গোস্বামী, উদয়াদিত্য ভরালী, প্রণতি গোস্বামী, ভগবান শর্মা, আনন্দ গোস্বামী, অরূপা পটঙ্গীয়া, দেবব্রত দাস এবং রবীন্দ্রচন্দ্র শর্মা এই আশীর দশকেও দাপটের সঙ্গে লিখে যাচ্ছেন।

বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। শুধু একটা কথাই পরিশেষে বলা যায়। সমাজ চেতনাই সাহিত্যের একমাত্র এবং প্রকট লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। সাহিত্যে ব্যক্তিমনের ভাবানুভূতি, অন্তর্দ্বন্দ্ব, মানব চরিত্রের বৈচিত্র্যের সন্ধান, জীবন ও জগতের অপার রহস্যের সন্ধান, প্রেম প্রকৃতি জন্ম-মৃত্যুর ভাবনাও প্রতিফলিত হওয়া দরকার। অভিজ্ঞতার জগৎ এবার সম্প্রসারিত হওয়ার সময় এসেছে। শুধু মতবাদের গণ্ডী আঁকড়ে না থেকে জীবনের নব নব উপলব্ধিকে সমাজচেতনার প্রসারণে যুক্ত করা প্রয়োজন।

সংক্রান্ত সংবাদ

রাশিয়ায় আজকের লেখক কবি এবং নাট্যকাররা কি ভাবছেন কি করছেন সে বিষয়ে আমরা খুব সামান্যই অবহিত। ইংরেজীভাষী দুনিয়ায় রুশসাহিত্য পড়ার সুযোগ খুব বেশী ঘটে না, যেটুকু বা সেখানে পৌঁছায় তাও বাসী খবরের মত, হালফিলের নয়। সুখের বিষয় নিশীথেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে রুশ ভাষাবিদ্ এক প্রবীণ ভদ্রলোক দীর্ঘ পরিশ্রমে 'এ শর্ট হিস্টরী অব সোভিয়েট লিটারেচার' শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য রচনা, লেখালেখি, আন্দোলন এবং বিভিন্ন প্রতিভার সরাসরি মূল্যায়ন রয়েছে এই গ্রন্থে। ১৯১০ থেকে ১৯৭০, এই দীর্ঘ ষাট বছরে সোভিয়েত ইউনিয়নে রচনাধারায় যে যুগান্তর ঘটে গেছে তার সুচিন্তিত সমীক্ষা করেছেন লেখক। গ্রন্থটি আশু প্রকাশিতব্য। যাঁরা রুশ সাহিত্যে কৌতূহলী তাঁদের কাছে সাহিত্যের হ্যাণ্ডবুক-এর মতো অনেক অজ্ঞাত তথ্যের দিশারী হবে এই গ্রন্থ।

॥ ২ ॥

ভারতের অন্যতম শিল্পপতি শ্রীমাধবপ্রসাদ বিড়লা অর্ধশতাব্দীরও বেশী কাল যাবত বাণিজ্য জগতের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত থাকার পর সম্প্রতি তাঁর মনোযোগ সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষেত্রে নিবদ্ধ করেছেন। জীবনের গোধূলিপর্বে এসে, তাঁর এই আত্মিক পরিবর্তনের পিছনে তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা বিড়লার নিরন্তর অনুপ্রেরণা যে অনেকখানি কাজ করেছে তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর অর্জিত অর্থের সিংহভাগ তিনি যে নতুন প্রকল্পে ব্যয় করতে উদ্যত হয়েছেন তার উদ্দেশ্য মানুষের আধ্যাত্মিক ও মানসিক উন্নতিবিধান। সম্পূর্ণ ব্যবসায়িকতা নিরপেক্ষ হয়ে এই নবগঠিত বিড়লা ফাউণ্ডেশনের গবেষণ ও প্রকাশন বিভাগ দুটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়েছেন প্রকাশনার ক্ষেত্রে। তাঁরা আপাতত হাত দিয়েছেন 'এনসাইক্লোপিডিয়া এশিয়ানা' এবং পঞ্চাশটি খণ্ডে বিভক্ত 'ক্ল্যাসিকস অব দি ঈস্ট' সিরিজে। এই প্রাচ্য মহাদেশের বহু শতাব্দীর অমূল্য সম্পদ, বহু অসামান্য মনীষা ও প্রতিভার অবিস্মরণীয় রচনাবলী সুযোগ্য পরিবেশনের অভাবে বিশ্বলোকচক্ষুর সামনে পৌঁছাতে পারেনি এতদিন, সেই অভাব মোচনের সশ্রদ্ধ প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছে এই প্রতিষ্ঠান। আমরা এই মহৎ ও বিশাল উদ্যোগের সাফল্য কামনা করছি। এশিয়ার বিভিন্ন ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এই মেলবন্ধন, কেবল অভ্যন্তরীণ ঐক্যকেই সূচিত করবে না, পূর্ব এবং পশ্চিমকেও মানসিক নৈকট্য দেবে আশা করা যায়।

প্রয়াণ

এই দুঃসংবাদের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না'। বাংলা সাহিত্যের এক সুহৃদ এবং মজ্জায় মজ্জায় এক কবি অকালে হঠাৎ চলে গেলেন। কল্যাণ সেনগুপ্তর জন্ম ১৯২৯ সালের মে মাসে। ১৯৮৬র ৪ নভেম্বর তাঁর জীবন অবসান ঘটল। এই কবির শৈশব দিনাজপুরে, কৈশোর কাটিহারে এবং যৌবন কেটেছিল কলকাতায়। সাম্মানিক ইংরেজীর স্নাতক, এম এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েও শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। রেলবিভাগে কেরানীর চাকরিতেই তাঁর প্রবসী জীবন কেটে গেল। যতদূর মনে পড়ে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল 'পূর্বাশা' পত্রিকায়। এবং কাব্য রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ওই সূত্রেই। পরে 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম জীবনে বহু লেখা লিখেছিলেন। তাঁর কবিতা তখন উত্তরসূরি প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হত। কী অজ্ঞাত কারণে জানি না, পঞ্চাশের দশকের পর তিনি এক রকম হারিয়েই গিয়েছিলেন সাহিত্য থেকে। দীর্ঘ বিরতির পর আবার তাঁর প্রত্যাবর্তন 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৭৮ সালে। এবার শুধু কবি হিসাবেই নন, গ্রন্থ সমালোচনায়ও হাত দিয়েছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। অমায়িক, অধ্যবসায়ী পড়ুয়া এবং বন্ধু বৎসল খাঁটি মানুষ ছিলেন কল্যাণ। শেষ দিন পর্যন্ত বাংলা কবিতার প্রতি তাঁর ছিল গভীর ভালোবাসা এবং যৌবনকালীন আবেগ। ১৯৮৩ সালে হঠাৎই মায়োপ্যাথী রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর বাঁ পাটি শুকিয়ে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। এই অবস্থায়ও মাঝে মাঝে কাটিহার থেকে ছুটে এসেছেন আমাদের কাছে, 'দেশ' পত্রিকার অফিসে। ১৯৮৫-র মার্চ মাস থেকে দীর্ঘ আড়াইমাস ছিলেন কলকাতার হাসপাতালে। কলকাতার সঙ্গে সেই তাঁর শেষ যোগাযোগ।

কল্যাণ সেনগুপ্ত

পঞ্চাশের দশকের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় কবি চলে গেলেন। পত্রপত্রিকায় ছড়ানো কবিতাবলী ছাড়া আর কোন স্মৃতি চিহ্নই রেখে গেলেন না আমাদের হাতে। একটি কাব্যগ্রন্থও না।

চিত্রসাংবাদিকতা

পত্র-পত্রিকায় স্টিললাইফ হয়ে একদা শোভাবর্ধন করতো যে ফটোগ্রাফী, পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিছুকাল তার অনুবর্তন করলেও শেষ পর্যন্ত তার লেজুড় হয়ে থাকেনি। কাহিনীচিত্রে কি বিজ্ঞাপনে কিংবা সংবাদ পরিবেশনে ফটোগ্রাফী এক নতুন ধারা এবং ধারণার সূত্রপাত করেছে আজকের দুনিয়ায়। একই সঙ্গে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জনের সার্থক এবং প্রভাবশালী মাধ্যম বর্তমানে এই চিত্র-সাংবাদিকতা। ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে আলোকচিত্র জয়ী হয়েছে। ফটোগ্রাফী তার নিজস্ব ভাষাটি শিখে নেবার সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে গেছে চিত্রকলায়। শিল্পরূপের ভাস্কর্যে। যুগবদলের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নিরন্তর আগ্রহ জাগ্রত হয়েছে তার প্রতি।
অথচ দুঃখের কথা, হয়তো লজ্জারও কথা এই যে, বাংলা ভাষায় ফটোগ্রাফীর কোন নিজস্ব কাগজ ছিল না এত দিন। ইংরেজী ভাষায় একাধিক পত্র-পত্রিকা বিলুপ্ত হয়ে যাবার পরে এ দেশে এখনো 'ভিউ ফাইন্ডার' চলেছে, হয়তো চলবেও। কিন্তু বাংলায়? সম্প্রতি কলকাতায় শোভাবাজার অঞ্চল থেকে অতনু পালের সম্পাদনায় 'ফটোগ্রাফী' মাসিকপত্রটি সে কলঙ্ক মোচন করে আত্ম প্রকাশ করেছে। এই অনাড়ম্বর কাগজটি যদিও এখনো একেবারেই প্রাথমিক স্তরে রয়েছে এবং যদিও তার জন্ম-পত্রিকায় আয়ুঘটিত লিখন এখনো অজ্ঞাত তবু তার যে সম্ভাবনা আছে এ কথা বলা যায়। ক্ষেম

আলোকচিত্র যেমন শিল্পকলা হয়ে উঠেছে তেমনি হয়ে উঠেছে বাঙ্ময় ভাষাচিত্র। এখন সাংবাদিকতার প্রায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গই নয়, চিত্র এখন স্বয়ম্ভর সাংবাদিকতা। চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জনে তার অগ্রভূমিকা। বাংলা প্রবাদবচনটিকে ঘুরিয়ে বলা যায়, কলম ক্যামেরা মন, লেখে তিন জন। স্বাগত এই ত্র্যহস্পর্শ।

আনো
লাবণ্য
এনটাইস্®
১০০% পলিয়েস্টার, পলিয়েস্টার ব্লেণ্ডস আর
সূতীর পোষাক তৈরী করার বস্ত্রসম্ভার।
সুরুচিপূর্ণ। সহজ সাধ্য দামে।
ন্যাশন্যাল
টেকসটাইল
কর্পোরেশন
(তামিলনাড়ু ও পন্ডিচেরী)
লিমিটেড
ভারত সরকারের একটি সংস্থা
১০/৬৪, সোমসুন্দরম্ মিল রোড, কোয়েম্বাটুর-৬৪১০০৯
MCA:NTC:117 Ben

সংগীত

ওপারের মহ্‌ফিলে

"আপনি বাঙ্গালি ও গুণী। আপনার মতো গুণী এখনকার দিনে খুবই বিরল। আপনার শিক্ষাদানে ও সাহচর্যে যদি আধুনিক শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে একটা সঙ্গীতের সাড়া জেগে ওঠে ও সেই প্রেরণাকে ভিত্তি করে যদি তারা নিজেদের গড়ে তোলবার একটা সুযোগ পায়, তাহলে এর চেয়ে বাঞ্ছনীয় আর কি হতে পারে ? শ্রীমান সুরেশ একজন সত্যিকারের শিক্ষিত যুবক ও সঙ্গীতরসপিপাসু। আপনার কাছে শেখার সৌভাগ্য হলে তাঁর আশা পূর্ণ হবে এই আমার ও তাঁরও বিশ্বাস। আপনার শেখানো সম্ভব হলে আমি যার পর নাই বাধিত ও আনন্দিত হবো।"

কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কাছে এ-চিঠিটি লিখেছিলেন স্বয়ং ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। তিনি তখন পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ আশ্রমে থাকেন। আর যাঁর সম্পর্কে এই চিঠি, তাঁর নাম সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। ভীষ্মদেবের অন্যতম প্রধান ও প্রিয় শিষ্য। গুরুর অবর্তমানে যাতে শিষ্যের সাংগীতিক তালিম অব্যাহত থাকে, তাই এই চিঠি।

প্রায় কৈশোরেই ভীষ্মদেবের কাছে নাড়া বেঁধেছিলেন সুরেশচন্দ্র। জন্ম পূর্ব বাংলার কুমিল্লায়, ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে। শিল্প, সঙ্গীত ও পাণ্ডিত্যের এক ঐতিহ্যমণ্ডিত পরিবারে। তদুপরি কুমিল্লায় তখন বহু স্বনামধন্য সংগীতশিল্পীর বাস। শৈশব থেকে কৈশোর পর্যন্ত তাই সুরেশচন্দ্র কাটিয়েছেন বড় ধরনের সাংগীতিক বাতাবরণের মধ্যে।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

কলকাতায় এসে ভীষ্মদেবের শিষ্যত্ব নেন ১৭/১৮ বছর বয়সে। সেই সূত্রেই খলিফা বদল খাঁ সাহেবের সাহচর্য লাভ করার সুযোগ পান। 'সুধাসাগরতীরে' নামের গ্রন্থে ('দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত, পরে আনন্দ পাবলিশার্স কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) বদল খাঁ সাহেবের শিক্ষাশৈলী ও চরিত্র সম্পর্কে একটি নিখুঁত আলেখ্য রচনা করেছেন সুরেশ চক্রবর্তী, একই সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন বিগত পঞ্চাশ-ষাট বছরের বাংলা সংগীতধারার একটি রসঘন, অনুপুঙ্খময়, অজ্ঞাত ইতিহাস। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের সংগীতজীবন সম্পর্কেও যাবতীয় কিংবদন্তী ও জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে তাঁর প্রধানতম শিষ্য নিত্যসঙ্গী সুরেশ চক্রবর্তী রচনা করেছেন একটি মর্মস্পর্শী, তথ্যনির্ভর, ঘটনাঘন, অন্তরঙ্গ ইতিহাস। 'দেশ' পত্রিকার 'বিনোদন'-সংখ্যায় (১৩৮৭) মুদ্রিত হয়েছিল সেই 'স্মরণ-বেদনার বরণে আঁকা' নামের অনন্য রচনাটি। নানা ঘরানার সংগীতের বিদগ্ধ পুরুষ ও সংগীতশিল্পীর সাহচর্যে এসেছেন সুরেশচন্দ্র। উর্দু ও আরবীর উপর ভাল দখল ছিল। কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে 'গুড-ইয়ার টায়ার্স' সংস্থার দায়িত্বপূর্ণ পদে। কর্মজীবনের চাপে প্রকাশ্য অনুষ্ঠান থেকে বহুকাল অন্তরালেই থেকেছেন। তবে অনুশীলন বন্ধ হয়নি। ভীষ্মদেবের অনুপস্থিতিতে তাঁর বাড়িতে গান শেখানোর দায়িত্বও নিয়েছেন একসময়। খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী ছায়া দেবীও তাঁর কাছে গান শিখেছেন। 'সুধাসাগরতীরে' গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন সংগীতগুরু ভীষ্মদেবের উদ্দেশে। সে-গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছিলেন : "মাঝে মাঝে মনে হয় মহফিলটা বোধ হয় ওপারেই ভালো জমেছে— মধ্যমণি বদল খাঁ সাহেব,—প্রাণপ্রিয় শাগির্দ ভীষ্মদেব, অমিয়নাথ, হরিচরণবাবু, ব্রজেনবাবু—এঁরা বেশ আসর জমাচ্ছেন।"

সেই আসরেই যোগ দিতে বুঝি চলে গেলেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। ২১ নভেম্বর, সকাল ৮-২০-তে। এপারে রেখে গেলেন স্ত্রী, একপুত্র ও এক কন্যা। এ-ছাড়াও অসংখ্য গুণমুগ্ধ এবং সুরদীক্ষিত ঘনিষ্ঠ শিষ্য-শিষ্যা।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

লাজুক তরুণের মিষ্টি ভায়োলিন

সঙ্গীত প্রতিযোগিতার সার্থকতা এই যে কিছু নতুন শিল্পীর সন্ধান আমরা পাই। ক্যালকাটা স্কুল অফ মিউজিকের অল ইণ্ডিয়া ভায়োলিন প্রতিযোগিতা শেষ হল ১২ নভেম্বর। সেদিন সন্ধ্যায় সাড়ে হলে বাজালেন বম্বের যোসেফ পিণ্টো—প্রথম পুরস্কার বিজয়ী। তাঁর সঙ্গে পিয়ানোয় ছিলেন ডাক্তার মিস ই. ভারুচা। তিনিও বম্বের। কলকাতার জ্যোতিশঙ্কর রায় পেলেন দ্বিতীয় পুরস্কার। সেদিন তাঁর বাজাবার কথা ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ফ্লু হবার জন্য হলে উপস্থিত থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পিণ্টোর হাত বেশ পাকা। তার হাতে সেদিন আমরা শুনলাম সেজার ফ্রানকের সনাটা। এই সনাটা ঠিক একশ বছর আগে লেখা। অসামান্য সুরের তরঙ্গে ভরপুর। পিণ্টো ও ভারুচা এই সনাটা বেশ নিখুঁতভাবে পরিবেশন করলেন। যদিও ভায়োলিন সনাটা, কিন্তু পিয়ানোর এতে অনেক সুন্দর সুন্দর কারুকার্যে ভরা সুরের অবদান আছে। ভারুচার বাজনা পরিষ্কার এবং সুরেলা। পিণ্টোর ভায়োলিন আমার বেশ নিটোল, ও সুরেলা লাগল। তাছাড়া বয়স অল্প হলেও, পিণ্টোকে হল ভর্তি লোকের সামনে বেশ সপ্রতিভ লেগেছে। ফ্রানকের সনাটার পরে তিনি সিবেলিয়াসের যে রোমান্স বাজালেন তাতে আমরা পিণ্টোর আর এক অন্য রূপ পেলাম। এই কাজটি সিবেলিয়াস ১৯১৫ সালে লেখেন। স্তব্ধ নিবিড় রাতের এক করুণ রূপ এই রোমান্সের মধ্যে আমরা পাই। এই কাজটিকে কোন কোন সময় নকটারনোও বলা হয়। সব শেষে পিণ্টো বাজালেন বেলা বারটোকের রুমানিয়ান ডান্স। বারটোকের এই রুমানিয়ান ডান্স ভায়োলিন বাদকদের অত্যন্ত প্রিয় কাজ। এর মধ্যে বেশ জিপসি ভাব আছে, এবং কিছু কিছু জায়গায় ডানসের চেয়ে ক্লাসিকাল সনাটার ধাঁচ খুঁজে পাওয়া যায়। জোসেফ পিণ্টো খুব লাজুক ছেলে। কিছুতেই আমায় ছবি দিল না। ছবি তোলার কথা তার মনেই হয়নি। তার একটাই লক্ষ্য ভায়োলিন। তার বাজনা আমরা আবার শুনবো।

কিশোর চট্টোপাধ্যায়

নজরুল সন্ধ্যা

সম্মেলক একটি গানে গীতবীথি-র নজরুল সন্ধ্যার সূচনা কলামন্দির (বি) মঞ্চে। নজরুল সন্ধ্যা, সুতরাং নজরুল রচনা পরিবেশনারই আয়োজন। প্রথমে নজরুলগীতি শোনালেন হাসি গুপ্ত রায়। কণ্ঠের আওয়াজ কিরকম এবং তা সুরে কিনা তাই প্রাথমিক বিচার্য বিষয় একজন সংগীত শিল্পীর ক্ষেত্রে। তারপর আসে অন্যান্য সাংগীতিক গুণাবলী। হাসি গুপ্ত রায়ের কণ্ঠ তেমন আকর্ষক নয়, সুরে গলা অথচ, সুতরাং তাঁর সংগীত পরিবেশনে একটা সীমাবদ্ধতা থেকেই যায়। নিষ্ঠার পরিচয় থাকা সত্ত্বেও তাঁর গান সম্পর্কে 'মন্দ নয়' এ-কথাটিই নির্বিবাদে বলা যেতে পারে।

বয়স ক্রমশ মানুষকে জীর্ণ করে ক্লান্ত করে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে হারও মানে। ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের কাছে বয়স নতজানু। এই প্রবীণ বয়সেও তাঁর গানে এক আশ্চর্য সতেজতা আর প্রাণের স্পর্শ। নজরুলগীতি মানেই শুধু অলংকরণেরঅমিত বাহুল্য নয়, কেবল সুরের খেলা নয়। এ-কথাই উপলব্ধ হয় শ্রীমিত্রের শীলিত সংযমী গায়নে। এবং এই সংযত গায়ন নজরুলগীতি শিক্ষার্থী শিল্পীদের অবশ্য শিক্ষণীয় বলাই বাহুল্য। বহুশ্রুত গানও নতুন হয়ে ফিরে আসে তাঁর সযত্ন পরিবেশনে। যন্ত্রানুষঙ্গে তালবাদ্যে একেবারেই অল্পবয়সী শঙ্খ

ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

মিত্রের ভূমিকা চমকপ্রদ। চর্চা অব্যাহত রাখলে সামনে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

অনুষ্ঠানের শেষার্ধে কয়েকটি নজরুলগীতির নৃত্যরূপায়ণ। নির্বাচিত গানগুলির মধ্যে কোন ভাবের সাযুজ্য ছিল না। 'ফুল ফাগুনের'—এই সমবেত গানটি ও সঙ্গে দ্বৈত নৃত্যটি (প্রীতম রায়, পামেলা দত্ত) উল্লেখযোগ্য। 'নিশিরাতে রিমঝিম' গানের নৃত্যরূপায়ণে শ্রবণা নাথ মন্দ নয়। অরূপ মজুমদারের কণ্ঠে 'সৃজন ছন্দে' চলনসই। নৃত্য-পরিচালনা প্রীতম রায়ের। সংগীত পরিচালনা করলেন হাসি গুপ্ত রায়।

আমরা কোথায় চলেছি

সারাদিন, সারাসপ্তাহ পরিশ্রম, তাই চাই একটু চিন্তাহীন আমোদ-প্রমোদ : এইরকমই মনোভাব শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষজনের। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমোদ-প্রমোদটা গিয়ে ঠেকে বিভিন্ন ভাষাভাষী সিনেমার রগরগে খুন-দাঙ্গা শরীরী প্রেমের জোলো প্যাচপ্যাচে কাহিনীতে, নায়ক-নায়িকার কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি সহকারে নিম্নমানের গানে কিংবা শ্যামবাজারী ব্যবসায়িক থিয়েটারে। শিক্ষাগত ক্ষেত্রে, বৃত্তিগত ক্ষেত্রে সফল মানুষজনেরও অনেকেই এই গড্ডলিকা প্রবাহে। আমরা এখন রীতিমত আধুনিক। যে-সব সিনেমা কমবয়সীরা আগে লুকিয়ে চুরিয়ে বাইরে সিনেমা হলে দেখত, এখন তা ঘরে আবালবৃদ্ধবণিতা একসঙ্গে উপভোগ করছেন দূরদর্শনের কল্যাণে। আর যা দেখান হয় তার বেশিরভাগই থার্ডগ্রেডের ছবি। এসবেরই স্বাভাবিক প্রভাব পড়ছে আমাদের সামগ্রিক জীবনধারায়—সাংস্কৃতিক চিন্তাধারায়। আমোদ-প্রমোদ ভাল কিন্তু তাতে একটা সুস্থতা সুরুচি থাকবে সেটাই তো কাম্য। এইসব কথাই মনে আসছিল সুজাতা সদনে 'টিউনস' নিবেদিত 'সংগীত ও সুপারসোনিক ইন্টারন্যাশনাল ড্যান্স' অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে। বলাই বাহুল্য, সুস্থরুচির চিহ্ন বিশেষ ছিল না সেদিনের অনুষ্ঠানে। প্রথম পর্বে শান্তনু ও ফিরোজা লায়লার একক ও দ্বৈত কণ্ঠে আধুনিক গান, ছায়াছবির গান। উদ্দাম কর্ণবিদারক যন্ত্রানুষঙ্গ, কিশোরকুমার-অমিতকুমারের গায়নের অনুকরণ, সিনেমার নায়কসুলভ চলাফেরা অঙ্গভঙ্গি এবং অনিবার্যভাবে হাতে মাইক : শান্তনুর অনুষ্ঠানে এই প্রাপ্তি। হাতে মাইক থাকলেও ফিরোজা লায়লা কিঞ্চিৎ স্থির ছিলেন আর অঙ্গভঙ্গিও বিশেষ ছিল না। তবে তাঁর তীক্ষ্ণ কণ্ঠের গানে লতা মঙ্গেশকরকে অনুকরণের ব্যর্থ প্রচেষ্টাই প্রকট। এখন ব্যবসায়িক হিন্দী-বাংলা সিনেমায় নাচ, লাফালাফি, হামাগুড়ি হাত ধরাধরি ইত্যাদি ছাড়া গান জমে না। সেই নাচ হাত ধরাধরি প্রত্যক্ষ করা গেল শান্তনু-ফিরোজা লায়লার দ্বৈত সংগীতে। উপস্থিত পাবলিক যারপর নাই খুশি। এইসব দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে পা ভারি হয়ে উঠেছে—প্রায় ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। সুতরাং দ্বিতীয়ার্ধের 'সুপারসোনিক ইন্টারন্যাশনাল ড্যান্স' দেখার সৌভাগ্যলাভে নিজেকে বঞ্চিত রেখেই প্রস্থান।

একথা ঠিকই যে এসবের পাশাপাশি ক্ষীণকায়ায় বয়ে চলেছে সুস্থ রুচিবান সাংস্কৃতিক এক ধারা, তবু বর্তমান অনুষ্ঠান দেখে এই কথাই স্বতঃ মনে আসে—আমরা কোথায় চলেছি ?

স্বপন সোম

চি ত্র ক লা

পাহাড় ও সমতলের রম্য নিসর্গচিত্র

ভূপাল নিবাসী বাঙালি শিল্পী সুশীল পাল সম্প্রতি আকাদেমীতে ১৯৩৮ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত তাঁর আঁকা অনেকগুলি নিসর্গদৃশ্য,প্রতিকৃতি আর ড্রয়িঙের একটি প্রদর্শনী করলেন। ভূপাল ও র'াণাঘাটের গ্রামীণ শোভা, সিমলা ও পাঁচমারীর পাহাড়ী অঞ্চল শিল্পীর নিসর্গদৃশ্যের বিষয়। অস্বচ্ছ জলরঙে আঁকা ছবিগুলির আয়তন প্রায় দেশ-এর মলাটের মত। দ্রুত তুলির টানে ডিটেলের বাহুল্য বর্জন করে নয়নাভিরাম বর্ণপ্রলেপে আকাশ প্রান্তর, গাছপালা ঘরবাড়ি পাহাড় এবং কদাচিৎ, মানুষজনের সরলীকৃত অবয়ব পটে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে নিসর্গরূপ রচনা করেছেন শিল্পী। ষাটের দশকে আঁকা এই সব নিসর্গ দৃশ্যে শিল্পীর লক্ষ্য প্রকৃতিকে দৃষ্টিরম্য করে চিত্রিত করা। উঁচুনীচু মালভূমি আর গাছপালা ঘরবাড়ি সংলগ্ন নীচু দিগন্তের বিস্তারে রমণীয় ভূপালের একটি নিসর্গচিত্র (২৭) দেখে ফরাসী প্রাক-ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পী কোরোর ওয়াইনডিং পাথের কথা মনে আসতে পারে যদিও আলোচ্য ছবিতে রঙের ছায় বৈচিত্র্য নেই ফরাসী ছবিটির মত। ইমপ্রেশনিস্ট ও তার পরের শিল্পীদের,যেমন সেজানের,আঁকা নিসর্গচিত্র মনে আসে কোন কোন ছবি দেখে। আবার কোনটিতে গোপাল ঘোষকে খুঁজে পাওয়া যাবে (২০)। গাঢ় নীল রঙে তুলির ছোট ছোট চৌকো টানে গড়ে উঠেছে পাহাড়ের ছবি সিমলার নিসর্গ দৃশ্যে (৩৩, ৩৪)। প্রাকৃতিক অবয়ব নিয়ে একটি প্যাটার্ন রচনার ঝোঁক আছে দুটি প্রদর্শেই। দুটি দৃষ্টান্তে (২৫, ৩১) মনোজ্ঞ পটবিভাজনে অবয়বকে

ভূপালের নিসর্গদৃশ্য—সুশীল পাল

...ভাবে সরল করে ...নার সুন্দর প্রবণতা লক্ষ করা ... দৃষ্টান্তে ছবিকে ঝলমলে করে ...চোখ ভোলানোর প্রয়াস ... এইসব ছবিতে শিল্পী সোচ্চার ...ঙের ব্যবহার করেছেন ...রে, ফলে ছবিতে এক ...শিত রম্যতা এসেছে (১২, ২২, ...১৮) —প্রকৃতির নিজস্ব সৌন্দর্য ... অনুভবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ...শিত হয়নি। ২৪, ২৮, ২৯, ৩০ ...দর্শগুলি উঁচুদরের পোস্টার বলে ...হতে পারে। ৩২ নং ছবিতে ... অন্ধকারের ব্যঞ্জনা দর্শককে আকৃষ্ট করে।

বিভিন্ন মাধ্যমে আঁকা প্রতিকৃতি গুলিতে প্রকরণ নৈপুণ্যের পরিচয় আছে। যদিও সাদা ক্রেয়নের রেখার বাহুল্য দু'একটি দৃষ্টান্তে না থাকলে ভাল হত। স্বচ্ছন্দ তুলির টানে জলরঙে আঁকা একটি সপ্রতিভ বালকের ছবি এবং প্যাসটেলে আঁকা একটি বালিকার সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মুখ শিল্পীর প্রতিকৃতি রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কনটিতে আঁকা নারী মূর্তির ড্রয়িং গুলিতে সহজ দক্ষতা আছে কিন্তু সপ্রাণ অভিব্যক্তি নেই।

মনসিজ মজুমদার

নদী মরুপথে

...কোনও মৃত্যু, কারো কারো অকাল মৃত্যু, আমাদের যন্ত্রণা দেয়। সোমনাথ সিনহা এই তো কিছুদিন আগে এপ্রিল মাসে প্রদর্শনী করলেন। প্রদর্শনীর আগে আমার বাসায় হঠাৎযেমনভাবে আসতেন তেমনিভাবে এসেছিলেন। ওঁর অনুরোধেই ওঁর সাম্প্রতিক কিছু ছবির রঙীন স্লাইড এবং মৌলিক কাজ দেখে ক্যাটালগের জন্য ভূমিকা লিখে দিই। এরও আগে প্রচ্ছদে ওঁর ছবি ছেপেই এবং পরিচিতি লিখে ওঁকে সম্মানিত করেছিলাম। সোমনাথ আমাকে দাদার মতো ভালবাসতেন। সোমনাথ দক্ষ শিল্পী ছিলেন। বিশেষত ছাপাই ছবির ক্ষেত্রে অল্পবয়স থেকে দেশ বিদেশে নানা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করছিলেন। তাঁর ছাপাই ছবি মার্কিন দেশের এবারকার ভারতোৎসবেও ছিল। চণ্ডীগড়ের যাদুঘরের সর্বভারতীয় বার্ষিকীতে তিনি প্রশংসাপত্র (১৯৮১) এবং পুরস্কার (১৯৮৩) পেয়েছিলেন। তারপর ১৯৮৫-তে তিনি বোম্বাই আর্ট সোসাইটি এবং দক্ষিণ আর্কট আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনীতে পুরস্কারও পেয়েছিলেন। এসব সাফল্যই প্রমাণ করে তিনি জাতশিল্পী ছিলেন। এসব পুরস্কার ছাড়াও, তাঁর কাজ নয়াদিল্লির ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্ট এবং ললিতকলা আকাদমি, চণ্ডীগড় যাদুঘর, লখনৌয়ের উত্তর প্রদেশ আকাদমি এবং বিড়লা আকাদমির সংগ্রহে আছে। তৈলচিত্র, মিশ্র মাধ্যম, কালো সাদা রেখাচিত্র, সাঁটা ছবি, চীনামাটির টালি এমন বহু মাধ্যমেই কাজ করেছেন। তবুও ছাপাই ছবিতেই তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বেশি। মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সে প্রতিষ্ঠা এবং খ্যাতি পেয়েছিলেন; তবুও যে বিয়োগান্ত পরিস্থিতিতে তিনি আত্মহননের পথ বেছে নিলেন সে-বিষয়ে ইদানীং বহু তথ্য খবর কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। তদন্তে হয়তো এ বিষয়ে নতুন আলোকপাত ঘটবে। আদালতে উদ্ঘাটিত হবে সত্য। সে-বিষয়ে সুতরাং পুনরাবৃত্তি করব না। মৌন থাকব। সোমনাথ যে স্পর্শকাতর প্রকৃত শিল্পী ছিলেন তাঁর অকাল স্বেচ্ছামৃত্যুতে তা প্রমাণিত হল। দুঃখ সেইখানে। তাঁর প্রতিভার সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটল না। অন্তরঙ্গ সম্পর্কের জন্যেই তাঁর মৃত্যু সহজে মেনে নিতে পারছি না।

সন্দীপ সরকার

চ ল চ্চি ত্র

অমরবন্ধন

তপন সাহার প্রথম ছবি দেখে এই কলমে কিঞ্চিৎ প্রশংসা করা হয়েছিল। নবীন পরিচালকের কাজ দেখে আশান্বিত হয়েছিলাম আমরা। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই ভ্রম দূর হয়েছিল। ওঁর নতুন ছবি 'অমরবন্ধন' দেখার পর এক ধরনের ক্লেদ ছাড়া মনে কিছু জমে না। কতখানি কুরুচিকর এবং অবাস্তব ছবি টালিগঞ্জে নির্মাণ করা সম্ভব তার একটি প্রতিযোগিতা চলছে যেন এখন। মজার কথা হল এইসব ছবির কোনটা আবার জনপ্রিয় হচ্ছে। যেসব দর্শক ছবিগুলো দেখেন তাঁরা

শতাব্দী রায়

তাতে কি মজা পান জানি না কিন্তু ওই আগুনে পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ছেন পরিচালকরা। ফলে আমাদের যন্ত্রণা বাড়ছে। তাপস পাল এই ছবিতে ঢোল বাজান। তাঁর পড়াশুনা ভাল লাগে না। ঢোল বাজাতে আর জমিদারের কর্মচারীর মেয়ে শতাব্দী রায়ের সঙ্গে প্রেম করতেই তাঁর জীবনযাপন। তাঁর বাজনার সঙ্গে শতাব্দী নাচে। কিন্তু কলকাতায় পড়তে গেল যখন শতাব্দী তখন অশিক্ষিত ঢোল বাদকটির বিরহ এত প্রবল যে আমাদের স্বপ্নদৃশ্যাবলী দেখতে হল। শুনতে হল একঘেয়ে গান। অতঃপর পুজোয় বাজনা বাজাতে ঢুলী তাপস কলকাতায় আসেন। সেখানে তখন জমিদার পুত্র শতাব্দীকে কব্জা করার পাঁয়তারা কষছে। কলেজের ফাংশনে সংক্ষিপ্ত পোশাকে নাচতে নাচতে যখন তাপসকে সঙ্গী হিসাবে কল্পনা করে তখন তো হোঁচট খাওয়ার অবস্থা। অদ্ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে মিলন ঘটল ওদের। শতাব্দী রায়ের জন্যে বসে থাকতে হয়েছিল প্রেক্ষাগৃহে। নবীনা অভিনেত্রী সুযোগ পেলে ভাল করবেন আশা করি। তাপস পাল একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। সুখেন দাস সাবলীল কিন্তু যাত্রাঘরানার সংলাপ পেলে খুব খুশি হন। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং সুমিত্রা মুখাপাধ্যায় চেষ্টা করেছেন টিকে থাকতে। সঙ্গীত এই ছবিতে আর পাঁচটা ছবির অনুকরণেই রচিত।

অমিত রায়

না ট ক

উত্তরণ এবং প্রতিফলন

ওয়েশকার ট্রিলজির রুটস অবলম্বনে 'উত্তরণ' নাটকটি 'স্বকাল' প্রযোজনায় শিশির মঞ্চে অভিনীত হয়। 'রুটস' অবলম্বনে নান্দীকার প্রযোজিত 'যখন একা' এবং তার হিন্দীরূপ 'পরিচয়' রঙ্গকর্মীরা আগেই পরিবেশন করেছেন। তারও আগে, নাটকের শেষ অঙ্ক নিয়ে নান্দীকার 'ফুল্ল ফুটুক না ফুটুক' নাম দিয়ে একাঙ্ক প্রযোজনা করেছিলেন। শেখর দাশের রূপান্তর ও নির্দেশনা নিশ্চয়ই অন্য ভাব দিতো কিন্তু 'যখন একা'-র দর্শক অনিবার্যভাবেই অনেক কিছু হারাবেন। অভিনয় ছাড়াও 'যখন একা' নাটকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিটেলের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছিল। বিশেষত 'যখন একা'র মঞ্চ পরিকল্পনা পরবর্তীকালের বহু নাটকেই অনুসৃত হয়েছে। 'উত্তরণ' নাটকে মনু দত্ত ও

সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় পরিকল্পিত দুটি সেট হয়ত পরিধিকে বিস্তৃত করে, কিন্তু কল্পনাকে সঙ্কুচিত করে। অভিনয়ে নির্দেশক অবশ্যই স্বাভাবিকত্বের উপর জোর দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগে, অনেক অক্ষমতাই হয়তো স্বাভাবিকত্বের অজুহাতে এড়ানো যায়। মূলচরিত্র বিমলা সব সময় হাসেন আবার সুজাতা দাশ তাঁদের সংলাপ শেষ করেই প্রস্তরবৎ। চলমান ঘটনার কোন অভিব্যক্তিই মুখে ফোটে না। আবার অনিল সাহা প্রায় চল্লিশ দশকের ভিলেন। কোনভাবেই তাঁর অভিনয় শেখর দাশ বা নির্মাল্য বিশ্বাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না।

'যখন একা'-র সঙ্গে পার্থক্য থাকার জন্য পটভূমি বদলানো হয়েছে—কিন্তু পটভূমি কখনই কয়েকটি শব্দ ছাড়া প্রতিষ্ঠিত নয়। শেখর দাশ বা নির্মাল্য বিশ্বাস যেমন চরিত্রের সঙ্গে মিলে যায়, গৌতম চৌধুরীর চরিত্র অনেকটা আরোপিত মনে হয়। সোমনাথ মুখোপাধ্যায়কে বেশ ভাল লাগে তাঁর গানের জন্য। প্রথমে ঝড়ের আওয়াজ তারপর নানারকম শব্দ ও যন্ত্রসংগীত এলোমেলোভাবে বাজে। এইখানেই সুযোগ ছিল পটভূমি রচনার। এক জায়গায় একটা ভাঙ্গা হারমোনিয়াম রাখার যুক্তি দেওয়া হয়। ভাবা গিয়েছিল গরীব লোকেরও সাধ বাসনার একটি হঠাৎ ঝলক উঁকি দিয়ে গেল। পরে দেখা গেল মা ও মেয়ে একসঙ্গে 'বিরহ দিয়ে গেলে এই কিগো শেষ দান' পুরো গানটি গেয়ে যান। হারমোনিয়ামের ওইটুকুই কাজ। গানটি একটি মুহূর্ত গড়ে তুললেও মায়ের যে বয়স দেখানো হয়েছে, সেখানে যৌক্তিকতার প্রশ্ন থেকেই যায়। আর এক জায়গায় বাবা তাঁর খেলা দেখার স্মৃতিচারণ করেন। সেই মধুর স্মৃতির মধ্যে শৈলেন মান্না, আমেদ, সালে, ভেঙ্কটেশের সঙ্গে সামাদও স্থান পেয়ে যান। যদিও সামাদ এঁদের অনেক আগে খেলেছেন। অনেকটা কিথ মিলার ও কপিলদেব বা গাভাসকার ও লেন হাটনের নাম একসঙ্গে উচ্চারণের মত বিভ্রান্তি। গোত্রান্তর ঘটাতে গিয়েও গোত্র ধরা পড়ে, নানা প্রতিফলনে।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

বি বি ধ

ভীষ্মদেব জন্মজয়ন্তী

ত্রিশের দশকে যে-কয়েকজন শিল্পীর গান সঙ্গীতরসিক শ্রোতার প্রাণমন অধিকার করেছিল ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। ছোট বেলাতেই সঙ্গীতে তাঁর পারদর্শিতা লক্ষ্য করা যায়, পরে নগেন্দ্রনাথ দত্ত ও ওস্তাদ বদল খাঁর তত্ত্বাবধানে তা আরও পরিণতি লাভ করে। সঙ্গীতজগৎ পায় সুর ও তানের এই যাদুকরকে। উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ও রাগাশ্রিত বাংলা গান রেকর্ড করেছিলেন। একক হার্মোনিয়াম বাদনের রেকর্ডও তাঁর ছিল। 'জাগো আলোক লগনে', 'নবারুণ রাগে' কিংবা 'যদি মনে পড়ে'— তাঁর এসব গান কি কালস্রোতে হারিয়ে যাওয়ার? স্মরণীয় গানের বরণীয় শিল্পীকে মনে রাখতেই হয়। প্রয়াত এই সঙ্গীতাচার্যের ৭৭তম জন্মজয়ন্তী পালন করলেন সম্প্রতি পঞ্চম সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় ভারতীয় ভাষা পরিষদ মঞ্চে এক সঙ্গীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে। অপ্রতিরোধ্য ছিল যে তাঁর গানের আকর্ষণ সে-কথাই বলছিলেন ভীষ্মদেবের শিষ্য কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আন্তরিক স্মৃতিচারণে। সমবেত নারীকণ্ঠে ঠাটমালা দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা। অনুশীলনবদ্ধ পরিবেশন। দ্বিতীয়ার্ধে সঙ্গীতের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানালেন পঞ্চম-এর ছাত্রছাত্রীরা। তবে সবাই যে এখনও এককভাবে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাইবার উপযুক্ত হয়ে ওঠেননি সেকথা বলাই বাহুল্য, অথচ সুযোগ পেয়েছেন এবং অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল সুদীর্ঘ এইভাবে। বেশির ভাগই গেয়েছেন বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল, অবশ্যই ছোট করে, আর কেউ কেউ ভজন। ভাস্বতী রায় কিংবা গৌতম ঘোষ একেবারেই প্রাথমিক শিক্ষানবীশ। উমা গুহের কণ্ঠ তৈরি ও সুরে, সম্ভবত সময়াভাবে বিলম্বিত না গেয়ে গাইলেন মধ্যলয় ঝাঁপতালে একটি বন্দীশ মালকোষে, তারপর একই রাগে দ্রুত বন্দীশ তিনতালে। পরিশীলিত পরিবেশন। দুর্গা রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত শোনালেন নিবেদিতা দত্ত। চর্চিত, সুরেলা কণ্ঠ। বিস্তার অংশটি মন্দ নয়। সাবলীল তানকর্তব করলেন। কণ্ঠে সুরময়তা আছে নবনীপা চন্দেরও। কেদারা রাগে

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

বিলম্বিত খেয়ালে আবেদন ছিল। তাঁর তানের কাজ স্বচ্ছন্দ। সুদীপ্ত মার্জিতের নিবেদনে ছিল পূরিয়া। কণ্ঠটি শুনতে ভাল। বিলম্বিত খেয়ালে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টাটুকু লক্ষণীয়, তানকর্তবও পরিচ্ছন্ন। নায়কীকানাড়া রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল পরিবেশন করলেন কাজী কামাল নাসের। কণ্ঠ শ্রবণসুখকর। তাঁর সামগ্রিক নিবেদনেই রয়েছে নিষ্ঠার পরিচয়। কৃষ্ণকলি দাস কিংবা মনমন চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ভজন মন্দ নয়। দেবযানী বসুর গলাটি ভাল, কিন্তু সুরের অভাব বোধ হল দু-একবার।

অংশগ্রহণকারীরা অধিকাংশই অল্পবয়সী, আরও চর্চায় উন্নতি করবেন, এমন আশা করাটা অসঙ্গত হবে না।

স্বপন সোম

তিষ্ঠ ক্ষণকাল

শ্রীমধুসূদন তাঁর সমাধিস্তম্ভে যে প্রত্যয় নিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, সেটা যে এমন নির্দয়ভাবে ফিরে আসবে কে জানত? মাইকেল মধুসূদন পুরস্কার দেওয়া হল গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা ৫ টায়—একটি নোটিশে লেখা, রাষ্ট্রপতি জৈল সিং-এর সভার জন্য নির্ধারিত অনুষ্ঠান পিছিয়ে আরম্ভ হবে ৬-৩০ মিনিটে। প্রচুর দর্শকের অধীর প্রতীক্ষা, কারণ কয়েকজন নামী তারকা পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে ছিলেন (যদিও তাঁদের প্রায় সকলেই গরহাজির)। এরপর হলে গিয়েও সকলে দাঁড়িয়ে, কারণ চেয়ার নেই। চেয়ার এল—মাইক্রোফোন তখনও অনুপস্থিত। বেশ খানিক সময় চলে গেল। তারপর প্রস্তাব, সমর্থন, মালাদানের যথাবিহিত কর্মবিধি। প্রত্যেকের ভাষণ, যার মধ্যে মাইকেল মধুসূদনের কথা, প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ প্রয়াত শঙ্করপ্রসাদ মিত্রের কথা এবং নিজের কথা আছে। এরকম প্রচারধর্মী অনুষ্ঠান সচরাচর দেখা যায় না। একজন অতিথি 'আশার ছলনে ভুলি' আবৃত্তি করতে গিয়ে দেখলেন আশা কুহকিনী—তিনি সব ভুলে গেছেন। প্রতিষ্ঠানের মূলশক্তি বিধান দত্ত (কার্ডে লেখা আছে বিখ্যাত সাহিত্যিক) বক্তৃতাসূত্রে জানিয়েছিলেন, তিনি কতবার বিদেশে সাহিত্য সম্মেলনে গেছেন। তাঁর লেখা দুটি গান এই সভায় গাওয়া হল। গান দুটি নিঃসন্দেহে স্কুল ম্যাগাজিনের উপযোগী। এরপর পুরস্কার বিতরণের পালা। প্রত্যেকে পুরস্কার নেন এবং তাঁর অনুভূতিকে প্রকাশ করতে বলা হয়। চিন্ময় রায় 'এই শান্ত সন্ধ্যায় ক্যারিকেচার দিয়ে গাম্ভীর্য নষ্ট করা যায় না' বলে চলে গেলেন। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় হৈমন্তী শুক্লাকে গাইতে হয় 'তোমার কাছে এ বর মাগি'। এই অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেকেই নিজের কথা শুনিয়ে দেন। একজন গ্রন্থকার জানিয়ে দিলেন পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থটি বাইশ'শ করে তিনটি সংস্করণ নিঃশেষিত। 'চলচ্চিত্রচঞ্চরী'-র ভবদুলালকে মনে আসে। যিনি ঘোষণা করছিলেন তিনি সকলের নামের সঙ্গে নানারকম কাব্য করছিলেন, বিশেষণ জুড়ছিলেন। আবৃত্তিকার প্রদীপ ঘোষ সম্পর্কে জানালেন 'তিনি আকাশবাণীর সঙ্গে যুক্ত'। প্রদীপ ঘোষ এই বিভ্রান্তিকর ঘোষণার ভ্রম সংশোধন করলেন। একবার বিত্তবাসনা নিয়ে এলোমেলো কিছু বলা হল। প্রত্যেকেই ভাবলেন বিত্তবাসনা যখন তখন বোধহয় পুরস্কার নেবেন শংকর। দেখা গেল বিচিত্র ধারাভাষ্যের পর মঞ্চে এলেন বেতার বিজ্ঞাপন কার্যক্রমের শিল্পী কল্যাণ সুন্দর। কল্যাণ সুন্দরকে ধন্যবাদ, তিনি কোন ভাষণ দেননি— আশা করছিলাম, ভাষণ দিতে গিয়ে তাঁর স্পট রেকর্ডিং ও স্পনসর্ড রেকর্ডিং-এর রেট হয়ত জানিয়ে দেবেন। এক একজন করে পুরস্কার নিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছেন। সঙ্গে আরও কিছু দর্শক—এইভাবে মধুসূদন স্মৃতি পুরস্কার অনুষ্ঠানে আগমনীর সুর বাজতে না বাজতেই বিজয়া এসে গেল।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

লক্ষ্যভ্রষ্ট গবেষণা

সৌরীন্দ্র মিত্র

রবীন্দ্রনাথ ও ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে/

কেতকী কুশারী ডাইসন/ এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং/ কল-৭৩/৬০·০০

শিরোনাম একটি এবং একটিই মলাট হলেও প্রকৃত পক্ষে বই আছে এখানে দুটি। প্রথমটি একটি উপন্যাস— মলাটের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী লেখিকার দ্বিতীয় উপন্যাস— বিদেশের পরিবেশে একটি বিদুষী বাঙালী মেয়ে অনামিকা এবং বিদেশে কর্মরত এক বাঙালী যুবক অশনির প্রেম কাহিনী।

এই কাহিনীটি দিয়েই বইয়ের আরম্ভ। খণ্ডে খণ্ডে এই গল্পটির সঙ্গে বেঁধে দিয়েছেন দ্বিতীয় বইটি। সেটা হল রবীন্দ্র গবেষণা এবং সেই সুবাদেই সমগ্র বইটির শিরোনাম। লেখিকা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের কৃতী ছাত্রী এবং বহুদিন বিদেশেই বসবাস ও শিক্ষকতা করেন। রবীন্দ্র গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি নবাগত হলেও তাঁর এই আগমন সম্ভবনাময়। গবেষণার কাজে তিনি নিষ্ঠার ও পরিশ্রমের পরিচয় দিয়েছেন: এলমহার্স্টের ডার্টিংটন হলে এবং বুয়েনস এয়ারিসে ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর সান ইসিদ্রোর বাড়ীতে যেখানে ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ দু মাস অতিথি ছিলেন এবং বর্তমানে যেটি একটি রবীন্দ্র মিউজিয়ামে পরিণত সেখানকার মহাফেজখানায় রক্ষিত বহু নথিপত্র ঘেঁটেছেন। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ ও ভিকতোরিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে

রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

অনেক আলোচনা ও বিতর্ক হয়ে গেছে, সে দিক থেকে এই বিশেষ সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন নূতন তথ্য সংযোজন করতে, অথবা কোন তাৎপর্যপূর্ণ নূতন আলোকসম্পাত করতে পেরেছেন তা বলা না গেলেও ভিকতোরিয়ার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে অনেক তথ্যের খুঁটিনাটি যোগ করেছেন, ফলে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হয়েছে। কিন্তু আলোচনার focus-টা শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে মনে হয় এল্‌মহার্স্টের উপরই ন্যস্ত হয়েছে। আলোচনাটি সুলিখিত হলেও এবং বিষয়ানুযায়ী গাম্ভীর্য মোটামুটি বজায় থাকলেও, মাঝে মাঝে দু-চারটি মন্তব্য অথবা তার ভাষা আলোচনার আবহাওয়াটা আবিল করে দিয়েছে। যেমন, সান ইসিদ্রোতে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ যে কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন (পূরবীর অন্তর্গত) সেই প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য: 'এত কামুফ্লাজ সত্ত্বেও ননীচোরা ধরা পড়ে গেলেন।' ননীচোরা ধরা পড়ে গেলেন ! তা হলে লেখিকার গবেষণার বিষয় রবীন্দ্রনাথের সন্ধানে নয়, ননীচোরার সন্ধানে ! খুব একটা হোঁচট খেতে হয়। উদ্দেশ্য যদি ননীচোরা ধরাই হয়ে থাকে, তার জন্য এত দূরে গিয়ে বিদেশী মহাফেজখানার নথিপত্র ঘাঁটার কী প্রয়োজন ছিল ? রবীন্দ্র বিদূষণের ব্যবসায় আমাদের দেশে বিগত পঞ্চাশ-ষাট বৎসর যাবৎ চালু আছে— এখনও কেউ কেউ স্বচ্ছন্দে চালিয়ে যাচ্ছেন। এই ব্যবসায় কোন মূলধন লাগে না, স্বচ্ছন্দে ঘরে বসেই চালানো যায়, অনেক পত্র-পত্রিকা এই ব্যবসায়ের প্রচারের দ্বারা মুনাফা তুলবার চেষ্টায় ব্যাপৃত। অথচ প্রসঙ্গটা হল পূরবীর 'আজিকার দিন না ফুরাতে' এবং আরও দু-একটি কবিতার বিচ্ছিন্ন অংশ যেখানে কবি একটি বাগানের অনুষঙ্গে ফাল্গুন, বনসরসী ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন, লেখিকা ভৌগোলিক গবেষণা করে বললেন যে, ঐ ফাল্গুন দক্ষিণ গোলার্ধের নভেম্বর, অতএব ঐ বাগান আসলে ভিলা ওকাম্পোর গোলাপ বাগান এবং ফাল্গুন, বনসরসী, কাঠবিড়ালী, গোধূলির বাঁশরি, মল্লিকার মালা— এসবই 'কামুফ্লাজ'। লেখিকা বিদুষী, স্বদেশী, বিদেশী অনেক ভাষায় অনেক কবিতা পড়েছেন তদুপরি তিনি নিজেও কবিতা লিখে থাকেন, সুতরাং এটা তাঁর না-জানার কথা নয় যে, কবিতায় যখন একটি বাগানের কথা থাকে সেটা একটা report নয়, হাজারটা বাগানের স্মৃতি- বিস্মৃতি জড়িয়ে একটি বিশেষ বাগানের অনুষঙ্গ জেগে ওঠে— সেটা 'কামুফ্লাজ' নয় ! তা ছাড়া লেখিকা সান ইসিদ্রোতে রবীন্দ্রনাথ ও ভিকতোরিয়ার পারস্পরিক সম্বন্ধের যে ছবিটি এঁকেছেন, তার মধ্যেও তো ননীচোরার আভাস কোথাও নেই। বস্তুত ঐ ছবিটির মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নেই, প্রচলিত ধারণাটিকেই তিনি confirm করেছেন, নূতনত্বের মধ্যে এলমহার্স্টের সঙ্গে ভিকতোরিয়ার ঘনিষ্ঠতার কিছু পল্লবিত বর্ণনা। আলোচনার শেষের দিকে দেখা যায় লেখিকা (বা তাঁর প্রতিনিধি গল্পের নায়িকা এবং গল্প অনুযায়ী গবেষক, অনামিকা) ভিকতোরিয়া সম্বন্ধে অতিরিক্ত উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। উৎসাহী হবার কারণ যথেষ্টই আছে, এ-দেশে তা সুপ্রচারিত: শ্রীমতী ওকাম্পো জ্ঞান ও সাহিত্যচর্চার সূত্রে দক্ষিণ আমেরিকায় বিখ্যাত এবং য়ুরোপের সুধীমণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত ছিলেন। এটুকুই তো যথেষ্ট। কিন্তু লেখিকা (বা অনামিকা) এটুকুতেই তৃপ্ত নন,তাঁকে এ-যুগের

একজন প্রথম সারির প্রগতিশীলা চিন্তানায়িকারূপে খাড়া করবার জন্য তিনি ব্যস্ত হলেন। কিন্তু প্রগতিশীলতার একমাত্র নিরিখ দেখা যায় feminism। এই feminism-এর নিরিখে তিনি বিচার করতে বসলেন। রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী ওকাম্পোর তুলনায় কতটা feminist অথবা anti-feminist। এবং এই তুলনার সূত্রেই পশ্চিমী যাত্রীর ডায়েরি, জাপান যাত্রী প্রভৃতি বই থেকে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করে দেখাচ্ছেন শ্রীমতী ওকাম্পোর তুলনায় রবীন্দ্রনাথ কতখানি anti-fiminist অর্থাৎ তিনি শ্রীমতী ওকাম্পোর গুরুদেব হবার সত্যিই যোগ্য কি-না সেটাই অত্যন্ত তুখোড় ভাষায় আলেচনা করেছেন। আলোচনাটা অচিরেই একটা বিতর্কে পরিণত হল। তার মধ্যে অবশ্য আপত্তির কিছু নেই। আপত্তিকর হল লেখিকার মেজাজ এবং ভাষা। তিনি ইতিহাস ঘেঁটে লম্বা এক ফর্দ পেশ করেছেন বিখ্যাত মহিলাদের এটা দেখাবার জন্য যে মেয়েরা অনিবার্যভাবেই দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মায় না। অতএব রবীন্দ্রনাথ যে নারী-পুরুষের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের কথা বলেছেন সেটা গ্রাহ্য নয়। ভাষার নমুনা : "রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই শুনেছেন মাদাম ক্যুরির কথা (১৮৬৭-১৯৩৪) ...জার্মানীর রোজা লুকসেমবুর্গের (১৮৭০-১৯১৯) নাম কি কখনো রবীন্দ্রনাথের কানে পৌঁছয় নি ?..." এই সূত্রে লেখিকা নাম করলেন "সেমিরামিস, ক্লিয়োপেট্রা বোয়াডিসিয়া প্রভৃতির নাম এবং প্রতি ক্ষেত্রেই প্রশ্ন : এঁদের নাম রবীন্দ্রনাথ কখনো শোনেনি ? অথবা বিতর্কের সূত্রে লেখিকার একটি মন্তব্য : 'রবীন্দ্রনাথ কি তবে মেয়েদের হিজরে হতে বলছেন ?' ঐ নামাবলী রবীন্দ্রনাথের কানে কখনো উঠেছিল কি ওঠেনি, সে তর্কে না গিয়ে একটা কথা না বললেই নয়—এ ভাষা রবীন্দ্র সমালোচনার অযোগ্য। স্কুলের ক্লাস ঘরে অথবা বিতর্কসভায় চললেও অথবা কোনো যোগ্য feminist-এর মানানসই হলেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মতানৈক্যের সূত্রে বিতর্কে এই জাতীয় ভাষার ব্যবহার বলতে হবে চরম অশালীনতা। কেন ? তাও কি ব্যাখ্যা করে বলতে হবে ? লেখিকাকে গোয়টের সেই বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করতে বলি : 'A man like Schlegel ought to be on knees when he criticises homer'। তাছাড়া লেখিকা যে তর্কটা করলেন তার মূলেই গোলমাল আছে মনে হয়। যে অংশগুলি লেখিকা উদ্ধৃত করেছেন এবং তুলনীয় আরো অনেক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নারী পুরুষের যে মৌলিক প্রভেদের আলোচনা করেছেন সেটা নারী পুরুষের সামাজিক বা রাষ্ট্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা বা স্বীকৃতির কথা মোটেই নয়। তিনি বলছেন আরো গভীর স্তরের কথা, অর্থাৎ sense of fulfilment-এর কথা এবং সেখানেই নারী পুরুষের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। এই জন্যই মনে হয় ডার্টিনটন্ হল, বুয়েনস এয়ারিস প্রভৃতি নানা বিদেশী মহাফেজখানায় অসংখ্য নথিপত্র ঘেঁটে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গবেষণার কাজে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে প্রাথমিক গোড়াপত্তন হিসেবে রবীন্দ্ররচনাবলী সমনোযোগী এবং যথার্থ শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার যথার্থ পরিচয় লাভ করা প্রয়োজন ! যাই হোক, ঐ feminism-এর সূত্রেই লেখিকা কাদম্বরী দেবীর প্রসঙ্গটা টেনে এনেছেন খানিকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবে। এই অংশটি লেখিকা যথেষ্ট সংযতভাবে লিখলেও তিনি যে কাদম্বরী দেবীকে ভিক্তোরিয়ার সান্নিধ্যে উপস্থাপিত করছেন তার মধ্যেই একটা কামুফ্লাজের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না কি ?

বইয়ের অন্য অংশটি একটি গল্প—নায়িকা অনামিকা এবং নায়ক অশনির অত্যন্ত আধুনিক লক্ষণযুক্ত প্রেমকাহিনী। শুধু জিজ্ঞাস্য এই কাহিনীটি লেখিকা খণ্ডশ রবীন্দ্র গবেষণার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন কী উদ্দেশ্যে ? লাভ কোনোটিরই হয়নি, দুটিই বাধাগ্রস্ত হয়েছে। গল্পের নায়িকা একজন বিদুষী বাঙালী মেয়ে স্বামীপুত্র কন্যা নিয়ে বিদেশে বসবাস করেন এবং বইয়ের একেবারে গোড়ার দিকেই অপঘাতে স্বামী রঞ্জনের মৃত্যু হলে পুত্রকন্যার শিক্ষার ব্যাপারে এবং রবীন্দ্রনাথ ও ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর বিষয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত হলেন। ক্রমে পরিচয় পাওয়া গেল নায়িকা একজন feminist এবং নায়িকা অচিরেই তার প্রমাণ দিলেন সদ্য পরিচিত অশনির সঙ্গে প্রেমে পড়ে এবং এক হোটেলের ঘরে রাত্রিবাস করে। সেই রাত্রিবাসের পল্লবিত বর্ণনা যদিও আধুনিক লক্ষণযুক্ত, দেখা যায় ভাষাটা হঠাৎ বদলে বঙ্কিমী ধরনের সাধু ভাষায় পরিণত হয়েছে। কেন, ঠিক বোধগম্য হল না। বোধ হয় লেখিকা এখানে একটি রোমান্সের অবতারণা করলেন— যদিও ফেমিনিস্ট রোমান্স। ঐ রাত্রিবাসের

...খছি ধীরে ধীরে ... সরে যাচ্ছে এবং ...য়ে চম্পটই দিল। ...কা কিছুদিন হা-হুতাশ ...পর সিদ্ধান্ত করলো : ...া একটা রাস্কেল। এর ...টা এক রকম ...ই গেল।

...হোক, এই গল্প ...নাথ ও ভিকতোরিয়ার ... গাঁটছড়ায় বাঁধার ...দৃশ্য কী ? এখানেও কি ...া কামুফ্লাজ-এর আভাস ... ? এই গল্পের ননীচোরা ...পরোক্ষে সান ইসিদ্রোর কাহিনীর উপর আভাসে আরোপিত হচ্ছে না ? জীবনযাত্রার সপুংখ বর্ণনা থাকলেও উপন্যাস হিসেবে গল্পটি ফুটে ওঠে নি। চরিত্র কোনটিই রূপবান হয়নি—সৌগত ও পূরবীর বালালীলার কিছু episode ছাড়া কিন্তু সব চেয়ে পীড়াদায়ক হয়েছে, গল্পের মাঝখানেই লেখিকা কোন বিদেশী ভাষার উচ্চারণবিধি শেখাবার আয়োজন করেছেন। দেখা যাচ্ছে লেখিকা এক ঢিলে তিনটি পাখি মারতে চেষ্টা করেছেন—একটি রবীন্দ্র গবেষণা, একটি উপন্যাস এবং বিদেশী ভাষার বর্ণপরিচয়। ফলে কোনটিই ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছয়নি।

অর্থনীতি ও সামাজিক কাঠামো

সরোজ উপাধ্যায়

রাষ্ট্র সমাজব্যবস্থা ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি/ প্রণব বর্ধন/ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ/ কল-৯/১২·০০

কল-৯/১২·০০

ভারতীয় অর্থনীতিতে উন্নয়নের শ্লথগতি ও বিরাট সংখ্যক জনগণের মধ্যে দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতার কারণ বিত্তবান শ্রেণীদের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে অনেকাংশে নিহিত রয়েছে কেন না বিত্তবান শ্রেণীরাই বহুলাংশে বিবিধ আর্থ ও সামাজিক কাজের নির্ধারক ও নিয়ামক। বর্তমান গ্রন্থে লেখক ভারতীয় অর্থনীতিতে বিত্তবান শ্রেণীর ভূমিকা, তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বর্তমান রাজনৈতিক পটভূমিকায় বিত্তবান শ্রেণীসমূহের অবস্থানের স্বরূপ এই সকল বিষয়ে আলোচনা করেছেন। প্রকাশক যে ভারতীয় অর্থনীতির বিবিধ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বই প্রকাশ করছেন এই গ্রন্থখানি সেই সিরিজের তৃতীয় অবদান।

ভারতীয় অর্থনীতিতে অনগ্রসরতার যে সকল কারণ চিহ্নিত করা হয় তাদের মধ্যে অন্যতম মুষ্টিমেয় ধনী সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি, বৈষম্য দূরীকরণে কায়েমী স্বার্থের বাধা, আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ বিধি, আবার কারও মতে আমাদের শিল্প কাঠামোয় দেশকে শিল্পোন্নয়নের পথে নিয়ে যাবার সীমিত ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধ যোগ্যতা ও ক্ষীণ মৌলিক সম্ভাবনা (Poor Intrinsic Potential)। লেখক দেখিয়েছেন বর্তমানে আমাদের জাতীয় উৎপাদনের দুই-পঞ্চমাংশ আসে কৃষি থেকে। কৃষিতে গত তিন দশকে উৎপাদনের হার যথেষ্ট বেড়েছে কিন্তু এই উৎপাদনকে তিন গুণ করা যায় যদি উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা, সেচ, রাসায়নিক সারের যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োগ করা হয়। আশির দশকের গোড়া পর্যন্ত মোট ফলনযোগ্য জমির শতকরা ৩১ ভাগকে ফলনের আওতায় আনা হয়েছে, মাটির নীচে যে জলসম্পদ রয়েছে তার এখনও ৭০ ভাগ অব্যবহৃত রয়েছে। এছাড়া কৃষিতে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের হার গত দেড় দশকে খুব একটা বাড়েনি। যদিও সরকারের দিক থেকে ভূমি ক্ষয়রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ঋণের প্রসার, সেচের ব্যবস্থা দেশের কৃষি উৎপাদনকে বাড়াতে সহায়তা করেছে তবুও কৃষিক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ এখনও যথেষ্ট অপ্রতুল। আমলাতান্ত্রিক অনীহা ও স্থানীয় চাষের প্রয়োজন সম্পর্কে তথ্যের অজ্ঞতা অনেক প্রকল্পকে পুরো মাত্রায় রূপায়িত হতে দেয়নি। সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও পুরো উৎপাদন ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে। শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হারে মন্দার অন্যতম কারণ হচ্ছে দেশের অধিকাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অভাব, শিল্পের বিভিন্ন খাতে সরকারি বিনিয়োগের হার হ্রাস পাওয়ার জন্য বেসরকারি বিনিয়োগও হ্রাস পেয়েছে, তাছাড়া মোট শিল্প উৎপাদনক্ষমতার পুরো ব্যবহার হয়নি বলেও উৎপাদনে শ্লথ গতি বিদ্যমান ছিল।

বিত্তবান শ্রেণীদের আচরণ সম্পর্কে লেখক যে

আলোচনা করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে তাদের ক্রিয়াকলাপ আর্থিক অগ্রগতিকে ব্যাপক হারে বাড়াতে অক্ষম। সরকারি ঋণ, সরকারি ক্ষেত্রে উৎপন্ন যন্ত্রপাতি, শিল্পের নানান উপকরণ (অনেক সময় কৃত্রিম নিচু দরে) পেয়ে বেসরকারি শিল্পপতিরা মুনাফার হার বাড়িয়েছে অথচ সেই মুনাফা তারা নতুন শিল্পে তেমন বিনিয়োগ করেনি। তা ছাড়া স্থায়ী মূলধনের বৃদ্ধির হার গত এক দশকে কমে গেছে। ছোট শিল্পের স্বার্থরক্ষার নিয়ন্ত্রণবিধিকে লঙ্ঘন করে। অননুমোদিত উৎপাদন ক্ষমতার বিনিয়োগ করে, নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত উৎপাদন করে তারা কর্তৃত্ব ও শিল্পসাম্রাজ্য বাড়িয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি পাদটীকায় লেখক এসকর্টস কোম্পানির নন্দার একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন। নন্দা সত্তরের দশকের মাঝামাঝি তদানীন্তন শিল্পমন্ত্রীকে বলেন যদি চাহিদা থাকে তবে লাইসেন্সের বাইরে আমি উৎপাদন করবো ও তার জন্য জরিমানা দেব না। "আসুন দেখি আমাকে গ্রেপ্তার করুন।" এই উদাহরণটি ভারতীয় শিল্পপতিদের নীতিবিহীনতা ও নিয়মানুবর্তিতার অভাবের নির্দেশক। বহু কোম্পানিতে সরকারি অর্থ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার সর্বাধিক হওয়া সত্ত্বেও পরিচালনগত ত্রুটিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারিবারিক প্রাধান্যে বাধা দেওয়া হয়নি। ভারতে প্রধানত তিনটি বিত্তবান শ্রেণী দেখা যায় যথা ব্যবসায়ী শিল্পপতি, ধনী কৃষক এবং উচ্চবেতনভোগী আমলা তথা পেশাদারী শ্রেণী। কৃষিপণ্য মূল্য এবং কৃষি ও শিল্পের বিনিময় হার (Terms of Trade) হচ্ছে ধনী শিল্পপতি ও বৃহত্তর চাষীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের উৎস স্থল। পুঁজিবাদীদের সঙ্গে আমলাদের সংঘাত লাইসেন্স প্রদান, বিবিধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। আমলারা এই নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতা বিভেদ পন্থা রেখে প্রয়োগ করে, প্রয়োজনে কাউকে বিশেষ ছাড় দেয়।

ফলে শিল্পপতিদের আমলাদের বিরুদ্ধে একজোট হতে পারে না। শিল্পপতিরা তুলনায় ধনী চাষীদের সঙ্গে অবশ্য আমলাদের কারবার হয় কম, তবে গ্রামের মধ্যে ধনী চাষীদের কর্তৃত্ব আমলাদের থেকে বেশি থাকে। দেখা যাচ্ছে ধনতান্ত্রিক কাঠামো জোরদার হয়ে উঠতে না পারার জন্য কোন শ্রেণীরই নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিস্তৃত হয়নি। দেশের রাষ্ট্রীয় উদ্যমগুলিও আশানুরূপ উদ্বৃত্ত তৈরি করতে পারেনি বলে, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র তাদের সামাজিক দায়িত্ব পুরো পালন করতে অক্ষম হয়েছে। শিল্পপতিরা বিবিধ সুযোগের ব্যবহার করেও শিল্প পরিচালনায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ (Internal resources) তৈরি করতে পারেনি। রপ্তানি বাণিজ্যে যে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে তার প্রভাব বিদেশী মুদ্রার্জনে খুব একটা দেখা যায়নি, এছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলিকে প্রসাদ বিতরণের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কর্তাব্যক্তি নিয়োগে স্বজনপোষণ দেখা দেয়, যা কর্মীদের মনোবলকে ভেঙে

দেয়। এই অব্যবস্থায় ট্রেড ইউনিয়নগুলিও শ্রমিকদের "পাইয়ে দেবার রাজনীতি" অবলম্বন করে। এর পুরো প্রভাব সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ভোগ করতে হয় যা আর্থিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে বিত্তবান শ্রেণী সমূহের অবস্থানের স্বরূপটাকেও লেখক দেখানোর চেষ্টা করেছেন। ভারতে গণতন্ত্রের সজীব অবস্থান লেখকের মতে এই বিষয়টি আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির উদারনৈতিকতার যতটা না প্রতিফলন তার চেয়ে বেশি প্রভাব রয়েছে, বিত্তবান শ্রেণীগুলির তথা রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্থাগুলির বিশ্বাস যে গণতন্ত্রের পটভূমিতে নিজেদের স্বার্থরক্ষার সুযোগ বেশি লাভের সম্ভাবনা। বিত্তবান শ্রেণীদের মধ্যে শিল্পপতি ও আমলারা নিজেদের স্বার্থেই শক্তিশালী কেন্দ্রের সমর্থক। গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষের বিবিধ সুবিধালাভের প্রত্যাশা বেড়ে যায়। কিন্তু শ্লথ গতিসম্পন্ন অর্থনীতিতে বৈষম্যযুক্ত সমাজব্যবস্থার আনুকূল্য বিতরণ সমানভাবে সম্ভব নয়, ফলে গণমানসে হতাশা বেড়েছে। দেশে অনেক খণ্ড বিচ্ছিন্ন আন্দোলন হয়েছে। লেখকের মতে, বর্তমানে আমরা এক অনিশ্চিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার চৌমাথায় দাঁড়িয়েছি, ভবিষ্যৎ অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি নির্ভর করবে আমরা কোন দিকে যাই, তার ওপর করে কোন পরিণতি আমাদের অর্থনীতিতে অপেক্ষা করছে সেবিষয়ে তিনি কোন অভিমত দেননি।

বইটিতে বিবিধ পর্যবেক্ষণমূলক তথ্য অত্যন্ত সুসংহতভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো যে অর্থনীতির একটি নিয়ামক শক্তি এই সত্যটি এই বইটি পড়লে বেশ বিশ্বস্তভাবে ধরা পড়ে। বইটির শেষ ভাগে যে পরিসংখ্যানগত সারণী দেওয়া হয়েছে সেগুলি বেশ অভিব্যাপক এবং বইটির বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভূমিকা প্রসঙ্গে লেখক মার্কস-এঙ্গেলস-এর মতামতই প্রধানত উল্লেখ করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিবিদরা মূলত সরকারের আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগকে প্রাধান্য দিতেন (পরিভাষায় যাকে Doctrine of Laissez Faire বলা হয়)। রাষ্ট্র আর্থিক কাজে হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে অর্থনীতির পুনর্গঠনে যে যোগ্য ভূমিকা অবলম্বন করতে পারে এই প্রসঙ্গে মার্কস সে যুগে যে মত পোষণ করেছেন তা অর্থতত্ত্বের ইতিহাসে যুগান্তকারী বলে গণ্য হয়। তবে ত্রিশের দশকের ভয়াবহ মন্দার পর অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে কেইনস সহ বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন তার উল্লেখ করলে এই আলোচনাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হতো। এছাড়া, বিত্তবান শ্রেণীর ভোগ কাঠামো (Consumption Pattern) ভারতের আর্থনীতিক প্রগতির পক্ষে আদৌ উপযোগী কিনা এই বিষয়ে আলোকপাত করলে পাঠক উপকৃত হতেন বিশেষভাবে। তবে পরিবেশিত নানান তথ্যগুলি পাঠককে মৌলিক চিন্তার খোরাক যোগাবে একথা বলাবাহুল্য।

আকর সহায়ক একটি গ্রন্থ

আনন্দ বাগচী

সমাজ ও সাহিত্যচিন্তায় বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা/ নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়/ মণ্ডল বুক হাউস

কল ৯/ ২০.০০

রামকৃষ্ণ-রসিক ও অনুসন্ধিৎসু লেখক হিসাবে অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের নাম সম্ভবত বাঙালী পাঠকের কাছে অপরিচিত নয়। ইতিপূর্বে তিনি 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ' নামে একটি গবেষণা-ধর্মী গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বর্তমান গ্রন্থটি, 'সমাজ ও সাহিত্য চিন্তায় বিবেকানন্দ' একটু ভিন্ন ধরনের রচনা। অন্তত এই রচনার পিছনের একটু ইতিহাস আছে। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার আয়োজিত স্মারক বক্তৃতামালা সূত্রে প্রদত্ত তাঁর পৃথক চারটি ভাষণের গ্রন্থিবদ্ধ রূপ এই বইটি। মূলে যা ছিল শ্রবণবোধ্য বক্তৃতা, প্রত্যক্ষ প্রতিবেদন, তাকেই পরিমার্জন ও পুনর্লিখনের মধ্য দিয়ে পঠনীয় রূপ দেওয়া হয়েছে। ফলে, হয়তো লেখকের অজ্ঞাতসারেই, রচনারীতির এমন এক বদল ঘটে গেছে যা সবার্থেই কাম্য ছিল। সারল্য, দ্রুততা ও সংহতি এই তিনগুণের প্রচ্ছন্ন সমাবেশ সম্ভব হতে পেরেছে এই কারণেই। নলিনীবাবুর বাহুল্যবর্জিত ভাষায় স্বচ্ছতা আছে। যার ফলে দুরূহ বিষয়ও অনায়াসে এবং

অন্তরঙ্গভাবে দেখা যায়। ব্যাপক অন্বেষণ ও অধ্যয়নের সুযোগ এবং সময় যাঁদের নেই তাঁরা সহজেই বিবেকানন্দের সামগ্রিক ধর্ম ও সমাজচিন্তার দৃষ্টিকোণটি অনুধাবন করতে পারতেন এই বই পড়ে। দুই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণের কাঠামোয় নলিনীবাবু এমন দুটি বিশাল ব্যক্তিত্বের চিন্তাধারাকে তুলে ধরেছেন চোখের সামনে যাঁরা আমাদের কাছে একই সঙ্গে সুপরিচিত অথচ সম্যক অর্থে অজ্ঞাত চরিত্র। তাঁদের ভাব ও ভাবনার নির্যাসটুকু যথাযথভাবে পরিবেশন করেছেন লেখক তাঁর এই বিবেকানন্দ-নিবেদিত প্রবেশিকার মধ্যে।

বাঘের কথা

মৃন্ময়ী দাস

ভারতের জাতীয় পশু বাঘ/ বিশ্বনাথ বসু/ মণ্ডল বুক হাউস/ কল-৯/২০.০০

একাধারে তথ্যসমৃদ্ধ ও সুখপাঠ্য বই পাওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। বিশ্বনাথ বসুর ভারতের জাতীয় পশু বাঘ এমনই একটি বই। ১৯৭২ সালে সিংহের বদলে বাঘকে ভারতের জাতীয় পশুরূপে গণ্য করা হয়। শৌর্য ও পরাক্রমের প্রতিমূর্তি এই জাতীয় পশুটি সম্পর্কে বিশদভাবে জানার কৌতূহল থাকাটা স্বাভাবিক। লেখক একাধারে শিকারী ও বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ। তিনি তাঁর দীর্ঘ দিনের পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছেন বইটি রচনার সময়ে। বইটিতে একদিকে যেমন বাঘের আদি ইতিহাস, বংশের ঠিকুজীকোষ্ঠী, সংখ্যা, বংশবিস্তার, বিভিন্ন প্রজাতিতত্ত্ব প্রভৃতির বিশদ বিবরণ আছে, অন্য দিকে আছে বর্তমানে বাঘের দ্রুত অবক্ষয়ের কারণ ও পরিসংখ্যান। এছাড়া লেখকের নিজের ও অন্য শিকারীদের বাস্তব অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ প্রচুর কাহিনীর সাবলীল বর্ণনাও। বইটিতে এককথায় ব্যাঘ্রতত্ত্ব ও শিকারকাহিনী উভয়েরই স্বাদ পাওয়া যায়। এর জন্য লেখককে বেদ, বৌদ্ধসাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত থেকে শুরু করে আধুনিক কালের বনাপশু সংক্রান্ত বহু বই থেকে তথ্য আহরণ করতে হয়েছে। বাঘের জন্ম, দেহতত্ত্ব, সমাজজীবন, আচার-আচরণবিধি, পরিবেশতত্ত্ব, সবই বইটিতে বর্ণনা করা আছে। বাঘ ভারতবর্ষের আদিবাসিন্দা নয়। ৫০০০ খ্রীস্ট পূর্বের কোনও এক সময়ে ব্রহ্ম ও আসামের পথে বাঘের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল আমাদের দেশে। সুদূর সাইবেরিয়া থেকে দক্ষিণ-পূর্বমুখী পদযাত্রায় ভারতবর্ষই নাকি বাঘের শেষ গন্তব্যসীমা।

বইটিতে লেখক বাঘের আবির্ভাব থেকে তার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বাঘের ইন্দ্রিয় ব্যবহারের ক্ষমতা ও স্বভাব সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত জ্ঞানের বিপরীত কিছু কিছু তথ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন বাস্তব উদাহরণ সহযোগে। বাঘের চোখ নাকি অন্ধকারে জ্বলে না, কেবলমাত্র আলো ফেললে তবেই জ্বলে। বিভিন্ন আলো এবং বাঘের মেজাজের তারতম্যের ওপর চোখের রঙ ও ঔজ্জ্বল্যের পরিবর্তন ঘটে। বাঘের আঘ্রাণক্ষমতা নাকি সামান্যই, শুধু চোখে দেখে ও অনুমানের সাহায্যে তাকে শিকার করতে হয়। বাঘের স্মৃতিশক্তি

ভালোই—সে বন্দুক রাইফেল হাতে সুসজ্জিত মানুষকে এড়িয়ে চলে, জংলী অরক্ষিত মানুষই তার শিকার হয় বেশি। বন কুকুরের ভয়ে বাঘ নাকি বন ছেড়ে পালায়, তার পরিসংখ্যানও লেখক দিয়েছেন। বাঘ সাধারণত মানুষ মারে না, সুন্দরবনের বাঘ এর ব্যতিক্রম পরিবেশজনিত কারণে। বাঘ দলবদ্ধ প্রাণী না হলেও মাঝে মধ্যে দল বাঁধে। বাঘ নিয়ে আলোচনা করতে করতে লেখক আরও আরও অন্য অনেক বন্যপ্রাণীর স্বভাব ও আচরণবিধির বর্ণনা করেছেন। বাঘ - শুকর, বাঘ-কুমীর বাঘ-মোষ, বাঘ-বাঘ প্রভৃতির মধ্যে যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়। বইটিতে সাদা বাঘের আবির্ভাব ও ঠিকুজীকোষ্ঠীর বিশদ বিবরণ কৌতূহলী মনের খোরাক যোগায়। বইটিতে একটি বিশেষ অংশ জুড়ে আছে বাঘের দ্রুত অবক্ষয় ও সংরক্ষণের বিষয়। প্রায় ৫০ বছর আগেও ভারতে বাঘের সংখ্যা ৪০,০০০-এর মত ছিল বলে মনে করা হয়। কিন্তু মানুষের লোভ কেবলমাত্র বাঘ কেন বহু বন্যপ্রাণীকেই দ্রুত অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বনভূমি কমেছে, শিকার বেড়েছে। বর্তমানে ভারতে বাঘের সংখ্যা ৩০০০-এর মত। ১৯৭২ সালে শুরু হয় ব্যাঘ্রপ্রকল্প। কিন্তু কেবলমাত্র সরকারী উদ্যোগ নয়, সাধারণ মানুষের সচেতন হওয়া উচিত এদের সুরক্ষার জন্য। কেবলমাত্র এই দুর্লভ প্রাণীর অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য নয়, মানুষ ও বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্যও এটা প্রয়োজন। লেখক এই বিষয়ে মানুষকে নানাভাবে সচেতন করেছেন। কিন্তু বইটিতে বিষয়বস্তু আরও সুসংবদ্ধ হলে ভাল হত। তথ্য ও ঘটনা যেন স্থানে স্থানে ছড়ানো ছিটোনো। এক বিষয় থেকে লেখক অন্য বিষয়ে অনেক দূর চলে গিয়ে আবার পুরনো বিষয়ে ফিরে এসেছেন। বইটিতে ছবি বড় কম।

বাংলা হেমিংওয়ে

বীরেন্দ্র দত্ত

নির্বাচিত হেমিংওয়ে/ অর্ধেন্দু চক্রবর্তী/ মডেল পাবলিশিং হাউস/ কল-৭৩/৪০.০০

বিশ্ববিশ্রুত আমেরিকান কথাকার আর্নেস্ট মিলার হেমিংওয়ে নতুন কোন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। বর্তমানে আমাদের আলোচ্য তাঁরই দুটি বিখ্যাত উপন্যাস, বেশ কিছু বাছাই গল্প, সামান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ চিঠির অনুবাদ সংকলন গ্রন্থ 'নির্বাচিত হেমিংওয়ে'। সংকলনের উল্লেখ্য দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি হ'ল সম্পাদক অর্ধেন্দু চক্রবর্তী লিখিত মুখবন্ধের মত হেমিংওয়ের জীবন-পরিচিতি ও সাহিত্য মূল্যায়ন প্রসঙ্গ, অন্যটি হেমিংয়ের একান্ত ব্যক্তিগত পারিবারিক ও শিল্পী স্বভাবের পরিচয়জ্ঞাপক কিছু মূল্যবান আলোকচিত্রের মুদ্রণ। মুখবন্ধের মত অংশটি সংযত ও সুলিখিত যদিও সম্পাদকের কোন কোন প্রাসঙ্গিক মন্তব্য নিশ্চিতভাবে বিতর্কের অবকাশ রাখে। যেমন, 'চিঠিপত্র প্রকৃত অর্থে ব্যক্তিগত' তা দিয়ে সাহিত্যের কোনই মূল্যায়ন হয় না।' মুদ্রিত আলোকচিত্রগুলি দুষ্প্রাপ্য এবং অনূদিত গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক। আলোচ্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে দুটি উপন্যাস—'দি ওল্ড ম্যান এ্যান্ড দি সী' এবং 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস', 'হেমিংওয়ের গল্প' এবং 'হেমিংওয়ের চিঠি', অনুবাদক যথাক্রমে অর্ধেন্দু চক্রবর্তী, অধীর দাস, দেবব্রত মল্লিক ও নীলাঞ্জন সেন। যে কোন অনুবাদ পড়তে গেলেই অনূদিত ভাষার স্বভাবী পাঠকদের সব সময়ে কিছু না কিছু অসুবিধে ও অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হয়। এ প্রসঙ্গে বহু ব্যবহৃত বক্তব্যটি হল—অনুবাদ আক্ষরিক হবে, না ভাবানুবাদ? এর সঙ্গে আরও প্রশ্ন আসে। একটা ভাষা থেকে অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদক বাক্যগঠনে কতটা মূলানুগ ও সংযত হবেন, আবার কতটাই বা স্বাধীনতা ভোগ করবেন? যেহেতু অনুবাদ প্রবন্ধ নয়, সৃষ্টিধর্মী কথাসাহিত্য ও চিঠিপত্র, সে ক্ষেত্রে অনুবাদিত ভাষার বাক্যগঠনে শব্দপ্রয়োগে অনুবাদকের

সচেতন, সতর্ক, শিল্পসম্মত শব্দজ্ঞান কতটা থাকা দরকার, কতটাই বা গদ্যের অন্তর্লীন অভিজ্ঞতা মূল লেখকের কল্পনা ও মননের অনুবর্তী হবে—তা বিবেচ্য । অর্থাৎ অনূদিত ভাষার গদ্যে বাক্য ও শব্দগুলি কি গঠিত হবে না নির্মিত হবে ? এইসব মৌল সমস্যা ও প্রশ্নগুলির দিকে তাকিয়েই নির্বাচিত হেমিংওয়ের গ্রন্থের অনূদিত উপন্যাস, গল্প ও চিঠির আলোচনা প্রয়োজন । গ্রন্থটির সম্পাদক অর্ধেন্দু চক্রবর্তী স্বয়ং 'দি ওল্ড ম্যান এ্যান্ড দি সী' গ্রন্থের অনুবাদের প্রথমেই আমাদের একটি বিভ্রান্তির মধ্যে রেখেছেন । হেমিংওয়ের মূল গ্রন্থের একেবারে আরম্ভের বাক্য তিনটি এইরকম : 'He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream and he had gone eighty four days now without taking a fish. In the first forty days a boy had been with him. But after forty days without a fish the boy's parents had told him that the old man was now definitely and finally salao, which is the worst form of unlucky.' অনুবাদক এই অংশটির অনুবাদ করেছেন এইভাবে, 'বুড়ো মানুষটা একা একাই গালফ স্ট্রীমে মাছ ধরে বেড়াতো । আজ চুরাশি দিন হয়ে গেল, কিন্তু এই চুরাশি দিনের মধ্যে একটাও মাছের মুখ দেখল না সে । এমন আকাল দেখে, চল্লিশ দিনের মাথায় ছেলেটার মা-বাপ বলেছিল, বুড়োটার কপাল ভেঙেছে ।' (পৃঃ ১) অনুবাদে মূলের দ্বিতীয় বাক্যটি হঠাৎ বাদ পড়ল কেন ? আর বাদ যাওয়ার ফলে তৃতীয় বাক্যের চল্লিশ দিনের মাথায় ছেলেদের মা-বাপ বলেছিল'—এমন প্রসঙ্গের আকস্মিকতা কাহিনীর সূত্রপাতেই বিভ্রম ঘটায় । হঠাৎ মাঝের একটি বাক্য অনূদিত না হওয়া কি মুদ্রণ প্রমাদ, না অনুবাদকের অনবধানতা, অথবা ইচ্ছাকৃত প্রয়াস ?

'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' গ্রন্থের অনুবাদে অধীর দাস ছোট ছোট বাক্য তৈরি করে মূল গ্রন্থের স্বাদ দানে সচেষ্ট ।

কথ্য শব্দের ব্যবহারে গদ্যের গতি মূলের মতই অনায়াস, স্বচ্ছন্দ । যেমন : 'হোটেলের জানলায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি । দেখলাম গাড়ি আসছে । হোটেলের সামনে এসে থামল । বৃষ্টির জন্য ঘোড়াটা মাথা নিচু করে আছে । ছাতা মাথায় বেয়ারাটা গাড়ি থেকে নেমে হোটেলে ঢুকল । বেয়ারা আমাদের ছাতা ধরল আমরা গাড়িতে গিয়ে উঠলাম ।

রাস্তার নদমা দিয়ে তোড়ে জল বয়ে যাচ্ছে ।' (পৃঃ ১২৭) মূলের বড় বড় বাক্যগুলিকে কোন কোন জায়গায় ছোট ছোট বাক্যে ভেঙে অনুবাদক উপন্যাসটির গদ্যে স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রেখেছেন যেমন তেমনি কথ্য শব্দের অন্তরঙ্গতা অনুবাদগ্রন্থটি পাঠে পাঠকদের আড়ষ্টতা সরায় ।

গল্পের অনুবাদে দেবব্রত মল্লিক, ঠিক যে অর্থে মূলের অনুগ হওয়ার কথা আমরা ভাবি তা নন । তিনি বেশ কিছুটা স্বাধীনতা নিয়ে বাক্যকে ভেঙেছেন ও গড়েছেন । 'দি স্নোজ অফ কিলিমানজারো' গল্পের উদাহরণই ধরা যাক । মূলে আছে : 'The cot the man lay on was in the wide shade on a mimosa tree and as he looked out past the shade onto the glare of the plain there were three of the big birds squatted obscenely while in the sky a dozen more sailed making quick-moving shadows as they passed'. এই অংশের অনুবাদ দেবব্রত মল্লিক করেছেন এইভাবে 'মিমোশা গাছের বিস্তৃত ছায়ায় মানুষটি একটি চৌকির ওপর শুয়ে । কিছু ক্ষণের মধ্যে ছায়া সরে যেয়ে পড়ে সমতল ভূমির উজ্জ্বল জায়গায় । সেখানে তিনটি বড় পাখি উবু হয়ে বসে আছে । সেই মুহূর্তে আকাশে উড়ল আরো এক ডজন । যত দ্রুত ওরা উড়ছিল ওদের ছায়াগুলোও সরে সরে যাচ্ছিল তত দ্রুত ।' যাই হোক, আলোচ্য গ্রন্থে হেমিংওয়ের পনেরোটি বিখ্যাত গল্পের অনুবাদ আছে । যত দূর মনে পড়ে, বাংলায় হেমিংওয়ের গল্পের এমন ব্যাপক অনুবাদ এই প্রথম । এবং অনুবাদগুলি গল্পকার হেমিংওয়ের মানসিকতা বোঝানোয় সক্ষম ।

হেমিংওয়ের মোট চারটি চিঠি অনুবাদ করেছেন নীলাঞ্জন সেন । এটা বুঝি মূলের সঙ্গে মিলিয়েই যে হেমিংওয়ের চিঠির গদ্য অনুবাদ বেশ কিছুটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার কিন্তু অনুবাদক সে ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নিয়ে আরও সহজ, সচ্ছল হতে পারতেন ।

[illegible]

দ

দিনরাত। জগন্নাথ চক্রবর্তী ২৬, ১৭
দিনরাত কাকে ডাকো। কমল তরফদার ৩৮, ৪২
দিনরাত রাতদিন। মৃণাল বসুচৌধুরী ৪৮, ৫
দিনরাতের খেলা। সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৩৪, ৩১-৩৫, ৭
দিনরাত্রির দাম। অমল মুখোপাধ্যায় ৪১, ৩৬
দিনলিপি। অশোক রায়চৌধুরী ৫০, ৪৬
দিনলিপি। পূর্ণেন্দুবিকাশ ভটাচার্য ৫০, ৪৬
দিনলিপি। সঞ্জয় ভট্টাচার্য ২৫, ৪৪ ; শা ১৯৫৮ ; শা ১৯৫৯
দিনলিপি—জ্যৈষ্ঠ। সঞ্জয় ভট্টাচার্য ২৬, ৫০
দিনান্তর। শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় ২১, ১৬
দিনান্তিকা। অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় শা ১৯৫৯
দিনে গরম, রাতে অন্ধকার ৪৮, ২২, ২০ জুন ১৯৮১ : ৭, সম্পা
দিনে দিনে প্রহরে প্রহরে। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৩৩, ৩১
দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৩, ২৭ (সা) ; ৫০, ১৩ ; সা ১৯৮৩
দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুভাষ চৌধুরী সা ১৯৮৩
দিনেমারের দেশে। আদিত্যবর্ণ মিত্র ৩৩, ১১
দিনের বাগানে। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৫০, ৩
দিনের রঙে শরৎ। শিশির ভট্টাচার্য ৪১, ২
দিনের শেষে। সত্যেন্দ্র আচার্য ৩৫, ২৫
দিনেশ দাশ
অদৃশ্য পাখি ১৩, ১২, ১৮ জা ১৯৬৯ : ১৩১৪, ক
অর্থহীন ৩৭, ৪৪, ২৯ আ ১৯৭০ : ৪৩৬, ক
অসংগতি শা ১৯৭১ : ৫৮, ক
আবির্ভেঃ নমো দেবতা ২৭, ২৪, ১৬ এ ১৯৬০ : ৮৩২, ক
আহা পিঁপড়ে শা ১৯৭৫ : ৩২৩, ক
এই বৃষ্টিতে ৩৯, ৩৫, ১ জু ১৯৭২ : ৯৫৫, ক
একটি গাছ শা ১৯৬০ : ৫৯, ক
একটি ঝড় শা ১৯৬২ : ৭৪, ক
একটি ঠিকানা শা ১৯৬৩ : ৬৫, ক
একটি পুরনো গাছ শা ১৯৬৭ : ৫৯, ক
একা শা ১৯৭৫ : ৩২৬, ক
এখন ঘুম শা ১৯৮১ : ২৪, ক
এখন শীত শা ১৯৬১ : ২৫, ক
এপার ওপার জুড়ে দু'পার বাংলায় ৩৮, ৩৯, ৩১ জু ১৯৭১ : ১৩৮৪, ক
কবিতা চিন্তা ২৮, ৪২, ১৯ আ ১৯৬১ : ২০২, ক
কাঁচের মানুষ ২৬, ৩৬, ৪ জু ১৯৫৯ : ৭৬৪, ক
কৈঁদোনা ৩০, ৭, ১৫ ডি ১৯৬২ : ৫৯৪, ক
গঙ্গা গঙ্গা গঙ্গা ৪৫, ১৪, ৪ সে ১৯৭৮ : ১৭, ক
গদ্য সনেট ৪১, ২৮, ১১ মে ১৯৭৪ : ৯৪, ক
গিরগিটি শা ১৯৭৪ : ২৩০, ক
ছাই শা ১৯৬৪ : ১০৬, ক
ছায়া ছায়া নব শা ১৯৫৯ : ১৭৩, ক
ছেঁড়া পাল শা ১৯৫৬ : ৫৯, ক
ছেলেগুলো ২৯, ২৩, ৭ এ ১৯৬২ : ৮৯০, ক
জানুয়ারী, ১৯৬৪ ৩১, ১৪, ৮ ফে ১৯৬৪ : ৩১, ক
জার্নাল : হাসপাতালে শা ১৯৮৩ : ৩৪৩, ক
ত্রিপুরায় শা ১৯৮০ : ৬৪, ক
দিকভ্রষ্ট ৩১, ৬, ১৪ ডি ১৯৬৩ : ৫৩২, ক
ধোঁয়া বৃষ্টি অন্ধকার শা ১৯৭০ : ৩২, ক
নিদ্রাহীনতা শা ১৯৭৯ : ৬২, ক
নোটবুক ১৯৮৩ ৫০, ১৯, ১২ মা ১৯৮৩ : ১০, ক
বার্ধক্যে শা ১৯৭৬ : ২৭২, ক
ভিজে ভোর ২১, ৩, ২১ ন ১৯৫৩ : ১৪৬, ক
মনে-মনে শা ১৯৫৪ : ৫৯, ক
মহাকাশ মানুষ রুটি ৩৮, ২, ১৪ ন ১৯৭০ : ১২৬, ক
মাংসের দোকান শা ১৯৭২ : ৯০, ক
মৃত সৈনিকদের উদ্দেশে ৩০, ২৩, ৬ এ ১৯৬৩ : ৮৭৬, ক
রক্তের আগুন হবে নদী শা ১৯৬৯ : ৭১, ক
রাম গেছে বনবাসে শা ১৯৭৩ : ৬২, ক
শব-সাধনা শা ১৯৬৬ : ৭২, ক
শিল্পীর স্বাধীনতা ৩১, ১৮, ২ মা ১৯৬৩ : ৪০১-৪০৩, স
শেষ কার্তিকের হাওয়া ৩১, ৭, ২১ ডি ১৯৬৩ : ৬৪২, ক
শ্রীমতী শা ১৯৫৭ : ৮৭, ক
সময় সময় নয় ৩৪, ২৪, ১৫ এ ১৯৬৭ : ১০৬৬, ক
হার্ট অ্যাটাক শা ১৯৮২ : ২১, ক
হে নারী হে নদী ২৯, ৭, ১৬ ডি ১৯৬১ : ৫৯৬, ক
হে হৃদয় হাসো হাসো শা ১৯৬৫ : ৯৩, ক
দিনেশ দাস, অনু
একটি আধুনিক আরবী কবিতা ২১, ২৬, ১ মে ১৯৫৪ : ৭৮৯, ক
কবি ২১, ২১, ২৭ মা ১৯৫৪ : ৪৬৩, ক
মৃত্যুতৃষ্ণা ২১, ২১, ২৭ মা ১৯৫৪ : ৪৬৩, ক
দিন্দা। গৌরকিশোর ঘোষ ২১, ৪
দিবাকর সেন ও সপ্তম ঘোষ
আচার্য জগদীশচন্দ্রের অপ্রকাশিত বাংলা রচনা ৪৮, ৩১, ২২ আ ১৯৮১ : ৯-১২, স
দিবাকর সেনরায়
ছলনা ২১, ৮, ২৬ ডি ১৯৫৩ : ৫৪৯, ক
শব্দচরিত ২১, ২০, ২০ মা ১৯৫৪ : ৪১০, ক
সংশয় ২১, ২, ১৪ ন ১৯৫৩ : ১৩৬, ক
স্মৃতিভ্রংশ ২১, ১৫, ১৩ ফে ১৯৫৪ : ১১৯, ক
দিবাভিসার। দ্বিজ নীলকণ্ঠ শর্মা ২১, ৪৩
দিবাস্বপ্ন। অরবিন্দ গুহ শা ১৯৫৭
দিবাস্বপ্ন। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৩, ৪৭
দিব্য পাখি। রামেন্দ্র দেশমুখ্য ৩২, ১২
দিব্যা রায়
মহাসমুদ্র ২৫, ৪৭, ২০ সে ১৯৫৮ : ৫২৫, ক
দিব্যেন্দু পালিত
অন্ধকারে স্মৃতির শব ২৯, ২৫, ২১ এ ১৯৬২ : ১০৭৬, ক
অবনত বারুদ ৩৭, ৩৬, ৪ জু ১৯৭০ : ১০৫৮, ক
অসুখ ৩৫, ৩০, ২৫ মে ১৯৬৮ : ৪৩৭-৪৪৩, গ
আজও সূর্য জ্বলে ৪৬, ২৬, ২৮ এ ১৯৭৯ : ৩৯, ক
আত্মরক্ষা ও তারপর ৩৪, ৩১, ৩ জুন ১৯৬৭ : ৫৮৫-৫৯৪, গ
আত্মীয় ২৮, ৪৪, ২ সে ১৯৬১ : ৩৯৪, ক
আদল ৪৪, ২০, ১২ মা ১৯৭৭ : ৪৪২, ক
এইভাবে ৪৪, ২৬, ২৩ এ ১৯৭৭ : ৮৭৪, ক
এক ঋতু ২৯, ৪৫, ৮ সে ১৯৬২ : ৫৪৭-৫৫৬, গ
একটি মন্দিরের জন্ম ও মৃত্যু ৪২, ১৩, ২৫ জা ১৯৭৫ : ৯৬৭-৯৭০, গ
এলিজি ৫০, ৩৮, ২৩ জু ১৯৮৩ : ৬২, ক
কলকাতা ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ ১৬, ৪৪, ২৫ ন ১৯৭৮ : ৩৫, ক
কিছু স্মৃতি, দুঃখ বোধ, কিছু অপমান সা ১৯৭৬ : ১৯৫-২০৬, স
কেন যে এমন করে ৪৬, ৩৮, ২১ জু ১৯৭৯ : ৩৯, ক
কোঅপারেটিভ ৪৪, ৩২, ৪ জুন ১৯৭৭ : ৯, ক
গন্ধের আবির্ভাব ৪১, ৩১, ১ জুন ১৯৭৪ : ৩৪৩-৩৪৮, গ
গর্ভ ৩৩, ১৮, ৫ মা ১৯৬৬ : ৪৪৩-৪৪৮, গ
ঘুম ৪০, ২৪, ১৪ এ ১৯৭৩ : ১০১৫-১০২৩, গ
ঘুম ৪৩, ৫১, ১৬ অ ১৯৭৬ : ৮৭৬, ক
ছাগল বিষয়ে দু চার কথা ৪৪, ৪৪, ২৭ আ ১৯৭৭ : ২৩-২৯, গ
জলাতঙ্ক ২৯, ১৪, ৩ ফে ১৯৬২ : ২৬, ক
তবুও আমার পাপ ৩৯, ৪৬, ১৬ সে ১৯৭২ : ৬৬০, ক
তোমার চোখের জল ৪৫, ৭, ১৭ ডি ১৯৭৭ : ৩৯, ক
তোমার ভালবাসা ২৫, ২১, ২২ মা ১৯৫৮ : ৫৫২, ক
তোমার মৃত্যু ঘিরে ৪৪, ৩২, ৪ জুন ১৯৭৭ : ৯, ক
দাঁত ৩৭, ৩৮, ১৮ জু ১৯৭০ : ১২৬৭-১২৭৫, গ
দুঃসময় ২৭, ৪০, ৬ আ ১৯৬০ : ৩৫-৪০, গ
দেহ মনের বৈতালিক সা ১৯৬৯ : ২৬৭-২৭৪
নিত্যগোপালের পুত্রলাভ ৪৯, ৩২, ১২ জুন ১৯৮২ : ২৭-৩১, গ
নিয়ম ২৩, ৫১, ২৪ মা ১৯৫৬ : ৬১১-৬১৮, গ
নির্বাসন, নয় নির্বাচন ৫০, ৪৭, ২৪ সে ১৯৮৩ : ২৯, ক
পরস্পর ২৭, ১৮, ৫ মা ১৯৬০ : ৩৬৯-৩৭৩, গ
পলাতকা ৩০, ৪৫, ৭ সে ১৯৬৩ : ৫৯৩-৫৯৬, গ
পাতালে বাড়ালে মুখ ৩১, ৯, ৪ জা ১৯৬৩ : ৮৭৮, ক
প্রাণ চায় বৃষ্টিপাত শা ১৯৭৪ : ২৩৩, ক
বুদ্ধিজীবী ৪৪, ৩৬, ২ জু ১৯৭৭ : ৩১-৩২
বৃষ্টি ৪৪, ৪৬, ১০ সে ১৯৭৭ : ৩৯, ক
ব্যক্তিগত ৪৫, ২২, ১ এ ১৯৭৮ : ৩৯, ক
ব্যাভেরিয়ান আল্পনা ৫০, ৬, ১১ ডি ১৯৮২ : ৩২, ক
ভূমিকা ৪৬, ২৬, ২৮ এ ১৯৭৯ : ৩৯, ক
ভ্রমণ কাহিনী শা ১৯৭৮ : ৬৬, ক
মানুষের মুখ ৩৮, ২২, ৩ এ ১৯৭১ : ৮৭৫-৮৮০, গ
মৃত্যুর পথ ৩১, ৪২, ২২ আ ১৯৬৪ : ২২৩-২২৭, গ
যদি মৃত্যু হয় ৪৫, ৩১, ৩ জুন ১৯৭৮ : ৩৯, ক
যার আলো ৪৪, ৯, ২৫ ডি ১৯৭৬ : ৬০৮, ক
রহস্যময় আলো শা ১৯৭৬ : ২৭৭, ক
রোদ্দুরই সব ঘাম শুষে নেয় ৩৬, ৩৯, ২৬ জু ১৯৬৯ : ১৩৭৮, ক
লাবণ্য তোমাকে ছোঁয় ৪১, ৩৭, ১৩ জু ১৯৭৪ : ৮১৪, ক
লাল উপমা শা ১৯৭৭ : ৭৭, ক
শীত গ্রীষ্মের স্মৃতি ২৬, ১৮, ২৮ জা ১৯৫৯ : ৩২১-৩৩০, গ
শেষ বঙ্গ ২৫, ৩৬, ৫ জু ১৯৫৮ : ৭০৭, ক
সাহিত্য ও রাজনীতি ২৯, ৩০, ২৬ মে ১৯৬২ ৪৫৮-৪৬০
সুখ ৩০, ৩১, ১ জুন ১৯৬৩ : ৫০১-৫১১, গ
সূর্যের ফুসফুস যেন ২৯, ৩৯, ২৮ জু ১৯৬২ : ১২৭০, ক
সেখানে বৃষ্টি পড়ে ৪০, ৫১, ২৭ অ ১৯৭৩ : ১১০৪, ক
স্যানাটোরিয়াম থেকে ৪৩, ৩৪, ১৯ জুন ১৯৭৬ :

দেখলেন তো?
মামুলি ডিসটেম্পারের চেহারাকে
জেনসন অ্যাণ্ড নিকলসন
কেমন পাল্টে দেয়...

অ্যাক্রিলিকের জাদুর স্পর্শে!

আপনার জন্যে জেনসন অ্যাণ্ড নিকলসন এনেছে—পেণ্ট টেকনোলজির একেবারে নতুন নতুন নমুনা! কেবল জেন্সোলিন অ্যাক্রিলিক ওয়াশেবল্ ডিসটেম্পার-ই আপনাকে দিতে পারে অপূর্ব ফিনিশ, পাকা আসল রঙ আর দ্রুত শুকিয়ে যাওয়া ক্ষমতা। এত গুণ অথচ দাম সেই অন্য অয়েল বাউণ্ড ডিসটেম্পারের মতই।

জেন্সোলিন অ্যাক্রিলিক ওয়াশেবল ডিসটেম্পার- সবসেরা ডিসটেম্পার, বাড়তি খরচও লাগেনা যার!

Rediffusion/JN/4932 n BN

২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৬ পাঁচ টাকা

দেশ

ত্বকে আসুক চির বসন্ত

বোরো ক্যালেনডুলা অ্যান্টিসেপ্‌টিক
ক্রীম—সতেজ আর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বকে'র সাথী।
এতে আছে প্রাকৃতিক উপাদান—ক্যালেনডুলা
ও হাইড্রাসার্টিস ভেষজে'র উপকারী নির্য্যাস।
বোরো ক্যালেনডুলা অ্যান্টিসেপ্‌টিক
ক্রীম—প্রতিকূল আবহাওয়ায় আপনার ত্বকে'র
চিরকালীন সুরক্ষা। ঠোঁট ফাটা, ছোটো খাটো
কাটা-ছড়া আর পোড়া'র ক্ষতকেও চটপট
সারিয়ে তোলে। বোরো ক্যালেনডুলার ভেষজ
পরশ, ত্বকে'র যত্ন—সারা বরষ।

বোরো ক্যালেনডুলা

অ্যান্টিসেপ্‌টিক ক্রীম

HL এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন

নিশ্বাসে দুর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়!

আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র!

নিয়মিত কোলগেট ব্যবহার সারা পরিবারকে দেয় সুস্থসবল দাঁত
আর তাজা নির্মল নিশ্বাস। এর থেকেই তো আসে আত্মবিশ্বাস!
আর কোলগেটের তাজা মিণ্টি স্বাদ কার না পছন্দ!

প্রতিবার দাঁত মাজার সময়ে কোলগেটের বিশিষ্ট ফর্মুলা কীভাবে কাজ করে দেখুন।

দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকেই নিশ্বাসের গন্ধ আর দাঁত ক্ষয়ের শুরু।

কোলগেটের অজস্র সক্রিয় ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে এই ক্ষয়ক্ষতিকারী খাবারের কণাগুলো বার করে আনে, রোগজীবাণু হ'তে দেয় না।

ফলে দাঁত থাকে সুস্থসবল, নিশ্বাস হয় ঝরঝরে তাজা।

প্রতিদিন নিয়মিত কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজতে ভুলবেন না। সম্ভব হ'লে প্রতিবার খাবার পর।
নিশ্বাসে দুর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়!
আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র।

B84.55 Ben

কি তাজা মিণ্টি স্বাদ!

সূচীপত্র

দেশ

১১ পৌষ ১৩৯৩ □ ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৬ □ ৫৪ বর্ষ ৯ সংখ্যা

প্র চ্ছ দ নি ব ন্ধ

প্র চ্ছ দ ক বি তা

প ত্রা ব লী

বি জ্ঞা ন

এ ই দে শ এ ই বি শ্ব

গ ল্প

ধা রা বা হি ক র চ না

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

খে লা

ব্য ঙ্গ কৌ তু ক

অ ঙ্গ না

নি য় মি ত

প্র চ্ছ দ

ওয়াসিম কাপুর

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক
৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ২০ পয়সা পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা

৩৭

বর্ষা-বসন্ত নিয়ে যতো বাড়াবাড়ি, শীত নিয়ে ততো সংযম, শীতকে ততো এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে আমাদের সাহিত্যে। অথচ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বঙ্গের অঙ্গনে শীতের মতন এমন পরমোৎসব লগ্ন দ্বিতীয়টি দুর্লভ। এর দিগন্ত-বিস্তারী শ্যামল-নীলিম নয়নমোহন দৃশ্যপটে সরষে-কলাই'র হলুদ-নীলকণ্ঠী, চুমকি বোনা রবিশস্যের সবুজ গালিচাখানি বিছানো। তার উপর উৎসবের বর্ণাঢ্য আসর। কারনিভাল সার্কাসের বকের মতো সাদা তাঁবু। তরজা, যাত্রা, মেলা, সম্মেলন। টুসু, বিহু, ডেনি, নবান্নের মধুর পরব। কালিদাসের রঘুবংশে বর্ণিত—'আপাদপদ্মপ্রণতা' সুবর্ণ-ধান্য মঞ্জরীর শোভা। এইটেই তো গাঁদা, গোলাপ, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকার মরশুম। বর্ণময় পুষ্পসজ্জা, উল, শাল, জামিয়ারের পোশাক বিলাস, 'চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়'-র প্রচুর রসঘন দিন-রজনী। রজনী বলতেই স্মর্তব্য হবে লেপ-তোষকের শয্যাসুখও, যা অন্য ঋতুতে অনুপস্থিত। এই সেই শীতের সৌষ্ঠব। এসবেরই [illegible] এবারকার [illegible]। পূর্বাপর প্রসঙ্গ বিস্তারে অনিবার্যভাবেই [illegible] এসে পড়ে [illegible] স্মৃতিচারণ [illegible] মুগ্ধ-[illegible] শীত আগা নিয়ে বেশ [illegible] অনুরণিত একালের বিশিষ্ট ক'জন কবির ভাবনায়।

৭৯

দক্ষিণ ভারতের জাভাদি পাহাড়চূড়ায় কাভালুর দিগন্তবিস্তৃত অন্ধকারের মধ্যে সেখানে ধ্যানমগ্ন আধুনিক ভারতের বিজ্ঞান-তপস্বীরা। এটি তাঁদের পীঠস্থান। এশিয়ার বৃহত্তম অপটিক্যাল টেলিস্কোপ বসিয়ে এই অন্ধকার রাজ্যে বসে তাঁরা জ্যোতির্মণ্ডল গবেষণায় রত। এবার সমরজিৎ কর সেখানে নিয়ে যাচ্ছেন পাঠককে।

১০২

রবীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী এই ত্রয়ীর কাছে তালিম পাওয়া নেপথ্যবাসিনী অমিয়া ঠাকুর অমর্ত্যবাসিনী হলেন। এবারে তাঁর অজানা জীবনকথা, যাতে তাঁকে নতুন করে পাবো এবং শ্রদ্ধানত হবো সবিস্ময়ে।

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

এক ছন্দভাঙা, ছিন্নবাঁধন, আদিম, আত্মঘাতী এবং দুর্ধর্ষ ভাস্কর যিনি মূর্তি গড়তে পাথর ভাঙেন আর তাকে নমনীয় করেন ছড়ানো জীবন থেকে আহৃত গূঢ়-গাঢ় রস দিয়ে। কে এই বিপ্লবী শিল্পী, কী তাঁর সৃষ্টি-রহস্য তাই নিয়ে এক বিস্ময়কর জীবনোপন্যাস আগামী সংখ্যা থেকে শুরু। লিখছেন অগ্রণী সাহিত্যিক সমরেশ বসু। এবং নায়ক, মহান শিল্পী রামকিঙ্কর।

৯৮

সুপ্রাচীন কাল থেকে সুসংস্কৃতির সর্বত্রগামিতায় 'নরডিক এরিয়ান' জার্মানরা সুসমৃদ্ধ। যুদ্ধধ্বস্ত হয়েও অফুরান প্রাণৈশ্বর্যে আজও অপরাজেয়। জার্মানির চিঠিতে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত তুলে ধরছেন তার বিস্ময়কর রূপ, তাঁর ভিন্ন স্বাদের লেখ-শৈলী ও বিশ্লেষণী বৈদগ্ধ্যে। এবারে আছে ওখানকার সপ্তাহান্ত ছুটির দিনের ছোটাছুটি। সর্বত্র সেমিনারের হিড়িক। যেখানে [illegible] থেকে [illegible] প্রাণ বাদ যান না কেউ, তীব্রভাবে আলোড়িত, আক্রান্ত হতেও পারেন নির্বিবাদে।

প্রকাশিত হল: দুটি চিরায়ত গ্রন্থের আনন্দ-মুদ্রণ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

ছোটদের উপযোগী ক্লাসিক

শকুন্তলা

দাম ৬·০০

মহাভারতের কথা অমৃতসমান। আর, মহাভারতের অন্তর্গত শকুন্তলার কথা? সন্দেহ নেই, এমন বেদনামধুর ক্লাসিক উপাখ্যান পৃথিবীতেই কম লেখা হয়েছে। এই কাহিনী নিয়েই মহাকবি কালিদাস রচনা করেছেন তাঁর অমর এক নাটক।

কালিদাসের সেই নাটকটিকেই ছোটদের জন্য নতুন করে লিখে গিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর ভাষায় জাদু, বর্ণনায় সম্মোহন। শব্দ নয়, যেন ছবির পর ছবি দিয়ে লেখা এক চিরকালীন রূপকথা অবনীন্দ্রনাথের ছোটদের এই 'শকুন্তলা'।

নতুন আনন্দ-মুদ্রণে পাতায় পাতায় নতুন ছবি এঁকেছেন একালের শিল্পী সুব্রত চৌধুরী, আর এঁকেছেন চোখ-জুড়োনো মলাট।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

অসামান্য বুদ্ধ-জীবনী

নালক

দাম ৭·০০

নালক হল গৌতমবুদ্ধের গল্প। দেবলঋষি যোগে বসেছিলেন। ছোট্ট ছেলে নালক ঋষির সেবা করছিল। এমন সময় অন্ধকারে আলো ফুটল। চাঁদের আলো নয়, সূর্যের আলো নয়, সমস্ত আলো মিশিয়ে এক অপরূপ আলোর আলো।

সন্ন্যাসী নালককে বললেন, কপিলবাস্তুতে বুদ্ধদেব জন্ম নেবেন। আমি চললাম।

একলা নালক চুপ করে বসে রইল বটতলায়। তার ধ্যানমগ্ন চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল বুদ্ধের সারা জীবনের ছবি। একের পর এক অদ্ভুত জীবন্ত ছবি।

ভগবান বুদ্ধের আশ্চর্য জীবনকাহিনী ও অলোকদৃষ্টির অধিকারী এক সন্ন্যাসী বালক নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে-অসামান্য গ্রন্থ, তারই নতুন আনন্দ সংস্করণ প্রকাশিত হল। এ-গ্রন্থকে পাতা জোড়া-জোড়া দুর্দান্ত ছবি আর মলাট দিয়ে সাজিয়েছেন এ-যুগের রূপদক্ষ শিল্পী কৃষ্ণেন্দু চাকী।

প্রকাশিত হচ্ছে

বুদ্ধদেব গুহর

নতুন উপন্যাস

ভোরের আগে

নবনীতা দেবসেনের

ডাকাবুকো অ্যাডভেঞ্চার-অভিজ্ঞতা

ট্রাকবাহনে ম্যাকমাহনে

দাম ১৬·০০

কোথায় আসামের জোড়হাটে এক সাহিত্যসম্মেলন, আর কোথায় তিব্বত-সীমান্ত! তাও আবার প্লেনে-ট্রেনে শৌখিন ভ্রমণ নয়, যাকে বলে একেবারে ডাকাবুকো স্টাইলে অ্যাডভেঞ্চার। র‍্যাশনট্রাকে জোর করে জায়গা করে নিয়ে দুর্গম পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে ম্যাকমাহন লাইনের পাশে তাওয়াং পৌঁছনো। সেই লাসা-তাওয়াং রোড, যেখান দিয়ে চীনেরা এসেছিল। সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। অজানিতের পথে ঝাঁপ দেওয়ার এই অনন্য অভিজ্ঞতাকেই এই বইতে তুলে ধরেছেন নবনীতা দেবসেন, তাঁর নিজস্ব সরস, সপ্রতিভ ভঙ্গিতে। আশ্চর্য স্বাদু এই বই। কী বিষয়ে, কী বর্ণনায়। তথ্য, ইতিহাস, নিসর্গদৃশ্যের অপরূপ বর্ণনা এ সবই রয়েছে।

কিন্তু সব-ছাপিয়ে যা দুর্বার আকর্ষণ তা হল, প্রতিটি পদক্ষেপকে মুচমুচে মজা দিয়ে মুড়ে জীবন্ত করে তুলে-ধরা—যার স্বাদ একমাত্র নবনীতা দেবসেনের কলমেই পরমরমণীয়।

লেখিকার অন্যান্য বই:

নটী নবনীতা ১৫·০০

স্বভূমি ১০·০০

পুণ্য পুরুষ, পুণ্য প্রসঙ্গ

আসন্ন কল্পতরু উৎসব ও সদা-গত সারদামায়ের পুণ্য অবিভাবতিথির অনুষঙ্গে স্মরণীয় আনন্দ পাবলিশার্স-এর কতিপয় প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ।

শ্রীম কথিত

অমৃতবাণীর সংগ্রহ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

দাম ২৫·০০

স্বামী লোকেশ্বরানন্দের

কথামৃতের অনন্য ভাষ্য

তব কথামৃতম

দাম ৪০·০০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের

পুণ্য চরিতকথা

বিবেকানন্দ চরিত

দাম ১৫·০০

ছেলেদের বিবেকানন্দ

দাম ৬·০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর

বিবেকানন্দের কালজয়ী রচনা ও বিবেকানন্দ বিষয়ে স্মরণীয় উক্তি নিয়ে

বিবেকানন্দ কবি চিরন্তন

দাম ২০·০০

বিবেকানন্দ কবি চিরন্তন

কিশোর-পাঠ্য জীবনী

আমাদের নিবেদিতা

দাম ৬·০০

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের

কথামৃতের গল্পমালা

কথায় কথায়

দাম ১০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশিত হল

বহুদর্শী প্রয়াত চিকিৎসক

নলিনীরঞ্জন কোনার-এর

অমূল্য স্মৃতিপঞ্জী

আমার ডাক্তারী ২য় খণ্ড

দাম ১৫·০০

স্মৃতিকথা মাত্রেই কোনও না কোনও দিক থেকে আকর্ষণীয়। তদুপরি, তা যদি হয় ডাক্তার নলিনীরঞ্জন কোনার-এর মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকের, তাহলে তার আকর্ষণ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। কেননা, প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারের অভিজ্ঞতার পরিধির অন্তর্ভুক্ত হন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। তাঁর চোখের সামনে উন্মোচিত হয় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বহু অজানা দিক, জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন মানুষের বিচিত্র

দৃষ্টিভঙ্গি। আরও বড় কথা, পরবর্তী প্রজন্মের তরুণ চিকিৎসকরাও খ্যাতকীর্তি পূর্বসূরীর এ-জাতীয় স্মৃতিপঞ্জী থেকে নানাভাবে উপকৃত হবার সুযোগ পান। মানুষের অজস্র রোগের অসংখ্য উপসর্গ, চিকিৎসার ধরন, বিভিন্ন সংকটময় পরিস্থিতি ও তার সমাধান সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়। তাঁর বহুব্যাপ্ত চিকিৎসক জীবনের বেশ কিছু কৌতূহলকর অভিজ্ঞতার বিবরণ নিয়ে ডাঃ কোনার এর আগে লিখেছেন 'আমার ডাক্তারী'। সেই মূল্যবান গ্রন্থেরই দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হল। এ-পর্বেও অনুরূপ কিছু বিবরণ। আশা করা যায়, এই খণ্ডটিও পূর্ববৎ সমাদৃত হবে।

থিয়েটারের ভালমন্দ

২৭ সেপ্টেম্বরের 'দেশ'-এ (৫৩ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা) শ্রীরমাপ্রসাদ বণিকের লেখা "দায়বদ্ধ" পড়লাম। এই নাট্যশিল্পীর বহু গুণমুগ্ধের মধ্যে আমিও একজন। আমাদের নাট্যকর্ম প্রসঙ্গে কিছু কিছু প্রশ্ন নিয়ে বিচলিত আছি বহুদিন যাবৎ। আশা ছিলো নবীন অথচ অভিজ্ঞ এই নাট্যশিল্পীর কাছে মিললেও মিলতে পারে চিন্তার সেই স্বচ্ছতা—বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতা, সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে আর দিশারীর ভূমিকা পালনে যা নিতান্তই অপরিহার্য। তিনি লিখলেন, "ষাটের দশক ছিল বাংলা থিয়েটারের স্বর্ণযুগ।" কিন্তু ষাটের দশকের কপালেই কেন এই গৌরব তিলক সেই প্রসঙ্গ বিশ্লেষিত নয় এই লেখায়। কেন, স্বর্ণযুগ কেন? কিছু কিছু ভালো প্রযোজনা হয়েছিলো বলে? সে তো পঞ্চাশ বা সত্তরের দশকেও হয়েছিলো। কোথায় ষাট ছিলো পঞ্চাশ বা সত্তরের দশক থেকে আলাদা? ষাটের দশকের যে কজন নাট্যশিল্পীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে—শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁরা তো সত্তরেও কমবেশি সৃষ্টিশীল।

শ্রী দত্ত তো আজও কাজের মধ্যেই আছেন। শম্ভু মিত্র আর, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভাবেই যদি আজ এই দশা তবে তো স্বীকার করতে হয় নিছকই এক তাসের ঘর ছিলো আমাদের এ যাবৎ কৃত সব নাট্যকর্ম। এর পরে লিখলেন "(আমাদের নাটক) যাতে সমস্ত সাধারণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন-মানুষ বুঝতে পারেন।" আবার পরের পরিচ্ছেদেই "মূল্যহীন ভাবনা দেখার জন্য আমাদের থিয়েটারের বুদ্ধিমান দর্শক মূল্য দেবেন এটা আশা করাই অন্যায়।...আসলে আমাদের থিয়েটারও যেমন আলাদা আমাদের দর্শকও বোধ হয় আলাদা।" বড্ডো বিভ্রান্ত হতে হয় মনোযোগী পাঠককে। 'সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন' দর্শক না 'বুদ্ধিমান দর্শক' না কি 'আলাদা' দর্শক—কারা আমাদের থিয়েটারের দর্শক, কারাই বা আমাদের বাঞ্ছিত দর্শক? আরো পরে তিনি যেন পরিহাসের ভঙ্গীতেই লেখেন "...পৃথিবীতে মূর্খরাই তো মেজরিটি তাই আমাদের থিয়েটার একটু কম পপুলার বলে তেমন হতাশ হবারও..." ইত্যাদি। তাহলে কি আমরা 'এলিটিস্ট' নাট্যচর্চায় মগ্ন হয়ে আছি? সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জন্য নয় আমাদের থিয়েটার? কাদের জন্য নাটক করি আমরা? এই প্রশ্নটির যথাযোগ্য বিবেচনা হওয়া উচিত আমাদের থিয়েটারের স্বার্থেই। "ভালো থিয়েটার হলে মানুষ ঠিকই দেখেন।" এবং "আমি বলবো গুণগত মান বাড়লেই দর্শক বাড়বে।" আবার "প্রয়োগ কৌশল এবং প্রযোজনার আঙ্গিক দর্শককে আকৃষ্ট করতে পারলে সেই প্রযোজনা যে দর্শকের অনুগ্রহ লাভ করবেই তাতে কোন সন্দেহ নেই।"

—কেমন যেন গোলমেলে লাগে। ভালো থিয়েটার মানে কী? কাকে বলে ভালো থিয়েটার? 'শোয়াইক' এবং 'অমিতাক্ষর' দুটি প্রযোজনাই দর্শকের আগ্রহ উদ্রেক করেছিলো, ঠিক। অতএব, দুটিই তবে ভালো থিয়েটার? 'নরক গুলজার' এবং 'রানীকাহিনী' দুটিই দর্শক আকর্ষণ করে—দুটিই তবে ভালো থিয়েটার? যদি এ'কথাটা সত্য বলে মেনে নিই যে ভালো থিয়েটার মানুষ ঠিকই দেখেন তবে কি উলটোটাকেও সত্য বলে মেনে নেওয়া যাবে যে ভালো না হলে মানুষ সেই থিয়েটার দেখেনই না? দর্শকের 'অনুগ্রহ' যে প্রয়োগ-কৌশল আর প্রযোজনার আঙ্গিক মাধ্যমে আদায় করা যায় এ তথ্য কিছু নতুন নয়—উৎপল দত্ত থেকে শুরু করে অনেকেই তা জানেন এবং মানেন। কিন্তু সেই 'অনুগ্রহ'ই কি ভালো থিয়েটারের প্রমাণ-পত্র? অথচ, এই বিশ্লেষণের দায়টা দর্শকের নয়, এমন কি সমালোচকদেরও নয়—আমাদেরই। আমরা যারা থিয়েটার করি, আমরা যারা শিল্প এবং জীবনের কাছে দায়বদ্ধ। শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়—সব কটি নাম এক সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে এই লেখায়। 'ক্ষমতাবান প্রতিভা' এই বিশেষণে বিশিষ্ট এঁরা চারজনেই ক্ষমতাবান আর প্রতিভা—এই দুটি শব্দের অর্থ-ব্যঞ্জনা কি তুল্যমূল্য? না কি প্রতিভার মধ্যেও রয়েছে সক্ষম-অক্ষম ভেদাভেদ? শব্দের এই অসতর্ক প্রয়োগের পেছন থেকে উঁকি মারে যে চিন্তার অবিন্যাস তাতে কেন বিভ্রান্ত হবেন এই সমর্থ নাট্যশিল্পী?

কেন বিবেচনা না করেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবার প্রবণতায় আচ্ছন্ন হবেন শ্রীবণিকের মত এক গুণী শিল্পী? অথচ, তাই ঘটে যখন তিনি লেখেন "খুব স্বাভাবিক কারণেই ব্যক্তিগত অভিনয়ের দিন এখন শেষ হয়েছে তাই দলগত অভিনয়, ভাল নাটক, ভাল প্রয়োগকৌশলই এখন থিয়েটারকে বাঁচাবার একমাত্র পথ।" ব্যক্তির প্রস্তুতি বিনা কি দলের প্রস্তুতি সম্ভব? দলগত অভিনয় কোন অবলম্বনে সাধিত হবে যদি ব্যক্তিগত অভিনয়-শিক্ষা-চর্চার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয় সেই ইমারত? আজকের নাট্যকর্মে যে দৈন্য প্রকট ব্যক্তির সম্যক প্রস্তুতিহীনতা কি তার অন্যতম কারণ নয়? 'রানীকাহিনী' আর 'আগশুদ্ধি'-র পরিচালকের তো এ তথ্য অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। "আশির দশকটা মনে হয় থিয়েটারের পক্ষে বেশ ভাল" লেখেন তিনি প্রায় 'এ সপ্তাহটা কেমন যাবে' ভঙ্গীতে। 'কয়েকটি ভালো প্রযোজনা' পেয়েছি বলেই কি বলা যাবে এ কথা? এক-আধখানা ভালো উপন্যাস খান-চারেক ভালো গল্প বা গোটা দু-তিনেক ভালো কবিতা লেখা তো হয়ই, তাই বলে কি বলা যাবে বাংলা সাহিত্যের সময়টা ভালো চলেছে? এক-দুখানা ভালো চলচ্চিত্র হলেই চলবে? দু-একখানা ভালো ছবি আঁকা হলেই বলবো যে শিল্পের বেশ ভালোই অবস্থা এখন? লেখাটি পড়া শেষ হলে কষ্ট হয় এই মানুষটির জন্য যিনি অপরিমেয় সারল্যে বলতে পারেন "অতীতের সমস্ত পাপকে দুরীভূত করে এবার পুণ্যের শপথ আমাদের।" হায়রে! অতীতের পাপ বুঝি এমনই সহজে দূর করে দেওয়া যায়? আর, দেওয়া গেল মনে করলেই বুঝি দূর হয় পাপ? 'পাপ'—এই ধারণায় বিশ্বাসী হলে তো 'প্রায়শ্চিত্ত'-কেও মেনে নিতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত ছাড়াই কি পাপমুক্ত হওয়া যাবে? তাহলে কোন পথে কীভাবে হবে সেই প্রায়শ্চিত্ত? কী হবে আমাদের সেই পুণ্যের 'ভয়ঙ্কর শপথ'—বাণী?

সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা-৭০০ ০৬৮

রবীন্দ্র-ক্ষিতি-মোহনের চিঠি

পয়লা নভেম্বর '৮৬ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন সেন সম্পর্কে আলোচনা ও চিঠিপত্র সম্বন্ধে আমার এই পত্র। সংযোজিত বিষয়টি নিঃসন্দেহে দেশ পত্রিকার গৌরব আর আমাদের পিপাসু মনের খোরাক। তবে দু একটি জায়গা সম্পর্কে কিছু জানতে বা বলতে ইচ্ছে করে।

প্রথমত:—৫৭ ও ৫৮ পাতায় কবির স্বহস্তে লেখা চিঠির যে ছবিটা আপনারা ছেপেছেন তাতে একের মাথা অন্যের দেহে জুড়ে দিয়েছেন। ৫৭ পাতায় 'চিঠির ছবিটির প্রথমাংশ ৪ নং চিঠির প্রথমাংশ ও শেষাংশ ২নং চিঠির শেষাংশ। একইভাবে ৫৮ পাতার 'চিঠির ছবিটি'র প্রথমাংশ ২নং চিঠির প্রথমাংশ ও শেষাংশ ৪নং চিঠির শেষাংশ।

দ্বিতীয়ত:—৫১ পাতায় তৃতীয় কলমে—"...এই সূত্র ধরে ক্ষিতিমোহনের ঠিকানা জোগাড় করে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আশ্রমের কাজে যোগ দিতে আহ্বান জানালেন।" এখানে ঠিকানা জোগাড় করে আহ্বান জানানো অর্থাৎ চিঠি দিলেন। আমার এই মতের সমর্থনে পরবর্তী লাইন উল্লেখ করছি।"...কবি নিঃসংশয় চিত্তে তাঁকে আবার অনুরোধ করে পত্র দিলেন।"

এই 'আবার' মানেই তো একবার দেবার পর। কিন্তু ১৯০৮এর ১১ই ফেব্রুয়ারীর কনফারেন্সের পর ১৩ ফেঃ চিঠিটিই প্রথম। তাহলে ঠিকানা জোগাড় করে আহ্বান জানানো এবং আবার অনুরোধ করে পত্র দেওয়া কথাগুলি কেমন বিভ্রান্তি জাগায় না কি?

তৃতীয়ত: ৫১ পাতায় তৃতীয় কলমে (ক্ষিতিমোহন) "যোগ দিলেন কাশ্মীরের চম্বায় শিক্ষাসচিবের পদে।" আবার কিছু নীচে "১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে হিমালয়ের চম্বা রাজ্য ছেড়ে ক্ষিতিমোহন চলে এলেন কলকাতায়।" পুনরায় ৫৯ পাতায় ২য় কলমে প্রথম পত্রের পরিচয়ের শেষ দিক থেকে জানতে পারছি তাঁর সঠিক ঠিকানা অমৃতসর (পাঞ্জাব)। এবং তিনি রাজধানী চম্বায়

পোস্ট অফিসে গিয়ে চিঠি দিলেন । তথ্য সঠিক কোথায় ? চতুর্থতঃ : ৫৬ পাতায় প্রথম কলমে যে মাসের ছবিটি ছাপা আছে তা দ্বিতীয় চিঠির । কারণ সেখানে ২৪-২-০৮ ও রিসিভিং-এর তারিখ ২৮-২-০৮ লেখা আছে । তা ছাড়া পত্র পরিচয় থেকে জেনেছি মোটামুটি চারদিনে শিলাইদহ থেকে অমৃতসরে চিঠি আসছে । এখন প্রশ্ন ২৪ তারিখের চিঠি ক্ষিতিমোহন সেন ২৮ তারিখে পেলেন, পড়লেন ও উত্তরও না হয় সেদিনই দিলেন । কিন্তু সে চিঠি পেয়ে ২৮ তারিখেই রবীন্দ্রনাথ কিভাবে তাঁর তৃতীয় চিঠি ক্ষিতিমোহনকে লিখতে পারেন ? এক হতে পারে ক্ষিতিমোহন সেন ২৪ তারিখেই উত্তর লিখে পত্রবাহক মারফৎ কবিকে সেদিনই পৌঁছে দিলেন । তাই কি ? পত্র পরিচয় থেকে ব্যাপারটি পরিষ্কার হচ্ছে না ।

অপূর্ব কুমার চট্টোপাধ্যায়
বোলপুর

নাচনী

বহু বছর আগে পুরুলিয়া-তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত "পুরুলিয়া সংস্কৃতি মেলা"-তে নাচনীদের সঙ্গীত নৃত্যকলা উপভোগ করার সুযোগ হয়েছিল । মহারাষ্ট্রের বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ লোক সংস্কৃতির অন্যতম পণ্ডিত শ্রীপু.ল., দেশপাণ্ডে-ও ওই সংস্কৃতি মেলাতে যোগ দিয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন । বাংলা ভাষারও বহু সাহিত্যিক সঙ্গীতশিল্পী এই মেলাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন ।

শ্রীতপন কর নাচনীদের জীবন সম্বন্ধে যে সমস্যা তুলে ধরেছেন (দেশ ১/১১/৮৬) তা কিছু আঞ্চলিক ব্যাপার নয় । এ ধরনের পরিস্থিতি ও সমস্যা অন্যান্য রাজ্যেও বর্তমান । যেমন মহারাষ্ট্রের "তামাশা" শিল্পীদের জীবনে । "নাচনী" ও "তামাশা" প্রায় একই ধরনের লোক-সংস্কৃতি । তবে এটা বলতে হবে, মহারাষ্ট্রের "তামাশা" শিল্পীদের সমস্যা আজ বহুলাংশে মিটে গিয়েছে । আজ এ রাজ্যের রসিকজনের নিকট এঁরা বিশেষভাবে সম্মানিত এবং আর্থিক ক্ষেত্রেও মোটামুটি সচ্ছল । বিগত চার দশকে, মহারাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক জগতে নেত্রীস্থানীয় শ্রীমতী দুর্গা ভগবত-এর উদ্যোগে, মহারাষ্ট্র সরকার, রাজ্যের সুধীজন "তামাশা"-কে উন্নত লোকসংস্কৃতির মর্যাদা দিয়ে সরকার ও সর্বসাধারণের নিকট যোগ্য স্বীকৃতি আদায় করেছেন ।

বাঙালীদের মনোবৃত্তির দৈন্যদশা দেখিয়ে তপনবাবু যে প্রশ্ন তুলেছেন—"নাচনীদের এই পরিণতি আমাদের মমত্ববোধকে কি একটুও নাড়া দেয় ?" তা খুবই মমান্তিক । কিন্তু ওই প্রসঙ্গে "কোন কবি" বলে জনপ্রিয় গান "জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা" রচয়িতাকে যে ভাবে অবজ্ঞা করেছেন, তাও খুব দুঃখের । বহুল প্রচলিত নানা শিল্পীর দ্বারা গীত ওই গানটির রচয়িতা হলেন প্রখ্যাত প্রণব রায় ।

সলিল ঘোষ
বোম্বাই

ভালো মন্দ ছবির বাজার

দেশ ৪ অক্টোবর সংখ্যায় বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'ভালো ছবি, মন্দ ছবি এবং ছবির বাজার' পড়লাম । বুদ্ধদেবের এই রচনা সময়ানুগ । তাঁর সিনেমার মতোই সংহত ও লক্ষভেদী । চিত্র পরিচালকের দায়, ঝুঁকি ও উপস্থাপনার সমস্যা চমৎকার বুঝিয়েছেন । এবং শুধু বাংলা ছবি নয়, আন্তর্জাতিক বাজারে ভালো ছবি

করিয়েদের সমস্যা তুলে ধরেছেন।
একটা প্রশ্ন, কোন কোন ভালো ছবি অনেক দর্শককে টানতে পারে, পারছে। সব ভালো ছবি অন্তত অধিকাংশ ভালো ছবি কেন তা পারে না, 'পথের পাঁচালি' পরবর্তী কয়েকটি ভালো ছবিই ভালো, মন্দের ভালো বাজার পেয়েছে। আসলে, রীতি সর্বস্ব উপস্থাপনা, বক্তব্য প্রকাশের জটিল ক্রম—এগুলো অনভ্যস্ত দর্শককে হতাশ করে। এগুলোকে ছাপিয়ে এমন কোন মাত্রায় পৌঁছনো দরকার যা সবাইকে ছুঁতে পারবে। অবশ্য পরামর্শ দেবার আমি কে। কিন্তু পরিচালকদের অবশ্যই ভাবতে হবে একটি তৃতীয় বিকল্পের। কিভাবে সবার কাছে ধীরে ধীরে পৌঁছনো যায়, তাদের শিল্পবোধকে জাগিয়ে তোলা যায়। নইলে আড়াল বাড়বে, দেওয়াল উঠবে আরো, আর তার ফলে সমূহ বিনষ্টি। ভালো ছবি শেষ পর্যন্ত কেবল 'কিউরিও' হয়ে থাকবে—এ চাই না।
বুদ্ধদেবের রচনার সঙ্গে 'গৃহযুদ্ধ' ছবির একটি দৃশ্যের স্থিরচিত্র ছাপা হয়েছে। ক্যাপশান দেওয়া আছে—'আহত সাংবাদিকের ভূমিকায় গৌতম ঘোষ।' ঠিক কি। আহত নয়, 'নিহত' হবে। গৌতমের সেই ক্ষুব্ধ অগ্নিগোলকের মতো স্থির দুটো চোখ; ভোলা যায় না।

স্বপনকুমার পাণ্ডা
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সংবাদপত্র বাঁচবে কি ?

১লা নভেম্বর সংখ্যার 'দেশ'-এ প্রকাশিত "সংবাদপত্র বাঁচবে কি ?" এই তথ্য সমৃদ্ধ নিবন্ধটি যথার্থই মূল্যবান। তবে এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি। শ্রীবাসুদেব রায় তাঁর নিবন্ধের এক জায়গায় বলেছেন, "পক্ষপাতদুষ্ট দোষে দায়ী হবেন তাঁরা যাঁরা ভাবেন পত্রপত্রিকা প্রকাশনা সিমেন্ট বা লোহার মতই নিরেট একটি বাণিজ্যিক শিল্প এবং মুনাফাই তার একমাত্র লক্ষ্য।" নিবন্ধের আর এক জায়গায় তিনি জানিয়েছেন যে পত্রপত্রিকাগুলি মূলত অগণিত পাঠকের মনোরঞ্জন, সেবা এবং শিক্ষায় নিবেদিত প্রাণ, তাই তাদের বিক্রয়মূল্যকে রাখতে হচ্ছে সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে। নিবন্ধে তাঁর দেওয়া পরিসংখ্যান কি সে কথা প্রমাণ করে ? লেখক অত্যন্ত পরিশ্রম করে বেশ কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন। তিন বছরে নিউজ প্রিন্ট ও পত্রপত্রিকার মূল্য বৃদ্ধির হার, বিজ্ঞাপনের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমের ব্যবহার, পত্রপত্রিকার প্রচার সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি, দেশী নিউজপ্রিন্ট উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের লাভক্ষতি প্রভৃতি। কিন্তু যে পরিসংখ্যানটির উল্লেখ আশা করা গিয়েছিল, তিনি কি তা স্থানাভাবে দিতে পারলেন না ? পত্র-পত্রিকার মূল্যবৃদ্ধির জন্য লেখক মূলত নিউজ প্রিন্টের মূল্যবৃদ্ধিকেই দায়ী করেছেন। কিন্তু নিউজ প্রিন্টের মূল্যবৃদ্ধির বোঝার সবটাই পাঠককে বহন করতে হবে কেন ? এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে পত্রপত্রিকা প্রকাশন সংস্থাগুলির মুনাফা কি পরিমাণে কমেছে বা বেড়েছে তার পরিসংখ্যান না দেওয়ায় এমন সুন্দর নিবন্ধটি অসম্পূর্ণতা দোষে দায়ি হয়ে রইল।
১৯৮৩ থেকে ১৯৮৬ তিন বছরে নিউজ প্রিন্ট ও পত্রপত্রিকাগুলির মূল্যবৃদ্ধির' পরিসংখ্যান দুটি পাশাপাশি রাখলে দেখা যায়, এই কবছরে নিউজ প্রিন্টের মল্যবৃদ্ধি ঘটেছে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ। নেপা প্রিন্ট বাদ দিলে তা দাঁড়ায় শতকরা ২৩ ভাগ। অথচ দক্ষিণ ভারতীয় পত্রিকা দুটি বাদ দিলে (যাঁরা পাঠকের

ক্রয়ক্ষমতার কথা বোধহয় বেশি চিন্তা করেন) সাময়িক পত্রিকাগুলির মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে শতকরা ৫০ ভাগ। আবার দৈনিক পত্রিকাগুলির ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধির হার শতকরা ৫৫ ভাগেরও বেশি। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। হিন্দু, টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, স্টেটসম্যান প্রভৃতি ইংরেজি দৈনিকগুলি প্রতিদিন কত পৃষ্ঠার কাগজ প্রকাশ করেন আর সমমূল্যে (কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি) স্থানীয় বাংলা দৈনিকগুলি কত পৃষ্ঠার কাগজ প্রকাশ করে থাকেন তা অনেকেরই অজানা নয়। বাংলা দৈনিকগুলির অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা বাড়লে অন্যান্য পৃষ্ঠায় টান পড়ে। এ ব্যাপারে ৬০ : ৪০ অর্থাৎ সংবাদপত্রে বিষয়বস্তুর জন্য ৬০ আর বিজ্ঞাপনের জন্য ৪০ ভাগ স্থান বরাদ্দ করার সাধু প্রচেষ্টা বহু ক্ষেত্রেই মানা হয় না। পাঠক প্রতারিত হন। এ বিষয়গুলির প্রতি লেখক একটু আলোকপাত করলে ভাল হোত।

সুতরাং সংবাদপত্র বাঁচবে কি? এই ভাবনাকে আরো গভীরে নিয়ে যেতে হবে। সংবাদপত্রকে বাঁচতে হলে একদিকে যেমন তার সুষ্ঠু অঙ্গসজ্জা, সংবাদের গ্রহণযোগ্যতা, চিন্তার গভীরতা প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনি তাকে পাঠকের সাধ্যের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদপত্র প্রকাশন সংস্থাগুলিকে মুনাফার অঙ্ক সাময়িকভাবে কমাবার দুঃসাহস দেখাতে হবে। এতে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানেরই শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। কেননা সংবাদপত্রের 'সলতে' হল বিজ্ঞাপন। আর এই বিজ্ঞাপন নির্ভর করে পাঠকসংখ্যার ওপর। পাঠকের সংখ্যা ক্ষয়িষ্ণু হলে ইলেকট্রনিক মাধ্যমের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের প্রতিযোগিতায় সংবাদপত্র তো পিছিয়ে পড়বেই।

দিলীপ ঘোষ

হাওড়া-৪

'একটি সোনার পাথরবাটি'

৪ অক্টোবর, দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ 'একটি সোনার পাথর বাটি' বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। গান্ধী চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনায় অশীনবাবুর আরো সাবধানী হওয়া উচিত ছিল বলেই মনে হয়।

অশীনবাবু এক জায়গায় লিখছেন, "গান্ধী চিন্তা করেন মানুষের মনকে ধরে ভালোমন্দ এবং পাপপুণ্য নিয়ে। তিনি জানেন মানুষ পাল্টালে তবেই সমাজ পাল্টাবে। মার্কসের চিন্তা শুরু হয় বাইরের জগতে, সমাজকে ঘিরে। মার্কস জানেন সমাজ পাল্টালে মানুষও পাল্টায়। মার্কসকে যদি জিজ্ঞাসা করতেন তাঁর নির্দিষ্ট পথে চললে সমাজ পাল্টাবে কিন্তু মার্কস কি পাল্টাবেন? উত্তর বোধ করি ছাপানো যেতো না"। এত সহজেই কি মার্কসকে নিরুত্তর করা যায়? আমার মনে হয় এটি সামাজিক দ্বান্দ্বিকতা ও সর্বহারা শ্রেণীর নৈতিকতা সম্বন্ধে মার্কসীয় ধারণার অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা। শ্রেণীভিত্তিক সমাজে মার্কস মূলত দুটি দ্বন্দ্বের উপস্থিতি দেখিয়েছেন, তা হলো শোষক এবং শোষিতের মধ্যে দ্বন্দ্ব। আর এর ভিত্তি হলো অর্থনৈতিক কাঠামো। এই সমাজে বেশির ভাগ মানুষ শ্রম দেয় কিন্তু তাদের শ্রমে উৎপন্ন বস্তু ও তার বন্টন ব্যবস্থায় তাদের কোন অধিকার থাকে না। তেমনি উৎপাদনের উপায়গুলি অর্থাৎ জমিজমা, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কলকারখানাগুলি মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে চলে যায়। ধর্ম আইন, রাজনীতি এসবই আর্থিক আধিপত্য বিস্তারকারী শ্রেণীটির স্বার্থ রক্ষা করে চলে। ফলে শ্রেণী দুটির মধ্যে সংঘাত দেখা দিতে থাকে এবং আর্থিক কাঠামোতে শ্রেণীগুলির অবস্থান অনুযায়ী তাদের চেতনা এবং সংস্কৃতিও ভিন্ন হয়।

তার মানে অবশ্য এই নয় যে রাতারাতি সমাজটি দুটো পৃথক শিবিরে ভাগ হয়ে যাবে। এবং তাদের শ্রেণীস্বার্থ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন আচার আচরণ ও সংস্কৃতি সমাজটিতে বসবাসকারী সব মানুষের মধ্যে দিয়ে একই সঙ্গে প্রতিফলিত হবে। এটি নির্ভর করবে শ্রেণীগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সংঘাত কতোটা তীব্র হচ্ছে এবং শোষিতদের মধ্যে সচেতন অংশটি (সবার চেতনা নিশ্চয়ই সমানভাবে বিকাশ লাভ করে না) কতো দক্ষভাবে শিবিরদুটির মধ্যে বিভাজন ঘটাতে সক্ষম এবং শোষকশ্রেণী কত সচেতন এবং সুনিপুণ ভাবে এই দ্বন্দ্বটি প্রশমিত করতে পারে, তার ওপর।

এই সংঘাত ও আন্দোলন

থেকেই দুটো ভিন্ন সংস্কৃতি জন্ম নেয়। অর্থাৎ একটি পুঁজিবাদী সমাজ পাল্টে যাবার আগেই সেখানকার মানুষেরা পাল্টে যেতে পারে যদি তারা সেই সমাজের কাঠামোটি পাল্টাবার প্রক্রিয়ায় যথার্থভাবে আত্মনিয়োগ করে। আর ঠিক এইভাবেই ইউরোপের তৎকালীন সমাজটি পাল্টাবার পূর্বেই মার্কস পাল্টে ছিলেন-—সর্বহারা শ্রেণীর অগ্রণী যোদ্ধা দার্শনিক, ও তাত্ত্বিক নেতা হিসাবে। সমাজে নিহিত পরস্পরবিরোধী দ্বন্দ্ব তাঁর চিন্তায় যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। তবে মার্কস বুঝেছিলেন এবং আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও তাই বলে যে আশু প্রয়োজন হলো কোটি কোটি নিপীড়িত, অভুক্ত মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের যোগান দেওয়া অর্থাৎ তাদের মানুষের মত বাঁচার ব্যবস্থা করা। আর মার্কস এটি দেখিয়েছেন যে উৎপাদন ব্যবস্থায় সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবল তা সম্ভব। অশীনবাবুকে আমার প্রশ্ন, মার্কস কোথায় এ কথা বলেছেন যে সমাজে বিপ্লব ঘটানোর কাজে নিযুক্ত মানুষদের মানসিক পরিবর্তন সমাজ পাল্টাবার পরেই কেবল সম্ভব? বস্তুত তাদের মানসিকতার পরিবর্তন ও সর্বহারা আন্দোলন পরস্পর নির্ভরশীল। অশীনবাবু আর এক জায়গায় লিখছেন "জীবনের মধ্যে তত্ত্ব এবং কাজ গান্ধী যেমনভাবে মিশিয়েছেন তেমন আর জানি না।" কথাটি কিন্তু আংশিক সত্য। গান্ধী অহিংসায় বিশ্বাসী শরীরে ইনজেকসানের সূচ প্রবেশ করানোকেও তিনি হিংসাকে প্রশ্রয় দেওয়া মনে করতেন। তাই তাঁর স্ত্রীর ভীষণ অসুস্থতাতেও পেনিসিলিন ইনজেকশন শরীরে চালনা করতে দেননি। (ধারণাটি যদিও সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের পরিচায়ক তবু তত্ত্ব ও কাজের মিল লক্ষণীয়) অপরদিকে গণতন্ত্রের পূজারী ও সত্যাগ্রহী গান্ধী কিন্তু হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতিরূপে সুভাষের নির্বাচনকে মেনে নিতে পারেননি (কারণ তাঁর মনোনীত প্রার্থীর পরাজয় ঘটে) এবং তার ফলে ওয়ার্কিং কমিটির নির্বাচিত অপর গান্ধী ভক্তদের দ্বারা সুভাষের হেনস্থা হওয়া এবং সবশেষে সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ সর্বজনবিদিত।

অরূপ বসুচৌধুরী
কলিকাতা-৭৫

মডেল স্কুল

'দেশ' ৩০ আগস্টের সংখ্যায় প্রকাশিত আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মডেল স্কুল, প্লেটো ও আমরা' রচনাটি একটু দেরিতে পড়বার সুযোগ পেয়েছি। আমি এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মডেল স্কুল সম্পর্কে উল্লেখ করতে চাইছি। বাংলার প্রথম লেঃ গভরনর এফ জে হ্যালিডে সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে ভারত সরকারের নিকট কয়েকটি মডেল স্কুল স্থাপন করার প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবটিকে বাস্তবে রূপায়িত করার সময় বিদ্যাসাগরকে এই কাজের দায়িত্ব দিতে চেয়ে হ্যালিডে সাহেব কিন্তু সবচেয়ে বেশি বাধা পেলেন জনশিক্ষা অধিকর্তা (ডি পি আই) উইলিয়ম গরডন ইয়ং-এর কাছ থেকে। শেষ পর্যন্ত সব বাধা কাটিয়ে লেঃ গভরনর বিদ্যাসাগরকে অতিরিক্ত দুটি পদে (শিক্ষা বিভাগীয় সহকারী পরিদর্শক ও দক্ষিণ বঙ্গের বিশেষ পরিদর্শক) নিযুক্ত করেন। অমিত পরিশ্রমী বিদ্যাসাগর তাঁর এলাকায় ১৮৫৪ খ্রীঃ একটানা ২২ দিন সফর করেন। পর বৎসর হুগলি, মেদিনীপুর, নদীয়া ও বর্ধমান জেলায় ৫টি করে মোট ২০টি মডেল স্কুল স্থাপন করেন। সেগুলির পরিদর্শনের ভারও তাঁর উপর ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই মডেল স্কুলগুলির পাঠক্রম, ভাষা মাধ্যম, ছাত্র চরিত্র, আয়-ব্যয়, পরিচালন ব্যবস্থা প্রভৃতি কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করতে পারেন না কেউ?

অজিত ভট্টাচার্য
সিঙ্গুর, হুগলী

মাছ ও বাঙালী

১৮ অক্টোবর ১৯৮৬ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত রাধাপ্রসাদ গুপ্তের 'মাছ ও বাঙালী' স্বাদে ও পরিবেশনায় উপভোগ্য। লেখককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রবন্ধের এক জায়গায় রাধাপ্রসাদবাবু লিখেছেন,"....বন্ধুবর শঙ্কর

চক্রবর্তী মশাই....রবীন্দ্রনাথের এই ছড়াটি শোনান যেটি বোধ হয় কোনো নাতনী স্থানীয়াকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন :
যদি কোনোদিন তব ভর্তা না ভর্ৎসে/ বেশি তেল হয়ে যায় পাকা রুই মৎসে/ লোভী এ কবির নাম মনে রেখো বৎসে ।"
উদ্ধৃতাংশটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা জয়শ্রী ও কুলপ্রসাদ সেনগুপ্তের বিবাহ উপলক্ষ্যে । 'পরিণয় মঙ্গল' নামে পুরো কবিতাটি 'প্রহাসিনী'-তে মুদ্রিত হয়েছে—যার প্রথম পঙক্তি "তোমাদের বিয়ে হল ফাগুনের চৌঠা...." ।
উদ্ধৃতাংশে কিছু ভুলও রয়ে গেছে । শুদ্ধ পাঠ হল :
যদি কোনো শুভদিনে ভর্তা না ভর্ৎসে,/ বেশি ব্যয় হয়ে পড়ে পাকা রুই মৎসে,/ কালিয়ার সৌরভে প্রাণ যবে উতলায়,/ ভোজনে দু'জনে শুধু বসিবে কি দু'তলায় ।/ লোভী এ কবির নাম মনে রেখো বৎসে । বর্জিত পঙ্‌ক্তি দুটি শুধু কবিকে নয় পাঠককেও লোভী করে তোলে ।

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা-৩৬

পৃথিবীর প্রথম তৈলচিত্র

বর্তমান পত্রলেখকের লেখা 'চায় শিল্পী' (২৩ আগস্ট) সম্বন্ধে মন্তব্য করে কনককুসুম দাস (১ নভেম্বর) লিখেছেন অপেক্ষাকৃত পরে আঁকা 'লাস মেনিনাস'-কে (১৬৫৬) পৃথিবীর প্রথম তৈলচিত্র আজ বলে রায় দেওয়া ভ্রমাত্মক, কারণ কোনটি যে প্রথম তৈলচিত্র আজও তার মীমাংসা হয়নি । ঠিকই, ইয়ান ফান আইক-এর ১৪৩৪-এ আঁকা 'আর্নলফিনির বিবাহ', না পোলাইয়োলো ভাইদের ১৪৭৫-এ আঁকা 'সেন্ট সিবাস্টিয়ান', না লিওনার্দো

দা ভিঞ্চির ১৫০০ থেকে ১৫০৪-এর মধ্যে আঁকা 'লা জোকোণ্ডা' কোনটি যে প্রথম তৈলচিত্র তা নিয়ে মতদ্বন্দ্বের শেষ নেই । অথচ, প্রতিটির স্রষ্টার নাম জানা, আঁকার কাল মোটামুটিভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিটিই বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষার জন্য লভ্য । তবু এত মতদ্বৈধ কেন ? কারণ, কোনটিই সম্পূর্ণ তৈলচিত্র নয়, অংশত তেল রঙে আঁকা ; বলা ভাল, তেল রঙে সমাপ্ত । আঠা ও ইমালশনের (ইমালশন তেলও নয় জলও নয় ; আবার তেল এবং জল দুইয়েই দ্রবীভূত হয় । ডিম আর দুধ প্রাকৃতিক ইমালশন । ইমালশনে আঠার গুণ থাকে) মিশ্রণে তৈরী জমির উপর, ইমালশনে পান দেওয়া (tempered) রঙ দিয়ে আণ্ডার-পেইনটিং করে, তার উপরের একটি বা দুটি স্তর তেলে দ্রবীভূত রঙ দিয়ে এই ছবিগুলি আঁকা হয়েছে । মতবিরোধের মূল কারণ, কোনটিতে তেল রঙের ব্যবহার বেশী আর কোনটিতে কম । এই তর্ক সম্বন্ধে অবহিত বলেই, আমি আমার লেখায় 'প্রথম' ও 'তৈলচিত্র' শব্দ দুটির মধ্যে 'সম্পূর্ণ' বিশেষণটি ভেবে-চিন্তে ব্যবহার করেছি ।

প্রণবরঞ্জন রায়
কলকাতা-২৯

জীবনী কার ?

'দেশ' (১৮-১০-১৯৮৬) সংখ্যায় প্রকাশিত 'মাছ আর বাঙালি' প্রচ্ছদ নিবন্ধে শ্রীরাধাপ্রসাদ গুপ্ত আইজাক ওয়ালটনের The Compleat Angler গ্রন্থটির উল্লেখ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন 'ওয়ালটনের বহু জীবনীকারদের মধ্যে আছেন তিন দিকপাল ইংরেজ কবি জন ডান, স্যার হেনরি ওটোন আর জর্জ হার্বার্ট' । আসলে ব্যাপারটা উল্টো—এই তিনজন কবির জীবনী লিখেছিলেন ওয়ালটন, যাঁদের বন্ধুও ছিলেন তিনি । আর ওয়ালটনের বইটির টাইটেলের মধ্যের শব্দটির বানান হবে 'Compleat', অধুনা 'Complete' নয় ।

অশোক সেন
কলকাতা-৯৪

ক্যাসেট দস্যু

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ সংখ্যায় শ্রীশুভরঞ্জন দাশগুপ্ত লিখিত 'লুণ্ঠিত সঙ্গীতের নির্লজ্জ ধ্বনি' পড়ে সঙ্গীতের মত এত বড় শিল্পের বিপর্যয়ের কথা জেনে সত্যিই মর্মাহত হলাম । একজন সঙ্গীতপ্রেমী হিসেবে আমার কিছু বলার আছে । আমাদের দেশে অধিকাংশ সঙ্গীতপ্রেমীই দারিদ্র্যের নিম্নসীমায় বাস করছেন ।

এহেন আর্থিক অবস্থায় সঙ্গীতের টানে তাঁদের অপেক্ষাকৃত কম দামের ক্যাসেটের প্রতি আকর্ষিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় । এ সংকটাবস্থায় শিল্পী- গায়ক ও বিধিসম্মত কোম্পানীগুলোই তস্করদের জালিয়াতি থেকে সঙ্গীত শিল্পকে বিশুদ্ধ রাখতে মুখ্য ভূমিকা নিতে পারেন । সঙ্গীত শিল্পীরা যদি প্রতি ক্যাসেট পিছু অপেক্ষাকৃত কম রয়্যালটি নেন এবং এই কোম্পানীগুলো যদি যুক্তিসম্মত দামে ভালো ক্যাসেট বাজারে পরিবেশন করতে পারে তাহলেই এতদিনকার সঙ্গীত শিল্পের ঐতিহ্য অনেকাংশে বজায় থাকবে । তবে অবশ্যই সরকারের প্রশাসনিক কিছু করণীয় আছে । ক্যাসেট দস্যুদের শনাক্ত করে তাদের ভুয়া ক্যাসেট বাজেয়াপ্ত করা সরকারের কর্তব্য ।

গৌতম আইচ
বার্নপুর

রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি

২২ নভেম্বর ১৯৮৬-র দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পক্ষে শ্রীমতী প্রণতি মুখোপাধ্যায় লিখিত পত্রটির জন্য ধন্যবাদ । প্রসঙ্গত জানাই বৈতানিক-এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমার বক্তব্য ছিল : 'রবীন্দ্র সঙ্গীতের স্বরলিপি বদল হয়ে যাচ্ছে এবং হয়ে চলেছে—এই মন্তব্য সঠিক নয় ।' আমি যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়েই সেই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলছি : 'বদল হয়ে যাচ্ছে এবং হয়ে চলেছে' এই অত্যন্ত অসতর্ক মন্তব্যে অকারণ যথেষ্ট ভুল বোঝার অবকাশ সৃষ্টি করা হচ্ছে ।

আশা করি শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় আমার মন্তব্যটির সরল ব্যাখ্যা করবেন কারণ বিষয়টির প্রতি তাঁর ভালোবাসা অকৃত্রিম ।

সুভাষ চৌধুরী
কলকাতা-১৯

যে দিন ভেসে গেছে

লাল উলের নরম বলের মত গড়ানে সূর্যটা আবার বেরিয়ে এসেছে কুয়াশার ঝুড়ি থেকে। সেই প্রাকৃত রমণীর অস্থির আঙুলে ঘড়ির কাঁটার মত উলের কাঁটা দুটো পরস্পর ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে যে ঘন ওমের বাসা বানাচ্ছিল ক্যালেন্ডারের সীমানা ছুঁয়ে তাতে এখন ফুটে উঠেছে জীবনের নতুন প্যাটার্ন। বড়দিন এসে পড়েছে গির্জায় গির্জায় ঘণ্টাধ্বনি তুলে। কলকাতার খাবার টেবিলে চলে এসেছে নতুন বাজারের কেক, আর রঙবেরঙের কার্ড। ময়দানে ময়দানে সার্কাসের তাঁবু, হোটেল অপেরায় ব্যালে, আলো আর আনন্দের ফোয়ারা। ঘরে ঘরে মণিমুক্তোখচিত রূপকথার অলৌকিক গাছ। বিশ্ববন্ধু স্যান্টা ক্লজ তাঁর তুষারশুভ্র মূর্তি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন চিরকালের শিশুর স্বপ্নরাজ্যে। চিরকালের শিশুর সেই কলকাতা, সেই সাহেব জমানার বড়দিন, সেই চৌরঙ্গীর চতুরঙ্গ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই শিশু নেই, শৈশব নেই, শিশুর পিতারাও অদৃশ্য হয়ে গেছেন পথের বাঁকে। সেই সুখ, সেই সন্তুষ্টি, সেই বিস্ময় হারিয়ে গেছে চিরকালের মত। দিন দুনিয়া বদলে গেছে বিলকুল। পৌষ মাস এখন বাঙালীর জীবনে সর্বনাশের সূচনা ছাড়া কিছু নয়। পরকালের নামে উচ্ছুগ্যু করা নিষ্পাপ বলির পাঁঠাটিকে সরকারী হাড়িকাঠে পৌঁছে দেবার সময় এল। স্কুলে স্কুলে তাই ধর্না, দরগায় দরগায় মাথা খোঁড়া, ডোনেশানের ডালি সাজানোর পালা।

আমাদের ছেলেবেলার সঙ্গে এই ছেলেবেলার কত ফারাক সেই কথাটাই আবার মনে পড়ল। একদিন কবির অভিযোগ ছিল, রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি। আজকে মনে হয় তাদের শুধু যে মানুষ করা হয়নি তাই নয়, তাদের বাঙালী করাও হয়ে ওঠেনি। অতীত এবং ভবিষ্যৎ দুটোই এখন ধুয়েমুছে গেছে।

আমাদের ছেলেবেলায় জলবায়ু অন্যরকম ছিল। আমরা অন্য রকম ছিলাম, আমাদের মা বাবা অন্য রকম ছিলেন। আমরা সবাই যে গরীব ছিলাম তা নয়, কিন্তু গরীবীআনা ছিল। খানায়পিনায়, পোশাকে আশাকে প্রাচুর্য ছিল না, প্রশ্রয় ছিল না, পক্ষপাতী স্নেহাধিক্য ছিল না। অভাব ছিল অবশ্যই তবে অভাববোধ ছিল না। মনে পড়ে বহুকাল পর্যন্ত দড়িপরানো ইজেরই ছিল আমাদের অধোদেশের লজ্জানিবারণ এবং সজ্জা-আবরণ— টু ইন ওয়ান। বোতাম লাগানো পকেট চড়ানো প্যান্ট ভাগ্যের শিকে ছিঁড়ে যদি কদাচিৎ পাওয়া যেত তাহলে সেটা হত আমাদের কাছে স্মরণীয় উপহার। এক জোড়ার বেশী দু জোড়া জুতো জোটেনি কখনো। মোজা ছাড়া ফিতে বাঁধা জুতো, সে প্রায় কচ্ছপের পরমায়ু নিয়ে পা কামড়ে আছে তো আছেই। চলেছে তো চলেছেই ফাটেও না ছেঁড়েও না, নাছোড় অবস্থা। তার হাত থেকে মুক্তি পাবার উপায় ছিল একমাত্র পা বড় হয়ে গেলে তবেই। তবে সে ব্যাপারেও গুরুজনের দূরদৃষ্টি ছিল সজাগ। জুতো কিনলে এক সাইজ বড়ই কেনা হত, ভেতরে ন্যাকরা গুঁজে পরতে হত প্রথম দিকে। জুতোয় জুতে দেওয়া সেই দুঃখী বাল্যবেলার পরে যখন বাৎসরিক বন্দোবস্তে পৌঁছলাম, পুজোয় নতুন জামাকাপড়ের গন্ধে পদমর্যাদাও বৃদ্ধি পেল তখনও সে জুতো নতুন অবস্থায় প্রায় শিরোধার্য ছিল। শিয়রে বালিশের পাশে না থাকলে রাত্তিরে ঘুমই আসত না। তবে আমাদের মাথার দামই বা কত ছিল তখন আর, বোধহয় কুল্যে চার আনায় ঠেকেছিল। কারণ আজকালকার মত সেলুনে গিয়ে উত্তমমধ্যম ছাঁট দেবার চিন্তা স্বপ্নেও ঠাঁই দিইনি কখনো। খবরের কাগজের শেমিজ গলিয়ে কুলপরামাণিকের সামনে মাথা হেঁট করে বসতে হত। বাপ জ্যাঠা খুড়োর ওপরে আর এক অভিভাবক ছিলেন এই ক্ষৌরকার। তাঁর কাঁচি ছিল সেন্সারের কাঁচি, ইচ্ছে করলেই তিনি হাতে মাথা কাটতে পারতেন। এবং কাটতেনও। একেবারে চোখের জল বের করে তবে ছাড়তেন। বাড়ির অভিভাবক আর স্কুলের শিক্ষক ছাড়াও আমাদের গার্জেনের অভাব ঘটেনি সে যুগে। পথেঘাটে বাড়ির রকে বসে তাঁরা আমাদের ওপর শ্যেন দৃষ্টি রাখতেন। তাঁদের সংবিধানের ওপরে আমাদের মুখে রাটি ছিল না। আমাদের কান দুটি ছিল বন্ধকী কারবারের বস্তু, অনেক বয়স অবধি সে-ইন্দ্রিয় পরহস্ত থেকে ছাড়াতে পারিনি। বড়দের আড্ডা মজলিশ থেকে আমাদের দূরত্ব ছিল অনেকখানি। কেউ আমাদের ডেকে বলেনি, কাকুকে তোমার ইংরেজি কবিতাটা মুখস্ত শুনিয়ে দাও তো। কিংবা আঁকা ছবিগুলো এনে দেখাও, কী চমৎকার হয়েছে।

খেলার জগৎটাও ছিল আজকের দিনের চেয়ে একেবারে আলাদা। ক্রিকেট ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট হাতে তুলে দেয়নি কেউ কখনো। এত খেলনাও ছিল না। রিমোট কন্ট্রোলে রোবট নাচেনি, অটোগ্রাফের খাতা আর ডাকটিকিটের অ্যালবাম কী বস্তু আমরা জানতাম না। রং-বেরঙের কাচের কিংবা নকশা পাথরের মার্বেল, ডাংগুলি, লাট্টু আর রবারের বলই ছিল অধিকন্তু। আরো ছোটবেলায়, থানকাপড়ের ছবি, রাংতা আর মাটির বেহালা পেলেই বর্তে যেতাম। কেমন ছিলাম আমরা? বোধহয় ভালোই ছিলাম। প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে দিনগুলো কাটিয়ে দিয়েছিলাম ভালোই।

অবস্থানগত তফাৎ শুধু পনের মিনিটের

কোনও কোনও মিডিয়ায় (খবরের কাগজকে মিডিয়া বলাই আজকালের ফ্যাশান) বলা হয়েছে যে, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারি মিখায়েল গোর্বাচভ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কাস্তে ধানের শিশকে, আলাপ-আলোচনার সময়, যতটা সময় দিয়েছিলেন, ভারতের মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি কাস্তে হাতুড়িকে তার চাইতে অন্তত পনের মিনিট সময় কম দিয়েছেন।

রূপদর্শী : কমরেড কাস্তে ধানের শিশেশ্বর রাও, এ সম্পর্কে আপনার ওপিনিয়ন কী?

কমরেড কাস্তে ধানের শিশেশ্বর রাও : কোন্ বিষয়ে?

রূপদর্শী : কমরেড গোর্বাচভ আপনাদের সঙ্গে পনের মিনিট বেশী কথা বলেছেন এবং কমরেড কাস্তে হাতুড়িদিরি পাদের সঙ্গে আপনাদের চাইতে পনের মিনিট কম কথা বলেছেন?

কমরেড কা· ধা· শি· রাও : হিজ্ কমরেড এক্সেলেন্সির সঙ্গে কথা বলে উই আর ভেরি মাচ্ স্যাটিস্ফায়েড্। মাচ্ মাচ্ মাচ্ স্যাটিস্ফায়েড। আমাদের আহ্লাদ একেবারে তুঙ্গে।

রূপদর্শী : তার মানে কি আমি এই ধরে নেব যে, কমরেড গোর্বাচভ আপনাদের সঙ্গে ওদের চাইতে পনের মিনিট বেশী কথা বলেছেন? অর্থাৎ আপনাদের খাতির ওদের চাইতে বেশী করেছেন?

কমরেড কা· ধা· শি· রাও : উই আর ওল্ড ফ্রেণ্ডস। আর কিছু বলতে চাই না।

রূপদর্শী : কমরেড কাস্তে হাতুড়িদিরিপাদ, নমস্কারম্।

কমরেড কা· হা· পাদ : নমস্কারম্। হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?

কমরেড কাস্তে হাতুড়িদিরিপাদ, এটা কি সত্যি যে কমরেড গোর্বাচভ আপনাদের সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলেছেন, তার চাইতে পনের মিনিট বেশী সময় ধরে ওদের সঙ্গে কথা বলেছেন?

কমরেড কা· হা· পাদ : ইটস্ এ লাই। এটা আমাদের বিরুদ্ধে জঘন্য প্রোপাগাণ্ডা।

আপনারা ঠিক কতক্ষণ কমরেড গোর্বাচভের সঙ্গে কথা বলেছেন কমরেড কাস্তে হাতুড়িদিরিপাদ, সেটা কি জানতে পারি?

কমরেড কা· হা· পাদ : নো। নিয়েৎ।

কেন নিয়েৎ অর্থাৎ নো অর্থাৎ না, সেটা কি জানতে পারি, কমরেড কাস্তে হাতুড়িদিরিপাদ?

কমরেড কা· হা· পাদ : নো। নিয়েৎ। এটা পার্টি সিক্রেট। এইটুকু বলতে পারি যে, হিজ্ কমরেড এক্সেলেন্সি গোর্বাচভ ওদের সঙ্গে কথা বলেছেন, আবার আমাদের সঙ্গেও কথা বলেছেন। ব্যস্। নাউ আমরাও রিকগনিশন

রূপদর্শীর ঝাঁকিদর্শন

পেয়ে গিয়েছি। আমরা এখন থেকে নিজেদের রিকগ্‌নাইজড্ পার্টি বলেই ধরে নেব। এটা আমাদের পক্ষে একটা দারুণ ডিপ্লোমেটিক সাফল্য। নাউ উই আর অ্যাট পার উইথ অল দি কমিউনিস্ট পার্টিজ অফ দি ওয়ার্ল্ড।

সে জন্য আপনারা জনগণের পক্ষ থেকে আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

কমরেড কা· হা· পাদ : থ্যাঙ্ক ইউ।

কমরেড কাস্তে ধানের শিশেশ্বর বলছিলেন যে, ওরা সোভিয়েত রাশিয়ার ওল্ড ফ্রেণ্ড। অবস্থানগতভাবে এটা তো আর পাল্টাতে পারা যাবে না।

কমরেড কা· হা· পাদ : ওরা বলেছে যে, ওরা সোভিয়েত রাশিয়ার ওল্ড ফ্রেণ্ড?

অন্তত কমরেড গোর্বাচভ তাই মনে করেন। এবং সেটা যে সত্যি, তা কি আপনাদের প্রতি কমরেড গোর্বাচভের ব্যবহার থেকে প্রমাণিত হয়নি?

কমরেড কা· হা· পাদ : কী রকম? কী রকম?

ওল্ড ইজ্ গোল্ড। আর আপনারা নিউ। এই আর কি?

কমরেড কা· হা· পাদ : ওল্ড ইজ্ গোল্ড! তা হলে আমরা কী? গিল্টির বালা, না কানপাশা? দেখুন, আপনাকে কনফিডেনশিয়ালি একটা অ্যাডভাইস দিচ্ছি, ওদের এত মাথায় তুলবেন না। আফটার অল হোয়াট আর দে? ওদের মুরোদ কত, তা তো জানাই আছে। ওল্ড ফ্রেণ্ড! কটা এম পি আছে ওদের? ক'জন এম এল এ? আমরা দুটো স্টেট রুল করছি। ওল্ড দেখলেই চলবে? ওয়েট্ দেখতে হবে না? ওয়েট্ কার বেশী?

কিন্তু কমরেড কাস্তে হাতুড়িদিরিপাদ, কমরেড গোর্বাচভ ওল্ড ফ্রেণ্ড আর নিউ ফ্রেণ্ড, এই দুইয়ের মধ্যে কিছুই তফাত করেননি?

কমরেড কা· হা· পাদ : অবশ্য আমরা তো কিছুই টের পাইনি। [illegible] নাথিং। আর তাতেই অনেকের গাত্রদাহ দেখা দিয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে যত সব কুৎসা প্রোপাগাণ্ডা শুরু হয়েছে। আমরা আদৌ অবাক হব না, যদি এর মধ্যে বুর্জোয়া প্রেসের হাত থেকে থাকে।

কিংবা সি আই এর হাত?

কমরেড কা· হা· পাদ : রাইট। থাকতেই পারে।

আবার কেন্দ্রের হাতও থাকতে পারে?

কমরেড কা· হা· পাদ : রাইট। থাকতেও পা···ওয়েট্ ওয়েট্, অবশ্য সে কথা এখনই বলা যাচ্ছে না। পলিটব্যুরো এবং সেন্ট্রাল কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত। আমাদের কালেকটিভ ডিসিশনটা আগে পাওয়া দরকার। হিজ্ কমরেড এক্সেলেন্সি যেভাবে রাজীবের ভাবমূর্তিটাকে গাছে তুলে দিয়ে গেলেন, তাতে গোটা পরিস্থিতিটা আবার ভালভাবে যাচাই করে নেওয়া দরকার। ওঁর কী, ওঁকে তো আর এখানে ভোটে দাঁড়াতে হবে না।

ওদের ঘনিষ্ঠ মহল তো সেই কথাই বলছে।

কমরেড কাস্তে হাতুড়িদিরিপাদ : ওরা আবার এ বিষয়ে কী বলছে?

আজ্ঞে কমরেড, ওরা যেটা বলছে সেটা এই যে, রাজীব সম্পর্কে আপনাদের নীতি হিজ্ কমরেড এক্সেলেন্সির অনুমোদন পায়নি। হিজ্ কমরেড এক্সেলেন্সির কথা হল, ভারত তৃতীয় বিশ্বের একটি শক্তিশালী দেশ এবং সোভিয়েত রাশিয়ার ওল্ড ফ্রেন্ড। এই অবস্থান বজায় রাখতে হবে। এটা বজায় রেখে অন্য কথা। এবং এখন ভারত মানেই, হিজ্ কমরেড এক্সেলেন্সির চোখে, রাজীব। যে নীতি বা যাদের নীতি হচ্ছে রাজীবকে হেনস্তা করা, সেটা হিজ্ কমরেড এক্সেলেন্সির চোখে, নেগেটিভ, ভারত সোভিয়েত মৈত্রীর পক্ষে ক্ষতিকর, এবং অতি বাম বিচ্যুতিতে ভরা। সেটা হিজ্ কমরেড এক্সেলেন্সি আপনাদের ভালভাবেই বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

কমরেড কা· হা· পাদ : আমাদের সঙ্গে রাজীব প্রসঙ্গে হিজ্ কমরেড এক্সেলেন্সির কোনও কথাই হয়নি।

কমরেড কাস্তে হাতুড়িদিরিপাদ, আপনি বললেন না, ভারতে কমিউনিস্টদের মধ্যে আপনাদের দলেই এম এল এ, এম পি-র সংখ্যা বেশী। আপনাদের হাতে দু দুটো স্টেট। জনগণের মধ্যে একমাত্র আপনাদেরই লিংক আছে।

কমরেড কা· হা· পাদ : রাইট্। কমিউনিস্টদের শক্তি বলতে যা বোঝায়, সে তো আমাদেরই। আমরাই।

তবুও দেখলেন তো, কাস্তে ধানের শিশেশ্বর রাওই আপনাদের আগে কমরেড গোর্বাচভের কাছে কল্কে পেলেন। আগে ডাক পেলেন। অবস্থানগতভাবে এটার ব্যাখ্যা কী দেবেন কমরেড? হা হা।

ছবি : দেবাশিস দেব

এই মুহূর্তে, যখন আপনি এটা পড়ছেন... আপনার মুখের একান্ত প্রয়োজনীয় ত্বক-কোমলকারক আর্দ্রতা হারিয়ে যাচ্ছে।

এর প্রতিকারের কি ব্যবস্থা করছেন আপনি ?

যদি বলেন, কিছুই না ... তাহলে বুঝবো, হয় আপনি জানেন না—যে আর্দ্রতা হল আপনার ত্বককোষের একান্ত প্রয়োজনীয়, জীবনদানকারী অংশ যা ত্বক কোমল ও মোলায়েম রাখতে সাহায্য করে। নয়তো—আপনার রঙরূপ শুষ্ক, প্রাণহীন বা ক্লান্ত দেখালে আপনার কিছু যায় আসে না !

যতদিন আপনার কৈশোর আছে, আপনার ত্বকের হারানো আর্দ্রতা চট্ করে ফিরে আসে। তাই অল্প-বয়সী ত্বক কোমল আর নমনীয় থাকে। তবে কৈশোর পেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের আর্দ্রতা যত তাড়াতাড়ি হারিয়ে যায়, তত তাড়াতাড়ি ফিরে আসে না ... আর, ঠিক এই সময়েই এমন একটা কিছু দরকার, যা আপনার ত্বকের আর্দ্রতা ঠিকমত রেখে সেটিকে নরম আর কোমল বানায়।

আপনার দরকার ল্যাক্‌মে ম্যাক্সিমাম ময়েশ্চা-রাইজিং লোশন। এ হল জল আর কিছু বিশিষ্ট কোমলকারক পদার্থের এক সূক্ষ্ম সংমিশ্রণ যা সত্যিসত্যিই মৃদুভাবে আপনার ত্বকের গভীরের কোষে পৌঁছে তাতে আর্দ্রতা আর পুষ্টি ফিরিয়ে আনে। আপনার ত্বক কোমল ও মোলায়েম রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া, এটি যেমন হালকা তেমনি তেলাভাব-রহিত ... মেখেছেন বলে মনেই হবে না। অথচ আপনার ত্বকে সদাই জাগবে এক তরতাজা অনুভূতি !

ল্যাক্‌মে ম্যাক্সিমাম ময়েশ্চারাইজিং লোশনে এক অনন্য স্বয়ং-নিয়ন্ত্রক গুণ আছে যা তার শোষণ মাত্রা—ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজন অনুসারে কম-বেশী করে। অর্থাৎ, আপনার মুখের বেশী শুষ্ক অংশগুলিতে বেশী ক'রে কাজ করে। যেমন, চোখ ও ঠোঁটের চারপাশের অংশগুলিকে বেশী করে শোষণ করতে দেয়। আবার তেলা অংশগুলিকে, যেমন—নাক ও থুতনী, কম শোষণ করতে দেয়। কাজেই আপনার ত্বক যে ধরণেরই হোক না কেন ... শুষ্ক বা তেলা, স্বাভাবিক বা সমন্বয়—ল্যাক্‌মে ম্যাক্সিমাম ময়েশ্চারাইজিং লোশন আপনার জন্যে সুন্দরভাবে কাজ করে।

ল্যাক্‌মে ম্যাক্সিমাম ময়েশ্চারাইজিং লোশন—কোমল সুন্দর ত্বকের জন্যে !

রূপ ঝলমল, অন্তর খুশি-উচ্ছল করতে ল্যাক্‌মে!

আচার্যদেব শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্ষিতিমোহন সেনকে লেখা : ১৯০৮-১৯৪০

॥ পত্র ৪৭ ॥

ওঁ

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

এখানে এসে অবধি জনসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্চি। চিঠিপত্র লেখা শক্ত হয়েচে। এখানে এসে একটা জিনিষ খুব স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি, আমরা মাংসাশী মানুষের হাতে। এরা প্রচণ্ড, এরা নিষ্ঠুর। পাঞ্জাবে এরা যে-বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল মনে করেছিলুম সেটা আকস্মিক, এবং সাময়িক আতঙ্ক থেকে তার উৎপত্তি। কিন্তু এখানে পার্লামেণ্টে সে সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছিল তার থেকে স্পষ্টই দেখ্‌তে পেয়েছি এই প্রচণ্ডতা এদের মজ্জায় নিহিত, এদের রক্তে বহমান। ডায়ারের কীর্ত্তিকে এরা কেউ কেউ "*splendid brutality*" বলে প্রশংসা করেচে। এই উপলক্ষ্যে এদের মেয়েদের মধ্যেও রক্তলোলুপ হিংস্রতার পরিচয় পেয়ে আমি বিস্মিত হয়ে গেছি। আমাদের বোঝবার সময় এসেচে যে, এদের কাছ থেকে আমাদের কিছু আশা করবার নেই—আশা করা আত্মাবমাননা। আমাদের এতকাল মনে এই দুরাশা ছিল যে, এরা দেবে আমরা পাব এদের সঙ্গে আমাদের এই দাতা-ভিক্ষুকের সম্বন্ধ। কিন্তু দেবার শক্তি এদের নেই ; সেই আমাদের সৌভাগ্য—কারণ দানের দ্বারা দুর্ব্বলকে যত নষ্ট করা যায় এমন বঞ্চনার দ্বারা নয়। আমাদের যদি পৌরুষ থাকত, বল থাকত তাহলে দান গ্রহণের দ্বারা আমরা ক্ষুদ্র হতুম না ; সকল বড় জাতই অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ করে কিন্তু সেই গ্রহণ করা খাজনা গ্রহণ করার মত—কেননা যার আছে সেই পাবে এই নিয়ম—রাজাই পাবে ভিক্ষুক পাবে না। অতএব এদের কাছে হাত পাতার চেয়ে আমাদের মৃত্যু শ্রেয়। আমাদের দেশের মডারেট যাঁরা তাঁরা 'হাত জোড় করে' ভিক্ষা করেন, আর যাঁরা এক্‌স্ট্রিমিস্ট্‌ তাঁরা চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করেন এইমাত্র তফাৎ, একদল মনিবের পাতের সামনে ল্যাজ নাড়েন আর একদল ঘেউ ঘেউ করেন—একদল মনে করেন তাঁরা ভারি সেয়ানা, আর একদল মনে করেন তাঁরা ভারি তেজস্বী, কিন্তু মনিবের উচ্ছিষ্ট এবং লাথি দুই দলের পিঠে সমান ভাবেই পড়ে—অথচ সেই উচ্ছিষ্টের ভাগ সম্বন্ধে দুই দলের কলহের আর অন্ত নেই। ওদিকে দেশের কাজ পড়ে আছে সেদিকে মন দেবার সময় নেই। অতএব উচ্ছিষ্টের চেয়ে এই লাথিই আমাদের পক্ষে যথার্থ সৌভাগ্য।

[১৯২০]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ পত্র ৪৮ ॥

ওঁ

পারিস

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

আমার কাজের সমস্ত ধারা এখন পশ্চিম বাহিনী হয়ে বইচে বলে এই নির্ব্বাসনের উজান ঠেলে দেশের দিকে চিঠিপত্র পাঠানো আমার পক্ষে বড় কঠিন হয়েচে। অর্জ্জুনের মত আমার মন সব্যসাচী নয়। এক সঙ্গে ডাইনে বাঁয়ে আমি লক্ষ্য স্থাপন করতে পারিনে। আসল কথা আমি জন্ম-কুঁড়ে, অথচ আমার ভাগ্য আমাকে খাটিয়ে নিতে ছাড়ে না, সেইজন্যেই উপস্থিতের দাবী মেটাতে গিয়ে অবর্ত্তমানকে ফাঁকি দিয়ে থাকি। কিন্তু আশা করচি এখানে যা আয়োজন করা যাচ্চে শান্তিনিকেতনেই তার পরিসমাপ্তি হবে। একদিন য়ুরোপকেও সেখানে আতিথ্য দান করতে হবে তার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্চে। সেই জন্যে আপনাদের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ, আশ্রমের যজ্ঞস্থলীকে আপনারা প্রশস্ত করবেন —প্রতিদিনই বিরাটের আগমনের প্রতীক্ষা করবেন। আর যত আয়োজন যেমনই হোক্‌ দক্ষিণার সঞ্চয় রাখ্‌বেন—উপকরণ সামান্য হোক কিন্তু দাক্ষিণ্যে কৃপণতা চলবে না—অনেক দিতে হবে। যতবার পশ্চিম মহাদেশে এসেচি এই কথাটা বারবার মনে উদয় হয়েচে, যে, বর্ত্তমান যুগে পশ্চিম পৃথিবী যে এতবড় হয়েচে তার কারণ এ নয় যে, তারা কাড়চে এবং জমাচ্চে। বস্তুত সেইখানেই তাদের মৃত্যুর কোঠা। কিন্তু তারা বিপুলভাবে

আত্মসমর্পণ করচে—তাদের সেই আত্মদানের স্রোতের অন্ত নেই—যেখানে সেখানেই তার ছোটবড় নানা ধারা দেখতে পাই। এই আত্মদানের ধারাই অমৃত ধারা—এই অমৃত পানেই য়ুরোপ মৃত্যুবান খেয়েও কিছুতে মরে না। তার দেহে লোভের বিষ পাপের বিষ যথেষ্ট আছে, কিন্তু আরোগ্যের ঔষধও তেমনি বড়। এদের মহাত্মাদের যখন দেখি তখনই বুঝতে পারি এদের সমুদ্রমন্থনের সমস্ত বিষ কোন্ নীলকণ্ঠ হজম করচেন।

আমাদের শান্তিনিকেতনকে এবার আপনি বাংলা দেশেরও বাহিরে বিস্তৃত করে দেখে এসেচেন। বুঝতে পেরেচেন সেই বড়

HOTEL ALGONQUIN
NEW YORK

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন
প্রিয়বরেষু
প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—
আপনার চিঠি পাবার পূর্ব্বেই আপনার খবর পেয়েছি। আপনি মুক্তভাবে আশ্রমের সঙ্গে যে যোগ রাখতে ইচ্ছা করেচেন সে যোগ পূর্ব্বের চেয়ে গভীর এবং দৃঢ় হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু আপনাকে বন্দী করবার বাসনা আমি সম্পূর্ণ ত্যাগ করি নি। আমি সম্প্রতি যে-বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কল্প নিয়ে এখানে কাজ করচি সে সঙ্কল্প যদি ব্যর্থ না হয়, তাহলে আপনাদের সকলকেই

শান্তিনিকেতনের অর্ঘ্য কত বড় থালায় সাজাতে হবে। কিন্তু ওখানেও সীমা নয়, সমুদ্র পারেও তার আসন পৌঁছবে। এই আসন প্রশস্ত করবার ভার আমরা পেয়েচি—আমাদের মন বড় হোক্, আমাদের আশা মহৎ হোক্, আমাদের দানের শক্তি আনন্দে আপন বাধা মোচন করুক।

এখানে এসে প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতদের সঙ্গে দেখা হচ্চে। অধ্যাপক *Sylvain Levi*র নাম নিশ্চয় শুনেচেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান যেমন গভীর তেমনি প্রশস্ত। ভারতবর্ষকে ইনি সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে ভালবাসেন। এমন সরল এবং উদারচিত্ত পণ্ডিত আমি দেখিনি। অধ্যাপক *Finot* এবং *Goloubew*র সঙ্গেও আমার অনেক আলাপ হল। গোলুবেফ আশ্রমের জন্যে ১০০টি ছবি দিয়েচেন বোধহয় শুনে থাকবেন। এঁরা দুজনে আগামী নবেম্বরে ফরাসী কাম্বোডিয়াতে প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের গবেষণা কার্য্যের জন্যে যাচ্চেন। এঁদের সঙ্গে আলোচনা করে আমার মনে হয় যে প্রাচীন ভারতের উপনিবেশগুলি ভাল করে দেখে তখনকার অবস্থা প্রভৃতি জেনে নেবার জন্যে আমাদের কোনো অধ্যাপকের প্রস্তুত হওয়া দরকার। বিশ্বভারতীতে এই বিশেষ বিষয়টির চর্চা রাখতে চাই। যদি আমি কোনো উপায়ে আপনাকে এঁদের সাহচর্য্যে নিযুক্ত করতে পারি তাহলে আপনি এই ভার গ্রহণ করতে পারেন ? আপনি ওঁদের সঙ্গে থাকলে ওঁদেরও উপকার হবে। অবশ্য সাংসারিক অভাবের কোনো কারণ যাতে না ঘটে সে রকম সংস্থান করে দেব। এরূপ ব্যবস্থা করা দুঃসাধ্য হবে না জেনেই আমি এই প্রস্তাব করচি। যদি কৃতকার্য্য হতে পারি তাহলে আপনার দ্বারা বিশ্বভারতীর একটা মহৎ অভাব মোচন হবে। শুধু পুঁথি পড়ে আমরা ভারতবর্ষকে চিন্‌তে পারব না।

ওখানকার কোনো ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনো কথা বলবার মত আমার বর্ত্তমান মনের ভাব নয়। এখন আমার "অন্যথা বৃত্তিচেতঃ।" তবু একটা দরকারী কথা আছে। শান্তিনিকেতনের যন্ত্রবিভাগ রথীর হাতে ছিল। তার অবর্ত্তমানে ঐ বিভাগের কার্য্যধারা এবং হিসাব প্রভৃতি পরিদর্শনে যদি আপনারা বিশেষ মনোযোগ না দেন তবে শুধু আর্থিক ক্ষতি হবে তা নয়, সমস্ত বিভাগটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই বিভাগকে বড় করে তুলতে হবে—সে জন্যে আমরা অর্থ সংগ্রহ করব—কেননা এই বিভাগ বিশ্বভারতীর পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অঙ্গ। যদি বর্ত্তমান অর্থাভাবের জন্যে এই বিভাগকে ভাল করে জাগিয়ে রাখা অসাধ্য হয় তাহলে যথাসম্ভব কাজ বন্ধ করে দেবেন—কিন্তু যদি কাজ চলতে থাকে তাহলে তার উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেই হবে। অধ্যক্ষ সভা থেকে এ সম্বন্ধে পাকা ব্যবস্থা করে দেবেন—রথীর ফিরে যাওয়া পর্য্যন্ত যদি ছুতোর কামারের কাজ ও তাঁত প্রভৃতি বন্ধ করে দিতে চান সেও শ্রেয় কিন্তু কাজ চালানো যদি দরকার মনে করেন তাহলে পাকা নিয়মে চালাবেন।

আপনি শুনে থাকবেন এবারে আমেরিকায় গিয়ে অর্থ সংগ্রহের দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হতে হবে। এবারে রিক্ত হস্তে ফিরব না এইরকম পণ করেচি। আমার পক্ষে এই ভিক্ষাবৃত্তির দুঃখ অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু দুঃখের মূল্যেই আমাদের সাধনাকে মূল্যবান করতে হবে। আর কোনো পন্থা নেই। আপনারা সকলে আমার নমস্কার গ্রহণ করবেন, আর ছাত্রদের আমার আশীর্ব্বাদ জানাবেন। ইতি ২১ আগস্ট ১৯২০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ পত্র ৪৯ ॥

ওঁ

HOTEL ALGONQUIN
NEW YORK

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন
প্রিয়বরেষু

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার চিঠি পাবার পূর্ব্বেই আপনার খবর পেয়েচি। আপনি মুক্তভাবে আশ্রমের সঙ্গে যে যোগ রাখতে ইচ্ছা করেচেন সে যোগ পূর্ব্বের চেয়ে গভীর এবং দৃঢ় হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু আপনাকে বন্দী করবার বাসনা আমি সম্পূর্ণ ত্যাগ করি নি। আমি সম্প্রতি যে-বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কল্প নিয়ে এখানে কাজ করচি সে সঙ্কল্প যদি ব্যর্থ না হয় তাহলে আপনাদের সকলকেই তার মধ্যে পূর্ণ ভাবে যোগ দিতে হবে। একটা বড় যজ্ঞের আয়োজন করচি—এতে আমার দেশের বন্ধুরা একত্র হলে তবেই বিদেশের অতিথিদের আহ্বান করতে পারব। আমি কেবল দূতের মত আমন্ত্রণ করে আসতে পারি কিন্তু আয়োজন যে আপনাদের হাতে। ভারতবর্ষে একদিন দূর দেশ থেকে অতিথি-সমাগম হত—বিশ্বের সঙ্গে সেদিন তার যোগ ছিল। সে অতিথিশালার দ্বার অনেকদিন থেকে রুদ্ধ, তার ভিত্তি সব বিদীর্ণ হয়ে গেছে। সেই অতিথিশালা নতুন করে গেঁথে তুলতে হবে—এবং আমাদের মাতৃভাণ্ডারের দ্বার খুলে অন্ন আহরণ করে আনতে হবে। আমি এখানে বলে বেড়াচ্চি যে, অন্ন আছে আমাদের ঘরে—সে কথা প্রমাণ করবার ভার আপনাদের সকলের উপরে। এরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবে বলে বিশ্বাস করি—কিন্তু যখন যজ্ঞশালায় সকলে উপস্থিত হবে তখন কেউ যেন অভুক্ত না থাকে এই আমাদের চিন্তা করতে হবে।

আমি কবি, দ্বারে বসে সানাই বাজাতে পারি কিন্তু পরিবেষণের শক্তি কি আমার আছে ?
যবদ্বীপ বলিদ্বীপ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতের উপনিবেশে অনুসন্ধিৎসুদের পাঠাবার প্রস্তাব অগ্রসর করে রেখে এসেচি । এখান থেকে দেশে ফেরবার পথে যখন য়ুরোপের মহাদেশে যাব তখন সকল কথা পাকা করে নিতে পারব । আর যাই হোক্ সেখানে আমাদের যে কেউ যাবেন এই সন্ধানকার্য্যে আনুকূল্য পাবেন । ভারতবর্ষ যখন ভারতের বাইরে আপন চিত্তশক্তি বিকীর্ণ করেছিল তখনি সে বড় হয়েছিল আজ তার চিত্ত সঙ্কুচিত, তার দীপ্তি ম্লান, এই দৈন্যই সব চেয়ে বড় দৈন্য । শান্তিনিকেতনের এই কাজ হোক্ সে যেন ভারতের নিত্য সম্পদকে বিশ্বের কাছে উদ্ঘাটিত করতে পারে—এবং সেই মুক্ত দ্বার দিয়ে বিশ্বের সম্পদকে অসঙ্কোচে গ্রহণ করবার অধিকার লাভ করতে পারে । শান্তিনিকেতনের এই সাধনার ভার আপনাদের হাতে এই কথা মনে রাখ্‌বেন । ইতি ৩০ নবেম্বর ১৯২০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ পত্র ৫০ ॥

ওঁ

Telton Hall
Cambridge mass
Boston

প্রীতি নমস্কার নিবেদন
ক্ষিতিবাবু, আপনি এখানে কোনো একটা জীবিকার উপায় করে ভেষজশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে ইচ্ছা করেছিলেন । আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোনো উপলক্ষ্যে একবার পশ্চিমসাগরকূল ঘুরিয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছা আমার মনে জাগ্রত আছে । সেইজন্যে আর্ব্বানা থেকে বেরিয়ে অবধি এই চেষ্টা করচি কিন্তু এ পর্য্যন্ত যাঁকেই বলেছি কেউ কর্ণপাত করেননি । তার প্রধান কারণ এই বুঝচি যে বিবেকানন্দের চেলারা এদেশে বেদান্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করে বেদান্ত এবং ভারতবর্ষের বিদ্যাবুদ্ধির উপর এদের শ্রদ্ধা একেবারে ঘুচিয়ে দিয়েছে । অবশেষে আমি আশা ছেড়ে দিয়েছিলুম । তারপরে আমি হার্বার্ডে চারটে বক্তৃতা পাঠ করবার সুযোগ পেয়েছিলুম । তাতে উপনিষৎ অবলম্বন করে আমার মনের কথা কিছু কিছু ব্যক্ত করেছি । আমার এই বক্তৃতা নিষ্ফল হয়নি । এখানকার অনেকেই এখন বলছেন আমরা কি করলে উপনিষদের তাৎপর্য্য গ্রহণ করতে পারবো । আমি তাঁদের বলেছি তোমাদের যাঁরা উপনিষৎ অনুবাদ করেছেন তাঁরা পণ্ডিতমাত্র, তাঁরা কথার মানে দিতে পারেন—কিন্তু উপনিষৎ ভারতবর্ষীয়ের জীবনের মধ্যে থেকে আপনার যে সত্যরূপ প্রতিফলিত করচে সেটা না জানলে কিছুই জানা হয় না । অতএব তোমাদের উচিত কোনো একজন ভারতবর্ষীয়কে অবলম্বন করে তাঁর মুখ থেকে ভারতবর্ষের বাণীকে গ্রহণ করা । শুনে এঁরা এখন খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন । এখানকার ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক Dr Woods প্রথমে এ প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়ে ছিলেন এখন তিনি আমাকে ধরে পড়েছেন এমন একজন অধ্যাপক আনিয়ে দিতে যাঁর কাছ থেকে তিনি সংস্কৃত ও হিন্দি শিখতে পারেন এবং যাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করতে পারেন । আমি আপনার নাম করেছি । তিনি খুব রাজি । আপনার পথ খরচা ত দেবেনই তা ছাড়া তিনি বল্লেন আমি বছরে ৫০০ ডলার দেব । অবশ্য ৫০০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ১৫০০ টাকায় আপনার সব খরচ চলবে না । কিন্তু এখানে আরো কেউ কেউ যোগ দেবেন । অতএব যাতে আপনি মাসে অন্তত ৭০ ডলার পেতে পারেন সে রকম বন্দোবস্ত হতে পারবে । তাহলে আপনার সমস্ত খরচ খরচা বাদেও হাতে গোটা ৫০ টাকা বাঁচবে । আমার খুব ইচ্ছা ছিল এই সঙ্গে অজিতকেও এখানে টেনে নিই—তাহলে আপনারা দুজনে মিলে এখানে অনেক কাজ করতে পারতেন—কাজ করবার দরকার আছে এবং ক্ষেত্রও আছে । আমরা ভারতবর্ষের বাইরে থেকেই ভারতবর্ষের যথার্থ উপকার করতে পারি । আমি এই মাস খানেকমাত্র আমার কোণ থেকে বেরিয়ে এসে ভারতবর্ষের প্রতি এদের চিত্তকে আকর্ষণ করতে পেরেছি । এদের চিত্তকে পেলেই এদের সমস্তকে পাওয়া হয় । আপনারা যদি কিছুকাল স্থির হয়ে বসে এখানে একটা সত্যকার ভারতবর্ষের হাওয়া বইয়ে দিতে পারেন তাহলে বিস্তর উপকার হবে । এরা একেবারেই আমাদের কিছুই জানে না । যাঁরা

বোলপুর স্টেশনের ওভারব্রিজে রবীন্দ্রনাথ

সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপক তাঁদের বিদ্যা যে কতই অগভীর তা দেখ্‌লে আশ্চর্য্য হতে হয় । ভেবে দেখুন না আমার মত লোকও এখানে কৃষ্ণবিষ্ণুর পদ পেতে পেরেছি । সংস্কৃত ভাষাতেও যে এদের বিশেষ দখল আছে তা নয় । ইতিমধ্যে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে— Deussen প্রভৃতির ইংরেজী বইগুলো পড়ে রাখবেন—প্রথমত তাতে ইংরেজি পরিভাষা সম্বন্ধে সাহায্য পাবেন তা ছাড়া ঐ বইগুলো পড়েই এঁদের বিদ্যা, সুতরাং এঁদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হলে এগুলো একবার দেখে রাখা ভাল । বেদান্তের দ্বৈতমতের ভাষ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্প্রতি এঁদের কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে অতএব এই সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করে আনবেন এবং হিন্দিভাষা শিক্ষা দেবার উপযুক্ত ব্যাকরণ ও Reader কিছু আনতে ভুলবেন না । সম্ভবত এখানে এঁদের সহযোগে হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কবীরের গ্রন্থ ও জীবনী প্রকাশের ব্যবস্থা হতে পারবে অতএব তার মালমসলা নিয়ে আসবেন । আমি এ সম্বন্ধে এঁদের সঙ্গে কথা কয়ে রেখেছি ।—কিন্তু অজিতের জন্য এখনো সুযোগ ঘটাতে পারি নি—চেষ্টা করব । যদি আপাতত নাও পারি ভবিষ্যতের আশা রইল । কিন্তু আপনার এটা ঠিক হয়ে গেছে বলেই মনে রাখ্‌বেন । অধ্যাপক Woods বল্‌ছিলেন যে, কথা পাকা হলে আপনাকে এই গ্রীষ্ম ঋতুতেই আসতে বলবেন—তাঁর মতে এই সময়েই সবচেয়ে সুবিধা—তিনি বলছিলেন শরতে ভারতবর্ষীয়েরা প্রায় আসে কিন্তু তাতে অনেক সময় নষ্ট হয় । যাই হোক কথা ঠিক হলেই আপনাকে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং

দ্বিধা ও বিলম্ব না করে চলে আসবেন।

আপনার দিক থেকে আমাদের দেশের দিক থেকে এবং এদের দেশের দিক থেকে আমিই এই তাগিদ দিচ্ছি। কিন্তু আমার বিদ্যালয়ের কথা যখন স্মরণ করি তখন অত্যন্ত বেদনা বোধ করি। বিশেষত সম্প্রতি অর্থাভাবের আলোচনায় আপনাদের অনেকেরই মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে—এই সময়ে আপনাদের অল্প একটু নাড়া দিলেই হয়ত একেবারেই খসে যাবেন। কিন্তু দোহাই আশ্রমদেবতার এই টাকার দুশ্চিন্তার উপলক্ষ্যে যদি আপনারা আশ্রমকে পরিত্যাগ করতে প্রবৃত্ত হন তা হলে সেটা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় হবে—কারণ যথার্থই টাকার অভাব ঘটেনি—অবশ্য বদান্যতার অভাব ঘটেছিল। আপনারা দেখতে পাবেন এখন থেকে আর টাকার কথা আশ্রমে উঠবে না। যা প্রয়োজন তার অভাব হবে না। এ কথা মনে রাখবেন আপনারা বিদ্যালয়কে ত্যাগ করা অন্যান্য সকল প্রকার অভাবের চেয়ে ঢের বেশি—লক্ষ্মী যদি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছা করেন তাঁকে বাধা দেব না কিন্তু "লক্ষ্মীছাড়ার দল"ও যদি বিদায় গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত হন তাহলে চলবে না।

কিন্তু আমার তরফ থেকে এ অনুনয় যদি বাহুল্য না হয় তাহলে এ অনুনয় অন্যায়। বাহিরের থেকে আশ্রমের নিষ্ক্রমণদ্বার রোধ করে দাঁড়ানো কিছুতেই শ্রেয় নয়। যখনই আপনারা অন্তরের থেকে একে পরিত্যাগ করবেন তখনই বূহ ভেদ করতে লেশমাত্র যেন বাধা না পান। অতএব আমি এ সম্বন্ধে কোনো কথাই কইব না—কেবল আমি এইটুকু জানিয়ে রাখছি—যে আমার দীনতা বশত আপনারা আশ্রম ত্যাগ করে যাবেন শেষকালে এই দুঃখ যেন আমাকে দিয়ে যাবেন না। অপরাধ হয়ত করেছি—কিন্তু তার প্রতিকার করতে প্রস্তুত আছি অতএব আপনাদের কাছ থেকে ক্ষমা প্রত্যাশা করি।

বষ্টনে হোমিওপ্যাথি কলেজ আছে তা ছাড়া সকল রকম চিকিৎসা শেখাবারই আয়োজন আছে। যাতে সেই অধ্যয়নের যথেষ্ট সময় পান ঐঁরা সেদিকে দৃষ্টি রাখতে প্রতিশ্রুত আছেন। এখানকার ভারতীয় ছাত্রদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাবেন এবং যাঁরা আমাকে স্নেহ করেন তাঁরা আপনাকেও আদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন।

কিন্তু বিদ্যালয় সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা করবেন—এবং পুনরায় একদা আমরা সকলে মিলে সেখানকার ছাতিমগাছের পুণ্যছায়ায় সমবেত হয়ে বসব একথা মন থেকে বিদায় করে দেবেন না।

এ চিঠি মার্চের মাঝামাঝি পাবেন—তৎক্ষণাৎ জবাব দেবেন কারণ হয়ত বা এপ্রেলের শেষাশেষি আমি ইংলণ্ডে যাত্রা করব। আমি এদেশে থাকতে থাকতে আপনার জন্যে সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা করে দিতে চাই।

আমার বক্তৃতাগুলি অধ্যাপক Woods গ্রন্থাকারে ছাপবার জন্যে Woods অত্যন্ত আগ্রহ করচেন। তাঁর ইচ্ছা তিনিই এর একটা ভূমিকা লেখেন। তিনি রামানুজের প্রভাব অর্থাৎ বেদান্তের ভক্তিবাদের ধারা ভারতবর্ষে কোন্ সময়ে কি রকম ব্যাপ্ত হয়েছিল তার একটু সংক্ষিপ্ত notes চান—আপনি যদি গোটাকতক মোটা কথা লিখে পাঠাতে পারেন তা হলে তিনি খুব খুশি হবেন। অর্থাৎ মধ্য যুগে শঙ্করাচার্য্যের বিরুদ্ধে যে একটা ধর্ম্মতন্ত্রের অভ্যুদয় হয়েছিল, যেটা আজও ভারতবর্ষের ধর্ম্মজীবনকে অধিকার করে রয়েছে সেইটের বিষয়ে কিছু লিখে পাঠাবেন—কবির দাদু রুইদাস প্রভৃতির ভিতর দিয়ে তার যে বিকাশ ভারতবর্ষে ছড়িয়েছে তার একটু বিবরণ চাই।

আমরা কাল সকালে শিকাগোতে ফিরে যাচ্ছি। সেখান থেকে কোথায় যাব কিছুই জানিনে। তাড়াতাড়ি আপনাকে এই চিঠি লিখলুম—হয়ত এ মেলে আর কোনো চিঠি লেখা সম্ভব না হতে পারে। ইতি

[১৯২১]

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ পত্র পরিচিতি ॥

॥ পত্র ৪৭ ॥

ইংল্যাণ্ড থেকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জুন রবীন্দ্রনাথ ইংল্যাণ্ডের প্লিমাউথ বন্দরে নামেন। সঙ্গী ছিলেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা মঞ্জু দেবী। এবারে রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে বিদেশের সাহায্য প্রার্থনা। শুধু তাই নয় বিশ্বভারতীর আদর্শকে বিদেশের বুদ্ধিজীবী মনীষীদের সামনে তুলে ধরাও তাঁর এবারের ইউরোপ ভ্রমণের অন্যতম কারণ। তাছাড়া জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ও ভারতে ব্রিটিশ শাসননীতি রবীন্দ্রনাথের মনে যে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল সে সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডের সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। উল্লেখ্য এর আগেই ১৯১৯ এর জুন মাসে রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যা কাণ্ডের প্রতিবাদে নাইটহুড ত্যাগ করেন। পত্রে সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যাণ্ডের ছবিটি পরিস্ফুট হয়েছে।

॥ পত্র ৪৮ ॥

ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করে ৬ আগস্ট রবীন্দ্রনাথ প্যারিসে আসেন। প্যারিস থেকে লেখা পত্র।

আমাদের শান্তিনিকেতন : ক্ষিতিমোহন, এণ্ড্রুজ, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও প্রমথ বিশীকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে গুজরাট সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে যান পত্রে সেই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

Sylvain Levi : সিলভাঁ লেভি (১৮৬৩—১৯৩৫)। বিশ্বভারতীর প্রথম ভিজিটিং প্রফেসর। শান্তিনিকেতনে যোগ দিয়ে লেভি তিব্বতী এবং চীনা বিভাগের উদ্বোধন করেন। ভারতবর্ষে এই বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন এই প্রথম। লেভির ছাত্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথও তাঁর ক্লাসে যোগ দিয়েছেন। উল্লেখ্য বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই পৌষ।

প্যারিসে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ লেভির আমন্ত্রণে ষ্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন। প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ লেভি তখন ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ভারতে এসে লেভি এদেশের মনীষীদের সঙ্গে যেমন সাক্ষাৎ করেছেন তেমনি শিক্ষাকেন্দ্রগুলিও ঘুরে ঘুরে দেখেছেন। ভারত সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল অতিমাত্রায়।

যন্ত্র বিভাগ : শান্তিকেতনের যন্ত্র বিভাগের আয়োজন ছিল যৎসামান্য। আশ্রমের রান্নাঘরের উত্তরে এবং বড় কূয়া—জলের ট্যাঙ্কের দক্ষিণে উঁচু প্রাচীর ঘেরা স্থানে ছিল— ১। ছাপাখানা, বই বাঁধাই ঘর ; ২। অয়েল ইঞ্জিন ডায়নামো। আলো দেওয়া হত সন্ধ্যা থেকে রাত্রি সাড়ে নটা পর্যন্ত। ৩। তাঁত ঘর ; ৪। সরষের তেলের ঘানি ; ৫। পাঁউরুটি তৈরির উনান ; ৬। ছুতার মিস্ত্রির ঘর এবং ৭। কো-অপারেটিভ স্টোর্স।

॥ পত্র ৪৯ ॥

ইউরোপ ভ্রমণ কালে রবীন্দ্রনাথ যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতি উপনিবেশ সমূহের ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেন। শুধু তাই নয়, বিশ্বভারতীতে এই বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র বিভাগের উদ্বোধন করার প্রস্তাব করে রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনের পরামর্শ চেয়েছিলেন।

॥ পত্র ৫০ ॥

প্যারিস থেকে ১৩ অক্টোবর ১৯২০ তারিখে লণ্ডনে এসে রবীন্দ্রনাথ পাড়ি দিলেন আমেরিকায়। এ সময়ে প্রতিমা দেবী অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ভেষজ শাস্ত্র : শান্তিনিকেতনে যোগ দেবার পূর্বেই ক্ষিতিমোহন ঠিক করেছিলেন জাতব্যবসা কবিরাজী করবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেওয়ায় তাঁর সে আশা পূর্ণ হয়নি। ক্ষিতিমোহন কৌতুক করে বলতেন, 'কবি রাজী হলেন না তাই কবিরাজী করা হল না।' ডাক্তার নিয়োগ করার মত আর্থিক সামর্থ্য সে সময় কবির ছিল না। কবি নিজেও বায়োকেমিক এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় অনেক রোগীর রোগ নিরাময় করেছেন। ক্ষিতিমোহন হোমিওপ্যাথি বিদ্যা অধ্যয়ন করেননি। ইচ্ছা ছিল করবেন।

লক্ষ্মী ছাড়ার দল : 'আমরা লক্ষ্মী ছাড়ার দল।' রচনা ১৮৯৫ শিলাইদহ। আশ্রম জীবনে এই গান সকলের প্রিয়। পরে 'বাঁশরী' নাটকে এই গান অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সংকলক : সুনীল দাস

গর্ভধারিণী

সমরেশ মজুমদার

লা-ছিরিঙ আর জয়িতা কথা বলতে বলতে আসছিল। গত সপ্তাহে যারা এই গ্রাম থেকে সুখিয়াপোকরিতে গিয়েছিল তারা ভাল ব্যবসা করছে। ওখানে একজন পাইকার তাদের কাছ থেকে নিয়মিত এলাচ কিনবে। মুরগী এবং বেতের ঝুড়ি যদি বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় অন্তত কালিয়াপোকরি পর্যন্ত তাহলে লাভ বেশী থাকবে।

খচ্চরওয়ালারা যা যা জিনিস গ্রামে আনত তা অনেক সস্তায় ওরা কিনে এনেছে নিচ থেকে। এভাবে চললে আগামী বরফে প্রত্যেকের শরীরে গরমজামা একটা না একটা থাকবেই। আনন্দ চাইছে এ বছরের মধ্যে অন্তত তিনটে গরু কিনে আনতে নিচে থেকে। গরুর যা দাম তা শেষপর্যন্ত ব্যবস্থা করা যাবে কিনা কে জানে। যদি জিনিসপত্র বিক্রীর টাকা উদ্বৃত্ত না থাকে তাহলে আনন্দই ব্যবস্থা করবে। সুদীপের টাকা এখনও রয়ে গেছে অনেকটা।

আনন্দ চাইছে এখানে একটা বেশ বড় ডেয়ারি করতে। পোলট্রি এবং ডেয়ারি যদি চালু করা যায় তাহলে সামনের বছর থেকে দুধ ডিম ও মুরগী চালান দিলে অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুত হবে। তবে এখন সুদীপের টাকা ঋণ হিসেবে নেওয়া হবে। লাভ হবার পর শোধ করার দায় থাকবে। পাশের গ্রামের সঙ্গে তাপল্যাঙের এখন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যেহেতু ওরা আনন্দ কিংবা জয়িতার সাহায্য সরাসরি নিচ্ছে না তাই এখনও পিছিয়ে। কিন্তু তাপল্যাঙ যা করছে ওরা সেই পথে এগোচ্ছে। লা-ছিরিঙের বিশ্বাস গরু কিনলে ওদের ওপর টেক্কা দেওয়া যাবে। এ বছর ওরা যাই রোজগার করুক গরু কেনার মত সমর্থ হবে না।

ওরা যখন আস্তানার কাছাকাছি তখন সুদীপকে দেখতে পেল জয়িতা। খানিকটা দূর থেকে দেখা বলেই জয়িতার মনে হল সুদীপ খুব রোগা হয়ে গিয়েছে। ইদানীং খুব খিটখিটে এবং সন্দেহ-পরায়ণ হয়েছে সুদীপ। বারংবার সে বোঝাবার চেষ্টা করছে, অনেক হয়েছে এবার ফেরা যাক। কিন্তু ফিরলে কি হবে তা নিয়ে মোটেই ভাবছে না। হঠাৎ লা-ছিরিঙ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কি তাপল্যাঙ ছেড়ে চলে যাবে?'

জয়িতা হাসল, 'হঠাৎ একথা তোমার মনে হচ্ছে কেন?'

লা-ছিরিঙ জবাব দিল, 'গ্রামের সবাই বলাবলি করছে। সবাই ভয় পাচ্ছে যে তোমরা চলে যাবে।'

'ভয় পাচ্ছে? ভয় কেন?' জয়িতা অবাক হল।

'তোমরা আসার আগে আমাদের অবস্থা কি ছিল তা তো দেখেছ। তোমরা এলে বলেই এখন গ্রামের মানুষ কোনরকমে কিছু খেতে পাচ্ছে। আমরা সবই বুঝতে পারছি এভাবে চললে আগামী তিনচার বছরে আর কোন অভাব থাকবে না। আমরা কখনও ভাবতে পারিনি যে সবাই এক হয়ে লড়তে পারব। তোমরা চলে গেলে এসব ভেঙে যাবে। আমাদের বুদ্ধি দেওয়ার কে থাকবে?'

অত্যন্ত সরল গলায় বলল লা-ছিরিঙ।

জয়িতা বলল, 'আমরা না হয় এখানে আছি কিন্তু পাশের গ্রামের মানুষরা কি করে পারছে?'

লা-ছিরিঙ হাত নাড়ল, 'ওরা তো তোমরা যা করতে বলছ আমাদের তাই নকল করছে। এই গ্রামের ব্যাপার দেখার পরেই তো রোলেন ওদের বোঝাল। চোখের সামনে কারো ভাল না দেখলে ওরা এসব মানত না। শোনা কথাতে কে বিশ্বাস করে!'

জয়িতা বলল, 'এটা ঠিক নয়। আমরা চলে গেলে যদি সব ভেঙে যায় তাহলে আমাদের সব পরিশ্রম অর্থহীন। তোমাদের উচিত নিজেরাই যাতে আরও এগিয়ে যেতে পার তা ভাবা।'

হঠাৎ লা-ছিরিঙ প্রসঙ্গ পাল্টাল, 'তোমাদের ওই বন্ধু আগে পালাতে চায়, না?'

সুদীপকে দেখাল সে। সুদীপ হাঁটছিল কাহুনের মন্দিরের দিকে।

'একথা কে বলল তোমাকে?'

'জানি। ওর ব্যবহার যেন কেমন কেমন। তাছাড়া ওই মেয়ের সঙ্গে বেশীদিন থাকলে ও মরে যাবে। এটা বুঝতে পেরেছে বলেই পালাতে চাইছে।' মাথা নাড়ল লা-ছিরিঙ।

আজকাল অল্প হাঁটলেই বুকে হাঁপ ধরে। মাথা ঘোরে। কপালে ঘাম জমে। জয়িতা দাঁড়াল একটু। মেয়েটির সম্পর্কে যে ইঙ্গিত লা-ছিরিঙ দিল তাতে কথা বলার লোভ বাড়ে। সেই প্রসঙ্গে যেতে চাইল না সে। কিন্তু লা-ছিরিঙ যেন নিজের মনেই বলে চলল, 'ওকে ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল

রোলেনরা। কারণ ও নাকি মা হবার পক্ষে খুব উপযুক্ত। কারো সঙ্গে বিয়ে দিলে গণ্ডায় গণ্ডায় বাচ্চা তৈরী করতে পারবে। নিয়ে গেলে হাড়ে হাড়ে টের পেত। ও একটা উকুন। যা দেখে তা শুষে নেবে। সেটা বুঝতে পেরেছে বলে তোমাদের বন্ধুটা পালাতে চাইছে। আর এই পালাতে চাওয়ার মতলবটা টের পেয়ে গেছে মেয়েটা। সে-ই সারা গ্রামে গাবিয়ে বেড়াচ্ছে।'

'পালাতে চাইলেই পালাতে দেবে কেন তোমরা? ধরে রেখ।'

'না। তা কি করে সম্ভব। তোমরা তো কোন অন্যায় করোনি। অন্যায় না করলে কাউকে শাস্তি দেওয়া যায়? ওই মেয়েটার যদি বাচ্চা হত তাহলে ওকে পালাতে দিতাম না আমরা।' কথাটা বলে ভাবল লা-ছিরিঙ আকাশের দিকে মুখ তুলে, তারপর মাথা নাড়ল, 'তাহলে হয়তো ও পালাতে চাইতো না। আগুনে জল পড়লে তা আর গনগনে থাকে না।'

গ্রামের সমস্ত সমর্থ পুরুষ এবং নারী আজ মন্দিরের চাতালে জড় হয়েছে। আনন্দ এবং কাহুন ওপরে বসে। কাহুনকে জোর করেই এনেছে আনন্দ। জনতার সঙ্গে যোগ দিয়ে জয়িতা দেখতে পেল সুদীপ খানিকটা দূরে একটা পাথরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। ওর খুব ইচ্ছে করছিল সুদীপের সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু দূরত্বটা ডিঙোতে গেলে অনেক মানুষকে সরাতে হয়। পালদেম উঠে এল আনন্দদের পাশে। এসে দুহাত তুলে দাঁড়াতে জনতার গুঞ্জন বন্ধ হল। পালদেম যেন নিজের কৃতিত্বে খুশী হল, তার মুখে হাসি ফুটল। জয়িতার মনে হল, সারল্য মানুষকে কত অল্পে তৃপ্ত করে।

আনন্দ উঠল, 'তাপল্যাঙের ভাই এবং বোনেরা। আজকের এই জমায়েতের একটা নির্দিষ্ট কারণ আছে। তার আগে আমি জানতে চাই এই গ্রামের সমস্ত মানুষ এখানে উপস্থিত আছে কিনা। কেউ না থাকলে তাকে ডেকে আনতে হবে।'

খানিকটা সময় গলা তুলে এ ওর নাম ধরে ডাকাডাকির পর সমস্বরে জানান দেওয়া হল, 'আছে, আছে।' আনন্দ মাথা নাড়ল। তারপর প্রায় বক্তৃতা দেবার ঢঙে বলল, 'তোমরা জানো এই গ্রামে কোন পালা এখন নেই। যিনি ছিলেন তিনি বরফের সময় মারা গিয়েছেন। কাহুন আছেন, কিন্তু তিনি তো পালা নন। আসলে এখন আর আমাদের একজন পালার কোন দরকার নেই। কারণ একজন পালা যে সবসময় ঠিক কাজ করবেন তার কোন স্থিরতা নেই। পৃথিবীর যেসব দেশে সমস্ত মানুষের পরিশ্রম একসঙ্গে যোগ হয় তাদের দেশের জন্যে, যেখানে প্রতিটি মানুষ একটি পরিবারের সদস্য সেখানে কোন একজন পালা সবার মাথার ওপরে থাকে না। থাকা উচিত নয়। অথচ সব কাজ ভাল ভাবে দেখার জন্যে, সবাই যাতে ঠিকঠাক সুবিধে পায় তা খেয়াল রাখার ব্যবস্থা থাকা চাই। কেউ কোন অন্যায় করে অথবা কেউ বা কারা যদি এমন কাজ করে যা সমস্ত গ্রামের ক্ষতি ডেকে আনবে তার শাস্তির ব্যবস্থা করা দরকার। এই শাস্তি কারা দেবে? সবাই মিলে? না কখনো নয়। এর জন্যে দরকার দশজন মানুষের একটা দল। যাদের ওপর সমস্ত গ্রামের দায়িত্ব থাকবে। আগে আমরা গ্রামের বাইরে যেতাম না। এখন যাচ্ছি। সেখানে যাতে ভাল ভাবে ব্যবসা করা যায় তার দায়িত্ব থাকবে এই দলের ওপর। কিসে গ্রামের মানুষের আরও ভাল করা যায় তা ওরা দেখবে। এই দলে কারা থাকবে তা ঠিক করবে তোমরা। আর সেই জন্যে এই জমায়েত। দল ঠিক হওয়ার পর তারাই বুঝে নেবে কে কোন দায়িত্ব নিতে চায়। তোমরা এবার নাম বল। যে নামগুলো বেশী মানুষ বলবে তারাই দলে থাকবে।' আনন্দ কথা শেষ করা মাত্র সব চুপচাপ হয়ে গেল। যেন বুঝে নিতে সময় লাগছে সবার। কাহুন মাথা নেড়ে মুখ ফেরালেন, 'আমি কি দলে থাকব?'

আনন্দ বলল, 'নিশ্চয়ই থাকবেন। সবাই যদি দলে আপনাকে চায়।'

কিছুক্ষণ কেটে গেল কিন্তু কেউ কোন কথা বলছে না। আনন্দর অস্বস্তি বাড়ছিল। কি ব্যাপার? ব্যবস্থাটা এদের মনঃপূত হচ্ছে না নাকি? এইসময় সে সুদীপকে এগিয়ে আসতে দেখল। ওপরে উঠে এসে সুদীপ বলল, 'অভ্যেস কখনও একদিনে তৈরী হয় না। উই শ্যুড হেল্প দেম।' সে চিৎকার করল, 'যারা এই দলে থাকতে চাও তারা ওপরে উঠে এস।'

এবার নড়াচড়া শুরু হল। এ ওর দিকে তাকায়। কিন্তু উঠতে যেন সঙ্কোচ বোধ করছে সবাই। এইসময় সাওদের গুটি গুটি পায়ে ওপরে উঠে এল। তাকে দেখে লা-ছিরিঙ এগিয়ে গেল। এবং অমনি আরও পাঁচজন বিভিন্ন বয়সী মানুষ এগিয়ে এল। আনন্দ পালদেমকে ধরে নিয়ে গুণল, আটজন। সুদীপ হাঁকল, 'আরও দুজন চাই।'

জনতার মধ্যে থেকে একজন চিৎকার করল, 'তোমরা দুজন তো আছ।'

আনন্দ কিছু বলার আগেই সুদীপ জানাল, 'না, আমরা দলে থাকতে পারি না। আমরা বাইরের লোক। আমার নাম সুদীপ, ওর নাম আনন্দ, তোমাদের নামের সঙ্গেও মেলে না। এই গ্রামের মানুষের ভালমন্দ দেখা শোনা করবে গ্রামেরই মানুষ, বাইরের লোক নয়।'

এইসময় কাহুন গিয়ে দাঁড়ালেন দলে। নজন হল। আর একজন চাই। হঠাৎ একটি মেয়ে বলল, 'দলে সব ছেলে থাকছে কেন? একজন মেয়ে চাই।'

সুদীপ বলল, 'নিশ্চয়ই। মেয়েরা আগে আসছে না বলেই থাকছে না। দশ নম্বরের জন্যে তুমি এসো।' মেয়েটা মাথা নাড়ল, 'আমি কি কিছু জানি যে দলে যাব। ড্রিমিত কোথায়? ড্রিমিত যাবে।' সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত নারীকণ্ঠে ধ্বনিত হল, 'ড্রিমিত! ড্রিমিত! ড্রিমিত!'

দুটি মধ্যবয়সিনী গিয়ে টানতে টানতে নিয়ে আসছিল জয়িতাকে। সুদীপ বাধা দিল, 'আরে ওকে আনছ কেন? ও তো আমাদের মতই বাইরের লোক।'

যে মেয়েটা কথা বলছিল সে ফুঁসে উঠল, 'কে বলেছে বাইরের লোক। ওর নাম ড্রিমিত। ড্রিমিত আমাদের নাম। ওর পোশাক আমাদের পোশাক। তুমি নিজেকে এখনও বাইরের লোক ভাবতে পার কিন্তু ড্রিমিত তা ভাবে না। ওকে আমরা আমাদের লোক মনে করি।'

কথাটার সমর্থন মিলল অনেক গলায়। সুদীপ কাঁধ নাচাল। ওরা ততক্ষণে জয়িতাকে ওপরে তুলে দিয়েছে। সুদীপ জয়িতার দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, 'চমৎকার!' বলে নিচে নেমে পাথরে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

আনন্দ বলল, 'তাহলে এই দশজন আগামী বারোটা চাঁদ পর্যন্ত গ্রামের দায়িত্বে থাকবে। এই সময়ে যদি এরা ভাল কাজ করে তাহলে আবার দায়িত্ব পাবে। যদি কেউ খারাপ কিছু করে তাহলে গ্রামের সমস্ত মানুষ এক হয়ে তাকে দল থেকে সরিয়ে দেবে। তোমরা এ ব্যাপারে রাজী?'

'ঠিক কথা, ঠিক কথা।' সবাই চেঁচিয়ে বলল।

আনন্দ এবার ঘোষণা করল, 'কে কোন দায়িত্ব নেবে তা এরা নিজেরা ঠিক করবে। এখন যে যার কাজে তোমরা যেতে পার।'

জমায়েত যখন ভাঙব ভাঙব করছে উল্লসিত হয়ে তখন একজন, এক বৃদ্ধ, চিৎকার করল, 'সবাই বলছে তোমরা নাকি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে। কথাটা ঠিক?'

কথাটা আনন্দর কানেও এসেছিল। সে মাথা নাড়ল, 'আমি জানি না।'

বৃদ্ধ বলল, 'আমরা খুব খারাপ ছিলাম। তোমরা চলে গেলে আবার খারাপ থাকব।'

আনন্দ প্রতিবাদ করল, 'কেন খারাপ থাকবে? তোমরা তো শিখে নিয়েছ ভালভাবে থাকতে গেলে কি কি করতে হয়। তোমাদের এই শেখাটা অনেক সভ্যদেশের মানুষ শিখতে পারেনি।

বৃদ্ধর কানে যেন কথাগুলো ঢুকল না, 'আগে কেউ গ্রামের বাইরে যেতে সাহস করত না। এখন যাচ্ছে। সেখানে অনেক ডাইনি ওৎ পেতে বসে আছে। তারা এদের যাদু করবে। তোমরা না থাকলে এরা গ্রামের কোন নিয়মকানুন মানবে না। তাছাড়া—।'

আনন্দ দেখল বৃদ্ধ উদাস হয়ে তাকাচ্ছে আকাশের দিকে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তাছাড়া?'

'আমাদের বাপ মা যারা স্বর্গে গিয়েছে তারা আমাদের কিছু শেখায়নি। আমরাও এদের কিছু শেখাতে পারিনি। এরা, যেসব বাচ্চা এখন জন্মাচ্ছে তাদের কিছু না শিখিয়ে বড় করছে। আসলে আমরা কিছুই জানি না, শেখাতে পারব কি করে! আমরা যখন মরে যাব, এরা যখন মরে যাবে তখন একই অবস্থা চলবে। তোমরা থেকে গেলে এ অবস্থা চলতে পারত না।'

আনন্দ কিছু বলার আগে পালদেম বলল, 'তাহলে এরা কি করে আমাদের বাচ্চাদের শেখাবে?' বৃদ্ধ জবাব দিল, 'কেউ রক্তের টানে শেখে, কেউ দেখে শেখে। ওরা চলে গেলে যারা আসবে তারা কিছুই শিখবে না। এখনও এই গ্রামের তিনটে পরিবার আলাদা রয়ে গেছে।'

আনন্দ উৎসাহিত করল, 'তোমরা মিছিমিছি দুশ্চিন্তা করছ। আমরা যাচ্ছি-না এখনই। তবে পুলিস যদি আমাদের ধরে নিয়ে যায় তাহলে অন্য কথা।'

বৃদ্ধ চিৎকার করল, 'পুলিসদের আমরা ঢুকতে দেব না।'

প্রতিধ্বনিত হল অনেক গলা পাহাড়ে পাহাড়ে, 'দেব না, দেব না।'
জমায়েত যখন ভেঙ্গেছে, মানুষজন যখন চলে যাচ্ছে তখন আনন্দ এগিয়ে গেল জয়িতার দিকে, 'কনগ্রাচুলেশন জয়িতা।' জয়িতা মাথা নাড়ল, 'উঁহু। জয়িতা নয় দ্রিমিত।'
'ও হ্যাঁ, দ্রিমিত।' আনন্দ মাথা নেড়ে নিজেকে সংশোধন করল।
এইসময় সেই মেয়েটা এসে দাঁড়াল সুদীপের পাশে। ও যে এতক্ষণ জমায়েতে ছিল তা কেউ লক্ষ্য করেনি। আনন্দ তখন পালদেমদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নেমে গেছে। জয়িতা গ্রামের তিনটে মেয়ের সঙ্গে গল্প করছে। হঠাৎ সুদীপ এগিয়ে এল তার সামনে, 'জয়িতা, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে। এদিকে আয়।'
জয়িতা ওর গলার স্বর শুনে চমকে তাকাল। অত্যন্ত রাগী দেখাচ্ছে সুদীপের মুখ। সে হাসবার চেষ্টা করল, 'জয়িতা এখন মরে গেছে সুদীপ, আমি দ্রিমিত।'
'এইসব ন্যাকামি রাখ। আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ এ স্ট্রেট কোয়েশ্চন!'
'বলে ফেল।'
'তোর শরীরে বাচ্চা আছে?'
সঙ্গে সঙ্গে জয়িতা পাথর হয়ে গেল। তার রক্ত চলাচল যেন এক মুহূর্তের জন্যে বন্ধ হল। তারপরেই কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। সুদীপের গলার স্বর আর এক পর্দা উঠল, 'উত্তর দে। সরাসরি বল হ্যাঁ কি না?'
সুদীপ কথা বলছিল বাংলায়। জয়িতা দুর্বল গলায় জবাব দিল, 'কি শুনলে খুশী হবি সুদীপ?'
'আমার খুশী অখুশীর ওপর কিছু নির্ভর করছে না।'
'তাহলে জিজ্ঞাসা করছিস কেন?'
'প্রয়োজন আছে। তোকে আমরা বন্ধু বলে মনে করতাম। আই ট্রিটেড ইউ অ্যাজ এ পার্শন। তুই একটা মেয়ে এটা আমার মাথায় কখনও আসেনি। এবং তুই, তুই সবসময় নিজেকে তাই মনে করতিস। কিন্তু এই মেয়েটা বলছে তুই প্রেগন্যান্ট। এর আগেও ও আমাকে বলেছিল যেদিন তুই বমি করেছিলি। আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আজ ও বলছে তোর মধ্যে নাকি চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে। আমি উত্তরটা চাই।'
'আমি বুঝতে পারছি না সুদীপ, এতে তোর উদ্বিগ্ন হবার কি আছে?'
'হু ইস দ্যাট ম্যান?' সুদীপের চোয়াল শক্ত হল।
'তুই তো বন্ধুর মত প্রশ্নটা করছিস না সুদীপ। তোর মুখ এখন কি হিংস্র হয়ে উঠেছে। অতএব আমি তোর কোন প্রশ্নের উত্তর দেব না।' জয়িতা খুব শান্ত গলায় শব্দগুলো উচ্চারণ করল। সুদীপ মুখ ফেরাল নিচের দিকে। তারপর বিড় বিড় করল, 'আই নো হিম।'

জয়িতা এবার হেসে উঠল, 'মিছিমিছি এব্যাপারে তুই উদ্বিগ্ন হচ্ছিস। এটা এখন সম্পূর্ণ মেয়েলি ব্যাপার। মেয়েদের কিছু নিজস্ব ব্যাপার থাকে সেখানে তোরা একেবারেই অবাঞ্ছিত।'
হঠাৎ সুদীপ চিৎকার করে উঠল বিশ্রী ভঙ্গীতে, 'বাদ দে! আমার সব জানা হয়ে গেছে!'
'কি জেনেছিস তুই?'
চিৎকারটা করেই সম্ভবত সুদীপ চেতনায় এসেছিল। এবং এখন তার মধ্যে হতাশা স্পষ্ট হল। দুহাতে মাথা চেপে ধরে সে বলল, 'তোকে আমি এতদিন অন্যচোখে দেখে এসেছিলাম। কলকাতায় তুই কি ছিলি ভেবে দ্যাখ? মেয়েলি যে কোন ব্যাপার তুই ঘেন্না করতিস।'
'ঘেন্না?' জয়িতা ওর কাছে এগিয়ে এল, 'সুদীপ তোকে আমাদের ঘেন্না করা উচিত নয়?'

'আমাকে? হোয়াই?' চোখ বড় হয়ে উঠল সুদীপের।
'এতদিন তুই কি করছিস? একটা মেয়ের হ্যাংলামির সুযোগ নিচ্ছিস। ওকে বিয়ে করার কথা চিন্তাও করছিস না। বরং কি করে এখান থেকে চলে যাওয়া যায় তার ফন্দি ভাবছিস। কলকাতায় থাকলে তুই এই কাজটা করতে পারতিস?'
চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সুদীপ। তারপর হাত নেড়ে মেয়েটিকে কাছে ডাকল। এখন, নিতান্ত অনিচ্ছায় মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়াল। সুদীপ তাকে জিজ্ঞাসা করল ওর ভাষায়, 'আমার বিরুদ্ধে তোর কোন নালিশ আছে?'
সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'সেটা কি এখানে বল?'
মেয়েটা এবার কেঁদে ফেলল দুহাতে মুখ ঢেকে। সুদীপ ওর কাঁধে হাত রাখল, 'ঠিক আছে, বল।' মেয়েটা এবার কোনমতে বলতে পারল, 'ও আমার সঙ্গে একদিনও শোয়নি। আমি অনেক চেষ্টা করেও পারিনি। বললেই বলে বন্ধুর সঙ্গে বন্ধু শোয় না। যদি কখনও আমাকে বিয়ে করে তবেই শোবে। আমাকে মেয়ে বলে যেন মনেই করে না ও।' কথাগুলোর সঙ্গে কান্না জড়ানো ছিল। সবাই অবাক হয়ে মেয়েটিকে দেখছিল।
সুদীপ এবার জয়িতার দিকে তাকাল, 'পরে কথা হবে তোর সঙ্গে।' বলে দৌড়ে নিচে নেমে গেল। তার শরীর তরতর করে নিচে নামছিল। জয়িতা স্তব্ধ হয়ে ওর যাওয়া দেখছিল। এতক্ষণ যে নাটক এখানে চলছিল তার দর্শকরা ব্যাপারটা সম্পর্কে ধন্দে ছিল যেহেতু সংলাপ ছিল বাঙলা-ইংরেজিতে মেশানো। তবে ব্যাপারটা যে মারাত্মক পর্যায়ে গিয়েছে
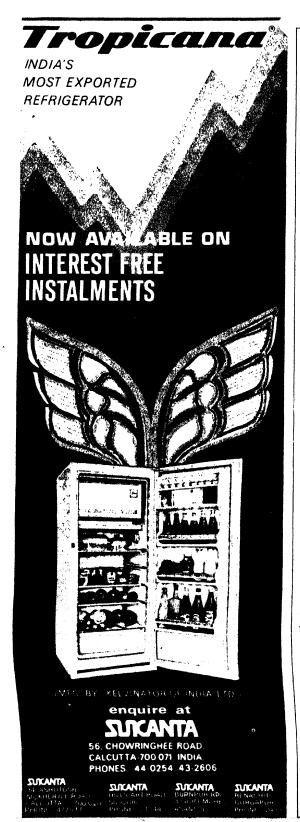
তাতে কারো সন্দেহ ছিল না। বিশেষ করে শেষ হল যখন মেয়েটির জবানবন্দীতে তখন তো বটেই। জয়িতা ওর আগে পাশের মেয়েদের দিকে তাকাল। সহজ সরল ঢলঢল মুখের মেয়েগুলোর নাম একই ধরনের, রোঙমিত, ইনামিত, পাশাংকিত, পরমিত। এবার যে মেয়েটির নাম ইনামিত সে প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে? ও ওরকম রেগে গিয়েছিল কেন?'

জয়িতা আবার বিন্দুতে মিলিয়ে আসা সুদীপকে দেখল। সুদীপ কোথায় যাচ্ছে? এইসময় কান্না থামিয়ে সুদীপের বান্ধবী চিৎকার করে উঠল, 'প্রিমিতের পেটে বাচ্চা এসেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসের শব্দ ছিটকে উঠল মুখগুলো থেকে। মেয়েরা উৎসাহে জয়িতাকে জড়িয়ে ধরল। ওরা এমন করছে যেন খুব বড় প্রাপ্তির খবর পেয়ে গেছে। এবং এই প্রথম অন্যধরনের লজ্জায় আক্রান্ত হল জয়িতা। সেই চিৎকার শুনে কাহুন নেমে এলেন মন্দির থেকে। মেয়েরা ছুটে গেল তাঁর কাছে, 'প্রিমিতের পেটে বাচ্চা এসেছে।'

লোকটির মুখ দেখে মন বোঝা দায়। কিন্তু কথাটা শোনামাত্র একটা হাত প্রসারিত হল তাঁর। যেন আশীর্বাদ করছেন কথাটা শোনামাত্র। পরমিত জয়িতাকে ইঙ্গিত করল বসার জন্যে। নিতান্ত অনিচ্ছায় হাঁটু গেড়ে বসল সে। মাথার ওপর অনর্গল অবোধ্য মন্ত্র বর্ষিত হতে লাগল। এরপর সবাই মিলে ওকে তুলে ধরতেই কাহুন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি তো বিবাহিত নও। অতএব তোমার ভাবী স্বামী কে? বিয়ের আয়োজন করতে হবে।'

'নাম বলাটা কি খুব জরুরী?'

'নিশ্চয়ই। কুমারী মেয়ের পেটে বাচ্চা এলে তার একটা পরিচয়ের ব্যবস্থা করাই নিয়ম।'

'আমি যদি না বলি।'

'তাহলে তোমাকে এই গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে। শুধু তোমার ক্ষেত্রে নয়, এই গ্রামের যে কেউ এমন করলে একই শাস্তি দেওয়া হবে। পুরুষ হলে তা আরও ভয়ানক হত।'

'সেই বিচার কি আপনিই করবেন কাহুন?'

'যতদিন তাপল্যাঙের মানুষ আমাকে কাহুন বলে স্বীকার করবে ততদিন অবশ্যই আমি করব। তবে আজ দশজনের দল তৈরী হয়েছে। তাদের কথাও শুনতে হবে। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে তোমাদের বন্দুকের কোন সম্পর্ক নেই।' কাহুন নির্লিপ্ত গলায় জানালেন।

জয়িতা মাথা নাড়ল। বন্দুক! এরা কেউ জানেনা সমস্ত গুলিগুলো এখন অকেজো। আর এই গ্রামের মানুষদের দিকে বন্দুকের নল তোলা মানে নিজের গলায় ঠেকানো। সে বলল, 'আমাকে একটু সময় দিন কাহুন।'

ঢালু পাহাড় বেয়ে দৌড়াবার সময় শরীরের ভার যেন কমে যায়। কিন্তু বুকের ভেতর ঝড় বইছিল সুদীপের। অনেকটা নেমে আসার পর সে আনন্দকে দেখতে পেল। পালদেম এবং সাওদেরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ওরা জমি দেখছে। পরিকল্পনা হয়েছে ওপরের ঝরনা থেকে জল যাতে সরাসরি জমিতে আনা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। সে ব্যাপারেই আলোচনা করছিল ওরা। সুদীপকে ওভাবে ছুটে আসতে দেখে অবাক হল সবাই। খানিকটা দূরে থমকে দাঁড়িয়ে দম নিতে নিতে সুদীপ ডাকল, 'আনন্দ, তোর সঙ্গে কথা আছে।'

'কি কথা?' আনন্দ ওকে জরিপ করার চেষ্টা করল।

'এদের সামনে বললে তোর হয়তো ভাল লাগবে না।'

আনন্দ মুখ ঘুরিয়ে পালদেমকে বলল, 'ঠিক আছে, আমরা পরে এটা নিয়ে কথা বলব। মনে হচ্ছে সুদীপের কোন সমস্যা হয়েছে— । ঠিক আছে।'

পালদেমরা চলে যাওয়ার পর আনন্দ এগিয়ে গেল, 'কি বলবি বল।'

মুখোমুখি কিছুক্ষণ তাকিয়ে সুদীপের মুখ বিকৃত হয়ে উঠল, 'ছিঃ।'

খুব অবাক হল আনন্দ, 'কি ব্যাপার? তুই এভাবে আমাকে ছিঃ বলছিস কেন?'

'তুই, তুই এমন কাজ করলি আনন্দ। তুই মুখে বলতিস যদি তাহলে কি আমি আপত্তি করতাম?'

'আঃ। কি বলছিস স্পষ্ট করে বল।'

'ন্যাকামি করিস না। তুই জানিস না কি করেছিস?'

আনন্দর কপালে ভাঁজ পড়ল, 'ব্যাপারটা কি বলতো ?'

'তোর সঙ্গে ওর শারীরিক সম্পর্ক আছে সেটা এতকাল চেপে রেখেছিলি কেন ?'

'শারীরিক সম্পর্ক ? কার সঙ্গে ? ওঃ। তোর মেয়েটা এই কথা বলেছে বুঝি।'

'আবার বুলি কপচার চেষ্টা ! জয়িতা প্রেগন্যান্ট তুই জানিস না ?'

'জয়িতা ?' প্রায় চিৎকার করে উঠল আনন্দ।

'আকাশ থেকে পড়লি মনে হচ্ছে।'

'কি যা তা বলছিস তুই ?'

'আনন্দ, আমি শেষবার আশা করছি তুই সত্যি কথা বলবি।'

'মিথ্যে কথা বলার কিছু দরকার আছে সুদীপ। আমি যদি করতাম তাহলে এই পাহাড়ে কেউ আমাকে বাধা দিতে আসতো ?'

'তাহলে স্বীকার করছিস না কেন ?'

'কারণ আমি করিনি।'

'বিশ্বাস করিনা !'

'চমৎকার। জয়িতার খবরটা তুই কোথায় পেলি ?'

'আমাকে বেশ কিছুদিন আগে মেয়েটা বলেছিল। বমি করছিল তখন। বিশ্বাস হয়নি আমার। আজ প্রশ্ন করতে ও ইনডাইরেক্টলি স্বীকার করে নিয়েছে।'

'হায় ভগবান !' আনন্দ চিৎকার করল এবার, 'ও স্বীকার করেছে ?'

'হ্যাঁ। তোর আর লুকোবার পথ নেই। কিন্তু আনন্দ, ওকে তো আমরা সবাই বন্ধু বলেই জেনে এসেছিলাম এতদিন। একঘরে শুয়েছি কিন্তু কখনও মেয়ে বলে মনে করিনি। কল্যাণটা ওকে ভালবাসতো। আই নো দ্যাট। ওর সম্পর্কে দুর্বল ছিল। আমার মনেও যে দুর্বলতা আসেনি তা নয়। কিন্তু আমি সবসময় মনে করতাম ওকে বন্ধুর সম্মান দেব। ও মেয়ে নয়, একটা মানুষ। জীবনের সব প্রলোভন ছেড়ে আমরা যে কাজে পা বাড়িয়েছি তাতে আর যাই হোক একটি মেয়ের সঙ্গে হৃদয় বিনিময় প্রধান হয়ে ওঠে না। অথচ তুই তাই করেছিস। না হলে তুই ওর শরীরের কথা ভেবে কলকাতার ওষুধের দোকান থেকে প্রটেকশান কিনতিস না। নাউ টেল মি, হোয়াটস দি ডিফারেন্স বিটুইন আস অ্যান্ড দ্যাট প্যারাডাইস পার্টি।'

আনন্দ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ওর রোগা শরীরটা শক্ত। এলোমেলো দাড়ি এবং চুল ভর্তি মাথাটা নিচের দিকে ফেরানো। তারপর ও চোখ তুলল, 'তোকে আমার খুন করতে ইচ্ছে করছে সুদীপ !'

সুদীপ চমকে উঠল। এই গলায় আনন্দ কখনও তার সঙ্গে কথা বলেনি। কিছুক্ষণ কেউ কথা বলল না। সুদীপ আশংকা করছিল আনন্দ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ওর চোখ দেখে সেই রকম মনে হচ্ছিল। কিন্তু আনন্দ কথা বলল, 'আমাকে যখন তোর সন্দেহ তখন আমিও বলতে পারি নিজে কাজটা করে তার দায়িত্ব আমার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছিস।'

'আমি ? আমি করেছি ?'

'নিশ্চয়ই। চোরের মায়ের সবসময় বড় গলা হয়। আর তাই কদিন থেকে তুই চলে যাওয়ার কথা বলে যাচ্ছিস। তুই এমন কাজ করলি কেন সুদীপ ?'

প্রশ্নটা শোনামাত্র যেন উন্মত্ত হয়ে গেল সুদীপ। দুপাশে মাথা নেড়ে চিৎকার করে বলে উঠল, 'ইটস এ লাই, মিথ্যে কথা, আমি কিছুই জানি না। জানলে আমি তোকে এসে—।'

বাক্যটা শেষ করতে পারল না সে। আনন্দ বলল, 'এটা তোর অভিনয় হতে পারে।'

'অভিনয় ?' সুদীপের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল।

'অবশ্যই। এতদিন ধরে ওই বিধবা মেয়েটার সঙ্গে থেকেও তোর লোভ মেটেনি। আমি বুঝতে পারছি না জয়িতা এই ভুল কি করে করল। এক সময় মেয়েটা সম্পর্কে জেলাস ছিল। কিন্তু সব জেনেশুনে—! শোন সুদীপ ! আমি কখনও তোর আর ওই মেয়েটার সম্পর্ক নিয়ে কিছু বলিনি। এটা অন্যায় কিন্তু আজ হোক কাল হোক তোকে বিয়ে করতে হবে ওকে বলেই চুপ করেছিলাম। কিন্তু এইটে আমি সহ্য করব না।'

সুদীপ হাসল অনেকক্ষণ পরে, 'আমার সম্পর্কে চমৎকার ধারণা তোদের। একটু আগে জয়িতা একই প্রশ্ন করেছিল। মেয়েটা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ। বাট আই নেভার স্লেপ্ট উইদ হার। কথাটা ও নিজের মুখে আজ সবাইকে বলেছে।'

'তুই ?' বিস্ময় ফুটে উঠল আনন্দর মুখে।

'হ্যাঁ।' সুদীপ জোরের সঙ্গে বলল।

আনন্দ মাথা নাড়ল, 'সব কেমন গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। তুই প্যারাডাইসের কথা বললি ! চিরকাল যে ব্যাপারটাকে ঘৃণা করে এলাম নিজে তা কিভাবে করব ? হ্যাঁ, যদি জয়িতাকে ভালবেসে পেতে চাইতাম তাহলে সেটা জোর গলায় বলতাম।'

সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'তুই ওকে ভালবাসিসনি ?'

'হ্যাঁ, বেসেছিলাম। কিন্তু পেতে চাইনি।'

'আমিও তাই।'

'আমার মনে হয় একমাত্র কল্যাণ পেতে চেয়েছিল।'

গলার স্বর দুজনের খাদে নেমে এসেছিল। হঠাৎ সুদীপ সজাগ হল, 'তাহলে কে ?'

'তুই যে ভাবে ছুটে এলি, ওকি কারো নাম বলেছে ?'

'না। কিন্তু তুই কিংবা আমি ছাড়া কে হতে পারে ? আমরা তিনজনেই এক শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষ হয়েছি। রুচি বল, মানসিকতা বল, আমরা এক। জয়িতার মত মেয়ে—।'

'ঠিকই। হয় তুই নয় আমি।'

'কিন্তু আমি নই।' চিৎকার করল সুদীপ।

'চিৎকার করার কিছু নেই। আমিও নই সুদীপ। স্টিল আইদার ইউ অর মি। এবং সেটা নির্ভর করবে জয়িতার সিদ্ধান্তের ওপর।'

'না। আমি মানি না। এটা হতে পারে না।'

'কেন মানবি না সুদীপ ?'

'ও, ও যদি সত্যি কথা না বলে !'

'জয়িতা কখনও মিথ্যে কথা বলতে পারে না।'

'তুই এখনও ওকে বিশ্বাস করিস আনন্দ ?' মাটিতে বসে পড়ে অদ্ভুত চোখে তাকাল সুদীপ।

'আমৃত্যু করব। তুই যে অস্বীকার করছিস তাও আমি বিশ্বাস করছি সুদীপ। অবশ্য আমার কথা বিশ্বাস করা না করা তোর ওপর নির্ভর করছে।'

দুই হাঁটুতে মাথা রাখল সুদীপ, 'স্যরি আনন্দ।'

আনন্দ চারপাশে তাকাল। হালকা মিটে রোদে এখন তাপল্যাঙ ভাসছে। ওপাশে নীল আকাশের নিচে চ্যামল্যাঙ, বরুণৎসে, নুপৎসে, লোৎসে, এভারেস্ট, মাকালু, ছোমল গর্বিত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। এই তাপল্যাঙকে ওরা তিনবছর আগে দ্যাখেনি। কর্মযজ্ঞের সমস্ত চিহ্ন চারপাশে ছড়ানো। একটি প্রাণের পুরো চেহারা পাল্টে গেছে এর মধ্যে। মার্কস সাহেব চেয়েছিলেন মানুষের বেঁচে থাককার রাস্তাটা পরিষ্কার হোক। পৃথিবীর সমস্ত নিপীড়িত মানুষ সেই পথে যাওয়ার স্বপ্ন দ্যাখে। ভারতবর্ষের কম্যুনিস্ট পার্টিরা তো সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেখল কাজ আর আদর্শের মধ্যে দুস্তর প্রভেদ। গণতন্ত্র, এবং ভোটের বাক্সে এমন একটা যাদু আছে যে এরা তার মোহ আজও কাটিয়ে উঠতে পারল না। কলকাতা শহরে তারাও কি বোকামি শুরু করেছিল ! এখানে এসে এই অরাজনৈতিক নিঃস্ব মানুষগুলোর সঙ্গে কাজ করতে করতে প্রতিটি মুহূর্তে আনন্দ সেটা অনুভব করেছে। ব্যক্তিহত্যা নয়, জীবন ফিরিয়ে দেওয়াতেই একজন কম্যুনিস্ট-এর বেঁচে থাকার সার্থকতা। আর সেই কাজ যখন তারা তিলে তিলে শুরু করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তখন জয়িতা গর্ভবতী। এই খবরে এত বিচলিত হচ্ছে কেন ? একটা ছোট্ট খবরে এত বড় বিশ্বাস ভেঙ্গে যেতে পারে না। আনন্দ বলল, 'সুদীপ, জয়িতার সন্তানের পিতা কে এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করে আমাদের কি লাভ ?' সুদীপ মুখ তুলল। আনন্দ বলল, 'এটা আমাদের সমস্যা নয়, তাই না ?'

'না। কিন্তু ও কি বন্ধুত্বের সম্মান রাখল ? আমার লাগছে এখানেই।'

আনন্দ হাসল, 'ও যে মেয়ে তাই আমরা ভাবতাম না। ও নিজেও কি ভাবত ! তাছাড়া তুই ভুলে যাচ্ছিস আমরা যেমন ছিলাম তেমন আছি কিন্তু ও এখন আর জয়িতা নয়। ইদানীং ও আমাকে বারংবার মনে করিয়ে দেয় ওর নাম ড্রিমিত। ওঠ, আজকের কাজগুলো সেরে ফেলি।'

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

পূর্ব-পশ্চিম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যৌবন : ৩৫

নোয়াখালিতে সিরাজুল নামে একটি ছেলেকে ঝোঁকের মাথায় একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছিল বাবুল, পরে সেকথা তার মনে ছিল না, সিরাজুলও সেই সময় ঢাকায় আসেনি। এক শীতের সকালে বৈঠকখানা ঘরে বসে কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ একজন আগন্তুককে দেখে বাবুল চিনতে পারলো না। লম্বা, কালো চেহারা যুবকটির দুই কাঁধে দুটি ক্যাম্বিশের ব্যাগ ঝুলছে, গালে অল্প অল্প দাড়ি, ময়লা কুর্তা-পাজামা পরা, মুখে গ্রাম্য অপ্রস্তুত হাসি। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে বললো, আদাব, বাবুলভাই, আমি আইস্যা পড়ছি।

বাবুলের মেজাজটি ভালো নেই, ঘুম থেকে উঠেই মঞ্জুর সঙ্গে কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছে। এখন সে খবরের কাগজ চোখের সামনে মেলে নিজের সঙ্গেই বোঝাপড়া করছিল, এই সময় এক মূর্তিমান ব্যাঘাতকে দেখে সে হঠাৎ বিরক্তভাবে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার ?

যুবকটি বললো, বাবুলভাই, আমি সিরাজুল ইসলাম, সেই যে নয়াডাঙ্গার আপনে গেছিলেন...আমার বউরেও সাথে নিয়ে আসতে হইলো.....

নাম শুনেও বাবুলের কিছু মনে এলো না। যুবকটি পেছন ফিরে তার স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এলো ভেতরে, সেই মেয়েটির হাতে গোলাপ ফুল ছাপ মারা একটি টিনের সুটকেস। সিরাজুলকে দেখে চিনতে না পারলেও তার পত্নী মনিরার মুখের দিকে এক নজর তাকাতেই বাবুলের সব মনে পড়ে গেল। জয়নাল আবেদিনের আঁকা একটি ছবিতে অবিকল এই রকম একটি নারীর মুখ আছে, সেইজন্যই ভোলা যায় না।

মনের মধ্যে একটা প্রবল অস্বস্তি ও দ্বন্দ্ব থাকলেও বাবুল উঠে দাঁড়িয়ে বললো, এসো, এসো !

সিরাজুল সবিস্তারে তার কাহিনী শোনালো। আইয়ুব খাঁ বনাম ফতিমা জিন্নার ভোট যুদ্ধের সময় গ্রামের অবস্থা দেখতে গিয়ে বাবুল চৌধুরী এই সিরাজুলের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, সিরাজুল যদি ঢাকায় এসে পড়াশুনো করতে চায় তা হলে বাবুল তাকে সবরকম সাহায্য করবে। সিরাজুল তখনই সে সুযোগ নিতে পারেনি কারণ তাদের গ্রামের প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতা ইরফান আলীর সঙ্গে সে মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছিল। বড়লোকদের সঙ্গে মামলা করে কোনোদিনই জেতা যায় না, তাই রাগের চোটে ইরফান আলীকে খুন করতে গিয়েছিল সিরাজুল। ইরফান আলীর মতন মানুষকে খুন করাও সহজ নয়, তারা সব সময় চ্যালাচামুণ্ডা পরিবৃত হয়ে থাকে, ইরফান আলীর ঘাড়ে কুড়ুলের কোপ মারতে গিয়ে সে ধরা পড়ে যায়, তার ফলে সে নিজেই যে খুন হয়ে যায়নি, সেটাই তার সাত পুরুষের ভাগ্য। তবে মার খেয়ে সে তিন মাস শয্যাশায়ী হয়ে ছিল, এখন তার ঘা শুকিয়েছে বটে, কিন্তু ঐ গ্রামে বসবাস করা আর সম্ভব নয় তার পক্ষে। ইতিমধ্যে তার মায়েরও মৃত্যু হয়েছে। ভিটেমাটি সব ইরফান আলীর হাতে সঁপে দিয়ে সে এখন বাবুলের কাছে আশ্রয় প্রার্থী। দুনিয়ায় আর কোথাও তার যাবার জায়গা নেই।

বাবুল ভেতরে ভেতরে বেশ খানিকটা দমে গেল। একটি গ্রাম্য যুবকের পড়াশুনোর প্রতি খুব আগ্রহ দেখে সে তাকে ঢাকার কলেজে পড়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে চেয়েছিল, সেই প্রতিশ্রুতি সে ফিরিয়ে নিতে পারে না। কিন্তু তাকে সপরিবারে আশ্রয় দেওয়া কি তার পক্ষে সম্ভব ? ঢাকার এই বাড়িখানা তো বাবুলের নিজস্ব নয়। তার বাবা-মা এখন অধিকাংশ সময় টাঙ্গাইলের বাড়িতে থাকলেও মাঝে মধ্যে এখানে এসে ওঠেন। তার বড় ভাই আলতাফ হোটেলেই বেশির ভাগ রাত কাটালেও এ বাড়িতে তার জন্য দুখানি ঘর রাখা আছে। এখানে কোনো বাইরের লোককে আশ্রয় দিতে গেলে তার বাবা মা ও আলতাফের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু সুটকেস ও বোঁচকা-বুঁচকি সমেত এসে উপস্থিত হয়েছে যে তরুণ দম্পতি, তাদের সে এখন ফেরাবে কী করে ?

একতলার গোটা তিনেক ঘরই তাদের পারিবারিক মালপত্রে ঠাসা, তারই কোণে একটা ঘর পরিষ্কার করে এদের জায়গা দিতে হবে আপাতত। তার আগে মঞ্জুকে ডেকে সব কথা বুঝিয়ে বলা দরকার। মঞ্জু সকাল থেকেই রেগে আছে, সেই রাগের ঝাল যদি এদের ওপরে পড়ে ? এখুনি মঞ্জুকে

ডাকতে বাবুলের সাহস হচ্ছে না।

সে সিরাজুল ও মনিরার মুখের ওপর চোখ বোলালো। কী অসহায় দুটি মুখ। লজ্জিত, ভীত ব্যাকুল। মানুষই মানুষকে এরকম অসহায় অবস্থার মধ্যে ঠেলে দেয়। ইরফান আলীর মতন লোকেরা এখন ক্ষমতা পেয়েছে, গ্রামে তারা যা খুশি করতে পারে, গরিবের ধন-প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেললেও তাদের বাধা দেবার কেউ নেই। থানা-পুলিস, সরকারি প্রশাসন সবই এখন ওদের কব্জায়। ইরফান আলীর কথা ভেবে বাবুল নিস্ফল ক্রোধে জ্বলে উঠলো। তার ফর্সা মুখখানি লালচে হয়ে গেল, সে কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলো না।

সিরাজুল হুমড়ি খেয়ে বাবুলের হাঁটু ধরে বসে পড়ে কাতর গলায় বললো, সাহেব, আমাগো পায়ে ঠ্যালবেন না। আমাগো যেকোন কাম করতে কন...আমার বউ বাসন মাজবে, ঘর সাফ করবে, আর, আমি...আপনে আমারে...

বাবুল মৃদু ধমক দিয়ে বললো, ও কী করছো, উঠে বসো!

প্রথমে সম্বোধন করেছিল বাবুলভাই, এখন বলছে সাহেব। আগে চেয়েছিল লেখাপড়া শেখার সুযোগ, এখন চাইছে চাকর-দাসী হিসেবে কোনো ক্রমে আশ্রয়। এইভাবেই নৈতিক অধঃপতন শুরু হয়।

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সব বন্ধ, বাবুলের বাইরে বেরুবার তাড়া নেই। এখনও ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়নি। বাবুল মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো এ বাড়িতে দুজন নতুন মানুষকে আশ্রয় দিতে গেলে পুরোপুরি দায়িত্ব সে একা নিতে পারবে না, মঞ্জু আর আলতাফের সঙ্গে পরামর্শ করতেই হবে। আলতাফ প্রায় নিশাচর, কোনোদিনই রাত দুটো আড়াইটের আগে শুতে যায় না। সকাল দশটার আগে বিছানা ছেড়ে ওঠে না। সকালের দিকে তার হোটেলে কিংবা খবরের কাগজের অফিসে কাজও থাকে না বিশেষ। টেলিফোন করলেও এখন জাগানো যাবে না আলতাফকে। মঞ্জু খুব সম্ভবত এখন গোসলখানায়। এদের সঙ্গে পরিচয় করাবার আগে মঞ্জুর সঙ্গে নিভৃতে কথা বলতে হবে।

একটি নতুন মেয়েকে রাখা হয়েছে বাড়ির কাজের জন্য,বাবুল তার উদ্দেশে হাঁক দিল, সেফু, সেফু! তারপর সিরাজুলকে বললো, অনেক দূর থেকে এসেছো, আগে নাস্তা পানি খেয়ে নাও, তারপর তোমাদের ঘরের ব্যবস্থা করা হবে।

সিরাজুল আর মনিরার মুখ থেকে সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগের কালো ছায়াটা সরে গেল। এই প্রথম তাদের আশ্রয় দেবার স্বীকৃতি জানালো বাবুল। এতক্ষণ তারা বাবুলের আচরণে ভরসা পায়নি।

সিরাজুল আবার নেমে এসে পা জড়িয়ে ধরলো বাবুলের। ছটফটিয়ে উঠে দাঁড়ালো বাবুল। দাতা কিংবা পরোপকারীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা সে কখনো নেয়নি, যেকোনো কারণে কেউ তাকে কৃতজ্ঞতা জানালে কিংবা সামনা সামনি প্রশংসা করলে সে খুব অস্বস্তি বোধ করে।

সেফু নামে মেয়েটি এই সময় ঘরে ঢুকতেই সে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠলো, কিছু খেতে টেতে দিবি না? পরোটা ভেজেছিস? নিয়ে আয়। বাড়িতে মেহমান এসেছে, কয়েকখানা বেশি করে নিয়ে আয়। আর দ্যাখ, ভাবী গোসলখানা থেকে বেরিয়েছে কিনা!

মনিরা ভীতু ভীতু গলায় জিজ্ঞেস করলো, আমি একটু ওর সঙ্গে যাবো?

বাবুল কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করলো। মঞ্জুকে আগে কিছু বলার আগেই যদি মেয়েটিকে সে দেখতে পায়, তা হলে তার প্রতিক্রিয়া কী রকম হবে?

সে সেফুর দিকে চোখের ইঙ্গিত করে বললো, ওনারে নিচের বাথরুমটা দেখায়ে দে।

ওপরে মঞ্জুর গলা শোনা গেল। তবু ওপরে যেতে বাবুল সময় নিচ্ছে, সে কি মঞ্জুর সঙ্গে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে? মঞ্জুর মতন সরল আর নরম স্বভাবের মেয়ে, কিছুদিন আগে পর্যন্তও যে কক্ষনো গলা চড়িয়ে কথা বলতো না, তাকেও ভয়? ইদানীং মঞ্জুর সঙ্গে প্রায়ই খিটিমিটি বাঁধছে, সেইজন্যই বাড়িতে বেশিক্ষণ বাবুলের মন টেঁকে না।

হঠাৎ বাড়ির সামনে একটা গাড়ি থামলো, তার থেকে নেমে এলো আলতাফ। পুরোদস্তুর সুট পরা, সদ্যস্নাত মাথার চুল, মুখে চোখে ব্যস্ত ভাব। আলতাফ শুধু যে আজ সকাল সকাল জেগে উঠেছে তাইই নয়, সে কোথাও যাবার জন্য তৈরি। গট গট করে ভেতরে এসে সে বাবুলের সঙ্গে কোনো কথা না বলেই ওপরে উঠে যাচ্ছিল, বাবুল তাকে ডেকে বললো, ভাইয়া, তোমার সাথে একটা কথা আছে!

আলতাফ থেমে গিয়ে মুখ ফেরালো। ছোট ভাইটিকে সে এক সময় খুবই ভালোবাসতো। এখন তার প্রতি খানিকটা বিরক্তি মেশানো অবজ্ঞা জমেছে। তার ধারণা হয়েছে, বাবুল নিতান্তই কুঁড়ে এবং অপদার্থ। কোনো কাজে তার সাহায্য পাওয়া যায় না। দিনকাল পত্রিকার কাজে তাকে জুড়ে দেবার অনেক চেষ্টা করা হলো, সে কিছুতেই মন লাগালো না, দুএকটা লেখা দিয়ে এখন একেবারে সরে পড়েছে। হোটেল ম্যানেজমেন্টের ভারও দিতে চাওয়া হয়েছিল তাকে, সে নেয়নি। নিজের ভবিষ্যৎ বা দেশের ভবিষ্যৎ কোনো কিছু সম্পর্কেই যেন বাবুলের মাথা ব্যথা নেই।

বাবুল আলতাফকে একপাশে নিয়ে গিয়ে সংক্ষেপে সিরাজুলদের বৃত্তান্তটি জানালো। সিদ্ধান্ত নিতে একটুও দেরি হলো না আলতাফের। এই পরিবারের দায়িত্বশীল অংশীদার হিসেবে সে বললো, ওরা থাকুক এখানে। একটা ঘর খালি কইরা দে। আমাকে আইজই করাচী যেতে হবে, এগারোটার ফ্লাইট, আমি ফিরে আসি, তারপর দেখা যাবে ওদের জন্য কোনো কাজকর্ম জোটানো যায় কিনা!

তারপর সে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, কী নাম বললি? ইরফান আলী। ইনসেকটিসাইড, ফার্টিলাইজারের ব্যবসা করে? বেসিক ডেমোক্র্যাট?

সিরাজুল মাথা নেড়ে বললো, জী!

আলতাফ বললো, সে লোকটারে তো আমি চিনি। আমাদের হোটেলে এসে রেগুলার ওঠে। সে এমন অমানুষ নাকি?

বাবুল বললো, আমি নিজের চোখেই তার বাঁদরামির খানিকটা নমুনা দেখেছি।

আলতাফ বললো, আমি ফিরে আসি, তারপর আমাদের কাগজে ওরে টাইট দেবো। ইনভেস্টিগেটিং রিপোর্টিং করে ওর বাপের নাম ভুলাবো।

মনিরার চোখে চোখ রেখে আলতাফ আশ্বাস দিয়ে বললো, ভয় নাই, আমরা তো আছি। এখন আমার হাতে সময় নাই, পরে আলাপ করবো। কেমন?

বাবুল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। আলতাফ দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। আলতাফ ওপরে উঠে যেতেই সে একতলার পেছন দিকের একটা ভাঁড়ার ঘর খালি করতে লেগে গেল। প্রচুর ধুলো ও মাকড়সার জাল, শৌখিন স্বভাবের বাবুল সেই ধুলোজাল মাখতে দ্বিধা করলো না। একটা কিছু কাজ সে করছে এই অনুভূতি তার মন থেকে কিছুক্ষণ আগের বিরাগ ভাবটা মুছে দিতে লাগলো। এর আগে বাড়ির কোনো দেয়ালে নিজের হাতে একটা পেরেকও পোঁতেনি সে।

একটা পুরোনো আলমারির মাথায় নানান আকারের অনেকগুলি কাচ রাখা ছিল, কে কবে কোন্ উদ্দেশ্যে ওখানে ঐ কাচগুলি রেখেছে তা বাবুল জানে না। আলমারিটি ঠেলে ঘরের বার করে দিতে গিয়ে সেই কাচ কয়েকটা খসে পড়ে গেল, তাতে এমন ঝন্ ঝন্ শব্দ হলো যাতে গোটা বাড়ির বাসিন্দারা সচকিত হবেই।

সেই শব্দে বাবুলেরও চড়াৎ করে একটা কথা মনে পড়ে গেল। আলতাফের সম্মতি পেয়েই সে অতি উৎসাহে সিরাজুলদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু মঞ্জুকে এখনো কিছু জানায়নি। এটা স্পষ্টতই মঞ্জুর প্রতি অবহেলা।

হাত মুছতে মুছতে সে সিরাজুলকে বললো, তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি উপর থেকে আসছি।

বেরিয়েই সে দেখলো সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছে মঞ্জু। একটা কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি পরা। তার একটু পেছনে সুখু মিঞাকে কোলে নিয়ে আছে মনিরা। মঞ্জু জিজ্ঞেস করলো, কী ভাঙলো?

বাবুল বললো, এমন কিছু না, কয়েকটা পুরোনো কাচ। আর শোনো, ইসে মানে, এই এরা এসে পড়েছে, এরা কয়েকদিন এখানে থাকবে।

মঞ্জু বললো, মনিরার কাছে সব শোনলাম। জানো, ঐ সিরাজুলের নাকি এখনও বুকে খুব ব্যথা হয়, ভালো করে সারে নাই, ওরে খাজুরের ডাল দিয়ে পিটায়েছিল, একবার ডাক্তার আশরাফ সাহেবের কাছে দেখাবার বন্দোবস্ত করো।

বাবুল ভেতরে ভেতরে বিরাট এক স্বস্তি বোধ করলো। তাকে বিশেষ ব্যাখ্যা করতে হলো না, আলতাফের মতনই মঞ্জুও এই নবাগতদের এক

কথায় মেনে নিয়েছে। চাপা অশান্তি সে একেবারে সহ্য করতে পারে না।

মঞ্জু আবার বললো, মামুন মামারে বলে ঐ শয়তান লোকটারে শাস্তি দেওন যায় না?

বাবুল একটু হাসলো। মঞ্জুর চোখে তার মামুনমামা এক মহা শক্তিমান পুরুষ। আসলে মামুনভাই একটি মাঝারি গোছের দৈনিকের সম্পাদক, দুর্বল ও মিনমিনে স্বভাবের মানুষ, তার কতটুকু ক্ষমতা আছে? আলতাফও আস্ফালন করে গেল, কিন্তু ঐ কাগজে সরকার পক্ষের কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি সম্পর্কে কী ছাপা হলো বা না হলো, তাতে কিছুই যায় আসে না।

সে বললো, মামুনমামা এলে তেনাকে বলে দেবো।

সিরাজুল-মনিরাকে এ গৃহে প্রতিষ্ঠার ভার মঞ্জুর ওপর সঁপে দিয়ে এক সময় আড্ডা দিতে বেরিয়ে পড়লো বাবুল। তার মনটা বেশ ভালো আছে, মঞ্জুর কাছে সে কৃতজ্ঞ বোধ করছে। মঞ্জু তো সত্যিই খুব ভালো, তার ওপর রাগ করার কোনো মানে হয় না।

বাবুল নিজে সাংবাদিকতা না করলেও সে তার বন্ধু জহিরের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে যায় প্রায়ই। এখন সেটা তার নেশা হয়ে গেছে। মোটামোটা বই পড়ে, তত্ত্ব মুখস্ত করে, পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে সে অর্থনীতি শিখেছে, এখন গ্রামের মানুষদের দেখে সে অনুভব করে যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে স্বদেশের মানুষকে চেনা যায় না।

পল্টনদের বাসায় ঢোকার রাস্তায় কামালের সঙ্গে দেখা। যুদ্ধের মধ্যে সে লাহোরে আটকা পড়ে গিয়েছিল, একটা ফিলমের শুটিংয়ের জন্য গিয়েছিল সে, তার জন্য দুশ্চিন্তা ছিল সকলের।

বাবুল জিজ্ঞেস করলো, তুই তাহলে বেঁচে আছিস?

কামালের মুখে এখন চাপ দাড়ি, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। বেশ মোটা হয়েছে, তাকে দেখলে এখন কল্পনা করাই শক্ত যে ছাত্রজীবনে সে অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা দিয়ে অনেক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে।

কামাল বললো, শহীদ হবার চান্সটা মিস করলাম। তোরা বোধহয় শুনেছিলি যে লাহোর শহর ইন্ডিয়ার হাতে চলে গেছিলো? সে সব কিছু না। লড়াই হয়েছে ইচোগিল খালের আশেপাশে, ওরা অনেকখানি এগিয়ে এসেছিল ঠিকই কিন্তু লাহোর শহরে একটাও গোলা পড়ে নাই।

বাবুল বললো, শহর দখল করলে শহরের লোকদের খাওয়াতে হতো।

কামাল বললো, অনেকে অবশ্য ভয়ে পালিয়েছিল...শোন বাবুল, ইসে, তুই আর একটা খবর শুনেছিস?

কী?

নীলা ভাবীর বোন দিলারা, তার হ্যাজব্যান্ড তো আর্মিতে ছিল, সেই ইউসুফ মারা গেছে, যুদ্ধের একেবারে শেষ দিনে, যুদ্ধ বিরতির মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে।

বাবুল গম্ভীর ভাবে বললো, হ্যাঁ, এ খবর শুনেছি। এই যুদ্ধে আমাদের চেনাশুনাদের মধ্যে ইউসুফই একমাত্র ভিকটিম। গ্রেট ট্রাজেডি, মাত্র আড়াই বছর আগে বিয়ে হয়েছিল, ওরকম ইউথফুল এনারজেটিক ছেলে...

—দিলারা লাহোরে গিয়েছিল বডি আইডেন্টিফাই করতে

—জানি! দিলারা কিছুতেই বিশ্বাস করে নাই। তাকে কিছুতেই বুঝানো যায় নাই। জোর করে সে লাহোরে চলে গেল পল্টনের ছোট ভাইয়ের সাথে।

—সে সময় আমি ছিলাম লাহোরে। আমার সাথে ওদের দেখা হয়েছিল কিন্তু সে বডি একেবারে মিউটিলেটেড, আইডেন্টিফাই করার কোনো উপায় নাই, ঐ দিককার একজন লেফটেনান্ট কর্নেল আমাদের খুব সাহায্য করেছিল, সমস্ত প্রমাণ পত্তর দেখিয়েছিল, দিলারা অবশ্য তাতে কনভিন্সড হয় নাই, তার কান্না থামানোর জন্য সেই লেফটেনান্ট কর্নেল নিজের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে গেল সকলকে। আমাকেও নিয়ে গেল, আমাকে তার বেশ পছন্দ হয়েছিল, আমাকে প্রথম দেখেই সে কী বলেছিল জানিস? "আপ বাঙালী হোনেসে কেয়া হ্যায়, আপকো তো সাচ্চা মুসলমান মালুম হোতা হ্যায়।"

দাড়ি চুমড়ে হেসে ফেললো কামাল। বাবুল হাসতে পারে না, দিলারার মুখখানি মনে পড়ে তার। কলকাতার মেয়ে, তার মুখে সপ্রতিভ ছাপ, অনেক বইপত্র পড়েছে সে, তার দুলাভাই-এর বন্ধুদের সঙ্গে কখনো কখনো তর্ক করতেও সে দ্বিধা করেনি। এই মেয়েটির একটি সুন্দর জীবন প্রাপ্য

ছিল।

পল্টনের বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কামাল বললো, ভিতরে গিয়ে তুই আরও দু একটা নতুন খবর শুনবি। তার আগে তোকে ব্যাকগ্রাউণ্ডটা বলে দিই। ওয়েস্ট পাকিস্তানের সেই সহৃদয় লেফটেনান্ট কর্নেলের নাম মীর মহম্মদ খান। বেশ সরল, ধর্মপ্রাণ, জেদী ধরনের মানুষ, বাঙালীদের সম্পর্কে তার মনে বেশ খানিকটা অবিশ্বাসের ভাব আছে, আবার কিছুটা অনুকম্পাও আছে। না হলে দিলারার অমন কান্নাকাটি শুনে তার এত দয়া হবে কেন? নিজের বাসায় নিয়ে গিয়ে তার আব্বা-আম্মার সাথে পরিচয় করায়ে দিয়েছে, আমাদের তিনদিন ধরে খাইয়েছে। আর জানিস তো, মায়েরা সব দেশেই এক, ঐ কর্নেল সাহেবের মা দিলারাকে নিজের কন্যার মতন স্নেহ করেছেন। পরিবারটি সত্যিই ভালো। আমি ওদের খুশি করবার জন্য দৈনিক ওক্ত নামাজ পড়েছি, উর্দু সিনেমা দেখে যতখানি উর্দু শিখেছি, তার সবটা ফলিয়ে কথা বার্তা বলেছি উর্দুতে, আমার বাবা যে একজন মৌলবী তাও জানিয়েছি।

বাবুল ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, এসব কিসের ব্যাকগ্রাউন্ড?

কামাল মৃদু হেসে বললো, দিলারাকে ওরা এত যত্ন করেছে, তার কান্না থামিয়ে সুস্থ করেছে, এইজন্য অনেক ধন্যবাদ ওদের প্রাপ্য। ঠিক কিনা? কিন্তু তারপর...

পল্টন দরজা খুলে দিল এই সময়। তার মুখ থমথমে। কোঁচকানো ভুরুটা ওদের দেখে খানিকটা সোজা করে সে বললো, আয়।

বাবুল কিছুই বুঝতে পারলো না। পল্টন রঙ্গরস প্রিয় মানুষ, বন্ধুদের দেখে সে হাসলো না পর্যন্ত। বাড়িতে আবার কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে?

অন্দরমহলে একটা চাপা কান্নার আওয়াজ! দুতিনজন মহিলা যেন একসঙ্গে কাকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছেন।

বাবুল জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে?

পল্টন কামালের দিকে তাকিয়ে বললো, এই কামালটাই তো যত নষ্টের গোড়া।

কামাল চোখ বড় বড় করে বললো, আরে, আমি কী করলাম?

পল্টন ধমক দিয়ে বললো, তুই কেন দিলারাকে সাথে নিয়ে এলি না? লাহোরে রেখে এলি কেন?

—বাঃ, আমি কী করতে পারতাম? মীর মহম্মদের মা দিলারাকে আরও কয়েকটা দিন রেখে দেবার জন্য পিড়াপিড়ি করতে লাগলেন, দিলারাও দেখলাম অরাজি না, আমি কি তারে জোর করে নিয়ে আসতে পারি? সে তো ওখানে ভালোই ছিল!

পল্টন নিচু গলায় বললো, সেই মীর মহম্মদ এখন ঢাকায়। গতকাল সে আমাদের বাসায় এসেছিল, আজ সকালেও এসেছিল

কামাল বললো, সে রোজই আসবে।

পল্টন বললো, সে কী প্রস্তাব দিয়েছে জানিস? সে দিলারাকে শাদী করতে চায়। লোকটার প্রথম বউ মরেছে দুবছর আগে।

কামাল বললো, আমি জানতাম এ রকম হবেই। আমরা সিনেমার গল্প লিখি তো, তখন দেখেই বুঝেছিলাম।

পল্টন আবার তাকে ধমক দিয়ে বললো, তুই চুপ কর। এখন কী করা যায়, বল তো বাবুল?

—দিলারার কী মত? এত তাড়াতাড়ি...ইউসুফের সাথে তার সুন্দর সম্পর্ক ছিল।

—ততটা সুন্দর ছিল না বোধ হয়। বাইরের থেকে বোঝা যায় না। ইউসুফের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সে অত কান্নাকাটি করেছিল, কিন্তু এখন মীর মহম্মদের প্রস্তাবে সে অরাজি নয়...মেয়েমানুষের চরিত্র বোঝা দায়...আসলে মীর মহম্মদের মাকে নাকি তার খুব পছন্দ হয়েছে।

তিন বন্ধু কথা বলছে বারান্দায় দাঁড়িয়ে, এক সময় দিলারা ছুটে এলো ভেতর থেকে, তার চুল এলোমেলো, তার পোশাক আলুথালু দুই গালে কান্নার রেখা, সে বাবুলদের দেখলো না, সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল ওপরে।

বাবুল ধীর স্বরে বললো, ও যদি রাজি থাকে, তাহলে আর আপত্তির কী আছে? বিধবা হয়ে শুধু শুধু কষ্ট পাওয়া...ওর যখন কোনো বাচ্চা কাচ্চা নেই।

পল্টন বললো, নীলার একেবারে পছন্দ নয়। আর কিছুদিন বাদে এখানকারই কোনো ভালো ছেলের সঙ্গে দিলারার আবার বিয়ে দেওয়া

যায়। আমাদের সংসারে একটা পশ্চিম পাকিস্তানী এসে ঢুকবে?

কামাল বাবুলের বুকে হাত রেখে বললো, সেটা যেমনভাবেই হোক আটকাতেই হবে। ভারতের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এবারে আমাদের আসল লড়াই হবে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে। লাহোরে থাকতে থাকতেই আমি সেটা বুঝে গেছি। আমাদের মেয়েদের ওরা পছন্দ করতে পারে বটে, বাঙালী পুরুষদের ওরা মানুষ বলেই গণ্য করে না।

পল্টন বললো, তুই একটু চেষ্টা করে দ্যাখ। তুই বুঝিয়ে বললে...

বাবুল বললো, আমি কী করতে পারি? আমার কথা শুনবে কেন?

পল্টন বললো, তোর কথা শুনবে। তোর ওপর দিলারার দুর্বলতা ছিল, তোকে এখনও খুব পছন্দ করে, তুই যদি একটু ভালো করে বলিস, অন্তত একটু প্রেমের ভান করিস...

মুখটা কুঁকড়ে গেল বাবুলের। মাটির দিকে তাকিয়ে সে ক্লিষ্ট গলায় বললো, ওভাবে বলিস না, ওভাবে বলিস না...

(ক্রমশ)

ছবি : অনুপ রায়

দানব ও দেবতা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আট

দিলীপকে বললুম, "কী হচ্ছে, লোকে কী মনে করবে !"

'কোন লোক ?'

'এত সব বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাদের চারপাশে !'

'তাকিয়ে দেখুন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কী করছেন ! খামচাখামচি, আঁচড়া আঁচড়ি। সভ্যতা একটা মেক আপ। স্বার্থের উত্তাপে সুন্দরীর গালের মেকআপের মতো গলে পড়ে যায়, বেরিয়ে আসে প্রিমিটিভ ম্যান, এপ ম্যান। দিন টিকিটটা দিন। গুঁতোগুঁতি করে আসি।'

'দু দুবার বাধা পড়েছে। আমি আর যাব না। পরে টিকিট ফেরত দিয়ে যা পাওয়া যায় নিয়ে নোব।'

'টিকিটটা দিন তো। বাধা আবার কি ! যত মেয়েলি সংস্কার। আগে কাল সকালের জন্যে করে আনি তো, তারপর দেখা যাবে। এয়ারপোর্ট হোটেলে থাকতে চান ?'

'না। হোটেলে থাকতে যাবো কোন দুঃখে !'

'পাঁচ তারা হোটেলে বিনা পয়সায় থাকার সুযোগটা ছেড়ে দেবেন ?'

'ভাই আমার বাড়ি যে হাজার তারা হোটেল। বাবুই পাখিরে ডাকি বলিছে চড়াই/ কুঁড়েঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই/ আমি থাকি মহা সুখে অট্টালিকা পরে/ তুমি কত কষ্ট পাও রোদ বৃষ্টি ঝড়ে/, মনে আছে তো বাবুইয়ের উত্তর।'

দিলীপ টিকিট নিয়ে চলে গেল গুঁতোগুঁতির দলে। আমি চলে গেলুম আমার ব্যাগেজ ছাড়াতে। সেই লটবহর তো গলায় লেবেল এঁটে ভোর সাড়ে চারটের সময় সিকিউরিটি চ্যানেল দিয়ে ঢুকে গেছে ভেতরে।

কাউন্টারের সায়েব বললেন, 'সে তো দেওয়া যাবে না। দিল্লি তো আপনাকে যেতেই হবে।'

'আমি যাবো না, আমার মাল খালাস করে দিন।'

'আমার ক্ষমতা নেই। ডিউটি অফিসারকে বলুন।'

ডিউটি অফিসার বললেন, 'চ্যানেলে গিয়ে দাঁড়ান, ঠিক সময়ে এসে যাবে।'

দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে, ব্যাগের হদিস আর পাওয়া গেল না। ফিরে এলাম সেই অফিসারের কাছে। তিনি তখন প্রায় ঘেরাও। অনেক লড়াইয়ের পর তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল। তিনি তাঁর সহকারীকে বললেন, 'ব্যাগেজ ক্লিয়ারেন্সের কি হল !'

সহকারী বললেন, 'সে তো আমরা লক করে রেখে দিয়েছি। পাওয়া যাবে না।'

আর মেজাজ রাখা গেল না। পকেট থেকে আইডেনটিটি বের করে বললুম, 'এটা দেখেছেন ? আমি তাহলে কাল সকালের জন্যে একটা স্টোরি তৈরি করি, কি বলেন ! ফ্লাইট নাম্বার টুনাইন থ্রি। ভালই হবে, বেশ ভালো একটা স্টোরি হবে।'

ভদ্রলোক একটু থতমত খেয়ে গেলেন। 'কি যে সব করে,' বলে তেড়ে বেরিয়ে আসতে গিয়ে টেলিফোনের তারে পা জড়িয়ে উল্টে পড়ে যাচ্ছিলেন। একজন ধরে ফেললেন। অফিসার একজনকে ডেকে বললেন, 'এই ভদ্রলোককে নিয়ে গিয়ে ব্যাগেজ ছাড়িয়ে দাও।' সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে চলেছি, পেছন থেকে এক আমেরিকান ভদ্রলোক বললেন,'ক্যান ইউ হেলপ মি ইন গেটিং মাই ব্যাগ অলসো ?'

আমি বললুম, 'ফলো মি।'

গলিপথ ধরে একটা গোডাউন পেরিয়ে আমরা চলে এলাম বিমান অবতরণ ক্ষেত্রের কিনারায়। সেখানে জিপসি ওয়াগনের মতো পরপর কয়েকটা ঠেলাগাড়ি দাঁড়িয়ে। সেখানে যে কর্মী দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁকে আমাদের পথপ্রদর্শক বললেন, 'এই ভদ্রলোকের ব্যাগটা বের করে দাও।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নিয়ে নিন, আমি আসছি। আর কোনও প্রবলেম নেই।'

ভদ্রলোক যেদিক থেকে এসেছিলেন, সেদিকেই ফিরে গেলেন হনহন করে।

আমাদের ব্যাগ কর্মী এক নম্বর ওয়াগনের দরজা খুলে বললেন, 'দেখে নিন।'

পর্বতপ্রমাণ ব্যাগ একের ঘাড়ে আর এক চেপে বসে আছে। আমি বললাম, 'মশাই, এ তো গন্ধমাদন, হনুমানও হেরে যাবে বিশল্যকরণীর সন্ধানে।'

আইডেনটিটি বের করে বললুম, 'এটা দেখেছেন ?'

কর্মী বললেন, 'রামায়ণ, মহাভারত ছেড়ে খুঁজে নিন, আমি এখুনি লক করে লকারে ঠেলে দোব।'

'এ তো মশাই, অসম্ভব ব্যাপার। আপনি নামাবেন না ?'

'ইমপসিবল।'

আমার সায়েব বললেন, 'ইমপসিবল।'

আমিও বললাম, 'ইমপসিবল।'

তিনটে ইমপসিবল, তিন দিক থেকে এসে ট্রাফিক জ্যামের মতো দাঁড়িয়ে গেল মুখোমুখি। আমার সায়েব বললেন, 'ডু সামথিং।' আর কি করবো। আমার করার মধ্যে তো একটাই অস্ত্র আছে, বুক পকেট থেকে প্রেসকার্ড বের করে দেখানো। আমাদের ব্যাগ কর্মী ততক্ষণে একের পর এক ওয়াগনের দরজা খুলে খুলে চলেছেন। এই রকম প্রায় সাত আটটা ব্যাগ ঠাসা গাড়ি। শেষের দরজাটা খুলতে খুলতে তিনি বললেন, 'ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এলেও একটা একটা করে নামানো সম্ভব নয়। এর থেকেই দেখে নিতে হবে।'

আমার আমেরিকান সায়েব, 'ও গড' বলে তড়বড় তড়বড় করে কাজে লেগে গেলেন। আমি বললুম, 'জয় ভগবান'। আমার চোখের সামনে ব্যাগের পর ব্যাগ, ব্যাগের পাহাড়। কত রকমের যে ব্যাগ হতে পারে, এই প্রথম দেখার সুযোগ হল। গবেষকরা গবেষণার বিষয় খুঁজে পান না, এই ব্যাগ নিয়ে কত মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা করা যায়। যেমন ছেলে দেখে বোঝা যায় পরিবারের পরিমণ্ডল। হ্যাপি ফ্যামিলির ছেলে,না আন-হ্যাপি-ফ্যামিলির হেলাফেলা বংশধর। শার্লক হোমস যেমন ওয়াটসনকে কুকুর দেখিয়ে পরিবারের অবস্থা বোঝার চোখ তৈরি করতে বলেছিলেন, ইউ ওন্ট সি এ হ্যাপি ডগ ইন এ মোরোজ ফ্যামিলি অর এ মোরোজ ডগ ইন এ হ্যাপি ফ্যামিলি। আমার সামনে কিছু আদরের ব্যাগ, কিছু অতি আদরের ব্যাগ, কিছু অনাদরের ব্যাগ। যতদূর মনে হ'ল প্রথমটায় আমার ব্যাগ নেই। আমার আমেরিকান সায়েবেরও নেই। সায়েব বললেন, 'তুমি অ্যাস্ট্রলজিতে বিশ্বাস করো ? ফেট ?' 'খুব করি। আগে না করলেও, আজ সকাল থেকে খুব করি।' 'তুমি লটারি করেছ কোনও দিন ?' 'দু একবার। লাগেনি কোনও দিন।' 'নাউ লেট আস ট্রাই আওয়ার লাক ইন দি সেকেন্ড ওয়ান।'

সায়েবের বাম্পার লটারি পাবার বরাত বা যোগ কেটে গেল। দ্বিতীয় গাড়ি থেকে ভদ্রলোকের ব্যাগ বেরিয়ে এল। বেশ লোভনীয় চেহারা। জাতে আমেরিকান তায় বেশ যত্নে থাকে। সায়েব আমাকে এক জোড়া থ্যাঙ্কস দিয়ে,

ব্যাগ হাতে বুক ফুলিয়ে চলে গেলেন। সেই বিশাল প্রান্তরে, আমি পড়ে রইলুম একা। আমার পেছনে, দূরে রানওয়েতে একটা প্লেন পড়ন্ত রোদে ঝিমোচ্ছে। তৃতীয়টাতেও আমার ব্যাগ নেই বলেই মনে হল। চতুর্থটায় পেয়ে গেলুম আমার সেই হারামাণিক। আরও গোটা কতক দামড়া-গুণ্ডা চেহারার ব্যাগ বেচারাকে প্রায় শেষ করে ফেলেছে। আহা রে, বাছা আমার।

আমার সেই এক রোগ। সেন্স অফ ডাইরেকসনের অভাব। কোন পথে কি ভাবে এসেছি খেয়াল নেই, অথচ ভাব দেখাচ্ছি আমি এক স্মার্ট গাই। আমেরিকানরা মানুষকে গাই বলে, আমরা বলি গরুকে। গ্যাটম্যাট, গ্যাটম্যাট করে একটা কাঁচের দরজার সামনে এসে, বন্দুকধারী প্রহরীকে দেখে বুঝলুম, ভুলপথে আসার কি অসাধারণ প্রতিভা ঈশ্বর আমাকে দিয়েছেন! সেন্ট্রির বিরস বদনের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসলুম। যেন আমার কত দিনের দোস্তের সঙ্গে দেখা। দোস্ত হাসি ফিরিয়ে দিলেন না। বন্দুকের অহঙ্কার। তখন ভয় হল, চ্যালেঞ্জ না করে বসেন ব্যাগ-চোর ভেবে। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাবাউট টার্ন। ছোট মতো একটা প্যাসেজে ঢুকে পড়লুম। কিছু দূর যাবার পর দরজা। দরজা ঠেলাতেই যে ঘরে এলুম, সে ঘরে বড় বড় প্যাকিং বক্স। আর না, কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। বরাতে শ্রীঘর নাচছে। উল্টো দিকে দরজা। ঠেলতেই খুলে গেল। আর দাঁড়ায়! বামে দুপা এগোতেই, চক্ষু স্থির, আরে এ তো সেই সিকিউরিটি চেকিং-এর ঘর। ওই তো সেই মেটাল ডিটেক্টার দিয়ে শরীর পরীক্ষা করার খুপরি। ওই তো সেই হাত ব্যাগ হাত ছাড়া করার কনভেয়ার বেল্ট। ভাগ্য ভালো কেউ কোথাও নেই। চোখ কান বুজিয়ে পেরিয়ে এলুম, জুয়েল থিফের দেবানন্দের মতো। উলটপুরাণের মতো উল্টো সিকিউরিটি। লাউঞ্জে এসে হাসি পেয়ে গেল। আমি আর কিছুক্ষণ থাকলে, দমদম বিমানবন্দরের সব ব্যবস্থা উল্টে পাল্টে যাবে।

দিলীপকে আবার খুঁজে পেলুম। বললে, 'কোথায় গিয়েছিলেন এতক্ষণ। আমার টিকিটের কাজ হয়ে গেছে।'

একটা ট্যাকসি ধরে এবার বাড়ি ফেরার পালা। সারা পথে কৈফিয়ত দেবার পালা নেই। মজা হল পাড়ায় ঢুকে। সন্ধে হয়ে এসেছে। অসংখ্য চেনা মুখ। সকলেরই এক প্রশ্ন, কি ব্যাপার, এর মধ্যে বিলেত ঘুরে এলেন। রকেটে গিয়েছিলেন বুঝি! আর একেবারে যিনি প্রতিবেশী তিনি বললেন, 'কি আনলেন?'

শ্যালিকাকে দেখিয়ে বললুম, 'এই যে বিলেত থেকে বউ নিয়ে এসেছি।'

একটা লোক বাড়ি ফিরে এল, কোথায় সবাই আনন্দ করবে, নিবু আঁচে পোলাও বসাবে, তা নয়। আমি যেন মৃত্যু সংবাদের টেলিগ্রাম ডেলিভারি করতে এসেছি। সবাই সেইভাবে আমাকে নিলে। বিমর্ষ গোবদা মুখ সব। 'যাঃ এবারেও ফিরে এলে?' যেন আজ পরীক্ষার ফল বেরোবার কথা ছিল। ফেল করে ফিরে এসেছি। 'আসলে ওর যাবার ইচ্ছে নেই। ভালো করে চেষ্টা করলে অবশ্যই যেতে পারতো। প্লেনের আবার ডানা খোলে না কি! প্লেন তো ভেঙে পড়ে! সবসুদ্ধু হুড়মুর করে পড়ে যায়।' সত্যি, পরিবার পরিজনেরা খুব চুপসে গেছে। পাড়া প্রতিবেশীর কাছে মুখ দেখাবে কি করে! 'ওরে চায়ের জল বসা। মুড়িটুড়ি যা হয় কিছু দে খেতে!'

আমি ভাবছি জামাকাপড় বদলে আর লাভ কি! ঘন্টা কয়েক পরে তো আবার সেই ছুটতে হবে। প্লেন ধরার পাঁয়তাড়া। সাগরদার বাড়িতে ফোন করলুম। হয়তো খাবার যোগাড় হচ্ছিল। আনন্দের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'কি ঠিক মতো পৌঁছে গেছ? দিল্লির অবস্থা কি! পি আই বি-র ঝামেলা মিটেছে!'

'সাগরদা আমি বাড়ি থেকে বলছি। দিল্লি যেতে পারি নি।'

'অ্যাঁ, সে কি! তুমি তোমার বরানগরের বাড়ি থেকে বলছ?'

একটু মুচকি হাসলুম, যেন কতদিনের দোস্তের সঙ্গে দেখা

'হ্যাঁ সাগরদা।'

'যাঃ, কি হল?'

'প্লেনের ডানা খুলে গেছে।'

পুরো ঘটনা শোনালুম। সাগরদা বললেন, 'কাল ভোরে তাহলে আবার চেষ্টা করছ!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'হাল ছেড়ো না। আমার শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ রইল। জানবে শুরুটা খারাপ হলে শেষটা ভালো হয়।'

রাতটা কেমন যেন হয়ে গেল। মরা মানুষ বেঁচে শ্মশান থেকে ফিরে এলে যেমন লাগে। আমার মনে হল। কারণ আমি তো মরিনি। মরে বেঁচে উঠিনি। তবে এ রাত জীবনের অন্য সব রাতের মতো নয়। আলো জ্বলছে ঘরে ঘরে। কি রকম যেন হলদেটে। পাশের বাড়ির প্লেয়ারে চটুল গান হচ্ছে। মনে হচ্ছে সবাই মিলে একসঙ্গে বলছে, বলো হরি।

ভালো ঘুম হলো না। কেউ ডাকার আগেই শেষ রাতে উঠে পড়লুম। অন্ধকার। গাছপালা সব ধ্যানস্থ। ধকধক করছে এক আকাশ তারা। বহু দূরের কোনও মন্দির থেকে শৃঙ্গার আরতির শব্দ ভেসে আসছে। শৃঙ্গার আরতি নয়, মা ভবতারিণীর মন্দিরে মঙ্গল আরতি হচ্ছে। বাড়ির ছাদে একা দাঁড়িয়ে আছি। শেষ রাতের বাতাস এখনও ওঠেনি। এখনও ক্ষয়া চাঁদ অস্ত যায় নি। দূরে ঝাঁকড়া শিরীষ গাছ। রাতের শিকার-ক্লান্ত প্যাঁচা কর্কশ স্বরে দিনের পাখিদের জানাতে চাইছে, আমার হল সারা, তোমরা এবার শুরু করো। তারাদের সভার পাশ দিয়ে আলোর একটা বিন্দু ধীরে পুব থেকে পশ্চিমে চলেছে। মানুষের ছাড়া অনেক স্যাটেলাইটের একটি। সন্ধানী চোখ মেলে সরে সরে যাচ্ছে। পৃথিবীর মানুষের সব গোপনীয়তা এখন বৃহৎশক্তির নখ দর্পণে। সামনে গঙ্গা। পরপারে আলোর মালা ক্রমশ ম্লান হয়ে আসছে। অনেক জেগেছে। বটতলা পর্যন্ত জোয়ারের জল এসে গেছে। পাশাপাশি তিনখানা নৌকো ভাসছে। সাদা একটা বেড়াল থুপ্পি মেরে বসে আছে। মাত্র কয়েক দিন আগে তার মালিক অপু ঠাকুর মারা গেছে। নাট মন্দিরের সাধু জগৎ জেগে ওঠার আগেই স্নান সেরে নিচ্ছেন।

যে ছেলেটি আমাকে নিয়ে যাবে, সেই সজল কোনও ঝুঁকি না নিয়ে এ বাড়িতেই রাতে শুয়েছিল। বাড়ি জেগে উঠেছে। আমিও তৈরি। আজ সঙ্গী হবে আমার স্ত্রী। কাল যারা ছাড়তে গিয়েছিল তারা সব অপয়া। কথাটা ভাবার মতো। এই রাত আর দিনের সন্ধিক্ষণে যখন সানাইয়ে যোগীয়া কি আহীর ভৈঁরো বাজার কথা, এই সময় ছাদের নির্জন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, মঙ্গল আরতি শুনতে শুনতে ফেলে আসা পঁচিশটা বছরের কথা ভাবলে, মনে হয়, জীবন এক নৌকো, আমরা দু'জনে হাল আর দাঁড় ধরে,

ঝড়ঝাপ্টার মধ্যে দিয়ে দুলতে দুলতে এসেছি। অনেক কষ্ট করেছে আমার সঙ্গে। সহ্য করেছে অনেক। ঠুনকো প্রেম এখন ঢালাই হয়ে জমাট একটা অস্তিত্ব। অনিশ্চিত কোনও যাত্রায় যাবার সময় জীবনের বন্ধন বড় বেশি অনুভব করা যায়। আর কিছুক্ষণ পরে মাথার ওপর এই আকাশটা আর থাকবে না। অন্য আকাশ। চারপাশে এই মুখ আর থাকবে না। অন্য মুখ।

গাড়ি ছেড়ে দিল। ভোরের আলো সবে ফুটছে। ভি আই পি রোড ধরে কিছু কিছু গাড়ি চলেছে। দেখলেই মনে হয় সদ্য ঘুমভাঙা গাড়ি। সকলেরই লক্ষ্য এয়ারপোর্ট। চেক ইন কাউন্টারে এরই মধ্যে বেশ বড় লাইন তৈরি হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলুম, 'আজ আপনাদের বিমানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব ঠিক আছে তো! উড়বে তো!'

এই কাজের যাঁরা ভারপ্রাপ্ত তাঁদের আচার আচরণ বিশেষ মধুর নয়। আধা সামরিক, আধা সামরিক ভাব। কারুরই মুখে সুপ্রভাত লেগে নেই। সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'ইয়েস।'

আবার আমার প্রশ্ন, 'কালকেরটাই উড়ছে?'

আবার সংক্ষিপ্ত উত্তর: 'ইয়েস, ইট ইজ অলরাইট বাই নাও।'

সিকিউরিটি চেকে যাবার আগে প্রিয়জনের কাছে হাত নেড়ে বিদায় নেবার পালা। বাঙালীর বিদায়পর্বে এখনও, এই ছিয়াশি সালেও প্রচুর সেন্টিমেন্ট। মন কেমন করা। আমার যাওয়াটাও তো বেশ গোলমেলে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অবস্থা বড় জটিল। পদে পদে নিরাপত্তার বাঁধন। তাঁর প্রাণ নেবার জন্যে একাধিক শক্তি সুযোগ খুঁজছে। সেই দলে বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত বিশাল দুই সমুদ্র পেরিয়ে যাওয়া তেমন নিশ্চিন্ত ভ্রমণ বলা যায় না।

আজ আর কোনও গোলমাল নেই। রাইট টাইমে ডানা জোড়া বিমান আকাশে ভেসে পড়ল। আমার পাশের যাত্রীর সঙ্গে নিমেষে আলাপ হয়ে গেল। বড় ভাল ছেলে। নাম অগ্নিহোত্রী। আজকাল অনেক নতুন নতুন বিষয় হয়েছে। অগ্নিহোত্রী এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার। রাঁচী থেকে দিল্লি চলেছেন। গল্পে গল্পে দিল্লি। এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের গেস্ট হাউস, গঙ্গারাম হস্‌পিট্যাল মার্গ। যথারীতি ঠকার পালা। রাম সেই সময় রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে জিতেছিলেন। এখন রাবণের যুগ। কথায় কথায় সীতাহরণ। আর সব লক্ষ্মণই ছুটছেন সোনার হরিণের পেছনে। রাম একালে হেরে ভূত। পঞ্চাশ টাকার পথ পঁচাত্তরে পেরিয়ে এলাম। রাজধানীতে রাজার সিংহাসনের তলায় কি না হচ্ছে! সারা দেশ জুড়ে এখন একটাই ইরাপসান, নাম তার করাপসান। সন্ধের দিকে এমন একজন স্কুটার আর ট্যাকসি ড্রাইভার পাওয়া যাবে না, যার মুখ দিয়ে না ভড়ভড় করে অ্যালকোহলের গন্ধ বেরোচ্ছে। তবে হ্যাঁ, পুলিস খুব কড়া। এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাকসি বেরোয় পুলিস চৌকিতে নম্বর লিখিয়ে।

আমি যখন দিল্লিতে তখন জুলাইয়ের শেষ। কয়েক দিন আগেই মারদাঙ্গা হয়ে গেছে। বিস্তীর্ণ এলাকায় কারফিউ চলেছে। তিলক নগর, প্যাটেল নগর, জনকপুরী, চাঁদনী চৌক। গেস্ট হাউসে বসতে না বসতেই, শ্যামলদা এসে গেলেন। চলুন পি আই বি। আমি আগেই হাত তুলে সারেন্ডার করেছিলাম। বকবেন না। দোষ আমার নয়। দোষ এয়ার লাইনসের।

শ্যামলদা বললেন, 'আমি আর কি বকবো। আসল বকুনি হবে যেখানে যাচ্ছি সেখানে।'

দক্ষিণ ভারত মন্দিরের জন্যে বিখ্যাত। কলকাতা বিখ্যাত খোঁড়াখুঁড়ি আর গর্তের জন্যে, বোম্বাই বিখ্যাত স্লামস-এর জন্যে, দিল্লি বিখ্যাত রাস্তার জন্যে। ফর্দাফাঁই রাস্তা। সাঁসা ছুটছে গাড়ি, অটো, বাস। স্কুটার ছাড়া দিল্লি অচল। ভেবেছিলাম দিল্লির সরকারী ভবন হয়তো বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুন্দর হবে। না। দিল্লিই হোক আর বোম্বাইই হোক ভারতীয়দের আধ্যাত্মিক স্বভাবে পাশ্চিমী পরিচ্ছন্নতা অসহ্য লাগে। পানের পিক, ল্যাভিটারির দুর্গন্ধ, ধুলো, ঝুল, অপরিষ্কার দরজা জানলা, এই সবের মধ্যে বেশ হোমলি লাগে। মাটির শরীর মাটিতেই যখন মিশবে, তখন অকারণ সময় আর শ্রম নষ্ট করে লাভ কি!

লম্বা, বহুত লম্বা একটা করিডর পেরিয়ে আমরা দু'জনে একটা ঘরে এসে পৌঁছলুম। সেই ঘরে যে অফিসার বসেছিলেন, ভারি সুন্দর। কাঠখোট্টা দিল্লিতে অনেকটা বাঙালীর মতো স্বভাব। মধ্যবয়সী। মাথার চুল সাদা। স্বাস্থ্যবান। গৌর বর্ণ। দীর্ঘ দেহী। এমন ভাবে বর্ণনা দিচ্ছি, যেন বিয়ের বিজ্ঞাপন লিখছি। আমাকে একটা রোগে ধরেছে, নাম ভুলে যাওয়া। অমন সুন্দর স্বভাবের একজন মানুষের নাম ভুলে যাওয়া অবশ্যই অপরাধ। ভদ্রলোক আমাকে বকবেন, এমন কি দেরি করে আসার জন্যে যাওয়ার তালিকা থেকে আমার নামও কেটে দিতে পারেন, এই রকম একটা মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে সোফায় বসে পড়লুম।

ভদ্রলোক টেবিলে কাগজের স্তূপ ঘাঁটতে ঘাঁটতে বললেন, 'চট্টোপাধ্যায় আর চ্যাটার্জি কি এক?'

বুঝলাম অবাঙালী মানুষ আমার পদবী নিয়ে ধাঁধায় পড়েছেন। বিভিন্ন কাগজপত্রে কখনো চট্টোপাধ্যায়, কখনো চ্যাটারজি হয়েছে। আমি বললাম, 'ইংরেজেরা যখন আদর করত তখন বলতো চ্যাটারজি। আর যখন রেগে যেত তখন বলত চট্টো হারামজাদা।' ভদ্রলোক হো হো করে হাসতে লাগলেন। এত উপভোগ্য হয়েছে আমার ব্যাখ্যা! বকুনির বদলে ভদ্রলোক সেই মুহূর্তে আমার বন্ধু হয়ে গেলেন। অনেক ফর্ম্যালিটিজ বাকি। আমি লেটে রান করছি। ভদ্রলোক আমাকে সাহায্য করার জন্যে চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এলেন। প্রথম কাজ মেকসিকোয় ঢোকার ভিসা, তিন ঘন্টার মধ্যে বের করতে হবে। অন্য সকলের সব কিছু হয়ে গেছে। আমার সবই বাকি। জিজ্ঞেস করলেন, 'ফরেন এক্সচেঞ্জ পেয়েছেন?'

'পেয়েছি।'

হিসেব করে দেখা গেল, চাইলে আমি আরও শ দুই ডলার বেশি পেতে পারতাম। দুঃখ করলেন। তিন চার দিন আগে দিল্লি এলে আমার এ অবস্থা হত না। ভিসার দরখাস্ত ফর্মে ছাপছোপ মেরে বললেন, 'এখুনি মেকসিক্যান এমব্যাসিতে চলে যান।'

শ্যামলদা বললেন, 'এইবার আপনার ভার নেবেন বিজয়দা।'

আমাদের দিল্লি অফিসের বিজয় ঘোষ, বিজয়দার কোনও তুলনা নেই। অমন পরোপকারী, সেবাপরায়ণ, সাহায্যকারী মানুষ কম দেখা যায়। আই ই এন এস বিলডিং-এ বিজয়দা এসে আমাকে তুলে নিলেন। যে মানুষ নিজের সম্পর্কে কম ভাবেন তাঁর চেহারায় একটা সদানন্দের ছাপ পড়ে।

(ক্রমশ)

কাগজের স্তূপ ঘাঁটতে ঘাঁটতে বললেন, 'চট্টোপাধ্যায় আর চ্যাটার্জি কি এক?'

ছবি: দেবাশিস দেব

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

শীতের বিলাস

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

[illegible] । জোর আড্ডা । সান্ধ্য মজলিশ । উচ্চাঙ্গ সংগীত । মধুর রোদে পিঠ রেখে তৈলচর্চা । বহুতর খাদ্যের আয়োজন । শীত আসে ধনীকে সুখের ছোঁয়া দিতে । খাইয়ে দাইয়ে [illegible] করিয়ে তৈল চিক্কন শরীরটিকে হাঁসফাঁস গ্রীষ্মের হাতে তুলে দেবার আগে সামান্য আয়েশ ।
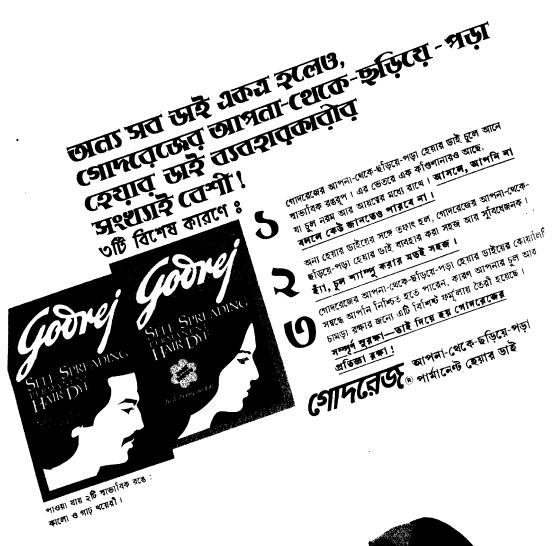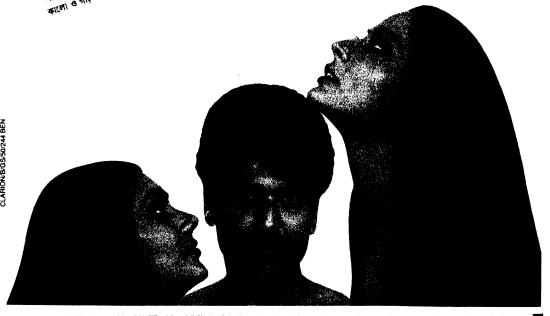
মূল বক্তব্য থেকে বেরিয়ে এই ধরনের একটু-আধটু ঘোরাফেরা করা হয়ত বেমানান নয় এটা বড় দুঃখের কথা যে আজকের এই পোড়া বাংলায় 'চরিত্রহীনের' প্রথম লাইনে বর্ণিত সেই বড় পশ্চিমী শহরের মতন শীত পড়ি পড়ি করে যেন পড়তেই চায় না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আর একশ বছর আগের বাঙালিদের স্মৃতি কথা আর অজস্র শীতের বিবরণ পড়ে মনে হয় দৈর্ঘ্য আর তীব্রতার দিক থেকে শীত আগের তুলনায় কমে গেছে। ব্যাপারটার অবশ্যই সত্যি মিথ্যে আবহাওয়া দপ্তরের নথিপত্র দেখলেই, নিঃসন্দেহে যাচাই হয়ে যায়। তবুও বলি যে রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে লিখেছিলেন যে, তিনি ছেলেবেলায় গাঁয়ের বুড়োদের মুখে শুনেছিলেন যে, তাঁদের ছোটবেলায় বোড়ালে ঘোর শীতে ভোরবেলায় ঘাসে জল জমে সাদা সাদ হয়ে পড়ে থাকত। তবে পরশুরামের নকুড়মামার মতন চিরকালই কিছু শীত-কাতুরে বা শীতভীতু লোক থাকত যাদের শীতের আধিক্যের কথা সাক্ষ্য হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না। নকুড়মামা দার্জিলিংয়ের গরমকালের ঠাণ্ডায় তিতিবিরক্ত হয়ে বলেছিলেন যে, ঠাণ্ডা চাইলে ত' লোকে কলকাতায় এক মণ বরফ কিনে তার ওপর অয়েলক্লথ পেতে শুয়ে থাকতে পারে, আর উঁচু চাইলে তালগাছে ওঠে না কেন।

এই রকম একজন শীত-ভীতু লোককে আমরা দেখি হুতোমের "রেলওয়ে" নামে নকশায়। সেই ব্রাহ্ম প্রচারক যিনি কাশী-যাত্রী দুই গোঁসাই প্রেমানন্দ আর জ্ঞানানন্দর কেরাঞ্চি গাড়িতে উঠে পড়ে ত্রাসের সঞ্চার করেন। তাঁর পুজোর আগের বেশভূষার বর্ণনা শুনুন : 'বাবুর একটি কালো বনাতের পেন্ট্লেন আর চাপকান পরা ছিল, তার ওপর নীল মেরিনোর চায়না কোট মাথায় একটা বিভর্ হেয়ারের চোঙ্গাকাটা ট্যাসল্ লাগানো ক্যাটিকৃষ্ট (catechist) ক্যাপ ও গলায় লাল আর হলুদ রঙের জালবোনা কমফর্টার…।" এছাড়া অবশ্যই বলা দরকার যে, সেদিন তাঁর পেটে আবকারির রসদও একটু বেশি মাত্রায় মজুত ছিল। ব্যাপারটা বুঝুন!

শীত পড়তেই বা না পড়তেই কলকাতার পথে-ঘাটে হুতোমের এই অমর ব্রাহ্মবাবুটির মতন এখনও অনেক লোক দেখা যায় যাঁদের মাথা থেকে পা অব্দি মনকি ক্যাপ, কমফরটার, ওভারকোট দিয়ে ঢাকা-চেহারা দেখলে মনে হয় যে বাবুরা যেন মেরু অভিযানে চলেছেন। যাঁরা পুলিন সেন আর শিল্পী সুনীলমাধব সেন এই দুই হিন্দুস্থান পার্কের মুখোমুখি প্রতিবেশীদের চিনতেন তাঁরাই জানেন শীতকে ভয়ের ব্যাপারে ওঁরা দুনিয়ায় কারুর চেয়ে কম যেতেন না। ছেলেবেলায় 'পদ্যপাঠে' শীত নিয়ে একটি পদ্য পড়েছিলাম যা এখন মনে হয় কোন শীত-কাতুরে কবির লেখা ছিল। তার দুটো লাইন হল :

জলে উঠেছে কি দাঁত,
    জলে উঠেছে কি দাঁত ?
নয় কেন ছুঁতে গেলে
    কেটে ফেলে হাত।

তবুও শেষ পর্যন্ত একদিন শীত আসে। মনে হয়

ভূতিনী মাসী

যেন 'কঙ্কাবতীর' সেই আকাশে চুনকাম করা কোন ভূতিনী মাসী বুঝি পুণ্য থেকে হেমন্তের ভাঁড় উজাড় করে চারিদিকে হিম ঢেলে দিলে। শীত পড়লে লোকে উৎফুল্ল আর উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন, প্রকৃতি নবরূপ ধারণ করেন। প্রায়ই সকালগুলো কুয়াশায় ঢাকা আর দিনগুলো মেঘলা মেঘলা হয়। কলকাতা থেকে একটু বাইরে গ্রামাঞ্চলে গেলে চোখে পড়ে দিগন্ত বিস্তৃত হুতোমের নবাবী আমলের সূর্যাস্তের মত মাঠে/ হেমন্তর পাকা ধানের সোনা। শীতের প্রকৃতির আর একটা রূপ দেখেছিলাম বীরভূম গিয়ে নয়, শ্রীঅশোক মৈত্র মহাশয়ের হ্যারিসন রোডের বাড়িতে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের আঁকা শান্তিনিকেতনের আশপাশের একটা ছবিতে। শীতের ভোর সকালের ছবির ঢিমে আলোয় ফিকে কুয়াশার আস্তর দেওয়া একটা কুঁড়ে ঘরের দোকানের ছবি। সামনে চাদরমুড়ি দেওয়া দু-চার জন ভূতের মতন দাঁড়িয়ে। পেছনে ন্যাড়া ন্যাড়া কয়েকটা তালগাছ। আমি ছবিটার এই যে বর্ণনা দিলাম তাতে হয়ত বেশির ভাগটাই আমার কল্পনা ঢুকে পড়েছে। তবে যেটা সত্যি সেটা হল সেই লালচে-বাদামি আর কিছু কালো দেওয়া ছবিতে কনকনে ঠাণ্ডার এমন একটা ভাব ছিল যে, দারুণ গ্রীষ্মে সেই ছবিটা দেখে আমার শীত শীত মনে হয়েছিল।

প্রায় চারশ পঞ্চাশ বছরের আগে বাংলায় শীতের এক সুন্দর বর্ণনা পাই মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের ফুল্লরার বারমাস্যায়। তার একাংশ হল :

কার্তিক মাসেতে হৈল হিমের জনম
জগজনে কৈল শীত নিবারণ বসন।
নিযুক্ত করিল বিধি সভার কাপড়
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড় ॥
দুঃখে কর অবধান দুঃখে কর অবধান
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।
মাস মধ্যে মাইসর আপন ভগবান
হাঠে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান।

* * *

কত অভাগ্য মনে গুনি কত অভাগ্য মনে গুনি পুরণে লোপাটা গায় দিতে করে টানি।
পৌষে প্রবল শীত সুখী জগজন
তুলি পাড়ি পাছুড়ি শীতের নিবারণ।

তুলি পাওড়ি মানে তোশক গদি আর পাছুড়ি মানে উত্তরীয়।

গরমে কিছু টাকার কুমীর 'বাতানুকূল' ঘরে ঢুকে হয়ত খানিকক্ষণের জন্যে শান্তি পান কিন্তু সাধারণ মানুষের একনাগাড়ে ভোগান্তির থেকে কোন নিস্তার নেই। কিন্তু শীত যত জোরেই পড়ুক না কেন গরম পোশাক পরলেই মনে হয় 'আঃ কি আরাম'। সজ্জাবিলাস শীতের একটা বড় বিলাস। তবে এটা বললে ভুল হবে না যে শীত কাটিয়ে আরাম ছাড়াও বেশির ভাগ লোকই কি মেয়ে আর কি পুরুষ শীতে নানান ধরনের সাদ। রঙিন দিশি-বিলিতি পোশাক পরে পেখম তুলে ভাবনও দেখান

আমার এই কথা শুনে কেউ যেন মনে না করেন যে, আমি কৃচ্ছ্রসাধকদের মতন লোকেদের সাজগোজের ইচ্ছেকে নিন্দে করছি। বরঞ্চ আমার মতটা ঠিক উল্টো। পোশাক-রূপী আধারের মানুষের মনের ওপর কত বড় প্রভাব তা ঠাকুর রামকৃষ্ণ একবার তাঁর স্বভাবসুলভভাবে মজার করে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে একটা রোগা ছেলে যদি হাফপ্যান্ট আর বুট পরে অমনি সে ইট মিট ফিট কত রকম ইংরিজি বলে আর এক এক লাফে দু-তিন ধাপ সিঁড়ি পার হয়ে যায়। আবার গিলে-করা পাঞ্জাবি আর চুনোট-করা শান্তিপুরি ধুতি যদি কেউ পরে অমনিই তার মুখে নিধুবাবুর টপ্পা এসে যায়। তাই একটু ভাবন করলে লোকের যদি আহ্লাদ আর ফূর্তি হয় তাহলে তার চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে।

প্রথমে সাহেবি পোশাকের কথায় আসা যাক। তবে তার আগে একটু ভনিতা দরকার। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মতন দু-চার জন খাঁটি সাহেব ছাড়া বেশির ভাগ শিক্ষিত দেশি লোকরা ভাবতেন যে, বিদেশি ধড়াচুড়ো না পরলে সভ্য বা সাহেব হওয়া যায় না। স্বীকার করছি যে, 'রাজ' আমলের শেষের দিক থেকে সরকারি দরবার আর সামাজিক অনুষ্ঠানে বিলিতি পোশাক ছাড়া কল্কে পাওয়া যেত না। কিন্তু ভর গ্রীষ্মে থ্রি-পিস স্যুট পরে হাতে লাঠি নিয়ে মরনিং আর ইভনিং ওয়াক করতে যাওয়ার পেছনে কি কোন জোর-জবরদস্তি ছিল? সত্যিই আজ একশ' দেড়শ বছর ধরে সাহেবি পোশাক পরা এ-দেশে অনেক ক্ষেত্রে পাগলামির পর্যায়ে চলে গিয়েছিল।

তবুও সাহেবি আমলে গরমের দিনে সাহেবি পোশাক পরার পেছনে হয় দরকার নয় ব্যক্তিগত অভিরুচি ছিল। কিন্তু ভাবা যায় না যে, স্বাধীনতার দশ-পনের বছর পরেও কোট-টাই না পরলে অফিসাররা দিশি আপিসেও যেতে পারতেন না, এমন কি দিশি বড় বড় ক্লাব আর কিছু হোটেল রেস্টুরেন্টে খানা খেতে রাত্তিরে ডাইনিং হলে ঢুকতে পারতেন না। তবে ষাটের গোড়াতে বেঙ্গল চেম্বার্স কমার্সের কর্তাদের এ ব্যাপারে টনক নড়ল। তাঁরা ফতোয়া জারি করলেন যে, ১৫ই এপ্রিল থেকে ১৫ই নভেম্বর অবধি আপিসে পাখায় কাপড় মোড়া পর্যন্ত

অফিসাররা ইচ্ছে করলে শার্ট-স্লিভসে আপিস যেতে পারেন। ক্লাবের ডাইনিং রুমের ব্যাপারেও এর চল হয়েছে। তবে এত বড় আস্পর্ধা যে এখনও কিছ কিছু কনসার্লেট আর দিশি-বিদিশি সাহেবদের ডিনারের নেমন্তন্নে গরমেও লাউঞ্জ স্যুট পরার হুকুম দেওয়া থাকে। সত্য সেলুকাস··· !

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুয়ারির কিছুদিন অবধি কলকাতার শীতে হাল্কা গরম স্যুট অতি আরামদায়ক পোশাক। আর আমরা যখন শীতের বিলাসের কথা বলছি তখন এখনও অব্দি ইংরেজি আমলের লাট-বেলাটদের বা রাজা মহারাজাদের শীতকালে দেওয়া গার্ডেন পার্টির বিলিতি পোশাক-আশাকের একটু ছোঁয়াচ এখনও যেখানে যেখানে টিকে আছে তার দু-একটা জায়গার কথা বলি। এর মধ্যে একটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জায়গা হল ক্যালকাটা রেসকোর্সের মেম্বারস স্ট্যান্ড আর গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড। ডিসেম্বরের বড়দিনের হপ্তায় আর নতুন বছরেই শীতের মরসুমে কলকাতার সেরা ঘোড় দৌড়গুলো হয়। যেমন বক্সিং ডে, (যা গত শতাব্দী থেকে ১৯৪৭ অব্দি ভাইসরয় কাপ বলে পরিচিত ছিল আর যা ১৯৩৯ পর্যন্ত প্রত্যেক বড়লাট রোলসরয়েস নয়, চৌঘুড়ি চেপে দেখতে আসবেন), নিউ ইয়ার্স ডে রেস, আর ইন্ডিয়ান ডার্বি। এইসব দৌড়ের দিনগুলোতে বিলেতের অ্যাসকটের মতন কলকাতার রেসকোর্সও শুধু রেস খেলা নয়, সামাজিক মিলনক্ষেত্র আর ফ্যাসান গ্রাউন্ডও হয়ে ওঠে। সেই সময়ে কলকাতার আজকের সাহেবি কেতাদুরস্ত স্ত্রী পুরুষেরা যেভাবে সুসজ্জিত হয়ে মাঠে হাজির হন তা দেখবার মত। মেয়েদের পোশাকে অবশ্যই গরম পোশাকের ছোঁয়াচ থাকলেও শাড়ির জলুসই প্রধান। তাই সাহেবি পোশাক দেখতে হলে পুরুষদের দেখতে হয়। এখন টপহ্যাট বা টেলকোট না থাকলেও ভালো ভালো স্যুটের সঙ্গে হ্যারিস টুইড আর বিলিতি গ্রে ব্যাগ এখনও এখানে দেখা যায়। রেসকোর্সের প্রাকৃতিক আর মানুষের তৈরি শোভা, রেসের জাত ঘোড়ার মেজাজ আর চেহারা, আর লোকজন মিলিয়ে পুরো পরিবেশ দেখলে মনে হয় না যে কলকাতা কলকাতাতেই আছে।

এই বিদেশি পোশাক-বিলাসের একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ দেখা যায় ডিসেম্বরের শেষ আর জানুয়ারির গোড়ায় রেসকোর্সের এলেনবরা গ্রাউন্ডে পোলোর মরসুমে। আমি প্রথম পোলো খেলা দেখি প্রায় চল্লিশ বছর আগে যখন জয়পুরের শেষ মহারাজা দ্বিতীয় সোয়াই জয় সিং-এর দলের বিশাল জয় জয়কার। আমার সেই প্রথম দিনটার কথা মনে আছে একটা বিশেষ কারণে। দু টাকার টিকিট কেটে এক পাশে অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছি খেলা শুরু হওয়ার জন্যে। হঠাৎ গুপ্তঘাতকের মতন অতর্কিত আক্রমণ। স্ট্রবেরি-আর-হুইপড ক্রীম মেশানো রঙ নিয়ে এক বিদেশি কুহকিনী পাঁচ টাকার বিনিময়ে অর্থাৎ আমার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে একটি স্যুভেনির দিয়ে আমায় ফৌত করে দিয়েছিলেন। আমি লুণ্ঠন, ফৌত ইত্যাদি শব্দ

আঁটসাঁট গোলগাল বাঁধাকপি

ব্যবহার আর এত বাগাড়ম্বর করলাম তার কারণ তখনকার পাঁচ টাকা বড় কম ছিল না আর তার ধকল সামলাতে আমার বেশ দু-চার দিন লাগে।

আমি বুঝতে পারি না আকবরের নিজের প্রিয় এমন জমজমাট পোলো খেলা বাঙালি দর্শকরা কেন নেননি। এই খেলায় অপূর্ব সুন্দর তালিম দেওয়া ঘোড়া আর তার সওয়ারি মানুষ শারীরিক আর মানসিক দিক থেকে একাত্ম হয়ে যায়। বিদ্যুতের গতিতে ধাবমান, চোখের পাতা না ফেলতেই থেমে ঘুরে যাওয়া ঘোড়া আর মানুষের অবিশ্বাস্য কেরদানি নিজের চোখে না দেখলে ভাবা যায় না। একটা টুইড কোট গায়ে চাপিয়ে ঘোর শীতের কনকনে দুপুরে প্রায় নির্জন মাঠে বসে পোলো খেলা দেখা আরও দু-চার জনের মতন আমারও আজ বহু বছরের বাৎসরিক বিলাস। বাঙালি পোশাকের বনেদি শীতের বাবুয়ানা এখনও এই দুর্দিনে কিছু কিছু ধনী বিয়ে বাড়ি আর সামাজিক অনুষ্ঠানে টিকে আছে। শীতকালে বনেদি বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে বা সামাজিক নেমন্তন্নয় পুরুষদের শাল-দোশালা আর মেয়েদের বেনারসীর পাল্লা-ঝালর, গয়নাগাটির ঝকমকানি এখনও হারিয়ে যাওয়া বিলাসবহুল জীবনের কথা মনে করিয়ে দেয় যদিও কবে বাঙালি বিয়েতে খাস গেলাসের বাঁধা রোশনাই আর চৌঘুড়ি উঠে গেছে। এই শীতের কটা দিনই ত' মেয়েরা সত্যিই আরাম করে ভারি সিল্ক পরতে পারেন আর পুরুষদের শাল-বিলাস ত অন্য কোন সময়ে সম্ভবই নয়। মাঝে মাঝে শীতে কোন কোন বাবুদের গায়ে মুর্শিদাবাদের অপরূপ রঙিন বালাপোশ দেখা যায় যা নাকি মাত্র আধপো তুলো ভরে তৈরি। মুর্শিদাবাদের গর্ব এই বালাপোশ। যেমন নরম আর তেমন গরম যা গায়ে দিলে শীতে আরামের চূড়ান্ত। আরও বহু ভাল জিনিসের মতন বালাপোশ উঠে যেতে বসেছে। তবে শোনা যাচ্ছে যে ঢাকাই জামদানী আর বালুচরীর মতন বালাপোশকেও সরকারি কস্তুরি মৃগনাভি দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা চলছে।

বাঙালির শীতের বিলাসের কথা বলতে বসে বাঙালির শালপ্রীতির কথা না বললে কিছুই বলা হয় না। আজ দুশ' বছরের ওপর ধরে পশ্চিম ভারতের রাজা-মহারাজা, নবাব আর রইস আদমিদের মতন বাঙালি পুরোনো ধনী বাবুরাই কাশ্মীরী অনুপম শাল আর জামেয়ারের সবচেয়ে বড় সমঝদার বলে গণ্য হয়ে এসেছেন।

ইংরেজ আমলের খুব কেতাদুরস্ত ধনী বাঙালি সাহেবদের স্যাভিল রো-র bespoken খলিফাদের তৈরি স্যুটের মতন, মহার্ঘ্য শাল ছিল নবাবী যুগের রাজপোশাক। সেই রকমই শাল ছিল টাকা, খ্যাতি, সম্মান আর প্রতিপত্তির রাজকীয় প্রতীক। তাই যে ঋতুতেই ছবি আঁকা হোক না কেন রামমোহন দ্বারকানাথ থেকে গত শতাব্দীর সব বড়লোকদের অয়েল পেন্টিং-এর জন্যে বসতে হলে ছবি খোলতাই করবার জন্যে ঝলমলে পোশাকের সঙ্গে ভাল শাল বা জামেয়ার গায়ে রাখতে হত। যেমন 'নিখাদ' ইংরেজদেরও প্রতিমূর্তিতে রোমান টোগা পরানো হত। মহারাজা নবকৃষ্ণ কবিয়াল আর গুণীদের বাহাদুরির তারিফ জানানোর জন্যে নবাবদের মতন শাল শিরোপা দিতেন। এ ব্যাপারে নবকৃষ্ণ অবশ্যই একা ছিলেন না।

শাল, পশমিনা, সাহ তুষ কত রকম ভেড়ার লোম থেকে তৈরি হয়। তবে আংটির মধ্যে দিয়ে গলে যাওয়া অদ্ভুত ওমওয়ালা সাহ তুষ যে অজাত ভেড়ার ছানার লোম থেকে তৈরি হয় সেটা কিংবদন্তী মাত্র। তেমনই কিংবদন্তী হল আইবেকস বা কাশ্মীরী পাহাড়ি ছাগলের ঝরা-লোম দিয়ে তৈরি শালের কথা। শালের পাড় আর জামেয়ারের নকশা মাফিক সেই সবের যেসব নাম হত সে সব ছিল বাঙালি বাবুদের নখদর্পণে যার ফিরিস্তি দেওয়ার জায়গা এখানে নেই। কাশ্মীরী শালে জামেয়ারের একটা বড় বৈশিষ্ট্যই হল কাশ্মীরের চিরাচরিত নানা নকশার সঙ্গে আঠারো শতকের শেষ আর উনিশ শতকের গোড়ায় ইউরোপী আর মধ্যপ্রাচ্যের বড় বড় শাল ব্যবসায়ীদের আনা নানান ধরনের নকশাও এক হয়ে মিশে গেছে।

মধ্যপ্রাচ্যের সুলতান আর ধনী আর ইউরোপ আর বিলেতের রাজা-রানী আর অভিজাত মহিলাদের শাল গত শতাব্দীতে সাজ-পোশাকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল।

শোনা যায় যে, প্রিন্স দ্বারকানাথ প্যারিসে তাঁর দেওয়া এক পার্টিতে আমন্ত্রিত সমস্ত সুন্দরীদের অনুপম শাল উপহার দেন। ইউরোপে শালের কথা একটা গল্প দিয়ে শেষ করি। নেপোলিয়ানের প্রিয়তমা জোসেফিন শাল পরতে খুব ভালবাসতেন। কিন্তু নেপোলিয়ান দেখতে চাইতেন তাঁর নগ্ন কাঁধ। তাই বেশ কয়েকবার তিনি জোসেফিনের গা থেকে খুলে নিয়ে সেই শাল ফায়ারপ্লেসে ফেলে দিয়েছিলেন। প্রেমান্ধ নেপোলিয়ানের এই নিষ্ঠুরতা ইউরোপ অবশ্যই নেয়নি। সেখানকার ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছাড়া বড় বড় মিউজিয়ামে পারস্যের নৈশাপুর আর খোরাসান, বুখারা আর সমরকন্দের গালিচার

মতন অমূল্য কাশ্মীরী শাল সংরক্ষিত আছে।

আমাদের দেশের যাদুঘর বড় বড় রাজা মহারাজার কথা বাদ দিলেও কলকাতার পুরোনো অনেক ধনী পরিবারে শাল জামেয়ারের দামি দামি সংগ্রহ আছে। এর মধ্যে যেমন একটা খুব সুবিদিত হল পাইকপাড়ার শ্রীজগদীশ সিংহ মশাইয়ের শাল-সংগ্রহ। ওঁর দুজন পরিচিত লোকের দৌলতে আমার একবার তাঁর শালের কয়েকটা দেখবার সৌভাগ্য হয়। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের আমলের না হলেও সেই সব পুরোনো শাল-জামেয়ারের রঙের জলুস আর রঙের সফিসটিকেশন আর দো-রোখা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জামেয়ারের কাজ বর্ণনা করার সাধ্যি আমার নেই। এই সংগ্রহের সঙ্গে তুলনা নয় আমি দেখেছি বলেই বলছি যে বন্ধুবর বসন্ত চৌধুরী আর পরিমল রায় আমাকে তাঁদের অপূর্ব সুন্দর শালগুলো দেখিয়েছিলেন।

শুধু বিশাল ধনী কেন আগে সব সঙ্গতিপন্ন বাঙালিরা শীতকালে শাল ব্যবহার করে বিলাস আর আরাম করতেন। হাল আমলে স্যুটের কাপড়ের মতন আগে নতুন জামাইয়ের শীতের তত্ত্বতে শাল থাকতই থাকত।

এখনও মামুলি কাশ্মীরী শাল বহু বাঙালি শীতে আয়েসের জন্যে গায়ে দেন। এই সব শাল যোগানোর জন্যে এখনও বহু বাড়ির বাঁধা শালওয়ালারা প্রতি বছর শীতের আগে তাঁদের খদ্দেরদের বাড়িতে মালপত্তর নিয়ে ঘড়ির কাঁটার মতন হাজির হন। আমি গেল বছর আমার একজন ধনী অবাঙালি বন্ধুর বাড়িতে এক প্রসিদ্ধ কাশ্মীরী শালওয়ালাকে দেখি যাঁর পূর্ব পুরুষরা আজ এক শ বছরের ওপর কলকাতায় শাল বেচে এসেছেন। এখনও যে দু-চারটি দামী শাল কেনার মতন শৌখিন ধনী আছেন তা তাঁর একটি মেয়েদের অন্যটি পুরুষদের শাল দেখে বুঝলাম। মেয়েদের শালটির দাম ছিল তিরিশ হাজার, পুরুষদেরটির ষাট। এই ধরনের শাল কেনার ক্ষমতা এখন অনেক হঠাৎ বড় লোকদের আছে কিন্তু সমঝদারি কই। সব দেখে শুনে মনে হয় জমজমাট কাশ্মীরী শাল আর জামেয়ারের জমানা বোধহয় ফুরিয়ে এল। তালিম, কারিগরি, খদ্দের সব কথা বাদ দিলেও এমন বুকের পাটাওয়ালা লোক কমে আসছে যাঁরা শালের জমিতে প্রথম ফোঁড় দেওয়ার পরে বয়ে বসে তিন বছর বাদে শেষ ফোঁড়টা দিতে হবে তা জেনেও সে কাজ ঘাড়ে নেবেন।

বাংলার অতুলনীয় নকশি কাঁথা কবে স্মৃতি হয়ে গেছে। সাধারণ লোকেদের চিরকেলে পাছুড়ি বা 'জাড় কালের কাঁথা' হল বনাত। যতদূর জানি অম্বিকা কালনার প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ সংস্কৃত পড়ানো ছাড়া বনাতের ব্যবসা করে টাকা করেছিলেন। বনাতের কথা বললেই আমাদের মতন পুরোনো লোকদের বিদ্যাসাগরের কথা মনে পড়বেই। ছেলেবেলায় পড়েছিলাম যে বিদ্যাসাগর একবার তাঁর মাকে গায়ের গরম কাপড় কিনে দিলে সেই করুণাময়ী বলেছিলেন যে আমার ত শীতের একটা ব্যবস্থা করলি কিন্তু গরিবদের কি হবে বাবা। মার কথায় বিদ্যাসাগর

কলকাতার রাস্তায় 'চারণকবি' ধুনুরি

বড় বাজার থেকে কয়েক গাঁটরি বনাত কিনে গরিবদের দেন। সেদিন নাকি উত্তর কলকাতার একটা গোটা পাড়া লালে লাল হয়ে গিয়েছিল। এ ত গেল এক কথা। এবার বড়মানুষি খেয়ালের একটা নমুনা দি। বাংলা পেশাদার থিয়েটারের একজন প্রতিষ্ঠাতা ভুবনমোহন নিয়োগী একবার কি একটা উপলক্ষে মনে নেই চীৎপুরের বারবণিতাদের মধ্যে 'শাল' বিতরণ করেন।

শীতের কাপড়-চোপড়ের কথা শেষ করার আগে বলি যে পুরোনো আমলের কলকাতার অনেক বাঙালি বাবুই দিশি-বিদেশি মিলিয়ে সাজগোজ করতেন। সে সাজ কি রকম হত তা এই লেখার সঙ্গে ছাপানো গত শতাব্দীর শেষ আর এ শতাব্দীর গোড়ায় থিয়েটারের সুবিখ্যাত নাচের মাস্টার আর 'আলিবাবার' প্রথম আবদাল্লা নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর (ন্যাপা বসু) ফটোটা দেখলে কিছুটা আঁচ করতে পারবেন। ব্যাপারটি সত্যিই ভাবা যায় না।

শীতে নবান্ন বাঙালিদের বড় পুরোনো বড় সুন্দর পার্বণ। সেই কবে কোন অতীতে অঘ্রান মাস দিয়ে আমাদের বছর শুরু হত তখন লোকেরা হেমন্তের প্রথম ফসলের আলো চাল, কাঁচা দুধ, নতুন গুড়, আখ আর কলা মেখে নবান্ন করে কৃতজ্ঞচিত্তে দেবতাকে ভোগ দেওয়া শুরু করেন। নবান্নর অনুষ্ঠান আর নবান্নর অবর্ণনীয় স্বাদ-গন্ধ আমাদের ছেলেবেলাকার শীতের একটা সবচেয়ে আনন্দময় স্মৃতি। গাঁয়ে গঞ্জে এখন নবান্ন থাকলেও কলকাতার বেশির ভাগ বাড়ি থেকে তা উঠে গেছে।

পূর্ব বঙ্গে অক্ষয় তৃতীয়ায় নতুন কাসুন্দী করার মত ছেলেবেলায় দেখেছি মা-ঠাকুমারা অঘ্রানের কোন এক দিনক্ষণ দেখে বড়ি দিতে শুরু করতেন। প্রথমে দুটো বিশাল বিশাল বুড়ো-বুড়ি বড়ি দিয়ে তাদের মাথায় ধান দুর্বো দিয়ে কি একটা আচার অনুষ্ঠান করে বড়ি দেওয়া হত। সারা শীতকালে যতরকমের যতখানি বড়ি দেওয়া হত তা সারা বছর ভেজে আর ঝালে-ঝোলে অম্বলে দিয়ে খাওয়া যেত। বলার দরকার নেই যে ফ্ল্যাট বাড়িতে বাস করে আর বড়ি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই এখন বেশির ভাগ সংসারেই কলে তৈরি বাজারের বড়িই ভরসা।

সুখের কথা পৌষ মাসে পিঠেপুলির নবান্ন বা বড়ি দেওয়ার মতন দুরবস্থা হয়নি। পুণ্য পুরাণ, রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক কাব্য আর বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ণিত নানান রকম নারকোল কোরা, নতুন গুড় আর অন্যান্য পুর দেওয়া সাদা পুলি, পায়েস পুলি, ক্ষীরপুলি, ডালের পুলি, সরু চাকলি ইত্যাদি পৌষ সংক্রান্তিতে বহু বাড়িতে বাড়িতে করা হয়। পূর্ব আর রাঢ় এই দুই বাংলার কিছু কিছু বড় লোকদের পিঠেপুলির ব্যাপারে এখনও ভয়ানক ঘটা। যেমন বাগবাজারের রসগোল্লার কলামবাস, নবীন দাশের নাতি শ্রীসারদা দাশ মশাই এখনও পৌষ পার্বণে বিশ তিরিশ রকমের পিঠে-পুলি করে বন্ধু-বান্ধবদের খাওয়ান যেগুলোর নাম এখানে আর এখন দিচ্ছি না। সে-সব পিঠের কোন তুলনা নেই। তবে বাড়িতে বাড়িতে কেক-পেসট্রি যে-ভাবে গুটি গুটি করে ঢুকে পড়ছে তাতে মনে হয় যে পিঠেপুলির ভবিষ্যৎ 'এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গে ভরা'তে খুব জ্বল জ্বলে নয়। প্রসঙ্গত বলি ওপারের এই প্রায়-প্রবাদ বাক্যটি ঈশ্বর গুপ্তর 'পৌষ পার্বণ' গদ্য থেকে নেওয়া। কেকের নামে বড়দিন আর ইংরিজি নতুন বছরের কথা এসে পড়ে। আজ প্রায় দুশ বছর ধরে শীতের আরামদায়ক কালে কলকাতার সাহেব বিবিরা কি ধুমধাম করে বড়দিন আর নতুন বছর করে আসছেন তার বর্ণনা ইংরেজদের লেখা অগুণতি বইয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। বড়দিন আর নতুন বছর সাহেব বিবিরা কলকাতা ছাড়া ভাবতে পারতেন না। এর জের দেখা যায় ১৯১২-য় দিল্লী ভারতের রাজধানী হলেও, ওয়াভেল আর মাউন্টব্যাটেন ছাড়া সব বড় লাটদের এই সময়ে কলকাতায় আগমনে। সে যাই হোক

সাহেব-বিবিদের এই বড়দিনের দুর্গোৎসবে ধর্মীয় ভাবের চেয়ে নাচ-গান খানা-পিনা-ডালি বিনিময় ইত্যাদির আমোদ-আহ্লাদের দিকটাই বড় হত। গুপ্ত কবির চোখে তৎকালীন বড়দিন কিরকম লাগত তার বর্ণনার খানিকটা শুনুন :

জমকে পোষাক পরি, গাড়ি আরোহণে।
চর্চ্চে যান সুরূপসী, শ্রীমতীর সনে ॥
বিশপের অগ্রভাগে, ঘাড় হেঁট করি।
ক্ষণমাত্র অবস্থান, টেস্টমেন্ট ধরি।
ভজনা হইলে পর, উঠে দেন ছুট।
সহিস বোলাও গাড়ি, ড্যাম ড্যাম হুট ॥
আলয়েতে আগমণ, মনের খুশীতে।
অঙ্গুলির অগ্রভাগ, চুষিতে চুষিতে ॥
পরস্পর নিমন্ত্রণ, কতরূপ খানা।
টেবিলের উপরেতে, কারিগরি নানা ॥
বেষ্টিত সাহেব যত, বিবিরূপ জালে।
আনন্দের আলাপন, আহারের কালে ॥
শক্তিসহ ভক্তিভাবে, ফেরে মাংস মদ।
হাতে হাতে স্বর্গলাভ, প্রাপ্ত ব্রহ্মপদ ॥

এখন কলকাতার বাঙালি অবাঙালিদের মধ্যে 'ইংরেজ ধরন' এত বেড়েছে যে মনে হয় বড়দিন আর ইংরিজি নতুন বছর তাঁদের সবচেয়ে বড় পরব। উপরের তুলে দেওয়া লাইনগুলোর শেষ চারটে এঁদের পক্ষে হাড়ে-হাড়ে সত্যি। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কালগুণে শীতে যে ভাবে দু-দণ্ড আয়েস করা যায় তা এদেশে অন্য সময়ে সম্ভব নয়। তা ছাড়াও বলা দরকার যে 'টুয়েলফথ্ নাইটে'র ম্যালভোলিওর মতন এই নিরানন্দ সংসারে একটু কেকস্ অ্যান্ড এ-ল্ থাকবে না এমন কথা বলে কি লাভ।

আমাদের ছেলেবেলায় বাঙালি সংসারে বড়দিন ভারি আনন্দের সঙ্গে দিশি মতে হত। আমরা বড়দিনে তখনকার সাধারণ সংসারে অতীব দুষ্প্রাপ্য দার্জিলিংয়ের চিনির মতন মিষ্টি কমলা নেবু আর তদোধিক দুষ্প্রাপ্য হগ সাহেবের বাজারের কেক আর তার সঙ্গে পাটালি গুড় আর শাঁকালু খেতে খেতে অজ্ঞতা-জনিত অশ্রদ্ধায় সুর করে চেঁচাতাম :

যীশু পরম দয়ালু
তাঁহার কৃপায় দাড়ি গজায়
শীতকালে খাই শাঁকালু।

তখনকার জমজমাট আর এখনকার তুলনায় একেবারে নিরিবিলি সাহেব-টোলায়, চিড়িয়াখানা আর হগ সাহেবের বাজার দেখা প্রায় এখনকার বিদেশ ভ্রমণের মতন ছিল। তবে সিনেমা-রেডিও-টিভি বর্জিত সেইকালে শীতকালে সার্কাস দেখা একটা সবচেয়ে বড় আনন্দ ছিল।

বড় হয়ে ত কত ভাল ভাল বিদেশি সার্কাস দেখেছি, এই সেদিনও ত অপূর্ব রাশিয়ান সার্কাস দেখলাম। কিন্তু ছেলেবেলার সেই বাঘ-সিংহ-হাতী-ঘোড়ার খেলা, সেই ফ্লাইং ট্র্যাপিজে শূন্যের দোল আর অ্যাক্রোব্যাটিকস, সেই ক্লাউনদের মজার কাণ্ডকারখানার স্মৃতি কখনই ম্লান হবে না।

আমাদের ছেলেবেলায় কেন তারও পঞ্চাশ ষাট বছর আগে সাহেব আর পরে প্রফেসার প্রিয়নাথ বোসের 'গ্রেট বেঙ্গল' বা বোসেস সার্কাস দেখতেন না এমন বাঙালি ছিলেন না। অথচ আশ্চর্যের কথা প্রিয়নাথের বংশধর অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু আর হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এইরকম দুচার জন ছাড়া সার্কাস নিয়ে সার্কাস দেখার আনন্দ নিয়ে কেউই বড় একটা লেখেননি। তাই এখানে শ্রী 'ম'র ঠাকুর রামকৃষ্ণর ১৮৮২র ১৫ই নভেম্বর সার্কাস দেখার বর্ণনা তুলে দিচ্ছি।

'শ্রীরামকৃষ্ণ আজ গড়ের মাঠে উইলসনের সার্কাস দেখিতে যাইতেছেন। মাঠে পৌঁছিয়া টিকিট হল আট আনার অর্থাৎ শেষ শ্রেণীর টিকিট। ভক্তরা ঠাকুরকে লইয়া উচ্চস্থানে উঠিয়া বেঞ্চির উপরে বসিলেন। ঠাকুর আনন্দে বলিতেছেন, বাঃ এখান থেকে বেশ

প্রথম আবদাল্লা নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

দেখা যায়।

'রঙ্গস্থলে নানারূপ খেলা অনেকক্ষণ ধরিয়া হইল। গোলাকার রাস্তায় ঘোড়া দৌড়িতেছে। ঘোড়ার পৃষ্ঠে এক পায়ে বিবি দাঁড়াইয়া। আবার মাঝে মাঝে বড় বড় লোহার রিং (চক্র)। রিং-এর কাছে আসিয়া ঘোড়া যখন রিং-এর নীচে দৌড়িতেছে, বিবি ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে লাফ দিয়া রিং-এর মধ্য দিয়া পুনরায় ঘোড়ার পৃষ্ঠে আবার এক পায়ে দাঁড়াইয়া। ঘোড়া পুনঃ পুন বন-বন করিয়া ঐ গোলাকৃতি পথে দৌড়াইতে লাগিল, বিবিও ঐরূপ এক পায়ে দাঁড়াইয়া।

'সার্কাস সমাপ্ত হইল। ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে নামিয়া আসিয়া ময়দানে গাড়ির কাছে আসিলেন। শীত পড়িয়াছে। গায়ে সবুজ বনাত দিয়া কথা কহিতেছেন....

এরপর অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণর বিবির ঘোড়ায় চড়ার কায়দার বাহাদুরির পেছনের কঠিন সাধনার কথা বলেন যে 'সংসার করা ঐরূপ কঠিন। অনেক সাধন-ভজন করলে পর, কেউ-কেউ ঈশ্বরকৃপায় পেরেছে। অধিকাংশ লোক পারে না।

আমাদের কলেজ জীবনে ইডেন গার্ডেনসের জানুয়ারির মিঠে-রোদে ছোট বড় ক্রিকেট খেলা দেখা ছিল সত্যিকারের বিলাস। তবে কোল্ড স্টোরেজের ফুল কপির মতন বিস্বাদ না হলেও ক্রিকেট এখন এমন বারোমেসে খেলা হয়ে গেছে যে তা নিয়ে এখানে আর কিছু বলছি না।

তবে একটা কথা সে যুগে আমরা ক্যালকাটা আর বালীগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাবের খেলায় এক সঙ্গে বাইশ জন : সাদা খেলোয়াড়দের খেলতে দেখেছি যা আর এদেশে কখন দেখা যাবে না।

পুরোনো আমলে বাঙালিদের আর একটা বিলাস ছিল শীত পড়লেই পশ্চিমে চেঞ্জে যাওয়া। যেমন বিদ্যাসাগর মশাই যেতেন কারমাটার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আর আশু মুখুজ্জে যেতেন দেওঘর মধুপুর, কলকাতার যত নামকরা ব্রাহ্মরা যেতেন গিরিডি। এখানে একটা রগড়ের কথা বলি। গুরুদাস ছিলেন কঠোর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তিনি রেলে কখন ল্যাভাটোরি ব্যবহার করতেন না। তাই নিয়ে কোনো একজন রসিক ব্যক্তি একদা বহুবিদিত ছড়া কেটেছিলেন : 'একই মূত্রে চলি গেলা দূর মধুপুর।

সেযুগে পশ্চিম বলতে লোকে বুঝতেন জামতাড়া, মিহিজাম, ঝাঁঝা, শিমুলতলা, মধুপুর, যশিডি, বদ্যিনাথ, হাজারিবাগ গিরিডি ইত্যাদি জায়গা। তখনকার সঙ্গতিপন্ন বাঙালিদের কাশী, বৃন্দাবন ভুবনেশ্বর, পুরী ইত্যাদি তীর্থস্থানের মতন পশ্চিমের জায়গাগুলোতে নিজেদের নিজেদের বাড়ি থাকত। কুঞ্জ, কুটীর, ধাম, ধুলি, নিবাস, নিকেতন, সদন, স্মৃতি মায় কটেজ ভিলা প্রভৃতি কথা লাগানো সেসব বাড়ির যে কতরকমের নাম ছিল বলা যায় না।

পশ্চিমে যাওয়ার মোদ্দা উদ্দেশ্যগুলো কি ছিল তা একবার এক ভদ্রলোক প্রায় এককথায় কি চমৎকারভাবে বলেছিলেন তা তিনি নিজেই জানতেন না। আমার তখন বয়স কুড়ি-বাইশ। আমি সেই বর্ষীয়ান ভদ্রলোকের সঙ্গে পশ্চিম নিয়ে কিছু বলবার চেষ্টা করি। ভদ্রলোক মুচকি হেসে আমায় ঠাণ্ডা করে দিয়েছিলেন এই বলে : 'ছোকরা কার সঙ্গে পশ্চিম নিয়ে তর্ক কোরচো জানো? আমি আজ সাতাশ বছর ধরে ফি শীতকালে শিমুলতলা যাই। দুখানা রুটি দিয়ে শুরু করি আর আঠারোটা হলে ফিরে আসি।' বিন্দুতে সিন্ধু না হলেও সে যুগের বাঙালিদের চেঞ্জে যাওয়ার পুরো ফিলসফিটা শেষের লাইনটার মধ্যে 'নিহিত' ছিল। যেমন কলকাতা থেকে অরুচি আর তিরিক্ষি ভাব নিয়ে পশ্চিমে যাওয়া। সেখানকার খটখটে কড়া শীত। সালসার মতন হজমি কুয়োরজল, সকাল-বিকেল হাঁটাহাঁটি, চেঞ্জারদের সঙ্গে মেলা-মেশা এবং খাঁটি জিনিস খেয়ে অচিরেই স্বাস্থ্যোন্নতি আর মনের ফূর্তি লাভ। তাছাড়া এখনকার মত হিল্লি দিল্লী করে ঘুরে মরার বালাই ছিল না। কোন ঝুঁকি নেওয়া নয়, অসপত্ন পতিপুজোর মত একই জায়গার প্রতি আনুগত্য।

তখনকার দিনে কেদার বাঁড়ুজ্জের কোষ্টির ফলাফলের পশ্চিমের শহর আর চেঞ্জারদের নিয়ে কত নাটক-নভেল-গল্প লেখা হয়েছে। হায়! বাঙালিদের সেই সব বড় সাধের বাড়িগুলো কবে বিক্রি হয়ে গেছে। এই ব্যাপারে আমার একটা বিষাদময় স্মৃতি আছে। সময়টা বোধহয় ১৯৫০। একদিন বেলা দশটা-এগারটার সময় আমি গিরিডির বারগাণ্ডার একটা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম একটা বাড়ির ফটকের থামের গা থেকে বাড়ির প্রাক্তন মালিক এক বিখ্যাত বাঙালির ইটালীয় মার্বেলে কোঁদা নামের ফলক খুলে বাড়ির নতুন মালিকের নাম বসানোর তোড়জোড় হচ্ছে। একটা যুগ শেষ হয়ে তার বিদায়ের চরম মুহূর্তটা এমন ভাবে চাক্ষুষ দেখবো তা কখনও ভাবতে পারিনি।

বলার দরকার নেই যে এখনও শীতে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়া বাঙালির জীবনে একটা বড় আনন্দ। এই বেরোনো নানা রকমের: শিবপুর বা কারুর বাগান বাড়িতে পিকনিক, নৌকোয় বা স্টীমারে গঙ্গাবিহার, ডায়মন্ড হারবার কিংবা সুন্দরবনের পাখি বা বাঘ দেখার দুরাশা নিয়ে যাওয়া কিংবা আরও দূর দূর পাল্লার পাড়ি দেওয়া।

এখন ভ্রমণ নেশাগ্রস্ত বাঙালি বিশেষ করে যুবক-যুবতীদের আর একটা শীতের বিলাসিতা হয়েছে যা দেখলে নকুড় মামা নির্ঘাত হার্ট-ফেল করতেন। আমি ঘোর শীতে পাহাড়ি অঞ্চলে বেড়ানোর কথা বলছি। আজ প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে কবি কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'শীতে কাশ্মীর, আর কাশ্মীরে শীত' বলে একটা বড় লেখায় তুষারাবৃত কাশ্মীরের অপরূপ রূপবর্ণনা করেছিলেন। আর মনে পড়ছে তার বেশ কিছু পরে নিরঞ্জন মজুমদার (রঞ্জন) দার্জিলিং নিয়ে বই লিখেছিলেন 'শীতে উপেক্ষিতা'। আজ কয়েকবছর ধরে শীতে বাঙালিদের দার্জিলিং কালিম্পং ছাড়া ঘাড়ওয়াল, কুমায়ুন, হিমাচল কাশ্মীর ইত্যাদি ব্যাপারটা অনেক ছড়িয়েছে। নভেম্বরে সান্দাকফু, পিন্ডারি গ্লেসিয়ার ছাড়া আমি অনেক বছর আগে বেশ কয়েকবার জানুয়ারির গোড়ার দিকে দার্জিলিং গিয়েছি। আমার মনে হয়েছিল শীতের সেই প্রায়-আশ্রমের মতন নির্জন আর শান্ত দার্জিলিং-এর সঙ্গে গরমের দার্জিলিং-এর কোনো তুলনাই হয় না। একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি, কুড়ি/পঁচিশ বছরের আগেকার কথা। ম্যালের-লাগোয়া একটা ফ্ল্যাটের ঘরে সকাল নটা-দশটায় ঘুম থেকে সেই হাড়-কাঁপানো শীতে নিজেকে বাইবেলের মৃত্যুপথযাত্রী রাজা দাউদের (ডেভিড) মতন 'ওল্ড আর কোল্ড' মনে হয়। কিন্তু সেখানে আমায় কে বা দাউদের পারিষদদের মতন সুন্নীয় সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা অভিশাপের মতন কোন ভরযুবতীকে এনে সঞ্জীবিত করার চেষ্টা করবে। যাই হোক কোনোরকমে জড়তা কাটিয়ে বাইরে গিয়ে দেখি কাঞ্চনজঙ্ঘা তার পঞ্চরত্ন শিখর নিয়ে রোদে ঝলমল করছেন। তারপর যখন প্রায়-জনহীন ম্যালে সেই গলানো সোনার মতন আলোয় বসলাম তখন তার তাপ আমায় যে উষ্ণতায় নেশা গ্রস্ত করে দিয়েছিল অহো! তা কোটি মন্বন্তরে আমি ভুলিবো না আমি কভু ভুলিবো না।

ঘোরা-ফেরা বেড়ানোর কথা ছাড়া, শীতে বাড়িতে বসে ছোট-খাটো আরাম আর আনন্দর কথা একটু ছুঁয়ে যাওয়া দরকার। যেমন ছুটির দিনে কুঁড়েমি করে লেপের তলায় শুয়ে গরম চা খেতে খেতে কাগজ পড়া, একটু বেলা হলে চেয়ারে বসে রোদ পোয়ানো, দুপুরে ইচ্ছে হলে রোদে-তাতা তেল মেখে সাবান দিয়ে গরম জলে চান, সন্ধ্যায় কখনও কখনও রুচিমত সুপের সঙ্গে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আড্ডা। শীতের নানান ভোজনবিলাসের কথায় আমাদের চিরকেলে খাদ্যরীতি ভেঙে একটা সব চেয়ে মোহনীয় মিষ্টি খাবারের কথা দিয়ে শুরু করছি। আমি নলেন গুড়ের কথা বলছি যার স্বাদ-গন্ধ সুধার সমান। তা ছাড়া জয়নগরের মোয়া, মণ্ডা, কাঁচা গোল্লা, সন্দেশ, পায়েস পরমান্ন ইত্যাদির স্বাদ বহুগুণে বাড়িয়ে দেয় নলেন গুড়ের অতুলনীয় ভুর ভুরে সুগন্ধ।

যে খেজুর রস বিশেষ প্রক্রিয়ায় জাল দিয়ে দখনের শিউলিরা নলেন গুড় তৈরি করেন তার উৎস হল কাঠখোট্টা খেজুর গাছ। এ যেন সাহারার বুক থেকে ঠাণ্ডা জলের ধারা বেরুনোর মতন। গুপ্ত কবি ঠিকই বলেছিলেন:

হায়রে শিশির তোর কি লিখিব যশ।
কালগুণে অপরূপ কাঠে হয় রস।/
পরিপূর্ণ সুধাবিন্দু খেজুরের কাঠে।
কাঠ কেটে উঠে রস যত কাঠ কাটে।/
দেবের দুর্লভ ধন জীবনের ঘড়া।
এক বিন্দু রস খেলে বেঁচে ওঠে মড়া।/

আমাদের চেয়েও প্রবীণরা তাঁদের ছেলেবেলায় খেজুর রসের ফিরিওয়ালাদের কাছ থেকে কিনে খাঁটি খেজুরের রসের স্বাদ এখনও ভুলতে পারেননি। এখনও শীতকালে বালিগঞ্জে শিউলিরা বাঁকে করে খেজুর রস বিক্রি করে তা খাঁটি নয় আর ভোরের রোদ লেগে খানিকটা গেঁজে গিয়ে তা তাড়ি তাড়ি হয়ে যায়। এখন ভুরভুরে গন্ধওয়ালা, মিছিবির পানার মতন মিষ্টি ঠাণ্ডা কনকনে সারা রাত জিরেন দেওয়া খেজুর রস খেতে গেলে কারুর বাগান বাড়িতে ভোর হতে না হতেই যেতে হয়। ঈশ্বর গুপ্তের খেজুর রস সম্বন্ধে একটা উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করি। তাঁর সময়ে ইংরেজরা খেজুর রসের ওপর ট্যাক্সো বসালে কবি লেখেন:

"আমাদের ভাগ্য দোষে মিছে করি দ্বেষ।
বিজাতীয় রাজা হয়ে নষ্ট করে দেশ।/
লোভকারী আবকারী যুক্ত করি কর।
এমন খেজুর রসে বসাইল কর।/
মাশুল উশুল করে রসে আর গুড়ে।
পরে বুঝি গঙ্গাজলে কর দেবে জুড়ে।/

নকুড় মামা

শালের তত্ত্বর সঙ্গে আগে শীতের নতুন নলেন পাটালি ইত্যাদি খেজুর গুড়ও নতুন জামাইকে পাঠানো হত।

শীতের খাওয়া-দাওয়ার কথার আগে শীতের বাজারের চেহারার কথা কিছু বলা দরকার। আগেকার যুগের শীতের হগ সাহেবের বাজার কিংবা বড়বাজারের চুস্ত-কায়দাওয়ালা পেশোওয়ারিদের কাবুল-হিরাট-বুখারা ওজড় করা মক্কা-মেওয়ার দোকান আজ কলকাতায় স্মৃতি হয়ে গেছে। তবুও আজকের সব কিছুরই আকাশ-ছোঁয়া দামের দিনে কথাটা বিকট ঠাট্টার মতন শোনালেও বলি যে ভরা শীতে কলকাতার কোন বাজারে গেলে ঈশ্বর গুপ্তের, 'হেমন্তে বিবিধ খাদ্য' আর কীটসের 'অটমন, দি সিজন অফ মিসট্স আর মেলো ফ্রুটফুলনেসে'র কথা মনে

পড়ে যায়।

এই সময়ে একটা বড় তরিতরকারির দোকানের শোভা আর বাহার দেখলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। সেখানে কত রকমের আকারের কত রকম রঙ, কত রকম টেকসচারের খেলা। যেমন গুপ্ত কবির ভাষায় পুরোনো বাবুদের মতন সার্টিনের কাবা গায়ে দেওয়া ধবধবে ফুলকপি, আঁটসাঁট গোলগাল বাঁধা কপি, ওলকপি আর কলাই শুঁটির ফিকে সবুজ, টকটকে লাল টোমাটো, কুচকুচে কালো, বেগ্নে, আর সাদায়-সবুজে মেশানো ঢাউস ঢাউস বেগুন, 'শিরে শোভে টোপ' অর্থাৎ সবুজ ঝুঁটিওয়ালা লাল, সাদা আর লাল-সাদায় মেশানো পাঁজির বিজ্ঞাপনের রাক্ষুসে সাইজের মুলো, 'প্রাচীনার স্তন সম অঙ্গের ধরন' নিয়ে হাল্কা-সবুজ কচি লাউ, 'পালঙ্কে রাখার মতন' গাড় সবুজ পালংশাক, সাপের মতন লকলকে লাউডগা। এছাড়া বীন, সীম, গাজর লেটুস, শালগম, পেঁয়াজ কলি, শশা, ধনে পাতা পুদিনা আর নৈনিতালের নতুন আলু, কত নাম করবো। গরম কালের তুলনায় সবই তরতাজা, সবই রসে টসটসে। প্রসঙ্গত এখানে আর একটা কথা বলা দরকার। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে আছে শিব একদিন শীতের ভোরে কি কি রাঁধতে বলেছিলেন তার এক অপরূপ বর্ণনা আছে। সেই আনাজ কোনাজের লিস্টে আমরা নিম, শিম, কুমড়ো, কাঁঠাল বিচি, করমচা, গোঁড়া লেবু, নটে, সরষে, বেথুয়া, আর পালংশাক, নানান রকমের ডাল, ফুলবড়ি আর বেসনের কথা আছে। কিন্তু তাতে লেটুস, সালগম কেন আলু, কপি আর মটর শুঁটির নামগন্ধও নেই। রান্নার ধরন-ধারণ না বদলালেও আমাদের 'অপরিবর্তিত প্রাচ্যে' প্রায় সাড়ে চারশ বছরের খাবার দাবারের অভ্যেস যে কি ভীষণ বদলে গেছে এটা তার একটা নজির।

শীতকালের খাবারের কথায় এলে প্রথমেই বলি মাছ, মাংস আর অসংখ্য আনাজকোনাজ বাঙালিরা কি ভাবে আর কত ভাবে রাঁধেন তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় পাক রাজেশ্বর বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের 'পাক প্রণালী', প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর সাহেব আর ফরাসী ঘেষা 'আমিষ ও নিরামিষ আহার' শ্রীমতী লীলা মজুমদার আর শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায়ের 'রান্নার বই' আরও অনেক পুরনো আর নতুন বইয়ে। কিছুটা বললাম কারণ এইসব বইয়ের বেশির ভাগ বইতেই কালিয়া-কাবাব-কোপ্তার চাপে অনেক হেঁশেলি রান্না বাদ পড়ে গেছে।

শীতকালের ভোজন বিলাসের ব্যাপারে আমি এখানে আমাদের ছোটোবেলায় সাধারণ খাবার-দাবারের কথা বলবো। সাধারণ খাবারের ব্যাপারে 'বিলাস' কথাটা হয়ত আপাত দৃষ্টিতে বেখাপ্পা মনে হতে পারে। কিন্তু সত্যিই তা নয়। শীতকালের আমিষ আর নিরামিষ দুই ধরনের হেঁশেলি খাবারই গিন্নি বান্নিদের হাতযশ আর কালগুণে অসাধারণ হয়ে পড়ে। আসল খাবারের আগে বলি একটা জলখাবারের কথা যার এখন আর কলকাতায় অন্তত পাট নেই। সেটা হল বিকেলে তাওয়ায় বালিতে সেঁকা শুঁড়ি আলু দিয়ে

পাঁজির বিজ্ঞাপনের রাক্ষুসে সাইজের মুলো

মুড়ি খাওয়া। সেই সেঁকা আলুর স্বাদ ভোলা যায় না।

আমার মনে পড়ছে ছেলেবেলায় সন্ধ্যে হতে না হতেই শীতকালে বাড়ির বারান্দার কাপড়ের আস্তর দেওয়া চিকগুলো ফেলে দেওয়া হত। এখন বাঙালিদের গম ধরানোর জন্য কত রকমের প্রচার হয়। তখন বহু গেরস্থ বাড়িতে শীত পড়লেই রুটি খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। মাটিতে আসন বা সরু করে সতরঞ্জি পেতে পাত পড়ত। প্রথমেই বাড়িতে জাঁতায় গমভাঙা আটার তৈরি ফুলকো ফুলকো গরম রুটি। তার সঙ্গে কোন দিন কপি, কোনোদিন পটল, বেগুন ভাজা বা বেগুন পোড়া। এমনি ডাল ছাড়া প্রায়ই খেতাম ঘাঁট বা ঘণ্ট। অর্থাৎ অড়হর ডালে মুলো, ডাঁটা, বেগুন, কচু ইত্যাদি দিয়ে একটি সুখাদ্য। টোমাটো তখন আমরা বেশি খেতাম বলে মনে পড়ে না। বলার দরকার নেই ফুলকপি, বাঁধাকপি আর কলাই শুঁটিই রান্না মাত করত। বাড়িতে বামুন থাকলেও মা ঠাকুমারা বেশি রাঁধতেন। ফুলকপির সঙ্গে ডুমো ডুমো করে কাটা আলু আর মটরশুঁটি দিয়ে নিরামিশ বা ভেটকি কিংবা রুই মাছ দিয়ে, গরম মশলার ভুরভুরে গন্ধে ভরা ডালনা, চিংড়ি মাছ আর কপির ঝোল, কই মাছ দিয়ে ফুলকপির তরকারি, চিংড়ি মাছ দিয়ে লাউ বা বাঁধাকপির তরকারি, বাধাঁকপির কালোজিরে ফোড়ন দেওয়া সাদা তরকারি, এখনকার উঠে যাওয়া ছোঁকা ছেঁচকি এই সবই বেশির ভাগই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রান্না করা হত। এমনি মাংস ছাড়া শীতকালে আগে স্নাইপ বা কাঁদাখোঁচা তিতির, বটের, ঘুঘু, হরিয়াল, ইত্যাদি পাখিও মাখা-মাখা করে কারি বাইরে বাড়িতে রান্না করা হত। কিছুদিন আগে অবধি কলকাতায় পাখিধরারা উত্তর কলকাতার বর্ষাকালে তপসে মাছের মতন বালীগঞ্জের অনেক জায়গায় শীতকালে ওই সব ফেরি করত। পাখি মেরে উড়ফুড় করে দেওয়া আর আরও নানান কারণে পাখি খাওয়া এখন প্রায় উঠে গেছে। আর আমরা এখন বুঝতে শিখছি যে বন্যরা বনে আর শিশুরা মাতৃক্রোড়ের মতন পক্ষীরা খাওয়ার টেবিলে নয় তরুশাখেই সুন্দর।

আমি আমাদের ছেলেবেলাকার যে সব খাবারের নাম বললাম আগেকার 'সুতারের' রান্নার কথা বাদ দিলে এখন বাড়িতে বাড়িতে হয়। এছাড়াও আরও অনেক দিশি আর বিদেশি ধরনের রান্না বাঙালি হেঁশেলে ঢুকে পড়েছে যা লোকে পরিতৃপ্তি করে খান।

রাত্তিরে খাওয়ার পর যখন একটু বেশি শীত শীত মনে হয় তখন আপাদ-মস্তক চাদরে মুড়ি দিয়ে বই পড়ার কি যে আরাম তা লিখে বলা যায় না। আস্তে আস্তে রাত বেড়ে চোখ ঘুমে ঢুলু ঢুলু হয়ে যায় তখন বিছানার দিকে এগিয়ে শয়নে পদ্মনাভ বলে লেপের ভেতর ঢুকে পড়া। দু-চার মিনিটের মধ্যে গায়ের তাপে বিছানা আর লেপ গরম হয়ে গেলে শীতের দীর্ঘরাত্তিরের 'অনন্ত শয়নে'র আগে সেই 'ওম' সেই উষ্ণতার কি নিটোল নিখাদ আনন্দ।

আমি অনেক সময় ভেবেছি যে লেপের তলার এই উষ্ণতার আরামের সঙ্গে আর কি কি শারীরিক আরামদায়ক অনুভূতির তুলনা করা যেতে পারে। যুবকযুবতী আর যাঁদের এখনও বয়েস আছে তাঁরা বলবেন এ কেন এর চেয়ে নিবিড়তর আরামের কথা 'ময়নামতীর গানে' অদুনা ত আট'শ বছরের আগে অমর ভাবে বলে গেছেন। শাশুড়ী ময়নামতীর চক্রান্তে তাঁর স্বামী গোপীচন্দ্রকে যৌবন কালে বনবাসে যেতে হয়। তার আগে অদুনা বৃথাই তাঁকে আরও নানা আবদার আর সোহাগের কথার সঙ্গে এই বলে বিরত করতে চেয়েছিলেন যে 'মাঘ মাসি সিতে ঘেসিয়া রমু গাও'। আমি যদি আমার বৃদ্ধ বয়সে বলি কথাটির মর্মার্থ জজে মানবেন তখন অনেক মিয়াই হয়ত কানে আঙুল দিয়ে তোবা তোবা করবেন। তাই আমি শীতে শয্যাবিলাসের সঙ্গে তুলনীয় নিজের মনের মতন দু-একটা কথা বলি। এই বিলাসের মতন নিবিড় আরামের অনুভূতি পাওয়া যায় অ্যাসিটিলিনে নয় খড় আর আমপাতার বিছানায় জাগান দিয়ে তোয়ের করা কাশীর ল্যাংড়ার স্বাদে, গরমে সারাদিন রোদে তেতে-পুড়ে ঘেমে নেয়ে ঠাণ্ডা জলে চান করার পর দখনে হাওয়ার ফুরফুরে ছোঁয়াচে, 'দেবতার কৃপাবারি'র মতন বছরের প্রথম বৃষ্টির জলে ভিজে।

হায়! দুনিয়ায় সব সুখের সব সাধের জিনিসের মতন শীতের সুখও বিধি আমাদের কপালে বেশিদিন লেখেননি। তাই হঠাৎ একদিন কানে আসে কোকিলের কুহু কুহু। কোকিলের এই ডাক একাধারে তার রাজ্যের সীমানা ঘোষক যাতে আর কোন পুরুষ কোকিল তার ধারকাছে ঘেষতে না পারে, তার দৈহিক মিলনের সাথীকে প্রেমের আবাহন, আর প্রকৃতির তরফ থেকে শীতের বিদায়ের 'পবলিক প্রোক্লামেশান'। শীত-ভীতু সর্দি ধেতো, হেঁপো-ফোলোদের এই ডাক শুনে আহ্লাদের সীমা থাকে না। কিন্তু শীত বিলাসীদের মনে হয় কি হবে পোড়ার মুখো কোকিলের ডাক শুনে? পুণ্যাত্মা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কি বলেননি যে ঐ ডাকই ত 'ফুলকপি নিয়ে গেল গালে মেরে চড়'!

পুলিপিঠে

লীলা মজুমদার

যদি আমরা সবাই মিলে দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে সায়েবদের মতো হবার চেষ্টা না করে যেখানে যত ভালো ভালো বাঙালিয়ানা আছে, সব সংগ্রহ করতাম তা হলে কি ভালো হত বলুন তো, ভাই ? সেই ভালো জিনিসগুলোর মধ্যে আবার যেগুলো সব চাইতে ভালো, তার মধ্যে আছে মাঝিদের গানের, বাউলদের গানের সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের সব রান্নাঘর থেকে পুলিপিঠে ভাজার সুবাস। আপনাদের মনে হতে পারে কলকাতার গলি থেকে বন্যার গন্ধ গেল কি গেল না, দেয়াল থেকে ভিজে দাগ কোনো দিনও যাবে কি না সন্দেহ, এখন মানুষটা পুলি পিঠের কথা তোলেই বা কেন, তৈরি করতে জানেই বা কজনা ? তা হতে পারে, তবে রস উপভোগ করতে না পারলে, মানব জন্মই বৃথা আর ভালো করে পিঠে-পুলি করতে জানলে, কম খরচায় ইতরভদ্রনির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা আখেরে যে আনন্দ লাভ করে, মহাকাব্য পড়েও তা করে না। কারণ নাম বা প্রস্তুতপ্রণালী না জানলেও তার উপভোগ্যতা এতটুকু কমে না। আর রবীন্দ্রনাথ লোককথা উপকথা প্রসঙ্গে যে অবিস্মরণীয় মন্তব্য করেছিলেন যে খাঁটি স্বদেশী জিনিসের এমন নমুনা আর কোথাও নেই ; সে কথা, পুলিপিঠের বেলাও এবং হয়তো আরো ব্যাপাকভাবেই খাটে।

তবে দুনিয়ার যাবতীয় ভালো জিনিসের মতো পুলি-পিঠেরো একটা বিশেষ সময় আছে। দেখুন, অমন নাক সেঁটকাবেন না ; ভালো জিনিস ভালো না লাগাতে কোনো বাহাদুরি নেই। এক্ষেত্রে সময়ের কথাটা বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে, কারণ এ-ই হল সেই সময়। বলা বাহুল্য এ লেখাটা শান্তিনিকেতনে প্রস্তুত এবং রেলপথে আসতে দেখেছি মাইলের পর মাইল ধানে পাক ধরেছে। বাড়িতে পৌঁছে দেখেছি কাঠবেড়ালিরা নেমে এসে মাটিতে দাঁড়িয়ে তিন গুণ লম্বা হয়ে সূর্যিমুখী ফুলের বিচি সংগ্রহ করছে। বুনো হাঁসরা এখনো আসেনি। নলেন গুড় নিয়েও কেউ আসেনি, অতএব এই হল পিঠে-পুলির জন্য মন তৈরি করার আসল সময়।

আমার ছোট বেলায় দেখতাম ঠাকুমা জ্যাঠাইমা পিসিমারা নতুন গুড়ের জন্য এই সময়ে মুখিয়ে আছেন ; দেশের বাড়িতে নারকেল পাড়া হয়ে, নানা স্থানে পৌঁছেও গেছে। আমার পিঠে-পুলির নিয়মে বেশ একটু বাঙালদেশী ভাব আছে এবং একশোবার বলব গুণ তাতে একশো গুণ বেড়েছে। গ্রামের ঘরে ঘরে যা তৈরি হয় তা দুষ্প্রাপ্য বা বেশি দামী হয় না। প্রধান উপকরণ খেজুরে গুড়, নারকেল, চালের গুঁড়ো, বা সুজি, মুগ বা কলাই ডাল, ঘন দুধ, খোয়া ক্ষীর, এলাচের গুঁড়ো, কেউ কেউ একটু কর্পূরও ব্যবহার করতেন। দুধকে তখনো খুব দামী জিনিস মনে করা হত না। টাকায় পাঁচ সাত সের গরুর দুধ। শুনতাম কালো গরুর দুধ নাকি বেশি মিষ্টি হয় ; লাল গরুর দুধ খেতে ভালো হলেও, যারা খায় তারা বদমেজাজী হয়ে যায়। ছোট বেলায় ভঁয়সা ঘি-তে রান্না হতে দেখেছি, কিন্তু পিঠে-পুলিতে বাঙালী ঘরে গরুর দুধই চলত। পিঠে-পুলিতে ছানার ব্যবহারও কখনো শুনিনি। উপকরণগুলো এমন, যাতে বেশ কিছু দিন রাখা যেত আর কোনোটাতেই পাতলা রস দেওয়া হত না বলে রেলে, নৌকোতে, গরুর গাড়িতে টেনে নিয়ে বেড়াবার অসুবিধা হত না। এই হল গিয়ে পিঠেপুলির পটভূমিকা। এর খ্যাতি ছিল দেশবিদেশে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সেকালে সায়েবদের নিবাস কলকাতাকেও পাড়ার গাঁয়ের লোকেরা প্রায় হাপ্ বিলেত ভাবত। আরেকটা কথা হল পৌষ মাসের পিঠে বলতেই সঙ্গে সঙ্গে পায়েসের কথাও ওঠে। পিঠের সঙ্গে পায়েস

যত ভালো ভালো বাঙালিয়ানা আছে, তার মধ্যে আবার যেগুলো সব চাইতে ভালো, তা হল, মাঝিদের গানের, বাউলের গানের সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের সব রান্নাঘর থেকে পুলিপিঠে ভাজার সুবাস

থাকলে তবে না ষোল কলা পূর্ণ হয়। এবার অভিজ্ঞতার কালক্রম রক্ষা করে যদ্দূর মনে পড়ে আমার জীবনে পুলি-পিঠের ভূমিকার কথা বলি।

সে ভূমিকাটিও নিতান্ত তুচ্ছ ছিল না। পুলি-পিঠে ছিল আমোদ আহ্লাদের প্রতীক, সুখের চিহ্ন। আমরা থাকতাম শিলং-এর পাহাড়ে, যেখানে সামান্য নারকেল পর্যন্ত সহজলভ্য ছিল না। সুখের বিষয় আমাদের বাড়িতে যামিনীদা বলে যে রান্না করত সে আমাদের গাঁয়ের লোক। বছরে একবার দেশে গিয়ে, আম কাঁঠালের সময় পার করে, একটা পুঁটলি ভরে নানারকম স্বর্গীয় সামগ্রী নিয়ে ফিরত, যার জন্যে আমরা পথ চেয়ে বসে থাকতাম। আমের আস্বাদ না জানাতে, তাকে না পাওয়ার কোনো দুঃখ ছিল না। সে যত ভালোই হক, পুঁটলির ভিতরকার ছোট বড় কালচে লালচে পুরু পুরু এবং গায়ে নকশা করা আমসত্ত্বের চাইতে যে ভালো হতে পারে না, তাতে আমাদের কোনো সন্দেহ ছিল না। আর থাকত পাছে ভেঙে যায় তাই বিস্কুটের টিনে ভরা ক্ষীরের আর নারকেলের ছাঁচ। অর্থাৎ চিনি দিয়ে পাক করা খোয়া ক্ষীরের, কিংবা মিষ্টি ক্ষীরের সঙ্গে নারকেল বাটা মেশানো প্রায় - অবিনাশ এক রকম মিষ্টি। ঠাকুমা পিসিমাদের হাতে নরুণ দিয়ে সূক্ষ্ম নকশা কাটা পাথরের চ্যাপ্টা পাত্রে গাওয়া ঘি মাখিয়ে, তার উপর আধ-ইঞ্চি পুরু ক্ষীরের পাক বেশ করে চেপে নকশাটি তাতে তুলে, আবার সযত্নে ছাঁচ থেকে সেগুলি খুলতে হত। আমাদের গাঁয়ের সব মেয়েরাই নিশ্চয় কারুশিল্পী ছিলেন, নইলে এ কাজ আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন মাস্টারমশাই নন্দলাল বসুও পারতেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবে ঐ গাওয়া ঘিয়ের প্রলেপটিতেই নাকি মুশকিল-আশান হত। আপনারা এগুলোকে পিঠে-পুলির তালিকা থেকে বাদ দিলেও, আমি দিই না।

নারকেল চিঁড়ের কথাও বলতে হয়। পুলিপিঠের সব গুণ আছে এতে। মালা থেকে সযত্নে পাকা নারকেল বের করে নেবেন। ভেঙে গেলে ক্ষতি নেই। কালো ছালটি বঁটি দিয়ে ছাড়িয়ে আধ-ইঞ্চি চওড়া ফালি করে কেটে নেবেন। তারপর শিলের ওপর দুটো ধার একটু ঘষে পাতলা করে নিয়ে, শিলের ওপরে রেখেই নরুণ দিয়ে চিঁড়ের মতো পাতলা খুদে খুদে স্লাইস করে কেটে ফেললে, চিঁড়ের মতোই দেখতেও হবে। তখন তাকে ঘন চিনির রসে নেড়ে, হাওয়ায় বিছিয়ে শুকিয়ে নিলে যে জিনিস তৈরি হয়, তাকেই বলে নারকেল চিঁড়ে। অতি উপাদেয় উপকারী এবং বহুকাল থাকে। ইচা-মুড়াই বা বাদ দিই কেন? কথাটার মানে চিংড়ি মাছের মুড়ো, কিন্তু শুনতে আরো ভালো না? শুনতে আরো ভালো, খেতেও তাই, কিন্তু দেখতে অবিকল। ঐ রকম খোলা থেকে নারকেল বের করে, কালো ছাল ছাড়িয়ে প্রায় দেশলাই কাঠির মতো সরু সরু এক ইঞ্চি মতো লম্বা টুকরো করে কুচিয়ে নেবেন। তারপর চিনি দিয়ে দুধ ঘন করতে করতে খোয়া হয়ে দাঁড়াবার ঠিক আগেই নারকেল কুচিগুলো দিয়ে, নামিয়ে, হাতে একটু গাওয়া ঘি মাখিয়ে নিয়ে, ছোট ছোট মুঠি করে তুলে একটু চাপ দিয়ে থালায় নামিয়ে রাখুন। মন থেকে একঘেয়ে কাজের বিরক্তিটুকু কেটে গেলে, তাকিয়ে দেখবেন যেন এক থালা চিংড়ি মাছের মুড়ো। তাতে এলাচের গুঁড়ো দিলে আরো ভালো।

এবার আস্কে পিঠে বলে একটা জাত-পিঠের কথা শুনুন। অনেকেই গরীবের খাওয়া বলে একে তুচ্ছ করেন, কিন্তু আমি বলি এরও তুলনা নেই। ওড়িশায় এর জন্ম। আমার বড়দি সুখলতা রাওয়ের শ্বশুরবাড়ি ছিল সেখানে। তাঁর এক বুড়ি ননদকে করতে দেখেছিলাম। আতপ চালের সঙ্গে তার সিকি পরিমাণে মিহি করে সাদা কলাই ভালো করে কয়েক ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে মিহি করে বেটে, দুধে বা জলে গুলে নিতে হবে। পোরে ভাজার গোলার মতো ঘন হবে। তারপর একটা তকতকে পরিষ্কার লোহার চাটু উনুনে বসিয়ে খানিকটা গরম হলেই, তার ঠিক মধ্যিখানে ছোট এক হাতা গোলা ঢেলেই একটা কাঁসার গেলাস চাপা দিয়ে গেলাসের বাইরে দু-হাতা জল ঢাললেন। অমনি সবটা বুড়বুড় করে ফুটে উঠল। তখন ন্যাকড়া দিয়ে ধরে গেলাস তুলতেই দেখি পিঠেটা কেমন ফুরফুলে হয়ে ফুলে উঠেছে। খুন্তি দিয়ে যত্ন করে উল্টে দিয়ে গেলাস চাপা দিয়ে সামান্য একটু জল ঢালতেই অন্য পিঠটাও হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চাটু নামিয়ে আস্কে পিঠেটো থালায় তুলে ঐ ভাবে দুই নং ভাজতে লাগলেন। শিখতে যতটা সময় লাগল, করতে বোধ হয় তার চেয়েও কম
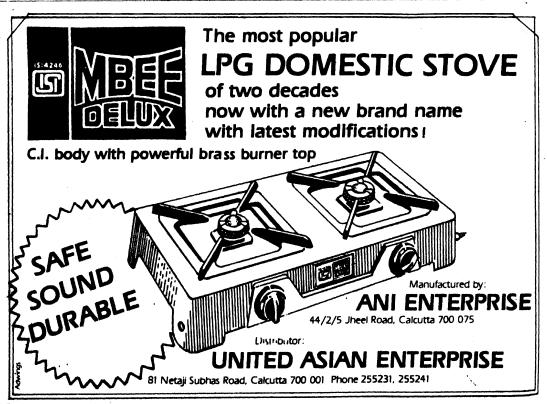
লেগেছিল। খান ত্রিশ ভেজে দিদিমণি থালা হাতে যখন উঠে দাঁড়ালেন, মনে হল যেন এক থালা ফোটা পদ্মফুল নিয়ে চলেছেন। যৎসামান্য খরচে তৈরি এই জিনিসটি হয় নলেন গুড়, নয় ক্ষীর, নয় চিনির রস দিয়ে খেতে হয়। নিজের হাতে করিনি কখনো, কিন্তু করা দেখেছি এবং খেয়ে সুখ পেয়েছি।

আধুনিকরা যতই উন্নাসিক হক না কেন, কাঁথার উপর সূচিকর্মের তুলনা নেই; নদীর ধারে কাশফুলের মতো রূপ নেই; কালো গরুর হাম্বার মতো ডাক নেই; ভাটিয়ালির মতো মন কেমন করা গান নেই; জলে ভেজা কামিনীর মতো সুগন্ধ নেই; মায়ের কোলে ছোট ছেলের মতো স্পর্শ নেই এবং তাজা ভাজা পুলি-পিঠের মতো আস্বাদ নেই।

খুব ভালো, খুব সহজ, পুলিকে-পুলি আবার পায়েস কে-পায়েস হল দুধপুলি। সাবেকি নিয়মে তৈরি করলে উপকরণ লাগবে দুধ, নারকেল, খেজুরে গুড়, এলাচ গুঁড়ো। যারা বেরসিক, খেজুরে গুড়ও মুখে রোচে না, তারা তার বদলে পুরের জন্য চিনি আর ক্ষীরের জন্য বাতাসা ব্যবহার করতে পারে। পুলির খোলটির জন্য সেকালে পিসিমা কাকিমাদের দেখেছি চালের গুঁড়ির সঙ্গে একটু ময়দা মিশিয়ে করতে। তাতে এক দিন পরেই পুলি হয়ে উঠত যেন ইঁট। আমার বুড়ি ননদ ওসব আদৌ না দিয়ে, সুজি দিয়ে করতেন। সাবধানে গড়তে নাড়তে হয়, নইলে ভেঙে যাবার ভয় আছে। কিন্তু পৌষ মাসে সাত দিনেও এতটুকু টসকাবে না।

আরেকটু খুলে বললে, আমার দিদিমণিদের বোধ হয় সুবিধে হবে। আড়াই সের দুধ, তাকে কিলোই বল আর লিটার-ই বল, আধ ঘণ্টা মতো জ্বাল দিয়ে বেশ ঘন হলে নামিয়ে রাখো। আমি বাস্তব কারণে টিনের দুধ একটু ঘন করে গুলে, মিনিট দশেক জ্বাল দিই। অবশ্য ক্রমাগত নাড়তেই হয়। মিষ্টি আমি পরে দিই, পাছে দুধ কেটে যায়। চিনি দিয়ে করলে সে ভয় থাকে না। কিন্তু কিঞ্চিৎ জোলো হবার সম্ভাবনা আছে। ক্ষীরটি হয়তো সেরটাকে দাঁড়াল।

যথেষ্ট চিনি বা খেজুরে গুড় দিয়ে একটি নারকেল কোরা পাক দিয়ে আগেই পুর করে রাখি। ছোট ছোট পান্তুয়ার মতো লম্বাটে করে ধর খান কুড়ি পুর গড়ে রাখলাম। পোয়াটাক সুজি ডুব জলে কম আঁচে সিদ্ধ করে নিই। এ-ও নাড়তে হয়। নাড়াকে ভয় করলে দিদিমণিদের দিয়ে পিঠেপুলি হবে না। সুজি সিদ্ধ হয়ে জলটাকে টেনে নিয়ে, খুন্তিতে জড়িয়ে উঠে এলে বুঝবে সুজি তৈরি। সুজিতে এবার এক মাঝারি চামচ বাদাম তেল মেখে নিলে চট করে শুকোবে না, চটচটেও থাকবে না। তারপর সুজি সেদ্ধকে কুড়িটা গুলি করে নাও। হাতে বাদাম তেল মেখে, যাতে হাতে লেগে না যায়, ভিতরে একটি পুরের দলা দিয়ে কুড়িটে চপের মতো গড়ে ফেল। দু মাথা একটু ছুঁচলো করে দিও; বেশি করলে কিন্তু ভেঙে যাবে।

তারপর ক্ষীরে পুলি গুলে ছেড়ে মিনিট পাঁচেক ফুটিয়ে, নামিয়ে ঠাণ্ডা কর। সবার শেষে অন্তত

পুলিপিঠে ছিল আমোদ-আহ্লাদের প্রতীক, সুখের চিহ্ন

এক দেড় পেয়ালা নলেন গুড়, কিংবা পাটালি গালিয়ে সাবধানে মিশিয়ে দাও। এ ভাবে করলে ক্ষীরে ছানা কাটার কোনো ভয় থাকে না। যারা গুড় খায় না, তারা বাতাসা বা চিনি দিয়ে করতে পারে।

তারপর একটা সুদর্শন পাত্রে ঢেলে, ওপরে এলাচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দাও। কেউ কেউ কিসমিসও দেন। সেকালে তার চল ছিল না এবং একালে এক মুঠোর দাম পাঁচ টাকা। তবু যদি দিতে চাও তো ভালো করে ধুয়ে এক চামচ বাদাম তেলে নেড়ে নাও। ফুলে ঢোল হলে, তুলে দুধ-পুলির ওপর ছড়িয়ে দিলে যে বাহার খোলে, তাতে সন্দেহ নেই। আরো দামী পেস্তার কুচি দিলে আরো সুন্দর দেখায়। আর তাই যদি বল, আমি নিজে আয়নায় দেখেছি ভালো করে চুল আঁচড়ে, মুখে একটু পাউডার মাখলে, আমাকেও বেশ দেখায়। সে যাক গে!

দিদিমণিরা গোকুল পিঠে করতে জান? খোয়া ক্ষীরের বা গুড় নারকেলের বা সব চাইতে ভালো অর্ধেক ক্ষীর অর্ধেক নারকেল মিশিয়ে একটি আধুনিক টাকার ডবল মাপে, চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা গোল গোল করে গড়ে রাখ। তারপর আটা বা ময়দায় বেশ করে বাদাম তেলের ময়েন দিয়ে, পোরে-ভাজার মতো পুরু গোলা করে নাও। এবার একটা ঝকঝকে পরিষ্কার চাটু মাঝারি আঁচে বসিয়ে, তাতে এক হাতা বাদাম তেল দাও। তেল গরম হলে একটি করে পুলি গোলায় ডুবিয়ে তেলে ছাড়। চটপটে হলে একেবারে গোটা চারেক ভেজে তুলতে পারবে। সবকটি ভাজা হলে ঘন চিনির রসে আঁশিয়ে তুলতে পার। গজার মতো বহুদিন থাকে। কেউ কেউ গোলার মধ্যেই খানিকটা চিনি মিশিয়ে দেন, তাতে আরো মুচমুচে হয়, পরে আঁশাবার দরকার হয় না। একটা বিষয়ে সাবধান হয়ো; সেটা হল গরম অবস্থায় ঢাকা চাপা দিলে অমনি মুচমুচে ভাব চলে যাবে অর্ধেক মজাও নষ্ট হবে। সব চাইতে ভালো থালায় করে জালের ডুলিতে রাখা। যদি তুলে রাখতে হয়, বিস্কুটের টিনে রাখাই ভালো।

নারকেল নাড়ুর নাম করিনি এতক্ষণ, ভেবেছি দিদিমণিরা জানে নিশ্চয়! প্রায় সমান পরিমাণে নারকেল কোরা আর ভেলি গুড় বা পাটালি গুঁড়ো করে বা স্রেফ চিনির পাক দিয়ে ঝুরঝুরে হবার আগে নামিয়ে এলাচের গুঁড়ো মিশিয়ে, গরম থাকতে থাকতে দুহাতের তেলোয় বাদাম তেল মাখিয়ে চটপট গুলি পাকিয়ে হাওয়ায় শুকিয়ে, তবে তুলো। মনে রেখো দেরি করে ফেললে দলা বাঁধতে চাইবে না; বেশি পাক দিলেও তাই; বেশি নরম বা অতিরিক্ত গুড় দিলেও তাই। আমি আরেকটা জিনিস করে দেখেছি যার সুফলের তুলনা হয় না। অর্থাৎ উনুনে বসিয়ে পাক দেবার সময় যদি খানিকটা খোয়া ক্ষীর বা গুঁড়ো দুধ মিশিয়ে দেওয়া যায়। বলে রাখি ঠাকুমারা এ কথা শুনলে নিশ্চয় আঁতকে উঠতেন। কিন্তু আমি অনেক ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে স্বর্গের অমৃতও বোধ হয় এইভাবে তৈরি হয়। ভাঁড়ে জলীয় অবস্থায় রাখা হয় না। তার কম ঝামেলা নয়। ভাঁড় ভেঙে গেলেই হয়ে গেল। আমার নারকেল নাড়ু যদি মাটিতে পড়েও যায়, নাতিরা যেন প্যান্টে মুছে খেয়ে ফেলে। তাতে কোনো দোষ হয় না।

মালপোয়া, পাটিসাপ্টা সব জায়গায় পাওয়া যায়। মুগের ডালের মুগসামালি তৈরিকরার যতটা হাঙ্গামা ফল ততটা আহামরি কিছু না। তা ছাড়া আমার খুব খারাপ লাগে, তাই এগুলো বাদ দিলাম। কিন্তু পৌষ মাসে পিঠের সঙ্গে নানা রকম সহজ কিন্তু কিঞ্চিৎ চমক দেওয়া পায়েস না খেয়ে অঙ্ক ভুল করার সমান দোষ হয়। তাই দিয়ে শেষ করি।

কে না জানে যে পায়েসের প্রধান উপকরণ হল ক্ষীর এবং তার সঙ্গে আর যাই দেওয়া যাক, তাতে রূপ, আস্বাদ, সুবাস বড় জোর কিঞ্চিৎ বাড়ানো যায়। এমন কি আমার দিল্লীওয়ালী বান্ধবীরা ক্ষীরকে বলে ক্ষীর, আবার পায়েসকেও বলে ক্ষীর। অবিশ্যি তারা ভাতকেও চাউল বলে। মোট কথা ক্ষীরের সঙ্গে নানাবিধ উপকরণ মেশালে তাকে পায়েস বলা হয়। রসগোল্লা দিয়ে ক্ষীর ফুটিয়ে নিলে হয় রসগোল্লার পায়েস।

বাসী লুচি চার টুকরো করে কেটে মিষ্টি ক্ষীরে ফুটোলে লুচির পায়েস হয়। সে এত ভালো যে রাবড়ি বলে ভুল হয়। নুন বাদ দিয়ে কুচো নিমকি ভেজে ঘন দুধে মিষ্টি সহ ফুটোলে চমৎকার পায়েস হয়। আমার বন্ধু পূর্ণিমা ঠাকুর একবার আমাকে অপূর্ব এক সামগ্রী খাইয়ে বলল, 'এটা কি বল?' বললাম 'লিচুর পায়েস, তাতে সন্দ নেই।' বলল, 'মোটেই না। চিনি দিয়ে ক্ষীর করে তার মধ্যে আস্ত পেঁয়াজ সিদ্ধর পাপড়ি খুলে মিশিয়ে একবার ফুটোলেই উৎকৃষ্ট পেঁয়াজের পায়েস হয়। কুচি কুচি ছানা ভাপিয়ে বা ভেজে, কিংবা ছানা মেখে চিনির রসে ফুটিয়ে ক্ষীরের সঙ্গে মিশিয়ে ফুটিয়ে নিলে ছানার পায়েস হয়। তবে সব চাইতে ভালো পায়েস হল নতুন গুড় দিয়ে সুগন্ধী গোবিন্দভোগ চালের পায়েস। এক সের ভালো দুধে এক ছটাক চাল ধুয়ে গাওয়া ঘি মাখিয়ে কম আঁচে ফুটিয়ে ফুটি... চাল সিদ্ধ ও দুধ ঘন হলেই তাকে ঠাণ্ডা করে গালানো গুড় মিশিয়ে, এলাচের গুঁড়ো দিতে হয়। কিসমিস, পেস্তা বদামের কুচিও চলে। ইতি শান্তি।

ছবি: সুব্রত চৌধুরী

দেশ

এটি কিনুন...

আর এটি নিন 'বিনামূল্যে'

উৎকৃষ্ট উৎপাদন তো বটেই, তার ওপর
'প্রাইড' অতিরিক্ত মুনাফাও দেয়।

একটি 'প্রাইড' ডিলাক্স শেভিং ব্রাশ কিনলে,
তার সঙ্গে ২ টা. ১৫ প. দামের একটি
'প্রাইড' টুথব্রাশ পাবেন—
বিনামূল্যে!

কিম্বা যদি 'প্রাইড' রেগুলার শেভিং ব্রাশ
কেনেন, তাহলে তার সঙ্গে ১ টা. ৬০ প.
দামের একটি 'প্রাইড' জুনিয়ার টুথব্রাশ
পাবেন — বিনামূল্যে!

আর যদি 'প্রাইড' পপুলার শেভিং ব্রাশ
কেনেন, তাহলে তার সঙ্গে ২০ গ্রামের
'প্রাইড' টুথপাউডার পাউচ প্যাক পাবেন—
বিনামূল্যে!

যতদিন স্টক থাকবে, এ সুযোগ কেবল
প. বঙ্গে বলবৎ থাকবে।

তাড়াতাড়ি করুন!
আজই প্রাইড আনুন।

আপনার শুভদিন শুরু করতে চাই—

বিজয় ইঞ্জিনীয়ারিং
৩ আরাধনা, ৮৮ ক্যাডেল রোড, মাহিম, বম্বে-৪০০ ০১৬। ফোন: ৬৪২ ৭৫৩৮

ঠাকুরবাড়ির খাওয়াদাওয়া : শীতকালে

চিত্রা দেব

আমসত্ত দুধে ফেলি
তাহাতে কদলী দলি
সন্দেশ মাখিয়া দিই তাতে,
হাপুস হুপুস শব্দ
চারিদিক নিস্তব্ধ
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

পড়লেই চোখে ভেসে ওঠে খাওয়া-দাওয়া'র একটা ভরপুর ছবি। তবে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে শীতকালটা সবারই পছন্দ। আমাদের গরম দেশে শীতকাল আনে স্বস্তি, আনে আরাম। শুধু তাই নয়, শীতকালে সোনার ফসলে ঘর ভরে যায়, নিশ্চিন্ত বিশ্রামের অবিমিশ্র সুখে কাটে ক'টা দিন। খাদ্যরসিক বাঙালীর রসনা সরস হয়ে ওঠে নানাবিধ সুখাদ্যে, নবান্ন ও পৌষপার্বণ তো আছেই, সেই সঙ্গে চলে দৈনন্দিন ভোজ্যতালিকায় নিত্য নতুন সংযোজন।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বনেদিয়ানা অনেকদিনের। মালক্ষ্মীর পদ্মের অনেকগুলো সোনার পাপড়ি দ্বারকানাথের ঘরে এসে পড়ার আগে পর্যন্ত এই বাড়িটি বোধহয় ধনে-মানে আর পাঁচটা ধনীগৃহের তুলনায় স্বতন্ত্র ছিল না। দ্বারকানাথের মনটিও ছিল সেকালের বাবুদের মতোই দরাজ। বেপরোয়া খুশির প্রমোদে গা ঢেলে দিয়ে কতবার তাঁর সাজানো বাড়িতে বসেছে রাজকীয় ভোজসভা। একা দ্বারকানাথের ডিনার বাবদই নাকি খরচ হত তিনশ টাকা। তাঁর ভোজসভা নিয়ে ছড়ার গান বাঁধা হয়েছিল 'খানা খাওয়ার কত মজা আমরা তার কি জানি ? জানেন ঠাকুর কোম্পানী।' অপরদিকে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে দিগম্বরী দেবী আহার করতেন স্বপাকে, একবেলা। পরাণ ঠাকুর তাঁর রান্নার সামান্য উপকরণ গুছিয়ে দিত হাতের কাছে। সদর ও অন্দরের এই বৈপরীত্যই বোধহয় তৎকালীন ধনী পরিবারের স্বাভাবিক চিত্র।

মহর্ষি পরিবারে এ রীতির অনেক অদল বদল হয়েছিল। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হবার পরই দেবেন্দ্রনাথ ডিনারের সমারোহ বন্ধ করে দিয়ে ডাল-রুটি খাওয়ার প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালেও ঠাকুরবাড়ির রোজকার ব্যঞ্জন ছিল ডাল, মাছের ঝোল ও অম্বল। বড়ি ভাজা, পোর ভাজা, আলু ভাতে ছিল ভোজের অঙ্গ। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী লিখেছেন, 'একবার জমিদারীর আয় কমে গিয়েছিল। তখন আমার শ্বশুর বলে পাঠালেন বউদের রান্না শেখাও।' এমনিতেও প্রত্যেক মহলে আলাদা আলাদা রান্নার ব্যবস্থা ছিল, তোলা উনুনে গিন্নীরা নিজের নিজের

হয়ত সময়টা গ্রীষ্মের দুপুর, তবু ঠাকুরবাড়ীর ভোজনপর্বেরই দৃশ্য এটি। আত্মীয়বর্গের সঙ্গে খেতে বসেছেন রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিদাদা (বামে), পরিবেশনে ইন্দিরা দেবী, পাখা হাতে সরলা দেবী
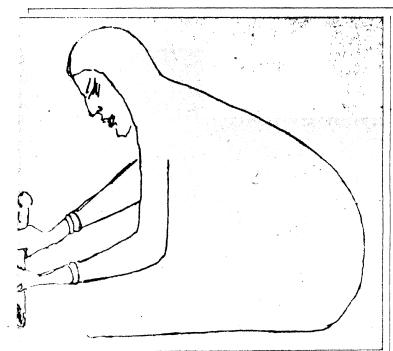
শীতের রাত্রে চিংড়ি মাছের হুসনিকারি দিয়ে ময়দার নরম রুমালি রুটি। ছবি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রুচি ও স্বামীর ফরমাশ অনুযায়ী নানারকম রান্না করতেন।

এরপর মহর্ষির নির্দেশে বাড়ির প্রতিটি কন্যা এবং বধূকে রান্নার তালিম নিতে হত। রন্ধনপটিয়সী এক আত্মীয়া বধূদের শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন। পছন্দমতো রাঁধবার জন্যে কন্যা এবং বধূরা প্রতিদিন প্রত্যেকে একটি করে টাকা পেতেন। মাছ তরকারি কেনা হত সে টাকায়। মহর্ষি বাড়িতে থাকলে প্রতিটি ব্যঞ্জনই তাঁকে সাজিয়ে দেওয়া হত। তিনি অতি সামান্য মুখে দিলেও এ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ এবং উৎসাহ দুই-ই ছিল। অবন ঠাকুর লিখেছেন মহর্ষির জন্যে গরুদের গুড় খাইয়ে তাদের দুধ মিষ্টি করার কথা। এ ছাড়াও হত নানারকম আয়োজন। গ্রীষ্মে মহর্ষি বেশির ভাগ সময়েই থাকতেন পাহাড়ে। শীতকালে গৃহে হত উৎসবের আয়োজন।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে প্রধান উৎসব ছিল ১১ মাঘের ব্রহ্মোৎসব। দুর্গাপুজোর মতো এই দিনটিকে আড়ম্বরপূর্ণ করে তোলার জন্যে মহর্ষি বেশ বড় মাপের আয়োজন করতেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবী লিখেছেন, 'পূর্বে পূজার সময়ে যেরূপ বৃহদাকারের মেঠাই তৈরি হইত এগারোই মাঘেও সেইরূপ মেঠাইয়ের ব্যবস্থা ছিল। সেই বড় বড় মেঠাইয়ের স্তূপ সকালবেলা হইতে বাহিরের ঘরে টেবিলের উপর সাজানো থাকিত ; যাহার যখন ইচ্ছা খাইতেন—কোন বাধা ছিল না।'

এগারো মাঘের উৎসবের তোড়জোড় শুরু হত মাঘ মাসের শুরু থেকেই। সমস্ত বাড়ি সাজানো হত, সবাই নতুন পোশাক পেত। রাত্রে ও দিনে ভূরিভোজের ব্যবস্থা ছাড়াও টেবিলে সাজানো থাকত বড় বড় দরবেশী মেঠাই ও কমলালেবুর পিরামিড। এই মেঠাই বস্তুটি সবার স্মৃতি কথাতেই বার বার এসেছে এবং সময়ের ব্যবধানে অনেক কিছুর পরিবর্তন হলেও মহর্ষির আমলে যে মেঠাই তৈরি হত তার চল জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অক্ষুণ্ণ ছিল দীর্ঘকাল। আগে এ মেঠাইয়ের আকার হত ফুটবলের মতো। মেঠাই তৈরির ভার ছিল কুঞ্জ নামে এক হালুইকরের হাতে। সৌম্যেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'দালানের পেছনে গোলাবাড়িতে থাকত বুড়ো কুঞ্জ, সে পঞ্চাশ বছরেরও উপর আমাদের বাড়িতে কাজ করেছে। তার কাজ ছিল এগারোই মাঘের উৎসবের দিনে মেঠাই তৈরি করা।' সৌম্যেন্দ্র নিজেও শৈশবে কুঞ্জকে মেঠাই তৈরি করতে দেখেছিলেন। সদ্যপ্রয়াতা অমিয়া দেবীর মুখে শুনেছিলুম মেঠাই তৈরি হত খোয়া ক্ষীরের সঙ্গে দরবেশের বেসন মিশিয়ে। এই খোয়া ক্ষীরকে বলা হত মেওয়া। এর সঙ্গে মেশানো হত চিনি, কিশমিশ, বাদাম, পেস্তা প্রভৃতি। তার ওপর সুগন্ধি তবক। স্বাদে গন্ধে মেঠাইয়ের তুলনা ছিল না। মধ্যাহ্নভোজের বারোয়ারী আয়োজন তিনি দেখেননি তবে বাড়ির লোকেরা সবাই মিলে একসঙ্গে বসে খিচুড়ি খেতেন নানারকম ভাজাভুজি দিয়ে।

মহর্ষি পরিবার ব্রাহ্ম হলেও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের আনন্দ বর্জন করা হয়নি। সাবেকী আমল থেকে যে সব নিয়ম চলে আসছে সেগুলি সবই পালিত হত এখানে। কার্তিক মাসে ভাইফোঁটা, অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন, পৌষমাসে পিঠেপার্বণ, মাঘমাসে মাঘোৎসব তো ছিলই, সরস্বতী পুজো পুরুষমহলে সারস্বত সম্মেলনে পরিণত হয়েছিল, বসন্তোৎসবের আবির খেলা বা নববর্ষের মিলনোৎসবও বাদ যায়নি। এদের ধর্মীয় দিনটিকে গ্রহণ না করলেও আনন্দানুষ্ঠানকে বর্জন করেননি মহর্ষি।

ভাইফোঁটার পর থেকেই শীতের আমেজ। অগ্রহায়ণ মাসে নতুন চাল উঠলে হবে নবান্ন। এখন এ অনুষ্ঠানটা শহরে বিশেষ হয় না। আগে ঘরে ঘরে হত : ঠাকুরবাড়িতে সৌদামিনী কাঁচা দুধে সুগন্ধি কামিনীভোগ আতপচাল, আখ, খেজুর গুড়ের পাটালি, নারকেল প্রভৃতি দিয়ে নবান্ন তৈরি করে প্রত্যেকের ঘরে পাঠিয়ে দিতেন। ঠাকুরবাড়ির প্রকৃত গৃহিণী ছিলেন তিনিই। ভাঁড়ার ঘরের চাবি থাকত তাঁর আঁচলে।

জোড়াসাঁকোর অপর বাড়ি অর্থাৎ গুণেন্দ্র পরিবারে এ অনুষ্ঠান হত আনুষ্ঠানিকভাবে। গগনেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা সুজাতা বললেন, শীতকালে নতুন যা কিছু উঠত সবই দেওয়া হত নবান্নয়। কাঁচা দুধে ভালো আতপচালের সঙ্গে পাটালি গুড়, নারকেলকোরা, কমলালেবুর কোয়া, আঙুর, কড়াইশুঁটি, কিশমিশ, বাদাম সহযোগে তৈরি হত নবান্ন, পাথরের বাটি ভরে ভরে খেতেন সকলে। ঠাকুরবাড়িতে কাঁসার বাসনের চল ছিল না। পুরুষেরা খেতেন জয়পুরী সাদা পাথরের থালা বাটিতে, মেয়েরা কালো পাথরের থালা বাটিতে। এছাড়া ছিল রুপোর বাসন।

রবীন্দ্রনাথেরও ঝোঁক ছিল দেশীয় খাদ্যের ওপরে। একরকম খাবার দুদিনের বেশি খেতে চাইতেন না, নিত্য নতুন রান্না হলে ভারি খুশী হতেন। নবান্নের স্বাদটিও তিনি পেতে চাইতেন অকৃত্রিমভাবে। বিয়ের পর একবার অমিতাদেবীর ওপর ভার পড়েছিল নবান্ন তৈরি করবার। গল্পটি তাঁর মুখেই শোনা। গুরুদেবকে পাঠানো হবে সুতরাং সুস্বাদু হওয়া চাই। নবান্নের স্বাদ বাড়াবার একাগ্রতায় অমিতা কাঁচা দুধের বদলে দুধটা একটু ঘন করে ক্ষীরের মতো করে দিলেন। দুরু দুরু বক্ষে দিয়ে এলেন বনমালীর হাতে। বনমালী সাজিয়ে দিল খাবার সময়ে। রবীন্দ্রনাথ অমিতার তৈরি নবান্ন খেয়ে শুধু বলেছিলেন, 'এটা কি নবান্ন হয়েছে ?'

নবান্নর পরে পৌষপার্বণ অপর একটি শীতকালীন খাওয়া দাওয়ার উৎসব। কিন্তু অগ্রহায়ণ মাস থেকেই শুরু হয়ে যেত শীতকালের নিরামিষ ব্যঞ্জন রান্না। ঠাকুরবাড়িতে একসময় অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে রন্ধনশিল্পও চরমোৎকর্ষ লাভ করেছিল। দেশী, বিলিতি রান্না তো বটেই সেই সঙ্গে বাড়ির নারী এবং পুরুষেরাও নানারকম নতুন রান্না আবিষ্কারের নেশায় মেতে ওঠেন। মহর্ষির নিজেরও এ অভ্যাস ছিল। প্রথম দলে যাঁরা ব্রাহ্ম হয়েছিলেন তাঁদের নিয়ে তিনি চাঁপ দানির বাগানে যেতেন মাঝে মাঝে। বামুন-চাকর সঙ্গে যেত, গাছতলায় উনুন খুঁড়ে রান্নাবান্না হত : কেউ কেউ শখ করে রাঁধতেন। উপাসনার পর রান্নার আয়োজন হলে মহর্ষি একবার বললেন, 'পায়েসটা আমি রান্না করব ; আমি পায়সান্ন পরিবেশন করে খাওয়াব সবাইকে।' রান্না হল। খেতে বসে সবাই চুপ। দেবেন্দ্রনাথ বললেন, 'কী,

ঠাকুরবাড়ীর সকলেই খুঁজতেন পাকপ্রণালীর নব নব কৌশল ছবি : নন্দলাল বসু

কেমন হয়েছে পায়েস ? ভাল হয়েছে তো !'

সবাই ঘাড় নাড়লেন, ভাল হয়েছে। একজন বলে ফেললেন, 'তবে একটু ধোঁয়ার গন্ধ।' দেবেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'ধোঁয়ার গন্ধ হয়েছে তো ? ওইটিই আমি চাইছিলুম, আমি আবার পায়েসে একটু ধোঁয়াটে গন্ধ পছন্দ করি কিনা।' আসলে পায়েসটা রান্নার সময় ধরে গিয়েছিল। নতুন নতুন রান্নার 'এক্সপেরিমেন্ট' করতে ভালবাসতেন রবীন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ দুজনেই। তাঁদের অনেক গল্পই আমরা শুনেছি। রান্নাঘরে মোড়ায় বসে কবি স্ত্রীকে নতুন রকমের রান্নার ফরমাশ করতেন। মৃণালিনীদেবীর গৃহিণীপনায় সব রান্নাই উতরে গেলে কবি তাঁকে রাগাবার জন্যে বলতেন, 'দেখলে, তোমাদেরই কাজ, তোমাদের কেমন এই একটা শিখিয়ে দিলুম।' পরবর্তীকালে কবি প্রতিমাদেবীকে বলতেন, 'বৌমা, তোমার শাশুড়িকে আমি কত রান্নার মেনু জোগাতুম, আমি অনেক রান্না তাঁকে শিখিয়েছিলুম, তোমরা বিশ্বাস করবে না জানি।' বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা বলতেন, 'তিনিও তো খুব ভালো রাঁধিয়ে ছিলেন, আমরা শুনেছি।' কবি হেসে বলতেন, 'তা ছিলেন, নইলে আমার মেনুগুলো এত উত্‌রত কি করে ?'

ঠাকুরবাড়িতে মেয়েরা পুরুষদের সামনে বা একসঙ্গে বসে কখনও খেতেন না। সেটাই ছিল তখনকার দস্তুর। মহর্ষি পরিবারে এই রীতিটি তুলে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁর ইচ্ছের কথা জানতে পেরে মহর্ষিই সে ব্যবস্থা করে দেন। সৌদামিনী লিখেছেন, 'বাড়ির ছেলেমেয়েরা সকলে একসঙ্গে বসিয়া খাইবে মেজদাদার এই ইচ্ছা জানিতে পারিয়া পিতৃদেব একটি বড় ঘরে খাইবার স্থান নির্দেশ করিয়া আমাদের সকলের একত্রে খাওয়া নিয়ম করিয়া দিলেন। প্রথম প্রথম আমরা লজ্জায় খাইতেই পারিতাম না—অল্প কিছু মুখে দিয়া বসিয়া থাকিতাম, ক্রমে ক্রমে আমাদের লজ্জা ভাঙিল।'

শুধু তাই নয়, রান্না সম্বন্ধে নানারকম পরীক্ষার পালাও শুরু হয় এসময় থেকে। ঠাকুরবাড়ির ছেলেরাও এ ব্যাপারে কমবেশি উৎসাহী হয়ে ওঠেন। ভাতের থালায় বৈচিত্র্যসঞ্চারে হেমেন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল বেশি। তিনি ফরাসী যুবক কাঁথরাকে পাচকের কাজ দিয়ে ফরাসী রান্নার স্বাদও গ্রহণ করেছিলেন। কাঁথরা তাঁকে শুধু ফরাসী খানাই খাওয়াতো না, ফরাসী ভাষাও শেখাতো। হেমেন্দ্রনাথের মেজো মেয়ে প্রজ্ঞাসুন্দরী শুধু রন্ধন পটিয়সী ছিলেন না, রান্নার বইও লিখেছিলেন। তাঁর বইয়ের অধিকাংশ রান্নাই ঠাকুরবাড়িতে হত। সবই যে তাঁদের নিজস্ব আবিষ্কার তা নয়, নিত্য নতুন রান্নার স্বাদ গ্রহণের আগ্রহে ঠাকুরবাড়ির সকলেই খুঁজতেন পাকপ্রণালীর নব নব কৌশল। আর সেকালে সব মেয়েই তো রাঁধতে জানতেন। তাই ঠাকুরবাড়ির রান্নাঘরে বাংলার সব অঞ্চলের ব্যঞ্জন যেমন হাজির হয়েছিল তেমনি তাতে মিশেছিল ঐ বাড়ির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এ বাড়ির সব রান্নাতেই মিষ্টি পড়ত বেশি, মশলা রুচিভেদে কোথাও বেশি, কোথাও কম। প্রজ্ঞাসুন্দরী অগ্রহায়ণ মাসের খাবারের একটি তালিকা করেছিলেন, ভুল বললুম বারো মাসেরই তালিকা আছে, অগ্রহায়ণের তালিকায় চোখ বোলালেই বোঝা যাবে ঠাকুরবাড়িতে শীতকালীন খাওয়া-দাওয়ার সূচনা হত কী ভাবে :

কলাইশুঁটির ডাল
কুমড়াবড়ির ঝোল
কুমড়াবড়ির ডালনা
কচি মুলার ঘণ্ট
থামে আলুর ডালনা
লাউয়ের ডালনা
লাউয়ের ঘণ্ট
ওলকপির ঘণ্ট
ওলকপির কারী
মুগের ডাল দিয়া ওলকপি
অরহর ডাল দিয়া ওলকপি
ফুলকপির ডালনা
ফুলকপির ঘণ্ট
বিটের কালিয়া
বিটের হিঙ্গি
ফুলকপি ভাজা
ফুলকপি সিদ্ধ
ফুলকপির অম্বল আম-আদা দিয়া
বাঁধাকপি সিদ্ধ
বেশন দিয়া বাঁধাকপি ভাজা
বাঁধাকপির ডালনা
বাঁধাকপির কালিয়া
পালম শাকের ঘণ্ট
পালম শাকের শিষ দিয়া ডালনা
কলাইশুঁটির কোপ্তা
কলাইশুঁটির কোপ্তাকারী
আলুর চপ
কাঁচা কুল ও বেগুনাদির অম্বল
চালতার গুড় অম্বল
পাকা আমড়ার অম্বল
টোপাকুলের অম্বল

স্বপ্ন আজ সার্থক হয়েছে!

পাইলট! এরোপ্লেন চালানোই ওর জীবনের স্বপ্ন ছিল। ছেলেবেলা থেকে ওর এই একই ধ্যান এবং একই ভাবনা। আমার মনে আছে, ওকে শক্ত-সমর্থ ভাবে বেড়ে ওঠার জন্য দিনে দুবার করে হরলিকস খেতে বলতাম। আজ ওর স্বপ্ন সত্যিই সার্থক হয়েছে — ভেবে কত ভাল লাগছে, ওকে দিনে দুবার করে হরলিকস খাবার অভ্যাস করিয়েছিলাম। এত বছর ধরে হরলিকসই ওকে সার্থকতার পথ দেখিয়েছে।

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের পক্ষে উপকারী

হরলিক্স ঘন দুধ, মল্টেড বার্লি আর সোনালী গমের দানার পুষ্টিগুণে ভরা একটি সুস্বাদু পানীয়।
১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে, পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি পরিবারে পুষ্টি যুগিয়ে আসছে।

পুষ্টি যোগাতে অদ্বিতীয়

HMM-8240 BEN

পাকা আমড়া দিয়া দুধভাত
খিচুড়ি
ফেনসা ভাত
পোলাও
জল শুঁজিয়ার পোলাও।

প্রজ্ঞাসুন্দরীর তালিকায় পৌষ ও মাঘ মাসের হিসেবও আছে। তবে সেগুলো এত দীর্ঘ নয়। পৌষমাসের তালিকায় কলাইশুঁটির খিচুড়ি, কাঁচালঙ্কার ডালনা, সজনে ফুলের রাই আর মুলোঘণ্ট থাকলেও মাঘমাসের তালিকা একেবারে অন্য। সে সময় যেটি দুর্লভ সেটি প্রিয়জনের পাতে দিতে পারার আগ্রহ দেখা যেত তাঁদের বাড়িতে। তাই মাঘমাসের তরকারির মধ্যে ইঁচড় দিয়া কলাইশুঁটির ঘণ্ট, টোপাকুল দিয়া সজিনাফুল দিয়া অম্বল, সজিনা ফুলের বড়া, আমের বোলের অম্বল, আমড়ার বোলের অম্বল, ইঁচড় দিয়া ছোলার ডাল, ফুলকপি দিয়া ছানার ঘণ্ট, কমলানেবুর কারী, কমলানেবুর বরফির প্রাধান্য। শেষেরটি অবশ্য তরকারি নয়, মিষ্টি। এই খাবারটির কথা সুভো ঠাকুরের মনে ছিল চিরদিন। তাঁর শৈশব স্মৃতির সঙ্গে জড়ানো শীতের রাতের ডিনারের সঙ্গে।

হেমেন্দ্রনাথের আহারের শৌখিনতার উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন তাঁর তিন পুত্র হিতেন্দ্র, ক্ষিতীন্দ্র ও ঋতেন্দ্র। তিন পরিবারেই খাওয়া-দাওয়ার বৈচিত্র্য ছিল। হিতেন্দ্র পরিবারে মোগলাই খানা পছন্দ করতেন সকলে। পাকা রাঁধিয়ে ছিলেন হিতেন্দ্রের স্ত্রী। অমিয়াদেবী তাঁর শাশুড়ির কাছে শুনেছিলেন মহর্ষির বাবুর্চি কালোর স্ত্রী খুব ভালো রাঁধতে পারত। তাকে তাঁরা বলতেন কালোর মেম। কালোর মেমের কাছেই বহু রান্নায় হাতে খড়ি হয়েছিল বধূদের। হিতেন্দ্র পরিবারে বেশিরভাগ দিনই সকালবেলায় আলু পেঁয়াজে ছোকা, বেগুনভাজা, কাঁচা মুগের ডালভিজে ও শশার সঙ্গে থাকত ময়দার লুচি। লুচিরও বৈশিষ্ট্য ছিল। ছোট ছোট চার আঙুল ব্যাসের সাদা ধবধবে ফুলকো লুচি। প্রথম ঘিয়ে ভাজা লুচি খেতেন পুরুষেরা, তারপরে ভাজা হত মেয়েদের জন্যে, তৃতীয় দফার লুচি হত বৌয়েদের জন্যে। এছাড়া জলখাবারে প্রতিদিনই থাকত পাউরুটি ও আলুভাজা। হিতেন্দ্র গৃহিণী এ দুটি খুবই পছন্দ করতেন। দুপুরে তিন পরিবারেই সাবেকী বাঙালীয়ানা বজায় ছিল। শীতকালে শুকতো, দই দিয়ে বড় বড় কই মাছের ঝোল, লাউ দিয়ে কই মাছ, ক্ষীর মেশানো ভাপা দই এবং আরো অনেক কিছু যা প্রজ্ঞাসুন্দরীর তালিকায় আছে। বিকেলের চায়ের আসরে কোনদিন সিঙাড়া, কোনদিন নিমকি। শীতকালে বরফিটাই বেশি হত। পেস্তার বরফি, বাদামের বরফি, নারকেলের বরফি। প্রত্যেকটিতেই জড়ানো হত সোনালি তবক।

কথায় বলে ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ, রবীন্দ্রনাথ আবার এই তবক দেওয়া, আতর দেওয়া মিষ্টি দু' চোখে দেখতে পারতেন না। অমিতা ঠাকুর একবার অনেক যত্ন করে তৈরি করেছিলেন পেস্তার বরফি। শীতের দিনেই পেস্তা পাওয়া যেত বেশি। অনেক যত্ন করে তৈরি করে দিয়ে এলেও রবীন্দ্রনাথ বরফিটা খাননি, বাজারের জিনিস ভেবে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। আরেকবার অমিতা পাঠিয়েছিলেন মোরব্বা, সেটাও কবির ভাল লাগেনি তেমন, বলেছিলেন 'কি বিলিতি বিলিতি গন্ধ'। অথচ অমিতার হাতের মাংস রান্না তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। পরে প্রতিমাদেবী তাঁর জন্যে মাংসের ঝোল রান্না করলে সুধাকান্ত রায়চৌধুরী গল্পচ্ছলে তাঁকে খাওয়াবার জন্যে বললেন, 'আজ বৌদি পাঁঠার মাংস রেঁধেছেন, খেয়ে দেখুন।' উত্তরে কবি হেসে বলেছিলেন, 'নাতবৌয়ের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া শক্ত হবে।' তাঁর জন্যে রান্না করা খুব শক্ত ছিল, মশলা ছাড়া স্বাদু ঝোল তিনি ভালবাসতেন। উপনয়নের সময় কাদম্বরীদেবী মশলাবিহীন হবিষ্যান্ন রেঁধে দিতেন, সে রান্নার স্বাদ গন্ধ কবিকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। একমাত্র চৈ দিয়ে রাঁধা ঝোল তাঁর ভাল লাগত। চৈয়ের গন্ধ, মৃদু ঝাল স্বাদ তাঁর প্রিয় ছিল। যশোরের এই বিশেষ মশলা বা শিকড়টি পাওয়া যেত শীতের দিনে। লঙ্কা তিনি একেবারেই খেতেন না। অমিতার মা লাবণ্যলেখা দেবী একবার শান্তিনিকেতনে ঝালহীন ঝোলে শুধু গন্ধ হবে বলে সাজিয়ে দিয়েছিলেন দুটি লঙ্কা, কবি সে ঝোল স্পর্শ করেননি। ফিরে আসি হেমেন্দ্র পরিবারের প্রসঙ্গে।

ক্ষিতীন্দ্র পরিবার পছন্দ করতেন বিদেশী খাবার। এই পরিবারের বধূ মেনকাদেবী জানালেন তাঁর শ্বশুরমশায় বা স্বামী কেউই মোগলাই খানার ভক্ত ছিলেন না। শীতকালে তাঁরা উপবাসভঙ্গ করতেন টোস্ট, স্যাণ্ডুইচ, ডিমের পোচ দিয়ে। মাঝে মাঝে হত বোম্বাই টোস্ট—পাউরুটিতে ডিম মাখিয়ে মাখনে ভেজে। দুপুরের খাওয়াটা হত ভারতীয় রীতিতে। বামুন ঠাকুর হরিপদ রান্না করত। খুব সরু আতপচালের ভাত, কপি দিয়ে ভাজা মুগের ডাল, মাগুরমাছের ঝোল বা রুইমাছের দমপোক্ত বা চিংড়ি মাছের হুসনিকারি আর খুব সরু করে কাটা আলুভাজা—চুলের মতো সরু করে কাটা এই আলুভাজা প্রতিদিনই চাই। ভালবাসতেন স্টাফিং টমেটো—গোটা টমেটোর মধ্যে মশলামাখা কিমা পুরে আগুনে ঝলসানো—দারুণ খেতে। এছাড়া চচ্চড়ি টচ্চড়ি—তবে বড়ি খেতেন না এঁরা। শেষ পাতে মিষ্টি দই আর দুটো সন্দেশ। রাত্রে এর বিপরীত। একেবারে সাহেবী কায়দায় ডিনার। শীতকালীন মেনু ছিল পোলাউ, মুরগীর রোস্ট, স্যালাড, ফিশফ্রাই, আলুর চপ, হ্যামবেকিং, স্টাফিং রোস্ট, সুপ দিয়ে শুরু হয়ে পুডিং-এ শেষ। প্রজ্ঞাসুন্দরীর তালিকায় বিদেশী খাবারও আছে:

পাতলা পাঁউরুটির ক্রুটোঁ
জারক নেবু
বাদামের সুপ
ভেটকী মাছের মেওনিজ
মুরগীর হাঁড়ি কাবাব
মটনের গ্রেভি কাটলেট
শবজী ও বিলেতী বেগুনের স্যালাড
স্নাইপরোস্ট
আলুর সিপেট
উফ্‌স্‌ আলানিজ
ডেজার্ট
কফি।

মহর্ষি চাঁপাদানির বাগানে যেতেন মাঝে মাঝে, সেখানে গাছতলায় উনুন খুঁড়ে রান্নাবান্না হত ছবি : নন্দলাল বসু

ঋতেন্দ্র পরিবারে শীতকালের খাবার ছোটদের খুব প্রিয় ছিল। গরমকালে তাদের সবাইকে দুধ খেতে হত তার সঙ্গে দেশী লুচি তরকারি, অঙ্কুরসমেত ভিজে ছোলা আর মুগ, শশার সঙ্গে আদার কুচি। কিন্তু শীতকালে সকালবেলায় জলখাবারে মিশত বিলিতি আমেজ। সুভো ঠাকুরের ভাষায়, 'লুচির বদলে টোস্ট এবং সেই টোস্টের ওপর ডিমের স্ক্র্যামবেল্ড এগের মোটা প্রলেপ। এছাড়া থাকত জ্যাম অথবা জেলি। নতুবা অস্ট্রেলিয়ান হানি উইথ হানিকম্ব অর্থাৎ মৌচাকের টুকরো সমেত মৌ-সুদ্ধ মধুতে চোবান এই চাকগুলো চুষতে লাগত অতিশয় চমৎকার। ছোটদের জন্য সাদা দুধের বদলে হত কোকো অথবা ওভালটিন।' ঠাকুরবাড়িতে গরমকালে চায়ের পাট ছিল না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও বলেছেন, 'শীতকালেই আমাদের চায়ের বরাদ্দ ছিল। এ চা চীনদেশের চা—তখনও আসামের চা আমাদের দেশে প্রচলিত হয় নাই। সে চায়ের কি সুগন্ধ।'

ঋতেন্দ্র পরিবারেও দিনেরবেলা দিশি পাকপ্রণালীমতো রান্না হত। রাত্রে সুভো ঠাকুরের যেটুকু মনে ছিল তা হল চিংড়ি মাছের হুসনিকারি

দিয়ে ময়দার নরম রুমালি রুটি খাওয়া। অন্যান্য আয়োজনও নিশ্চয় থাকত। বিশেষ করে অরেঞ্জ ব্লুমের সেই স্বাদ। 'কমলালেবুর ভিতরের সমস্ত কোয়াগুলো অটুট অবস্থায় বের করে তারই রসে জমানো হত সেই আস্ত কমলালেবুর খোলার মধ্যে কমলালেবুর জেলি। মাথাটা চাকতি করে কেটে চামচ দিয়ে সেই জেলি কুরে কুরে খাওয়ার লোভ সম্বরণ করা ছোটদের পক্ষে হত দুঃসাধ্য।'

এ তো গেল বড়মাপের খাওয়া দাওয়ার আয়োজন। এছাড়া ঠাকুরপরিবারের পাঁচ নং এবং ছয় নং বাড়িতে শীতের বিকেলে প্রায়ই হত চিঁড়ে ভাজা ও কড়াইশুঁটি ভাজা, কড়াইশুঁটির কচুরি, আলুর চপ, খোয়া ক্ষীর দিয়ে ছোলার ডালের হালুয়া, মাছের কচুরি, মাংসের সিঙাড়া, ফুলকপির সিঙাড়া, আলুর কচুরি, মুড়ির সঙ্গে সাঁতলা ভাজা। সাঁতলা ভাজার অবশ্য সময় নেই তবে শীতেই বেশি হত। অমিয়াদেবীর প্রিয় জিনিস ছিল এটি। প্রস্তুত প্রণালীটিও মনে ছিল তাঁর, মুড়ি, চিঁড়েভাজা, খই, ছোলামটর ভাজা, পোস্ত ঘিয়ে ভেজে সব একসঙ্গে মিশিয়ে তেজপাতা, হলুদ দিয়ে ভেজে তৈরি হত মুখরোচক জলখাবারটি। বাড়ির মেয়েরাই এসব খেতেন বেশি। আবার কোনদিন তাঁদের শখ হত ফলার খাবার—ঘন দুধ, কামিনীভোগ চালের চিঁড়ে, মুড়কি, পাটালি, কলা, আখ, সন্দেশ প্রভৃতি দিয়ে হত ফলার। গগনেন্দ্র পরিবারের সকলে ভালবাসতেন সরভাজা। এক কড়া দুধ জ্বাল দিয়ে চাঁচি তৈরি করে সেই চাঁচি ছুরি দিয়ে কেটে ঘিয়ে ভেজে রসে ফেলা হত।

শীতকালে একদিকে যেমন ভালো খাওয়া দাওয়া হত তেমনি অন্তঃপুরের গৃহিণীদের নজর রাখতে হত ভাঁড়ারের দিকে। গরমকালে যেমন শীতকালের কথা ভেবে তৈরি করে রাখতেন আমসত্ত্ব, আমচুর, আমের আচার কি কাসুন্দি শীতকালেও তাঁদের নজর রাখতে হত বড়ি দেওয়া, কুলকুটো, কুলের আচার, তিলকুটা, গুড়কুল, গুড় তেঁতুল তৈরি করা হচ্ছে কিনা। সুজাতাদেবী বললেন, তাঁর বাপেরবাড়িতে ফুলকপি, আলু, সিম দিয়ে আচার হত—সবগুলো কেটে একসঙ্গে সেদ্ধ করে মশলা ও তেল দিয়ে। অগ্রহায়ণ মাসে সব বাড়িতেই বড়ি দেবার সূচনা হত 'বড়ি হাত' দিয়ে। দুটো বিউলির ডাল বাটা তালের ওপর সিঁদুর দুর্বাঘাস দিয়ে অনুষ্ঠান করে বড়ি দেওয়া শুরু হত। বড়িও ছিল বিভিন্ন রকমের। কুল ঢেঁকিতে কুটে নিয়ে গুড়ে পাক করে কুলকুটো তৈরি হত অবনঠাকুরদের বাড়িতে—এক অন্দরমহল থেকে সেগুলি যেত অন্যের অন্দরমহলে আবার সৌদামিনী খুব ভালো তিলকুটা করতে পারতেন, সেটি তিনি এ বাড়িতে পাঠাতেন গগনেন্দ্র ভালবাসেন বলে।

রবীন্দ্রনাথের মতো অবনীন্দ্রনাথও রান্নার এক্সপেরিমেন্ট করতেন। বাড়ির ছোটদের নিয়ে তিনি যেমন রান্নার ক্লাস খুলেছিলেন তেমনি নিজেও বই দেখে রান্না শেখাতেন রাধুকে। প্রথমে তাঁদের বাবুর্চি ছিল নবীন, তারপরে তালেব আলি, শেষে রাধু। সে অবশ্য বাবুর্চি ছিল না তবে সবই শিখে নিয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ প্রচলিত রান্নাকে একটু আধটু উল্টে দিয়েছিলেন। যেখানে প্রথমে পেঁয়াজ ভাজবার কথা, সেখানে ভাজতেন শেষে। যেখানে সেদ্ধ করার কথা সেখানে ভেজে ফেলতেন, এভাবেই তৈরি হয়েছিল নতুন পদ—মুরগীর মাছের ঝোল আর মাছের মাংসের কারি। তাঁদের তিন ভাইয়েরই প্রিয় খাদ্য ছিল স্নাইপরোস্ট। গগনেন্দ্রের ছোট জামাই সরোজ মুখোপাধ্যায় ও অবনীন্দ্রের ছেলে অলোকেন্দ্র যেতেন পাখি শিকারে গোবরডাঙা বা সুন্দরবনে। তিন ভাই অপেক্ষা করতেন শীতের সন্ধ্যার ডিনারের এই স্পেশাল মেনুটির জন্যে।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে শীতকালের বড় অনুষ্ঠান ছিল পৌষপার্বণ। সরলাদেবী লিখেছেন, 'পৌষ সংক্রান্তিতে পিঠে গড়া—সেটা একটা বিরাট অনুষ্ঠান...ঘরোয়া আনন্দ, ননদ-ভাজ মেয়ে-বৌরা মিলে গড়া ও বামুনে ভেজে দিলে এ-ঘর ও-ঘরে বণ্টন করা।' সমস্ত পৌষমাস ধরে পিঠে খাবার পালা চলত। মেয়েলিপ্রবাদে আছে সরস্বতী পুজোর পরে গোটা পিঠে খেতে নেই। তাতে বোঝা যায় সেদিনই শীতকালীন ভোজের সমাপ্তি ঘটত পঞ্জিকা মাফিক। রবীন্দ্রনাথ পিঠে পুলি খুবই ভালবাসতেন। সেজন্যে শান্তিনিকেতনের অনেকেই বিশেষ করে শিক্ষক নেপালচন্দ্র রায়ের স্ত্রী ও পুত্রবধূ নানারকম পিঠেপুলি করে তাঁকে পাঠাতেন। কবি নিজেও মাঝে মাঝে নেপালবাবুকে জিজ্ঞেস করতেন, 'পৌষপার্বণের আর কত দেরি?'

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যে বড় মাপের পৌষপার্বণ হত সরলা তাঁর আভাস দিয়েছেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীও লিখেছেন, 'দৈনিক বাজারে আমাদের কিছু করতে হত না। কেবল পৌষপার্বণে রাশীকৃত পিঠে গড়তে হত বলে লোক কম পড়লে বৌদের ডাক পড়ত।' বৃহৎ ব্যাপার যেখানে সেখানে বৈচিত্র্য তত থাকত না। বেশির ভাগ হত রাঙালুর পুলি ও সেদ্ধ পিঠে। বধূরা নানারকম পিঠে তৈরি করতেন, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের মেয়েরা। ঠাকুরবাড়িতে বধূ হয়ে এসেছিলেন যশোরের অনেক মেয়ে, এনেছিলেন তাঁদের আপন আপন পারিবারিক ঐতিহ্য ও রন্ধনশিল্প। মৃণালিনী দেবী খুব ভালো চিঁড়ের পুলি তৈরি করতেন। সৌম্যেন্দ্রনাথের মা চারুবালা দেবীর দুধ পুলি ছিল সবচেয়ে সুস্বাদু। পাঁচ নং বাড়িতে বধূরা করতেন ক্ষীরপিঠে। ও-বাড়ির দ্বিপেন্দ্রনাথ ভালবাসতেন খুব। বৈশিষ্ট্য ছিল কি কোন?

ছিল বইকি। সুজাতা দেবী বললেন, 'আমাদের বাড়ির পিঠে একটু অন্যরকম হত।' যেমন ধরা যাক সেদ্ধপিঠে। চালের গুঁড়ো দিয়ে পিঠে গড়ে তাতে ক্ষীর-নারকেলের পুর দিয়ে জলের ভাবে সেদ্ধ করে তৈরি হয় সেদ্ধপিঠে, সেই পিঠে খাওয়া হয় নলেন গুড়ের রসে ডুবিয়ে। কিন্তু তাঁদের বাড়িতে সেদ্ধপিঠেটিকে আবার সেদ্ধ করা হত দুধ ও গুড় মেশানো পাতলা ক্ষীরের সঙ্গে। তাতে স্বাদ বাড়ত, পিঠের নামও বদলে হত ক্ষীরপিঠে। পাটিসাপটাও অমনি করে ভাজার পরে রসে ফেলা হত। তাঁরা জানতেন পিঠে ঘিয়ে ভাজলেও মুগসামলি সরষের তেলে ভাজা না হলে মচমচে হত না। এছাড়া হত পায়েস, খেজুরের গুড়ের পায়েসই বেশি। কমলালেবুর পায়েস, আখের পায়েস, আতার পায়েস কিংবা হেমকণা পায়েস। প্রজ্ঞাসুন্দরীর পৌষপার্বণের তালিকা থেকে এ অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এগুলি সবই সেদিনকার অনুষ্ঠানকে সরস করে রাখত।

সরুচাকলি, মুগসামলি,
সিদ্ধপিঠে, ভাপাপিঠে,
বাটাসাপ্টা, পাটীসাপ্টা,
চিঁড়ের পুলি, রাঙাআলুর পুলি,
গোলআলুর পুলি, আস্কেপিঠে,
চুষিপিঠে, কলাইশুটির পুলি,
খইয়ের পুলি, আঁদোসা,
রসবড়া, গুড়পিঠে,
ছানারপুলি, ক্ষীরের পুলি,
দুধ দিয়া চুষিপিঠে,
ময়দার শাপ্টা পুলি, গোকুলপিঠে,
কচুর পিঠে, লাউয়ের পুলি।

এদের মধ্যে আঁদোসা ছাড়া অন্যগুলো সবই আমাদের কমবেশি পরিচিত। আঁদোসার প্রস্তুত প্রণালীটিও কারোর মুখে শুনিনি। রবীন্দ্রনাথ কোন কোন পূর্ববঙ্গীয় মিষ্টান্নের নাম বদলে দিয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ পরিবারের মেয়েরা তাঁকে খাইয়েছিলেন 'এলোঝেলো'। নাম শুনে তিনি নাক সিঁটকে বলেছিলেন, 'এই সুন্দর জিনিসের এই নাম, আমি এর নাম দিলাম 'পরিবন্ধ'।' ঠাকুরবাড়ির মেয়েরাও ভালো রাঁধতেন। মহর্ষির কন্যাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো রান্না জানতেন শরৎকুমারী দেবী। দ্বিজেন্দ্রনাথের কন্যা সরোজাসুন্দরীও এ ব্যাপারে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। যাঁরা জানতেন না তাঁদের উৎসাহও কম ছিল না। ইন্দিরা দেবী রাঁধতে পারতেন না কিন্তু যেখানে যে নতুন রান্নাটি খেতেন তার প্রস্তুতপ্রণালীটি সযত্নে লিখে রাখতেন খাতায়। সাম্প্রতিককালে ঠাকুরবাড়ির আর এক বধূ পূর্ণিমাদেবীও লিখেছেন ঠাকুরবাড়ির রান্নার পাকপ্রণালী, তাতেও দেখি শীতকালীন খাদ্যের অসংখ্য আয়োজন—বেগুন পোস্ত, লাউ পোস্ত, বেগুনবড়া দিয়ে সুক্তোনি, কড়াইশুঁটির চপ, টমেটো মাছ, ফুলকপির পাতুরি, কপি কড়াইশুঁটি বড়া, তপসীর ঘি তপসী, বেগুন ঝাল পোস্ত, টমেটো ভাপে, শিমের পোরভাজা, লাউয়ের কোপ্তাকারি, কড়াইশুঁটির ধোঁকা, লাউপাতা ভাজা—তালিকা বৃদ্ধি করে লাভ কি? এর সব রান্নাই হয়ত ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব নয়, বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মতো এও মিশে গেছে ঠাকুরবাড়ির ভোজনরসিক মানুষের শিল্পরুচির সঙ্গে। তার সঙ্গে মিশে থাকত এই পরিবারের নারীদের নিরলস প্রয়াসের একাগ্র সাধনা। এ শুধু পেট ভরাবার আয়োজন নয়, শিল্পীমনেও খোরাক।

কবি একেই বলেছিলেন, 'অনির্বচনীয়'
শোভন হাতের সন্দেশ পান্তোয়া
মাছ মাংসের পোলাও ইত্যাদিও
যবে দেখা দেয় সেবামাধুর্যে ছোঁওয়া
তখন সে হয় কী অনির্বচনীয়।'

অঘ্রানরাত্রির মধ্যযামে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

হেমন্ত ফুরিয়ে এল, আজ
চোদ্দই অঘ্রান। এই সময়ে কোথাও
বৃদ্ধেরা পারতপক্ষে নিশাকালে শয়নকক্ষের
চৌকাঠ পেরিয়ে
উঠানে, রাস্তায়, মাঠে, মুক্ত আকাশের নীচে গিয়ে
দাঁড়ায় না। শ্লেষ্মা পাছে প্রকুপিত হয়,
পাছে দেহযন্ত্রে কোনো গণ্ডগোল ঘটে,
অথবা ভাবনায়
পাছে ঢুকে পড়ে ঠাণ্ডা বাতাসে সঞ্চরমাণ কিঞ্চিৎ কুয়াশা,
তাই তারা
আপাদমস্তক কাঁথা অথবা কম্বলে
মুড়ি দিয়ে, বন্ধ ক'রে জানালা-কপাট
জীর্ণ তক্তাপোষে কিংবা শৌখিন পালঙ্কে বসে থাকে।

বসে-বসে অভ্যাসবশত তারা যে-যার বৃদ্ধাকে
বলে যায়
যৌবনদিনের নানা ভয়ংকর সাহসের কথা।
যে-বৃদ্ধ নিঃসঙ্গ, যাকে মায়া কি মমতা
করবার মানুষ নেই ঘরে,
সেও কি লাগায় ঠাণ্ডা বাইরে গিয়ে? লাগায় না। সেও
ঘরে বসে
পাঠ করে ধর্মগ্রন্থ, অথবা (দুধের
অভাবে যেমন তক্রপান) পর্নো-পত্রপত্রিকায়
অর্ধেক-নগ্নিকা নারীমূর্তি দেখে সময় কাটায়।

বৃদ্ধ তো আমিও, তবে অঘ্রানরাত্রির কুয়াশায়
আমি কেন বাইরে ঘুরে বেড়াই, কে জানে।
হতে পারে, হেমন্তের জাতকের প্রাণে
উত্তীর্ণ-ষাটেও টান থেকে যায় কুয়াশার প্রতি।
হতে পারে, অন্যান্য মাসেও
তারা বেঁচেবর্তে থাকে, কিন্তু ঠিক ততটা বাঁচে না,
যতটা স্মৃতির মধ্যে কার্তিকে-অঘ্রানে
বেঁচে ওঠে।

কে জানে [illegible] জন্যে [illegible] জীবনে [illegible]
সহসা [illegible] বেঁচে ওঠা।
কে জানে [illegible]
কার্তিকের [illegible]
[illegible]

ছবি : [illegible]

কার মুখচ্ছবি ফোটে হেমন্তরাত্রির
প্রেক্ষাপটে।
মনে হয়, বিস্মৃতির অনন্ত গহ্বর থেকে আজ
বিগত জন্মের কোনো স্বপ্নের মতন
ভেসে উঠে সে ওই জলের ঊর্ধ্বে অবশ্য দাঁড়াবে।
বৃদ্ধ তো আমিও, কিন্তু সেই দৈব আলেখ্য দর্শন
করবার জন্যেই আমি আজ
বাড়ি থেকে তিন-চার মাইল হেঁটে তারপরে এখন
মধ্যরাতে এই
নদীর কিনারে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

অথচ, তাজ্জব কাণ্ড, বরফের মতো ঠাণ্ডা নদীর উপরে
একটুও কুয়াশা নেই আজ।
চাঁদ নেই, তবু কোনো গোপন উৎসের
স্বচ্ছ আলো
ছড়িয়ে রয়েছে নীল, মেঘমুক্ত, নির্মল আকাশে।
তারই মধ্যে ভাসে
অজস্র বৈদূর্যমণি। আজ
যেহেতু কুয়াশা কিংবা মেঘের পর্দার বাধা নেই,
তাই বন্য মত্তহস্তিযূথের মতন,
দৌড়ের তাণ্ডবে যেন এ-ওকে পিছনে ফেলে রেখে,
প্রথম শীতের হাওয়া হু হু করে ছুটে আসছে, আর
হাওয়ার ঝাপটে
[illegible]।

ও-পারে হাওয়ার সঙ্গে [illegible]
[illegible]

এক বিশ্বব্যাপী একাকিত্বের মধ্যে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

একজন মানুষ খোলা আকাশের নিচে
মঞ্চে ওঠার আগে
সিঁড়িতে থমকে দাঁড়িয়ে আপন মনে
বললো,
জিততে হবে, জয়টাই বড় কথা,
আর কিছুই কিছু না
তারপর বিজয়ীর ভূমিকায় অভিনেতার মতন
কাঁধের কার্নিস উঁচু করে
হাতে অদৃশ্য অস্ত্র, চোখে সেই অস্ত্রের রশ্মি
উঠে দাঁড়ালো ওপরে
যদিও তলপেটে ক্ষণিকের জন্য একটা প্রজাপতি
হাঁটুতে দু'এক টুকরো ভয়, ওঠে অজ্ঞেয়মতন অহংকার
জন-উপসাগরের সামনে দাঁড়িয়ে
আবার বিড়বিড় করলো সেই বীজমন্ত্র
জয়ী হতে হবে
আর কিছুই কিছু না
তারপর [illegible] অবিশ্বাস ও [illegible] মতন আশ্বাস
নিয়ে
কালো কালো অসংখ্য [illegible] দিকে
তাকিয়ে
[illegible]
[illegible]

তার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে হাউই......

যারা ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান গড়ে ছিল
যারা সমুদ্রের বুকে নির্মাণ করেছিল সস্ত মিশেলের টিলা
যারা শূন্যের পটভূমিকায় সাজিয়েছে তাজমহল
যারা সোনালি সেতু দিয়ে ছুঁয়েছিল দূরতর দ্বীপ
যারা হারমিটেজ সংগ্রহ শালায় জাজ্বল্যমান করেছে
মানুষের
হৃদয় ও মনীষার শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি
যারা বাষ্পকে করেছে ভৃত্য, বিদ্যুতকে আলাদীনের প্রদীপের
দৈত্য
যারা চাঁদের বুকে পা দিয়ে টেলিফোনে বার্তা পাঠিয়েছিল
পৃথিবীকে
যারা ভাঙতে চেয়েছিল দেশ-সীমার দেয়াল
তারা নিজের সন্তানদের আদর করতে করতে কোন ছবি দেখেছিল
আগামীকালের
গ্যালিলিও কি মাটিতে পা ঠুকতে ঠুকতে ভেবেছিলেন
তাঁর উত্তর পুরুষেরা
রাজনীতির পাশা খেলোয়াড়দের ক্রীতদাস হবে
লুই পাস্তুর কি জানতেন পাগলা কুকুরে কামড়ানো
যে কিশোরটিকে তিনি বাঁচালেন
তার জীবন-মরণ বাজি ধরা চেষ্টায়
সে অকারণে এক মুহূর্তে [illegible] একটি সৈনিকের
গুলির ফুৎকারে
সহস্র সূর্যের দীপ্তিতেও কি [illegible]
[illegible]খতে পা[illegible]
সেই টলটলে পায়ে
হেঁটে যাওয়া শিশু[illegible]

সমস্ত আগুন নিবে যাওয়ার পর আকাশ ছেয়ে আছে
ছাই রঙের অন্ধকারে
যেখানে প্রাসাদমালা ছিল সেখানে
একটি বিরাট দগদগে ঘা
যেখানে নদী ছিল সেখানে নদী নেই
যেখানে পাহাড় ছিল সেখানে নেই এক টুকরো পাথর
যেখানে ভালোবাসা ছিল, সেখানে দীর্ঘশ্বাসও শোনা যায় না
যারা জয় চেয়েছিল, তাদের কঙ্কালও মাটি পায়নি
যারা রূপ চেয়েছিল, যারা স্বপ্নে সৌধ গড়েছিল
যারা লড়েছিল মানুষে মানুষে সাম্যের জন্য
যারা আরাধনা করেছিল [illegible]
যারা প্রতিদিন জল দিয়ে, স্নেহ-মমতায় বাঁচিয়েছিল
ছোট ছোট [illegible]
তারা আজ কেউ নেই
পরাক্রমের প্রতিদ্বন্দ্বীরা একই সঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেছে
চরাচর জুড়ে এক নিবাত নিষ্কম্প নিস্তব্ধতা
তার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি শিশু
সমস্ত ঘৃণা ও অবিশ্বাসের গরল মন্থন করে
সে ঠিক উঠে [illegible]
এক বিশ্বব্যাপী একাকিত্বের মধ্যে সে হাঁটছে
আস্তে আস্তে পা ফেলে
তার শীত করছে
শুধু তার জন্যই আবার জাগতে হবে সূর্যকে।

কুয়াশায়

[illegible]চট্টোপাধ্যায়

[illegible] টিলা, হয়ে ওঠে মেঘ।
যদি নামি, যদি আমি ভূপৃষ্ঠে দাঁড়াই
তার মানে টিলা থেকে নিচে আছে আকাড়া খোয়াই—
মাঠ, আলপথ, জল, আলপথ, জল
মাঝেমধ্যে গম-নাড়া, মাঝেমধ্যে ওঁরাও [illegible]
তার মধ্যে দিয়ে শুধু যেতে হবে কুয়াশা [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
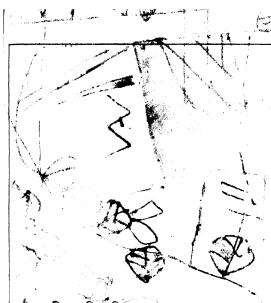
তোমার কী কাজ ছিলো বিখ্যাত প্রভাতে
তুমি কাজ করো
পাথরে ছিলো না জল, আমি এসে গেছি
পাথর মাড়িয়ে, জল ছিলো না পাথরে ।'

'দুহাত ভরেই জল, তাই ঠাণ্ডা লাগে···
দস্তানা তোমার নেই, আমি বুনে দেবো ।
কিছুতে বলবে না কাউকে, গালে হাত রাখো
যতোই জলের হাত, গ্রীষ্মের খরতা
তুমি সঙ্গে নিয়ে এলে, চা, কফি বানাবো ?'
'কিন্তু, তা এখন নয়, উল্টোদিকে বসো
পা দুখানি স্পষ্ট করো, হাতে রাখো হাত
তুমি কাজ করো ।'
'কাজ করা সম্ভব এখন ?'
'কেনই বা নয়, কাজ, কাজ ছিলো পাথরের নদী
কেমন বহতা শীতে, এতো নয় বৃষ্টি সর্বজয়া
গ্রীষ্মের সন্ন্যাস নয়, এতো শীতে দুখানি চরণ
আমার হাতের মধ্যে নিয়ে নেওয়া
পৌষী প্রভাতে !'

অর্জুনের ছাল কারা ছড়িয়ে রেখেছে,
রেশমের গুটি ছেড়ে পালিয়েছে কীট,
বৃষ্টি পড়ে এ-সময়ে শালের জঙ্গলে ।
বাঘের মাঘের শীত গায়ে আমাদের
বৃষ্টি পড়ে, এ-সময়ে আমাদের গানে
বৃষ্টি পড়ে, দূরে থাক শালের মঞ্জরী
লুপংগুটু ঝর্ণা নয়, আর্টিজীয় কূপ···
সেই ভোরবেলা উঠে দুজনে চলেছি
দুজন একজন হতে পারিনি এখনো ।
অর্জুনের নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি,
পথে পড়েছিলো রোরো, পার হয়ে এসেছি,
হেঁটেছি মাইল দুই, কুয়াশা-কানিতে
সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে এসে পৌঁচেছি কূপের
উনুনের মতো টিলা, সে-টিলা মাড়িয়ে,
অর্জুনের শিরা ছিলো তার উপর বসে
একটি হাত দিয়ে ওর কাঁধটি জড়িয়ে

একা একা বসে আছি, দুপ্রান্তে দুজন—
দুজন একজন হতে পারিনি এখনো !

ভোরবেলা চুম্বনের শীত ওষ্ঠে লাগে
দুটি করতলে করে সে-মুখ স্থাপন
আবার চুম্বন করি সেই ওষ্ঠাধরে,
তখন উষ্ণতা পাই, শরীরে উন্মুখ
হয়ে পড়ে ইন্দ্রিয়েরা
তখনি শালের
ভিতরে বুকের মধ্যে দুটি হাত রাখি ।
ও কিছু বলে না, শুধু অন্ধের মতন
চোখ বুজে স্থির থাকে পাথরের মতো ।
'আমি তো পাথর হতে চাইনি কখনো
কেন যে এমন হয়, কিছুতে বুঝি না !'
'তুমি বড়ো ভয় পাও, সেজন্যে ঘরের
বাহিরে এনেছি আজ কিছু পাবো বলে—'
'এই কি যথেষ্ট পাওয়া, এর বেশি নয় ?'
'সে-পাওয়া পরের, আমি তুলে রেখে দেবো
যেদিন বিবাহ হবে একসঙ্গে পাবো
তোমার সমগ্র'
'যদি বিবাহ না হয় !'
তাহলেও যা পেয়েছি, তাও তো অনেক
কুয়াশায় যা পেয়েছি তাও তো অনেক
যথেষ্ট, যথেষ্ট ॥'
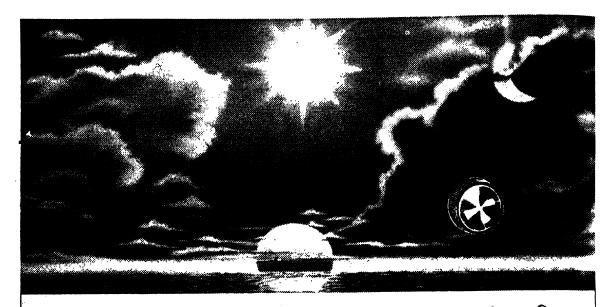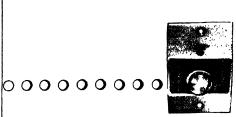
শুধু একটা নব ঘুরিয়ে ফেলুন আর আপনার ১০০ ওয়াটের বাল্‌বের কড়া আলো-কে বদলে স্নিগ্ধ, মধুর নাইট ল্যাম্পে পরিণত করুন!

রাইডার লাইট ডিমার

আপনার বিভিন্ন মেজাজের তালে, যে আলো জ্বলে।

মিষ্টি মধুর গান বা বাজনা কি কড়া আলোয় শুনতে ভাল লাগে? সুরের তাল কেটে যায়। আর গানের মেজাজের সঙ্গে তাল রাখতে বার-বার বাল্‌ব পাল্টানো সম্ভব কি? বিরক্তিতে 'ধুত্তোর' বলে সবকিছু ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে যাবেন।

এই কারণেই রাইডার ডিমার, এক কথায় চমৎকার। কারণ, এখন আপনি ইচ্ছা করলে ১০০ ওয়াটের বাল্‌বের কড়া আলো-কে নব ঘুরিয়ে মাঝারি ৪০ ওয়াটের আলোয় বা চান কি জিরো ওয়াটের রাতের আলোয় পরিণত করতে পারেন।

কিংবা ইণ্ডিকেটরটিকে পাশে টেনে বা শুধু আঙুলের ছোঁয়ায় এই জাদুই আলো হয়।

দেখুন, রাইডার ডিমার পাচ্ছেন রকমারি মডেলে। স্বতন্ত্র ডিমার সমেত কর্ড টাইপও নিতে পারেন।

কিছুতে, আপনি পাবেন বিশেষ ট্রিমারের ব্যবস্থা, যার ফলে যথাযথ ঘোরালে, ঠিকমত সবচেয়ে কম আলো জ্বলে। আবার কিছুতে আছে এক LED বা নিওন ইণ্ডিকেটর, যার দরুন, যখন আপনি জেগে উঠবেন বা অন্ধকার ঘরে চলবেন-ফিরবেন, জ্বলবে আলোর কিরণ।

তাছাড়া, আপনি ৪০% অবধি বিজলী খরচ বাঁচাচ্ছেন এবং ছিপছিপে গড়নের এমন এক ছোট্ট ইউনিট পাচ্ছেন, যা আপনার ছিমছাম ঘরে মানায় সুন্দর।

এমন এক সুন্দর উপায়, ভাবা কি যায়! সাঁঝের আলো বা রাতের আলো আপনার মুঠোয় এল।

Rider

এমন চমৎকার উপায়, যা চমক জাগায়!

market movers/RI/836/86 Ben
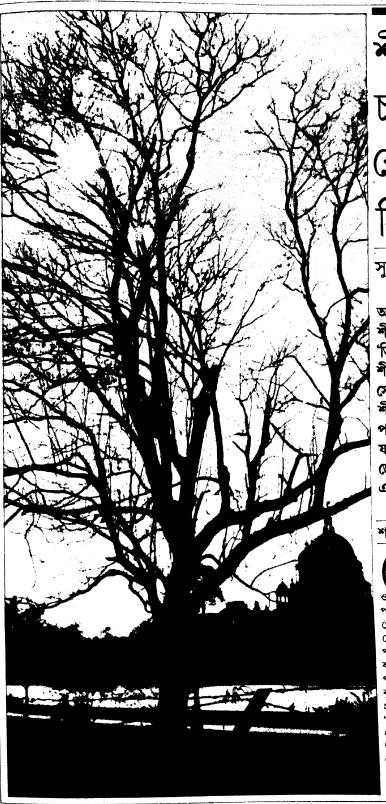
শীতের চলচ্চিত্র : রোদ্দুরের দিন হিমের রাত্রি

সুনীল বসু

আজকের কলকাতার শীতে—শীতের কলকাতায়— এই 'তিলোত্তমা' শহর কলকাতায় শীতের সুন্দরী বুড়ীর আবির্ভাব— সেই সঙ্গে পঞ্চাশ বছর আগের শীত মরসুমের ধূসর স্মৃতির পাণ্ডুলিপি খুলে বসেছেন লেখক যা মনে করিয়ে দেয় সেকালের জৌলুস-লাগা দিন, শীতের ছোট এক মুঠো দুরন্ত দুপুর।

শহরে

দেখতে দেখতে ১৯৮৬-র শীত এসে পড়ল। শীত বললেই একটা ছোট্ট স্মৃতি মনের মধ্যে গুন গুন করে ওঠে। এক সময় সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত পূর্বাশা পত্রিকাটি তখন নিয়মিত পড়তুম। কল্লোল গোষ্ঠীর অনেক লেখকই পরবর্তীকালে পূর্বাশায় লেখক শ্রেণীভুক্ত হয়েছিলেন। আমার অতি প্রিয় পূজনীয় লেখক বুদ্ধদেব বসুও পূর্বাশায় কখনও কখনও লেখা দিতেন। বহুদিনকার কথা তো। পূর্বাশায় একবার একটি উপন্যাস শুরু করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। চমৎকার একটি নাম দিয়েছিলেন প্রথমে সে উপন্যাসটির—নাম দিয়েছিলেন 'শীতের শিকল'। কলকাতার কোন এক শীত-ঋতুর বর্ণনা দিয়ে উপন্যাসটির শুরু, তার কিছু কিছু অংশ এখনও স্মৃতিবিদ্ধ হয়ে আছে—এখনও স্মৃতির মধ্যে লেখকের ভাষার সৌন্দর্য ঝলসে ওঠে টের পাই। সেখানে বোধহয়

শহরে শীত আসে পাতা ঝরিয়ে   *ছবি : দেবীপ্রসাদ সিংহ*

ধুলোর গন্ধের বর্ণনাও ছিল আর হাজার সুন্দর ভাষার বয়ন-শিল্প। কলকাতার শীতের পরশ আমার ছেলে বয়সের স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, একে একে সেই তথ্যগুলির মোড়ক খুললেই বেরিয়ে আসে হাজারো জিনিস। তখন থাকতুম আমহার্স্ট স্ট্রীট অঞ্চলে ন'নম্বর পঞ্চানন ঘোষ লেনে লাহাদের ছোট্ট একতলা বাড়িতে। লাল রঙের স্বপ্নের মতন ছোট চৌকো একতলা বাড়ি। সকালে বসেছি প্রথম ভাগের পড়া পড়তে। আমার মা সকালেই স্নান করতেন। স্নান সেরে ছোট্ট গোল সিঁদুরের টিপ কপালে পরে এসে স্নিগ্ধ মূর্তিমতী উষার মত এসে দাঁড়াতেন, আমার পড়া ধরতেন। তখন গলির ভেতর দিয়ে ফেরিঅলা হাঁকতে হাঁকতে যেত 'চাই চিঁড়ের চাক, মুড়ির চাক, ছোলার চাক' ইত্যাদি। ভীষণ ভাল লাগত চিটে গুড়ে বানানো মুড়ির চাক খেতে —পড়া পারলে এবং আবদার ধরলে মা আমাকে এক আধদিন সেই তখনকার অতি পুরনো শীতকালে মুড়ির চাক কিনেও দিতেন মনে আছে। কতকাল আগের কলকাতা শহরের সেই অপরূপ শীতকাল, পঞ্চাশ বছরের পুরনো সেই সকাল এখনো যেন টাটকা সদ্য আমার মনের মধ্যে। এই তো সদ্য সেই ভোর তখন ছিলুম বালক, তারপর কিশোর তারপর যুবক আর এখন চক্ষের পলকে জীবনের পলিত বিকেলে আমি নব্য বৃদ্ধ। শীত ঋতুর, শহুরে শৈত্যের দৈত্যের কথা লিখতে বসেছি, মুঠো মুঠো অনুভূতির মালা—জীবন-নাটক যেন এক পলকে স্বপ্নের মাঞ্জা দিয়ে শুরু হল আর পলকে যেন বেজে উঠছে প্রকৃতির ঝরা-পাতার মত জীবন খাতার পাতা ওল্টানোর খসখসানি।

সকাল বেলায় সে বছর কাঁচা সোনার মতন শীতের রোদ্দুর। বাড়ির দরজায় এল একটি কাঁচা-পাকা চুলের আধবুড়ো শালওয়ালা। প্রতি বছর তখন আসত। জ্ঞান হবার পর থেকে দেখে আসছি তাকে। বাড়ি বা আস্তানা কাশ্মীরে। একটি চোখ ছিল কানা। দুটো শোবার ঘরের মাঝখানে প্যাসেজটায় পাহাড়ের মত বাণ্ডিল বাঁধা নানারঙের শালের বাণ্ডিল খুলে সে মেলে ধরত রকমারি পশমী গায়ের কাপড়—বাবা-মা পছন্দ করতেন। রাখা হত প্রতি বছর লোভনীয় গরম চাদর। ছোটবেলায় নদরু আমাকে মানে তার খোঁখা বাবুকে দিয়েছিল একখানা টুকটুকে সিঁদুরে লাল আলোয়ান। না সেই আলোয়ানের দাম সে কিছুতেই নেয়নি, ওটা ছিল তার অপত্য স্নেহের উপহার। আমাদের পঞ্চানন ঘোষ লেনে প্রতি বছর শীতকালে আসত এক চোখ কানা নদরু—সময়ের স্রোতে সে মুখ কোথায় গিয়েছে হারিয়ে, এখনও কলকাতার শীতে মানে শীতকালে কাশ্মিরী শাল-বিক্রেতাদের আবির্ভাবের রেওয়াজ উঠে যায় নি। তারা আসে গরম শাল চাদর আলোয়ান বেচতে, বাকিতে রাখা চলে, এক শীত ঋতুর বকেয়া দাম শোধ দেওয়া চলে আগামী বছরের শীতকালে। এই বিশ্বাসের বাণিজ্য করে পশমের বিচিত্র বণিকরা, দর্শনে ওরা কান্তিমান, আচরণে মধুর। ইদানীংকালে শীতে গরম কাপড়ের ব্যবসায়ে নেমেছে কলকাতায় ভুটিয়ারা—তিব্বতীরা—এমনকি নেপালের অধিবাসীরাও। চৌরঙ্গি অঞ্চলে পশমের জামা এন্তার, কেনাকাটা প্রচুর, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের রেলিং-এ শীতের আচ্ছাদনের আমদানির বহর আজ বহু বছর হতে চলল। এবং শিয়ালদা অঞ্চলও বাদ নয়। শিয়ালদার দুপাশের রাস্তায় প্রচুর জামা-কাপড়ের দোকান। সোয়েটার থেকে মাফলার, টুপি থেকে স্টোল, হরেক আলোয়ান থেকে সস্তা আর দামী র‍্যাগ এবং লেপ। শীতের যাবতীয় উপকরণ। বাঁদুরে টুপি, দস্তানা, ছোট বড় মেজো সেজো ছোট গায়ের চাদর এবং পায়ের মোজা, শীতকে কাবু করবার যাবতীয় তোড়জোড় পশমী সুতীর অস্ত্রশস্ত্র,—তার সঙ্গে ধোঁয়া-ওড়া চা কিংবা কফি। শীত মানেই আমার শৈশবের নিত্য-সঙ্গী, কিন্তু শীতের প্রসঙ্গ তুললেই কেন যে শৈশব উঁকি মারে আমি বুঝি না। ভোরবেলায় ঘুম ভাঙতেই মা-কে প্রশ্ন করেছিলাম বাবা আমার ফুটবল এনেছেন কিনা, শুনলাম আগে মুখ ধোও পোশাক বদলাও তারপর ফুটবল পাবে! সে কি মারাত্মক অস্থিরতা। মা, শিগগীর বল দাও, এই আমি মুখ হাত পা ধুচ্ছি, পোশাক পরছি। মনে হচ্ছে এই মাত্র সেদিনকার সকাল বেলা, ঘুমের মত মুছে গেছে পঞ্চাশটা বছর—কোথা দিয়ে, কি ভাবে, আলতো স্পর্শে আমি বুঝতেও পারিনি। সেদিন ছিলুম শৈশবের অতি কাছে এখন কাছে বার্ধক্যের। হে জীবন, তুমি কি পদ্ম পত্রে নীর? নাকি সেই কাব্য ধ্বনিত করব এই মুখে আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায় তাই ভাবি মনে ইত্যাদি...ইত্যাদি। আমার দুঃখ আমি আদপেই ক্রীড়ারসিক হতে পারিনি, কেন যে আমার ক্রীড়া বৈরাগ্য তা কিছুতেই বোধগম্য হয় না।

মনে আছে বাবার সঙ্গে গাড়ি করে দল বেঁধে ভাই-বোনরা গিয়েছি ধর্মতলা স্ট্রীটের ওয়াছেল মোল্লা-র দোকানে। আমি একখানা আস্ত ক্রিকেট ব্যাট, লাল ডিউস বল পছন্দ করলাম। সেই ব্যাট-বল এনে সে রাত্রে আর ঘুম হতে চায় না, কতক্ষণে হৃষীকেশ পার্কে গিয়ে আমার বন্ধু কালুর সঙ্গে ব্যাট করব, কয়েক ওভার বল করব! ভাবতে আশ্চর্য লাগে আর ক'দিন পরেই কলকাতায় এসে পড়ছে ক্রিকেট খেলার রোদ্দুরের জৌলস-লাগা দিন, শীতের ছোট এক মুঠো দুপুর, দুরন্ত দুপুর। এই সময়ই সেই আমাদের ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি ক্রিকেট মরসুমের

শীত ঋতুর রূপকথা আওড়াতে গিয়ে উড়ে আসছে কত রেশমের মেঘ, কত কপোতপক্ষ বিধূনন। বয়সের নানা প্রেক্ষিতে শীতকে প্রাণভরে দেখেছি। শীতকালে রাঙা রোদ্দুরের সকালে ফেরিঅলার হাঁক 'মুড়ির চাক', 'ছোলার চাক' ভীষণ ভাল লাগত।

উত্তাল কোলকাতা, সে খেলা হ'ত ইডেন গার্ডেনে আর এখনো পর্যন্ত ওখানের সবুজ গালিচার মখমল বিছানো স্বর্গোদ্যানে। কত নারী-পুরুষ, যৌবন ঢলঢল কাঁচালাবণি বেশীর ভাগ, ঠাণ্ডা পানীয়, হিমানী দুধের দলা, হাসা-হাসি, আনন্দের উচ্ছল উপভোগ, অপরাহ্নে গৃহমুখী রঙিন প্রজাপতি স্রোত, পাখির কলকলানি আর আগামী কাল মাঠে ময়দানে দুপুর উদ্‌যাপন, ক্রিকেট, ক্রিকেটের উষ্ণ হুল্লোড়, সবার, সবকিছুর চাঁদোয়া তুমি শীত ঋতু, তুমি চলে যেও না, তুমি পটভূমি হয়ে থাকো, রামধনু রঙ ডুবে শাড়ির আঁচল উড়িয়ে আশ্চর্য কলকাতাকে উষ্ণ সাহচর্য দাও!

কতকাল আগের ধূসর স্মৃতির পাণ্ডুলিপি খুলে বসেছি। বিকেল বেলায় আমরা খেলাধুলো করতে যেতুম আমহার্স্ট স্ট্রীটের হৃষীকেশ পার্কে। সিটি কলেজের প্রায় উল্টোদিকের এই পার্ক। এখনো বিদ্যমান অবশ্য অন্য সাজে। যত রাজ্যের পাতাবাহার গাছের পাতা ছেঁড়া এবং জড়ো করা ছিল আমার স্বভাব; বাড়ি এনে ছাদের একধারে জড়ো করে ঠাকুর পুজো ইত্যাদি খেলা খেলতুম। দেখা যেত পার্ক থেকে রাজা হৃষীকেশ লাহার বিরাট প্রাসাদ। ওখানে জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করতেন উচ্চপদে আমার পিতাঠাকুর। জীবনের কত শীত ঋতু চলে গেছে কাল স্রোতে—পড়ে আছে অসংখ্য শীত—আর হিমের গুঁড়ো মাখা স্মৃতি, সে গুলো ঝাড়া পোঁছা করে আলোয় তুলে ধরলেই এক কাঁড়ি রচনা আর এইটুকুই তো আমি দিব্যি পারি। আমরা বিকেলে পঞ্চানন ঘোষ লেন থেকে আসতুম কয় ভাই বোন—আমি, আমার সহোদর দুই বোন আর

সিলিং পাখাগুলোর ছুটি হলেই ছাদে কিংবা রাস্তায় বসে যায় ধুনুরির মেলা

মেজকাকার দুই মেয়ে। মনে আছে একবার শীতকালে খেলাধুলো শেষ হতে বিকেল পেরিয়ে সন্ধে নেমে এল, বাড়ি ফিরব আমরা—সুভাষচন্দ্র বসু বক্তৃতা দেবেন পার্কে। গ্যাস বাতি জ্বেলে দেওয়া হল—কাঠের প্লাটফর্ম ঘাসের উপর বিছিয়ে খানকতক চেয়ার পেতে দেওয়া হয়েছিল। সন্ধে পেরিয়ে নামলে রাত্রি ছোট্ট একটা জটলার মধ্যে ছিলুম বালক বয়সের আমি। সুভাষচন্দ্রকে সেই প্রথম দেখা। ছোট্ট আমি আর যুবক সুভাষচন্দ্র। খদ্দরের পাঞ্জাবি গায়ে, চোখে সোনার ফ্রেমের গোল চশমা। বোধ হয় তখন সেই শীতকালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধে নি। পরবর্তীকালের কলকাতায় জাপানী বম্বিংও হয় নি। মা তখন ছিলেন—অনেক কিছু যেমন আবছা ঘষা ঘষা হয়ে গিয়েছে—কিছু কিছু স্মৃতি বড্ড অবিকল রয়ে গিয়েছে। শীত ঋতুর রূপকথা আওড়াতে গিয়ে উড়ে আসছে কত রেশমের মেঘ, কতো কপোত পক্ষ বিধূনন। ছোটবেলার পঞ্চানন ঘোষ লেন। তারপর কৈশোরে যুদ্ধের সময় আমহার্স্ট রো-তে তারপর যুবক বয়সে হরতকি বাগান। সব অঞ্চলেই বয়সের নানা প্রেক্ষিতে শীতকে প্রাণ ভরে দেখেছি। শীতকালে রাঙা রোদ্দুরের সকালে সবচেয়ে মজার জলখাবার ছিল আমাদের বাড়িতে টাটকা মুড়ি আর গরম জিলিপি, আজ থেকে কুড়ি পঁচিশ বছর আগে বিহারী মালিক ছাপরাবাসী খাবারের দোকানে এক আনায় ছোট মুঠো মাপের পাওয়া চারখানা কচুরি আর সামান্য মিষ্টি ছোঁয়ানো গরম হালুয়া। আর কখনো শীতে সকালের জলখাবার পেতুম এক পয়সার দু'খানা লম্বাটে লাল বেগুনি তার সঙ্গে আধ-পয়সার বড় ঠোঙার এক ঠোঙা মুড়ি। পরবর্তীকালে দেখলুম আমাদের যৌথ পরিবারে মা-কাকিমাদের সাহায্য করার জন্য মেয়েরা ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরতে শুরু করেছে। তখন তারা ভাজতে শিখেছে শীতের লোভনীয় খাবার ফুলকপির ফুলুরি অথবা চমৎকার ঝাল-ঝাল আলুর চপ। কলকাতা, আমাদের প্রিয়তমা কলকাতার শীতের এক প্রধান আকর্ষণ পেয়ালায় পেয়ালায় ধোঁয়াওড়া চা আর সঙ্গে তেলেভাজা অথবা অপূর্ব সিঙাড়া। শীতকালে পাড়ার অনেক দোকানেই সিঙাড়া আর তেলেভাজার মরসুম; গরম পিয়াজীর সঙ্গে বল্লভি, তার সঙ্গে আলুর তরকারি। রাধাবল্লভির ডাক নাম বল্লভি। কুমড়ো-দিয়ে ব্যাসন দিয়ে ভাজা হচ্ছে—ফড়ে পুকুরের তেলেভাজার দোকানে। একজন খদ্দেরকে দোকানি বলেছিল সকালের বেগুনি শেষ, এখন কড়াইতে ছাড়া হচ্ছে কুমড়ি। সেই প্রথম বেগুনির জাতভাই কুমড়ির সঙ্গে আমার পরিচয়। এখন আর আমি শহর কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা নই—এসেছি পঁচিশ মাইল দূরের এক আধা গ্রাম্য পরিবেশে—কলকাতায় শীত আসে ঠিকই কিন্তু বহুকাল পূর্বের রামধনু রঙা রূপকথা শীত-আবির্ভাব এখন আর ঘটে না। তখন হেমন্তর ঐ গানটা প্রায়ই আমার কণ্ঠ ছুঁয়ে থাকত, 'শুকনো শাখার পাতা ঝরে যায়....' শীতের পাতলা ঠাণ্ডা আঁচড় হাওয়ায় লাগবার সঙ্গে সঙ্গেই—অর্থাৎ কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে যেই মাঝরাতে পাতলা চাদর গায়ে দিতে হতো, সিলিং পাখাগুলোর পাখা ঘোরার যেই হত ছুটি মনে পড়ত ধুনুরিদের কথা, তুলো ধুনে বাড়ির ছাদে চনমনে রোদ্দুরে বসে বানাতে হবে লেপ-তোশক মা-কাকিমারা পুরনো বালিশ ছিঁড়ে নতুন খেরোয় বানাতেন বড় ছোট মেজো বালিশ-কোল বালিশ আবার কখনো দর্জির কাছে মাপ দিয়ে আসতে হতো নতুন লেপের ওয়াড়ের। গরম-জামা কাপড়ের ড্রাইং-ক্লিনিং ?' এক শীতে কাচতে দিয়ে পরের শীতে আনতে যেতুম সেই পশমী আচ্ছাদনগুলি, বাবা একসঙ্গে টাকা বার করতে পারতেন না, বছর ঘুরে যেত, অনেক সময় এক বছর পরে গিয়ে একবার তো আমার একখানি দুগ্ধ ফেননিভ শালই আর পেলুম না, কোপ পড়ল আমার অতি প্রিয় সাদা দুধ-সাদা গায়ের কাপড়খানায় যেটা বাবা পরবর্তীকালে বাড়িতে-আসা শালওয়ালার কাছ থেকে সওদা করে দিয়েছিলেন। এই একদম সাদা চাদরের উপর আকর্ষণ ছিল আমার বরাবর অন্য একটা কারণে। তখন সবে ফার্স্ট ইয়ারের স্কটিশের ছাত্র আমি, আমার এক লম্বা চুলের কবি বন্ধু জুটেছিল, তার নাম ছিল শিশিরশুভ্র বসু। সে একবার আমাদের কলেজের সাহিত্য আলোচনায় বিকেল তিনটেয় ট্যাক্সি করে নিয়ে এল প্রখ্যাত বুদ্ধদেব বসুকে—বাচ্চা ছেলের মতন কচি মুখের মানুষটি, একটু টেনে টেনে চিবিয়ে চিবিয়ে পরিশীলিত ঢঙে কথা বলেন, দেখা মাত্র ভালবাসলুম, মুখখানি বড় উদাসীন, সমস্ত গায়ে জড়িয়ে এসেছেন একখানি সাদা ঘি-রঙের পশমী চাদর—সেই আমার মাথায় ঢুকল, একদম সাদা চাদর গায়ে দেব শীতকালে, বোনেরা বলত দাদাটা যেন কি, এই বয়সে বুড়ো সাজবার শখ, দূর সাদা নি-রঙ পশমী আস্তরণ গায়ে দিও না তো—মোটেই ভাল দেখায় না!

কলকাতার শীতে—শীতের কলকাতায়—এই তিলোত্তমা শহর কলকাতায় শীতের সুন্দরী বুড়ীর আবির্ভাব ঘটলেই বিগত কাল থেকেই বা আমার জ্ঞান উন্মেষের সময় থেকেই দেখে আসছি রকমারি বিনোদনের উপস্থিতি, যেমন সার্কাস, ম্যাজিক, চিড়িয়াখানায় দল বেঁধে যাওয়া, নিউ মার্কেট থেকে কেক কিনে নিয়ে গড়ের মাঠে বসে খাওয়া, নানা রকম মেলার আগমনী বিজ্ঞাপন এবং শীতের প্রধান আকর্ষণ ইডেনের ক্রিকেট এখন অবশ্য সল্ট লেকের সুপরিব্যাপ্ত স্টেডিয়াম। যখন বয়স কাঁচা ছিল এই শীতের আসার সূচনাতেই শুরু হত বুক কাঁপাকাঁপি, দুরু দুরু বক্ষ, গুরু গুরু রক্ত স্পন্দন, স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার কুচকাওয়াজ পাশ-ফেলের ভাগ্যনির্ণয়ের আলোছায়া, হেডমাস্টারের হাত থেকে প্রোগ্রেস রিপোর্ট গ্রহণ এবং প্রোমোটেড শব্দটা সচক্ষে দেখলেই পৃথিবীর রঙ মুহূর্তে যেত বদলে, বকেয়া মাইনে শেষ করে হাতে পেতুম নীলচে ছাপানো কাগজ খণ্ড, আবার ফাঁকিবাজির দাপাদাপিতে শুরু হত প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতির যাবতীয় কড়ার ভাঙার পালা। বিদ্যালয়ের পড়াশুনোয় ভাল ছেলে না হবার চিরস্থায়ী ছাপমারা ললাটলিখন। যাক যেকথা বলছিলাম, শীতে নাগরিক উপভোগ্যতা। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে এখন যেখানে খানিকটা জাহাজী আদলে দাঁড়িয়ে উঠেছে ইণ্ডিয়ান অ্যার লাইন্সের বিশাল অট্টালিকা, কুড়িটা তিরিশটা বা চল্লিশটা বছর আগে ওখানেই আসত সার্কাস পার্টি। আমরা অনেক বড় দল হয়ে যেতুম সার্কাস দেখতে বাবার সঙ্গে—একবার বড়মাসী

শীতের ছবি : আগুনের উষ্ণ সাহচর্য

ছিলেন আমাদের সঙ্গে। তাঁবুর নিচে একসময় গোটা ঘিরল প্রকাণ্ড জাল দিয়ে—এল বিশাল এক কামান—কামানের গোলারূপে দাগা হবে জ্যান্ত একটা মানুষ। কামানের চোঙ থেকে উদগীরিত হবে বিশাল শব্দ—মানুষের গোলা সশব্দে নিক্ষেপিত হওয়ার পর সেটা এসে পড়বে বিছোনো জালে,—এই আরকি, ভয়ে আমাদের ছোটদের বুক কেঁপেছিল আজও মনে আছে। এরপর সত্যি আচমকা সেই শব্দ হল, আমরা চোখে দেখলুম অন্ধকার, কানে আঙুল দেওয়া সত্ত্বেও যেন তালা লেগে গিয়েছিল। ছোটবেলার কলকাতার সেই শীতকাল, সার্কাস, মনে পড়ছে গণপতির ম্যাজিক, লোহার গরাদের খাঁচার মাথায় আচ্ছামতন দড়ির বাঁধন খুলে এসে দিব্যি হারমোনিয়ম বাজানো,—আর লোকের ক্রমাগত হাততালি, সে সবই ঘটত শীত ঋতুতে। বাবার সঙ্গে দল বেঁধে যেতুম আমরা আউট্রাম ঘাটে, ইডেন গার্ডেনে বা হগ সাহেবের বাজারে—সেখান থেকে কেনা হত কেক, খেতুম বসে গড়ের মাঠে, একবার কোনো এক শীতকালে ইডেন গার্ডেনে বিরাট বড় মেলা, সেই মেলায় প্রদর্শিত হচ্ছে প্রায় এক মণের এক পান্তুয়া, সে আবার কি চামচে করে কেটে কেটে দিচ্ছে দর্শকদের খেতে. সেও অনেক কাল আগের কথা, মেলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি, বুক স্টলে, সিগনেট বুক শপের দোকান এলগিন রোডে, কেনা হয়েছিল কৃষ্ণা হাতীসিং-এর 'কোন খেদ নাই' বইটি আর বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের 'রুদ্ধ কারার দিনগুলি'—এসব বই ছিল আমার সহোদরা ভগিনীর বড়ো প্রিয়। সে এখন কুইবেকে।

বেলা বারোটা তখন। সাইরেন বেজে থেমে রয়েছে। বেশ ভারী ভারী ধুপ ধুপ ধুপ শব্দ। খিদিরপুরে জাপানি বম্বিং হচ্ছে। বাবা রাজবাড়িতে। হৃষীকেষ পার্কের উল্টো পিঠের বাড়িতে—বড় চিন্তা হচ্ছে। কি হয় কি হয়। বড় দুঃশ্চিন্তা, বড়ই অনিশ্চিতি। বাড়ির সবাই বারণ করছে 'ছাদে উঠিস না'। তখন প্লেন অন্ত প্রাণ। আকাশ তখন পোর্সিলেন পেয়ালার মতন মাজা নীল। গুট গুট গুট গুট করে তারপর ভোমরার মতন ওঁয়া ওঁয়া করে উড়ে আসছে চিকন দিগন্তের গা বেয়ে ঠিক আকাশে এক সার অভ্রের কুচি উড়িয়ে দেওয়ার মতন রুপুলি জাপানী প্লেন—আমি দিব্যি গুনলাম ছত্রিশখানা, তারা আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং তারপর অ্যান্টি ক্রাফটের ক্রমাগত গোলা ছোঁড়ার শব্দ। এই আকাশ। শীতের নীল আকাশ! ঠিক এই সময়ই সার বেঁধে অসংখ্য উড়ে আসে, দল বেঁধে অগণন পাখি, সাইবেরিয়ার যাযাবর পাখি, ওরা উড়ে গিয়ে বসে চিড়িয়াখানার জলায়—সেখানে ওরা পাতে মাস তিনেকের বসতি, আবার একদিন যেমন এসেছিল তেমনি দল বেঁধে অদৃশ্য হয়ে যায় সাবেক আস্তানায়। সামান্য পাখি, হাজার হাজার মাইলের দিক ভুল হয় না। এও এক আশ্চর্য লীলা। কে যেন বলেছিল ওদের শ্রুতিযন্ত্রের নকলেই মানুষের একালের রাডারের উৎপত্তি, হবেও বা। সে প্রসঙ্গ থাক। শীতকাল আমাদের প্রতি বছর চিড়িয়াখানাকে মনে পড়িয়েছে। কতবার গিয়েছি ওখানে—সুদুর বাল্যকাল থেকে শুরু করে এই সদ্য বার্ধক্য পর্যন্ত। কত কত মজার ঘটনার সাক্ষী আমি এই চিড়িয়াখানার পরিপ্রেক্ষিতে। সেবার কিন্তু অহীন মোটেই ঠিক কাজ করেনি বাচ্চা চাকর শম্ভুর হাত ধরে যখন বাঘ ভালুক আর কুমিরের আঁচার কাছে আঙুল দিয়ে কি সব দেখাচ্ছিল আর বোঝাচ্ছিল। আমার সেজ বোন শম্ভুকে নিয়ে গিয়েছিল ছেলে মিঠু আর টিফিন বাক্স সামলাবার জন্য। একসময় যখন সবাইকে যথাস্থানে খুঁজে পাওয়া গেল,—শুধু পাওয়া গেল না শম্ভু আর অহীনকে। হঠাৎ বাঘের খাঁচার ভিড়ের কাছে খোকা ভৃত্য শম্ভু আর বিশালকায় যুবক অহীন্দ্রচন্দ্র। আমার বোন তো খেপে লাল স্বামীর এতাদৃশ সাম্যবাদী কাণ্ডকারখানায়। আর একবার আমার ছোট বোনের ছোট মেয়ের চুল খামচে টেনে দিয়েছিল একটা সত্যিকারের রসিক বাঁদর—তখন তার সে কি হাপুস কান্না। এখন শুনি মনোরম শীতকালে ভ্রমণ আনন্দের অযোগ্য রম্যস্থান চিড়িয়াখানা। যেমন রাক্ষুসে ভিড় তেমনি নোংরা তেমনি পয়সার হ্যাংলা চাহিদা। কলকাতা এখন নরক নগরী। কোথায় যাবেন শীতের দুপুরে একটু বেড়াতে? বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম, রবীন্দ্র সদনের কোন অনুষ্ঠানে, যাদুঘরে, বোটানিকসে—যেখানে যাওয়া সাব্যস্ত করুন আপনার অনেক আগেই সেখানে দু লক্ষ লোক দন্ত বিকশিত করে মুখ-ব্যাদান করে বসে আছে। আর উপায় নেই, সমস্ত রকম বঙ্গ-সংস্কৃতি এখন ত্রাহি ত্রাহি মধুসূদন করে সর্ব-যোদ্ধাদের কাছ থেকে নিষ্কৃতি চাইছে।

নরনারীর বিবাহ সংঘটন এই শীত ঋতুতে বাঙালীদের একটি অতি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ পর্ব।

না, শহরের শীত ঠিক গ্রামের শীতের মতন ঝলসান রোদ্দুর স্যাঁকা ওম দেওয়া তা দেওয়া নয়। কলকাতায় শীত স্যাঁতসেঁতে, জবুথবু গায়ে সেঁটে থাকা, গলিতে গলিতে পাড়ায় পাড়ায় তার যেন মোটেই গা-ঝাড়া সৌন্দর্য নেই। সন্ধের পরেই ধোঁয়া আর ধুলোর একটা পুরু মিশেল, সর্দি-কাশির বিশ্রী আবহাওয়া আর এখন তো কলকাতা মানেই রসাতলের গোলকধাঁধা, লোড শেডিং তার সঙ্গে অনিঃশেষ মোটরের স্রোত, তার পিছনে উচ্চিংড়ের মত স্কুটার তার পিছনে সাইকেল তার পিছনে ঠ্যালাগাড়ি, মাথায় গন্ধমাদন পর্বত বা হেড-ডেলিভারির মুটেমজুর, রাস্তার চলা-চলে খবরদারি করে শৃংখলা দেয় এই

রাজ্যে এমন কেউ নেই। এই শীতের কলকাতা।

মফস্বলে

বলার কিছু নেই—গ্রামে শীত ঋতু অপরূপ। মানে একটা মাত্র আ-কার বসিয়ে দিয়ে বলতে হয় অপরূপা। আমি দেখেছি তার দখলে রামধনুর পাখনা চিকচিকোনো পাতলা সিল্ক রোদ্দুর। ভোরে সেটা আলপাকার ছোঁয়াচ, দুপুরে উঠোনে হাঁটু মুড়ে বসা পরমা সুন্দরীর এক-ঢাল কালো মিশমিশে মৃদু খয়েরি চুল শুকোনা আলতো আলতো তাপ ছোঁয়া রোদ, আর বিকেলে বিষ্ণু দে-র কবিতার পাশে আঁকা ঝিলে বা ঝরনায় জল আনতে যাওয়া এক সার সাঁওতালি মেয়ের ছবির সঙ্গে স্মৃতি জাগানো গোলাপি গোধূলি রোদ্দুর—আমার মনে হয় একালের শক্তিমান কবি স্বর্গত বিষ্ণু দে তার কবিতার সংলগ্ন কাঠখোদাই ছবিটির সঙ্গে গোধূলি-মাখা রোদ্দুরের একটা আদল দিতে চেয়েছিলেন, এই দৃশ্য মনে হলে রোদ্দুরের চিন্তায় এখনও ভাসমান নৌকোর মত ফেঁপে ওঠে আমার একহারা অনুভূতি। পাড়াগাঁর শীত, তার আর তুলনা নেই মানে এই বাংলার, সোনার বাংলার, সে এক কথায় তুলনারহিত। বেনজির! প্রথমেই মনে পড়ে পাকা ধানের মাঠ। চাষীরা ধান কাটছে। আঁটির পর আঁটি মাঠে শুইয়ে রাখছে। লাগবে হলুদ রোদের তাপ। লাগবে মাঠের উড়ু-উড়ু ওম-ছোঁয়া হাওয়া, মেঠো ইঁদুর খাবে কিছু সেই ধানের সোনার দানা, তা খাক, ওরা রাত্রে ভিজবে আকাশের ঠাণ্ডা হিমে, তারপর বোঝাই হবে গরুর গাড়িতে, যাবে বাড়ি বাড়ি যদি খড় ভাল হয় লোকসান নেই, দাম প্রচুর, এ-বছর দাম কত উঠবে, কাহন কত করে হবে এখনো জানা নেই। যেখানে ধান ঝাড়া হবে সেই জায়গাটা ভাল করে গোবর জলে তকতকে করে নিকোনো চাই, তবে চাষী ধরবে আঁজলায় সোনার ফসল, শীতেই হবে চালিতে ঝাড়াই,—তারপর কুলোর বাতাসে কুড়ো ধুলো ইত্যাদি উড়নো এবং তারপর বস্তার পর বস্তায় সেই সোনার ফসলের আশ্রয় গ্রহণ। কিন্তু ভাতের থালা পিঁড়ির পাশে পৌঁছতে এখনো অনেক দেরি। আগে কাঠ-ফাট বন-বাদাড় পাতা-পুতি শুকনো ডাল-ফাল অনেক জ্বালানি জড়ো করো, মাটিতে বানাও ধান-সেদ্ধর চুল্লি, ঐ ফসল সিদ্ধ শুকনো না হ'লে ধান-কলে যাবে কি ক'রে? গ্রামে গঞ্জে ধান ভাঙবার জন্যে লাইন পড়ে, চাহিদা অনুসারে ধানকলের আধিক্য নেই। সব চেয়ে বড় কথা, কল যাতে চলবে সেই কারেন্ট। বিজলী থাকলে সব থেকে মঙ্গল, অন্যথায় শুধু ঘন্টার পর ঘন্টা ক্লান্তিকর প্রতীক্ষা। ধান সিদ্ধ শুকনো করার মধ্যে মেহনত আছে যথেষ্ট। ঠিকমত না হলে অর্থাৎ যেমন প্রয়োজন সেইমত না হলে ধান ভেঙে যাবে—চালও বেরবে ভাঙা-ভাঙা। এর পর ধানের কুড়ো সমেত বাড়িতে আনা এবং ঝাড়া এবং তারপর জমির পরিমাণ হিসেবে সঞ্চয় করে রাখা। অনেকে অবশ্য বস্তাবন্দি করে রাখেন এবং প্রয়োজন মত ভাঙিয়ে নিয়ে ব্যবহার করেন। শীতকালে ফসল-কাটা মাঠের দৃশ্য এবড়োখেবড়ো হলেও এক এক জায়গায় নয়ন লোভন।

আমি অবশ্য জানি না খেজুরের চারা কারা লাগায়। বটের চারা যেমন আপনা-আপনি জন্মায়, খেজুরের চারাও বোধ হয় পাখিদের মুখে মুখে ছড়ানো বীজ থেকে একদিন পৃথিবীর মুখ দেখে। খেজুর পাতার জন্মকাল থেকেই চেহারায় সুন্দর। কালো বুড়িটা একদিন যখন না বলে-কয়ে খেজুর গাছের তিরতিরে চিরুনি গোছের পাতাগুলি কেটে নিয়ে যাচ্ছিল তখন আপত্তি জানালে বলল, এগুলো ছেঁটে দিলে তোমার গাছটা তেজবল হবে খুনি।

আহা, সেধে উপকার করতে এসেছ, তুমি কি সত্যযুগের মেয়েলোক নাকি?

তোমার কি কাজে লাগবে খেজুরের এই সুন্দর পাতাগুলোন। তখন ফাঁস হল আসল সন্দেশটি, চ্যাটাই বুনবো বাপ—হাটে বিকেবো, তুমি না দিলি প্যাটটা ভরবো কি দিয়ে, আমরা গরিবগুর্বো, আপত্তি করিস নে বাপ—তোরে একখান চ্যাটাই বুনে দেবানে, ধান শুকতে পারবি। বুঝেছি ব্যাপারটা! পরবর্তীকালে ওই কালো বুড়ীর চ্যাটাই উপহার পেয়েছিলুম কি না, সেটা আর মনে নেই। এই শীতে মহার্ঘ অমৃত খেজুরের রস। সেই রসের সঙ্গে পরিচয় আমার হারানো বাল্যকাল থেকে। যশোরের গ্রামে থাকতে আমার ছোটকাকা গাছ থেকে দেশের বাড়িতে রসের ঠিলে পেড়ে নিয়ে আসত। যেমন হিম ঠাণ্ডা তেমনি সুধা তরল মিষ্টি। অপূর্ব খেজুরের পাতলা হালকা সোনালী রস যে খেয়েছে সে আর কোনোদিন ওর স্বাদ ভুলবে না। শীত ঋতুতে বাংলার প্রধান এবং প্রবল আকর্ষণ খেজুরের রস, রসের পায়েস, রস জাল দিয়ে নলিনী বা নলেন গুড় বা পাটালি। পাটালি বা খেজুর গুড়, ঝোলা গুড় আসে ঠিলে করে বা কাগজে মোড়ক হয়ে গ্রাম-গঞ্জ থেকে শহরে বাবুদের শিয়ালদার বাজারে, বউ বাজারে, মাণিকতলার বাজারে। এই পরম ঐশ্বর্যশালিনী শীতে নিপট্টু ভদ্রলোক খেতে ভাল বাসবেন না নলেন গুড়ের তাল শাঁস সন্দেশ, শাঁখ সন্দেশ, খাবারের দোকানের নাম না করলেও চলবে, বিখ্যাত মিষ্টির দোকানের নলেন গুড়ের আতা সন্দেশ। আগেকার দিনে শুনেছি খেজুরের রস জ্বাল দেওয়া হচ্ছে গ্রামে, যাদের তল্লাটে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে—বাচ্চাই হোক বা বুড়োই হোক—যার গুড় সে একটু আস্বাদ না করিয়ে ছাড়ত না। সে দিন গিয়েছে চলে বিস্মৃতির স্রোতে। এখন শুধু টান আর টানাটানি, শুধু মানুষের বনো, শুধু নেই নেইয়ের আকাল। নলেন পাটালি টাটকা নারকেল কোরা, তার সঙ্গে হাট থেকে আনা মুড়ি—এর চেয়ে ভাল জলখাবার কি

নবান্ন

নব অন্ন অর্থাৎ নবান্ন। সম্বৎসরের প্রথম নতুন অন্ন গ্রহণ। সেদিনের কথাগুলো মুছে যায় নি এখনো। মেজমামার সঙ্গে সে-বছর শীতকালে গিয়েছি ই. জি. আর ম্যানসন হলে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য-এর 'নবান্ন' দেখতে। কৃষক আন্দোলনের সেই নাটকখানিতে নাট্যকার স্বয়ং সেজেছিলেন অভিনয়ে। কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরে এসেছে সেই বৃদ্ধ যে গ্রামের মাটিতে চিৎকার করে বলেছিল 'আমি এসে গিছি... আমি এসে গিছি... আমি এসে গিছি'... ইত্যাদি। অসম্ভব স্মৃতিস্থায়ী সেই মর্মবিদারী অভিনয়। নবান্ন অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে শুভ দিন দেখে একটা পাত্রে আগ-চাল তুলে রেখে এবং ঘটে চাল দিয়ে তারপর নবান্ন মাখা হয় নারকেল বাটা চিনি ও গুড়ের সঙ্গে, সামান্য আদা গরম-মশলা আর নুনও মেশে এর সঙ্গে। কখনো শুভক্ষণ নির্ণয় করে চাল বাটা কমলা লেবু পাটালি অর্থাৎ সেই ঋতুর যা-কিছু নতুন তা এক সঙ্গে মেখে পাঁচজনে উৎসবের উপকরণ হিসেবে পরিবেশিত হয়। বিকেলে আবার রান্না করে অনেক রকম তরকারি সহযোগে জল মাছ টক-এর সঙ্গে খাওয়া হয়। বাসী জিনিস বা যে খাদ্য থাকে তার প্রচলন বাসী নবান্ন হিসাবে। নবান্নের সময় কাচ্চাবাচ্চারা কাক ডেকে উঠে সমস্ত বায়স-সমাজকে সাদর নিমন্ত্রণ করে বলে, ও কাক, কো কো কো, আমাদের বাড়ি শুভ নবান্ন, আসবে যাবে কাক, বলি কি নেবে, নিয়ে তুমি উত্তর মুখে যাবে... এর ফলে সর্বত্র মঙ্গল সূচনা হয়। নবান্নের শুভ নির্দিষ্ট দিনেই পিতৃপুরুষকে জল দেওয়ার নিয়ম আছে। গ্রামাঞ্চলে নবান্ন উৎসব ছিল নব্য ধান্য বরণের এক বহু প্রচলিত অনুষ্ঠান। বোধ হয় এখন এই পার্বণের রেওয়াজ আস্তে আস্তে বিস্মৃতির পথে চলে যাচ্ছে।

*আর দু'খানা **পাঁউরুটি** ঠোস্ আর এক কাপ ট্যালটেলে দুধ কম ছা (চা)!*

মনে আছে দেরাজতুল্ল আর ছোবান মিয়ার কথা। আমার দাদু গোপাল ঘোষ ছিলেন গোকুলচন্দ্র লাহা রাজ স্টেটের নায়েব। কলকাতার কাছেই ছিল সেই ঘুমের ছবির মতন পটে আঁকা তুল্রির টানের মতন গ্রাম পৃথিবী। ঐ দুজন নরম, অতি মোলায়েম, মুসলমান আমার মতন ক্ষুদ্র বালককে আমার বাল্যকালের শীতকালে মামারবাড়ি এলে বলত, যান খোকাবাবু, যে ক'য় খান আউখ খাতি পারেন খাতে গিয়া খায়আ আসেন-প্যাট পুরিয়া আরও লইয়া আসেন যতেক কভা পারেন। কয়েক দিনই আমার সমবয়সী ছোটমামার সঙ্গে গিয়েছি ছোবান মিয়ার আখ খেতে। শীতের মরসুমের সেই আখ ক্ষেত অনিঃশেষ, আমরা খুশি মত আখ ভেঙেছি খেয়েছি, গায়ের কার্পড়ের আস্তরণে বেঁধে নিয়ে এসেছি গোছা গোছা করে, ভাবি পৃথিবীতে এমনও একটা স্বপ্নময় সময় ছিল আমাদের জীবনে! ছোবান-দেরাজতুল্ল কবে পাড়ি জমিয়েছে বেহেস্তে—ছোবান মিয়ার ছেলে শুনেছি লতাপত হোসেন এখন থাকে ঢাকায়। সেখানে মাস্টারি করে। দেখতে ছিল কাঞ্চনবর্ণ, আমার ছোটমামার সঙ্গী। সে রকম আখের ব্যাপক চাষ আর দেখি না এ দেশে আজকাল! সবই যেন পালাবদলের আর এক পিঠ, যে পিঠটা এই প্রৌঢ় বয়সে পাচ্ছি, সেটা একেবারে রসকষহীন শুকনো খড় আর পোড়া কাঠ। শুধু তো ইক্ষু দণ্ডই শীতের স্বর্গীয় প্রহরী নয়, আরও আছে বহুবিধ রসনার লোভ জাগানো মনোহারী উপকরণ। সেই ছোটবেলার দিন থেকে শুনে আসছি পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট—না পড়াশুনো করে ছেলের হাতের মোয়া নাকি! মোয়া আর মেওয়া দুটোই স্বপ্ন জাগায়। ছেলের হাতের মোয়া আর সবুরে মেওয়া ফলা এ দুটো কথা তো কোন বাল্যকাল থেকে শ্রুত। আজকাল শীতের প্রারম্ভ থেকে শুরু হয় জয়নগরের মোয়ার বাক্স। ভাল জাতের মোয়ায় উপচে পড়ে নলিনী গুড়ের মোহাতুর সুবাস, একটা করে কিসমিস আর পেস্তা রঙের গুঁড়োও ছোঁয়ানো থাকে। বড় বাক্সয় গত বছরও দামের পড়তা ছিল বারো থেকে চোদ্দটা অবধি। ছয় থেকে বারো টাকা। গালে দিলে জিভে ছোঁয়ালে গলে যায় মিষ্টি খইয়ের টুকরোগুলো। শীতের মরসুমে জয়নগরের মোয়ার স্বাদ জানে না এমন বঙ্গপুরুষ বিরল। সেকালেও ছিল মোয়ার রাজত্ব, একালেও উপে যায়নি মোয়ার দাপট। তবে খাঁটি জয়নগরের মোয়া জাত আলাদা। সাধারণত জয়নগরের যশ নিয়ে যারা বিকোয় আসলে তারা পরাজয়নগরের—রসনার স্বাদ গ্রহণে তা বুঝতে পারি। শীতের হাজারো আকর্ষণ, দুপুরবেলায় ভাতের সঙ্গে সরপুঁটি মাছ ভাজা, তার সঙ্গে ঝাঁঝ তোলা কোনো সুস্বাদু আচার। কান-ফান ঝাঁ ঝাঁ করবে নাকের ডগা চিড়বিড় জ্বলবে তবেই না কাসুন্দির মাহাত্ম্য।

আমাদের আদরের বাংলা দেশ-এ শীতকালে শুধু শরীর রোদ্দুরে মেলে দেওয়া, অঢেল সবজির আঁইঢাই খাওয়া-দাওয়ায় মন মাতানো, আত্মতৃপ্তির হাই তোলা, ঢেঁকুর তোলা আরাম আয়েশে। বলতে কি আমাদের শীত তো আর ইংলন্ড আমেরিকার শীত নয় তুষার পাত আর পাতা ঝরনির স্রোত নয় সে বরং কালিম্পং শিমলা মুসৌরী বরং কিছুটা সাহেব বিবির দেশ-এর ভূমিকার অ্যাক্টো করে। বাঙালীর শীত মানে তার 'আহা মরি ঢলো ঢলো' পাখির ডিমে তা দেওয়া ওম ছোঁয়া বসন্ত। খাও দাও ঘুরে বেড়াও, অঢেল আড্ডায় গা ভাসাও,- ঢিমে তালে অম্লমধুর, পরনিন্দা করো, লেপ কাঁথা রোদ্দুরের তাপে শুকোও, তারপর নাকে সরষের তেল দিয়ে ছান্দিক নিঃশ্বেস গর্জনে দুপুরের চিংড়িপোড়া, ঘুম ঘুমোও। ওগো শীত-সম্রাজ্ঞী, তুমি তোমার ছ'টি বোনের মধ্যে সব থেকে রূপসী, মন ভুলোনো, প্রাণ মাতানো, জন্মাবধি তোমাকে দেখে আসছি দিনে রাত্রে, তোমার সান্নিধ্যে সমান আরাম, সমান সুযোগ, যে যে-রকম কুড়িয়ে পুড়িয়ে গুঁড়িয়ে নিতে পারে। মনের সুখে ছাদে শুকতে দেওয়া বড়ি কুড়োও, রাস্তায় বা বাগানে পুরনো পত্র-স্তূপ পুড়িয়ে তালুর স্যাঁকা দিয়ে শরীরের মানে গা-গতরের শীত জুড়োও, বা,—আর নয়ত জাঁতায় মুসুরির ডাল গুঁড়িয়ে টরটরে শীতের পুঁটি মাছ ভাজা দিয়ে ফোঁড়ন দেওয়া মুসরির ডালের সঙ্গে গরম ভাত সাবাড় করো। আমি টমেটো আর তেলালো মসৃণ বেগুনের রূপে জন্মমুগ্ধ। এই শীতে গাঁ গঞ্জের কাঁটা অলা অথবা কাঁটা-না-থাকা কালচে আর মিহি সবজে বেগুনকে মুঠোয় ধরে সোহাগ জানাতে সাধ যায়। মনে পড়ছে দেশে বাল্যকালে আমরা সকালে খেতুম দুধের কড়াইতে রাঁধা ঈষৎ বেগনী রঙের ডুমো ডুমো চালের কাঁসি ভর্তি ফ্যানে ভাত, বাড়িতে পাতা সর-বাটা-ঘি সঙ্গে কখনো একটু তার সঙ্গে বাড়িতে পাতা সর বাটা ঘি একটু সঙ্গে, অথবা কাঁচা টমেটো পেঁয়াজ লেটুস শাক অথবা বীট গাঁজর এবং কড়াইশুঁটি সেদ্ধর স্যালাড। কড়াই শুঁটি সেদ্ধ আলু সেদ্ধ লঙ্কার গুঁড়ো গোল-মরিচের গুঁড়ো একটু তেঁতুলের টক শালপাতার ঠোঙায় মোড়া, আমার এক বোনের দেওয়া নাম বি-কমপ্লেক্স। শীতেই এই খাদ্যবস্তুটির জন্যে জিব যেন লক লক করে ওঠে।

গাঁয়ের শীত তোমার মহিমার শেষহীন নকশা তুলে আর পারি নে! তুমি যেমনি মধুর তেমনি একটুখানি সময়ের জন্য স্থায়িত্বের তকমা আঁটা, এই হলে তুমি ভোরবেলায় চুনি-পান্নার মরকতমণির মুকুট মাথায়, ফুসমন্তরে কখন ঢলে পড়ল তোমার চিকন রোদ্দুরের জরির ফিতে চুমকির মেখলা, পরে নিলে মুখ-শুকনো অকাল-বৈধব্যের উদাস উদাস সাদা থান। আমাদের একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শীতের রোগাটে বিকেলকে বলতেন উড় উড়ু বিধবার রূপ। নামটা বলতে চাই না।

আমার বড় প্রিয় স্পর্শ—শীতের নরম মোলায়েম বালাপোশ। আমার দাদুর ছিল। মামার বাড়িতে তো চল ছিলই, আমাদের কলকাতার বাড়িতেও পিতৃদেবকে দেখেছি বালাপোশে শীতে সমাবৃত হতে। তার সঙ্গে মানাতো রুপোর গড়গড়া জরির মোড়কে গড়গড়ার নল, তার সঙ্গে ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক খাওয়ার শব্দ। একবার দাদু এসে উঠেছিলেন আমাদের আমহার্স্ট রো-র বাড়িতে, কলকেতে টীকে ধরিয়ে তামাক সেজে দিতুম, এখনো যদি ফিরে এসে বলেন, এক ছিলিম তামাক খাওয়াতে পারিস, দাদু, আমি বোধহয় দিব্যি কলকে সেজে টীকেয় ফুঁ দিয়ে দিয়ে তামাক ধরিয়ে আনতে পারি। শীত, এই সব অনুভূতিই তোমার সহগামী। সহযোগী।

জাঁকিয়ে যে বছর ঠাণ্ডা পড়ে সে বছর ভোর রাত্রে উঠে দেখেছি ঘন কুয়াশার মোড়ক চতুর্দিকে, তিন হাত দূরের চরাচর যেন ঠাহর হয় না, কলাগাছের পাতা আর বাসনা বেয়ে, নয়ত বক ফুল আর সজনে গাছের ডাল-পালা বেয়ে শিশিরের ফোঁটা ঝরে ক্রমাগত টুপটাপ টুপটাপ, হন্ হন্ হন্ করে আবছা বপু যাচ্ছে কাছের স্টেশনের দিকে ভোরের গাড়ি ধরবার তাড়া, কাঠ পাতার বোঝা নিয়ে যাচ্ছে মাথায় করে দরিদ্র নেই-আস্তানা পুরুষ-নারীরা, সকাল হবে আজ সাড়ে সাতটা বেলায়, খোকা-খুকু ঘুম থেকে উঠে কথা বললে মুখ-গহ্বর দিয়ে বের হচ্ছে ধোঁয়া, এই ধোঁয়ার সঙ্গে শোনা যাবে মজার খিলখিল্ কচি দাঁতের হাসি, ছাই-গাদার পাশে কোঁকড়া কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে আছে কালোকুলো কুকুরগুলো, বিড়ালগুলো আড়ামোড়া ভেঙে অত্যন্ত সন্তপর্ণে ডিঙোচ্ছে চাতাল অথবা বারান্দা, রাত্রি শেষ, একটি শীত ঋতুর! এখুনি কেরোসিন স্টোবে গৃহিণী চাপাবেন চায়ের কাৎলি, চমৎকার পোর্সিলেন পেয়ালায় পরিবেশিত হবে গরম সোনালি চায়ের লিকার দুধ-চিনি, সেই সঙ্গে পারিবারিক চা-পিয়াসীদের অধর স্পর্শের শব্দ, সঙ্গে বিস্কুট অথবা বাসী রুটি। একটু পরেই আসবে দুধের যোগানদার, আর একটু বেলায় রোদের লাল কিরণ দেখা দিলেই জানলা গলে ঘরের মেঝেতে আছড়ে পড়বে পাট করা খবরের কাগজ, মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছে আপ আর ডাউন ইলেকট্রিক ট্রেনের ধপ্‌ধপানি, উর্ধ্বশ্বাস সরীসৃপের দাপানির শব্দ। কলকাতার কাছেই এই পাড়াগাঁ-এর রূপকথার রাংতা মোড়া শীত নিয়ে এসেছে তার অঢেল ফল-ফলারি, টাটকা কচি আর কাঁচা সবজির অফুরন্ত বহর, আমাদের এখানটায় নেই অস্কার ওয়াইল্ডের স্বার্থপর দৈত্যের ন্যাড়া বাগান! অনিঃশেষ পুষ্পরাজি চতুর্দিকে, ঋতুপুষ্পের অফুরন্ত সমারোহ, সবুজ ঘাসের নরম গালচে, নীল আকাশের স্বপ্নিল নাইলন, শীতেই বোধহয় ওড়ে ফড়িং আর প্রজাপতি, ঠাকুরের নিবেদিত ফুলবাতাসাকে ঘিরে ধরে কুচকুচে বদখৎ ডেঁয়োপিপড়ে, এক চিলতে রোদ্দুরের সঙ্গে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে কলকলানো ঝগড়ুটে শালিক-চড়ুই ছাতার। বাঁশী বাজিয়ে যায় জলতরঙ্গ পাখি, ঠাকুমা দিদিমা-পিসিমা নতুন কাঁসা-পিতল রোদ্দুরে সার সার এনে রাখছেন আচারের শিশি। কত আচার! কত লোভনীয় আচার-আমলকির জলপাইয়ের বোম্বাই লঙ্কার এঁচড়ের আচার আরও তেতুলের আমুকির কুলের পিঁয়াজের। এখনও তো নাম করিনি সেই দুই মহার্ঘ খাদ্য উপকরণের যারা গোটা শীতকালটাকে উচ্চকিত উল্লাসে

জমিয়ে রাখে।

দার্জিলিং সিমলা আর নাগপুরের কমলা লেবু আর কাশ্মিরের আপেল। এখনই পাওয়া যাবে খোলা না ছাড়ানো আখরোট, বেদানা, কালো আর সবজে আঙুর। বা আবার কখনো-কখনো তেমন জুতের ফল নয় ন্যাসপাতি। দার্জিলিঙের কমলা লেবুর দুই মেরু চাপা-চ্যাপ্টা তার কোয়াগুলো অম্লমধুর রসে টুম্বুর ক্যালসিয়াম ভর্তি, খোসাগুলো ইঁট-ইঁট রঙের, রোদ্দুরে সুকিয়ে নিয়ে পানে দিলেও খাওয়া চলে, কমলা লেবুর কাল্পনিক আভিজাত্যে গোটা বাংলা দেশ শীতকালে আহা-মরি সোহাগী হয়ে ওঠে বা হয়ে থাকে। আর সবুজ আনাজ-পাতি। সীম বরবটি কড়াইসুঁটি মুলো বেগুন ঝিঙে ফুলকপি বাঁধাকপি ওলকপি। চোখের নিরাপত্তার জন্যে যখন প্রিয় বন্ধু বিলাত আমেরিকা ঘোরা চক্ষু-বিশারদ ডাক্তারকে পত্র নিক্ষেপ করলাম, প্রত্যুত্তরে সে লিখেছিল এখন এই শীতকালে শুধু খাও গ্রীণ ভেজিটেবল চোখের উপকার হবে,—বাজারি ভিটামিন বড়ির চেয়ে এদের কার্যকারিতা কিছু কম নয়!

আর মাত্র তিনটে পর্ব ফর্দে তুলে দিতে পারলে গ্রাম-দেশে শীত-এর অভ্যুদয়ের বয়ান শেষ হয়। আমাদের বিগত বাল্যকালে এই শীত ঋতুর সঙ্গে মিশত বার্ষিক পরীক্ষার সাবধান বাণী। সাজো সাজো পড়াশুনোর হিড়িক। তারপর বুক দুর দুর দই-এর ফোঁটা কপালে দিয়ে পরীক্ষা দেওয়া, পাশ করে নতুন ক্লাসে গিয়ে বসা, বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে কলেজ স্ট্রীট পাড়ায়—মনিকাকার সঙ্গে ভিড়ের মধ্যে হাঁকাহাঁকি করে নতুন নতুন রকমারি মলাটের বই কেনার স্বর্গীয় আনন্দ। বাড়িতে এসে নতুন বইয়ে মলাট দেওয়া, বইয়ের দোকান থেকে বই কেনার দরুন নতুন একখানা কালেণ্ডার পাবার ন্যায্য অধিকার সব মিলিয়ে শীত ঋতুই যেন হয়ে যেত আমাদের অতি প্রিয় সঙ্গী। জীবনে সেই সব মসলিন-মোলায়েম রাত্রি আর ফিরবে না,— মনিকাকাও পাড়ি জমিয়েছে অতি দূর দূরান্তে চাওয়া-পাওয়ার নাগালের বাইরে।

আমি তো বহু বিলম্বে বনেছি গ্রামের বাসিন্দা। মূলে আমি কলকাতা শহরেরই পুরনো পড়শী। গ্রামে বিগত কয়েক বছর পেলাম সরস্বতী পুজোর কাম্য সান্নিধ্য। আঁচ। এখন আমাদের ছেলে-মেয়েদের আমাদের ছেলে-বেলার বয়স। তারা সরস্বতী পুজোর নামে নানা রঙিন পরিকল্পনার ভাবনায় মেতে ওঠে। কত বড় ঠাকুর হবে, কোথায় হবে প্যাণ্ডেল কেমন হবে চালচিত্র, অঞ্জলি দেওয়া থেকে কুচযুগ শোভিত জননীর রূপ বর্ণনা পর্যন্ত শ্লোক মুখস্তের পালা। কালিদাসদের মূর্খতা থেকে মহা কবিত্বে উত্তীর্ণ হওয়ার গল্প পর্যন্ত মুখে মুখে আবর্তিত হয়ে ফেরে।

এবার আমার শৈত্য সৌন্দর্য চর্চার শেষ পাতাটি, বা বলি না কেন শেষ কথাটি। এখনকার উপকরণের আনন্দ সঞ্চারে শহরও যা গ্রামও তাই। পৌষ লক্ষ্মী পুজোরও রেওয়াজ চলে এসেছে এ দেশে, দেবস্তাকে ঘিরে, ঋতুর পর্যায়গুলিকে ঘিরে বাঙালির রকমারি উৎসবের শেষ নেই, বৈচিত্র্যে তার ভাঁটা নেই। মা

এই শীতে মহার্ঘ অমৃত খেজুরের রস ছবি : দিলীপ ব্যানার্জি

কাকিদের পৌষ শেষের লগ্নগুলিতে পিঠে-পার্বণের ক্ষণগুলিকে আমরা বাঙালি, আমাদের পক্ষে ভুলে যাওয়া অসম্ভব। গ্রামে এক রকমের পিঠে পায়েসের চল, শহরে আছে ঐ একই খাদ্য সামগ্রীর রকমফের।

একদিন বঙ্গ-মুলুকে এতো অর্থনৈতিক টান ছিল না। এর জন্যে দায়ী কি লোক সংখ্যা? তেমন করে হাড়-কাঁপুনি শীত পড়ে মাত্র দু'চার দিন। নিঝুম হয়ে থাকে রাত্রি। ঝাউতলায় শিরীষতলায় ঝুলে থাকে পাঁশুটে কুয়াশা। আগে সন্ধে হলেই গুমা অঞ্চলে ডাক শোনা যেত অবিশ্রান্ত হুক্কা হুয়ার। কোথায় গেল তারা? দ্রাবিড় ভিড় ক্রমে ক্রমে যত দম বন্ধ করে আনছে ততই কি হারিয়ে যাচ্ছে বন-জঙ্গলের আদিম ইশারা। যত শীত জাঁকিয়ে আসছে কলকাতার কাছে আধা-পাড়াগাঁয়ে ততই মাইকে যাত্রার আর থিয়েটারের নির্জনতা চুরমারকারী প্রচার বিবরণ। শীত মুড়ি দিয়ে তাঁবুর ভিতরে বসে দেখে নল-দময়ন্তী, পুতুল নাচ, যাত্রা, শোনে মোল্লার কোরাণ ব্যাখ্যা, কখনো হবি-কীর্তনের অষ্টপ্রহর খোল-করতালের জগঝম্প কীর্তন ধ্বনি।

শীত, তোমার মহিমা অনিঃশেষ। তোমার জন্যে সম্বচ্ছর প্রতীক্ষা। কবে বিদায় হবে ভ্যাপসানি গরম, কবে চুকে-বুকে যাবে বন্যার জলমগ্ন দাপুটে উৎপাত, ফুল ফুটবে হলুদ গালচে বানিয়ে গাঁদা, স্থল-পদ্ম, সূর্যমুখী, গোলকচাঁপা, দালিয়া, জিনিয়া, টগর, জবা ইত্যাদি;—ভোরবেলায় ঘাসের জাজিমে মরকত শিশির, কচুর পাতায় মুক্তো, ডালে ডালে মাকড়সার জালের রেশমী মশারি। ঋতুগুলির মধ্যে তুমি সবচেয়ে সুন্দরী, মর্তকায়ায় যতদিন আছি-তোমার জাদু আকর্ষণে আমায় আকণ্ঠ ভরপুর করে রেখেছ,—এই মায়া, এই নিবিড় মোহ সৃষ্টি আর কিছুতে হয় না। কে বলে তোমায় রিক্তা, তুমি মহীয়সী মহা-সম্রাজ্ঞী রূপে গুণে সৌন্দর্যে সম্পদে,—তোমাকে কোটি কোটি প্রণতি।

আমাদের আদরের বাংলাদেশে শীতকালে শুধু শরীর রোদ্দুরে মেলে দেওয়া, অঢেল সব্জির আইটাই, খাওয়া-দাওয়ায় মন-মাতানো আত্মতৃপ্তির হাই তোলা আরাম আয়েশে। আমাদের শীত মাসে খাওদাও ঘুরে বেড়াও, লেপ-কাঁথা রোদ্দুরে শুকোও তারপর ছন্দিক নিঃশ্বেস গর্জনে দুপুরের চিঁড়িপোড়া ঘুম ঘুমাও।

বঙ্গ-রসের গল্পকার

অগভীর নিস্তরঙ্গ বাঙালী জীবনের উর্ধ্বতলে যে সামান্য আলোড়ন ও কম্পন দেখা যায়, ঘূর্ণিঘনঘটার বদলে যে ক্ষণস্থায়ী ঢেউ ওঠে এবং মিলিয়ে যায় তাকেই প্রভাতকুমার নিপুণ দক্ষতায় কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর সরল নির্দোষ ও পরিশীলিত হাস্যরস সংসারসমস্যাভারমুক্ত এক স্বস্তির জগতে বাঙালীকে পৌঁছে দিয়েছে।

ত্রৈলোক্যনাথ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষকে একদিকে মজলিশী কৌতুক-হাস্যে চোলাই করে এবং সমাজ সমালোচনাকে রূপকথার ব্যঞ্জনাত্মক অন্বয়ে রহস্যময় করে জীবনের সমান্তরাল এক স্বতন্ত্র রঙ্গজগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। কথ্যস্বাদ জড়িত অসংখ্য উদ্ভট অবিশ্বাস্য গল্পচূর্ণে ঠাসা এই ধারাবাহিক কাহিনীমালা মাদকে-মূঢ়তায় প্রায় অপ্রকৃতিস্থ এক ঘোর-লাগা আবহের মধ্যে আশ্চর্য সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পেরেছিল। হৃদয়বৃত্তির পরিবর্তে বুদ্ধিচারিতাই তবু রচনাগুলির প্রচ্ছন্ন বাহন। তাৎপর্য ঘটিত উইট তাঁর গল্পের হস চিহ্ন, তাঁর হাস্যরহস্যের চাবিকাঠি। তাই আক্ষরিক অর্থে জনপ্রিয়তা ত্রৈলোক্যনাথের ভাগ্যে জোটেনি। সে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন ত্রৈলোক্য সীমান্তবর্তী লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রভাতকুমারই প্রথম বাঙালীর বাস্তব জীবনের সঙ্গে হাস্যরসের দূরত্ব মোচন করলেন। তার বহু পরিচিত পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে, স্বল্প পরিসর জীবন পরিধির মধ্যে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বৈষম্য, অসঙ্গতি, স্খলন-পতন- ভ্রান্তিকে সহজাত কৌতুকবোধে অভিসিক্ত করে দিলেন। অলীক আশা আকাঙ্ক্ষা আসক্তি নির্ভর দিবাস্বপ্নকে কাকতলীয় দৈবঘটনায় উচ্চকিত করে এমন এক রঙীন বৈচিত্র্য ও তরলতা সঞ্চার করে দিয়েছেন যে তা কলহাস্যে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। অগভীর নিস্তরঙ্গ বাঙালী জীবনের উর্ধ্বতলে যে সামান্য আলোড়ন ও কম্পন দেখা যায়, ঘূর্ণিঘনঘটার বদলে যে ক্ষণস্থায়ী ঢেউ ওঠে এবং মিলিয়ে যায় তাকেই প্রভাতকুমার নিপুণ দক্ষতায় কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর সরল নির্দোষ ও পরিশীলিত হাস্যরস সংসার সমস্যাভারমুক্ত এক স্বস্তির জগতে বাঙালীকে পৌঁছে দিয়েছে। সেই সঙ্গে গল্পের চুম্বকপ্রবাহ প্রভাতকুমারের রচনায় এক নতুন মাত্রা যোজনা করেছে। তার আবেদন বাড়িয়েছে। ছোটগল্পের শিল্পরূপ ও রীতি, পরিমিতিবোধ ও সমাপ্তি দক্ষতা ছিল তাঁর অসামান্য। রবীন্দ্রগোষ্ঠীর গল্পকার হয়েও প্রভাতকুমার ছিলেন ভিন্নজাতের লেখক।

রবীন্দ্রনাথের এক টুকরো পত্রাংশ উদ্ধৃত করলেই প্রভাতকুমারের গল্পের চরিত্রলক্ষণ স্পষ্ট হবে। ... 'মনে ভাবিলাম সব গল্পই তো পূর্বে পড়া [নবকথা ও ষড়শী সম্পর্কে] হইয়াছে— ইহা আর পড়িব কি ?... নিতান্তই অলসভাবে বইয়ের পাতা উল্টাইতে সুরু করিলাম— দেখিতে দেখিতে মনটা আটকা পড়িয়া গেল। দ্বিতীয়বার যেন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলাম তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়ায় কল্পনার ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও যে কিছুমাত্র ভার আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই। ...যাহা হউক তোমার প্রথম সংস্করণের পাঠকেরা যে দ্বিতীয় সংস্করণেও ভীড় করিয়া দাঁড়াইবে, নিজের মধ্যে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল।'

কেবল দ্বিতীয় সংস্করণেই নয়, সম্প্রতি যদি তাঁর কোন সংস্করণ প্রকাশিত হয় তা হলেও পাঠকের ভিড় হবেই, নতুন পুরনো সব রকম পাঠকেরই। এই দুরারোগ্য সমস্যাপীড়িত সমাজে, এই ক্লান্তিকর সময়ে, বক্তব্যভারাক্রান্ত শৈলীপালিস- সর্বস্ব গল্পাল্পতায় পাণ্ডুর ছোটগল্পের দুনিয়ায় প্রভাতকুমারের গল্পগর্ভ ছোট গল্পের আবেদন যে এখনো ফুরোয়নি তাতে সন্দেহ নেই। উপন্যাস এবং ছোটগল্প উভয় ক্ষেত্রেই প্রভাতকুমারের স্বচ্ছন্দ বিচরণ ঘটলেও তাঁকে হয়তো অনেকেই প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক হিসেবে স্বীকৃতি দেবেন না। তার কারণ গভীর সমস্যার আবর্ত, চরিত্রের তুঙ্গ সংঘাত, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের অনুপুঙ্খ প্রয়োগ তাঁর উপন্যাসে লক্ষ্যগোচর হয় না। জীবন ও চরিত্র ব্যাপারে তিনি কখনই কটু ও নির্মম হতে পারেন নি। ঘটনাবৈচিত্র এবং চারিত্রিক স্নিগ্ধতাই তার অঙ্গীকর্ম ছিল। জীবন ও সমাজের প্রখর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও নিরানন্দ মন্দচিত্রে এবং কুটিল চরিত্রে তিনি দুঃসাহসী হয়ে উঠতে পারেন নি। কিন্তু খণ্ড জীবনের গল্পকার হিসেবে তিনি অনবদ্য এবং অতুলনীয় হয়ে উঠতে পেরেছেন।

প্রভাতকুমারের জন্ম ১৮৭৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী বর্ধমানের ধাত্রীগ্রামে, তাঁর মাতুলালয়ে। তাঁদের আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলার গুরুপ গ্রামে। বাবা জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় ছিলেন রেলের নগণ্য চাকুরে। কর্মসূত্রে বাংলার বাইরে নানা জায়গায় তাঁকে ভেসে বেড়াতে হত। ফলে প্রভাতকুমারের বিঘ্নিত শিক্ষাজীবন কাটে আত্মীয়গৃহে। জামালপুর থেকে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা এবং পাটনা থেকে ১৮৯১ ও ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে এফ এ ও বি এ পাস করেন। এফ এ পরীক্ষার ঠিক আগেই তাঁর বিবাহ হয়। বি এ পরীক্ষার পর সরকারী ক্লার্কশীপ পাস করে প্রথমে সিমলায় কিছুদিন কাজ করেন, পরে কলকাতায় ফিরে এসে ডিরেকটর জেনারেল অফ টেলিগ্রাফস অফিসে স্থায়ীভাবে কর্মরত হন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। ইতিমধ্যে ১৮৯৫ সাল থেকে ভারতী পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে শুরু করেন। মাত্র ছ বছরের দাম্পত্য জীবনের সমাপ্তি ঘটে গেল আকস্মিকভাবে ১৮৯৭ সালে। স্ত্রী বিয়োগের প্রায় তিন বছরের মধ্যেই আবার পিতৃবিয়োগ, পর পর দুটি আঘাত প্রভাতকুমারকে একেবারে ভেঙেচুরে রেখে গেল। এই সময় এক বিচিত্র যোগাযোগ ঘটে গেল সরলা দেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভাতকুমারকে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে বিলেত পাঠালেন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯০৩ সালে ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে ফিরলেন কিন্তু পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হল না। মায়ের অমতের ফলে সরলা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল না। এই আঘাত এবং চিরনিঃসঙ্গতা প্রভাতকুমারের সাহিত্যজীবনকে অভাবিত ভাবে প্রভাবিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। এরপর অল্পকালের জন্যে দার্জিলিং, পরে রংপুরে চার বছর এবং গয়ায় আট বছর প্র্যাকটিস করার পর নাটোররাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সৌজন্যে 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার সম্পাদনার ভার নিয়ে স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে আসেন। একটানা চোদ্দ বছর জগদিন্দ্রনাথের সহযোগী হিসেবে তাঁর সম্পাদনায় এই রুচিশীল মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯১৬ সালের গোড়ার দিকে এই পত্রিকায় যেমন যুক্ত হয়েছিলেন তেমনি ওই বছরই আগস্ট থেকে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ অবধি এই অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৩২ সালের ৫ এপ্রিল প্রভাতকুমারের মৃত্যু হয়। কেবল লেখক হিসেবেই নয় মানুষ হিসেবেও তিনি সাহিত্য সমাজে সকলের প্রিয় ছিলেন। এরকম আত্মপ্রচার বিমুখ, মিতভাষী, বন্ধুবৎসল বিশিষ্ট ভদ্রলোক কদাচিৎ দেখা যায়।

রচনাবলী : উপন্যাস ॥ ১। রমাসুন্দরী (১৯০৮) ২। নবীন সন্ন্যাসী (১৯১২) ৩। রত্নদীপ (১৯১৫) ৪। জীবনের মূল্য (১৯১৭) ৫। সিন্দুর কৌটা (১৯১৯) ৬। মনের মানুষ (১৯২২) ৭। আরতি (১৯২৪) ৮। সত্যবালা (১৯২৫) ৯। সুখের মিলন (১৯২৭) ১০। সতীর পতি (১৯২৮) ১১। প্রতিমা (১৯২৮) ১২। গরীব স্বামী (১৯৩০) ১৩। নবদুর্গা (১৯৩০) ১৪। বিদায়বাণী (১৯৩৩)।
গল্পগ্রন্থ ॥ ১। নবকথা (১৮৯৯) ২। ষোড়শী (১৯০৬) ৩। দেশী ও বিলাতী (১৯০৯) ৪। গল্পাঞ্জলি (১৯১৩) ৫। গল্পবীথি (১৯১৬) ৬। পত্রপুষ্প (১৯১৭) ৭। গহনার বাক্স (১৯২১) ৮। হতাশ প্রেমিক (১৯২৪) ৯। বিলাসিনী (১৯২৬) ১০। যুবকের প্রেম (১৯২৮) ১১। নতুন বউ (১৯২৯) ১২। জামাতা বাবাজী (১৯৩১)।
কাব্যগ্রন্থ ॥ অভিশাপ।

শতবর্ষের আলোয় বার্ন কনভেনশন

গ্রন্থস্বত্ব। ইংরেজীতে বলে 'কপিরাইট'। ইংরেজী কথাটা ঠিক যুৎসই নয়। বাংলা শব্দটি ইংরেজীর তুলনায় অনেক বেশী বোধগম্য হলেও সম্পূর্ণ তাৎপর্য ঠিক প্রকাশ পায় না। কারণ, স্বত্ব কেবল গ্রন্থের ক্ষেত্রে বা প্রকাশিত লেখার ক্ষেত্রেই নয়—প্রকাশিত ও অপ্রাকশিত যাবতীয় লেখাতেই লেখকের তা রয়েছে। ফরাসী ইত্যাদি ভাষায় বলে 'লেখকের অধিকার'। কথাটি অনেক পরিষ্কার।
আইনের দিক থেকে পেটেন্ট ও কপিরাইটের মধ্যে পার্থক্য আছে। পেটেন্টের কথা আসে তখনই যদি কেউ নতুন কিছু একটা আবিষ্কার করে। ভিন্ন ভিন্ন লেখকের কিন্তু একই জাতীয় গ্রন্থে গ্রন্থস্বত্ব থাকা সম্ভব। পেটেন্টের ক্ষেত্রে সে কথা আসে না—একজনই তা পেতে পারে। আবার, পেটেন্ট স্বত্বের কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই—ব্যাপারটা চিরন্তন।
সব ব্যাপারেই দ্বিমত আছে। গ্রন্থস্বত্ব এর ব্যতিক্রম নয়। জমি-বাড়ির মত গ্রন্থস্বত্বও একটি সম্পত্তি ছাড়া কিছুই নয়। অতএব এতেও স্বত্ব হবে চিরকালীন। এটা এক দলের মত। ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিচারে যে কোন একচেটিয়া ব্যাপার সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। গ্রন্থস্বত্ব একরকম একচেটিয়া ব্যাপার। এই অধিকার যত সীমিত হয় ততই তা সমাজের পক্ষে মঙ্গল।
তর্কের খাতিরে গ্রন্থস্বত্বকে একচেটিয়া ব্যাপার বলে চিহ্নিত করলেও একটা কথা বলা উচিত যে, ব্যাপারটা চিরন্তন নয়, যা পেটেন্টের ক্ষেত্রে আছে। আবার এটা সর্বজনগ্রাহ্য যে অধিকার সুরক্ষিত না হলে কোন স্রষ্টাই সৃষ্টিকার্যে উৎসাহিত হন না—সমাজের অগ্রগতির পথে যা বিরাট বাধার সৃষ্টি করে। তাই সমাজের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে গ্রন্থস্বত্ব ধারণাটি সর্বদেশে স্বীকৃতি লাভ করেছে।
বর্তমানে গ্রন্থস্বত্ব বলতে যা বুঝি তার শুরু গুটেনবার্গের ছাপাখানা আবিষ্কারের (পঞ্চদশ শতাব্দী) পর থেকে। লেখকদের অধিকারের কথাটা তখন বিরাট করে দেখা দেয়। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম গ্রেট ব্রিটেন একটি আইন পাস করে ১৭১০ সালে। এরপর অন্যান্য দেশও এই জাতীয় আইন পাস করতে শুরু করে—ডেনমার্ক ১৭৪১ সালে, ফ্রান্স ১৭৯৩ সালে, জার্মানি ১৮৩৭ সালে ইত্যাদি।
এইসব আইনে নিজ নিজ দেশে লেখকরা তাঁদের অধিকারের স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু অন্য দেশে তাঁদের লেখা কেউ ছাপালে কিছু করার ছিল না। শিল্প বিপ্লবের পর এই প্রশ্নটা বেশী করে চোখে পড়ে। লেখকের গ্রন্থস্বত্ব অন্য দেশে ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। সব দেশই এই অসুবিধার সম্মুখীন হয়। সবাই বুঝতে পারে, এ ব্যাপারে একটা কিছু করা দরকার। এক্ষেত্রে ফ্রান্স এগিয়ে এসে একটা দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে। ফ্রান্সই প্রথম দেশ যারা স্বদেশের লেখকদের মত বিদেশী লেখকদের অধিকার স্বীকার করে নেয়। অর্থাৎ অ-ফরাসী কোন লেখকের বিনা অনুমতিতে তাঁর মূল গ্রন্থের বা তার অনুবাদ কেউ ফ্রান্সে প্রকাশ করতে পারবে না। এরপরই পারীতে একটি আন্তর্জাতিক সংঘের সৃষ্টি হল—আসোসিয়াশিঁও লিত্‌তারেয়ার এ আরতিস্তিক আঁতেরনাশিওনেল—১৮৭৬ সালে। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ভিক্টর উগো। এই সংঘ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আন্তর্জাতিক গ্রন্থস্বত্ব সুরক্ষার জন্য একটি খসড়া চুক্তি তৈরি করে। উল্লেখ্য, এর খসড়ার ভিত্তিতেই বার্ন কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় (৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬) সুইজারল্যান্ডের বার্ন শহরে। এটা একশো বছর আগের কথা। এই কনভেনশনে অংশগ্রহণকারী চৌদ্দটি দেশকে নিয়ে গঠিত হল বার্ন ইউনিয়ন। সদস্য সংখ্যা বেড়ে বেড়ে ১৯৭০ সালে হয় ৫৯টি দেশ। এই চুক্তি অনুযায়ী স্বদেশের লেখকরা নিজ দেশের আইন অনুযায়ী যে সুবিধা ভোগ করেন, স্বাক্ষরকারী দেশের লেখকরাও সেই একই সুবিধা সে দেশে ভোগ করতে পারবেন।
প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক নতুন বিষয়—যেমন রেডিও, সিনেমা, রেকর্ড ইত্যাদি—এই চুক্তির আওতায় আসে। আরও অন্যান্য কারণে চুক্তির বয়ান ও বদল হতে থাকে। এসব কারণে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে এই চুক্তির পরিবর্তন ও পরিমার্জন হয়—পারী (১৮৯৬), বার্লিন (১৯০৮), রোম (১৯২৮), ব্রাসেলস (১৯৪৮), স্টকহলম (১৯৬৭) এবং সর্বশেষ পারী (১৯৭১)। উল্লেখ করার মত ঘটনা হল যে, এত বড় আন্দোলনে দুটি বড় দেশ শরিক হতে রাজি হয়নি—এরা হল যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। প্রথম দিকে যুক্তরাষ্ট্র অন্য দেশের—প্রধানত ব্রিটেনের—লেখকদের বই অম্লান বদনে ছেপে দিত। এবং সেই সমস্ত বইয়ের কিছু কিছু নমুনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির অফিসঘরেও শোভা পেত। এতে কেউ লজ্জাবোধ করত না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭৩ সালে স্বেচ্ছায় এর আওতায় আসে।
যাই হোক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সব দেশই বার্ন কনভেনশন সম্পর্কে বেশী করে সচেতন হতে থাকে। স্টকহলম অধিবেশনে—যা স্টকহলম প্রোটোকল নামে পরিচিত (১৯৬৭)—উন্নয়নশীল দেশগুলির কথা ভেবে তাদের বিরাট সুবিধা দেওয়ার কথা হয়। উন্নত দেশের বই লাইসেন্সের বলে উন্নয়নশীল দেশ ছাপাতে বা অনুবাদ করে ছাপাতে পারবে। বলা বাহুল্য, উন্নত দেশগুলি এ প্রস্তাবে রাজী হতে পারেনি। তাদের বক্তব্য এর দ্বারা গ্রন্থস্বত্বের মূল নীতিই লঙ্ঘিত হবে। ১৯৭১ সালে পারী অধিবেশনে ঠিক হয় যে, গ্রন্থস্বত্বাধিকারীর সম্মতি না পেলে উন্নয়নশীল দেশের সরকার দ্বারা প্রদত্ত লাইসেন্সের বলে পাঠ্যপুস্তক জাতীয় পুস্তকের ক্ষেত্রে এই সুবিধা উন্নয়নশীল দেশ ভোগ করতে পারবে। এর দ্বারা উভয়পক্ষের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়েছে। গুরুত্ব

আইনের দিক থেকে পেটেন্ট ও কপিরাইটের মধ্যে পার্থক্য আছে। পেটেন্টের কথা তখনই আসে যদি কেউ নতুন কিছু একটা আবিষ্কার করে। ভিন্ন ভিন্ন লেখকের কিন্তু একই জাতীয় গ্রন্থে গ্রন্থস্বত্ব থাকা সম্ভব। পেটেন্টের ক্ষেত্রে মাত্র একজনই তা পেতে পারে। পেটেন্টের কোন নির্দিষ্ট সময় সীমা নেই।

বেওয়ারিস

দুলেন্দ্র ভৌমিক

আমডাঙার পাকা সড়ক ছেড়ে কাঁচা রাস্তায় নামতে হলে দীনুকে সাবধানী হতে হয়। দু হাতে ব্রেক চেপে প্যাডেল বন্ধ করে গাড়ির গতি কমিয়ে আস্তে আস্তে নামতে হয় নিচের ঢালু পথে। এখানের কাঁচা রাস্তাটাকে ঠিক রাস্তা বলা চলে না। গরুর গাড়ি চলে চলে নরম মাটিতে এমন কাণ্ড করে রেখেছে যে শয়তান আর দীনু ছাড়া আর কেউ এ রাস্তায় হড়হড়িয়ে গাড়ি নামাতে পারে না। গোটা গাঁয়ে দীনুর মতো রিকশাভ্যান আছে মোটে দুখানা। আছে বলা ভুল বরং বলা যায় ছিল। দীনুও মনে মনে বলে, 'হ্যাঁ ছ্যালো। দু'খানা সাইকেল রেকশো ছ্যালো। তা গেল বছর দোলের দিন সেই দু'খানার একখানা নরীর ধাক্কা খেয়ে মায়ের ভোগে গেল। বিপনের বড় তেজ ছ্যালো। সিগরেট টানতে টানতে গাড়ি চালাতো। দত্তবাবুদের গুদাম থেকে পাটের আটি বয়ে আনতো সদর হাটে। রোয়াব ছ্যালো বিপনের। তা সেই দোলের দিন দেদার তাড়ি খেয়ে রোয়াব মেরে গাড়ি চালাতে গিয়ে ঠিক এইখানটাতেই গাড়ি উলটে পড়লো ঠিক কোলা ব্যাঙের মতো। যেইমাত্র পড়া আর অমনি সদরের পাকা রাস্তা দিয়ে যমের বাহনের মতো ছুটে এল তাগড়াই লরীটা। ব্যাটা ড্রাইভার গাড়ি থামাবার আগেই বিপনে খতম। এরপর আর কেউ গাড়ি থামায় ? ভাঙাচোরা গাড়িটার সঙ্গে প্রায় কাদামাটির মতো থেতলে ছিল বিপনের শরীরটা। বেলচা দিয়ে লাশ তুলতে হয়েছে।

সেই থেকে দীনু সাবধান হয়ে গেছে। আগের মতো হড়হড়িয়ে নামা কিংবা প্যাডেল মেরে হুড়হাড় করে রাস্তায় আর উঠে আসে না। পাকা সড়কটাও ঠিক এই জায়গাটায় এমন করে বাঁক নিয়েছে যে, পাঁচ দশ হাত দূরের কোন গাড়ি নজরে পড়ে না। ঘোষালদের বাগানটা কলা বৌয়ের ঘোমটার মতো রাস্তার ওপর ঠিক ওই বাঁকের মাথায় এমন করে এগিয়ে এসেছে যাতে করে রাত বিরেতে আরও গণ্ডগোল লেগে যায়। এখন কাঁচা রাস্তায় নেমে ঘোষালদের বাগানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দীনু ভাবল, রোজই যেমন ভাবে, আজও ভাবল, শালা ট্যাঁকে পয়সা থাকলে বাগানটা কিনে নিতুম। বাবুদের ফুর্তি মারাবার জায়গা। আগে নাকি কোলকাতা থেকে মেয়েমানুষ ভাড়া করে এনে এখানে খ্যামটা নাচ হতো। সেসব অনেককাল বন্ধ। এখন মাঝে মধ্যে বাবুদের ছেলেরা বন্ধুবান্ধব নিয়ে ছুটি ছাটায় আসে। সেও এক রকম ফুর্তি বলা যায়। বোতাম

টিপে যন্ত্র থেকে গান বার করে আর তার সঙ্গে মাগীমদ্দ সবাই পাছা দুলিয়ে নাচে। এমন বেঢপ রাস্তায় বাবুদের মিনিবাস নামে না। তখন দীনুর রিকশা ভ্যানে চাপিয়ে আনতে হয় মুরগীর খাঁচা, মদের বোতলের পেটি আর বাবুদের খাবারদাবারের নানা সরঞ্জাম। একবার একটা বোতল চোখের পলকে ঝেড়ে দিয়েছিল দীনু। বাঁশবাগানের গর্তে লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল। সন্ধ্যেবেলা বাড়ির দাওয়ায় বসে দাঁতে করে টেনে সেই বোতলের ছিপে খুলে পুরো বোতলটাই সাবাড় করে দিয়ে দেখেছিল তার একটুও নেশা হয়নি। জিনিসটার নাম বীয়ার। পুরো বোতলেও দীনু বুঝতে পারল না সে আদৌ কিছু খেয়েছে কিনা। আধঘন্টা বাদে কলকলিয়ে পেচ্ছাপ করার পর পেটের ভারটাও কমে গেল। এর চেয়ে তাড়ি কিংবা চোলাই ঢের ভাল।

বাড়ির দিকে ভ্যানটা ঘোরাতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যেতে হল দীনুকে। একটা কান্নার আওয়াজ আসছে দক্ষিণ দিক থেকে। মণ্ডলপাড়ার ভেতর থেকে কান্নাটা উঠছে। দীনু গাড়ির মুখ ফেরাল। তার মেজাজ খুশ হয়ে আসছে। গেল হপ্তা থেকেই আন্ত্রিক না তান্ত্রিক কী একটা ব্যামো ঢুকেছে মণ্ডলপাড়ায়। ব্যামো যত বাড়ে সদরের হাসপাতালে যাবার জন্য দীনুরও রেট বাড়ে ধাপে-ধাপে। এমনিতে সদর হাসপাতাল পর্যন্ত গেলে তিন টাকার বেশি কোন শালা দিতে চায় না। তাও আবার কত দরদস্তুর। এ সময় দরকষাকষির সময় নেই। হাসপাতাল মানেই পাঁচ টাকা। রাতবিরেত হলে আরও বেশি। যদি দাও তাহলে দীনু কাঁহার তৈরি, নইলে ঘরের দাওয়ায় শুয়ে শুয়ে আকাশের চাঁদ দেখতে দেখতে মায়ের ভোগে যাও।

রোজগারের গন্ধ পেয়ে দীনু মণ্ডলপাড়ার দিকে গাড়ি চালাতে লাগল। সারা দুপুর দমফাটা গরমের পর এখন মাঝে মধ্যে হালকা বাতাস বইছে। গায়ে বাতাস লাগলে ঘামটা শুকিয়ে আসার সময় বেশ আরাম লাগে। দীনু ভেবেছিল বাড়ি ফিরে পুকুরে চান করবে। কিন্তু চান এখন তোলা থাক। আট টাকার একটা দাঁও মারার লোভে সে প্যাডেলে চাপ দিল। যেতে চাইলেই কী আর তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। রাস্তা তো নয় যেন আমডাঙার চষা ক্ষেত। ভ্যানের চাকা কেতরে কেতরে যায়। মণ্ডলপাড়ার ভেতরে ঢোকবার আগেই সে বুঝে গেল তার আন্দাজ মিথ্যে নয়। হ্যারিকেন নিয়ে লোক বেরিয়েছে তাকে খুঁজতেই। দীনু অন্ধকারে ঘন্টি বাজাতেই হ্যারিকেনটা একটু উঁচুতে তুলে কেউ একজন বলল, 'কে দীনু না ?'

দীনু গলার স্বর ক্লান্ত আর কাতর করে বলল, 'হ্যাঁ, তো দীনুই বটে।' লোকটি ব্যগ্র গলায় এবং ক্ষিপ্র গতিতে গাড়ির কাছে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, 'আমি তোর খোঁজেই যাচ্ছিলাম বাবা। একটিবার ঘরে আয়। মেয়েটা আমার এ্যাখন ত্যাখন অবস্থা।'

দীনু অতি ঘোড়েল মাল। সে জানে এই মওকায় ঝট করে রেট বাড়িয়ে নিতে না পারলে কেউ আর কোনদিন কস্মিনকালেও চার আনা পয়সা বেশি দেবে না। দয়াধম্ম দেখাতে গেলে পরনের ন্যাতা জোটে না। নিজের বাপ ধম্ম করতে গিয়ে জমিজমা সব খুইয়ে বসে আছে। দয়াধম্ম হচ্ছে কিনা নেবুর জলের মতো। গুরুপাক ভোজনের পর তারিয়ে তারিয়ে খেতে ভাল লাগে। খালি পেটে নেবুপানি সইবে কেন। অতএব দীনু কাঁহার তার গলার স্বরে বিষম ক্লান্তি ফুটিয়ে বলল, 'আমি যে এখন ঘর যাচ্ছি। সারাদিন কুটোটি দাঁতে কাটিনি। পেটে খিচ ধরে আসছে। রোদে পুড়ে পুড়ে মাথাও চক্কর মারছে। 'অ্যাখন আমি গাড়ি টানতে পারবুনি।'

লোকটা এগিয়ে এসেছে গাড়ির কাছে। সাইকেল ভ্যানের কাঠের পাটাতনের ওপর হ্যারিকেন রেখে দীনুর হাতটা চেপে ধরে বলল, 'দোহাই বাপ! তুই না গেলে মেয়েটা বিনা চিকিৎসেতে ঘরে পড়ে মরবে। একটু দয়া কর দীনু। তোর কষ্ট আমি পুষিয়ে দেব।'

লোকটার গলা থরথর করে কেঁপে উঠল। দীনু মনে মনে বলল, 'বাছাধন পথে এসো। তুমি শালা দাশরথি মণ্ডল। বুড়ো বয়সে নাগর সেজে তিনবার বে করেছ। একবার বারোয়ারির অষ্টমীতে আমাকে খিচুড়ি খাবার আসন থেকে তুলে দিয়ে বলেছিলে, তোদের জন্যে পাত পেড়ে খাবার ব্যবস্থা হয়নি। কলাপাতা নিয়ে আয় তাতে পেসাদ নিয়ে যা। সেদিন আমার দশ বছরের বোবা মেয়েটার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিলো। সেই জল তোমার চোখে পড়েনি। এখন আমায় বাপ বলছ। তা বলছ বল। আমিও তোমার মতো বাপের কাজ করে যাব।'

দীনু দাশরথিকে শুনিয়ে লম্বা করে একটা শ্বাস ফেলল। কাতর গলায় বলল, 'শরীর আর বইছে না গো। কুচকিতে আবার একটা বিষফোঁড়া—পা চালালেই মনে হয় প্রাণখান বেইরে যাবে।'

দাশরথির গলা আরও কাতর হল। দীনুর ঘামে ভেজা পিঠে হাত রেখে বলল, 'তোকে পুষিয়ে দেব দীনু, পুষিয়ে দেব।'

দীনু ক্লান্ত গলায় বলল, 'চলেন, কী আর করা। একই গাঁয়ে থাকি। বিপদে তো যেতেই হবে।'

দাশরথি হ্যারিকেন নিয়ে দীনুর পাশে পাশে হাঁটে। দীনু গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করে, 'কত দিবেন মনস্ত করিছেন?'

দাশরথি চলতে চলতেই জবাব দেয়, 'এখন কী দামাদামির সময়। তুই যা চাস।'

দীনু প্যাডেলে জোরে করে একটা চাপ দিয়ে দাশরথির দিকে তাকাল। হ্যারিকেনের আলোয় খুব ভাল করে মুখটা দেখা যাচ্ছে না। দীনু গলায় আক্ষেপ ফুটিয়ে বলল, 'এ সময় কী আর চাইবো। গাঁয়ের ব্যাপার। আপনি বলেই এলাম। যতক্ষণ কলিজায় পৈরাণ আছে ততক্ষণ তো আর চোখ বুজে থাকতে পারিনে। খান পনেরো টাকা দিবেন।'

চলতে চলতেই দাশরথি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। হ্যারিকেনটা দীনুর মুখের কাছে তুলে ধরে অবাক গলায় শুধোয়, 'বলিস কি! পনেরো টাকা।'

দীনু চোখ সরিয়ে নিয়ে মনে মনে বলে, 'শালা, ঘরে মেয়ে মরতে বসেছে এখনও হিসেব ভুল হচ্ছে না। আবার বলে, পুষিয়ে দেব। বন্দকী কারবার করে মালকড়ি তো নেহাৎ কম হড়কাও নি। এখন মেয়ের জন্যে একটু বেশি ছাড়লে কলজে শুকিয়ে ওঠে কেন?'

দীনু এসব ব্যাপারে দয়াধম্মে বিশ্বাস করে না।

সে খচ্ করে গাড়ি থামিয়ে দিয়ে বলে, 'তাহলে ঘর যাই। পেটে বড্ড খিচুনি মারছে। সারাদিনে তো কম রুগী বইনি। শরীরে জুত নেই।'

দাশরথি ব্যস্ত হয়ে দীনুর হাত চেপে ধরে বলল, 'দেব, পনেরোই দেব। তবু তুই আয়।'

দাশরথি দাঁতে দাঁত চেপে হাঁটতে হাঁটতে ভাবল, মেয়েটা একবার বেঁচে ফিরুক। তারপর তোর রমজানি আমি বার করছি।'

দীনু বুঝতে পারে দাশরথি বেকায়দায় ফেঁসে গিয়ে পনেরো টাকায় রাজী হয়ে গেল। মনে মনে নির্ঘাৎ দীনুর বাপচোদ্দ পুরুষ তুলে শাপশাপান্ত করছে। কিন্তু তাতে দীনুর বয়েই গেছে। কৈবর্তপাড়ার মাসি বলে, দীনুটা একটা শয়তান। শরীরে দয়ামায়া নেই। গাড়ি থেকে মরা নামিয়ে দিয়েই বলে, কাঁদবার আগে আমার ভাড়া মিটিয়ে দাও। ভাড়া দিয়ে তারপর গলা ছেড়ে সারাদিন কাঁদো।' দীনু নিজেও জানে, তার ভেতরে একটা শয়তান আছে। সেটা মাঝেমধ্যে যখন জেগে ওঠে তখন চোষকাগজের মতো শরীরের সব মায়ামমতা দয়াধম্ম শুষে নেয়। শয়তানটাকে কখনও কখনও তার ভালো লাগে। তার বাপের মধ্যে কোন শয়তান ছিল না বলে সে ঠকেছে। দীনু ঠকতে চায় না। ভগবানের চাইতে শয়তানই তার ঢের আপন। ভগবান তাকে কিচ্ছু দেয়নি। দিতে পারেনি। জোতজমি বেহাৎ হয়েছে। গোখরোর ছোবলে বারো বছরের ছেলেটা গেছে। একটা মাত্র মেয়ে কিন্তু সেও জন্ম থেকে বোবা। বৌটা বারো মাস রোগে ভোগে। এই তো তার কপাল—তার ভগবানের বিধান। তার চেয়ে শয়তান ভালো। সে ভেতরে ভেতরে দীনুকে জেদি করে তোলে। সে শেখায় কখন কেমন করে মানুষকে নিঙড়ে নিতে হয়। এই যেমন এখন সে নিঙড়ে নিচ্ছে দাশরথি মণ্ডলকে। তার ভেতরে শয়তান আছে বলেই পারছে। ভগবান থাকলে কি পারতো!

দাশরথির দাওয়ায় তখন পাড়াপড়শীদের ভিড়। দীনুকে দেখতে পেয়ে সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দাশরথি এগিয়ে গিয়ে বৌকে ডাকল, 'দেরি করো না গাড়ি এসে গেছে।'

দীনু গাড়িটাকে টেনে নিয়ে দাঁড় করালো বারান্দার সামনে। কাঠের পাটাতনের ওপর এবার বিছানা পাততে হবে। এসব কাজ ঝটপট করতে পারে দীনু। মেয়েটাকে তোলবার সময় দীনু দাশরথির তৃতীয় পক্ষের বৌটাকে একবার ভালো করে দেখে নিল। আগেও বার কয়েক দেখেছে কিন্তু সে দূর থেকে। কোন দরকার ছিল না তবু দীনু হাত বাড়িয়ে তোষকটা নিতে গিয়ে খানিকটা ইচ্ছে করেই বাঁ হাতের কনুই দিয়ে দাশরথির বৌয়ের বুকের কাছটায় একটা খোঁচা দিল। দীনু জানে, এখন এসব ব্যাপার নিয়ে কেউ কথা তুলবে না। এখন সবাই ব্যস্ত আর ব্যগ্র মেয়েটাকে নিয়ে। এসময় কারো মাথায় কুমতলব আসে? দীনুর কিন্তু এসে যায়। বারুণীর স্নানে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে সবাই পুণ্য করে। দীনুর পুণ্যে অত আগ্রহ নেই। সওয়ারী নামিয়ে দিয়ে সে গঙ্গার ঘাটের কাছটায় ঘাপটি মেরে বসে বসে মেয়েদের স্নান দেখে। গঙ্গা স্নানে পুণ্য হয় বলে কাপড় চোপরের দিকে অত খেয়াল রাখে না কেউ। যুবতী বৌগুলো বেসামাল হয়ে স্নান করে। তারপর ভিজে কাপড়ে যখন ছপ ছপ শব্দ তুলে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আসে তখন শরীরের সঙ্গে লেপটে থাকা সেই কাপড় আর তলা থেকে ফুটে বেরুনো শরীর দেখতে দীনুর খুব ভাল লাগে। কোন পাপটাপের কথা তার মনে হয় না। দাশরথির বৌটা দেখতে জব্বর জিনিস। ভিটে মাটি বন্দক দিয়ে বাপটা দেউলে হয়ে যাচ্ছিল। তখন বাপ কচি মেয়েটাকে এই হুলো হুমদোটার কাছে বে দিয়ে ভিটেমাটি ছাড়ায়। মোদ্দা কথা, মেয়ে বন্দক দিয়ে বাস্তুভিটে ছাড়িয়ে নেওয়া আর কি! তিন কুড়ি বয়স পেরিয়ে এসে সেই হুমদো এখন কচি মেয়েটাকে বৌ বৌ বলে ডাকছে। জেনে বুঝে সেই বৌয়ের বুকে কনুয়ের খোঁচা দিলে পাপ হবে কেন? দাশরথির বৌ সেজে সংসারের চাবি আঁচলে বেঁধেছে বটে, কিন্তু ওদিকে মাঝ দুপুরে পিরীত চালাচ্ছে গাঁয়ের মাস্টারের সঙ্গে। দীনুর কাছে গায়ের কোন বেত্তান্ত অজানা নয়।

রিকশা ভ্যানে মেয়েটাকে শুইয়ে দেওয়া হয়ে যাবার পর দাশরথি বলল, 'বাবা, দেখেশুনে চালাস।'

দীনু অভয় দেওয়ার ভঙ্গি করে বলল, 'কিচ্ছু ভাববেন না। একেবারে পেট্রোল গাড়ির মতো গড় গড করে নিয়ে যাবো।'

কথাটা শেষ করেই দীনু গলা নামিয়ে দাশরথিকে বলল, 'তা আমারটা দিয়ে দিন।'

দাশরথি অবাক হওয়ার চাইতে বিরক্ত হল বেশি। বলল, 'এখনই চাই?'

দীনু সরল গলায় উত্তর দিল, 'এর আবার অ্যাখন ত্যাখন কি! মিটিয়ে দেয়াই তো নিয়ম।'

নিজের সাইকেলে ওঠবার আগে দাশরথি পকেট থেকে দীনুকে টাকাটা দিয়ে বলল, 'পনেরোই দিলাম।'

দীনু একথার কোন জবাব দেওয়ার দরকার মনে করল না। সে গাড়ি টানতে আরম্ভ করল।

হাসপাতালে মেয়েটাকে নামিয়ে দিয়ে দীনু যা করে সেই কাজটা আগে সেরে ফেলল। ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে বুঝে নিতে চাইল, মেয়েটা আজকের রাত টিকে যাবে নাকি ঘণ্টাখানেক বারান্দায় বসলে লাশ নিয়ে ফেরা যাবে। তাহলে ফিরতি পথেও নিদেন পক্ষে আরও দশ-পনেরো রোজগার হয়ে যায়। কিন্তু সে রকম কোন সম্ভাবনা না থাকায় দীনু বাড়ি ফিরে এলো প্রায় মাঝরাত্তিরে। উঠোনে চাটাই পেতে বৌটা ঘুমিয়ে পড়েছে। মেয়েটা রিকশার শব্দে উঠে বসল। হ্যারিকেনের আলোটা বাড়িয়ে নেমে এল বাপের কাছে। দীনু এই একটা জায়গায় বড় দুর্বল। মেয়েটা কথা বলতে পারে না। ওর চোখের দিকে তাকালে দীনুর বুকের মধ্যে খচ খচ করে। ওর গভীর চোখে মেটে অন্ধকার। আতুড়ে সাধ করে ওর নাম রেখেছিল জবা। জবা সব বুঝতে পারে, দেখতে পায়, শুধু বাপের বুকের ভেতরটা ছাড়া। শয়তানের থাবা বাঁচিয়ে এখনও একটু জায়গা দীনু রেখে দিয়েছে তার বোবা মেয়েটার জন্য। জবা জলের বালতি আর গামছা এগিয়ে দেয়। দীনু মুখ হাত ধুয়ে ঘরে যায়। জবা মাকে ধাক্কা দিয়ে তোলে।

দীনু খেতে খেতে মেয়ের দিকে তাকায়। ওর চোখে ঘুমের চিহ্ন নেই। মেয়েটা বোধ হয় অনেক রাত একা একা জেগে থাকে। মনে মনে হয়তো কথা বলে।

দীনু খাওয়া শেষ করে বারান্দায় বসে বিড়ি ধরাচ্ছিল। বৌ এসে ওর পাশে বসল।

দীনু জানে এখন কোন কথাটা তার বৌ বলবে। মাঝরাত্তিরে দাওয়ায় বসে পিরীত করার মতো বৌ তার নয়। বৌ ছোট করে একটা হাই তুলে বলল, 'ছেলেটার বাপের সঙ্গে কথা কয়েছো?'

বিড়িতে টান দিয়ে দীনু বলল, 'বোবা মেয়ে পার করা অত সহজ নয়। দেদার টাকা চাইছে।'

অসহায় গলায় বৌ প্রশ্ন করে, 'কত?'

দীনু মনে মনে বিরক্ত হয়। বিরক্ত গলাতেই বলে, 'শুনে কী করবি। অত টাকা তোর বাপও দেখেনি, আমার বাপও দেখেনি।'

গলায় আর্তি তুলে বৌ বলে, 'তাহলে?'

দীনু হাই তুলে বলে, 'তাহলে আর কী। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। বেদেডাঙায় একটা সন্ধান পেয়েছি। ছেলেটা ইটভাটায় কাজ করে।'

দীনুর বৌয়ের গলায় স্তিমিত উৎসাহ আবার ঝিলিক দিয়ে ওঠে। স্বামীর পিঠে হাত রেখে বলে, 'জবাব বেত্তান্ত জানে?'

শেষ হয়ে আসা বিড়িটা উঠোনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দীনু বলে, 'বেত্তান্ত আর এমন কী মহাভারত। গোটা গা জানে দীনু কাঁহারের মেয়ে বোবা। ওরাও জানে। জানে বলেই গলায় পা দিয়ে বায়না ধরছে।'

বৌয়ের উৎসাহ নিভে এলো। অন্ধকার আকাশের দিকে চোখ রেখে উদাস গলায় বলল, 'ওরা কত ট্যাকা চাইছে?'

দীনু কোমরের লুঙ্গি আলগা করতে করতে বলল, 'চশমখোর বাপটা বলছে হাজার টাকা নগদ দিতেই হবে। আর ছেলেটা চাইছে একখানা সাইকেল। এই দুইয়ে মিলে তোর আঠারোশো টাকা লাগবে। তার ওপর আরও খরচ যোগ করলে দাঁড়াবে পেরায় তিনহাজার টাকা।'

দীনুর বৌ অস্ফুটে আহত গলায় বলে, 'এত টাকা? কোথায় পাবে গো?'

দীনু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, 'পেতে হবে। টাকা নেই বলে তো মেয়েডারে ঘরে রাখতে পারব না। টাকার উপায় বার করতে হবে। সেই উপায়ের তক্কে তক্কে আছি।'

দীনু চাপা গলায় কথাটা এমন হিংস্রভাবে বলল যে তার বৌয়ের গা শিউরে উঠল। সে স্বামীর কাঁধে ধাক্কা দিয়ে ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'তুমি কি চুরি-ডাকাতির মতলব করছো নাকি! তাহলে কিন্তু আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব।'

দীনু বৌকে ধমক দিয়ে বলল, 'ধ্যাৎ, যা বুঝিস না তাই নিয়ে কথা কইতে আসিস না। চুরি করলে তো শালা কবেই দাশরথির দোকান ভেঙে ফেলতাম। আমি আছি অন্য ধান্ধায়।'

দীনুর বৌয়ের ভয় গেল না। সে স্বামীকে অবিশ্বাসের চোখে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, 'কিসের ধান্ধা ?'

দীনু আরেকটা বিড়ি ধরাতে ধরাতে বলল, 'বেওয়ারিস বুঝিস ?'

দীনুর বৌ বোকার মতো ফ্যাল্ ফ্যাল চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, 'সেটা কী জিনিস গো ?'

'যে মালের কোন মালিক নেই। ধর, পুকুরঘাটে চান করতে গিয়ে দেখলি ঘাটের রানায় এক খণ্ড সাবান পড়ে আছে। কার সাবান কে জানে ! তুই সেটা তুলে নিয়ে এলি। তাতে কোন দোষ হোল ?'

দীনুর বৌ মাথা নাড়ল। বাইরে আলোর তেজ না থাকায় স্বামীর মুখটা ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল না। বুঝতে পারছিল না, তার স্বামী ঠিক কী বোঝাতে চাইছে। দীনু বিড়িতে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'ঠিক তেমনই মানুষও বেওয়ারিস হয়। সাতকুলে কেউ নেই, কিংবা ধর রাস্তার কোন ভিখেরি, লোকটা মরে গেল। তখন ওর লাশটা হবে বেওয়ারিস।'

দীনুর বৌয়ের মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। সে বলল, 'তাতে তোমার কী লাভ হবে ?'

দীনু নিজের মনেই হাসতে হাসতে বলল, 'তেমন একটা বেওয়ারিস লাশ হাতাতে পারলে বুঝবি কত লাভ। আমার লোক ঠিক করা আছে। লাশ দিলেই হাতেহাতে টাকা।'

দীনুর বৌ আঁতকে ওঠে। বলে, 'ওমন কাজ তুমি করো না। ওতে অধম্ম হবে। পরকালে কষ্ট পাবে।'

দীনু মুখ ভেংচে বলে, 'শালা একালের কষ্ট সামলাতেই প্রাণ যায় তো পরকাল। একালেও কষ্ট, পরকালেও কষ্ট। আমার ওতে কিছু যায় আসে না।'

দীনুর বৌ আর কথা বলতে পারে না। ভয়ে তার বুক কাঁপতে থাকে। এই গোয়ার লোকটাকে তার বেজায় ভয়। জেদ করলে যা খুশি তাই করতে পারে। পাড়ার লোক তার স্বামীকে ডাকে 'শয়তান' বলে। দীনুর বৌয়ের কখনও কখনও মনে হয় খুব একটা খারাপ বোধ হয় বলে না। লোকটার অতবড় শরীরের মধ্যে মনটাকে মাঝে মাঝে খুঁজে পায় না দীনুর বৌ। বৌ ঘরে যাবার আগে বলে যায়, 'আমার নামে দিব্যি দেওয়া রইল। তুমি ওসব ধান্ধায় মেতে থেকো না। তাতে অধম্ম হবে।'

দীনু কোন কথা বলল না। চাটাইয়ের ওপর শুয়ে পড়ে অন্ধকার আকাশের দিকে চোখ রেখে সে ভাবতে লাগল, নিজের ধম্ম নিজের কাছে। বেওয়ারিস লাশ তুলে দিয়ে যদি এক ক্ষেপে তিন চারশো টাকা পাওয়া যায় তাহলে-সেই মওকা ছাড়ে কোন শালা। মরে গেলে সেই মানুষের কোন জাত থাকে না। তার ছাল ছাড়িয়ে হাড় বিক্রি করে যদি কেউ পেট চালায় তাতে মরা মানুষটার আর কী ক্ষতি। দালাল গোছের লোকটা তাকে অবশ্য বলেছে রূপনারাণের কাছে একটা জায়গা আছে সেখানে বড় বড় কড়াইতে মরা মানুষ সেদ্ধ করা হয়। তারপর হাতা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মাংস ছাড়িয়ে শুধু হাড়গুলো বার করে নেওয়া হয়। জ্যান্ত মানুষের চাইতে মরা মানুষের দাম নেহাৎ কম নয়। তেমন তেমন মওকা পেলে নাকি দেড় দুহাজারও মিলে যেতে পারে।

কিন্তু তেমন মওকা দীনুর কাছে আসে না। হাটেঘাটে কত লোক মেরে অথচ কেউ বেওয়ারিস হয় না। লাশ নেবার যোগ্য দাবীদার ঠিক জুটে যায়। বেদে ডাঙার হাটে বসে ভিক্ষে করতো একটা লোক। দীনু তার নাম জানে না। তার সাতকুলে কেউ আছে বলে দীনুর মনে হয়নি। লোকটা শুয়ে থাকতো চণ্ডীতলার চালাঘরে। হেগেমুতে হেজে গিয়ে লোকটা ওখানেই মরে যেতে বসেছিল। খবর পেয়ে দীনু তার গাড়ি নিয়ে শকুনের মতো উড়ে গেল চণ্ডীতলায়। লোকটার তখন শ্বাস উঠেছে। চোখ ঠিকরে বেরুচ্ছে কোটর থেকে। দীনু লোকটাকে নিজের গাড়িতে তুলে নিল। ওর হয়ে ভাড়া দেবার কেউ ছিল না। কিন্তু দীনু তখন ভাড়ার কথা ভাবছিল না। তার মনে হয়েছিল হাতের কাছে মওকা এসে গেছে। লোকটার শরীর থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল। কিন্তু দীনু সেসব খেয়ালের মধ্যে আনল না। যারা ভিড় করে দীনুর এই কাণ্ড দেখছিল তারা দীনুকে ধন্য ধন্য করল। দীনু লোকটাকে সাইকেল রিকশার ওপর তুলে দিয়ে মনে মনে ভাবল, দীনু অত বোকা নয়। দয়াধম্ম করতে দীনুর এখানে আসতে বয়ে গেছে। লোকটা মরে গেলেই লাশটা বেওয়ারিস হয়ে যাবে। তিন চারশো টাকার একটা সওদা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে দীনু। এতে কোন দয়াধম্ম নেই।

লোকটা হাসপাতালে পৌঁছবার আগেই মরে গেল। মরা লোককে ভর্তি করাবার দরকার নেই। দীনু খোশ মেজাজে লাশটা আবার সাইকেল রিকশায় তুলতে যাবার কথা ভাবছে ঠিক তখনই কোত্থেকে ওই ভিখেরিটার একটা ভাগ্নে এসে জুটলো। ভাগ্নে একা নয়, সঙ্গে আরও কয়েকজন। দীনুর সাইকেল রিকশায় না উঠে সেই লাশ উঠলো বাঁশের মাচায়। আপসোসে আর আক্ষেপে মনটা বিষিয়ে গেল দীনুর। ভাগ্নে এসে দীনুকে অনেক ভালো ভালো কথা বলল। দীনুর মতো মানুষ নাকি সে দেখেনি। এই সব ভাল কথায় দীনুর মন ভাল হবার নয়। তার ইচ্ছে হচ্ছিল গলা খুলে খিস্তি করে। কিন্তু পারল না। হাতের নাগালের মধ্যে এসেও মওকাটা ফসকে গেল দীনুর।

মাঝ দুপুরে দীনু গাড়ি চালিয়ে এসে বেদেডাঙার মোড়ে দাঁড়াল। একটু জিরেন চাই। এখান থেকে ইঁটভাটার চিমনিটা দেখা যায়। ছেলেটা ওই ভাটায় কাজ করে। সামনের শ্রাবণে ওরই সঙ্গে জবার বিয়েটা হয়ে যেতে পারত যদি—

দীনু ঢোক গেলে। তার মন এলোমেলো হয়ে যায়। বুকের মধ্যে ক্ষ্যাপা হাওয়ার মতো একটা অস্থির দাপাদাপি শুরু হয়। গায়ে গতরে খেটে চারশো টাকা মাত্র জমাতে পেরেছে। এখনও দেদার টাকার দরকার। দীনু আস্তে আস্তে আবার প্যাডালে চাপ দেয়। গাড়ি নিয়ে এসে দাঁড়ায় সেই দোকানটার সামনে। পরেশের বাপের দোকান। পরেশ এখন ইঁটভাটায় কাজে গেছে। বাপ দোকানে বসে চা বানাচ্ছে। দীনুকে দেখে পরেশের বাপ চোখ তুলে তাকাল। দীনু এই তাকানোর মানে বোঝে। লোকটার নাম নিকুঞ্জ। গলায় কণ্ঠির মালা ঝুলিয়ে বকধার্মিকের মতো দোকানে বসে থাকে। কেষ্টঠাকুর আর টাকা দুটোই খুব ভাল চেনে। দীনু হাত জোড় করে নমস্কার করল। দীনু একবার নমস্কার করলে নিকুঞ্জ দুবার করে। কাঁঠালের রসের মতো বিনয় আর ভক্তি যেন গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে। দীনু কিছু বলতে যাবার আগে নিকুঞ্জ বলে, 'ঠাকুরের ইচ্ছেয় কথা যখন দিয়েছি তখন কাজটা তো করে যেতে হবে। শ্রাবণ তো এসে গেল। টাকা, সাইকেল এসবের কি ব্যবস্থা হল?'

দীনু মনে মনে ঘাবড়ায়। মুখে বলে, 'হয়ে যাবে কর্তামশাই হয়ে যাবে।'

নিকুঞ্জ চা বানিয়ে নিজেই চুমুক দেয়। এক চুমুক খাবার পর বলে, 'চা খাবে নাকি হে।'

দীনু মনে মনে বলে, 'শালা'। কিন্তু মুখে বলে, 'না, এই তো খেয়ে এলাম।'

নিকুঞ্জ দুঢোক চা খেয়ে বলে, 'তোমার কথায় ভরসা করতে পারছি কই। নগদ টাকার অর্ধেক কিস্তিটাও দিলে না। এখনও বলছ হয়ে যাবে। কেমন করে হবে কে জানে। আমায় বাপু ঝুলিয়ে রেখো না। না পারলে বলে দাও।'

দীনুর মাথায় হঠাৎ জেদ চেপে যায়। নিকুঞ্জর হাত চেপে ধরে বলে, 'আপনি দিন দ্যাখেন। আমি আসছে হপ্তায় টাকা নিয়ে আসবো।'

বাড়ি ফিরে দীনু ঠিক করে ফেলে ভিটের জমিটুকু বেচে দেবে। বৌ বোঝায়, 'তুমি ওমন কাজ করো না। থাকবো কোথায়? কে থাকবার জায়গা দেবে।'

দীনু বোঝে না। জবা ছল ছল চোখে সব শোনে। বুঝতে পারে তাকে নিয়ে বাপে আর মায়ে একটা গণ্ডগোল বেঁধেছে। কিন্তু দীনুর জেদ কমে না। দীনুর বৌয়ের মুখ শুকিয়ে যায়। গলা থেকে শব্দ বেরুতে চায় না। সে জানে দীনুর গোঁ বড্ড শক্ত গোঁ। তার বুকের মধ্যে সর্বনাশের ঝড় বইতে থাকে।

শেষ রাত্তিরে দীনু যখন ঘুমিয়ে কাদা হয়ে আছে তখন তার ঘুম ভাঙলো জবা। বাপের বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বাপকে ধাক্কা দিচ্ছে। তার চোখ ভয়ে আর উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে। কথা বলতে পারে না বটে, কিন্তু গলা দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজ বার করতে পারে। সেই আওয়াজ এখন কান্নার চাইতেও করুণ শোনাচ্ছে।

দীনু উঠে বসল। মেয়ের মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে বুঝতে চাইল ব্যাপারটা কি। জবা আঙুল দিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখাচ্ছে। ঘরের মধ্যে থেকে গোঙানির আওয়াজ এলো। দীনু ভেতরে এসে দেখল তার বৌ মেঝেতে বমি করে নেতিয়ে পড়ে আছে। দুহাতে পেট খামচে ধরে অসহায় চোখ তুলে সে একবার স্বামীর দিকে তাকালো।

দীনু উবু হয়ে বসে বলল, 'কী হল তোর?'

দীনুর বৌ কাতরাতে কাতরাতে উত্তর দিল, 'ব্যামোয় ধরেছে। মাঝরাত থেকে শুরু। এখন আর পারছি নে গো।'

এই রোগের লক্ষণ দীনুর অচেনা নয়। দীনু দড়ির ওপর থেকে গামছাটা নিয়ে মাথায় বাঁধল। তারপর বলল, 'চল হাসপাতালে যাই।'

দেড়দিন পর এক সকালে দীনুর বৌ মরল। যেমন একটা নরম ভোরে সে হাসপাতালে এসেছিল, তেমনই একটা নরম সকালে দীনুর বৌয়ের লাশ এনে তোলা হোল দীনুরই রিকশা ভ্যানে। দীনুর চারপাশে তখন পাখি ডাকছে। পাকুড় গাছের মাথায় সকালবেলার ঝিরঝিরে হাওয়া লেগে মিহি শব্দ ছড়াচ্ছে পাতায় পাতায়। সকালবেলার সেই নরম আলোতে দীনু তার মরা বৌয়ের দিকে একবার তাকালো। তারপর নিজের মাথার গামছা খুলে বৌয়ের মাথার বালিশ বানিয়ে দিয়ে শরীরটাকে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধল। তার বুকের ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। শরীরটা অসাড় মনে হচ্ছিল। সিটের ওপর বসে প্যাডেলে চাপ দিল। গাড়ি চলতে লাগল ধীরে ধীরে।

হাসপাতালের সীমানা ছাড়িয়ে পাকা সড়কে পড়ে দীনু হঠাৎ গাড়ি থামাল। এক মিনিট, দু মিনিট—দীনু ভেবে যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে তার চোয়াল শক্ত হোল। হাতের শিরা ফুলে উঠল। সে গাড়ির মুখ অন্যদিকে ঘোরাতে ঘোরাতে ভাবল, এই দুনিয়ায় গরীব মানেই বেওয়ারিস। বেঁচে থাকতেই যার কেউ নেই, মরে গেলে তার জন্যে মরাকান্না কাঁদবার দরকার কী। চিতায় তুলে পোড়ালে সেটা তার বৌ দেখতে আসবে না। পেটে কিল মেরে ধম্ম করতে পারে না। তার চাইতে মরা বৌয়ের শরীরের হাড়গুলো অন্যের কাজে লাগুক। বিনিময়ে যদি পাঁচ সাতশো টাকা বাগাতে পারে দীনু তাহলে কালই নিকুঞ্জকে পাঁচশো টাকা দিয়ে আসা যাবে। বাকী টাকার জন্যে তো ভিটেটুকু রইল। মেয়েটার হিল্লে হয়ে গেলে দীনুর বুকের ওপর থেকে বিষম ভারটা নেমে যাবে। তার বৌটা বুদ্ধি ধরে বটে। ঠিক মোক্ষম সময়ে মরে তার সমস্যাটা হালকা করে দিয়ে গেছে। বোবা মেয়েটার একটা গতি করতে পারার সুখে দীনু এখন সব ভুলে যেতে পারছে। এক টুকরো সুখের স্বপ্নে দীনু তার শোক অথবা দুঃখ, তার শয়তান মন আর তার বৌ কোন কিছুকেই আমল দিল না। সে জানে তার বৌয়ের শরীর থেকে মাংস ছাড়িয়ে হাড়গুলো বার করে নেওয়া হবে। তাহোক সেটা তার বৌ জানতেও পাবে না। তার বুকের মধ্যে একটা পেরেক বিঁধে যাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু তার যন্ত্রণাটা সে টের পেতে চাইছে না। এখন তার মগজের মধ্যে শুধু একটা বোবা মেয়ের অসহায় চোখ ভেসে বেড়াচ্ছে। জবার বিয়ে হবে; বর হবে। জবা হয়তো একদিন মা হবে। দীনুর বুকের মধ্যে বোলতার কামড়ের মতো গভীর একটা কষ্টের পাশাপাশি ক্ষীণ অথচ তীক্ষ্ণ সুখের একটা দোতারাও বাজছিল। বেজে যাচ্ছিল।

হঠাৎ সেই সুরটা কাটল। পেছন থেকে কেউ বুঝি তার নাম করে ডাকল। চোখ ঘোরাবার আগে দীনু দেখল তার দশ হাত দূরে সেই লোকটা, যে বেওয়ারিস লাশ কেনবার জন্যে পকেটে টাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দীনু লোকটাকে দেখে হাসল। হেসে মুখ ফেরাল পেছনে। যেদিক থেকে ডাকটা এসেছে।

পেছন ফিরেই দীনুর বুকের রক্ত পাক দিয়ে উঠে সহসা হিম হয়ে যেতে লাগল। চষা ক্ষেতের ওপর দিয়ে দৌড়ে আসছে জবা, তার পেছনে তারই গায়ের একটা ছেলে। দীনু প্যাডেলে চাপ দিতে ভুলে গেল। তার হাত শিথিল হয়ে এল। রিকশা ভ্যানটা নিজের খেয়ালে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে জামগাছের গুড়িতে ধাক্কা মেরে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সিটের ওপর থেকে নেমে আসবার আগেই জবা এসে দাঁড়াল তার সামনে। ওর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। সেই চোখে কী ছিল সেকথা দীনু জানে না, বুঝতে পারে না, শুধু টের পায় তার বুকের ভেতরের শয়তানটা মাথা নিচু করে মুখ ঢাকছে।

জবা তার মার মুখের দিকে তাকাল। দূরে দাঁড়ান ওই লোকটাকেও দেখল। কী বুঝল কে জানে। তারপর ভেজা চোখ তুলে বাপের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালো যাতে দীনুর মনে হল জন্ম থেকে যে মেয়েটা কথা বলতে পারেনি সেই মেয়েটার দুই চোখে এখন অজস্র কথা তীব্র ঘৃণার মূর্তি ধরে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

দীনু সহ্য করতে না পেরে চোখ বুজে ফেলল। তার মনে হল তারই বৌয়ের আত্মা এখন যেন মেয়ের শরীরে ঢুকে তার দিকে তাকিয়ে আছে।
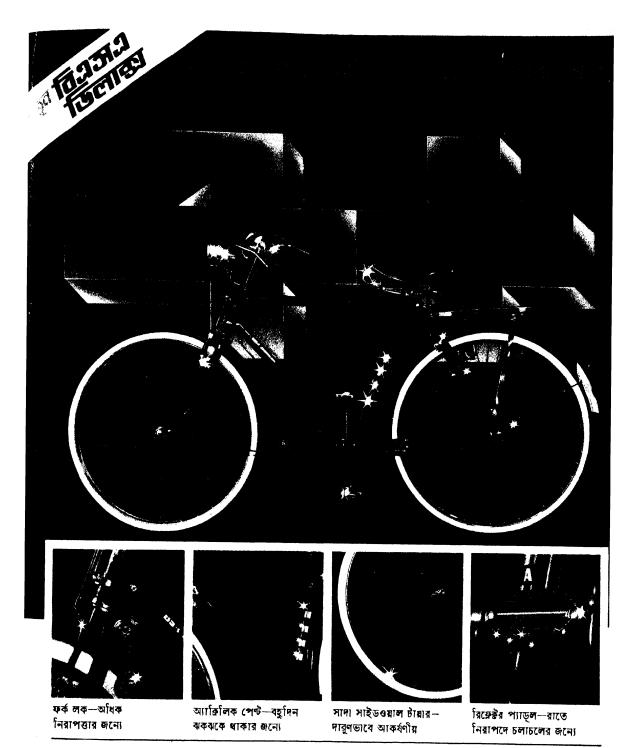
ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী ■

কাল যাব গভীর অরণ্যে। সেখান থেকে রজ্জু-মানবদের কাছে। দেখি তারা আমাদের পোড়া-বাড়ি মেরামত করে দেয় কি না।
আমি যাব, বাবা ?
ওয়াকারকাকা, আমিও যাব। *
এবারে নয়।
* অরণ্যদেবকে রাজা বলে ওয়াকারকাকা।

রাজা, তুই তো জানিস, রজ্জু-মানবরাই আমাদের ঝুলন্ত বাড়ি তৈরি করে দিয়েছিল।

"ওরা গাছের মগডালে থাকে, নীচের থেকে দেখাই যায় না।"

আরে, আরে!
"ওয়াকারকাকাকে ওরা দড়ি ঝুলিয়ে উপরে তুলে নিয়েছিল।"

"সে এক আশ্চর্য জায়গা…
স্বাগতম অরণ্যদেব!
অরণ্যদেব!

"ওদের ছেলেমেয়েরা দড়িতে ঝুল খেতে ওস্তাদ। দেখতে-দেখতে আমারও খুব লোভ হল…

রাজা!
"তাই লাফ দিয়েছিলুম।"
ই-ই-ই
ক্রমশ ১১
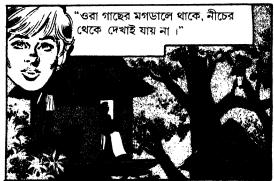
জ্যোতির্বিজ্ঞানে ভারতীয় সাফল্য

সমরজিৎ কর

তামিলনাড়ুর জাভাদি হিলস-এর আড়াই হাজার ফুট উঁচু চূড়ায় স্থাপিত হয়েছে কাভালুর মানমন্দির। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের তত্ত্বাবধানে এখানেই আকাশের দিকে অতন্দ্র চোখ মেলে তাকিয়ে রয়েছে এশিয়ার বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি—ভেইনু বাপ্পু দূরবীক্ষণ। তার সঙ্গে এক রোমাঞ্চকর সাক্ষাৎকারের সূচনাপর্ব এই রচনাটি।

অনিন্দ্যসুন্দর স্টীল!

'সেল'-এর তৈরি ৩৭ পিসের অপূর্ব ডিনার সেট

উৎসবের দিনের সেরা উপহার

Dinner Set

একেবারে হালফ্যাশানের স্টেনলেস স্টীলের বাসন-কোসন। সুদৃশ্য, ঝকঝকে অথচ টেকসই। আপনার আজীবনের সঙ্গী। কোনরকম দাগ ধরে না, ভেঙ্গেচুরেও যায় না। টকই বলুন কিংবা মিষ্টিই বলুন—সবরকম খাবারই এই বাসনে পরিবেশন করতে পারবেন। অথচ বাসনের জেল্লা আর চমক নষ্ট হবে না কোনদিনই।

এই বাসনের স্টীল তৈরি হচ্ছে সালেম স্টীল প্ল্যান্টে। নিশ্চয়ই জানেন স্টীল অথরিটি অফ ইণ্ডিয়ার এই অসাধারণ ইস্পাত কারখানায় অতি উন্নত ধরনের কারিগরির সাহায্যেই স্টেনলেস স্টীল তৈরি হয়। কাজেই বুঝতেই পারছেন যে এই বাসনের স্টীল একেবারে এক নম্বর।

সুদৃশ্য, ছিমছাম এবং নিখুঁত স্টেনলেস স্টীল ডিনার সেট। সত্যি, এমন ডিনার সেট বাড়িতে থাকাটাও গর্বের। গর্ব শুধু আপনার নয়—আমাদেরও! এমনকি সরবৎ সেট, দু-ধরনের নাস্তা সেট, সার্ভিং ট্রে এগুলিও ন্যায্য দামে আলাদাভাবে পেতে পারেন।

ডিনার সেট ৩৭ পিসের	–	৬৭০ টাকা
সরবৎ সেট ৭ পিসের	–	১৮০ টাকা
নাস্তা সেট ১ ও ২, ১২ পিসের	–	১৮০ টাকা এবং ২১০ টাকা
রাইস ট্রে ১ পিস	–	৫০ টাকা

স্থানীয় কর আলাদা।

স্টীল অথরিটি অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

সেন্ট্রাল মার্কেটিং অর্গানাইজেশন

১, আর· এন· মুখার্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০০১

কোথায় পাবেন ■ কলিকাতা — সমবায়িকা ■ বোম্বাই — সহকারী ভাণ্ডার
■ দিল্লী — সুপারবাজার এবং কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার — সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড
■ চণ্ডীগড় — সুপারবাজার ■ মাদ্রাজ — কামধেনু
■ 'সেল' এর সবকটি ইস্পাত কারখানার কো-অপারেটিভ স্টোরে।

॥ এক ॥

কাভালুর-এ গিয়েছিলাম। এখানকার মানমন্দির জ্যোতির্মণ্ডল পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের কাছে এখন পীঠস্থান। সম্প্রতি এখানে বসান হয়েছে ২·৩ মিটার অ্যাপারচারের একটি টেলিস্কোপ। সারা এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম। এই টেলিস্কোপটির রূপকার বিশিষ্ট ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ এম কে ভেইনু বাপ্পু। দুর্ভাগ্য, টেলিস্কোপটি চালু হওয়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি পরলোকগমন করেন। ৬ জানুয়ারি, ১৯৮৬ এটির উদ্বোধন করতে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধী। ওইদিন প্রয়াত জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কথা স্মরণ করে এখানকার মানমন্দির এবং এই টেলিস্কোপটির নামকরণ করেছেন ভেইনু বাপ্পু মানমন্দির এবং ভেইনু বাপ্পু টেলিস্কোপ। এই টেলিস্কোপটি দেখব বলেই গিয়েছিলাম কাভালুর-এ।

কলকাতা থেকে রওনা হওয়ার আগে যোগাযোগ করেছিলাম বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অভ্ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স-এর ডিরেক্টর ডঃ জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে। ডঃ ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, চলে আসুন। এখান থেকে আপনার কাভালুরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। তাঁর সবুজ সঙ্কেত পাওয়া মাত্র আমার সফরসূচিটিও তৈরি করে নিলাম। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা এবং সেই গবেষণার প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরির ব্যাপারে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অভ্ অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের সারা পৃথিবীতেই এখন নামডাক। তাঁদের তত্ত্বাবধানে কাজ চলছে বাঙ্গালোর, কোদাইকানাল, কাভালুর এবং গৌরীবিদানুর-এ। বাঙ্গালোরে রয়েছে তাঁদের অপটিক্স এবং ইলেকট্রনিক্স বিষয়ক গবেষণাগার, একটি যন্ত্রশালা এবং প্রশাসন কেন্দ্র। এছাড়াও জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞান এবং ব্রহ্মাণ্ড বিষয়ক সমস্যা নিয়েও এখানে গবেষণা করছেন একদল বিজ্ঞানী। এখানে তৈরি হচ্ছে অত্যন্ত সংবেদনশীল নানারকম আলোকবিজ্ঞান (Optics) বিষয়ক যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জাম। তাঁদের উদ্ভাবিত এবং তৈরি করা যন্ত্র শুধু নিজেদের প্রয়োজনেই যে তাঁরা ব্যবহার করছেন তা নয়, শরিক হয়েছে আরও অনেকে। তাঁদের যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করছেন বাঙ্গালোর এবং হায়দ্রাবাদের প্রতিরক্ষা গবেষণাগার, ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার থুম্বা এবং শ্রীহরিকোটা কেন্দ্র, আমেদাবাদের মহাকাশ প্রায়োগিক কেন্দ্র এবং ফিজিকাল রিসার্চ ল্যাবোরেটরি, বাঙ্গালোরের ন্যাশনাল এরোনটিকাল ল্যাবোরেটরি এবং বোম্বাই-এর টাটা ইনস্টিটিউট অভ্ ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ। কোদাইকানালে চলছে সৌর গবেষণা, কাভালুরে নক্ষত্রজগৎ এবং গৌরীবিদানুরে বাঙ্গালোরের রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুগ্মভাবে রেডিও অ্যাস্ট্রনমি নিয়ে কাজ চলছে। তাই আগে থেকেই ঠিক করে নিয়েছিলাম, এই সব কেন্দ্রে যে ধরনের কাজ চলছে সে নিয়েও কথা বলব ডঃ ভট্টাচার্যের সঙ্গে।

কোদাইকানালে সৌর-গবেষণার জন্যে এই মানমন্দির

সৌভাগ্যই বলব। বাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অভ্ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স-এ দেখা হতেই ডঃ ভট্টাচার্য বললেন, ভাল সময়ে এসে গেছেন। ডঃ এন এ নরসিমহম এখন এখানে রয়েছেন। দুদিন বাদে আমাদের কাউন্সিলের মিটিং। তিনি আমাদের কাউন্সিলের একজন সদস্য। কাভালুরের ভেইনু বাপ্পু টেলিস্কোপ তৈরির ব্যাপারে তাঁরও ভূমিকা যথেষ্ট। আগামীকাল তিনি কাভালুর যাচ্ছেন। আপনি তাঁর সঙ্গে চলে যান। তাঁর সহযাত্রী হলে নতুন এই টেলিস্কোপটি সম্পর্কে অনেক কথাই জানতে পারবেন আপনি। কাভালুর থেকে ফিরে এলে আমাদের কাজকর্ম নিয়ে কথা বলা যাবে, কেমন ?

এর চেয়ে আর বড় সুযোগ কী হতে পারে ! ডঃ নরসিমহমের নাম আমি আগেই শুনেছিলাম। এক সময় ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের স্পেকট্রোকোপি গ্রুপের তিনি ছিলেন প্রধান। বর্ণালী বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করেছেন নোবেল বিজ্ঞানী ডঃ জি হের্জবার্গের সঙ্গে। দুই দশকেরও বেশি প্রয়াত ডঃ ভেইনু বাপ্পুর সঙ্গে বর্ণালী বিষয়ক সমস্যাবলী, বিশেষ করে সূর্য এবং নক্ষত্রের বর্ণালীর উপর তিনি গবেষণাও পরিচালনা করেছেন। ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অভ্ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, বাঙ্গালোরে। এই ইনস্টিটিউটটি তৈরির ব্যাপারেও তাঁর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই কাভালুর যাওয়ার সময় তিনি আমার সঙ্গী হবেন, এতো অভাবিত সুযোগ।

ডঃ ভট্টাচার্য বললেন, আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছেন আরও একজন—এস সি তাপাড়ে। বাপ্পু টেলিস্কোপের প্রজেক্ট ম্যানেজার। টেলিস্কোপটি তৈরির অনেক খুঁটিনাটি কথাবার্তা তাঁর কাছ থেকেও শুনতে পাবেন।

বলতে বাধা নেই, এটাও একটি বড় রকমের সুযোগ। ঠিক হল, পরদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমরা রওনা হব। ইনস্টিটিউট থেকেই গাড়ির ব্যবস্থা করা হল।

ডঃ ভট্টাচার্য বললেন, কাভালুরের সবই তো অপটিকাল টেলিস্কোপ। রাতের দিকে গেলে আকাশ দেখার সুবিধে হবে।

যথাসময়ে রওনা হলাম আমরা—ডঃ নরসিমহম, তাপাড়ে এবং আমি।

বাঙ্গালোর শহর পেরিয়ে নিউ ম্যাড্রাস হাইওয়ে দিয়ে ছুটে চলল আমাদের গাড়ি। আমার পাশে ডঃ নরসিমহম। বয়েসে কিছুটা পরিণত। কিন্তু দেখলাম, কথাবার্তায় খুবই মুখর। বিশেষ করে ডঃ বাপ্পুর ব্যাপারে। পথে যেতে যেতে শুধু জ্যোতির্বিদ্যাই নয়, ভারতের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম নিয়ে কথা বললেন তিনি।

বললেন, বারানসী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় পি এইচ ডি করার পর অনেক সুযোগ পেয়েছি আমি। এবং তার মূলে ছিলেন হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা। হের্জবার্গ ছিলেন তাঁর বন্ধু। তিনিই আমাকে হের্জবার্গের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ করে দেন। বিদেশ থেকে ফিরে যোগ দিই ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে। পারমাণবিক শক্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে তখন সেখানে শুরু হয়েছে নানারকম গবেষণা। যাদের মধ্যে অন্যতম বর্ণালী বিজ্ঞান।

কী ধরনের গবেষণায় তখন আপনি হাত দিয়েছিলেন ? প্রশ্ন করলাম আমি।

বলতে পারেন, বেশির ভাগই পারমাণবিক কণার বর্ণালী নিয়ে। পারমাণবিক চুল্লিতে ব্যবহার করা হয় জ্বালানি হিসেবে ইউরেনিয়াম। মডারেটার হিসেবে ব্যবহার করা হয় গ্র্যাফাইট, ভারী জল। এছাড়া নানারকম ধাতুও ব্যবহার করা হয়। যেমন জারকোনিয়াম, টাটানিয়াম প্রভৃতি। এইসব বস্তুর বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের জন্যে দরকার বর্ণালী বিষয়ক পরীক্ষা। যেমন ইউরেনিয়াম জ্বালানির কথাই ধরুন। ইউরেনিয়ামে খাদ হিসেবে যদি সামান্যতমও বোরোন থাকে তাহলে তা আর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। নিউট্রন কণার আঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজন ঘটিয়ে উৎপাদন করা হয় তাপশক্তি। ইউরিয়ামে বোরোন থাকলে সেই বোরোন প্রচুর পরিমাণ নিউট্রন কণা শোষণ করে। বোরোন থাকলে তাই ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজন ঘটাতে যতটা নিউট্রন দরকার তা পাওয়া যায় না। অনেকেই তো জানেন, এক একটি মৌলিক পদার্থ প্রচণ্ড উত্তপ্ত করলে তা থেকে বিকীর্ণ হয় বিশেষ বিশেষ ধরনের বর্ণালী। জ্বালানি হিসেবে যে ইউরেনিয়াম ব্যবহৃত হয়, ব্যবহার করার আগে তার যৎসামান্য নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করে নিই আমরা। বর্ণালী বিশ্লেষণ করে দেখে নিই তাতে বোরোন রয়েছে কিনা। থাকলেও তার পরিমাণই বা কতটা। ঠিক তেমনি, পারমাণবিক চুল্লিতে ব্যবহার করা হয় জারকোনিয়াম। এক্ষেত্রে ওই বস্তুটির বিশুদ্ধতা মাপার জন্যে বর্ণালী বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়ে থাকে। ট্রম্বের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে এ ধরনের কাজের জন্যে আমাদের গ্রুপ নিজেদের দক্ষতায় স্ক্যানিং স্পেকট্রোমিটারও তৈরি করেছে।

প্রশ্ন : শুনেছি, ডঃ বাপ্পুর সঙ্গে গবেষণার ব্যাপারে আপনার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি জ্যোতির্বিদ, আপনি মুখ্যত পারমাণু বিজ্ঞানী।

কীভাবে গড়ে উঠল আপনাদের ঘনিষ্ঠতা ?

উত্তর : খুবই সহজ ব্যাপার। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় বর্ণালীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সূর্য, কোটি কোটি নক্ষত্র—তারা বিকীর্ণ করছে কত রকমই না রশ্মি। এই সব রশ্মি বিশ্লেষণ করে নক্ষত্রের গঠন, নাক্ষত্রিক পরিমণ্ডলে বস্তুর বিভিন্ন দশা জানার ব্যাপারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন। এইসব গবেষণা নক্ষত্র এবং নক্ষত্র জগতের ভৌতিক চরিত্র সম্পর্কে অনেক মৌলিক তথ্যও জুগিয়ে থাকে। এ সব কথা নিয়ে ডঃ বাপ্পুর সঙ্গে আমার আলোচনা করার সৌভাগ্য হয়েছিল। পরে আমরা পারস্পরিক সহযোগিতায় ইণ্ডিয়ান ইনসটিটিউট অফ অ্যাসট্রোফিজিক্স-এ বর্ণালী বিষয়ক গবেষণার সুযোগ সুবিধে গড়ে তোলার চেষ্টা করি। কাভালুরের ২·৩ মিটারের দূরবীনের বর্ণালী সংশ্লিষ্ট গবেষণার সাজসরঞ্জাম তৈরির ব্যাপারে ডঃ বাপ্পুর সঙ্গে আমিও জড়িত ছিলাম।

ছুটে চলেছে গাড়ি। মাঝে মাঝে এইসব অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সমস্যাবলী নিয়ে কথা বলে চলেছি আমরা। দেখলাম, এখানকার প্রতিটি খুঁটিনাটি খবর তাপাড়ের নখদর্পণে।

ম্যাড্রাস হাইওয়ে ছেড়ে বাঁ পাশে ঘুরে আমরা গিয়ে পড়লাম অপেক্ষাকৃত সরু পাহাড়ি পথে। "উই আর নাও অ্যাট দ্য গেটওয়ে অভ্ জাভাদি হিল্স।" আমাকে চমকে দিয়েই যেন বলে উঠলেন তাপাড়ে।

জাভাদি হিল্স মানে ? প্রশ্ন করলাম আমি।

জাভাদি হিল্স মানে জাভাদি হিল্স। দেখতে পাচ্ছেন না, এবার আমরা পাহাড়ে উঠছি।

দেখতে পাচ্ছি বললে ভুল হবে। ঘড়িতে তখন প্রায় নটা। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। অতএব দূরের কিছু দেখা সম্ভব নয়। তবে গাড়ির আলোয় বুঝতে পারছিলাম, এবার সমতল ছেড়ে আমরা উঁচু নিচু রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি। গাড়ি পাহাড়ে উঠছে।

তাপাড়ে বললেন, এই জাভাদি হিল্সের উপরই কাভালুর। প্রায় আড়াই হাজার ফুট আমাদের উঠতে হবে। এখান থেকে কাভালুর আরও ১১ কিলোমিটার দূরে।

গাড়ি আঁকাবাঁকা পথ ধরে উঠতে লাগল। এবার শুরু হয়েছে গভীর অরণ্য। তাপাড়ে বললেন, এক সময় এ সব জঙ্গলে ছিল নানারকম বন্য পশুপাখি। বাঘ, ভালুক, হরিণ প্রভৃতি। বাঘ এখান থেকে এখন অবলুপ্ত। মাঝে মাঝে ভালুক দেখা যায়। বন্য মহিষও। তবে অজস্র পাখি এখনও রয়েছে। আর আছে নানারকম বিষধর সাপ।

এদিকে রাস্তায় কোন আলো নেই। প্রচণ্ড অন্ধকার। মন্তব্য করলাম আমি।

এর জন্যেই তো কাভালুর মানমন্দিরের পক্ষে একটি আদর্শ জায়গা, মিঃ কর। নক্ষত্রের আলো নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কারবার। চারপাশে আলো থাকলে নক্ষত্রের আলো চিনে ওঠা শক্ত। জাভাদি হিল্সের এই অঞ্চলে তেমন লোকালয় নেই যে সেখান থেকে আলো আসবে। এছাড়া এখানকার আশপাশে কোন কারখানাও নেই। কারখানা থাকলে তার ধোঁয়া আকাশে ছড়াত, আবছা করে দিত সুদূর নক্ষত্রের আলো। এখানে প্রচুর গাছপালা থাকায়, বাতাসে ধুলোও জমে কম। বাতাস ধূলিমুক্ত থাকে। তাই আকাশও থাকে পরিষ্কার।

জ্যোতিঃপর্যবেক্ষণের মানমন্দির বসাতে গেলে এ সব সমস্যার দিকে নজর দিতে হয়। বললেন তাপাড়ে।

কাভালুরের নিকটতম গ্রাম ছত্রম। আদিবাসী অধ্যুষিত ছোট্ট গ্রাম। সন্ধের পর এ গ্রামে নেমে আসে অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার। এখান থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে কাভালুর মানমন্দির। যখন পৌঁছলাম, রাত তখন সাড়ে নটা। বাঙ্গালোর থেকে ১৭০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে সময় লাগল চার ঘন্টার মত।

যদিও কিছুটা সমস্যা এখনও রয়েছে।

ওটা মানে ?

অনস্তম। যে জায়গাটি দেখছেন এই তার নাম। এক সময়ে ছিল ছোট্ট একটি গ্রাম। এখন দ্রুত শহরে রূপান্তরিত হচ্ছে। নতুন নতুন কারখানা বসান হচ্ছে সেখানে। বসতি বাড়ছে। রাস্তায় বসান হয়েছে আলো। ওই আলো রাতের আকাশ কিছুটা উদ্ভাসিত করে। যা আকাশ পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে কিছুটা বাধাই সৃষ্টি করে। আমরা শহর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলছি। তাঁদের বলেছি, উন্মুক্ত স্থানে তাঁরা যেন নিয়ন-ল্যাম্পের আলো ব্যবহার করেন কম। তাপাড়ে বললেন।

শুধু নিয়ন-আলো কেন ?

অন্যান্য আলোও নক্ষত্র থেকে আসা আলোর সঙ্কেত কিছুটা অস্পষ্ট করে দেয়। তবে নিয়ন-ল্যাম্পের আলোয় এ কাজটা আরও বেশি হয়। সেই জন্যেই তাঁদের নিয়ন-আলোর ব্যাপারে অনুরোধ করা হয়েছে। ঝালাই-এর কাজে গ্যাস ব্যবহার করা হয়। গ্যাস জ্বলার সময় বেরোয় তীব্র আলো। সেই আলোও নক্ষত্র দর্শনে বিঘ্ন ঘটায়। পর্যবেক্ষণের সময় উন্মুক্ত স্থানে যাতে কেউ গ্যাসে ঝালাই কাজ না করেন, সেদিকেও নজর রাখার আমরা চেষ্টা করছি।

কাভালুরের আর এক দৃশ্য

প্রথমেই পড়ল মেস এবং গেস্ট হাউস। পুরো চত্বরে বিদ্যুতের আলো। তার পাশেই গম্বুজের মত মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে ছোট্ট একটি মানমন্দির।

তাপাড়ে বললেন, এখন কোন পর্যবেক্ষণ চালান হচ্ছে না, তাই আলোগুলি জ্বালান রয়েছে। পর্যবেক্ষণ চালানর সময় এখানে বাইরের সমস্ত আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়, যাতে কোন ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন না থাকে।

এখানে কোন স্ট্রিট লাইটও নেই। কিন্তু পাহাড়ের চূড়া থেকে কিছুটা দূরে সমতলে দেখলাম অজস্র আলো। ব্যাপারটা লক্ষ করতেই তাপাড়েকে জিজ্ঞেস করলাম, ওই তো আলো দেখছি। ওই আলো কী আপনাদের পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে অসুবিধে সৃষ্টি করে না ?

আমার প্রশ্নে কিছুটা বিচলিত হলেন তিনি। গেস্ট হাউসের ভেতরে আলো। আশপাশে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে এক একটি গম্বুজ-ঘরে রয়েছে আরও কয়েকটি টেলিস্কোপ। সেখান থেকেও আসছে টিমটিম আলোর রশ্মি। সবুজ গাছপালায় চারদিকটা প্রচণ্ড অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। সেখান থেকে নিচে সমতলে যেন অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে একটি আলোর দ্বীপ। সেদিকে চেয়ে তাপাড়ে বললেন, ওটাই আমাদের কাছে ভবিষ্যতে একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

পৌঁছানর পর কিছুটা বিশ্রাম। ঘড়িতে বাজল রাত এগারটা। তাপাড়ে, ডঃ নসিমহম এবং আমি রওনা হলাম পাহাড়ের আর একটি চূড়ার দিকে। যেখানে বসান হয়েছে এশিয়ার বৃহত্তম অপটিক্যাল টেলিস্কোপ—ভেনুই বাপ্পু টেলিস্কোপ। নিচে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী। মাথার উপর শত সহস্র নক্ষত্রখচিত আকাশ। গেস্ট হাউস থেকে সেই টেলিস্কোপের গম্বুজ ঘরে যেতে গাড়িতে মিনিট পাঁচেক লাগে। ভাবছিলাম, মাত্র পাঁচ মিনিট তো। তারপরই সেখান থেকে টেলিস্কোপের মাধ্যমে আমরা গিয়ে পড়ব শত সহস্র লক্ষ আলোক বৎসর দূরে। সুদূর কোন নক্ষত্র জগতে। ভাবতেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম। *(ক্রমশ)*

এঁর দাঁত সুরক্ষিত রয়েছে
সিবাকা ফ্লোরাইড
এই ফ্লোরাইড সংরক্ষণ দিয়েছে
Cibaca Fluoride
Cibaca Fluoride toothpaste
দাঁতকে জীবনভর সঙ্গী ক'রে
নিতে হ'লে, দন্তছিদ্রের সংরক্ষণ করুন
আর, সিবাকা ফ্লোরাইড-এর ফ্লোরাইডই দেয়
ঐ অপরিহার্য সংরক্ষণ । কারণ, মুখের ভেতরের
ক্ষতিকর অ্যাসিড যখন দাঁতের তলার ভাগকে ঘিরে ফেলে, তখন
এই ফ্লোরাইড, দাঁতের এনামেলের সঙ্গে মিশে গিয়ে দন্তছিদ্র হওয়া রোধ
করে—আর, ফলে, প্রাথমিক অবস্থাতেই দন্তক্ষয় হওয়াও রোধ হয় ।
তাই সিবাকা ফ্লোরাইড দিয়ে, দন্তছিদ্র হওয়া বন্ধ করুন, দন্তক্ষয় রোধ করুন ।
দাঁতে নব জীবনের সাড়া
সিবাকা
ফ্লোরাইড
টুথপেস্ট
ভারতের সর্বপ্রথম ও প্রভাবশালী ফ্লোরাইড টুথপেস্ট

ফুটবলারের উন্নতিকল্পে উদ্যোগ

অরিজিৎ সেন

বাঙালীর মতে, বাঙলার পথে, অনেকদিন চলল ভারতীয় ফুটবল। বয়সের ভারে, স্বার্থপরতার চাপে আজ বাঙালীর ফুটবল ছন্নছাড়া অবস্থায়।

কাব্য করা আমার পেশা নয়, কিন্তু এই দীনতা ঢাকতে ঢাকতে আজ আমার মত সব সাংবাদিকই ক্লান্ত, ভারাক্রান্ত। এরই মধ্যে সকলকেই খুঁজে বেড়াতে হচ্ছে আশার আলো। কিন্তু এই বাঁশবন ছেড়ে শেয়াল রাজাই বা কোথায় যাবে ? তাই "হেথা নয় হেথা নয়" করে নতুন দিগন্তের আশায় "অন্য কোনো খানে" যাওয়াটা অবধারিত। কলকাতার বড় ক্লাবের ধোঁকাবাজির পেশাদার ফুটবলে আন্তর্জাতিক রেওয়াজ অনুযায়ী জুনিয়ার দলের ঠাঁই নেই। প্রতিটি দেশেই পেশাদার ক্লাবগুলি জুনিয়ার প্লেয়ার নিয়ে তাদের বেশ কয়েক বছর তালিমে রেখে বড়দের আসরে নিয়ে আসে।

এই প্রথাটা অনেক দিনের। এতে শুধু ক্লাব নয়, দেশও উপকৃত হচ্ছে—কারণ এই শিক্ষার ফলে নিত্য নতুন প্রতিভার প্রস্তুতিও তো হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা শুধু নয়, এতে বিশ্ব পর্যায়েও টুর্নামেন্টগুলিতেও কম্পিটিশন জোর থেকে জোরদার হয়।

আবার কয়েকটি দেশে ফুটবল স্কুল আছে। ক্রিকেটে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের জন্য যেমন ইংল্যাণ্ডের আলফ গোভারের স্কুলই সেরকম। ব্রাজিলও একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে অল্পবয়স থেকেই ফুটবল শেখার ব্যবস্থা করেছে।

আমাদের দেশের ফুটবল কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে ব্রাজিলের ধাঁচের স্কুলই কাজে আসবে। এই ধরনের প্রস্তাব প্রায় দুই দশক আগে থেকেই অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কর্মকর্তারা বিভিন্ন মহল থেকে শুনে আসছেন। কিন্তু প্রথমে হেসে উড়িয়ে দিয়ে

দিল্লীতে ভারতীয় একাদশ বনাম বখুম দলের প্রদর্শনী ম্যাচ — *ছবি : রাজেন্দ্র কুমার*

পরবর্তীকালে অর্থাভাবের অজুহাতে এ আই এফ এফ আজও এই ব্যাপারে এগোয়নি। অথচ ১৯৫১-র প্রথম এশিয়াড ফুটবলে আমরা প্রথম স্থান থেকে শুরু করলেও আজ প্রথম দশের মধ্যেও পড়ি না। এমন নয় যে অন্যান্য দেশের আর্থিক অবস্থা আমাদের চেয়ে এত ভাল যে তারা ইনটেনসিভ ট্রেনিং-এর মাধ্যমে ফুটবলের উন্নতিসাধন করছে। বরং বলা যায় যে আরব দেশগুলি এবং চীন ও দুই কোরিয়া বাদে বাকীরা ভারতীয় ফুটবলারদের মত সুযোগ সুবিধা পায় না। ভারতে কলকাতার ফুটবলারদের মত এত সুযোগ কেউই পায় না। অথচ এখানকার ফুটবল আজ দুই দশক ধরে একই অবস্থায় থমকে দাঁড়িয়ে। ফুটবলারদের "দেখাশুনা" এখন অনেক বেশী করা হয়। আর কলকাতার পেশাদারেরা আজ ক্রমাগত গোয়ার সত্যিকারের অ্যামেচারদের কাছে বার বার মাথা হেঁট করছে।

এবারের এশিয়ান গেমসে ভারত তিনটি ম্যাচের একটিও ড্র করতে পারেনি। মোট আট গোল হজম করে একটি মাত্র দিতে পেরেছে। প্রতিটি ম্যাচেই কোণঠাসা হয়ে খেলতে হয়েছে ভারতীয়দের। কোচ প্রদীপ ব্যানার্জিকে অন্য কোনো বিষয়ে দোষারোপ করা গেলেও, অন্তত একটি ব্যাপারে সকলেই ওঁর সঙ্গে একমত হবেন। উনি বলেছেন, "বর্তমান দলের কাছ থেকে এর চেয়ে ভাল রেজাল্ট পাওয়া সম্ভব নয়।"

জাতীয় দলের অনেক খেলোয়াড়ই "পি কে"-র সম্বন্ধে অনেক কটু কথা বলেছেন সোল থেকে ফিরে এসে। ওঁদের সকলের দৌড় বিভিন্ন ক্লাব প্রতিযোগিতায় পাওয়া গেল। শেষ পর্যন্ত প্রদীপ ব্যানার্জির কথায় সুর মেলালেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ শ্যাম থাপা। বললেন, বর্তমান খেলোয়াড়দের নিয়ে ভাল ফল আশা করা যায় না। ওঁর কথায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত কেননা এ বছরে ইস্টবেঙ্গলেই জাতীয় দলের সবচেয়ে বেশী খেলোয়াড় ছিল।

সোল থেকে ফিরে অনেকেই অনেক কথা বলছেন। ওঁদের কাছ থেকে অনেক প্ল্যানও শোনা গেল। এর মধ্যে, ভারতীয় দলের 'শেফ দ্য মিশন' অশোক মাট্টুর কথা মনে রাখার মত। ভারতীয় বক্সিং ফেডারেশনের সভাপতি অশোক মাট্টু দক্ষিণ কোরিয়ায় খেলার অভাবনীয় প্রগতি অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের চোখ দিয়ে দেখেন। উনি বললেন যে ও-দেশের এত অল্প সময়ে এত বেশী অগ্রগতির প্রধান কারণ ওখানকার সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা। যে দেশকে হকিতে আট বছর আগেও ধর্তব্যের মধ্যে নিয়ে আসা হত না, সেই দেশ ভারতের সঙ্গে ড্র করে পাকিস্তানকে সব দিক থেকে পরাজিত করে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ হয়ে গেল ১৯৮৬-র এশিয়াডে।

মাট্টু বললেন ওদেশে স্পনসরশিপ এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে প্রায় প্রতিটি খেলার জন্য এক একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জাতীয় দলের প্রশিক্ষণ, তাদের ভরণ-পোষণ এমন কি তাদের কিটস পর্যন্ত এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানই দেয়। এই হাত খুলে খয়রাতির বদলে কোম্পানি প্রায় প্রচুর প্রচার।

অবশ্য এই ধরনের ব্যবস্থা এ দেশে কতটা উপকারি হবে তা বলা যায় না, কারণ এ আই এফ এফ নিজস্ব ভাণ্ডার থেকে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিয়ে সোল এশিয়াডের জন্য প্রচুর টাকা খরচ করেছে। এবং এর ফল প্রায় শূন্য।

কিন্তু স্পনসরশিপের মাধ্যমে সাব-জুনিয়ার বা জুনিয়ার ছেলেদের

বিনোদন ১৯৮৬

বিশেষ আকর্ষণ

সারথির সারথি ☐ মতি নন্দীর দুর্দান্ত ক্রীড়া উপন্যাস। এক ফাইটার ফুটবলারের অসাধারণ আলেখ্য ; মাঠ এবং ব্যক্তিজীবনের সমস্যাকে যে ক্রমাগত ড্রিবল করে চলেছে খেলোয়াড়ী মানসিকতায়। ফুটবলারের এমন আধুনিক চিত্রায়ণ বাংলা উপন্যাসে প্রথম।

ব্রাজিল ☐ খেলাকে কেন্দ্র করে দিব্যেন্দু পালিতের একটি আকর্ষণীয় গল্প।

সেনচুরির অপেক্ষায় দেওধর ☐ একটি টেস্ট না খেললেও যার নামে ট্রফি চালু আছে—ভারতীয় ক্রিকেটের সেই ঋজু ব্যক্তিত্ব দেওধরের সঙ্গে রূপক সাহার দীর্ঘ আকর্ষণীয় সাক্ষাৎকার।

আধুনিক জীবনের সঙ্গে খেলার এক অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ। ময়দান থেকে হেঁসেল সর্বত্রই এখন এর যাতায়াত। সেই কথাটি স্মরণে রেখেই এবারে আমাদের নিবেদন—খেলা। সাহিত্যিক থেকে শুরু করে ক্রীড়া বিশেষজ্ঞ, খেলোয়াড় সকলের কলমেই এবার—খেলা। কোন একটি বিশেষ বিষয়ের উপর জোর নয়, বিষয়-বৈচিত্র্যই এবারের বিনোদনের বৈশিষ্ট্য। ফুটবল-ক্রিকেট থেকে পর্বতারোহণ—তাস-দাবা পর্যন্ত নানা বিষয়ের উপর বিশিষ্ট আলোচনা, সঙ্গে উপন্যাস, গল্প, রসরচনা এবং অন্তরঙ্গ আলোচনা। লেখায়-রেখায় এক জমজমাট সংগ্রহযোগ্য আয়োজন।

খাটে বসে খেলা ☐ একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক **সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের** অম্লমধুর রসরচনা।

আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ☐ ভারত তথা এশিয়ার সোনার মেয়ে **পি· টি· উষার** কলমে তাঁর জীবনে ট্র্যাক ও ট্র্যাকের বাইরে সম্মুখীন হওয়া বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বীদের একটি সজীব ও আকর্ষণীয় বিশ্লেষণ।

মাঠভর্তি দর্শকদের কথা মনে রেখে পাতাভর্তি ছবি।

বড়দিনে প্রকাশিত হবে।

এর সঙ্গে সরস এবং তথ্যে ভরপুর একগুচ্ছ রচনা।

লিখছেন—প্রদীপ ব্যানার্জী ☐ অজয় বসু ☐ পঙ্কজ রায় ☐ মানালি বেঙ্গসরকার ☐ আখতার আলী ☐ গুরবক্স সিং ☐ রীতা সেন ☐ চুনী গোস্বামী ☐ রাজু মুখোপাধ্যায় ☐ অরিজিৎ সেন ☐ শঙ্করলাল ভট্টাচার্য ☐ দুলেন্দ্র ভৌমিক ☐ মধুজিৎ মুখোপাধ্যায় ☐ শিশির ঘোষ ☐ বিকাশ মুখোপাধ্যায় ☐ মুকুতা মুখোপাধ্যায় ☐ রতন চক্রবর্তী ☐ প্রশান্ত ভট্টাচার্য ☐ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ শান্তনু ঘোষ ☐ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ গৌতম ভট্টাচার্য ☐ বিষেণ সিং বেদী এবং আরো অনেকে।

দাম : ২০·০০ টাকা রেজিঃ ডাকযোগে : ২৩·২০ টাকা

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হতে পারে। একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ত নিজেই আমাকে বলেছেন যে, তাঁরা একটি সর্বভারতীয় টুর্নামেন্ট করতে চান, আন্তঃ অঞ্চল ভিত্তিতে। এই জোনাল টুর্নামেন্ট এখনও এদেশে চালু হয়নি। হলে এর থেকে অনেক টাকাই পাওয়া যেতে পারে। এই মর্মে একটি স্কীমও এ আই এফ এফ-কে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত এ নিয়ে এ আই এফ এফ-এ কোনো রকম আলোচনাই হয়নি। অথচ এই ধরনের টুর্নামেন্ট থেকে যে টাকা পাওয়া যাবে, তা দিয়ে জুনিয়ারদের দেখাশুনার ভার এ আই এফ এফ নিতে পারে। এমনকি নিজেরা একটি ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রই খুলতে পারে। আসলে এ আই এফ এফ-এ এমন কেউ নেই যিনি পরিশ্রম দিয়ে এই ধরনের একটি সফল টীম করতে পারেন।

শেষমেশ জামশেদপুরে টাটাই এই ধরনের একটি প্রকল্পে হাত দিয়েছে। নামকরণ হয়েছে টাটা ফুটবল অ্যাকাডেমি। দ্বারোদঘাটন হওয়ার কথা ১ জানুয়ারি, ১৯৮৭। এই স্কীমের আগে টাটা স্পনসর করেছিল "সুপার সকার"। প্রথম বছরে ব্রাজিল থেকে একটি দল নিয়ে এসে পরের বার পশ্চিম জার্মানির বোখুম দল উপহার দেয় দেশের ফুটবল প্রেমীদের। যদিও এই দুটি দলের কোনোটিতেই নেহরু কাপের মত বিশ্বে পরিচিত খেলোয়াড় ছিল না, এদের খেলা দেখে দর্শকসাধারণ আনন্দিত হয়েছিল। আমাদের ফুটবল দেবতারা ওদের সঙ্গে খেলায় নিজেদের দক্ষতা কোনো কিছুই ভালভাবে দেখাতে পারেনি।

কিন্তু শুধু ফুটবল উপহার না দিয়ে ওই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা দেশকে ফুটবল্যার উপহার দিতে চাইছিল। তাই অনেক চিন্তা ভাবনার পর স্থির হয় যে ফুটবলের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করলেই সহায়তা সূচারু হবে।

টাটা ফুটবল অ্যাকাডেমির কর্ণধার হচ্ছেন এইচ পি বোধনওয়ালা। ওঁর মতে এই ধরনের একটি স্কীমে আগের থেকে কোনো বাজেট তৈরি করা যায় না। ওঁরা চান একেবারে কম বয়সী ছেলেদের একত্র করে তাদের পড়াশুনার ভার নিয়ে ফুটবলের বর্ণপরিচয় থেকে শুরু করতে। শুধু থাকা-খাওয়া এবং পড়া নয়, এই ফুটবল অ্যাকাডেমির কর্তৃপক্ষ চান ওদের সব দায়-দায়িত্ব নিতে। বছরে এক মাসের ছুটি দেওয়া ছাড়াও ছেলেরা মাসে মাসে পকেট মানি পাবে।

আপাতত তিরিশ জন ছেলে নিয়ে টি এফ এ শুরু করার পরিকল্পনা আছে। এদের রাখা হবে কীনান স্টেডিয়ামের কাছে একটি নতুন আবাসে। তবে টি এফ এ-এর নিজস্ব বাড়ি এবং মাঠ তৈরি হচ্ছে এখান থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে। ওই কমপ্লেক্সটি তৈরি হলেই টি এফ এ জামশেদপুরের অন্যান্য খেলার থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা হয়ে যাবে।

বোধনওয়ালা সর্বোচ্চ আসনে বসলেও ওঁর বয়স এবং ফুটবলের অজ্ঞতার জন্য উনি টি এফ এ-র দৈনন্দিন ব্যবস্থায় হাত দেবেন না। এ ব্যাপারে সর্বেসর্বা হবেন চুনী গোস্বামী। ব্যাঙ্কের উচ্চপদের চাকরি ছেড়ে উনি টি এফ এ-তে আসেন শুধু ফুটবল ভালবাসেন বলে। ফিফার কোচিং সার্টিফিকেট থাকা সত্ত্বেও উনি প্রশিক্ষণে কোনোদিন নামেন নি শুধু ওই ধরনের কাজে স্থায়িত্বের অভাবের জন্য।

নিজেই বলেছিলেন যে, উনি ক্লাব কোচিং করতে চান না শুধু এই কারণে যে তাহলে ওঁকে হয়ত মোহনবাগানের বিপক্ষে ছেলেদের খেলাতে হত। কিন্তু টি এফ এ-তে ত সে ধরনের সম্ভাবনা একেবারেই নেই, তবে কেন উনি সেখানে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিলেন না তা বলা শক্ত। চুনী গোস্বামী টি এফ এ-র "অ্যাডভাইজার" নিযুক্ত হয়েছেন। ওঁর কাজ হল কোচকে নিয়ে ছেলে স্কাউট করা, তাদের প্রশিক্ষণের ধরন স্থির করা এবং তাদের উন্নতির গ্রাফ রাখা।

কিন্তু মাঠে আসল কাজ যিনি করবেন, সেই প্রশিক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মহম্মদ হাবিবকে। প্রথমে সৈয়দ নাঈমুদ্দিনকে টি এফ এ নিযুক্ত করতে চায়। কিন্তু পারিশ্রমিকের ব্যাপারে পার্থক্য থেকে যায় বলে নঈম শেষ পর্যন্ত গররাজি হয়। বোধনওয়ালা বলেছিলেন যে, টাকার ব্যাপারে টাটা উদার, তাহলে নঈমের ছেলের পড়াশুনার ভার এবং ওঁর থাকার ব্যবস্থা করতে ওঁরা নারাজ হলেন কেন বোঝা গেল না।

এরপর নাম শোনা গেল হাকিমের। স্কোয়াড্রন লীডার হাকিম হচ্ছেন ভারতের শ্রেষ্ঠ কোচ রহিমের ছেলে। উনি একজন কোয়ালিফাইড রেফারি এবং ক্লাব পর্যায়ে কোচিং-এর অভিজ্ঞতাও ওঁর আছে। কিন্তু ওই এক ব্যাপারে, অর্থাৎ টাকার অঙ্কে মিল পাওয়া গেল না বলে উনি শেষ পর্যন্ত টাটার অফার ফিরিয়ে দিলেন।

হাবিব কোচিং শিখেছেন এন এস এন আই এস-এ। ওই সার্টিফিকেটের বলে উনি চাকরি পেলেন আই এফ এ-র জুনিয়ারদের প্রশিক্ষণ করার। কিন্তু সুদূর হায়দ্রাবাদ থেকে কলকাতায় এসে আই এফ এ-র অফার গ্রহণ করার পরেও হাবিব শেষ পর্যন্ত টাটা অ্যাকাডেমিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

আমাদের দেশে ফুটবলের অগ্রগতির প্রধান বাধা হল অসম্পূর্ণ শিক্ষা। আজকের দিনে প্রথম জীবনে সঠিক পদ্ধতি শেখার উপায় এখনও নেই। কয়েকজন ভাল কোচ হয়ত আছেন। কিন্তু টানা কয়েক বছর একসঙ্গে ছেলেদের না পাওয়ার জন্য এঁদের প্রশিক্ষণের সঠিক প্রতিফলন তাঁদের ছাত্রদের খেলায় পাওয়া যায় না। ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা বন্ধ করার জন্যই টি এফ এ স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু হাবিব সঠিক রাস্তা দেখাতে পারবেন কিনা এখনই বলা সম্ভব নয়। ভাল খেলোয়াড় হলেই যে ভাল কোচ হওয়া যায়, এ-কথা কেউ কখনই বলতে পারেন না।

টি এফ এ নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় প্রতিষ্ঠান হতে চলেছে। অন্তত এটুকু বোঝা যাবে যে, এদেশে আদৌ কোনো ফুটবল ট্যালেন্ট আছে কিনা। হারজিতের কথা নয়, ভাল ফুটবল খেলতে পারলেই টি এফ এ-র ছেলেরা ওই স্কুলের সার্থকতা বুঝে যাবে। বুঝে যাচ্ছে।

কিন্তু সেটাও সম্ভব হবে না যদি আরও ভাল কোচ নিযুক্ত না হয়। এক্ষেত্রে বিদেশী কোচ আমদানী করতে পারলে টি এফ এ অনেক উন্নত খেলোয়াড় উপহার দিতে পারে। আর বিদেশী কোচের সঙ্গে শিক্ষানবিশ হয়ে থাকলে পরবর্তীকালে হাবিব নিজেই প্রশিক্ষণের সব দায়িত্ব নিতে পারবেন।

শুধু কোচ আমদানী করলেও কিন্তু টি এফ এ-র সব সমস্যার সমাধান হবে না। কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে যে, যদিও এই ছাত্রদের সব দায়িত্ব তাদের স্কুল জীবনের শেষ পর্যন্ত তারা নেবে, পরবর্তীকালে টাটাতে চাকরির ব্যাপারে কিন্তু কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব করা হবে না।

অনেক বছর একসঙ্গে কাটিয়ে এই ছেলেরা যদি হঠাৎ আলাদাভাবে খেলতে শুরু করে, তাদের পক্ষে নতুন জায়গায় মানিয়ে নিয়ে নতুন কোচের অধীনে খেলা কঠিন হতে পারে। অথচ প্রথম কয়েকটি ব্যাচ যদি একসঙ্গে থাকতে পারে, তাহলে ফুটবলেরই উন্নতি হতে পারে।

আবার ১৭-১৮ বছরের ছেলেদের নিয়ে টি এফ এ যদি একটি দল গঠন করে—মানে প্রশিক্ষণের শেষ দিকে পরিণত খেলোয়াড়দের নিয়ে—তাহলে তাদের দেশের বিভিন্ন টুর্নামেন্টে খেলানো যেতে পারে। এতে শুধু যে ছেলেদের এত বছরের প্রশিক্ষণের ফল পাওয়া যাবে তা নয়, এই ছেলেদের নিয়েই এ আই এফ এফ জাতীয় ইয়ুথ দল গঠন করতে পারে। এতে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে এবং দেশের ফুটবল মানের উন্নতিও মাপা যাবে।

ইয়ুথ দল ভাল খেললে কয়েক বছরের মধ্যেই এদের সিনিয়ার দলে নেওয়া যাবে। আশা করা যাচ্ছে যে, তিরিশজনের মধ্যে অন্তত দশজন খুব ভাল খেলোয়াড় তৈরি হবে। এ আই এফ এফ-এর শুধু শেষ পর্যায়ের ট্রেনিং এবং বিদেশে পাঠানোর খরচ বহন করতে হবে।

এই টি এফ এ সফল হলে এর প্রভাব হবে সুদূর প্রসারী। সরাসরি ক্লাব পর্যায়ে যদি এরা ছড়িয়ে না যায়, তাহলে এই ইয়ুথ দলই দেশের তথাকথিত রথী-মহারথীদের আসনচ্যুত করতে পারে। ক্লাব প্রেমের জায়গায় হয়ত তখন দেশপ্রেম আসতে পারে।

তবে সবই নির্ভর করছে টি এফ এ-র পরিচালনার ওপর। সুষ্ঠুভাবে চললে এই স্কুলই হয়ে উঠবে দেশের ফুটবলের নিউক্লিয়াস। এর থেকেই আগামী দিনের দিক্‌পাল খেলোয়াড় আসবে। এবং শুকিয়ে যাওয়া প্রতিভার পুনর্বিকাশ ঘটবে। এই টি এফ এ-ই এখন একমাত্র আশার আলো। ■

ম্যাকেনরোর জনপ্রিয়তা

কোর্টে বদমেজাজ দেখানো, অভদ্রতার জন্য জন ম্যাকেনরো সহ-খেলোয়াড় ও টেনিস কর্তাদের দুচক্ষের বিষ হতে পারেন কিন্তু ওর জনপ্রিয়তা বিরাট। গতমাসে এক গণসমীক্ষায় এর কিছুটা আন্দাজ পাওয়া গেল, এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল লণ্ডনের মাদাম তুসো জাদুঘরে যে গোটাকুড়ি ক্রীড়াবিদের মোমের মূর্তি রক্ষিত আছে তার মধ্যে প্রধান আকর্ষণ কোনটি খুঁজে বার করা। দেখা গেছে, মহম্মদ আলি, ভিভ রিচার্ডস, মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা, বিয়র্ন বর্গদেরও ছাপিয়ে সবার বড় হয়ে উঠেছেন ম্যাকেনরো।

কারেকা যদি

আসল নাম আন্তোনিও ডি অলিভেরা। কারেকা ডাক নাম। ডাক নামেই অবশ্য ফুটবলবিশ্ব ব্রাজিলের এই কুশলী স্ট্রাইকারকে চেনে। গত মেক্সিকো বিশ্বকাপে কারেকাই ছিলেন ব্রাজিলের সর্বোচ্চ গোলদাতা। তাঁর ধারণা ছিল, প্রতিযোগিতারই সর্বোচ্চ গোলদাতা হবেন কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিল বিদায় নেওয়ায় সে আশা পূর্ণ হয়নি, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এই ম্যাচে ব্রাজিলের প্রথম গোলটিও কিন্তু করেছিলেন কারেকা, সাও পাওলো টিমের হয়ে কারেকা খেলেন। তাঁর ক্লাব সমর্থকদের স্থির বিশ্বাস, বিয়াশির বিশ্বকাপে কারেকা থাকলে ব্রাজিলকে ওভাবে বিদায় নিতে হত না। মাংসপেশীতে টান ধরায় সেবার স্পেন পৌঁছেও কারেকাকে দেশে ফিরে আসতে হয়েছিল।

শকুনের ঠোকর

গত বিশ্বকাপে ডেনমার্ক যেদিন উরুগুয়েকে ৬—১ হারাল, তার পরদিন রাতে গ্র্যান্ড হোটেলে আই টি সি আয়োজিত এক পার্টিতে তুমুল আলোচনা চলছিল এ নিয়ে। ডেনমার্ক তখন প্রায় সবার ফেবারিট। সবাই ধরে নিয়েছে তারাই চ্যাম্পিয়ন। তাই চারপাশে ভীড় করে দাঁড়ানো যে পনের-কুড়িজনকে প্রদীপ ব্যানার্জি ডেনমার্কের খুঁতটা বোঝাতে চাইছিলেন, তারা কিছুতেই মানতে রাজি হচ্ছিল না। পি কে বারবার একই কথা বলছিলেন, ডেনমার্ক ভাল খেলছে, ওদের খেলা দেখতে দারুণ লাগছে, সবই ঠিক কিন্তু ভাল টিমের সঙ্গে এরকম অল আউট অ্যাটাকে খেলা চলবে না, রাশিয়ার মতো কঠিন ডিফেন্সের সামনে পড়ুক, ডেনমার্ক শেষ হয়ে যাবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর কথা মিলে গেল। তবে [illegible] ছিলেন বলে, ডেনমার্ককে শেষ করে দিল 'শকুনের ঠোকর'। স্প্যানিশ ভাষায় 'এল বুইত্রে' কথাটির অর্থ শকুন। এমিলিও বুত্রাগেনো। বয়েস মাত্র তেইশ কিন্তু বিপক্ষ ডিফেন্সে ঠোকর দেবার অসম্ভব ক্ষমতা তদুপরি নামের সঙ্গে মিল এই দুয়ে মিলে সে 'শকুন' নাম অর্জন করে ফেলেছে। হ্যাটট্রিক সহ স্পেনের এই স্ট্রাইকার চারটি গোল দিয়েছিল ফেবারিট ডেনমার্ককে। এবং কি আশ্চর্য, দুবছর আগেও সে স্পেনের দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ খেলত। বুত্রাগেনো এখন খেলে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে।

তার টিমের অন্য ফরোয়ার্ডদের মধ্যে আছে ভালদানো ও হুগো সাঞ্চেজ মেক্সিকো বিশ্বকাপের আগে বুত্রাগেনো কখনও চার গোল করেনি এবং মাদ্রিদের হয়েও নিয়মিত খেলোয়াড় ছিল না। ডেনমার্ক ম্যাচই ওর ভাগ্য খুলে দিয়েছে।

দুই তারকার মধ্যে

ভারতীয় ক্রিকেট সম্পর্কে সামান্যতম খোঁজখবরও যাঁরা রাখেন, তাঁরাও জানেন বিষেণ সিং বেদি আর সুনীল গাওস্করের মধ্যে সম্পর্ক মোটেই ভাল নয়। একে অন্যের বিরুদ্ধে বহুবার বিষোদ্গার করেছেন। সর্ডারের অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারত যখন দিল্লিতে দ্বিতীয় টেস্ট খেলছিল, বেদি তাঁর বাড়িতে একটি ছোট ডিনার পার্টি দেন। খুব কমসংখ্যক এতে নিমন্ত্রিত ছিলেন, প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার এই ভোজটি আয়োজিত হয় গাওস্করের সম্মানে। গুটিদশেক আমন্ত্রিত ও তাঁর প্রধান অতিথির সামনে ছোটখাট একটি বক্তৃতাও বেদি দেন। বলেন, "টামা একশ টেস্ট খেলে যে অসাধারণ কীর্তি সুনীল স্থাপন করেছে তাকে সম্মান জানাতেই আজকের এই সামান্য প্রয়াস। কোন সন্দেহ নেই ইদানীংকালে ভারতের যাবতীয় ক্রীড়াবিদের মধ্যে ও-ই সেরা। ব্যক্তি যদি খেলার চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায় সেটা নিশ্চয়ই খুব ভাল লক্ষণ নয়। তবু সুনীলের আমি প্রশংসা করব অসাধারণ নিষ্ঠা, মনের জোর ও অধ্যবসায় দ্বারা ব্যাপারটাকে ও এই জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছে। আমার নিজের মনে হয়, অন্তত আরও

দুবছর ভারতীয় ইনিংসে সূচনা করার দায়িত্ব ওর হাতে থাকা উচিত। আমার সঙ্গে সুনীলের সম্পর্ক যে খুব ভাল তা বলতে পারি না। বহুবার ওর সঙ্গে মতের অমিল ঘটেছে। এতে হয়তো সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস আমরা কখনই হারাইনি—পারস্পরিক শ্রদ্ধা। ক্রিকেটার হিসাবে আমি অত্যন্ত তৃপ্ত যে, নিজেকে গাওস্কর-বিশ্বনাথদের সহ খেলোয়াড় বলে দাবি জানাতে পারি।"

গাওস্কর ওই পার্টিতে স্বাভাবিক, ভদ্র ব্যবহারই করেছেন। একবারের জন্যও কাউকে বুঝতে দেননি আয়োজনকারীর সঙ্গে তাঁর প্রকৃত কি সম্পর্ক। পরে অবশ্য বেদিকে খোলাখুলিই বলেছেন, "সত্তর দশকের শুরু বা তার মাঝামাঝি এই পার্টি যতটা উপভোগ্য হত, এখন কিন্তু তা হল না।"

বথামের পর

বথামের পর ডেফ্রিটাস, এরকম একটা আশার ইঙ্গিত ইংরেজ সাংবাদিকরা পত্রপত্রিকায় দিতে শুরু করেছেন। ব্রিটিশ প্রেসের বাড়াবাড়ি এবং একচোখামির কথা সর্বজনবিদিত। যেহেতু ইয়ান বথামের সঙ্গে ইদানীংকালে তাদের সম্পর্ক মোটেই ভাল নয়, ফিলিপ ডেফ্রিটাসকে ইচ্ছাকৃতভাবে আলোকিত করা হচ্ছে। ডেফ্রিটাস বথামের ধারেকাছেও নয়। তবে এটাও ঘটনা, গত কয়েক বছরের মধ্যে এত প্রতিভাবান অল রাউন্ডার ইংল্যান্ড আর পায়নি। বথামের মতো কুড়ি বছর বয়সী এই ছেলেটিরও সেরা ক্রিকেট বেরিয়ে আসে বিপদের সময়।

মিডলসেক্সের পক্ষে এ মরসুমে ৯৪ উইকেট নিয়েছে ডেফ্রিটাস। একবছর, প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলার পরেই অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্যও নির্বাচিত হয়। ব্রিসবেনে জীবনের প্রথম টেস্টে বেশ সাফল্যের সঙ্গেই উৎরে গেছে। 'ড্যাফি' (ওর ডাক নাম) কতদূর এগোয়, আমরা এখন তা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করব।

গৌতম ভট্টাচার্য

শ্রীচৈতন্য পরিমণ্ডল

সুধীর চক্রবর্তী

ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য/ নির্মলনারায়ণ গুপ্ত/ রত্নাবলী/ কল-৯/৫০·০০

বাঙ্গালী মনীষায় শ্রীচৈতন্য/ (সং) নির্মলনারায়ণ গুপ্ত/ রত্নাবলী/ কল-৯/২০·০০

আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ/ শেখরেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায়/ এস· এন· পাবলিকেশনস/ কল-৯/২২·০০

গরুড় স্তম্ভের নীচে উপবিষ্ট শ্রী চৈতন্য — ছবি : নন্দলাল বসু

আমাদের চারিদিকে ক্রমাগ্রসর জড়বাদ ও যান্ত্রিক কৃৎকৌশলের আচ্ছন্নতার মধ্যেও মাঝে মাঝে সুবাতাসের মত আসে এক-একটা উপলক্ষ। সেই উপলক্ষকে ঘিরে আমাদের মনন ও রসচর্চার কিছু বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই যেমন শ্রীচৈতন্যের পাঁচশো বছরের লগ্ন। এমনটা তো প্রত্যাশিতই যে, এ-সময়ে বেরোবে মহাপ্রভুকে নিয়ে অনেক বই, জমে উঠবে নানা তর্ক। কেননা, তাঁর জীবনের ঘটনাগুলি যেমন বৈপ্লবিক, তেমনই তাঁর জীবনকাহিনী ও মৃত্যু নিয়ে আছে নানা বিতর্ক ও ধূসরতা। তাঁর সৃষ্ট বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায় নিয়েও নানা পালাবদলের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁকে নিয়ে তাই অনেক বই লেখা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। তবে এ কথাও ঠিক যে, বৈষ্ণব ধর্ম ও শ্রীচৈতন্য বিষয়ে বই লেখার অধিকার বোধ হয় সকলের নেই। কারণ বৈষ্ণব ধর্মের একটা দিক যেমন সরস পদাবলীতে ব্যক্ত, আরেক দিক তেমনই কঠিন তত্ত্ব ও দর্শনে গূঢ়। এই তত্ত্বদর্শনের একটা বড় অংশ আবার সংস্কৃত ভাষায় লেখা। কাজেই বৈষ্ণব ধর্ম ও শ্রীচৈতন্য বিষয়ে বই লেখার আগে অগ্রপশ্চাৎ ভেবে নেওয়া ভাল ; বিশেষত এই জন্য যে, এ প্রসঙ্গে এর আগে বিশিষ্ট বৈষ্ণব শাস্ত্রজ্ঞদের লেখা ইংরাজি ও বাংলায় অনেক প্রসিদ্ধ আকরগ্রন্থ বেরিয়েছে।

এ সব কথা মনে রেখে যদি আমাদের আলোচ্য তিনখানি বই পড়তে বসি তবে হতাশ হতে হয় বৈকি। যেমন ধরা যাক, শেখরেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বই 'আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ'। ১৯৬৩ সালে প্রথম প্রকাশিত এ-বই ১৯৮৬তে দ্বিতীয় সংস্করণ পেয়েছে। এর উপজীব্য মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলার প্রথম অংশ। তার মানে বইটির আরেক খণ্ড অপেক্ষিত। লেখক জানিয়েছেন, 'গৌরভক্তগণের কৃপা থাকলে' দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। বোঝাই যাচ্ছে লেখকের লক্ষ হলেন গৌরভক্তগণ। কাজেই বইটি তাঁদের উপযোগী এলিয়ে-পড়া ভাষায় লেখা এবং ভক্তির মশলায় বেশ স্বাদু। কিন্তু মুশকিল বাধে যখন এ-জাতীয় বই আসে বিচারের জন্য আমাদের কাছে। আমরা তো শ্রীচৈতন্যকে বুঝতে চাই তাঁর যুগের প্রেক্ষিতে, ইতিহাসের আলোয়। যুক্তি-তথ্য-বিশ্লেষণ সে ক্ষেত্রে জরুরী, ভক্তিরস সেই পথকে শুধুই আবিল করে। যেমন ধরা যাক, শ্রীচৈতন্যের প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর মৃত্যু। সুকুমার সেন স্পষ্ট লিখেছেন তাঁর 'চৈতন্যাবদান' বইয়ের ৩৫ পৃষ্ঠায় যে লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু ঘটে 'গঙ্গাতীরে সাপের কামড়ে'। এ মত আরো অনেকেরই। অথচ শেখরেন্দুবাবু 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার আন্তর্দ্ধ্যান'(এমন বর্ণাশুদ্ধি অনেক আছে) শীর্ষকে লেখেন 'প্রেম কালকূট—বিরহ বিষ। অনুক্ষণ এই বিরহ-বিষের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে··· গঙ্গার তীরে লক্ষ্মীপ্রিয়া নিজেকে অন্তর্দ্ধান করলেন'। এবং আরো লেখেন, 'স্বামী-বিরহে এভাবে প্রাণত্যাগ, লক্ষ্মীপ্রিয়ার অন্তর্দ্ধান, গৌরাঙ্গ-প্রেমের এক অলৌকিক দৃষ্টান্ত'। এবারে প্রশ্ন উঠবেই, এ বই কি আমরা যথাযথ বিচার করতে পারি ? অতএব আপাতত 'আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ'কে ভক্তিভরে কপালে ঠেকিয়ে আলমারিজাত করাই শ্রেয়।

তুলনায় নির্মলনারায়ণ গুপ্তর সম্পাদিত 'বাঙালী মনীষায় শ্রীচৈতন্য' বরং অনেক আকর্ষণীয়। বইটি আসলে একটি সংকলন। চৈতন্য বিষয়ে নিবন্ধ, গান ও জীবনবৃত্তান্ত বিভিন্নজনের লেখা এতে আছে। লেখকসূচীতে লালন ফকির, দীনবন্ধু মিত্র, নবীনচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, স্বামী বিবেকানন্দ যেমন আছেন তেমনই আছেন শ্রীঅরবিন্দ, প্রমথ চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র সেন এবং এমনকি গোপাল হালদার। শ্রীচৈতন্য বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বচনসমুচ্চয়ও সংকলিত হয়েছে। এমন পাঁচফুলের সাজি যিনি সাজিয়েছেন তাঁর মধুকরবৃত্তির প্রশংসা করতেই হয়। তবে সম্পাদক নিজেই স্বীকার করেছেন, 'ব্যবহৃত রচনাগুলির অধিকাংশই মূলের সংক্ষিপ্ত রূপ। কোন কোন ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন উক্তি বা বিবৃতিকে একসূত্রে গেঁথে সাজিয়ে নিতে হয়েছে। স্বল্প পরিসরে উনিশ ও বিশ শতকে বাঙালী মনীষীদের চৈতন্যচর্চার একটা মোটামুটি পরিচয় লাভই এ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য'। বলতেই হয় উদ্দেশ্য মহৎ। তবে উনিশ ও বিশ শতকের চৈতন্যচর্চার প্রসারিত দিগন্ত ১৪৮ পৃষ্ঠার

জীর্ণতায় ধরার চেষ্টা খুব দুঃসাহসিক। গীতকার ও লেখকের সংখ্যা ৪২। এবারে বোধ হয় বোঝা যাবে মূলের সংক্ষিপ্তকরণ কী পর্যায়ের ও কতটা ঘটেছে। লেখাগুলি পড়ে তবু আমাদের লাভই হয়। একটি গ্রন্থে এত বিশিষ্ট মানুষের লেখা একত্র পাওয়া কম সৌভাগ্য নয়। আপত্তি কেবল দু রকম। প্রথমত, সকলের সব মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় এমনকি তাঁরা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হলেও নয়, সম্পাদকের এদিকটা লক্ষ রাখা উচিত ছিল। অগ্রহণীয় এমন অনেক মন্তব্যের মধ্যে একটি নমুনা এখানে উল্লেখযোগ্য। বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন, 'নব বৈষ্ণব বিধানে জাতবিচারের বালাই না রেখে, হিন্দু সামাজিক আইনের আওতার বাইরে, বিয়ে করার স্বাধীনতা দেওয়া হল। অব্রাহ্মণ পাত্র-পাত্রী স্বচ্ছন্দে ব্রাহ্মণ পাত্র-পাত্রীকে বিয়ে করতে পারত। এ ছাড়া, মধ্যযুগীয় বাল্যবিবাহ প্রথার অবসান ঘটান হল এবং বিধবা বিবাহ চালু করা হল'। নির্মলনারায়ণ গুপ্ত একটু অনুসন্ধান করলে বিপিনচন্দ্রের বক্তব্যের অসারতা ধরতে পারতেন। দ্বিতীয়ত, ঠিক মত সতর্ক থাকলে তিনি লালন, কুবির বা যাদুবিন্দুর লেখা গৌরপদাবলী সংকলিত করতেন না, কেননা এঁদের গৌণ ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত পদে গৌর মানে শ্রীচৈতন্য নয়। দেহতত্ত্ব সাধনার একটি অনুভবকে এঁরা গৌর বলে উল্লেখ করেন। জীবনের সঠিক উপলব্ধিকেই এঁরা চৈতন্য বলেন। সম্পাদক হিসাবে নির্মলবাবু বেশ নির্বিচার ও উদার বলতেই হয়।

'ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য' নির্মলবাবুর মৌলিক গ্রন্থ। 'ভারত পর্যটনকালে মহাপ্রভু যে সব প্রদেশের উপর দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই সেই প্রাদেশিক সাহিত্যে তাঁর প্রভাব আদৌ (দেখা যাচ্ছে লেখক আদৌ কথার অর্থ জানেন না) পড়েছিল কিনা, অথবা কিভাবে কতটা পড়েছিল' আলোচ্য বইতে তিনি তাই অনুসন্ধান করেছেন। কাজটি কঠিন এবং ৩৪৮ পৃষ্ঠার এই প্রয়োজনীয় রচনা সব রকমের সততা সত্ত্বেও পুরো সাফল্য দাবী করতে পারে না। কারণ, বিমানবিহারী মজুমদারের লেখা 'শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গ অনেক অধিকারবোধের প্রত্যয়ে ঋজু। নির্মলবাবু যদিও নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, বিমানবাবুর বইটি দিগ্‌দর্শিনী তবু তাঁর অনুসন্ধানের পর 'প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপকতর অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে', কিন্তু নির্মলবাবুকে গ্রহণ করতে হয়েছে Secondary source। এখানেই গোলযোগ। বস্তুত, আসাম, ওড়িষা, দক্ষিণ ভারত, গুজরাত, মহারাষ্ট্র ও ব্রজমণ্ডলের সাহিত্যে সর্বাদৌ এবং সর্বাধুনিক কাল পর্যন্ত মহাপ্রভুর ভাবসাধনার প্রভাব ও পরিধি নির্ণয় সঠিকভাবে

করতে গেলে এ সব ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে হতে হবে গভীর অধীতি। কোনো একজনের পক্ষে তা কি সম্ভব? সেই জন্য নির্মলবাবুকেও অনেক ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিতে হয় ইংরাজি অনুবাদের আশ্রয়। ইংরাজি অনুবাদ যে এ ব্যাপারে খুব বেশি তা তো নয়। সমস্যা এখানেই। তবু নির্মলবাবুর বইখানি সুসংকলিত ও নির্ভরযোগ্য। বিশেষত ওড়িয়া ও অসমীয়া সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব অংশ দুটি খুবই তথ্যনির্ভর ও ব্যাপক। তুলনায় দক্ষিণ ভারত, গুজরাত ও মহারাষ্ট্রের বিষয়ে লেখাগুলি পরিমিত, সম্ভবত তথ্যের অপ্রতুলতার জন্যই। হিন্দি সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য বিষয় হিসাবে চমৎকার কিন্তু লেখকের অনুসন্ধানের সংকল্পের সঙ্গে খাপ খায়নি। পরিশিষ্টে সংযোজিত 'গুরু নানক ও শ্রীচৈতন্য' এবং 'মণিপুরী বৈষ্ণবধর্মে শ্রীচৈতন্য' গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। অবশ্য ভারত পর্যটনকালে মহাপ্রভু এই দুই দেশের উপর দিয়ে যাননি। সে বিচারে এই দুই অধ্যায় অবান্তর। মণিপুরের মহাপ্রভু-সংরাগ নির্ণয়ে লেখক নবদ্বীপের প্রত্যক্ষ ভূমিকা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন মনে হয়। তিনি কি জানেন নবদ্বীপের একটি অংশের নাম মণিপুর এবং মণিপুর রাজবংশের ও জনগণের সঙ্গে আজ পর্যন্ত নবদ্বীপের যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ?

এ সব কূটকচালি বাদ দিলে নির্মলনারায়ণ গুপ্তর বইখানি কিন্তু খুব কাজের। ব্যাপক শ্রমলব্ধ ও শ্রদ্ধাশীল। শুধু ভক্তবৃন্দ নন, সকল চৈতন্য উৎসাহীকেই এ বই পড়তে আহ্বান জানানো চলে।

বাংলার মনীষী বঙ্গ ভাষা ও বঙ্গ সংস্কৃতি

ঝরা বসু

বাংলার মনীষা ও বাংলা সাহিত্য (১ম)/ প্রমথনাথ বিশী/ জিজ্ঞাসা/ কল-৯/১৮·০০

বঙ্গ ভাষা ও বঙ্গ সংস্কৃতি/ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য/ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ/ কল-৯/২৫·০০

সদ্যোগত শতাব্দীটি ছিল জাগরণের মহালগ্ন। জাগরণ ঘটিয়েছিলেন একজন দুজন মনীষী নয়—বহু মনীষী, বহু বিদ্বজ্জন জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্মসাধনায় সমগ্র শতাব্দীকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শতাব্দীকাল ধরে যেন মহাজীবনের মহামিছিল এগিয়ে চলেছিল। মিছিলে অবশ্য মানুষের পরিচিতি

একাকার হয়ে যায় কিন্তু যাদের হাতে পতাকা থাকে সেই-সব শক্তিমান কর্মীদের ব্যক্তিত্ব জনগণের ভীড়েও বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। এই সব মানুষেরা যাঁরা মনস্বিতার গুণে জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যাঁদের জীবন কেটেছে আদর্শের বাস্তব রূপায়ণে, যাঁরা দেশ গড়ার কারিগরিতে সুদক্ষ তাঁদের জীবন ও চরিত্র চিত্রণের দায়িত্ব আমাদের। বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির গবেষকগণ এই কাজটি অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে বহুবার পালন করেছেন। এ-কালের এক কালজয়ী সাহিত্যিকের উপন্যাসেও 'সেই সময়'-এর মনীষা চরিত্রাবলী অঙ্কিত হয়েছে। সম্প্রতি হাতে এল—প্রমথনাথ বিশীর 'বাংলার মনীষা ও বাংলা সাহিত্য' নামে একটি প্রবন্ধের গ্রন্থ—যে গ্রন্থটিতে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মনীষীগণের চরিত্রের সুপাঠ্য বিবরণ। চরিত্র চিত্রণ করতে গিয়ে অধ্যাপক বিশী প্রথমেই একটু চিন্তায় পড়েছিলেন—গুরু চালে লিখবেন না লঘু চালে? ভাববার কারণটি আমরা জানি। তিনি যে বাংলা সাহিত্যে 'প্র-না-বি' ছদ্মনামে লঘুকলমী রস রচনায় কত পটু তা আমরা জানি। —কিন্তু তিনি লঘুভাবে লেখেননি। যথার্থই তাঁর এই বিবেচনা। কারণ উনিশ শতকের শালপ্রাংশু মহাভুজ প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষদের নিয়ে আর যাই হোক লঘু পরিহাস একেবারেই চলে না। তাই গ্রন্থটি লিখবার আগে প্রমথ বিশী উনিশ শতকের সামাজিক ও সংস্কৃতির ইতিহাস সবিশেষ মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেছিলেন। প্রতিটি ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর খুঁটিনাটি বর্ণনা সে সাক্ষ্য দেয়।

সংস্কৃতির জগতে কত রকম পারদর্শিতার কথা শোনা যায়। কোন এক কৃতী বঙ্গসন্তান না কি একটি চালের দানায় সম্পূর্ণ রামায়ণ লিখে রেখে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। 'বাংলার মনীষা ও বাংলা সাহিত্য'—প্রথম খণ্ড, 'রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ'—গ্রন্থটিতে স্বর্গীয় প্রমথনাথ বিশী সেই কৃতিত্বই দেখিয়ে গেছেন। রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ার থেকে শুরু করে উনিশ শতকের উনচল্লিশটি ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে প্রায় সম্পূর্ণ চিত্র উদঘাটিত করেছেন একশ এগার পাতার ক্ষুদ্র পরিসরে। একশত বছরের কর্মযজ্ঞ ও সেই কর্মকাণ্ডের উত্তাল জলধিতরঙ্গ যেন শ্রীবিশীর যাদুদণ্ডের স্পর্শে সংহত হয়ে আছে এই গ্রন্থটির মধ্যে। রাজা রামমোহন রায় নব্য ভারতের ব্রাহ্ম মুহূর্তের বিরাট পুরুষ। এই মানুষটির আধুনিকতার দিকটি তুলে ধরেছেন। "রেনেসাঁসের ইন্দ্রধনুর তোরণের তল দিয়া তাঁহাকে দেখিতে হইবে।" ডেভিড হেয়ার এ-দেশে ইংরেজি শিক্ষার গুরুমহাশয়। হেয়ার সাহেব ছিলেন সহৃদয় ও সাধুব্যক্তি। তিনি মানুষকে বিশ্বাস করতেন, মানুষও তাঁকে বিশ্বাস করত। শ্রীবিশীর চিন্তার মৌলিকতা সর্বত্র। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তাঁর সমীক্ষা—'বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে ও স্ত্রীশিক্ষা প্রসারণের মূলে শুধু তাঁর কোমল হৃদয়াবেগ নয়—তার সঙ্গে ছিল প্রবল Logic — "বিদ্যাসাগরের হাতে একখানি মাত্র Logic এর তরবারি ছিল, কিন্তু তাহার বিচিত্র কার্যকলাপ দেখিলে মনে হইত, তাহার হাতে একশত তরবারি আবর্তিত হইতেছে।"

চরিত্রগুলির গুরুগম্ভীর আলোচনা করবেন বলেই প্রমথ বিশী স্থির করেছিলেন— কিন্তু নিজের প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেননি। প্রবন্ধগুলিতে বিষয় থেকেও বিষয়ের ভারহীনতা লক্ষ করা যায়। 'প্র-না-বি'র স্নিগ্ধ কৌতুকময়তা ও মৃদু হাস্য প্রায় সর্বত্রই প্রচ্ছন্ন আছে। 'ডরো মৎ হাম হেয়ার সাহেব হ্যায়'— 'সেই সব মেলোড্রামা— মেখলার গুরু হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও, কিংবা রাজনারায়ণ বসু সম্পর্কে মন্তব্য— 'সেই মাটির স্বর্গ এক সময়ে সমস্ত বাঙালী জাতিটার রাজসিংহাসন ছিল। আজ নাস্তিকের সূক্ষ্ম হাসির তীক্ষ্ণ শূলের উপরে আমরা বিরাজ করিতেছি। তাই এত বেশি করিয়া রাজনারায়ণ বসুকে মনে পড়িতেছে।" —ইত্যাদি অংশগুলিতে লেখকের অন্তরৈশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

কবির মন নিয়ে রচনা করেছেন 'পরমহংসদেব' প্রবন্ধটি। আলোচনার ভঙ্গীটিও মনোজ্ঞ। পরমহংসদেবের দুটি ছবির (একটি উপবিষ্ট আর একটি দণ্ডায়মান) বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে লোকোত্তর পুরুষটিকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। এই ছবি দুখানি যেন রামকৃষ্ণ জীবন-দর্শনের প্রতীক। যেন ধনুকের দুই কোটি—এক কোটিতে ভূমি—অপর কোটিতে ভূমা।

এই তো গেল গ্রন্থের মূল বিষয়ের পরিচয়। এই বইটিতে আমরা আসলের সঙ্গে ফাউ পেয়েছি। লেখকের একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা—এতে উনিশ শতকের মানসিকতা ও যুগধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই লেখকের মনে হয়েছে

শীর্ণতায় ধরার চেষ্টা খুব দুঃসাহসিক। গীতকার ও লেখকের সংখ্যা ৪২। এবারে বোধ হয় বোঝা যাবে মূলের সংক্ষিপ্তকরণ কী পর্যায়ের ও কতটা ঘটেছে। লেখাগুলি পড়ে তবু আমাদের লাভই হয়। একটি গ্রন্থে এত বিশিষ্ট মানুষের লেখা একত্র পাওয়া কম সৌভাগ্য নয়। আপত্তি কেবল দু রকম। প্রথমত, সকলের সব মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় এমনকি তাঁরা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হলেও নয়, সম্পাদকের এদিকটা লক্ষ রাখা উচিত ছিল। অগ্রহণীয় এমন অনেক মন্তব্যের মধ্যে একটি নমুনা এখানে উল্লেখযোগ্য। বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন, 'নব বৈষ্ণব বিধানে জাতবিচারের বালাই না রেখে, হিন্দু সামাজিক আইনের আওতার বাইরে, বিয়ে করার স্বাধীনতা দেওয়া হল। অব্রাহ্মণ পাত্র-পাত্রী স্বচ্ছন্দে ব্রাহ্মণ পাত্র-পাত্রীকে বিয়ে করতে পারত। এ ছাড়া, মধ্যযুগীয় বাল্যবিবাহ প্রথার অবসান ঘটান হল এবং বিধবা বিবাহ চালু করা হল'। নির্মলনারায়ণ গুপ্ত একটু অনুসন্ধান করলে বিপিনচন্দ্রের বক্তব্যের অসারতা ধরতে পারতেন। দ্বিতীয়ত, ঠিক মত সতর্ক থাকলে তিনি লালন, কুবির বা যাদুবিন্দুর লেখা গৌরপদাবলী সংকলিত করতেন না, কেননা এঁদের গৌণ ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত পদে গৌর মানে শ্রীচৈতন্য নয়। দেহতত্ত্ব সাধনার একটি অনুভবকে এঁরা গৌর বলে উল্লেখ করেন। জীবনের সঠিক উপলব্ধিকেই এঁরা চৈতন্য বলেন। সম্পাদক হিসাবে নির্মলবাবু বেশ নির্বিচার ও উদার বলতেই হয়।

'ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য' নির্মলবাবুর মৌলিক গ্রন্থ। 'ভারত পর্যটনকালে মহাপ্রভু যে সব প্রদেশের উপর দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই সেই প্রাদেশিক সাহিত্যে তাঁর প্রভাব আদৌ (দেখা যাচ্ছে লেখক আদৌ কথার অর্থ জানেন না) পড়েছিল কিনা, অথবা কিভাবে কতটা পড়েছিল' আলোচ্য বইতে তিনি তাই অনুসন্ধান করেছেন। কাজটি কঠিন এবং ৩৪৮ পৃষ্ঠার এই প্রয়োজনীয় রচনা সব রকমের সততা সত্ত্বেও পুরো সাফল্য দাবী করতে পারে না। কারণ, বিমানবিহারী মজুমদারের লেখা 'শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গ অনেক অধিকারবোধের প্রত্যয়ে ঋজু। নির্মলবাবু যদিও নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, বিমানবাবুর বইটি দিগ্‌দর্শিনী তবু তাঁর অনুসন্ধানের পর 'প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপকতর অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে', কিন্তু নির্মলবাবুকে গ্রহণ করতে হয়েছে Secondary source। এখানেই গোলযোগ। বস্তুত, আসাম, ওড়িষা, দক্ষিণ ভারত, গুজরাত, মহারাষ্ট্র ও ব্রজমণ্ডলের সাহিত্যে সর্বাদৌ এবং সর্বাধুনিক কাল পর্যন্ত মহাপ্রভুর ভাবসাধনার প্রভাব ও পরিধি নির্ণয় সঠিকভাবে

বাঙালী মনীষায়

শ্রীচৈতন্য

করতে গেলে এ সব ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে হতে হবে গভীর অধীতি। কোনো একজনের পক্ষে তা কি সম্ভব? সেই জন্য নির্মলবাবুকেও অনেক ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিতে হয় ইংরাজি অনুবাদের আশ্রয়। ইংরাজি অনুবাদ যে এ ব্যাপারে খুব বেশি তা তো নয়। সমস্যা এখানেই। তবু নির্মলবাবুর বইখানি সুসংকলিত ও নির্ভরযোগ্য। বিশেষত ওড়িয়া ও অসমীয়া সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব অংশ দুটি খুবই তথ্যনির্ভর ও ব্যাপক। তুলনায় দক্ষিণ ভারত, গুজরাত ও মহারাষ্ট্রের বিষয়ে লেখাগুলি পরিমিত, সম্ভবত তথ্যের অপ্রতুলতার জন্যই। হিন্দি সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য বিষয় হিসাবে চমৎকার কিন্তু লেখকের অনুসন্ধানের সংকল্পের সঙ্গে খাপ খায়নি। পরিশিষ্টে সংযোজিত 'গুরু নানক ও শ্রীচৈতন্য' এবং 'মণিপুরী বৈষ্ণবধর্মে শ্রীচৈতন্য' গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। অবশ্য ভারত পর্যটনকালে মহাপ্রভু এই দুই দেশের উপর দিয়ে যাননি। সে বিচারে এই দুই অধ্যায় অবান্তর। মণিপুরের মহাপ্রভু-সংরাগ নির্ণয়ে লেখক নবদ্বীপের প্রত্যক্ষ ভূমিকা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন মনে হয়। তিনি কি জানেন নবদ্বীপের একটি অংশের নাম মণিপুর এবং মণিপুর রাজবংশের ও জনগণের সঙ্গে আজ পর্যন্ত নবদ্বীপের যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ?

এ সব কূটকচালি বাদ দিলে নির্মলনারায়ণ গুপ্তর বইখানি কিন্তু খুব কাজের। ব্যাপক শ্রমলব্ধ ও শ্রদ্ধাশীল। শুধু ভক্তবৃন্দ নন, সকল চৈতন্য উৎসাহীকেই এ বই পড়তে আহ্বান জানানো চলে।

বাংলার মনীষী বঙ্গ ভাষা ও বঙ্গ সংস্কৃতি

ঝরা বসু

বাংলার মনীষা ও বাংলা সাহিত্য (১ম)/ প্রমথনাথ বিশী/ জিজ্ঞাসা/ কল-৯/১৮·০০

বঙ্গ ভাষা ও বঙ্গ সংস্কৃতি/ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য/ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ/ কল-৯/২৫·০০

সদ্যোগত শতাব্দীটি ছিল জাগরণের মহালগ্ন। জাগরণ ঘটিয়েছিলেন একজন দুজন মনীষী নয়—বহু মনীষী, বহু বিদ্বজ্জন জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্মসাধনায় সমগ্র শতাব্দীকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শতাব্দীকাল ধরে যেন মহাজীবনের মহামিছিল এগিয়ে চলেছিল। মিছিলে অবশ্য মানুষের পরিচিতি

একাকার হয়ে যায় কিন্তু যাদের হাতে পতাকা থাকে সেই-সব শক্তিমান কর্মীদের ব্যক্তিত্ব জনগণের ভীড়েও বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। এই সব মানুষেরা যাঁরা মনস্বিতার গুণে জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যাঁদের জীবন কেটেছে আদর্শের বাস্তব রূপায়ণে, যাঁরা দেশ গড়ার কারিগরিতে সুদক্ষ তাঁদের জীবন ও চরিত্র চিত্রণের দায়িত্ব আমাদের। বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির গবেষকগণ এই কাজটি অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে বহুবার পালন করেছেন। এ-কালের এক কালজয়ী সাহিত্যিকের উপন্যাসেও 'সেই সময়'-এর মনীষা চরিত্রাবলী অঙ্কিত হয়েছে।

সম্প্রতি হাতে এল—প্রমথনাথ বিশীর 'বাংলার মনীষা ও বাংলা সাহিত্য' নামে একটি প্রবন্ধের গ্রন্থ—যে গ্রন্থটিতে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মনীষীগণের চরিত্রের সুপাঠ্য বিবরণ।

চরিত্র চিত্রণ করতে গিয়ে অধ্যাপক বিশী প্রথমেই একটু চিন্তায় পড়েছিলেন—গুরু চালে লিখবেন না লঘু চালে? ভাববার কারণটি আমরা জানি। তিনি যে বাংলা সাহিত্যে 'প্র-না-বি' ছদ্মনামে লঘুকলমী রস রচনায় কত পটু তা আমরা জানি। —কিন্তু তিনি লঘুভাবে লেখেননি। যথার্থই তাঁর এই বিবেচনা। কারণ উনিশ শতকের শালপ্রাংশু মহাভুজ প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষদের নিয়ে আর যাই হোক লঘু পরিহাস একেবারেই চলে না। তাই গ্রন্থটি লিখবার আগে প্রমথ বিশী উনিশ শতকের সামাজিক ও সংস্কৃতির ইতিহাস সবিশেষ মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেছিলেন। প্রতিটি ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর খুঁটিনাটি বর্ণনা সে সাক্ষ্য দেয়।

সংস্কৃতির জগতে কত রকম পারদর্শিতার কথা শোনা যায়। কোন এক কৃতী বঙ্গসন্তান নাকি একটি চালের দানায় সম্পূর্ণ রামায়ণ লিখে রেখে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। 'বাংলার মনীষা ও বাংলা সাহিত্য'—প্রথম খণ্ড, 'রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ'—গ্রন্থটিতে স্বর্গীয় প্রমথনাথ বিশী সেই কৃতিত্বই দেখিয়ে গেছেন। রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ার থেকে শুরু করে উনিশ শতকের উনচল্লিশটি ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে প্রায় সম্পূর্ণ চিত্র উদ্ঘাটিত করেছেন একশ এগার পাতার ক্ষুদ্র পরিসরে। একশত বছরের কর্মযজ্ঞ ও সেই কর্মকাণ্ডের উত্তাল জলধিতরঙ্গ যেন শ্রীবিশীর যাদুদণ্ডের স্পর্শে সংহত হয়ে আছে এই গ্রন্থটির মধ্যে। রাজা রামমোহন রায় নব্য ভারতের ব্রাহ্ম মুহূর্তের বিরাট পুরুষ। এই মানুষটির আধুনিকতার দিকটি তুলে ধরেছেন। "রেনেসাঁসের ইন্দ্রধনুর তোরণের তল দিয়া তাঁহাকে দেখিতে হইবে।" ডেভিড হেয়ার এ-দেশে ইংরেজি শিক্ষার গুরুমহাশয়। হেয়ার সাহেব ছিলেন সহৃদয় ও সাধুব্যক্তি। তিনি মানুষকে বিশ্বাস করতেন, মানুষও তাঁকে বিশ্বাস করত। শ্রীবিশীর চিন্তার মৌলিকতা সর্বত্র। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তাঁর সমীক্ষা—'বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে ও স্ত্রীশিক্ষা প্রসারণের মূলে শুধু তাঁর কোমল হৃদয়াবেগ নয়—তার সঙ্গে ছিল প্রবল Logic — "বিদ্যাসাগরের হাতে একখানি মাত্র Logic এর তরবারি ছিল, কিন্তু তাহার বিচিত্র কার্যকলাপ দেখিলে মনে হইত, তাঁহার হাতে একশত তরবারি আবর্তিত হইতেছে।"

চরিত্রগুলির গুরুগম্ভীর আলোচনা করবেন বলেই প্রমথ বিশী স্থির করেছিলেন— কিন্তু নিজের প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেননি। প্রবন্ধগুলিতে বিষয় থেকেও বিষয়ের ভারহীনতা লক্ষ করা যায়। 'প্র-না-বি'র স্নিগ্ধ কৌতুকময়তা ও মৃদু হাস্য প্রায় সর্বত্রই প্রচ্ছন্ন আছে। 'ডরো মৎ হাম হেয়ার সাহেব হ্যায়'— 'সেই সব মেলোড্রামা— মেখলার গুরু হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও, কিংবা রাজনারায়ণ বসু সম্পর্কে মন্তব্য— 'সেই মাটির স্বর্গ এক সময়ে সমস্ত বাঙালী জাতিটার রাজসিংহাসন ছিল। আজ নাস্তিকের সূক্ষ্ম হাসির তীক্ষ্ণ শূলের উপরে আমরা বিরাজ করিতেছি। তাই এত বেশি করিয়া রাজনারায়ণ বসুকে মনে পড়িতেছে।" —ইত্যাদি অংশগুলিতে লেখকের অন্তরৈশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

কবির মন নিয়ে রচনা করেছেন 'পরমহংসদেব' প্রবন্ধটি। আলোচনার ভঙ্গীটিও মনোজ্ঞ। পরমহংসদেবের দুটি ছবির (একটি উপবিষ্ট আর একটি দণ্ডায়মান) বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে লোকোত্তর পুরুষটিকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। এই ছবি দুখানি যেন রামকৃষ্ণ জীবন-দর্শনের প্রতীক। যেন ধনুকের দুই কোটি—এক কোটিতে ভূমি—অপর কোটিতে ভূমা।

এই তো গেল গ্রন্থের মূল বিষয়ের পরিচয়। এই বইটিতে আমরা আসলের সঙ্গে ফাউ পেয়েছি। লেখকের একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা—এতে উনিশ শতকের মানসিকতা ও যুগধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই লেখকের মনে হয়েছে

আত্মোপলব্ধি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ভারতবোধের উপর নির্ভর করে বিগত শতাব্দীর চৈতন্য জাগ্রত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন কিংবা রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ সকলের মধ্যেই ছিল ব্যক্তিত্ব প্রবল। বিগত শতাব্দীর মানসিকতায় Reason-এর ছিল প্রবল প্রতাপ। এ ছাড়া এই যুগে ভারত উপলব্ধি ও ভারতবোধ সকল মনীষীদের মধ্যে প্রবলাকারে দেখা গেছে। প্রাদেশিকতার ভাবনাটি এসেছে অনেক পরে। ১৯৩৫ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের পর। ভূদেব, মাইকেল, কেশবচন্দ্র সেন, বিবেকানন্দ পরস্পরের কত প্রভেদ। কিন্তু একটি স্থানে সকলেই এক—সকলেই ভারত-নাবিক। রমেশচন্দ্র দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—এঁরা সকলেই ভারত-চৈতন্যের দ্বারা—এক ভাবসূত্রে গাঁথা ছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘকালের অধ্যাপক, রবীন্দ্রনাথ যাঁকে ভাষাতাত্ত্বিক রূপে বরণ করেছিলেন, যিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলা বানান সংস্কারের কাজ করবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন সেই গবেষক অধ্যাপকের সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থখানি "বঙ্গ ভাষা ও বঙ্গ সংস্কৃতি" মৌলিকতার দাবী করে। ডঃ বিজন ভট্টাচার্য দীর্ঘকাল ধরে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। কিছু সংগ্রহিত হয়েছে কিছু বা অগ্রথিত থেকে গেছে। এই রকম ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মূল্যবান কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন এই গ্রন্থখানি। একদা যা পড়ে ভাল লেগেছিল, যা দৈনিকীর পাতা কেটে সংরক্ষণ করে রাখবার ইচ্ছে হয়েছিল—কিন্তু রাখা হয়নি—সেই সব রচনাগুলি যখন কেউ একপাত্রে পরিবেশন করেন তখন পাঠককুল আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় আহ্লাদিত হয়ে পড়েন। এই সুকৃতির কৃতিত্বটুকু ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ পাবলিশার্সেরও সমভাবে প্রাপ্য।

এ-কথা ঠিক আজকের দিনের পাঠকদের রুচি বদল হয়েছে। গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রবন্ধকেও ভালবাসতে শিখছে। তাই কোন প্রবন্ধ-গ্রন্থ যদি আবার বিষয়-বৈচিত্র্যে ভরপুর হয় তবে তার আকর্ষণ পাঠকদের কাছে আরও বৃদ্ধি পায়। এই বইটিতে ষোলটি স্বল্প-দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে। বাংলা বানান পদ্ধতি, হিন্দির সঙ্গে বাংলা বানানের পার্থক্য, বানান-বিধির গোড়ার কথা, শিক্ষা ব্যবস্থায় মাতৃভাষার প্রবর্তনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা—ইত্যাদি অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রবন্ধ যেমন আছে—তেমনি আছে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ের তরল রচনা। সকড়ি, এঁঠো, শ্যাম্পু, বঙ্গীয় মিষ্টান্ন সংস্কৃতির একদিক, মহাপ্রভুর ভোজন বিলাস ইত্যাদি রম্য প্রবন্ধ গ্রন্থটিকে সরস করে তুলেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানান পদ্ধতিই আমরা অনুসরণ করছি। রবীন্দ্রনাথই বিশ্ববিদ্যালয়কে বানান সংস্কারের কাজে হাত দিতে বলেছিলেন এবং নিজেও এই কাজে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন। বানান ও ব্যাকরণের খটমটে আলোচনা বাদ দিয়ে চলুন 'বঙ্গীয় মিষ্টান্ন সংস্কৃতির সন্ধানে'। 'সোহন হালুয়া' খেয়েছেন—সাধারণ হালুয়ার চেয়ে আরও বেশি ঘি-চিনির কড়া পাক। মোহনভোগ ও হালুয়া একই খাদ্যবস্তু। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অমৃতসর গুরুদ্বারে 'কড়াভোগ' বিতরণের কথা জানান। 'জিলিপি' একটি নিখিল ভারতীয় মিষ্টান্ন। জিলিপি-র অভিজাত সংস্করণ অমৃতি। খাবারটির পাঁচশ বছরের পুরাতন ঐতিহ্য আছে। মহাপ্রভু যখন নীলাচলে ছিলেন তখন তাঁকে অমৃতমণ্ডা, অমৃতগুটিকা, সরামৃত ভোগ দেওয়া হত। মিহিদানা, বোঁদে, বালুশাহী, ক্ষীরের চপ, মালপোয়া, স্পঞ্জ রসগোল্লা, রাজভোগ, ক্ষীরমোহন—আরও কত কি মিষ্টির নাম—সবই বাংলার কৃষ্টি।

মহাপ্রভুর পাঁচশত বছরের জন্মোৎসব যখন সর্বত্র পালিত হচ্ছে—ঠিক এই মুহূর্তে জানতে মজা লাগে ঐ প্রেমিক-সাধক মানুষটির প্রিয় খাদ্যবস্তু কি কি ছিল। বাস্তুক শাক, পটল, কুষ্মাণ্ড বড়ি, মানকচু, নানা ফলমূল, নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্তাকু, ফুলবড়ি ভাজা, নারিকেল শস্য, মোচার ঘণ্ট, ছানা, রসালা মথিত দধি সন্দেশ, পরমান্ন, ঘনাবর্ত দুগ্ধ, চাঁপাকলা, ক্ষীরপুলি এবং অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য লাফরা (লাবড়া ?) তাঁর খাদ্য তালিকার অন্তর্গত। 'সার্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে।/ প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে ॥'/ শালিধানের ভাতও মহাপ্রভু পছন্দ করতেন। শালিধানের অন্নস্তূপে গব্যঘৃত দিয়ে সিক্ত

করা হোত। পাতার চারদিক দিয়ে বয়ে যেত গব্যঘৃতের ধারা। পরমান্নকে সুস্বাদু করার জন্যও তাতে ঘি ঢালা হত। হায়রে! কবে কেটে গেছে মহাপ্রভুর কাল। রস ও রসনার সঙ্গমস্থল এই প্রবন্ধগুলি।
'বঙ্গ ভাষা ও বঙ্গ সংস্কৃতি' গ্রন্থটিতে বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতের সম্পূর্ণ নতুন স্বাদ ও নতুন দিকের সন্ধান দিয়েছেন। নির্মলেন্দু মণ্ডলকৃত নয়নশোভন প্রচ্ছদটি বইটির নান্দনিক মূল্য বৃদ্ধি করেছে। প্রবন্ধের বই হলেও গ্রন্থটি প্রিয়জনকে প্রীতি উপহার দেবার যথেষ্ট উপযুক্ত।

সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য ও জীবন

প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

সতীনাথ ভাদুড়ী : আধুনিক বাংলা উপন্যাসের একটি অধ্যায়/ মৈত্রেয়ী ঘোষ/ মডার্ন কলাম/ কল-৯/৩৫·০০

বাংলাসাহিত্যে লেখক সতীনাথ ভাদুড়ী স্বয়ংস্বতন্ত্র উজ্জ্বল অধ্যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লেখকের সক্রিয় লেখনীচালনাকালে বা তাঁর মরণোত্তর পর্বের প্রথম পর্যায়েও প্রথম শ্রেণীর লেখক হয়েও প্রাপ্য মর্যাদা বা শিরোপা তিনি বিশেষ পাননি। ১৯৪৫ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত লেখকের সাহিত্যরচনার কালসীমা। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে ঐ কালপর্যায়ের কথাসাহিত্যেও সূক্ষ্ম বিচারে সতীনাথের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীশঙ্খ ঘোষ এবং নির্মাল্য আচার্যের সম্পাদনায় চারখণ্ডে সমাপ্ত 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হবার পর লেখকের জনসমাদর স্বীকৃতি পেয়েছে।
বাংলা সাহিত্যে সতীনাথ-পরিচিতির প্রয়াসে তাঁদের দু'জনের প্রয়াসকে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি দিতে হয়। গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে সাধারণ পাঠক-পাঠিকা যেমন সতীনাথ-সচেতন হয়ে ওঠেন, তেমনি গবেষক-গবেষিকাদের বিশ্লেষণী কুশলী লেখনীও সতীনাথ ভাদুড়ীর যথার্থ মূল্যায়নে নিরত হয়ে ওঠে। আলোচ্য গ্রন্থখানি গবেষণালব্ধ একটি সর্বাঙ্গীন মূল্যায়ন। সতীনাথের সাহিত্য প্রতিভার বিশ্লেষণ করে বর্তমানে একাধিক গবেষণাগ্রন্থ ও গবেষণা-কল্প পুস্তকাদি রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এগুলির মধ্যে ডঃ মৈত্রেয়ী ঘোষের গ্রন্থখানিতে সতীনাথের প্রতিভা ব্যাখ্যার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ, রসময় পর্যালোচনা শক্তি, তথ্য আহরণের ও প্রয়োগের বাঞ্ছিত পূর্ণতা বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে বড়রকমের অভাব পূরণ করেছে।
১৯৪৫ থেকে ১৯৬৫ কালসীমায় রচিত সতীনাথের সমগ্র উপন্যাসের রচনাকালের সুষ্ঠু উল্লেখের সঙ্গে লেখিকা যে নতুনত্বের পরিচয় সংযোজিত করেছেন—তা হ'ল এই কুড়ি বছরের ঈষৎ জীর্ণ ন'খানি ডাইরীতে উল্লেখিত লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের আনন্দ-বেদনা ও সংশয়ের পরিচয়বাহী উদ্ধৃত মূল্যবান অংশ। উপন্যাসগুলি রচনার প্রাক্-প্রস্তুতির এই চিন্তাপর্ব তুলে ধরে ডঃ মৈত্রেয়ী ঘোষ সমগ্র উপন্যাসগুলির চরিত্র নির্ণয়ে অসাধারণ বাস্তবমুখিনতা ও ইতিহাস-সচেতন মনস্তাত্ত্বিক রীতির প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন। সতীনাথের উপন্যাস-রীতির বিশ্লেষণেও প্রাচ্য প্রভাবের সঙ্গে পাশ্চাত্য ফরাসী

সাহিত্যের প্রভাবেরও যথোচিত উল্লেখ করেছেন। মানবমনের অন্তর্লোকের রহস্যপূর্ণ ব্যাখ্যায় সতীনাথ কি পরিমাণে তৎপর সেই রহস্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখিকা বিশ্লেষণের সঙ্গে ভাবানুষঙ্গের অনুপুঙ্খ পরিচয়ও তুলে ধরেছেন। লেখক খণ্ড থেকে কিভাবে ক্লান্তিবিহীন উৎসাহে সমগ্রে পৌঁছেছেন—সেই মানসিক প্রয়াসকে ডঃ শ্রীমতী ঘোষ একটি স্বতন্ত্র 'পদ্ধতি' রূপে ব্যাখ্যা করে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি প্রুস্তের পদ্ধতির সঙ্গে সতীনাথের পদ্ধতিতে মিলিয়েছেন—জেম্‌স জয়েস টমাস মান, মার্সেল, প্রুস্ত, ফ্রানৎস কাফ্‌কা, আলব্যের কাম্যু, জাঁ পল সার্তর, ফ্রাঁসোআ মোরিআক, হেমিংওয়ে, লাক্‌সনেস, পাস্তেরনাক প্রমুখের পাশ্চাত্য উপন্যাস রীতির সঙ্গে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে কিভাবে রূপদক্ষ ঔপন্যাসিক হিসেবে মিলিয়েছেন—তা-ও ব্যাখ্যা করেছেন। এঁদের জীবনজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে সতীনাথ বিশ্বমানবের আত্মসন্ধানে রত এবং তার মধ্য দিয়েই লেখকের কিভাবে আত্মাবিষ্কার ঘটেছে—লেখিকা তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন। সতীনাথ ও সমকালীন ঔপন্যাসিকদের তুলনামূলক আলোচনা—বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের পটভূমি বর্ণনায় যথাযথ সালে সংঘটিত বিবরণের সঙ্গে বিভিন্ন লেখকের প্রকাশসাল সহ উপন্যাসের উল্লেখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। সতীনাথের বিচিত্র ও বহুমুখী সাহিত্যকর্মের উপর যথাযথ আলোকপাত করতে চেয়ে লেখিকা গ্রন্থের সূচনাপর্বেই লেখকের ব্যক্তিজীবন ও ভাদুড়ী পরিবারের বিস্তৃত তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেছেন। ব্যক্তি জীবনকেও তিনি সতীনাথের ছাত্রজীবন, সতীনাথের আইনব্যবসায়, সতীনাথের রাজনৈতিক জীবন, সতীনাথের কারাজীবন, রাজনৈতিক জীবন ছেড়ে সাহিত্যচর্চায় নিবেশিত জীবন, ব্যক্তিমানুষ হিসেবে সতীনাথের প্রতিভাজাগরণের নানা পর্যায় ও পারিপার্শ্বিকের পরিচয় বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছেন, সাহিত্যে এই প্রভাবের প্রতিফলনের দিকটিও সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। সতীনাথের রাজনৈতিক জীবনের পরিচায়নে লেখিকা বিস্তৃতভাবে বিহারের আগস্ট আন্দোলনের সঙ্গে সতীনাথ কতোটা জড়িত ছিলেন—'বিহারের স্বাধীনতা আন্দোলন' নামক তিন খণ্ডে রচিত গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে সতীনাথের সক্রিয় ভূমিকার বিশ্লেষণ করেছেন। 'পরিশিষ্টে' ইংরেজিতে রচিত মূল গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করেছেন। জাগরী উপন্যাসে আগস্ট আন্দোলনের বিবরণকে সতীনাথেরই বাস্তবজীবনের ভগ্নাংশ করে তোলার ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল রচনায় এই প্রয়াস লেখিকার বস্তুমুখীন বিশ্লেষণের শ্রমকে সার্থক করে তুলেছে। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর ক্ষেত্রেও পূর্ণিয়ার পরিচিত ব্যক্তি ও পরিবেশ রচনার একান্ত বাস্তবদৃষ্টিকোণকেও লেখিকা ডঃ ঘোষ সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। নিছক বিবরণধর্মিতা থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্লেষণকেই লেখিকা প্রাধান্য দিয়েছেন। রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সমকালীন চিন্তার জগতে সতীনাথ যে মননশীল স্রষ্টা—'সতীনাথের উপন্যাসচিন্তা' অধ্যায়ে লেখিকা সেই বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণের পরিচয় দিয়েছেন। 'জাগরী' উপন্যাসের উপভোগ্যতার বিশ্লেষণে, 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের শিল্পরসগত চলিষ্ণুতার উল্লেখে ও বাস্তবতার বর্ণনায় লেখিকা গ্রামীণ ভারতের হৃৎস্পন্দনকে তুলে ধরে লেখকের শিল্পগত সততার দিকটি ব্যাখ্যা করেছেন। পর্ববিভাগ করে সতীনাথের ছোটগল্প বিচারের ক্ষেত্রেও পারম্পর্যযুক্ত মনস্তাত্ত্বিক পর্যালোচনা রীতির মধ্য দিয়ে নরনারীর মনোলোকে লেখকের পরিভ্রমণ পর্যবেক্ষণ এবং সমীক্ষার নিজস্ব দিকটির উপরেও আলোকপাত করা হয়েছে। মূল গল্পের পুঙ্খানুপুঙ্খ উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণ করে লেখিকা- পাঠক-পাঠিকার সামগ্রিক ধারণা ও সজাগ রসোদ্বোধনে সহায়তা করেছেন। গল্প রচনার সাবলীল নাটকীয় ভঙ্গী, মনোবিকলন, মনোবিকার, মনোগহনের জটিল চেতনা-প্রবাহেরও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। সতীনাথের ভ্রমণ কাহিনীর বর্ণনাতেও লেখিকা সতীনাথের অপূর্ব আশ্চর্য সমীক্ষাশক্তির সঙ্গে দরদের সংমিশ্রণের দিকটি ব্যাখ্যা করেছেন। সতীনাথের আঞ্চলিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলেও ভাষারীতির উপর কিছুটা আলোকপাত অভিপ্রেত ছিল। তথাপি

আত্মমুখী শিল্পী ও বহির্মুখী কর্মী হিসেবে সতীনাথের পরিচায়নে এই গ্রন্থখানি নান্দনিক সিদ্ধিতে সার্থক।

গল্পের দ্রুত লয়

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী/ (সং) গীতা দত্ত ও সুখময় মুখোপাধ্যায়/ এশিয়া পাবলিশিং কোং/ কল-৭/৩০·০০

টি·ভি·-কমিক্স ও ইলেকট্রনিক খেলার সরঞ্জামের মধ্যে আজকের যে কিশোর পাঠকের অবস্থান, হেমেন্দ্রকুমার তাঁদেরও অনেকাংশে জয় করে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

রচনাবলীর ৭ম খণ্ডটির প্রকাশ সেই সাক্ষ্য বহন করছে, সঙ্গে সঙ্গে শিশু ও কিশোর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর সহজাতবোধ যে কত গভীর ছিল সে কথাও আরেকবার প্রমাণিত হল। ডিটেকটিভ গল্পের ক্ষেত্রে তিনি হোমসের ডিটেকটিভ লজিক ব্যবহারই সঙ্গতবোধ করেছেন, যে কারণে রহস্যটি কতিপয় সূত্রে প্রায় শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা মূর্তি নিতে থাকে। এতে করে কিশোর পাঠকের অনুসন্ধানী মন শখের গোয়েন্দা জয়ন্তর সঙ্গে নিজের অবস্থান বদলে নিতে পারে। পাঠক মনে-মনে একজন সক্রিয় গোয়েন্দা হয়ে ওঠে। 'পাঠকের' আগে 'অলস' শব্দটি তখন বাতিল হয়ে যায়।

আবার ওই একই পাঠক একটু ভিন্ন নিসর্গ, দুর্গম কোন অভিযান, অশুভের সঙ্গে মরণপণ লড়াইয়ে মেতে ওঠা ও মঙ্গলপ্রদ এক অবসান পেতে চায় সেই লড়াই, বিজয়ী হওয়ার সুস্থ ও স্বাভাবিক এই প্রবণতার প্রশ্রয় আছে হেমেন্দ্রকুমারের অ্যাডভেঞ্চার গল্পে।

রচনাবলীর ৭ম খণ্ডের তিন-চতুর্থাংশে দখল করেছে এই দু জাতের লেখা, যা রুদ্ধশ্বাসে পড়ার। আবার যখের ধনের পটভূমি আফ্রিকা হওয়ায় বাঙালি পাঠকের পক্ষে অনিবার্যত চাঁদের পাহাড় মনে পড়ে যাবে। বিভূতিভূষণের স্থৈর্য, সংযম, ও আশ্চর্য শিক্ষণ পদ্ধতির সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চার রসসঞ্চার হেমেন্দ্রকুমারের বৈশিষ্ট্য নয় ঠিকই। কিন্তু এ দুটি কিশোর-উপন্যাসকে একই পরিধির মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব। আর তা করলে দুটি উপন্যাসই যেন আরও উজ্জ্বলতা পেতে পারে।

হেমেন্দ্রকুমার দ্রুতগতি, বিপদ এখানে অনেক বেশি মূর্ত চেহারা নিয়ে আসে আর বিজয় অর্জন প্রায় ভাগ্যের নিবন্ধ।

'আষাঢ়ে গল্প' কথাটা বাংলায় বড্ড বেশি নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আষাঢ়ে গল্পের সম্ভাবনা যাঁর হাতে প্রায় মুক্তি অর্জন করে, নিঃসন্দেহে তিনি হেমেন্দ্রকুমার। ভাষার প্রশ্নেও 'শিক্ষিত' জনসুলভ তথাকথিত সাহিত্য ভাষাকে হেমেন্দ্রকুমার অনেক কম গুরুত্ব দিয়েছেন। তুলনায় প্রতিদিনের ব্যবহার্য শব্দভাণ্ডারই ছিল তাঁর মুখ্য আশ্রয়। অধিকাংশ বাক্যই কোন-না-কোন কর্মকাণ্ডকে ভাষায় চিত্রিত করছে: 'দেখতে দেখতে শত্রুরা যে যেদিকে পারলে, প্রাণ নিয়ে পলায়ন করলে; ঘটনাস্থলে রইল খালি বিমল আর জনাকয়েক হত ও আহত জুলু আর কাফ্রি-জাতের লোক। কুমার ও রামহরি একছুটে নিচে নেমে গিয়ে বিমলের গলার বাঁধন খুলে দিলে।'

গল্প বলার জন্য তিনি উদগ্রীব, বাক্য পরম্পরায় গল্পটি সাজিয়ে তোলার সঙ্গে এর বিরোধ আছে। গল্পটি চলন্ত ছবির মত তাঁর মস্তিষ্কে যে দ্রুত লয়ে এসে যাচ্ছে ভাষা তার সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে পারছে না। ফলে কার্যকরী পন্থা হিসেবে তিনি স্টেটমেন্ট ফর্মটাই পছন্দ করছেন। এবং তাকে এক ঈর্ষণীয় জায়গায় নিয়ে যেতে পারেন অনায়াসে।

বিচিত্র কর্মপ্রবাহের সাক্ষ্য

গৌতম নিয়োগী

বিবেকানন্দের সাধনা/ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ/ পুথিপত্র/ কল-৯/১৫·০০

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দু বছর পার না হতেই সন্ন্যাসী এবং প্রথম স্তরের বুদ্ধিজীবী স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু হয়েছিল, মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে। তাঁর স্বল্পায়ু জীবনই কিন্তু জাতীয় জীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্রের বিচিত্র এবং বিশাল কর্মৈষণার জন্য বিশেষ গতির সঞ্চার করেছিল। যে মূল প্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নরেন্দ্রনাথ

দত্ত রূপান্তরিত হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দে এবং ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন কর্মযজ্ঞে তা একদিকে আধ্যাত্মিক, অন্যদিকে সামাজিক। অর্থাৎ ঈশ্বর বিশ্বাসের সঙ্গে সমাজের লোকহিত সাধনার সমন্বয়; একটি বাদ দিয়ে অপরটির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য তাঁর অন্বিষ্ট নয়। অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ তাঁর সুলিখিত গ্রন্থে বিবেকানন্দের সেই সাধনার পরিচয় দিয়েছেন পর্যাপ্ত তথ্য এবং স্বচ্ছ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্লেষণের সাহায্যে। যেহেতু এটি নিছক জীবনীগ্রন্থ নয়, বা ভক্তের স্তাবকতা নয়, তাই লেখকের মুক্ত মন এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসা করবার মতো, কেননা কখনোই অন্ধ ভক্তি, আবেগপ্রবণতা কিংবা ইচ্ছাকৃত তথ্যবিকৃতি তাঁর সুন্দর বিশ্লেষণে বাধা সৃষ্টি করেনি। সাম্প্রতিক বিবেকানন্দচর্চার ক্ষেত্রে বহু তথাকথিত 'ভক্ত'-পণ্ডিত যে-দোষ কাটিয়ে উঠতে পারেননি এবং ফলে মোটা মোটা পুঁথি দ্বিতীয় সারির গবেষণাকর্মের বেশি স্বীকৃতি ঐতিহাসিকদের কাছে পায়নি।
ইহলৌকিক সমস্যার সঙ্গে পারলৌকিক মোক্ষচিন্তার যোগসূত্র স্থাপন করে মানবসেবা এবং লোকহিতই ধর্মের বিশেষ দিক হিসেবে চিহ্নিত করা আধুনিক সত্যোপলব্ধির শ্রেষ্ঠ ফসল। বাংলাদেশে এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন মনীষী রামমোহন রায় প্রথম এবং শতাব্দীর শেষেই সেই ধারারই ভিন্ন পথে হলেও পরিণত উত্তরসূরী স্বামী বিবেকানন্দ। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ যখন লেখেন "স্বামী বিবেকানন্দের বহুমুখী প্রতিভার মৌলিকতা স্বীকার করেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, রামমোহনের পরবর্তীকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলেই রামমোহনের ধর্ম ও

সমাজচিন্তার স্বাভাবিক উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন তিনি" (পৃঃ ৯১) তখন তাঁর ইতিহাসনিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা হয়। বস্তুতপক্ষে নৈনিতাল পাহাড়ে অবস্থানকালে স্বামীজী তাঁর শিষ্যা নিবেদিতাকে স্পষ্টই বলেছিলেন, অন্তত তিনটি বিষয়ে রামমোহন রায়ের অনুসরণে তিনি কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম: রামমোহনের বেদান্ত গ্রহণ ও প্রচার, দ্বিতীয়: রামমোহনের স্বদেশপ্রীতি ও তার প্রচার এবং তৃতীয়: রামমোহনের মানবপ্রীতি—যা হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতি সমদৃষ্টির মাধ্যমে বিকাশ লাভ করেছিল (Sister Nibedita, Notes on Some Wanderings with Swami Vivekananda, p. 19)। এই সমস্ত কর্মসূচীর মধ্যে রাজা রামমোহনের যে মননশীলতা, হৃদয়বত্তা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় ফুটে উঠেছিল তা বিচারশীল বিবেকানন্দের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

দ্বিজেন্দ্রলাল শুরু করেছেন একেবারে গোড়া থেকে, প্রথম অধ্যায়ে 'বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পটভূমিকা' শীর্ষক আলোচনার মধ্য দিয়ে এবং তারপর একে একে আরো এক ডজন অধ্যায় যুক্ত করেছেন বিবেকানন্দ-মনীষীর নানা দিকে সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে, প্রাসঙ্গিকভাবে এনেছেন বাঙালি তিন মনীষী রাজা রামমোহন, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিশ্বমানব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। এর আগে বিবেকানন্দ-জীবনের খণ্ড সত্য অনেক বইতে পেয়েছি; কিছু বইতে উচ্চাঙ্গের জীবনীর উপকরণও পেয়েছি, পড়েছি বহু স্মৃতিকথা, তবু বর্তমান গ্রন্থখানি পাঠ করে বিবেকানন্দকে যেন নতুন করে পেলাম। এই গ্রন্থে অতি সংক্ষিপ্ত একটি 'ভূমিকা' লিখে দিয়েছিলেন প্রয়াত ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং স্বীকার করেছিলেন গ্রন্থখানি 'নানাবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ'। আরো একটি 'পরিচিতি' লিখে দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। তাঁর মতে: "মনে করি সার্থক হয়েছে তাঁর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা গ্রন্থ আলোচনার ক্ষেত্রকে তথ্যসমৃদ্ধ ও বিচিত্র তত্ত্বসৌন্দর্যে সুষমায়িত করার জন্য।" উভয়ের মতের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বলা যায়, লেখক বিবেকানন্দের সাধনার চরম অভিপ্রায় ও বাণী সঠিকভাবে ধরতে পেরেছেন।
বিবেকানন্দ বিষয়ক একখানি গ্রন্থপঞ্জী এবং একটি নির্ঘণ্ট থাকলে গ্রন্থটি আরো সুন্দর হত। প্রেম

বড়দিনের ভাবনা

শ্রীমতী

আকাশ থেকে খসে পড়েছিল নীল জোতিষ্ক। স্বর্গলোক থেকে ধরাতলে এসেছিলেন ঈশ্বরদূত যীশু খ্রীষ্ট। পৃথিবীর মানুষকে অমৃতের বাণী শোনাতে জন্ম হয়েছিল এই মহামানবের। সেই আগমনবার্তাকেই আনন্দমুখর করা হয় বড়দিনে। ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের মানব-ধর্ম। কেবলমাত্র বাঙালিই বোধ হয় ধর্মের ব্যাপারে, বিশেষত কোন উৎসবের ব্যাপারে উৎসাহিত হয় সবচেয়ে বেশি। বড়দিনের সঙ্গে সাহেবদের ছোঁয়া অবশ্য রয়েছে। স্বাধীনতার আগে থেকেই বড়দিন এখানে একটা যেন সর্বজনীন উৎসব। সাহেবেরা চলে গেলেও সাহেবিয়ানার কদর আজ আমাদের ঘরে ঘরে। ওদের উৎসবটা আমরা প্রায় নিজেদেরই করে নিলেও ওদের নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা, পরিশ্রম করবার ক্ষমতা, কর্মনিষ্ঠা, আত্মপ্রত্যয় এসব কোন ব্যাপারেই আমাদের কিন্তু মাথা ব্যথা নেই। যে কোন একটা হুজুগে মেতে ওঠাই আমাদের স্বভাব। আর তাই বাঙালির উৎসব অভিধানে ধর্ম নির্বিশেষে আনন্দই প্রধান আকর্ষণ। বছরের শেষ সময়। চারদিকে বেশ ঠাণ্ডার আমেজ। বাড়িতে বাচ্চাদের বার্ষিক পরীক্ষাও শেষ। অতএব বেশ একটা হালকা ফুরফুরে মেজাজে দুর্গাপুজোর ধুতি পরা কর্তা লাল পেড়ে টাঙ্গাইল পরা গিন্নী সাহেবি কায়দায় প্যান্ট কোট আর সিন্থেটিক শাড়ি জড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছেন নিউমার্কেটে, পার্ক স্ট্রীট অথবা খ্রীষ্টান পাড়ায় বড়দিনের সাজসজ্জা দেখবার জন্য। আজ যেন চিনে রেস্তোঁরা বা ঐ ধরনের কোন নামিদামি রেস্তোঁরায় খাবারই দিন। অনভ্যস্ত হাতে গিন্নী কাঁটা দিয়ে কেটে কেটে ফিস ফ্রাই অথবা চাইনিজ নুডলস খাবেন, কর্তার বুক গর্বে ফুলে উঠবে। শ্বশুর বাড়িতে এসে অবধি বউ-এর যেন ক্লান্তি নেই। সারা বছরই একই কাজ, একভাবে দিনগত পাপক্ষয়। দুর্গাপুজোতেও বিরাম নেই। বছরকার এই সময়টায় একটু যেন শান্তি। বড়দিন উপলক্ষে তবু চিড়িয়াখানা বা ব্যান্ডেল চার্চ নিদেন হর্টিকালচার বা অ্যাসেম্বলি হাউসে ফ্লাওয়ার শো বেশ লাগে। বড়দিনের আনন্দ চলে বছর শেষের বেশ কয়েকটা দিন। ইংরেজ চলে গেলেও আর যা আমরা আঁকড়ে ধরে আছি তা হল ওদের ভাষা। কারণ এখনও আমাদের দেশের বা সারা বিশ্বের একমাত্র সাধারণ ভাষা বোধহয় ইংরিজিই। তা ছাড়া উচ্চশিক্ষা বা পরীক্ষা (চাকরির জন্য) যাই দাও না কেন ইংরাজিই তার একমাত্র মিডিয়াম। কিন্তু আমরা যেন ইংরাজি শিক্ষা, ইংরাজিতে কথা বলা, [প্রয়োজন না হলেও] ইংরাজি গান বাজনা, সাহেবি ঢঙে খাওয়া, চলা-বলা-পড়া এ সব কিছুতেই নিজেদের বেশ গর্বান্বিত মনে করি। আমার ইংরাজি মিডিয়ামে পড়া ছেলে টমকে যদি ঠাকুমা খোকন বলে ডেকে ফেলেন মোটেই শ্রুতিমধুর লাগবে না আমার। অথবা বাঙালি সাহেব টম যদি পাশের ফ্ল্যাটের 'নরেন্দ্রনাথ' স্কুলে পড়া পঞ্চানন অথবা কেদারনাথের সঙ্গে খেলা করে বা গল্প করে আমার মাথা খারাপ হবার যো হয়। আমরা সবাই যেন সবাইকে সব সময় প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছি। কে কতটা এগিয়ে যেতে পারে—প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়লে চলবে না। বছরের শুরুতে ইংরাজি মিডিয়াম স্কুলগুলোতে মাথা গলাবার জায়গা থাকে না। পাড়ার সদ্য গজিয়ে ওঠা নর্থ পয়েন্ট, ইষ্ট পয়েন্ট আর ড্রিম ফ্লাওয়ারেও উপচে পড়ছে ভীড়। ইংরাজিকে ভালবেসে, ইংরেজদের ভালবেসে সবসময় আমরা বোধহয় সাহেবিয়ানা করি না। আমাদের মধ্যে কেমন যেন একটা মেকি সাহেবিয়ানার প্রবণতাটাই বেশি। এ যেন পাড়ার আর পাঁচজনকে দেখাবার জন্য সাহেব সাজা। আমাদের

বাচ্চাদের ভেদাভেদ জ্ঞানটা আমরাই শিখিয়ে দিই। এখন হয়েছে বাবা মা'র বদলে ড্যাডি মাম্মির যুগ। মা, পিসীমার দেওয়া নাম ঝুম্পা ভাল লাগে না জিনস্ পরিহিতা কনভেন্টের মেয়ের। তবু অগতির গতি ঝুম্পাকেই করে নেওয়া হয় ঝুম্পাপ্পা, তবু একটু নতুনত্ব। নইলে প্রেস্টিজ থাকে না। আমাদের মধ্যবিত্ত বাড়ির বাচ্চারা তাই পোষ-পার্বনে পুলি পিঠেও খায়, বড়দিনে কেক, প্যাসট্রিও খায়। দুর্গাপুজোর বেলুন তায় আবার বড়দিনে খ্রীষ্টমাস ট্রি দিয়ে ঘর সাজাবার বায়না ধরে। এ যেন এক দোদুলামান অবস্থা। কোনপথে যাবে, কোন নিশানায় পথ চলবে এ সব কিছুই বোঝে না এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা। চলতে হবে চলছি, পড়তে হবে পড়ছি, তারপর দেখা যাবে! এই হট্টমালার দেশে বড়দিনের আনন্দমুখর দিনে পার্ক স্ট্রীটও যেমন আলোর মালায় বড় বেরঙের কেক আর ট্রি-তে সজ্জিত হয়, তেমনি মধ্যবিত্ত ছা-পোষা পরিবারের ছোট্ট ৭এ/৫বি পল্লীর 'কালাচাঁদের কেকের দোকানেও' ভীড় লেগে যায়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাইয়ের এই উৎসব দিনগুলোকে তাই স্বাগত জানাতেই হয়।

নির্বাসিতের পুনর্বাসন

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

গ্রোসে-সাক্সেন নামের সমীপপল্লীতে

এ এক অজব আলোচনাপ্রবণ দেশ। সমস্ত বিষয়কেই সমীক্ষণ করে দেখার বাতিক এখানে এতই প্রবল যে সপ্তাহান্তেও, মানুষ যখন ছুটির ধান্দায় আতুর, আবালবৃদ্ধবনিতা সপ্তাহান্তের সেমিনারে যোগ দেবার জন্যে হন্যে হয়ে ওঠেন। কিসের খোঁজে এত আর্তি? এই প্রশ্নের একটি নেতিবাচক অসন্তুত্তর দিতে পারলে সহজেই ঝামেলা চুকে যেত, এমন কি সেই মুদ্রা নিদারুণ রকম সপ্রতিভ দেখাত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষজনের উৎকাঙ্ক্ষা এত শাণিত সাবলীলতায় উড়িয়ে দেওয়া আদৌ সমীচীন হবে না। বিশেষত বিষয়ের মাধ্যমে আত্ম সন্ধানের ঝোঁক যদি দেখা যায়, তাকে খারিজ করা যাবে কী করে? অনেক সময় বিষয়বস্তু খুঁজে পাওয়া যায় হাতের কাছেই, তাকে দূরদূরান্ত থেকে হাতড়ে আনতে হয় না। 'নির্বাসিতের মন' এমনই একটি উপকরণ এখানে হয়তো। শুধু বহির্দেশে নয়, স্বদেশেও মানুষ নির্বাসিত থাকতে পারে। এই নির্বাসন হতে পারে ক্ষমতাপ্রাপ্তের স্বেচ্ছাচারিতার দরুন, যেমন আজও দক্ষিণ কোরিয়ায়, অন্তরীণদশায়। কিংবা বহুকাল অন্ধকারে থাকবার পর, যেমন নিকারাগুয়ায়, ফিরে পাওয়া চেতনার মধ্যে বিচ্ছুরিত সেই বেদনায় যা মনে করিয়ে দেয়, কী করে এতকাল আলো থেকে নির্বাসিত ছিলাম। এই দু রকম বোধই এখানে নতুন নয়। এখানকার মানুষ সমস্ত অর্থেই দেশান্তর বা বাস্তুহীনতার সঙ্গে রক্তে ও স্নায়ুতে পরিচিত। নির্বাসিতের মন নিয়েই গ্রেসে-সাক্সেন নামের সমীপপল্লীতে আমরা দু'দিনের ছুটির সেমিনার মাতিয়ে দিয়েছিলাম। ঠিক তার কদিন আগেই নিকারাগুয়ার জন্য এক বাস বই এখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বাসটির নাম 'বের্টোল্ট ব্রেশ্ট্'। নিকারাগুয়ার কবি মারিয়া কাস্তিনা ভেগার মন্ত্রবীজোপম উক্তিটি ('বিপ্লব আসলে একটি বই') হয়তো আমাদের উদ্দীপ্ত করে থাকবে।

এখানকার অনেক প্রকাশক একজোট হয়ে এই বাসের ভিতর এক লক্ষ মার্কের বই পুরে দিয়েছেন। 'চলন্ত এই লাইব্রেরির ভিতর', একজন প্রকাশক বলছিলেন, 'বেঁচে থাকবে আমাদের জাগ্রত হৃদয়।' এই সহৃদয় আগ্রহ নিছক সংবেদনার সমার্থদ্যোতক নয়। এক মহিলাশিল্পী এঁকেছেন রঙিন বই-বাসের কার্ড, তাঁর ধারণা এগুলি বিক্রি হয়ে গেলে নিকারাগুয়ার ত্রিতাপ সমস্যার নিরসন ঘটবে; এই কুশল কামনা, যতো অবান্তরই হোক, অশ্লীল বলে চিহ্নিত করার মতো স্পর্ধা আমার নেই; যেহেতু, অন্যান্য সুলক্ষণ ছাড়াও, শিল্পী কোথাও তাঁর নিজের নাম জাহির করেননি। ওফেনবাখ শহরের একটি ব্যাংক একটি বিশেষ অ্যাকাউন্ট নম্বর (১০০৮১৬৮-১৪) দিয়ে যে আবেদন জানিয়েছিল, লক্ষ লক্ষ মানুষ সাড়া দিয়ে কৃতার্থ হয়েছে, সেটাও এই প্রসঙ্গে উজ্জ্বল সংবাদ। আমাদের সপ্তাহান্তিক সেমিনারে বিভিন্ন ভাষায় পাশাপাশি সাজিয়ে দিয়েছিলাম জগতের অগণন নির্বাসিত লেখকের রচনা থেকে জীবন্ত অসংখ্য অংশোবশেষ। কখনো অনুভূত প্রতিবেদের টুকরো, কখনো-বা নিঃশর্ত আনন্দ বেদনার অন্তঃসাক্ষ্যকণা। বলা বাহুল্য, এ রকম অনুষ্ঠানে ব্রেশ্টের মতো অতিথিশিল্পী সবচেয়ে বরেণ্য। ফ্যুরারের জার্মানি থেকে পালিয়ে গিয়ে মার্কিন স্বনির্বাসে তাঁর অস্তিত্ব যে বিফলে যায়নি, সেকথা ব্রেশ্ট-ভাবুকরা ভালো করে জানেন। স্বদেশ থেকে অন্তরিত হবার পর্বে যে ব্রেশ্ট নিজেকে প্রথম আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন, সেই তথ্যটিও সবারই জানা। এই আবিষ্ক্রিয়ার অধ্যায়ে তাঁর জীবনের ঘরোয়া-জড়োয়া খেয়ালখুশি কেমন তাঁর প্রধান অঙ্গীকারের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল, সেই দৃশ্যপট আমরা একটি কোণে তুলে ধরেছিলাম, তাঁর কাজের

কড়চা বা দিনলিপি থেকে উৎকলনের মাধ্যমে। এখানে তার এলোমেলো ফ্রেস্কোময় কিছু নজির রইল:

২০-৯-৪৩

সান্ধ্যভোজের নিমন্ত্রণে এলেন ঈশারউড। ছোটোখাটো, কোমলস্বভাবী, ধৈর্যময়, এমন কি স্থৈর্যশিকারীও যেন। আমার 'ভালোমানুষ' পড়ে বেশ খুশি, বিনীত অভিনন্দনও জানালেন। দেবতাদের চিত্রায়ণ নিয়ে ঈষৎ অসন্তুষ্ট বলেই যেন মনে হলো। আমি ওঁকে অনেকক্ষণ ধরেই এটা-ওটা বোঝাতে চেষ্টা করলাম। এমন সময় বন্ধু হানস্ ফিরটেল এসে হাজির। ঈশারউডকে বলেই ফেলল: 'আপনি, অডেন, হাক্সলি, আপনারা তিনজনেই আপনাদের স্বাধীন বুদ্ধি বিবেচনা ভারতবর্ষের কাছে সঁপে দিয়ে বসে আছেন।' আমি ওই ধারণাটা আরো একটু বিশদ করতে গিয়ে বলে উঠলাম: 'আসলে কিনা ভারতীয়তার ধ্যানধারণা কুষ্ঠরোগের মতোই আপনাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে।'

একটি সেমিনারের প্রান্তে ব্রেশ্টের নাটকের মহড়া

[জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর মন্তব্য: 'অতঃপর ঈশারউডের মুখের অবস্থাটা কেমন হয়েছিল, আপনারা যাঁরা আজকের আসরে উপস্থিত নেই, স্পষ্টই অনুমান করতে পারছেন']। আসল ব্যাপার কী না, ঈশারউড আচমকা বৌদ্ধ বনে গিয়েছেন, ওই বামন সন্ন্যাসী ঋষির খুদে বিকল্প দিব্বি আলখাল্লা পরে ধূপের ধোঁয়া ছড়িয়ে খালি পায়ে হলিউডের মঠে ঘুরে বেড়ান। ঐ মঠখানা প্রকৃতপক্ষে একটা হোটেল। এবং ওই অতি সূক্ষ্ম ঈশারউড, যাঁর সঙ্গে হাক্সলির রীতিমত দহরম-মহরম, একেবারে ছাঁকনিতে ছেঁকে-তোলা; আমি তো তাঁকে বলেই ফেললাম: 'আপনি বিক্রীত'। তখুনি তিনি ঘড়ি দেখলেন, বিদায় নিতে ব্যস্ত। এ রকম লোকের সঙ্গে আপনারাই বলুন, কীভাবে আলোচনা চালাবো। বেয়ারাকে ডেকে বিল চুকিয়ে দিলাম। প্রস্থানের সময় আমার মনের অবস্থাটা হলো সেই মেডিকেল সার্জনের মতো যাঁর রোগী অস্ত্রোপচারের মাঝখানে পিটটান দিলে, তিনি ভাবতে বসেন: 'এ শুধু একটি ক্ষতচিহ্ন নিয়েই পালিয়ে গেল।' [আমার মন্তব্য: 'ঈশারউডের ভারতীয় অতীন্দ্রিয়তার উপর ব্রেশ্টের চটে যাওয়ার অন্যতম কারণ নিশ্চয়ই, তাঁকে স্বকীয় রচনার অনুবাদক হিসেবে অর্জনের প্রয়াসে তিনি ঐ সন্ধ্যায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। তা নইলে তিনি একই জর্নালের এক জায়গায় বলতেন না: 'ভেবেছিলাম আমার ভালোমানুষ বইটা ওঁকে দিয়ে তর্জমা করাবো— কিন্তু ঈশারউড সেকথা শোনার পাত্তরই নন।']

★

১৭ মে ১৯৪৪

খারাপ লোক যখন হঠাৎ ভালোমানুষ বনে যায়, সে তার মন্দ স্বভাবটি লুকিয়ে রাখতেই চেষ্টা করে। আমি ঈশারউডকে অনুরোধ করেছিলাম আমার 'সেৎজুয়ানের ভালোমানুষ'

নাটকটা তর্জমা করতে। তিনি নানা কাজের অছিলা দেখিয়ে সেই প্রস্তাব কিনা নাকচ করে দিলেন। তাঁর গুরু কোন এক স্বামীজীর ভারতীয় বই তিনি অনুবাদ করছেন। তাছাড়া নাকি ফিল্মের জন্য গল্প ফাঁদছেন। তাছাড়াও হাক্সলির সঙ্গে কী সব কাজ করছেন বলে অনুমান করা যায়। শেষে কিনা নাট্যপ্রযোজনার জন্য দরকার পড়লে, আমাকে দু-একশো ডলার দাতব্য হিসেবে দিতে চাইলেন!'

★

৩ মার্চ '৪৩
[জীবনযাপনের সঙ্গে শিল্পসৃষ্টি এমনভাবেই জড়িয়ে যাচ্ছে যে, আলাদা করে এ দুটোকে শনাক্ত করতে পারছি না।] দিনের নকশাটা এই রকম। সকাল সাতটায় উঠে পড়ি। তারপর খবরের কাগজ, রেডিও। ছোট্ট তামার কেটলিতে কফি বানাই। সকালের দিকটাতেই কাজ করি। হাল্কা লানচ সেরে নিই বারোটা নাগাদ। দুপুরের বিশ্রামের পর আমায় ঘিরে থাকে ডিটেকটিভ উপন্যাস। বিকেলে এটা-ওটা দেখাশোনা, কিংবা কাজ। সন্ধে সাতটা নাগাদ খেয়ে নিই। তারপর আসেন অতিথিরা। রাত্তিরে শেক্সপীয়রের রচনা থেকে আধপৃষ্ঠা বা আর্থার ওয়েলির চীনা কবিতার সংস্করণ। রেডিও। এবং গোয়েন্দা উপন্যাস।

★

১২ ডিসেম্বর ৪২
এমিল লুডহ্বিগ নির্বাসিতদের বিষয়ে নির্বাসিতদের লেখা একটি বইয়ের পরিকল্পনা করেছেন। ঐ সংকলনে ওভিদ বিষয়ে লিখতে রাজি হয়েছেন ফয়েস্টহ্বাঙার। আমি ওঁকে এই বলে বারণ করেছিলাম, কয়েক দশক ধরেই এমিল লুডহ্বিগ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যেন মার্কিনীরাই জার্মানদের শিক্ষাগুরু হোক। তবু ফয়েস্টহ্বাঙার নাছোড়। তদুপরি তিনি আবিষ্কার করেছেন, ওভিদকে নাকি ইচ্ছাক্রমে নির্বাসনের শামিল করা হয়নি।

★

৭ জুলাই ৪৩
হলিউডের ফিল্মি-দুনিয়ার পাল্লায় পড়ে শেক্সপীয়রের দশাটা যেন র‍্যাঙ্কের মধ্যে লুকিয়ে পড়বার মতো। সবাই এখানে শুধু ফন্দি আঁটছে— যাকে বলে প্ল্যান।

★

১০ সেপ্টেম্বর '৪৪
চার্লস লটনের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে নতুন-নতুন আইডিয়া বেরিয়ে আসছে— কনফুসিয়াসের জীবন

ব্রেশটের বন্ধু অভিনেতা চার্লস্ লটন

নিয়ে নাটক লেখা, আর তারি ভাবাসঙ্গে 'রোজা লুক্সেমবুর্গের জীবন ও মৃত্যু' নিয়ে নাটক লেখার ভাবনাটাও জেগে উঠল। আসলে দুটো বিষয়কে নিয়েই অখণ্ড একটি বৃত্ত গড়ে তোলা সম্ভব।

★

১০ ডিসেম্বর '৪৩
লটনের সঙ্গে গ্যালিলিওর তর্জমা ও মঞ্চভাষ্য নিয়ে রীতিমতো মেতে আছি— এক স্তর থেকে আরেক স্তরে যেতে গিয়ে যে সমস্যাগুলি স্বতন্ত্রভাবে হাজির হচ্ছে সেগুলির সুরাহা অবিশ্যি খুবই শক্ত ব্যাপার— একটানা লেখার সময় কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় না—তার ফলে চিন্তাও এগিয়ে যায় নিপুণভাবে। এভাবে সমস্যা এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ কখনোই পশ্চাদপসরণ বা সমর্পণ নয়। বরং ঠিক তার উল্টো। হালটাকে খুব গভীরে ডোবানো বা উপর-উপর ছুঁয়ে ধরে রাখা— কোনোটারই দরকার নেই— এগিয়ে যাওয়াটাই আসল কথা। যখন দেখি আমার অভিনিবেশের শক্তি ফুরিয়ে আসছে, তুলে নিই যে-কোনো একটা ক্রাইম উপন্যাস তখন আমার ভাবনা-চিন্তা করার সামর্থ্যকে আমি ততোটা আমল দিই নে।

★

১০-১০-৪৩
অধুনা আমি প্রায় ই জার্মান শব্দ ভুলে যাচ্ছি। এমন জার্মান শব্দ ব্যবহার করছি যা ইংরেজি শব্দের অনুষঙ্গ মনে পড়িয়ে দেয়। তখন তোলপাড় করে শব্দ খুঁজি, জার্মান ভাষায় সাধুশব্দ ধরা দেয় না। আমাকে আকুল করে তোলে উপভাষার শব্দবিশেষ, যেমন Godfather-এর বদলে [বাভারিয়ার] dohdle

★

১০ ডিসেম্বর '৪?
লটনের সঙ্গে বসেই আজকের কাজ : নাট্যকার ও অভিনেতা— দুই পেশার শিল্পীর মধ্যে ধ্রুপদী সহযোগিতার দৃষ্টান্ত। কাজ করতে গিয়ে দেখলাম, লটন লক্ষ করছেন, এক-এক জায়গায় নাটকটি [গ্যালিলিও] নিস্তেজ-দুর্বল হয়ে আসছে ··· অতঃপর হঠাৎই কোদালাকৃতি ঐ বিপুল মাংসপুঞ্জের পর্বতপ্রতিম লোকটি নাছোড় হয়ে বসেন, যতোক্ষণ না যথাযোগ্য রূপান্তর-সংশোধন খুঁজে পাওয়া যায়। লটন মানুষটার ভিতরে একগুঁয়েমি ও সূক্ষ্মসংবেদনশীলতার অপূর্ব এক মিশ্রণ আমি অনুভব করেছি। তথাকথিত সমালোচকদের তথ্যনিষ্ঠ এবং অতি সাবধানতার সঙ্গে উচ্চারিত প্রস্তাবসমূহের চেয়েও ওঁর পরামর্শগুলি অনেক বাস্তব এবং সৃজনী। যেমন ভেপোনেকে সরিয়ে দেওয়া— প্রথম দৃশ্যে লুডোভিকের সহায়তায় শিক্ষার্থীর অনুষঙ্গ বর্জন— শেষ দৃশ্যে ডাইনিদের ছায়াসম্পাত— এসব বদল ওঁর মাথা থেকেই এসেছে। প্রথম দৃশ্যটিকে উনি তছনছ করে ঢেলে সাজিয়েছেন। তৃতীয় দৃশ্যের ধারাবাহিকতাও ভেঙে দিয়েছেন। খুদে সন্ন্যাসীর সঙ্গে দৃশ্যটিতে গ্যালিলিওর মনে দ্বিধা জাগিয়ে তুলেছেন, শেষ দৃশ্যে মাটির উপস্থিতি এনে শিল্পগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন, সর্বশেষ গ্যালিলিও-দৃশ্যে মহান রূপান্তর ঘটিয়েছেন। সর্বক্ষেত্রেই নন্দনবোধ বজায় রেখে রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার এনেছেন। এভাবেই জনরুচিকে আহত করে তিনি রূপান্তরিত করতে চান। লটন আগে ভুলভাল ভাঙাচোরা অনুবাদের সাহায্যে আমার নাটকটা পড়েছিলেন। নতুন ভাষ্য আমরা এইভাবে তৈরি করছি। আমি প্রত্যেকটি বাক্য ইংরেজিতে তর্জমা করছি, লটন— যিনি একবর্ণ জার্মান জানেন না, সমস্ত কথাই লিখে নিলেন। সবশেষে তাঁর অভিনব প্রস্তাবগুলি পেশ করে গোটা ব্যাপারটা অভিনয় করে দেখাচ্ছেন, যতোক্ষণ না সামগ্রিক অনুভাব (Gestus) ধরা দেয়।

★

৪-৩-৪৫
হানস্ আইসলারের বাড়িতে পার্টি ছিল। সংগীতস্রষ্টা শোপ্যাঁকে নিয়ে পোল মুনির একটি ফিল্মের দারুণ 'কপি' করে দেখালেন চ্যাপলিন। মুনির রুমাল নিয়ে খেলাটা, চ্যাপলিন আমাদের জানালেন, আঠারো বছর বয়সেই তিনি রপ্ত করেছেন। লোকগীতিনাট্যের ধাঁচে তিনি রুমাল নিয়ে অসুখী এক বৃদ্ধের অভিনয় করে দেখালেন। ঐ খেলাটাই ছিল যা একটু তরল ধরনের। তারপর বললেন চ্যাপলিন তাঁর একটি পরিকল্পনার কথা। মাঝবয়সী এক পরিবারভারগ্রস্ত পিতাকে 'to make his living' নারীহত্যা করতে হবে। বয়স এবং জীবিকানির্বাহের সমস্যায় এই কাজটা হাসিল করা খুবই শক্ত। চ্যাপলিনের ইচ্ছে ক্লাসিক যুগের চার্লিকে বিসর্জন দেওয়া। দেখতে হবে শব্দচিত্রে চার্লি কীভাবে কথা বলে— আসলে আমরা তো সবাই জানি চার্লি যে মূক হিসেবেই অনন্য অভিনেতা। ভবঘুরে প্রোলেটারিয়েটের কী দশা হয়েছে দ্যাখো— তিনি new deal-এর শিকার হয়েছেন। শেষে কিনা আবার ইংরেজিতে বলছেন : 'the new deal took care of him.'
[এই প্রকল্পই ১৯৪৭-এ 'মঁসিয়ো ভের্দো'তে পরিণত]

... ...

প্রদর্শনীর দেয়াল জুড়ে ব্রেশটের এই ধরনের অনুচিন্তা ছড়িয়ে ধরা হয়েছিল। উদ্যোক্তাদের মধ্যে অনেকেই ব্রেশটের অনুব্রতী এবং

তাঁদের বক্তব্য হলো এই যে, স্রষ্টা এই মানুষটি নির্বাসনকেও স্বর্গ বানিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর চারদিকে জড়ো হয়েছিলেন দিব্যোন্মাদ বেশ কিছু মানুষ যাঁদের কাছে কল্পনাশক্তি বেঁচে থাকবার আয়ুধ।

উদ্যোক্তাদের মধ্যে আরেকটি অংশ অবশ্যই এই সরল থীসিস বিষয়ে সন্দিহান। এঁরা নির্বাসন বিষয়ে বই-পত্তর সংগ্রহ করে তাঁদের সংশয় মূর্ত করার কাজে সক্রিয় ছিলেন। এইসব বই সদাই বাজারে মিলছে। 'জার্মানি থেকে ইহুদির দেশান্তর ১৯৩৩-৪১' মর্মে একটি ক্যাটালগ এই প্রদর্শনীতে গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছিল। ভিতরের ছবিগুলি ভাষার সাহায্যে বর্ণিত ঘটনাপটের চেয়েও অব্যর্থ সংকেতে তাৎপর্যময়। এখানে প্রদর্শিত এসব দুর্গত মুখ আর তাদের স্বদেশের রৌদ্রছায়ায় অভিষিক্ত হয়নি।

ফিরে তো আসেন নি অনেকেই, আস্বাদ নিতে পারেননি মুক্ত মননের পরিমণ্ডলের যেখানে অসাম্প্রদায়িকতা মূল্যবোধে পরিণত হয়েছে। ফিরে না আসার অভিমান নিয়ে মার্কিন পরবাসে শেষ পর্যন্ত আশ্রিত থেকে গিয়েছিলেন হানস সাল্‌-এর মতো অনেক কবি। হানস সাল তাঁর 'শেষের যারা' কবিতাটি এভাবে শেষ করেছিলেন :

আমরাই সবশেষের।
আমাদের প্রশ্ন করে সমস্ত উত্তর নিংড়ে নাও।
আমরাই উত্তর দিতে পারব।

১৯৭৩-এ, অর্থাৎ ফ্যাসিবাদীদের আয়োজিত গ্রন্থমেধপর্বের ঠিক চল্লিশ বছর পর উচ্চারিত এই আবেদন। ঐ বছরই হানস আলবার্ট হ্বাল্টারের লেখা 'জার্মান নির্বাসন সাহিত্য (Exilliteratur) ১৯৩৩-১৯৫০' শীর্ষক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। প্রথম দু ভল্যুম আগের বছরেই বেরিয়ে গিয়েছিল। এই তিন খণ্ডের পাতায় পাতায় একদা ভস্মীভূত গ্রন্থমালার জন্য তর্পণসন্তাপের ছাপ। বলা বাহুল্য, কীভাবে হান্‌স সালের মতো কবিদের প্রশ্ন করে সমস্ত কথা জেনে নিতে হবে, সে বিষয়ে হ্বাল্টারের মতো দরদী মনীষীরও জানা ছিল না। কিন্তু তাঁর প্রণীত ওই গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর থেকেই যুদ্ধোত্তর জার্মানি নির্বাসিতদের নিয়ে যে বিবেকজ্বালার শামিল হয়েছে তার কোনো মেদুর নিরসন আজো হয়নি। ১৯৪৫-এর পর ছবিটা এত স্পষ্ট ছিল না। নির্বাসী লেখকদের রচনা, তাঁদের স্বদেশে, অবচেতনে নিশ্চিন্ত হবার গরজ থেকেই নিঃসন্দেহে, নতুন করে যে নির্বাসিত হয়েছিল। ধ্বংসের পর জেগে উঠেছে তখন এখানে-ওখানে নতুন সম্ভাবনার শ্যামলসুনীল স্কাইলাইন, তখন কে স্বযাচিত উচাটনদশায় ভাবতে বসবে যুদ্ধ বিতাড়ন গণহনন ইত্যাকার প্রসঙ্গ, 'কে আর হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে?' ১৯৫০ পর্যন্ত ভাবের ঘরে মায়াবী অপহরণের আলেখ্য অনেকটা এ রকমই। (হ্বর্নের বের্গেনগ্রুন তাঁর 'অটুট দুনিয়া (Die heile Welt/১৯৫০) বইতে ফুটিয়ে তুলেছেন অনাহত রূপকথার পরিবেশ যেখানে সব কিছু অবিকল আগের মতো আরোগ্যরঞ্জিন। কোথাও যেন মাটিতে একতিল চিড় খায়নি। এ রকম মনোভঙ্গিকেই সমালোচকেরা এক ধরনের 'অন্তর্মুখী দেশত্যাগ' (innere Emigration) বলে চিহ্নিত করেছেন। এটা কোনো সার্থক লেবেল নয়। কল্পস্বর্গে পলায়নের অভীপ্সাকেই এখানে একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। স্টেফান আন্দ্রেস, হানস কারোসা, রাইনহোল্ড শ্নাইডার, এর্নস্ট হ্বিশার্ট প্রমুখ লেখকদের রচনা এই অন্তর্মুখী দেশত্যাগের পর্বে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ধ্রুপদী মানবিক ঐতিহ্যের গ্রন্থরাজিও পলায়নপ্রিয় পাঠকমণ্ডলী পড়তে শুরু করে দিয়েছিলেন, কেননা সেখানে যুদ্ধের অপস্মৃতি লেগে নেই। ব্রেশট কিংবা হাইনরীশ মান কারো পাঠ্যক্রমেই তেমন প্রবেশাধিকার পাননি। আসল কথা, আডেনাউয়ারের সংস্কারপর্বে নির্বাসী লেখকের রচনা, ছমছমে অস্বস্তির সেইজন্যেই, অনাশ্রিত থেকে গিয়েছিল।

সাম্প্রতিক সময়ের ঝোঁক, সেই তুলনায় অনেক আলোকপ্রাপ্ত। সমালোচকেরা এমন কি নির্বাসন-সাহিত্যের নবজাগৃতির কথা বলতে শুরু করেছেন। ট্যুর্গেন সের্কেস-এর 'দগ্ধ কবির দল' (১৯৭৭) বইটি এই নবযুগ সূচিত করে দিয়েছে বলা যায়। প্রাচীন লেখকদের পুনরাবিষ্কার এই অর্থেই ঘটছে যে, আমাদের সময়ে তাঁদের নতুন বসতি দরকার। ১৯৩৩-এর আগে যাঁরা নতুন পথ খুঁজছিলেন, নাৎসিরা যাঁদের পথ আটকে দিতে চেয়েছিল, এখন তাঁদের জয়জয়কার : বেঞ্জামিন, ব্লখ, ব্রেশট, ব্রোশ, হোরভাথ, এর্নস্ট হ্বাইস, যোসেফ রোথ, রেনে শিকেলে, থেয়োডোর প্লিফিয়ার, আলফ্রেড ড্যাবলিন, হাইনরীশ ও টোমাস মান, হ্বাল্টার মেরিং, ইর্মগার্ড কয়েন, স্টেফান ও আর্নল্ড ৎসোইগ, কার্ল ৎসুকমায়ার, ফ্রানৎস হের্ফেল, লিঅন ফয়েস্টহ্বাঙার, ক্লাউন দান ব্রুনো ফ্রাংক, এবং এ রকম আরো কতো নাম। শুধুমাত্র খ্যাতিমান লেখকদের মধ্যেই এই স্বীকৃতি দেবার আয়োজন পরিমিত থাকছে না। যাঁদের কখনোই নাম শুনিনি, এ রকম অগণ্য রচয়িতা এক-একদিনের অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন। এজন্য অভিনন্দিত করতে হয় সে সব প্রকাশককে যাঁরা বাণিজ্যিকেই মূলমন্ত্র করে তোলেননি। অন্তত পঞ্চাশটি প্রকাশনের দ্রুত তালিকা দেওয়া সম্ভব যাদের দৃষ্টি অপ্রতিরোধ্য ও বরেণ্য একদা অনাবিষ্কৃত অথবা এখনো অপরিচিত নতুনদের দিকে। এদের প্রকাশিত সমস্ত বইতেই যে মেধা বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে সে রকম দাবি কেউই পোষণ করেন না। বস্তুত শিল্পীর যাপিত সময়কেই প্রতিভার লক্ষণ হিসেবে মর্যাদা দিতে পারাটাই এক্ষেত্রে বড়ো কথা। নতুন প্রতিভা খুঁজে বের করার একটি শর্ত যে আমাদের সময়ের প্রেক্ষিতে তরুণ লেখকের সদিচ্ছা বিষয়ে শ্রদ্ধা পোষণ, এই সমস্ত প্রকাশনের কার্যক্রমে তার পরিচয় মেলে। হানস আলবার্ট হ্বাল্টারের স্থাপিত ভিত্তিপ্রস্তর সময়ের মহাদেশের অবজ্ঞাত কোণে পড়ে থাকেনি। তিনি নিজেই উদ্বাস্তু লেখকদের গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করতে গিয়ে প্রায় দু হাজার রচয়িতার একটি অমূল্য তালিকা সম্পন্ন করে গিয়েছিলেন, এই লেখকপঞ্জিটি অমূল্য। কার রচনা কালোত্তীর্ণ, কার ভাষায় চিরায়ত সাহিত্যের প্রমাদ গুণ নেই ইত্যাদি নিয়ে তর্জনীমুদ্রার বালাই সেখানে নেই। প্রধানত এমিল স্টাইগারবিভাবিত নতুন সমালোচনার ধারাটি এই প্রবণতার ধারাতেই বয়ে চলেছে। কোনো পূর্বধার্য মানদণ্ডে কোনো সাহিত্যগ্রন্থকে তেমন আর বিচার করা হয় না। প্রতিটি লেখক প্রত্যেক বইতে নতুন মানদণ্ড রচনা করেন। সমালোচকের কাজ তার সশ্রদ্ধ সমীক্ষণ। তার অর্থ এই নয় যে কোনো বইই খারিজ করা হয় না। গভীর সম্ভ্রম সত্ত্বেও যে অপ্রতিম বলে সুকীর্তিত লেখককে বরবাদ করে দেওয়া হয়ে থাকে তার প্রমাণ 'মূষাবতী' (Racttin/১৯৮৬), গুন্টার গ্রাসের সদ্যতন উপন্যাস। দূরদর্শন এবং ভিডিও-র যুগে শুধুমাত্র বই পড়ুয়াদের জন্যই একটি জগৎ এখানে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন গ্রাস। প্রায় সমস্ত শিবিরের সমালোচকেরাই এই কথাশিল্পায়ন অনুত্তীর্ণ বলে রায় দিয়েছেন। একবাক্যে সকলেই এ রকম নির্ধারণ করলেই একটি বই পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত হবে, সেকথা কেউ বলছেন না। এঁদের বৃহদংশেরই বক্তব্য, গ্রাসের সম্প্রতিনির্ণীত মাপকাঠিকে ছুঁতে পারছে না এই বই।

নাট্যকার ব্রেশট

এই সমস্ত প্রসঙ্গই সপ্তাহশেষের প্রদর্শনী ও আলোচনাচক্রে ঘুরে ঘুরে এসেছিল। স্বভাবতই সেমিনারসমূহে যা হয়, একগুয়ে তার্কিকেরা তাঁদের উপপাদ্য প্রতিপন্ন করেন, অথবা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে তৃপ্ত থাকেন। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তফাৎ শুধু এই যে, আমাদের এক ব্রেশটবিশেষজ্ঞ বন্ধু তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করবার পরও একটি নান্দনিক মাত্রা জুড়ে দিলেন। তিনি নতুন করে আমাদের সবাইকে মনে করিয়ে দিলেন লটন দম্পতির ধ্বস নেমে লুপ্ত হয়ে যাওয়া সেই বাগানটির কথা যাকে নিয়ে ব্রেশট Garden in Progress (ইংরেজিতেই ঐ নামকরণ) নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। তার তিন স্তবক তিনি মন্ত্রের ঘোরে পড়ে শোনালেন, স্মৃতি থেকেই। কিছু বিভ্রম ছিল এখানে ওখানে, কিন্তু তাঁর সেই পাঠেই এখানে তর্জমা করে দিলাম :

বাড়ির রাস্তায় জবার বীথি
এত ঘনসংবদ্ধ যে পথিক
তাদের পিছনদিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে
পরিপূর্ণ সুবাস আদায় করে নিতে
পারে।

মঠের মতো বাড়ি, দীপাধারের কাছে
অ্যারিজোনার ক্যাকটাস, মানুষপ্রমাণ
উঁচু, গোটা বছরে
একটি রাত্রেই ফোটে, আর এই
যুদ্ধবিক্ষত কামানবিধ্বংসী বছরে
তার শাদা ফুলগুলো বজ্রমুষ্টির মতো
বিশাল, আর
চীনদেশের অভিনেতার মতোই সুকুমার

হায় রে সুন্দর বাগান, তটের উপর
ভঙ্গুর শিলায় স্থাপিত। ধ্বস নেমে
এসে
বিনা নোটিসেই তাকে গহ্বরে লুপ্ত করে
দেয়। মনে হয় তাকে
সম্পূর্ণ যে করে তোলা যাবে এমন
সময় আর নেই। ■

সংগীত

অমিয়া ঠাকুর স্মরণে (১৯০৮ – ১৯৮৬)

রবীন্দ্রসঙ্গীতের সজ্জায় মনের মধ্যে ফুটে ওঠে যে ছবি তার পূর্ণতম রূপটি বিভাসিত হতে দেখেছি যাঁর মধ্যে তাঁর নাম অমিয়া ঠাকুর। প্রকৃত অর্থে শিল্পীর সন্ধান মেলে কদাচিৎ। অমিয়া ঠাকুরের মধ্যে দেখেছি সেই বিরল ব্যক্তিত্ব যা তাঁকে অনন্যতম স্বাতন্ত্র্যে মর্যাদা-মণ্ডিত করে তুলেছিল। হিরণ্যোপম কণ্ঠের অধিকারিণী অমিয়া ঠাকুর ছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত জগতের নেপথ্যবাসিনী শিল্পী। পেশাদারী শিল্পী না হওয়ায় তাঁর গান তেমনভাবে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়নি। যাঁরা এই অবিস্মরণীয়ের গায়নভঙ্গি শ্রবণে ও দর্শনে বঞ্চিত হয়েছেন তাঁদের জন্য বেদনা বোধ হয়।

১৯০৮ সালে ১২ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় তাঁর জন্ম। বাবা সুরেন্দ্রমোহন রায় ছিলেন ব্যারিস্টার, মা সুরেন্দ্রবালা দেবী ছিলেন অসামান্য রূপের অধিকারিণী। শৈশবেই অমিয়া দেবীর সঙ্গীতশিক্ষা শুরু যার পূর্ণ বিকাশ ঠাকুর বাড়ির বধূরূপে। বেথুন স্কুলের ছাত্রী হওয়ার সূত্রে স্কুলের অন্যান্য পাঠ্যসূচীর সঙ্গে নানা ধরনের গান শেখার সুযোগ হয় তাঁর। সেই সব গানের মধ্যে ছিল এমন অনেক গান যা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রসঙ্গীত বলে তিনি জেনেছেন। আট বছর বয়সে তাঁর রাগসঙ্গীতের শিক্ষা শুরু হয় বাড়িতে এক মুসলমান ওস্তাদের কাছে সারেঙ্গি সহযোগে। এরপর স্বনামধন্য ধ্রুপদ গায়ক যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে একাদিক্রমে বারো বছর তালিম নিয়ে সাংগীতিক শিক্ষার ভিতটি গড়ে নিয়েছিলেন তিনি।

অমিয়া ঠাকুর তখন বেথুন কলেজের 'ফার্স্ট ইয়ারের' ছাত্রী— আঠারো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা'য় প্রমদা চরিত্র রূপায়ণের দায়িত্ব পড়ল তাঁর 'পরে। মায়ার খেলার গান শিখলেন সরলা দেবীর কাছে আর গানের সঙ্গে অ্যাকশান দেখিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। অমিয়া দেবীর বর্ণনায় সেই সুখস্মৃতির ছবি গাঁথা আছে তাঁর স্মৃতিকথায় (দেশ বিনোদন ১৩৮৬)। মায়ার খেলায় প্রমদার ভূমিকায় অমিয়া দেবী গান ও অভিনয় আক্ষরিক অর্থেই কিংবদন্তী হয়ে আছে। গানে অভিনয়ে অমিয়া দেবী সেদিন প্রমদা-চরিত্রকে স্মরণীয় করে তুলেছিলেন— এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, তখন মাইক ব্যবহার করা হত না, রূপসজ্জার জন্য প্রসাধন সামগ্রীর সম্ভার এত পাওয়া যেত না। অসাধারণ রূপ ছিল তাঁর—যেমনটি ছিল তাঁর মায়ের।

এই মায়ার খেলার সূত্র ধরেই ঘনিষ্ঠতা এবং বিবাহ। হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র হৃদিন্দ্রনাথের সঙ্গে অমিয়াদেবীর বিবাহের প্রস্তাব দেন তৎকালীন ঠাকুর পরিবারের সঙ্গীত-শিক্ষক স্বনামধন্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রাহ্মমতে বিবাহ হয় ১৭ মাঘ ১৩৩৫। ঠাকুরবাড়িতে বিবাহে তাঁর সঙ্গীতচর্চার ছেদ পড়েনি। যোগীন্দ্রনাথের কাছে তালিম তখনও অব্যাহত ছিল সেই সঙ্গে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের তালিমও পেতে থাকলেন। পারিবারিক সূত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ছাড়াও আর একজনের কাছে তিনি গান শেখবার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করেন— তিনি রবীন্দ্রনাথ। কলকাতায় যখনই এসেছেন নতুন নতুন গান শিখিয়ে গিয়েছেন অমিয়া দেবীকে। গুরু এবং শিষ্যার মণিকাঞ্চন যোগে শিষ্যার কণ্ঠে 'ওগো কাঙাল আমারে' 'কী রাগিণী' 'বড়ো বিস্ময় লাগে' 'সখী আঁধারে' 'আমি শ্রাবণ আকাশে ওই' গানগুলি যে অনাস্বাদিত আনন্দ এনে দিয়েছে গায়নভঙ্গি ও সুষ্ঠু পরিবেশনে তা আজও অনেকে ভুলতে পারেন না। ভুলতে পারেন না রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে গীত প্রথমদিনে 'মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে' এবং রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আদেশক্রমে দ্বিতীয় দিনে গাওয়া 'ওগো কাঙাল আমারে' গানগুলির কথা— যা শুনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তৃপ্ত আনন্দিত হন। স্বামী হৃদিন্দ্রনাথের অনিচ্ছায় প্রকাশ্য সাধারণ অনুষ্ঠানে গান গাওয়া হয়ে ওঠেনি তাঁর এমনকি বেশ কয়েকখানি গান রেকর্ডে ধৃত হয়েও প্রকাশিত হতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর হিন্দুস্তান মিউজিকাল প্রোডাক্টস থেকে অমিয়া দেবী গীত 'হে নূতন দেখা দিক আরবার' ও 'সম্মুখে শান্তি পারাবার' গান দুটির রেকর্ড প্রচারিত হয়। মাত্র কয়েক বছর আগে পঞ্চকন্যা শিরোনামে একটি রেকর্ডে অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর কণ্ঠের দুটি গান 'বড়ো বিস্ময় লাগে' এবং 'তবু মনে রেখো' প্রচারিত হয় যা তাঁর একেবারেই পছন্দ ছিল না বলে অনেকবার মন্তব্য করেছেন।

কিছুদিন আগে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে তাঁর গান শোনা গিয়েছে। কলকাতা দূরদর্শনে তাঁকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমাদের। কিছুদিন কলকাতা আকাশবাণীর অডিশন বোর্ডের সদস্যও ছিলেন। দু-চারটি সংস্থা থেকে সংবর্ধিত হয়েছেন কিন্তু ঠিক যে মাপের শিল্পী ছিলেন তার পরিচয় সংরক্ষিত হল না। আমাদের স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটেনি এক্ষেত্রেও। তাঁরই সৌজন্যে রবীন্দ্রনাথের একটি অবিস্মরণীয় গান আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। অমিয়া দেবীর কণ্ঠে হিন্দী 'এ ধনি ধনি চরণ পরসত' গানটি শুনে তাঁরই কণ্ঠের জন্য রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন 'কী ধ্বনি বাজে গহন চেতনা-মাঝে'।

গহন চেতনা-মাঝে যে ধ্বনি বাজাতে পারতেন তা কেবল তাঁর শিক্ষার গুণেই নয়, রবীন্দ্রসঙ্গীতে আত্মস্থ হওয়ার জন্যে। যখনই তিনি গান করেছেন মনে হয়েছে এ গানের উৎস মস্তিষ্ক নয় হৃদয়। কখনো কারো গান সম্পর্কে তাঁকে বিরূপ মন্তব্য করতে শুনিনি। পরশ্রীকাতরতা কি তা তাঁর জানা ছিল না। যেমন আভিজাত্য ছিল তাঁর রূপে তেমন তাঁর গানে—সে জাত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অমিয়া দেবী রবীন্দ্রনাথের কথা বলেছিলেন : 'তাঁর মতো মানুষের কাছে যেতে পেরেছি। তাঁর ধ্বনি কানে নিয়েছি। তাঁর গান কণ্ঠে ধরেছি। তাতেই জীবন পূর্ণ'। এ কেবল কথার কথা নয়। তাঁর জীবনের প্রতিটি পর্বেই পরিপূর্ণ জীবনের এই সুর ধ্বনিত হয়েছে।

সুভাষ চৌধুরী

প্রভাতী আয়োজন

সলিলশঙ্করের একক সেতারবাদন : এই ছিল 'আরোহণ' সংস্থার আয়োজন এক প্রভাতী উচ্চাঙ্গ যন্ত্রসঙ্গীতানুষ্ঠানে, যুব কেন্দ্র মঞ্চে। রামকেলি রাগে আলাপ, জোড়, ও ঝালা বাজিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সলিলশঙ্কর। সকালের সুরের একটা হৃদয়ভেদ্য নিবিড় আবেদন আছে, ধ্বনিমাধুর্যপূর্ণ আলাপে ছিল তারই প্রকাশ। আলাপ পর্বে আর ভাল লাগল খাদের কিছু কাজ। জোড় ও ঝালাও নিপুণভাবে বাজান হয়েছিল। অতঃপর ঝাঁপতালে একই রাগে। গৎটি ঠিক সুবিন্যস্তরূপে এল না, তাছাড়া আন্তরিকতার স্পর্শও যেন কম ছিল। অবশ্য পরিশীলিত পরিচ্ছন্ন তানকারী প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

রামকেলি-র পর নটভৈরবী। এই রাগে আলাপ জোড় নয়, শিল্পী বাজালেন তিন তাল ও দ্রুত একতালে দুটি গৎ। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ভাল কাজ (যেমন তালের কাজ) পাওয়া গেলেও গৎ দুটি যে সুসংহত হয়েছে সে কথা বলা যাবে না। বিরতির পর শিল্পী পরিবেশন করলেন সিন্ধুভৈরবী ধুন। সুরেলা, উপভোগ্য নিবেদন। তবলায় শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিপুণ সহযোগিতা দিয়েছেন, তবে অতি দ্রুত লয়ে সামান্য অস্বচ্ছন্দ মনে হল

সলিলশঙ্কর

সেদিন তাঁকে, আরও চর্চায় এই দুর্বলতাটুকু দূর হয়ে যাবে এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। পরিশেষে একটি কথা। শুধু সমগ্র অনুষ্ঠান নয়, পরিচ্ছন্ন ঘোষণাও যে অনুষ্ঠান-সৌকর্যেরই একটি দিক, সেকথা অনেকেরই খেয়াল থাকে না। সেদিন এক পুরুষ কণ্ঠের অমার্জিত ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণে প্রারম্ভিক ঘোষণা ও শিল্পীর পরিচয় জ্ঞাপন, অনুষ্ঠান—সৌকর্য যে কিছুটা ক্ষুন্ন করেছিল তা বলাই বাহুল্য।

একগুচ্ছ বাংলা আধুনিক

'দক্ষিণায়ন'-এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র দেখে বোঝা যায়নি অনুষ্ঠানে একঝাঁক তরুণ-তরুণীর কণ্ঠে একঝাঁক বাংলা আধুনিক গান শোনা যাবে। গায়ক-গায়িকারা অনামা, কিন্তু অধিকাংশেরই কণ্ঠ তৈরি, সুতরাং অনুষ্ঠানের একটা মান ছিল। তবে এটাও স্বীকার্য যে এক সন্ধ্যার পক্ষে একটু বেশিই হয়ে পড়েছিল অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা। শেষের দিকে প্রায় শূন্য প্রেক্ষাগৃহ। এঁদের গানের আলোচনার আগে কলামন্দির (বি) মঞ্চে অনুষ্ঠিত এই সঙ্গীতাসরের প্রাথমিকপর্বে ফেরা যাক। সংস্থার পক্ষ থেকে হার্দ্য সংবর্ধনা পেলেন কণ্ঠশিল্পী হৈমন্তী শুক্লা। মানপত্রটি পাঠ করলেন ছন্দা সেন। 'সম্মান পেয়ে খুব খুশী' এ কথা সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে জানিয়ে শ্রীমতী শুক্লা তাঁর সুরময় কণ্ঠে উপহার দিলেন কয়েকটি বাংলা আধুনিক।

এ-পর্বেই সংস্থা ও বাংলা আধুনিক প্রসঙ্গে দু-চারকথা বলেছিলেন সংস্থা-সম্পাদিকা অসীমা মুখোপাধ্যায়।

'চৌরঙ্গী' ছায়াছবিতে 'বড় একা লাগে' শোনার পর সে-গানের সুরকারের প্রতি মনস্ক হতে হয়েছিল

অসীমা মুখোপাধ্যায়

শ্রোতাদের। আর এইভাবেই সুরকার হিসেবে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন অসীমা মুখোপাধ্যায়। তাঁর অন্য একটি পরিচয় তিনি কণ্ঠশিল্পীও। আলোচ্য ওই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা গাইলেন তাঁর সুর-করা আধুনিক গানই, গীতিকার অবশ্য বিভিন্ন। একই সঙ্গে একগুচ্ছ গান শুনে এই কথাই মনে হল যে তাঁর সুর প্রধানত ঐতিহ্যানুযায়ী, ঐতিহ্যানুসারী, পাশ্চাত্য প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম। সুরের সহজ নিরাভরণ রূপের প্রতিই তাঁর পক্ষপাতিত্ব। যেমন : 'দুঃখ আমার তোমায়' ও 'অনেক হয়েছে রাত', (কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়) ইত্যাদি গান সেই সাক্ষ্যই বহন করে। উপরোক্ত গান দুটি আগেই এক খ্যাতনামা শিল্পীর কণ্ঠে শোনা, সেদিন আশিস চক্রবর্তী ও শ্যামল দত্ত গান দুটির প্রতি সুবিচার করেছেন বলা যায়। আগে অন্য এক অনুষ্ঠানে নীলাঞ্জন নন্দীর কণ্ঠে ইংরাজী গান শুনে তাঁকে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন মনে হয়েছিল কিন্তু এই অনুষ্ঠানে কিশোরকুমার-অমিতকুমারের আদলে তাঁর বাংলা গান হতাশ করল। বরং পম্পি নন্দী অনেক স্বাভাবিক ও সতেজ। 'আমি আঁধারের কন্ঠ' (কথা : বিশ্বনাথ দাস) এটিও আগে শোনা— প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সুগীত। বাণী ভট্টাচার্য, রানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, শিখা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা গোপা সেন— প্রত্যেকেরই গলা সুরে। রাগের অল্প ছোঁয়ায় 'তবু ফিরায়ে দিয়েছি' (কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়) কিংবা সুরের অভিনব চলনে 'এক পা এগিয়ে' রূপরেখা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে যথাযথ রূপ পায়। সরমা দেবনাথ ও ঝর্না বসু— দুজনের কণ্ঠই সুরময়, কিন্তু গায়নভঙ্গী অকৃত্রিম নয়। দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠ শুনতে ভাল, আল্পনা দাসের কণ্ঠ উজ্জ্বল। রবীন দাস কিংবা রমেশ ভট্টাচার্য তেমন উল্লেখ্য নন। পূর্ণিমা পাঁড়ালের গলা জোরালো, ঘাটতি কিন্তু সুরে। যন্ত্রানুষঙ্গে ছিলেন অসীম সেনগুপ্ত, শেখর দাস, নিমাই মুখার্জী প্রমুখ। অনুষ্ঠান সংযোজনায় তথা ঘোষণায় ছিলেন ছন্দা সেন।

স্বপন সোম

না ট ক

রাজার ঢাকী

গত ২১শে অক্টোবর বৃটিশ কাউন্সিল ও সংস্কৃতি সাগরের উদ্যোগে বিড়লা সভাগারে পরিবেশিত হল King's Trumpeter নামে একটি উপভোগ্য অনুষ্ঠান। ইংরেজ কবি কিপলিঙের কবিতা, গল্প, চিঠির অংশ নিয়ে রচিত কিংসেলি অ্যামিসের স্ক্রিপ্টে একক অভিনয়-আবৃত্তি পাঠ করে বৃটিশ অভিনেতা জেরালড হারপার কিপলিঙের এক মনোজ্ঞ মঞ্চ-প্রতিকৃতি রচনা করলেন। রবীন্দ্রনাথ যাদের বলেছেন ছোট ইংরেজ কিপলিঙ তাদেরই একজন হলেও তিনি একজন বড় ইংরেজ লেখক। কিপলিঙের লেখায় বৃটিশরাজের বিরক্তিকর ঢক্কানিনাদ শুনতে পেলেও তাঁর রচনার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। কিপলিঙের মত জ্যাক লনডনও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মহিমা প্রচার করেছিলেন কিন্তু তাঁর গুণমুগ্ধ পাঠকদের মধ্যে ছিলেন লেনিন এবং স্ট্যালিন।

এসব সত্ত্বেও কিপলিঙকে ভারতীয়দের কাছে গ্রহণযোগ্যভাবে চিত্রিত করতে অনেক কাঠ খড়

জেরালড হারপার

পোড়াতে হয়। তাঁর উগ্র রাজভক্তি, জঙ্গী সাম্রাজ্যপ্রেম, গণতন্ত্র এবং Female of the species ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর অতি সংকীর্ণ রক্ষণশীল ধ্যানধারণার ওপর তাই চুনকাম করে আজকাল কিপলিঙের শিল্পকৃতির পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টা হচ্ছে। জেরালড হারপারের কিপলিঙ আপাতদৃষ্টিতে একজন entertainer, প্রচারপত্রে অনুষ্ঠানটিকে বলা হয়েছে

এনটারটেইনমেন্ট। অনুষ্ঠানের প্রথমাংশে তিনি একজন উজ্জ্বল, প্রাণচঞ্চল ভারতপ্রবাসী নির্ভেজাল ইংরেজ যুবক যার কবিতায় গল্পে ইঙ্গ-ভারতীয় জীবনের ছবিতে ছিল উজ্জ্বল অস্থিরতা, ককনী কৌতুক, তীক্ষ্ণ শ্লেষ, ভাবপ্রবণ মানবতাবোধ, কল্পনার উল্লাস, শব্দপ্রয়োগ ও বাচনভঙ্গীর নাটকীয় চমৎকারিত্ব। হারপার তাঁর কুশল অভিনয়ে আবৃত্তিতে এবং বাগ্মিতায় কিপলিঙের রচনার অনুচ্চেয় উপাদানগুলিকে পূর্ণমাত্রায় দর্শকদের চিত্তবিনোদনের কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু এর মধ্যে আমাদের পরিচিত কিপলিঙকে মনস্ক দর্শক হারিয়ে ফেলেননি। তাঁকে অনুদার অপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়নি ঠিকই— যেমন হত যদি What happened, The Whiteman's Burden-এর মত কবিতা এবং The story of A.B.C-র মত গল্প স্ক্রিপটে স্থান পেত। আবার সহজে ভারতীয়দের মন জয় করার জন্যে The Finest Story in the World, The Bridge Builders-এর মত গল্প এবং Buddha at Kamakura-র মত কবিতাও নির্বাচিত হয়নি।

প্রথমাংশের মঞ্চসজ্জায় একটি বিরাট ইউনিয়ন জ্যাক এবং লাহোরের মিলিটারী ও সিভিল গেজেটের কোন সংখ্যার একটি পাতার বিরাট ব্লো-আপ পাশাপাশি টাঙিয়ে দিয়ে মঞ্চ-নির্দেশক গ্রে উইলবি দর্শকদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন Two sided man কিপলিঙের কথা আর সেই সঙ্গে ইঙ্গিত ছিল ভারত তথা প্রাচ্যের প্রতি কবির আকর্ষণ বিকর্ষণের জটিল মনোভাব যা ছিল প্রথমাংশের প্রধান বিষয়।

যে বীভৎস পরিণতির গল্পটি অনুষ্ঠানের প্রায় শুরুতেই পরিবেশিত হল সেই Beyond the Pale-র বিষয়, বোনাসি ডব্রির মতে, "East is East, and West is West." উনিশ বছর বয়সে লেখা এই গল্পে কিপলিঙের বক্তব্য ছিল : 'A man should, whatever happens, keep to his own caste and creed.' এই গল্পের বক্তব্যটি বিস্তারিত করা হল Jungle Book-এর অংশে বিশেষ ও Jungle Law কবিতাটিতে। সভ্যতার সীমানা পেরিয়ে এই প্রাচ্য দেশে একটি শ্বেতাঙ্গ যুবক এক প্রাচ্য বিধবা রমণীকে ভালবেসে ব্যর্থ হয়েছিল সমাজ সংস্কারের অনড় বাধায় কিন্তু Jungle Law শাসিত জঙ্গলে মানবশিশু পেরেছিল হিংস্র পশুকে বশে আনতে।

Departmental Ditties ও Barrackroom Ballads-এর কয়েকটি অতি পরিচিত কবিতায় ছিল হোয়াইট ম্যানস বারডেন বহনে দুর্দশাক্লিষ্ট বেচারী জ্যাক ব্যারেট, টমি অ্যাটকিনস আর ড্যানি ডিভারদের কথা। হারপারের কণ্ঠে বিশুদ্ধ ককনী উচ্চারণে এই কবিতাগুলির উচ্চরোল ধ্বনিত হয়েছিল এমনভাবে যে বিক্ষুব্ধ দর্শকেরা আপন অভিরুচি মত সেই ধ্বনিময়তায় শুনতে পেলেন "mighty music of drums and trumpets" (হাওয়েল), বা 'বাগ্মিতার নির্ঘোষ' (এলিয়ট) বা লালকুর্তা গায়ে মাতাল অহঙ্কারী হুলিগানদের হুল্লোড় (বুকানন)।

প্রথমাংশের শেষে Gunga Din কবিতায় হারপার এই হুল্লোড়ের উচ্চগ্রাম থেকে কণ্ঠস্বরকে নামিয়ে আনতে পেরেছিলেন এক চোখ ছলছল করা কোমল স্বরক্ষেপে।

দ্বিতীয়াংশে ইংল্যান্ডের পটভূমিতে পরিণত প্রতিভার প্রৌঢ় কিপলিঙের উপস্থাপনায় হারপার শোনালেন সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের কবিতা— যেগুলিতে কবি কখনও স্বগত, কখন জনান্তিকে উদ্দিষ্ট, নিজকণ্ঠস্বরে ব্যক্ত করেছেন নানা গভীর বোধ ও ব্যক্তিগত অনুভবের কথা। সঙ্গে ছিল চিঠি ও আত্মজীবনী থেকে কিছু উদ্ধৃতি এবং মৌগলী ভাইয়ের জঙ্গল থেকে বিদায়ের কাহিনী।

উঁচু নাটকীয় পর্দায় হারপারের গলা যত খেলে, হার্দ্য, নম্র, গীতিময় নিমগ্নতায় তাঁর কণ্ঠস্বর খুব সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখাতে পারে না। তবু গভীর অধ্যাত্মবোধের কবিতা Eddi's Service, অতি সংযত পুত্রশোকের কবিতা My Boy Jack এবং কোমল আবেগের নির্জন রোমান্টিক কবিতা The way through the woods-এর বিশুদ্ধ আবৃত্তি করে হারপার সকলকে আবিষ্ট করেছিলেন আর কিপলিঙের অনপচায়িত কবি-প্রতিভার মনোজ্ঞ পরিচয় দিতে পেরেছিলেন।

সবশেষের Mandalay সুখশ্রাব্য হলেও প্রাচ্যের প্রতি এই অতি ভাবপ্রবণ পিছুটান দ্বিতীয়াংশে খুব প্রাসঙ্গিক মনে হয়নি।

মনসিজ মজুমদার

চি ত্র ক লা

প্রখ্যাতির প্রতিকৃতি

অতি উন্নত ফটোগ্রাফির যুগে বাস্তবানুগ তেলরঙের প্রতিকৃতির কদর ইদানীং চিত্ররসিকদের কাছে কিছু কম। সম্প্রতি বিকাশ ভট্টাচার্য চেনা-অচেনা নানা ব্যক্তির প্রতিকৃতি এঁকে মাঝে মাঝে দর্শকদের চমকে দেন। মূলানুগত্য ছাড়াও তাঁর আঁকা প্রতিকৃতিতে এক স্বতন্ত্র আবেদন থাকে যা আমাদের চোখ আটকে রেখে মনকে আলোড়িত করে। তুলনায় সম্প্রতি আকাডেমীতে প্রদর্শিত অনিল দত্তের আটাশটি তেলরঙে আঁকা প্রতিকৃতির আবেদন অনেক সহজ ও সরল। চিত্রিত ব্যক্তির সপ্রাণ সাদৃশ্যই তাঁর অনুচ্চাশী প্রতিকৃতির মূল উপজীব্য। রঙের প্রলেপে এক একটি তুলির আঁচড়ে মুখাবয়বের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলিকে ফুটিয়ে তুলছেন। সার্থক দৃষ্টান্তে চিত্রিত ব্যক্তি খুব সজীব ব্যক্তিত্বে ধরা পড়েছেন। শঙ্খ ঘোষ বেশ ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত আবার সংবেদনশীল ; গণেশ ঘোষ নিরভিমান, অভিজ্ঞ, উৎসুক আলাপচারী ; প্রভাত মুখোপাধ্যায় সৌম্য, আত্মনিমগ্ন জ্ঞানতপস্বী ; অরুণ মিত্র ভাবুক, কবি এবং বুদ্ধিজীবী—অনেকগুলি প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকলে দর্শকের মনে অনিবার্যভাবে এই সব বিশেষণ আসা যাওয়া করবে। আবার অনেকগুলিতে নিছক সাদৃশ্য ছাড়া ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় —অনিল দত্ত

অভিব্যক্তি নেই, যেমন : প্রেমেন্দ্র মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র। কয়েকটিতে সাদৃশ্য কতখানি মূলানুগ তা নিয়ে সন্দেহ জাগতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অমিতাভ চৌধুরী এবং সবিতাব্রত দত্তের প্রতিকৃতি উল্লেখ করা যায়। তবে কোনটিতেই শিল্পী প্রতিকৃত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে নিজের বিশিষ্ট মূল্যায়ন বা ধারণার পরিচয় বা ইঙ্গিত দেন নি। খ্যাতির আড়ালের মানুষটিকে খোঁজার চেষ্টা করেননি। সকলেই তাঁর নমস্য এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তিনি এই প্রতিকৃতিগুলি এঁকেছেন।
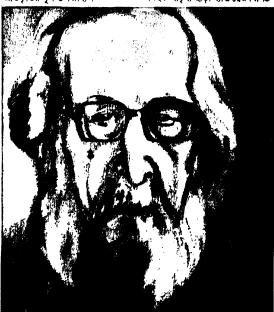
সমকালীন প্রখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, অভিনেতা, সাংবাদিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে খ্যাতিমান অতি পরিচিত নামের ব্যক্তিদের সামনাসামনি আবক্ষ প্রতিকৃতি এঁকেছেন শিল্পী। মাত্র একঘন্টা করে তিনবার এইসব যশস্বী ব্যক্তিদের তিনি তাঁর ক্যানভাসের সামনে পেয়েছেন। সদ্য প্রয়াত প্রবোধ চন্দ্র সেনের বেলায় শিল্পী এই সুযোগ মাত্র একবার পেয়েছেন তাই তাঁর প্রতিকৃতি অসমাপ্ত থেকে গেছে।

কতগুলি প্রদর্শে (৫, ৯, ১৩) তুলির কাজ মসৃণ, ডিটেলের যত্ন নিয়েছেন শিল্পী। কতগুলিতে মোটা করে

মনসিজ মজুমদার

দ

দীপক ঘোষ
দোলতিথি ৪৯, ১৭, ২৭ ফে ১৯৮২ : ৪৫, ক
দীপক দত্ত
অদিতি চৌধুরী ২৪, ৩৭, ১৩ জু ১৯৫৭ : ৮৬১-৮৬৪, গ
দীপক ভট্টাচার্য
কার্বুসিয়েরের শহরের ভাস্কর্য ৫০, ৫০, ১৫ অ ১৯৮৩ : ১৪-১৬, স
'গড্ডলিকা প্রবাহে'র ভাস্কর্য শিল্প ৪৮, ২৭, ২৫ জু ১৯৮১ : ৯-১০, স
ভারতশিল্পে শিশু ৪৬, ৩৭, ১৪ জু ১৯৭৯ : ৪৫-৪৭, স
ভীমরতির উৎস সন্ধানে ৫০, ১৩, ২৯ জা ১৯৮৩ : ৫২, স
লক্ষ্মী-সরস্বতীর মিলন ৪৭, ৫০, ১১ অ ১৯৮০ : ৪৫-৫১, স
দীপক মজুমদার
অনুভব ৩১, ১৬. ২২ ফে ১৯৬৪ : ২০৪, ক
অর্থময়তার জন্যে ৩৭, ৪৮, ২৬ সে ১৯৭০ : ৮৫৪, ক
কলকাতায় প্রথম আন্তর্জাতিক ক্ষিপ্ত—দর্শন উৎসব ৪৫, ২১, ২৫ মা ১৯৭৮ : ৬১-৬৫, স
চতুর বসন্ত ২৪, ২৪, ১৩ এ ১৯৫৭ : ৭৩৫, ক
চীৎকার ২৯, ১৬, ১৭, ফে ১৯৬২ : ২১৮, ক
ছড়া : আমেরিকা ৩৪, ৪৯, ৭ অ ১৯৬৭ : ৯৫৩, ক
ছুটি ৫০, ৩৫, ২ জু ১৯৮৩—৫১, ১, ৫ ন ১৯৮৩, রম্য
দুটি কবিতা ৩০, ১, ৩ ন ১৯৬২ : ৩১, ক
ব্যারিটোন শা ১৯৬৩ : ৬৮, ক
যদি ৩৪, ৪১, ১২ আ ১৯৬৭ : ১২২, ক
সনেট সুন্দরবন ৪৬, ৪৫, ৮ সে ১৯৭৯ : ৩৯, ক
দীপক মজুমদার, অনু
প্রতীক্ষা ৩০, ২৭, ৪ মে ১৯৬৩ : ১৬, ক
ভব্যতা ৩০, ২৭, ৪ মে ১৯৬৩ : ১৬, ক
দীপক রায়
এই পীচে ৫০, ৩, ২০ ন ১৯৮২ : ২৬, ক
নিমন্ত্রণ ৪৭, ৪৭, ২০ সে ১৯৮০ : ১৪, ক
প্যারাসুট ৪৯, ৮, ২৬ ডি ১৯৮১ : ২৯, ক
বিদায় ৪৬, ৩০, ২৬ মে ১৯৭৯ : ৩৯, ক
শিকারা ৪৯, ৩১, ৫ জুন ১৯৮২ : ২৭, ক
দীপক সেন
দুর্গা মহিষমর্দিনী শা ১৯৫৯ : ১৩১-১৩২, স
দীপঙ্কর ঘোষ
লণ্ডনে ভারত উৎসবের চারটি মাস ৪৯, ৫১, ২৩ অ ১৯৮২ : ১৬-২১, স
লণ্ডনের চিঠি ৫০, ২৯, ২১ মে ১৯৮৩ : ৫৫-৫৬ ; ৫০, ৩৭, ১৬জু ১৯৮৩ : ৬২-৬৩, স
দীপঙ্কর চক্রবর্তী
আশ্চর্য মানুষ পিকাসো ৪২, ৩৭, ১২ জু ১৯৭৫ : ৮৪৩-৮৪৪,স
দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ৪৫, ৫২, ২৮ অ ১৯৭৮ : ২৫-৩০, স
পুরনো রীতি নতুন যোজনা ২৬, ৪২, ১৫ আ ১৯৫৯ : ১৬১-১৬৭
বিজ্ঞান ও ধর্ম ৫০, ৩৫, ২ জু ১৯৮৩ : ৪৯-৫২
বক্রেশ্বরের উপাখ্যান ২৫, ১৬, ১৫ ফে ১৯৫৮—২৫, ১৭, ২৩ ফে ১৯৫৮, স
ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক ঘরানা ৩৯, ১৪, ৫ ফে ১৯৭২—৩৯, ১৫, ১২ ফে ১৯৭২
শিক্ষাসংস্কার ও মাতৃভাষা ৪০, ২২, ৩১ মা ১৯৭৩ : ৮৩৭-৮৪০
দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় অনু
আর্ট ও সমকালীন পৃথিবী ৪১, ৯, ২৯ ডি ১৯৭৩ : ৭৮৩-৭৯০
দীপঙ্কর দাশগুপ্ত
প্রতিদিন হায় ২২, ৩৬, ৯ জু ১৯৫৫ : ৮০৮, ক
শুচিস্মিতা ২৪, ৩৫, ২৯ জুন ১৯৫৭ : ৭৪০, ক
দীপঙ্কর দাস
সাঁকো ৪৮, ২৮, ১ আ ১৯৮১ : ৯-১৬, গ
স্বজন ৫০, ৪০, ৬ আ ১৯৮৩ : ৩৩-৩৬, গ
দীপঙ্কর বিশ্বাস
স্মৃতির কিশোরী ৪৬, ৪৬, ১৫ সে ১৯৭৯ : ৩৪ ক
দীপঙ্কর রায়
মুমূর্ষু মহানগরী কলকাতা ৩০, ১৫, ৯ ফে ১৯৬৩ : ১৪১-১৪৬, স
দীপঙ্কর শ্রী অরবিন্দ। দিলীপকুমার রায় ৩৯, ৪১
দীপনারায়ণ দত্ত
ফসল : পাখি ২৪, ৩৫, ২৯ জুন ১৯৫৭ : ৭৪০, ক
দীপশিখা। নরেন্দ্রনাথ মিত্র শা ১৯৬৪
দীপা গোস্বামী
রাজধানীতে চাট-সন্ধানী ৩২, ৩৯, ৩১ জু ১৯৬৫ : ১৩৪৫-১৩৪৮, স
দীপা চট্টোপাধ্যায়, ৩০, ৪
দীপা সেন
এই নির্মল খাঁচায় ৩৬, ৪৯, ৪ অ ১৯৬৯ : ৯৬৭, ক
দীপান্বিতা। সুনীলচন্দ্র সরকার ২৩, ২
দীপান্বিতা ভট্টাচার্য
সন্ধ্যারাগ ২৮, ৯, ৩১ ডি ১৯৬০ : ৬৬০, ক
দীপালী গোস্বামী
লাল পলাশ ২১, ১৫, ১৩ ফে ১৯৫৪ : ১০০-১০৩, গ
দীপালী দত্তরায়
অ্যাপেনডিক্স ৪২, ৫১, ১৮ অ ১৯৭৫ : ৯০৯-৯১৫, গ
প্রমোদকর ৪৬, ৪৪, ১ সে ১৯৭৯ : ২১-৩০, গ
বিকল্প ৪২, ৩৭, ১২ জু ১৯৭৫ : ৮১৭-৮২৯, গ
লাল হলুদ সবুজ আলো নেই শা ১৯৭৬ : ১১৯-১৫৪, উ
দীপালী বসু
বিলেতের প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৭, ২২, ২এ ১৯৬০ : ৭০১-৭০৪, স
দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়
গোধূলিতে ২১, ১৪, ৬ ফে ১৯৫৪ : ১৪, ক
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬, ১৮
দীপেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় *দেখুন* বলরাম বসু ও দীপেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
দীপ্তি ও বিয়াত্রিচে। জগন্নাথ চক্রবর্তী ৩২, ১২
দীপ্তি ত্রিপাঠী
কালের সাক্ষী কালের শিক্ষক নবীনচন্দ্র ৩০, ২৮ (সা) ১১ মে ১৯৬৪ : ২৪৯-২৫১
দীপ্তি মল্লিক ৪৪, ২১
দীপ্তিকুমার বিশ্বাস
আসামের কবি যতীন্দ্রনাথ দুয়ারা ২২, ২৪, ১৬এ ১৯৫৫ : ৭৪৩-৭৪৪, স
দীপ্তেন্দু চক্রবর্তী
অপসরণ ২২, ৪৪, ৩ সে ১৯৫৫ : ৩৪১-৩৪৭, গ
দীর্ঘ অবসর। শামসের আনোয়ার ৪৯, ৩৭
দীর্ঘ কবিতার রেখা। দীপক কর ৪৭, ৪৭
দীর্ণ দেবতালয়। গৌরকিশোর ঘোষ ২৪, ২৩
২০০০ খ্রীঃ অব্দে কলকাতা ৪৩, ২৫, ১৭ এ ১৯৭৬ : ৮২৭, সম্পা
দুই অরণ্য। সমরেশ বসু শা ১৯৬৩
দুই আকাশ। মণীন্দ্র রায় ২৭, ১৯
দুই আগুনের মাঝখানে। সুধীর রায়চৌধুরী ২৯, ৪৯
দুই আয়নায় মুখ। আনন্দ বাগচী ২৯, ৪১
দুই আলমারী বই। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ২৪, ২১
দুই আলো। বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯, ৪
দুই ঐতিহাসিক দিবস ৪২, ১৩, ২৫, জা ১৯৭৫ : ৯৫১, সম্পা
দুই কবি : জয়দেব ও রবীন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ২৯, ১৯
দুই কলকাতা ৩৭, ১১, ১৩ জা ১৯৭০ : ১০৬১
দুই কাল দুই কবি। পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৩৯, ২৮ (সা)
দুই কালাধার কাহিনী ৪১, ২৯, ১০ মে ১৯৭৪ : ১৬৯, সম্পা
দুই কুকুর। বুদ্ধদেব বসু, অনু ৩৬, ৩১
দুই গৃহ। মনীশ ঘটক ২৫, ৩৪
দুই ঘর। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৩২, ৩০
দুই চরিত্র। সত্যজিৎ রায় শা ১৯৬২
দুই চরিত্র। সিদ্ধেশ্বর সেন ২৯, ১০
দুই চোখে। শিশিরকুমার দাশ ৪৮, ২৩
দুই জীবন। সুব্রত চক্রবর্তী ৪২, ২৬
দুই দশকের হকি। প্রদ্যোৎকুমার দত্ত বি ১৯৭১
দুই দিক। বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত ৪৪, ৫১
দুই দেশ : শক্তি এবং মানুষ। সমরজিৎ কর ৫০, ৪২—৫১, ১২
দুই দেশের ক্রিকেট। প্রদ্যোৎকুমার দত্ত বি ১৯৭৯
দুই ধর্ম মহাসম্মেলন ৪৫, ৪৯, ৭ অ ১৯৭৮ : ৯, সম্পা
দুই নাম এক সুর। প্রতিভা বসু শা ১৯৬৭
দুই পাহারাঅলা। শক্তি চট্টোপাধ্যায় শা ১৯৬৭
দুই পিতা। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৪২, ৩৯
দুই পৃথিবী। ফণিভূষণ আচার্য ২৪, ২২
দুই বসন্তে। শঙ্খ ঘোষ ২৯, ২১
দুই বিভূতিভূষণ। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪১, ১৫
দুই বৃদ্ধের কাহিনী। অসীম রায় ৪২, ১৪
দুই ভাই। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ৩৭, ১৬
দুই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ। আবু সয়ীদ আইয়ুব ৩৭, ২২
দুই ভূতের গল্প। রতন ভট্টাচার্য ২৯, ১৪
দুই মাতা। সুনীলচন্দ্র সরকার ২৫, ৪২
দুই মৃত্যু। সিন্ধুবাদ ৩০, ৩৯
দুই মেরু। প্রতিভা বসু শা ১৯৮১
দুই যাত্রায় এক ফল। শচীন কর ২৭, ১০
দুই যুগ : অভিনয়। বিমল চক্রবর্তী ৩৭, ৯ (বি)
দুই যুগ : সঙ্গীত। রবি বসু ৩৭, ৯ (বি)
দুই রবীন্দ্রনাথ। নীরদচন্দ্র চৌধুরী ৩৪, ৪০
দুই রাত্রি। সন্তোষকুমার ঘোষ শা ১৯৭০
দুই শতকের ফরাসী সাহিত্য। নন্দদুলাল দে ৩৫, ১৯
দুই শহর। অরুণ বাগচী ২৪, ৪৬
দুই শাখা। ভূপেন্দ্রমোহন সরকার ৩৬, ২১
দুই শিবিরে। বিজয়া মুখোপাধ্যায় শা ১৯৭০
দুই সাংস্কৃতিক দূত। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫, ১
দুই সিংহ। রাজশেখর বসু শা ১৯৫৬
দুই সোনাশিল্পী ও তাদের সোনার কাজ। পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৪৩, ৩৪
দুঃখ ছুঁয়ে আসে। বিজয়া মুখোপাধ্যায় ৪৩, ৩৭

"সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে"

ডক্টর রমা চৌধুরী
এম এ পি এইচ ডি (অক্সফোর্ড)
প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

"বিদ্যা" বা "শিক্ষা" কি—সে বিষয়ে স্বভাবতই বহু মতভেদ আছে বহু দিক থেকেই। এ বিষয়ে একটি প্রধান প্রশ্ন হল —শিক্ষা কি কেবল হবে তাত্ত্বিক, অথবা ব্যবহারিক? সাধারণত শিক্ষাকে প্রথমত এবং প্রধানত বহুলাংশেই তাত্ত্বিক বলেই গ্রহণ করা হয়, ব্যবহারিক অথবা

বৃত্তিমূলক নয়। অর্থাৎ, এ স্থলে বলা হয় যে বিদ্যা বা শিক্ষা হল জ্ঞানবিজ্ঞানের ব্যাপার—তার সম্পর্ক হচ্ছে মস্তিষ্কের সঙ্গে। অন্যদিকে, বৃত্তি হল কাজকর্মের ব্যাপার—তার সম্পর্ক হচ্ছে হস্তের সঙ্গে। কিন্তু মস্তিষ্ক ও হস্ত যে সর্বদা একত্রে যাবে, তার ত কোনো অর্থ বা নিশ্চয়তা নেই। সেজন্য অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, জ্ঞানীগুণিজনেরা কোনোরূপ বৃত্তি না জেনেও যথেষ্ট সাফল্য ও আনন্দেই আছেন। অপর পক্ষে, শ্রমিক-কৃষক প্রভৃতিরা লেখাপড়া না জেনেও ভালো চাষবাস করছেন, বা অন্যান্য কাজ করছেন কৃতিত্ব সহকারে। তা হলে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু ? এই প্রসঙ্গে, আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে সামান্য মাত্র চিন্তা করে দেখতে পারি। আমরা জানি যে, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ আদ্যন্তকাল সাম্য-ঐক্য-সমন্বয়-সামঞ্জস্যের ধন্য দেশ। সেজন্য দেহ-মন-আত্মার সমন্বয়ে গঠিত মানবের ক্ষেত্রে, দেহ, মন এবং আত্মার প্রত্যেকটিরই পরিপূর্ণ বিকাশই ছিল ভারতীয় শিক্ষাবিৎগণের চিরকাম্য। এই কারণে ভারতবর্ষে তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক শিক্ষা ছিল সর্বদাই অঙ্গাঙ্গি বন্ধনে আবদ্ধ। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার্থীকে একটি সুন্দর, সুমধুর নাম দেওয়া হয়েছিল :—"ব্রহ্মচারী।" এরূপ ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে বাস করে শিক্ষা লাভ করতেন এবং উচ্চতম ধর্ম-দর্শন নীতিতত্ত্বাদির জ্ঞানাহরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নানারূপ কায়িক পরিশ্রম করতে হল বাধ্যতামূলকভাবে। (যেমন—তাঁকে সমিধ বা

যজ্ঞকাষ্ঠাদি সংগ্রহ করতে হত ; ভিক্ষা করতে হত ; গোচারণ, অগ্নিসংরক্ষণ প্রভৃতি কার্যও সানন্দে সাগ্রহে করতে হত—এবং অন্যান্য নানা বৃত্তিও শিখে নিতে হত। কারণ, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পরেই ত গার্হস্থ্যাশ্রমে তাঁকে প্রবেশ করতে হত—যেক্ষেত্রে বৃত্তিজ্ঞান অত্যাবশ্যক। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী দেহ-মনের এবং দেহ-আত্মার এরূপ একত্রে সমন্বিত শিক্ষাদানের দ্বারা শিক্ষার্থীবৃন্দের কোনোক্রমেই অমঙ্গল সাধিত হত না—বরং ঠিক তার বিপরীত। দেহের দিক থেকে বৃত্তিশিক্ষা মনের দিক থেকে সাধারণ সাংসারিক বিদ্যাশিক্ষা এবং আত্মার দিক থেকে উচ্চতম আত্মিক আধ্যাত্মিক শিক্ষা পরস্পর বিরুদ্ধ না হয়ে মিলিতভাবে ছাত্রছাত্রীগণের সমগ্র জীবনকে ধন্যাতিধন্য করত। এর একটি দৃঢ়তর, স্পষ্টতর, মধুরতর প্রমাণ হল, নারীদের শিক্ষাপদ্ধতি। সেই যুগে, নরনারীর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিল না : এবং সেজন্য নারীরাও পুরুষদের ন্যায় শিক্ষাদীক্ষার সমান সুযোগ সুবিধা লাভ করতেন, এবং কৃতিত্ব অর্জনও করতেন। এই প্রসঙ্গে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে বিরচিত বাৎস্যায়ণের "কামসূত্রের" নাম উল্লেখযোগ্য। এই সুবিখ্যাত গ্রন্থে, নারীদের অবশ্য শিক্ষণীয় চৌষট্টী কলার কথা বলা আছে :—যথা নৃত্য, গীত, বাদ্য, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি কলাবিদ্যা ((Fine Arts) ; পাককর্ম, সূচীকর্ম, বৃক্ষরোপণ, বৃক্ষপালন, গোসেবা, পশুপালন প্রমুখ সাংসারিক বিদ্যা (Domestic Arts) ; স্থাপত্যবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, নির্মাণবিদ্যা প্রমুখ যন্ত্রবিদ্যা (Mechanical Arts) ব্যায়াম, ক্রীড়াকৌশল, যুদ্ধবিদ্যা প্রমুখ দৈহিক বিদ্যা (Physical Arts) —ইত্যাদি। সত্যই, প্রাচীন যুগের নারীরা যে কত শক্তিধারিণী ছিলেন, যার জন্য তাঁরা এতগুলি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষাও আয়ত্ত করতে পারতেন—যা পরের নবীন এবং বর্তমান যুগের নারীরা আমরাও পারি না—তা ভেবে বিস্ময়ান্বিত হতে হয়।

আমাদের বিশ্ববন্দ্য শাস্ত্রকারগণ বলেছেন :—

"সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।"

"সেই হল বিদ্যা, যা আমাদের মুক্তিদান করে।"

অর্থাৎ যা আমাদের আত্মার অজ্ঞানাবরণ উন্মোচিত করে, মনের অন্ধকার দূরীভূত করে, দেহের দুর্বলতা পরাভূত করে। সেজন্য, বর্তমান ভারতেও পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক, তত্ত্ব ও বৃত্তি, জ্ঞান ও কর্মের নির্বাধ সম্মেলনই চিরকাম্য নিশ্চয়ই।

ওঁ শান্তিঃ

মার্কিন দেশে করেসপন্ডেন্স কোর্স

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible] পড়েছে। [illegible] চিঠির মাধ্যমে কম্পিউটার [illegible]-এর বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করে মার্কিন সমাজের পক্ষে একেবারে 'গ্র্যাজুয়েট'। অর্থাৎ [illegible] একটা চাকরি পেয়েছে। এবং নিজের জন্যে একটা গাড়িও কিনে ফেলেছে।

উইসকনসিন-এর সুনন্দা দত্ত মজুমদার-এর প্রায় একই অভিজ্ঞতা। উইসকনসিন-এ একটা সেমিনার বাড়িতে সুনন্দার সঙ্গে আমার দেখা। ওর গল্পটা ওর মুখেই শোনা যাক।

"সারা আমেরিকা জুড়েই রয়েছে হোম স্টাডি স্কুলস। এ দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এইসব স্কুল থেকে চিঠির মাধ্যমে লেখাপড়া শেখে। আমি এদেশে এসে একটা কথা প্রথমেই বুঝতে পারি। সেটা হল, এদেশে আমার লেখাপড়া কোনও কাজেই আসবে না। আসলে আমাদের দেশের অ্যাকাডেমিক পড়াশোনা এদের কেজো সমাজে কি কাজে লাগবে বলুন? যাই হোক, আমি একটা হোম স্টাডি স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম। এবং এই করেসপন্ডেন্স কোর্সে [illegible] আমি [illegible] মার্কিন [illegible] করেসপন্ডেন্স কোর্সগুলির তুলনা নেই।"

চিঠির মাধ্যমে লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারটা মার্কিন দেশেই বোধহয় সবচেয়ে সফল। নানা ধরনের কারিগরী বিদ্যার শিক্ষা দেওয়া হয় এইসব করেসপন্ডেন্স কোর্স-এর মাধ্যমে।

নিশ্চয় জানতে চাইবেন কিভাবে চিঠির মাধ্যমে লেখাপড়া শেখানো হয়? মূল পদ্ধতিটা কি রকম? সে-কথা শোনা যাক শিকাগোর অলকেশ বর্মনের কাছ থেকে।

"আমি এখানে করেসপন্ডেন্স কোর্স নিয়েছি। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা হল, ওরা আমাকে যা যা যেভাবে লিখতে পড়তে হবে, সেটা পোস্টে পাঠিয়ে দিত। ইন আদার ওয়ার্ডস, দে উড প্রেপেয়ার অ্যান্ড মেল লেসন্স। এছাড়া ওরা ভিশুয়াল এডস এবং টেপ রেকর্ডেড লেসন্স-ও পাঠাতো। তারপর আমি আবার চিঠিতে আমার প্রশ্নোত্তর পাঠিয়ে দিতাম ওদের [illegible] জন্যে। এখন [illegible] বাড়িতে বসে চিঠিতে [illegible] পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রি পেলাম। তারচেয়ে বড় কথা, সেই ডিগ্রির কিছু একটা দাম আছে। সেই ডিগ্রির ভিত্তিতে আমার চাকরিতে উন্নতি হয়েছে।"

করেসপন্ডেন্স কোর্স-এর জন্ম আসলে বলা চলে ইংল্যান্ডে। ১৮৪০ সালে শর্টহ্যান্ডের জনক আইজ্যাক পিটম্যান চিঠির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের শর্টহ্যান্ড শেখাতে শুরু করেন। এইভাবেই শুরু হয় করেসপন্ডেন্স কোর্স-এর চল। ফ্রান্সে চিঠির মাধ্যমে শিক্ষাদান শুরু করেন চার্লস তুঁস আর জার্মানিতে গুস্তাভ ল্যাঙ্গেনশিট। ১৮৭০ সালে করেসপন্ডেন্স কোর্স-এর বিপ্লব ঘটালেন টমাস জে ফস্টার। পেনসিলভ্যানিয়ার কয়লাখনিতে শ্রমিকদের নিরাপত্তা কিভাবে রক্ষা করা যাবে, সেই বিষয়ে তিনি শুরু করলেন করেসপন্ডেন্স কোর্স। ফস্টার-এর এই বিপ্লবই স্ক্র্যান্টন-এ প্রথম আন্তর্জাতিক করেসপন্ডেন্স স্কুলের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলো।

[illegible] ১৮৭৩ সালে [illegible] করেসপন্ডেন্স কোর্স প্রথম শুরু হয় ১৮৭৪ সালে। আরও বিস্তৃতভাবে প্রোগ্রাম শুরু করেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলিয়াম রেনে হার্পার।

এ-যুগে অবশ্য করেসপন্ডেন্স কোর্স-এর ভূমিকা এবং চরিত্র অনেক পাল্টেছে। উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এ আই এম বা আর্টিকিউলেটেড ইনস্ট্রাকশনাল মিডিয়া প্রজেক্ট কিন্তু একেবারে নতুন ধরনের করেসপন্ডেন্স কোর্স যার মধ্যে রেডিও ব্রডকাস্ট থেকে শুরু করে ফিল্মস্ট্রিপ, সব কিছুর অবদানই রয়েছে। বলা যেতে পারে এ আই এম করেসপন্ডেন্স কোর্স-এর নতুন যুগ সূচিত করেছে। আমাদের দেশেও এ আই এম-এর প্রভাব আসছে।

হতাশার নিরালোক দীপটিতে সাফল্যের আলোর ছোঁয়া

কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়

এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে

দেশ বিভাগ নয়। দাঙ্গা নয়। আজ থেকে একচল্লিশ বছর আগে এক বাঙালী যুবক পরমেশচন্দ্র গোস্বামী ঘর ছেড়েছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। পিতা দিনেশচন্দ্র গোস্বামীর শরীরে জমিদার বংশের রক্ত। তিনি চেয়েছিলেন অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিং জেলার উস্তি গ্রামে ছেলেকে আটকে রাখতে। পরমেশচন্দ্র গোস্বামীর তখন আঠারো বছর বয়স। ঐ সময় আজাদ হিন্দ ফৌজ ইঙ্গ-মার্কিন সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল দখল করেছে, উড়িয়ে দিয়েছে ভারতের জাতীয় পতাকা। আসামের কোহিমা শহর আর কাছাড় জেলার শিলচর শহরের কাছে বিষেণপুরও আজাদ হিন্দ ফৌজের দখলে। ভারতের অভ্যন্তরেও ব্যাপক জন জাগরণের ঢেউ স্বাধীনতার জন্য ফুঁসে উঠেছে। এই অবস্থার মধ্যে ভয়ঙ্কর আঠারো বছর বয়সের মানসিকতা ধীরে ধীরে তৈরী করে নিয়েছে নিজেকে। স্বাধীনতা আসন্ন। এর পরে দেশকে স্বনির্ভর হতে হবে। রামচন্দ্রের সেতু বন্ধনে কাঠবিড়ালীরও ভূমিকা ছিল। পরমেশচন্দ্র মনে মনে ভেবেছিলেন এই দেশকে গড়ে তুলতে হবে সমষ্টির উন্নয়নের মাধ্যমেই। পুত্রের এই মানসিকতার মূল্যায়ন করতে পারেননি পিতা দিনেশচন্দ্র। এই নিয়ে মত বিরোধ। পরে তীব্র মনোমালিন্য। ফলে পরমেশচন্দ্র একদিন কাউকে না জানিয়েই গ্রাম ছেড়ে পাড়ি দিয়েছিলেন সুদুর বম্বে। সহায় সম্বলহীন আঠারো বছর সেদিন পথ চলতে কোথাও থেমে যায়নি। কিছুদিন মিলিটারিতে তারপর কিছুদিন নেভিতে চাকরি করে তিনি বম্বেতে ডাঃ ভাটিয়ার কমার্শিয়াল কলেজে কাজ করতে শুরু করেন। পশ্চিমের রাজ্যগুলিতে তখন শিল্প বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার লাভ ঘটছে। সেখানে তখন সমৃদ্ধির সূর্যোদয়।

ভি· টি· কলেজ

কমার্শিয়াল কলেজে কাজ করতে করতে পরমেশচন্দ্রের মনের গভীরে বহুমুখী একটা প্রতিষ্ঠান গড়ার স্বপ্ন বাসা বাঁধতে থাকে। যে প্রতিষ্ঠানে থাকবে কারিগরি শিক্ষা থেকে শুরু করে বিজ্ঞান কলা বাণিজ্য শেখার ব্যবস্থা। বহু ভাষার প্রসারের জন্য বাস্তবমুখী মহাবিদ্যালয় গড়ারও পরিকল্পনা ছিল তাঁর। স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার আশায় তিনি একক প্রচেষ্টায় ভি টি কলেজ অফ কমার্স নাম দিয়ে জন্ম দিলেন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। বম্বের ফেয়ার রোডে একটি ঘর ভাড়া নিলেন। রোজ পাঁচ টাকা। সম্বল তখন একটি মাত্র টাইপ মেশিন। তবু ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছিল। প্রতিষ্ঠানটি বড় হচ্ছিল একটু একটু করে।

বেশিদিন সেখানে কাটাতে পারলেন না তিনি। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা যে আসলে ভারতবাসীর রাজনৈতিক ঐক্য এবং সাংস্কৃতিক মৈত্রী বন্ধনকে দ্বি-জাতি তত্ত্বের কুঠারে দু' টুকরো করার নিষ্ঠুর চাল তা অনুভব করে চরম আঘাত পেলেন পরমেশচন্দ্র। কাতারে কাতারে উদ্বাস্তু এসে জমা হচ্ছিল পশ্চিম বাংলায়। দিকে দিকে রুটি কাপড় আর বাসস্থানের জন্য হাহাকার। তাঁর বাঙালী মনের বাড়ি ফেরার টান হয়ত তখন প্রবল হয়ে উঠেছিল। তিনি ফিরে এলেন। যুক্তিবাদী চিন্তা ভাবনা তাঁকে তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধানে জাদুকরের ভূমিকায় অবতীর্ন করল না। তিনি বুঝেছিলেন যুবশক্তিকে অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচাতে হলে, দেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে হলে অর্থনৈতিক কাঠামো দৃঢ় করার দরকার। ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ তখন ছিল প্রধানত কৃষিনির্ভর। কিন্তু শিল্প ও কৃষির যদি সুসমঞ্জস সহাবস্থান না ঘটে তা হলে অর্থনৈতিক দৃঢ়তা আসা অসম্ভব। তিনি আরও অনুধাবন করেছিলেন শিল্প মানে শুধু ভারী শিল্পই নয় অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে তুলতে গেলে পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্পকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু যেখানে নিত্য হাহাকার কেবলমাত্র টিকে থাকবার জন্যই, সেখানে ব্যয়বহুল শিক্ষায় শিক্ষিত হতে বলা অনেকটা উপোসী মানুষকে কেক খাবার পরামর্শ দেয়া।

ঈশ্বর যখন কাউকে দিয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ করাবার কথা ভাবেন তখন সেই ব্যক্তিকে বিশেষ আত্মবিশ্বাস দেবার ব্যাপারে যথেষ্ট অকৃপণ হয়ে থাকেন। পরমেশচন্দ্র ফিরে এলেন শিয়ালদা স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলে। তাঁকে তখন প্রতিদিনই দেখা যেত শিয়ালদা স্টেশনে চিৎকার করে হ্যাণ্ডবিল বিলি করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। 'মাত্র এক টাকায় টাইপ শেখানো হয়', 'মাত্র দু' টাকায় শর্টহ্যাণ্ড শেখানো হয়।' শিয়ালদা স্টেশনের কাছাকাছি অঞ্চলে এক হোটেল মালিক সর্দারজীর সহায়তায় তিনি পেয়েছিলেন ছোট্ট একটি বারান্দা। একদিন সেখানে ঘর হল। টুলের বদলে জায়গা দখল করে নিল চেয়ার। একটি মাত্র টাইপ মেশিন দুই তিন চার করে ক্রমে বেড়েই চলল।

তখন থেকেই ১২, ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জি রো, কলকাতা-৯ ঠিকানায় গোড়া পত্তন হল রয়েল কলেজের। প্রতিষ্ঠানটি ধীরে ধীরে ছোট চারা গাছ থেকে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে ছড়িয়ে পড়ল কলকাতার বুকে। ৬/১ ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জী রো, কলকাতা-৯/ ৫, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩/ ১৪৩, সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড, খিদিরপুর : কলকাতা-২৩-এ রয়েল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের নতুন ঠিকানা হল। তারও অনেক পরে পরমেশচন্দ্র ১৯৬৮ সালে কলকাতায় ১৫৪, বৌবাজার স্ট্রীটে প্রতিষ্ঠা করলেন ভি টি কলেজ। পরমেশচন্দ্র মনে করতেন শিক্ষা মানে এই নয় যে পুঁথিগত বিদ্যার চর্বিত চর্বন। দার্শনিক প্রজ্ঞা বলে জীবন এক অন্তহীন সংগ্রাম। তিনি ভেবেছিলেন—জীবন একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ। এই পারমাণবিক যুগে সভ্যতা যখন মহাকাশে খুঁজে নিতে চাইছে নিজস্ব অস্তিত্ব তখন এই

প্রতিষ্ঠাতা পরমেশচন্দ্র গোস্বামী

চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার প্রধান হাতিয়ার হল শিক্ষা, এবং সে শিক্ষা হাতে কলমের শিক্ষা। এই শিক্ষায় শিক্ষিত কারিগরের দল দেশ জুড়ে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে যেমন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে দৃঢ় করতে পারে তেমনই পারে অস্তিত্ব রক্ষার প্রতিযোগিতায় ভাগ্য লক্ষ্মীর বরমাল্য জিতে নিতে।

সেই পথ লক্ষ্য করে…

মাত্র চুয়ান্ন বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন পরমেশচন্দ্র। সুখের বিষয় তিনি যাবার আগে বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর যৌবনের স্বপ্ন আরো বহুকাল বাস্তবায়িত হতে থাকবে কর্মধারার বহু বিচিত্র গতি পথে। বাইরে বিরাট কর্মযজ্ঞে মেতে থাকলেও ঘরের দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল সমান। ছেলে গোপালচন্দ্র লেখাপড়ায় ভালো হলে কি হবে ভয়ানক দুরন্ত। তাঁর দুরন্তপনার বাড়ির লোক অতিষ্ঠ, পাড়া প্রতিবেশীও। স্নেহশীল পিতা পুত্রকে নিজের চোখের সামনে রেখে দেখাশুনো করবার জন্য রোজই নিয়ে আসতেন অফিসে। সেখানে বসে দুরন্তপনা করার সুযোগের অভাবে গোপালচন্দ্রর মনে হত তিনি বন্দীজীবনযাপন করছেন। প্রথম প্রথম ভালো না লাগলেও নিয়মিত আসতে আসতে এক সময় অফিসে আসাটাই অভ্যাস হয়ে গেল। ইতিমধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি কম পাশ করলেন তিনি। খুব কাছ থেকে বাবার কাজের পদ্ধতি লক্ষ্য করতে করতে তাঁর মনেও নতুন চিন্তার চারা ডালপালা মেলতে লাগল। পুরুষশাসিত এই সমাজে মেয়েদের আত্মবিকাশের সুযোগ এখনো ব্যাপক নয়। যে সমস্ত মেয়েরা ঘর গৃহস্থালীর কাজ করেই গোটা জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন, যাঁরা বাইরে বেরুবার সুযোগ পান না তাঁদের জন্য কিছু করার কথা চিন্তা করলেন তিনি। এ ছাড়া আরও একটা কথা মনে হয়েছিল তাঁর, দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা বেশি—সেই সব লোকেদের কাছেও পৌঁছন দরকার।

গোপালচন্দ্র তাঁর চিন্তা ভাবনার কথা পরমেশচন্দ্রকে জানালেন না। কেউ জানতেও পারল না সেদিনের তেইশ বছরের যুবকই পূর্ব ভারতে একটি বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতি চালু করার প্রথম পথ প্রদর্শক হবেন। মূলধন নেই অথচ দরকার একটি স্থায়ী আশ্রয়ের। ঠিকানার। যেখান থেকে চিন্তা ভাবনার স্থায়ী রূপায়ণ করা সম্ভব হবে। ১৯৭৮ সাল। গোপালচন্দ্র ভাড়া নেবার উদ্দেশ্যে বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে উপস্থিত হলেন সোদপুরের রামচন্দ্রপুর-এ। আলাপ হল দেবব্রত ভট্টাচার্য নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। কথায় কথায় উদ্দেশ্য জানালেন তিনি।

পরিকল্পনার কথা শুনে উৎসাহিত করলেন দেবব্রতবাবু। নামমাত্র ভাড়ায় তাঁর বারান্দাটি ছেড়ে দিলেন। শুধু তাই নয় কাজ শুরুর সময় অকারণ বেতন দিয়ে কর্মচারী রাখায় বাধা দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেন, তিনি এবং তাঁর স্ত্রী যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। সেদিন থেকে শুরু হল গোপালচন্দ্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী ডাকযোগে শিক্ষার কোর্স।

প্রতিষ্ঠানের নাম **সেন্ট টমাস কলেজ**, রামচন্দ্রপুর, সোদপুর, ২৪ পরগণা। তারপর থেকে আর থামা নয়। তাঁর বিজয়রথ এগিয়ে চলতে, থাকে স্বপ্ন তোরণের দিকেই। এর পর একে একে গড়ে ওঠে ১৯৭৯ সালে **সিস্টার নিবেদিতা কলেজ**। ১৩৭ বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলকাতা-৪/ ১৯৮০ সালে **উইলিয়ম কেরী কলেজ অফ এডুকেশন**, ১৪৩, সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোড, কলকাতা-২৩/ ১৯৮১ সালে **ডাঃ বি সি রায় কলেজ অফ এডুকেশন**, ১২ বিপিন পাল রোড, কলকাতা-২৬/ **ডেভিড হেয়ার কলেজ অফ করেসপণ্ডেন্স**, মার্কেন্টাইল বিল্ডিং ব্লক-সি (১০/১ এফ), ৯/১২ লালবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-১, ১৯৮২ সালে **অল ইন্ডিয়া করেসপণ্ডেন্স কোচিং ইনস্টিটিউট**, রামচন্দ্রপুর, সোদপুর/ ১৯৮৪ সালে **অক্সফোর্ড কলেজ অফ এডুকেশন**, ৭১/১এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯।

পরমেশচন্দ্র দেখে গিয়েছিলেন তাঁর পুত্রের চিন্তাধারার জয়যাত্রা। পিতার মৃত্যুর পর গোপালচন্দ্র গোস্বামী তুলে নিয়েছেন পিতার কাজের দায়িত্বভার। সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা করছেন অধ্যক্ষ হয়ে। এরই মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ পাশ করেছেন। গৌহাটি থেকে পাশ করেছেন কস্টিং। কোন্নগরের হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম ডি এইচ করে, হোমিওপ্যাথি মেডিসিনে এস এম পি করেছেন। এই ব্যাপক কর্মযজ্ঞের পুরোহিত হয়ে প্রতিনিয়তই মা স্ত্রী ভাই বোন সকলের কাছ থেকেই প্রেরণা পাচ্ছেন। বাড়ির সকলের কেবল একটাই মাত্র অভিযোগ তাঁরা চান আর একটু কম পরিশ্রম করুক গোপালচন্দ্র। কিন্তু গোপালচন্দ্র তো এখন শুধুমাত্র তাঁর পরিবারের সদস্য নন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষ এমন কি ভারতের বাইরেরও সেই মানুষের আত্মার আত্মীয় যাঁরা হতাশার অন্ধকারে তলিয়ে না গিয়ে খুঁজে পেয়েছেন বেঁচে থাকার অনির্বাণ আলো। চরৈবেতি মন্ত্রের শক্তি যাঁদের পথ চিনিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

বর্তমান কর্ণধার গোপালচন্দ্র গোস্বামী

প্রয়োজন বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শুধু মাত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করেই ক্ষান্ত হননি। ভারতবর্ষে যে এক সময় উন্নত কারিগরি শিক্ষার প্রেক্ষাপট ছিল, যে সব কুশলী কারিগরের জন্ম হয়েছিল এই দেশে শোষণের নির্মম কাঁচি চালিয়ে তা নির্মূল করে দেয়া হল। তাঁদের কারখানায় তৈরী চটকদার পণ্যের কাছে আমাদের দেশের কারিগরদের তৈরী পণ্য অসম প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পেরে ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ল। তৈরী হল বিলাতি পণ্যের মোহমুগ্ধ করণিক কুল। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে আজ দারিদ্র প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যে অবশ্য প্রয়োজন তা উপলব্ধি করতে দেরী হয়ে গেছে অনেক। দেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলনে শিক্ষার পরিকল্পনায় বুনিয়াদী প্রাথমিক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শৈশব শিক্ষার প্রথম থেকেই যাতে শিশুরা কারিগরি শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারে এ জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকরা গ্রহণ করেছেন দায়িত্ব ভার। এর পাশাপাশি সরকারী ও বেসরকারী কারিগরি শিক্ষার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পরমেশচন্দ্র বুঝেছিলেন ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত যুবসমাজ—যাঁদের কাছে নেই ভবিষ্যতের কোন প্রতিশ্রুতি, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁদের যথার্থ শিক্ষিত করে তুলতে পারলে অসামাজিক আচরণে লিপ্ত হওয়ার বদলে তাঁরাই গড়ে তুলবে নতুন ভারত। পিতার মত গোপালচন্দ্রও মনে করেন কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন হলে চাকরি ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত ভিড় ধীরে ধীরে কমে যাবে। স্বনির্ভরতার শক্ত পাটাতনে দাঁড়িয়ে আজকের নাগরিক এগিয়ে যাবে একবিংশ শতাব্দীর দিকে।

বিশাল কর্মযজ্ঞের পরিচালনা

রয়েল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এবং জি টি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অগ্রণী প্রতিষ্ঠান। সেই স্বাধীনতার পূণ্যলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত তাঁরা যথাসম্ভব স্বল্পব্যায়ে এবং অল্প সময়ে তত্ত্বগত এবং হাতে কলমে দু'ভাবেই কারিগরি শিক্ষা দিয়ে আসছেন। সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রত্যেক কলেজেই একজন ইনচার্জ আছেন। যিনি ছাত্র ছাত্রী ভর্তি করা ছাড়াও অন্যান্য প্রাথমিক কাজ দেখাশুনা করেন। প্রতিদিনের কাজের ভিত্তিতে রিপোর্ট দাখিল করা হয় মূল কেন্দ্রে অধ্যক্ষের কাছে। যে কোন বিষয়ে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নেয়ার এবং শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব অধ্যক্ষের।
কলেজগুলি খোলা থাকে সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত। দু ঘন্টা অন্তর অন্তর বিভিন্ন শিফটে ভিন্ন ভিন্ন কোর্সের ক্লাস নেয়া হয়। ছাত্র ছাত্রীদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলবার জন্য প্রতিটি বিষয়ের উপরে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকেরা নিযুক্ত আছেন। এ ছাড়া প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক বিষয়ের বিভাগীয় প্রধান সপ্তাহে একবার করে পরিদর্শন করে আসেন।

ডাক বাহনে একাসনে বিশ্বকর্মা সরস্বতী

কেন্দ্রীয় সরকারের বিশ দফা কর্মসূচীর দফা নম্বর ১৬-তে বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূর করার উল্লেখ আছে। বয়স্কদের স্বাক্ষর করার বিষয়টি ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ন্যূনতম চাহিদা পূরণ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ডাক যোগে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলনের মাধ্যমে গোপালচন্দ্র যে শুধু মাত্র বয়স্ক শিক্ষার প্রসারে দেশসেবা করছেন তা নয়, গৃহবধূ থেকে চাকরিজীবি সর্বস্তরের মানুষের বড় হবার আকাঙ্খা পূরণ করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে, বলিষ্ঠ উত্তর দিয়েছেন সংকটময় এক সামাজিক প্রশ্নের।
ডাকযোগে পঠনপাঠন ব্যবস্থার মধ্যে সাধারণ স্কুল কলেজের শিক্ষা থেকে বৃত্তিমূলক সব কিছুই যোগ করা হয়েছে। শিক্ষক যেমন করে ক্লাসে পড়ান ঠিক সেই পদ্ধতিতে পাঠক্রম ছাপিয়ে শিক্ষার্থীকে পাঠিয়ে দেয়া হয়। বাড়িতে অনুশীলনের পরে পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ফেরত এলে যত্নের সঙ্গে পরীক্ষার পর তা আবার পাঠিয়ে দেয়া হয়। কখনও সম্ভাব্য ক্ষেত্রে মাসে একবার শিক্ষার্থীকে সশরীরে এসে হাজিরা দেবার অনুরোধ জানানো হয়। এই বিভাগে যেখানে হাতে কলমে শিক্ষার প্রয়োজন সেখানে চার্ট, ডায়াগ্রাম, গ্রাফ এঁকে এবং সাংকেতিক শব্দের প্রয়োগে পাঠ্য বিষয়কে পৌঁছে দেয়া হয় শিক্ষার্থীর কাছে। পরমেশচন্দ্র অনুভব করেছিলেন বাজারে এমন কোন বই নেই যা সহজে শিক্ষার্থীকে পাঠ্যসূচীর গভীরে নিয়ে যেতে পারে। এই অভাব বোধ থেকে উদ্যোগী হয়ে নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে রচনা করেছিলেন বিভিন্ন বিষয়ের উপর বেশ কয়েকটি বই যা শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠক্রমকে আরও সহজ এবং গ্রহণযোগ্য করে তাঁদের উন্নতির পথকে সুগম করেছে।

কালার টেলিভিশনের পাঠ

ডাকযোগের শিক্ষায় একই সঙ্গে বিশ্বকর্মা এবং সরস্বতী পৌঁছে যাচ্ছে পশ্চিম বাংলার প্রতিটি শহরে গ্রামে। নাগাল্যাণ্ড, আন্দামান, অরুণাচল, গুজরাট, বিহার, তামিলনাড়ু এক কথায় আসমুদ্র হিমাচল ভারতের প্রতিটি প্রদেশেই এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারিত হচ্ছে দিন দিন। দেশের গণ্ডী ছেড়ে এখন তা পাড়ি দিয়েছে লণ্ডন, সৌদি আরব—আরও অন্যান্য দেশে। ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি প্রধান শহরগুলিতে যেখানে শিক্ষার্থী আছেন সেখানেই আছে পরীক্ষা কেন্দ্র। সংখ্যায় আনুমানিক একশো পঁচাত্তরটি। খাতা এবং প্রশ্নপত্র পাঠিয়ে স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক অথবা গেজেটেড অফিসারের অধীনে পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা আছে। এই কলেজ থেকে শিক্ষালাভ করে ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তে এবং বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছেন প্রাক্তন শিক্ষার্থীর দল। যাঁরা অনেকেই আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার্থী হিসেবে এসে শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানকে ভালোবেসে এখানেই থেকে গেছেন এমন দৃষ্টান্তও আছে। এমনই একজন কিরণশঙ্কর চৌধুরী। যিনি ছত্রিশ বছর আগে টাইপ শিখবার জন্য ভর্তি হন। রয়েল কলেজের প্রথম দিকের ছাত্র। এখান থেকেই শেখেন জার্মান, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান, উর্দু ভাষা। বাংলা, ইংরেজী, হিন্দি তিনটি ভাষাতেই শর্টহ্যাণ্ড শিখেছেন। ছাত্র হিসেবেও প্রিয় ছিলেন এখন এই কলেজের অধ্যাপক হিসেবেও প্রিয়। পুরনো দিনের ছাত্র বর্তমানে ইনচার্জ এবং টাইপ ও শর্টহ্যাণ্ডের শিক্ষক যথাক্রমে ইস্তাক আহমেদ খান এবং সুশীল দত্ত। মীরা সেনগুপ্তও পুরনো দিনের ছাত্রী। বর্তমানে সিস্টার নিবেদিতা কলেজের ইনচার্জ। এই রকম উদাহরণ আছে অনেক। এই প্রতিষ্ঠানের আজ যাঁরা শিক্ষার্থী তাঁরাও আগামী দিনের দেশ গড়ার কারিগর। এভাবেই পরবর্তী দিনগুলিতে এই কলেজ থেকেই তৈরি হবে সুশিক্ষিত স্বনির্ভর জাতি ও প্রজন্ম, যাঁরা হবেন ভবিষ্যত ভারতের ভিত্তি ফলক। উদ্যোগী পুরুষ গোপালচন্দ্র মনে করেন সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান দিকে দিকে যত গড়ে ওঠে ততই মঙ্গল। তাতে আরও ছাত্র ছাত্রীর উপকার হবে। যে পরিমাণ ছাত্রছাত্রী বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠানে আসছেন তাঁদের সবাইকে জায়গা দেয়া সম্ভব হচ্ছে

টেলিফোন অপারেটিং

হাতেকলমে অটোমোবাইল

টাইপরাইটিং শিক্ষা

না। আরো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে সমাজের উপকারই হবে। এই সংকটময় সামাজিক পরিস্থিতিতে তিনি মনে করেন সমাজের প্রতি তাঁরও দায়িত্ব আছে। তিনি চান সর্বস্তরের যে সমস্ত শিক্ষার্থী এই প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষালাভ করবেন তাঁরা যেন প্রয়োজন হলে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে গিয়ে কখনও পিছু হটে না আসেন। তাই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি। সম্প্রতি তাঁর সহোদর পার্থপ্রতিম গোস্বামী ভিন্ন ধরনের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে এসে যোগ দিয়েছেন এই প্রতিষ্ঠানে। ঐতিহ্যকে ধরে রাখবার টানে। শিক্ষার্থীদের সুস্থ সুন্দর খোলামেলা পরিবেশের মধ্যে শিক্ষাদানের বিষয়ে প্রতিনিয়ত চিন্তা করেন গোপালচন্দ্র। কিন্তু সাধ ও সাধ্যের মধ্যে বিস্তর ফারাক। আরও এক স্বপ্ন তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন। এই জাতীয় আরও কলেজকে স্বীকৃতি দিয়ে সেদিন গড়ে তোলা হবে ব্যাপক কাজের পরিকল্পনা। ভারতবর্ষের প্রতিটি অঞ্চলে গিয়ে সেখানে তিন মাস অথবা ছ' মাসের জন্য ক্যাম্প করে স্থানীয় মানুষদের হাতে কলমে কাজ শেখানো হবে। কলেজের প্রশংসা করে বহু গুণীজনের এবং ক্ষমতাসীন মানুষের পাঠানো শুভেচ্ছাপত্র গোপালচন্দ্রের কাছে আছে। শুধু প্রশংসা নয় তাঁর স্বপ্ন সার্থক হতে পারে সরকারের স্বীকৃতি জায়গা এবং অর্থকরী অনুদান পেলেই। পিতা পরমেশ চন্দ্রের মত গোপালচন্দ্রও থেমে থাকতে জানেন না। শ্রম অধ্যবসায় ও গড়ে তোলার উচ্ছ্বাসে তিনি নিরলস। সতত চেষ্টা করে চলেছেন ম্লান মূক মুখগুলিতে ভাষা ফোটাতে। এই সব স্তব্ধ বুকে আশার অনুরণন জাগিয়ে তুলতে। তাঁর স্বপ্ন হল এদের অন্তরের নিরালোক দীপটিতে তিনি নিজের হাতে আলোর ছোঁয়া দেবেন।

কে কী বলেন

একুশ বছরের শেখর চ্যাটার্জী থাকেন সালকিয়া, হাওড়ায়। বি এস-সি পাশ করার পরে এখন ল' পড়ছেন। বিদেশ যাবার ব্যাপারে একটা যোগাযোগ হয়ে আছে আগে থেকেই। হামবুর্গে যাবার জন্য পাশপোর্টের দরখাস্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই দরখাস্ত করেছেন ভি টি কলেজে স্পোকেন ইংলিশ কোর্সে ভর্তি হবার জন্য। বিদেশে যেতে হলে ইংরেজী বলাটা ভালোভাবে রপ্ত না করলে সেখানে গিয়ে অসুবিধা হবে বলেই এই কোর্সে ভর্তি হওয়া। সেসন এখনও শেষ হয়নি। তবে আশা করছেন সেসন শেষ হওয়ার আগেই ইংরেজিতে কথা বলাটা রপ্ত করে ফেলবেন। কথাটা জানিয়েই মৃদু হেসে বললেন : অবশ্য এটা সম্ভব হবে কলেজের শেখানোর পদ্ধতির গুণে আর আমাদের যিনি শিক্ষক তাঁর চেষ্টায়।'

বেহালার সুতপা চক্রবর্তী জিওলজিতে অনার্স নিয়ে আশুতোষ কলেজ থেকে পাশ করেছেন। বাইশ বছর বয়স। পাশ করার পর চাকরি পাওয়ার জন্য নিজেকে নানা ভাবে তৈরী করছেন। টাইপ শর্টহ্যাণ্ড শিখে ফেলেছেন। টেলিফোন অপারেটরের কোর্সও শেষ করেছেন কিছুদিন হল। বললেন, 'চাকরির যা অবস্থা সব রকমই শিখে রাখছি। নানা রকম শেখা থাকলে হয়ত একটা চাকরি পেয়েও যেতে পারি। সুতপা এখন ভর্তি হয়েছেন স্পোকেন ইংলিশ কোর্সে। বললেন, বাংলা মিডিয়ামে পড়াশুনা করেছি, ইংরেজীতে কথা বলার অভ্যাস গড়ে ওঠেনি। তাই এখানে ভর্তি হলাম। চাকরির ক্ষেত্র ছাড়া ইংরেজীতে কথা বলতে পারার দাম সব জায়গাতেই। একটু থেমে বললেন, কলেজের শিক্ষক মিঃ এস পি সরকারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। উনি আমাদের যথেষ্ট যত্ন নিয়ে শেখান। বললেন, ইতিমধ্যেই ইংরেজীতে কথা বলবার মত কিছু যোগ্যতা অর্জন করেছি।

নিরঞ্জন চ্যাটার্জী কাজ করেন রেল-এ। থাকেন উল্টোডাঙ্গা। ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা। ছোটবেলা থেকেই ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ব্যাপারে উৎসাহী। ভি টি/ রয়েল কলেজের এক প্রাক্তন ছাত্র নিরঞ্জনবাবুর বন্ধু। বন্ধুর কাছ থেকে সব শুনে এই কলেজে চলে আসেন। ভর্তি হলেন কালার টি ভি ট্রেনিং-এ। তাঁর সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল তখন কোর্স শেষ হতে মাত্র অল্প কদিন বাকি। বললেন, 'আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এই কলেজে ভর্তি হয়ে একটু মন দিয়ে কোর্স শেষ করতে পারলেই শেখাটা সহজ হয়ে যায়। হাসতে হাসতে বললেন, 'আমি এখনই কালার টি ভি তা যে কোন রকম খারাপ হোক না কেন সারিয়ে দেব। নতুন টি ভি বানাতেও পারবো।' বললাম, 'আপনি তো চাকরি করেন। ট্রেনিং নিলেন কেন ? বাড়তি উপার্জনের জন্য ?' নিরঞ্জনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'না না এটা আমার শখ বলতে পারেন। কারও টি ভি খারাপ হলে শুধু যাতায়াত ভাড়া পেলে আর আমার হাতে সময় থাকলে তক্ষুনি চলে যাব।'

ইলিয়ট লেন-এর সফিকুল ইসলাম-এর বয়স কুড়ি বছর। বঙ্গবাসী মর্নিং কলেজে বি এ প্রথম বর্ষের ছাত্র। ভর্তি হয়েছেন টেকনিক্যাল কোর্স অটোমোবাইল-এ। জানালেন ছোটবেলা থেকেই এ ব্যাপারে উৎসাহ আছে। বললাম, 'শুধু উৎসাহের জন্যই ভর্তি হলেন?' সফিকুল বললেন, 'সেটা বললে অবশ্য মিথ্যে বলা হবে। আসলে চাকরির যা অবস্থা দেখছি চেষ্টা করেও যদি শেষ পর্যন্ত না পাই তবে একটা গ্যারেজ খুলবার ইচ্ছে আছে।' আঠারো মাসের কোর্সের মাত্র আট মাস হয়েছে। সফিকুল বললেন, 'থিওরিটিক্যাল ক্লাসগুলি খুব ভালো লাগছে। এক বন্ধুর কাছে শুনে এই কলেজে এসেছি। দেখছি যা শুনেছি সত্যিই তাই। যা শেখানো হয় খুবই যত্ন নিয়ে শেখানো হয়।'

বেলঘরিয়ার অভিজিৎ বসুর বয়স সাতাশ বছর। বাবা নেই। স্কুলে পড়ার খরচটুকু যোগাড় করা সম্ভব ছিল না বলে বাধ্য হয়ে পড়াশুনো ছেড়ে এসে ভর্তি হয়েছেন টেলারিং কোর্সে। বাড়িতে মা দাদা বৌদি। আট মাসের কোর্সের জন্য যাবতীয় খরচ বহন করছেন দাদা। আশা, যদি অভিজিৎ টেলারিং ভালো ভাবে শিখতে পারে তাহলে অভাবের সংসারে একটু সুসার হবে। অভিজিৎ এক বন্ধুর কাছ থেকে শুনেছিলেন এই ভি টি কলেজের কথা। কোর্স শেষ করতে মাত্র কয়েক দিন বাকী। বললাম, 'এই আট মাসে কিছু শিখতে পারলেন?' অভাবী চেহারার মলিন ভাবটা মুছে গিয়ে হঠাৎ ঝকঝকে হয়ে উঠল গোটা মুখটা। বললেন, 'হ্যাঁ। আমি এই আট মাসেই যা শিখেছি তাতে এই কলেজ থেকে বেরিয়ে যেখানেই হোক.কাজ করতে কোন অসুবিধা হবে না।' একটু থেমে নিজে থেকেই বললেন, 'ইচ্ছে আছে একটা ছোটখাট দোকান দেবার।' মনে মনে শুভেচ্ছা জানালাম অভিজিৎকে।

ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইজার-এর দু' বৎসরের কোর্সে ভর্তি হয়েছেন ভবানীপুরের বিশ্বজিৎ রায়। ছাব্বিশ বছরের এই যুবক বাড়ির বড় ছেলে। বাবা চাকরি করেন। আর্থিক অনটনের জন্য পড়াশুনো করতে পারেননি বিশ্বজিৎ। ক্যালকাটা রেসকোর্সে ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টে হেলপারের কাজ করেন। অফিসের পর সন্ধ্যায় আসেন পড়তে। বন্ধুদের কাছে এই কলেজের কথা শুনে এসেছিলেন। মাত্র চার মাস হল, কোর্স শেষ হতে এখনো আরো অনেক দিন বাকী। কলেজ থেকে বেরিয়ে বিশ্বজিৎ আশা রাখেন আরো ভালো চাকরি পাবার। বিশ্বজিৎ আশাবাদী। বললেন, 'এই চার মাসে পড়ানোর পদ্ধতি দেখে মনে হয়েছে এই কলেজের উদ্দেশ্য সৎ। কলেজ শেষ করে আমরা যাতে উন্নতি করতে পারি এইভাবেই সব কিছু শেখানো হয়। কোথাও কোন ফাঁকি নেই।'

কোন্নগর থেকে আসেন প্রবীর কর। ড্রাফটসম্যানশিপ (সিভিল) কোর্সে ভর্তি হয়েছেন তিনি। চব্বিশ বছরের যুবক সায়েন্স নিয়ে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছেন। এক বছরের কোর্সে ন' মাস শেষ হয়েছে। প্রবীরের অনেক বন্ধু এখান থেকে পাশ করে ভালো ভালো চাকরি পেয়ে গেছেন। বন্ধুদের দেখে উৎসাহিত হয়ে তিনি চলে এসেছেন ভি টি কলেজে। বললেন, 'আমাদের শিক্ষক রামকৃষ্ণ রায় খুবই যত্নের সঙ্গে আমাদের পড়ান। আমি আশা করি, কোর্স শেষ করার পর একটা চাকরির জন্য আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না।'

I am an assistant Talmud Torah, Bowbazar. I
Freeschool and Talmud Torah, Bowbazar. I
have taken my teachers' training from David
Hare College of Correspondence, Lal Bazar
Street. I am grateful to this college because
this training has helped me to teach my
students in a more scientific method.

Kaberi Mallick

প্রশংসাপত্র

যাঁরা আজ প্রতিষ্ঠিত

সুনীল দাস

রবীন্দ্রনাথ পাঁজা

অঘটন আজও ঘটে। এটা শুধুমাত্র প্রবাদের কথা নয়। বাস্তবে ঘটেছে শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাঁজার জীবনে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাথম্যাটিক্সে অনার্সের ছাত্র ভি· টি· রবীন্দ্রবাবু মাত্র ১৫ মাসের ট্রেনিং নিয়েছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ। শুধু ট্রেনিং-এ পাশ করার প্রতিশ্রুতি নয় চাকরিরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। কথা আর কাজে বিন্দুমাত্র অমিল হয়নি সেপ্টেম্বর মাসে রেজাল্ট আউট, পরের দিন হাতে পেলেন চাকরির ইনটারভিউ লেটার। এবারেও পাশ। বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত দেবসন্স প্রাইভেট লিমিটেডে। সিনিয়র সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার। শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাঁজা মনে করেন, বর্তমানে ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধান একমাত্র করা সম্ভব টেকনিকাল কোয়ালিফিকেশনের মাধ্যমে। বলা বাহুল্য, সে ব্যাপারে বৌবাজারের ভি· টি· কলেজ এক অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে।

ক্যাথলিন হেলেন ন্যাটাল

সিস্টার নিবেদিতা কলেজের মাত্র দু মাসের সিনিয়র টিচার ট্রেনিং কোর্সে পাশ করেই চাকরি পেয়েছেন ক্যাথলিন হেলেন ন্যাটাল। ছেষট্টি সালে স্কুল ফাইনাল পাশ করে আর এগুতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত আশার আলো দেখিয়ে তাঁর জীবনকে উজ্জ্বল করে তোলে সিস্টার নিবেদিতা কলেজ। বর্তমানে সেন্ট মেরি স্কুলের শিক্ষিকা ন্যাটাল আজ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন। সিস্টার নিবেদিতা ছাত্রী থেকে আজ নিজেই অসংখ্য ছাত্রীকে গড়ে তুলতে জীবন উৎসর্গ করেছেন। এখানেই তাঁর সাফল্য। তিনি গর্বিত।

এরা সুপারফাইটার্স!